রচনাবলী

সৈয়দ মুজতবা আলী

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৬

সম্পাদক

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সুমথনাথ ঘোষ

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা

শ্রীচুনী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ

সিল্ক স্ক্রীন ও

চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও মানসী প্রেস, ৭৩ মানিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে শ্রীপ্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

প্রকাশকের নিবেদন

ডক্টর সৈয়দ মুজতবা আলীর সহিত তাঁহার রচনাবলী প্রকাশের ব্যাপারে আমাদের অনেক আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল। আমাদের পরম দুঃখের বিষয়, সে আলাপ-আলোচনার বাস্তব পরিণতি তাঁহার হাতে তুলিয়া দিতে পারিলাম না। সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'দেশে-বিদেশে', কিন্তু তাঁহার অনেক রম্যরচনা 'দেশে-বিদেশে' গ্রন্থেরও পূর্বে লিখিত—সে কথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। তাঁহার সম্পূর্ণ রচনাসৃষ্টির বিষয়বৈচিত্র্য এমনই বিপুল ও বিভিন্নধর্মী যে গল্প-উপন্যাস রচয়িতা কথাসাহিত্যিকদের রচনার মত তাহার শ্রেণীবিভাগ করা দুঃসাধ্য। যেহেতু রম্যরচনাই তাঁহার লেখনীর প্রথম সৃষ্টি, এই কারণে রচনাবলীর প্রথম দিকের খণ্ডগুলিতে প্রধানত রম্যরচনার গ্রন্থগুলিই অন্তর্ভুক্ত করা হইল। এই রচনাবলী প্রকাশের কাজে ডক্টর আলীর আত্মীয়-স্বজন অগণিত বন্ধু-বান্ধবের নিকট হইতে যে উপদেশ-পরামর্শাদি পাইয়াছি, তাহার জন্য আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ডক্টর আলীর মধ্যম-অগ্রজ সুপণ্ডিত সৈয়দ মুর্তাজা আলী তাঁহার লিখিত ডক্টর আলীর জীবনীটি এই রচনাবলীতে সংযোজিত করিবার অনুমতি দিয়া আমাদের ঋণবদ্ধ করিয়াছেন।

সূচীপত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী (জীবনী)	সৈয়দ মুর্তাজা আলী	৴০
কথারসিক সৈয়দ মুজতবা আলী	প্রমথনাথ বিশী	।৵০
ভূমিকা	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	॥০
পঞ্চতন্ত্র ১ম পর্ব		
বই কেনা	...	৩
কাইরো	...	৭
পুলিনবিহারী	...	১১
আহারাদি—	...	১৩
নেতাজী	...	১৬
রোগক্ষয়—শিক্ষালাভ	...	১৯
ইস্কিলাস—শেলি—স্পিটলার	...	২৪
মোপাসাঁ—চেখফ—রবীন্দ্রনাথ	...	২৭
অনুবাদ সাহিত্য	...	২৯
'কলচর'	...	৩২
ঝর্ণা	...	৩৪
প্যারিস	...	৩৬
আজব শহর কলকেতা	...	৩৮
কিসের সন্ধানে ?	...	৪০
ভক্তি	...	৪৬
'আমার ভাণ্ডার আছে ভরে—'	...	৪৯
মার্জারনিধন কাব্য	...	৫৪
বেদে	...	৫৮
ভাষাতত্ত্ব	...	৬১
সিনিয়র এপ্রেন্টিস্	...	৬৩
দাম্পত্য জীবন	...	৬৫
পঁচিশে বৈশাখ	...	৬৮
তোতা-কাহিনী	...	৭০
ত্রাহি বিশ্বকর্মা	...	৭২
রেডুক্‌ৎসিয়ো আড্‌ আবসুর্ডুম !	...	৭৪
ইয়োরোপে ভারতীয় শাস্ত্র-চর্চা	...	৭৭
চরিত্র পরিচয়	...	৭৯
আড্ডা	...	৮১
ধূপ-ছায়া	...	৯০
মেশেদিনী	...	৯২
কোন্-ভিনারের মা	...	৯৭

কোদণ্ড মুথহানা ... ১০৩
মাদ্রাজ উপকণ্ঠের বেলাভূমি ... ১২৫
আনিকি পাসিকিভি ... ১২৭
বিদেশে ... ১২৯

ময়ূরকণ্ঠী

গুরুদেব ... ১৫১
নন্দলালের দেয়াল ছবি ... ১৫৪
বড় দিন ... ১৫৫
পাণ্ডা ... ১৫৭
গীতা-রহস্য ... ১৬০
বন ... ১৬২
'নেভা'র রাধা ... ১৬৪
বর্বর জর্মন ... ১৬৭
ফরাসী—জর্মন ... ১৭২
'এ তো মেয়ে মেয়ে নয়...' ... ১৭৩
স্বয়ংবরচক্র ... ১৭৫
ইঙ্গ-ভারতীয় কথোপকথন ... ১৭৮
শিক্ষা-সংস্কার ... ১৮১
কোন গুণ নাই তার— ... ১৮৩
কালো মেয়ে ... ১৮৮
ঋতালী ... ১৯০
রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও ইয়োরোপীয় সুরধারা ... ১৯৩
শ্রমণ রিয়োকোয়ান ... ১৯৬
প্রব্রজ্যা ... ২০৪
কিংবদন্তীচয়ন ... ২১১
মহাপরিনির্বাণ ... ২১৬
ফুটবল ... ২১৮
বেমক্কা ... ২২১
আমরা হাসি কেন ? ... ২২৩
গাইড ... ২২৫
আচার্য তুচ্চি ... ২২৬
নিশীথদা ... ২২৯
পরিমল রায় ... ২৩১
মপাসাঁ ... ২৩৩
রামমোহন রায় ... ২৩৫

বিশ্বভারতী	...	২৩৭
নাগা	...	২৪০
হিন্দু-মুসলমান কোড বিল	...	২৪১
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৪৬
'জিদ-ওয়াইল্ড্'	...	২৪৮
এষাস্য পরমাগতি	...	২৫০
দিস্ ইয়োরোপ	...	২৫২
শমীম	...	২৫৪
দীনেন্দ্রনাথ	...	২৫৬
ভারতীয় নৃত্য	...	২৫৮
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — নির্বাসিতের আত্মকথা	...	২৬৩
জয়হে ভারতভাগ্যবিধাতা	...	২৭০
ইন্দ্রলুপ্ত	...	২৭৪
নয়রাট	...	২৭৫
আজাদ হিন্দ ফৌজের সমরসংগীত	...	৩০৬

স্বন্দ্বমধুর

নোনাজল	...	৩০৯
নোনামিঠা	...	৩১৭
মণি	...	৩৩১
চাচা-কাহিনী	...	৩৪১
বাঁশী	...	৩৫২
গ্রন্থ-পরিচয়	...	৩৫৭

সৈয়দ মুজতবা আলী

সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্ম হয় ১৯০৪ সালের শেষের দিকে করিমগঞ্জ শহরে। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের আগে করিমগঞ্জ শহর সিলেট জেলার ভিতরে ছিল। বর্তমানে করিমগঞ্জ আসাম প্রদেশের কাছাড় জেলার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের পিতা সৈয়দ সিকান্দার আলী (পরে খানবাহাদুর) তখন সেখানে রেজিস্ট্রেশন বিভাগে চাকরি করতেন। আমাদের আম্মার নাম আমতুন মন্নান খাতুন।

মুজতবা আলীর বাল্যজীবনের একটি ঘটনা থেকে তার সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। তার বয়স যখন পাঁচ তখন মিঃ জে. হেজলেট আই. সি. এস. (ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ রেজিস্ট্রেশন) আসেন চাড়াভাঙ্গায় বাবার অফিস পরিদর্শন করতে। সেই নিভৃত পল্লীঅঞ্চলে ইংরেজ সাহেবের আগমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। অফিসের বারান্দা লোকে লোকারণ্য। সাহেব নিবিষ্ট মনে অফিসের কাজ পরিদর্শন করছেন। তাঁর বাম হাতে বাঁধা মূল্যবান হাতঘড়ি। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে মুজতবা আলী সাহেবের কবজিতে বাঁধা রিস্টওয়াচে হাত রাখল। হেজলেট সাহেব ছিলেন অমায়িক ব্যক্তি। তিনি হেসে জানতে চাইলেন ছেলেটি কে? বাবা কাছেই ছিলেন। পুত্রের আচরণে লজ্জিত হলেন। সাহেব হেসে বললেন, 'নেভার মাইন্ড, হি উইল বি এ জিনিয়াস!' এই ঘটনাটি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সৈয়দ মুস্তাফা আলীর আত্মস্মৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ছাত্রজীবনেই তার সাহিত্যপ্রীতির উন্মেষ ঘটে। তখনই সে ছিল ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের উৎসাহী পাঠক। তখন সবেমাত্র কান্তিচন্দ্র ঘোষের রুবাইয়াতের অনুবাদ প্রমথ চৌধুরীর ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মুজতবা আলীর ঝোঁক চাপল রুবাইয়াতের বিভিন্ন বাংলা ও ইংরাজী অনুবাদ সংগ্রহ করার দিকে। সে ফিটজেরাল্ডের অনুবাদের বিভিন্ন সংস্করণ উইণ্ডফিল্ডের অনুবাদ সত্যেন দত্ত ও কান্তি ঘোষের অনুবাদ সংগ্রহ করে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ত। পরবর্তী জীবনে নজরুল ইসলামের রুবাইয়াতের অনুবাদে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সরস ভূমিকা লেখে। ১৯২১ সালে দেশে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বন্যা আসে। সৈয়দ মুজতবা আলী তখন সিলেটে সরকারী হাই স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে। সে তখন ক্লাসের ফার্স্ট বয়। সরস্বতী পূজার সময়ে কয়েকটি হিন্দু ছাত্র ডেপুটি কমিশনারের বাংলো থেকে ফুল চুরি করে। পরের দিন ডেপুটি কমিশনার ডসন সাহেব (I. A. Dawson) চুরির খবর পেয়ে দোষী ছেলেদের ডেকে পাঠান। ছেলেরা উপস্থিত হলে ডেপুটি কমিশনারের হুকুমে চাপরাসীরা ছেলেদের দু-এক ঘা বেত মারে। তখন দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত। ছেলেরা আরম্ভ করল ধর্মঘট। কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গুনলেন।

তখন যেসব সরকারী কর্মচারীর পুত্রেরা ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল তাদের অভিভাবকদের উপর কর্তৃপক্ষ চাপ দিলেন। আমার বাবা তখন ডিস্ট্রিক্ট সাবরেজিস্ট্রার। (আসামে তখন এ চাকুরির নাম ছিল—স্পেশাল সাব-রেজিস্ট্রার।) ডেপুটি কমিশনার বাবাকে ডেকে নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। বাবা মুজতবাকে স্কুলে ফিরে যেতে বলেন। মুজতবা আলী কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তার মনোভাব অনমনীয়। সে কিছুতেই স্কুলে ফিরে যেতে রাজী হল না। আমার বাবার মনে হল তাকে সিলেটের রাজনৈতিক আবহাওয়া থেকে দূরে সরাতে পারলে বোধ হয় সব দিক দিয়ে সুবিধা হবে।

ইতিপূর্বে ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন সিলেটে আসেন তখন তিনি ছাত্রদের কাছে আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। মুজতবা আলীর বয়স তখন চৌদ্দ বছর। বক্তৃতা শুনে কারও সঙ্গে পরামর্শ না করে সে রবীন্দ্রনাথের কাছে চিঠি লেখে। চিঠিতে জিজ্ঞাসা ছিল, 'আকাঙ্ক্ষা উচ্চ করতে হলে কি করা প্রয়োজন?' রবীন্দ্রনাথ সিলেট থেকে আগরতলা গিয়েছিলেন। কবির সিলেট ত্যাগের সপ্তাহখানের পরে আশমানী রঙের খামে ও আশমানী রঙের চিঠির কাগজে মুজতবা আলীর নামে আগরতলা থেকে কবির নিজের হাতের লেখা জবাব এল। ১০।১২ লাইনের এই চিঠির মর্ম ছিল, 'আকাঙ্ক্ষা উচ্চ করিতে হইবে—এই কথাটার মোটামুটি অর্থ এই—স্বার্থই যেন মানুষের কাম্য না হয়। দেশের মঙ্গলের জন্য ও জনসেবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ কামনাই মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়। তোমার পক্ষে কি করা উচিত তা এতদূর থেকে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে তোমার অন্তরের শুভেচ্ছাই তোমাকেই কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে।' অপ্রত্যাশিত এই চিঠি আমাদের পরিবারে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। তখন থেকেই বিশ্বকবির সান্নিধ্যলাভের আগ্রহ মুজতবা আলীর হৃদয়ে জাগ্রত হয়। বাবা তাকে সরকারী স্কুলে ফিরে যেতে বললে সে শান্তিনিকেতন যাওয়ার ইচ্ছা প্রকার করে। তখন সবেমাত্র বিশ্বভারতী স্থাপিত হয়েছে। মুজতবা আলী বোধ হয় বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগে প্রথম বাইরের ছাত্র। তখন রবীন্দ্রনাথ নিজেই বিশ্বভারতীতে পড়াতেন। মুজতবা আলী তাঁর কাছে বলাকা, শেলি ও কীট্‌সের কাব্য অধ্যয়ন করার সৌভাগ্য লাভ করে। একাদিক্রমে পাঁচ বছর অধ্যয়ন করে সে বিশ্বভারতীর স্নাতক হয়। মুজতবা আলী ও গুজরাটের বাচ্চুভাই শুক্লাই বোধ হয় বিশ্বভারতীর প্রথম বছরের গ্রাজুয়েট।

বাল্যকালে মুজতবা আলীর চেহারা অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তার বর্ণ গৌর ছিল। মুখের রেখা ছিল ধারালো। শেষ জীবনের মাথাজোড়া টাক থেকে তার যৌবনকালের চেহারার হদিস পাওয়া কঠিন ছিল। বাস্তবিকই সে যৌবনে ছিল কাঞ্চনকান্তি সুপুরুষ। তার ডাকনাম ছিল সিতারা বা নক্ষত্র। সিতারা শব্দ পরে সিতু রূপে সংক্ষিপ্ত হয়। তাই মুজতবা আলী মার্জার-নিধন কাব্যে লিখেছে—

"বাণীরে বন্দিয়া কেচ্ছা খতম বয়ান
দীন সিতু মিয়া ভণে শুন পুণ্যবান।"

শান্তিনিকেতনের পড়া শেষ করে মুজতবা আলী কিছুকাল আলিগড়ে পড়াশুনা করে। সেখানকার পরিবেশ তাকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। যদিও সে সেখানে জনপ্রিয়তা অর্জন করে ও ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়।

এই সময়ে তার কাবুল যাওয়ার সুযোগ হয়। আমানুল্লাহ্ খান তখন আফগানিস্থানে ব্যাপক শিক্ষা সংস্কারে মনোযোগী হয়েছেন। শান্তিনিকেতন থেকে ফরাসী অধ্যাপক বেনোয়া ও রাশিয়ান অধ্যাপক বগদানভ্ তখন কাবুলের শিক্ষাবিভাগে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের সাহায্যে সে কাবুল শিক্ষা-বিভাগে চাকরি পায়। তার দায়িত্ব ছিল কৃষিবিজ্ঞান কলেজে সাধারণ বিষয়ে অধ্যাপনা। কাবুলে প্রায় দুই বছর থেকে সে ১৯২৯ সালের মাঝামাঝি দেশে ফিরে আসে। ইতিমধ্যে বাচ্চাই সাকো কাবুলের বাদশাহ হয়েছেন। পড়াশুনার কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আফগানিস্তান থেকে ফিরতে তাকে অনেক বেগ পেতে হয়। আমার আব্বা তৎকালীন ভারতীয় লোকসভার সহ-সভাপতি। সিলেটের সুসন্তান আবদুল মতীন চৌধুরীর সাহায্যে মুজতবা আলী দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে। মুজতবা আলীর কাবুল-প্রবাসজীবনের সরস বর্ণনা আছে 'দেশে-বিদেশে' বইতে। কাবুল থেকে ফিরে এলে মুজতবা আলী বিদেশে যেতে আগ্রহী হয়। এই সময় বিশ্বভারতীর ডিগ্রী বিদেশে স্বীকৃতিলাভ করে নি। শুধু ব্রিটিশের হাতে পরাজিত জার্মান সরকার বিশ্বভারতী ও জামিয়ামিলিয়া ইত্যাদি স্বদেশী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দিত। মুজতবা আলী Wilhelm Humboldt নামক জার্মান প্রতিষ্ঠান থেকে একশত পঞ্চাশ টাকা মাসিক বৃত্তি লাভ করে। এই বৃত্তি জার্মানীতে পড়াশুনা নির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। আমি তাকে মাসে একশ টাকা করে পাঠাতাম। মুজতবা আলী প্রথমে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু বার্লিনের মত বড় শহরের হট্টগোল তার সহ্য হয় নি। কয়েক মাস পরে সে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়। এখানে দুই বছর পড়াশুনা করে সে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী অর্জন করে। তার গবেষণার বিষয় ছিল 'The origin of the khozhas and their religious life to-day'. জার্মানী থেকে শিক্ষা সমাপন করে সে ১৯৩২ সালে দেশে ফিরে আসে।

এর পর সে পুনরায় ইউরোপ যায় ও ইউরোপ থেকে কায়রো গিয়ে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। সে যখন কায়রোতে তখন বরোদার মহারাজা সয়াজীরাও গাইকোয়াড় আল-আজহার পরিদর্শনে যান।

এখানে মহারাজাকে মুজতবা আলীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। মহারাজা তার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন এবং দেশে ফিরলে তাকে মহারাজার সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করেন। ১৯৪৩ সালে দেশে ফিরে মুজতবা আলী বরোদায় যায়। মহারাজা তাকে বরোদা কলেজে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। মুজতবা আলী প্রায় আট বৎসর বরোদায় অধ্যাপনা করে। এই সময়ে সে গুজরাটের একখানি আরবী ইতিহাস সম্পাদনা করতে শুরু করে। এই কাজ সে শেষ করতে পারে নি। সয়াজীরাও মুজতবা আলীকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন ও বিদেশী পণ্ডিতদের কাছে পরিচিত করিয়ে দিতেন। মহারাজার মৃত্যুর

পর বরোদার পরিবেশ মুজতবা আলীর কাছে প্রীতিকর মনে হয় নি। তখন সে বরোদার চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলিকাতায় চলে আসে। এই সময় থেকে সে দীর্ঘকাল ৫ পার্ল রোড়ে তার বন্ধু আবু সৈয়দ আইয়ুবের সহচার্যে বাস করে। আইয়ুব যক্ষ্মরোগে আক্রান্ত হয়ে দক্ষিণ ভারতের মদনাপল্লী যান। মুজতবা আলী তাঁর অনুগমন করেন। এই সময়ে সে কিছুকাল বাঙ্গালোরে বাস করে। বাঙ্গালোরে অবস্থানকালেই সে দেশে-বিদেশে লেখার কাজে হাত দেয়।

মুজতবা আলী পরিণত বয়সে সাহিত্যকর্মে ব্রতী হয়। ১৩৪২ সালের মোহম্মদী পত্রিকায় তার মিশরের শিক্ষায়তন শীর্ষক একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯৩৯ সালে মে মাসে সে সিলেট শহরে কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করে। তার ভাষণ মাসিক মোহম্মদী ও সিলেটের আল-ইস্‌লাহ পত্রিকায় ছাপা হয়!

এর পর সে আনন্দবাজারে সত্যপীর ও টেকচাঁদ নামে একটি 'কলম' লিখতে আরম্ভ করে। মুজতবা 'রায়পিথৌরা' এই ছদ্মনামে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড কাগজেও লিখেছেন।

১৯৪৮ সালে সে দেশ পত্রিকায় 'দেশে-বিদেশে' লিখতে আরম্ভ করে। এই বই প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে। প্রকাশক ছিলেন নিউ এজ পাবলিশার্স। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই বই জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

রম্যরচনার ক্ষেত্রে নূতন প্রকাশভঙ্গিতে যে লেখক প্রথম জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তিনি যাযাবর। তাঁর অনবদ্য সুন্দর প্রথম গ্রন্থ 'দৃষ্টিপাত' বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে। এর পরেই মুজতবা আলী এই ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছে। তার রচনাশৈলীর একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। সে তার মনের ভাব বাচনভঙ্গীর ওপর এঁকে দিতে সমর্থ হয়েছিল। সে অনেক আরবী ফরাসী শব্দ ও পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক শব্দকে বাংলাভাষায় প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে। তার কলমের গুণে তার ব্যবহৃত নতুন শব্দ আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে গিয়েছে। তার ভাষায় ফরাসী গদ্যসাহিত্যের প্রাঞ্জলতা স্বচ্ছতা ও বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণতা দেখতে পাওয়া যায়। লঘুচালের ভাষায় বুদ্ধিদীপ্ত রচনাশৈলীতে চমক ও শ্লেষের ব্যবহারে সে এক অভিনব রম্যসাহিত্য সৃষ্টি করেছে। অতি সাধারণ ঘটনাকে তীক্ষ্ণ-পর্যবেক্ষণ-শক্তি আতস কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকে তীব্রতর স্বচ্ছ রূপপ্রদানের ক্ষমতা তার অসাধারণ।

মুজতবা আলী বগুড়া কলেজে অধ্যক্ষরূপে যোগদান করে। তার প্রগতিশীল মতবাদ কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখেন নি। তার বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ ছিল, কলেজ ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধে একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অশোভন মন্তব্য করা হয়েছিল। তার লেখা পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা পুস্তিকা কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখেন নি। এই সকল কারণে সে বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য হয় ও ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করে।

পরে সে প্রায় সাত বৎসর অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কটক স্টেশনের ডিরেক্টার ছিল। এই সময়টা তার সুখে কাটে। এসময় বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র

নবকৃষ্ণ চৌধুরী উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এর পরে সে পাটনা ও দিল্লীতে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সঙ্গে যুক্ত ছিল। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর চাকুরি করার আগে সে ভারত গবর্ণমেণ্টের Cultural Relation সংস্থার সেক্রেটারী ছিল। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর চাকরি ছেড়ে শান্তিনিকেতনে সে জার্মান ভাষা অধ্যাপনা করতো। পরে সে বিশ্বভারতীর ইসলামিক কালচার বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়।

মুজতবা আলী ছিল বহুভাষাবিদ। ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান ইত্যাদি ইউরোপীয় ভাষা ও আরবী, ফারসী, উর্দু, হিন্দী, সংস্কৃত, গুজরাটী, মারাঠী ইত্যাদি প্রাচ্য ও ভারতীয় ভাষার তার দখল ছিল। সে পনেরোটি ভাষা জানতো।

তার প্রকাশিত গ্রন্থের নাম নিম্নে দেওয়া গেল—দেশে-বিদেশে, চাচা-কাহিনী, পঞ্চতন্ত্র (১ম ও ২য় পর্ব), ময়ূরকণ্ঠী, অবিশ্বাস্য, ধূপছায়া, চতুরঙ্গ, দ্বন্দ্বমধুর, ভবঘুরে, টুনিমেম, দু'হারা, হাস্যমধুর, প্রেম, জলে-ডাঙায়, শবনম্, শহর ইয়ার, বড়বাবু, পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, কত না অশ্রুজল, হিটলার ইত্যাদি। দ্বন্দ্বমধুর মুজতবা আলী ও রঞ্জনের উভয়ের রচনার সংকলন। এ সকল বই ছাড়া তার শ্রেষ্ঠ গল্প, শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা, পছন্দসই, বহুবিচিত্র ইত্যাদি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। তার আর একখানা বই 'তুলনা-হীনা' তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে সে পূর্বদেশ পত্রিকায় 'পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়' নামে একটি ধারাবাহিক রচনা লেখে।

পূর্বে অ্যাসিস্টাণ্ট ডি. পি. আই. পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। মুজতবা আলীর দুই পুত্র সৈয়দ মশররফ আলী ও সৈয়দ জগলুল আলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজে পড়ছে।

মুজতবা আলী ছিল আমার আব্বার কনিষ্ঠ পুত্র। তার জন্মের পরেই আমার আব্বার চাকুরিতে উন্নতি হয়েছিল। এই কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতি আব্বা ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল। মুজতবা আলী বন থেকে ডক্টরেট নিয়ে এলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি মুজতবার থিসিস সর্বদা তাঁর সঙ্গে রাখতেন। তাঁর ওফাত হয় ১৯৩৯ সালে ৭৪ বয়সে। ১৯৪৮ সালে মুজতবা আলী সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। পরম পরিতাপের বিষয় আমাদের আব্বা মুজতবা আলীর সাহিত্যখ্যাতি চোখে দেখে যেতে পারেন নি।

সৈয়দ মুর্তাজা আলী

কথারসিক সৈয়দ মুজতবা আলী

দেশে-বিদেশে বইখানা প্রথম প্রকাশিত হওয়া মাত্র পাঠকসমাজ চমকে উঠল, আর তারপরে বইয়ের পরে বই প্রকাশিত হয়ে সেই প্রথম চমককে অব্যাহত রাখলো, শেষ পর্যন্ত সেই চমকের ভাব অব্যাহত ছিল—যদিচ পাঠকের চোখ তখন অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। লেখকের এই ক্ষমতা বিস্ময়কর ও বিরল।

সৈয়দ মুজতবা আলীর নাম আজ দুই বঙ্গে সুপরিচিত, শ্রেষ্ঠ লেখকগণের তিনি অন্যতম। আমার সৌভাগ্য এই যে পাঠক সমাজের কাছে লেখক রূপে পরিচিত হওয়ার অনেক আগেই আমার সঙ্গে তাঁর দেখা ও পরিচয় হয়েছিল। আমার হাতের কাছে কয়েক খণ্ড শান্তিনিকেতন পত্রের পুরাতন ফাইল আছে, তার মধ্যে চোখে পড়লো ১৯২৬ সালে যে সব ছাত্র-ছাত্রী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন সেই তালিকায় সৈয়দ মুজতবা আলী নামটি। ঠিক কোন্ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন মনে নেই, ১৯২১ বা ১৯২২ হওয়া সম্ভব। তাঁকে প্রথম দেখে Curram অঙ্কিত শেলীর ছবির মুখ মনে এসেছিল, সেই উজ্জ্বল উদাস চোখ, সেই এলোমেলো চুলের অজস্রতা, সেই মুখমণ্ডলের ছাঁদ। অপরে এই মিল লক্ষ্য করেছিলেন কিনা জানি না। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করে কলেজে গেলেন না, শান্তিনিকেতনেই কিছু কিছু বিদেশী ভাষা শিখতে শুরু করলেন। কবে তিনি সে-স্থান পরিত্যাগ করলেন এখন আর মনে নেই, আমি ১৯২৭ সালে পরিত্যাগ করেছিলাম, হয়তো তার কিছু পরেই। এবার তাঁর আরম্ভ হল বিদেশ ভ্রমণের পালা—জার্মানীর প্রতি বিশেষ টান ছিল তাঁর। তখন এবং তারপরে একাধিকবার জার্মানীতে গিয়েছেন, ইউরোপের অন্য দেশেও। জার্মান ফরাসী প্রভৃতি বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করে গিয়েছিলেন। ভাষা শিক্ষাতেই তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। ফরাসী ভাষা বেশ ভালো জানতেন।

এই সময়টার তাঁর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, বন্ধুদের মুখে শুনতে পেতাম তিনি কখনো কাবুলে, কাবুল কলেজের আহ্বানে কলেজের অধ্যাপক, কখনো শুনতে পেতাম বরোদা কলেজের অধ্যাপক। তারপরে একদিন শুনলাম দেশে ফিরেছেন, আপাতত বিদেশের পালা শেষ। দেখাও হ'ল। এবারে এসে অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হলেন, কখনো পাটনায়, কখনো দিল্লীতে। কিন্তু কোথাও স্থায়ীভাবে বসতে পারলেন না, তাঁর মধ্যে যে ভবঘুরেটা ছিল ঘুরিয়ে মারতো সে। তা ছাড়া চাকুরির ছক-কাটা জীবন তাঁর পছন্দ নয়। অবশেষে সমস্ত চাকুরি পরিত্যাগ করে মুক্ত-পুরুষ হয়ে ফিরে এলেন বাংলাদেশে। তখন তাঁর আয়ের একমাত্র পথ কলম। কলম তাঁকে জীবনের শেষ পর্যন্ত খোরাক যুগিয়েছে।

আগে বলেছি তাঁর বিদেশ ভ্রমণের পালা শেষ হল। তবে শেষ হয়েও শেষ হল না, রূপান্তরিত হয়ে দেখা দিল দেশে-বিদেশে গ্রন্থরূপে। এখানাই তাঁর

শ্রেষ্ঠ বই, সেই সঙ্গে পঞ্চতন্ত্রকে ধরা যেতে পারে। তাঁর বহির্মুখী মনের পরিচয় দেশে-বিদেশে, আর বহুমুখী মনের পরিচয় পঞ্চতন্ত্রে। সমস্তর মূলে তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর সেই সঙ্গে জীবন সম্বন্ধে কৌতূহল। তাঁর রচনার স্টাইলকে অনায়াসে বৈঠকী চাল বলা যেতে পারে, এ যেন আসর জমিয়ে কথা বলছেন আর সে-সব কথা অনায়াসে কলমের মুখে ঝরছে, কলম তাঁকে এতটুকু বিকৃত করতে পারেনি। এ বড় শক্ত কাজ। অবনীন্দ্রনাথের পথে বিপথে এই চালে রচিত, সে যেন লেখকের হয়ে কলম কথা বলে চলেছে। তবে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুজতবা আলীর রচনার পার্থক্য এই যে তাঁর ভাষায় দেশী-বিদেশী, বিশেষ উর্দু-ফারসির অনায়াস ও অঙ্গাঙ্গী মিশ্রণ, কোথাও এতটুকু ফাটল নেই। কাজী নজরুল ইসলাম যা করেছেন পদ্যে, সৈয়দ মুজতবা আলী তাই করেছেন গদ্যে। এ আলালের ঘরের দুলালের ফারসি-বহুল বাংলা নয়—বাংলার সঙ্গে ফারসি মিশিয়ে এক নূতন ধাঁচ—অথচ কখনো অবাংলা বলে মনে হয় না। বৈঠকী রীতির এই বিশেষ স্টাইল বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রধান দান। দ্বিতীয় দান দেশ-বিদেশের আবহাওয়াকে বাঙালীর মনের আবহাওয়ার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া। তৃতীয় দানের কথা বলতে হলে প্রথম দানের উল্লেখ করতে হয়, মনীষাকে বৈঠকী রীতিতে প্রকাশ। বিদ্যা আছে অথচ বিদ্যার ভার নেই—এ যেন চন্দ্রলোকের আবহাওয়ায় ভারের লঘুভবন। তিনি পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু কোথাও পণ্ডিতী করেন নি—সেই জন্যে সাধারণ পাঠকেরও আকর্ষণ তাঁর রচনার প্রতি। তাঁর অকাল মৃত্যু একটি সম্ভাবনাকে হঠাৎ ছিন্ন করে দিল, কেবলই মনে হতে থাকে না-জানি আরও কী ছিল তাঁর রহস্যময় ঝুলিটার মধ্যে!

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ভূমিকা

সৈয়দ মুজতবা আলী বা আমাদের সৈয়দদার রচনাবলীর ভূমিকা আমি লিখতে বসেছি, এ সংবাদটি তিনি জীবিতকালে পেলে তখনই কাগজ কলম নিয়ে বসে যেতেন এবং সেই মজার ঘটনাটা নিয়েই পঞ্চতন্ত্রের একটা অধ্যায় লিখে ফেলতেন, আর রচনাটি যে খাসা হ'ত—সে বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ।

ঘটনাটা হাস্যকর বটে, হয়ত সৈয়দদার পক্ষে শোচনীয়ও। কিন্তু কি করব বলুন, যদি আর কেউই লিখতে সাহস না করেন, একজনকে তো অগ্রজকৃত্য, বন্ধুকৃত্য করতেই হয়। আমার দিক থেকে একটা প্রশংসার দাবী এই করতে পারি যে, তাঁর মুখ চেয়ে হাস্যাস্পদ হবারও ভয় করি নি। দেবদূতরা যেখানে পা ফেলতেও ভয় পান, সেখানে আহাম্মুকরা অনায়াসে ছুটে আসে—এই অবশ্যবর্ষণীয় বিদ্রূপবাক্য ভাগ্যে আছে জেনেও, অথবা জেনেই, এ কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছি।

তবে সাফাই একটা আছে। সেটা সৈয়দদাই দিয়ে গেছেন। তিনি নেতাজীকে উপলক্ষ ক'রে যা বলেছেন, তা আমরা তাঁর বেলায়ও কাজে লাগাতে পারি।

"আমাদের মতো সাধারণ লোকের পক্ষে সুভাষচন্দ্রের মতো মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করা অন্ধের হস্তী দর্শনের ন্যায়। তৎসত্ত্বেও যে আমরা সুভাষচন্দ্রের জীবনী দর্শনে প্রবৃত্ত হয়েছি তার প্রধান কারণ, আমাদের মতো অর্বাচীন লেখকেরা যখন মহাপুরুষকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার জন্য ঐ একমাত্র পন্থাই খোলা পায়, তখন তার শ্রদ্ধাবেগ তাকে অন্ধত্বের চরমে পৌঁছিয়ে দেয় —শ্রদ্ধা ও ভক্তির আতিশয্য তখন আমাদের চেয়ে সহস্রগুণে উত্তম লেখককেও বাচাল করে তোলে।

"দ্বিতীয় কারণ, এক চীনা গুণী জনৈক ইংরেজকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরিজীতে বুঝিয়ে বলেছিলেন, 'সরোবরে জল বিস্তর কিন্তু আমার কাপ ক্ষুদ্র। জল তাতে ওঠে অতি সামান্য। কিন্তু আমার শোক নেই—মাই কাপ ইজ স্মল, বাৎ আই ড্রিঙ্ক অফতেনার··· ।'

"আমাদের পাত্র ছোট, কিন্তু যদি সুভাষ-সরোবর থেকে আমরা সে পাত্র ঘন ঘন ভরে নিই তাহলে শেষ পর্যন্ত সরোবর নিঃশেষ হোক আর না-ই হোক, আমাদের তৃষ্ণা নিবৃত্তি নিশ্চয়ই হবে। আমার পাত্রে উঠেছে দুই গণ্ডূষ জল, অথবা বলব, আমি অন্ধ, হাত দিয়ে ফেলেছি সৌভাগ্যক্রমে দুটি দাঁতেরই উপর। অবশ্য সব অন্ধই ভাবে সে-ই সবচেয়ে মহামূল্যবান স্থলে হাত দিয়ে ফেলেছে।" [পঞ্চতন্ত্র, ১ম পর্ব, ষোড়শ মুদ্রণ, পৃঃ ১৭]

সৈয়দ মুজতবা আলী নেতাজী নন—তেমনি আমিও মুজতবা আলী নই। সুতরাং অন্ধের হস্তীদর্শনের উপমাটা এখানে বেমালুম খাটে। আর ঐ

কথাটাও—'মাই কাপ ইজ স্মল—বাৎ আই ড্রিংক অফতেনার।' অনেকবার অনেক রকম ভাবে সৈয়দদার রচনা দেখতে বুঝতে, তা নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করেছি ; তাতে আমার সামর্থ্যের বাটি যতই ক্ষুদ্র হোক—সে রসের কিছুমাত্র স্বাদ পাই নি, এমন হ'তে পারে না। সুতরাং সৈয়দসাহিত্যচর্চা আমার পক্ষে একেবারে অমার্জনীয় ধৃষ্টতা না-ও হতে পারে।

তবে, নির্বোধ হলেও, গেছো বোকা হয়ত নই (কে জানে, এই পংক্তিটি পড়ে পাঠক খুব একচোট হেসে নিচ্ছেন কিনা)। ঠিক ভূমিকা যাকে বলে তা আমি লিখতে বসি নি। মূল্যবান কোন গ্রন্থের যে সব ভূমিকা লেখা হয়, অন্তত যা রীতি—তাতে কিছুটা সমালোচনা থাকে, কিছুটা থাকে 'উজ্জ্বল অঙ্গুলি করে' গুণগুলো দেখিয়ে দেওয়া, 'অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া' চক্ষু উন্মীলিত ক'রে দেওয়ার প্রচেষ্টা। এক কথায় কিছু ব্যাখ্যার কাজ করা।

সৈয়দ সাহিত্যে এটা নিষ্প্রয়োজন। তাঁর রচনা দিবালোকের মতো পরিষ্কার, ঝরণার জলের মতো স্বচ্ছ—সেই রকমই সুস্বাদু, সুপেয়, স্বাস্থ্যকর। তাঁর রচনায় আবিলতা নেই, তা সোজাসুজি পাঠকদের হৃদয়ে পেঁছিয় এবং কিছুটা রসায়নের কাজ করে বলেই তিনি এত জনপ্রিয়। নইলে, তাঁর মতো পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনার পূর্ণ মূল্য দেওয়া, তার সমস্ত বক্তব্য বুঝে তার রসগ্রহণ করা অধিকাংশ সাধারণ পাঠকদের পক্ষে দুঃসাধ্য। তুলনাটা আর একটু দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যে আনতে গেলে বলতে হয়—তাঁর রচনা অনেকটা পায়েসের মতো। খাঁটি দুধ, কামিনী বা গোলাপ-সরু চাল, নলেন-গুড় সহযোগে প্রস্তুত পরমান্ন, সুস্বাদু ও লোভনীয় সন্দেহ নেই কিন্তু কিঞ্চিৎ গুরুপাক, সম্পূর্ণ জীর্ণ করা কঠিন। তবু, জীর্ণ না হ'লেও যেমন রসনামন অনির্বচনীয় ভাবে তৃপ্ত হয়—মুজতবা আলীর রচনা তেমনিই একটা তৃপ্তি দেয়, সবটা না বুঝে, রেফারেন্সগুলো না জেনেও অনেকটা আনন্দলাভে বাধা থাকে না। জ্ঞান বা পাণ্ডিত্যের কথা বাদ দিয়েও অনেক কিছু আছে তাঁর লেখাতে, আর তার আস্বাদে কোন বাধা নেই—কাঁটা-খোঁচা যাকে বলে—সেই জন্যেই আমাদের মতো গোলা লোকও পড়ে প্রচুর আনন্দ পান। ইলিশমাছ সৈয়দদার খুব প্রিয় ছিল—কিন্তু ভাগ্যে তাঁর রচনা অত কণ্টকা-কীর্ণ নয়, হিন্দুবিধবার নিরামিষ ব্যঞ্জনের মতো (এও সৈয়দদার প্রিয় অবশ্য) সুস্বাদু ও কিছু হয়ত গুরুপাক—তবু অনায়াসে অন্ধকারেও খেয়ে যাওয়া যায়। এ একটা মস্ত সুবিধে। সবটা, কি দিয়ে কি তৈরী, না বুঝলেও মোটামুটি রসাস্বাদনে বাধা থাকে না।

না, ব্যাখ্যা করারও যেমন প্রয়োজন নেই তেমনি সমালোচনা করারও না। আমি ওঁর সঙ্গে একমত, "সমালোচনা লেখার মতো শক্তি—দুষ্ট লোকে বলে শক্তির অভাব—আমার এবং আমার মতো অধিকাংশ লোকের নেই।.....আর কীই বা হবে সমালোচনা লিখে? কটা সুস্থ লোক সমালোচনা পড়ে?... আলগোছে তফাৎ থেকে সমালোচনা-প্রবন্ধে একটু-আধটু ঠোকর দেয়

অনেকেই—অর্থাৎ রোক্কা পয়সা ঢেলে মাসিকটা যখন নিতান্তই কিনেছে তখন পয়সার দাম তোলবার জন্যে একটু-আধটু খোঁচাখুঁচি করে। ফলে চারের রস যত না পেল বঁড়শির খোঁচাতে তার চেয়ে বেশী জখম হয়ে দুত্তোরছাই বলে তাসপাশাতে ফিরে যায়।"

ব্যাখ্যাও করব না সমালোচনাও করব না—তবে ভূমিকা নাম দিয়ে এ কী আবোলতাবোল লিখতে বসেছি?—স্বাভাবিক ভাবেই এ প্রশ্ন উঠতে পারে। হক কথাও। আমি বলব—ঐ অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো, আমি যেটুকু তাঁকে দেখেছি বুঝেছি—সেইটুকুই এখানে বলব। সহৃদয় পাঠকদের পছন্দ না হয় পড়বেন না। দয়া ক'রে এই পাতা কটা উল্টে যাবেন।

সৈয়দসাহিত্য পড়তে গিয়ে প্রথমেই আমার যা মনে হয়েছে, আমার বিশ্বাস আরও অনেক সুধী পাঠকের হবে—মুজতবা আলী মূলত কবি ছিলেন। চিরজীবন বেশির ভাগ গদ্য রচনা করে গেলেও তাঁর মন ছিল কবির মন, দৃষ্টি ছিল কবির দৃষ্টি। তাই যেখানেই দেখেছেন কোন অবিচার অত্যাচার, দুঃখ ও শোক, সুৎ নিরপরাধ লোকের শাস্তিভোগ, সেখানেই তিনি অতি সেণ্টিমেণ্টাল কোমলহৃদয় ব্যক্তির মতো হাহাকার ক'রে উঠেছেন। সে হাহাকারে কখনও ভাগ্যের প্রতি, বিধাতার সম্বন্ধে নিরুপায় ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে—কখনও মানুষের সম্বন্ধে প্রকট উষ্মা। তাঁর 'শমীম', 'ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার সমুখে ঘন আঁধার' রচনা দুইটি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হয়ত 'মৃত্যু'কেও এর মধ্যে ফেলা যায়। এমন কি যে আঘাত প্রত্যক্ষভাবে তাঁর ওপর আসে নি, যা তিনি নিজে দেখেন নি—তাও তাঁকে এক এক সময় কত বিচলিত করত তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'মৃত্যু' রচনাটি। মৃত্যুর এই অকরুণ ও অকারণ আঘাতগুলো যদিচ প্রধানত তাঁর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ওপরই—লেখাটা পড়লে মনে হয় তাঁকেও কম বাজে নি।

তা ছাড়াও—তাঁর আপাতচটুল মজলিসী লেখার মধ্যে যেখানে যেখানেই তিনি প্রসঙ্গত কোন কাহিনী বলতে বসেছেন—সেখানেই দেখবেন করুণ কোন ঘটনা—করুণ বললেও ঠিক বলা হয় না—প্যাথেটিক* অভিজ্ঞতা। যেমন কোদণ্ড মুথহানার, শামসাদবানুলয়লার ইতিহাস। এই ধরনের ব্যথাতুর, ভাগ্যের-হাতে-মার খাওয়ার কাহিনী তাঁর অজস্র রচনায় মণিমুক্তোর মতো ছড়ানো রয়েছে। 'পছন্দসই' বইয়ের লেখাগুলো তিনিই সাজিয়েছিলেন—তাঁর নিজের প্রিয় লেখার সংকলন হিসাবে—তাতে দেখুন, প্রায় সব রচনাই আসলে এই ধরনের করুণ বা প্যাথেটিক কাহিনী। এগুলি সবই তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বিবৃত করা—হয়ত সামান্য একটু হেরফের অদলবদল আছে, কিন্তু সত্য ঘটনার এক সের দুধে পাঁচপো জল পড়ে নি। 'ক্রন্দসী' গল্পই ধরুন না কেন—বলে-কয়েই শুধু নামটা পাল্টেছেন নায়িকার। বাকী সবই সত্য। তাঁর গুরুদেবের ভাষাতেই বলতে হয়—"শান্তি কোথায় মোর তরে হায় বিশ্বভুবন মাঝে অশান্তি যে আঘাত করে তাই তো বীণা বাজে!"

* অভিধানে অর্থ লেখা আছে 'হৃদয়স্পৃক।'

অশান্তি শুধু নয়,—"অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ/কুটিল কুৎসিত ক্রূর, এর পরে তব অভিশাপ/বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জুনের অগ্নিবাণ সম/তুমি সত্য-বীর, তুমি সুকঠোর নির্মল নির্মম/করুণ কোমল।" রবীন্দ্রনাথ, সৈয়দদারই গুরুদেব তাঁর আর এক প্রিয় কবি সত্যেন দত্তর সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন, তাঁর নিজের বেলাতেও হুবহু তাই খাটে। সত্যবীর না হোক, লেখার সময় কিছুকাল সত্যপীর নামও নিয়েছিলেন সৈয়দদা। 'এর পরে তব অভিশাপ/বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জুনের অগ্নিবাণ সম'—এ দৃষ্টান্ত তাঁর রচনায় ভুরি ভুরি। অথবা বলা যায়, এ ছাড়া কিছু নেই।

মুজতবা আলীর রচনা পড়তে শুরু করলে প্রথম একটা আল্‌তো ধারণা হ'ত—তিনি হাসাতে বসেছেন। কারও কারও এমনও ধারণা হ'ত—সাহিত্যের রাজদরবারে তিনি শুধু ভাঁড়ামি করতে চান। এমন কি—হায় হতভাগ্য দেশবাসী—অনেক পড়ার পরও এই ধারণা অনেকের যায় নি। তিনি মজলিসী গল্প বলতেন, আড্ডাবাজী ধরনে—সে কথা বলেও গেছেন বার বার—বলতে গেলে বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের তিনিই স্রষ্টা (সে কথায় পরে আসছি) কিন্তু সেটা আর যাই হোক, ভাঁড়ামি নয়। এ বিষয়ে তাঁর এক প্রিয়—অতি প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, পৃথিবীর বোধ করি সর্বশ্রেষ্ঠ ভাঁড়, একদা বিশ্ববাসীর ভোটে স্বীকৃত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাঁচ ব্যক্তির অন্যতম চার্লি চ্যাপলিনের অভিনয় বা নির্মিত ছায়াচিত্রের সঙ্গে (এসব ছবির গল্প হয় উনি নিজে লিখতেন, নয়ত বেছে বেছে নিজের মতো কাহিনীগুলিই নির্বাচন করতেন, নয়ত কাঠামোটা বলে দিয়ে অন্যকে দিয়ে লেখাতেন) তাঁর রচনাধারার অনেক মিল আছে। চার্লিরও হাসিটা যেমন ঠিক হাসি নয়—কান্নারই ছদ্মবেশ, মুখোশ, অথবা কান্নাকে ব্যঙ্গ করা—সৈয়দদার রচনাও তাই, হাসিতে অশ্রুতে মেশানো, অশ্রুর মাত্রাই বেশী; কোথাও কোথাও তা এসেছে সোজাসুজি, কোথাও বা এসেছে হাসির আড়ালে, তামাশার মুখোশ পরে। ব্যঙ্গবিদ্রূপ যা করেছেন, তার মধ্যেও ভাল করে (পড়লে) চেয়ে দেখলে দেখা যাবে—দুটি করুণ চোখের দৃষ্টি বেদনায় ছলছল করছে।

যথার্থ কবিপ্রকৃতি ছাড়া এ সম্ভব নয়। তিনি কবিতাও লিখেছেন—কিন্তু সে নগণ্য; তাঁর অনেক রচনার ফার্সী গজল বা রুবাইয়ের অনুবাদ করেছেন (সত্যেন দত্তর অনুবাদ পেলে সে চেষ্টা আর করেন নি) কিন্তু সেও কাব্যরচনা হিসেবে এমন কিছু উৎকৃষ্ট মানের নয়। আসলে তাঁর সমস্ত রচনাই মূলতঃ কাব্য, কাব্যধর্মীয় গদ্য—কবিতার মতো ক'রে সাজালে গদ্যকবিতা হ'তে পারত। যেখানে যেখানে তিনি নিসর্গ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন সেখানে তাঁর লেখনী ছদ্মবেশও রাখতে পারে নি। যেমন, দু-একটি উদাহরণই দিই—

"বসেছিলুম জলের আর জেলেপাড়ার মাঝখানে। পিছনে নারকেল বন—তাতে আগুন লাগিয়ে সূর্য প্রচণ্ড মহিমায় অস্ত গেলেন—গরবিনীর সতীদাহ। সমুদ্রের গর্জন আর ঢেউয়ে-ভেসে-আসা-পোনা-মাছ-লুব্ধ কাকের কর্কশ চিৎকার, নারকেল গাছের উসকোখুসকো মাথার অবিশ্রান্ত আছাড়

খাওয়া—অশান্তির চরম আয়োজন।···

"অন্ধকার নামল অতি ধীরে ধীরে। পাটরাণী তো চিতেয় উঠলেন লাল টকটকে হয়ে। আকাশ সিঁদুর মুছলেন অতি অনিচ্ছায়—এমেঘে ওমেঘে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে। সকলের শেষ পান্না জল লালে-নীলে মেশা বেগুনি ঝিলিক-টুকু মুছে ফেলে আস্তে আস্তে শ্যামলা সবুজ হলেন।

"কোনদিন আবার রঙের রাজা মাত্র তিনটি রঙ নিয়ে খেলায় বসেন। সমুদ্র আর পুবের আকাশকে দেন কালো-নীল, পশ্চিম আকাশকে একটুখানি গোলাপী আর মাথার উপর বাকী সমস্ত আকাশ পায় ফিকে ফিরোজা। যতক্ষণ না কালো পরদায় সব কিছু ঢাকা পড়ে যায়, ততক্ষণ শুধু এই তিন রঙের 'ফিকে ঘন'র খেলা। তাতে কতই না কারচুপি। এদিকে কালো-নীল যত ঘনিয়ে ঘনিয়ে নীলের রেশ কমাতে লাগল, ওদিকে তেমনি গোলাপী ফিকে হতে হতে শিরীষ রঙের আমেজ নিতে আরম্ভ করল। মাঝখানের আকাশ ফিরোজাতে শ্বেত-চন্দনের প্রলেপ লাগিয়েই যাচ্ছে। এ যেন তিন স্বর নিয়ে খেলা। আর তবলাও ঠিক বাঁধা। পশ্চিমের আকাশ যদি দ্রুত লয়ে রঙ বদলান তবে পুবও সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাল রাখেন। আর সমুদ্রের গর্জন যেন তানপুরোর আমেজ।

"সমে এসে যখন পুব-পশ্চিম মিলে গেল অন্ধকারে, তখন তানপুরোর রেশটুকু মাত্র রইল সাগরপারে। মশালচি এসে আসমানের ফরাশে এখানে-ওখানে তারার মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে গেল। এবার রাত্রির মুশায়েরা (কবিসঙ্গম) বসবে। নারকেল মাথা দোলাবে, ঝিঁঝি নূপুর বাজিয়ে নাচবে, পুবের বাতাস সভার সর্বাঙ্গে গোলাপজল ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করে যাবে। তার পর দূর সাগরের ওপারে লাল মদের ভাঁড় থেকে মাতাল চাঁদ উঠবেন ধীরে ধীরে পা টেনে টেনে, একটুখানি কাৎ হয়ে। মোসাহেবদের মুখে হাসি ফুটবে—অন্ধকারে যারা গা-ঢাকা দিয়ে বসেছিল তাদের সবাইকে তখন চেনা যাবে।

* * *

"দূর থেকে রোষে ক্রোধে তর্জনে-গর্জনে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে সিন্ধুপারে লুটিয়ে পড়ে অবশেষে এ কী বিগলিত আত্মনিবেদন!

"তাণ্ডবের ডমরু বাজিয়ে, ছিন্নমস্তার আত্মঘাতে নিজেকে বারে বারে দ্বিখণ্ডিত করে, পাড়ে এসে অবশেষে লক্ষ কিঙ্কিণীর এ কী মৃদু শান্ত নূপুর-গুঞ্জরণ!

"সূর্যোদয়ের লোহিতোজ্জ্বল রক্ত-টিপ, দ্বিপ্রহরের অতি ঘন নীলাম্বরি, সন্ধ্যার গৈরিক পট্টবাস, সর্বশেষে অন্ধকারে সর্বস্ব ত্যাগ করে কার অভিসারে সিন্ধুপারে মৃদুপদসঞ্চারণ!!" [পঞ্চতন্ত্র, ১ম পর্ব, ১৬শ মুদ্রণ, পৃঃ ১১-১৩]

"পশ্চিম বাঙলা যেখানে সত্যই সুন্দর সেখানেই দেখি তার উঁচু-নিচু খোয়াইডাঙা আর দূরদূরান্তের নীলাভ পাহাড়। উঁচু-নিচুর ঢেউ-খেলানো মাঠের এখানে ওখানে কখনো বা দীর্ঘ তালগাছের সারি, আর কখনো বা একা

দাঁড়িয়ে একটিমাত্র তালগাছ। এই তালগাছগুলো মানুষের মনে যে অন্তহীন দূরত্বের মায়া রচে দিতে পারে তা সমুদ্রও দিতে পারে না। সমুদ্রপাড়ে বসে মনে হয়, এই আধ মাইল দূরেই বুঝি সমুদ্র থেমে গিয়েছে—আকাশে নেমে গিয়ে নিরেট দেয়ালের মত হয়ে সমুদ্রের অগ্রগতি বন্ধ করে দিয়েছে।

"পশ্চিম বাঙলার খোয়াইডাঙা তাই তার শালতাল দিয়ে, দূর না হয়েও যে দূরত্বের মরীচিকা সৃষ্টি করে, সে মায়াদিগন্ত মানুষের মনকে এক গভীর মুক্তির আনন্দে ভরে দেয়। জানি, মন স্বাধীন; সে কল্পনার পক্ষিরাজ চড়ে এক মুহূর্তেই চন্দ্রসূর্য পেরিয়ে সৃষ্টির ওপার পানে ধাওয়া দিতে পারে, কিন্তু সে স্বপ্নপ্রয়াণে তো আমার রক্তমাংসের শরীরকে বাদ দিয়ে চলতে হয়—আমাকে দেখতে হয় সব-কিছু চোখ বন্ধ করে। আর এখানে আমার দুটি মাত্র চোখই আমাকে এক নিমেষে নিয়ে যায় দূর হতে দূরে, যেখানকার শেষ নীল পাহাড় বলে, 'আরো আছে, আরো দূরের দূর আছে'; সে যেন ডাক দিয়ে বলে, 'তুমি মুক্ত মানুষ, তুমি ওখানে বসে আছ কী করতে—চলে এসো আমার দিকে।'...

"পূব-বাঙলার সৌন্দর্য দূরত্বে নয়, পূব-বাঙলার 'মাঠের শেষে মাঠ, মাঠের শেষে/সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে' নয়, সেখানে মাঠের শেষেই ঘন-সবুজ গ্রাম আর গ্রামখানির উপর পাহারা দিচ্ছে সবুজের উপর সাদা ডোরা কেটে কেটে সুদীর্ঘ সুপারি গাছ। আর সে সবুজ কত না আভা, কত না আভাস ধরতে জানে। কচি ধানের কাঁচা-সবুজ হলদে-সবুজ থেকে আরম্ভ করে আম, জাম, কাঁঠালের ঘন সবুজ, কৃষ্ণচূড়া-রাধাচূড়ায় কালো সবুজ; পানার সবুজ, শ্যাওলার সবুজ, কচি বাঁশের সবুজ, ঘন বেতের সবুজ—আর ঝরে-পড়া সবুজ পাতার রস খেয়ে খেয়ে পূব-বাঙলার মা-টি হয়ে গেছেন গাঢ় সবুজ···কৃষ্ণশ্যাম। তাই তাঁর মেয়ের গায়ের রঙে কেমন যেন সবুজের আমেজ লেগে আছে। সে শ্যামশ্রী দেশ-বিদেশে আর কে পেয়েছে, আর কে দেখেছে?" [অবিশ্বাস্য, ২য় মুদ্রণ, পৃঃ ১০-১১]

কে জানে প্রথম যৌবনে বা কৈশোর বয়সে অতি ভীরু ভদ্র কোমল মন তাঁর—কোন প্রবল আঘাত পেয়েছিল কিনা, যার ক্ষত সারা জীবনেও শুকোয় নি—তা সামান্য দুঃখের কাঁটা লাগলেও তা থেকে রক্তক্ষরণ হয়েছে।

আমাদের এ অনুমানের কিছু সমর্থনও তারা রচনাতেই মেলে ঃ—

"আজ না হয় ঠাট্টা-মসকরা রঙ্গ-রসিকতা ক'রে মনের গভীর আবেগ, তার গোপন ক্ষুধা, তার অসম্ভব অসম্ভব স্বপন-চয়ন, তার বন্ধ পাগলামি যতখানি পারি ঢেকে চেপে বলছি কিন্তু তখন, হায়, এ হালকামি ছিল কোথায়?" [শবনম্, ২য় বিশ্ববাণী সং, পৃঃ ২৮]

উপন্যাসের নায়কের মুখেই বসেছে কথাগুলো—কিন্তু এ নায়ককে লেখকই নিজের সঙ্গে প্রায় একাত্ম করেন নি কি?

সম্ভবত তাঁর এই কবিপ্রকৃতি, বৈদগ্ধ্য এবং সত্যকার আভিজাত্যের জন্যেই তিনি পুরাতন 'সেন্স অফ ভ্যালুজ' বা মূল্যবোধের সমর্থক ছিলেন।

ভদ্রতা, শিষ্টাচার, মিথ্যা সম্বন্ধে ঘৃণা—সর্বোপরি কৃতজ্ঞতা—আজ যে গুণ-গুলোর গুণপনা হারিয়ে যেতে বসেছে, যাকে পৌরাণিক যুগের 'নন্‌সেন্স' বলে মনে করা হয়—সেগুলো সম্বন্ধে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। তাঁর রচনাতে—যার অধিকাংশ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রূপে তাঁর আত্মজীবনেরই অংশ—এই পুরাতন জগতের মূল্যবোধের, বিশেষত কৃতজ্ঞতাবোধের নিদর্শন অসংখ্য। সামান্যতম ঋণও, যা সে পক্ষ ঋণের কোন কারণ বা উপকার বলে মনেই করেন না—তাও প্রথম সুযোগেই উল্লেখ করেছেন।

আমরাও এসব বিষয়ে—বিশেষ জীবনের মূল্যায়নে—প্রাচীনপন্থী। (আমাদের বিশ্বাস অধিকাংশ পাঠকই তাই—নইলে সৈয়দদার বই এত বিক্রী হবে কেন ?), সেইজন্যই এই গুণগুলি ভদ্রলোক মাত্রেরই থাকা অত্যাবশ্যক বলে মনে করি। আর, কে না জানে সৈয়দদা সময়ে সময়ে যত বোহেমিয়ান জীবনই যাপন করুন না কেন—মনেপ্রাণে যথার্থ ভদ্রলোক ছিলেন। He was a gentleman first, other things afterwards. অন্য গুণ বা দোষ তাঁর জীবনে পরে - অনেক পরে।

তাঁর এই কৃতজ্ঞতাবোধেরই বড় নিদর্শন তাঁর প্রগাঢ় গুরুভক্তি। গুরুদেব বলতে তিনি রবীন্দ্রনাথকেই বুঝতেন, রবীন্দ্রসাহিত্য বিশেষ রবীন্দ্রসঙ্গীত (রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাঁর অসীম অনুরাগ তাঁর প্রতি রচনাতেই প্রকাশ পেয়েছে—একথা যদি বলি, বোধ হয় অত্যুক্তি করা হয় না) তার সঙ্গে যেন ওতপ্রোত ভাবে মিশে ছিল। হয়ত এমন ভাবে দেহের অস্থিতে মজ্জাতে, প্রতি রক্ত-কণিকায় পর্যন্ত না মিশে গেলেই ভাল হ'ত। যখনই গুরুদেবের প্রসঙ্গ এসেছে তখনই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা-ভক্তি—বোধ হয় তার চেয়েও বেশী—ভালবাসা। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে তিনি ভালই বাসতেন, বৈষ্ণবরা যেমন ভাবে তাদের ভগবানকে ভালবাসে—হয়ত সেই রকমই : সখারূপে, নাথরূপে।

রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে তাঁর সত্তায় মিশে না গেলেই হয়ত ভাল হ'ত—কথাটা বলেছি ভেবেই। রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে তিনি সুফী সাধকের, পীরের বাণী শুনতে পেয়েছিলেন, তার মধ্যে পেয়েছিলেন সেই সাধনার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। তাঁর শহরইয়ার উপন্যাসে শহরইয়ারকে তিনি বার বার এই কথাই বলেছেন, বোঝাতে চেয়েছেন। শহরইয়ার যখন স্বামী ছেড়ে সংসার ছেড়ে এক সুফী পীরের কাছে গিয়ে পড়ে থাকছে—তখন উনি (এ উপন্যাসের 'আমি' বা বক্তা লেখকের ব্যক্তিগত সত্তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম, একরূপ) রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাণীর দিকে তার মনোযোগ আকর্ষণ করছেন, বার বার কতকগুলি বিশেষ রেকর্ড বাজাতে বলছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিভূত করছেন, প্রভাবিতও করেছেন। তাই তাঁর উপন্যাসের মধ্যে যেটি প্রথম ও বোধ করি সর্বাধিক জনপ্রিয়—সেই 'শবনম'এ তাঁর অজ্ঞাতসারেই 'শেষের কবিতা'র প্রভাব এসে পড়েছে। সুভাষিত কথার মালা গেঁথে গেছেন, সেটা ক্রমশ যেন নেশার মতো পেয়ে বসেছে তাঁকে। তাতে উপন্যাসের ক্ষতি হয়েছে। কাহিনী দানা বাঁধতে পারে নি তেমন।

বোধ হয় লেখকও সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন, শেষের ট্র্যাজিক ঘটনাটি দিয়ে তাল সামলাবার চেষ্ট করেছেন—তবু, উপন্যাস হিসেবে যতটা সার্থক হওয়া উচিত ছিল তাঁর মতো বহু-সাহিত্যদর্শী রসবোদ্ধা লেখকের পক্ষে, তা হ'তে পারে নি।

তাঁর উপন্যাস 'শবনম' ও 'শহরইয়ার' দুয়ের নায়ক তিনি স্বয়ং। শহর-ইয়ারে তো একেবারে সম্পূর্ণরূপেই নিজেকে চিহ্নিত ক'রে দিয়েছেন। এটা যেমন একটা প্রচণ্ড বিস্ময়—এমন কি 'স্টাণ্ট' বললেও বিশেষ অপরাধ ঘটে না—তেমনি বিপুল অসুবিধারও কারণ হয়েছে।

তাঁর উপন্যাস সুলিখিত ও সুললিত তাতে সন্দেহ নেই। বহু করুণ মধুর শাখা কাহিনীতে ভরা—কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই—পণ্ডিত মুজতবা আলী বার বারই এসে ঔপন্যাসিকের কলম কেড়ে নিয়েছেন। তাঁর বলবার কথা অনেক, বলবার অধিকারও যথেষ্ট—প্রবৃত্তিও, তাঁদের পণ্ডিতের বংশ, বহু পুরুষের ঐতিহ্য রক্তে তার কাজ ক'রে যায়—তাঁর মধ্যে একটি সত্যকারের শিক্ষক ছিল—তিনি যা জানতেন তা, পাঠকদের গ্রহণ-ক্ষমতা কত, আধারের পরিধির মাপ বিচার না ক'রেই জানাবার জন্য ব্যগ্র ও ব্যস্ত হয়ে পড়তেন, বস্তুত না জানিয়ে থাকতে পারতেন না। তার ফলে কাহিনী বারে বারে হোঁচট খেত, কোথাও দানা বেঁধে ওঠার অবসর পেত না। তা সত্ত্বেও যে—শবনম ও শহর-ইয়ার—দুটি চরিত্র পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়েছে, সেইটেই ও'র লেখনীর বৈশিষ্ট্য, ধার; ও'র অসমান্য শক্তির পরিচায়ক।

এই দুটি উপন্যাসে লেখক স্বয়ং নায়ক বলে তত্ত্বালোচনার মাত্রা একটু বেশী হয়ে পড়েছে। অবিশ্বাস্য ও তুলনাহীনায় এই অসুবিধা নেই। বস্তুত উপন্যাস হিসেবে অবিশ্বাস্য অনেকটা পূর্ণাঙ্গ এবং সার্থক। এর নায়কের জীবনের সুগভীর ট্র্যাজেডি, তীব্র বেদনাময় অন্তর্দ্বন্দ্ব, ভাগ্যের হাতে মার খাওয়ার অসহায়তা—একটা পরিপূর্ণ রূপ নিতে পেরেছে। শেষের চিঠিটি একটু বক্তৃতা ও তত্ত্ববহুল, তৎসত্ত্বেও উপন্যাসের প্রকৃত গুণ বইটিতে বর্তমান।

বোধ হয় অবিশ্বাস্য উপন্যাসের নায়ক ঐ সাহেব চরিত্রের মূল মানুষটিকে—অন্তত অনেকটা ঐ রকম—লেখক কোথাও দেখে থাকবেন। এর ট্র্যাজেডি, এর সকরুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব—হয়ত কাল্পনিক, কোন তথ্যে নির্ভর ক'রে সে অনুমান গড়ে উঠেছিল—তাঁকে নাড়া দিয়েছিল, এ কাহিনী বহুদিন ধরেই মাথায় ছিল তাঁর, ভাবনার মধ্যে বহন করেছেন। টুনিমেম গল্পের ও'হারাই যে অবিশ্বাস্য উপন্যাসের ওরেলি তাতে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। এ কাজ তারাশঙ্কর চিরদিন ক'রে গেছেন, তাঁর বহু বিখ্যাত উপন্যাসই আগে বীজগল্পাকারে বেরিয়েছে।

মুজতবা আলী ঈশ্বরবিশ্বাসী খাঁটি মুসলমান ছিলেন। কিন্তু বহু শাস্ত্র—পৃথিবীর প্রায় তাবৎ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে অনায়াসে সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস ও

অসাম্প্রদায়িকতা—অথবা বলা উচিত উদার দৃষ্টি ও সম্প্রদায়নিরপেক্ষতা—তাঁর রচনার মধ্যে পাশাপাশি চলেছে বরাবর। এতটা কেউ ভেবেচিন্তে হিসেব ক'রে লিখতে পারে না, অন্তরের কথা, সহজ সত্য বলেই তা এমন ভাবে ফুটেছে।

তিনি সংস্কৃত ভাল জানতেন (যদিও বার বার আমাদের বলেছেন যে এ বিষয়ে তাঁর দাদারা 'জায়াণ্ট'—তিনি কিছুই নন, 'পিগমী'), মূল রামায়ণ মহাভারত পড়েছেন, আমাকে একবার কথায় কথায় স্মৃতি থেকে শান্তি পর্বে ভীষ্মের উক্তি এবং দ্যূতসভায় বিদুরের উক্তির মূল শ্লোক কয়েকটি উদ্ধার ক'রে শোনান। তাঁর রচনাতেও সে প্রমাণ আছে। গীতা বেদ ভাল ক'রেই পড়া ছিল। খাঁটি মুসলমান হিসাবে ইসলামকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে বিশ্বাস করতেন কিন্তু তার পরই যে ধর্মের শিক্ষার ওপর তাঁর অধিক আস্থা ছিল—তা হচ্ছে হিন্দু ধর্ম। এটা কথার কথা নয়, মুখোশও নয়। সে পরিচয় বলতে গেলে ওঁর রচনার ছত্রে ছত্রে আছে। পদাবলী কীর্তনের ওপর যার এত প্রগাঢ় অনুরাগ, রাধাকৃষ্ণর বিরহ-কাহিনী তাকে স্পর্শ করে নি—তা হ'তে পারে না।

তাঁর স্বভাবেই কোন কাপট্য বা হীনতা ছিল না। উত্তরকালে যারা শুধু তাঁর লেখাই পড়বে তারাও বুঝবে যে তিনি মনেপ্রাণে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন—এবং কোন সংকীর্ণতা তাঁর থাকা সম্ভব নয়। আগেও বলেছি এখনও বলছি—তিনি সর্বপ্রথম ও সর্বদা—ভদ্রলোক ছিলেন, ভদ্রতার সব রকম নিরিখে বিচার করলেও। যথার্থ ভদ্রলোক ও যথার্থ অভিজাত। এ বিষয়ে বংশপরম্পরা ঐতিহ্য তো ছিলই—তার ওপর পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের আলোকসামান্য প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের ছাপ—অন্য রকম হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, 'বড়বাবু' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর তাঁর যে অসীম অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল—যার পরিচয় আমরা বহু-বার পেয়েছি তাঁর সঙ্গে আলাপে আড্ডায়—যার পরিচয় তাঁর বহু রচনায়—অপরিমাণ ভক্তি—হয়ত বা, যাকে ইংরেজীতে বলে awe তাও—তাতেই বোঝা যায় তাঁর মনের গঠন ও গতি কোন্ দিক ঘেঁষা ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন শুদ্ধসত্ত্ব মানুষ, কোন মালিন্য তাঁকে কোনদিন স্পর্শ করতে পারত না, সম্পূর্ণ অহিংস—যে কারণে মহাত্মা গান্ধীও তাঁকে অন্তরঙ্গ-আত্মীয়তা-সূচক বড়দা বলে সম্বোধন উল্লেখ করতেন—আর ঠিক সেই কারণেই তিনি অবৈষয়িক অসংসারী ছিলেন, ফলে সাধারণ লোকে তাঁকে বদ্ধ পাগল ভাবত। এই লোককে যিনি ভক্তি করতে পারেন ভালবাসতে পারেন—(সে প্রমাণ তাঁর প্রখ্যাত রচনা 'বড়বাবু'তেই পাবেন পাঠকরা)—এঁর রচনা যিনি শ্রদ্ধাসহকারে পড়েন ও মতের মূল্য দেন—দ্বিজেন্দ্রনাথের 'গীতাপাঠ' বইখানি তাঁর বিছানায় বালিশের পাশে রাখা থাকত দেখেছি—যিনি এঁর মতকে সূফী-সাধকদের সঙ্গে তুলনীয় মনে করতেন—তিনি নিজেও কিছুটা অগ্রসর বৈকি!

তাঁর অন্তরে শুদ্ধ-সৎ চিন্তার, ঈশ্বরবিশ্বাসের একটা পাবক বহ্নি ছিল

—তার জন্যই যেন কোন আবর্জনা মনে জমতে পারত না, কোন অভ্যাসের দোষ তাঁর মনকে আবিল ক'রে তুলতে পারে নি। Self-purifying স্বতঃ শোধনশীল উচ্চচিন্তাই তাঁকে চিরদিন পঙ্কিলতা থেকে রক্ষা করে এসেছে। এই নির্মল মনের জন্যই তাঁর উপন্যাসগুলিতে কোন জঘন্য চিন্তা কি যৌন-মিলন-চিত্র স্থান পায় নি, গল্প বলতে বসে অমল পবিত্র প্রেমের কথা ছাড়া ভাবতে পারেন নি। 'অবিশ্বাস্য'তে ব্যভিচারের কথা আছে—বস্তুত স্বামী-স্ত্রীর যৌনমিলন বা তার অভাব, অভাবের ফলে ব্যভিচার—সমস্ত কাহিনীটার মূলে এ কথাই—তবু বই পড়ে শেষ করলে কোথাও আধুনিক মার্কিন (আমাদের দেশেও সে প্রবল বাতাস এসে পৌঁচেছে) উপন্যাসের মতো আঁশটে গন্ধ পাওয়া যায় না। দুটি নিরপরাধ জীবন কী ভাবে ভাগ্যের হাতে অকারণ অকরুণ মার খেল—সেই বেদনাতেই পাঠকের মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে, যৌন জীবনের প্রশ্ন প্রধান হয়ে ওঠে না। এ-ই তাঁর জীবনদর্শন। অন্তত অনেকখানি।

সৈয়দদার আগে বাংলাসাহিত্যে রম্যরচনার একেবারে অভাব ছিল না। ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়-দের রচনা হাস্যরসমধুর হ'লেও এগুলি আসলে রম্যরচনাই। যাযাবরের তো কথাই নেই। তাঁর 'দৃষ্টিপাত' রম্যরচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। দিলীপকুমার রায়—যিনি belles Lettres 'বেলে লেৎরস্'কে মঞ্জুভাষা নামকরণ করেছিলেন—তিনিও অনেক রম্যরচনা লিখেছেন। এঁদের কাছে বাংলাসাহিত্যের ঋণ অনেক। রাজশেখর বসু ও তাঁর পূর্বাচার্য অসামান্য শক্তিধর ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়—যিনি সে আমলেই একটি গল্পর জন্য পঞ্চাশ টাকা দক্ষিণা আদায় করতেন বলে শুনেছি—এঁদের আবির্ভাব অপ্রত্যক্ষভাবে সৈয়দ সাহিত্য-রচনার মূলে অনেক রসদ যুগিয়েছে। তবে মুজতবা আলীর লেখাগুলিতে রম্যরচনা ও রসসাহিত্য ছাড়াও কিছু আছে। একে কী নাম দেবেন - 'আড্ডাসাহিত্য' বললেই ঠিক বলা হয়, 'মজলিসী সাহিত্য' বললে অভিধানটার ওপর একটু পালিশ পড়ে। এই মজলিসী ঢং—অপর কেউ কেউ চেষ্টা করলেও—পরিপূর্ণ মজলিসী রচনায়—মুজতবা আলী বাংলাসাহিত্যে একক ও অনন্য।

'গালগল্পে'র মেজাজে, কর্মহীন অবসরের অলস উদ্দেশ্যহীন আড্ডার ঢঙে বলে গেলেও কথাগুলি অনেক কাজের কথায় ভর্তি; জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, শাস্ত্রচর্চা ও সার্থক বিচার-সমালোচনায় ঠাসা। আগেই বলেছি তাঁর মধ্যে একটি শিক্ষক ছিলেন, আলীদার স্বভাবে সেটাই প্রধান—তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে সেই শিক্ষকতা নাই—যাকে সহজ বাংলায় মাস্টারী বলে—প্রবল ও অগ্রগণ্য হয়ে উঠেছে। রসগোল্লা দিয়ে শটকে শেখানোর মতোই আড্ডাবাজী হালকা 'গল্পে'র সুগার-কোটিং বা মধুপ্রলেপ দিয়ে আমাদের অনেক মূল্যবান শিক্ষণীয় তথ্য ও সত্য শেখাতে জানাতে চেয়েছেন। বহু দেশ ঘুরেছেন তিনি, বহু লোক দেখেছেন—পণ্ডিত, গুণী, রাজনৈতিক থেকে শুরু করে একেবারে সাধারণ মানুষ—এই সাধারণের সম্বন্ধেই প্রীতি-ভালবাসা বেশী ছিল তাঁর—

সে অভিজ্ঞতাও কম নয়, গল্পের মধ্যে দিয়ে নানাপ্রকার শাখাপ্রসঙ্গে সেই বিশাল, আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত জগৎকে জানতে বোঝাতে চেয়েছেন। আমাদের অজ্ঞতায় ঔদাসীন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কিন্তু হতাশ হন নি, হাল ছাড়েন নি।

[এই জানবার চেষ্টা এত বেশী ছিল যে আমার মতো সামান্য লেখকের কোন কোন রচনা সাময়িক পত্রে প্রকাশের সময় কোন শব্দার্থে বা শব্দপ্রয়োগে ভুল থাকলে গরজ ক'রে চিঠি লিখে তা জানিয়ে দিতেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় অনুরাগ দেখে—বিশেষ মুঘল আমলের ঘটনা উপলক্ষ্য ক'রে—তিনি আমাকে Wollaston-এর মহামূল্যবান য়্যাংলো-পার্সিয়ান অভিধানটি কিনতে পরামর্শ দেন। এবং আমি পেয়ে গেলে কৃত্রিম পরিতাপ প্রকাশ ক'রে একটি সরস চিঠি দেন, কারণ বইটি তিনিও খুঁজেছিলেন, পান নি !]

তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে কিছু নেন নি, পরোক্ষ ভাবে অনেক নিয়েছেন। তাদের মূল্য বুঝেছেন বলেই সেই চলা-পথ ত্যাগ ক'রে নিজের পৃথক রাস্তা ক'রে নিতে পেরেছেন।

কিন্তু তাঁর দ্বারা খুব বেশী লেখক প্রভাবিত হ'তে পারেন নি। তা বোধ হয় হওয়া সম্ভবও নয়। তাঁর প্রত্যক্ষ উত্তর সাধক বলতে গেলে একটিই—রূপদর্শী বা গৌরকিশোর ঘোষ। তবে শংকরের অপ্রত্যক্ষ ঋণ কিছু আছে। অন্তত মুজতবা আলীর আবির্ভাবের আলোয় তিনি নিজের পথ, নিজের শক্তির বৈশিষ্ট্য দেখতে পেয়েছেন।

সৈয়দদা একটা কথা বার বার বলেছেন যে, রোজগারের দুশ্চিন্তা না থাকলে তিনি কলম ধরেন না। তাই যদি হবে, এতই যদি অর্থ সম্বন্ধে সচেতন তবে রোজগারের সিধা সহজ রাস্তাগুলো—ভাল ভাল চাকরিগুলো ছাড়লেন কেন ? এই প্রশ্নটাই মাঝে মাঝে মনে জাগে। এত বড় লেখক—এত শক্তিমান, যিনি রচনাবৈশিষ্ট্যে আজও অনন্য, তিনি কি সাহিত্যসৃষ্টির জন্যই সাহিত্য রচনার প্রেরণা কোন দিন অনুভব করেন নি—সৃষ্টিযন্ত্রণা যাকে বলে ? লেখবার, নিজের বক্তব্য বলবার তাগিদ ? বিশ্বাস হয় না, কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

বার বার সেই কথাটাই মনে হয়—জীবন প্রভাতে কোথায় একটা কঠিন আঘাত পেয়েছিলেন, অনুভব করেছিলেন সীমাহীন আশাভঙ্গের বেদনা—তাই আশা বলতে উদ্যম বলতে সার্থকতার স্বপ্ন বলতে আর কিছু তাঁর ছিল না। জীবন, প্রতিভা, যশ, সমস্তগুলো সম্বন্ধেই একটা সীমাহীন ঔদাসীন্য, apathy এসে গিয়েছিল। স্থায়ী যশলাভ বা অমর সাহিত্য রচনা করার কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ করতেন না। তৎসত্ত্বেও যেটুকু আমরা পেয়েছি সে নিতান্তই আমাদের, সাহিত্য-পাঠকদের ভাগ্য, সাহিত্য-সরস্বতীর করুণা।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

পঞ্চতন্ত্র

(প্রথম পর্ব)

উৎসর্গ

শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার

মহাশয়ার করকমলে—

লেখকের নিবেদন

এই পুস্তিকার অধিকাংশ লেখা রবিবারের 'বসুমতী' ও সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় বেরোয়। অনুজপ্রতিম শ্রীমান কানাই সরকার ও সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মনোজ বসু কেন যে এগুলো পুস্তিকাকারে প্রকাশ করার জন্য আমাকে বাধ্য করলেন সে কথা সহৃদয় পাঠকেরা বিবেচনা করে দেখবেন।

মুজতবা আলী

বই কেনা

মাছি-মারা-কেরানী নিয়ে যত ঠাট্টা-রসিকতাই করি না কেন, মাছি ধরা যে কত শক্ত সে কথা পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন। মাছিকে যে-দিক দিয়েই ধরতে যান না কেন, সে ঠিক সময়ে উড়ে যাবেই। কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে, দু'টো চোখ নিয়েই মাছির কারবার নয়, তার সমস্ত মাথা জুড়ে নাকি গাদা গাদা চোখ বসানো আছে। আমরা দেখতে পাই শুধু সামনের দিক, কিন্তু মাছির মাথার চতুর্দিকে চক্রাকারে চোখ বসানো আছে বলে সে একই সময়ে সমস্ত পৃথিবীটা দেখতে পায়।

তাই নিয়ে গুণী ও জ্ঞানী আনাতোল ফ্রাঁস দুঃখ করে বলেছেন, 'হায়, আমার মাথার চতুর্দিকে যদি চোখ বসানো থাকতো, তাহলে আচক্রবালবিস্তৃত এই সুন্দরী ধরণীর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য একসঙ্গেই দেখতে পেতুম।'

কথাটা যে খাঁটি, সে-কথা চোখ বন্ধ করে একটুখানি ভেবে নিলেই বোঝা যায়। এবং বুঝে নিয়ে তখন এক আপসোস ছাড়া অন্য কিছু করবার থাকে না। কিন্তু এইখানেই ফ্রাঁসের সঙ্গে সাধারণ লোকের তফাৎ। ফ্রাঁস সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, 'কিন্তু আমার মনের চোখ তো মাত্র একটি কিংবা দুটি নয়। মনের চোখ বাড়ানো-কমানো তো সম্পূর্ণ আমার হাতে। নানা জ্ঞানবিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ত করতে থাকি, ততই এক-একটা করে আমার মনের চোখ ফুটতে থাকে।'

পৃথিবীর আর সব সভ্য জাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, আমরা ততই আরব-উপন্যাসের এক-চোখা দৈত্যের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি আর চোখ বাড়াবার কথা তুললেই চোখ রাঙাই।

চোখ বাড়াবার পন্থাটা কি? প্রথমতঃ—বই পড়া, এবং তার জন্য দরকার বই কেনার প্রবৃত্তি।

মনের চোখ ফোটানোর আরো একটা প্রয়োজন আছে। বারট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন, 'সংসারে জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে, মনের ভিতর আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার ভিতর ডুব দেওয়া। যে যত বেশী ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, যন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা তার ততই বেশী হয়।'

অর্থাৎ সাহিত্যে সান্ত্বনা না পেলে দর্শন, দর্শন কুলিয়ে উঠতে না পারলে ইতিহাস, ইতিহাস হার মানলে ভূগোল—আরো কত কি।

কিন্তু প্রশ্ন, এই অসংখ্য ভুবন সৃষ্টি করি কি প্রকারে?

বই পড়ে। দেশ ভ্রমণ করে। কিন্তু দেশ ভ্রমণ করার মত সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্য সকলের থাকে না, কাজেই শেষ পর্যন্ত বাকি থাকে বই। তাই ভেবেই হয়ত ওমর খৈয়াম বলেছিলেন,—

Here with a loaf of bread
beneath the bough
A flask of wine, a book of
verse and thou,
Beside me singing in the wilderness
And wilderness is paradise enow.

রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত-যৌবনা—যদি তেমন বই হয়। তাই বোধ করি খৈয়াম তাঁর বেহেশ্‌তের সরঞ্জামের ফিরিস্তি বানাতে গিয়ে কেতাবের কথা ভোলেন নি।

আর খৈয়াম তো ছিলেন মুসলমান। মুসলমানদের পয়লা কেতাব কোরানের সর্বপ্রথম যে বাণী মুহম্মদ সাহেব শুনতে পেয়েছিলেন তাতে আছে 'আল্লামা বিল কলমি' অর্থাৎ আল্লা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন 'কলমের মাধ্যমে'। আর কলমের আশ্রয় তো পুস্তকে।

বাইবেল শব্দের অর্থ বই—বই par excellence, সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক—The Book.

যে-দেবকে সর্ব মঙ্গলকর্মের প্রারম্ভে বিঘ্নহন্তারূপে স্মরণ করতে হয়, তিনিই তো আমাদের বিরাটতম গ্রন্থ স্বহস্তে লেখার গুরুভার আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। গণপতি 'গণ' অর্থাৎ জনসাধারণের দেবতা। জনগণ যদি পুস্তকের সম্মান করতে না শেখে, তবে তারা দেবভ্রষ্ট হবে।

কিন্তু বাঙালী নাগর ধর্মের কাহিনী শোনে না। তার মুখে ঐ এক কথা 'অত কাঁচা পয়হা কোথায়, বাওয়া, যে বই কিনব ?'

কথাটার মধ্যে একটুখানি সত্য—কনিষ্ঠাপরিমাণ—লুকনো রয়েছে। সেইটুকু এই যে, বই কিনতে পয়সা লাগে—ব্যস্‌। এর বেশী আর কিছু নয়।

বইয়ের দাম যদি আরো কমানো যায়, তবে আরো অনেক বেশী বই বিক্রী হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই যদি প্রকাশককে বলা হয়, 'বইয়ের দাম কমাও', তবে সে বলে 'বই যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রি না হলে বইয়ের দাম কমাবো কি করে ?'

'কেন মশাই, সংখ্যার দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাঙলা পৃথিবীর ছয় অথবা সাত নম্বরের ভাষা। এই ধরুন ফরাসী ভাষা। এ-ভাষায় বাঙলার তুলনায় ঢের কম লোক কথা কয়। অথচ যুদ্ধের পূর্বে বারো আনা, চৌদ্দ আনা, জোর পাঁচ সিকে দিয়ে যে-কোন ভাল বই কেনা যেত। আপনারা পারেন না কেন ?'

'আজ্ঞে, ফরাসী প্রকাশক নির্ভয়ে যে-কোন ভালো বই এক ঝট্‌কায় বিশ হাজার ছাপাতে পারে। আমাদের নাভিশ্বাস ওঠে দু'হাজার ছাপাতে গেলেই বেশী ছাপিয়ে দেউলে হব নাকি ?'

তাই এই অচ্ছেদ্য চক্র। বই সস্তা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই সস্তা করা যায় না।

এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে। করবে কে ? প্রকাশক না ক্রেতা ? প্রকাশকের

পক্ষে করা কঠিন, কারণ ঐ দিয়ে পেটের ভাত যোগাড় করে। সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ। এক্সপেরিমেণ্ট করতে নারাজ—দেউলে হওয়ার ভয়ে।

কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয় নি। বই কেনার বাজেট যদি আপনি তিনগুণও বাড়িয়ে দেন, তবু তো আপনার দেউলে হবার সম্ভাবনা নেই। মাঝখান থেকে আপনি ফ্রাঁসের মাছির মত অনেকগুলি চোখ পেয়ে যাবেন, রাসেলের মত এক গাদা নূতন ভুবন সৃষ্টি করে ফেলবেন।

ভেবে-চিন্তে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে বই কেনে সংসারী লোক। পাঁড় পাঠক বই কেনে প্রথমটায় দাঁতমুখ খিচিয়ে, তারপর চেখে চেখে সুখ করে করে, এবং সর্বশেষে সে কেনে ক্ষ্যাপার মত, এবং চুর হয়ে থাকে তার মধ্যিখানে। এই একমাত্র ব্যসন, একমাত্র নেশা যার দরুন সকালবেলা চোখের সামনে সারে সার গোলাপী হাতী দেখতে হয় না, লিভার পচে পটল তুলতে হয় না।

আমি নিজে কি করি? আমি একাধারে producer এবং consumer—তামাকের মিকশ্চার দিয়ে আমি নিজেই সিগারেট বানিয়ে producer এবং সেইটে খেয়ে নিজেই consumer : আরও বুঝিয়ে বলতে হবে? আমি একখানা বই produce করেছি—কেউ কেনে না বলে আমিই consumer; অর্থাৎ নিজেই মাঝে মাঝে কিনি।

* * *

মার্ক টুয়েনের লাইব্রেরিখানা নাকি দেখবার মত ছিল। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বই, বই, শুধু বই। এমন কি কার্পেটের উপরও গাদা গাদা বই স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকত—পা ফেলা ভার। এক বন্ধু তাই মার্ক টুয়েনকে বললেন, 'বইগুলো নষ্ট হচ্ছে; গোটাকয়েক শেলফ যোগাড় করছ না কেন?'

মার্ক টুয়েন খানিকক্ষণ মাথা নিচু ক'রে ঘাড় চুলকে বললেন, 'ভাই, বলছো ঠিকই—কিন্তু লাইব্রেরিটা যে কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেলফ তো আর সে কায়দায় যোগাড় করতে পারিনে। শেলফ তো আর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার চাওয়া যায় না।'

শুধু মার্ক টুয়েনই না, দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই লাইব্রেরি গড়ে তোলে কিছু বই কিনে; আর কিছু বই বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার করে ফেরৎ না দিয়ে। যে-মানুষ পরের জিনিস গলা কেটে ফেললেও ছোঁবে না সেই লোকই দেখা যায় বইয়ের বেলা সর্বপ্রকার বিবেক-বিবর্জিত তার কারণটা কি?

এক আরব পণ্ডিতের লেখাতে সমস্যাটার সমাধান পেলুম।

পণ্ডিত লিখেছেন, 'ধনীরা বলে, পয়সা কামানো দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন কর্ম। কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন, না, জ্ঞানার্জন সবচেয়ে শক্ত কাজ। এখন প্রশ্ন, কার দাবিটা ঠিক, ধনীর না জ্ঞানীর? আমি নিজে জ্ঞানের সন্ধানে ফিরি, কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, সেইটে আমি বিচক্ষণ জনের চক্ষুগোচর করাতে চাই। ধনীর মেহনতের ফল হ'ল টাকা। সে ফল যদি কেউ জ্ঞানীর হাতে তুলে দেয়, তবে তিনি সেটা পরমানন্দে কাজে লাগান, এবং শুধু তাই নয়, অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়,

জ্ঞানীরা পয়সা পেলে খরচ করতে পারেন ধনীদের চেয়ে অনেক ভালো পথে, ঢের উত্তম পদ্ধতিতে। পক্ষান্তরে জ্ঞানচর্চার ফল সঞ্চিত থাকে পুস্তকরাজিতে এবং সে ফল ধনীদের হাতে গায়ে পড়ে তুলে ধরলেও তারা তার ব্যবহার করতে জানে না—বই পড়তে পারে না।'

আরব পণ্ডিত তাই বক্তব্য শেষ করেছেন কিউ. ই. ডি দিয়ে 'অতএব সপ্রমাণ হল জ্ঞানার্জন ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর।'

তাই প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক যোগাড় করার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করে। একমাত্র বাঙলা দেশ ছাড়া।

সেদিন তাই নিয়ে শোকপ্রকাশ করাতে আমার জনৈক বন্ধু একটি গল্প বললেন। এক ড্রইংরুম-বিহারিণী গিয়েছেন বাজারে স্বামীর জন্মদিনের জন্য সওগাত কিনতে। দোকানদার এটা দেখায়, সেটা শোঁকায়, এটা নাড়ে, সেটা কাড়ে, কিন্তু গরবিনী ধনীর (উভয়ার্থে) কিছুই আর মনঃপূত হয় না। সব কিছুই তাঁর স্বামীর ভাণ্ডারে রয়েছে। শেষটায় দোকানদার নিরাশা হয়ে বললে, 'তবে একখানা ভাল বই দিলে হয় না?' গরবিনী নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন, 'সেও তো ওঁর একখানা রয়েছে।'

যেমন স্ত্রী তেমনি স্বামী। একখানা বই-ই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

অথচ এই বই জিনিসটার প্রকৃত সম্মান করতে জানে ফ্রান্স। কাউকে মোক্ষম মারাত্মক অপমান করতে হলেও তারা ঐ জিনিস দিয়েই করে। মনে করুন আপনার সবচেয়ে ভক্তি-ভালবাসা দেশের জন্য। তাই যদি কেউ আপনাকে ডাহা বেইজ্জৎ করতে চায়; তবে সে অপমান করবে আপনার দেশকে। নিজের অপমান আপনি হয়ত মনে মনে পঞ্চাশ গুণে নিয়ে সয়ে যাবেন, কিন্তু দেশের অপমান আপনাকে দংশন করবে বহুদিন ধরে।

আঁদ্রে জিদে'র মেলা বন্ধুবান্ধব ছিলেন—অধিকাংশই নামকরা লেখক। জিদ রুশিয়া থেকে ফিরে এসে সোভিয়েট রাজ্যের বিরুদ্ধে একখানা প্রাণঘাতী কেতাব ছাড়েন। প্যারিসের স্তালিনীয়ারা তখন লাগল জিদের পিছনে—গালিগালাজ কটুকাটব্য করে জিদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুললো। কিন্তু আশ্চর্য, জিদের লেখক বন্ধুদের অধিকাংশই চুপ ক'রে সব কিছু শুনে গেলেন, জিদের হয়ে লড়লেন না। জিদের জিগরে জোর চোট লাগল—তিনি স্থির করলেন, এদের একটা শিক্ষা দিতে হবে।

কাগজে বিজ্ঞাপন বেরল। জিদ তাঁর লাইব্রেরিখানা নিলামে বেচে দেবেন বলে মনস্থির করেছেন। প্যারিস খবর শুনে প্রথমটায় মূর্ছা গেল, কিন্তু সম্বিতে ফেরা মাত্রই মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটলো নিলাম-খানার দিকে।

সেখানে গিয়ে অবস্থা দেখে সকলেরই চক্ষুস্থির।

যে-সব লেখক জিদের হয়ে লড়েন নি, তাঁদের যে-সব বই তাঁরা জিদকে স্বাক্ষর সহ উপহার দিয়েছিলেন, জিদ মাত্র সেগুলোই নিলামে চড়িয়েছেন। জিদ শুধু জঞ্জালই বেচে ফেলছেন।

প্যারিসের লোক তখন যে অট্টহাস্য ছেড়েছিল, সেটা আমি ভূমধ্যসাগরের

মধ্যিখানে জাহাজে বসে শুনতে পেয়েছিলুম—কারণ খবরটার গুরুত্ব বিবেচনা করে রয়টার সেটা বেতারে ছড়িয়েছিলেন—জাহাজের টাইপ-করা একশো লাইনি দৈনিক কাগজ সেটা সাড়ম্বরে প্রকাশ করেছিল।

অপমানিত লেখকরা ডবল তিন ডবল দামে আপন আপন বই লোক পাঠিয়ে তড়িঘড়ি কিনিয়ে নিয়েছিলেন—যত কম লোকে কেনা-কাটার খবরটা জানতে পারে ততই মঙ্গল। (বাঙলা দেশে নাকি একবার এরকম টিকি বিক্রি হয়েছিল।)

শুনতে পাই, এঁরা নাকি জিদকে কখনো ক্ষমা করেন নি।

* * *

আর কত বলবো? বাঙ্গালীর কি চেতনা হবে?

তাও বুঝতুম, যদি বাঙালীর জ্ঞানতৃষ্ণা না থাকতো। আমার বেদনাটা সেইখানে! বাঙালী যদি হটেনটট হত, তবে কোনো দুঃখ ছিল না। এরকম অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতের কোথাও দেখি নি। জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু কেনার বেলা সে অবলা। আবার কোনো কোনো বেশরম বলে, 'বাঙালীর পয়সার অভাব।' বটে? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ-কথা? ফুটবল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে, না সিনেমার টিকিট কাটার 'কিউ' থেকে।

থাক্ থাক্। আমাকে খামাখা চটাবেন না। বৃষ্টির দিন। খুশ গল্প লিখব বলে কলম ধরেছিলুম। তাই দিয়ে লেখাটা শেষ করি। গল্পটা সকলেই জানেন, কিন্তু তার গূঢ়ার্থ মাত্র কাল বুঝতে পেরেছি। আরব্যোপন্যাসের গল্প।

এক রাজা তাঁর হেকিমের একখানা বই কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাঁকে খুন করেন। বই হস্তগত হল। রাজা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বইখানা পড়ছেন। কিন্তু পাতায় পাতায় এমনি জুড়ে গিয়েছে যে, রাজা বার বার আঙুল দিয়ে মুখ থেকে থুথু নিয়ে জোড়া ছাড়িয়ে পাতা উল্টোচ্ছেন। এদিকে হেকিম আপন মৃত্যুর জন্য তৈরি ছিলেন ব'লে প্রতিশোধের ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন। তিনি পাতায় পাতায় কোণের দিকে মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ। রাজার আঙুল সেই বিষ মেখে নিয়ে যাচ্ছে মুখে।

রাজাকে এই প্রতিহিংসার খবরটিও হেকিম রেখে গিয়েছিলেন কেতাবের শেষ পাতায়। সেইটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা বিষবাণের ঘায়ে ঢলে পড়লেন।

বাঙালীর বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে, আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

কাইরো

কাইরো যাওয়ার জন্য আলাদা করে কাঠখড় পোড়াবার প্রয়োজন হয় না। ইয়োরোপ যাবার সময় জাহাজ সুয়েজ বন্দরে থামে। সেখানে নেবে সোজা কাইরো চলে যাবেন। এদিকে আপনার জাহাজ অতি ধীরে মন্থরে সুয়েজ খালের ভিতর দিয়ে পোর্ট সইদের দিকে রওয়ানা হবে। খালের দুদিকে বালুর পাড়

যাতে ভেঙে গিয়ে খালটাকে বন্ধ না করে দেয়, তার জন্য কড়া আইন, জাহাজ যেন গরুর গাড়ির গতিতে এগোয়। কাজেই জাহাজ সইদ বন্দর পেঁছিতে না পেঁছিতে আপনি কাইরোতে ঢুঁ মেরে ট্রেনে করে, সেই সইদ বন্দরেই পেঁছে যাবেন। সেই জাহাজেই চেপে, সেই কেবিনেই শুয়ে ইয়োরোপ চলে যাবেন—ফালতো কোনো খরচা লাগবে না।

অবশ্য তাতে করে কাইরোর মত শহরের কিছুই দেখা হয় না—আর কাইরোতে দেখবার মত জিনিস আছে বিস্তর। পিরামিড দেখা হয়ে যাবে নিশ্চয়ই, এইটুকু যা সান্ত্বনা। জাহাজের অনেকেই আপনাকে বললেন, ঘণ্টা দশকের জন্য কাইরোতে ওরকমধারা ঢুঁ মেরে বিশেষ কোন লভ্য নেই। আমারও সেই মত; কিন্তু তবু যে যেতে বলছি তার কারণ যদি আপনার পছন্দ হয়ে যায়, তবে হয়ত বিলেত থেকে ফেরার মুখে ফের কাইরোতে নেবে দু'চার সপ্তাহ কাটিয়ে আসতে পারেন। ইয়োরোপে তো দেখবেন কুল্লে এক ইয়োরোপীয় সভ্যতা (ফরাসী, জর্মন, ইংরেজ যত তফাৎই থাক না কেন, তবু তো তারা আপোসে একটা সভ্যতাই গড়ে তুলেছে), আর দেখেছেন ভারতীয় সভ্যতা—তার উপর যদি আরেক তৃতীয় সভ্যতার সঙ্গে মোকাবেলা হয়ে যায়, তবে তাতে নিশ্চয়ই বিস্তর লভ্য।

আমার লেগেছিল কাইরো দেখতে পাক্কা একটি বছর! অতদিন আপনি থাকবেন না সে আমি জানি। আপনার অতটা সময় লাগবে না—সে কথাও জানি। কারণ আমি কাটিয়েছিলুম প্রথম ছ'টি মাস শুধু আড্ডা মেরে মেরে—বাড়ির ছাতের উপর থেকে পিরামিড স্পষ্ট দেখা যায়, ট্রামে করে হুশ করে সেখানে যেতে কোনোই বাধা নেই, পূর্ণিমায় আবার ইস্পিশল সার্ভিস, তৎসত্ত্বেও ছ'টি মাস কেটে গেল এ-কাফে ও-কাফে করে করে, পিরামিড দেখার ফুরসৎ আর হয়ে ওঠে না। বন্ধুরা কেউ জিজ্ঞেস করলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতুম, 'সবই ললাটঙ্ক লিখন। কলকাতায় দশ বছর কাঠিয়ে "গঙ্গাস্তান" যখন হয়ে উঠেনি, তখন বাবা-পিরামিড দর্শন কি আমার কপালে আছে?' (আসল কারণটা চুপে চুপে বলি;—এক গাদা পাথর দেখায় যে কি তত্ত্ব তা আমি পিরামিড দেখার আগে এবং পরে কোনো অবস্থাতেই ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারি নি)।

সে কথা থাক; সভ্যতা, পিরামিড এ-সব জিনিস নিয়ে অন্য জায়গায় পাণ্ডিত্য ফলাব। 'বসুমতী'র পাঠকরা এতদিনে আমাকে বিলক্ষণ চিনে গিয়েছেন, আমার মুখে পাণ্ডিত্যের কথা শুনলে ঠা-ঠা করে হেসে উঠবেন। তাই সেই আড্ডাতেই ফিরে যাই।

আমি ভালোবাসি হেদো, হাতিবাগান, শ্যামবাজার। ও-সব জায়গায় তাজমহল নেই, পিরামিড নেই। তাতে আমার বিন্দুমাত্র খেদও নেই। আমি ভালোবাসি আমার পাড়ার চায়ের দোকানটি। সেখানে সকাল-সন্ধ্যা হাজিরা দিই, পাড়ার পটলা, হাবুল আসে, সবাই মিলে বিড়ি ফুঁকে গুষ্ঠীসুখ অনুভব করি আর উজির-নাজির মারি। আমার যা কিছু জ্ঞান-গম্যি তা ঐ আড্ডারই ঝড়তি-পড়তি মাল কুড়িয়ে নিয়ে।

তাই যখন কপালের গদিশে কাইরোতে বাসা বাঁধতে হল, তখন আড্ডাভাবে

তিনদিনেই আমার নাভিশ্বাস উপস্থিত হল। ছন্নের মত শহরময় ঘুরে বেড়াই আর পটলা-হাবলুর বসন্ত রেস্টুরেন্টের জন্য সাহারার উষ্ণ নিশ্বাসের সঙ্গে আপন দীর্ঘ নিশ্বাস মেশাই। এমন সময় সদ্‌গুরুর কৃপায় একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম—পাড়ার কফিখানাতে রোজই দেখতে পাই গোটা পাঁচেক লোক বসন্ত রেস্টুরেন্টরই মত চেঁচামেচি কাজিয়া-ঝগড়া করে আর এন্তার কফি খায়, বিস্তর সিগারেট পোড়ায়।

দিন তিনেক জিনিসটা লক্ষ্য করলুম, কখনো কফিখানায় বসে, কখনো ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। নূতন শহরের সব কিছুই গোড়ার দিকে সুর-রিয়ালিস্টিক ছবির মতো এলোপাতাড়ি ধরনের মনে হয়? অর্থ খাড়া হতে হতে কয়েকদিন কেটে যায়। যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম তখন আমেজ করলুম, আমাদের বসন্ত রেস্টুরেন্টের আড্ডা যখন গুরুচণ্ডাল সক্কলের জন্যই অবারিতদ্বার, তখন এরাই বা আমাকে ব্রাত্য করে রাখবে কেন? হিম্মৎ করে তাদের টেবিলের পাশে গিয়ে বসলুম আর করুণ নয়নে তাদের দিকে মাঝে মাঝে তাকালুম। শকুন্তলার হরিণও বুঝি ওরকমধারা তাকাতে পারত না।

দাওয়াই ধরলো। এক ছোকরা এসে অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় নিল এবং জানালো তাদের আড্ডায় বিস্তর সীট ভেকেন্ট, আমি যদি ইত্যাদি। আমাকে তখন আর পায় কে? ভাঙা ফরাসী, টুটাফুটা আরবী, পিজ্‌ন ইংরিজী সবকিছু জড়িয়ে-মড়িয়ে দু'মিনিটের ভিতরেই তাঁদের সবাইকে বসন্ত রেস্টুরেন্টে নেমন্তন্ন করলুম পটলা-হাবলুর ঠিকানা দিলুম, বসন্ত যে ভেজাল তেল আর পচা হাঁসের ডিম দিয়ে খাসা মামলেট বানায় তার বর্ণনা দিতেও ভুললুম না।

কিন্তু কোথায় লাগে আমাদের আড্ডা কাইরোর আড্ডার কাছে? বাঙালী-আড্ডার সব কটা সুখ কাইরোর আড্ডাতে তো আছেই; তার উপর আরেকটা মস্ত সুবিধার কথা এই বেলা বলি, যার জন্য এতক্ষণ ধরে ভূমিকা দিলুম।

দুনিয়ার যত ফেরিওলা কাইরোর কাফেতে চক্কর মেরে যায়। টুথব্রাশ, সাবান, মোজা, আরশি, চিরুনি, নোটবক, পেন্সিল, তালাচাবি, ফাউন্টেন পেন, ঘড়ি—হেন বস্তু নেই যা ফেরিওলা নিয়ে আসে না! আমি জানি, আপনি সহজে বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু ধর্মসাক্ষী, দর্জি পর্যন্ত বস্তা বস্তা কাপড় মুটের ঘাড়ে চাপিয়ে কাফের ভিতর চক্কর মেরে যায়। কাইরোর লোক দোকানে যেতে ভালোবাসে না। তাতে নাকি সময় নষ্ট হয়, আর দোকানী একা পেয়ে আপনাকে ঠকাবেও নিশ্চয়। আড্ডাতে বন্ধু-বান্ধব রয়েছেন। পাঁচজনে মিলে বরং ফেরিওয়ালাকে ঘায়েল করার সম্ভাবনা অনেক বেশী।

একপ্রস্ত সুট বানাবার বাসনা ছিল। আড্ডাতে সেটা সবিনয় নিবেদন করলুম। পাশ দিয়ে দর্জি যাচ্ছিল—ডাক দিতে সবাই 'হাঁ হাঁ, করো কি করো কি!' বলে বাধা দিলেন! 'ও ব্যাটা সুট বানাবার কি জানে? প্লাস্তিরাস আসুক। গ্রীক বটে, ঠকাবার চেষ্টা করবে, কিন্তু আমরাও তো পাঁচজন আছি। ও কাপড় আনে ঠকিয়ে, কাস্টম না দিয়ে। আমরাও ওকে ঠকাতে পারলে টাকায় আট আনা লাভ। ঠকলে দু' আনা লাভ। অথবা কুইট্‌স।' তারপর আড্ডা

আমায় বুঝিয়ে বলল, যে সুট বানাতে চায় সে যেন বর। তার কথা কওয়া ভালো দেখায় না। সে কনেপক্ষের প্যাঁচে পাড় বানচাল হয়ে যাবে, গয়নাগুলো যাচাই না করে নিয়ে ফেলে আখেরে পস্তাবে।

প্লাস্তিরাস এল। তারপর বাপরে বাপ! সে কী অসম্ভব দরদস্তুর, বকাবকি, —শেষটায় হাতাহাতির উপক্রম। আড্ডা বলে, 'ব্যাটা তুমি দুনিয়া ঠকিয়ে খাও, তোমাকে পুলিসে দেব।' প্লাস্তিরাস বলে, 'ও দামে সুট বানালে আমাকে আপন পাতলুন বন্ধক দিয়ে কাচ্চা-বাচ্চার জন্য আণ্ডারুটি কিনতে হবে।'

পাক্কা তিনঘণ্টা লড়াই চলেছিল। এর ভিতর প্লাস্তিরাস তিনবার রাগ করে কাপড়ের বস্তা নিয়ে চলে গেল, তিনবার ফিরে এল। আড্ডাও দল বাড়াবার জন্য কাফের ছোকরাকে পাঠিয়ে আমাদের গ্রীক সভ্য পাউলুসকে ডেকে আনিয়েছ। তখন লাগল গ্রীকে গ্রীকে লড়াই। সুড-এটেন্ নিয়ে হিটলার চেম্বারলেনে এর চেয়ে বেশী দর-কষাকষি নিশ্চয়ই হয় নি। যখন রফারফি হল তখন রাত এগারোটা। আমি বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়েছিলুম—আড্ডা তাতে আপত্তি জানান নি, বরের উপস্থিতি অপরিহার্য নয়। কাফের ছোকরা আমাকে বিছানা থেকে টেনে নিয়ে গেল। মাপ দেওয়া হল। তিন দিন বাদে পয়লা ট্রায়েল —অবশ্য কাফেতেই।

তিন দিন বাদে আড্ডা ফুল স্ট্রেন্থে হাজির। আমি কাফের পিছনের কামরায় গিয়ে নূতন সুট পরে বেরিয়ে এলুম। সর্বত্র চকের দাগ আর তাঁতী-বাড়ির মত আমার সর্বাঙ্গ থেকে সুতো ঝুলছে। সুটের চেহারা দেখে সবাই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মার লাগাও ব্যাটা প্লাস্তিরাসকে; এ কি সুট বানিয়েছে না মৌলবী সাহেবের জোব্বা কেটেছে?' ও কি পাতলুম না চিমনির চোঙা? প্লাস্তিরাস দর্জি না হাজাম? ইত্যাদি সর্বপ্রকারের কটুকাটব্য। প্লাস্তিরাসও হেঁকে বলল, সে স্বয়ং বাদশার সুট বানায়। সবাই বললে, 'কোন্ বাদশা? সাহারার?'

তারপর এ বলে আস্তিন কাটো, ও বলে কলার ছাঁটো। কেউ বলে পাতলুন নামাও, কেউ বলে কোট তোলো। প্লাস্তিরাসও পয়লা নম্বরের ঘড়েল—সকলের কথায় কান দেয় আবার কারো কথায় কান দেয়ও না, অর্থাৎ যা ভালো বোঝে তাই করে।

এই করে করে কাফেতে আড্ডা জমানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনটে ট্রায়েল পেরলুম। সুট তৈরী হল। আমি সেইটে পরে বরের মত লাজুক হাসি হেসে সবাইকে সেলাম করলুম। সুট দীর্ঘজীবী হোক বলে সবাই আশীর্বাদ করলেন। কাফের মালিক পর্যন্ত আমাদের পরবে শামিল হল। আমি সব্বাইকে একপ্রস্থ কফি খাওয়ালুম। সে-সুট পরে আজও যখন ফার্পোতে যাই গুণীরা তারিফ করেন।

পুলিনবিহারী

ছেলেবেলায় যে-রকম গলাজল ঠেলে ঠেলে খাল পেরতুম, ঠিক সেইরকম পূর্বের হাওয়া ঠেলে ঠেলে সমুদ্রপারে পেঁছিতে হল।

অন্য দিন সমুদ্র থেকে থেকে এক-একখানা করে ঢেউ পাঠায়। সে অনেক দূর থেকে পাঁয়তারা কষে কষে দড়ি পাকিয়ে পাকিয়ে কোমর বেঁধে শেষটায় পাড়ে এসে আছাড় খায়। আজ বিশাল আয়োজন। একসঙ্গে অনেকগুলো পালোয়ান; একজনের পিছনে আরেকজন পাঁয়তারা কষে কষে আসছে। তারপর পাড়ে এসে হুটোপুটি—দোস্ত-দুশমনের সনাক্ত হওয়ার গোলমালে আপসে হানাহানি। শেষটায় কোলাকুলিতে মিলে গিয়ে ছোট ছোট দ'য়ে জমে যাওয়া।

সমস্ত আকাশ জুড়ে ছেঁড়া ছেঁড়া রঙিন মেঘ—এলোমেলো, যেন আর্টিস্টের পেলেটে, এলোপাতাড়ি হেথা হোথায় এবড়ো-থেবড়ো রঙ। কিন্তু তবু সব-সুদ্ধ মিলে গিয়ে যেন কেমন একটা সামঞ্জস্য রয়েছে—মনে হয় না অদলবদল করলে কিছু ফেরফার হবে।

বসেছিলুম জলের আর জেলেপাড়ার মাঝখানে। পিছনে নারকেল বন—তাতে আগুন লাগিয়ে সূর্য প্রচণ্ড মহিমায় অস্ত গেলেন—গরবিনীর সতীদাহ। সমুদ্রের গর্জন আর ঢেউয়ে-ভেসে-আসা-পোনা-মাছ-লুব্ধ কাকের কর্কশ চিৎকার, নারকেল গাছের উস্কোখুস্কো মাথার অবিশ্রান্ত আছাড় খাওয়া—অশান্তির চরম আয়োজন।

তাই বোধ করি একটি জেলে-ডিঙিও জলে নামে নি। লম্বা সারি বেঁধে কাৎ হয়ে পড়ে আছে ডাঙ্গায়, যেন, ডিসেকশান টেবিলের সারি সারি মড়া। সমস্ত তীরে মাত্র দু'টি জেলে সুতো ফেলে গভীর ধৈর্যে মাছ ধরার চেষ্টাতে আছে। জোয়ারের জোর টোপ ধুয়ে নিয়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে, নূতন টোপ সাজতে হয়—তবু তাদের ধৈর্য অসীম। বাদবাকি ছেলেবুড়ো বালুপাড়ে বসে আছে—এত মেহন্নত করে লাভ নগণ্য।

অন্ধকার নামল অতি ধীরে ধীরে। পাটরাণী তো চিতেয় উঠলেন লাল টকটকে হয়ে। আকাশ সিঁদুর মুছলেন অতি অনিচ্ছায়—এমেঘে ওমেঘে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে। সক্কলের শেষ পান্না জল লালে-নীলে মেশা বেগুনি ঝিলিকটুকু মুছে ফেলে আস্তে আস্তে শ্যামলা সবুজ হলেন।

কোনদিন আবার রঙের রাজা মাত্র তিনটি রঙ নিয়ে খেলায় বসেন। সমুদ্র আর পূবের আকাশকে দেন কালো-নীল, পশ্চিম আকাশকে একটুখানি গোলাপী আর মাথার উপর বাকী সমস্ত আকাশ পায় ফিকে ফিরোজা। যতক্ষণ না কালো পরদায় সব কিছু ঢাকা পড়ে যায়, ততক্ষণ শুধু এই তিন রঙের ফিকে ঘন'র খেলা। তাতে কতই না কারচুপি। এদিকে কালো-নীল যত ঘনিয়ে ঘনিয়ে নীলের রেশ কমাতে লাগল, ওদিকে তেমনি গোলাপী ফিকে হতে হতে শিরিষ রঙের আমেজ নিতে আরম্ভ করল। মাঝখানের আকাশ ফিরোজাতে শ্বেত-চন্দনের প্রলেপ লাগিয়েই যাচ্ছে। এ যেন তিন স্বর নিয়ে খেলা। আর

তবলাও ঠিক বাঁধা। পশ্চিমের আকাশ যদি দ্রুত লয়ে রঙ বদলান তবে পুবও সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাল রাখেন। আর সমুদ্রের গর্জনে যেন তানপুরোর আমেজ।

সমে এসে যখন পুব-পশ্চিম মিলে গেল অন্ধকারে, তখন তানপুরোর রেশটুকুমাত্র রইল সাগরপারে। মশালচি এসে আসমানের ফরাসে এখানে-ওখানে তারার মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে গেল। এবার রাত্রির মুশায়েরা (কবিসঙ্গম) বসবে। নারকেল গাছ মাথা দোলাবে, ঝিঁঝিঁ নূপুর বাজিয়ে নাচবে, পুবের বাতাস সভার সর্বাঙ্গে গোলাপজল ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করে যাবে। তারপর দূর সাগরের ওপারে লাল মদের ভাঁড় থেকে মাতাল চাঁদ উঠবেন ধীরে ধীরে গা টেনে টেনে, একটুখানি কাৎ হয়ে। মোসাহেবদের মুখে হাসি ফুটবে—অন্ধকারে যারা গা-ঢাকা দিয়ে বসেছিল, তাদের সবাইকে তখন চেনা যাবে।

* * *

সমুদ্রপারে, নীল গম্বুজের তলে, বিশ্ব-সংসারের ঠিক মাঝখানে যখন বসি তখন মনে হয়, যেন সার্কাসের গোল তাঁবুর মাঝখানে আমাকে কে যেন বসিয়ে দিয়েছে আর চতুর্দিকে গ্যালারিতে লাল হলদে সোনালি মেঘের পাল অপেক্ষা করছে আমি কখন বাঁদর-নাচ আরম্ভ করব।

ভারি অস্বস্তি বোধ হয়।

এই সব রঙচঙা মেঘের দল অত্যন্ত অভদ্র চার-আনী দর্শক।

হঠাৎ একজন যেন হেসে হেসে লাল হয়ে ফেটে পড়ার যোগাড় করে পাশের আরেক চার-আনীকে কি বলে। সেও তখন লাল হয়ে উঠে তার পাশের জনকে সে কথা বলে—দেখলে দেখতে সমস্ত তাঁবুর সবাই লাল হয়ে ওঠে। যেদিকে তাকাই সেদিকেই হাসির লুটোপুটি।

লুকোবার জায়গা নেই।

বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলুম বিরক্ত হয়ে।

কিন্তু তবু সেই মাঝখানেই। তবু যেন তার চার-আনীর দলকে সঙ্গে নিয়ে আমারই চতুর্দিকে ঠিক তেমনি ঘিরে দাঁড়াতে চায়।

বিশ্বসংসার আমাকে বাঁদর-নাচ নাচিয়ে ছাড়বে না!

* * *

দু'জোড়া কপোত-কপোতী নিত্যি নিত্যি দেখতে পাই। একে অন্যকে পেয়েই তারা খুশী। সে খুশী তাদের বসাতে, চলাতে, তাদের হাত-পা নাড়া-চাড়াতে যেন উপচে পড়ে। এক জোড়া সমুদ্রের পারে পারে পা-চারী করে—ছেলেটা যেমন ছ'ফুট ঢ্যাঙা, মেয়েটিও তেমনি পাঁচ ফুটের কমতি। ছেলেটার কর্ম, মেয়েটার দুই জুতো এক ফিতেতে বেঁধে কড়ে আঙুলে ঝুলিয়ে দোলাতে দোলাতে লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলা; মেয়েটা-শুধু পায়ে ভিজে বালির উপর দিয়ে চড়ুই পাখীর মত লাফ দিয়ে দিয়ে নেচে যায়—কেউ তাড়া করে এলে লাফ দিয়ে এক পাশে সরে যায়, চলে গেলে বেঁকে গিয়ে জলের দিকে এগোয়। খাটো করে পরা ফ্রক, পা দু'টি সুডৌল ঘন শ্যামবর্ণ। কথাবার্তা

কখনো কইতে শুনি নি—একে অন্যের দিকে তাকায় পর্যন্ত না। এগুতে এগুতে তারা আড়ায়ার পর্যন্ত চলে যায়, তবু দূর থেকেও তাদের চেনা যায়—ঢ্যাঙা আর বেঁটে। ঢ্যাঙা নাক-বরাবর সোজা চলেছে, মেয়েটি এঁকে-বেঁকে।

আরেক জোড়া সমস্তক্ষণ বসে থাকে ডাঙায়-তোলা একটা নৌকোর আড়ালে কুণ্ডলী-পাকানো জালের বস্তায় হেলান দিয়ে। সমুদ্রের দিকে তাকায় না, পিছনের সূর্যাস্তও জালের বস্তায় ঢাকা পড়ে। সমস্তক্ষণ গুজুর গুজুর। কখনো খুব পাশাপাশি ঘেঁষে বসে, ছেলেটা মেয়েটির কোলে হাত রেখে, কখনো দেখি মেয়েটির হাত ছেলেটির কোমর জড়িয়ে। বেড়ায় না, ডাইনে-বাঁয়ে তাকায় না। রাত ঘনিয়ে এলে একই সাইকেলে চড়ে উত্তর দিকে চলে যায়।

* * *

দূর থেকে রোষে-ক্রোধে তর্জন-গর্জনে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে সিন্ধুপারে লুটিয়ে পড়ে অবশেষে এ কী বিগলিত আত্মনিবেদন।

তাণ্ডবের ডমরু বাজিয়ে, ছিন্নমস্তার আত্মঘাতে নিজেকে বারে বারে দ্বিখণ্ডিত করে, পাড়ে এসে অবশেষে লক্ষ কিঙ্কিণীর এ কী মৃদু শান্ত নূপুর-গুঞ্জরণ!

সূর্যোদয়ের লোহিতোজ্জ্বল রক্ত-টিপ, দ্বিপ্রহরের অতি ঘন নীলাম্বরী, সন্ধ্যার গৈরিক পট্টবাস, সর্বশেষে অন্ধকারে সর্বস্ব ত্যাগ করে কার অভিসারে সিন্ধুপারে মৃদুপদসঞ্চারণ!!

আহারাদি—

যে লোক উদ্ভিদতত্ত্ব জানে না, সে দেশী-বিদেশী যে-কোন গাছ দেখলেই মনে করে, এও বুঝি এক সম্পূর্ণ নূতন গাছ। তখন নূতন গাছের সঙ্গে তার চেনা কোনো গাছের কিছুটা মিল সে যদি দেখতে পায় তবে অবাক হয়ে ভাবে, এই চেনা-অচেনায় মেশানো গাছের কি অন্ত নেই। কিন্তু শুনেছি, উদ্ভিদবিদ্যা নাকি পৃথিবীর বেবাক গাছকে এমন কতকগুলো শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলেছে যে, নূতন কোনো গাছ দেখলে তাকে নাকি কোনো একটা শ্রেণীতে ফেলে নামকরণ পর্যন্ত করা যায়। আশ্চর্য নয়, কারণ ধ্বনির বেলা তো তাই দেখতে পাচ্ছি। ইংরিজী শুনে মনে হয় যে, এই বিকট ভাষার স্বর-ব্যঞ্জনের বুঝি অন্ত নেই। কিন্তু ডেনিয়েল জোন্স এবং পূর্বাচার্যগণ এমনি উত্তম শ্রেণীবিভাগ করে ফেলেছেন যে, আজ আমরা বাপঠাকুরদার চেয়ে বহু কম মেহন্নতে ইংরিজী উচ্চারণ শিখতে পারি।

আহারাদির বেলাও তাই। আপনার হয়ত কোনো কাবুলীওয়ালার সঙ্গে মিতালি হল। সে আপনাকে দাওয়াত করে খাওয়াল। প্রথমটায় আপনি হয়ত ভেবেছিলেন যে, হাতুড়ি বাটালি সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। গিয়ে দেখেন, খেতে দিল তোফা পোলাও আর খাসা মুরগীর ঝোল। তবে ঠিক জাকারিয়া স্ট্রীটের মত রান্না নয়, কলকাতাবাসী পশ্চিমা মুসলমানরা যে রকম রান্না করে ঠিক

সে-রকম নয়। কেমন যেন একটুখানি আলাদা, কিন্তু খেতে উমদা।

অথবা মনে করুন আপনাকে প্যারিসের কোনো রেস্তোরাঁয় আপনার ভারতীয় বন্ধু 'হাঙ্গেরিয়ান গুলাশ' খেতে দিলেন। হয়ত আপনি ইয়োরোপে এসেছেন মাত্র কয়েকমাস হল—নানা প্রকার যাবনিক খাদ্য খেয়ে খেয়ে আপনার পিত্তি (উভয়ার্থে) চটে আছে। তখন সেই 'গুলাশ' দেখে আপনি উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করবেন। সেই রাত্রেই আপনি গিন্নীকে চিঠি লিখলেন, 'বহুকাল পরে মাংসের ঝোল খেয়ে বিমলানন্দ উপভোগ করলুম।' কারণ 'হাঙ্গেরিয়ান গুলাশ' আর সাদা-মাটা মাংসের ঝোলে কোনো তফাৎ নেই।

আর আপনার বন্ধু যদি ন'সিকে গুণী হন এবং সেই গুলাশের সঙ্গে খেতে দেন 'ইতালিয়ান রিসোত্তো', তাহলে আপনাকে হাতী দিয়ে বেঁধেও সেই রেস্তোরাঁ থেকে বের করা যাবে না। ইয়োরোপের বাকী ক'টা দিন আপনি সেই রেস্তোরাঁর টেবিল বেড়ালছানার মত আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে চাইবেন। কারণ বহুকাল যাবনিক আহারাদির পর মাংসের ঝোল আর রুটি মুখরোচক বটে, কি তার সঙ্গে কি পোলাও আর মাংসের ঝোলের তুলনা হয়? ঘড়েল পাঠক নিশ্চয়ই এতক্ষণে ধরে ফেলেছেন যে, 'ইতালিয়ান রিসোত্তো' মানে পোলাও, তবে ঠিক, ভারতীয় পোলাও নয়। কোপ্তা-পোলাওয়ের কোপ্তাগুলোকে যদি ছোট্ট ছোট্ট টুকরো করে পোলাওয়ে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে তাই হবে রিসোত্তো।

অথবা মনে করুন, দেশে ফেরার সময় আপনি একদিনের তরে কাইরোতে ঢুঁ মেরে এলেন। কিছু কঠিন কর্ম নয়। পোর্ট সইদে জাহাজ থেকে নেমে ট্রেনে কাইরো, সেখানে ঘণ্টা বারো কাটিয়ে মোটরে করে সুয়েজ বন্দরে পেঁছে ফের সেই জাহাজই ধরা যায়—কারণ জাহাজ সুয়েজ খাল পেরোয় অতি ধীরে ধীরে।

কাইরোতে খেলেন মিশরী রান্না। চাক্তি চাক্তি মাংস খেতে দিল, মধ্যিখানে ছ্যাঁদা। দাঁতের তলায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে বটে, কিন্তু সোওয়াদ খাসা। খাচ্ছেন আর ভাবছেন বস্তুটা কি, কিন্তু কোন হদিস পাচ্ছেন না। হঠাৎ মনে পড়ে যাবে, খেয়েছি বটে আমজাদিয়ায় এইরকম ধারা জিনিস—শিককাবাব তার নাম। তবে মশলা দেবার বেলা কঞ্জুসী করেছে বলে ঠিক শিককাবারের সুখটা পেলেন না।

এতক্ষণে আপনার শাস্ত্রাধিকার হল। এই যে মশলার তত্ত্বটা আবিষ্কার করতে পেরেছেন, এরই খেই ধরে আপনি রান্নার শ্রেণী বিভাগ নিজেই করে ফেলতে পারবেন।

পৃথিবীতে কুল্লে দুই রকমে রান্না হয়। মশলাযুক্ত এবং মশলাবর্জিত। মশলা জন্মে প্রধানতঃ ভারতবর্ষে, জাভায়, মালয়ে। ইউরোপে মশলা হয় না। তাই ইউরোপীয় রান্না সাধারণতঃ মশলাবর্জিত।

এবার ঈষৎ ইতিহাসের প্রয়োজন। তুর্ক পাঠানরা যখন এদেশে আসে তখন পশ্চিম এবং উত্তর ভারত নিরামিষ খেত। তুর্ক পাঠানরা মাংস খেত বটে, কিন্তু সে রান্নায় মশলা থাকত না। তুর্ক-পাঠান—মোগলরা যে রকম ভারতবর্ষের অলংকার কারুকার্যের সঙ্গে তুর্কিস্থানী ইরানী স্থাপত্য মিলিয়ে তাজমহল

বানালো, ঠিক সেইরকম ভারতীয় মশলার সঙ্গে তাদের মাংস রান্নার কায়দা মিলিয়ে এক অপূর্ব রান্নার সৃষ্টি করল। আপনারা তাজমহল দেখে 'আহা' আহা' করেন, আমি করি না। কারণ তাজমহল চিবিয়ে খাওয়া যায় না। আর খাস মোগলাই রান্না পেলেই আমি খাই এবং খেয়ে 'জিন্দাবাদ বাবুর আকবর' বলি—যদিও তাঁরা বহুকাল হল এ-জিন্দেগীর খাওয়াদাওয়া শেষ করে চলে গিয়েছেন।

এই 'মোগলাই' রান্না ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের তাবৎ মাংস-খেকোদের ভিতর ছড়িয়ে পড়ে। (বাঙালী আর দ্রাবিড়ের কথা আলাদা ; এরা মাংস খায় কম, আর খাস মোগল-পাঠানের সংস্পর্শে এসেছে তারও কম। পিরালী ঠাকুরবাড়ি ব্যত্যয়, তাঁরা মোগলের সঙ্গে খানিকটা মিশেছিলেন বলে তাঁদের রান্নায় বেশ মোগলাই খুশবাই পাওয়া যায়)। এমন কি মোগলের দুশমন রাজপুত মারাঠারা পর্যন্ত মোগলাই খেতে আরম্ভ করল। এখনো রাজপুতানা, বরোদা, কোল্হাপুর রাজ্যের সরকারী অতিথিশালায় উঠলে বাবুর্চি প্রথম দিনই শুধায় 'মোগলাই' না নিরামিষ খাবেন। আমার উপদেশ—মোগলাইটাই খাবেন—তাতে করে পরজন্মে অজ-শিশু হয়ে জন্মালেও আপত্তি নেই।

মোগল-পাঠানরা এই রান্না আফগানিস্থান-তুর্কীস্থানে প্রচলিত করল। আস্তে আস্তে সেই রান্নাই তাবৎ মধ্যপ্রাচ্য ছেয়ে ফেলল। তবে যত পশ্চিম পানে যাবেন, ততই মশলার মেকদার কমে আসবে। অর্থনীতিতে নিশ্চয়ই পড়েছেন, উৎপত্তিস্থল থেকে কোন বস্তু যত দূরে যাবে ততই তার দাম বেড়ে যায়। আফগানিস্থানের রান্নায় যে হলুদ (কাবুলীরা বলে 'জরদ্ চোপ' অর্থাৎ হলদে কাঠ) পাবেন, ইস্তাম্বুল পর্যন্ত সে হলুদ পেঁছিয় নি।

তুর্করা বল্কান জয় করে, হাঙ্গেরি পেরিয়ে ভিয়েনার দরজায় হানা দেয়। হাঙ্গেরিতে মোগলাই মাংসের ঝোল 'হাঙ্গেরিয়ান গুলাশে' পরিবর্তিত হল এবং মিশরী এবং তুর্কদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ভেনিসের কারবারীরা 'মিন্সট-মীটে'র পোলাও বা রিসোত্তো বানাতে শিখল। গ্রীস সেদিন পর্যন্ত তুর্কীর তাঁবেতে ছিল, তাই গ্রীসের পোশাকী রান্না আজও চোগা-চাপকান পরে থাকে।

পৃথিবীতে দ্বিতীয় উচ্চাঙ্গের রান্না হয় প্যারিসে কিন্তু মশলা অতি কম, যদিও ইংরিজী রান্নার চেয়ে ঢের ঢের বেশী। এককালে তামাম ইয়োরোপ ফ্রান্সের নকল করত, তাই বল্কান গ্রীসেও প্যারিসী রান্না পাবেন। গ্রীস উভয় রান্নার সঙ্গমস্থল। বাকি জীবনটা যদি উত্তম আহারাদি করে কাটাতে চান, তবে আস্তানা গাড়ুন গ্রীসে (দেশটা বেজায় সস্তা)। লঞ্চ, ডিনার, সাপার খাবেন ফরাসী মোগলাই এবং ঘরোয়া গ্রীক কায়দায়। ভুঁড়ি কমাবার কোমরবন্দ্ সঙ্গে নিয়ে যাবেন—গ্রীসে এ জিনিসের বড্ড বেশী চাহিদা বলে বস্তুটা বেজায় আক্রা।

সুশীল পাঠক, স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আপনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন। আপনার মনে আঁকুবাকু প্রশ্ন, রান্না-জগতে বাঙালীর অবদান কি ?

আছে, আছে। মাছ, ছানা এবং বাঙালী বিধবার নিরামিষ রান্না।

Uttarpara Jaikrishna Public L

কিন্তু তার আগে তো চীনা রান্নার বয়ান দিতে হয়। মোগলাই, ফরাসী এবং চীনা এই ত্রিমূর্তির বর্ণনা না করে আমি 'প্রাদেশিক সংকীর্ণতা'র প্রশ্রয় দিতে চাইনে।

আরেকদিন হবে। বৈদ্যরাজ বলেছেন, দীর্ঘজীবী হয়ে যদি বহুকাল ধরে উদরমার্গের সাধনা করতে চাও, তবে বীজমন্ত্র হচ্ছে 'জীর্ণে ভোজনং'। অর্থাৎ হজম না করা পর্যন্ত পুনরায় আহারে বসবে না। তাও যদি না মানেন, তবে চটে গিয়ে সুকুমার রায়ের ভাষায় বলব (দোষটা তাঁর, কটু বাক্যটা তিনিই কয়েছেন)—

এত খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা
খাও তবে কচু পোড়া, খাও তবে ঘণ্টা ॥

নেতাজী

আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে সুভাষচন্দ্রের মত মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করা অন্ধের হস্তী-দর্শনের ন্যায়। তৎসত্ত্বেও যে আমরা সুভাষচন্দ্রের জীবনী দর্শনে প্রবৃত্ত হয়েছি তার প্রধান কারণ, আমাদের মত অর্বাচীন লেখকেরা যখন মহাপুরুষকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার জন্য ঐ একমাত্র পন্থাই খোলা পায়, তখন তার শ্রদ্ধাবেগ তাকে অন্ধত্বের চরমে পৌঁছিয়ে দেয়—শ্রদ্ধা ও ভক্তির আতিশয্য তখন আমাদের চেয়ে সহস্রগুণে উত্তম লেখককেও বাচাল করে তোলে।

দ্বিতীয় কারণ, এক চীনা গুণী জনৈক ইংরেজকে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বুঝিয়ে বলছিলেন, 'সরোবরে জল বিস্তর কিন্তু আমার পাত্র ক্ষুদ্র। জল তাতে ওঠে অতি সামান্য। কিন্তু আমার শোক নেই—মাই কাপ্ ইজ্ স্মল—বাট আই ড্রিংক অফতেনার (My cup is small but I drink oftener)।'

আমাদের পাত্র ছোট, কিন্তু যদি সুভাষ-সরোবর থেকে আমরা সে পাত্র ঘন ঘন ভরে নিই তাহলে শেষ পর্যন্ত সরোবর নিঃশেষ হোক আর নাই হোক, আমাদের তৃষ্ণা নিবৃত্তি নিশ্চয়ই হবে। আমার পাত্রে উঠেছে দুই গণ্ডূষ জল, অথবা বলব, আমি অন্ধ, হাত দিয়ে ফেলেছি সৌভাগ্যক্রমে দুটি দাঁতেরই উপর। অবশ্য সব অন্ধই ভাবে, সেই সবচেয়ে মহামূল্যবান স্থলে হাত দিয়ে ফেলেছে, কাজেই এ-অন্ধের অভিমত আত্মম্ভরিতাপ্রসূতও হতে পারে।

প্রথম, বর্মায় সুভাষচন্দ্র কি কৌশলে হিন্দু-মুসলমান-শিখকে এক করতে পেরেছিলেন? এবং শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষে ফেরার পরও এঁদের অধিকাংশ অখণ্ডবাহিনীরূপে আত্মপরিচয় দিতে চেয়েছিলেন। আমরা জানি, সুভাষচন্দ্রের সাইগন আসার বহুপূর্বে রাসবিহারী বসু অনেক চেষ্টা করেও কোনো আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলতে পারেন নি। অথচ রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রের তুলনায় জাপানীদের কাছে অনেক বেশী পরিচিত ছিলেন—জাপান-ফের্তা ভারতীয়দের মুখে শুনেছি রাসবিহারী বসুকে জিজ্ঞাসা না করে জাপান সরকার কখনো কোনো ভারতীয়কে জাপানে থাকবার ছাড়পত্র মঞ্জুর করত না।

একদিকে যেমন দেখতে পাই, সুভাষচন্দ্র 'আজাদ হিন্দ' নামটি অনায়াসে সর্বজনপ্রিয় করে তুললেন, অন্যদিকে দেখি, কৃতজ্ঞ মুসলমানেরা তাঁকে 'নেতাজী' নাম দিয়ে হৃদয়ে তুলে নিয়েছে—'কাইদ-ই-আকবর' বা ঐ জাতীয় কোনো দুরূহ আরবী খেতাব তাঁকে দেবার প্রয়োজন তারা বোধ করে নি। পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, তখন এ-দেশে হিন্দী-উর্দু সমস্যা কংগ্রেসকে প্রায়ই বিচলিত করত, অথচ দেখি সুভাষচন্দ্রকে এ সমস্যা একবারের তরেও কাতর করতে পারে নি। বেতারে আমি সুভাষচন্দ্রের প্রায় সব বক্তৃতাই শুনেছি এবং প্রতিবারই বিস্ময় মেনেছি হিন্দী-উর্দুর অতীত এ ভাষা নেতাজী শিখলেন কি করে? নেতাজী তো শব্দতাত্ত্বিক ছিলেন না, ভাষার কলাকৌশল আয়ত্ত করবার মত অজস্র সময়ও তো তাঁর ছিল না। এ-রহস্যের একমাত্র সমাধান এই যে, রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি যে মহাত্মার থাকে, দেশকে সত্যই যিনি প্রাণ মন সর্বচৈতন্য সর্বানুভূতি দিয়ে ভালোবাসেন, সাম্প্রদায়িক কলহের বহু ঊর্ধ্বে নির্দ্বন্দ্ব পুণ্যলোকে যিনি অহরহ বিরাজ করেন, যে মহাপুরুষ দেশের অখণ্ড সত্যরূপ ঋষির মত দর্শন করেছেন, বাক্যব্রহ্ম তাঁর ওষ্ঠাগ্রে বিরাজ করেন। তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেন, সে-ভাষা সত্যের ভাষা, ন্যায়ের ভাষা, প্রেমের ভাষা। সে-ভাষা শুদ্ধ হিন্দী অপেক্ষাও বিশুদ্ধ হিন্দী, শুদ্ধ উর্দু অপেক্ষাও বিশুদ্ধ উর্দু। সে-ভাষা তাঁর নিজস্ব ভাষা। এই ভাষাই মহাত্মাজীর আদর্শ ভাষা ছিল।

নিজের মনকে বহুবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি, সুভাষচন্দ্র না হয় সর্বদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উড্ডীয়মান ছিলেন, কিন্তু সাধারণ সৈন্যকে তিনি কি করে সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত করলেন? যে উত্তর শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেছি, সেটা ঠিক কি না জানি না; আমার মনে হয়, সুভাষচন্দ্র শুদ্ধ মাত্র সাম্প্রদায়িকতা দূর করার জন্য কখনো কোমর বেঁধে আসরে নামেন নি। আমার মনে হয়, সুভাষচন্দ্র এমন এক বৃহত্তর জাজ্বল্যমান আদর্শ জনগণের সম্মুখে উপস্থিত করতে পেরেছিলেন, এবং তার চেয়েও বড় কথা, এমন এক সর্বজনগ্রহণীয় বীরজনকাম্য পন্থা দেখাতে পেরেছিলেন যে, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি শিখ সকলেই সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করেছিলেন। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, সুভাষচন্দ্র বলছেন, 'আগুন লেগেছে, চল আগুন নেভাই, এই আমার হাতে জল। তোমরাও জল নিয়ে এসো।' সুভাষচন্দ্র কিন্তু এ কথা বলছেন না, 'আগুন নেভাতে হলে হিন্দু-মুসলমানকে প্রথম এক হতে হবে, তারপর আগুন নেভাতে হবে। এস প্রথমে মিটিং করি, প্যাক্ট বানাই, শিলমোহর লাগাই, তারপর স্বরাজ।'

বৃহত্তর আদর্শের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করেছে,—তা সে ব্যক্তিগত স্বার্থই হোক আর সাম্প্রদায়িক স্বার্থই হোক—এ তো কিছু অভূতপূর্ব জিনিস নয়। স্বীকার করি এ জিনিস বিরল। তাই এ রকম আদর্শ দেদীপ্যমান করতে পারেন অতি অল্প লোকই, তাই সুভাষচন্দ্রের মত নেতা বিরল।

দ্বিতীয় যে গজদন্ত আমি অনুভব করতে পেরেছি, সেটি এই :—

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি তিনজন নেতা স্বেচ্ছায় নির্বাসন বরণ করে

দেশোদ্ধারের জন্য মার্কিন-ইংরেজের শত্রুপক্ষকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। এদের মধ্যে প্রথম জেরুজালেমের গ্র্যান্ডমুফতী এবং দ্বিতীয় ইরাকের আবদুর রশীদ। এঁদের দুজনই আপন আপন দেশের একচ্ছত্র নেতা ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি আমাদের নেতাজী। তিনি ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান নেতা ছিলেন না।

তিনজনই কপর্দকহীন, তিনজনই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন আপন আপন যশ এবং চরিত্রবল। প্রথম দুজনের স্বজাতি ছিল উত্তর আফ্রিকায়, অথচ শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এঁদের কেউই কোনো সৈন্যবাহিনী গঠন করে তুনিসিয়া আলজেরিয়ায় ইংরেজের সঙ্গে লড়তে পারলেন না; শুধু তাই নয়, জর্মন রমেল যখন উত্তর আফ্রিকায় বিজয় অভিযানে বেরুলেন, তখন এঁদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাবারও প্রয়োজন তিনি অনুভব করলেন না। এঁদের কেউই জর্মন সরকারকে আপন ব্যক্তিত্ব দিয়ে অভিভূত করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁদের গতি হল আর পাঁচজনের মত ইতালী থেকে বেতারযোগে আরবীতে বক্তৃতা দিয়ে 'প্রোপাগ্যান্ডা' করার।

অথচ, পশ্য, পশ্য সুভাষচন্দ্র কি অলৌকিক কর্ম সমাধান করলেন। স্বাধীন রাষ্ট্র নির্মাণ করে, ইংরেজের 'গর্ব ভারতীয় সৈন্যদের' এক করে, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করলেন। বর্মা-মালয়ের হাজার হাজার ভারতবাসী সর্বস্ব তাঁর হাতে তুলে দিল, স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রাণ দেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

আমরা জানি, জাপান চেয়েছিল সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সৈন্যগণ যেন জাপানী ঝান্ডার নীচে দাঁড়িয়ে লড়েন (মুফতী এবং আবদুর রশীদ জর্মনীকে সে সুযোগ দিতেও বাধ্য করাতে পারেন নি)। সুভাষচন্দ্র কবুল জবাব দিয়ে বলেছিলেন, "আমি আজাদ হিন্দ ও তার ফৌজের নেতা। আমার রাষ্ট্র নির্বাসনে বটে, কিন্তু সে-রাষ্ট্র স্বাধীন এবং সার্বভৌম! যদি চাও, তবে সে রাষ্ট্রকে স্বীকার করার গৌরব তোমরা অর্জন করতে পারো। যদি ইচ্ছা হয়, তবে অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্থ দিতে পারো—এক স্বাধীন রাষ্ট্র যে রকম অন্য স্বাধীন রাষ্ট্রকে মিত্রভাবে ধার দেয়, কিন্তু আমি কোনো ভিক্ষা চাই না এবং আমার সৈন্যগণ 'আজাদ হিন্দ' ভিন্ন অন্য কোনো রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে যুদ্ধ করবে না।"

এই ইন্দ্রজাল কি করে সম্ভব হল? সুভাষচন্দ্রের আত্মাভিমান যেমন তাঁকে বাঁচিয়েছিল জাপানের বশ্যতা না করা থেকে, তেমনি তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে জাপান তাঁর কথামত চলতে বাধ্য হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে আরো কত গুণ, কত কূটবুদ্ধি, কত দুঃসাহস, কত নির্বিকার ধৈর্য, কত চরিত্রবলের প্রয়োজন হয়েছিল, আমাদের মত সাধারণ লোক কি তার কল্পনাও করতে পারে।

কপর্দকহীন, সামর্থ্যসম্বলহীন সুভাষচন্দ্র টোকিয়োতে একা দাঁড়িয়ে—প্রথম দেখি এই ছবি। তারপর দেখি, সেই সুভাষচন্দ্র নেতাজীরূপে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে দাঁড়িয়ে, ভারতেরই এক কোণে।

যতই বিশ্লেষণ করি না কেন, এই দুই ছবির মাঝখানের পর্যায়গুলো ইন্দ্রজাল

—ভানুমতীই থেকে যায়। এ যুগে না জন্মে এ কাহিনী ইতিহাসে পড়লে কখনই বিশ্বাস করতুম না।

"জিন্দাবাদ নেতাজী"।

রোগক্ষয়—শিক্ষালাভ

মানুষ যেমন বিষের ধুঁয়ো এটম বম বানিয়ে তার আপন ভাইকে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে মারতে শিখেছে—ঠিক তেমনি এমন মানুষেরও অভাব নেই যাঁরা মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার জন্য সমস্ত কল্পনাশক্তি, সর্বশেষ রক্তবিন্দু ক্ষয় করতে প্রস্তুত আছেন। কেন জানিনে, আজ হঠাৎ, এঁদেরই একজনের কথা মনে পড়লো। এই প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষের নাম মসিয়ো লুই ভোতিয়ে।

আমি তখন জিনীভায়। এক অচেনা ভদ্রলোক এসে আমার সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ করলেন, লেজাঁয় তাঁর যক্ষ্মারোগীর সানাটরিয়ামটি আমি যদি দেখতে যাই তবে তিনি অত্যন্ত খুশী হবেন। ফ্রান্স, জর্মনি, সুইটজারল্যাণ্ডে বিস্তর সানাটরিয়া দেখেছি, সর্বত্রই সব গুণীর মুখে একই কথা, 'যক্ষ্মার বিশেষ কোনো চিকিৎসা নেই, তবে রোগী যদি মনস্থির করে ফেলে যে, যমকে চোখের জলে নাকের জলে না করা পর্যন্ত সে মরবে না, অর্থাৎ বিছানায় শুয়ে শুয়েই সে হিম্মৎ নামক অস্ত্রখানি দিয়ে তার সঙ্গে লড়াই দেবেই দেবে, তবে হয়ত, হয়ত কেন, নিশ্চয়ই সে বীরকে বাঁচাবার একটা চেষ্টা করাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই।'

আমি ডক্টর ভোতিয়েকে এ-কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি ভারী খুশী হলেন। বললেন, 'আপনি যখন এ তত্ত্বটা জানেন তখন আপনারই বিশেষ করে লেজাঁতে আসা উচিত।' তবু আমার যেতে ইচ্ছা করছিল না; কারণ যক্ষ্মার হাসপাতাল দেখা কিছুমাত্র আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা নয়। কিন্তু ভোতিয়ে সেই শ্রেণীর লোক যাঁরা খানিকটে হেসে, খানিকটে যুক্তিতর্ক দিয়ে, খানিকটে অনুনয়-বিনয় করে গররাজি লোককে নিমরাজি নিজের পায়ে পটিয়ে টেনে নিয়ে যেতে পারেন। আমি খানিকটে ধস্তাধস্তি করেছিলুম, কিন্তু তখন যদি জানতুম যে ভোতিয়ে মুস্‌সোলীন এবং লয়েড জর্জের কাছ থেকে আপন হাসপাতালের জন্য টাকা বাগাতে সমর্থ হয়েছেন, তাহলে নিশ্চয়ই আপত্তি না করে সুবোধ ছেলেটির মত সুড়সুড় করে লেজাঁ চলে যেতুম।

লেজাঁ যেতে হয় চেন-রেলওয়ে ধরে। এমনই ভয়ংকর খাড়া পাহাড়ের উপর যক্ষ্মা সানাটরিয়ামগুলো বানানো হয়েছে যে সাধারণ ট্রেন, এমন কি মোটরও সেখানে পেঁছিতে পারে না।

হোটেল আছে; কিন্তু যখন নিতান্ত এসেই গিয়েছি তখন সানাটরিয়ামের ভিতর থাকলেই তো দেখতে পাবো বেশী।

মসিয়ো ভোতিয়ে, মাদাম, এমন কি বাচ্চা দুটো পর্যন্ত আমাকে দিল-খোলা অভ্যর্থনা জানালেন। বাচ্চা দুটোর বয়স ছয় আর আট। এদের জন্ম হয়েছে

এই সানাটরিয়ামেই ! তারা সুস্থ। শ'খানেক যক্ষ্মারোগীর সঙ্গে তারা খায়-দায় খেলাধুলা গল্পগুজব করে—বাপ-মা'র তাতে কোনো ভয় নেই। আমিই তাহলে ডরাব কেন ?

মসিয়ো ভোতিয়ে বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, যক্ষ্মা রোগটা ছেলেছোকরাদেরই হয় বেশি। বরং এ রোগটার সবচেয়ে বড় ডেরা খাটানো রয়েছে কলেজে কলেজে। কলেজের ছোকরারা এ রোগে মরেও সবচেয়ে বেশী। আপেক্ষাকৃত বয়স্ক রোগী কিংবা নিতান্ত বাচ্চাকে বাঁচানো অনেক সহজ।

'তার প্রধান,—প্রধান কেন, একমাত্র কারণ, যক্ষ্মা হলেই তাদের পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়। তারা তখন ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখে। ভাবে, পড়াশোনা যদি নাই করতে পারলুম তবে দু'পাঁচ বৎসর পরে সেরে গিয়েই বা করব কি ? খাবো কি ? সংসারই বা পাতবো কি দিয়ে ?

'তাই তারা রোগের সঙ্গে লড়বার আর কোনো প্রয়োজন দেখতে পায় না, সব হিম্মৎ হারিয়ে ফেলে, এগিয়ে মৃত্যুর হাতে আপন জানটি ভেট দেয়।'

মসিয়ো ভোতিয়ে বললেন, 'যবে থেকে আমি যক্ষ্মা রোগ নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছি তখন থেকেই আমি কাজে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে, অবসর সময়ে অহরহ ভেবেছি এর কোনো প্রতিকার করা যায় কিনা ? শেষ পর্যন্ত আমি যে প্রতিকার আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি তারই ভিতরে আজ আপনি আমি বসে কথা বলছি—তার নাম 'সানাটরিয়া ইউনিভের্সিতের', অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় আরোগ্যায়তন'।

'এখানে শুদ্ধমাত্র কলেজের ছেলেমেয়েদের নেওয়া হয়। এবং জিনীভা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের বন্দোবস্ত যেন আমাদের রোগীদের টার্ম হিসেবে নেওয়া হয় অর্থাৎ এরা জিনীভায় ক্লাস না করে ক্লাস করছে এই সানাটরিয়ামে। এরা এখানেই পড়াশোনা করে, সুইট্জারল্যাণ্ডের সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপকরা এখানে এসে মাঝে মাঝে লেকচার দিয়ে যান, তাছাড়া যক্ষ্মাবৈরী বহু নিমন্ত্রিত রবাহূত গুণী এখানে এসে দু'দশ দিন থেকে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় নানাপ্রকারে সাহায্য করে যান।

'বুঝতেই পারছেন, যে-সব বিষয় নিলে ভয়ঙ্কর বেশী খাটতে হয়, সেগুলোর ব্যবস্থা এখানে নেই। তাই নিয়ে ছেলেমেয়েরাও বেশী কান্নাকাটি করে না, তারা জানে, সে ধরনের পড়াশোনা করলে তাদের শরীর কখনো সারবে না। তারা খুশি, কোনো কিছু একটা নিয়ে পাশ দিতে পারলেই ; কাজেই বিজ্ঞানের ছেলে দর্শন নিতে আপত্তি করে না, ইঞ্জিনিয়ারিঙের ছেলে ইতিহাস উৎসাহের সঙ্গেই পড়ে।

'অবশ্য স্বাথ্যের অবস্থার উপর পড়াশোনার মেকদার নির্ভর করে। আমাদের সব সময় কড়া নজর, কেউ যেন বড্ড বেশী না খাটে। কিছুদিন থাকার পর রোগীরাও তত্ত্বটা বুঝে ফেলে, আর নূতন রোগীদের ধমক দিয়ে ব্যাপারটা তাদের কাছে জলের মত তরল করে দেয়। আমাকে তো আজকাল

এ-নিয়ে বিলকুল মাথা ঘামাতে হয় না। ওদের চিকিৎসার দিকে এখন আমি আরো বেশী সময় দিতে পারি।'

একটুখানি চোখ টিপে মুচকি হেসে বললেন, 'পড়াশোনা বিশেষ হয় না, সে তো বুঝতেই পারছেন। তা নাই বা হল। ছেলেমেয়েরা সাহস তো পায় বেঁচে থাকবার, সেইটেই হল আসল কথা। জিনীভা বিশ্ববিদ্যালয়ও আমার কলটা বেশ বুঝতে পেরেছেন, আমিই তাদের খোলাখুলি বলে রেখেছি. এখানে মধ্যযামিনীর তৈল ক্ষয় নিষিদ্ধ, বেশী পড়াশোনা এখানে হতেই পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা তো আর হৃদয়হীন পাষাণ নন ; এখান থেকে যারা পরীক্ষা দেয়, তাদের প্রতি তাঁরা সদয়, আর যারা সেরে উঠে বাকী টার্মগুলো জিনীভায় কাটায় তাদের প্রতিও মোলায়েম ব্যবহার করেন।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'কিন্তু টাকা পাই কোথায়? অঢেল টাকার দরকার। আমি পনেরো বছর ধরে তামাম ইয়োরোপ চষে বেড়াচ্ছি টাকার জন্য। মুস্‌সোলীনি, লয়েড জর্জ থেকে আরম্ভ করে যেখানে যে আমাকে সামান্যতম সাহায্য করতে পারে তারই দরজায় হ্যাট পেতে ভিক্ষা মেঙেছি।

'এখন আমার ইচ্ছা এ-প্রতিষ্ঠানটিকে ইণ্টারনেশলাল—সার্বজনীন সার্বভৌমিক করার। ভারতবর্ষ থেকে যদি রোগী ছাত্র আসে তবে তার জন্য যেন এখানে আমি ব্যবস্থা করতে পারি, সেও যেন নিরাময় হয়, সঙ্গে সঙ্গে জিনীভা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি নিয়ে ফিরতে পারে। আপনাদের দেশে তো রাজা মহারাজদের অনেক টাকা— দানখয়রাতও তাঁরা করেন শুনেছি।'

আমি মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললুম, 'এককালে রাজ-রাজড়ারা বিস্তর দান-ধ্যান করতেন এ-কথা সত্যি, আজকালও যে একেবারেই নেই সে-কথা আমি বলব না। আপনি যদি স্বয়ং ভারতবর্ষে আসেন তবে একটা চেষ্টা দিয়ে দেখতে পারি। আমার দ্বারা যোগসূত্র স্থাপনের যেটুকু সামান্য সাহায্য সম্ভবপর—'

ডক্টর ভোতিয়ে আমার দু'খানা হাত চেপে ধরে নীরবে আমার চোখের দিকে সকৃতজ্ঞ নয়নে তাকিয়ে রইলেন।

আমি দেশে ফিরে এলুম! তারপর লেগে গেল ১৯৩৯-এর লড়াই। সুইট্‌জারল্যাণ্ড ছোট্ট দেশ। সীমান্ত রক্ষার জন্য ভোতিয়ের মত ডাক্তারকে উর্দি পরে ব্যারাকে ঢুকতে হল—অবশ্য ডাক্তারের উর্দি। কিন্তু তাঁর এ-দেশে আসাটা আর হয়ে উঠল না।

* * *

মসিয়ো লুই ভোতিয়ে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের লেজাঁ নামক স্থানে যে 'আরোগ্যায়তন বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেখানে যক্ষ্মা সারানোর সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া শেখানোর অভিনব সমন্বয় বহু সুইট্‌জারল্যাণ্ডবাসীর হৃদয়মন আকৃষ্ট করেছে। তাঁরা অকৃপণ হস্তে এ-প্রতিষ্ঠানে অর্থদান করেছেন এবং তাঁদেরও ইচ্ছা এ-প্রতিষ্ঠানটি ক্রমে ক্রমে বিশ্বজনের সম্পদ হয়ে উঠুক। কিন্তু উপস্থিত জাতীয়তাবাদ নামে যে বর্বরতা পৃথিবীকে শতধা বিভক্ত করে

দিচ্ছে, তার সামনে মসিয়ো ভোতিয়ে নিরুপায়। তাই আমার বিশ্বাস, যতদিন সুইট্জারল্যাণ্ডে বিশ্বকল্যাণের জন্য সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা না হয়, ততদিন এ-দেশে আমাদেরও চুপ করে বসে থাকা অনুচিত হবে। লেজাঁতে যে প্রতিষ্ঠান সম্ভবপর হয়েছে, এদেশেই বা তা হবে না কেন? বরঞ্চ এদেশে তার প্রয়োজন অনেক বেশী; কারণ এদেশের ছাত্র-সমাজে যক্ষ্মারোগের যে প্রসার তার সঙ্গে অন্য কোন দেশেরই তুলনা হয় না। অস্মদ্দেশীয় যক্ষ্মাবৈরী সজ্জন সম্প্রদায় আশা করি কথাটা ভেবে দেখবেন।

কিন্তু এ-হেন গুরুতর বিষয় নিয়ে মাদৃশ অর্বাচীন জনের অত্যধিক বাগাড়ম্বর অশোভনীয়। আমার উচিত, যোগাযোগের ফলে আমার যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয়েছে সেইটে পাঁচজনকে শুনিয়ে দেওয়া। তারপর কে কি করল না করল তা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।

লেজাঁয় যক্ষ্মারোগের জন্য কি চিকিৎসা করা হয়, সে সম্বন্ধে সালঙ্কার বিবৃতি দেবার প্রয়োজন নেই। দক্ষিণ ভারতের মদনপল্লীর 'আরোগ্য-বরমে' যে-সব ব্যবস্থা আছে, সেগুলো তো আছেই তার উপর লেজাঁ এবং ডাভোসের অন্যান্য মামুলী সানাটরিয়াতে যক্ষ্মারোগ বাবদে যে-সব গবেষণা অষ্টপ্রহর করা হচ্ছে, তার ফলও মসিয়ো ভোতিয়ে অহরহ পাচ্ছেন।

সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদান। এবং তার এক প্রধান অঙ্গ নানা দেশের নানা গুণীকে লেজাঁতে নিমন্ত্রণ করে তাঁদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করা। তার জন্য ভোতিয়ের প্রতিষ্ঠানে একটি চমৎকার লেকচার থিয়েটার আছে। অন্যান্য সানাটরিয়াতে এ রকম হলের প্রয়োজন হয় না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি লেজাঁ পেঁছিবার ঠিক কয়েকদিন আগে দু-তিনজন বড় বড় পণ্ডিতের গুরু গুরু ভাষণের গুরুভোজনের ফলে ছেলেমেয়েরা ঈষৎ কাতর হয়ে পড়েছিল! তাই বোধ করি, মসিয়ো ভোতিয়ে একটা জব্বর রকমের জোলাপের ব্যবস্থা করেছিলেন।

মসিয়ো ভোতিয়ে আমাকে সোজাসুজি বললেন, 'আপনি একটা লেকচার দিন। জর্মন কিংবা ফ্রেঞ্চ, যে-কোনো ভাষায়!'

আমি বললুম, 'আপনি যদিও জাতে সুইস, আপনার মাতৃভাষা ফরাসী এবং আপনি ফরাসী ঐতিহ্যে গড়ে-ওঠা বিদগ্ধজন। কাজেই আপনিও নেপোলিয়নের মত 'অসম্ভব' কথাটায় বিশ্বাস করেন না এবং তাই আপনার পক্ষে এ অনুরোধ করাটা 'অসম্ভব' নয়; আমি কিন্তু ফরাসী নয়, আমি 'অসম্ভব' কথাটা জানি এবং মানি। আমার পক্ষে বক্তৃতা দেওয়া অসম্ভব।'

এগারো বৎসর হয়ে গিয়েছে, সম্পূর্ণ কথোপকথনটা আমার আজ আর মনে নেই। তবে চোখ বন্ধ করলে যে ছবিটি এখনো মনের ভিতর দেখতে পাই, তাতে আছে—এক বিরাট ফ্রাঙ্কেনস্টাইন যেন আমার দিকে দু'বাহু বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে আর আমি ক্রমেই পিছু হটে হটে শেষটায় দেয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। আর পিছু হটবার জায়গা নেই। ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দু'হাত আমার গলা টিপে ধরেছে। হাত দুখানি বলছে,

'এতগুলো রোগীকে আপনি নিরাশ করবেন ?'

আমি অস্ফুট কণ্ঠে বলেছিলুম,

'পড়েছি যবনের হাতে
খানা খেতে হবে সাথে।'

* * *

ঝট্‌পট্‌ ইশ্‌তিহার বেরিয়ে গেল 'ভারতীয় অমুক কাল সন্ধ্যায় লেজাঁর 'সানতরিয়াঁ ইউনিভের্সিতের সুইসে' একখানা ভাষণ দেবেন। বিষয়……। লেজাঁর তাবৎ সানাতরিয়াঁর অধিবাসিবৃন্দকে সাদর নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে।' অর্থাৎ ভোতিয়ে সাহেবের প্রতিষ্ঠানের পাঁচজন তো আসবেনই, অন্যান্য সানাতরিয়াঁর আরো বহু দুশ্‌মনকে ডাকা হয়েছে আমার মুখোশ খসাবার জন্য—কিন্তু ধর্ম সাক্ষী, আমি অনেক মুখোশ পরেছি বটে, পাণ্ডিত্যের মুখোশ কখনো পরি নি।

ভোতিয়ে বললেন, 'চলুন, হলটার ব্যবস্থা কি রকম হল দেখবেন।'

লোকটা নিশ্চয়ই স্যাডিস্ট। এই যে সামনে পুজো আসছে, আমরা তো কখনো বলির মোষটাকে হাড়িকাঠ দেখিয়ে চ্যাটাস্‌ চ্যাটাস্‌ করে ঠোঁট চাটিনে।

গিয়ে দেখি মধ্যিখানে বেশ খানিকটে জায়গা ফাঁকা রেখে চতুর্দিকে চেয়ার বেঞ্চি পাতা হয়েছে। তবে কি আমাকে ওখানে ফেলে জবাই করা হবে—আমার ছট্‌ফটানির জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়েছে ? কি হবে বৃথা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে ? গর্দিশ, গর্দিশ, সবই কপালের গর্দিশ।

ভোতিয়ে ব্যবস্থাটা দেখে চ্যাটাস্‌ চ্যাটাস্‌ করলেন, অদৃশ্য সাবানে হাত দুটো কচলালেন। বুঝলুম, আমার অনুমান ভুল নয়। জবাইটা জব্‌বর ধরনেরই হবে।

ফ্রম থর্ন টু থর্ন অর্থাৎ কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় ভোতিয়ে আমাকে সেই হলে নিয়ে ঢোকালেন।

দেখি ফাঁকা জায়গাটা ভরে গিয়েছে বিস্তর হুইল চেয়ারে। যে-সব রোগীর পায়ের হাড়ে যক্ষ্মা অথবা যাদের নড়াচড়া করা বারণ, তাদের আনা হয়েছে হুইল চেয়ারে করে। জন দুই শুয়ে আছে লম্বা লম্বা কোঁচ সোফায়। পরে জানলুম, যারা নিতান্তই খাট ছাড়তে পারে না তাদের জন্য ঘরে ঘরে 'ইয়ার ফোনে'র ব্যবস্থা করা হয়েছে।

একজন দেখি হুইল চেয়ারে বসে পাইপ টানছে। তখন আমার গর্দানে ঘি মালিস করা হচ্ছে—অর্থাৎ কে যেন যা-তা আবোল-তাবোল বকে আমার পরিচয় দিচ্ছে। ভোতিয়ে আমার পাশে বসে—পাছে আমি শেষ মুহূর্তে পালাবার চেষ্টা করি। কানে কানে জিজ্ঞেস করলুম, 'পাইপ সিগরেট খাওয়া যক্ষ্মারোগীদের বারণ নয় ?' ভোতিয়ে বললেন, 'ভিতরে তামাক না থাকলে নিশ্চয়ই বারণ নয়'। আমি বললুম, 'অর্থাৎ ?' অর্থাৎ বেচারীর যক্ষ্মা হওয়ার পূর্বে সে দিনরাত পাইপ টানত! অভ্যাসটা সম্পূর্ণ ছাড়তে পারে নি বলে এখন খালি-পাইপ কামড়ায়। ধুঁয়ো বেরুচ্ছে না বলে দাঁত কিড়িমিড়ি খায়, আর হরেদরে প্রতি মাসে গোটা সাতেক ভাঙে। কিন্তু ছেলেটা পাইপ বাবদে জউরি। "ব্রায়ার" ছাড়া

অন্য কোনো পাইপ চিবোতে রাজী হয় না।'

আপনি ভাবছেন, শ্রোতারা যক্ষ্মারোগী, তাই তাদের বিবর্ণ বিশীর্ণ মুখচোখ। আদপেই না। আপেলের মত লাল গাল প্রায় সব্বায়ের, চোখে মুখে উৎসাহ আর উত্তেজনা। যার দিকে তাকাই সে-ই যেন আমায় হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে নিচ্ছে, সবাই যেন বলছে, 'কি ভয় তোমার ; এত দূর দেশ থেকে এসেছো, যা-ই বলো না কেন আমরা কান পেতে শুনবো।'

তবু আমি মনে মনে গুরুদেবকে স্মরণ করলুম আমাকে ত্রাণ করার জন্য।

তারপর কি হল ?

তারপর কি হল ? ভয়ে আমার হাত-পা পেটের ভিতর সেঁধিয়ে গিয়েছে ; আর আজ যদি আপনাদেব কাছে স্বীকারও করি যে তারা বক্তৃতা-শেষে আমার দিকে পচা ডিম আর পচা টমাটো ছুঁড়েছিল, তাহলেও আপনাদের চারখানা হাত গজাবে না।

আমি কি বলেছিলুম ?

সে বকবকানি আপনারা তো প্রতি হপ্তায় শোনেন। নূতন করে বলে আর কি লাভ ?

ইস্কিলাস— শেলি—স্পিটলার

বিদ্রোহী মানুষকে সমাজের কড়া বাঁধন মেনে নেবার জন্য গ্রীক নাট্যকার ইস্কিলাস যে নাটকখানি লেখেন তার নাম প্রমিথিয়ুস বাউন্ড—শৃঙ্খলবদ্ধ প্রমিথিয়ুস। ইস্কিলাস ইচ্ছে করেই নাটকের পাত্র-পাত্রী দেবসমাজ থেকে বেছে নিয়েছিলেন। ভাবখানা অনেকটা এই :—খুদ দেবতারাই যখন নিয়ম কানুন না মেনে চলতে পারেন না তখন তুমি আমি কোন্ ছার। নাটকের মূল গল্প হচ্ছে : প্রমিথিয়ুস দেবতাদের পরম যত্নে লুকিয়ে-রাখা সাত-রাজার-ধন-মাণিক অগ্নি জিনিসটি চুরি করে মানুষের হাতে তুলে ধরেন, তাই দিয়ে মানব-সভ্যতা গড়ে ওঠে। দেবরাজ জুপিটার ভয়ঙ্কর চটে গিয়ে প্রমিথিয়ুসকে পাহাড়ের গায়ে পেরেক পুঁতে বেঁধে রাখলেন, শকুনি দিয়ে বুকের কলিজা, চোখের পাতা খাওয়ালেন, যাতে করে প্রমিথিয়ুস আপন পাপ স্বীকার করে সোজা রাস্তায় চলেন। প্রমিথিয়ুস সে নিপীড়ন সহ্য না করতে পেরে শেষটায় হার মানলেন। জুপিটার খুশি, ইস্কিলাস আরো বেশী খুশী—স্বর্গরাজ্যে ধর্মরাজ্যে পরিণত হল।

আমাদের কবিগুরু রামায়ণে এরকম কোনো ধর্মনীতি প্রচার করতে চেয়েছিলেন কি না জানিনে কিন্তু সেখানেও রাবণকে শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয়েছিল।

তারপর প্রায় দু'হাজার বছর কেটে গেল। দেবতাদের হুমকির ভয়ে কি গ্রীস, কি ভারতবর্ষ কেউই প্রমিথিয়ুসের মত তাঁদের সামনে মাথা খাড়া করে দাঁড়াতে সাহস পেল না। কিন্তু তবু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, এই দু'হাজার বৎসর ধরে যাদের বুকের কলিজা, চোখের পাতা খাওয়ানো হল,

তারা কি সব সময়ই ভিতরে বাইরে দু'দিকেই আপন 'পাপ' স্বীকার করে নিয়েছিল? তাদের ভিতর কি এমন কেউ ছিল না যে বাইরে ক্ষমা চেয়েছে হয়ত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মরেছে যে দেবতার অনুশাসনই চিরন্তন ধর্ম নয়ঃ যেখানে নিপীড়ন দিয়ে ক্ষমা-ভিক্ষা বের করতে হয় সেখানে নিশ্চয়ই কোনো দুর্বলতা, কোনো ত্রুটি লুকানো রয়েছে।

এই কথাটি জোর গলায় বলবার মত সাহস প্রথম দেখালেন ইংরেজ কবি শেলি। তখনকার দিনে রূঢ়ার্থে ভগবান বলতে যা বোঝাত শেলি সে পুরুষকে অস্বীকার করলেন, আর সেই ভগবানের নামে গড়া তখনকার দিনের সমাজের আইন-কানুন ভাঙতে কসুর করলেন না। ভগবানের পুলিসমেন অর্থাৎ পাদ্রী পুরুতরা তখন শেলির পিছনে জুপিটারের মতনই শকুনি লাগিয়ে দিলেঃ শেলির অনেকখানি কলিজা খাওয়ানো হয়, শেলি অসহ্য যন্ত্রণায় বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করলেন, শেলিরও চোখের পাতার অনেকখানি শকুনির পেটে গিয়েছিল। কিন্তু তবু শেলি হার মানেন নি।

এবং সেই না-মানা অজরামর রূপ নিয়ে বেরল তাঁর নাট্যকাব্য 'প্রমিথিয়ুস আনবাউন্ড'—মুক্ত প্রমিথিয়ুস। শুনেছি, এক জাপানী চিত্রকর নাকি তাঁর বুকের জখমের রক্ত দিয়ে তুলি ভিজিয়ে ভিজিয়ে ছবি আঁকতেন বলে তাঁর ছবি সমস্ত জাপানের চিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছিল। হয়ত রূপক, হয়ত সত্য; কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, শেলির প্রমিথিয়ুস নাট্য বুকের রক্ত দিয়ে আঁকা। অত্যাচার-জর্জরিত মানবাত্মার তীক্ষ্ণতম চিৎকার, ধর্ম-প্রতিষ্ঠান সমাজবিধির বিরুদ্ধে মানবের গভীরতম হুঙ্কার এ কাব্যে যে রূপ, যে রস পেয়েছে তার সঙ্গে তুলনা দেবার মত দ্বিতীয় কাব্য তো সহজে খুঁজে পাইনে।

(আর পাঁচজন হয়ত স্বীকার করবেন না, কিন্তু আমার মনে হয় মধুসূদনের রাবণ চরিত্রে যেন আমি খানিকটা সেই সুর শুনতে পাই। কিন্তু হিন্দু সমাজ তো মধুসূদনের উপর কোনো অত্যাচার করে নি—তাঁর তুলনায় হিন্দু ঈশ্বর-চন্দ্রকে তো অনেক বেশী কটুবাক্য শুনতে হয়েছে। তখনকার দিনের কলকাতার বিদগ্ধ ইতর কোনো সমাজই তো মধুসূদনের পিছনে শকুনির পাল চালিয়ে দেয় নি। তবু হয়তো হৃদ্যতার অভাব দেখতে পেয়েছিলেন এবং হয়তো মনে মনে আপন সনাতন ধর্ম বর্জন সম্বন্ধে ঈষৎ বিবেকদংশনে কাতর হয়েছিলেন। তাই বোধ হয় তিনি অন্য চরিত্র না নিয়ে রাবণকে বেছে নিয়েছিলেন, অর্থাৎ রাবণের যে গোড়ার দিকে খানিকটা দোষ আছে একথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাই হয়ত প্রমিথিয়ুস ও রাবণ এক পাত্র নয়। শেলির প্রমিথিয়ুস বলে, আমি কোন দোষ করিনি। মধুসূদনের রাবণ বলে, 'একবার দোষ করেছিলুম বলেই কি আমাকে বিনষ্ট করার জন্য দেবনরবানর সবাই একজোট হয়ে সর্ব ধর্ম সর্ব ক্ষাত্রনীতি বিসর্জন দেবে?')

তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ধর্মের বাঁধন ঢিলে হয়ে গেল, এমন কি বড় বড় শহরে সমাজের তিরস্কারও গাড়িঘোড়ার শব্দের নীচে চাপা পড়ে গেল। প্যারিস তো এমন জায়গায় গিয়ে পেঁছিল যে, সেখানে যে শুধু সমস্ত পৃথিবীর

মুক্তিকামী নর-নারী সম্মিলিত হল তাই নয়, আধা-পাগল বদ্ধপাগল এমন সব চিৎকার কলাবৎকে প্যারিস সয়ে নিল যাঁরা আপন দেশে থাকলে আর কিছু না হোক অন্ততঃ পাগলা গারদের ভিতরে জীবনের বেশীর ভাগ কাটাতেন।

কিন্তু এ সব মুক্তির বদলে মানুষ তখন আরেক দেবতার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। অর্থের এবং সঙ্ঘের অত্যাচার।

না খেয়ে মানুষ যে পূর্বে কখনো মরে নি একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু এবারে কলকারখানার জোরে, মানুষের পয়সা কামাবার হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে যে প্রতিষ্ঠান যে সঙ্ঘ গড়ে উঠল তার অত্যাচার দেশ-বিদেশে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগল। লুণ্ঠন যে আগে ছিল না তা নয়, কিন্তু এখন সাম্রাজ্যবাদের নামে যে শোষণ আরম্ভ হল তার শেষ নেই। চেঙ্গিস নাদির আট্টিলা আসত দু'দিনের তরে; কিন্তু এখন যে পাদ্রী কামান রাজপুরুষ বণিক পুলিস আসতে লাগল তার আর অন্ত নেই। তাদের শোষণ দিনযামিনী, সায়ং প্রাতঃ, শিশির বসন্ত, যুগ যুগ ধরে। জমিদার ব্যারন যে সুন্দরী ধরে নিয়ে যেত সে তো অজানা নয়। কিন্তু এখন বড় বড় দোকানের চাকরিতে তরুণীদের আর নিস্তার নেই। বড় সায়েবদের বিলাস লালসায় যে নারীমেধ যজ্ঞ জ্বলে তার ইন্ধন অষ্টপ্রহর দেদীপ্যমান রাখবার জন্য আর কোনো তরুণীর বসনভূষণ বাঁচিয়ে রাখবার উপায় নেই।

এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহাকাব্য রচনা করলেন সুইট্জারল্যান্ডের মহাপুরুষ কার্ল স্পিটলার। সে কাব্যের নাম প্রমেটয়েস উন্ট এপিমেটয়েস (Prometheus und Epimetheus)। এ কাব্যের সঙ্গে তুলনা দিতে পারি এমন আর কোনো কাব্য আমার জানা নেই। গুরুগম্ভীর গদ্যচ্ছন্দে লেখা সে কাব্য, পদ্যের সর্বোচ্চ শিখরে জ্যোতিষ্মান ভাস্করের ন্যায় সে গদ্য। এ গদ্য ছন্দ পাই উপনিষদ, বাইবেল এবং কুরানে। এবং উপনিষদ, বাইবেল, কুরানের অনুবাদ যে-রকম অসম্ভব, এ কাব্যের অনুবাদও মানুষের সাধ্যের বাইরে। এ-কাব্য রচনা করে স্পিটলার নোবেল প্রাইজ পান, তৎসত্ত্বেও এখন পর্যন্ত এ-কাব্যের অনুবাদ হয় নি।

স্পিটলার যে অত্যাচার অবিচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রমিথিয়ুসের কণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, সে অত্যাচার ইতিমধ্যে আরও রুদ্ররূপ ধারণ করেছে। কলকাতা বুকের উপরই তার নব নব তাণ্ডব আমরা দেখতে পাচ্ছি। মানুষের গড় দুর্ভিক্ষ, দৈনন্দিন অনশন, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, দৈন্যের দায়ে দেহ বিক্রয়, নিরপরাধের উপর গুলিবর্ষণ, সাম্প্রদায়িক বর্বরতা, মানুষের প্রাণ নিয়ে বিবেকহীন রাজনৈতিকদের ছিনিমিনি খেলা, অরক্ষণীয়ার অন্ধকার ভবিষ্যৎ, অর্থের জোরে সমাজের বুকের উপরে বসে অন্নাভাবে মৃত্যুভয়েকাতর পিতামাতার সম্মুখে তাদের কুলকামিনীর সর্বনাশ, ভ্রূণহত্যা—সবই তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু কই সে বাঙালী স্পিটলার ??

মোপাসাঁ—চেখফ্—রবীন্দ্রনাথ

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অদ্ভুত যোগাযোগের ফলে অনেক তথ্য ও অনেক প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। শুনেছি র‍্যোন্‌টগেনের রঞ্জনরশ্মি আবিষ্কার, ফ্যারাডের বৈদ্যুতিক শক্তির আবিষ্কার এ রকম যোগাযোগের ফল। সাহিত্যে এ রকম ধারা বড় একটা হয় না। শুধু ছোট গল্পের বেলা তাই হয়েছে। কিন্তু একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, র‍্যোন্‌ট্‌গেন ও ফ্যারাডে যদি বহু বৎসর ধরে আপন আপন জ্ঞানচর্চায় নিবিষ্ট না থাকতেন, তাহলে যে-সব যোগাযোগের ফলে রঞ্জনরশ্মি ও বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কার হল সে সব যোগাযোগ বন্ধ্যাই থেকে যেত। ছোট গল্পের বেলাও তাই—মোপাসাঁ যদি সাহিত্য সাধনায় পূর্বের থেকেই নিযুক্ত না থাকতেন, তবে ফ্লবেরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সম্পূর্ণ নিষ্ফল হত।

ফ্লবের যে কি অদ্ভুত সুন্দর ফরাসী লিখে গিয়েছেন, তার বর্ণনা দিতে পারেন শুধু ফ্লবেরই। ভলতেরের পরেই ফ্লবেরের নাম করতে হয় এবং এঁদের মাঝখানের যে-কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক পেলেও বাংলা ভাষা বর্তে যাবে। আর ফ্লবেরের আশা শিকেয় তুলে রাখাই ভালো, তাঁর মত লেখক জন্মাবার পূর্বে এদেশের গঙ্গায় বিস্তর চড়া পড়ে যাবে। তার কারণ এ নয় যে আমাদের দেশে শক্তিমান লেখকের অভাব, বেদনাটা সেখানে নয়, আসল বেদনা হচ্ছে আমাদের লেখকেরা খাটতে রাজী নন। ফ্লবেরের লেখা পড়ার সময় বোঝাই যায় না তার পিছনে কি অসম্ভব পরিশ্রম রয়েছে, কারণ সে পরিশ্রমের উপরে ফ্লবেরকে আরো পরিশ্রম করতে হয়েছে গোড়ার পরিশ্রমটা ঢাকবার জন্য। ভলতেরের সরল স্বচ্ছ শৈলীর প্রশংসা করলে তিনি নাকি করুণ হাসি হেসে বলতেন, 'ফরাসী জাতটা কি আর জানে তাদের কষ্ট বাঁচাবার জন্য আমি নিজে কতটা কষ্ট স্বীকার করি?' ফ্লবের এ কথাটা বললে মানাতো আরো বেশী—তিনি তো শেষটায় সে পরিশ্রম সইতে না পেরে লেখাই ছেড়ে দিলেন।

ধুয়ে মুছে কেচে ইস্ত্রি করে পাট না করা পর্যন্ত ফ্লবের ভাষাকে রেহাই দিতেন না। তাই যখন শাগরেদ মোপাসাঁর ভিতর ফ্লবের গুণের সন্ধান পেলেন তখন মোপাসাঁর লেখার উপর নির্মম র‍্যাঁদা চালাতে আরম্ভ করলেন। আর কী সব অদ্ভুত ফরমায়েশ—দশ লাইনে করুণ বর্ণনা লেখো, পনেরো লাইনে বীররস বাৎলাও, এটা ছিঁড়ে ফেলে দাও, ওটা ছাপিয়ো না—অর্থাৎ ফ্লবের শাগরেদ মোপাসাঁকে ধুয়ে মুছে কেচে তৈরি করে প্রায় পকেটস্থ করে ফেলেছেন, এমন সময় তাঁর ডাক পড়লো সেই লোক থেকে যেখানে রসসৃষ্টি করা যায় বিনা পরিশ্রমে—স্বর্গলোকে পরিশ্রম নেই বলেই মর্তলোকের সৃষ্টি হয়েছিল এ-কথা বাইবেলে লেখা আছে।

এই তালিমের ফলেই ছোট গল্পের সৃষ্টি? মোপাসাঁর পূর্বের লেখকরা কি বর্ণনা, কি চরিত্র-বিশ্লেষণ, কি ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সব কিছুই লিখতেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। ছোট গল্প লিখতে হলে যে বাকসংযম দরকার, বিস্তর কথা

অল্প কথায় প্রকাশ করবার যে কেরামতির প্রয়োজন, প্রকাণ্ড আলোটার চতুর্দিক কালো কাপড়ে ঢেকে তার সামনের দিকে পুরু কাঁচ লাগালে যে রশ্মির তীব্রতা বাড়ে সেই জ্ঞান মোপাসাঁর পূর্বে কারো ছিল না, অথবা তাই নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কেউ অনুভব করেন নি। সর্বাঙ্গ বেনারসীতে ঢেকে মুখ থেকে শুধু ঘোমটা সরিয়ে ফিক করে এক ঝলক হেসে সুন্দরী চলে গেল—মোপাসাঁর পূর্বে ফরাসীরা যেন এ-অভিজ্ঞতার কল্পনাই করতে পারেন নি। তাঁদের কায়দাটা কি ছিল সে কথা ফেনিয়ে বলার সাহস আমার নেই—কলকাতা এ সব বাবদে প্যারিসের মত 'উদার' নয়।

এ সব নিছক যোগাযোগের কথা। মোপাসাঁর আপন কৃতিত্ব তবে কোন্‌খানে? গল্পটাকে বিশেষ এক জায়গায় এনে অকস্মাৎ ছেড়ে দেওয়া, এবং সেই অকস্মাৎ ছেড়ে দেওয়াটাই গল্পের সম্পূর্ণতাকে প্রকাশ করল—ইংরিজিতে যাকে বলে 'ক্লাইমেক্‌স্'—এইখানে মোপাসাঁর বিশেষত্ব। মোপাসাঁর পূর্বের ঔপন্যাসিকেরা তাবৎ নায়ক নায়িকাদের জন্য এতটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত না করে উপন্যাস বন্ধ করতেন না। নটে গাছটি তাঁরা এমনি কায়দায় মুড়তেন যে, পাঠকের মনে আর কোনো সন্দেহ থাকত না যে এদের জীবনে আর কিছু ঘটতে পারে না, এরা এখন থেকে 'পুত্র কন্যা লাভ করতঃ পরমানন্দে জীবন যাপন করিল' অথবা 'অনুতাপের তুষানলে তিলে তিলে দগ্ধ হইতে লাগিল'।

ক্লাইমেক্‌স্ আবিষ্কার মোপাসাঁর একান্ত নিজস্ব।

মোপাসাঁর পর বিস্তর লেখক এন্তার ছোট গল্প লিখেছেন, কেউ কেউ মোপাসাঁর চেয়েও ভালো লিখেছেন; কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সব গল্পই মোপাসাঁর ছাঁচে ঢেলে গড়া। মোপাসাঁ যে কাঠামোটি গড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই কাঠামোটিতে কোন ফেরফার করার সাহস কারোরই হল না।

চেখফ্‌ই (Chekhov, Tschehoff ইত্যাদি নানা বানানে নামটি লেখা হয়, কিন্তু উচ্চারণ 'চেখফ্') প্রথম এই কাঠামোতে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে ক্লাইমেক্‌স্ বাদ দিয়েও সরেস ছোট গল্প লেখা যায়। শুধু তাই নয়, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে খুব কম ঘটনাই এ রকম ধারা 'বুমস্‌-প্যাঙ' করে সশব্দে ক্লাইমেক্‌সে এসে অরকেস্ট্রা শেষ করে। চেখফের অনেক গল্প ক্লাইমেক্‌সে শেষ হয় সত্য; কিন্তু সেটা গল্পের নিজস্ব প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সব গল্পই যদি পাঠক ক্লাইমেক্‌সের প্রত্যাশা করে করে পড়ে, তবে সেগুলো একঘেয়ে হয়ে যেতে বাধ্য সব কবিতাই তো আর সনেট নয় যে শেষের দুই ছত্রে কবিতার সারাংশ জোর গলায় বলে দেওয়া হবে। তাই চেখফের বহু ক্লাইমেক্‌স্-বর্জিত গল্পের ভারকেন্দ্র এমন ভাবে সমস্ত গল্পে ভাগ করে করে দেওয়া হয়েছে যে, পাঠক রসিয়ে রসিয়ে নিশ্চিন্ত মনে গল্পগুলো পড়তে পারে—ক্লাইমেক্‌সের আচমকা ইলেকট্রিক শকের জন্য নাক কান খাড়া করে থাকতে হয় না।

আর ভাষার দিক দিয়ে চেখফ্ মোপাসাঁকেও ছাড়িয়ে যান। যান। টলস্টয় ফ্লবেরের চেয়ে অনেক বড় স্রষ্টা এবং চেখফ্ যদিও টলস্টয়ের শিষ্য নন তবু তিনি বহু বৎসর ধরে টলস্টয়ের সাহচর্য ও উপদেশ পেয়েছিলেন। টলস্টয় স্বয়ং

গর্কির চেয়ে চেখফ্‌কে পছন্দ করতেন বেশী—তিনি নাকি একবার গর্কিকে বলেছিলেন, চেখফ্‌ মেয়ে হলে তিনি তাঁর কাছে নিশ্চয়ই বিয়ের প্রস্তাব পাড়তেন।

রবীন্দ্রনাথের গোড়ার দিকের গল্পগুলি বড় ঢিলে। প্রমাণ করা কঠিন, কিন্তু আমার মনে হয়, এই ঢিলে ভাব তাঁর প্রথম কাটাল মোপাসাঁর গল্পের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর। তখন থেকে রবীন্দ্রনাথের গল্পে মোপাসাঁরই মত ঠাস বুনুনি দেখতে পাওয়া যায়, আর কাঠামোটাও হরেদরে মোপাসাঁর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত লেখক আপন বৈশিষ্ট্য বর্জন করে লিখবেন—তা সে কাঁচা লেখাই হোক আর পাকা লেখাই হোক—সে কথা অনায়াসে অস্বীকার করা যায়। রবীন্দ্রনাথের গল্প মোপাসাঁ চেখফ্‌ দুজনের গল্পকেই হার মানায় তার গীতিরস দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্পটি কেমন যেন সঙ্গীতের কোনো এক রাগে বাঁধা। এখানে সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল রয়েছে। মৃৎশকটিকা, শকুন্তলা, রত্নাবলী নাটক গ্রীক কাঠামাতে ফেলা যায় সত্য; কিন্তু এগুলিতে যে গীতিরস রয়েছে, গ্রীক নাটকে তো নেই—তাই আমরা সংস্কৃত নাটকে যে আনন্দ পাই, গ্রীক নাটকে সেটি পাই নে।

রবীন্দ্রনাথ বিশেষ বয়সে শেলি, কীটসের প্রভাবে পড়েছিলেন সত্য, কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য, রবীন্দ্রনাথ সে প্রভাব একদিন সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন। গল্পের বেলাতেও রবীন্দ্রনাথ একদিন মোপাসাঁর প্রভাব ঝেড়ে ফেলে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শেষের দিকের গল্পগুলিতে কি যেন এক অনির্বচনীয়ের প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। 'মিস্টিক' কথাটাকে সব কিছুই ঢাকা পড়ে যায় বলে শব্দটা ব্যবহার করতে বাধো বাধো ঠেকে; কিন্তু মানব-চরিত্রের আলো-অন্ধকারের আবছায়া আঁকুবাঁকু, মানব-চরিত্রের যে দিক দৈনন্দিন জীবনে আমাদের চোখে পড়ে না, মানুষকে যে সব সময় তার বাক্য আর আচরণ দিয়েই চেনা যায় না মানুষের সেই দুর্জ্ঞেয় অন্তঃস্তল রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছিলেন আধা-আলোরই ভাষা এবং ভঙ্গী দিয়ে প্রকাশ করতে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ একা, মোপাসাঁ চেখফের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র সেখানে সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

অনুবাদ সাহিত্য

বাঙলা সাহিত্যের মত অদ্ভুত এবং বেতালা সাহিত্য পৃথিবীতে কমই আছে। রবীন্দ্রনাথ গান আর কবিতা দিয়ে যে বাঙলা গীতিসাহিত্য রচে গিয়েছেন তার কাছে এসে দাঁড়াতে পারে, এমন গীতিসাহিত্য পৃথিবীতে আর নেই বললেও চলে। মেঘদূতের মত গীতিকাব্য পৃথিবীতে নেই—রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান অনেক স্থলে কালিদাসের মেঘদূতকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিকাব্য দিয়ে বাঙলা সাহিত্যকে যেন একসঙ্গে তেইশটা ডবল প্রমোশন পাইয়ে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পও বিশ্বসাহিত্যের যে-কোন কথাসাহিত্যের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারে। আরো বিস্তার অতুলনীয় সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের কলম দিয়ে বেরিয়েছে, তার উল্লেখ এখানে অবান্তর।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৃষ্টিকার। তাঁর পক্ষে অন্য লেখকের রচনা অনুবাদ করবার কোন প্রয়োজন ছিল না। এমন কি এ-কথা বললে ভুল বলা হবে না, যেটুকু অনুবাদ তিনি করেছেন তাতে সময় নষ্ট হয়েছে মাত্র। কদম-ফুলের কেশর ছাড়িয়ে লাটু বানিয়ে ছেলেরা জিনিসটাকে কাজে লাগায় বটে, তবু নিষ্কর্মা কদম-ফুলেরই দাম বেশী।

অনুবাদ-চর্চা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বেশী সময় নষ্ট করেন নি বলেই বোধ করি বাঙলা সাহিত্য অনুবাদের দিক দিয়ে এত হীন। তাই বলছিলুম বাঙলা সাহিত্য বেতালা সাহিত্য ; গীতিকাব্যে যেন যে পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডময় উড়ে বেড়ায় আর অনুবাদ সাহিত্যের বেলা সে যেন এদো কুয়োর ভেতরে খাবি খায়।

অথচ ঊনবিংশ শতকে শেষের দিকে বাঙলা ভাষায় যে অনুবাদ সাহিত্যের রচনা দানা বাঁধতে আরম্ভ করে, তার তুলনায় আজকের দিনে তাকিয়ে দেখি সে দানা দিয়ে মিঠাই মণ্ডা তো হ'লই না, তলানির চিনিটুকু দিয়ে আজ যেন সাহিত্য-সভায় পানসে শরবৎ বিলানো হচ্ছে। গীতিকাব্যে যে সাহিত্য তেইশটে ডবল প্রমোশন পেয়েছিল, অনুবাদে সেই সাহিত্যকেই বাহান্নটা ডিগ্রেডেশন দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অনুবাদ করতে হলে বিদেশী ভাষা জানার প্রয়োজন। আজকের দিনে কলকাতা শহরে শুধু ফরাসী বই বিক্রয়ের জন্য দোকান হয়েছে—সত্তর বৎসর আগে ছিল না।—তবু আমাদের অনুবাদ-সাহিত্যে যেটুকু শরবৎ আজ বিলোনো হচ্ছে তার আগাগোড়া ইংরিজী থেকে।

অথচ ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ফরাসী সাহিত্যের উত্তম রস-সৃষ্টি বাঙলায় অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন। বিংশ শতকেও তিনি এই কর্মে লিপ্ত এবং মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত তিনি একাজে ক্ষান্ত দেন নি। ঠিক স্মরণ নেই, তবে খুব সম্ভব লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের বিরাট মারাঠী গীতার অনুবাদই তাঁর শেষ দান।

আশ্চর্য বোধ হয় যে, বাঙালী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভুলে গিয়েছে। সংস্কৃত থেকে তিনি যে সব নাটক অনুবাদ করেছিলেন সেগুলোর কথা আজ থাক। উপস্থিত পিয়ের লোতির একখানা বইয়ের কথা স্মরণ করছি।

পিয়ের লোতির মত লেখক পৃথিবীতে কমই জন্মেছেন। শুদ্ধমাত্র শব্দের জোরে, সম্পূর্ণ অজানা, অদেখা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা গড়ে তোলা যে কি কঠিন কর্ম, তা শুধু তাঁরাই বুঝতে পারবেন, যাঁরা কখনো এ-চেষ্টায় দণ্ডমাত্র কালক্ষেপ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করার মত দুর্মতি কোনো বাঙালীর হওয়ার কথা নয়, তাই বলতে আপত্তি নেই যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর অদেখা বা অল্প-দেখা জিনিস নিয়ে কাব্য সৃষ্টি করাটা পছন্দ করতেন

না। সাধারণ বাঙালীর সঙ্গে পাহাড় এবং সমুদ্রের পরিচয় অতি কম—তাই বোধ করি রবীন্দ্রনাথ এ দু'টো জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন যতদূর সম্ভব কম। শীতপ্রধান দেশের পাতা-ঝরা হেমন্ত ঋতু, শুভ্র মল্লিকা বর্ষণের মত বরফ-পাত যে কি দর্শনীয় বস্তু, সিনেমা থেকেও তার খানিকটে আন্দাজ করা যায়, – রবীন্দ্রনাথ এসব দেখেছেন, উপভোগ করেছেন বহুবার ; কিন্তু কোথাও তার বর্ণনা করেছেন বলে তো মনে পড়ে না।

পিয়ের লোতির বৈশিষ্ট্য এইখানেই। তিনি জাপান, তুর্কী, আইসল্যাণ্ড এবং আরও নানাদেশের যে সব ছবি ফরাসী ভাষায় এঁকে দিয়ে গিয়েছেন, সে-সব পড়ে মনে হয় ভাষার সঙ্গীত, বর্ণ, গন্ধ একসঙ্গে মিলে গিয়ে কি করে এই-রূপ রসবস্তু নির্মাণ হতে পারে! মনে হয়, একসঙ্গে যেন পঞ্চেন্দ্রিয় রস গ্রহণ করছে, মনে হয় কারো কলম যদি নিতান্ত অরসিক জনকে দেশ-কাল-পাত্র ভোলাতে সক্ষম হয়, তবে সে কলম পিয়ের লোতির।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লোতি যে বইখানা লিখেছেন তার নাম 'ল্যাঁদ, সাঁজাংলে'। অর্থাৎ 'ভারতবর্ষ, কিন্তু ইংরেজকে বাদ দিয়ে।' অর্থাৎ তিনি ভারতবর্ষের ছবি আঁকতে বসেছেন কিন্তু মনস্থির করে ফেলেছেন যে, এ-দেশের ইংরেজদের সম্বন্ধে তিনি কিছু বলবেন না।

স্বীকার করি, ইংরেজ-বর্জিত-ভারত' ('বসুমতী' কর্তৃক প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্র গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য)। 'ল্যাঁদ, সাঁজাংলে'র ঠিক অনুবাদ নয়, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের অনুবাদশশাঙ্কে ঐ একটি মাত্র কলঙ্ক। বাদবাকী পুস্তকখানা অনুবাদ-সাহিত্যে যে কি আশ্চর্য কুতুব-মিনার, তার বর্ণনা দিতে হলে লোতির কলমের প্রয়োজন।

ত্রিবাঙ্কুরে লোতি ভারতীয় সঙ্গীত শুনে বিস্ময়ের উচ্ছ্বাসে সে-সঙ্গীতের বর্ণনাতে কত না স্বর কত না ধ্বনি মিশিয়ে দিয়েছেন ; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা সে-স্বর সে ধ্বনি অবিকল বাজিয়ে চলেছে। মাদ্রাজে লোতি ভরত-নাট্যম দেখে ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে মানবহৃদয়ের যত প্রকারের আশা-নৈরাশ্য, ঘৃণা-ক্রোধ, আকুলি-বিকুলি সম্ভব হতে পারে, সব ক'টি প্রকাশ করেছেন কখনো গম্ভীর মেঘমন্দ্রে, কখনো মধুর বীণাঝঙ্কারে, কখনো শব্দ সমন্বয়ের চটুল নৃত্যে—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা-বীণা যেন প্রতি মন্দ্র, প্রতি ঝঙ্কার, প্রতি ব্যঞ্জনা ঠিক সেই সুরে রসসৃষ্টি করেছে। ইলোরার স্থাপত্য-ভাস্কর্য লোতিকে বিহ্বল ভয়াতুর করে ফেলেছে, অনির্বচনীয় চিরন্তন সত্তার রসস্বরূপে স্বপ্রকাশ দেখিয়ে—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখনী লোতির বিহ্বল ভয়ার্ত হৃদয়ের প্রতি কম্পন প্রতি স্পন্দন ধরে নিয়ে যেন বীণাযন্ত্রের চিকণ কাজের সঙ্গে মৃদঙ্গের নিপুণ বোল মিশিয়ে দিয়েছে।

এরূপ অদ্ভুত সঙ্গত দিয়ে বাঙলা সাহিত্যের মজলিসে যে অনুবাদ-সাহিত্য আরম্ভ হয়েছিল, আজ তার সমাপ্তি দেখতে পাচ্ছি সস্তা, রগরগে ইংরিজী উপন্যাসের অনুবাদে। খেমটা আর 'ফিলমি গানের' সঙ্গে তার মিতালি ॥

'কলচর'

'পরশুরামে'র কেদার চাটুজ্যেকে বাঘা তাড়া করেছে, ভূত ভয় দেখিয়েছে, হনুমান দাঁত খিচিয়েছে, পুলিস কোর্টের উকীল জেরা করেছে, তবু তিনি ভয় পান নি কিন্তু শেষটায় এক আমেরিকান মেমসায়েবের পাল্লায় পড়ে হিমসিম খেয়ে যান। কেদার চাটুজ্যের প্রতি আমার অগাধ ভক্তি কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাকে সবিনয় বলতে হবে তাঁর তুলনায় আমি দেশভ্রমণ করেছি অনেক বেশী, কাজেই আমাকে ভয় দেখিয়েছে আরো অনেক বেশী ভূত, অদ্ভুত, নাৎসী, কম্যুনিস্ট, মিশনারী, কলাবৎ, সম্পাদক, দারোয়ান ইত্যাদি কিন্তু তবু যদি তামা-তুলসী-গঙ্গাজল নিয়ে শপথ কাটতে হয়, তবে বলব আমি সবচেয়ে বেশী ভয় পেয়েছি 'কলচরে'র সামনে।

বাঙলা দেশে 'কলচর' আছে কিনা জানিনে ; যদি বা থাকে তবে আমি নিজে বাঙালী বলে সে জিনিস এড়িয়ে যাবার অন্ধিসন্ধি জানি। কিন্তু বিদেশ-বিভূঁইয়ে হঠাৎ বেমক্কা এ জিনিসের মুখোমুখি হয়ে পড়লে যে কী দারুণ নাভিশ্বাস ওঠে তার বর্ণনা দেবার মত ভাষা এবং শৈলী আমার পেটে নেই।

পশ্চিম ভারতে একবার এই 'কলচর' অথবা 'কলচরড্' সমাজের পাল্লায় পড়েছিলুম। তার মর্মন্তুদ কাহিনী নিবেদন করছি।

এক যুবতীর সঙ্গে কোনো এক চায়ের মজলিসে আলাপ হল। তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে যাবার নিমন্ত্রণ করলেন। সুন্দরী রমণী। প্রত্যাখ্যান করি কি প্রকারে ? তখন যদি জানতুম তিনি আমাকে বাঙালী অতএব 'কলচরড্' ঠাউরে নিমন্ত্রণ করেছেন তাহলে ধর্ম সাক্ষী আমি কেটে পড়তুম। কারণ, আমি 'কলচরড্' নই এবং পূর্বেই বলেছি ও-জিনিসটাকে আমি বড্ড ডরাই।

সুন্দরী মোটর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই বাড়ি খুঁজে বের করার মেহন্নত থেকে রেহাই পেলুম। গাড়ি এসে এক বিপুলায়তন বাড়ির সামনে দাঁড়াল। বাড়ি বলা হয়ত ভুল হল। সংস্কৃতে খুব সম্ভব এই বস্তুকেই 'প্রাসাদ' বলে।

কিন্তু সে কী অদ্ভুত বিভীষিকা। সাঁচীর স্তূপ, অজন্তার প্রবেশদ্বার, অশোকের স্তম্ভ, মাদুরার মণ্ডপ, তাজের জালির কাজ, জামি মসজিদের আরাবেস্ক্ ভারতবর্ষের তাবৎ সৌন্দর্য সেখানে যেন এক বিরাট তাণ্ডব নৃত্য লাগিয়েছে। যে ফিরিস্তিটা দিলুম সেটা পূর্ণাবয়ব কি না জানি নে এবং এসব স্থাপত্য কলার মর্ম এ অধম জানে না সেটাও সে সবিনয় স্বীকার করে নিচ্ছে। আমি সাহিত্য নিয়ে ঈষৎ নাড়াচাড়া করি, কারণ ঐ একমাত্র জিনিসই মাস্টার অধ্যাপকেরা আমাকে স্কুল-কলেজে ঠেঙ্গিয়ে ঠেঙ্গিয়ে কিছুটা শিখিয়েছেন। সাহিত্যের দৃষ্টিবিন্দু দিয়ে তাই যদি সে-প্রাসাদের বর্ণনা দিই তবে বলতে হবে, আমি যেন এক কবিতার সামনে দাঁড়ালুম যার প্রথম লাইন চর্যাপদী, দ্বিতীয় লাইন চণ্ডীদাসী, তৃতীয় লাইন মাইকেলী, চতুর্থ লাইন রঙ্গলালী, পঞ্চম লাইন ঠাকুরী এবং শেষ লাইন নজরুলী। জানি, আজ যদি কেউ এই সব ক'জন মহাজনের শৈলী এবং ভাষা আয়ত্ত ক'রে কাব্য সৃষ্টি করতে

পারেন তবে তিনি কি কালিদাস, কি সেক্সপীয়র, কি গ্যোটে সর্ব যুগের সর্ব কবিরাজকে ছাড়িয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু আমি যে বিভীষিকার সামনে দাঁড়ালুম সে তো তা নয়। এ যেন কেউ কাঁচি দিয়ে নানান কবির লেখা নিয়ে হেথা থেকে দু'ছত্র হোথা থেকে তিন পংক্তি কেটে গঁদ দিয়ে জুড়ে দিয়ে বলছে, 'পশ্য, পশ্য, কী অপূর্ব কবিতা ; এ-কবিতা মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ যে-কোনো কবির লেখাকে হার মানায় কারণ এ-কবিতা দুনিয়ার তাবৎ কবির বারোয়ারী চাঁদা দিয়ে গড়া। বাঁদর হারালেও এখানে খুঁজে পাবে।'

তখনও পালাবার পথ ছিল, কিন্তু সুন্দরীর—যাক্‌গে। না পালাবার অন্য আরেকটা কারণও মজুদ ছিল। এ বিভীষিকা দেখে গাঙ্গুলী মশাই অথবা ক্রামরিশ বীবী পালাবেন, কিন্তু আমি তো 'কলচরড্' নই আমি পালাব কেন ?

ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি লিফ্‌টের সামনে। অপূর্ব সে খাঁচা। এতদিন বাদে আজ আর মনে নেই কোন্ কোন্ শৈলীর ঘুষোঘুষিতে (কোলাকুলিতে নয়) সে লিফ্‌টের চারখানা কাঠের পাট নির্মিত ছিল। প্রত্যেক পাটে অতি সূক্ষ্ম নাজুক, মোলায়েম দারুশিল্প। জয়পুরের মিনা যেন সূক্ষ্মতায় তার কাছে হার মানে।

ভিতরে ঢুকলুম। তখন লক্ষ্য করলুম লিফ্‌টবয় দরজাখানা বন্ধ করল অতিশয় সন্তর্পণে—পাছে কাঠের চিকন কাজে কোনো জখম হয়। কিন্তু ফল হল এই যে লিফ্‌ট আর উড্ডীয়মান হতে চায় না। বয় ধীরে ধীরে চাপ বাড়ায় কিন্তু লিফ্‌ট নড়তে চায় না। তারপর হুস করে বলা নেই কওয়া নেই, লিফ্‌ট উপরের দিক চলল, পক্ষীরাজের বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে হঠাৎ জিন লাগালে সে যে-রকম ধারা আচমকা লম্ফ দিয়ে ওঠে।

তারপর দোতলায় নামবার কথা—লিফ্‌ট সেখানে থামে না। থামলো গিয়ে আচম্বিতে দোতলা আর তেতলার মাঝখানে।

একে ত গাঁয়ের ছেলে, বয়স হওয়ার পর শহরে এসে প্রথম লিফ্‌ট দেখেছি এবং তখনকার দিনে ধুতিকুর্তা পরা থাকলে লিফ্‌ট চড়তে দিত না বলে এ ফাঁড়া থেকে প্রাণ বাঁচাতে পেরেছি, তার উপর জানি দড়াম করে দরজা বন্ধ না করলে ভালো লিফ্‌টও নড়তে চায় না এবং তার উপর দেখি এই ছোকরা চাকরি যাবার ভয়ে দরজার উপর জোর লাগাতেও রাজী হয় না। এই 'কলচরড্' লিফ্‌টটাকে জখম চোটের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আমার প্রাণটা বলি দিতে হবে নাকি ?

আমি তখন হন্যে হয়ে উঠেছি। ধমক দিয়ে বললুম, 'দরজা জোরে বন্ধ করো।'

সে করে না। এই মাগ্‌গীর বাজারে প্রাণের চেয়ে চাকরি বড়। প্রাণ জিনিসটা জন্মে জন্মে বিনা খরচে, বিনা মেহনতে পাওয়া যায় ; কিন্তু চাকরির জন্য বিস্তর বেদরদ বেইজ্জতী সইতে হয়।

আমি আর কি করি ? ধাক্কা দিয়ে ছোঁড়াটাকে পথ থেকে সরিয়ে দরজায় দিলুম বিপুল এক ধাক্কা। হুস করে লিফ্‌ট উঠে গেল তেতলায়। আমি দরজা

খুলে নাবতে যাচ্ছি, বয় চেঁচিয়ে বললো, 'আপনি যাবেন দোতলায়, তেতলায় নয়।' আমি বললুম, 'তুমি যাও চুলোয়।' ছোকরা বাঙলা বোঝে না।

তেতলা থেকে সিঁড়ি ভেঙে নামলুম দোতলায়।

ততক্ষণে লিফ্‌টের ধড়াধড় শব্দ শুনে সুন্দরীর ভাই-বেরাদর দু'একজন সিঁড়ির কাছে জমায়েত হয়ে গিয়েছেন। আমি ছোকরার চাকরি বাঁচাবার জন্য নিজের অপরাধ স্বীকার করলুম। ওঁরা যে-রকম ভাবে আমার দিকে তাকালেন তাতে মনে হল আমি যেন তাজমহলের উপর এটম বম মেরেছি অথবা ওস্তাদ ফৈয়াজ খানের গলা কেটে ফেলেছি।

'কলচরড্' নই, তাই বলতে পারব না, 'কলচর' দেশ-কাল-পাত্র মেনে নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হয় কি না। কিন্তু লিফ্‌টের ভিতরকার 'কলচর'কে সম্মান দেখাতে গিয়ে আমি প্রাণটা দিতে রাজী নই। তাই বলছিলুম, আমি 'কলচর' জিনিসটাকে ডরাই।

বর্ষা

কাইরোতে বছরে ক' ইঞ্চি বৃষ্টি পড়ে এতদিন বাদে সে কথা আমার আর স্মরণ নেই। আধা হতে পারে সিকিও হতে পারে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস মেঘমুক্ত নীল আকাশ দেখে দেখে আমার তো প্রথমটায় মনে হয়েছিল, এদেশে বুঝি আদপেই বৃষ্টিপাত হয় না। আর গাছপালার কী দুরবস্থা, পাতাগুলোর কী অদ্ভুত চেহারা! সাহারার ধুলো উড়ে এসে চেপে বসেছে পাতাগুলোর গায়ে—সিন্দবাদের কাঁধে যে রকম পাগলা বুড়ো চেপে বসেছিল—সে ধুলা সরানো দুদশটা হৌজের কর্ম নয়। কাফেতে বসে বুলভারের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে প্রায়ই ভাবতুম, এদের কপালে কি কোন প্রকারের মুক্তিস্নান নেই?

সুদানের একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হ'ল। সে বললে, তার দেশে নাকি ষাট বছরের পর একদিন হঠাৎ কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি নেবেছিল। মেয়েরা, কাচ্চাবাচ্চারা, এমন কি গোটা কয়েক জোয়ান মদ্দরা পর্যন্ত হাউমাউ করে কান্নাকাটি জুড়েছিল, 'আকাশ টুকরো টুকরো হয়ে আমাদের ঘাড়ে ভেঙে পড়লো গো। আমরা যাব কোথায়? কিয়ামতের (মহাপ্রলয়ের) দিন এসে গেছে। সব পাপের তওবা (ক্ষমা-ভিক্ষা) মাঙবার সময় পেলুম না, সবাইকে যেতে হবে নরকে।' গাঁও-বুড়োরা নাকি তখন সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'এতে ভয় পাবার কিছু নেই। আকাশ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে না। এ যা নাবছে সে জিনিস জল। এর নাম মৎর্ (অর্থাৎ বৃষ্টি)।' সুদানী ছেলেটি আমায় বুঝিয়ে বললে, 'আরবী ভাষায় মৎর্ (বৃষ্টি) শব্দ আছে; কারণ আরব দেশে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়, কিন্তু সুদানে যে-আরবী ভাষা প্রচলিত সে-ভাষায় মৎর্ শব্দ কখনো ব্যবহৃত হয় নি বলে সে শব্দটি সুদানী মেয়েছেলেদের সম্পূর্ণ

অজানা।

সুদানে যাই হোক। কিন্তু একদিন যখন হঠাৎ কাইরোতে বৃষ্টি নাবল আমি তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে কাফে ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। বিরহী যক্ষ যেরকম দুই বাহু প্রসারিত করে উত্তরের বাতাস আলিঙ্গন করেছিল ; আমি ঠিক সেইরকম 'ঝড় নেমে আয়' বেসুরা বেতালা করে গাইলুম আর আমার জোব্বাজাব্বা যে ভিজে কাঁই হল, সে কথা বলাই বাহুল্য।

বৃষ্টি না থামার পূর্বেই ফিরে এলুম পাড়ার কাফেতে। সবাইকে বোঝাবো, বাঙলা দেশে কি রকম অদ্ভুত বর্ষা নামে, তার কি অপূর্ব জৌলুস। দেখি, আড্ডার সদস্যরা কেউ আধভেজা, কেউ ছ'আনা, কেউ দু' আনা। আমাকে দেখা মাত্র সবাই তো মারমার করে তেড়ে এল। আরে, বুঝিয়েই বলো না, কি ব্যাপার, চটছো কেন ?

সবাই এক সঙ্গে কথা কয়। কি মুশকিল! ভাবখানা অনেকটা ;—এই ড্যাম নুইসেন্স বৃষ্টির প্রশংসা আমি বাস্কেল ইণ্ডিয়ান কেন এতদিন ধরে করে আসছি ? আর দ্যাট্ পোয়েট টেগোর, যার নামে আমি অজ্ঞান, সে-ই বা এই বৃষ্টির নামে এত কবিতা লিখল কেন ? সুট বরবাদ হয়ে গিয়েছে, হিম লেগে কেউ হাঁচ্ছে, কেউ কাঁদছে, কেউ বা পিছলে-পড়ে হাত ভেঙে ফেলেছে। আর সব চেয়ে মারাত্মক খবর, পাউলুসের বান্ধবী বৃষ্টির জন্য আসতে পারে নি বলে পাউলুস মর্মাহত হয়ে পটাসিয়াম সায়ানাইডের সন্ধানে বেরিয়ে গিয়েছে।

মহা মুশকিলে পড়লুম। জুৎসই কি উত্তর দিই। মৃৎশকটিকায় বসন্তসেনা বৃষ্টিতে ভিজে যখন চারুদত্তের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন যে কাব্য সৃষ্টি হয়েছিল, তার বর্ণনা এদের সামনে এই বেমক্কায় পেশ করলে এরা আমাকে খুন করবে ; মেঘদূতের বয়ান, জয়দেবের 'মেঘৈর্মেদুরম্বরং' এদের সামনে গাইতে গেলে এরা আমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে। তাই ভাবলুম, কার্ল মার্কসের স্মরণ নেওয়াই প্রশস্ত। অর্থনৈতিক কারণ দেখালে এরা হয়ত মোলায়েম হবে। বললুম, 'বৃষ্টি না হলে গাছপালা, গম-ধান গজাবে কি প্রকারে ?'

সবাই আমার দিকে এমন ভাবে তাকালে যেন আমি বেহেড মাতাল অথবা বদ্ধ উন্মাদ। মিশরে পাগলা উটের কামড় খেয়ে বহু লোক মতিচ্ছন্ন হয়ে যায় বলে এরা পাগলকে কি ভাবে শায়েস্তা করতে হয় সে কথা বিলক্ষণ জানে। রমজান বললো, 'কাইরো শহরের ভিতর কি যবগম ফলে যে এখানে বৃষ্টির প্রয়োজন ? যবগম ফলে গ্রামাঞ্চলে। সেখানে বৃষ্টি হোক না, কে বারণ করছে। কিন্তু শহরের ভিতরে কেন ?'

শরিফ মুহম্মদ বললো, 'সেখানেই বা বৃষ্টি হবে কেন ? আমাদের গম-ধান ফলে নাইলের জলে। এই যে বৃষ্টি কখন আসে কখন আসে না তার তো কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। এর উপর নির্ভর করলে মিশরীদের আর বাঁচতে হত না। আমি কি উত্তর দেব ভাবছি, এমন সময় গ্রীক সদস্য পাউলুস ফিরে এসে ঝুপ করে একটা চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা রেখে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে আরম্ভ করল। আমার সঙ্গে তর্কাতর্কির কথা সবাই ভুলে গিয়ে পাউলুসের চতুর্দিকে

ঘিরে দাঁড়ালো।

কি হয়েছে, কি ব্যাপার ?

অনেক ঝুলোঝুলির পর পাউলুস মাথা না তুলেই ফুঁপিয়ে যা বললো তার অর্থ, মেঘ আর বৃষ্টিতে তার বান্ধবীর বিরহবেদনা তাকে কাবু করে ফেলেছে। এ যন্ত্রণা সে সইতে পারবে না। পটাসিয়াম সায়ানাইড রেশনড হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর অন্য কোনো প্রশস্ত পন্থা আড্ডা যদি তাকে না বাৎলায় তবে—ইত্যাদি।

আমাকে তখন আর পায় কে ? হুঙ্কার দিয়ে বললুম, 'ওরে মূর্খের দল, জীবনের সব চেয়ে বড় সত্য বিরহ। আর বিরহ কারে কয়, সে-কথা কি করে জানবি মেঘ না জমলে, বৃষ্টি না ঝরলে ? আর শেষ তত্ত্বকথা কবিতা কি করে ওৎরাবে বিরহবেদনা যদি মানুষকে পাগল করে না তোলে ?

* * *

আজও ভাবি, আমাদের পদাবলী, জয়দেব, কালিদাস শূদ্রক যে বিরহ-বর্ণনা রেখে গিয়েছেন তার সঙ্গে তো অন্য কোন সাহিত্যের বিরহবর্ণনার তুলনা হয় না। তার একমাত্র কারণ আমাদের বর্ষা।

জিন্দাবাদ হিন্দুস্থানী বর্ষা ! !

প্যারিস

জর্মন ভাষায় একটি গান আছে :

"In Paris, in Paris, sind die
Maedels so suess
Wenn sie fiuestern "Monsieur,
ich bin Dein,—"

অর্থাৎ :

প্যারিসের মেয়েগুলো কি মিষ্টি !
যখন তারা কানের কাছে গুনগুনিয়ে বলে,
'মসিয়ো আমি তোমারি।'
সবাই হেসে হেসে তাকায়, সবাই কথা বলবার
সময় 'তুমি' বলে ডাকে
আর কানে কানে বলে, 'তোমায় ছেড়ে
আর কারো কাছে যাব না।'
কিন্তু হায়, শুধু তোমাকেই না, আরো
পাঁচজনকে তারা ঐ রকমধারাই বলে !

ইংরেজীতে বলে, 'কেরীং কোল টু নিউ কাসল', হিন্দীতে বলে 'বরেলীমে

বাঁস লে জানা' (বেরলীতে নাকি প্রচুর বাঁশ জন্মে), রাশানে বলে, 'তুলা শহরে সামোভার নিয়ে যাওয়া' (সেখানে নাকি পৃথিবীর বেশীর ভাগ সামোভার তৈরী হয়), গুজরাতীতে বলে, 'ভরা কলসী নিয়ে নদীতে যাওয়া' এবং ফরাসীতে বলে, 'প্যারিসে আপন স্ত্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া !'

ফরাসী প্রবাদটিই মুখরোচক। কিন্তু প্রশ্ন, সত্যই কি প্যারিস-সুন্দরীরা বড্ডই দিলদরিয়া ? উপরের গানটাতে তো খানিকটে হদিস পাওয়া গেল। তবু কেন তামাম ইয়োরোপবাসীর সুখস্বপ্ন অন্ততঃ একবারের মত প্যারিসে যাওয়া ? এমন কি যে জর্মন ফরাসী জাতটাকে দু'চোখের দুশমন বলে জানে, সেও ফরাসীনীর নাম শুনলে বে-এক্তেয়ার হয়ে পড়ে। হিন্দুর কাশী দর্শনাভিলাষ ইসলমানের মক্কা গমন তার কাছে নস্যি।

এ অধম ছেলেবেলায় এক ভশ্চায্যি বামুনের খপ্পরে পড়েছিল। তিনি তার মাথায় তখনই গবেষণার পোকা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই প্যারিসে নেবেই ভাবলুম, 'সত্য কোন্ হিরণ্ময় পাত্রে লুক্কায়িত আছেন, তার গবেষণা করতে হবে' এবং তার নির্যাস আজ আপনাদের কাছে নিবেদন করব। এ-নির্যাস বানাতে আমাকে বিস্তর কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে।

প্রথমতঃ, প্যারিসের মেয়েরা সুন্দরী বটে। ইংরেজ মেয়ে বড্ড ব্যাটামুখো, জর্মন মেয়েরা ভোঁতা, ইতালিয়ান মেয়েরা অনেকটা ভারতবাসীর মত (তাদের জন্য ইয়োরোপে আসার কি প্রয়োজন ?) আর বলকান মেয়েদের প্রেমিকরা হরবকতই মারমুখো হয়ে আছে (প্রাণটা তো বাঁচিয়ে চলতে হবে)। তার উপর আরো একটা কারণ রয়েছে—ফরাসী মেয়ে সত্যি জামা-কাপড় পরার কায়দা জানে —অল্প পয়সায়—অর্থাৎ তাদের রুচি উত্তম।

তা না হয় হল। কিন্তু সুন্দরীরাই যে সব সময় চিত্তাকর্ষণ করেন তা তো নয়। যে-সব দেশে কোর্টশিপ করে বিয়ে হয়, সে-সব দেশে দেখেছি, মেলা সুন্দরীর বর জোটে নি আর এন্তার সাদামাটা মেয়ে খাপসুরৎ বর নিয়ে শহরময় দাবড়ে বেড়াচ্ছে।

তবে কি মানুষ প্রেমে পড়ার বেলা সুন্দরী খোঁজে, বিয়ে করার সময় অন্য বস্তু ? তবে কি প্রেম আর বিয়ে ভিন্ন ভিন্ন শিরঃপীড়া ? হবেও বা।

তবে একথা অস্বীকার করার যো নেই, ফরাসী মেয়েরা আর পাঁচটা দেশের মেয়েদের তুলনায় ঢের বেশী বিদগ্ধা। গান বোঝে, সাহিত্য নিয়ে নাড়াচড়া করে, নাচতে জানে, ওয়াইনে বানচাল হয় না, অপ্রিয় সত্য এড়িয়ে চলে, পলিটিকস্ নিয়ে মাথা ঘামায় কম এবং জাত-ফাত, সাদা কালো, দেশী-বিদেশী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সংস্কার বিবর্জিত। ভালো লেগেছে তাই, হামেশাই দেখতে পাবেন, দেবকন্যার মত সুন্দরী ফরাসীনী যমদূতের মত বিকট হাবশীর সঙ্গে সগর্বে সদম্ভে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছেলেটার সঙ্গে আলাপ করে দেখবেন, নাচে খাসা, গান গায় তোফা, ছবি দেখলেই বলতে পারে কোন্ নম্বরী, আর ডাক্তারি পড়ে বলে এর ব্যাণ্ডেজ ওর ইন্‌জেকশন্ হামেশাই বিন্‌ফিতে করে দেয়।

জর্মন মেয়ে বিদেশীকে প্রচুর খাতির-যত্ন করে, প্রেমে পড়ে ফরাসীনীর

চেয়েও বেশী, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আপনি চিরদিনই তার কাছে 'আউসল্যাণ্ডার' (আউটল্যাণ্ডার) বা 'বিদেশীই থেকে যাবেন—কিন্তু ফরাসীনীর মনে অন্য ভাগাভাগি। তার কাছে পৃথিবীতে দুই রকম লোক আছে—কলচরড্ আর অনকলচরড্। ফরাসী, বিদেশী এই দুই স্পৃশ্য অস্পৃশ্য বাদ-বিচার তার মনে কখনো ঢোকে না।

আপনি দিব্য ফরাসী বলছেন, ফ্রাঁস আপনি পড়েন, রোদাঁকে ভক্তি করেন, শোপাঁর রস চাখতে জানেন, বর্দো বর্গেণ্ডি সম্বন্ধে ওকীবহাল, ব্যস, তবেই হল। কোনো ইংরেজ বন্ধুকে যদি আপনি ফরাসীনীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার সময় সসম্ভ্রমে ভারতীয় কায়দায় বলেন, 'ইনি অক্সাফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট,' তবে ফরাসীনী অত্যন্ত গম্ভীর মুখে শুধাবে, 'কোন্ সব্জেক্টে মহাশয়? টেনিস না ক্রিকেট?' ফরাসীনীর বিশ্বাস, অক্সফোর্ডে মাত্র ঐ দুই কর্মই হয়। ভাগ্যিস প্যারিসীনী জানে না, ভারতবর্ষে কিছুই হয় না—কাজেই আপনাকে এ রকম ধারা প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞেস করবে না।

কিন্তু ফরাসীনীর সব চেয়ে বড় গুণ—সে ভণ্ডামি করতে জানে না। আর সব শহরে যা হয়, প্যারিসেও তাই হয়, কিন্তু ফ্রান্সের লোক ঢেকে চেপে রাখবার চেষ্টা করে না। যদি কোনো জিনিস চেপে যায়, তবে সেটা দুষ্টিকটু রুচিবিরুদ্ধ বলে – নিজেকে ধর্মপ্রাণ, নীতিবাগীশ বলে প্রচার করার জন্য নয়।

অর্থাৎ ফরাসীনীর কাছে টেস্ট্ বা রসবোধ মরাল্ বা নীতিবোধের চেয়ে বহুৎ বেশী বরণীয়।

আজব শহর কলকেতা

আজব শহর কলকেতা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। বুড়ো হতে চললুম তবু তার প্রমাণ পেলুম কমই। তাই নিয়ে একখানা প্রামাণিক প্রবন্ধ লিখব ভাবছি এমন সময় নামল জোর বৃষ্টি। সমীরণে পথ হারানোর বেদনা বেজে উঠল কারণ যদিও পথ হারাই নি তবু সমস্যাটা একই! ছাতা নেই, বর্ষাতি নেই, ট্রামে চড়বার মত তাগদও আর নেই—বাস মাথায় থাকুক,—ট্যাক্সি চড়তে বুক কচ কচ করে; কাজেই বাড়ি ফেরার চিন্তার বেদনাটা 'পথহারানো'র মতই হল। এমন সময় সপ্রমাণ হয়ে গেল 'কলকেতা আজব শহর'—সামনে দেখি বড় বড় হরফে লেখা 'ফ্রেঞ্চ বুক শপ'!

খেয়েছে! নিশ্চয়ই কোনো ফরাসী পথ হারিয়ে কলকাতায় এসে পড়েছে আর যে দুটি পয়সা ট্যাকে আছে তাই খোয়াবার জন্য ফরাসী বইয়ের দোকান খুলেছে। বাঙালী প্রকাশকরা বলেন, 'শুধু ভালো বই ছাপিয়ে পয়সা কামানো যায় না, রদ্দি উপন্যাসও গাদা গাদা ছাড়তে হয়।' কথাটা যদি সত্যি হয় তবে শুধু ফরাসী বই বেচে এ দোকানে মুনাফা করবে কি প্রকারে? তাই আন্দাজ করলুম, এই 'ফ্রেঞ্চ বুক শপ' বোধ হয় হাতীর দাঁতের মত—শুধু দেখবার জন্য,

চিবোবার জন্য দাঁত রয়েছে লুকোনো অর্থাৎ দোকানের নাম বাইরে যদিও 'ফ্রেঞ্চ বুক শপ,' ভিতরে গিয়ে পাবো অন্য মাল—'খুশবাই', 'সাঁঝের পীর,' 'লোধ্রেণু', 'ওষ্ঠ-রাগ'।

সেই ভরসায় ঢুকলুম। বৃষ্টিটাও জোরে নেমেছে। নাঃ। আজব শহর কলকেতাই বটে। শুধু ফরাসী বই বেচেই লোকটা পয়সা কামাতে চায়। গাদা গাদা হলদে আর সাদা মলাটওলা এন্তার ফরাসী বই, কিছু সাজানো-গোছানো, কিছু যত্রতত্র ছড়ানো। ফরাসী দোকানদার কলকাতায় এসে বাঙালী হয়ে গিয়েছে। বাঙালী দোকানদারেরই মত বইগুলো সাজিয়েছে টাইপ রাইটারের হরফ সাজানোর মত করে। অর্থাৎ সিজিলটা যার জানা আছে সে চোখ বন্ধ করেই ইচ্ছেমত বই বের করে নিতে পারবে, যে জানে না তার কোমর ভেঙে তিন টুকরো হয়ে যাবে।

ফুটফুটে এক মেমসাহেব এসে ইতিমধ্যে ফরাসী হাসি হেসে দাঁড়িয়েছেন। পরশুরামের কেদার চাটুজ্যেকে আমি মুরুব্বি মানি। তারই ভাষায় বললুম, সেলাম মেমসাহেব।' মেমসাহেব ফরাসীতে বললেন, 'আপনার আনন্দ কিসে?' —অর্থাৎ 'কি চাই?' মেরেছে। ফরাসী ভাষা কবে সেই প্রথম যৌবনে বলেছি সে কথাই স্মরণ নেই – গোটা ভাষাটার কথা বাদ দিন।

জর্মন ভাষায় একটি প্রেমের গান আছে Dein Mund sagt "Nein" Aber Deine Augen sagen "Ja". অর্থাৎ, তোমার মুখ বলছে 'না, নো', কিন্তু তোমার চোখ দু'টি বলছে 'হাঁ হাঁ'।

কিন্তু ফরাসী জর্মনির দুশমন। জর্মন যা করে ফরাসী তার ঠিক উল্টো করাটাই জাত্যভিমানের কৈবল্যানন্দ বলে ধরে নিয়েছে। তাই মেমসাহেব যতই মুখে 'ইয়েস ইয়েস' বলেন ততই দেখি তাঁর চোখে স্পষ্ট লেখা রয়েছে 'না' 'নো' —অর্থাৎ মেমসাহেব আমার ইংরেজী বুঝতে পারছেন না। মহা মুশ্কিল।

হঠাৎ কখন ফরাসী রাজদূত মসিয়ো ফ্রাঁসোয়া পঁসে'র নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে বোধ হয় কিছুটা ফরাসী বেরিয়ে পড়েছিল, আর যাবে কোথা, মেমসাহেব আদেশ দিলেন, 'মসিয়ো, ফরাসীতে কথা বললেই পারেন।'

বাঙালীর জাত্যভিমানে বড্ডই আঘাত লাগলো স্বীকার করতে যে যদিও ফরাসী ভাষাটা কেঁদেকুকিয়ে পড়ে নিতে পারি, বলতে গেলে আমার অবস্থা ডডনং হয়ে দাঁড়ায়। ভাবলুম, দুগ্গা বলে ঝুলে পড়ি। এ মেমসাহেব যদি কলকাতার বুকের উপর বসে বাঙলা (এমন কি ইংরিজীও) না বলতে পারে তবে আমি ফ্রান্স থেকে হাজারো মাইল দূরে দাঁড়িয়ে টুটিফুটি ফরাসী বললে এমন কোন্ বাইবেল অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

দশ বছরের পুরোনো মর্চে ধরা, জাম-পড়া, ছাতি-মাথা ফরাসী তানপুরোটার তার বেঁধে বরজলালের মত ইমনকল্যাণ সুর ধরলুম। এবং কী আনন্দ, কী আনন্দ, মেমসাহেবও বুড়ো রাজা প্রতাপ রায়ের মত। আমার ফরাসী শুনে কখনো 'আহাহা বাহাবা বাহাবা' বলেন, কখনো, 'গলা ছাড়িয়া গান গাহো' বলেন। এই হল ফরাসী জাতটার গুণ। হাজারো দোষের মধ্যে একটা কিছু

ভালো দেখতে পেলেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।

আমাকে আর পায় কে?

আপনাদের আশীর্বাদে তার শ্রীগুরুর কৃপায় তখন ব্যাকরণকে গঙ্গাযাত্রায় বসিয়ে উচ্চারণের মাথায় ঘোল ঢেলে চালালুম আমার ধেনো মার্কা ফরাসী শ্যাম্পেন। মেমসাহেব খুশ। আম্মো তর।

অতি সযত্নে তিনি আমার বইয়ের ফর্দ টুকে নিলেন, বই আসা মাত্র আমায় খবর দেবেন সে ভরসাও দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে সাত সমুদ্র তেরো নদীর এপারে বিদেশীর সঙ্গে মাতৃভাষায় কথা কইতে পাওয়ার আনন্দে সুখ-দুঃখের দু'চারটা কথাও বলে ফেললেন। মাত্র তিন মাস হল এদেশে এসেছেন, তাই ইংরিজী যথেষ্ট জানেন না, তবে কাজ চালিয়ে নিতে পারেন, বইয়ের দোকান তাঁর নয়, এক বান্ধবীর, তার অনুপস্থিতিতে শুদ্ধমাত্র ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার কামনায় দোকানে বসেছেন।

তুলসীদাস বলেছেন—'পৃথিবীর কি অদ্ভুত রীতি। শুঁড়ি দোকানে জেঁকে বসে থাকে আর দুনিয়ার লোক তার দোকানে গিয়ে মদ কেনে। ওদিকে দেখ, দুধওয়ালাকে ঘরে ঘরে ধন্না দিয়ে দুধ বেচতে হয়।'

বুঝলুম কথা সত্যি। এতদিন পৃথিবীর লোক প্যারিসে জড়ো হত ফরাসী বেচবার জন্য।

সে কথা থাক্। ইতিমধ্যে একটি বাঙ্গাল ছোকরা দোকানে ঢুকে জিজ্ঞেস করলো, 'কনার্শিয়াল আর্ট সম্বন্ধে কোন বই আছে কিনা?' আমার মনে বড় আনন্দ হল। বাঙালী তাহলে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। ফরাসী ভাষায় কমার্শিয়াল আর্টের বই খুঁজছে।

ততক্ষণে আমি একটা খাসা বই পেয়ে গিয়েছি। ন্যুরনবর্গের মোকদ্দমায় যেসব দলিল-দস্তাবেজ পাওয়া গিয়েছিল, তাই দিয়ে গড়া হিটলার চরিত্রবর্ণন। হিটলার সম্বন্ধে তাঁর দুশমন ফরাসীরা কি ভাবে তার পরিচয় বইখানাতে আছে। এ বইখানার পরিচয় আপনাদের দেব বলে লেখাটা শুরু করেছিলুম, কিন্তু গৌরচন্দ্রিকা শেষ হতে না হতেই ভোরের কাক কা-কা করে আমার স্মরণ করিয়ে দিলে, কলম 'ফুরিয়ে গিয়েছে'। আরেক দিন হবে।

কিসের সন্ধানে

হটেনটট্‌দের কথা আলাদা। শিক্ষালাভের জন্য তারা যেখানে খুশি যেতে পারে। একথা তাদের ভাবতে হয় না, 'যে-শিক্ষা লাভ করতে যাচ্ছি সেটা আবার দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে খাপ খাবে তো?' কারণ কোনো প্রকারের ঐতিহ্যের কণামাত্র বালাই তাদের নেই।

ইংরেজ শাসনের ফলে আমরা প্রায় হটেন্‌টটের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছিলুম।

আর কয়েকটি বৎসর মাত্র ইংরেজ এদেশে থাকলে আমরা একে অন্যকে কাঁচা খেয়ে ফেলতে আরম্ভ করতুম।

ইংরেজ গিয়েছে। তাই এখন প্রশ্ন উঠেছে আমরা বিদ্যালাভ করতে যাব কোন্ দেশে? এতদিন এ প্রশ্ন কেউ শুধাতো না। টাকা থাকলেই ছোকরারা ছুটতো হয় অক্সফোর্ডের দিকে নয় কেমব্রিজের পানে। সেখানে সীট না পেলে লণ্ডন কিংবা এডিনবরা।

কিমাশ্চর্যমতঃপরম্। এই ভারতবর্ষে একদিন বিদ্যাশিক্ষার এমনি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল যে, গান্ধার, কম্বোজ, বল্হীক, তীব্বত, শ্যাম, চীন থেকে বিদ্যার্থী শ্রমণ এদেশে আসত সত্যজ্ঞান লাভ করার জন্য। এবং বিংশ শতকে দেখলুম, এই এই ভারতবর্ষের লোকেই ধেয়ে চলেছে ইংলণ্ডের দিকে 'বিদ্যালাভে'র জন্য। ভারতীয় ঐতিহ্য তখন তার দুরবস্থার চরমে পৌঁছেছে।

রাধার দুরবস্থা যখন চরমে পৌঁছেছিল, তখন যমুনার জল উজান বয়েছিল, একথা তাহলে মিথ্যা নয়।

কিন্তু আমাদের ছেলেরা যে ইংলণ্ডের পানে উজান স্রোতের মতো বয়ে চলেছিল, সেটা তো আর রাতারাতি বন্ধ করে দেওয়া যায় না—পরাধীনতা-মুর্গীটার গলা কাটা যাওয়ার পরও সে খানিকদূর পর্যন্ত ছুটে যায় তারপর ধপ করে মাটিতে পড়ে। তাই এই বেলা জমাখরচ নিয়ে নেওয়া ভালো, ভারতীয় ছেলে ইয়োরোপে পেত কি, যেত কিসের আশায়?

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করার সময় বলেছিলেন, ইয়োরোপকে আমরা চিনলুম ইংলণ্ডের ভিতর দিয়ে—তাই আমাদের প্রায় সকলেরই বিশ্বাস ইংলণ্ড আর ইয়োরোপ একই জিনিস। ইংলণ্ডের অনেক গুণ আছে সে কথা কেউ অস্বীকার করবে না, কিন্তু ইয়োরোপীয় বৈদগ্ধ্যভাণ্ডারে যে ইংলণ্ড তেমন কিছু হীরে-মানিক জমা দিতে পারে নি, সে কথাও সত্য। ইয়োরোপীয় বৈদগ্ধ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কুতুবমিনার বলতে যাঁদের নাম মনে আসে—মাইকেল এঞ্জেলো, রদাঁ, রাফায়েল, সেজান, বেটোফেন, ভাগনার, গ্যোটে, টলস্টয়, দেকার্ত, কাণ্ট, পাসত্যোর, আইনস্টাইন ইংলণ্ডে জন্মায় নি। তাই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বিশ্বভারতীতে যেন ফ্রান্স, জর্মনি, ইটালী, রুশ থেকে গুণীজ্ঞানীরা এসে এদেশে ছেলেমেয়েদের সামনে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরেন।

রবীন্দ্রনাথ যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন বহু গুণী শান্তিনিকেতনে এসেছেন, বহু ছাত্র তাঁদের কাছ থেকে নানা প্রকারের বিদ্যা আহরণ করেছে, কিন্তু আজ শান্তিনিকেতনে সে-মেলা আর বসে না। তবু আমার বিশ্বাস, বাঙালী যদি আত্মবিশ্বাস না হারায় তবে এই শান্তিনিকেতনেই—দিল্লী, এলাহাবাদ, আমেদাবাদে নয়—এই শান্তিনিকেতনের পঞ্চবটীর তলায়ই একদিন পঞ্চমহাদেশ সম্মিলিত হবে। আমাদের দেখতে হবে, এই পঞ্চবটী যেন ততদিন শুকিয়ে না যায়।

ভারতীয় ছেলে যে ইংলণ্ডে পড়াশোনা করতে যেত তার কারণ এই নয় যে, তাদের সবাই ধরে নিয়েছিল ইংলণ্ডই ইয়োরোপের প্রতীক—তারা ধরে নেয় নি

যে, ইয়োরোপ থেকে যা কিছু শেখবার মত আছে তার তাবৎ সম্পদ অক্সফোর্ড কেমব্রিজেই পাওয়া যায়। এদের ভিতর অনেক ছেলেই জানতো, শিল্পকলার জন্য ফ্রান্স, এবং বিজ্ঞানদর্শনের জন্য জর্মনিতেই গঙ্গোদক পাওয়া যায়—অভাব-বশতঃ তারা যে তখন কূপোদকের সন্ধানে যেতো তাও নয়। তার একমাত্র কারণ চাকরি দেবার বেলা ইংরেজ এ জলেরই কদর দেখাতো বেশী। (এতে আশ্চর্য হবার মত কিছু নেই ; আয়ানও চাইতেন না যে রাধা যমুনার জল আনতে যান, পাছে কৃষ্ণের সঙ্গে সেখানে তাঁর দেখা হয়ে যায়—ইংরেজও চাইত না যে, ফ্রান্স জর্মনি গিয়ে আমরা সভ্য ইয়োরোপকে চিনে ফেলি। আয়ান ইংরেজ দু'-জনেই তাই কূপোদক-সম্প্রদায়ের মুখপাত্র)।

জানি, আমার পাঠক মাত্রই টিপ্পনি কাটবেন আমি বড্ড বেশী প্রাদেশিক কিন্তু তাই বলে তো আর ডাহা মিথ্যা কথা বলতে পারি নে। নিবেদন করতে বাধ্য হচ্ছি যে, ইংলেণ্ড বর্জন করে তবু যে কয়টি ছেলে প্যারিস, বার্লিন, মুনিক, ভিয়েনায় জ্ঞানের সন্ধানে যেত তাদের অধিকাংশই বাঙালী।

আশা করি একথা কেউ বলবেন না যে বাঙালীর ট্যাঁকে এত বেশী কড়ি জমে গিয়েছিল যে, সেগুলো ওড়াবার তালে সে প্যারিস যেত, জর্মন ঘুরত। বরঞ্চ বাঙালীর বদনাম সে চাকরির সন্ধানে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে। এক অখ্যাতনামা বাঙালী কবি চাকরির বাঁচানো সম্পর্কে আপিস ধাবমান বাঙালী কেরানীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

ভরা পেটে ছুটতে মানা ? চিবিয়ে খাওয়া
স্বাস্থ্যকর ?
চাকরি আগে বাঁচাই দাদা, প্রাণ বাঁচানো
সে তারপর।

যে অন্নের জন্য বাঙালী কেরানীগিরি করে সেই অন্ন পর্যন্ত বাঙালী কেরানী ধীরে-সুস্থে খেয়ে আপিস যেতে পারে না। এত বড় প্যারাডক্স, এত বড় স্বার্থত্যাগ বাঙ্গালা দেশের বাইরে আপনি পাবেন না।

আমি বলি—আর আপনার কথায় কান দেব না—বাঙালীরই ঈষৎ রসবোধ ছিল, তাই সে প্যারিস যেত।

প্যারিসে একপ্রকারের হতভাগা চিত্রকরের দল আছে—এদের নাম পেভমেণ্ট আর্টিস্ট। এরা আবার দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এদের ভিতর যারা কিঞ্চিৎ খানদানি তারা আপন ছবি ফুটপাথের রেলিঙের উপর ঝুলিয়ে রেখে একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আপনি যদি কোনো ছবি সম্বন্ধে কিছু জানতে চান তবে সে পরম উৎসাহে আপনাকে বাৎলে দেবে ছবিটার তাৎপর্য কি। আপনি যদি সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ দেখান তবে সে তার তাবৎ ছবির ঠিকুজি-কুলজি, নাড়ী-নক্ষত্র সব কিছু গড় গড় করে বলে যাবে, আর যদিস্যাৎ আপনি একখানা ছবি কিনে ফেলেন—এ জাতীয় অলৌকিক ঘটনা অতিশয় রাঙা শুক্কুরবার ছাড়া কখনো দৃষ্টিগোচর হয় না—তবে সে আপনাকে 'ও রিভোয়া' জানাবার সময় কানে কানে বলে দেবে, 'এ ছবি কিনে আপনি ভুল করেন নি,

মসিয়ো—এ ছবি দেখিবার জন্য তামাম পৃথিবী একদিন আপনার দোরের গোড়ায় ধন্না দেবে।'

অবশ্য ততদিন সে উপোস করে। শেষটায় সে-দিন না দেখেই সে মরে—শীতে এবং ক্ষুধায়।

এদের চেয়েও হতভাগা চিত্রকর আছে। তাদের রঙ আর ক্যানভাস কেনবার পয়সা পর্যন্ত নেই। তাই তারা রঙিন খড়ি দিয়ে ফুটপাথের একপাশে ছবি এঁকে রাখে। প্যারিসের ফুটপাথে বারোমাস পুজোর ভিড়—তাই এদের ছবি আঁকতে হয় অপেক্ষাকৃত নির্জন ফুটপাথে। সেখানে পয়সা পাবার আশাও তাই কম।

এসব ছবি তো আর কেউ বাড়ি নিয়ে যেতে পারে না, তাই ছবি দেখে খুশী হয়ে কেউ যদি চিত্রকরের হ্যাটের ভিতর—বলতে ভুলে গিয়েছিলুম হ্যাটটা ছবির একপাশে চিৎ করে পাতা থাকে—দু'টি পয়সা ফেলে দেয় তবে সেটা ভিক্ষে দেওয়ার মতই হ'ল। এ শ্রেণীর চিত্রকররা অবিশ্যি বলে, 'পয়সাটা ভিক্ষে নয়, পিকচার গ্যালারির দর্শনী। দর্শনী দিয়েছে বলে কি তোমাকে গ্যালারির ছবি বাড়ি নিয়ে যেতে দেয়?' হক্ কথা।

এদের যদি বেশী পয়সা দিয়ে বলেন, 'ঐ ছবিটা তুমি আমাকে ক্যানভাস আর রঙ কিনে ভালো করে এঁকে দাও', তবে সে পয়সাটা সীনের জলে ফেলারই সমান। এ শ্রেণীর চিত্রকরের সঙ্গে বোতলবাসিনীর বড্ড বেশী দহরম-মহরম।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল বলে মন উদাস হয়ে গিয়েছিল। তাই বেড়াতে বেরিয়েছি আর দেশের কথা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি ফুটপাথের উপর অলৌকিক দৃশ্য। পদ্মানদীর গোটা কয়েক ছবি রঙিন খড়ি দিয়ে আঁকা। ছবিগুলো ভালো না মন্দ সেকথা আমি এক লহমার তরেও ভাবলুম না। বিদেশ-বিভূঁইয়ে দেশের লোক পেলে সে পকেটমার না শঙ্করাচার্য, সেকথা কেউ শুধায় না।

বৃষ্টি নামলেই ছবিগুলো ধুয়ে মুছে যাবে। আর্টিস্টের দিকে তাকালুম। শতচ্ছিন্ন কোট পাতলুন। হাতে বেয়ালা। বাঙালী।

আমাকে দেখে তার মুখের ভাব কণামাত্র বদলালো না। বেয়ালাখানা কানের কাছে তুলে ধরে ভাটিয়ালি বাজাতে আরম্ভ করল।

হাড্ডিসার মুখ, ঠোঁট দুটো অনবরত কাঁপছে, চোখ দুটিতে কোনো প্রকারের জ্যোতির বিন্দুমাত্র আভাস নেই, একমাথা উস্কোখুস্কো চুল, কিন্তু সব ছাড়িয়ে চোখে পড়ে তার কপালখানা। এবং সে কপাল দেখে স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে, এরকম 'কপালী' মানুষ বিদেশ-বিভূঁইয়ে ভিক্ষে মাঙছে কেন?

তাকে পাশের কাফেতে টেনে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে বিস্তর বেগ পেতে হয়েছিল। আমার কোনো কথার উত্তর দেয় না, আমার চেয়ে দেড় মাথা উঁচু বলে তার দৃষ্টি আমার মাথার উপর দিয়ে কোথায় কোন্ দূরান্তে গিয়ে ঠেকেছে তার সন্ধান নেই। একবার হাত ধরে বললুম, 'চলুন, এক কাপ কফি খাবেন';

ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে ফেলল।

আমি নিরাশ হয়ে চলে যাচ্ছি দেখে হঠাৎ হ্যাটটা তুলে নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলল। পাশের কাফেতে বসে আমি শুধালুম, 'কফি? চা?' মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালো। আমি মনে মনে বুঝতে পেরেছিলুম সে কি চায়; কিন্তু সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হবার জন্য চা কফির প্রস্তাব পেড়েছিলুম। শেষটায় শুধালুম, 'তবে কি খাবেন?'

একটি কথা বললো 'আবসাঁৎ।'

দুনিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক মাদক দ্রব্য! শতকরা আশীভাগ তাতে এলকহল। এ মদ মানুষ তিন চার বৎসরের বেশী খেতে পারে না। তারই ভিতরে হয় আত্মহত্যা করে, নয় পাগল হয়ে যায়, না হয় এলকহলিক বিভীশিখা দেখে দেখে এক মারাত্মক রোগে চীৎকার করে করে শেষটায় ভির্‌মি গিয়ে মারা যায়। ইঁদুরছানার নাকের ডগা এ মদে একবার চুবিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিলে সে মিনিট তিনেকের ভিতর ছফ্‌ফট্‌ করে মারা যায়।

কী বিকৃত মুখ করে যে আর্টিস্ট আবসাঁৎটা খেল, তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। মনে হল, পানীয় যেন আগুন হয়ে পেটে ঢুকতে চায় বলে নাড়ীভুঁড়ি উল্টে গিয়ে বমি হয়ে বেরতে চায়, আর সমস্ত মুখে তখন ফুটে ওঠে অসহ্য যন্ত্রণার বিকৃততম বিভীষিকা। চোখ দুটো ফুলে উঠে যেন বাইরের দিকে ছিটকে পড়ে যেতে চায়, আর দরদর করে দু'চোখ দিয়ে জল নেমে আসে।

আমি মাত্র একটা আবসাঁতের অর্ডার দিয়েছিলুম। সেটা শেষ হতেই আমার দিকে না তাকিয়ে নিজেই গোটা তিনেক অর্ডার দিয়ে ঝপাঝপ গিললো।

আমি চুপ করে আপন কফি খেয়ে যাচ্ছিলুম।

গোটা চারেক আবসাঁৎ সে ততক্ষণে গিলেছে। তখন দেখি সে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এ অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য এর চোখে এল কোত্থেকে?

হঠাৎ বললো, 'আর কেন ছোকরা, এইবার কেটে পড়ো, বীট ইট্‌, গে ভেক্‌, ভিৎ ভিৎ।' ক'টা ভাষায় যে সে আমায় পালাতে বললো তার হিসেবই আমি রাখতে পারলুম না।

আমি চুপ করে বসে রইলুম— নট নড়ন-চড়ন—নট-কিচ্ছু।

একগাল হেসে বলল, 'দেখলি? আমি ভিখিরি নই। এই ভাষা ক'টি ভাঙিয়েই আমি তোর চেয়ে দামী সুট পরতে পারবো, বুঝলি? আবসাঁৎ দিয়ে প্যারিস শহর ভাসিয়ে দিতে পারবো, বুঝলি, কমপ্রাঁ, ফের্‌শট্‌হেস্ট ডু, পন্নিময়েশ?' আবার চলল ভাষার তুবড়ি।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিটিয়ে খানিকক্ষণ হাসলো। শুধালো, 'ছবি আঁকতে এসেছিস এ দেশে?—না হলে আর্টিস্টের উপর এ দরদ কেন, বাপু? তা তোর অজন্টার কি হল? না বাগ-গুহা? কিংবা মোগল? অথবা রাজপুত?'

তারপর হঠাৎ হো হো করে হেসে কুটি কুটি। 'অবনবাবু? নন্দলাল?

যামিনী রায় ? এনারা সব আর্টিস্ট। কচু।'

আমি তবু চুপ।

বললে, 'অ-অ-অ-। সেজান্ রেনোয়া গোগাঁ, আঁরি-মাতিস ? বল্ না রে ছোকরা।'

আমি পূর্ববৎ।

'তবে শোন্ ছোকরা। এদের কাছ থেকে কিচ্ছুটি শেখবার নেই, তোকে সাফ সাফ বলে দিচ্ছি। আমার কথা শোন্। আর্ট জিনিসটা কি ? আর্ট হচ্ছে—'

বলে সে আমায় প্রথম আর্ট সম্বন্ধে একখানা লেকচর শোনালে। সেই গ্রীকদের আমল থেকে নন্দনশাস্ত্রের ইতিহাস শুরু ক'রে হঠাৎ চলে গেল ভরত দণ্ডিন মম্মট ভট্টে। সেখান থেকে গোত্তা খেয়ে নাবলো টলস্টয়ে—মধ্যিখানে গ্যোটেকে খুব একহাত নিল। তারপর বদলের, মালার্মে। শেষ করল জেমস জয়েসকে দিয়ে।

আরো বিস্তর কাব্য, নাট্য, চিত্রের সে উল্লেখ ক'রে গেল, যার নাম আমি বাপের জন্মে শুনি নি।

তারপর ঝপ ক'রে আরেকটা আবসাঁৎ গিলে বললো, 'উহুঁ! তোর চোখ থেকে বুঝতে পারছি ছবির তুই বুঝিস কচুপোড়া। একবার একটা সাড়া পর্যন্ত দিলি নে। তবে কি তোর শখ মূর্তি গড়াতে ? অশোকস্তম্ভের সিংগি, গান্ধারের বুদ্ধ, মথুরার অমিতাভ, এলেফেণ্টার ত্রিমূর্তি, মাইকেল এঞ্জেলোর মোজেস, নটরাজ ? বল্ না ?

তারপর ছাড়লে আরেকখানা লেকচর। দুনিয়ার কোন যাদুঘরের কোন্ কোণে কোন্ মূর্তি লুকনো আছে, সব খবর নখাগ্র-দর্পণে।

এই রকম ক'রে লোকটা আর্টের যত শাখা-প্রশাখা আছে তার সম্বন্ধে আপন মনে কখনো মাথা নেড়ে, কখনো শব্দ ওজন ক'রে ক'রে, কখনো গড়গড়িয়ে মেল গাড়ির তেজে, কখনো বক্রোক্তি ক'রে সন্দেহের দোদুল-দোলায় দুলে ব্যাখ্যান দিল। এদেশ ওদেশ সেদেশ সব দেশ-মহাদেশের সর্বপ্রকারের আর্ট বস্তুর পাঁচমেশালি বানিয়ে।

এরকম পণ্ডিত আমি জীবনে আর কখনো দেখি নি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে সে চুপ করে আর থাকতে দিল না।

বোধ হয় নেশা একটু কমে গিয়েছিল ; তাই চাপ দিয়ে শুধালো, 'বল্, তুই এদেশে এসেছিস কি করতে ?'

আমি না পেরে ক্ষীণ কণ্ঠে বললুম, 'লেখাপড়া শিখতে।'

খুব লম্বা একখানা 'অ-অ-অ' টেনে বললো।

'তা তো শিখবি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওয়াইন, শ্যাম্পেন, আবসাঁৎ ? তার কি হবে ? নানা প্রকারের ব্যামো ? তার কি হবে ? অদ্ভুত অদ্ভুত নয়া নয়া ইনকিলাবী মতবাদ ? তার কি হবে ?

* * *

এই হল মুশকিল। আবসাঁৎ ব্যামোর চেয়েও ভয়ংকর অর্ধসিদ্ধ অর্ধপক্ক

মতবাদ। শুধু ইনকিলাবী নয়, অন্য পাঁচরকমেরও।

আজ পর্যন্ত যেটুকু এদেশে এসেছে তাকেই আমরা সামলে উঠতে পারছি নে। আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের শিক্ষার সঙ্গে তাকে কি করে মিল খাওয়াবো, বুঝে উঠতে পারিনে। অথচ পশ্চিমের সঙ্গে লেন-দেনও তো বন্ধ ক'রে দেওয়া যায় না। উপায় কি??

ভক্তি

ভক্তি ও ভালবাসার ভিতর দিয়ে অনির্বচনীয় সত্তাকে পাবার চেষ্টা মানুষ সব যুগে আর সব দেশেই করেছে। এ-প্রচেষ্টার তুলনাত্মক ইতিহাস আজও লেখা হয় নি। কারণ শেষ পর্যন্ত এ-ইতিহাস লেখা হবে সর্বধর্মের উৎপত্তিস্থল প্রাচ্যেই এবং প্রাচী এখনো আপন ঘৃত-লবণ-তৈল-তণ্ডুল-বস্ত্র-ইন্ধন নিয়ে এতই উদ্ব্যস্ত যে তিন দেশের শাস্ত্রগ্রন্থ একত্র করে সেদিকে আপন শক্তি নিয়োজিত করবার অবসর পাচ্ছে না।

ভক্তিমার্গের প্রসার ও বিস্তার হয় প্রধানতঃ হিন্দু, মুসলিম এবং খৃস্টান ধর্মে। হিন্দু ধর্মের শাস্ত্ররাশি এতই বিশাল এবং বিক্ষিপ্ত যে, তার ভিতর দিয়ে ভক্তির অভ্যুদয় পদে পদে অনুসরণ করা সহজ কর্ম নয়। তার তুলনায় খৃস্টধর্মে ভক্তির অনুসন্ধান অনেক সহজ। একমাত্র বাইবেলখানা মন নিয়ে পড়লেই ভক্তির সূত্রপাত ও ক্রমবিকাশ বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

বাইবেলের প্রথম খণ্ডে (অর্থাৎ ওল্ড টেস্টামেণ্ট) ঈশ্বরের যে রূপ পাওয়া যয়ে সেটি প্রধানতঃ একচ্ছত্রাধিপতি দুর্ধর্ষ, অকরুণ এমন কি বদরাগী এবং খাম-খেয়ালী রাজার রূপ? তাঁর সামনে পশুপক্ষী দাহ না করলে তিনি তৃপ্ত হন না, তাঁর পদপ্রান্তে কুমারী কন্যাকে বিসর্জন না দিলে তিনি বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহা-মারী দিয়ে দেশ লণ্ডভণ্ড করে দেন। তাই ওল্ড টেস্টামেণ্টের দেবতাকে পূজারী আপন অর্ঘ্য দিচ্ছে অতি ভয়ে, সশঙ্ক চিত্তে।

খৃস্ট এসে এই ভাবধারা সম্পূর্ণ বদলে দিলেন। তিনি বললেন, সৃষ্টিকর্তা রাজাধিরাজ, তাঁর ঐশ্বর্যের সীমা নেই, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তিনি আমাদের পিতা। 'আওয়ার ফাদার উইচ আর্ট ইন হেভ্‌ন্।' এইখানেই ভক্তির সূত্রপাত। ভগবানকে ভয় করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁর করুণা, তাঁর স্নেহ পেতে হলে তাঁকে ভালবাসতে হবে পিতার মত।

কিন্তু মানুষ একবার ভালবাসার মন্ত্র পেলে সে আর মাটির মানুষ হয়ে থাকতে চায় না। মুক্তপক্ষ বিস্তার করে সে আকাশের সর্বোচ্চ স্তরে উড্ডীয়মান হতে চায়। পিতার প্রতি ভালবাসা মঙ্গলময় জিনিস কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়ে অনেক মধুর, বহু নিবিড় মাতার প্রতি পুত্রের ভালবাসা, পুত্রের প্রতি মাতার মমতা। তাই ক্যাথলিক জগৎ গেয়ে উঠলো, "ধন্য হে জননী মেরি,

তুমি মা করুণাময়ী।"

ক্যাথলিক জগতে তাই ভগবানের পূজা প্রধানতঃ মা-মেরিরূপে। এ পূজা 'আভেমারিয়া' মন্ত্র দিয়ে সমাধান হয় এবং সে মন্ত্র যে কত সঙ্গীত-স্রষ্টাকে অনুপ্রাণিত করেছে তার ইয়ত্তা নেই। খৃস্টবৈরী ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রধান সঙ্গীতকার মেণ্ডেলজোন এই আভেমারিয়া মন্ত্রে সুর দিয়ে লক্ষ লক্ষ ক্যাথলিক নরনারীর ধর্মপিপাসা সঙ্গীতসুধা দিয়ে তৃপ্ত করেছেন—সঙ্গীতজগতে আপন অক্ষয় আসন রেখে গিয়েছেন।

'উর্ধ্বদিকে উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত এই আভেমারিয়া সঙ্গীতের প্রতীক উর্ধ্বশির ক্যাথলিক গির্জা। আতুর মানুষের যে প্রার্থনা, যে বন্দনা অহরহ মা-মেরির শুভ্র কোলের সন্ধানে উর্ধ্বপানে ধায় তারই প্রতীক হয়ে গির্জাঘর তার মাথা তুলেছে উর্ধ্বদিকে। লক্ষ লক্ষ গির্জার লক্ষ লক্ষ শিখর মা-মেরির দিব্য সিংহাসনের পার্থিব স্তম্ভ।'

কিন্তু মানুষ এখানে এসেও থামল না। সত্য হোক, মিথ্যা হোক, মানুষের বিশ্বাস মাতার প্রেম, পুত্রের ভালবাসার চেয়েও শক্তিশালী যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণীর মধ্যে যে প্রেম উদ্ভাসিত হয়। বাইবেলে যখন বলা হয়েছে "For, love is stronger than death" তখন মহাপুরুষ এই প্রেমের কথা ভেবেছিলেন। তাই মানুষ বিচার করল, 'ভগবানকে যদি ভালবাসা দিয়েই পেতে হয়, তবে সে ভালবাসা তার নিবিড়তম রূপ নেবে না কেন? ভগবানকে তবে পিতা অথবা মাতারূপে কল্পনা না করে তাঁকে হৃদয়ে বসাব বল্লভরূপে, প্রেমিকরূপে।'

সমস্ত বৈষ্ণব রসসাধনা এই তত্ত্বের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত—সে কথা পরে হবে। কিন্তু ক্যাথলিক রহস্যবাদী ভক্তেরা (Mystic saints)-ও যে এ-রকম রসস্বরূপে আরাধনা করছেন তার সন্ধান আমরা কমই রাখি,—কারণ আমাদের পরিচয় প্রধানতঃ প্রটেস্টাণ্ট ধর্মের সঙ্গে। ঈষৎ দীর্ঘ হলেও নিচের কবিতাটি উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না :—

O Night, that did's't lead us thus,
O Night, more lovely that dawn
of light,
O Night that broughtest us
Lover to lover's sight
Lover with loved in marriage
of delight !
Upon my flowery breast,
Wholly for him, and save himself
for none,
There did I give sweet rest
To my beloved one ;

The fanning of the cedars
breathed thereon
When the first morning air
Blew from the bower, and waived
his locks aside,
His hand with gentle care,
Did wound me in the side,
And in my body all my senses
died.
All things I then forgot,
My cheek on him who for my
coming came ;
All ceased and I was not,
Leaving my cares and shame
Among the lilies and forgetting
them.

ক্যাথলিক জগতের বিখ্যাত সাধু সান খোয়ানু দে লা ক্রুসের (San Juan de la Cruz) কবিতা পড়ে কে বলবে—এ কবিতা অধ্যাত্ম জগতের ধর্মরস সৃষ্টি করবার জন্য রচিত হয়েছিল ? এ কবিতা তো বৈষ্ণব পদাবলীর সুরে বাঁধা।

কিন্তু ভগবানকে রসস্বরূপে আরাধনা করার প্রচেষ্টাতে ক্যাথলিক জগতের এই চূড়ান্ত।

বৈষ্ণব ভক্ত সেই চূড়ান্ত ত্যাগ করে তারপর আকাশে উড্ডীয়মান হন। বৈষ্ণব প্রেমিক বলেন, 'বৈধ প্রণয়ের নিবিড়তা বার বার হার মেনেছে অবৈধ প্রেমের সম্মুখে। আত্মীয়স্বজন, প্রচলিত ধর্মরীতি যেখানে এসে প্রেমের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, দুর্বার প্রেম এসে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায় সেইখানেই। তাই আমাদের কদম্ববনবিহারিণী বিরহিণী ব্রজসুন্দরী শ্রীরাধা যে প্রেম পাগলিনী, সে প্রেমের সঙ্গে অন্য কোন প্রেমের তুলনা হয় না। বাঙালীর রাধা বিবাহিতা, —সমাজ তাঁর প্রেমের পথে অলঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়ে তুলেছে। শাশুড়ী-ননদী শঙ্খ-করাতের মত তাঁকে আসতে যেতে যেন খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলছেন।

বহু যুগ পূর্বে উচ্চারিত মন্ত্র তাই তার সম্পূর্ণ অর্থ পেল কৃষ্ণরাধার মিলনে—

যদেৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।
যদেৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।

ভারতের বাইরে একমাত্র ইরানে মাঝে মাঝে এই সর্বোচ্চ রসসাধনার সন্ধান মেলে। কারণ ভারত ও ইরানের আধ্যাত্মিক যোগাযোগ বহু শত শতাব্দীর।

তাই ইরানী কবি সুর মিলিয়ে গেয়েছেন ঃ—

'মন্ তু শুদম্ তু মন্ শুদী, মন্ তন্ শুদম্
তু জাঁ শুদী
তা কসী ন গোয়েদ্ বাদ্ আজ্ ঈ মন্ দিগরম্
তু দিগরী।'

আমি তুমি হনু, তুমি আমি হলে, আমি দেহ
তুমি প্রাণ,
এর পরে যেন কেহ নাহি বলে তুমি আন
আমি আন।

* * *

এই বিশাল রসধারার কত স্রোত, কত শাখা-প্রশাখা। কত ধ্বনি, কত সঙ্গীত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে সান গোয়ান, শ্রীরাধা, রুমীর বিরহকাতর বক্ষ থেকে। কিন্তু হায়, এ শতাব্দীর যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতি মানুষকে কাছে এনেও কাছে আনতে পারল না। অর্থের সন্ধানে, স্বার্থের অন্বেষণে আজ পৃথিবীর এক কোণের মানুষ অপর কোণে গিয়ে মাথা কোটে, কিন্তু এ সব সাধক প্রেমিকদের বাণী এক করে দেখবার চেষ্টা কেউ যে করে না!!

'আমার ভাণ্ডার আছে ভরে—'

শব্দপ্রাচুর্যের উপর ভাষার শক্তি নির্ভর করে। ইংরেজি এবং বাংলা এই উভয় ভাষা নিয়ে যাঁদের একটুখানি ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়, তাঁরাই জানেন বাঙলার শব্দ-সম্পদ কত সীমাবদ্ধ। ডাক্তারী কিংবা ইঞ্জিনীয়ারিং টেকনিকেল শব্দের কথা তুলছি নে—সে সব শব্দ তৈরী হতে দেরি—উপস্থিত সে শব্দের কথাই তুলছি যেগুলো সাহিত্য ক্ষেত্রেই সর্বদা দরকার হয়।

ইংরেজির উদাহরণই নিন্। ইংরেজি যে নানা দিক দিয়ে ইয়োরোপীয় সর্ব-ভাষার অগ্রগণ্য তার অন্যতম প্রধান কারণ ইংরেজির শব্দ-সম্পদ। এবং ইংরেজি সে সম্পদ আহরণ করেছে অত্যন্ত 'নির্লজ্জে'র মত পূর্ব-পশ্চিম সর্ব দেশ মহাদেশ থেকে। গ্রীক, লাতিনের মত দুটো জোরালো ভাষা থেকে তার শব্দ নেবার হক তো সে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েইছে, তার উপর ফরাসীর উপরও ওয়ারিশান বলে তার ষোল আনা অধিকার। তৎসত্ত্বেও—সুকুমার রায়ের ভাষায় বলি—

এতো খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা
খাও তবে কচু-পোড়া খাও তবে ঘণ্টা!!

ইংরেজ উত্তরে বেশরমের মত বলে, "ঠিক বলেছে, আমার মনে ওঠে নি, আমি কচু-পোড়া এবং ঘণ্টা খেতেও রাজী!"

তাই দেখুন ইংরেজ, আরবী, ফার্সী, তামিল, হিন্দী, মালয়—কত বলবো? —দুনিয়ায় তাবৎ ভাষা থেকে কচু-পোড়া ঘণ্টা সব কিছু নিয়েছে, এবং হজমও করে ফেলেছে। 'এডমিরাল' নিয়েছে আরবী 'আমীর-উল-বহর' থেকে, 'চেক'

(কিস্তিমাতের) নিয়েছে ফার্সী 'শাহ' থেকে, 'চুরুট' নিয়েছে তামিল 'শুরুট্টু' থেকে, 'চৌকি' নিয়েছে হিন্দী থেকে, 'এমাক' নিয়েছে মালয় থেকে।

(কিন্তু আশ্চর্য, ইংরেজের এই বিদঘুটে গরুড়ের ক্ষুধা শব্দ বাবদেই ; আহারাদির ব্যাপারে ইংরেজ নকিষ্যি কুলীনের মত উন্নাসিক, কট্টর স্বপাকে খায়, এ-দেশে এত কাল কাটানোর পরও ইংরেজ মাস্টার্ড (অর্থাৎ সর্ষেবাটা বা কাসুন্দি) এবং মাছে মিলিয়ে খেতে শেখে নি, অথচ কে না জানে সর্ষেবাটায় ইলিশ মাছ খাদ্য-জগতে অন্যতম কুতুব-মিনার ? ইংরেজ এখনো বিস্বাদ ফ্রাইড ফিশ খায়, মাছ ভাজতে শিখলো না ; আমরা তাকে খুশী করার জন্য পান্তুয়ার নাম দিলুম লেডিকিনি (লেডি ক্যানিং) তবু সে তাকে জাতে তুললো না, ছানার কদর বুঝলো না। তাই ইংরেজের রান্না এতই রসকষ-বর্জিত, বিস্বাদ এবং একঘেয়ে যে তারই ভয়ে কন্টিনেন্টাল মাত্রই বিলেত যাবার নামে আঁৎকে ওঠে—যদি নিতান্তই লণ্ডন যায় তবে খুঁজে খুঁজে সোহো মহল্লায় গিয়ে ফরাসী রেস্তোরাঁয় ঢুকে আপন প্রাণ বাঁচায়। আমার কথা বাদ দিন, আমার পেটে এটম বোম মারলেও আমি ইংরিজি খানা দিয়ে আমার পেট ভরতে রাজী হবো না।)

শব্দের জন্য ইংরেজ দুনিয়ার সর্বত্র ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায় সে না হয় বুঝলুম ; কিন্তু ইংরেজের মত দম্ভী জাত যে দুশমনের কাছ থেকেও শব্দ ধার নেয় সেইটেই বড় তাজ্জবকী বাৎ। এই লড়াইয়ের ডামাডোলে সবাই যখন আপন আপন প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত তখনো ইংরেজ গোটা কয়েক শব্দ দুশমনের কাছ থেকে ধার নিয়ে দাঁত দেখিয়ে হেসেছে। লুফ্‌ট-ভাফ্‌ফের মার খেয়ে খেয়ে ইংরেজ যখন মর-মর তখনো সে মনে মনে জপছে, 'লুফ্‌ট-ভাফ্‌ফে, লুফ্‌ট-ভাফ্‌ফে, শব্দটা ভুললে চলবে না', ব্লিৎস্‌ক্রীগের ঠেলায় ইংরেজ যখন ডানকার্কে ডুবু-ডুবু তখনো ইষ্টনাম না জপে সে জপেছে, ব্লিৎস-ক্রীগ, ব্লিৎস-ক্রীগ।'

আর বেতামিজীটা দেখুন। গালাগাল দেবার বেলা যখন আপন শব্দে কুলোয় না—মা লক্ষ্মী জানেন সে ভাণ্ডারেও ইংরেজের ছয়লাব—তখনো সে চক্ষুলজ্জার ধার ধারে না। এই তো সেদিন শুনলুম কাকে যেন "স্বাধিকার-প্রমত্ত" বলতে গিয়ে কোনো এক ইংরেজ বড় কর্তা শত্রুপক্ষকে শাসিয়েছেন, "আমাদের উপর ফ্যুরার- গিরার ফপরদালালি করো না।"

পাছে এত সব শব্দের গন্ধমাদন ইংরেজকে জগন্নাথের জগদ্দল পাথরে চেপে মারে তাই তার ব্যবস্থাও সে করে রেখেছে। 'জগন্নাথ' কথাটা ব্যবহার করেই সে বলেছে, "ভেবে চিন্তে শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করবে—পাগলের মত ডোণ্ট থ্রো ইয়োরসেলভস আণ্ডার দি হুইল অব Juggernaut (জগন্নাথ)।"

ব্যাটারা আমাদের জগন্নাথকে পর্যন্ত সমুদ্রযাত্রা করিয়ে দেশে নিয়ে ছেড়েছে। পারলে তাজমহল আর হিমালয়ও আগেভাগেই নিয়ে বসে থাকত—কেন পারে নি তার কারণ বুঝতে বেগ পেতে হয় না।

ফরাসী জাতটা ঠিক তার উল্টো। শব্দ গ্রহণ বাবদে সে যে কত মারাত্মক ছুঁৎবাইগ্রস্ত তা বোঝা যায় তার অভিধান থেকে। পাতার পর পাতা পড়ে যান, বিদেশী শব্দের সন্ধান পাবেন না। মনে পড়ছে, আমার তরুণ বয়সে শান্তিনিকেতনের ফরাসী অধ্যাপক বেনওয়া সায়েবের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। রোমা রলাঁর পঞ্চাশ না ষাট বছর পূর্ণ হওয়াতে পৃথিবীর বড় বড় রলাঁ-ভক্তেরা তখন তাঁকে একখানা রলাঁ-প্রশস্তি উপহার দেন। এ-দেশ থেকে গাঁধী, জগদীশ বসু এঁরা সব লিখেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন কি না ঠিক মনে পড়ছে না। বেনওয়া সায়েবও সে-কেতাবে একখানা প্রবন্ধ লিখেছিলেন—বিষয়বস্তু 'শান্তিনিকেতনের আশ্রম'। 'আশ্রম' শব্দে এসে বেনওয়া সায়েবের ফরাসী নৌকা বানচাল হয়ে গেল। 'আশ্রম' শব্দটা ফরাসীতে লিখবেন কি প্রকারে, অথচ ফরাসী ভাষায় 'আশ্রম' জাতীয় কোনো শব্দ নেই। আমি বললুম, 'প্যারিস শহর আর ব্রহ্মচর্যাশ্রম যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুই প্রান্তে অবস্থিত—অন্ততঃ ভাবলোকে—সে কথা সবাই জানে, তবু—ইত্যাদি।' বেনওয়া সায়েব ফরাসী কায়দায় শোলডার শ্রাগ করে বললেন, 'উঁহু বদহজম হবে।' সায়েব শেষটায় কি করে জাতরক্ষা আর পেট ভরানোর দ্বন্দ্ব সমাধান করেছিলেন সে-কথাটা এতদিন বাদে আজ আমার আর মনে নেই।

অর্থাভাববশতঃ একদা আমাকে কিছুদিনের জন্য এক ইংরেজ ব্যবসায়ীর ফ্রান্সাগত ফরাসী চিঠি-পত্রের অনুবাদ করে দিতে হয়েছিল। মনে পড়ছে, কারবারে ফরাসী পক্ষ হামেশাই ইংরেজ পক্ষকে দোষারোপ করতো যে ইংরেজ অনেক সময় আপন অভিসন্ধি সাফ সাফ বলে না। ইংরেজি ভাষায় শব্দসম্পদ প্রচুর বলে ইচ্ছে করলেই আপন বক্তব্য ঘোলাটে, আব্‌ছা আব্‌ছা করে লেখা যায়। ফরাসীতে সেটি হবার জো নেই। যা বলার সেটা পরিষ্কার হয়ে বেরবেই বেরবে (লক্ষ্য করে থাকবেন কাচ্চা-বাচ্চার শব্দ-সম্পদ সীমাবদ্ধ বলে তাদের কথায় সব জিনিসই হয় কালো নয় ধলা, সব কিছুই পরিষ্কার, কোনো প্রকারের হাফটোন নেই)। তাই ফরাসী এই চিঠিপত্র লেনদেনের ব্যাপারে পড়লো বিপদে।

কিন্তু ফরাসীরাও গম যব দিয়ে লেখাপড়া শেখে না। তাই শেষটায় ফরাসী কারবারি হুমকি দিল, সে ইংরেজ রেখে চিঠি-পত্র ইংরিজিতে লেখাবে। ইংরেজ হন্তদন্ত হয়ে চিঠি লিখল, 'সে কি কথা, আপনাদের বহুৎ তকলিফ হবে, বড্ড বেশী বাজে খর্চা হবে, এমন কম্ম করতে নেই।'

তখন একটা সমাঝাওতা হল।

* * *

Gepaeckaufbewahrungstelle !

শব্দটা শুনে মূর্ছা যাই আর কি !

প্রথমবার বার্লিন যাচ্ছি, জর্মন ভাষার জানি শুধু ব্যাকরণ, আর কণ্ঠস্থ আছে হাইনরিশ হাইনের গুটিকয়েক মোলায়েম প্রেমের কবিতা। সে-রেস্ত দিয়ে তো বার্লিন শহরে বেসাতি করা যায় না। তাই একজন ফরাসী সহযাত্রীকে ট্রেনে

বার্লিন পেঁছিবার কিছু আগে জিজ্ঞেস করলুম, 'ক্লোক-রুম' বা 'লেফট-লগেজ-অফিসের' জর্মন প্রতিশব্দ কি? বললেন—

Gepaeckaufbewahrungstelle!

প্রথম ধাক্কায়ই এ-রকম আড়াইগজী শব্দ মুখস্থ করতে পারবো, সে দুরাশা আমি করি নি। মসিয়োও আঁচতে পারলেন বেদনাটা—একখানা কাগজে টুকে দিলেন শব্দটা। তাই দেখালুম বার্লিন স্টেশনের এক পোর্টারকে। মাল সেখানে রেখে একটা হোটেল খুঁজে নিলুম। ভাগ্যিস 'হোটেল' কথাটা আন্তর্জাতিক—না হলে ক্লোক-রুমের তুলনায় হোটেলের সাইজ যখন পঞ্চাশগুণ বড় তখন শব্দটা পঞ্চাশগুণ লম্বা হত বই কি।

জর্মন ভাষার এই হল বৈশিষ্ট্য। জর্মন ইংরিজির মত দিল-দরিয়া হয়ে যত্রতত্র শব্দ কুড়োতে পারে না, আবার ফরাসীর মত শব্দতাত্ত্বিক বাত-ব্যামোও তার এমন ভয়ংকর মারাত্মক নয় যে উবু হয়ে দু'একটা নিত্যপ্রয়োজনীয় শব্দ কুড়োতে না পারে। শব্দ সঞ্চয় বাবদে জর্মন ইংরেজী ও ফরাসীর মাঝখানে। তার সম্প্রসারণক্ষমতা বেশ খানিকটা আছে; কিন্তু ইংরিজী রবরের মত তাকে যত খুশী টেনে লম্বা করা যায় না।

জর্মন ভাষার আসল জোর তার সমাস বানাবার কৌশলে আর সেখানে জর্মনের মত উদার ভাষা উপস্থিত পৃথিবীতে কমই আছে।

এই যে উপরের শব্দটা শুনে বিদগ্ধ পাঠক পর্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন সেইটেই নিন। Gepaeck অর্থ যা প্যাক করা যায়, অর্থাৎ লাগেজ, aufbewahrung অর্থ তদারকি করা (ইংরিজী beware কথা থেকে bewahrung); আর stelle কথার অর্থ জায়গা। একুনে হল 'লাগেজ তদারকির জায়গা'। জর্মন সবকটা শব্দকে আলাদা আলাদা রূপে বিলক্ষণ চেনে বলেই সমাসটার দৈর্ঘ্য তাকে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত করে না।

তুলনা দিয়ে বক্তব্যটা খোলসা করি।

"কিংকর্তব্যবিমূঢ়" কথাটার সামনে আমরা মোটেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হই নে। তার কারণ, কর্তব্য আর বিমূঢ় আমরাই হামেশাই ব্যবহার করি আর কিং কথাটার সঙ্গেও আমাদের ঈষৎ মুখ চেনাচেনি আছে। কাজেই সমাসটা ব্যবহার করার জন্য আমাদের বড্ড বেশী 'প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে'র প্রয়োজন হয় না। যারা সামান্যতম বাঙলা জানে না তাদের কথা হচ্ছে না, তারা 'নিত্যসা ফতেনা দিয়ামা' করে এবং ঘৃত-তৈল-লবণ-তণ্ডুল-বস্ত্র-ইন্ধনের সামনে ঘরপোড়া গোরুর মত সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়।

বড্ড বেশী লম্বা সমাস অবিশ্যি কাজের সুবিধে করে দেয় না। তাই যারা সমাস বানাবার জন্যই সমাস বানায় তাদের কচকচানি নিয়ে আমরা ঠাট্টা-মস্করা করি। জর্মনরাও করে। রাজনৈতিক বিসমার্ক পর্যন্ত সমাস বানাবার বাই নিয়ে ঠাট্টা করতে কসুর করেন নি। 'ড্রাগিস্ট' শব্দটা জর্মনে চলে, কিন্তু তার একটা উৎকট জর্মন সমাস স্বয়ং বিসমার্ক বানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

Gesundheitswiederherstellungsmittelzusammen' mischun-

gverhaeltnisskundiger.

টুকরো টুকরো করলে অর্থ হয়; 'স্বাস্থ্য,' 'পুনরায় দান,' 'সর্বভৈষজ', 'এক-সঙ্গে মেশানোর তত্ত্বজ্ঞান'। একুনে হবে 'স্বাস্থ্যপুনরদানসর্বভৈষজসংমিশ্রণ-শাস্ত্রজ্ঞ'।

(সমাসটায় কোনো ভুল থেকে গেলে বিদগ্ধ পাঠক বিরক্ত হবেন না—আমার সংস্কৃতজ্ঞান 'নিত্যসা ফতেমা' জাতীয়)।

সংস্কৃত ভাষা সমাস বানানোতে সুপটু, সে-কথা আমরা সবাই জানি এবং প্রয়োজনমত আমরা সংস্কৃত থেকে সমাস নিই, কিন্তু নতুন সমাস যদি বা আমরা বানাই তবু কেমন যেন আধুনিক বাংলায় চালু হতে চায় না। 'আলোকচিত্র', 'যাদুঘর', 'হাওয়া-গাড়ি' কিছুতেই চললো না।—ইংরিজি কথাগুলোই শেষ পর্যন্ত ঠেলে ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকে আসন জাঁকিয়ে বসলো। দ্বিজেন্দ্রনাথ নির্মিত automobile কথার 'স্বতশ্চলশকট' সমাসটা চালানোর ভরসা আমরা অবশ্য কোনো কালেই করি নি।

বিশেষ করে এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই এ প্রস্তাবটি আমি উত্থাপন করেছি—এবং এতক্ষণ ধরে তারই পটভূমিকা নির্মাণ করলুম।

ভাষাকে জোরালো করার জন্য যে অকাতরে বিদেশী শব্দ গ্রহণ করতে হয়, সেকথা অনেকেই মেনে নেন, কিন্তু আপন ভাষারই দুটো কিংবা তারও বেশী শব্দ একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে যে তৃতীয় শব্দ নির্মাণ করে ভাষার শব্দভাণ্ডার বাড়ানো যায় সে দিকে সচরাচর কারো খেয়াল যায় না।

এই সমাস বাড়ানোর প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা কোনো কোনো ভাষার নেই। ইংরিজী ফরাসী কেঁদে-কুঁকিয়ে দৈবাৎ দু'একটা সমাস বানাতে পারে—যথা 'হাই-ব্রাও' 'রাঁদেভু'। এ প্রবৃত্তি যে ভাষার নেই, তার ঘাড়ে এটা জোর করে চাপানো যায় না।

বাংলার আছে, কিন্তু মরমর। এখানে শুদ্ধ সংস্কৃত সমাসের কথা হচ্ছে না—সে তো আমরা নিইই—আমি খাঁটি বাংলা সমাসের কথা ভাবছি। হুতোমের আমলেও অশিক্ষিত বাঙালী খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ দিয়ে খাস সমাস বানাতো। মেছুনি ডাকছে, "ও-'গামছা-কাঁধে,' দাঁড়া, ঐ হোথায় 'খ্যাংরা-গোঁপো' তোর সঙ্গে কথা কইতে চায়।"

একেই বলে সমাস! চট করে ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কিন্তু আজকালকার লেখকেরা এরকম সমাসের দিকে নজর দেন না, নতুন সমাস গড়বার তকলিফ বরদাস্ত করতে তো তাঁরা বিলকুল নারাজ বটেনই। সমাস বানাবার প্রবৃত্তিটা অনাদরে ক্রমেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে, কারণ লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখকেরা যদি দিশী সমাসকে আপন লেখনে স্থান না দেন, তবে ক্রমে ক্রমে গোটা প্রবৃত্তিটা বেমালুম লোপ পায়—যে-রকম বাউল-ভাটিয়ালী সাহিত্যিকদের কাছে সম্মান পাচ্ছে না বলে ক্রমেই উপে যাচ্ছে—পরে যখন হুঁশ হয় ততদিনে ভাষায় লড়াইয়ের একখানা উমদা-সে উমদা হাতিয়ার অবহেলায় মর্চে ধরে শেষ হয়ে গেছে। তখন শুধু মাথা-চাপড়ানো আর কান্নাকাটি।

রবীন্দ্রনাথ এ তত্ত্বটা শেষ বয়সে বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই শেষ রাতেই ওস্তাদের মার দেখিয়ে গিয়েছেন :—

'ডাকছে থাকি থাকি
ঘুমহারা কোন্ 'নাম-না-জানা' পাখী,
দক্ষিণের 'দোলা-লাগা', 'পাখী-জাগা'
বসন্ত প্রভাতে'

তাই বলি বাঙ্গলা ভাষা 'লক্ষ্মীছাড়া,' 'হতভাগা' নয়! শুধু হাতীর মত আমরা নিজেদের তাগদ জানি নে

মার্জারনিধন কাব্য
বা
গুরবে কুশ্ তন শব-ই আওওয়ল

কোন্ দেবে পূজা করি কোন্ শীনী ধরি ?
গণপতি, মৌলা-আলী, ধূর্জটি, শ্রীহরি ?
মুশকিল্-আসান্ আর মুর্শিদ মস্তান্
কোম্পানী কি মহারানী, ইংরেজ, শয়তান ?
হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, যেবা আছ যথা
ইস্পাহানী, ডালমিঞা—কলির দেবতা।
সবারে স্মরণ করি সিতুমিঞা ভনে
বেদরদ বেধড়ক ভয় নাহি মনে ॥

ইরান দেশের কেচ্ছা শোন সাধুজন
বেহদ্ রঙীন কেচ্ছা, বহুৎ বরণ।
এন্তার তালিম পাবে করিলে খেয়াল
রোশনী আসিবে দিলে ভাঙিয়া দেয়াল।
পুরানা যদিও কেচ্ছা তবু হর্কৎ
সমঝাইয়া দিবে নয়া হাল হকীকৎ ॥

ইরান দেশেতে ছিল যমজ তরুণী।
ইয়া রঙ, ইয়া ঢঙ, নানা গুণে গুণী।
কোথায় লায়লী লাগে কোথায় শিরীন
চোখেতে বিজলী খেলে ঠোঁটে বাজে বীণ।
ওড়না দুলায়ে যবে দুই বোন যায়
কলিজা আছাড় খায় জোরা রাঙা পায়।
এ্যাসা পীরিতি তোলে ফকিরেরও জানে
বেহুঁশ হইয়া লোক তারীফ বাখানে।

দৌলতও আছিল বটে বিস্তরে বিস্তর
বাপ দাদা রাখি গেলা চাকর-নফর।
ধন জন ঘর বাড়ী তালাব খামার
টাকা কড়ি জওয়াহর এন্তারে এন্তার।
তাই দুই নারী চায় থাকিতে আজাদ
কলঙ্কের ভয়ে শুধু বিয়ে হৈল সাধ।
তখন সে করিল শর্ত সে বড় অদ্ভুত
সে শর্ত শুনিলে ডর পায় যমদূত।
বলে কিনা প্রতি ভোরে মিঞার গর্দনে
পঞ্চাশ পয়জার মারি রাখিবে শাসনে।
এ বড় তাজ্জব বাৎ বেতালা বদ্‌খদ্‌
এ শর্ত মানিবে কেবা হয় যদি মর্দ্‌?
দুল্‌হা বরেতে ছিল পাড়া ছয়লাপ
শর্ত শুনে পত্রপাঠ হয়ে গেল সাফ।
সিতু মিঞা বলে সাধু এ বড় কৌতুক
মন দিয়া কেচ্ছা শোনো পাবে দিলে সুখ॥

শীত গেল বর্ষা গেল আসিল বাহার
ফুলে গুলে ইস্‌ফাহান হৈল গুলজার।
শীরাজ তব্রীজ আর আজর বৈজান
খুশীতে ভরপুর ভেল জমিন আসমান।
শুধু দুই ভাই নাম ফিরোজ মতীন
পেটের ধান্দায় মরে দুঃখে কাটে দিন।
অবশেষে ছোট ভাই বলে ফিরোজেরে
"কি করে বাঁচিবে বলো, কি হবে আখেরে।
তার চেয়ে জুতা ভালো চলো দুই জনে
শাদী করি পেট ভরি দু মেয়ের সনে।"
দুআভুআ ফিরোজের মন মাঝে হয়
শাদীতে আয়েশ বটে জুতারও তো ভয়।
হদীসের লাগি ঘাঁটে কুরান পুরাণ
দীন সিতু মিঞা ভণে শুনে পুণ্যবান॥

মজলিস জৌলুস করি দুনিয়া রওশন
জোড়া শাদী হয়ে গেল খুশ ত্রিভুবন।
চলি গেলা দুই ভাই ভিন্ন হাবেলিতে
মগ্ন হইলা মত্ত হইলা রসের কেলিতে।

পয়জারের ভয়ে নারি করিতে বয়ান
সিতু ভণে চুপিসাড়ে শুনে পুণ্যবান ॥

তিন মাস পরে বুঝি খুদার কুদ্রতে
আচম্বিতে দু ভায়েতে দেখা হল পথে।
কোলাকুলি গলাগলি গিনা কলিজায়
মরি মরি মেলামেলি করে দুজনায়।

"তোমার মাথায় টাক নেই কেন ?
শুধায় ফিরোজ ভাই
মানিয়া তাজ্জব উত্তরে মতীন
"টাক কেন বলো তাই ?"
কাঁচুমাচু হয়ে পুছিল ফিরোজ
"জোরে কি মারে না চটি ?"
"আরে দুত্তোর হিম্মত কাহার
আমি কি তেমনি বটি ?
বাখানিয়া বলি শোন কান পেতে
তরতিব কাহারে কয়।
আজব দুনিয়া আজব চিড়িয়া
মামেলা ঝামেলা ময়।
তাই বসিলাম তলওয়ার হাতে
বীবী দিলা খানা আনি
কোর্মা পোলাও তন্দুরী মুর্গী
ঢাকাই বাখরখানী।
খানা আইল যেই বীবীর পেয়ারা
বিড়াল আসিল সাথে
যেই না করিল মরমিয়া 'ম্যাঁও'
খাপটা না তুল্যা হাতে,—
খুল্যা তলোয়ার এক কোপে কাট্যা
ফালাইনু কল্লাডারে
তাজ্জব বীবী আক্কেল গুড়ুম
জবানে রা'টি না কাড়ে।
গুস্সা কৈরা কই 'এসব না সই
মেজাজ বহুৎ কড়া
বরদাস্ত নাই বিলকুল আমার
তবিয়ৎ আগুনে গড়া।'

তার পর কার ঘাড়ে দুইডা মাথা
করিবে যে তেড়িমেড়ি ?"
সিতু মিঞা কয় নিশ্চয় নিশ্চয়
বাঘিনী পরিল বেড়ি।

"ক্যাবাৎ", "ক্যাবাৎ" বলি হাওয়া করি ভর
চলিলা ফিরোজ মিঞা পেঁাছি গেলা ঘর।
মিলেছে দাওয়াই আর আন্দেশা তো নাই
খুদার কুদ্রতে ছিল তালেবর ভাই।
তার পর শোনো কেচ্ছা শোনো সাধুজন
ঠাস্যা দিল সেই দাওয়া পুলকিত মন।
সে রাতে খানার ওক্তে খুল্যা তলোয়ার
কাট্যা না ফালাইল মিঞা কল্লা বিল্লিডার।
চক্ষু দুইডা রাঙ্গা কর্যা হুঙকারিয়া কয়
"তবিয়ৎ আমার বুরা গর্বড় না সয়।
হুঁশিয়ার হয়ে থেকো নয় সর্বনাশ।"
সিতু মিঞা শুনে কয়, শাবাশ শাবাশ ॥
হায়রে বিধির লেখা, হায়রে কিস্মৎ
জহর হইয়া গেল যা ছিল শর্বৎ।
ভোর না হইতে বীবী লয়ে পয়জার
মিঞার বুকেতে চড়ি কানে ধরি তার।
দমাদম মারে জুতো দাড়ি ছিঁড়ে কয়
"তবিয়ৎ তোমার বুরা, বরদাস্ত না হয় ?
মেজাজ চড়েছে তব হয়েছ বজ্জাৎ ?
শাবুদ করিব তোমা শুনে লও বাৎ
আজ হৈতে বেড়ে গেল রেশন তোমার
পঞ্চাশ হৈতে হৈল একশ' পয়জার।"
এত বলি মারে কিল মারে কানে টান
ইয়াল্লা ফুকারে সিতু, ভাগ্যে পুণ্যবান ॥
কোথায় পাগড়ী গেল কোথায় পাজামা
হোঁচট খাইয়া পড়ে কভু দেয় হামা।
খুন ঝরে সর্ব অঙ্গে ছিঁড়ে গেছে দাড়ি
ফিরোজ পেঁাছিল শেষে মতীনের বাড়ি।
কাঁদিয়া কহিল, "ভাইয়া কি দিলি দাওয়াই
লাগাইনু কামে এবে জান যায় তাই।"
বর্ণিল তাবৎ বাৎ, মতীন শুনিল
আদর করিয়া ভায়ে কোলে তুলি নিল।

বুলাইয়া হাত মাথে বুলাইয়া দেহ
"বিড়াল মেরেছে" কয়, "নাই তো সন্দেহ।
ব্যাকরণে তবু, দাদা, কৈলা ভুল খাঁটি।
বিলকুল বরবাদ সব গুড় হৈল মাটি।
আসলে এলেমে তুমি করোনি খেয়াল
শাদীর পয়লা রাতে বধিবে বিড়াল।"
বাণীরে বন্দিয়া বন্দিয়া বান্ধিলো বয়ান
দীন সিতু মিঞা ভণে শুনে পুণ্যবান ॥

* * *

মল্লিনাথস্য { স্বরাজ লাভের সাথে কালোবাজারীরে
মারনি এখন তাই হাত হানো শিরে।
শাদীর পয়লা রাতে মারিবে বিড়াল
না হলে বর্বাদ সব, তাবৎ পয়মাল ॥*

বেদে

ঝাড়া বিয়াল্লিশ বছর মিশরে চাকরি করার পর ইংরেজ রাস্‌ল, পাশা (পাশা খেতাবটি তিনি মিশরীয় সরকারের কাছ থেকে পান) একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ লিখেছেন। সা'দ জগলুল পাশা থেকে আরম্ভ করে বহু বাঘ বহুৎ চিড়িয়ার সঙ্গে তাঁর বিস্তর যোগাযোগের ফলে এই কেতাবখানি লেখা হয়েছে।

এমন কি বেদেরাও এ বইয়ে বাদ পড়ে নি। রাস্‌ল্‌ পাশার মতে মিশরের বেদেরা আসলে ভারতীয়। শুধু তাই নয়, রাস্‌ল্‌ পাশা পৃথিবীর আর সব পণ্ডিতদের সঙ্গে একমত হয়ে বলেছেন পৃথিবীর সব বেদেরই ভাষা নাকি আসলে ভারতীয়—তা সে ইয়োরোপীয় বেদেই হোক্‌ আর চীনে বেদেই হোক্‌।

পণ্ডিত নই, তাই চট্‌ করে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। ইয়োরোপীয় বেদেরা ফর্সায় প্রায় ইংরেজের শামিল, সিংহলের বেদে ঘনশ্যাম। আচার-ব্যবহারেও বিস্তর পার্থক্য, বহুৎ ফারাক। আরবিস্থানের বেদেরা কথায় কথায় ছোরা বের করে, জর্মনীর বেদেরা ঘুষি ওঁচায় বটে, কিন্তু শেষটায় বখেড়ার ফৈসালা হয় বিয়ারের বোতল টেনে। চীন দেশের বেদেরা নাকি রুপালি ঝরণাতলায় সোনালী চাঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চুকুস চুকুস্‌ করে সবুজ চা চাখে।

তবু আজ স্বীকার করি গুণীরাই হক্‌ কথা বলেছেন ॥

* * *

* ইরানে এ কাহিনী সবিস্তরে বলা হয় না। শুধু বলা হয়, 'গুরবে কুশতন, শব-ই-আওওয়ল' অর্থাৎ গুরবে=বিড়াল, কুশতন=মারা, শব=রাত্রি, আওওয়ল=প্রথম। সোজা বাঙলার 'পয়লা রাতেই মারবে বিড়াল।'

আমার বয়স তখন পঁচিশ-ছাব্বিশ। আজ যেখানে জর্মনীর রাজধানী, সেই সাদা-মাটা বন্ন্ (Bonn) শহরে আমি তখন কলেজ যাই। এগারোটার ঝোঁকে কলেজের পাশের কাফেতে বসে এক পাত্র কফি খাই। ও সময়টায় বনের মত আধা-ঘুমন্ত পুরীর কাফেতে খদ্দেরের ঝামেলা লাগে না। খদ্দের বলতে নিতান্ত আমারই মত দু'একটি কফি-কাতর প্রাণী।

সেদিনও তাই। আমি এক কোণে কফি সাঙ্গ করে উঠি-উঠি করছি, এমন সময় অন্য কোণের কাউণ্টারে, আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল এসে এক বেদেনী। গোলাপী স্কার্ট, বেগুনি ব্লাউজ, লাল-নীলে ডোরা-কাটা স্কার্ফ, মিশকালো খোঁপাবাঁধা চুল। কেক্ আর কফির গুঁড়ো কিনতে এসেছে।

সওদা শেষ হয়ে গেলে পর যখন সে ঘুরে দাঁড়াল তখন হঠাৎ তার চোখ পড়ল আমার উপর। প্রথমটায় থ হয়ে তাকিয়ে রইল প্যাট প্যাট করে। তারপর কি এক বিজাতীয় ভাষায় চীৎকার করে সোল্লাসে এগিয়ে এল আমার দিকে। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় সর্বমুখ টমাটোর মত লাল করে অনর্গল বকে যেতে লাগল সেই 'যাবনিক' ভাষায়। সে ভাষা আমার চেনা-অচেনা কোনো ভাষারই চৌহদ্দি মাড়ায় না, কিন্তু শোনালো—তারই মুখের মত —মিষ্টি।

আমি জর্মনে বললুম, 'আমি তো আপনার ভাষা বুঝতে পারছি নে।'

মেয়েটি মুখ করল আরও লাল। বুঝলুম, চটেছে। ফের চলল সেই তুবড়ী বাজী—সেই বিজাতীয় বুলিতে। কিছুতেই জর্মন বলতে রাজী হয় না।

আমি কাতর হয়ে কাফের মালিককে বললুম, 'একে বুঝিয়ে বলুন না, আমি ভারতীয়। এর ভাষা বুঝতে পারছি নে।'

আমার সকরুণ নিবেদনটা শেষ হওয়ার পূর্বেই মেয়েটা হুঙ্কার দিয়ে কাফে-ওয়ালাকে পরিষ্কার জর্মনে বলল, 'সেই কথাই তো হচ্ছে। আমরা বেদে, ভারতবর্ষ আমাদের আদিম ভূমি। এও ভারতীয়। আমার জাত-ভাই। ভদ্রলোক সেজেছে, তাই আমার সঙ্গে কথা কইতে চায় না।'

আমি আর কি বলব? পণ্ডিতেরাও তো এই মতই পোষণ করে। তবু বললুম, 'কিন্তু সত্যি বলছি, আমি আপনার ভাষা বুঝতে পারছি নে।'

চোখে-মুখে—এমন কি আমার মনে হল চুলে পর্যন্ত—ঘেন্না মেখে মেয়েটা গটগট করে কাফে থেকে বেরিয়ে গেল। আমি বোকা বনে তাকিয়ে রইলুম।

কয়েক মিনিট পরে জানলার দিকে নজর যেতে দেখি সেই মেয়েটি আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কফির দাম পূর্বেই চুকিয়ে দিয়েছিলুম—চুপ করে বেরিয়ে পড়ে তার মুখোমুখি হলুম।

ধবধবে দাঁতে হাসির ঝিলিক লাগিয়ে আমায় অভ্যর্থনা করে নিয়ে বললো—দুত্তোর ছাই আমার সেই বিজাতীয় ভাষায়—কি বললো, খোদায় মালুম। গড় গড় করে চোখে-মুখে হাসি মেখে, সুডোল দু'খানি বাহু দুলিয়ে, সর্বাঙ্গে সৌন্দর্যের ঢেউ তুলে।

আমি আবার জর্মনে বললুম, 'সত্যি ফ্রলাইন (কুমারী), আমি তোমার ভাষা বুঝতে পারছি নে।'

কেউটে সাপের মতো ফণা তুলে যেন আমাকে ছোবল মারতে এল। আমি তড়াক করে তিন কদম পিছিয়ে গেলুম।

হঠাৎ মেয়েটা কি যেন ভেবে নিয়ে আবার হাসি মুখে বলল,—যাক্ বাঁচাল, এবার জর্মনে—'সব মানুষেরই কিছু-না-কিছু পাগলামি থাকে, তোমার বুঝি মাতৃভাষায় কথা না বলার? তা আমি সেটা সয়ে নিলুম। কিন্তু কেন এ স্নবারি, আপন ভাষাকে অবহেলা, কাফের লোকের সামনে আপন জনকে অস্বীকার করা? তাই তো তোমাকে বাইরে ডেকে আনলুম।'

আমি বললুম, 'তোমার আপন জন হতে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আমি তো তা নই।

ফের ফণা তুলতে গিয়ে নিজেকে চেপে নিয়ে বলল, 'তোমার আপন জন নই আমি? দেখো দিকিনি তোমার রঙ আর আমার রঙ মিলিয়ে—একই বাদামী না? হাঁ, আমার একটু সোনালী বটে—তা সে আমি রোদবৃষ্টিতে ঘোরাঘুরি করি বলে। দেখো দিকিনি চুলের রঙ—মিশকালো, ঢেউখেলানো। নিজের চোখে দেখনি কখনো আয়না দিয়ে?—আমার চোখের রঙ তোমারই মত কালো। আর সব জর্মনদের দিকে তাকিয়ে দেখো, হাবা-গবার দল, শ্বেত কুষ্ঠের মত সাদা, মাগো!'

আমি চুপ।

বলল, 'বুঝতে পেরেছি, বাপু, বুঝতে পেরেছি; বাপ তোমার দু'পয়সা রেখে গিয়েছে—হঠাৎ-নবাব হয়েছ। এখন আর বেদে বলে পরিচয় দিতে চাও না—হাতে আবার খাতাপত্র—কলেজ যাও বুঝি? ভদ্রলোক সাজার শখ চেপেছে, না?'

আমি বললুম, 'ফ্রলাইন, তুমি ভুল বুঝেছ। আমার সাতপুরুষ লেখাপড়া করেছে, আমিও তাই করছি। ভদ্রলোক সাজা-না-সাজার কোনো কথাই উঠছে না।'

মেয়েটি এমনভাবে তাকালো যার সোজা অর্থ 'গাঁজা গুল'। জিজ্ঞেস করল, তুমি ভারতীয় নও?'

আমি বললুম, 'আলবাৎ!'

আনন্দের হাসি হেসে বলল, 'ভারতীয়েরা সব বেদে।'

আমি বললুম, 'সুন্দরী, তোমরা ভারতবর্ষ ছেড়েছ হাজার দু'হাজার বছর কিংবা তারও পূর্বে। বাদবাকী ভারতীয়রা এখনো গেরস্থালী করে।'

কিছুতেই বিশ্বাস করে না। বলল, 'তোমার সঙ্গে আর কাঁহাতক খামকা তর্ক করি। তার চেয়ে চলো আমার সঙ্গে। আমাদের সার্কাসের গাড়ি শহরের বাইরে রেখে এসেছি। বাবা, মা সেখানে। তোমাকে পেলে ভারি খুশী হবেন। তাঁদের সঙ্গে তর্ক করো। তখন বুঝবে ঠ্যালা কারে কয়। বাবা সব জানে। কাচের গোলার দিকে তাকিয়ে তোমাকে সব বাৎলে দেবে।'

অনেকক্ষণ ধরে এ রকম ধারা কথা হয়েছিল। আমি কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না, আমি বেদে নই, স্নব নই, সাদা-মাটা ভারতীয়।

* * *

এ-কথাটা কিন্তু সেদিন সাফ বুঝে গেলুম, দু'হাজার কিংবা তার বেশি বছর ধরে যাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি তারা যদি বিদেশ-বিভূঁইয়ে দেখামাত্র আমাকে ডাক দিয়ে বলে, 'তুমি আমাদের আপন জন', তখন কি করে বুক ঠুকে বলি—যদিও জানি, আজ আমাদের ভাষা আলাদা, আচার-ব্যবহার আলাদা—যে ওরা ভারতীয় নয় ? ?

ভাষাতত্ত্ব

প্যারিসে রেস্তরাঁয় বসে আছি। নিতান্ত একা ; যাঁদের আসবার কথা ছিল তাঁরা আসেন নি। এমন সময় একটি অতি সুপুরুষ এসে আমারই টেবিলের একখানা শূন্য চেয়ারে আসন গ্রহণ করলেন—অবশ্য প্রথমে ফরাসী কায়দায় বাও করে, আমার অনুমতি নিয়ে।

নিতান্ত মুখোমুখি তদুপরি কাত্তিকের মত চেহারাখানা—বার বার আমার মুগ্ধ চোখ তাঁর চেহারার দিকে ধাওয়া করছিল। তিনিও নিশ্চয়ই এ রকম পরিস্থিতিতে জীবনে আরো বহুবার পড়েছেন ; কি করতে হয় সেটা তাঁর রপ্ত আছে।

সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বলছেন, 'ইচ্ছে করুন।'

আমি ধন্যবাদ জানালুম।

জিজ্ঞেস করলেন, 'ফরাসীটা বলতে পারেন তো ? আমি তো আর কোনো ভাষা জানি নে।'

আমি বললুম, 'ফরাসী ভাষাটা সব সময় ঠিক বুঝতে পারি কি না বলা একটু কঠিন। এই মনে করুন, কোনো সুন্দরী যখন প্রেমের আভাস দিয়ে কিছু বলেন, তখন ঠিক বুঝতে পারি আবার যখন ল্যান্ডলোর্ড ভাড়ার জন্যে তাগাদা দেন তখন হঠাৎ আমার তাবৎ ফরাসী ভাষাজ্ঞান বিলকুল লোপ পায়।'

উচ্চাঙ্গের রসবিকাশ হল না সে কথা আমার সুরসিক পাঠকেরা বুঝতে পেরে নিশ্চয়ই একটুখানি স্মিতহাস্য করবেন। আমিও এ-কথা জানি, কিন্তু বিদেশে যখন মানুষ নিতান্ত একা পড়ে এবং রাম, শ্যাম যে-কোনো কারোর সঙ্গে বন্ধুত্ব জমাতে চায় তখন ঐ হল একমাত্র পন্থা, অর্থাৎ তখন কাঁচা, পাকা যে-কোনো প্রকারের রসিকতা করে বোঝাতে হয় যে, আমি তখন সঙ্গসুখলিপ্সু।

ফরাসী ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'দেশভ্রমণ বড় ভাল জিনিস। বিদেশে ভাষা নিয়ে এ ভানটা অনায়াসে করা যায়। আমি করি কি প্রকারে ? আমি যে ফরাসী সে তো আর বেশীক্ষণ লুকিয়ে রাখতে পারি নে।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'সে না হয় হল। কিন্তু বলুন তো, শব্দার্থ

আপনি ঠিক ঠিক বুঝতে শিখেছেন? এই যদি আমি বলি যে, আমি "জার্নালিস্ট" তাহলে তার মানে কি হল?'

একগাল হেসে বললুম, 'তা আর জানি নে? তার মানে হল আপনি খবরের কাগজে লেখেন।'

'উঁহু, হল না। ঠিক তার উল্টো; আমি লিখি নে। সে কথা যাক। আরেকটি উদাহরণ দি। আমি যদি বলি, "আচ্ছা তা হলে আরেকদিন দেখা হবে", তবে তার মানে কি?'

আমি এবারে আরেক গাল আর হাসলুম না; বললুম, 'তার মানে আরেক দিন দেখা হবে, এতে আর অস্পষ্টতাটা কোথায়?'

বললেন, 'ফেল্!' তার মানে হল, "আপনি এবারে দয়া করে গাত্রোৎপাটন করুন।"

আমি খুশী হয়ে বললুম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ আমরাও যখন বাঙলায় বলি, "এবার তুমি এসো" তখন তার অর্থ "তুমি এবারে কেটে পড়ো।"

'ঠিক ধরেছেন। তাই বলছিলুম, আমি জার্নালিস্ট; কিন্তু না-লেখার জন্য লোকে পয়সা দেয়। খুলে কই।

'এই ধরুন কয়েক মাস আগে খবর পেলুম, আমাদের ডাকসাইটে রাজনৈতিক মসিয়ো অনুস্বার একটি রমণীর সঙ্গে ঢলাঢলি করছেন। ওদিকে বাজারে তাঁর সুনাম আর খ্যাতি অতিশয় ধর্মভীরুরূপে—কোথায় জানি নে গির্জে মেরামত করে দিয়েছেন, কোন্ সেণ্টের জন্মদিনে জাব্বাজোব্বা পরে পরবে পয়লা নম্বরী বনেছিলেন এইরকম ধারা কত কি? আমি খবরটা শুনে বললুম, "বটেরে স্যাঙাৎ, দাঁড়াও তোমাকে দেখাচ্ছি।"

'করলুম কি, লাগলুম তত্ত্ব-তাবাশে। ডাক্তাররা নাকি এক্স-রে দিয়ে পেটের মধ্যিখানের ছবি তোলেন? স্রেফ গাঁজা; তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী নাড়ী-ভুঁড়ির খবর মেলে কয়েক আউন্স রুপো ঢেলে, সোনা ঢাললে তার চেয়েও ভালো।

'সেই নর্তকীর নামধাম সাকিন ঠিকানা হাড়হদ্দের তাবৎ খবর পেয়ে গেলুম এক হপ্তার ভিতর।'

সিগারেট ধরাবার জন্য কথা বন্ধ করে একটুখানি ভেবে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু এ কর্মে একটুখানি খাবসুরৎ হতে হয়। আমি—' বলে থামলেন।

আমি বললুম, 'আপনার চেহারা সম্বন্ধে কি আর বলব—'

বাধা দিয়ে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ।'

তারপর করলুম কি জানেন, একপ্রস্ত উত্তম সুট পরে, গোঁফে আতর মেখে লেগে গেলুম নর্তকীর পিছনে। প্রেমের কবিতাগুলো ঝালিয়ে নিলুম আচ্ছা করে, টাঙ্গো ওয়ালটস নাচের নবীনতম "অবদানগুলো" রপ্ত করে নিয়ে দিলুম হানা। জানতুম, রাজনৈতিক মসিয়ো অনুস্বারের টাকার জোয়ারের উপর আমি থাড্ডো কেলাস খোলামকুচি, কোথায় ভেসে যাব কেউ পাত্তাটি পাবে না, কিন্তু খোলামকুচি না হয়ে যদি পদ্মফুল হই—চেহারাটা বিবেচনা করুন—তা

হলে নর্তকী কি কি একটুখানি মোলায়েম হবেন না ?

আমি অবিশ্যি নর্তকীকে প্রিয়ারূপে চিরকালের জন্য জিতে নিতে চাই নি। মসিয়ো অনুস্বার তাকে নিয়ে প্রেমসে প্রেমের ঢলাঢলি করুন আমার তাতে নস্যি। আমি শুধু চাই একটুখানি খবর।

কিছুটা ভাবসাব হয়ে যাবার পর আমি আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলুম যে, তিনি যদি অন্য সূত্র থেকে অর্থাৎ অনুস্বারের কাছ থেকে টাকা মারেন তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তিনি দু ঘোড়া না চড়ে আড়ই শ'টা চড়ুন আমি আপনাদের দেশের ফকিরের মত নির্বিকার। আমি একটুখানি প্রেমেই খুশী।

'কাজেই আস্তে আস্তে প্রেমের নেশায় বানচাল হয়ে নর্তকী খবর দিয়ে ফেললেন, কোন্ হোটেলে কবে তাঁরা গোপনে স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করেছেন, কোন্ ইয়েটে কবে ক'দিন ক'রাত্তির কাটিয়েছেন। সেই খেই ধরে তাবৎ গোপনীয় খবর যোগাড় করে গেলুম, অনুস্বারের কাছে। তাঁকে বললুম, "নিছক সাহিত্যের খাতিরে আমি তাঁর জীবনী লিখতে চাই, তাতে অবশ্য নর্তকী সম্পর্কীয় কিঞ্চিৎ প্রামাণিক সংবাদও থাকবে। তবে কিনা, কিছু অর্থ পেলে আমি এসব ছাপবো না।"

অনুস্বারে জউরি এবং ঘড়েল লোক। যেসব হোটেলে জাল সই করেছেন তার ফোটোগ্রাফ দেখে বুঝলেন আমিও কাঁচা নই।'

তাপপর বললেন, 'লিখি নি বলেই তো টাকা পেলুম, হাজার দশেক। যাক্‌গে, এখন আমি চললুম।'

ব্যাপারটা বুঝতে আমার মিনিট খানেক লাগল। তখন ছুটে গিয়ে তাঁকে বললুম, 'এটা কি তবে ব্ল্যাক-মেলিং হল না ?'

হেসে বললেন, 'অর্থাৎ "না-লিখিয়ে জার্নালিস্ট"। তাই তো বলছিলুম, ভাষা জিনিসটে অদ্ভুত।'

আমি স্বয়ং জার্নালিস্ট—আঁৎকে উঠলুম ॥

সিনিয়ার এপ্রেন্টিস্

কোনো কোনো ধর্মগ্রন্থ যত পুরনো হয় তাদের কদর ততই বেড়ে যায়। নতুন যুগের লোক সে সব গ্রন্থ থেকে নতুন সমস্যার অতি প্রাচীন এবং চিরন্তন সমাধান পায় বলে তারা সব কেতাবকে অনায়াসে হার মানায়। শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়, কোনো কোনো গল্পও অজরামর হয়ে থাকে ঐ একই কারণে। তারই একটা অতি মর্মান্তিকভাবে কাল মনে পড়ে গেল—কুড়িটি টাকা জেবে নিয়ে বাজার ঘুরে এলুম, ধুতি পেলুম না। গল্পটি হয়ত অনেকেই জানেন—তাঁরা অপরাধ নেবেন না।

গণেশ বেচারী এপ্রেন্‌টিস্ মাইনে পায় না। কাজ শিখছে, এর ধাঁতানি ওর গুঁতানি চাঁদপানা মুখ করে সয়। আশা, একদিন পাকাপাকি চাকরি, মাইনে সব

কিছুই পাবে। চাকরি খালি পড়লও, কিন্তু বড়বাবু সেটা দিয়ে দিলেন তাঁর শালীর ছেলেকে—সে কখনো এপ্রেন্‌টিসি করে নি। বড়বাবু গণেশকে ডেকে বললেন, 'বাবা গণেশ, কিছু মনে করো না ; এ চাকরিটা নিতান্তই অন্য একজনকে দিয়ে দিতে হল। আসছেটা তোমাকে দেব নিশ্চয়ই।'

কাকস্য পরিবেদনা, আবার চাকরি খালি পড়ল, বড়বাবু ফের ফক্কিকারি মারলেন, গণেশকে ডেকে আবার মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজালেন। এমনি করে দেদার চাকরি গণেশের সামনে দিয়ে ভেসে গেল, তার এপ্রেন্‌টিসির আঁকশি দিয়ে একটাকেও ধরতে পারল না। শেষের দিকে বড়বাবু আর গণেশকে ডেকে বাপুরে, বাছারে বলে সান্ত্বনা মালিশ করার প্রয়োজনও বোধ করেন না।

গণেশের চোখ বসে গেছে, গাল ভেঙে গেছে, রগের চুলের দু'এক গাছায় পাক ধরলো, পরনের ধুতি ছিঁড়ে গিয়েছে, জামাটা কোনো গতিকে গায়ে ঝুলে আছে। গণেশ এ-টুলে ও-টুলে, এর কাজ, ওর ফাইফরমাশ করে দেয়—আর করে করে আপিসের বেবাক কাজ তার শেখা হয়ে গেল। চাকুরি কিন্তু হল না।

এমন সময় বড় সাহেব একদিন বড়বাবুকে দোতলায় ডেকে বললেন, 'আমায় একটা জরুরী রিপোর্ট লিখে আজকেরই মেল ধরতে হবে। কেউ যেন ডিস্‌টার্ব না করে। দরজার গোড়ায় একজন পাকা লোক বসিয়ে দাও, কাউকে যেন ঢুকতে না দেয়।'

দরোয়ানরা সেদিন করেছিল ধর্মঘট। বড়বাবু গণেশকে দিলেন দোরের সামনে বসিয়ে। বললেন, 'কিছু মনে করো না বাবা গণেশ, হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ', ইত্যাদি। গণেশ টুলে বসে ছেঁড়া ধুতিতে গিঁট দিতে লাগল।

এমন সময় নিচের রাস্তায় হৈহৈ রৈরৈ। এক বদ্ধ পাগল রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, পরনে কপ্পিনটুকু পর্যন্ত নেই—ইংরেজিতে যাকে বলে 'বার্থ-ডে-স্যুট'—আর পিছনে রাস্তার ছোঁড়ারা তাকে লেলিয়ে লেলিয়ে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

হবি তো হ, পাগলা করল গণেশের আপিসের দিকেই ধাওয়া। সিঁড়ি ভেঙে উপরের তলায় উঠে ঢুকতে গেল বড় সাহেবের ঘরে। গণেশ টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কিন্তু পাগলকে বাধা দিল না।

মারমার কাটকাট কাণ্ড। পাগলের পিছনে পিছনে ছোঁড়াগুলোও গিয়ে ঢুকেছে বড়সাহেবের ঘরে। চীৎকার চেঁচামেচি। পাগলা আবার সাহেবকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে ফেলে রিভলভিং-টিল্‌টিঙ চেয়ারে বসতে চায়।

তাই দেখে কেউ বদ্যি ডাকে
কেউ বা ডাকে পুলিশ,
কেউ বা বলে কামড়ে দেবে
সাবধানেতে তুলিস !

শেষটায় পুরো লালবাজার এসে ঘর সাফ করল।

সায়েব রেগে কাঁই। বড়বাবুকে ধরে তো এই-মার কি তেই-মার লাগান আর কি। বলেন 'তুমি একটা ইডিয়েট, আর দোরে বসিয়েছিলে তোমার মত একটা ইম্বেসাইলকে। কোথায় সে, ডাকো তাকে।'

গণেশ এসে সামনে দাঁড়াল।

সায়েব মারমুখো হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইউ প্রাইজ-ইডিয়েট, পাগলকে তুমি ঠেকালে না কেন?'

গণেশ বড় বিনয়ী ছেলে। বললে, 'আমি ভেবেছিলুম, উনি আমাদের আপিসের সিনিয়র এপ্রেন্‌টিস্‌। আমি তো জুনিয়র, ওঁকে ঠ্যাকাবো কি করে?

সাহেব তো সাত হাত পানিমেঁ। বললেন, 'হোয়াড্যু মীন বাই দ্যাট?'

গণেশ বললে, 'হুজুর, আমি তিন বৎসর ধরে এ আপিসে এপ্রেন্‌টিসি করছি। খেতে পাই নে, পরতে পাই নে। এই দেখুন ধুতি। ছিঁড়ে ছিঁড়ে পট্টি হয়ে গিয়েছে। লজ্জা ঢাকবার উপায় নেই। তাই যখন এঁকে দেখলুম, আমাদের আপিসে ঢুকছেন, একদম অবস্তর উলঙ্গ, তখন আন্দাজ করলুম, ইনি নিশ্চয়ই এ-আপিসের সিনিয়র এপ্রেন্‌টিস্‌। তা না হলে তাঁর এ অবস্থা হবে কেন? এখানে এপ্রেন্‌টিসি করে করে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে সিনিয়র এপ্রেন্‌টিস্‌ হয়েছেন।'

* * *

১৯৪৭ সালে স্বরাজ লাভ হয়। আমাদের এপ্রেন্‌টিসি তখন শুরু হয়। তখনো পরনে ধুতি ছিল, গায়ে জামা ছিল। আর আমাদের সিনিয়র এপ্রেন্‌টিস হওয়ার বেশী বাকী নেই। সবই আল্লার কেরামতী।

দাম্পত্য জীবন

যাঁদের ঝড়তি-পড়তি মালা কুড়িয়ে নিয়ে ভাঙিয়ে খাচ্ছি—অর্থাৎ 'পঞ্চতন্ত্র' তৈরি করছি তাঁদের সঙ্গে 'দেশে'র পাঠক-পাঠিকার যোগসূত্র স্থাপন করার বাসনা এ-অধমের প্রায়ই হয়। তাঁদেরই একজন আমার এক চীনা-বন্ধু। সত্যকার জহুরী লোক—লাওৎসে, কন-ফুৎসিয়ে টৈ-টম্বুর হয়ে আছেন। তত্ত্বালোচনা আরম্ভ হলেই শাস্ত্রবচন ওষ্ঠাগ্রে। আমি যে পদে পদে হার মানি সে-কথা আর রঙ-ফুলিয়ে, তুলি-বুলিয়ে বলতে হবে না।

ক্লাবের সুদূরতম প্রত্যন্ত প্রদেশে একটি নিমগাছের তলায় বসে তিনি আপিস ফাঁকি দিয়ে চা পান করেন। তাঁর কাছ থেকে আমি এন্তার এলেম হাঁসিল করেছি—তারই একটা আপিস ফাঁকি দেওয়া। কাছে পেঁছিতেই একগাল হেসে নিলেন—অর্থ সুস্পষ্ট—ছোকরা কাবেল হয়ে উঠছে। আর ক'দিন বাদেই আপিস-যাওয়া বিলকুল বন্ধ করে পুরো তনখা টানবে।

ইতিমধ্যে এক ইংরেজও এসে উপস্থিত।

রসালাপ আরম্ভ হল। কথায় কথায় বিবাহিত জীবন নিয়ে আলোচনা। সাহেব বললে, 'লণ্ডনে একবার স্বামীদের এক আড়াই মাইল লম্বা প্রসেশন হয়েছিল, স্ত্রীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য। প্রসেশনের মাথায় ছিল এক পাঁচ ফুট লম্বা টিউটিঙে হাড্ডি-সার ছোকরা। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই ছ'ফুট লম্বা ইয়া লাশ এক ঔরৎ দুমদুম করে তার দিকে এগিয়ে

গিয়ে তার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললে, 'তুমি এখানে কেন, তুমি তো আমাকে ডরাও না। চলো বাড়ি।' সুড়সুড় করে ছোকরা চলে গেল সেই খাণ্ডার বউয়ের পিছনে পিছনে।'

আমার চীনা বন্ধুটি আদত-মাফিক মিষ্টি মৌরী হাসি হাসলেন। সায়েব খুশী হয়ে চলে গেল।

গুটিকয়েক শুকনো নিমপাতা টেবিলের উপর ঝরে পড়ল। বন্ধু তাই দিয়ে টেবিলক্লথের উপর আল্পনা সাজাতে সাজাতে বললেন, 'কী গল্প! শুনে হাসির চেয়ে কান্না পায় বেশী।' তারপর চোখবন্ধ করে বললেন,

'চীনা গুণী আচার্য সু তাঁর প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থে লিখেছেন, একদা চীন দেশের পেপিং শহরে অত্যাচার-জর্জরিত স্বামীরা এক মহতী সভার আহ্বান করেন। সভার উদ্দেশ্য, কি প্রকারে নিপীড়িত স্বামীকুলকে তাঁদের খাণ্ডার গৃহিণীদের হাত থেকে উদ্ধার করা যায়?

'সভাপতির সম্মানিত আসনে বসানো হল সবচেয়ে জাঁদরেল দাড়িওয়ালা অধ্যাপক মাওলীকে। ঝাড়া ষাটটি বছর তিনি তাঁর দজ্জাল গিন্নীর হাতে অশেষ অত্যাচার ভুগেছেন সে কথা সকলেরই জানা ছিল।

'ওজস্বিনী ভাষায় গম্ভীর কণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষে বক্তার পর বক্তা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপন আপন অভিজ্ঞতা বলে যেতে লাগলেন। স্ত্রীলোকের অত্যাচারে দেশ গেল, ঐহিত্য গেল, ধর্ম গেল, সব গেল, চীন দেশ হটেনটটের মুল্লুকে পরিণত হতে চলল, এর একটা প্রতিকার করতেই হবে! ধন-প্রাণ, সর্বস্ব দিয়ে এ অত্যাচার ঠেকাতে হবে। এস ভাই, এক জোট হয়ে—

'এমন সময় বাড়ির দারোয়ান হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলল, "হুজুররা এবার আসুন। আপনাদের গিন্নীরা কি করে এ সভার খবর পেয়ে ঝাঁটা, ছেঁড়া জুতো, ভাঙা ছাতা ইত্যাদি যাবতীয় মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এদিকে ধাওয়া করে আসছেন।"

'যেই না শোনা, আর যাবে কোথায়? জানলা দিয়ে, পেছনের দরজা দিয়ে, এমন কি ছাত ফুটো করে, দেয়াল কাণা করে দে ছুট,! দে ছুট! তিন সেকেণ্ডে মিটিঙ সাফ—বিলকুল ঠাণ্ডা!

'কেবলমাত্র সভাপতি বসে আছেন সেই শান্ত গম্ভীর মুখ নিয়ে—তিনি—বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি। দারোয়ান তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বার বার প্রণাম করে বলল, "হুজুর যে সাহস দেখাচ্ছেন তাঁর সামনে চেঙ্গিস খানও তসলীম ঠুকতেন, কিন্তু এ তো সাহস নয়, এ হচ্ছে আত্মহত্যার শামিল। গৃহিণীদের প্রসেশনের সকলের পয়লা রয়েছেন আপনারই স্ত্রী। এখনো সময় আছে। আমি আপনাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।" সভাপতি তবু চুপ। তখন দারোয়ান তাঁকে তুলে ধরতে গিয়ে দেখে তাঁর সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা। হার্ট ফেল করে মারা গিয়েছেন।'

আচার্য উ থামলেন। আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে 'সাধু সাধু,' 'শাবাস, শাবাস' বললুম। করতালি দিতে দিতে নিবেদন করলুম, 'এ একটা গল্পের মত

গল্প বটে।'

আচার্য উ বললেন, 'এ বিষয়ে ভারতীয় আপ্তবাক্য কি ?'

চোখ বন্ধ করে আল্লা রসুলকে স্মরণ করলুম, পীর দরবেশ গুরু ধর্ম কেউই বাদ পড়লেন না। শেষটায় মৌলা আলীর দয়া হল !

হাত জোড় করে বরজলালের মত ক্ষীণ কণ্ঠে ইমন কল্যাণ ধরলুম।

শ্রীমন্মহারাজ রাজাধিরাজ দেবেন্দ্রবিজয় মুখ কালি করে একদিন বসে আছেন ঘরের অন্ধকার কোণে। খবর পেয়ে প্রধান মন্ত্রী এসে শুধালেন, 'মহারাজের কুশল তো ?' মহারাজ রা কাড়েন না। মন্ত্রী বিস্তর পীড়াপীড়ি করাতে হঠাৎ খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন, 'ঐ রাণীটা—ওঃ কি দজ্জাল, কি খাণ্ডার ! বাপরে বাপ ! দেখলেই আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।'

মন্ত্রীর যেন বুক থেকে হিমালয় নেমে গেল। বললেন 'ওঃ ! আমি ভাবি আর কিছু। তাতে অতো বিচলিত হচ্ছেন কেন মহারাজ ! বউকে তো সব্বাই ডরায়—আম্মো ডরাই। তাই বলে তো আর কেউ এরকমধারা গুম হয়ে বসে থাকে না।'

রাজা বললেন, 'ঐ তুমি ফের আরেকখানা গুল ছাড়লে।' মন্ত্রী বললেন, 'আমি প্রমাণ করতে পারি।' রাজা বললেন, 'ধরো বাজি।' 'কত মহারাজ !' দশ লাখ ?' 'দশ লাখ।'

পরদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরে ঢোল পেটানোর সঙ্গে সঙ্গে হুকুম জারি হল—বিষ্যুদবার বেলা পাঁচটায় শহরের তাবৎ বিবাহিত পুরুষ যেন শহরের দেয়ালের বাইরে জমায়েৎ হয় ; মহারাজ তাদের কাছ থেকে একটি বিষয় জানতে চান।

লোকে লোকারণ্য। মধ্যিখানে মাচাঙ—তার উপরে মহারাজ আর মন্ত্রী। মন্ত্রী চেঁচিয়ে বললেন, 'মহারাজ জানতে চান তোমরা তোমাদের বউকে ডরাও কি না। তাই তাঁর হয়ে আমি হুকুম দিচ্ছি যারা বউকে ডরাও তারা পাহাড়ের দিকে সরে যাও আর যারা ডরাও না তারা যাও নদীর দিকে।'

যেই না বলা অমনি হুড়মুড় করে, বাঘের সামনে পড়লে গোরু পালের মত, কালবৈশাখীর সামনে শুকনো পলাশ পাতার মত সবাই ধাওয়া করলে পাহাড়ের দিকে, একে অন্যকে পিষে, দলে, থেঁৎলে—তিন সেকেণ্ডের ভিতর পাহাড়ের গা ভর্তি।

বউকে না-ডরানোর দিক বিলকুল ফর্সা। না, ভুল বললুম। মাত্র একটি রোগা টিঙটিঙে লোক সেই বিরাট মাঠের মধ্যিখানে লিক্‌লিক্ করছে।

রাজা তো অবাক। ব্যাপারটা যে এরকম দাঁড়াবে তিনি তার কল্পনাও করতে পারেন নি। মন্ত্রীকে বললেন, তুমিই বাজি জিতলে। এই নাও দশ লখা হার।' মন্ত্রী বললেন, 'দাঁড়ান, মহারাজ। ঐ যে একটা লোক রয়ে গেছে। মন্ত্রী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। কাছে এলে বললেন, তুমি যে বড় ওদিকে দাঁড়িয়ে ? বউকে ডরাও না বুঝি ?'

লোকটা কাঁপতে কাঁপতে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, 'অতশত বুঝিনে,

হুজুর। এখানে আসবার সময় বউ আমাকে ধমক দিয়ে বলেছিল, 'যেদিকে ভিড় সেখানে যেয়ো না।" তাই আমি ওদিকে যাই নি।'

আচার্য উ আমাকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'ভারতবর্ষেরই জিৎ। তোমার গল্প যেন বাঘিনী-বউ। আমার গল্প ভয়ে পালালো।'

তবু আমার মনে সন্দ রয়ে গিয়েছে। রসিক পাঠক, তুমি বলতে পারো কোন্ গল্পটাকে শিরোপা দি ? ?

পঁচিশে বৈশাখ

রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য পেয়েছিলুম, তাই যদি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে দেখি তাহলে আশা করি' সুশীল পাঠক এবং সহৃদয়া পাঠিকা অপরাধ নেবেন না।

রবীন্দ্রনাথ উত্তম উপন্যাস লিখেছেন, ছোট গল্পে তিনি মপাসাঁ, চেখফকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন, নাট্যে তিনি যে-কোন মিস্টিকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন, কবিরূপে তিনি বিশ্বজনের প্রশংসা অর্জন করেছেন, শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যে গবেষণা করেছেন তার গভীরতা পণ্ডিতদের নির্বাক করে দিয়েছে, সত্যদ্রষ্টা হিসাবে তাঁর ব্যাখ্যান ভক্তজনের চিত্তজয় করতে সমর্থ হয়েছে, তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি আরো কত বৎসর ভারতবাসীকে নব নব শিক্ষা নেবে তার ইয়ত্তা নেই আর গুরুরূপে তিনি যে শান্তিনিকেতনে নির্মাণ করে গিয়েছেন তার স্নিগ্ধচ্ছায়ায় বিশ্বজন একদিন সুখময় নীড় লাভ করবে সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই।

আমার কিন্তু ব্যক্তিগত বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ এসব উত্তীর্ণ হয়ে অজরামর হয়ে রইবেন তাঁর গানের জন্য।

সুরের দিক দিয়ে বিচার করবে না। সুহৃদ শান্তিদেব ঘোষ তাঁর 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতে' এমন কোন জিনিস বাদ দেন নি যে সম্বন্ধে আপনি আমি আর পাঁচজনকে কিছু বলে দিতে পারি। আমি বিচার করছি, কিংবা বলুন মুগ্ধ হয়ে ভাবি যে, কতগুলো অপূর্ব গুণের সমন্বয় হলে পর এ রকম গান সৃষ্ট হতে পারে। সামান্য যে দু'চারটে ভাষা জানি তার ভিতর আমি চিরজীবন যে রসের সন্ধান করেছি সে হচ্ছে গীতিরস। শেলি কীট্স, গ্যোটে হাইনে, হাফিজ আত্তার, কালিদাস জয়দেব, গালীব জওক্ এঁদের গান বলুন কবিতা বলুন সব কিছুর রসাস্বাদ করে এ জীবন ধন্য মেনেছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বার বার বলেছি—

'এমনটি আর পড়িল না চোখে,
আমার যেমন আছে।'

তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বার বার হার মেনেছি। রবীন্দ্রনাথের গান এমনি এক অখণ্ড রূপ নিয়ে হৃদয় মন অভিভূত করে ফেলে যে, তখন সর্বপ্রকারের বিশ্লেষণ ক্ষমতা লোপ পায়।

জর্মন যখন 'লীডার' কিংবা ইরানীরা যখন গজল গান একমাত্র তখনই আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত জাতীয় কিঞ্চিৎ রস পেয়েছি। তাই একমাত্র সেগুলোর

সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের গানের তুলনা করে ঈষৎ বিশ্লেষণ করা যায়।

তখন ধরা পড়ে ঃ

রবীন্দ্রনাথের গানের অখণ্ড, সম্পূর্ণ রূপ। বহু লীডার এবং গজল শুনে মনে হয়েছে এ গান অপূর্ব, এ গান যদি আরো অনেকক্ষণ ধরে চলত তবে আরো ভালো লাগত অর্থাৎ শুধু যে অতৃপ্ত রেখে গিয়েছে তাই নয়, অসম্পূর্ণ বলেই মনে হয়েছে এ 'লীডার' বা 'গজল' আরো কিছুক্ষণ ধরে চলতে পারতো। রবীন্দ্রনাথের গান কখনই অসম্পূর্ণরূপে আমার সামনে দাঁড়ায় নি। তাঁর গান শুনে যদি কখনো মনে হয়ে থাকে এ গান আমাকে অতৃপ্ত রেখে গেল তবে তার কারণ তার অসম্পূর্ণতা নয়, তার কারণ অতিশয় উচ্চাঙ্গের রসসৃষ্টি মাত্রই ব্যঞ্জনা এবং ধ্বনিপ্রধান। তার ধর্ম সম্পূর্ণ তৃপ্ত করে ও ব্যঞ্জনার অতৃপ্তি দিয়ে হৃদয়মন ভরে দেওয়া। তখন মনে হয়, এ গান আমার সামনে যে-ভুবন গড়ে দিয়ে গেল তার প্রথম পরিচয়ে তার সব কিছু আমার জানা হল না বটে, কিন্তু খেদ নেই, আবার শুনব তখন সে ভুবনের আরো অনেকখানি আমার কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে আর এমনি করে একদিন সে ভুবন আমার নিতান্ত আপন হয়ে উঠবে। কোনো সন্দেহ নেই এরকম ধারাই হয়ে থাকে কিন্তু আরেকটি কথা তার চেয়েও সত্য ঃ রবীন্দ্রনাথের কোনো গানই কখনো নিজকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে না।

শব্দের চয়ন, সে শব্দগুলো বিশেষ স্থলে সংস্থাপন এবং হৃদয়মনকে অভাবিত কল্পনাতীত নূতন শব্দের ভিতর দিয়ে উন্মুখ রেখে ভাবে, অর্থে, মাধুর্যের পরিসমাপ্তিতে পেঁছিয়ে দিয়ে গান যখন সাঙ্গ হয় তখন প্রতিবারই হৃদয়ঙ্গম করি, এ গান আর অন্য কোনো রূপ নিতে পারতো না—নটরাজের মূর্তি দেখে যেমন মনে হয়, নটরাজ অন্য কোনো অঙ্গভঙ্গি দিয়ে আমার চোখের সামনে নৃত্যকে রূপায়িত করতে পারতেন না। তাই বলি, নটরাজের প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গির মত রবীন্দ্রনাথের গানের প্রত্যেকটি শব্দ।

লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই, চমৎকার সুর তাল জ্ঞান, মধুরতম কণ্ঠ, তবু কোনো কোনো গায়কের গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গান ফিকে, পানসে অর্থাৎ ফ্ল্যাট বলে মনে হয়। কেন এরকম ধারা হয় তার কারণ অনুসন্ধান করলে অধিকাংশ স্থলেই দেখতে পাবেন, গায়কের যথেষ্ট শব্দ-সম্মান বোধ নেই বলে প্রতিটি শব্দ রসিয়ে বসিয়ে গাইছেন না আর তাই যেন নটরাজের প্রতিটি অঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে তাঁর নৃত্য বন্ধ হয়ে গেল।

মৃত্তিকার বন্ধন থেকে রবীন্দ্রনাথ কত শতবার আমাদের নিয়ে গিয়েছেন 'নীলাম্বরের মর্মমাঝে'। আবার যখন তিনি আমাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন তখন এই মৃত্তিকাই স্বর্গের চেয়ে অধিকতর 'মধুময় হয়ে ওঠে'।

'তারায় তারায় দীপ্তশিখার অগ্নি জ্বলে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে—'

শুনে কি কল্পনা করতে পারি যে

'ঐ আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন,

কোথায় ছিল কোন্ যুগে মোর নিমন্ত্রণ।'

তারপর যখন মনকে তৈরি করলুম সেই স্বর্গসভার নব নব অভিজ্ঞতার জন্য তখন আবার হঠাৎ আমি

'কালের সাগর পাড়ি দিয়ে এলেম চলে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে ॥'

তারপর এ-ধারার কি অপরূপ বর্ণনা

'হেথা মন্দমধুর কানাকানি জলে স্থলে
শ্যামল মাটির ধরাতলে।
হেথা ঘাসে ঘাসে রঙিন ফুলের আলিম্পন
বনের পথে আঁধার-আলোয় আলিঙ্গন।'

কখনো স্বর্গে কখনো মর্ত্যে, আপন অজানাতে এই যে মধুর আনাগোনা, মানুষকে দেবতা বানিয়ে, আবার তাকে দেবতার চেয়ে মহত্তর মানুষ করে তোলা —মাত্র কয়েকটি শব্দ আর একটুখানি সুর দিয়ে—এ অলৌকিক কর্ম যিনি করতে পারেন তিনিই 'বিশ্বকর্মা মহাত্মা'।

তোতা কাহিনী

পারস্য দেশের গুণী-জ্ঞানীরা বলেন, আল্লা যদি আরবী ভাষায় কোরান প্রকাশ না করে ফার্সীতে করতেন, তবে মৌলানা জালালউদ্দীন রুমীর 'মসনবি' কেতাবখানাকে কোরান নাম দিয়ে চালিয়ে দিতেন। এ ধরনের তারিফ আর কোন দেশের লোক তাদের কবির জন্য করেছে বলে তো আমার জানা নেই।

মৌলানা রুমী ছিলেন ভক্ত। তিনি ভগবানকে পেয়েছিলেন কদম্ববনবিহারিণী শ্রীরাধা যেরকম করে গোপীজনবল্লভ শ্রীহরিকে পেয়েছিলেন, অর্থাৎ প্রেম দিয়ে। রুমী তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা মসনবিতে বর্ণনা করেছেন। বেশির ভাগ গল্পচ্ছলে, তারই একটি 'তোতা কাহিনী'।

ইরান দেশের এক সদাগরের ছিল একটি ভারতীয় তোতা। সে তোতা জ্ঞানে বৃহস্পতি, রসে কালিদাস, সৌন্দর্যে রুডলফ ভেলেন্টিনো, পাণ্ডিত্যে ম্যাক্সমুলার। সদাগর তাই ফুরসৎ পেলেই সেই তোতার সঙ্গে দুদণ্ড রসালাপ, তত্ত্বালোচনা করে নিতেন।

হঠাৎ একদিন সদাগর খবর পেলেন ভারতবর্ষে কার্পেট বিক্রি হচ্ছে আক্রা দরে। তখনই মনস্থির করে ফেললেন ভারতে যাবেন কার্পেট বেচতে। যোগাড়-যন্ত্র তদ্দণ্ডেই হয়ে গেল। সর্ব শেষে গোষ্ঠীকুটুমকে জিজ্ঞেস করলেন, কার জন্য হিন্দুস্তান থেকে কি সওদা নিয়ে আসবেন। তোতাও বাদ পড়ল না—তাকেও শুধালেন সে কি সওগাত চায়। তোতা বললে, 'হুজুর, যদিও আপনার সঙ্গে আমার বেরাদরি, ইয়ারগিরি বহু বৎসরের, তবু খাঁচা থেকে মুক্তি চায় না কোন্ চিড়িয়া? হিন্দুস্তানে আমার জাতভাই কারোর সঙ্গে যদি দেখা হয় তবে আমার এ অবস্থার বর্ণনা করে মুক্তির উপায়টা জেনে নেবেন কি? আর তার প্রতিকূল ব্যবস্থাও যখন আপনি করতে পারবেন, তখন এ সওগাতটা চাওয়া তো

কিছু অন্যায়ও নয়।

সওদাগর ভারতবর্ষে এসে মেলা পয়সা কামালেন, সওগাতও কেনা হল, কিন্তু তোতার সওগাতের কথা গেলেন বেবাক ভুলে। মনে পড়ল হঠাৎ একদিন এক বনের ভিতর দিয়ে যাবার সময় একঝাঁক তোতা পাখি দেখে। তখ্খুনি তাদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'তোমাদের এক বেরাদর ইরান দেশের খাঁচায় বন্ধ হয়ে দিন কাটাচ্ছে। তার মুক্তির উপায় বলে দিতে পারো?' কোনো পাখিই খেয়াল করল না সদাগরের কথার দিকে। শুধু দুঃসংবাদটা একটা পাখির বুকে এমনি বাজ হানল যে, সে তৎক্ষণাৎ মরে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সদাগর বিস্তর আপসোস করলেন নিরীহ একটি পাখিকে বেমক্কা বদ-খবর দিয়ে মেরে ফেলার জন্যে। স্থির করলেন, এ মুর্খামি দু-বার করবেন না। মনে মনে নিজের গালে ঠাস-ঠাস করে মারলেন গণ্ডা দুই চড়।

বাড়ি ফিরে সদাগর সওগাত বিলোলেন দরাজ হাতে। সবাই খুশ, নিশ্চয়ই 'জয় হিন্দ্' বলেছিল ব্যাটা-বাচ্চা সবাই। শুধু তোতা গেল ফাঁকি—সদাগর আর ও-ঘরে যান না পাছে তোতা তাঁকে পাকড়ে ধরে সওগাতের জন্য। উঁহু, সেটি হচ্ছে না, ও খবরটা যে করেই হোক চেপে যেতে হবে।

কিন্তু হলে কি হয়—গোঁপ কামানোর পরও হাত ওঠে অজানাতে চাড়া দেবার জন্য (পরশুরাম উবাচ), বে-খেয়ালে গিয়ে ঢুকে পড়েছেন হঠাৎ একদিন তোতার ঘরে। আর যাবে কোথায়—'অস্-সালাম আলাই কুম, ও রহমৎ উল্লাহি, ও বরকত ওহু, আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞে হোক। হুজুরের আগমন শুভ হোক ইত্যাদি ইত্যাদি, তোতা চেঁচাল।

সদাগর 'হেঁ হেঁ' করে গেলেন! মনে মনে বললেন, খেয়েছে!

তোতা আর ঘুঘু এক জিনিস নয় জানি, কিন্তু এ তোতা ঘুঘু। বললে, 'হুজুর সওগাত?'

সদাগর ফাটা বাঁশের মধ্যিখানে। বলতে পারেন না, চাপতেও পারেন না। তোতা এমন ভাবে সদাগরের দিকে তাকায় যেন তিনি বেইমানস্য বেইমান। সওগাতের ওয়াদা দিয়ে গড্ড্যাম্ ফক্কিকারি। মানুষ জানোয়ারটা এই রকমই হয় বটে! তওবা, তওবা!

কি আর করেন সদাগর। কথা রাখতেই হয়। দুম করে বলে ফেললেন।

যেই না বলা তোতাটি ধপ করে পড়ে মরে গেল। তার একটা বেরাদর সেই দূর হিন্দুস্তানে তার দুরবস্থার খবর পেয়ে হার্টফেল করে মারা গেল, এরকম একটা প্রাণঘাতী দুঃসংবাদ শুনলে কার না কলিজা ফেটে যায়?

দিলের দোস্ত তোতাটি মারা যাওয়ায় সদাগর তো হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। 'হায়, হায়, কী বেকুব, কী বে-আক্কেল আমি। একই ভুল, দুবার করলুম।' পাগলের মত মাথা থাবড়ান সদাগর। কিন্তু তখন আর আপসোস ফায়দা নেই—ঘোড়া চুরির পর আর আস্তাবলে তালা মেরে কি লভ্য! সদাগর চোখের জল মুছতে মুছতে খাঁচা খুলে তোতাকে বের করে আঙ্গিনায় ছুঁড়ে ফেললেন।

তখন কী আশ্চর্য, কী কেরামতি! ছুঁড়ে ফেলতেই তোতা উড়ে বসল গিয়ে বাড়ির ছাদে। সদাগর তাজ্জব—হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন তোতার দিকে। অনেকক্ষণ পরে সম্বিত ফিরে শুধালেন, 'মানে?'

তোতা এবারে প্যাঁচার মত গম্ভীর কণ্ঠে বললো, 'হিন্দুস্থানী যে তোতা আমার বদনসিবের খবর পেয়ে মারা যায়, সে কিন্তু আসলে মরে নি। মরার ভান করে আমাকে খবর পাঠালো, আমিও যদি মরার ভান করি, তবে খাঁচা থেকে মুক্তি পাবো।'

সদাগর মাথা নিচু করে বললেন, 'বুঝেছি, কিন্তু বন্ধু, যাবার আগে আমাকে শেষ তত্ত্ব বলে যাও। আর তো তোমাকে পাব না।'

তোতা বললে, 'মরার আগেই যদি মরতে পারো, তবেই মোক্ষলাভ। মড়ার ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, মান-অপমান বোধ নেই। সে তখন মুক্ত, সে নির্বাণ মোক্ষ সবই পেয়ে গিয়েছে। মরার আগে মরবার চেষ্টা করো।'

* * *

এই গল্প ভারতবর্ষে বহু পূর্বে এসেছিল। কবীর বলেছেন,

'ত্যজো অভিমানা শিখো জ্ঞানা
সত্‌গুরু সঙ্গত তরতা হৈ
কহৈঁ কবীর কোই বিরল হংসা
জীবতহী জো মরতা হৈ ॥

(অভিমান ত্যাগ করে জ্ঞান শেখো, সৎগুরুর সঙ্গ নিলেই ত্রাণ। কবীর বলেন, 'জীবনেই মৃত্যুলাভ করেছেন সেরকম হংসসাধক বিরল')।

আর বাঙলা দেশের লালন ফকিরও বলেছেন,

'মরার আগে মলে শমন-জ্বালা ঘুচে যায়।
জানগে সে মরা কেমন, মুরশীদ ধরে জানতে হয়।' ॥

ত্রাহি বিশ্বকর্মা

দিল্লি শহরে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন স্থাপত্যের নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। শুধু কুৎব্ মিনারের গায়ে লাগানো কুওৎউল্‌ইসলাম মসজিদের কয়েকটি অংশ যে প্রাচীন হিন্দু মন্দির থেকে নেওয়া হয়েছে সে কথা মসজিদের দেয়ালে পাথরে খোদাই করা রয়েছে আর সেগুলোর দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। কী সুনিপুণ, সুদক্ষ দৃঢ় হস্তের কলাসৃষ্টি! নৈসর্গিক সৌন্দর্য স্থপতি যে রকম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন ঠিক তেমনি বিশ্বভুবনের সর্বরসবস্তুর অভেদ্য, সমষ্টিগত রূপও তিনি হৃদয়ঙ্গম করে উভয়ের অপূর্ব সংমিশ্রণ প্রস্তরগাত্রে প্রকাশ করেছেন কখনো অতি অল্প দু-একটি ইঙ্গিত দিয়ে, কখনো সূক্ষ্মতম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিবিড়তম 'বর্ণনা' এবং ব্যঞ্জনা দিয়ে।

এ তো হল কারুকার্যের কথা। কিন্তু যে স্তম্ভগুলোর উপর এসব কারুকার্য খোদাই করা হয়েছে তাদের আকার-প্রকার দেখলেও মনে কোন সন্দেহ থাকে না যে এ স্তম্ভগুলো নিশ্চয়ই একদা কোনো মহৎ স্থাপত্যের অঙ্গরূপে

নির্মিত হয়েছিল। মনে কণামাত্র দ্বিধার অবকাশ থাকে না যে সে যুগের স্থাপত্য গাম্ভীর্যে এবং মধুরতায় অন্য যে-কোনো দেশের স্থাপত্যের সম্মুখে মস্তকোত্তোলন করতে পারত।

তারপর আরম্ভ হল নব পর্যায়। কুৎবুমিনার, ইলতুৎমিশের কবর, আলাউদ্দিন খিলজির মসজিদ, গিয়াসুউদ্দীন তুগলুকের কবর, সিকন্দর লোদীর মসজিদ, এবং গোর, হুমায়ুনের কবর, খানখানার কবর, জামি মসজিদ, লালকেল্লা, সফদরজঙ্গ আরো কত অজস্র কলা নিদর্শন। দেখতে দেখতে মাসের পর মাস কেটে যায়, দেশকালপাত্রজ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পায়—দিল্লী ত্যাগ না করা পর্যন্ত সে রসের সায়রে ডুবে মরা থেকে বাঁচতে পারে না।

তারপর ইংরেজের বর্বরতা। সেক্রেটারিয়েট মেমোরিয়েল ও রাজা জর্জের প্রতিমূর্তি দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয় যে হিন্দু-মুসলিম যুগের কলাসৃষ্টি দেখার পরও ইংরেজ কী করে এ সব গর্ভস্রাব (সুশীল পাঠক! ক্ষমা ভিক্ষা করি, অনেক ভাবিয়াও কোনো ভদ্র শব্দ খুঁজিয়া পাইলাম না) যত্রতত্র নিক্ষেপ করে গেল। যে ইংরেজ আপন দেশে চরিত্রবান সেই ইংরেজই বিদেশে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ হলে অসাধু হয়ে যায়—যে ইংরেজ স্বদেশে স্ব-ঐতিহ্যে মধ্যম শ্রেণীর স্থাপত্য নির্মাণে সক্ষম সেই ইংরেজই বিদেশে সাম্রাজ্যবাদের দম্ভে মদোন্মত্ত স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে সৃষ্টি করে—কি সৃষ্টি করে? অশ্লীল কথাটার আর পুনরাবৃত্তি করবো না।

ফরাসী গুণী ক্লেমাঁসো দিল্লীর ইংরেজ স্থাপত্য দেখে বলেছিলেন, 'বাই গদ্, হোয়াৎ ওয়ান্দারফুল রুইন্স্ দে উইল মেক্!' এরপর এ-স্থাপত্য বাবদে এ অধম আর কি নিবেদন করবে?

* * *

কিন্তু এ সব কিছু হার মানে এক নবীন পরিকল্পনার সম্মুখে। এক অতি আধুনিক শিল্পী মহাত্মাজীর স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য একটি 'আজব' প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। পদ্মাসনে আসীন মহাত্মাজীর একটি ১৪০ ফুট উঁচু মূর্তি নির্মাণ করা হবে এবং সেই মূর্তির ভিতরে চারতলা এমারৎ তৈরী থাকবে। যেহেতু মস্তিষ্ক চিন্তাধার তাই মূর্তির মস্তকে লাইব্রেরী থাকবে এবং সেই হিসেবে বক্ষে থাকবে অন্য কিছু, নাসিকা কর্ণেও তাই সেই রকম জুৎসই কিছু একটা। সমস্ত পরিকল্পনাটা আমার মনে নেই; তবু অনুমান করি উপরের হিসাব মাফিক পেটে থাকবে হোটেল রেস্তোরাঁ!

শান্ত সমাহিত হয়ে ভাবুন দেখি আমরা কোথায় এসে পৌঁচেছি। সেই বিরাট মূর্তি প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে থাকবে তামাম দিল্লী শহরের দিকে অষ্টপ্রহর—হয়ত বা চোখে দুটি জোরালো সার্চ-লাইট জুড়ে দেওয়া হবে। মূর্তিটি যদি কলাসৃষ্টি হিসাবেও অতি উচ্চ পর্যায়ের হয় তবু তার বিরাট আকার আর সব সূক্ষ্মানুভূতিকে গলা টিপে মেরে ফেলে তাবৎ দিল্লীবাসীর মনে হরবকৎ জাগিয়ে রাখবে যে অনুভূতি সেটা হচ্ছে, ভয়-বিহ্বলতা।

অথচ ধর্ম সাক্ষী—মহাত্মাজীকে দেখে কেউ কখনো ভয়ে বিহ্বল হয় নি।

অতি পাষণ্ড ইংরেজও তাঁর সামনে শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে মাথা নত করেছে।

সে কথা থাক্। আমার প্রশ্ন, এই যে ব্যাপারটি হতে চলল—শুনলাম শ্রী গাড্‌গিল মূর্তিটির মড্‌ল্ দেখে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করেছেন এবং পরিকল্পনাটির মূর্তমান করার মঞ্জুরী না-মঞ্জুরী তাঁরই শ্রীহস্তে—সেটি কলাসৃষ্টির দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতে গেলে তাকে কি বলা যায়?

অবিমিশ্র ভাস্কর্য? তা তো নয়। স্থাপত্য? তাও তো নয়। কারণ ভাস্কর্যের ভিতর স্থাপত্য থানা গাড়েন না। তদুপরি সর্বকলাসৃষ্টির একটা বিশেষ পরিমাণ আছে—মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব হতে পারেন কারণ তিনি এপিক, কিন্তু মেঘদূত অষ্টাদশপর্ব হতে পারেন না, এবং মহাভারতও মেঘদূতের আকার ধরতে পারেন না। তাজমহলকে আরও দশগুণ বড় করে বানালে তার মাধুর্য সম্পূর্ণ লোপ পাবে; মার্বেলে তৈরী যে ক্ষুদে ক্ষুদে তাজ লোকে ড্রইংরুমে সাজিয়ে রাখে তার থেকে আসল তাজের কোনো রসই পাওয়া যায় না। একশ চল্লিশ ফুট উঁচু মূর্তি ভাস্কর্যের রস দিতে পারবে না।—যদি কোনো রস দেয় তবে সে বীভৎস—সে কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি। হায়, মহাত্মাজীকে দেখতে হবে বিরাট দানবের মূর্তিতে?

আরেকটি কথা পেশ করতে আমার বড় বাধো বাধো ঠেকছে। কিন্তু না করে উপায়ও নেই। সংক্ষেপে বলি। মূর্তির ভিতর যখন চারতলা বাড়ি থাকবে, লাইব্রেরী হাসপাতাল থাকবে তখন অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে স্নানাগার ও তৎসংলগ্নীয় যাবতীয় শৌচাগারও থাকবে। একদিকে গ্রামের মেয়েরা এসে সেই বিরাট মূর্তির সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মূর্তির ভিতরে স্নানাগারে, শৌচালয়ে—থাক্!

হিন্দু-মুসলমান তুর্ক-পাঠান অনেক কিছু রেখে গিয়েছে দিল্লী শহরে—তাই দেখবার জন্যে দুনিয়ার লোক হদ্দমুদ্দ হয়ে জমায়েত হয় সেখানে। বিস্ময়ে তারা নির্বাক হয়, বিশুদ্ধ কলারসে তারা নিমজ্জিত হয়, আনন্দে আত্মহারা হয়ে তারা প্রশস্তিবাক্যে আমাদের প্রাণ অতিষ্ট করে তোলে, যেন ওগুলো নিতান্ত আপনার আমার তৈরী, সাতদিন থাকবে বলে দিল্লীতে এসে থাকে সাতমাস, আর প্রাণ ভরে, প্রেমসে অভিসম্পাত দেয় ইংরেজদের বানানো নিউ দিল্লীকে।

আমার মনে হয়, এ মূর্তি গড়া হলে ইংরেজ পর্যন্ত আমাদের অভিসম্পাত না করে হুইস্কি স্পর্শ করবে না।

কিংবা লণ্ডনে বসে মূর্তিটির ছবি দেখেই যে ঠাট্টা অট্টহাস্য ছাড়বে তার শব্দ আমরা ভারত-পাকিস্তান সর্বত্র শুনতে পাবো।

রেডুক্‌ৎসিয়ো আড্ আবসুর্ডুম!

গিয়ে দেখলুম ক্লাবের প্রত্যন্ত প্রদেশে সেই নিমগাছের তলায় চীনা বন্ধু, গুণী অধ্যাপক উ বসে আছেন। নিমপাতা এখন বর্ষণ রসে টৈটম্বুর বলে টেবিলের উপর ঝরে পড়ে না। তাই উ বকুল ফুল দিয়ে আল্পনা আঁকছেন।

আমি চীনা কায়দায় ঝুঁকে ঝুঁকে দুলতে দুলতে বললুম, 'জয় হিন্দ!'

অধ্যাপক মৃদু হাস্য করে মাথা নাড়িয়ে বললেন, 'আলাইকুম সালাম আজ তোমাদের ইদের পারব না?'

আমি বললুম, 'ছুটির বাজার, তাই আপনার কাছ থেকে তত্ত্বকথা শুনতে এলুম।'

'তৎপূর্বে বল, এ ফুলের নাম কি?'

মূল বক্তব্যের সঙ্গে এ প্রশ্নোত্তরের কোনো যোগ নেই তবু বাঙালীর মনে বিমলানন্দের সৃষ্টি হবে বলে নিবেদন করছি।

বললুম, 'বাঙলা, মারাঠী, সংস্কৃতে "বকুল", হেথাকার নেটিভ ভাষাতে "মোলশী"।'*

অনেকক্ষণ ধরে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললেন, 'বকুল, মোলশী,—মোলশী বকুল। উহুঁ, বকুলটিই মিষ্টি।' বাঙালীর ছাতি তিন বিঘৎ ফুলে উঠল তো?

আমি বললুম, 'মিষ্টি নামই যদি রাখবেন তবে "প্রাণনাথ" বলে ডাকলেই পারেন।'

ভুরু কুঁচকে বললেন, সে আবার কি?'

'প্রাণনাথ মানে, মাই ডার্লিং।'

'আরো বুঝিয়ে বলো।'

আমি বললুম, আমি বাঙাল। আমারই দেশের এক "চুকুমবুদাই" অর্থাৎ এদিকে মুখচোরা ওদিকে চটে যায় ক্ষণে ক্ষণে, এসেছে কলকাতায়। গেছে বেগুন কিনতে। দোকানীকে বললে, "দাও তো হে, এক সের বাইগন।" দোকানী পশ্চিম বাঙলার লোক। "বেগুনে"র উচ্চারণ "ব্যইগন" শুনে একটু-খানি গর্বের ঈষৎ মৌরী-হাসি হেসে শুধালো, "কি বললে হে জিনিষটার নাম?" বাঙাল গেছে চটে, উচ্চারণ নিয়ে যত্রতত্র এরকম ঠাট্টা-মস্কারা করার মানে?—চতুর্দিকে আবার বিস্তর "ঘটি" দাঁড়িয়ে। তেড়েমেড়ে বলল, "বাইগন কইছি তো বেশ কইছি হইছে কি"?'

দোকানী আরেক দফা হাম্বড়াই আত্মম্ভরিতার মৃদু হাসি হেসে বললে, 'ছ্যাঃ, বাইগন, বাইগন। দেখো দিকিনি আমাদের শব্দটা কি রকম মিষ্টি—বেগুন, বেগুন।'

বাঙাল বলল, মিষ্টি নামই যদি রাখবা, তবে "প্রাণনাথ" ডাকলেই পারো। দাও, তবে এক সের প্রাণনাথ। প্রাণনাথের সের কত? ছ' পয়সা না সাত পয়সা।'

উ প্রাণভরে হাসলেন উচ্চস্বরে। তারপর চোখ বন্ধ করে মিটমিটিয়ে। সর্ব শেষে চেশায়ার বেড়ালের হাসিটার মত 'আকাশে আকাশে রহিল ছড়ানো সে হাসির তুলনা।'

সুশীল পাঠক, তুমি রাগত হয়েছে, বিলক্ষণ বুঝতে পারছি। এ বাসি মাল

* বানানে ভুল থাকতে পারে, আমি যেরকম শুনেছি, সেই রকমই লিখলুম।

আমি পরিবেশন করছি কেন ? এ গল্প জানে না কোন্ মর্কট ? পদ্মার এ-পারে কিংবা হে-পারে ?

তিষ্ঠ, তিষ্ঠ। এ গল্পের খেই ধরে চীনা-গুণী সেদিন তত্ত্ব বিতরণ করেছিলেন বলেই এটাকে 'এনকোর' করতে হল।

* * *

হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'এ গল্পে কি তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে ?'

খাইছে। আমি করজোড় বললুম, 'আপনিই মেহেরবাণী করুন।'

বললেন, "রেডুক্‌ৎসিয়ো আড্ আবসুর্ডুম" কাকে বলে জানো ?'

আমার পেটের এলেম আপনারা বিলক্ষণ জানেন। কাজেই বলতে লজ্জা নেই, অতিশয় মনোযোগের সহিত গ্রীবাকণ্ডুয়নে নিযুক্ত হলুম।

বললেন, 'কেন। জানো না, যখন কোনো বিষয় টানাটানি করলে অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হয় তখনই তাকে বলে "রেডৎক্‌সিয়ো আড্ আবসু-র্ডুম"।'

ততক্ষণে বুঝে গিয়েছি। সোৎসাহে বললুম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, রিডাকশিও এ্যাড-এ্যাবসার্ডাম্।' একটুখানি গর্বের হাসিও হেসে নিলুম।

বাঁকা নয়নে তাকিয়ে বললেন, 'কথাটা যখন লাতিন তখন ইংরিজি উচ্চারণ করছো কেন ? ইংরেজের মুখ না হলে তোমরা কোনো ঝাল খেতে পারো না বুঝি ?'

'সে কথা থাক। শোনো।'

আসল কথা হচ্ছে বাঙাল দেখিয়ে দিল, মিষ্টি নামই যদি রাখবে তবে যাও একস্ট্রিমে। রাখো নাম "প্রাণনাথ"। তৎক্ষণাৎ প্রমাণ হয়ে গেল, মিষ্টত্বের দোহাই কত অ্যাবসার্ড।

এই দেখো না, মার্কিন জাতটা কি রকম অ্যাবসার্ড। কোনো কর্মে সুনিপুণ হতে পারাটা অতীব প্রশংসনীয়। এতে সন্দেহ করবে কে ? কিন্তু এরও তো একটা সীমা থাকা দরকার। গল্প দিয়ে জিনিসটে বোঝাচ্ছি।

'ব্রুকলিন ব্রিজ যখন বানানো হয় তখন দু'পাড় থেকে দু'দল লোক পুল তৈরি করে মাঝ গাঙ্গের দিকে রওয়ানা হল। এমনি চৌকশ তাদের হিসেব, এমনি সুনিপুণ তাদের কলকব্জা যে মধ্যিখানে এসে যখন পুলের দু'দিকে জোড়া লাগল তখন দেখা গেল এক ইঞ্চির আঠারো ভাগের উঁচু-নীচুর ফেরফার হয়েছে। তারিফ করবার মত কেরদানী, কোনো সন্দ নেই।

'পক্ষান্তরে আমার স্বর্ণভূমি চীনদেশে কি হয় ? দুদল লোককে এক পাহাড়ের দু'দিকে দেওয়া হয়েছিল সুড়ঙ্গ বানানোর জন্য। এদিক থেকে এনারা যাবেন, ওদিক থেকে ওনারা আসবেন। মধ্যিখানে মিলে গিয়ে খাসা টানেল।

কিন্তু কার্যত হল কি ? দেখা গেল, ডবল সময় চলে গেল তবু মধ্যিখানে দু'দলের দেখা নেই। তারপর এক সুপ্রভাতে দুদল বেরিয়ে এলেন দুদিকে। মধ্যিখানে মেলামেলি, কোলাকুলি হয় নি।'

আমি চোখ টিপে ইশারায় জানালুম, এ কি রঙ্গ বুঝতে পেরেছি।

তিনি বললেন, 'আদপেই না। মার্কিনরা সুনিপুণ, সেই নৈপুণ্যের প্রসাদাৎ তারা পেল কুল্লে একখানা ব্রিজ। আর আমরা পেয়ে গেলুম, দু'খানা টানেল। লাভ কার বেশী হ'ল বল তো!'

তাই বলি অত্যধিক নৈপুণ্য ভালো নয়।

'রেডুক্‌ৎসিয়ো আড্‌ আবসুর্ডুম!'।

ইউরোপে ভারতীয় শাস্ত্র-চর্চা

সুইটজারল্যাণ্ডের মত দেশেও লোকে সংস্কৃত পড়ে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সুইসদের কৌতূহলও আছে—যদি সে দেশে মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ানো হয় ও তাতে সংস্কৃতের অধ্যাপক কুল্লে একজনই। সেই অধ্যাপকটি এসেছেন এদেশে—সেদিন দেখা হল এখানে। অমায়িক লোক, চেহারাটি খাবসুরৎ, ইংরেজি বলেন ভাঙা-চাঙা, নিজের ভুলে নিজেই হেসে ওঠেন। ভারতবর্ষের নীল আকাশ, সোনালি রোদ আর সবুজ ঘাসের যা তারিফ করলেন তা শুনে আমি লাজুক হাসি হেসে 'হ্যাঁ, হ্যাঁ' করে গেলুম, এমনি কায়দায় যেন ওগুলো নিতান্ত আমারই হাতে গড়া, এগজিবিশানে ছেড়েছি, দু'চার পয়সা পেলে বিক্রি করতেও রাজী আছি। সুইটজারল্যাণ্ডের পাল্টা প্রশংসাও করলুম, 'আহা, কী চমৎকার শাদা বরফ, নীল সরোবর আর চকচকে ঝকঝকে বাড়িঘরদোর।' সায়েব হাসিমুখে অনেক ধন্যবাদ দিলেন।

জিজ্ঞেস করলুম, 'সায়েব, তোমার দেশে সংস্কৃত এগোচ্ছে কি রকম?'

সায়েব বললেন, 'মন্দ না, তবে কেতাবপত্রের বড় অভাব। আর সংস্কৃত ক'টা ছেলে পড়ে না-পড়ে সেইটেই তো আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পাঁচজন সুইসের জ্ঞানগম্যি কতটুকু। সুইসরা ভাবে, ভারতবর্ষ দেশটা সাপে বাঘে ভর্তি, মধ্যিখানে হরেকরকমের সাধু-সন্ন্যাসী আর ফকির-বৈরাগী ঘুরে বেড়াচ্ছে—তাদের ঝোলা থেকে হরবকত হরেকরকমের সাপ লাফ দিয়ে দিয়ে বেরোচ্ছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান দেবার মত প্রামাণিক বই কেউ তো লেখে না যেগুলো সাধারণ সুইস পড়তে পারে। ইংরিজি জানে ক'টা সুইস?'

এই খেই ধরে দু'দণ্ড রসালাপ হল।

* * *

গেল শতকের মাঝামাঝি এবং শেষের দিকে বিস্তর ভারতীয় কেতাবপত্রের ইংরিজি, ফরাসী, জর্মন অনুবাদ হয়। ঠিক সেই সময়েই বিজ্ঞানের প্রসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের লোক ক্রমেই ঈশ্বর, ধর্ম এবং পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাস হারাতে থাকে। অথচ গুণী-জ্ঞানীরা জানতেন যে ঈশ্বর ধর্ম আত্মা এসব ব্যাপারে অনেকখানি কুসংস্কার মেশানো থাকলেও সব কিছু 'গাঁজাখুরি' বলে এক ঝটকায় ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায় না, দেওয়া উচিতও নয়। তাই তাঁরা এমন কিছুর সন্ধান করেছিলেন যাতে ঊনবিংশ শতকের 'মুক্ত', 'কুসংস্কারবর্জিত', 'বৈজ্ঞানিক' মনও চরম তত্ত্বের সন্ধান পায়।

তাই বৌদ্ধধর্ম তাদের মনকে বেশ একটা জোর নাড়া দেয়। কারণ, বৌদ্ধ-ধর্মে ভগবানের বালাই নেই, আত্মাটাকে পর্যন্ত কবুল জবাব দেওয়া যায়। ওদিকে ইরানী কবি ওমর খৈয়ামের 'কিস্মৎ' অর্থাৎ অদৃষ্টবাদ ইয়োরোপকে পাগল করে তুলেছে, তাদের সঙ্গে বুদ্ধদেবের 'ধর্মচক্রে'র অলঙ্ঘ্য নিয়মও বেশ খাপ খেয়ে গেল।

পল্লবগ্রাহীরা ওমরকে নিয়ে পড়ে রইল আর যাঁরা 'এহ বাহ্য' জানতেন তাঁরা বৌদ্ধধর্মের খেই ধরে ভারতবর্ষের আর পাঁচটা তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান করতে লাগলেন। উপনিষদ না জেনে বৌদ্ধধর্মের ঐতিহাসিক পটভূমির সঙ্গে পরিচয় হয় না। তাই বিশেষ করে উপনিষদের উত্তম উত্তম অনুবাদ ইংরিজি, ফরাসী, জর্মনে বেরুলো। তারই দু'একখানা 'দ্য লুক্স' সংস্করণ এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে। আর গীতার তো কথাই নেই।

এবং সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, এসব কেতাবপত্র যে পণ্ডিতেরাই পড়লেন তা নয়—সর্বসাধারণের মধ্যে এসব অনুবাদ এবং তাদের নিয়ে গড়ে তোলা মৌলিক বইও ছড়িয়ে পড়ল। জাতকের বিস্তর গল্প কাচ্চাবাচ্চাদের জন্য অনুবাদ করা হল, মাসিকে ধারাবাহিক হয়ে বেরুতে লাগল।

এমন সময় একটা ঘটনা ঘটলো, তার জন্য কে দায়ী তা আমি জানি নে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা তখন ভাবখানা দেখাতে আরম্ভ করলেন যে, এ সব তত্ত্বজ্ঞানের বস্তু সাধারণ লোকের বিদ্যেবুদ্ধির বাইরে। এসব জিনিসপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করবেন গুণী-জ্ঞানীরা, এসব কেতাবপত্রের টীকা-টিপ্পনী লিখবেন যাঁদের 'শাস্ত্রাধিকার' আছে তাঁরাই।

তখন ব্যাপারটা কিসে গিয়ে দাঁড়ালো আমি ঠিক বলতে পারব না, তবে কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, যেসব অনুবাদ বেরোয় তাতে অনুবাদেরচেয়ে টীকাটিপ্পনী বেশী, ফুটনোটে ফুটনোটে ছয়ালপ আর অনুবাদের ভাষাও দিনকে দিন এমনি টেকনিক্যাল এবং 'হিং টিং ছটে' ভর্তি হতে লাগল যে সেগুলো সাধারণ পাঠক আর বুঝতে পারে না!

সর্বজনপাঠ্য যে-সব অনুবাদ আগে বেরোত সেগুলোতে ভুল থাকত বটে এখানে ওখানে, কিন্তু সাধারণ মানুষ সেগুলো অন্তত পড়ত এবং পড়ে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারত। শুধু তাই নয় এমন লোকও আমি চিনি যিনি, বৌদ্ধ দর্শন ও নীতি অতি সামান্য মাত্রায় পড়ে নিয়েই আপন জীবন সেই অনুসারে চালাবার চেষ্টা করেছেন। ধর্মাচরণ তো অভ্রভেদী পাণ্ডিত্যের উপর নির্ভর করে না।

ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষ এবং ভারতীয় শাস্ত্রচর্চার জন্য ইয়োরোপের বহু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়, সেগুলো থেকে প্রতি বৎসর প্রামাণিক অনুবাদ, মূল গ্রন্থ, এমন কি মোটা মোটা ত্রৈমাসিকও বেরুতে লাগল, ইংরিজী, ফরাসী, জর্মন, ইতালীয় রুশ ভাষায়. কিন্তু তার প্রায় সব কটাই এমনি পদ্ধতিতে লেখা এবং তার কায়দা-কেতা এমনি পাকা-পোক্ত যে, তাতে কামড় দিতে হলে পাণ্ডিত্যের লৌহদন্তের প্রয়োজন, সাধারণ মানুষ কামড় দিতে গিয়ে দাঁত হারায়,

হজমের তো কথাই ওঠে না। এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্বজনবোধ্য অনুবাদের বই বেরতে লাগল কম—যা দু'একখানা বেরলো সেগুলে পল ব্রাণ্টনের রগরগে বই কিংবা মিস মেয়োর মত প্রপাগাণ্ডা মেশানো।

ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় আর ওরিয়েণ্টালিস্ট্স্ কনফারেন্সের ভিতর হারেমবন্ধ হলেন।

তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ যখন ইয়োরোপ গেলেন তখন এল এক নূতন জোয়ার। বিশেষ করে, কণ্টিনেণ্টে রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি জানবার জন্য বহু লোকের আগ্রহ দেখা গেল। ফ্রান্সে রেনে গ্রুসের মত লোক আবার চেষ্টা করলেন ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি সাধারণ পাঠকের সামনে তুলে ধরবার জন্য। দু'চারজন পণ্ডিত ব্যক্তিও এ-কর্মে যোগ দিলেন কিন্তু কেন জানি নে, এ আন্দোলন খুব বেশী লোকের ভিতর ছড়াতে পারলো না।

হয়ত ইয়োরোপে তখন যে অশান্তি দেখা দিয়েছিল—কম্যুনিজম নাৎসিজম দুই-ই সে অশান্তির পিছনে ছিল—তার মাঝখানে সাধারণ মানুষ মনস্থির করে কোনো ভালো জিনিসই গ্রহণ করতে পারছিল না? প্রতিদিন নূতন সমস্যা, অস্ত্রবস্ত্রের নূতন নূতন অনটন, চতুর্দিকে পালোয়ানীর পাঁয়তারা কষার হুঙ্কারধ্বনি, এর মাঝখানে মানুষ পড়বেই বা কি, ভাববার সময়ই বা তার কোথায়?

শুধু ভারতীয় সংস্কৃতি নয়, চীনা, আরবী-ফারসী, প্রাচীন মিশর, বাবিলনীয় সর্বপ্রকারের প্রাচ্যদেশীয় সভ্যতা সংস্কৃতির অনুসন্ধান তখনো একেবারে নির্মম ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিতরেই সীমাবদ্ধ। বাইরের লোক তখন প্রাণপণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঠেকাতে ব্যস্ত। অন্য জিনিসের জন্য ফুর্সৎ কই?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধকল কাটতে না কাটতেই এটম বম, চীন, কোরিয়া।

এদিকে ভারতবর্ষ স্বরাজ পেল। দেশ-বিদেশে আমাদের আপন রাজদূতাবাস বসল। অনেকেই আশা করলেন, এইভাবে হয়ত একটা কিছু হবে—কিন্তু সে কাহিনী আরেক দিনের জন্য মুলতুবী রইল।

* * *

ইয়োরোপের উপস্থিত যে উত্তেজনা উন্মাদনা চলেছে তার মাঝখানে ইয়োরোপীয় ছাত্র যখন প্লাতো-আরিস্ততল, কিকেরো-টাকিটুস পড়া ছেড়ে দিয়েছে—ক্লাসিক্স যখন 'নিজ বাসভূমে' মরমর তখন ভরত-শঙ্কর পড়বে কে?

তবু প্রশ্ন থেকে যায়, আমাদের কি নিতান্তই কোনো কিছুই করবার নেই??

চরিত্র পরিচয়

গল্প শুনেছি, ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন আর স্কচ এই চারজনে মিলে একটা চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করল। বন্দোবস্ত হল সবাই কিছু কিছু সঙ্গে নিয়ে আসবেন। ইংরেজ নিয়ে এল বেকন আর আণ্ডা, ফরাসী নিয়ে এল এক বোতল স্যাম্পেন জর্মন নিয়ে এল ডজনখানেক সসেজ, আর স্কচম্যান—? সে সঙ্গে নিয়ে এল

তার ভাইকে।

এ জাতীয় বিস্তর গল্প ইয়োরোপে আছে। স্কচদের সম্বন্ধে গল্প আরম্ভ হলেই মনে মনে প্রত্যাশা করতে পারবেন যে গল্পটার প্রতিপাদ্য বস্তু হবে, হয় স্কচদের হাড়কিপ্‌টেমিগিরি নয় তাদের হুইস্কির প্রতি অত্যধিক দুর্বলতা। ওদিকে আবার বিশ্বসংসার জানে স্কচরা ভয়ঙ্কর গোঁড়া ক্রীশ্চান আর মারাত্মক রকমের নীতিবাগীশ (বঙ্গজ হেরম্ব মৈত্র অতুলনীয়)। তাই এই তিনগুণে মিলে গিয়ে গল্প বেরল ;—

এক স্কচ পাদ্রী এসেছেন লণ্ডনে, দেখা করতে গেছেন তাঁর বন্ধুর সঙ্গে। গিয়ে দেখেন হৈহৈ রৈরৈ, ইলাহি ব্যাপার, পেল্লাই পার্টি, মেয়েমদ্দে গিসগিস করছে। বন্ধুর স্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে কাঁচুমাচু হয়ে পাদ্রীকে অভ্যর্থনা জানালেন। কারণ জানতেন স্কচ পাদ্রীরা এরকম পার্টি পরবের মাতলামো আদপেই পছন্দ করেন না। অথচ ভদ্রতাও রক্ষা করতে হয়, তাই ভয়ে ভয়ে শুধালেন,

'একটুখানি চা খাবেন ?'

পাদ্রী হুঙ্কার দিয়ে বললে, 'নো টী !'

আরো ভয়ে ভয়ে শুধালেন, 'কফি ?'

'নো কফি !'

'কোকো ?'

'নো কোকো !'

ভদ্রমহিলা তখন মরীয়া। মৃদুস্বরে কাতর কণ্ঠে শেষ প্রশ্ন শুধালেন, 'হুইস্কি সোডা ?'

'নো সোডা !'

অথচ কলকাতায় একবার অনুসন্ধান করে আমি খবর পাই, যে সব ব্রিটিশ এদেশে দানখয়রাত করে গিয়েছেন তাঁদের বেশীর ভাগই স্কচ্—ইংরেজের দান অতি নগণ্য। তারপর বিলেতে খবর নিয়ে জানলুম, স্কচরা হুইস্কি খায় কম, বেশীর ভাগ রপ্তানি করে দেয়, আর নিজেরা খায় বিয়ার !

ঠিক সেই রকমই বিশ্বদুনিয়ার বিশ্বাসী ফরাসী জাতটা বড্ডই উচ্ছৃঙ্খল। পঞ্চমকার নিয়ে অষ্টপ্রহর বেএক্তেয়ার। তাই ইংরিজী 'ক্যারিইঙ কোল্ টু নিউ কাসলের' ফরাসী রূপ নাকি 'ক্যারিইঙ এ ওয়াইফ টু প্যারিস'।

এ প্রবাদটি আমি ফরাসী ভাষায় শুনি নি ; শুনেছি ইংরেজের মুখে ইংরেজি ভাষাতে। তাই প্যারিস গিয়ে আমার জানবার বাসনা হল ফরাসীরা সত্যই উপরের প্রবাদবাক্য মেনে চলে কিনা ?

খানিকটা চলে, অস্বীকার করা যায় না। যৌন ব্যাপারে ফরাসীরা বেশ উদার কিন্তু একটা ব্যাপারে দেখলুম তারা ভয়ঙ্কর নীতিবাগীশ। ফষ্টিনষ্টি তারা অনেকখানি বরদাস্ত করে—অবশ্য নিয়ম, সেটা যেন বিয়ের পূর্বে না করে পরেই করা হয়—কিন্তু সেই ফষ্টিনষ্টি যদি এমন চরমে পৌঁছয় যে স্ত্রী স্বামীকে কিংবা স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে চায় তবে ফরাসী মেয়েমদ্দ দু'দলই

চটে যায়। 'পরিবার' নামক প্রতিষ্ঠানটিকে ফরাসী জাত বড়ই সম্ভ্রমের সঙ্গে মেনে চলে। তাই পরকীয়া প্রেম যতই গভীর হোক না কেন তারই ফলে যদি কোনো পরিবার ভেঙে পড়ার উপক্রম করে তবে অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়, নাগর-নাগরী একে অন্যকে ত্যাগ করেছেন।

কাজেই মেনে নিতে হয়, এ-ব্যাপারে ফরাসীদের যথেষ্ট সংযম আছে।

ঈষৎ অবান্তর, তবু হয়ত পাঠক প্রশ্ন শুধাবেন, তাহলে এই যে শুনতে পাই প্যারিসে হরদম ফুর্তি সেটা কি তবে ডাহা মিথ্যে?

নিশ্চয়ই নয়। প্যারিসে ফুর্তির কমতি নেই। কিন্তু সে ফুর্তিটা করে অফরাসীরা। যৌন ব্যাপারে ইংরেজের ভণ্ডামি সকলেই অবগত আছেন—লরেন্স্ সেটা বিশ্বসংসারের কাছে গোপন রাখেন নি। তাই ইংরেজ মোকা পেলেই ছুটে যায় প্যারিসে। পাড়াপ্রতিবেশী তো আর সেখানে সঙ্গে যাবে না—বেশ যাচ্ছেতাই করা যাবে। শুধু ইংরেজ নয়, আরো পাঁচটা জাত আসে, তবে তারা আসে খোলাখুলি সবাসাভাবে—ইংরেজের মত 'ফরাসী আর্ট' দেখার ভান করে না। কোন জর্মনকে যদি বার্লিনে শুনতে পেতুম বলছে, 'ভাই হপ্তাখানেকের জন্য প্যারিস চললুম' তখন সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেতুম আর পাঁচজন মিটমিটিয়ে হাসছে—অবশ্য প্রথম জর্মনও সে হাসিতে যোগ দিতে কসুর করছে না।

তা সে যাই হোক, একটা প্রবাদ আমি বিশ্বাস করি। ফরাসীরা বলে 'পারফিডিয়স অ্যালবিয়ন' অর্থাৎ 'ভণ্ড ইংরেজ'। একটি গল্প শুনুন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগার খবর শুনে এক বুড়ো শিখ মেজর জিজ্ঞেস করলেন, 'কে কার বিরুদ্ধে লড়ছে?'

'ইংরেজ-ফরাসী জর্মনির বিরুদ্ধে।'

সর্দারজী আপসোস করে বললেন, 'ফরাসী হারলে দুনিয়া থেকে সৌন্দর্যের চর্চা উঠে যাবে আর জর্মনি হারলেও বুরি বাৎ, কারণ জ্ঞানবিজ্ঞান কলকৌশল মারা যাবে।' কিন্তু ইংরেজর হারা সম্বন্ধে সর্দারজী চুপ।

'আর যদি ইংরেজ হারে?'

সর্দারজী দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তবে দুনিয়া থেকে বেইমানি লোপ পেয়ে যাবে।'

আড্ডা

আড্ডা সম্বন্ধে সম্প্রতি কয়েকটি উত্তম উত্তম লেখা বাঙলায় বেরনোর পর ইংরিজিতেও দেখলুম আড্ডা হামলা চালিয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপের ভশচায এবং জমিদার-হাবেলির মৌলবী যেন হঠাৎ কোট-পাতলুন-কামিজ পরে গট্‌গট করে স্টেটসম্যান অফিসে ঢুকলেন। আমার তাতে আনন্দই হল।

কিন্তু এ সম্পর্কে একটি বিষয়ে আড্ডার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আড্ডাবাজরা বলতে চান, বাংলার বাইরে নাকি আড্ডা নেই। কথাটা ঠিকও, ভুলও। তুলনা

দিয়ে নিবেদন করছি। সিন্ধুনদ উজিয়ে যে মাছ ধরা পড়ে, তার নাম 'পাল্লা' —অতি উপাদেয় মৎস্য। নর্মদা উজিয়ে ভরোচ শহরে যে মাছ ধরা পড়ে তার নাম 'মাদার'—সেও উপাদেয় মৎস্য। আর গঙ্গা পদ্মা উজিয়ে যে মাছ বাঙালীকে আকুল উতলা করে তোলে, তার নাম ইলিশ—খোট্টা (মাফ কীজীয়ে) মুল্লুকে পেঁছিনর পর তার নাম হয় হিল্‌সা।

উপর্যুক্ত সর্ব মৎস্য একই বস্তু—দেশভেদে ভিন্ন নাম। তফাৎ মাত্র এইটুকু যে সরষে বাটা আর ফালি ফালি কাঁচা লংকা দিয়ে আমরা যে রকম ইলিশ দেবীর পুজো দি বাদবাকীরা ওরকমধারা পারে না। অর্থাৎ আড্ডা বহু দেশেই আছে, শুধু আমাদের মত তরিবৎ করে রসিয়ে রসিয়ে চাখতে তারা জানে না। অপিচ ভুললে চলবে না সিন্ধীরা আমাদের সরষে-ইলিশ খেয়ে নাক সিঁটকে বলেন, 'কী উম্‌দা চীজকে বরবাদ করে দিলে।' ভৃগুকচ্ছের (ভরোচের) মহাজনগণও সিন্ধীর রান্না পাল্লা খেয়ে 'আল্লা আল্লা' বলে রোদন করেন।

কে সূক্ষ্ম নিরপেক্ষ বিচার করবে? এ যে রসবস্তু—এবং আমার মতে ভোজনরস সর্বরসের রসরাজ।

তাই কাইরোর আড্ডাবাজরা বলেন, একমাত্র তাঁরাই নাকি আড্ডা দিতে জানেন।

কাইরোর আড্ডা কক্‌খনো কোনো অবস্থাতেই কারো বাড়িতে বসে না। আড্ডাবাজরা বলেন, তাতে করে আড্ডা নিরপেক্ষতা—কিংবা বলুন গণতন্ত্র—লোপ পায়। কারণ যাঁর বাড়িতে আড্ডা বসলো, তিনি পানটা-আসটা, খিচুড়িটা, ইলিশ-ভাজাটা (আবার ইলিশ! সুশীল পাঠক, ক্ষমা করো। ঐ বস্তুটির প্রতি আমার মরাত্মক দুর্বলতা আছে। বেহেশ্‌তের বর্ণনাতে ইলিশের উল্লেখ নেই বলে পাঁচ-বকৎ নামাজ পড়ে সেথায় যাবার কণামাত্র বাসনা আমার নেই) 'ফিরি' দেন বলে তাঁকে সবাই যেন একটু বড্ড বেশী তোয়াজ করে। আড্ডাগোত্রের মিশরী নিকষ্যি মহাশয়রা বলেন, বাড়ির আড্ডায় 'মেল' মেলে না।

অপিচ, পশ্য পশ্য, কোনো কাফেতে যদি আড্ডা বসে, তবে সেখানে কেউ কাউকে খয়ের খাঁ বানাতে পারে না—যেন পুরীর মন্দির, জাতফাত নেই, সব ভাই, সব বেরাদর।

এবং সব চেয়ে বড় কথা বাড়ির গিন্নী 'মুখপোড়া মিনষেরা ওঠে না কেন' কখনো শুনিয়ে, কখনো আভাসে-ইঙ্গিতে জানিয়ে অকারণে অকালে আড্ডার গলায় ছুরি চালাতে পারেন না। তার চেয়ে দেখো দিকিনি, দিব্যি কাফেতে বসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছ, পছন্দমাফিক মমলেট কটলেট খাচ্ছো, আড্ডা জমজমাট* ভরভরাট, কেউ বাড়ি যাবার নামটি করছে না, কারো গিন্নী এসে উপস্থিত হবেন সে ভয়ও নেই—আর চাই কি?

শতকরা নব্বুই জন কাইরোবাসী আড্ডাবাজ এবং তার দশ আনা পরিমাণ অর্ধেক জীবন কাটায় কাফেতে বসে আড্ডা মেরে। আমাদের আড্ডা বসত 'কাফে দ্য নীল' বা 'নীলনদ কাফেতে'। কফির দাম ছ' পয়সা, ফি পাত্তর। রাবড়ির মত ঘন, কিন্তু দুধ চাইলেই চিত্তির। সবাই কালো কফি খায়, তাই দুধের কোনো ব্যবস্থা নেই। কিছু ঘাবড়াবেন না, দু'দিনেই অভ্যাস হয়ে যায়।

কালো কফি খেলে রঙভী ফর্সা হয়।

আমাদের আড্ডাটা বসত কাফের উত্তর-পূর্ব কোণে, কাউন্টারের গা ঘেঁষে। হরেক জাতের চিড়িয়া সে আড্ডায় হরবকৎ মৌজুদ থাকত। রমজান বে আর সজ্জাদ এফেন্দি খাঁটি মিশরী মুসলমান, ওয়াহহাব আতিয়া কপ্ট ক্রীশ্চান অর্থাৎ ততোধিক খাঁটি মিশরী, কারণ, তার শরীরে রয়েছে ফারাওদের রক্ত। জুর্নো ফরাসী কিন্তু ক'পুরুষ ধরে 'কাইরোর হাওয়া বিষাক্ত করছে' কেউ জানে না, অতি উত্তম আরবী কবিতা লেখে আর সে কবিতার আসল বক্তব্য হচ্ছে, সে তলওয়ার চালিয়ে আড়াই ডজন বেদুইনকে ঘায়েল করে প্রিয়াকে উটের উপর তুলে মরুভূমির দিগদিগন্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, যদিও আমরা সবাই জানতুম, জুর্নো যেটুকু মরুভূমি দেখেছে সে পিরামিডে বেড়াতে গিয়ে, তাও জীবনে একবার মাত্র, যদিও পিরামিড কাইরো থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে। উট কখনো চড়ে নি, ট্রামের ঝাঁকুনিতেই বমি করে ফেলে। আর তলওয়ার? তওবা, তওবা! মার্কোস জাতে গ্রীক, বেশী নয় কুল্লে আড়াই হাজার বৎসর ধরে তারা মিশরে আছে। মিশর রাণী, গ্রীক রমণী ক্লিয়োপাত্রার সঙ্গে তার নাকি খেশকুটুম্বিতা আছে। হবেও বা, কারণ প্রায়ই ব্যবসাতে দাঁও মেরেছে বলে ফালতো এবং 'ফিরি' এক রোঁদ কফি খাইয়ে দিত। তাতে করে কাফের 'গণতন্ত্র' ক্ষুণ্ণ হত না, কারণ মার্কোসকে 'কাট্যা ফালাইলে'ও আড্ডার ঝগড়া-কাজিয়ায় সে কস্মিনকালেও হিস্যা নিত না; বেশীর ভাগ সময় চেয়ারের হেলানে মাথা রেখে আকাশের দিকে হাঁ করে ঘুমুতো কিংবা খবরের কাগজ থেকে তুলোর ফটকা বাজারের তেজি-মন্দির (বুল এ্যাণ্ড বিয়ার) হালহকিকৎ মুখস্থ করতো।

আর বাঙলা দেশের তাবৎ চণ্ডীমণ্ডপ, বেবাক জমিদার-হাবেলীর আড্ডার প্রতিভূ হিসেবে আপনাদের আশীর্বাদে আর শ্রীগুরুর কৃপায় ধূলির ধূলি এ-অধম।

আমার বাড়ির নিতান্ত গা ঘেঁষে বলে নিছক কফি পানার্থে ঐ কাফেতে আমি রোজ সকাল-সন্ধ্যা যেতুম। বিদেশ-বিভূঁই, কাউকে বড় একটা চিনি নে, ছন্নের মত হেথা-হোথা ঘুরে বেড়াই আর দেশভ্রমণ যে কি রকম পীড়াদায়ক 'প্রতিষ্ঠান' সে সম্বন্ধে একখানা প্রামাণিক কেতাব লিখব বলে মনে মনে পায়তারা কষি। এমন সময় হঠাৎ খেয়াল গেল কাফের কোণের আড্ডাটির দিকে। লক্ষ্য করি নি যে কফি-পানটা ওদের নিতান্ত গৌণকর্ম, ওরা আসলে আড্ডাবাজ।

আম্মো যে আড্ডাবাজ সে তত্ত্বটা ওদেরও মনে ঝিলিক দিয়ে গেল একই ব্রাহ্মমুহূর্তে। সে 'মহালগনে'র বর্ণনা আমি আর কি দেব? সুরসিক পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো শ্রীহরি শ্রীরাধাতে, ইউসুফ জোলেখাতে, লায়লী মজনুতে, খ্রিস্তান ইজোল্‌দেতে কি করে প্রথম চারি চক্ষু বিনিময় হয়েছিল। কী ব্যাকুলতা, কী গভীরা তৃষা, কী মহা ভবিষ্যতের প্রগাঢ় সুখস্বপ্ন, কী মরুতীর পার হয়ে সুধাশ্যামলিম নীলাম্বুজে অবগাহনানন্দ সে দৃষ্টি-বিনিময়ে ছিল। এক ফরাসী কবি বলেছেন, 'প্রেমের সব চেয়ে মহান দিবস সেদিন, যেদিন প্রথম বলেছিলুম, আমি তোমাকে ভালোবাসি।' তত্ত্বটা হৃদয়ঙ্গম হয় সেই ব্রাহ্ম

মুহূর্তে।

তাবা-তুলসী-গঙ্গাজল নিয়ে আসুন, স্পর্শ করে বলব, তিন লহমাও লাগে নি, এই ব্রাত্যের উপনয়ন হয়ে গেল, বেদ শাখা ঋষি স্থির হয়ে গেলেন—সোজা বাঙলায় বলে, জাতে উঠে গেলুম। অমিয়া ছানিয়া, নয়ন হানিয়া বললুম, 'এক রৌদ কফি ?'

আড্ডার মেম্বররা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে পরিতোষের স্মিতহাস্য বিকশিত করলেন। ভাবখানা, ভুল লোককে বাছা হয় নি।

কাফের ছোকরাটা পর্যন্ত ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছে। আমার ছন্নছাড়া ভাবটা তার চোখে বহু পূর্বেই ধরা পড়েছিল। রৌদ পরিবেশন করার সময় নীলনদ-ডেল্টার মত মুখ হাঁ করে হেসে আমি যে অতিশয় ভদ্রলোক—অর্থাৎ জোর টিপ্‌স্‌ দি—সে কথাটা বলে আড্ডার সামনে আমার কেস রেকমেণ্ড করলো।

জুর্নো তাড়া লাগিয়ে বললেন, 'যা, যা, ছোঁড়া মেলা জ্যাঠামো করিস নে।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খাসা আরবী বলেন আপনি।'

রবিঠাকুর বলেছেন—

'এত বলি সিক্তপক্ষ্ম দুটি চক্ষু দিয়া
সমস্ত লাঞ্ছনা যেন লইল মুছিয়া
বিদেশীর অঙ্গ হতে—'

ঠিক সেই ধরনে আমার দিকে তাকিয়ে জুর্নো যেন আমার প্রবাস-লাঞ্ছনা এক থাবড়ায় ঝেড়ে ফেললেন, আমার অঙ্গ থেকে।

আমি কিন্তু মনে মনে বললুম, 'ইয়া আল্লা, তেরো দিনের আরবীকে যদি এরা বলে খাসা তবে এরা নিশ্চয়ই খানদানী মনিষ্যি।' করজোড়ে বললুম, 'ভারতবর্ষের নীতি, সত্য বলবে, প্রিয় বলবে, অপ্রিয় সত্য বলবে না ; আপনাদের নীতি দেখছি আরো এক কদম এগিয়ে গিয়েছে, প্রিয় অসত্যও বলবে।'

আড্ডা তো—পার্লিমেণ্ট নয় তাই হরবকৎ কথার পিঠে কথা চলবে এমন কোনো কসমাদিব্যি নেই। দুম্‌ করে রমজান বে বললে, 'আমার মামা (আমি মনে মনে বললুম, 'যগাদাসের মামা') হজ করতে গিয়েছিলেন আর বছর। সেখানে জনকয়েক ভারতীয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তারা নাকি পাঁচ বকৎ নামাজ পড়ত আর বাদবাকী তামাম দিনরাত এক চায়ের দোকানে বসে কিচিরমিচির করত। তবে তারা নাকি কোন্‌ এক প্রদেশের—বিঙ্গালা, বাঙালী—কি যেন—আমার ঠিক মনে নেই—'

উৎসাহে উত্তেজনায় ফেটে গিয়ে চৌচির হয়ে আমি শুধালুম, 'বাঙালা ?'

'হাঁ, হাঁ।'

আমি চোখ বন্ধ করে ভাবলুম, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম বাঙালী। কিন্তু কই, কখনো তো এত গর্ব অনুভব করি নি যে, আমি বাঙালী। এই যে নমস্য মহাজনরা মক্কা শহরে আড্ডাবাজ হিসেবে নাম করতে পেরেছেন—নিশ্চয়ই বিস্তর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে—তাঁরা আলবৎ শ্রীহট্ট, নোয়াখালি, চাটগাঁ, কাছাড়ের বাঙালী খালাসী, পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা নগরীর উপকণ্ঠে

খিদিরপুরে আড্ডা মারতে শিখে 'হেলায় লঙ্কা করিলা জয়'।

আস্তে আস্তে চেয়ার থেকে উঠে ডান হাত বুকের উপর রেখে মাথা নিচু করে অতিশয় সবিনয় কণ্ঠে বললুম, 'আমি বাঙালী।'

গ্রীক সদস্য মার্কোস প্রথম পরিচয়ের সময় একবার মাত্র 'সালাম আলাইক্' করে খবরের কাগজের পিছনে ডুব মেরেছিলেন। তাঁর কানে কিছু যাচ্ছিল কি না জানি নে। আমি ভাবলুম, রাশভারী লোক, হয়ত ভাবছেন, নূতন মেম্বার হলেই তাঁকে নূতন জামাইয়ের মত কাঁধে তুলে ধেই ধেই করেই নাচতে হবে একথা আড্ডার কন্‌স্‌টিট্যুশানে লেখে না। মুখের উপর থেকে খবরের কাগজ সরিয়ে বললেন, 'দাঁও মেরেছি। একটা শ্যাম্পেন হবে? আমাদের নূতন মেম্বর—।' কাউণ্টারের পিছনে দাঁড়িয়েছিল মালিক; তার দিকে তাকিয়ে বাঁ হাত গোল করে বোতল ধরার মুদ্রা দেখিয়ে ডান হাত দিয়ে দেখালেন ফোয়ারার জল লাফানোর মুদ্রা। ম্যানেজার কুল্লে দুই ডিগ্রী কাৎ করে ঘাড় নাড়ল।

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'এ দোকানে তো মদ বেচার লাইসেন্স নেই।'

মার্কোস বললেন, 'কাফের পেছনে, তার ড্রইংরুমে। ব্যাটা সব বেচে;—আফিম, ককেইন, হেরোইন, হশীশ যা চাও।'

ছোকরাকে বললেন, 'আর একটা তামাকও সাজিস।'

বলে কি? কাইরোতে তামাক! স্বপ্ন নু মায়া নু মতিভ্রম নু?

দিব্যি ফর্শী হুঁকো এল। তবে হনুমানের ন্যাজের মত সাড়ে তিনগজী দরবারি নল নয় আর সমস্ত জিনিসটার গঠন কেমন যেন ভোঁতা ভোঁতা। জরির কাজ করা আমাদের ফর্শী কেমন যেন একটু 'নাজুক', মোলায়েম হয়—এদের যেন একটু গাঁইয়া। তবে হ্যাঁ, চিলিমটা দেখে ভক্তি হল—ইয়া ডাবর পরিমাণ। একপো তামাক হেসেখেলে তার ভিতর থানা গাড়তে পারে—তাওয়াও আছে। আগুনের বেলা অবিশ্যি আমি টিকের ধিকিধিকি গোলাপী গরম প্রত্যাশা করি নি, কারণ কাবুলেও দেখেছি টিকে বানাবার গুহ্যতথ্য সেখানকার রসিকরাও জানেন না।

আর যা খুশবাই বেরল তার রেশ দীর্ঘ চৌদ্দ বছর পরও যেন আমার নাকে লেগে আছে।

পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো সুগন্ধী ইজিপশিয়ন সিগারেট ভুবনবিখ্যাত। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছ বিশেষ করে মিশরই সুগন্ধী সিগারেট তরিবৎ করে বানাতে শিখল কি করে? আইস, সে সম্বন্ধে ঈষৎ গবেষণা করা যাক। এই সিগারেট বানানোর পিছনে বিস্তর ইতিহাস, এন্তার রাজনীতি এবং দেদার রসায়নশাস্ত্র লুক্কায়িত রয়েছে।

সিগারেটের জন্য ভালো তামাক জন্মায় তিন দেশে। আমেরিকার ভার্জিনিয়াতে, গ্রীসের মেসেডোন অঞ্চলে এবং রুশের কৃষ্ণসাগরের পারে পারে। ভারতবর্ষ প্রধানত ভার্জিনিয়া খায়, কিছুটা গ্রীক, কিন্তু এই গ্রীক তামাক এদেশে টার্কিশ এবং ইজিপশিয়ন নামে প্রচলিত। তার কারণ একদা গ্রীসের উপর আধিপত্য করতো তুর্কী এবং তুর্কী গ্রীসের বেবাক তামাক ইস্তাম্বুলে নিয়ে এসে

কাগজে পেঁচিয়ে সিগারেট বানাত। মিশরও তখন তুর্কীর কব্জাতে, তাই তুর্কীর কর্তারা কিছুটা তামাক মিশরে পাঠাতেন। মিশরের কারিগররা সেই গ্রীক তামাকের সঙ্গে খাঁটি মিশরের খুশবাই মাখিয়ে দিয়ে যে অনবদ্য রসনলী নির্মাণ করলেন তারই নাম ইজিপশিয়ন সিগারেটে।

নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন চায়ের টিন যদি রান্নাঘরে ভালো করে বন্ধ না রাখা হয়, তবে ফোঁড়নের ঝাঁঝে চা বরবাদ হয়ে যায়, অর্থাৎ আর কিছু না হোক খুশবাইটি আঁতুড়ঘরে নুন-খাওয়ানো বাচ্চার মত প্রাণত্যাগ করে। মালজাহাজ লাদাই করা যে অপিসারের কর্ম তিনিও বিলক্ষণ জানেন, যে-জাহাজে কাঁচা তামাক লাদাই করা হয়েছে তাতে কড়া গন্ধওলা অন্য কোনো মাল নেওয়া হয় না—পাছে তামাকের গন্ধ এবং কিঞ্চিৎ স্বাদও নষ্ট হয়ে যায়।

তাই তামাকের স্বাদ নষ্ট না করে সিগারেটকে খুশবাইয়ে মজানো অতীব কঠিন কর্ম। সিগারেটে একফোঁটা ইউকেলিপ্‌টস তেল ঢেলে সেই সিগারেট ফুঁকে দেখুন, একফোঁটা তেল আস্ত সিগারেট একদম বরবাদ করে দিয়েছে। পাঁচ বছরের বাচ্চাও তখন সে সিগারেট না কেশে অনায়াসে ভস্ ভস্ করে ফুঁকে যেতে পারে (বস্তুত বড্ড বেশি ভেজা সর্দি হলে অনেকে এই পদ্ধতিতে ইউকেলিপ্‌টস্ সেবন করে থাকেন—যাঁরা সিগারেট সইতে পারেন না তাঁরা পর্যন্ত)।

বরঞ্চ এমন গুণী আছেন যিনি এটম বমের মাল-মসলা মেশানোর হাড়হদ্দ হালহকিকৎ জানেন, কিন্তু তামাকের সঙ্গে খুশবাই! তার পিছনে রয়েছে গূঢ়তর, রহস্যাবৃত ইন্দ্রজাল।

কিচ্ছু বাড়িয়ে বলছি নে। অজন্তার দেওয়াল এবং ছবির রঙ কোন্ কোন্ মসলা দিয়ে বানানো হয়েছিল, পাঠানযুগে পাথরে পাথরে জোড়া দেবার জন্য কি মাল কোন্ পরিমাণে লাগানো হয়েছিল আমরা সে তত্ত্বগুলো মাথা খুঁড়েও বের করতে পারি নি এবং পারে নি বিশ্বসংসার বের করতে কি কৌশলে, কি মসলা দিয়ে মিশরীরা তাদের মমীগুলোকে পচার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

স্বীকার করি, মিশরীরাই একদিন সে কায়দা ভুলে মেরে দিয়েছিল—পাঠান-মোগল যুগে যে রকম আমাদের অনেকখানি রসায়নবিদ্যা অনাদরে লোপ পায়। তবু তো আমরা আজও মকরধ্বজ, চ্যবনপ্রাশ বানাতে পারি—ভেজাল তো শুরু হল মাত্র সেদিন, আমাদেরই চশমার সামনে।

মিশরীরাও ঠিক সেই রকম সুগন্ধ-তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভুলে যায় নি। ঝড়তি-পড়তি যেটুকু এলেম তখনো তাদের পেটে ছিল তাই দিয়ে তারা সেই সমস্যা সমাধান করলো, তামাকে কি করে খুশবাই জোড়া যায়, তামাকের 'সোয়াদ'টি জখম না করে।

তাই যখন কোনো ডাকসাঁইটে তামাক কদরদারের (হায়! এ গোত্র পৃথিবীর সর্বত্র কি কাবুল, কি দিল্লী, কি কাইরো—সুকুমারের ভাষায় বলি—হুশ হুশ করে মরে যাচ্ছে) তদারকিতে কাইরোর কাফেতে তামাক সাজা হয় এবং সেই কদরদার যখন সে তামাকের নীলাভ ধুঁয়োটি ফুরফুর করে নাকের ভিতর দিয়ে

ছাড়েন এবং নীলনদের মন্দমধুর ঠাণ্ডা হাওয়া যখন সেই ধুঁয়োটির সঙ্গে রসকেলি করে তাকে ছিন্নভিন্ন করে কাফের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়, তখন রাস্তার লোক পর্যন্ত উন্নাসিক হয়ে থমকে দাঁড়ায়, পাঁড় সিগারখেকো, পাইকারি সিগারেটফোঁকা পর্যন্ত বুকের উপর হাত রেখে আসমানের দিকে তাকিয়ে 'অলহমদুলিল্লা' (খুদাতালার তারিফ) বলে।

আর ইলিশের বেলা যে-রকম হয়েছিল, এ অধম ঠিক সেই রকম তাজ্জব মানে, বেহশতের বর্ণনায় এ তামাকের বয়ান নেই কেন ? তা হলে পাপ করে নরকে যেত কোন্ মূর্খ ?

বাঙালী তার চুলটিকে কেতাদুরস্ত করে রাখতে ভালোবাসে, কাবুলী বেলা-অবেলা মোকা পেলেই তার পায়জারে গুটিকয়েক পেরেক ঠুকিয়ে নেয়, ইংরেজ আয়না সামনে পেলেই টাইটা ঠিক মধ্যিখানে আছে কি না তার তদারকিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, পেশাওয়ারী পাঠানের প্রধান শিরঃপীড়া তার শিরাভরণ নিয়ে, আর মিশরীর চরম দুর্বলতা তার জুতো জোড়াটিকে 'বালিশ' (আরবী ভাষায় 'প' অক্ষর নেই, তাই ইংরিজি 'পালিশ' কথাটা মিশরীতে 'বালিশ' রূপ ধারণ করেছে) রাখার জন্যে।

অতএব কাফেতে ঢোকামাত্রই কাফের 'বুৎ-বালিশ' (অর্থাৎ বুট পালিশ করনেওলা) ছোকরা এসে আপনাকে সেলাম ঠুকবে। আপনি তাকে বিলক্ষণ চেনেন, তাই দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলবেন, 'যা, যা'—তার অর্থ 'আচ্ছা পালিশ কর।' সে বত্রিশখানা ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে আপনার 'বুৎ-বালিশ' কর্মে নিযুক্ত হবে।

সদস্যদের কেউ বলবেন, 'শুভ দিবস' কেউ 'এই যে', কেউ একটু মৃদু হাস্য করবেন, আর কেউ মুখ খবরের কাগজের আড়ালে রেখেই কাগজখানা ঈষৎ দুলিয়ে দেবেন। ইতিমধ্যে আপনার কফি এসে উপস্থিত। ওয়েটার ঠিক জানে, আপনি কতটা কড়া, কতখানি চিনি আর কোন্ ঢঙের পেয়ালার কফি খেতে পছন্দ করেন। আপনি বলবেন, 'চিঠিপত্র নেই ?'

অর্থাৎ গৃহিণীর ভয়ে আপনি প্রিয়াকে কাফের ঠিকানা দিয়েছেন।

জিজ্ঞেস করলেন, 'ফোন ?'

'আজ্ঞে না। তবে ইউসুফ বে আপনাকে বলতে বলেছেন, তিনি একটু দেরিতে আসবেন। আপনি যেন না যান।'

'চুলোয় যাক গে ইউসুফ বে। আমি জিজ্ঞেস করছি, চিঠি বা ফোন নেই ?'

কাঁচুমাচু হয়ে বললে, 'আজ্ঞে না।' জানে আজ আপনি দরাজ হাতে বখশিশ দেবেন না।

'যাও, চিঠির কাগজ নিয়ে এস !'

কাফের নাম-ঠিকানা-লেখা উত্তম চিঠির কাগজ, খাম, ব্লটিং প্যাড যাবতীয় সাজসরঞ্জাম এক মিনিটের ভিতর উপস্থিত হবে। আপনি পাশের টেবিলে গিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে প্রেমপত্র লিখে যখন ঘণ্টাখানেক পরে আড্ডার টেবিলে ফিরে ওয়েটারকে বলবেন, চিঠিটা ডাকে ফেলতে, তখন হঠাৎ রমজান বে শুধাবে,

'কাকে লিখলে ?' যেন কিছুই জানে না।

চটে গিয়ে বলবেন, 'তোমার তাতে কি ?'

রমজান বে উদাস সুরে বলবে, 'না, আমার তাতে কি। তবু বলছিলুম, সকালে বিল্‌কিসের সঙ্গে দেখা। সে তোমাকে বলে দিতে বললে, তুমি যেন সাড়ে এগারোটায় "ফামিনা" সিনেমার গেটে তাঁর সঙ্গে দেখা করো।'

আরো চটে গিয়ে বলবেন, 'তাহলে এতক্ষণ ধরে সেটা বলো নি কেন ?'

'সাড়ে এগারোটা বাজতে তো এখনো অনেক দেরি।'

'আঃ, সে কথা হচ্ছে না। আমি যে মিছিমিছি এক ঘণ্টা ধরে চিঠিটা লিখলুম।'

রমজান বে আরো উদাস সুরে বলবে, 'জানি নে, ভাই, তোমাদের দেশে প্রেমের রেওয়াজ কি। এদেশে তো জানি, প্রিয়া পাশের ঘরে, আর এ-ঘরে বসে প্রেমিক পাতার পর পাতা প্রেমপত্র লিখে যাচ্ছেন।'

এতক্ষণ একটা মুখরোচক আলোচনার বিষয়বস্তু উপস্থিত হল। রেশনশপ খোলা মাত্রই মেয়ে-মদ্দে যে রকম দোকানের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তামাম আড্ডা ঠিক সেই রকম প্রেমপত্র লেখার সময়-অসময়, মোকা-বে-মোকা, কায়দা-কেতা সম্বন্ধে আলোচনা জুড়ে দেবে।

ক্রমে ক্রমে আলোচনার বিষয়বস্তু হটতে হটতে পৌঁছবে সেই সনাতন প্রশ্নে, কোন্ দেশের রমণী সব চেয়ে সুন্দরী হয়।

অবান্তর নয়, তাই নিবেদন করি, দেশ-বিদেশ ঘুরেছি, অর্থাৎ ভ্যাগাবণ্ড হিসাবে আমার ঈষৎ বদনাম আছে। কাজেই আমাকে কেউ শুধান, কোন্ দেশের রান্না সবচেয়ে ভাল, কেউ শুধান, তুলনাত্মক কাব্যচর্চার জন্য কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশস্ততম, আর অধিকাংশ শুধান, কোন্ দেশের রমণী সব চেয়ে সুন্দরী ?

আমি কলির পরশুরামের স্মরণে উত্তর দি, 'এনারা আছেন, ওনারাও আছেন।' কারণ যাঁরা দেশ-বিদেশ ঘোরেন নি, তাঁদের সঙ্গে এ-আলোচনাটা দানা বাঁধে না, বড্ড একতরফা বক্তৃতার মত হয়ে যায়, আর সবাই জানেন, বক্তৃতা আড্ডার সব চেয়ে ডাঙর দুশমন।

এ সংসারে যদি কোনো শহরের সত্যকার হক্ক থাকে, উপযুক্ত প্রাণাভিরাম বিষয় নিয়ে আলোচনা করার তবে কসম খেয়ে বলতে পারি, সে শহর কাইরো। কারণ কাইরোতে খাঁটি বাসিন্দারূপে যুগ যুগ ধরে আছে গ্রীক, আরব, তুর্কী, হাবশী, সুদানী, ইতালীয়, ফরাসিস, ইহুদী এবং আরো বিস্তর চিড়িয়া। এদের কেউ কেউ বোরকা পরেন বটে, তবু অক্লেশে বলা যেতে পারে, কাফের দরজার দিকে মুখ করে বসে, আড্ডা অনায়াসে নিজের মুখে ঝাল খেয়ে নিতে পারে।

আর শীতকাল হলে তো পোয়া বারো। কাইরোতে বছরে আড়াই ফোঁটা বৃষ্টি হয়, সাহারার শুকনো হাওয়া যক্ষ্মারোগ সারিয়ে দেয়, পিরামিড কাইরোর বাইরেই ঠায় বসে, ফুর্তি-ফার্তির নামে কাইরো বে-এক্তিয়ার, মসজিদ-কবর কাইরো শহরে বে-শুমার, শীতকালে না-গরম-না-ঠাণ্ডা আবহাওয়া, সবসুদ্ধ জড়িয়ে মড়িয়ে

কাইরো টুরিস্টজনের ভূস্বর্গ এবং টুরিস্টাদেরও বটে।

তদুপরি মার্কিন লক্ষপতিরা আসেন নানা ধান্দায়। তাঁদের সন্ধানে আসেন তাবৎ দুনিয়ার ডাকসাইটে সুন্দরীরা। তাঁদের সন্ধানে আসেন হলিউডের ডিরেক্টররা এবং তাঁরা সঙ্গে নিয়ে আসেন আরেক ঝাঁক সুন্দরী।

কিন্তু থাক্ সুশীল পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো, কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধে আলোচনা শাস্ত্রে নিষেধ। গুরুর বারণ।

* * *

মিশরী আড্ডাবাজরা (দাঁড়ান, ব্যাকরণে ভুল হয়ে গেল, মিশরী মাত্রই আড্ডাবাজ: এমন কি সাদ্ জগলুল্ পাশা পর্যন্ত দিনে অন্তত একবার আড্ডার সন্ধানে বেরতেন। তবে, হাঁ, তিনি কোনো টেবিলে গিয়ে বসলে কেউ সাহস করে সে টেবিলের ত্রিসীমানায় ঘেঁষত না। সেখান থেকে তিনি চোখের ইশারায় এঁকে ওঁকে তাঁকে ডেকে নিয়ে আড্ডা জমাতেন) দৈবাৎ একই আড্ডায় জীবন কাটান। বিষয়টা সবিস্তর বুঝিয়ে বলতে হয়।

এই মনে করুন, আপনি রোজ আপিস ফেরার পথে 'কাফে দ্য নীলের' উত্তর-পূব কোণে বসেন। সেই টেবিলটায় আপনার জন-পাঁচেক দোস্ত বসেন। আড্ডার ফুল স্ট্রেন্থ্ জন দশ—সবাই কিন্তু সব দিন এ আড্ডাতেই আসেন না। তাই হরে-দরে আপনার টেবিলে জন পাঁচ-সাত নিয়মিত উপস্থিত থাকেন।

এ ছাড়া আপনি সপ্তাহে একদিন—জোর দু'দিন, বাড়ির পাশের সেমিরামিস কাফেতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বসেন। এ আড্ডার সদস্যরা কিন্তু আপনার 'কাফে দ্য নীলের' সদস্যদের বিলকুল চেনেন না। এরা হয়ত চ্যাংড়ার দল, কলেজে পড়ে, কেরানীগিরি করে, বেকার, কিংবা ইনশিওরেন্স এজেন্ট (তার অর্থও বেকার)। এদের আলোচনার বিষয়বস্তু রাজনীতি, অর্থাৎ কোন্ পাশার কউ কোন্ মিনিস্টারের সঙ্গে পরকীয় করেন বলে তাঁর বোনপো পার্টিতে ভালো নোকরি পেয়ে গেল, কিংবা আলোচনার বিষয়বস্তু সাহিত্য, অর্থাৎ কোন প্রকাশক এক হাজারের নাম করে তিন হাজার ছাপিয়ে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিয়েছে। তা ছাড়া অবশ্যই দুনিয়ার হাজারো জিনিস নিয়ে আলোচনা হয়, তা না হলে আড্ডা হবে কেন। এ আড্ডার সদস্যদের সবাই সবজান্তা। এরা মিশর তথা তাবৎ দুনিয়ার এত সব গুহ্য এবং গরম গরম খবর রাখেন যে এদের কথাবার্তা, হাবভাব দেখে আপনার মনে কোনো সন্দেহ থাকবে না যে এদের প্রত্যেকের চোখের সামনে এক অদৃশ্য, অশ্রুত টেলিপ্রিন্টার খবর জানিয়ে যাচ্ছে এবং সে খবরের যোগান দিচ্ছেন রাশার বেরিয়া, জর্মনির হিমলার আর কলকাতার টেগার্ট। রোজ বাড়ি ফেরার সময় আপনি তাজ্জব মানবেন, এদের সাহায্য ছাড়া মিশর তথা দুনিয়ার বাদবাকী সরকারগুলো চলছে কি করে। আপনার মনে আর কোনো সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকবে না যে, এদের যদি মস্কো, বার্লিন, লণ্ডন, দিল্লীর বড়কর্তা বানিয়ে দেওয়া হয়, তবে দুনিয়ায় কুল্লে সমস্যার সাকুল্য সমাধান এক লহমায়ই হয়ে যাবে। মনে মনে বললেন, 'হায়, দুনিয়া, তুমি জানছো না তুমি কি হারাচ্ছো।'

আপনি এদের চেয়ে বছর দশেক বড়, তাই এরা আপনাকে একটুখানি সমীহ করে, যদিও আড় না হয়েই বিড়ি টানে। কারণ এদেশে সে রেওয়াজটা তেমন নেই। আপনি নিতান্ত বিদেশী বলেই এ আড্ডায় ছিটকে এসে পড়েছেন। এদের কাউকে পয়লা আড্ডায় নিয়ে গিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি নিয়ে গিয়েছিলুম ; বেচারী সেখানে রা'টি কাড়ে নি যদ্যপি দুসরা আড্ডাতে সে-ই তড়পাতো সব চেয়ে বেশী।

তা ছাড়া আপনি মাসে এক দিন কিংবা দু দিন শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা কাফেতে যান। আপনার এক বন্ধু সে কাফেটারই উপরতলায় থাকেন। খাসা জায়গায়—সামনেই নীল নদ বয়ে যাচ্ছে। আপনারই বন্ধু এখানকার এ-আড্ডার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে প্রথম খুঁজবেন কাফেতে—সেখানে না পেলে অবশ্য তাঁর ফ্ল্যাটে যেতে পারেন, তাতে কিন্তু কোনো লাভ নেই।

এ কাফে আপনাকে উদ্বাহু হয়ে অভ্যর্থনা করবে যেন আপনি অনেক দিনের হারিয়ে-যাওয়া ফিরে-পাওয়া ভাই। কারণ আপনি এখানে আসেন কালে-ভদ্রে। আপনাকে পেয়ে এঁদের বিশেষ আনন্দ কারণ পক্ষাধিক কাল ধরে তাঁরা যে সব বিষয় কেটেকুটে ঘষে পিষে চাটনি বানিয়ে ফেলেছিলেন সেগুলো তাঁরা নূতন করে হাড়কাটে ঢুকিয়ে রাম দা' ওঁচাবেন। আপনার রায় জানতে চাইবেন। যে রায়ই দিন না কেন আপনার উদ্ধার নেই। আপনি যদিও গাঁধীর দেশের লোক—আপনি অবশ্য একশ' বার ওঁদের বলেছেন যে, গাঁধীর সঙ্গে আপনার কোনো প্রকারে সাক্ষাৎ যোগাযোগ নেই, কিন্তু তাতে করে কোনো ফায়দা ওৎরায় না—যদিও আপনার জ্ঞানগম্যিতে কারো কোনো সন্দেহ নেই, কারণ আপনি গুহ্য ষষ্ঠেন্দ্রিয় ধারণ করেন ইত্যাদি ইত্যাদি তবু স্বীকার করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপনি নির্ঘাৎ শেষ বাস্ মিস করবেন। বন্ধুর ফ্ল্যাটে সোফার উপর চতুর্থ যাম যাপন করে পরদিন সকাল বেলা বাড়ি ফিরবেন।

ধূপ-ছায়া

জাহাজে শেষ রাত্রি। পরদিন ভেনিস পৌঁছব।

তিনদিন ধ'রে কারো মুখে আর কোনো কথা নেই—শেষ রাত্রে যে জহুর ফ্যান্সি বল হবে তাই নিয়ে সুবো-শাম জল্পনা-কল্পনা! মহিলারা কে কি পরবেন তাই ভেবে ভেবে আকুল হয়ে উঠেছেন কিন্তু কে কোন্ বেশ ধরবেন সে কথা একে অন্যের কাছ থেকে একদম চেপে যাচ্ছেন। নিতান্ত বিপদে পড়লে তবু বরঞ্চ কোনো পুরুষের শরণাপন্ন হওয়া যায় কিন্তু স্ত্রীলোক?—নৈব নৈব চ। বুঝলুম, আমাদের দেশে ভুল বলে না, 'বরঞ্চ যমের হাতে স্বামীকে তুলে দেব তবু সতীনের কোলে নয়'। এস্থলে বরঞ্চ অপরিচিত, অর্ধপরিচিত হুলোর সাহায্য কবুল, তবু কোনো মেনির ছায়া মাড়াব না।

আমি নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, বয়সে চ্যাংড়া, চব্বিশ হয় কি না হয়। ভয়ে কারোর

সঙ্গে কথা কই নে, পাছে এটিকেটের ব্যাকরণ-ভুল হয়ে যায়। আমার কেবিনে —বিবেচনা করুন খুদ কেবিনে, 'ডেকে' না, 'লাউঞ্জে' না—এক গরবিনী ফরাসিনী ভামিনী এসে উপস্থিত, 'মসিয়ো, তিন সত্যি দাও, কাউকে বলবে না, তোমাকে যা বলতে যাচ্ছি।'

বাপ মা আদর করে বলতেন আমার নাকি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। আমি বিলক্ষণ জানি, আমার বর্ণ কি? আমারই এক বন্ধু আমার রঙ দেখিয়ে দোকানদারকে বলেছিলেন, ঐ রঙের বুট-পলিশ দিতে। লজ্জায় সেই বর্ণ টিকেয় আগুন ধরার রঙ চড়ালো। সাত বার খাবি খেয়ে বললুম, 'ইয়েস, ইয়েস, উই, উই, উই; বিলক্ষণ, বিলক্ষণ!'

বললেন, 'আপনার সিল্কের পাগড়িটা এক রাত্রের মত ধার দিন।' আমার মত কালো কুচ্ছিৎকে তিনি প্রেমনিবেদন করবেন সে দুরাশা আমি করি নি কিন্তু নিতান্ত গদ্যময়ী পাগড়ি! কে বলে ফরাসিনী সুরসিকা?

তা যাক্ গে—এইটে আসল বক্তব্য নয়। মোদ্দা কথা, এই করে করে ফ্যান্সি বল্ 'রূপায়িত' হল।

ইলাহি ব্যাপার, পেল্লাই কাণ্ড। শিখের বাচ্চা দাড়িমাড়ি বাগিয়ে ভলগা-মাঝির পোশাক পরে নাচছে চীনা পাজামা-কুর্তা পরা নধরা ভিয়েনা-সুন্দরীর সঙ্গে, বগলে ঝাড়ু দেবে মেথরানীর বেশ পরে ফরাসিনী ধেই ধেই করছেন স্প্যানীয় রাজপুত্রের বেশে মিশকালো নিগ্রোর সঙ্গে, রেড্ ইণ্ডিয়ানের রঙ মেখে জাপানী তুর্কী-নাচন নাচছেন এক পার্সী নারীর সঙ্গে—তার সর্বাঙ্গ প্যাকিঙের ব্রাউন-পেপারে মোড়া, তদুপরি কালো হরফে লেখা 'ফ্রেজাইল, উইথ কেয়ার'—কাঁচের বস্তু, ভঙ্গুর, সাবধানে নাড়াচাড়া করো।'

এ সব বস্তু রপ্ত হতে বাঙালী ছেলের সময় লাগে।

আমি কি পরে গিয়েছিলুম তা আর বলব না। একেই তো মর্কটের মত চেহারা, তাকে 'ফিন্‌সি' করলে বড়ি শুকনোর সময় কাগ তাড়াবার জন্য পাড়ায় ডাক পড়বে।

'বারে' গিয়ে দাঁড়ালুম।

উঃ! চ্যাংড়া-চিংড়ীরা কী বেদম ফুর্তিটাই না করতে জানে। হোলির দিনে যেমন মানুষ গায়ে রঙ মাখে এরা ঠিক তেমনি দু পাত্তর রঙিন জল গিলে মনে রঙ লাগিয়ে নিয়েছেন। চোখ অল্প অল্প গোলাপী হয়ে গিয়েছে—বিশ্ব-সংসার গোলাপী রঙে ছোপানো বলে মনে আমেজ লাগছে। না হয় খর্চা হয়েই গেল শেষ কড়ি—খর্চা না করলে খুদা আরো পয়সা দেবেন কি করে? না হয় নাচলই লক্ষ্মীছাড়া মেরিটা ঐ খাটাশ-মুখো সেপাইটার সঙ্গে তোমাকে ছোলাগাছি দেখিয়ে—ভয় কি, আরো মেলা মেরি ফেনী রয়েছে। মনে আরেক পোঁচ রঙ লাগিয়ে লাও হে লাটুবাবু, বাবুরা যখন অত করে কইচেন। বেবাক বাৎ ভুলে যাবে। অত সিরিয়স হয়ো না মাইরি, এই শেষ পরবের রাত্তিরে।

তার সঙ্গে এ কোণে ও কোণে, হেথা-হোথা, একে অন্যের কানে কানে কত 'মৃদু মর্মর গানে মর্মের বাণী বলা', কত 'বেদনার পেয়ালা' ভরে গেল কত হিয়ায়,

কত গান উঠলো বুকে বুকে, 'পিয়ো হে পিয়ো'।'

অরকেস্ট্রা কিন্তু ঢাক ঢোল কত্তাল বাজিয়ে হুঙ্কার দিচ্ছে—

'ওগো, ডনা ক্লারা, তোমাকে আমি নাচতে দেখেছি
ওগো ডনা ক্লারা, তোমার সোনার ছবি বুকে এঁকেছি।'

* * *

বাইরে এসে ডেকের সুদূরতম প্রান্তে একখানা চেয়ার টেনে একলাটি চুপ করে বসলুম। সিগার সিগরেটের অত্যাচারে সমুদ্রের লোনা হাওয়া জলসাঘরে নাক গলাতে পারে নি; আমাকে পেয়ে খুশী হয়ে আমার সর্বাঙ্গে আদর করে হাত বুলিয়ে গেল।

আজ কি অমাবস্যা? এরকম অন্ধকার শ্রাবণ-ভাদ্রের মেঘাচ্ছন্ন অমা-যামিনীতেও দেশে কখনো দেখি নি। গাছপালা, বাড়িঘরদোর যেন অন্ধকারের খানিকটে শুষে নেয় বলে ডাঙ্গার অন্ধকার সমুদ্রের অন্ধকারের চেয়ে অনেকখানি হাল্কা। এখানে দিনের বেলাকার নীল সমুদ্র আর নীল আকাশ রাত্রিবেলায় যেন এক হয়ে মিশে গিয়ে জমে উঠে গড়ে তুলেছে এক ঘনকৃষ্ণ অন্ধ-প্রাচীর, না—আরো কাছে এসে আমার চোখে মাখিয়ে দিয়ে-গেছে কৃষ্ণাঞ্জন।

শুধু চিলিক মেরে যাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে প্রপেলারের তাড়ায় ভেসে-ওঠা ফেনা আর বুদ্বুদ। ঐ ফেনাটুকু মাঝে মাঝে না দেখতে পেলে মনে ভয় জাগত অন্ধ হয়ে গিয়েছি, জলসাঘরের দিকে ছুটে গিয়ে আলো দেখে সেখান থেকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে হত।

জাহাজের হৃৎপিণ্ড যেন ধপ্ ধপ্ করছে—তাই অষ্টপ্রহর একটা একটানা মৃদু শিহরণ জাহাজের সর্বাঙ্গে লেগেই আছে। সে শিহরণ এমনিতে দেহেমনে অস্বস্তি জাগায় কিন্তু আজ এই মৃত্যু-অন্ধকারে সে স্পন্দন যেন আমার চৈতন্যবোধকে গভীরতম সুষুপ্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখল।

কান্নার শব্দ?

তাজা হাওয়া পাওয়ার জন্য কে যেন সুদূর জলসাঘরের একখানি জানালা খুলে দিয়েছে। তারই ক্ষীণ আলোতে দেখি একটি মেয়ে রেলিঙে মাথা রেখে কাঁদছে।

এ মেয়ে সিঙ্গাপুর গিয়েছিল তার স্বামীর সঙ্গে হনি-মুন যাপন করতে। সেখানে স্বামী হঠাৎ মারা যায়। দেশে ফিরে যাচ্ছে একা॥

মেশেদিনী

আরেক জাহাজে একটি মহিলা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বয়স, এই ধরুন চল্লিশের সামান্য এদিক-ওদিক। লিপস্টিক, রুজ, পাউডার মাখলে অনায়াসে পঁয়ত্রিশ বলে চালিয়ে নিতে পারতেন। মুখ আর রঙ দেখে বোঝা গেল ইনি খাঁটি মেম নন, কিন্তু ঠিক কোন্ দিশী সেটা অনুমান করতে পারলুম না। পরনে পুরনো ধরনের লম্বা ফ্রক আর গায়ে লম্বা-হাতা ব্লাউজ। চোখে মুখে ভারী একটা প্রশান্তির ভাব লেগে আছে—একটুখানি কেমন যেন উদাস-উদাস ধরনেও স্কুল

বলা হয় না।

কিন্তু তাঁর চেহারা, বেশভূষা, ধরনধারণ সেইটে আসল কথা নয়। তিন চার দিন যেতে না যেতেই লক্ষ্য করলুম, এযাবৎ তাঁকে কারো সঙ্গে একটি মাত্র কথাও বলতে শুনি নি। সমস্ত দিন লাউঞ্জের এক কোণে একা বসে বসে কাটান; তাঁর টেবিলে অন্য কাউকে এসে কথা বলতেও দেখি নি। ওঁর চেয়ে দেখতে খারাপ, বয়সে বেশী, এমন রমণীরাও যখন প্রৌঢ়দের নেকনজর পাচ্ছেন, দু'দণ্ড রসালাপ করাবার অবকাশও পাচ্ছেন, তখন ইনিই বা জাহাজ-যজ্ঞশালার প্রান্তভূমিতে সঙ্গরসের উপেক্ষিতা কেন?

কাউকে জিজ্ঞেস করার মত সাহসও খুঁজে পাই নে। উনি আমার মা হতে পারেন, বেশী জিজ্ঞেসবাদ করলে ঠোঁটকাটারা হয়তো বলে বসবে, 'ইডিপস কম্‌প্‌লেক্স' কিংবা ঐ ধরনেরই কিছু একটা।

তখন হঠাৎ একদিন দেখি, আমারই পরিচিত এক সহযাত্রী লাউঞ্জের ভিতর দিয়ে যাবার সময় ওঁকে নমস্কার করলেন, উনিও উত্তর দিলেন। তাঁকে তখন সুবিধেমত এটা, ওটা, পাঁচটা কথার ফাঁকে জিজ্ঞেস করলুম, মহিলাটি কারো সঙ্গে কথা কন না কেন? ভদ্রলোক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি করে কথা বলবেন? উনি তো ফার্সী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা জানেন না। ওঁর বাড়ি মেশেদ্।' তারপর বললেন, 'আপনি না কাবুলে ছিলেন? সেখানকার ভাষা পশতু না ফার্সী কি যেন?'

আমি বললুম, 'ফার্সী অনেকখানি ভুলে গিয়েছি; তবে এককালে ফার্সীর মাধ্যমে কাবুলে ইংরিজি পড়িয়েছি।'

আর যাবে কোথায়। আমাকে হিড়হিড় করে হাতে ধরে টেনে নিয়ে চললেন সেই মহিলার দিকে—যেন জলে-ডোবা মানুষকে দম দেবার জন্য বদ্যি খুঁজে পেয়েছেন। আমাকে তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে এমন একখানা মিষ্টি হাসি ছাড়লেন, যেন তিনি এখ্‌খুনি আমাকে আপন হাতে গড়ে তৈরি করেছেন। নোবেল-প্রাইজ-পাওয়া ব্যাটাকেও বোধ হয় বাপ এতখানি দেমাকের সঙ্গে দুনিয়ার সামনে পেশ করে না।

তারপর বললেন শুধু একটি কথা—'ফার্সী!'

মহিলাটিও এই হুল্লোড়ের মাঝখানে একটুখানি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছেন। সামলে নিয়ে শুধালেন, 'আপনি ফার্সী বলতে পারেন?'

আমি সবিনয় বললুম, 'এককালে পারতুম।'

ভারী একটা পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, 'বসুন।'

তারপর বললেন, 'আমি যে বেশী কথা কইতে ভালবাসি তা নয়, তবে এই পাঁচ দিন ধরে একটি কথাও বলতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠেছি। আমি সমস্ত জীবন কাটিয়েছি ইরানের মেশেদ শহরে। তারপর গেল আট বছর লণ্ডনে।'

আমি শুধালুম, 'ইংরিজি শেখেন নি সেখানে?'

বললেন, 'না, লণ্ডনে তো আমি ইচ্ছে করে যাই নি। আমার স্বামী মেশেদে সর্বস্বান্ত হয়ে লণ্ডন গেলেন তাঁর কাকার কাছে। আমরা ইহুদি,

জানেন তো, আমরা ব্যবসা করি দুনিয়ার সর্বত্র। সেখানে ও'র দু'পয়সা হয়েছে, কিন্তু আমাদ্বারা আর ইংরিজি শেখা হল না। ইরান ইহুদিরা যে দু'চারজন লণ্ডনে আছেন, তাঁদের সঙ্গেই মেলামেশা করি, কথাবার্তা কই। তবে হাট করতে গিয়ে "গ্রীন পীজ, কলি-ফ্লাওয়ার, টাপেন্স, ত্রাপেন্স-হে পেনি" বলতে পারি, ব্যস।'

আমি বললুম, 'ইংরিজি তো তেমন কঠিন ভাষা নয়, আর আপনি যে, দু'চারটে ইংরিজি বললেন সেগুলো তো খুব শুদ্ধ উচ্চারণে।'

মহিলাটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'কি করে শিখি বলুন? আমার মন পড়ে আছে সেই মেশেদ শহরে। লণ্ডন সাফসুৎরো জায়গা, বিজলি বাতি, জলের কল, খাওয়াদাওয়া, থিয়েটার সিনেমা সবই ভালো—কোথায় লাগে তার কাছে বুড়ো গরিব মেশেদ? তবু যদি জানতুম একদিন সেই মেশেদে ফিরে যেতে পারবো, তাহলেও না হয় লণ্ডনটার সঙ্গে পরিচয় করার চেষ্টা করতুম, কিন্তু যখনই ভাবি ঐ শহরে আমাকে একদিন মরতে হবে, আমার হাড় ক'খানা বাপ-পিতামোর হাড়ের কাছে জায়গা পাবে না, তখন যেন সমস্ত শহরটা আমার দুশমন, আমার জল্লাদ বলে মনে হয়।'

আমি বললুম, 'আপনার এমন কি বয়স হয়েছে যে আপনি মরার কথা ভাবতে আরম্ভ করেছেন?'

'তেমন কিছু নয়, জানি, কিন্তু যখন এ কথাও জানি যে, লণ্ডনেই মরতে হবে, তখন যেন বয়সের আর গাছ-পাথর থাকে না।'

আমি শুধালুম, 'মেশেদে ফিরে যাওয়া কি একেবারেই অসম্ভব? আপনি না বললেন, আপনাদের দু'পয়সা হয়েছে।'

মহিলাটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অনেকক্ষণ ধরে ভাবলেন। বুঝলুম, সব কিছু আমাকে প্রথম পরিচয়েই বলবেন কি না, তাই নিয়ে মনে মনে তোলপাড় করছেন। শেষটায় বললেন, 'দুঃখ তো সেইখানেই। আজ আমাদের যা টাকা হয়েছে, তাই নিয়ে আমরা মেশেদের পুরনো ভিটে, জমিজমা সব কিছু কিনতে পারি, নূতন ব্যবসা ফাঁদতে পারি।'

আবার নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'দুঃখ তো সেইখানেই। আমার স্বামী যেতে চান না। লণ্ডন তাঁর ভালো লেগে গিয়েছে। ভূতের মত খাটেন, পয়সা কামান আর মোটর-হোটেল, রেস্তরাঁ-ক্লাব, কনসার্ট-কাবারে করে করে বেড়ান। আমার উপরও চোটপাট, আমিও কেন সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হৈ করি না।'

বললেন, 'বুঝলেন—এখন তিনি লণ্ডনের প্রেমে; বুড়ী মেশেদকে বেবাক ভুলে গিয়েছেন।

জাহাজে যে ক'দিন ছিলুম রোজ দু'একবার ও'র কাছে গিয়ে বসতুম। ভদ্রমহিলা নিজের থেকেই একদিন বললেন, 'আপনি যেন না আবার ভাবেন আমি আপনার এক বোঝা হয়ে উঠলুম। যাঁদের সঙ্গে হৈহল্লা করতে আপনি ভালোবাসেন তাঁদের বাদ দিয়ে আমার সঙ্গে বেশী সময় কাটাবার কোনো

প্রয়োজন নেই।'

আমি আপত্তি জানালুম।

তবু তিনি শান্তভাবে লাউঞ্জে আপন কোণে বসে থাকতেন; কথা বলার জন্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোনো চেষ্টাই করতেন না। আমি কাছে গেলেই মিষ্টি হেসে বলতেন, 'বসুন'; তার পর শুধাতেন, 'কি খাবেন বলুন।' জাহাজে খাবার ব্যবস্থা কুলীন শ্বশুরবাড়ির মত, কাজেই এস্থলে 'খাবার' বলতে পানীয়ই বোঝায়।

আমি একদিন বললুম, 'প্রতিবারেই আপনি আমাকে কিছু একটা খেতে বলেন কেন, বলুন তো?'

অবাক হয়ে বললেন, 'কী আশ্চর্য! আপনি মেশেদে অর্থাৎ লণ্ডনে আমার বাড়িতে এলে আপনাকে ভালোমন্দ খেতে দিতুম না?'

আমি বললুম, 'কিন্তু এটা তো আপনার বাড়ি নয়।'

তিনি বললেন, 'সে কি কথা! আমার কাছে এলেন তার মানে আমার বাড়িতে এলেন।'

তারপর বললেন, 'কিন্তু এখানে দিই বা কি? আচ্ছা বলুন তো, আপনি জাহাজের এই বিলিতি রান্না খেতে ভালোবাসেন?'

আমি বললুম, 'এ জাহাজের রান্নার খুশনাম আছে। আমি কিন্তু আমাদের দিশী রান্নাই পছন্দ করি।'

হেসে বললেন, 'তবে আপনার রসবোধ আছে! এই আইরিশ স্টু আর বাঁধাকপি-সেদ্ধ মানুষ কি করে খায় খোদায় মালুম। সেদিন আবার পোলাও রেঁধেছিল—মাগো! ছিরি দেখে ভিরমি যাই।'

আমি শুধালুম, 'মেশেদের লোক পোলাও খায়?'

বললেন, 'হায়, জাহাজে আপন রান্নাবান্নার ব্যবস্থা নেই তা না হলে আপনাকে এ্যাসা পোলাও খাইয়ে দিতুম যে জীবনভর তার সোয়াদ জিভে লেগে থাকত। ভালো কথা, আপনি তো বোম্বাই যাচ্ছেন সেখানে আপনাকে আচ্ছাসে পোলাও খাইয়ে দেব।'

আমি বললুম, 'আমি তো ভেবেছিলুম আপনি মিশর যাচ্ছেন।'

তিনি বললেন, 'ওঃ, আপনাকে বলি নি বুঝি, আমি বোম্বাই যাচ্ছি—আমার মেয়ের সেখানে বিয়ে হয়েছে। যে ভদ্রলোক আপনাকে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন তিনি আমার স্বামীর বন্ধু। উনি বিপদে-আপদে সাহায্য করতে পারবেন বলেই এই জাহাজে যাচ্ছি।'

তারপর একটুখানি লাজুক হাসি হেসে বললেন, 'আমি যে দিদিমা হতে চললুম।'

তারপর রোজই গল্প হত তাঁর মেয়ের সম্বন্ধে। আমাকে কতবার জিজ্ঞেস করতেন, বোম্বাইয়ে ভালো ডাক্তার-বদ্যির ব্যবস্থা আছে কি না। আমি বলতুম, লণ্ডনের মত না, তবে ব্যবস্থা মেশেদের চেয়ে নিশ্চয়ই ভালো। ইঙ্গেক জর্মনিতে পাস-করা ইহুদী ডাক্তারও বোম্বাইয়ে আছেন।

বললেন, 'ও কথা বলবেন না, মশাই ; মেশেদে আমাদের যে বুড়ী ধাইমা ছিলেন তাঁর হাতে কখনো কোনো পোয়াতী মরে নি, কোনো বাচ্চা কোনো জখম নিয়ে জন্মায় নি। আর তাঁর সব কেরদানি তো শুধুমাত্র দু'খানা খালি হাত দিয়ে —ডাক্তারদের যন্তরপাতির তো উনি ধার ধারতেন না।'

আমি বললুম, 'আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে এখনো এ রকম ধাই আছেন তবে বোম্বাই শহর, সেখানে সায়েব-সুবোদের ব্যাপার।'

উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'আপনি ঠিক ধরেছেন কিন্তু আজকের দিনের বড় শহরে কেউ আর একথা মানে না। আমার মেয়েকে চিঠিতে ঐ কথা লিখেছিলুম, সে তো হেসেই উড়িয়ে দিল।'

চুপ করে থেকে বললেন, 'আর দেবেই না কেন ? ওর ছেলেবেলা ও মেশেদে কাটিয়েছে কিন্তু মেশেদের জন্য তো ওর এতটুকু দরদ নেই। আমার স্বামীরই মত, লণ্ডন-প্যারিসের নামে অজ্ঞান।'

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, 'আপনি এ নিয়ে এত শোক করেন কেন ? সে সব কাল গেছে, জমানা বদলে গিয়েছে ; এখনও মানুষ আঁকড়ে ধরে থাকবে নাকি মেশেদ কারবালা, কান্দাহার হিরাত ?'

বললেন, 'কেন, আপনি তো প্যারিস ভিয়েনা লণ্ডন বার্লিন দেখেছেন—তবু তো ফিরে যাচ্ছেন কোথাকার এক ছোট শহরে।'

আমি ঘাড় চুলকে বললুম, 'আমার যে মা রয়েছেন।'

বললেন, 'একই কথা ; মা যা মায়ের শহরও তা।'

* * *

বোম্বাইয়ে জাহাজ ভিড়েছে। এক সুন্দরী তরুণী আর ছোকরাকে দেখে আমার পরিচিতা মহিলা আকুল হয়ে উঠলেন। তাঁরা জাহাজে উঠতেই তিন-জনে জড়াজড়ি কোলাকুলি। আমি একটুখানি কেটে পড়লুম।

তা হলে কি হয়, আমার নিষ্কৃতি নেই। আমাকে পাকড়ে ধরে নিয়ে মেয়ে জামাইকে বার বার বলেন, 'এই আমার বন্ধু দিল-জানের দোস্ত, আমার সঙ্গে ফার্সী কথা কয়েছে, ফুর্তি-ফার্তি হৈ-হল্লা ছেড়ে দিয়ে।'

মেয়ে যতই জিজ্ঞেস করে, জাহাজে ছিলে কি রকম, খেলে কি, বাবা কি রকম আছেন, কে বা শোনে কার কথা, সত্য-সত্যই জাহাজে যেন 'সমুদ্রে রোদন'। তিনি বার বার বলেন, 'বুঝলি, নয়মি, এঁকে আচ্ছাসে খাইয়ে দিতে হবে। পোলাওর সব মালমসলা আছে তো বাড়িতে ?'

ভেবেছিলুম হোটেলে উঠব। মহিলা শোনামাত্র আমাকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললেন তাঁদের সঙ্গে, আমাকে কড়া নজরে রাখলেন কাস্টম অফিসে, যেন আমি চোরাই মদ—পাছে কাস্টমস্ আমাকে পাকড়ে নিয়ে যায়।

তিন দিন তাঁদের সঙ্গে থেকে অতি কষ্টে নিষ্কৃতি পাই।

সে তিন দিন কি রকম ছিলুম ? মাছ যে রকম জলে থাকে। ভুল বলা হল ; মাছকে যদি শুধান, 'কি রকম আছো ?' তবে সে বলবে, 'সৈয়দের ব্যাটা যে রকম ইহুদী পরিবারে ছিল।'॥

কোন্-ভিনারের মা

বরোদায় চাকরি নেবার কয়েকদিন পরেই ডাঃ এর্নস্ট্ কোন্-ভিনারের (অর্থাৎ ভিয়েনার Cohn) সঙ্গে আলাপ হয়। যদিও নাম থেকে বোঝা যায়, 'কোন্' পরিবার এককালে ভিয়েনায় বসবাস করতেন তবু ইনি বার্লিনেই জন্মান, পড়াশুনো করে সেখানে নামজাদা অধ্যাপক হন এবং হিটলার ইহুদীদের উপর চোট-পাট আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই সস্ত্রীক লণ্ডন চলে যান। বুড়ো মহারাজ তৃতীয় সয়াজীরাও তাঁকে সেখান থেকে পাকড়াও করে নিয়ে এসে বরোদা যাদুঘরের বড়-কর্তা বানিয়ে বসিয়ে দেয়।

লোকটির পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ এবং তাঁর স্ত্রীও এতখানি লেখাপড়া জানতেন যে তিনি তাঁর স্বামীকে পর্যন্ত কাজকর্মে সাহায্য করতে পারতেন। সয়াজীরাওয়ের পাঠানো 'ভিনাস দি মিলো,' মাইকেল এঞ্জেলোর তৈরী 'মোজেস' ও 'মুমূর্ষু দাসের' প্লাস্টার-কাস্ট যেদিন বার্লিন থেকে বরোদা এসে পৌঁছল, সে দিন ফ্রাউ কোন্-ভিনারের কী উত্তেজনা-উৎসাহ! স্টেশনে গিয়ে সেই বিরাট বিরাট বাক্স নিজে তদারকি করে নামালেন, আহার নিদ্রা শিকেয় তুলে দিয়ে কাস্ট্-গুলোকে যাদুঘরে সাজালেন,—সে সময় তিনি যাদুঘরে একটানা চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়েছিলেন,—তারপর ফোলা-ফোলা লাল-লাল চোখ নিয়ে বেরলেন, আমাদের খবর দিতে, প্রভুরা বহাল-তবিয়তে যাদুঘরে আসর জমিয়ে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। পাছে আমি হুজুরদের কিমৎ ঠিকমত মালুম না করতে পেরে তেনাদের 'তাচ্ছিল্য' করি, তাই আমাকে তাঁর মোটরে তুলে নিয়ে গিয়ে হুজুরদের সঙ্গে নিজে পরিচয় করিয়ে দিলেন। হুজুরদের নাম-গোত্র, হাল-হকিকৎ, হাড়-হদ্দ এমনি গটগট করে বয়ান করে দিলেন যে, তার থেকেই বুঝতে পারলুম যে এঁর এলেমের এক কাহন পেলেও আমি সুবে বোম্বাই-বরোদা-আহমদাবাদের 'কলা-বাজারে' বাকী জীবন বেপরোয়া হয়ে দাবড়ে বেড়াতে পারব।

আর হ্যার ডক্টর কোন্-ভিনারের পাণ্ডিত্য আমাকে ফলিয়ে বলতে হবে না। নন্দন-শাস্ত্র এবং বিশ্ব-স্থাপত্যের বিভিন্ন শৈলী সম্বন্ধে তিনি যেসব কেতাব লিখে গিয়েছেন, সেগুলো নাৎসী-পতনের পর ফের ছাপা হতে শুরু হয়েছে।

স্থাপত্যে পণ্ডিত অথচ বাল্যকালে তিনি লেখাপড়া শেখেন রাব্বিদের (ইহুদী পুরুষ-পণ্ডিত) টোলে। তাই ইহুদি ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর; অথচ ইহুদীদের আচার-ব্যবহার, তাদের কঞ্জুসি নিয়ে তিনি ঠাট্টা-মস্করা করাতে ইহুদীর শত্রু ক্রীশ্চানের চেয়েও ছিলেন বাড়া। সেসব রসিকতা একদিন মোকা-মাফিক ছাড়বার বাসনা আমার আছে।

স্বামী স্ত্রী দুজনেরই বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। পুত্র-কন্যা হয় নি, অথচ দুজনেরই হৃদয় ছিল স্নেহে ভরা। 'দেশে'র পাঠক এই ইঙ্গিত থেকেই টক্ করে বুঝে যাবেন, আমি তাঁর ন'সিকে সুযোগ নিতে কসুর করি নি। যতদিন কোন্-ভিনাররা এদেশে ছিলেন, ততদিন জর্মন বই, মাসিক, খবরের কাগজের জন্য আমাকে কিছুমাত্র দুর্ভাবনা করতে হয় নি।

'সে বছরে ফাঁকা, পেনু কিছু টাকা' ধরনে কি করে যে কিছু টাকা আমার হাতে '৩৮ ('ইংরেজিতে') জমে গিয়েছিল, সেটা নিতান্ত আমি বলছি বলেই আজ আমার বিশ্বাস হয়—হায়, এখন যা অবস্থা, '৩৮-এর মুজতবা আলীকে পথে পেলে 'দাদা, বাছা' বলে তার কাছ থেকে দু-পয়সা হাতিয়ে নিতুম।

তা সে কথা যাকগে। সে জমানো টাকাটা হাতে বড্ড বেশি চুলকোচ্ছিল বলে বাসনা হল জর্মনিতে গিয়ে সে-টাকাটা পুড়িয়ে আসি। বন্ধুবান্ধব সে দেশে মেলা, ওদিকে হিটলার যা নাচন-কুদন আরম্ভ করেছে, কখন না দুম করে লড়াই লেগে যায়, আর তাঁরাও সেই বেপ্যাঁচে পড়ে প্রাণটা হারান।

বরোদা ছোট্ট জায়গা—তাই খাসা জায়গা। তিন দিনের ভিতর পাসপোর্ট হয়ে গেল। বোম্বাই কাছে ; ট্রাঙ্ককল করে জাহাজের টিকিট কাটা হয়ে গেল —আর গরম সুটমুট তো ছিলই। শিকের হাঁড়ি থেকে নামিয়ে ঝেড়ে-ঝুড়ে তৈরি করে নিলুম।

কোন্-ভিনারদের বললুম, জর্মনি যাচ্ছি।

শুনে দুজনেই চমকে উঠলেন। তারপর অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে রইলেন। বুঝলুম, দেশের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠেছে—যে-দেশ আবার দেখবার সৌভাগ্য হয়ত তাঁদের জীবনে আর কখনো আসবে না। আর কিছু বুঝি না বুঝি, বিদেশে দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে বুকটা যে কি রকম তেলে-ফেলা বেগুনের মত ছ্যাঁৎ করে ওঠে, সেটা বিলক্ষণ বুঝি ; এবাবতে আমি বিস্তর পোড়-খাওয়া গরু। চুপ করে রইলুম।

কোন্-ভিনার শুধালেন, 'আপনি কি বার্লিন যাবেন ?'

আমি বললুম, 'এবারে জর্মনি যাচ্ছি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে। তারা তামাম জর্মনি ছড়িয়ে। বন্ন্, কলোন, হানোফার, বার্লিন অনেক জায়গায়ই যেতে হবে।'

কোন্ ভিনার বললেন, 'আমরা বার্লিন ছাড়ি '৩৩এ। এদেশে আসি '৩৫এ। এখানে আসার পর আমার পরিচিত কেউ বার্লিন যায় নি ; আমার বুড়ী মাকে এই তিন বৎসরের ভিতর কেউ গিয়ে বলতে পারে নি যে সে আমাকে দেখেছে, আমি ভালো আছি। আমি ছাড়া আমার মায়ের এ সংসারে আর কেউ নেই। আপনি যদি—'

আমি বমলুম, 'আমি অতি অবশ্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব ; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

খানিকটা কিন্তু-কিন্তু করে কোন্-ভিনার শেষটায় বললেন, 'তবে দেখুন, একখানা পোস্টকার্ড লিখে তার পর যাবেন। আমার মার বয়স আশীর কাছাকাছি। আপনি যদি হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হন তবে তিনি জোর শক্ পাবেন। সেটা সামলাবার জন্য--'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমি খবর দিয়েই যাব।'

কোন্-ভিনার বললেন, 'আর দেখুন, আমার যে হার্ট-ট্রাবল সেটা একদম চেপে যাবেন। কি হবে বুড়ীকে জানিয়ে ? আমার বাবাও হার্টের রোগে মারা যান।

আমি বললুম, 'বুঝিয়ে বলতে হবে না। আমি ঠিক ধরতে পেরেছি। এ-জিনিস সবাই করে থাকে। আমি ওঁকে বলব, আপনারা দুজনেই আরামে দিন কাটাচ্ছেন। এই তো?'

পবননন্দনপদ্ধতিতে এক লম্ফে বার্লিন পেঁছিই নি। বোম্বাই, জেনওয়া, জিনীভা, লেজাঁ, বন্ন্, কলোন, ডুসেলডর্ফ, হানোফার হয়ে হয়ে শেষটায় বার্লিন পেঁছিলুম। পূর্বেই নিবেদন করেছি, বিষ্ণুচক্রে কর্তিত খণ্ড খণ্ড সতীদেহের ন্যায় আমার বন্ধুবান্ধব ছড়িয়ে আছেন দেশ-বিদেশে।

৩২এ নাৎসিরা রাস্তায় কম্যুনিস্টদের উপর গুণ্ডামি করতো, ৩৪এ তারা ছিল দম্ভী—এবারে ৩৮এ গিয়ে দেখি, তাদের গুণ্ডামিটা চলছে ইহুদীদের উপর। তার বর্ণনা অনেকেই পড়েছেন, আমাকে আর নূতন করে বলতে হবে না।

পোস্টকার্ডে লিখলুম, 'আমি এর্নস্ট কোন্-ভিনারের মিত্র; বরোদা থেকে এসেছি, আপনার সঙ্গে বুধবার দিন সকাল দশটায় দেখা করতে আসব।'

যে মহল্লায় কোন্-ভিনারের মা থাকতেন আমি সে পাড়ায় পূর্বে কখনো যাই নি। যে বিরাট চক-মেলানো বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হলুম, সেখানে অন্তত চল্লিশটা ফ্ল্যাট থাকার কথা। অথচ অবাক হলুম, জর্মন বাড়ির দেউড়িতে যে রকম সচরাচর সব পরিবারের নাম আর ফ্ল্যাটের নম্বর লেখা থাকে এখানে তার কিছুই নেই। ওদিকে দেউড়ির চেহারা দেখে মনে হল, এককালে নেমপ্লেট-গুলো দেউড়ির পাশের দেয়ালে লাগানো ছিল। যে দু'একটি লোক আনাগোনা করছে তাদের চেহারা দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল এরা ইহুদী,—অনুমান করলুম, সমস্ত বাড়িটাই ইহুদীদের—এবং চোখেমুখে কেমন যেন ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব। আমার দিকে তাকালও সন্দেহের চোখে, আড়নয়নে।

বুড়ীর ফ্ল্যাটের নম্বর আমি জানতুম। একজনকে জিজ্ঞেস করলুম, 'বারো নম্বর ফ্ল্যাট যেতে হলে কোন্ সিঁড়ি দিয়ে ক'তলায় যেতে হয় বলতে পারেন?' 'না' বলে লোকটা কেটে পড়ল। আরো দু-তিনজনকে জিজ্ঞেস করলুম, সবাই বলে 'না'।

আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হলুম, কারণ আমার অজানা ছিল না যে ইহুদীরা পাড়াপ্রতিবেশীর খবর রাখে সবচেয়ে বেশী—এবং বিশেষ করে প্রতিবেশী যদি আপন জাতের লোক হয়।

তখন হঠাৎ আমার মাথার ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। মনে পড়ল, দশ বৎসর পূর্বে কাবুলেও আমার ঐ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেখানেও রাস্তায় কেউ কারো বাড়ি বাৎলে দেয় না। কারণ অনুসন্ধান করাতে এক বিচক্ষণ কাবুলী বলেছিলেন, 'বলতে যাবে কেন? তুমি যদি লোকটার বন্ধু হও, তবে তার বাড়ি কোথায়, সে-কথা তো তোমার জানা থাকার কথা। হয়ত তুমি স্পাই, কিংবা রাজার কাছ থেকে এসেছ তাকে তলব করতে। সেখানে হয়ত তার ফাঁসি হবে। লোকটার বাড়ি বাৎলে দিয়ে আমি তার

অপমৃত্যুর গৌণ কারণ হতে যাব কেন ?'

এখানে ইহুদীরাও ঠিক সেই পন্থাই ধরেছে। হয়ত আমি নাৎসি স্পাই—কি মতলবে এসেছি কে জানে ?

শেষটায় অনেক ওঠা-নামা করে বারো নম্বর ফ্ল্যাট খুঁজে পেলুম—ফ্ল্যাটের নম্বর পর্যন্ত ইহুদীরা সরিয়ে ফেলেছে। ঘণ্টা বাজাতে দরজার একটা কাচের ফুটো (এ ফুটোটা আবার পিতলের চাক্তি দিয়ে ভিতর থেকে ঢেকে রাখা হয়) দিয়ে কে যেন আমায় দেখে নিলে। আমি একটু চেঁচিয়ে আমার পরিচয় দিলুম।

একটি তরুণী—তারও মুখে উত্তেজনা আর ভীতি—দরজা খুলে দিল। আমি ঢুকতেই তড়িঘড়ি দরজা বন্ধ করে দিল।

আমাকে নিয়ে গেল ড্রয়িং-রুমে। সেখানে দেখি এক অথর্ব থুরথুরে বুড়ী কৌচের এক কোণে কৌচেরই চামড়ার সঙ্গে হাত আর মুখের শুকনো চামড়া মিলিয়ে দিয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। আমি বললুম, 'করেন কি, করেন কি, আমি এর্নস্টের বন্ধু, আমার সঙ্গে লৌকিকতা করতে হবে না।'

তবু বুড়ী অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ালেন। দুখানা হাড্ডি-সার ফালি ফালি হাত দিয়ে আমার দু-বাহু ধরে বললেন, 'বারান্দায় চলুন—সেখানে আলোতে আপনাকে ভালো করে দেখব।'

বাইরে বসিয়ে আমাকে তাঁর ঘোলাটে চোখ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন।

তারপর হঠাৎ ঝর ঝর করে দু'চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ল—আমি তাঁর চোখের দিকে তাকিয়েছিলুম, হঠাৎ যে এ রকম দু'চোখ ভেঙে জল নেমে আসবে তার কণামাত্র পূর্বাভাস পাই নি।

চোখ মুছে বললেন, 'মাপ করবেন, আমি কাঁদছিলুম না, আমার চোখ দিয়ে যখন-তখন এ রকম জল নেমে আসে। আমি ঠেকিয়ে রাখতে পারি নে। আমি এখন কাঁদব কেন ? আমি কত খুশী। এর্নস্ট কি রকম আছে ? তার বউ ?'

আমি বললুম, 'বড় আরামে আছেন। জানেন তো, ভারতবর্ষ খারাপ দেশ নয়। এর্নস্টের কাজও শক্ত নয়। ভালো বাড়িঘর পেয়েছেন। আর জানেন তো এর্নস্টের স্বভাব—দু'বছর হয়েছে মাত্র এরই মধ্যে অনেক বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে নিয়েছেন। আপনার বৌমা প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আমাদের লাঞ্চ-ডিনার খাওয়ান। আমাকে বড্ড স্নেহ করেন।'

দেখি বুড়ী কাঁপছেন আর বার বার রুমাল বের করে চোখ মুছছেন।

আমার হাত দুখানি ধরে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। আমি বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছি—কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছি নে। আমার বুকের ভিতর কি যেন হচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি কাল আবার আসতে পারবেন ? না,—হয়ত আপনার অনেক কাজ ?'

আমি বুঝতে পারলুম, বুড়ী নিজেকে সামলাবার জন্য সময় চান। বললুম,

'নিশ্চয় নিশ্চয়। আমি কাল আসব। আমার কোনো অসুবিধে হবে না। আমার তো এখানে কোনো কাজ-কর্ম নেই ; ছুটি কাটাতে এসেছি মাত্র।'

বানিয়ে বানিয়ে গল্প জমাচ্ছি না, তাই যদি বিবরণটি নন্দনশাস্ত্রসম্মত স্বরূপ গ্রহণ না করে তবে আশা করি সুশীল পাঠক অপরাধ নেবেন না। কোন্-ভিনারের মা'র বেদনা নিয়ে সুন্দর গল্প রচনা করা যায় জানি, কিন্তু আমার মনের উপর সে এমনই দাগ কেটে গেছে যে সেটাকে গল্পের খাতিরে ফের-ফার করতে আমার বড্ড বাধো বাধো ঠেকে। সুরসিক পাঠক সেটা হয়ত বুঝতে পারবেন না, তবে সহৃদয় পাঠকের সহানুভূতি পাব সে আশা মনে মনে পোষণ করি।

দ্বিতীয়বারে বুড়ী অতটা বিচলিত হলেন না। এবারেও কাঁদলেন তবে জর্মনি বিজ্ঞানের দেশ বলে তার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দিলেন ; বললেন, চোখের কাছের যে স্যাক্ থেকে জল বেরোয়, বুড়ো বয়সে মানুষ নাকি তার উপর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে। হবেও বা, কিন্তু বিদেশে ছেলের কথা ভেবে মা যদি অঝোরে কাঁদে তবে তার জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার কি প্রয়োজন ?

শুধালেন, 'এস্‌পেরেগাস্ খাবেন—একটুখানি গলানো মাখনের সঙ্গে ?'

আমি তো অবাক। এস্‌পেরেগাস্ মানুষে খায় পশ্চিম বাঙলায় যে রকম আসল খাওয়া হয়ে গেলে টক খাওয়া হয়। বলা নেই কওয়া নেই, সকাল বেলা দশটার সময় সুস্থ মানুষ হঠাৎ টক খেতে যাবে কেন ?

মজাটা সেইখানেই। আমি এস্‌পেরেগাস্ খেতে এত ভালোবাসি যে রাত তিনটের সময় কেউ যদি ঘুম ভাঙিয়ে এস্‌পেরেগাস্ খেতে বলে তবে তক্ষুনি রাজী হই। ভারতবর্ষে এস্‌পেরেগাস্ আসে টিনে করে—তাতে সত্যিকার সোয়াদ পাওয়া যায় না—তাজা ইলিশ নোনা ইলিশের চেয়েও বেশী তফাৎ। সেই এস্‌পেরেগাসের নামেই আমি যখন অজ্ঞান তখন এখানকার তাজা মাল !

মা-ই বললেন, 'আমি যখন এর্নস্টের কাছ থেকে খবর পেলুম, আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, তখন বউমাকে লিখলুম, আপনি কি খেতে ভালোবাসেন সে খবর জানাতে। বউমা লিখলে পুরো লাঞ্চ খাওয়াতে হবে না, শুধু এস্‌পেরেগাস্ হলেই চলবে। সৈয়দ সাহেব মোষের মত এস্‌পেরেগাস্ খান—বেলা-অবেলায়।'

বুড়ী মধুর হাসি হেসে বললেন, 'পুরো লাঞ্চ এখন আমি আর রাঁধতে পারি নে, বউমা জানে। তাই আমার মনে কিন্তু-কিন্তু রয়ে গিয়েছে, হয়ত আমাকে মেহন্নত থেকে বাঁচাবার জন্য লিখেছে আপনি বেলা-অবেলায় এস্‌পেরেগাস্ খান।'

আমি বললুম, 'আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

'দেশে'র চতুর পাঠকদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখে আর কস্য লভ্য যে আমি পেটুক। উল্টে তাঁরা বুঝে যাবেন, মিথ্যেবাদীও বটে।

এস্‌পেরেগাসের পরিমাণ দেখে আমার চোখ দুটো পটাং করে সকেট্ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। মহা মুশকিল সেগুলো কার্পেট থেকে কুড়িয়ে নিয়ে

সকেটে ঢুকিয়ে এস্‌পেরেগাস্‌ গ্রাস করতে বসলুম।

জানি, এক মণ বললে আপনারা বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু প্লীজ, আধ মণ না মানলে আমাকে বড্ড বেদনা দেওয়া হবে। সুকুমার রায়ের 'খাই-খাই' খানে-ওয়ালাও সে-খানা শেষ করতে পারত না।

আমি ঐ এক বাবদেই আমার মাকে খুশী করতে পারতুম—গুরুভোজনে। ধর্মসাক্ষী, আর সব বাবদে মা আমাকে মাফ্‌ করে দিয়েছেন। কোন্‌-ভিনারের মা পর্যন্ত খুশী হলেন, তাতে আর কিমাশ্চর্যম্‌!

হায় রে দুর্বল লেখনী—কি করে কোন্‌-ভিনারের মায়ের এস্‌পেরেগাস্‌ রান্নার বর্ণনা বতরিবৎ বয়ান করি! অমিত্রাক্ষর ছন্দে শেষ কাব্য লিখেছেন মাইকেল, শেষ এস্‌পেরেগাস্‌ রেঁধেছেন কোন্‌-ভিনারের মা।

আহারাদি শেষ হলে পর কোন্‌-ভিনারের মা বললেন, 'আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।'

আমি বললুম, 'আদেশ করুন।'

তিনি বললেন, 'আপনি যদি না করতে পারেন, তবে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হব না।'

একটি অপরূপ হিরে লাগানো সোনার আংটি বের করে বললেন, 'নাৎসিরা এখন আর কোনো দামী জিনিস জর্মনির বাইরে যেতে দেয় না—সে নিয়ে তাদের উপর আমার কোনো ক্ষোভ নেই—আমি কি করে জানবো দেশের মঙ্গল কিসে। কিন্তু এ আংটিটা এর্নস্টের প্রাপ্য। তার বাপঠাকুদ্দা চোদ্দপুরুষ এই আংটিটা পরে বিয়ে করেছিলেন; এ আংটিটা তাকে দেবেন।'

আমার আঙুলে ঠিক লেগে গেল। আমি বললুম, 'আপনাকে ভাবতে হবে না।'

একটা সোনার চেনে ঝোলানো জড়োয়া পদক দিয়ে বললেন, 'এটা এর্নস্টের বাপ আমাকে বিয়ের রাতে বাসরঘরে দিয়েছিলেন, (পঞ্চাশ বছর পরে সেই পরবের স্মরণে তিনি একটুখানি লাজুক হাসি হাসলেন) এটা বউমার প্রাপ্য। এটা আপনি তাকে দেবেন।'

আমি কলার খুলে গলায় পরে নিয়ে বললুম, 'নিশ্চিন্ত থাকুন।'

কোন্‌-ভিনারের মা পই পই করে বললেন, 'কাস্টম্‌সের বিপদে পড়লে জানলা দিয়ে ফেলে দেবেন কিংবা ওদের দিয়ে দেবেন। আমি কোন শোক করব না। ছেলে, বউকে আমি চিঠিতে এ বিষয়ে কিছুই জানাচ্ছি নে। তাদেরও কোনো শোক করতে হবে না।'

বরোদা ফিরে আমি কোন্‌-ভিনারকে আংটি দিলুম, তাঁর বউকে পদক দিলুম।

* * *

ছ'মাস পরে বুড়ী মারা যান। কোন্‌-ভিনার এক বছর পরে মারা যান। তাঁর স্ত্রী এখন কোথায় জানি নে।

কোদণ্ড মুখহানা

(জীবনী)

দ্বিতীয়বার বিলেতে যাওয়ার সময় জাহাজে চড়ে যে অনুভূতিটা হয়, তার সঙ্গে দোজবরের মনের অবস্থা তুলনা করা যেতে পারে। ঔৎসুক্য, আশঙ্কা সব কিছুরই তখন কমতি ঘটে, বাড়িতে থাকে শুদ্ধমাত্র হুঁশিয়ারিটা, অর্থাৎ প্রথমবারে যে-সব ভুল করেছি, আবার যেন সেগুলো নতুন করে না করতে হয়। প্রথমবারের উৎসাহের চোটে বউকে কুমার জীবনের দু'একটা রোমাণ্টিক কাহিনী বলে ফেলে যে মারাত্মক ভুল করেছিলুম, এবারে আর সেটি করব না। প্রথমবার বিলেতে যাওয়ার সময় প্রকাশ করে ফেলেছিলুম যে পকেট লাইট-ওয়েট চেম্পিয়ান, এবারে আর সে পাঁচালি না, এবার ব্লাফ দিয়ে স্টুয়ার্ড, কেবিনবয় সকলের কাছ থেকে পুরোমাত্রায় খাতিরযত্ন উশুল করে মামুলী টিপ দিয়েই মোকামে পেঁছাব।

তারই ব্যবস্থা করতে করতে খানার ঘণ্টা বেজে গেল। প্রথমবার বিলেতে যাবার সময় ঘণ্টা শুনে জেলের কয়েদীর মত হন্তদন্ত হয়ে ছুট মেরেছিলুম খানা-কামরার দিকে, এবারে গেলুম ধীরে-সুস্থে, গজ-মন্থরে। এবারে ভয় নেই, ভরসাও নেই!

ভেবেছিলুম, গিয়ে দেখব, সায়েব-মেমের হৈ-হল্লার এক পাশে নেটিভ্‌রা মাথা গুঁজে ছুরি-কাঁটার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে এমনি ব্যস্ত যে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাবার ফুরসৎ পাচ্ছেন না, কিন্তু যা দেখলুম, তাতে একেবারে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।

উত্তম বিলিতি কাটের ডবল-ব্রেস্ট কোট, মানানসই শার্টকলার, শিষ্ট-সংযত টাই-পরা এক শ্যামবর্ণের দোহারা গঠন দীর্ঘাকৃতি ভদ্রলোক তুর্কী টুপির ট্যাসেল দুলিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে গল্প বলে আসর জমিয়ে তুলেছেন আর আটজন ভারতীয় অন্নগেলা বন্ধ করে গোগ্রাসে তাঁর গল্প গিলছে। আমি টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক অতিশয় সপ্রতিভভাবে গল্প বলা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। ন্যাপকিনে হাত মুছতে মুছতে মৃদু হেসে বললেন, 'এই যে আসুন, ডাক্তার সাহেব, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলুম। টেবিলের মাথাটা আপনার জন্যেই রেখেছি, আর তো সব ছেলে-ছোকরার দল! এদের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই।' বলে বেশ গট গট করে বোস্, চাটুজ্যে, শুক্ল, মিশ্র, চৌধুরী ইত্যাদি আটজন ভারতীয়ের নাম অবলীলাক্রমে বলে যেতে লাগলেন।

লোকটি গুণী বটে! দশ মিনিট হল যাবার ঘণ্টা পড়েছে। এরি মধ্যে আটজন লোকের সঙ্গে শুধু যে আলাপই করে নিয়েছে তাই নয়, সকলের নাম বেশ স্পষ্ট মনেও রেখেছে।

সব শেষে বললেন, 'আমার নাম মুখহানা।'

এ আবার কোন্ দিশী নাম রে বাবা! পরনে সুট্, মাথায় তুর্কীর টুপি। গড়গড় করে ভুল-শুদ্ধে-মেশানো ইংরিজি বলছে। মিশরের লোক? উহুঁ! সিংহলী? কি জানি। মুসলমান তো নিশ্চয়ই—তুর্কী টুপি যখন রয়েছে।

দু'খানা ফর্ক হাতে তুলে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এঁদের রাস্‌ল্ পাশার গল্প শোনাচ্ছি।' বলে গোড়ার দিকটা যে আমি শুনতে পাই নি, তার জন্যে যেন মাপ চাওয়ার মৃদু হাসি হেসে বললেন, 'আশ্চর্য লোক রাস্‌ল্ পাশা। প্রথম তো মিশর থেকে তাড়ালেন হসীস। তারপর এসে জুটল ককেইন। সে যে কি অদ্ভুত কায়দায় মিশরে ঢুকতো, তার সন্ধান না পেয়ে সি. আই. ডি. যখন হার মানলো, তখন রাস্‌ল্ পাশাই কায়দাটা বের করলেন। কি করে যে লক্ষ্য করলেন, ভিয়েনা থেকে টেবিলের পায়ার ভিতরে করে গুপ্তি ককেইন আসছে, সেটা তাকে না জিজ্ঞেস করে সি. আই. ডি. পর্যন্ত ঠাহর করতে পারে নি। রাস্‌ল্ পাশাই বুঝিয়ে বললেন, "ভিয়েনার চেয়ে কাইরোর কাঠের আসবাব অনেক বেশী মিহিন, সস্তাও বটে। তার থেকেই বুঝলুম, নিশ্চয়ই কোনরকম শয়তানির খেল রয়েছে। একটা টেবিলের পায়া ভাঙতেই ককেইন বেরিয়ে পড়ল।" বুঝুন, লোকটার কড়া চোখের তেজ। কাস্টম অফিসে কি মাল আসছে-যাচ্ছে, তাতে যেন এক্সরে হয়ে ঢুকছে বেরুচ্ছে।'

তারপর গল্প ক্ষান্ত দিয়ে নিপুণ হাতে দু'খানি ফর্ক দিয়ে মাছের কাঁটা বাছতে লাগলেন। ভদ্রলোকের খাওয়ার তরিবৎটা দেখবার মত হেকমৎ—যেন পাকা সার্জনের অপারেশন। এবং তার চেয়েও তারিফ করবার জিনিস তাঁর গল্প করা এবং সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে যাওয়ার মেকদার জ্ঞান। খাওয়ার সময় যারা গল্প বলতে ভালোবাসে, তাদের বেশীর ভাগই খাওয়াটা অবহেলা করে শেষের দিকে হড়হড় করে সব কিছু গিলে ফেলে। এ ভদ্রলোক দুটোই একসঙ্গে চালালেন ধীরে-সুস্থে, তাড়াহুড়ো না করে। আমি বললুম, 'আপনি দেখছি মিশরের অনেক কথাই জানেন।' তাঁর মুখে তখন মাছ। কথা না বলে আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। ভাবখানা এই 'একটু দাঁড়ান, গ্রাসটা গিলি, তারপর বলব।'···বললেন, 'জানব না? আমি আঠার বছর কাইরোতে কাটালুম যে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মিশর ছাড়লেন কবে?'

তিনি বললেন, 'ছাড়বো কেন, এখনও তো সেখানেই আছি।'

আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলুম। বললুম, 'বিলাত থেকে ফেরার মুখে কিছুদিন মিশরে কাটানো আমার বাসনা। কাইরোতেই থাকব ভাবছি।'

প্লেটের মাছের দিকে তাকিয়েই বললেন, 'হুঁ।'

আমি তো অবাক। এরকম অবস্থায় দেশের লোক অন্ততপক্ষে বলে, আসবার খবরটা দেবেন, সহৃদয় লোক নানাপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। এ ভদ্রলোকের কথাবর্তা চালচলন দেখে তো মনে হয়েছিল, ইনি কাইরোর মত পাণ্ডববর্জিত দেশে স্বদেশবাসীকে লুফে নিন আর নাই নিন, গতানুগতিক ভদ্রতার সম্বর্ধনাটা অন্তত করবেন। তাই তাঁর দরদহীন 'হুঁ'-টার ভেজাকম্বল আমার সর্বাঙ্গে যেন কাঁপন লাগিয়ে দিল। আর পাঁচজনও যে একটু আশ্চর্য হয়েছেন স্পষ্ট বুঝতে

পারলুম। তারপর গালগল্প তেমন করে আর জমলো না।

খাওয়ার পর উপরে এসে ডেকচেয়ারে শুয়ে বিরস বিবর্ণ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় সেই ভদ্রলোক আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমার মুখে তিনি ঈষৎ অবহেলার ভাব লক্ষ্য করলেন কিনা জানি নে, তবে বেশ সপ্রতিভভাবেই আমার পাশের ডেকচেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, 'আপনি আমায় মাপ করুন।' আমি বললুম, 'সে কি কথা, কি হয়েছে?' বললেন, 'আমি ভারতবাসী, তাই ভারতীয়দের প্রতি আমার একটু অভিমান আছে। এই আঠার বৎসর ধরে আমি মিশর ভারতবর্ষ করে আসছি। প্রতিবারই দু'চারজন ভারতীয় উৎসাহের সঙ্গে কাইরো আসবে বলে প্রতিজ্ঞা করে—আজ পর্যন্ত কেউ আসে নি। আপনি আসবেন কিনা জানি নে; তবে স্ট্যাটিস্টিক্স যদি পাকাপাকি বিজ্ঞান হয়, না আসার সম্ভাবনাই বেশী। তাই আমার অভিমান, এখন কেউ কাইরো যাবার প্রস্তাব করলে আমি গা করি নে।'

তারপর তিনি হঠাৎ খাড়া হয়ে বসলেন। বেশ একটু গরম সুরে বললেন, 'আশ্চর্য হই বার বার স্বদেশবাসী ছাত্রদের দেখে। বিলেতে ডিগ্রী পাওয়া মাত্রই ছুট দেয় দেশের দিকে, সেই ক্যাশ সার্টিফিকেট ভাঙাবার জন্যে। কতবার কত ছেলেকে বুঝিয়ে বলেছি, মিশরীয় সভ্যতা ভাল করে দেখবার জিনিস, ওর থেকে অনেক কিছু শেখবার মত আছে, এমন কি নেমন্তন্ন করেছি আমার বাড়িতে ওঠবার জন্যে কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! কি হবে এদের দিয়ে বুঝতে পারি নে।'

আমি চুপ করে শুনে গেলুম। কি আর বলব? তারপর বললেন, 'আমি নিজে লেখাপড়া করবার সুযোগ-সুবিধে পাই নি। বাবা অল্প বয়সে মারা যান বলে। তাই—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'সে কি কথা? আপনি তো চমৎকার ইংরিজি বলছেন।

মুখহানা মুচকি হেসে বললেন, 'ইংরেজ চাষা আমার চেয়ে ভাল ইংরিজি বলে। তাই বলে সেও শিক্ষিত নাকি? আপনিও এই কথাটা বললেন? আপনি না হের ডক্টর!'

এক মাথা লজ্জা পেলুম।

বললেন, 'তবু আপনার নেমন্তন্ন রইল। ইউরোপ থেকে ফেরবার মুখে আসবেন? তবে আলেকজ্যান্ড্রিয়ায় নেমে আমাকে তার করবেন। আমার টেলিগ্রাফী ঠিকানা "মোহিনী টী", আমার চায়ের ব্যবসা।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'মিশরের লোক কি চা খায়?'

বেশ গর্বের সঙ্গে বললেন, 'আগে খেত না। এখন তার বাপ খায়। আমি খাইয়ে ছেড়েছি। আপনি কিন্তু ঠিকই জিজ্ঞেস করেছেন—আগে তারা শুধু কফি খেত।'

আমি আরও আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'আপনি খাইয়ে ছেড়েছেন, তার মানে?'

খুব একগাল হেসে নিয়ে বললেন, 'তাহলে আপনার সামনে একটু উঁচু ঘোড়া

চড়ে নিই। আপনাদের তো লেখাপড়ার হাই-জম্প লঙ-জম্প। আমার ব্যবসায়ে। বলব সব ?'

আমি বললুম, 'ভারতের লোক মিশরে চা বেচছে, একথা শুনে কার না আনন্দ হয় ? আপনি ভাল করে সব কিছু বলুন।'

মুথহানা বললেন, 'তবে শুনুন। আমার বাড়ি কুর্গে। বাবা অল্প বয়সে মারা যান, আগেই বলেছি। তাই ১৯১৬ সনে ঢুকে পড়লাম কুর্গ পল্টনে, জানেন তো, কুর্গের লোক আর সব ভারতীয়ের চেয়ে আলাদা। রাইফেলটা, লড়াইটার নাম শুনলে ভয় পায় না। আমাদের পল্টনের সঙ্গে সঙ্গে আমি গেলুম আলেকজ্যান্ড্রিয়া। তারপর তান্তা দামনহুরু জগাজিগ্ করে করে শেষটায় কাইরো। আড়াই বছর ছিলুম কাইরোতে। তারপর লড়াই থামল। মহাত্মা গাঁধী শুরু করেছেন অসহযোগ আন্দোলন। ইংরেজের উপর আমারও মন গিয়েছে বিগড়ে—বিশেষ করে লড়াইয়ের সময় কালো-ধলায় তফাৎ করার বাঁদরামি দেখে দেখে। ভাবলুম, কি হবে দেশে ফিরে গিয়ে ? তার চেয়ে এখানে যদি জগলুল পাশার দলে ভিড়ে যেতে পারি, তবে ভারতবর্ষের আন্দোলনের সঙ্গে এদের স্বাধীনতা আন্দোলন মেলাবার সুবিধে হলে হয়েও যেতে পারে।

'পড়ে রইলুম কাইরোয়। পল্টন থেকে খালাস পাওয়ার সময় যা-কিছু টাকা-কড়ি পেয়েছিলুম, তাই দিয়ে বাঁধলুম ছোট একটি বাসা—অর্থাৎ ফ্ল্যাট। জগলুলের দলের সঙ্গে যোগাযোগও হল, কিন্তু মুশ্কিলে পড়লুম অন্নবস্ত্রের সমস্যা নিয়ে। ওঁরা অবশ্য আমার এ-সব ভাবনা পার্টির কাঁধে তুলে নিতে খুশী হয়েই রাজী হতেন, কিন্তু হাজার হোক ওঁরা বিদেশী ওঁদের টাকা আমি নেব কেন ? তাই ফাঁদতে হল ব্যবসা। খুললুম চায়ের দোকান। পার্টির মেম্বাররাই হলেন প্রথম খদ্দের। ওঁরা আমার ফ্ল্যাটে চা খেয়ে খেয়ে চায়ের তত্ত্ব সমঝে গিয়েছিলেন।

'তখন লাগল আমাতে কফিতে লড়াই। আর সে লড়াই এমনি মারাত্মক হয়ে দাঁড়ালো যে, বাধ্য হয়ে আমাকে পলিটিক্স ছাড়তে হল। নেংটি পরে অসহযোগ করতে পারে গাঁধী, আমি পারি নে। অবশ্য লড়াইয়ের লুট তখন কিছু কিছু আসতে আরম্ভ করেছে—অর্থাৎ দু'পয়সা কামাতে শুরু করেছি। পার্টি-মেম্বারদের চাটা-আঁসটা ফ্রি খাওয়াই, তাইতেই তাঁরা খুশী। টাকা-কড়িও মাঝে-মাঝে—কিন্তু সেকথা যাক।'

আমি দুটো শরবতের অর্ডার দিলুম। মুথহানা আমার হাত চেপে ধরে বললেন, 'আপনি এখনো কামাতে শুরু করেন নি—আমি কারবারী, বিলটা আমিই সই করি।'

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বললুম, 'সামান্য দু'পয়সা—।'

হেসে বললেন, 'ইক্সেক্যুস্লি। বেশী হলে দিতুম না।'

আমি শুধালুম, 'আপনার সঙ্গে কফির লড়াইটা কতদিন চলেছিল ?'

'বহু বৎসর। এখনো চলছে। কিন্তু পয়লা রোঁদে মার খেয়েই বুঝতে পারলুম, মাত্র একখানা চায়ের দোকান সমস্ত দেশের কফির সঙ্গে কখনই লড়তে

পারবে না। তাই আরম্ভ করলুম চায়ের পাতা বিক্রি। কিন্তু ব্রুকবণ্ড লিপ্টন বিক্রি করে আমার লাভ হয় কম, আর যে ইংরাজকে দেখলে আমার ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে ধুঁয়ো বেরোয়, তার হয়ে মায় প'বারো। কাজেই আনাতে হল চায়ের পাতা আসাম থেকে, দার্জিলিং থেকে, সিংহল থেকে। কিন্তু ব্লেণ্ডিঙের জানি নে কিছুই চায়ের স্বাদও ভাল করে বুঝতে পারি নে—ছেলেবেলা থেকে খেয়েছি কফি, কারণ কুর্গের লোক মিশরীদের মতোই কফি খায়। তখন জিহ্বাটাকে স্বাদকাতর করবার জন্য বাধ্য হয়ে ছাড়তে হল সিগার, খাবারদাবার থেকে বর্জন করতে হল লঙ্কা আর সর্বপ্রকারের গরমমসলা।'

আমি বললুম, 'এর চেয়ে অল্প কৃচ্ছ্রসাধনে তো মিশরের রাজকন্যে পাওয়া যেত।'

'তা যেত। কিন্তু আমি তখনও কফির ড্রাগনের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছি। আরেকটা কথা ভুলবেন না। মিশরীয়রা যদি ভারতের কফি খেত, তাহলে আমি ভারতীয় চা'কে ভারতীয় কফির পেছনে লেলিয়ে দিতুম না। ভায়ে ভায়ে লড়াই আমি আদপেই পছন্দ করি নে। যাক্ সেকথা! আমি দেশে থেকে হরেক রকম চা আনিয়ে ব্লেণ্ড করে ব্র্যাণ্ড ছাড়লুম, তারই নাম দিলুম "মোহিনী টী", মোহিনী আমার মায়ের নাম।'

বলে যেন বড় লজ্জা পেলেন। আমি তো বুঝলুম না এতে লজ্জার কী আছে। কফির সঙ্গে একা লড়নেওয়ালা, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের ঘড়েল-ব্যবসায়ী মায়া-দরদহীন কারবারের মাঝখানে যে মায়ের কথা স্মরণ রেখেছে, এ যেন মিশরীয় মরুভূমির মাঝখানে সুধাশ্যামলিল মরুদ্যান। কিন্তু আমাকে কোনও কথা বলতে না দিয়েই তিনি যেন লজ্জা ঢাকবার জন্যেই উঠে দাঁড়ালেন। 'আরেক দিন হবে' এরকম ধারা কি যেন খানিকটে বলে আস্তে আস্তে আপন কেবিনের দিকে রওয়ানা হলেন।

আমার তখন খেয়াল হল মোহিনী নামটার দিকে। মুসলমান মেয়ের নাম মোহিনী হল কি করে? আর হবেই না কেন? বাংলা দেশে যদি 'চাঁদের মা' 'সুরুযের মা' হতে পারে, কুর্গের মেয়ের 'মোহিনী' হতে দোষ কী?

* * *

আস্তে আস্তে মুথহানা সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পারলুম। কিন্তু সব চেয়ে বেশী দুঃখ হল একদিন যখন শুনলুম, কফিকে খানিকটে হার মানিয়ে তিনি যখন মোহিনীকে চালু করতে সক্ষম হয়েছেন, তখন বাজারে এসে জুটল লিপ্টন আর ব্রুকবণ্ড। তারা তাঁর পাকা ধানে মই দিলে না বটে, কিন্তু ধানের বেশ খানি-কটা বড় ভাগ তুলে নিয়ে খেতে লাগল। মুথহানা বললেন, 'আমি হার মানি নি বটে, কিন্তু এদের সঙ্গে লড়বার মত পুঁজি আমার গাঁটে নেই। ভারতবর্ষের দু' একজন চায়ের ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ করে দেখলুম, তাঁরা আমার লড়াইটাকে বুনো মোষ তাড়া করার পর্যায়ে ফেলে দিয়েছেন—নাইলের জলে আপন রেঙ্গ ডোবাতে চান না।

অথচ ব্যক্তিগতভাবে কোনও ইংরেজের সঙ্গে তাঁর কোনও দুশমনি নেই।

জাহাজ ভর্তি ইংরেজের প্রায় সব কটাই দেখি তাঁর সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা কয়। এ-লাইনের সব কটা জাহাজ তিনি ভাল করে চেনেন বলে কি ভারতীয় কি ইংরেজ সকলেরই ছোটখাটো সুখ-সুবিধা অনায়াসে করে দিতে পারেন। ভদ্রলোক যেন প্যাসেঞ্জার আর জাহাজ-কর্তাদের মাঝখানে বেসরকারী লিয়েজোঁ অফিসার।

কিন্তু তাঁর আসল কেরামতি স্বপ্রকাশ হল আদন বন্দরে এসে।

আদন বন্দরে কোনও প্রকারের শুল্ক নেই বলে আদনের আরব ব্যবসায়ীরা দুনিয়ার হরেক রকম জিনিস জাহাজে বেচতে আসে। আর মেমসাহেবরাও এ তত্ত্বটা জানেন বলে হন্যে হয়ে থাকেন দেশের পাঁচজনের জন্য আদন বন্দরে সস্তায় সওগাত কিনবেন বলে।

ডেক-চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপ করে দরকষাকষি দেখছিলুম—আর সব ভারতীয়েরা আদন দেখতে গেছেন, প্রথমবারে আমিও গিয়েছিলুম—এমন সময় হেলেদুলে মুথহানা এসে উপস্থিত। আর যায় কোথায়? সব মেম একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, 'আসুন, মিস্টার মুথহানা। এই আরবদের হাত থেকে আমাদের বাঁচান।'

মুথহানা আশ্চর্য হবার ভান করে বললেন, 'সে কি মেদাম, ইংরেজ হল ব্যবসায়ীর জাত। তাকে ঠকাচ্ছে আরব? আর ব্যবসায়ে কানা আমি ভারতীয় বাঁচাবো সেই ইংরেজকে? ড্রাগনকে বাঁচাবো ডেমসেলের হাত থেকে?'

তারপর ছোটালেন আরবী ভাষার তুবড়ী। সঙ্গে সঙ্গে কখনও ব্যঙ্গের হাসি, কখনও ঠাট্টার অট্টহাস্য, কখনও অপমানিত অভিমানের জলদ গর্জন, কখনও সর্বস্ব লুণ্ঠিত হওয়ার ভয়ে দুর্বলের তীক্ষ্ণ আর্তরব, কখনও রুদ্রের দক্ষিণ মুখের প্রসন্ন কল্যাণ অভয়বাণী, সর্বশেষে দু'চার পয়সা নিয়ে ছেলে-ছোকরার মত কাড়াকাড়ি। আমি গোটাপাঁচেক স্ন্যাপশট্ নিলুম।

কিন্তু আরবরা বেহদ্দ খুব। হুঁ। লোকটা দরদস্তুর করতে জানে বটে। এর কাছে ঠকেও সুখ। তার উপর মুথহানা কপচাচ্ছেন মিশরের আরবী—অতি খানদানী, তার সর্বশরীরে নীল নদের মত নীল রক্ত, আদনের আরবী তার সামনে সুকুমার রায়ের—

"কানের কাছে নানান্ সুরে
নামতা শোনায় একশো উড়ে।"

দরদস্তুর, কারবার-বেসাতি শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমি মুগ্ধ হয়ে বললুম, 'কি চমৎকার আরবী বলতে পারেন আপনি।'

মুথহানা বললেন, 'আবার! মিশরের যে-কোনোও গাড়োয়ান আমার চেয়ে ভাল আরবী বলতে পারে এবং গাড়োয়ানের মতই আমি না পারি আরবী লিখতে, না পারি পড়তে।'

আমি বললুম, 'খানিকটে নিশ্চই পড়তে পারেন। মধ্যবিত্ত ঘরের সব মুসলমানই তো ছেলেবেলায় কুরান পড়তে শেখে।' মুথহানা বললেন, 'তুর্কী টুপি দেখে আপনিও আমাকে মুসলমান ঠাউরে নিয়েছেন, কিন্তু আমি তো

মুসলমান নই।' তারপর একটুখানি ভেবে নিয়ে বললেন, 'হিন্দুই বা বলি কি প্রকারে? হিন্দু ধর্মের কি-ই বা জানি, কি-ইবা মানি।'

তারপর বললেন, এবারে যখন মাকে দেখতে গেলুম কুর্গে, তখন গাঁয়ের মুসলমানরা আমার খানিকটা জমি কিনতে চাইল মসজিদ গড়ার জন্য। আমি বললুম, 'এক-রত্তি জমির জন্য আর পয়সা নেব না। মুসলমান দেশের নুন-নিমক খাই, না হয় দিলুম তাদের জাতভাইদের মসজিদ বানাবার জায়গা।' ওদিকে মহীশূর দরবারে কে গিয়ে লাগিয়েছে আমি নাকি 'আজী প্রভোকাতর', কম্যুনাল রায়ট লাগাবার তালে ইংরেজ আমাকে দেশে পাঠিয়েছে। কী মুশ্‌কিল! এল এক ডেপুটি তদন্ত করার জন্যে। আমাকে দেখেই শুধাল, 'আপনি হিন্দু, আপনার মাথায় তুর্কী টুপি কেন?' আমি বললুম, 'আপনি হিন্দু, আপনার পরনে কেরেস্তানি সুট কেন? আপনি যদি বিলেতে না গিয়েও সুট পরতে পারেন তবে মিশরে আঠারো বৎসর থাকার পরও কি আমার তুর্কী টুপি পরার হক্ বর্তালো না?' আশ্চর্য, আপনিই বলুন তো, সিংহের মাথায় "লর্ড" পরালে যদি মানুষ ইংরেজ না হয় তবে আমার মাথায় তুর্কী টুপি চড়ালেই আমি মুসলমান হয়ে যাব কেন? যে দেশে থাকবে, সে দেশের পাঁচজনকে হিন্দীতে যাকে বলে 'আপনাতে' হবে অর্থাৎ আপন করে নিতে হবে। তার জন্য বেশভূষা, আহার-বিহার, সব বিষয়েই মনকে সংস্কারমুক্ত না রাখলে চলবে কেন? কিন্তু আপনাকে এসব বলার কি প্রয়োজন? আপনিও তো অনেক দেশ দেখেছেন।'

এমন সময় আবব কারবারীরা এসে আমাদের কাছে দাঁড়াল। মুখহানা চেয়ার থেকে উঠে তাদের সঙ্গে হাত মেলালেন। কথা কইলেন এমনভাবে যেন জন্ম-জন্মান্তরে পরম আত্মজন! বুঝলুম, কারবারীরা এসেছিল বিশেষ করে তাঁর কাছ থেকেই বিদায় নেবার জন্যে। যাবার সময় বলে গেল, এ জাহাজে তাদের অর্থলাভ হয় নি বটে কিন্তু বন্ধুলাভ হল।

তারপর যে কদিন তিনি জাহাজে ছিলেন, প্রায় সমস্ত সময়টা কাটালেন গাদা গাদা চিঠিপত্র টাইপ করে। কিন্তু লৌকিকতার স্মিতহাস্য, সী সিকদের তত্ত্বতাবাশ, পাঁচজনের সাতটা ফরমাইশ-সুপারিশ করাতে তৎপর। আর তুর্কী টুপির ট্যাসেল দুলিয়ে দুলিয়ে খানা-টেবিল যে বিলক্ষণ তপ্ত-গরম রাখলেন, সে-কথা আমি না বললেও এন্‌কর লাইন জাহাজ কোম্পানী হলপ খেয়ে বলবে।

সুয়েজবন্দরে তিনি নেমে গেলেন—জাহাজ অন্ধকার করে। এর চেয়ে ভাল বর্ণনা আমি চেষ্টা করে খুঁজে পেলুম না। এমন সব পুরনো অলঙ্কার আছে যার সামনে হালফ্যাশান হামেশাই হার মানবে।

ইউরোপে দশ মাস কেটে গেল এটা-সেটা দেখতে দেখতে। তার প্রথম চার মাস কাটল কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক পণ্ডিত অজিত বসুর সঙ্গে। তিনি সস্ত্রীক ফ্রান্স, সুইটজারল্যাণ্ড, জর্মনি, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ঘুরলেন যক্ষ্মা-হাসপাতাল দেখে দেখে—আমি ছিলুম দোভাষী হয়ে। কবি সাদী বলেছেন, 'কয়লাওয়ালার সঙ্গে দোস্তী করলে গায়ে কিছু না কিছু কয়লার গুঁড়ো লাগবেই,

আতরওয়ালার সঙ্গে আশনাই হলে গায়ে কিঞ্চিৎ খুশবাই লাগবেই।' বিয়াল্লিশটা স্যানাটরিয়া ঘুরে আমার গায়ে কয়লা না আতর লাগল সে সমস্যা এখনও সমাধান করতে পারি নি তবে যক্ষ্মার যে বিশেষ কোনও চিকিৎসা নেই সে কথাটা দোভাষী-গিরি করে বেশ ভাল করেই হৃদয়ঙ্গম হল।* ডাক্তারে ডাক্তারে কথা বলার সময় সাধারণত সত্য গোপন করে না।

তারপর একদিন শুভ প্রাতে ভেনিস বন্দরে পেঁছিলুম। শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে লিডোতে সাঁতার কেটে, সিনমার্ক দর্শন করে, চন্দ্রালোকে গণ্ডোলা চড়ে, টুরিস্ট ধর্মের তিন আশ্রম পালন করার পর ভেনিস থেকে সন্ন্যাস নিলুম। তিন দিন পরে আলেকজ্যাণ্ডিয়া বন্দর। সেখান থেকে কাইরোর ট্রেনে চাপবার পূর্বে তার করলুম, 'মোহিনী টী'কে।

এ দশ মাস ইচ্ছে করেই মুখহানাকে কোনও চিঠিপত্র লিখি নি। স্থির করে-ছিলুম ভদ্রলোককে তাক লাগিয়ে দেব। আর পাঁচটা ভারতীয়ের তুলনায় বাঙালী যে প্রতিজ্ঞা পালনে জান-কবুল, সে কথাটা হাতে-নাতে দেখিয়ে দেব—"বাঙালীর বাত নড়ে তো বাপ নড়ে"।

কাইরো স্টেশনে নেমে কিন্তু তাক লাগল আমারই। যে-লোকটি নিজেকে মুখহানা বলে পরিচয় দেয় তার সঙ্গে জাহাজের মুখহানার যে কোনোখানে মিল আছে সে কথা আপন স্মৃতিশক্তিকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস না করে মানবার উপায় নেই। ওঁর গায়ে সুটটি পরা ছিল যেন সার্জেনের হাতে রবারের দস্তানা —এর গায়ে সুট ঝুলছে যেন ভিখিরির ভিক্ষের ঝুলি। ওঁর মুখে ছিল উজ্জ্বল হাসি, ওঁর ছিল পুরুষ্টু টোল-খেকো বাচ্চা ছেলের তুলতুলে গাল, এর দেখি কপালের ঢিপি আর দুই ভাঙা গালের উনুনের ঝিঁক। উঁচু কলারের মাঝখানে এই যে কণ্ঠা প্রথম দেখলুম, সেটাকে তিন ডবল সাইজ করে দিলেও মাঝখানের ফাঁক ভরবে না!

আর সেই চোখ দুটি গেল কোথায়? কেউ হাসে দাঁত দিয়ে, কেউ হাসে ঠোঁট দিয়ে, বেশীর ভাগ লোক মুখ আর গাল দিয়ে—মুখহানা হাসতেন সুদ্ধ দুটি চোখ দিয়ে। আর তার ঝিলিমিলি এতই অদ্ভুত যে, তখনই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে জোয়ার জলের চাঁদের ঝিকিমিকি।

এঁর বয়স তো এখনও আটত্রিশ পেরোয় নি। এ বয়সে তো চোখে ছানি পড়ে না।

ট্যাক্সি ডাকলেন। আমার তো আবছা-আবছা মনে পড়ল, নিজের গাড়ির কথা যেন কোনও কথার ফাঁকে আপন অনিচ্ছায় জাহাজে বলেছিলেন। কি জানি, হয়ত গাড়ি কারখানায় গিয়েছে।

কন্তারা-তুল-দিক্কা স্টেশন থেকে দূরে নয়। ফ্ল্যাট পাঁচতলায়। মুখহানা ড্রয়িংরুমের সোফার উপর নেতিয়ে পড়ে প্রাণপণ হাঁপাতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনার কি হয়েছে বলুন।' বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'কিছু না,

* ১৯৩৩-৩৪ এর কথা: এখন অবস্থা অন্য রকম।

একটু কাশি।' এই মুথহানা সেই মুথহানা। আমি চুপ করে গেলুম।

স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। নাম হেলেনা। সাইপ্রিস দ্বীপের গ্রীক মেয়ে। গ্রীক ছাড়া জানেন অতি অল্প কিচেন-আরবী আর তার চেয়েও কম ইংরিজি। আমি জানি গ্রীক ব্যাকরণের শব্দরূপ ধাতুরূপ—ক্লাস নাইনের ছোকরা যেমন উপক্রমণিকা জানে। অনুমান করলুম, গ্রীক রমণী বিদেশীর মুখে ভুল উচ্চারণে আপনার ভাষার ধাতুরূপ শোনার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হবে না। তাই আরবী ইংরিজির গুরু চণ্ডালী দিয়ে যতটা পারি ভদ্রতা রক্ষা করলুম। মুথহানা গ্রীক বললেন অক্লেশে।

দুবার যে ভুল করেছি সে ভুল আর করলুম না। শুধু জিজ্ঞেস করলুম, 'গ্রীক শিখতে আপনার ক'বৎসর লেগেছিল?' বললেন, এই আঠারো বছর ধরে শিখছি। এখানকার কারবারী মহলে গ্রীক না জেনে ব্যবসা করা কঠিন।' ব্যাস, সুদ্ধ প্রশ্নের উত্তরটুকু। জাহাজে হলে এরই খেই ধরে আরো কত রসালাপ জমত।

খানা-কামরা নেই। ড্রইংরুমে টেবিল সাফ করে খানা সাজানো হল। একটি ন'দশ বছরের ছোকরা, ছুরিটা, কাঁটাটা এগিয়ে দিল। মোট খাটুনিটা গেল হেলেনার উপর দিয়ে। বুঝলাম রেঁধেছেনও তিনিই। চমৎকার পরিপাটী রান্না।

খাওয়ার সময় টেবিলে বসলেন মুথহানার বিধবা শালী তাঁর ছোট মেয়ে নিয়ে। আভাসে ইঙ্গিতে অনুমান করলুম, এঁরা তাঁর পুষ্যি।

ইতিমধ্যে আমার মনে আরেক দুর্ভাবনার উদয় হল। হাত ধুতে যাবার সময় চোখে পড়েছে মাত্র দু'খানা শোবার ঘর। আমি তবে শোবো কোথায়? হোটেলে যাবার প্রস্তাব মুথহানার কাছে পাড়ি-ই বা কি প্রকারে? ভদ্রলোক যে-রকম ঠোঁট সেলাই করে নীরবতার উইয়ের ঢিবির ভিতর শামুকের মত বসে আছেন তাতে আমি সূচ্যগ্রও ঢোকাবার মত ভরসা পেলুম না। তবে কি ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করব, মমিকে যেরকম এদেশে কাঠের কফিনে পুরে রাখে অতিথিকেও তেমনি রাত্রে কাঠের বাক্সে তালাবন্ধ করে রাখার রেওয়াজ আছে কিনা!

আহরাদির পর হেলেনা আমার প্রথম সিগারেটটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে রাত্রের মত বিদায় নিলেন। খনিকক্ষণ পরে রান্নাঘরে বাসনবর্তন ধোয়ার শব্দ শুনতে পেলুম।

মুথহানা সোফায় শুয়ে ছিলেন। আমাকে বললেন, 'পাশে এসে বসুন, কথা আছে।' আমি আরেকটি সিগারেট ধরালুম। বললেন, 'আপনি আমার দেশের লোক, আপনাকে সব কথা বলতে লজ্জা নেই। সংক্ষেপেই বলব, আমার বেশী কথা বলতে কষ্ট হয়।

'জাহাজে আপনার সঙ্গে অনেক কথাই খোলাখুলি বলেছিলুম। তার থেকে হয়ত আপনি আন্দাজ করেছিলেন, আমার দু'পয়সা আছে, বাড়ি-গাড়িটাও আছে, আর এখন দেখছেন আপনাকে শুতে দেবার মত আমাদের একখানা ফালতো কামরা পর্যন্ত নেই। হয়ত আপনি ভাববেন, আমি ধাপ্পা দিয়েছিলুম

আপনি কখনো মিশরে আসবেন না এই ভরসায়।'

আমি বাধা দিতে যাচ্ছিলুম কিন্তু মুথহানা তাঁর হাড্ডিসার হাতখানা তুলে আমাকে ঠেকালেন। বললেন, 'না ভেবে থাকলে ভালই। আপনাদের শরৎ-বাবুর এক উপন্যাসে—আমি মাতৃভাষা কানাড়ায় পড়েছি, যে অবিশ্বাস করে লাভবান হওয়ার চেয়ে বিশ্বাস করে ঠকা ভাল। যাক সে কথা।' বলে বেশ একটু দম নিয়ে কি বলবেন সেটা যেন মনের ভিতর গুছিয়ে নিলেন।

'সংক্ষেপেই বলি। যে গ্রীক রাস্কেলটার হাতে আমি আমার ব্যবসা সঁপে দিয়ে দেশে গিয়েছিলুম, ফিরে দেখি সে সব কিছু ফুঁকে দিয়েছে। বাড়িভাড়া দেয় নি, ওভার ড্রাফ্‌ট নিয়েছে, শেষটায় স্টকের চা পর্যন্ত জলের দরে বিক্রি করে দিয়েছে। এখানে ওখানে কত ছোটোখাটো ধার যে নিয়েছে, তার পুরো হিসাব এখনও আমি পাই নি। আমার নাম জাল করেছে যখনই দরকার হয়েছে। আপনি ভাবছেন আমি এরকম লোকের হাতে সব কিছু সঁপে দিয়ে গেলুম কেন? কী করে জানব বলুন? দশ বৎসর ধরে সে আমার সঙ্গে কাজ করছে, বিয়েরটা সিগারেটটা পর্যন্ত স্পর্শ করত না। আর সব কিছু ফুঁকে দিয়েছে—' একটুখানি হেসে বললেন, 'ফাস্ট উইমেন আর স্লো হর্সের পিছনে।'

নিজে দুর্দৈবের কাহিনী বলার ভিতরেও রসিকতা করতে পারেন যাঁর মনের কোণে—হয়ত নিজের অজানাতেই ধনজনের প্রতি জন্মলব্ধ বৈরাগ্য সঞ্চিত হয়ে আছে। 'বহু দেশ ঘুরেছি' এ কথাটা বলতে আমার সব সময়েই বাধো বাধো ঠেকে, কিন্তু এখানে বাধ্য হয়ে সে কথাটা স্বীকার করতে হল, মুথহানার এই দুর্লভ গুণটির পরিপ্রেক্ষিত দেখবার জন্য।

জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনার স্ত্রীও জানতে পারেন নি?' বললেন, 'তিনি তখন সাইপ্রিসে, বাপের বাড়িতে। কিন্তু আজকের মত থাক এ-সব কথা। আমার সংসারের অবস্থা দেখে আপনি বাকীটা আন্দাজ করে নিতে পারবেন।

'শুয়ে শুয়ে তাই নিয়ে কিন্তু অত্যধিক দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি আবার সব কিছু গড়ে তুলবো। এই আপনার চোখের সামনেই। এখন শুয়ে পড়ুন, আমি ওমরকে ডেকে দিচ্ছি। সে আপনার বিছানা ঐ কোণে দিভানটার উপর করে দেবে। কষ্ট হবে—।' আমি বাধা দিলুম। মুথহানাও চুপ করে গেলেন।

সেই ছোকরা চাকরটি এসে বেশ পাকা হাতে বিছানা করে দিল। বুঝলুম, মুথহানার অতিথিদের জন্য প্রায়ই তাকে এরকম বিছানা করে দিতে হয়।

ঘর থেকে বেরুবার সময় মুথহানা শেষ কথা বললেন, 'আমি কিন্তু সব কিছু আবার গড়ে তুলব। আমি অত সহজে হার মানি নে।' একমাত্র জর্মন বৈজ্ঞানিকদের গলায় আমি এরকম আত্মবিশ্বাসের অকুণ্ঠ ভাষা শুনেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুথহানার গলা থেকে বেরুল একটু খুসখুসে আওয়াজ।

অতি অল্প, কিন্তু আমার ভাল লাগল না।

শুনেছি রাজশয্যায় নাকি যুবরাজেরও প্রথম রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। সত্যি মিথ্যে জানি নে, কিন্তু কাইরোতে যে হবে না সে বিষয়ে আমার মনে দ্বিধা

নেই। আধো ঘুম আধো জাগরণে সেই পাঁচতলার উপর থেকে শুনেছিলুম সমস্ত রাত ধরে ফারাও-প্রজাদের ফুর্তির পিছনে ছুটোছুটি হুটোপুটির শব্দ।

কলকাতা ঘুমোয় এগারোটায়, বোম্বাই বারোটায় আর কাইরো দেখলুম অন্ধকারে ঘুমোতে ভয় পায়। সকাল বেলা আটটার সময় বেলকনিতে দাঁড়িয়ে দেখি, কাইরো শহর রাত বারোটার ভাতঘুমে অচেতন। স্থির করলুম, একদিন ভোরের নমাজের সময় মসজিদে গিয়ে দেখতে হবে ইমাম (নমাজ পড়ানেওয়ালা) আর মুয়াজ্জিন (আজান দেনেওয়ালা) ছাড়া কজন লোক মসজিদে সে সময় হাজিরা দেয়। অনুমান করলুম ব্যাপারটা—দত্তের প্রবন্ধ লেখার মত। তিনি লেখার ইমাম আর কম্পজিটর পড়ার মুয়াজ্জিন। কিন্তু যাক এসব কথা—আমি কাইরোর জীবনী লিখতে বসি নি।

সেই অসুস্থ শরীর নিয়ে মুথহানা পরের চিন্তায় মাথা ঘামাতে আরম্ভ করলেন সকালবেলা থেকে। দেখি, দুনিয়ার যত বিপদগ্রস্ত লোক আস্তে আস্তে তাঁর ড্রইংরুমে জড়ো হতে আরম্ভ করেছে। বেশীর ভাগ ভারতীয়, প্রায় সকলেরই পাসপোর্ট নিয়ে শিরঃপীড়া। এদের সকলেই দর্জি—এ দেশে আর্মি কনট্রাক্টার-দের সঙ্গে এসেছিল চাকরি নিয়ে। কনট্রাক্টাররা চলে যাওয়ার পর এখানেই ঘর বেঁধেছে—কাইরোর অতি সাধারণ মেয়েও পাঞ্জাবী দর্জির হৃদয়খানা খান্‌খান্‌ করে ফেলতে পারে। কারো কারো হৃদয় ইতিমধ্যে জোড়া লেগে গিয়েছে অর্থাৎ নেশা কেটে গিয়েছে। এখন কেটে পড়তে চায়, কিন্তু পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলেছে—মুথহানা যদি ব্রিটিশ কন্‌সুলেটে গিয়ে একটুখানি সুপারিশ করেন। কারো বা মিশরে বসবাস করার মেয়াদ পেরিয়ে গেছে—মুথহানা যদি মিশরে বিদেশী দপ্তরে গিয়ে একটুখানি ধস্তাধস্তি করে আসেন। কেউ বা তার পাসপোর্টখানা কালো-বাজারে ইহুদীকে বিক্রি করে দিয়েছিল (ইহুদী কেমিকাল দিয়ে তার ফটো মুছে ফেলে প্যালেস্টাইনী জাতভাইয়ের জন্য তাই দিয়ে জাল পাসপোর্ট বানিয়ে ধর্ম আর অর্থ দুইই সঞ্চয় করবে), এখন মুথহানা যদি কোনও মালজাহাজের কাপ্তেনকে বলে কয়ে কিংবা 'টু পাইস' দিয়ে তাকে চোরাই মালের মত দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দেন।

দু-একজন পয়সাওয়ালা পাঞ্জাবী কনট্রাক্টারও এলেন। মুথহানা যদি রেজিমেন্টের কর্নেলের সঙ্গে দেখা করে একখানা নতুন বুইক ভেট দিয়ে আসেন। না অন্য কোনও রকম লুব্রিকেশনের খবর তিনি বলতে পারেন ?

দুপুর বেলা খাবার সময় মুথহানাকে দু'একখানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেই বুঝতে পারলুম, জাহাজে যে-রকম তিনি প্যাসেঞ্জার ও কর্তাদের মাঝখানের বেসরকারী লিয়েজাঁ অফিসার ছিলেন এখানেও তিনি তেমনি দুঃস্থ ভারতীয় ও মিশরী, ইংরেজ সর্বপ্রকার কর্তাব্যক্তির মধ্যিখানের অনাহারী লিয়েজোঁ অফিসার।

শরীর সুস্থ থাকলে বনের মোষ তাড়ানোটা বিচক্ষণ জনের কাছে নিন্দনীয় হলেও স্বার্থের পক্ষে সেটা ভালো, কিন্তু এই দুর্বল শরীর নিয়ে ভদ্রলোক কেন যে হয়রান হচ্ছেন সে-কথার একটু ইঙ্গিত দিতেই মুথহানা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আ-আমি কি করব ? আমি যে এখানকার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের

সেক্রেটারি।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'মেম্বার কারা?'

'ঐ দর্জির পাল আর দু-চারটে ভ্যাগাবণ্ড।'

'আর কেউ সেক্রেটারি হতে পারে না?'

'সব টিপসইয়ের দল। কনসুলেটে গিয়ে ইংরিজিতে কথা বলবে কে?'

'তাহলে প্রেসিডেণ্ট হচ্ছেন না কেন?'

'প্রেসিডেণ্টের পক্ষে কন্‌সুলেটে ছুটোছুটি করা কি ভাল দেখায়? এসোসিয়েশনের তো একটা প্রেস্টিজ দেখানো চাই।'

'প্রেসিডেণ্ট কে?'

'এক বুড়ো দর্জি। ইংরিজিতে নাম সই করতে পারে।'

আমি আর বাক্যব্যয় করলুম না। এরকম লোককে কোনো প্রকারের সদুপদেশ দেয়া অরণ্যে রোদন—এবং সেই অরণ্যেই যেখানে সে মোষ তাড়াচ্ছে, শুনেও শুনবে না।

মুথহানা আপিসে চলে গেলেন। আমি হেলেনাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'মুথহানার এই কাশিটা কবে হল এবং কি করে?'

হেলেনা বললেন, 'খেটে খেটে। ভারতবর্ষ থেকে ফিরে এসে যখন দেখলেন কারবার একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তখন গাড়ি বেচে দিয়ে বড় বাড়ি ছেড়ে এখানে এসে উঠলেন। তারপর নূতন করে ব্যবসা গড়ে তোলবার জন্য এই দশ মাস ধরে দিন নেই রাত নেই চব্বিশ ঘণ্টা ঘোরাঘুরি করছেন। বাড়ি ফেরেন রাত দুটো, তিনটে, চারটে। কথা শোনেন না, ফিরে এসে ঠাণ্ডাজলে স্নান করেন, কখনও কখনও আবার খেতেও রাজী হন না, বলেন ক্ষিদে নেই। আগে তিনি সব সময় আমার কথামত চলতেন, এই নূতন করে কারবার গড়ে তোলার নেশা যবে থেকে তাঁকে পেয়েছে তখন থেকে তিনি আর আমার কোনও কথা শোনেন না। এর চেয়ে তিনি যদি অন্য কোনো স্ত্রীলোকের প্রেমে পড়েও আমাকে অবহেলা করতেন, আমি এতটা দুঃখ পেতুম না। তবু তো তিনি সুস্থ থাকতেন!'

আমি কথাটার মোড় ফেরাবার জন্য বললুম, 'জ্বর-টর হয়েছিল?' বললেন, 'প্রায় মাস তিনেক আগে তিনি ভেঙে পড়েন। দিন পনেরো শুয়ে ছিলেন, আর সেই পনেরো দিনেই যেন শরীর থেকে সব মাংস-চর্বি খসে পড়ে গেল। আর জানেন, তিনি কখনও ডাক্তার ডাকান নি।'

আমি বললুম, 'এ কথা তো বিশ্বাস করা যায় না।'

হেলেনা উঠে চলে গেলেন। আমি থামালুম না। একা একা যতক্ষণ খুশি কাঁদা যায়।

চায়ের সময় আমি মুথহানাকে বেশ পরিষ্কার, জোর গলায় বললুম, তিনি যদি ভাল ডাক্তার না ডাকান, তবে আমি কাল সকালেই বিছানা-পত্র নিয়ে তাঁর বাড়ি ত্যাগ করব। তিনি যদি অভিমান করতে পারেন, ভারতীয়েরা প্রতিজ্ঞা করেও কাইরো আসে না বলে, তবে আমি অভিমান করতে পারি

যে-ভারতীয় স্বদেশবাসীর সামান্যতম অনুরোধ পালন করে না, তার মুখদর্শন না করলেও আমার চলবে।

ডাক্তার এল। যক্ষ্মা। বেশ এগিয়ে গেছে। এক্সরে না করেই ধরা পড়ল।

তারপর যে এগারো মাস আমি কাইরোতে কাটালুম তার স্মৃতি আমার মন থেকে কখনো মুছে যাবে না। ওমর খৈয়াম বলেছেন :—

প্রথম মাটিতে গড়া হয়ে গেছে শেষ মানুষের কায়
শেষ নবান্ন হবে যে ধান্যে, তারো বীজ আছে তায়।
সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে লিখে রেখে গেছে তাই
বিচারকর্তা প্রলয় রাত্রি পাঠ যা করিবে ভাই ॥

—সত্যেন দত্ত।

আর আইনস্টাইনও নাকি বলেছেন, পৃথিবীর সব কিছু চলে এক অলঙ্ঘ্য নিয়ম অনুসারে। ওমর খৈয়াম ছিলেন আসলে জ্যোতির্বিদ—কাজের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি রুবাঈয়াৎ লিখেছেন মাত্র—এবং আইনস্টাইনের চোখও উপরের দিকে তাকিয়ে। এই দুই পণ্ডিত গ্রহনক্ষত্রের নিয়ম-মানা দেখে যা বলেছেন, আমি মুথহানার জীবনে তাই দেখতে পেলুম।

কত অনুনয়বিনয়, কত সাধ্যসাধনা, কত চোখের জল ফেললেন হেলেনা—আমার কথা বাদ দিচ্ছি—না, না, না, তিনি তাঁর কারবার ফের গড়ে তুলবেনই। ডাক্তার পই পই করে বলে গিয়েছেন, কড়া নজর রাখতে হবে তিনি যেন নড়াচড়া না করেন—কিন্তু থাক্, ডাক্তরের বিধানের কথা তুলে আর কি হবে, মধ্যবিত্ত কোন বাঙালী পাঠক সাক্ষাৎ কিংবা পরোক্ষভাবে যক্ষ্মার সঙ্গে পরিচিত নয়—সব কিছু উপেক্ষা করে তিনি বেরুতেন রোজ সকালে চায়ের কারবারে। তাও না হয় বুঝতুম তিনি যদি শুধু অফিসে ডেক-চেয়ারে শুয়ে থাকতেন। কতদিন মর্নিং-কলেজ থেকে ফেরার মুখে দেখেছি মুথহানা চলেছেন ক্লান্ত, শ্লথ গতিতে, দ্বিপ্রহর রৌদ্র উপেক্ষা করে, বড়-বড় খদ্দেরের আফিসে আরও কিছু চা গছাবার জন্য। বাড়ি ফিরতেন রাত আটটা, ন'টা, দশটায়।

খৈয়াম আইনস্টাইন ঠিকই বলেছেন সব কিছু চলেছে এক অদৃশ্য অলঙ্ঘ্য নিয়মের বেত্রাঘাতে। মুথহানা-পতঙ্গ ধেয়ে চলেছে কারবারের আগুনে আপন পাখা পোড়াবে বলে।

খুক্ খুক্ তখন অদম্য হয়ে উঠেছে। শালী টের পেয়ে মেয়েকে নিয়ে পালালেন। সুভাষিতে আছে, 'পরান্নং দুর্লভং লোকে' কিন্তু সে পরান্ন যদি যক্ষ্মার বীজাণুতে ঠাসা থাকে, তবে তা সর্বথা বর্জনীয়।

হেলেনা কিন্তু হাসিমুখে বোনকে গাড়িতে তুলে দিলেন।

আশ্চর্য এই মেয়ে হেলেনা! মুথহানাকে যা সেবা করলেন, তার কাছে মনে হয়, বাঙালী মেয়ের সেবাও হার মানে। অন্য কোনও দেশে আমি এ জিনিস দেখি নি, হয়ত এরকম দুর্যোগ চোখের সামনে ঘটে নি বলে।

ঘুম থেকে উঠে কতবার তিনি মুখহানার শরীর মুছে দিতেন, সে শুধু তাঁরাই বলতে পারবেন যাঁরা যক্ষ্মা রোগীর সেবা করেছেন। ডাক্তার নিশ্চয়ই বারণ করেছিলেন, তবু হেলেনা মুখহানার সঙ্গে এক খাটেই শুতেন। আমি তাই নিয়ে যখন হেলেনাকে একদিন অত্যন্ত কাতর অনুনয়বিনয় করলুম, তখন তিনি বললেন, 'আমি কাছে শুয়ে তাঁর বুকের উপর হাত রাখলে তিনি কাশেন কম, ঘুম হয় ভাল।' আমি বললুম, 'এ আপনার কল্পনা।' হেসে বললেন, 'ঐ কল্পনাটুকুই তো তিনি বিয়ে করেছেন। আমি তো আর আসল হেলেনা নই।' আমি চুপ করে গেলুম।

কত-না হাঁটাহাঁটি খোঁজাখুঁজি করে তিনি নিয়ে আসতেন বাজার থেকে সব চেয়ে সেরা জাফার কমলালেবু, কী অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তৈরি করতেন টমাটোর রস, রান্না করতেন স্বামীর কাছ থেকে শেখা ভারতীয় কায়দায় মাংসের ঝোল, কোপ্তা-পোলাও, মাদ্রাজী রসম্, স্নান করিয়ে দিতেন স্বামীকে আপন হাতে, মুখহানা বেশী কাশলে জেগে কাটাতেন সমস্ত রাত। তিনি নিজে রোগা, কিন্তু ধন্বন্তরী যেন তখন তাঁকে বর দিয়েছেন যমের সঙ্গে লড়বার জন্য।

কাইরোতে বৃষ্টি হয় বছরে দেড় না আড়াই ইঞ্চি, আমার মনে নেই। দিনের পর দিন মেঘমুক্ত নীলাকাশ দেখে দেখে বাঙালীর মন যেন হাঁপিয়ে ওঠে। যখনই উপরের দিকে তাকাই, দেখি নীল আকাশ প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। প্রথমবার যখন ইয়োরোপের পাড়াগাঁয়ে বেড়াতে গিয়েছিলুম, তখন মাঝে মাঝে নীলচোখো মেমসাহেবরা আমার দিকে তাকিয়ে থাকত—এই অদ্ভুত জংলী লোকটার বিদ্‌ঘুটে চেহারা দেখে, আর অস্বস্তিতে আমার সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠত। কাইরোর সেই নীলাকাশ সেই নির্লজ্জাদের নীল চোখের মত হরবকত আমার দিকে তাকিয়ে আছে, একবার পলক পর্যন্ত ফেলে না; মেঘ জমে না, দরদের অশ্রুবর্ষণ বিদেশী বিরহীর জন্য একবারের তরেও ঝরল না।

পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ থেকে কত রকমের হাওয়া কাইরোর উপর দিয়ে বয়ে গেল, কত না মুখের বোরকা সরিয়ে ক্ষণেকের তরে নিশিকৃষ্ণ চোখের বিদ্যুৎ ঝলক দেখিয়ে দিলে, কিন্তু তাদের কেউই এক রত্তি মেঘ সঙ্গে নিয়ে এলো না। সাহারা থেকে, লাল দরিয়া পেরিয়ে, হাবশী মুল্লুকের পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে মধ্য-সাগরের মধ্যিখান থেকে চার রকমের হাওয়া বইল, যেন হলদে, লাল, কালো, নীল রঙ মেখে কিন্তু মেঘ আর জমে ওঠে না।

ভুল বললুম, মেঘ জমে উঠতে লাগল হেলেনার মুখের উপর। পূব-সাগরের পার হতে একদা যে নীল মেঘ সাইপ্রিস রমণীর চিত্তাকাশ প্রেমের বেদনায় ভরে দিয়েছিল, আজ সে মেঘ তার সমস্ত মুখও ছেয়ে ফেলল। দু'চোখের চতুর্দিকে যে কালো ছায়া জমে উঠল, সে যেন চক্রবাল-বিস্তৃত বর্ষণ-বিমুখ খরা মেঘ; আমি মেঘের দেশের লোক, আমার বাড়ি চেরাপুঞ্জির গা ঘেঁষে, ছেলেবেলা থেকে মেঘের সঙ্গে মিতালি—কিন্তু হে পর্জন্য! এ রকম মেঘ যেন আমাকে আর না দেখতে হয়।

কানাড়া ভাষায় উত্তম বিরহের কবিতা আছে, এ কথা কখনো শুনি নি। কুর্গের লোক খুব সম্ভব মেঘের দিকে নজর দেয় না। মুথহানা হেলেনার মুখের উপর জমে-ওঠা মেঘ দেখতে পেলেন না।

দ্রোণ জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎস অর্জুন, তুমি লক্ষ্যবস্তু ভিন্ন অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছ কি? তোমার ভ্রাতৃগণ, তোমার আচার্য, তোমার পিতামহ?'

অর্জুন বললেন, 'না গুরুদেব, আমি শুধু লক্ষ্যবস্তু দেখতে পাচ্ছি।'

মুথহানার নজর কারবারের দিকে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার মনে ধোঁকা লাগল, মুথহানা লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন কি না। বিশেষ করে যেদিন শুনলুম, তাঁর রেস্ত নেই বলে তিনি ব্যাঙ্কের মুচ্ছুদ্দিগিরিতে মাল ছড়াচ্ছেন। সে মাল মজুদ থাকে ব্যাঙ্কেই—মুথহানা কিছুটা ছাড়িয়ে নিয়ে বিক্রি করে দাম শোধ করলে আরো খানিকটা পান। ওদিকে ব্রুকবণ্ড লিপ্টন অঢেল মাল ঢেলে দিয়ে যায় দোকানে দোকানে বিনি পয়সায়, বিনি আগামে। ব্যাঙ্কের গুদোমে রাখা মাল লড়বে দোকানে দোকানে সাজানো মালের সঙ্গে!

ব্যাঙ্কের টাকার সুদ তো দিতেই হয় বুকের রক্ত ঢেলে, তার উপর গুদোম-ভাড়া। মিশরী ব্যাঙ্কের নির্দয়তার সামনে সাহারা হার মানে।

কাজেই মুথহানার মাথার ঘাম যদি ব্যবসা গড়ে তোলাকে এগিয়ে দেয় এক কদম, যক্ষ্মাকে এগিয়ে দেয় এক ক্রোশ।

ত-তত্ত্বটা মুথহানা বুঝতে পারেন নি। তিনি ব্যবসা নিয়ে মশগুল। আমি তো ব্যবসা জানি নে। কিন্তু সিগারেট যে খায় না, গন্ধ পায় সে-ই বেশী।

মুথহানার সব চেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়াল ঐ পাঁচতলা বাড়ির বিরাশিখানা সিঁড়ি। সুস্থ মানুষ আমাদের ফ্ল্যাট চড়তে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যায়, ড্রইংরুম পৌঁছে প্রথম দশ মিনিট সোফার উপর নেতিয়ে পড়ে ম্যালেরিয়া রোগীর মত ধোঁকে, অথচ মুথহানাকে ভাঙতে হচ্ছে প্রতিদিন অন্তত দুবার করে এই গৌরী-শঙ্কর। একতলা বাড়ির জন্য মুথহানা যে চেষ্টা করেন নি তা নয়, কিন্তু কাই-রোতে নতুন বাড়ির সন্ধান নতুন কারবার গড়ে তোলার চেয়েও শক্ত। সেলামীর টাকা যা চায়, তা দিয়ে কলকাতায় নতুন বাড়ি তোলা যায়।

ছোকরা চাকর ওমরকে নাকি মুথহানা কোনও এক ড্রেন থেকে তুলে এনে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন, তার বয়স যখন চার। মুথহানার তখন পয়সা ছিল, ওমরের তখন সেবা করেছে এক ফ্যাশনেবল আয়া আর স্বয়ং হেলেনা। আজ দশ বৎসরের ওমর নিজের থেকে ছোকরা চাকরের জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির ছেলের মত অনায়াসে সব কাজ করে, আমার ভুল আরবী ভুল আরবী শুনে মিট-মিটিয়ে হাসে আর হেলেনার গ্রীক পড়ানো থেকে পালাবার জন্য অন্ধি-সন্ধির সন্ধানে থাকে।

এইটুকু ছেলে, কিন্তু মুথহানার প্রতি তার ভক্তি-ভালবাসার অন্ত ছিল না। রান্নাঘরে কাজ করছে কিন্তু গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ দীর্ণ করে তার কান যেন গিয়ে সেঁটে আছে ফুটপাথের সঙ্গে (আমরা কেউ কিছু শুনতে পাই নি—হঠাৎ কাজ-

কর্ম ফেলে ছুটলো বেতের হালকা চেয়ার নিয়ে নিচের তলার দিকে। কি করে যে সামান্যতম খক্‌খুক্‌ শুনতে পেত, তা সে-ই জানে। প্রতি তলায় সে চেয়ার পাতবে, মুথহানা বসে জিরোবেন। এই করে করে সে মুথহানাকে পাঁচতলায় নিয়ে আসত। কেউ বাতলে দেয় নি, আবিষ্কারটা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব।

মুথহানাকে কখনো দেখি নি ওমরের সঙ্গে আদর করে কথা কইতে। অল্প কথা বলতেন, না অন্য কোনও কারণে জানি নে, কিন্তু এটা জানি তাঁর চলা-ফেরাতে আচারব্যবহারের কি যেন এক গোপন যাদু লুকোনো ছিল, যার দিকে আকৃষ্ট না হয়ে থাকা যেত না—বাচ্চা ওমরও বাদ পড়ে নি।

পয়লা ট্রায়েলেই খুশ হয়ে ওমর ঈদের জোব্বা আঁকড়ে ধরেছিল। মুথহানা কিন্তু তিন-তিন বার এদিকে কাটালেন, ওদিকে ছাঁটালেন। ঈদের দিন ওমর যখন নূতন জোব্বা পরে আমাদের সবাইকে সেলাম করল, তখন মুথহানা বউয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওমর তো আমাদের ডাগর হয়ে উঠেছে, কনের সন্ধানে লেগে যাও।'

মিশরেও আমাদের দেশের মত অল্প বয়সে বিয়ে হয়। ওমর তিন লম্ফে ঘর ছেড়ে পালালো। মিশরের বাচ্চারাও বিয়ের কথা শুনলে লজ্জা পায়।

এ-রকম মানুষকে পরোপকার করার প্রবৃত্তি থেকে ঠেকানো আজরাঈলেরও (যমেরও) অসাধ্য। আমি গিয়েছিলুম ব্রিটিশ কন্‌সুলেটে পাসপোর্ট রেজিস্ট্রি করাতে। গিয়ে দেখি, মুথহানা কন্‌সুলেটের এক কেরানীকে আদি, রৌদ্র, বীর, হাস্য সর্বপ্রকারের রস দিয়ে ভিজিয়ে ফেলে কোন্‌ এক ভবঘুরের জন্য একখানা পাসপোর্ট যোগাড় করতে লেগে গেছেন। সাহেব যতই বুঝিয়ে বলে, 'ভারতীয় জন্মপত্রিকা না দেখানো পর্যন্ত আমরা কি করে জানব লোকটা ভারতীয়, আর ভারতীয় সপ্রমাণ না হলে আমরা পাসপোর্ট দেব কি করে?' মুথহানা ততই ইমান-ইনসাফ্‌ দয়াধর্মের শোলোক কপচান, কখনো সাহেবের হাত দু'খানা চেপে ধরেন, কখনো রেডক্রসে পয়সা দেবেন বলে লোভ দেখান, কখনও 'দি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন লিমিটেড, কাইরো'র প্রতিভূ হিসাবে সদম্ভে সগর্বে দু'হাতে বুক চাপড়ান!

রুমাল দিয়ে চোখের কোণ মোছেন নি—নবরসের ঐটুকুই বাদ পড়েছিল। সাহেব না হয়ে কেরানী মেম হলে সেটাও বোধ হয় বাদ পড়ত না।

সাহেব যখন শেষটায় রাজী হল, তখন দেখা গেল, লক্ষ্মীছাড়া ভবঘুরেটার কাছে পাসপোর্টের দাম পাঁচটি টাকা পর্যন্ত নেই। এক লহমার তরে মুথহানা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। সামলে নিয়ে অতি সপ্রতিভভাবে জেব থেকে টাকাটা বের করে দিলেন।

এ টাকা তিনি কখনও ফেরত পান নি। আমি যখন বললুম, 'টাকাটা এসোসিয়েশনের খর্চায় ফেলুন,' তখন তিনি হঠাৎ তেড়ে খেঁকখেঁকিয়ে বললেন, 'লোকটা হজে যেতে চায়। সুদিন থাকলে আমি কি শুধু পাসপোর্ট—'

আমি তাড়াতাড়ি মাপ চাইলুম। মুথহানা চুপ করে গেলেন। উঠে যাবার সময় আমার সামনে এসে মাথা নিচু করে বললেন, 'আমার মেজাজটা একটু

তিরিক্ষি হয়ে গেছে। আপনি আমায় মাফ করবেন।' আমি তাঁর হাত দুখানি ধরে বললুম, 'আপনি আমার বড় ভাইয়ের মত।'

আমি কাইরো আসার পরও মুখহানা আট মাস কারবার গড়ে তোলবার জন্য লড়াই করেছিলেন। তারপর একদিন হার মানলেন। কারবারের কাছে নয়, যক্ষ্মার কাছে।

গ্রীসের রাজকুমারীর সঙ্গে ইংলণ্ডের রাজকুমারের বিয়ে। কাইরোবাসী হাজার হাজার গ্রীক আনন্দে আত্মহারা। সবাই যেন জাতে উঠে যাচ্ছে, চাঁড়াল যেন দৈবযোগে পৈতে পেয়ে যাচ্ছে। এবার থেকে গ্রীকদের সমঝে চলতে হবে। রাজপুত্তুরের শালার জাত, বাবা চালাকি নয়! আমাদের পাড়ার গ্রীক মুদিটা পর্যন্ত পিরামিডের মত মাথা খাড়া করে মোরগটার মত দোকানের সামনের ফুটপাথে গটর-গটর করে টহল দেয়, আমাকে আর সেলাম করে না। কি আর করি, রাজপুত্তুরের শালা, বাবা, চাট্টিখানি কথা নয়, আমি সেলাম করে জিজ্ঞেস করি, 'বর-কনে কিরকম আছেন?' মিশররাণী গ্রীক-রমণী ক্লিওপাত্রার দম্ভ মুখে মেখে আমার দিকে সে পরম তাচ্ছিল্যভরে তাকিয়ে বলে, 'কনগ্রেচুলেট করে তার করেছি, জবাব এলেই খবর পাবে!'

আমি তো ভয়ে মর-মর। সিন্ধী ভাষায় প্রবাদ আছে—সিংহটাও নাকি শালাকে ডরায়।

সেই বিয়ের পরবের ফিল্ম এলো কাইরোয়। গ্রীক-মেয়ের গর্ভের বাচ্চা পর্যন্ত ছুটলো সে ছবি দেখতে। আমাদের ওমর আধা-ভারতীয়, আধা-গ্রীক (যদিও রক্তে খাশ মিশরী)। সে ধরে বসলো ছবি দেখতে যেতেই হবে। আমিও সায় দিলুম। ভাবলুম মুখহানার মনটা যদি চাঙ্গা হয়। হেলেনা বায়োস্কোপ যেতে ভালবাসতেন। কিন্তু স্বামীর অসুখ হওয়ার পর থেকে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

গিয়ে দেখি 'কিউ' লম্বা হতে হতে প্যাঁচ খেয়ে 'ইউ' হয়ে তখন 'ডবল ইউ' হওয়ার উপক্রম। আমরা সবাই একটা কাফেতে গিয়ে বসলুম। ওমর কালা-বাজার থেকে টিকিট আনল।

ভিতরে গোলমাল, চেঁচামেচি, চিৎকার। বাঙালী যজ্ঞিবাড়িকে চিৎকারে গ্রীকরা হার মানায়। মুখহানা যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, আমরা লক্ষ্য করি নি। সিনেমা থেকে ফিরেই গলা দিয়ে অনেকখানি রক্ত উঠল। আমরা বিচলিত হয়ে পড়েছি দেখে হঠাৎ তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গ্রীকগুলো হন্যে হয়ে উঠেছে। ওদের দেখলে ভাবখানা কি মনে হয় জানেন?'

আমি বললুম, 'না।'

বললেন, 'মনে হয় না, যেন বলতে চায় "হেই, ঐ ড্যাম দুনিয়াটার দাম কত বল্ তো, আমি ওটা কিনব"?'

হাসলেন না কাশলেন ঠিক বুঝতে পারলুম না। অসুখ, খিটখিটেমি আর খাপছাড়া রসিকতা—এ তিনের উদ্ভট সংমিশ্রণের সামনে আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম।

অনেক রাত অবধি ঘুম এলো না। মনটা বিকল হয়ে গিয়েছে। যক্ষ্মাতে মরে বহু লোক, তার উপর চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, এ মানুষটা রক্ত-সূত্র দিয়ে দিনের পর দিন মরণ-বঁধুর ডান হাতে রাখী বেঁধেই চলেছে। যে ব্যবসা-মন্ত্র এতদিন তাঁকে অন্ন-বস্ত্র ভোগ-বিলাস দিচ্ছিল, আজ যেন সে-ই হঠাৎ এক ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মত তাঁর হাতছাড়া হয়ে তাঁরই কণ্ঠরুদ্ধ করে সবলে দুই বাহু দিয়ে নিষ্পেষিত করে বিন্দু-বিন্দু রক্ত নিঙড়ে নিচ্ছে।

হঠাৎ শুনি হেলেনার কান্না। দরজা খুলে বেরুতেই দেখি, মুথহানার শোবার ঘরের দরজা খোলা আর মুথহানা ঠাস-ঠাস করে হেলেনার গালে চড় মারছেন। আমি ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরতেই তিনি যেন চৈতন্য ফিরে পেয়েছেন এরকম ভাবে আমার দিকে তাকালেন। আমি তাঁকে খাটে শুইয়ে দিয়ে আপন ঘরে ফিরে এলুম।

ভোরের দিকে ঘুম ভাঙল। দেখি ঘরে আলো জ্বলছে আর হেলেনা আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে। আমি আশ্চর্য হলুম না, বললুম, 'বসুন।'

আমি স্থির করেছিলুম, সুযোগ পাওয়া মাত্রই তাঁকে বুঝিয়ে বলব, তিনি যেন মুথহানাকে মাপ করেন। অসুখে ভুগে ভুগে মানুষ কি-রকম আত্মকর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে, সে কথা বুঝিয়ে বলব। অন্তত এটা তো বলতেই হবে—তা সে সত্যই হোক আর মিথ্যেই হোক—সেবার পরিবর্তে ভারতবাসী আঘাত দেয় না।

কিন্তু আমাকে কিছুই বলতে হল না। হেলেনা চোখের জল দিয়ে আমাকেই অনুনয়-বিনয় করলেন আমি যেন মুথহানাকে ভুল না বুঝি। এ মুথহানা সে মুথহানা নয় যিনি তিন বৎসর ধরে তাঁকে সাধ্যসাধনা করেছিলেন তাঁর প্রেম গ্রহণ করতে। বাড়ি-গাড়ি টাকা-পয়সা, তাঁর সর্বস্ব তিনি হেলেনাকে দিয়ে তিন বৎসর ধরে বার বার তাঁকে বলেছিলেন তিনি তাঁকে গ্রহণ না করলে তিনি দেশত্যাগী হবেন।

হেলেনা বললেন, 'আপনি ভাবছেন, দেশত্যাগী হবেন শুধু কথার কথা। তা নয়। আমার মামা তো ব্যবসায়ের ভিতর দিয়ে মুথহানাকে চিনতেন দশ বৎসর ধরে। তিনিই বলেছেন, 'এই কাইরোর মত শহরে মুথহানা কোনও মেয়ের দিকে একবারের তরে ফিরেও তাকান নি। সাত বছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে, টাকা-পয়সা যখন তাঁর ছিল তখন কত ফরাসী কত হাঙ্গেরিয়ান মেয়ে তাঁর পিছু নিয়েছে, কিন্তু এই সাত বছরের ভিতর একদিন একবারের তরেও আমার মনে এতটুকু সন্দেহ হয় নি যে তিনি আমায় ফাঁকি দিতে পারেন। মুথহানা তো ফাঁকির মানুষ নন।'

আমি চুপ করে শুনতে লাগলুম। বললেন, 'আজ না হয় তিনি দুরবস্থায় পড়েছেন বলে আমাকে তাঁর ব্যাঙ্কের হিসেব দেখান না, কিন্তু এমন দিনও তো ছিল যখন তিনি ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে বলতেন—"সব টাকা উড়িয়ে দাও হেলেনা, আমি তাহলে বেশী কামাবার উৎসাহ পাব।" আমার গায়ে হাত তুলেছেন? তুলুন, তুলুন। ঐ করে যদি তাঁর রোগ বেরিয়ে যায় তবে তিনি জুড়োবেন, তাঁর শরীর সেরে যাবে।'

তারপর বললেন, 'বলুন, আপনি মুথহানাকে ভুল বোঝেন নি ?'

আমি বললুম, 'না। আমি আরেকটি কথা বলতে চাই। আপনি মুথহানাকে যে সেবা করেছেন, তার চেয়ে বেশী সেবা আমার মাও আমার বাবাকে করতে পারতেন না।'

এর বাড়া তো আমি আর কিছু জানি নে। হেলেনার মুখে গভীর প্রশান্তি দেখা গেল। বললেন, 'আপনি আমায় বাঁচালেন। সব সময় ভয় মুথহানা হয়ত ভাবেন, বিদেশী মেয়ে বিয়ে করে তিনি হয়ত মনের মত সেবা পেলেন না। আমার বুকের কতটা ভার নেবে গেল আপনি বুঝতে পারবেন না।'

কথাটা ঠিক। আমি অতটা ভেবে বলিও নি। পরদিন ছুটি ছিল। মুথহানা এসে কোনও ভূমিকা না দিয়েই বললেন, 'কথা আছে।'

তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'স্থির করেছি, কারবার গুটিয়ে ফেলব।'

আমি আশ্চর্য হলুম, খুশীও হলুম, বললুম, 'সেই ভাল।' বললেন, 'আমি হার মানি নি ; গুটোতে হচ্ছে অন্য কারণে। আমার দম নিতে বড্ড কষ্ট হয়। আর এই কাইরোতে আমার শরীর সারবে না। কুর্গে এক মাস থাকলেই আমার শরীর সেরে যাবে।' তারপর খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, 'আপনি তো কখনও কুর্গে যান নি, তা না হলে আমার কথাটার মর্ম বুঝতে পারতেন। এই সাহারার হাওয়া আমি একদম সইতে পারি নে। আমার বুক যেন ঝাঁঝরা করে দেয়।'

কিছু বললুম না। কারণ জানতুম, জেনে-শুনে মিথ্যে কথা বলছেন না। সহারায় এই বালু-ছাঁকা শুকনো বাতাস দিয়ে ফুসফুস পরিষ্কার করার জন্য অগুণতি ইয়োরোপীয় যক্ষ্মা রোগী প্রতি বৎসর মিশরে আসে।

উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'জানেন হের ডক্টর, ট্যামারিণ্ড ট্রি কাকে বলে ?'

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ।'

'আমার বাড়ির সামনে এক বিরাট তেঁতুল গাছ আছে। তারই ছাওয়ায় যদি আমি তিনটি দিন ডেক-চেয়ারে শুতে পারি তাহলে সব কাশি সব ব্রঙ্কাইটিস ঝেড়ে ফেলতে পারব। যক্ষ্মা না কচু! হোয়াট রট্!

আপন মনে মুচকি মুচকি হাসলেন। বললেন, 'আমি কী বোকা! এতদিন এ কথাটা ভাবি নি কেন বুঝতে পারি নে। আর কাঁজির কথা কেন মাথায় খেলে নি তাও বুঝতে পারিনে। খাবো মায়ের হাতে বানানো কাঁজি, শুয়ে থাকব তেঁতুল-তলায়, দম নেব তেঁতুল-পাতা-ছাঁকা হাওয়া! ব্যস্! তিন দিনে সব ব্যামো বাপ্ বাপ্ করে পালাবে। যক্ষ্মা! হোয়াট ননসেন্স!'

তারপর হঠাৎ কি যেন মনে পড়ল। বললেন, 'হেলেনা যে খারাপ রাঁধে তা নয়। কিন্তু কাঁজি বানানো তো সোজা কর্ম নয়! আর এ মিশরী চালে কাঁজি হবেই বা কী রে ?'

উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কারবার গুটোনোও তো কঠিন কাজ।' তারপর খুব সম্ভব ঐ কথাই ভাবতে ভাবতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু রাম উল্টো বুঝলেন। মুথহানা খাটতে লাগলেন টপ গিয়ারে। আমি

জেলে নই তা বলতে। পারব না, জাল ফেলাতে মেহনত বেশী না গুটোতে। তবে এ কথা জানি, নদী-পুকুরে আবর্জনা থাকে বলে জাল আকসারই হেথা হোথা জড়িয়ে যায় আর ছাড়াতে গিয়ে চোখের জলে নাকের জলে হতে হয়। মুথহানারও হল তাই।

এখন শুধু আর ওমরের চেয়ারে চলে না। দারোয়ান ধরে ধরে উপরের তলায় উঠিয়ে দিয়ে যায়। আর কথা বলা বেড়ে গিয়েছে।

'বুঝলেন হের ডক্টর, আমার মা অজ পাড়াগেঁয়ে মেয়ে। নামটা পর্যন্ত সই করতে জানে না। আপনার মা জানেন?'

ভাঁড়াবার প্রলোভন হয়েছিল কিন্তু মিথ্যেবাদীর স্মরণশক্তি ভাল হওয়া চাই।

একটু যেন নিরাশ হয়ে বললেন, 'তাহলে আপনি সহজে বিশ্বাস করবেন না কিন্তু আমাদের অঞ্চলের সবাই জানে, হেন ব্যামো নেই মা যার দাওয়াই জানে না। আসলে কিন্তু দাওয়াই নয়, ডক্টর। মা সারায় পথ্যি দিয়ে। কচু, ঘেঁচু, দুনিয়ার যত সব বিদঘুটে আবোল-তাবোল দিয়ে মা যা রাঁধে, তা একবার খেলেই আপনি বঝতে পারবেন ওর হাতে যাদু আছে। কিন্তু ওসব কিছুরই দরকার হবে না আমার। ঐযে বললুম কাঁজি আর তেঁতুলের ছায়া! তারপর ফিরে এসে দেখিয়ে দেব ব্যবসা গড়া কারে কয়!'

একদিন লক্ষ্য করলুম, আগে বরঞ্চ মুথহানা মাঝে মাঝে গাড়িতে করে বাড়ি ফিরতেন, এখন প্রতি দিন হেঁটে। তাই নিয়ে একটুখানি মতামত প্রকাশ করলে পর মুথহানা বললেন, 'আপনাকে সব কথা খোলসা করে বলি নি, শুনুন। আমি চাই হেলেনাকে যতদূর সম্ভব বেশী টাকা দিয়ে যেতে। ওর তো কেউ নেই যে ওকে খাওয়াবে। আমি অবশ্যি শিগ্‌গিরই ফিরে আসব। কিন্তু ও বেচারী এ ক'মাস বড্ড খেটেছে, এখন একটুখানি আরাম না করলে ভেঙে পড়বে যে।'

আমি বললুম, 'ওঁকে বলেছেন যে আপনি একা দেশে যাচ্ছেন?'

মুথহানা ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'হুঁ, বড্ড কাঁদছে।'

আমি বললুম, 'দেখুন মিস্টার মুথহানা, আর যা করুন—করুন, কিন্তু দুটি টাকা বেশী রেখে যাবার জন্য ব্যামোটা বাড়াবেন না।'

বুনো শুয়োরের মত মুথহানা ঘোঁৎ করে উঠলেন। বললেন, 'যান, যান, বেশী উপদেশ কপচাতে হবে না। বিয়ে তো করেন নি যে বুঝতে পারবেন হেলানা আমার কে?'

তারপর গট গট করে রান্নাঘরে গিয়ে লাগালেন ওমরকে দুই ধমক। সে অবশ্যি এসব ধমককে থোড়াই কেয়ার করে।

ফিরে এসে বললেন, 'সৈয়দ সাহেব?'

'জী?'

'রাগ করলেন?'

'পাগলা না কি।'

বললেন, 'আমার মা'র কথা বলছিলুম না আপনাকে? অদ্ভুত মেয়ে।

বাবা যখন মারা গেলেন তখন আমার বয়স এক। বিশেষ কিছু রেখে যেতেও পারেন নি। কি দিয়ে যে আমায় মানুষ করলো, এখনও তার সন্ধান পাই নি। এই যে আমি কারবারে হার মানি নে, কন্‌সুলেটে ঘাবড়াই নে, ইংরেজ গুপ্তচরকে ডরাই নে—সে-সব ঐ মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছি। আপনি বললেন, লেখাপড়া শেখে নি—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'আমি কক্‌খনো বলি নি।'

চোখ দুটি অগাধ স্নেহে ভরে নিয়ে বললেন, 'যদি কোনদিন কুর্গ আসেন তবে নিজেই দেখতে পাবেন।' তারপর হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে বললেন, আমি না থাকলেও আসতে পারেন—নিশ্চয়ই আসবেন। শুধু বলবেন, 'আমি মুথহানাকে চিনি,' ব্যস্‌ আর দেখতে হবে না। বুড়ী আপনাকে নিয়ে যা মাতামাতি লাগাবে। কিন্তু কথা কইবেন কি করে? মা তো কানাড়া ছাড়া আর কিছু জানে না।'

* * *

পূর্ণ তিনটি মাস আমি মুথহানার কাছ থেকে তাঁর মায়ের গল্প শুনেছি। একই গল্প পাঁচ সাত বার করে। আমার বিরক্তি ধরে নি। কিন্তু এ কথাও মানি আর কেউ বললে আমি এ কথা বিশ্বাস করতুম না। এক মাস যেতে না যেতেই আমার মনে হল, ফটোগ্রাফের দরকার নেই, গলার রেকর্ডের দরকার নেই, মুথহানার মাকে আমি হাজার পাঁচেক অচেনা মানুষের মাঝখানে দেখলেও চিনে নিতে পারব।

কুর্গ গেলে আমি প্রথম দিন কি খাবো তাও জানি, নাইতে যাবার সময় লাল না নীল কোন রঙের গামছা পাবো তাও জানি, শুধু-গায়ে চলাফেরা করলে মায়ের যে আপত্তি নেই তাও জানি এবং বিশেষ করে জেনে নিয়েছি, বিদায় নেবার সাত দিন আগের থেকে যেন রোজই যাবার তাগাদা দিই, না হলে বোম্বায়ে এসে জাহাজ ধরতে পারব না।

এ তিন মাসের প্রথম দু মাস মুথহানার জীবনে মাত্র দুটি কর্ম ছিল। ধুঁকতে ধুঁকতে ঠোক্কর খেয়ে পড়ি-মরি হয়ে এ দোকান, ও দোকান ঘুরে-ঘুরে সমস্ত দিন ব্যবসা গুটোনো, আর রাত্রে আমাকে মায়ের গল্প বলা।

তারপর মুথহানাকে শয্যা নিতে হল। এদিকে আমার পয়সাও ফুরিয়ে এসেছে। মুথহানা জানতেন, আমি একমাস পরেই দেশে ফিরব। টাকা থাকতেই আমি টিকিট কেটে রেখেছিলুম। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল আরও কিছু দিন থাকার কিন্তু তাহলে হেলেনায় হিস্যায় ভাগ বসাতে হত। সে তো অসম্ভব।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে কান পেতে অপেক্ষা করছেন, আমি কখন বাড়ি ফিরব।

'হের ডক্টর!'

'আপনি আমাকে সব সময় "ডক্টর", "ডক্টর" করেন কেন?'

'রাগ করেন কেন? আমি তো লেখাপড়া শিখি নি। আমার বন্ধু "ডক্টর", সেটা ভাবতে ভাল লাগে না? কিন্তু সে কথা যাক। বলছিলুম কি, আমার

'মা—না থাক্—'

আমি বললুম, 'আপনাকে বলতেই হবে।'

'আপনি শক্‌ট্‌ হবেন। আর কেন যে বলছি তাও জানি নে। আমার মা ব্লাউজ-শেমিজ পরেন না, শুধু একখানা শাড়ি।'

আমি বললুম, 'আমার মাও গরমের দিনে ব্লাউজ শেমিজ পরেন না।'

'আঃ, বাঁচালেন।'

* * *

কাইরো ছাড়ার দিন সাতেক আগে মুথহানা তাঁর ঘরে আমাকে ডেকে পাঠালেন। খান ত্রিশেক খাম দিয়ে বললেন, 'এই ঠিকানা সব খামে টাইপ করে দিন তো।'

দেখি লো,

C. D. Muthana
Virarajendrapeth
Marcara
South Coorg. India.

বললেন, 'হেলেনা শুধু গ্রীক লিখতে পারে। তাই এই খামগুলো দেশে যাবার সময় তার কাছে রেখে যাব। আমাকে চিঠি লিখতে তাহলে তার কোনও অসুবিধে হবে না। আমিও তো শিগ্‌গিরই দেশে যাচ্ছি।'

টাইপ করছি আর ভাবছি, এর কটা খামের প্রয়োজন হবে? এ বড় অমঙ্গল চিন্তা, পাপ চিন্তা—কিন্তু শত চেষ্টা করেও মনকে তার থেকে মুক্ত করতে পারলুম না।

কাইরো ছাড়ার আগের দিন মুথহানা আমাকে ডেকে বললেন, 'ওমর বলছিল আপনি নাকি বিকেলের দিকে আজহর অঞ্চলে যাবেন। আমার জন্যে তিনখানা কুরান শরীফ কিনে আনবেন?'

আমি বললুম, 'কার জন্য কিনছেন?'

'আমার গাঁয়ের মোল্লাদের জন্য। তারা বলেছিল, ভারতবর্ষে ছাপা কুরানে নাকি বিস্তর ছাপার ভুল থাকে। কাইরোর কুরান নিয়ে গেলে তারা যা খুশীটা হবে!'

আমার ভুল অমূলক। বিদায় নেবার দিন দেখি মুথহানা ভারি খুশী-মুখ। বার বার বললেন, 'শিগ্‌গিরই ভারতবর্ষে দেখা হবে।' হেলেনা—থাক সে কথা। ও-রকম অসহায়ের কান্না আমি জীবনে কখনও দেখি নি, কখনও দেখতে হবে না, তাও জানি।

দেশে ফিরেই মুথহানাকে চিঠি লিখলুম। জবাব পেলুম না। তখন অতি ভয়ে ভয়ে তাঁর মাকে লিখলুম, 'কোদণ্ডের শরীর একটুখানি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল বলে তিনি কিছুদিনের জন্য দেশে আসবেন বলেছিলেন। আপনার কথা আমাকে সব সময় বলতেন আর দেশের ঘরবাড়ির জন্য তাঁর মন অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছিল। আমি তাঁর সঙ্গে এক বৎসর একই বাড়িতে ছিলুম। আপনার কথার

সব সময় ভাবতেন আর আমাকে রোজই আপনার কথা বলতেন। কম ছেলেই মাকে এত ভালোবাসে। আপনি আমার প্রণাম নেবেন।' বহু ভেবে-চিন্তে এই কটি কথা লিখেছিলুম, পাছে আমার কোনও কথা তাঁর মনে ব্যথা দেয়।

এ চিঠিরও উত্তর পেলুম না।

তার মাস খানেক পর কাইরো থেকে খবর পেলুম, কোদণ্ড মুথহানা আমি চলে আসার তিন দিন পর ইহলোক ত্যাগ করেন।

মাদ্রাজ উপকণ্ঠের বেলাভূমি

এই যে সামনের বালুপাড়ের উপর জেলেপাড়া এর সঙ্গে মানব-সভ্যতার কোথায় যোগসূত্র—এই পাড়ার বাইরে যে সংসার তার উপরে সে কথাটা নির্ভর করে, কি পরিমাণ সহযোগিতা পায়?

এদের ঘরে যা তৈজসপত্র তা বিক্রি করলে দু টাকার বেশী উঠবে না। যে সব বাসনকোসন সামনের রাস্তার কলতলায় ধুতে নিয়ে আসে তার অধিকাংশ মাটির। দৈন্য বোধ হয় এদের চরম, কারণ হাঁড়ি-কলসীগুলোও অত্যন্ত মামুলী—তাদের আকারপ্রকারে সামান্যতম সৌন্দর্যের সন্ধান নেই। এমনই এবড়ো-থেবড়ো যে কোনো গতিকে দাঁড় করানো যায় মাত্র—ভার-কেন্দ্র বলে কোনো জিনিস বেশির ভাগ হাঁড়ি-কলসীতে নেই।

পুরুষরা কাজকর্ম করে সুদ্ধু একখানা কালো রঙের এক বিঘৎ চওড়া নেংটি আর ঘুনসি পরে। সন্ধ্যেবেলায় দেখেছি কেউ কেউ ধুতি-শার্ট পরে—বেশীর ভাগ যে জামা-কাপড় পরে সেগুলো দেখে মনে হয় যেন মাছের বদলে কুড়িয়ে-নেওয়া পরিত্যক্ত বুশ-শার্ট, বোতামহীন শর্ট। ময়লা ঝোলাঝালা শর্ট-শার্ট দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, নিতান্ত হিম বাতাসের কন্‌কনানিতে বাধ্য হয়ে পরেছে।

মেয়েরা পরেছে উত্তর ভারতে তৈরী মিলের শাড়ি। দক্ষিণ ভারতের সুন্দর সবুজ-সোনালী, মেরুন-নীল রঙের মামুলী শাড়ি কেনার পয়সা এদের নেই। এক-রঙা জামা যা পড়েছে তা সে এমনি বিবর্ণ আর রুক্ষ যে সেটা পরার কোন অর্থ বোঝা যায় না—পরার কি প্রয়োজন? আমাদের জেলেনীরা তো পরে না। দু'একজনের পায়ে আংটি, হাতে বালা, নাকে ফুল—সবই রুপোর।

এরা কেরোসিনের ডিবে জ্বালায় না, রেড়ির তেলের পিদিম এখনো বুঝে উঠতে পারে নি। আর সে জ্বালানোই বা কতক্ষণের জন্য? সন্ধ্যে ভালো করে ঘনাতে না-ঘনাতেই সাঁঝের পিদিম দেখিয়ে এরা আলো নিভিয়ে ফেলে।

এদের মাছ-ধরার জাল, খানকয়েক এবড়ো-থেবড়ো তক্তায় জোড়া কাটামারুন ভেলা, দড়াদড়ি সব কিছুই এদের নিজের হাতে তৈরী—সামান্য সীসের গুলি আর লোহার পেরেক হয়ত সভ্য মানবের কাছ থেকে কিনে নেওয়া।

এদের ছেলেমেয়েরা ইস্কুল যায় না, ব্যামো শক্ত না হলে ডাক্তার হাসপাতালের সন্ধান করে না।

শহরের সভ্যতার কাছ থেকে এই নগণ্য,—প্রায় উঞ্ছবৃত্তিলব্ধ—ন্যাকড়াটুকু গুলিপেরেকটার বদলে এরা সকাল সন্ধ্যা খাটে। যে মাছ ধরে তার অতি সামান্য অংশ খায়, বেশীর ভাগ 'বিক্রি' করে দিতে হয় ঐ ন্যাকড়াটুকু, ঐ পেরেকটা আর দু'মুঠো চালের জন্য। 'বেচাকেনা'র নামে এই নগ্ন প্রবঞ্চনা চোখের সামনে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

'নগ্ন প্রবঞ্চনা?' চক্ষুষ্মান লোকের সামনে এ নগ্নতা ধরা পড়ে।

আর সবাই দেখছে সেই গল্পের রাজা যেন ফক্কিকারের জামা-কাপড় পরে শোভাযাত্রায় চলেছেন। 'সভ্যতা'র এই শোভাযাত্রার মাঝখানে সেই সরল বালকের চেঁচানো কেউ শুনতে পায় না—কিংবা চায় না।

* * *

সমুদ্রের গর্জন আর বাতাসের হাহাকারে যতক্ষণ বারান্দা মুখরিত থাকে, ততক্ষণ রাস্তার কলতলার শব্দ কানে আসে না—শুধু দেখি সমুদ্রপারের জেলেরা আসছে পথের পাশের কলতলায় নাইতে অথবা কাপড় কাচতে; মেয়েরা আসছে জল নিতে, বাসন ধুতে, কাপড় কাচতে, কাচ্চা-বাচ্চাদের নাওয়াতে, মাথা ঘষতে। কল থেকে জল বেরোয় অতি মন্দগতিতে—একটি কলসী ভরতে আধ ঘণ্টাটাক লাগে।

বেশী ভিড় না থাকলে দূর গাঁয়ের মেয়েরা শহরে যাবার মুখে মাথা থেকে চুবড়ি নামিয়ে দুদণ্ড জিরিয়ে নেয়, কলে হাত পা ধোয়।

আপিস কিংবা কারখানা যাওয়ার তাড়া থাকলে নিশ্চয়ই কলতলায় ঝগড়া-ঝাঁটি বেধে যেত। এখানে সব কিছু ধীরে-সুস্থে এগোয়। ঐ যে জেলেটা আরাম করে কলতলায় গা এলিয়ে দিয়েছে তার জন্য কলসীহাতে মেয়েটার কোনো আপত্তি আছে বলে মনে হচ্ছে না। যে কথাবার্তা হচ্ছে তা সমুদ্রের গর্জনে আর বাতাসের শনশনানিতে শোনা যাচ্ছে না।

আজ বাদলার দিন। নাইবার চাড় নেই বলে কলতলায় ভিড় কম। কাচ্চা-বাচ্চারা তো একদম আসে নি। কিন্তু কড়া গরম পড়লে এখানে রীতিমত হাট বসে যায়। কড়া গরম পড়ার মানে যে তখন হাওয়া বন্ধ, কাজেই তখন একটু আধটু চিৎকারও শোনা যায়—মেজাজও তখন কড়া হয়ে যায় বলে।

কলতলায় ভিড় কমে এসেছে। দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি, একটি জেলেনী কলসী ভরে দাঁড়িয়ে আছে—কলতলায় আর কেউ নেই যে কলসীটা মাথায় তুলে দেবে।

এমন সময় এক রিক্সা-ওলা যাচ্ছিল। রিক্সা দাঁড় করিয়ে সে কলসীটা তুলে দিয়ে ফের রিক্সা টানতে টানতে চলে গেল।

মেয়েটা একবার কৃতজ্ঞ নয়নে তাকালো পর্যন্ত না। রিক্সা-ওলাও অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সাহায্যটুকু করে গেল—যেন এরকম ধারা করাটা তার হামেশাই লেগে আছে।

একেই বলে খাঁটি ভদ্রতা।

আনিকি পাসিকিভি

এক বাঙালী দম্পতির সঙ্গে জিনীভার এক বড় হোটেলে উঠেছি। প্রথম দিনই খানাঘরে লক্ষ্য করলুম, আমাদের টেবিলের দিকে মুখ করে বসেছেন এক দীর্ঘাঙ্গী যুবতী। দীর্ঘাঙ্গী বললে কম বলা হয়, কারণ আমার মনে হল এঁর দৈর্ঘ্য অন্তত পক্ষে পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি হবে—আর আমরা তিনজন বাঙালী গড়পড়তায় পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি হই কি না-হই।

দৈর্ঘ্যের সঙ্গে মিলিয়ে সুগঠিত দেহ—সেইটেই ছিল তাঁর সৌন্দর্য, কারণ মুখের গঠন, চুলের রঙ এবং আর পাঁচটা বিষয়ে তিনি সাধারণ ইয়োরোপীয় রমণীদেরই মত।

ভদ্রতা বজায় রেখে আমরা তিনজনই যুবতীটিকে অনেকবার দেখে নিলুম। ফিস ফিস করে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের ভিতরে আলোচনাও হল। তখন লক্ষ্য করলুম, আমাদের দিকে তিনিও দু'চারবার তাকিয়ে নিয়েছেন।

সেই সন্ধ্যায় বাঙালী ভদ্রমহিলাটি হোটেলের ড্রয়িংরুমে বারোয়ারী রেডিয়োটা নিয়ে স্টেশন খোঁজাখুঁজি করছিলেন; আমি একপাশে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলুম। হঠাৎ সেই যুবতী ঘরে ঢুকে সোজা মহিলাটির কাছে গিয়ে পরিষ্কার ইংরিজিতে বললেন, 'আপনাকে সাহায্য করতে পারি কি? আপনি কি কোনো বিশেষ স্টেশন খুঁজছেন? আমার বেতারবাই আছে।'

পরিচয় হয়ে গেল। রোজ খাবার সময় আমাদের টেবিলেই বসতে আরম্ভ করলেন। নাম আনিকি পাসিকিভি—দেশ ফিনল্যাণ্ডে।

ফিনল্যাণ্ডের আর কাকে চিনব? ছেলেবেলায় ফিন্ লেখক জিলিয়াকুসের 'রুশ বিদ্রোহের ইতিহাস' পড়েছিলুম আর তাঁর ছেলে জিলিয়াকুসও বিখ্যাত লেখক—প্রায়ই 'নিউ স্টেটসম্যানে' উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন। ব্যস্।

কিন্তু তবু যেন পাসিকিভি নামটা চেনাচেনা বলে মনে হয়। সে কথাটা বলতে আনিকি, একটুখানি লজ্জার সঙ্গে বললেন, 'আমার বাবা ফিনল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট।'

আমরা তিনজনেই একসঙ্গে বললুম, 'অ।'

আনিকির সঙ্গে আলাপ হওয়াতে আমাদের ভারি সুবিধে হল। বাঙালী দম্পতি ইংরিজি আর বাঙলা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানতেন না, কাজেই আমাকে সব সময়ই ওঁদের সঙ্গে বেরতে হত। আনিকি অনেকগুলো ভাষা জানতেন; তিনি তাঁদের নিয়ে বেরতেন আর আমি য়ুনিভার্সিটি, লাইব্রেরি, মিটিং-মাটিং করে বেড়াতুম।

সুইস খানা যদিও বেজায় পুষ্টিকর তবু একটুখানি ভোঁতা—আনিকি ম্যানেজারের সঙ্গে কথা কয়ে তার পরিপাটি ব্যবস্থা করে দিলেন। শামুনিক্স্ দেখতে যাবার জন্য মোটর ভাড়া করতে যাচ্ছি—আনিকি এক দোস্তের গাড়ি ফিরি-গ্র্যাটিস-অ্যাণ্ড-ফরনাথিং যোগাড় করে দিলেন। তা ছাড়া জিনীভা, লজান, মন্ত্রো, ভিল্নভ্ (রমা রলাঁ সেখানে থাকতেন) সম্বন্ধে দিনের পর দিন নানা-প্রকারের খবর দিয়ে আমাদের ওয়াকিবহাল করে তুললেন।

সূক্ষ্ম রসবোধও আনিকির ছিল। আমি একদিন শুধালুম, 'আপনি অতগুলো ভাষা শিখলেন কি করে?'

বললেন, 'বাধ্য হয়ে। ইয়োরোপের খানদানী ঘরের মেয়েদের মেলা ভাষা শিখতে হয় বরের বাজার কর্নার করার জন্য। ইংরেজ ব্যারন, ফরাসী কাউন্ট, ইতালিয়ান ডিউক সক্কলের সঙ্গে রসালাপ না করতে পারলে বর জুটবে কি করে?'

তারপর হেসে বললেন, 'কিন্তু সব শ্যাম্পেন টক্! এই পাঁচ ফুট এগারোকে বিয়ে করতে যাবে কোন্ ইংরেজ, কোন্ ফরাসি? তাকে যে আমার কোমরে হাত রেখে নাচতে হবে বিয়ের রাতের বল ডান্সে। যা দেখতে পাচ্ছি, শেষটায় জাতভাই কোনো ফিন্‌কেই পাকড়াও করতে হবে!'

আমি শুধালুম, 'ফিন্‌রা কি বেজায় ঠ্যাঙা হয়?'

বললেন, 'ছয় ছয় তিন, ছয় ছয় হামেশাই। তাই তো তারা আর পাঁচটা জাতকে আকসার হাইজাম্পে হারায়।'

রসবোধ ছাড়া অন্য একটি গুণ ছিল আনিকির। হাজির-জবাব। কিছু বললে চট করে তার জুৎসই জবাব তাঁর জিভে হামেহাল হাজির থাকত।

একদিন বেড়াতে বেরিয়েছি তাঁর সঙ্গে। এক ডেঁপো ছোকরা আনিকির দৈর্ঘ্য দেখে তাকে চেঁচিয়ে শুধালে, 'মাদমোয়াজেল, উপরের হাওয়াটা কি ঠাণ্ডা?'

আনিকি বললেন, 'পরিষ্কার তো বটেই। তোমার বোটকা প্রশ্বাস সেখানে নেই বলে।'

আনিকির সঙ্গে আমাদের এতখানি হৃদ্যতা হয়েছিল যে তিনি আমাদের সঙ্গে লজান, মন্ত্রো, লুৎসের্ন, ইন্টেরলা কন, ৎসুরিশ সব জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন।

বিদায়ের দিন শ্রীমতী বসু তো কেঁদেই ফেললেন।

* * *

দু'এক বৎসর আমাদের সঙ্গে পত্র ব্যবহার ছিল। তার পর যা হয়—আস্তে আস্তে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।

তারপর বহু বৎসর কেটে গিয়েছে, এখানে এক ফিন্ মহিলার সঙ্গে আলাপ। শুধালুম, 'প্রেসিডেন্ট পাসিকিভির মেয়েকে চেনেন?'

গুম্ হয়ে রইলেন ভদ্রমহিলা অনেকক্ষণ। তারপর শুধালেন, 'আপনার সঙ্গে এখন কি তাঁর যোগাযোগ নেই?'

আমি বললুম, 'বহু বৎসর ধরে নেই।'

বললেন, 'তিনি চার মাস ধরে হাসপাতালে। পেটের ক্যানসার। বাঁচবেন না। আপনি একটা চিঠি লিখুন না। অবশ্য অসুখের কথা উল্লেখ না করে। জাস্ট, এমনি, হঠাৎ যেন মনে পড়েছে।'

সে রাত্রেই লিখলুম।

দিন চারেক পরে আরেক পার্টিতে সেই ফিন্ মহিলার সঙ্গে দেখা। শুধালেন, 'চিঠি লিখেছেন?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

বললেন, 'দরকার ছিল না। কাল দেশের কাগজে পড়লুম, মারা গেছেন।'

বিদেশে

প্রায়ই প্রশ্ন শুনতে হয়, 'সব চেয়ে কোন্ দেশ ভাল ?'

'মাই কানট্রি রাইট অর রঙ, মাই মাদার ড্রান্ক্ অর সোবার্' জাতীয় পাঁড় লোক হলে তো কথা নেই, চট করে বলবে, তার দেশই সব চেয়ে ভালো। কিন্তু আপনি যদি সে গোত্রের প্রাণী না হন তবে কি উত্তর দেবেন ? কেউ যদি প্রশ্ন শুধায়, 'সব চেয়ে খেতে ভালো কি ?' তা হলে যে রকম মুশকিলে পড়তে হয়।

তখন উল্টে শুধাতে হয়, 'ভালো দেশ' বলতে তুমি কি বোঝো ? প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আবহাওয়া, আহারাদি, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, সৌন্দর্যের পূজা, ধন-দৌলত, আতিথেয়তা, তুমি চাও কোনটা ?' 'সব কটা মিলিয়ে হয় না ?' 'আজ্ঞে না।'

তবু যদি কেউ পিস্তল উঁচিয়ে বলে, 'এখুনি তোমায় এদেশ ছাড়তে হবে ; কোথায় যাবে বলো !' (যাঁদের ভ্রমণে শখ তাঁরা অবশ্য উল্লসিত হয়ে বলবেন, 'পিস্তল ওঁচাতে হবে না, একবার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেই হল') তা হলে বোধ হয় সুইটজারল্যাণ্ডের নামই করব।

ধরে নিচ্ছি খর্চাটা আপনিই দিচ্ছেন—কারণ খর্চা যদি না দেন তবে তো সক্কলের পয়লাই ভাবতে হবে কোন্ দেশে গেলে দু' মুঠো অন্ন জুটবে। তা হলে 'সাউথ সী আয়লেণ্ড' বা আফ্রিকার এমন কোন দেশের কথা ভাবতে হবে যেখানে এন্তার কলা-নারকেল রয়েছে, জীবন সংগ্রাম কঠোর নয়—বেঘোরে প্রাণটা যাবার সম্ভাবনা কম। সেদিক দিয়ে অবশ্যি মালদ্বীপ সব চেয়ে ভালো। ওদেশে কেউ কখনো শখ করে যায় নি তাই 'অতিথি' শব্দটা মালদ্বীপের ভাষায় ঝাঁ চকচকে নূতন হয়ে পড়ে আছে, কখনো ব্যবহার হয় নি। মালদ্বীপের প্রত্যেকটি দ্বীপ এত ছোট যে, যে-কেউ যে-কোনো মুহূর্তে আপন বাড়ি ফিরে যেতে পারে—অতিথি হতে যাবে কে কার বাড়ি ? এখানে অবশ্য পালা নেমন্তন্নের কথা উঠছে না। তাই কেউ যদি কখনো পাকে-চক্রে মালদ্বীপ পেঁছিয় তবে তাকে এর বাড়িতে ওর বাড়িতে এ দ্বীপে ও দ্বীপে দু'দিন চারদিন থাকতে গিয়ে হেসেখেলে বছর তিনেক কেটে যায়। আমার জীবনে আমি মাত্র একটি মালদ্বীপ-বাসীর সঙ্গে কাইরোতে পরিচিত হই। প্রতিবার দেখা হলেই ভদ্রলোক মালদ্বীপ যাবার আমন্ত্রণের কথাটি আমায় স্মরণ করিয়ে দিতেন।

তাই বলছিলুম, খর্চা যখন আপনিই দিচ্ছেন তবে সুইটজারল্যাণ্ড সই। সুইটজারল্যাণ্ডের মত আক্কা দেশ ইউরোপে আর নেই—সেখানকার খর্চা যদি আপনি বরদাস্ত করতে পারেন তবে আর সর্বদেশ তো ফাউ। টুক করে প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা ঘুরে আসতে পারবেন। খর্চা সুইটজারল্যাণ্ডে থাকলে যা বার্লিন ঘুরে এলেও তা।

স্বপ্নেই যখন খাচ্ছেন, তখন ভাত কেন পোলাওই খান (সিন্ধী প্রবাদে বলে, 'স্বপ্নের পোলাওই যখন রাঁধছো তখন ঘি ঢালতে কঞ্জুসি করছো কেন ?'), স্বপ্নেই যখন ভ্রমণ করছেন তখন থার্ড ক্লাস কেন, গোটা জাহাজ চার্টার করে ড্য

লুক্স কেবিনে কিম্বা প্রেশারাইজড্ স্লেনে করে জিনীভা চলে যান।

লেক অব জিনীভার পারে একটি ছোট, অতি ছোট কুটির (শালে) ভাড়া নেবেন আর একটি রাঁধুনি যোগাড় করে নেবেন।

শুনেই নাভিশ্বাস উঠলো তো? বিদেশ-বিভুঁই জায়গা, তার ছুরি-চামারি ঠেকাবে কে? হিসেবে আলুর সের আড়াই টাকা দেখিয়ে বলবে না তো, 'কত্তা, দাঁওয়ে মেরেছি, না হলে আসলে দাম তিন টাকা?'

এই হল সুইটজারল্যাণ্ডের প্রথম সুখ। ছুঁচোমো, ছ্যাঁছড়ামো ওদেশ থেকে প্রায় উঠে গিয়েছে। সুইটজারল্যাণ্ডের হোটেলেও তাই। আক্রা বটে—বসবাস খাই-খরচের জন্য হয়ত দৈনিক কুড়ি টাকা নিল কিন্তু তার পরও আপনাকে মাখনটাতে ফাঁকি, মুর্গীটাতে জুচ্চোরি এসব করে না। আপনার খাওয়া দেখে যদি তার সন্দেহ হয় আপনি পেট ভরে খান নি তবে এসে বলবে, 'আপনি বিদেশী, এ রান্না আপনার হয়ত পছন্দ হয় নি। আপনি কি খেতে চান বাৎলে দিন, আমরা সে রকম রেঁধে দেব।'

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আপনার রাঁধুনী আপনাকে ফাঁকি দেবে না।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙতেই বিছানার পাশের বোতামটি টিপবেন। পাঁচ মিনিটের ভিতর গরম কফি, মুরমুরে রুটি আর শিশির-ভেজা মাখনের গুলি। রাঁধুনী বলবে, 'স্যর, চমৎকার ওয়েদার। আপনি বেরুচ্ছেন তো? আমি বাজার চললুম।'

লেকের পারে এসে একখানা বেঞ্চিতে বসবেন। খবরের কাগজটি পাশে রেখে তার উপর হ্যাট চাপা দেবেন।

আহা, কী গভীর নীল জল জিনীভা লেকের। লেকের ওপারে যে আল্প্স সেও যেন নীল, আর তার মাথায় মাথায় সাদা সাদা বরফের টুপি। তার উপর চূড়োর কাটা-কাটা সাদা ঝালরে সাজানো আকাশের ঘন নীল চন্দ্রাতপ। আর আকাশ-বাতাস, হ্রদের জল, পাহাড়ের গা, বরফের টুপি সব কিছু ভরে দিয়েছে কাঁচা হলুদের সোনালি রোদ। সকাল বেলায় বাতাস একটু ঠাণ্ডা; কিন্তু প্রতিক্ষণে আপনার গালে কানে আদর করে সে বাতাস কুসুম-কুসুম গরম হতে থাকবে। ওভার-কোটের বোতামগুলো খুলে দিয়ে পাইপটা ঠাসতে আরম্ভ করবেন। হয়তো গুন্‌গুন্ করতে আরম্ভ করবেন, 'আমি চিনি, চিনি, চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী।'

নীল জলের উপর দিয়ে সাদা জাহাজের এ-পার ও-পার খেয়া। জলের উপর আল্প্সের কালো ছায়া পড়েছে, ফাঁকে ফাঁকে নীল জল, তার উপর সাদা জাহাজ। সেই আল্পনার উপর জাহাজের চাকার তাড়ায় ভেঙে পড়ছে লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের চুমকি। যেন কোন্ খেয়ালি বাদশা টাকশাল থেকে এইমাত্র বেরনো টাকা নিয়ে খোলামকুচির খেলা লাগিয়েছেন।

পাল তুলে দিয়ে চলেছে জেলের নৌকো। অতি ধীরে অতি মন্থরে। জাল টেনে তোলার সময় রোদ এসে পড়ছে ভেজা জালে। কালো জাল যাদুর ছোঁয়া লেগে রুপোর জাল হয়ে গেল।

এই রকম রুপোর জাল দিয়ে আপনার প্রিয়া তার খোঁপা জড়াতো না ?

তৎক্ষণাৎ বুকটা চড়চড় করে ইস্-পার-উস্-পার ফেটে যাবে। কোন্ মূর্খ বলে দেশ-ভ্রমণে অবিমিশ্র আনন্দ ?

রববারে জিনীভার লোকের পাড় আরও চমৎকার।

বিস্তর নরনারী জাহাজ চড়ে বেরিয়েছে ফুর্তি করতে। এসব জাহাজ 'ইম্পিশাল'—লম্বালম্বি লেকের এপার ওপার হয়। সমস্ত দিন জাহাজে কাটিয়ে উত্তম আহারাদি করে (হে বাঙালী, লেকের মাছ খেতে চমৎকার

বাপ রে সে কি বিরাট মাছ উদর আণ্ডাময়
মুখে দিলে মাখন যেন জঠর ঠাণ্ডা হয়),

জাহাজের ব্যাণ্ডের সঙ্গে টাঙ্গোর ধাগিনাতি নাকধিন আর ওয়াল্ট্সের ধা ধিন না, ধা তিন না নেচে, কিংবা মাউথ-হারমনিয়াম বাজিয়ে, ছোঁড়াছুঁড়িদের সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ করে, কিংবা জাহাজের এক কোণে আপন মনে বসে খুদাতালার আসমান-পানি, পাহাড়-পর্বত দেখে দেখে সমস্ত দিনটা দিব্য কেটে যায়।

সুইসরা ইংরেজের মত গেরেমভারী লোক নয়। যদি দেখে, আপনি বিদেশী, এক কোণে একা বসে আছেন তবে কোনো একটু ছুতো ধরে আপনার সঙ্গে আলাপ করে নেবেই নেবে। অবশ্য আপনি যদি খেঁকিয়ে ওঠেন তবে আলাদা কথা, কিন্তু আপনি তো বদরসিক নন—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আপনি 'পঞ্চতন্ত্র' পড়েন—আপনি খুশী হয়েই সাড়া দেবেন।

কিন্তু সুশীল পাঠক, এই বেলা তোমাকে বলে রাখি। দেশভ্রমণের ষোল-আনা আনন্দই বরবাদ-পয়মাল যদি তুমি সে দেশের ভাষায় কথা কইতে না পারো। ভুল বললুম, বলা উচিত ছিল, যদি বুঝতে না পারো। কথা কইবার প্রয়োজন অত বেশী নয়, সুইস যদি দেখে যে তুমি তার ভ্যাচর ভ্যাচর বুঝতে পারছো, মাঝে মাঝে মোকা-মাফিক 'হুঁ' 'হুঁ' করছো কিংবা বুড়া রাজা প্রতাপ রায়ের মত সমে সমে মাথা নাড়ছো তা হলেই সে খুশী।

সুইস কেন, পৃথিবীর প্রায় সব জাতের লোকই বিদেশী সম্বন্ধে কৌতূহলী। বিশেষ করে মেয়েদের উৎসাহ এ বাবদে পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী। অথচ মেয়েরা লাজুক তাই তারা পুরুষকে অগ্রদূত হিসাবে পাঠায় কলেকৌশলে আলাপ জমাবার জন্য। তার পর

'দীন যথা যায় দূরে, তীর্থ দশরশনে
রাজেন্দ্র সঙ্গমে—'

কিংবা কালিদাসের বজ্রমণি সমুৎকীর্ণ হওয়ার পর সূত্র যে রকম সুড়ুৎ করে উৎরে যায় (সংস্কৃতটা আর ফলালুম না, ভুল হয়ে যাবার প্রচুর সম্ভাবনা), মেয়েটি আপনার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নেবে।

সাবধানী পথিক, ভয় পেয়ো না। যে মেয়েটি আপনার সঙ্গে আলাপ জমাবার জন্য ছোঁড়াটাকে পাঠিয়েছিলেন সে ফালতো। তার বোন ছোকরাটির ফিয়াঁসে। বোন সঙ্গে আছে, সে বেচারী একা একা কি করে ?

চামড়া আর চুলের রঙ তাজ্জব জিনিস।

আমরা ফর্সা রঙের জন্য আকুল, যার চুল একটুখানি বাদামী তার তো দেমাকে মাটিতে পা পাড়ে না। আর বেশীর ভাগ উত্তর এবং মধ্য ইয়োরোপীয় বাদামী চামড়া আর কালো চুলের জন্য জান্ কোরবানী দিতে কবুল।

চট করে একটা ঘটনার উল্লেখ করে নেই। এ ঘটনা অধমের জীবনে একাধিকবার হয়েছে।

এরকম এক জাহাজে এক কোণে একা বসে আছি। আমার থেকে একটু দূরে এক পাল ইস্কুলের মেয়ে মাস্টারনীর সঙ্গে ফুর্তি করতে জাহাজে চেপেছে। সবাই আপন আপন স্যাণ্ডউইচ বাড়ি থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। স্যাণ্ডউইচগুলো টেবিলের মধ্যিখানে বারোয়ারি করে রাখা হয়েছে, আর জাহাজ থেকে তারা অর্ডার করেছে লেমনেড।

কী চেঁচামেচি! 'দেখ দেখ, ফ্রিডির মা কি রকম খাসা বেকন্-স্যাণ্ডউইচ পাঠিয়েছে,' ফ্রিডি লজ্জায় টমাটো হয়ে বলছে, 'না না, মাস্টার্ড ছিল না বলে স্যাণ্ডউইচ ভালো হয় নি,' 'ক্লারার মা'র পাঠানো স্যালাডটা খা ভাই, জানিস ওঁর বাগানে যা লেটিস আর টমাটো হয়!' আর টীচার শুধু বলছেন, 'চুপ চুপ, অত করে চ্যাঁচাতে নেই। লোকে কি ভাববে?'

ধর্ম সাক্ষী লোকে কিছু ভাবে না। বরঞ্চ ওরা না চ্যাঁচালে পাঁচজন অস্বস্তি অনুভব করত; ভাবত কালা-বোবাদের ইস্কুল পিক্‌নিকে বেরিয়েছে।

সব কটা মেয়ে—ইস্তেক টীচার—আড়নয়নে ভদ্রতা বজায় রেখে আপনার কালো চুল আর বাদামী রঙের দিকে তাকাবে।

পরের স্টেশনে হুড়মুড় করে সবাই নেমে গেল। আমার মনটা উদাস হয়ে গেল।

তখন দেখি একটি আট ন'বছরের মেয়ে টেবিলের তলায় লুকিয়ে ছিল, গুড়ি গুড়ি আমার কাছে এসে কার্টসি করে (অর্থাৎ দু হাতে ফ্রক একটুখানি তুলে হাঁটু ভেঙে) বললে, 'গুটেন্ টাখ্) সুপ্রভাত) !'

আমি চিবুকে হাত দিয়ে আদর করে বললুম, 'গুটেন্ টাখ্, মাইন জুসেন (সুপ্রভাত, মিষ্টি মেয়ে)।'

লজ্জার কাঁচুমাচু হয়ে, চুলের ডগা পর্যন্ত লাল করে বললে, 'আপনি রাগ করবেন না?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয় না।'

'তবে বলুন তো, আপনি কি দিয়ে চুল কালো করেছেন! আমি কাউকে বলবো না, তিন সত্যি।'

আমি তখন তার সোনালি চুলের দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে। বললুম, 'ডার্লিং, তোমার কী সুন্দর সোনালি চুল!'

গাল ফুলিয়ে বললে, 'রাবিশ, আমি কালোচুল চাই।'

কিছুতেই বোঝাতে পারি নে, আমি চুলে রঙ মাখাই নি।

শেষটায় হঠাৎ বুদ্ধি খেলল। কোটের আস্তিন সরিয়ে দেখালুম আমার লোমও কালো। বললুম, 'ওগুলো তো আর বসে বসে কালো করি নি।'

বিশ্বাস তখন তার হল। মুখে গভীর বিষাদ মেখে, মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে জাহাজ থেকে নেমে গেল।

দু'টাকা জোর ন'সিকে দিয়ে টিকিট কেটে বসেছেন। এমন আর কি আক্কা হল? সমস্ত দিন কাটাতে গেলে বায়স্কোপেও তার চেয়ে বেশি খরচা হত।

হুবহু গোয়ালন্দী জাহাজ। কেবিনের বালাই নেই—সব খোলা ডেক। রেলিঙের গা ঘেঁষে ঘেঁষে চারজনের বসবার মত ছোট ছোট টেবিল সাজানো। নীল সাদায় ডোরা কাটা করকরে টেবিল ক্লথ। ক্লিপ দিয়ে টেবিলের সঙ্গে সাঁটা, পাছে হাওয়াতে ভর করে পক্ষীরাজের মত ডানা মেলে লেকের 'হে-পারে' চলে যায়।

'হে-পারে?' চট করে মনটা পদ্মার দিকে ধাওয়া করলো তো?

আমারও মনে পড়েছিল পদ্মার-কথা। জীবনে কতবার প্রদোষের আধা-আলো-অন্ধকারে চাঁদপুর থেকে জাহাজে করে গোয়ালন্দের দিকে রওয়ানা হয়েছি। বিনিদ্র রজনীর ক্লান্তিতে সর্বদেহমন অবসন্ন—বাড়ি ছাড়ার সময় মা অমঙ্গলের চোখের জল ঠেকিয়ে রাখতে পারেন নি, সে কথা বার বার বুকের ভিতর কাঁটার মত খোঁচা দিচ্ছে, বহু চেষ্টা করেও মন থেকে সেটাকে সরাতে পারছি নে।

পদ্মার সূর্যোদয় মনের অনেকখানি বেদনা প্রতিবারই কমিয়ে দিয়েছে। রেলিঙের পাশে বসে, তারই উপর মাথা কাৎ করে তাকিয়ে আছি আকাশের দিকে, যেখানে কালো-সাদার মাঝখানে আস্তে আস্তে গোলাপী আভা ফুটে উঠছে। পদ্মার জল রাঙা হয়ে গেল, মহাজনী নৌকোর পাল ফুলে উঠে মাঝখানটায় গোলাপী মেখে নিয়েছে, দূরের পাখি আর এ-পৃথিবীর পাখি বলে মনে হচ্ছে না, কোন নন্দনকাননের মেহদি পাতার রস দিয়ে যেন ডানা দুটি লাল করে নিয়েছে।

ঐ তো সূর্য ঐ তো সবিতা!

জাহাজ জোর ফালতো স্টীম ছাড়ছে। তারই উপর ক্ষণে ক্ষণে রামধনুর রঙ খেলে যাচ্ছে। মাঝি-মাল্লাদের চেঁচামেচি কেমন যেন আর কর্কশ বলে মনে হচ্ছে না। পাশে মোল্লাজীর নমাজ পড়া শেষ হয়েছে। সুর করে কোরান পড়তে আরম্ভ করেছেন। হাওয়াতে তাঁর দাড়ি দুলছে, পাগড়ীর ন্যাজ দুলছে। বর-যাত্রীর দল যাচ্ছে, না কনে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, কে জানে—একমাথা সিঁদুর-মাখা একটি মেয়ে ঘন ঘন শাঁখ বাজাচ্ছে। হিঁদু বাড়িতে তো শাঁখ শুনেছি সন্ধ্যেবেলায়, ভোরেও বাজায় নাকি? কে জানে?

উত্তমার্ধ নগ্ন, জাহাজের রশির মত মোটা ধবধবে পৈতে-ঝোলানো এক ব্রাহ্মণ বললেন, 'দেখো তো, মিয়া, ঠিক ঠিক রাজবাড়ির টিকিট দিয়েছে তো? যা ভিড় ছিল, কি দিতে কি দিয়ে বসছে কে জানে? চশমাটাও হারিয়ে গিয়েছে।'

রসভঙ্গ হল অস্বীকার করি নে, কিন্তু কাতর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ; অবহেলা অবিনয় করলে মর্শীদ-মুরুব্বীর মারাত্মক অভিসম্পাত লাগবে। বেশ করে দেখে নিয়ে বললুম, 'আজ্ঞে (আগে হলে একথা বলার প্রয়োজন হত না যে, মুরুব্বীরা ছেলেবেলাই আমাদের পই-পই করে শিখিয়েছিলেন, হিন্দু গুরুজনদের সঙ্গে কথা কইতে হরদম 'আজ্ঞে'—বাঙাল ভাষায় 'আইগা' বলতে হয়) ঠিকই দিয়েছে ; আপনাকে ঠকাতে যাবে কোন্ পাষণ্ড ?'

ব্রাহ্মণ ভারী খুশী। আমার পাতা বিছানাতে পরম পরিতৃপ্তিভরে গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

হঠাৎ একটা গল্প মনে পড়ে গেল।

তরকারি-বেচনে-ওলা গেছে জাহাজ ইস্টিশানে টিকিট কাটতে—

'বাবু অ—অ—অ, অ—বাবু, নারান্‌জোর (নারায়ণগঞ্জ) এ্যাখ্‌খান টিকস্ দিবাইন নি ?'

বাবু বললেন, 'ছ আনা।'

তরকারি-ওলা বললে, 'বাবু অ—অ—অ, চারি আনায় অইব না ?'

বাবু পশ্চিম বাঙলার লোক, ওনাদের মেজাজ আমাদের দ্যাশে এলে একটুখানি মিলিটারি হয়ে যায়। খেঁকিয়ে বললেন, 'দে ব্যাটা দে, ছ' আনা দে।'

গভীর বেদনা সহকারে তরকারি-ওলা বললে, 'বাবু অ—অ—, তুমি আমার দোকানে রোজ রোজ আও। কলাডা মুলাডা কিনো। দরদাম করো। আর আমি আইলাম তোমার দোকানে এগ্ দিন। দরদাম করতা গেলাম—তুমি অমন খাটাশের মতন মুখডা করলা ক্যান্ ?'

মনে আমার সন্দেহ জাগছে, চতুর পাঠক বিশ্বাস করতে চান না জিনীভার জাহাজে বসে আমার এ 'নারানজী' (নারায়ণগঞ্জী) গল্প সত্যই মনে পড়েছিল কি না।

কেন পড়েছিল বলছি।

ইয়োরোপের সব দেশের ভিতর সুইটজারল্যাণ্ডই সবচেয়ে 'এক দরে বিক্রি'। সেখানে দরদস্তুর করতে গেলে (আমি বাঙাল, তাই করেছিলুম) সুইস এমনই বোকার মত তাকায়, কিংবা খেঁকিয়ে ওঠে যেন তাকে আমি ড্যাম্ মিথ্যেবাদী বলে সন্দ করছি।

অথচ দেখুন, ইয়োরোপীয়রা আমার দেশে হামেশাই দরদস্তুর করে। আমি যদি তরকারি-ওলার মত ওদেশে একবার গিয়ে দরদস্তুর করি, তবে ওরা 'খাটাশের মত মুখ করবে ক্যান ?'

ইতিমধ্যে মধ্য দিনের তপ্ত হাওয়া আমার মন উদাস করে দিয়েছে। মেঘের ডাকে, নব বরষণে বাঙালীর মন কেমন যেন গভীর বেদনায় ভরে যায়, আর সে মনটা উদাস হয়ে যায় দুপুর বেলায় আকাশের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ যেন বুকে বেজে ওঠে, আমি এ সংসারের নই, এখানকার সুখ-দুঃখের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

কিন্তু ওরকম ধারা মন খারাপের দাওয়াই জাহাজে মজুদ। হঠাৎ অর্কেস্ট্রা

বেজে উঠল ঃ

'গোলাপবাগানে, সান্‌সুসির গোলাপবাগানে—'

কি হয়েছিল ?

'সেই গোলাপবাগানে আমি মেরিকে চুমো খেয়েছিলুম—

প্রথম চুম্বন তো মানুষ জীবনে কখনো ভুলতে পারে না।'

ট্রেনে বসে আছেন ; চট করে আপনার সঙ্গে কেউ আলাপ জমাতে যাবে না—আপনি হয়ত চুপ করে বসে থাকাটাই পছন্দ করেন। কিন্তু ফুর্তির জাহাজে যখন বসেছেন, তখন নিশ্চয়ই ফুর্তি করতে চান—বাঙলা কথা। একা বসে বসে ফুর্তি হয় না, তাই কেউ যদি আপনার সঙ্গে পরিচয় করে সুখদুঃখের গল্প জুড়তে চায়, তা হলে আপনার আপত্তি না থাকারই কথা এবং আশ্চর্য, মানুষ অনেক সময় পরদেশীর সঙ্গে যতখানি প্রাণ খুলে কথা কইতে পারে, স্বদেশবাসীর সঙ্গে ততটা পারে না। প্রাণের কোণে বছরের পর বছরের জমানো কোনো এক গভীর বেদনা আপনি লজ্জায় কখনো কাউকে স্বদেশে প্রকাশ করেন নি ; হঠাৎ একদিন দেখতে পাবেন, অজানা-অচেনা বিদেশবিভূঁইয়ে এক ভিনদেশীর সামনে আপনি আপনার সব দুঃখ কাহিনী উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। তার সঙ্গে জীবনে আপনার আর কখনো দেখা হবে না—সেই কারণেই হয়ত আপনার হৃদয়ের আঁকুবাঁকু তার বুকের উপর চেপে বসা জগদ্দল পাথর সরিয়ে ফেলে নিষ্কৃতির গভীর আরাম পায়। ইয়োরোপের লোক তাই কোনো এক গোপন বেদনা নিয়ে যখন হন্যে হবার উপক্রম করে, তখন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যায়—সেখানে বেদনার বোঝা নামিয়ে দিয়ে সে আবার সুস্থ মানুষ হয়ে সংসারের দুঃখ-কষ্টের সামনাসামনি হয়।

বোধ হয়, ঐ একই কারণে কখনো কখনো মানুষ বিদেশে স্বদেশবাসীর কাছেও তার বেদনার দ্বার খুলে দেয়।

একদা প্রাগ শহরে দেখি, এক ভারতীয় বৃদ্ধ—খুব সম্ভব দাক্ষিণাত্যের—রাস্তায় বেকুবের মতন দাঁড়িয়ে আছেন। মুখের ফ্যাল-ফ্যাল ভাব দেখে অনুমান করলুম, হয়ত রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন, কিংবা হয়ত পার্সটাও গেছে। কাছে গিয়ে শুধালুম 'ব্যাপার কি ?'

ভদ্রলোক তো আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেন আর কি। শুধু যে হোটেল হারিয়ে বসেছেন তাই নয়, হোটেলের নামটা পর্যন্ত বেবাক ভুলে গিয়েছেন।

কি করে তাঁর হোটেল খুঁজে পেলুম সে এক নয়, পাঁচ—মহাভারত। দ্বিজেন্দ্রলাল তো আর মিছে বলেন নি, 'একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লংকা করিল জয়।' লংকা রাক্ষসের দেশ, প্রাগে ভদ্রসন্তানের বসবাস। আমার মত লেখাপড়ায় পাঁঠা বঙ্গ সন্তানের মাথায় এসব ফন্দিফিকির বিস্তর খেলে—সাক্ষাৎ শার্লক হোম্‌স্‌ আর কি—সে কথা 'দেশে'র পাঠককে হাইজাম্প-লঙজাম্প দিয়ে বোঝাতে হবে না।

কিন্তু আমি মনে মনে পাঁচশবার তাজ্জব মানলুম, এই নিরীহ তামিল ব্রাহ্মণের

প্রাগে আসার কি প্রয়োজন? তখনকার দিনে প্রতি শহরে মেলা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স বসত না যে, তিনি ভেটেরানারির 'রিণ্ডারপেস্ট' কিংবা ভারত বিদেশে ক' শ' মণ গাঁজাগুলি চালান করতে পারবে, তাই নিয়ে পাণ্ডববর্জিত প্রাগে ভারতের প্রতিভূ হয়ে আলোচনা করতে আসবেন।

হোটেলে পেঁছিতে দেখি, সেখানেও আরেক কুরুক্ষেত্র। এরকম নিরীহ বিদেশী প্রাণী হোটেলের লোকও কখনো দেখে নি—প্রাগ তো প্যারিস নয়—তাই তারা ব্যাকুল হয়ে পড়েছে দশটায় বেরিয়ে লোকটা আটটা অবধি ফেরে নি কেন? তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার জন্য আমি সেখানে শার্লক হোম্‌সেরই কদর পেলুম।

ভদ্রলোক চেপে ধরলেন, তাঁর সঙ্গে খানা খেতে যেতে হবে।

অপেরার টিকিট আমার কাটা ছিল—প্রাগের অপেরা ডাকসাইটে—কিন্তু আমার মনে হল, 'প্রাগে তামিল ব্রাহ্মণ' যে-কোনো অপেরার টাইটলকে হার মানাতে পারে।

বললেন, 'খানাটা কিন্তু আমার ঘরেই হবে—ডাইনিংরুমে না।'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

ঘরে ঢুকেই তড়িঘড়ি সুট খুলে ফেলে ধুতি বের করে মাদ্রাজী কায়দায় সেটাকে লুঙ্গি বানিয়ে পরলেন, গায়ে চাপালেন শার্ট, আর কাঁধে ঝোলালেন তোয়ালে।

চেয়ারে বসে খাটে দু-পা তুলে দিয়ে বললেন, 'আঃ!'

এরকম দরাজ-দিল লোক আমি জীবনে আর কখনো দেখি নি।'

ওয়েটার ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে যখন বলে, এটা আনবো কি, সেটা আনবো কি, তিনি মাথা দুলিয়ে বলেন, 'ইয়েস, ইয়েস, ব্রিং, ব্রিং।'

বড় হোটেল। সেখানে 'আ লা কার্তে' অন্তত একশ' পদ রান্না হয়, তিনশ' রকমের মদ মজুদ আছে। আমি বাধা দিতে গেলে তিনি বলেন, 'কি জ্বালাতন, ভালো করে খেতে দেবে না কি?'

অথচ তিনি খেলেন, আলু-কপি-মটর-সেদ্ধ, রুটি-মাখন, স্যালাড্ আর চা। বললেন, 'বুড়ো বয়সে আর মাছ-মাংসটা ধরে কি হবে?'

তবে তিনি নিশ্চয়ই এই প্রথম ইয়োরোপ এসেছেন। যে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি বৃদ্ধবয়সে অন্যকে মাংস খাওয়ায় সে যৌবনে এলে নিজেও চেখে নিত।

ক্রমে ক্রমে পরিচয় হল। আই সি এস থেকে পেন্সন নিয়েছেন। ওদিকে শাস্ত্রী ঘরের ছেলে—বিস্তর সংস্কৃত সুভাষিত মুখস্থ। একটানা নানা রকমের গল্প বলে যেতে লাগলেন—প্রধানত শঙ্কর রামানুজের জীবনের চুটকিলা ঘটনা নিয়ে। ইংরেজিতে যাকে বলে, 'লাইটার সাইড'। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনে যেতে লাগলুম।

তবে কি রাতের অন্ধকার যেমন যেমন ঘনাতে লাগে, মানুষের মনের অন্ধকার ঘর তার দরজা আসতে আস্তে খুলে দেয়? আমরা আহারাদির পর বেলকনিতে ডেকচেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়েছি, চোখ আকাশের দিকে। চতুর্দিকের ফ্লাটের

আলো আর রাস্তার বাতি নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের তারা জ্বল-জ্বল করে ফুটে উঠছে। চেনা ঘরদোরের তুলনায় মানুষ তেমন কিছু ক্ষুদ্র জীব নয়, কিন্তু বিরাট গম্ভীর আকাশের মূর্তি যখন তারায় তারায় ফুটে ওঠে, তখন তার ক্ষুদ্র হৃদয় আর তার ক্ষুদ্রতর লৌকিকতা, সংকীর্ণতা কেমন যেন আস্তে আস্তে লোপ পেয়ে যায়।

কোনো ভূমিকা না দিয়ে বৃদ্ধ হঠাৎ বললেন, 'যার সঙ্গে আলাপচারি হয়; সে-ই ভাবে, এ-বুড়ো ইয়োরোপে এসেছে কি করতে? কি যে বলব, ভেবে পাই নে।'

এ তো তিনি আমাকে বলেছেন না, আপন মনে ভাবছেন এবং হয়ত তাঁর অজানাতেই গলা দিয়ে সে ভাবনা প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে। আমি যে শুধু চুপ করলুম, তাই নয়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও প্রায় বন্ধ করে আনলুম, যাতে তার চিন্তাধারা কোনো প্রকারের টক্কর না খায়।

না, ভুল বুঝেছি। তিনি আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন।

বললেন, 'দেশের অনেকেই জানে, কিন্তু কেউ আমাকে কখনো জিজ্ঞেস করে নি। এদেশে জিজ্ঞেস করলেও উত্তর দিই নে। কিন্তু তোমাকে বলি। এতে অসাধারণ কিংবা কেলেঙ্কারির কিছুই নেই—থাকলে মানুষ চুপ করে থাকে না, সব সময়েই ফলিয়ে বর্ণনা করে আপন সাফাই গায়।

'আমি বড় সুখী ছিলুম। স্ত্রী, দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে। দুটি ছেলেই ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে এম. এ.-তে, সংস্কৃতে আর ইকনমিক্সে। মেয়েটির বিয়ে ঠিক —জামাইয়ের চেহারা কন্দর্পের মত।

'চাকরি জীবনে মাদুরা, কাঞ্চী, তাঞ্জোর বহু জায়গায় ঘুরেছি, কিন্তু পৈতৃক ভদ্রাসনে যাবার কখনো সুযোগ হয় নি; আমিও গ্রাম ছেড়েছি, ষোল বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পরেই।

'হঠাৎ গৃহিণী চেপে ধরলেন—আমি তখন সবেমাত্র পেন্সন নিয়েছি—তিনি তাঁর শ্বশুরের ভিটে দেখতে যাবেন। ছেলেরাও বলে যাবে, মেয়েটার তো কথাই নেই। আমি অনেক করে বোঝালুম, সেখানে এটা নেই, ওটা নেই, সেটা নেই, সাপ আছে, খবরের কাগজ নেই, মশা আছে, পাইখানার ব্যবস্থা নেই, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, তারা যাবেই যাবে। আমারও যে সামান্য দুর্বলতা হয় নি, সে কথা হলফ করে বলতে পারব না।

'বিশ্বেস করবে না, বাবা, তারা গ্রাম দেখে মুগ্ধ। আমি তো ট্রেনে পই পই করে গ্রামটাকে যতদূর সম্ভব কালো করে এঁকেছিলুম, তাদের শক্‌টা যেন বড্ড বেশি কঠোর কঠিন না হয়। তারা গাইলে উল্টো গান। ইঁদারা থেকে জল তুললো হৈ-হৈ করে—মাদ্রাজে কলের জল বন্ধ হলে এরাই 'দি হিন্দু' কাগজে কড়া কড়া চিঠি লিখত—, মেয়েটা দেখি, ছোট ছোট ইঁট নিয়ে বাস্তু-ভিটের গর্তগুলো বন্ধ করছে, গৃহিণী শুকনো তুলসীতলায় অনবরত জল ঢালছেন।

'বড় আরাম পেলুম। গৃহিণীর কথা বাদ দাও, তিনি সতী-সাধ্বী, কিন্তু

আমার 'মর্ডান' ছেলেমেয়েরাও যে আমার চতুর্দশ পুরুষের ভিটেকে তাচ্ছিল্য করল না, তাই দেখে আমার চোখে জল ভরে এল।

'আমার ছেলেবেলায় যারাই গ্রাম থেকে চলে যেত, তারা আর ফিরে আসত না। আমার বাবা তাই আমাকে কতবার বলেছেন, তার ঠিক নেই, 'বেণু-গোপলা, দেশের ভিটেমাটি অবহেলা করিস নি, আর যা কর কর!"

'চাকরির ধান্দায় আমি তাঁর সে আদেশ পালন করতে পারি নি। এখন দেখি, আমার ছেলেমেয়েরা তাঁর সে আদেশ পালন করছে। বসে বসে প্ল্যান কষছে, কোথায় রজনীগন্ধা ফেটাবে, কোথায় পাঁচিল তুলবে, কোথায় নাইট স্কুল খুলবে। আমার গৃহিণী সার্থক গর্ভধারিণী।'

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে রইলেন। আমি আরো বেশি চুপ। বললেন, 'এর পর আর বলার কিছু নেই, তাই সংক্ষেপে বলি। মাত্র দুদিন কেটেছে; তিন দিনের দিন সকাল বেলা মেয়েটার কলেরা হল, ঘণ্টাখানেকের ভিতরে ছেলে দুটোরো। লোক ছুটিয়ে মাদ্রাজে তার করলুম। আরো লোক ছুটলো এখানে-সেখানে ডাক্তার-বদ্যির সন্ধানে। দশ ঘণ্টার ভিতরে তিনজনই চলে গেল। গৃহিণীর চোখের সামনে।

'তিনি গেলেন তার পরদিন। কলেরায় না অন্য কিছুতে বলতে পারি নে। আমি তখন সম্বিতে ছিলুম না।'

আমি ক্ষীণকণ্ঠে বললুম, 'থাক, আর না।'

আমার আপত্তি যেন শুনতে পান নি। বললেন, 'মাদ্রাজে ফিরে আসার কয়েকদিন পরে আমার ব্যাংকার আমার স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা কইতে চাইলে—সে জানতো আমাদের টাকা-পয়সার বিষয় আমি কিছুই জানি নে। তার কাছ থেকে শুনলুম, গৃহিণী ভালো ভালো শেয়ার কিনে লাখ তিনেকের মত জমিয়েছিলেন।

'তাই বেরিয়ে পড়েছি। টমাস কুক যেখানে নিয়ে যায়, সেখানেই যাই।

'ওদের ছবি দেখবে? চলো, ঘরের ভিতর যাই।'

মনোজ বসুর ভাষায় জাহাজে বসে 'কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে' চলে গিয়েছিলুম, হঠাৎ হুশ হল আমি পদ্মায় নই, প্রাগে নই আমি বসে আছি জিনীভা লেকের জাহাজে।

জাহাজে অর্কেস্ট্রা গানের পর গান বাজিয়ে যাচ্ছে আর ডেকের মাঝখানে বিস্তর লোক টাঙ্গো, ওয়াল্‌ট্‌স্‌, ফক্স ট্রট নাচছে। আর সে কত জাতবেজাতের লোক—, বড় বড় চেক কাটা কোট-পাতলুন-পরা মার্কিন (আমাদের মারোয়াড়ী ভাইয়ারা যে রকম 'বড়া বড়া বুট্টাদার' নক্সা পছন্দ করেন) নিখুঁৎ, নিপুণ, লিপস্টিক-রুজ-মাখা তন্বঙ্গী ফরাসিনী, গাদা-গোদা হাব্দা-হোব্দা জর্মন আর ডাচ্‌, গায়ে কালো নেট্‌ আর লেসের ওড়না জড়ানো বিদ্যুৎনয়নী হিস্পানী রমণী, আপন হাব্বাইয়ের দম্ভে-ভরা একটুখানি আলগোছে-থাকা ইংরেজ আর তাদের উঁচু-নীচুর-টক্করহীন হকির বাঘিনী, টেনিস—পাগলিনী স্পোর্টস রমণী।

এই হরতেন রুইতেন সায়েব বিবির তাসের দেশে নিরীহ ভারতসন্তান কল্কে পাবে কি ?

তা পায়—আকসারই পায়।

তার প্রধান কারণ, আর পাঁচটা ইয়োরোপীয় এবং মার্কিন জাত সুইটজারল্যাণ্ডে এসেছে ফুর্তি করতে, এদেশের মেয়েদের সঙ্গে ভাবসাব জমিয়ে ফষ্টিনষ্টি করতে। তার কলকৌশল—নাচের ভিতর দিয়ে, ভাষার অজ্ঞতার ভান করে, দামী দামী মদ খাইয়ে—এরা বিলক্ষণ জানে এবং কাজে খাটাতে কিছুমাত্র কসুর করে না। এদের সম্বন্ধে তাই সুইস বাপ, ভাই, মা দিদি এমন কি মেয়েরাও একটুখানি সাবধান।

ভারতীয় মাত্রই যে এদের তুলনায় 'ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির' এ-কথা আমি বলব না। কিন্তু ইয়োরোপ বাসের প্রথম অবস্থায় ভারতীর মদ খেত কিংবা খাওয়াতে জানে না, নাচতে পারে না এবং সবচেয়ে বড় কথা তার ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে সে কণামাত্র তালিম পায় নি বিদেশিনীর সঙ্গে কি করে দোস্তী-ইয়ার্কি জমাতে হয়।

আমি 'ৎসুরিশ সংবাদ' পড়ছিলুম। পড়া শেষ হতে কাগজখানা টেবিলের উপর রাখামাত্রই আমার পাশের টেবিলের এক ছোকরা এসে আমাকে 'বাও' করে বললে, 'আমার "বাজেল সংবাদে"র বদলে আপনার 'ৎসুরিশ সংবাদ'খানা এক মিনিটের জন্য পেতে পারি কি ?'

'নিশ্চয় নিশ্চয়।'—এ ছাড়া আপনি আর কি বলবেন ?

কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল আলাপ জমাবার জন্য সরকারী রাস্তা ধরেই সে যাত্রা শুরু করেছে। কারণ এতক্ষণ ধরে সে তার সঙ্গের দু'টি মেয়ের সঙ্গেই গল্পগুজব বা নাচ-গান করছিল—কাগজ পড়ার ফুর্সৎ কই ?

তবু কাগজখানা যখন নিয়ে গিয়েছে তখন দু' মিনিট পড়ার ভান করতে হয়। তাই করল। ফেরৎ দেবার সময় ধন্যবাদ জানিয়ে হেসে বলল, 'আজকাল কিস্সু নূতন খবর মেলে না।'

আমি বললুম, 'একদম না ; সব যেন দড়কচ্চা মেরে গিয়েছে।'

মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললো, 'যা বলেছেন।'

এরপর আপনাকে অবশ্যই বলতে হয়, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ; বসুন।'

কিন্তু কিন্তু করে বসবে, তারপর আরো দু' মিনিট না যেতেই বলবে, 'তার চেয়ে চলুন না আমাদের টেবিলে। আমার সঙ্গে দু'টি বান্ধবী রয়েছেন। তাঁরা বড্ড একলা পড়ে গেলেন।'

আপনি বলবেন, 'রাম রাম ! বড্ড ভুল হয়ে গেল আপনাকে ঠেকিয়ে রেখে।'

'ছোকরা বলবে, 'সে কি কথা, সে কি কথা !'

এই হল প্রধান সরকারী পন্থা, আলাপ-পরিচয় করার—অবশ্য আরো বহু গলিঘুঁচিও আছে।

বড়টির নাম গ্রেটে, ছোটটি ট্রুডে। ছেলেটার নাম পিট্। পিট্ বলবে, 'কিছু একটা পান করুন।'

আমি বললুম, 'এইমাত্র কফি খেয়েছি ; এখন আর থাক—অনেক ধন্যবাদ।'

এইবারে যে আলাপচারি আরম্ভ হবে তার চৌহদ্দি বাতানো সরল কর্ম নয়। সাধু-সন্ন্যাসীরা সত্যি পেরেকের বিছানায় দিনের পর দিন কাটাতে পারেন কিনা, গোখরোর বিষ ওঝা নামাতে পারে কিনা, কিংবা যোগাভ্যাস করে মাটি থেকে তিন ইঞ্চি উঠে যেতে কাউকে কখনো আমি দেখেছি কিনা?

ছেলেটা যদি দর্শনের ছাত্র হয় তবে হয়ত ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বসবে, মেয়েটির যদি বাজনায় শখ থাকে তবে আপনাকে শুধিয়ে বসবে, ভারতীয় সঙ্গীতে ক'রকমের তাল হয়।

এসব তাবৎ প্রশ্নের সদুত্তর কে দেবে? ব্রজেন শীল, সুনীতি চাটুয্যে, বিশ্বকোষ, সুকুমার রায়ের 'নোটবুক', গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা সব মিলিয়ে ককটেল্ বানালেও ঐ প্রশ্নমরু তাকে বেমালুম শুষে নেবে।

বিদেশী একথা বোঝে না যে, তার ঠিক যে জিনিসে কৌতূহল আপনার তাতে মহব্বৎ নাও থাকতে পারে। তার উপরে আরেকটা কথা ভুললে চলবে না, আমরা ইস্কুল-কলেজে যে তালিম পাই তাতে ক্রুসেডের তারিখ মুখস্থ করানো হয়—অজন্তা, ধ্রুপদ শেখানো হয় না।

তবে অতি অবশ্য স্বীকার করবো, একটি প্রাতঃস্মরণীয় প্রতিষ্ঠান আমি চিনি যিনি এসব প্রশ্নের উত্তম উত্তম উত্তর দিতে পারেন।

হেদোর ওতর-পূব কোণের 'বসন্ত রেস্টুরেন্ট'। সেখানে আমরা সুবো-শাম রাজা-উজীর কতল করি, হেন সমস্যা, হেন বখেড়া নেই যার ফৈসালা আমরা পত্রপাঠ করে দিতে পারি নে।

'বসন্ত রেস্টুরেন্টে'র আমি আদি ও অকৃত্রিম সভ্য। তস্য প্রসাদাৎ আমি হরমুল্লুকে হর-সওয়ালের জবাব দিতে পারি।

বিদেশীদের সম্বন্ধে ভারতীয়ের কৌতূহল কম। কলকাতায় বিস্তর চীনা থাকে; আমি আজ পর্যন্ত একজন বাঙালীকেও দেখি নি, যিনি উৎসাহী হয়ে চীনাদের সঙ্গে আলাপচারি করেছেন। মাত্র একটি বাঙালী চিনি, যিনি ছেলে-বেলা থেকে কাবুলীওয়ালাদের সঙ্গে ভাব করে দোস্তী জমিয়েছিলেন—কাবুলীরা এখন এদেশে দুর্লভ হয়ে যাওয়াতে তাঁর আর শোকের অন্ত নেই।

ইয়োরোপীয়রা সংস্কৃত যে রকম পড়ে, আরবী চীনা ভাষারও তেমনি চর্চা করে। তাই আমার মনে সব সময়েই আশ্চর্য বোধ হয়েছে যে, ভারতীয় সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল সবচেয়ে বেশি কেন?

পিটুকে জিজ্ঞেস করাতে সে বললে, 'পণ্ডিতেরা কেন ভারতপ্রেমী হন, সে কথা আমরা বলতে পারবো না, তবে আমার মত পাঁচজন সাধারণ লোকের কথা কিছু বলতে পারি।

'প্রাচ্যের তিন ভূখণ্ডের সঙ্গে আমাদের কিছুটা পরিচয় আছে। ভারত, আরবভূমি আর চীন। তুর্কদেরও আমরা ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, কিন্তু তারা অনেকখানি ইয়োরোপীয় হয়ে গিয়েছে, আর তিব্বত সম্বন্ধে কৌতূহল পুষে আর লাভ কি? তিব্বতীরা তো এদেশে আসে না।

'আরবরা সেমিটি, চীনারা মঙ্গোলীয়। এদের ধরনধারণ এত বেশি আলাদা

যে, এরা যেন অন্য লোকের প্রাণী বলে মনে হয়। অথচ ভারতীয়রা আর্য—তাই তারা চেনা হয়েও অচেনা। এই ধরুন না, যখন চীনা বা আরব ফরাসী-জর্মন বলে, তখন কেমন যেন মনে হয় ভিন্ন যন্ত্র বাজছে। অথচ ভারতীয়রা যখন ঐ ভাষাগুলোই বলে তখন মনে হয় একই যন্ত্র বাজছে, শুধু ঠিকমত বাঁধা হয় নি।

'আরেকটা কারণ বোধ হয় খ্রীষ্টের পরই—সময়ের দিক দিয়ে নয়, মাহাত্ম্যে—মহাপুরুষ বলতে আমরা বুদ্ধদেবের কথাই ভাবি। এখন অবশ্য অনেকখানি মন্দা পড়েছে, কিন্তু এককালে এখানে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে প্রচুর বই বেরিয়েছিল। তার কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক ভগবানে বিশ্বাস হারায়, অথচ একথা জানত না যে, ঈশ্বরকে বাদ দিয়েও শুধু যে ধার্মিক জীবনযাপন করা যায় তাই নয়, ধর্মপত্তন করা চলে। তাই যখন বুদ্ধের বাণী এদেশে প্রথম প্রথম প্রচার হল, তখন বহু লোক সে বাণীতে যেন হারানো-মাণিক ফিরে পেল। কেউ কেউ তো আদমশুমারীর সময় নিজেদের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলে জাহির করল।

'এযুগে গাঁধী পরম বিস্ময়ের বস্তু। অস্ত্রধারণ না করে বিদেশী ডাকুকে তাড়ানো যায় কিনা জানি নে। কিন্তু গাঁধীর প্রচেষ্টাটাই বিশ্বজগৎকে একদম আহাম্মুখ বানিয়ে দিয়েছে। আমি অনেক ধার্মিক ক্রীশ্চানকে চিনি, যাঁরা গাঁধীর নাম শুনলেই ভক্তিতে গদগদ হন। একজন তো বলেন, খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন খ্রীষ্ট এবং মাত্র একটি লোক সে ধর্ম স্বীকার করেছেন, তিনি গাঁধী।'

ট্রুডে বললে, 'টেগোরের নাম করলে না?'

'পিট্ বললে, 'টেগোরকে চেনে এদেশের শিক্ষিত লোক। তার কারণও রয়েছে। এযুগে সাধারণ লোক পড়ে প্রধানত খবরের কাগজ। খবরের কাগজে গাঁধীর কথা দুদিন অন্তর অন্তর বেরয়, কিন্তু টেগোরের কথা বেরয় তিনি যখন এদেশে আসেন।'

ট্রুডে বললে, 'আর বুদ্ধদেবের কথা বুঝি খবরের কাগজে নিত্যি নিত্যি বেরয়, না তিনি প্রতি বৎসর এখানে স্কেট করতে আসেন?'

গ্রেটে বললে, 'ছিঃ, বুদ্ধদেবকে নিয়ে ওরকম হাল্কা কথা কইলে বুদ্ধদেবের দেশের লোক হয়ত ক্ষুণ্ণ হবেন।'

আমি বললুম, 'আদপেই না। আমাদের দেশে দেবতাদের নিয়ে মজার মজার গল্প আছে।'

পিট্ বললে, 'বুদ্ধদেব যে একশ' বছরের স্টার্ট পেয়ে বসে আছেন।'

ট্রুডে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আপনাদের ঠাকুর-দেবতাদের নিয়ে যে সব মজার গল্প আছে, তারই একটা বলুন না।'

আমি শিব বেজায়গায় একবার বর দিয়ে যে কি বিপদে পড়েছিলেন, আর শেষটায় বিচক্ষণ নারদ তাঁকে কি কৌশলে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, সেই গল্পটি বললুম।

তিনজনেই হেসে কুটিকুটি।

ট্রুডে জিজ্ঞেস করলে, 'শিব কি ডাক্তর দেবতা?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়। তবে কি না তিনি শ্মশানে থাকেন, ভূতের নৃত্য দেখেন, কাপড়চোপড়ও সব সময় ঠিক থাকে না। দেবতাদের পার্লিমেণ্টে সচরাচর যান না।'

সবাই অবাক হয়ে শুধায়, 'তবে তিনি ডাঙর হলেন কি করে?'

এখানেই আমি হামেশাই একটু বিপদে পড়ে যাই। নীলকণ্ঠের বৈরাগ্য যে এদেশের ঘোর সংসারী মনকেও মাঝে মাঝে ব্যাকুল করে তোলে, সেটা ইয়োরোপীয়রা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। 'আরো চাই', আরো চাই'য়ের দেশে 'কিছু না', 'কিছু না'র তত্ত্ব বোঝাই কি প্রকারে? আমি যে বুঝেছি তা-ও নয়।

তবে ইয়োরোপের সর্বত্রই মেয়েরা হরপার্বতীর বিয়ের বর্ণনা শুনতে বড় ভালোবাসে। বিশেষ করে যখন বরযাত্রায় বলদের পিঠে শিবকে দেখে মেনকা চিৎকার করে তাঁকে খেদিয়ে দেবার জন্যে আদেশ দিলেন, আর যখন শুনলেন তিনিই বর এবং ভিরমি গেলেন—তখন মেয়েরা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

আমি তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে উত্তেজনাটা বাড়ানোর জন্য ধীরে ধীরে একটি সিগ্‌রেট ধরাই।

'তারপর, তারপর?' সবাই চেঁচায়।

জানি অসম্ভব। তবু তখন এ-ক'টি ছত্র অনুবাদ করার চেষ্টা করি।

ভৈরব সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত আঁখি
দেখে, তব শুভ্রতনু রক্তাংশুকে রীহয়াছে ঢাকি
প্রাতঃসূর্য রুচি।
অস্থিমালা গেছে খুলে মাধবীবল্লরী মূলে
ভালে মাখা পুষ্পরেণু—চিতাভস্ম কোথা
গেছে মুছি।
কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি-পানে—
সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনি গানে
কবির পরাণে॥

* * *

এ দৃশ্য আমি একমাত্র সুইটজারল্যাণ্ডেই দেখেছি।

পশ্চিমের সূর্য হেলে পড়েছে আর তার লাল আলো এসে পড়েছে পাহাড়ের গায়ের বাড়িগুলোর হাজার হাজার কাচের সার্শীতে। সার্শীগুলো লালে লাল হয়ে গিয়ে একাকার—মনে হয় বাড়িগুলো বুঝি মিনিটখানেকের ভিতরই পুড়ে খাক হয়ে যাবে। আগুনের জিভের মত লালের আঁচ উঠেছে, আকাশের দিকে, আর তারই রঙ গিয়ে লেগেছে দূর পাহাড়ের চূড়োয় সাদা বরফে। সেখানেও লেগে গেছে দাউ দাউ করে আগুন। পাহাড়ের কোলে বসা মেঘগুলোও সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে যাচ্ছে; ওদিকে আকাশের এখানে ওখানে যে সব মেঘের টুকরো সমস্ত দিন সাদা ভেড়ার মত আকাশের নীল মাঠে শুয়ে ছিল তারা দেখি পূর্ব-পশ্চিমের আগুনে তেতে গিয়ে গোলাপী হয়ে উঠেছে। সেই লাল

রঙের আওতায় পড়ে নীল পাহাড় আর হ্রদের নীল জল ঘন বেগুনী রঙ মেখে নিয়েছে।

চতুর্দিকে হুলস্থুল কাণ্ড ; কিন্তু নিঃশব্দে। মেঘেমেঘে, আকাশে-আকাশে পাহাড়পর্বতে, ঘরবাড়িতে এমন কি জলেবাতাসে এই যে বিরাট অগ্নিকাণ্ডটা হয়ে যাচ্ছে তাকে নেভাবার জন্য চেঁচামেচি-চিৎকার হচ্ছে না, আগুনের তাপে কাঠ-বাঁশ ফেটে যাওয়ার ফট্-ফাট্ দু-দ্দড়াম্ শব্দ হচ্ছে না, ঐ যে লেকের পাড়ে সোনালী বেঞ্চিতে বসে আছে মেয়েটি তার সাদা ফ্রকে আগুন লেগেছে, সেও তো চিৎকার করে কেঁদে উঠছে না। এ কী কাণ্ড!

এ আগুনের কি জ্বালা নেই, না, এদেশের জনমানব-পশুপক্ষীকে কোনো এক ভানুমতী ইন্দ্রজাল দিয়ে অসাড়-অচেতন করে দিয়েছেন? হাঁ, এ তো ইন্দ্রজালই বটে। এতখানি আগুন, লক্ষ লক্ষ কলসী থেকে উজাড় করে ঢেলে দেওয়া এতখানি গলানো সোনা, হাজার হাজার মণ গোলাপী পাপড়ির লোধ্র-রেণু, না জানি কত শত জ্বালা আবির-গুলাল এরকম অকৃপণ হাতে ঢেলে দিলে, ছড়িয়ে ফেললে স্বর্গপুরীকেও লাল বাতি জ্বালাতে হবে—হয়ত এই আগুন থেকেই পিদিম ধরিয়ে নিয়ে।

এ তো কনে-দেখার আলো নয় ; এ তো সতীদাহের বহ্নিকুণ্ড।

গ্রেটে আর ট্রুডের ব্লণ্ড্, চুল অদৃশ্য হেয়ার-ড্রেসারের হাতে সোনালি হয়ে গেল। পিট্ কথা বলবার সময় ঘন ঘন হাত নাড়ে ; মনে হচ্ছে যেন সোনালি জলে হাত দুখানি সাঁতার কাটছে।

সূর্য পাহাড়ের পিছনে অতি ধীরে ধীরে অস্তাচলে নেমে গিয়েছেন। আবার সেই ভানুমতী এসেছে। অদৃশ্যে তিনি ঘন ঘন এখানে ওখানে উড়ে গিয়ে শাড়ির আঁচল দিয়ে মেঘের গা থেকে আবির তুলে নিয়ে কাজল মাখিয়ে দিচ্ছেন, ফুঁ দিয়ে এক এক সার সাশী থেকে আগুন নিবিয়ে দিচ্ছেন, কখনো বা দেখি লেকের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি জলের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন—যেন গোবর দিয়ে আঙ্গিনা লেপে দেওয়া হল।

এ দৃশ্য সুইটজারল্যাণ্ডেও নিত্য নিত্য ঘটে না। জাহাজের ব্যাণ্ড তাই দুই নাচের মাঝখানে এখন অনেকখানি সময় নিচ্ছে। জাহাজের বহু নরনারী স্তব্ধ হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। এরকম সূর্যাস্ত কমই হয় যেখানে তুমি আমিও হিস্যেদার—স্পষ্ট দেখলুম তোমার কাপড়ের আগুন লেগে গিয়েছিল আমার কাপড়েও। আপন অজানাতে আমাদের দেহ, আমাদের বেশভূষা এ রসের সায়রে ছোট ছোট দ' সৃষ্টি করে তুলেছে।

ট্রুডে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার দেশে এরকম সূর্যাস্ত হয়?'

আমি বললুম, 'কাশ্মীরে হয় ; সেখানে বরফ আছে, পাহাড় আছে, লেক আছে। কিন্তু হাজার হাজার চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে জানলার সাশী নেই বলে হয়ত এতখানি আগুন ধরে না। তবে যদি হিমালয়কে ভারত বলে গোনা হয় তবে নিশ্চয়ই এর চেয়েও বেশী আগুন-জ্বালা সূর্যাস্ত সেখানে হয়—সুইস পর্যটক-দেরই লেখাতে পড়েছি।'

ভানুমতী দিকে দিকে কাজলধারা বইয়ে দিয়েছে। চতুর্দিক অন্ধকার।

শুধু ফুটে উঠেছে অন্ধকার ঘাসের উপর লক্ষ লক্ষ বিজলি-বাতির ফুল। আকাশের ফরাশেও দেবতারা জ্বালিয়ে দিয়েছেন অগুণতি তারার মোমবাতি। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, পাহাড়ের উপরের দিকে যে আলোগুলো জ্বলছে সেগুলো মানুষের প্রদীপ না দেবতার তারা। মানুষ স্বর্গের দিকে ধাওয়া করে উঠেছে পাহাড়ে, আর দেবতারা নেমে এসেছেন পৃথিবীর দিকে ঐ পাহাড়ের চূড়ো পর্যন্ত —একে অন্যকে অন্ধকারের এপার ওপার থেকে সাঁঝের পিদিম দেখাবার জন্য।

"মাটির প্রদীপখানি আছে মাটির ঘরের কোলে,
সন্ধ্যাতারা তাকায় তারি আলো দেখবে ব'লে।
সেই আলোটি নিমেষহত প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো,
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের ভয়ের মত দোলে ॥
সেই আলোটি নেবে জ্বলে শ্যামল ধারার হৃদয়তলে,
সেই আলোটি চপল হাওয়ায় ব্যাথায় কাঁপে পলে পলে।
নামল সন্ধ্যাতারার বাণী আকাশ হতে আশিস আনি,
অমরশিখা আকুল হল মর্তশিখায় উঠতে জ্বলে ॥"

পিটু বললে, 'একটি প্রেমের গল্প বলুন।'

আমি বললুম, 'ভারতবর্ষে সত্যকার প্রেমের গল্প আছে একটি, যার সঙ্গে অন্য কোনো দেশের গল্প পাল্লা দিতে পারে না। সে কাহিনীতে মাটির মানুষ তার আপন বিরহবেদনার বর্ণনা শুনতে পায়, আবার ভগবদপ্রেমের জন্য ব্যাকুল জনও সেই কাহিনীতে আপন আকুলি-বিকুলির নিবিড়তম বর্ণনাও শুনতে পায়। কিন্তু রাধামাধবের সে কাহিনী বলবার মত ভাষা আমার নেই।'

ট্রুডে বললে, আমি একখানি ছবি দেখেছি, তাতে রাধা কৃষ্ণের গায়ে পিচকারি দিয়ে লাল রং মারছেন। চরৎকার ছবি!'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আমি পিটুকে বললুম, 'তার চেয়ে বরঞ্চ আপনি আপনার প্রেমের কাহিনী বলুন না?'

পিটু তো বেশ খানিকটা ঠা ঠা করে হাসল—দু পাত্রের পর মানুষ অল্পেতেই হাসে কাঁদে—তারপর বললে, 'হারগট্ হ্যারগট্ (রামচন্দর!) এ যুগে কি আর সে রকম প্রেম কারো জীবনে আসে যা নিয়ে রসিয়ে গল্প জমানো যায়?'

ট্রুডে বললে, 'বলেই ফেল না ছাই তোমার সাদা-মাটা গল্পটা।'

গ্রেটে দেখি চুপ করে আছে।

পিটু বললে, 'আমার প্রেমে পড়ার কাহিনীতে মাত্র সামান্য একটু বিশেষত্ব আছে। সেইটুকুই বুঝিয়ে বলি।

' আমি তখন সবে কলেজে ঢুকেছি। ফার্স্ট পিরিয়েডে ক্লাস থাকত না বলে আমি বাড়ি থেকে বেরতুম ন'টার সময়। একদিন ন'টার কয়েক মিনিট পরে কলেজের কাছেই একটি মেয়ে আমার পাশ দিয়ে উল্টো দিকে চলে গেল। হাবভাব দেখে মনে হল কলেজেরই ছাত্রী কিন্তু আসল কথা সেইটে নয়—আসল কথা হচ্ছে ওরকম সুন্দরী আমি আর কখনো দেখি নি।

'আমার বুকের রক্ত দুম্ করে জমে গেল ; আমার হার্টটা যেন লাফ দিয়ে গলার কাছে পেঁাছে গেল। আমি অনেকক্ষণ সেই রাস্তার উপর ঠায় দাঁড়িয়ে রইলুম। সেদিন আর ক্লাস করা হল না ; কলেজের বাগানে বসে বসে সমস্ত সকালটা কাটল।

'পরদিন ঠিক ঐ সময়ই মেয়েটি আমাকে রাস্তায় ক্রস্ করল। এবারে দুজনাতে চোখাচোখি হল—এক ঝলকের তরে। তারই ফলে আমাকে রাস্তার পাশের রেলিঙ ধরে সে নজরের ধাক্কা সামলাতে হল।

'তারপর রোজই ঐ সময় রাস্তায় দেখা হয়, এক লহমার চোখাচোখি হয়। বুঝলুম মেয়েটির সেকেন্ড পিরিয়েড ফ্রী তাই বোধ হয় বাড়ি কিংবা অন্য কোথাও যায়।

'আগেই বলেছি, মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী। রোজ সকালে নটার পর তার সেই এক ঝলকের তরে আমার দিকে তাকিয়ে দেখা যেন আমার গলায় এক পাত্র সোনালি মদ ঢেলে দিত আর বাদবাকী দিন আমার কাছে আসমানজমীন গোলাপী রঙে রাঙা বলে মনে হত।

'করে করে তিন মাস কাটল।'

পিট্ মদের গেলাসে মুখ ঠেকাতে আমি শুধালুম, 'পরিচয় করবার সুযোগ হল না, তিন মাসের ভিতর ? কলেজ ডান্সে, কলেজ রেস্তোরাঁ—কোথাও ?'

পিট্ বলল, 'ভয়, ভয়, ভয়। আমার মনে হত এরকম সুন্দরী কখনোই, কোন অবস্থাতেই আমার মত সাদা-মাটাকে ভালোবাসবে না, বাসতে পারে না, অসম্ভব, অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব। বিশ্বাস করবেন না, পাছে আলাপচারি হয়ে যায় আর সে আমায় অবহেলা করে সেই ভয়ে কোনো নাচের মজলিসে দেখা হলে আমি তৎক্ষণাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে সে স্থল পরিত্যাগ করতুম। তার চেয়ে পরিচয় না হওয়াটাই ঢের ঢের ভালো।'

আমি বললুম, 'টেগোরেরও গান আছে—

'সেই ভালো সেই ভালো আমারে না হয় না জানো
দূরে গিয়ে নয় দুঃখ দেবে কাছে কেন লাজে লাজানো ?'

পিট্ বলল, 'আশ্চর্য, টেগোর তো অতি সুপুরুষ ছিলেন। তিনি এরকম মর্মান্তিক অনুভূতিটা পেলেন কোথায় ?'

আমি শুধালুম, 'কিন্তু মেয়েটিও তো আপনার দিকে তাকাত !'

'ঠিক বলেছেন, কিন্তু আমার মনে হত মেয়েটি শুধু দেখতে চায়, এই বেশরম বাঁদরটা কত দিন ধরে এ তামাশা চালায়।'

আমি শুধালুম, 'তার পর ?'

'তিন মাস হয়ে গিয়েছে। আমি প্রেমের পাখায় ভর করে চন্দ্রসূর্য ঘুরে বেড়াচ্ছি। প্রেমের এ পাখা দানা-পানি অর্থাৎ প্রতিদানের তোয়াক্কা করে না বলে এর কখনো ক্লান্তি হয় না ; এ প্রেম আমার মনের বাগানে ফোটা জুঁই,—কারো অবহেলা-অনাদরের খরতাপে এ ফুল কখনো শুকোবে না।

'কলেজের বাগানে বসে একদিন চোখ বন্ধ করে আমি আমার প্রিয়াকে দেখছি এমন সময় কাঁধে হাত পড়ল। চোখ মেলে দেখি আমার গ্রামের একটি পরিচিত ছেলে আর তার পাশে দাঁড়িয়ে আমার স্বপ্নের ফুল। পালাবার পথ ছিল না, পরিচয় হয়ে গেল।'

'তারপর ?'

'আমার একদম মনে নেই। যেটুকু মনে আছে বলছি। হঠাৎ দেখি ছেলেটি উধাও, আর আমার স্বপ্ন তখনো মূর্তি ধরে পাশে বসে আছে। কিন্তু আসল কথায় ফিরে যাই। সেই যে ভয়ের কথা বলেছিলুম। প্রথম আলাপেই আমি যে তার সঙ্গে পরিচয় করতে ডরাই সে কথা কি জানি কি করে বেরিয়ে গেল। মেয়েটি অবাক হয়ে শুধাল, "কিসের ভয় ?" আমি বললুম, "আপনি বড় বেশী সুন্দর।" তখন যা শুনলুম সে আমি তখনো বিশ্বাস করি নি এখনো করি নে—তার বিশ্বাস, আমি একটা আস্ত এ্যাডনিস্ এবং তাই আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে সে ভয় পেয়েছিল। শুনুন কথা !'

আমি বললুম, 'আপনারা দুজনাই দেখতে চমৎকার কিন্তু সেইটে আসল কথা নয়। আসল কথা আছে এক ফার্সী প্রবাদে, "লায়লীরা বায়দ্ ব্ চশ্‌মে মজনুন দীদ !" লায়লীকে দেখতে হয় মজনুর চোখ দিয়ে।'

জাহাজ পাড়ে এসে ভিড়ল। সবাই নেমে পড়লুম। আবার দেখা হবে, বলে পিট্, গ্রেটে, ট্রুডে বিদায় নিল।

আপন মনে বাড়ির দিকে চলতে চলতে একটা কথা ভাবতে লাগলুম ; এই যে ইয়োরোপীরা প্রাণ খুলে ফূর্তি করে, হৈ-হল্লা করে, আমরা এ-রকম ধারা আপন দেশে করতে পারি নে কেন ? সায়েবসুবোদের লেখাতে পড়েছি, আমরা নাকি বড্ড সিরিয়স, সংসারকে আমরা নাকি মায়াময় অনিত্য ঠাউরে নিয়ে মুখ গুমসো করে বসে আছি, ফুর্তি-ফার্তি করার দিকে আমাদের আদপেই মন নেই।

'জাতক' তো খ্রীষ্টের বহু পূর্বে লেখা। তাতে যে হরেক রকম পাল্‌ব পরবের বর্ণনা পাই তার থেকে তো মনে হয় না, আমরা সে যুগে বড্ড রাশভারি মেজাজ নিয়ে আত্মচিন্তা আর তত্ত্বালাপে দিন কাটাতুম। স্পষ্ট মনে পড়ছে কোন এক পরবের দিনে এক নাগর তার প্রিয়ার মনস্তুষ্টির জন্য রাজবাগানে ফুল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে শূলের উপর প্রাণ দেয়। মরার সময় সে আক্ষেপ করেছিল, 'প্রিয়া, আমি যে মরছি তাতে আমার কোনো ক্ষোভ নেই, কিন্তু তুমি যে পরবের দিনে ফুল পরে যেতে পারলে না সে দুঃখ আমার মরার সময়ও রইল।'

আমাদের কাব্যনাটক রাজরাজড়াদের নিয়ে—সেখানে হদিস মেলে না আমাদের সাধারণ পাঁচজন আনন্দ উৎসব করত কি না এবং করলে কি ধরনে করত। শুধু 'মৃৎশকটিকা' আর 'মালতীমাধবে' সাধারণ লোকের সবিস্তর বর্ণনা রয়েছে এবং এ দুটি পড়ে তো মনে হয় না এ সময়ের সাধারণ পাঁচজন আজকের দিনের ইয়োরোপীয়দের তুলনায় কিছু কম আয়েস করত। 'মৃৎশকটিকা'য় রান্নাঘরের

যে বর্ণনা পাই তার তুলনায় সুইটজারল্যাণ্ডের যে-কোনো রেস্তরাঁ নস্যাৎ। আর 'মালতীমাধবে'র নাগর মাধববাবু তো জাহাজের পিট্ সাহেবকে প্রেমের লীলাখেলায় দু কলম তালিম দিতে পারে।

তবে কি নিতান্ত এ যুগে এসেই আমরা হঠাৎ বুড়িয়ে গিয়েছি? তাও তো নয়। হুতোমের কেতাবখানায় একবার চোখ বুলিয়ে নিন—বাবুরা তো কিছু মাত্র কম ঢলাঢলি করেন নি। তবে কি এই বিংশ শতকে এসে হঠাৎ আমাদের ভীমরতি ধরল? তাও তো নয়। ফুটবল খেলা দেখতে এক কলকাতা শহরই যা পয়সা উড়োয় তার অর্ধেক বোধ হয় তামাম সুইটজারল্যাণ্ডও করে না।

ফুটবল সিনেমা লোকে দেখুক—আমার আপত্তি আছে কি নেই সে প্রশ্ন উঠছে না। আমি শুধু ভাবি এসব আনন্দে উত্তেজনার ভাগটা এতই বেশী যে মানুষ যেন সেখানে স্থায়ী কোনো কিছু সন্ধান পায় না। আমার মনে হয়, স্টীমারে বা ট্রেনে, সত্যযুগে, যখন ভিড় বেশী হত না তখন ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করাতেও আনন্দ ছিল অনেক বেশী। বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে তবু এখনো মনে পড়ছে দু'একজন যথার্থ সুরসিককে। এঁরা কামরায় উঠেই পাঞ্জাবির বোতাম খুলে দিয়ে কোঁচা দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে যা গল্প জুড়তেন তার আর তুলনা হয় না। আমরা গুটিকয়েক প্রাণী রোজই এক কামরায় উঠতুম আর এঁরা কামরাখানিকে গালগল্প দিয়ে প্রতিদিন রঙীন করে দিতেন। অসুখ করে আমাদের কেউ দু'দিন কামাই দিলে এঁরা রীতিমত ব্যস্ত হয়ে উঠতেন, কোনো কৌশলে দুটো ডাব কিংবা চারটি ডালিম পাঠানো যায় কি না তার আন্দেশা করতেন কিন্তু যাক্, এ বাবতে 'রূপদর্শী' আমার চেয়ে ঢের বেশী ওকীব-হাল।

আমি ভাবছি, সেই সব আনন্দের কথা যেখানে অজানা জনকে চেনবার সুযোগ হয়। উদয়াস্ত তো আমরা বসে আছি সাংসারিকতার মুখোশ পরে। আপিসে যারা আমার কাছে আসে তারা আসে স্বার্থের খাতিরে, বাড়িতে যাঁরা আসেন তাঁরা বন্ধুজন, তাঁদের আমি চিনি, তাঁরা আমায় চেনেন কিন্তু নূতন পরিচয় হবে কি প্রকারে?

তাই ট্রেনের স্বল্পক্ষণের পরিচয় অনেক সময় গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ট্রেনে তুমি আমাকে চেন না, আমি তোমাকে চিনি নে। আলাপচারিটা কোনো স্বার্থের খাতিরে আরম্ভ হয় না বলে শেষ পর্যন্ত সে যে কত অন্তরঙ্গতায় দুজনকে নিয়ে যেতে পারবে তার কোনো স্থিরতা নেই।

অবশ্য এখন আমরা সব মেকি সায়েব হয়ে গিয়েছি। আগের আমলের মত কেউ যদি শুধান, 'বাবাজীর আসা হচ্ছে কোন্ থেকে' কিংবা 'বাবাজীরা—?' অর্থাৎ 'বাবাজী বামুন, কায়েত, না বদ্যি?' তাহলে আমরা বিরক্ত হই। কেন হই, তা এখনো আমি বুঝে উঠতে পারি নে।

ইংরেজ শুনেছি হয়। আমি বলতে পারব না। কারণ আমি পারতপক্ষে কোনো ইংরেজের সঙ্গে আলাপ জমাতে চাই নে। অবশ্য কোনো ইংরেজ আলাপ করতে চাইলে আমি খেঁকিয়ে উঠে তাকে স্নাবও করি নে। কিন্তু ফরাসী জর্মন সুইস অন্য ধরনের। তারা অনেক বেশী মিশুকে। কাফে বা মদের দোকানে

তারা যে রোজ সন্ধ্যায় আড্ডা জমায় সেখানে কোনো সদস্য যদি কোনো নূতন লোক নিয়ে উপস্থিত হয় তবে আর পাঁচজন আনন্দিত হয়। ইংরেজের ক্লাবে যদি কোনো সদস্য আপন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে তবে আর পাঁচজন তার দিকে আড়নয়নে তাকায়। কোনো কোনো ক্লাবে তো কড়া আইন, আপনি মাসে ক'দিন ক'জন অতিথিকে নিমন্ত্রণ করতে পারেন।

জর্মন, ফরাসী, সুইসদের ভিন্ন রীতি। 'পাবে', কাফেতে ইয়ারদোস্ত যোগাড় করার পরও তাদের প্রাণ ভরে ওঠে না বলে তারা যায় ফুর্তির জাহাজ চড়তে। সেখানে কত দেশের কত লোকের সঙ্গে আলাপ হবে—

কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।

ময়ূরকণ্ঠী

উৎসর্গ

মমাগ্রজ সুসাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা আলী সাহেবকে—

নিবেদন

'পঞ্চতন্ত্র' বাঙালী পাঠকের কাছে আশাতীত সমাদর লাভ করাতে আমার জানা-আজানা পাঠকের কেউ কেউ ঐ-জাতীয় আরেকখানি সংকলন প্রকাশ করার জন্য আমাকে অনুরোধ জানান। আমার শরীর অসুস্থ থাকায় শিষ্য ও সখা দিল্লীবাসী শ্রীমান বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য আমার পুরনো লেখা থেকে অশেষ পরিশ্রম করে আপন রুচি-অনুযায়ী এই সংকলনটি প্রস্তুত করেছেন। এ পুস্তিকার অধিকাংশ লেখা 'আনন্দবাজার', 'বসুমতী' ও 'দেশ'-এ বেরিয়েছিল কোনো কোনো লেখা 'দেশে-বিদেশে'র চেয়েও পুরনো।

গজনী সুলতান মাহমুদের সভাপণ্ডিত অল-বীরুনী একাদশ শতাব্দীতে সংস্কৃত শিখে আরবী ভাষায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানা প্রামাণিক পুস্তক রচনা করেন। পুস্তকে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বর্ণনা দেবার সময় তিনি বলেন যে, ঐ সব ধর্মের মহাজনগণ আপন আপন ধর্মের যে ধারণা হৃদয়মনে পোষণ করেছেন তিনি সে-গুলোর বর্ণনা করেছেন মাত্র—কোনো মতের সমর্থন কিংবা খণ্ডন তিনি করতে চান নি। নানা ধর্ম বর্ণনার সময় আমি প্রাতঃস্মরণীয় অল-বীরুনীর পদাঙ্ক অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি।

'বাঙালী' বলতে আমি উভয় বাঙলার এবং বাঙলার বাইরেরও হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান-বৌদ্ধ বাঙলাভাষী জনকেই বুঝি।

সৈয়দ মুজতবা আলী

গুরুদেব

রবীন্দ্রনাথের শিষ্যদের ভিতর সাহিত্যিক হিসাবে সর্বোচ্চ আসন পান শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী। তিনি যে রকম রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পেয়েছেন সবচেয়ে বেশি, তেমনি বিধিদত্ত রসবোধ তাঁর আগের থেকেই ছিল। ফলে তিনি সরস, হালকা কলমে রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন জীবন, খুশ-গল্প, আড্ডা-মজলিস সম্বন্ধে যা লিখেছেন তারপর আর আমার কিছু লিখবার মত থাকতে পারে না। কারণ বিশীদা যে মজলিসে সবচেয়ে উঁচু আসন পেয়েছেন সে মজলিসে রবীন্দ্রনাথের শিষ্য হিসাবে যদি নিতান্তই আমাকে কোনো স্তোকাসন দেওয়া হয় তবে সেটা হবে সর্বনিম্নে।

কিন্তু বহু শাস্ত্রে বিধান আছে সর্বজ্যেষ্ঠ যদি কোনো কারণে শ্রদ্ধাঞ্জলি না দিতে পারে, তবে দেবে সর্বকনিষ্ঠ। এই ছেলে ধরার বাজারে কিছু বলা যায় না—গুরুদেবকে স্মরণ করার সময় আমরা সবাই একবয়সী ছেলেমানুষ, রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে আজকের শিশুবিভাগের কনিষ্ঠতম আশ্রমিক—কাজেই বিশীদার যদি ভালো-মন্দ কিছু একটা হয়ে যায় তবে আমার আকন্দাঞ্জলির প্রয়োজন হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে মা-'বসুমতীর' কাছে এটি গচ্ছিত রাখছি।

ব্যাপকার্থে রবীন্দ্রনাথ তাবৎ বাঙালীর গুরু, কিন্তু তিনি আমাদের গুরু শব্দার্থে। এবং সে গুরুর মহিমা দেখে আমরা সবাই স্তম্ভিত হয়েছি। ব্যক্তিগত কথা বলতে বাধো-বাধো ঠেকে কিন্তু এ স্থলে ছাত্রের কর্তব্য সমাধান করার জন্য বলি, শান্তিনিকেতন ছাড়ার পর বার্লিন, প্যারিস, লণ্ডন, কাইরো বহু জায়গায় বহু গুরুকে আমি বিদ্যাদান করতে দেখেছি কিন্তু এ গুরুর অলৌকিক ক্ষমতার সঙ্গে কারোরই তুলনা হয় না। কত বৎসর হয়ে গেল, কিন্তু আজও মনের পটের উপর রবীন্দ্রনাথের আঁকা কীটসের 'অটামে'র ছবি তো মুছে গেল না। কীটস হেমন্তের যে ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তাকে যে আরও বেশি উজ্জ্বল করা যায়, এ কথা তো কেউ সহজে বিশ্বাস করবেন না। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে "You do not paint a lily"—তাই মনে প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক নয়, রবীন্দ্রনাথ কীটসের হেমন্ত-লিলিকে মধুরতর প্রিয়তর করতেন কোন জাদুমন্ত্রের জোরে?

তুলনা না দিয়ে কথাটা বোঝাবার উপায় নেই। ইংরিজী কবিতা পড়ার সময় আমাদের সব সময় মনে হয়, ইংরিজী কবিতা যেন রূপকথার ঘুমন্ত সুন্দরী। তার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করি, কিন্তু তার বাক্য-হাস্য-নৃত্য রস থেকে বঞ্চিত থাকি বলে অভাবটি এতই মর্মন্তুদ হয় যে, শ্যামলী স্থূলাঙ্গী জাগ্রতা গৌড়জার সঙ্গসুখ তখন অধিকতর কাম্য বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের বর্ণনশৈলী ভানুমতী মন্ত্র দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সৃজনীশক্তি তাঁর সোনার কাঠির পরশ দিয়ে কীটসের হৈমন্তীকে জাগিয়ে দিয়েছিল আমাদের বিদ্যালয়ের নিভৃত কোণে। গুরুদেব কীটসের এক ছত্র কবিতা পড়েন, নিদ্রিতা

সুন্দরীকে চোখের সামনে দেখতে পাই। তিনি তাঁর ভাষার সোনার কাঠি ছোঁয়ান, সঙ্গে সঙ্গে হৈমন্তী নয়ন মেলে তাকায়। গুরুদেবের কণ্ঠে প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, সুন্দরী নৃত্য আরম্ভ করে। গুরুদেব তাঁর বীণার তারে করাঙ্গুলিস্পর্শে ঝংকার তোলেন, সুন্দরী গান গেয়ে ওঠে।

কীটস, শেলি, ব্রাউনিং, ওয়াডস্‌ওয়ার্থকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এ ইন্দ্রজাল কতবার দেখেছি আর ভেবেছি, হায়, এ বর্ণনা যদি কেউ লিখে রাখত তাহলে বাঙালী তো তার রস পেতই, বিলেতের লোকও একদিন ওগুলো অনুবাদ করিয়ে নিয়ে তাদের নিজের কবির কত অনাবিষ্কৃত সৌন্দর্য দেখতে পেত। কিন্তু জানি ভানুমতীর ছবি ফটোগ্রাফে ওঠে না, গুরুদেবের এ বর্ণনা কারো কলম কালিতে ধরা দেয় না। যেটুকু দিয়েছে সেটুকু আছে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের ভাণ্ডারে।

তারপর একদিন বেলজিয়মে থাকার সময় বিলেত যাবার দরকার হল। ইচ্ছে করেই যাওয়াটা পিছিয়ে দিলুম—তখন বসন্ত ঋতু। কীটসের 'হৈমন্তী'র সঙ্গে দেখা হতে অনেক বাকী। সায়েব-মেমসায়েবরা অসময়ে দেখা করেন না।

বিলিতী হৈমন্তীকে দেখে মুগ্ধ হলুম, অস্বীকার করব না। কীটসের ফিরিস্তি মিলিয়ে 'নর্থশির' বর্ণনা টায়-টায় মিলে গেল, কিন্তু গুরুদেবের হৈমন্তীর সন্ধান পেলুম না। কীটসের সুন্দরীকে বার বার তাকিয়ে দেখি আর মনে হয়, আগের দিনের বেলাভূমিতে কুড়িয়ে-পাওয়া ঝিনুক ঘরের ভিতরে এসে ম্লান হয়ে গিয়েছে। গুরুদেবের গীতিশৈলী পূর্বদিনের সূর্যাস্তের সময় যে লীলাম্বুজ নীলাম্বরের সৃষ্টি করেছিল, যার মাঝখানে এই শক্তিই ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটা বিচ্ছুরিত করেছিল, গৃহকোণের দৈনন্দিনতার মাঝখানে সে যেন নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে, 'তুলসীর মূলে' যে 'সুবর্ণ দেউটি' দশদিক উজ্জ্বল করেছিল সেই দেউটি দেবপদস্পর্শলাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে ম্লানমুখে আপন দৈন্য প্রকাশ করতে লাগল।

তারপর আরও কয়েক বৎসর কেটে গেল। হঠাৎ একদিন শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর কাছ থেকে তার পেলুম, জর্মানির মারবুর্গ শহরে গুরুদেব আমাকে ডেকেছেন—জানতেন আমি কাছাকাছি আছি।

মারবুর্গের যে জনসভার বর্ণনা আমি অন্যত্র দিয়েছি। আজ শুধু বলি, গুরুদেব সেদিন যখন 'ঘন ঘন সাপ খেলাবার বাঁশী' বাজালেন তখন মারবুর্গের পরবে জমায়েত তাবৎ জার্মানির 'গুণী-জ্ঞানী মানী তত্ত্ববিদের সেরারা' মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত অপলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। দীর্ঘ এক ঘণ্টাকাল গুরুদেব বক্তৃতা দিলেন,—একটি বারের মত সামান্যতম একটি শব্দও সেই সম্মিলিত যোগসমাধির ধ্যান-ভঙ্গ করল না। আমার মনে হল গুরুদেব যেন কোন এক অজানা মন্ত্রবলে সভাস্থ নরনারীর শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত স্তম্ভন করে দিয়েছেন—ডাইনে বাঁয়ে তার শব্দটুকুও শুনতে পাই নি।

আমার মনে হয়েছিল, সভাগৃহ থেকে বেরুতে গিয়ে দেখব সেই বিপুল-কলেবর অট্টালিকা বল্মীকস্তূপে নিরন্ধ্র নীরন্ধ্র হয়ে গিয়েছে।

সেই জনতার মাঝখানেই গুরুদেবকে প্রণাম করলুম—জানি নে তো কখন আবার দেখা হবে। এত সব গুণীজ্ঞানীর মাঝখানে আমার জন্য কি আর বিশেষ সময় নির্দিষ্ট করা সম্ভবপর হবে? কিন্তু ভুলে গিয়েছিলুম গুরুদেবেরই কবিতা :—

আমার গুরুর পায়ের তলে
শুধুই কি রে মানিক জ্বলে?
চরণে তাঁর লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটি ঢেলারে।
আমার গুরুর আসন কাছে
সুবোধ ছেলে কজন আছে
অবোধ জনে কোল দিয়েছেন
তাই আমি তাঁর চেলারে।

বিশাল জনতার উদ্বেলিত প্রশংসা-প্রশস্তি পাওয়ার পরও, আমি যখন প্রণাম করে দাঁড়ালুম, তিনি মৃদুকণ্ঠে শুধালেন, 'কি রকম হল?'

আমি কোনো উত্তর দিই নি।

শহরে উজির-নাজীর-কোটালরা গুরুদেবকে তাঁর হোটেলে পেঁছে দিলেন। আমি পরে সেখানে গিয়ে শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর কাছ থেকেই বিদায় নিতে চাইলুম। তিনি বললেন, 'সে কি কথা, দেখা করে যান।'

আমি দেখা হবে শুনে খুশি হয়ে বললুম, 'তাহলে আপনি গিয়ে বলুন।'

শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী বললেন, 'সে তো আর পাঁচজনের জন্য। আপনি সোজা গিয়ে নক্ করুন।'

গুরুদের ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তবু হাসিমুখে বসতে বললেন। তারপর ভালো করে তাকিয়ে বললেন, 'এত রোগা হয়ে গিয়েছিস কেন?'

আমি মাথা নীচু করে চুপ করে রইলুম।

কিছু কথাবর্তা হল। আমার লেখাপড়া সম্বন্ধে। যখন উঠলুম তখন বললেন, 'অমিয়কে ডেকে দে তো।'

চক্রবর্তী এলেন। গুরুদেব বললেন, 'অমিয়, একে ভালো করে খাইয়ে দাও।'

জানি পাঠকমণ্ডলী এই তামসিক পরিসমাপ্তিতে ক্ষুব্ধ হবেন। কিন্তু সোক্রাতেসের চোখে যখন মরণের ছায়া ঘনিয়ে এল আর শিষ্যেরা কানের কাছে চীৎকার করে শুধালেন, 'গুরুদেব, কোনো শেষ আদেশ আছে?'

তখন সোক্রাতেস বললেন, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। পরশুদিন যে মুর্গটা খেয়েছিলুম তার দাম দেওয়া হয় নি। দিয়ে দিয়ো।' এই সোক্রাতেসের শেষ কথা।

সব দিকে যাঁর দৃষ্টি তিনিই তো প্রকৃত গুরু এবং তাও মৃত্যুর বহু পূর্বে॥

নন্দলালের দেওয়াল-ছবি

তুর্কী-নাচন নাচেন নন্দবাবু
চতুর্দ্দিকে ছেলেরা সব কাবু।
তুলির গুত্তা ডাইনে মারেন, মারেন কভু বাঁয়ে
ঘাড় বাঁকিয়ে, গোঁফ পাকিয়ে, দাঁড়িয়ে এক পায়ে।
অষ্টপ্রহর চর্কীবাজী কীর্তি-মন্দিরে
ছেলেরা সব নন্দলালকে ঘিরে
মাছি যেমন পাকা আমের চতুর্দিকে ফিরে।

হচ্ছে 'নটীর পূজা'
রানীর সঙ্গে হল নটীর পূজা নিয়ে যুঝা।
বরাঙ্গনা ভিক্ষু নটীর নৃত্যচ্ছন্দ ধূপ—
তুলির আগুন পরশ পেয়ে নিল আবার সেই অপরূপ-রূপ
—বহু যুগের পরে—
চৈত্যভবন ভরে।
গানের আসর পারা
—সন্ধ্যাকাশে ফোটে যেন তারার পরে তারা—
হেথায় সেতার কাঁপে ভীরু, হোথায় বীণার মীড়
আধফোটা গুঞ্জরণের ভিড়
তার পিছনে মৃদু করুণ-বাঁশি
গুমগুমিয়ে থেকে থেকে উঠছে ভেসে খোল-মৃদঙ্গের হাসি।

এ যেন সুন্দরী —
প্রথমেতে নীলাম্বরী পরি,
সর্ব অঙ্গে জড়ায় যেন অলঙ্কারের জাল ;—
তিলোত্তমা গড়েন নন্দলাল।
চিত্রপটে কিন্তু নটী ফেলে অলঙ্কার
শুনি যেন বলে চিত্রকার,—
"তথাগতের দয়ায় যেন তেমনি ঘুচে তোমা সবার সকল অহঙ্কার।"

সাদামাটার রক্তবিহীন ঠোঁটে
লজ্জা সোহাগ ফোটে,
পাংশু দেয়াল আনন্দে লাল নন্দলালের লালে
তুলির চুমো যেই না খেলো গালে॥*

* শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর বরদারাজ্যের 'কীর্তি-মন্দিরে' রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা'র ফ্রেস্কো ছবি আঁকিবার সময় লেখক কর্তৃক এক বান্ধবীকে আসিয়া দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণপত্র।

বড় দিন

বাইবেলে বলা হয়েছে পূব থেকে তিন জন ঋষি প্যালেস্টাইনের জুডেয়া প্রদেশের রাজা হেরোডের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইহুদিদের নবীন রাজা কোথায় জন্ম নিয়েছেন ? আমরা পূর্বাকাশে তাঁর তারা দেখতে পেয়ে তাঁকে পুজো করতে এসেছি।'

সেই তারা-ই তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল বেৎলেহেম—যেখানে প্রভু যীশু জন্ম নিয়েছিলেন। মা মেরী আর তাঁর বাগদত্ত যোসেফ পান্থশালায় স্থান পান নি বলে আশ্রয় নিয়েছিলেন পান্থশালার অশ্বালয়ে। তারই মাঝখানে কুমারী মেরী জন্ম দিলেন এ জগতের নব জন্মদাতা প্রভু যীশুকে।

দেবদূতরা মাঠে গিয়ে রাখাল ছেলেদের সুসংবাদ দিলেন—প্রভু যীশু, ইহুদিদের রাজা জন্ম নিয়েছেন। তারাও এসে দেখে, গাধা-খচ্চর, খড়-বিচুলির মাঝখানে মা-জননীর কোলে শুয়ে আছেন রাজাধিরাজ।

এই ছবিটি এঁকেছেন যুগ যুগ ধরে বহু শিল্পী, বহু কবি, বহু চিত্রকর। নিরাশ্রয়ের ঘরে এসে আশ্রয় নিলেন বিশ্বজনের আশ্রয়-দাতা।

* * *

বাইরের থেকে গম্ভীর গুঞ্জরণ শুনে মনে হল বিদ্যালয়ের ভিতর বুঝি তরুণ সাধকেরা বিদ্যাভ্যাস করছেন। জানা ছিল টোল-মাদ্রাসা নয়, তাই ভিতরে ঢুকে ভিরমি যাই নি।

ক'শ নারী পুরুষ ছিলেন আদম-শুমারী করে দেখি নি। পুরুষদের সবাই পরে এসেছেন ইভ্‌নিং ড্রেস। কালো বনাতের চোস্ত পাতলুন—তার দুদিকে সিল্কের চকচকে দু ফালি পট্টি ; কচ্ছপের খোলের মত শক্ত শার্ট, কোণভাঙা কলার—ধবধবে সাদা ; বনাতের ওয়েস্‌ট্‌ কোট আর কোটের লেপেলে সেই সিল্কের চকচকে ট্যারচা পট্টি ; কালো বো ফুটে উঠেছে সাদা শার্ট কলারের উপর—যেন শ্বেত সরোবরে কৃষ্ণা কমলিনী। পায়ে কালো বার্নিশের জুতো—হাতে গেলাস।

কিংবা শার্ক-স্কিনের ধবধবে সাদা মসৃণ পাতলুন। গায়ে গলাবন্ধ 'প্রিন্‌স্‌ কোট'—সিক্‌স্‌-সিলিণ্ডারী অর্থাৎ ছ-বোতামওয়ালা। কালো বোতাম হাইদ্রাবাদী চৌকো, কারো বা বিদরী গোল—কালোর উপরে সাদা কাজ। একজনের বোতাম-গুলো দেখলুম খাস জাহাঙ্গীর-শাহী মোহরের।—হাতে গেলাস।

তারি মধ্যিখানে বসে আছেন এক খাঁটি বাঙালী নটবর। সে কী মোলায়েম মিহি চুনট-করা শান্তিপুরে ঘি রঙের মেরিনার পাঞ্জাবি আর তার উপরে আড়করা কালো কাশ্মীরী শালে সোনালি জরির কাজ। হীরের আংটি বোতাম ম্যাচ করা, আর মাথায় যা চুল তাকে চুল না বলে কৃষ্ণমুকুট বললেই সে তাজমহলের কদর দেখানো হয়। পায়ে পাম্প—হাতে গেলাস।

'দেশসেবক'ও দু একজন ছিলেন। গায়ে খদ্দর—হাতে ? না, হাতে কিচ্ছু না। আমি আবার সব সময় ভালো করে দেখতে পাই নে—বয়স হয়েছে।

কিন্তু এ সব নস্যি। দেখতে হয় মেয়েদের। ব্যাটাছেলেরা যখন মনস্থির করে ফেলেছে, সাঁঝের ঝোঁকে সাদা কালো ভিন্ন অন্য রঙ নিয়ে খেলা দেখাবে না তখন এই দুই স্বর সা আর রে দিয়ে কি ভেল্কিই বা খেলবে?

হোথায় দেখো, আহা-হা-হা। দুধের উপর গোলাপী দিয়ে ময়ূরাকণ্ঠী-বাঙ্গালোরী শাড়ি! জরির আঁচল। আর সেই জরির আঁচল দিয়ে ব্লাউজের হাতা। ব্লাউজের বাদ-বাকী দেখা যাচ্ছে না, আছে কি নেই তাই বলতে পারব না। বোধ হয় নেই—না থাকাতেই সৌন্দর্য বেশি। ফরাসীরা কি এ জিনিসকেই বলে 'দোকোল্‌তে'? বুক-পিঠ-কাটা মেমসায়েবদের ইভ্‌নিং ফ্রক এর কাছে লজ্জায় জড়সড়।

ডান হাতে কনুই অবধি সোনার চুড়ি—বাঁ হাতে কবজের মত বাঁধা হোমিও-প্যাথিক রিস্টওয়াচ। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ডিনারের কত বাকি? কটা বেজেছে?' বলেই লজ্জা পেলেন, কারণ ভুলে গিয়েছিলেন নিজের হাতেই বাঁধা রয়েছে ঘড়ি। কিন্তু লাল হলেন না, কারণ রুজ আগে-ভাগেই এত লাল করে রেখেছে যে, আর লাল হবার 'পার্কিঙ-প্লেস' নেই।

হাতে? যান মশাই,—আমার অতশত মনে নেই। হালকা সবুজ জর্জেটের সঙ্গে রক্তে-রাঙা ব্লাউজ। কপালে সবুজ টিপ। শাড়ির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে বাঁ হাতে ঝুলছে ব্যাগ, কিন্তু ব্যাগের স্ট্র্যাপটার রঙ মেলানো রয়েছে রক্ত-রাঙা ব্লাউজের সঙ্গে এবং তাকে ফের মেলানো হয়েছে স্যাণ্ডেলের স্ট্র্যাপের সঙ্গে। আর কোথায় কোথায় মিল অমিল আছে দেখবার পূর্বেই তিনি সরে পড়লেন। ডান হাতে কিছু ছিল? কী মুশকিল!

আরে! মারোয়াড়ী ভদ্রলোকরা কি পার্টিতে মহিলাদের আনতে শুরু করেছেন? কবে থেকে জানতুম না তো।

একদম খাঁটি মারোয়াড়ী শাড়ি। টকটকে লাল রঙ—ছোটো ছোটো বোট্টাদার। বেনারসী-র‍্যাপার। সেই কাপড় দিয়েই ব্লাউজ—জরির বোট্টা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সকাল বেলা হাওড়ায় নামলে ব্রিজ পেরিয়ে হামেশাই এ রকম শাড়ি দেখতে পাই—মহিলারা স্নান সেরে ফিরছেন। সেই শাড়ি এখানে? হাতে আবার লাইফ বেল্ট সাইজের কাঁকন।

মাথার দিকে চেয়ে দেখি, না, ইনি মারোয়াড়ী নন। চুলটি গুটিয়েছেন একদম পাকাপোক্ত গ্রেতা গার্বো স্টাইলে। কাঁধের উপর নেতিয়ে পড়ে ডগার দিকে একটু-খানি ঢেউখেলানো। শুধু চুলটি দেখলে তামা-তুলসী স্পর্শ করে বলতুম, জীবনের শেষ স্বপ্ন সফল হল—গ্রেতার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে। কিন্তু কেন হেন জঙ্গলী শাড়ির সঙ্গে মডার্ন চুল?

নাসিকাগ্রে মনোনিবেশ করে ধ্যান করে হৃদয়ঙ্গম করলুম তত্ত্বটা। শাড়ি ব্লাউজের কন্‌স্ট্রাস্ট্‌ ম্যাচিঙের দিন গেছে। এখন নব নব কর্নট্রাসট্‌-এর সন্ধান চলেছে। এ হচ্ছে প্রাচীন পন্থা আর আধুনিক ফ্যাশানের দ্বন্দ্ব। গলার নীচে ত্রয়োদশ শতাব্দী—উপরে বিংশ। প্রাণভরে বাঙালী মেয়ের বুদ্ধির তারিফ করলুম। উচ্চকণ্ঠে করলেও কোনো আপত্তি ছিল না। সে হট্টগোলের ভিতর

এটম বমের আওয়াজও শোনা যেত না। কি করে খানার ঘণ্টা শুনতে পেলুম, খোদায় মালুম।

হাওড়া থেকে শেয়ালদা সাইজের খানা-টেবিল। টার্কি পাখীরা রোস্ট হয়ে ঊর্ধ্বপদী হয়েছেন অন্তত শ'জনা, মুরগী-মুসল্লম অগুনতি, সাদা কেঁচোর মত কিলবিল করছে ইতালির মাকরোনি হাইনৎসের লাল টমাটো সসের ভিতর, আণ্ডার রাশান স্যালাড গায়ে কম্বল জড়িয়েছে প্যোব ব্রিটিশ মায়োনেজের ভিতর, চকলেট রঙের শিককাবাবের উপর আঁকা হয়েছে সাদা পেঁয়াজ-মুলোর আলপনা, গরম-মশলার ক্বাথের কাদায় মুখ গুঁজে আছেন রুইমাছের ঝাঁক, ডাঁটার মত আটা আটা এসপেরেগাস টিন থেকে বেরিয়ে শ্যাম্পেনের গন্ধ পেয়ে ফুলে উঠেছে পোলাওয়ের পিরামিডের উপর সসেজের ডজন ডজন কুতুবমিনার।

কন্‌ট্রাস্‌ট্‌, কনট্রাস্‌ট্‌, সবই কন্‌ট্রাস্‌ট্‌।

প্রভু যীশু জন্ম নিলেন খড়বিচুলির মাঝখানে—আর তার পরব হল শ্যাম্পেনে টার্কিতে !!

পাণ্ডা

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

'নামিনু শ্রীধামে। দক্ষিণে বামে পিছনে সমুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত।'

এর পর পাণ্ডাদের সহৃদয় অত্যাচারের কথা ফলিয়ে বলবার মত সাহস আমাদের মত অর্বাচীন জনের হওয়ার কথা নয়। ওস্তাদরা যখন 'মিয়াকী তোড়ী' অর্থাৎ মেয়া তানসেন রচিত তোড়ী রাগিণী গান তখন গাওয়া আরম্ভ হওয়ার পূর্বে দুহাত দিয়ে দুটি কান ছুঁয়ে নেন। ভাবখানা এই 'হে গুরুদেব, ওস্তাদের ওস্তাদ, যে-গান তুমি গেয়েছ সেটি গাইবার দম্ভ যে আমি প্রকাশ করলুম, তার জন্য আগে-ভাগেই মাপ চাইছি।' সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদেরও তাই করা উচিত—মাইকেলও তাই করেছেন। আদি কবির স্মরণে বলেছেন, 'রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থদরশনে।' কালিদাসও বলেছেন,—সংস্কৃতটা মনে নেই—'বজ্রমণি ছেদ করার পর সূত্র যেমন অনায়াসে মণির ভিতর দিয়ে চলে যেতে পারে, বাল্মীকির রামায়ণের পর আমার রঘুবংশ ঠিক সেইরূপ।'

শুধু এইটুকু বলে রাখি, পাণ্ডা বলতে ভারতীয় যে মহান জাতের কথা ওঠে তার কোনো জাত নেই। অর্থাৎ শ্রীধামের পাণ্ডা আর আজমীঢ়ের মুসলমান পাণ্ডাতে কোনো পার্থক্য নেই—যাত্রীর প্রাণটা নিমেষে কণ্ঠাগত করবার জন্য এঁদের বজ্রমুষ্টি ভারতের সর্বত্রই এক প্রকার। ভারতের হিন্দু-মুসলমান মিলনের এর চেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ আর কি হতে পারে? কংগ্রেস যদি এঁদের হাতে দেশের ভারটা ছেড়ে দিতেন তবে ভারত ছেদের যে কোনো প্রয়োজন হ'ত না সে বিষয় আমি স্থির-নিশ্চয়। এর জন্য মাত্র একটি প্রমাণ পেশ করছি।

উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে সর্বপ্রকারের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ সে কথা সবাই জানেন ; কিন্তু এ তথ্যটি কি লক্ষ্য করেছেন যে, শিখরা তীর্থ করবার জন্য দিব্য পাকিস্তান যাচ্ছেন, পাকিস্তানের মুসলমানেরা হিন্দুস্থানের আজমীঢ় আসছেন, পূর্ব-পাঞ্জাবের কাদিয়ান গ্রামে যাচ্ছেন? পাণ্ডার ব্যবসা দুনিয়ার প্রাচীনতম ব্যবসা—ওটাকে নষ্ট করা কংগ্রেস লীগের কর্ম নয়।

সে কথা যাক। আমি বলছিলুম, বিদেশ যাওয়ার পূর্বে আমার বিশ্বাস ছিল পাণ্ডা-জগতের অশোক-স্তম্ভ এবং কুতুবমিনার ভারতীয় হিন্দু এবং মুসলমান পাণ্ডা। জেরুজালেমে গিয়ে সে ভুল ভাঙল।

আমি তীর্থপ্রাণ। অর্থাৎ তীর্থ দেখলেই ফুল চড়াই, 'শীরনী বিলাই। ভারতীয় তাবৎ তীর্থ যখন নিতান্তই শেষ হয়ে গেল তখন গেলুম জেরুজালেম। ইহুদি, খ্রীষ্টান, মুসলমান এই তিন ধর্মের ত্রিবেণী জেরুজালেমে। বিশ্বপাণ্ডার ইউ.এন.ও. ঐখানেই। সেখানে থেকে গেলুম বেৎলেহেম—প্রভু যীশুর জন্মস্থান।

বড়দিনের কয়েক দিন পরে গিয়েছিলুম। জেরুজালেম-বেৎলেহেমের বাস-সার্ভিস আমাদের স্টেট বাসের চেয়ে অনেক ভালো (বাসের উপর পলায়মান ব্যাঘ্রের ছবি এঁকে কর্তারা ভালই করেছেন—বাঘ পর্যন্ত ভিড় দেখে ভয়ে পালাচ্ছে)। পকেটে গাইড-বুক—পাণ্ডার 'এরজাৎস'—কাঁধে ক্যামেরা—হাতে লাঠি। আধ ঘণ্টার ভিতর বেৎলেহেম গ্রামে নামলুম।

ভেবেছিলুম, দেখতে পাবো, বাইবেল-বর্ণিত ভাঙাচোরা সরাই আর জরা জীর্ণ আস্তাবল—যেখানে যীশু জন্ম নিয়েছিলেন। সব কপূর। সব কিছু ভেঙে চুরে তার উপর দাঁড়িয়ে এক বিরাট গির্জা।

গির্জাটি প্রিয়দর্শন অস্বীকার করি নে। আর ভিতরে মেঝের উপর যে মোজায়িক বা পাথরে-খচা আলপনা দেখলুম তার সঙ্গে তুলনা দেবার মত রস-সৃষ্টি সেণ্ট সোফিয়া, সেণ্ট পল কোথাও আমি দেখি নি। সে কথা আরেক দিন হবে।

গাইড বুকে লেখা ছিল, গির্জার নিচে ভূগর্ভে এখনো আছে সেই আস্তাবল—যেখানে প্রভু যীশু জন্মগ্রহণ করেন। সেই গহ্বরে ঢুকতে যেতেই দেখি সামনে এক ছ-ফুটি পাণ্ডা। বাবরী চুল, মান-মনোহর গাল-কম্বল দাড়ি, ইয়া গোঁপ, মিশকালো আলখাল্লা, মাথায় চিমনির চোঙার মত টুপি, হাতে মালা—তার এক একটি দানা বেবি সাইজের ফুটবলের মত। পাদ্রী-পাণ্ডার অর্ধ-নারীশ্বর।

গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে শুধাল, 'হোয়াট ল্যাংগুইজ্? কেল লাঁগ? বেলশে শপ্রাখে? লিসান এ?'—প্রায় বারোটা ভাষায় জিজ্ঞেস করল আমি কোন্ ভাষা বুঝি।

সবিনয় বললুম, 'হিন্দুস্থানী।'

বললে, 'দস্ পিয়াস্তর।' অর্থাৎ দশ পিয়াস্তর (প্রায় এক টাকা) দর্শনী দাও॥

'দস্' ছাড়া অন্য কোন হিন্দুস্থানী সে জানে না বুঝলুম, কিন্তু তাই বা কি

কম ? আমি অবাক হয়ে ইংরেজিতে বললুম, 'প্রভু যীশুর জন্মভূমি দেখতে হলে পয়সা দিতে হয় ?'

বললে, 'হ্যাঁ।'

অনেক তর্কাতর্কি হল। আমি বুঝিয়ে বললুম, 'আমি ভারতীয়, খ্রীষ্টান নই, তবু সাত-সমুদ্র-তেরো-নদী পেরিয়ে এসেছি সেই মহাপুরুষের জন্মভূমি দেখতে যিনি সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করেছিলেন গরীব-ধনীর তফাত-ফারাক ঘুচিয়ে দেবার জন্য, যিনি বলেছিলেন কেউ কামিজটা চাইলে তাকে জোব্বাটি দিয়ে দেবে —আর তাঁরই জন্মভূমি দেখবার জন্য দিতে হবে পয়সা ?'

শুধু যে চোরা ই ধর্মের কাহিনী শোনে না তা নয়। আমি উলটো পথ নিলুম—পাণ্ডা ফিরে পর্যন্ত তাকাল না।

গাইড বুকে লেখা ছিল, গহ্বরে যাবার দুটি রাস্তা। একটি গ্রীক অর্থডক্স্ প্রতিষ্ঠানের জিম্মায়, অন্যটি রোমান ক্যাথলিকদের। গেলুম সেটির দিকে— গির্জাটি ঘুরে সেদিকে পেঁছিতে হয়।

এখানে দেখি আরেক পাণ্ডা—যেন পয়লাটার যমজ। বেশ-ভূষায় ঈষৎ পার্থক্য।

পুনরপি সেই সদালাপ। 'ফেলো কড়ি মাখো তেল।' অশ্মো না-ছোড়-বন্দা।

দিল-দরাজ, খোলা-হাত পাঠক হয়ত অসহিষ্ণু হয়ে বলবেন, তুমি তো আচ্ছা ত্যাঁদোড় বাপু ; এত পয়সা খর্চা করে পেঁছিলে মোকামে—এখন দু-পয়সার চাবুক কিনতে চাও না হাজার টাকার ঘোড়া কেনার পর ?' তা নয়, আমি দেখতে চাইছিলুম পাণ্ডাদের দৌড়টা কতদূর অবধি।

এবারে হার মানবার পূর্বে শেষ বাণ হানলুম।

বললুম, 'দেশে গিয়ে কাগজে লিখব, রোমান ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠান কি রকম প্রভু যীশুর জন্মস্থান ভাঙিয়ে পয়সা কামাচ্ছে। আমাদের দেশেও কমুনিটি আছে।'

বলে লাঠিটা বার তিনেক পাথরে ঠুকে ফিরে চললুম ঘোঁত-ঘোঁত করে বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে।

পাণ্ডা ডাকলে, 'শোন।'

আমি বললুম, 'হুঁঃ।'

'তুমি সত্যি এত টাকা খরচ করে এখানে এসে দশ পিয়াস্তরে জন্য তীর্থ না দেখে চলে যাবে ?'

'আলবত। প্রভুর জন্মভূমি দেখার জন্য পয়সা দিয়ে প্রভুর স্মৃতির অবমাননা করতে চাই নে।'

খ্যাঁস-খ্যাঁস করে দাড়ি চুলকোল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর ফিস্-ফিস্ করে কানের কাছে মুখ—বোটকা রসুনের গন্ধ—এনে বলল, যদি প্রতিজ্ঞা করো কাউকে বলবে না ফ্রী ঢুকতে দিয়েছি, তবে—'

আমি বললুল, 'আচ্ছা, এখানে তোমার ব্যবসা মাটি করব না। কিন্তু দেশে

গিয়ে বলতে পারব তো ?'

তখন হার মানল। আমরা বহু লংকা জয় করেছি !!

গীতা-রহস্য

গীতার মত ধর্মগ্রন্থ পৃথিবীতে বিরল। তার প্রধান কারণ, গীতা সর্বযুগের সর্ব মানুষকে সব সময়েই কিছু না কিছু দিতে পারে। অধ্যাত্মলোকে চরম-সম্পদ পেতে হলে গীতাই অত্যুত্তম পদপ্রদর্শক, আর ঠিক তেমনি ইহলোকের পরম সম্পদ পেতে হলে গীতা যে রকম প্রয়োজনীয় চরিত্র গড়ে দিতে পারে, অন্য কম গ্রন্থেরই সে শক্তি আছে। ঘোর নাস্তিকও গীতাপাঠে উপকৃত হয়। অতি সবিনয় নিবেদন করছি, এ কথাগুলো আমি গতানুগতিকভাবে বলছি নে, দেশ-বিদেশে গীতাভক্তদের সাথে একসঙ্গে বসবাস করে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এ বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ়ভূমি নির্মাণ করেছে।

তাই গীতার টীকা রচনা করা কঠিনও বটে, সহজও বটে। সর্বধর্ম সর্ব-মার্গের সমন্বয় যে গ্রন্থে আছে তার টীকা লেখার মত জ্ঞানবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অল্প লোকেরই থাকার কথা ; আর ঠিক তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তিই যখন আপন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কিছু না কিছু সমর্থন গীতাতে পায় তখন তার পক্ষে একমাত্র গীতার টীকা লেখাই সম্ভবপর হয়—একমাত্র গীতাই তখন সে-ব্যক্তির সামান্য অভিজ্ঞতা বিশ্বজনের সম্মুখে রাখবার মত সাহসে প্রলোভিত করতে পারে।

লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলকের 'গীতারহস্য' প্রথম শ্রেণীর টীকা। 'গীতা রহস্যে' লোকমান্যের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত অভিমতও আছে বটে, কিন্তু এ গ্রন্থের প্রধান গুণ, তার তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী। এই তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী উন-বিংশ শতকের শেষের দিকে এবং এই শতকের প্রথম দিকেই সর্বপ্রথম সম্ভবপর হয়,—কারণ তার পূর্বে সর্বধর্মে জ্ঞান আহরণ করতে হলে সর্বভাষা আয়ত্ত করতে হত, এবং সে কর্ম অসাধারণ পণ্ডিতের পক্ষেও অসম্ভব। উনবিংশ শতকে নানা ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হল এবং বিংশ শতকে সমস্ত উপাদান এরূপ সর্বাঙ্গ-সুন্দর সুসজ্জিত হয়ে গেল যে, তখনই প্রথম সম্ভবপর হল তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে গীতা বিচার করা।

এ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দেশে-বিদেশে বহুতর সাধক, গুণীজ্ঞানী গীতাকে কেন্দ্র করে নানা ধর্মালোচনা করেছেন। বাংলা ইংরেজী এই দুই ভাষাতেই গীতা সম্বন্ধে এত পুস্তক জমে উঠেছে যে, তাই পড়ে শেষ করা যায় না। ভারতবর্ষীয় অন্যান্য ভাষা, ফরাসী এবং বিশেষ করে জর্মনে গীতা সম্বন্ধে আমরা বহু উত্তম গ্রন্থ দেখেছি।

তৎসত্ত্বেও বলতে বাধ্য লোকমান্যের গ্রন্থখানি অনন্যসাধারণ। এ পুস্তক লোকমান্য মাণ্ডালে জেলে বসে মারাঠী ভাষায় লেখেন।

"অনুবাদ সাহিত্য" প্রবন্ধ লেখার সময় আমি এই পুস্তকখানার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলুম। স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এ পুস্তকখানির অনবদ্য

অনুবাদ বাংলা ভাষায় করে দিয়ে গিয়ে গৌড়জনের চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়ে গিয়েছেন। এ অনুবাদের সঙ্গে করুণ রসও মিশ্রিত আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি,—

'লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলক তাঁহার প্রণীত 'গীতা-রহস্য' বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধক্রমে, বঙ্গবাসীর কল্যাণ কামনায় বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে,—অতীব দুরূহ ও শ্রমসাধ্য হইলেও আমি এই গুরুভার স্বেচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি অনুবাদ শেষ করিয়া উহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছিলাম। ভগবানের কৃপায়, এতদিন পরে উহা গ্রন্থাকারেও প্রকাশ করিয়া আমার এই কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি।'

তারপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যা বলেছেন, পাঠকের দৃষ্টি আমি সেদিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে চাই ঃ—

'কেবল একটি আক্ষেপ রহিয়া গেল—এই অনুবাদ গ্রন্থখানি মহাত্মা টিলকের করকমলে স্বহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলাম না। তাহার পূর্বেই তিনি ভারতবাসীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া দিব্যধামে চলিয়া গেলেন।'

যতবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদখানা হাতে নিই ততবারই আমার মন গভীর বিস্ময়ে ভরে ওঠে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা অনুবাদ ৮৭২ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ। এই অনুবাদ কর্ম প্রায় ষাট বৎসর বয়সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আরম্ভ করেন। যৌবনে তিনি বড় ভাই সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন মহারাষ্ট্রে ছিলেন তখন মারাঠী শিখেছিলেন এবং ততদিনে নিশ্চয়ই সে ভাষার অনেকখানি ভুলে গিয়েছিলেন—রাঁচীতে বসবাস করে দূর মারাঠা দেশের সঙ্গে সাহিত্যিক কেন, কোনো প্রকারের যোগ রাখাই কঠিন। তাই ধরে নিচ্ছি, সেই বৃদ্ধ বয়সে তিনি নূতন করে মারাঠী শিখে প্রায় তিন লক্ষ মারাঠী শব্দ বাংলায় অনুবাদ করেছেন, মাসের পর মাস তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তার প্রকাশের তত্ত্বাবধান করেছেন, এবং সর্বশেষে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন। ভূমিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

'গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনে আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।'

অর্থাৎ প্রুফ দেখার ভারও আসলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপরেই ছিল।

তাই বিস্ময় মানি যে, এই হিমালয় উত্তোলন করার পর যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখলেন লোকমান্য ইহলোকে নেই তখন তিনি সেই শোক প্রকাশ করলেন, 'কেবল একটি আক্ষেপ রহিয়া গেল' বলে। এ শোক, এ আক্ষেপ প্রকাশ করার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাণ্ডারে কি ভাষা, বর্ণনশৈলী, ব্যঞ্জনা-নৈপুণ্য ছিল না? মৃচ্ছকটিকা, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, নীলপাখী অনুবাদ করার পরও কি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে করুণ রস প্রকাশ করার ক্ষমতা অলব্ধ ছিল?

তাই মনে হয়, যিনি বহু রসের সাধনা আজীবন করেছেন, বৃদ্ধ বয়সে সর্বরস মিলে গিয়ে তাঁর মনে এক অনির্বচনীয় সামঞ্জস্যের অতভূপূর্ব শান্তি এনে দেয়। অথবা কি দীর্ঘ দিনযামিনী গীতার আসঙ্গ লাভ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই বৈরাগ্য-

বিজয়ী কর্মযোগে দীক্ষা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, যেখানে মানুষ কর্ম করে অনাসক্ত হয়ে কেবলমাত্র বিশ্বজনের উপকারার্থে? তাই মনে হয়, সাধনার উচ্চমত স্তরে উত্তীর্ণ হয়েও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্পর্শকাতরতা লোপ পায় নি—লোকমান্যকে সম্পূর্ণ পুস্তক স্বহস্তে নিবেদন করতে পারেন নি বলে ব্যথিত হয়েছিলেন। কিন্তু সে বেদনা প্রকাশ করেছেন শোকে আতুর না হয়ে, গাম্ভীর্য এবং শান্তরসে সমাহিত হয়ে।

কিন্তু এ সব কথা বলা আমার প্রধান উদ্দেশ্য নয়। আমার ইচ্ছা বাঙালী যেন এ অনুবাদখানা পড়ে, কারণ লোকমান্য রচিত 'গীতা-রহস্যে'র ইংরেজী অনুবাদখানা অতি নিকৃষ্ট। যেমন তার ভাষা খারাপ, তেমনি মূলের কিছুমাত্র সৌন্দর্য কণামাত্র গাম্ভীর্য সে অনুবাদে স্থান পায় নি। অথচ বাংলা অনুবাদে, আবার জোর দিয়ে বলি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা অনুবাদে, মূলের কিছুমাত্র সম্পদ নষ্ট হয় নি, মূল মারাঠী পড়ে মহারাষ্ট্রবাসী যে বিস্ময়ে অভিভূত হয়, অনুবাদ পড়ে বাঙালীও সেই রসে নিমজ্জিত হয়।

কিন্তু অতিশয় শোকের কথা—এ অনুবাদ গত আট বৎসর ধরে বাজারে আর পাওয়া যায় না। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ার পর এ পুস্তকের আর পুনর্মুদ্রণ হয় নি। আমার আন্তরিক ইচ্ছা কোনো উদ্যোগী বাঙালী প্রকাশক যে পুনার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে এ পুস্তক পুনরায় প্রকাশ করেন।

আমার কাছে যে অনুবাদখানি রয়েছে তাতে লেখা আছে :—

All rights reserved by
Messrs, R. B. Tilak and S. B. Tilak,
568 Narayan Peth, Poona City.*

বন

পশ্চিম-জর্মনীর রাজধানী বনবাসী হতে চললেন শুনে পাঠক যেন বিচলিত না হন। এ 'বনে'র উচ্চারণ 'ঘরে'র মত। বাংলা উচ্চারণের অলিখিত আইন অনুযায়ী 'ন' অথবা 'ণ' পরে থাকিলে একমাত্রিক শব্দে 'অ'-কারটি 'ও'-কারে পরিণত হয়। যথা—মন, বন, উচ্চারিত হয় মোন, বোন,—ইত্যাদি রূপে। কিন্তু এই জর্মন Bonn শব্দের উচ্চারণে 'ব'য়ের স্বরবর্ণটি 'ঘরের অ-কারের মত উচ্চারিত হয়। তাই পরাধীন জর্মনী আজ বনে রাজধানী পেয়ে যেন ঘর পেয়েছে একথা অনায়াসে বলা যায়।

কাগজে বেরিয়েছে বনের লোকসংখ্যা এক লক্ষ। আমাদের দেশে যেমন বলা হয়, পাঁচ বৎসর লালন করবে, দশ বৎসর তাড়না করবে এবং ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করলে পুত্রের সঙ্গে মিত্রের ন্যায় আচরণ করবে, জর্মনীতে ঠিক তেমনি

* সম্প্রতি খবর এসেছে, বিশ্বভারতীতে পুস্তকখানি পাওয়া যাচ্ছে।

আইন, কোনো শহরের লোকসংখ্যা যদি একলক্ষে পেঁছে যায় তবে তিনি সাবালক হয়ে গেলেন, তাঁকে তখন 'গ্রোস-স্টাট্' বা বিরাট নগররূপে আদর-কদর করে বার্লিন ম্যুনিক কলোন হামবুর্গের সঙ্গে একাসনে বসাতে হবে। অর্থাৎ মার্কিন ইংরেজ কর্তাদের মতে বন বিরাট নগর এবং জর্মনীর রাজধানী তাঁরা বিরাট নগরেই স্থাপনা করেছেন।

কিন্তু এই কেঁদে ককিয়ে টায়ে-টায়ে এক-লক্ষী শহরেই রাজধানী কেন করতে হল? আমি বন শহরে বহু কর্মক্লান্ত দিবস এবং ততোধিক বিনিদ্র যামিনী যাপন করেছি। বনে হাড়হদ্দ আমি বিলক্ষণ জানি। তার লোকসংখ্যা কি কৌশলে ১৯৩৮ সালে এক লক্ষ করা হয়েছিল সেও আমার অজানা নয়। এক-লক্ষী হয়ে সাবালকত্ব পাবার জন্য বন কায়দা করে পাশের একখানা গ্রামকে আদমশুমারীর সময় আপন কণ্ঠে জড়িয়ে নিয়েছিল—যদিও সে গ্রামটি বনের উপকণ্ঠে অবস্থিত নয়, দুয়ের মাঝখানে বিস্তর যব-গমের তেপান্তরী ক্ষেত।

আসল তত্ত্ব হচ্ছে বন রুশ সীমান্ত থেকে অনেক দূরে। মার্কিন ইংরেজ ধরে নিয়েছে আসছে লড়াইএ জর্মনী রুশের বিরুদ্ধে লড়বে এবং তখন রাজধানী যদি রুশ সীমান্তের কাছে থাকে, তবে তাতে মেলা অসুবিধা—প্যারিস ফ্রান্সের উত্তর সীমান্তে থাকায় তাকে যেমন প্রতিবারেই মার খেতে হয়, বেড়ালের মত রাজধানীর বাচ্চা নিয়ে কখনো লিয়োঁ কখনো ভিশিময় ঘুরে বেড়াতে হয়।

কিন্তু বনে রাজধানী নির্মাণে আরেকটি মারাত্মক তথ্য আবিষ্কৃত হয়ে গেল। বেলজিয়ম যে রকম প্রতিবার জর্মনীকে ঠেকাতে গিয়ে বেধড়ক মার খেয়েছে, এবার জর্মনী রুশকে ঠেকাতে গিয়ে সেইরকম ধারাই মার খাবে। বার্লিন গেছে, ফ্রাঙ্কফুর্ট যাবে, বনও বাঁচবে না।

কিন্তু থাক এসব রসকষহীন রাজনীতি চর্চা। বরঞ্চ এসো সহৃদয় পাঠক, তোমাকে বনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

এপারে বন, ওপারে 'সিবেন গেবির্গে' অর্থাৎ সপ্তশ্রীলাচল। মাঝখানে রাইন নদী। সে নদীর বুকে উপর দিয়ে জাহাজ চড়ার জন্য প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক তামাম ইউরোপ আমেরিকা থেকে জড়ো হয়। নদীটি এঁকে বেঁকে গিয়েছে, দুদিকে সমতল জমির উপর গম-যবের ক্ষেত, মাঝে মাঝে ছবির মত ঝকঝকে তকতকে ছোট্ট ছোট্ট ঘরবাড়ি, সমতল জমির পিছনে দু সারি পাহাড় নদীর সঙ্গে সঙ্গে এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে—মেঘমাশ্লিষ্টসানুং।

আর বন শহরের ভিতরটাও বড় মনোরম। বার্লিনের মত চওড়া রাস্তা নেই, পাঁচতলা বাড়িও নেই। মোটরের গাঁক-গাঁকও নেই। আছে কাশী আগ্রার মত ছোট ছোট গলিঘুঁচি, ছোট্ট ছোট্ট বাড়ি-ঘর-দোর, ঘুমন্ত কাফে, অর্ধ-জাগ্রত রেস্তোরাঁ। আর বিশাল বিরাটবিপুল কলেবর আধখানা শহর জুড়ে ভুবন-বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই জর্মনীতে প্রথম সংস্কৃত চর্চা আরম্ভ হয়। হেরমান য়াকোবি এখানেই অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর শিষ্য কির্ফেল এখনো সেখানে সংস্কৃত পড়ান। পুরাণ সম্বন্ধে তাঁর মোটা কেতাবখানার তর্জমা ইংরাজীতে এখনো হয় নি। কির্ফেলের সতীর্থ অধ্যাপক লশ উপনিষদ নিয়ে

বছর বিশেক ধরে পড়ে আছেন। তাঁর সুহৃদ্ রুবেনসের শরীর ঈষৎ ইহুদী রক্ত ছিল বলে তিনি জর্মনী ছাড়তে বাধ্য হন। উপস্থিত তিনি তুর্কীর আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ান। বহুকাল ধরে রামায়ণখানা কামড়ে ধরে পড়ে আছেন—প্রামাণিক পুস্তক লেখবার বাসনায়।*

আর রাইনের ওয়াইনের প্রশংসা করার দায় তো আমার উপর নয়। ফ্রান্সের বর্দো বার্গেণ্ডির সঙ্গে সে কাঁধ মিলিয়ে চলে।

আমি যখন প্রথম দিন আমার অধ্যাপকের সঙ্গে লেখাপড়া সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলুম, তখন তিনি ভূরি-ভূরি খাঁটি তত্ত্বকথা বলার পর বললেন :

'এখানে ফুল প্রচুর পরিমাণে ফোটে, তরুণীরা সহৃদয়া এবং ওয়াইন সস্তা। বুঝতে পারছেন, আজ পর্যন্ত আমার কোনো শিষ্যেরই বদনাম হয় নি যে নিছক পড়াশুনো করে সে স্বাস্থ্যভঙ্গ করেছে। আপনিই বা কেন করতে যাবেন?'

রাজধানী ঠিক মোকামেই থানা গাড়লো ॥

'নেভা'র রাধা

অনেক প্রেমের কাহিনী পড়েছি, এমন সব দেশে বহু বৎসর কাটিয়েছি যেখানে প্রেমে না পড়াতেই ব্যত্যয়—তাই চোখের সামনে দেখেছি প্রেমের নিত্য নব প্যাটার্ন—কিন্তু একটা গল্প আমি কিছুতেই ভুলতে পারি নে। তার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে গল্পটি বলেছেন ওস্তাদ তুর্গেনিয়েফ। এবং শুধু তাই নয়—ঘটনাটি তাঁর নিজের জীবনে সত্য সত্যই ঘটেছিল।

দস্তয়েফস্কি তলস্তয়ের সৃজনীশক্তি তুর্গেনিয়েফের চেয়ে অনেক উঁচুদরের, কিন্তু তুর্গেনিয়েফ যে স্বচ্ছসলিল ভঙ্গীতে গল্প বলতে পারতেন, সেরকম কৃতিত্ব বিশ্ব-সাহিত্যে দেখাতে পেরেছেন অতি অল্প ওস্তাদই। তুর্গেনিরেফের শৈলীর প্রশংসা করতে গিয়ে এক রুশ সমঝদার বলেছেন, 'তাঁর শৈলী যেন বোতল থেকে তেল ঢালা হচ্ছে—ইট ফ্লোজ্ লাইক্ অয়েল।'

তুর্গেনিয়েফ ছিলেন খানদানী ঘরের ছেলে—তলস্তয়েরই মত। ওরকম সুপুরুষও নাকি মস্কো, পিটার্সবুর্গে কম জন্মেছেন। কৈশোরে তাঁর একবার শক্ত অসুখ হয়। সেরে ওঠবার পর ডাক্তার তাঁকে হুকুম দেন নেভা নদীর পারে কোনো জায়গায় গিয়ে কিছুদিন নির্জনে থাকতে। নেভার পারে এক জেলেদের গ্রামে তুর্গেনিয়েফ পরিবারের জমিদারি ছিল। গ্রামের এক প্রান্তে জমিদারের একখানি ছোট্টা বাঙলো—চাকর-বাকর নিয়ে ছোকরা তুর্গেনিয়েফ বাঙলোয় গিয়ে উঠলেন।

---

* হালে খবর পেয়েছি তিনি রুশদেশে গিয়ে সেখান থেকে রামায়ণের প্রামাণিক পাঠ প্রকাশ করেছেন।

সেই ছবিটি আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। জমিদারের ছেলে, চেহারাটি চমৎকার আর অসুখ থেকে উঠে সে চেহারাটি দেখাচ্ছে করুণ, উদাস-উদাস, বেদনাতুর। তার উপর তুর্গেনিয়েফ ছিলেন মুখচোরা এবং লাজুক, আচরণে অতিশয় ভদ্র এবং নম্র। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, গ্রামে হুলস্থুল পড়ে গিয়েছে—জেলে-মেয়েরা দূর থেকে আড়নয়নে দেখছে তুর্গেনিয়েফ মাথা নিচু করে, দুহাত পিছনে একজোড় করে নদীর পারে পাইচারি করছেন। জরাজীর্ণ গ্রামে হঠাৎ যেন দেবদূত নেমে এসেছেন।

মেয়েরা জানে এরকম খানদানী ঘরের ছেলে তাদের কারো দিকে ফিরেও তাকাবে না, কিন্তু তা হলে কি হয়, তরুণ হৃদয় অসম্ভব বলে কোনো জিনিস বিশ্বাস করে না। সে রববারে জেলে-তরুণীরা গির্জায় গেল দুরুদুরু বুক নিয়ে—বড়দিনের ফ্রক-ব্লাউজ পরে।

তরুণীদের হৃদয় ভুল বলে নি। অসম্ভব সম্ভব হল। তুর্গেনিয়েফ মেয়েদের দিকে তাকালেন। তাঁর মনও চঞ্চল হল।

তুর্গেনিয়েফ পষ্টাপষ্টি বলেন নি, কিন্তু আমার মনে হয় মস্কো পিটার্সবুর্গের রঙ-মাখানো গয়না-চাপানো লোক-দেখানো সুন্দরীদের নখরা-ককেট্রি তাঁর মত বিতৃষ্ণায় ভরে দিয়েছিল বলে তিনি জেলে-গ্রামের অনাড়ম্বর সরল সৌন্দর্যের সামনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আমার মনে হয়, তুর্গেনিয়েফের কবি-হৃদয় অতি সহজেই হীরার ফুল অনাদর করে বুনো ফুল আপন বুকে গুঁজে নিয়েছিল।

কিন্তু আশ্চর্য, গ্রামের সুন্দরীদের পলায়নম্বরী কাউকে তিনি বেছে নিলেন না। এই উল্টোস্বয়ম্বরে যাকে তিনি হৃদয় দিলেন সে স্বপ্নেও আশা করতে পারে নি, এই প্রিয়দর্শন তরুণটি সুন্দরীদের অবহেলা করে তাকেই নেবে বেছে। সত্য বটে মেয়েটি কুৎসিত ছিল না, এবং তার স্বাস্থ্যও ছিল ভালো ; কিন্তু তাই দিয়ে তো আর প্রেমের প্রহেলিকার সমাধান হয় না।

মেয়েটির মনে যে কী আনন্দ, কী গর্ব হয়েছিল সেটা কল্পনা করতে আমার বড় ভালো লাগে। তুর্গেনিয়েফ তার অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন—নিজের জীবনে ঘটেছিল বলে হয়ত তিনি এ ঘটনাটিকে বিনা অলংকারে বর্ণনা করেছেন। আমার কিন্তু ভারি ইচ্ছে হয়, মেয়েটির লজ্জা-মেশানো গর্ব যদি আরো ভালো করে জানতে পারতুম—তুর্গেনিয়েফ যদি আরো একটুখানি ভালো করে তাঁর হৃদয়ের খবরটি আমাদের দিতেন।

শুধু এইটুকু জানি, মেয়েটি দেমাক করে নি। ইভানকে পেয়ে সে যে-লোকে উঠে গিয়েছিল সেখানে তো দেমাক দম্ভের কথাই উঠতে পারে না। আর তুর্গেনিয়েফ হিংসা, ঈর্ষা থেকে মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন অন্য মেয়েদের সঙ্গে অতি ভদ্র মিষ্ট আচরণ দিয়ে—কোনো জমিদারের ছেলে নাকি ওরকমধারা মাথা থেকে হ্যাট তুলে নিচু হয়ে জেলেনীদের কখনো নমস্কার করেনি।

কৈশোরের সেই অনাবিল প্রেম কিরূপে আস্তে আস্তে তার বিকাশ পেয়েছিল, তুর্গেনিয়েফ তার সবিস্তার বর্ণনা দেন নি—তাই নিয়ে আমার শোকের অন্ত নেই।

দুজনে দেখা হত। হাতে হাত রেখে তারা নদীর ওপারের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকত। চাঁদ উঠত। সন্ধ্যার ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে আরম্ভ করলে তুর্গেনিয়েফ তাঁর ওভারকোট দিয়ে মেয়েটিকে জড়িয়ে দিতেন। সে হয়ত মৃদু আপত্তি করত—কিন্তু নিশ্চয়ই জানি ইভানের কোনো ইচ্ছায় সে বেশীক্ষণ বাধা দিতে পারত না।

তুর্গেনিয়েফ সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন। বাড়ি থেকে হুকুম এসেছে প্যারিস যেতে।

বিদায়ের শেষ সন্ধ্যা এল। কাজ সেরে মেয়েটি যখন ছুটে এল ইভানের কাছে থেকে বিদায় নিতে, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

অঝোরে নীরবে কেঁদেছিল শুধু মেয়েটি। তুর্গেনিয়েফ বারে বারে সন্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি এরকম ধারা কাঁদছো কেন? আমি তো আবার ফিরে আসব—শিগগিরই। তোমার কান্না দেখে মনে হচ্ছে, তুমি ভাবছ, আমি আর কখনও ফিরে আসব না।'

কিন্তু হায়, এসব কথায় কি ভাঙা বুক সান্ত্বনা মানে? জানি, তুর্গেনিয়েফের তখনো বিশ্বাস ছিল তিনি ফিরে আসবেন, কিন্তু যে ভালোবেসেছে সমস্ত সত্তা সর্বৈব অস্তিত্ব দিয়ে তাঁর হৃদয় তো তখন ভবিষ্যৎ দেখতে পায়—বিধাতা পুরুষেরই মত।

তুর্গেনিয়েফ বললেন, 'তোমার জন্য প্যারিস থেকে কি নিয়ে আসব?'

কোনো উত্তর নেই।

'বল কি নিয়ে আসব?'

'কিচ্ছু না—শুধু তুমি ফিরে এসো।'

'কিছু না? সে কি কথা? আর সবাই তো এটা, ওটা, সেটা চেয়েছে। এই দেখো, আমি নোটবুকে সব কিছু টুকে নিয়েছি। কিন্তু তোমার জন্য সব চেয়ে ভালো, সব চেয়ে দামী জিনিস আনতে চাই। বলো কি আনব?'

'কিচ্ছু না।'

তুর্গেনিয়েফকে অনেকক্ষণ ধরে পীড়াপীড়ি করতে হয়েছিল, মেয়েটির কাছ থেকে কোন একটা কিছু একটার ফরমাইশ বের করতে। শেষটায় সে বললে, 'তবে আমার জন্য সুগন্ধি সাবান নিয়ে এসো।'

তুর্গেনিয়েফ তো অবাক। 'এই সামান্য জিনিস! কিন্তু কেন বলো তো, তোমার আজ সাবানে শখ গেল? কই তুমি তো কখনো পাউডার সাবানের জন্য এতটুকু মায়া দেখাও নি—তুমি তো সাজগোজ করতে পছন্দ কর না।'

নিরুত্তর।

'বলো।'

'তা হলে আনবার দরকার নেই।' তারপর ইভানের কোলে মাথা রেখে কেঁদে বলল, 'ওগো, শুধু তুমি ফিরে এসো।'

'আমি নিশ্চয়ই সাবান নিয়ে আসব। কিন্তু বল, তুমি কেন সুগন্ধি সাবান চাইলে?'

কোলে মাথা গুঁজে মেয়েটি বলল, 'তুমি আমার হাতে চুমো খেতে ভালোবাসো আমি জানি। আর আমার হাতে লেগে থাকে সব সময় মাছের আঁশটে গন্ধ। কিছুতেই ছাড়াতে পারি নে। প্যারিসের সুগন্ধি সাবানে শুনেছি সব গন্ধ কেটে যায়। তখন চুমো খেতে তোমার গন্ধ লাগবে না।'

অদৃষ্ট তুর্গেনিয়েফও সে গ্রামে ফেরবার অনুমতি দেন নি।

সে দুঃখ তুর্গেনিয়েফও বুড়ো বয়স পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি ॥

বর্বর জর্মন

ন্যুরনবের্গের মকদ্দমা এগিয়ে চলেছে, চতুর্দিকে আটঘাট বেঁধে তরিবত করে তামাম দুনিয়ায় ঢাকঢোল বাজিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ওঃ, কী বাঁচনটাই না বেঁচে গেছে! এয়সা দুশমনের জাত যদি লড়াই জিতত, তা হলে তোমাদের দমটি পর্যন্ত ফেলতে দিত না। ভাগ্যিস আমরা ছিলাম, বাঁচিয়ে দিলাম।

বিলেতী কাগজগুলে যে দাপাদাপি করে, তাতে আশ্চর্য হবার বিশেষ কিছু নেই। তারা মার খেয়েছে, এখন শুধু মার দিয়েই খুশী হবে না, হরেক রকমে দুশমনকে অপমান করবে, তাতে ডবল সুখ; সে-সব কথা সবাইকে ইনিয়ে-বিনিয়ে শোনাবে, তাতে তেহাই সুখ; তারপর দেশটার কলকব্জা অর্থাৎ তার জিগর-কলিজা, নাড়িভুঁড়ি বিনা ক্লোরফর্মে টেনে টেনে বের করে তাকে আচ্ছা করে বুঝিয়ে দেবে, বেলজেন কাকে বলে।

কিন্তু এ দেশের ইংরেজী কাগজগুলো যখন ফেউ লাগে, তখন আর বরদাস্ত হয় না। ছিলি তো বাবা যুদ্ধের বাজারে বেশ, না হয় স্কচ না খেয়ে সোলান খেয়েছিস, না হয় এসপেরেগাস আরটিচোক খেতে পাস নি, না হয় তুলতুলে ফ্ল্যানেল আর নানা রকমের হ্যাট ও ক্যাপ পাস নি বলে সর্দি ও গর্মির ভয়ে একটুখানি পা সামলে চলেছিলি, তাই বলে যা বুঝিস নে, মালুম নেই, তা নিয়ে এত চেল্লাচেল্লি করিস কেন? টু পাইস তো করেছিস, সে কথাটা ভুলে যাস কেন, তাই নিয়ে দেশে যা, দুদিন ফুর্তি কর, যে জায়গা নাগাল পাস নে, সেখানে চুলকোতে যাস নি। কিন্তু শোনে কে! সেই জিগির—জর্মন বর্বর, 'বশ', 'হান'।

পরশুদিন জর্মন বর্বরতার প্রমাণ পেলুম, পুরনো বইয়ের দোকানে—একখানা কেতাব, আজকালকার জলের চেয়েও সস্তা দরে কিনলাম। তার নামধাম—

BENGALISCHE ERZAEHLER / DER SIEG DER SEELE / AUS DEM INDISCHEN / INS DEUTSCH UEBERTAGEN / VON / REINHARDT WAGNER /

অর্থাৎ 'বাঙালী কথক'। (Erzaehler ধাতুর অর্থ কাহিনী বলা) 'আত্মার জয়, ভারতীয় ভাষা হইতে জর্মনে রাইনহার্ট ভাগনার কর্তৃক অনূদিত।'

চমৎকার লাল মলাটের উপর সোনালী লাইনে একটি অজন্তা ঢঙের সুন্দরী

বাঁশি বাজাচ্ছে। ছবিখানি এঁকেছেন, কেউ-কেটা নয়, স্বয়ং অধ্যাপক এড্‌মুন্‌ড্‌শেফার।

কেতাবখানা যতন্ত্র বিক্রির জন্য পাওয়া যাবে না—এস্তেহার রয়েছে! 'ব্যুশারফ্রয়েণ্ডে' সংঘের সভ্যরা কিনতে পাবেন। বর্বর জর্মন বটতলা ছাপিয়ে, পেঙ্গুইন বেচে পয়সা করতে চায় না, তার বিশ্বাস—দেশে যথেষ্ট সত্যিকারের রসিক পাঠক আছে, তারা সংঘের সদস্য হয়ে বাছা বাছা বই কিনবে। আর যদি তেমনটা নাই হয়, হল না, চুকে গেল—বাংলা কথা।

'বাংলা কথা' ইচ্ছে করেই বললাম, কারণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ভাগনার সাহেব খাসা বাংলা জানেন। প্রথম আলাপে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মহাশয় কোন্‌ ভাষার অধ্যাপক?

বাংলার।

বাংলার? বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে?

আজ্ঞে।

ছাত্র কটি?

গেল পাঁচ বছরের হিসেব নিলে গড়পড়তা ৩/৫।

গর্বে আমার বুক ফুলে উঠল। আমি যে ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি, সেখানে ফিল্‌ক্লাসে নিদেনপক্ষে দেড়শটা বাঁদর ঝামেলা লাগাত। আদর্শ ছিল—৩০০ আপন ওয়ান প্রফেসারের। বললাম, ৩/৫ একটু কম নয়?

ভাগনার বিরক্ত হয়ে বললেন, রবিবাবুর লেখা পড়েন নি—The rose which is single need not envy the thorns which are many?

উঠে গিয়ে ধনধান্যে পুষ্পে ভারা রেকর্ডখানি লাগালেন। ভাব হয়ে গেল। কিন্তু মনে মনে বললাম, কুল্লে ৩/৫-এর জন্যে একটা আস্ত প্রফেসার। জর্মনরা বর্বর।

অবতরণিকাটি ভাগনার সাহেব নিজেই লিখেছেন; আগাগোড়া তর্জমা করে দিলুম।

'সংকলনটি আরম্ভ স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ গদ্য রচনাগুলোকে বাংলার tschota galpa (ছোট গল্প) বলা হয়। ছোট গল্পগুলোকে এক রকমের ছোটখাটো উপন্যাস বলা যেতে পারে; শুধু নায়কনায়িকার সংখ্যা কম। গল্পগুলোর কাঠামো পশ্চিম থেকে নেওয়া হয়েছে, ভিতরকার প্রাণবস্তু কিন্তু খাঁটি ভারতীয়। মাঝে মাঝে দেখা যায় সমস্ত গল্পটার আবহাওয়া একটিমাত্র মূল সুরের চতুর্দিকে গড়া। কতকগুলো আবার গীতিরসে ভেজানো। আবার এও দেখা যায়, ভারতবাসীর ধর্ম তার আচার-ব্যবহারের সঙ্গে এমনই বাঁধা যে গল্পের বিকাশ ও সমস্যা সমাধান এমন সব কারণের উপর নির্ভর করে, যেগুলো পশ্চিমে নভেলে থাকে না। আশা-নিরাশার দোলা-খাওয়া কাতর হৃদয় এই সব গল্পে কখনও বা ধর্মের কঠিন কঠোর আচারের সঙ্গে আঘাত খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে, কখনও বা তার ছোট গণ্ডির ভিতর শান্তি খুঁজে পায়; সেই ধুকধুক হৃদয়ের কঠোর দুঃখ, চরম

শান্তির বর্ণনা করা হয়েছে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। আন্দ্রেয়াস হয়েসলারের সঙ্গে আমরা সুর মিলিয়ে বলতে পারি, "মানুষের আত্মার ভাঁজে ভাঁজে যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি।"

'ভারতীয়দের প্রেম বড় উদার, তাতে গণিকারও স্থান আছে। গণিকাদের কেউ কেউ আবার জন্মেছে বেশ্যার ঘরে, বদ খেয়ালে বেশ্যা হয় নি। গ্যোটের গণিকাকে ভগবান অবহেলা করেন নি, এঁদেরও হয়তো অবহেলা করবেন না।

'সংকলনটি সুখে-দুঃখের গল্পেই ভর্তি করা হয়েছে ; হাস্যরসের গল্প নিতান্ত কম দেওয়া হয়েছে। তার কারণও আছে, দুঃখ-যন্ত্রণা সব দেশের সব মানুষেরই এক রকম, কিন্তু হাস্যরস প্রত্যেক জাতিরই কিছু না কিছু ভিন্ন প্রকৃতির। করুণ রসে মানুষ মানুষকে কাছে টানে, হাস্যরস আলাদা করে। তবু তিনটি হাস্যরসের গল্প দেওয়া হল ; হয়তো পশ্চিম দেশবাসীরা সেগুলোতে আনন্দ পাবেন।

'বিশ্বসাহিত্যের সেবা যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে সব চেয়ে ভাল রচনা বাদ দেওয়া অন্যায়। কাজেই রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়া চলে না। তাঁর 'লিপিকা' থেকে তাই কয়েকটি সব চেয়ে ভাল লিখন দেওয়া হল ; এগুলোকে ছোট ছোট গল্প বলা ভুল হবে।[১] লেখাগুলো সহজেই দুভাগে আলাদা করা যায়, কতকগুলো মহাকাব্যের কাঠামোয় গড়া বলে গভীর সত্যের রূপ প্রকাশ করে তোলে, আর কতকগুলো ছবির মত কিসের যেন প্রতীক, কেমন যেন অস্বচ্ছ অর্ধ-অবগুণ্ঠিত অনাদি অনন্তের আস্বাদ দেয়, অথবা যেন নিগূঢ় আত্মার অন্তর্নিহিত কোমল নিশ্বাস আমাদের সর্বাঙ্গে স্পর্শ দিয়ে যায়।

'সর্বশেষে যাঁরা তাঁদের লেখার অনুবাদ করবার অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, বিশেষ করে যাঁরা এই সংকলনের গোড়াপত্তন ও সম্পূর্ণ করাতে সাহায্য করেছেন। সদুপদেশ দিয়েছেন ও অনুবাদে যাতে ভুলত্রুটি না থাকে তার জন্য আমি নিম্নলিখিত মহাশয়দের কাছে কৃতজ্ঞ,—হের দ. প. রায়চৌধুরী, ডি. ফিল. (গ্যোটিঙেন) ; ইঞ্জিনিয়র বিদ্যার্থী অ. ভাদুড়ী ; য. চ. হুই, এম. এস-সি ; য. ভ. বসু, ডি. ফিল, (বার্লিন) এবং ইঞ্জিনিয়ারীঙ ডিপ্লোমাধারী স. চ. ভট্টাচার্য।[২] সুরসিক, বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ল. ভ. রামস্বামী আইয়ার[৩] এম. এ. বি. এল. বেশির ভাগ মূল লেখাগুলি পাঠিয়েছেন ও সংকলন আরম্ভ করার জন্য উৎসাহিত করে শেষ পর্যন্ত সাহায্য করেছেন। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার জন্য গৃহিণীকে ধন্যবাদ।'

অবতরণিকাটি নিয়ে অনেক জল্পনাকল্পনা করা যায়, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য

১। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' থাকতে ভাগনার কেন যে সেগুলো জাজে লাগালেন না, তা বোঝা গেল না।

২। D. P. Roy Chowdhury ; A Bhadhuri ; J. C. Huii ; J. Bose ; S. C. Bhattacharya.

৩। ইনি শব্দতাত্ত্বিকদের সুপরিচিত।

পাঠক যেন নিজেই ভাগনার সাহেবের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন। আমার শুধু একটি বক্তব্য যে অবতরণিকার ভাষ্যটি সরল, যাঁরা মূল জর্মনে কানট হেগেল এমন কি টমাস মান্‌ও পড়েছেন তাঁরাই জানেন জর্মনে কি রকম আড়াইগজী সব বাক্য হয়। ভাগনারের জর্মন অনেকটা বাংলা ছন্দের—কিছুটা প্রমথ চৌধুরীর মত। বাক্যগুলো ছোট ছোট; সাদামাটা খাস জর্মন কথার ব্যবহার বেশি কিন্তু দরকারমত শক্ত লাতিন কথা লাগাতে সায়েব পিছ্‌পা হন নি। জর্মন গুরুচণ্ডালীর সম্বন্ধে বাংলার মত ভয়ংকর সচেতন নয়। ভাগনার আবার সাধারণ জর্মনের চেয়েও অবচেতন।

পাঠকের সব চেয়ে জানার কৌতূহল হবে যে, কার কার লেখা ভাগনার সাহেব নিয়েছেন। তার ফিরিস্তি দিচ্ছি :—

১। আমার দেশ (কবিতা) : শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়[৪]
(Schridvidschendralal Raj)

২। সন্ন্যাস : শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (বিল্বদল)

৩। অঙ্কিত ; গোলাপ ; চোর ; কুসুম ; শিউলি : শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় (সিঁদুর চুপড়ি, মধুপর্ক)

৪। দেবতার ক্রোধ ; রত্নপ্রদীপ : শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (আল্পনা ও জলছবি)

৫। পদ্মফুল ; জন্ম মৃত্যু শৃঙ্খল (আংশিক অনূদিত) : শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু (মায়াপুরী)

৬। একাকী ; প্রেমের প্রথম কলি : শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী (হাসি ও অশ্রু)

৭। বউ চোর, রসময়ীর রসিকতা : শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (ষোড়শী, গল্পাঞ্জলি)

৮। গলি ; পরীর পরিচয় ; নূতন পুতুল ; ছবি ; সুয়োরানীর সাধ ; সমাপ্তি ; সমাধান ; লক্ষ্যের দিকে ; সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় ; পায়ে চলার পথ ; কণ্ঠস্বর ; প্রথম শোক ; একটি দিবস : শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Schrirabindranath Thakur (লিপিকা)

৯। আঁধারে আলো : শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মেজদিদি)

১০। পাষাণ হৃদয় : শ্রীমতী সুনীতি দেবী (বঙ্গবাণী)

এখনই বলে দেওয়া ভাল যে পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৬ সালে। তার মানে এই নয় যে, এই কজনই তখন নামজাদা লেখক ছিলেন। বরঞ্চ মনে হয়, ভাগনার ১৯১২-২০এর সময় বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন ও সে যুগে এঁদেরই

৪। জীবিত মৃত সকলের নামের পূর্বেই ভাগনার "শ্রী" ব্যবহার করেছেন। বাংলা "শ" বুঝতে হলে জর্মানে sch (ইংরাজীতে Schedule এর sch), 'জ' বুঝাতে হলে 'dsch', চ বুঝাতে হলে 'tsch', 'য়' বুঝাতে হলে 'J' ব্যবহার করা হয়েছে।

যে খুব প্রতিপত্তি ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় যে কেন বাদ পড়লেন ঠিক বোঝা গেল না। অবশ্যি মনে রাখতে হবে যে, নির্বাচনটা ঠিক ভাগনারের হাতে ছিল না। এ দেশ থেকে যে সব বই পাঠানো হয়েছিল, তা থেকে ভাল হোক, মন্দ হোক তাঁকে বাছতে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের নাম ভাগনার চলতি জর্মন কায়দায় 'টেগোর' লেখেন নি।

নানা টীকা-টিপ্পনী করা যেত, কিন্তু সেটা পাঠকের কাছে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। জর্মন-মন এই গল্পগুলোতেই কেন সাড়া দিল, তার কারণ অনুসন্ধান তাঁরাই করুন।

সাধারণ জর্মনের পক্ষে দুর্বোধ কতকগুলো শব্দ পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে; যেমন—অগ্নি (দেবতা), অলকা, অন্নপূর্ণা, আরতি, আষাঢ়, B A., বেলপাতা, ভৈরবী রাগিণী, ভর্তৃহরি, ফুলশয্যা, চোরা বাগান, দোয়েল, জয়দেব যোগাসন, হাতের নোয়া, একতারা, হোলি, হুলুধ্বনি, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসের মহাভারত, মেদিনীপুর, শালিগ্রাম, সমুদ্রমন্থন, পয়সা, পানি কৌড়ি, রজনীগন্ধা, রাসলীলা, সাহানা, শুভদৃষ্টি, রথযাত্রা, ব্রাহ্ম সমাজ, ইংরেজী, উড়িয়া বামুন।

সবগুলোর মানে, সব কটাই অতি সংক্ষেপে ঠিক ঠিক দেওয়া হয়েছে। মাত্র একটি ভুল—মেঘদূতকে Epos বা মহাকাব্য বলা হয়েছে। উড়ে বামুনরা যে গঙ্গাস্নানের সময় ডলাই-মলাই ও ফোটা-তিলক কেটে দেন সে কথাটি বলা হয়েছে, কিন্তু আমাদের যে রান্নার নামে কি বিষ খেতে দেন, সেটা বলতে ভাগনার ভুলে গিয়েছেন। B. A, উপাধি ভাগনার জর্মনদের বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং M. A, যে লাতিন Magister Artium সেটা বলতে ভোলেন নি। আশা করতে পারি আমাদের প্রতি জর্মনদের ভক্তি বেড়েছে।

আম-কাঁঠাল, শিউলি-বকুল বহু গল্পে বার বার এসেছে, কিন্তু ফুল আর ফলের ছয়লাপে ভাগনার ঘাবড়ে গিয়ে সেগুলো বোঝাবার চেষ্টা করেন নি। তবে তিনি রজনীগন্ধার প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষপাতদুষ্ট।

অনুবাদ কি রকম হয়েছে? অতি উৎকৃষ্ট, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, পদে পদে ছত্রে ছত্রে এই কথাটি বার বার বোঝা যায় যে, দূর বার্লিনে বসে কি গভীর ভালবাসা দিয়ে ভাগনার অনুবাদগুলো করেছেন এবং সেই ভালবাসাই তাঁকে বাংলার ছোট গল্পের অন্তস্তলে নিয়ে গিয়েছে।

ভৈরবী কোন্ সময় গাওয়া হয়, ফুলশয্যাতে কে শোয়, মেদিনীপুর কোন্ দিকে, হাতের নোয়া আর হুলুধ্বনি কাদের একচেটে, কৃত্তিবাস কাশীরাম দাস কে এই সব বিস্তর বায়নাক্কা বরদাস্ত করে জর্মন ১৯২৮ সালে এই বই পড়েছে আর সুদূর বাংলার হৃদিরস আস্বাদন করবার চেষ্টা করেছে।

বর্বর নয় তো কি!!

ফরাসী—জর্মন

গল্প শুনিয়াছি, এক পাগলা মার্কিন নাকি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, 'হস্তী' সম্বন্ধে যে সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিবে তাহাকে এক লক্ষ পৌণ্ড্ পারিতোষিক দেওয়া হইবে। প্রবন্ধের বিষয়টি যে বৃহৎ সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই; তাহা না হইলে মার্কিন বিশেষ করিয়া ঐ বিষয়টিই নির্বাচন করিবেন কেন?

সে যাহাই হউক, খবর শুনিবামাত্র ইংরাজ তৎক্ষণাৎ কুকের আপিসে ছুট দিল। হরেক রকম সাজসরঞ্জাম যোগাড় করিয়া পক্ষাধিকাল যাইতে না যাইতেই সে আসামের বনে উপস্থিত হইল ও বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই কেতাব লিখিল 'আসামের পার্বত্যাঞ্চলে হস্তী শিকার'।

ফরাসী খবর শুনিয়া ধীরে সুস্থে চিড়িয়াখানার দিকে রওয়ানা হইল! হাতিঘর বা পিলখানার সম্মুখে একখানা চৌকি ভাড়া লইয়া আস্তে আস্তে শ্যাম্পেনে চুমুক দিতে লাগিল। আড়নয়নে হাতিগুলির দিকে তাকায় আর শার্টের কফে নোট টুকে। তিন মাস পর চটি বই লিখিল 'লামুর পারমি লেজেলেফাঁ' অর্থাৎ 'হস্তীদের প্রেমরহস্য'।

জর্মন খবর পাইয়া না ছুটিল কুকের আপিসে, না গেল চিড়িয়াখানায়। লাইব্রেরিতে ঢুকিয়া বিস্তর পুস্তক একত্র করিয়া সাত বৎসর পর সাত ভলুমে একখানা বিরাট কেতাব প্রকাশ করিল; নাম 'আইনে কুৎসে আইনক্যুরুঙ ইন ডাস স্টুডিয়ম ডেস এলোফাণ্টেন', অর্থাৎ 'হস্তীবিদ্যার সংক্ষিপ্ত অবতরণিকা'।

গল্পটি প্রাক্-সভিয়েট যুগের। তখনকার দিনে রুশরা কিঞ্চিৎ দার্শনিক ভাবালু গোছের ছিল। রুশ খবর পাইয়া না গেল হিন্দুস্থান, না ছুটিল চিড়িয়াখানায়, না ঢুকিল লাইব্রেরিতে। এক বোতল ভদকা (প্রায় 'ধান্যেশ্বরী' জাতীয়) ও ত্রিশ বাণ্ডিল বিড়ি লইয়া ঘরে খিল দিল। এক সপ্তাহ পরে পুস্তক বাহির হইল, 'ভিয়েদিল লিলি ভি এলেফাণ্ট'? 'তুমি কি কখনও হস্তী দেখিয়াছ'? অর্থাৎ রুশ যুক্তি-তর্ক দ্বারা প্রমাণ করিয়া ছাড়িল যে হস্তী সম্বন্ধে যে সব বর্ণনা শোনা যায় তাহা এতই অবিশ্বাস্য যে তাহা হইতে এমন বিরাট পশুর কল্পনা পর্যন্ত করা যায় না। অর্থাৎ হস্তীর অস্তিত্ব প্রমাণাভাবে অস্বীকার করিতে হয়।

আমেরিকান এই সব পন্থার একটিও যুক্তিযুক্ত মনে করিল না। সে বাজারে গিয়া অনেকগুলি হাতি কিনিল ও বক্রার্থে নয়, সত্য সত্যই 'হাতি পুষিল'। কুড়ি বৎসর পরে তাহার পুস্তক বাহির হইল 'বিগার এ্যাণ্ড বেটার এলেফেণ্টস —হাউ টু গ্রো দেম?' অর্থাৎ 'আরো ভালো ও আরও বৃহৎ হাতি কি করিয়া গজানো যায়।' শুনিয়াছি আরো নানা জাতি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হস্তীর স্বদেশবাসী এক ভারতবাসীও নাকি ছিলেন। কিন্তু 'নেটিভ' 'কালা আদমী' বলিয়া তাঁহার পুস্তিকা বরখাস্ত-বাতিল-মকুব-নামঞ্জুর-ডিসমিস-অসিদ্ধ করা হয়। অবশ্য কাগজে-কলমে বলা হইল যে, যেহেতুক ভারতবাসী

হস্তীকে বাল্যাবস্থা হইতে চিনে তাই তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাহাকে পক্ষপাতদুষ্ট করিতে পারে !

গল্পটি শুনিয়া হস্তী সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়ে না সত্য, কিন্তু ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও মার্কিন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ঘোলাটে ধারণা তবুও হয়। সব জাতির বিশেষত্ব লইয়া আলোচনা সম্ভবপর নহে, করিবার প্রয়োজনও নাই, কারণ প্রাচ্য জাতিসমূহের কথা ছাড়িয়া দিলে (আর ছাড়িতেই হইবে, কালা-ধলা একাসনে বসিতে পারে শুধু দাবার ছকেই) সত্যই বিদগ্ধ বলিতে বোঝায় জর্মন ও ফরাসীকে। বাদবাকি সকলেই ইহাদের অনুকরণ করে। তবে জর্মনরা নতমস্তকে স্বীকার করে যে, কন্‌সানট্রেশন ক্যাম্পের' অনুপ্রেরণা তাহারা ইংরাজের নিকট হইতে পাইয়াছিল। নিতান্ত তাহারা কোনো জিনিস অর্ধপক্ক রাখিতে চাহে না বলিয়াই এই প্রতিষ্ঠানটিকে পূর্ণ বৈদগ্ধ্যে পেঁছাইয়াছিল।

জর্মন যদি কোনো ভারতবাসীকে পায় তবে ইতি-উতি করিয়া যে কোনো প্রকারে তাহার সঙ্গে আলাপ জুড়িবার চেষ্টা করিবেই। আলাপ হওয়া মাত্র কালবিলম্ব না করিয়া আপনাকে এক গেলাস বিয়ার দিবে তারপর আপনার কালো চুলের প্রশংসা করিবে ও আপনার বাদামী (তা আপনি যত ফর্সাই হউন না কেন) অথবা কালো রঙের প্রশস্তি গাইবে। তারপর আপনাকে প্রশ্নবাণের শরশয্যায় শোয়াইয়া ছাড়িবে, 'আপনারা দেশে কি খান, কি পরেন, সাপের বিষে মানুষ কতক্ষণে মরে, সাধুরা শূন্যে উড়িতে পারেন কি না, কাণ্ট বড় না শঙ্কর, তাজমহল নির্মাণ করিতে কত খরচ হইয়াছিল, অজন্তার কলা মারা গেল কেন, কামশাস্ত্রের প্রামাণিক সংস্করণ কোথায় কোথায় পাওয়া যায়, সর্পপূজা এখনও ভারতবর্ষে চলে কি না, সাধারণ ভারতবাসীর গড়পড়তা কয়টি স্ত্রী থাকে, হিন্দু মুসলমান ঝগড়া কেন ?'

'কিন্তু হাঁ,' বার তিনেক মাথা নাড়াইয়া বলিবে, হ্যাঁ, গান্ধী একটা লোক বটে। ওরকম লোক যীশুখ্রীষ্টের পরে আর হয় নাই (ইংরাজকে কী ব্যতিব্যস্তই না করিল। গোলটেবিল বৈঠকের পর তাঁহার কথা ছিল বাইমার শহরে আসিবার। কিন্তু আসিলেন না ; আমরা বড়ই হতাশ হইয়াছিলাম। সত্যই কি গান্ধী গ্যোটেকে এত ভক্তি করেন যে তামাম ইউরোপে ঐ একমাত্র বাইমারই তাঁহার মন কাড়িল ?'

ভারতবাসীর প্রতি সাধারণ জর্মনের ভক্তি অসীম ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহার কৌতূহলের অন্ত নেই ॥

'এ তো মেয়ে মেয়ে নয়—'

সংবাদপত্রের পাঁজে যাঁরা পোড় খেয়ে ঝামা হয়ে গিয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত আত্মজনের মৃত্যুতেও বিচলিত হন না। হবার উপায়ও নেই। কারণ, যদি সে আত্মজন প্রখ্যাতনামা পুরুষ হন, তবে সাংবাদিককে অশ্রু সংবরণ করে সে মহাপুরুষ সম্বন্ধে রচনা লিখতে বসতে হয়। এ অধম পাঁজাতে ঢুকেছে বটে, পোড়ও

খেয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ ঝামা হয়ে যায় নি বলে তার চোখের জল মুছতে অনেকখানি সময় কেটে গিয়েছে।

বহু সাহিত্যিক, বহু কবি, বহু ঔপন্যাসিকের সঙ্গে দেশবিদেশে আমার আলাপ হয়েছে কিন্তু সরোজিনী নাইডুর মত কলহাস্যমুখরিত, রঙ্গরসে পরিপূর্ণ অথচ জীবনের তথা দেশের সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য সম্বন্ধে সচেতন দ্বিতীয় পুরুষ বা রমণী আমি দেখি নি। কতবার দেখেছি দেশের গভীরতম দৈন্য-দুর্দশা নিয়ে গম্ভীরভাবে, তেজীয়ান ভাষায় কথা বলতে বলতে হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে তিনি রঙ্গরসে চলে গিয়েছেন। লক্ষ্য করে তখন দেখেছি যে, রসিকতার কথা বলেছেন বটে, কিন্তু তখনও চোখের জল ছলছল করছে। আমার মনে হয়েছে, দুঃখ-বেদনার বেদনার কথা বলতে বলতে পাছে তিনি সকলের সামনে হঠাৎ কেঁদে ফেলেন, সেই ভয়ে কথার বাঁক ফিরিয়ে হাসি তামাসায় নেমে পড়েছেন।

চটুল রসিকতাই হোক আর গুরুগম্ভীর রাজনীতি নিয়েই কথা হোক, সরোজিনী যে-ভাষা যে শৈলী ব্যবহার করতেন তার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি, এমন কোন সাহিত্যিক বা কবির নাম মনে পড়ছে না। রবীন্দ্রনাথ গল্প বলতে অদ্বিতীয় ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সরোজিনীর মত কখনও শতধা উচ্ছ্বসিত হতেন না। সরোজিনী আপন-ভোলা হয়ে দেশকালপাত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে যে গল্পগুজব করে যেতেন, তাতে মজলিস জমত ঢের বেশি। রবীন্দ্রনাথ যেমন কখনও কাউকে খুব কাছে আসতে দিতেন না, সরোজিনীর মজলিসে কারো পক্ষে দূরে বসা ছিল অসম্ভব।

এরকম প্রতিভা নিয়ে জন্মেছেন অল্প লোক। অথচ সরোজিনীর চেয়ে অল্প প্রতিভা নিয়ে অনেকেই সরোজিনীর চেয়ে সফলতর সৃষ্টিকার্য করতে সক্ষম হয়েছেন। সরোজিনী ভাব গম্ভীর ছিল, ভাষা মিষ্ট ছিল। তৎসত্ত্বেও তাঁর কাব্য-সৃষ্টি তাঁর ক্ষমতার পিছনে পড়ে রইল কেন?

আমার মনে হয়, সরোজিনীকে যাঁরা বক্তৃতা দিতে শুনেছেন, তাঁর মজলিসে আসন পাবার সৌভাগ্য যাঁদের রয়েছে, তাঁরাই স্বীকার করবেন বিদেশী মায়া-মৃগের সন্ধানে বেরিয়ে সরোজিনী স্থায়ী যশের সতী সীতাকে হারালেন। এতে অবশ্য সরোজিনীর দোষ নেই। অল্প বয়সে তিনি যে ভাষা শিখেছিলেন, পরিণত বয়সে সেই ভাষাতেই তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন। কিন্তু মাতৃস্তন্য না খেয়ে তিনি হরলিকস্ খেয়েছিলেন বলে তাঁর কবিতা কখনও মাতৃরসের স্নিগ্ধতা পেল না। আমি জানি, পৃথিবীতে আজ ইংরেজ ছাড়া কোনো বিদেশী সরোজিনীর মত ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখতে পারবেন না! এ বড় কম কথা নয়, কিন্তু এ কৃতিত্বও আমাদিগকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। কারণ নিশ্চয় জানি, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী দ্বন্দ্বের বাতাবরণে যদি সরোজিনী বাল্যকাল না কাটাতেন, বাংলা মায়ের কোলে বসে যদি তিনি শুধু বাংলাই শুনতেন, তা হলে কৈশোরে বিদেশী ভাষা তাঁর কবিত্ব-প্রতিভাকে ভস্মাচ্ছাদিত করতে পারত না, —মাইকেলের প্রতিভা যে রকম বিদেশী ভস্মকে অনায়াসে সরিয়ে ফেলতে পেরেছিল।

তাই সরোজিনী আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে রইলেন। সরোজিনী প্রমাণ করে দিলেন, বিদেশী ভাষায় কখনও স্থায়ী সৃষ্টি-কর্ম সম্ভবপর হয় না। আর কোনো ভারতবাসী ভবিষ্যতে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষাতে কবিতা লিখবে না। পূর্ব-পাকিস্তান উর্দু গ্রহণ না করে বিচক্ষণের কার্য করেছে। পশ্চিমবঙ্গ যেন হিন্দী-মৃগের সন্ধানে না বেরোয়।

পাঠক যেন না ভাবেন, আমি সরোজিনীর কবিতা পড়ে মুগ্ধ হই নি। আমি শুধু বলতে চাই, সরোজিনীর কবিতার চেয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব বহুগুণে বৃহত্তর ছিল। তিনি আর পাঁচজন কবির মত অবসর সময়ে কবিতা লিখে বাদবাকি সময় সাধারণ লোকের মতন কাটাতেন না। তাঁর কথা, তাঁর হাসি, তাঁর গালগল্প, তাঁর রাগ, তাঁর অসহিষ্ণুতা, তাঁর ধৈর্যচ্যুতি, তাঁর আহার বিহার ভ্রমণ বিলাস সব কিছুই ছিল কবিজনোচিত। রাজনৈতিক সরোজিনী, জনপদকল্যাণী সরোজিনী, বাক্‌নিপুণা সরোজিনী—এই তিন এবং অন্য বহুরূপে যখন তিনি দেখা দিতেন, তখন সেসব রূপই তাঁর কবিরূপের নীচে চাপা পড়ে যেত। কবিতা রচয়িত্রী সরোজিনীর চেয়েও কবি সরোজিনী বহু বহু গুণে মহত্তর।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাংলার এক কবি লিখেছিলেন বাংলার কুঁড়েঘরে রবির উদয় হল, এ বিস্ময় আমাদের কখনও যাবে না। ঠিক তেমনি ভারত এমন কি পুণ্য করেছিল যে তার বুকে ফুটে উঠল সরোজিনী ?

স্বয়ংবর চক্র

ট্রামে বাসে মেয়েদের জন্য আসন ত্যাগ করা ভদ্রতা অথবা অপ্রয়োজনীয়, এ সম্বন্ধে সর্বত্র আলোচনা শোনা যায় এবং আলোচনা অনেক সময় অত্যধিক উষ্মাবশত মনকষাকষি সৃষ্টি করে। একদল বলেন, মা-জননীরা দুর্বল, তাহাদিগকে স্থান ছাড়িয়া দেওয়া কর্তব্য ; অন্য দল বলেন, মা-জননীরা যখন নিতান্তই বাহির হইয়াছেন, তখন বাহিরের কষ্টটা যত শীঘ্র সহ্য করিতে শেখেন ততই মঙ্গল।

মেয়েরা যদি শব্দার্থেই ট্রামে-বাসে বাহির হইতেন, তাহা হইলে বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ ছিল না, কিন্তু তাঁহারা যে শীঘ্রই ব্যাপকার্থে আর্থাৎ নানা প্রকার চাকরি ব্যবসায় ছড়াইয়া পড়িবেন সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ অন্যান্য দেশে যাহা পঁচিশ বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল এদেশে তাহার পূর্বাভাস দেখা যাইতেছে। সব কিছু ঘটিবে, এমন কথাও বলিতেছি না।

১৯১৪-এর পূর্বে জর্মন পরিবার কর্তা দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারিতেন, পুত্রকে শিক্ষাদানের গ্যারাণ্টি দিতে আমি প্রস্তুত, কন্যাকে বর দানের। দেশের অবস্থা সচ্ছল ছিল ; যুবকেরা অনায়াসে অর্থোপার্জন করিতে পারিত বলিয়াই যৌবনেই কিশোরীকে বিবাহ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে

প্রবেশলাভ করিবার পূর্বেই কিশোরীদের বিবাহ হইয়া যাইত; তাহারা বড় জোর আবিটুর বা ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়িবার সুযোগ পাইত।

১৯১৪-১৮ সনের যুদ্ধে দেশের প্রায় সকল যুবককেই রণাঙ্গনে প্রবেশ করিতে হইল। মেয়েদের উপর ভার পড়িল খেত-খামার করিবার, কারখানা দোকান আপিস চালাইবার, ইস্কুলে পড়াইবার, ট্রাম ট্রেন, চালু রাখিবার। জর্মনীর মত প্রগতিশীল দেশেও মেয়েরা স্বেচ্ছায় হেঁসেল ছাড়ে নাই, নাচিতে-কুঁদিতে বাহির হয় নাই। সামরিক ও অর্থনৈতিক বন্যা তাহাদের গৃহবহ্নি নির্বাপিত করিয়াছিল, হোটেলের আগুন শতগুণ আভায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

যুদ্ধের পর যুবকেরা ফিরিয়া দেখে, মেয়েরা তাহাদের আসনে বসিয়া আছে। বেশীর ভাগ মেয়েরা আসন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিল, যদি উপার্জনক্ষম বর পাইয়া ঘরসংসার পাতিবার ভরসা তাহাদিগকে কেউ দিতে পারিত। কিন্তু সে ভরসা কোথায়? জর্মনীতে তখন পুরুষের অভাব। তদুপরি ইংরাজ ফরাসী স্থির করিয়াছে জর্মনীকে কাঁচা মাল দেওয়া বন্ধ করিয়া তাহার কারবার রুদ্ধশ্বাস করিবে; জর্মনীর পুঁজির অভাব ছিল তো বটেই।

তখন এক অদ্ভুত অচ্ছেদ্য চক্রের সৃষ্টি হইল! মেয়েরা চাকরি ছাড়ে না, বর পাইবার আশা দুরাশা বলিয়া চাকরি ছাড়িলে খাইবে কি, পিতা হৃতসর্বস্ব ভ্রাতা যুদ্ধে নিহত অথবা বেকার। বহু যুবক বেকার, কারণ মেয়েরা তাহাদের আসন গ্রহণ করিয়া তাহাদের উপার্জনক্ষমতা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বিবাহ করিতে অক্ষম। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে সমস্যাটি জটিল নয়। যুবকেরা পত্নীর উপার্জনে সন্তুষ্ট হইলেই তো পারে। কিন্তু সেখানে পুরুষের দম্ভ যুবকের আত্মসম্মানকে আঘাত করে। পত্নীর উপর্জনের উপর নির্ভর করিয়া পুরুষ জীবন যাপন করাকে কাপুরুষতা মনে করে। মেনীমুখো, ঘরজামাই হইতে সহজে কেহ রাজী হয় না; বিদেশে না, এদেশেও না। ইংলণ্ডে তো আরো বিপদ। বিবাহ করা মাত্র যুবতীকে পদত্যাগ করিতে হইত—স্বামী উপার্জনক্ষম হউন আর নাই হউন। (রেমার্কের 'ডের বেকৎস্যুক্'—দ্রষ্টব্য)।

যত দিন যাইতে লাগিল গৃহকর্তারা ততই দেখিতে পাইলেন যে, 'মেয়েকে বর দিব,—ভালোই হউক আর মন্দই হউক—এ গ্যারাণ্টি আর জোর করিয়া দেওয়া যায় না। কাজেই প্রশ্ন উঠিল. পিতার মৃত্যুর পর কন্যা করিবে কি? সে তো ম্যাট্রিক পাস করিয়া বাড়িতে বসিয়া অলস মস্তিষ্ককে শয়তানের কারখানা করিয়া বসিল। এদিকে ওদিকে তাকাইতেও আরম্ভ করিয়াছে। না হয় তাহাকে কলেজেই পাঠাও; একটা কিছু লইয়া থাকিবে ও শেষ পর্যন্ত যদি সেখানে কোনো ছোকরাকে পাকড়াও নাও করিতে পারে তবু তো লেখাপড়া শিখিবে, তাহারি জোরে চাকরি জুটাইয়া লহবে।

আমি জোর করিয়া বলিতে পারি ১৯২৪-৩২-তে যে সব মেয়েরা কলেজে যাইত তাহাদের অল্পসংখ্যকই উচ্চশিক্ষাভিলাষিণী হইয়া, কারণ, বারে বারে দেখিয়াছি ইহারা উপার্জনক্ষম বর পাওয়া মাত্রই 'উচ্চশিক্ষাকে' ভালো করিয়া নমস্কার না করিয়াই অর্থাৎ কলেজ-আপিসে রক্ষিত সার্টিফিকেট মেডেল না

লইয়াই—ছুটিত গির্জার দিকে। আরেকটি বস্তু লক্ষ্য করিবার মত ছিল—তাহা সভয় নিবেদন করিতেছি। ইহাদের অধিকাংশই দেখিতে উর্বশী মেনকার ন্যায় ছিলেন না। সুন্দরীদের বিবাহ ম্যাট্রিকের সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া যাইত—তাহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে আসিবে কোন্ দুঃখে? কলেজে যে কয়টি সুন্দরী দেখা যাইত, তাহাদের অধিকাংশ অধ্যাপক-কন্যা।

অচ্ছেদ্য চক্র ঘুরিতে লাগিল আরও দ্রুত বেগে। কলেজের পাস করা মেয়ে আস্কারা পাইয়াছে বেশী। যে চাকুরিবাজারে সাধারণ মেয়ে প্রবেশ করিতে ভয় পাইত তাহারা সেই সব চাকুরির বাজারও ছাইয়া ফেলিল—চক্রের গতি দ্রুততর হইল। পার্থের সন্ধান নাই—তিনি তখনো অজ্ঞাতবাসে—স্বয়ংবর চক্র ছিন্ন করিবে কে?

কিন্তু ইতোমধ্যে সেই নিয়ত ঘূর্ণ্যমান স্বয়ম্বর চক্রের একটি স্ফুলিঙ্গ নৈতিক জগতে অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিল। সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি।

মেয়েরা অর্থোপার্জন করিতেছে। পিতা মৃত। পরিবার পোষণ করিতে হয় না। বিবাহের আশা নাই। অর্থ সঞ্চয় করিবে কাহার জন্য? নিরানন্দ, উত্তেজনাহীন শুষ্ক জীবন কেনই বা সে যাপন করিতে যাইবে? অভিভাবকহীন যুবতী ও প্রৌঢ়ারা তখন বিলাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দোষ দিয়া কি হইবে? পিতা বা ভ্রাতা না থাকিলে অরক্ষণীয়ার কি অবস্থা হয় তাহা বেদেই বর্ণিত হইয়াছে—যতদূর মনে পড়িতেছে কোন এক বরুণ মন্ত্রেই—ঋষি সেখানে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন।

উপার্জনক্ষম যুবতীরা বিলাসের প্রশ্রয় দেওয়া মাত্রই চক্র দ্রুততর হইল। যে সব যুবকেরা অন্যথা বিবাহ করিত, তাহারা এই পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিল। মুক্ত হট্টে দুগ্ধ যখন অপর্যাপ্ত তখন বহু যুবক গাভী ক্রয় করা অবিমৃষ্যকারিতার লক্ষণ বলিয়া স্থির করিল। বিবাহ-সংখ্যা আরো কমিয়া গেল—গির্জার বিবাহ-পুরোহিতদের দীর্ঘতর অবকাশ মিলিল। নাইট ক্লাবের সৃষ্টি তখনই ব্যাপকভাবে হইল, 'গণিক' জাতির জন্ম হইল—ইহাদেরই নাম ইউরোপীয় সর্বভাষায় জিগোলো। যে পুরুষ স্ত্রীর উপার্জনে জীবন ধারণ করিতে ঘৃণা বোধ করিত, সে-ই গোপনে, কখনো প্রকাশ্যে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইল (মাউরার জর্মনী পুটস দ ক্লক ব্যাক' দ্রষ্টব্য)।

তখন পুরুষ বলিল, 'স্ত্রীপুরুষে যখন আর কোনো পার্থক্যই রহিল না, তখন পুরুষ ট্রামে-বাসে স্ত্রীলোকদিগের জন্য আসন ত্যাগ করিবে কেন?' উঠিয়া দাঁড়াইলেও তখন বহু মেয়ে পরিত্যক্ত আসন গ্রহণ করিতে সম্মত হইত না। সব কিছু তখন ৫০।৫০। আমার দৃঢ় অন্ধবিশ্বাস কলিকাতা কখনও ১৯৩২-এর বার্লিনের আচরণ গ্রহণ করিবে না। বাঙালী দুর্ভিক্ষের সময় না খাইতে পাইয়া মরিয়াছে; কুকুর বিড়াল খায় নাই। তবুও সমাজপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম—অর্থনৈতিক কারণে মানুষ কি করিয়া নৈতিক জগতে ধাপের পর ধাপ নামিতে বাধ্য হয়।

অনুসন্ধিৎসু প্রশ্ন করিবেন, জর্মনীর স্বয়ংবর চক্র কি কেহই ছিন্ন করিতে

সক্ষম হন নাই ? হইয়াছিলেন। সে বীর হিটলার। পার্থের ন্যায় তাঁহারও নানা দোষ ছিল, কিন্তু অজ্ঞাতবাসের পর তিনিই চক্রভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৯৩৪ সালে ড্রেসডেন শহরে এক নির্দিষ্ট দিনে চারিশত যুবক-যুবতীকে সগর্বে শোভাযাত্রা করিয়া দল বাঁধিয়া বিবাহ করিতে যাইতে দেখিলাম। অন্য শহর-গুলিও পশ্চাৎপদ রহিল না ; সর্বত্র সপ্তপদী সচল হইয়া উঠিল। ১৯৩৮ সালে গিয়া দেখি কলেজগুলি বৌদ্ধ মঠের ন্যায় নারীবর্জিত। হিটলার কি কৌশলে চক্রভেদ করিয়াছিলেন সে কথা আরেক দিন হইবে !!

ইঙ্গ-ভারতীয় কথোপকথন

দেশে বিদেশে বহুবার দেখিয়াছি যে, ইংরাজ ও ফরাসীর প্রশ্নে ভারতীয় সদুত্তর দিতে পারিতেছেন না। তাহার প্রধান কারণ (১) ভারতীয়রা স্বীয় ঐতিহ্য ও বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে সুপরিচিত নহেন—ইহার জন্য প্রধান আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিই দায়ী। (২) বিদেশী রীতিনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা—সে জ্ঞান থাকিলে ভারতীয় তৎক্ষণাৎ বিদেশীকে চক্ষে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া দেখাইয়া দিতে পারে যে, সে যাহা করিতেছে তাহা অন্যরূপে বা অল্প কিয়দ্দিন পূর্বে বিদেশীরাও করিত। নিম্নলিখিত কথোপকথন হইতে আমাদের বক্তব্যটি পরিস্ফুট হইবে ও আশা করি কোনো কোনো ভারতীয়ের উপকারও হইবে।

বিদেশী : তোমাকে সেদিন ফির্পোতে দাওয়াত করিয়াছিলাম। তুমি টালবাহানা দিয়ে পলাইলে। শুনিলাম, শেষটায় নাকি আমজদীয়া হোটেলে খাইতে গিয়াছিলে। ফির্পোর খানা রাঁধে ত্রিভুবন-বিখ্যাত ফরাসীস শেফ্ দ্য কুইজিন। সেই শেফ্‌কে উপেক্ষা করিয়া তুমি কোন্ জঙ্গলীর রান্না খাইতে গেলে !

ভারতীয় : তোমাদের রান্নার অন্য গুণাগুণ বিচারের পূর্বে একটি অত্যন্ত সাধারণ বস্তুর দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। লক্ষ্য করিয়াছ কি না জানি না যে, তোমাদের রান্নায় তিক্ত টক ও ঝাল এই তিন রসের অভাব। অর্থাৎ ছয় রসের অর্ধেক নাই—ঝাল কিছু কিছু দাও বটে কিন্তু তাও বোতলে পুরিয়া টেবিলে রাখ, কারণ ঐ রসটির প্রতি তোমাদের সন্দেহ ও ভয় এখনও সম্পূর্ণ ঘুচে নাই। কাজেই তোমাদের খানা না খাইয়াই বলা যায় যে, আর যে গুণই থাকুক, বৈচিত্র্য তোমাদের রান্নায় থাকিবে না। শুধু লবণ আর মিষ্ট এই সা, রে লইয়া তোমরা আর কি সুর ভাঁজিবে ? দুই-তারা লইয়া বীণার সঙ্গে টক্কর দিতে চাও ? আমজদীয়ার 'জঙ্গলী'ও তাই তোমার শেফ্‌কে অনায়াসে হারাইয়া দিবে। দ্বিতীয়ত, তোমাদের ডাইনিং টেবিলে ও রান্নাঘরে কোনো তফাত নাই। তোমরা ক্রুয়েট নামক ভাঙা-বোতল-শিশিওয়ালার একটা ঝুড়ি টেবিলের উপর রাখ। নিতান্ত রসকষহীন সিদ্ধ অথবা অগ্নিপক্ক বস্তু যদি কেহ গলাধঃকরণ না করিতে পারে তবে তাহাকে ডাইনিং টেবিলে পাকা রাঁধুনী সাজিতে হয়। স্নেহ জাতীয় পদার্থ সংযোগ করিতে গিয়া অলিভ ওয়েল ঢাল, উগ্রতা উৎপাদনের জন্য রাই সরিষার (মাস্টার্ড) প্রলেপ দাও, কটু করিবার জন্য গোলমরিচের গুঁড়া ছিটাও,—বোতলটার আবার ছিদ্র রুদ্ধ বলিয়া তাহাকে লইয়া ধস্তাধস্তি করিতে

স্কন্ধদেশস্থ অস্থিচ্যুতি ও ধৈর্যচ্যুতি যুগপৎ অতি অবশ্য ঘটে,—ভীতু পাচক বড় সাহেবের ভয়ে লবণও দিয়াছে কম,—লক্ষ্য করিয়াছ কি শতকরা আশীজন সূপ মুখে দিবার পূর্বেই নুন ছিটাইয়া লয় ?—অতএব লবণ ঢালো। তৎসত্ত্বেও যখন দেখিলে যে ভোজদ্রব্য পূর্ববৎ বিস্বাদই রহিয়া গিয়াছে তখন তাহাতে সস্ নামক কিম্ভূতকিমাকার তরল দ্রব্য সিঞ্চন করো। তোমার গাত্রে যদি পাচক রক্ত থাকে অবশ্য তুমি তাবৎ প্রলেপসিঞ্চন অনুপান-সম্মত বা মেকদার-মাফিক করিতে পারো, কিন্তু আমি বাপু 'ভদ্রলোকে'র ছেলে, বাড়িতে মা-মাসীরা ঐ কর্মটি রান্নাঘরে রন্ধন করিবার সময় করিয়া থাকেন। খানার ঘর আর রান্নাঘরে কি তফাৎ নেই ?

সায়েব : রুচিভেদ আছে বলিয়াই তো এত বায়নাক্কা।

ভারতীয় : ঐ সব জ্যেষ্ঠতাতত্ব আমার সঙ্গে করিও না। তাই যদি হইবে তবে খানাঘরেই আগুন জ্বালাইয়া লইয়া মাংস সিদ্ধ করো না কেন, গ্রিল কবাব ঝলসাও না কেন ? কেহ অর্ধপক্ক মাংস পছন্দ করে, কেহ পূর্ণপক্ক। সেখানেও তো রুচিভেদ ; তবে পাচকের হাতে ঐ কর্মটি ছাড়িয়া দাও কেন ? আসল কথা, এই রুচিভেদ স্বীকার করিয়াও পাচক বহুজনসম্মত একটি মধ্যপন্থা বাহির করিয়া লহে ও গুণীরা সেইটি স্বীকার করিয়া অমৃতলোকে পেঁছেন। রুচিভেদ থাকা সত্ত্বেও গুণীরা সেক্সপীয়র কালিদাস পছন্দ করেন। কবি কখনো যমক, অনুপ্রাস, উপমা আখ্যানবস্তুর পৃথক পৃথক নির্ঘণ্ট পৃথক পৃথক পুস্তকে দিয়া বলেন না রুচিমাফিক মেকদার-অন পানযোগে কাব্যসৃষ্টি করিয়া রসাস্বাদন করো।

সায়েব : সে কথা থাকুক। কিন্তু আমজদীয়ার খানা খাইলে তো হাত দিয়া ; সেখানে তো ছুরি-কাঁটার বন্দোবস্ত নাই।

ভারতীয় : না, আছে। ভারতবর্ষ তোমাদের পাল্লায় পড়িয়া দিন দিন এমনি অসভ্য হইয়া পড়িতেছে যে, ভারতীয়রাও ছুরি-কাঁটা ধরিতে শিখিবার চেষ্টা করিতেছে। এ নোংরামি করিবার কি প্রয়োজন তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

সায়েব : নোংরামি ? সে কি কথা ?

ভারতীয় : নিশ্চয়ই। ঐ তো রহিয়াছে তোমার ছুরি, কাঁটা, চামচ ; ঐ তো ন্যাপকিন। ঘষো আর দেখো, কতটা ময়লা বাহির হয়। আর যেটুকু বাহির হইবে না, তাহা খাদ্যরস সংযোগে অগোচরে পেটে যাইবে। আর আমি আমার আঙুল ঘষি, দেখো কতটা ময়লা বাহির হয়। আর যদি আমার আঙুল ময়লা হয়ই, তবে আমি এখনই টয়লেট ঘরে গিয়ে আচ্ছা করিয়া হাত ধুইয়া লইব। তুমি যদি ছুরি-কাঁটা লইয়া ঐ দিকে ধাওয়া করো তবে ম্যানেজার পুলিস ডাকিবে, ভাবিবে চৌর্যবৃত্তিতে তোমার হাতেখড়ি হইয়াছে মাত্র। আর শেষ কথাটিও শুনিয়া লও, আমারি আঙুল আমি আমারি মুখে দিতেছি ; তুমি যে কাঁটা-চামচ মুখে দিতেছ সেগুলি যে কত লক্ষ পায়োরিয়াগ্রস্তের অধরোষ্ঠে এবং আস্যগহ্বরেও নিরন্তর যাতায়াত করিতেছে তাহার সন্দেশ

চাখো কি? চীনারা তোমাদের তুলনায় পরিষ্কার। খাইবার কাঠি সঙ্গে লইয়া হোটেলে প্রবেশ করে।

সায়েব: সে কথা থাকুক (ধুয়া)।

ভারতীয়: হ্যাঁ আলোচনাটি আমার পক্ষেও মর্মঘাতী। আমারি এক বাঙালী খ্রীষ্টান বন্ধু কাঁটা দিয়া ইলিশ মাছ খাইতে যান—বেজায় সায়েব কিনা—ফলে ইলিশাস্থি তাঁহার গলাস্থ হয় এমনি বেকায়দা বেদুরস্তভাবে যে, তাঁহার শরীরের অস্থিগুলি এখন গোরস্তানে চিরতরে বস্তি গাড়িয়াছে (অশ্রু বর্ষণ)।

সায়েব: আহা! তবে ইলিশ না খাইলেই হয়।

ভারতীয়: ইংরাজ হইয়া বেকন-আণ্ডা না খাইলেই হয়; ফরাসী হইয়া শ্যাম্পেন না খাইলেই হয়; জর্মন হইয়া সসিজ না খাইলেই হয়; বাঙালী হইয়া ইলিশ না খাইলেই হয়, অনশনে প্রাণত্যাগ করিলেও হয়; আত্মহত্যা করিলেও হয়। লজ্জা করে না বলিতে? বাংলার বুকের উপর বসিয়া হোম্ হইতে টিনস্থ বেকন না পাইলে 'বিটিশ ট্রেডিশন ইন্ ডেঞ্জার' বলিয়া কমিশন বসাইতে চাহো, আর আমি গঙ্গার পারে বসিয়া গঙ্গার ইলিশ খাইব না? তাজ্জব কথা!

সায়েব: সে কথা থাকুক (ধুয়া)। কিন্তু ঐ বলিলে তোমাদের মেয়েরা রান্না করেন, তাঁহারা কি শুধুই রান্না করেন? তাঁহারা এই নির্মম পর্দাপ্রথা মানেন কেন?

ভারতীয়: সে তাঁহারা মানেন; তাঁহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিও।

সায়েব: তাঁহাদিগের সঙ্গে তো দেখাই হয় না।

ভারতীয়: সে আমাদের পরম সৌভাগ্য।

সায়েব: (চিন্তিত মনে) কথাটা কি একটু কড়া হইল না? আমরা কি এতই খারাপ?

ভারতীয়: খারাপ ভালোর কথা জানি না সাহেব। তবে ১৭৫৭ সালে তোমাদের সাথে পীরিতিসায়রে সিনান করিতে গিয়া শুধু যে আমাদের সকলি গরল ভেল তাহা নয়, স্বরাজগামছাখানা হারাইয়া ফেলিয়া দুইশত শীত বৎসর ধরিয়া আকণ্ঠ দৈন্য-দুর্দশা-পঙ্কে নিমগ্ন—ডাঙায় উঠিবার উপায় নাই। পুরুষদের তো এই অবস্থা তাই মেয়েরা অন্তরমহলে তোমাদিগকে quit করিয়া বসিয়া আছেন।

সায়েব: এ সব তো বাইরের কথা; তোমাদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য—

ভারতীয়: আরেকদিন হইবে। উপস্থিত আমাকে Quit India-গাহিতে রাস্তায় যাইতে হইবে।

[ডিসেম্বর ১৯৪৫]

শিক্ষা-সংস্কার

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি সংস্কার করা হইবে এই রকম একটি খবর শুনিতে পাইলাম।

পণ্ডিতেরা একত্র হইয়া এই বিষয়ে নানা তর্ক নানা আলোচনা করিবেন ; সেই সব পণ্ডিতের নামাবলীতে দেশবিদেশের নানা ডিগ্রী নানা উপাধির লাঞ্ছন অঙ্কিত থাকিবে ; নানা ভাষায় নানা কণ্ঠে তাঁহারা জ্ঞানগর্ভ মতামত প্রকাশ করবেন। সেখানে আমাদের ক্ষীণ নেটিভ কণ্ঠ পৌঁছিবে এমন দুরাশা আমরা করি না। আমাদের প্রধান দোষ অবশ্য যে আমরা 'ওল্ড ফুলজ' 'ধর্মপ্রাণ' ; আমাদের যুক্তি-তর্ক ধর্মশাস্ত্র হইতে সঞ্চয় করি, সেগুলি এযুগে বরবাদ রদ্দি জঞ্জাল। কিন্তু আমরা নাচার। পরমহংসদেব বলিয়াছেন, যে মুলা খাইয়াছে তাহার ঢেকুরে মুলার গন্ধ থাকিবেই, আমরা 'মুলা' না খাইয়া থাকিলেও জানি যে তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইলে 'মুলের' অনুসন্ধান নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শুনিতে পাই সায়েবরাও নাকি তাই করেন—নদীর মুল অনুসন্ধান করিতে গিয়া নাকি তাঁহারা বিস্তর পাহাড় পর্বত অতিক্রম করেন।

দেশে যখন ধনদৌলত পর্যাপ্ত ছিল তখন বহু লোক তীর্থ করতে যাইতেন এবং বহু পণ্ডিতের এই ধারণা যে তাবৎ উত্তর ভারতে রেলগাড়ি প্রচলিত হইবার পূর্বেও যে ভাঙা-ভাঙা হিন্দি দিয়া কাজ চালানো যাইত তাহার কারণ যাত্রীদের তীর্থ পরিক্রমা। দেবীর ব্রহ্মরন্ধ্র পীঠ বেলুচিস্থানের হিঙ্গুলা হইতে বামজঙ্ঘা পীঠ শ্রীহট্ট পর্যন্ত বহু বহু যাত্রী বহু যুগ ধরিয়া গমনাগমন করিয়াছেন, বহু ভাষার বহু শব্দের আদান-প্রদান সংমিশ্রণের ফলে পণ্ডিতজন নিন্দিত একটি 'চলতি' ভাষা যুগ যুগ ধরিয়া রূপ পরিবর্তন করিয়া অধুনা হিন্দুস্থানী নামে পরিচিত। সে যাহাই হোক, এই অবদানের স্মরণে তীর্থযাত্রীদের প্রশংসা করিবার সদুদ্দেশ্য লইয়া বক্ষ্যমাণ আলোচনা নিবেদন করিতেছি না।

তীর্থে পুণ্যসঞ্চয় হইত কিনা সে তর্ক অধুনা নিষ্ফল, কিন্তু এ বিষয়ে তো বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, জ্ঞান সঞ্চয় হইত, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইত, সংকীর্ণতা হ্রাস পাইত এবং নানা বর্ণ, নানা জাতি, নানা আচার ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করিয়াও যাত্রী হৃদয়ঙ্গম করিত ভারতবর্ষের অখণ্ড রূপ। আবার বলি, নানা পার্থক্য নানা বৈষম্যের গন্ধধূপধূম্রের পশ্চাতে ভারতমাতার সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি প্রস্ফুটিত হইত। গ্রামের বৈচিত্র্যহীন সমাজে ফিরিয়া আসিয়াও তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিত সেই সুস্পষ্ট আলেখ্য।

শিক্ষার এক মূল অঙ্গ ছিল তীর্থভ্রমণ, দেশভ্রমণ বলিলে একই কথা বলা হয়।

প্রশ্ন এই, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তো অজস্র ডিগ্রি প্রতি বৎসর অকৃপণ-ভাবে বর্ষণ করেন, কিন্তু কখনো তো বিদ্যার্থীকে বার্ষিক পরিক্রমার সময় জিজ্ঞাসা করেন না, 'তুমি দেশভ্রমণ করিয়াছ, ভারতবর্ষের অখণ্ড রূপ হৃদয়ে আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছ ?'

বোধ হয় করা হয় না, তাই যখন সাধারণ বাঙালী গ্রাজুয়েট লিলুয়ার টিকিট কাটে তখন বলিয়া বেড়ায়, 'ভাই, কি আর করি, হাওয়া বদলাইতেই হয়, পশ্চিম চলিলাম।'

অসহিষ্ণু পাঠক বলিবেন, 'কী বিপদ! বিশ্ববিদ্যালয় কি বুকিং আপিস যে তুমি বাতায়নস্থ হইলেই তোমাকে সস্তায় বিদেশে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন?'

নাই বা দিলেন, কিন্তু এমন বন্দোবস্ত কি সম্পূর্ণ অসম্ভব যে, বাঙালীছেলে ছয় মাস এলাহাবাদে পড়িল, আরো ছয় মাস লাহোরে এবং সর্বশেষ তিন বৎসর কলিকাতায়? নিন্দুকে বলে যে, কলেজের ছেলেরা নাকি প্রায় দুই বৎসর গায়ে ফুঁ দিয়া বেড়ায়, শেষের চারি মাস, তিন মাস, অবস্থাভেদে দুই মাস নোট মুখস্থ করিয়া পাস দেয়। তবেই জিজ্ঞাসা, চারি বৎসরের এক বৎসর অথবা এম. এ. পাসের জন্য ছয় অথবা সাত বৎসরের দুই অথবা তিন বৎসর যদি কোনো ছেলে প্রদেশে প্রদেশে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয়ার্থে (সে শতকরা এক শত নাই হউক) তীর্থভ্রমণ অর্থাৎ এই কলেজ সেই কলেজ করে, তবে কি পাপ হয়?

এমন কি একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও নাই যেখানে তাবৎ ভারতের ছেলে অধ্যয়ন করিতে সমবেত হয়, একে অন্যকে চিনিতে পারে? (কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ও আলীগড়ে ঈষৎ হয়, কিন্তু নানা কারণে এস্থলে তাহার আলোচনা আজ আর করিব না) অথচ সংস্কৃত পড়িবার জন্য ভারতবর্ষের সর্ব-প্রদেশের ছাত্র কাশীর চতুষ্পাঠীতে সমবেত হয়, মুসলমান ছাত্র দেওবন্দ যায়। (বিশ্বভারতীর কথা তুলিলাম না, কারণ সরকারী ছাপ লইতে হইলে সেখানকার ছাত্রকে এখনো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খিড়কি দরজা দিয়া ঢুকিতে হয়)।

অবিশ্বাসী পাঠক বলিবেন, "কথাটা মন্দ শুনাইতেছে না, তবে ঠিক সাহস পাইতেছি না। অন্য কোনো দেশে কি এ ব্যবস্থা আছে?" 'হোমে'র অর্থাৎ সদাশয় সরকারের দেশের কথা বলিতে পারি না এবং তাহাতে কোনো ক্ষতি নাই, কারণ শুনিয়াছি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সৃষ্টি স্থিতি নাকি ইটন্ হ্যারোর ক্রীড়া-ভূমিতে। তাই যদি হয়, তবে দেব পতঞ্জলির ভাষায় বলি, "হেয়ং দুঃখ-মনাগতম্'। স্বরাজ পাইয়া বিদেশে অপ্রতিহতভাবে দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিবার কুমতি ভারতের যেন কদাচ না হয়; তাহাতে পরিণামে যে দুঃখ পাইতে হইবে তাহা পূর্ব হইতেই বর্জনীয়।

কিন্তু ফ্রান্সে আছে, জর্মনীতে আছে, সুইটজারল্যাণ্ডে আছে, অস্ট্রিয়ায় আছে, তাবৎ বলকানে আছে, অথবা ১৯৩৯ পর্যন্ত ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলকান রাজ্য হইতে প্রতি বৎসর শত শত ছাত্র বার্লিন, ভিয়েনা, প্যারিস, জিনিভা যাইত, বৎসর দুই বৎসর নানা কলেজ নানা দেশ ঘুরিয়া পুনরায় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া গিয়া বাড়ির বিশ্ববিদ্যালয়ে পাস দিত, বিদেশের 'টার্ম' স্বদেশে গোনা হইত, আর দেশের অভ্যন্তরস্থ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তো কথাই নাই। এমন জর্মন ছেলে কস্মিনকালেও খুঁজিয়া পাইবেন না যে ঝাড়া পাঁচ বৎসর

একই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার্জন করিয়া পদবী লইয়াছে। হয়ত উত্তরায়ণ কাটাইয়াছে রাইনল্যান্ড, কলোনে অথবা হাইডেলবের্গে—দক্ষিণায়ন কীল অথবা হমবুর্গে, তার পরের বৎসর মুনিকে ও সর্বশেষ দুই বৎসর স্বপুরী ক্যোনিগসবের্গে। শুধু তাহাই নহে। দেশের এক প্রান্তের ছাত্র যাহাতে অন্য প্রান্তে যায় তাহার জন্য রেল কোম্পানি তাহাকে সিকি ভাড়ায় লইয়া যাইতে বাধ্য। ছুটির সময় যখন বাড়ি যাইবে, ফিরিয়া আসিবে তাহার জন্যও সিকি ভাড়া।

কিন্তু আমি অরণ্যে রোদন করিতেছি। কারণ, স্মরণ, আছে, শান্তি-নিকেতনের নূন-কলেজেট হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পাস করা একটি গুজরাতী ছেলের বাসনা হয় এম. এ. বোম্বাই হইতে দিবে। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় আবেদন নামঞ্জুর করিলেন, কারণ সে কলিকাতার নন্‌কলেজেট। কর্তাদের বুঝাইবার বিস্তর প্রয়াস করিলাম যে কবিগুরু প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠের নন্‌-কলেজেট বহু কলেজেটের অপেক্ষা শ্রেয়, অন্তত বিশ্বভারতী কলেজ অনেক মার্কামারা সফরীপ্রোষ্ঠী কলেজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অধ্যাপকমণ্ডলী ধারণ করে, কিন্তু অরণ্যে রোদন।

ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে কি অপূর্ব বিশ্বপ্রেম, সহযোগিতা!

কোন গুণ নেই তার—

বেহারীভাইয়ারা (সদর্থে) বাংলা ভাষা এবং বাঙালীর উপর খড়্গহস্ত হয়েছেন শুনে বহু বাঙালী বিচলিত হয়েছেন। বাঙালীর প্রতি অন্যান্য প্রদেশের মনোভাব যদি বাঙালীরা সবিস্তর জানতে পান তবে আরো বিচলিত হবেন—কিন্তু সৌভাগ্য বলুন আর দুর্ভাগ্যই বলুন, বাংলা দেশের লোক মারাঠী-গুজরাতী ভাষা নিয়ে অত্যধিক ঘাঁটাঘাঁটি করে না বলেই ও সব ভাষায় আমাদের সম্বন্ধে কি বলা হয় না হয় সে সম্বন্ধে কোনো খবর পায় না। তাবৎ মারাঠী-হিন্দী-গুজরাতী আমাদের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করেন এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু উত্তর-ভারতবর্ষের সর্বত্রই যে ঈষৎ বাঙালী-বিদ্বেষ বর্তমান আছে সে কথা অস্বীকার করবার যো নেই।

কিন্তু বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। তবে বংলা ভাষা তথা বাঙালী বৈদগ্ধ্য সম্বন্ধে অন্যান্য প্রদেশ কেন যে ঈর্ষাপরায়ণ সে তত্ত্বের অনুসন্ধান করিলে আমারা তাদের অনেকখানি ক্ষমা করতে পারব। ক্ষমা মহতের লক্ষণ তো বটেই, তদুপরি আমরা যখন সর্বপ্রদেশের মধ্যে প্রীতি এবং সৌহার্দ্য কামনা করি, তখন এ বিষয়ে আমাদেরই সকলের চেয়ে বেশী সচেতন হওয়া উচিত। আপন প্রদেশ সম্বন্ধে আমারই যেমন সর্বপ্রথম গর্ব অনুভব করে 'সপ্তকোটি কণ্ঠে' উল্লাসধ্বনি করে উঠেছিলুম, ঠিক তেমনি আমরাই সর্বপ্রথম ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতা বর্জন করে পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গের ভিতর দিয়ে ভারতভাগ্যবিধাতার রূপ দেখতে চেয়েছিলুম। আজ না হয় বাংলাদেশ সর্বজনমান্য নেতার অভাবে

অনাদৃত, আজ না হয় কেন্দ্রে আমরা চক্রবর্তী নেই, তাই বলে বাংলা দেশ আরো বহুকাল যে এরকম ধারা সর্বযজ্ঞশালার প্রান্তভূমিতে অনাদৃত থাকবে ও কথা বিশ্বাস করার চেয়ে আত্মহত্যা বহুগুণে শ্লাঘানীয়। তাই প্রাদেশিক ক্ষুদ্রতা দূর করার কর্তব্য আমাদেরই স্কন্ধে।

অবাঙালীরা যে বাঙালীর দিকে বক্রদৃষ্টিতে তাকান তার প্রধান কারণ এই নয় যে বাঙালী যেখানে যায় সেখানকার হনুমানজী, রণছোড়জী, (আসলে ঋণ ছোড়জী অর্থাৎ যিনি মানুষকে সর্বপ্রকার ঋণমুক্ত করিতে সাহায্য করেন) বা অম্বামাতার সেবা না করে কালীবাড়ি স্থাপনা করে কিংবা বিদ্যার্জন করবার জন্য গণপতিকে পুজো না করে সরস্বতীকে আহ্বান করে—কারণ সকলেই জানেন এ বাবদে তাবৎ ভারতবাসী একই গড্ডালিকার তাঁবেতে পড়েন। খুলে বলি।

বেদের ইন্দ্র, বরুণ, যম, প্রজাপতিকে দৈনন্দিন ধর্মজীবন থেকে বাদ দিয়ে শুধু বাঙালীই যে ব্রাত্য হয়ে গিয়েছে তা নয়, ভারতবর্ষের কোনখানেই এদের জন্য আজ আর কোনো মন্দির নির্মিত হয় না। শিব আর বিষ্ণু কি করে যে এঁদের জায়গা দখল করে নিলেন সে আলোচনা উপস্থিত নিষ্প্রয়োজন—অথচ বেদে এদের অনুসন্ধান করতে হয় মাইক্রোস্কোপ দিয়ে—এমন কি বাঙালী যেমন সামাজিক ধর্মচর্চায় মা কালীকে ডাকাডাকি করে, উত্তর-ভারতে তেমনি হনুমানজী, গুজরাতে রণছোড়জী, মহারাষ্ট্রে অম্বামাতা।

বেদনাটা সেখানে নয়। বাঙালীর পয়লা নম্বরের 'দোষ' সে মাছ-মাংস খায়। কি উত্তর, কি দক্ষিণ—সর্বত্রই ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা মাছ-মাংস খান না এবং উভয় বস্তুর খাদককে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। মহারাষ্ট্রের সারস্বত ব্রাহ্মণগণ মাছ খান (এঁদের এক শাখার নাম গৌড়ীয় সারস্বত ও কিম্বদন্তী এই যে, তাঁরা আসলে বাঙালী), তাই সেখানকার চিৎপাবন, দেশস্থ এবং করাড় ব্রাহ্মণগণ সারস্বতদের অবজ্ঞার চোখে দেখেন—যেন মাছ খেয়ে সারস্বত ব্রাহ্মণরা হিন্দু-সমাজ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছেন! এই মাছ খওয়াটা দোষ না গুণ সে আলোচনা পণ্ডিত এবং বৈদ্যরাজ করবেন; উপস্থিত আমার বক্তব্য এই যে, মাছ-মাংস খায় বলেই বঙালী সনাতন হিন্দুধর্মের কাছাকাছি থাকতে পেরেছে। নিরামিষে আসক্তি জৈন ধর্মের লক্ষণ—কারণ বৌদ্ধ গৃহীরা পর্যন্ত মাছ-মাংস খান এবং নিমন্ত্রিত শ্রমণও উভয় বস্তু প্রত্যাখ্যান করেন না। জৈনদের প্রতি আমাদের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই ও 'হস্তিনাং তাড্যমানপি ন গচ্ছেৎ জৈন মন্দিরম্' উপদেশটি অবাঙালীই দিয়েছেন। রাজপুতরা মাছ-মাংস খান, তাই বোধ করি মীরাবাঈ গেয়েছেন—

ফলমূল খেয়ে হরি যদি মেলে
তবে হরি হরিণের।

কাজেই মাছ-মাংস খাওয়ার জন্যে যদি বাঙালী অন্যান্য প্রদেশের বিরাগ-ভাজন হয় তাতে শোক করবার কিছুই নেই। তার অর্থ শুধু এই যে বাঙালী ভারত-ব্যাপী জৈন্য প্রভাবের ফলে সনাতন ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় নি।

আমাদের দুই নম্বরের দোষ আমার পরীক্ষা, আত্মা ইত্যাদি শব্দ সংস্কৃত

কায়দায় পরীক্ষা আত্মা উচ্চারণ করি না। সংস্কৃত ভাষা পড়বার সময় এ সব শব্দ কি ভাবে উচ্চারণ করতে হবে সে আলোচনা পরে হবে, উপস্থিত দ্রষ্টব্য আমরা কেন বাঙলায় এ সব শব্দ বাঙলা কায়দায় উচ্চারণ করি।

এর উত্তরে প্রথমেই বলতে হয়, হিন্দী-গুজরাতী-মারাঠীরাও করেন। সাধারণ হিন্দী বলার সময় সবাই ক্ষত্রিয়কে শত্রিয় বলেন, লক্ষ্মণঝোলাকে লছমনঝোলাই বলে থাকেন। অর্থাৎ যে ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে বাঙলা দেশ থেকে সংস্কৃত উচ্চারণ লোপ পায়, সেই ধ্বনিপরিবর্তন অন্যান্য প্রদেশেও ঘটেছিল—যার ফলে লক্ষ্মণ লছমন হয়ে যান। পরবর্তী যুগে দেশজ হিন্দী, বাঙলা, গুজরাতীর উপর যখন সংস্কৃত তার আধিপত্য চালাতে গেল তখন আর সব প্রদেশ সে আধিপত্য মেনে নিল, কিন্তু বাঙলা স্বীকার করল না। বাঙালী তখন সেই ধ্বনিপরিবর্তনের আইন মেনে নিয়ে সংস্কৃত শব্দও বাঙলা কায়দায় উচ্চারণ করতে লাগল। এস্থলে বাঙালী পৃথিবীর আর সব জাত যা করেছে, তাই করল—ইংরেজ, ফরাসী অথবা জর্মন যখন তার ভাষাতে গ্রীক বা লাতিন শব্দ উচ্চারণ করে তখন সেগুলো আপন আপন ভাষার ধ্বনিপরিবর্তন দিয়েই করে, এমন কি গোটা বাক্যও আপন কায়দায় উচ্চারণ করে (ইংরেজ এবং ভারতীয় আইনজ্ঞেরা nisi শব্দকে লাতিন নিসি উচ্চারণ না করে নাইসাই করেন, a priori-কে আ প্রিয়োরি না বলে এ প্রায়োরাই বলেন)। হিন্দী গুজরাতী মারাঠী ইত্যাদি ভাষা সাধারণ শব্দের ধ্বনিপরিবর্তন মেনে নিয়েছে (এমন কি মারাঠীরা জ্ঞানেশ্বরকে দানেশ্বর বলেন!) কিন্তু অপেক্ষাকৃত অচলিত সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত পদ্ধতিতে উচ্চারণ করে।

অর্থাৎ আমরা consistent এবং অন্যান্য প্রদেশ এ নীতিটা মানেন না।

অবাঙালীরা তাই ভাবেন আমরা সংস্কৃত উচ্চারণ 'বিকৃত' করে তার উপর 'অত্যাচার' করেছি।

কিন্তু ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, বাংলা খুব তাড়াতাড়ি স্বাধীন হতে পেরেছে। আজ যে বাঙলা সাহিত্য হিন্দী, মারাঠী বা গুজরাতীকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পেরেছে, তার অন্যতম প্রধান কারণ আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছি। একবার ভেবে দেখলেই হয় আমরা যদি আজও বিদ্যাসাগরী বাঙলা লিখতুম তাহলে 'মেজদিদি', 'বিন্দু', 'জ্যাঠাইমা' চরিত্র আঁকা অসম্ভবপর হত কি-না? ইংরেজের অত্যাচার-জর্জরিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে প্রশ্ন করলেন, 'এই ভূতের খাজনা দেবো কিসে?' উত্তরে বললেন, 'শ্মশান থেকে মশান থেকে, ঝোড়ো হাওয়ায় হা হা করে উত্তর আসে, আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।' এ উত্তর কি বিদ্যাসাগরী বাঙলায় কখনো রূপ পেত?

ভাষা এবং সাহিত্য সৃষ্টিতে আমাদের স্বাধীন হবার প্রচেষ্টা দম্ভপ্রসূত নয়, সংস্কৃতের প্রতি অবজ্ঞাজনিত নয়। ধর্ম জানেন, ভট্টপল্লী, নবদ্বীপ তথা বাঙলা দেশে সংস্কৃত চর্চা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়, কিন্তু বাঙলা বাঙলা এবং সংস্কৃত সংস্কৃত। বাঙলা ভাষা যখন আপন নিজস্বতা

খুঁজছিল তখন সে জানত না যে ইংরিজী ফরাসী জর্মন একদা লাতিনের দাস্যবৃত্তি থেকে মুক্তিলাভ করেই যশস্বিনী হয়েছে। বাঙলার এই প্রচেষ্টা ভগবানের দান এবং এই প্রচেষ্টার ফল-স্বরূপ জন্মেছিলেন বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এখনও বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন নি। প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন মহত্তর রবীন্দ্রনাথ, বিরাটতম বঙ্কিম পান ; কিন্তু ততদিন যদি আমরা এঁদের নিয়ে গর্ব না করি তবে আমাদের নিমক-হারামির অন্ত থাকবে না।

* * *

অবাঙালীরা যখন বাঙালীর প্রতি বিরক্ত হন তখন তাদের মুখে অনেক সময়ই শুনতে পাওয়া যায়, তোমরা বাঙালীরা আর কিছু পারো না পারো একটা জিনিসে তোমরা যে ওস্তাদ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—তোমাদের কেউ যদি সামান্য একটুখানি কিছু করতে পারে, তবে তাই নিয়ে তোমরা এত লাফালাফি মাতামাতি, সোজা ইংরিজীতে তাকে এত 'বুসট' করো যে অবাঙালী পর্যন্ত সেই প্রোপাগাণ্ডার ঠ্যালায় শেষটায় মেনে নেয় যে, যাকে নিয়ে কথা হচ্ছে সে লোকটা সত্যি জব্বর কিছু একটা করেছে বটে। এই যেমন তোমাদের রবীন্দ্রনাথ।

বাঙালী মাত্রেই এরকম ধারা কথা শুনলে পঞ্চাশ গোনবার উপদেশটা যে নিতান্ত অর্বাচীনের ফতোয়া সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হয়ে অবাঙালীকে বেশ দু কথা শুনিয়ে দেয় এবং আমিও স্বীকার করি যে শোনাবার হক তার তখন আলবত আছে।

আমি শোনাই না, কারণ আমি জানি অবাঙালী বেচারী পড়েছে মাত্র গীতাঞ্জলি, গার্ডেনার এবং চিত্রাঙ্গদার অনুবাদ। হয়তো আরও দু-একখানা পড়েছে কিন্তু তবু আমি বিশ্বাস করি যে, ইংরেজী যার মাতৃভাষা নয় তার পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন যে এগুলোর মধ্যে এমন কি কবিত্ব, এমন কি তত্ত্ব আছে, যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি খেতাব দিয়ে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করা যায়। ইয়েট্‌স্ সাহেব যখন গীতাঞ্জলিকে প্রশংসা করে সপ্তম স্বর্গে তোলেন তখন তার একটা অর্থ করা যায় ঃ—রবীন্দ্রনাথের ইংরিজীতে হয়তো এমন কোনো অদ্ভুত গীতিরস লুকোনো আছে যার স্বাদ পেয়ে ইংরিজীভাষী ইয়েট্‌স্ প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন কিন্তু আমার মত বাঙালী অতটা উচ্চাঙ্গ ইংরিজী জানে না এবং আর পাঁচজন অবাঙালী যদি আমারই মত হয় তাতে আমার রাগ করার কি আছে ?

সাধারণ বাঙালী যখন অবাঙালীর এই 'নীচ' আক্রমণে মার মার করে তেড়ে যায় তখন সে ধরে নিয়েছে যে অবাঙালী রবীন্দ্রনাথের উত্তম উত্তম কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েও নিছক টিটেমি করে বাঙালীর নিন্দে করছে। কাজেই ঝগড়াটা শুরু হয় ভুল-বোঝা নিয়ে। কিন্তু একবার ঝগড়া শুরু হয়ে গেলে কাদামাটি ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে দু-চারটে পাথরও ছোঁড়া হয়, তখন মানুষ জানা অজানাতে অন্যায় কথাও বলে ফেলে। তর্কের ঝোঁকে তখন অবাঙালী আমাদের অন্যান্য

মহাপুরুষও যে কেবলমাত্র বিজ্ঞাপনের জোরেই খ্যাতনামা হয়েছেন সে কথা বলতেও কসুর করে না।

আমি বাঙালী কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তাই কি করে বুক ঠুকে বলি বলুন যে, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষের বিজ্ঞাপন দেবার প্রয়োজন আমরা কখনো অনুভব করি নি। এঁরা বাঙালীর ধর্মজগতের গুরুর আসন গ্রহণ করে বাঙালী জাতটাকে গড়ে তুলেছেন। এ সত্যটা জানি এবং হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠী, উর্দু নিয়ে চর্চা করছি বলে এ তথ্যটাও জানি যে ভগবান বোধ হয় বাঙালীকে নিতান্ত নিষ্কর্মা জেনেই দয়া করে একমাত্র তাকেই অকৃপণ হস্তে এতগুলি ধর্মগুরু দিয়ে ফেলার পর হুঁশিয়ার হয়ে অন্য প্রদেশগুলোর উপর কঞ্জুসি চালিয়েছেন।

আজকাল অবশ্যি ধর্ম রায়বাহাদুর খেতাব নিয়ে কি বাঙলা, কি বোম্বাই, কি দিল্লী সর্বত্রই পেনশন টানছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য বিবেকানন্দ এবং দূর শিষ্য সুভাষচন্দ্র এবং দেবেন্দ্রনাথের শিষ্য রবীন্দ্রনাথ এই বাঙালীর জাতীয়তাবোধ কতখানি জাগ্রত করে দিয়ে গেছেন, সে কথা আঘরাই এখনো ভালো করে বুঝে উঠতে পারি নি—বিজ্ঞাপন দেবে কে, বুসট্ আপ করবার গরজ কার? হা ধর্ম!

রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন আমাদের অচলায়তনের অন্ধ প্রাচীরে অনেকগুলো জানলা তৈরী করে দিয়েছেন—তারি ভিতর দিয়ে আমরা পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞানের সন্ধান পেলুম। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও জনগণের সঙ্গে সে ঐতিহ্যের যোগসূত্র সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে দিয়ে গেলেন। তাই এক দিক দিয়ে আমরা যেমন বাইরের জিনিস নিতে শিখলুম অন্য দিক দিয়ে ঠিক তেমনি আপন জিনিসকে অবহেলা না করে আপন সংস্কৃতি সভ্যতা গড়ে তুললুম।

সব চেয়ে স্বপ্রকাশ হয়েছে এই তত্ত্বটি আমাদের সাহিত্যে। মাইকেল খ্রীস্টান, নজরুল মুসলমান এবং প্রমথ চৌধুরীকে ফরাসী বললে কিছুমাত্র ভুল বলা হয় না। অথচ তিনজনই বাঙালী এবং তাঁরা যে সাহিত্য গড়ে তুলেছেন সেটি বাংলা সাহিত্য। কিন্তু এঁরাই শুধু নন, আর যে পাঁচজন বাঙালী সাহিত্য গড়ে তুলেছেন তাঁদের সকলেই জানা অজানাতে আমাদের ধর্মগুরুদের উপদেশ সাহিত্য-ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের দরদী ঘরোয়া সাহিত্যের পশ্চাতে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের সরলতা, রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার পিছনে রয়েছে রামমোহনের বিদগ্ধ মনোবৃত্তি।

বহু আকস্মিক ঘটনা, বহু যোগাযোগের ফলে বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে। ইংরিজী তথা ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্যকলার চর্চা প্রধানত হয়েছিল কলকাতা এবং মাদ্রাজে। কিন্তু তামিল-ভাষাভাষীদের মধ্যে যাঁরা এসব দিকে আকৃষ্ট হলেন তাঁরা মাতৃভাষার সেবা করলেন না। ফলে তাঁরা বাঙালীর চেয়ে ভালো ইংরিজী শিখলেন বটে—যদিও সে ইংরিজী সাহিত্যে স্থান পাবার উপযুক্ত হল না—কিন্তু তামিল ভাষা সমৃদ্ধ হতে পারল না। মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের

লোকমান্য টিলক (কথাটা তিলক নয়) এবং স্বামী দয়ানন্দ জন্মালেন বটে কিন্তু সে সব প্রদেশে ইউরোপীয় সাহিত্য প্রচেষ্টার যথেষ্ট প্রসার হল না বলে মারাঠী, গুজরাতী সাহিত্য আজও বাঙলার অনেক পিছনে।

অবজ্ঞাপ্রসূত প্রাদেশিক বিদ্বেষ তাহলে ঘুচবে কবে? যেদিন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অন্য প্রদেশের ভাষা শেখবার ব্যাপক ব্যবস্থা হবে সেদিন থেকে। ইংরেজ এ ব্যবস্থা করবার কোনো প্রয়োজন বোধ করে নি—তার কারণটাও অনায়াসে বোঝা যায়—কিন্তু আমাদের বেশ ভালো করে মেনে নেওয়া উচিত, সর্বপ্রদেশের সর্বপ্রচেষ্টার সঙ্গে যদি আমাদের বহু ছাত্রছাত্রী বহু প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে সংযুক্ত না হয়, তবে অবজ্ঞাপ্রসূত এ সব বিদ্বেষ কস্মিনকালেও যাবে না, এবং কেবলমাত্র রাষ্ট্রভাষা শিখলেই সব সমস্যার সমাধান হবে না।

প্রত্যেক ছাত্রই যে বারোটা প্রাদেশিক ভাষা শিখবে এ প্রস্তাব কেউ করবে না, মানবেও না। ব্যবস্থাটা হবে এই যে, বহু ছাত্র মারাঠী, বহু ছাত্র গুজরাতী, অন্যেরা তামিল অথবা কানাড়া অথবা অন্য কোনো প্রাদেশিক ভাষা শিখবে, তারা ঐসব ভাষা থেকে উত্তম উত্তম পুস্তক বাঙলায় অনুবাদ করবে, ঠিক সেইরকম বাঙলা বইও নানা ভাষায় অনূদিত হবে। ফলে এক প্রদেশ অন্য প্রদেশের সাহিত্য চিনতে শিখবে এবং তারপরেও যদি বিদ্বেষ থেকে যায় তবে তার জন্য অন্ততঃ আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতিকে দোষ দেওয়া যাবে না।

কালো মেয়ে

কত করুণ দৃশ্য, কত হৃদয়বিদারক ঘটনা দেখি প্রতিদিন—সত্য বলতে কি, তাই রাস্তায় বেরুতে ইচ্ছে করে না—কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করেন, সব চেয়ে মর্মন্তুদ আমার কাছে কি লেগেছে, তবে বলব, আমাদের পাড়ার কালো মেয়েটি।

সকালবেলা কখন বেরিয়ে যায় জানি নে। সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফেরে—আমি তখন রকে বসে চা খাচ্ছি। মাথা নিচু করে, ক্লান্ত শ্লথগতিতে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে চলে যায়। আজ পর্যন্ত আমাদের রকের দিকে একবারও ঘাড় তুলে তাকায় নি—আমার মনে হয়, এ জীবনে কোনোদিনই সে কোনো দিকে তাকিয়ে দেখে নি।

দেবতা ওকে দয়া করেন নি। রঙ কালো এবং সে কালোতে কোনো জৌলুস নেই—কেমন যেন ছাতা-ধরা-মসনে-পড়া ছাবড়া-ছাবড়া। গলার হাড় দুটি বেরিয়ে গিয়ে গভীর দুটো গর্ত করেছে, গায়ের কোথাও যেন একরত্তি মাংস নেই, গাল ভাঙা, হাত দুখানা শরের কাঠি, পায়ে ছেঁড়া চপ্পল, চুলে কতদিন হল তেল পড়ে নি কে জানে। আর সমস্ত মুখে যে কী বিষাদ আর ক্লান্তি তার বর্ণনা দেবার মত ভাষা আমার নেই। শুধু জানি—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—দিনের পর দিন তার মুখের বিষাদ আর ক্লান্তি বেড়েই চলেছে। আরো জানি, একদিন তাকে আর দেখতে পাবো না। শুনবো, যক্ষ্মা কিংবা

অন্য কোনো শক্ত ব্যামোয় পড়েছে, কিংবা মরে গিয়েছে।

শুনলুম, মাস্টারনীগিরি করে বিধবা মা আর ছোট ভাইকে পোষে। তার নাকি পয়সাওলা এক দাদাও আছে—সে থাকে অন্যত্র বউ নিয়ে, এদের দিকে তাকায় না।

বাপ দাদা করেছিলেন তাই আমিও ভগবানে বিশ্বাস করি গতানুগতিকতাবে, কিন্তু যদি এ মেয়ের কোনদিন বর জোটে তবেই ভগবানে আমার সত্যকার বিশ্বাস হবে।

জানি, জানি, জানি, এর চেয়েও অনেক বেশি নিদারুণ জিনিস সংসারে আছে, কলকাতাতেই আছে। কিন্তু আমি পাড়াগেঁয়ে ছেলে, মেয়েছেলে নিষ্ঠুর সংসারে লড়াই করে অপমান-আঘাত সহ্য করে টাকা রোজগার করে, এ জিনিস দেখা আমার অভ্যাস নেই, কখনো হবে না। গাঁয়ের মেয়েও খাটে—আমার মাও কম খাটতেন না—কিন্তু তার খাটুনি তো বাড়ির ভিতরে। সেখানেও মান-অপমান দুঃখ-কষ্ট আছে স্বীকার করি,—কিন্তু এই যে পাড়ার কালো মেয়েটি যে সকাল হতে না হতেই নাকে-মুখে দুটি গুঁজে, এর কনুই, ওর হাঁটুর ধাক্কা খেয়ে ট্রামে-বাসে উঠছে, দুপুর বেলা কিছু খাবার জুটবে না, জুটবে হয়তো হেড মিসট্রেসের নির্মম ব্যবহার, ছাত্রীদের অবজ্ঞা অবহেলা—হয়তো তার শ্রীহীনতা নিয়ে দু-একটা হৃদয়হীন মন্তব্যও তাকে শুনতে হয়। ক্লাস শেষ হলে সে খাতা দেখতে আরম্ভ করবে, সন্ধ্যার আবছায়ায় যখন ক্ষুদে লেখা পড়বার চেষ্টায় গর্তে-ঢোকা চোখ দুটো ফেটে পড়বার উপক্রম করবে তখন উঠবে বাড়ি ফেরার জন্য। আজ হয়তো বাসের পয়সা নেই, বাড়ি ফিরতে হবে হেঁটে হেঁটে। ক মাইলের ধাক্কা আমি জানি নে।

কিন্তু জানি, আমি যে গ্রামে জন্মেছি, সেখানে এককালে সব মেয়েরই বর জুটত। ভালো হোক, মন্দ হোক, জুটত এবং ছোট হোক, বড় হোক কোনো না কোনো সংসারে গিয়ে সে আশ্রয় পেত।

আজ আর সেদিন নেই। মধ্যবিত্ত পরিবারের কটি ছেলে আজ পয়সা কামাতে পারে যে বিয়ে করবে? এককালে গ্রামে সকলেরই দুমুঠো অন্ন জুটত—তা সে গতর খাটিয়ে, চাকরি করেই হোক, আর না করেই হোক—তাই শেষ পর্যন্ত শ্রীহীনা মেয়েরও বর জুটত। আজ যে দু-চারটি ছেলে পয়সা কামাবার সুযোগ পায়, তার কনের বাজারে ঢুকে বেছে নেয় ডানাকাটা পরীদের। সাধারণ মেয়েরাও হয়ত বর পায়, শুধু শেষ পর্যন্ত পড়ে থাকে আমাদের পাড়ার মাস্টারনী আর তারই মত মলিনারা।

এ সমস্যা যে শুধু আমাদের দেশেই দেখা দিয়েছে তা নয়। বেকার-সমস্যা যেখানে থাকবে সেখানেই ছেলেরা বিয়ে করতে নারাজ। মেয়েরাও বুঝতে পারে, বর পাবার সম্ভাবনা তাদের জীবনে কম, তাই তারাও কাজের জন্য তৈরী হয়—বাপ-মা তো একদিন মারা যাবেন, দাদারা তাকে পুষতে যাবে কেন? এই একান্ন পরিবারের দেশেই দাদারা ক্রমশ সরে পড়ছে, যে দেশ কখনো একান্ন পরিবার ছিল না সেখানে অরক্ষণীয়াকে পুষবে কে? কিন্তু আর আর

দেশ আমাদের মত মারাত্মক গরিব নয় বলে টাইপিস্ট মেয়েটির পেট-ভরা অন্ন জোটে, মাস্টারনী যখন বাড়ি ফেরে তখন তার মুখে ক্লান্তি থাকলেও মাঝে মাঝে সিনেমা-থিয়েটার যাবার মত পয়সা সে কামায়ও বটে। বর জুটবে না, মা হতে পারবে না, সে দুঃখ তার আছে, কিন্তু ইয়োরোপের মেয়ের অনেকখানি স্বাধীনতা আছে বলে প্রেমের স্বাদ সে কিছুটা পায়। নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার নিন্দা বা প্রশংসা করা আমার কর্ম নয়ঃ এ দেশের মেয়েরা পরিণয়বন্ধনের বাইরে প্রেমের সন্ধানে ফিরুক, এ কথা বলাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু বলতে চাই, পশ্চিমের অরক্ষণীয়া তবু কোনো গতিকে বেঁচে থাকার আনন্দের কিছুটা অংশ পায়—আমাদের পাড়ার মেয়েটি যে এ জীবনে কোনো প্রকার অনেন্দের সন্ধান পাবে সে দুরাশা আমি স্বপ্নেও করতে পারি নে।

এ মেয়ের দুরবস্থার জন্য দায়ী কে?

আমি সোজাসুজি বলবো, আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক কর্তারা। পাঠক জানেন, এ অধম সপ্তাহের পর সপ্তাহ লিখে যাচ্ছে, কিন্তু কারো নিন্দে সে কখনো করতে যায় নি। সে চেষ্টা করেছে আপনাদের আনন্দ দিতে—তারই ফাঁকে ফাঁকে যে সপ্তাহে সে তত্ত্ব বা তথ্য পরিবেশন করবার সুযোগ পেয়েছে, সেদিন তার আনন্দের অবধি থাকে নি; এর গলদ,ওর ত্রুটি নিয়ে সে আলোচনা বা গালাগালি করে কোনো সস্তা রুচিকে সে টক ঝাল দিয়ে খুশী করতে চায় নি। কিন্তু এখন যদি না বলি যে, আমাদের কর্তারা আজ পর্যন্ত দেশের অন্ন-সমস্যা সমাধানের জন্য কিছুই করতে পারেন নি, কোনো পরিকল্পনা পর্যন্ত করতে পারেন নি, তা হলে অধর্মাচার হবে।

বেকার সমস্যা ঘোচাতে পারুন আর নাই পারুন, মধ্যবিত্তকে অন্ন দিতে পারুন আর নাই পারুন, অন্তত তাঁরা যেন তরুণ-তরুণীদের মনে একটুখানি আশার সঞ্চার করে দিতে পারেন। ভালো করে ভাত না জুটলেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে, যদি তার মনে আশা উদ্দীপ্ত করে দেওয়া যায়।

আমাদের কালো মেয়ের কোনো ভবিষ্যৎ নেই—এ কথা ভাবতে গেলে মন বিকল হয়ে যায়—কিন্তু এদের সংখ্যা বেড়েই চলবে, এ কথা ভাবলে কর্তাদের বিরুদ্ধে সর্বদেহমন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

আশাটুকুরও সঞ্চার যদি কর্তারা না করতে পারেন, তবে তাঁরা আসন ত্যাগ করে সরে পড়েন না কেন? হায়, অরক্ষণীয়ার অভিসম্পাতকেও এঁরা আর ভয় করেন না!!

ঋতালী

ইসমাইলি খোজা সম্প্রদায়ের গুরুপুত্র প্রিন্স আলী খানের সঙ্গে শ্রীমতী ঋতা (স্পেনিশ ভাষায় যখন t অক্ষরের উচ্চারণ বাংলা 'ত'য়ের মত হয় তখন r টাকে 'ঋ' বানাতে কারো বড় বেশী আপত্তি করা উচিত নয়) হেওয়ার্থের শাদী হয়েছে আর বিয়ের দাওয়াতে নাকি হাজার দেড়েক বোতল শ্যাম্পেন খাওয়া হয়েছে।

ফ্রান্সের যে অঞ্চলে শাদীটা হয়েছে সেখানে শ্যাম্পেন মাগগী নয়। তবু যে বেশ কিছু পয়সা খরচা হয়েছে, সে বিষয়ে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই ; কারণ জর্মনরা নাকি ফ্রান্সত্যাগ করার পূর্বে প্রাণ ভরে শ্যাম্পেন খেয়ে ফ্রান্সের তাবৎ শ্যাম্পেনের গুদোম উজাড় করে দিয়ে যায়। বছর সাতেক না যাওয়া পর্যন্ত ১৯৪৫ এর শ্যাম্পেন খাওয়ার মত 'পরিপক্ক' হবে না।—কাজেই আলী খান নিশ্চয়ই ৪৫এর আগেকার লুকোনো মাল গৌরীসেন পয়সা দিয়ে কিনেছেন। তা কিনুন, তাঁর পয়সার অভাব নেই। কিন্তু প্রশ্ন, মুসলমান ধর্মে যখন মদ বারণ তখন ধর্মগুরুর বড় ব্যাটা (পরে ইনিই গুরু হবেন) এ খবরটা ছাপতে দিলেন কোন্ সাহসে ?

বোম্বায়ে যখন বাস করতুম তখন আলী খানের খোজা সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল। তখন কিছুদিন তাঁদের ইতিহাস, শাস্ত্র, আচার-ব্যবহার নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলুম। সেগুলি সত্যিই বহু রহস্যে ভরা।

খোজাদের বিশ্বাস, আদমকে সৃষ্টি করার সময় আল্লা তাঁর জ্যোতির খানিকটা তাঁর শরীরে ঢেলে দেন। সে জ্যোতি আদম থেকে বংশানুক্রমে মহাপুরুষ মোসেজ (মুসা), নোয়া (নুহ), ইব্রাহাম (ইব্রাহিম), সলমন (সুলেমান), ডেভিড (দায়ুদ) হয়ে হয়ে শেষটায় মহাপুরুষ মুহম্মদের পিতামহে পৌঁছোয়। তারই এক অংশ তখন বর্তে মহম্মদে, অন্য অংশ তাঁর খুড়োর ছেলে আলীতে। আলী মুহম্মদের মেয়েকে বিয়ে করেন। তাঁর ছেলে হুসেনের শরীরে আবার সেই দ্বিখণ্ডিত জ্যোতি সংযুক্ত হয়। তারপর সেই জ্যোতি বংশানুক্রমে চলে এসেছে প্রিন্স আলী খানের পিতা আগা খানের শরীরে। তিনি মারা গেলে আলী খান সেই জ্যোতি পাবেন।

কিন্তু এই বিশ্বাসের সঙ্গে ভারতবর্ষের খোজারা আরেকটা বিশ্বাস জুড়ে দিয়েছেন। সে মত অনুসারে খোজারা বিশ্বাস করেন, বিষ্ণু নয়বার মৎস্য কূর্ম ইত্যাদি রূপে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন এবং দশমবারে কল্কিরূপে যে অবতীর্ণ হওয়ার কথা আছে, সেও খাঁটি ; কিন্তু হিন্দুরা জানে না যে কল্কি বহুদিন হল অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছেন আলীরূপে মক্কা শহরে। এবং শুধু তাই নয়, সেই কল্কি অবতারের জ্যোতি তাঁর ছেলে হুসেনে বর্তে ক্রমে ক্রমে বংশপরম্পরায় নেমে এসে উপস্থিত বিরাজ করছে আলী খানের পিতা আগা খানের শরীরে।

তাই হজরত আলী হলেন কল্কি অবতার এবং সেই কল্কির জ্যোতি আগা খানের শরীরে আছে বলে তিনিও কল্কি অবতার। তাই খোজা ধর্মগ্রন্থে আগা খানের সম্পূর্ণ নাম লেখা হয় 'দশবাঁ নকলঙ্কী অবতার আগা সুলতান মুহম্মদ শাহ'।

কিন্তু প্রশ্ন, খোজারা এই অদ্ভুত সংমিশ্রণ করল কি প্রকারে ? অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, দশম-একাদশ শতাব্দীতে ইরানের ইসমাইলি সম্প্রদায় আপন দল বাড়াবার জন্য চতুর্দিকে মিশনারি পাঠান। (আরো নানা সম্প্রদায় তখনকার দিনে ইরানের বন্দর-আব্বাস থেকে জাহাজে করে সমুদ্রতীরবর্তী সিন্ধু

প্রদেশ আর কাঠিয়াওয়াড়ে এসে আপন আপন মতবাদ প্রচার করতেন)। এই মিশনারীদের উপর কড়া হুকুম ছিল, দল বাড়াবার জন্য কারো ধর্মমত যদি খানিকটা গ্রহণ করতে হয় তাতে কোনো আপত্তি নেই—মোদ্দা কথা হচ্ছে, সংখ্যাবৃদ্ধি যে করেই হোক করতে হবে।

এই মিশনারীদের একজন এসে কাজ আরম্ভ করেন কাঠিয়াওয়াড় এবং কচ্ছের লোহানা রাজপুত সম্প্রদায়ের মধ্যে। এঁরা ছিলেন বৈষ্ণব—কিন্ত পাঞ্চরাত্র মতবাদের। এঁরা ইসমাইলি মতবাদের দিকে কেন আকৃষ্ট হলেন তার খবর পাওয়া যায় না। কিন্তু এঁরা যে এই নূতন ধর্ম গ্রহণ করার সময় বিষ্ণুর অবতারবাদটা সঙ্গে এনেছিলেন, সে কথাটা আজও খোজাদের 'জমাতখানা'তে (খোজারা অন্যান্য মুসলমানদের মসজিদে যান না, তাঁদের আপন মসজিদের নাম 'জমাতখানা' বা সম্মেলনালয়) প্রকাশ পায় তাঁদের উপাসনার সময়। সর্বপ্রথম বিষ্ণুর নয় অবতারের নাম স্মরণ করা হয় বসে বসে এবং দশম অবতার আলী এবং হিজ হাইনেস দি আগা খানের নাম আরম্ভ হতেই সবাই উঠে দাঁড়ান।

গোঁড়া খোজারা বিশ্বাস করেন, স্বর্গে ঈশ্বর নেই। তিনি শরীর ধারণ করে আছেন আগা খানরূপে।

চন্দ্র, সূর্য তাঁর আদেশে চলে, তিনিই ইচ্ছে করলে এক মুহূর্তে সর্ব সৃষ্টি ধ্বংস করতে পারেন, নূতন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও সৃষ্টি করতে পারেন।

এরকম বিশ্বাস যে বিংশ শতাব্দী—বা অন্য যে কোনো শতাব্দীতে—কেউ করতে পারে সেটা আমার ধারণার বাইরে ছিল, কিন্তু যখন স্বকর্ণে শুনলুম, তখন আর অবিশ্বাস করি কি প্রকারে?

ভারতবর্ষে সুন্নি সম্প্রদায় খোজাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে অজ্ঞ। কিন্তু ইরাণের সুন্নিরা অনেক কিছু জানেন বলে খোজা এবং তাঁদের জনক সম্প্রদায় ইসমাইলি মতবাদকে বিধর্মী বলে ফতোয়া দিয়েছেন। কোরানে যখন বিষ্ণু এবং নয় অবতারের উল্লেখ নেই, এবং যেহেতু কোরান অবতারদের বিরুদ্ধে আপন বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে তখন সুন্নি মতবাদ যে খোজা সম্প্রদায়কে বিধর্মী বলবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? খোজারা অবশ্য তা নিয়ে মাথা ঘামান না, কারণ খোজারা যদিও কোরানকে 'ভালো কেতাব' রূপে স্বীকার করেন, তবু কর্মক্ষেত্রে তাঁরা মানেন কচ্ছী এবং গুজরাতী ভাষায় লিখিত নিজস্ব 'গিনান' গ্রন্থাবলীকে। 'গিনান' শব্দ সংস্কৃত 'জ্ঞান' শব্দ থেকে বেরিয়েছে এবং এ সব গিনান লিখেছেন খোজা ধর্মগুরুরা।

খোজারা তিনবার নামাজ পড়েন, এবং রোজার মাসে মাত্র একদিন উপোস করেন। তাও বেলা বারোটা পর্যন্ত।

কিন্তু সব চেয়ে বড় তত্ত্বকথা, আগা খান এত টাকা পেলেন কোথায়? তাঁর ঠাকুর্দা তো ইরান থেকে পালিয়ে এসেছিলেন গত শতকের মাঝামাঝি। এইখানেই খোজা ধর্মের গুহ্যতত্ত্ব লুক্কায়িত।

প্রতি জামাতখানাতে একটা করে প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুক থাকে। প্রতি

অমাবস্যা পূর্ণিমায় প্রত্যেক খোজা এই সিন্দুকে আপন মুনাফা (কোনো কোনো স্থলে আমদানির) থেকে অষ্টমাংশ ফেলে দেয় এবং এই সব টাকা যায় আগা খানের তহবিলে। তা ছাড়া পালা-পরবে দান বলতে যা কিছু বোঝায় সবই ফেলা হয় এই সিন্দুকে এবং বহু খোজা মরার আগে তার তাবৎ ধনসম্পত্তি গুরু আগা খানের নামে উইল করে দিয়ে যায়। খোজা সম্প্রদায়ের কারবার ব্যবসা জগৎ জোড়া—শাঙ্গাই থেকে জিব্রাল্টার পর্যন্ত। কাজেই আগা খানের মাসিক আয় কত তার হিসাব নাকি স্বয়ং আগা খান ছাড়া কেউ জানে না।

তা জেনে আমাদের দরকারও নেই। এবং আমি জানি, এত সব তত্ত্বকথা শোনার পরও পাঠক শুধাবেন, কিন্তু যে শ্যাম্পেন নিয়ে আরম্ভ করেছিলে তার তো কোনো হিল্যে হল না। মদ যখন বারণ তখন আলী খান শ্যাম্পেন খান কি প্রকারে? তবে কি শ্যাম্পেন মদ নয়?

বিলক্ষণ! শ্যাম্পেনে আছে শতকরা প্রায় পনেরো অংশ মাদকদ্রব্য বা এলকহল। এবং যেহেতুক শ্যাম্পেন খুললেই সোডার মত বুজবুজ করে, তাই তাতে আছে ছোট ছোট বুদবুদ। সেগুলো পেটে গিয়ে খোঁচা দেয় বলে নেশা হয় চট করে এবং স্টীল ওয়াইন বা শান্ত মদের তুলনায় অনেক বেশী। তবে?

খোজারা বলেন, 'আলী খান একদিন স্বয়ং কল্কি অবতারের জ্যোতি; পাবেন বলে তিনি এখন থেকেই পূতপবিত্র। কোনো বস্তু তাঁকে অপবিত্র করতে পারে না। তাই অপবিত্র মদ তাঁর হস্তস্পর্শ লাভ করা মাত্রই পবিত্র হয়ে যায়।'

এতক্ষণ যা নিবেদন করলুম, সেগুলো দলিল দস্তাবেজ অর্থাৎ খোজাদের শাস্ত্র-গ্রন্থ থেকে প্রমাণ করা যায়, কিন্তু এবারে যেটি বলব সেটি আমার শোনা গল্প—এক নাস্তিক খোজার কাছ থেকে।

একদিন নাকি খানা খেতে খেতে পঞ্চম জর্জ আগা খানকে জিজ্ঞেস করেন, 'এ কথা কি সত্যি, ইয়োর হাইনেস, যে, আপনার চেলারা আপনাকে পুজো করে?'

আগা খান নাকি উত্তরে বলেছিলেন, 'তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে, ইয়োর ম্যাজস্টি? মানুষ কি গোরুকেও পুজো করে না?'

উত্তরটার দর আমি আর যাচাই করলুম না॥

রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও ইয়োরোপীয় সুরধারা

প্রায়ই প্রশ্ন শুনতে পাওয়া যায়, ইয়োরোপ রবীন্দ্রনাথকে কতখানি চিনতে পেরেছিল, আর আজ যে ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথের নাম কেউ বড় একটা করে না তার কারণ কি?

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বে আরেকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। সে প্রশ্ন স্বগত—আমরা, অর্থাৎ বাঙালীরাই রবীন্দ্রনাথকে কতখানি চিনি? রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা, নাট্যনির্মাণক্ষমতা, দার্শনিক চিন্তাশক্তি, সার্বভৌমিক ধর্মানুভূতি, ঔপন্যাসিক অন্তর্দৃষ্টি, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, ঐতিহ্যগত শিক্ষাদান প্রচেষ্টা, বৈয়া-

করণিক অনুসন্ধিৎসা—সব কিছু মিলিয়ে তাঁর অখণ্ডরূপ হৃদয়মনে আঁকার কথা দূরে থাক, যেখানে তিনি ভারতের তথা পৃথিবীর সব কবিকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন তারই সম্পূর্ণ পরিচয় পেয়েছেন কজন বাঙালী ?

কবিতার কথাই ধরা যাক। সেখানে দেখি কেউ কেউ 'কল্পনা' ছাড়িয়ে কবির সঙ্গে কল্পলোকে 'হংসবলাকা'র পাখা মেলতে নারাজ, কেউবা মহুয়া'তে পৌঁছে বঁধুকে 'মহুয়া' নাম ধরে ডেকেই সন্তুষ্ট, আর 'রোগশয্যায়' কবিকে সঙ্গ দিতে রাজী অতি অল্প দুঃসাহসী রসজ্ঞ। কাউকে দোষ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয় ; আমি নিজে গুরুদেবের গদ্যকবিতার রস পাই না। কাজেই আমরা সকলেই পরমানন্দে অন্ধের হস্তীদর্শন করছি—কিন্তু আমাদের চরম সান্ত্বনা, এ সংসারের অধিকাংশ অন্ধ আপন আপন যষ্টি ত্যাগ করে বৃহত্তর লোকের ক্ষীণতম আভাস পাওয়ার জন্য অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ উদ্‌গ্রীব নয়।

এ-কথাও বলা বৃথা যে রবীন্দ্র-কাব্যের সম্পূর্ণ রস পাই আর না-ই পাই, তার কাব্যজগতের মূল সুরটি আমরা ধরতে পেরেছি। মনে পড়ছে বিশ্বভারতীর সাহিত্যসভায় এক তরুণ লেখক রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাসের কাব্যে প্রধান দুটি মিল দেখিয়ে একখানা সরেস প্রবন্ধ পড়েছিলেন—বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাস উভয়েই বর্ষার ও প্রেমের কবি। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হলে সভাপতি রূপে কবিগুরু লেখাটির প্রচুর প্রশংসা করে বলেন যে, 'যদিও মিল দুটি স্বীকার্য তৎসত্ত্বেও প্রশ্ন, এই দুই বস্তু বাদ দিয়ে ভারতীয় কোন কবি কি লিখতে পারতেন ? রবীন্দ্রনাথ সালঙ্কার আপন বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন,—এতদিন পরে স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে তার প্রতিবেদন দেওয়া আমার পক্ষে 'সাহিত্যিক' সাধুতার পরিচায়ক হবে না, তবে ভাবখানা অনেকটা এই ছিল যে রাফায়েল মাদোনা এঁকেছেন, অজন্তাকারও মাতাপুত্র এঁকেছেন কিন্তু দুজনের ভিতর সত্যিকার মিল কতদূর ?

অর্থাৎ রবীন্দ্র-কাব্যের মূল সুর যদি এই শ্রেণীরই হয় তবে তার কোনো মূল্য নেই।

(এস্থলে অবান্তর হলেও একটি কথা না বললে হয়তো প্রবন্ধলেখকের প্রতি) অন্যায় করা হবে। যদিও রবীন্দ্রনাথের মতে প্রবন্ধটি স্বতঃসিদ্ধ বস্তু সপ্রমাণ করে ব্যর্থতার প্রমাণ দিয়েছিল তবু সভাস্থ আর পাঁচজন সে মত পোষণ করেন নি, এবং বিশ্বভারতীর যে কোনো ছাত্র এ রকম প্রবন্ধ লিখতে পারলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন।)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার মহত্তম এবং মধুরতম বিকাশ তাঁর গানে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলতেন যে তিনি তাঁর গানে প্রকৃতিকেও হারাতে পেরেছেন এবং সে গর্বটুকু একটি গানে অতি অল্প কথায় প্রকাশ করেছেন :

আজ এনে দিলে, হয়ত দিবে না কাল—
রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল।
এ গান আমার শ্রাবণে শ্রাবণে
তব বিস্মৃতি স্রোতের প্লাবনে

ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী
বহি তব সম্মান ॥

শুধু কদম ফুল। প্রকৃতির কত নগণ্য সৌন্দর্যবস্তু, মানুষের মত উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুদ্র দুঃখ-দৈন্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত স্পর্শমণির স্পর্শে হেমকান্ত সফল পরিপূর্ণতায় অজরামর হয়ে গিয়েছে, এবং ভবিষ্যতে,—ক্যাথলিকদের ভাষায় বলি,—ক্যাননাইজ্‌ড হয়ে যুগ যুগ ধরে বাঙালীর স্পর্শকাতর হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি আকর্ষণ করবে।

অথচ আজকের দিনে এ-কথাও সত্য সে অল্প বাঙালীই রবীন্দ্রনাথের আড়াই হাজার গানের আড়াইশ গান শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

তবে কি আমারা রবীন্দ্রনাথের কবিত্বে প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাই নি? সেকথাও সত্য নয়। আমরা এতক্ষণ বাঙলী যুধিষ্ঠিরকে শুধু তাঁর নরক দর্শন করাচ্ছিলুম এবং সেই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলুম যে বাঙালীর পক্ষেও যদি রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণরূপে চেনা এত কঠিন হয় তবে অবাঙালীর পক্ষে, বিশেষতঃ সাহেবের পক্ষে—তা তিনি ইংরেজই হোন আর জর্মনই হোন—সম্পূর্ণ অসম্ভব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ যখন ইউরোপ যান তখন তিনি বিশেষ করে জর্মনীতে রাজাধিরাজের সম্মান পান। সে সম্মানের কাহিনী বিশ্বভারতী লাইব্রেরিতে নানা ভাষায় সযত্নে রক্ষিত আছে।

তারপর রবীন্দ্রনাথ আবার জর্মান যান ১৯৩০ সালে। মারবুর্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রশস্ততম গৃহে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কি এক জয়ন্তী উপলক্ষে সমস্ত জর্মনির বিদ্বজ্জন তখন মারবুর্গে সমবেত; তাঁরা সকলেই সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজীতে ধর্ম সম্বন্ধে একটি রচনা পাঠ করেন। অধ্যাপক অটো সে বক্তৃতার জর্মন অনুবাদ করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় রচনা পাঠ শুনেছিল এবং পাঠ শেষ হলে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাধ্বনি উঠেছিল, তার তুলনা দেবার মত ভাষা আমার নেই।

সেদিন বিকেলবেলা মারবুর্গের পুস্তকবিক্রেতাদের দোকানে গিয়ে অনুসন্ধান করলুম, রবীন্দ্রনাথের কোন্ কোন্ পুস্তকের জর্মন অনুবাদ পাওয়া যায়। নির্ঘণ্ট শুনে আশ্চর্য হলুম—গীতাঞ্জলি, গার্ডেনার, চিত্রা, ডাকঘর, সাধনা এবং নেশানালিজম! মাত্র এই কখানি বই নিয়ে আর ইংরেজি ভাষায় একটি বক্তৃতা শুনে জর্মনরা এত মুগ্ধ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এবং এখনো আছে যে ইংরিজি বা জর্মনে এই কখানা বই পড়ে রবীন্দ্রনাথের আসল মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব।

তখনই আমার বিশ্বাস হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে জর্মনির এই উচ্ছ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হবে না। গীতাঞ্জলির ধর্মসঙ্গীত জর্মন মনকে চমক লাগাতে পারে, গার্ডেনারের প্রেমের কবিতাও জাদু বানাতে পারে, সাধনার রচনাও বিদ্যুৎশিখার মত ঝলকাতে পারে কিন্তু এসব দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতর এবং শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টির অনুবাদ অপরিহার্য।

কিন্তু কোনো ব্যাপক অনুবাদকার্য কেউ হাতে তুলে নেন নি। তার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে অনেক গবেষণার প্রয়োজন। উপস্থিত শুধু সব চেয়ে বড় দুঃখটা নিবেদন করি।

রবীন্দ্রনাথের গানের মত হুবহু গান জর্মনে আছে এবং সেগুলি জর্মনদের বড় প্রিয়। এগুলোকে 'লীডার' বলা হয় এবং শুধু লীডার গাইবার জন্য বহু জর্মন গায়ক প্রতি বৎসর প্যারিস, লণ্ডন যায়। এসব লীডারের কোনো কোনো গানের কথা দিয়েছেন গ্যোটের মত কবি, আর সুর দিয়েছেন বেটোফেনের মত সঙ্গীতকার।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের গানে গ্যোটে বেটোফেনের সমন্বয়। একাধারে এই দুই সৃজন পন্থার সম্মেলন হয়েছিল বলে রবীন্দ্র-সঙ্গীত জর্মন লীডারের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। অনুভূতির সূক্ষ্মতা, কল্পনার প্রসার, এবং বিশেষ করে সুর ও কথার অঙ্গাঙ্গী বিজড়িত অর্ধনারীশ্বর পৃথিবীর কোনো গান বা 'লীডার' জাতীয় সৃষ্টিতে আজ পর্যন্ত অবতীর্ণ হন নি—রবীন্দ্র-সঙ্গীতের যে রকম হয়েছে।

বাঙালীকে বাদ দিলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রকৃত মূল্য একমাত্র জর্মনিই ঠিক বুঝতে পারবে।

কোনো ব্যাপক অনুবাদ তো হ'লই না, এমনকি রবীন্দ্রনাথের গানও জর্মন কণ্ঠে গীত হ'ল না।

কাজেই 'সাত দিনের ভানুমতি' আট দিনের দিন কেটে গেল। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যেদিন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মত অনুবাদক কবি ইয়োরোপে জন্মাবেন সেদিন ইয়োরোপ,

'চিনে নেবে চিনে নেবে তারে।'॥

শ্রমণ রিয়োকোয়ান

বাস্তুবাড়ি আমূল ভস্মীভূত হওয়ার পরমুহূর্তেই ক্ষতির পরিমাণটা ঠিক কতদূর হয়েছে অনুমান করা যায় না। যেমন যেমন দিন যায়, এটা ওটা সেটার প্রয়োজন হয় তখন গৃহস্থ আস্তে আস্তে বুঝতে পারে তার ক্ষতিটা কত দিক দিয়ে তাকে পঙ্গু করে দিয়ে গিয়েছে।

ইংরেজ রাজত্বের অবসান হয়েছে। আগুন নিবেছে বলে উপস্থিত আমরা সকলেই ভারী খুশি কিন্তু ক্ষতির খতিয়ান নেবার সময়ও আসন্ন। যত শীঘ্র আমরা এ-কাজটা আরম্ভ করি ততই মঙ্গল।

ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্পের যে ক্ষতি হয়েছে সে সম্বন্ধে আমারা ইচ্ছা-অনিচ্ছায় অহরহ সচেতন হচ্ছি কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতি বৈদগ্ধ্যলোকে আমাদের যে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে তার সন্ধান নেবার প্রয়োজন এখনো আমরা ঠিক ঠিক বুঝতে পারি নি। অথচ নূতন করে সব কিছু গড়তে হলে যে আত্মবিশ্বাস, আত্মাভিমানের প্রয়োজন হয় তার মূল উৎস সংস্কৃতি এবং বৈদগ্ধ্যলোকে।

হটেন্‌টট্‌দের মত রাষ্ট্রস্থাপনা করাই যদি আমাদের আদর্শ হয় তবে আমাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির কোন প্রকার অনুসন্ধান করার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি আর পাঁচটা সর্বাঙ্গসুন্দর রাষ্ট্রের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবার বাসনা আমাদের মনে থাকে তবে সে প্রচেষ্টা 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ'।

আত্মাভিমান জাগ্রত করার অন্যতম প্রধান পন্থা, জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে সে-ও একদিন উত্তমর্ণ ছিল, ব্যাপক অর্থে সে-ও মহাজন রূপে বহু দেশে সুপরিচিত ছিল।

কোন্ দেশ কার কাছে কতটা ঋণী, সে তথ্যানুসন্ধান বড় বড় জাল পেতে আরম্ভ হয় গত শতাব্দীতে। ভৌগোলিক অন্তরায় যেমন যেমন বিজ্ঞানের সাহায্যে লঙ্ঘন করা সহজ হতে লাগল, অন্যের ইতিহাস পড়বার সুযোগও তেমনি বাড়াতে লাগল। কিন্তু সে-সময়ে আমরা সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত, ইংরেজের সম্মোহনমন্ত্রের অচৈতন্য অবস্থায় তখন সে যা বলেছে আমরা তাই বলেছি, সে যা করতে বলেছে তাই করেছি।

আমাদের কাছে কে কে ঋণী সে-কথা বলার প্রয়োজন ইংরেজ অনুভব করে নি, আমরা যে তার কাছে কত দিক দিয়ে ঋণী সে কথাটাই আমাদের কানের কাছে অহরহ ঢ্যাঁটরা পিটিয়ে শুনিয়েছে। কিন্তু ইংরেজ ছাড়া আরো দু-চারটে জাত পৃথিবীতে আছে, এবং ইংরেজই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ভুবনবরেণ্য মহাজন জাতি এ-কথা স্বীকার করতে তারা প্রস্তুত নয়, এমন কি ইংরেজ যার উপর রাজত্ব করেছে সে যে একদিন বহু দিক দিয়ে ইংরেজের চেয়ে অনেক বেশী সত্য ছিল সে-কথাটা প্রচার করতেও তাদের বাধে না। বিশেষ করে ফরাসী এবং জর্মন এই কর্মটি পরমানন্দে করে থাকে। কোনো নিরপেক্ষ ইংরেজ পণ্ডিত কখনো জন্মান নি, এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় কিন্তু অনুভূতির সঙ্গে দরদ দিয়ে ভারতবাসীকে 'তোমারা ছোট জাত নও' এ-কথাটি বলতে ইংরেজের চিরকালই বেধেছে।

তাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা খবর পেলুম যে চীন ও জাপানের বহুলোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধধর্ম চীন ও জাপানের আত্মবিকাশে বহু দিক দিয়ে যুগ-যুগ ধরে সাহায্য করেছে, তবু সেই জ্ঞানের ভিতর দিয়ে আমরা এঁদের সঙ্গে নূতন কোনো যোগসূত্র স্থাপনা করতে পারলুম না। এমন সময় এসেছে, চীন ও জাপান যে-রকম এ-দেশে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে অধিকতর সংখ্যায় আসবে ঠিক তেমনি আমাদেরও খবর নিতে হবে চীন এবং জাপানের উর্বর ভূমিতে আমাদের বোধিবৃক্ষ পাপী-তাপীকে কি পরিমাণ ছায়া দান করেছে।

এবং এ-কথাও ভুললে চলবে না যে প্রাচ্যলোকে যে তিনটি ভূখণ্ড কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে যশ অর্জন করেছে তারা চীন ভারতবর্ষ ও আরবভূমি। এবং শুধু যে ভৌগোলিক হিসাবে ভারতবর্ষ আরব ও চীন ভূখণ্ডের ঠিক মাঝখানে তা নয়, সংস্কৃতি সভ্যতার দিক থেকেও আমরা এই দুই ভূখণ্ডের সঙ্গমস্থলে আছি। এক দিকে মুসলমান ধর্ম ও সভ্যতা এ-দেশে এসে আমাদের শিল্প-

কলাকে সমৃদ্ধ করেছে, আবার আমাদের বৌদ্ধধর্মের ভিতর দিয়ে আমরা চীন-জাপানের সঙ্গে সংযুক্ত। কাজেই ভারতবাসীর পক্ষে আর্য হয়েও এক দিকে যেমন সেমিতি (আরব) জগতের সঙ্গে তার ভাবের আদান প্রদান চলে, তেমনি চীন-জাপানের (মঙ্গোল) শিল্পকলা চিন্তাধারার সঙ্গেও সে যুক্ত হতে পারে। অথচ চীন আরব একে অন্যকে চেনে না।

তাই পূর্ব-ভূখণ্ডে যে নবজীবন সঞ্চারের সূচনা দেখা যাচ্ছে, তার কেন্দ্রস্থল গ্রহণ করবে ভারতবর্ষ। (ব্যবসা-বাণিজ্যের দৃষ্টি বিন্দু থেকে আমাদের লক্ষপতিরা এ তথ্যটি বেশ কিছুদিন হল হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছেন—জাপান হাট থেকে সরে যেতেই অহমদাবাদ ডাইনে, পারস্য-আরব বাঁয়ে জাভা-সুমাত্রাতে কাপড় পাঠাতে আরম্ভ করেছে।) ভৌগোলিক ও কৃষ্টিজাত উভয় সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ যদি আপন আসন গ্রহণ না করে তবে দোষ ভগবানের নয়।

উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি, আমাদের মৌলভী-মৌলানারা আরবী-ফারসী জানেন। এঁরা এত দিন সুযোগ পান নি—এখন আশা করতে পারি, আমাদের ইতিহাস-লিখনের সময় তাঁরা 'আরবকে ভারতের দান' অধ্যায়টি লিখে দেবেন ও যে-স্থপতিকলা মোগল নামে পরিচিত তার মধ্যে ভারতীয় ও ইরান-তুর্কী কিরূপে মিশ্রিত হয়েছে সে বিবরণ লিপিবদ্ধ করবেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা চীন এবং জাপানের ভাষা জানি নে। [বিশ্বভারতীর 'চীনা-ভবনে'র দ্বার ভালো করে খুলতে হবে, এবং এই চীনা-ভবনকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে চীন সভ্যতার অধ্যয়ন আলোচনা আরম্ভ করতে হবে।]

জাপান সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল এতই কম যে জাপানে বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণ সম্বন্ধে আমাদের কোনো জ্ঞানই নেই। [তাই শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র বীরভদ্র রাও চিত্র যখন তাঁর 'শিল্পী' কাগজে জাপানে সংগৃহীত ভারতীয় সংস্কৃতির নিদর্শন প্রকাশ করেন তখন অল্প পাঠকই সেগুলো পড়েন। বিশ্বভারতীর আরেক প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান্ হরিহরণ সাত বৎসর জাপানে থেকে উৎসাহের অন্ত নেই—তাঁর স্ত্রীও জাপানী মহিলা—কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো বিদ্যার্থী তাঁর কাছে উপস্থিত হয় নি।]

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ-লেখক জাপানী ভাষা জানে না। কিন্তু তার বিশ্বাস, জাপান সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে কৌতূহল জাগাবার জন্য ইংরিজী এবং অন্যান্য ভাষায় লেখা বই দিয়ে যতটা সম্ভবপর ততটা কাজ আরম্ভ করে দেওয়া উচিত। জাপানী ছাড়া অন্য ভাষা থেকে সংগৃহীত প্রবন্ধে ভুল থাকার সম্ভাবনা প্রচুর, তাই প্রবন্ধ-লেখক গোড়ার থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে।

ভারতবর্ষীয় যে-সংস্কৃত চীন এবং জাপানে প্রসারলাভ করেছে সে-সংস্কৃতি প্রধানত বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষীয় তথা চৈনিক বৌদ্ধধর্ম ও জাপানী বৌদ্ধধর্ম এক জিনিস নয়—তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্বের এক প্রধান নীতি এই যে, প্রত্যেক ধর্মই প্রসার এবং বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে

নূতন নূতন বাতাবরণের ভিতর নূতন নূতন রূপ ধারণ করে। জেরুজালেমের খ্রীষ্টধর্ম ও প্যারিসের খ্রীষ্টধর্ম এক জিনিস নয়, মিশরী মুসলিমে ও বাঙালী মুসলিমে প্রচুর পার্থক্য।

জাপানে যে-বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃতি লাভ করেছে সে-ধর্মও দুই দিক থেকে চর্চা করতে হবে। প্রথমত, জাপানীতে অনূদিত ও লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ,—এ কর্ম করবেন পণ্ডিতেরা, এবং এদের কাজ প্রধান গবেষণামূলক হবে বলে এর ভিতর সাহিত্য-রস থাকার সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয়ত, জাপানী শ্রমণ-সাধু-সন্তদের জীবনী-পাঠ। আমার বিশ্বাস, উপযুক্ত লেখকের হাতে পড়লে সে-সব জীবনী নিয়ে বাঙলায় উত্তম সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে।

অধ্যাপক য়াকব ফিশারের লেখা বৌদ্ধ শ্রমণ রিয়োকোয়ানের জীবনী পড়ে আমার এ-বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে। অধ্যাপক ফিশার জাতে জর্মন, রিয়োকোয়ান জাপানী ছিলেন,—কিন্তু শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বইখানি লেখা হয়েছে বলে সার্থক সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছে। পুস্তকখানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগার সামান্য কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল বলে এ-দেশে প্রচার এবং প্রসার লাভ করতে পারে নি। বইখানি ইংরিজিতে লেখা, নাম Dew drops on a Lotus Leaf। আর কিছু না হোক নামটি আমাদের কাছে অচেনা নয় 'নলিনীদলগতজলমতিতরলং' বাক্যটি আমাদের মোহাবস্থায়ও আমরা ভুলতে পারি নি। শঙ্করাচার্য যখন 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' আখ্যায় নিন্দিত হয়েছেন তখন হয়তো জীবনকে পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় দেখার উপমাটাও তিনি বৌদ্ধধর্ম থেকে নিয়েছেন।

বহু মানবের হিয়ার পরশ পেয়ে
বহু মানবের মাঝখানে বেঁধে ঘর
—খাটে, ছেলে যারা মধুর স্বপ্ন দেখে—
থাকিতে আমার নেই তো অরুচি কোনো।
তবুও এ-কথা স্বীকার করিব আমি,
উপত্যকার নির্জনতার মাঝে
—শীতল শান্তি অসীম ছন্দে ভরা—
সেইখানে মম জীবন আনন্দঘন ॥

শ্রমণ রিয়োকোয়ানের এই ক্ষুদ্র কবিতাটি দিয়ে অধ্যাপক ফিশার তাঁর রিয়োকোয়ান-চরিতের অবতরণিকা আরম্ভ করেছেন।

ফিশার বলেন: রিয়োকোয়ানের আমলের বড় জাগীরদার মাকিনো তাঁর চরিত্রের খ্যাতি শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে শ্রমণকে সাদরে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। তাঁর বাসনা হয়েছিল, শ্রমণের কাছ থেকে ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করবেন।

মাকিনোর দূত রিয়োকোয়ানের কুঁড়েঘরে পৌঁছাবার পূর্বেই গ্রামের লোক খবর পেয়ে গিয়েছিল যে স্বয়ং মাকিনো রিয়োকোয়ানের কাছে দূত পাঠাচ্ছেন। খবর শুনে সবাই অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর কুটীরের চারদিকের জমি বাগান সব কিছু পরিষ্কার করে দিল।

রিয়োকোয়ান ভিনগাঁয়ে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন কুঁড়েঘরের চতুর্দিক সম্পূর্ণ সাফ। মাকিনোর দূত তখনো এসে পেঁছিয় নি। রিয়োকোয়ানের দুই চোখ জলে ভরে গেল, বললেন, "হায় হায়, এরা সব কি কাণ্ডটাই না করেছে। আমার সব চেয়ে আত্মীয় বন্ধু ছিল ঝিঁ ঝিঁ পোকার দল। এই নির্জনতায় তারাই আমাকে গান শোনাত। তাদের বাসা ভেঙে ফেলা হয়েছে, হায়, তাদের মিষ্টি গান আমি আবার শুনব কবে, কে জানে?"

রিয়োকোয়ান বিলাপ করছেন, এমন সময় দূত এসে নিমন্ত্রণপত্র নিবেদন করল। শোকাতুর শ্রমণ উত্তর না দিয়ে একটি ক্ষুদ্র কবিতা লিখে দূতকে দিলেন,

আমার ক্ষুদ্র কুটীরের চারি পাশে,
বেঁধেছিল বাসা ঝরা পাতা দলে দলে—
নৃত্যচটুল, নিত্য দিনের আমার নর্ম-সখা
কোথা গেল সব? আমার আতুর হিয়া
সান্ত্বনা নাহি মানে।
হায় বলো মোর কি হবে উপায় এবে
জ্বলে গিয়ে তারা করিত যে মোর সেবা,
এখন করিবে কেবা?

ফিশার বলেন, দূত বুঝতে পারল নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

আমরা বলি, তাতে আশ্চর্য হবারই বা কি আছে? আমাদের কবি, জাপানের কবি এবং ঝরা পাতার স্থান তো জাগীরদারের প্রাসাদকাননে হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন:

ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে
অনেক হাসি অনেক অশ্রুজলে।[১]

ফিশার বলেন, এই জাপানী শ্রমণ, কবি, দার্শনিক এবং খুশখৎকো[২], তিনি আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চান।

রিয়োকোয়ান বহু বৎসর ধরে জাপানের কাব্যরসিক এবং তত্ত্বান্বেষীগণের মধ্যে সুপরিচিত, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে তাঁর খ্যাতি ছড়ায় মাত্র বৎসর ত্রিশ পূর্বে। যে-প্রদেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রব্রজ্যাভূমিতে তিনি কিংবদন্তীর রাজবৈদ্য তাৎসুকিচি ইরিসওয়া বলেন, "আমার পিতামহী মারা যান ১৮৮৭ সনে। তিনি যৌবনে রিয়োকোয়ানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প আমাকে বলেছেন।"

রিয়োকোয়ানের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৯১১ সনে প্রকাশিত এক ক্ষুদ্র পুস্তিকায়। স্বয়ং হকুওসাই সে পুস্তকের জন্য ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। তার প্রায় পঁচিশ বৎসর পর রিয়োকোয়ানের প্রিয়া শিষ্যা ভিক্ষুণী তাইশিন রিয়ো-

---

১ শেলির 'What if my leaves are falling' ভিন্ন অনুভূতিতে, ঈষৎ দম্ভপ্রসূত।
২ Calligrapher=সুদর্শন লিপিকর।

কোয়ানের কবিতা থেকে 'পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দু' নাম দিয়ে একটি চয়নিকা প্রকাশ করেন। রিয়োকোয়ানকে কবি হিসাবে বিখ্যাত করার জন্য ভিক্ষুণী তাইশিন এ চয়নিকা প্রকাশ করেন নি। তিনিই তাঁকে ঘনিষ্ঠ ভাবে চেনবার সুযোগ পেয়েছিলেন সব চেয়ে বেশি—আর যে পাঁচজন তাঁকে চিনতেন, তাঁদের ধারণা ছিল তিনি কেমন যেন একটু বেখাপ্পা, খামখেয়ালী ধরণের লোক, যদিও শ্রমণ হিসাবে তিনি অনিন্দনীয়। এমন কি রিয়োকোয়ানের বিশিষ্ট ভক্তেরাও তাঁকে ঠিক চিনতে পারেন নি। তাঁদের কাছে তিনি অজ্ঞেয়, অমর্ত্য সাধক হয়ে চিরকাল প্রহেলিকা রূপ নিয়ে দেখা দিতেন। একমাত্র ভিক্ষুণী তাইশিনই রিয়োকোয়ানের হৃদয়ের সত্য পরিচয় পেয়েছিলেন, চয়নিকা প্রকাশ করার সময় তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সর্বসাধারণ যেন তাঁর কবিতার ভিতর দিয়ে তাঁর মহানুভব হৃদয়ের পরিচয় পায়।

এ-মানুষটিকে চেনা কারো পক্ষেই খুব সহজ ছিল না। তিনি সমস্ত জীবন কাটিয়েছিলেন কবিতা লিখে, ফুল কুড়িয়ে আর ছেলেদের সঙ্গে গ্রামের রাস্তার উপর খেলাধুলো করে। তাতেই নাকি পেতেন তিনি সব চেয়ে বেশি আনন্দ। খেলার সাথী না পেলে তিনি মাঠে, বনের ভিতর আপন মনে খেলে যেতেন। ছোট ছোট পাখি তখন তাঁর শরীরের উপর এসে বসলে তিনি ভারী খুশি হয়ে তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতেন। যখন ইচ্ছে ঘুমিয়ে পড়তেন, মদ পেলে খেতে কসুর করতেন না, আর নাচের দলের সঙ্গে দেখা হলে সমস্ত বিকেল-সন্ধ্যা তাদের সঙ্গে ফূর্তি করে কাটিয়ে দিতেন।

বসন্ত-প্রান্তে বাহিরিনু ঘর হতে
ভিক্ষার লাগি চলেছি ভাণ্ড ধরে—
হেরি মাঠ-ভরা নাচে ফুলদল
নাচে পথ-ঘাট ভরে।
দাঁড়াইনু আমি এক লহমার তরে
কথা কিছু ক'ব বলে
ও মা, এ কি দেখি! সমস্ত দিন
কি করে যে গেছে চলে!

এই আপন-ভোলা লোকটির সঙ্গে যখন আর আর সংসার-বিমুখ শ্রমণদের তুলনা করা যায় তখনই ধরা পড়ে শ্রমণ-নিন্দিত প্রকৃতির সঙ্গে এঁর কবিজন-সুলভ গভীর আত্মীয়তা-বোধ। এই 'সর্বং শূন্যং সর্বং ক্ষণিকং' জগতের প্রবহমাণ ঘটনাবলীকে তিনি আর পাঁচ জন শ্রমণের মত বৈরাগ্য ও বিরক্তির সঙ্গে অবহেলা করছেন না, আবার সৌন্দর্য-বিলাসী কবিদের মত চাঁদের আলো আর মেঘের মায়াকেও আঁকড়ে ধরতে অযথা শোকাতুর হচ্ছেন না। বেদনা-বোধ যে রিয়োকোয়ানের ছিল না তা নয়—তাঁর কবিতার প্রতি ছত্রে ধরা পড়ে তাঁর স্পর্শ-কাতর হৃদয় কত অল্পতেই সাড়া দিচ্ছে—কিন্তু সমস্ত কবিতার ভিতর দিয়ে তাঁর এমন একটি সংহত ধ্যানদৃষ্টি দেখতে পাই যার মূল নিশ্চয়ই বৌদ্ধ-ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের অন্তস্তল থেকে আপন প্রাণশক্তি সঞ্চয় করছে।

অথচ তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা বলে গিয়েছেন, তিনি কখনো কাউকে আপন ধর্মে দীক্ষা দেবার জন্য চেষ্টা করেন নি, অন্যান্য শ্রমণের মত বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন নি।

তাই এই লোকটিকে বুঝতে জাপানেরও সময় লেগেছে। ফিশার বলেন, ১৯১৮ সনে শ্রীযুক্ত সোমা গায়েফু কর্তৃক 'তাইগু রিয়োকোয়ান' পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর সমগ্র জাপানে এই শ্রমণের নাম ছড়িয়ে পড়ে।

আজ তাঁর খ্যাতি শুধু আপন প্রদেশে, আপন প্রব্রজ্যাভূমিতে সীমাবদ্ধ নয়। জাপানের সর্বত্রই তাঁর জীবন, ধর্মমত, কাব্য এবং চিন্তাধারা জানবার জন্য বিপুল আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

সেই উত্তেজনা, সেই আগ্রহ বিদেশী শিক্ষক গায়ক ফিশারকেও স্পর্শ করেছে। দীর্ঘ আড়াই বৎসর একাগ্র তপস্যার ফলে তিনি যে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তার কল্যাণে আমরাও রিয়োকোয়ানের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। উপরে উল্লিখিত রিয়োকোয়ানের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত সোমা গায়েফু ফিশারের গ্রন্থকে সপ্রেম আশীর্বাদ করেছেন, এবং এ-কথাও বলেছেন যে ফিশারই একমাত্র ইউরোপীয় যিনি শ্রমণ রিয়োকোয়ানের মর্মস্থলে পেঁছিতে পেরেছেন।

জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে সমুদ্রপারের এক গ্রামে ১৭৫৮ সালে রিয়োকোয়ানের জন্ম হয়। রিয়োকোয়ান-বংশ সে অঞ্চলে আভিজাত্য ও প্রতিপত্তির জন্য সুপরিচিত ছিল। রিয়োকোয়ানের পিতা গ্রামের প্রধান বা অগ্রণীরূপে প্রচুর সম্মান পেতেন।

রিয়োকোয়ানকে বুঝতে হল তাঁর পিতার জীবনের কিছুটা জানতে হয়। তিনিও কবি ছিলেন এবং তাঁর কবিতাতেও এমন একটি দ্বন্দ্ব সব সময়ই প্রকাশ পায় যে দ্বন্দ্বের অবসান কোন কবিই এ জীবনে পান নি। সাধারণ কবি এ-রকম অবস্থায় কাব্য-জীবন ও ব্যবহারিক জীবনকে পৃথক করে নিয়ে পাঁচ জনের সঙ্গে যত দূর সম্ভব মিলে-মিশে চলবার চেষ্টা করেন, কিন্তু রিয়োকোয়ানের পিতার দ্বন্দ্ব-মুক্তি প্রয়াস এতই নিরঙ্কুশ ও পরিপূর্ণ আন্তরিকতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল যে তিনি শেষ পর্যন্ত কোনো সমাধান না পেয়ে আত্মহত্যা করেন।

রিয়োকোয়ানের অন্যান্য ভাই-বোনরাও কবিতা রচনা করে জাপানে খ্যাতি লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁদের জীবনও সমাজের আর পাঁচ জনের জীবনের মত গতানুগতিক ধারায় চলতে পারে নি। রিয়োকোয়ানের ছোট দুই ভাই ও এক বোন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

ধন-সম্পত্তি খ্যাতি-প্রতিপত্তি সব কিছুই ছিল, রাজধানীতে রিয়োকোয়ানের পিতা সুপরিচিত ছিলেন, বসত-গ্রামের অধিবাসীরা রিয়োকোয়ান-পরিবারকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখত, তৎসত্ত্বেও কেন পরিবারের পিতা আত্মহত্যা করলেন, তিন পুত্র এক কন্যা চীরবস্ত্র গ্রহণ করলেন এ রহস্যের সমাধান করার চেষ্টা রিয়োকোয়ান-জীবনীকার অধ্যাপক য়াকব ফিশার করেন নি। তবে কি জাপানের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন সে-যুগে এমন কোন পক্ষের বিরুদ্ধে

হয়ে উঠেছিল যে স্পর্শকাতর পরিবার মাত্রকেই হয় মৃত্যু অথবা প্রব্রজ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে সর্ব সমস্যার সমাধান করতে হত? ফিশার সে-রকম কোন ইঙ্গিতও করেন নি।

ফিশার বলেন, রিয়োকোয়ান শিশু বয়স থেকেই অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতির পরিচয় দেন। আর সব ছেলেমেয়েরা যখন খেলাধুলায় মত্ত থাকত তখন বালক রিয়োকোয়ান তন্ময় হয়ে কন-ফুৎসিয়ের তত্ত্ব-গম্ভীর রচনায় প্রহরের পর প্রহর কাটিয়ে দিতেন। তাঁর এই আচরণে যে তাঁর পিতা-মাতা ঈষৎ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন তার ইঙ্গিত ফিশার দিয়েছেন।

রিয়োকোয়ানের সব জীবনী-লেখকই দুটি কথা বার বার জোর দিয়ে বলেছেন। রিয়োকোয়ান বালক-বয়সেও কখনো মিথ্যা কথা বলেন নি এবং যে যা বলত তিনি সরল চিত্তে তাই বিশ্বাস করতেন। এই প্রসঙ্গে ফিশার রিয়োকোয়ানের বাল্য-জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

রিয়োকোয়ানের বয়স যখন আট বৎসর তখন তাঁর পিতা তাঁরই সামনে একটি দাসীকে অত্যন্ত কঠিন বাক্য বলেন। দাসীর দুঃখে রিয়োকোয়ান বড়ই ব্যথিত হন ও ক্রুদ্ধ-নয়নে পিতার দিকে তাকান। পিতা তাঁর আচরণ লক্ষ্য করে বললেন, "এ রকম চোখ করে বাপ-মায়ের দিকে তাকালে তুমি আর মানুষ থাকবে না, ঐ চোখ নিয়ে মাছ হয়ে যাবে।" তাই শুনে বালক রিয়োকোয়ান বাড়ি ছেড়ে অন্তর্ধান করলেন। সমস্ত দিন গেল, সন্ধ্যা হয়ে এল, তবু তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। উদ্বিগ্ন পিতা-মাতা চতুর্দিকে সংবাদ পাঠালেন। অবশেষে এক জেলে খবর পাঠাল, সে রিয়োকোয়ানকে সমুদ্রপারের পাষাণ-স্তূপের কাছে দেখতে পেয়েছে। পিতা-মাতা ছুটে গিয়ে দেখেন, তিনি পাষাণ-স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছেন, আর সমুদ্রের ঢেউ তাঁর গায়ে এসে লাগছে। কোলে করে বাড়ি এনে বাপ-মা জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ওখানে নির্জনে সমস্ত দিন কি করছিলে?" রিয়োকোয়ান বড় বড় চোখ মেলে বললেন, "তবে কি আমি এখনো মাছ হয়ে যাই নি, আমি না দুষ্টু ছেলের মত তোমাদের অবাধ্য হয়েছিলুম?"

রিয়োকোয়ান কেন যে সমস্ত দিন সমুদ্রপারে জলের কাছে কাটিয়েছিলেন তখন বোঝা গেল। মাছই যখন হয়ে যাবেন তখন জলের কাছে গিয়ে তার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকাই তো প্রশস্ততম পন্থা।

সংসার ত্যাগ করেও রিয়োকোয়ান পিতা-মাতা সম্বন্ধে কখনো উদাসীন হতে পারেন নি। মায়ের স্মরণে বৃদ্ধ শ্রমণ রিয়োকোয়ান যে কবিতাটি রচনা করেন সেটি মায়েরই ভালোবাসার মত এমনি সরল সহজ যে অনুবাদে তার সব মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায়:—

সকাল বেলায় কখনো গভীর রাতে
আঁখি মোর ধায় দূর 'সাদো'[১] দ্বীপ পানে

---

১ রিয়োকোয়ানের মাতা 'সাদো' দ্বীপে জন্মেছিলেন।

শান্ত-মধুর কত না স্নেহের বাণী
মা আমার যেন পাঠায় আমার কানে।

প্রব্রজ্যা

রিয়োকোয়ানের বয়স যখন সতেরো তখন তাঁর পিতা রাজধানীতে চলে যাওয়ায় তিনি গ্রামের প্রধান নির্বাচিত হলেন। তার দুই বৎসর পরে রিয়োকোয়ান সংসার ত্যাগ করে সংঘে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ধনজন সুখ-সমৃদ্ধি সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে যৌবনের প্রারম্ভেই কেন যে রিয়োকোয়ান সংসার ত্যাগ করলেন তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ফিশার প্রচলিত কিংবদন্তী বিশ্লেষণ করেছেন। কারো মতে রিয়োকোয়ানের কবিজন-সুলভ অথচ তত্ত্বান্বেষী মন জনপদপ্রমুখের দৈনন্দিন কূটনৈতিক কার্যকলাপে এতই ব্যথিত হত যে তিনি তার থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে সংঘের শরণ নেন; কারো মতে ভোগ-বিলাসের ব্যর্থতা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে তিনি সংসার ত্যাগ করেন।

রিয়োকোয়ান নাকি এক সন্ধ্যায় তাঁর প্রণয়িনী এক গাইশা[১] তরুণীর বাড়িতে যান। এমনিতেই তিনি গাইশাদের কাছে থেকে প্রচুর খাতির-যত্ন পেতেন, তার উপর তখন তিনি গ্রামের প্রধান। গাইশা-তরুণীরা রিয়োকোয়ানকে খুশি করার জন্যে নাচল, গাইল—প্রচুর মদও খাওয়া হল। কিন্তু রিয়োকোয়ান কেন যে চিন্তায় বিভোর হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেন তার কোন কারণ বোঝা গেল না। তাঁর প্রিয়া গাইশা-তরুণী বার বার তাঁর কাছে এসে তাঁকে আমোদ-আহ্লাদে যোগ দেওয়াবার চেষ্টা করল কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হল না। তিনি মাথা নিচু করে আপন ভাবনায় মগ্ন রইলেন।

প্রায় চারশ টাকা খরচ করে সে রাত্রে রিয়োকোয়ান বাড়ি ফিরলেন।

পরদিন সকাল বেলা রিয়োকোয়ান বাড়ির পাঁচ জনের সঙ্গে খেতে বসলেন না। তখন সকলে তাঁর ঘরে গিয়ে দেখে, তিনি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। কি হয়েছে বোঝবার জন্য যখন কম্বল সরানো হল তখন বেরিয়ে এল রিয়োকোয়ানের মুণ্ডিত-মস্তক আর দেখা গেল তার সর্বাঙ্গ জাপানী শ্রমণের কালো জেব্বায় ঢাকা।

আত্মীয়-স্বজনের বিস্ময় দূর করার জন্য রিয়োকোয়ান বিশেষ কিছু বললেন না, শুধু একটুখানি হাসলেন। তার পর বাড়ি ছেড়ে পাশের কহ্‌শহ্‌জী সংঘের (মন্দির) দিকে রওয়ানা হলেন। পথে তাঁর বল্লভা গাইশার বাড়ি পড়ে। সে দেখে অবাক, রিয়োকোয়ান শ্রমণের কৃষ্ণবাস পরে চলে যাচ্ছেন। ছুটে গিয়ে সে তাঁর জামা ধরে কেঁদে, অনুনয়-বিনয় করে বলল, "প্রিয়, তুমি এ কি করেছ!

---

১ 'গাইশা' ঠিক বেশ্যা বা গণিকা নহে; মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনা অথবা প্রাচীন গ্রীসের 'হেটেরে' শ্রেণীয়া।

তোমার গায়ে এ বেশ কেন ?"

রিয়োকোয়ানেরও চোখ জলে ভরে এল। কিন্তু তবু দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি সঙ্ঘের দিকে এগিয়ে গেলেন।

হায়, অনন্তের আহ্বান যখন পৌঁছয় তখন সে ঝঞ্ঝার সামনে গাইশা-প্রজাপতি ডানা মেলে কি বল্লভকে ঠেকাতে পারে ?

ফিশার বলেন, এ-সব কিংবদন্তী তাঁর মনঃপূত হয় না। তাঁর মতে এগুলো থেকে রিয়োকোয়ানের বৈরাগ্যের প্রকৃত কারণ পাওয়া যায় না।

ফিশারের ধারণা, রিয়োকোয়ান প্রকৃতির দ্বন্দ্ব থেকে সন্ন্যাসের অনুপ্রেরণা পান। তিনি যে-জায়গায় জন্মগ্রহণ করেন সে-জয়গায় প্রকৃতি গ্রীষ্ম বসন্তে যে-রকম মধুর শান্তভাব ধারণ করে ঠিক তেমনি শীতকালে ঝড়-ঝঞ্ঝার রুদ্র রূপ নিয়ে আঘাত আবেগ দিয়ে জনপদবাসীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ফিশারের ধারণা-রিয়োকোয়ানের প্রকৃতিতে এই দুই প্রবৃত্তিই ছিল ; এক দিকে ঋজু শান্ত পাইন-বনের মন্দ-মধুর গুঞ্জরণ, অন্য দিকে হিম ঋতুর ঝঞ্ঝা-মথিত বীচি-বিক্ষোভিত সমুদ্রতরঙ্গের অন্তহীন উদ্বেল উচ্ছ্বাস।

প্রকৃতিতে এ দ্বন্দ্বের শেষ নেই—রিয়োকোয়ান তাঁর জীবনের দ্বন্দ্ব সমাধান-কল্পে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ফিশার দৃঢ়কণ্ঠে এ কথা বলেন নি—এই তাঁর ধারণা।

মানুষ কেন যে সন্ন্যাস নেয় তাঁর সদুত্তর তো কেউ কখনো খুঁজে পায় নি। সন্ন্যাসী-চক্রবর্তী তথাগত জরা-মৃত্যু দর্শনে নাকি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন ; আরো তো লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রতিদিন জরা-মৃত্যু চোখের সামনে দেখে, কিন্তু কই, তারা তো সন্ন্যাস নেয় না ? বার্ধক্যের ভয়ে তারা অর্থসঞ্চয় করে আরো বেশি, মৃত্যুর ভয়ে তারা বৈদ্যরাজের শরণ নেয় প্রাণপণে—ত্রিশরণের শরণ নেবার প্রয়োজন তো তারা অনুভব করে না। যে জরা-মৃত্যু বুদ্ধদেবকে সন্ন্যাস এবং মুক্তি এনে দিল সেই জরা-মৃত্যুই সাধারণ জনকে অর্থের দাস এবং বৈদ্যের দাস করে তোলে।

গাইশা-তরুণীর প্রেমের নিষ্ফলতা আর ক্ষণিকতা হৃদয়ঙ্গম করে রিয়োকোয়ান সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ? তাই বা কি করে হয় ? প্রেমে হতাশ হলেই তো সাধারণ মানুষ বৈরাগ্য বরণ করে,—রিয়োকোয়ানের বেলা তো দেখতে পাই গাইশা-প্রণয়িনী তাঁকে করুণ কণ্ঠে প্রেম-নিবেদন করে সন্ন্যাস-মার্গ থেকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে !

এবং অতি সামান্য কারণেও তো মানুষ সন্ন্যাস নেয়। কন-ফুৎসিয় কেন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তার কারণ ছন্দে বেঁধে দিয়েছেন ঃ

মসৃণ দেহ উচ্চপৃষ্ঠ উদ্ধত বলীয়ান
বৃষ চলিয়াছে ভয়ে তার কাছে কেহ নহে আগুয়ান
সে করিল এক ধেনুর কামনা অমনি শৃঙ্গাঘাত
আমি লইলাম ভিক্ষাপাত্র; সংসারে প্রণিপাত ! (—সত্যেন দত্ত)

এবং এ সব কারণের চেয়েও ক্ষুদ্রতর কারণে মানুষ যে সন্ন্যাস নেয় তার উদাহরণ তো আমরা বাঙালী জানি। 'ওরে বেলা যে পড়ে এল'—অত্যন্ত

সরল দৈনন্দিন অর্থে এক চাষা আর এক চাষাকে এই খবরটি যখন দিচ্ছিল তখন হঠাৎ কি করে এক জমিদারের কানে এই মামুলী কথা কয়টি গিয়ে পৌঁছল। শুনেছি, সে জমিদার নাকি অত্যাচারীও ছিলেন এবং এ-কয়টি কথা যে পূর্বে কখনো তিনি শোনেন নি সে-ও তো সম্ভবপর নয়। তবে কেন তিনি সেই মুহূর্তেই পালকি থেকে বেরিয়ে এক বস্ত্রে সংসার ত্যাগ করলেন ?

সমুদ্রবক্ষে বারিবর্ষণ তো অহরহ হচ্ছে, শুক্তিরও অভাব নেই। কোটি কোটি বৃষ্টিবিন্দুর ভিতর কোনটি মুক্তায় পরিণত হবে কেউ তো বলতে পারে না, হয়ে যাওয়ার পরেও তো কেউ বলতে পারে না কোন শুক্তি কোন মুক্তায় মুক্তি পেল।

রাজার ডাকঘর অমলের জানালার সামনেই বসল কেন ? অমলই বা রাজার চিঠি পেল কেন ?

শুধু পতঞ্জলি বলেছেন, 'তীব্র সংবেগানামাসন্নঃ' (১, ২৯)। অর্থাৎ যাঁদের বৈরাগ্য ভাব প্রবল তাঁরাই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে মোক্ষ পান। কিন্তু কাদের বৈরাগ্য ভাব প্রবল হয় আর কেনই বা প্রবল হয় তার সন্ধান পতঞ্জলি তো দেন নি।

তাই বোধ হয় শাস্ত্রকাররা এই রহস্যের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'সন্ন্যাসের সময়-অসময় নেই। যে মুহূর্তে বৈরাগ্য ভাবের উদয় হয়, সেই মুহূর্তেই সন্ন্যাস গ্রহণ করবে।'

রিয়োকোয়ান উনিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

এ-প্রসঙ্গে ফিশার বলেন, 'আপাতদৃষ্টিতে রিয়োকোয়ানের সন্ন্যাস গ্রহণ স্বার্থপরতা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি জনসাধারণের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তার থেকে তাঁকে স্বার্থপর বলা চলে না।'

এই সামান্য কথাটিতেই ফিশার ধরা দিয়েছেন যে তিনি ইয়োরোপীয়। সন্ন্যাস গ্রহণ কোনো অবস্থাতেই স্বার্থপরতার চিহ্ন নয়। অন্তত ভারতবর্ষে নয়।

সর্বস্ব ত্যাগ করে শান্তির সন্ধানে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেন, তাঁদের সম্মুখে কি কি বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হতে পারে, তার বর্ণনা ভারতবর্ষের সাধকেরা দিয়ে গিয়েছেন। সংসার ত্যাগের প্রথম উত্তেজনায় মানুষ যে তখন সম্ভব-অসম্ভবের মাঝখানে সীমারেখা টানতে পারে না, সে সাবধান-বাণী ভারতীয় গুরু বার বার সাধনার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন এবং সব চেয়ে বেশি সাবধান করে দিয়ে গিয়েছেন উৎকট কৃচ্ছ্রসাধনের বিরুদ্ধে।

ভারতবর্ষ নানা দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে এই সব চরম সত্য আবিষ্কার করতে পেরেছে বলেই পরবর্তী যুগের ভারতীয় সাধকের ধ্যান-মার্গ অপেক্ষাকৃত সরল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু চীন জাপান প্রভৃতি বৌদ্ধভূমি ভারতবর্ষের এ ইতিহাসের সঙ্গে সুপরিচিত নয়। তারা নিয়েছে আমাদের সাধনার ফল—আমাদের পন্থা যে কত পতন-অভ্যুদয় দ্বারা বিক্ষুব্ধ, তার সন্ধান ভারতবর্ষের বাইরে কম সাধকই পেয়েছেন। তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যে অসম্ভবের প্রত্যাশা করতে গিয়ে ভারতবর্ষের বাইরে বহু নবীন সাধক সাধনার দৃঢ় ভূমি থেকে বিচ্যুত হন।

রিয়োকোয়ানের জীবনী-লেখক অধ্যাপক ফিশারের বর্ণনা হতে তাই দেখতে পাই, তিনি সঙ্ঘে প্রবেশ করে কি অহেতুক কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের ভিতর দিয়ে নির্বাণের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করলেন। স্বয়ং বুদ্ধদেব যে সব আত্মনিপীড়ন বর্জনীয় বলে বার বার সাধককে সাবধান করে দিয়েছেন, বহু জাপানীসঙ্ঘে সেই আত্মনিপীড়নকেই নির্বাণ লাভের প্রশস্ততম পন্থা বলে বরণ করে নেওয়া হয়েছিল।

ফিশার বলেন, 'সঙ্ঘের চৈত্যগৃহে কুশাসনের উপর পদ্মাসনে বসে দেওয়ালের দিকে মুখ করে নবীন সাধককে প্রহরের পর প্রহর আত্মচিন্তায় মনোনিবেশ করতে হত। একমাত্র আহারের সময় ছাড়া অন্য কোনো সময়েই দেয়াল ছাড়া অন্য দিকে চোখ ফেরাবার অনুমতি তাদের ছিল না। একটানা কুড়ি ঘণ্টা ধরে কখনো কখনো তাদের ধ্যানে নিমজ্জিত থাকতে হত এবং সেই ধ্যানে সামান্যতম বিচ্যুতি হলে পিছন থেকে হঠাৎ স্কন্ধোপরি গুরুর নির্মম লগুড়াঘাত।'

ধ্যানে নিমজ্জিত হবার চেষ্টা যাঁরাই করেছেন, তাঁরাই জানেন, প্রথম অবস্থায় নবীন সাধক ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে। একেই বলে জড়-সাধনা এবং পতঞ্জলি তাই যে উপদেশ দিয়েছেন, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, অল্প সময়ে ফললাভের আশা করা সাধনার প্রতিকূল। অত্যধিক মানসিক কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে কত সাধক যে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যান, সে কথা ভারতীয় গুরু জানেন বলেই শিষ্যকে অতি সন্তর্পণে শারীরিক ও মানসিক উভয় সাধনাতে নিযুক্ত করে ধীরে ধীরে অগ্রগামী হতে উপদেশ দেন।

আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে, রিয়োকোয়ান সঙ্ঘের উৎকট কৃচ্ছ্রসাধনায় ভেঙে পড়েন নি। নয় বৎসর ধ্যান-ধারণার পর তাঁর গুরুর মৃত্যু হয়। রিয়োকোয়ান তখন সঙ্ঘ ত্যাগ করে পর্যটকরূপে বাহির হয়ে যান। রিয়োকোয়ানের পরবর্তী জীবনযাপনের পদ্ধতি দেখলে স্পষ্ট অনুমান করা যায়, তিনি অত্যাধিক কৃচ্ছ্রসাধনের নিষ্ফলতা ধরতে পেরেছিলেন বলেই সঙ্ঘ ত্যাগ করে পর্যটনে বাহির হয়ে যান।

দীর্ঘ কুড়ি বৎসর রিয়োকোয়ান ধ্যান-ধারণা ও পর্যটনে অতিবাহিত করেন। তাঁকে তখন কোন্ সব দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল, তার সন্ধান আমরা কিছুটা পাই তাঁর কবিতা থেকে; কিন্তু সেগুলি থেকে রিয়োকোয়ানের সাধনার ইতিহাস কালানুক্রমিক ভাবে লেখবার উপায় নেই।

কিন্তু একটি সত্য আমরা সহজেই তাঁর কবিতা থেকে আবিষ্কার করতে পারি। দ্বন্দ্ব থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি রিয়োকোয়ান কখনো পান নি। মাঝে মাঝে দু'একটি কবিতাতে অবশ্য রিয়োকোয়ানকে বলতে শুনি, তিনি, শান্তির সন্ধান পেয়েছেন, কিন্তু পরক্ষণেই দেখি, ভিন্ন কবিতায় তিনি হয় নব বসন্তের আগমনে উল্লসিত, নয় বৃষ্টি-বাদলের মাঝখানে দরিদ্র চাষার প্রাণান্ত পরিশ্রম দেখে বেদনানুভূতিতে অবসন্ন। আমার মনে হয়, রিয়োকোয়ান যে চরম শান্তি পান নি, সেই আমাদের পরম সৌভাগ্য। নির্দ্বন্দ্ব জীবনের সন্ধান যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের তো কবিতা রচনা করবার কোনো আবেগ থাকার কথা নয়। শান্ত

রস এক প্রকারের রস হতেও পারে, কিন্তু সে রস থেকে কবিতা সৃজন হয় কি না তা তো জানিনে এবং হলেও সে রস আস্বাদন করবার মত স্পর্শকাতরতা আমাদের কোথায় ? দাক্ষিণাত্যের আলঙ্কারিকেরা তাই শঙ্করাবরণম্‌কে সন্ন্যাস রাগ বলে সঙ্গীতে উচ্চ স্থান দিতে সম্মত হন না। তাঁদের বক্তব্য সন্ন্যাসীর কোন অনুভূতি থাকতে পারে না, আর অনুভূতি না থাকলে রসসৃষ্টিও হতে পারে না।

রিয়োকোয়ানের কবিতা শঙ্করাবরণম্‌ বা সন্ন্যাসী রাগে রচিত হয় নি। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ কুড়ি বৎসর সাধনা ও পর্যটনের পর যখন তিনি খবর পেলেন যে, তাঁর পিতা জাপানের রাজনৈতিক অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাবার জন্য আত্মহত্যা করেছেন তখন এক মুহূর্তেই তাঁর সমস্ত সাধনা-ধন তাঁকে বর্জন করল।

খ্রীষ্ট বলেছেন, " The foxes have holes and the birds of the air have nests ; but the Son of man hath not where to lay his head." অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের জন্মভূমি নেই, আবাসভূমিও নেই। কিন্তু পিতার মৃত্যুতে রিয়োকোয়ান বিচলিত হয়ে হঠাৎ যেন বাল্যজীবনে ফিরে গেলেন।

হেথায় হোথায় যেখানে যখন আমি
তন্দ্রামগন,—সুপ্তির কোলে আপনারে দিই ছাড়া
সেই পুরাতন নিত্য নবীন স্বপ্নের মায়া এসে
গুঞ্জরে কানে, চিত্ত আমার সেই ডাকে দেয় সাড়া।
এ স্বপ্ন নয়, ক্ষণেকের খেদ, উড়ে-যাওয়া আবছায়া
এ স্বপ্ন হানে আমার বক্ষে অহরহ একই ব্যথা
ছেলেবেলাকার স্নেহ ভালোবাসা, আমার বাড়ির কথা।

এ কি শ্রমণের রাণী, এ কি সন্ন্যাসের নিরাবলম্বতা !

ফিশার বলেন, 'মাতৃভূমির আহ্বান রিয়োকোয়ানকে এতই বিচলিত করে ফেলল যে তিনি স্বগ্রামের দিকে যাত্রা করলেন। ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল।'

অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের মনে হয়, সান্ত্বনা দেবার চেয়ে হয়ত সান্ত্বনা পাওয়ার জন্যই তাঁর হৃদয় তৃষাতুর হয়েছিল বেশি। আত্মজনের সঙ্গসুখ শ্রমণ রিয়োকোয়ান কখনো ভুলতে পারেন নি ; সে-সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়া 'ক্ষণেকের খেদ' নয়, চিত্তাকাশে 'উড়ে-যাওয়া আবছায়া' নয়, সে বেদনা অবচেতন মনে বাসা বেঁধে ক্ষণে ক্ষণে নির্বাণ অন্বেষণের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু এই ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্বল্যের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলে কবি রিয়োকোয়ান শ্রমণ রিয়োকোয়ান হতে পারতেন না। কবি ও শ্রমণের মাঝখানে যে অক্ষয় সেতু রিয়োকোয়ান নির্মাণ করে গিয়েছেন, যে-সেতু আমাদের কাছে চিরবিস্ময়ের বস্তু, সেই সেতুর বিশ্বকর্মা তিনি কখনই হতে পারতেন না।

ফিশার বলেন, কিন্তু বাড়ির কাছে পেঁছে রিয়োকোয়ান থমকে দাঁড়ালেন,

নিজের আচরণে লজ্জিত হলেন এবং চিত্তসংযম আয়ত্ত করে দৃঢ় পদক্ষেপে দ্বিতীয় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। ফিশার বলেন, বোধ হয় রিয়োকোয়ানের সন্ন্যাসবৃত্তি তাঁর নীচাসক্তি থেকে প্রবলতর ছিল বলেই শেষ মুহূর্তে তিনি স্বগ্রামে প্রবেশ করলেন না। তাই হবে। কারণ, উপেন দুই বিঘে জমি কিছুতেই না ভুলতে পেরে শেষকালে যখন আপন বাস্তুভিটায় ফিরে এল, তখন সে দুটি আমের লোভ সম্বরণ করতে পারল না। আর যে-চিত্ত সন্ন্যাসের দৃঢ় ভূমি নির্মাণে তৎপর সে-চিত্ত ক্ষণিক দুর্বলতার মোহে স্বগৃহে ফিরে এলেও গৃহ-সংসারের প্রকৃত রূপ হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ও প্রবাসের দূরত্বে যেগৃহ তার কাছে মধুময় বলে মনে হয়েছিল ('নিকটে ধূসর-জর্জর অতি দূর হতে মনোলোভা') তার বিকট রূপ দেখে সে তখন পুনরায় 'আমি লইলাম ভিক্ষাপাত্র সংসারে প্রণিপাত' বলে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে।

বৌদ্ধ দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতে গেলে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন সন্ন্যাসধর্মকে ক্ষুণ্ণ করে না। স্বয়ং বুদ্ধদেব বোধিলাভের পর কপিলাবস্তুতে ফিরে এসেছিলেন। শ্রমণ রিয়োকোয়ান বোধিলাভ করতে পারেন নি বলেই স্বগ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

এই সময় রিয়োকোয়ানের পিতার নিজের হাতের লেখা একটি কবিতা পুত্রের হাতে এসে পড়ে; কবিতাটি তিন লাইনে লেখা জাপানী হাক্কু পদ্ধতিতে রচিত :—

কি মধুর দেখি রেশমের গাছে ফুটিয়াছে ফুলগুলি ;
কোমল পেলব করিল তাদের
ভোরের কুয়াশা তুলি !

রিয়োকোয়ানের মৃত্যুর পর এই কবিতাটি পাওয়া গিয়েছে। আর এক প্রান্তে রিয়োকোয়ানের নিজের হাতে লেখা, 'হায়, এই কুয়াশার ভিতর বাবা যদি থাকতেন ! কুয়াশা সরে গেলে তো বাবাকে দেখতে পেতুম।'

বোধ হয়, এই সময়কারই লেখা আরেকটি কবিতা থেকে রিয়োকোয়ানের মনের সংগ্রাম স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে :—

এই যে জীবন, এই যে মৃত্যু প্রভেদ কোথাও নাই,
যে জন জানিল তার কাছে বাঁচা হয়ে ওঠে মধুময়।
কিন্তু হায় রে মাটি দিয়ে গড়া অন্ধ আমার হিয়া
ফিরে চারি দিকে—রিপুর ঝঞ্ঝা যখন যেদিকে বয়।
দুর্বার রণ। তার মাঝখানে শিশু আমি, অসহায়
ধুক্‌ধুক্‌বুকে বাজে 'ভুল' বাজে 'ঠিক'—
চরম সত্য স্মরণ ছাড়িয়া লুপ্ত হয়েছে হায় !

এই দ্বন্দ্বই তো চিরন্তন দ্বন্দ্ব। সর্বদেশের সর্বকালের বহুলোক এই দ্বন্দ্বের নিদারুণ বর্ণনা দিয়েছেন। সত্য দেখতে পেয়েছি, কিন্তু আমার রিপু যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে—এই প্রতিবন্ধক ভিতরের না বাইরের, তাতে কিছু মাত্র আসে-যায় না, রাধার বেলা শাশুড়ী ননদী, হাফিজের বেলা,—

প্রেম নাই প্রিয় লাভ আশা করি মনে
হাফিজের মত ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে !

এ দ্বন্দ্বের তুলনা দিয়েছেন সব কবিই আপন হৃদয় দিয়ে। পূর্ববঙ্গের কবি হাসান রাজা চিঁড়ে-ভানার সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলেছেন,—

হাসনজানের রূপটা দেখি ফাল্‌দি ফাল্‌দি উঠে
চিঁড়া-বারা হাসন রাজার বুকের মাঝে কুটে।

রিয়াকোয়ান কান পেতে বুকের ধুকধুকে শুনতে পেয়েছেন, 'ভুল, ঠিক', 'ভুল, ঠিক', 'ভুল, ঠিক' !

এ তো গেল রিয়োকোয়ানের মনের দ্বন্দ্বের কথা, কিন্তু বাইরের দিকে রিয়োকোয়ানের জীবন অত্যন্ত সহজ গতিতেই চলেছিল। আহার শয়ন বাসস্থান সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিলেন বলে সন্ন্যাস-আশ্রমের অভাব অনটন তাঁকে কিছুমাত্র স্পর্শ করতে পারে নি। তাঁর ভ্রাম্যমান জীবন সম্বন্ধে জাপানে বহু গল্প প্রচলিত আছে এবং সে গল্পগুলির ভিতর দিয়ে স্পষ্ট দেখা যায়, শ্রমণ রিয়োকোয়ান আর কিছু না হোক, খ্যাতি-প্রতিপত্তি, বিলাসবাসনের মোহ সম্পূর্ণ জয়লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এই গল্পগুলির কয়েকটি অনুবাদ করার পূর্বে বলে নেওয়া ভালো যে, বৃদ্ধ বয়সে রিয়োকোয়ান স্বগ্রামের দিকে ফিরে আসেন, আর পাশের পাহাড়ের এক পরিত্যক্ত আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই জরাজীর্ণ গৃহে বহুকাল ধরে কেউ বসবাস করে নি, তার অর্ধেক ধ্বসে গিয়েছে, বাকিটুকু লতা-পাতার নিচে ঢাকা পড়ে গিয়েছে, কিন্তু ফিশার বলেন, বহু বৎসরের পরিভ্রমণে শ্রান্ত-ক্লান্ত শ্রমণের কাছে এই ধ্বংসস্তূপই শান্তিনীড় বলে মনে হল।

এই প্রত্যাবর্তন নিয়ে ফিশার দীর্ঘ আলোচনা করেন নি। আমাদেরও মনে হয়, করার কোনো প্রয়োজন নেই। গৃহী হোন আর সন্ন্যাসীই হোন, বার্ধক্যে আশ্রয়ের প্রয়োজন। রিয়োকোয়ানের বেলা শুধু এইটুকু দেখা যায় যে, সর্ব-সঙ্ঘের দ্বার তাঁর সামনে উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি শ্রমণমণ্ডলীর প্রধান তো হতে চানই নি[১], এমন কি কারো সেবা পর্যন্ত গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ ছিলেন।

রিয়োকোয়ানের প্রত্যাবর্তন-সংবাদ পেয়ে তাঁর ভাই-বোনেরা তাঁকে গৃহে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সফল হতে পারেন নি।

বুদ্ধদেব কপিলাবস্তুতে ফিরেছিলেন বটে, কিন্তু রাজপ্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন নি।

এই সময়ের লেখা একটি কবিতাতে রিয়োকোয়ানের শান্ত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় :—

---

১ জাতকের গল্পে আছে এক বৃদ্ধ শ্রমণ কোন সংঘে আশ্রয় গ্রহণ করতে চাইলে সেই সংঘের প্রধান শ্রমণ ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। হয়তো জাতকের এই গল্পটি রিয়োকোয়ানের অজানা ছিল না, কারণ ফিশার বলেন, রিয়োকোয়ান বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন এবং জাতক বৌদ্ধধর্মের কতখানি স্থান অধিকার করেছে, সে কথা অমরাবতী, সাঁচীর ভাস্কর্যস্থাপত্য দেখলে আজও চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

এই তো পেয়েছি শান্তিনিলয়, খরতাপ হেথা নাই
জীবন-সাঁঝের শেষ ক'টি দিন কাটাব হেথায় আমি
স্বপ্নের মোহে, কল্পনা বুনে। গাছেতে ছায়াতে হেথা
আমারে রাখিবে সোহাগে ঘিরিয়া—কাটাব দিবস-যামী।

কিংবদন্তীচয়ন

লুকোচুরি খেলা

রিয়োকোয়ান প্রকৃতি আর ছেলেপিলেদের নিয়েই বেশির ভাগ জীবন কাটিয়েছেন। ফিশার বলেন, তিনি কোনো জায়গাতেই কিছু দিন থাকলেই ছেলেমেয়েরা তাঁকে চিনে নিত। ফিশার বলেন নি কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রকৃতিও তাঁকে চিনে নিত এবং রবীন্দ্রনাথের 'হাজার হাজার বছর কেটেছে কেহ তো কহে নি কথা' কবিতাটি আমার মতের সায় দেবে।

রিয়োকোয়ান গাঁয়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় ছেলেমেয়েরা লুকোচুরি খেলছিল। রিয়োকোয়ানকে দেখে তাদের উৎসাহ আর আনন্দের সীমা নেই। বেশি ঝুলোঝুলি করতে হল না। রিয়োকোয়ান তো নাচিয়ে বুড়ি, তার উপর পেয়েছেন মৃদঙ্গের তাল। তদ্দণ্ডেই খেলাতে যোগ দিলেন। খেলাটা বনের ভিতর ভালো করে জমবে বলে সবাই গ্রাম ছেড়ে সেখানে উপস্থিত। সবাই হেথায় হোথায় লুকোলো। রিয়োকোয়ান এ খেলাতে বহু দিনের অভ্যাসের ফলে পাকাপোক্ত—তিনি লুকোলেন এক কাঠুরের কুঁড়েঘরে। ঘরের এক কোণে কাঠ গাদা করা ছিল, তিনি তার উপরে বসে ঝোলা-ঝোলা আস্তিন দিয়ে মুখ ঢেকে ভাবলেন, ওখানে তাঁকে কেউ কক্‌খনো খুঁজে পাবে না, আর পেলেই বা কি, তাঁর তো মুখ ঢাকা, চিনবে কি করে?

খেলা চলল। সবাইকে খুঁজে পাওয়া গেল। রিয়োকোয়ান যে কুঁড়েঘরে লুকিয়েছিলেন, সে-কথা কারো অজানা ছিল না, কিন্তু ছেলেরা বলল, 'দেখি, আমরা সবাই চুপ-চাপ বাড়ি চলে গেলে কি হয়?'

রিয়েকোয়ান সেই কাঠের গাদার উপর বসে সমস্ত বিকেল বেলাটা কাটালেন—পরদিন সকাল বেলা কাঠুরের বউ ঘরে ঢুকে চমকে উঠে বলল, 'ওখানে কে ঘুমুচ্ছ হে?' তার পর চিনতে পেরে 'থ' হয়ে বলল, 'সে কি, সন্ন্যাসী ঠাকুর যে! আপনি এখানে কি করছেন?'

রিয়োকোয়ান আস্তিন-ফাস্তিন নাড়িয়ে মহা ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আরে চুপ, চুপ, চুপ। ওরা জেনে যাবে যে। বুঝতে পারো না!'

'চলো' খেলা

রিয়োকোয়ানকে যে ছেলেমেয়েরা হামেশাই বোকা বানাতে পারত, সে-কথা সবাই জানে, আর পাঁচ জনও তাঁকে আকসার ঠকাবার চেষ্টা করত। কিন্তু প্রশ্ন, রিয়োকোয়ানের কাছে এমন কি সম্পদ ছিল যে মানুষ তাঁকে ঠকাবার চেষ্টা করবে?

ফিশার বলেন, রিয়োকোয়ানের হাতের লেখা ছবির চেয়েও বেশি কদর পেত এবং সেই হাতের লেখায় তাঁর কবিতার মূল্য অনেক লোকই জেনে গিয়েছিল। কিন্তু রিয়োকোয়ান চট করে যাকে তাকে কবিতা দিতে রাজী হতেন না, বিশেষ করে যারা তাঁর কবিতা বিক্রি করে পয়সা মারার তালে থাকত, তাদের ফন্দী-ফাঁদ এড়াবার চেষ্টা সব সময়ই করতেন। গল্পগুলো থেকে জানা যায়, তিনি ফাঁদে ধরা পড়েছেনই বেশি, এড়াতে পেরেছেন মাত্র দু-এক বার।

জাপানে 'চলো' খেলার খুবই চলতি, আর রিয়োকোয়ানকে তো কোন খেলাতেই নামাবার জন্য অত্যধিক সাধাসাধি করতে হত না।

রিয়োকোয়ান বন্ধু মনসুকের সঙ্গে এক দিন দেখা করতে গিয়েছিলেন। মনসুকে বললেন, 'এসো, "চলো" খেলা খেলবে?' রিয়োকোয়ান তো তৎক্ষণাৎ রাজী। মনসুকে খেলা আরম্ভ করার সময় বললেন, 'কিছু একটা বাজি ধরে খেললে হয় না? তাহলে খেলাটা জমবে ভালো।'

রিয়োকোয়ান বলেন, 'তা তো বটেই। যদি আমি জিতি তাহলে তুমি আমাকে কিছু কাপড়-জামা দেবে—শীতটা তো বেড়েই চলেছে।'

মনসুকে বললেন, 'বেশ, কিন্তু যদি আমি জিতি?'

রিয়োকোয়ান তো মহা দুর্ভাবনায় পড়লেন। তাঁর কাছে আছেই বা কি, দেবেনই বা কি? বললেন, 'আমার তো, ভাই, কিছুই নেই।'

মনসুকে অতি কষ্টে তাঁর ফুর্তি চেপে বললেন, 'তোমার চীনা হাতের লেখা যদি দাও তাইতেই আমি খুশি হব।' রিয়োকোয়ান অনিচ্ছায় রাজী হলেন। খেলা আরম্ভ হল। রিয়োকোয়ান হেরে গেলেন। আবার খেলা শুরু, আবার রিয়োকোয়ানের হার হল। করে করে সবসুদ্ধ আট বার খেলা হল, রিয়োকোয়ান আট বারই হারলেন। আর চীনা হাতের লেখা না দিয়ে এড়াবার যো নেই।

রিয়োকোয়ান হস্তলিপি দিলেন। দেখা গেল, আটখানা লিপিতেই তিনি একই কথা আট বার লিখেছেন:

'চিনি মিষ্টি
ওষুধ তেতো।'[১]

মনসুকে যখন আপত্তি জানিয়ে বললেন, আট বার একই কথা লেখা উচিত হয় নি তখন রিয়োকোয়ান হেসে উত্তর দিলেন, 'কিন্তু "চলো" খেলা কি সব বারই একই রকমের হয় না? তাই একই কথা আট বার লিখে দিয়েছি।'

কুড়িয়ে-পাওয়া

রিয়োকোয়ানকে কে যেন এক বার বলেছিল রাস্তায় পয়সা কুড়িয়ে পাওয়াতে ভারী আনন্দ। একদিন আশ্রমে ফেরার পথে তিনি মনে মনে সেই কথা নিয়ে চিন্তা করতে করতে বললেন, 'এক বার দেখাই যাক না, কুড়িয়ে পাওয়াতে কি আনন্দ লুকনো আছে।' রিয়োকোয়ান ভিক্ষা করে কয়েকটি পয়সা পেয়েছিলেন।

১ খুব সম্ভব কবিতাটির গূঢ়ার্থ, 'বাজী জেতাতে বড় আনন্দ, আর বাজী হারাতে বড় দুঃখ।'

সেগুলো তিনি একটা একটা করে রাস্তায় ছড়িয়ে ফের তুলে নিলেন। অনেক বার ছড়ালেন, কুড়োলেন, কিন্তু কোন রকম আনন্দই পেলেন না। তখন মাথা চুলকে আপন মনে বললেন, 'এটা কি রকম হল? আমায় সবাই বললে, কুড়িয়ে পাওয়াতে ভারী ফুর্তি, কিন্তু আমার তো কোন ফুর্তি হচ্ছে না। তারাও তো ঠকাবার লোক নয়।' আরো বহু বার ছড়ালেন, কুড়োলেন, কিন্তু কোন সুখই পেলেন না। এই রকম করতে করতে শেষটাই বেখেয়ালে সব কটি পয়সাই ঘাসের ভিতর হারিয়ে গেল।

তখন তাঁকে অনেকক্ষণ ধরে পয়সাগুলো খুঁজতে হল। যখন পেলেন তখন মহা ফুর্তির সঙ্গে চেঁচিয়ে বললেন, 'এইরারে বুঝতে পেরেছি। কুড়িয়ে পাওয়াতে আনন্দ আছে বৈকি।'

ধূর্ত নাপিত

রিয়োকোয়ানের হাতের লেখা এতই সুন্দর ছিল আর তাঁর কবিতাতে এমনি অপূর্ব রসসৃষ্টি হত যে তাঁর হাতের লেখা কবিতা কেউ যোগাড় করতে পারলে বিক্রি করে বেশ দুপয়সা কামাতে পারত। রিয়োকোয়ান নিজে শ্রমণ; কাজেই তিনি এসব লেখা বিক্রি করতেন না—গরিব-দুঃখীকে বিলিয়ে দিতেন। কিন্তু কেউ ধাপ্পা দিয়ে তাঁর কাছ থেকে লেখা আদায় করার চেষ্টা করলে তিনি ফাঁদ এড়াবার চেষ্ট করতেন।

শ্রমণকে মাথা নেড়া করতে হয়। তাই রিয়োকোয়ান প্রায়ই এক নাপিতের কাছে যেতেন। নাপিতটি আমাদের দেশের নাপিতের মতই ধূর্ত ছিল এবং রিয়োকোয়ানের কাছ থেকে অনবরত কিছু লেখা আদায় করার চেষ্টা করত। তাঁকে তাই নিয়ে বড্ড বেশি জ্বালাতন করলে তিনিও 'দেব' 'দিচ্ছি' করে কোন গতিকে এ অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা করতেন।

শেষটায় ধূর্ত নাপিত একদিন তাঁর মাথা অর্ধেক কামিয়ে বলল, 'ঠাকুর, হাতের লেখা ভালোয় ভালোয় এই বেলা দিয়ে দাও। না হলে বাকী অর্ধেক আর কামাবো না।' এ-রকম শয়তানির সঙ্গে রিয়োকোয়ানের এই প্রথম পরিচয়। কি আর করেন? হাতের লেখা দিয়ে মাথাটি মুড়িয়ে—উভয়ার্থে—আশ্রমে ফিরলেন। নাপিতও সগর্বে সদম্ভে লেখাটি ফ্রেমে বাঁধিয়ে দোকানের মাঝখানে টাঙালো—ভাবখানা এই, সে এমনি গুণী যে রিয়োকোয়ানের মত শ্রমণ তাকে হাতের লেখা দিয়ে সম্মান অনুভব করেন।

কিন্তু খদ্দেরদের ভিতর দু চারজন প্রকৃত সমঝদার ছিলেন। তাঁরা নাপিতকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, লেখাতে একটা শব্দ সম্পূর্ণ বাদ পড়ে গিয়েছে। নাপিত ছুটে গিয়ে রিয়োকোয়ানের ভুল দেখিয়ে শুদ্ধ করে দেবার জন্যে বলল। তিনি বললেন, 'ওটা ভুল নয়। আমি ইচ্ছে করেই ও রকম ধারা করেছি। তুমি আমার অর্ধেক কামিয়ে দিয়েছিলে। আমিও তাই লেখাটি শেষ করে দিই নি। আর ঐ যে বুড়ি আমাকে সিম বিক্রি করে সে সর্বদাই

আমাকে কিছুটা ফাউ দেয়। তোমার লেখা লেখা যেটুকু বাদ পড়েছে সেটুকু বুড়িকে লেখা দেবার সময় ফাউ করে জুড়ে দিয়েছি। বিশ্বাস না হয় গিয়ে দেখে এসো।'

তার পর রিয়োকোয়ান অনেকক্ষণ ধরে মাথা দুলিয়ে হাসলেন।

রিয়োকোয়ান ও মোড়ল তোমিতোরি

শ্রমণদের দিন কাটে নানা ধরনের লোকের আতিথ্য নিয়ে। রিয়োকোয়ান একবার অতিথি হলেন মোড়ল তোমিতোরির। জাপানে তখন 'চলো' খেলার খুব চলতি এবং রিয়োকোয়ান সর্বদাই এ-খেলাতে হারেন বলে সকলকেই তাঁর সঙ্গে খেলতে চায়।

তাই খেলা আরম্ভ হল। কিন্তু রিয়োকোয়ানের অদৃষ্ট সেদিন ভালো ছিল। বাজীর পর বাজী তিনি জিতে চললেন। বাড়ির ছেলে-মেয়েরা ভারী খুশি—রিয়োকোয়ানও আনন্দে আত্মহারা। তোমিতোরি রিয়োকোয়ানকে বিলক্ষণ চিনতেন, তাই রগড় দেখবার জন্য হঠাৎ যেন ভয়ংকর চটে গিয়ে বললেন, 'তুমি তো আচ্ছা লোক হে! অতিথি হয়ে এসেছ আমার বাড়িতে আর জিতে জিতে আমার সর্বস্ব কেড়ে নিতে তোমার একটুকু লজ্জা হচ্ছে না? এ-রকম স্বার্থপর ছোটলোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব ভদ্রত্ব কি করে বজায় রাখা যায় আমি তো ভেবেই পাচ্ছি নে।'

রিয়োকোয়ান রসিকতা না বুঝতে পেরে ভারী লজ্জা পেলেন। তাড়াতাড়ি কোনো গতিকে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন বন্ধু কেরার বাড়িতে। কেরা বন্ধুর চেহারা দেখেই বুঝলেন, কিছু একটা হয়েছে। জিজ্ঞেস করলে, 'কি করেছ, খুলে বলো।' রিয়োকোয়ান বললেন, 'ভারী বিপদগ্রস্ত হয়েছি। তোমিতোরির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। কি যে করব ভেবেই পাচ্ছি নে। তুমি কিছু বুদ্ধি বাৎলাতে পারো? তোমিতোরিকে যে করেই হোক খুশি করতে হবে।'

কেরা ব্যাপারটা শুনে তখনই বুঝতে পারলেন যে রিয়োকোয়ান রসিকতা বুঝতে পারেন নি। কিন্তু তিনিও চেপে গিয়ে দরদ দেখিয়ে বললেন, 'তাই তো! তা আচ্ছা, কাল তোমাকে তোমিতোরির কাছে নিয়ে গিয়ে মাপ চাইব।'

রিয়োকোয়ান অনেকটা আশ্বস্ত হলেন।

পরদিন ভোরবেলা দুজনা মোড়লের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন। রিয়োকোয়ান দোরের বাইরে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেরা ভিতরে গিয়ে যেন ভয়ংকর কিছু একটা হয়েছে, এ-রকম ভাবে গম্ভীর গলায় রিয়োকোয়ানের হয়ে তোমিতোরির কাছে মাপ চাইলেন। রিয়োকোয়ান উদ্বেগে কাতর হয়ে কান খাড়া করে শুনতে পেলেন তোমিতোরি তাঁকে মাপ করতে রাজী আছেন। তদ্দণ্ডেই দুশ্চিন্তা কেটে গেল আর মহা খুশি হয়ে তৎক্ষণাৎ তোমিতোরির সামনে গিয়ে হাজির। তোমিতোরি প্রচুর খাতিরযত্ন করে রিয়োকোয়ানকে বসালেন। রিয়োকোয়ানকে আর তখন পায় কে! খুশিতে সব কিছু বেবাক

ভুলে গিয়ে এক লহমার ভিতরেই বললেন, 'এসো, "চলো" খেলা আরম্ভ করা যাক।'

রিয়োকোয়ান এমনই সরল মনে প্রস্তাবটা করলেন যে সবাই হেসে উঠলেন। খেলা আরম্ভ হল।

এবারও রিয়োকোয়ান জিতলেন।

কী বিপদ

রিয়োকোয়ান ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলা-ধুলো করতে ভালোবাসতেন। তারা মাঝে মাঝে তাঁকে বড় বিপদগ্রস্ত করত।

কথা নেই বার্তা নেই একদিন হঠাৎ একটা ছেলে চেঁচিয়ে বলল, 'ঠাকুর, আমায় একটা রায়ো দাও (রায়ো মুদ্রার দাম প্রায় চার টাকার মত)।' রিয়োকোয়ান তো অবাক। এক রায়ো? বলে কি? তাঁর কাছে দুগণ্ডা পয়সা হয় কি না হয়।'

ছেলেরা ছাড়ে না। আরেক জন বলল, 'আমাকে দুটো রায়ো দাও।' কেউ বলে তিনটে, কেউ বলে চারটে। নিলমের মত দাম বেড়েই চলল আর রিয়োকোয়ান বিস্ময়ে হতবাক হয়ে হাত দুখানা মাথার উপর তুলে দাঁড়িয়ে ভাবছেন অত টাকা তিনি পাবেন কোথায়?

যখন নিলাম দশ রায়ো পেরিয়ে গেল তখন তিনি হঠাৎ দড়াম করে লম্বা হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

ছেলেরা তো এতক্ষণ নিলামের ফুর্তিতে মশগুল হয়ে ছিল। রিয়োকোয়ানকে হঠাৎ এ-রকম ধারা মাটিতে পড়ে যেতে দেখে ভয়ে-ভয়ে কাছে এগিয়ে এসে ডাকল, 'ও ঠাকুর, ওঠো। এ-রকম করছ কেন?' কোনো সাড়াশব্দ নেই। আরো কাছে এগিয়ে এসে দেখে তাঁর চোখ বন্ধ, সমস্ত শরীরে নড়া-চড়া নেই।

ভয় পেয়ে সবাই কানের কাছে এসে চেঁচাতে লাগল, 'ও ঠাকুর, ওঠো। ও-রকম ধারা করছ কেন?' তখন কেউ কেউ বলল, 'ঠাকুর মারা গিয়েছেন।' দু-চারজন তো হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেলল।

যখন হট্টগোলটা ভালো করে জমে উঠেছে তখন রিয়োকোয়ান আস্তে আস্তে চোখ মেললেন। ছেলেরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। যাক্, ঠাকুর তাহলে মারা যান নি। সবাই তখন তাঁর আস্তিন ধরে ঝুলোঝুলি করে চেঁচাতে লাগল, 'ঠাকুর মরে যান নি, ঠাকুর বেঁচে আছেন।'

রায়োর কথা সবাই তখন ভুলে গিয়েছে। কানামাছি খেলা আরম্ভ হয়েছে। ঠাকুর হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

* * *

ফিশার আরও বহু কিংবদন্তী উদ্ধৃত করে তাঁর পুস্তিকাখানি সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলেছেন। সেগুলো থেকে দেখা যায়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রিয়োকোয়ান বয়স্ক লোকের সংসর্গ ত্যাগ করে ক্রমেই ছেলে-মেয়ে, প্রকৃতি আর প্রাণিজগৎ নিয়ে

দিন যাপন করেছেন। কিংবদন্তীর চেয়ে রিয়োকোয়ানের কবিতাতে তাঁর এই পরিবর্তন চোখে পড়ে বেশি।

বস্তুত, রিয়োকোয়ানের জীবনী আলোচনার চেয়ে বহু গুণে শ্রেয় তাঁর কবিতা পাঠ। কিন্তু তিনি তাঁর কবিতা লিখেছেন এমনি হাল্কা তুলি দিয়ে যে তার অনুবাদ করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কোনো প্রকৃত সমঝদার যদি এই গুরুভার গ্রহণ করেন তবে আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লেখা সার্থক হবে।

মহাপরিনির্বাণ

ভিক্ষুণী তেইশা (তাইশিন) রিয়োকোয়ানের শিষ্যা ছিলেন সে-কথা এ জীবনীর প্রথম ভাগেই বলা হয়েছে। রিয়োকোয়ানের শরীর যখন তেহাত্তর বৎসর বয়সে জরাজীর্ণ তখন তিনি খবর পেলেন শ্রমণের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। সংবাদ পেয়ে তেইশা গুরুর পদপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন।

সেই অবসন্ন শরীর নিয়ে শ্রমণ যে মধুর কবিতাটি রচনা করেছেন তার থেকে আমরা তাঁর স্পর্শকাতর হৃদয়ের খানিকটা পরিচয় পাই,—

নয়ন আমার যার লাগি ছিল তৃষাতুর এত দিন
ভুবন ভরিয়া আজ তার আগমন
তারই লাগি মোর কঠোর বিরহ মধুর বেদনা ভরা
তারই লাগি মোর দিন গেল অগণন।
এত দিন পরে মনের বাসনা পূর্ণ হয়েছে আজ
শান্তি বিরাজে ঝঞ্ঝা-মথিত ক্ষুব্ধ হৃদয়-মাঝ।

শেষ দিন পর্যন্ত তেইশা রিয়োকোয়ানের সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেন। গুরুর মন প্রসন্ন রাখার জন্য তেইশা সব সময়ই হাসিমুখে থাকতেন, কিন্তু আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় ভিক্ষুণী কতটা কাতর হয়ে পড়েছিলেন ফিশার তাঁর পুস্তকে সে বেদনার কিছুটা বর্ণনা দিয়েছেন।

শেষ মুহূর্ত যখন প্রায় এসে উপস্থিত তখনো রিয়োকোয়ান তাঁর হৃদয়াবেগ কবিতার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন—

নলিনীর দলে শিশিরের মত মোদের জীবন, হায়—
শূন্যগর্ভ বাতাহত হয়ে চলিছে সুমুখ পানে।
আমার জীবন তেমনি কাটিল, এবার হয়েছে শেষ
কাঁপন লেগেছে আমার শিশিরে—চলে যাবে কোন্‌খানে।

রিয়োকোয়ান শান্ত ভাবে শেষ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করে ছিলেন, কিন্তু ভিক্ষুণী তেইশার নারী-হৃদয় যে কতটা বিচলিত হয়ে পড়েছিল, সে-কথা তেইশাই ঐ সময়ের লেখা কবিতাটি থেকে বোঝা যায়ঃ—

গভীর দুঃখে হৃদয় আমার সান্ত্বনা নাহি মানে
এ মহাপ্রয়াণ দুর্দমনীয় বেদনা বক্ষে হানে।

সাধনায় জানি, জীবন মৃত্যু প্রভেদ কিছুই নেই
তবুও কাতর বিদায়ের ক্ষণ সমুখে আসিল যেই।

এ কবিতা পড়ে আমাদের মত গৃহী একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়ে। সর্বস্ব ত্যাগ করে, আজীবন শান্তির সন্ধান করার পরও যদি ভিক্ষুণীরা এ-রকম কথা বলেন তবে আমরা যাব কোথায়? আমরা তো আশা করেছিলুম, দুঃখের আঘাত সয়ে সয়ে কোনো গতিকে শেষ পর্যন্ত হয়ত আত্মজনের চিরবিচ্ছেদ সহ্য করার মত খানিকটা শক্তি পাব, কিন্তু তার আর ভরসা রইল কোথায়? ঋষি বলেছেন, 'একমাত্র বৈরাগ্যেই অভয়'; কিন্তু তেইশার কবিতা পড়ে মানুষের শেষ আশ্রয় বৈরাগ্য সম্বন্ধেও নিরাশ হতে হল।

জানি, এ কবিতা পড়ে রিয়োকোয়ান উত্তরে লিখেছিলেন—

রক্তপদ্মপত্রের মত মানব জীবন ধরে,
একে একে সব খসে পড়ে ভূমি 'পরে
ঝরার সময় লাগে তার গায়ে যে ক্ষুদ্র কম্পন
সেই তো জীবন।

কিন্তু রিয়োকোয়ান তো ও-পারের যাত্রী—তাঁর দুঃখ কিসের? বিরহবেদনা তো তাদের তরেই, যারা পিছনে পড়ে রইল।

"—কিন্তু যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ, তারা যা হারালো তার সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা?" (রবীন্দ্রনাথ)

তাই ফিশার বলেন, 'শত শত লোক শ্রমণের শব-যাত্রার সঙ্গে গিয়েছিল। আর যে সব অগণিত ছেলে-মেয়ের সঙ্গে তিনি খেলা-ধুলো করেছিলেন, তারাই যেন শ্রমণের শোকসন্তপ্ত বিরাট পরিবার।'

ফিশার তাঁর পুস্তিকা শেষ করেছেন রিয়োকোয়ানের সর্বশেষ কবিতাটি উদ্ধৃত করে,—

চলে যাবো যবে চিরতরে হেথা হতে
স্মৃতির লাগিয়া কী সৌধ আমি গড়ে যাবো কোন্ পথে?
কিন্তু যখন আসিবে হেথায় ফিরে ফিরে মধু ঋতু
পেলব-কুসুম মুকুলিত মঞ্জরি
নিদাঘের দিন স্বর্ণ-রৌদ্রে ভরা
কোকিল কুহরে, শরৎ-পবন গান গায় গুঞ্জরি
রক্তপত্র সর্ব অঙ্গে মেপল লইবে পরে
এরাই আমার স্মৃতিটি রাখিবে ধরে।
এরাই তখন কহিবে আমার কথা
ফুল্লকুসুম মুখর কোকিল যথা
রক্তবসনা দীপ্তা মেপল শাখা
প্রতিবিম্বিত আমার আত্মা—এদেরই হিয়ায় আঁকা॥

ফুটবল

'পরশুরামে'র কেদার চাটুজ্যে মশাই দূর থেকে বিস্তর মেমসাহেব দেখেছিলেন ; আমিও দূর থেকে বিস্তর সিনেমা স্টার, পলিটিশিয়ান আর ফুটবল খেলোয়াড় দেখেছি। দেখে ওঁদের প্রতি ভক্তি হয়েছে এবং গদগদ হয়ে মনে মনে ওঁদের পেন্নাম জানিয়েছি।

তাই কি করে যে 'ইস্টবেঙ্গল' ক্লাবের কয়েকজন খেলোয়াড় এবং ম্যানেজার মশায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল তার সঠিক ব্যাখ্যা আমি এখনো সমঝে উঠতে পারি নি। তবে শুনেছি আমরা যে-রকম খাঁচার ভিতর সিংহ দেখে খুশি হই, সিংহটাও নাকি আমাদের দিকে কৌতূহলের সঙ্গে তাকায় তার বিশ্বাস মানুষকে নাকি জড়ো করা হয় নিছক তাকে আনন্দ দেবার জন্য, যেদিন লোকের সংখ্যা কম হয় সেদিন নাকি সিংহ রীতিমত মন-মরা হয়ে যায়। (আরো শুনেছি, একটা খাঁচার গোটাকয়েক শিক ভেঙে যাওয়াতে গরিলা নাকি দস্তুরমত ভয় পেয়ে গিয়ে পেছন-ফিরে দাঁড়িয়েছিল—তার বিশ্বাস ছিল খাঁচাটার উদ্দেশ্য তাকে মানুষের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য।)

তাই যখন 'ইস্টবেঙ্গলে'র গুটিকয়েক রয়েল বেঙ্গল টাইগার আমার দিকে তাকালেন তখন আমি খুশি হলুম বইকি। তারপর তাঁদের মাধ্যমে আর সক্কলের সঙ্গেও মোলাকাত হয়ে গেল। সব কটি চমৎকার ভদ্রসন্তান, বিনয়ী এবং নম্র। আমি বরঞ্চ সদম্ভে তাদের শুনিয়ে দিলুম ছেলেবেলার 'বী' টীমের খেলাতে কি রকম কায়দাসে একখানা গোল লাগিয়ে দিয়েছিলুম, অবশ্য সেটা সুইসাইড্ গোল ছিল।

কেউ কেউ জিজ্ঞেস করলেন, আমি তাঁদের খেলা দেখতে যাবো কি না? বললুম, ফাইনালের দিন নিশ্চয়ই দেখতে যাবো। ম্যানেজার বললেন, তা হলে তো যে-করেই হোক ফাইনাল পর্যন্ত উঠতে হবে—বিবেচনা করুন, একমাত্র নিতান্ত আমাকে খুশি করার জন্যই তাঁদের কি বিপুল আগ্রহ!

ফাইনালের দিন ম্যানেজার আমাকে আমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

* * *

দিল্লীতে ফুটবলের কদর কম। খেলা আরম্ভ হওয়ার পনেরো মিনিট পূর্বে গিয়েও দিব্য সীট পাওয়া গেল। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম আমার এক চ্যালাকে—শিটিফিটি দেওয়ার জন্য। পরে দেখলুম, ও ওসব পারে না, সে জন্মেছে পশ্চিমে। বললুম, আরে বাপু, মুখে আঙুল পুরে যদি হুইসিলই না দিতে পারিস তবে ফুটবল খেলা দেখতে এসেছিস কেন? রবিঠাকুরের "ডাকঘর" দেখতে গেলেই পারিস।'

খেলা দেখতে এসেছে বাঙালী—তাদের অধিকাংশ আবার পদ্মার ও-পারের—আর মিলিটারি; এই দুই সম্প্রদায়। মিলিটারী এসেছে গোর্খা টীমকে সাহস দেবার জন্য, আর আমরা কি করতে গিয়েছি সে-কথা তো আর খুলে বলতে হবে না। অবশ্য আমাদের ভিতর যে 'মোহনবাগান' কিংবা 'কালীঘাট'

ফ্যান ছিলেন না, সে-কথা বলব না, তবে কলকাতা থেকে এত দূরে বিদেশে তাঁরা তো আর গোর্খাদের পক্ষ নিতে পারেন না। 'দোস্ত নীস্ত, লেকিন দুশমন ই-দুশমন হস্ত' অর্থাৎ 'মিত্র নয়' তবে শত্রুর শত্রু' এই ফার্সী প্রবাদ সর্বত্র খাটে না।

পিছনে দুই সর্দারজী বড্ড ভ্যাচর ভ্যাচর করতে লাগল। ইষ্টবেঙ্গল নাকি ফাইনাল পর্যন্ত উঠেছে নিতান্ত লাক্‌সে কপাল জোরে, ওরা নাকি বড্ড রাফ খেলে (সবুট গোর্খার সঙ্গে রাফ্ খেলবে ইষ্টবেঙ্গল !) আর পদে পদে নাকি অফ-সাইড্। ইচ্ছে হচ্ছিল লোকটাকে দু'ঘা বসিয়ে দি কিন্তু তার বপুটা দেখে সাহস হল না।

* * *

খেলার পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই আমার মনে দৃঢ়প্রত্যয় হল ইস্ট-বেঙ্গল নিশ্চয় জিতবে। দশ মিনিটের ভিতর গোর্খারা গোটা চারেক ফাউল করলে আর ইস্টবেঙ্গল গোটা তিনেক গোল দেবার মোকা নির্মমভাবে মিস করলে। একবার তো বলটা গোল-বারের ভিতরে লেগে দুম করে পড়ে গেল গোল লাইনের উপর। গোলি সেটা তড়িঘড়ি সরিয়ে ফেললে। আমি দু'হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে বললুম, হে মা কালী, বাবা মৌলা আলী, তোমাদের জোড়া পাঁঠা দেব, কিন্তু এরকম আস্কারা দিয়ে মস্কোরা কোরো না, মাইরি।' বলেই মনে পড়ল 'মাইরি' কথাটা এসেছে 'মেরি' থেকে। থুড়ি থুড়ি বলে 'দুর্গা, দুর্গা, দুর্গতি-নাশিনী'কে স্মরণ করলুম।

হাফ-টাইম হতে চলল গোল আর হয়না—এ কী গব্বযন্তনা রে, বাবা। ওদিকে অবশ্য ফাউলের সংখ্যা কমে গিয়েছে—রেফারি দেখলুম বেজায় দড় লোক। কেউ ফাউল করলে তার কাছে ছুটে গিয়ে বেশ দু'কথা শুনিয়েও দেয়। জীতা রহো বেটা। ফাউলগুলো সামলাও, তারপর ইস্টবেঙ্গলকে ঠ্যাকাবে কেডা।

নাঃ, হাফ-টাইম হয়ে গেল। খেল তখনো আঁটকুড়ী—গোল হয় নি।

ওহে চানাচুর-বাদামা-ভাজা, এদিকে এসো তো, বাবা। না, থাক, শরবতই খাই। চেঁচাতে চেঁচাতে গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে। চ্যালাই পয়সাটা দিলে ; তা দেবে না ? যখন হুইসিল দিতে জানে না। রেফারি আর কবার হুইসিল বাজালে ? সমস্তক্ষণ তো বাজালুম আমিই।

* * *

হাফ-টাইমের পর খেলাটা যদি দেখতেন ! গপাগপ আরম্ভ হল পোলো দিয়ে রুই ধরার মত গোল মারা।

আমি তো খেলার রিপোর্টার নই, তাই কে যে কাকে পাস করলে, কে কতখানি প্যার্টন উইভ করলে, কে কজন দুশমনকে নাচালে লক্ষ্য করি নি, তবে এটা স্পষ্ট দেখলুম, বলটাই যেন মনস্থির করে ফেলেছে, সবাইকে এড়িয়ে গোর্খার গোলে ঢুকবেই ঢুকবে। একে পাশ কাটিয়ে, ওর মাথার উপর দিয়ে, কখনো বা

তিন কদম পেছিয়ে গিয়ে, কখনো বা কারো দু'পায়ের মধ্যিখানের ফাঁক দিয়ে বলটা হঠাৎ দেখি বলটা ধাঁই করে হাওয়ায় চড়ে গোর্খা গোলের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃৎপিণ্ডটা এক লম্ফ দিয়ে টনসিলে এসে আটকে গিয়েছে—বিকৃতস্বরে বেরল 'গো—অ—অ—ল!' ('রূপদর্শী' দ্রষ্টব্য)।

ফুটবল ভাষায় একটি তীব্র 'সট'-এর ('Sot'—Shot নয়) ফলে গোলটি হল।

পিছনের সর্দারজী বললেন, 'ইয়ে গোল বচানা মুশকিল নহী থা।'

আমি মনে মনে বললুম, 'সাহিত্যে একে আমরা বলি, "মুখবন্ধ"। এরপর আরো গোটা দুই হলে তোমার মুখ বন্ধ হবে। লোকটা জোরোলো না হলে—।'

* * *

এ সব ভাবাভাবির পূর্বেই আরেকখানা সরেস গোল হয়ে গিয়েছে। কেউ দেখল, কেউ না। একদম বেমালুম। তারই ধকল কাটাতে কাটাতে আরেকখানা, তিসরা অতিশয় মান-মনোহর গোল! সেটি স্পষ্ট দেখতে পেলুম। ও গোল কেউ বাঁচাতে পারত না। দশটা গোলি লাগিয়ে দিলেও না।

এবার ম্যানেজারকে অভিনন্দন জানানো যেতে পারে। উঠে গিয়ে তাকে জোর শ্যাকহ্যান্ড করলুম। ভারী খুশি। আমায় বললে, 'প্রত্যেক গোলে আপনার রি-একশন লক্ষ্য করছিলুম। আমরা আমাদের কথা রেখেছি (অর্থাৎ ফাইনালে উঠেছি) আর আপনিও আপনার কথা রেখেছেন (আমি কথা দিয়েছিলুম ওরা ফাইনাল জিতবেই)।' তার সঙ্গী তো আমার হাতখানা কপালে ঠেকালে।

মোরগ যে রকম গটগট করে গোবরের ঢিবিতে ওঠে আমি তেমনি আমার চেয়ারে ফিরে এলুম। ভাবখানা, তিনটে গোলই যেন নিতান্ত আমিই দিয়েছি।

তারপর শাঁ করে আরো একখানা।

দশ-বারো মিনিটের ভিতর ধনাধন চারখানা আদি ও অকৃত্রিম, খাঁটি, নির্ভেজাল গোল।

পিছনের সর্দারজী চুপ।

চ্যালাকে বললুম, 'চলো বাড়ি যাই। খেলা কি করে জিততে হয়, হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলুম তো!'

রাত্রে সব খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানাতে গেলুম। গিয়ে দেখি এক ঢাউস ট্রফি। সঙ্গে আরেকটা বাচ্চা। বললুম, 'বাচ্চাটাই ভালো। বড়টা রাখা শক্ত (উভয়ার্থে)।'

ওদের-ই বিস্তর নাইন-নাইণ্টি পুড়িয়ে বাড়ি ফিরলুম।

বেমক্কা

বন্ধুবর

গুলাম কুদ্দুসকে—

লোকসঙ্গীত ও বিদগ্ধ সঙ্গীতে যে পার্থক্য সেটা সহজেই আমাদের কানে ধরা পড়ে, তেমনি লোকসাহিত্য ও বিদগ্ধ সাহিত্যের পার্থক্য সম্বন্ধেও আমরা বিলক্ষণ সচেতন। আর্টের যে-কোনো বিভাগেই—নাট্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য—তা সে যাই হোক না কেন, এই বিদগ্ধ এবং লোকায়ত রসসৃষ্টির মধ্যে পার্থক্যটা আমরা বহুকাল ধরে করে আসছি।

তাই বলে লোকসঙ্গীত কিম্বা গণ-সাহিত্য নিন্দনীয় এ-কথা কোনো আলংকারিকই কখনো বলেন নি। বাউল ভাটিয়াল বর্বরতার লক্ষণ কিম্বা বারমাসী যাত্রাগান রসসৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে না, এ-কথা বললে আপন রসবোধের অভাব ঢাক পিটিয়ে বলা হয় মাত্র।

কিন্তু যখন এই লোকসঙ্গীত বা লোকনৃত্য শহরের মাঝখানে স্টেজের উপর সাজিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাড়ম্বরে শোনানো এবং দেখানো হয়, তখনই আমাদেব আপত্তি। যখনই বলা হয় এই সাঁওতাল নাচের সামনে ভরতনৃত্যম হার মানে কিম্বা বলা হয় এই 'রাবণবধ' পালা 'ডাকঘরে'র উপর ছক্কা-পাঞ্জা মেরেছে—তোমরা অতিশয় বেরসিক বর্বর বুর্জুয়া বলে এ তত্ত্বটা বুঝতে পারছো না, তখন নিরীহ বুর্জুয়া হওয়া সত্ত্বেও আপত্তি না করে থাকতে পারি নে।

কথাটা খুলে বলি। লোকসঙ্গীত (এবং বিশেষত গণ-নৃত্য) ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পার্থক্য অনেক জায়গায় আছে, কিন্তু একটা পার্থক্য এস্থলে বলে নিলে আমার প্রতিবাদের মূল তত্ত্বটা পাঠক সহজেই ধরে নিতে পারবেন। এই ধরুন, সাঁওতাল কিংবা গুজরাতের গরবা নাচ। এগুলো গণ-নৃত্য এবং এর সবচেয়ে বড় জিনিস এই যে, এ নাচে সমাজ বা শ্রেণীর সকলেই হিস্যাদার। চাঁদের আলোতে, না-ঠাণ্ডা না-গরম আবহাওয়াতে জনপদবাসী যখন দুদণ্ড ফুর্তিফাতি করতে চায়, তখন তারা সকলেই নাচতে শুরু করে। যাদের হাড় বড্ড বেশী বুড়িয়ে গিয়েছে তারা ঘরে শুয়ে থাকে, কিন্তু যারা আসে তাদের কেউই নাচ থেকে বাদ যায় না। হয় নাচে, না হলে ঢোল বাজায়—বাচ্চা কোলে নিয়ে আধ-বয়সী মাদেরও নাচের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় না। তাই বলা যেতে পারে সাঁওতাল কিম্বা গরবা নাচ—অর্থাৎ তাবৎ গণ-নৃত্যই—নাচা হয় আপন আনন্দের জন্য, লোককে দেখানোর জন্য, কিম্বা 'লোক দেখানো'র জন্য নয়। অর্থাৎ লোকনৃত্যে দর্শক থাকে না।

কিন্তু যখন উদয়শংকর নাচেন তখন আমরা সবাই ধেই ধেই করে নেচে উঠি নে, কিম্বা যখন খানসায়েব চোখ বন্ধ করে জয়জয়ন্তী ধরেন তখন আমরা আর সবাই চেল্লাচেল্লি করে উঠি নে। ইচ্ছে যে একদম হয় না সে-কথা বলতে পারি নে, তবু যে করি নে তার একমাত্র কারণ উদয়শংকরের সঙ্গে পা মিলিয়ে কিম্বা খানসাহেবের সঙ্গে গলা মিলিয়ে রসসৃষ্টি আমরা এক মুহূর্তের তরেও করতে পারি

নে। (যদি পারতুম তবে উদয়শঙ্করের নাচ দেখবার জন্য, খানসাহেবের গান শোনবার জন্য গাঁটের পয়সা খরচ করতুম না—কিম্বা বলতে পারেন, সিংগীর গলায় আপন মাথা ঢোকাতে পারলে সার্কাসে যেতুম না)।

তাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কিংবা নৃত্যের জন্য শ্রোতা এবং দর্শকের প্রয়োজন।

লোকনৃত্যে যখন সবাই হিস্যা নিতে পারে আপন পা চালিয়েই, তখন এ কথা আশা করি সকলেই মেনে নেবেন যে, সে নৃত্য খুব সরল হওয়াই স্বাভাবিক। তাতে সূক্ষ্ম পায়ের কাজ থাকার কথা নয়, ভাবভঙ্গী প্রকাশের জন্য দুর্বোধ্য মুদ্রা সেখানে থাকতেই পারে না এবং তাই বলা যেতে পারে, সে নৃত্যে আর যা থাকে থাকুক, বৈচিত্র্য থাকতে পারে না!

তাই গণ-নৃত্য মাত্রই একঘেয়ে।

কমুনিস্ট ভায়ারা (কমরেডরা) মনস্থির করেছেন গণ-কলা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ কলা এবং সেই গণ-নৃত্য শহরে বুর্জুয়াদের দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে হবে। তাই মেহন্নত, ততোধিক তকলিফ বরদাস্ত করে তাঁরা শহরে স্টেজ খাটান, পর্দা ঝোলান, রঙ-বেরঙের আলোর ব্যবস্থা করেন আর তারপর চালান হৈদ্রাবাদী কিম্বা কুয়াম্বতুরেরও হতে পারে,—জানি নে, ধোপার নাচ। কিম্বা গুজরাতী গরবা! বলেন, 'পশ্য, পশ্য'—থুড়ি, 'দ্যাখ, দ্যাখ, এরেই কয় লাচ।'

পূর্বেই নিবেদন করেছি গণ-নৃত্য নিন্দনীয় নয়, কিন্তু যে গণ-নৃত্য একঘেয়ে এবং বৈচিত্র্যহীন হতে বাধ্য, সেই নাচ দেখতে হবে ঝাড়া আধঘণ্টা ধরে? ঘন ঘন হাততালি দিয়ে বলতে হবে 'মরি, মরি'? দু-চার মিনিটের তরে যে এ নাচ দেখা যায় না, সে কথা বলছি নে।

আলো-অন্ধকারে ভিনু গাঁয়ে যাচ্ছেন, দেহ ক্লান্ত, মন অবসন্ন, চাঁদ উঠি উঠি করেও উঠছেন না—এমন সময় দেখতে পেলেন গাঁয়ের মন্দিরের আঙিনায় একপাল মেয়ে মাথায় ছ্যাঁদা-ওলা কলসীতে পিদিম রেখে চক্কর বানিয়ে ধীরে ধীরে মন্দ মধুর পা ফেলে নাচছে। জানটা তর হয়ে গেল। দু মিনিট দাঁড়িয়ে আলোর নাচ আর মেয়েদের গান, 'সোনার দেওর, আমার হাত রাঙাবার জন্য মেহেদী এনেছ কি?' দেখে নিলেন। কিন্তু তারপর? যে নাচ আস্তে আস্তে বিকাশের দিকে এগিয়ে যায় না, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী, পদবিন্যাসের ভিতর দিয়ে যে নাচ পরিসমাপ্তিতে পৌঁছয় না, সে নাচ দেখবেন কতক্ষণ ধরে? এ-নাচের পরিসমাপ্তি কোনো রসসৃষ্টির আভ্যন্তরীণ কারণে হয় না, এর পরিসমাপ্তি হয় নর্তকীরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েন তখনই।

আলো-অন্ধকার, চাঁদ উঠি-উঠি, শ্যাওলামাখা ভাঙা দেউলের পরিবেশ থেকে হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে-নিয়ে-আসা নৃত্য শহরের স্টেজে মূর্ছা তো যায় বটেই, তার উপর মাইক্রোফোনযোগে চিৎকার করে তারস্বরে আপনাকে বলা হয় 'এ নাচ বড় উমদা নাচ—'। এ নাচ আপনাকে দেখতে হয় আধঘণ্টা ধরে! আধঘণ্টা ধরে দেখতে হয় সেই নাচ, যার সর্ব পদবিন্যাস মুখস্থ হয়ে যায় আড়াই মিনিটেই।

পনরো টাকার সীটে বসে (টাকাটা দিয়েছিলেন আমার এক গোলাপী

অর্থাৎ নিম-কমুনিস্টি কমরেড) আমি আর থাকতে না পেরে মুখে আঙুল পুরে শিটি দিয়েছিলুম প্রাণপণ। হৈ হৈ রৈ রৈ। মার মার কাট কাট। এ কী বর্বরতা ?

আমি বললুম, 'কেন বাওয়া, আপত্তি জানবার এই তো প্রলেটারিয়েটস্ট অব দি প্রলেটারিয়েট কায়দা।'

আমরা হাসি কেন ?

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে কবিগুরু বিশ্বভারতী সাহিত্য-সভায় এক খ্যাতনামা লেখকের সদ্য-প্রকাশিত একটা রচনা পাঠ করেন। রচনার আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল, 'আমরা হাসি কেন' ?

এতদিন বাদে আজ আর সব কথা মনে নেই, তবে এইটুকু স্পষ্ট স্মরণে পড়ছে যে, বের্গসন হাসির কারণ অনুসন্ধান করে যে সব তত্ত্বকথা আবিষ্কার করেছিলেন, প্রবন্ধটি মোটের উপর তারই উপর খাড়া ছিল।

প্রবন্ধ পাঠের পর রবীন্দ্রনাথ আপন বক্তব্য বলেন।

সভায় উপস্থিত অন্যান্য গুণীরাও তখন নানারকম মতামত দেন এবং সবাই মিলে প্রাণপণ অনুসন্ধান করেন, 'আমরা হাসি কেন' ? যতদূর মনে পড়ছে, শেষ পর্যন্ত সর্বজনগ্রাহ্য কোনো পাকাপাকি কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না।

পরদিন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন সভার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'হাসির কারণ বের করতে গিয়ে সকলের চোখের জল বেরিয়ে গিয়েছিল।' (ঠিক কি ভাষায় তিনি জিনিসটে রসিয়ে বলেছিলেন আজ আর আমার সম্পূর্ণ মনে নেই— আশা করি আচার্য অপরাধ নেবেন না)।

* * *

দিল্লীর ফরাসিস ক্লাবের ('সের্কল ফ্রাসেঁ' অর্থাৎ 'ফরাসী-চক্র') এক বিশেষ সভায় মসিয়ে মার্তে নামক এক ফরাসী গুণী গত বুধবার দিন ঐ একই বিষয় নিয়ে অর্থাৎ 'আমরা হাসি কেন ?' একখানি প্রামাণিক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ফরাসী রাজদূত এবং আরো মেলা ফরাসী-জাননেওয়ালা ফরাসী অফরাসী ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন। ফরাসী কামিনীগণ সর্বদাই অত্যুত্তম সুগন্ধ ব্যবহার করেন বলে ক্ষণে ক্ষণে মনে হচ্ছিল আমি বুঝি প্যারিসে বসে আছি।

(এ কিছু নূতন কথা নয়—এক পূর্ববঙ্গবাসী শিয়ালদা স্টেশনে নেমেও গেয়েছিলেন,—

ল্যামা ইসটিশানে গাড়ির থনে
মনে মনে আমেজ করি
আইলাম বুঝি আলী-মিয়ার রঙমহলে
ঢাহা জেলায় বশ্যাল ছাড়ি।)

শুধু প্যারিস নয় আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন 'কোতি,' 'উবিগাঁর' খুশবায়ের দোকানে বসে আছি।

ডাঃ কেসকর উত্তম ফরাসী বলতে পারেন। তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করে প্রাঞ্জল ফরাসীতে বক্তার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বের্গসন আর সেই চিরন্তন কারানুসন্ধান, 'হাসি কেন'? আমি তো নাকের জলে চোখের জলে হয়ে গেলুম—ত্রিশ বৎসর পূর্বে যে রকমধারা হয়েছিলুম—কিন্তু তবু কোনো হদিস মিলল না।

কিন্তু সেইটে আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, এই দিল্লী শহর যে ক্রমে ক্রমে আন্তর্জাতিক মহানগরী হতে চলল সেইটেই বড় আনন্দের কথা।

এতদিন ধরে আমরা ইয়োরোপকে চিনতে শিখলুম ইংরেজের মাধ্যমে এবং তাতে করে মাঝে মাঝে আমরা যে মারাত্মক মার খেয়েছি, তার হিসেব-নিকেশ এখনো আরম্ভ হয় নি। একটা সামান্য উদাহরণ নিন।

ইংরেজের আইরিশ স্টু, মাটন রোস্ট আর প্লাম পুডিং খেয়ে খেয়ে আমরা ভেবেছি ইয়োরোপবাসী মাত্রই বুঝি আহারাদি বাবতে একদম হটেনটট। তারপর যেদিন উত্তম ফরাসী রান্না খেলুম, তখন বুঝতে পারলুম, ক্রোয়াসাঁ রুটি কি রকম উপাদেয়, একটি মামুলী অমলেট বানাতে ফরাসী কতই না কেরদানি-কেরামতি দেখাতে পারে, পাকা টমাটো, কাঁচা শসা আর সামান্য লেটিসের পাতাকে একটুখানি মালমশলা লাগিয়ে কী অপূর্ব স্যালাড্ নির্মাণ করতে পারে। মাস্টার্ড, উস্টারসস আর বিস্তর গোলমরিচ না মাখিয়েও যে ইয়োরোপীয় রান্না গলাধঃকরণ করা যায় সেইটি হৃদয়ঙ্গম হল ফরাসী রান্না খেয়ে।

তাই আমার আনন্দ যে, ধীরে ধীরে একদিন ফ্রান্সের সঙ্গে আমাদের মোলাকাত এ-দেশে বসেই হবে।

সের্কল ফ্রাসেঁ দিল্লীবাসীকে তার জন্য তৈরী করে আনছেন।

* * *

প্রবন্ধ পাঠের পর মসিয়ো মার্তে কয়েকটি রসালো গল্প বলেন। তিনি যে অনবদ্য ভাষায় এবং তার সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী সঞ্চালনে গল্পগুলো পেশ করেছিলেন সে জিনিস তো আর কালি-কলমে ওতরাবে না—তাই গল্পটি পছন্দ না হলে মসিয়োর নিন্দা না করে দোষটা আমারই ঘাড়ে চাপাবেন।

এক রমণী গিয়েছেন এক সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে। তিনি ডাক্তারের ঘরে ঢুকতেই ডাক্তার তাঁকে কোনো কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই আধঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। অতি কষ্টে সুযোগ পাওয়ার পর রমণী বললেন, 'ডাক্তার, আমাকে অতশত বোঝাচ্ছেন কেন? আমি এসেছি আমার স্বামীর চিকিৎসা করাতে।'

ডাক্তার বললেন, 'ও! তাঁর কি হয়েছে?'

রমণী বললেন, 'ঠিক ঠিক বলতে পারব না তবে এইটুকু জানি, তাঁর বিশ্বাস তিনি সীল মাছ।'

'বলেন কি? তা, তিনি এখন কোথায়?'

'তিনি বারান্দায় বসে আছেন।'

'তাঁকে নিয়ে আসুন তো, দেখি, ব্যাপারটা কি।'

ভদ্রমহিলা বাইরে গিয়ে সঙ্গে নিয়ে এলেন একটা সীল মাছ।

গাইড

দিল্লীতে একটি সরকারী টুরিস্ট ব্যুরো বসেছে। তার প্রধান কর্ম টুরিস্টদের সদুপদেশ দেওয়া, এটা সেটা করে দেওয়া এবং বিচক্ষণ গাইডের তদারকিতে শহরের যাবতীয় দ্রষ্টব্য বস্তু দেখানো।

এই সম্পর্কে এক ভদ্রলোক খবরের কাগজে চিঠি লিখতে গিয়ে জানিয়েছেন, দিল্লীতে বিচক্ষণ গাইডের বিলক্ষণ অভাব। আমি পত্রলেখকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

'পাণ্ডা' এবং 'গাইড' হরেদেরে একই মাল। তীর্থস্থলের গাইডকে পাণ্ডা বলা হয়—তাই গয়াতে আপনি পাণ্ডা ধরেন, কিংবা বলুন, পাণ্ডা আপনাকে ধরে—আর ঐতিহাসিক ভূমি এবং তীর্থক্ষেত্রের যদি সমন্বয় ঘটে তবে সেখানে পাণ্ডা এবং গাইডের সমন্বয় হয়। যেমন জেরুজালেম। তিন মহা ধর্ম—ক্রীশ্চান, ইহুদী এবং মুসলমান—এখানে এসে সম্মিলিত হয়েছে। তার উপর জেরুজালেমের অভেজাল ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। ফলে পৃথিবীর হেন দেশ হেন জাত নেই যেখান থেকে তীর্থযাত্রী (পাণ্ডার বলির পাঁঠা) এবং টুরিস্ট (গাইডের কুরবানীর বকরী) জেরুজালেমে না আসে।

দিল্লী অনেকটা জেরুজালেমের মত। এর ঐতিহাসিক মূল্য তো আছেই, তীর্থের দিক দিয়ে এ জায়গা কম নয়। চিশতী সম্প্রদায়ের যে পাঁচ গুরু এদেশে মোক্ষলাভ করেছেন তাঁদের তিনজনের কবর দিল্লীতে। কুতুব-মিনারের কাছে কুৎব উদ্‌দীন বখতিয়ার কাকীর (ইনি ইলতুৎমিশ-অলতমশের গুরু) কবর, হুমায়ুনের কবরের কাছে নিজাম উদ্‌দীন আওলিয়ার কবর (ইনি বাদশা আলা উদ্‌দীন খিলজী এবং মুহম্মদ তুগলকের গুরু) আর দিল্লীর বাইরে শেষ গুরু নাসির উদ্‌-দীন 'চিরাগ-দিল্লী'র কবর। আর কালকাজী, যোগমায়া তো আছেনই।

এ সব জায়গায় পাণ্ডারা যা গাঁজাগুল ছাড়ে সে একেবারেই অবর্ণনীয়। এদিকে বলবে এটা হচ্ছে আকবরের দুধ-ভাইয়ের কবর, ওদিকে বলবে, তিন হাজার বছরের পুরনো এই কবরের উপরকার এমারত!

বেঙ্গল কেমিকেলের আমার এক সুহৃদ গিয়েছিলেন বৃন্দাবন। পাণ্ডা দেখালে এক দোলনা—ভক্তিভরে বললে, এ দোলায় দোল খেতেন রাধাকৃষ্ণ পাশাপাশি বসে। বন্ধুটি নাস্তিক নন, সন্দেহপিশাচ। বললেন, 'যে কড়ির সঙ্গে দোলনা ঝোলানো রয়েছে, তাতে তো লেখা রয়েছে, টাটা কোম্পানির নাম; আমি তো জানতুম না, টাটা এত প্রাচীন প্রতিষ্ঠান।'

পরদিন বৃন্দাবন থেকে সজল নয়নে বিদায় নেবার বেলা বন্ধু সে জায়গায় গিয়ে দেখেন, কড়িতে প্রাণপণ পলস্তারার পর পলস্তারা রঙ লাগানো হচ্ছে।

* * *

দিল্লীতে ভালো গাইডের সত্যই অভাব। সখা এবং শিষ্য শ্রীমান বিবেক ভট্টাচার্য কপালী লোক। তিনি কখনো কখনো ভালো গাইড পেয়ে যান—সে বিষয়ে তিনি 'দেশে' মনোরম প্রবন্ধ লিখেছেন কিন্তু সচরাচর আপনার কপালে এখানে যা গাইড জুটবে তারা না জানে ইতিহাস এবং না পারে ছড়াতে গাঁজা-গুল।

ভালো গাইড মানে কথকঠাকুর, আর্টিস্ট। তাঁর কর্ম হচ্ছে, ইতিহাস আর কিম্বদন্তী মিলিয়ে মিশিয়ে আপনাকে গল্পের পর গল্প বলে যাওয়া, আর সে সব গল্প শুনে আপনি এত খুশী যে দিনের শেষে তাঁকে পাঁচ টাকা দিতে আপনার বুক কচকচ করে না।

একদা ভিয়েনা শহরে আমি এই রকম একটি গাইড পেয়েছিলুম। শহরের দ্রষ্টব্য বস্তু দেখাতে দেখাতে বললে, 'এই দেখুন শ্যোনব্রুন প্রাসাদ। রাজাধিরাজ ফ্রান্‌ৎস্‌য়োসেফ এখানে বেলকনিতে দাঁড়িয়ে দেখতেন পল্টনের কুচকাওয়াজ। দেশ-বিদেশের গেরেমভারী রাজকর্মচারী রাজদূতেরা হুজুরের চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে দেখতেন আমাদের শৌর্য বীর্য আমাদের ঐশ্বর্য। তারপর হুজুরে বেরতেন সোনার-পাত মোড়া গাড়িতে, বীবীসাহেবা বেরতেন রুপোর গাড়িতে। আহা, কোথায় গেল সে সব দিন!'

খানিকক্ষণ পর বাড়ি ফেরার পথে গাইড বলল, 'দেখুন দেখুন, এই ছোট্ট বাড়িখানা, ফ্রান্‌ৎস্‌য়োসেফ যে রকম রাজার রাজা ছিলেন, ঠিক তেমনি সঙ্গীতে রাজার রাজা বেটোফেন দৈন্যে-ক্লেশে কাতর হয়ে এই লজঝড় বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর শেষ কটি সিমফনি—সেই ত্রিলোকবিখ্যাত স্বর্গীয় সঙ্গীতসুধা কে না পান করেছে বলুন—তিনি এইখানেই রচেছিলেন।'

আমি করজোড়ে সে বাড়িকে নমস্কার করলুম দেখে গাইডের হৃদয়ে বিষাদে হরিষ দেখা দিল। ট্যাক্সিওয়ালাকে বললে, 'একটুখানি চক্কর মেরে বেটোফেন যে বাড়ীতে দেহ-ত্যাগ করেছিলেন সেইটে দেখিয়ে দাও।'

সে বাড়ির সামনে আমরা দুজনাই নিস্তব্ধ! এই জীর্ণ শীর্ণ দরিদ্র গৃহে রাজাধিরাজ বেটোফেন দেহত্যাগ করলেন।

* * *

আমরা বাড়ি ফিরছি। হঠাৎ গাইড ট্যাক্সিওয়ালাকে বললেন, 'একটু তাড়াতাড়ি চালাও বাছা, ঐ পাশের বাড়িতে আমার শাশুড়ি থাকেন, খাণ্ডার রমণী, পাছে না দেখে ফেলে!'

আচার্য তুচ্চি

দিল্লীর ইন্ডিয়ান কালচারেল এসোসিয়েশন গত শুক্রবার দিন ইতালির খ্যাতনামা অধ্যাপক জিয়োসেপ্পে তুচ্চিকে এক সভায় নিমন্ত্রণ করে সাদর অভ্যর্থনা জানান। সভাস্থলে ইতালির রাজদূত ও শ্রীযুক্তা তুচ্চিও উপস্থিত ছিলেন।

ভারত-তিব্বত-চীনের ইতিহাস এবং বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি, বিকাশ এবং দেশদেশান্তরে তার প্রসার সম্বন্ধে আজকের দিনে অধ্যাপক তুচ্চির যে

জ্ঞান আছে তার সঙ্গে বোধ হয় আর কারোর তুলনা করা যায় না। বিশেষ করে মহাযান বৌদ্ধধর্মের যে সব শাস্ত্র সংস্কৃতে লোপ পেয়ে গিয়েছে কিন্তু তিব্বতী এবং চীনা অনুবাদে এখানে পাওয়া যায়, সেগুলো থেকে অধ্যাপক তুচ্চি নানাপ্রকারের তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করে বৌদ্ধধর্মের যে ইতিহাস নির্মাণ করে যাচ্ছেন, সে ইতিহাস ভারতের গৌরব বর্ধন করে চলেছে। ঠিক বলতে পারব না কিন্তু অনুমান করি, প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরে তিনি এই কর্মে নিযুক্ত আছেন। তাঁর স্বাস্থ্য এখনো অটুট ; তাই আশা করা যেতে পারে তিনি আরো বহু বৎসর ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যার সেবা করতে পারবেন।

* * *

ইতালির ইস্কুলে থাকতেই তুচ্চি সংস্কৃত শিখতে আরম্ভ করেন। কলেজে ঢোকার পূর্বেই তাঁর মহাভারত, রামায়ণ ও কালিদাসের প্রায় সব কিছুই পড়া হয়ে গিয়েছিল—টোলে না পড়ে এতখানি সংস্কৃত চর্চা এই ভারতেরই কটি ছেলে করতে পেরেছে ? কলেজে তুচ্চি সংস্কৃতের বিখ্যাত অধ্যাপক ফরমিকির সংস্রবে আসেন। অধ্যাপক ফরমিকির নাম এদেশে সুপরিচিত নয়, কিন্তু ইতালির পণ্ডিত মাত্রই জানেন, সে দেশে সংস্কৃত-চর্চার পত্তন ও প্রসারের জন্য তিনি কতখানি দায়ী। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর ছিল অবিচল অনুরাগ এবং গভীর নিষ্ঠা। অধ্যাপক তুচ্চি তাঁর অন্যতম সার্থক শিষ্য।

* * *

অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি, উইনটারনিৎস ও লেসনি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করে স্বদেশে চলে যাওয়ার পর এদেশ থেকে রবীন্দ্রনাথ নিমন্ত্রণ করেন অধ্যাপক ফরমিকি এবং তুচ্চিকে। ১৯২৫এ এঁরা দুজন ভারতবর্ষে আসেন।

অধ্যাপক ফরমিকি শান্তিনিকেতনে সংস্কৃত পড়াবার সুযোগ পেয়ে বড় আনন্দিত হয়েছিলেন। একদিন তিনি আমাকে বলেন, 'জানো', সমস্ত জীবনটা কাটল ছাত্রদের সংস্কৃত ধাতুরূপ আর শব্দরূপ শিখিয়ে। রসিয়ে রসিয়ে কাব্য-নাট্য পড়ানো আরম্ভ করার পূর্বেই তাদের কোর্স শেষ হয়ে যায়—তারা তখন স্বাধীনভাবে সংস্কৃত-চর্চা আরম্ভ করে দেয়। জীবনে এই প্রথম শান্তিনিকেতনে সুযোগ পেলুম পরিণত-জ্ঞান ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাব্যনাট্য পড়ার। ব্যাকরণ পড়াতে হচ্ছে না, এটা কি কম আরামের কথা।'

এবং আশ্চর্য, আমার মত মূর্খদেরও তিনি অবহেলা করতেন না। এবং ততোধিক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর—কঠিন জিনিস সরল করে বোঝাবার। সাংখ্য বেদান্ত তখনো জানতুম না, এখনো জানি নে, কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে বসুমতী বেহুনের বাড়ির বারান্দায় মোড়াতে বসে সাংখ্য এবং বেদান্তের প্রধান পার্থক্য তিনি কি অদ্ভুত সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলেছিলেন। তিতিক্ষু পাঠক অপরাধ নেবেন না, যদি আজ এই নিয়ে গর্ব করি যে, অধ্যাপক ফরমিকি আমাকে একটুখানি স্নেহের চোখে দেখতেন। রাস্তায় দেখা হলেই, সাংখ্য বেদান্তের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বাজিয়ে নিতেন, যা শিখিয়েছেন আমার ঠিক ঠিক মনে আছে কি না।

হেমলেট চরিত্রের সাইকো-এনালেসিস ইয়োরোপে তিনিই করেন প্রথম। হেমলেট যে কেন প্রতিবারে তার কাকাকে খুন করতে গিয়ে পিছু-পা হত সে কথা তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন।

* * *

গুরু পড়াতেন সংস্কৃত আর শিষ্য পড়াতেন ইতালিয়ান। অধ্যাপক তুচ্চির অন্যতম মহৎ গুণ, তিনি ছাত্রের মনস্তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখে অধ্যাপনা করেন। আমরা একটুখানি ইতালিয়ান শিখে নিয়ে বললুম, এইবারে আমরা দানুন্‌দ্‌জিয়ো পড়ব।

তুচ্চি বললেন, 'উপস্থিত মাদ্‌জিনি পড়ো।'

তারপর বুঝিয়ে বললেন, 'তোমরা এখন স্বাধীনতার জন্য লড়ছো। তোমাদের চিন্তাজগতে এখন স্বাধীনতা কি, স্বাধীনতা-সংগ্রাম কাকে বলে এই নিয়ে তোলপাড় চলছে। আর এসব বিশ্লেষণ মাদ্‌জিনি যে রকম করে গিয়েছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীকে তিনি যে রকম উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন এ রকম আর কেউ কখনো পারেন নি। তোমাদের চিন্তাধারার সঙ্গে এগুলো মিলে যাবে, ভাষা-শেখাটাও তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবে।'

হলও তাই। অধ্যাপক তুচ্চি শান্তসমাহিত গম্ভীর প্রকৃতির পণ্ডিত নন—তাঁর ধাঁচ অনেকটা ফরাসিস। অল্পেতেই উত্তেজিত হয়ে যান আর মাদ্‌জিনির ভুবন-বিখ্যাত বক্তৃতাগুলোতে যে উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রচুরতম খোরাক রয়েছে তা যাঁরা মাদ্‌জিনি পড়েছেন তাঁরাই জানেন—এমন কি এই গত বিশ্বযুদ্ধের সময়ও চার্চিল মাদ্‌জিনির বক্তৃতা আপন বক্তৃতায় কাজে লাগিয়েছেন। তুচ্চি পড়াতে পড়াতে উৎসাহে দাঁড়িয়ে উঠতেন আর দিক্‌চক্রবালের দিকে হাত বাড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে মাদ্‌জিনির ভাষায় বলতেন,

"আভান্তি, আভান্তি ও ফ্রাতেল্লি।"

"অগ্রসর হও, অগ্রসর হও, হে ভ্রাতৃবৃন্দ—"

'আসবে সে দিন আসবে, যেদিন নবজীবনের সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে তোমরা পিছন পানে তাকাবে—পিছনের সব কিছু তখন এক দৃষ্টিতেই ধরা পড়বে, তার কোনো রহস্যই তোমাদের কাছে তখন আর গোপন রইবে না ; যেসব দুঃখবেদনা তোমরা একসঙ্গে সয়েছ সেগুলোর দিকে তাকিয়ে তোমরা তখন আনন্দের হাসি হাসবে।'

এসব সাহসের বাণী সর্বমানবের সুপরিচিত। আমরা যে উৎসাহিত হয়েছিলুম তাতে আর বিচিত্র কি ?

* * *

তারপর দীর্ঘ সাতাশ বৎসর কেটে গিয়েছে। এর ভিতর অধ্যাপক তুচ্চি পাণ্ডুলিপির সন্ধানে ভরেত-তিব্বত বহুবার ঘুরে গিয়েছেন এবং তাঁর পরিশ্রমের ফল ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডার এবং ইতালীর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

ইতালির প্রাচ্যবিদ্যামন্দির আচার্য তুচ্চির নিজের হাতে গড়া বললে অত্যুক্তি করা হয় না। শুধু যে সেখানে সংস্কৃত, পালির চর্চা হয় তাই নয়,

বাঙলা, হিন্দী শেখাবার ব্যবস্থাও সেখানে আছে, এবং চীনা, জাপানী, তিব্বতী ভাষার অনুসন্ধান করে ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস সেখানে লেখা হচ্ছে। ইতি-মধ্যে তুচ্চি নিজে যে সব প্রাচীন পুস্তক প্রকাশ করেছেন, যে সব সারগর্ভ পুস্তক রচনা করেছেন, তার সম্পূর্ণ তালিকা দিতে গেলেই এ গ্রন্থের আরো দু পৃষ্ঠার প্রয়োজন হবে।

* * *

সম্বর্ধনা-সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আচার্য তুচ্চি বলেন, 'বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারত-ইতালীতে যে ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগসূত্র স্থাপিত ছিল সে কথা আপনারা সকলেই জানেন (দক্ষিণ-ভারতে আজও প্রতি বৎসর বহু রোমান মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়), কিন্তু সেইটেই বড় কথা নয়। ভারত-ইতালির আত্মায় আত্মায় যে ভাব বিনিময় হয়েছিল সেইটেই সবচেয়ে মহান তত্ত্ব এবং সেই তত্ত্বানুসন্ধান করে নূতন করে আমাদের ভাবের লেনদেন, আদানপ্রদান করতে হবে।

'আমি ইতালিতে যে প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছি সেটিকে সফল করবার জন্য আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি।'

* * *

আমরা একবাক্যে বলি ভগবান আচার্য তুচ্চিকে জয়যুক্ত করুন ॥

নিশীথদা

কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র, খ্যাতনামা ব্যারিস্টার, নিঃস্বার্থ দেশসেবক শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এদেশের বহু গুণী জ্ঞানী, বহু প্রখ্যাত কর্মী তাঁর সংস্রবে এসেছিলেন—এমন কি, একথা বললে ভুল বলা হবে না যে, দেশসেবা করেছেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত নিশীথ সেনের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয় নি, এরকম লোক বাঙলা দেশ দেখে নি। তাই নির্ভয়ে বলতে পারি, কৃতী নিশীথ সেনের কর্মজীবনের প্রশস্তি কীর্তন করার লোকের অভাব হবে না।

আমি কিন্তু নিশীথদাকে সেভাবে চিনি নি। আমি তাঁকে পেয়েছিলুম বন্ধুরূপে, তাঁর জীবন-অপরাহ্নে। তিনি তখন কলকাতার ভিতর-বাইরে এতই সুপরিচিত যে প্রথম আলাপের দিন কেউ আমাকে বুঝিয়ে বলল না, নিশীথ সেন বলতে কি বোঝায়। তারপর নানা রকম গাল-গল্পের মাঝখানে কে যেন আমাকে বলল, 'আনন্দবাজারে যে ইংরেজকে কটু-কাটব্য আরম্ভ করেছ (আমি তখন 'সত্যপীর' নাম নিয়ে ঐ কাগজে কলমে ধার দিচ্ছি) তার আগে খবর নিয়েছ কি, "সিডিশন", "ডিফেমশন", মহারাণীর বিরুদ্ধে লড়াই", এসব জিনিসের অর্থ কি?' আমি কোনো কিছু বলবার আগেই নিশীথ সেন বললেন, 'আমরাই জানি নে, উনি জানবেন কি করে? আপনি তো দর্শনে ডক্টর, না?' আমি সবিনয়ে বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' নিশীথ সেন আমার দিকে চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, 'ইংরেজ তার সমালোচককে জেলে ঠেলাবার জন্য যেসব আইন-কানুন

বানিয়েছে, সেগুলো কোন্ স্থলে প্রযোজ্য, কাকে সেই ডাণ্ডা দিয়ে ঠ্যাঙানো যায়, তার টীকাটিপ্পনী, নজীর-দলিল ইংরেজ আপন হাতেই রেখেছে। সুবিধেমত কখনো সেটা টেনে টেনে রবারের মত লম্বা করে, কখনো ফাঁদ ঢিলে করে পাখিকে উড়ে যেতেও দেয়। এই দেখুন না, লোকমান্য টিলককে যে আইনের জোরে জেলে পুরল, সে আইন ওরকমধারা কাজে লাগানো যায়, সে কথা একেবারে আনাড়ি উকিলও মানবে না। তবু টিলককে তো জেলে যেতে হল। তাই সিডিশন কিসে হয় আর কিসে হয় না, সেকথা ঝানু উকিলরা পর্যন্ত আগেভাগে বলতে পারে না। ইংরেজ যদি মনস্থির করে আপনাকে আলিপুর পাঠাবে তবে সে তখন আপনার বিরুদ্ধে অনেক নূতন-পুরাতন আইন বের করবে। আমরা—অর্থাৎ উকিল ব্যারিস্টাররা—তখন তার বিরুদ্ধে লড়ি, সব সময়ে যে হারি, তাও বলতে পারি নে।' তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'আমার ফোন নম্বরটা জানেন তো? কোনো অসুবিধে হলে ফোন করবেন। আমি যা পারি করে দেব।'

প্যারীদা কান পেতে শুনছিল, লক্ষ্য করি নি। তক্ষুনি বললে, 'নম্বরটা টুকে নাও, ওহে আলী। কাজে লাগবে।'

পরে খবর নিয়ে জানতে পারলুম, নিশীথদা কত বড় ডাকসাইটে ব্যারিস্টার এবং তার চেয়েও বড় কথা, সেই আলিপুরের আমল থেকে আজ পর্যন্ত পাঁচজনের জানাঅজানাতে কত অসংখ্যবার ফীজ না নিয়ে বিপ্লবীদের জন্য লড়েছেন। লোকটির প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠলো।

কিন্তু থাক এসব কথা। পূর্বে নিবেদন করেছি, এসব কথা গুছিয়ে বলবার জন্য লোকের অভাব হবে না।

নিশীথদা প্রায় আমার বাপের বয়সী ছিলেন, কিন্তু কি করে তিনি যে একদিন দাদা হয়ে গেলেন এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলুম, তাঁকে 'তুমি' বলতে আরম্ভ করে দিয়েছি সে শুধু যাঁরা নিশীথদাকে চিনতেন তাঁরাই বলতে পারবেন।

একই প্লেনে শিলং গেলুম, সেখানে প্যারীদার বাড়ীতে উঠলুম। সিগার ফুঁকতে ফুঁকতে আমার ঘরে ঢুকে খাটের একপাশে বসে বললেন, 'কবি (বিশ্ব সাক্ষী, আমি কবি নই), চমৎকার ওয়েদার, বাইরে এসো।' বাইরে মুখোমুখি হয়ে বসলুম, তিনি নানা রকমের প্রাচীন কাহিনী বলে যেতে লাগলেন; অরবিন্দ ঘোষ, সুরেন বাঁড়ুয্যে, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, রাসবিহারী ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, আশুতোষ মুখুজ্যে, আব্দুর রসুল এঁদের সম্বন্ধে এমন সব কথা বললেন, যার থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে, কতখানি পাণ্ডিত্য, কত গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা থাকলে পরে মানুষ এত সহজে বাঙলা দেশের পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস এবং তার কৃতী সন্তানদের জীবনী একবার মাত্র না ভেবে অনর্গল বলে যেতে পারে। আজ আমার দুঃখের অবধি নেই, কেন সেসব কথা তখন টুকে রাখলুম না।

আমি মূর্খের মত মাঝে মাঝে আপত্তি উত্থাপন করেছি এবং খাজা গবেটের

মত আইন নিয়েও। নিশীথদার চোখ তখন কৌতুক আর মৃদু হাস্যে জ্বলজ্বল করে উঠত। চুপ করে বাধা না দিয়ে শুনতেন। তারপর মাত্র একদিন চোখা যুক্তি দিয়ে আমাকে দু'টুকরো করে কেটে ফেলতেন। আমার তাতে বিন্দুমাত্র উত্তাপ বোধ হয় নি। তাই শেষের দিকে যখন যে সব জিনিস নিয়ে আমি মনে মনে দম্ভ পোষণ করি, এই লোকটির সংস্রবে আসতে পেরেছি বলে।

কী অমায়িক অজাতশত্রু পুরুষ! আর কী একখানা স্নেহকাতর হৃদয় নিয়ে জন্মেছিলেন তিনি! আইন আদালতের খররৌদ্র তাঁর সে শ্যামমনোহর হৃদয়ে সামান্যতম বাণ হানতে পারে নি।

তাঁর বয়স তখন সত্তর। সেই শিলঙে একদিন সকাল বেলা দেখি, ড্রেসিং গাউনের পকেটে হাত পুরে বারান্দায় ঘন ঘন পাইচারি করছেন, মুখে সিগার নেই। কথা কয়ে ভালো করে উত্তর পাইনে। কি হয়েছে, ব্যাপার কি নিশীথদা?

তিনি দিন ধরে স্ত্রীর চিঠি পান নি।

সে কি নিশীথদা, সত্তর বছর বয়সে এতখানি?

সেই জ্বলজ্বলে চোখ—সে চোখ দুটি কেউ কখনো ভুলতে পারে—দিয়ে বললেন, 'কবি, সব জানো, সব বোঝো, কিন্তু বিয়ে তো করো নি, তাহলে এটাও বুঝতে।'

নিশীথদা বউদিকে বড্ড ভালোবাসতেন। আমি জানি নিশীথদা আরো কিছুদিন কেন এ সংসার থাকলেন না।

ফেব্রুয়ারি মাসে অখণ্ডসৌভাগ্যবতী শ্রীমতী শোভনা ইহলোক ত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে নিশীথদার জীবনের জ্যোতি যেন নিভে গিয়েছিল।

আজ বোধ হয় নিশীথদার আর কোন দুঃখ নেই—আমাদেরও দুঃখের অন্ত নেই।

ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি॥

পরিমল রায়

পরিমল রায়ের অকালমৃত্যুতে কেউ সখা, কেউ গুরু, কেউ সহকর্মী, কেউ প্রতিবেশী এবং দিল্লী শহর একটি উৎকৃষ্ট নাগরিক থেকে বঞ্চিত হল।[১] মৃত্যুকালে পরিমল রায় নিউইয়র্কে ছিলেন কিন্তু এ আশা সকলেই মনে মনে পোষণ করতেন যে আমেরিকায় বহু প্রকারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তিনি আবার দিল্লীতেই ফিরে আসবেন এবং তাঁর বন্ধুবান্ধব, তাঁর শিষ্যমণ্ডলী তথা বাংলা সাহিত্যামোদীজন তাঁর সে অভিজ্ঞতার ফল লাভ করতে সক্ষম হবেন।

পরিমল রায় সত্যই নানা গুণের আধার ছিলেন।

একদা "মৌলানা খাফী খান" আমাকে একটি ক্ষুদ্র বিতর্ক-সভাতে নিয়ে যান। সে সভাতে পরিমল রায় ভারতবর্ষে কি প্রকারে কলকব্জা কারখানা

১ স্বর্গীয় পরিমল রায়ের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সহানুভূতি জানাই।

ফ্যাক্টরী তৈরী করার জন্য পুঁজি সংগ্রহ করা যেতে পারে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এরকম আলোচনা আমি জীবনে কমই শুনেছি। পরিমল রায় জানতেন, তাঁর শ্রোতারা অর্থনীতি বাবদে এক একটি আস্ত 'বিদ্যাসাগর'; তাই তিনি এমন সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় মূল বক্তব্যটি বলে গেলেন যে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং সে পাণ্ডিত্যকে অজ্ঞজনের সামনে নিতান্ত স্বতঃসিদ্ধ দৈনন্দিন সত্যরূপে প্রকাশ করার অলৌকিক পদ্ধতি দেখে আমি মুগ্ধ হলুম। তাঁর ভাষণ শেষ হলে আমি দু-একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলুম। আমার প্রশ্ন শুনে তিনি বাঘা পণ্ডিতের মত খেঁকিয়ে উঠলেন না। অতিশয় সবিনয়ে তিনি আমার দ্বিধা-গুলোকে এক লহমায় সরিয়ে দিলেন। আমার আর শ্রদ্ধার অন্ত রইল না। পণ্ডিতজনের বিনয় মূর্খের চিত্তজয় করতে সদাই সক্ষম।

সেদিন তাঁর সঙ্গে আলাপচারি হয় নি। তার কয়েকদিন পরে আরেক সভাতে তাঁর সঙ্গে দেখা। শুধালেন, 'চিনতে পারছেন কি?'

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ'। আর সঙ্গে সঙ্গে গড় গড় করে তাঁর ভাষণের আটটি পয়েন্ট একটার পর একটা আউড়ে গেলুম। এ আমার স্মৃতিশক্তির বাহাদুরি নয়। এর কৃতিত্ব সম্পূর্ণ পরিমল রায়ের। পূর্বেই নিবেদন করেছি, পরিমল রায় তাঁর বক্তব্য এমন চমৎকার গুছিয়ে বলতে পারতেন যে, একবার শুনলে সেটি ভুলে যাওয়ার উপায় ছিল না। আজ যে বিশেষ করে পরিমল রায়ের শিষ্যেরাই সবচেয়ে বেশি শোকাতুর হয়েছেন, সেটা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

কিন্তু এসব কথা থাক। অর্থনীতিতে পরিমল রায়ের পাণ্ডিত্য যাচাই করার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই।

নিছক সাহিত্যিকের চেয়ে যাঁরা আর পাঁচটা কাজে জড়িত থেকেও সাহিত্য চর্চা করেন, তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে আমি বড়ই উল্লসিত হই। পেটের ধান্দার একটা হেস্তনেস্ত কোনোগতিকে করে নেওয়ার পর যে লোক তখনো বাণীকে স্মরণ করে, সে ব্যক্তি পেশাদারী সাহিত্যসেবীর চেয়েও শ্রদ্ধার পাত্র। পরিমল রায়ের কর্তব্যবোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ম ছিল বলে তাঁর বেশী সময় কাটত অধ্যাপন অধ্যয়নে। তারপর যেটুকু সময় বাঁচত তাই দিয়ে তিনি বাণীর সেবা করতেন।

এবং সকলেই জানেন সাহিত্যকদের দুটি মহৎ গুণ তাঁর ছিল। তাঁর পঞ্চেন্দ্রিয় রসের সন্ধানে অহরহ সচেতন থাকত এবং তিনি সে রস বড় প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠকের সামনে তুলে ধরে দিতে পারতেন। পরিমল রায়ের চোখে পড়ত দুনিয়ার যত সব উদ্ভট ঘটনা, আর সে সব উদ্ভট ঘটনাকে অতিশয় সাদামাটা পদ্ধতিতে বর্ণনা করার অসাধারণ ক্ষমতা তিনি পরিশ্রম করে আয়ত্ত করেছিলেন।

এদেশের লোকের একটা অদ্ভুত ভুল ধারণা আছে যে, রসিক লোক ভাঁড়ের শামিল। এ ভুল ধারণা ভাঙাবার জন্যই যেন পরিমল রায় বাঙলা দেশে জন্ম নিয়েছিলেন। সকলেই জানেন, তিনি কথা বলতেন কম, আর তাঁর প্রকৃতি ছিল গম্ভীর—একটুখানি রাশভারি বললেও হয়তো বলা ভুল হয় না।

চপলতা না করেও যে মানুষ সুরসিক হতে পারে পরিমল রায় ছিলেন তার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ; আমাদের নমস্য 'পরশুরাম' এস্থলে পরিমল রায়ের অগ্রজ।

আর যে গুণের জন্য পরিমল রায়কে আমি মনে মনে ধন্য বলতুম সেটা তাঁর লেখনী সংযম। এ গুণটি বাংলা দেশে বিরল। ভ্যাজর ভ্যাজর করে পাতার পর পাতা ভর্তি না করে আমরা সামান্যতম বক্তব্য নিবেদন করতে পারি নে। সংক্ষেপে বলার কায়দা রপ্ত করা যে কি কঠিন কর্ম সেটা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যকে বোঝানোর চেষ্টা পণ্ডশ্রম। এ গুণ আয়ত্ত করার জন্য বহু বৎসর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। তিন লাইনে যে নন্দলাল এখখানা হাসিমুখ এঁকে দিতে পারেন কিম্বা একটি মাত্র 'সা' দিয়ে আরম্ভ করেই যে ওস্তাদ শ্রোতাকে রসাপ্লুত করতে পারেন তার পশ্চাতে যে কত বৎসরের মেহন্নত আর হয়রানি আছে সে কি দর্শক, শ্রোতা বুঝতে পারে?

তাই আমার শোকের অন্ত নেই যে, বহুদিনের তপস্যার ফলে যখন পরিমল রায়ের আপন সংক্ষিপ্ত নিরলঙ্কার ভাষাটি শান দেওয়া তলওয়ারের মত তৈরী হল, যখন আমরা সবাই এক গলায় বললুম, 'ওস্তাদ, এইবারে খেল দেখাও' ঠিক তখন তিনি তলওয়ারখানা ফেলে দিয়ে অন্তর্ধান করলেন।

এই তো সেদিনকার লেখা। একটি মোটা লোক রায়ের বাড়ির সামনে দিয়ে রোজ ঘোঁত ঘোঁত করে বেড়াতে বেরোন। আরেকটি রোগাপটকা পনপন করে সেই সময় বেড়াতে বেরোয়। একজনের আশা ঘোঁতঘোঁতিয়ে রোগা হবে, আরেকজনের বাসনা পনপনিয়ে সে মোটা হবে। ফলং? যথা পূর্বম্ তথা পরম্।

এ জিনিস চোখের সামনে নিত্যি নিত্যি হচ্ছে। কিন্তু কই, আমরা তো লক্ষ্য করি নি। পরিমল রায় এ তত্ত্বটি আবিষ্কার করে এমনি কায়দায় সামনে তুলে ধরলেন যে, এখন রোগা মোটা যে কোন লোককে যখন ঘোঁত ঘোঁত কিম্বা পনপন করতে দেখি তখন আর হাসি সামলাতে পারি নে।

আমার বড় আশা ছিল পরমিল রায় দেশে ফিরে এসে মার্কিনদের নিয়ে হাসির হর্‌রা, মজার বাজার গরম করে তুলবেন। দ্বিজেন্দ্রলাল, সুকুমার রায়, পরশুরাম এঁরা কেউ মার্কিন মুল্লুক যান নি। আশা ছিল পরিমল রায়ের মার্কিন-বাস রসের বাজারে আসর জমাবে।

একটি আড়াই ছত্রের টেলিগ্রামে সব আশা চুরমার হল। কাকে সান্ত্বনা দিই? আমিই সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছি নে॥

মপাসাঁ

বাঙালায় বলি, 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না,' পদ্মার ওপারে বলি,—

'পীর মানে না দেশে-খেশে,
পীর মানে না ঘরের বউয়ে,'

আর পশ্চিমারা বলেন, 'ঘরকী মুর্গী দাল বরাবর' অর্থাৎ পরে পোষা মুর্গী

মানুষ এমনি তাচ্ছিল্য করে খায়, যেন নিত্যকার ডাল-ভাত খাচ্ছে।

কিন্তু একবার গাঁয়ের কদর পাওয়ার পর আবার যে মানুষ গেঁয়ো যোগী হতে পারে, সে সম্বন্ধে কোনো প্রবাদ আমার জানা নেই। কিন্তু তাই হয়েছে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মপাসাঁর বেলায়।

মাস তিনেক পূর্বে মপাসাঁর কয়েকখানা চিঠি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তারি সমালোচনা করতে গিয়ে ফরাসী একাডেমির সদস্য—অর্থাৎ তিনি অতিশয় কেষ্ট-বিষ্টু জন—মসিয়ো আঁদ্রে বিইঈ (Billy) মপাসাঁ সম্বন্ধে মিঠে-কড়া দু-চারটি কথা বলেছেন।

এক ফরাসী সাহিত্য-প্রচারক নাকি বিইঈকে বললেন, 'কেম্ব্রিজের ছেলে-মেয়েরা আজকাল যে মপাসাঁ পড়ে, সে শুধু অস্বাস্থ্যকর কৌতূহল নিয়ে।' (অর্থাৎ মপাসাঁর যৌন গল্পগুলোই তারা পড়ে বেশি)। উত্তরে বিইঈ বললেন, 'বিদেশীরা, বিশেষত কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ডের লোক আজকাল আর মপাসাঁ পড়ে না, তারা পড়ে প্রুস্ত, ভালেরি, মালার্মে, র‍্যাঁবো। মপাসাঁর কদর এখনো আছে জর্মনি এবং রাশায়। খুদ ফ্রান্সে ছোকরাব দল তো মপাসাঁকে একদম পাঁচের বাদ দিয়ে বসে আছে। ভুল করেছে না ঠিক করেছে? কিছুটা ভুল কিছুটা ঠিক—কারণ মপাসাঁ একদিক দিয়ে যেমন অত্যাশ্চার্য কলাসৃষ্টি করেছেন, অন্যদিকে আবার অত্যন্ত যাচ্ছেতাইও লিখেছেন।'

এ সম্পর্কে মপাসাঁর চিঠি প্রকাশ করতে গিয়ে সম্পাদক মেনিয়াল বলছেন, 'আমেরিকার লোকে মপাসাঁ পড়ে উঁচুদরের ক্লাসিক হিসেবে। মপাসাঁর সর্বাঙ্গসুন্দর ভাষাকে সেখানকার ফরাসী পড়ুয়া মাত্রই আদর্শরূপে মেনে নেয়। তাঁর ভাষার স্বচ্ছতার জন্যই (সে স্বচ্ছতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন আনতোঁল ফ্রাঁসের মত গুণী) আমেরিকাতে মপাসাঁর লেখা উদ্ধৃত করে অন্তত কুড়িখানা পাঠ্য বই বেরিয়েছে।'

উত্তরে বিইঈ সাহেব অবিশ্বাসের সুরে বলেছেন, 'জানতে ইচ্ছে করে, এখনো কি মার্কিন পাঠক মপাসাঁকে এতটা কদর করে? আর ইংলণ্ডের অবস্থা কি? মেনিয়াল তো কিছু বললেন না; আমার মনে হয়, মপাসাঁর লেখাতে যেটুকু খাঁটি ফরাসী ইংরেজ সেটা এড়িয়ে চলে।'

চলতে পাবে, নাও চলতে পারে। সে কথা উপস্থিত থাক। এর পর কিন্তু বিইঈ সায়েব যেটা বলেছেন সেটা মারাত্মক। সকলেই জানেন, মপাসাঁ ছিলেন ফ্লবেরের অতি প্রিয় শিষ্য—ফ্লবের তাঁকে হাতে ধরে লিখতে শিখিয়েছিলেন। বিইঈ বলছেন, 'ফ্লবের তাঁর প্রিয় শিষ্যের কোনো দোষই দেখতে পেতেন না, কিন্তু তিনি পর্যন্ত বেঁচে থাকলে মপাসাঁর অত্যধিক (Surabondant=Superabundant) লেখার নিন্দা করতেন।'

এ কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না, তবে এ সম্পর্কে হিটলারের একটা মন্তব্য মনে পড়ল। হিটলার বলতেন, 'আজকালকার ছোকরারা বড্ড

১ M. Edouard Mayniai এবং Artine Artinian কর্তৃক প্রকাশিত Correspondance inedite.

বেশি বই পড়ে আর তার শতকরা নব্বুই ভাগ ভুলে যায়। তার চেয়ে যদি দশখানা বই পড়ে ন'খানা মনে রাখতে পারে, তবে সেই হয় ভালো।' মাস্টার হিসেবে আমার জানা আছে, দশখানা বই পড়লে ছেলেরা ভুলে মেরে দেয় ন'খানা। কিম্বা বলতে পারেন পাঁচ দুগুণে দশের শূন্য নেমে হাতে রইবে পেন্সিল!

মপাসাঁ যদি তাঁর লেখার ত্রিশ ভাগ কমিয়ে দিতেন, তবে সে ত্রিশ ভাগে কি শুধু তাঁর খারাপ লেখাগুলিই—বিইঈর বিচারে—পড়ত? কাটা পড়ত দুইই। তাহলে অন্তত শতকরা কুড়িটি উত্তম গল্প আমরা পেতুমই না। ইংরেজিতে বলে 'টবের নোংরা জল ফেলার সময় বাচ্চাকেও ফেলে দিয়ো না।' ফেলা যায় বলেই এ সতর্কবাণী!

ভাল লেখা বার বার পড়ি। খারাপ লেখা একবার পড়ে না পড়লেই হল।

কিন্তু মোদ্দা কথায় আসা যাক।

ইংরেজি, জর্মন, রাশান, স্পানিশ, এমন কি আরবী, ফারসী বাঙলা, উর্দু নিন এমন কোন্ সাহিত্য আছে যে মপাসাঁর কাছে ঋণী নয়? ছোট গল্প লেখা আমরা শিখলুম কার কাছ থেকে? উপন্যাসের বেলা বলা শক্ত কে কার কাছ থেকে শিখল, কিন্তু ছোট গল্প লেখা সবাই শিখেছেন মপাসাঁর কাছ থেকে। কিম্বা দেখবেন রাম যদি শ্যামের কাছ থেকে শিখে থাকেন, তবে শ্যাম শিখেছেন মপাসাঁর কাছ থেকে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মপাসাঁর কাছে ঋণী—যদিও জানি অসাধারণ প্রতিভা আর অভূতপূর্ব সৃষ্টিশক্তি ধারণ করতেন বলে রবীন্দ্রনাথ বহুতর গল্পে মপাসাঁকে ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে গিয়েছেন। গীতিরস ছিল রবীন্দ্রনাথের হস্তস্থলে—মপাসাঁর যেখানে ছিল কিঞ্চিৎ অনটন—তাই ছোট গল্পে গীতিরস সঞ্চার করে তিনি এক নূতন রসবস্তু গড়ে তুললেন, কবিতাতে সুর দিয়ে যে রকম ঐন্দ্রজালিক গান সৃষ্টি করেছিলেন।

শেষ কথা, কার ভাণ্ডার থেকে মানুষ সবচেয়ে বেশি চুরি করেছে? যে কোনো একখানা হেজিপেজি মাসিক হাতে তুলে নিন। দেখবেন ভালো গল্পটি মপাসাঁর লোপাট চুরি—দেশকালপাত্র বদলে দিয়ে। আর আশ্চর্য মপাসাঁর বেলাই এ জিনিসটা করা যায় সব চেয়ে বেশি কারণ তাঁর অধিকাংশ গল্পই সব কিছুর সীমানা ছাড়িয়ে যায়।

এত চুরির পরও যাঁর ভাণ্ডার অফুরন্ত তিনি প্রাতঃস্মরণীয়।।

রামমোহন রায়

ভারত এবং আরব ভূখণ্ডের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অদান-প্রদান কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে, তার সম্যক আলোচনা এখনো হয় নি। গোড়ার দিকে যেসব সংস্কৃত বইয়ের আরবী তর্জমা হয়, সেগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অনুবাদকদের সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান খুব গভীর ছিল না। পরবর্তী যুগে দেখা দিলেন এক পণ্ডিত, যাঁর সঙ্গে তুলনা দিতে পারি, এমন পণ্ডিত পৃথিবীতে কমই জন্মেছেন।।

সেই দশম-একাদশ শতাব্দীতে যখন 'ম্লেচ্ছে'র পক্ষে সংস্কৃত শেখার কোন

পন্থাই উন্মুক্ত ছিল না, তখন গজনীর মামুদ বাদশার সভাপণ্ডিত আল-বীরুনী অতি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত শিখে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গসুন্দর চর্চা করে আরবী ভাষাতে একখানা অতি উপাদেয় প্রামাণিক গ্রন্থ লেখেন। বইখানি সে-যুগের হিন্দু জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের একখানা ছোটখাট বিশ্বকোষ বলা যেতে পারে।

পাঠান যুগে আরবী-ফার্সীতে কিঞ্চিৎ সংস্কৃত চর্চা হয়, কিন্তু আসল চর্চা আরম্ভ হয় আকবরের সময় এবং আল-বিরুনীর পর যদি সত্য পণ্ডিতের অনুসন্ধান কেউ করে তবে যেতে হয় আকবরের পৌত্রের যুগে, শাহ্‌জাহানের পুত্র দারা-শীকুহ'র কাছে। আরবী-ফার্সী-সংস্কৃত এ তিন ভাষাতেই তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ এবং ভক্তিমার্গে—তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক—হেন সূক্ষ্মতত্ত্ব নেই, যা তাঁর পাণ্ডিত্যের চৌহদ্দীর বাইরে পড়ে।

তারপর ভারতবর্ষের যে অবিশ্বাস্য অধঃপতন আরম্ভ হয়, তার ইতিহাস সকলেই জানেন। টোল-চতুষ্পাঠী, মক্তব-মাদ্রাসার, সংস্কৃত এবং আরবী-ফার্সী কোন গতিকে বেঁচে রইল মাত্র—এর বেশি জোর করে কিছু বলা যায় না।

তারপর এই হতভাগ্য ভারতবর্ষেই এই আমাদের পরম শ্লাঘার সম্পদ এই বাংলা দেশেই জন্মালেন এক বাঘাপণ্ডিত, এক 'জবরদস্ত মৌলবী'—যিনি কি আল-বিরুনী, কি দারা-শীকুহ যে কারো সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে পারেন।

শুধু তাই নয়, নানা দ্বন্দ্ব নানা সংঘাতের ঊর্ধ্বে যে সত্যশিবসুন্দর আছেন, যাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করলে পরস্পরবিরোধী সংঘাত মাত্রই লোপ পায়, সেই সত্যশিবসুন্দরকে তিনি হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন, মনোজগতে স্পষ্টরূপে ধারণা করতে পেরেছিলেন বহুবিধ ঐতিহ্যের সম্মিলিত সাধনার ভিতর দিয়ে। বাল্যকালে তিনি শিখেছিলেন আরবী-ফার্সী, পরবর্তীকালে সংস্কৃত এবং সর্বশেষে হীব্রু, গ্রীক, লাতিন। হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খ্রীষ্ট—এই চার ধর্মজগতে তিনি অনায়াসে অতি স্বচ্ছন্দে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে, অন্তরের খাদ্য অন্বেষণ করে যে শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন, সে-শক্তি যে শুধু সে-যুগের মূঢ়তা-জড়তাকে জয় করতে পেরেছিল, তাই নয়, সে-শক্তির প্রসাদাৎ পরবর্তী বাঙলা দেশ এবং ভারতবর্ষ যে নব নব অভিযানের পথে বেরিয়েছিল, তার কিঞ্চিৎ কল্পনা আমরা আজ করতে পারি আমাদের অদ্যকার জীবন্মৃত অবস্থা থেকে।

রামমোহন বলতে কি বোঝায়, তার সর্বাঙ্গসুন্দর ধারণা রবীন্দ্রনাথের ছিল, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, তাঁর বহুমুখী পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার সম্যক চর্চা এখনো হয় নি। 'দেশে'র এক পৃষ্ঠা সে কর্মের জন্য প্রশস্ত নয় এবং এ অধম সে-শাস্ত্রাধিকার থেকে বঞ্চিত।

নিপীড়িত হলেই সে ব্যক্তি মহাজন, একথা বলা চলে না, কিন্তু মহাজন মাত্রই নিপীড়িত হন, সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ নেই। রাজার ভাগ্যে

সে নিপীড়িন এসেছিল, চাষীদের কাছ থেকে নয়—সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না—তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন সর্বধর্মের পণ্ডিতগণ।

আরবী ভূমিকা (মুকদ্দমা) সম্বলিত তিনি যে ফার্সী কেতাব রচনা করেন, তার নাম 'তুহফাতু ল্ মুওয়াহ্হিদীন' (একেশ্বরবাদীর উদ্দেশ্যে উপঢৌকন) এবং সে-গ্রন্থে তিনি আল্লার সত্যরূপের যে-বর্ণনা মুসলমান ধর্মশাস্ত্র তন্ন তন্ন করে বয়ান করলেন, সে-রূপ সে-বর্ণনা ক্রিয়াকাণ্ডে নিমজ্জিত তৎকালীন মুসলমান পণ্ডিতজনকে বিন্দুমাত্র উল্লসিত করে নি। পরবর্তী যুগে মৌলবী-মৌলানা, আলি-উলামা তাঁকে জবরদস্ত মৌলবীরূপে স্বীকার করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁকে 'মুতাজিলা' (স্বাধীনচেতা)—গোঁড়ারা যেরকম ভদ্র ব্রাহ্মকে 'বেহ্মজ্ঞানী' নামে দিয়ে তাচ্ছিল্য করেন—নাম দিয়ে তাঁর সৎ ধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার করেছিলেন।

হুবহু সেই বিরুদ্ধাচরণই তো তিনি পেয়েছিলেন 'স্বধর্মী'দের কাছ থেকে। অদ্বৈতের অনুসন্ধানকে ঊনবিংশ শতাব্দী প্রায় ম্লেচ্ছাচারের মত বর্জনীয় বলে মনে করেছিলেন—এ-ইতিহাস সকলেই জানেন।

আবার হুবহু তৃতীয় দফায় তিনি বিরুদ্ধাচরণ পেলেন খ্রীষ্টান মিশনারীদের কাজ থেকে। যে খ্রীষ্টধর্ম তখন বাঙলা দেশে প্রচারিত হচ্ছিল, সে-ধর্ম কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু বা মুসলমান যে কোন ধর্মের চেয়ে কোন দিক দিয়ে আধ্যাত্মিকতায় উৎকৃষ্ট ছিল না। হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মে রামমোহন যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, সেই আগের অনুসন্ধানে তিনি বাইবেলে যে খ্রীষ্টকে আবিষ্কার করলেন, যে-খ্রীষ্ট 'কেরামতি' করেন না, অর্থাৎ তিনি জলকে মদ বানাবার ভেল্কিবাজি দেখান না, সাতখানা রুটি দিয়ে পাঁচ হাজার লোককে পরিতৃপ্ত করার চেষ্টাও করেন না।

যে-খ্রীষ্টান মিশনারীরা এতকাল ধরে রামমোহনের কুসংস্কারবর্জিত স্বাধীন চিন্তাবৃত্তির প্রশংসা করেছিলেন, তাঁরাই হলেন সবচেয়ে বেশি ক্রুদ্ধ উচ্চকণ্ঠে সর্বত্র ঘোষণা করলেন, 'রামমোহন মূর্খ, রামমোহন যীশুকে চিনতে পারে নি, অলৌকিক কর্ম (কেরামতি) বাদ দিলে যে যীশু দাঁড়ান, তিনি প্রকৃত যীশু নন।

হিন্দু-মুসলমান সে-যুগে কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাঁদের বিরুদ্ধে-ব্যবহার রামমোহনকে বিস্মিত কিংবা বিচলিত করে নি। কিন্তু খ্রীষ্টানদের এ ব্যবহারে তিনি নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন—আজ ডীন ইনগ্ সেটা বুঝতে পারবেন।

তিনি ধর্মের গলা-মেলানো একই প্রতিবাদে রামমোহন বিচলিত কিংবা পথভ্রষ্ট হন নি—সে আমাদের পরম সৌভাগ্য ॥

বিশ্বভারতী

কবি, শিল্পী—স্রষ্টামাত্রই স্পর্শকাতর হয়ে থাকেন। এবং সেই কারণেই আর পাঁচজনের তুলনায় এ জীবনে তাঁরা এমন সব বেদনা পান যার সঙ্গে আমাদের কোনো পরিচয় নেই। রাজনৈতিক কিংবা ব্যবসায়ী হতে হলে গণ্ডারের চামড়ার প্রয়োজন—গণ্ডারের চামড়া নিয়ে কোনো কবি আজ পর্যন্ত সার্থক

সৃষ্টি করে যেতে পারেন নি।

জীবনের বহুক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বহু অপ্রত্যাশিত আঘাত পেয়েছিলেন। তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের আশীর্বাদ পান; তৎসত্ত্বেও বাঙলাদেশ বহুদিন ধরে তাঁকে কবি বলে স্বীকার করতে চায় নি। শুধু তাই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে বহু গণ্যমান্য লোক এমন সব অন্যায় আক্রমণ এবং আন্দোলন চালান যে রবীন্দ্রনাথকে হয়তো অল্প বয়সে কীটসের মতো ভগ্নহৃদয় নিয়ে ইহলোক পরিত্যাগ করতে হত। রবীন্দ্রনাথ যে বহু বেদনা পেয়েও কীটসের মতো ভেঙে পড়েন নি তার অন্যতম প্রধান কারণ, ধর্মে তাঁর অবিচল নিষ্ঠা ছিল এবং দ্বিতীয়টি মহর্ষি স্বহস্তে রবীন্দ্রনাথের নৈতিক মেরুদণ্ডটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

এ জীবনে রবীন্দ্রনাথ বহু বেদনা পেয়েছেন এবং তার খবর বাঙালীমাত্রই কিছু না কিছু রাখেন। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, বিশ্বভারতীর নবপ্রতিষ্ঠান উপলক্ষ্যে তারই একটি নিবেদন করি।

১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বভারতীর' প্রতিষ্ঠা করেন কিংবা বলতে পারি যে ইস্কুলটি ('পূর্ব বিভাগ') প্রায় কুড়ি বৎসর ধরে বাঙলা বা বাঙলার বাইরে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিল তার সঙ্গে একটি কলেজ ('উত্তর বিভাগ') যোগ দিয়ে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের নানাপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা করারও ব্যবস্থা হল।

তাই গুরুদেবের বাসনা ছিল, পূর্ব-পশ্চিমের গুণীজ্ঞানীরা যেন শান্তিনিকেতনে সম্মিলিত হয়ে একে অন্যের সহযোগিতায় বৃহত্তর ও ব্যাপকতর সাধনায় নিযুক্ত হন।

সেই মর্মে রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ জানালেন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা পণ্ডিত অধ্যাপক সিলভা লেভিকে। ভারতীয় সংস্কৃতির সর্ববিষয়ে লেভির অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল তো বটেই; তদুপরি বৌদ্ধধর্মে বোধ করি তখনকার দিনে পশ্চিমে এমন কেউ ছিলেন না যিনি তাঁর সামনে সাহস করে দাঁড়াতে পারতেন।

শান্তিনিকেতনে তখন বহুতর পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, শ্রীযুত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় এণ্ড্রুজ এবং পিয়ার্সন, শ্রীযুত নিতাইবিনোদ গোস্বামী, অধ্যাপক কলিন্স্ বগ্দানফ বেনওয়া, ক্রামরিশ, শ্রীযুত মিশ্রজী, শ্রীযুত হিডজিভাই মরিস, শ্রীযুত প্রভাত মুখোপাধ্যায় ও আরো বহু খ্যাতনামা লোক তখন শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করতেন।

সঙ্গীতে ছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কদের ভিতর ছিলেন শ্রীযুত অমিয় চক্রবর্তী, শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশী।[১]

এবং আশ্রমের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সংযুক্ত না হয়েও এক ঋষি আশ্রমটিকে

১ সিংহলের শ্রমণ পণ্ডিতদ্বয় এবং আরও কয়েকজনের নাম ভুলে যাওয়ার জন্য তাঁদের কাছে লজ্জিত আছি।

আপন আশীর্বাদ দিয়ে পুণ্যভূমি করে রেখেছিলেন। বাঙলাদেশ তাঁকে প্রায় ভুলে গিয়েছে। ইনি রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরবর্তীকালে লেভি এঁর পদপ্রান্তে বসবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতনে তখন পণ্ডিত এবং পাণ্ডিত্যের কিছুমাত্র অনটন ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সে ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর সর্বশেষ কপর্দক দিয়ে—এবং এস্থলে ভক্তিভরে একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে এই সব বড় বড় পণ্ডিতেরা যে দক্ষিণা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন সে দক্ষিণা আজকের দিনে দিতে গেলে অনেক অপণ্ডিতও অপমান বোধ করবেন।

কিন্তু ছাত্র ছিল না। বিশ্বভারতী তখন পরীক্ষা নিত না, উপাধিও দিত না।

এখনো আমাব স্পষ্ট মনে আছে, তখনকার দিনে বিশ্বভারতীর অন্যতম প্রধান নীতি ছিল ঃ "দি সিস্টেম অব এগজামিনেশন উইল হ্যাভ নো প্লেস্ ইন বিশ্বভারতী, নর উইল দ্যার বী এনি কন্‌ফারিং অব ডিগ্রীজ।"

এ অবস্থায় বিশ্বভারতীতে অধ্যয়ন করতে আসবে কে ?

তবে এই যে এত অর্থব্যয় করে বিদেশ থেকে পৃথিবীবরেণ্য পণ্ডিত লেভিকে আনানো হচ্ছে ইনি বক্তৃতা দেবেন কার সামনে, ইনি গড়ে তুলবেন কোন্ ছাত্রকে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের তখন কোনো যোগ-সূত্র ছিল না। তবু রবীন্দ্রনাথ ব্যবস্থা করলেন যাতে করে কলকাতার ছাত্ররা শান্তিনিকেতনে এসে সপ্তাহে অন্তত একটি বক্তৃতা শুনে যেতে পারে। শান্তি-নিকেতনে রবিবার অনধ্যায় নয় কাজেই শনিবার বিকেল কিংবা রবির সকালের ট্রেন ধরে যে কোনো ছাত্র কলকাতা থেকে এসে লেভির বক্তৃতা শোনবার সুযোগ পেল।

যেদিন প্রথম বক্তৃতা আরম্ভ হওয়ার কথা সেদিন রবীন্দ্রনাথ খবর নিয়ে জানতে পারলেন কলকাতা থেকে এসেছেন মাত্র দুটি ছাত্র! তারও একজন রসায়নের ছাত্র—আর পাঁচজন যে রকম 'বোলপুর দেখতে' আসে এই সুযোগে সেও সেই রকম এসেছে!

বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রী সংখ্যা তখন বারো জনও হবে না। তার মধ্যে সংস্কৃত পড়তেন জোর চারজন।

এই ছটি ছাত্রের সামনে (অবশ্য পণ্ডিতরাও উপস্থিত থাকবেন) বক্তৃতা দেবেন সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসে ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত লেভি! রবীন্দ্রনাথ বড় মর্মাহত হয়েছিলেন।

তাই প্রথম বক্তৃতায় ক্লাসের পুরোভাগে খাতাকলম নিয়ে বসলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

লেভির আর কোনো খেদ না থাকারই কথা॥

নাগা

৩১শে আগস্ট সংসদে প্রশ্নোত্তরকালে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহর[১] লাল নেহরু বলেন যে, গত ২৪শে মে একদল নাগা ভারতীয় নাগা-অঞ্চলে হানা দেয় ও ৯৩টি মুণ্ডু কেটে নিয়ে চলে যায়।

আসামে মিরি, মিশমি, আবর, আকা, দফলা, কুকী, গারো, লুসাই, খাসী, নাগা ইত্যাদি বহু প্রকারের উন্নত, অনুন্নত, সভ্য অসভ্য জাতি আছে। এদের ভিতর খাসী, লুসাই, গারোরা এবং আরো কয়েকটি জাতি বড়ই ঠাণ্ডা মেজাজের, এবং সবচেয়ে মারাত্মক নাগারা। এরা এখনো পরমানন্দে নরমাংস ভক্ষণ করে এবং কে কতটা শৌর্যশালী তার বিচার হয় কে কটা মুণ্ডু কাটতে পেরেছে তাই দিয়ে!

নাগা পাহাড়ের যে অংশটুকু ইংরেজ দখল করে সেখানে ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর মিশনারি যায় এবং ফলে অনেক নাগা খ্রীষ্টান হয়ে যায়। মিশনরিদের ধর্মপ্রচার ও ইংরেজের আইনকানুনের ভয়ে ব্রিটিশ নাগারা বড় অনিচ্ছায় মানুষ কেটে কেটে খাওয়া বন্ধ করে; কিন্তু স্বাধীন ও বর্মী নাগারা এসব 'ম্লেচ্ছ-সংস্কারে'র কিছুমাত্র তোয়াক্কা না করে সুযোগ পেলেই ব্রিটিশ নাগা অঞ্চলে হানা দিয়ে মুণ্ডু কেটে নিয়ে যেতে থাকে।

বিশেষ করে ব্রিটিশ (বর্তমান ভারতীয়) অঞ্চলেই এরা হানা দেয় কেন?

তার একমাত্র কারণ ব্রিটিশ আইন করে—এবং সে আইন ভারতীয়রাও চালু রেখেছেন—ব্রিটিশ নাগাদের ভিতর এক গ্রাম অন্য গ্রামকে হানা দেওয়ার রেওয়াজ বন্ধ করে দেয়। অবশ্য এ আইন নাগারা চাঁদপানা মুখ করে সয়ে নেয় নি—বিস্তর মার খাওয়ার পর অতি অনিচ্ছায় তারা হানাহানি বন্ধ করে। ফলে তারা নির্বীর্য ও শান্তিপ্রিয় হয়ে পড়ে ও সঙ্গে সঙ্গে হানাহানির জন্য যেসব অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন সেগুলো লোপ পেতে থাকে।

ওদিকে স্বাধীন নাগারা দেখল এ বড় উত্তম ব্যবস্থা। আপসে তারা মাঝে মাঝে হানাহানি করে বটে, কিন্তু সেখানে যেমন অন্যের মুণ্ডুটি কাটবার সম্ভাবনা আছে ঠিক তেমনি নিজের মুণ্ডুটি কাটা যাওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনাও আছে, কারণ উভয় পক্ষই উদয়াস্ত লড়াইয়ের পাঁয়তারা কষে, তীর চোখা রাখে, ধনুকের ছিলা বদলায়। অপিচ ব্রিটিশ নাগারা লড়াই করতে ভুলে গিয়েছে, তীরধনুক যা আছে তা দিয়ে হানাহানি করা যায় না। এদের হানা দিলে প্রাণ যাবার ভয় নেই, গোলায় মজুদ ধান লুট করা যায় আর শুয়ার ছাগল ত নিতান্তই ফাউ। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, একগাদা মুণ্ডু

---

১ বাঙলাতে সাধারণতঃ 'জওহর' লেখা হয় এবং এ ভুল সংশোধন করা উচিত। 'জওহর' কথাটি ফার্সীতে একবচন এবং অর্থ বাংলাতে যা তাই। 'জওয়াহর' কিংবা 'জওয়াহির' শব্দটি 'জওহর' শব্দের আরবী ব্যাকরণসম্মত বহুবচন। পণ্ডিতজী তাঁর নাম বহুবচনে ব্যবহার করেন এবং আমাদেরও তাই করা উচিত। এস্থলে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ফার্সীতে আসলে শব্দটি 'গওহর'; কিন্তু আরবী বর্ণমালায় 'গ' নেই বলে আরবরা 'জওহর' লেখেন পরবর্তী যুগে 'গওহর'ও প্রচলিত হয়। তাই মুসলমানী নাম 'গৌহর' ও জওহর' একই।

কপাকপ কেটে নিয়ে নির্বিঘ্নে বাড়ি চলে যাওয়া যায়। অন্ততপক্ষে একটা মুণ্ডু না দেখাতে পারলে স্বাধীন নাগা অঞ্চলে বউ জোটে না; কাজেই নাগা সম্বরণদের গত্যন্তর কোথায়?

ভারতীয় নাগারা ফরিয়াদ করে আমাদের বলে, 'হানাহানি বন্ধ করে দিয়ে তোমরা আমাদের নির্বীর্য করে ফেলেছ। তাই সই। কিন্তু তার ঝুঁকিটা কি তোমাদেরই নেওয়া উচিত নয়? স্বাধীন নাগারা যখন আমাদের গ্রাম আক্রমণ করে তখন আমরা আত্মরক্ষা করতে অক্ষম। তোমাদের কি তখন কর্তব্য নয় পুলিশ সেপাই রেখে আমাদের বাঁচানো?'

অতি হক কথা। কিন্তু প্রশ্ন, এ কর্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায় কি প্রকারে? আমাদের সেপাইরা যে নাগাদের ডরায় তা নয়, কারণ নাগাদের হাতে বন্দুক থাকে না। গোটা দুত্তিন মেশিনগান দিয়েই এক পাল নাগাকে কাবু করা যায়, কিন্তু বেদনাটা তখন সেখানে নয়। মুশকিল হচ্ছে এই, স্বাধীন নাগারা হানা দেবার পূর্বে শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে দিনক্ষণ জানিয়ে দিয়ে শুভাগমন করে না এবং আমাদের পক্ষেও প্রতি পাহাড়ের চুড়োয় সেপাই মোতায়েন করা সম্ভব নয়।

নাগারা দল বেঁধে গাঁ বানিয়ে সমতলভূমিতে বসবাস করে না। তারা থাকে পাহাড়ের চুড়োয় চুড়োয় এবং সে চুড়োগুলোর উচ্চতা তিন থেকে ছ হাজার ফুট। কাজেই এক পাহাড়ের চুড়ো থেকে যদি দেখাও যায় যে অন্য চুড়ো আক্রান্ত হয়েছে তবু সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতেই সব কেচ্ছা খতম হয়ে যায়।

তবে কি নাগাদের আপন হাতে কিছু কিছু বন্দুক-টন্দুক দেওয়া যায় না? সেখানে মুশকিল হচ্ছে, নাগাদের ঠিক অতটা বিশ্বাস করা যায় না। কারণ বন্দুক পেলে তারা সোল্লাসে অবিচারে অন্য নাগাদের আক্রমণ করবে। তা হলে সে একই কথায় গিয়ে দাঁড়ালো।

নাগারা এই ব্যবস্থাটাই চায়। তারা বলে, তোমরা যখন আমাদের বাঁচাতে পারছ না তখন আমরাই আপন প্রাণ বাঁচাই। এটাতেও আমাদের মন সাড়া দেয় না।

আচ্ছা, তবে কি আমাদের সৈন্যরা স্বাধীন নাগা অঞ্চল আক্রমণ করে তাদের বেশ কিছু ডাণ্ডা বুলিয়ে দিতে পারে না?

পারে। তবে তাতেও ঝামেলা বিস্তর॥

হিন্দু-মুসলমান-কোড বিল

শাস্ত্রে সব পাওয়া যায়—কোনো কিছুর অনটন নেই। সম্পত্তি বিলিয়ে দিতে চান, না বিলিয়ে দিতে চান; পুজো করতে চান, না করতে চান—একখানা কিংবা বিশখানা; পুজো-পাজা করতে চান কিংবা ব্যোম ভোলানাথ বলে বুঁদ হয়ে থাকতে চান, এমন কি মরার পর পরশুরামী স্বর্গে গিয়ে অপ্সরাদের সঙ্গে দুদণ্ড রসালাপ করতে চান কিংবা রবি ঠাকুরী 'কোণের প্রদীপ মিলায় যথা জ্যোতিঃ সমুদ্রেই' হয়ে গিয়ে নির্গুণ নির্বাণানন্দ লাভ

করতে চান, তাবৎ মালই পাবেন।

তা না হলে সতীদাহ বন্ধ করার সময় উভয় পক্ষই শাস্ত্র কপচালেন কেন? বিধবা-বিবাহ আইন পাস করার সময়, শারদা বিলের হাঙ্গামহুজ্জুতের সময় উভয় পক্ষই তো শাস্ত্রের দোহাই পেড়েছিলেন, এ-কথা তো আর কেউ ভুলে যায় নি।

শুধু হিন্দুশাস্ত্র না, ইহুদি খ্রীষ্টান মুসলিম সব শাস্ত্রেরই ঐ গতি। শুধু হিন্দুশাস্ত্র এঁদের তুলনায় অনেক বেশি বনেদী বলে এঁর বাড়িতে দালানকোঠার গোলকধাঁধাঁ ওঁদের তুলনায় অনেক বেশি, পথ হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা পদে পদে। তাতে অবশ্য বিচলিত হওয়ার মত কিছুই নেই, কারণ স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট নাকি বলেছেন, যেহোভার আপন বাড়িতে দালান-কোঠা বিস্তর।

তাই শাস্ত্রের প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা। তাতে ফয়দাও এন্তার। মুসলিম শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ চর্চা করেছি বলেই মোল্লা-মৌলবীকে আমি বড্ড বেশি ডরাই নে। কুঁড়েমি করে জুম্মার নমাজে যাই নি, মোল্লাজী রাগত হয়ে প্রশ্ন শুধালেন, যাই নি কেন? চট করে শাস্ত্র-বচন উদ্ধৃত করলুম, আমি যে জায়গায় আছি সেটাকে ঠিক শহর (মিস্‌র্) বলা চলে না অতএব জুম্মার নমাজ অসিদ্ধ। ব্যস, হয়ে গেল। ঠিক তেমনি বিয়ে যখন করতে চাই নি, তখন আমি শাস্ত্রের দোহাই পেড়েছি আবার ওজীর সাহেব ফজলু ভায়া যখন পরিপক্ক বৃদ্ধ বয়সে তরুণী গ্রহণ করলেন, তখন তিনিও হদীস (স্মৃতি) কপচালেন।

গ্রামাঞ্চলে থাকতে হলে কুইনিনের মতো শাস্ত্র নিত্য সেব্য।

সে কথা থাক।

হিন্দু-রমণী তালাক (লগ্নচ্ছেদ) দিয়ে নবীন পতি বরণ করতে পারবেন কি না, সে সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নে। আমার শিরঃপীড়া, আমার গৃহিণী বেঁকে গিয়ে কিছু একটা করে ফেলবেন না তো! এ প্রশ্ন মনে উঠত না, কিন্তু হিন্দু কোড বিল আসর গরম করে তোলাতে মুসলমান ভায়াদের টনক নড়েছে। খুলে কই।

হঠাৎ এক গুণী খবরের কাগজে পত্রাঘাত করলেন,—তিনি হিন্দু না মুসলমান মনে নেই—হিন্দু রমণী যদি লগ্নচ্ছেদ করবার অধিকার পায়, তবে মুসলমান রমণীতেও সে অধিকার বর্তাবে না কেন? ঠিকই তো। কিন্তু উত্তরে আর পাঁচজন মুসলমান বললেন,—কেউ খেঁকিয়ে, কেউ মুরুব্বীর চালে, কেউ বা হিন্দু ভায়াদের পিঠে আদরের থাবড়া দিয়ে—মুসলমান শাস্ত্র নূতন কোড দিয়ে রদ-বদল করার কোনো প্রয়োজন নেই। মুসলমান রমণীর যে অধিকার আছে তাই নিয়ে তারা সন্তুষ্ট—ওসব মালের প্রয়োজন হিন্দুদের।

লক্ষ্য করলুম, কোনো মুসলমান রমণী খবরের কাগজে এ বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না।

তাই প্রশ্ন, লগ্নচ্ছেদ করার জন্য মুসলমান পুরুষ রমণীর কতটুকু অধিকার? এ আলোচনায় মুসলমানদের কিছুটা লাভ হবে, হিন্দুদের কোনো ক্ষতি হবে না।

মৌলা বখ্‌শ্‌ মিঞা যে-কোনো মুহূর্তে বেগম মৌলাকে তিনবার 'তালাক, তালাক, তালাক' বললেই তালাক হয়ে গেল—স্বয়ং শিবেরও সাধ্য নেই তিনি তখন সে তালাক ঠেকান, এস্থলে 'শিব' বলতে অবশ্য মোল্লা-মৌলবী বোঝায়।

বেগম মৌলা সতীসাধ্বী। আজীবন স্বামীর সেবা করেছেন। তাঁর তিনটি পুত্রকন্যা, সবচেয়ে ছোটটির বয়স দশ কিংবা বারো। তাঁর বাপের বাড়িতে কেউ নেই। তিনি বিগতযৌবনা—বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ তিনি পুনরায় বিয়ে করতে চাইলেও নূতন বর পাবেন না।

বেগম মৌলাকে তদ্দণ্ডই পতিগৃহ ত্যাগ করতে হবে। কাচ্চাবাচ্চাদের উপরও তাঁর কোনো অধিকার নেই—নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য হলে অবশ্য আলাদা কথা।

'তালাক, তালাক, তালাক' বলার জন্য মৌলা সাহেবকে কোনো কারণ দর্শাতে হবে না, কেন তিনি গৃহিণীকে বর্জন করছেন; তাঁর কোন অপরাধ আছে কি না, তিনি অসতী কিংবা চিররুগ্না, কিংবা বদ্ধ উন্মাদ—এর কোনো কারণই দেখাবার জন্য কেউ তাকে বাধ্য করতে পারে না। এস্থলে নিরঙ্কুশ, চৌকশ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'।

(জানি, মৌলা সাহেব হেড আপিসের বড়বাবুর মতো বড় শান্ত স্বভাব ধরেন। হঠাৎ তিনি ক্ষেপে গিয়ে এরকম ধারা কিছু একটা করবেন না, কিন্তু সেকথা অবান্তর। এখানে প্রশ্ন, মৌলার হক কতটুকু, বেগম মৌলারই বা কতটুকু? তুলনা দিয়ে বলতে পারি, ভদ্র হিন্দু সচরাচর বিনা কুসুরে একমাত্র পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন না। কিন্তু কস্মিনকালেও করেন না একথা বললে সত্যের অপলাপ হয়।)

যাঁরা তালাক আইনের কোনো পরিবর্তন চান না, তাঁরা উত্তরে বলবেন, আরে বাপু, তালাক দেওয়া কি এতই সোজা কর্ম? 'মহরে'র কথাটি কি বেবাক ভুলে গেলে? মৌলার মাইনে তিন শ টাকা। 'মহরে'র টাকা পাঁচ হাজার। অত টাকা পাবে কোথায় মৌলা সাহেব?

হিন্দু পাঠককে এই বেলা 'মহর' জিনিসটি কি সেটি বুঝিয়ে বলতে হয়। 'মহর' অর্থ মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে স্ত্রীধন। বিয়ের সময় মৌলাকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়, তাঁর বেগমকে তিনি কতটা স্ত্রীধন দেবেন। মৌলা বলেছিলেন, পাঁচ হাজার (অবস্থাভেদে পঞ্চাশ, একশ, এক হাজার বা পাঁচ লক্ষও হতে পারে) এবং এ প্রতিজ্ঞাও করেছিলেন, বেগম সাহেবা যে-কোনো মুহূর্তে স্ত্রীধন তলব করলে তিনি তদ্দণ্ডেই নগদা-নগদি আড়াই হাজার ঢেলে দেবেন এবং বাকী আড়াই হাজার কিস্তিবন্দিতে শোধ দেবেন।

এসব শুধু মুখের কথা নয়। এ সমস্ত জিনিস বিয়ের রাতে দলিল লিখে তৈরী করা হয় ও পরে 'মেরেজ রেজিস্ট্রারে'র আপিসে পাকাপোক্ত রেজিস্ট্রি করা হয়। মৌলা এ টাকাটা ফাঁকি দিতে পারবেন না, সে কথা সুনিশ্চিত।

উত্তরে নিবেদন:

মৌলার গাঁঠে পাঁচ হাজার টাকা থাক আর নাই থাক, তিনি যে স্ত্রীকে

তালাক দিলেন, সেটা কিন্তু অসিদ্ধ নয়। টাকা না দিতে পারার জন্য শেষ তক্ মৌলার সিভিল জেল হতে পারে, কিন্তু তালাক তালাকই থেকে গেল। অর্থাৎ একথা কেউ মৌলাকে বলতে পারবে না, তোমার যখন পাঁচ হাজার টাকা রেস্ত নেই, তাই তালাক বাতিল, বেগম মৌলা তোমার স্ত্রী এবং স্ত্রীর অধিকার তিনি উপভোগ করবেন।

মোদ্দা কথা, তালাক হয়ে গেল, টাকা থাক আর নাই থাক।

* * *

পুনরায় নিবেদন করি, শাস্ত্র কি বলেন সে-কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না। কুরানশরীফ যা বলেছেন, তার যেসব টীকা-টিপ্পনী লেখা হয়েছে, তার উপর যে বিরাট শাস্ত্র গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে দেশাচার-লোকাচার মিলে গিয়ে উপস্থিত যে পরিস্থিতি বিদ্যমান তাই নিয়ে আমাদের আলোচনা। সেই পরিস্থিতি অনুযায়ী বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষে একে অন্যের উপর কতখানি অধিকার, বিশেষ করে একে অন্যকে বর্জন করার অধিকার কার কতটুকু সেই নিয়ে আলোচনা।

পূর্বেই নিবেদন করেছি স্বামী যে-কোনো মুহূর্তে স্ত্রীকে বর্জন করতে পারেন। তাঁকে তখন কোনো কারণ কিংবা অজুহাত দর্শাতে হয় না। তবে তিনি যে 'মহর' বা স্ত্রীধন দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সে অর্থ তাঁকে দিতে হবে। অবশ্য না দিতে পারলে যে তালাক মকুব হবে তাও নয়। স্ত্রী তাঁর ভূতপূর্ব স্বামীর মাইনে 'অ্যাটাচ' করতে পারেন, আদালতের ডিগ্রি নিয়ে সম্পত্তি ক্রোক করতে পারেন ; এক কথায় উত্তমর্ণ অধমর্ণকে যতখানি নাস্তানাবুদ করতে পারেন ততখানি তিনিও করতে পারেন।

উত্তম প্রস্তাব। এখন প্রশ্ন স্ত্রী যদি স্বামীকে বর্জন করতে চান তবে তিনি পারেন কি না? যদি মনে করুন, স্ত্রী বলেন. 'এই রইল তোমার স্ত্রীধন, আমাকে খালাস দাও' কিম্বা যদি বলেন, তুমি আমাকে যে স্ত্রীধন দেবে বলেছিলে সে স্ত্রীধনে আমার প্রয়োজন নেই, আমি তোমাকে বর্জন করতে চাই, তবু স্বামী সাফ 'না' বলতে পারেন। অবশ্য স্ত্রী স্বামীকে জ্বালাতন করার জন্য তাঁর স্ত্রীধন তদ্দণ্ডেই চাইতে পারেন—কারণ স্ত্রীধন তলব করার হক স্ত্রীর সব সময়ই আছে, স্বামী তালাক দিতে চাওয়া না-চাওয়ার উপর সেটা নির্ভর করে না। স্বামী যদি সে ধন দিতে অক্ষম হন তা হলেও স্ত্রী তালাক পেলেন না। অর্থাৎ তিনি যদি পতিগৃহ ত্যাগ করে ভিন্ন বিবাহ করতে চান তবে সে বিবাহ অসিদ্ধ ; শুধু তাই নয়, পুলিশ স্ত্রী এবং নবীন স্বামী দুজনের বিরুদ্ধে 'বিগেমি'র মোকদ্দমা করতে পারবে।

পক্ষান্তরে আবার কোনো স্ত্রী যদি স্ত্রীধনটি ভ্যানিটি-ব্যাগস্থ করে বাপের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকেন তবে স্বামীও তাঁকে জোর করে আপন বাড়িতে নিয়ে আসতে পারেন না। আইন স্বামীকে সে অধিকার দেয়, কিন্তু আনবার জন্য পুলিশের সাহায্য দিতে সম্পূর্ণ নারাজ। আপনি যদি জোর করে আনতে যান তবে শালী-শালাজের হস্তে উত্তমমধ্যমের সমূহ সম্ভাবনা।

তখন আপনি আর কি করতে পারেন? তাঁকে তালাক দিয়ে হৃদয় থেকে

মুছে ফেলবার চেষ্টা করতে পারেন আর আপনি যদি প্রতিহিংসা-পরায়ণ হন তবে আপনি তালাক না দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারেন। তাতে করে আর কিছু না হোক স্ত্রী অন্তত আরেকটা লোককে বিয়ে করতে পারবেন না।

খুব বেশি না হলেও কোনো কোনো সময় এরকম হয়ে থাকে। পরিস্থিতিটা দু রকমের হয়।

হয় স্বামী বদরাগী, কিংবা দুশ্চরিত্র। স্ত্রীকে খেতে পরতে দেয় না, মারধোর করে। সহ্য না করতে পেরে স্ত্রী বাপ কিংবা ভাইয়ের বাড়িতে পালাল (বাপ বেঁচে না থাকলে ভাইও আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়, কারণ ভাই যে সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে তাতে বোনেরও অংশ আছে)। সেখান থেকে সে স্ত্রীধনের তলব করে মোকদ্দমা লাগাল। স্বামীর কণ্ঠশ্বাস—অত টাকা যোগাড় করবে কোথা থেকে?

তখন সাধারণত মুরুব্বীরা মধ্যিখানে পড়েন—বিশেষত সেই সব মুরুব্বীরা যাঁরা বিয়েটা ঠিক করে দিয়েছিলেন। তাঁরা পতিকে বোঝাবার চেষ্টা করেন, 'তোমাতে ওতে যখন মনের মিল হয় নি তখন কেন বাপু মেয়েটাকে ভোগাচ্ছ। তালাক দিয়ে ওকে নিষ্কৃতি দাও, বেচারী অন্য কোথাও বিয়ে করুক।'

বেয়াড়া বদমায়েশ স্বামী হলে বলে, 'না, মরুকগে বেটি। আমি ওকে তালাক দেব না।'

মুরুব্বীরা বলেন, 'তবে ঢালো "মহরে"র ঢাকা। না হলে বসতবাড়ি বিক্রি হবে, কিংবা মাইনে অ্যাটাচ্‌ড্‌ হবে। তখন বুঝবে ঠ্যালাটা।'

বিশ্বাস করবেন না, এরকম দুশমন ধরনের স্বামীও আছে যে বাড়ি বিক্রয় করে মহরের শেষ কপর্দক দেয় কিন্তু তালাক দিতে রাজী হয় না।

কিংবা সে শেষ পর্যন্ত রাজী হয় যে বিবি তাঁর স্ত্রীধন তলব করবেন না। আর সেও তাকে তালাক দিয়ে দেবে।

কিন্তু এটা হল আপোসে ফৈসালা। আইনের হক স্ত্রীলোকের নেই যে সে পতিকে বর্জন করতে পারে। তবু এস্থলে পুনরায় বলে রাখা ভালো, "মহরে"র টাকা দেবার ভয়ে অনেক স্বামী স্ত্রীর উপর চোট-পাট করা থেকে নিরস্ত থাকেন।

এখন প্রশ্ন, স্বামীর যদি গলিত কুষ্ঠ হয়, কিংবা সে যদি বদ্ধ উন্মাদ বর্তায় যদি তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়, যদি সে বার বার কুৎসিত রোগ আহরণ করে স্ত্রীতে সংক্রামিত করে, যদি সে লম্পট বেশ্যাসক্ত হয় তবে কি স্ত্রী তাকে আইনত তালাক দিতে পারেন না।

শুনেছি, স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে 'তুমি আমার মায়ের মতো' অর্থাৎ এই উক্তি দ্বারা সে প্রতিজ্ঞা করে যে স্ত্রীকে সে তার ন্যায্য যৌনাধিকার থেকে বঞ্চিত করবে তবে নাকি সে স্ত্রী মোকদ্দমা করে আদালতের পক্ষ থেকে তালাক পেতে পারে॥

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইস্কুলে পড়ি; ষোল বছর বয়স। বিশ্বাস হয়, বিশ্ববিখ্যাত অবনীন্দ্রনাথ তাকে প্রথম দর্শনেই পূর্ণ দু ঘণ্টা ধরে ভারতীয় কলার নবজাগরণের ইতিহাস শোনালেন?

সত্যিই তাই হয়েছিল। আমার এক বন্ধু আমাকে নিয়ে গিয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের কাছে। তিন মিনিট যেতে না যেতেই তিনি হঠাৎ সোৎসাহে এক ঝটকায় হেলান ছেড়ে খাড়া হয়ে বসে আমাকে সেই প্রাচীন যুগের কথা —কি করে তিনি ছবি আঁকা শিখতে আরম্ভ করলেন, সে ছবি দেখে দ্বিজেন্দ্রনাথ কি বললেন, হ্যাভেলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ, টাইকানের সঙ্গে তাঁর সহযোগ, ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির গোড়াপত্তন, নন্দলাল অসিতকুমারের শিষ্যত্ব, আরো কত কী যে বলে গেলেন তার অর্ধেক লিখে রাখলেও আজ একখানা সর্বাঙ্গসুন্দর কলা-ইতিহাস হয়ে যেত।

আর কী ভাষা, কী রঙ। আজ যখন পিছন পানে তাকাই তখন মনে মনে দেখি, সেদিন অবনীন্দ্রনাথ কথা বলেন নি, সেদিন যেন তিনি আমার সামনে ছবি এঁকেছিলেন। রঙের পর রঙ চাপাচ্ছেন; আকাশে আকাশে মেঘে মেঘে সূর্যাস্ত সূর্যোদয়ের যত রঙ থাকে তার থেকে তুলে নিয়ে ছবির এখানে লাগাচ্ছেন, ওখানে লাগাচ্ছেন আর যতই ভাবি এর পর আর নতুন নতুন রঙ বানিয়ে ছবির উপর চাপাচ্ছেন।

আর কী উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে তাঁর সুখদুঃখ, তাঁর পতন-অভ্যুদয়ের অনুভূতি অজানা অচেনা এক আড়াই ফোঁটা ছোকরার মনের ভিতর সঞ্চালন করার প্রচেষ্টা। বুঝলুম, তিনি তাঁর জীবন দিয়ে ভালোবেসেছেন ভারতীয় কলাশিল্পকে আর 'আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে' প্রদীপ্ত করে দিয়েছেন আমাদের দেশের নির্বাপিত কলাপ্রচেষ্টার অন্ধ-প্রদীপ।

* * *

তারপর একদিন তিনি এলেন শান্তিনিকেতনে। সেখানেও আমি কেউ নই। রবীন্দ্রনাথ নন্দলাল এবং নন্দলালের কৃতী শিষ্যগণ তাঁর চতুর্দিকে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আম্রকুঞ্জে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন, বিশ্বকবিরূপে, শান্তি-নিকেতনের আচার্যরূপে। আর সেদিন রবীন্দ্রনাথ যে ভাষা দিয়ে অবনীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে আসন নিতে অনুরোধ করলেন সে রকম ভাষা আমি রবীন্দ্রনাথের মুখে তার পূর্বে কিংবা পরে কখনো শুনি নি। রবীন্দ্রনাথ সেদিন যেন গদ্যে গান গেয়েছিলেন, আমার মনে হয়, সেই দিনই তিনি প্রথম গদ্য কবিতা লেখা আরম্ভ করলেন। দেশেবিদেশে বহু সাহিত্যিককে বক্তৃতা দিতে শুনেছি, কিন্তু এরকম ভাষা আমি কোথাও শুনি নি—আমার মনে হয়, দেবদূতরা স্বর্গে এই ভাষায় কথা বলেন—সেদিন যেন ইন্দ্রপুরীর একখানা বাতায়ন খুলে গিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে উর্বশীর বীণা গুঞ্জরণ করে উঠেছিল।

* * *

অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। আমি উত্তরায়ণের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। দেখি—অবনীন্দ্রনাথ সদলবলে আসছেন। আমাকে চিনতে পারলেন বলে মনে বড় আনন্দ হল।

তখন আমাদের সবাইকে বললেন, 'জানো, বৈজ্ঞানিকরা বড় ভীষণ লোক—আমাদের সব স্বপ্ন ভেঙে দেয়। এই দেখো না, আজ সন্ধ্যায় আমি দক্ষিণের দিকে তাকিয়ে দেখি কালো কালো মেঘ এসে বাসা বাঁধছে ভুবনডাঙার ওপারে ডাক-বাঙলোর পিছনে। মেঘগুলোর সর্বাঙ্গে কেমন যেন ক্লান্তির ভাব আর বাসা বাঁধতে পেরে তারা একে অন্যকে আনন্দে আলিঙ্গন করছে।

রথী শুনে বলেন, 'মেঘ কোথায়? এ তো ধানকলের ধোঁয়া!'

এক লহমায় আমার সব রঙীন স্বপ্ন বরবাদ হয়ে গেল। তাই বলছিলুম বৈজ্ঞানিকগুলো ভীষণ লোক হয়।'১

সে যাত্রায় যে কদিন ছিলেন তিনি যে কত গল্প বলেছিলেন, তরুণ শিল্পীদের কত অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন তার ইতিহাস, আশা করি, একদিন সেই শিল্পীদের একজন লিখে দিয়ে আমাদের প্রশংসাভাজন হবেন।

* * *

আবার সেই প্রথম দিনের পরিচয়ে ফিরে যাই।

আমি তখন আটোগ্রাফ শিকারে মত্ত। প্রথম গগনেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলুম আমার অটোগ্রাফে কিছু এঁকে দিতে। তাঁর কাছে রঙ তুলি তৈরী ছিল। চট করে পাঁচ মিনিটের ভিতর আকাশে ঘন মেঘ আর তার ফাঁকে ফাঁকে গুটি কয়েক পাখি এঁকে দিলেন।

এর কয়েক দিন পূর্বে শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা কলকাতায় এসে 'বর্ষামঙ্গল' করে গিয়েছে। গগনেন্দ্রনাথ ছবি এঁকে দিয়ে বললেন, 'পাখিরা বর্ষামঙ্গল করছে।'

অবনীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করতে তিনি বললেন, 'তুমি নিজে ছবি আঁকো না কেন?'

আমি সবিনয়ে বললুম, 'আমি ছবি দেখতে ভালোবাসি।'

বললেন, 'দাও তোমার অটোগ্রাফ। তোমাকে কিছু একটা লিখে দিচ্ছি আর যেদিন তুমি তোমার প্রথম আঁকা ছবি এনে দেখাবে সেদিন তোমার বইয়ে ছবি এঁকে দেব।'

বলে লিখলেন, 'ছবি দেখে যদি আমোদ পেতে চাও তবে আকাশে জলে স্থলে প্রতি মুহূর্তে এত ছবি আঁকা হচ্ছে যে তার হিসেব নিলেই সুখে চলে যাবে দিনগুলো।

'আর যদি ছবি লিখে আনন্দ পেতে চাও তবে আসন গ্রহণ করো এক জায়গায়, দিতে থাকো রঙের টান, তুলির পোঁচ। এ দর্শকের আমোদ নয় স্রষ্টার আনন্দ' ।।১

---

১ পাঠক, অবনীন্দ্র যে ভাষায় বলেছিলেন তার সন্ধান এতে পাবেন না।

'জিদ-ওয়াইল্‌ড্‌'

আঁদ্রে জিদের বই এবং বিশেষ করে তাঁর 'জ্‌র্নাল'গুলো (ডায়েরী) বিশ্ববিখ্যাত। আর পাঁচজনের মতো আমিও সেগুলো পড়েছি, তাঁর পরলোকগমনের পর ফ্রান্স-দেশে তাঁর সম্বন্ধে যেসব লেখা বেরিয়েছে তারও কিছু কিছু নেড়েচেড়ে দেখেছি, কিন্তু তবু মেনে নিতেই হল যে, ঠিক ঠিক হদিসটি পেলুম না—জিদকে ফেলি কোন্‌ পর্যায়ে, কপালে টিকিট সাঁটি কোন্‌ রঙের ? অথচ গুরুর আদেশ জিদ সম্বন্ধে লিখতে হবে—উপায় কি ?

একটা উপায় আছে, সেটি হচ্ছে জিদের বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আলোচনা করা। এই ধরুন না, অস্কার ওয়াইল্‌ড্‌। জিদ তাঁকে বিলক্ষণ চিনতেন এবং ওয়াইল্‌ড্‌ও তাঁকে স্নেহ করতেন। ওয়াইল্‌ড্‌ তখন খ্যাতনামা পুরুষ, প্যারিসে এলে তাঁর পিছনে ফেউ লেগে যেত : তার উপর ওয়াইল্‌ড্‌ বলতে পারতেন খাসা ফরাসী। জিদই তাঁর চটি বই 'অস্কার ওয়াইল্‌ডের স্মরণেতে লিখেছেন 'ওয়াইল্‌ড্‌ অত্যুৎকৃষ্ট ফরাসী জানতেন তবু মাঝে মাঝে ভান করতেন যেন জুতসই শব্দ খুঁজে পাচ্ছেন না—অবশ্য তখন তাঁর মতলব হত ঐ কথাগুলোর উপর বিশেষ করে জোর দেবার। উচ্চারণে তাঁর প্রায় কোনো ভুলই ছিল না—শুধু ইচ্ছে করে দুটো একটা শব্দ এমনভাবে উচ্চারণ করতেন যাতে করে সেগুলো ভারি নূতন ধরনের চমক দিয়ে দিত। প্রথম যে সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় সেদিন তিনি একটানা আমাদের গল্প শুনিয়েছিলেন কিন্তু কেমন যেন খাপছাড়া খাপছাড়া, আর সে সন্ধ্যার গল্পগুলো তাঁর সবচেয়ে ভালো গল্প বলেও ধরে নেওয়া যায় না। হয়তো ওয়াইল্‌ড্‌ আমাদের চিনতেন না বলে আমাদের গ্রহণ করার ক্ষমতা পরখ করে নিচ্ছিলেন। ঐ ছিল তাঁর স্বভাব—তা সে বুদ্ধিমানের হোক আর বোকারই হোক—যে-লোক যে জিনিসের রস বুঝতে পারবে না তাকে তিনি সে জিনিস কক্‌খনো পরিবেশন করতেন না। যার যে রকম রুচি তাকে ঠিক সেই রকমেরই মাল দিতেন তিনি। যারা তাঁর কাছ থেকে কোনো জিনিসের প্রত্যাশা করত না তারা পেতও না কিছু—কিংবা হয়ত পেত সামান্য একটুখানি গেঁজলা। আর সবচেয়ে তিনি পছন্দ করতেন খুশগল্প বলে পাঁচজনকে খুশ্‌ করে রাখতে, তাই অনেকেই যাঁরা ভেবে নিয়েছেন যে, তাঁরা ওয়াইল্‌ড্‌কে চিনতে পেরেছেন, তাঁরা শুধু তাঁকে চিনেছেন খুশি দেনেওয়ালা হিসেবে (amuseur = amuser)।'

জিদ এখানে একটুখানি ইঙ্গিত করেছেন যে, বেশীর ভাগ লোকই ওয়াইল্‌ড্‌কে চিনেছে কেমন যেন একটু 'ভাঁড়' 'ভাঁড়' রূপে এবং সেইটিই তাঁর আসল রূপ ছিল না।

মনে হচ্ছে এর থেকে জিদ কিঞ্চিৎ শিখে নিয়েছিলেন। কারণ, পূর্বেই তিনি বলেছিলেন, 'ঐ ছিল তাঁর স্বভাব—তা সে বুদ্ধিমানের হোক আর বোকারই হোক—সবাইকে আপন রুচি অনুযায়ী পরিবেশন করার।' তাই বোধ করি ; জিদ সেই প্রথম যৌবনেই মনস্থির করে ফেলেছিলেন যে, ওটা বোকারই কর্ম, আর তিনি অন্য কারোর রুচির বিলকুল তোয়াক্কা না করে

টক-টক হক কথা বলে যাবেন।

সে না হয় বুঝলুম। অপরকে টক কথা শুনিয়ে দেওয়া খুব কঠিন কর্ম নয়—আমরা সবাই জানা-অজানাতে হরদম করে থাকি—কিন্তু প্রশ্ন, নিজের সম্বন্ধে টক কথা পাঁচজনকে শুনিয়ে বলতে পারে কটা লোক? জিদ পারতেন কি না?

ওয়াইল্‌ড্‌ কোন্‌ অপরাধে জেলে গিয়েছিলেন সে-কথা সকলেই জানেন। জেল থেকে বেরিয়ে ওয়াইল্‌ড্‌ দেখেন লণ্ডন-সমাজ তার তাবৎ দরজা দড়াম করে তাঁর মুখের উপর বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি তখন গেলেন ফ্রান্স। প্যারিসেও গোড়ার দিকে ঐ একই অবস্থা হতে পারে ভেবে তিনি গেলেন একটি ছোট নির্জন শহরে! খবর পেয়ে জিদ তৎক্ষণাৎ সেখানে ছুটে গিয়ে জখমী ওয়াইল্‌ডের বিস্তর তত্ত্বতাবাশ করলেন। জিদ তাঁর অতি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন উপযুক্ত চটি বইয়ে। পাঁচজনে কি বলবে না বলবে তার তোয়াক্কা জিদ তখন করেন নি; সে কথাটা তিনি না বললেও স্পষ্ট বোঝা যায়।

তারপর ওয়াইল্‌ড্‌ ফিরে এলেন প্যারিসে। জিদের সঙ্গে তাঁর দুচার বার দেখা সাক্ষাৎ হল। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, প্যারিসও যে শুধু ওয়াইল্‌ডের হুঁকো-নাপিতই বন্ধ করেছে তা নয়, তাঁর বন্ধুবান্ধবের অনেকেও তাঁকে কুষ্ঠরোগীর মতো বর্জন করতে আরম্ভ করেছেন। জিদ লিখেছেন 'ওয়াইল্‌ড্‌ যখন দেখতে পেলেন দু-চারখানা দরজা তাঁর জন্য বন্ধ তখন তিনি আর কোনো দরজাতেই কড়া নাড়লেন না—ছন্নের মত এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

এমন সময় একদিন জিদ দেখতে পেলেন, ওয়াইল্‌ড্‌ এক কাফের বারান্দায় বসে আছেন। স্বীকার করি, ও রকম জায়গায় হঠাৎ মোলাকাত হয়ে যাওয়াতে আমি একটু খানি অস্বস্তি অনুভব করলুম—চতুর্দিকে ভিড়। বন্ধু 'জি—' ও আমার জন্য ওয়াইল্‌ড্‌ দুটো ককটেল অর্ডার দিলেন। আমি তাঁর মুখোমুখি হয়ে বসতে যাচ্ছিলুম যাতে করে লোকজনের দিকে পিঠ ফিরানো থাকে কিন্তু ওয়াইল্‌ড্‌ ভাবলেন, আমি পাশে বসতে বোকার মতো নিরর্থক লজ্জা পাচ্ছি (হায়, ওয়াইল্‌ড্‌ সম্পূর্ণ ভুল করেন নি) তাই পাশের চৌকি দেখিয়ে বললেন, 'আঃ, আমার পাশে এসে বসো না; আমি আজকাল বড্ড একলা পড়ে গিয়েছি।'

তারপর দুজনাতে কি কথাবার্তা হল সে কথা আরেক দিন হবে। উপস্থিত লক্ষ্য করার বস্তু যে, জিদও জনমতের ঠেলায় কাবু হয়ে পড়েছিলেন। এবং যে ব্যবহার করলেন তাকে স্নব, ক্যাডের আচরণ বলা যেতে পারে। বাঙলা কথায় একদম ছোটলোকোমি করলেন।

একদিন জিদ নির্ভয়ে যেচে গিয়ে ওয়াইল্‌ডের সঙ্গে দেখা করেছিলেন লোকনিন্দার পরোয়া না করে, এবং আশ্চর্য তাই নিয়ে তিনি বিন্দুমাত্র গর্ব করেন নি এবং আরো যখন অন্যায় আচরণ করলেন তখনও সেটা লুকোলেন না। শুধু তাই নয়, পাঠক যাতে অতি নির্মমভাবেই তাঁর মাথায় ঘোল ঢালতে পারে তাই কোনো প্রকারের অজুহাত বা আত্মনিন্দাও পেশ করলেন না।

কি উপন্যাস, কি ছোট গল্প, কি জুর্নাল, সর্বত্রই জিদ এই আশ্চর্য সাধুতা দেখিয়েছেন ॥[১]

এষাস্য পরমাগতি

প্রাচ্যভূমি থেকে শ্বেতের প্রাধান্য কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যেমন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নব নব আন্দোলনের সূত্রপাত হচ্ছে, ঠিক তেমনি সংস্কৃতির ভূমিতেও নূতন নূতন চাষ-আবাদ আরম্ভ হয়েছে। চীনদেশ থেকে আরম্ভ করে ইন্দোনেশিয়া, ভারত-পাকিস্তান হয়ে আফগানিস্থান, ইরান, আরব ভূমি পেরিয়ে এক দিকে মরক্কো পর্যন্ত এবং অন্য দিকে তুর্কী ইস্তক। সবগুলোর খবর রাখা অসম্ভব—এতগুলো ভাষা শেখার শক্তি এবং সময় আছে কার?—তবু মোটামুটিভাবে তার খানিকটা জরিপ করা যায়।

তিনটে বড় বড় বিভাগ করে প্রাথমিক জরিপ করা যায়। চীন, ভারত, পাকিস্তান এবং আরব ভূমি। ইন্দোনেশিয়া, ইরান এবং তুর্কীকেও সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যায় না, কিন্তু উপস্থিত সেগুলোকে হিসেবে নিলে আলোচনাটা একদম কব্জার বাইরে চলে যাবে।

এ তিন ভূখণ্ডেই দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃতির বাজারে দিশী-বিদেশী দুই মালই চলছে। দর্শন, বিজ্ঞানের তুলনায় সাহিত্যই উপস্থিত এ তিন ভূখণ্ডে সংস্কৃতির প্রধান বাহন—এবং সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি যে বস্তু লেখা এবং পড়া হচ্ছে সে হল উপন্যাস এবং ছোট গল্প। এ দুই জিনিসই প্রাচ্যদেশীয় নিজস্ব ঐতিহ্যগত সম্পদ নয়; ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজের কাছ থেকে শেখা। চিত্র-ভাস্কর্য-স্থাপত্যের বেলাও তাই—সেজান, রেনওয়া, রদাঁ এপস্টাইনের প্রভাব কি কাইরো কি কলিকাতা সর্বত্রই দেখা যায়। ইয়োরোপীয় দর্শন এবং বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নিয়ে সবচেয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছে ভারত—কিছুটা কাইরো, তেলাভিভ এবং বাইরুত। একমাত্র ওস্তাদী সঙ্গীতের বেলা বলা যেতে পারে যে, ইয়োরোপীয় প্রভাব এর উপর কোন চাপই দিতে পারে নি।

কিন্তু এরকম পদ গুনে গুনে ফিরিস্তি বানাতে গেলে একখানা ছোটখাটো বিশ্বকোষ লিখতে হয়। সেটা এড়াতে হলে অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হয়।

বৈদগ্ধ্য সংস্কৃতি নির্মিত হয় বিশেষ মনোবৃত্তি হৃদয়াবেগ দ্বারা। তার কিছুটা হদিস পেলে মোটামুটি ভাবে বলতে পারা যায়, বৈদগ্ধ্য সংস্কৃতি চলছে কোন্ পথে।

শ্বেতের প্রভাব কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যে আন্দোলন এ তিন ভূখণ্ডে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে, তাকে 'ছুঁৎবাই', 'বিশুদ্ধীকরণ' বা 'সত্যযুগে প্রত্যাবর্তন' নাম দেওয়া যেতে পারে। এর প্রধান ধর্ম, বৈদেশিক সর্বপ্রকার প্রভাব বর্জন করে বিশেষ কোন প্রাচীন ঐতিহ্যকে নূতন করে চাঙ্গা করে

১ Andre Gide: Oscar Wilde. In memoriam, Paris, Mercure de France.

তোলা। এই ভারতবর্ষেই কেউ চায় বৈদিক যুগে ফিরে যেতে (ক্রিয়াকাণ্ডে যাদের ভক্তি অত্যধিক), কেউ চায় উপনিষদের যুগ জাগাতে (দার্শনিক মনোবৃত্তিওয়ালারা), কেউ বা গুপ্ত যুগ (সাহিত্য-কলায় যাদের মোহ), কেউ বা ভক্তি যুগে (বৈষ্ণবজন) ডুব মারতে চান। কেউ বলেন, রবরের জুতো পরে কাঁচা শাকসব্জি খাও, কেউ বলেন, ছেলেমেয়েরা বড্ড বেশি মেশামিশি করছে, তাদের সিনেমা যেতে বারণ করে দাও। পাকিস্তানে এ আন্দোলন 'ইসলামী রাষ্ট্রে'র নামে শক্তি সঞ্চয় করতে চায়। কাইরোর আজহর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কট্টর মৌলানারা এ-দলেরই শামিল। ইন্দোনেশিয়ায় এদেরই নাম দার-উল-ইসলাম সম্প্রদায়। ইবন-ই-সউদ গোষ্ঠীর ওয়াহ্হাবী আন্দোলন এই মনোবৃত্তি নিয়েই আরম্ভ হয়। এ-দলের মান্দারিনরা চীনে কিন্তু বিশেষ পাত্তা পাচ্ছেন না।

প্রমাণ করতে পারব না, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, এ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত বানচাল হবে। তার প্রধান কারণ, কোন দেশেরই যুবক সম্প্রদায় এ আন্দোলনে যোগ দিতে রাজী হচ্ছে না।

দ্বিতীয় আন্দোলন ঠিক এর উল্টো। এর চাঁইরা বলেন, 'প্রাচ্য প্রাচ্য করে তো ইংরেজ ফরাসী ওলন্দাজের হাতে মার খেলে বিস্তর। প্রাচ্য ঐতিহ্য সর্ব-প্রকার প্রগতির "এনিমি নাম্বার ওয়ান"। আমাদের সর্বপ্রকার বৈদগ্ধ্য-সংস্কৃতি প্রচেষ্টা যদি আধুনিকতম, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রগতির সঙ্গে বিজড়িত না হয়, তবে তার কোন প্রকারেরই ভবিষ্যৎ নেই।' এ আন্দোলনের বড়-কর্তাদের অধিকাংশই কম্যুনিস্ট ভায়ারা। এঁদের বিশ্বাস, সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্যের রঙঢং সম্পূর্ণ নির্ভর করে বিত্তোৎপাদন এবং ধন-বণ্টন পদ্ধতির উপর এবং যেহেতু প্রাচ্যভূমিও একদিন মার্কসের অলঙ্ঘ্য নিয়মানুযায়ী প্রলেতারিয়ারাজে পরিণত হবে, সেই হেতু প্রাচ্যেরও সংস্কৃতি গড়ে উঠবে গণ-নৃত্য, গণনাট্য, গণ-সাহিত্যের উপর। তাই ঐতিহ্যগত সর্বপ্রকার বৈদগ্ধ্য-সংস্কৃতি 'বুর্জুয়া' —সুতরাং বর্জনীয়।

ভারত-পাকিস্তানে এ আন্দোলন সুবিধে করে উঠতে পারছে না, কিন্তু বিশেষ করে তুর্কীতে এবং কিছুটা কাইরো বাইরুতে এর প্রভাব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কম্যুনিস্ট ছাড়াও বহু যুবকযুবতী এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। তার অন্যতম কারণ অবশ্য এই যে প্রথম আন্দোলনে যোগ দিতে হলে ক্ল্যাসিক্স্ পড়তে হয়, সঙ্গীতের শখ থাকলে দশ বছর সা রে গা মা করতে হয়, কুরানহাদিস কণ্ঠস্থ করতে হয়—তাতে বায়ানাক্কা বিস্তর। এতো হাঙ্গামা পোয়ায় কে? তাই দ্বিতীয়টাই সই।

এ দুই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ ঠিক করবেন ট্রুমান স্তালিন। আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না।

তৃতীয় আন্দোলন প্রাচ্যভূমিতে আরম্ভ করেন রাজা রামমোহন। তাঁর প্রচেষ্টা বাঙালী পাঠককে নূতন করে বলতে হবে না। প্রাচ্যভূমির ঐতিহ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির মূল্যবান সম্পদ মিলিয়ে নিয়ে তিনি নব নব সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দ তাঁদের স্বপ্নকে বৈদগ্ধ্যের বহু ক্ষেত্রে মূর্তমান করেছেন। কাইরোর তাহা হোসেন, বাইরুতের খলীল গিবরানী,

ঢাকার বাঙালী সাহিত্যিক সম্প্রদায়, লাহোরে ইকবালের শিষ্যমণ্ডলী এবং ইন্দোনেশিয়ার সুতান শহরীর এ সম্প্রদায়ভুক্ত।

বিশেষ করে সুতান শহরীরের নাম ভক্তিভরে স্মরণ করতে হয়। জাভা সুমাত্রা বালীর অনাড়ম্বর জীবন যাপন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে সদানন্দ কৃত্রিমতাবিবর্জিত সংস্কৃতি ইন্দোনেশিয়ায় এতদিন ধরে গড়ে উঠেছে, ওলন্দাজ বর্বরতা যাকে বিনষ্ট করতে পারে নি, সেই সংস্কৃতির সঙ্গে শহরীর চান উত্তম উত্তম ইয়োরোপীয় চিন্তাবৃত্তি, অনুভবসম্পদ যোগ দিয়ে নূতন সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে তুলতে। এবং সে চাওয়ার পিছনে রয়েছে শরীরের নিরঙ্কুশ আত্মত্যাগ আর কঠোরতম সাধনা। বিশ্বসংসারের সব আন্দোলন সব প্রচেষ্টার সঙ্গে তিনি নিজেকে অহরহ সংযুক্ত রেখে সেই পন্থার অনুসন্ধান করছেন, যে পন্থা শুধু যে ইন্দোনেশিয়ার চিন্তাবিকাশ কলাপ্রকাশ মূর্তমান করবে তাই নয়, তাবৎ প্রাচ্যভূমি তার থেকে অনুপ্রেরণা আহরণ করতে পারবে।

এ পন্থা অন্বেষণে নিজেকে অহরহ সজাগ রাখতে হয়—গীতার সংযমী, যিনি সদাজাগ্রত তিনিই এ মার্গের অধিকারী। শহরীর এ মার্গের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

এষাস্য পরমাগতি ।।

দিস্ ইয়োরোপ !

গিরিজা মুখুজ্জে দেশে থাকতে বার দুই জেলে যান—সে কিছু না, নস্যি। (কেন বলছি, বাকিটুকু পড়লেই বুঝতে পারবেন) তারপর ছিটকে গিয়ে লণ্ডন, সেখান থেকে প্যারিস। দিব্য আছেন, সরবন্ যান, ফরাসী গুণীদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে, দু পয়সা কামানও বটে। এমন সময় দেখা গেল, জর্মনরা প্যারিসের ঘাড়ে এসে পড়ল বলে। মুখুজ্জে গুটিকয়েক ফরাসী আত্মজনের সঙ্গে আরো সব লক্ষ লক্ষ ফরাসীদের মতো দক্ষিণের পথ ধরলেন। পায়ে হেঁটে, মালবোঝাই বাইসিকেল কিংবা হাত-গাড়ি ঠেলে ঠেলে যখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ক্লান্তিতে ভিরমি যাবার উপক্রম (ওদিকে মনে মনে ভাবছেন, জর্মনদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন), তখন হঠাৎ মালুম হল, জর্মন বাহিনী তাঁকে পিছনে ফেলে রাতারাতি অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। তখন সামনে পিছনে সবই সমান; ফিরে এলেন প্যারিস।

মুখুজ্জে ভারতীয়, কাজেই ইংরেজের দুশমন। কিন্তু তাহলে কি হয়—পাসপোর্টে যে পাকাপোক্ত ইস্টাম্পো মারা রয়েছে, মুখুজ্জে ব্রিটিশ প্রজা, অর্থাৎ তিনি জর্মনির শত্রু। কাজেই যদিও পাদমেকং ন গচ্ছামি করে আপন কুঠুরিতে শুধু-শাম ঘাপটি মেরে বসে থাকতেন, তবু।

একদা কেমনে জানি ভারতীয় মহাশয়
পড়িলেন ধরা, আহা, দুরদৃষ্ট অতিশয়।[১]

জর্মন পুলিশের তদারকিতে ফরাসী জেলখানায় মুখুজ্জে তখন ইষ্ট-

১ সুকুমার রায়ের অচলিত কবিতা।

দেবতার নাম জপ করতে লাগলেন। সে-জেলে ইংরেজের শত্রু-মিত্র বিস্তর 'ব্রিটিশ' প্রজার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হল। তার বর্ণনাটি মনোরম।

কিছুদিন পর জেল থেকে নিষ্কৃতি পেলেন।

তখন নাম্বিয়ার তাঁকে বললেন, তাঁর সঙ্গে বার্লিন যেতে। সেখানে গিয়ে দেখেন, সুভাষচন্দ্র ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য হরেক রকম তরিবত-তত্ত্বতাবাশ আরম্ভ করে দিয়েছেন। মুখুজ্জেকে 'আজাদ হিন্দ' বেতারে বেঁধে দেওয়া হল নানা প্রকারের ব্রডকাস্টের জন্যে। সুভাষের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ যোগাযোগ হল। গ্র্যাণ্ড মুফতির সঙ্গেও বিস্তর দহরম মহরম হল।

সুভাষ সম্বন্ধে মুখুজ্জে অনেক কিছু লিখেছেন। উপাদেয়।

তারপর সুভাষ দেখলেন, বার্লিনে থেকে কাজ হবে না। ওদিকে ইংরেজ সিঙ্গাপুরে শিঙে ফুঁকেছে। জাপানীরা বর্মায় ঢুকছে। সুভাষ চলে গেলেন জাপান। এদিকে 'আজাদ হিন্দ' বেতার দড়কচ্চা মেরে গেল। মুখুজ্জেরা কিন্তু ক্ষান্ত দেন নি।

তারপর জর্মনির পতন আরম্ভ হল। বোমার ঠেলায় বার্লিনে কাজ করা দায়। তাবৎ ভারতীয়কে সরানো হল হল্যাণ্ডে; সেখান থেকে আজাদ হিন্দে'র বেতারকর্ম চালু থাকল বটে, কিন্তু মুখুজ্জেরা বুঝলেন, সময় ঘনিয়ে এসেছে। তারপর প্রায় সবাই একে একে ফিরে এলেন বার্লিন। সেখান থেকে মুখুজ্জে গেলেন দক্ষিণ-জর্মনিতে। ইতিমধ্যে রাশানরা ঢুকল বার্লিনে।

এবারে তিনি আইনত রাশার শত্রু। কারণ রাশার মিত্র ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি বিস্তর বেতার বক্তৃতা ঝেড়ে বসে আছেন। আইনত তিনি অ্যামেরি, হো হো'র সমগোত্র। কাজেই পালাতে হল 'নিরপেক্ষ' সুইটজারল্যাণ্ডে। এক দরদী জর্মন সীমান্ত পুলিশই তাঁকে বাতলে দিলে কি করে নিষুতি রাতে রাইন নদী সাঁতরে ওপারে যাওয়া যায়।

আমরা ভাবি সুইসরা বড্ডই নিরপেক্ষ মোলায়েম জাত। মুখুজ্জে সেখানে যে বেইজ্জতি আর লাঞ্ছনার ভিতর দিয়ে গেলেন, তার বর্ণনা আমি আর এখানে দিলুম না।

সুইসরা মুখুজ্জেকে আত্মহত্যার দরজায় পৌঁছিয়ে হঠাৎ একদিন প্রায় 'কানে ধরে' ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দিল জর্মনিতে। জর্মনির যে অঞ্চলে তাঁকে ফেরত-ডাকে পাঠানো হল, সেটি ফরাসীর তাঁবেতে। কাজেই তাঁকে পত্রপাঠ গ্রেপ্তার করা হল। কিন্তু মুখুজ্জে যখন কমাণ্ডাণ্টকে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি জর্মনিতে যা কিছু করেছেন সে শুধু 'পাত্রি'র (দেশের) জন্য, তখন ফরাসীরা—আর এ শুধু ফরাসীরাই পারে—মুখুজ্জের বিগত জীবনটা যেন বেবাক ভুলে গেল। শুধু তাই নয়, খেতে পরতে দিল। বলল, 'তুমি যখন দিব্য ফরাসী-জর্মন জানো, তখন আমাদের সঙ্গে থেকে কাজ করো না কেন?' তাই সই। ব্যবস্থাটা স্থানীয় জর্মনদেরও মনঃপূত হল—অবিশ্যি বিজয়ী ফরাসীরা তখন তার থোড়াই পরোয়া করত—কারণ মুখুজ্জে তাদের সামনে 'দম্ভী বীরে'র মূর্তিতে দেখা দেন নি।

তারপর সেই ফরাসী রেজিমেণ্ট দেশে চলে গেল। মুখুজ্জের আবার জেল।

ইংরেজ তখন অ্যামেরি হো হো'র মতো মুখুজ্জেকে পেলে তাঁকেও ঝোলায়।

কিন্তু ঝোলাবার সুযোগ পায় নি। ফরাসীরা মুখুজ্জেকে ইংরেজের হাতে তুলে দেয় নি।

তারপর স্বরাজ হয়ে গেল। দেশের ছেলে দেশে ফিরে এল।

* * *

কিন্তু বইখানা মুখুজ্জের আত্মজীবনী নয়। বইটিতে মুখুজ্জে ইয়োরোপ দেখেছেন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে, নানা পটপরিবর্তনের সামনে, পয়লা সারিতে বসে। উত্তম বই।[২]

শমীম

আমার বন্ধু শমীম মারা গিয়েছে। শমীম এ-সংসারে কোনো কীর্তি রেখে যেতে পারে নি, যার জন্যে লোকে সভাস্থলে কিংবা কাগজে শোক প্রকাশ করবে। তার আত্মজন এবং নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া তাকে কেউ বেশিদিন স্মরণ করবে না।

তার কথা আপনাদের জোর করে শোনাবার অধিকার আমার নেই, কারণ পূর্বেই নিবেদন করেছি, শমীম কোন কীর্তি রেখে যেতে পারে নি। তবু যে কেন তার সম্বন্ধে লিখছি, তার কারণ সে আমার বন্ধু, আর তাই আশা, আমার বহু সহৃদয় পাঠক সেই সূত্রে তাকে স্নেহের চোখে দেখবেন, এবং বহু দেশ দেখবার পর বলছি, ওরকম সচ্চরিত্র ছেলে আমি কোথাও দেখি নি।

শমীম আমার ছেলের বয়সী। তার জন্মের প্রায় প্রথম দিন থেকেই আমি তাকে চিনি। আর এমন সুন্দর চেহারা নিয়ে সে জন্মাল, আর সে সৌন্দর্য দিন দিন এমনি বাড়তে লাগল যে, বাড়িতে যে আসত, সে-ই ছেলেটির দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারত না। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল, কী বিনয়নম্র ভদ্রসংযত ব্যবহার এবং পরদুঃখকাতর হৃদয় ভগবান তাকে দিয়েছেন। আমি নিশ্চয়ই জানি বাড়ির ভিতরে বাইরে এমন কেউ ছিল না যে শমীমের উপর বিরক্ত হয়েছে কিংবা রাগ করেছে।

কিন্তু তবু বলব, শমীম মন্দ অদৃষ্ট নিয়ে জন্মেছিল।

ধরা পড়ল সে সন্ন্যাস রোগে ভুগছে। সন্ন্যাসের চিকিৎসা আছে কি না জানি নে, কিন্তু একথা জানি, তার পিতা (আমার অগ্রজ-প্রতিম) চিকিৎসক হিসেবে আর আমরা পাঁচজনে বন্ধুবান্ধব হিসেবে তার চিকিৎসার কোন ত্রুটি করি নি। আর মায়ের সেবা সে কতখানি পেয়েছিল, সেকথা কি বলব? সর্ব-কনিষ্ঠ চিররুগ্ন কোন্ ছেলেকে তার মা হৃদয় উজাড় করে সেবা-শুশ্রূষা করে না?

ভগবান এতেও সন্তুষ্ট হলেন না,—তাকে দিলেন মারাত্মক টাইফয়েড্ জ্বর। আমি দেশে ছিলুম না, ফিরে এসে দেখি জ্বর যাবার সময় শমীমের একটি চোখ নিয়ে গিয়েছে। আমি অনেক দুঃখকষ্ট অবিচার-অত্যাচার দেখেছি সহজে কাতর হই নে, কিন্তু শমীমের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি

২ Girija Mukherjee, This Europe. Saraswaty Library, Calcutta.

যে আঘাত পেয়েছিলুম সে আঘাত যেন আমার চেয়ে দুর্বল লোককে ভগবান না দেন।

শমীমের বাপ খুড়ো ঠাকুর্দা সকলেই গম্ভীর প্রকৃতির—শমীমও ছেলেবেলা থেকে শান্তস্বভাব ধরত, এখন সে ক্রমে ক্রমে গম্ভীর হতে লাগল। পড়াশোনা তার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং কখনো যে করতে পারবে সে ভরসা ক্রমেই ক্ষীণ হতে লাগল। হয়তো তাই নিয়ে মনে মনে তোলপাড় করত—আশ্চর্য কি, যে ছেলে অল্পবয়সে লেখাপড়ায় সকলের সেরা ছিল তার সব লেখাপড়া চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো মর্মন্তুদ ব্যাপার কি হতে পারে?

বিশ্বাস করবেন না, ঐ গাম্ভীর্যের পিছনে কিন্তু তার ছিল প্রচুর রসবোধ। আমাকে খুশি করবার জন্য সে আমাদের বাড়ি—নং পার্ল রোড সম্বন্ধে একটি রচনা লেখে। তাতে আমাদের সকলের রসময় (অনেকটা আইরিশ ধরনের হিউমার) বর্ণনার পর ছিল উপরের তলায় তার দাদামশায়ের বর্ণনার ফিনিশিং টাচ্। দাদামশায় আসলে কুষ্ঠিয়ার লোক, 'এটা' 'সেটা' না বলে বলেন 'ইডা', 'সিডা', আর বুড়োমানুষ বলে সমস্ত দিন বাড়ির এঘর ওঘর করে বেড়ান। তার বর্ণনা শমীম দিল এক লাইনে—'আর দাদামশাই তো সমস্ত দিন "ইডা" "সিডা" নিয়ে আছেন।

শমীমের বড় ভাই শহীদ তখন প্রেমে পড়েছে। মেয়েটির নাম হাসি। খানার টেবিলে একদিন জল্পনাকল্পনা হচ্ছে, একটা চড়ুই-ভাত করলে হয় না? শহীদ গম্ভীর হয়ে বসে আছে—আমি শুধালুম,'তুমি আসছো তো?' শহীদ বলল, 'না।'

শমীম বলল, 'ও আসবে কেন? আমরা তো "হাসি" না।'

অর্থাৎ তার ডার্লিং 'হাসি' তো আমাদের সঙ্গে চড়ুই-ভাতে আসবে না এবং আহা, শহীদ কতই-না jolly chap—আমরাই শুধু গম্ভীর।

কিন্তু আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করত তার পরোপকার করার প্রচেষ্টা। ৪৭-এর দাঙ্গার সময় আমাদের বাড়িতে প্রায় সত্তর জন হিন্দু নরনারী আশ্রয় নেন—আমি তখন দক্ষিণে—ফিরে এসে শুনি গুণ্ডারা বাড়ি আক্রমণ করেছিল, শমীম নির্ভয়ে এদের সেবা করেছে; আমি আশ্চর্য হই নি।

তার পর ৫১ সনে হোলির কয়েকদিন আগে যখন সাম্প্রদায়িক কলহের ফলে বিস্তর মুসলমান নরনারী এসে আমাদের পাড়ায় আশ্রয় নিল তখন শমীম তার মা, বাবা, বোনের সঙ্গে যোগ দিয়ে ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে তাদের সেবা করল, তার বাবার ডিসপেনসারিতে বসে রুগীদের জন্য ওষুধ তৈরী করাতে, ইনজেকশন-ভেকসিনেশন দেওয়াতে সর্বপ্রকারে সাহায্য করলে। পৃথিবীর সবাই শমীমকে ভুলে যাবে কিন্তু দু-একটি আর্ত হয়তো এই সুহাস, সুভাষ, প্রিয়দর্শন ছেলেটিকে মনের কোণে একটুখানি ঠাঁই দেবে।

সেই সময়ে দিল্লীর এক হিন্দু ভদ্রলোক আমাদের এবং পাড়ার মুসলমানদের অনেক সাহায্য করেন। আমরা স্থির করলুম, দিল্লীর লোক, এঁকে নিমন্ত্রণ করে কোর্মা-পোলাও খাওয়াতে হবে। সব ঠিক, এমন সময় শমীম তার মাকে গিয়ে বললে, 'এই দুর্দিনে লোকে খেতে পাচ্ছে না, আর তোমরা দাওয়াত করে খাওয়াচ্ছ

কোর্মা-পোলাও। আমি তা হলে খাব না। যদি নিতান্তই খাওয়াতে হয়, তবে খাওয়াও আমরা যা রোজ খাই।'

আমরা মামুলী খানাই পরিবেশন করেছিলুম।

* * *

খবর পেলুম, শমীম ট্রেনের সামনে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। আমি কিছুই ভাবতে পারছি নে। এত সহৃদয়, পরোপকারী ছেলে বুঝতে পারল না যে তার মা, বাপ, খুড়ো, ভাই, বোন, আমাকে, তার বন্ধু শুকুরকে এতে কতখানি আঘাত দেবে?

দিনেন্দ্রনাথ

'দেশে'র ৪১শ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখে দিনেন্দ্রভক্ত, দিনেন্দ্র-সখাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। গুপ্ত মহাশয় দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়, দিনেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগী মাত্রেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য তত্ত্ব এবং তথ্য, দিনেন্দ্রনাথের মধুর, সহৃদয়, বন্ধুবৎসল হৃদয়ের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে আমার মনে দিনেন্দ্রনাথের যে ছবি আছে সেটি হুবহু মিলে গেল। একাধিকবার ভেবেছি, দিনেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এত অল্প লোকই লিখেছেন যে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার যেটুকু জানা আছে তাই লিখে ফেলি, কিন্তু প্রতিবারেই মনে হয়েছে, দিনেন্দ্র-জীবন আলোচনা করার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই। গুপ্ত মহাশয় এখন আমার কর্তব্যটি সরল করে দিলেন। আমার বক্তব্যের কোনো কথা যদি গুপ্ত মহাশয়ের কাজে লেগে যায়, তবে আমি শ্রম-সাফল্যের আনন্দ পাব।

স্বীকার করি, রবীন্দ্রনাথ শান্তিকেতন-মন্দিরে যে বক্তৃতা দিতেন, তা অতুলনীয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করি, যেদিনকার উপাসনা দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গীত দিয়ে আরম্ভ হত, সেদিন সে সঙ্গীত যেন আমাদের মনকে রবীন্দ্রনাথের উপাসনার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তুত এবং উন্মুখ করে তুলত। দিনেন্দ্রনাথের বিশাল গম্ভীর কণ্ঠ আমাদের হৃদয়মন ভরে দিত, তার পর সমস্ত মন্দির ছাপিয়ে দিয়ে ভাঙা-খোয়াই পেরিয়ে যেন কোথা থেকে কোথা চলে যেত। তাই আমার সব সময় মনে হয়েছে দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠ একজনকে শোনাবার জন্য, এমন কি একটা সম্পূর্ণ আসরকেও শোনাবার জন্য নয়, তাঁর কণ্ঠ যেন ভগবান বিশেষ করে নির্মাণ করেছিলেন সমস্ত দেশের জনগণকে শোনাবার জন্য। তাই বোধ হয় তাঁর কণ্ঠে যে রকম 'জনগনমন অধিনায়ক' গান শুনেছি আজ পর্যন্ত কারো কণ্ঠে সেরকম ধারা শুনলাম না।

এরকম গলা এ দেশে হয় না—এ গলার ভলুম পেলে ইতালির শ্রেষ্ঠতম অপেরা-গাইয়ে জীবন ধন্য মনে করেন।

হয়তো আমার কল্পনা, কিন্তু প্রায়ই আমার মনে হয়েছে, মন্দিরে দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গীত যেন অনেক সময় রবীন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠতর ধর্মব্যাখ্যানে অনুপ্রাণিত করেছে।

একথা সবাই জানেন, দিনেন্দ্রনাথ যে শুধু গায়কই ছিলেন তাই নয়, তিনি অতিশয় উচ্চদরের সঙ্গীতরসজ্ঞও ছিলেন। কি উত্তর কি দক্ষিণ, কি ইয়োরোপীয় সর্বসঙ্গীতে সর্ববাদ্যের খবর তিনি তো রাখতেনই—তার উপর তিনি জানতেন কি করে গায়ক এবং যন্ত্রীকে উৎসাহ দিয়ে দিয়ে তার সর্বশ্রেষ্ঠ নৈপুণ্য টেনে বের করে আনতে হয়। প্রায় ত্রিশ বৎসর হয়ে গিয়েছে, তাই আজ আর ঠিক মনে নেই, তবে বোধ হয় সে গুণীর নাম ছিল সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী, পিঠাপুরম্ মহারাজের বীণকার—তিনি এসেছেন রবীন্দ্রনাথকে বীণা শোনাতে। রবীন্দ্রনাথ আর দিনেন্দ্রনাথ উদ্‌গ্রীব হয়ে বসেছেন; তার পর আরম্ভ হল বীণাবাদন।

আমার সন্দেহ হয়েছিল দক্ষিণের গুণীর মনে কিঞ্চিৎ দ্বিধা ছিল, উত্তর ভারতের শান্তিনিকেতন তাঁর সঙ্গীত সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে কি না। দশ মিনিট যেতে না যেতেই রবীন্দ্রনাথ আর দিনেন্দ্রনাথ যেমন যেমন তাঁদের সূক্ষ্ম রসানুভূতি ঘাড় নেড়ে, মৃদু হাস্য করে বা বাহবা বলে প্রকাশ করতে লাগলেন সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গমেশ্বর বুঝতে পারলেন তিনি যে সমঝদার শ্রোতার সামনেই বাজাচ্ছেন তাই নয়, এ রকম শ্রোতা তিনি জীবনে পেয়েছেন কমই। সে রাত্রে কটা অবধি মজলিস্ চলেছিল আজ আর ঠিক মনে নেই, তবে শান্তিনিকেতনের 'খাবার ঘণ্টা'র অনেক পর অবধি—বারটা হতে পারে, দুটোও হতে পারে।

সে যুগে ইয়োরোপ থেকেও বহু কলাবিৎ আসতেন রবীন্দ্রনাথকে গান কিংবা বাজনা শোনাতে। দুজনকে স্পষ্ট মনে আছে, কিন্তু নাম ভুলে গেছি। এককন ডাচ মহিলা গাইয়ে (বিনায়ক রাও এঁর নাম স্মরণ করতে পারবেন) এবং অন্যজন বেলজিয়ান বেহালা-বাজিয়ে। ডাচ মহিলাটি খুব বেশি দিন আশ্রমে থাকেন নি, কিন্তু বেলজিয়ানটি দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে একদম জমে যান। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি বাজিয়ে যেতেন—ভদ্রলোক দিনে অন্তত বারো ঘণ্টা আপন মনে, একা একা, বেহালা বাজাতেন—আর দিনেন্দ্রনাথ তাঁর সূক্ষ্মতম কারুকার্যের সময় মাথা নেড়ে নেড়ে রসবোধের পরিচয় দিয়ে তাঁর উৎসাহ বাড়াতেন।

বেলজিয়ানটি দিনেন্দ্রনাথের কাছ থেকেও অনেক কিছু শিখেছিলেন—তার অন্যতম, সিগার বর্জন করে গড়গড়া পান। আশ্রম ছাড়ার দিন ভদ্রলোক দুঃখ করে আমাকে বলেছিলেন, 'দেশে যেতে মন চাইছে না, সেখানে তামাক পাব কোথায়?' যদিস্যাৎ পেয়ে যান সেই আশায় ভদ্রলোক তাঁর আলবোলাটি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

দিনেন্দ্রনাথ সাহিত্যের উচ্চাঙ্গ সমঝদার ছিলেন। প্রাপ্তবয়সে তিনি ফরাসীও শিখেছিলেন এবং স্বচ্ছন্দে ফরাসী উপন্যাস পড়তে পারতেন। ওদিকে ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রতি ছিল তাঁর গভীর প্রেম। তাই কি লেভি, কি উইনটার্‌নিৎস্ সকলের সঙ্গে ছিল তাঁর হৃদ্যতা। বিদেশীকে কি করে খানা খাইয়ে, আড্ডা জমিয়ে, সঙ্গীতের চর্চা করে, সৌজন্য ভদ্রতা দেখিয়ে—আমি একমাত্র দিনেন্দ্রনাথকেই চিনি যিনি পৃথিবীর সকল জাতের লোকেরই ম্যানারস এটিকেট জানতেন—তার দেশের কথা ভুলিয়ে দেওয়া যায় এ কৌশল তাঁর যা রপ্ত ছিল এর

সঙ্গে আর কারো তুলনা হয় না। তাই তাঁর বাড়ি ছিল বিদেশীদের কাশীবৃন্দাবন।

দিনেন্দ্রনাথ গাইতে পারতেন, বাজাতে পারতেন, অন্যের গানবাজনার রস চাখতে পারতেন এ-কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি ; তদুপরি তিনি ছিলেন সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ। এ বড় অদ্ভুত সমন্বয়। শাস্ত্রজ্ঞের রসবোধ কম, আবার রসিকজন শাস্ত্রের অবহেলা করে—দিনেন্দ্রনাথ এ নীতির ব্যত্যয়—শাস্ত্রের কচকচানি তিনি ভাল-বাসতেন না। কিন্তু সঙ্গীতের বিজ্ঞানসম্মত চর্চার জন্য যেখানেই শাস্ত্রের প্রয়োজন হত, তিনি সেখানেই সত্য শাস্ত্র আহরণ করে ছাত্রের সঙ্গীতচর্চা সহজ-সরল করে দিতে জানতেন।

আমাদের ঐতিহ্যগত রাগপ্রধান সঙ্গীতচর্চার জন্য প্রাচীন অর্বাচীন বহু শাস্ত্র আছে, রবীন্দ্রনাথ এ যুগে সঙ্গীতের যে নূতন ভুবন সৃষ্টি করে দিলেন, তার রহস্য ভেদ করার জন্য কোনো প্রামাণিক শাস্ত্র নেই। এ-শাস্ত্র নির্মাণ করার অধিকার একমাত্র দিনেন্দ্রনাথেরই ছিল। বহু অনুনয়-আবেদন করার পর তিনি সে শাস্ত্র রচনা করতে সম্মত হলেন।

কয়েকটি অধ্যায় তিনি লিখেছিলেন। সেগুলি অপূর্ব। শুধু যে সেগুলিতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত 'দর্শনে'র সন্ধান মেলে তাই নয়, সেগুলিতে ছিল ভাষার অতুলনীয় সৌন্দর্য অমিত ঝঙ্কার—সে ভাষার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি একমাত্র 'কাব্যের উপেক্ষিতা'র ভাষা।

এ শাস্ত্র তিনি কখনো সমাপ্ত করতে পেরেছিলেন কিনা জানি নে। হয়তো আমার ভুল, কিন্তু প্রথম অধ্যায়গুলো শুনেই আমার মনে হয়েছিল এ ছন্দে শেষরক্ষা করা সহজ কর্ম নয়। এর জন্য যতখানি পরিশ্রমের প্রয়োজন, দিনেন্দ্র-নাথের হয়তো ততখানি নেই।

আমি দিনেন্দ্রনাথের নিন্দে করছি নে। কিন্তু আমি জানি তিনি গান গাইতে, বাজনা বাজাতে, গানবাজনা শুনতে, সাহিত্যরস উপভোগ করতে, প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকতে, আড্ডা জমাতে, বন্ধুবান্ধবকে খাওয়াতে, বিদেশীদের আদর-আপ্যায়ন করাতে এত আনন্দ পেতেন যে কোনো প্রকারের কীর্তি নির্মাণ করাতে ছিলেন তিনি সম্পূর্ণ পরাঙ্মুখ, নিরঙ্কুশ বীতরাগ।

নাই বা হল সে শাস্ত্র সে কীর্তি গড়া ! আজ যদি দিনেন্দ্র-শিষ্যেরা আপন আপন নৈবেদ্য তুলে ধরেন, তবে তার থেকেই নূতন শাস্ত্র গড়া যাবে ॥

ভারতীয় নৃত্য

নৃত্য জীবনীশক্তির চরম বিকাশ। যে-সব কলা দ্বারা মানুষ তাহার সৌন্দর্যানুভূতি প্রকাশ করে, তাহাদের গভীরতম মূল নৃত্যরস হইতে প্রাণ-সঞ্চয় করে। অন্যান্য কলা সৃষ্ট হইবার বহু পূর্বে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত, আড়ম্বরহীন নৃত্য দ্বারা তাহার অনুভূতি প্রকাশ করিয়াছে - অপরের হৃদয়ে সেই রস সঞ্চারিত করিবার জন্য এই সরল কলাই তখন তাহার একমাত্র আশ্রয়ও ছিল। আদিম মানবের বাদ্যযন্ত্র ছিল না, ধ্বনি বিশ্লেষণ করিয়া সঙ্গীত সৃষ্টি করিতে সে তখনও শিখে নাই, প্রতিমা নির্মাণের যন্ত্রপাতি

তাহার ছিল না, চিত্রাঙ্কনের সরঞ্জাম তাহার কাছে তখনও অজানা। অনুভূতি প্রকাশ করিবার একমাত্র পন্থা ছিল তাহার নিজের দেহ; সেই দেহ সে সাবলীল ছন্দে তালে তালে আন্দোলিত করিয়া তাহার সুখ-দুঃখ, ভয়-ঘৃণা প্রকাশ করিত। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অনুভূতি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল—নৃত্যও তাহার সঙ্গে যোগ রাখিয়া সুকুমার কলায় পরিণত হইল; মানুষ নৃত্য দ্বারা তাহার সূক্ষ্মতম ও গভীরতম অনুভূতিকে রূপ দিতে শিখিল।

সলীল ছন্দে, তালমানযোগে দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আন্দোলন দ্বারা মানুষ যখন তাহার জীবনীশক্তির চরম সত্তাকে সপ্রকাশ করিয়া তুলে তখনই তাহা নৃত্যের রূপ ধারণ করে। নৃত্য তখন মানুষের নব নব সৌন্দর্যানুভূতি, সত্যের সঙ্গে তাহার অন্তরতম পরিচয় নব নব রূপে উন্মোচন করিয়া প্রকাশ করে। তাই শুদ্ধ, অকৃত্রিম নৃত্য সম্পূর্ণ বাধাবন্ধহীন। দেশ ও কালের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে তাহাকে রুদ্ধ করা, কুসংস্কার দ্বারা তাহাকে আচ্ছন্ন করার অর্থ আর কিছুই নয়—তাহার অফুরন্ত জীবন-উৎসকে রুদ্ধ করা, তাহার স্বাধীনতাকে পঙ্গু করা। আমাদের দেশের হৃদয় একদিন স্বতঃস্ফূর্ত, বাধাবন্ধহীন আনন্দের নৃত্যছন্দে আন্দোলিত হইয়াছিল, আজ সেই ধারা বন্ধ হইয়া ব্যবসায়ী নটনটীদের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্ধকূপের সৃষ্টি করিয়াছে। রোগজীর্ণ, বিষাক্ত, বিলাসব্যসনীদের উত্তেজনা দানেই আজ আহার চরম আনন্দ, পরম লাভ। ক্ষুদ্র হৃদয়ের অবসর বিনোদন ও ক্ষণস্থায়ী চিত্তচাঞ্চল্যের প্রকাশ করাকেই এখন নৃত্যের আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

কিন্তু ধীরে ধীরে আমাদের সুস্থবুদ্ধি পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছে; নৃত্যের বিকৃত বিকলাঙ্গ দেহে পুনরায় প্রাণ সঞ্জীবিত হইতেছে। ভারতীয় নৃত্যের নবজীবন সন্ধিক্ষণের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে ভারতের উচ্চাঙ্গ ও জনপদ নৃত্যের বিভিন্ন ধারার সহিত পরিচিত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন।

সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতি অনুন্নত জাতির ভিতরে যে-সব নৃত্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে রহিয়াছে ফসল কাটা, নবান্নের আনন্দ অথবা বৃষ্টিপাত, ঝঞ্ঝাবাত, ভূতপ্রেতের লীলাখেলা। বসুন্ধরার আদিম সন্তান নৃত্যযোগে প্রয়োজনমত কখনো প্রকৃতির রুদ্র মূর্তিকে তুষ্ট করিতে চাহিয়াছে, কখনো তাহার দক্ষিণ মুখের কামনা করিয়াছে। ডমরু ঢোলের বৈচিত্র্যহীন তালের সঙ্গে সে তখন তাহার দেহের ছন্দ মিলাইয়া নাচিয়াছে। সে নৃত্য অমার্জিত, কিন্তু তবু কখনও কখনও তাহাতে হিল্লোলের সন্ধান পাওয়া যায়। অর্ধবৃত্তাকারে তাহারা নাচে, গান গায় ও মধ্যস্থলে দুইজন পুরুষ মাদল বাজাইয়া তীক্ষ্ণ চীৎকার ও উন্মত্ত নৃত্যে স্ত্রীলোকদিগকে দ্রুততর নৃত্যে উত্তেজিত করে। পুরুষেরাও কখনো মূল নর্তকরূপে অপ্রসন্ন দেবতাকে তুষ্ট করিবার জন্য অথবা দর্শকের মনে বিচিত্র ভাব সঞ্চারের জন্য নৃত্য করিয়া থাকে। অসভ্য সমাজে ইহাদের প্রতিপত্তিও অসীম; সমাজ তাহাদিগকে ভক্তিভরে পূজা করে।

আমাদের দেশের জনপদনৃত্য বলিতে প্রধানত গুজরাতের গরবা, মালাবারের কৈকট্টকলি, উত্তর-ভারতের কাজরী ও মণিপুরের রাসলীলাই বুঝায়। ইহাদের মূলে ধর্মের অনুপ্রেরণা, অঙ্গভঙ্গিতে ইহারা সুমার্জিত ও আঙ্গিকের দিক দিয়া যে ইহাদের যথেষ্ট বিকাশ হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই নৃত্যগুলি পুনরাবৃত্তিবহুল বলিয়া দর্শকের মন সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তৎসত্ত্বেও ইহাদের মাধুর্য ও প্রাণশক্তি অস্বীকার করা যায় না। গুজরাতের গরবাতে যথেষ্ট লালিত্য ও প্রাণশক্তি আছে, কিন্তু পদভঙ্গির অভাব; মালাবারের কৈকট্টকলিতে সবল অঙ্গ সঞ্চালন ও বিচিত্র পদভঙ্গির প্রাচুর্য আছে, কিন্তু মাধুর্যের অভাব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজন যে, একমাত্র গুজরাতের জনপদ নৃত্যেই স্ত্রী-পুরুষেরা যেমন পৃথক পৃথক মণ্ডলীতে নৃত্য করিয়া থাকে, সেইরূপ উভয়ে সম্মিলিত হইয়াও নৃত্য করিবার রীতি প্রচলিত আছে। নর্তকীরা বহু ছিদ্রবিশিষ্ট মৃৎপাত্রে জ্বলন্ত প্রদীপ রাখিয়া অথবা মস্তকে সুগঠিত পিত্তল কলসী ধারণ করিয়া মনোরম অঙ্গভঙ্গিতে চক্রাকারে নৃত্য করে; সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও রাসগীতি গায়, করতালি দিয়া তাল লয় রক্ষা করে। কখনও কখনও দুইটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড দিয়া নাচিবার সময় তাল বজায়; অজন্তা ও অন্যান্য প্রাচীন চিত্রে ঐ কাষ্ঠখণ্ডের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে সঙ্গীত সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়; তখন কেবলমাত্র মাদলের তালে শুদ্ধ স্বাধীন নৃত্য আরম্ভ হয়; অঙ্গভঙ্গি তখন সবল হইয়া ওঠে ও পদসঞ্চালন দ্রুততর গতিতে হইতে থাকে।

জনপদনৃত্যের মধ্যে মণিপুরী রাসলীলাতেই সর্বাধিক সাধনা ও শিক্ষার প্রয়োজন হয়; আঙ্গিকের দিক দিয়াও উন্নত বলিয়া রাসলীলাকে উচ্চাঙ্গ নৃত্যরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। মণিপুরের রাসলীলা ভক্তিরসে পরিপূর্ণ —গোপ ও গোপীগণের আবেষ্টনীতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাহিনী বর্ণনা করাই এই নৃত্যের উদ্দেশ্য। রাজবাড়িতে রাসলীলার নাচ শিখানো হয়, ও দেশের জনসাধারণ রসের দিক দিয়া ইহার বিচার করিয়া ইহার প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে। রাসলীলায় তরুণীরা ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলীতে গোপীরূপে নৃত্য করে ও রাধার ভূমিকায় বালককে নামানো হয়। তরুণীদের নৃত্য অপেক্ষাকৃত শান্ত ও সরল; তরুণ ও বয়স্কদের নৃত্য সবল ও ছন্দ-বৈচিত্র্যবহুল। নাচের তাল রক্ষা হয় মৃদঙ্গের জ্ঞাতি, খোল সংযোগে।

উচ্চাঙ্গ নৃত্যের মধ্যে প্রধান—উত্তর-ভারতের কথক, দক্ষিণ-ভারতের ভরত নাট্যম্ ও মালাবারের কথাকলি ও মোহিনী আট্যম্। পরিতাপের বিষয় এই সব কয়টি নৃত্যই ব্যবসাদার নটনটীর কবলগ্রস্ত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল বিত্তশীলাদের ঘৃণ্য লালসাগ্নি উদ্দীপ্ত ও চরিতার্থ করিবার জন্য নিযুক্ত হইতেছে। যে দুষ্ট পরিবেষ্টনীর মধ্যে এইসব নৃত্যের চর্চা আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে এই মহৎ কলার প্রাণবন্ত সৌন্দর্য ও পূর্ণাবয়ব আঙ্গিকের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। মুসলিম সভ্যতার প্রভাবে উত্তর-ভারতের উচ্চাঙ্গ নৃত্য কঠিন ও জটিল তাল-লয়ের সৃষ্টি করে, সে-তাল প্রকাশ করিলে তবলার

বোল পদধ্বনিতে শোনা যায়। শুধু তাই নয়, হাবভাব, নিতম্ব ও কটিসঞ্চালন, কটাক্ষভঙ্গি, স্কন্ধান্দোলন, এক কথায় সর্ব অঙ্গের চালনা ও ভাবপ্রকাশ শুদ্ধমাত্র দর্শকের হৃদয়ে পাশবিক আনন্দদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। এইসব নৃত্যে বিকাশপ্রাপ্ত আঙ্গিকের সন্ধান মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, কিন্তু বেশির ভাগই হীন ও অশ্লীল।

দক্ষিণে প্রচলিত ভরত নাট্যম্ শুদ্ধ হিন্দুকলা। ভারত নাট্যে যে-সব 'মুদ্রা' দ্বারা দেবদেবী, পশুপক্ষী ও বিভিন্ন অনুভূতির প্রকাশ করা হয় সেইগুলি এই নৃত্যের মুখ্য বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। উত্তরের কথক নৃত্যের তুলনায় ভরত নৃত্যে পদসঞ্চালনের কারুকার্য নাই এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গসঞ্চালনও অপেক্ষাকৃত কর্তিত ও সংযত। মালাবারের মোহিনী আট্যম্ অনেকটা ভরত নাট্যের ন্যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই নৃত্য মরণোন্মুখ—সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। দক্ষিণের সব কয়টি উচ্চাঙ্গ নৃত্যই কেবলমাত্র স্ত্রীলোকেরাই নাচিয়া থাকে—অতি অল্প বয়সেই বালিকারা পুরুষ পেশাদারের কাছে শিক্ষা আরম্ভ করে ও বহুবৎসরব্যাপী কঠিন নিয়ম রীতিমত পালন করিয়া নৃত্যকলায় পারদর্শিনী হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সব নৃত্যে আজকাল কেবলমাত্র শুষ্ক অঙ্গিকের পরিচয় পাওয়া যায়, শুদ্ধ কলার চিহ্নমাত্র নাই। যে-নৃত্য সৃষ্টি করে না, কেবলমাত্র পূর্বানুকরণ করিয়াই সন্তুষ্ট হয়, তাহার যে এই গতি হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি!

আজকাল কথাকলি অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে ও এ-সম্বন্ধে প্রচুর বাক্যবিন্যাস করা হইয়াছে বলিয়া এই সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বলার প্রয়োজন। এদেশের সর্বত্রই নর্তক-নর্তকী, গায়ক-গায়িকা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে রামায়ণ মহাভারতের উপাখ্যান অভিনয় করিয়া থাকে; বিভিন্ন প্রদেশে ইহারা বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। মালাবারে ইহারা কথাকলি নামে পরিচিত—'কথা' অর্থ 'গল্প' ও 'কলি' অর্থ 'নাট্য'। কথাকলির অভিনেতারা অন্যান্য প্রদেশের নট-নটীর ন্যায় বাক্য উচ্চারণ করে না; তাহারা মূক অভিনয় করে, তবলা ও মন্দিরা সহযোগে নাচে ও তাহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া দুইজন গায়ক গল্পগুলি গান গাহিয়া শুনায়। মুক্ত আকাশের নীচে অভিনয় হয় ও সূর্যোদয় পর্যন্ত আনন্দোৎসব চলে। অভিনেতারা বৃহৎ চুনটদার জামাকাপড় পরে ও বিচিত্র প্রসাধনের দ্বারা একপ্রকার অভিনব মুখোশ নির্মাণ করে। কথাকলি নৃত্যের কটাক্ষ, মুখের মাংসপেশী নিয়ন্ত্রণ, নানাপ্রকার 'মুদ্রা'র ব্যবহার ও বিশেষত পদদ্বয়ের সম্প্রসারণ দ্বারা নৃত্যকে প্রাণদান প্রভৃতি আঙ্গিক অত্যন্ত দুরূহ ও বহুবৎসরব্যাপী কঠিন সাধনা ব্যতীত এই কলায় দক্ষতা লাভ অসম্ভব। নয় দশ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই বালিকাকে নৃত্যে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিতে হয় ও পূর্ণ যৌবন লাভ না করা পর্যন্ত নর্তকীকে কঠোর সাধনার ভিতর দিয়া জীবনযাপন করিতে হয়।

কথাকলি ঠিক নৃত্য নয়, নৃত্যনাট্যও নয়। বরঞ্চ মুখোশপরা তামাসা-নাচের সঙ্গেই ইহার সাদৃশ্য অধিক; নৃত্যকলা ইহাতে স্ফুরিত হয় না। নৃত্যের প্রারম্ভেই যবনিকান্তরালে দুই-একটি আবাহন নৃত্য করা হয় ও তারপর প্রত্যেক শ্লোক বা গান গাওয়া শেষ হইতেই অভিনেতারা চক্রাকারে 'কলসম' নৃত্য করে। তারপর স্ত্রী চরিত্রের 'সরি' নৃত্য ও রাজহংস বা ময়ূরের পক্ষীনৃত্য করা হয়।

কথাকলি নৃত্য শক্তি ও তেজঃপ্রধান, কিন্তু অন্যান্য উচ্চাঙ্গ নৃত্যে-পদসঞ্চালনের যে কারুকার্য ও গতিছন্দের বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় ইহাতে তাহার অত্যন্ত অভাব। অভিনেত্রীদিগকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অঙ্গভঙ্গি শিক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও যে কেন তাহাদের নৃত্য এত রূঢ় ও অপরূপে প্রকাশ পায়, তাহা অনেক সময় বুঝিয়া উঠা যায় না। কথাকলি গণ্ডিবদ্ধ বলিয়া পূর্বানুকরণ করিয়াই সন্তুষ্ট ও মাঝে মাঝে তাহার বস্তুতান্ত্রিকতা অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়া দাঁড়ায়। শুধু আঙ্গিকের দিক দিয়াই আজ কথাকলি আমাদের কৌতূহল ও দৃষ্টি আকর্ষণ করে; সুকুমার কলা হিসাবে এই নৃত্য ভারতবর্ষের অন্যান্য উচ্চাঙ্গ নৃত্যের ন্যায় আজ মৃত।

মাত্র কুড়ি বাইশ বৎসর হইল এদেশে নৃত্যকে বিষাক্ত পরিবেষ্টনী হইতে মুক্ত করিয়া আমাদের সামাজিক জীবনে স্থান দিবার চেষ্টা করা হইতেছে ও সঙ্গীত চিত্রাঙ্কনের ন্যায় নৃত্যও সুকুমার কলা হিসাবে গ্রহণ করিবার প্রয়াস দেখা যাইতেছে। তাই আজকাল সঙ্গীতের মজলিসে, স্কুল-কলেজের আমোদ-অনুষ্ঠানে, পারিবারিক ও সামাজিক উৎসব-আনন্দে নৃত্যচর্চা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কণ্ঠসংগীতের সঙ্গে মিলাইয়া কেবলমাত্র তালসংযুক্ত পদসঞ্চালন থাকিলেই তাহা পূর্বের ন্যায় এখনও নৃত্য নামে নন্দিত হয়। সেই নৃত্যকলা এখন 'ফ্যাশান' হইয়া দাঁড়াইয়াছে—কোনো রকম শিক্ষা-দীক্ষা না লইয়াই চ্যারিটি-রিলিফ ফাণ্ডের অজুহাতে যত্রতত্র নৃত্য করা ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে। এখনও কি এই সরল তত্ত্বটি বুঝিবার সময় হয় নাই যে নৃত্য অর্থহীন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্ষেপের মূল্যহীন সমষ্টিমাত্র নহে? এখনও কি দেশবাসী বুঝিবে না যে, নৃত্য অন্যান্য সুকুমার কলার ন্যায় একনিষ্ঠ ও আজীবন সাধনাসাপেক্ষ কলা বিশেষ? অতি অল্পসংখ্যক নর্তকনর্তকীই এযাবৎ অর্থহীন অঙ্গসঞ্চালন ত্যাগ করিয়া প্রকৃত নৃত্যরসে মনঃসংযোগ করিয়াছেন। এবং ইঁহাদের ভিতরেই বা কয়জন সত্যাসত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে নৃত্যের ন্যায় উচ্চাঙ্গের সুকুমার কলায় পারদর্শী হইতে হইলে তাহার প্রতি কী অবিচল নিষ্ঠা ও কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয়? বেশীর ভাগই তো দেখতে পাই দুই-একদিনের ছন্নছাড়া শিক্ষায় দুই একটি নৃত্যেই সন্তুষ্ট। তাহাতে তো শুধু লোক ভুলানো চলে—সে তো কলা নহে। তাই সামান্য যে কয়জন প্রকৃত নৃত্যকলা হিসাবে গ্রহণ করিয়া সাধনা করিতেছেন তাঁহারা সত্যই প্রশংসনীয়। সমাজের বাধাবন্ধ উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা সাহসের ভরে লোকচক্ষুর সম্মুখে নৃত্যকলা দেখাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহারাও সেই প্রাচীন ঐতিহ্যগত নৃত্য দেখাইয়াই সন্তুষ্ট। তাঁহাদের নৃত্যে ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ নাই। পেশাদার নর্তকেরা যে দৈন্য বহু সাধনালব্ধ আঙ্গিকের দ্বারা লুকাইয়া রাখিতে সমর্থ হয়, তাঁহাদের নৃত্যে তাহা বার বার ধরা পড়ে। ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা যে কাহারও নাই এমন নহে, কিন্তু আছে অতি অল্পসংখ্যক গুণীর ভিতরে। তাঁহারা যে শুধু গভীর সাধনার দ্বারা নৃত্য আয়ত্ত করিয়াছেন এমন নহে, তাঁহারা যে শুধু প্রাচীন ঐতিহ্যগত

নৃত্য সর্বাঙ্গসুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও নহে, তাঁহাদের বিশেষত্ব এই যে, বর্তমান যুগের রুচি অনুযায়ী তাঁহারা নৃত্যের প্রাচীন বিষয়বস্তুকে নূতন রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত গুণীর চরম লক্ষ্য তো ইহাও হইতে পারে না; তিনি সৃষ্টিকর্তা, তাঁহাকে নব নব বিষয়ের কল্পনা করিতে হইবে, নব নব রূপে সেগুলিকে প্রকাশ করিতে হইবে—জরাজীর্ণ বৃদ্ধাকে নবীনবেশে সজ্জিত করিয়া তিনি কেন বিড়ম্বিত হইবেন? জীবনীশক্তির যে দ্রুত, অবিশ্রান্ত স্পন্দন আমরা আমাদের ধমনীতে ধমনীতে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি। অতি সনাতন ভাবনা-কামনা একদিন যে রূপ, যে বর্ণ নিয়া প্রকাশিত হইত তাহার সঙ্গে আমাদের অদ্যকার সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণ সংগ্রাম, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের কোথায় যোগসূত্র? সুকুমার কলা কি কখনো মৃতদগ্ধ চিন্তা অনুভূতির অন্ধকূপে প্রাণধারণ করিতে পারে? নৃত্য তো শুধু তাললয়যোগে অঙ্গসঞ্চালন নয়, নৃত্য তো সুচারু পদক্ষেপের নামান্তর নয়; আঙ্গিকের উৎকর্ষ নৃত্য, অঙ্গবিন্যাস দ্বারা সুদর্শন আলিম্পন সৃষ্টি করাও নৃত্য নয়। প্রকৃত নৃত্যের চরম আদর্শ আমাদের জীবনের দ্বন্দ্বানুভূতি প্রকাশ করা, সত্য ও সুন্দরকে উন্মোচন করিয়া আমাদের চক্ষুর গোচর করা। জিজ্ঞাসা করি, রাধা-কৃষ্ণ, শিব-পার্বতী নৃত্য কি যথেষ্ট নাচা হয় নাই, প্রচুর দেখা হয় নাই? এখনও কি ধর্মের আচ্ছদনে আবৃত কুসংস্কারের নাগপাশ ছিন্ন করিবার সময় হয় নাই? এ যুগের মানুষের কি নিজস্ব কোনোও অনুভূতি, কোনো দ্বন্দ্ব, কোনো আশা, কোনো আদর্শ নাই? তাহাদের কি কিছুই বক্তব্য নাই—মানবসংসারের চিরন্তন দীপান্বিতা প্রজ্বলিত করিবার কোন প্রদীপ নাই? বাহির হইয়া আসুক এ দেশের তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, মোহমুক্ত হইয়া প্রকাশ করুক তাহাদের আশা-অনুভূতি আপন সবল কণ্ঠে, শুধু কর্মে নয়,—সাহিত্যে, চিত্রে, ভাস্কর্যে, সঙ্গীতে ও নৃত্যে॥—(শ্রীমতী ঠাকুরের গুজরাতি লিখন হইতে অনূদিত)।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—নির্বাসিতের আত্মকথা

কোনো কোনো বই পড়ে লেখকেরা আপন আপন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড় নিরাশ হন। যাদের সত্যকার শক্তি আছে, তাদের কথা হচ্ছে না, আমি ভাবছি আমার আর আমার মত আর পাঁচজন কমজোর লেখকের কথা।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পর পুনরায় 'নির্বাসিতের আত্মকথা' পুস্তিকাখানি আদ্যন্ত পড়লুম। পাঠকমাত্রই জানেন, ছেলেবেলার পড়া বই পরিণত বয়সে পড়ে মানুষ সাধারণত হতাশ হয়। 'নির্বাসিতের' বেলা আমার হল বিপরীত অনুভূতি, বুঝতে পারলুম, কত সূক্ষ্ম অনুভূতি, কত মধুর বাক্যভঙ্গি, কত উজ্জ্বল রসবাক্য, কত করুণ ঘটনার ব্যঞ্জনা তখন চোখে পড়ে। সাধুভাষার মাধ্যমে যে এত ঝকঝকে বর্ণনা করা যায়, সে ভাষাকে যে এতখানি চটুল গতি দিতে পারা যায়, 'নির্বাসিত' যাঁরা পড়েন নি, তাঁরা কল্পনামাত্র করতে পারবেন না।

কিন্তু প্রশ্ন, এই বই পড়ে আপন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হলুম কেন?

হায়, এ রকম একখানা মণির খনির মত বইয়ের চারিটি সংস্করণ হল ত্রিশ বৎসরে! তাহলে আর আমাদের ভরসা রইল কোথায়?

* * *

১৯২১ (দু-চার বছর এদিক-ওদিক হতে পারে) ইংরেজিতে একদিন শান্তিনিকেতন লাইব্রেরিতে দেখি একগাদা বই গুরুদেবের কাছ থেকে লাইব্রেরিতে ভর্তি হতে এসেছে। গুরুদেব প্রতি মেলে বহু ভাষায় বিস্তর পুস্তক পেতেন। তাঁর পড়া হয়ে গেলে তার অধিকাংশ বিশ্বভারতীয় পুস্তাকাগারে স্থান পেত। সেই গাদার ভিতর দেখি, 'নির্বাসিতের আত্মকথা'।

বয়স অল্প ছিল, তাই উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম জানা ছিল না। বইখানা ঘরে নিয়ে এসে এক নিঃশ্বাসে শেষ করলুম। কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলছি নে, এ বই সত্যসত্যই আহার-নিদ্রা ভোলাতে পারে। 'পৃথিবীর সব ভাষাতেই এরকম বই বিরল; বাঙলাতে তো বটেই।'

পরদিন সকালবেলা গুরুদেবের ক্লাসে গিয়েছি। বই খোলার পূর্বে তিনি শুধালেন 'উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নির্বাসিতের আত্মকথা" কেউ পড়েছ?' বইখানা প্রকাশিত হওয়ামাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছে; তিনি সেখানে পড়ে লাইব্রেরিতে পাঠান, সেখান থেকে আমি সেটাকে কব্জা করে এনেছি, অন্যেরা পড়বার সুযোগ পাবেন কি করে? বয়স তখন অল্প, ভারি গর্ব অনুভব করলুম।

বললুম, 'পড়েছি।'

শুধালেন, 'কি রকম লাগল?'

আমি বললুম, 'খুব ভালো বই।'

রবীন্দ্রনাথ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আশ্চর্য বই হয়েছে। এ রকম বই বাঙলাতে কম পড়েছি।'

বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে বলে আজ আর হুবহু মনে নেই রবীন্দ্রনাথ ঠিক কি প্রকারে তাঁর প্রশংসা ব্যক্ত করেছিলেন। আমার খাতাতে টোকা ছিল এবং সে খাতা কাবুল-বিদ্রোহের সময় লোপ পায়। তবে একথা আমার পরিষ্কার মনে আছে, যে, রবীন্দ্রনাথ বইখানার অতি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

বিখ্যাত লেখককে দেখার সাধ সকলেরই হয়। আমি যে সে কারণে উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম তা নয়। আমার ইচ্ছা ছিল দেখবার যে বারো বৎসর নরক-যন্ত্রণার পর তিনি যে তাঁর নিদারুণ অভিজ্ঞতাটাকে হাসি-ঠাট্টার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করলেন তার কতখানি সত্যই তাঁর চরিত্র-বলের দরুন এই বিশেষ রূপ নিল আর কতখানি নিছক সাহিত্যশৈলী মাত্র। অর্থাৎ তিনি কি সত্যই এখনো সুরসিক ব্যক্তি, না অদৃষ্টের নিপীড়নে তিক্ত-স্বভাব হয়ে গিয়েছেন।

গিয়ে দেখি পিতা-পুত্র বসে আছেন।

বেশ নাদুস-নদুস চেহারা (পরবর্তী যুগে তিনি রোগা হয়ে গিয়েছিলেন), হাসিভরা মুখ আর আমার মত একটা আড়াই ফোঁটা ছোকরাকে যে আদর করে কাছে বসালেন, তার থেকে তৎক্ষণাৎ বুঝে গেলুম যে, তাঁর

ভিতর মানুষকে কাছে টেনে অনেবার কোন আকর্ষণী ক্ষমতা ছিল, যার জন্যে বাঙলা দেশের তরুণ সম্প্রদায় তাঁর চতুর্দিকে জড় হয়েছিল।

ছেলেটিকেও বড় ভালো লাগলো। বড্ড লাজুক আর যে সামান্য দু'একটি কথা বলল, তার থেকে বুঝলুম, বাপকে সে শুধু যে ভক্তি-শ্রদ্ধাই করে তা নয়, গভীরভাবে ভালোও বাসে।

অটোগ্রাফ-শিকারের ব্যসন তখন বাঙলা দেশে চালু হয় নি। তবে সামান্য যে দু'একজন তখনকার দিনে এ ব্যসনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা শুধু স্বাক্ষরেই সন্তুষ্ট হতেন না, তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কুটেশন বা আপন বক্তব্য লিখিয়ে নিতেন। আমার অটোগ্রাফ দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, প্রফুল্ল রায়, লেভি, অ্যাণ্ড্রুজ ইত্যাদির লেখা তো ছিলই, তার উপর গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমার, কারপেলেজের ছবিও ছিল।

উপেনবাবুকে বইখানা এগিয়ে দিলুম।

এর পিছনে আবার একটুখানি ইতিহাস আছে।

বাজে-শিবপুরে শরৎচন্দ্রকে যখন তাঁর স্বাক্ষর এবং কিছু একটা লেখার জন্য চেপে ধরেছিলুম, তখন তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন বিশেষ করে তাঁর কাছেই এলুম কেন? আমি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলুম, 'আপনার লেখা পড়ে আপনার কাছে না আসাটাই তো আশ্চর্য!'

শরৎবাবু একটুখানি ভেবে লিখে দিলেন, 'দেশের কাজই যেন আমার সকল কাজের বড় হয়।'

আমি জানি শরৎচন্দ্র কেন ঐ কথাটি লিখেছিলেন। তখন তিনি কংগ্রেস নিয়ে মেতেছিলেন।

তারপর সেই বই যখন রবীন্দ্রনাথকে দিলুম, তখন তিনি শরৎচন্দ্রের বচন পড়ে লিখে দিলেন,—

'আমার দেশ যেন উপলব্ধি করে যে, সকল দেশের সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ দ্বারাই তার সার্থকতা।'

এর ইতিহাস বাঙালীকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বমৈত্রী নিয়ে তখন রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের তর্ক আলোচনা হচ্ছিল।

উপেনবাবুকে অটোগ্রাফ দিতে তিনি দুটি লেখা পড়ে লিখে দিলেন,—

'সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।'

* * *

ছেলেবেলায় বইখানা পড়েছিলুম এক নিশ্বাসে কিন্তু আবার যখন সেদিন বইখানা কিনে এনে পড়তে গেলুম তখন বহুবার বইখানা বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকতে হল। বয়স হয়েছে, এখন অল্পতেই চোখে জল আসে আর এ বইয়েতে বেদনার কাহিনী 'অল্পে'র উপর দিয়ে শেষ হয় নি। সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব বোধ হয় বইখানির সেখানেই। উপেন্দ্রনাথ যদি দস্তয়েফ্‌স্কির মতো পুঙ্খানুপুঙ্খ করে তাঁর কারাবাস আর আন্দামান-জীবন (জীবন না বলে 'মৃত্যু' বলাই ঠিক)

বর্ণনা করতেন তবে আমাদের মনে কোন্ জাতীয় অনুভূতির সৃষ্টি হত বলা সুকঠিন কিন্তু এই যে তিনি নির্বাসিতদের নিদারুণ দুঃখ-দুর্দৈবের বহুতর কাহিনী প্রতিবারেই সংক্ষিপ্ততম বর্ণনায় শেষ করে দিয়েছেন এতে করেই আমাদের কল্পনা তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে কত হৃদয়বিদারক ছবি এঁকে আমাদের হৃদয়কে মথিত করেছে কত বেশি। সেটা হল প্রকৃত শক্তিশালী লেখকের লক্ষণ। যেটুকু ব্যঞ্জনার পাখা প্রয়োজন উপেন্দ্রনাথ সেইটুকু মাত্র দিয়েই আমাদের উড়িয়ে দিলেন। উপেন্দ্রনাথ স্বয়ং যে উদ্ধৃতি আপন পুস্তকে ব্যবহার করেছেন আমি সেইটে দিয়ে তাঁর এ অলৌকিক ক্ষমতার প্রশস্তি গাই ;

"ধন্য ধন্য পিতা দশমেস গুরু
যিন চিড়িয়াঁসে বাজ তোড়ায়ে"

"ধন্য ধন্য পিতঃ, হে দশম গুরু ! চটক দিয়া তুমি বাজ শিকার করাইয়াছিলে ; তুমি ধন্য !"[১]

উপেন্দ্রনাথ দস্তয়েফ্স্কির মতো শক্তিশালী লেখক নন ; দস্তয়েফ্স্কির মতো বহুমুখী প্রতিভা তাঁর ছিল না কিন্তু এ-কথা বার বার বলব দস্তয়েফ্স্কির সাইবেরিয়া কারাবাস উপেন্দ্রনাথের আত্মকথার কাছে অতি নিশ্চয় হার মানে।

সবচেয়ে মামুলী জিনিস নিয়েই উপেন্দ্রনাথের শক্তির পরিচয় দিই। ভাষার দখল অনেক লোকেরই আছে কিন্তু একই ভাষার ভিতর এত রকমের ভাষা লিখতে পারে কজন ? এক শ সত্তর পাতার বইয়ে ফলাও করে বর্ণনা দেবার স্থান নেই অথচ তার মাঝখানেই দেখুন, সামান্য কয়টি ছত্রে কী অপরূপ গুরুগম্ভীর বর্ণনা ;—

"গানটা শুনিতে শুনিতে মানস-চক্ষে বেশ স্পষ্টই দেখিতাম যে, হিমাচলব্যাপী ভাবোন্মত্ত জনসঙ্ঘ বরাভয়করার স্পর্শে সিংহগর্জনে জাগিয়া উঠিয়াছে ; মায়ের রক্তচরণ বেড়িয়া বেড়িয়া গগনস্পর্শী রক্তশীর্ষ উত্তাল তরঙ্গ ছুটিয়াছে ; দ্যুলোক ভূলোক সমস্তই উন্মত্ত রণবাদ্যে কাঁপিয়া উঠিয়াছে। মনে হইত যেন আমরা সর্ববন্ধনমুক্ত—দীনতা, ভয়, মৃত্যু আমাদের কখনও স্পর্শ করিতে পারিবে না।"[২]

পড়ে মনে হয় যেন বিবেকানন্দের কালীরূপ বর্ণনা শুনছি ;—

"নিঃশেষে নিবেছে তারাদল
মেঘ আসি আবরিছে মেঘ
স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার
গরজিছে ঘূর্ণ বায়ুবেগ
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত পরান
বহির্গত বন্দীশালা হতে
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি
ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে"[৩]

উপরের গম্ভীর গদ্য পড়ার পর যখন দেখি অত্যন্ত দিশী ভাষায়ও তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন ঠিক তেমনি জোর দিয়ে তখন আর বিস্ময়ের

১ নির্বাসিতের আত্মকথা, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ৯৬০
২ আত্মকথা, পৃঃ ৬৬। ৩ সত্যেন দত্তের অনুবাদ।

অন্ত থাকে না। শুধু যে সংস্কৃত শব্দের ওজস্ এবং প্রসার সম্বন্ধে তিনি সচেতন তাই নয়, কলকাতা অঞ্চলের পুরো-পাক্কাতে তো-কড়া ভাষাতেও তাঁর তেমনি কায়েমি দখল।

'বারীন বলিল—"এতদিন স্যাঙ্গাতেরা পট্টি মেরে আসছিলেন যে তাঁরা সবাই প্রস্তুত; শুধু বাঙলাদেশের খাতিরে তাঁরা বসে আছেন। গিয়ে দেখি না, সব ঢুঁঢু। কোথাও কিছু নেই; শুধু কর্তারা চেয়ারে বসে বসে মোড়লি কচ্ছেন। খুব কষে ব্যাটাদের শুনিয়ে দিয়ে এসেছি"। [৪]

এ-ভাষা হুতোমের ভাষা; এর ব্যবহার অতি অল্প লেখকেই করেছেন।

এককালে পশ্চিম-বাঙলার লোকও আরবী-ফার্সী শব্দে প্রসাদগুণ জানতেন ও কায়দামাফিক সেগুলো ব্যবহার করে ভাষার জৌলুস বাড়াতে কসুর করতেন না। ক্রমে ক্রমে এ ঐতিহ্য পশ্চিমবঙ্গে লোপ পায় অথচ পূর্ববাঙলার লেখকদের মেকদারবোধ কম ছিল বলে তাঁরা এ বাবদে অনেক জায়গায় লাভের বদলে লোকসানই করেছেন বেশি। উপেন্দ্রনাথ তাগমাফিক আরবী-ফার্সীও 'এস্তেমাল' করতে জানতেন।

"কোনরূপে হিন্দুকে মুসলমান ভাণ্ডারীর খানা খাওয়াইয়া তাহার গোঁফ ছাটিয়া দিয়া একবার কলমা পড়াইয়া লইতে পারিলে বেহেস্তে যে খোদা-তাল্লা তাহাদের জন্য বিশেষ আরামের ব্যবস্থা করিবেন, এ বিশ্বাস প্রায় সকল মোল্লারই আছে। [৫]

কিন্তু উপেন্দ্রনাথ ছিলেন একদম ন-সিকে বাঙালী। তাই,

"আমরা হিন্দু-মুসলমান সকলকার হাত হইতে নির্বিচারে রুটি খাই দেখিয়া মুসলমানেরা প্রথম প্রথম আমাদের পরকালের সদগতির আশায় উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল, হিন্দুরা কিঞ্চিৎ ক্ষুন্ন হইয়াছিল; শেষে বেগতিক দেখিয়া উভয় দলই স্থির করিল যে, আমরা হিন্দুও নই, মুসলমানও নই—আমরা বাঙালী।" [৬]

বাঙালীরা এরকম নেতিবাচক রমণীয় সংজ্ঞা আমি আর কোথাও শুনি নি।

কিন্তু এসব তাবৎ বস্তু বাহ্য।

না সংস্কৃত, না আরবী-ফারসী, না কলকত্তাই সব কিছু ছাড়িয়ে তিনি যে খাঁটি মেটে বাঙলা লিখতে পারতেন তার কাছে দাঁড়াতে পারেন আজকের দিনের ক'জন লেখক?

"শচীনের পিতা একদিন তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। জেলে কিরকম খাদ্য খাইতে হয় জিজ্ঞেসা করায় শচীন লপসীর নাম করিল। পাছে লপসীর স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া পিতার মনে কষ্ট হয় সেই ভয়ে শচীন লপসীর গুণগ্রাম বর্ণনা করিতে করিতে বলিল, 'লপসী খুব পুষ্টিকর জিনিস।' পিতার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। তিনি জেলার বাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—'বাড়িতে ছেলে আমার পেলোওএর বাটি টান মেরে ফেলে দিত; আর আজ লপসী তার কাছে পুষ্টিকর জিনিস।' ছেলের এ অবস্থা দেখিয়া বাপের মনে যে কি হয় তাহা কখনও ভাল করিয়া বুঝি নাই,

৪ আত্মকথা, পৃঃ ৩৩। ৫ পৃঃ ১১৯। ৬ পৃঃ ১২১।

তবে তাহার ক্ষীণ আভাস যে একেবারে পাই নাই তাহাও নয়। একদিন আমার আত্মীয়স্বজনেরা আমার ছেলেকে আমার সহিত দেখা করাইতে লইয়া আসিয়াছিলেন। ছেলের বয়স তখন দেড় বৎসর মাত্র; কথা কহিতে পারে না। হয়তো এ জন্মে তাহার সহিত আর দেখা হইবে না ভাবিয়া তাহাকে কোলে লইবার বড় সাধ হইয়াছিল। কিন্তু মাঝের লোহার রেলিংগুলা আমার সে সাধ মিটাইতে দেয় নাই। কারাগারের প্রকৃত মূর্তি সেইদিন আমার চোখে ফুটিয়াছিল।[৭]

* * *

স্থাপত্যের বেলা ব্যাপারটা চট করে বোঝা যায়, কিন্তু সাহিত্যে অতটা সোজা নয়। তাজমহলকে পাঁচগুণ বড় করে দিলে তার লালিত্য সম্পূর্ণ লোপ পেত, যদিও ঐ বিরাট বস্তু তখন আমাদের মনকে বিস্ময়বিমূঢ় করে দিত, আর আমরা স্তম্ভিত হয়ে বলতুম, 'এ কী এলাহী ব্যাপার!' ফলে শাহ্‌জাহান যে প্রিয়ার বিরহে কাতর হয়ে ইমারতখানা তৈরী করেছিলেন, সেকথা বেবাক ভুলে যেতুম।

আর তাজমহলকে ছোট করে দিলে কি হয়, তা তো নিত্যি নিত্যি স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। শ্বেতপাথরের ক্ষুদে তাজমহল মেলা লোক ড্রইং-রুমে সাজিয়ে রাখেন। পাঁচজন তার দিকে ভালো করে না তাকিয়েই গৃহস্বামীকে জিজ্ঞেস করেন তিনি আগ্রায় গিয়েছিলেন কবে? ভদ্রলোকের আগ্রা গমন সফল হল—ক্ষুদে তাজ যে কোণে সেই কোণেই পড়ে রইল।

সাহিত্যের বেলাও অনেক সময় প্রশ্ন জাগে, 'এ উপন্যাসখানা যেন বড্ড ফেনিয়ে লেখা হয়েছে কিংবা অন্য আরেকখানা এতটা ঊর্ধ্বশ্বাসে না লিখে আরো ধীরে-মন্থরে লিখলে ঠিক আয়তনে গিয়ে দাঁড়াত।' যোগাযোগ' পড়ে মনে হয় না, এই বইখানাকে বড় কিংবা ছোট করা যেত না, 'গোরা'র বেলা মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে, হয়তো এ অনবদ্য পুস্তকখানা আরো ছোট করলে তার মূল্য বাড়ত।

আমার মনে হয় 'আত্মকথা' সংক্ষেপে লেখা বলে সেটি আমাদের মনে যে গভীর ছাপ রেখে গিয়েছে, দীর্ঘতর হলে হয়তো সেরকম অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারত না! আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, এ বইখানা লিরিক না করে এপিক করলেই ভালো হত। এ বই যদি 'ওয়ার অ্যান্ড পীসের' মত বিরাট ক্যানভাস নিয়ে চিত্রিত করা হত তবে বুঝি তার উপযোগী মূল্য দেওয়া হত। কিন্তু এ বিষয়ে কারো মনে দ্বিধা উপস্থিত হবে না যে, লিরিক হিসাবে এ বই এর চেয়ে কি বড়, কি ছোট কিছুই করা যেত না।

বই আরম্ভ করতেই চোখে পড়ে প্রথম বিপ্লবী যুগের এই তরুণদের হৃদয় কি অদ্ভুত সাহস আর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কী অবিশ্বাস্য তাচ্ছিল্যে ভরা ছিল। পরবর্তী যুগে ইংরেজের জেলখানার স্বরূপ আমরা চিনেছিলুম এবং শেষের দিকে জেল-ভীতি সাধারণের মন থেকে তো এক রকম প্রায় উঠেই গিয়েছিল,

---

৭ পৃঃ ৬৯, ৭০।

কিন্তু যে যুগে এঁরা হাসিমুখে কারাবরণ করেছিলেন, সে যুগের যুবকদের মেরুদণ্ড কতখানি দৃঢ় ছিল, আজ তো আমরা তার কল্পনাই করতে পারি নে। উল্লাস, কানাই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শুনে হেসেছিল—যেন কাঁধ থেকে বেঁচে থাকার একটা মস্ত বোঝা নেমে গেল। আজ যখন বাঙলাদেশের দিকে তাকাই, তখন বারংবার শিরে করাঘাত করে বলতে ইচ্ছে করে, 'হে ভগবান, সে যুগে তুমি অকৃপণ হস্তে বাঙলা দেশকে এত দিয়েছিলে বলেই কি আজ তোমার ভাণ্ডার সম্পূর্ণ রিক্ত হয়ে গিয়েছে?'

অথচ রুদ্র মহাকাল এই তরুণদের হৃদয়ে এবং জীবনে যে তাণ্ডব নৃত্য করে গেলেন, যার প্রতি পদক্ষেপে বঙ্গদেশের লক্ষ লক্ষ কুটির আন্দোলিত হল, বাঙালী হিন্দুর ইষ্টদেবী কালী করালী যখন বারংবার হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'মৈঁ ভূখা-হুঁ' তখন যে এই বঙ্গসন্তানগণ প্রতিবারে গম্ভীরতর হুঙ্কার দিয়ে বলল,—

"কালী তুই করালরূপিণী / আয় মাগো আয় মোর কাছে,"

যূপকাষ্ঠে স্বেচ্ছায় স্কন্ধ দিয়ে বলল, 'হানো, তোমার খড়্গ হানো,' তখনকার সেই বিচিত্র ছবি উপেন্দ্রনাথ কী দম্ভহীন অনাড়ম্বর অনাসক্তিতে চিত্রিত করে গেলেন।

দক্ষিণ ভারতের মথুরা, মাদুরায় এক তামিল ব্রাহ্মণের বাড়িতে কয়েক মাস বাস করার সৌভাগ্য আমার একবার হয়েছিল। গৃহকর্ত্রী প্রতি প্রত্যুষে প্রহরাধিককাল পূর্বমুখী হয়ে রুদ্র-বীণা বাজাতেন। একদিন জিজ্ঞাসা করলুম, 'আজ আপনি কি বাজালেন বলুন তো। আমার মনের সব দুশ্চিন্তা যেন লোপ পেল।' বললেন, 'এর নাম "শঙ্করবরণম্"—সন্ন্যাসী রাগও একে বলা হয় কারণ এ রাগে আদি, বীর, করুণ কোনো প্রকারের রস নেই বলে একে শান্তরসও বলা হয়। কিন্তু শান্ত অবস্থাকে তো রসাবস্থা বলা চলে না, তাই এর নাম সন্ন্যাস রাগ।'

উপেন্দ্রনাথের মূল রাগ সন্ন্যাস রাগ।

অথচ এই পুস্তিকা হাস্যরসে সমুজ্জ্বল।

তাহলে তো পরস্পরবিরোধী কথা বলা হল। কিন্তু তা নয়। উপেন্দ্রনাথ তাঁর সহকর্মীদের জীবন তথা বাঙলাদেশের পতনঅভ্যুদয়বন্ধুরপন্থা নিরীক্ষণ করছেন অনাত্মীয় বৈরাগ্যে—তাই তার মূল রাগ সন্ন্যাস—এবং তার প্রকাশ দিয়েছেন হাস্যরসের মাধ্যমে, দুঃখ-দুর্দৈবকে নিদারুণ তাচ্ছিল্যেরব্যঙ্গ দিয়ে এ বড় কঠিন কর্ম—কঠোর সাধনা এবং বিধিদত্ত সাহিত্যরস একধারে না থাকলে এ ভানুমতী অসম্ভব।

আমার প্রিয় চরিত্র ডন কুইক্‌সট্। উপেন্দ্রনাথ বিপরীত ডন।

ডন এবং উপেন্দ্রনাথের সাহস অসীম; দুইজনেই পরের বিপদে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে শানিত তরবারি নিয়ে আক্রমণ করেন, অন্যায় অত্যাচারের সামনে দুজনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লোহিতরঙে রঞ্জিত দেখেন।

পার্থক্য শুধু এইটুকু, উইণ্ডমিলকে ডন মনে করেন দৈত্য, দাসীকে মনে করেন রাজনন্দিনী, ভেড়ার পালকে মনে করেন জাদুকরের মন্ত্রসম্মোহিত পরীর দল।

আর উপেন্দ্রনাথ দেখেন বিপরীত। কারাগারকে ভাবেন রঙ্গালয়, কারা-রক্ষককে মনে করেন সার্কাসের সং, পুলিস বাহিনীকে মনে করেন ভেড়ার পাল।

এই নব ডন কুইক্‌সট্‌কে বার বার নমস্কার ॥

জয়হে ভারতভাগ্যবিধাতা

ম্যাট্রিক পাশের লিস্টে নাম দেখে যেমন 'ইয়া আল্লা' বলে ছেলে-ছোকরারা লম্ফ দিয়ে ওঠে আমাদের অখণ্ড স্বরাজলাভের আনন্দোল্লাস তার সঙ্গে তুলনীয়। এমন কি, ম্যাট্রিকেও যদি পাঠকের মন সন্তুষ্ট না হয় তাহলে বি. এ., এম. এ., পি-এইচ. ডি. ডি. লিট. যা খুশী বলতে পারেন তাতেও কোনো আপত্তি নেই। শুধু তাই নয়—এ স্বাধীনতা পাশের আনন্দ অন্য সব পাশের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি। কারণ অন্য যে-কোনো পরীক্ষায় দু-একজনের ইয়ার-বক্সী ফেল মারেনই মারেন—নিতান্ত পরশ্রীকাতর এবং বিঘ্ন-সন্তোষী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কারোরই কোনো পরীক্ষা পাশ নিরঙ্কুশ আনন্দায়ক হয় না—এ-পরীক্ষায় কিন্তু সবাই পাশ, সবাই রাজা। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী আজ স্বাধীন হলেন, আপনিও হলেন, আমিও হলুম।

কিন্তু প্রশ্ন ততঃ কিম? অবশ্য বলতে পারেন পরীক্ষা পাশ করে জ্ঞানার্জন হল এবং জ্ঞানার্জন স্বয়ংসম্পূর্ণ, আপন মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠিত। এর পর কিছু না করলেও কোনো আপত্তি নেই। এটা একটা উত্তর বটে কিন্তু কোনো জিনিস একদম কোনো কাজে লাগল না এ-কথাটা ভেবে কেমন যেন সুখ পাওয়া যায় না। প্রবাদ আছে, 'ইট ইজ বেটার টু ব্রেক দি হার্ট ইন লভ দেন ডু নাথিং উইথ ইট'—স্বাধীনতাটা কোনো কাজে লাগাব না একথা, ভেবে মন কেমন যেন সুখ পায় না; বাসনা হয়, দেখাই যাক না, রাজনৈতিক স্বরাজের মই চড়ে আরো পাঁচ রকমের স্বরাজ হস্তগত হয় কি না। এ-লোভ সকলেরই থাকবে সে-কথা হলপ করে বলা যায় না, কিন্তু অন্ততপক্ষে এ-তত্ত্বটা স্বীকার করে নিতে হবে যে, পাশের পর লেখা-পড়া বন্ধ করে দিলে জ্ঞান যে রকম কর্পূরের মতো বিনা কারণেই উবে যেতে থাকে, স্বাধীনতা-টাকেও তেমনি চালু না রাখলে ক্রমে ক্রমে সেও তার রূপ বদলাতে থাকে। স্বাধীনতা লাভের পরমুহূর্তেই যদি বেধড়ক ধর-পাকড় আরম্ভ করে দেন, মনে মনে ভাবেন পাঁচটা লোকের স্বাধীনতা কেড়ে নিলেই পাঁচশ লোকের স্বাধীনতার বাঁচাও তা হয়ে যাব কিংবা যদি ব্যক্তি-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে কালোবাজারীদের ল্যাম্পপোস্টে না ঝোলান তবে শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বরাজ লাভটা ঠিক কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আগেভাগে হলফ করে কিছু বলা যায় না।

হিটলারের পূর্বেও জর্মনি স্বাধীন ছিল কিন্তু জর্মনিকে সর্বাঙ্গসুন্দর স্বাধীনতা দিলেন হিটলার। লেনিনের পূর্বে রাশার জনসাধারণ স্বাধীনতার স্বাদ পায় নি, লেনিন এক ধাক্কায় গোটা দেশটাকে অনেকখানি এগিয়ে দিলেন।

এখন আবার স্তালিন দেশটাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে এসেছেন যে এর পর কি হয় না হয় বলা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত তিনিও হিটলারের গতি লাভ করবেন নাকি ?

কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, আমাদের চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার কোনো উপায় নেই—কিছু একটা করতেই হবে। স্বাধীনতার ঘোড়া চড়ি আর নাই চড়ি সেটাকে অন্তত বাঁচিয়ে রাখার জন্য দানা-পানির খর্চা হবেই হবে।

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেকখানি বিলিতি ছিল বলে আমাদের স্বরাজলাভও অনেকখানি বিলিতি কায়দায় হয়েছে। এখনও আমাদের লাট-বেলাটরা বিলিতি কায়দায় লঞ্চ-ডিনার খাওয়ান, পরট দেখেন, সেলুট নেন, এডিসি ফেডিসি কত ঝামেলা, কত বখেড়া। তাই স্বাধীনতা নিয়ে কি করব কথাটা উঠলেই গুণীরা বলেন, 'ইয়োরোপ কি বলছে, কান পেতে শোনো তো ; তারপর বিবেচনা করে ভালো-মন্দ যা হয় একটা কিছু করব।'

ইয়োরোপ কি বলছে সে বিষয়ে কারো মনে কোনো ধোঁকা নেই। ইয়োরোপ বলছে, 'হয় মার্কিন ইংরেজের ডিমোক্রেসি গ্রহণ করে তাদের দলে যোগ দাও, নয় লালরক্ত মেখে রুশের সঙ্গে এক হয়ে যাও। এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।'

ক্ষীণকণ্ঠে কেউ কেউ বলেন, 'কেন ? টিটো ?'

উত্তরে শুনি অট্টহাস্য। টিটো ইংরেজে বন্দুক-কামান কেনা-বেচার সমঝাওতাও নাকি হয়ে গিয়েছে কিংবা হব-হব করছে। টিটো মিয়ার 'তৃতীয় পন্থা' তিতু-মীরের বাঁশের কেল্লার মতো তিন দিনও টিকল না। তাঁকেও আস্তে আস্তে মার্কিন-ইংরেজের আস্তিন পাকড়ে এগোতে হচ্ছে।

এর পর আর কোন্ সাহসে ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ডের কথা তুলি ?

এবং তার চেয়েও মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে ইয়োরোপীয় সাহিত্যিক, চিত্রকর, কবি, দার্শনিকদের নিরঙ্কুশ নৈরাশ্যবাদ। ইংরেজি, ফরাসি, জর্মন, ইতালি যে কোনো মাসিক খুললেই দেখতে পাবেন ইয়োরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিই মাথায় হাত দিয়ে বলেছেন, 'কোনো পন্থাই তো দেখতে পাচ্ছি নে—মার্কিনের দেখানো পথ মনঃপূত হয় না, রুশের পথই বা ধরি কি প্রকারে ? মার্কিন ইংরেজের "ডিমোক্রেসি" এমনিতেই শোষণ-পন্থী তার উপর আমরা যদি তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কম্যুনিজমকে নির্মূল করে দি তাহলে এখনো তারা রুশ জুজুর ভয়ে যেটুকু সমঝে চলত, চাষামজুরকে দুমুঠো অন্ন দিত তাও আর দেবে না। আর রুশের কলমা পড়ে যদি মার্কিন-ইংরেজকে সাবড়ে দিই তাহলে স্তালিনকে ঠেকাবে কে ? যুগযুগসঞ্চিত ইয়োরোপের তাবৎ সভ্যতা তাবৎ সংস্কৃতিকে তো তিনি "বুর্জোয়া" বলে নাকচ করে দিয়েছেন, এমন কি তাঁর আপনজন ভার্গা, ভাভিলফ, কল্‌ৎসফ হয় "পেনশনে" নয় নির্বাসনে কিংবা মাটির নীচে। স্তালিন যদি বিশ্বজয় করতে পারেন তবে এ-দুনিয়াতে বাইবেল-কুরান, বেদ-পুরাণ তো থাকবেনই না, প্লাতো শেকস্‌পীয়র থাকবেন কিনা তাই নিয়ে অনায়াসে জল্পনা-কল্পনা করা যেতে পারে। আণ্ডা-মাখনের ছয়লাপ হয়তো হবে, কিন্তু এই পৃথিবীর লোক

প্লাতোশেকস্‌পীয়র পড়তে পাবে না শুনে জ্ঞালিনী কলমা পড়তে কিছুতেই মন মানে না।'

এবং তার চেয়েও মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি এদের নৈরাশ্যের অনুযোগ। একমাত্র পেশাদারী পাদ্রি-পুরোত ছাড়া ইয়োরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আজ আর এ-বিশ্বাস করেন না যে প্রভু যীশুর সাম্যের বাণী বিশ্বসমস্যার সমাধান করতে পারবে। একদিন সে-বাণী দাসকে মুক্তি দিয়েছিল, অত্যাচারীকে শান্ত করতে পেরেছিল, জড়লোক থেকে অধ্যাত্মলোকের অনির্বাণ দীপশিখার চিরন্তন দেওয়ালির উৎসবপ্রাঙ্গণে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু আজ সে বাণী ভাটিকানের আপন দেশেই লুণ্ঠন অগ্নিবর্ষণ বন্ধ করতে পারছে না।

ইয়োরোপে মরা ঘোড়ার মতো পড়ে আছে। ধর্মের চাবুকে সে আর খাড়া হবে না।

অতএব? অতএব কোনো দিকেই যখন আর কোনো ভরসা নেই তখন যা-খুশি একটা বেছে নাও। আর দয়া করে আমাদের শান্তিতে মরতে দাও, আর তাও যদি না করতে দাও তবে আত্মহত্যা করতে দাও। রুশিয়া এবং পশ্চিম-ইয়োরোপে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ভিতরই আজ বেশি।

* * *

আমরা যদি হটেনটট হতুম তাহলে আমাদের কোনো দুর্ভাবনা থাকতো না। আত্মহত্যা ছাড়া—অসভ্যদের ভিতর অত্মহত্যার সংখ্যা অতি নগণ্যও বটে—অন্য যে-কোনো দুটো পন্থার ভিতরে একটা বেছে নিয়ে 'দুর্গা' বলে ঝুলে পড়তুম। তারপর যা-হবার হত। (কিছুটা যে হয়েছে সে-কথাও অস্বীকার করা যায় না। কম্যুনিস্টরা তো আছেনই, আরেক দল যে রুশের বিরুদ্ধে ঝটপট শত্রুতা জানিয়ে মার্কিন কল-কব্জা হাতিয়ে এ-দেশটা শোষণ করতে চান সে তত্ত্বটাও আমাদের অজানা নয়।)

'ধন্য সেই জাত, যার কোনো ইতিহাস নেই।' সে নির্ভয়ে যা-কিছু একটা বেছে নিতে পারে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যই বলুন, আর সৌভাগ্যই বলুন আমাদের ঐতিহ্য রয়েছে। সে ঐতিহ্যে আমরা শ্রদ্ধা হারাই নি—হয়তো তার প্রধান কারণ এই যে, বিদেশী শাসনের ফলে আমরা সে ঐতিহ্য অনুযায়ী চলবার সুযোগ এযাবৎ পাই নি।

কিন্তু যতদিন সে-শ্রদ্ধা আমাদের মনে রয়েছে ততদিন তো আমরা বিগত-যৌবনা অরক্ষণীয়ার মতো নিরাশ হয়ে গিয়ে মার্কিন কিংবা রুশের গলায় মাল্য পরিয়ে দিতে পারি নে। স্বরাজের জন্য যারা জেল খাটল, প্রাণ দিল তাদের অনেকেই তো মনে মনে স্বপ্ন দেখেছিল ভারতবর্ষের লুপ্ত ঐতিহ্য উদ্ধার করে তারই আলোকে ভবিষ্যতের পথ বেছে নেবে, এমন কি গোপনে গোপনে হয়তো এ দম্ভও পোষণ করেছিল যে বিশ্বজনকেও সেই 'আলোকমাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গনে' নিমন্ত্রণ করতে পারবে। কৃষ্ণের দেশ, বুদ্ধের

দেশ, চৈতন্যের দেশ আজ কপর্দকহীন, দেউলে, একথা মন তো সহজে মেনে নিতে চায় না।

কিন্তু সেখানে আরেক বিপদ। ঐতিহ্যের কথা তুললেই আরেক দল উল্লসিত হয়ে বলেন, 'ঠিক বলছ, চলো, আমরা বেদ-উপনিষদের সত্যযুগে ফিরে যাই।'

কোনো বিশেষ 'সত্যযুগে' ফিরে যাওয়ার অর্থই মেনে নেওয়া যে, আমাদের ভবিষ্যৎ বলে কোনো জিনিস নেই, সেই যুগকে প্রাণপণ আঁকড়ে ধরার অর্থই হল এ-কথা মেনে নেওয়া যে আমরা যুগ যুগ ধরে শুধু অবনতির পথেই চলে আসছি এবং নূতন জীবন, নবীন ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার মতো কোনো ক্ষমতা আমাদের নেই। তাই এঁরা তখন সেই বিশেষ 'সত্যযুগে'র আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকর্ম (এমন কি কুসংস্কার পর্যন্ত, কারণ আমরা বিশেষ কোনো সর্বাঙ্গসুন্দর 'সত্যযুগে' বিশ্বাস করিনে বলে সব যুগেই কিছু না কিছু কুসংস্কার মূঢ়তা ছিল বলে ধরে নিই) পদে পদে অনুসরণ অনুকরণ করতে লেগে যান। তখন জিগির ওঠে, ইয়োরোপীয় সব কিছু বর্জন করো, মার্কিন রুশের গা ছুঁয়েছ কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, ছড়াও চতুর্দিকে গোবরের জল, ঠেকাও তাই দিয়ে শুদ্ধ "ভারতীয়-সংস্কৃতি"-কে "অস্পৃশ্যের পাপ-স্পর্শ থেকে"।

এঁরা গড়ে তুলতে চান আবার সেই 'অচলায়তন' যার অন্ধ প্রাচীর ভেঙে ফেলবার জন্য কবিগুরু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন নবযুগের প্রতীক নূতন 'ডাকঘর' যার ভিতর দিয়ে রুগ্ন অমলকে রাণী পাঠবেন প্রাচীন রাজা, যিনি জনগণের অধিনায়ক, ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।

মার্কিন না রুশ না, এমন কি ভারতীয় কোন বিশেষ 'সত্যযুগ'ও না—এসব এড়িয়ে বাঁচিয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যের চলিষ্ণু সদাজাগ্রত শাশ্বত সত্যধর্মের পথে আমাদের চালাবেন কে? সর্বব্যাপী দ্বন্দ্ব, আদর্শে আদর্শে সংঘাত, ঐতিহ্যে ঐতিহ্যে সংগ্রাম, এর মাঝখানে শান্তসমাহিত হয়ে ধ্রুব সত্যের সন্ধান দেবেন কে?

তিনি এলে আমরা তাঁকে চিনতে পারব তো? আমার মনে হয় পারব। কারণ তিনি কোন্ ভাষায় তাঁর বাণী প্রচার করবেন তার কিছুটা সন্ধান আমরা পেয়ে গিয়েছি—তিনি স্বীকার করে নেবেন প্রথমেই জনগণমন-অধিনায়ক ভারত-ভাগ্যবিধাতাকে, তাঁর উদার বাণীতেও অহরহ প্রচারিত থাকবে সেই আহ্বান যে আহ্বানে সাড়া দেবে হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসিক-মুসলমান-খ্রীষ্টান, তাঁর কণ্ঠে শুনতে পাবো সেই চির-সারথির রথচক্রঘর্ঘর, যিনি পতন অভ্যুদয়ের বন্ধুর পন্থার উপর দিয়ে নিয়ে এসেছেন আমাদিগকে এই নবযুগের অরুণোদয়ের সামনে।

শত মূঢ়তার মাঝখানে যে আমরা আজ কোটিকণ্ঠে ভারত-ভাগ্যবিধাতাকে স্বীকার করে নিলুম—জাতীয়-সঙ্গীত নির্বাচনে পথভ্রান্ত হই নি—এ বড় কম আশার কথা নয়॥

ইন্দ্রলুপ্ত

(আবু সঈদ আইয়ুবকে)

ঘরের দাওয়ায়, তেঁতুলের ছাওয়ায়, মাঠের হাওয়ায়
খাওয়া-দাওয়ায়
শান্তি নেই, গরমেরও ক্লান্তি নেই।
সবুজ ঘাস হল হলদে, তারপর ফিকে।
দস্যি কাল-বোশেখী বাঁশের বনে ত্রিবিক্রমে বিক্রমে
তাদের কোমর ভেঙে নামল মাঠে।
লাথি মেরে ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেল তার শুকনো শেকড়
বেরিয়ে পড়ল শুভ্র, উষ্ণ, নগ্ন মৃত্তিকা।
মাঠের টাক—
আমার টাকের মতো।

কলনের ঘন বনে
নিদাঘের তপ্ত কাফে কোণে
তুমি বসে আনমনে
—আমার চুলের ঘুঙুর তোমার নাচাল নয়ন নীল
কালোকে নীলেতে নাৎসি হারাতে পেল কি গোপন মিল ?—
রাইনের ওয়াইনের মৃদু গন্ধ,
অন্ধ ভিখারীর ছবি দেয়ালেতে ডাইনে,
একচোখা রেডিয়োটা করে কটমট
ভয়ে ভয়ে বললাম, 'ফ্লান, Gruess Gott !
বেতারের সুরটা টাঙ্গো না ফক্স-ট্রট ?'
চট করে চটে যাও পাছে !
তুমি রূপসিনী বন্দিনী
নরদিশী নন্দিনী।
তোমার প্রেম এল যে
শ্রাবণের বর্ষণের ধারা নিয়ে
চারিদিকে টেনে দিয়ে
ঘনকৃষ্ণ সজল যামিনী যননিকা।
সে বিরাট বিলুপ্তির বিস্মরণে
শুধু আমার চেতনার ছয় ঋতু
আর তোমার চেতনার চার ঋতুর বিজড়িত নিবিড় স্পর্শ—

লাল ঠোঁট দিয়া বঁধুয়া আমার
পড়িল মন্ত্র কাল
দেহলি রুধিয়া হিয়ারে বান্ধিল
পাতিয়া দেহের জাল।
মুখে মুখ দিয়া হিয়ায় হিয়ায়
পরশে পরশে রাখি
বাহু বাহুপাশে ঘন ঘন শ্বাসে
দেহে দেহ দিল ঢাকি।
হঠাৎ দামিনী ধমকালো
বিদ্যুৎ চমকালো
দেখি, নীল চোখ
কাতরে শুধাই একি
তোমার নয়নে দেখি,
আমার দেশের নীলাভ আকাশ
মায়া রচিছে কি ?
তোমার বক্ষতলে
আমার দেশের শ্বেতপদ্ম কি
ফুটিল লক্ষ দলে ?
রাত পোহাল। বর্ষণ থেমেছে।
কিন্তু কোথায় শরতের শান্তি, হেমন্তের পূর্ণতা ?
ঋতুচক্র গেল উলটে—
যমুনার জলও একদিন উজান বয়েছিল।—
কোন্ ঝড় তোমাকে নিয়ে গেল ছিনিয়ে
কোন্ ঝড় আমাকে নিয়ে গেল ঝেঁটিয়ে ?
বেরিয়ে এল মাঠের টাক,
আমার টাক।
আমার জীবনে ইন্দু লুপ্ত
আমার কপালে ইন্দ্রলুপ্ত ॥

নয়রাট

দেশভ্রমণের সময় যারা ছন্নের মতো ছুটোছুটি করে—অর্থাৎ সকালে মিউজিয়ম, দুপুরে চিত্রশালা, বিকেলে গির্জেদর্শন, সন্ধ্যায় অপেরা, রাত-দুপুরে কাবারে, আমি তাদের দলে নেই। দেশে ফেরার পর কোনো পাক্কা টুরিস্ট যদি আশ্চর্য হয়ে বলেন, 'সে কি হে? তুমি প্রাগে তিন দিন কাটালে অথচ বলছ রাজা কার্লের বর্মাভরণ-অস্ত্রশস্ত্রের মিউজিয়াম দেখ নি—এ তো অবিশ্বাস্য', আমি তাহলে তা নিয়ে তর্কাতর্কি করি নে কারণ মনে মনে জানি আমি প্রত্যেকটি কড়ির পুরো দাম তোলার জন্য দেশভ্রমণে বেরই নি। ছ

পয়সার টিকিট আমাকে শ্যামবাজার পর্যন্ত নিয়ে যায়—আমি নামব হেদোয়—তাই আমাকে শ্যামবাজার পর্যন্ত গিয়ে সেখানে নেমে, পায়ে হেঁটে ঘণ্টাতে ঘণ্টাতে হেদোয় এসে বেঞ্চিতে বসে ধুঁকতে হবে নাকি? আট নম্বরের জুতো ছ টাকায় দিচ্ছে বলে আমার ছ-নম্বরী পা-কে আট নম্বরী পরাতে যাব নাকি?

তাই আমার উপদেশ ও কর্মটি করতে যাবেন না। খাওয়ার যে রকম সীমা আছে, ভালো জিনিস দেখারও একটা সীমা আছে। ক্লান্তি বোধ হলেই দেখা ক্ষান্ত দিয়ে একটা কাফেতে বসে যাবেন কিংবা যদি বাগানে বসবার মতো আবহাওয়া হয় তবে বাগানে বসে কফি, চা, বিয়ার কিছু একটা অর্ডার দিয়ে সিগারেটটি ধরিয়ে আরামসে গা এলিয়ে দেবেন।

এই হল জাবর-কাটার মোকা। এ কদিনে যা কিছু দেখেছেন তার মধ্যে যে কটি মনে ঢেউ তুলেছিল সেই ঢেউগুলি গুনবেন। কিংবা বলব আপনার মনের ফিল্ম যে ছবিগুলো তুলেছিল তার গুটিকয়েক ডিভালাপ প্রিনটিং করবেন, চোখ বন্ধ করে এক-একটা দেখবেন আর মনের ঘাড় নাড়িয়ে বলবেন, উত্তম হয়েছে, খাসা হয়েছে।

আমার পাশের টেবিলে দুই পাঁড় দাবাখেলনেওলা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে দাবা খেলছিলেন। দু'কাপ কফি হিম হয়ে গিয়েছে—উপরে কফির ঘন সর পড়েছে। জামবাটি সাইজ অ্যাশ-ট্রে পোড়া সিগারেটে ভর্তি। আরো জনতিনেক লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে, কিন্তু কারো মুখে কথা নেই, এ দৃশ্য বাঙালীকে রঙ ফলিয়ে দেখাতে হবে না। কৈলাস খুড়োর যে ছবি শরচ্চন্দ্র এঁকে গিয়েছেন তার দোহার গাইবার প্রয়োজন বাঙলাদেশে বহুকাল ধরে হবে না।

খেলোয়াড়দের একজন দেখলুম ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে আসছেন। আধ ঘণ্টাতেই কাবু হয়ে গেলেন। গজের কিস্তিতে যখন মাত হবু-হবু, তখন ঘাড়গর্দানে 'শ্রাগ' করে বললেন, 'স্পাঞ্জ ফেলে দিলুম,' অর্থাৎ আমার খেলা গয়াগঙ্গাগদাধরহরি।

দর্শকদের একজন তখন মিনমিনিয়ে বললেন, 'কেন? ঐ বড়েটা একঘর ঠেলে দিলে হয় না?'

খাসা চাল তো! ওদিকে কারো নজরই যায় নি। এ চালে আরো খানিকক্ষণ লড়াই দেওয়া যেতে পারে।

খেলোয়াড়টি উঠে দাঁড়িয়ে সেই দর্শককে বললেন, 'আপনি তাহলে বসুন।' দর্শক তখন খেলোয়াড়রূপে বসে প্রথম সামলালেন আপন ঘর, তার পর দিতে আরম্ভ করলেন ধীরে ধীরে চাপ। স্পষ্ট বোঝা গেল ইনি উচ্চাঙ্গের লেঠেল। এবার অন্য পক্ষের প্রাণ যায় আর কি। শেষটায় তাই হল। পয়লা বারের কসাই এবারে বকরি হয়ে বললেন—যা বললেন—তার অর্থ 'হরিবোল বল হরি!"

আমরা লক্ষ্য করি নি কে-ই বা এরূপ স্থলে করে—আরো জনতিনেক দর্শক তখন বেড়ে গিয়েছেন। তাঁদেরই একজন তখন মিনমিনিয়ে বললেন, 'কেন, গজটা পেছিয়ে নিলে হয় না?'

এ চালের অর্থটা আমার কাছে ধরা পড়ল না। কিন্তু কসাই দেখলুম

ধরতে পেরেছেন। শুধু বললেন, 'হুঁ।' তখন পয়লা বারের কসাই, দুসরা বারের বকরি উঠে বললেন, আপনি তা হলে বসুন।'

অর্থাৎ খোল-নলচে দুইই তখন বদলে গিয়েছে।

এবারে সত্যি সত্যি লাগল মোষের লড়াই।

শেষটায় খেলা চাল-মাত হল।

* * *

ফিরে এসে আপন চেয়ারে বসলুম।

খেলোয়াড়দের একজন তখন পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। এক চণ্ডু-খানায় যখন এতক্ষণ একসঙ্গে আফিং খেয়েছি তখন খানিকটে পরিচয় হয়ে গিয়েছে বই কি—একটা ছোট নড্ করলুম। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে বললেন, 'সুপ্রভাত।' আমি বললুম, 'বসুন, বসুন।'

ঝুপ করে বসে পড়ে বললেন, 'বসুন", হুঁঃ, "বসুন"। ওদিকে আমার প্রাণ যায় আর কি?'

আমি শুধালুম, 'কেন, কি হয়েছে?' বুঝলুম লোকটি দিলখোলা।

বললেন, 'জবাই করবে, মশাই, জবাই করবে আমাকে—বউ। বলেছিলুম, এই এলুম বলে। কি করে জানব বলুন, দাবার চক্করে পড়ে যাব। বলতে পারেন, মশাই, এই বিদ্‌ঘুটে খেলা বের করেছিল কে? হাঁ, হাঁ, ভারতবর্ষেই তো এর জন্মভূমি। কিন্তু এদেশে এল কি করে?'

'শুনেছি পারসিকরা আমাদের কাছ থেকে শেখে, আরবরা তাদের কাছ থেকে, তারপর ক্রুসেডের লড়াইয়ে বন্দী ইয়োরোপীয়রা শেখে আরবদের কাছ থেকে, তারা দেশে ফিরে—'

'আমাদের মজালে। কিন্তু এখন আমার উপায় কি? আপনারা এ অবস্থায় দেশে কি করেন?'

'চাঁদ-পানা মুখ করে গাল সই।'

'ব্যস্! ব্যামোটা বাধিয়ে বসে আছেন ঠিক; ওষুধটা বের করতে পারেন নি। কিন্তু আমি পেরেছি। চলুন, আমার সঙ্গে, লঞ্চ খাবেন।'

'আর গালও খাব? না?'

'না, না, আপনাকে বকবে কেন? আমি বলব, এঁর সঙ্গে গল্প করতে করতে কি করে যে বেলা বয়ে গেল ঠাহর করতে পারি নি। চলুন, চলুন আর দেরি করা নয়।'

চললুম।

ভদ্রলোকের বয়স—এই ধরুন ৪৫-৪৬। স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ, পরনে উত্তম রুচির কোট-পাতলুন-টাই। সব কিছু পরিপাটি। তাই অনুমান করলুম তাঁর অর্ধাঙ্গিনী তাঁকে বকুন-ঝকুন আর যা-ই করুন না কেন, গৃহিণী হিসেবে তিনি ভালোই।

বললেন, 'যা খুশি তাই বউকে বলে যাবেন, কিচ্ছু ভয় করবেন না। তাঁকে যদি ভুলিয়ে-ভালিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী বানিয়ে সিংহলে পাঠিয়ে দিতে পারেন,

তাতেও আমি কোনো আপত্তি করব না, কিন্তু স্যর, দয়া করে ঐ দাবা খেলার কথাটি চেপে যাবেন।'

আমি বললুম, নিশ্চয়ই।'

দরজা খুলে দিলেন স্বয়ং স্ত্রী। কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তার পূর্বেই ভদ্রলোক আলাপ করিয়ে দিলেন, 'ইনি আমার স্ত্রী, ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা—ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা নয়রাট্‌।' আমি বললুম, 'আমার নাম আলী।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার বয়স ৩৫-৩৬ হবে। সুইটজারল্যাণ্ডে এই বয়সে মেয়েদের পূর্ণ যুবতী বলে ধরা হয়। এ-যৌবনে কুমারীর রূপের নেশা আর মাতৃত্বের-মাধুরী মিশে গিয়ে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তার রস মানুষ নির্ভয়ে উপভোগ করতে পারে—স্বামী সন্দেহের চোখে দেখে না, রমণী আপনার চোখে চটক লাগাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে না। মেয়েদের আচরণ এ সময় সত্যই বড় মধুর হয়; কখনো তারা তরুণীর মতো ভাবে বিহ্বল আত্মহারা হয়ে অকারণ বেদনার কাহিনী বলে যায়, কখনো আবার মাতৃত্বের গর্ব নিয়ে আপনাকে নানা সদুপদেশ দেয়, বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার পাতবার জন্য স্নিগ্ধচোখে অনুনয়-বিনয় করে।

স্ত্রীকে কিছু বলতে না দিয়েই হ্যার নয়রাট্‌ বকে যেতে লাগলেন, 'বুঝলে ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা, আমি ঠিক সময়েই ফিরে আসতুম কিন্তু এই হ্যার আলীর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। ইনি ভারতবর্ষের লোক—শুনেছ তো ভারতবর্ষের লোক কি রকম গুণী-জ্ঞানী হয়। ইনি তাঁদেরই একজন। তার প্রমাণও আমি হাতে-নাতে পেয়ে গিয়েছি। রাস্তায় আসতে আসতে তাঁকে জিজ্ঞেস করে জানতে পেলুম, সাতদিন ধরে এসেছেন জিনীভায়, এখনো লীগ অব নেশনসের "চিড়িয়াখানা" দেখতে যান নি, শামুনিক্‌স্‌ চড়েন নি, অপেরা-থিয়েটার কিছুই দেখেনে নি। আর সব টুরিস্টদের মতো সুইট-জারল্যাণ্ডের প্রত্যেক দ্রষ্টব্য বস্তুকে পিঁপড়ে নিঙড়ে ঘি বের করাবার জন্য উঠে পড়ে লাগেন নি। আমার তো মনে হয়, এ-দেশের উচিত এঁকে এঁর খর্চার পয়সা কিছু ফেরৎ দেওয়া। কী বল?'

পাছে ভদ্রমহিলার অভিমানে ঘা লাগে, আমি তাঁর দেশের কুতুব তাজ ভারতীয় দম্ভের নেশায় তাচ্ছিল্য করছি তাই তাড়াতাড়ি বললুম, 'আমি বড় দুর্বল, বেশি ঘোরাঘুরি করলে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আস্তে আস্তে সব-কিছুই দেখে নেব।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'সেই ভালো। শামুনিক্‌স্‌ পাহাড় তো আর বসন্তের বরফ নয় যে দুদিনে গলে যাবে, সুইটজারল্যাণ্ড ভ্রমণ তো আর দাবা-খেলা নয় যে সুযোগ পেয়েও দুটি কিস্তি না দিলে—'

বাকিটা আমি আর শুনতে পাই নি। আমি তখন ওয়াল-পেপার হয়ে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে যাবার জন্য আস্তে আস্তে পিছুপা হতে আরম্ভ করেছি।

শুনি, হ্যার নয়রাট্‌ ব্যথা-ভরা সুরে বলছেন, 'গিন্নী, ছিঃ।'

আমার অবস্থা তখন এক মাতাল আরেক স্যাঙাত মাতালকে সাফাই গাইবার জন্য নিয়ে এসে ধরা পড়লে যা হয়।

নাঃ। ভুল করেছি। ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার কামড়ানোর চেয়ে ঘেউ-ঘেউটাই বেশি। বললে, 'আঃ, আপনারাও যেমন। মেয়েছেলে এরকম দু-একটা কথা সব সময়েই কয়ে থাকেন—ওসব কি গায়ে মাখতে আছে? তুমি দাবা-খেলায় দু-একটা আজেবাজে চাল মাঝে মাঝে দাও না—দুশমন কি করে তাই দেখবার জন্য?'

আবার দাবা। খেয়েছে।

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা স্বামীকে বললেন, 'আজ তো লাঞ্চের ব্যবস্থা বড় মামুলী। সুপ্‌, ফিশ্‌ আ লা রুস (রাশান কায়দায়) আর অ্যাপল টার্ট উইথ হুইপ্‌ট্‌ ক্রীম। তার চেয়ে বরঞ্চ চল রেস্তোরাঁয়—জিনীভা লেকের মাছ সুইস কায়দায় রান্না—ভালোমন্দ এটা সেটা। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে শুধালেন, 'আপনি কি খেতে ভালোবাসেন?'

আমি নির্ভয়ে বললুম, 'সুপ্‌, ফিশ্‌ আ লা রুস, অ্যাপল টার্ট উইথ হুইপ্‌ট্‌ ক্রীম।'

হ্যার নয়রাট্‌ তো আনন্দে গদগদ। বললেন, 'দেখলে গিন্নী, কি রকম অদ্ভুত আদব-কায়দা। তুমি যদি বলতে আজ রেঁধেছি, স্ট্রিকনিন-সুপ, পটাসিয়াম সায়ানাইড-ফ্রাইড, আর্সেনিক-পুডিং আর কোবরা-রসের কফি তা হলে উনি বলতেন "দি আইডিয়া, আমি দু বেলা ঐ জিনিসই খাই"।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'দেখো, পেটার, বিশ্বসংসারের লোককে তুমি আপন মাপকাঠি দিয়ে মেপো না। তোমার মত ওঁর পেট অজুহাতের মানওয়ারী জাহাজ নয়।'

পেটার বললেন, 'সব দাবা-খেলোয়াড়কেই অজুহাত-বিদ্যে আয়ত্ত করতে হয়। বিয়ের পরেই যে রকম হনিমুন, দাবা-খেলার পরই সেই রকম অজুহাত অন্বেষণ!

আমি বললুম, 'কিন্তু আমি তো দাবা খেলি নে।'

কথা শুনে দুজনাই খানিকক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। শেষটায় পেটার বললেন, 'দেখলে গিন্নী, অজুহাতের রাজা কারে কয়? একদম কবুল জবাব উনি দাবা খেলেন না! বাপ্‌স! মারি তো হাতি লুট তো ভাণ্ডার। অজুহাত যদি দিতেই হয় তবে এমন একখানা ঝাড়ব যে মানুষ রা কাড়বার ফাঁকটি পাবে না। পাক্কা আড়াই ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে দেখলেন আমাদের খেলা, আর এখন অম্লান বদনে বলছেন উনি দাবা খেলেন না!'

আমি সবিনয়ে শুধালাম, 'আপনি কনসার্ট শুনতে যান? আচ্ছা, সেখানে তো পাকি সাড়ে তিন ঘণ্টা বাজনা শোনেন; তাই বলে কি আপনি পিয়ানো, ব্যালা, চেল্লো কত্তাল বাজান?'

ওদিকে দেখি, ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা আমাদের তর্কাতর্কিতে কান দিচ্ছেন না; শুধু বললেন, 'তাই বলো, দাবা খেলা হচ্ছিল।'

চাণক্য বান্ধবের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে যে সঙ্গ দেয় সে বান্ধব।' আমার বিশ্বাস চাণক্য কখনো বিয়ে করেন নি। তা না হলে তিনি 'রাজদ্বারে' না বলে 'জায়াদ্বারে' বলতেন।

জানি, অতিশয় অভদ্রতা হল—তবু বললুম, 'আমার ক্ষিদে পেয়েছে।'

বন্ধুর ফাঁসিটাকে মুলতুবী করাতে পারলুম—এই বা কি কম সান্ত্বনা।

* * *

আমরা বাড়িতে রান্নাঘরের বারান্দায় বসে যেরকম হাপুসহুপুস শব্দ করে আহারাদি সমাপন করি, নেমন্তন্ন খেতে গিয়েও প্রায় সেই রকমই করে থাকি। তফাত মাত্র এইটুকু যে, বাড়িতে চিৎকার করে বলি, 'আরো দুখানা মাছভাজা দাও', নেমন্তন্ন বাড়িতে বলি, 'চৌধুরী মশাইকে আরো দুখানা মাছভাজা দাও।'

সায়েব-সুবোদের কিন্তু বাড়ির খাওয়াতে, রেস্তোরাঁয় আহারে এবং নেমন্তন্নের ভোজনে ভিন্ন ভিন্ন কায়দা-কেতায় খাওয়া-দাওয়া করতে হয়। সায়েবরা বাড়িতে খেতে বসে গোগ্রাসে গোস্ত গেলে আর পোশাকী ডিনারে কিংবা ব্যানকুয়েটে একরকম না খেয়েই বাড়ি ফেরে। ব্যানকুয়েটে আপনাকে সুপ দেওয়া হবে আড়াই চামচ, তার থেকে আপনি খাবেন দেড় চামচ। ডিনারে সুপ খেয়ে ন্যাপকিন দিয়ে মোলায়েম কায়দায় ঠোঁট ব্লট করবেন, কিন্তু ড্রাক অব উইন্ডসরের সঙ্গে ব্যানকুয়েট খেতে বসলে ঠোঁট ব্লট করাও নিষিদ্ধ, অর্থাৎ তখন ধরে নেওয়া হয়, আপনি এতই কম সুপ খেয়েছেন যে, আপনার ঠোঁট পর্যন্ত ভেজে নি। তারপর পদের পর পদ উত্তম খাদ্য আসবে—আপনি আপন প্লেটে তুলে নেবেন কখনো আড়াই আউন্স, কখনো দু আউন্স এবং খাবেন তার থেকে এক আউন্স কিংবা তার চেয়েও কম। মুর্গীর হাড্ডি থেকে যে ছুরি দিয়ে মাংস চাঁচবেন তার উপায় নেই এবং গ্রেভিটুকুর মোহ করেছেন কি মরেছেন। সাইড প্লেটে যে এক স্লাইস টোস্ট দিয়েছিল তার এক-দশমাংশের বেশি খেলে পাঁচজনে ভাববে, আপনি রায়লসীমার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত 'পারিয়া' কিংবা মধ্য-আফ্রিকার মিশনারি-খেকো হটেনটট্।

বিশ্বাস করবেন না, এক খানদানী ক্লাবে আমি দুই পক্ষকে পাকি দু ঘণ্টা ধরে তর্কাতর্কি করতে শুনলুম, সসেজ কি করে খেতে হয়। সমস্যাটা এইরূপ ঃ—(ক) সসেজ থেকে ছুরি দিয়ে চাক্তি কেটে নিয়ে তার উপর মাস্টার্ড মাখাবে কিংবা (খ) প্রথম সসেজের ডগায় মাস্টার্ড মাখিয়ে নিয়ে পরে সসেজ থেকে চাক্তি কেটে তুলবে? আমি প্রথম পক্ষের হয়ে লড়াই করেছিলুম এবং শেষটায় আমরা ভোটে হেরে গেলুম। এর থেকেই বুঝতে পারছেন, আমি খানদানী খানা খেতে শিখি নি—ব্যানকুয়েটে আমার নাভিশ্বাস ওঠে।

বিশ্বাস করবেন না, মাসখানেক হল এক সুইস খবরের কাগজে দেখি, এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছেন, প্লেটে যে গ্রেভি পড়ে থাকে, তার উপর রুটি টুকরো টুকরো করে ফেলে সেই গ্রেভি চেটেপুটে নেওয়া (জর্মন শব্দ tunken) ব্যাকরণ-সম্মত—অর্থাৎ কায়দাদুরস্ত—কি না?

উত্তরে এক 'খানদানী মনিষ্যি' বলেছেন, কিছুকাল পূর্বেও এ-অভ্যাস কি বাড়িতে, কি রেস্তোরাঁয়, কি ব্যানকুয়েটে সর্বত্রই অতিশয় নিন্দনীয় বলে গণ্য করা হত, কিন্তু আজকের বিশ্বময় খাদ্যাভাবের দিনে বাড়িতে—আপন ডাইনিং রুমে—কর্মটি ক্ষমার্হ।

মুর্গীর ঠ্যাংটি হাতে তুলে নিয়ে 'কড়কড়ায়তে, মড়মড়ায়তে' বাড়িতে বেশির ভাগ ইউরোপীয়ই করে, কিন্তু বাইরে নৈব নৈব চ। তবে কোন কোন

জর্মন এবং সুইস্ রেস্তোরাঁয় রোস্ট সার্ভ করবার সময় মুর্গীর ঠ্যাংগুলো উপরের দিকে সাজিয়ে রাখে এবং ঠ্যাংগুলোর ডগায় বাটার পেপারের ক্যাপ পরিয়ে দেয়, যাতে করে আপনি হাত নোংরা না করে ঠ্যাংটা চিবুতে পারেন। এ ব্যবস্থা দেখে ইংরেজের জিভে জল আসে, কিন্তু সেটা চেপে গিয়ে বলে, 'জর্মনরা বর্বর!'

অপিচ এসপেরেগাস এবং আর্টিচোক ছুরি-কাঁটা দিয়ে খাওয়া গো-হত্যার ন্যায় মহাপাপ—খেতে হয় হাত দিয়ে।

ইংরেজ যদিস্যাৎ কখনো রাইস-কারি কিংবা ইটালিয়ান রিসোট্টো (এক রকমের কিমা-পোলাও) খায়, তবে টেবিল কিংবা ডেসার্ট স্পুন দিয়ে সে খাদ্য মুখে তোলে। তাই দেখে ফরাসী-ইতালী আঁতকে ওঠে—বলে, কী বর্বরতা! একটা আস্ত চামচ মুখে পুরছে—বাপ্স্। তারা রাইস-কারি খায় ডান হাতে কাঁটা নিয়ে—বিনা ছুরিতে। তাই দেখে চীনা ভদ্রসন্তান আবার ভিরমি যায়। বলে, একটা আস্ত ফর্ক মুখে ঢোকাচ্ছে—কী বর্বরতা! তার চেয়ে চপস্টিক কত পরিষ্কার, কত পরিপাটি।

আর বঙ্গসন্তান আমি বলি, এ সবকটা পদ্ধতিই বর্বর না হোক, অন্তত নোংরা। ফর্ক, স্পুন, এমন কি চপস্টিক পর্যন্ত আমার আপন আঙুলের চেয়ে নোংরা। সব চেয়ে বড়ীয়া হোটেলের স্পুন নিয়ে আপনি আচ্ছাসে ন্যাপকিন দিয়ে ঘষুন—দেখতে পাবেন ন্যাপকিন কালো হয়ে গেল। অথচ আপনি হাত ধুয়ে যে খেতে বসেন, তখন কাপড়ে আঙুল ঘষলে কাপড় ময়লা হয় না।

কিন্তু আমার প্রধান আপত্তি টেবিলে বসে খাওয়াতে। টেবিল ক্লথ বাঁচিয়ে, ছুরি-কাঁটা না বাজিয়ে, জল খাওয়ার সময় গ্লাসে ঠোঁটের দাগ না লাগিয়ে টেবিলের তলায় পাশের কিংবা সামনের লোকের পায়ে গুত্তা না মেরে আপন গেলাস আর পরের গেলাসে খিচুড়ি না পাকিয়ে, আঁত্রের ফর্ক আর জয়েন্টের ফর্কে গোলমাল না বাধিয়ে, প্লেট শেষ হওয়ার পূর্বে ছুরি-কাঁটা পাশাপাশি না রেখে, ডাইনে-বাঁয়ে সব কিছু রদ্দিবরবাদ না করে, এবং আহারান্তে ঘোত ঘোত করে ঢেকুর না তুলে আহার করা আমার পক্ষে কঠিন, সুকঠিন। বিলিতি ডিনার খেতে পারেন মাত্র ম্যাজিশিয়ানরাই যাঁদের হাত-সাফাই আছে, যাঁরা চিড়িতনের টেক্কাকে বেমালুম হরতনের নয়লা বানিয়ে দিতে পারেন।

এবং সব চেয়ে গর্ভ-যন্ত্রণা, খাওয়ার দিকে আপনি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারবেন না। এর সঙ্গে ওর সঙ্গে আপনাকে মধুর মধুর বাক্যালাপ করতে হবে। আবহাওয়া থেকে আরম্ভ করে আপনাকে রিলেটিভিটি পর্যন্ত কপচাতে হবে। আবার শুধু গল্প করলে চলবে না—সঙ্গে সঙ্গে খেতে হবে। এর পরিমাণ ঠিক রাখা সেও এক কঠিন কর্ম। আপনি যদি প্রধান অতিথি হন, তবে আপনাকে বকর বকর করতে হবে বেশি, যদি আমার মতো ব্যাক-বেঞ্চার হন, তবে চুপ করে সব কিছু শুনে যেতে হবে—তা সে যতই নিরস নিরানন্দ

হোক না কেন ?

বলুন তো মশাই, ভোজনের নেমন্তন্ন কি এগজামিনেশন হল ?

* * *

নয়রাট লোকটি খুশ গল্প করে ঘরবাড়ি জমজমাট করে রাখতে চান সে কথাটা দু মিনিটেই বুঝে গেলুম, আর গৃহিণীর ভাবসাব দেখে অনুমান করলুম ইনিও সাদাসিধে লোক, লৌকিকতার বড় ধার ধারেন না। খানা-টেবিলের পাশে পৌঁছেই বললেন, 'এ বাড়িতে পোলিশ গভর্মেণ্ট, (পোলাণ্ডের ইতিহাসে এত ঘন ঘন অরাজকতা আর বিদ্রোহ হয়েছে যে, জর্মন ভাষায় 'পোলিশ গভর্নমেণ্ট' বলতে 'এলো-মেলো' 'ছন্নছাড়া' বোঝায়) যে যেখানে খুশি বসতে পারেন।'

নয়রাট বাধা দিয়ে বললেন, 'সে কি করে হয়? আমি বসব আমার পশ্চাদ্দেশের উপর, তুমি বসবে—।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা রাগ করে বললেন, 'ছিঃ, পেটার, ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে এই আজ সকালে; আর এর-ই ভিতর তুমি আরম্ভ করে দিয়েছ যত সব অশ্লীল কথা! তার উপর উনি আবার বিদেশী।'

নয়রাট বললেন, 'দেখো, প্রিয়া, তুমি অনেকগুলো ভুল করেছ। প্রথমত তুমি বিলক্ষণ জানো, আমি দিশি-বিদেশীতে কোন ফারাক দেখতে পাই নে। যার সঙ্গে আমার মনের 'মিল, রুচির মিল হয় সে-ই আমার আত্মজন। কি বলেন আলিসাহেব ?'

আমি বললুম, 'অতি খাঁটি কথা। তবে ভারতীয় ঋষি বলেছেন, "আমি" "তুমি"তে পার্থক্য করে লঘুচিত্তের লোক, যার চরিত্র উদার তার কাছে সর্ব বসুধা আত্মজন।'

নয়রাট গুম্‌ মেরে শুনলেন। অনেকক্ষণ ধরে ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় নাড়িয়ে শেষটায় বললেন, 'এটা হজম করতে আমার একটু সময় লাগবে—ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার রান্নার মতো।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা ভয়ঙ্কর চটে যাওয়ার ভান করে (আমার তাই মনে হল) বললেন, 'দেখো, পেটার, তুমি খাওয়া বন্ধ করে এখ্‌খুনি রেস্তোরাঁ যাও; না হলে এই ডিশ ছুঁড়ে তোমার মাথা ফাটাব।'

পেটার অতি ধীরে ধীরে আরেক চামচ টমাটো সুপ গিলে নিয়ে প্রথম গিন্নিকে শুধালেন, আরো সুপ আছে কি না, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সবাইকে আত্মজন করা কি কখনো সম্ভব? এই দেখুন না, সেদিন ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললে, একজোড়া ফ্রেঞ্চ নূতন জুতো কিনবে—দাম চল্লিশ ফ্রাঁ (৩৮)—আমি বললুম আমার অত টাকা নেই, ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললে, সে আমার কাছ থেকে টাকা চায় না, তার মা আসছেন দু'দিন পরে, তিনি টাকাটা দেবেন। কি আর করি বলুন তো? তদ্দণ্ডেই টাকাটা ঝেড়ে দিলুম। ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার মা! বাপরে বাপ্‌! আপনি কখনো ম্যান-ইটার বাঘের মুখোমুখি হয়েছেন?'

আমি কিছু বলবার পূর্বেই ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা আমাকে বললেন, 'দোহাই মা-মেরির! এই পেটারটা যে কি মিথ্যাবাদী আপনাকে কি করে বোঝাই? (পেটারের আপত্তি শোনা গেল, 'ডার্লিং, অশ্লীল গল্পের চেয়ে গালি-গালাজ অনেক বেশি খারাপ') আমার মা' যাতে বড়দিন একা-একা না কাটান তার জন্য নিজে—আমাকে না বলে—লুৎসেন গিয়ে তাঁকে এখানে নিয়ে এল। তার পর বছরের শেষ রাত্রে তাঁর সঙ্গে ধেই ধেই করে নাচলে ভোর চারটে অবধি—ওঁর সঙ্গে নাচলে অন্তত পঁচিশটা নাচ, আমার সঙ্গে দুটো, জোর তিনটে। বুড়ীকে শ্যাম্পেন খাইয়ে খাইয়ে টং করিয়ে দিয়ে, যত সব অদ্ভুত পুরানো রাশান আর পোলিশ নাচ। কখনো সে মাটিতে বসে উবু থাবড়ায় —মা তখন তার চতুর্দিকে পাঁই পাঁই করে চক্কর খাচ্ছেন -কখনো বাঁদরের মত লম্ফ দিয়ে ছাতে মাথা ঠোকে—মা তখন ১৫ ডিগ্রীতে কাত হয়ে স্কার্ট তুলেছেন হাঁটু অবধি। তারপর তাঁকে কাঁধের উপরে তুলে নিয়ে বাঁই বাঁই করে ঘুরল ঝাড়া দশ মিনিট। বাদবাকি নাচনে-ওলা-নাচনে-ওলীরা ততক্ষণে ফ্লোর তাদের জন্য সাফ করে দিয়ে আপন আপন টেবিলে চলে গিয়েছে। অরকেস্ট্রাও বন্ধ পাগল হয়ে গিয়েছে, একটা নাচের জন্য ওরা বাজনা বাজায় দশ, জোর পনের মিনিট—ঐ মাৎসুর্কা না কি পাগলা নাচের জন্যে ওরা বাজনা বাজালে পাকা এক ঘণ্টা। নাচের শেষে মা তো নেতিয়ে পড়ল চেয়ারে, ওদিকে কিন্তু চোখ বন্ধ করে বুড়ী মিটমিটিয়ে হাসছে—খুশিতে ডগোমগো!"

পেটার বললেন, 'ডার্লিং' কিন্তু সে রাত্রের সব চেয়ে সেরা নাচের জন্য কে প্রাইজ পেল সেটা তো বললে না।'

তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'মা পেলেন ফার্স্ট প্রাইজ, আমি সেকেণ্ড। তাই তো আমি শাশুড়িদের বিলকুল পছন্দ করি নে।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'আচ্ছা আহাম্মুক তো! নাচের পয়লা প্রাইজ হামেশাই রমণী পায়। দুসরাটা পুরুষ। এটা হচ্ছে শিভালরি। তোমাকে কি করে পয়লা প্রাইজ দিত?'

পেটার আমার দিকে মুখ করে বললেন, 'গিন্নীর রাগ, আমি ওর সঙ্গে নাচলুম না কেন? আচ্ছা মশায়, বলুন তো, আপনি যদি কবিতা পড়ে শোনান, খোশগল্প করেন, বাজনা বাজান কিংবা কালোয়াতি করেন তবে যে সমে সমে মাথা নাড়তে পারে তাকে আদর-কদর করবেন, না, আপন স্ত্রীকে? যেহেতু তিনি আপন স্ত্রী। রসের বাজারে আপন পর করা যায়?'

আমি উল্লসিত হয়ে বললুম, 'তাই তো আমি নিবেদন করলুম, "যাঁর চরিত্র উদার—অর্থাৎ যিনি রসিক জন—তাঁর কাছে সর্ব বসুধা আত্মজন"।

পেটার নয়রাট বললেন, 'গিন্নী অবশ্যি একটা কথা ঠিক বলেছেন, আমরা কেউই এটিকেটের ধার ধারি নে। এ বিষয়ে চমৎকার একটা "ট্যুনিস", "শেলে"র গল্প আছে। "ট্যুনিস-শেল"কে চেনেন?'

আমি বললুম, 'ঠিক মনে পড়ছে না।"

'আগাগোড়া একটি "প্রতিষ্ঠান" বলতে পারেন। "ট্যুনিস্" কথাটা এসেছে

লাতিন "আন্তনিয়ুস" থেকে। আন্তনিয়ুস গালভরা, গেরেমভারী, খানদানী ঐতিহাসিক নাম। আর ট্যুনিস্ অতিশয় প্লিবিয়ান অপভ্রংশ—নামটাতেই তাই একটুখানি রসের আমেজ লাগে।'

আমি বললুম, 'আমাদের "পঞ্চানন" নামটাও গেরেমভারী কিন্তু তার গার্হস্থ্য সংস্করণ "পাঁচু"টাতেও ঐরকম রসসৃষ্টি হয়।'

'তাই নাকি? আপনারাও তাহলে এ রসে বঞ্চিত নন? আর "শেল" কথাটার মানে "ট্যারা"। বুঝতেই পারছেন, পিতৃদত্ত নাম নয়, পাড়াদত্ত। এবং নাম থেকেই বুঝতে পারছেন, এরা দুজন ড্যুক ব্যারন নন—খাঁটি ওয়ার্কিং কেলাস। খায়দায়, ফুর্তিফার্তি করে, ফোকটে দু পয়সা মারার তালে থাকে, কাজে ফাঁকি দিতে ওস্তাদ আর বিয়ার-খানায় আড্ডা জমাতে পারলে এরা আর কিছু চায় না।

'একদিন হয়েছে কি, ট্যুনিস্-শেল রাস্তায় একখানা দশ টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়েছে—তা ওরা হামেশাই ওরকমধারা রাস্তায় টাকা কুড়িয়ে পায়, না হলে গল্পই বা জমবে কি করে?

'ট্যুনিস্ বললে, "চ, শেল; এই দিয়ে উত্তমরূপে আহারাদি করা যাক।" দুজনা ঢুকল গিয়ে এক রেস্তোরাঁয় আর অর্ডার দিলে দুখানা কটলেটের।

'ওয়েটার এসে ছুরিকাঁটা আর দুখানা প্লেট সাজিয়ে দিয়ে আনল একখানা বড় ডিশে করে দুখানা কটলেট।'

নয়রাট বললেন, 'কটলেট তো আর অ্যারোপ্লেনের স্ক্রু নয় যে ফিতে দিয়ে মেপেজুপে কিংবা ছাঁচে ঢেলে, ঠিক একই সাইজে বানানো হবে, কাজেই একখানা কটলেট আরেকখানার চেয়ে সামান্য একটু বড় হবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

'ট্যুনিস তাই ঝপ করে বড় কটলেটখানা আপন প্লেটে তুলে নিল। শেল চুপ্ করে দেখল। তারপর আস্তে আস্তে ছোট কটলেটখানা তুলে নিয়ে ট্যুনিসকে বললে, "ট্যুনিস, তুই আদব-কায়দা একদম জানিস নে।"—যেন নিজে সে মহা খানদানী ঘরের ছেলে।

'ট্যুনিস শুধালে, "কেন, কি হয়েছে?"

'শেল বললে, "ভদ্রতা হচ্ছে, যে ডিশ থেকে প্রথম খাবার তুলবে, সে নেবে ছোট টুকরোটা।"

'ট্যুনিস বললে, "অ। আচ্ছা, তুই যদি প্রথম নিতিস তবে তুই কি করতিস?"

'শেল দম্ভ করে বলল, "নিশ্চয়ই ছোট কটলেটটা তুলতুম।"

'তখন ট্যুনিস বললে, "সেইটেই তো পেয়েছিস, তবে ভ্যাচর ভ্যাচর করছিস কেন?"

নয়রাট গল্প শেষ করে খানাতে মন দিলেন।

বলতে পারব না, আমার পাঠকদের গল্পটা কি রকম লাগল—আমার কিন্তু উত্তম মনে হল, তাই প্রাণভরে খানিকক্ষণ হেসে নিলুম।

নয়রাট বললেন, 'তাই যখন কেউ এটিকেট নিয়ে বড্ড বেশি কপচাতে

শুরু করে তখনই আমার এই গল্পটা মনে পড়ে আর হাসি পায়। আরে বাবা, সংসারে থাকবি মাত্র দু'দিন। তার ভিতর কত হাঙ্গামা, কত হুজ্জত। সেই সব সামলাতে গিয়েই প্রাণটা খাবি খায়। তার উপর যদি এটিকেটের নাগপাশ দিয়ে সর্বাঙ্গ আর নবদ্বার বেঁধে দাও (ফ্রানৎসিস্‌কার আপত্তি শোনা গেল, "পেটার, আবার অশ্লীল কথা!") তবে দম ফেলবে কি করে? হাঁচবার এটিকেট, কাশবার এটিকেট থুথু ফেলার এটিকেট, গা চুলকাবার এটিকেট—প্রাণটা যায় আর কি।'

আমি সায় দিলুম।

তখন নয়রাট শুধালেন, 'বলুন তো, কি সে জিনিস যা চাষা অনাদরে তাচ্ছিল্যে, এমন কি বলতে পারেন, ঘেন্নাভরে রাস্তায় ফেলে দেয়, আর ভদ্রলোক সেটাকে ধোপদুরস্ত দামী রুমালে ঢেকে, পকেটে পুরে অতি সন্তর্পণে বাড়ি নিয়ে আসেন?'

আমি খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললুম, 'তা তো জানি নে।'

বললেন, 'সিকনি। চাষা ফাঁত করে রাস্তায় নাক ঝেড়ে ওদিকে আর তাকায় না, ভদ্রলোক রুমাল খুলে ছিঁক করে তারই উপর একটুখানি নাক ঝেড়ে সেটিকে সযত্নে ভাঁজ করে, পকেটে পুরে বাড়ি ফেরেন।'

ফ্রানৎসিস্‌কা হঠাৎ বললেন, 'পেটার, তুমি তো বকবক করে এটিকেটের নিন্দাই করে যাচ্ছ, ওদিকে একদম ভুলে গিয়েছ, ভদ্রলোক প্রাচ্যদেশীয়, সেখানে এটিকেটের অন্ত নেই; এদেশে তো প্রবাদই রয়েছে, ওরিয়েন্টাল্‌ কার্টসি"। যে আচার ওঁদের প্রিয় তুমি তাই নিয়ে মস্করার পর মস্করা করে যাচ্ছ।'

পেটার বললেন, 'আদপেই না। আমি তো ভদ্রতার (ম্যানার্স) নিন্দে করছিনে, আমি করছি এটিকেটের। দুটো তো এক জিনিস নয়।'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাদের দেশে ব্যবস্থাটা কি রকম?'

আমি বললুম, 'অনেকটা আপনাদের দেশেরই মতো। অর্থাৎ, ভদ্রতা-রক্ষার চেষ্টা আমারাও করে থাকি তবে এটিকেটের বাড়াবাড়ি দেখলে তাই নিয়ে আপনার-ই মতো টীকাটিপ্পনী কেটে থাকি। তবে কি না ভারতবর্ষ বিরাট দেশ—তার নানা প্রদেশে নানা রকমের এটিকেট। এই ধরুন লক্ষ্ণৌ। সেখানে কোনো খানদানী বাড়িতে নিমন্ত্রণে যেতে হলে বাড়িতে উত্তমরূপে আহারাদি সেরে যেতে হয়। কারণ, খানার মজলিসে গল্প উঠবে, কোন্‌ মৌলানা দিনে আড়াই তোলা খেতেন, কোন্‌ সাহেব-জাদা দুই তোলা, কোন পীর-জাদা এক তোলা আর কোন্‌ নওয়াব একদম খেতেনই না। অথচ সংস্কৃত আপ্তবাক্য এ বিষয়ে যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা এ এটিকেট আদপেই মানতেন না।'

কর্তা-গিন্নী উভয়েই শুধালেন, 'আপ্ত-বাক্য কি?'

আমি বললুম,—

'পরান্নং প্রাপ্য দুর্বুদ্ধে, মা প্রাণেষু দয়াং কুরু।
পরান্নং দুর্লভং লোকে প্রাণাঃ জন্মনি জন্মনি॥

অর্থাৎ,—

ওরে মূর্খ, নেমতন্ন পেয়েছিস, ভালো করে খেয়ে নে। প্রাণের মায়া

করিস নি, কারণ ভেবে দেখ, নেমন্তন্ন কেউ বড় একটা করে না। বেশি খেয়ে যদি মরে যাস তাতেই বা কি—প্রাণ তো ভগবান প্রতি জন্মে ফ্রি দেয়, তার জন্য তো আর খর্চা হয় না।'

* * *

আমি বললুম, 'চমৎকার রান্না হয়েছে'—রান্না সত্যই মামুলী রান্নার চেয়ে অনেক ভালো হয়েছিল, পোশাকী রান্না বললেও অত্যুক্তি হয় না। তারপর জিজ্ঞেস করলুম, 'রুশ কায়দায় মাছ কি করে রাঁধতে হয়?'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'আপনার বুঝি রান্নার শখ?'

আমি বললুম, 'না; তবে আমার মা খুব ভালো রাঁধতে পারেন আর নূতন নূতন দিশী-বিদেশী পদ শেখাতে তাঁর ভারি আগ্রহ। আমি প্রতিবার দেশ-বিদেশ ঘুরে যখন বাড়ি ফিরি তখন সবাই আমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নানা রকম গল্প শোনে, মাও শোনেন, কিন্তু বলার প্রথম ধাক্কা কেটে যাওয়ার পর তিনি আমাকে একলা-একলি শুধান, নূতন রান্না কি কি খেলুম। আমি ভালো ভালো পদগুলোর নাম করলে পর মা শুধাতেন ওগুলো কি করে রাঁধতে হয়। গোড়ার দিকে রন্ধনপদ্ধতি খেয়াল করে শিখে আসতুম না বলে মাকে কষ্ট করে এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করে করে শেষটায় পদটা তৈরী করার পদ্ধতি বের করতে হত। এখন তাই মোটামুটি পদ্ধতিটা লিখে নিই; মাকে বলা মাত্রই দুই ট্রায়েলের পরই ঠিক জিনিস তৈরী করে দেন।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'বলেন কি?'

বললুম, 'হ্যাঁ, আশ্চর্য হবারই কথা। আমিও একদিন মাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, তিনি কোনো পদ না দেখে না চেখে তৈরী করেন কি করে? মা বলেছিলেন,—এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে—"আরে বাপু, রান্না মানে তো, হয় সেদ্ধ করা, নয় তেলে-ঘিয়ে ভাজা, কিংবা শুকনো শুকনো ভাজা অথবা শিকে ঝলসে নেওয়া। এর-ই একটা, দুটো কিংবা তিনটে কায়দা চালালেই পদ ঠিক উতরে আসবে। আর তুইও তো বলেছিস আমাদের দেশের বাইরে এমন কোনো মশলা জন্মায় না যা এদেশে নেই। তা হলে তুই যা বিদেশে খেয়েছিস আমি তৈরী করতে পারব না কেন?"

তারপর বললুম, 'অবশ্য মা আমাকে কখনো এস্‌পেরেগাস্‌ কিংবা আর্টিচোক খাওয়ান নি কারণ ওগুলো আমাদের দেশে গজায় না। তাই নিয়ে মায়েরও কোনো খেদ নেই—কারণ যে সব শাক-সব্জী আমাদের দেশে একদম হয় না সেগুলোর কথা আমি মায়ের সামনে একদম চেপে যেতুম।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বুদ্ধিমতী মেয়ে বললেন, 'ওঃ, পাছে তাঁর দুঃখ থেকে যায়, তিনি তাঁর ছেলের সব প্রিয় খাদ্য খাওয়াতে পারলেন না।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ। কিন্তু তিনি যে তরো-বেতরো রান্না শেখার জন্য উঠেপড়ে লেগে যেতেন তার আরো একটা কারণ রয়েছে। রান্না হচ্ছে পুরো-দস্তুর আর্ট। আর আমার মা—'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'থামলেন কেন?'

আমি লজ্জার সঙ্গে বললুম, 'নিজের মায়ের কথা সত্যি হলেও বলতে গেলে কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকে। আপনারা হয়তো ভাববেন ফুলিয়ে বলছি।'

নয়রাট এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন, এখন হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'ব্যস! হয়েছে। আপনাকে আর এটিকেট দেখাতে হবে না। ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা আপনাকে বলে নি, এ বাড়িতে এটিকেট বারণ?'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা তাড়াতাড়ি বললেন, 'ছিঃ, পেটার, তুমি ওরকম কড়া কথা কও কেন?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত হয়ে বললুম, 'আদপেই না। ওঁর ধমক থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, আপনারা সরল প্রকৃতির লোক, আপনাদের সামনে সব কিছু অনায়াসে খুলে বলা যায়। তা হলে শুনুন, যা বলেছিলুম, রান্না হচ্ছে পুরোদস্তুর আর্ট বিশেষ আর আমার মা খাঁটি আর্টিস্ট। ঠিক আর্ট ফর আর্টস সেক নয়, অর্থাৎ তিনি মনের আনন্দে খুদ-খুশীর জন্য রেঁধেই যাচ্ছেন, কেউ খাচ্ছে না, কিংবা খেয়েও কেউ ভালোমন্দ কিছু বলছে না—তা নয়। তিনি রান্নার নূতন নূতন টেকনিক্‌ শিখতে ভালোবাসতেন সত্যকার আর্টিস্ট যে রকম নূতন নূতন টেকনিক্‌ শিখতে ভালোবাসে। আপনি ভালো প্যাস্টেলপেণ্টিং করতে পারেন, কিন্তু অয়েলপেণ্টিং দেখে কিংবা তার কথা শুনে আপনারও কি ইচ্ছে হবে না সেই টেকনিক্‌ রপ্ত করার? কিংবা আপনি উড্‌কাট করেন—যদি লাইন এন্‌গ্রেভিং, এচিং, মেদজোটিণ্ট, আকওয়াটিণ্টের খবর পান, তবে সেগুলোও আয়ত্ত করার বাসনা আপনার হবে না?

'অথচ দেখুন খাঁটি আর্টিস্ট অজানা জিনিস আয়ত্ত করার জন্য যত উদ্‌গ্রীবই হোক না কেন, হাতের কাছের সামান্যতম মালমশলাও সে অবহেলা করে না—নানা রঙের মাটি, শাক-সব্জী থেকেও নূতন রঙ্‌ আহরণ করার চেষ্টা করে।

'ভারতবর্ষের যে প্রান্তে আমার দেশ, সেখানে সব সময় জাফরান পাওয়া যায় না। তাই মা তারই একটা "এরজাৎস" সব সময়ে হাতের কাছে রাখেন। বুঝিয়ে বলছি—

'আমাদের দেশে এক রকম ফুল হয় তার নাম শিউলি। শিউলির বোঁটা সুন্দর কমলা রঙের আর পাপড়ী শাদা। ফুল বাসি হয়ে গেলে মা সেই বোঁটাগুলো রোদ্দুরে শুকিয়ে বোতলে ভরে রাখেন। সেই শুকনো বোঁটা গরম জলে ছেড়ে দিলে চমৎকার সুগন্ধ আর কমলা রঙ বেরয়। মেয়েরা সাধারণত ঐ রঙ দিয়ে শাড়ি ছোপায়। মা খুব সরু চালের ভাত ঐ রঙে ছুপিয়ে নিয়ে চিনি, কিসমিস, বাদাম দিয়ে ভারি সুন্দর 'মিঠাখানা' তৈরী করেন।

'এটা মায়ের আবিষ্কার নয়। কিন্তু তবু যে বললুম, তার কারণ প্রকৃত গুণী কলাসৃষ্টির জন্য দেশী-বিদেশী কোনো উপকরণ অবহেলা করেন না।'

নয়রাটদের বাড়িতে এটিকেট বারণ, তবু আপন মায়ের কথা একসঙ্গে এতখানি বলে ফেলে কেমন যেন লজ্জা পেলুম।

* * *

রুশ কবি পুশ্‌কিনের রচিত একটি কবিতার সারমর্ম এই,—

'হে ভগবান, আমার প্রতিবেশীর যদি ধনজনের অন্ত না থাকে, তার গোলাঘর যদি বারো মাস ভর্তি থাকে, তার সদাশয় সচ্চরিত্র ছেলেমেয়ে যদি বাড়ি আলো করে রয়, তার খ্যাতি-প্রতিপত্তি যদি দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে, তবু তাতে আমার কণামাত্র লোভ নেই; কিন্তু তার দাসীটি যদি সুন্দরী হয় তবে—তবে, হে ভগবান, আমাকে মাপ করো, সে অবস্থায় আমার চিত্ত-চাঞ্চল্য হয়।'

পুশ্‌কিন সুশিক্ষিত, সুপুরুষ এবং খানদানী ঘরের ছেলে ছিলেন, কাজেই তাঁর 'চিত্তদৌর্বল্য' কি প্রকারের হতে পারত সেকথা বুঝতে বিশেষ অসুবিধে হয় না। এইবারে সবাই চোখ বন্ধ করে ভেবে নিন কোন্ জিনিসের প্রতি কার দুর্বলতা আছে।

আমি নিজে বলতে পারি, সাততলা বাড়ি, ঢাউস মোটরগাড়ি, সাহিত্যিক প্রতিপত্তি, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এ সবের প্রতি আমার কণামাত্র লোভ নেই। আমার লোভ মাত্র একটি জিনিসের প্রতি—অবসর। যখনই দেখি, লোকটার দু'পয়সা আছে অর্থাৎ পেটের দায়ে তাকে দিনের বেশির ভাগ সময় এবং সর্বপ্রকারের শক্তি এবং ক্ষমতা বিক্রী করে দিতে হচ্ছে না, তখন তাকে আমি হিংসে করি। এখানে আমি বিলাসব্যসনের কথা ভাবছি নে, পেটের ভাত '—'র[১] কাপড় হলেই হল।

'অবসর বলতে আমি কুঁড়েমির কথাও ভাবছি নে। আমার মনে হয়, প্রকৃত ভদ্রজন অবসর পেলে আপন শক্তির সত্য বিকাশ করার সুযোগ পায় এবং তাতে করে সমাজের কল্যাণলাভ হয়। এই ধরুন, আমার বন্ধু শ্রীক' দাশগুপ্ত। বদ্যির ছেলে—পেটে অসীম এলেম, তুখোড় ছোকরা, তালেবর ব্যক্তি। সদাগরী আপিসে কর্ম করে, বড় সাহেবকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়—মোটা তন্‌খা ভী পায়।

বয়স তার এখনো তিরিশ পেরোয় নি। পার্টিশেনের পর মারোয়াড়ী কারবারীরা যখন তার 'বস্'কে ঘায়েল করে ব্যবসা কেনবার জন্য উঠেপড়ে লাগল, তখন আমার এই বদ্যির ব্যাটা সায়েবকে এমন সব 'কৌশল' বাতলালে যে উল্টে ওনারা চোখের জলে নাকের জলে।

সায়েবও বড় নেমকহালাল[২] লোক। প্রায়ই 'হ্যালো, ড্যাস্-গুপ্‌টা', বলে বাড়িতে ঢোকেন, 'লৌচি' (লুচি) খেয়ে যান, ড্যাস্-গুপ্‌টার ছেলেদের জন্য পুজোর বাজারে দু'চারখানা 'ডোটি' (ধুতি) ও রেখে যান। আমি বরাবর

---

১ শব্দটা গ্রাম্য; কিন্তু পূজনীয় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অভিধানে শব্দটিকে অবহেলা করেন নি বলে আমি ড্যাস দিয়ে সারলুম। তিনি গুরুজন—তাঁর শাস্ত্রাধিকার আছে।

২ 'নেমকহারাম' অর্থাৎ 'অকৃতজ্ঞ', সমাসটা বাংলায় চলে। 'নেমকহালাল' ঠিক তার উল্টো অর্থাৎ 'কৃতজ্ঞ'। 'নেমকহারাম' 'নেমকহালাল' কথাগুলো কিন্তু 'কৃতজ্ঞ' 'অকৃতজ্ঞে'র চেয়ে জোরদার। 'নমক' = 'নুন'—তার 'অপমান' (হারাম) কিম্বা 'সম্মান' (হালাল)।

সকালটা দাশগুপ্তের বাড়িতে কাটাই, তাই সায়েবের সঙ্গে মাঝে মাঝে মোলাকাত হয়ে যায়। লোকটি এদেশে-আসা সাধারণ ইংরেজের মত গাড়ল নয়, ইংরিজি শোলোক খাসা কপচাতে পারে, অর্থাৎ মধুরকণ্ঠে উচ্চ-স্বরে শেলি-কীটস্ আবৃত্তি করতে পারে।

সায়েবের কথা উপস্থিত থাক। দাশগুপ্তের কথায় ফিরে যাই।

আমি জানি দাশগুপ্ত কোনো চেম্বার অব্ কমার্সের বড়কর্তা হবার জন্য লালায়িত নয়। দেড় হাজার টাকার মাইনেকেও সে থোড়াই কেয়ার করে।

আমি জানি, আজ যদি তাকে কেউ পাঁচশ টাকা প্রতি মাসে দেয়, তবে সে কলকাতা শহরের হেথা-হোথা সর্বত্র দশখানা নাইট স্কুল খুলবে। এখন সে আপিসে দিনে সাত ঘণ্টা কাটায়—নাইট স্কুল খোলবার মোকা পেলে সে পরমানন্দে দিনে চোদ্দ ঘণ্টা সেগুলোর তদারকিতে, ক্লাস নেওয়াতে কাটাবে। বিশ্বাস করবেন না, সে তার উড়ে চাকরটাকে স্বাক্ষর করার জন্য উড়ে কায়দায় বর্ণমালা পর্যন্ত শিখিয়েছে—চোখ বন্ধ করে মাথা দুলিয়ে দিব্য বলে যায়,—

'ক' রে কমললোচন শ্রীহরি।
করেন শঙ্খ-চক্রধারী ॥
'খ' রে খগ-আসনে খগপতি।
খটন্তি লক্ষ্মী-সরস্বতী ॥
'গ' রে গরুড়—ইত্যাদি—

(আমার সহৃদয় উড়িষ্যাবাসী পাঠকবৃন্দ যেন কোনো অপরাধ না নেন—যদি নামতাতে কোনো ভুল থেকে যায়; আমি দাশগুপ্তের মুখে মাত্র দু'তিনবার শুনেছি; কেউ যদি আমাকে পুরো পাঠটা পাঠিয়ে দেন, তবে বড় উপকৃত হই)।

অর্থাৎ আজ যদি দাশগুপ্তকে পেটের ধান্দায় আপিস না যেতে হয়, তবে সে তার জীবন্মৃত্যুর চরম কাম্য কাজে ফলাতে পারবে। কে ক'লক্ষ মণ পাট কিনল, কে ধাপ্পা এবং ঘুষ দিয়ে ক'খানা ওয়াগন বাগালে তাতে দাশগুপ্তের কোনো প্রকারের চিত্তদৌর্বল্যও (হেথাকার ভাষায় 'দিল্‌চস্‌পী') নেই। দেড় হাজার টাকার মাইনে কমে গিয়ে পাঁচশ' হলে সে দুম করে মোটরখানা বিক্রী করে দিয়ে ট্রামে চড়ে ইস্কুলগুলোর তদারক করবে।

আপনি বিচক্ষণ লোক, আপনি শুধাবেন, এ পাগলামি কেন?

এটা পাগলামি নয়।

আসলে দাশগুপ্ত ইস্কুল মেস্টার। তার বাবা টোলে আয়ুর্বেদ শেখাতেন, তার ঠাকুরদাও তাই, তাঁর বাপও তাই, তাঁর উপরের খবর জানি নে।

এবং আমার সুহৃদ যে কী অদ্ভুত ইস্কুল-মেস্টার সে কথা কি করে বোঝাই? চাকরির ঝামেলার মধ্যিখানেও সে একটা নাইট ইস্কুল চালায়।

একদিন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দেখি, সে তার ইস্কুলে ইংরেজী পড়াচ্ছে। চেঁচিয়ে বলছে, 'আই গো!'

ছোঁড়ারা তীব্রকণ্ঠে ঐক্যস্বরে বলছে, 'আই গো!'

'উই গো!'

'উই গো !'
'ইউ গো !'
'ইউ গো !'
'হী গোজ !'
'হী গোজ !'
'রাম গোজ !'
'রাম গোজ !'
'শ্যাম গোজ !'
'শ্যাম গোজ !'

দাশগুপ্ত সন্দার-পোড়ার মত বলে যাচ্ছে আর ছোঁড়ারা চীৎকার করে দোহার গাইছে।

সর্বশেষে দাশগুপ্ত লাফ দিয়ে উচ্চতম কণ্ঠে চেঁচাল, 'রাম অ্যাণ্ড শ্যাম গো গো গো !'

দাশগুপ্তের স্বপ্ন কখনো বাস্তবে পরিণত হবে না। এমন দিন কখনো আসবে না যে, সে পেটের চিন্তার ফৈসালা করে নিয়ে তামাম শহর নাইট স্কুলে নাইট স্কুলে ছয়লাপ করে দিতে পারে।

দাশগুপ্তের কথা যাক। আমি তার উল্লেখ করলুম নয়রাট-জীবনীটা তুলনা দিয়ে খোলসা করার জন্য।

ইয়োরোপে এ জিনিসটা হামেশাই হচ্ছে।

নয়রাট মেট্রিক পাস করেন ১৮ বছর বয়সে, সাংসারে ঢোকেন ১৯ বছর বয়সে। তারপর ঝাড়া ছাব্বিশটি বছর বাবসা-বাণিজ্য করে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে দেখেন এতখানি পুঁজি জমেছে যে, বাকী জীবন তাঁকে আর সংসার-খরচের জন্য ভাবতে হবে না।

নয়রাটের ভাষাতেই বলি,

'টাকা জমানোর নেশা আমাকে কখনো পায় নি। আমি জানি এ দুনিয়ার বহু লোকই আমার ধারণা নিয়ে সংসারে ঢোকে কিন্তু বেশির ভাগই শেষ পর্যন্ত ধর্মচ্যুত হয়। জীবনে আমার কতকগুলো শখ ছিল—কিন্তু হিসেব করে দেখলুম, সেগুলো বাগে আনতে হলে পেটের একটা ফৈসালা পয়লাই করে নিতে হবে। তাই খাটলুম ছাব্বিশ বছর ধরে একটানা। আমার অসুখ-বিসুখ করে না, আমি একদিনের তরে কাজে কামাই দিই নি—ঐশুধু বিয়ের সময় যে সাতদিন হনিমুন কাটাই বাধ্য হয়ে তারই জন্য ছুটি নিতে হয়েছিল।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'তা ছুটি নিয়েছিলে কেন ? আমি বলি নি, তোমার আপিসঘরে, কিম্বা সেখানে জায়গা না হলে তোমার গুদোমঘরে পাদ্রী ডেকে মন্ত্র পড়লেই হবে।'

নয়রাট বললেন, 'অন্য মতলব ছিল, ডার্লিং, তোমাকে তো আর সব কিছু খুলে বলি নি।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'বটে !'

নয়রাট আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাকে খুলে কই।'

'বিয়ে করেই বউকে নিয়ে চলে গেলুম এক অজ পাড়াগাঁয়ে। সে গাঁ'টা খুঁজে বের করতে আমার বেশ বেগ পেতে হয়েছিল এবং সে গাঁ থেকেও আধ মাইল দূরে একটি 'শালে' ভাড়া নিলুম সাতদিনের জন্য। সেখানে ইলেকটিরি আছে—ব্যস্ আর কিছু না। জলের কল না, খবরের কাগজ না, দুধওয়ালা দুধ পর্যন্ত দিয়ে যায় না।

'রাত্তিরের ডিনার খেয়েই আমরা সে বাড়িতে গিয়ে উঠলুম।

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বাড়িতে ঢুকেই সোহাগ করে বললে—'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'চোপ্।'

নয়রাট বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, চোপ্।' তারপর আমাকে বললেন, 'আচ্ছা, তাহলে কমিয়ে-সমিয়ে বলছি—বাদবাকিটা পরে আপনাকে একলাএকলি বলব।'

'ভোর তিনটের সময় আমি চুপসে খাট ছেড়ে উঠে পা টিপে টিপে নামলুম নিচের তলায়। পিছনের বাগানে গিয়ে সেখান থেকে জল সংগ্রহ করে গেলুম রান্নাঘরে। সেখানে নাকে-মুখে বিস্তর ধুঁয়ো গিলে ধরালুম উনুন। তারপর বেকন ফ্রাই করে, গরম কফি, টোস্ট ইত্যাদি বানিয়ে যাবতীয় বস্তু একখানা বিরাট খুঞ্চাতে সাজিয়ে গেলুম উপরের তলায় ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার বিছানার কাছে। আস্তে আস্তে জাগিয়ে বললুম, "ব্রেকফাস্ট তৈরী।"

'ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললে (আবার "চোপ" এবং "আচ্ছা, আচ্ছা, চোপ্" শোনা গেল), ডার্লিং তুমি আমাকে কত না ভালোবাসো—এই ভোরে এই শীতে আমাকে কিছু না বলে তুমি এত সব করেছ।'

'আমি বললুম, "ডার্লিং না কচু, ভালোবাসা না হাতি। আমি এসব তৈরি করে আনলুম শুধু তোমাকে দেখাবার জন্য যে, বাদবাকি জীবন তোমাকে এই রকম ধারা করতে হবে। আর আমি শুয়ে শুয়ে ব্রেকফাস্ট খাবো।"

আমি প্রাণ খুলে হাসলুম।

দেখি নয়রাটও মিটমিটিয়ে হাসছেন। ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'আপনি এই তাড়িখানার বেহুদা প্রলাপটা বিশ্বাস করলেন?'

আমি বললুম, 'কেন করব না? শাদীর পয়লা রাতে শুধু ইরানেই নয়, আরো মেলা দেশে মেলা বর বেড়াল মেরেছে, এ তো আর নূতন কথা কিছু নয়। এবারে সুইস সংস্করণটি শেখা হল এই যা।

দুজনেই জিজ্ঞেস করলেন, 'সে আবার কি?'

আমাকে বাধ্য হয়ে শাদীর পয়লা রাতে বেড়াল-মারার গল্পটা বলতে হল, কিন্তু নয়রাটের মত জমাতে পারলুম না—রসিয়ে গল্প বলা আমার আসে না, সে আমার বন্ধুবান্ধব সকলেই জানেন।

দুজনেই স্বীকার করলেন, ইরানী গল্পটাই ভালো।

তখন ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'পেটারের বকুনিতে অনেকগুলো ভুল রয়েছে। প্রথমত আমরা হনিমুন যে বাড়িতে কাটাই, সেখানে গ্যাস ছিল, উনুন ধরাবার কথাই ওঠে না, দ্বিতীয়ত পেটার কক্‌খনো ব্রেকফাস্ট খায় না এবং সর্বশেষ

---

৩ 'পঞ্চতন্ত্র ১ম পর্ব', দ্রষ্টব্য।

বক্তব্য, যে-ব্রেকফাস্টের বর্ণনা সে দিল সেটা ইংলিশ ব্রেকফাস্ট। কোনো কন্‌টিনেন্টাল শূয়ারের মতো ব্রেকফাস্টের সময় একগাদা বেকন আর আণ্ডা গেলে না। পেটার গল্পটা শুনেছে নিশ্চয়ই কোনো ইংরেজের কাছ থেকে, আর সেটা পাচার করে দিলে আপনার উপর দিয়ে।'

পেটার বললেন, 'রেমব্রাণ্ট একবার এক ভদ্রলোকের মায়ের পট্রেট এঁকে-ছিলেন। ভদ্রলোক ছবি দেখে বললেন, তাঁর মায়ের সঙ্গে মিলছে না। রেমব্রাণ্ট বললেন, "একশ বছর পর আপনার মায়ের সঙ্গে কেউ এ ছবি মিলিয়ে দেখবে না—তারা দেখবে ছবিখানি উতরেছে কিনা।" '

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গল্পটি ভালো কি না, সেইটেই হচ্ছে আসল কথা। ঘটেছিল কি না, সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর ; আপনি কি বলেন ?'

আমি বললুম, 'সুন্দর-ই সত্য—না ঘটলেও ঘটা উচিত ছিল।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'বটে !'

নয়রাট বললেন, 'আমার শখ ছিল দাবা-খেলাতে এবং সে ব্যসনে মেতে আমার কত সময়-সামর্থ্য বরবাদ গিয়েছে তার হিসেব-নিকেশ আমি কখনো করি নি। দাবা-খেলা আমি আরম্ভ করি সাত বছর বয়সে। আমার বাবা কাকা দুজনেই পাঁড় দাবাড়ে ছিলেন আর কাকা রোজ রাত্তিরে বাবার সঙ্গে দাবা খেলতে আসতেন। এক রাত্রে আসতে পারলেন না জোর বরফের ঝড় বইছিল ব'লে, আর ওদিকে বাবা তো মৌতাতের সময় হন্যে হয়ে উঠলেন। আমি থাকতে না পেরে বললুম, "তা আমার সঙ্গেই খেলো না কেন ?" বাবা তো প্রথমটা হেসেই উড়িয়ে দিলেন, কিন্তু জানেন তো দাবার নেশা কী নিদারুণ জিনিস—বরঞ্চ মদের মাতাল খুনীর সঙ্গে এক টেবিলে মদ খেতে রাজী হবে না, দাবার মাতাল তার সঙ্গে খেলতে কণামাত্রও আপত্তি জানাবে না। বাবা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে খেলতে বসলেন, প্রথম দু'বাজি জিতলেনও কিন্তু তৃতীয় বাজি হল চালমাত এবং তারপর তিনি আর কখনো জেতেন নি। তবে তাঁর হল বুড়ো হাড়, এখনো খুব শক্ত শক্ত চালের চমৎকার চমৎকার উত্তর বাতলে দিতে পারেন।'

আমার আশ্চর্য লাগল, কারণ শরৎ চাটুজ্জেও কৈলাস খুড়োর বর্ণনাতেও ঐ কথাই বলেছেন ; খুড়োর শেষ বয়সে আটপৌরে খেলা ভুলে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু কঠিন সমস্যা সমাধানের জন্য খেলোয়াড়রা তাঁর কাছে যেত। সে কথাটা নয়রাটকে বলতে তিনি বল্লেন, 'অতিশয় হক্‌ কথা। পৃথিবীতে মেলা ধর্ম আছে—তাই ক্রীশ্চান, জু এবং দাবাড়ে। দাবাখেলা ধর্মের পর্যায়ে পড়ে, আর যারাই এ ধর্ম মানে তারা সব-ভাই-সব-ব্রাদার। দাবাড়েদের "পেন্‌ফ্রেণ্ড" পৃথিবীর সর্বত্র যে রকম ছড়ানো তার সঙ্গে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের তুলনা হয় না।'

তারপর বললেন, 'সেই যে বাবা দাবা ধরিয়ে দিলেন তারপর ওর হাত থেকে আমি আর রেহাই পাই নি। একবার এক পাঁড় মাতালকে বলতে শুনেছিলুম, সে নাকি জীবনে মাত্র একবার মদ খেয়েছে। আমরা সবাই আসমান থেকে পড়লুম, উল্লুকটা বলে কি—উদয়াস্ত যে লোকটা "ট্যানিসে"র উপর থাকে, সে কি না জীবনে কুল্লে একটিবার মদ খেয়েছে ! বেহেড মাতাল এরেই কয়।

তখন মাতাল বললে সে মদ খেয়েছে একবারই—তারপর থেকে এ অবধি শুধু তার খোঁয়ারিই ভাঙছে।'

আমি বললুম, 'ওমর খৈয়াম এ বাবদে যা নিবেদন করেছেন সেটা ঠিক হুবহু এর সঙ্গে খাপ খায় না, তবু অনেকটা এরই কান ঘেঁষে। খৈয়াম বলেছেন, "রোজার পয়লা রাত্তিরে অ্যায়সা পীনা পীউংগা যে তারই নেশার বেহুঁশীতে কেটে যাবে রোজার ঝাড়া পুরো মাসটা। হুঁশ হবে ঈদের দিন। ঈদ মানে পরব (পরব par excellence), পরব মানতে হয়, না হলে জাত যাবে, ধর্ম যাবে, তাই তখন ফের বসে যাব সুরাহী পেয়ালা প্রিয়া নিয়ে।" তারপর খৈয়াম কি করেছিলেন সে হদিস তাঁর রুবাইতে মেলে না, তবে বিবেচনা করি, দুসরা রমজান তক্ তিনি তাঁর কায়দা-কানুনে কোনো রদ্‌বদল করেন নি।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি। এখন বললেন, 'আমি তো এ রুবাই ফিটজিরাল্ডে পাই নি। আপনি কি ফার্সীতে পড়েছেন?'

আমি বললুম, 'ফিটজিরাল্ড তো তর্জমা করেছেন মাত্র বাহাত্তর না বিরাশীটি রুবাইয়াৎ। ওমরের নামে প্রচলিত আছে আট শ' না এক হাজার, আমি ঠিক জানি নে। তবে এ রুবাইটি আপনি নিশ্চয়ই হুইনসফিল্ড কিংবা নিকোলার অনুবাদে পাবেন। এঁরা ওমরের প্রায় কোনো রুবাই-ই বাদ দেন নি।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা শুধালেন, 'আপনি যে বললেন, "ওমরের নামে প্রচলিত রুবাইয়াৎ" তার অর্থ কি? আপনি কি বলতে চান, এগুলো ওমরের রচনা নয়?'

আমি বললুম, 'গুণীদের মুখে শুনেছি, ওমরের বেশির ভাগ রুবাইয়াতের মূল বক্তব্য ছিল, "এই বিরাট বিশ্ব-সংসার কোন্ নিয়মে চলে, কি করলে ঠিক কর্ম করা হয় এসব বোঝা তোমার আমার সাধ্যের বাইরে। অতএব যে দু'দিন এ সংসারে আছ সে দু'দিন ফুর্তি করে নাও; মরার পর কে কোথায় যাবে, কি হবে, না হবে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।" তারপর থেকে অন্য যে কোনো কবি এই মতবাদ প্রচার করে নূতন রুবাই লিখতেন তিনি তক্ষুনি সেটা ওমরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন। তার কারণও সরল। ওমর রাজানুগ্রহ পেয়েছিলেন, প্রধান মন্ত্রী নিজাম-উল-মুলুকও ছিলেন তাঁর ক্লাসফ্রেন্ড। তাই তিনি নির্ভয়ে ইসলাম-বিরোধী এই চার্বাকী মতবাদ প্রচার করে যেতে পেরেছিলেন; কিন্তু পরের আমলে আর সব কবির সৌভাগ্য তো হয় নি—তাঁরা মোল্লাদের বিলক্ষণ ডরাতেন। তাই তাঁরা তাঁদের বিদ্রোহী মতবাদ ওমরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আপন প্রাণ বাঁচাতেন—ওদিকে যা বলবার তাও প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে যেতেন।

'তাই দেখতে পাবেন, হাফিজের (এবং অন্য আরও কয়েক কবির) দিওয়ানে (তথাকথিত 'কম্‌প্লীট ওয়ার্কসে') ওমরের কবিতা, আবার ওমরের দিওয়ানে হাফিজের কবিতা। এ জট ছাড়িয়ে ওমরের কোন্‌গুলো, হাফিজের কোন্‌গুলো সে বের করা আজকের দিনে অসম্ভব।'

নয়রাট বললেন, 'আপনাদের ওমর কোনো কম্মের নয়। তার স্বর্গপুরীর

৪ 'সুফীরা মদ্য 'ভগবদ্-প্রেম' অর্থে ব্যাখ্যা করেন।

৫ 'রুবাই' একবচন, 'রুবাইয়াৎ' বহুবচন।

বর্ণনাতে তিনি বলেছেন,

"সেই নিরালা পাতায়-ঘেরা
বনের ধারে শীতল ছায়
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে,
ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।
মৌন ভাঙ্গি তার কাছেতে
গুঞ্জে তবে মঞ্জু সুর
সেই তো সখি, স্বর্গ আমার,
সেই বনানী স্বর্গপুর।"

'অত সব বয়নাক্কার কী প্রয়োজন!

'এক দাবাতেই যখন তাবৎ কিস্তি মাত হয়?'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা শুধালেন, 'ওমর সম্বন্ধে নানারকমের আজগুবী গল্প শোনা যায়—আমার মন সেগুলো মানতে রাজী হয় না, কিন্তু সেগুলো মানা না-মানার চেয়েও বড় প্রশ্ন; খুদ সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে, ইসলামের মত কট্টর ধর্মাবলম্বীদের দেশে তিনি তাঁর বিদ্রোহ জাহির করলেন কোন্ সাহসে? বুঝলুম না হয় রাজা আর প্রধানমন্ত্রী তাঁকে রক্ষা করছিলেন কিন্তু সেইটেই তো শেষ কথা নয়। সে যুগে দেশের পাঁচজন কি ভাবতো না ভাবতো তার হয়ত খুব বেশী মূল্য ছিল না কিন্তু মোল্লা সম্প্রদায়? সে যুগের রাজারাও তো ওদের সঙ্গে চলতেন।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, কিন্তু ভেবে দেখুন তো, রাজাতে পোপেতে যদি ঝগড়া লাগে তবে শেষ পর্যন্ত কি হয়? হুকুম চালাবার জন্য রাজারা সৈন্যের উপর নির্ভর করেন। সৈন্যরা যদি রাজার প্রতি সহানুভূতি রাখে তবে তারা হুকুম পাওয়া মাত্রই মোল্লাদের ঠ্যাঙাতে রাজী; পক্ষান্তরে তারা যদি মোল্লাদের মতবাদে বিশ্বাস রাখে তবে তারা বিদ্রোহ করে, অর্থাৎ রাজাকে ধরে ঠ্যাঙায়।

'এ তো হল কমন-সেন্স। তাই এস্থলে প্রশ্ন ইরানের লোক সে আমলে কতখানি ইসলাম-অনুরাগী ছিল?'

'ইতিহাস থেকে আমার যেটুকু জ্ঞান হয়েছে—কিন্তু থাক, এসব কচকচানি হয়ত হ্যার নয়রাট পছন্দ করছেন না—'

নয়রাট বললেন, 'ফের এটিকেট? আর এটিকেট হলই বা—আমি আপনার বক্তব্যটা শুনছি ইন টার্মস্ অব্ চেস্। আপনি এখন ওপনিং গেম্ আরম্ভ করেছেন, তারপর মিড্ গেম্ আসবে—আমি দেখছি আপনি ঘঁটিগুলো কি কায়দায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—যা বলছিলেন বলে যান।'

আমি বললুম 'ইরানের সভ্যতা সংস্কৃতি আরবদের চেয়ে বহু শত বৎসরে খানদানী। ইরান ইসলাম প্রচারের বহু পূর্বেই রাজ্য-বিস্তার করতে গিয়ে গ্রীসের সঙ্গে লড়েছে, ভারতের পশ্চিম-সীমান্ত দখল করেছে, মিশরীদের সঙ্গে টক্কর দিয়েছে, রোমানদের বেকাবু করেছে, অর্থাৎ রাষ্ট্র হিসেবে ইরান বহু শত বৎসর ধরে পৃথিবীর পয়লা শক্তি হিসেবে গণ্য হয়েছে। পৃথিবীর সম্পদ ইরানে জড়ো হয়েছিল বলে ইরানীরা যে স্থাপত্য, যে ভাস্কার্য নির্মাণ করেছিল তার সঙ্গে তুলনা

দেবার মতো কলানিদর্শন আজও পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। আর বিলাসব্যসনের কথা যদি তোলেন তবে আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস ইরানীরা যে রকম পঞ্চেন্দ্রিয়ের পূর্ণতম আনন্দ গ্রহণ করেছে সেরকম ধারা তাদের পূর্বে বা পরে কেউ কখনো করতে পারে নি।

'এই ধরুন না, আরব্য-উপন্যাস। অথচ বেশির ভাগ গল্পে যে ছবি পাচ্ছেন সেগুলো আরবের নয়, ইরানের—আমার ব্যক্তিগত 'ফেন্সি' মত নয়, পণ্ডিতেরা এ কথাই বলেন।

'মনে পড়ছে সেই গল্প?—যেখানে এক সুন্দরী তরুণী এসে এক ঝাঁকা-মুটেকে নিয়ে চলল হরেক রকমের সওদা করতে। মাছমাংস, ফলমূল কেনার পর সে তরুণী যে সব সুগন্ধি দ্রব্য কিনল তার সব কটা জিনিসের অনুবাদ কি ইংরিজী, কি ফরাসী, কি বাঙলা কোনো ভাষাতেই সম্ভব হয় নি—কারণ, এসব জিনিসের বেশির ভাগই আমাদের অজানা। এমন কি আজকের দিনের আরবরা পর্যন্ত সে-সব বস্তু কি, বুঝিয়ে বলতে পারে না। তুলনা দিয়ে বলছি, আজকের দিনে প্যারিসে যে পাঁচশ' রকমের সেণ্ট বিক্রী হয় সেগুলোর বয়ান, ফিরিস্তি, অনুবাদ কি এস্কিমো ভাষায় সম্ভবে?

'ইরানের তুলনায় সে-যুগে আরবরা ছিল প্যারিসের তুলনায় অনুন্নত—অর্থাৎ সভ্যতা-সংস্কৃতি নিম্ন পর্যায়ে। সেই আরবরা যখন ধর্মের বাঁধনে এক-জোট হয়ে ইরানে হানা দিল তখন বিলাস-ব্যসনে ফুর্তি-ফার্তিতে বেএক্তেয়ার ইরানীরা লড়াইয়ে হেরে গেল। আপনাদের ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত দিতে গেলে গ্রীস-রোমের কাহিনী বলতে হয়, সে কাহিনী আমার বলার প্রয়োজন নেই। সেটা হবে "সুইটজারল্যাণ্ডে ঘড়ি আনার মত"।

'ইরানীরা মুসলমান হয়ে গেল, কেন হল সে-কথা আরেকদিন হবে, যারা হতে চাইল না অথচ জানত দেশে থাকলে অর্থনীতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে একদিন হতেই হবে তারা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল আমার দেশ ভারতবর্ষে—সে ইতিহাসও এস্থলে অবান্তর।

'আরবরা মরুভূমির সরল, প্রিমিটিভ মানুষ; তারা ইরানের বিলাস-ব্যভিচার দেখে স্তম্ভিত—"শকৃট্", "আউট-রেজ্ড্"। আবার ইরানীরাও আরবদের বেদুইন ধরন-ধারণ দেখে ততোধিক স্তম্ভিত এবং "শকৃট্"।

'তদুপরি আরেকটা কথা ভুললে চলবে না, আরবরা সেমিটি বংশের (ইহুদী গোত্রের সঙ্গে তাদের "মেলে"), আর ইরানীরা আর্য। জীবনাদর্শ ভিন্ন ভিন্ন; ধর্ম এক হলে কি হয়? প্যারিসের ক্রীশ্চান আর নীগ্রো ক্রীশ্চান কি একই ব্যক্তি?

'এইবার মোদ্দা কথায় ফিরে যাই; ইরানীরা মুসলমান হল বটে (এবং এদের অনেকেই খাঁটি মুসলিম) কিন্তু তাদের মজ্জাগত মদ্যাদি পঞ্চমকার ছাড়তে পারলো না। তাই ইরানের জনসাধারণ ওমরের মদ্য-দর্শনবাদ খুশীসে বরদাস্ত করে নিল।

'দেশের লোক যখন গোপনে গোপনে মদ খায় তখন রাজার আর কি ভাবনা? মোল্লারা যা বলে বলুক, যা করে করুক—এবং একথাও রাজার অজানা ছিল না যে, বহু লোক আপন হারেমে বসে ঐতিহ্যগত মদ্যপানে কার্পণ্য করেন না।

'তাই ওমর বেঁচে গেলেন, রাজাও কোনো মুশকিলে পড়লেন না।'

* * *

নয়রাট বললেন, 'আপনাদের ওমর খৈয়াম যা আমার ট্যুনিস-শেল্‌ও তা।'

আমি ঠিক বুঝতে না পেরে শুধালুম, 'ট্যুনিস-শেল্‌ নিয়ে তো সব রসিকতার গল্প, আর খৈয়াম তো রচেছেন চতুষ্পদী।'

নয়রাট বললেন, 'মিলটা অন্য জায়গায়। আপনিই বললেন না, দুনিয়ার যত ঈশ্বর-বিদ্রোহী, মদ্যোৎসাহী চতুষ্পদী—তা সে ওমরের হোক, হাফিজের হোক, আত্তারের হোক, সব কটা এসে জুটেছে ওমরের চতুর্দিকে, ঠিক তেমনি রসিকতার গল্পে নায়ক যদি মাত্র দুজন হয়, আর তার একজন আরেক জনের উপর টেক্কা মারার চেষ্টা করে তবে শেষ পর্যন্ত সেগুলো ট্যুনিস-শেলের নামে চালু হবেই হবে। এগুলোকে তাই সাইক্‌ল্‌ (চক্র) বলা হয়। ওমর সাইক্‌ল্‌, ট্যুনিস-শেল সাইক্‌ল্‌ কিম্বা পল্‌ডি সাইক্‌ল্‌। ওমর যে-রকম ইরানের, ট্যুনিস-শেল্‌ তেমনি জর্মনীর কলোন শহরের আবার পল্‌ডি সুইটজারল্যাণ্ডের। আপনাদের ভারতবর্ষে এরকম সাইক্‌ল্‌ আছে?'

আমি বললুম, 'এন্তার! হর-পার্বতী সাইক্‌ল্‌, গোপালভাঁড় সাইক্‌ল্‌, শেখ চিল্লী সাইক্‌ল্‌ এবং আরো বিস্তর। কিন্তু পল্‌ডি সাইক্‌লের বিশেষত্ব কি?'

নয়রাট বললেন, 'পল্‌ডি হলেন অতিশয় খানদানী ঘরের ছেলে, উত্তম বেশভূষায় ছিমছাম না হয়ে বেরোন না, সকলের সঙ্গে অতিশয় ভদ্র ব্যবহার—এ তো সব হল; কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, তিনি একটি পয়লা নম্বরের বক্কেশ্বর, আনাড়ির চূড়ামণি—বে-অকুফের শিরোমণি। দু-একটা উদাহরণ দিচ্ছি—'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'কিন্তু শ্লীজ, অশ্লীলগুলো না।'

নয়রাট বেদনাতুরতার ভান করে বললেন, 'ফ্রান্‌ৎসিস্‌কাকে নিয়ে ঐ তো বিপদ। একশ বার বোঝাবার চেষ্টা করেছি, শ্লীল-অশ্লীল—একেবারে স্বতঃসিদ্ধরূপে, অর্থাৎ perse—পৃথিবীতে নেই, যেরকম নিজের থেকে "ডার্ট" বা ময়লা বলে কোন জিনিস হয় না। অস্থানে পড়লেই জিনিস ডার্ট হয়। ডাস্টবিনের ভিতরকার ময়লা ময়লা নয়—একথা কেউ বলে না, "ডাস্টবিন ময়লা হয়ে গিয়েছে, ওটা সাফ করো", বলে, "ডাস্টবিন ভর্তি হয়ে গিয়েছে।" ঠিক তেমনি সুন্দরীর ঠোঁটের উপর লিপস্টিক ডার্ট নয়, কিন্তু যদি সেই লিপস্টিক আমার গালে লেগে যায়—'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'পেটার! আবার!'

আমার মনে হল, ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বাড়াবাড়ি করছেন, তাই নয়রাটকে সমর্থন করার জন্য গুনগুন করলুম,

'অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলুঢুলু আঁখি,

দুজনেই জিজ্ঞেস করলেন, 'মানে?'

আমি সালঙ্কার সবিস্তর নন্দকুমারের গণ্ডে চন্দ্রাবলীর তাম্বুলরাগের বর্ণনা দিলুম।

নয়রাটকে আর পায় কে ?—চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'শুনলে, গিন্নী শুনলে ? শ্রীকৃষ্ণ ভারতীয়দের স্বয়ং ভগবান, আমাদের যেরকম যীশুখ্রীষ্ট। তিনি যদি রাধা ভিন্ন অন্য রমণীকে দয়া দেখাতে পারেন, তবে আমার গালে কিংবা ইভনিং শার্টে লিপস্টিক আবিষ্কার করলে তুমি মর্মাহত হও কেন ?'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বাধা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী ঢিড্‌ মিথ্যেবাদী রে, বাবা ! আমি আর মা-বোন ভিন্ন অন্য মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে হলে যে পুরুষ—হ্যাঁ পুরুষই বটে—শব্দের জন্য পকেট-ডিক্সনারি বের করে তার গালে লিপস্টিক ! ডু লিবার হ্যার গট ফন বেনটাইম (বাঙলায়—"হে পিণ্ডিদাদন খানের মা কালী !")'

আমি বললুম, 'কিন্তু হ্যার নয়রাট, একটা ভুল করবেন না। দেবতা যা করবার অধিকার রাখেন, সাধারণ মানুষের তা নেই। কিন্তু সে কথা থাক, শ্লীল-অশ্লীল সম্বন্ধে আপনি কি যেন বলছিলেন ?'

নয়রাট বললেন, 'Per se বাই ইটসেলফ যেরকম ডার্ট হয় না, ঠিক তেমনি স্ব-হক্কে কোনো জিনিস অশ্লীল নয়। উদাহরণ দিয়ে বলি,—যেখানে বাইবেল পাঠ হচ্ছে, সেখানে হঠাৎ পেটের ব্যামো নিয়ে আরম্ভ করা অশ্লীল এবং তার চেয়েও ভালো দৃষ্টান্ত, ডাক্তাররা যেখানে যৌন সম্পর্কের আলোচনা করছেন, সেখানে বেমক্কা বাইবেল পাঠ আরম্ভ করা তার চেয়েও বেশি অশ্লীল।

'অর্থাৎ বক্তব্য বস্তু প্রতীয়মান, জাজ্বল্যমান করার জন্য যে কোন দৃষ্টান্ত, যে কোন তথ্য, যে কোন গল্প শ্লীল—তা সে পঁচিশবার দাস্তের বয়ানই হোক, গণিকা-জীবনকাহিনীই হোক। পক্ষান্তরে ইর্‌রেলেভেণ্ট আউট অব প্লেস (বেমক্কা) জিনিস, তা সে ধর্মসঙ্গীতই হোক আর টমাস আকুনিয়াসের জীবনই হোক।'

আমার আশ্চর্য লাগল। কারণ দেশের ভটচাজ মশাই ('পাদটীকা' দ্রষ্টব্য) এবং কাবুলের মৌলানা মীর আসলম ('দেশে-বিদেশে' দ্রষ্টব্য) ঐ একই কথা বলেছিলেন।

আমি বললুম, 'খাঁটি কথা। কিন্তু এসব থাক না এখন। বরঞ্চ একটা পল্‌ডি গল্প বলুন।'

নয়রাট বললেন, 'সেই ভালো।'

'পিয়ন পল্‌ডিকে মনি অর্ডারের টাকা দিলে। পল্‌ডি দিল জোর টিপস্‌। পাশে বসেছিলেন বন্ধু, তিনি বললেন, 'পল্‌ডি, অত বেশি টিপস্‌ দিলে কেন ?' পল্‌ডি পরম সন্তোষ সহকারে মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে বললে, 'ঐ তো ! কিসসু জানো না, কিসসু সমঝো না ; জোর টিপস্‌ দিলে ঘন ঘন মনি অর্ডার নিয়ে আসবে না ?'

আমার হাসি শেষ হবার পূর্বেই নয়রাট বললেন, "কিংবা ধরুন, পল্‌ডির বুকে ব্যাথা। ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে বুক-পিঠ বাজিয়ে বললেন, 'ঠিক ডায়গ্‌নোজ করতে পারছি নে। তবে মনে হচ্ছে অত্যধিক মদ্যপানই কারণ।'

পল্‌ডি হেসে বললেন, 'তাই নিয়ে বিচলিত হবেন না, ডাক্তার, আমি না-হয় আরেকদিন আসব, যেদিন আপনি অত্যধিক মদ্যপান করে মাতাল হয়ে যান নি।'

নয়রাট বললেন, 'পল্‌ডি রসিকতাতে শুধু থাকে রস। ও-গুলোর ভিতর দিয়ে পল্‌ডির দেশ, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি সম্বন্ধে বিশেষ কোনো খবর পাওয়া যায় না কিন্তু ট্যুনিস-শেলের গল্পের ভিতর দিয়ে জর্মানি, কলোনের শ্রমিকশ্রেণী এবং তাদের জীবনধারণ সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যায় এবং তাতে করে গল্পগুলো বেশ একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের রঙ ধরে। এই ধরুন পাদ্রী সম্প্রদায়কে নিয়ে আমরা প্রায়ই ব্যঙ্গ করে থাকি। তার-ই একটা ট্যুনিস-শেল্‌ সাইক্লে বেশ খানিকটে রসের সৃষ্টি করেছে।

'ট্যুনিস আর শেল্‌ একখানা দশ টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়েছে (কটলেটের গল্পে পূর্বেই বলেছি তারা হরদম রাস্তায় টাকা কুড়িয়ে পায়) এবং ঝগড়া লেগে গিয়েছে টাকাটার ওপর কার হক্ক। ট্যুনিস বলে সে আগে দেখেছে; শেল্‌ বলে সে আগে কুড়িয়ে নিয়েছে এবং পজেশন ইজ থ্রি-ফোর্থ অব ল'। তারপর এ বলে ও মিথ্যেবাদী ও বলে এ মিথ্যেবাদী। করতে করতে হঠাৎ ট্যুনিস বললে, "তাই সই, মিথ্যেবাদী হওয়াটাও কিছু সোজা কর্ম নয়, আমি হচ্ছি পাঁড় মিথ্যেবাদী আর তুই হচ্ছিস পেঁচি (এমেচার) মিথ্যেবাদী।" শেল্‌ বললে, "গাঁজা, ঠিক তার উল্টো।"

'তখন স্থির হল পাল্লা দিয়ে দুজনে মিথ্যে কথা বলবে, যে সব চেয়ে বেহুদা বেশরম মিথ্যে বলতে পারবে, টাকাটা সে-ই পাবে।

'তখন ট্যুনিস বিস্‌মিল্লা বলে আরম্ভ করলে,—

"পরশুদিন ঘরে মন টিকছিল না বলে বাইরে এসে এক লম্ফে চলে গেলুম আমেরিকায়। সেখানে পেঁছিলুম এক সমুদ্রপারের 'লিডো'তে। দেখি হাজার হাজার মেয়েমদ্দ সেখানে চান করছে, সাঁতার কাটছে। আর ছুঁড়ি-গুলো কী বেহায়া! আমার এই একটা নেক্‌টাইয়ের কাপড় দিয়ে তিনটে মেয়ের সুইমিং কস্টুম হয়ে যায়। (ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'পেটার, আবার?' নয়রাট বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, টাপেটোপে বলছি'।) আমার ভায়ঙ্কর রাগ হল। করলুম কি, সব কটা হুলো-মেনিকে ধরে একটা ব্যাগে পুরে দিলুম আরেক লাফ। এবারে পেঁছিলুম, ফুজি-আমা পাহাড়ের কাছে। ব্যাগের ভিতর তিন হাজার বেড়াল ক্যাঁও ম্যাঁও করছিল বলে আমার দারুণ বিরক্তি বোধ হল। তাই আস্ত ব্যাগটা গিলে ফেলে গোটা আড়াই ঢেকুর তুললুম, তারপর—"

"শেল্‌ বাধা দিয়ে বললে, এতে আর মিথ্যে কোন্‌খানটায় হল? আমি তো তোর সঙ্গেই ছিলুম, পষ্ট দেখলুম, তুই এসব করছিলি।"

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা গল্পটা আগে শোনেন নি বলে হাসলেন। আমিও বললুম, 'এ গল্পটা ভারি নতুন ধরনের। শেলের উত্তরটা অত্যন্ত আচমকা একটা ধাক্কা দিলে।'

নয়রাট বললেন, 'গল্পটা এখনো শেষ হয় নি।'

আমরা বললুম, 'সে কি কথা?'

নয়রাট বললেন, গল্পটি যদিও খাস কলোন শহরের, -তবু তার টেকনিকে একটু চীনা পদ্ধতি এসে গিয়েছে। এ গল্পে দুটো 'সারপ্রাইজ', কিংবা বলতে পারেন দুটো কিক আছে। খুলে বলিছ;—

'ট্যুনিস আর শেল্, যখন রাইন নদীর পাড়ের রেলিঙে ভর করে মিথ্যের জাহাজ ভাসাচ্ছিল, তখন এক পাদ্রী সাহেব পাশে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্তসৌন্দর্য নিরীক্ষণ করছিলেন। অনিচ্ছায় কিংবা সেচ্ছায়ও হতে পারে, ট্যুনিস শেলের বিকট মিথ্যের বহর তাঁর কানে এসে পেঁাচেছিল। থাকতে না পেরে বললেন, "ছি, ছি, বাছারা; এ-রকম ডাহা মিথ্যে তোমরা মুখ দিয়ে বের করছো কি করে? জানো না, মিথ্যা কথা মহাপাপ? আমি জীবনে কখনো মিথ্যা বলি নি।"

'ট্যুনিস পাদ্রীর কথা শুনে প্রথম হকচকিয়ে গেল, তারপর থ মেরে গেল। সম্বিতে ফিরে শেষটায় ক্ষীণকণ্ঠে, বাজি হারার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শেল্‌কে বললে, "ভাই শেল্, নোটটা ওকেই দে, টাকাটা ওরই পাওনা। তুই এ-রকম পাঁড় মিথ্যে বলতে পারবি নে; আম্মো পারবো না।"'

আমি বললুম 'খাসা গল্প; এটা মনে রাখতে হবে।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'কিন্তু আমি জানি, পেটার ওখানে থাকলে প্রাইজটা সে-ই পেত।'

আমি নয়রাটকে বললুম, 'গল্পটি সুন্দর, কিন্তু এতে টিপিকাল কলোনের কি আছে? আমাদের মোল্লা-পুরুত সম্বন্ধেও তো এরকম বদনাম আছে।'

নয়রাট বললেন, 'আমি জানতুম না। তবে শুনুন আরেকটা—আর এর জবাব আপনি দিতে পারবেন না।'

'ট্যুনিস-শেল্ আবার একখানা দশ টাকার নোট পেয়েছে (ট্যুনিস-শেল্ সাইক্লের ভিতরে এ হচ্ছে "নোটের সাব্-সাইকেল্")। এবারে ঝগড়া হয় নি। দুজনে সেই টাকা দিয়ে মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে রাস্তায়। পুলিস তাদের পেঁাছে দিয়েছে হাসপাতালে। সকালবেলা তাদের ঘুম ভেঙেছে আর নেশা কেটেছে। দেখে চতুর্দিক ফিটফাট, ছিমছাম। ট্যুনিস শুধালে, "ওরে শেল্, এ আবার এলুম কোথায়?" শেল্ বললে, "আমিও তাই ভাবছি। দাঁড়া, দেখে আসছি।"

'শেল্ গেল ঘরের বাইরে। পাঁচ সেকেণ্ডের ভিতর ছুটে এসে বললে, "ওরে ট্যুনিস—আমরা ভারতবর্ষে পেঁাছে গিয়েছি—রাতারাতি আমাদের ভারতে পাচার করে দিয়েছে।"

'ট্যুনিস তো তাজ্জব। শুধালে, "কি করে জানলি?"

'বললে, "করিডরে মোটা হরপে লেখা আছে, "Die Toiletten befinden sich auf jenseits des Ganges".'

নয়রাট বললেন, অর্থাৎ, "করিডরের দুপাশে বাথরুমের ব্যবস্থা আছে।" এখন 'করিডর' শব্দ জর্মনে Gang আর Gang-এর দুপাশে—অর্থাৎ ষষ্ঠীতৎপুরুষ Ganges, তার মানে বাথরুম গঙ্গার (নদীর) দুপারে।'

'তাই ট্যুনিস-শেল্ রাতারাতি ভারতে পেঁাছে গিয়েছে।'

নয়রাট বললেন, 'দেশভ্রমণের গল্পই যদি উঠল তবে সেই সাবসাইক্লই চলুক।'

আমি বললুম, 'উত্তম প্রস্তাব।'

নয়রাট বললেন, 'ট্যুনিস-শেল্ পেটের ধান্দায় হামবুর্গ গিয়ে জহাজের খালাসির চাকরি নিয়ে পেঁাচেছে গিয়ে ইস্তাম্বুল শহরে, সেখানে—'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'না, পেটার, ওটা চলবে না।'

নয়রাট ব্যথা-ভরা নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গল্পটা কিন্তু ছিল খাসা ; তার আর কি করা যায়! তবে তাদের নিয়ে যাই নিউ ইয়র্কে'।

'হয়েছে কি, ট্যুনিসের এক মামা নিউ ইয়র্কে দুপয়সা রেখে মারা গিয়েছে। ট্যুনিস উকিলের চিঠি পেয়েছে তাকে সেখানে সশরীরে উপস্থিত হয়ে নিজের সনাক্ত দিয়ে টাকাটা ছাড়িয়ে আনতে হবে। ওদিকে ট্যুনিস আবার ভয়ানক ভীতু ধরনের লোক। একা বিদেশ যেতে ডরায়—শেল্‌কে বললে, "ভাই, তুই চ।" শেল্‌ ভাবলে—আর আমিও তাই ভাবতুম,—মন্দ কি, ফোকটে মার্কিন-মুল্লুকটা দেখা হয়ে যাবে।

'তারা নিউ ইয়র্ক পেঁছিল ঠিক বড় দিনের দিন। তামাম মার্কিন দেশ ঝেঁটিয়ে এসে জড়ো হয়েছে নিউ ইয়র্কে পরব করার জন্য, সব হোটেল আগাগোড়া ভর্তি, করিডরে পর্যন্ত ক্যাম্প্‌ কট্‌ পেতে শোবার ব্যবস্থা ফালতো গেস্টদের জন্য করা হয়েছে।

'মহা দুর্ভাবনায় পড়ল দুই ইয়ার। ডিসেম্বরের শীতে আশ্রয় না পেলে শীতেই অক্কা-লাভ। দুই বন্ধু কলোন গির্জের মা-মেরিকে স্মরণ করে এক ডজন মোমবাতি মানত করলে। আপনি তো মুসলমান, এসব মানেন না, কিন্তু—'

আমি বললুম, 'আলবত মানি। একশবার মানি। কলকাতায় মৌলা আলীর দর্গায় মোমবাতি মানত করলে বহু বাসনা পূর্ণ হয়। আর আমাদের দেশে এমন জায়গাও আছে যেখানে মানত করলে মোকদ্দমা পর্যন্ত জেতা যায়।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা শুধালেন, 'ডিভোর্স পাবার দরগা আছে?'

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ, তবে সেখানে স্বামী-স্ত্রীকে একসঙ্গে গিয়ে কামনাটা জানাতে হয়।'

নয়রাট আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ।' তারপর গল্পের খেই তুলে নিয়ে বললেন, 'কলোনের মা-মেরি বড় জাগ্রত দেবতা। একটা হোটেলে শেষটায় একটা ডবল রুম জুটে গেল, কিন্তু ব্যবস্থাটা শুনে দুই ইয়ারই আঁতকে উঠলেন।

'ঘর পঞ্চাশ তলায়, আর লিফট্‌ বিগড়ে গিয়েছে!'

'দুইজনাই একসঙ্গে বললে, "হে মা-মেরি এতটা দয়াই যখন করলে, তখন লিফট্‌টা সারাতে পারলে না মা?"'

আমি বললুম, 'আমাদের গোপালভাঁড়ও তাই বলেছিল,—

"এত দয়াই যদি করলি, মা কালী,
তবে আরেকটু দয়া করে,
বনে আছে দেদার ফড়িং
খা না দুটো ধরে।"

নয়রাট বললেন, 'গল্পটা কি?,

আমি বললুম, 'আপনাকে একদিন সময়মত আমাদের "গোপালভাঁড়-সাইক্ল" শোনাব, তবে তার অনেকগুলি ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার সামনে বলা চলবে না।'

নয়রাট বললেন, 'তবে নিয়ে চলুন আপনাদের ডিভোর্স-দর্গায়।'

সিগরেট ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা ভাঁড়াঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। আমি বললুম, 'অত তাড়া কিসের? ভারত যাবার জাহাজ আরো সপ্তাহখানেক পর ছাড়ে।'

নয়রাট বললেন, তখন ট্যুনিস শেল্‌কে বলেল, "ভাই, এ ছাড়া আর উপায় যখন নেই তখন চ, সিঁড়ি ভাঙি আর কি?"

'শেল্‌ বললে, "একটা ব্যবস্থা করলে হয় না, প্রতি তলা উঠতে উঠতে তুই এক-একটা করে গল্প বলবি আর তাতেই মশগুল হয়ে আমরা পঞ্চাশতলা বেয়ে নেব। তুই তো মেলা গল্প জানিস।"

'ট্যুনিস বললে, "যা বলেছিস, সাধে কি আর তোকে সঙ্গে এনেছিলুম? তবে শোন," বলে আরম্ভ করলে সিঁড়ি ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে গল্প-বলা।'

নয়রাট বললেন, সে কত বাহারে গল্প! আমি গল্প কলেক্‌ট্‌ করি নে, কিন্তু আমার এক বন্ধু আছেন, তাঁর সঙ্গে আমি আপনাকে আলাপ করিয়ে দেব, তিনি সব কটা জানেন।

তা সে কথা থাক।

'ট্যুনিস আর শেল্‌ এক এক তলার সিঁড়ি ভাঙে আর ট্যুনিস এক-একখানা জান্‌—তর্‌-র-র্‌ গল্প ছাড়ে। হেসেখেলে বিন্‌-মেহন্নত, বিন্‌-কসরতে তারা পঁচিশতলা এক ঝটকায় মেরে দিলে।

'তখন ট্যুনিস বললে, "ভাই শেল, আমার সব গল্প খতম। আর কোন গল্প মনে পড়ছে না।"

'তখন শেল্‌ বললে, "ঘাবড়াস নি। আমারো কিছু পুঁজি আছে।"

'বলে তখন শেল্‌ আরম্ভ করল গল্প বলতে। সেও কিছু কম বাহারে নয়, তবে ট্যুনিস তালেবর ব্যক্তি, তার সঙ্গে তুলনা হয় না।

'করে করে তারা আরো চব্বিশখানার সিঁড়ি ভাঙলে—গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে।

'মাত্র একতলা বাকি। শেল্‌ দুম্‌ করে মাটিতে বসে পড়ল। এক ঝটকায় হোক আর উনপঞ্চাশ ঝটকায়ই হোক পা-গুলো তো আর গল্প শুনতে পায় না। শেল্‌ ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়ে বললে, "ভাই আমার গুদোমও খতম।"

তখন ট্যুনিশ বললে, "কুছ্‌ পরোয়া নদারদ। আমার একখানা গল্প মনে পড়েছে—একদম সত্যি গল্প।—আমরা ফ্লাটের চাবি সঙ্গে আনতে ভুলে গিয়েছি।"

* * *

লঞ্চ খেতে এসে তখন প্রায় চায়ের সময় হয়ে গিয়েছে অথচ গাল-গল্পের কম্বলের ভিতর এমনি ওম জমে গিয়েছে যে সে কম্বল ফুটো করে বেরতে ইচ্ছে করে না। শীতের দেশ তো—উভয়ার্থে শীতের দেশ, ইয়োরোপীয়দের মনেও শীত; আড্ডা জমিয়ে সঙ্গ-সুখের আলিঙ্গনে সেটাকে গরম করতে জানে না—তাই এদের কুণ্ডলিতে বহুদিন পরে যেন 'বসন্ত রেস্টুরেন্টে'র আনন্দ পেলুম।

শেষটায় একটা হাফ্‌-মোকা পেয়ে বললুম, 'আমি তা হলে উঠি।'

নয়রাট একটি কথা বললেন, 'কেন ?'

আমি একটু অবাক হয়ে গেলুম। এরকম অবস্থায় সচরাচর বলা হয়, "সে কি কথা ? এখনই যাবেন কেন ?' কিংবা 'বড্ড কাজ পড়ে আছে বুঝি ?' অথবা অন্য কিছু। আমার কোনো জবাব যোগাল না।

নয়রাট বললেন, 'দেখুন মশাই, আপনাকে বলি নি, কিন্তু আপনাকে আমি বিলক্ষণ চিনি। গেল কয়েকদিন ধরে যখনই লেকের পাড় দিয়ে কাজ-কর্মে কোথাও যেতে হয়েছে, তখনই আপনাকে দেখেছি, ঐ একই বেঞ্চের উপর—তাও আবার একই পাশে—বসে আছেন। শুনেছি, ইংলণ্ডের পার্কে চেয়ারে বসলে তার জন্যে ট্যাক্স দিতে হয়—'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'সেখানে দম ফেলতেও ট্যাক্স দিতে হয় এবং তারই ভয়ে কেউ যদি দম বন্ধ করে, তবে মরে গিয়ে তাকে ডেথ্‌-ট্যাক্স দিতে হয়।'

নয়রাট বললেন, 'তাহলে বিবেচনা করি সেখানে বিয়ের উপরও ট্যাক্স আছে। আহা, ইংলণ্ডে জন্মালে হত।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'আহা আমি যদি তিব্বতে জন্মাতুম। সেখানে প্রত্যেক রমণীর পাঁচটা করে স্বামী থাকে, আর সব কটাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়।'

আমি বললুম, 'ষাট, ষাট (ইংরিজিতে tut tut), ও রকম অলুক্ষণে কথা কইবেন না।'

সমস্বরে, 'কেন ?'

আমি বললুম, 'তাহলে আসছে জন্মে, পেটারকে জন্মাতে হবে ইংলণ্ডে আর মাদাম ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা (ব'লে তাঁর দিকে 'বাও' করে বললুম), আপনাকে জন্ম নিতে হবে তিব্বতে।'

দুজনাই কিচির-মিচির করে উঠলেন। তার থেকে যে প্রশ্ন ওতরালো তার মোটামুটি জিজ্ঞাসা, 'আসছে জন্মে' কথাটার মানে কি ? আমরা তো মরে গিয়ে হয় স্বর্গে যাব, কিংবা নরকে, কিংবা কপ্পুর হয়ে যাব, 'আসছে জন্মে' তার অর্থ কি ?

আমি বললুম, 'এই যে পেটার শুধালেন, আমি বেঞ্চিতে সর্বসময় বসে থাকি কেন ? তার অর্থ আমি চলাফেরা, হাঁটাহাঁটি করি না কেন ? সুইট্‌জারল্যাণ্ডে যদি ইংলিশ্‌ কায়দায় বেঞ্চিতে বসতে হত তাহলে ট্যাক্স দিয়ে দিয়ে আমি ফতুর হয়ে যেতুম সেকথা আমি খুব ভালো করেই জানি কিন্তু চলাফেরা করলে আমাকে খেসারতি দিতে হবে অনেক বেশি।'

লাইন কোন্‌ দিকে চলেছে ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা যেন তার খানিকটা আভাস পেয়েছেন বলে মনে হল। পেটার কিন্তু রতি-ভর হদিস না পেয়ে শুধালেন, 'এর কোনো মানে হয় না, আপনি রাস্তায় হাঁটছেন, তার জন্য ট্যাক্স দিতে হবে কেন ? ইংলণ্ডের মতো বর্বর দেশেও ও-রকম ট্যাক্স নেই।'

আমি বললুম, 'পরজন্মে মানুষ এ পৃথিবীতে আসে পূর্বজন্মের কামনা নিয়ে। আমি সমস্ত দিন যতদূর সম্ভব চুপচাপ বসে থাকি যাতে করে

ভগবান পরজন্মে আমাকে এমন জায়গায় বসান যেখানে আমাকে কোন কিছু না করতে হয়। আমি যদি হাঁটাহাঁটি করি, তবে ভগবান ভাববেন, আমি ঐ কর্মই পছন্দ করি, আর আমাকে এ জগতে পাঠাবেন পোস্টম্যান করে। তখন মরি আর কি, জলঝড়ে, বিষ্টিতুফানে এর বাড়ি ওর বাড়ি চিঠি-পার্শেল বয়ে বয়ে।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা শুধালেন, 'আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি নে কিন্তু কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছি। আপনি বলতে চান, মানুষ মরে গিয়ে এই পৃথিবীতে আবার ফিরে আসে। সে কি করে হয়?'

জ্ঞানী পাঠক! অপরাধ নেবেন না। আপনি সেস্থলে থাকলে আমার অনেক পূর্বেই বুঝে যেতেন, 'জন্মান্তরবাদ' এরা জানে না এবং আপনি সেইটি বুঝতে পেরে তক্‌খুনি তার শাস্ত্রসম্মত সদুত্তর দিয়ে দিতেন। কিন্তু আমি তো পণ্ডিত নই, দেশ আমাকে আদর করে না, দেশ আমাকে খেতে-পরতে দেয় না, তাই তো আমি লক্ষ্মীছাড়া গৃহহারা হয়ে গিয়েছি বিদেশ, আমি অতশত বুঝতে পারব কি করে?

তদুপরি আরেক কথা আছে। আমি মুসলমানের ছেলে। ইসলাম জন্মান্তরবাদ মানে না; যদিও প্রাগৈতিহাসিক যুগে মক্কাবাসীরা জন্মান্তরে বিশ্বাস করতো। সেই যুগের একটি আরবী কবিতা এই সুবাদে মনে পড়ল।

কবিতাটির গীতিরস বাঙলাতে অনুবাদ করার মত বাঙলা-ভাষা-জ্ঞান আমার নেই কিন্তু কল্পনা-চতুর পাঠক হয়তো আমার অনুবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি পেরিয়ে গিয়ে ঠিক তত্ত্বটি সমঝে যাবেন। মরুভূমির আরব বেদুইন প্রিয়াকে উদ্দেশ করে বলছে,

'প্রিয়ে,
আরবভূমি মরুভূমি, নীরস কর্কশ
তোমার আমার প্রেমের সুধাশ্যামলিম-রস
কেউ বুঝতে পারল না।
তাই সর্বদেহমনহৃদয় দিয়ে প্রার্থনা করি,
তুমি যেন এমন দেশে জন্মাও,—
—আসছে জন্মে—
কত শত শতাব্দীর পরে তা জানিনে,
যেখানে মানুষ জলে ডুবে আত্মহত্যা করার
আনন্দ অনায়াসে অনুভব করতে পারে।'

এর টীকা অনাবশ্যক। আরব দেশে হাঁটু-জলের বেশি গভীরতর কোনো প্রকার নদীপুকুর নেই। তাই কবি জন্মান্তরে সেই দেশের কামনা করেছেন যেখানে মানুষ জলে ডুবে চরম শান্তি পায়।

সে দেশ বাঙলা দেশ। চেরাপুঞ্জির দেশ, যেখানে সব চেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়। নদীনালা, পুকুর-হাওরে জলের থৈ থৈ।

আরব বেদুইন কবি এই দেশই মনে মনে কামনা করেছিল।

* * *

আমি বললুম, 'আসছে জন্মের কথা থাক। আপনি যে এ জন্মের কাহিনী আরম্ভ করেছিলেন সেইটি তো শেষ করলেন না। আপনি বলছিলেন আপনার গুটিকয়েক শখ পূরণ করার জন্য আপনি এক-টানা ছাব্বিশ বছর খেটে পয়সা জমিয়ে এখন দিব্য আরাম করতে পারছেন। আপনার শখগুলো কি?'

নয়রাট বললেন, 'এক নম্বর দাবা-খেলা আর দু নম্বর—বলতে একটু বাধো-বাধো ঠেকছে।'

আমি বললুম, 'এইবার আপনারা ভদ্রতা "আরম্ভ" করলেন!'

নয়রাট বললেন, 'ভদ্রতায় ঠেকছে না। ঠেকছে অন্য জায়গায়। তবু না হয় বলেই ফেলি। আমি যখন ইস্কুল যেতুম তখন একটি জারজ ছেলেকে আমার ক্লাসের ছেলেরা বড় ক্ষ্যাপাত--ছেলেরা এ বিষয়ে যে কী রকম ক্রূর আর নিষ্ঠুর হতে পারে তার বর্ণনা আপনি নিশ্চয়ই মোপাসাঁর পড়েছেন। আমি তখনো গল্পটি পড়ি নি কিন্তু আজ মনে হয় ছেলেটির দুর্দৈব কাহিনী মোপাসাঁ শতাংশের একাংশও বর্ণনা করতে পারেন নি। আমার নিজের বিশ্বাস যৌনবোধ না জন্মানো পর্যন্ত মানুষের মনে স্নেহ করুণা ইত্যাদি কোনো প্রকারের সদ্‌গুণ দেখা দেয় না। তাই বালকেরা হয় সচরাচর অত্যন্ত নিষ্ঠুর—আমি ক্লাসের আর সকলের চেয়ে ছিলুম বয়সে একটু বড়, আমার তখন নিজের অজানাতেই যৌনবোধ আরম্ভ হয়েছে এবং তাই ঐ হতভাগ্য ছেলেটার জন্য আমার হৃদয়ে গভীর বেদনার উদ্রেক হত। কিন্তু বয়সে বড় হলে কি হয়, আমি ছিলুম একে রোগাপটকা, তার উপর মারামারি হাতাহাতির প্রতি আমার আন্তরিক ঘৃণা। তাই আমি তাকে কোনো প্রকারে সাহায্য না করতে পেরে মনে মনে বড় লজ্জা বোধ করতুম। তবে সুযোগ পেলেই, আর পাঁচটা ছেলের চোখের আড়ালে ওর হাতে একটা চকলট গুঁজে দিতুম, রাস্তায় দেখা হলে একটা আইসক্রীম খাইয়ে দিতুম।

'প্রথম যে-দিন তাকে চকলেট দিয়েছিলুম সেদিন সে আমার দিকে বদ্ধ ইডিয়টের মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল, তারপর দরদর করে তার দু চোখ বেয়ে জল বেরিয়ে এসেছিল। ক্লাসের তিরিশটে কসাইয়ের ভিতরেও যে একটি ছেলে গোপনে গোপনে তার জন্য হৃদয়ে দরদ ধরে এর কল্পনাও যে কখনো তার মনের কোণে ঠাঁই দিতে পারে নি।'

তাকিয়ে দেখি ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার চোখ ছলছল করছে। অথচ তিনি নিশ্চয়ই এ-কাহিনী আগে শুনে থাকবেন। মনে মনে বললুম, নয়রাট সত্যই 'সহধর্মিণী' পেয়েছেন। বাইরে বললুম, 'থামলেন কেন?'

বললেন, 'এখনো বাধো-বাধো ঠেকছে। তবু বলছি, কারণ এ বিষয়ে আমি মিশনারি।'

'ছেলেটাকে ধমক দিয়ে বললুম, "এই ফুল! চোখ মুছে ফেল। আর সবাই দেখে ফেললে তোকে জ্বালাবে আরো বেশি, আমাকেও রেহাই দেবে না।"

'চোখের জলের সঙ্গে আনন্দ আর কৃতজ্ঞতা মিশে গিয়ে তার চেহারা যে কি রকম বিকৃত হয়ে গিয়েছিল তার ছবি আমি আজো দেখতে পাই।

'আপনাকে কি বলবো, তারপর সেদিন ক্লাসে বসে যখনই আড়নয়নে তাকিয়েছি তখনই দেখেছি, সে চোখ বন্ধ করে আছে, তার ঠোঁটের দু কোণে গভীর প্রশান্তির মৃদু হাস্য, আর গালের আপেল দুটো খুশিতে উপরের দিকে উঠে চোখ দুটো যেন চেপে ধরেছে। আমি তো ভয়ে মরি, মুখটা আবার কি বলতে গিয়ে কি না বলে ফেলে।

'তার পর দিন থেকে আরম্ভ হল আরেক আজব কেচ্ছা। ছেলেরা রুটিনমাফিক তাকে 'ব্যা—ড' বললে, চুলে ধরে টান দিলে, অন্যান্য প্রকরণেরও কোনো খাঁকতি হল না কিন্তু সেও রুটিনমাফিক চিৎকার চেঁচামেচি গালাগাল দিলে না—সে দেখি, চোখ বন্ধ করে মিটমিটিয়ে হাসছে—আমি ভাবলুম, হয়েছে, ছোঁড়াটা বোধ করি ক্ষেপে গেছে।

'বহু পরে সে আমাকে একদিন বলেছিল, সে নাকি তখন খুশিতে ডগোমগো, তার নাকি ভারী আনন্দ, তার আর কি ভয়, এই ক্লাসেই তার একটি বন্ধু রয়েছে, সে তাকে চকলেট খাইয়েছে।'

আমি বললুম, 'অতিশয় হক্ কথা! ফার্সীতে প্রবাদ আছে,—

"দুশ্‌মন্ চি কুনদ্, আগর্ মেহেরবান বাশদ্ দোস্ত।"

"দুশ্‌মন্ কি করতে পারে, দোস্ত যদি মেহেরবান্ হয়!"

নয়রাট উল্লসিত হয়ে ফ্রানৎসিস্‌কাকে বললেন, 'বউ, প্রবাদটা টুকে নাও তো, কাউকে দিয়ে ফার্সীতে লিখিয়ে নিজে জর্মনে গথিক হরফে তর্জমা লিখে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবো।'

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এতদিন ধরে আমি জুতসই একটা প্রবাদের সন্ধানে ছিলুম—অপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

তারপর বললেন, 'ছোঁড়াটা অদ্ভুত। আমাকে বিপদে না ফেলার জন্য আমার কাছে এসে ন্যাওটামি করতো না। একলা-একলি দেখা হলে শুধু আমার দিকে তাকিয়ে একটুখানি মুচকি হেসে চোখ বন্ধ করত।

'তার কয়েকদিন পরে আমার জন্মদিন। ক্লাসের ছোঁড়াগুলোর প্রতি যদিও আমি ঐ ছোকরাটাকে জ্বালাতন করার জন্য বিরক্ত হতুম তবু অন্য বাবদে ওরাই তো আমার সঙ্গী; তাই তাদের নেমন্তন্ন করলুম, আর না করলে মা-ই বা কী ভাববে? তারা আমার জন্য উপহার আনলে, বই, পেন্সিল, ছুরি, কলের লাটিম এবং আর পাঁচটা জিনিস। আমরা কেক্ লেমনেড খাচ্ছি, জোর হৈ-হুল্লোড় চলছে, এমন সময় বাড়ির দাসী আমার কানে কানে বললে, "ছোটবাবু, তোমার জন্য একটি ছেলে নিচের তলায় গেটে দাঁড়িয়ে। কিছুতেই উপরে আসতে চায় না; তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।"

'আমার সব বন্ধুই তো গটগট করে উপরে আসে। এ আবার কে?

'গিয়ে দেখি সেই পাগলা। হাতে এক ঢাউস বাক্স। লজ্জায় লাল হয়ে বললে—"তোর জন্মদিনে একটা প্রেজেন্ট এনেছি। ছোট্ট একটা পাল-লাগানো ইয়ট'।"

'বলে কি? 'ইয়ট' তখন আমাদের স্বপ্নের বাইরে। পুরো বছরের জলখাবারের পয়সা জমালেও আমাদের ক্লাসের ধনী ছোকরা আডলফ্ পর্যন্ত 'ইয়ট' কিনতে পারে না—তখনো জানতুম না, সে পয়সাওলা ছেলে।

'লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। বললুম, "তুই উপরে চ, কেক খাবি।"

'বললে, "না, ভাই, তুই যা, উপরে আরো অনেক সব রয়েছে।"

'আমি তাকে জোর করে উপরে টেনে নিয়ে এলুম। কোত্থেকে সাহস পেলুম আজো জানি নে। বোধ হয় ইয়টের কৃতজ্ঞতায়।'

আমি থাকতে না পেরে বললুম, 'ছিঃ, ও জিনিস নিয়ে ঠাট্টা করবেন না।'

নয়রাট বললেন, 'থ্যাংক উই। তার পর উপরে কি হল ঠিক বলতে পারব না। প্রথমটায় সবাই থ মেরে গেল। তারপর একে একে সক্কলেই পাগলার সঙ্গে শেক-হ্যাণ্ড করলে। তার চোখ দিয়ে আবার সেই পয়লা দিনের মতো ঝরঝর করে জল নেমে এল।

'সেই দিনই আমি মনস্থির করলুম, বড় হলে আমি সর্বত্র এরকম ছেলেদের অন্যায় অত্যাচার থেকে বাঁচাবো। ভগবান আমাকে আজ দেখিয়ে দিয়েছেন, এ শক্তি আমার ভিতরে আছে।'

নয়রাট হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'এখুখুনি আসছি; আমি একটা টেলিফোন করতে ভুলে গিয়েছিলুম।'

বুঝলুম, বিনয়ী লোক, লজ্জা ঢাকবার অবকাশ খুঁজছেন॥

আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর-সঙ্গীত

কদম্ কদম্ বঢ়ায়ে জা
খুশীকে গীত্ গায়ে জা
ইয়েহ্ জিন্দগী হ্যায় কৌম কী
(তো) কৌম পৈ লুটায়ে জা॥

এগিয়ে যা এগিয়ে যা
খুশীর গীত গাইতে যা।
দেশের তরে জীবন ধন
দেশের লাগি করবি নে পণ?

তু শেরে হিন্দ্ আগে বঢ়্
মরণেসে ফিরভি তু ন ডর্
আসমান তক্ উঠায়ে সির্
জোশে ওতন্ বঢ়ায়ে জা॥

শেরে হিন্দ এগিয়ে যা।
সামনে মরণ ফিরে না চা॥
আকাশ বিঁধে তুলবি শির
দেশের জোশ বাড়বে বীর।

তেরে হিম্মৎ বঢ়তী রহে
খুদা তেরী সুন্তা রহে
জো সামনে তেরে চঢ়ে
(তো) খাক্‌মে মিলায়ে জায়॥

বাড়ুক বাড়ুক সাহস তোর
খুদা তোরে দেবেন জোর।
সামনে বাধা পরোয়া না কর
ধুলায় তারা পাবে যে গোর॥

চলো দিল্লী পুকারকে
কৌমী নিশান সম্ভাল্‌কে
লাল কিল্লে গাঢ়কে
লহ রায়ে জা লহ রায়ে জা॥

হুংকারিয়া দিল্লী চল
কৌমী নিশান জাগিয়ে তোল
লালকেল্লায় ঝাণ্ডা খোল
এগিয়ে যা ফুর্তিতে চল॥

কদম্ কদম্ বঢ়ায়ে জা॥

এগিয়ে যা, এগিয়ে যা॥

শেরে হিন্দ্=হিন্দুস্থানের ব্যাঘ্র, জোশ্=শক্তি, কৌমী নিশান=জাতীয় পতাকা

দ্বন্দ্বমধুর

উৎসর্গ

বাংলা সাহিত্যকে সর্বপ্রথম সংকীর্ণতার গণ্ডি থেকে মুক্ত করে,
তার অধিকার ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন উভয় বাংলার
যে-সব পাঠক-পাঠিকা লেখক-লেখিকা বাংলাকে
সুন্দর ও কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে
সত্যবদ্ধ—তাঁদের উদ্দেশে

নোনাজল

সেই গোয়ালন্দ চাঁদপুরী জাহাজ। ত্রিশ বৎসর ধরে এর সঙ্গে আমার চেনাশোনা। চোখ বন্ধ করে দিলেও হাতড়ে হাতড়ে ঠিক বের করতে পারব, কোথায় জলের কল, কোথায় চা-খিলির দোকান, মুর্গীর খাঁচাগুলো রাখা হয় কোন্ জায়গায়। অথচ আমি জাহাজের খালাসী নই—অবরের-সবরের যাত্রী মাত্র।

ত্রিশ বৎসর পরিচয়ের আমার আর সবই বদলে গিয়েছে বদলায় নি শুধু ডিসপ্যাচ স্টীমারের দল। এ-জাহাজের ও-জাহাজের ডেকে কেবিনে কিছু কিছু ফেরফার সব সময়ই ছিল, এখনও আছে, কিন্তু সব কটা জাহাজের গন্ধটি হুবহু একই। কীরকম ভেজা-ভেজা, সোঁদা-সোঁদা যে গন্ধটা আর সব-কিছু ছাপিয়ে ওঠে, সেটা মুর্গী-কারি রান্নার। আমার প্রায়ই মনে হয়েছে, সমস্ত জাহাজটাই যেন একটা আস্ত মুর্গী, তার পেটের ভেতর থেকে যেন তারই কারি রান্না আরম্ভ হয়েছে। এ-গন্ধ তাই চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ, যে কোন স্টেশনে পেঁছানো মাত্রই পাওয়া যায়। পুরনো দিনের রূপরসগন্ধস্পর্শ সবই রয়েছে, শুধু লক্ষ্য করলুম ভিড় আগের চেয়ে কম।

দ্বিপ্রহরে পরিপাটি আহারাদি করে ডেকচেয়ারে শুয়ে দূর-দিগন্তর দিকে তাকিয়ে ছিলুম। কবিত্ব আমার আসে না, তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য আমার চোখে ধরা পড়ে না, যতক্ষণ না রবি ঠাকুর সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। তাই আমি চাঁদের আলোর চেয়ে পছন্দ করি গ্রামোফোনের বাক্স। পোর্টেবুলটা আনব আনব করছি, এমন সময় চোখে পড়ল একখানা মুদিতা 'দেশ'—মালিক না আসা পর্যন্ত তিনি যদি পরহস্তে কিঞ্চিৎ 'ভ্রষ্টা'ও হয়ে যান, তা তাঁর 'স্বামী বিশেষ বিরক্ত হবেন না নিশ্চয়ই।

'রূপদর্শী' ছদ্মনাম নিয়ে এক নতুন লেখক খালাসীদের সম্বন্ধে একটি দরদ-ভরা লেখা ছেড়েছে। ছোকরার পেটে এলেম আছে, নইলে অতখানি কথা গুছিয়ে লিখল কী করে, আর এত সব কেচ্ছা-কাহিনীই বা যোগাড় করল কোথা থেকে? আমি তো একখানা ছুটির আর্জি লিখতে গেলেই হিমসিম খেয়ে যাই। কিন্তু লোকটা যা সব লিখেছে, এর কি সবই সত্যি? এতবড় অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে খালাসীরা লড়াই দেয় না কেন? হুঁঃ! এ আবার একটা কথা হল। সিলেট নোয়াখালির আনাড়ীরা দেবে ঘুঘু ইংরেজের সঙ্গে লড়াই—আমিও যেমন!

জাহাজের মেজো সারেঙের আজ বোধ হয় ছুটি। সিল্কের লুঙ্গি, চিকনের কুর্তা আর মুগার কাজ-করা কিস্তি টুপি পরে ডেকের ওপর টহল দিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আবার আমার দিকে আড়নয়নে তাকাচ্ছেও। ডিসপ্যাচের পুঁটি ও মানওয়ারির তিমি দুই-ই মাছ—একেই জিজ্ঞাসা করা যাক না কেন, 'রূপদর্শী' দর্শন করেছে কতটুকু আর কল্পনায় বুনেছে কতখানি!

একটুখানি গলা খাঁকারি দিয়ে শুধালুম, 'ও সারেঙ সাহেব, জাহাজ লেট যাচ্ছে না তো?'

লোকটা উত্তর দিয়ে সবিনয়ে বলল, 'আমাকে "আপনি" বলবেন না সাহেব। আমি আপনাকে দু-একবারের বেশী দেখি নি, কিন্তু আপনার আব্বা সাহেব, বড় ভাই সাহেবেরা এ-গরিবকে মেহেরবানি করেন।'

খুশী হয়ে বললুম, 'তোমার বাড়ি কোথা? বস—না, তার ফুরসত নেই?' ধপ করে ডেকের উপর বসে পড়ল।

আমি বললুম, 'সে কী? একটা টুল নিয়ে এসো। এসব আর আজকাল—' কথাটি শেষ করলুম না, সারেঙও টুল আনল না। তারপর আলাপ পরিচয় হল। দ্যাশের লোক—সুখ-দুঃখের কথা অবশ্যই বাদ পড়ল না। শেষটায় মোকা পেয়ে 'রূপদর্শী-দর্শন' তাকে আগাগোড়া পড়ে শোনালুম। সে গভীর মনোযোগ দিয়ে তার জাতভাই চাষারা যেরকম পুঁথিপড়া শোনে, সে রকম আগাগোড়া শুনল, তারপর খুব লম্বা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

আল্লাতালার উদ্দেশে এক হাত কপালে ঠেকিয়ে বললে, 'ইনসাফের (ন্যায়ধর্মের) কথা তুললেন, হুজুর, এ-দুনিয়ায় ইনসাফ কোথায়? আর বে-ইনসাফি তো তারাই করেছে বেশী, যাদের খুদা ধনদৌলত দিয়েছেন বিস্তর। খুদাতালাই কার জন্যে কী ইনসাফ রাখেন, তাই বা বুঝিয়ে বলবে কে? আপনি সমীরুদ্দীকে চিনতেন, বহু বছর আমেরিকায় কাটিয়েছিল, অনেক টাকা কামিয়েছিল?'

আমেরিকার কথায় মনে পড়ল। 'চৌতলি পরগণায় বাড়ি, না, যেন ওই দিকেই কোন্‌খানে।'

সারেঙ বললে, 'আমারই গাঁ ধলাইছড়ার লোক। বিদেশে সে যা টাকা কামিয়েছে ওরকম কামিয়েছে অল্প লোকই। আমরা খিদিরপুরে সইন (sign) করে জাহাজের কামে ঢুকেছিলাম—একই দিন একই সঙ্গে।'

আমি শুধালুম, 'কী হল তার? আমার ঠিক মনে পড়ছে না।'

সারেঙ বললে, 'শুনুন।'

'যে লেখাটি হজুর পড়ে শোনালেন, তার সব কথাই অতিশয় হক। কিন্তু জাহাজের কাজে, বিশেষ করে গোড়ার দিকে যে কী জান মারা খাটুনি তার খবর কেউ কখনও দিতে পারবে না, যে সে-জাহান্নামের ভিতর দিয়ে কখনও যায় নি। বয়লারের পাশে দাঁড়িয়ে যে লোকটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কয়লা ঢালে, তার সর্বাঙ্গ দিয়ে কী রকম ঘাম ঝরে দেখেছেন—এই জাহাজেই যার দুদিক খোলা, পদ্মার জোর বাতাসের বেশ খানিকটা যেখানে স্বচ্ছন্দে বেশ আনাগোনা করতে পারে। এ তো বেহেশ্‌ৎ। আর দরিয়ার জাহাজের গর্ভের নীচে যেখানে এঞ্জিন-ঘর, তার সব দিক বন্ধ, তাতে কখনও হাওয়া-বাতাস ঢোকে না। সেই দশ বারো চোদ্দ হাজার-টনী ডাঙর ডাঙর জাহাজের বয়লারের আকারটা কত বড় হয় এবং সেই কারণে গরমিটার বহর কতখানি, সে কি বাইরের থেকে কখনও অনুমান করা যায়? খাল বিল নদীর খোলা

হাওয়ার বাচ্চা আমরা—হঠাৎ একদিন দেখি, সেই জাহান্নামের মাঝখানে, কালো-কালো বিরাট-বিরাট শয়তানের মত কলকব্জা, লোহালক্কড়ের মুখোমুখি।

'পয়লা পয়লা কামে নেমে সবাই ভিরমি যায়। তাদের তখন উপরে টেনে জলের কলের নীচে শুইয়ে দেওয়া হয়, হুঁশ ফিরলে পর মুঠো মুঠো নুন গেলান হয়, গায়ের ঘাম দিয়ে সব নুন বেরিয়ে যায় বলে মানুষ তখন আর বাঁচতে পারে না।

'কিংবা দেখবেন কয়লা ঢেলে যাচ্ছে বয়লারে ঠিক ঠিক, হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, বেলচা ফেলে ছুটে চলেছে সিঁড়ির পর সিঁড়ি বেয়ে, খোলা ডেক থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে। অসহ্য গরমে মাথা বিগড়ে গিয়েছে, জাহাজী বুলিতে একেই বলে "এমখ"—'

আমি শুধালুম, 'এরেই কি ইংরাজীতে বলে এমাক্ (amuck)? কিন্তু তখন তো মানুষ খুন করে!'

সারেঙ বললে, 'জী হাঁ। তখন বাধা দিতে গেলে হাতের কাছে যা পায়, তাই দিয়ে খুন করতে আসে।' তারপর একটু থেমে সারেঙ বললে, 'আমাদের সকলেরই দু-একবার হয়েছে, আর সবাই জাবড়ে ধরে চুবিয়ে আমাদের ঠাণ্ডা করেছে—শুধু সমীরুদ্দী কখ্খনো একবারের তরেও কাতর হয় নি। তাকে আপনি দেখেছেন, সায়েব? বাং মাছের মত ছিল তার শরীর, অথচ হাত দিয়ে টিপলে মনে হত কচ্ছপের খোল। জাহাজের চীনা বাবুর্চির ওজন ছিল তিন মণের কাছাকাছি—তাকে সে এক থাবড়া মেরে বসিয়ে দিতে পারত। লাঠি খেলে খেলে তার হাতে জমেছিল বাঘের থাবার তাগদ। কিন্তু সে যে ভিরমি যায় নি, "এমখ" হয় নি, তার কারণ তার শরীরের জোর নয়—দিলের হিম্মৎ—সে মন বেঁধেছিল, যে করেই হোক পয়সা সে কামাবেই, ভিরমি গেলে চলবে না, বিমারি পাকড়ানো সখ্ৎ মানা।'

সারেঙ বললে, 'কী বেহদ তকলীফে জানপানি হয়ে যে কুলুম শহরে পেঁছিলাম—'

আমি শুধালাম, 'সে আবার কোথায়?'

বললে, 'বাংলায় যারে লঙ্কা কয়।'

আমি বললুম, 'ও, কলম্বো।'

'জী। আমাদের উচ্চারণ তো আপনাদের মত ঠিক হয় না। আমরা বলি কুলুম শহর। সেখানে ডাঙায় বেড়াবার জন্য আমাদের নামতে দিল বটে, কিন্তু যারা পয়লা বার জাহাজ বেরিয়েছে, তাদের উপর কড়া নজর রাখা হয়, পাছে জাহাজের অসহ্য কষ্ট এড়াবার জন্যে পালিয়ে যায়। সমীরুদ্দী বন্দরে নামলেই না। বললে, নামলেই তো বাজে খরচা। আর সে-কথা ঠিকও বটে, হুজুর, খালাসীরা কাঁচা পয়সা বন্দরে যা ওড়ায়! যে জীবনে কখনও পাঁচ টাকার নোট দেখে নি, আধুলির বেশী কামায় নি, তার হাতে পনের টাকা। সে তখন কাগের বাচ্চা কেনে।'

'আমরা পেট ভরে যা খুশি তাই খেলাম। বিশেষ করে শাক-সবজি।

জাহাজে খালাসীদের কপালে ও জিনিস কম। নেই বললেও হয়—দেশে যার ছড়াছড়ি।'

'তারপর কুলুম থেকে আদন বন্দর।'

আমার আর ইংরিজী 'এইডন' বলার দরকার হল না।

'তারপর লাল-দরিয়া পেরিয়ে সুয়েজের খাড়ি—দু দিকে ধু-ধু মরুভূমি, বালু আর বালু, মাঝখানে ছোট্ট খাল।'

বুঝলুম, 'সুয়েজের খাড়ি' মানে সুয়েজ কানাল।

'তারপর পুর্সই। সেখানে খালের শেষ। বাড়িয়া বন্দর। আমরা শাক-সবজি খেতে নামলাম সেখানে। ঝানুরা গেল খারাপ জায়গায়।'

পোর্ট সঈদের গণিকালয় যে বিশ্ববিখ্যাত, দেখলুম, সারেঙের পো সে খপরটি রাখে।

'পুর্সই থেকে মার্সই, মার্সই থেকে হামবুর—হামবুর জর্মনির মুলুকে।'

ততক্ষণে সিলেটী উচ্চারণে বিদেশী শব্দ কী ধ্বনি নেয়, তার খানিকটা আন্দাজ হয়ে গিয়েছে, তাই বুঝলুম, মারসেইলজ, হামবুর্গের কথা হচ্ছে। আর এটাও লক্ষ্য করলুম যে, সারেঙ বন্দরগুলোর নাম সোজা ফরাসী-জর্মন থেকে শুনে শিখেছে, তারা যে-রকম উচ্চারণ করে, ইংরিজীর বিকৃত উচ্চারণের মারফতে নয়।

সারেঙ বলল, 'হামবুরে সব মাল নেমে গেল। সেখান থেকে আবার মাল গাদাই করে আমরা দরিয়া পাড়ি দিয়ে গিয়ে পৌঁছলাম নুউক বন্দরে—মিরকিন মুলুকে।

'নয়া ঝুনা কোন খালাসীকে নুউক বন্দরে নামতে দেয় না। বড় কড়াকড়ি সেখানে। আর হবেই বা না কেন? মিরকিন মুলুক সোনার দেশ। আমাদের মত চাষাভুষাও সেখানে মাসে পাঁচ-সাত শো টাকা কামাতে পারে। আমাদের চেয়েও কালা, একদম মিশকালা আদমীও সেখানে তার চেয়েও বেশী কামায়। খালাসীদের নামতে দিলে সব কটা ভেগে গিয়ে তামাম মুলুকে ছড়িয়ে পড়ে প্রাণ ভরে টাকা কামাবে। তাতে নাকি মিরকিন মজুরদের জবর লোকসান হয়। তাই আমরা হয়ে রইলাম জাহাজে বন্দী।'

'নুউক পৌঁছবার তিন দিন আগে থেকে সমীরুদ্দীর করল শক্ত পেটের অসুখ। আমরা আর পাঁচজন ব্যামোর ভান করে হামেশাই কাজে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু সমীরুদ্দী এক ঘণ্টার তরেও কোন প্রকারের গাফিলি করে নি বলে ডাক্তার তাকে শুয়ে থাকবার হুকুম দিলে।'

'নুউক পৌঁছবার দিন সন্ধ্যেবেলা সমীরুদ্দী আমাকে ডেকে পাঠিয়ে কসম-কিরে খাইয়ে কানে কানে বললে, সে জাহাজ থেকে পালাবে। তারপর কী কৌশলে সে পারে পৌঁছবে, তার ব্যবস্থা সে আমায় ভাল করে বুঝিয়ে বললে।

'বিশ্বাস করবেন না সায়েব, কী রকম নিখুঁত ব্যবস্থা সে কত ভেবে তৈরী করেছিল। কলকাতার চোরা-বাজার থেকে সে কিনে এনেছিল একটা খাসা নীল রঙের সুট, শার্ট, টাইকলার, জুতা, মোজা।'

'আমাকে সাহায্য করতে হল শুধু একটা পেতলের ডেগচি যোগাড় করে দিয়ে। সন্ধ্যার অন্ধকারে সমীরুদ্দী সাঁতারের জাঙিয়া পরে নামল জাহাজের উলটো ধার দিয়ে, খোলা সমুদ্রের দিকে। ডেগচির ভিতরে তার সুট, জুতো, মোজা আর একখানা তোয়ালে। বুক দিয়ে সেই ডেগচি ঠেলে ঠেলে বেশ খানিকটা চক্কর দিয়ে সে প্রায় আধ-মাইল দূরে গিয়ে উঠবে ডাঙায়। পাড়ে উঠে, তোয়ালে দিয়ে গা মুছে, জাঙিয়া ডেগচি জলে ডুবিয়ে দিয়ে শিস দিতে দিতে চলে যাবে শহরের ভিতর। সেখানে আমাদেরই এক সিলেটী ভাইকে সে খবর দিয়ে রেখেছিল হামবুর থেকে। পুলিসের খোঁজাখুঁজি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে কয়েকদিন, তারপর দাড়িগোঁফ কামিয়ে চলে যাবে নুউক থেকে বহুদূরে, যেখানে সিলেটীরা কাঁচা পয়সা কামায়। পালিয়ে ডাঙায় উঠতে পুলিসের হাতে ধরা পড়ার যে কোন ভয় ছিল না তা নয়, কিন্তু একবার সুটটি পরে রাস্তায় নামতে পারলে পুলিস দেখলেও ভাববে, সে নুউকবাসিন্দা, সমুদ্রপারে এসেছিল হাওয়া খেতে।'

'পেলেনটা ঠিক উতরে গেল, সায়েব। সমীরুদ্দীর জন্য খোঁজ-খোঁজ্ রব উঠল পরের দিন দুপুরবেলা। ততক্ষণে চিড়িয়া যে শুধু উড় গিয়া তা নয় সে বনের ভিতর বিলকুল উধাও। একদম না-পাত্তা। বরঞ্চ বনের ভিতর পাখিকে পেলেও পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু নুউক শহরের ভিতর সমীরুদ্দীকে খুঁজে পাবে কোন পুলিসের গোসাঁই?'

গল্প বলায় ক্ষান্ত দিয়ে সারেঙ গেল জোহরের নমাজ পড়তে। ফিরে এসে ভূমিকা না দিয়েই সারেঙ বললে, 'তারপর হুজুর আমি পুরো সাত বচ্ছর জাহাজে কাটাই। দু-পাঁচবার খিদিরপুরে নেমেছি বটে, কিন্তু দেশে যাবার আর ফুরসৎ হয়ে ওঠে নি। আর কী-ই বা হত গিয়ে, বাপ-মা মরে গিয়েছে, বউ-বিবিও তখন ছিল না। যতদিন বেঁচে ছিল, বাপকে মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতাম—বুড়া শেষের ক বছর সুখেই কাটিয়েছে—খুদাতালার শুকুর—বুড়ী নাকি আমার জন্য কাঁদত। তা হুজুর দরিয়ার অথৈ নোনা পানি যাকে কাতর করতে পারে না, বুড়ির দু ফোঁটা নোনা জল তার আর কী করতে পারে বলুন!'

বলল বটে হক কথা, তবু সারেঙের চোখেও এক ফোঁটা নোনা জল দেখা দিল।

সারেঙ বললে, 'যাক সে কথা। এ সাত বছর মাঝে মাঝে এর মুখ থেকে ওর মুখ থেকে খবর কিংবা গুজব, যাই বলুন, শুনেছি, সমীরুদ্দী বহুত পয়সা কামিয়েছে, দেশেও নাকি টাকা পাঠায়, তবে সে আস্তানা গেড়ে বসেছে মিরকিন মুলুকে, দেশে ফেরার কোন মতলব নেই। তাই নিয়ে আমি আফসোস করি নি, কারণ খুদাতালা যে কার জন্য কোন্ মুলুকে দানাপানি রাখেন, তার হদিস বাতলাবে কে?

'তারপর কল-ঘরের তেলে-পিছল মেঝেতে আছাড় খেয়ে ভেঙে গেল আমার পায়ের হাড্ডি। বড় জাহাজের কাম ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে এসে ঢুকলাম

ডিসপ্যাচারের কামে। এ-জাহাজে আসার দুদিন পরে, একদিন খুব ভোরবেলা ফজরের নমাজের ওজু করতে যাচ্ছি, এমন সময় তাজ্জব মেনে দেখি, ডেকে বসে রয়েছে সমীরুদ্দী! বুকে জাবড়ে ধরে তাকে বললাম, ভাই সমীরুদ্দী! এক লহমায় আমার মনে পড়ে গেল, সমীরুদ্দীকে এককালে আমি আপনার ভাইয়ের মতন কতই না প্যার করেছি।'

'কিন্তু তাকে হঠাৎ দেখতে পাওয়ার চেয়েও বেশী তাজ্জব লাগল আমার, সে আমার প্যারে কোন সাড়া দিল না বলে। গাঙের দিকে মুখ করে পাথরের পুতুলের মত বসে রইল সে। শুধালাম, "তোর দেশে ফেরার খবর তো আমি পাই নি। আবার এ জাহাজে করে চলেছিস তুই কোথায়? কলকাতা? কেন? দেশে মন টিঁকল না?"

'কোন কথা কয় না। ফকির-দরবেশের মত বসে রইল ঠায়, তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে, যেন আমাকে দেখতেই পায় নি।'

'বুঝলাম কিছু একটা হয়েছে। তখনকার মত তাকে আর কথা কওয়াবার চেষ্টা না করে, ঠেলেঠুলে কোন গতিকে তাকে নিয়ে গেলাম আমার কেবিনে। নাশতার পেলেট সামনে ধরলাম, আণ্ডা ভাজা ও পরটা দিয়ে সাজিয়ে—ওই খেতে সে বড় ভালবাসত—কিছু মুখে দিতে চায় না। তবু জোর করে গেলালাম, বাচ্চাহারা মাকে মানুষ যে-রকম মুখে খাবার ঠেসে দেয়, কিন্তু হুজুর, পরের জন্য অনেক কিছু করা যায়, জানতক কুরবানি দিয়ে তাকে বাঁচানো যায়, কিন্তু পরের জন্য খাবার গিলি কী করে?'

'সেদিন দুপুরবেলা তাকে কিছুতেই গোয়ালন্দে নামতে দিলাম না আমার, হুজুর, মনে পড়ে গেল বহু বৎসরের পুরনো কথা—নুউক বন্দরেও আমাদের নামতে দেয় নি, তখন সমীরুদ্দী সেখানেই গায়েব হয়েছিল।

'রাত্রের অন্ধকারে সমীরুদ্দীর মুখ ফুটল।

'হঠাৎ নিজের থেকেই বলতে আরম্ভ করল, কী ঘটছে।'

সারেঙ দম নেবার জন্য না অন্য কোন কারণে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল বুঝতে পারলুম না। আমিও কোন খোঁচা দিলুম না। বললে, 'তা সে দুঃখের কাহিনী—ঠিক ঠিক বলি কী করে সাহেব? এখনও মনে আছে, কেবিনের ঘোরঘুট্টি অন্ধকারে সে আমাকে সব-কিছু বলেছিল। এক-একটা কথা যেন সে-অন্ধকার ফুটো করে আমার কানে এসে বিঁধেছিল, আর অতি অল্প কথায়ই সে সব কিছু সেরে দিয়েছিল।'

'সাত বছরে সে প্রায় বিশ হাজার টাকা পাঠিয়েছিল দেশে তার ছোট ভাইকে। বিশ হাজার টাকা কতখানি হয়, তা আমি জানি নে, একসঙ্গে কখনও চোখে দেখি নি—'

আমি বললুম, 'আমিও জানি নে, আমিও দেখি নি।'

'তবেই বুঝুন হুজুর, সে-টাকা কামাতে হলে কটা জান কুরবানি দিতে হয়।'

'প্রথম শাঁচশো টাকা পাঠিয়ে ভাইকে লিখলে, মহাজনের টাকা শোধ দিয়ে বাড়ি ছাড়াতে। তার পরের হাজার দেড়েক বাড়ির পাশের পতিত জমি কেনার

জন্য। তারপর আরও অনেক টাকা দিঘি খোদাবার জন্য, তারপর আরও বহুত টাকা শহুরী ঢঙে পাকা চুনকাম করা দেয়াল-ওলা টাইলের চারখানা বড় ঘরের জন্য, আরও টাকা ধানের জমি, বলদ, গাই, গোয়ালঘর, মরাই, বাড়ির পিছনে মেয়েদের পুকুর, এসব করার জন্য এবং সর্বশেষে হাজার পাঁচেক টাকা টঙিঘরের উল্টোদিকে দিঘির এপারে পাকা মসজিদ বানাবার জন্য।

'সাত বছর ধরে সমীরুদ্দী মিরকিন মুলুকে, অসুরের মত খেটে দু শিফ্‌ট্‌ আড়াই শিফ্‌টে গতর খাটিয়ে জান পানি করে পয়সা কামিয়েছে, তার প্রত্যেকটি কড়ি হালালের রোজকার, আর আপন খাই-খরচার জন্য সে যা পয়সা খরচ করেছে, তা দিয়ে মিরকিন মুলুকের ভিখারীরও দিন গুজরান হয় না।

'সব পয়সা সে ঢেলে দিয়েছে বাড়ি বানাবার জন্য, জমি কেনার জন্য। মিরকিন মুলুকের মানুষ যে-রকম চাষবাসের খামার করে, আর ভদ্রলোকের মত ফ্যাশানের বাড়িতে থাকে, সে দেশে ফিরে সেই রকম করবে বলে।'

'ওদিকে ভাই প্রতি চিঠিতে লিখেছে, এটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে—করে করে যেদিন সে খবর পেল মসজিদ তৈরী শেষ হয়েছে, সেদিন রওয়ানা দিল দেশের দিকে। নুউক বন্দরে জাহাজে কাজ পায় আনাড়ী কালা আদমিও বিনা তকলিফে। তার ওপর সমীরুদ্দী হরেক রকম কারখানার কাজ করে করে কলকব্জা এমনি ভাল শিখে গিয়েছিল যে, তারই সার্টিফিকেটের জোরে, জাহাজে আরামের চাকরি করে ফিরল খিদিরপুর। সন্ধ্যের সময় জাহাজ থেকে নেমে সোজা চলে গেল শেয়ালদা। সেখানে প্লাটফর্মে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরে চাটগাঁ মেল ধরে, শ্রীমঙ্গল স্টেশনে পেঁছিল রাত তিনটেয়। সেখান থেকে হেঁটে রওয়ানা দিল ধলাইছড়ার দিকে—আট মাইল রাস্তা, ভোর হতে না-হতেই বাড়ি পেঁছে যাবে।'

'রাস্তা থেকে পোয়াটাক মাইল ধানক্ষেত, তারপর ধলাইছড়া গ্রাম। আলের উপর দিয়ে গ্রামে পেঁছিতে হয়।'

'বিহানের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে সমীরুদ্দী পেঁছিল ধানক্ষেতের মাঝখানে।'

'মসজিদের একটা উঁচু মিনার থাকার কথা ছিল—কারণ মসজিদের নকশাটা সমীরুদ্দীকে করে দিয়েছিলেন এক মিশরী ইঞ্জিনিয়ার, আর হুজুরও মিশর মুলুকে বহুকাল কাটিয়েছেন, তাদের মসজিদে মিনারের বাহার হুজুর দেখেছেন, আমাদের চেয়ে ঢের বেশী।'

'কত দূর-দরাজ থেকে সে-মিনার দেখা যায়, সে আপনি জানেন, আমিও জানি, সমীরুদ্দীও জানে।'

'মিনার না দেখতে পেয়ে সমীরুদ্দী আশ্চর্য হয়ে গেল, তারপর ক্রমে ক্রমে এগিয়ে দেখে—কোথায় দিঘি, কোথায় টাইলের টঙিঘর!'

আমি আশ্চর্য হয়ে শুধালাম, 'সে কী কথা!'

সারেঙ যেন আমার প্রশ্ন শুনতে পায় নি। আচ্ছন্নের মত বলে যেতে লাগল, 'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, সেই পুরনো ভাঙা খড়ের ঘর, আরও পুরনো হয়ে গিয়েছে। যেদিন সে বাড়ি ছেড়েছিল, সেদিন ঘরটা ছিল চারটা বাঁশের

ঠেকনায় খাড়া, আজ দেখে ছটা ঠেকনা। তবে কি ছোট ভাই বাড়ি-ঘরদোর গাঁয়ের অন্য দিকে বানিয়েছে? কই, তা হলে তো নিশ্চয়ই সে-কথা কোন-না-কোন চিঠিতে লিখত। এমন সময় দেখে গাঁয়ের বাসিত মোল্লা। মোল্লাজী আমাদের সবাইকে বড্ড প্যার করেন। সমীরুদ্দীকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।'

'প্রথমটায় তিনিও কিছু বলতে চান নি। পরে সমীরুদ্দীর চাপে পড়ে সেই ধানক্ষেতের মধ্যিখানে তাকে খবরটা দিলেন। তার ভাই সব টাকা ফুঁকে দিয়েছে। গোড়ার দিকে শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া, মৌলবীবাজারে, শেষের দিকে কলকাতায়—ঘোড়া, মেয়েমানুষ আরও কত কী।'

আমি থাকতে না পেরে বললুম, 'বল কী সারেঙ! এ-রকম ঘা মানুষ কি সইতে পারে? কিন্তু বল দিকিন, গাঁয়ের কেউ তাকে চিঠি লিখে খবরটা দিলে না কেন?'

সারেঙ বললে, 'তারাই বা জানবে কি করে, সমীরুদ্দী কেন টাকা পাঠাচ্ছে। সমীরুদ্দীর ভাই ওদের বলেছে, বড় ভাই বিদেশে লাখ টাকা কামায়, আমাকে ফুর্তি-ফার্তির জন্য তারই কিছুটা পাঠায়। সমীরুদ্দীর চিঠিও সে কাউকে দিয়ে পড়ায় নি—সমীরুদ্দী নিজে আমারই মত লিখতে পড়তে জানে না, কিন্তু হারামজাদা ভাইটাকে পাঠশালায় পাঠিয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছিল। তবু মোল্লাজী আর গাঁয়ের পাঁচজন তার টাকা ওড়াবার বহর দেখে তাকে বাড়ি-ঘরদোর বাঁধতে, জমি-খামার কিনতে উপদেশ দিয়েছিলেন। সে নাকি উত্তরে বলেছিল, বড় ভাই বিয়ে শাদি করে মিরকিন মুলুকে গেরস্থালী পেতেছে, এ দেশে আর ফিরবে না, আর যদি ফেরেই বা, সঙ্গে নিয়ে আসবে লাখ টাকা। তিন দিনের ভিতর দশখানা বাড়ি হাঁকিয়ে দেবে।'

আমি বললুম, 'উঃ! কী পাষণ্ড! তারপর?'

সারেঙ বললে, 'সমীরুদ্দী আর গাঁয়ের ভিতর ঢোকে নি। সেই ধানক্ষেত থেকে উঠে ফিরে গেল আবার শ্রীমঙ্গল স্টেশনে। সমীরুদ্দী আমাকে বলে নি কিন্তু মোল্লাজী নিশ্চয়ই তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন, কিন্তু সে ফেরে নি। শুধু বলেছিল, যেখান থেকে এসেছে, সেখানেই আবার ফিরে যাচ্ছে।

'কলকাতার গাড়ি সেই রাত আটটায়। মোল্লাজী আর গাঁয়ের মুরুব্বীরা তার ভাইকে নিয়ে এলেন স্টেশনে—টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে সে গাঁয়েই ছিল। সমীরুদ্দীর দু পা জড়িয়ে ধরে সে মাপ চেয়ে তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলে। আরও পাঁচজন বললেন, বাড়ি চল, ফের মিরকিন যাবি তো যাবি, কিন্তু এতদিন পরে দেশে এসেছিস, দুদিন জিরিয়ে যা।'

আমি বললুম, 'রাস্কেলটা কোন্ মুখ নিয়ে ভাইয়ের কাছে এল সারেঙ?'

সারেঙ বললে, 'আমিও তাই পুছি। কিন্তু জানেন সায়েব, সমীরুদ্দী কী করলে? ভাইকে লাথি মারলে না, কিছু না, শুধু বললে সে বাড়ি ফিরে যাবে না।

'তার পরদিন ভোরবেলা এই জাহাজে তার সঙ্গে দেখা। আপনাকে তো বলেছি, শা-বন্দরের বারুণীর পুতুলের মত চুপ করে বসে।'

দম নিয়ে সারেঙ বললে, 'অতি অল্প কথায় সমীরুদ্দী আমাকে সব-কিছু বলেছিল। কিন্তু হুজুর, শেষটায় সে যা আপন মনে বিড়বিড় করে বলেছিল, তার মানে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। তবে কথাগুলো আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে বলেছিল, "ভিখিরী স্বপ্নে দেখে, সে বড়লোক হয়ে গিয়েছে, তারপর ঘুম ভাঙতেই সে দেখে সে আবার দুনিয়ায়। আমি দেশে টাকা পাঠিয়ে বাড়ি ঘরদোর বানিয়ে হয়েছিলাম বড়লোক, সেই দুনিয়া যখন ভেঙে গেল তখন আমি গেলাম কোথায়?"'

বাস্তব ঘটনা না হয়ে যদি শুধু গল্প হত, তবে এইখানেই শেষ করা যেত। কিন্তু আমি যখন যা শুনেছি তাই লিখছি তখন সারেঙের বাদবাকি কাহিনী না বললে অন্যায় হবে।

সারেঙ বললে, 'চৌদ্দ বছর হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমার সর্বক্ষণ মনে হয় যেন কাল সাঁঝে সমীরুদ্দী আমার কেবিনের অন্ধকারে তার ছাতির খুন ঝরিয়েছিল।

'কিন্তু ওই যে ইনসাফ বললেন না হুজুর, তার পাত্তা দেবে কে?'

'সমীরুদ্দী মিরকিন মুলুকে ফিরে গিয়ে দশ বছরে আবার তিরিশ হাজার টাকা কামায়। এবারে আর ভাইকে টাকা পাঠায় নি। সেই ধন নিয়ে যখন দেশে ফিরছিল তখন জাহাজে মারা যায়। ত্রিসংসারে তার আর কেউ ছিল না বলে টাকাটা পেঁছিল সেই ভাইয়েরই কাছে। আবার সে টাকাটা ওড়াল।'

ইনসাফ কোথায়?

নোনামিঠা

ব্যারোমিটার দেখে, কাগজ-পত্র ঘেঁটে জানা যায়, লাল-দরিয়া এমন কিছু গরম জায়গা নয়। জেক্কাবাদ পেশওয়ার দূরে থাক্, যাঁরা, পাটনা-গয়ার গরমটা ভোগ করেছেন তাঁরা আবহাওয়া-দপ্তরে তৈরি লাল-দরিয়ার জন্ম-কুণ্ডলী দেখে বিচলিত তো হবেন-ই না, বরঞ্চ ঈষৎ মৃদু হাস্যও করবেন। আর উন্নাসিক পর্যটক হলে হয়তো প্রশ্ন করেই বসবেন, 'হালকা আল্‌স্টারটার দরকার হবে না তো!'

অথচ প্রতিবারেই আমার মনে হয়েছে, লাল-দরিয়া আমাকে যেন পার্ক সার্কাসের হোটেলে খোলা আগুনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শিক-কাবাব ঝলসাচ্ছে। ভুল বললুম; মনে হয়েছে, যেন হাঁড়িতে ফেলে, ঢাকনা লেই দিয়ে সেঁটে আমাকে 'দম-পুখতের' রান্না বা 'পুটপক' করেছে। ফুটবলীদের যে রকম 'বগি-টীম' হয়, লাল-দরিয়া আমার 'বগি-সী'।

সমস্ত দিনটা কাটাই জাহাজের বৈঠকখানায় হাঁপাতে হাঁপাতে আর বরফভর্তি গেলাসটা কপালে ঘাড়ে নাকে ঘষে ঘষে, আর রাতের তিনটে যামই কাটাই রকে অর্থাৎ ডেকে তারা গুনে গুনে। আমার বিশ্বাস ভগবান লাল-দরিয়া গড়েছেন চতুর্থ ভূতকে বাদ দিয়ে। ওর সমুদ্রে যদি কখনও হাওয়া বয় তবে নিশ্চয়ই কিম্ভূতই বলতে হবে।

তাই সে রাত্রে ব্যাপারটা আমার কিম্ভূত বলেই মনে হল।

ডেক-চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঠিক ঘুম নয়, তন্দ্রা। এমন সময় কানে এল, সেই লাল-দরিয়ায়, দেশ থেকে বহুদূরের সেই সাত সমুদ্রের এক সমুদ্রে—সিলেটের বাঙাল ভাষা। স্বপ্নই হবে। জানতুম, সে-জাহাজে আমি ছাড়া আর কোন সিলেটী ছিল না। এ-রকম মরমিয়া সুরে মাঝ রাতে, কে কাকে 'ভাই, হি কথা যদি তলচস'—বলতে যায়? খেয়ালী-পোলাও চাখতে, আকাশ-কুসুম শুঁকতে, স্বপ্নের গান শুনতে কোনও খরচা নেই; তাই ভাবলুম চোখ বন্ধ করে স্বপ্নটা আরও কিছুক্ষণ ধরে দেখি।

কিন্তু ওই তো স্বপ্নের একটিমাত্র দোষ। ঠিক যখন মনে হবে, বেশ জমে আসছে, ঠিক তখনই ঘুমটি যাবে ভেঙে। এস্থলেও সে-আইনের ব্যত্যয় হল না। চোখ খুলে দেখি, সামনে—আমার দিকে পিছন ফিরে দুজন খালাসী চাপা গলায় কথা বলছে।

বেচারীরা। রাত বারোটার পর এদের অনুমতি আছে ডেকে আসবার। তাও দল বেঁধে নয়। বাকী দিনের অসহ্য গরম তাদের কাটাতে হয় জাহাজের পেটের ভিতরে।

সিলেট-নোয়াখালির লোক যে পৃথিবীর সর্বত্রই জাহাজে খালাসীর কাজ করে সে-কথা আমার অজনা ছিল না। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল, তারা কাজ করে মাল-জাহাজেই; এ ফরাসী যাত্রী-জাহাজে রাত্রি দ্বিপ্রহরে, তাও আবার নোয়াখালি চাটগাঁয়ের নয়, একদম খাঁটি আমার আপন দেশ সিলেটের লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে তার সম্ভাবনা স্বপ্নেই বেশী, বাস্তবে কম।

এরা কথা বলছিল খুবই কম। যেটুকু শুনতে পেলুম, তার থেকে কিন্তু এ-কথাটা স্পষ্ট বোঝা গেল, এদের একজন এই প্রথম জাহাজের 'কামে' ঢুকেছে এবং দেশের ঘরবাড়ির জন্য তার মন বড্ড উতলা হয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গী পুরনো লোক; নতুন বউকে যে-রকম বাপের বাড়ির দাসী সান্ত্বনা দেয় এর কথার ধরন অনেকটা সেই রকমের।

আমি চুপ করে শুনে যাচ্ছিলুম। শেষটায় যখন দেখলুম ওরা উঠি-উঠি করছে তখন আমি কোনও প্রকারের ভূমিকা না দিয়েই হঠাৎ অতি খাঁটি সিলেটীতে জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমাদের বাড়ি সিলেটের কোন্ গ্রামে?'

সিলেটের খালাসীরা দুনিয়ায় তাবৎ দরিয়ার মাছের মত কিলবিল করে এ-সত্য সবাই জানে, কিন্তু তার চেয়ে ঢের সত্য—সিলেটের ভদ্রসন্তান পারতপক্ষে কখনও বিদেশ যায় না। তাই লাল-দরিয়ার মাঝখানে সিলেটী শুনে আমার মনে হয়েছিল, ওটা স্বপ্ন; সেইখানে সিলেটী ভদ্রসন্তান দেখে ওদের মনে হল, আজ মহাপ্রলয় (কিয়ামতের দিন) উপস্থিত। শাস্ত্রে আছে, ওই দিনই আমাদের সকলের দেখা হবে এক-ই জায়গায়; ভূত দেখলেও মানুষ অতখানি লাফ দেয় না। দুজন যেভাবে একই তালে-লয়ে লাফ দিল তা দেখে মনে হল ওরা যেন ওই কর্মটি বহুদিন ধরে মহড়া দিয়ে আসছে।

উভয় পক্ষ কথঞ্চিৎ শান্ত হওয়ার পর আমি সিগারেট-কেস খুলে ওদের

সামনে ধরলুম। দুজনেই সকসঙ্গে কানে হাত দিয়ে জিভ কাটল। আমাকে তারা চেনে না বটে—আমি দেশ ছেড়েছি ছেলেবেলায়—তবে আমার কথা তারা শুনেছে এবং আমার বাপ-ঠাকুর্দার পায়ের ধুলো তারা বিস্তর নিয়েছে, খুদাতালার বেহদ্ মেহেরবানি, আজ তারা আমার দর্শন পেল. আমার সামনে ওসব—তওবা, তওবা ইত্যাদি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার দেশের চাষারা ইয়োরোপীয় চাষার চেয়ে ঢের বেশী ভদ্র।

খালাসী-জীবনের কষ্ট এবং আর পাঁচটা সুখ-দুঃখের কথাও হল। দুঃখের কথাই পনের আনা তিন পয়সা। বাকী এক পয়সা সুখ—অর্থাৎ মাইনেটা, সেই এক পয়সাই পঁচাত্তর টাকা। ওই দিয়ে বাড়িঘর ছাড়াবে, জমি-জমা কিনবে।

শেষটায় শেষ প্রশ্ন শুধালুম, 'আহারাদি?' রাত তখন ঘনিয়ে এসেছে।

বললে, 'ওই তো আসল দুঃখ হুজুর। আমি তো তবু পুরোন লোক। পাঁউরুটি আমার গলায় গিঁট বাঁধে না। কিন্তু এই ছেলেটার জান পান্তাভাতে পোঁতা।। পান্তাভাত! ভাতেরই নেই খোঁজ, ও চায় পান্তাভাত। মুলে নেই ঘর, পুব দিয়া তিন দোর। হুঃ।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'সে কী কথা! আমি তো শুনেছি, আর কিছু না হোক তোমাদের ডাল ভাত প্রচুর খেতে দেয়। জাহাজের কাম করে কেউ তো কখনও রোগা হয়ে দেশে ফেরে নি!'

বললে, ঠিকই শুনেছেন সায়েব। কিন্তু ব্যাপার হয়েছে কী, কোনও কোনও বন্দরে চাল এখন মাগ্‌গি। সারেঙ আমাদের রুটি খাইয়ে চাল জমাচ্ছে ওই সব বন্দরে লুকিয়ে চাল বিক্রি করবে বলে। সারেঙ দেশের জাতভাই কি না, না হলে অন্ন মারার কৌশল জানবে কী করে?'

আমি বললুম, 'নালিশ ফরিয়াদ কর নি?'

বললে, 'কে বোঝে কার বুলি? এদের ভাষা কি জানি "ফ্রিঞ্চি" না কী, সারেঙই একটুখানি বলতে পারে। ইংরিজী হলেও না হয় আমাদের মুরুব্বীদের কেউ কেউ ওপরওয়ালাদের জানাতে পারতেন। ওই তো সারেঙের কল! ধন্যি জাহাজ; ব্যাটারা শুনেছি কোলা ব্যাঙ ধরে ধরে খায়। সেলাম সায়েব, আজ উঠি। দেরি হয়ে গিয়েছে। আপনার কথা শুনে জানটা—'

আমি বললুম, 'বাস বাস।'

মাঝরাতের স্বপ্ন আর শেষরাতের ঘটনা মানুষ নাকি সহজেই ভুলে যায়। আমার আবার চমৎকার স্মৃতিশক্তি—সব কথাই ভুলে যাই। তাই ভাতের কেচ্ছা মনে পড়ল, দুপুরবেলা লাঞ্চের সময় রাইস-কারি দেখে।

জাহাজটা ফরাসিস, ফরাসিসে ভর্তি। আসলে এটা ইণ্ডো-চীন থেকে ফরাসী সেপাই লস্কর লাদাই করে ফ্রান্স যাবার মুখে পণ্ডিচেরিতে একটা ঢুঁ মেরে যায়। প্যাসেঞ্জার মাত্রই পল্টনের লোক, আমরা গুটিকয়েক ভারতীয়ই উটকো মাল। খানাটেবিলে আমার পাশে বসত একটি ছোকরা সুলিয়োৎনা—অর্থাৎ সাব অলর্টান। আমার নিতান্ত নিজস্ব মৌলিক ফরাসিসে তাকে রাত্রের ঘটনাটি গল্পচ্ছলো নিবেদন করলুম।

শুনে সে তো মহা উত্তেজিত। আমি অবাক! ছুরি কাঁটা টেবিলে রেখে, মিলিটারি গলায় ঝাঁজ লাগিয়ে বলতে শুরু করলে, 'এ ভারি অন্যায়, অত্যন্ত অবিচার, ইনুই—অন-হার্ড-অব—, ফাঁতাস্তিক—ফেনটাসটিক আরও কত কী!'

আমি বললুম, 'রোস রোস। এত গরম হচ্ছ কেন? এ অবিচার তো দুনিয়ায় সর্বত্রই হচ্ছে, আকছারই হচ্ছে। এই যে তুমি ইন্দোচীন থেকে ফিরছ, সেখানে কি কোন ড্যানিয়েলগিরি করতে গিয়েছিলে, যো গার্সো (বাছা)! ওসব কথা থাক, দুটি খাও।'

ছোকরাটির সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল বলেই কথাটা বলবার সাহস হয়েছিল। বরঞ্চ ইংরেজকে এ-সব কথা বলবেন, ফরাসিকে বললে হাতাহাতি বোতলফাটাফাটির সম্ভাবনাই বেশী।

চুপ মেরে একটু ভেবে বললে, 'হুঁঃ। কিন্তু এস্থলে তো দোষী তোমরাই জাতভাই ইণ্ডিয়ান সারেঙ!'

আমি বিষম খেয়ে বললুম, 'ওই-যু-যা!'

পৃথিবীতে এমন কোন দেশ এখনও দেখলুম না যেখানে মানুষ সুযোগ পেলে দুপুরবেলা ঘুমোয় না। তবু কেন বাঙালীর ধারণা যে, সে-ই এ ধনের একমাত্র অধিকারী, এখনও বুঝে উঠতে পারি নি। আপন আপন ডেকচেয়ারে শুয়ে, চোখে ফেটা মেরে আর পাঁচটি ফরাসিসের সঙ্গে কোরাসে ওই কর্মটি সবেমাত্র সমাধান করেছি, এমন সময় উর্দি-পরা এক নৌ-অফিসার আমার সামনে এসে অতিশয় সৌজন্য সহকারে অবনত মস্তকে যেন প্রকাশ্যে আত্মচিন্তা করলেন, 'আমি কি মসিয়ো অমুকের সঙ্গে আলাপ করার আনন্দ করছি?'

আমি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে, আরও অবনত মস্তকে বললুম, 'আদপেই না। এ শ্লাঘা সম্পূর্ণ আমার-ই।'

অফিসার বললেন, 'মসিয়ো ল্য কমাদাঁ—জাহাজের কাপ্তান সাহেব—মসিয়োকে—আমাকে—তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দাভিবাদন জানিয়ে প্রার্থনা করছেন যে, তিনি যদি মসিয়োর উপস্থিতি পান তবে উল্লসিত হবেন।'

পাপাত্মা আমি। ভয়ে আঁতকে উঠলুম। আবার কী অপকর্ম করে ফেলেছি যে, মসিয়ো ল্য কমাদাঁ আমার জন্য হুলিয়া জারি করেছেন। শুকনো মুখে ঢোঁক গিলে বললুম, 'সে-ই হবে আমার এ-জীবনের সব চেয়ে বড় সম্মান। আমি আপনার পথপ্রদর্শনের জন্য ব্যাকুল।'

মসিয়ো ল্য কমাদাঁ যদিও যাত্রী-জাহাজের কাপ্তান, তবু দেখলুম তাঁর ঠোঁটের উপর ভাসছে আর-একখানি জাহাজ এবং সেটা সবপ্রকার বিনয় এবং স্তুতি-স্তোকবাক্যে টৈটম্বুর লাদাই। ভদ্রতার মানওয়ারী বললেও অত্যুক্তি হয় না। তবে মোদ্দা কথা যা বললেন, তার অর্থ আমার মত বহুভাষী পণ্ডিত ত্রিভুবনে আর হয় না, এমন কী প্যারিসেও হয় না।

এত বড় একটা মারাত্মক ভ্রমাত্মক তথ্য তিনি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন

এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করব করব করছি, এমন সময় তাঁর কথার তোড় থেকেই বেরিয়ে গেল, তিনি তিনশো তিরানব্বুই বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এই প্রথম একটি মহাপণ্ডিত আবিষ্কার করেছেন, যিনি তাঁর খালাসীদের কিচির-মিচিরের একটা অর্থ বের করতে পারেন। যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তা হলে আমার মত আরও বহু লক্ষ পণ্ডিত সিলেট জেলায় আছেন। তারপর তিনি অনুরোধ করলেন, আমি যদি দয়া করে তাঁর খালাসীদের অসন্তুষ্টির কারণটি খোলসা করে বর্ণনা করি, তবে তিনি বড় উপকৃত হন। আমি তা-ই করলুম। তখন সেই খালাসীদের আর সারেঙের ডাক পড়ল। তারা কুরবানির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে উপস্থিত হল।

কাপ্তান আর জজ ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী। সাক্ষীর বয়স কত, সেই আলোচনায় জজেরা হেসে-খেলে সাতটি দিন কাটিয়ে দেন; কাপ্তানরা দেখলুম, তিন মিনিটেই ফাঁসির হুকুম দিতে পারেন। মসিয়ো ল্য কমাদাঁ অতি শান্তকণ্ঠে এবং প্রাঞ্জল ফরাসীতে সারেঙকে বুঝিয়ে দিলেন, ভবিষ্যতে তিনি যদি আর কখনও এরকম কেলেঙ্কারির খবর পান, তবে তিনি একটিমাত্র বাক্যব্যয় না করে সারেঙকে সমুদ্রের জলে ফেলে তার উপর জাহাজের প্রপেলারটি চালিয়ে দেবেন।

যাক। বাঁচা গেল। মরবে তো সারেঙটা!

পানির পীর বদর সায়েব। তাঁর কৃপায় রক্ষা পেয়ে 'বদর বদর' বলে কেবিনে ফিরলুম।

খানিকক্ষণ পর চীনা কেবিন-বয় তার নিজস্ব ফরাসীতে বলে গেল, খালাসীরা আমাকে অনুরোধ জানিয়েছে আজ যেন আমি মেহেরবানি করে কেবিনে বসে তাদের পাঠানো 'ডাল-ভাত' খাই।

গোয়ালন্দী জাহাজের মামুলী রাইস কারি খেয়েই আপনারা আ-হা হা করেন, সেই জাহাজের বাবুর্চিরা যখন কোর্মা কালিয়া পাঠায়, তখন কী অবস্থা হয়? নাঃ, বলব না। দু-একবার ভোজনের বর্ণনা করার ফলে শহরে আমার বদনাম রটে গিয়েছে, আমি পেটুক এবং বিশ্বনিন্দুক। আমি শুধু অন্যের রন্ধনের নিন্দা করতেই জানি। আমার ভয়ঙ্কর রাগ হয়েছে। তামা-তুলসী স্পর্শ করে এই শপথ করলুম—না, থাক, আপনার আমার বাড়িতে মা-বোনদের আমি একটি লাস্ট চান্স দিলুম।

কাপ্তান সাহেব আমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে আছেন। খালাসীরা তাই এখন নির্ভয়ে খাবার নিয়ে আমার কেবিনে আসে।

এমনি করে জাহাজের শেষ রাত্রি উপস্থিত হল। সে-রাত্রের খালাসীদের তৈরী গ্যালা-ব্যানকুয়েট খেয়ে যখন বাঙ্কে এ-পাশ ও-পাশ করছি, এমন সময় খালাসীদের মুরুব্বীটি আমার পায়ের কাছটায় পাটাতনে বসে হাতজোড় করে বললে, 'হুজুর, একটি নিবেদন আছে।'

মোগলাই খানা খেয়ে তখন তবিয়ত বেজায় খুশ। মোগলাই কণ্ঠেই ফরমান জারি করলুম, 'নির্ভয়ে কও।'

বললে, 'হুজুর ইটা পরগনার ঢেউপাশা গাঁয়ের নাম শুনেছেন ?'

আমি বললুম, 'আলবত ! মনু গাঙ্গের পারে।'

বললে, 'আহা, হুজুর সব জানেন।'

মনে মনে বললুম, 'হায়, শুধু কাপ্তান আর খালাসীরাই বুঝতে পারল আমি কত বড় বিদ্যোসাগর। যারা বুঝতে পারলে আজ আমার পাওনাদারদের ভয় ঘুচে যেত তারা বুঝল না।'

বললে, 'সেই গ্রামের করীম মুহম্মদের কথাই আপনাকে বলতে এসেছি, হুজুর। করীম ব্যাটা মহাপাষণ্ড, চোদ্দ বছর ধরে মার্সই (মার্সলেস) বন্দরে পড়ে আছে। ওদিকে বুড়ী মা কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো কানা করে ফেলেছে ; কত খবর পাঠিয়েছে। হা—কিছুতেই দেশে ফিরবে না। চিঠিপত্রে কিছু হল না দেখে আমরা বন্দরে নেমে তার বাড়ি গিয়েছিলাম, তাকে বোঝাবার জন্য। ব্যাটার বউ এক রেঙখেকী, এমন তাড়া লাগালে যে আমরা পাঁচজন মন্দা মানুষ প্রাণ বাঁচিয়ে পালাবার পথ পাই নে। তবে শুনেছি, মেয়ে-মানুষটা প্রথম প্রথম নাকি তার ভাতারের দেশের লোককে আদর-কদর করত। যবে থেকে বুঝেছে, আমরা তাকে ভাঙচি দিয়ে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার তালে আছি, সেই থেকে মারমুখো খাণ্ডার হয়ে আছে।'

আমি বললুম, 'তোমরা পাঁচজন লেঠেল যে-কর্মটি করতে পারলে না, আমি সেইটে পারব ? আমাকে কি গামা পাহলওয়ান ঠাউরেছ ?'

বললে, 'না, হুজুর, আপনাকে কিছু বলবে না। আপনি সুট টাই পরে গেলে ভাববে আপনি এসেছেন অন্য কাজে। আমাদের লুঙ্গি আর চেহারা দেখেই তো বেটী টের পেয়ে যায়, আমরা তার ভাতারের জাত-ভাই। আপনি হুজুর, মেহেরবানি করে "না" বলবেন না, আপনার যে কতখানি দয়ার শরীর সে-কথা বেবাক খালাসী জানে বলেই আমাকে তারা পাঠিয়েছে। আপনার জন্যই আজ আমরা ভাত—'

আমি বললুম, 'বাস্ বাস, হয়েছে হয়েছে। কাপ্তান পাকড়ে নিয়ে শুধাল বলেই তো সব কথা বলতে হল। না হলে আমার দায় পড়েছিল।'

বললে, 'তওবা, তওবা। শুনলেও গুনা হয়। তা হুজুর, আপনি দয়া করে আর "না" বলবেন না। আমি বুড়ীর হয়ে আপনার পায়ে ধরছি।'

বলে সত্য-সত্যই আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরল। আমি 'হাঁ হাঁ, কর কী, কর কী' বলে পা দুটো ছাড়ালুম।

ওরা আমাকে যা কোর্মা-পোলাও খাইয়েছে তার বদলে এ-কাজটুকু না করে দিলে অত্যন্ত নেমকহারামি হয় , ওদিকে আবার এক ফরাসিনী দজ্জাল। ঝাঁটা কিংবা ভাঙা ছাতা নয়, পিস্তল হাতে নিয়ে তাড়া লাগানোই ওদের স্বভাব।

কোন্ মুর্খ বেরয় দেশভ্রমণে ! কত না বাহান্ন রকমের যত সব বিদ্‌কুটে, খুদার খামকা গেরো !

বন্দরে নেমে দেখি, পরদিন ভোরের আগে বার্লিন যাবার সোজা ট্রেন

নেই। ফাঁকি দিয়ে গেরোটা কাটাব তারও উপায় আর রইল না। দুজন খালাসী নেমেছিল সঙ্গে—ঢেউপাশার নাগরের বাড়ি দেখিয়ে দেবে বলে। তাদের পরনে লুঙ্গি, গায়ে রঙিন শার্ট, মাথায় খেজুর-পাতার টুপি, পায়ে বুট, আর গলায় লাল কম্ফর্টার। ওই কম্ফর্টারটি না থাকলে ওদের পোশাকী সজ্জাটি সম্পূর্ণ হয় না—বাঙালীর যে-রকম রেশমী উড়ুনি।

দুই হুজুরে আমাকে 'হুজুর' 'হুজুর' করতে করতে নিয়ে গেল বন্দরের এক সাবার্বে। সেখানে দূরের থেকে সন্তর্পণে ছোট্ট একটি ফুটফুটে বাড়ি দেখিয়ে দিয়েই তাঁরা হাওয়া হয়ে গেলেন। আমি প্রমাদ গুনতে গুনতে এগলুম। পানির পীর বদর সায়েবকে এখন আর স্মরণ করে কোনও লাভ নেই। তাই সোঁদরবনের ডাঙার বাঘের পীর গাজী সাহেবের নাম মনে মনে জপতে লাগলুম—যাচ্ছি বাঘিনীরই সঙ্গে মোলাকাত করতে।

বেশ জোরেই বোতাম টিপলুম—চোরের মায়ের বড় গলা।

কে বলে খাণ্ডার? দরজা খুলে একটি ত্রিশ-বত্রিশ বছরের অতিশয় নিরীহ-চেহারার গো-বেচারী যুবতী এসে আমার সামনে দাঁড়াল।' 'গো'-বেচারী বললুম তার কারণ আমাদের দেশটা গরুর। আসলে কিন্তু ওদের দেশের তুলনা দিয়ে বলতে হয়, 'মেরি হ্যাড এ লিট্‌ল ল্যাম্‌'-এর ভেড়াটি যেন মেরির রূপ নিয়ে এসে দাঁড়াল। ওদিকে আমি তৈরি ছিলুম পিস্তল, মেশিনগান, হ্যাণ্ড গ্রেনেডের জন্য। সামলে নিয়ে জাহাজে যে চোস্ত ফরাসিস আদব-কায়দার তালিম পেয়েছিলুম, তারই অনুকরণে মাথা নিচু করে বললুম, 'আমি কি মাদাম মা-ও মের (মুহম্মদের ফরাসী উচ্চারণ) সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ লাভ করছি?' ইচ্ছে করেই কোন্ দিশী লোক সেটা উল্লেখ করলুম না। ফরাসীরা চীনা ভারতীয় এবং আরবীদের মধ্যে তফাত করতে পারেন না। আমরা যে রকম চীনা, জাপানী এবং বর্মী সবাইকে একই রূপে দেখি।

চেহারা দেখে বুঝলুম মাদাম গুবলেট করে ফেলেছেন। বললেন, 'আঁদ্রে (প্রবেশ করুন), মসিয়ো।'

ভরসা পেয়ে বললুম, 'মসিয়ো মাওমের সঙ্গে দেখা হতে পারে কি?'

'অবশ্য!'

ড্রইংরুমে ঢুকে দেখি, শেখ করীম মুহম্মদ উত্তম ফরাসী সুট পরে টেবিলের উপর রকমারি নকশার কাপড়ের ছোট ছোট টুকরোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

আমি ফরাসীতে বললুম, 'আমি মাদ্রাজ থেকে এসেছি, কাল বার্লিন চলে যাব। ভাবলুম, আপনাদের সঙ্গে দেখা করে যাই।' সে যে ভারতীয় এবং তার ঠিকানা জানলুম কী করে সে-কথা ইচ্ছে করেই তুললুম না।

ভাঙা-ভাঙা ফরাসীতে অভ্যর্থনা জানাল।

আমি ইচ্ছে করেই মাদামের সঙ্গে কথাবার্তা জুড়ে দিলুম। মার্সেলেস যে কী সুন্দর বন্দর, কত রকম-বেরকমের রেস্তোরাঁ-হোটেল, কত জাত-বেজাতের লোক কত-শত রকমের বেশভূষা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আরও কত কী।

ইতিমধ্যে একটি ছেলে আর মেয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি করে ঘরে ঢুকেই আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

কী সুন্দর চেহারা! আমাদের করীম মুহম্মদ কিছু নটবরটি নন, তার বউও ফরাসী দেশের আর পাঁচটা মেয়ের মত, কিন্তু বাচ্চা দুটির চেহারায় কী অপূর্ব লাবণ্য! কে বলবে এরা খাঁটি স্প্যানিশ নয়? সে দেশের চিত্রকরদের অয়েল পেন্টিঙে আমি এ রকম দেবশিশুর ছবি দেখেছি। ইচ্ছে করে, কোলে নিয়ে চুমো খাই। কিন্তু আশ্চর্য লাগল, পূর্বেই বলেছি, বাপের চেহারা তো বাংলা দেশের আর পাঁচজন হাল-চাষের শেখের যা হয় তা-ই, মায়ের চেহারাও সাধারণ ফরাসিনীর মত। তিন আর তিনে তা হলে সব সময় ছয় হয় না। দশও হতে পারে—ইনিফিনিটি অর্থাৎ পরিপূর্ণতাও হতে পারে। প্রেমের ফল তা হলে অঙ্কশাস্ত্রের আইন মানে না।

মাদাম ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইনি তোদের বাবার দেশের লোক। ছেলেটি তৎক্ষণাৎ আমার কাছে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়াল। আমি আদর করতেই বলে উঠল, 'ল্যাঁদ, সে ত্যঁ প্যাই ঈ ফাঁতাস্তিক নেস্‌পা?'—অর্থাৎ ভারতবর্ষ ফেনটাসটিকে দেশ, সে দেশের অনেক ছবি সে দেখেছে, ভারি ইচ্ছে সেখানে যায়, কিন্তু বাবা রাজী হয় না—অঁক্‌ল্‌ (কাকা), আমাকে নিয়ে চল,' ওই ধরনের আরও কত কী।

আমি আবার প্রমাদ গুনলুম। কথাটা যে-দিকে মোড় নিচ্ছে তাতে না মাদাম পিস্তল বের করে।

অনুমান করতে কষ্ট হল না, আলোচনাটা মাদামের পক্ষেও অপ্রিয়। তিনি শুধালেন, 'মসিয়ের রুচি কিসে—চা, কফি, শোকোলো (কোকো), কিংবা—'

আমি বললুম, 'অনেক ধন্যবাদ।'

তবু শেষটায় কফি বানাতে উঠে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে করীম মুহম্মদ উঠে দাঁড়িয়ে সিলেটী কায়দায় পা ছুঁয়ে সেলাম করতে গেল। বুঝলুম, ওর চোখ ঠিক ধরতে পেরেছে। আমি সিলেটীতেই বললুম, 'থাক্‌ থাক্‌।'

যে ভাবে তাকাল তার থেকে বুঝতে পারলুম, সে পায়ের ধুলো নিতে যাচ্ছে না, সে পায়ের ধুলো নিচ্ছে তার দেশের মুরুব্বীদের যাঁর ভিতর রয়েছেন আমার পিতৃ-পিতামহও, সে তার মাথায় ঠেকাচ্ছে দেশের মাটির ধুলো, তার মায়ের পায়ের ধুলো। আমি তখন বারণ করবার কে? আমার কী দম্ভ! সে কি আমার পায়ের ধুলো নিচ্ছে?

শুধু একটি কথা জিজ্ঞেস করলে, 'হুজুর কোন হোটেলে উঠেছেন?' আমি নাম বললুম। স্টেশনের কাছেই।

আমি বললুম, 'বস।' সে আপত্তি জানাল না। তারপর দুজনই আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম। কারও মুখে কোনও কথা নেই।

এমন সময়ে মেয়েটি কাছে এসে দাঁড়াল। আমি তার গালে চুমো খেয়ে বললুম, 'মধু।'

বাপ হেসে বললে, 'এবারে জন্মদিনে ওকে যখন জিজ্ঞেস করলাম ও কী সওগাত চায় তখন চাইলে ইণ্ডিয়ান বর। আমাদের দেশের মেয়েরা বিয়ের কথা পাড়লেই ঘেমে ওঠে।'

তার গলায় ঈষৎ অনুযোগের আভাস পেয়ে আমি বললুম, 'মনে মনে নিশ্চয়ই পুলকিত হয়। আর আসলে তো এসব বাড়ির দেশের দশের আবহাওয়ার কথা। এরা পেটের অসুখের কথা বলতে লজ্জা পায়, আমরা তো পাই নে।'

ইতিমধ্যে কফি এল। মাদাম বললেন, 'মেয়ের নাম সারা (Sara ইংরিজিতে (Sarah), ছেলেটির নাম রোমাঁ।' বাপ বললে, 'আসলে রহমান।' বুঝলুম লোকটার বুদ্ধি আছে। 'সারা' নাম মুসলমান মেয়েদেরও হয়। আর রহমানের উচ্চারণ ফরাসীতে মোটামুটি রোমাঁই।

বেচারী মাদাম। কফির সঙ্গে দিলে দুনিয়ার যত রকমের কেক, পেসট্রি, গাতো, ব্রিয়োশ, ক্রোয়াসাঁ। বুঝলুম, পাড়ার দোকানের যাবতীয় চায়ের আনুষঙ্গিক ঝেঁটিয়ে কিনে আনিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, প্যাঁজের ফুলুরিও। মাদাম বললে, 'ম মারি—ইল লেজ এম।' আমার স্বামী এগুলো ভালবাসেন।

ছেলেটি চেঁচিয়ে বললে, 'মোয়া ওসি, মামি'—আমিও মা।

মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'মোয়া ওসি, মনোঁকল'—আমিও চাচা।

আমি আর সইতে পারলুম না। কী উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি সে-সম্বন্ধে আমি সমস্তক্ষণ সচেতন ছিলুম। রোমাঁর ভারত যাওয়ার ইচ্ছে, সারার ভারতীয় বরের কামনা এসব আমায় যথেষ্ট কাবু করে এনেছিল, কিন্তু ফ্রান্সের সেরা সেরা মিষ্টির কাছে ফুলুরির প্রশংসা—এ কোন্ দেশের রক্ত চেঁচিয়ে উঠে আমাকে একেবারে অভিভূত করে দিলে?

আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, 'আজ তবে আসি। বার্লিনের টিকিট আমার এখনও কাটা হয় নি। সেটা শেষ না করে মনে শান্তি পাচ্ছি নে।'

সবাই চেঁচামেচি করতে লাগল। ছেলেটা বললে, 'কিন্তু আপনি তো এখনও আমাদের অ্যালবাম্ দেখেন নি।' বলেই কারও তোয়াক্কা না করে অ্যালবাম্ এনে পাতার পর পাতা উল্টে যেতে লাগল। 'এই তো বাজান (বাবা+জান, সিলেটীতে বাজান), কী অদ্ভুত বেশে এদেশে নেমেছিলেন, এটার নাম লুঙ্গি, না বাজান? কিন্তু ভারি সুন্দর, আমায় একটা দেবে, অঁকল্—চাচা? বাবারটা আমার হয় না, (মাদাম বলেন, 'চুপ', ছেলেটা বললে, 'পার্দোঁ' অর্থাৎ বে-আদবি মাফ কর) এটা মা, বিয়ের আগে, ক্যাল্ এ জনি, কী সুন্দর—'

ওঃ!

গুষ্টিসুদ্ধ আমাকে ট্রাম-টার্মিনাসে পেঁছে দিতে এল। পৃথিবীর সর্বত্রই সর্বমহল্লা থেকে অন্তত একটা ট্রাম যায়—বিনা চেঞ্জে—স্টেশন অবধি। বিদেশীকে সেই ট্রামে বসিয়ে দিলেই হল। মাদাম কিন্তু তবু পই পই করে কণ্ডাক্টরকে বোঝালেন, আমাকে যেন ঠিক স্টেশনে নাবিয়ে দেওয়া হয়। 'মসিয়ো এ (ত্) এত্রাজেঁর, স্ট্রেঞ্জার, বিদেশী, (তারপর ফিস্ ফিস্ করে) ফরাসী বলতে

পারেন না—'

মনে মনে বড় আরাম বোধ করলুম। যাক, তবু একটি বুদ্ধিমতী পাওয়া গেল, যে আমার ফরাসী বিদ্যের চৌহদ্দি ধরতে পেরেছে।

মাদাম, কাচ্চাবাচ্চারা চেঁচালে, 'ও রভোয়ার।'

করীম মুহম্মদ বললে, 'সেলাম সায়েব।'

আহারাদির পর হোটেলের লাউঞ্জে বসে ওপরে ঘুমুতে যাব-যাচ্ছি, যাব-যাচ্ছি করছি, এমন সময় করীম মুহম্মদ এসে উপস্থিত। পরনে লুঙ্গি কম্ফর্টার।

ইয়োরোপের কোনও হোটেলে ঢুকে আপনি যদি লাউঞ্জে জুতো খুলতে আরম্ভ করেন, তবে ম্যানেজার পুলিস কিংবা অ্যাম্বুলেন্স্ ডাকবে। ভাববে আপনি খেপে গেছেন। এ-তত্ত্বটি নিশ্চয়ই করীমের জানা; তাই তার সাহস দেখে অবাক মানলুম। বরঞ্চ আমিই ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি তাকে বারণ করলুম। কিন্তু তারপর বিপদ, সে চেয়ারে বসতে চায় না। বুঝতে পারলুম, পরিবারের বাইরে এসে সে ঢেউপাশায় 'কেরীম্যা' হয়ে গিয়েছে। জুতো পরবে না; চেয়ারে বসবে না, কথায় কথায় কদম্বোস্—পদচুম্বন—করতে চায়।

বিরক্ত হয়ে বললুম, 'এ কী আপদ!'

লজ্জা পেয়ে বললে, 'হুজুরের বোধ হয় অস্বস্তি বোধ হচ্ছে সকলের সামনে আমার সঙ্গে কথা বলতে! তা হলে, দয়া করে আপনার কামরায়—'

আমি উষ্মা প্রকাশ করে বললুম, 'আদপেই না।' এবং এ অবস্থায় শ্রীহট্টের প্রত্যেক সুসন্তান যা বলে থাকে, সেটাও জুড়ে দিলুম, 'আমি কি এ ঘরে 'মাগনা'' বসেছি, না, এদের জমিদারির প্রজা। কিন্তু তুমি এ-রকম করছ কেন? তুমি কি আমার কেনা গোলাম না কি? চল উপরে।'

সেখানে মেঝেতে বসে একগাল হেসে বললে, 'কেনা গোলাম না তো কী? আমার চাচাতো ভাই আছমত ছিল আপনাদের বাসার চাকর। এখনও আমি মাকে যখন টাকা পাঠাই সেটা যায় আপনার সাহেবের (পিতার) নামে। আমি আপনাদের বাসায় গিয়েছি, আপনার আম্মা আমাকে চীনের বাসনে খেতে দিতেন। আমি আপনাকে চিনি হুজুর।'

আমি শুধালুম, 'বউকে ফাঁকি দিয়ে এসেছ?'

বলল, 'না হুজুর। খেতে বসে রোমার মা আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বললে। আপনাকে সে রাত্রে খেতে বলতে পারে নি তার জন্য দুঃখ করলে। ও সত্যি বললে যে, আপনাতে আমাতে বাড়িতে নিরিবিলি কথাবার্তা হবে না, তাই আপনাকে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করে নি। আসবার সময় বললে, "উনি যা বলেন তাই হবে"।'

আমি শুধালুম, 'বউ না বললে তুমি আসতে না?'

কিছুমাত্র না ভেবে বললে, 'নিশ্চয়ই আসতাম। তবে ওকে খামকা কষ্ট দিতে চাই নে বলে না-বলে আসতুম।' বলে লাজুক বাচ্চাটির মত ঘাড় ফেরালে। আমার বড় ভাল লাগল।

আমি শুধালুম,'আমি তোমাদের বাড়িতে বলতে গিয়েছিলুম তোমরা জানলে কী করে? আমি শুনেছি, তোমার বউ দেশের লোককে তাড়া লাগায়। আমাকে লাগাল না কেন?'

যেন একটু লজ্জা পেয়ে বলল, 'তা একটু-আধটু লাগায় বটে, হুজুর, ওরা যে বলে বেড়ায় আমাকে রোমার মা ভ্যাড়া বানিয়ে রেখেছে সে-খবরটা ওর কানে পেঁছেছে। তাই গেছে সে ভীষণ চটে। আসলে ও বড় শান্তপ্রকৃতির মেয়ে, ঝগড়া-কাজিয়া কারে কয় আদপেই জানে না।'

'আর মানুষকে কি কখনও ভ্যাড়া বানানো যায়? কামরূপে না, কোনখানেই না।'

-'আপনি তা হলে সব কিছু শুনে বিবেচনা করুন, হুজুর।'

'সতেরো বছর বয়সে আমি আর-পাঁচজন খালাসীর সঙ্গে নামি এই বন্দরে। কেন জানি নে, হুজুর, হঠাৎ পুলিস লাগালে তাড়া। যে যার জান নিয়ে যেদিকে পারে দিলে ছুট। আমি ছিটকে পড়লাম শহরের এক অজানা কোণে। জাহাজ আর খুঁজে পাই নে। শীতের রাতে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে শেষটায় এক পোলের নীচে শুয়ে পড়লাম জিরব বলে। যখন হুঁশ হল তখন দেখি, আমি এক হাসপাতালে শুয়ে। জ্বরে সর্বাঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে—দেশে আমার ম্যালেরিয়া হত। তারপর ক-দিন কাটল হুঁশে আর বেহুঁশে তার হিসেব আমি রাখতে পারি নি। মাঝে মাঝে আবছা আবছা দেখতে পেতাম ডাক্তাররা কী সব বলাবলি করছে। সেরে উঠে পরে শুনতে পাই ওদের কেউ কখনও ম্যালেরিয়া রোগীর কড়া জ্বর দেখে নি বলে সবাই ভড়কে গিয়েছিল। আর জ্বরের ঘোরে মাঝে মাঝে দেখতে পেতাম একটি নার্সকে। সে আমায় জল খাইয়ে রুমাল দিয়ে ঠোঁটের দু-দিক মুছে দিত। একদিন শেষরাতে কম্প দিয়ে এল আমার ভীষণ জ্বর। নার্স সব কখানা কম্বল চাপা দিয়ে যখন কম্প থামাতে পারল না তখন নিজে আমাকে জড়িয়ে ধরে পড়ে রইল। দেশে মা যেরকম জড়িয়ে ধরত ঠিক সেই রকম। তারপর আমি ফের বেহুঁশ।

'কিন্তু এর পর যখন জ্বর ছাড়ল তখন আমি ভাল হতে লাগলাম। শুয়ে শুয়ে দেশের কথা, মায়ের কথা ভাবি আর ওই নার্সটিকে দেখলেই আমার জানটা খুশিতে ভরে উঠত। সে মাঝে মাঝে আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিত আর ওদের ভাষায় প্রতিবারে একই কথা বলত। আমি না বুঝেও বুঝতাম, বলছে, ভয় নেই, সেরে উঠবে।

'তারপর একদিন ছাড়া পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম বন্দরের দিকে। সেখানে জাত-ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। অন্য এক জাহাজের—আমাদের জাহাজ তো কবে ছেড়ে দিয়েছে। সে সব কথা শুনে বললে—"ভাগো ভাগো, এখুনি ভাগো। তোমার নামে হুলিয়া জারি হয়েছে, তুমি জাহাজ ছেড়ে পালিয়েছ। ধরতে পারলেই তোমাকে পুলিস জেলে দেবে।"

'ক বছর? কে জানে? এক হতে পারে, চোদ্দও হতে পারে। আইন-কানুন হুজুর আমি তো কিছুই জানি নে।'

'কিন্তু যাই-ই বা কোথায়? যে দিকে তাকাই সে-দিকেই দেখি পুলিস। খানা-পিনার কথা তুলব না হুজুর, সে তখন মাথায় উঠে গিয়েছে। কিন্তু রাতটা কাটাই কোথায়?'

'শেষটায় শেষ অগতির গতির কথা মনে পড়ল। হাসপাতাল ছাড়ার সময় সেই নার্সটি আমার সঙ্গে শেকহ্যান্ড করে দিয়েছিল একখানা চিরকুট। তখনও জানতাম না, তাতে কী লেখা। যাকে দেখাই সে-ই হাত দিয়ে বোঝায়—আরও উত্তর দিকে যাও। শেষটায় একজন লোক আমাকে একটা বড় বাড়ির দেউড়ি দেখিয়ে চলে গেল।

'সেখানে ঘণ্টাতিনেক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রোঁদের পুলিস আমাকে সওয়াল করতে লাগাল। হাসপাতালে দু মাস ওদের বুলি শুনে শুনে যেটুকু শিখেছিলাম তার থেকে আমেজ করতে পারলাম, ওর মনে সন্দ হয়েছে, আমি কী মতলবে ওখানে দাঁড়িয়ে আছি—আর হবেই না কেন? বুঝলাম রাশিতে জেল আছেই। মনে মনে বললাম, কী আর করি, একটা আশ্রয় তো চাই। জেলই কবুল। চাচা মামু অনেকেই তো লাঠালাঠি করে গেছেন, আমি না হয় না করেই গেলাম।

'এমন সময় সেই নার্সটি এসে হাজির। পুলিসকে কী একটা সামান্য কথা বলে আমাকে হাতে ধরে নিয়ে গেল তার ছোট্ট ফ্ল্যাটে—পুলিস যেভাবে তাকে সেলাম করে রাঁটি না কেড়ে চলে গেল তার থেকে আন্দেশা করলাম, পাড়ার লোক ওকে মানে।

'আমাকে খেতে দিল গরম দুধের সঙ্গে কাঁচা আণ্ডা ফেটে নিয়ে। বেহুঁশির ওক্তে কী খেয়েছি জানি নে, হুজুর, কিন্তু হুঁশের পর দাওয়াই হিসেবেও আমি শরাব খাই নি। তাই "বরান্দি"টা বাদ দিল।'

'রাতে খেতে দিল রুটি আর মাংসের হালকা ঝোল। চারটি ভাতের জন্য আমার জান তখন কী আকুলি-বিকুলি করেছিল আপনাকে কখনও সমঝাতে পারব না, হুজুর।'

জাহাজের খালাসীদের স্মরণে আমি মনে মনে বললুম, 'সমঝাতে হবে না।' বাইরে বললুম, 'তারপর?'

একটুখানি ভেবে নিয়ে বললে, 'সব কথা বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে সায়েব। আর কী-ই বা হবে বলে? ও আমাকে খাওয়ালে পরালে আশ্রয় দিলে—বিদেশে-বিভুঁইয়ে যেখানে আমার জেলে গিয়ে পাথর ভাঙার কথা—এ সব খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে না বললে কি তার দাম কমে যাবে!'

'দাম কমবে না বলেই বলছি হুজুর, সুজন নার্সের কাম করে—'

আমি শুধালুম, 'কী নাম বললে?'

একটু লজ্জা পেয়ে বললে, 'আমি ওকে সুজন বলে ডাকি—ওদের ভাষায় সুজান।'

বুঝলুম ওটা ফরাসী Suzzanne, এবং আরও বুঝলুম, যে-জাতের লোক আমাদের দেশে মরমিয়া ভাটিয়ালী রচেছে তাদেরই একজনের পক্ষে নামের এটুকু পরিবর্তন করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কিছু কঠিন কর্ম নয়। অতখানি স্পর্শ-

কাতরতা এবং কল্পনাশক্তি ওদের আছে।

আমি শুধালুম, 'তার পর কী বলছিলে?'

বললে, 'সুজন নার্সের কাম করে আমাকে যে এক বছর পুষেছিল তখন আমি তার বাড়ির কাজ করেছি। বেচারীকে নিজের রান্না নিজেই করতে হত—হাসপাতাল থেকে গতর খাটিয়ে ফিরে আসার পর। আমি পাক-রসুই করে রাখাতাম। শেষ দিন পর্যন্ত সে আপত্তি করেছে, কিন্তু আমি কান দিই নি।'

আমি শুধালুম, 'কিন্তু তোমার পাড়ার পুলিস কিছু গোলমাল করলে না?'

একটুখানি মাথা নিচু করে বললে, 'অন্য দেশের কথা জানি না হুজুর, কিন্তু এখানে মহব্বতের ব্যাপারে এরা কোন রকম বাগড়া দিতে চায় না। আর এরা জানত যে ওর বাড়িতে ওঠার এক মাস পরে ওকে আমি বিয়ে করি।'

'কিন্তু হুজুর আমার বড় শরম বোধ হত; এ যে ঘর-জামাই হয়ে থাকার চেয়েও খারাপ। কিন্তু করিই বা কী?

'আল্লাই পথ দেখিয়ে দিলেন।

'সুজন আমাকে ছুটি-ছাটার দিনে সিনেমায়-টিনেমায় নিয়ে যেত। একদিন নিয়ে গেলে এক মস্ত বড় মেলাতে। সেখানে একটা ঘরে দেখি নানা দেশের নানা রকম তাঁত জড় করে লোকজনকে দেখানো হচ্ছে তাঁতগুলো কী করে চালানো হয়, সেগুলো থেকে কী কী নকশার কাপড় বেরয়। তারই ভিতর একটা দেখতে পেলাম, অনেকটা আমাদের দেশেরই তাঁতের মত।

'আমার বাপ ঠাকুরদা জোলার কাজ করেছে, ফসল ফলিয়েছে, দরকার হলে লাঠিও চালিয়েছে।

'অনেক ইতি উতি কিন্তু-কিন্তু করে সুজনকে জিজ্ঞেস করলাম, "তাঁতের দাম কত?" বুঝতে পারল, ওতে আমার শখ হয়েছে। ভারি খুশী হল, কারণ আমি কখনও কোন জিনিস তার কাছ থেকে চাই নি। বললে, ওটা বিক্রির নয়, কিন্তু মিস্ত্রী দিয়ে আমাকে একটা গড়িয়ে দেবে।

'ও দেশে ধুতি, শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা কিনবে কে? আমি বানালাম স্কার্ফ, কম্ফর্টার। দিশী নকশায়। প্রথম নকশায় আধখানা ফুটতে না ফুটতেই সুজনের কী আনন্দ! স্কার্ফ তাঁত থেকে নামাবার পুর্বেই সে পাড়ার লোক জড় করে বসেছে, আজগুবী এক নূতন জিনিস দেখাবে বলে। সবাই পই-পই করে দেখলে, অনেক তারিফ করলে। সুজনের ডবল আনন্দ, তার স্বামী নিষ্কর্মা ভবঘুরে নয়। একটা হুনুরী, গুণী লোক।

'গোড়ার দিকে পাড়াতে, পরে এখানে-সেখানে বিস্তর স্কার্ফ বিক্রি হল। বেশ দু পয়সা আসতে লাগল। তারপর এখানকার এক তাঁতীর কাছে দেখে এলাম কী করে রেশমের আর পশমের কাজ করতে হয়। শেষটায় সুজন নিয়ে এল আমার জন্য বহুত কেতাব, সেগুলোতে শুধু কাশ্মীরী নকশা নয়, আরও বহুত দেশের বহুত রকম-বেরকমের নকশাও আছে। তখন যা পয়সা আসতে লাগল তারপর আর সুজনের চাকরি না করলেও চলে। সেই কথা বলতে সে খুশির সঙ্গে রাজী হল। শুধু বললে, যদি কখনও দরকার হয় তবে আবার

হাসপাতালে ফিরে যেতে পারবে। রোমাঁ তখন পেটে। সুজন সংসার সাজাবার জন্য তৈরী।

'আপনি হয়তো ভাবছেন আমি কেন বুড়ীর কথা পাড়ছি নে। বলছি, হুজুর, রাতও অনেক ঘনিয়ে এসেছে, আপনি আরাম করবেন।

'আপনি বিশ্বাস করবেন না, দু পসসা হতে সুজন বললে, "তোমার মাকে কিছু পাঠাবে না?" আমি আগের থেকেই বন্দরে ইমানদার লোক খুঁজছিলাম। রোমাঁর মা-ই বললে, ব্যাঙ্ক দিয়েও নাকি দেশে টাকা পাঠানো যায়।

'মাসে মাসে বুড়ীকে টাকা পাঠাই। কখনও পঞ্চাশ কখনও একশো। ঢেউ-পাশাতে পঞ্চাশ টাকা অনেক টাকা। শুনি বুড়ী টাকা দিয়ে গাঁয়ের জন্য জুম্মা-ঘর বানিয়ে দিয়েছে। খেতে-পরতে তো পারছেই।

'টাকা দিয়ে অনেক কিছুই হয়, দেশে বলে, টাকার নাম জয়রাম, টাকা হইলে সকল কাম—কিন্তু হুজুর, টাকা দিয়ে চোখের পানি বন্ধ করা যায় না। একথা আমি খুব ভাল করেই জানি। বুড়ীও বলে পাঠিয়েছে, টাকার তার দরকার নেই, আমি যেন দেশে ফিরে যাই।

'আমার মাথার বাজ পড়ল, সায়েব; যেদিন খবর নিয়ে শুনলাম, দেশে ফিরে যাওয়া মোটেই কঠিন নয়, কিন্তু ফিরে আসা অসম্ভব। আমি এখন আমার মহল্লার মুরুব্বীদের একজন। থানার পুলিসের সঙ্গেও আমার বহুত ভাব-সাব হয়েছে। আমার বাড়িতে প্রায়ই তারা দাওয়াত-ফাওয়াত খায়। তারা প্যারিস থেকে পাকা খবর আনিয়েছে, ফিরে আসা অসম্ভব। মুসাফির হয়ে কিংবা খালাসী সেজে পালিয়ে এলেও প্যারিসের পুলিস এসে ধরে নিয়ে দেশে চালান দেবে। এমন কি, তারা আমাকে বারণ করেছে আমি যেন ওই নিয়ে বেশী নাড়া চাড়া না করি। প্যারিসের পুলিস যদি জেনে যায় আমি বিনা পাসপোর্টে এ দেশে আছি তা হলে তারা আমাকে মহল্লার পুলিসের কদর দেখাবে না। এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে। আপনি কী বলেন, হুজুর?'

তাহা মিথ্যে বলি কী প্রকারে? আমার বিলক্ষণ জানা ছিল, ফ্রান্স চায় টুরিস্ট্ সে দেশে এসে আপন গাঁটের পয়সা খরচ করুক, কিন্তু তার বেকারীর বাজারে কেউ এসে পয়সা কামাক এ-অবস্থাটা সে যে করেই হোক রুখবে।

আমি চুপ করে রইলুম দেখে করীম মুহম্মদ মাথা নীচু করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

অনেকক্ষণ পর মাথা তুলে বললে, 'রোমাঁর মা আমার মনের সব কথা জানে। দেশের লোক ভাঙচি দেয়, আমি ভেড়া বনে গিয়েছি এ-কথা বলে—এ-সব শুনে সে তাদের পছন্দ করে না, কিন্তু মাঝে মাঝে ভোরের ঘুম ভেঙে গেলে দেখি সেও জেগে আছে। তখন আমার কপালে হাত দিয়ে বলে, "তোমার দেশে যদি যেতে ইচ্ছে করে, তবে যাও। আমি একাই বাচ্চা দুটোকে সামলাতে পারব।" এ-সব আরম্ভ হল, ও নিজে মা হওয়ার পরের থেকে।

'আজ আপনার কথা তুলে বললে, "এ ভদ্রলোকের শরীরে দয়ামায়া আছে। আমার ছেলেমেয়েকে কত আদর করলেন।" আমি বললাম, "সুজন, তুই

জানিস নে, আমাদের দেশের ভদ্রলোক আমাদের কত আপনজন। এই যে ভদ্রলোক এলেন, এঁর সায়েব (পিতা) আমার বাবাকে "পাতী" (ছেলে) বলে ডাকতেন। এ দেশের ভদ্রলোক তো গরিবের সঙ্গে কথা কয় না।" আপনি-ই বলুন, হুজুর।'

তার 'আপনজন'। ওইটুকুই বাকী ছিল।

'সুজনই আজ বললে, "ওঁর কাছে গিয়ে তুমি হুকুম নাও। উনি যা বলেন তাই হবে।" এইবার আপনি হুকুম দিন, হুজুর।'

আমি হাত জোড় করে বললুম, 'তুমি আমায় মাপ কর।'

সে আমার পায়ে ধরে বললে, 'আপনার বাপ-দাদা আমার বাপ-দাদাকে বিপদে-আপদে সলা দিয়ে হুকুম করে বাঁচিয়েছেন, আজ আপনি আমায় হুকুম দিন।'

আমি নির্লজ্জের মত পূর্ব-ঐতিহ্য অস্বীকার করে বললুম, 'তুমি আমায় মাপ কর।'

অনেক কান্নাকাটি করল। আমি নীরব।

শেষ রাত্রে আমার পায়ে চুমো খেল, আমি বাধা দিলুম না। বিদায় নিয়ে বেরবার সময় দোরের গোড়ায় তার বুক থেকে বেরল, 'ইয়া আল্লা!'

মণি

'কাব্যের উপেক্ষিতা'য় ভারতের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের কবিগুরু বাল্মীকির বিরুদ্ধে অনুযোগ করেছেন, তিনি তাঁর কাব্যে ঊর্মিলার প্রতি অবিচার করেছেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলেছেন, রসসৃষ্টিতে তাবৎ-নায়িকাকে সমান সম্মান, সমান অধিকার দেওয়া সম্ভবপর নয়।

তবু তো ঊর্মিলার উল্লেখ রামায়ণে আছে। কিন্তু রামচন্দ্র আর সীতাদেবীর কি আরও বহু অনুচর সখা বান্ধবী পরিচারিকা ছিলেন না, যাঁদের উল্লেখ আদিকবি আদপেই করেন নি? তাঁদের জীবনে সুখ-দুঃখ উৎসব-ব্যসন বিরহ-বেদনা মিলনানন্দ সব-কিছুই ছিল। এতৎসত্ত্বেও আদিকবি তাঁদের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি। তিনি তো কিছু নিছক কাল্পনিক চরিত্রসৃষ্টি করেন নি, নির্ভেজাল রূপকথাতে যে-রকম হয়। তিনি তো লিখেছিলেন ইতিহাস, অবশ্য রসের গামলায় চুবিয়ে নিয়ে, বাটিক প্রক্রিয়ায়। হলই বা। তাই বলে কি শেষমেশ ওইসব অভাগাদের জ্যান্ত পোঁতা হল না?

জানি নে, আদিকবিকে এ-ফরিয়াদ জানালে তিনি কী উত্তর দিতেন। যে চন্দ্রবৈদ্য শ্রীরামচন্দ্রের নখ-চুল কেটে দিত, যে শুক্রবৈদ্য মা-জননী জনকতনয়ার দুকূল-কাঁচুলি কেচে দিত তারা যদি কবিসমীপে নিবেদন করত, তাদেরই বা তিনি ভুলে গেলেন কেন? ঊর্মিলার মত নিদেন তাদের নামোল্লেখ করলেই তো তারা অজরামর হয়ে যেত, তবে তিনি কী উত্তর দিতেন?

অত দূরে যাই কেন? কবিগুরু শ্রীরবীন্দ্রনাথকে যদি জিজ্ঞেস করা হত,

বিনয় এবং ললিতার মত দুটি অত্যুত্তর চরিত্রসৃষ্টি করার পর—হায়, বাংলায় সচ্চরিত্র কী দুর্লভ—তিনি সে-দুজনকে পথমধ্যে গুমখুন করলেন কেন, তা হলে তিনি কী উত্তর দিতেন ?

আমি বাল্মীকি নই, রবীন্দ্রনাথও নই। এমন কি আমার আপন গ্রামের প্রধান লেখক নই। আমার গ্রামের শুকুরুল্লা এবং পাগলা মাধাই যে-সব ভাটিয়ালি রচে গিয়েছে, আমার রচনা তাদের সামনে লজ্জায় ঘোমটা টানে। মাধাইয়ের একটি ভাটিয়ালির ভুলে-যাওয়া অন্তরা আমি তিরিশ বছর ধরে চেষ্টা করেও পূরণ করতে পারি নি। মাধাই আমি একই পাঠশালাতে একই শ্রেণীতে পড়েছি। মাধাই ফি বছর ফেল মারত, আমি ফার্স্ট হতুম।

তাই, বিশেষ করে তাই, আমি মোক্ষম মনঃস্থির করেছি, আমি আমার সৃজনে যাদের প্রতি অনিচ্ছায় অবজ্ঞা প্রকাশ করেছি, তাদের প্রত্যেককে জ্যান্তগোর থেকে খুঁড়ে তুলে প্রাণবন্ত করব। অর্থাৎ অর্ধমৃত করব। কারণ, আমি শক্তিমান লেখক নই। অদ্যাবধি বর্ণিত আমার তাবৎ চরিত্রই জীবন্মৃত। অতএব এঁরাও অমৃত না হয়ে আমৃত হবেন। কিন্তু আমি তো নিষ্কৃতি পাব আমার জন্মপাপ থেকে।

আমি কাবুলে ছিলাম, তখন সেখানকার ব্রিটিশ লিগেশনের সঙ্গে আমার কণামাত্র হৃদ্যতা হয় নি। 'দেশে-বিদেশে' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা সে-কথা হয়তো স্মরণ করতে পারবেন। তবে লিগেশনের একজন প্রধান কর্মচারীর সঙ্গে আমার অত্যন্ত হার্দিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইনি পেশাওয়ারের খানদানী বাসিন্দা। অতিশয় খাস পাঠান। এঁর চতুর্দশ পুরুষের কেউ কখনও আপন গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে-শাদি করেন নি। পেশাওয়ারের পুলিস ইন্‌স্‌পেক্‌টর আহমদ আলীর অগ্রজ। নাম শেখ মহবুব আলী। ব্রিটিশ লিগেশনে তিনি ছিলেন ওরিয়েণ্টাল সেক্রেটারি।

এঁর মত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ কূটনৈতিক আমি অষ্টকুলাচল সপ্তসমুদ্র পরিক্রমা করেও দেখতে পাই নি। আমার বিশ্বাস পাঠান-প্রকৃতি ধরে। কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু এইসব সরল পাঠানদের যাঁরা সর্দার হন, যেমন মনে করুন ইপ্পাইয়ের ফকীর, ইংরেজীতে বলে ফকির অব ইপি (Ipi), তাঁদের মত ধুরন্ধর ইহসংসারে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। শেখ মহবুব আলীই বলতেন, 'পাঠানরা হয় গাড়ল, নয় ঘড়েল। মাঝখানে কিছু নেই। পিগমিজ অ্যাণ্ড জাইণ্টস, নো নর্মেলস্।' অধ্যাপক বগদানফ এবং বেনওয়ার সঙ্গে তাঁর প্রচুর হৃদ্যতা ছিল। বগদানফ গত হয়েছেন। বেনওয়া আছেন, সৃষ্টিকর্তা তাঁকে শতায়ু দিন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই মহবুব আলীর বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে সত্যাসত্য জানতে পারবেন।

মহবুব আলী বিলক্ষণ জানতেন, লিগেশনের ইংরেজ কর্তাদের সঙ্গে আমার অহি-নকুল সম্পর্ক। ওদিকে তিনি যদিও ইংরেজের সেবা করতেন, তবু ভিতরে ভিতরে ওদের তিনি দিল-জান্ দিয়ে করতেন ঘেন্না, 'ঘৃণা' নয়—ঘেন্না। এটা অবশ্য আমার নিছক অনুমান। মহবুব আলীর মত ঝাণ্ডু চাণক্য বাক্য বা আচরণে সেটা প্রকাশ করবেন, সে-চিন্তাও বরাহভক্ষণসম মহাপাপ ! বোধ হয়

প্রধানত এই কারণেই তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তদুপরি আমি আহমদ আলীর বন্ধু। এবং সর্বশেষ সত্য, আমি বহু-দূরদেশাগত রোগাপটকা, নির্বান্ধব, দুনিয়াদারি-বাবদে-বেকুব বাঙালী। এমত অবস্থায় আপনি ভগবানের শরণ না নিয়ে পাঠানের শরণ নিয়েই বিবেচকের কর্ম করবেন। তবে এ-কথাও বলব, আমি তাঁর শরণ নিই নি। তিনিই আমাকে অনুজরূপে তাঁর হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন।

সে-কথা থাক্। আমি আজ তাঁর জীবনী লিখতে বসি নি। আমি লিখতে বসেছি তাঁর স্ত্রীর পরিচারিকা সম্বন্ধে। উল্লিসিত পাঠক বিরক্ত হয়ে আমার বাকী লেখাটুকু পড়বেন না, সে-কথা আমি জানি; কিন্তু তার চেয়েও মোক্ষম জানি, আমি যে গুণীজনের মজলিসে দৈবেসৈবে মুখ খোলার অনুমতি পাই, তাঁদের পৌনে ষোল আনা সহৃদয় সদাশয় জন। তাঁদের অকৃপণ হৃদয় জন্মদাসী রাজরানী সবাইকে আসন দিতে জানে।

আমার সঙ্গে মহবুব অলীর হৃদ্যতা হওয়ার কয়েকদিন পর আমার ভৃত্য এবং সখা আবদুর রহমান আমাকে যা জানালে তার সারাংশ এই ঃ

মহবুব আলীর পরিবার এবং অন্য এক পরিবারের দুশমনী-লড়াই ক্ষান্ত দেবার জন্য একদা স্থিরীকৃত হয়, দুই পরিবার যেন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মহবুব আলী এ পরিবারের বড় ছেলে। তাই তাঁকেই বিয়ে করতে হল অন্য পরিবারের বড় মেয়েকে। নবদম্পতি গোড়ার দিকে সুখেই ছিলেন। ইতিমধ্যে বলা নেই—কওয়া নেই, হঠাৎ মহবুব আলীর এক অতি দূর চাচাতো ভাই তাঁর শ্বশুর-পরিবারের ততোধিক দূর এক মামাতো ভাইকে খুন করে। ফলে মহবুব আলীর স্ত্রী পিতৃগণের আদেশানুযায়ী স্বামীগৃহ বর্জন করে পিত্রালয়ে চলে যান।

আবদুর রহমানের কাহিনী অনুযায়ী এ-ঘটনা ঘটেছিল বছর দশেক পূর্বে। বলতে গেলে এই অবধি মহবুব আলী অকৃতদার। অধুনা অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। তিনি শীঘ্রই হিন্দুস্থান থেকে বিয়ে করে অন্য বিবি নিয়ে আসছেন।

সুহৃদ সম্বন্ধে তার অপরোক্ষ আলোচনা করা অসঙ্গত, তা সে ভৃত্যের সঙ্গেই হক আর পিতৃব্যের সঙ্গেই হক—এই আমার বিশ্বাস। কিন্তু আবদুর রহমান যখন একবার কথা বলতে আরম্ভ করে তখন তাকে ঠেকানো অসাধ্য ব্যাপার।

শেষটায় আমি বিরক্ত হয়ে বলেছিলুম, 'তোমারই বা এসব বলার কী দরকার? আমারই বা জেনে কী হবে? তিনি তো আমাকে এসব কিছু বলেন নি?'

আবদুর রহমান বললে, 'তিনি কেন বলেন নি সে-কথা আমি কী করে জানব? (পরে মহবুব আলীর কাছে শুনেছিলাম, দুঃখের কথা নাকি বন্ধু বন্ধুকে বলে না) তবে আপনার তো জানা উচিত।' আলোচনা এখানেই সমাপ্ত হয়।

তবে রাত্রে আমার গায়ে লেপকম্বল জড়িয়ে দেবার সময় আবদুর রহমান বলেছিল, 'শেখ মহবুব আলী খান বড় ভালো লোক।'

আবদুর রহমান সার্টিফিকেট দেবার সময় রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করে

না। এ-কথা বলে রাখা ভাল।

* * * *

শেখ মহবুব আলীর বাসাতে আমি সময় পেলেই যেতুম। তাঁর বাসাটি লিগেশনের প্রত্যন্ত-প্রদেশে অবস্থিত ছিল বলে ইংরেজের ছায়া না মাড়িয়ে সেখানে পেঁছানো যেত। তিনি দফতরে থাকলে তাঁর ছেলেবেলাকার বন্ধু এবং চাকর গফুর খান তাঁকে খবর দিতে যেত। আমি ততক্ষণে ড্রইং-রুমে বসে আগুন পোয়াতুম আর বাবুর্চিকে সবিস্তর বয়ান দিতুম কোন্ কোন্ বস্তু খাওয়া আমার বাসনা।

শেখ গফুর ফিরে এসেই আমার পায়ের কাছে বসে ভাঙা ভাঙা উর্দু ফার্সী পাঞ্জাবী পশতুতে মিশিয়ে গল্প জুড়ে দিত। পাঠানদের ভিতর জাতিভেদ নেই। শেখ গফুর আর মহবুব আলী খান প্রভু-ভৃত্য হলেও তাদের সম্পর্ক ছিল সখ্যের। তাই গফুর আমার সঙ্গে গল্প করাটা তার কর্তব্য বলে মনে করত; আমি 'ভদ্রসন্তান', আর সঙ্গে গল্প করে যে তাকে 'আপ্যায়িত' করছি, সে-কথা তাকে বললে সে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হত। আবদুর রহমান এবং গফুরে যে সৌহার্দ্য ছিল, সে-কথা বলা বাহুল্য।

সচরাচর মহবুব আলীর ড্রইং-রুম খোলাই থাকত।

আবদুর রহমান রচিত মহবুব আলীর 'পারিবারিক প্রবন্ধ' শোনার কয়েকদিন পর তাঁর বাড়িতে গিয়ে ড্রইং-রুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে দেখি, সেটা ভিতর থেকে বন্ধ। দরজার হ্যাণ্ডেলের কাছে তখন দেখি বিজলির বোতাম, কলিং বেল। একটুখানি আশ্চর্য হয়ে ভাবনু, মহবুব আলী আবার কবে থেকে পর্দানশিন হলেন, তাঁর গৃহে মাতা নেই, অপ্রিয়বাদিনী ভার্যা পর্যন্ত নেই, তাঁর গৃহ তো অরণ্যসম। অরণ্যকে ছিটকিনি দিয়ে বন্ধ করার কা কস্য প্রয়োজন? দিলুম বোতাম টিপে, সঙ্গে সঙ্গে ডাকলুম, 'ভাই গফুর!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেল। ভেবেছিলুম দেখব গাট্টাগোট্টা গাল-কম্বল দাড়ি সম্বলিত বেঁটে কেলে গফুর মহম্মদ খান। দেখি,—হকচকিয়ে গেলুম,—দেখি, দীর্ঘ এবং তন্বঙ্গী একটি মেয়ে। পরনে-লম্বা শিলওয়ার আর হাঁটু পর্যন্ত নেবে-আসা কুর্তা। ওড়না দিয়ে মাথার অর্ধেক অবধি ঘোমটা।

শ্যামা। এবং সে অতি মধুর শ্যামবর্ণ। পেশওয়ার কাবুলে মানুষের রঙ হয় ফরসা, কিংবা রোদে-পোড়া বাদামী। এ-মেয়ের রঙ সেই শ্যাম, যেটি পর্দানশিন বাঙালী মেয়ের হয়। তার কী তুলনা আছে?

বলতে সময় লাগল। কিন্তু প্রথম দিন তাকে দেখেছিলুম এক লহমার তরে। আমি তাকে ভাল করে দেখবার পূর্বেই সে দিয়েছিল ভিতরপানে ছুট। তখন লক্ষ্য করেছিলুম, সেও আধ লহমার তরে, গরুগামিনী রমণীর যে যে স্থলে বিধাতা সৌন্দর্য পুঞ্জীভূত করে দেন, তন্বঙ্গীর ক্ষীণ দেহে তার কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নি; বরঞ্চ বলব, তিনি অজন্তার চিত্রকরের মত একটু যেন বাড়াবাড়ি করেছেন। অথচ বয়স পনের-ষোল হয় কি না-হয়। তবে কি বিধাতা মানুষের

আঁকা ছবি দেখে তাঁর সৃষ্টির সৌন্দর্য বাড়ান ?

তা সে যাক গে। তখন কি আর অত করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলুম, না, ওই বিষয়ে চিন্তাই করেছিলুম !

আমি আগুনের কাছে গিয়ে বসলুম। খানিকক্ষণ পরে মহবুব আলী এলেন। পাশে বসে ডাক দিলেন, 'ম-অ-অ-ণি—'

মণি দোরের আড়লে দাঁড়ালে দুজনাতে পশতু ভাষায় কাথাবার্তা হল। আমি তার এক বর্ণও বুঝতে পারলুম না। মহবুব আলী আমাকে বললেন, 'মোটা রান্না এখনও বাবুর্চিই করে কিন্তু মণির হাতে তৈরী নাশতা না হলে আমার বিবির চলে না। মণি বললে, আপনি কী খেতে ভালবাসেন সে ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছে এবং তৈরী করছে। ভালই হল। ও বড় তেজী মেয়ে। যাকে অপছন্দ করে তার রুটিতে হয়তো সেঁকো বিষ দেবে।'

দাবা খেলতে বসলুম এবং যথারীতি হারলুম। খেলার মাঝখানে মণি এসে অন্য টেবিলে নাশতা সাজালে।

সময় নিয়েছে বটে কিন্তু রেঁধেছে ভাল। মমলেটের রঙটি সর্বাঙ্গে সোনালী হলদে। এখানে বাদামী, সেখানে হলদে, ওখানে সাদা নয়। তে-কোণা পরোটাও তৈরি করেছে যেন টিস্কয়ার সেটস্কয়ার দিয়ে। ভিতরে ভাঁজে ভাঁজে কোন জায়গায় কাঁচাও নয়।

খাওয়া শেষ হলে আমি বললুম, 'আধ ঘণ্টাটাক বসে যাই। সেঁকো বিষ দিয়েছে কি না তার ফলাফল দেখে যাই।' মণি দাঁড়িয়ে ছিল। সে মহবুব আলীর মুখের দিকে তাকাল। তিনি পশতুতে অনুবাদ করলেন। মণি 'যাঃ' কিংবা ওই ধরনের কিছু একটা বলে চলে গেল।

ভবিষ্যৎ দেখতে পেলে তখন ওই কাঁচা রসিকতাটুকুও করতাম না।

ইতিমধ্যে মহবুব আলী আমার বাড়িতে একবার এসেছিলেন বলে আমি তাঁর বাড়ি গেলুম দিন পনের পরে। এবারে বাইরের বোতামে চাপ দেওয়া মাত্রেই হুট করে দরজা খুলে গেল।

মণি আমাকে দেখে নিঃসঙ্কোচে পশতু ভাষায় কিচির-মিচির করে উঠল। কিছুতেই থামতে চায় না। আমি একবার সামান্য সুযোগ পেয়ে বললুম, 'পশতু', তারপর বাঁ হাত উপরের দিকে তুলে ভরতনাট্যম কায়দায় পদ্মফুল ফোটাবার মুদ্রা দেখিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, 'ডডনং'। অর্থাৎ আমি পশতু বুঝিনে। কিন্তু কে বা শোনে কার কথা ! ভরতনাট্যমে আমি যদি হই খুচরো কারবারী, মণির বেসাতি দেখলুম পাইকিরী লাটের। ডান হাত দিয়ে এক অদৃশ্য ঝাঁটা নিয়ে আকাশের বেশ খানিকটা ঝাঁট দেবার মুদ্রা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে, 'কুছ পরওয়া নহী।' কিন্তু শুধু মুদ্রা দিয়ে তো আর বেশীক্ষণ কথাবার্তা চালানো যায় না। তা হলে মানুষ ভাষার সৃষ্টি না করে শুধু নেচে কুদে ও মুদ্রা দেখিয়েই শঙ্করদর্শনের আলোচনা চালাত, একে অন্যকে এটম বম্ বানাবার কৌশল শেখাত।

ইতিমধ্যে গফুর এসে আমার পায়ের কাছে কার্পেটের উপর বসে জানালে

মহবুব আলী শহরে গেছেন, ফিরতে দেরি হবে। তবে পই পই করে বলে গিয়েছেন, আমাকে যেন আটকে রাখা হয়। মণি ততক্ষণে রান্নাঘরে চলে গিয়েছে।

গফুর তার মনিবের সঙ্গে যে-রকম খোলা-দিলে গল্প জমায়, আমার সামনে সেই ভাবেই উজির-নাজির কতল করতে আরম্ভ করল। আশকথা-পাশকথা বলে সে শুধালে, 'মণিকে আপনার কী রকম লাগে?'

আল্লা জানেন, মৌলা আলীর দোহাই, আমি স্নব নই। দাসী পরিচারিকা সম্বন্ধে আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচনা করতে আমার কণামাত্র আপত্তি নেই। আমার সেবক আবদুর রহমানের সঙ্গে আমার যে-ভাবের আদান-প্রদান রস-রসিকতা চলত, সে-রকম ধারা আমি বহু 'শিক্ষিত' 'খানদান' লোকের সঙ্গে করতে রাজী নই। কিন্তু এখানে তো ব্যাপারটা অতখানি সরল নয়। তাই একটু বিরক্তির সুরে বললুম, 'আমার লাগা না-লাগার কী আছে?'

গফুর আমার উত্তর শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে সামলে নিয়ে বললে, 'এ আপনি কী বলছেন! আপনি শেখ মহবুব আলীর দোস্ত। তাঁর ইষ্টকুটুম, গোষ্ঠীপরিবারের পাঠান-পখতুনের চেয়ে আপনাকে উনি ঢের ঢের বেশী ভালবাসেন। আর আপনি যেভাবে কথা বললেন, তাতে মনে হল ওঁর পরিবারের জন্য আপনার যেন কোন দরদ নেই। আজ যদি মণির বিয়ের সম্বন্ধ আসে তবে কি মহবুব আলী আপনার সঙ্গে ওই বাবদে সলা পরামর্শ না নিয়ে থাকতে পারবেন?'

আমি শুধালুম, 'এসেছে নাকি?' সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বললুম, থুড়ি, ভুল করলুম, এতখানি ঔৎসুক্য দেখানো উচিত হয় নি। 'শাদির পয়লা রাতে বেরাল মারবে', এ যে দুসরা রাত খতম হবার উপক্রম!

আমার ভাবান্তর লক্ষ্য না করেই গফুর সোৎসাহে বললে, 'গণ্ডায় গণ্ডায়। সুবে পেশওয়ার-কোহট, বন্নু দেরা-ইসমাইল খান, ইস্তেক জম্মু-জলন্ধর অবধি। লিগেশনের সব কটা পাঠান চাপরাসী-দফতরী, কেরানী খাজাঞ্চী মণিকে শাদি করতে চায়।'

আমি জানতুম, পাঠানদের আপন গোষ্ঠীর ভিতর জাতবিচার নেই। কিন্তু সেটা ছিল থিয়োরেটিকল জানা, এখন দেখলুম সেটা কীরকম মারাত্মক প্র্যাকটিকল। লিগেশনের খাজাঞ্চী মেলের লোকও পরিচারিকা মণিকে বিয়ে করতে চায়!

ইতিমধ্যে মণি দু-তিনবার ঘরে এসে অগ্নিবাণ হেনে গফুরের দিকে তাকিয়েছে। ভাষা না জেনেই বুঝতে পেরেছে, ওর সম্বন্ধেই কথাবার্তা হয়েছে। আমি গতিক সুবিধের নয় দেখে বললুম 'থাক্ থাক্।'

মণি আমার জন্য এক অজানা পেশাওয়ারী কাবাব বানিয়েছে। ভারি মোলায়েম। দেখে মনে হয় কাঁচা, কিন্তু হাত দিয়ে মুখের কাছে তুলতে না তুলতেই ঝর ঝর করে ঝরে পড়ে। আমি আগের থেকেই হাঁ করে ছিলুম; মুখে কিছু পৌঁছল না দেখে মণি খিলখিল করে হেসে উঠল। ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে

ভিতরের দরজা দিয়ে অন্তর্ধান করল।

মহবুব আলী এলেন। দাবার ফাঁকে বললেন, 'মণিকে নিয়ে বড় বিপদে পড়েছি।'

আমি বললুম, 'কিস্তি সামলান। ঘোড়া উঠে, নৌকা ঘোড়ার ডবল কিস্তি।'

মহবুব আলী বললেন, 'মণিকে নিয়ে বড় বিপদে পড়েছি।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, আমিও বিপদে পড়েছি। আবদুর রহমান বলছিল, এখন থেকে সবাইকে রাস্তায় দেরেশী পরে বেরুতে হবে। দর্জির দোকানে ভিড় লেগেছে। কী করি, বলুন তো?'

ততক্ষণে খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি যথারীতি হেরে গিয়েছি।

পূর্বেই বলেছি, মহবুব আলী চাণক্যস্য চাণক্য। তাই এটাও জানেন, কখন সাফসফা খোলাখুলি কথা কইতে হয়। বললেন, 'মণিকে বিয়ে করার জন্য সব কটা পাঠান আমার দোরে ধন্না দিচ্ছে। ওদিকে মণি বলে, সে কাউকে বিয়ে করতে চায় না। কেন? আমার বিবি বললেন, সে নাকি—'

আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললুম, 'বাস্, বাস্।'

মহবুব আলী আমার উষ্মার জন্য তৈরী ছিলেন। আমার দুখানা হাত ধরে বললেন, 'দোস্ত, আমি জানি, এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আপনি সৈয়দ-বংশের ছেলে। আপনারা পাঠান-মোগলে বিয়ে শাদি করেন না। যদিও-কুরান হদিসের রায়, যে-কোনও মুসলমান যে-কোনও মুসলমানীকে বিয়ে করতে পারে। হক কথা। কিন্তু লোকাচার দেশাচারও আছে। সেগুলো মানতে হয়। আজ যদি আপনি আমার বোন কিংবা শালীকে বিয়ে করে দেশে ফেরেন তবে আমি কোনও রকম দুশ্চিন্তা করব না। কিন্তু মণিকে বোঝাই কী করে, আপনার সঙ্গে তার বিয়ে সম্পূর্ণ অসম্ভব। সে ছেবেলা থেকে দেখেছে যে-কোনও মেয়ের সঙ্গে যে-কোনও ছেলের বিয়ে হয়। তা যে শুধু পাঠানদের ভিতরেই, সে কী করে জানবে বলুন? বাইরের সংসারে যে অন্য ব্যবস্থা, কী করে বুঝবে বলুন?'

আমি আরও বিরক্ত হয়ে বললুম, 'আঃ! কী এক স্টর্ম-ইন-এ টি-পট! তিলকে তাল! আপনার বাড়ির মেয়ে কাকে বিয়ে করতে চায়, না-করতে চায়, তাতে আমার কী?'

মহবুব শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনার তাতে কী?'

আবদুর রহমানের উপদেশ স্মরণ এল। বললুম, 'না, না, আপনি আমাকে এতখানি হৃদয়হীন মনে করবেন না। কিন্তু ভেবে দেখুন, আমাকে যেখানে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে এবং যেস্থলে আমার হাতে কোনও সমাধান নেই, সেখানে আমি উপদেশেই বা দিই কী প্রকারে?'

* * *

কাবুলে এপিডেমিক সর্দিকাসি দেখা দিল। ঝাড়া দশ দিন ঘরে বন্ধ থাকতে হল। সেরে উঠে শুনি, মহবুব আলী আমার চেয়েও বে-এক্তেয়ার। ভেবেছিলুম

কিছুদিন ও-পাড়া মাড়াব না। তবু যেতে হল।

এবারে মণি দরজা খুলেই যা পশতুর তুবড়ি বাজি, বিডন্-বিশপ ফল্‌স্ চালালে, তার সামনে আমি একদম হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কুমারী পার্বতী কাম্য পতিনিন্দা শুনে ন যযৌ ন তস্থৌ হয়েছিলেন, আমি উলটো অবস্থায়। ফল কিন্তু একই।

লক্ষ্য করলুম, মণিকে ভয়ংকর রোগা দেখাচ্ছে। ফার্সীতে শুধালুম, 'সর্দি হয়েছে নাকি?' মণি এক বর্ণ ফার্সী বোঝে না। খলখল করে হেসে বাড়ির ভিতর চলে গেল।

মহবুব এলেন লাঠিতে ভর করে। ঠাণ্ডা দেশের সর্দি, যাবার বেলা মানুষকে অর্ধমৃত করে দিয়ে যায়। বিশেষ করে যাদের চর্বি নিয়ে কারবার।

আমি জানতুম ওই কথাই উঠবে, যদিও আশা করেছিলুম, নাও উঠতে পারে। মণির বেশ উত্তেজনা থেকে অবশ্য আমেজ করেছিলুম, আরও কিছু একটা হয়েছে।

বললেন, 'ওই যে আমাদের ছোকরা চাপরাসী মাহমুদ জান, রাসকেল না ইডিয়ট কী বলব! সে-ই ঘটিয়েছে কাণ্ডখানা। আপনি যখন দিন সাতেক এলেন না, তখন ওই মাহমুদ মণিকে একটা খাসা আরব্য উপন্যাস শোনালে। রাসকেলটা গল্প বানাতে আস্ত পাঠান। সে মণিকে বললে, "বাদশা আনাউল্লা খান সৈয়দ সায়েবকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, এদেশে বিয়ে না করে দামড়ার মত ঘুরে বেড়ানো অত্যন্ত অনুচিত। লোকনিন্দা হয়, বিশেষ করে আপনি যখন শিক্ষক। তারপর সৈয়দ সায়েবের হাত ধরে তাঁকে নিয়ে গেলেন তাঁর মেয়ে-ইস্কুলে। সেখানে দু'শো মেয়েকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে হুকুম দিলেন, বেছে নাও। সৈয়দ সাহেব আর কি করেন! শাহানবাদশার হুকুম। না মানলে গর্দান। আর মেয়েগুলোই বা কি কম খাপসুরত! সৈয়দ সায়েব বিয়ে করে মশগুল। তাই এদিক আসার ফুরসৎ তাঁর আর কই?'

আমি জীবনে ওই একবারই গীতাবর্ণিত নিষ্কম্প প্রদীপ-শিখাবৎ!

মহবুব আলী বললেন, 'মণি তো চিৎকার করে কান্নাকাটি জুড়ে দিল। তার পর শয্যা নিল, এই ড্রইং-রুমের দরজার গোড়ায়। একটানা রোজার উপবাস। রাত্রেও খায় না—'

আমিও শুধালুম, 'মণি বিশ্বাস করলে ওই গাঁজাখুরি?'

'কেন করবে না? মণি মাঝে মাঝে মোটরে করে আমার বিবির সঙ্গে শহরে যায়। পথে পড়ে মেয়ে-ইস্কুল। দেখেছে, মেয়েগুলোর বরফের মত ফরসা রঙ, বেদানার মত ট্যাবাট্যাবা লাল গাল, ধনুকের মত ভুরু—'

আমি বললুম, 'থাক্ থাক্। আপনাকে আর কবিত্ব করতে হবে না। কিন্তু আমি তো পছন্দ করি শ্যামবর্ণ—'

এইবারে মহবুব আলীর মুখে ফুটল মধুর হাসি। ন্যাকরা-গলা আবদেরে-আবদেরে সুরে বললেন, 'তা হলে মণিকে ডেকে সেই সুসমাচার শুনিয়ে দি এবং এটাও বলব কি যে, আপনি মণিকে কাবুলী মেয়েদের চেয়ে বেশী খাপসুরত

বলে মনে করেন ?'

আমি তো রেগে টঙ। চিৎকার করে বললুম, 'বলুন, বলুন, বিশ্বসুদ্ধকে বলুন। আমার কী আপত্তি ? মণি যখন বিশ্বাস করে আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তখন তো আপনার সব সমস্যা সমাধান হয়ে গিয়েছে।'

মহবুব আলী হাসলেন, আরও মধুর হাসি। আমার গা জ্বলে গেল।

অমিয় ছানিয়া বললেন, 'ওই তো আপনার ভুল। তাই যদি হত তবে আপনাকে দেখা মাত্রই মণি হাসির বন্যা জাগাল কেন ? চিৎকার করে তখন কী বলেছে, শুনেছেন ? না, আপনি পশতু বোঝেন না। বলেছে, ওঁর হাতে মেহদীর দাগ নেই, উনি বিয়ে করেন নি।'

আমি চুপ। শেষটায় কাতর কণ্ঠে শুধালুম, 'মেহদীর দাগ ছাড়া কি কখনও বিয়ে হয় না ?'

মহবুব আলী বললেন, 'বোঝান গিয়ে মণিকে। আপনাকে কতবার বলেছি, ও পাঠান-মেয়ে, ও বোঝে পাঠানদের কায়দাকানুন। ও শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় পাঠান-জগতে। বিশ্বভুবনের খবর ও রাখে না।'

আমি শাধালুম, 'আপনাকে গতবারে দেখেছিলুম. এ-ব্যাপার নিয়ে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সেটা হঠাৎ কেটে গেল কী প্রকারে ? আমার তো মনে হচ্ছে জিনিসটে আরও বেশী প্যাঁচালো হয়ে যাচ্ছে।'

তিনি বললেন, 'পাঠান-মেয়েরা সচরাচর বাপ-চাচার আদেশমত নাক কান বুজে বিয়ে করে। কিন্তু হঠাৎ কখনও যদি পাঠান মেয়ে কাউকে ভালবেসে ফেলে তখন সে আগুনে হাত না দেওয়াই ভাল। ব্যাপারটার গুরুত্ব গোড়ার দিকে আমি বুঝতে পারি নি ; তাই তার একটা সমাধান খুঁজেছিলুম। এখন নিরাশ হয়ে অভয় মেনে বসে আছি।'

আমি আর কী বলব ! অত্যন্ত চিন্তিত মনে বাড়ি ফিরলুম।

* * *

সমস্যার ফয়সালা করে দিল বাচ্চায়ে সকাও কাবুল আক্রমণ করে। আমি থাকি শহরের মাঝখানে, ব্রিটিশ লিগেশন শহরের বাইরে মাইল দেড়েক দূরে। বাচ্চা এসেছে সেদিক থেকেই এবং থানা গেড়েছে লিগেশন আর শহরের মাঝখানে। লিগেশন আর শহর একে অন্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সেখানে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

কয়েকদিন পরে বাচ্চা হটে গেল। তখন ব্রিটিশ প্লেন এসে বিদেশী মেয়েদের পেশাওয়ার নিয়ে যেতে লাগল। খবর পেয়েই ছুটে গেলুম আমার বন্ধু মৌলানা জিয়াউদ্দীনের স্ত্রীর জন্য একটা সীট যোগাড় করতে।

মহবুব আলীর কলিং-বেল টেপা মাত্রই এবারে দরজা খুলল না। তখন হ্যাণ্ডেল ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল।

খানিকক্ষণ পর মহবুব আলী এলেন। মুখ বিষণ্ণ। কোন ভূমিকা না দিয়েই বললেন, 'কাবুল নিরাপদ স্থান নয় বলে লিগেশনের সব মেয়েদের পেশাওয়ারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার স্ত্রী চলে গিয়েছেন। মণিও গেছে।'

আমি বলতে চাইলুম, 'ভালই হল', কিন্তু বলতে পারলুম না।

তারপর বললেন, 'আপনাকে বলে কি হবে, তবু বলি। যে কদিন শহর লিগেশন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল সে কদিন এখানে অনেক রকম গুজব পেঁছিত, কেউ বলত কাবুলে লুঠতরাজ আরম্ভ হয়ে গেছে, কেউ বলত বিদেশীদের সব খুন করে ফেলা হয়েছে। আর মণি ছুটোছুটি করেছে, এ-চাপরাসী থেকে ও-চাপরাসীর কাছে, এ-আরদালীর কাছ থেকে ও-আরদালীর কাছে। টাকা দিয়ে লোভ পর্যন্ত দেখিয়েছে, আপনার কুশল সংবাদ নিয়ে আসবার জন্যে।'

আমি চুপ।

'তারপর যখন সে জানতে পারলে তাকেও আমার স্ত্রীর সঙ্গে পেশাওয়ার চলে যেতে হবে তখন এক বিপর্যয় কাণ্ড করে তুললে। কান্নাকাটি জুড়ে দিয়ে বললে, সে কিছুতেই দেশে ফিরে যাবে না। এক রকম গায়ের জোরে তাকে প্লেনে তুলে দিতে হল।'

আমি কিছু বলি নি।

* * *

একদিন কাবুলে অনেক কষ্ট সওয়ার পর খবর পেলুম, অ্যারোপ্লেনে জিয়াউদ্দীন ও আমার জন্য জায়গা হয়েছে। আগের রাত্রে মহবুব আলী আমাকে গুডজর্নি বাঁভইয়াজ জানাতে এলেন। বিদায়ের সময় আমাকে একটা মোটা খাম দিয়ে বললেন, 'আপনি পেশাওয়ারে পেঁছে আমার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে মণিকে খবর দেবেন। মণি এলে তার হাতে খামটা দিয়ে বলবেন—এটা মহবুব আলীর স্ত্রীর হাতে দিয়ো।'

আমি বললুম, 'আমি তো পশতু বলতে পারি নে।'

তিনি কথা কটি উর্দু হরফে লিখে বার তিনেক আমাকে দিয়ে পড়িয়ে নিলেন।

অ্যারোপ্লেনে বসে পরের দিন অনেক চিন্তা করেছিলুম। কী চিন্তা করেছিলুম, সে-কথা দয়া করে জিজ্ঞাসা করবেন না।

পেশাওয়ার পেঁছেই, গেলুম মহবুব আলীর শ্বশুরবাড়ি। বৈঠকখানায় ঢুকে দেখি, দুই বৃদ্ধ মুরুব্বী স্থানীয় লোক বসে আছেন। আমি মহবুব আলীর কুশল সংবাদ জানিয়ে তাঁদের অনুরোধ জানালুম, মণিকে একটু খবর দিতে। ভদ্রলোকেরা একটু চমকে উঠলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়ে বললেন, 'খবর দিচ্ছি।' এঁরা চমকে উঠলেন কেন? তবে কি এ-বাড়ির মেয়েরা বৈঠকখানায় আসে না? তাহলে মহবুব আলীর সেটা বোঝা উচিত ছিল।

মণি এল। আমাকে দেখে অন্দরের দোরের গোড়ায় স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল। মুখে কথা নেই। মুরুব্বীদের দিকে একবার তাকালে। তাঁরা তখন অন্য দিকে ঘাড় ফিরিয়ে নিয়েছেন। মণি মৃদু কণ্ঠে একটি শব্দ শোধালে, 'সলামত?' কথাটা ফার্সী! হয়তো পশতুতেও চলে! অর্থ 'কুশল?'

আমি ঘাড় নাড়িয়ে বললুম, 'হ্যাঁ।'

তারপর তার কাছে গিয়ে খামটা দিয়ে সেই শেখা বুলিতে পশতুতে বললুম,

'এটা মহবুব আলীর স্ত্রীর হাতে দিয়ো।' মণির মুখ খুশিতে ভরে উঠল। যা বলল সে-ভাষা না জেনেও বুঝতে পারলুম, সে বলছে, 'পশতু তা হলে শিখেছেন ?'

আমি দুঃখ দেখিয়ে ঘাড় নেড়ে 'না' জানালুম।

মণি ভিতরে চলে গেল।

আমি উঠি-উঠি করছিলুম এমন সময় চাকর এসে বললে কিছু খেয়ে যেতে। পাঠানের বাড়িতে না খেয়ে চলে যাওয়া বড় বেয়াদবি।

মণি টেবিলে খাবার সাজিয়ে দোরের আড়ালে দাঁড়াল।

একটি কথা বলল না।

বাড়ি থেকে বেরবার সময় একবার পিছনেব দিকে তাকালুম, মণিকে শেষ সেলাম জানাবার জন্য। কোথাও পেলুম না।

টাঙ্গাতে উঠে উলটো দিকে মুখ করে বসতেই নজরে গেল দোতলার বারান্দার দিকে। দেখি মণি দাঁড়িয়ে। মাথায় ওড়না নেই। আর দু' চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে, লম্বা লম্বা ধারা বয়ে।

টাঙ্গা মোড় নিল।

সে রাত্রে দেশের ট্রেন ধরলুম।

চাচা-কাহিনী

বার্লিন শহরের উলাণ্ড স্ট্রীটের উপর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুস্থান হৌস নামে একটি রেস্তোরাঁ জন্ম নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে, বাঙালীর যা স্বভাব, রেস্তোরাঁর এক কোণে একটি আড্ডা বসে যায়। আড্ডার গোসাঁই ছিলেন চাচা, বরিশালের খাজা বাঙাল মুসলমান, আর চেলারা—গোসাঁই, মুখুজ্জে, সরকার, রায়, চ্যাংড়া গোলাম মৌলা ইত্যাদি।

রায় চুক চুক করে বিয়ার খাচ্ছিলেন আর গ্রাম-সম্পর্কে তাঁর ভাগ্নে গোলাম মৌলা ভয়ে ভয়ে তাঁর দিকে মিট মিট করে তাকাচ্ছিল, পাছে তিনি বানচাল হয়ে যান। এ-মামলা চাচা রোজই দেখেন, কিছু বলেন না, আজ বললেন, 'অত ডরাচ্ছিস কেন ?'

মৌলা লাজুক ছেলে। মাথা নিচু করে বললে, 'ওটা খাবার কী প্রয়োজন ? আপনি তো কখনও খান নি, এতদিন বার্লিনে থেকেও। মামুরই বা কী দরকার ?'

চাচা বললেন, 'ওর বাপ খেত, ঠাকুরদা খেত, দাদামশাই খেত, মামারা খায় এ দেশে না এসেও। ও হল পাইকারী মাতাল, আর পাঁচটা হিন্দুস্থানীর মত পেঁচী মাতাল নয়। আর আমি কখনও খাই নি তোকে কে বললে ?'

আড্ডা একসঙ্গে বললে, 'সে কী চাচা ?'

এমন ভাবে কোরাস গাইলে, মনে হল, যেন বছরের পর বছর তারা ওই বাক্যগুলোই মোহড়া দিয়ে আসছে।

ডান হাত গলাবন্ধ কোটের মধ্যিখান দিয়ে ঢুকিয়ে, বাঁ হাতের তেলো চিত করে চাচা বললেন, 'মদকে ইংরিজিতে বলে স্পিরিট, আর স্পিরিট মানে ভূত। অর্থাৎ মদে রয়েছে ভূত। সে-ভূত কখন কার ঘাড়ে চাপে তার কি কিছু ঠিক-ঠিকানা আছে? তবে ভাগ্যিস, ও-ভূত আমার ঘাড়ে মাত্র একদিনই চেপেছিল, একবারের তরে।'

গল্পের সন্ধান পেয়ে আড্ডা খুশ! আসন জমিয়ে সবাই বললে, 'ছাড়ুন চাচা।'

রায় বললেন, 'ভাগিনা, আরেকটা বিয়ার নিয়ে আয়।'

মৌলা অতি অনিচ্ছায় উঠে গেল। উঠবার সময় বললে, 'এই নিয়ে আঠারটা।'

রায় শুধালেন, 'বাড়তি না কমতি?'

ফিরে এলে চাচা বললেন, 'ফ্রলাইন ফন্ ব্রাখেলকে চিনিস?'

লেডি-কিলার পুলিন সরকার বললে, 'আহা কৈসন্ সুন্দরী,

রূপসিনী বলন্দিনী
নরদিশি নন্দিনী।'

শ্রীধর মুখুজ্জে বললে, 'চোপ্—।'

চাচা বললেন, ওর সঙ্গে প্রেম করতে যাস নি। চুমো খেতে হলে তোকে উদুখল সঙ্গে নিয়ে পেছনে ঘুরতে হবে।'

বিয়ারের ভুড়ভুড়ির মত রায়ের গলা শোনা গেল, 'কিংবা মই।'

গোসাঁই বললেন, 'কিংবা দুই-ই। উদুখলের উপর মই চাপিয়ে।'

শ্রীধর বললে, 'কী জ্বালা! শাস্ত্র শ্রবণে এরা বাধা দিচ্ছে কেন? চাচা, আপনি চালান।'

চাচা বললেন, 'সেই ফন্ ব্রাখেল আমায় বড় স্নেহ করত, তোরা জানিস। ভরগ্রীষ্মকালে একদিন এসে বললে, "ক্লাইনার ইডিয়ট (হাবা-গঙ্গারাম), এবারে আমার জন্মদিনে তোমাকে আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে যেতে হবে। শহরে থেকে থেকে তুমি একদম পিলা মেরে গেছ, গাঁয়ের রোদে রঙটিকে ফের একটু বাদামির আমেজ লাগিয়ে আসবে।"

আমি বললুম, "অর্থাৎ জুতোতে পালিশ লাগাতে বলছ? রোদ্দুরে না বেরিয়ে বেরিয়ে কোনও গতিকে রঙটা একটু 'ভদ্রস্থ' করে এনেছি, সেটাকে আবার নেটিভ-মার্কা করব? কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তুমি না হয় আমাকে সয়ে নিতে পার; কিন্তু তোমার বাড়ির লোক? তোমার বাবা, কাকা?"

ব্রাখেল বললে, "না হয় একটু বাঁদর-নাচই দেখালে।"

চাচা বললেন, 'যেতেই হল। ব্রাখেল আমার যা-সব উপকার করেছে তার বদলে আমি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পেও যেতে পারি।'

মৌলা চট করে একবার ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে নিলে।

চাচা বললে, 'অজ পাড়াগাঁ ইস্টিশান। প্যাসেঞ্জারে যেতে হল। গাড়ি থেকে নামতেই দেখি, স্বয়ং স্টেশনমাস্টার সেলাম ঠুকে সামনে হাজির। তার পিছনে

ছোটবাবু, মালবাবু—অবশ্য দ্যাশের মত খালি গায়ে আলপাকার ওপর ব্রেস্ট্-কোট পরা নয়, টিকিট-বাবু, দু-চারজন তামাশা দেখনেওলা, পুরো পাক্কা প্রসেশন বললেই হয়। ওই অজ স্টেশনে আমিই বোধ হয় প্রথম ভারতীয় নামলুম, আর আমিই বোধ হয় শেষ।

স্টেশনমাস্টার বললে, "বাইরে গাড়ি তৈরি, এই দিকে আজ্ঞা হোক।"

বুঝলুম, ফন্ ব্রাখেলেরা শুধু বড়লোক নয়, বোধ হয় এ-অঞ্চলের জমিদার।

বাইরে এসে দেখি, প্রাচীন ফিটিং গাড়ি, কিন্তু বেশ শক্তসমথ। কোচম্যান তার চেয়েও বুড়ো, পরনে মর্নিং স্যুট, মাথায় চোঙার মত অপ্‌রা হ্যাট, আর ইয়া হিণ্ডেনবুর্গি গোঁফ, এডওয়ার্ডী দাড়ি, আর চোখ দুটো এবং নাকের ডগাটি সুজি রায়ের চোখের মত লাল, জবাকুসুমসংকাশং।

কী একটা মন্ত্র পড়ে গেল; দাড়ি-গোঁপের ছাঁকনি দিয়ে যা বেরোল তার থেকে বুঝলুম, আমাকে ফিউডাল পদ্ধতিতে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। এ চাপানের কী ওতোর মন্ত্র গাইতে হয় ব্রাখেল আমাকে শিখিয়ে দেয় নি। কী আর করি, "বিলক্ষণ, বিলক্ষণ" বলে যেতে লাগলুম, আর মনে মনে ব্রাখেলকে প্রাণ ভরে অভিসম্পাত করলুম, এ-সব বিপাকের জন্য আমাকে কায়দা-কেতা শিখিয়ে দেয় নি বলে।

আমি গাড়িতে বসতেই কোচম্যান আমার হাঁটুর উপর একখানা ভারী কম্বল চাপিয়ে দু দিকে গুঁজে দিয়ে মিলিটারী কায়দায় গটগট করে গিয়ে কোচবাক্সে বসল। তারপর চাবুকটা আকাশে তুলে সার্কাসের হাণ্টারওয়ালী ফিয়ারলেস নাদিয়ার মত ফটাফট করে মাঠের মধ্যিখান দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিলে। ইতিমধ্যে স্টেশনমাস্টারের ফুটফুটে মেয়েটি আমার অটোগ্রাফ আর স্ন্যাপ্ দুইই তুলে নিয়েছে।

মাঠের পর ঈষৎ খাড়াই, তারপর ঘন পাইন বন; বন থেকে বেরুতেই সামনে উঁচু পাহাড় আর তার উপর যমদূতের মত দাঁড়িয়ে এক কাসল্। মহাভারতের শান্তিপর্বে শরশয্যায় শুয়ে শুয়ে ভীষ্মদেব মেলা দুর্গের বয়ান করেছেন, এ দুর্গ যেন সব কটা মিলিয়ে লাবড়ি-ভর্তা।

আমি ভয় পেয়ে শুধালুম, "ওই আকাশে চড়তে হবে?"

কোচম্যান ঘাড় ফিরিয়ে গর্বের হাসি হেসে বললে, "ইয়াঃ মাইন হের!" দেমাকের ঠ্যালায় তার গোঁপের ডগা দুটো আরও আড়াই ইঞ্চি প্রমোশন পেয়ে গেল। তারপর ভরসা দিলে, 'এক মিনিটে পেঁছে যাব স্যার্।' আমি মনে মনে মৌলা আলীকে স্মরণ করলুম।

এ কী বিদঘুটে ঘোড়া রে বাবা, এতক্ষণ সমান জমিতে চলছিল আমাদের দিশী টাট্টুর মত কদম আর দুলকি চাল মিশিয়ে, এখন চড়াই পেয়ে চলল লাম্বী চালে। রাস্তাটা অজগরের মত পাহাড়টাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উপরে উঠে যেন কাস্‌ল্‌টায় ফণা মেলেছে; কিন্তু ফণার কথা থাক্, উপস্থিত প্রতি বাঁকে গাড়ি যেন দু চাকার উপর ভর দিয়ে মোড় নিচ্ছে।

হঠাৎ সামনে দেখি বিরাট খোলা গেট। কাঁকরের উপর দিয়ে গাড়ি এসে

যেখানে দাঁড়ালো তার ওপর থেকে গলা শুনে তাকিয়ে দেখি, ভিলিকিনি থেকে—'

মৌলা শুধাল, ভিলিকিনি মানে ?'

চাচা বললেন, 'ও ব্যালকনি, আমাদের দেশে বলে ভিলিকিনি—সেই ভিলিকিনি থেকে ফন্ ব্রাখেল চেঁচিয়ে বলছে, যোহানেস, ওঁকে ওঁর ঘর দেখিয়ে দাও ; গুস্টাফ টেবিল সাজাচ্ছে।'

তারপর আমাকে বললে, "ডিনারের পয়লা ঘণ্টা এখুনি পড়বে, তুমি তৈরী হয়ে নাও।"

চাচা বললেন, 'পরি তো কারখানার চোঙার মত পাতলুন আর গলাবন্ধ কোট, কিন্তু একটা নেভি-ব্লু সুট আমি প্রথম যৌবনে হিম্মৎ সিং-এর পাল্লায় পড়ে করিয়েছিলুম, তার রঙ তখন বাদামীতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এর পর কোন্ রঙ নেবে যেন মনঃস্থির করতে না পেরে ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে আছে। হাত-মুখ ধুয়ে সেইটি পরে বেডরুমটার ফেন্সি জিনিসপত্রগুলো তাকিয়ে দেখছি এমন সময় ব্রাখেল আমাকে নক্ করে ঘরে ঢুকল। আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "এ কী ? ডিনার-জ্যাকেট পর নি ?"

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, "ওসব আমার নেই, তুমি বেশ জান।"

ফন্ ব্রাখেল বললে, "উঁহু, সেটি হচ্ছে না। এ বাড়িতে এ-সব ব্যাপারে বাবা জ্যাঠা দুজনাই জোর রিচুয়াল মানেন, বড্ড পিটপিটে। তোমাদের পুজোপাজা নেমাজ-টেমাজের মত সসেজ থেকে মাস্টার্ড খসবার উপায় নেই।" তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললে, "তা তুমি এক কাজ কর। দাদার কাবার্ডভর্তি ডিনার-জ্যাকেট, শার্ট, বো—তারই এক প্রস্থ পরে নাও। এটা তারই বেডরুম ; এই কাবার্ডে সব-কিছু পাবে।"

আমি বললুম, "তওবা, তোমার দাদার জামা-কাপড় পরলে কোট মাটি পেঁছে তোমার ডিনার গাউনের মত টেল করবে।"

বললে, "না, না, না। সবাই কি আমার মত দিক-ধেড়েঙ্গে! তুমি চট্‌পট্ তৈরী হয়ে নাও, আমি চললুম।"

চাচা বললেন, 'কী আর করি, খুললুম কাবার্ড। কাতারে কাতারে কোট পাতলুন ঝুলছে—সদ্য প্রেস্‌ড, দেরাজ ভর্তি শার্ট, কলার, বো হীরে-বসানো স্লীভ-লিন্‌ক্‌স, আরও কত কী!

'মানিকপীরের মেহেরবানি বলতে হবে, জুতোটি পর্যন্ত ফিট করে গেল দস্তানার মত।

'তারপর চুল ব্রাশ করতে গিয়ে আমার কেমন যেন মনে হল, এ বেশের সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যিখানে সিঁথি জুতসই হবে না, ব্র্যাকব্রাশ করলেই মানাবে ভাল। আর আশ্চর্য, বিশ বছরের দু ফাঁক করা চুল বিলকুল বেয়াড়ামি না করে এক লম্ফে তালুর উপর দিয়ে পিছনে ঘাড়ের উপর চেপে বসল, যেন আমি মায়ের গর্ভ থেকে ওই ঢঙের চুল নিয়েই জন্মেছি। আয়নাতে চেহারা দেখে মনে হল, ঠিক জংলীর মত তো দেখাচ্ছে না, তোরা অবিশ্যি বিশ্বাস করবি নে।'

চাচার ন্যাওটা ভক্ত গোসাঁই বললে, 'চাচা, এ আপনার একটা মস্ত দোষ ; শুধু আত্মনিন্দা করেন। ওই যে আপনি মহাভারতের শান্তিপর্বের কথা বললেন, সেখানেই ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে আত্মনিন্দার প্রচণ্ড নিন্দা করে গেছেন।'

চাচা খুশী হয়ে বললে, 'হেঁ-হেঁ, তুই তো বললি, কিন্তু ওই পুলিনটা ভাবে সে-ই শুধু লেডি-কিলিং লটবর। তা সে কথা যাক গে, ঈভনিং-ড্রেসে কালা কেষ্ট সেজে আমি তো শিস দিতে দিতে নামলুম নীচের তলায়—'

পুলিন শুধালে, 'স্যার্, আপনাকে তো কখনও শিস দিতে শুনি নি, আপনি কি আদপেই শিস দিতে পারেন ?'

চাচা বললেন, 'ঠিক শুধিয়েছিস। আর সত্যি বলতে কী, আমি নিজেই জানি নে, আমি শিস দিতে পারি কি না। তবে কি জানিস, হাফপ্যাণ্ট পরলে লাফ দিতে ইচ্ছা করে, জোব্বা পরলে পদ্মাসনে বসে থাকবার ইচ্ছা হয়, ঠিক তেমনি ঈভনিং ড্রেস পরলে কেমন যেন সাঁঝের ফষ্টি-নষ্টি করবার জন্য মন উতলা হয়ে ওঠে, না হলে আমি শিস দিতে যাব কেন ? শিস কি দিয়েছিলুম আমি, শিস দিয়েছিল বকাটে সুটটা। তা সে কথা যাক।'

ততক্ষণে ডিনারের শেষ ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে। আন্দাজে আন্দাজে ড্রইংরুম পেরিয়ে ঢুকলুম গিয়ে ব্যানকুয়েট-হলে।

কাস্‌লের ব্যানকুয়েট-হল আমাদের চণ্ডীমণ্ডপ-সাইজ হবে। তার আর বিচিত্র কী এবং সিনেমার কৃপায় আজকাল প্রায় সকলেরই তার বিদ্‌ঘুটে ঢপ-ঢং দেখা হয়ে গিয়েছে ; কিন্তু বাস্তবে দেখলুম ঠিক সিনেমার সঙ্গে মিলল না। আমাদের দিশী সিনেমাতে চণ্ডীদাস পাঞ্জাবির বোতাম লাগাতে লাগাতে টিনের ছাতওলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন, যদিও বোতাম আর টিন এসেছে ইংরিজী আমলে। আর হলিউড যদি ব্যানকুয়েট-হল্ দেখায় অষ্টাদশ শতাব্দীর, তবে আসবাবপত্র রাখে সপ্তদশ শতাব্দীর, জাস্ট টু বী অন্ দি সেফ্ সাইড।

ফন ব্রাখেলদের কাস্‌ল্ কোন্ শতাব্দীর জানি নে কিন্তু হলে ঢুকেই লক্ষ্য করলুম, মান্ধাতার আমলের টেবিল-চেয়ারের সঙ্গে সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর সুখ-সুবিধার সরঞ্জামও মিশে রয়েছে। তবে খাপ খেয়ে গিয়েছে দিব্যি, এঁদের রুচি আছে কোনও সন্দেহ নেই। এসব অবশ্য পরে, খেতে খেতে লক্ষ্য করেছিলুম।

টেবিলের এক প্রান্তে ক্লারা ফন ব্রাখেল, অন্য প্রান্তে যে ভদ্রলোক বসেছেন তাঁকে ঠিক ক্লারার বাপ বলে মনে হল না, অতখানি বয়স যেন ওঁর নয়।

প্রথম দর্শনেই দুজনেই কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। বাপের হাত থেকে তো ন্যাপকিনের আংটিটা ঠং করে টেবিলের উপর পড়ে গেল। আমি আশ্চর্য হলুম না, ভদ্রলোক হয়তো জীবনে এই প্রথম ইণ্ডার (ভারতীয়) দেখেছেন, কালো ঈভনিং-ড্রেসের ওপর কালো চেহারা—গোসাঁইয়ের পদাবলীতে—

'কালোর উপরে কালো।'

হকচকিয়ে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয় কিন্তু ক্লারা কেমন যেন অদ্ভুতভাবে

তাকালে ঠিক বুঝতেই পারলুম না। তবে কি বো'টা ঠিক হেডিং মাফিক বাঁধা হয় নি। কই, আমি তো একদম রেডিমেডের মত করে বেঁধেছি, এমন কি হাল-ফ্যাশান মাফিক তিন ডিগ্রি ট্যারচাও করে দিয়েছি। তবে কি ঈভনিং ড্রেস আর ব্যাকব্রাস করা চুলে আমাকে ম্যাজিসিয়ানের মত দেখাচ্ছিল ?

সামলে নিয়ে ক্লারা ভদ্রলোককে বললে, "পাপা, এই হচ্ছে আমার ইণ্ডিয়ার আফে !"

অর্থাৎ, ভারতীয় বাঁদর।

বাপও ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন। মিষ্টি হেসে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে শেক-হ্যাণ্ড করলেন। ক্লারাকে বললেন, "প্‌ফুই—ছিঃ, ও-রকম বলতে নেই।"

আমি হঠাৎ কী করে বলে ফেললুম, "আমি যদি বাঁদর হই তবে ও জিরাফ।"

বলেই মনে হল, তওবা, তওবা, প্রথম দিনেই ও-রকমধারা জ্যাঠামো করা উচিত হয় নি।

পিতা কিন্তু দেখলুম, মন্তব্যটা শুনে ভারি খুশ। বললেন "ডাঙ্কে—ধন্যবাদ—ক্লারাকে ঠিক শুনিয়ে দিয়েছ। আমরা তো সাহস পাই নে।"

পালিশ-আয়নার মত টেবিল, স্বচ্ছন্দে মুখ দেখা যায়। তার উপর ওলন্দাজ লেসের গোল গোল হালকা চাকতির উপর প্লেট পিরিচ সাজানো। বড় প্লেটের দু দিকে সারি বাঁধা অন্তত আটখানা ছুরি, আটখানা কাঁটা, আধ ডজন নানা ঢঙের মদের গেলাস। সেরেছে! এর কোন্ ফর্ক দিয়ে মুরগী খেতে হয়, কোন্‌টা দিয়ে রোস্ট আর কোন্‌টা দিয়েই বা সাইড্ ডিশ ?

আসল খাবার পূর্বের চাট—'অর দ্য অভ্‌রে'র নাম দিয়েছি আমি চাট, তখন দেওয়া হয়ে গিয়েছে। খুঞ্চার ছ পদ থেকে আমি তুলেছি মাত্র দু পদ, কিঞ্চিৎ সসেজ আর দুটি জলপাই, এমন সময় বাটলার দু হাতে গোটা চারেক বোতল নিয়ে এসে শুধাল, শেরি ? পোর্ট ? ভেরমুট ? কিংবা হুইস্কি সোডা ?

আমি এসব দ্রব্য সসম্ভ্রমে এড়িয়ে চলি। হঠাৎ কী করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল "নো বিয়ার !"

বলেই জিভ কাটলুম। আমি কী বলতে কী বললুম! একে তো আমি বিয়ার জীবনে কখনও খাই নি, তার উপরে আমি ভাল করেই জানি, বিয়ার চাষাড়ে ড্রিংক, ভদ্রলোকে যদি-বা খায় তবে গরমের দিনে, তেষ্টা মেটাবার জন্যে। অষ্টপদী ব্যানকুয়েটে বিয়ার! এ যেন বিয়ের ভোজে কালিয়ার বদলে শুঁটকি তলব করা!

ক্লারা জানত, আমি মদ খাই নে, হয়তো বাপকে তাই আগের থেকে বলে রেখে আমার জন্যে মাফ চেয়ে রেখেছিল, তাই সে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকালে।

বাটলার কিন্তু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে এক ঢাউস বিয়ারের মগ নিয়ে এল, তার ভিতরে অনায়াসে দু বোতল বিয়ারের জায়গা হয়।

যখন নিতান্তই এসে গিয়েছে তখন খেতে হয়। ভাবলুম, একটুখানি ঠোঁটে

ভেজাব মাত্র, কিন্তু তোমরা বিশ্বাস করবে না, খেতে গিয়ে ঢক ঢক করে প্রায় আধ মগ সাফ করে দিলুম।'

মৌলা এক বিঘত হাঁ করে বললে, 'এক ধাক্কায় এক বোতল? মামুও তো পারবে না।'

চাচা বললেন, 'কেন শরম দিচ্ছিস, বাবা? ওরকম ইভনিং-ড্রেস পরে ব্যানকুয়েট-হলে বসলে তোর মামাও এক ঝটকায় দু পিপি বিয়ার গিলে ফেলত। বিয়ার কি আমি খেয়েছিলুম? খেয়েছিল ওই শালার ড্রেস!'

গোসাঁই মর্মাহত হয়ে বললে, 'চাচা!'

চাচা বললেন. 'অপরাধ নিস নি গোসাঁই, ভাষা বাবদে আমি মাঝে মাঝে এট্টুখানি বে-এক্তেয়ার হয়ে যাই। জানিস তো আমার জীবনের পয়লা গুরু ছিলেন এক ভশ্চায, তিনি শ'কার ব'-কার ছাড়া কথা কইতে পারতেন না। তা সে কথা থাক্।'

তখনও খেয়েছি মাত্র আড়াই চাক্তি সসেজ আর আধখানা জলপাই, পেট পদ্মার বালুচর। সেই শুধু-পেটে বিয়ার দু মিনিট জিরিয়েই চচ্চড় করে চড়ে উঠল মাথার ব্রহ্মরন্ধ্রে।

এমন সময় হের ফন ব্রাখেল জিজ্ঞেস করলেন, "বার্লিনে কী রকম পড়াশোনা হচ্ছে?"

বুঝলুম, এ হচ্ছে ভদ্রতার প্রশ্ন, এর উত্তরে বিশেষ কিছু বলতে হয় না, হুঁ হুঁ করে গেলেই চলে কিন্তু আমি বললুম, "পড়াশোনা? তার আমি কী জানি? সমস্ত দিন, সমস্ত রাত বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না, তো কাটে হৈ-হৈ করে ইয়ার-বকশীদের সঙ্গে।"

বলেই অবাক হয়ে গেলুম। আমার তো দিনের দশ ঘণ্টা কাটে স্টাটস্ বিবলিওটেকে, স্টেট লাইব্রেরিতে, ক্লারারও সে খবর বেশ জানা আছে। ব্যাপার কী? সেই গল্পটা তোদের বলেছি?—পিপের ছ্যাঁদা দিয়ে হুইস্কি বেরুচ্ছিল, ইঁদুর চুক চুক করে খেয়ে তার হয়ে গিয়েছে নেশা, লাফ দিয়ে পিপের উপরে উঠে আস্তিন গুটিয়ে বলছে, "ওই ড্যাম ক্যাটটা গেল কোথা? ব্যাটাকে ডেকে পাঠাও, তার সঙ্গে আমি লড়ব।"

কিন্তু এত সাত-তাড়াতাড়ি কি নেশা চড়ে?

ইতিমধ্যে আপন অজানাতে বিয়ারে আবার লম্বা চুমুক দিয়ে বসে আছি।

করে করে তিন-চার পদ খাওয়া হয়ে গিয়েছে। যখন রোস্ট টার্কীতে পেঁছেছি, তখন দেখি অতি ধোপদুরস্ত ইভনিং-ড্রেস-পরা আর এক ভদ্রলোক টেবিলের ওদিকে আমার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন। ক্লারা তাঁকে বললে, "জ্যাঠামশাই, এই আমাদের ইঁডার।" বড় নার্ভাস ধরনের লোক। হাত অল্প অল্প কাঁপছে। আর বার বার বলছেন, "তোমরা ব্যস্ত হয়ো না, সব ঠিক আছে, সব ঠিক আছে, আমি শুধু ইয়ে—" তারপর আমার দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে বললেন, "আমি শুধু রোস্ট আর পুডিং খাই বলে একটু দেরিতে আসি।"

তারপর আমি কী বকর-বকর করেছিলুম আমার স্পষ্ট মনে নেই। সঙ্গে

সঙ্গে চলছে বিয়ারের পর বিয়ার, কখনও বা বেশ উঁচু গলায় বলে উঠি, "গুস্টাফ, আরও বিয়ার নিয়ে এস।"

এ কী অভদ্রতা! কিন্তু কারও মুখে এতটুকু চিত্তবৈকল্যের লক্ষণ দেখতে পেলুম না, কিংবা হয়তো লক্ষ্য করি নি। আর ভাবছি, ডিনার শেষ হলে বাঁচি।

শেষ হলও। আমরা ড্রইংরুমে গিয়ে বসলুম। কফি লিকার সিগার এল। আমি অভদ্রতার চূড়ান্তে পেঁছে বললুম, "নো লিকার, বিয়ার প্লীজ!"

বাবা হেসে বললেন, "আমাদের বিয়ার তোমার ভাল লাগাতে আমি খুশী হয়েছি। কিন্তু একটু বিলিয়ার্ড খেললে হয় না? তুমি খেলো?"

বললুম, "আলবত!" অথচ আমি জীবনে বিলিয়ার্ড খেলেছি মাত্র দু'দিন, কলকাতার ওয়াই. এম. সি. এ-তে। এখানকার বিলিয়ার্ড টেবিলে আবার পকেট থাকে না, এতে খেলা অনেক বেশী শক্ত।

জ্যাঠামশাই দাঁড়িয়ে বললেন, "গুড বাই, তোমরা খেলোগে।"

ক্লারাও আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে "গুড নাইট" বললে।

খুব নিচু ছাতওয়ালা, প্রায় মাটির নীচে বিরাট জলসাঘর, তারই এক প্রান্তে বিলিয়ার্ড-টেবিল। দেওয়ালের গায়ে গায়ে সারি সারি বিয়ারের পিপে। এত বিয়ার খায় কে? এরা তো কেউ বিয়ার খায় না দেখলুম।

ইতিমধ্যে লিকারের বদলে ফের শ্যাম্পেন উপস্থিত। আমি বললুম, "নো শ্যাম্পেন।" আবার চলল বিয়ার।

মার্কার কিউ এনে দিলে। আমি সেটা হাতে নিয়ে একটু বিরক্তির সঙ্গে বললুম, "এ আবার কী কিউ দিলে?"

মার্কারের মুখে কোন অসহিষ্ণুতা ফুটে উঠল না। বরঞ্চ যেন খুশী হয়েই আলমারি খুলে একটি পুরনো কিউ এনে দিলে। আমি পাকা খেলোয়াড়ীর মত সেটা হাতে ব্যালান্স্ করে বললুম, "এইটেই তো, বাবা, বেশ; তবে ওই পচা মাল পাচার করতে গিয়েছিলে কেন?"

আমার বেয়াদবি তখন চূড়া ছেড়ে আকাশে উঠে ঢলাঢলি আরম্ভ করে দিয়েছে। অবশ্য তখনও ঠিক ঠিক ঠাহর হয় নি, মালুম হয়েছিল অনেক পরে।

গ্রামের একঘেয়ে জীবনের ঝানু খেলোয়াড়কে আমি হারাব এ আশা অবিশ্যি আমি করি নি; কিন্তু খেলতে গিয়ে দেখলুম, খুব যে খারাপ খেলছি তা নয়, তবে আমার প্রত্যাশার চেয়ে ঢের ভাল। আর প্রতিবারেই আমি লীড পেয়ে যাচ্ছিলুম অতি খাসা, স্বপ্নের বিলিয়ার্ডেও মানুষ ও রকম লীড পায় না।

রাত ক'টা অবধি খেলা চলেছিল বলতে পারব না। আমি তখন তিনটে বলের বদলে কখনও ছটা কখনও নটা দেখছি, কিন্তু খেলে যাচ্ছি ঠিকই, খুব সম্ভব ভাল লীডের লাকে।

হের ফন্ ব্রাখেল শেষটায় না বলে থাকতে পারলেন না, "তোমার লাক বড় ভাল।"

অত্যন্ত বেকসুর মন্তব্য। আমি কিন্তু চটে গিয়ে বেশ চড়া গলায় বললুম, "লাক, না কচুর ডিম! নাচতে না জানলে শহর বাঁকা। আই লাইক্ দ্যাট্!"

ব্রাখেল কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, আমিও অষ্টমে উঠে আরও কড়া কথা শুনিয়ে দিলুম। ওদিকে দেখি মার্কার ব্যাটা মিটমিটিয়ে হাসছে। আমি আরও চটে গিয়ে হুঙ্কার দিলুম, 'তোমার মুলোর দোকান বন্ধ কর, এখন রাত সাড়ে তোরোটায় কেউ মুলো কিনতে আসবে না।' অথচ বেচারী বুড়ো থুত্থুড়ো, সব কটা দাঁত জগন্নাথ দেবতাকে দিয়ে এসেছে।

চিৎকার-চেল্লাচেল্লির মধ্যিখানে হঠাৎ দেখি সামনে জ্যাঠামশাই, পরনে তখনও পরিপাটি ঈভনিং-ড্রেস।

আবার সেই নার্ভাস স্বরে বললেন, "সরি সরি, তোমরা কিছু মনে কোর না, আমি শব্দ শুনে এলুম।" তারপর ক্লারার বাপের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুই বড় ঝগড়াটে, ভল্‌ফ্‌গাঙ, নিত্য নিত্য এর সঙ্গে ঝগড়া করিস।" তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "তার চেয়ে বরঞ্চ একটু তাস খেললে হয় না? আমার ঘুম হচ্ছে না।"

আমি বললুম, "হুঁ হুঁ হুঁ।"

তাসের টেবিল এল।

আমি স্কাট খেলেছি বিলিয়ার্ডের চেয়েও কম।

জ্যাঠা বললেন, 'কী স্টেক?'

বাপ বললেন, 'নিত্যিকার।'

'নিত্যিকার' বলতে কী বোঝাল জানি নে। ওদিকে আমার পকেটে তো ছুঁচো ডিগবাজি খেলছে। জ্যাঠা হিসাব করে বললেন, 'হানস্‌ পনেরো মার্ক ভল্‌ফ্‌গাঙ্‌ দুই।'

আপনার থেকে আমার বাঁ হাত কোটের ভিতরকার পকেটের দিকে রওনা হল। তখনই মনে পড়ল, এ কোট তো ক্লারার দাদার। আমার মনিব্যাগ তো পড়ে আছে আমার কোটে, উপরের তলায়। কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে হাত গিয়ে ঠেকল এক তাড়া করকরে নোটে। ঈশ্বর পরম দয়ালু, তাঁহার কৃপায় টাকা গজায়. এই টাকা দিয়েই আজকের ফাঁড়া কাটাই, পরের কথা পরে হবে। ক্লারাকে বুঝিয়ে বললে সে নিশ্চয়ই কিছু মনে করবে না। আর নিজের মনিব্যাগে রেস্ত আছেই বা কী? দশ মার্ক হয় কি না-হয়।

এদিকে রেস্ত নেই, ওদিকে খেলার নেশাও চেপেছে। পরের বাজিতে আবার হারলুম, এবার গেল আরও কুড়ি মার্ক, তারপর পঞ্চাশ, তারপর কত তার আর আমার হিসেব নেই। নোটের তাড়া প্রায় শেষ হতে চলল। আমি যুধিষ্ঠির নই, অর্থাৎ কোন রমণীর উপর টুয়েন্টি পার্সেন্ট অধিকারও আমার নেই, না হলে তখন সে রেস্তও ভাঙাতে হত, এমন সময় আস্তে আস্তে আমার ভাগ্য ফিরতে লাগল। দশ কুড়ি করে সব মার্ক তোলা হয়ে গেল, তারপর প্রায় আরও শ দুই মার্ক জিতে গেলুম।

ওদিকে মদ চলছে পাইকারী হিসেবে আর জ্যাঠামশাই দেখি হারার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশী নার্ভাস হয়ে যাচ্ছেন। আমি তো শেষটায় না থাকতে পেরে খলখল করে হেসে উঠলুম। কিছুতেই হাসি থামাতে পারি নে। গলা দিয়ে এক ঝলক

বিয়ার বেরিয়ে এল, কোন গতিকে সেটা রুমাল দিয়ে সামলালুম। কিন্তু হাসি আর থামাতে পারি নে। বুঝলুম, এরেই কয় নেশা।

জ্যাঠামশাই নার্ভাস সুরে বললেন, "হেঁ-হেঁ, এটা যেন, কেমন যেন,—হেঁ-হেঁ, তোমার লাক্—হেঁ-হেঁ—নইলে আমি খেলাতে—"

আবার লাক্! এক মুহূর্তে আমার হাসি থেমে গিয়ে হল বেজায় রাগ। বিলিয়ার্ডের বেলায়ও আমাকে শুনতে হয়েছিল ওই গুড্ ড্যাম্ লাকের দোহাই।

টং হয়ে এক ঝটকায় টেবিলের তাস ছিটকে ফেলে বললুম, "তার মানে? আপনারা আমাকে কী পেয়েছেন? ইউ অ্যান্ড ইয়োর ড্যাম্ লাক্, ড্যাম্, ড্যাম—"

বাপ-জ্যাঠা কী বলে আমায় ঠাণ্ডা করতে চেয়েছিলেন আমার সেদিকে খেয়াল নেই। কতক্ষণ চলেছিল তাও বলতে পারব না, আমার গলা পর্দার পর পর্দা চড়ে যাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার যত কটুকাটব্য।

এমন সময় দেখি, ক্লারা।

কোথায় না আমি তখন হুঁশে ফিরব—আমি তখন সপ্তমে না, একেবারে সেঞ্চুরির নেশায়। শেষটায় বোধ হয়, 'ছোটলোক', 'মীন', এইসব আশ্রাব্য শব্দও ব্যবহার করেছিলুম।

ক্লারা আমার কাঁধে হাত দিয়ে নিয়ে চলল দরজার দিকে। অনুনয় করে বললে, "অত চটছ কেন, ওঁদের সঙ্গে না খেললেই হয়, ওঁরা ওই রকমই করে থাকেন।"

বেরুবার সময় পর্যন্ত শুনি ওঁরা বলছেন, "সরি, সরি, প্লীজ প্লীজ। আমাদের দোষ হয়েছে।"

তবু আমার রাগ পড়ে না।'

চাচা কফিতে চুমুক দিলেন। রায় বললেন, 'ঢের ঢের মদ খেয়েছি, ঢের ঢের মাতলামো দেখেছি, কিন্তু এরকম বিদঘুটে নেশার কথা কখনও শুনি নি।'

চাচা বললেন, 'যা বলেছ! তাই আমি রাগ ঝাড়তে ঝাড়তে গেলুম শোবার ঘরে! ঈভনিং-কোট, পাতলুন খোলার সঙ্গে সঙ্গে মাথা কিন্তু ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করেছে, বিয়ারের মগও হাতের কাছে নেই।

বালিশে মাথা দিতে না দিতেই স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, সমস্ত সন্ধ্যা আর রাতভোর কী ছুঁচোমিটাই না করেছি! ছি-ছি, ক্লারার বাপ-জ্যাঠামশায়ের সামনে কী ইতরোমোই না করে গেলুম ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে!

আর এদেশে সবাই ভাবে ইণ্ডিয়ার লোক কতই না বিনয়ী, কতই না নম্র!

যতই ভাবতে লাগলুম, মাথা ততই গরম হতে লাগল। শেষটায় মনে হল, কাল সকালে, আজ সকালেই বলা ভাল, কারণ ভোরের আলো তখন জানলা দিয়ে ঢুকতে আরম্ভ করেছে, এঁদের আমি মুখ দেখাব কী করে? জানি, মাতালকে মানুষ অনেকখানি মাফ করে দেয়, কিন্তু এ যে একেবারে চামারের মাতলামো!

তা হলে পালাই।

অতি ধীরে ধীরে কোন প্রকারের শব্দটি না করে সুটকেসটি ওইখানেই ফেলে গাছের আড়ালে আড়ালে কাস্‌ল্‌ থেকে বেরিয়ে স্টেশন পানে দে ছুট। মাইল-খানেক এসে ফিরে তাকালুম ; নাঃ, কেউ পিছু নেয় নি।

চোরের মত গাড়িতে ঢুকে সোজা বার্লিন।'

মৌলা বললে, 'শুনলেন, মামা ?'

চাচা বললেন, 'আরে শোনই না শেষ অবধি।'

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় তখন ঘরে বসে মাথায় হাত দিয়ে ভাবছি, এমন সময় ঘরের দরজায় টোকা, আর সঙ্গে সঙ্গে ক্লারা। হায়, হায়, আমি ল্যাণ্ডলেডিকে একদম বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, সবাইকে যেন বলে, আমি মরে গিয়েছি কিংবা পাগলা গারদে বন্ধ হয়ে আছি কিংবা ওই ধরনের কিছু একটা।

শেষটায় মর-মর হয়ে ক্লারার কাছে মাতলামোর জন্য মাফ চাইলুম।

ক্লারা বললে, 'অত লজ্জা পাচ্ছ কেন ? ও তো মাতলামো না, পাগলামো। কিংবা অন্য কিছু, তুমি সব কিছু বুঝতে পার নি, আমরাও যে পেরেছি তা নয়।

'তুমি যখন দাদার সুট পরে ডিনারে এলে তখনই তোমার সঙ্গে কোথায় যেন দাদার সাদৃশ্য দেখে বাবা আর আমি দুজনাই আশ্চর্য হয়ে গেলুম, বিশেষ করে ব্যাকব্রাশ করা চুল আর একটুখানি ট্যারচা করে বাঁধা বো দেখে। তার পর তুমি জোর গলায় চাইলে বিয়ার, দাদাও বিয়ার ভিন্ন অন্য কোন মদ খেত না ; তুমি আরম্ভ করলে দাদারই মত বকতে, "লেখাপড়ার সময় কোথায় ? আমি তো করি হৈ-হৈ"—আমি জানতুম একদম বাজে কথা ; কিন্তু দাদা হৈ-হৈ করত আর বলতেও কসুর করত না।'

'শুধু তাই নয়। দাদাও ডিনারের পর বাবার সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলত এবং শেষটায় দুজনাতে ঝগড়া হত। জ্যাঠামশাই তখন নেমে এসে ওদের সঙ্গে তাস খেলা আরম্ভ করতেন এবং আবার হত ঝগড়া। অথচ তিনজনাতে ভালবাসা ছিল অগাধ।'

'তোমাকে আর সব বলার দরকার নেই ; তুমি যে ঘরে উঠেছিলে ওই ঘরেই একদিন দাদা আত্মহত্যা করে।'

'কিন্তু আসলে যে কারণে তোমার কাছে এলুম, তুমি মনে কষ্ট পেয়ো না ; বাবা-জ্যাঠামশাই আমাকে বলতে পাঠিয়েছেন, তাঁরা তোমার ব্যবহারে কিছু মাত্র আশ্চর্য কিংবা দুঃখিত হন নি।'

চাচা থামলেন।

রায় বললেন, 'চাচা, আপনি ঠিকই বলেছিলেন, শিস দিয়েছিল সুটটাই, বিয়ারও ও-ই খেয়েছিল।'

চাচা বললেন, 'হক কথা। মদ মানে স্পিরিট, স্পিরিট মানে ভূত, তাই স্পিরিট স্পিরিট খেয়েছিল।'

বাঁশী

আজ আর সে শান্তিনিকেতন নেই।

তার মানে এ নয়, গুরুদেব নেই, দিনুবাবু নেই, ক্ষিতিমোহনবাবু ক্লাস নেন না। সে তো জানা কথা। কোম্পানির রাজত্ব, মহারানীর সরকারই যখন চলে গেল তখন এঁরাও যে শালবীথি থেকে একদিন বিদায় নেবেন, সে তো আমাদের জানাই ছিল; কিন্তু এটা জানা ছিল না যে, আশ্রমের চেহারাটিও গুরুদেব সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

খুলে কই।

তখন আশ্রমের গাছপালা ঘর-বাড়ি ছিল অতি কম। গাছের মধ্যে শালবীথি, বকুলতলা, আম্রকুঞ্জ আর আমলকি-সারি। বাস্। হেথা-হোথা খানসাতেক ডরমিটরি, অতিথিশালা আর মন্দির। ফিরিস্তি কম্প্লিট। তাই তখনকার দিনে আশ্রমের যেখানেই বসো না কেন, দেখতে পেতে দূরদূরান্তব্যাপী, চোখের সীমানা-চৌহদ্দি ছাড়িয়ে—খোয়াইয়ের পর খোয়াই, ডাঙার পর ডাঙা—চতুর্দিকে তেপান্তরী মাঠ। ভোরবেলা সুজিঠাকুরের টিকিটি বেরুনোমাত্র সিটিও আমাদের চোখ এড়াতে পারত না। রাত তেরটার সময় চাঁদের ডিঙির গলুইখানা ওঠামাত্রই আমরা গেয়ে উঠতুম—'চাঁদ উঠেছিল গগনে।' যাবে কোথায়, চতুর্দিকে বেবাক ফাঁক। আর আজ? গাছে গাছে ছয়লাপ। আম জাম কাঁঠাল খানদানী ঘরানারা তো আছেনই, তার সঙ্গে জুটেছেন যত সব দেশ-বিদেশের নাম-না-জানা কালো নীল হলদে ইয়া-ইয়া ফুলের গাছ। এখন আশ্রমের অবস্থা কলকাতারই মত। সেখানে পাঁচতলা এমারত সুজি-চন্দর ঢেকে রাখে, হেথায় গাছপালায়।

ওই দূরদূরান্তে, চোখের সীমানার ওপারে তাকিয়ে থাকা ছিল আমাদের বাই। অবশ্য যারা লেখাপড়ায় ভাল ছেলে তারা তাকাত বইয়ের দিকে, আর আমার মত গবেটরা এক হাত দূরের বইয়ের পাতাতে চোখের চৌহদ্দি বন্ধ না রেখে তাকিয়ে থাকত সেই সুদূর বাটের পানে—তাকিয়ে আছে কে তা জানে। গুরুরা, অর্থাৎ শাস্ত্রীমশাই মিশ্রজী কিছু বলতেন না। তাঁরা জানতেন, বরঞ্চ একদিন শালতলার শালগাছগুলো নর-নরৌ-নরাঃ, গজ-গজৌ-গজাঃ উচ্চারণ করে উঠতে পারে কিন্তু আমাদের দ্বারা আর যা হোক, লেখাপড়া হবে না। অন্য ইস্কুল হলে অবশ্য আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হত, কিন্তু তাঁরা দরদ দিয়ে বুঝতেন, আমি বাপ-মা-খ্যাদানো ছেলে, এসেছি এখানে, এখান থেকে খেদিয়ে দিলে, হয় যাব ফাঁসি, নয় যাব জেলে।

এই দূরের দিকে তাকিয়ে থাকার নেশা আপনাদের বোঝাই কী প্রকারে? আমি নিজেই যখন সেটা বুঝে উঠতে পারি নি, তখন সে চেষ্টা না করাই শ্রেয়। তবে এইটুকু বলতে পারি, এ-নেশাটা সাঁওতাল ছোঁড়াদের বিলক্ষণ আছে। আকাশের সুদূর সীমানা খুঁজতে গিয়ে তারা বেরিয়েছিল সাঁজে, তারপর অন্ধকার রাতে, পথ হারিয়ে একই জায়গায় সাত শো বার চক্কর খেয়ে

পেয়েছে অক্কা। বুড়ো মাঝিরা বলে, পেয়েছিল ভূতে। সে-কথা পরে হবে।

আমি শান্তিনিকেতনে আসি ১৯২১ সনে। গাঁইয়া লোক। এখানে এসে কেউ বা নাচে ভরতনৃত্যম, কেউ বা গায় জয়জয়ন্তী, কেউ বা লেখে মধুমালতী ছন্দে কবিতা, কেউ বা গড়ে নব নটরাজ, কেউ বা করে বাতিক, লেদার-ওয়ার্ক, ফ্রেস্কো, স্টুকো, উড-ওয়ার্ক, এচিং, ড্রাই-পয়েন্ট, মেদজো-টিন্ট্ আরও কত কী। এক কথায় সবাই শিল্পী, সবাই কলাবৎ।

আমারও বাসনা গেল—শিল্পী হব। আর্টিস্ট হব। ওদিকে তো লেখা-পড়ায় ডডনং, কাজেই যদি শিল্পীদের গোয়ালে কোন গতিকে ভিড়ে যেতে পারি তবে সমাজে আমাকে বেকার-বাউণ্ডুলে না বলে বলবে শিল্পী, কলাবৎ, আর্তিস্ৎ।

অথচ আমার বাপ-পিতামোর চোদ্দপুরুষ, কেউ কখনও গাওনা-বাজনার ছায়া মাড়ানো দূরে থাক্, দূর থেকে ঝঙ্কার শুনলেই রামদা নিয়ে গাওয়াইয়ার দিকে হানা দিয়েছেন। আমরা কট্টর মুসলমান। কুরানে না হোক আমাদের স্মৃতি-শাস্ত্রে গাওনা-বাজনা বারণ, বাঁদর-ওলার ডুগডুগি শুনলে আমাদের প্রাচিত্তির করতে হয়। আমার ঠাকুদ্দাদার বাবা নাকি সেতারের তার দিয়ে সেতারীকে ফাঁসি দিয়ে শহীদ হয়েছিলেন।

কাজেই প্রথম দিন ব্যালাতে ছড় টানা মাত্রই আশ্রমময় উঠল পরিত্রাহি অট্টরব। কেউ শুধালে, গরু জবাই করছে কে; কেউ ছুটলে গুরুদেবের কাছে হিন্দু ব্রহ্মচর্যাশ্রমে মামদো ভূতের উপদ্রব থামাবার জন্য অনুরোধ করতে। গুরুদেব পড়লেন বিপদে। তাঁর মনে পড়ল আপন ছেলেবেলাকার কাহিনী—তাঁর পিতৃদেব তাঁর প্রথম কবিতা শুনে কী রকম বাঁকা হাসি চেপে ধরেছিলেন। তাই তিনি সে রাত্রে কবিতা লিখলেন,

'আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে
বাঁশী তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে?'

কার হাতে আর দেবেন? দিলেন আমারই হাতে। সবাই বুঝিয়ে বললে, 'ভাই ব্যালাটা ক্ষান্ত দাও। বাঁশী বাজাও; কিন্তু দোহাই আশ্রম-দেবতার আশ্রমের বাইরেই রেওয়াজটা কোর।'

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা বাঁশী হাতে নিয়ে গেলুম সাঁওতাল-গাঁয়ের দিকে। পশ্চিমাস্য হয়ে, অস্তমান সূর্যের দিকে তাকিয়ে ধরলুম তোড়ি।

সাঁওতাল-গাঁয়ের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে মেলা 'এন্‌কোর', 'সাধু সাধু' রব কাড়লে।

সুদূর দিক্‌প্রান্তের দিকে, অস্তমান সূর্যের পানে তাকিয়ে আমার মাথায় তখন চাপল সেই বাই, যেটা পূর্বেই আপনাদের কাছে নিবেদন করেছি—হোথায় যেথায় সূর্য অস্ত যাচ্ছে, আমাকে সেখানে যেতে হবে।

নেমে পড়লুম খোয়াইয়ে।

গোধূলির আলো ম্লান হয়ে আসছে। তারই লালিমা খোয়াইয়ের গেরুয়াকে কী রকম যেন মেরুন রঙ মাখিয়ে দিচ্ছে। চতুর্দিকে কী রকম যেন একটা

ক্লান্তি আর অবসাদ। আমি সুদূরের নেশায় এগিয়ে চললুম।

হঠাৎ দুম্ করে অন্ধকার হয়ে গেল।

প্রথমটায় বিপদ বুঝতে পারলুম না। বুঝলুম মিনিট পাঁচেক পরে। অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে, উঁচু ঢিপি থেকে গড়গড়িয়ে সর্বাঙ্গ ছড়ে গিয়ে নীচে পড়ে, হঠাৎ উঁচু ঢিপির সঙ্গে আচমকা নাকের ধাক্কা লেগে, কখনও বা কারও অদৃশ্য পায়ে বেমক্কা ল্যাং খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে।

উঠি আর পড়ি, পড়ি আর উঠি।

দশ মিনিটে সাঁওতাল-গাঁয়ে ফেরার কথা। পনের, পঁচিশ মিনিট, আধ-ঘণ্টাটাক হয়ে গেল, গাঁয়ের কোনও পাত্তাই নেই।

ততক্ষণে রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছি। জাহান্নামে যাক গে আকাশের সীমানা-ফিমানা, এখন আশ্রমের ছেলে আশ্রমে ফিরতে পারলে বাঁচি। কিন্তু কোথায় আশ্রম, কোথায় সাঁওতাল-গ্রাম! একই জায়গায় চক্কর খাচ্ছি, না, কোন একদিকে এগিয়ে যাচ্ছি তাই আল্লার মালুম।

এমন সময় কানের কাছে শুনি—

অদ্ভুত তীক্ষ্ণ কেমন যেন এক আর্তরব! একটানা নয়, থেমে থেমে। কেমন যেন—ফিঁৎ, ফিঁৎ, ফিঁৎ, ফী-ী-ী-ী-ীৎ!

ভয়ে ছুট লাগাবার চেষ্টা করলুম। সেই ফিঁৎ ফিঁৎ যেন কলরব করে উঠে আরও জোরে চেঁচাতে লাগল—ফীঁৎ ফীঁৎ!

ইয়া আল্লা, ইয়া পয়গম্বর, ইয়া মৌলা আলীর মুরশীদ। বাঁচাও বাবারা, এ কী ভূত, না প্রেত, না ডাইনী!

হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলুম গড়গড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভুতুড়ে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাপার কী!

আস্তে আস্তে ফের রওয়ানা দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই শব্দ—প্রথমে ক্ষীণ, আমি যত জোরে চলতে থাকি শব্দটাও সঙ্গে সঙ্গে জোরালো হতে থাকে। প্রথমটায় আস্তে আস্তে—ফিঁৎ, ফিঁৎ, ফিঁৎ। আমি যত জোর চলতে আরম্ভ করি শব্দটাও দ্রুততর হতে থাকে—ফিঁৎ ফিঁৎ ফিঁৎ।

আর সে কী প্রাণঘাতী, জিগরের খুন-জমানেওলা শব্দ!

যেন কোন কঙ্কালের নাকের ভিতর দিয়ে আসছে দীর্ঘনিশ্বাস—কখনও ধীরে ধীরে আর কখনও বা দ্রুতগতিতে। একদম, আমার সঙ্গে কদম কদম বাড়হায়ে যাচ্ছে, আমার কানের কাছে যেন সেঁটে গিয়ে, লম্বা লম্বা হাতের আঙুল দিয়ে কানের পর্দাটা ছিঁড়ে দিচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল গুরুদেবের "কঙ্কাল" গল্পটা। কিন্তু গুরুদেব মহর্ষির সন্তান; তিনি ভয় পান নি। বেশ জমজমাট করে খোশগল্প করেছিলেন কঙ্কাল আর ভূতের সঙ্গে। আমি পাপী—নেমাজ-রোজা নিত্য নিত্য কামাই দিই।

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার যেন আমার গলার টুঁটি চেপে ধরল।

আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম। দেখি, যেন আমার চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ তারা

ফুটে উঠছে। কিন্তু হলদে রঙের। 'প্যোর কোলমনস মাস্টার্ড'।'

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম, বলতে পারব না।

যখন হুঁশ হল তখন গায়ে লাগল পুবের বাতাস। তাই উলটো দিকে চলতে আরম্ভ করলুম। ওই রকম যদি চলতে থাকি, তবে একদিন না একদিন আশ্রম, ভুবনডাঙা, কিংবা রেল লাইনে পেঁছিবই পেঁছিব।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ জোরে সেই—ফিঁৎ ফিঁৎ ফিঁৎ।

কিন্তু এবারে সঙ্গে সঙ্গে একটা ঢিপিতে উঠতেই দেখি—উত্তরায়ণ। তারই বারান্দায় গুরুদেবের সৌম্য মূর্তি। টেবিল-ল্যাম্পের পাশে বসে মিশ্রজীর সঙ্গে গল্প করছেন!

আমি চিৎকার করে উঠলুম—

ওয়া গুরুজীকি ফতে।

গুরুর জয়, গুরুদেবের জয়।

তিনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন। তাঁরই কৃপায় রক্ষা পেয়েছি।

কিন্তু 'ওয়া গুরুজীকী ফতে' বেরিয়েছিল—'ওবা গরজীকী ফত' হয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে, চাপা সুরে।

ততক্ষণে ধড়ে জান ফিরে এসেছে।

শব্দটা তবে কিসের ছিল?

বাঁশীর। আমার চলার সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীতে হাওয়া ঢুকে ফিঁৎ ফিঁৎ করছিল। জোরে চললে হাত ঘন ঘন দোলা খেয়েছে, ফিঁৎ ফিঁৎও জোরে বেজেছে। আস্তে চললে আস্তে আস্তে।

বাঁশীটা ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। শেষবারের মত ফিঁৎ করে কাতর আর্তনাদ ছেড়ে সে নীরব হল।

আমি কলাবৎ হবার চেষ্টা করি নি।

গুরুদেব যখন গেয়েছেন—

'বাঁশী তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে?'

তখন আমার কথা ভাবেন নি।

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৫৭

সম্পাদক

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সুমথনাথ ঘোষ

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা

শ্রীচুনী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ

সিল্ক স্ক্রীন ও

চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে

এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ শশী প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট,

কলিকাতা ৬ হইতে অশোককুমার ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা	গৌরকিশোর ঘোষ		/০
ধূপছায়া			
দেশভ্রমণ	...	...	১
রসগোল্লা	...	...	৬
চাপরাসী ও কেরানী	...	...	১৫
চিন্তা	...	...	২৪
বাঙালী	...	...	৩২
সুকুমার রায়	...	...	৩৬
ভাষার জমা-খরচ	...	...	৪০
দর্শনচর্চা	...	...	৪৪
লেসে ফ্যের	...	...	৪৮
মার্কিনী তাত	...	...	৫২
বাঙ্গালী মেনু	...	...	৫৪
রন্ধন-যজ্ঞ	...	...	৫৮
'বাঁশবনে—'	...	...	৬২
বাংলার গুণ না জর্মন গুণী	...	...	৬৮
শিক্ষাপ্রসঙ্গ	...	...	৭১
পোলেমিক	...	...	৭৪
চরিত্র-বিচার	...	...	৭৮
দেয়ালি	...	...	৮১
গানের কথা : ভারত ও কাবুল	...	...	৮৩
উনো, হিন্দী, ক্রিকেট	...	...	৮৪
বুদ্ধং শরণং	...	...	৮৮
অ্যার ট্রাভেল	...	...	৯২
ভাষা ও জনসংযোগ	...	...	১০২
ইংরাজী বনাম মাতৃভাষা	...	...	১০৫
টুকিটাকি	...	...	১১৭

খেলাচ্ছলে ১১৮
পিকনিকিয়া ১২১
সাহিত্যিকের মাতৃভাষা ১২২
আসা-যাওয়া ১২৩
দেহলি-প্রান্ত ১২৫
পঞ্চতন্ত্র (২য় পর্ব)
ঐতিহাসিক উপন্যাস ১৩১
কচ্ছের রাণ ১৩৫
দর্শনাতীত ১৪০
মা-মেরীর রিস্ট-ওয়াচ ১৪৪
অনুবাদ সাহিত্য ১৪৮
বাবুর শাহ্ ১৫২
ফের্ডিনান্ট্ জাওয়ারব্রুখ ১৫৫
হিডজিভাই পি মরিস্ ১৬০
'আধুনিক' কবিতা ১৬৬
মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা পণ্ডিতের নিদ্রা শ্রেয়ঃ ... ১৭১
আলবের্ট শ্বোয়াইৎসার ১৭৯
মরহুম ওস্তাদ ফৈয়াজখান ১৮১
'পঞ্চাশ বছর ধরে করেছি সাধনা।' 'কটা ভাষা?' 'হা কপাল!
বাঙলাই হল না।' ১৮৫
ইণ্টারভ্যু ১৯০
অর্থং অর্থং ১৯৫
অদ্যাপিও সেই খেলা খেলে গোরা রায়।
মধ্যে মধ্যে ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥ ১৯৯
সাবিত্রী ২০৫
আধুনিকা ২১৯
ফরাইজ্ ২১২
চোখের জলের লেখক ২১৬
ছাত্র বনাম পুলিশ ২২০
রাসপুতিন ২৩৯
বিষ্ণুশর্মা ২৫৭
বার্লাম ও য়োসাফট্ ২৬১

রবি-মোহন-এনড্রুজ ২৬৫
'ইজরায়েল বিশ্বের প্রবাদ-সত্য রূপে গণ্য হবে'—বাইবেল ... ২৭২
এমেচার ভার্সস স্পেশালিস্ট ২৭৮
মিজোর হেপাজতী ২৮৩
গাড়োলস্য গাড়োল ২৯১
ভাষা ২৯৬
কবিগুরু ও নন্দলাল ২৯৮
খেলেন দই রমাকান্ত ৩০১

চতুরঙ্গ

রবি-পুরাণ ৩০৯
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ৩১৩
পুষ্পধনু ৩২৭
মরহুম মৌলানা ৩৩০
নসরুদ্দীন্ খোজা (হোক) ৩৩৬
নজরুল ইসলাম ও ওমর খৈয়াম ৩৪৬
ত্রিমূর্তি (চাচা-কাহিনী) ৩৬১
মামদোর পুনর্জন্ম ৩৬৮
দিল্লী-স্থাপত্য ৩৭৭
বেজো না চরণে চরণে ৩৮৯
ইভান সের্গেভিচ তুর্গেনেফ ৩৯৩
গাঁজা ৪০১
হরিনাথ দে'র স্মরণে ৪০৯
অনুকরণ না হনুকরণ ? ৪১৬
ফরাসী-বাঙালা ৪২২
চার্লি চ্যাপলিন ৪৩১
ফিল্মের ভাষা ৪৩৭
ক্রন্দসী ৪৪২
ছুছুন্দর কা সির্‌পর চামেলি কা তেল ৪৪৮
আর্ট না অ্যাকসিডেন্ট ৪৫২
আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন ৪৫৬

ভূমিকা

কোনও কোনও জ্ঞানীগুণীর সৈয়দ মুজতবা আলী সম্পর্কে অনুযোগ, তাঁর পাণ্ডিত্য যত ছিল, তাঁর রচনায় তিনি তার পরিচয় রেখে যেতে পারেননি। নিজে জ্ঞানী বা গুণী কোনটাই নই, তাই ও-কথার সত্য মিথ্যা যাচাই করতে পারব না। তবে লোককে জ্ঞান দেবার জন্য কোনও আগ্রহ এই মজলিশী মানুষটি কখনও দেখিয়েছেন বলে মনে পড়ে না। তাঁর চরিত্র বরং ছিল ঠিক উলটো। পণ্ডিতিয়ানা কি গুরুমশাইগিরি মুজতবার ধাতে সইত না।

পঞ্চতন্ত্রে মুজতবা এক জায়গায় লিখেছেন, "বেহেশ্‌তের বর্ণনাতে ইলিশের উল্লেখ নেই বলে পাঁচ-বখৎ নামাজ পড়ে সেথায় যাবার বাসনা আমার নেই।" এই মন্তব্যটা থেকেই তাঁর চরিত্র বোঝা যায়। তত্ত্বজ্ঞানী হবার বাসনা তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন রসালাপী। একেবারে নৈকুষ্যি আড্ডাবাজ। আর এই কথাটা মুজতবা কি লেখায় আর কি জীবনচর্যায় কোথাও লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেননি। "আম্মো যে আড্ডাবাজ সে তত্ত্বটা ওদেরও মনে ঝিলিক দিয়ে গেল একই ব্রাহ্ম মুহূর্তে।" কায়রোর আড্ডাধারীরাই যে প্রথম দর্শনে আড্ডাবাজ মুজতবাকে চিনে নিতে পেরেছিল তাই নয়, তাঁর অগণিত পাঠকবর্গও তাঁকে চিনে নিতে ভুল করেননি। আড্ডাপ্রিয় বাঙালীর জন্য যে রস তিনি সাহিত্যের ভিয়েনে সৃষ্টি করে গিয়েছেন তা আদ্যন্ত আড্ডারই রস।

আর এই আড্ডার চক্রবর্তী বলুন, কুতব মিনার বলুন, অশোক স্তম্ভ বলুন, স্বয়ং সৈয়দ মুজতবা আলী। চাচা কাহিনীর অবিস্মরণীয় চাচার কথা স্মরণ হলেই আমার আলী সাহেবের কথা মনে পড়ে যায়। পার্ক সার্কাসে ৫নং পার্ল রোডে এবং নাসিরউদ্দীন রোডের আস্তানায়, দিল্লীতে কনসটিটিউশন ক্লাবে, বোলপুরের উকিলপাড়ার বাসাবাড়িতে, শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায় চায়ের দোকানে, কি কলকাতার বিভিন্ন পানশালায় যখনই সৈয়দ মুজতবা আলীর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তিনি বারলিন শহরের কুরফুরসটেন-ডাম সড়কে অবস্থিত 'হিন্দুস্থান হৌসে'র আড্ডার চক্রবর্তী চাচার মত, যার অনবদ্য বিবরণ তাঁর রচিত 'চাচা কাহিনী'র পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে, আড্ডা জমিয়ে বসে আছেন। তিনিই সে আড্ডার মধ্যমণি এবং বখতিয়ার খিলজী। কথা বলতে এতও ভালবাসতেন! আর কত বিষয়ই না জানতেন!

ওঁর কথা আমরা এমন গোগ্রাসে গিলতাম যে তিনি বিদগ্ধ না অর্ধদগ্ধ তা

বিচার করে দেখবার ফুরসতই পাইনি। তবে আড্ডাবাজ মুজতবা আলীর যে পরিচয় আমীনুর রশীদ চৌধুরী সাহেব সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের জবানীতে (দেশ, ৪১ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, পৃ ৪১৬) দিয়েছেন তার খানিকটা উদ্ধৃত করছি। পাঠক মহাশয়েরা এর থেকেই কিছুটা আন্দাজ নিশ্চয়ই পাবেন।

"দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথা শুনিতে শুনিতে পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরিয়া গিয়াছিল। পাশে একটি কফির দোকান ছিল, প্রস্তাব করিলাম সেখানে একটু গিয়া বসি, এক কাপ কফি খাই। তারপর সেখানে বসিয়া কফির অর্ডার দিয়া পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের কথা দুই পক্ষেরই জিজ্ঞাসাবাদ চলিল। একজনের কথা উঠিতে আমি বলিলাম যে সর্বনাশের পথ ধরিয়া সারাদিন মদ খাইয়া চুর হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য—আমি মদ খাই না এবং সাহচর্যগুণে ঐ জিনিসটির প্রতি আমার বিতৃষ্ণা আছে। মুজতবা আলী কিন্তু সেই মদের উপর কথা পাড়িয়া বসিলেন। পৃথিবীতে কত রকম মদ আছে এবং ঐগুলা কিভাবে তৈরি হয়, কিভাবে খাওয়া হয়, কোন্ মদের স্বাদ কি রকম—এই সবের আলোচনা—বিশদ আলোচনা আরম্ভ করিলেন। আমরা তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিলাম। উনি যখন তাঁহার কথা শেষ করিলেন তখন আবিষ্কার করিলাম সন্ধ্যার বাতি জ্বলিয়া গিয়াছে। আমাদের দুপুরের খাওয়াও হয় নাই।

"আগে মুজতবা আলীর কথাবার্তা শুনিয়া মনে করিতাম যে তাঁহার মধ্যে গভীরতা নাই। কিন্তু আমাদের মতো তিনটি প্রাণীকে প্রায় ঘণ্টা দশেক যাবৎ যে তন্ময় করিয়া রাখিতে পারেন তাঁহার মধ্যে গভীরতা নাই একথা কি করিয়া বলি।"

লোককে নাওয়া খাওয়া ভুলিয়ে কথা শোনাবার যে এলেম মুজতবা আলীর ছিল তা তাঁর লেখাতেও বর্তেছে। তাঁর অননুকরণীয় বাগ্‌ভঙ্গীই যে তাঁর রচনা-রীতিকে গড়ে তুলেছিল সে বিষয়ে বিতর্কের সুযোগ নেই। মুজতবা আলীর যে-কোনও রচনা পড়লেই মনে হয়, তিনি কলমের মুখে কথা বলছেন। একটা উদাহরণ দিই। মদের প্রতি সজনীবাবুর বিতৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও মুজতবা আলীর সামনে ঘণ্টা দশেক ঠাঁই বসে থেকে তাঁকে মদের নানা ব্যাখ্যান শুনতে হয়েছিল। তেমনি তামাকের নামে মূর্ছা যান এমন লোকও এই বিবরণটির শেষ না পড়ে পারবেন না, একথা আমি হলফ করে বলতে পারি।

"বলে কি? কাইরোতে তামাক? স্বপ্ন নু মায়া নু মতিভ্রম নু?

"দিব্যি ফর্শী হুঁকো এল। তবে হনুমানের ন্যাজের মত সাড়ে তিনগজী দরবারি নল নয় আর সমস্ত জিনিসটার গঠন কেমন যেন ভোঁতা ভোঁতা।

জরির কাজ করা আমাদের কর্শী কেমন যেন একটু 'নাজুক', মোলায়েম হয়—এদের যেন একটু গাঁইয়া। তবে হ্যাঁ, চিলিমটা দেখে তক্তি হল—ইয়া ডাবর পরিমাণ। একপো তামাকে হেসেখেলে তার ভিতর খানা গাড়তে পারে—তাওয়াও আছে। আগুনের বেলা অবিশ্যি আমি টিকের ধিকিধিকি গোলাপী গরম প্রত্যাশা করিনি, কারণ কাবুলেও দেখেছি টিকে বানাবার গুহ্যতথ্য সেখানকার রসিকরাও জানেন না।

"আর যা খুশবাই বেরল তার রেশ দীর্ঘ চৌদ্দ বছর পরও যেন আমার নাকে লেগে আছে।

"পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো সুগন্ধী ইজিপশিয়ন সিগারেট ভুবনবিখ্যাত। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছ বিশেষ করে মিশরই সুগন্ধী সিগারেট তরিবৎ করে বানাতে শিখল কি করে? আইস, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গবেষণা করা যাক। এই সিগারেট বানাবার পিছনে বিস্তর ইতিহাস, এন্তার রাজনীতি এবং দেদার রসায়ন শাস্ত্র লুক্কায়িত আছে।

"সিগারেটের জন্য ভালো তামাক জন্মায় তিন দেশে। আমেরিকার ভার্জিনিয়াতে, গ্রীসের মেসেডোন অঞ্চলে এবং রুশের কৃষ্ণসাগরের পারে পারে। ভারতবর্ষ প্রধানত ভার্জিনিয়া খায়, কিছুটা গ্রীক কিন্তু এই গ্রীক তামাক এদেশে টার্কিশ এবং ইজিপশিয়ন নামে প্রচলিত। তার কারণ একদা গ্রীসের উপর আধিপত্য করতো তুর্কী এবং তুর্কী গ্রীসের বেবাক তামাক ইস্তাম্বুলে নিয়ে এসে কাগজ পেঁচিয়ে সিগারেট বানাত। মিশরও তখন তুর্কীর কব্জাতে, তাই তুর্কীর কর্তারা কিছুটা তামাক মিশরে পাঠাতেন। মিশরের কারিগররা সেই গ্রীক তামাকের সঙ্গে খাঁটি মিশরের খুশবাই মিশিয়ে দিয়ে যে অনবদ্য রসনলী নির্মাণ করলেন তারই নাম ইজিপশিয়ন সিগারেট।"—(আড্ডা, পঞ্চতন্ত্র)

সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রতিভার সম্যক পরিচয়টা তুলে ধরবার জন্যই এই নাতিদীর্ঘ উদ্ধৃতিটি তুলে ধরা হল। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, শুধুমাত্র বাগ্‌-বিভূতি নয়, মুজতবা আলী কথার পরতে পরতে হরেক রকম তথ্য ও সমাচার এমন সুন্দর আন্দাজে পরিবেশন করতে পারতেন বলেই তাঁর শ্রোতা বা পাঠক মুগ্ধ হয়ে পড়তেন। আর তাঁর পরিবেশিত তথ্যসম্ভার ছিল যত ব্যাপক তত বিচিত্র। দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা এবং অক্লান্ত অধ্যয়নই তাঁকে এই সুবিপুল রত্ন-ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী করে তুলেছিল। আর এর জন্য তাঁকে কত না পরিশ্রম করতে হয়েছিল। এই পরিশ্রমের ব্যাপারটা তিনি তাঁর পাঠকদের কাছে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখতেন, যে তথ্য তিনি অনায়াসে সরসভাবে পরিবেশন করে গেলেন তা সংগ্রহ

করার পিছনে যে কত ঘাম ঝরেছে (আরবী, ফার্সী, উর্দু, হিন্দী, সংস্কৃত, মারাঠী, গুজরাতী, ইংরেজী, ফরাসী, জর্মান সহ পনেরটি ভাষা তাঁর অধিগত ছিল) তা আদৌ বোঝা যেত না, সম্ভবত সেই কারণেই জ্ঞানীগুণী মহল থেকে এই মন্তব্য শোনা যেত, জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে ইংরেজিতে যাকে বলে playing to the gallery তিনি তাই করে গিয়েছেন, আর তাই করতে গিয়ে শক্তির অপচয় করেছেন। আমি মনে করি, সৈয়দ মুজতবা আলীকে আমরা তত্ত্বজ্ঞানী অধ্যাপকরূপে না পেয়ে যে রসালাপী আড্ডাধারীরূপে পেয়েছি, এটা আমাদের পক্ষে শাপে বর হয়েছে।

॥ দুই ॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ১৯৪৮ সালে, একটা অদ্ভুত ঘটনার মধ্য দিয়ে। তখন দেশ পত্রিকায় তাঁর "দেশে-বিদেশে" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে আমাদের একেবারে চমকে দিচ্ছে। ঐ বছরই সত্যযুগ পত্রিকায় ফা হিয়েন ছদ্মনামে লিখিত আমার একটা রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথম কিস্তি পড়েই উনি আমাকে তলব করেন। ৫নং পার্ল রোডের বাড়ির একতলায় একটা ঘরে তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ এবং ঐ বাড়িরই তিন-তলার ঘরে তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে শেষ সাক্ষাৎ।

প্রথম সাক্ষাতে তাঁকে আমার নদে-শান্তিপুরের গোসাঁই বলেই মনে হয়েছিল। মাথাভর্তি টাক, সহাস্য, প্রাণোচ্ছল, দীপ্যমান সে চেহারা ভোলবার নয়। তাঁর অগ্রজ সৈয়দ মুর্তাজা আলী লিখেছেন, "বাল্যকালে মুজতবা আলীর চেহারা অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তার বর্ণ গৌর ছিল। মুখের রেখা ধারালো।...বাস্তবিকই সে যৌবনে ছিল কাঞ্চনকান্তি সুপুরুষ। তার ডাকনাম ছিল সিতারা বা নক্ষত্র।"

তার দাদার এই বিবরণ থেকেই জানা যায়, ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন সিলেটে আসেন তখন তিনি ছাত্রদের কাছে 'আকাঙ্ক্ষা' সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। মুজতবা আলীর বয়স তখন চৌদ্দ বছর। বক্তৃতা শুনে কারো সঙ্গে পরামর্শ না করেই মুজতবা রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে জিজ্ঞাসা করেন, "আকাঙ্ক্ষা উচ্চ করতে হলে কি করা প্রয়োজন?" রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আকাঙ্ক্ষা উচ্চ করিতে হইবে—এই কথাটার মোটামুটি অর্থ এই—স্বার্থই যেন মানুষের কাম্য না হয়। দেশের মঙ্গলের জন্য ও জনসেবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ কামনাই মানুষকে কল্যাণের পথে

নিয়ে যায়। তোমার পক্ষে কি করা উচিত তা এতদূর থেকে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে তোমার অন্তরের শুভেচ্ছাই তোমাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে।"

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিখানাই তরুণ মুজতবাকে রবীন্দ্রনাথের কাছে এনে দেবার যোগসূত্রের কাজ করে। ১৯২১ সালে দেশে অসহযোগ আন্দোলনের বন্যা আসে। মুজতবা আলী তখন সিলেটে সরকারী হাই স্কুলে ক্লাস নাইনের ছাত্র ও ক্লাসের ফার্স্ট বয়। সরস্বতী পূজার সময়ে কয়েকটি হিন্দু ছাত্র ডেপুটি কমিশনারের বাংলো থেকে কুল চুরি করে। পরের দিন ডেপুটি কমিশনার ডসন সাহেব চুরির খবর পেয়ে দোষী ছেলেদের ডেকে পাঠান। ছেলেরা উপস্থিত হলে ডেপুটি কমিশনারের হুকুমে চাপরাসীরা ছেলেদের দু-এক ঘা বেত মারে। ছেলেরা ধর্মঘট করল। তখন যে সব সরকারী কর্মচারীর পুত্রেরা ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল তাদের অভিভাবকদের উপর কর্তৃপক্ষ চাপ দিলেন। মুজতবা আলীর পিতা সৈয়দ সিকান্দর আলী তখন সিলেটে জেলা সাবরেজিস্ট্রারের পদে বহাল। ১৯০৪ সালে তিনি যখন করিমগঞ্জ শহরে রেজিস্ট্রেশন বিভাগে চাকরি করতেন তখন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মুজতবা জন্মগ্রহণ করেন।

ডেপুটি কমিশনার সাহেব মুজতবা আলীর বাবাকে ডেকে নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। বাবা মুজতবাকে স্কুলে ফিরে যেতে বললেন। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুজতবা কিছুতেই স্কুলে ফিরে যেতে রাজী হলেন না। বাবা তাঁকে সরকারী স্কুলে ফিরে যেতে বললে তিনি শান্তিনিকেতনে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন সবেমাত্র বিশ্বভারতী স্থাপিত হয়েছে। তখন রবীন্দ্রনাথ নিজেই বিশ্বভারতীতে পড়াতেন। মুজতবা আলী তাঁর কাছে বলাকা, শেলী ও কীটসের কাব্য অধ্যয়ন করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তখন বেনোয়া, বগদানফ, সিলভা লেভি, ভিনটারনিৎস, তুচ্চি প্রভৃতি দিকপাল অধ্যাপকগণ বিশ্বভারতী আলো করে ছিলেন। এঁদের সান্নিধ্যে আসার ফলেই মুজতবার নানা ভাষা শিক্ষার বুনিয়াদ তৈরি হয়ে যায়। তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণাও বেড়ে ওঠে।

শান্তিনিকেতনের পড়া শেষ করে মুজতবা আলী কিছুকাল আলীগড়ে পড়াশুনা করেন। তারপর তাঁর কাবুলে অধ্যাপনা করতে যাওয়ার সুযোগ হয়। সেখানে দু বছর থাকবার পর ১৯২৯ সালে দেশে ফিরে আসেন। এই সময়ের অভিজ্ঞতাই তাঁর অবিস্মরণীয় রচনা 'দেশে-বিদেশে'র উৎস।

এরপর মুজতবা জার্মান বৃত্তি নিয়ে প্রথমে বার্লিন এবং পরে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। আমীনুর রশীদ চৌধুরী সাহেব লিখেছেন, ব্রাসেলসে পাকিস্তান দূতাবাসের প্রথম সেক্রেটারী ডঃ হাসান ইমাম, আদি নিবাস বিহারে, তাঁকে

সিলেটের লোক জেনে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলীকে চেনেন কি না? "আমি উত্তর দিলাম, চিনিব না কেন, উনি তো আমার আত্মীয়ও হন। এরপর ভদ্রলোকের উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। আমাকে বলিলেন, দেখুন, আমি বন বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ভরতি হই তখন অধ্যাপকমণ্ডলীর মুখে প্রাচ্যের একজন ছাত্রেরই নাম শুনিতাম। তিনি হইলেন ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী।" বন থেকে তিনি ডক্টর ডিগ্রি পান। বন বিশ্ববিদ্যালয় পায় তাঁর গবেষণা 'খোজা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও তাদের বর্তমান ধর্মজীবন'। আর আমরা, বাঙালী পাঠকেরা, পেয়েছি মুজতবার কান্না-হাসির মালায় গাঁথা অভিজ্ঞতার অপূর্ব ফসল, আমার মতে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'চাচা কাহিনী'।

১৯৩২ সালে তিনি জার্মানী থেকে দেশে ফিরে আসেন। তারপর আবার ইওরোপ যাত্রা এবং ইওরোপ থেকে কায়রো। সেখানে আল-আজহার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়াশুনা করেন। বরোদার মহারাজা সয়াজীরাও গাই-কোয়াড়ের সঙ্গে কায়রোতেই তাঁর আলাপ হয়। কায়রোর কথা 'পঞ্চতন্ত্রে'র এখানে-ওখানে ছড়ানো। আর তাঁর 'কোদণ্ড মুখহানা'র কাহিনী তো বাঙালী পাঠকের কাছে কায়রোকে দৃঢ় বন্ধনে বেঁধে রেখে দেবে চিরকাল।

১৯৩৪ সালে দেশে ফিরে মুজতবা বরোদা যান। বরোদা কলেজে তিনি তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। মহারাজার মৃত্যুর পর তিনি কলকাতায় ফিরে এসে ৫নং পার্ল রোডে তাঁর বন্ধু আবু সয়ীদ আইয়ুবের সাহচর্যে বাস করতে থাকেন। অসুস্থ আইয়ুব চিকিৎসার জন্য মদনাপল্লী গেলে মুজতবাও তাঁর অনুগমন করেন এবং এই সময় কিছুদিন বাঙ্গালোরে বাস করেন। তিনি রমন মহর্ষির প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এবং আশ্রমবাসীও হয়েছিলেন।

বাঙ্গালোরে বসেই তিনি 'দেশে-বিদেশে' রচনা শুরু করেন। তবে আনন্দ-বাজার পত্রিকায় সত্যপীর এবং টেকচাঁদ ছদ্মনামে তাঁর রচনা তার আগেই প্রকাশিত হয়েছে। 'দেশে-বিদেশে'র প্রকাশ যেন তাঁর দিগ্বিজয়ের সমান।

১৯৪৯ সালে সৈয়দ মুজতবা আলী বগুড়া কলেজে অধ্যক্ষরূপে যোগ দেন। কিন্তু তাঁর পরিশীলিত এবং পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারা তাঁর পাকিস্তান বাসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে তিনি আবার কলকাতায় চলে আসেন এবং ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। এরপর আকাশবাণীতে যোগ দিয়ে তিনি কটকের স্টেশন ডিরেক্টার হন। তার আগে তিনি কিছুদিন ভারত সরকারের কালচারাল রিলেশন্‌স সংস্থার সেক্রেটারীর পদেও কাজ করেন। আকাশবাণীর চাকরি ছেড়ে তিনি বিশ্বভারতীতে যোগ দেন। সেখানে প্রথমে

জার্মান ভাষা পড়াতেন পরে তিনি ইসলামিক কালচার বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিশ্বভারতীর অধ্যাপনা ছাড়বার পর সাহিত্যচর্চা ছাড়া আর কিছু করেননি।

১৯৩১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষাব্রতী শ্রীমতী রাবেয়া খাতুনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। মুজতবা আলীর দুই পুত্র সৈয়দ মশররফ্ আলী এবং সৈয়দ জগলুল আলী বাংলাদেশেই বাস করেন।

॥ তিন ॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর মধ্যে একটা ভাবুক, সদা ছট্‌ফটে রসিক শিশু পুরুষ লুকানো ছিল। পরিহাসের তলায় অনেক গ্লানি লুকিয়ে রাখার ক্ষমতা তাঁর ছিল অসাধারণ। 'দেশে-বিদেশে' কি 'চাচা-কাহিনী'র পাতায় পাতায় যার অজস্র নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। গভীর মর্মান্তিক সব দুঃখের কাহিনী কত অনায়াসেই না বলে যেতে পারতেন! হাসতে গিয়ে মনে হত কি বোকাই না বনে গিয়েছি।

৫নং পার্ল রোডের বাড়িতেই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। বেশ কিছুদিন ধরে রোগে ভুগছিলেন। কোথায় সেই উজ্জ্বলকান্তি! অবসন্ন পাণ্ডুর চেহারাটি নিয়ে তিনি "আস্তাজ্ঞা হোক" বলে চৌকির উপর উঠে বসলেন। চারদিকে বই ছড়ানো। এলোমেলো ঘর। গায়ে একটা নক্‌শী-কাঁথা জড়ানো।

এই এলোমেলো বেশবাসের মধ্যেও যেটা হারায়নি তা হল তাঁর অনর্গল কথার স্রোত। তাঁর রচনায় যা বয়েই চলেছে।

গৌরকিশোর ঘোষ

ধূপছায়া

উৎসর্গ

অগ্রজ সৈয়দ মরতুজা আলী সাহেবের করকমলে

ছেলেবেলায় মাস্টারমশাই গোরু সম্বন্ধে রচনা লিখতে হুকুম দিতেন। এখনও মনে পড়ছে, তালুর ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে যেত কিন্তু কিছুতেই ভেবে পেতুম না, গোরু সম্বন্ধে লিখব কী? শেষটায় মনে হত, আমি একটা আস্ত গোরু, না হলে গোরু সম্বন্ধে কিছুই লিখতে পারছি নে কেন—যে গোরু ইস্কুল আসতে-যেতে নিত্যি নিত্যি দেখতে পাই। সে-কথা একদিন এক বন্ধুকে বলতে সে বাঁকা হাসি হেসে বলেছিল, আত্মজীবনী লেখা তো কঠিন নয়।

শেষটায় অনেক ভেবে-চিন্তে লিখতুম, গোরুর চারখানা পা, দুটো শিঙ আর একটা ন্যাজ আছে। গুরুমশাই তারই উপর চোখ বুলিয়ে যেতেন, পেটের অসুখ থাকলে দিতেন ছ নম্বর, মর্জি ভাল থাকলে দিতেন আট। আমিও খুশী হয়ে ভাবতুম, এই গোরুর ন্যাজ ধরে পরীক্ষা-বৈতরণী ঠিক ঠিক পেরিয়ে যাব।

কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবতুম, দুটো শিঙ বলার অর্থ হয়, কারণ গণ্ডারের নাকি একটা শিঙ। চার পা বলাও অবান্তর নয়, কারণ চার না হয়ে গোরুর দু পাও হতে পারত কিন্তু একটা ন্যাজ বলার ত কোন মানে হয় না—আজ পর্যন্ত ত কোন জানোয়ারের দুটো ন্যাজের কথা শুনি নি। একদিন মাস্টারমশাইকে প্রশ্নটা শুধালে তিনি বললেন, ইংরেজী ভাষার আইন অনুসারে বলতে হয়, দি কাউ হ্যাজ এ টেল। 'এ'টা না দিলে ব্যাকরণের গলতি হয়। তখন বুঝলুম 'এ টেল'টা গোরুর ন্যাজ নয়, ইংরেজী ব্যাকরণের ন্যাজ। কিন্তু তবু প্রশ্ন রয়ে গেল, বাংলাতে যখন 'একটা' ব্যবহার না করে দিব্য বলতে পারি 'গোরুর ন্যাজ আছে' তখন ইংরেজের মত সুসভ্য জাত সৃষ্টির প্রথম পূর্বাহ্ণে বৃক্ষাবতরণকালে তার মর্কট রূপটি ত্যাগ করার সময় এই বৈয়াকরণিক কিংবা আলঙ্কারিক পুচ্ছটিও বর্জন করল না কেন?

আমি ইংরেজী লিখতে পারি নে। যাঁরা ওই ভাষাতে নাম করেছেন, তাঁদের মুখে শুনেছি, ওই 'এ'র ন্যাজ নাকি এখনও তাঁদের মুখের উপর মাঝে মাঝে ঝাপটা মারে। তাই শুনে বিঘ্নসন্তোষী মন বিমলানন্দ লাভ করে।

সে-কথা থাক্।

কিন্তু যখন মাস্টারমশাই হুকুম দিতেন, 'দেশভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় কিঞ্চিৎ বর্ণনা কর', তখন সে-বৈতরণীর ও-পার আর চোখে দেখতে পেতুম না। গোরু জানোয়ারটা উৎকৃষ্ট হোক নিকৃষ্ট হোক সেটাকে তবু চিনি, না-হক্ক এ-কথা কখনই বলে ফেলব না, 'গোরু বড় প্রভুভক্ত জীব, সে রাত জেগে

চোর-ডাকু খেদায় কিংবা পাড়ার মোন্দারমশাই গোরু চড়ে আদালতে পেশকারি করতে যান।' কিন্তু দেশভ্রমণ বলতে ত বুঝি দাদীর বাড়ি যাবার সময় নৌকোর ছৈয়ের ভিতরের দিকটা—ছৈয়ের বাইরে যেতে চাইলেই বাবা রাশভারী গলায় বলতেন, 'থাক্ থাক্, আর বিলে ডুবে মরতে হবে না।' বাংলা ভাষাটা নিতান্ত পশ্চিম-বাঙলার ভাষা। না হলে 'ডানপিটের মরণ গাছের ডগায়' না বলে বলত, 'ডানপিটের মরণ বিলের তলায়'। সেই ছৈয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ত আর দেশভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান জন্মায় না। কাজেই তখন বাধ্য হয়ে সন্ধান নিতে হত, কোন্ 'এসে বুক' মুখস্থ করে বীরভূমের হেতমপুর ইস্কুলের বিশ্বম্ভর ভড় গেল-বার ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হয়েছে। 'চিত্তের প্রসার', 'অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য', 'কষ্টসহিষ্ণুতার পরিপূর্ণতা' ইত্যাদি যাবতীয় উত্তম উত্তম গুণরাজিতে প্রবন্ধটি ভরে দিতে তাই আমাদের তখন আর কণামাত্র অসুবিধে হত না—ইস্কুল-ঘরের চারিটি বেড়ার ভিতর বসে বসে। মাস্টারমশাইও কোন আপত্তি জানাতেন না, কারণ আমরা বিলক্ষণ জানতুম, তাঁর দৌড়, 'মোল্লার দৌড় মসজিদ তক'—অর্থাৎ, তাঁর এক ভাগ্নে ম্যাট্রিক ফেল মেরে আগরতলায় পালিয়ে যাওয়াতে তিনি ভয়ে ভয়ে 'দুর্গা দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী' জপ করতে করতে অতি অনিচ্ছায় আগরতলা অবধি একবার 'দেশভ্রমণ' করেছিলেন। জাত যাবার ভয়ে তিনি সেই যাওয়া-আসাটা সেরেছিলেন নিরম্বু, অপর্ণব্রতে। ফিরে এসে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন, কারণ ভিড়ে মেলা জাত-বেজাতের লোক হয়ত তাঁর গাত্রস্পর্শ করে ফেলেছে। এবং সবচেয়ে মারাত্মক অগ্নিপরীক্ষা তাঁকে তখন পেরতে হয়েছিল, তার সঙ্গে অন্য কোন পরীক্ষার তুলনা হয় না, সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ দেশভ্রমণের ঝাড়া বারোটি ঘণ্টা তিনি তাঁর নর্মসখী কৃশানুদীপ্ত তাম্রকূটশীর্ষ ডাবাসুন্দরীর সুচিক্কণ কৃষ্ণগণ্ডে একটি মাত্র নিবিড় চুম্বন দিতে পারেন নি। তিনি 'পথি নারী বিবর্জিতা' এই আপ্তবাক্যটির স্মরণে শুচিস্মিতাকে সজল নয়নে তাঁর সপত্নীর হাতে সমর্পণ করে দৃঢ়পদে পশ্চিমাভিযান করেছিলেন।

এ-জাতীয় গুরু পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছেন। টোলো-পণ্ডিত, আপন চেষ্টায় ইংরেজী শিখেছিলেন, কিন্তু কোনও ডিগ্রী ছিল না বলে ক্লাস সিক্সের উপরে যাবার তাঁর হক্ ছিল না।

কিন্তু সেইটে আসল কথা নয়। আসল কথা এই, তিনি যখন দেশভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে 'পয়েন্ট' দেবার সময় উচ্চাঙ্গের বক্তৃতা ঝাড়তেন তখন, কেন জানি নে, একমাত্র আমারই মনে সন্দেহ হত যে, তাঁর ভ্রমণ-প্রশস্তি হিন্দু গৃহিণীর ভিন্ন হেঁশেলে মুর্গী রান্না করার মত। ছেলে-ছোকরারা খাবে, তিনি রান্নার পর

গঙ্গাস্নান করে বুনেদী হেঁশেলে পুঁই-চচ্চড়ি চড়াবেন।

আমি তাই একদিন সাহস করে বলেছিলুম, ঘোরাঘুরি করলেই যদি এত বিদ্যে হয় তবে ত গার্ডসাহেব আজমল আলী আমাদের শহরের সবচেয়ে জ্ঞানী পুরুষ। আশ্চর্য, পণ্ডিতমশাই রাগ করলেন না। সন্দিগ্ধ নয়নে, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন শুধু; আমি তাঁর চোখের ভাষাতে পড়লুম, 'তবে কি রাস্কেলটা আমার মনের গোপন খবর পেয়ে গিয়েছে?'

তা সে যাই হোক, পণ্ডিতমশাই কিন্তু তখন একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তার অর্থ, আর পাঁচটা জিনিসের মত দেশভ্রমণও খুদাতালা আপন হাতে কব্জা করে রেখেছেন। পাঁচটা জিনিসের মত দেশভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় হওয়ার পরই মানুষ দেশভ্রমণে বেরয় না; যার কপালে ওটা লেখা আছে, কিংবা বলুন কপালে নয়, যার পায়ে চক্কর আছে, সে-ই বেরয় দেশভ্রমণে। কেউ বেরয় পণ্ডিতমশায়ের মত গজরাতে গজরাতে, কেউ বেরয় চেন-ছাড়া পাখির মত তিড়িং তিড়িং করে, তিন লম্ফে গেট-পেরিয়ে।

দেশভ্রমণ করেছি, এ-রকম একটা খ্যাতি আমার আছে। এ-সম্বন্ধে কোন প্রকারের উচ্চবাচ্য আমি করি নে। অর্থাৎ আমি যে-সব ভূমি দেখেছি, শুধুমাত্র সেগুলোর সাদামাটা বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত থাকি। দেশভ্রমণ ভাল কি মন্দ, কোন কোন দেশে গিয়েছিলাম এ-সম্বন্ধে কোন প্রকারের ইঙ্গিত দেবার প্রয়োজন মনে করি নে। অথচ, আমার বহু সহৃদয় পাঠক ধরে নিয়েছেন যে, আমি দেশভ্রমণের নাম শুনলেই মুক্তকচ্ছ হয়ে তদ্দণ্ডেই বন্দর পানে ধাওয়া করি।

এ-ধারণাটা সত্য নয়। কিন্তু তবু এটার প্রতিবাদ আমি করতুম না, যদি না এ-ধারণা আমার প্রতি কিঞ্চিৎ অবিচার করত। কিংবা এটা যদি নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার হত তা হলেও চুপ করে থাকলে কোন ক্ষতি হত না। কিন্তু এ-ব্যাপারে আমিই সবেধন উজ্জ্বল নীলমণি নই, আমার চেয়েও হতভাগা গুটি কয়েক আছেন। তাই ব্যক্তিগত কাহিনী বলার সঙ্কোচ অনিচ্ছায় কাটাতে হল।

কেউ যখন বলে 'ফলনা দেশভ্রমণ করতে ভালবাসে' তখন সে-বাক্যে আমি প্রশংসার চেয়ে নিন্দাই দেখতে পাই বেশী। এ যেন অনেকটা 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে, গামছা পর গিয়ে'। তার অর্থ মেয়েটা এমনি মারাত্মক রকমের হন্যে হয়ে উঠেছে বিয়ে করবার জন্য যে, বাপ-মার স্নেহ-ভালবাসার তোয়াক্কা সে আর করে না, আপন বাড়ি-ঘর ছেড়ে যেতে তার আর কোন ক্ষোভ নেই, বিয়ের অপরিহার্য আনুষঙ্গিক শাড়ি-গয়না, বাজনাবাদ্যিরও তার প্রয়োজন নেই, আপন গামছা পরেই পড়ি-মরি হয়ে সে সাতপাক ঘুরবে।

পাঁড় দেশভ্রমণকারীর-অর্থও তা-ই। যে মাটিতে তার নাড়ি পোতা আছে, যে-নদীর জল খেয়ে সে আজ চলতে শিখেছে, যে আমজামকাঁঠাল তাকে ছায়া দিয়ে শ্যামল শীতল করে রেখেছে, যার প্রতিটি দূর্বাদল তার পদ-তাড়না কামনা করে—তারা যেন কিছুই নয়, তারা যেন বানের জলে ভেসে-আসা, ফেল্‌না। গুরুদের আশীর্বাদ, বাপ-মায়ের স্নেহ, ভাইবোনের ভালবাসা, বন্ধুজনের সদান্তরিকতা, এসব কথা আর তুললুম না, সেগুলো এতই শুচিশুদ্ধ পবিত্র যে, ওদের স্মরণকে কলঙ্কিত করে মহাপাতকী হতে চাই নে।

অসহিষ্ণু হয়ে শান্ত পাঠক বললেন, 'কী জ্বালা, লোকটা ত আর চিরকালের তরে দেশত্যাগী হয়ে চলে যাচ্ছে না। দুদিন কিংবা দুবছর পরে আবার তো ফিরে আসবে। ইতিমধ্যে তোমার গাছগুলো ত আর রবি ঠাকুরের "হংস-বলাকা"র মত ডানা মেলে আকাশের কিনারা খুঁজতে বেরিয়ে যাবে না, কিংবা নদীটি জনকতনয়ার অভিসম্পাতে অন্তঃসলিলা হয়ে যাবেন না, কিংবা—"

বেশ কথা। তা হলে কিছু বলার নেই। এবং সত্যি বলতে কী, সেইটেই কাম্য। আমাদের মুনিঋষিরা সেই নির্দেশই দিয়ে গিয়েছেন; আমাদের বাপ-পিতেমো তাই করেছেন। মুসলমান মৌলানা-দরবেশরা তাই বলেছেন। তাদের ব্যাটা-বাচ্চারা তাই করেছে।

তাই শাস্ত্রকার আদেশ দিয়েছেন, গুরুগৃহে বিদ্যাচর্চা সমাপ্ত হলে পর তীর্থ-ভ্রমণান্তে ('দেশভ্রমণ' কিংবা হালফিলের কথা 'টুরিজ্‌ম্‌') স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করত গৃহস্থাশ্রম-প্রবেশ কর্তব্য। তারপর আর দেশভ্রমণ-টেশভ্রমণের রা-টি কেড়ো নি। নিতান্তই যদি বাউণ্ডুলেপনা করতে হয় তবে কর, প্রাণভরে কর, সন্ন্যাস নেবার পর। এমন কী, বাণপ্রস্থ যাবে জনপদভূমির প্রত্যন্ত প্রদেশে। সে-অবস্থায়ও যত্রতত্র পর্যটন গর্হিত।

কিন্তু সন্ন্যাসের বাউণ্ডুলেগিরির প্রতি কর্তারা এত সদয় কেন? তার এক কারণ:

ভোগে রোগভয়ং, কুলে চ্যুতিভয়ং, বিত্তে নৃপাদ্‌ ভয়ং,
মানে দৈন্যভয়ং, বলে রিপুভয়ং, রূপে তরুণ্যা ভয়ং,
শাস্ত্রে বাদীভয়ং, গুণে খলভয়ং, কায়ে কৃতান্তাদ্‌ ভয়ং,
সর্ববস্তু ভয়ান্বিতং, ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ং॥

শুধু বৈরাগ্যেই অভয়। তাই শাস্ত্রকার বলেছেন, যে মুহূর্তে মনে বৈরাগ্যের উদয় হবে সেই মুহূর্তেই সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করবে। ব্রহ্মচর্য সমাপ্ত না করে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করা যায় না, গার্হস্থ্য সমাপন না করে বাণপ্রস্থ গ্রহণ

গর্হিত ; কিন্তু সন্ন্যাস নেওয়া যায় যে-কোনও সময়ে—ডবল, ট্রিপ্‌ল প্রমোশন নিয়ে।

কিন্তু সন্ন্যাস নেওয়ার পর আর গৃহে ফিরতে পারবে না। সেইটেই হল সবচেয়ে বড় কথা এবং সেই দিকেই বিশেষ করে আমি আমার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সন্ন্যাস গ্রহণের পর কোন জায়গাতেই তিন দিনের বেশী থাকবার নিয়ম নেই, এক বর্ষাকাল ছাড়া। বৌদ্ধ শ্রমণদেরও এই 'বিনয়'।

এর সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য কী ? সন্ন্যাস গ্রহণ করলে আত্মার কি প্রসার হয় না-হয় সে-সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করবার অধিকার আমার নেই ; কিন্তু তাতে করে সমাজ ও সংস্কারের কী ক্ষতিবৃদ্ধি হয় সে সম্বন্ধে বলার অধিকার আমাদের মত সংসারীদের নিশ্চয় আছে।

আমার মনে হয়, সন্ন্যাস নিয়ে পর্যটন করুন, আর সন্ন্যাস না নিয়ে টুরিস্টের মত বাউণ্ডুলেপনা করুন, ফল একই। নানা দেশ নানা লোক, বহু সমাজবন্ধন, বহু উচ্ছৃঙ্খলতা, বিস্তর ধর্মাচার এবং ততোধিক চার্বাকাচরণ দেখে দেখে মানুষের চিত্তের প্রসার হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই 'প্রসার'ই তাকে দেশের রীতিনীতি সম্বন্ধে একদিক দিয়ে করে দেয় নির্বিকল্প উদাসীন, অন্যদিক দিয়ে আপন মাটি আপন গ্রামের কল্যাণকামনায় নিস্পৃহ। ইংরেজীতে একেই বলে 'জেডেড', ফরাসীতে 'ব্লাজে'। এই অবস্থার কল্পনা করেই জার নিকোলাস বলেছিলেন, 'পরের বেদনা বুঝিতে না পারে, না ভাবে আপন সুখ'। গ্রাম্য ভাষায় একেই বলে 'দড়কচ্চা হয়ে "ল্যাদা" মেরে যাওয়া।'

এইসব 'ভবঘুরে'রা তখন আর সমাজের ভিতর আপন আসন গ্রহণ করে কর্তব্যাচরণে আত্মনিয়োগ করতে পারে না। প্রত্যেক সমাজেরই কতকগুলি অন্যায় বন্ধন থাকে, এককালে হয়ত সেগুলোর কোন অর্থ ছিল, এখন লোকে ভুলে গিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আবার মুক্তির রন্ধ্রও থাকে। এ-দুয়ের টানাটানির মাঝখানের উত্তম পন্থাটি বের করার নামই সমাজ। আমাদের বাউণ্ডুলেটির কাছে দুটোই অর্থহীন। সে ঘোরাঘুরির ফলে দেখেছে বহু সমাজ, যেখানে অন্য বন্ধন, অন্য মুক্তি। দেশের সমাজের মূঢ়তা যেমন তাকে বিচলিত করতে পারে না, তার আদর্শবাদও তাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। তাই পূর্বেই নিবেদন করেছি, সন্ন্যাসগ্রহণের পর স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন নিষিদ্ধ।

আর যদি ধ্যান-ধারণা সাধনা-তপস্যার কথা তোলেন, তবে তার পরম শত্রু দেশভ্রমণ। গ্যোটে বলেছেন, 'চরিত্রবল সৃষ্টি করতে হলে জনসমাজে মেশো, কিন্তু যদি প্রতিভার সম্যক প্রস্ফুরণ তোমার কামনা হয়, তবে সাধনা কর নির্জনে।'

আর আমাদের অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ছবি দেখে যদি আমোদ পেতে চাও তবে আকাশে জলে-স্থলে প্রতি মুহূর্তে এত ছবি আঁকা হচ্ছে যে, তার হিসেব নিলেই সুখে চলে যাবে দিনগুলো—'

'আর যদি ছবি লিখে আনন্দ পেতে চাও তবে আসন গ্রহণ কর এক জায়গায়, দিতে থাক তুলির টানে রঙের পোঁচ। এ দর্শকের আমোদ নয়, স্রষ্টার আনন্দ।'

চতুর্দিকে নিজেকে বিক্ষিপ্ত বিকীর্ণ করে দিলে এ-আনন্দ পাওয়া যায় না॥

রসগোল্লা

'চুঙ্গিঘর' কথাটা বাংলা ভাষাতে কখনও খুব বেশী চালু ছিল না বলে আজকের দিনে অধিকাংশ বাঙালী যদি সেটা ভুলে গিয়ে থাকে, তবে তাই নিয়ে মর্মাহত হবার কোন কারণ নেই। ইংরেজীতে একে বলে 'কাস্টম্ হাউস', ফরাসীতে 'দুয়ান্', জর্মনে 'ৎসল্-আম্‌ট্', ফার্সীতে 'গুম্‌রুক' ইত্যাদি ইত্যাদি। এতগুলো ভাষাতে যে এই লক্ষ্মীছাড়া প্রতিষ্ঠানটার প্রতিশব্দ দিলুম তার কারণ আজকের দিনে আমার ইয়ার, পাড়ার পাঁচু, ভূতো সবাই সরকারী, নিম-সরকারী, মিন-সরকারী পয়সায় নিত্যি নিত্যি কাইরো-কান্দাহার প্যারিস-ভেনিস সর্বত্র নানাবিধ কনফারেন্স করতে যায় বলে, আর পাকিস্তান হিন্দুস্থান গমনাগমন ত আছেই। ওই শব্দটি জানা থাকলে তড়িঘড়ি তার সন্ধান নিয়ে আর পাঁচজনের আগে সেখানে পৌঁছতে পারলে তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। ওটাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা কস্মিনকালেও করবেন না। বরঞ্চ রহমত কাবুলীকে তার হক্কের কড়ি থেকে বঞ্চিত করলে করতেও পারেন কিন্তু তার দেশের 'গুম্‌রুক্'টিকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবেন না। 'কাবুলি-ওয়ালা' ফিল্ম আমি দেখি নি। রহমতও বোধ করি সেটাতে তার 'গুম্‌রুক্'কে এড়াবার চেষ্টা করে নি।

কেন ? ক্রমশ প্রকাশ্য।

ডাক্তার, উকিল, কসাই, ডাকাত, সম্পাদক (এবং সম্পাদকরা বলবেন, লেখক) এদের মধ্যে সকলের প্রথম কার জন্মগ্রহণ হয় সেকথা বলা শক্ত। যারই হোক, তিনি যে চুঙ্গিঘরের চেয়ে প্রাচীন নন সে-বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। মানুষে মানুষে লেনদেন নিশ্চয়ই সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছিল এবং সেই মুহূর্তেই তৃতীয় ব্যক্তি বলে উঠল, 'আমার ট্যাক্সোটা ভুলো না কিন্তু'—তা সে তৃতীয় ব্যক্তি গাঁয়ের মোড়লই হন, পঞ্চাশখানা গাঁয়ের দলপতিই হন, কিংবা রাজা অথবা

তাঁর কর্মচারীই হন। তা তিনি নিন, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই, কারণ এযাবৎ আমি পুরনো খবরের কাগজ ছাড়া অন্য কোনও বস্তু বিক্রি করি নি। কিন্তু যেখানে দু পয়সা লাভের কোন প্রশ্নই ওঠে না, সেখানে যখন চুঙ্গিঘর তার না-হক্কের কড়ি না-হক চাইতে যায়, তখনই আমাদের মনে সুবুদ্ধি জাগে, ওদের ফাঁকি দেওয়া যায় কী প্রকারে ?

এই মনে করুন, আপনি যাচ্ছিলেন ঢাকা। প্যাক করতে গিয়ে দেখেন, মাত্র দুটি শার্ট ধোপার মারপিট থেকে গা বাঁচিয়ে কোন গতিকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। ইস্টিশানে যাবার সময় কিনলেন একটি নয়া শার্ট। বাস্, আপনার হয়ে গেল। দর্শনা পৌঁছতেই পাকিস্তানী চুঙ্গিঘর হুলুধ্বনি দিয়ে দর্শনী চেয়ে উঠবে। তারপর আপনার শার্টটির গায়ে হাত বুলবে, মস্তক আঘ্রাণ করবে এবং শেষটায় ধৃতরাষ্ট্র যে-রকম ভীমসেনকে আলিঙ্গন করেছিলেন ঠিক সেই রকম বুকে জড়িয়ে ধরবে।

আপনার পাঁজর কখানা পটপট করতে আরম্ভ করেছে, তবু শুকনো মুখে চিঁচিঁ করে বলবেন, 'ওটা ত আমি নিজের ব্যবহারের জন্য সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। ওতে ত ট্যাক্স লাগবার কথা নয়।'

আইন তাই বলে।

হায় রে আইন! চুঙ্গিওলা বলবে, 'নিশ্চয় নিশ্চয়। কিন্তু ওটা যদি আপনি ঢাকাতে বিক্রি করেন ?'

তর্কস্থলে ধরে নিলুম, আপনার পিতামহ তর্কবাগীশ ছিলেন তাই আপনি মূর্খের ন্যায় তর্ক তুললেন, 'পুরনো শার্টও ত ঢাকাতে বিক্রি করা যায়।'

এই করলেন ভুল। তর্কে জিতলেই যদি সংসারে জিত হত তবে সক্রাতেসকে বিষ খেতে হত না, যীশুকে ক্রুশের উপর শিব হতে হত না।

চুঙ্গিওলা জানে, জীবনের প্রধান আইন, চুপ করে থাকা, তর্ক করার বদভ্যাসটি ভাল নয়। এক্কেবারেই হয় না ওতে বুদ্ধিশক্তির চালনা।

কী যেন এক অজানার ধেয়ানে, দীর্ঘ অ্যারস্ট্রিপের পশ্চাতের সুদূর দিকচক্রবালের দিকে তাকিয়ে বলবে, 'তা পারেন।'

তারপর কাগজ পেনসিল নিয়ে কী সব টরে-টক্কা করবে। তারপর বলবে, 'পনের টাকা।'

আপনার মনের অবস্থা আপনিই তখন জানেন—আমি আর তার কী বয়ান দেব! ব্যাপারটা যখন আপনার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হল, তখন আপনি ক্ষীণতম কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু ওই শার্টটার দামই ত মাত্র চার টাকা।'

চুঙ্গিওলা একখানা হলদে কাগজে চোখ বুলিয়ে নেবে। আপনি এটাতে দরখাস্ত করেছিলেন এবং নূতন শার্টটার উল্লেখ করেন নি। চুঙ্গিওলার কাছে তার সরল অর্থ, আপনি এটা স্মাগ্‌ল করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, পাচার করতে চেয়েছিলেন, হাতে-নাতে বেআইনী কর্ম করতে গিয়ে ধরা পড়লে তার জরিমানা দশ টাকা, জেলও হতে পারত, আফিং কিংবা ককেইন হলে—এ যাত্রা বেঁচে গেছেন।

সেই হলদে কাগজখানা অধ্যয়ন করে কোন লাভ নেই। কারণ তার প্রথম প্রশ্ন ছিল,

১। আপনার জন্মের সময় যে কাঁচি দিয়ে নাড়ি কাটা হয়েছিল, তার সাইজ কত ?

এবং শেষ প্রশ্ন,

২। আপনার মৃত্যুর সন ও তারিখ কী ?

আপনি তখন শার্টটির মায়া ত্যাগ করে ঈষৎ অভিমানভরে বললেন, 'তা হলে ওটা আপনারা রেখে দিন।'

কিন্তু ওইটি হবার জো নেই। আপনি ঘড়ি চুরি করে পেয়েছিলেন তিন মাসের জেল। ঘড়ি ফেরত দিলেই ত আর হাকিম আপনাকে ছেড়ে দেবে না। শার্ট ফেরত দিতে চাইলেও রেহাই নেই।

তখন শার্টটা চড়বে নিলামে। এক টাকা পেলে আপনি মহা ভাগ্যবান। জরিমানাটার অবশ্য নড়নচড়ন হল না।

ঢাকা থেকে ফিরে আসবার সময় ভারতীয় চুঙ্গিওলা দেখে ফেললে আপনার নূতন পেলিকান ফাউন্টেন পেনটি। কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই। আপনি ভাবলেন, ভারত এবং পাকিস্তান উভয়েই এ-কর্মে নূতন, তাই প্যাসেঞ্জারকে খামকা হয়রান করে। বিলেত-ফিলেতে বোধ হয় চুঙ্গিঘর টুরিস্টদের নিছক মনোরঞ্জনার্থে। তবে শুনুন।

আমার এক বন্ধু প্রায়ই ইউরোপ-আমেরিকা যান। এতই বেশী যাওয়া-আসা করেন যে, তাঁর সঙ্গে কোথাও দেখা হলে বলবার উপায় নেই, তিনি বিদেশ যাচ্ছেন না ফিরে আসছেন। ওই যে রকম ঢাকার কুট্টি গাড়ওয়ান এক ভদ্র-লোককে ভি-শেপের গেঞ্জি উল্টো পরে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কর্তা আইতেছেন, না যাইতেছেন ?'

তিনি নেমেছেন ইটালির ভেনিস বন্দরে জাহাজ থেকে। ঝাণ্ডু ব্যবসায়ী লোক। তাই চুঙ্গিঘরের সেই হলদে কাগজখানায় যাবতীয় প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে

শেষটায় লিখেছেন, 'এক টিন ভ্যাকুয়াম প্যাকড্ ভারতীয় মিষ্টান্ন। মূল্য দশ টাকা।' অস্কার ওয়াইল্ড যখন মার্কিন মুল্লুকে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তখন চুঙ্গিঘর পাঁচজনের মত তাঁকেও শুধিয়েছিল, 'এনিথিং টু ডিক্লেয়ার?' তিনি আঙুল দিয়ে তাঁর মগজের বাক্সটি বার কয়েক ট্যাপ করে উত্তর দিয়েছিলেন, 'মাই জিনিয়াস।' আমার পরিচিতদের ভিতর ওই ঝাণ্ডুদাই একমাত্র লোক, যিনি মাথা ত ট্যাপ করতে পারতেনই, সঙ্গে সঙ্গে হার্টটা ট্যাপ করলেও কেউ কোন আপত্তি করতে পারত না।

জাহাজখানা ছিল বিরাট সাইজের—ঝাণ্ডুদার বপুটি স্বচক্ষে দেখেছেন যাঁরা, তাঁরাই আমার কথায় সায় দেবেন যে, তাঁকে ভাসিয়ে রাখা যে-সে জাহাজের কর্ম নয়—তাই সেদিন চুঙ্গিঘরে লেগে গিয়েছিল মোহনবাগান ভর্সস ফিল্ম-স্টার্ট-টীম ম্যাচের ভিড়। ঝাণ্ডুদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ মনে পড়ল ইতালির 'কিয়ান্তি' জিনিসটি বড়ই সরেস এবং সরস। চুঙ্গিঘরের কাঠের খোঁয়াড়ের মুখে দাঁড়িয়েছিল এক পাহারাওলা। তাকে হাজার লিরার একখানা নোট দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন কয়েক বোতল 'কিয়ান্তি' রাস্তার ওধারের দোকান থেকে নিয়ে আসতে। পাহারাওলা খাঁটি খানদানী লোকের সংস্পর্শে এসেছে ঠাহর করতে পেরে খাঁটি নিয়ে এল তিন মিনিটেই। পূর্বেই বলেছি ঝাণ্ডুদা জন্মেছিলেন তাগড়াই হার্ট নিয়ে—জাহাজের পরিচিত অপরিচিত তথা চুঙ্গিঘরের পাহারাওলা, সেপাই, চাপরাসী, কুলী সবাইকে 'কিয়ান্তি' বিলোতে লাগলেন দরাজ দিলে। 'স্বাস্থ্যপান' আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই ঝাণ্ডুদার ডাক পড়ে গেল চুঙ্গির কাউন্টারে। মাল খালাসিতে তাঁর পালা এসে গেছে। নিমন্ত্রিত রবাহূত সব্বাইকে দরাজ হাত দুখানা পাখির মত মেলে দিয়ে বললেন, 'আপনারা ততক্ষণে ইচ্ছে করুন; আমি এই এলুম বলে।' 'কিয়ান্তি' রানীকে বসিয়ে রাখা মহাপাপ।

ঝাণ্ডুদার বাক্স-পেঁটরায় এত সব জাত-বেজাত হোটেলের লেবেল লাগানো থাকত যে, অগা চুঙ্গিওলাও বুঝতে পারত এগুলোর মালিক বাস্তুভিটার তোয়াক্কা করে না—তাই জীবন কাটে হোটেলে হোটেলে। আজকের চুঙ্গিওলা কিন্তু সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে আরম্ভ করলে, প্রথম ভাগের ছেলে যে-রকম বানান ভুল করে করে বই পড়ে। লোকটার চেহারা বদখত। টিঙটিঙে রোগা, গাল দুটো ভাঙা, সে-গালের হাড় দুটো জোয়ালের মত বেরিয়ে পড়েছে, চোখ দুটো গভীর গর্তের ভিতর থেকে নাকটাকে প্যাঁসনের মত চেপে ধরেছে, নাকের তলায় টুথব্রাশের মত হিটলারী গোঁপ। পূর্বেই নিবেদন করেছি, ঝাণ্ডুদা ঝাণ্ডু লোক, তাই তিনি মানুষকে তার চেহারা থেকে যাচাই করেন না। এবারে কিন্তু তাঁকেও

সেই নিয়মের ব্যভিচার করতে হল। লোকটাকে আড়চোখে দেখলেন, সন্দেহের নয়নে আমার কানে কানে বললেন, 'শেক্‌স্‌পিয়ার নাকি বলেছেন, রোগা লোককে সমঝে চলবে।' আমার বিশ্বাস, আজ যে শেকস্‌পিয়ারের এত নাম-ডাক সেটা ওই দিন থেকেই শুরু হয়—কারণ ঝাণ্ডুদা আত্মনির্ভরশীল মহাজন, কারও কাছ থেকে কখনও কানাকড়ি ধার নেন নি। তিনি ঋণ স্বীকার করাতে ওই দিন থেকে শেকস্‌পিয়ারের যশ-পত্তন হয়।

চুঙ্গিওলা শুধালে, 'ওই টিনটার ভিতর আছে কী?'

'ইণ্ডিয়ান সুঈট্‌স।'

'ওটা খুলুন।'

'সে কী করে হয়? ওটা আমি নিয়ে যাব লণ্ডনে। খুললে বরবাদ হয়ে যাবে যে?'

চুঙ্গিওলা যে-ভাবে ঝাণ্ডুদার দিকে তাকালে তাতে যা টিন খোলার হুকুম হল, পাঁচশো ঢ্যাঁঢরা পিটিয়ে কোন বাদশাও ও-রকম হুকুম-জারি করতে পারতেন না।

ঝাণ্ডুদা মরীয়া হয়ে কাতর নয়নে বললেন, 'ব্রাদার, এ-টিনটা আমি নিয়ে যাচ্ছি আমার এক বন্ধু মেয়ের জন্য লণ্ডনে—নেহাতই চিংড়ি মেয়ে। এটা খুললে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

এবারে চুঙ্গিওলা যে-ভাবে তাকালে, তাতে আমি হাজার ঢ্যাঁঢরার শব্দ শুনতে পেলুম।

বিরাট-লাশ ঝাণ্ডুদা পিঁপড়ের মত নয়ন করে সকাতরে বললেন, 'তাহলে ওটা ডাকে করে লণ্ডন পাঠিয়ে দাও, আমি ওটাকে সেখানেই খালাস করব।'

আমরা একবাক্যে বললুম, 'কিন্তু তাতে ত বড্ড খরচা পড়বে। পাউণ্ড পাঁচেক—নিদেন।'

হ্রস্বশ্বাস ফেলেই বললেন, 'তা আর কী করা যায়।'

কিন্তু আশ্চর্য, চুঙ্গিওলা তাতেও রাজী হয় না। আমরাও অবাক। কারণ এ-আইন ত সক্কলেরই জানা।

ঝাণ্ডুদা একটুখানি দাঁত কিড়মিড় খেয়ে লোকটাকে আইনটার মর্ম প্রাঞ্জল ভাষায় বোঝালেন। তার অর্থ টিনের ভিতরে বাঘ-ভাল্লুক ককেইন-হেরয়িন যা-ই থাক্, ও-মাল যখন সোজা লণ্ডন চলে যাচ্ছে তখন তার পুণ্যভূমি ইতালি ত আর কলঙ্কিত হবে না।

আমরা সবাই কসাইটাকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, ঝাণ্ডুদার প্রস্তাবটি অতিশয় সমীচীন এবং আইনসঙ্গতও বটে। আমাদের দল তখন বেশ বিরাট আকার ধারণ

করেছে। 'কিয়াস্তি'-রানীর সেবকের অভাব ইতালিতে কখনও হয় নি—প্রাচুর্য থাকলে পৃথিবীতেও হত না। এক ফরাসী উকিল কাইরো থেকে পোর্ট সঈদে জাহাজ ধরে—সে পর্যন্ত বিন্ ফীজে লেকচার ঝাড়লে। চুঙ্গিওলার ভাবখানা সে পৃথিবীর কোন ভাষাই বোঝে না।

ঝাণ্ডুদা তখন চটেছেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'শালা, তবে খুলছি। কিন্তু ব্যাটা তোমাকে না খাইয়ে ছাড়ছি নে।' তারপর ইংরেজীতে বললেন, 'কিন্তু তোমাকে ওটা নিজে খেয়ে পরখ করে দেখতে হবে ওটা সত্যি ইণ্ডিয়ান সুঈট্‌স কিনা।'

শয়তানটা চট করে কাউণ্টারের নীচে থেকে টিন-কাটার বের করে দিলে। ফরাসী বিদ্রোহের সময় গিলোটিনের অভাব হয় নি।

ঝাণ্ডুদা টিন-কাটার হাতে নিয়ে ফের চুঙ্গিওলাকে বললেন, 'তোমাকে কিন্তু ওই মিষ্টি পরখ করতে হবে নিজে, আবার বলছি।'

চুঙ্গিওলা একটু শুকনো হাসি হাসলে। শীতে বেজায় ঠোঁট ফাটলে আমরা যে-রকম হেসে থাকি।

ঝাণ্ডুদা টিন কাটলেন।

কী আর বেরবে? বেরল রসগোল্লা। বিয়ে-শাদিতে ঝাণ্ডুদা ভুরি ভুরি রসগোল্লা স্বহস্তে বিতরণ করেছেন—ব্রাহ্মণ-সন্তানও বটেন। কাঁটা-চামচের তোয়াক্কা না করে রসগোল্লা হাত দিয়ে তুলে প্রথমে বিতরণ করলেন বাঙালীদের, তারপর যাবতীয় ভারতীয়দের, তার পর আর সবাইকে অর্থাৎ ফরাসী, জর্মন, ইতালীয় এবং স্প্যানিয়ার্ডদের।

মাতৃভাষা বাংলাটাই বহুত তকলিফ বরদাস্ত করেও কাবুতে আনতে পারি নি, কাজেই গণ্ডা তিনেক ভাষায় তখন বাঙালীর বহু যুগের সাধনার ধন রসগোল্লার যে বৈতালিক গীতি উঠেছিল তার ফটোগ্রাফ দি কী প্রকারে?

ফরাসীরা বলেছিল, 'এপাতাঁ!'

জর্মনরা, 'ক্লর্কে!'

ইতালিয়ানরা, 'ব্রাভো!'

স্প্যানিশরা, 'দেলিচজো, দেলিচজো।'

আরবরা, 'ইয়া সালাম, ইয়া সালাম।'

তামাম চুঙ্গিঘর তখন রসগোল্লা গিলছে। আকাশে বাতাসে রসগোল্লা। কিউবিজ্‌ম বা দাদাইজ্‌মের টেক্‌নিক দিয়েই শুধু এর ছবি আঁকা যায়। চুঙ্গি-ঘরের পুলিস-বরকন্দাজ, চাপরাসী-স্পাই সকলেরই হাতে রসগোল্লা। প্রথমে ছিল

ওদের হাতে 'কিয়াস্তি', আমাদের হাতে রসগোল্লা। এক লহমায় বদলাবদলি হয়ে গেল।

আফ্রিকার এক ক্রিশ্চান নিগ্রো আমাকে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'ক্রিশ্চান মিশনারিরা যখন আমাদের দেশে এসেছিলেন তখন তাঁদের হাতে ছিল বাইবেল, আমাদের ছিল জমিজমা। কিছুদিন বাদেই দেখি, ওঁদের হাতে জমিজমা, আমাদের হাতে বাইবেল।'

আমাদের হাতে 'কিয়াস্তি'।

ওদিকে দেখি, ঝাণ্ডুদা আপন ভুঁড়িটি কাউন্টারের উপর চেপে ধরে চুঙ্গিওলার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলছেন বাংলাতে—'একটা খেয়ে দেখ।' হাতে তাঁর একটি সরেস রসগোল্লা।

চুঙ্গিওলা ঘাড়টা একটু পিছনের দিকে হটিয়ে গম্ভীররূপ ধারণ করেছে।

ঝাণ্ডুদা নাছোড়বান্দা। সামনের দিকে আরেকটু এগিয়ে বললেন, 'দেখছ তো, সবাই খাচ্ছে। ককেইন নয়, আফিঙ নয়। তবু নিজেই চেখে দেখ, এ বস্তু কী।'

চুঙ্গিওলা ঘাড়টা আরও পিছিয়ে নিলে। লোকটা অতি পাষণ্ড। একবারের তরে 'সরি-টরি' ও বললে না।

হঠাৎ বলা-নেই-কওয়া-নেই, ঝাণ্ডুদা তামাম ভুঁড়িখানা কাউন্টারের উপর চেপে ধরে ক্যাঁক করে পাকড়ালেন চুঙ্গিওলার কলার বাঁ হাতে আর ডান হাতে থেবড়ে দিলেন একটা রসগোল্লা ওর নাকের উপর। ঝাণ্ডুদার তাগ সব সময়েই অতিশয় খারাপ।

আর সঙ্গে সঙ্গে মোটা গলায়, 'শালা, তুমি খাবে না। তোমার গুষ্টি খাবে। ব্যাটা, তুমি মস্করা পেয়েছ। পই পই করে বললুম, রসগোল্লাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, চিংড়িটা বড্ড নিরাশ হবে, তা তুমি শুনবে না'—আরও কত কী!

ততক্ষণে কিন্তু তাবৎ চুঙ্গিঘরে লেগে গিয়েছে ধুন্দুমার! চুঙ্গিওলার গলা থেকে যেটুকু মিহি আওয়াজ বেরুচ্ছে তার থেকে বোঝা যাচ্ছে সে পরিত্রাণের জন্য চাপরাসী থেকে আরম্ভ করে ইল্‌দুচে মুস্‌সোলিনী—মাঝখানে যত সব কনসাল, লিগেশন মিনিসটার, অ্যাম্বসেডর প্লেনিপটিনশিয়ারি—কারুরই দোহাই কাড়তে কসুর করছে না। মেরি মাতা, হোলি যিসস, পোপঠাকুর ত বটেনই।

আর চিৎকার-চেঁচামেচি হবেই না কেন? এ যে রীতিমত বে-আইনী কর্ম। সরকারী চাকুরেকে তার কর্তব্যকর্ম সমাধানে বিঘ্ন উৎপাদন করে তাকে সাড়ে তিনমণী লাশ দিয়ে চেপে ধরে রসগোল্লা খাওয়াবার চেষ্টা করুন আর সেকো

খাওয়াবারই চেষ্টা করুন, কর্মটির জন্য আকছারই জেলে যেতে হয়। ইতালিতে এর চেয়ে বহুত অল্পেই ফাঁসি হয়।

ঝাণ্ডুদার কোমর জাবড়ে ধরে আমরা জনাপাঁচেক তাঁকে কাউণ্টার থেকে টেনে নামাবার চেষ্টা করছি। তিনি পর্দার পর পর্দা চড়াচ্ছেন, 'খাবি নি, ও পরান আমার, খাবি নি, ব্যাটা—' চুঙ্গিওলা ক্ষীণকণ্ঠে পুলিসকে ডাকছে। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে আমার মাতৃভূমি সোনার দেশ ভারতবর্ষের ট্রাঙ্ককলে যেন কথা শুনছি। কিন্তু কোথায় পুলিস? চুঙ্গিঘরের পাইক বরকন্দাজ ডাণ্ডা-বরদার, আস-সরদার বেবাক চাকর-নফর বিলকুল বেমালুম গায়েব! এ কি ভানুমতী, এ কি ইন্দ্রজাল!

দেখি, ফরাসী উকিল আকাশের দিকে দু হাত তুলে অর্ধনিমীলিত চক্ষে, গদ্-গদ কণ্ঠে বলছে, 'ধন্য পুণ্যভূমি ইতালি, ধন্য পুণ্যনগর ভেনিস্! এ-ভূমির এমনই পুণ্য যে হিদেন রসগোল্লা পর্যন্ত এখানে মিরাক্‌ল্ দেখাতে পারে। কোথায় লাগে 'মিরাক্‌ল্ অব মিলান,' এর কাছে—এ যে সাক্ষাৎ জাগ্রত দেবতা, পুলিস-মুলিস সবাইকে ঝেঁটিয়ে বার করে দিলেন এখান থেকে! ওহোহো, এর নাম হবে "মিরাক্‌ল্ দ্য রসগোল্লা।" '

উকিল মানুষ, সোজা কথা প্যাঁচ না মেরে বলতে পারে না। তার উচ্ছ্বাসের মূল বক্তব্য, রসগোল্লার নেমকহারামি করতে চায় না ইতালীয় পুলিস-বরকন্দাজরা। তাই তারা গা-ঢাকা দিয়েছে।

আমরা সবাই একবাক্যে সায় দিলুম। কিন্তু কে এক কাষ্ঠরসিক বলে উঠল, 'রসগোল্লা নয়, কিয়ান্তি।' আরও দু'চার পাষণ্ড তায় সায় দিলে।

ইতিমধ্যে ঝাণ্ডুদাকে বহু কষ্টে কাউণ্টারের এদিকে নামানো হয়েছে। চুঙ্গিওলা রুমাল দিয়ে রসগোল্লার থ্যাবড়া মুছতে যাচ্ছে দেখে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'ওটা পুছিস নি; আদালতে সাক্ষী দেবে—ইগজিবিট্ নাম্বার ওয়ান।'

ওদিকে তখন বেটিং লেগে গিয়েছে, ইতালিয়ানরা 'কিয়ান্তি' পান করে, না রসগোল্লা খেয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে? কিন্তু ফৈসালা করবে কে? তাই এ-বেটিঙে রিস্‌ক্ নেই। সবাই লেগে গিয়েছে।

কে একজন ঝাণ্ডুদাকে সদুপদেশ দিলে, 'পুলিস টুলিস ফের এসে যাবে। ততক্ষণে আপনি কেটে পড়ুন।'

তিনি বললেন, 'না, ওই যে লোকটা ফোন করছে। আসুক না ওদের বড় কর্তা।'

তিন মিনিটের ভিতর বড় কর্তা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন। ফরাসী

উকিলের বোধ হয় সবচেয়ে বড় যুক্তি ঘুষ। এক বোতল 'কিয়ান্তি' নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ঝাণ্ডুদা বাধা দিয়ে বললেন, 'নো।'

তারপর বড় সাহেবের সামনে গিয়ে বললেন, 'সিন্নোর, বিফো ইউ প্রসীড, অর্থাৎ কিনা ময়না তদন্ত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে আপনি একটি ইণ্ডিয়ান সুঈট্‌স্ চেখে দেখুন।' বলে নিজে মুখে তুললেন একটি। আমাদের সবাইকে আরেক প্রস্থ বিতরণ করলেন।

বড় কর্তা হয়ত অনেক রকমের ঘুষ খেয়ে ওকিবহাল এবং তালেবর। কিংবা হয়ত কখনও ঘুষ খাননি। 'না বিইয়ে কানাইয়ের মা' যখন হওয়া যায় এবং স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র যখন এ-প্রবাদটি ব্যবহার করে গেছেন তখন 'ঘুষ না-খেয়েও দারোগা' ত হওয়া যেতে পারে।

বড় কর্তা একটি মুখে তুলেই চোখ বন্ধ করে রইলেন আড়াই মিনিট। চোখ বন্ধ অবস্থায়ই আবার হাত বাড়িয়ে দিলেন। ফের। আবার।

এবারে ঝাণ্ডুদা বললেন, 'এক ফোঁটা কিয়ান্তি ?'

কাদম্বিনীর ন্যায় গম্ভীর নিনাদে উত্তর এল, 'না। রসগোল্লা।'

টিন তখন ভোঁ-ভোঁ।

চুঙ্গিওলা তার ফরিয়াদ জানালে।

কর্তা বললেন, 'টিন খুলেছ ত বেশ করেছ, না হলে খাওয়া যেত কী করে ?' আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কী করতে ? আরও রসগোল্লা নিয়ে আসুন।' আমরা সুড় সুড় করে বেরিয়ে যাবার সময় শুনতে পেলুম, বড় কর্তা চুঙ্গিওলাকে বলছেন, 'তুমিও ত একটা আস্ত গাড়ল। টিন খুললে আর ওই সরেস মাল চেখে দেখলে না ?'

'কিয়ান্তি না রসগোল্লা' সে-বেটের সমাধান হল।

ইতালির প্রখ্যাতা মহিলা-কবি ফিলিকাজা গেয়েছেন,

'ইতালি, ইতালি, এত রূপ তুমি কেন ধরেছিলে, হায়!
অনন্ত ক্লেশ লেখা ও-ললাটে নিরাশার কালিমায়।'

আমিও তাঁর স্মরণে গাইলুম,

রসের গোলক, এত রস তুমি কেন ধরেছিলে, হায়!
ইতালির দেশ ধর্ম ভুলিয়া লুটাইল তব পায়!!

চাপরাসী ও কেরানী

কিছুদিন পূর্বে বক্তৃতা দেবার সময় পণ্ডিতজী বলেন, চাপরাসীদের মাইনে মাস্টারদের চেয়ে বেশী কিংবা ওই ধরনের কিছু একটা। আমার ঠিক মনে নেই। তার জন্য পণ্ডিত সম্প্রদায় আমার অপরাধ নেবেন না। বিবেচনা করে দেখলে তাঁরা বুঝতে পারবেন, আমি তাঁদের উপকারই করেছি। কারণ পণ্ডিতজীর সব কথা বিশেষ করে তাঁর সব শপথ এবং প্রতিজ্ঞা সর্বসাধারণ স্মরণ রাখলে বড় বিপদ হত। আমার মত কোন কোন আহাম্মুক এখনও ভুলতে পারে নি, পণ্ডিতজী স্বরাজলাভের উষাকালে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি কালোবাজারীদের ল্যাম্পপোস্টে ঝোলাবেন। কেউ যদি কাউকে ওই ভাবে ঝুলে থাকতে দেখে থাকেন, তবে দয়া করে জানাবেন। দৃশ্যটি নয়নাভিরাম না হলেও প্রাণাভিরাম। একটু তাড়াতাড়ি জানাবেন। কারণ আমার জীবন-সায়াহ্ন আসন্ন।

অতএব, পণ্ডিতজী প্রাতঃস্মরণীয় বটেন, কিন্তু তাঁর বচনামৃত প্রাতঃস্মরণীয় নয়।

খয়ের। বাংলা 'খয়ের' নয়, উর্দু 'খয়ের'। তার অর্থ 'তা সে যাকগে'। এই উর্দু 'খয়ের'টি এই বেলাই একটু ভাল করে শিখে নিন। বিস্তর 'ফায়দা ওঠাতে' পারবেন। বুঝিয়ে বলি।

উর্দুওয়ালারা দেশ সম্বন্ধে বক্তৃতার আরম্ভেই শুরু করেন তার দুঃখ-কাহিনীর বর্ণনা দিয়ে। আমরা খেতে পাই নে, পরবার কিছু নেই, আশ্রয় জোটে না, শিক্ষার ব্যবস্থা হয় নি, মেয়েরা গর্ভযন্ত্রণায় মারা যায়, ডাক্তারবদ্যির ব্যবস্থা হল না, ইত্যাদি ইত্যাদি।' আমরা তখন উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করি, এইবারে বুঝি দেশের কর্ণধাররা বাতলে দেবেন, তাঁরা এ সব বালাই-আপদ দূর করবার জন্য কী সব পরিপাটী ব্যবস্থা করেছেন, দেশের কোন্ কোন্ জায়গায় এ সব অভাব-অনটন তাঁদের সম্মার্জনী-সঞ্চালনে দূরীভূত হয়েছে, এইবারে আমাদের সবুরের মেওয়া ফলবে কবে, এই ধরনের কোন কিছু।

বারমাস্যা শেষ হওয়ার পর বক্তা দম নেবেন। চতুর্দিকে সূচীভেদ্য নৈঃস্তব্ধ্য। আমরা কান পেতে আছি, এইবার শুনতে পাব, 'চাপানে'র 'ওতর', এইবারে শুরু হবে উল্টো 'বারমাস্যা', এইবারে আরম্ভ হবে আমাদের আশার বাণী, ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন।

ও হরি! কোথায় কী?

শুনতে পাবেন, বক্তা গুরুগম্ভীর নিনাদে একটি কথা বললেন, সেটি 'খ য়ে র'। মানে? এর অর্থটা ত তাহলে বুঝতে হয়। কারণ ইতিমধ্যে বক্তা 'চাপানের

ড্রাই ফার্মিং' কিংবা 'জান্‌জিবারের কো-অপারেটিভ সিস্টেমে' চলে গিয়েছেন। তা হলে নিশ্চয়ই ও 'খয়ের' শব্দে তাবৎ সমস্যার সমাধান ঘাপটি মেরে বসে আছে। ওঁ-তে যে রকম হিন্দুর ব্রহ্ম লাভ, ক্রুশে যে রকম খ্রীশ্চানের গড লাভ। 'সকলং হস্ততলং শব্দমাত্রেণ যদি অর্থধনং কোঽপি লভেৎ।'

এইবারে 'খয়ের'-কলমার গুহ্য অর্থ শোনার পূর্বে ভাল ডাক্তারকে দিয়ে হার্টটি দেখিয়ে নিন। শক্‌-টি মারাত্মক রকমের হবে; ছাপাখানায় সদ্‌ব্রাহ্মণও আছেন। আর কেউ না পড়লেও তাঁরা বাধ্য হয়ে আমার লেখা কম্পোজ করেন, প্রুফ দেখেন। অকালে ব্রহ্মহত্যা করলে লোক-সভায়ও আমার ঠাঁই হবে না।

'খয়ের' কথার সাদামাটা প্লেন 'নির্ভেজাল' অর্থ, 'তা সে যাক্‌গে—অন্য কথা পাড়ি'। অর্থাৎ এতক্ষণ আপনি যে সব দুঃখ-কাহিনীর ফরিয়াদ-প্রতিবাদ আগড়ম্‌-বাগড়ম্‌ যা কিছু বলেছেন, তার উত্তর দেবার দায় আর আপনার রইল না। আপনি এখন কালীঘাট, মৌলা আলী সর্বত্রই লম্ফ ঝম্প দিতে পারেন। কারণ 'খয়ের' শব্দের প্রসাদাৎ আপনি আপনার পুচ্ছটি ইতিমধ্যে কপাত করে কর্তন করে ফেলেছেন।

'খয়ের' বাক্যের শব্দার্থ আরবী ডিক্‌শনারি ঘেঁটে বের করেও পুলি-পিঠের ন্যাজ গজাবে না। ওতে পাবেন 'খয়ের' অর্থ 'উত্তম', 'শিব', 'মঙ্গল'। তবে কি বক্তা যে গোড়ার দিকে ফুল্লরার বারমাস্যা গেয়েছিলেন সেটা 'ভাল'?

না। আমরা অর্থাৎ বাঙালীরাও এ-রকম জায়গায় 'উত্তম' বলে থাকি, কিন্তু বিপরীত অর্থে। আমাদের পণ্ডিতগণ কোনও কিছুর সুদীর্ঘ অবতারণা করার পর সর্বশেষে বলেন, 'উত্তম প্রস্তাব'। তার অর্থ এই নয়, 'এতক্ষণ যা বললুম সে সব খুব ভাল জিনিস'—তার সরল অর্থ, 'এ-দিককার কথা বলা হল, এবার অন্য পক্ষের বক্তব্য নিবেদন করছি এবং সেইটেই আমার বক্তব্য এবং তাতেই পাবেন প্রশ্নের সমাধান, রহস্যের মীমাংসা।'

'খয়ের'-এর এরূপ ব্যবহারকে ফার্সীতে বলা হয়, 'তাকিয়া-ই-কালাম'—'কথার' (কালামের) 'বালিশ' (তাকিয়া)। অর্থাৎ যে কথার উপর ভর করে নিশ্চিন্ত মনে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়তে পারেন! বিপক্ষ রা'টি কাড়তে পারবে না, আপনি কেল্লা ফতেহ করে দিয়েছেন, ভাগ্যিস, আপনি, মোকামাফিক 'খয়ের' শব্দটি প্রয়োগ করতে জানতেন, 'রাখে খয়ের মারে কে?'

মুসলমানরা নাকি এদেশের মন্দির ভেঙেছে, পার্ক সার্কাসে শিককাবাব চালিয়েছে, ইদানীং নূতন শুনছি, খামখেয়ালিতে খেয়াল আমদানি করে ধ্রুপদ-ধামার বরবাদ করেছে। করেছে ত করেছে, তাই বলে কি উষ্মাভরে গোস্‌সা-

ঘরে এখনও খিল দিয়ে বসে রইবেন? গড়ের মাঠে গিয়ে রাষ্ট্রভাষায় (কটকে আমার বৃদ্ধ বাঙালী কেরানী সরকারী ইশ্‌তিহার পড়ে ভীত কণ্ঠে আমাকে শুধিয়েছিল 'আমাকেও লোষ্ট্রভাষা শিখতে হবে নাকি, স্যার?') কী ভাবে 'খয়ের' শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ করতে হয়, সেটি শিখবেন না? ওইটে ঠিকমত, তাগমাফিক, বাংলায় 'এস্‌তেমাল' করতে পারলে পাড়ার তর্কবাগীশ, তাকিয়া (-ই-কালামের)-র কল্যাণে তর্কবালিশ হতে কতক্ষণ?

চিন্তা করে দেখুন, 'খয়ের' শব্দের কত গুণ! রাষ্ট্রভাষা হিন্দী তাঁর শব্দভাণ্ডার থেকে লাথি ঝাঁটা মেরে তাবৎ আরবী-ফার্সী শব্দ বের করে দিচ্ছেন—কারণ হিন্দী বাংলার তুলনায় অনেক ধনী (!) কিনা—কিন্তু কই, 'খয়ের' শব্দটি তাড়াবার প্রস্তাব ত কেউ করে না। কট্টর কান-ফাটা হিন্দীতে 'ভারতওয়ার্ষকী উন্নতি ঔর সোওয়াধীন্তা, গঁড়তন্তর ঔর সামওয়াদ' ইত্যাদি 'কঠন্ কঠন্' (কঠিন কঠিন) সমস্যায়ে নির্মাণ করার পর সে-ইন্দ্রজাল তাঁরা ছিন্নভিন্ন করেন কোন মোহমুদ্‌গরে? সেই সনাতন—রাম! রাম!—সেই যাবনিক, ম্লেচ্ছ খ-য়ের দ্বারা। এবং সেই 'খয়ের'-এর 'খ'ও উচ্চারণ করেন অ্যাসন্ ঘর্ষণ দ্বারা যে শুনে মনে হয় বড়ী মসজিদের সামনে জাকারিয়া স্ট্রীটে কাবলীওলা 'খ' উচ্চারণ করার ছলে গলা সাফ করছে। কোথায় লাগে তার কাছে স্কচ 'লখ্' শব্দের 'খ', জর্মন 'বাখ' শব্দের ওই একই ব্যঞ্জন?

মুসলমানরা মন্দির ভেঙে অতিশয় অপকর্ম করেছে, কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই রাগে 'খয়ের' শব্দের যে বিরাট বালাখানা তৈরি করে দিলে তার উপরে বসে হাওয়া খাবেন না?

শুধু মন্দ দিকটাই দেখবেন, ভাল দিকটা দেখবেন না?

তবে একটা গল্প শুনুন।

হয়ত অনেকেই শুনেছেন, তাঁরা অপরাধ নেবেন না। কারণ, বিবেচনা করে দেখুন, পুরনো গল্পের পুনরাবৃত্তি না করলে সেটি বেঁচে থাকবে কী করে? মহাভারতের গল্প সবাই জানে, তাই বলে কি আমরা মহাভারতের চর্চা বন্ধ করে দিয়েছি?

খয়ের।

গল্পটা কমিয়ে-সমিয়ে বলছি।

কালীঘাটের মন্দিরের সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে এক ভদ্রসন্তানের হৃদয়ে ধর্ম-ভাবের উদয় হল। মন্দিরে ঢুকে পাণ্ডাকে ডেকে যথারীতি যাবতীয় পূজো-পাটা করালে এবং শেষটায় উত্তম দক্ষিণা পেয়ে পাণ্ডা ভদ্রসন্তানের কপালে ইয়া

একখানা খাসা তিলক কেটে দিল। বহর আর চেহারা দেখে মনে হয় ওই দিয়ে লাইটনিং কণ্ডক্টরের কাজ অনায়াসে চালানো যায়। দেখলেই ভক্তি হয়। গড় হয়ে পেন্নাম করতে ইচ্ছে যায়। ভক্তিতে গদগদ হয়ে 'তারা ব্রহ্মময়ী মা, বজ্র-যোগিনী মা' ইত্যাদি জপ করতে করতে ভদ্রসন্তান বাড়িমুখো হল।

কিন্তু হায়, সংসারে কত না সর্বজনীন অনাচার, রঙিন প্রলোভন। হবি ত হ, কিছুদূর যেতে না যেতে পথে পড়ল বাহারে একখানা 'বার'। সেদিন ছিল মঙ্গলবার, ড্রাই ডে, শরাব বারণ, তাই ভদ্রসন্তান প্রলোভনের ভয় নেই জেনে সে-পথ নিয়েছিল, কিন্তু বিধি বাম, বড়দিন না কিসের যেন জব্বর পরব ছিল বলে 'ইস্পিশেল' কেস হিসাবে 'বার' খোলা।

এখন এগোই কী প্রকারে? ভদ্রসন্তানের রাস্তায় এগোবার কথা হচ্ছে না। আমি গল্পটা নিয়ে এগোই কী প্রকারে? পাঠকরা জীবনে একটিমাত্র অপকর্ম করে থাকেন, সেটি আমার রচনাপঠন। তাঁদের আমি অধর্মের কাহিনী শোনাই কী করে? কিন্তু তাঁরা যখন এতাবৎ এতখানি দয়া করেছেন তখন গোপাল-ভাঁড়ের মা-কালীর মত জোড়া মোষ থেকে নেমে নেমে শেষ পর্যন্ত দুটো বুনো ফড়িং নিজেই ধরে খেতে রাজী হবেন—এই আমার ভরসা।

পাঁট। ইংরেজীবাগীশ ছোঁড়ারা বলে 'পাইণ্ট'। তিন কোয়াটার খেতে না খেতেই হয়ে গেল। রঙিন পাখনায় ভর করে সে পুনরায় নামল রাস্তায়। কোয়াটারটুকু ফেলা যাবে বলে বোতলটা পকেটে—বোতলবা সিনীর সেবকেরা বরঞ্চ জীবনের বেটার-হাফকে বিসর্জন দিতে রাজী আছে, ওই 'ব্যাড' কোয়াটারকে নয়।

যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে চাঁদ উদয় হয়েছিলেন কি না বলতে পারব না, কারণ আমি জ্যোতির্বিদ নই। তবে উদয় হলেন পাড়ার মৈত্রমশাই, নিষ্ঠাবান সদাচারী ব্রাহ্মণ, কালেভদ্রে বাড়ি থেকে বেরন। এক মৈত্র মিনার্ভা থিয়েটার কোথায় জেনেও বলেন নি। ইনি কিন্তু বোতল দেখে বললেন, 'পাষণ্ড মাতাল!'

পকেটে বোতল থাকলেই, এমন কী সঙ্গে সঙ্গে টলটলায়মান হলেই মানুষ মাতাল হয় না। কিন্তু মৈত্রমশাই ন্যায়শাস্ত্রের চর্চা করতেন। তাতে আছে,—

১। দেবদত্ত বিরাট লাশ।

২। দেবদত্তকে দিনের বেলায় কেউ কখনও ভোজন করতে দেখে নি।

অতএব, দেবদত্ত রাত্রে খায়।

এটাকে বলে নলেজ বাই ইনফারেন্স্।

আমাদের ভদ্রসন্তান সচরাচর কথা কাটাকাটি করে না। কিন্তু দ্রব্যগুণ

অনস্বীকার্য। বেদনাভরা কণ্ঠে, গদগদ ভাষে করুণ নয়নে শুধু বললে, 'মৈত্র মশাই, বোতলটাই শুধু দেখলেন, তিলকটা দেখলেন না।'

মন্দির ভাঙাটাই শুধু দেখলেন, 'খয়ের'টা শুনলেন না।

আমার অনেক পাঠক আমাকে বাচনিক এবং পত্র দ্বারা মাঝে মাঝে জানান যে, আমার কোন কোন গল্প তাঁরা বন্ধু-মিলনে ব্যবহার করে থাকেন। আমি শুনে বড় উল্লাস বোধ করি। কারণ পাণ্ডিত্য বিতরণ করার শক্তি মুর্শিদ আমাকে দেন নি। আমি বিদুর, যা পারি তাই দি। তাঁরা হয়ত বলবেন, এ-গল্পটা সর্বত্র বলা যাবে না। তাই তাদের জন্য একটা গার্হস্থ্য সংস্করণ নিবেদন করছি। ইটি অনায়াসে পুত্র-কন্যার হাতে দিতে পারবেন।

ঢাকার কুট্টি গাড়োয়ানের গল্প। কুট্টি বসে আছে ছ্যাকরা গাড়ির কোচবাক্সে। বাবু জামাজোড়া পরে উপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। পা গেল হড়কে। বহুতর ধাক্কা আর গোত্তা খেয়ে খেয়ে বাবু গড়িয়ে পৌঁছলেন নীচে। তিন লম্ফে কুট্টি কোচবাক্স থেকে নেমে কর্তাকে কোলে তুলে নিলে। সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দরদ ভরা কণ্ঠে কয়, 'অহো-হো, কত্তার বড় লাগছে। আহা-হা-হা, এইহানে লাগছে, এ হে-হে-হে, ওইহানে লাগছে।' গা বুলোয় আর আদর করে, আদর করে আর গা বুলোয়। শেষটায় কিন্তু সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'কিন্তু কত্তা আইছেন জল্‌দি।'

জখম-চোটের কথাই শুধু ভাবছ, তাড়াতাড়ি যে এসেছে সেটা দেখছ না।

কিন্তু কেরানী আর চাপরাসীদের কী হল ?

খয়ের।

•

চাপরাসীদের মাইনে কোতওয়ালের মত হোক সেই আমার প্রার্থনা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চাপরাসীদের কাছে নিবেদন, কোতওয়ালের মাইনে যেন কমে গিয়ে চাপরাসীদের আজকের মাইনেতে না দাঁড়ায়। আমার বাসনা, সকলেরই যেন কোটালের মাইনে হয়—অর্থাৎ আই-জি-র মাইনে হয়। আমি ধনী হব, তুমি ধনী হবে, সবাই ধনী হবে—এই হল সত্যকার প্রার্থনা। ঋষি যখন বিশ্বজনকে আহ্বান করে জানিয়েছেন সকলেই অমৃতের পুত্র তখন ওই সত্যই ঘোষণা করেছেন। পাঁড় কমিউনিস্টও ওই আদর্শের জন্য লড়ে। পেঁতিরা বলে, 'মজদুর ভাইরা শুধু সোনার খাটে বসে রুপোর শানকি থেকে দু হাত ভরে গুড় খাবে এবং

আর সবাই রাস্তায় পাথর ভাঙবে।' এটা কোন কাজের কথা নয়। আমাদের পণ, আমরা সবাই রাজা হব।

কিন্তু বেদান্তের এই অতি প্রাচীন সত্যটি পুনরায় জানাবার জন্য আমি এ-প্রবন্ধের অবতারণা করি নি। মূল কথায় ফিরে যাই।

মনে করুন, আপনি দিল্লির কোনও সরকারী দফতরে কাজ করেন। সেখানে গেলে না করেও উপায় নেই। কেন নেই; সে কথা পরে হবে। বিশ্বাস না হয়, ১৯৪৭ সনের একখানি টেলিফোন ডাইরেক্টরির সঙ্গে ১৯৫৭ সনের খানার তুলনা করে দেখুন, চাকুরের সংখ্যা কত গুণ বেড়েছে। ওখানে একদিন রুটিওলা আণ্ডাওলা আর থাকবে না—এই আমার বিশ্বাস।

আপনার চাপরাসী চৈতরাম কিংবা ব্রিজমোহন ৯৫৲ মাইনে পায়। কেরানী বোধ হয় ১১৫৲ পায়। আমি লেটেস্ট খবর দিতে পারব না—তবে অনুপাতটা মোটামুটি এই। অঙ্কশাস্ত্র এস্থলে বলবে, 'অতএব চাপরাসী কেরানীর চেয়ে বিশ টাকা কম পায়।' ওই করলেন ভুল। শুনুন।

আপনি চৈতরামকে ঘন্টি বাজিয়ে বললেন, 'যাও ত চৈতরাম, এক পাকিট গোল্ডফ্লেক নিয়ে এস।'

সরকারী আইন অনুসারে চৈতরাম অনায়াসে বলতে পারে, 'আমি যাব না। আমি মাইনে পাই সরকারী কাজের জন্য। আপনার জন্য সিগরেট আনা সরকারী কাজ নয়।' আপনি কিচ্ছু বলতে পারবেন না। বলা উচিতও নয়।

কিন্তু চৈতরাম তা বলবে না। সে ভদ্রলোক। তদ্দণ্ডেই বলবে, 'বৃহৎ (উচ্চারণ 'বোহৎ') আচ্ছা, হুজুর।' এবং লম্ফ দিয়ে এমন তীরবেগে বেরিয়ে যাবে যে, আপনি মনে মনে শাবাশি দিয়ে বলবেন, 'সোনার চাঁদ ছেলে, কী স্মার্ট।'

এক মিনিটের ভিতর চৈতরাম আপনার টেবিলের উপর প্যাকেটটা রাখবে। সিগরেটের দোকানে আসতে-যেতে পনের মিনিট লাগার কথা। কী করে হল?

চৈতরাম ডাইনের বুক পকেটে রাখে গোল্ডফ্লেক, বাঁয়ের পকেটে ক্যাপস্টান, পাতলুনের পকেটে রেড অ্যাণ্ড হোয়াইট, মেপোল ইত্যাদি। নিতান্ত কর্কশ ব্যবসায়ী হিসাবে সে পরিচয় দিতে চায় না বলে, বারান্দায় গিয়ে পকেট থেকে প্যাকেটটি বের করে এনেছে। আসলে সিগরেট বিক্রয় চৈতরামের উটকো ব্যবসা। ঠিকমত নোটিস দিলে সে আপনাকে বলকান্ সবরনী সিগরেটও এনে দিতে পারে। ও-মাল সুদ্ধমাত্র এম্বেসিগুলোর ক্যান্টিনে পাওয়া যায়।

আইন বলে, সরকারী চাকরির সঙ্গে সঙ্গে অন্য ব্যবসা করতে পারবে না।

কিন্তু আপনি যখন পুরনো খবরের কাগজ বিক্রি করলে সরকার আপনাকে ছড়ো দেয় না, তখন চৈতরামের সিগরেট বিক্রিতে দোষ কী ? কিছু না। আমি তাকে আশীর্বাদ জানাচ্ছি, তার ব্যবসা বাড়ুক।

কিন্তু কেরানী এ-ব্যবসা করতে পারে না। কে কত মাইনে পায়, এ-কথা এখন আর তুলবেন না। সিগরেট বিক্রি করে এখন চৈতরাম কেরানীর মাইনে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই হল আরম্ভ।

প্রায়ই আপনি লক্ষ্য করেন, দশটা থেকেই চৈতরাম টুলের উপর ঢোলে। তার মানে অবশ্য এ নয় যে, ডাকলে তার সাড়া পাবেন না। বরঞ্চ ঘণ্টি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই সে দর্শন দেওয়াতে কখনও গাফিলতি করে নি। একদিন আমি তাকে শুধালুম তার ইন্‌সম্‌নিয়া আছে কি না। সে মাথা নিচু করে ঘাড় নেড়ে শুধু জানালে, 'না।' হেড ক্লার্ক ওই সময় আমার ঘরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ঠোঁটের কোণে একটুখানি মৃদু হাস্যের রেখা দেখতে পেলুম। পরে তাঁকে শুধালুম, 'ব্যাপারটা কী ?'

নাঃ! চৈতরাম প্রতি রাত্রে অভিসারে বেরয় না—যদিও তার যমুনা-পারে বাস এবং পিতৃপিতামহের সাবেক মোকাম বৃন্দাবন এবং মথুরার মাঝখানে। নাঃ! 'বৃন্দাবনকে কুন্‌জ্‌-গলিয়ে শ্যামরিয়া কা দরসন' ইত্যাদি যাবতীয় সমুদায় ব্যাপার সে মায়ের গব্ব থেকেই শুনে আসছে, ও-সব রোমান্‌সে তার কোনও চিত্তদৌর্বল্য নেই।

সে করে অতিশয় গন্ধময়ী ব্যবসা। খবরের কাগজ বেচে। সাতটার ভিতর ওই কর্ম শেষ হয়ে যায় বলে সরকারী চাকরির সঙ্গে এতে ওতে কোনও দ্বন্দ্ব বাধে না। দুধের ব্যবসাও আটটার ভিতর শেষ হয়ে যায় বলে এককালে তাও করেছে। এখন নাকি ভাবছে, দুটোই কম্বাইন করা যায় কি না। চোর পালিয়ে যাওয়াতে বাবু তম্বি করে দরওয়ানকে পুছেছিলেন, 'চোর ভাগা কিওঁ ?' দরওয়ান বললে, 'মেরা এক হাথ মে তলওয়ার, দুস্‌রেমে ঢাল ; পক্‌ড়ে কৈসে ?' চৈতরাম তাকে ছাড়িয়ে যাবে। তার এক হাথমে দুধ, দুস্‌রেমে পাইপর (পেপার) এবং সঙ্গে সঙ্গে সে নৌকরিকেও পাকড়ে ধরে থাকবে।

এইবারে চিন্তা করুন, চৈতরামের আয় কতখানি বেড়ে গেল। কেরানী বেচারি ত আর সকালবেলা দুধ কিংবা খবরের কাগজ বিক্রি করতে পারে না। সমাজে মুখ দেখাবে কী করে ? পারে টুইশানি করতে। কিন্তু সেখানকার কম্পিটিশন কী রকম মারাত্মক, সে-কথা আপনারা না জানতে পারেন, আমি বিলক্ষণ জানি—বেকার হওয়ার পরের থেকে এই আট মাস ঘুরে ঘুরে একটাও

যোগাড় করতে পারি নি। অধম কুলীন সন্তান—এর চেয়ে অনেক অল্পায়াসে পাঁচটি বিয়ে করতে পারতুম। চারটি আইনত—'হিন্দু কোড-বিল' আমার উপর অর্সায় না।

হেড ক্লার্ক আপনাকে বলবেন, 'স্যর, আপনি যে চাপরাসীদের য়ুনিফর্মের জন্ত দরদ দিয়ে পার্সনাল ইন্‌ট্রেস্ট নেন, সে বড় ভাল কথা। কিন্তু স্যর, এদের য়ুনিফর্ম ছেঁড়ে সরকারী ফাইল এ-ঘর থেকে ও-ঘর নিয়ে যাবার সময় নয়, ছেঁড়ে বাইসিকলের সেডলে বসে দুধ বিক্রি করার ফলে। চাপরাসীদের পাতলুন দেখে বলে দেওয়া যায়, সকাল বেলা কে কোন্ ব্যবসা করে।'

ভুলে গিয়েছিলুম, য়ুনিফর্মের সাফসুতরায়ের জন্য চৈতরাম সরকারের কাছ থেকে 'ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্‌স্' পায়। অবশ্য একদিন ক্যাসওয়েল লীভ নিলে সেদিনের জন্য অ্যালাওয়েন্‌স্‌টি কাটা যায়। অ্যাকাউন্টেন্টের অর্ধেক সময় যায় পাঁচ টাকাকে একত্রিশ ভাগ করে দুই কিংবা তিন দিয়ে গুণ করার খেজালতী কর্মে—আপনাদের মোটা মাইনের হিসেব রাখতে নয়। এই 'ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্‌স্ শীট'খানা ঠিকমত টানতে পারেন ক'টি ঝানু অ্যাকাউন্টেন্ট, তাই নিয়ে বিরাট বিরাট আলোচনা হয়ে গিয়েছে। একবার এক আনা, তিন কড়া, দুই ক্রান্তির গোলমালে আপিসসুদ্ধ সবাই অডিটার-জেনারেলের কাছে কী হুড়োটাই না খেয়েছিলুম! শনিবার হাফ ডে—অ্যাকাউন্টেন্ট হাফ ওয়াশিং চার্জ কেটেছিলেন বলে। কাগজের সম্পাদক যখন তাঁর স্তম্ভে বলেন, সরকারী পয়সার প্রতি আমাদের দরদ নেই তখন আমাদের প্রতি বড় অবিচার করেন। অবশ্য 'দামোদরে' কত লক্ষ টাকা কোন্ দিকে ভেসে যায়, সে-কথা আমি বলতে পারব না, তবে এ-কথা আল্লার কসম খেয়ে বলব, বেহেস্তের দোহাই দিয়ে বলব, 'তাঁবা-তুলসী-গঙ্গাজল' স্পর্শ করে বলব, সরকারী নোকরি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পরও এই 'ওয়াশিং শীটে'র দুঃস্বপ্ন দেখে এখনও মাঝে মাঝে ঘুম থেকে এক গা ঘেমে জেগে উঠি। গিন্নি জানেন। বুকে হাত বোলান আর গুরুদত্ত 'ওয়াশিং-ওচাটন' আওড়ান।

কেরানী ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্‌স্ পায় না। য়ুনিফর্ম যখন নেই তখন ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্‌স্ হয় কী প্রকারে? শিশুবোধ ব্যাকরণ। অথচ তাকে ঠাট বজায় রেখে দফতরে আসতে হয়। বুশ শার্ট ইস্ত্রি না করা থাকলে বছরের শেষে তার কনফিডেনশিয়েল রিপোর্ট লিখি, 'শ্যাবি।' আপনি হয়ত বলবেন, 'ওই ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্‌স্ আর ক'পয়সা?' বটে! ছ পয়সা হোক আর ছ গণ্ডাই হোক—দেখুন না একবার রাস্তায় নেমে, ছ পয়সা কামাতে কতক্ষণ লাগে।

ওই য্-যা। ভুলে গিয়েছিলুম, বর্ষাকাল এসেছে—চৈতরাম বর্ষায় ছাতা আর বর্ষাতি পায়। মহামূল্যবান সরকারী সব ফাইল এ-দফতর থেকে ও-দফতরে নিয়ে যাবার সময় যদি ভিজে যায় তবেই ত চিত্তির—একদম অক্ষরার্থে।

কিন্তু কেরানী পায় না। যদিও সরকারী কাজেই তাকে এ-দফতর ও-দফতর করতে হয়—বগলে ফাইলও থাকে। কেরানীরা সচরাচর চাপরাসীর ছাতা ধার চায়।

একবার এক কেরানী ছাতাখানা হারিয়ে ফেলে। চাপরাসী বলে, 'ছাতা কিনে দাও।' সরকারী ফাইল বাঁচাবার প্রেমে নয়, দুধ বাঁচাবার জন্য। কেরানী বলে, 'সরকারী কাজে খোওয়া গিয়েছে, ওটা "রাইট অফ্" হবে।' দুধের স্মরণে নাকি উপদেশ দিয়েছিল, 'তা বেরবার সময় দুধে জল দিস্ নি, বৃষ্টির জলে ওটা পুষিয়ে নিস।' শেষটায় কী হয়েছিল, জানি নে। সি. সি. বিশ্বাস বলতে পারবেন। তখন আইন-মন্ত্রী ছিলেন তিনি।

চৈতরাম শীতকালে কম্বল পায়। কেরানী পায় না। তার চামড়া বোধ করি গণ্ডার ব্র্যাণ্ড। সদাশয় সরকার বলতে পারবেন।

চৈতরাম কোয়ার্টারও পায়। একখানা ঘর। এক ফালি বারান্দা। এক ডুমো উঠোন। ঘরখানা সে একজন রেফুজীকে পঁচিশ টাকায় ভাড়া দিয়ে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে। সে চৈতরামের কাছে চিরকৃতজ্ঞ ও তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। চৈতরাম বারান্দায় শোয়, মাঝে-মধ্যে ওদের সঙ্গে নাশ্‌তা বখরায় খায়-টায়। চৈতরাম দুখানা ঘর পেলে বড় ভাল হত। একখানাতে সে মাথা গুঁজতে পারত বলে? উহুঁ। দুখানাই ভাড়া দিতে পারত বলে। তাই চণ্ডীগড়ের নূতন ক্যাপিট্যালে তারা দুখানা ঘরের জন্য আবেদন-আন্দোলন চালিয়েছে। আমি সেই আবেদনে সানন্দে স্বাক্ষর নিয়েছি।

কোয়ার্টার কেরানীও পায়—যাদের সত্যকার মুরুব্বীর জোর আছে। কিন্তু সেটা ভাড়া দিয়ে থাকবে কোথায়? বারান্দায়? মুশকিল।

এই তো গেল মোটামুটি জরিপ। তার ওপর পুজো-আর্চায় বখশিশটা-আসটা। কোন জিনিস বড় সাহেবের জন্য কিনে আনলে তিনি কি আর চেঞ্জটা সব সময় ফেরত চান? কেরানী এসব রসে বঞ্চিত।

এই কাঁড়া কাঁড়া টাকা নিয়ে চৈতরাম করে কী?

ওই জানলেই ত পাগল সারে।

কেরানীদের সঙ্গে লগ্নির ব্যবসা করে। এটা সবিস্তার বর্ণনা করতে আমার বাধো-বাধো ঠেকছে। তবে এইটুকু বলতে পারি, কেরানীরা অসন্তুষ্ট নয়। এবং

আপনি খুশী, মাসের পয়লা তারিখে কাবুলীওয়ালাদের দফতরের আনাচে-কানাচে ঘোরার কটু দৃশ্য দেখতে হয় না বলে। চাপরাসী ওদের ঠেকিয়ে রেখেছে!

জনৈক বন্ধু গল্পটি বলেছেন—

আহাম্মুক জামাই শ্বশুরকে শোধাচ্ছে, 'সম্বুরমশাই, সম্বুরমশাই, আপনার বিয়ে হয়েছে?'

'হ্যাঁ।' (মনে মনে, 'ব্যাটা না হলে তুই বউ পেলি কোত্থেকে?')

'কার সঙ্গে, সম্বুরমশাই?'

রাগত কণ্ঠে, 'তোমার শাশুড়ীর সঙ্গে।'

জামাই, গদগদ কণ্ঠে, 'আহাহা, ভালই হয়েছে, ভালই হয়েছে, ঘরে ঘরে বিয়ে হয়েছে।'

দফতরের ভিতর আপোসে এই ব্যবস্থা আপনারও পছন্দসই হওয়ার কথা। চিন্তা করে দেখুন।

* * *

শুনেছি, একদম টপে উঠলে, অর্থাৎ মন্ত্রী-টন্ত্রী হয়ে গেলে নাকি অনেক রকম সুখ-সুবিধা আছে। অবশ্য চাপরাসীদের মত টায় টায় এ রকম নয়! তবে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। কোনও বিশেষজ্ঞ যদি সেটা বাতলে দেন তবে ঠিক আন্দাজ করতে পারব, দশ পার্সেন্ট উচ্ছুগ্‌গো করাতে তাঁরা কী পরিমাণ আত্মোৎসর্গ করেছেন।

চিল্কা

সন্ধ্যাবেলা গোলাপের কুঁড়িটির দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলুম। প্রকৃতি যেন যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি কুঁড়ি তৈরী করার পর আজ এ-কুঁড়িতে তার পরিপূর্ণতা পেয়েছে।

সকালবেলা বাগানে গিয়ে দেখি, সে-কুঁড়িটি ফুটেছে। কুঁড়ির ভিতরে প্রকৃতি গোপনে গোপনে পাপড়ির যে নিখুঁত সামঞ্জস্য সাজিয়ে রেখেছিল সেই সামঞ্জস্য নিয়েই পাপড়িগুলো বাতাসের গায়ে শরীর মেলে দিয়েছে। রেণু যেন রাজকুমারী, আর চতুর্দিকে সার বেঁধে তাঁর সখীরা এক নিস্তব্ধ নৃত্য আরম্ভ করে দিয়েছেন।

চুপ করে দেখতে দেখতে আমার মনে হল, সন্ধ্যেবেলার কুঁড়িতে দেখেছিলুম এক সৌন্দর্য আর সকালবেলাকার ফোটা-ফুলে দেখছি আরেক সৌন্দর্য। এই পরিবর্তনটি যদি আমার চোখের সামনে ঘটত তবে এই দুই সৌন্দর্যের ভিতর

আরও সৌন্দর্য দেখতে পেতুম। কিন্তু সে ত হবার নয়; ফুল ফোটে এত ধীরে ধীরে যে তার বিকাশ আর পরিবর্তন ত চোখে পড়ে না। মমস্ত রাত কুঁড়ির কাছে জেগে রইলেও সৌন্দর্যের ক্রমবিকাশে তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ আমার চোখ এড়িয়ে যাবে।

ভগবান আমার সে-ক্ষোভ চিল্কার পারে ঘুচিয়ে দিলেন।

অতি ভোরে চিল্কার সার্কিট হাউসে ঘুম ভাঙল, বারান্দায় কাচ্চাবাচ্চাদের কিচির কিচির শুনে। আঙ্গুল-আশ্রমের ছেলেমেয়েগুলো তা হলে নিশ্চয়ই দুপুর-রাতে এসে পৌঁছেছে।

দরজা খুলে পুব আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, আমার বাগানের সেই গোলাপ-কুঁড়ি। শুধু এ-কুঁড়ির রঙ একটু বেশী লালচে। আমার আর পুর্ব আকাশের মাঝখানে বিস্তীর্ণ জলরাশির উপর এক ফালি সিঁথির সিঁদুর। কিংবা যেন কোন রক্তাম্বরধারিণী গরবিনী চিল্কার উপর দিয়ে পুর সাগরের পানে যেতে যেতে রক্তাম্বরী নিংড়ে নিংড়ে জল ফেলে ফেলে আমার ওই কুঁড়ির পিছনে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন।

সুন্দরীর কথা ভুলে গিয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম কুঁড়ির দিকে। সে কুঁড়ি ফুটতে আরম্ভ করেছে। শুধু এর পাপড়ির আকার অন্য রকমের। সোজা, ধারালো তলোয়ারের মত এক একটি সূর্যরশ্মি দিগ্বলয়ের অন্তরাল থেকে হঠাৎ পূর্ব গগন পানে ধেয়ে ওঠে। অসংখ্য রশ্মি অর্ধচক্রাকারে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। তাদের কেন্দ্র—ঘুমন্ত রাজকুমারীর এখনও দেখা নেই। আকাশের লাল ক্রমেই কমে আসতে লাগল। চিল্কার রাঙা জলের ফালি গোলাপী হয়ে হয়ে শেষটায় নীলাম্বরী পরতে আরম্ভ করেছে।

চতুর্দিকে আর সব কিছু পাণ্ডু, যেন হিমানীর গ্লানি-মাখা।

সবিতা স্বপ্রকাশ হলেন। আলোতে আলোতে হিমানীর সর্ব-গ্লানি ঘুচে যাচ্ছে। পুব আকাশের দিকে ধেয়ে-ওঠা সূর্য-অসিরাজি সবিতা সংহরণ করে নিয়েছেন। জাদুকর তার ভানুমতীর ইন্দ্রজাল অদৃশ্য করে পূর্ণ মহিমায় রঙ্গমঞ্চে একা দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমারই চোখের সামনে আমার বাগানের গোলাপের কুঁড়িটি ফুটে উঠল। এর সম্পূর্ণ ফোটাটি আমি প্রাণভরে দেখলুম। এর কিছুই ফাঁকি গেল না। কিন্তু এ-ফোটা গোলাপের ফোটার চেয়ে কত লক্ষ গুণে গম্ভীর। এর ব্যাপ্তি বিশ্ব-চরাচর ছড়িয়ে এবং হয়ত ছাড়িয়ে।

আমার মনে আর কোন ক্ষোভ রইল না।

আলো ফুটেছে, কিন্তু জলে বাতাসে, ডাঙায় আকাশে এখনও যেন কী এক আবেশ জড়ানো। চিল্কার জল কেমন যেন একটা নীলুফরি রঙ মেখে নিয়েছে। এ-রঙ সমুদ্রের জল চেনে না, দেশের বিলে, বিদেশের ব্লু ডানয়ুবেও নীলের এ-আভাস আমি কখনও দেখি নি। তবে কি চিল্কা একদিকে যেমন হ্রদ, অন্যদিকে তেমনি সমুদ্রের সঙ্গে জোড়া বলে সাদায় আর নীলে মিশে গিয়ে নীলুফরি রঙ ধরেছে? তাই হবে। বর্ষায় নাকি নদীর অপর্যাপ্ত জল হ্রদে নেমে এসে তার লোনা জলকে মিঠা করে দেয়। শীতে নাকি সমুদ্রের জোয়ারের মারে জল ফের লোনা হয়ে যায়।

নীলুফরির মাঝখানে ওই বিরাট কালো পোঁচ কিসের? মন্দমধুর ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে বলে সে-পোঁচ আবার অল্প অল্প দুলছে। স্টীমলঞ্চ ক্রমেই কালো পোঁচের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখি সেই কালো ফালিটা জল ছেড়ে আকাশের দিকে হাওয়ায় ভর করে উড়ে চলল—লক্ষ লক্ষ পাখি। এরা নাকি এসেছে সাইবেরিয়া থেকে, হিমালয় থেকে। ঠিকই ত; এদেরই ত আমি দেখেছি খাসিয়া পাহাড়ের পায়ের কাছে, ডাউকির হাওরে হাওরে, চেরাপুঞ্জির জলে ভর্তি বিলে বিলে।

চিল্কার সমস্ত সৌন্দর্য এক মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল। হৃৎপিণ্ডটা কে যেন শক্ত হাতে মুচড়ে দিল, বুক থেকে কী যেন একটা উঠে এসে গলাটাকে বন্ধ করে দিল। আর যেন ঢোক গিলতে পারছি নে।

মাথার উপরকার সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলে শুভ্র মল্লিকার পাপড়ি ছড়ালে কে? পাপড়িগুলো অতি ধীরে ধীরে কেঁপে কেঁপে, এদিক ওদিক হয়ে হয়ে জলের দিকে নেমে আসছে। বিলেতের বরফ-বর্ষণ এর কাছে হার মানে।

এ ত সেই পাখিগুলোর বুক। এদের পিঠের রঙ কালো। তাই তারা যখন জলে বসে থাকে তখন মনে হয়, এরা হ্রদের নীল চোখের কৃষ্ণাঞ্জন, আর আকাশ থেকে যখন নেমে আসে তখন উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি সিত-মল্লিকা-বর্ষণ।

পাশে ভাগ্নী কৃষ্ণা বসে ছিল। বললে, 'মামা, ওই দেখ, চিল্কার দেবী কালী-মার দ্বীপ। ওখানে জল নেই, ঘাস নেই, তোমার টাকের মত সব কিছু খা-খা করছে।

টাকের কথা ওঠাতে বিরক্ত হয়ে দ্বীপের দিকে না তাকিয়ে তাকালুম রোষ-কষায়িত লোচনে, কৃষ্ণার চোখের দিকে। সেখানে দেখি চিল্কার মাধুরী। কৃষ্ণার

চোখের সাদা যেন সাদা হতে হতে নীলুফরি হয়ে গিয়েছে আর তার গায়ের কালো রঙ দিয়ে চোখের চতুর্দিকে স্বয়ং বিশ্বকর্মা এঁকে দিয়েছেন কৃষ্ণাঞ্জন।

ভগবান একই সৌন্দর্য কত না ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখান! শিশুর খলখলে হাসি আমি শুনেছি নির্ঝরিণীর কলকল রোলে, বিগলিত মাতৃস্তন্য দেখেছি আরবের মরুভূমির বুক ফেটে বেরিয়ে আসা সুধারসে, নবজাত শিশুর গাত্রগন্ধে পেয়েছি প্রথম আষাঢ়ের ভিজে মাটির গন্ধ।

রসময় পাঠক, এইবারে আমি তোমার একটু করুণা ভিক্ষা করি। আমি কাব্যরস ভিন্ন অন্য আরও দু-একটি রসের সন্ধান করি। তারই একটি খাদ্যরস। চিল্কার এ-পাখির রস আমি চেখেছি দেশে। আবার লোভ হল। সঙ্গে ছিল স-বন্দুক পারিকুদের রাজা। তার এবং তার বন্দুকের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালুম। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে চিল্কার কালীকে স্মরণ করে বললুম, 'গোটা পাঁচেক পাখি দাও না, মা!' তারপর ভাবলুম, না, অত বেশী চাওয়া-চাওয়ি ভাল নয়, দেবীকে দেখাতে হবে, আমি কত অল্পেতেই সন্তুষ্ট হই। মনে মনে বললুম, 'আচ্ছা, না হয়, পাঁচটা না-ই বা দিলে। গোটা দুত্তিন দিলেই হবে। আমার খাঁই মাইজী বড্ডই কম।'

বলেই একটা ইরানী গল্প মনে পড়ে যাওয়াতে হাসি পেল। এক ইরানী দরবেশ ভগবানকে উদ্দেশ করে বললে, 'হে আল্লাতালা, আমাকে হাজার পঁচিশেক তুমান দাও। আমি তোমার কিরে কেটে বলছি, তার থেকে পাঁচ হাজার তুমান গরিব-দুঃখীদের ভিতর দান-খয়রাত করে বিলোব। আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না? আচ্ছা, তা হলে তোমার পাঁচ হাজার তুমান কেটে নিয়ে আমাকে বিশ হাজারই দাও।'

চিল্কা হ্রদ বিস্তর ছোট ছোট দ্বীপে ভর্তি। মাত্র একটি ছাড়া নাকি সব কটাতেই মিষ্টি জল পাওয়া যায়। এসব দ্বীপে থাকে গরিব জেলেরা। ডাঙার সঙ্গে এদের কোন যোগসূত্র নেই। এদের পোস্ট-অফিস নেই, টেলিগ্রাফের তার ডাঙার সঙ্গে দ্বীপের মানুষকে কাছাকাছি এনে দেয় নি। আর আপন দ্বীপের বাইরে বিশ্বসংসারের কাকেই বা এরা চেনে যে ওরা এদের টেলিগ্রাম পাঠাবে, ওরা এদের কুশল সংবাদ জানতে চাইবে।

আমি ভাবলুম, আমার দেশে নাগা-গারোরা পর্যন্ত মাঝে মাঝে পাহাড় থেকে নেমে, পায়ে হেঁটে কিংবা বাসে করে শহরে যায়। এটা সেটা দেখে,র ফুটপাতে

দোকানে বসে চা খায়, সিনেমা যায়, কেনাকাটাও করে। এই উড়িষ্যারই আদি-বাসীরা মাঝে মাঝে বন থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের বাড়িঘরদোর দেখে, হয়ত মনে মনে সংকল্প করে, বনের ভিতরই ওদের জীবনকে আরও সমৃদ্ধ করবে। কিন্তু চিল্কার দ্বীপবাসীরা সৃষ্টির সেই আদিমকাল থেকেই দ্বীপবাসী। আজ যে-সব জিনিসপত্র দিয়ে তারা মাছ ধরে, দু-হাজার বৎসর পূর্বেও তাই দিয়ে তারা মাছ ধরেছে। সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি, বিজ্ঞানের প্রসার এদের কোনও কাজে লাগে নি।

হয়ত ভালই আছে। ফার্সীতে বলে, 'দূর বাশ্, খুশ বাশ্।' দূরে আছে; ভালই আছে। টমাস কেম্পিসও বলেছেন, 'যতবার আমি মানবসমাজে গিয়েছি ততবারই আমি খানিকটে মনুষ্যত্ব হারিয়ে বাড়ি ফিরেছি।' হয়ত 'সভ্যতা'র আওতায় না এসে এরা সত্যই সভ্যতর।

চিল্কার বড় দ্বীপ পারিকুদ। ডাঙা থেকে মাইল আষ্টেক দূরে হবে। দ্বীপে নেমে খানিকক্ষণ চলার পর মনে হল, কোথায় চিল্কা, কোথায় তার নীলুফরি জল, কোথায় দূর-দূরান্তের সিন্ধুরেখা আর কোথায়ই বা কৃষ্ণপক্ষ পক্ষীর শুভ্র বক্ষের মল্লিকা বর্ষণ। এ ত দেখছি, পুব-বাংলার পাড়া-গাঁ। রাস্তার উপর সাদা ধুলো। দু দিকে রাস্তার জন্য মাটি তোলার ফলে লাইন বেঁধে ডোবার সারি। তাতে ফুটেছে ছোট ছোট শ্বেতপদ্ম রক্তপদ্ম। মাছরাঙা ওড়াওড়ি করছে আর মাঝে মাঝে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ধ্যানমগ্ন বক। মোষগুলো গলা অবধি ডুবিয়ে চোখ বন্ধ করে ধীরে গম্ভীরে মাথা নাড়ছে। শুধু পুব-বাংলার জমির মত এ-জমি উর্বরা নয়; তাই ক্ষেত-খামারের চিহ্ন কম।

রোদ চড়ছে। দূর গ্রামের শ্যামশ্রীর দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়য়। ওইখানে পৌঁছতে পারলে হয়। শহরের লোক; এতখানি হেঁটে অভ্যেস নেই। ক্লান্তি বোধ হচ্ছে।

সঙ্গে পারিকুদের রাজা। রাজবাড়িতে পৌঁছে দু দণ্ড জিরিয়ে নিলুম। সেখানে বিরাট বিরাট কৌচ সোফা, দশ-হাতী খাড়া আয়না, জগদ্দল কাবার্ড আলমারি, সোনার সিংহাসন, মার্বেল-টপ টেবিল, বাথ-টাব, ঝাড়-ফানুস, আরও কত কী! এসব ওই গরিব জেলেদের পয়সায়? অবিশ্বাস্য।

কলকাতা থেকে ট্রেনে এসেছে চিল্কার পার অবধি। তারপর কত চেল্লাচেল্লি হৈ-হুল্লোড়ের ভিতর এগুলোকে নৌকায় চাপানো হয়েছে, নাবাতে হয়েছে, কত লোক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এগুলোকে রাজবাড়ি পর্যন্ত কাঁধে করে বয়ে

এনেছে, পড়ি-মরি হয়ে উপরের তলায় তুলেছে।

শুধু রাজপরিবার এগুলো ব্যবহার করেন। রাজপরিবার বলতে উপস্থিত রাজা আর রাণী। আর আজ সকালের মত আমরা।

সূর্য মধ্যগগনে। লঞ্চ পুবদিকে সমুদ্রের পানে ধাওয়া করেছে, যেখানে হ্রদের সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গম।

পূর্বদিগন্তে যেখানে সমুদ্র আর হ্রদ আকাশের সঙ্গে মিশেছে সে-জায়গা ঝাপসা হয়ে আছে। মনে হয়, হ্রদ দূরে যেতে যেতে হঠাৎ যেন কোথাও অসীম শূন্যে লীন হয়ে গিয়েছে। গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে গরমের দেশের দগ্ধতাম্র দিগন্তে যে আস্বচ্ছ ছায়ানৃত্য আরম্ভ হয়, এখানে যেন তারই এক অন্যরূপ। এখানে যেন অশরীরী বাষ্প-নৃত্য আরম্ভ হয়েছে আর তারই আড়ালে হ্রদের শেষ, সমুদ্রের আরম্ভ, সমুদ্রবক্ষে আকাশের চুম্বনে সব কিছু ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

তাই পশ্চিমমুখো হয়ে বসলুম ডাঙার দিকে তাকিয়ে।

পাখিরা সব গেল কোথায়? শুধু দু-একটি ঝাঁক হেথা হোথায়। বোধ হয় ঠাণ্ডা দেশের প্রাণী বলে দ্বীপের গাছতলার ঠাণ্ডাতে আশ্রয় নিয়েছে।

কত রকমের নীল রঙ দেখছি।

হ্রদের জল দুপুর-রোদে অতি হাল্কা ফিকে নীল হয়ে গিয়েছে। হ্রদের পরে পাড়ের গ্রামের রঙ এমনিতে ঘন সবুজ কিন্তু এখন দেখাচ্ছে হ্রদের জলের চেয়ে একটুখানি ঘনতর নীল। গ্রামের পিছনে পাহাড়, তার রঙ আরও একটু বেশী ঘন নীল। এবং সর্বশেষে পাহাড়ের পিছনের আকাশ ঘোর নীল।

এ কী করে সম্ভব হয় জানি নে। গ্রামের গাছপালা, পাহাড়ের ঝোপ-ঝাড় হয় সবুজ রঙের কিন্তু আজ এরা নীলের ছোপ মেখে নিল কী করে? তবে কি আমার আর পাড়ের মাঝখানে দীর্ঘ নীল বিস্তৃতি, আমার চোখ দুটিকে নীলাঞ্জন—কিংবা নীল চশমা পরিয়ে দিয়েছে যে আমি সব কিছুই নীল দেখছি?

মেজিশিয়ানরা দেখেছি মাথার উপরে হাত তুলে এক প্যাক তাস ছেড়ে দেয় আর আলগা আলগা তাসগুলো জুড়ে গিয়ে ভাঁজে ভাঁজে নেমে আসে। এখানে যেন আকাশের অন্তরাল থেকে কোন এক জাদুকর আকাশ, পাহাড়, বন, জল এই হরতন, চিরতন, রুহিতন, ইশকাপনের চারখানা তাস জুড়ে দিয়ে ভাঁজে ভাঁজে লটকে দিয়েছেন। কিন্তু এ-ওস্তাদ লাল-কালোর দু রঙ না নিয়ে, মেলাই তসবির না এঁকে, এক নীলের ভিন্ন ভিন্ন আভাস দিয়ে অপূর্ব এক ভেল্‌কি-বাজি দেখাচ্ছেন।

হ্রদের বুকে হাওয়া এতটুকু আঁচড় কাটে নি—একেবারে সম্পূর্ণ নিখিরকিচ। শুধু আমাদের লঞ্চ যেন চিরুনির মত ইন্দ্রপুরীর কোন এক রমণীর দীর্ঘ বিস্তৃত নীলকুন্তলে সিঁথি কেটে কেটে সমুদ্র-সীমন্তের দিকে এগিয়ে চলেছে। সিঁথির দু দিকে চূর্ণ কুন্তলের ফেনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে কিন্তু এ গরবিনীর কুন্তলদাম এমনই বিপুল যে চিরুনি বেশীদূর এগতে-না-এগতেই দেখতে পাই, দু দিকের ঘন কুন্তল সিঁথিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

চতুর্দিকে অসীম শান্তি পরিব্যাপ্ত। শুধু লঞ্চের মোটরটার একটানা শব্দ কর্ণে পীড়া দেয়। সান্ত্বনা শুধু এইটুকু, এই নীলিমার সৌন্দর্য-মাধুরীতে ডুব দিলে কানে এসে মোটরের শব্দ পৌঁছয় না।

যোগশাস্ত্রে পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তি-নিরোধের অনেক পন্থার নির্দেশ দিয়েছেন। এটা দিলেন না কেন?

এবারে সূর্যাস্ত। পশ্চিমের আকাশ হয়ে গিয়েছে টুকটুকে লাল। আকাশ যেন প্রথমটায় তাঁর নীল কপালের সিঁথিতে এক ফালি সিঁদুর মেখেছিলেন, তারপর তাঁর খোকা কচি হাতের এলোপাতাড়ি থাবড়া দিয়ে এখানে-ওখানে থাবলা থাবলা সিঁদুর লাগিয়ে দিয়েছে! মা শেষটায় সমস্ত মাথায় সিঁদুর মেখে নিয়েছেন।

নীলে লালে মিশে গিয়ে বেগুনী হয়? তাই বোধ হয়। হ্রদের জল বেগুনী হয়ে গিয়েছে।

আজকের সূর্যাস্ত বড় অল্প সময়েই শেষ হয়ে গেল। আকাশে মেঘ থাকলে তারা সূর্যাস্তের লালিমা খানিকটে শুষে নেয় এবং সূর্য পাহাড়ের আড়ালে চলে যাওয়ার পরও মহফিল-শেষের তানপুরোর রেশের মত খানিকক্ষণ আকাশ-বাতাস জলস্থল রাঙিয়ে রাখে।

দিল্লির কবি গালিব সাহেব এই 'শেষ রেশটুকু'র উপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। তাঁর দুরবস্থা তখন চরমে। বাড়িখানা ঝুরঝুরে। এক বন্ধুকে চিঠি লিখেছিলেন, 'অগর পানী বরসতা এক ঘন্টা, তো ছৎ বরসতী দো ঘন্টে'—'জল যদি বর্ষে এক ঘন্টা ত ছাত বর্ষে দু ঘন্টা!'

দু-এক ঝাঁক পাখি এখানে ওখানে। পারিকুদের রাজাকে বললুম, 'দু-একটা মার না।'

রাজার রাজকীয় চাল। পাখি দেখলে চাকরকে ধীরে সুস্থে বলেন, 'বন্দুকো।' চাকর রাজার রাজা! তার চাল আরও ভারিক্কি। আরও ধীরে সুস্থে কেস

খুলে বন্দুক এগিয়ে দেয়। রাজা গদাইলস্করী চালে 'বন্দুকো' জোড়া লাগিয়ে বলেন, 'কার্তুজো'। ক-রে, ক-রে সব যখন তৈরী তখন পাখিরা সাইবেরিয়ায় চলে গিয়েছে। তবে কি রাজার তাগ খারাপ ?

তবু ভদ্রতার খাতিরে দু-একটা গুলি ছুঁড়লেন। ফলং শূন্যং।

আমার একটা গল্প মনে পড়ে গেল।

বড়লাট গেছেন বরোদায় পাখি শিকারে। আমাদের ওস্তাদ শিকারী রহমৎ মিয়া গেছেন সঙ্গে। সন্ধ্যায় যখন ওস্তাদ বাড়ি ফিরলেন তখন বাচ্চা শিকারীরা উদ্‌গ্রীব হয়ে শুধালে, বড়লাট সায়েবের তাগ কী রকম ? ওস্তাদ প্রথমটায় রা কাড়েন না। শেষটায় চাপে পড়ে বললেন, 'বড়লাটের মত শিকারী হয় না, আশ্চর্য তাঁর তাগ। কিন্তু আজ খুদাতালা পাখিদের প্রতি সদয় (মেহেরবান) ছিলেন।'

পূর্ব পশ্চিমে যেন দেখন-হাসি, ইলেকটিরিতে খবর পাঠাল, না বয়স্কাউটের নিশানে নিশানে কথাবার্তা। পশ্চিমের লালের ইশারায় পুব লাল হয়। সেই লাল ফিকে হচ্ছে—কী গোপন কায়দায় তার খবর পূর্বে পৌঁছচ্চে ? মাঝের বিস্তীর্ণ আকাশ ত ফিকে, কোনও রঙ নেই, ফেরফার নেই। কী করে এর হাসি ওর গায়ে গিয়ে লাগে, এর বেদনা ওর বুকের সাড়ায় প্রকাশ পায় ?

আধা আলো-অন্ধকারে সাতপাড়া দ্বীপে নামলুম। আম-বাগানের ভিতর ছোট একটি ডাক-বাংলো। লাঙ্গুল-আশ্রমের কাচ্চাবাচ্চারা কিচিরমিচির করছে। খানিক পরে চিল্কা হ্রদের তাজা মাছ-ভাজার গন্ধ নাকে এল। সর্বাঙ্গে ক্লান্তি, কখন খেলুম, কখন ঘুমিয়ে পড়লুম, কিচ্ছু মনে নেই।

শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙল। দেখি আমার অজানতে বাতিওলারা এসে আসমানের ফরাশে এখানে ওখানে তারার মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে গিয়েছে। এবারে শেষ রাত্রের মুশায়েরা বসবে। আম গাছ মাথা দোলাবে, ঝিঁঝি নূপুর বাজাবে, পুবের বাতাস মজলিসের সর্বাঙ্গে গোলাপ-জল ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করে যাবে।

তারপর দেখি দূর সাগরের ওপারে লাল মদের ভাঁড় থেকে চাঁদ উঠলেন ধীরে ধীরে, গা টেনে টেনে। সকলের মুখে হাসি ফুটল। অন্ধকার আকাশে যে সব মোসাহেবরা গা-ঢাকা দিয়েছিলেন তাঁদেরও চেনা গেল। ছোট বাচ্চা যেমন মুশায়েরার মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়ে, আমি আবার তেমন ঘুমিয়ে পড়লুম।

ভোর হল। আজ আমার ছুটি শেষ। আপিসের কথা মনে পড়তেই সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল। লঞ্চে উঠে পাড়ের পানে রওয়ানা দিলুম। সে সকালেও অনেক নবীন সৌন্দর্য দেখা দিয়েছিল কিন্তু আপিসের জুজু আমার পঞ্চেন্দ্রিয় অসাড় করে দিয়েছে। যেন ডুব-সাঁতার দিয়ে ডাঙায় পৌঁছে, আপিস আর অদৃষ্টকে অভিসম্পাত দিতে দিতে কটক এলুম।

বাঙালী

এই যে কলকাতা। জয় মা গঙ্গা!

আর যেন মা তোমায় কুলত্যাগ করে ভিন-দেশে যেতে না হয়।

আহা, মাইকেল কি কবিতাই না রচেছিলেন—

'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়।
তাই ভাবি মনে—'

কিন্তু আশাকে আমি দোষ দিই নে। আশাকে তখনই দোষ দেওয়া যায়, যখন মানুষ হেথাকার শান্তি-সুখ বর্জন করে হোথাকার খ্যাতি-প্রতিপত্তির জন্য ছোটে। কিন্তু বঙ্গসন্তান মাত্রই কলকাতা ছাড়ে পেটের দায়ে। হেথায় অন্ন জুটছে না বলেই সে হোথাপানে ধেয়ে যায়—হায়, তার জীবনে স্বাধীনতা কোথায়? 'তার জীবন' কথাটিই ভুল। তা না হলে আজ ঢাকার পয়সাওলা ছেলে কলকাতার রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করছে কেন, কলকাতার বাচ্চাই বা দিল্লির এর দোরে ওর দোরে হানা দিচ্ছে কেন? তার জীবন ত এখন দৈন্যের জীবন, দু মুঠো অন্নের কাছে গচ্ছিত, এক টুকরো কাপড়ের কাছে বেচে দেওয়া।

কিন্তু থাক্ এসব অপ্রিয় আলোচনা। আপনাদের ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে, আপনারা শাঁক বাজান আর না-ই বাজান 'মম চিত্ত মাঝে' ঘন ঘন শাঁক বাজছে।

বড্ড ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে—না? তবে কিনা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, যার জন্মদিন, তা সে পাঁচ বছরের ছেলেই হোক সেদিন সে রাজা। তার চতুর্দিকে সেদিন পরব জমে ওঠে, তাকেই সবাই কথা কইতে দেয়। আজ কলকাতায় আমার পুনরায় নবজন্মদিনে আমার সহৃদয় পাঠকরা আমার ভ্যাচর ভ্যাচর কিঞ্চিৎ বরদাস্ত করে নেবেন বইকি। শাস্ত্রেও তার ব্যবস্থা আছে। আমি স্মার্ত নই, তাই আবছা-আবছা মনে পড়ছে, কেউ যদি চৌদ্দ বৎসর (কিংবা সাতও হতে পারে) নিরুদ্দেশ থাকে, তবে তার শ্রাদ্ধ করতে হয়, কিন্তু তারপর

যদি হঠাৎ সে ফিরে আসে, তবে তার জন্ত নূতন করে জন্মোৎসব ইত্যাদি যাবতীয় ক্রিয়া-কর্ম করতে হয়। তাকেও মাতৃগর্ভস্থ ছোট বাচ্চাটির মত দু' মুঠো বন্ধ করে আস্তে আস্তে ভূমিষ্ঠ হওয়ার ভান করতে হয়। তার নামকরণ, চূড়াকরণ, এমন কী নূতন করে উপনয়নও হয়। মনে পড়ছে না, তবে বিবেচনা করি, ব্রহ্মচর্যের পর তাকে পুনরায় তার স্ত্রীকে বিয়েও করতে হয়—বিলিতি ধরনের সিলভার, গোল্ডেন ওয়েডিংয়ের মত। তাতেই বা কী কম আনন্দোল্লাস, অবশ্য সব কিছুই হয় ঘণ্টাখানেকের ভিতর। এ সব ক'টা ব্যবস্থাই আমার বড়ই মনঃপূত, ভাবতে গেলেই হৃদয় প্রসন্ন হয়ে ওঠে। বিশেষ করে যখন বাচ্চাটির অর্থাৎ লোকটাব মায়ের ছবি মনের ওপব ভেসে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা একটু পরিবর্তন করে বলি, তিনিও কি সেদিন বধূবেশ পরে সীমন্তের উপর অর্ধাবগুণ্ঠন টেনে নিয়ে অন্যান্য অন্তঃপুরিকা কুললক্ষ্মীদের ন্যায় প্রসন্নকল্যাণ মুখে মাঙ্গল্য রচনায় নিরতিশয় ব্যস্ত হন না ?

কিন্তু হায় যার মা নেই ?

দিল্লি ভাল জায়গা ; ভালবাসি কিন্তু কলকাতাকে।

আসানসোল কিংবা বর্ধমানের কাছে রেলগাড়িতে ঘুম ভাঙল। আগের রাত্রে যুক্তপ্রদেশেব কোন নাম-না-জানা জায়গায় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম মনে গভীর প্রশান্তি নিয়ে যে, পরদিন সকালবেলাই চোখ মেলব বাঙলা দেশে ; তাই না জাগলে আমি হাওড়া পেরিয়ে, শেয়ালদা ছাড়িয়ে যে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে চলে যেতুম, তার খবর কি আই বি পর্যন্ত রাখতে পারত ? ডাক্তাররা বলেন, মনের শান্তি সর্বোত্তম নিদ্রাদায়িনী—ওনারা তত্ত্বটা লাতিনে বলেন বলে আমি অনুবাদটি ঈষৎ সংস্কৃত-ঘেঁষা করে দিলুম। ঘুম কেন বর্ধমানের কাছাকাছি ভাঙল সে-কথাও নিবেদন করছি। চায়ের গন্ধ পেয়ে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, আসাম-বাঙলার বাইরে কেউ চা তৈরি করতে জানে না—বাঙলা প্ল্যাটফর্মের রদ্দি চা-ও দিল্লী-লাহোরেব উত্তম উত্তম খানদানী পরিবারের চা-কে খুশবাইতে হার মানাতে পারে। বাঙলার চায়ের খুশবাই ঘুম ভাঙাল।

চোখ খুলে দেখি সমুখে বাঙলা।

অবশ্য মানতে হবে যুক্তপ্রদেশ-বিহাব ডুম করে বাঙলা দেশে পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যদি 'আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন থেকে' 'কালের সাগর' পাড়ি দিয়ে এক মুহূর্তেই 'শ্যামল মাটির ধরাতলে' চলে আসতে পারেন তবে আপনিই বা কেন এক ঘুমের ডুব-সাঁতার কেটে এলাহাবাদ থেকে বর্ধমান পৌঁছতে পারবেন না ? এমন কী, গেল রাত্রিতে যে-লোকটা আপনার কামরায় ঢুকে

উপরের বার্থে শুয়েছিল, যাকে আপনি 'ছাতু' ভেবে অবহেলা করেছিলেন, সে-ব্যক্তি বর্ধমান পৌঁছে দেখবেন দিব্যি বাংলা বলতে আরম্ভ করেছে। আপনার জানটা অকারণে খুশ হয়ে যাবে, গায়ে পড়ে বলবেন, 'এক কাপ চা হবে স্যার!'

পাঞ্জাবীদের তুলনায় এরা কালো, বেঁটে, রোগা, অনেকেই হাড্ডিসার, এদের স্যুট কেনার পয়সা নেই, যদি বা থাকে তবু মাসে দুবার করে প্রেস করিয়ে' ব-তরিবত পরতে জানে না, এদের রমণীরা এখনও সেই মান্ধাতার আমলের শাড়ি ব্লাউজ পরে, পেট-কাটা একবিঘতী কাঁচুলির উপর অবহেলার দোপাট্টা ফেলে এরা গ্যাট-ম্যাট করে হাঁটতে শিখলে না, এদের বাচ্চারা ট্যাঁশ উচ্চারণে 'ড্যাডি' 'মাম্মি' 'ও কে' 'নো কে' বলতে শিখলে না—এরাই বাঙালী।

দিল্লির লোক একদা মাংস রুটি খেত; এখনও তারা রুটি মাংসই খায়। শুনেছি বাঙালীরা নাকি এককালে মাছ-ভাত খেত। ঠিক বলতে পারব না, এখনও খায় কি না। রেশনে যে-বস্তু পাওয়া যায়, তাকে চাল বলে তারা তাদের বাপ-পিতেমোর খাদ্য চালকে অসম্মান করতে চায় না। এই কিছুদিন পূর্বে হঠাৎ কিছু মাছ ধরা পড়াতে বাঙালী উদ্বাহু হয়ে যে-নৃত্যটা দেখালে, তাতে মনে হল—আমি দিল্লিতে বসে 'আনন্দবাজারে' পড়েছিলুম—যেন স্বয়ং উর্বশী স্বর্গ থেকে সুধাভাণ্ড নিয়ে বাংলা দেশে অবতীর্ণা হয়েছেন! ছেলেবেলায় দেখেছি, উদ্‌বৃত্ত মাছ পচিয়ে পোড়াবার জন্য তেল আর ক্ষেতে দেবার জন্য সার তৈরি করা হয়েছে। যাঁরা এসব করেছেন, তাঁরাও বাঙালী, এরাও বাঙালী।

এককালে এ-দেশের শিক্ষিত লোক মাত্রই সংস্কৃত জানতেন কিংবা আরবী-ফার্সী জানতেন। উনবিংশ শতকে বাঙলা দেশে যে সাহিত্য গড়ে উঠল, যার তুলনা ভারতের অন্য কোনও প্রদেশে নেই—সে এমারত গড়াতে চুনসুর্কি যোগালে সংস্কৃত এবং কিছুটা আরবী-ফার্সী, আজ সে-সৌধের স্তম্ভ তোরণ দেখে বাঙালী মুগ্ধ, কিন্তু শুনতে পাই দু'মুঠো অন্নের জন্য সে আজ এতই কাতর যে, জোর করেও তাকে আজ আর সংস্কৃত পড়ানো যাচ্ছে না। তবে এ-কথা ঠিক, তাই নিয়ে সে লজ্জা অনুভব করে, খবরের কাগজে প্রকাশিত চিঠিতে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। (রাষ্ট্রভাষার পীঠভূমিতে সংস্কৃতচর্চার জন্য চেল্লাচেল্লি হয়, কিন্তু কেউ গা করে না।)

এই লজ্জাটুকু নিয়েই বাঙালী।

তবুও এই বাঙলা দেশ।

এখনও ধুলো কমে নি, সে-ধুলো এখনও লাল, পুরোপুরি বাঙলা দেশ এখনও আরম্ভ হয় নি।

হঠাৎ দেখি লাইনের পাশে পুকুর ভরে রক্তপদ্ম ফুটেছে। সবুজ বাঁশবনের মাঝখানে ছোট্ট পুকুরটি—কৃষ্ণনীরে রক্ত-সরোজিনী! দিল্লির নিজাম-প্রাসাদের লাল গোলাপের কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, ক্ষণেকের তরে বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল, কিন্তু পরমুহূর্তে মনে পড়ল, তরুণ বয়সে যখন এই অঞ্চলে বসবাস করতে এসেছিলুম, তখন প্রথম দর্শনেই এরা আমার হৃদয়ের কতখানি জুড়ে নিয়ে বসেছিল। শরৎ হেমন্ত, এমন কী, বেশ শীত পড়ার পরও কত দূর পুকুরে পদ্মের সন্ধানে গিয়েছি, কখনও ফিরেছি একটি মাত্র পদ্ম নিয়ে, হাতে ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে, কখনও বা এক আঁটি বগলে করে। প্রিয়জনকে বিলিয়েছি হাসিমুখে, লোভীজন জোর করে কিছুটা কেড়ে নিয়ে গিয়েছে, ক্ষণেকের তরে ক্ষুণ্ণ হয়েছি, কিন্তু বিরক্ত হই নি। ঘরে এসে কলসীতে তাদের জিইয়ে রাখবার চেষ্টা করেছি যতদিন পারা যায়। তারপর তারা একে একে শুকনো মুখে বিদায় নিয়েছে —আজ সকালে একজন, কাল সকালে দুজন। বুকে লেগেছে, মনে ভেবেছি, আর পদ্ম আনতে যাব না, আনলেও সব-কটি বিলিয়ে দেব, ঘরে রেখে বিদায়-বেদনার ব্যবস্থা করব না।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা কি মনে রাখা সোজা? একেই তো জ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন শ্মশান-বৈরাগ্য।

শ্মশান থেকে ফিরে এসে মানুষ আবার কিছুদিন পরে বিয়ে করে সংসার পাতে, আবার বিরহ-বেদনা, মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে। আমিও শ্মশান-বৈরাগ্য ভুলে গিয়ে নূতন করে সংসার পেতেছি, আবার তাদের বিদায়-বেলার ম্লান মৃদু গন্ধে বিধুর হয়েছি।

কিন্তু ওই যে লোকে বলে, মার খেতে খেতে মানুষ শক্ত হয়, কই, আমি তো হতে পারলুম না।

তারপর কত দেশ-বিদেশে ঘুরেছি। নরগিস দেখেছি, দাযুদী কিনেছি, লিলি শুঁকেছি, বসরার গোলাপ বুকে গুঁজেছি, বড় বড় ফুলের বাজারে পুষ্প-প্রদর্শনীতে অবাক হয়ে বিদেশী ফুলের জলুস দেখেছি, কিন্তু কখনও বেশীক্ষণের জন্য ভুলে থাকতে পারি নি আমার রক্তপদ্মকে।

বিদেশী বন্ধুরা জিজ্ঞেস করেছেন মতামত। আমি তাদের ফুলের অকুণ্ঠ প্রশংসা গেয়ে শেষটায় বলেছি, কিন্তু আমাদের পদ্ম ভারি চমৎকার ফুল। এক বন্ধু তখন মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'এ-লোকটা বিদেশে ঘোরে স্বদেশ আপন পকেটে রেখে রেখে।'

এইবার দেশে ফিরেছি। স্বদেশ আর পকেটে পুরে রাখতে হবে না।

জয় মা, গঙ্গে,
ত্রিভুবনতারিণী তরল তরঙ্গে।

সুকুমার রায়

গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।

আঙিনা পেরুতে-না-পেরুতেই একখানা খাসা নেমন্তন্ন পেয়ে গেলুম।

এলগিন রোড অঞ্চলের কয়েকটি ছেলেমেয়ে 'হরবোলা' নাম দিয়ে একটি দল গড়েছে। এদের উদ্দেশ্য হাস্যরসের উত্তম উত্তম পালার অভিনয় করে বাঙালীর হৃদয়ে তার লুপ্তপ্রায় হাস্যরসকে আবার বইয়ে দেওয়া। হরবোলার প্রযোজকদের ভাষায় বলি, 'হাসতে ভুলে গেছি বলে দুর্নাম আছে আমাদের (বাঙালীর)। সুকুমার রায়কে কেন্দ্র করে সেই দুর্নাম কিছুটা যদি আমরা দূর করতে পারি, তাহলেই এই উদ্যোগ সার্থক হবে।' হরবোলা নেমন্তন্ন করেছেন, তাঁদের প্রথম পালা দেখতে।

সুকুমার রায় যে বাঙলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক সে-বিষয়ে কারও মনে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। তাঁরই রচিত 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' বেছে নিয়ে হরবোলা আপন রুচি ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

'সকের থিয়েটার', তার উপর হরবোলার অধিকাংশ সদস্য অভিনয় করতে নেমেছেন, গান ধরতে শুরু করেছেন জীবনে এই প্রথম, কাজেই পালা এবং তার বন্দোবস্তে যে দোষত্রুটি থাকবে সেটা আগের থেকেই বলা যেতে পারে, কিন্তু দোষত্রুটি সত্ত্বেও তাঁরা যে রসসৃষ্টি করতে পেরেছেন, সেইটেই সব চেয়ে আনন্দের কথা।

আমি কিন্তু একটা ধোঁকা নিয়ে বাড়ি ফিরলুম।

সিরিয়স নাট্য কী-ভাবে অভিনয় করতে হয়, সে সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি একটা ধারণা আছে, কিন্তু যে নাট্য মূলে হাস্যরসে টইটম্বুর তার অভিনয় হবে কী প্রকারে? বিশেষ করে সুকুমার রায়ের পালা, যেখানে প্রতি ছত্রে, না, প্রতি শব্দে রস আর রস। নট যদি সেখানে তার অভিনয় নিয়ে সে-রস শুধু প্রকাশই করেন, তবে ত আর কোন হাঙ্গামা থাকে না, কিন্তু যদি সে রস প্রকাশ করতে গিয়ে নট সেখানে 'থিয়েটারি' (অর্থাৎ করুণকে করুণতর, বীরকে বীরতর, হাস্যরসঘনকে ঘনতর) করে ফেলেন, তা হলে সেটা চপলতায় পরিণত হয়। সুকুমার রায়ের রচনা হাস্যরসে এতই কানায় কানায় ভরা যে, তাতে কোনও

কিছুই যোগ দিতে গেলেই, তা সে আঙ্গিকের মাত্রাধিক্যেই হোক অথবা অন্য যে-কোন বস্তুই হোক, রস নষ্ট হয়ে যায় এবং রসিকতা তখন প্রগল্‌ভতা হয়ে যায়।

এই বিপদে না পড়ার জন্যই বাস্টার কীটন হামেশাই প্যাঁচার মত মুখ করে হাস্যরসের অভিনয় করতেন, কিন্তু চার্লি চেপলেন তাঁর অভিনয়ে যৎকিঞ্চিৎ 'থিয়েটারি' এনে হাস্যরসকে আরও জম-জমাট ভর-ভরাট করে তোলেন, কিন্তু এ দুজনেরই সমস্যা হরবোলা সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেক সহজ। এঁদের রসিকতা ঘটনা কিংবা অ্যাক্‌শান নিয়ে—কেউ কলার খোসায় পা দিয়ে পিছলে পড়লেন, কেউ 'পিয়া মিলন কো' গিয়ে খাণ্ডার স্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে পড়লেন, কাজেই তাঁর অভিনয় অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু সুকুমার রায়ের রসিকতা সূক্ষ্মতর, হাস্যরসের জগতে সূক্ষ্মতম বললেই ঠিক বলা হয়, সে-রসিকতা প্রধানত ভাষায় এবং ভাষা ছাড়িয়ে ব্যঞ্জনায়। অভিনয়ের ভিতর দিকে তাকে বাহ্য রূপ দেওয়া, চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা (একসটেরিয়োরাইজ করা) ত সহজ কর্ম নয়। করিই বা কি প্রকারে? বাস্টার কীটনের মত প্যাঁচা-ঢঙে, না চার্লির মত একটুখানি রসিয়ে?

এই হল আমার ধোঁকা।

'হরবোলা' সম্প্রদায়ের মস্ত একটা সুবিধে, তাঁরা 'সকের দল' গড়েছেন। কাজেই তাঁরা একসপেরিমেন্ট করতে ভয় পাবেন না জানি, সেই আমার ভরসা। আঙ্গিক নিয়ে ধোঁকা থাকলেও এ-বিষয়ে আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই যে, তাঁরা সে-আঙ্গিক ব্যবহারে অভিনয়ের দিক দিয়ে প্রচুর সফলতা অর্জন করেছেন। সুতরাং তাঁরা যদি সুকুমার রায়ের আসছে পালা কীটন-আঙ্গিকে করে দেখেন তবে মন্দ হয় না। এই ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করে করেই শেষটায় পরিষ্কার হয়ে যাবে ঠিক কোন্ আঙ্গিক সুকুমার রায়ের হাস্যরসকে রঙ্গমঞ্চে রূপায়িত করার উপযুক্ত।

'শক্তিশেল'-এর সঙ্গীতের পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন আমার জনৈক বন্ধু, ওস্তাদ ফৈয়জ খানের শিষ্য। আমি তাঁর অন্ধ ভক্ত, কাজেই এস্থলে তাঁর সঙ্গীত-পরিচালনার গুণাগুণ যদি আমি বিচার না করি, তবে আশা করি তিনি অপরাধ নেবেন না।

শেষ কথা, কর্মকর্তাগণ অভ্যাগত-অতিথিদের প্রচুর খাতির-যত্ন করেন। শুধু লৌকিকতা বা মুখের কথা নয়, আমি সর্বান্তঃকরণে 'হরবোলা'র হরবকৎ হরেক-রকমের উন্নতি কামনা করি।

সুকুমার রায়ের মত হাস্যরসিক বাঙলা সাহিত্যে আর নেই সে-কথা রসিকজন মাত্রেই স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু এ-কথা অল্প লোকেই জানেন যে, তাঁর জুড়ি ফরাসী, ইংরেজী, জর্মন সাহিত্যেও নেই, রাশানে আছে বলে শুনি নি। এ-কথাটা আমাকে বিশেষ জোর দিয়ে বলতে হল, কারণ আমি বহু অনুসন্ধান করার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছি।

একমাত্র জর্মন সাহিত্যের ভিলহেল্‌ম্ বুশ সুকুমারের সমগোত্রীয়—স্ব-শ্রেণী না হলেও। ঠিক সুকুমারের মত তিনিও অল্প কয়েকটি আঁচড় কেটে খাসা ছবি ওতরাতে পারতেন। তাই তিনিও সুকুমারের মত আপন লেখার ইলাসট্রেশন নিজেই করেছেন। বুশের লেখা ও ছবি যে ইয়োরোপে অভূতপূর্ব সে-কথা 'চরুয়া' ইংরেজ ছাড়া আর সবাই জানে।

বুশ এবং সুকুমার রায়ে প্রধান তফাত এই যে, বুশ বেশীর ভাগই ঘটনা-বহুল গল্প ছড়ায় বলে গিয়েছেন এবং সে-কর্ম অপেক্ষাকৃত সরল, কিন্তু সুকুমার রায়ের বহু ছড়া নিছক 'আবোল-তাবোল', তাতে গল্প নেই, ঘটনা নেই, কিছুই নেই—আছে শুধু মজা আর হাসি। বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত যে-রকম শুধুমাত্র ধ্বনির উপর নির্ভর করে, তার সঙ্গে কথা জুড়ে দিয়ে গীত বানাতে হয় না, ঠিক তেমনি সুকুমার রায়ের বহু বহু ছড়া স্রেফ হাস্যরস, তাতে অ্যাকশান নেই, গল্প নেই অর্থাৎ আর-কোন দ্বিতীয় বস্তুর সেখানে স্থান নেই, প্রয়োজনও নেই। এ বড় কঠিন কর্ম। এ-কর্ম তিনিই করতে পারেন, যাঁর বিধিদত্ত ক্ষমতা আছে। এ-জিনিস অভ্যাসের জিনিস নয়, ঘষে মেজে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এ-বস্তু হয় না।

বুশ আর সুকুমারের শেষ মিল, এদের অনুকরণ করাব ব্যর্থ চেষ্টা জর্মন কিংবা বাংলায় কেউ কখনও করেন নি, এঁদের ছাড়িয়ে যাবার ত কথাই ওঠে না।

একদা প্যারিস শহরে আমি, কয়েকজন হাস্যরসিকের কাছে 'বোম্বাগড়ের রাজা'র অনুবাদ করে শোনাই—অবশ্য আমসত্ত্বভাজা কী তা আমাকে বুঝিয়ে বলতে হয়েছিল (তাতে করে কিঞ্চিৎ রসভঙ্গ হয়েছিল অস্বীকার করি নে) এবং 'আলতা'র বদলে আমি লিপস্টিক ব্যবহার করেছিলুম (আমার ঠোঁটে কিংবা চোখে নয়—অনুবাদে)।

ফরাসী কায়দায় লোকে হো-হো করে হাসে না, এটিকেটে বারণ, কিন্তু আমার সঙ্গীগণের হাসির হর্‌রাতে আমি পর্যন্ত বিচলিত হয়ে তাঁদের হাসি বন্ধ করতে বার বার অনুরোধ করেছিলুম। কিছুতেই থামেন না। শেষটায় বললুম,

তোমরা যেভাবে হাসছ, তাতে লোকে ভাববে, আমি বিদেশী গাড়ল, বেফাঁস কিছু একটা বলে ফেলেছি আর তোমরা আমাকে নিয়ে হাসছ—আমার বড় লজ্জা করছে।' তখন তাঁরা দয়া করে থামলেন, ওদিকে আর পাঁচজন আমার দিকে আড়নয়নে তাকাচ্ছিল বলে আমি ত ঘেমে কাঁই।

তারপর একজন বললেন, 'এরকম weird, ছন্নছাড়া, ছিষ্টিছাড়া কর্মের ফিরিস্তি আমি জীবনে কখনও শুনি নি।'

আরেকজন বললেন, 'ঠিক। এবার একটা চেষ্টা দেওয়া যাক, এ লিস্টে আর কিছু জুতসই বাড়ানো যায় কি না।'

সবাই মিলে অনেকক্ষণ ধরে আকাশপাতাল হাতড়ালুম, দু-একজন একটা দুটো অদ্ভুত কর্মের নামও করলেন, কিন্তু আর সবাই সেগুলো পত্রপাঠ ডিসমিস করে দিলেন। আমরা জন পাঁচ প্রাণী প্রায় আধ ঘণ্টা ধ্বস্তাধ্বস্তি করেও একটা মাত্র জুৎসই এপেন্‌ডিক্‌স্ পেলুম না। গোটা কবিতার ত প্রশ্নই ওঠে না।

আগের থেকেই জানতুম, কিন্তু সেদিন আবার নূতন করে উপলব্ধি করলুম, যদিও সুকুমার রায় স্বয়ং বলেছেন, 'উৎসাহে কি না হয়, কি না হয় চেষ্টায়', যে-জগতে সুকুমার বিচরণ করতেন, সেখানে তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্।

সিগনেট প্রেস সুকুমার রায়কে পুনরায় বাঙালী পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন বলে বাংলার ভিতরে বাইরে বহু লোক ওই প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা করছেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি। আমার বাসনা, সিগনেট যত শীঘ্র পারেন সুকুমার রায়ের অন্যান্য গদ্য পদ্য লেখা যেন পুনরায় প্রকাশ করেন। বহু অতুলনীয় অনবদ্য অভূতপূর্ব লেখা 'সন্দেশ'-এর ফাইলে চাপা পড়ে আছে। 'পাগলা দাশু'কে পেয়ে যেন লণ্ড লস্ট ব্রাদারকে পাওয়ার আনন্দে তাকে জড়িয়ে ধরেছি, কিন্তু তার আর সব ভাই-বেরাদররা কোথায়? তারা যেন আর বেশীদিন আত্মগোপন না করে।

দু-একটি অসাবধানতা লক্ষ্য করেছি, তারই একটা এ-স্থলে নিবেদন করি।

'খাই-খাই' কাব্যের 'পরিবেশন' কবিতায় আপ্তবাক্য দেখছি—

'কোনো চাচা অন্ধপ্রায় ('মাইনাস' কুড়ি)
ছড়ায় ছোলার ডাল পথঘাট জুড়ি।
মাতব্বর যায় দেখ মুদি চক্ষু দুটি
"কারো কিছু চাই" বলি তড়বড় ছুটি
বীরোচিত ধীর পদে এসে দেখি ত্রস্তে
ওই দিকে খালি পাত, চল হাঁড়ি হস্তে '

অথচ আমার অর্ধবিশ্বাস্য স্মরণশক্তি বলেছে :—

'কোনো চাচা অন্ধপ্রায় (মাইনাস কুড়ি)
ছড়ায় ছোলার ডাল পথঘাট জুড়ি।
মাতব্বর যায় দেখ মুদি চক্ষু দুটি
"কারো কিছু চাই" বলে' তড়বড় ছুটি।
হঠাৎ ডালের পাঁকে পদার্পণ মাত্রে
হুড়মুড়ি পড়ে কারো নিরামিষ পাত্রে।
বীরোচিত ধীরপদে'
—ইত্যাদি ইত্যাদি

'হঠাৎ ডালের পাঁকে' ইত্যাদি লাইন দুটো বাদ পড়াতে অর্থ অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে।

কিন্তু থাক্, আর না। সুকুমার রায় বলেছেন :

'বেশ বলেছ, ঢের বলেছ
ঐখেনে দাও দাঁড়ি,
হাটের মাঝে ভাঙবে কেন
বিদ্যে বোঝাই হাঁড়ি॥'

ভাষার জমা-খরচ

পুব-বাংলার বিস্তর নরনারী চিরকালই কলকাতায় ছিলেন; কিন্তু এবারে কলকাতায় এসে দেখি তাঁদের সংখ্যা এক লপ্‌তে গুয়া গাছের ডগায় উঠে গিয়েছে। কিছুদিন পূর্বেও পুব-বাংলার উপভাষা দক্ষিণ কলকাতাতেই শোনা যেত, এখন দেখি তামাম কলকাতাময় বাঙাল ভাষার (আমি কোন কটু অর্থে শব্দটি ব্যবহার করছি নে—শব্দটি সংক্ষিপ্ত এবং মধুর) ছয়লাপ।

বাঙাল ভাষা মিষ্ট এবং তার এমন সব গুণ আছে যার পুরো ফায়দা এখনও কোন লেখক ওঠান নি। পুব-বাংলার লেখকেরা ভাবেন, 'ক'রে' শব্দকে 'কইরা' এবং অন্যান্য ক্রিয়াকে সম্প্রসারিত করলেই বুঝি বাঙাল ভাষার প্রতি সুবিচার করা হয়ে গেল। বাঙাল ভাষার আসল জোর তার নিজস্ব বাক্যভঙ্গীতে বা ইডিয়মে—অবশ্য সেগুলো ভেবেচিন্তে ব্যবহার করতে হয় যাতে করে সে-ইডিয়ম পশ্চিমবঙ্গ তথা পুব-বাংলার সাধারণ পাঠক পড়ে বুঝতে পারে। যেমন মনে করুন, বড়লোকের সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়ে যদি গরিব-মার খায় তবে [illegible]

অঞ্চলে বলে, 'হাতির লগে পাতি খেলতায় গেছলায় কেন?' অর্থাৎ 'হাতির সঙ্গে পাতি খেলতে গিয়েছিলে কেন?' কিন্তু পাতিখেলা যে Polo খেলা সে-কথা বাংলা দেশের কম লোকই জানেন, (চলন্তিকা এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহনে শব্দটি নেই) কাজেই এ-ইডিয়ম ব্যবহার করলে রস ঠিক ওতরাবে না। আবার,

'দুষ্টুলোকের মিষ্ট কথা,
দিঘল-ঘোমটা নারী
পানার তলার শীতল জল।
তিনই মন্দকারী।'

'কামুফ্লাজ' বোঝাবার উত্তম ইডিয়ম। পুব, পশ্চিম কোন বাংলার লোকের বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না।

ইডিয়ম, প্রবাদ, নিজস্ব শব্দ ছাড়া বাঙাল সভ্যতায় আরেকটি মহদ্‌গুণ আছে এবং এ-গুণটি ঢাকা শহরের 'কুট্টি' সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ—যদিও তার রস তাবৎ পুব-বাংলা এবং পশ্চিম-বাংলারও কেউ কেউ চেখেছেন। কুট্টির রস-পটুতা বা wit সম্পূর্ণ শহুরে বা 'নাগরিক'—এস্থলে আমি নাগরিক শব্দটি প্রাচীন সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করলুম, অর্থাৎ চটুল, শৌখিন, হয়ত বা কিঞ্চিৎ ডেকাডেন্ট।

কলকাতা, লখনউ, দিল্লি, আগ্রা, বহু শহরে আমি বহু বৎসর কাটিয়েছি এবং স্বীকার করি লখনউ, দিল্লিতে (ভারত বিভাগের পূর্বে) গাড়োয়ান সম্প্রদায় বেশ সুরসিক। কিন্তু এদের সব্বাইকে হার মানতে হয় ঢাকার কুট্টির আছে। তার উইট, তার রিপার্টি (মুখে মুখে উত্তর দিয়ে বিপক্ষকে বাক্‌শূন্য করা, ফার্সী এবং উর্দুতে যাকে বলে 'হাজিব-জবাব') এমনই তীক্ষ্ণ এবং ক্ষুরস্য ধারার ন্যায় নির্মম যে আমার সলা যদি নেন তবে বলব, কুট্টির সঙ্গে ফস করে মস্করা না করতে যাওয়াটাই বিবেচকের কর্ম।

প্রথম তা হলে একটি সর্বজন-পরিচিত রসিকতা দিয়েই আরম্ভ করি। শাস্ত্রও বলেন, অরুন্ধতী-ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় অর্থাৎ পাঠকের চেনা জিনিস থেকে ধীরে ধীরে অচেনা জিনিসে গেলেই পাঠক অনায়াসে নূতন বস্তুটি চিনতে পারে—ইংরেজীতে এই পন্থাতেই 'ফ্রম স্কুলরুম টু দি ওয়াইড ওয়ার্লড' বলে)

আমি কুট্টি ভাষা বুঝি কিন্তু বলতে পারি নে। তাই পশ্চিমবাংলার ভাষাতেই নিবেদন করি।

রাস্তায়, 'রবনা থেকে কত নেবে?'

কুট্টি গাড়োয়ান, 'এমনিতে ত দেড় টাকা, কিন্তু কর্তার জন্য এক টাকাতেই হবে।'

যাত্রী, 'বল কী হে? ছ আনায় হবে না?'

কুট্টি, 'আস্তে কন, কর্তা, ঘোড়ায় শুনলে হাসবে।'

এর জুতসই উত্তর আমি এখনও খুঁজে পাই নি।

মোটেই ভাববেন না যে, এ-জাতীয় রসিকতা মান্ধাতার আমলে একসঙ্গে নির্মিত হয়েছিল এবং আজও কুট্টিরা সেগুলো ভাঙিয়ে খাচ্ছে।

'ঘোড়ার হাসি'র মত কতকগুলো গল্প অবশ্য কালাতীত, অজরামর, কিন্তু কুট্টি হামেশাই চেষ্টা করে নূতন নূতন পরিবেশে নূতন নূতন রসিকতা তৈরি করার।

প্রথম যখন ঢাকাতে ঘোড়দৌড় চালু হল তখন এক কুট্টি গিয়ে যে-ঘোড়াটাকে ব্যাক করল সেটা এল সর্বশেষে। বাবু বললেন, 'এ কী ঘোড়াকে ব্যাক করলে হে? সক্কলের শেষে এল?'

কুট্টি হেসে বললে, 'কন্ কী কর্তা, দেখলেন না, ঘোড়া ত নয়, বাঘের বাচ্চা, বেবাকগুলোকে খেদিয়ে নিয়ে গেল।'

আমি যদি নীতি-কবি ঈসপ কিংবা সাদী হতুম, তবে নিশ্চয়ই এর থেকে 'মরাল' ড্র করে বলতুম, একেই বলে 'রিয়েল, হেলথী, অপটিমিজ্‌ম।'

কিংবা, আরেকটি গল্প নিন, এটা একেবারে নিতান্ত এ-যুগের।

পাকিস্তান হওয়ার পর বিদেশীদের পাল্লায় পড়ে ঢাকার লোকও মর্নিং স্যুট, ডিনার জ্যাকেট পরতে শিখেছেন। হাঙ্গামা বাঁচাবার জন্য এক ভদ্রলোক গেছেন একটি কালো লঙ কোট বা প্রিন্স-কোট বানাতে। ভদ্রলোকের রঙ মিশ্‌কালো, তদুপরি তিনি হাড়কিপটে। কালো বনাত দেখলেন, সার্জ দেখলেন, আলপাকা দেখলেন, কোনও কাপড়ই তাঁর পছন্দ হয় না, অর্থাৎ দাম পছন্দ হয় না। দোকানী শেষটায় বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোককে সদুপদেশ দিল, 'কর্তা, আপনি কালো কোটের জন্য খামকা পয়সা খরচা করতে যাবেন কেন? খোলা গায়ে বুকের উপর ছটা বোতাম, আর দু হাতে কব্জির কাছে তিনটে তিনটে করে ছোট বোতাম লাগিয়ে নিন। খাসা প্রিন্স-কোট হয়ে যাবে।'

তিন বৎসর পূর্বেও কলকাতায় মেলা অনুসন্ধান না করে বাখরখানী (বাকির-খানি) রুটি পাওয়া যেত না; আজ এই আমীর আলী অ্যাভিন্যুতেই অন্তত আধাডজন দোকানে সাইনবোর্ডে বাখর-খানী লেখা রয়েছে। তাই বিবেচনা করি, কুট্টির সব গল্পই ক্রমে ক্রমে বাখরখানীর মতই পশ্চিম-বাংলায় ছড়িয়ে

পড়বে এবং তার নূতনত্বে মুগ্ধ হয়ে কোন কৃতি লেখক সেগুলোকে আপন লেখাতে মিশিয়ে নিয়ে সাহিত্যের পর্যায়ে তুলে দেবেন—পরশুরাম যে-রকম পশ্চিমবাংলার নানা হাল্কা রসিকতা ব্যবহার করে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, হুতোম যে-রকম একদা কলকাতার নিতান্ত কক্‌নিকে সাহিত্যের সিংহাসনে বসাতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এটা হল জমার দিকে, কিন্তু খরচের দিকে, একটা বড় লোকসান আমার কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে, নিবেদন করি।

ভদ্র এবং শিক্ষিত লোকেরই স্বভাব অপরিচিত, অর্ধপরিচিত কিংবা বিদেশীর সামনে এমন ভাষা ব্যবহার না করা, যে-ভাষা বিদেশী অনায়াসে বুঝতে না পারে। তাই খাস কলকাতার শিক্ষিত লোক পুব-বাঙালীর সঙ্গে কথা বলবার সময় খাস কলকাত্তাই শব্দ, মোটামুটি ভাবে যেগুলোকে ঘরোয়া অথবা 'স্ল্যাঙ' বলা যেতে পারে, ব্যবহার করেন না। তাই এস্তার, ইলাহি, বেলেল্লা, বেহেড, দো গেড়ের চ্যাং এ-সব শব্দ এবং বাক্য কলকাতার ভদ্রলোক পুব-বাঙালীর সামনে সচরাচর ব্যবহার করেন না। অবশ্য যদি বক্তা সুরসিক হন এবং আসরে মাত্র একটি কিংবা দুটি ভিন্ন প্রদেশের লোক থাকেন তবে তিনি অনেক সময় আপন অজানাতেই অনেক ঝাঁঝ-ওলা ঘরোয়া শব্দ ব্যবহার করে ফেলেন।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে শ্যামবাজারের রক্‌-আড্ডাতে পুব-বাঙালীর সংখ্যা থাকত অতিশয় নগণ্য। তাই শ্যামবাজারী গল্প ছোটালে এমন সব ঘরোয়া শব্দ, বাক্য প্রবাদ ব্যবহার করতেন এবং নয়া নয়া বাক্য-ভঙ্গী বানাতেন যে, রসিকজনই বাহবা শাবাশ না বলে থাকতে পারত না।

আজ পুব-বাংলার বহু লোক কলকাতার আসর সরগরম করে বসেছেন বলে খাঁটি কলকাত্তাই আপন ভাষা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হয়ে গিয়েছেন এবং ঘরোয়া শব্দ-বিন্যাস-ব্যবহার ক্রমেই কমিয়ে দিচ্ছেন। হয়ত এঁরা বাড়িতে এসব শব্দ এখনও ব্যবহার করেন; কিন্তু আড্ডা তো বাড়ির লোকের সঙ্গে জম-জমাট হয় না—আড্ডা জমে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে এবং সেই আড্ডাতে পুব-বাংলার সদস্যসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে বলে খাস কলকাত্তাই আপন ঘরোয়া শব্দগুলো ব্যবহার না করে করে ক্রমেই এগুলো ভুলে যাচ্ছেন। কোথায় না এসব শব্দ আস্তে আস্তে ভদ্র ভাষায় স্থান পেয়ে শেষটায় অভিধানে উঠবে, উল্টে এগুলো কলকাতা থেকে অন্তর্ধান করে যাবে।

আরেক শ্রেণীর খানদানী কলকাত্তাই চমৎকার বাংলা বলতেন। এঁরা ছেলেবেলায় সায়েবী ইস্কুলে পড়েছিলেন বলে বাংলা জানতেন অত্যন্ত কম এবং বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক ছিল তাসুর ভাদ্রবধূর। তাই এঁরা বলতেন

ঠাকুরমা দিদিমার কাছে শেখা বাংলা এবং সে-বাংলা যে কত মধুর এবং ঝলমলে ছিল তা শুধু তাঁরাই বলতে পারবেন যাঁরা সে-বাংলা শুনেছেন। ক্রীক রোর মন্মথ দত্ত ছিলেন সোনার বেনে, আমার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু, কলকাতার অতি খানদানী ঘরে জন্ম। মন্মথদা যে-বাংলা বলতেন তার উপর বাংলা সাহিত্যের বা পুব-বাংলার কথ্য ভাষার কোনও ছাপ কখনও পড়ে নি। তিনি যখনই কথা বলতে আরম্ভ করতেন, আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতুম আর মন্মথদা উৎসাহ পেয়ে রেকাবের পর রেকাব চড়ে চড়ে একদম আসমানে উঠে যেতেন। কেউ অন্য-মনস্ক হলে বলতেন, 'ও পরান, ঘুমুলে?' মন্মথদার কাছ থেকে এ-অধম এস্তার বাংলা শব্দ শিখেছে।

আরেকজনকে অনেক বাঙালীই চেনেন। এঁর নাম গাঙ্গুলী মশাই—ইনি ছিলেন শান্তিনিকেতন অতিথিশালার ম্যানেজার। ইনি পিরিলি ঘরের ছেলে এবং গল্প বলার অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা এঁর ছিল। বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত হরিনাথ দে, সুসাহিত্যিক সুবেশ সমাজপতি ছিলেন এঁর বাল্যবন্ধু, এবং শুনেছি এঁরা এঁর গল্প মুগ্ধ হয়ে শুনতেন।

কলের এক দিক দিয়ে গোরু ঢোকানো হচ্ছে, অন্য দিক দিয়ে জলতরঙ্গের মত ঢেউয়ে ঢেউয়ে মিলিটারি বুট বেরিয়ে আসছে, টারালাপ্ টাবালাপ্ করে, গাঙ্গুলী মশাই আর অন্যান্য ক্যাডেটরা বসে আছেন পা লম্বা করে, আর জুতো-গুলো ফটাফট করে ফিট হয়ে যাচ্ছে—এ-গল্প শুনে শান্তিনিকেতনের কোন্ ছেলে হেসে কুটিপাটি হয় নি?

হায়, এ-শ্রেণীর লোক এখন আর দেখতে পাই নে। তবুও এখনও আমার শেষ ভরসা শ্যামবাজারের উপর।

দর্শনচর্চা

মাদ্রাজে দর্শনশাস্ত্রের ছাত্রগণের এক সভায় শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী বলেন, 'প্রাচীনকালে চরম ও পরম সত্যের অন্বেষণার জন্য যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রবর্তন করেন, তাঁহারা ইহাকে কেবল বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভবপর বলিয়াই মনে করতেন না, তাঁহারা ইহাকে অতিশয় প্রয়োজনীয় বলিয়াও মনে করিতেন। ক্রমে ক্রমে পরবর্তী কালে দার্শনিকগণ যে-সমস্ত কথা লিখিলেন তাহা অর্থহীন হইয়া পড়িল এবং শেষ পর্যন্ত সে-সমস্ত কথা একত্র গ্রথিত কতকগুলি কথার মালা ব্যতীত আর কিছুই হইল না।'

ঠিক এই উক্তিটিই আজকাল নানা গুণী জ্ঞানীর মুখে শুনতে পাওয়া যায় বলে এ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন।

এককালে দর্শনচর্চার প্র্যাকটিকাল মূল্য ছিল, এখন আর নেই ; এখন দার্শনিক-দের কেতাবে শুধু শব্দ আর শব্দ, এই হল রাজাজীর মূল বক্তব্য।

এককালে 'ক' ছিল এখন 'খ' হয়ে গিয়েছে, সে-কথা কেউ বললেই দার্শনিকরা তার জবাবে বলেন, কারণ বিনা কার্য হয় না, অতএব দেখতে হবে দর্শনের বাস্তব মূল্য হঠাৎ উবে গেল কেন।

এ-কথা যদি প্রমাণ করা যায় যে, দার্শনিকেরা আস্তে আস্তে চরম ও পরম সত্যের সন্ধান ছেড়ে দিয়ে একদিন অসত্যের সন্ধানে লেগে গেলেন তা হলে অবশ্য এটা অসম্ভব নয় যে, সেই কারণেই তাদের পুস্তকারাজি আজ অবোধ্য হয়ে উঠেছে ; কিন্তু এযাবৎ, কি এদেশে, কি বিদেশে, কেউ ত দার্শনিকদের এ-রকম সন্দেহের চোখে কখনও দেখে নি। বরঞ্চ বেশ জোর দিয়ে বলতে হবে, সত্য দার্শনিক চরম সত্য ছাড়া অন্য কোনও জিনিসের সন্ধান কখনও করে নি—ধাপ্পাবাজি জাল-জোচ্চুরি করার ক্ষমতা যার আছে, সে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নে মন দেবে কেন, এসব ত করে অন্য লোকেরা। এই দার্শনিকই তাই দুঃখ করে বলেছেন,

প্রতারণাসমর্থজনে বিদ্যয়া কিম্
প্রয়োজনম্।

অর্থাৎ যে প্রতারণা করতে জানে তার বিদ্যার কি প্রয়োজন। তারপরই তিনি আবার বলেছেন ঠিক ওই একই বাক্য,

প্রতারণাসমর্থজনে বিদ্যয়া কিম্
প্রয়োজনম্।

কিন্তু এবারে প্রতারণাসমর্থ শব্দের সন্ধি ভাঙতে হবে প্রতারণা + অসমর্থ দিয়ে, অর্থাৎ তুমি যদি প্রতারণা না করতে জান তবে বিদ্যে নিয়ে তোমার কী কাজ হবে ?

তাই বিদ্যা বিদ্যারই জন্য, দর্শন দর্শনেরই জন্য, অর্থাৎ সত্যানুসন্ধান সত্যানু-সন্ধানেরই জন্য। সত্য নিরূপিত হলে সেটা যদি তোমার আমার কাজে না লাগে তবে সত্যের সেটা দোষ নয়। শিবলিঙ্গ দিয়ে যদি মশারির পেরেক ঠোকা না যায় তবে সেটা শিবলিঙ্গের দোষ নয়।

মানুষ কোনও যুগেই সম্পূর্ণ সত্যের সন্ধান পায় নি—পেয়ে থাকলে তার আর অবনতি উন্নতি কিছুই হত না। সম্পূর্ণ সত্য ভগবানের হাতে, মানুষের কাজ,

হচ্ছে প্রাণপণ চেষ্টা করা সেই সত্যের যতদূর সম্ভব কাছে পৌঁছনোর। তাই করতে গিয়ে তার প্রচেষ্টার ফল যদি অবাস্তব (ইমপ্র্যাকটিকাল) হয় তবু তাকে সত্যেরই সন্ধান করতে হবে।

এ-স্থলে আর একটি কথা ওঠে। সত্য নিরূপিত হলে তাকে কাজে লাগাবার ভার কার হাতে? এখানে বিজ্ঞান থেকে একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। এটম বম বানাবার সূত্রটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করলেন তারপর এটম বম্ বানানো হবে কি না এবং হলে পর সেটা হিরোসিমার মাথায় ফাটানো হবে কিনা সেটা স্থির করেন রাজনৈতিকরা, সমাজপতিরা, জাঁদরেলরা। তাঁরা যদি না চান, তবে বৈজ্ঞানিকদের সাধ্য নেই যে, তাঁরা এটম বম্ হাতে নিয়ে ভুবনময় দাবড়ে বেড়াবেন। এবং শেষ পর্যন্ত এটা বানানো হোক আর নাই হোক, এটম বম ভাল কাজে লাগুক আর মন্দ কাজেই লাগুক, এটম বম তৈরি করার পিছনে যে বৈজ্ঞানিক সত্য সূত্র আবিষ্কৃত হল সেটা সত্যই থেকে যাবে।

কিন্তু এগুলো হল আংশিক সত্য—বৈজ্ঞানিকের সন্ধানের আদর্শ। দার্শনিক সন্ধান করেন চরম সত্যের। সে-সত্য কখনও কারও অমঙ্গল করতে পারে না। কারণ পৃথিবীর সর্বত্রই স্বীকৃত হয়েছে, যাহা সত্য তাহাই শিব এবং তাহাই সুন্দর। এই তিনের চরম রূপ কখনই একে অন্যকে আঘাত করতে পারে না।

বৈজ্ঞানিক তথ্যের বেলা যে-রকম, দার্শনিক-সত্যের বেলাও ঠিক তেমনি। রাজনৈতিক, সমাজবিদ্ এবং আর পাঁচজন স্থির করবেন দার্শনিক-সত্যের কতখানি মানব-সমাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। রাজাজী দার্শনিকদের প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন, 'আধুনিক যুগের দার্শনিকগণের আরম্ভ সংশয়ে, পরিসমাপ্তি সংশয়ে এবং তারা চিরসংশয়বাদী। এই সংশয় ধর্মবিশ্বাসের স্থান অধিকার করিয়াছে।' যদি বা এ-মন্তব্য স্বীকার করে নিই, তবু আবার বলতে হবে, সংশয়বাদ ধর্মের আসন কেড়ে নেবে কিনা সে-কথা স্থির করবেন সমাজপতিরা। দার্শনিকেরা সত্য নিরূপণ করাটাই তাঁদের চরম স্বধর্ম বলে বিশ্বাস করেন, সে-নিরূপণ সমাজে কী স্থান নেবে, সে সম্বন্ধে তাঁরা উদাসীন।

এককালে চিত্রকলা, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি সর্ব কলা-শিল্প ধর্মের সেবা করত। ছবি আঁকা হত দেবদেবীর, গান গাওয়া হত দেবদেবীর, নৃত্য করা হত দেবতার সামনে। আজ নন্দলাল দেবদেবীর ছবি আঁকেন, আবার খোয়াইডাঙারও ছবি আঁকেন (এবং নন্দলালও খাঁটি বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকের ন্যায় সম্পূর্ণ উদাসীন যে, লোকে তাঁর দেবদেবীর ছবিকে পূজো করছে কি না, তিনি সুন্দরের রূপ দিয়েই আনন্দিত), রবীন্দ্রনাথ রচেছেন শত শত বর্ষার গান, উদয়শঙ্করের আপন

রচা সার্থক নৃত্যের বেশীর ভাগ সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে। তাই বলে আজ কি কেউ এ-অপবাদ দেয় যে, এদের কলা-সৃষ্টি প্র্যাকটিকাল নয়, রবীন্দ্রনাথের গান 'একত্র গ্রথিত কতকগুলি কথার মালা ব্যতীত আর কিছুই নয়', উদয়শঙ্করের নৃত্যে আছে শুধু কতকগুলো অর্থহীন অঙ্গসঞ্চালন এবং পদবিন্যাস!

মোদ্দা কথা এই, যাঁরা 'ধর্মপ্রাণ' তাঁরা এঁদের সৃষ্টিকর্ম, বৈজ্ঞানিকের তথ্য, দার্শনিকের সত্য, ধর্মের সেবায় নিয়োজিত করতে পারছেন না বলে দোষ দিচ্ছেন বৈজ্ঞানিককে, কলাকারকে, দার্শনিককে।

কেন পারছেন না, এ-প্রশ্ন যদি কেউ শুধায় তবে অপ্রিয় সত্য বলতে হবে, এবং আজ যখন অপ্রিয় সত্য দিয়েই তত্ত্বালোচনা আরম্ভ করেছি তবে সেই আলাপই এখন তালে চলে আসুক। আসল কথা হচ্ছে এই, আজ যাঁরা 'হা ধর্ম হা ধর্ম' করেন, তাঁদের অধিকাংশই (রাজাজীর কথা বলছি নে, তিনি সত্যই ধর্মপ্রাণ কি না সে বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতা নেই) ধর্মে একনিষ্ঠ নন। স্বধর্মে, সত্য ধর্মে, সনাতন ধর্মে যদি তাঁদের শ্রদ্ধা ঐকান্তিক এবং অবিচল হত তবে তাঁরা আজ দার্শনিককে, কাল বৈজ্ঞানিককে হিরণ্যকশিপু, হিরণাক্ষ্য নামে অভিহিত করতেন না।

কিন্তু আমি কে? আমার ছোট মুখে বড় কথা কেন?

অতএব সে আপ্ত-বাক্য সন্ধান করে, এক ঋষির বচন উদ্ধৃত করে তাঁরই পশ্চাতে আশ্রয় নিই

সে ঋষি প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিগুরুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁর মত ধর্মনিষ্ঠ ঋষি উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মেছেন অতি কম। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এরকম ভগবৎপ্রেমিক আমি আমার জীবনে অল্পই দেখেছি।

তিনি লিখেছেন,

'একটা ক্রন্দন এবং বিলাপের অভিনয় সম্প্রতি আমাদের দেশের একদল নিষ্কর্মা লোকের একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাঁদুনি গায়কদিগের ধুয়া এই যে, আমাদের দেশের এমন যে একটি সেকেলে পৈতৃক সম্পত্তি—বৈরাগ্য, একেলে সভ্যতার হস্তে পড়িয়া তাহার অন্তিম দশা ঘনাইয়া আসিয়াছে—তিনি আর বেশী দিন টেঁকেন না। এইরূপ ক্রন্দন শুনিলে আমাদের হাসি পায়, কান্না ও হাসি পায়। হাসি পায় তার কারণ এই যে, বৈরাগ্য যদি তোমার এতই প্রিয়বস্তু, তবে তার পথ অবলম্বন কর—ক্রন্দন কেন? একেলে সভ্যতা ত আর তোমার হাত পা বাঁধিয়া রাখে নাই; কোতোয়ালের প্রতি মহারাণীর

(ভিক্টোরিয়া) এমন কোনও শক্ত রাজাজ্ঞা নাই যে 'কাহাকেও বৈরাগ্যের পথে চলিতে দেখিয়াছ কি আর অমনি তাহার শির লইবে'। বৈরাগ্য ত আর বাজারের সামগ্রী নয় যে, সেকালের বাজারে তাহা সুলভ ছিল, একালের বাজারে তাহা দুর্মূল্য হইয়াছে। বাজারের সামগ্রী স্বতন্ত্র; আর অন্তঃকরণের সামগ্রী স্বতন্ত্র; বাজারের সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তু—অন্তঃকরণের সামগ্রী সাধনের বস্তু। তুমি বলিবে যে কাল পড়িয়াছে শক্ত; চব্বিশ ঘণ্টা সংসারকার্যে ষোল আনা লিপ্ত থাকিলে যদি এক আনা কাঞ্চি হাসিল হয় তবে তাহাই গৃহী ব্যক্তির পরম সৌভাগ্য; দেখিতেছ না—একটা কেরানীগিরি খালি হইয়াছে কি আর অমনি দলকে দল বি এ, এম এ কাতারে কাতারে পিঁপড়ার পালের ন্যায় আপিস অঞ্চলে গতায়াত করিতে থাকে। ইহার উত্তরে আমি এই বলি যে, প্রকৃত বৈরাগ্য সংসারে কোন কর্তব্য সাধনেরই প্রতিবন্ধকতাচরণ করে না—তাহা দূরে থাকুক, সেরূপ বৈরাগ্য কর্তব্য সাধনের পথ আরও পরিষ্কার করিয়া দেয়। বৈরাগ্য অভ্যাস আর কিছু না—মনের সুর বাঁধা; সেতারের সুর বাঁধা থাকিলে যেমন তাহাতে যে রাগিণী ইচ্ছা, সেই রাগিণীই বাজানো যাইতে পারে, তেমনি অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের সুর বাঁধা থাকিলে—যখন যাহা কর্তব্য তাহাই সুচারুরূপে নির্বাহ করা যাইতে পারে।' (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নানা চিন্তা, সাধনা—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রবন্ধ, পৃ ১—২, বিশ্বভারতী)।

এই উদ্ধৃতিতে যেখানে যেখানে 'বৈরাগ্য' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে 'ধর্ম' শব্দ ব্যবহার করলেই আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট হবে ॥

লেসে ফ্যের

নৃতত্ত্ববিদের কৈলাস, কৈলাস পর্বতে নয়, তাঁদের স্বর্গ আসামের পর্বতে। এ-কথা ভূ-ভারতের তাবৎ নৃতত্ত্ববিদ্ উত্তমরূপে জানেন বলেই আসামে আসবার জন্য তাঁদের ছোঁকছোঁকের অন্ত ছিল না। কিন্তু ইংরেজ তখন আসামের ম্যানেজার, কাজেই ব্যাপারটা দাঁড়াল ইংরেজী প্রবাদে যাকে বলে 'ডগ্ ইন্ দি মেঞ্জার' নয় 'ডগ্ অ্যাণ্ড দি ম্যানেজার'। ইংরেজ নিজে অনুন্নত পার্বত্যজাতির ভিতর বসবাস করে তাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধতর করত না, অন্য উৎসাহী পণ্ডিতকেও তাদের সঙ্গে মিশতে দিত না।

ইংরেজ কস্মিন্‌কালেও কোনও প্রকারের জ্ঞানচর্চা করে নি একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ওই কর্ম সে করেছে রাজ্যবিস্তার এবং আনুষঙ্গিক ধনার্জনের

বহু পূর্বে। নৃতত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বের যখন প্রচার এবং প্রসার হল, টাকার গরমিতে ইংরেজ তখন 'কোনও প্রভু হস্তীদেহ ভুঁড়িখানা ভারী'গোছ হয়ে গিয়েছেন, মা-সরস্বতীর পিছনে আসামের বনে-বাদাড়ে ঘোরার মত গত্তি আর তাঁর গায়ে নেই। যে দু-চারখানা বই ইংরেজ আসামের অনুন্নত সম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধে লিখেছে সেগুলো প্রাচীন পদ্ধতিতে লেখা—নৃতত্ত্বের নব নব তত্ত্বাবিষ্কারের দৃষ্টিবিন্দুর সন্ধান এ-কেতাবগুলোতে পাবেন না।

কিন্তু জানা-অজানায় ইংরেজ এদের অনেকের সর্বনাশ করে দিয়ে গিয়েছে, এদের ভিতর মিশনারিদের ঘোরাঘুরি এবং বসবাস করতে দিয়ে।

খ্রীষ্টধর্ম অতি উত্তম ধর্ম। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান কোনও ধর্ম থেকেই সে নিকৃষ্ট নয়। কোটি কোটি লোক শত শত বৎসর ধরে খ্রীষ্টের বাণী থেকে নব নব আদর্শের অনুপ্রেরণা পেয়েছে, খ্রীষ্টের অনুকরণ করে বহু সাধুসন্ত ভগবানের কাছে পৌঁছে গিয়েছেন, তাঁদের দেখে সংশয়বাদীরা বলেছেন, ভগবান আছেন কি না জানি নে কিন্তু যদি থাকেন তবে তাঁর স্বরূপ এঁদেরই মত।

কিন্তু সেই মহান ধর্ম প্রচারের ভার যদি অজ্ঞের হাতে পড়ে তবে তার ফল বিষময় হয়। কারণ সে তখন খ্রীষ্টের নামে যে-বাণী প্রচার করে সে উচাটন শয়তানের।

আসামের সব মিশনারি যে শয়তান ছিলেন, এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু অজ্ঞের স্কন্ধে শয়তান ভর করে যে কী কুকর্ম করতে পারে সে-তত্ত্ব হজরৎ মুহম্মদ (দঃ) জানতেন বলেই বলেছেন,

মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা জ্ঞানীর নিদ্রা শ্রেয়ঃ।

যে-মিশনারি এসে আসামের বনেব ভিতর বাসা বাঁধল তার বাংলো দেখে আমরা দূরের থেকে মুগ্ধ হই। অনেকটা যেন—

'ওই যেখানে দিঘির উঁচু পাড়ি,
সিসু গাছের তলাটিতে,
পাঁচিলঘেরা ছোট্ট বাড়ি
ওই যে রেলের কাছে,
ইষ্টেশনের বাবু থাকে,
আহা এরা কেমন সুখে আছে॥'

টিলার উপর ফুটফুটে বাংলো, চতুর্দিকে ফুলের কেয়ারি, ঝকঝকে তকতকে বারান্দায় বেতের চেয়ার-টেবিল সাজানো—মনে হয়, আহা, পাদরী কেমন সুখে আছে।

যাদের ভিতর পাদরী সাহেব খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে এসেছেন, তাদের তুলনায় তিনি আছেন অনেক সুখে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই কিন্তু বিলেতের যে-কোনও মজুরের বাড়ি পাদরীর বাসার চেয়ে অনেক বেশী আরামদায়ক, মজুর পাদরী সাহেবের চেয়ে খায় ভাল এবং পাদরীর সবচেয়ে বড় দুঃখ যে তাকে আত্মীয়স্বজন স্বদেশবাসী বর্জন করে আমরণ থাকতে হয় স্বদেশ থেকে বহু দূরে অনাত্মীয়ের মাঝখানে। তাই রবীন্দ্রনাথ এদেরই একজনকে দিয়ে বলিয়েছেন,

'আপনার জন আপনার দেশ
হয়েছি সর্বত্যাগী।
হৃদয়ের প্রেম সব ছেড়ে যায়
তোমার প্রেমের লাগি।
সুখসভ্যতা রমণীর প্রেম
বন্ধুর কোলাকুলি,
ফেলি দিয়া পথে তব মহাব্রত
মাথায় লয়েছি তুলি।
এখনো তাদের ভুলিতে পারি নে
মাঝে মাঝে জাগে প্রাণে,
চিরজীবনের সুখবন্ধন
সেই গৃহমাঝে টানে।'

কিন্তু এটা হল পাদরীর হৃদয়ের দিক। এবং বাইরের দিক দিয়ে দেখতে গেলে পাদরী আপন দেশের তুলনায় যত দৈন্যেই থাকুক না কেন, এদেশের মধ্যবিত্ত সন্তানের চেয়েও তাদের আর্থিক অবস্থা ঢের ঢের ভাল এবং চাষাভুষোদের সঙ্গে এদের কোন তুলনাই হয় না।

কিন্তু পার্থক্যটা সবচেয়ে মারাত্মক হয় যখন পাদরী পার্বত্য অনুন্নত জাতির ভিতর গিয়ে বাংলো বাঁধে।

অনুন্নত জাতি' বুঝতে পারে না যে, ক্রীশ্চান হয়ে গেলেই সে পাদরী সায়েবের বাংলো ভেট পেয়ে যাবে না। পাদরীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সে পাদরীর বাড়ি ঘর-দোর, জামা কাপড়, বাসন-কোসন. টেবিল-চেয়ার দেখে মুগ্ধ হয় এবং এই সব জিনিস যোগাড় করার জন্য তার সরল মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু নাগা কিংবা লুসাইয়ের যা আমদানি, তা দিয়ে এসব বস্তুর কল্পনাও সে করতে পারে না। ফ.ল তার জীবন বিষময় হয়ে ওঠে।

পাদরী সায়েবরা এই সর্বনাশটি করেছেন অনুন্নত জাতিদের। চোখের সামনে

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যে ছিমছাম স্টাণ্ডার্ড অব্ লিভিংটি তুলে ধরেছেন, সে-স্টাণ্ডার্ডে পৌঁছনোর ক্ষমতা নাগা কিংবা লুসাইয়ের কস্মিনকালেও হবে না—দ্বন্দ্ব তার লেগেই থাকবে।

অন্য বাবদে এই সব অনুন্নত সম্প্রদায়গুলোর প্রতি ইংরেজের নীতি ছিল 'লেসে ফ্যের' অর্থাৎ তাদের জীবনধারণ-পদ্ধতিতে কোনপ্রকার পরিবর্তন না আনা, এবং আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, একমাত্র নাগাদের বাদ দিয়ে আর সব অনুন্নত সম্প্রদায়কে যত কম ঘাঁটানো যায় ততই মঙ্গল। তার কারণ এদের অনেকেই এমন শান্ত, সরল ও নির্দ্বন্দ্ব জীবন যাপন করে যে, আমাদের 'সভ্যতা' তাদের জীবনে নূতন কিছু ত আনবেই না, বরঞ্চ নানা প্রকারের দৈন্য দুর্দশা সৃষ্টি করবে। অন্তত একজন অতিশয় জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষিতুল্য ভারতীয়কেও আমি এই মত পোষণ করতে দেখেছি। প্রাতঃস্মরণীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় হয় সাঁওতালদের সঙ্গে গত শতকের শেষের দিকে। তখনও বোলপুর অঞ্চলে ধান-কল হয় নি, সেখানকার কৃত্রিম জীবন তখনও সাঁওতালদের চরিত্র নষ্ট করে দিতে সক্ষম হয় নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই সকল অনাড়ম্বর সাঁওতালদের জীবনধারণ-পদ্ধতি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেছিলেন এবং আমাকে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, এদের জীবনে আমরা যেন হস্তক্ষেপ না করি। তবে তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, সাঁওতালরা যে অহেতুক ভূতপ্রেতকে ডরায়, সেটা সারাবার জন্য সর্বশক্তিমান ভগবানের ধারণা এদের ভিতর প্রচার করলে ভাল হয়। সে-ধারণা প্রচার করার কতটুকু প্রয়োজন, গুণীরা তার বিচার করবেন কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রথম উপদেশ আমি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নিয়েছি।

আমি জানি, এর বিরুদ্ধে আপত্তি উঠতে পারে। যারা শিক্ষাদীক্ষায় বিশ্বাস করেন, মড়ক এবং অন্যান্য ব্যাধি যাঁরা নির্মূল করতে চান, তাঁরা হয়ত সহজে আমাদের 'লেসে ফ্যের' পন্থা মেনে নেবেন না। উত্তরে আমার নিবেদন, এই সব অনুন্নত জাতির সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও এত কম যে, বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন যে, এদের সম্বন্ধে আরও অনেক অনুসন্ধান করার পর বিস্তর ভেবে-চিন্তে কাজ আরম্ভ করতে হবে—অবশ্য ততদিন বেঁচে থাকলে আমি তখনও আপত্তি জানাব। কারণ ধর্মের মিশনারি আর 'সভ্যতা'র মিশনারিদের ভিতর আমি পার্থক্য দেখতে পাই অতি কম॥

মার্কিনী তাত

মার্কিনরা হন্যে হয়ে উঠেছে। বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে। যেদিকে তাকায় সেদিকেই কমুনিস্ট-জুজু দেখে। দেশে যে-রকম ছেলে-ধরার জুজু দেখা দিলে মানুষ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে যাকে-তাকে ধরে বেধড়ক মার লাগায়, অনেকটা সেই রকমই। তফাত এই যে, এদেশের কর্তাব্যক্তিরা এ-রকম মারধোর থেকে দূরে থাকেন, আর যতখানি পারেন জুজুর ভয়টা তাড়াবার চেষ্টা করেন। মার্কিন মুলুকে কিন্তু কমুনিস্ট-ডাইনী পোড়ানোর ভারটা আপন হাতে তুলে নিয়েছেন ওই দেশের কর্তাব্যক্তিরা।

তা তারা আপন দেশে যা খুশি করুন, আমরা রা-টি কাড়ব না। আমরা বলি—

'হরি হে রাজা কর রাজা কর
যার ধারি তারে মার
যার ধারি দুচারখানা
তারে কর দিন-কানা
যার ধারি দু শ চার শ
তারে কর নির্বংশ
যে আমার আধলা ধারে
ব্যাটা যেন দিয়ে মরে।'

কমুনিস্টরা আমাকে কিছুই ধারে না, তারা এখন মরুক তখন মরুক আমার কিছুটি যায় আসে না।

কিন্তু মার্কিনরা যখন এদেশে এসে দাবড়াতে থাকে, তখন আমি বিদ্রোহ করি। ভারতবর্ষের যত্রতত্র আজকাল দেখতে পাবেন মার্কিন অধ্যাপক অমুক তার তমুক 'গণতন্ত্র' 'নবীন জীবনপদ্ধতি' 'দর্শনের নব সূত্রপাত' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছেন। ওগুলো হচ্ছে মুখোশ—যে কোন বক্তৃতায় যান, দেখতে পাবেন তিন মিনিট যেতে-না-যেতেই, দর্শন, বিজ্ঞান, কলাশিল্পের বাহানা ধরে তাঁরা ঠিক পৌঁছে গেছেন আসল মোকামে, 'এস ভাই ভারতীয়, তোমরা আমরা সবাই মিলে রুশকে ঘায়েল করি।'

ইংরেজীতে একেই বলে 'ওয়ার-মঙ্গারিং', বাঙলায় বলে, 'তাতানো', 'ওসকানো', 'খ্যাপানো'।

ধর্মসাক্ষী, স্বেচ্ছায় যাই নি। অকালে বৃষ্টি নেমেছিল, আশ্রয়ের সন্ধানে

বারান্দায় উঠেছিলুম। যজ্ঞির যজমানরা আমার আসল মতলব ধরতে না পেরে সভাস্থলে বসিয়ে দিলেন। ভোজনের নিমন্ত্রণে নয়, পঞ্চাশী-আইনে পড়ে না। বক্তৃতার সারাংশ পূর্বেই নিবেদন করেছি। অবাক মানলুম দেশের লোক এই 'তাতানো'টা ধরতে পারল না। যে-রকমভাবে তাবৎ বক্তৃতাটা গলাধঃকরণ করে মিষ্টি মিষ্টি প্রশ্ন শুধাল, তার থেকে মনে হল তারা যেন আরও মণ্ডাটা মিঠাইটা চাইছে।

থাকতে না পেরে শুধালুম, 'সায়েব তোমার আসল মতলব, আমরা যেন তোমাদের সঙ্গে এক হয়ে বলশিদের সঙ্গে লড়ি—নয় কি? ঠিক বুঝেছি ত?'

সায়েব একগাল হেসে আমার বুদ্ধির তারিফ করলেন। আমি শুধালুম, 'বলশিদের সঙ্গে কোনও সমঝোতা হয় না? আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেন, "অসম্ভব নয়"। তাই তিনি কোন দলেই ভিড়ছেন না।'

সায়েব বললেন, 'রুশরা চলে যাক চেকোশ্লোভেকিয়া হাঙ্গেরি রুমানিয়া পোলাণ্ড ছেড়ে। তারা কী রকম সেখানে রাজত্ব চালাচ্ছে জান? সেখানে তারা সর্বপ্রকার স্বাধীনতার টুঁটি চেপে তার দম বন্ধ করে মারছে, জান সে কথা?' এবার আমি পাল্টা একগাল হেসে বললুম, 'বিলক্ষণ জানি সায়েব। কিন্তু বল ত, তোমারই রুজভেল্ট আর চার্চিল যখন ইয়ালটা, তেহরান পৎসদামে এসব দেশ রুশের হাত তুলে দিয়েছিলেন, তখন কি তাঁরা এত গবেট ছিলেন যে জানতেন না, রুশ সেখানে কোন্ ধরণের রাজত্ব কায়েম করবে? তোমারই মার্কিন জাত, ইংরেজ আর ফরাসী বেরাদর পশ্চিম জার্মানিতে কি বলশি প্যাটার্ন বুনছে, না নিজেদের প্যাটার্ন? তা নয় সাহেব, রুজভেল্ট চার্চিল বিলক্ষণ জানতেন রুশ-নাগর বলকানসুন্দরীকে নিয়ে কোন্ রঙ্গরস করবেন। কিংবা বলতে পারি, শেয়ালকে যদি দাওয়াত করে' মুর্গীর খাঁচায় ঢোকাও, তবে সকালবেলাকার মমলেটের আশাটা সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করাই ভাল।'

সায়েবের মুখ সেদ্ধ হ্যামবর্ণ, সেটা লিপস্টিক হল কিনা বুঝতে পারলুম না—চোখে চশমা ছিল না—তবে কণ্ঠে উষ্মা প্রকাশ পেল। বললেন, 'তোমরা গণতন্ত্র মান। বিশ্বজোড়া গণতন্ত্রের বিপদে তোমরা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে?'

বললুম, 'তাতে করে ত আমরা মার্কিনেরই অনুসরণ করব। ভুলে গেছ, ১৯১৪ সালে লয়েড জর্জ যখন তোমাদের দরজায় ধন্না দিয়ে কান্নাকাটি করেছিলেন, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র বাঁচাও, তখন তোমরা সাড়া দিয়েছিলে? না বলেছিলে, "ও ইয়োরোপের ঘরোয়া ব্যাপার।" শেষটায় ঢুকেও বেরিয়ে পড়লে। লীগ অব নেশন্‌সে যোগ ত দিলেই না উল্টে তার খয়েরখাঁ উইলসনকে তাড়ালে। তারপর

১৯৩৯ সালে যখন চেম্বারলেন চার্চিল একই কান্না কাঁদলেন, ফ্যাসিজমের হাত থেকে গণতন্ত্র বাঁচাও, তখনও কি পত্রপাঠ লক্ষিত হয়ে লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিলে? না পার্লহারবারের আঁতে যখন ঘা পড়ল, তখন "গণতন্ত্র বাঁচাবার" টনক নড়ল? এখন দেখছ রুশ বড্ড বেশী তাগড়া হয়ে উঠেছে, তাইতে এত শিরঃপীড়া। সে-কথা থাক্। কিন্তু এ-কথাও মানবে যে, আজ যদি আমরা কোনও পক্ষে যোগ না দিই, তবে সে শুধু তোমাদের ইতিহাস থেকে হদিস নেওয়ার মত হবে'। ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন, জাপান লড়াই করে মরল, তাই আজ তোমরা পয়লা নম্বর। এবার তোমরা আর রুশরা মারামারি করে দুবলা হও, তখন আমরা পৃথিবীতে রাজত্ব করব।'

কথাটা সায়েবের বড্ড টক লাগল। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'কিন্তু এই যে লড়াইয়ের বিপদ ঘনিয়ে আসছে, তাব থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখতে পারবে কি?'

আমি বললুম, 'সে হচ্ছে অন্য কাহিনী। দুর্ভিক্ষেব সময় বাঙালী ডাস্টবিন থেকে ভাত কুড়িয়ে খেয়েছে, তাই বলে ওটা তার কর্তব্য এ-কথা ত কেউ বলতে যাবে না। লড়াই এড়াতে পারব না, তাই তৈরী হয়ে জেতার পক্ষ নিই, সে হচ্ছে এক কথা; আর তোমাদের পক্ষে স্বেচ্ছায় খুশ এক্তেয়ারে, বহালতবিয়তে "কর্তব্যবোধে" "গণতন্ত্র বাঁচাতে" যোগ দি, সে হচ্ছে অন্য কথা। আমাদের সে বোধটা হচ্ছে না।'

ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেছে! দেশ ত আমি চালাই নে। কেটে পড়লুম।

কিন্তু প্রশ্ন, এই যে হরেক রকম চিড়িয়া নানারকম মুখোস পরে এদেশে এসে 'ওয়ার-মঙ্গারিং' করে, তার কি কোন দাওয়াই নেই?

বাঙ্গালী মেনু

বয়স হয়েছে, যখন খুশি রেস্তরাঁয় ঢুকে মমলেট-কটলেট হুকুম দিতে লজ্জা করে। আর যখন বয়স হয় নি তখন জেবে সিঙ্গিল চায়েরও রেস্ত থাকত না বলে রেস্তরাঁয় ঢোকবার উপায় ছিল না।

ভগবান দয়াময়। তিনি সব কিছুই দেন; কিন্তু তাঁর 'টাইমিং'টা বড্ডই খারাপ। বৃদ্ধকে দেন তরুণী ভার্যা এবং হোটেলে যাবার পয়সা। উনিশ শতকের নাটক-নভেলে একেই বলা হত 'অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস'।

অসময়ে বৃষ্টি। ট্রাম থেকে নেমেই রেস্তরাঁতে ঢুকতে হল। বহুকাল পরে কলকাতা ফিরেছিও বটে—পুরনো যাবতীয় প্রতিষ্ঠান আগেরই মত চালু আছে কি না দেখার বাসনাটাও রয়েছে।

একখানা আলুর চপ আর এক কপ্ চা।

শুনেছি, সায়েবরা মাস্টার্ড খান শুধু শূকর এবং আরেকটা নিষিদ্ধ মাংসের সঙ্গে। মুর্গী, মটন, মাছের সঙ্গে তাঁরা রাই খান না। মুর্গী, মটনের সঙ্গে না ই বা খেলেন, কিন্তু মাছের সঙ্গে সরষে যেন রবীন্দ্রসঙ্গীতে কথার সঙ্গে সুরের মিল —এ-তত্ত্বটা সায়েবরা এদেশে দু'শ বছর থেকেও শিখল না দেখে তাজ্জব মানতে হয়।

তা সে যা-ই হোক, আমি সরষে খাই সব জিনিসের সঙ্গে—এই নিতান্ত সন্দেশ-রসগোল্লা ছাড়া। তাই আলুর চপের মটনকিমা সরষে সংযোগে খেতে খেতে ছোকরাকে বললুম, 'সরষেটা ভাল না।'

ম্যানেজার শুনতে পেয়ে বললে, 'হক্-কথা বলেছেন, স্যার, কিন্তু বিলিতী মাস্টার্ডের উপর সরকার ট্যাক্সো যা লাগিয়েছেন তার ঝাঁঝটা মাস্টার্ডের চেয়েও বেশী।'

আমি বললুম, 'তবে নাকচ করে দিন বিলিতী মাস্টার্ড; চালান দেশের তৈরী খাঁটি, প্লেন কাসুন্দি। খরচাও কম পড়বে।'

ম্যানেজার আমার দিকে হাবার মত তাকালে। বোধ হয় ভাবলে, আমি নিতান্তই গাঁইয়া। তা আমি বটিও।

দিশী বিলিতী কোন মাস্টার্ডই কাসুন্দির সামনে দাঁড়াতে পারে না। কাসুন্দিতে থাকে মিঠে-কড়া, মোলায়েম-মোলায়েম ঝাঁজ—আর বিলিতী মাস্টার্ডের ঝাঁজ চাষাড়ে, ফরাসী মাস্টার্ডে বদ্‌খদ্ মিষ্টি-মিষ্টি ভাব।

যবে থেকে আমার পাশের বাড়িতে এক দার্শনিক এসে উঠেছেন, পাড়ার আমাদের সকলের গায়ে দর্শনের হাওয়া লেগেছে। আমরা এখন আর তথ্য নিয়ে তর্ক করি নে, তত্ত্ব কারে কয় তার-ই চিন্তা করি। আমি তাই কাসুন্দির খেই ধরে তত্ত্বচিন্তায় মনোনিবেশ করলুম। আমরা আপন জিনিসের সম্মান দিতে জানি নে। হিন্দীতে যাকে বলে 'ঘরকী মুর্গী দাল বরাবর' অর্থাৎ 'গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না'।

তখন মনে পড়ে গেল, গেল লড়াইয়ের সময় আমাকে এক মার্কিন অফিসার আফ্‌সোস করে বলেছিল, কলকাতায় বাঙালী-রান্না খাবার রেস্তরাঁ নেই। তাকে এক বাঙালী নিমন্ত্রণ করে ডাল-চচ্চড়ি খাইয়েছিল, সেই থেকে বেচারী তামাম

কলকাতা চষে বেড়িয়েছে বাঙালী-রান্নার সন্ধানে, আর পেয়েছে শুধু মমলেট-কটলেট-ডেভিল কিংবা কোর্মা-পোলাও-কালিয়া। সে চেয়েছে এক ঘটি জল, পেয়েছে তিনখানা বেল।

দর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শোপেনহাওয়ার বলেছেন, 'অমা যামিনীর অন্ধকার অঙ্গনে অন্ধের অনুপস্থিত অসিত অশ্বডিম্বের অনুসন্ধান।' কলকাতায় বাঙালী-রান্নার রেস্তরাঁ অনুসন্ধান এই একই গোত্রীয়—কলকাতায় প্রথম আশ্চর্য!

অথচ দেখুন ইংরেজী (কিংবা ট্যাঁশ বলতে পারেন), মোগলাই, চীনা, মাদ্রাজী, গুজরাতী ('অন্নপূর্ণা' দ্রষ্টব্য—খাওয়া না-খাওয়ার জিম্মেদার আপনি) বহু রকমের রান্নাই এই কলকাতায় পাবেন। রোস্ট কবাব চপ্ সুয়েজ ইডলি-ডোসে করহী, ফরাসী এস্‌কেলোপ দ্য ভো ও শাতোব্রিয়া, এমন কি ভিয়েনার ভীনার শ্নিৎসেল পর্যন্ত পাবেন। পাবেন না শুধু খ্যাঁট, অম্বল।

তাই ভাবছি, আপনাতে আমাতে একটা বাঙালী-রেস্তরাঁ খুললে হয় না?

বাঙালী সর্বভুক। তাই বাঙালী প্রবাদ 'লোহা খাই নে শক্ত বলে, "—" খাই নে গন্ধ বলে।' তাই বলে কি আমাদের রেস্তরাঁয় সব কিছু থাকবে? উঁহু! আমাদেব মাপকাঠি হবে—বাড়িতে আমাদের মা-মাসীরা আটপৌরে এবং পোশাকী যে-সব রান্না করেন।

তা হলে এইবারে 'মেনু'টা তৈরি করা যাক।

কিন্তু তার পূর্বেই স্থির করতে হয়, খেতে দেবেন কিসে?

আমি মনস্থির করেছি—কাঁসা কিংবা পেতলের থালায়। সাদা কিংবা কালো পাথরেব থালারও ব্যবস্থা থাকবে, নিতান্ত সাত্ত্বিক জনের জন্য শালপাতা, কলা-পাতার ব্যবস্থাও থাকবে। সব কটা থাক্ আর নাই থাক্—চীনে বাসন ছুরি-কাঁটা বারণ।

এখন আহারাদি।

১। ভাত—আতপ এবং সেদ্ধ, লুচি, পরোটা, বাকর-খানী (বাদ দিলে চলবে না, পুব-বাঙলার বিস্তর লোক কলকাতায় আস্তানা গেড়েছেন), ঘি-ভাত, পোলাও। কিছু বাদ পড়ল না ত? ভেবে দেখুন। এ 'মেনু' তৈরী করা ত একজনের কর্ম নয়। আমি শুধু একটা পয়লা খসড়া করে দিচ্ছি।

এ-স্থলে আরেকটি তত্ত্ব খুলে কই। রেস্তরাঁ প্রতিষ্ঠানটি মোটামুটি ইয়োরোপীয়; তাই কোনও কোনও বাবদে আমাদের নকল করতে হবে ইয়োরোপকে—অর্থাৎ প্যারিসকে, কারণ রেস্তরাঁ-লোকের বৈকুণ্ঠ প্যারিসে। তাই 'মেনু' বানাবার পরিচ্ছেদ, অনুচ্ছেদ, পদ ফরাসী কায়দাতেই যুক্তিসম্মত এবং অভিজ্ঞতা-সম্পূর্ণ

ফরাসী 'মেনু' আরম্ভ হয় হরেক রকম রুটির বর্ণনা দিয়ে (আমিও তাই ভাত-লুচি-পোলাও দিয়ে বিসমিল্লা পড়েছি), তারপর অর দ্য অভ্র, সুপ্, ডিম, ফিশ ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব—

২। তেতো ;—

উচ্ছেভাজা, করেলাসেদ্ধ, নালতে শাক (ইন সীজন—মৌসুমী কালে)। এইবারে ভাবুন, কিংবা মা-মাসীকে জিজ্ঞেস করুন, আর কী কী তেতো আছে—আমার দুর্ভাগ্য, যে-অঞ্চলে জন্ম আমার, সেখানে তেতোটার খোলতাই নেই। পশ্চিমাঞ্চলে স্টাফ্‌ট—অর্থাৎ মাংসের পুর দেওয়া—করেলা খায়, কিন্তু বিবেচনা করি তার রেওয়াজ বাংলা দেশে নেই।

৩। ডাল ;—

মুগ, ছোলা, মসুর, কলাই ইত্যাদি। তারপর ডালের সঙ্গে সজনের ডাঁটা, কেউ বা দু-চারটে বড়ি দেয়। অতএব ডালের দুভাগ—প্লেন এবং মেশানো, যেমন পূর্বেই বলেছি ডাল আ লা ডাঁটা ; কিংবা আ লা নারকোল, অর্থাৎ ডালে নারকোলের টুকরো থাকবে।

৪। ভাজা ;—

নিয়ে কিন্তু বিপদ। কারণ এতক্ষণ দিব্য নিরামিষ চলছিল, এখন ভাজা নিরামিষ, আমিষ, ডিম তিন প্রকারই হতে পারে।

অতএব

(ক) আলু, পটল, বেগুন, কুমড়ো···

(খ) ডিমভাজা, মমলেট···

(গ) মাছভাজা (ইলিশ, রুই, পুঁটি, পোনা···)

কাজেই খ এবং গ-কে হয়তো 'ডিম' এবং 'মাছের' অনুচ্ছেদে পুনরাবৃত্তি করতে হবে। 'ক্রস রেফেরেন্স' দিতে পারেন, কিন্তু ভয়, তাহলে 'মেনু' হয়ত জর্মন ডক্‌টরেট্ থিসিসের প্রকার এবং আকার নিয়ে নেবে। উপস্থিত অবশ্য আমি সেই নিষ্ঠা নিয়েই এই মহামূল্যবান নির্ঘণ্ট নির্মাণের প্রয়াসী হচ্ছি, কিন্তু তৈরী মালে ত ও জিনিস ওতরালে চলবে না।

(৪) ছেঁচকি—ছোঁকা—ছক্কা—চচ্চড়ি—লাবড়া (লাফড়া)।

এইবারে আমার পেটের এলেম বেরিয়ে গেল। এগুলোর মধ্যে একটা আরেকটার সূক্ষ্ম পার্থক্য আমি জানি নে। যদিও খাবার সময় রাঁধুনীকে অপটু ঠাওরালে এ-বিষয়ে উচ্চাঙ্গের বক্তৃতা দিতে কসুর করি নে। আর-পাঁচজন কান

পেতে শোনে, কারণ তারা জানে আমার চেয়েও কম। দু-একবার যে কান-মলা খাই নি তাও নয়। সে কথা যাক। এখন প্রশ্ন, এ-অনুচ্ছেদের মূল হেডিং নেবেন কী এবং তার পদ বাতলাবেন কী কী?

করে করে আসবেন, মাছ মাংসে— তার কত অনুচ্ছেদ, তস্য ছেদ, পদ, পদ-ভেদ—ডালনা, ঝোল, কালিয়া, মালাই সহযোগে, ডাবের ভিতর, কলাপাতায় পেঁচিয়ে, দমে দিয়ে, সরষে মেখে—খোদায় মালুম, কোথায় গিয়ে পৌঁছব।

তাই আমার প্রস্তাব; একখানা ফুলস্ক্যাপ কাগজ নিন এবং রেস্তরাঁর মেনুর কায়দায় একখানা বাঙালী মেনু তৈরী করুন দু পাতা জুড়ে, অর্থাৎ ফুলস্ক্যাপ কাগজের ভাঁজ খুলে যতটা জায়গা পান। এর বেশী কাগজ নিতে পারবেন না কারণ পূর্বেই বলেছি মেনু থিসিস নয়। আবার শীটখানা যেন টায়-টায় ভর্তি হয়। ফাঁক থাকলে চলবে না। আমি যে পরিচ্ছেদ-অনুচ্ছেদ দিয়ে প্যাটার্ন বাতলালুম সেটা একদম অবজ্ঞা করে আপনি আপন মেনু বানাবেন। কোন্ জিনিসের কত দাম সেটা আপনি বলতে পারেন, না-ও পারেন। না-বলাই ভাল। কারণ 'কস্‌টিং' ব্যাপারটা বড়ই কঠিন। রেস্তরাঁ-ম্যানেজার অভিজ্ঞতা থেকে সেটা স্থির করবেন।

'এক্‌স্ট্রা' অনুচ্ছেদটি ভুলবেন না। তাতে থাকবে, কাঁচা লঙ্কা, চাটনি (ধনে, পুদিনা…), আচার (আম, জারক নেবু…) ইত্যাদি এবং কাসুন্দি।

যে-কাসুন্দি নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছিলুম।

এইবারে বিবেচনা করুন॥

রন্ধন-যজ্ঞ

খবর এসেছে লণ্ডনে এক বিরাট রন্ধনযজ্ঞ হবে। সে-যজ্ঞে পৃথিবীর আঠারোটি দেশ আপন আপন সুস্বাদু রান্না পেশ করবেন। অতি উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু হায়, আমাকে বিচারকর্তা করে ডেকে পাঠাচ্ছে না কেন? রন্ধন-মার্গে সত্যের সন্ধানে আমি বিস্তর ইন্ধন পুড়িয়েছি, আকাশের অ্যারোপ্লেন, মাটির ট্রেন আর জলের জাহাজ এই তিন সচল বস্তু ভিন্ন আর সবই ত আমি খেয়ে দেখেছি। তাও আবার দেশী বিদেশী নানা কায়দায়। জর্মন কায়দায় রান্না ভারতীয় 'রাইস-কারী' (অতিশয় অখাদ্য) খেয়েছি, শিখের বানানো বাঙালী লেডিকেনি খেয়েছি (সেফ পেল্লাদ-মারা গুলি—প্রহ্লাদকে খাইয়ে দিলে হিরণ্যকশিপুকে আর ভাবতে হত না), আরব বেদুইনের হাতে 'পাকানো' দিল্লীর বিরিয়ানি খেয়েছি, জাপানীর

স্বহস্তে তৈরী চেঙ্গিসখানী কাবাব ভী খেয়েছি (এর নির্মাণ-কৌশল একদিন সবিস্তর নিবেদন করব—আহা, অতি খাসা জিনিস), আর কত বলব।

তা সে-কথা যাক গে, সে নিয়ে দুঃখ করে কোন লাভ নেই, গুণীর আদর কি আর এ মূঢ় সংসার করেছে কিংবা করবে ?

লণ্ডন থেকে আরও খবর এসেছে, ভারতীয় 'টীম' চলবে শ্রীমতী ভট্টাচার্য, শ্রীমতী বসু এবং শ্রীমতী রায়ের কর্তৃত্বে। তিনজনই বাঙালী, কাজেই বাঙালী হিসেবে, হে পাঠক, তোমার আমার দুজনেরই মনে বিমল আনন্দ অনুভূত হল, এ-কথা অস্বীকার করে খামোখা মিথ্যেবাদী হতে যাব কেন ? কে না জানে, আজ বাঙ্গালী সর্বত্র অনাদৃত, কেন্দ্রীয় সরকার তাকে উপেক্ষা করে, বিদেশে তার খ্যাতি-প্রতিপত্তি শনৈঃ শনৈঃ কমে যাচ্ছে, বিশেষজ্ঞের পালা-পরবে শ্রাদ্ধ-নিমন্ত্রণে সে প্রায় ব্রাত্য—অপাঙ্‌ক্তেয় হতে চলল। এরই মধ্যিখানে যদি বিশ্ব-রন্ধনযজ্ঞে তিন বঙ্গরমণী ভারতের প্রতিভূ হিসেবে আমন্ত্রণ পান, তবে কোন্ বাঙালীর ছাতি তিন ফুট ফুলে উঠবে না ?

কিন্তু আমার নিবেদন, গর্ব অনুভব করেছি বটে কিন্তু আনন্দিত হই নি।

আমি বাঙালী, আমি এই 'দেহলিপ্রান্তে' বসেও বাঙালী-রান্না খাই। আমি আতপ চালের ভাত, কিঞ্চিৎ ঘৃত, সোনা মুগের ডাল (দিল্লিতে অতিশয় নিকৃষ্ট), সর্ষে বাটায় মাছের ঝোল ইত্যাদি খেয়ে থাকি। বাঙালীর অন্যান্য রান্না নিয়েও আবার দম্ভের অন্ত নেই, কিন্তু বিশ্বের দরবারে যদি আমাদের অর্থাৎ ভারতীয় রান্নার কেরদানি দেখাতে হয় তবে শুধু বাঙালী হেঁশেল দেখালেই চলবে না।

হাঁ, আলবত, অতি অবশ্য আমি স্বীকার করি, বাঙালীর সর্ষে-ইলিশ, মালাই-চিংড়ি, ডাব-চিংড়ি, বাঙালী বিধবার নিরামিষ (বিশেষ করে 'বোষ্টমের পাঠা' এঁচোড়), জলখাবারের লুচি, আলুর দম, সিঙাড়া, মাছের ডিমের বড়া, মোচার পুর দেওয়া সমোসা ইত্যাদি, তারপর ছানার মিষ্টি, রসগোল্লা, লেডিকেনি, সন্দেশ, চিনিপাতা দই, মিহিদানা সীতাভোগ আরও কত কী ! (মুদ্রাকর মহাশয়, আপনার জিভে জল আসছে, অথচ এ-লেখা কম্পোজ না করে আপনার বাইরে যাবার উপায় নেই, তদুপরি আজকের দিনে আপনি আমি কেউই এ-সব সুস্বাদু বস্তু চাখবার সামর্থ্য রাখি নে, অতএব অপরাধ নেবেন না।)

এমন কী, আমাদের উচ্ছেভাজা, আমের অম্বল, কিসমিস-টমাটোর টক (প্রধানত বীরভূম, মেদিনীপুর অঞ্চলের) নগণ্য জিনিস নয়, ভোজনরসিক মাত্রেই জানেন।

আর পিঠে—তার ফিরিস্তি আর দেব না।

কিংবা যাকে বলে 'ফেনসি-খানা' বিশেষ জেলা বা মহকুমার আপন বৈশিষ্ট্য। বাইরের—এমন কী, বাংলা দেশের ভেতরের লোকই যেগুলো জানে না, যেমন মনে করুন ব্যাঙের ছাতা, ইংরেজীতে যাকে বলে মাশরুম, মেদিনীপুর এ-বস্তুর পাক্কা কদরদার, ভোজনরাজ ফরাসীও এর নামে অজ্ঞান, কিংবা পুব-সিলেটের 'চোঙা-পিঠে' (এক রকম হাল্কা বাঁশের চোঙায় ভেজা চাল ভরে দিয়ে সে-চোঙা খোলা আগুনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঝলসানো হয়, তারপর চোঙা ভেঙে ফেললে একখানা আস্ত লম্বা টুকরো বেরিয়ে আসে—এক ফুট লম্বা; খেতে হয় শুকনো মালই কিংবা করকরে কই মাছ ভাজার সঙ্গে), কত বলব!

শুঁটকি? নাক সিঁটকাচ্ছেন ত? কিন্তু আমার বিশ্বাস শুঁটকির আপন মূল্য আছে। ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন সব ভোজন-রসিকজনই 'স্মোকড্-ফিস' অর্থাৎ শুঁটকির কদর জানেন।

আরও কত কী!

কিন্তু ভুললে চলবে না যে, বাঙালী মাছ, নিরামিষ, পিঠে, সন্দেশ সুচারুরূপে তৈরি করতে জানলেও সে পারে না—এবং একদম পারে না মাংস রাঁধতে।

বাঙালী-বাড়িতে মাংস খেতে গেলে আমার চোখে জল আসে। মাংস আর ঝোল নন্-কো-অপারেশন করে বসে আছেন—এদিকে শক্ত মাংস ওদিকে টলটলে ঝোল। মাংসের নিতান্ত আপন 'সোওয়াদ' আছে বলেই খাওয়া যায়, কিন্তু আসলে অখাদ্য।

কিংবা মাংস-চালে মিশিয়ে বিরিয়ানি পোলাও বাঙালী রাঁধতে জানে না (বাঙালীর উপাদেয় ঘি-ভাত, মটরশুঁটি-ঘি-ভাত অন্য জিনিস) অথবা মাংসে তরকারিতে মিলিয়ে আলু-গোশৎ, মটর-গোশ্‌ৎ, গোবি-(কপি) গোশ্‌ৎ বাঙালী বিলকুল চেনে না।

একেবারে কেউই পারে না—একথা আমি বলব না। ঢাকার নবাব-বাড়ি, সিলেটের কাজীবাড়ি এবং মজুমদার-বাড়ি (শুনেছি—খাই নি), মুর্শিদাবাদের ও মাটিয়াবুরুজের নবাব-বাড়ি এসব বস্তু সত্যই ভাল রাঁধেন। আর পারে উত্তম মুর্গী-ঝোল রাঁধতে গোয়ালন্দ, নারায়ণগঞ্জ-চাঁদপুর জাহাজের খালাসীরা; যে একবার খেয়েছে, সে কখনও ভুলতে পারে না।

কিন্তু এসব মাংস রান্না বড়ই সীমাবদ্ধ, বাংলা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে নি। আমার আশ্চর্য বোধ হয়, বিক্রমপুরের মেয়ে প্রতি বৎসর গোয়ালন্দী জাহাজে করে কলকাতা-হস্টেলে যায়, যাবার সময় জাহাজে 'রাইস-কারি' খায়, সে

রাঁধতে-বাড়তেও জানে, কিন্তু জাহাজের ওই মুর্গী-ঝোল সে কখনও রাঁধতে পারল না।

মাত্র একটি বাঙালী কাপালিককে আমি চিনি, যিনি সত্যই মাংস রাঁধতে জানতেন। পাঁঠার মাংস কষে তিনি পেঁয়াজ-রশুন-লঙ্কা দিয়ে যে অপূর্ব, না অভূতপূর্ব 'মহাপ্রসাদ' রাঁধতেন তার সঙ্গে তুলনা দেবার মত সুখাদ্য আমি এ জীবনে কখনও খাই নি। কিন্তু তিনি ব্যত্যয়। তিনি এখন সেই লোকে, বিবেচনা করি, যেখানে আহারাদির কোন ঝামেলা নেই, তাই আমাদের শহরে এখন আর কেউ 'মহাপ্রসাদে'র সন্ধান পায় না। আমার মত দু-একজন এখনও তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় তাঁর স্মরণে চোখের জল ফেলে।

অথচ দেখুন, পশ্চিম-ভারতে বহুতর তরো-বেতরো মাংস রান্না হয়। নানা রকমের সুরুয়া (সূপ), শিক-শামী-টিকিয়া-বুড়ী-আফগানী-মিশ্রী-নরগিস কত রকমের কাবাব, ছ-সাত রকমের পোলাও, বিরিয়ানি, কুর্মা, কালিয়া, পসিন্দা, গুর্দা, কলিজা, তন্দুরীমুর্গী, মুর্গীমুসল্লম, মুর্গীশাহী, রওগন যুষ, তারপর মাংসে তরকারিতে মেশানো আলু-গোশ্‌ৎ, গোবী-গোশ্‌ৎ, দইয়ে মাংস মাখানো রায়তা-গোশ্‌ৎ, মাংস কুচি কুচি করে কোফতা, কীমা এবং তার থেকে কোফতা-ঝোল, কীমা-ঝোল, বাহান্ন রকমের সমোসা, এবং আরও কত কী।

এক কথায় আমরা বাঙালী যে-রকম মাছ দিয়ে পঁয়ষট্টি রকমের ভেল্কিবাজি দেখাই, এরাও তেমনি মাংস দিয়ে নিপুণ বোল চিকন কাজ দেখাতে জানে।

আমার মনে সন্দেহ জাগছে বাঙালী রমণীরা লণ্ডনে এসব রান্না রাঁধবেন কী করে ?

কিংবা পার্সীদের ধনে-শাক ? উপাদেয় বস্তু।

মাছের রাজা আমরা, কিন্তু ভৃগুকচ্ছ নগরের পার্সীদের রান্না ইলিশ-মশালাও ত ফেলনা নয়। মাছটিকে ঠিক মধ্যিখানে লম্বালম্বি কেটে ফাঁকা জায়গাটা সবুজ পেশা মশলা দিয়ে ভরে গোটা মাছটাকে কলাপাতায় মুড়ে আগুনে সেঁকা হয়। তিনখানা আড়াই-সেরী আস্ত ইলিশ খেয়েও আপনার পেটের অসুখ করবে না, এর বাড়া কী প্রশংসা আছে বলুন ?

গুজরাতীদের পতৌড়ি। ঘোলের ভিতর বেসন ভিজিয়ে রাখবেন রাত্রিবেলা। সকালে তাই দিয়ে চাপাটির মত পাতলা রুটি বানাবেন, তেলে ভেজে নিয়ে ফালি ফালি করে কেটে 'রোল অপ' করে নেবেন। মুখে দিলে মাখনের মত মিলিয়ে যাবে। নিরামিষের ভিতর এ-রকম মুখরোচক বস্তু এ-ভারতে কমই আছে।

মিষ্টির ভিতর শ্রীখণ্ড এবং দুধ-পাক।

মারাঠীদের দহি-ভাত। বেহারীদের আচার। তামিলদের মালে-গাটানি স্থপ, রসম, ইডলি-ডোসে। কাশ্মীরীদের বসন্ত ঋতুর বাচ্চা ভেড়ার কাবাব। পাঞ্জাবীদের হালুয়া, লস্‌সী ; আরও কত প্রদেশের কত অনবদ্য 'অবদান'!

ক্রিকেট-টীমে আর রন্ধন-টীমে কোনও তফাত নেই। ক্রিকেটে এগার জন নাইডু পাঠানো হয় না—তা তিনি যত ভাল ব্যাট্‌স্‌ম্যানই হোন না কেন। ফাস্ট মিডিয়ম স্লো গুগলি বোলার, উত্তম উইকেট কীপার, এমন কী, না-ব্যাট্‌স্‌ম্যান না-বোলার শুদ্ধমাত্র ফীল্ডার (যথা ভাইয়া) দু-একজন রাখতে হয়।

অতএব এই রন্ধন-যজ্ঞে ভারতের সর্ব প্রদেশ থেকে বহুতর ভীমসেনকে পাঠাতে হবে॥

'বাঁশবনে—'

প্যারিসের এক সুবিখ্যাত 'গুর্মে' অর্থাৎ 'খুশখানেওলা' বা ভোজনরসিক একবার তুর্কীতে বেড়াতে যান। ইয়োরোপে উত্তম ভোজনের মক্কা-মদীনা যে রকম প্যারিস, এশিয়া-আফ্রিকায় সেই রকম তুর্কী। অন্তত ইয়োরোপীয়দের বিশ্বাস তাই—যদিও আমার ব্যক্তিগত ধারণা প্রাচ্যদেশীয় ভোজন-মক্কা তুর্কী নয় দিল্লি, লখনউ, আগ্রা। কিন্তু সে-কথা থাক্‌।

প্যারিস গুর্মের কন্‌স্‌তুন্‌তুনিয়া (কন্‌স্টানটিনোপোল) আগমন-বার্তা সেখানকার ভোজন রসিক-সমাজে ছড়িয়ে পড়তে বেশীদিন লাগল না। তাঁদের চক্রবর্তী যে পাশা ওই মার্গে বহুদিন ধরে সাধনার ফলে স্বর্গত মহামান্য আগা খানকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, তিনি প্যারিসের গুর্মেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নৈশভোজনে নিমন্ত্রণ জানালেন—গুর্মেও তারই প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছিলেন।

সে-ভোজনের বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। বরঞ্চ যে এখনও ইউরোপীয় সঙ্গীত শোনে নি, তাকে বেটোফেন সমঝাতে আমি রাজী আছি।

গুর্মে পরের দিনই প্যারিস রওয়ানা দিলেন। তাঁর তীর্থদর্শন সমাপন হয়েছে—তিনি ত আর সিন্‌সোফিয়া মসজিদ দেখতে কন্‌স্‌তুন্‌তুনিয়া আসেন নি।

প্যারিসে ফিরে যাওয়া মাত্রই সেখানকার গুর্মে-সমাজ তাঁকে শুধালে, 'কী রকম খেলে ?'

তিনি বললেন, 'অপূর্ব, অপূর্ব! এ-রকম খানা এ-জন্মে কখনও খাই নি। তুর্কী গিয়ে আমার উদর ধন্য হয়েছে, আমার রসনা তার চরম মোক্ষলাভ করেছে।'

এবম্প্রকার বহুবিধ উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পর তিনি কিঞ্চিৎ তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করলেন। তার পর বললেন, 'কিন্তু…'

সবাই বললে, 'কিন্তু…?'

'পদ ছিল বড্ড বেশী।'

ভোজন-মার্গে যাঁরা মন্ত্রসিদ্ধ তাঁরাই শুধু এ-বাক্যের অর্থ বুঝতে পারবেন।

কেউ যখন বলে, 'ওঃ, যা খাইয়েছে! ডাল ছিল চার রকমের, পোলাও ছিল পাঁচ রকমের, অমুক ছিল তমুক রকমের—'

তখন আমার ভুরু ইঞ্চিখানেক উপরের দিকে ওঠে।

চার রকমের ডাল? লোকটা কি তবে জানে না তার বাড়িতে কোন্ ডাল সবচেয়ে ভাল রান্না হয়? আর চার রকমের ডাল এবং পাঁচ রকমের পোলাও-ই যদি আপনি খান তবে রসগোল্লা সন্দেশে পৌঁছবেন কী করে? যদি বলেন, 'রুচির পার্থক্য রয়েছে, তাই চার রকমের ডাল', তবে শুধাই সার্থক কবি সুন্দরীর বর্ণনাকালে কি পঁচিশটা বিশেষণ দিয়ে বলেন, 'রুচি-মাফিক তোমরা বিশেষণটা বেছে নাও' কিংবা চিত্রকর হনুমানের ছবি আঁকার সময় তাঁর পশ্চাদ্দেশে পাঁচটা পাঁচ রকমের ন্যাজ এঁকে দিয়ে বলেন, 'পছন্দ-সই তোমার ন্যাজটা বেছে নাও।'

কাগজে পড়েছি ডাচেস অব উইনজার কখনও সুপ খেতে দেন না। ডিনারের অবতরণিকায় গাদা-গুচ্ছের তরল বস্তু পেটে ঢুকিয়ে দিলে বাদ-বাকী পদ মানুষ ভাল করে খাবে কী করে? অতিশয় হক্ কথা। আমার ভাল পাচক নেই বলে আমি পারতপক্ষে কাউকে নিমন্ত্রণ করি নে। যদিস্যাৎ করি, তবে ছোট্ট একটি টমাটো ককটেল দিই (শেরির গেলাস-ভর্তি টমাটো রস এবং দশ ফোঁটা 'মাগ্‌গী' —তদভাবে উস্টাস সস্+চার ফোঁটা তাবাস্কো সস্—তদভাবে চীনা চিলি সস্—তদভাবে একটি চিমটি লাল লঙ্কাগুঁড়ো+প্রয়োজনীয় নুন। এসব ভাল করে মিশিয়ে খুশবায়েব জন্য উপরে অতি সামান্য গোল-মরিচের গুঁড়ো ভাসিয়ে দেবেন)। এটা খাদ্য নয়—ক্ষুধা-উত্তেজক মাত্র।'

তবে রেস্তরাঁর কথা আলাদা। কারণ রেস্তরাঁয় তাবৎ চৌষট্টি পদ খাবার জন্য কেউ পীড়াপীড়ি করে না। ভোজে আপনি পদের পর পদ স্কিপ্ করতে থাকলে গৃহস্বামী তথা অন্য নিমন্ত্রিতেরা সন্দ করবেন, আপনি একটা স্নব্। রেস্তরাঁয় সে-আশঙ্কা নেই।

এবং ভাল রেস্তরাঁতে আ লা কার্তের বাহান্ন পদ থাকার পরও গোটা তিনেক তাব্‌ল দোৎ (t b e d'h.te) বা ফিক্‌স্‌ড্ দামে ফিক্‌স্‌ড্ পদের ভোজন থাকে। যেমন মনে করুন দু টাকাতে আছে (১) সেলেরি সুপ, (২) রোস্ট মাটন,

(৩) পুডিং ; আড়াই টাকাতে (১) সেলেরি স্যুপ, (২) বয়েলড্ ফিশ, (৩) রোস্ট মাটন, (৪) পুডিং ; এবং তিন টাকাতে আছে (১) সেলেরি স্যুপ, (২) বয়েল্ড ফিশ্, (৩) রোস্ট চিকেন্, (৪) পুডিং কিংবা আইসক্রীম।

এই তাব্ল্ দোৎ বাতলে দেবার প্রধান উদ্দেশ্য ডোমকে বাঁশ-বাছতে সাহায্য করা। বিশেষ করে এই সাহায্যের প্রয়োজন মহিলাদেরই বেশী। ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, মহিলারা মেনু কার্ড অর্থাৎ আ লা কার্ত হাতে নিলে পুরুষদের কী হয়। এই ফাঁকে মর্নিং ওয়াক সেরে এসে দেখবেন, ম্যাডাম তখনও মনস্থির করতে পারেন নি কোন্ স্যুপ তার বিম্বাধর ছুঁয়ে কম্বু কণ্ঠ পেরিয়ে লম্বোদরে বিলম্বিত হবেন। ইতিমধ্যে ওয়েটারের দাড়ি গজিয়ে গিয়েছে—দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘড়ির কাঁটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে—অবশ্য আসলে তা নয়, ইতিমধ্যে পাকা চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে।

দা-ঠাকুরের পাইস-হোটেলে মেনু বাছতে আমাদের কোনও অসুবিধে হয় না। কখন তেতো খেতে হয় আর কখনই বা টক, সে-তত্ত্ব আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি। আমাদের সময়ে পাইস হোটেলে তাব্ল্ দোৎও থাকত। ওই জিনিস সে-দিন রান্না হয়েছে লাটে ; কাজেই সেইটে সেদিন অর্ডার দিলে ভোজনপর্ব সমাধান হত সস্তায়।

সায়েবী হোটেলে গিয়ে আমরা পড়ি বিপদে। সে-রেস্তরাঁ যদি আবার উন্নাসিক হয়, তবে প্রায় সমস্ত মেনুখানাই লেখা থাকে ফরাসী ভাষায়। 'বাছুরের কাটলেট' নাম দেখে আপনি হিন্দুসন্তান আঁতকে উঠলেন, কিন্তু ওইটেই হয়ত খেতে দেখলেন আপনার মুসলমান বন্ধুকে। শুধালেন, 'কী বস্তু?' বললে, 'এস্কালপ দ্য ভো ভিয়েনোওয়াজ'—তাতে বাছুরের নাম-গন্ধ নেই, 'ভো' যে বাছুর আপনি জানবেন কী করে? আপনি তাই দিব্যি অর্ডার দিয়ে বসলেন। রেস্তরাঁ যদি আরেক কাঠি সরেস হয়, তবে ওই বস্তুরই নাম পাবেন জর্মনে—'ভিনার শ্নিৎসেল্'। 'শ্নিৎসেল্' অর্থ 'এস্কালপ', তার মানে ইংরেজীতে 'স্ক্যালপ', সোজা বাংলায়, 'মাংসের টুকরো'। ওটা কিসের মাংস তার কোনও হদিস ওতে নেই। শুয়োরেরও 'শ্নিৎসেল্' হয়, চীনদেশে হয়ত কুকুরেরও হয়। শুনেছি, আমাদের মুনিঋষিরা গণ্ডার খেতেন। অনুমান করি, তাঁরা তা হলে গণ্ডারের 'শ্নিৎসেল্' খেতেন।

আমি ইংরেজী জানি নে। মুসলমান মুরুব্বীদের কাছে শুনেছি, শুয়োরের মাংসের নাম ইংরেজীতে 'পর্ক' এবং ওটা খাওয়া মহাপাপ। তাই 'পর্কচপ্' না খেয়ে আশ্বস্ত হতুম, ধর্মরক্ষা করেছি। তার পর একদিন আবিষ্কার

করলুম, 'হ্যাম', 'বেকন' শুয়োরের মাংস, এমন কী ওই মাংসের কটলেট, সসেজও হয়—এবং মেনুতে তার উল্লেখও থাকে না। আবিষ্কারের পর অহোরাত্র জলস্পর্শ করি নি এবং মোল্লাবাড়িতে গিয়ে 'তওবা' অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত করেছিলুম। মোল্লা সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন 'অজান্তে খেলে পাপ হয় না'। কিন্তু আমার পাপিষ্ঠ মন চিন্তা করে দেখলে, অজান্তে খেলেও স্বাদে ভাল লাগতে পারে।

কিন্তু ইংরেজী রেস্তরাঁ বাবদে আমার আপনার বিশেষ কোন দুশ্চিন্তা নেই। বন্ধুবান্ধবদের ভিতর আকছারই দু-একজন বিলেত-ফেরতা থাকেন। মেনু সম্বন্ধে তাঁদের সুগভীর জ্ঞান দেখাবার মোকা পেয়ে তাঁরা বিমলোল্লাস অনুভব করেন, আমরাও উপকৃত হই। তদুপরি 'বয়' যখন বিল হাজির করে, তখন আমি হঠাৎ জানলা দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে থাকি—এটিকেট-দুরস্ত বিলেত-ফেরতাকেই এক্ষেত্রে বিল শোধ করতে হয়। উদাস, ভাবালু হওয়ার ভান করতে পারলে বিস্তর লাভ।

বাঙালীর দুর্বলতা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বা ইংলিশ্ রান্নার প্রতি নয়—তার প্রাণ ছোঁক ছোঁক করে মোগলাই রান্নার জন্য। কিন্তু মেনু পড়তে জানে না বলে যা-তা অর্ডার দিয়ে বসে এবং নিতান্ত পয়সা ঢেলে দিয়েছে বলে সেটা যখন অতি অনিচ্ছায় খায়, তখন দেখতে পায়, পাশের টেবিলে এক ভাগ্যবান ঠিক সেই সেই জিনিসই পরম পরিতোষ সহকারে খাচ্ছে, যে-সব খাবার সৎ-কামনা নিয়ে সে রেস্তরাঁয় এসেছিল।

একেই বলে অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস।

জীবনের মেজর ট্র্যাজেডি বা 'অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে'র নিদর্শন যদি দিতে হয়, তবে আমার প্রথম যৌবনের প্রথমা প্রিয়া যে আমাকে জিল্‌ট করেছিলেন সেটার উল্লেখ আমি করব না, কিন্তু এটার উল্লেখ অতি অবশ্য করব। সুখাদ্যের জিল্‌টিং ভোলার জন্য একটা জীবন যথেষ্ট দীর্ঘ নয়।

বাঙালী-রান্না বললে কী বোঝায় সেটা আমরা মোটামুটি জানি, কিন্তু সব বাঙালী-রান্না এক রকম নয়। পুব আর পশ্চিম বাংলার রান্নাতে এস্তার তফাত। পুবের রান্নাতে ঝালের প্রাচুর্য, পশ্চিমের রান্নাতে চিনি। কে যেন বলেছিল, 'মাই মোটর কার ইজ সাউণ্ড ইন্ এভ্‌রি পার্ট, এক্‌সেপ্‌ট ইন দি হর্ন—ঠিক সেই রকম পশ্চিম-বাংলার রান্নাতে 'সুগার ইন্ এভ্‌রিথিং এক্‌সেপ্‌ট ইন্ রসগোল্লা।'

সব মোগলাই রান্না এক রকমের নয়। কলকাতায় এই কয়েক বছর পূর্বেও প্রচলিত ছিল একমাত্র 'কলকাত্তাই মোগলাই' রান্না। হালে 'লাহোরী মোগলাই'ও

প্রচলিত হয়েছে। দেশ-বিভাগের পর লাহোর-পিণ্ডির 'শেফ'রা দিল্লির কনট সার্কাসে এসে 'পাঞ্জাবী মোগলা'ই রান্না প্রবর্তন করেন (দিল্লীর মোগলাই এখন চাঁদনী চৌকে আশ্রয় নিয়েছে) এবং তারই ব্রাঞ্চ এখন কলকাতা এসে পৌঁছেছে।

এ রান্নার বৈশিষ্ট্য তিনটি জিনিসে :—

(১) আফগানী নান্। কলকাতার আদিম ও অকৃত্রিম নান্-রুটির (ফার্সীতে 'নান' শব্দেরই অর্থ রুটি—'নান্-রুটি' তাই হুবহু পাঁউ-রুটির মত, কারণ পর্তুগীজ 'পাঁউ' শব্দের অর্থ রুটি) সঙ্গে এর অতি অল্প মিল। আফগানী নান্ দৈর্ঘ্যে প্রায় এক হাত এবং আকারে অনেকটা সিংহল দ্বীপের ন্যায়। রুটির পাশগুলো মোলায়েম, মধ্যিখানটা বিস্কুটের মত ক্রিসপ্ (ওই দিয়ে ভোজনের শেষ অঙ্কে দিব্য 'চীজ্ অ্যাণ্ড বিস্কিট্'ও খাওয়া যায়)। এই নান্ আপনি কতখানি মোলায়েম বা ক্রিস্প্ খেতে পছন্দ করেন সেটা দু-চার দিন খাওয়ার পরেই খান-সামাকে বলে দিতে পারবেন।

(২) তন্দুরী মাছ। মাঝারি সাইজের একটা আস্ত মাছ সাফসুতরো করে, মসলাদি মাখিয়ে তন্দুর-(আভ্ন) এর ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যখন বেরিয়ে আসে তখন মনে হয়, বোধ হয় ভালমত রান্না হয় নি। কিন্তু খেয়ে দেখবেন, অপূর্ব স্বাদ। আমাদের বাড়িতে তন্দুর নেই বলে আমরা পাঞ্জাবীদের এই 'তন্দুরী ফিশ্' অবদানটি মুক্তকণ্ঠে এবং সরস জিহ্বায় মেনে নিয়েছি।

(৩) তন্দুরী চিকেন্। এতে প্রায় কোনও মসলাই ব্যবহার করা হয় না বলে এ-জিনিস যত খুশি খান অসুখ করবে না। অতি মোলায়েম এবং উপাদেয়। আস্ত মুর্গীটি হাত দিয়ে ভাঙবেন, এবং হাত দিয়েই নান্ সহযোগে খাবেন—ছুরি-কাঁটার পাশ মাড়াবেন না।

সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে শিক কাবাব, শামী কাবাব, বড়ী কাবাব, মিশ্রী (মিশরীয়) কাবাব অল্প অল্প খেতে পারেন। একটুখানি গ্রেভি-ওলা ভিজে বস্তুর প্রয়োজন হলে কোফ্তা-নরগিস্ (অনেকটা ডেভিলের মত) অর্ডার দিতে পারেন। আমি কিন্তু এ-পর্বে শুকনোই পছন্দ করি।

উপরোল্লিখিত এক, দুই, তিন নম্বরের জিনিস খাস কলকাতাই মোগলাই রেস্তরাঁয় পাবেন না। তবে শুনেছি, ইদানীং কোনও কোনও রেস্তরাঁ চাপে পড়ে রাখতে আরম্ভ করেছেন।

এবার ভেজার পালা।

মটন পোলাও, চিকেন পোলাও, আণ্ডা পোলাও এবং মটর পোলাও। ফিশ

পোলাও অল্প রেস্তরাঁয় পাওয়া যায়।

এর সঙ্গে দুনিয়ার জিনিস খেতে পারেন। কোর্মা, কালিয়া, দোলমা, রেজালা যা খুশি। যাঁরা ঝাল খেতে ভালবাসেন অথচ অম্বলের ভয়ে খান না, তাঁরা 'দহী-ওলা-গোশ্‌ৎ—অর্থাৎ দই-মাংস (সাধারণত মটনের হয়) খাবেন। দিল্লি-ওলারা যে এত ঝাল খেয়েও কাল কাটাচ্ছে তার একমাত্র কারণ, হয় দহি-ওলা গোশ্‌ৎ খায়, নয় খাওয়ার পর এক ভাঁড় টক দই খায়।

পেটটাকে যদি আরও ধাতস্থ রাখতে চান তবে খাবেন 'শাকওলা-গোশ্‌ৎ'—অর্থাৎ শাকের সঙ্গে মাংস। এটা শিখদের প্রিয় খাদ্য—যে রকম ওরা করেলার ভিতর কিমা মাংস পুরে দোলমা খায়।

আর ঝাল-ফর্জী, রওগন যূস, শাহী কুর্মা এবং লাটের মাল চিকেন কারি, মটন কারি ইত্যাদি ত রয়েছেই। ভেজিটেরিয়নদের জন্য মটর-পোলাও এবং চীজ-আলু, কিংবা চীজ-মটর কারি। তবে মাংসহীন সাদা পোলাওয়ের সঙ্গেই চীজ-মটর ঝোল মানায় বেশী।

আমি মটর-পোলাওয়ের সঙ্গে মটন কিংবা চিকেন কারি খাই; কারণ মটন-পোলাওয়ের সঙ্গে মটন-কারিতে মটনের বাড়াবাড়ি হয়, আবার চিকেন পোলাওয়ের সঙ্গে মটন-কারিতে দুটো মাংসের ককটেলকে আমার গুবলেট বলে মনে হয়। তবে এটা নিছকই রুচির কথা। আর ভুলবেন না গ্রেভির অপ্রাচুর্য হলে, সব সময়ই ওটা আলাদা করে অর্ডার দেওয়া যায়।

সর্বশেষ উপদেশ, বয়স্ক ওয়েটারকে মেনু বাছাই করার সময় ডেকে নিয়ে তার সদুপদেশ নেবেন। না নিলে কী হয়?

এক ইংরেজ স্নব গেছেন প্যারিসের রেস্তরাঁয়। তিনি কারও উপদেশ নেবেন না। মেনুর প্রথম পদে আঙুল দিয়ে বোঝালেন কী চাই। নিশ্চয়ই স্যুপ। এল তাই। উত্তম প্রস্তাব।

তারপর আঙুল নামালেন অনেকখানি নীচে। ভাবলেন মাছ, মাংস আণ্ডা কিছু একটা আসবে। এল আবার স্যুপ। ইংরেজ জানতেন না, ফরাসীরা বাইশ রকমের স্যুপ রাখে।

খেয়েছে! এখন কী করা যায়? আঙুল দিলেন সর্বশেষ পদে। পুডিঙ্‌, কিংবা আইসক্রীম হবে।

এল খড়কে—টুথ-পেক্‌!!

বাংলার গুণ না জর্মন গুণ

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের হল-করিডরে দু-পিরিয়ডের মাঝখানে লেগে যায় গোরু-হাটের ভিড়, কিংবা বলতে পারেন আমাদের সিনেমা-হলের সামনের জনারণ্য। তফাত শুধু এইটুকু যে, জর্মনরা আইনকানুন মেনে চলতে ভালবাসে বলে ধাক্কাধাক্কি চেঁচামেচি বড়-একটা হয় না, করিডরে ত রীতিমত উজোন-ভাটা দুটো স্রোতের মত ছেলেমেয়েরা চলে এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসের দিকে, কিংবা ইউনিভার্সিটি-রেস্তরাঁর দিকে অথবা কমন-রুম পানে।

তার মাঝখানে মাঝে মাঝে হঠাৎ দেখতে পেতুম বুড়ো আইনস্টাইন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে চলেছেন ক্লাস নিতে। আলুথালু কেশ, লজ্‌ঝড় বেশ। কোন্ খেয়ালে মগ্ন ছিলেন খোদায় মালুম। শেষ মুহূর্তে টনক নড়েছে সেদিন তাঁর ক্লাস আছে—রুম নম্বর গিয়েছেন ভুলে, কী পড়াতে হবে তারও খেয়াল নাই। ছেলেরা সমীহভরে পথ করে দিত আর বুড়ো আইনস্টাইন ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে তাবৎ ইউনিভার্সিটি-বিল্ডিং চষে বেড়াতেন আপন রুমের সন্ধানে। মুখে শুধু 'পারদোঁ, পারদোঁ' (মাফ করুন, মাফ করুন), কারণ জানেন, কলিশন লাগলে দোষ তাঁরই।

অথবা দেখতে পেতুম, অর্থশাস্ত্রের বাঘা কৌটিল্য সমবার্ট চলেছেন হেলেদুলে। বগলে একগাদা কেতাব, তারই ধাক্কায় টাইটা একটু বেঁকে গিয়েছে, সঙ্গে গোটা দশেক শিষ্য-শিষ্যা। চলতে চলতেই পড়ানো চলছে। সমবার্ট আর কতদিন বাঁচবেন কে জানে, তাই—

ছেলেরা সব সমবার্টেরে ঘিরে
মাছি যেমন পাকা আমের চতুর্দিক ফিরে—

তাঁর শেষ জ্ঞানবিন্দুটুকু শুষে নিতে চায়।

কিংবা দেখতুম কাঁচাপাকা চুল, একচোখ কানা সংস্কৃতের অধ্যাপক ল্যুডার্স। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য বেদে। মোন-জো-দড়ো সভ্যতা আর্য, অনার্য, না প্রাক-আর্য, তাই নিয়ে যখন ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা খুন-খারাপি করার মত অবস্থায় এসে পড়েছেন, তখন সবাই বললেন, 'মোন-জো-দড়ো বৈদিক, না প্রাক-বৈদিক, সেকথা ঠাহর করার মত এলেম মার্শালের পেটে নেই। সেখানে পাঠাও ল্যুডার্সকে। চতুর্বেদ আর সে-সময়কার আহার-বিহার, ক্ষেত-খামার, হাতিয়ার-তলোয়ার সর্ববিষয় তাঁর নখদর্পণে। মোন-জো-দড়ো সভ্যতার গোপনতম কোণেও যদি বৈদিক সভ্যতার কণামাত্র প্রভাব গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকে, তবু সে

ল্যুডার্সকে ফাঁকি দিতে পারবে না—

'করাচী বন্দরে নেমেই ল্যুডার্স তার গন্ধ পাবেন, ওই একটি চোখ দিয়েই তাকে খুঁজে নেবেন আর ক্যাঁক করে ধরে নিয়ে বিশ্বজনকে দেখিয়ে দেবেন, বেদের ইন্দ্রদেব কোন্ ময়ূরের প্যাখম পরে সেখানে ঘাপটি মেরে বসে আছেন।

'আর ল্যুডার্স যদি বলেন, "না, বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে মোন-জো-দড়োর কোনও প্রকারের যোগসূত্র নেই," তাহলে নাককান বুজে সেই রায় মেনে নিয়ে তাবৎ ঝগড়া-কাজিয়ার উপর ধামাচাপা দিয়ে দাও।'

আইনস্টাইন, সমবার্ট, ল্যুডার্স এঁরা সব ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তম্ভ, তোরণ-শিখর-বিশেষ। তা ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো শুষে নেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীরে কত যে নাম-না-জানা ঘুলঘুলি গবাক্ষ ছিলেন তার হিসেব রাখবে কে?

এঁরা যে বিশ্ববিদ্যালয়-যজ্ঞশালার প্রত্যন্ত প্রদেশে অনাবৃত উপেক্ষিত ছিলেন তা নয়, কিন্তু এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ হতে সময় লাগত একটু বেশী। এঁদেরই একজন ছিলেন, অধ্যাপক ভাগনার, ইনি পড়াতেন বাংলা ভাষা।

জর্মন ভাষা বিশ্ববরেণ্য ভাষা। সে-ভাষা পড়াবার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থা আছে কিনা জানি নে, কিন্তু বাংলার মত অর্বাচীন ভাষা পড়াবার ব্যবস্থা যে সুদূর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, এ-সংবাদ শুনে পুলকিত হয়েছিলুম।

ভাগনারের সঙ্গে আলাপ হতেই তিনি তাঁর বাড়িতে আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন। যথেষ্ট বঙ্গভাষাভাষীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয় নি বলে তিনি কথা কইলেন জর্মন ভাষায়, মাঝে মাঝে বাংলা মসলার ফোড়ন দিয়ে। অদ্ভুত শোনাল, কিন্তু সেই নির্বান্ধব পাণ্ডববর্জিত দেশে বিদেশীর মুখে বাংলা শুনে জানটা যে তর্ হয়ে গেল, সে-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

ভাগনারের বাড়ি গিয়ে দেখি, ভদ্রলোক একখানা বাংলা বই নিয়ে ধস্তাধস্তি করছেন। ডাইনে বাঁয়ে বিস্তর বাংলা অভিধান, ব্যাকরণ—এক পাশে ব্যোট্‌লিঙ্ক-রোটের পর্বতপ্রমাণ সংস্কৃত-জর্মন অভিধান।

বাংলা অভিধানে হদিস না মিললে সংস্কৃত দিক-সুন্দরীর (ডিক্সনারি) নিকট দিগ্‌দর্শন যাচঞা করবেন বলে।

ভূমিকা না করেই বললেন, 'আমায় একটু সাহায্য করুন।'

এতদিন পর আজ আর ঠিক মনে নেই কিন্তু খুব সম্ভব গল্পটা ছিল শরৎ চাটুয্যের 'আঁধারে আলো'। 'হাবুবাবু ছোরা চালাতে শিখেছে' এইরকম ধারা কী জানি কী একটা ছিল। যোগরূঢ়ার্থে 'নীলকণ্ঠ' শিব এ-কথা ভাগনার জানতেন কিন্তু 'হাবুবাবু' যোগরূঢ়ার্থে যে শান্ত-শিষ্ট গোবেচারী—নিন্‌কমপুপ—সে কথাটার

সন্ধান ভাগনার কোথাও পান নি, অবশ্য আভাসে-আন্দাজে শব্দটার খানিকটে মানে আন্দাজ করে নিতে পেরেছিলেন।

কিন্তু ভাগনার দেখলুম তাঁর ওয়াটার্লুতে এসে ঠেকেছেন, সেই গল্পের মধ্যে বিদ্যাপতির এক উদ্ধৃতিতে :—

"আজু রজনী হম ভাগে পোহাইনু
পেখনু পিয়া-মুখ চন্দা
জীবনযৌবন সফল করি মাননু
দশদিশ ভেল নিরানন্দা—"

আজু-ফাজু, পেখনু-টেখনু খাঁটি বাংলা কথা নয়, কিন্তু হুঁশিয়ার ভাগনার কেঁদে-ককিয়ে এসব কথার মানে বেশ কিছুটা রপ্ত করে ফেলেছেন, কিন্তু 'নিরানন্দা' কথায় এসে যে মানে তিনি করেছেন, সেটা মন মেনে নিলেও হৃদয় 'নিরানন্দা'ই থেকে যায়।

ভাগনার বললেন, 'তবে কি এই বুঝতে হবে, প্রিয়মুখচন্দ্র দর্শন করাতে আমার এতই আনন্দ হল যে, মনে হচ্ছে দশদিশ নিরানন্দ হয়ে গিয়েছে, কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল আনন্দ আমাতে এসে ঠাঁই নেওয়ায় "দশদিশ নিরানন্দ" হয়ে গিয়েছে?'

অভিনবগুপ্তের না হোক, অভিনব টীকা তো বটেই।

সবিনয়ে বললুম বিদ্যাপতি বিনা টীকায় পড়ার মত বিদ্যা আমার নেই তবে যতদূর মনে পড়ছে, কথাটা এখানে 'নিরানন্দ' নয়, আসলে আছে বোধ হয় 'নিরদ্বন্দ্বা'। আমাতে প্রিয়াতে মিলন হয়েছে ঐক্য হয়েছে, দশদিশে আমি আর কোনও দ্বন্দ্ব দেখতে পাচ্ছি নে। যেখানে যত দ্বন্দ্ব অর্থাৎ বিরহ ছিল সেখানেই মিলন এসে গিয়েছে—দশদিশে এখন শান্তি।

আর বেদেও ত ঋষি প্রার্থনা করেছেন, "সর্বপ্রকারের দ্বন্দ্বের সমাধান হোক।"

ভাগনার বললেন, উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু ছাপার ভুল হতে যাবে কেন?

এর কোনও সদুত্তর আমি দিতে পারি নি। আপনারা যদি বাতলে দেন। ঘটনাটি যে এত সবিস্তর বয়ান করলুম তার 'মরাল' কী?

সুকুমারী ভাষায় বলি :—

'হাসতে হাসতে যারা হচ্ছে কেবল সারা
রাম্‌গরুড়ের লাগছে ব্যথা
বুঝছে না কি তারা?'

প্রকাশক আর ছাপাখানা যে 'নিরন্ধ্রা' হয়ে ছাপার ভুল করেই যাচ্ছেন, 'ভাগনারেরই লাগছে ব্যথা, বুঝছে না কি তারা ??'

শিক্ষা প্রসঙ্গ

কিছুকাল আগে বোম্বায়ে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণ বলেন, এদেশের সবচেয়ে বড় কর্তব্য আপামরজনসাধারণের ভিতর শিক্ষার প্রচার ও প্রসার করা এবং বেকার-সমস্যার নিরঙ্কুশ সমাধান করা।

এ অতি সত্য কথা—এমন কি পৃথিবীর বর্বরতম দেশও এ-তত্ত্ব মেনে নেবে। কিন্তু প্রশ্ন, শিক্ষার বিস্তার এবং প্রসার করা যায় কী প্রকারে? পূর্ববঙ্গে একটি প্রবাদ আছে :—

'যত টাকা জমাইছিলাম
শুঁটকি মাছ খাইয়া
সকল টাকা লইয়া গেল
গুলবদনীর মাইয়া।'

যত রকমের খাজনা হতে পারে, যত প্রকারের ন্যায্য অন্যায্য ট্যাক্স হতে পারে সবই ত চাঁদপানা মুখ করে দিচ্ছি। সরকারের হাতে সে-টাকা জমা হচ্ছে এবং তার বেবাক খরচ হয়ে যাচ্ছে এ-খাতে ও-খাতে সে-খাতে, অর্থাৎ গুলবদনীর মাইয়াই সব টাকা নিয়ে যাচ্ছে, শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যে-অর্থের প্রয়োজন তার শতাংশের এক অংশও উদ্বৃত্ত থাকছে না।

কাজেই গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলি কী করে, পুরনোগুলিই বা চালু রাখি কোন্ কৌশলে ?

কিন্তু আমার মনে হয় পুরনো স্কুল চালু রাখা আর নূতন স্কুল খোলাই শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রধান কর্ম নয়।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, কোন বিশেষ গ্রামে গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে একটি ভাল পাঠশালা উত্তমরূপে চালু আছে, প্রতি বৎসর দশ বারোটি ছেলে শেষ পরীক্ষা পাস করে বেরিয়ে যাচ্ছে, কেউ কেউ বৃত্তিও পাচ্ছে, কিন্তু তবু যে-কোনও সময় আপনি সে-গ্রামে গিয়ে যদি হিসেব নেন, কটি ছেলে লিখতে পড়তে পারে, তবে দেখবেন দশ-বারোটির বেশী না; বাদবাকী আর সবই লেখা-পড়া ভুলে গিয়েছে এবং যে দশ-বারোটি কেঁদে-ককিয়ে পড়তে পারে তারাও শীঘ্রই সম্পূর্ণ নিরক্ষর হয়ে যাবে। অবশ্য আমি এস্থলে সাধারণ চাষা-মজুরের

কথাই ভাবছি—মধ্যবিত্ত কিংবা বিত্তশালী পরিবারের কথা উঠছে না।

এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবেন—আমরা চাষার ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে দিয়ে ভাবি, আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এ-কথা ভাবি নে, তারা পরীক্ষায় পাস করার পর পড়বে কী! তারা যে পুনরায় নিরক্ষর হয়ে যায় তার একমাত্র কারণ তাদের কাছে পড়বার মত কিছু থাকে না।

ইয়োরোপের চাষা মজুর আমাদের মত গরিব নয়। তারা যে নিরক্ষর হয়ে যায় না, তার একমাত্র কারণ তারা খবরের কাগজ পড়ে এবং মেয়েরা ক্যাথলিক হলে প্রেয়ার বুক আর প্রটেস্টাণ্ট হলে বাইবেল পড়ে। অবসর-সময়ে হয়ত একখানা নভেল কিংবা ভ্রমণ-কাহিনী পড়ে, কাজ না থাকলে হয়ত তারা চিঠি-চাপাটিও লেখে, কিন্তু এগুলো আসল কারণ নয়—আসল কারণ খবরের কাগজ, প্রেয়ার বুক এবং বাইবেল।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমাদের চাষা খেতে পায় না, সে খবরের কগজ কিনবার পয়সা পাবে কোথায়?

তাই দেখতে পাবেন, যে-চাষা কোন গতিকে তার ছেলেকে পাঠশালা পাসের সময় একখানা রামায়ণ কিংবা মহাভারত কিনে দিতে পেরেছিল তাব বাড়িতে তবু কিছুটা সাক্ষরতা বেঁচে থাকে। এই আংশিক বাঁচাও তাটা কিন্তু প্রধানত বাংলা দেশে। হিন্দীভাষীদের তুলসী রামায়ণ পড়ে সে-লাভ হয় না, কারণ তুলসীদাসের ভাষা আর আধুনিক হিন্দীতে প্রচুর তফাত। তুলসীদাসের ভাষা দিয়ে আজকের দিনে চিঠি লেখা যায় না—কাশীরাম কিংবা কৃত্তিবাসের ভাষার সঙ্গে কিন্তু আধুনিক বাংলার খুব বেশী পার্থক্য নেই।

তাই দেখতে পাবেন মুসলমান চাষা পাঠশালা পাসের পর খুব শিগগিরই নিরক্ষর হয়ে যায়, কারণ সে রামায়ণ-মহাভারত পড়ে না এবং বাংলা ভাষায় এ-রকম ধরণের সহজ সরল মুসলমানী ধর্মপুস্তক নেই। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পরিস্থিতিটা কী রকম তার খবর আমার জানা নেই, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করলে আমরা শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিস্তর হদিস পাব।

তা হলে ওষুধ কী?

যে-উত্তর সকলের প্রথম মনে আসবে সে হচ্ছে, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরি বসানো। কিন্তু অত টাকা যোগাবে কোন্ গৌরী সেন? সরকার ত দেউলে। তা হলে?

এইখানে এসে আমিও আটকা পড়ে যাই। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নূতন ইস্কুল

খোলার চেয়েও বড় কাজ, পড়ার জিনিস সাক্ষর ছেলেমেয়েদের হাতে দেওয়া —বিনি পয়সায় কিংবা অতি অল্প দামে।

আমি বহু বৎসর ধরে এ-সমস্যা নিয়ে মনে তোলপাড় করেছি, বহু গুণীর সঙ্গে আলোচনা করেছি, দেশ-বিদেশে উন্নত অনুন্নত সমাজে অনুসন্ধান করেছি —তারা এ-সমস্যার সমাধান কী প্রকারে করে, কিন্তু কোন ভাল ওষুধ এখনও খুঁজে পাই নি। আমার পাঠকেরা যদি এ-সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত আমাকে জানান, তবে তার আলোচনা করলে আমরা লাভবান হব সন্দেহ নেই।

অন্য এক বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণ বলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্তব্য ছাত্রদের 'স্পিরিচুয়াল' ডিরেক্‌শান্ দেওয়া।

আমার মনে হয়, এইমাত্র আমরা যে-সমস্যা নিয়ে বিব্রত হয়েছিলুম সেই সমস্যারই এ আরেকটা দিক।

'স্পিরিচুয়াল' বলতে শ্রীরাধাকৃষ্ণণ নিশ্চয়ই 'রিলিজিয়ান' বলতে চান নি— তাহলে হাঙ্গামা অনেকখানি কমে যেত—তাই মোটামুটি ধরা যেতে পারে, তিনি আমার প্রয়োজনের দিকটাতেই ইঙ্গিত করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কর্ম ছাত্রকে তার দেশের বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করা এবং এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ভারতীয় বৈদগ্ধ্যে আত্মার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজনের অধিক সুস্বাদু আহার্য রয়েছে। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, অধ্যাপকেরা যদি ছাত্রকে ভারতীয় বৈদগ্ধ্যের প্রতি অনুসন্ধিৎসু করতে পারেন, সে-বৈদগ্ধ্যের উত্তম উত্তম বস্তুর রসাস্বাদ করাতে শেখান, তবে ছাত্র নিজের থেকেই তার প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক ধন চিনে নিতে পারবে। সকলেরই কাজে লাগবে এমন মুষ্টিযোগ যখন মুষ্টিগত নয়, তখন ছাত্রের সামনে গন্ধমাদন রাখা ছাড়া উপায় নেই—যে যার বিশল্যকরণী বেছে নেবে।

কিন্তু সমস্যা তৎসত্ত্বেও গুরুতর। ছেলেদের পড়তে দেব কী? ভারতীয় বৈদগ্ধ্যের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ সংস্কৃত-পালিতে, তিন ভাগ ইংরেজীতে, আর মেরে কেটে দুভাগ বাংলায়। অথচ আজকের দিনে সব ছেলেকে ত আর জোর করে বি. এ অনার্স অবধি সংস্কৃত পড়াতে পারি নে। এবং তাতেই বা কী লাভ? কজন সংস্কৃতে অনার্স গ্র্যাজুয়েটকে অবসরসময়ে সংস্কৃত বইয়ের পাতা ওল্টাতে আপনি আমি দেখেছি? সংস্কৃত গড় গড় করে পড়া শিখতে হলে টোল ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অতএব মাতৃভাষাতেই আমাদের বৈদগ্ধ্যচর্চা করতে হবে।

এবং সেখানেই চিন্তির। আজ যদি আপনি বেদ, উপনিষদ, ষড়দর্শন, কাব্য,

অলঙ্কার, নৃত্যনাট্য-সঙ্গীতশাস্ত্র বাংলা অনুবাদে পড়তে চান তবে একবার ঘুরে আসুন কলেজ স্কোয়ারে বইয়ের দোকানগুলোতে। যে-সব বইয়ের বাংলা অনুবাদ হয়ে গিয়েছে সেগুলোই যোগাড় করতে গিয়ে আপনাকে চোখের জলে নাকের জলে হতে হবে।

আর কত শত সহস্র পুস্তক যে আপনার পড়তে ইচ্ছা হবে, অথচ অনুবাদ নেই তার হিসেব করবে কে?

হিন্দীওয়ালাদের ত আরও বিপদ। আমাদের চেয়ে ওদের অনুবাদ-সাহিত্য অনেক বেশী কম-জোর। এই দিল্লির কনট সার্কাসে আমি হিন্দী বইয়ের দোকানে সার্কাসের ঘোড়ার মতই চক্কর লাগাই—আজ পর্যন্ত কোন সংস্কৃত বইয়ের উত্তম হিন্দী অনুবাদ চোখে পড়ল না, যেটি বাড়িতে এনে রসিয়ে রসিয়ে পড়ি।

মারাঠী ভাষায় তবু কিছু আছে, গুজরাতীতে তারও কম। আসামীতে প্রায় কিছুই নেই, ওড়িয়ার খবর জানি নে—তবে যেহেতু শিক্ষিত আসাম এবং উড়িষ্যা-সন্তান মাত্রই বাংলা পড়তে পারেন তাই তাঁদের জন্য বিশেষ দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

মোদ্দা কথায় ফিরে যাই। রাধাকৃষ্ণণ ত দায় চাপিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অর্থাৎ অধ্যাপকদের উপর। কিন্তু হায়, তাদের ত দরদ নেই এসব জিনিসের প্রতি। আর স্বয়ং রাধাকৃষ্ণণের যদি দরদ থাকত তবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে উপরাষ্ট্রপতি হতে গেলেন কেন!?

পোলেমিক

কলকাতাতে বর্ষা বসন্ত আছে বটে, কিন্তু তাতে করে কলকাতাবাসীর জীবন-যাত্রায় কোনও প্রকারের ফেরফার হয় না। হৈ-হুল্লোড়, পার্টপরব, কেনাকাটা, মারামারি একই ওজনে চলে। দিল্লিতে কিন্তু ভিন্ন ব্যবস্থা। এখানে দুই ঋতু—গ্রীষ্ম আর শীত। শীতকালে এন্তার দাওয়াত-নেমন্তন্ন, দিনে দশটা করে মীটিং, হপ্তায় দুটো করে আর্ট প্রদর্শনী, আজ ভরতনাট্যম, কাল কথাকলি, পরশু য়েহুদী মেনুহিন, আর এক গাদা সঙ্গীত সম্মেলন, কবিসঙ্গম, মুশাইরা। গ্রীষ্মকালে এ-সব-কিছুতে মন্দা পড়ে যায়, শুধু যে সব দেশের বাৎসরিক পরব গরমে পড়েছে, সে সব দেশের রাজদূতেরা বাধ্য হয়ে "রিসেপশন" দেন, আর সবাই শার্ক স্কিন আর কালো বনাতের মধ্যিখানে প্রচুর পরিমাণে ঘামেন। পার্টিগুলোর জলুসেরও খোলতাই হয় না, কারণ ডাকসাইটে সুন্দরীরা পাহাড়-পর্বতে ঘুরতে গেছেন—

পার্টিতে যদি রঙবেরঙের শাড়ির ব্যবহারই না থাকল তবে সে-পার্টি অতি নিরামিষ (নিরম্বু ত বটেই ; এসব পার্টিতে জল মানা)। তাই পাঁচজন পার্টি থেকে ভদ্রতা রক্ষা করেই তাড়াতাড়ি কেটে পড়েন।

এসব হল নিউ দিল্লির কাহিনী। পুরানী দিল্লিতে কিন্তু একটা জিনিসের অভাব কখনও হয় না। প্রায় প্রতিদিনই কোন-না-কোন নাগরিককে অভিনন্দন করার জন্য কোন-না-কোন পার্কে তাঁবু আর শামিয়ানা খাটিয়ে, দিগধিড়িঙ্গে লাউডস্পীকার ঝুলিয়ে যা চেল্লাচেল্লি আরম্ভ হয় তাতে পাড়ার লোক ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে—দরজা জানলা বন্ধ করে একে অন্যের সঙ্গে কথা পর্যন্ত কওয়া যায় না।

এ-রকম একটা অভিনন্দন-পার্টিতে আমি দিনকয়েক পূর্বে গিয়েছিলুম। যে দুজনকে অভিনন্দন করা হল, আমি তাঁদের নাম শুনি নি, দিল্লির কজন লোক তাঁদের নাম শুনেছে তাও বলতে পারব না।

দুজনারই যে প্রশস্তি গাওয়া হল, তা শুনে আমার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি ছোট লেখার কথা মনে পড়ল। এ লেখাটি সচরাচর কেউ পড়েন না বলে উদ্ধৃতির প্রলোভন সম্বরণ করতে পারলুম না।

'কবিকুলতিলকস্য কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' এই ছদ্মনামে বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখেছেন :—

'আমি এ স্থলে—নাথ বিদ্যারত্নকে নদিয়ার চাঁদ বলিলাম। কিন্তু শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণীসভাদেবী—মোহন বিদ্যারত্নকে নবদ্বীপচন্দ্র অর্থাৎ নদিয়ার চাঁদ বলিয়াছেন। উভয়েই বিদ্যারত্ন উপাধিধারী, উভয়েই স্ব স্ব বিষয়ে সর্বপ্রধান বলিয়া গণ্য, বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়ও উভয়ের একই ধরনের। সুতরাং উভয়েই নবদ্বীপ-চন্দ্র অর্থাৎ নদীয়ার চাঁদ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হবার যোগ্য পাত্র, সে বিষয়ে সংশয় নাই কিন্তু এ পর্যন্ত এক সময়ে দুই চাঁদ দেখা যায় নাই। সুতরাং একজন বই, দুইজনে নদিয়ার চাঁদ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উভয়ের মধ্যে একজন একবারেই বঞ্চিত হইবেন, সেটাও ভাল দেখায় না ; এবং ঐ উপলক্ষে দুজনে হুড়হুড়ি গুঁতাগুঁতি করিয়া মরিবেন সেটাও ভাল দেখায় না। এজন্য আমার বিবেচনায় সমাংশ করিয়া দুজনকেই এক এক অর্ধচন্দ্র দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করা উচিত। শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণীসভাদেবী আমার এই পক্ষপাতবিহীন ফয়তা ঘাড় পাতিয়া লইলে আর কোনও গোলযোগ বা বিবাদ বিসংবাদ থাকে না। এক্ষণে তাঁর যেরূপ মরজি হয়।'

নিত্যি নিত্যি কারণে-অকারণে হৈ হুল্লোড় করার অভ্যাস দিল্লিবাসী বাঙালীর

উপরও বেশ কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে। আজ এখানে সাহিত্যসভা, কাল ওখানে বর্ষামঙ্গল প্রায়ই এসব 'পরব' হয়।

এবং অনেক সময় মনে হয়েছে, এ-সব পরবে সত্যকার কাজ যেন ঠিকমত হচ্ছে না।

তাই আমি চেষ্টা করেছি, ছোট গণ্ডির ভিতর অল্প সংখ্যক লোক নিয়ে প্রতি সপ্তাহে কিংবা প্রতি পক্ষে "স্টাডি সার্কাল" বসাবার, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ-যাবৎ কৃতকার্য হতে পারি নি। আমার বয়স হয়েছে তদুপরি আমি খ্যাতনামা সাহিত্যিক নই, কাজেই আমার দ্বারা এ-জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পত্তন সম্ভবপর নয়, অথচ এর প্রয়োজন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

কেন্দ্র হিসাবে দিল্লির মাহাত্ম্য ক্রমেই বাড়ছে। কেন্দ্রের হাতে অর্থ আছে এবং সে-অর্থের কিছুটা প্রাদেশিক সরকারও পান—সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের সেবার্থে। বাংলার প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রের কাছ থেকে বাংলা সাহিত্যের জন্য কত টাকা বাগাতে পারবেন, সে তাঁরা জানেন, কিন্তু আমরা যারা দিল্লিতে আছি, এ বাবদে আমাদেরও যথেষ্ট কর্তব্য আছে। আমরা যদি ছোট ছোট কর্মঠ সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারি, তবে শেষ পর্যন্ত আমাদের কর্মতৎপরতা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। আজ যে বাংলা সাহিত্যের প্রতি আমাদের দরদের অভাব, তার প্রধান কারণ আমরা সাহিত্যের সত্যকার চর্চা করি নে।

তার অন্যতম জাজ্বল্যমান উদাহরণ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন আমরা বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের জন্য কিছুই করে উঠতে পারি নি, অথচ সেখানে রুশ ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে।

এদিকে আবার দিল্লিতে ব্যাঙের ছাতার মত একটা জিনিস বড্ড বেশী গজাচ্ছে। এঁরা হচ্ছেন আর্ট ক্রিটিক সম্প্রদায়। এঁরা ছবি বোঝেন, মেনুহিন শোনেন, আবার আলাউদ্দীন সায়েবকেও হাততালি দেন; এঁরা ভরতনাট্যম আর মণিপুরী নিয়ে কাগজে কপচান, চীনা সেরামিক এবং দক্ষিণ-ভারতের ব্রোঞ্জ সম্বন্ধে এঁদের 'জ্ঞানে'র অন্ত নেই।

এঁদের একজন ত সবজান্তা হিসেবে এক বিশেষ গণ্ডিতে রাজপুত্রের আদর পান, বিলক্ষণ দু পয়সা তাঁর আয়ও হয়। তা হোক, আমার তাতে কণামাত্র আপত্তি নেই—পারলে আমিও ওঁর ব্যবসা ধরতুম।

কিন্তু আমার দুঃখ ভদ্রলোকটি বড্ডই বাংলা এবং বাঙালী-বিদ্বেষী। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল এবং তাঁদের শিষ্য-উপশিষ্যেরা যে 'বেঙ্গল স্কুল' গড়ে তুলেছেন, সেটাকে মোকা পেলেই এবং মাঝে মাঝে না পেলেও বেশ কড়া

কড়া কথা শুনিয়ে দেন।

তাঁর মতে যামিনী রায়, যামিনী রায়, এবং আবার যামিনী রায়। বাংলা দেশের আর সব মাল বরবাদ, রদ্দী।

ইনি যে সব 'আর্ট সমালোচনা' প্রকাশ করেন, তার সুস্পষ্ট প্রতিবাদ হওয়া উচিত। যাঁরা এসব জিনিসের সত্য সমঝদার, তাঁদের উচিত বেরিয়ে এসে আপন দেশের সুসন্তানদের কীর্তি বার বার স্বীকার করা। 'ডেকাডেন্স' বা 'গোল্লায় যাওয়ার' অন্যতম লক্ষণ আপন দেশের মহাজনকে অস্বীকার করা বা খেলো করে দেখানো।

এ-জাতীয় লেখাকে 'পোলেমিক' বলে—বাংলায় 'মসীযুদ্ধ' বলতে পারি। এবং মসীযুদ্ধে বাঙালীব পর্বতপ্রমাণ ঐতিহ্যসম্পদ আছে। ভারতচন্দ্রের পদ্যময় পোলেমিক, আর বাঙলা গদ্য ত আরম্ভ হল খাঁটি মসীযুদ্ধ দিয়ে। রামমোহন ত কলমের লড়াই লড়লেন, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের গোঁড়াদের সঙ্গে। তার পরের বাঘ বিদ্যাসাগব। তিনি যে পোলেমিক লিখেছেন, সে-লেখা লিখতে পারলে পৃথিবীব বড় আইনজীবী নিজেকে ধন্য মনে করবেন—অধমের মতে পোলেমিকে বিদ্যাসাগর মশাই মিলটনের বাড়া। আর মসীযুদ্ধে ব্যঙ্গ কী করে প্রয়োগ করতে হয় তাব উদাহরণ ত আপনারা একটু আগে 'অর্ধচন্দ্র' দানে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। তারপর তিন নম্বরের মল্লবীর বঙ্কিম। তিনি হেস্টি সাহেবের (নাম ঠিক মনে নেই) বিরুদ্ধে সনাতন হিন্দুধর্মের হয়ে যে লড়াই লড়লেন সে ত অতুলনীয়। বরঞ্চ বলব, 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর চেয়েও বড় ক্যানভাসে কাজ করেছেন বঙ্কিম এ-মসীযুদ্ধে এবং এ-সত্যও আজ স্বীকাব করব যে, আজ যদি কোন হেস্টি পুনরায় দেখা দেয় তবে তার সঙ্গে ও-রকম পাণ্ডিত্য আর ইংরেজী জ্ঞান নিয়ে (এখানে সাহিত্যিক বঙ্কিমের কথা হচ্ছে না—সে-সাহিত্যিক যে নেই সে-কথা ইস্কুলের ছোঁড়ারা পর্যন্ত জানে) লড়নেওলা আজ বাংলা দেশে নেই।

তারপর রবীন্দ্রনাথ, তিনিও কম লড়েন নি। তবে তাঁর রুচিবোধ বিংশ শতাব্দীর ছিল বলে তাঁর লেখাতে ঝাঁজ কম, কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে লেখা চিঠিতে কী তিক্ততা, কী ঘেন্না!

গল্প শুনেছি উর্দুর কবি-সম্রাট গালিব সাহেব তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জওক্ সাহেবের একটি দোহা মুশাইরায় (কবি-সঙ্গমে) শুনে বার বার জওক্‌কে তসলীম করে বলেছিলেন, 'আপনি দয়া করে ওই দুটি ছত্র আমায় দিয়ে দিন, আর তার বদলে আমি আমার সম্পূর্ণ কাব্য আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি।'

রবীন্দ্রনাথের ওই শেষ চিঠির পরিবর্তে পৃথিবীর যে-কোন পোলেমিস্ট তাঁর সব পোলেমিক দিতে সোল্লাসে প্রস্তুত হবেন।

শরৎচন্দ্র যদি তাঁর মসীযুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে না করে সে-যুগের আর যে-কোন লোকের সঙ্গে করতেন, তবে তিনিও মসীযোদ্ধা হিসেবে নাম কিনে যেতে পারতেন।

তাঁর 'নারীর মূল্য' পোলেমিকের প্রথম চাল। বাংলা দেশ এ-পুস্তকের বিরুদ্ধে কলম ধরলে তিনি যে কী মাল ছাড়তেন, তার কল্পনা করতেও আমি ভয় পাই। ধর্মে বিবেকানন্দ পোলেমিস্ট, ব্যঙ্গকবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল।

এতখানি ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও কোনও বাঙালী এই সব ভুঁইফোড় 'আর্ট ক্রিটিক'দের জোরসে দু-কথা শুনিয়ে দেয় না কেন ??

চরিত্র-বিচার

অঙ্কশাস্ত্রে প্রশ্ন ওঠে না, এ-বাবদে আপনার কিংবা আমার অভিজ্ঞতা কী। রস-নির্মাণে ঠিক তার উল্টো। সেখানে লেখক আপন অভিজ্ঞতা থেকে চরিত্র নির্মাণ করেন, আর পাঠক আপন অভিজ্ঞতা দিয়ে সেটাকে অল্পবিস্তর যাচাই করে নেন। কিন্তু যখন কোনও জাতির চরিত্র নিয়ে আলোচনা হয় তখন সেটাকে একদিক দিয়ে যেমন অঙ্কশাস্ত্রের মত নৈর্ব্যক্তিক করা যায় না, ঠিক তেমনি সেটাকে সম্পূর্ণ নিজের অভিজ্ঞতার উপরও ছেড়ে দেওয়া যায় না। এবং তখন আবার এ-প্রশ্নও ওঠে যে-সব লোক এ-আলোচনায় যোগ দিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতা এ-বাবদে কতখানি।

আমার অতি সামান্য আছে। তাই এই ভূমিকা দিয়ে আরম্ভ করতে হল। এবং অনুরোধ, নিজের অভিজ্ঞতার দোহাই যদি মাত্রা পেরিয়ে যায় তবে যেন পাঠক অপরাধ না নেন। সেটা সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়। 'বাঙালীচরিত্র' সম্বন্ধে যদি প্রামাণিক পুঁথি-প্রবন্ধ থাকত, তবে তারই উপর নির্ভর করে আলোচনা অনেক-খানি এগিয়ে যেতে পারত। তা নেই। বস্তুত আমাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় অন্য প্রদেশের লোক দ্বারা বাঙালী সম্বন্ধে অকৃপণ, অকরুণ নিন্দাবাদ থেকে। যথা 'বাঙালী বড় দম্ভী', 'বাঙালী অন্য প্রদেশের সঙ্গে মিশতে চায় না'। সহৃদয় মন্তব্য যে একেবারেই শুনতে পাওয়া যায় না, তা নয়—যেমন শুনবেন, 'বাঙালী মেয়ে ভাল চুল বাঁধতে জানে,' কিংবা 'ব্যবসাতে বাঙালীকে ঘায়েল করা (অর্থাৎ ঠকানো) অতি সরল'।

আমি ভারতবর্ষের সব প্রদেশেই বাস করেছি। দিল্লিতেই প্রায় চার বৎসর ছিলুম। চোখ-কান খোলা-খাড়া না রাখলেও সেখানে আপনাকে অনেক খবর অনেক গুজব শুনতে হয়।

বাঙালীর প্রতি আপনার যদি কোনও দরদ থাকে তবে কিছুদিনের মধ্যেই আপনি কতকগুলি জিনিস বুঝে যাবেন।

(১) সিন্ধী পাঞ্জাবী দেশহারা হয়ে দিশেহারা হয় নি। সিন্ধীরা বোম্বাই অঞ্চলে, পাঞ্জাবীরা দিল্লী অঞ্চলে আপন ব্যবসা-বাণিজ্য দিব্য গোছগাছ ছিমছাম করে নিয়েছে। বরঞ্চ অনেক স্থলে এদের সুবিধেই হয়েছে বেশী। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। দিল্লির কনট সার্কাস থেকে মুসলমান হোটেলওয়ালারা চলে যাওয়াতে সেখানে পাঞ্জাবীরা গাদা গাদা রেস্তরাঁ খুলেছে। ফলে খাস দিল্লির মোগলাই রান্না সেখান থেকে লোপ পেয়েছে—এখন যা পাবেন সে বস্তু পাঞ্জাবী রান্না, লাহোর অঞ্চলের। (দিল্লির রান্নার কাছে সে রান্না অজ পাড়াগেঁয়ে।) এই পাঞ্জাবীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার অন্ত নেই। এদের কেউ কেউ পারমিট-গিরমিট ব্যাপারে আমার কাছে দৈবেসৈবে সাহায্য নিতে এসেছে—কিন্তু কখনও হাত পাতে নি। এরা যা খাটছে এবং খেটেছে তা দেখে আমি সর্বান্তঃকরণে এদের কল্যাণ এবং শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছি।

তাই অতিশয় সভয়ে শুধাই, পুব-বাংলার লোক পশ্চিম-বাংলায় এসে অনেক করেছে, কিন্তু পাঞ্জাবী-সিন্ধীরা যতখানি পেয়েছে ততখানি কি তাদের দ্বারা হয়েছে? এ বড় বে-দরদ এবং বেয়াদব প্রশ্ন। পূর্ববঙ্গবাসীরা এ প্রশ্নে আমার উপর চটে গিয়ে অনেক কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেবেন। আমি নতশিরে সব উত্তর মেনে নিচ্ছি এবং এ-স্থলে আগেভাগেই বলে রাখছি, আমি তাদের উকিল হয়েই এ-আলোচনা আরম্ভ করেছি, তাদেরই সাফাই গাইবার জন্য। একটু ধৈর্য ধরুন।

(২) চাকরি যেখানে ব্যক্তিবিশেষ কিংবা ব্যবসাবিশেষের চাকরি, সেখানে সে-চাকরির মূল্য চাকুরের পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু দেশের পক্ষে তা যৎসামান্য। কিন্তু চাকরি যখন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে হয়, তখন তার গুরুত্ব অসাধারণ। সকলেই জানেন, দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মুখে অনেকগুলো বিরাট বিরাট পরিকল্পনা রয়েছে। এ-সব পরিকল্পনা ফলবতী করার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত বর্তায় কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের উপর।

তাই প্রশ্ন, এই সব চাকরি পাচ্ছে কজন বাঙালী? পূর্বের তুলনায় এদের উপস্থিত রেশিয়ো কী? পূর্বের তুলনা বাদ দিলেও, প্রাদেশিক জনসংখ্যার হিসাবে তারা তাদের ন্যায্য হক্কগত রেশিয়ো পাচ্ছে কি?

দিল্লিবাসী বাঙালীমাত্রই একবাক্যে তারস্বরে বলবেন, 'না, না, না।' পরশ্রী-কাতর অবাঙালীও সে-ঐকতানে যোগ দেন। মনে মনে হয়ত বলেন, 'ভালই হয়েছে।' তা সে-কথা থাক্।

কেন পায় নি তার জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষ দেব না। দোষ বাঙালীর। কে কেন পারলে না, সে সাফাই গাইবার জন্যই এ-আলোচনা। একটু ধৈর্য ধরুন।

(৩) অথচ দ্রষ্টব্য, দিল্লির সাংস্কৃতিক মজলিসে বাঙালী এখনও তার আসন বজায় রাখতে পেরেছে। এই কিছুদিন পূর্বেই শম্ভু মিত্র দিল্লিতে যা ভেল্কিবাজি দেখালেন সে-কেরামতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। অল্পের ভিতর লিট্‌ল থিয়েটার চালান চাটুর্য্যে। দিল্লিতে যাবতীয় চিত্র-ভাস্কর্য প্রদর্শনী হয় বাঙালী উকীলবাবুর তাঁবুতে। গাওনা-বাজনাতে বাঙাল আলাউদ্দীন সায়েব—রবিশঙ্করের কথা নাই বা তুললুম। শিক্ষাদীক্ষায় মৌলানা আজাদ সায়েব। সাহিত্যে হুমায়ুন কবীর।

ইতিমধ্যে সত্যজিৎ রায়ের তোলা 'পথের পাঁচালী' দিল্লি ছাড়িয়েও কঁহা কঁহা মুল্লুকে চলে গিয়েছে। নভেম্বরে বুদ্ধ-জয়ন্তী হওয়ার পূর্বেই হাঁকডাক পড়ে গিয়েছে, কে করে তবে 'নটীর পূজা', কাকে ডাকা যায় 'চণ্ডালিকা'র জন্য?

অর্থাৎ বাঙালীর রসবোধ আছে, অর্থাৎ স্পর্শকাতর। তাই সে সেনসিটিভ এবং অভিমানী।

আলিপুর বোমা মামলার সময় শমসুল হক্ (কিংবা ইসলাম) নামক একজন ইন্সপেক্টর আসামীদের সঙ্গে পিরিত জমিয়ে ভিতরের কথা বের করে ফাঁস করে দেয়। বোমারুরা তাই তার উল্লেখ করে বলত, 'হে শমসুল, তুমিই আমাদের শ্যাম, আর তুমিই আমাদের শূল।'

স্পর্শকাতরতাই বাঙালীর 'শ্যাম' এবং স্পর্শকাতরতাই তার 'শূল'। সুদ্ধমাত্র কিছু না দিয়ে স্টেজ সাজিয়ে নিয়ে দশটা বাঙালী তিন দিনের ভিতর যে-রকম একটা নাট্য খাড়া করে দিতে পারে অন্য প্রদেশের লোক সে-রকম পারে না। আবার যেখানে পাঁচটা সিদ্ধী পারমিটের জন্য বড় সায়েবের দরজায় পঞ্চান্ন দিন ধন্না দেবে সেখানে বাঙালীর নাভিশ্বাস ওঠে পাঁচ মিনিটেই। সংসারে করে খেতে হলে ড্রিল-ডিসিপ্লিনের দরকার। আর ওসব জিনিস পারে বুদ্ধিতে যারা কিঞ্চিৎ

ভোঁতা, অনুভব-অনুভূতির বেলায় একটুখানি গণ্ডারের চামড়া-ধারী।

স্পর্শকাতরতা এবং ডিসিপ্লিন এ-দুটোর সমন্বয় হয় না? বোধ হয় না। লাতিন জাতটা স্পর্শকাতর, তাদের ভিতর ডিসিপ্লিনও কম। ইংরেজ সাহিত্য ছাড়া প্রায় আর সব রসের ক্ষেত্রে ভোঁতা—তাই তার ডিসিপ্লিনও ভাল।

এ-আইনের ব্যত্যয় জর্মনিতে। চরম স্পর্শকাতর জাত মোক্ষম ডিসিপ্লিন মেনে নিলে কী মারাত্মক অবস্থা হতে পারে হিটলার তার সর্বোত্তম উদাহরণ। হালের জর্মনরা তাই বলে, 'অতখানি ডিসিপ্লিন ভাল নয়।' কিন্তু এ-কথা কাউকে বলতে শুনি নি, 'অতখানি স্পর্শকাতরতা ভাল নয়।'

কোনও জিনিসেরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়, সে ত আমরা জানি, কিন্তু আসল প্রশ্ন, লাইন টানব কোথায়? জাতীয় জীবনে স্পর্শকাতরতা থাকবে কতখানি আর ডিসিপ্লিন কতখানি? কিংবা শুধাই উপস্থিত যে মেকদার বা প্রোপর্শন আছে সেটাতে বাড়াই কোন্ বস্তু—স্পর্শকাতরতা, না ডিসিপ্লিন?

গুণীরা বিচার করে দেখবেন॥

দেয়ালি

ভারতবর্ষের সর্বত্রই দেয়ালি-উৎসব হয় এবং সর্বত্রই ওই দিন আলো জ্বালানো হয়। দিল্লিতেও বিস্তর আলো জ্বালানো হয়েছিল—বহু রঙের বহু ধরনের আলো জ্বালিয়ে দিল্লিবাসীরা তাদের ভিন্ন ভিন্ন রুচির প্রকাশ দিতে চেষ্টা করেছিলেন। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে কলকাতাতেও এই রকম রঙ-বেরঙা আলো জ্বালানো হয়।

আমার কিন্তু এখনও ভাল লাগে ছোট শহরের দেয়ালি দেখতে—যেখানে বিজলী বাতি নেই। বিজলীর প্রধান দোষ মানুষ নানা রঙের প্রদীপ জ্বালাবার জন্য সহজেই প্রলুব্ধ হয় এবং তাতে যেন রুচির অভাব লক্ষ্য হয়। দ্বিতীয়ত, পিদিমের শিখার কাঁপনে কেমন যেন একটা প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়, বিজলীর নিষ্কম্প আলো বড় ঠাণ্ডা বড় নির্জীব বলে মনে হয়। তৃতীয়ত, বিজলী বাতি একবার জ্বালিয়েই খালাস, তার জন্য কোন তদারকি করতে হয় না। তাতে করে কেমন যেন জীবনস্পন্দনের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না—মনে হয় সিনেমা-সাজানোর আলোই জ্বালানো হয়েছে, তবে সিনেমা-কোম্পানির অঢেল পয়সা নেই বলে রোশনাইটার খোলতাই হয় নি।

তার চেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যখন দেখি, একটি মেয়ে তার ছোট ভাইকে সঙ্গে

নিয়ে এ-পিদিমে তেল ঢালছে, ও-পিদিমের পলতে উস্কে দিচ্ছে, পিদিমের আলো তার মুখে এসে পড়েছে, ছোট ভাইকে হাতে ধরে এক পিদিম থেকে আর এক পিদিম জ্বালাতে শেখাচ্ছে, তখন মনের উপর যে-ছবিটি আঁকা হয় সে-ছবি বহু বৎসর পরে স্মরণ করেও প্রবাসীর মনে আনন্দ হয়, তার সঙ্গে খানিকটে মধুর বেদনাও এনে দেয়।

দিল্লি শহরও পিদিম জ্বালে। কিন্তু পাশের বাড়িতে বিজলী বাতির রোশনাই থাকলে পিদিমের আলো কেমন যেন ম্লান আর বে-জলুস মনে হয়। তদুপরি দিল্লির যে-সব জায়গায় পিদিম জ্বালানো হয় সে-সব জায়গার সঙ্গে আমার ত কোনও হার্দিক সম্পর্ক নেই, তাই, 'অতীত প্রাণ যেন মন্ত্রবলে নিমেষে প্রাণে নাহি জাগে।'

এই দেয়ালি দেখে আরেক দেয়ালির কথা মনে পড়ে গেল। আর যে-বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তার সঙ্গে তুলনীয় বর্ণনা তিনি তাঁর দীর্ঘ কবি-জীবনে অল্পই দিতে পেরেছেন :—

'কবি বলে, যাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে
যেখানে সে চিরন্তন দেয়ালির উৎসব প্রাঙ্গণে
মৃত্যুদূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দদীপগুলি,
যেথা মোর জীবনের প্রত্যূষের সুগন্ধি শিউলি
মাল্য হয়ে গাঁথা আছে অনন্তের অঙ্গদে কুণ্ডলে,
ইন্দ্রাণীর স্বয়ম্বর বরমাল্য সাথে ; দলে দলে
যেথা মোর অকৃতার্থ আশাগুলি, অসিদ্ধ সাধনা,
মন্দির-অঙ্গনদ্বারে প্রতিহত কত আরাধনা
নন্দন-মন্দারগন্ধ-লুব্ধ যেন মধুকর-পাঁতি,
গেছে উড়ি মর্ত্যের দুর্ভিক্ষ ছাড়ি।'

দেয়ালির উৎসব-আলো দেখে বার বার মনে পড়ল, জীবনের বড় বড় আনন্দ-দীপগুলি অনন্ত ওপারে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছেন। হায়, কজনের জীবনে কবার তারা এপারের দেয়ালি সর্বাঙ্গসুন্দর করে জ্বালাতে পারে !!

গানের কথা : ভারত ও কাবুল

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, কে জানিত কাবুলীও গান গায়।

কিন্তু সত্যই কাবুলী গান গাইতে আর শুনতে ভালবাসে।

কাবুলে কিন্তু লোকসঙ্গীতেরই রেওয়াজ বেশী। কাবুলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা কম, এবং সে-সঙ্গীতে তার নিজস্ব কোনও ঐতিহ্য নেই বলে সে সম্পূর্ণ নির্ভর করে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের উপর। কাবুল শহরে যে দু-চারজন কালোয়াত আছেন তাঁরা প্রায় সকলেই উত্তর ভারতে বাস করে সদ্‌গুরুর কাছ থেকে কলাচর্চা শিখে গিয়েছেন। তবে উচ্চারণের বেলায় খাঁটি হিন্দী গানে তাঁরা একটুখানি বিব্রত হয়ে পড়েন যদিও উর্দু গজল গাইতে তাঁদের তেমন কোনও অসুবিধা হয় না।

যাঁদের রেডিও আছে, তাঁরা প্রায়ই ভারতীয় কেন্দ্র থেকে আমাদের ওস্তাদী, গজল-গীত শুনে থাকেন।

কাবুলীরা খাস আরবী, ইরানী বা তুর্কীস্থানী সঙ্গীত শুনে সুখ পান না।

তাই যখন খবর এল, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর কাবুলে গান গাইতে গিয়েছেন তখন আনন্দিত হলুম। এঁর পূর্বে কজন সত্যকার ওস্তাদ কাবুলে গিয়েছেন সে-কথা আমার জানা নেই, তবে দু-চারজন গিয়ে থাকলেও ওঙ্কারনাথ যে সেখানে রাজসম্মান পাবেন সে-বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না।

কার্যত তাই হয়েছে।

একদা কাবুলের রাজা যে-রকম শ্রমণ হিউয়েন সাঙকে সাদর অভ্যর্থনা করেছিলেন ঠিক তেমনি কাবুলের আজকের রাজা পণ্ডিত ওঙ্কারনাথকে সহৃদয় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রাজা জহীর শাহ্ পণ্ডিতজীকে বলেন, রেকর্ডে পণ্ডিতজীর সঙ্গীত শোনার সৌভাগ্য তাঁর পূর্বেই হয়েছিল, কিন্তু মুখোমুখি তাঁর আপন কণ্ঠের গান শোনার সুযোগ তাঁর জীবনে এই প্রথম।

কাবুলীরা তাগড়া জাত, তারা সঙ্গীতে গুরুগম্ভীর কণ্ঠ পছন্দ করে। ঠিক ওই বস্তুটিই পণ্ডিতজীর আছে—তিনি গাইতে আরম্ভ করলে সভাস্থল গমগম করতে থাকে। তিনি যে শুধু এদেশে সুখ্যাত তাই নয়, ইয়োরোপও তাঁর গলা শুনে মুগ্ধ হয়েছে। আমার এক জর্মন বন্ধু পণ্ডিতজীর 'নীলাম্বরী'তে গাওয়া 'মিতুয়া' রেকর্ডখানা বাজিয়ে বার বার আনন্দোল্লাস প্রকাশ করেন।

তাই ওঙ্কারনাথ যে কাবুলে অকুণ্ঠ উচ্চকণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছেন তাতে আশ্চর্য হবার কী।

কিন্তু এই কি শেষ?

হাউই জ্বলে ছাই হয়ে যাওয়ার পূর্বে তার শিখা দিয়ে যে-লোক তার মাটির প্রদীপটি জ্বালিয়ে নেয় সে-ই বুদ্ধিমান। ওঙ্কারনাথ কাবুলে যে আতশবাজি দেখিয়ে দিলেন তার জের এখানেই শেষ হওয়া উচিত নয়। ওরই খেই ধরে অনেক কিছু করবার আছে।

বিদেশী কত ছাত্র ভারতীয় সরকারের বৃত্তি নিয়ে এদেশে এসে ইঞ্জিনীয়ারিং, ডাক্তারি শিখে যায়। এসব বিদ্যা আমাদের নিজস্ব নয়, ইয়োরোপের কাছ থেকে শেখা। এগুলোতে আমাদের আপন কোনও গর্ব নেই। কিন্তু কাবুলী 'শাগরেদ' যদি ভারতে এসে আমাদের নিজস্ব সঙ্গীত শিখে যায় তবে তাতে ভারতের গর্ব ষোল আনা; এই করেই পুনরায় ভারত-আফগানিস্তানে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপিত এবং দৃঢ়ীভূত হবে। ভারত সরকারের উচিত তার সুব্যবস্থা করা—আফগানিস্তান আমাদের তুলানায় গরিব দেশ। (আরেকটা কথা ভুললে চলবে না, কাবুলে পাশ্চাত্ত্য 'জাজ' ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে; আমরা যদি এই বেলা জোর হাতে হাল না ধরি তবে একদিন দেখতে পাব, কাবুল আর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনতে চায় না।)

দ্বিতীয়ত এদেশ থেকে ছাত্র কিংবা অধ্যাপক পাঠাতে হবে কাবুল গিয়ে অনুসন্ধান করতে, আমাদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এবং নৃত্য একদা কাবুলে কতখানি প্রচারিত এবং প্রসারিত ছিল এবং অদ্যকার পরিস্থিতিই বা কী! তাঁকে প্রস্তাব করতে হবে, কী করলে আমাদের সঙ্গীত সে-দেশে আপন অর্ধলুপ্ত গৌরব পুনরায় উদ্ধার করতে সক্ষম হবে।

এ সব কর্ম যত শীঘ্র করা যায় ততই মঙ্গল।

আমি চেষ্টা করছি, কাবুলী খবরের কাগজ থেকে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের বিজয় অভিযান উদ্ধার করতে।—শক্ত কাজ। দিল্লিতে ত আর কাবুলী সংবাদপত্র বিক্রয় হয় না! পেলেই কিন্তু পেশ করব॥

উনো, হিন্দী, ক্রিকেট

প্রাতঃস্মরণীয় কবিরাজ সুকুমার রায় বলেছেন,

'গোঁফকে বলে তোমার আমার—গোঁফ কি কারো কেনা?
গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।'

অর্থাৎ মানুষ দিয়ে গোঁফের বিচার হয় না—গোঁফ দিয়ে মানুষের বিচার করতে হয়।

কথাটা আমাদের কাছে আজগুবী মনে হলেও আসলে তা নয়। চোখ খোলা রাখলে নিত্যি নিত্যি তার উদাহরণ স্পষ্ট দেখতে পাবেন। এই মনে করুন কলকাতা শহর। কী লোকসংখ্যা, কী আয়তন, কী ব্যবসা-বাণিজ্য, কী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা—সব দিক দিয়েই কলকাতা শহর দিল্লিকে একশবার হার মানাতে পারে, কিন্তু হলে কী হয়, দিল্লি যে রাজধানী! অতএব দিল্লির মাহাত্ম্য কলকাতার চেয়ে বেশী।

অর্থাৎ রাজধানীর গোঁফ দিয়ে শহর যাচাই করতে হয়। শহরের প্রাধান্য থেকে রাজধানী হয় না।

তবেই দেখুন, সুকুমার রায়ের বাণীটি আপ্তবাক্য কিনা।

তাই দিল্লির ধারণাইউ এন ও'র পালা-পরব করার অধিকার তারই সবচেয়ে বেশী এবং এ-সপ্তাহে দিল্লি বিস্তর ঢাক-ঢোল বাজিয়ে সে-পরব সমাধান করেছেও বটে।

মেলা গুণী বিস্তর ভাষণ দিয়েছেন। কী গলা, কী বলার ধরন, কী হাত-পা নাড়া, কী উচ্ছ্বাস—সব দেখে শুনে মনে কণামাত্র সন্দেহ আর থাকে না, এঁরা যদি দিল্লিতে বক্তৃতা না দিয়ে উনোতে দিতেন তবে অনায়াসে আমাদের জন্য কাবুল-কান্দাহার জয় করে আনতে পারতেন।

এঁরা কী বক্তৃতা দিলেন? আমার নীরস ভাষা দিয়ে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করলে গুণীদের প্রতি অবিচার করা হবে, তাই প্রতীকের সাহায্যে, অর্থাৎ অ্যালজেব্রা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করব।

এঁদের প্রায় সকলেই একই কথা বললেন। সেটা হচ্ছে এই; যদিও উনো ক, খ, গ করতে সক্ষম হন নি, তবু চেষ্টা করলে ভবিষ্যতে চ, ছ, জ হয়ত বা করলে করতেও পারেন এবং ট, ঠ, ড-ও যে তাঁদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব এ-কথাই বা বুক ঠুকে বলতে পারে কে?

যেন ইস্কুলের মাস্টার মশায় জমিদারবাবুর ফেল করা ছেলের প্রোগ্রেস-রিপোর্ট লিখছেন। জমিদারবাবুকে না চটিয়ে তাঁর গর্দভ ছেলের হাল-হকিকৎ বাতলানো সোজা কর্ম নয়। উনোর প্রশস্তিগায়করা সেই টাইট-রোপ-ডানসিং কর্মটি দিল্লিতে সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন।

হায় কাশ্মীর, হায় কোরিয়া, হায় ইন্দোচীন, হায় তুনিস্, আরও কত হায়, হায়!

আমি কিন্তু উনোর কাম্-কেরদানি থেকে দুটো শিক্ষা লাভ করেছি।

প্রথমত, মীটিঙে গালিগালাজ মারামারি না করা। কিছুদিনের কথা, ফ্রান্সের পার্লিমেণ্টে সদস্যেরা অন্য কোনও অস্ত্র শস্ত্র পান নি বলে গলার চেন খুলে একে

অন্যকে জোরসে ঠুকেছেন—ফলে রক্তারক্তিও নাকি হয়েছিল। বাংলা দেশের পার্লিমেন্টেও নাকি অনেক কিছু হয়েছে, যদিও রক্তারক্তি হয়েছে বলে স্মরণ হচ্ছে না। তবে মারামারিই ত শেষ কথা নয়। ভাষা অনেক সময় ডাণ্ডার চেয়েও কঠিন কঠোরতর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মাস্টাররা এখন ছেলেদের চাবুক মারেন না বটে, তবে সে-চাবুক এসে আশ্রয় নিয়েছে তাঁদের জিভে; তাঁদের জিভ এখন চাবুকের চেয়ে নিষ্ঠুরতর।

কিন্তু সে-তত্ত্বালোচনা উপস্থিত থাক্।

আমার কাছে আশ্চর্য বোধ হয়, এখন উনোতে হাতাহাতি কিংবা পুরোদস্তুর একে অন্যকে অপমান না করেও তাঁরা কাজকর্ম (তা সে যতই নগণ্য কিংবা অর্থহীন হোক না কেন) সমাধান করছেন কী করে?

কাষ্ঠরসিকেরা এর উত্তরে কী বলবেন তাও আমি বিলক্ষণ জানি। তাঁরা বলবেন, 'আরে বাপু, যেখানে শুধু তর্কাতর্কি—বাক্‌যুদ্ধ, যেখানে কোনও প্রকারের জীবন-মরণ-সমস্যার সমাধান হবে না, যেখানকার কোনও বাগাড়ম্বরই আমার আপন দেশে কোনও প্রকারের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে না অর্থাৎ আমার দেশকে এক গিরে জমি কিংবা এক কড়ির আমদানি খোয়াতে হবে না, সেখানে মারামারি হাতাহাতি করতে যাব কোন্ দুঃখে?

হক্ কথা। দুনিয়ার বহু জাতই এ-তত্ত্ববাক্যে সায় দেবে। কিন্তু আমি বাঙালী। আমার মন বলে কথাটা হক্ হলেও টক করে মেনে নিতে আমার বাধছে। 'মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলে'র খেলাতে কে জেতে কে হারে, তাতে আমার কণামাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, তবু ত তাই নিয়ে তর্ক করে আমি সেদিন দুটো চড় খেয়েছি, তিনটে কিল মেরেছি। সে-রাত্রে না-খেয়ে শুতে গিয়েছি, পাশের বাড়ির শা—রা সাত টাকা সেরে ইলিশ কিনে ফিষ্টি করেছে।

দ্বিতীয় তত্ত্ব ততোধিক গুরুত্বব্যঞ্জক (সোজা বাংলায় ইমপর্টেন্ট) হিন্দী ভাষা রাষ্ট্রভাষা। তাঁর জয় হোক। তিনি দেশ-বিদেশ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুন; আমার বুক ফাটবে না! কিন্তু যখন বলা হয়, হিন্দী না শিখলে (এবং ইংরেজী বর্জন করার পর) আমরা দিল্লির পার্লিমেন্টে একে অন্যকে বুঝব কী করে, তাই সবাই হিন্দী শেখ, তখন আমার মনে আসে উনোর কথা। সেখানে কে গণ্ডা ভাষা নিয়ে কারবার চলে ঠিক বলতে পারব না, তবে বিবেচনা করি ভারতে যে-কটি ভাষা চালু আছে, তার চেয়ে অনেক বেশী ভাষা-ভাষী সেখানে জমায়েত হন। তাঁদের বেশির-ভাগই বক্তৃতা দেন আপন আপন মাতৃভাষাতে। বর্মার সদস্য যখন আপন মাতৃভাষায় বক্তৃতা দেন, সঙ্গে সঙ্গে সে-বক্তৃতা ইংরেজী, ফরাসী, স্পেনিশ

ইত্যাদি বহু ভাষায় অনূদিত হয়। প্রত্যেক সদস্যের কানে 'ইয়ার-ফোন' লাগানো। সমুখে ছোট একটি কল। তিনি যে-ভাষায় অনুবাদ চান, সে-ভাষার উপর কলের কাঁটাটি লাগিয়ে অনুবাদটি শুনে নেন। যেমন যেমন বক্তৃতা হয়, অনুবাদও সঙ্গে সঙ্গে চলে। বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনুবাদ শেষ হয়—সব সদস্যই জেনে যান, বক্তা কী বললেন। যে-সব সদস্য বক্তার মাতৃভাষা জানেন, একমাত্র তাঁরাই তখন 'ইয়ার ফোন' ব্যবহার করেন না।

তবে দিল্লির পার্লিমেন্টেই বা এ-ব্যবস্থা হতে পারে না কেন? ভারতসুদ্ধ লোককেই বা হিন্দী-উর্দু-হিন্দুস্থানী শিখতে হবে কেন?

হিন্দী-উর্দু-হিন্দুস্থানীর কথায় মনে পড়ল ক্রিকেট-কমেন্টারির কথা।

এবারকার ক্রিকেট টেস্টম্যাচের খেলাতে হিন্দীতেও 'সমসাময়িক টীকা' ধাকমান-মন্নীনাথ (রানিং কমেন্টারি) দেওয়া হচ্ছে। যেদিন আপিসের অত্যাচারে খেলা দেখতে যেতে পারি নি, সেদিন লাঞ্চের সময় টীকা শুনে দুধের আশ ঘোল নয়, জল দিয়ে মিটিয়েছি। মাঝে মাঝে হিন্দী টীকাও ইচ্ছা-অনিচ্ছায় শুনতে হয়েছে।

সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

এই টীকাকার যুক্তপ্রদেশের অতি খানদানী ঘরের ছেলে। তিনি জানেন, আমির ইলাহী বহুদিনের মুরুব্বী খেলোয়াড়। তাই তিনি বার বার বললেন, এর পর আমির ইলাহী সাহেব বড়ী খুবসুরতকে সাথ (বড় সৌন্দর্যের সঙ্গে) গেন্দ (বল) পাকড়্লী (ফিল্ড করলেন)। আমির ইলাহীকে 'সাহেব' বলার পূর্বে তিনি অন্য দু-একজনকে 'সাহেব' উপাধি দেন নি, এর পর তাঁর মনে হল সবাইকে 'সাহেব' বলা উচিত, তাই তিনি আঠার বছরের ছোকরা হাফীজকেও 'সাহেব' সম্বোধন করতে লাগলেন।

ক্রিকেট গণতান্ত্রিক খেলা। ক্রিকেটের দেবেন্দ্র ব্র্যাডমানকেও কোনও ইংরেজ টীকাকার মিস্টার ব্র্যাডমান কিংবা 'রেসপেকটেড' ব্র্যাডমান বলে উল্লেখ করেন না, কিন্তু ভারতবর্ষ সৌজন্য—ভদ্রতার দেশ, ক্রিকেট খেলি আর যাই খেলি, পিতৃবয়স্ক আমির ইলাহী, কিংবা মুরুব্বী অমরনাথকে 'সাহেব' না বলে বাক্য-স্ফুরণ করি কি প্রকারে?

টীকাকার আবার হিন্দী-উর্দু দুই-ই জানেন। আবার তিনি এ-তথ্যও জানেন, করাচি-লাহোরে বিস্তর মুসলমান তাঁর টীকা রেডিওর পাশে বসে কান পেতে শুনছেন। তাঁরা কট্টর হিন্দী বুঝতে পারেন না—টীকাকার তাঁদেরই বা নিরাশ করেন কী প্রকারে? তাই সমস্তক্ষণ তিনি ছিলেন আপসের তালে।

দৃষ্টান্ত দি।

পাকিস্তানের 'অবস্থা তখন বড়ই বিপদসঙ্কুল', হিন্দীতে প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয়, 'বিপজ্জনক পরিস্থিতি', উর্দুতে বলতে হয়, 'খতরনাক হালৎ'। টীকাকার দু কূল রক্ষা করলেন, 'খতরনাক পরিস্থিতি'। আশা করলেন, পাকিস্তান হিন্দুস্থান উভয়েই বুঝে যাবে 'অবস্থা সঙ্গিন'।

আমি কিন্তু সত্যই স্বীকার করি, ভাষার উপর ভদ্রলোকের দখল আছে। মাকড় 'আরামকে সাথ' (অক্লেশে, আরামের সঙ্গে) গেন্দ (বল) বোলারকে ফিরিয়ে দিলেন, পঙ্কজবাবু 'আহ্‌সানীসে' (অনায়াসে, অবহেলায়) বলটাকে পাকড়ে নিলেন, গুলমহম্মদ বড় 'শানদার' (মহিমাময়) খেলা দেখালেন, নাজির মহম্মদ 'কাইম' ('কায়েমী'—অর্থাৎ সেটেলড্‌ ডাউন) হয়ে গিয়েছেন—আরও কত কী।

আর অদ্ভুত তাঁর নিরপেক্ষতা। বরের মাসী, কনের পিসী। একে বলেন, সাধু সাধু, ওকে বলেন, শাবাশ শাবাশ। কেউ ক্যাচ ধরলে তিনি 'অচৈতন্নি', কেউ সিঙ্গল করলে তিনি 'বেহুঁশ'।

খেলা না দেখেও খেলা দেখার আনন্দ পেয়েছি॥

বুদ্ধং শরণং

সারিপুত্ত ও মহামৌদ্‌গল্যায়নের পূতাস্থি প্রায় এক শতাব্দীর পর পুনরায় তাঁদের সমাধিস্থলে রক্ষিত হচ্ছে।

প্রায় এক শ বছর পূর্বে সাঁচীর স্তূপের উপর থেকে নীচের দিকে সুড়ঙ্গ কেটে তলার দিকে দুটি পেটিকা পাওয়া যায় এবং তাদের উপরের লেখা থেকে সপ্রমাণ হয় যে, পেটিকা দুটিতে এই দুই মহাস্থবিরের দেহাবশেষ রক্ষিত আছে। আপাত-দৃষ্টিতে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে এই দুই মহাপুরুষের দেহাস্থি বের করা বর্বরতা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সে-যুগের তার সত্যই একান্ত প্রয়োজন ছিল। সে-যুগে বিদেশী শাসন-কর্তারা এই ত্রিভুবনে আমাদের যে কোনও গৌরবস্থল থাকতে পারে সে-কথা আদপেই স্বীকার করতে চাইতেন না—শুধুমাত্র একটি বিষয়ে তাঁরা আমাদের বাহাদুরির শাবাশি দিতে অকুণ্ঠ ছিলেন, সে নাকি আমাদের কল্পনাশক্তি—উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল কল্পনা-প্রবণতা। এই 'প্রশস্তি' দিয়ে তার পর-মুহূর্তেই তাঁরা তার সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে বলতেন, 'এদের বুদ্ধ, এদের আনন্দ, সারিপুত্ত মৌদ্‌গল্যায়ন, জনপদ-কল্যাণী সবই এদের কল্পনাপ্রসূত—অভদ্র ভাষায় গাঁজা-গুল।'

দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ ইংরেজ পণ্ডিতগণ এ মতে ঠিক সায় দিতেন না বলেই

সাঁচীর স্তূপ খুঁড়ে এই দুই শ্রমণের দেহাস্থি বের করা হয়েছিল। পেটিকা দুটি না বেরলে আমাদের আরও কতখানি এবং কতদিন ধরে গালাগাল খেতে হত তার ঠিক হিসেব করা কঠিন।

তারপর এই দুই পেটিকা বিলেতে প্রায় এক শ বছর বাস করার পর বহু দেশে বহু লক্ষ নরনারীর সশ্রদ্ধ অভিবাদন পেয়ে আবার সাঁচীতে ফিরে এসেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, খোঁড়া না হয় হয়েছিল, কিন্তু পেটিকা দুটি বিলেতে নিয়ে যাওয়ার কী প্রয়োজন ছিল ?

সেখানেও এঁদের জীবনের মাহাত্ম্য এক অদৃশ্য ইঙ্গিত দেখায়। এঁদের দেহাস্থি যদি একদা বিদেশে না যেতেন তবে তাঁদের দেশে ফিরে আসার উপলক্ষ্য নিয়ে এতগুলো ভিন্ন ভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারত না এবং আজ সাঁচীতে তার চরম উৎসব উপলক্ষ্যে এতগুলি দেশের গুণী, জ্ঞানী, সাধু, তাপস একত্র হয়ে তাঁদের জীবন মাহাত্ম্য কীর্তন করে, একমন হয়ে, তাঁদের জীবনাদর্শের স্মরণে পৃথিবীতে পুনরায় শান্তির বাণী প্রচার এবং প্রসার করতে নবীন ভাবে অনুপ্রাণিত হতেন না।

এখানে ঈষৎ একটি অপ্রিয় মন্তব্য করে দ্বিতীয় প্রস্তাব আরম্ভ করি।

এ-দেশের সরস্বতীপূজা, দুর্গাপূজা যে আজ জাঁকজমক আর বাহ্যাড়ম্বরেই শেষ হয় সে-কথা বাংলা দেশের বিচক্ষণ লোক মাত্রেই স্বীকার করে নিয়েছেন, তাই সাঁচীর উৎসব যে বাগাড়ম্বরেই শেষ হতে পারে, সে-ভয় আমাদের সম্পূর্ণ অমূলক নাও হতে পারে। তাই প্রশ্ন, সাঁচীতে সমবেত মনীষীগণ যে একবাক্যে শপথ গ্রহণ করলেন, পৃথিবীতে পুনরায় শাক্যমুনির শান্তিবাণী প্রচারিত হোক, তার সম্ভাবনা কতটুকু ?

এ-আশা দুরাশা যে পৃথিবীতে বহু লোক এখন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এ-পর্বের প্রধান পুরোহিত পণ্ডিতজী, শ্যামাপ্রসাদ এবং রাধাকৃষ্ণণ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা কিংবা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন নি। তাই আজ যদি আমরা সবাই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ না করেও বুদ্ধদেবের শিক্ষা জীবনে সফল করবার চেষ্টা করি তাহলে আমরা কপটাচারী, এ-কথা বলা অন্যায় হবে।

আমার মনে হয়, ধর্ম পরিবর্তনের যুগ আর নেই, প্রয়োজনও নেই। একদা এ-পৃথিবীতে অন্য ধর্মের তত্ত্ব এবং সার অনুসন্ধান করতে হলে স্বধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ এবং সে-সমাজে সম্পূর্ণ প্রবেশ না করে সে-ধর্মের ফললাভ করার কোন পন্থা উন্মুক্ত থাকত না—কারণ তখন প্রত্যেক ধর্ম আপন আপন সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভিতর সীমাবদ্ধ থাকত। আজ সর্ব ধর্মগ্রন্থ অনায়াসলভ্য, আজ

আমরা অন্য ধর্মের সাধুসজ্জনদের সহবাস করতে পারি, ভিন্ন ভিন্ন সমাজের দোষ-গুণ আপন অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করে নিতে পারি। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য, এ-কর্ম সহজ, সরল করে দেওয়াও বটে। সুতরাং আজ আর ধর্ম পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই; আজ হিন্দু খ্রীষ্টান না হয়েও আপন সমাজে অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে পারে, মুসলমান হিন্দু না হয়েও শঙ্করদর্শন মেনে নিয়ে জীবন সে ধারায় চালাতে পারে।

শান্তির বাণী ত সব ধর্মই প্রচার করেছে; তাই এখন প্রশ্ন, শান্তির বাণীর জন্য বৌদ্ধধর্মের কাছেই হাত পাতবার প্রয়োজন!

প্রয়োজন এই, প্রত্যেক ধর্মই কোন না কোন এক কিংবা একাধিক নীতির উপর জোর দিয়েছে বেশী। বৌদ্ধধর্ম সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছে পৃথিবীতে শান্তি আনার জন্য (কেন দিয়েছিল সে প্রশ্নের উত্তর তৎকালীন রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে বিজড়িত) এবং তারই ফলে মৌর্যযুগে তাবৎ ভারতবর্ষ পৃথিবীর ইতিহাসে একদিন অখণ্ড রাষ্ট্ররূপে দেখা দিয়াছিল। সারিপুত্ত, মহামৌদ্গল্যায়ন প্রমুখ শ্রমণেরা যদি আপন প্রাণ হাতে নিয়ে প্রদেশ হতে প্রদেশান্তরে শান্তির বাণী প্রচার না করতেন (জাতকে বার বার দেখতে পাই, যে-কোনও দেশ বা প্রদেশের প্রত্যন্ত প্রদেশে যাওয়ার অর্থ সে-যুগে ছিল আপন প্রাণ নিয়ে খেলা করা) তাহলে প্রদেশ-প্রদেশের সীমান্তরেখা বিলীন হত না এবং ফলে ঐক্যবদ্ধ অবিচ্ছিন্ন ভারত কবে সে রূপ নিত—এবং আদৌ নিত কি না—আজ তার কল্পনা করা যায় না।

এবং এইখানেই তথাগতের প্রেম এবং মৈত্রী অভিযানের শেষ নয়—আরম্ভ মাত্র। পুনরায় বলি, আরম্ভ মাত্র।

তারপর এই বৌদ্ধবাণীর কল্যাণেই সিংহল গমন সহজ হল, দুর্ধর্ষ আফগানিস্তানের সঙ্গে মিত্রতা-সূত্রে বদ্ধ হল, (কাবুলের গ্রীক, বৌদ্ধ হয়ে গিয়ে গান্ধার শিল্প নির্মাণে সাহায্য করল এবং আজ যে আমরা প্রভু বুদ্ধের মূর্তি দেখে শান্তিরসে পূর্ণ হই, তার গোড়াপত্তন করে এই গ্রীকরাই), দুর্লঙ্ঘ্য হিন্দুকুশ অতিক্রম করে বৌদ্ধ শ্রমণরা বামিয়ান পৌঁছলেন (সেখানকার বুদ্ধমূর্তি পৃথিবীর আর যে-কোনও বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ মূর্তির চেয়ে উচ্চ), তারপর বর্বর তাতার তুর্কমান পর্যন্ত বৌদ্ধ মন্ত্র গ্রহণ করল, সর্বশেষে তখনকার দিনের সবচেয়ে সভ্যদেশ চীন পর্যন্ত তথাগতের শরণ নিল!

এ-দিকে বর্মা, শ্যাম, মালয়, যবদ্বীপ, বলীদ্বীপ ভূখণ্ড।

ভারতের মত বিরাট দেশকে চীনের মত বিশালতর দেশের সঙ্গে মিলিয়ে

দয়ে এই বৌদ্ধ অভিযান যে মানব সভ্যতাকে কতখানি এগিয়ে দিল তার সুস্পষ্ট ধারণা দূরে থাক্, তার কল্পনামাত্রও আজ আমরা করতে পারি নে। জানি পরবর্তী যুগে খৃষ্টধর্ম আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত সাগর পর্যন্ত ভূখণ্ডকে এক করে দিয়েছিল, কিন্তু সে ত অসংখ্য দ্বন্দ্ব অগণিত সংগ্রামের ভিতর এবং আজও তার শেষ হয় নি।

ভারত-চীন, ভারত-তিব্বত এবং ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল তা প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মের মাধ্যমে। এ-কথা বললে ভুল বলা হবে না যে, যেদিন ভারত বৌদ্ধ ধর্ম বর্জন করল (কেন করল, এবং না করলে তার গত্যন্তর ছিল কি না, সে প্রশ্নের উত্তর দীর্ঘ এবং এখানে অবান্তর), সেইদিন থেকেই ভারতের সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক ক্ষীণ হতে হতে একদিন সম্পূর্ণ লোপ পেল।

কিন্তু ভারত বৌদ্ধ ধর্ম বর্জন করেছে এ-কথা ভুল। তথাগতের বাক্য, নীতি, অবদান (প্রাচীনার্থে) ধর্ম সনাতন হিন্দু ধর্মের শিরা-উপশিরায় আজ এমনই মিশে গিয়েছে যে, তার বিশ্লেষণ অসম্ভব এবং অপ্রয়োজন।

পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণও আজ সেগুলো হিন্দু ধর্ম থেকে বর্জন করতে সম্মত হবেন না। তাই আজ ব্রাহ্মণ শ্যামাপ্রসাদ, রাধাকৃষ্ণণ ও জওয়াহিরলালের শ্রমণাস্থি স্কন্ধে গ্রহণ কিঞ্চিন্মাৎ গুরুভার বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না।

এবং শুধু কি তাই? অমিতাভের বাণীতে কী অমিত অমৃত লুকানো রয়েছে যে, বর্তমান যুগে যেদিন তার বাণী ইয়োরোপে পৌঁছল সেদিন ফ্রান্সের বুর্নফ ইত্যাদি পণ্ডিতগণ আগ্রহের সঙ্গে সে বাণী গ্রহণ করলেন। ইয়োরোপের জন-সাধারণও কী অদ্ভুত সাড়া দিলে সে বাণী শুনে! ইয়োরোপ তখন আজকের চেয়ে বেশী ধর্মবিমুখ—বিগত দুই যুদ্ধ ইয়োরোপকে আবার আত্মার সন্ধানে তাড়া দিয়েছে—তবু তারা কী আগ্রহেই না বৌদ্ধ-ধর্মগ্রন্থ সংস্করণের পর সংস্করণ শেষ করল!

খুদ পরমেশ্বরকে বাদ দিয়ে, পাদরী-পুরুতের তোয়াক্কা না করেও ধর্মচর্চা করা যায়, একমাত্র নিজের উপর নির্ভর করে, ক্রিয়াকাণ্ড বর্জন করে, তথাগতের উপদেশের সঙ্গে সাধনাগত অভিজ্ঞতা মিলিয়ে নিয়ে, তথাগত যেখানে আগত হয়েছেন সেখানে পৌঁছনো যায়, এ-স্বপ্ন ইয়োরোপের কোন জ্ঞানী কোন গুণী দার্শনিকই দেখবার সাহস করেন নি। বুদ্ধের অশ্রুতপূর্ব বাণী এক মুহূর্তেই ইয়োরোপের সামনে এক নবীন ভুবন আলোক দিয়ে জাজ্বল্যমান করে দিল।

তাই উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে আজ ওই এক মহাপুরুষ—বুদ্ধদেব—যাঁর

পায়ের কাছে আজ সর্ব নাস্তিক সর্ব আস্তিক স্বধর্ম-ভ্রষ্ট না হয়েও দীক্ষা গ্রহণ করতে পারে, ত্রিশরণ জপ করতে পারে—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি ॥

অ্যার ট্রাভেল

পঁচিশ বৎসর পূর্বে প্রথম অ্যারোপ্লেন চড়েছিলুম। দশ টাকা দিয়ে কলকাতা শহরের উপর পাঁচ মিনিটের জন্য খুশ-সোওয়ারি বা 'জয় রাইড' নয়, রীতিমত দু শ মাইল রাস্তা—পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে নদী-নালা পেরিয়ে এক শহর থেকে অন্য শহর যেতে হয়েছিল। তখনকার দিনে এদেশে প্যাসেঞ্জার সার্ভিস ছিল না, কাজেই আমার অভিজ্ঞতাটা গড়পড়তা ভারতীয়দের পক্ষে একরকম অভূতপূর্বই হয়েছিল বলতে হবে।

তারপর ১৯৪৮ থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বহু জায়গায় প্লেনে গিয়েছি এবং যাচ্ছি। একদিন হয়ত পুষ্পকরথে করেই স্বর্গে যাব, অর্থাৎ প্লেন-ক্র্যাশে অক্কালাভ করব—তাতে আমি আশ্চর্য হব না, কারণ এ ত জানা কথা, 'ডানপিটের মরণ গাছের ডগায়'। সে-কথা থাক্।

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে প্রতিবারই লক্ষ্য করি, পঁচিশ বৎসর পূর্বে প্লেনে যে সুখ-সুবিধে ছিল আজও প্রায় তাই। ভুল বলা হল, 'সুখ-সুবিধে' না বলে 'অসুখ-অসুবিধেই' বলা উচিত ছিল, কারণ প্লেনে সফর করার চেয়ে পীড়াদায়ক এবং বর্বরতর পদ্ধতি মানুষ আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারে নি। আমার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যাঁরা প্লেনে চড়েন তাঁরা ওকীব-হাল, তাঁদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। উপস্থিত, তাই তাঁদেরই উদ্দেশ্যে নিবেদন, প্লেনে চড়ার সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য যাদের এ-যাবৎ হয় নি।

রেলে কোথাও যেতে হলে আপনি চলে যান সোজা হাওড়া। সেখানে টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসুন—ব্যস, হয়ে গেল। অবশ্য আপনি যদি বার্থ রিজার্ভ করতে চান তবে অন্য কথা, কিন্তু তবু একথা বলব, হঠাৎ খেয়াল হলে আপনি শেষ মুহূর্তেও হাওড়া গিয়ে টিকিট এবং বার্থের জন্য একটা চেষ্টা দিতে পারেন এবং শেষ পর্যন্ত কোন গাতকে একটা বার্থ কিংবা নিদেনপক্ষে একটা সীট জুটে যায়ই।

প্লেনে সেটি হবার জো নেই। আপনাকে তিন দিন, পাঁচ দিন, কিংবা সাত দিন পূর্বে যেতে হবে 'অ্যার আপিসে'। আপনাকে সব জায়গার টিকিট দেয় না —কেউ দেবে ঢাকা, কেউ দেবে আসাম, মাদ্রাজ অঞ্চল, কেউ দেবে দিল্লির।

এবং এ-সব অ্যার আপিস ছড়ানো রয়েছে বিরাট কলকাতার নানা কোণে, নানা গহ্বরে। এবং বেশীর ভাগই ট্রাম-লাইন, বাস-লাইনের উপরে নয়। হাওড়া যান ট্রামে, দিব্য মা-গঙ্গার হাওয়া খেয়ে; অ্যার আপিসে যেতে হলে প্রথমেই ট্যাক্সির ধাক্কা।

অ্যার আপিসে ঢুকেই আপনার মনে হবে, ভুল করে বুঝি জঙ্গী দফতরে এসে পড়েছেন। পাইলট, রেডিও-অফিসার ত উর্দি পরে আছেনই, এমন কী টিকিট-বাবু পর্যন্ত শার্টের ঘাড়ে লাগিয়েছেন নীল সোনালীর ব্যাজ-ঝিল্লা-রিবন-পট্টি যা-খুশি বলতে পারেন। রেলের মাস্টারবাবু গার্ড সাহেবরাও উর্দি পরেন কিন্তু সে-উর্দি জঙ্গী কিংবা লস্করী উর্দি থেকে স্বতন্ত্র, অ্যার আপিসে কিন্তু এমনি উর্দি পরা হয়—খুব সম্ভব ইচ্ছে করেই—যে আমার মত কুনো বাঙালী সেটাকে মিলিটারী কিংবা নেভির য়ুনিফর্মের সঙ্গে গুবলেট পাকিয়ে আপন অজানাতে দুম্ করে একটা স্যলুট করে।

তারপর সেই উর্দি-পরা ভদ্রলোকটি আপনার সঙ্গে কথা কইবেন ইংরেজীতে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন আপনি ধুতি কুর্তা-পরা নিরীহ বাঙালী, তবু ইংরেজী বলা চাই। আপনি না হয় সামলে নিলেন, বি-এ এম-এ পাস করেছেন—কিন্তু আমি মশাই পড়ি মহা বিপদে। তিনি আমার ইংরেজী বোঝেন না, আমি তাঁর ইংরেজী বুঝতে পারি নে—কী জ্বালা! এখন অবশ্য অনেক পোড় খাওয়ার পর শিখে গিয়েছি যে জোর করে বাংলা চালানোই প্রশস্ততম পন্থা। অন্তত তিনি বক্তব্যটা বুঝতে পারেন।

তখ্‌খুনি যদি রোক্কা টাকা ঢেলে দিয়ে টিকিট কাটেন তবে ত ল্যাঠা চুকে গেল, কিন্তু যদি শুধু 'বুক' করান তবে আপনাকে আবার আসতে হবে টাকা দিতে। নগদা টাকা ঢেলে দেওয়াতে অসুবিধা এই যে, পরে যদি মন বদলান তবে রিফাণ্ড পেতে অনেক হাপা পোয়াতে হয়। সে না হয় হল, রেলের বেলাও হয়।

কিন্তু প্লেনের বেলা আরেকটা বিদকুটে নিয়ম আছে। মনে করুন, আপনি ঠিক সময় দমদম উপস্থিত না হতে পারায় প্লেন মিস্ করলেন। রেলের বেলায় তখুনি টিকিট ফেরত দিলে শতকরা দশ টাকার খেসারতির আক্কেলসেলামি দিয়ে ভাড়ার পয়সা ফেরত পাবেন। প্লেনের বেলা সেটি হচ্ছে না। অথচ আপনি

পাকা খবর পেলেন, প্লেনে আপনার সীট ফাঁকা যায় নি, আর-এক বিপদগ্রস্ত ভদ্রলোক পুরো ভাড়া দিয়ে আপনার সীটে ট্র্যাভেল করেছেন, অ্যার কোম্পানিও স্বীকার করল, কিন্তু তবু আপনি একটি কড়িও ফেরত পাবেন না। অ্যার কোম্পানির ডবল লাভ। এ নিয়ে দেওয়ানি মোকদ্দমা লাগালে কী হবে বলতে পারি নে, কারণ আমি আদালতকে ডরাই অ্যার কোম্পানির চেয়েও বেশী।

টিকিট কেটে ত বাড়ি ফিরলেন। তারপর সেই মহা মূল্যবান 'মূল্য-পত্রিকা'খানি পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে প্লেনে দমদম থেকে ছাড়বে দশটার সময়, আপনাকে কিন্তু অ্যার আপিসে হাজিরা দিতে হবে আটটার সময়! বলে কী? নিতান্ত থাড্ডো কেলাসে যেতে হলেও ত আমরা এক ঘণ্টার পূর্বে হাওড়া যাই নে—কাছাকাছির সফর হলে ত আধ ঘণ্টা পূর্বে গেলেই যথেষ্ট, আর যদি ফার্স্ট কিংবা সেকেণ্ডের (প্লেনে আপনি ভাড়া দিচ্ছেন ফার্স্টের চেয়েও বেশী—অনেক সময় ফার্স্টের দেড়া) বার্থ রিজার্ভ থাকে তবে ত আধ মিনিট পূর্বে পৌঁছলেই হয়।

আপনি হয়ত প্লেনে থাকবেন পৌনে দু ঘণ্টা, অথচ আপনাকে অ্যার আপিসে যেতে হচ্ছে পাকা দু ঘণ্টা পূর্বে (মোকামে পৌঁছে সেখানে আরও কত সময় যাবে সে-কথা পরে হবে)।

এইবারে মাল নিয়ে শিরঃপীড়া। আপনি চুয়াল্লিশ (কিংবা বিয়াল্লিশ) পাউণ্ড লগেজ ফ্রী পাবেন। অতএব

"সোনামুগ সরু চাল সুপারি ও পান
ও হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই চারিখান
গুড়ের পাটালি কিছু ঝুনা নারিকেল
দই ভাণ্ড ভাল রাই সরিষার তেল
আমসত্ত্ব আমচুর—"

ইত্যাদি মাথায় থাকুন, বিছানাটি যে নিয়ে যাবেন তারও উপায় নেই। অথচ আপনি গৌহাটি নেমে হয়ত ট্রেনে যাবেন লামডিং, সেখানে উঠবেন ডাকবাংলোয়। বিছানা বিশেষ করে মশারি বিনা কী করে পোয়াবেন দিনরাতিয়া?

বিছানাটা নিলেন কি? না। তার ভেতরে যে ভারী জিনিস কিছু কিছু লুকোবেন ভেবেছিলেন সেটিও তাহলে হল না। অবশ্য লুকিয়ে কোন লাভ হত না, কারণ জিনিসটিকে ওজন ত করা হতই—মালে আপনি ফাঁকি দিতে পারতেন না।

অ্যার ট্রাভেল করবেন—মাত্র চুয়াল্লিশ পাউণ্ড ফ্রী লগেজ—অতএব আপনি নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের মত একটি পিচবোর্ডের কিংবা ফাইবারের সুটকেসে মালমাত্র পুরে—সেটার অবস্থা কি হবে মোকামে পৌঁছলে পরে বলব—রওয়ানা দিলেন অ্যার আপিসের দিকে, ছাতা বরষাতি অ্যাটাচি হাতে, তার জন্যে ফালতো ভাড়া দিতে হবে না (থ্যাঙ্ক ইউ !)।

ট্যাক্সি যখন নিতেই হবে তখন সঙ্গে চললেন দু-একজন বন্ধুবান্ধব। যদিস্যাৎ দৈবাৎ প্লেন মিস করেন তবে একটি কড়িও ফেরত পাবেন না বলে দু-দশ মিনিট আগেই রওনা দিলেন এবং অ্যার আপিসে পৌঁছলেন পাকি সোয়া দু ঘণ্টা পূর্বে—আমার জাতভাই বাঙালরা যে রকম ইষ্টিশানে গাড়ি ছাড়ার তিন ঘণ্টা পূর্বে যায়।

অ্যার আপিসের লোক হন্তদন্ত হয়ে ট্যাক্সি থেকে আপনার মাল নামাবে। সে-লোকটা কুলি-চাপরাসী সমন্বয়—তা হোক গে—কিন্তু তার বাই সে 'হিন্দী'তে —রাষ্ট্রভাষাতে—অর্থাৎ তার অউন, অরিজিন্যাল হিন্দীতে কথা বলবেই—যে-রকম তার বসের ইংরেজী বলার বাই অথচ উভয়পক্ষই বাঙালী।

আমাদের বঙ্কিম, আমাদের রবীন্দ্রনাথ বলতে আমরা অজ্ঞান, কিন্তু এই বাংলা দেশের মহানগরী, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথের লীলাভূমিতেই আপিস আদালতে, রাস্তাঘাটে 'আ মরি বাংলাভাষার' কী কদর, কী সোহাগ।

কলকাতা বাঙালী শহর। বাঙালী বলতে আপনি আমি মধ্যবিত্ত বাঙালীই বুঝি, তাই আমাদের অ্যার আপিসগুলোর অবস্থা মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের মত। অর্থাৎ মাসের পয়লা তিন দিন ইলিশ মুর্গী তারপর আলুভাতে আর মশুর ডাল।

ঢাক-ঢোল শাঁক-করতাল বাজিয়ে যখন প্রথম আমাদের অ্যার আপিসগুলো খোলা হয় তখন সায়েবী কায়দায় বড় বড় কৌচ, বিরাট বিরাট সোফা, এন্তার ফ্যান, হ্যাট-স্ট্যাণ্ড, গ্লাস-টপ টেবিল—তার উপরে থাকত মাসিক, দৈনিক, অ্যাশট্রে আরও কত কী! সাহস হত না বসতে, পাছে জামাকাপড়ের ঘষায় সোফার চামড়া নোংরা হয়ে যায়—চাপরাসীগুলোর উর্দিই ত আমার পোশাকের চেয়ে ঢের বেশী ধোপদুরস্ত ছিমছাম।

আর আজ? চেয়ারগুলোর উপর যা ময়লা জমেছে তাতে বসতে ঘেন্না করে। ফ্যানগুলো ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে ছুটির জন্য আবেদন জানাচ্ছে, দেয়ালে চুনকাম করা হয় নি সেই অন্নপ্রাশনের দিন থেকে—সমস্তটা নোংরা এলোপাতাড়ি আর আবহাওয়াটা ইংরাজীতে যাকে বলে ড্রেয়ারী ডিসমেল।

একটা অ্যার আপিসে দেখেছি—ভিতরে যাবার দরজায় যেখানে হাত দিয়ে

ধাক্কা দিতে হয় সেখানে যা ময়লা জমেছে তার তুলনায় আমাদের রান্নাঘরের তেলচিটে-কালি-মাখা দরজাও পরিষ্কার। আপনি সহজে বিশ্বাস করবেন না আসুন একদিন আমার সঙ্গে, দেখিয়ে দেব।

এইবারে একটু আনন্দের সন্ধান পাবেন। দশাসই লাশদের যখন ওজন করা হবে তখন আড়নয়নে ওজনের কাঁটাটার দিকে নজর রাখবেন। ১৬০ থেকে তামাশা আরম্ভ হয়, তারপর ডবল সেঞ্চুরি পেরিয়ে কেউ কেউ মুস্তাক আলীর মত ট্রিপলের কাছা-কাছি পৌঁছে যান। আমার বন্ধু '—মুখুজ্যে' যখন একবার ওজন নিতে উঠেছিল তখন কাঁটাটা বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে শেষটায় থপ করে শূন্যেতে এসে ভিরমি গিয়েছিল। মুখুজ্যে আমাকে হেসে বলেছিল, 'কিন্তু ভাড়া তুমি যা দাও আমিও তাই।'

কী অন্যায়!

তারপর আবার সেই একটানা একঘেয়ে অপেক্ষা।

তিন কোয়ার্টার পরে খবর আসবে মালপত্র সব বাসে তোলা হয়ে গিয়েছে। আপনারা গা-তুলুন।

রবি ঠাকুর কী একটা গান রচেছেন না?

"আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে
তোমার সুরে সুর মেলাতে—"

অ্যার কোম্পানির বাসগুলো কিন্তু আপিসগুলোর সঙ্গে দিব্য সুর মিলিয়ে বসে আছে। লড়াইয়ের বাজারে যখন বিলেত থেকে নূতন মোটর আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন কচু-বন থেকে কুড়িয়ে আনা যে-সব বাস গ্রামাঞ্চলে চড়েছিলুম, আমাদের অ্যার কোম্পানির বাস প্রায় সেই রকম। ওদেরই আপিসের মত নোংরা, নড়বড়ে আর সীটগুলোর স্প্রিং অনেকটা আরবীস্তানের উটের পিঠের মত। 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন' হওয়ার শখ যদি আপনার হয়, আরব দেশ না গিয়ে, তবে এই বাসের যে-কোন একটা দু দণ্ডের তরে চড়ে নিন। আপনার মনে আর খেদ থাকবে না।

মধ্য-কলকাতা থেকে দমদম ক মাইল রাস্তা সে-খবর বের করা বোধ হয় খুব কঠিন নয়; কিন্তু সেই বাসে চড়ে আপনার মনে হবে

'যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ!

মোটর, ট্যাক্সি, স্টেট বাস, বে-সরকারী বাস এমন কি দু-চারখানা সাইকেল রিক্শাও আপনাকে পেরিয়ে চলে যাবে। ত্রিশ না চল্লিশ যাত্রীকে এক খেপে দমদম নিয়ে যাবার জন্য তৈরি এই ঢাউশ বাস—প্রতি পদে সে জাম্ হয়ে যায়,

ড্রাইভার করবে কী, আপনিই বা বলবেন কী ?

দিল্লি থেকে কলকাতা আসবার সময় একবার দেখেছিলুম, যে-যাত্রী প্লেনের দোলাতে কাতর হয় নি সে এই বাসের ঝাঁকুনিতে বমি করেছিল।

দমদম পৌঁছলেন। এবারে প্লেন না-ছাড়া পর্যন্ত একটানা প্রতীক্ষা। -সেও প্রায় তিন কোয়ার্টারের ধাক্কা।

তবে সময়টা অত মন্দ কাটবে না। জায়গাটা সাফ-সুতরো, বইয়ের স্টল আছে, দমদম আন্তর্জাতিক অ্যার পোর্ট বলে জাত-বেজাতের লোক ঘোরাঘুরি করছে, ফুটফুটে ফরাসী মেম থেকে কালো-বোরকায়-সর্বাঙ্গ-ঢাকা পর্দানশিনী হজ-যাত্রিণী সব কিছুই চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবে।

তবে একথাও ঠিক, হাওড়ার প্লাটফর্মের তুলনায় এখানে উত্তেজনা এবং চাঞ্চল্য কম।

প্লেনে যখন মাল আর আপনার জায়গা হবেই তখন আর হুড়োহুড়ি করার কী প্রয়োজন ?

তবু ভারতবর্ষ তাজ্জব দেশ। দিন কয়েক পূর্বে দমদম অ্যার পোর্ট রেস্তরাঁয় ঢুকে এক গ্লাস জল চাইলুম। দেখি জলের রঙ ফিকে হলদে। শুধালুম, শরবত কি ফ্রি বিলানো হচ্ছে ?

বয় বললে, জলের টাঁকি সাফ করা হয়েছে, তাই জল ঘোলা, এবং মৃদুস্বরে উপদেশ দিলে, ও জল না খাওয়াই ভাল।

শুনেছি ইয়োরোপের কোন কোন দেশে নরনারী এমন কী কাচ্চা-বাচ্চারাও নাকি জল খায় না। দমদমাতে যদি কিছুদিন ধরে নিত্যি নিত্যি টাকি সাফ করা হয় তবে আমরা সবাই সায়েব হয়ে যাব।

শুধু কি তাই, জলের জন্য উদ্বাস্তুরা উদ্ব্যস্ত করে তুলবে না কলকাতা কর্পোরেশনকে। আমরা সবাই এখন রুটির বদলে কেক খাব। সে-কথা থাক্।

কিন্তু দমদম অ্যার পোর্টের সত্যিকার জলুস খোলে যেদিন ভোরে কুয়াশা জমে। কাণ্ডটা আমি এই শীতেই দুবার দেখেছি। ভোর থেকে যে সব প্লেনের দমদম ছাড়ার কথা ছিল তার একটাও ছাড়তে পারে নি। তার প্যাসেঞ্জার সব বসে আছে অ্যার পোর্টে।

আরও যাত্রী আসছে দলে দলে, তাদেরও প্লেন ছাড়তে পারছে না, করে করে প্রায় দশটা বেজে গেল। এক দিক থেকে যাত্রীরা চলে যাচ্ছে, অন্য দিক থেকে আসছে; এই স্রোত বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তখন দমদমাতে যে যাত্রীর বন্যা জাগে, তাদের উৎকণ্ঠা, আহারাদির সন্ধান, খবরের জন্য অ্যার কোম্পানির

কর্মচারীদের বার বার একই প্রশ্ন শোধানো, 'ড্যাম ক্যালকাটা ওয়েদার' ইত্যাদি কটুবাক্য, নানা রকমের গুজব—কোথায় নাকি কোন্ প্লেন ক্র্যাশ করেছে, কেউ জানে না—যে-সব বন্ধুরা 'সী-অফ্' করতে এসেছিলেন তাঁদের আপিসের সময় হয়ে গেল অথচ চলে গেলে খারাপ দেখাবে বলে কষ্টে আত্মসম্বরণ, প্লেন 'টেক অফ' করতে পারছে না ওদিকে ব্রেকফাস্টের সময় হয়ে গিয়েছে বলে যাত্রীদের স্ত্রী খাওয়ানো হচ্ছে, কঞ্জুস কোম্পানিরা গড়িমসি করছে বলে তাদের যাত্রীদের অভিসম্পাত—আরও কত কী!

লাউড স্পীকার ভোর ছটা থেকে রা কাড়ে নি। খবর দেবেই বা কী?

দমদম নর্থ-পোল হলে কী হত জানি নে। শেষটায় কুয়াশা কাটল। হঠাৎ শুনি লাউড স্পীকারটা কুয়াশায়-জমা গলার কাশি বার কয়েক সাফ করে জানালে, 'অমুক জায়গার প্যাসেঞ্জাররা অমুক প্লেনে (ডি বি জি, হি বি জি, হিজিবিজি কী নম্বর বললে বোঝা গেল না) করে রওয়ানা দিন।'

আমি না হয় ইংরেজী বুঝি নে, আমার কথা বাদ দিন, কিন্তু লক্ষ্য করলুম, আরও অনেকে বুঝতে পারেন নি। গোবেচারীরা ফ্যাল ফ্যাল করে ডাইনে বাঁয়ে তাকালে, অপেক্ষাকৃত চালাকেরা অ্যার আপিসে খবর নিলে, শেষটায় যে প্লেন ছাড়বে তার কোম্পানির লোক আমাদের ডেকে-ডুকে জড়ো করে প্লেনের দিকে রওয়ানা করে দিলে—পাণ্ডারা যে-রকম গাঁইয়া তীর্থযাত্রীদের ধাক্কাধাক্কি দিয়ে ঠিক-গাড়িতে তুলে দেয়।

আমার সঙ্গে পাশাপাশি বসে যাচ্ছিলেন এক মারোয়াড়ী ভদ্রলোক। আমাকে বললেন, 'আজকাল ত অনেক ইংরেজী না-জাননেওয়ালা যাত্রী-ভী প্লেনে চড়ছে তব্ বাঙালী জবান মে প্লেনকা খবর বলে কাহে?'

ওই বুঝলেই ত পাগল সারে।

দেবরাজকে সাহায্য করে রাজা দুষ্মন্ত যখন পুষ্পক রথে চড়ে পৃথিবীতে ফিরছিলেন, তখন যেমন যেমন তিনি পৃথিবীর নিকটবর্তী হতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় পর্বত, গৃহ অট্টালিকা অতিশয় দ্রুত গতিতে তার চক্ষুর সম্মুখে বৃহৎ আকার ধারণ করতে লাগল। যতদূর মনে পড়ছে, রাজা দুষ্মন্ত তখন তাই নিয়ে রথীর কাছে আপন বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

পুনার জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তারই উল্লেখ করে আমার কাছে সপ্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে, দুষ্মন্তের যুগ পর্যন্ত ভারতীয়েরা নিশ্চয়ই খ-পোত নির্মাণ করতে পারতেন, না হলে রাজা ক্রমাসন্ন পৃথিবীর এহেন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিলেন কী প্রকারে?

তার বহু বৎসর পরে একদা রমণ মহর্ষি একটা ঘটনা বিশদভাবে পরিস্ফুট করার জন্য তুলনা দিয়ে বলেন, উপরের থেকে নীচের দিকে দ্রুতগতিতে আসার সময় পৃথিবীর ছোট ছোট জিনিস যে রকম হঠাৎ বৃহৎ অবয়ব নিতে আরম্ভ করে, ঠিক সেই রকম ইত্যাদি, ইত্যাদি।

মহর্ষির এক প্রাচীন ভক্ত আমার কাছে বসে ছিলেন। আমাকে কানে কানে বললেন 'এখন ত তোমার বিশ্বাস হল যে, মহর্ষি যোগবলে উড্ডীয়মান হতে পারেন।' আমায় এ-কথাটি তাঁর বিশেষভাবে বলার কারণ এই যে, আমি একদিন অলৌকিক ঘটনার আলোচনা প্রসঙ্গে একটি ফার্সী প্রবাদবাক্য উল্লেখ করে বলেছিলুম :—

"পীররহা নমীপরন্দ্,
শাগিরদান উম্বারা মীপবানন্দ্।"

অর্থাৎ 'পীর (মুরশীদ) ওড়েন না, তাঁদের চেলারা ওঁদের ওড়ান (cause them fly)।'

তার কিছুদিন পরে আমি রমণ মহর্ষির পীঠস্থল তীরু-আন্নামালাই (শ্রীআন্না-মালাই) গ্রামের নিকটবর্তী অরুণাচল পর্বত আরোহণ করি। মহর্ষি এই পর্বতে প্রায় চল্লিশ বৎসর নির্জনে সাধনা করার পর তীরু-আন্নামালাই গ্রামে অবতরণ করেন—সাধারণ ভাষায় অবতীর্ণ হন।

পাহাড়ের উপর থেকে রমণাশ্রম দ্রৌপদী-মন্দির সব কিছু খুব ছোট দেখাচ্ছিল। তারপর নামবার সময় পাহাড়ের সানুদেশে এক জায়গায় খুব সোজা এবং বেশ ঢালু পথ পাওয়ায় আমি ছুটে সেই পথ দিয়ে নামতে আরম্ভ করলুম এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলুম, আশ্রম, দ্রৌপদী-মন্দির কী রকম অদ্ভুত দ্রুত-গতিতে বৃহৎ আকার ধারণ করতে লাগল।

আমার এ-অভিজ্ঞতা থেকে এটা কিছু সপ্রমাণ হয় না যে পুষ্পক রথ কল্পনার সৃষ্টি কিংবা রমণ মহর্ষি যোগবলে আকাশে উড্ডীয়মান হন নি, কিন্তু আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, দ্রুতগতিতে অবতরণ করার সময় ভূপৃষ্ঠ কীরূপ বৃহৎ আকার ধারণ করতে থাকে।

কিন্তু এর উল্টোটা করা কঠিন, কঠিন কেন, অসম্ভব। অর্থাৎ দ্রুতগতিতে উপরের দিকে যাচ্ছি আর দেখছি পৃথিবীর তাবৎ বস্তু ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে—এ-জিনিস অসম্ভব কারণ দৌড় দিয়ে উপরের দিকে যাওয়া যায় না।

সেটা সম্ভব হয় অ্যারোপ্লেন চড়ে।

মাটির উপর দিয়ে প্লেন চলছিল মারাত্মক বেগে, সেটা ঠাহর হচ্ছিল অ্যারো-

ড্রোমের দ্রুত পলায়মান বাড়িঘর, হ্যাঙ্গার, ল্যাম্পপোস্ট থেকে ; কিন্তু সেই প্লেন যখন শ পাঁচেক ফুট উপরে উঠে গেল, তখন মনে হল আর যেন তেমন জোর গতিতে সামনের দিকে যাচ্ছি নে।

উপরের থেকে নীচের দিকে তাকাচ্ছি বলে খাড়া নারকেল গাছ, টেলিফোনের খুঁটি, তিনতলা বাড়ি ছোট ত দেখাচ্ছিলই, কিন্তু সব কিছু যে কতখানি ছোট হয়ে গিয়েছে, সেটা মালুম হল, পুকুর, ধানক্ষেত আর রেল-লাইন দেখে। ঠিক পাখির মত প্লেনও এক-একবার গা-ঝাড়া দিয়ে এক এক ধাক্কায় উঠে যাচ্ছিল বলে নীচের জিনিস ছোট হয়ে যাচ্ছিল এক এক ঝটকায়।

জয় মা-গঙ্গা! অপরাধ নিয়ো না মা, তোমাকে পবননন্দন পদ্ধতিতে ডিঙিয়ে যাচ্ছি বলে। কিন্তু মা, তুমি যে সত্যি মা, সেটা ত এই আজ বুঝলুম তোমার উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময়। তোমার বুকের উপর কৃষ্ণাম্বরী শাড়ি, আর তার উপর শুয়ে আছে অগুনতি খুদে খুদে মানওয়ারী জাহাজ, মহাজনী নৌকা—আর পানসি-ডিঙির ত লেখাজোখা নেই। এতদিন এদের পাড় থেকে অন্য পরিপ্রেক্ষিতে দেখছি বলে হামেশাই মনে হয়েছে জাহাজ নৌকা এরা তেমন কিছু ছোট নয়, আর তুমিও তেমন কিছু বিরাট নও, কিন্তু 'আজ কী এ দেখি, দেখি, দেখি, আজ কী দেখি—' এই যে ছোট ছোট আণ্ডাবাচ্চারা তোমার বুকের উপর নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে আছে, তারা তোমার বুকের তুলনায় কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য। এদের মত হাজার হাজার সন্তান-সন্ততিকে তুমি অনায়াসে তোমার বুকের আঁচলে আশ্রয় দিতে পার।

প্লেন একটুখানি মোড় নিতেই হঠাৎ সর্বব্রহ্মাণ্ডের সূর্যরশ্মি এসে পড়ল মা-গঙ্গার উপর। সঙ্গে সঙ্গে যেন এ-পার ও-পার জুড়ে আগুন জ্বলে উঠল, কিন্তু এ আগুন যেন শুভ মল্লিকার পাপড়ি দিয়ে ইস্পাত বানিয়ে।

সেদিকে চোখ ফিরে তাকাই তার কী সাধ্য? মনে হল স্বয়ং সূর্যদেবের—রুদ্রের—মুখের দিকে তাকাচ্ছি ; তিনি যেন শুধু স্বচ্ছ রজত-যবনিকা দিয়ে বদন আচ্ছাদন করে দিয়েছেন। এ কী মহিমা, এ কী দৃশ্য! কিন্তু এ আমি সইব কী করে? তোমার দক্ষিণ মুখ দেখাও, রুদ্র। হে পূষন্, আমি উপনিষদের জ্যোতিদ্রষ্টা ঋষি নই, যে বলব—

'হে পূষন্, সংহরণ
করিয়াছ তব রশ্মিজাল
এবার প্রকাশ করো
তোমার কল্যাণতম রূপ,

দেখি তারে যে-পুরুষ
তোমার আমার মাঝে এক।'

আমি বলি, তব রশ্মিজাল তুমি সংহরণ কর, তুমি আমাকে দেখা দাও, তোমার মধুর রূপে, তোমার রুদ্র রূপে নয়। তোমার বদন যবনিকা ঘনতর করে দাও।

তাই হল—হয়ত প্লেন তাঁরই আদেশে পরিপ্রেক্ষিত বদলিয়েছে—এবার দেখি গঙ্গাবক্ষে স্নিগ্ধ রজত-আচ্ছাদন, আর তার উপর লক্ষ কোটি অলস সুরসুন্দরীরা শুধু তাদের নূপুর দৃশ্যমান করে নৃত্য আরম্ভ করেছেন। কিন্তু এ-নৃত্য দেখবার অধিকার আমার আছে কি? রুদ্র না হয় অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর চেলা নন্দীভৃঙ্গীরা ত রয়েছেন! স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সমঝে চলতেন, যদিও ওদিকে পুষনের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল, তাই বলেছেন :—

'ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গী দল
রক্ত-আঁখি!'

অষ্ট্রিচ পাখি যে-রকম ভয় পেলে বালুতে মাথা গুঁজে ভাবে, কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না, আমিও ঠিক তেমনি পকেট থেকে কালো চশমা বের করে পরলুম—এইবারে নূপুর-নৃত্য দেখতে আর কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

শুনি, 'স্যর, স্যর।' এ কী জ্বালা। চেয়ে দেখি প্লেনের স্টুয়ার্ড ট্রেতে করে সামনে লজেঞ্জুস ধরেছে। বিশ্বাস করবেন না, সত্যি লজেঞ্জুস! লাল, নীল, ধলা, হরেক রঙের। লোকটা মস্করা করছে নাকি—আমি ছোঁড়ার বাপের বয়সী—আমাকে দেখাচ্ছে লজেঞ্জুস! তারপর কি ঝুমঝুমি দিয়ে বলবে, 'বাপধন, এইটে দোলাও দেখিনি, ডাইনে বাঁয়ে, ডাইনে—আর—বাঁয়ে।'

এদিকে প্রকৃতির রসরঙ্গ, ওদিকে লজেঞ্জুসের রস। আমি মহাবিরক্তির সঙ্গে বললুম, 'থ্যাঙ্ক ইউ'

লোকটা আচ্ছা গবেট ত! শুধালে, 'থ্যাঙ্ক ইউ, ইয়েস, অর থ্যাঙ্ক ইউ, নো?' মনে মনে বললুম, 'তোমার মাথায় গোবর।' বাইরে বললুম, 'নো।' কিন্তু এবারে আর 'থ্যাঙ্ক ইউ' বললুম না।

কিন্তু বিশ্বাস করবেন না, মশাইরা, বেশীর ভাগ ধেড়েরাই লজেঞ্জুস নিলে এবং চুষলে।

তবে কি হাওয়ায় চড়ে ওদের গলা শুকিয়ে গিয়েছে, আর ওই বাচ্চাদের মাল নিয়ে গলা ভেজাচ্ছে? আল্লায়, মালুম।

ও মা, ততক্ষণে দেখি সামনে আবার গঙ্গা। কাটোয়ার বাঁক।

প্লেন আবার গঙ্গা ডিঙল। ওকে ত আর খেয়ার পয়সা দিতে হয় না। কে বলেছে :—

'ভাগ্যিস আছিল নদী জগৎ সংসারে
তাই লোকে কড়ি দিয়ে যেতে পারে
ও-পারে ??'

ভাষা ও জনসংযোগ

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র দোল সংখ্যায় (১৯৫৩) শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র সেন 'বাংলা-সাহিত্যের অতীত এবং ভবিষ্যৎ' শীর্ষক একটি সুচিন্তিত এবং তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন। হিন্দী ইংরেজী বনাম বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে যাঁরা কৌতূহলী, তাঁদের সকলকে আমি এই প্রবন্ধটি পড়তে অনুরোধ করি—তাঁরা লাভবান হবেন।

আমার আলোচনায় জানা-অজানাতে প্রবোধচন্দ্রের অনেক যুক্তি এসে গিয়েছে এবং আসবে। প্রবোধচন্দ্র না হয়ে অন্য কোন কাঁচা লেখক হলে আমি আমার লেখাতে পদে পদে তাঁর উদ্ধৃতির ঋণ স্বীকার করতুম—কিন্তু এঁর বেলা সেটার প্রয়োজন নেই, কারণ প্রবোধবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত, তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য বাংলা ভাষা যেন তাঁর ন্যায্য হক্ক পায় এবং সেই হক্ক সপ্রমাণ করার জন্য কে তাঁর লেখা থেকে কতখানি সাহায্য পেল, সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। এবং আমার বিশ্বাস, দরকার হলে তিনিও অন্য লেখকের রচনা থেকে যুক্তি-তর্ক আহরণ করতে কুণ্ঠিত হবেন না। আমার লেখা তাঁকে সাহায্য না-ই করল।

প্রাচ্যে যে-সব বড় আন্দোলন হয়ে গিয়েছে, সে-সব আন্দোলন শুধু যে তার জন্মভূমিতেই সফল হয়েছে তাই নয়, তার ঢেউ পশ্চিমকেও তার সুপ্তিতে জাগরণ এনে দিয়েছে, সে-সব আন্দোলনকে আমরা সচরাচর ধর্মের পর্যায়ে ফেলে নবধর্মের অভ্যুদয় নাম দিয়ে থাকি। ভারতবর্ষে তাই বৌদ্ধ ও জৈনদের দুই বৃহৎ আন্দোলনকে আমরা ধর্মের আখ্যা দিয়েছি, সেমিতি ভূমিতে ঠিক ওই রকমই দুই মহাপুরুষকে কেন্দ্র করে দুটি জোরাল আন্দোলন সৃষ্ট হয়—তাদের নাম খ্রীষ্টধর্ম এবং ইসলাম।

আজকের দিনে ধর্ম বলতে আমরা প্রধানত বুঝি, মানুষের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক। পূজা-অর্চনা কিংবা কৃচ্ছ্রসাধন ধ্যানাদি করে, কী করে ভগবানকে পাওয়া যায় ধর্ম সেই পন্থা দেখিয়ে দেয়, এই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু একটুখানি

ধর্মের ইতিহাস অধ্যয়ন করলেই দেখতে পাবেন, ভগবানকে পাওয়ার জন্য ধর্ম যতখানি মাথা ঘামিয়েছে তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী চেষ্টা করেছে, মানুষে মানুষে সম্পর্ক সভ্যতর করার জন্য। ধর্ম চেষ্টা করেছে, ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য কমাতে, অন্ধ-আতুরের আশ্রয় নির্মাণ করাতে—এক কথায়, এমন এক নবীন সমাজ গড়ে তুলতে যেখানে মানুষ মাৎস্যন্যায় বর্জন করে, একে অন্যের সহযোগিতায় আপন আপন শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ করতে পারে। বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম এই সব কাজেই মনোযোগ করেছে বেশী—ভগবানের সান্নিধ্য এবং তার সাহায্য সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে।

বিত্তশালী এবং পণ্ডিতের সংখ্যা সংসারে সব সময়েই কম ছিল বলে বড় আন্দোলনকারী মাত্রই এদের উপেক্ষা করে জনগণকে কাছে আনতে—এমন কী 'খেপিয়ে তুলতে'—চেষ্টা করেছেন প্রাণপণ। তাই তাঁরা বিত্তশালী এবং পণ্ডিতের ভাষা উপেক্ষা করে যে-ভাষায় কথা বলেছেন, সেটা জনগণের ভাষা। তথাগতের ভাষা তৎকালীন গ্রাম্য ভাষা পালি এবং মহাবীরের ভাষা অর্ধমাগধী, খ্রীষ্টের ভাষা হিব্রুর গ্রাম্য সংস্করণ, আরামেয়িক এবং মুহম্মদের (দঃ) ভাষা আরবী। আরবী সে-যুগে এতই অনাদৃত ছিল যে, আরবেরাই আশ্চর্য হল, এ-ভাষায় আল্লা তাঁর কুরআন প্রকাশ (অবতরণ = নাজিল) করলেন কেন? তারই উত্তর কুরআনে রয়েছে,

আল্লা বলেছেন :

"Had we sent as
A Quaran (in a language)
Other then Arabic, they would
Have said : why are not
It's verses explained in detail ?
What ! (a book.) not in Arabic
And (a Messenger an Arab ?)"

অর্থাৎ "আমরা যদি আরবী ভিন্ন অন্য কোন ভাষাতে কুরআন পাঠাতুম, তা হলে তারা বলত, এর বাক্যগুলো ভাল করে বুঝিয়ে বলা হয় নি কেন? সে কি! বই আরবীতে নয় অথচ পয়গম্বর আরব?"

আল্লা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, আরব পয়গম্বর যে আরবী ভাষায় কুরআন অবতরণের ভাষা ব্যবহার করবেন সেই ত স্বাভাবিক, অন্য যে-কোন ভাষায় (এবং সে যুগে হীব্রু ছিল পণ্ডিতের ভাষা) সে কুরআন পাঠানো হলে মক্কার

লোক নিশ্চয়ই বলত, 'আমরা ত এর অর্থ বুঝতে পারছি নে।'

গণ-আন্দোলনে সব চেয়ে বড় কথা—আপামর জনসাধারণ যেন বক্তার বক্তব্য স্পষ্ট বুঝতে পারে।

তাই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের চতুর্দিকে যে-আন্দোলন গড়ে উঠল, তার ভাষা বাংলা, তুকারামের ভাষা মারাঠী (তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছেন, সংস্কৃতই কেবল সাধুভাষা?—তবে কি মারাঠী চোরের ভাষা), কবীরের ভাষা সে-সময়ে প্রচলিত হিন্দী এবং তিনিও বলেছেন, "সংস্কৃত কূপজল (তার জন্য ব্যাকরণের দড়ি-লোটার প্রয়োজন) কিন্তু 'ভাষা' (অর্থাৎ চলতি ভাষা) 'বহতা' নীর—যখন খুশি ঝাঁপ দাও, শান্ত হবে শরীর।" রামমোহন, দয়ানন্দ আপন আপন মাতৃভাষায় তাঁদের বাণী প্রচার করেছিলেন, আর শ্রীরামকৃষ্ণ যে-বাংলা ব্যবহার করে গিয়েছেন, তার চেয়ে সোজা সরল বাংলা আজ পর্যন্ত কে বলতে পেরেছেন? এমন কি বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁর বিপক্ষ দলকে উপদেশ দিয়েছিলেন সংস্কৃত না লিখে বাংলায় উত্তর দিতে। তিনি নিজেও সংস্কৃতে লেখেন নি, যদিও তিনি সংস্কৃত জানতেন আর-সকলের চেয়ে বেশী।

আমার মনে হয় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পতনের অন্যতম কারণ সেদিনই জন্ম নিল, যেদিন বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতেরা দেশজ ভাষা ত্যাগ করে সংস্কৃতে শাস্ত্রালোচনা আরম্ভ করলেন। দেশের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল, ওদিকে সংস্কৃতে শাস্ত্রচর্চা করতে ব্রাহ্মণদের ঐতিহ্য ঢের ঢের বেশী—বৌদ্ধ-জৈনদের হার মান ত হল।

পৃথিবী জুড়ে আরও বহু বিরাট আন্দোলন হয়ে গিয়েছে—পণ্ডিতী ভাষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, মাতৃভাষার উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করে।

এইবারে নিবেদন, ইতিহাস আলোচনা করে দেখান ত পৃথিবীর কোথায় কোন্ মহান এবং বিরাট আন্দোলন হয়েছে জনগণের কথ্য এবং বোধ্য ভাষা বর্জন করে?

এ-তত্ত্ব এতই সরল যে, এটাকে প্রমাণ করা কঠিন। স্বতঃসিদ্ধ জিনিস প্রমাণ করতে গেলেই প্রাণ কণ্ঠাগত হয়।

আটঘাট বেঁধে পূর্বেই প্রমাণ করেছি, এসব আন্দোলন নিছক ধর্মান্দোলন (অর্থাৎ আত্মা-পরমাত্মাজনিত) নয়, এদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অংশ অনেক বেশী গুরুত্বব্যঞ্জক।

তাই ভারতবর্ষ এখন যে নবীন রাষ্ট্র নির্মাণের চেষ্টা করছে, তার সঙ্গে এই সব আন্দোলনের পার্থক্য অতি সামান্য এবং তুচ্ছ। এই যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

করা হয়েছে, তার সাফল্যের বৃহদংশ নির্ভর করবে জনগণের সহযোগিতার উপর—এ-কথা পরিকল্পনার কর্তাব্যক্তিরা বহুবার স্বীকার করেছেন এবং ক্রমেই বুঝতে পারছেন, উপর থেকে পরিকল্পনা চাপিয়ে কোনও দেশকে উন্নত করা যায় না—যদি নীচের থেকে, জনগণের হৃদয়মন থেকে সাড়া না আসে, সহযোগিতা জেগে না ওঠে।

আমাদের সর্ব প্রচেষ্টা, সর্ব অর্থব্যয়, সর্ব কৃচ্ছ্রসাধন সম্পূর্ণ নিষ্ফল হবে যদি আমরা আমাদের সর্ব পরিকল্পনা সর্ব প্রচেষ্টা জনগণের বোধ্য ভাষায় তাদের সম্মুখে প্রকাশ না করি। এ-বিষয়ে আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই।

আমি জানি, ভারতবর্ষ এগিয়ে যাবেই, কেউ ঠেকাতে পারবে না। শুধু যাঁরা অন্তহীনকাল ধরে ইংরেজীর সেবা করতে চান, তাঁরা ভারতের অগ্রগামী গতিকে মন্থর করে দেবেন মাত্র।

এ বিশ্বাস না থাকলে আমি বার বার নানা কথা এবং একাধিকবার একই কথা বলে বলে আপনাদের বিরক্তি ও ধৈর্যচ্যুতির কারণ হতুম না॥

ইংরেজী বনাম মাতৃভাষা

'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'এ সুপণ্ডিত, প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার 'কম্পালসরি হিন্দী—ইট্‌স্ এফেক্‌ট্ অন্ এডুকেশন' শীর্ষক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধের পূর্বার্ধে তিনি দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন। প্রথমত, অ-হিন্দী অঞ্চলের আপন ভাষা—যথা বাংলা, মারাঠী, দক্ষিণী ভাষাগুলোর স্থান হিন্দী দখল করে নিয়ে সে-সব অঞ্চলে একে অন্যের যোগসূত্রের এবং সাহিত্যে কলাসৃষ্টির মাধ্যম হতে পারবে কি? দ্বিতীয়ত, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার জগতে আমরা যদি দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখি, তবে এটা কি কাম্য হবে যে, হিন্দী ইংরেজীর জায়গা দখল করে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হয়ে উঠুক?

নানা যুক্তি তর্ক দিয়ে শ্রীযুত সরকার সপ্রমাণ করেছেন, বাংলা, মারাঠী ইত্যাদির স্থান হিন্দী কখনও দখল করতে পারবে না। আমরাও তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরেও তিনি বলেছেন, ইংরেজীর স্থলে হিন্দী কাম্য হতে পারে না। শ্রীযুত সরকার তাই ব্যবসা-বাণিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য ভারতবর্ষে ইংরেজীই চালু রাখতে চান। বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি ইংরেজীকেই শিক্ষার মাধ্যমরূপে রাখতে চান—না হিন্দী, না বাংলা, এবং তাঁর লেখাতে তিনি এমন

কোনও ইঙ্গিতও দেন নি যে, আজ হোক কিংবা এক শ বছর পরেই হোক, শেষ পর্যন্ত বাংলাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হবে। তাঁর ব্যবস্থা অনুযায়ী দেখতে পাচ্ছি, ইংরেজীই অজরামররূপে চিরকাল আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যম হয়ে থাকবে।

সরকার মহাশয় ইংরেজী ভাষার যে গুণকীর্তন করেছেন তার সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত। ইংরেজীর মত আন্তর্জাতিক ভাষা পৃথিবীতে আর নেই, অদ্যকার (বিশেষ জোর দিয়ে আমিও বলছি অদ্যকার) দিনে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং দর্শনের চর্চা করতে হলে ইংরেজী ভিন্ন গত্যন্তর নেই।

কিন্তু ইংরেজী চিরকাল এদেশের শিক্ষার মাধ্যম, তথা উচ্চাঙ্গ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বাহন হয়ে থাকবে এ ব্যবস্থা আমরা কাম্য বলে মনে করি নে।

এ কথা ঠিক যে, আজই যদি আমরা ইংরেজী বর্জন করি, তবে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হব, কিন্তু কোনও দিনই শিক্ষার মাধ্যমরূপে বর্জন করতে পারব না একথা আমরা বিশ্বাস করি নে।

পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচ্য দেশের অবস্থা আজ কী? আরব ভূখণ্ড বিশেষ করে মিশরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা কি দিল্লি-কলকাতার চেয়ে অনেক কম? মিশরে জ্ঞানচর্চার মাধ্যম আরবী, ইংরেজী না ফরাসী? 'অজহর' মুসলিম শাস্ত্রালোচনার পীঠস্থল—সেখানে যে আরবী মাধ্যম হবে, তাতে আর কী সন্দেহ! তাই সে-দৃষ্টান্ত দেব না, কিন্তু য়ুরোপীয় ঢঙে নির্মিত বাকী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম ত ফরাসী নয়, ইংরেজীও নয়। অথচ তারা দিব্য আরবীর মাধ্যমেই আলোপ্যাথি, য়ুরোপীয় ইঞ্জিনীয়ারিং শিখছে, তাদের পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রতিবেদন (রিপোর্ট) আরবীতেই বেরয়। বিদেশী অধ্যাপকদের আরবী শিখে সে-ভাষাতেই পড়াতে হয়।

আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যম ফরাসীস্? বা তেহরানে?

এই যে চীনে, এতবড় রাজনৈতিক ও সামাজিক নবজাগরণ হয়েছে সে কি রাশানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যম করে? না, আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাশান শিক্ষার মাধ্যম, কিংবা চীনারা তাঁদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা রাশান ভাষায় আরম্ভ করে দিয়েছেন? পণ্ডিতজী তাঁর চিন্তার ফল ইংরেজীতে প্রকাশ করেন, কিন্তু মাওৎসে তুঙ রাশানে কেতাব লিখেছেন, এ-কথা ত কখনও শুনি নি।

জাপানে শিক্ষার মাধ্যম কি ইংরেজী? জাপানীদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বেরয় কোন্ ভাষায়?

শ্রীযুক্ত সরকার বলেছেন,—"Even in the Latin Republics of

South America, English is fast advancing as the medium of commercial communication and displacing (except for petty purely local transactions) Portuguese and in some of the States corrupt Spanish by the people."

লাতিন-আমেরিকা সম্বন্ধে আমার সাক্ষাৎজ্ঞান নেই, তাই 'পেটি প্যুরলি লোকাল ট্রানজ্যাকশনস্' বলতে শ্রীযুক্ত সরকার কী বলতে চেয়েছেন, ঠিক বুঝতে পারলুম না। তবে কি ওইসব অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী? এমন কথা ত কখনও শুনি নি—বরঞ্চ আমার ঠিক ঠিক জানা আছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে, জর্মনির ইস্কুলে যারা লাতিন গ্রীক পড়ত না তাদের বাধ্য হয়ে ইংরেজী, ফরাসী এবং স্প্যানিশের মধ্যে যে-কোনও দুটো শিখতে হত এবং লাতিন আমেরিকায় ইংরেজীর চেয়ে স্প্যানিশের মাধ্যমেই ব্যবসা-বাণিজ্য ভাল চলবে এ-তত্ত্ব জানা থাকায় বহু ছেলেমেয়ে স্প্যানিশ শিখত।

লাতিন আমেরিকা অনেক দূরের পাল্লা—এবারে ইংলণ্ডের খুব কাছে চলে আসা যাক—ইংরেজী ভাষার গুণ-গরিমা প্রতিবেশী হিসাবে যারা সব চাইতে বেশী জানে এবং বোঝে। এরা সংখ্যায় খুব নগণ্য তবু ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যম করে নেয় নি। হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোতে কি শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী, না তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে ইংরেজীতে? এদের ব্যবসা-বাণিজ্যের বেশ একটা বড় হিস্যা ইংলণ্ডের সঙ্গে, কিন্তু কই, তারাও ত তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী অবশ্যপাঠ্য করে নি? আজকের দিনের সঠিক খবর বলতে পারব না, তবে যতদূর জানা আছে, যারা উচ্চশিক্ষাভিলাষী তাদের হয় শিখতে হয় লাতিন-গ্রীক, নয় ইংরেজী, ফরাসী, জর্মন, স্প্যানিশ ইত্যাদির যে-কোন দুটো ভাষা।

এখন প্রশ্ন, যারা মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য একটি কিংবা দুটি ভাষা শেখে তাদের জ্ঞানগম্যি ওসব ভাষাতে কতখানি হয়? পণ্ডিতদের কথা হচ্ছে না, তাঁদের সংখ্যা অতিশয় নগণ্য। জর্মন পণ্ডিতমাত্রই ক্লাসিক্স্ এবং ফরাসী, ইংরেজী, ইতালীয় পড়ে বুঝতে পারেন, ইংরেজ পণ্ডিতদের বেশীর ভাগ ফরাসী জর্মন পড়তে পারেন—বিশেষ করে যাঁরা অর্থনীতির চর্চা করবেন তাঁদের মাসিক পত্রিকায় জমবার্ট, শুমপেটার পড়ার জন্য বাধ্য হয়ে জর্মন শিখতে হত। অ্যাটম-বমের গবেষণা করেছেন আমেরিকাতে বসে জর্মনরাই, কিংবা যাঁরা জর্মন জানতেন।

কিন্তু ইয়োরোপে আর যারা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজী শেখে, ইস্কুল কলেজ ছাড়ার পর তারা ওই ভাষাতে জ্ঞান-চর্চা করে কতটুকু? উচ্চশিক্ষিত

ইংরেজমাত্রই অন্তত আট বছর ফরাসী শেখেন—কিন্তু কলেজ ছাড়ার বছর পাঁচেক পরই এঁরা আর ফরাসী বই কেনেন না। আমি এঁদের বাড়ির কেতাবের শেল্‌ফ্‌ মনোযোগ করে দেখেছি—পাঠ্যাবস্থায় যে-সব ফরাসী বই তাঁরা কিনেছিলেন তার উপর আর কিছু কেনবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। এঁদের 'দ্বিতীয় ভাষা' সম্বন্ধে জ্ঞান শেষ পর্যন্ত কতটুকু থাকে সে সম্বন্ধে জেরম কে জেরমের ঠাট্টা-মস্করা পড়ে দেখবেন।

বস্তুত বহু গবেষণা করে শিক্ষকগণ এই চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতেই এসেছেন যে, মানুষকে ব্যাপকভাবে দোভাষী করা যায় না। গোলামদের কথা আলাদা। তারা যখন দেখে অর্থাগমের একমাত্র পন্থা 'মুনিবের ভাষা শেখা' তখন সব-কিছু বিসর্জন দিয়ে প্রভুর ভাষা শেখে—আমি যে-রকম শিখেছিলুম, ফলে আজ না পারি উত্তম বাংলা বলতে, না পারি মধ্যম ইংরেজী লিখতে। কিন্তু আমার ছেলে গোলাম নয়—আমার আশা সে একদিন বাংলাতেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করবে। আমার ছেলে না পারুক, যদি আপনার ছেলে পারে তাতেই আমি খুশী এবং যদি সেদিন তার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে ইংরেজ ফরাসী আপন আপন মাতৃভাষাতে তার কেতাব অনুবাদ করে—আজ যে-রকম মাওৎসে তুঙের চীনা বই বেরনোমাত্রই ইংরেজ গায়ে পড়ে তৎক্ষণাৎ স্ব-ভাষায় তার অনুবাদ করে, এখনও যে-রকম ইংরেজ 'শকুন্তলা' নাট্যের অনুবাদ করে—তবে আমি অমর্ত-লোক থেকে তাকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করব। অনন্তকাল ধরে আমরা শুধু ইংরেজী থেকে নেবই, কিছু দেবার সময় কখনও আমাদের আসবে না, এ-কথা ভাবতেও আমার মন বিরূপ হয়।

তবে কি বাংলাভাষী লোকসংখ্যা পৃথিবীতে এতই কম যে, আমরা কখনও বাংলাকে ফরাসী কিংবা জর্মনের মত সমৃদ্ধিশালী করতে পারব না?

ভাষা		ভাষীদের সংখ্যা (হাজার সমষ্টিতে)
বাংলা	...	৬০০০০
আরবী	...	২৫০০০
চীন	...	৪৩০০০০
গ্রীক	...	৫৫০০
জাপানী	...	৫৫০০০
জর্মন	...	৮০০০০
হিন্দুস্থানী (অর্থাৎ হিন্দী উর্দু দুই মিলিয়ে; না হলে শুদ্ধ হিন্দীভাষীর সংখ্যা বাংলার চেয়ে কম)		৯০০০০

ওলন্দাজ	...	১০০০০
ইংরেজী	...	১৮০০০০
ফরাসী	...	৪৫০০০
রুশ	...	৮৫০০০
তুর্কী	...	৭০০০

এবারে ভাষার ভিত্তিতে না নিয়ে লোকসংখ্যা নিন, কারণ, যে বর্ষপঞ্জী থেকে এই সংখ্যাগুলি পেয়েছি, দুর্ভাগ্যক্রমে তাতে নরউইজিয়ন, সুইডিশ, ডেনিশ, ফিনিশ ভাষীর সংখ্যা দেওয়া হয় নি।

নরওয়ে	...	২৯৫২
ডেনমার্ক	...	৩৯৭৩
ফিনল্যাণ্ড	...	৩৭৩৪

আমার যতদূর মনে পড়ছে, চীনা, ইংরেজী, রুশীয়, জর্মন এবং স্প্যানিশের পরেই পৃথিবীতে বাংলার স্থান।

নরওয়ে, সুইডেন তাদের ২৯,৫২, ৬৫,২৩ নিয়ে আপন আপন ভাষায় দর্শন লেখে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে, ডাক্তারি শেখে, ইঞ্জিনীয়ারি করে আর আমরা ৬০০,০০ হয়েও চিরকাল ইংরেজীর ধামা-ধরা হয়ে থাকব?

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি আমরা কল্পনা করতে পারি নি, ফার্সী যদি এদেশ থেকে চলে যায়, তবে আমরা রাজকার্য চালাব কী করে। ইংরেজ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, ইংরেজীতেও চালানো যায়। আজ আমরা কল্পনা করতে পারছি নে, ইংরেজী ছেড়ে আমরা যাব কোথায়?

কিন্তু অধমের বক্তব্য এইখানেই শেষ নয়।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন, পণ্ডিতজনের মতের বিরুদ্ধে যেয়ো না, কারণ পণ্ডিতের জ্ঞান আছে, তোমার নেই।

তবে কি মূর্খের বিরুদ্ধে মতানৈক্য প্রকাশ করব? সে ত আরও ভয়ঙ্কর আমার আপন অজানাতে যে-সব অসিদ্ধ যুক্তি-তর্ক উত্থাপন করব, যে-সব ভুল ঐতিহাসিক তথ্য পেশ করব, মূর্খ অজ্ঞতাবশত সেগুলো মেনে নিয়ে আমাকে আরও বিপদে ফেলবে।

তাই আমি শ্রীযুত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের সঙ্গেই মতানৈক্য প্রকাশ করছি। তিনি জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ এবং সুপণ্ডিত; আমার মত অর্বাচীনের যুক্তি-তর্কে, বিশেষত ঐতিহাসিক নজির পেশ করার সময় যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে,

তবে তিনি সেগুলো সানন্দে এবং অনায়াসে মেরামত করে দিয়ে আমার জ্ঞানবৃদ্ধি করে দেবেন। বাঘা টেনিস-খেলোয়াড় টিল্‌ডেনও বলেছেন, 'সব সময় তোমার চেয়ে ভাল খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলবে—না হলে খেলাতে তোমার কখনও উন্নতি হবে না।' ইতিহাসে শ্রীযুত সরকার ভুবন-বিখ্যাত—তাঁর সঙ্গে দ্বিমত হয়ে আমিই লাভবান হব।

ইংরেজী ভাষার জ্ঞানভাণ্ডার দেখে আমরা আজ কিছুতেই কল্পনা করতে পারি নে, এ-ভাষা বাদ দিয়ে আমরা চলব কী করে? বাংলায় এ-রকম ভাণ্ডার নির্মাণ করব কী প্রকারে?

ইতিহাস বলেন, একদা ইয়োরোপের সর্বত্র জ্ঞানচর্চা হত লাতিনের মাধ্যমে। ইংরেজী, ফরাসী, জর্মনের নামও তখন কেউ মুখে আনত না। ওই সব অপোগণ্ড অর্বাচীন ভাষা যে কখনও জ্ঞানচর্চার মাধ্যম হতে পারে একথা কেউ বললে তখন নিশ্চয়ই তাকে পাগলা-গারদে পাঠানো হত, কিংবা ডাইনী 'ভর করেছে' ভেবে জ্যান্ত পুড়িয়ে ফেলা হত। অথচ এমন দিনও এল যখন ফ্রান্সের লোক লাতিন বর্জন করে ফরাসী ভাষাকেই জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার মাধ্যম বলে মেনে নিল। জর্মনি তখনও শিক্ষাদীক্ষায় ফ্রান্সের অনেক পিছনে, তাই জর্মন রাজা-রাজড়া, নবাব-সুবেদাররা উত্তম ফরাসী-চর্চা করাটাই জীবনের সর্বপ্রধান কাম্য বলে ধরে নিয়েছিলেন। কাচ্চা-বাচ্চাদের পর্যন্ত ফরাসী 'পার্লিয়েরেন' 'স্প্রেষেন' ক্রিয়া খাঁটি জর্মন, তার অর্থ 'কথা বলা' কিন্তু জর্মনরা তখন অনুকরণে এমনি মত্ত যে ফরাসী 'পার্লে' ক্রিয়া পর্যন্ত ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে—তুলনা দিয়ে বলি, আমি ছেলেবেলা থেকে ইংলিশ 'স্পাক' করে আসছি) করতে শেখানো হত এবং জর্মন ভাষাটাকে চাকরবাকরের ভাষা (গ্রেজিন্‌ডে-স্প্রাখে) বলে গণ্য করা হত। ফ্রিডরিক দি গ্রেট মাতৃভাষা জর্মনকে হেয় জ্ঞান করে ফরাসীতে কবিতা লিখতেন এবং সেই রদ্দী কবিতা মেরামত করতে গিয়ে গুণী ভলতেয়ারের নাভিশ্বাস উঠত।

তারপর একদিন ফরাসী নিজের থেকেই ব্যাঙাচির ন্যাজের মত খসে পড়ল। জর্মনই জ্ঞানচর্চার মাধ্যম হয়ে গেল।

তারপর জর্মন এল ইংরেজীর আওতায়। শ্রীযুত যদুনাথ এই সম্পর্কে লিখেছেন—

"The late German Emperor, Wilhelm II, before world-war No. I, had made English a Compulsory second language in all the secondary schools of his Empire. Wsa

that a sign of his slavery to the British people? No, like a shrewd practical politician he felt that this was the best way of promoting Germany's trade all over the world." (Hindusthan Standard, Feb. 1st, '53.)

এবার দেখা যাক এই ইংরেজীর প্রভাব খদ জর্মনরা পরবর্তী যুগে কী চোখে দেখেছে।

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুত য়োহান ভীসনার 'জর্মন-ভাষা শিক্ষা' ('ডয়েচ্‌শে স্প্রাখলেরে') নামক একখানি পুস্তিকা লেখেন। এ-পুস্তিকা অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির শিক্ষা-বিভাগ (কুলটুস্‌ মিনিস্টেরিয়ুমের) কলেজের জন্য পাঠ্যপুস্তক হিসাবে নির্বাচন করেন।

জর্মনের উপর লাতিন, ফরাসী তথা ইংরেজীর প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক ভীসনার যা বলেছেন সেটি আমি তুলে দিচ্ছি। অনুবাদের সঙ্গে মূল জর্মন এখানে তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্য যে, অনুবাদে কোনও ভুল থাকলে গুণী পাঠক সেদিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারবেন। (ডবল স্পেস-ওলা শব্দগুলো ইংরেজী—পাঠকের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করছি)।

Dem 19 Jhdt war es vorbehalten, unser Deutsch mit englischen Woertern xu ueberfluten. Die weit verbreitete Kenntnis der englischen Weltsprache, dazu der maechtige Einfluss englischer Sitte und Mode bewirkten, dass der deutsche G e n t l e m a n m S m o k i n g oder S w e a t e r wenigstens bis zum Weltkriege den Englaender ebenso nachaeffte wie frueher der deutsche Cavalier den Franzosen, Jede Kneipe bis dahin warein B a r, jedes Dampfschiff ein S t e a m e r, jeder Fahrstuhl ein L i f t (mit einem L i f t b o y) jede Fuellfeder eine F o u n t a i n-p e n jeder Fuenfuhr-Tee ein F i v e o' c l o c k t e a, Deutsche Fabrikanten schrieben auf ihre fuer Deutschland bestimmten Erzeugnisse K o h-i-n o o r m a d e b y L. & C. H a r d m u t h i n A u s t r i a, B r i t i s h g r a p h i t e d r a w i n g p e n c i l, c o m-p r e s s e d l e a d, Am ueppigsten wucherte das

englische natuerlich auf dem Gebiete des S p o r t s; deutsche Mittelschulen veranstalten F o o t - b a l l - m e e t i n g s und L a w n - t e n n i s - m a t c h e s wobei alles englisch war, auch das Zaehlen, nur nicht die Auesprache, Wie leichtfertig der Deutsche sein Volkstum vollends preisgibt, wenn er mit dem Auslande in unmittelbare Beziehung tritt, sieht man an der g e m i x t e n Sprache des Deutsch-Amerikhaners; immer bissitg (busy), kauft sich dieser eine goldene W a t s c h e n (w a t c h) s t a r t e t f o r h o m (geht nach Hause) und r i n g t die B e l l (laeutet die Glocke) order b e l l t (laeutet einfach). —ভীসনার, ডয়েচ্‌শে স্প্রাখলেরে, পৃ ৮৫।

"আর উনবিংশ শতাব্দী রইলেন আমাদের জর্মন ভাষা ইংরেজী শব্দের বন্যায় ভাসিয়ে দেবার জন্য। বিশ্বভাষা হিসেবে ইংরেজীর প্রসার এবং ইংরেজী রীতিনীতির প্রভাব হওয়ার ফলে বিশ্বযুদ্ধ (প্রথম) না লাগা পর্যন্ত জর্মন Gentleman Smoking কিংবা Sweater পরে পরে বাঁদরের মত ইংরেজের অনুকরণ করেছিল—একদা যে-রকম জর্মন Cavalier ফরাসীর অনুকরণ করেছিল। স্কাইপেকে বলা হত bar, ডামপফশিফকে বলা হত steamer, ফারস্টুলকে lift (এবং তার ভিতরে থাকত litt-boy), ফ্যুলফেডারকে fountain-pen, ফ্যুনফউরটিকে five o' clock tea. জর্মন কারখানাওয়ালারা জর্মনিরই জন্য নির্মিত মালের উপর লিখতেন, Koh-i-noor made by L. &. C Hardmuth in Austria, British graphite drawing pencil, compressed leac. এই (শব্দের) আগাছা অবশ্য সবচেয়ে বেশী পল্লবিত হল sports-এর জমিতে। জর্মন হাইস্কুলগুলো football meetings এবং Lawn-Tennis-matches-এর ব্যবস্থা করল এবং সেখানে সবই ইংরেজীতে চলত, এমন কী, সংখ্যা গোনা পর্যন্ত—একমাত্র উচ্চারণটি ছাড়া (লেখক ব্যঙ্গ করে ইঙ্গিত করেছেন—ওই কর্মটি সরল নয় বলেই)। বিদেশীর সঙ্গে সোজা সংস্পর্শে এলে জর্মন কী অবহেলায় তার জাত্যভিমান বর্জন করে তার উদাহরণ দেখা যায় তার খিচুড়ি জমন-মার্কিন ভাষাতে, 'বিজিক' (Busy) ঘড়ি কিনলে সেটা Watschen (Watch) srartet for hom (বাড়ি রওয়ানা দিল) এবং ringt die bell (ঘণ্টা বাজায়) কিংবা শুধু belt (এখানে।

লেখক একটু রসিকতা করেছেন, শুদ্ধ জর্মনে belt অর্থ 'ঘেউ ঘেউ করা')।"

তারপর লেখক দুঃখ করেছেন যে, এই করে করে জর্মন ভাষা একটা জোব্বার মত হয়ে উঠল যার সর্বাঙ্গে রঙিন তালি এবং সে-তালির টুকরোগুলোর নানা রঙের নানা জামা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া!

আমি অধ্যাপক ভীসনারের সঙ্গে ষোল আনা একমত নই। বাংলা এখনও অতি দুর্বল ভাষা; তাকে এখনও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রচুর বিদেশী শব্দ নিতে হবে। আমি যে এই নাতিদীর্ঘ উদাহরণটির অতি কষ্টে নকল এবং অনুবাদ পেশ করলুম (ভুল করলুম, অ্যাদ্দিন বাজারে জোর ঢোল বাজিয়েছি, আমি খুব ভাল জর্মন জানি, এইবারে অনুবাদের বেলায় ধরা পড়ব) তার উদ্দেশ্য এই যে, জর্মন যদি সুসময়ে এই পাগলামি বন্ধ না করত তবে সে এতদিনে কথামালার চিত্রিতা গর্দভী হয়ে যেত।

অর্থাৎ আমরা যদি অনন্তকাল ধরে ইংরেজীরই সেবা করি, তবে আমাদের বাংলা ভাষাটি চিত্রিতা মর্কটী হয়ে যাবেন।

এ বিষয়ে আরও অনেক বক্তব্য আছে। কিন্তু এতখানি লেখার পর আজ সকালের (রবিবারের) কাগজ এসে পৌঁছল। সে কাগজ পড়ে আমি উল্লাসে মুক্তকচ্ছ হয়ে নৃত্য করেছি। বাংলা ভাষার প্রতি দরদী-জন মাত্রই খবরটি পড়ে উল্লসিত হবেন। খুলে কই।

আশা করি, আমার পাঠকেরা বিজ্ঞানে শ্রীযুত সত্যেন বসু এবং শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পাণ্ডিত্যে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করেন না। যে সব গুণী আমার বৈজ্ঞানিক কৌতূহলজাত প্রশ্ন এক লহমায়, বিনা কসরতে ফৈসালা করে দেন, তাঁরাই দেখছি, এই দুই পণ্ডিতের নাম উচ্চারিত হলেই মাথা নীচু করেন।

শ্রীযুত বসু বলেন, (আমি খবরের কাগজ থেকে তুলে দিচ্ছি, সভাতে যাবার আমার অধিকার নেই—তাই প্রতিবেদনে ভুল থাকলে বসু মহাশয় যেন নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করেন) কেউ কেউ এই ধারণা পোষণ করেন যে, অন্তত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষাকে মাধ্যমরূপে স্বীকার করে নিতেই হবে, কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস (confident) যতদিন না বাংলাতে বিজ্ঞানের চর্চা হয় ততদিন পশ্চিম বাঙলায় বিজ্ঞানের প্রসার হতেই পারবে না।

তাঁর বিশ্বাস বাংলাতেই প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক শব্দ কিছুটা আছে, কিছুটা বানানো যেতে পারে, এবং বাদবাকী বিদেশী ভাষা থেকে নিতে কোনও সংকোচ করার প্রয়োজন নেই।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও বলেন, বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা পরিভাষা নির্মাণের সময় হয়ে গিয়েছে।

এর পর আর কী চাই? আমি যে-জিনিস অন্ধভাবে অনুভব করেছি, আমার যে-সব দরদী পাঠক আমার সঙ্গে এতদিন মোটামুটিভাবে একমত, তাঁরা কি এই দুই পণ্ডিতের উক্তি শুনে উল্লসিত হলেন না?

একটা জিনিসকে আমি বড্ড ডরাই, আপনাদের অনুমতি নিয়ে সেটি আজ আপনাদের কাছে নিবেদন করব।

গণ-আন্দোলন বাদ দিয়ে কোনও দেশেই কোনও বড় কাজ করা সম্ভব হয় । যতদিন পর্যন্ত শুধু ভারতীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই স্বরাজ-আন্দোলনের জন্য চেষ্টা করেছিলেন ততদিন ইংরেজ আমাদের থোড়াই পরোয়া করেছিল, কিন্তু যখন ভারতের জনগণ ইংরেজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল – অবশ্য সেটা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আত্মত্যাগের ফলেই সম্ভবপর হল—তখন বাধ্য হয়ে ইংরেজকে এদেশ ছাড়তে হল। তাই, আবার বলছি, গণজাগরণ, গণ-আন্দোলনের শক্তিই আমাদের স্বরাজ এনে দিয়েছে।

এবং সবচেয়ে বড় কথা, আজ যদি ভারতীয় রাষ্ট্র তার স্বরাজ্যকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে চায় তবে তার দরকার অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক স্বরাজ্য-লাভ। রাজনৈতিক স্বরাজ্যের আপন মূল্য আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার ব্যবহারিক মূল্যের দিকটা ভুললে চলবে না—রাজনৈতিক স্বাধীনতার ফলে আমাদের হাতে যে-শক্তি এল তারই প্রয়োগ করে এখন আমাদের জয় করতে হবে অন্য সর্ব-স্বাধীনতা। এক কথায় এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য, নবীন রাষ্ট্র গড়ে তোলা।

আমরা ভাবি, রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য 'চাষাভুষো'কে 'খ্যাপাবার' দরকার ছিল, এখন যখন স্বরাজ হয়ে গিয়েছে, তখন এদের দিয়ে আর কোনও দরকার নেই, এরা ফিরে যাক ক্ষেতে-খামারে, ফলাক ধানচাল, আর মধ্যবিত্ত-শ্রেণী, আমরা শহরে বসে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করব আর তাই দিয়ে নবীন রাষ্ট্র গড়ে তুলব! তাই আমরা সে-চর্চা ইংরেজীতে করব, বাংলায় করব, না বাণ্টু ভাষায় করব তাতে কিছু আসে-যায় না, আমরা বুঝতে পারলেই হল, ওরা ওদের কম-জোর মাতৃভাষা নিয়ে পড়ে থাক্। ভাবতেই আমার সর্বাঙ্গ ঘেন্নায় রী রী করে ওঠে।

বহু দেশ ভ্রমণ করে, বহু গুণীর সাহচর্যে এসে, আপন মনে নির্জনে বসে বহু

তোলপাড় করে আমার সুদৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে, এ বড় ভুল ধারণা, এ অতি মারাত্মক বিশ্বাস। আমার মনে আজ কণামাত্র সন্দেহ নেই যে, জনগণের সহযোগিতা ভিন্ন আমরা নবীন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারব না। আমি আমার সহৃদয় পাঠক-সম্প্রদায়কে কখনও কোনও তত্ত্বে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস স্থাপন করতে অনুরোধ করি নি—তার পক্ষে, স্বপক্ষে যুক্তি তর্ক পেশ করেই ক্ষান্ত দিয়েছি—কিন্তু আজ যুক্তি-তর্ক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অনুরোধ করেও বলছি, সাহস দিচ্ছি, জনগণের ভিতর বিশ্বাস অনুপ্রাণিত করুন, তাদের সহযোগিতা আহ্বান করুন—আপনারা লাভবান হবেন। এ ছাড়া অন্য পন্থা নেই।

এখন প্রশ্ন, জনগণের সহযোগিতা, জনগণমন আমরা জয় করব কী প্রকারে?

বিদেশী প্রবাদ, সব লোককে কিছুদিন ঠকাতে পার, কিছু লোককে সবদিন ঠকাতে পার, কিন্তু সব লোককে সব দিন ঠকাতে পারবে না। আমাদের অধঃপতনের যুগে আমাদের সব লোককে—অর্থাৎ জনগণকে—আমরা অন্ধানুকরণ করতে শিখিয়েছিলুম, কিন্তু আজ আর সে-কর্ম সম্ভবপর নয়। আমরা চাইও না। আজ আমরা চাই, জনগণ যেন আমাদের আদর্শ বুঝতে পেরে, সেই মর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে নবীন রাষ্ট্রনির্মাণে আমাদের সহায়তা করে।

তাই প্রশ্ন, জনগণ আমাদের আদর্শ বুঝবে কী প্রকারে? আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে, ভারতীয় ইতিহাসের ধারা অনুসন্ধান করে যদি তাবৎ বস্তু ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ করে সপ্রমাণ করি, আমাদের পক্ষে এই কর্ম কাম্য, আমাদের পক্ষে ওই নীতি প্রয়োজনীয়, আমাদের পক্ষে আরেক পন্থা সুগম তবে তারা এ-সব বুঝবে কী করে?

চট্ করে আপনি উত্তর দেবেন, মাতৃভাষাতে লিখলেই কী তারা সব কিছু বুঝতে পারবে?

এর সদুত্তর দিতে হলে আপনাকে আবার একটুখানি কষ্ট স্বীকার করে ইউরোপে যেতে হবে।

ফ্রান্স, জর্মনি, হল্যাণ্ডে বেশীর ভাগ লোক শিক্ষা সমাপন করে ম্যাট্রিকের সঙ্গে সঙ্গে। এবং ওদের ম্যাট্রিক আমাদের ম্যাট্রিকের চেয়ে উচ্চস্তরের বলে তারা আর-কিছু শিখুক আর না-ই শিখুক, মাতৃভাষাটা অতি উত্তমরূপে শেখে। তারপর টাকা-পয়সা রোজগারের ধান্ধার ভিতর কেউ করে সাহিত্যের চর্চা, কেউ করে ইতিহাসের, কেউ দর্শনের—ইত্যাদি। এবং তাই প্রায়ই দেখা যায়, বহু সুসাহিত্যিক উত্তম উত্তম পুস্তক লিখে যাচ্ছেন অথচ তাঁরা সুদ্ধমাত্র ম্যাট্রিক, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছায়া মাড়ান নি। আমাদের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এই ধরনের—

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র অন্য ধরনের। কিন্তু ইয়োরোপে রবীন্দ্র-শরতের গোষ্ঠী বৃহত্তর।

এ ত হল সৃষ্টিকর্ম—এ অনেক কঠিন কাজ—এর চেয়ে অনেক সোজা, বই পড়ে বোঝা এবং সাধনা দ্বারা ক্রমে ক্রমে সুসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক অধ্যয়ন করে করে দেশের উচ্চতম আদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা। এ-জিনিসটি ইয়োরোপে অহরহ হচ্ছে এবং তাই ইয়োরোপের যে-কোনও দেশে গুণীজ্ঞানী যে শুধু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভিতরেই পাওয়া যায় তা নয়, জনসাধারণের ভিতরেও বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি পাওয়া যায় যাঁরা অনায়াসে অধ্যাপকের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন।

আমাদের দেশের বাংলা দৈনিকগুলো যে ইংরেজীর তুলনায় পিছিয়ে আছে সে-কথা আমরা সবাই জানি, তবুও দেখেছি, একমাত্র 'আনন্দবাজার'-পড়নেওলা গ্রাম্য বাঙালী অনেক সময় ওরই মারফতে এতখানি জ্ঞান সঞ্চয় করতে পেরেছে যে, ইংরেজী-জাননেওলা শহুরেকে তর্কে কাবু করে আনতে পারে।

আমার তখন বড় দুঃখ হয় যে, আমাদের বড় বড় পণ্ডিতেরা ইংরেজীতে না লিখে যদি বাংলা কাগজে লিখতেন, তবে আমার গাঁয়ের পড়ুয়া জ্ঞান-লোকে আরও কত দিগ্বিজয় করতে পারত।

মিল্টন বলেছেন :—

'ক্ষুধার্ত হৃদয় নিয়ে ঊর্ধ্বমুখে চায় এরা কে দেবে এদের খাদ্য!'

আমাদের পণ্ডিতেরা এতদিন এদের বঞ্চিত রেখেছেন; স্বরাজ পাওয়ার পরও এঁরা তাদের জন্য কিছু করতে চান না। (আমি অবশ্য এঁদের দোষ দিই নে —এঁদের কাছে আমরা বহু দিক দিয়ে ঋণী—কিন্তু এঁরা অন্য যুগের লোক, ইংরেজী লেখাতে তাঁরা এত অভ্যস্ত যে, আজ বাংলা লিখতে এঁদের সত্যই কষ্ট হয়।)

মুসলমানেরা প্রাদেশিক ভাষাগুলোকে কিছু কিছু সাহায্য করেছিলেন সে কথা আমরা জানি, ক্রীশ্চান মিশনারিরাও তাই করেছিলেন, কিন্তু এ-কথা ভুললে চলবে না যে, মুসলমানরা ফার্সী এবং ইংরেজ ইংরাজীকেই সম্মানের স্থান দিয়েছিল। ফলে মুসলমান যুগে যাঁরা ফার্সী জানতেন তাঁরা ছিলেন 'শরীফ' অর্থাৎ 'ভদ্র' আর ব্রিটিশ যুগে (বলা উচিত 'ক্রীশ্চান যুগে' কারণ ভারতের ইতিহাসের প্রথম দুই যুগ যদি 'হিন্দু পিরিয়ড' এবং 'মুসলিম পিরিয়ড' হয়, তবে তৃতীয় যুগ 'ক্রীশ্চান পিরিয়ড' হবে না কেন?—এ-তত্ত্বটির প্রতি আমার ক্ষীণদৃষ্টি জ্যোতিষ্মান করেছেন ছন্দ-সম্রাট শ্রীপ্রবোধ সেন) যাঁরা ইংরেজী জানতেন, তাঁরা ছিলেন 'ভদ্রলোগ্ ক্লাস', অর্থাৎ 'শরীফ', অর্থাৎ 'ভদ্র'।

অথচ, ভদ্র, 'ভদ্র' বলতে আমরা আবহমান কাল এমন কিছু বুঝেছি যার সঙ্গে ফার্সী কিংবা ইংরেজী জানা-না-জানার কোনও সম্পর্ক নেই।

মুসলমান যুগে বরঞ্চ ভদ্রে গ্রাম্যে কিঞ্চিৎ যোগাযোগ ছিল, কারণ মুসলমান যুগে আমাদের সভ্যতা ছিল গ্রাম্য, অর্থাৎ জনপদ সভ্যতা ; কিন্তু ক্রীশ্চান আমলে সভ্যতা ইংরেজী-অভিজ্ঞ এবং ইংরেজী-অনভিজ্ঞের মাঝখানে এমনি এক বিরাট, নিরেট পাঁচিল তুলে দিলে যে, আজও আমরা সে-দেয়াল ভাঙতে পারি নি, এবং ভাঙবার চেষ্টা করতে চাই নে। আমরা এখন ইংরেজী-জাননে-ওলা আর ইংরেজী না-জাননে-ওলার মাঝখানে সেই প্রাচীন অন্ধপ্রাচীর, অচলায়তন খাড়া রাখতে চাই।

এই ব্যবস্থাটাকেই আমি ডরাই, বড্ড ডরাই। এ-ব্যবস্থা মেনে নিলে আপনারা একদিন আবার পরাধীন হবেন। সে-কথা আরেক দিন হবে॥

টুকিটাকি

দাবা খেলার জন্মভূমি কোথায় ?

দাবা খেলার ইতিহাস সম্পর্কে নানা মুনি নানা কথা কয়ে থাকেন। দাবার শেষের দিকের ইতিহাস সুস্পষ্ট এবং সেখানে তর্কাতর্কির অবকাশ নেই। ইরান জয় করার পরে আরবরা সেদেশে প্রথম দাবা খেলা শেখে। সকলেই জানেন, কোনও খেলা সম্পূর্ণ আপন করে নেওয়ার পরও তার মূল পরিভাষা অনেক সময় আগা-গোড়া পরিবর্তিত হয় না। তাই আরবরা ইরানী দাবা খেলা শেখার পরও দাবার রাজাকে ইরানী শব্দ 'শাহ্' (রাজা) দিয়ে চিহ্নিত করে, এবং 'তোমার শাহ্ বিপদে' বলার সময়, অর্থাৎ কিস্তি দেওয়ার সময় শুধু 'শাহ্' বলত।

এর পর ক্রুসেড লড়াইয়ের সময়ে বন্দী ইয়োরোপীয়রা আরবদের কাছ থেকে দাবা খেলা শেখে এবং তারাও কিস্তি দেওয়ার সময় 'শাহ্' বলত। সেই 'শাহ্' লাতিনের ভিতর দিয়ে ইংরেজীতে রূপ নেয় 'শেক্' এবং সর্বশেষে 'চেক্' রূপে (ব্রিটিশ 'একস্‌চেকারে'র নাম ওই 'চেক্' থেকে এসেছে)।

কিস্তিমাতের 'মাত' কথাটা ওই ভাবেই আরবী, 'শাহ্, মাতা' অর্থাৎ 'তোমার রাজা মারা গিয়েছে' ইংরেজীতে রূপ নিয়েছে 'চেক মেট' হয়ে।

এখন প্রশ্ন, ইরানীরা দাবা খেলা শিখল কার কাছ থেকে ? দাবা ইরানী খেলা এ-দাবি পারস্য দেশে কখনও করা হয় নি। বরঞ্চ সে-দেশে কিংবদন্তী

প্রচলিত যে, এ-খেলা 'পঞ্চতন্ত্র' পুস্তকের মত ভারতবর্ষ থেকে ইরানে গিয়েছে।

একাদশ শতাব্দীতে গজনীর পণ্ডিত অল-বীরুনী তাঁর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকে দাবা খেলার ছক এঁকে দিয়েছেন ও ঘুঁটিরও বর্ণনা করেছেন। তবে আজকের দাবা আর সে-দাবার পার্থক্য প্রচুর। তখনকার দিনে দাবা খেলা হত চারজনে—ছকের চারকোণে চার খেলোয়াড় আপন আপন ঘুঁটি নিয়ে বসতেন এবং চালও দিতে হত পাশা (ডাইস বা অক্ষ) ফেলে।

তাই নিয়ে বিচলিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ আজ ভারতীয় দাবা ও বিলিতী দাবা হুবহু এক খেলা নয়।

কাজেই সম্পূর্ণ নূতন কোন প্রমাণ উপস্থিত না হলে ভারতবর্ষ যে দাবা খেলার জন্মভূমি তা নিয়ে তর্ক করবার কোনও কারণ নেই।

খেলাচ্ছলে

কিছুকাল আগে পার্লিমেণ্টে জনৈক সদস্য যে প্রশ্ন শুধান তার সারমর্ম এই :—

হেলসিন্‌কিতে যে ওলিম্পিক খেলা হয় সেখানে খেলার শেষে যখন সব দেশ আপন আপন জাতীয় পতাকা নিয়ে পরিক্রমা করে তখন ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করে সেই শোভাযাত্রায় যোগ দেবার জন্য কোনও ভারতীয়কে খুঁজে পাওয়া যায় নি। অবশেষে নাকি এক ফিন্‌ যুবক ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করে।

প্রশ্নকর্তা কোনও কোনও ভারতীয়কে এই ঘটনার জন্য তীব্র নিন্দাও করেন।

উত্তরে সহ-শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, তিনিও এই রকম কথা শুনেছেন।

আমাদের মনে হয়, এর একটা কড়া তদন্ত হওয়া উচিত।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ভারতীয়রা অন্যান্য জাতির তুলনায় অভদ্র নয়। এককালে ভারতীয় সৌজন্য-শালীনতা বিদেশী বহু পর্যটককে মুগ্ধ করেছিল বলে তাঁরা তাঁদের ভ্রমণ-কাহিনীতে ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যে বিস্তর প্রশস্তি গেয়ে গিয়েছেন। মেগাস্তেনেস থেকে এ-ইতিহাস আরম্ভ হয় এবং যদিও কোনও লেখক আমাদের কোনও কোনও আচার-ব্যবহারের নিন্দা করেছেন বটে, কিন্তু আমরা অভদ্র, এ-কথা কাউকে বড়-একটা বলতে শোনা যায় নি। বিদেশে ভারতীয়েরা আরও সাবধানে চলে বলে সেখানেও তারা প্রচুর খাতির-যত্ন পায়।

তবে হঠাৎ আজ এ-রকম একটা পীড়াদায়ক ঘটনা ঘটল কেন ?

আমার মনে হয়, আমাদের টীমের কর্তাব্যক্তিরা পরবটার কথা বেবাক ভুলে

গিয়েছিলেন, কিংবা ব্যাপারটার গুরুত্ব ঠিক মেকদারে যাচাই করতে পারেন নি বলে সবাই মিলে রঙ্গভূমি ত্যাগ করে শহরে ফুর্তিফার্তি করতে চলে গিয়েছিলেন আর তাই চ্যাংড়ারাও যে চলে যাবে তার আর কী সন্দেহ!

কর্তারা শহরে বেড়াতে যান নি, চ্যাংড়াদের তাঁরা যেতে বারণ করলেন, তবু তারা বে-পরোয়া চলে গেল, এ-কথা বিশ্বাস করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। এ-টীমে যারা গিয়েছিল তাদের দু-একজনকে আমি চিনি। পতাকা তোলার জন্য তাদের আদেশ করলে তারা নিশ্চয়ই, অতি অবশ্যই, শহরে চলে যেত না—সেখানে শেষ পরবের জন্য সানন্দে অপেক্ষা করত।

বিদেশে আপন দেশের পতাকা উত্তোলন করার জন্য নির্বাচিত হওয়া কি কম শ্লাঘার বিষয়?

কাজেই মুরুব্বীদের প্রশ্ন শোধানো উচিত, তাঁরা তখন ছিলেন কোথায়, তাঁরা কাকে কী আদেশ দিয়েছিলেন, কেউ সে আদেশ অমান্য করেছিল কি না?

এরই পিঠে-পিঠে সংবাদপত্রে আরেকটা খবর পড়লুম।

পার্লিমেণ্টে যেদিন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, সেদিনই শ্রীযুত পঙ্কজ গুপ্ত জিওলজিক্যাল সার্ভে রিক্রিয়েশান ক্লাবে বক্তৃতা দেবার সময় বলেন, ভারতের খেলোয়াড়রা যখন বিদেশে খেলতে যান তখন তাঁরা প্রায়ই অভদ্র ভাষায় লেখা বেনামী চিঠি পান এবং তাঁরা যে মন না দিয়ে ফুর্তি-ফার্তি, আরাম-আয়েশ করে বিলেতে দিন কাটাচ্ছেন সে কটুবাক্যও চিঠিগুলোতে বর্ষিত থাকে।

গুপ্তমহাশয় বলেন, এ-ধারণা ভুল এবং এ-অভিযোগ কখনও সম্ভবপর হতে পারে না, কারণ প্রতি সপ্তাহে এক নাগাড়ে ছদিন জীবন-মরণ পণ করে খেলা প্র্যাকটিস করতে হয়, এ সময় ঢলাঢলির ('ঈজী লাইফ') কথাই উঠতে পারে না।

এ অতি হক কথা—বিদেশে নানা শ্রেণীর খেলোয়াড়দের সংস্রবে এসে আমারও ওই একই ধারণা হয়েছে। তবে সব অভিজ্ঞতারই আরেকটা সাবধান হওয়ার দিকও আছে, অর্থাৎ ভুরি ভুরি অভিজ্ঞতা থাকলেও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সতর্ক হওয়ার রাশে ঢিল দেওয়া বিচক্ষণের কর্ম নয়।

এ-সংসারে দুষ্ট লোকের অভাব নেই। দেশবিদেশের বহু জায়গায় এরা ওই সন্ধানে থাকে, খেলোয়াড়দের খেলার মাঠের বাইরে এমনভাবে বেকাবু করা যায় কি না, যাতে করে পরের দিন তারা ভাল করে খেলতে না পারে। তাই তারা খেলা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে এবং যে কদিন খেলা হচ্ছে সে-কদিন রোজ সন্ধ্যায় নেটিভ-স্টেট স্টাইলে জব্বর জব্বর ককটেল পার্টি দেয় এবং দেশবিদেশের এমন

সব হোমরা-চোমরাদের নেমতন্ন করে যে, সেখানে বিদেশী খেলোয়াড়দের, ওদের সম্মান রক্ষার্থে ইচ্ছা না থাকলেও বাধ্য হয়ে যেতে হয়। তারপর নানা কায়দায়-কৌশলে খেলোয়াড়দের মদ খাওয়াবার চেষ্টা সমস্ত সন্ধ্যা ধরে চলে। যারা পালা-পরবে নিতান্ত অল্প খায় তাদের নিস্তার নেই, আর যারা খেতে ভালবাসে তারা অনেক সময় প্রলোভন সামলাতে পারে না। দলের ম্যানেজার এবং কাপ্তেন অবশ্য মুর্গীর মত চিলের ছোঁ থেকে বাচ্চাদের বাঁচাবার চেষ্টা করেন কিন্তু অনেক সময় পেরে ওঠেন না, তাই ওদের দোষ দিয়ে কোনও লাভ নেই।

কোনও কোনও সময় এমন প্রলোভনও রাখা হয় যে-সম্বন্ধে লিখতে আমার বাধো-বাধো ঠেকছে। ফার্সীতে বলে 'দানিশমন্দরা ইশারা বশ অস্ত'—অর্থাৎ বুদ্ধিমানকে ইশারাই যথেষ্ট।

ফলং? পরের দিন তারা এমন খেলা খেলে যে, দেখে মনে হয় এরা নিতান্তই খেলাধুলো করতে এসেছে।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে আমার ভয় হয়ত অমূলক, হয়ত আমি খামখাই ঘামের ফোঁটায় কুমির দেখছি, হয়ত আসলে ওটা কুমির নয়, ফুসকুড়ি, কিন্তু ওকীবহাল হওয়ার জন্য বলতে হয়,

সাবধানের মার নেই
(যদিও জানি
'মারেরও সাবধান নেই')।

মনে করুন সি কে নাইডু, সি এস নাইডু, জাম সাহেব, ব্র্যাডম্যান, লারউড, অমরনাথ, অমব সিং, মুশতাক, ওয়াজিব আলী এবং একমাত্র এঁদের মত পয়লা নম্বরওয়ালারা যদি আজ ইহলোক পরলোক ছেড়ে দিল্লিতে একখানা সরেস ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে আসেন, তবে আপনার মানসিক চাঞ্চল্যটা কী রকমের হয়?

স্বীকার করি, গেল শনিবার দিন এখানে 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' ও প্রেসিডেন্টস্ এস্টেট ক্লাবে যে একদিনের ক্রিকেট ম্যাচ খেলা হয়, তাতে নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও 'অনিবার্য' কারণে এঁদের কোনও মহারথীই উপস্থিত হতে পারেন নি। তাই বলেই যদি আপনারা ভাবেন খেলা উচ্চাঙ্গের হয় নি, তাহলে মারাত্মক ভুল করা হবে। 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' দিল্লির রীতিমত পুরাদস্তুর কেউ-কেড়া কাগজ, এবং রাষ্ট্রপতির আপন এস্টেট ক্লাবও ত আমাদের শ্লাঘার প্রতিষ্ঠান। অতএব বিবেচনা করুন, এ-খেলার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি কি অতিশয় প্রয়োজনীয় কর্তব্য সমাধান করছি নে?

কিন্তু হায়, আমার দারুণ দুর্ভাগ্য, এ-খেলার মন্ত্রীনাথরূপে আপনাদের সমীপে কোনও টীকা নিবেদন করার উপায় আমার নেই। কারণ ও-খেলাতে আমি সশরীরে উপস্থিত হতে পারি নি, যদিও আমার চিত্ত, হৃদয়, চৈতন্য, আত্মা, সর্ব অস্তিত্ব ওই খেলাতে উপস্থিত ছিল। দরদী পাঠক শুধাবেন, কেন উপস্থিত হতে পার নি?

অভিমান।

এই যে আমি 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে'র এত বড় সম্ভ্রান্ত দৈনন্দিন পাঠক, ওই কাগজের গুণী কর্মচারীগণের সঙ্গে আমার বহু যুগের হৃদ্যতা, তাঁরা আমার মত একটা ওস্তাদ ক্রিকেটিয়ারকে ওই পরবের দিনে বেবাক ভুলে গেলেন? কেন, আমি কি রান্নাঘরের পিছনে বাতাবি নেবু দিয়ে ঘন ঘন সেঞ্চুরি করি নি? অবশ্য স্বীকার করি উইকেট্ ছিল না—কিন্তু উইকেট ত থাকে ক্লান্ত হলে বসবার জন্য, আমি ত ক্লান্ত হইনে।

ম্যাচ ড্র গেছে। যাবে না? আমাকে না নিলে!!

পিকনিকিয়া

গল্প শুনেছি, এক ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন এবং স্কট নাকি বারোয়ারী চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করে। কথা ছিল সবাই কিছু কিছু সঙ্গে আনবেন। ইংরেজ আনল বেকন-আণ্ডা, ফরাসী এক বোতল শ্যাম্পেন, জর্মন এক ডজন সসেজ আর স্কট নিয়ে এল তার ভাইকে।

দিল্লিতে কিন্তু পিকনিকিয়ারা শুধু ভাইকে সঙ্গে আনেন না, আনেন ভাইয়ের শালী-শালাদের, তারা আনে তাদের কাকা-মামাদের এবং তারা ফের কাদের নিয়ে আসে তার হদিস এখনও পাই নি। সঙ্গে আনে ক্রিকেট, ফুটবল, গ্রামোফোন, পোর্টেবল রেডিও, মণ তিনেক পুরি, তদনুপাতের তরকারি এবং মাংস, গোলগাপ্পা (ফুচকা) এবং মিঠা পান।

এঁদের পীঠস্থল কুতুবমিনার, হাউজ-খাস এবং লোধি গার্ডেনস্। পাঁচ-সাত জনের পিকনিক হেথা-হোথা ছড়ানো থাকলে যত না গোলমাল আর উপদ্রব হয়, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী পীড়াদায়ক হয় এই সব পাইকিরী পিকনিকে। বে-খেয়ালে থাকলে হঠাৎ যে কখন দুম্ করে ক্রিকেট-বলটা আপনার ঘাড়ে এসে পড়বে তার কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই।

এঁরা আনন্দ করুন, আমার তাতে কি আপত্তি, কিন্তু এই যে সাক্ষাৎ মরু-

ভূমিসম দিল্লি শহরে এত তকলিফ বরদাস্ত করে বহুত মেহন্নত করে ঘাস গজানো হয়, তারই উপর যখন অত্যাচার চলে তখন আমার মত শান্ত লোকেও এই দিল্লির শীতে উষ্ণ হয়ে ওঠে। লনে খোলা আগুন জ্বালানো বারণ, তাঁর জ্বালাবেনই এবং চৌকিদার আপত্তি জানালে তাঁরা ঝগড়া-কাজিয়া লাগিয়ে দেন। কিংবা দেখি, চৌকিদার আর কোন আপত্তি করছে না, যেন সে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। রৌপ্যচক্র অস্বচ্ছ, তার ভিতর দিয়ে দেখবেই বা কী করে।

তাই দিল্লিতে আগমনেচ্ছু রসিকজনকে সাবধান করি, যদি শান্ত সমাহিত চিত্তে স্থাপত্যানন্দ উপভোগ করতে চাও তবে রবির সকালে কদাচ কুতুব, হাউজ-খাস এবং লোধি উদ্যান দেখতে যেয়ো না।

নিতান্তই যদি যেতে চাও তবে যেয়ো সরযূকুণ্ডে। অতি চমৎকার স্থল এবং ভিড় নেই বললেও চলে ॥

সাহিত্যিকের মাতৃভাষা

শ্রীযুক্ত নীরদ চৌধুরী তাঁর 'অজানা ভারতীয়ের আত্মজীবনী' লিখে দেশবিদেশে সুনাম (কারো কারো মতে কুনাম) অর্জন করেছেন। বইখানা পাঠ করবার সুযোগ—কিংবা কুযোগ—আমার এখনও হয় নি, তবে পুস্তকখানার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী, সে কথা আমি চৌধুরী মহাশয়ের নিজের মুখেই শুনেছি এবং তিনি তাঁর ভুবনবিখ্যাত পুস্তক থেকে গুটিকতক অধ্যায় আমাদের পড়ে শুনিয়েছেন। ওঃ! সে কী ইংরেজীর বাহার—তার ভিতর কত ভাষা থেকে, কত কেতাব থেকে কত রকম-বেরকমের আলপনা, কত ব্যঙ্গ, কত হুঙ্কার, কত বাকচাতুরী—ছাত্র ছত্রে হাউই উড়ছে, পটকা ফাটছে—মূল বিষয়ের দিকে ধ্যান দেয় কার ঠাকুরদার সাধ্যি!

তা সে বইয়ের কথা যাক। ও-রকম বই পড়ার বয়স আমার বহুকাল হল গেছে। এ ধরণের বই আনাতোল ফ্রাঁস কেন পড়েন না, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'আমার সে বয়স গেছে, যখন মানুষ যা বোঝে না তাই ভালবাসে। আমি আলো ভালবাসি।' নীরদ চৌধুরী যে-রকম এ-যুগের ভলতেয়ার, আম্মো এ যুগের ফ্রাঁস !!

শ্রীযুত চৌধুরী পত্রান্তরে একখানা প্রবন্ধ লিখেছেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, তিনি এককালে বাংলায় লিখতেন এবং ইচ্ছে করলেই বাংলায় সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকদের একজন হতে পারতেন।

চৌধুরী মশাই মানুষ; তাঁরও নানা দোষ আছে। কিন্তু তিনি যে অত্যধিক বিনয়-ভারে অবনত এ কথা তাঁর পরম শত্রুও বলবে না।

ইংরেজী লেখক হিসেবে মিঃ চাওডরি কতখানি নাম করেছেন জানি নে—জানার প্রয়োজনও বোধ করি নি। বিবেচনা করি অ্যাদ্দিনে তিনি ল্যাম, রাসকিনকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তিনি 'হেলায় লঙ্কা করিত জয়' শুনে আমার মনোরাজ্যে নানাপ্রকারের খণ্ড বিদ্রোহের সৃজন হয়েছে।

তাঁর বাংলা লেখা আমার কিছু কিছু পড়া আছে। বাংলা সাহিত্যের কিঞ্চিৎ সাধনা আমিও করেছি, যদিও শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্যতম হওয়ার চেষ্টায়, দিল্লি আমার জন্য এখনও বিলক্ষণ দূর অস্ত্। তিনি কাঁচা বা নিকৃষ্ট বাংলা লিখতেন একথা আমি বলব না, কিন্তু তিনি যে কীট্‌সের মত কোন ভয়ঙ্কর অমৃতভাণ্ড নিয়ে বাংলা সাহিত্যে নামেন নি, সে-কথাও আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে।

তবে এ দম্ভ কেন? এর সোজা অর্থ কি এই নয়: ওহে বাঙালী গ—ভ-গণ, তোমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও সাহিত্যের যে এভারেস্টে উঠতে পারছ না, আমি ইচ্ছা করলে পবননন্দন পদ্ধতিতে এক লম্ফেই সেখানে উঠতে পারতুম।

দ্বিতীয়ত, ছোঃ, বাংলা আবার একটা সাহিত্য, তাতে আবার নাম করা! মারি তো হাতি, লুটি তো ভাণ্ডার। নাম করতে হয় ত ইংরেজীই সই।

অর্থাৎ আপন মাতৃভাষাকেও তাচ্ছিল্য।

বৃথা তর্ক। আমি শুধু শেষ প্রশ্ন শুধাই—স্বজাতীয় লেখক, আপন আপন মাতৃভাষাকে তাচ্ছিল্য করে কে কবে সত্য বড় হয়েছে??

আসা-যাওয়া

পুব ও পশ্চিম দেশবাসীদের ভিতর মেলা মিল আর গরমিল দুইই রয়েছে বলে কেউ বলেন (কিপলিং), এ দুয়ে মিলন অসম্ভব, আর তার বহু পূর্বে গ্যোটে বলে গিয়েছেন, 'পুব পশ্চিম এখন আর আলাদা আলাদা হয়ে থাকতে পারবে না।'

যেখানে কিপলিং, গ্যোটে, রবি ঠাকুর, লিন্ যুটাং একমত হতে পারছেন না সেখানে আমি কথা কইতে যাব কোন্ সাহসে? যেখানে ফৈয়াজখানে আর হীরু গাঙ্গুলীতে লড়াই লেগে গিয়েছে সেখানে আমি বেমক্কা বে-সমে হাততালি দিয়ে মরি আর কী?

তবু সামান্য একটা কথা নিবেদন করতে চাই।

পশ্চিমের লোক কখনও কারও সঙ্গে কথা ঠিক না করে, অর্থাৎ পাকাপাকি

এনগেজমেণ্ট না করে দেখা করতে আসে না। এবং টম যদি ডিকের বাড়িতে কিংবা আপিসে আসতে চায় তবে ডিকের অনুমতি না নিয়ে কখনও আসবে না। কিন্তু, পশ্য, টম ডিকের অনুমতি নিয়ে এল বটে—ক'টার সময় ভেট হবে—কিন্তু সে যখন খুশি চেয়ার ছেড়ে বলতে পারে, 'তবে এখন চললুম'—তার জন্য ডিকের কোন অনুমতি প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ ইয়োরোপে কারও বাড়িতে যাওয়াটা তার হাতে, বেরিয়ে আসাটা আপনাব হাতে।

প্রাচ্যের প্রায় সব দেশেই ব্যবস্থাটা উল্টো। আপনি যখন খুশি রায় মহাশয়ের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হতে পারেন। 'এই যে রায় সাহেব' বলে হঙ্কার দিয়ে আপনি রায় মহাশয়ের বৈঠকখানায় ঢুকবেন, আর রায়ও 'এই যে চৌধুরী মশায়, আসতে আজ্ঞে হোক, বসতে আজ্ঞা হোক' বলে কোল-বালিশ আর হুঁকোর নলটা আপনার দিকে এগিয়ে দেবেন। আপনি বালিশটা জাবড়ে ধরে ফুরুৎ ফুরুৎ করে আলবোলায় দম টানতে টানতে মৃদু মৃদু পা দোলাতে থাকবেন।

কিন্তু যখন বললেন 'এবারে উঠি?' তখন কিন্তু রায়ের পালা। আপনি যে দুম করে চলে আসবেন সেটি হচ্ছে না, সে অধিকার আপনার নেই। রায় বলবেন, 'আরে, বসুন. স্যাব। এত তাড়া কিসের।' আপনার তখন জোর করে চলে আসাটা সখৎ বে-আদবী।

এর গুহ্য কারণ, হয়ত আপনি বহুদিন পরে এসেছেন, হয়ত কাশীবাস সেরে ফিরেছেন, রায়-গৃহিণী খবর পেয়ে আপনার জন্য সিঙাড়া ভাজবার তোড়জোড় করেছেন, আপনি হট্ করে চলে এলে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন, অতএব আপনাকে আরও কিছুক্ষণ বসতে হবে।

অর্থাৎ বিদায় নেবার বেলা আপনাকে অনুমতি নিতে হবে।

বিশেষ করে ইরান-আফগানিস্তানে এ-নিয়ম অলঙ্ঘ্য। ভেঙেছেন কি, আপনার নামে গোটা পাঁচেক ব্যঙ্গ-কবিতা লেখা হয়ে যাবে। মাহমুদকে নিয়ে ফিরদৌসীর ব্যঙ্গ-কবিতা তার সামনে লজ্জায় বোরকা টানবে।

রুশ দেশ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যিখানে। তাই তারা খানিকটে এদের মানে, খানিকটে ওদের মানে। শার্ট তারা সায়েবদের মত পাতলুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, কিন্তু তারা যখন আপন 'ন্যাশনাল ব্লাউস' জাতীয় কুর্তা পরে, তখন সেটা আমাদেরই পাঞ্জাবির মত সামনে পিছনে ঝুলিয়ে দেয়।

তারা দেখা করতে আসে খবর দিয়ে, না-দিয়ে, দুইই। বিদেয় নেবার সময় তারা কিন্তু তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করে। গাল-গল্পের মাঝে একটুখানি মোকা

পেলে বলে, 'এইবার ভাই, তোমার সঙ্গে আরেকটি পাপিরসি খেয়ে বাড়ি যাব।'

এ বড় উত্তম পন্থা। আন্তোন যদি ভ্যাচোর-ভ্যাচোর করে আপনার প্রাণ এতক্ষণ অতিষ্ঠ করে তুলে থাকে, তবে আপনি তদ্দণ্ডেই উল্লসিত হয়ে উঠবেন, 'যাক, লক্ষ্মীছাড়াটা তাহলে আর বেশী ভোগাবে না।' আপনার তখন উপেক্ষার ভাবটা ঝেড়ে ফেলে খুশী মুখে দু-চারটি কথা বলতে কিছুমাত্র কষ্ট হবে না। পক্ষান্তরে আন্তোন যদি আপনার দিলের দোস্ত হয় তবে তার আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনাটার জন্য আপনি নিজেকে খানিকটা সামলে নিতে পারবেন।

এবং দ্বিতীয়ত, ইয়োরোপে দেখা হওয়া মাত্রই প্রথম প্রয়োজনীয় কথা পাড়া হয়, পরে গাল-গল্প। প্রাচ্য দেশে তার উলটো—পাঁচটি টাকা চাইবার হলে বিদেয় নিয়ে দোরের গোড়ায় এসে তখন আমতা-আমতা করে চাইতে হয়, বাড়িতে ঢুকেই হুঙ্কার দিয়ে নয়।

রুশ দেশে ওই শেষ সিগারেটের সময় যা কিছু 'বিজিনেস talk' এবং শিবরাম চক্রবর্তী অনুপুনএ 'টক বিজিনেস'॥

দেহলি-প্রান্ত

দিল্লি ছাড়ার সময় আমার ঘনিয়ে এল। বিচক্ষণ জন দিল্লিতে বেশীদিন থাকে না। পঞ্চপাণ্ডব পর্যন্ত মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল দেখে হিমালয় মুখো রওয়ানা দেন। এমন কী সামান্য কুকুরটা পর্যন্ত এখানে পড়ে থাকে নি।

তবে কি যাঁরা এখানে পড়ে থেকে শেষটায় শিব হয়ে যান, তাঁরা অবিবেচক? আদপেই না। এই দুশমনের ভূমি, গরমে শিককাবাব-বানানেওলা, শীতে কুলফী-জমানেওলা, সেক্রেটারি-জয়েণ্ট লুসক্রু-আণ্ডার-তস্য-আণ্ডারকাভার, জাত-বেজাতের-কর্মচারী-কণ্টকিত এই ভূমিতে যে ব্যক্তি 'অশেষ ক্লেশ ভুঞ্জিয়া' পরলোকগমন করে সে 'পরশুরামী' স্বর্গে গিয়ে অপ্সরাদের সঙ্গে দুদণ্ড রসালাপ করতে পারুক আর নাই পারুক, তাকে অন্ততপক্ষে নরকদর্শন করতে হয় না। কারণ এক নরক থেকে বেরিয়েই অন্য নরকে যাবার ব্যবস্থা কোনও ধর্মগ্রন্থই দিতে পারে না। আমি বিস্তর ধর্মের ঘাটে মেলা জল খেয়েছি—এ কথাটা আপনারা প্রায় আপ্ত বাক্যরূপে মেনে নিতে পারেন।

কিন্তু এসব নিছক রাগের কথা।

এই যে আমি দেহলি-বাসীদের সঙ্গে রাশানদের মত শেষ একটা (না, দু-

তিনটে) সিগারেট খাওয়ার হুমকি দিচ্ছি সে শুধু তাঁদের আপন জন ভেবে অভিমানবশত।

আপনারা আমার সাহিত্যিক প্রচেষ্টার কদর করলেন না, আমার গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ আপনাদের সাহিত্য-সভায় পড়তে দিলেন না, যদি বা প্রধান বক্তা কোন আণ্ডার সেক্রেটারির নেমন্তন্ন পেয়ে শেষ-মুহূর্তে কামাই দিলেন বলে আমাকে রচনা পড়তে দিলেন, তখন আবার আমার গুরুগম্ভীর রচনা শুনে আপনারা হাসলেন, যখন রসরচনা (আহা আজকাল রসরচনা লিখে কত লোক রাতারাতি নাম কিনে নিলে) পড়লুম তখন আপনারা গম্ভীর হয়ে গেলেন, সেক্রেটারিদের মস্করা করে কবিতা পড়ে শুনালুম—আপনারা সভয়ে গোপনে একে একে সভাস্থল ত্যাগ করলেন, যখন তাঁদের প্রশস্তি গেয়ে রচনা পাঠ করলুম তখন স্পষ্ট শুনতে পেলুম, আপনারা ফিসফিস করে বলছেন আমি তেলমালিশের ব্যবসা (মাসাজ ইনস্টিটুট নয়) খুলেছি, কিছু না পেরে শেষটায় যখন গান গাইলুম তখন পাড়ার ছোঁড়ারা ঠিক সেই সময় গাধার লেজে টিনের কেনেস্তারা বেঁধে তাকে পাড়াময় খেদিয়ে বেড়াল, ভরতনৃত্যম্ নাচি নি—তাহলে বোধ হয় আপনারা হনুমানের ছবি এঁকে তার তলায় আমার নাম লিখে বছরের শেষে 'নরসিং দাস' প্রাইজের বদলে এই প্রাইজ দিতেন।

তবু আমি আপনাদের উপর এক ফোঁটাও রাগ করি নি। বরঞ্চ আমি আপনাদের কাছে উপকৃত হয়ে রইলুম। আপনাদের সংস্রবে না এলে এই যে সাহিত্যরচনার মামদো ভূত আমাদের কাঁধে ছিল সে কি কস্মিনকালেও নামত ?

বিবেচনা করি এখন কলকাতা ফিরে গেলে পাড়ার ছোঁড়ারা আমাকে দেখা মাত্রই পরিত্রাহি চিৎকার করে পালাবে না, তরুণীরা হয়ত কিঞ্চিৎ ঘাড় বেঁকিয়ে 'এই যে' বলে একটুখানি মিঠে হাসিও জানাবেন, 'ওইরে, আবার এসেছে' বলে দুদ্দাড় করে দরজা জানলা বন্ধ করবেন না।

ব্যালাটা বেচে দিয়েছি। পাণ্ডুলিপিগুলো কাঞ্জিলালকে 'অবদান' করেছি। তার বন্ধু পরিমল দত্ত নাকি গাঁটের পয়সা খরচা করে সেগুলো ছাপাবে। তা ছাপাক ; আপনারা শুধু নজর রাখবেন সে যেন অ্যাকাউন্টস্ বিভাগে বদলি না হয়—ছোকরা তাহলে তবিল তছরুপের দায়ে পড়বে। পরিমলকে আমি স্নেহ করি।

যতই ভাবছি, ততই দিল্লি দেখি খারাপ নয়।

দিল্লির গরম অসহ্য! কিন্তু বিবেচনা করুন সেই গ্রীষ্মের শেষে যখন কালো যমুনার ওপার থেকে দূর-দিগন্ত পেরিয়ে আকাশ-বাতাস ভরে দিয়ে বিজয় মল্লের মত গুরুগুরু করে নবীন মেঘ দেখা দেয়, তারই আবছায়া অন্ধকারে আপনি

খাটিয়াখানা বাইরে পেতে নব বরিষণের প্রতীক্ষায় প্রহর গোনেন, আপনার ত্রিযামা-যামিনীর সখা তারার দল একে একে ম্লান মুখে আপনার কাছ থেকে বিদায় নেয়, অল-ইণ্ডিয়া-রেডিয়োর ঘড়িটা আবার তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই অন্ধকার বিদীর্ণ করেই আপনারই চারপাইখানার কাছে এসে আপনাকে সঙ্গসুখ দেয়, দূর বৃন্দাবনের প্রথম বর্ষণে ভেজা মিঠে হাওয়া এসে আপনার গালে চুমোর পর চুমো খেয়ে যায়, হঠাৎ আকাশের এস্পার ওস্পার ছিঁড়ে-ফেঁড়ে বিদ্যুৎ চমকে দিয়ে নিজাম প্রাসাদের চূড়ো, রাশান রাজদূতাবাসের ফটক, নিমগাছে এর গায়ে ওর বুকে মাথা কোটা এক ঝলকের তরে দেখিয়ে দেয় এবং তারপর সবশেষে অতি ধীরে ধীরে রিমঝিম করে বৃষ্টিধারা যখন আপনার সর্বাঙ্গে গোলাপজল ছিটিয়ে দেয়—তখন আপনি খাটিয়া ঘরের ভিতর টেনে নিয়ে যাবার চিন্তাটা পর্যন্ত করেন না, ভিজে মাটির গন্ধ দিয়ে বুকের রন্ধ্র ভরে নেন, ইতিমধ্যে শুনতে পান—আরকিয়োলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের দরোয়ান রামলোচন সিং তুলসীদাস-কৃত রামায়ণ সুর করে পড়তে আরম্ভ করে দিয়েছেন, আর আপনার প্রতিবেশী সারস্বত ব্রাহ্মণের মেয়ে ভৈরবীতে গান ধরেছে।

দিল্লি কি সত্যই খুব মন্দ জায়গা ?

কিংবা এই শীতকালের কথাটাই নিন। নিতান্ত যদি সন্ধ্যের পর আপনাকে না বেরতে হয় তবে পুনরায় বিবেচনা করুন···

এ-রকম দিনের পর দিন গভীর নীলাকাশ আপনি কোথায় পাবেন ? সকাল-বেলায় সোনালী রোদ ট্যারচা হয়ে আপনার চোখের উপর এসে পড়েছে, ক্রমে ক্রমে লেপ কাঁথা গরম হয়ে উঠল, নাকে টোস্ট স্যাঁকার সোঁদা সোঁদা গন্ধ এসে পৌঁছচ্ছে, এইবার ছাঁৎ করে ডিম-ভাজার শব্দ আর গন্ধ আসবে, আপনি ড্রেসিং-গাউনটা গায়ে চাপিয়ে দিয়ে বারান্দায় এসে বসলেন।

আহা ! সবুজ ঘাসে শিশিরের ঝিলিমিলি, প্রাতঃস্নাত শান্ত ঋজু ঝাউ সামনে দাঁড়িয়ে, শীতের বাতাসে বুগনভেলিয়ার মৃদু কম্পন, তারপর ধীরে ধীরে প্রখর হতে প্রখরতর রৌদ্রে বিশ্বাকাশের আলিঙ্গন, ধূপছায়াতে কালো-সবুজের স্নেহ-চিক্কণ আলিম্পন, আপনার আমার মত গরিবের ফালি অঙ্গনটুকু নন্দনকানন হয়ে উঠল—আপনি সেই সৌন্দর্যের মোহে আপিস কামাই দিয়ে আনন্দঘন দিন স্বর্ণ-রৌদ্রে চক্ষু মুদ্রিত করে কাটালেন—

এ শুধু দিল্লিতেই সম্ভব।

দিল্লি ত্যাগ তাই সহজ কর্ম নয়॥

পঞ্চতন্ত্র

২য়. পর্ব

ডাক্তার রণজিৎ রায়কে
স্নেহ ও কৃতজ্ঞতার
চিহ্নস্বরূপ

সৈ. মুজতবা আলী

ঐতিহাসিক উপন্যাস

কলকাতায় এসে শুনতে পেলুম, বর্তমানে নাকি ঐতিহাসিক উপন্যাসের মরসুম যাচ্ছে। আশ্চর্য লাগলো। বঙ্কিম আরম্ভ করলেন ঐতিহাসিক উপন্যাস দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ লিখলেন সামাজিক - কিঞ্চিৎ রোমান্টিক-ঘ্যাষা—উপন্যাস, শরৎচন্দ্র লিখলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিয়ে, তারাশঙ্কর তথাকথিত নিম্ন সম্প্রদায় নিয়ে। এর পর আবার হঠাৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস কি করে যে ডুব-সাঁতারে রিটার্নজার্নি মারলে ঠিক বোঝা গেল না। আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, কাজেই আর পাঁচ-জনের মত হতভম্ব হতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাকি এখন জোর কাটতি। আবার একাধিক জন বলছেন, এগুলো রাবিশ। পাঁচজনের মত আমি আবার হতভম্ব।

কিন্তু এতে করে আমার ব্যক্তিগত উপকার হয়েছে। বছর পঁচিশেক পূর্বে আমাকে বিশেষ কারণে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ও মারাঠা শক্তির অভ্যুদয় নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়। সে যুগের প্রায় সব কেতাবপত্রই ফার্সীতে। বহু কষ্টে তখন অনেক পুস্তক যোগাড় করেছিলুম। তার কিছু কিছু এখনো মনে আছে। মাঝে মাঝে আজকের দিনের কোনো ঘটনা হুবহু 'শেষ মোগলদের' সঙ্গে মিলে যায় এবং লোভ হয় সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কিন্তু সে সব কেতাবপত্র এখন পাই কোথায়? স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করলে হয়তো ইতিহাসের প্রতি অবিচার করা হবে।

কিন্তু ঐ ঐতিহাসিক উপন্যাসই এক্ষণে আমার পরিত্রাণ এনে দিয়েছে। ধরে নিন্, আমি ঐতিহাসিক উপন্যাসই লিখছি।

মারাঠারা যখন গুজরাত সুবা (বা সুবে অর্থাৎ প্রদেশ, প্রভিন্স) দখল করে তার রাজধানী অহমদাবাদে ঢুকল তখন সেখানকার দেওয়ান (প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রী) মুহাফিজ্‌খানার (আর্কাইভ্‌স্-এর) তাবৎ কাগজপত্র বাড়ি নিয়ে গিয়ে গুজরাত-কাঠিয়াওয়াড়ের একখানা প্রামাণিক ইতিহাস লেখেন। বইখানি তিনি দিল্লীর বাদশা-সালামৎ মুহম্মদ শাহ বাদশাহ রঙ্গীলাকে ডেডিকেট করেন। ইতিহাসের নাম 'মিরাৎ-ই-আহমদী'। পুস্তকের মোকদ্দমায়[১] তিনি

১ বাংলায় মোকদ্দমা বলতে মামলা, 'কেস' বোঝায়। আরবীতে অর্থ অবতরণিকা। 'কদম' মানে পদক্ষেপ ('কদম্ কদম বঢ়হায়ে যা'); মোকদ্দমা প্রথম পদক্ষেপ, অবতরণিকা। আবার প্রথম পদক্ষেপ বলে তার অর্থ মামলা রুজু

বাদশা-সালামৎকে উদ্দেশ করে বলেন, যে রাজনীতি অনুসরণ করার ফলে দিল্লীর বাদশারা গুজরাতের মত মাথার-মণি প্রদেশ হারালেন সে নীতি যদি না বদলানো হয় তবে তাবৎ হিন্দুস্থানই যাবে। সেই নীতির প্রাথমিক স্বর্ণযুগ, ক্রমবিকাশ ও অধঃপতন তিনি সেই ইতিহাসে ধারাবাহিক লিপিবদ্ধ করেছেন।

সেই ইতিহাস থেকে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে লিখছি—তাই আবার বলছি ভুলচুক হলে ধরে নেবেন, এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে একবার পর পর কয়েক বৎসর ধরে গুজরাতে বৃষ্টি না হওয়ার ফলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দলে দলে লোক অহমদাবাদ পানে ধাওয়া করে; সেখানে যদি দু'মুঠো অন্ন জোটে। অগণিত পিতামাতা তাদের পুত্র-কন্যাকে দাস-দাসীরূপে বিক্রয় করে দেয়। গুজরাতি মেয়েরা যে টাকা-মোহর ফুটো করে অলঙ্কার হিসেবে পরে সেগুলো পর্যন্ত বিক্রয় করে দেয়। বিস্তর লোক উপবাসে মরলো।

গুজরাত সুবার সুবেদার (গভর্নর, কিন্তু বর্তমান গভর্নরের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতা ধরতেন এবং দেওয়ানের সঙ্গে এক জোটে প্রদেশ চালাতেন) তখন অহমদাবাদের সব চেয়ে ধনী শ্রেষ্ঠীকে পরামর্শের আমন্ত্রণ জানালেন। এইসব শ্রেষ্ঠীরা প্রধানত জৈন, এবং স্মরণাতীত কাল থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য করে করে বহু অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন (বর্তমান দিনের শ্রেষ্ঠী কস্তুরভাই লালভাই, হটিসিং এই গোষ্ঠীরই লোক)।

সুবেদার সেই শ্রেষ্ঠীকে শুধালেন, দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য কিছু করা যায় কি না। শ্রেষ্ঠী বললেন, মালওয়া অঞ্চলে এবারে প্রচুর ফসল ফলেছে, সেখানে গম-চাল পাওয়া যাবে। তবে দুই প্রদেশের মাঝখানে দারুণ দুর্ভিক্ষ। মালবাহী গাড়ি লুট হবে। অতএব তিনি দুই শর্তে দুর্ভিক্ষ-মোচনের চেষ্টা করতে পারেন: ১) সুবেদার নিরাপদে মাল আনানোর জন্য সঙ্গে গার্ডরূপে ফৌজ পাঠাবেন, ২) মাল এসে পৌঁছলে সুবেদার শ্রেষ্ঠীতে মিলে যে দাম বেঁধে দেবেন মুদীরা যদি তার বেশী দাম নেয় তবে তদ্দণ্ডেই তাদের কঠোর সাজা দেবার জিম্মাদারী সুবেদার নেবেন। সুবেদার সানন্দে সম্মতি দিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠী সুবেদারের কাছ থেকে অর্থ-সাহায্য চান নি।

করার প্রথম কদম—এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে লাতিনে যাকে বলে প্রিমা ফাশি কেস্—কিন্তু বাঙলায় এখন মোকদ্দমা বলতে পুরো কেসটাই বোঝায়।

বাড়িতে এসে শ্রেষ্ঠী বংশানুক্রমে সঞ্চিত অর্থ, অলঙ্কার-জওহরাৎ বের করলেন ; স্ত্রী কন্যাকে তাঁদের অলঙ্কার পর্যন্ত খুলে দিতে বললেন।

সেই সমস্ত ঐশ্বর্যভাণ্ডার নিয়ে শ্রেষ্ঠীর কর্মচারীরা সুবেদারের ফৌজ সহ মালওয়া পানে রওয়ানা দিলেন। কিছুদিন পরেই মুখে মুখে অহমদাবাদে খবর রটে গেল, মাল পৌঁছল বলে। পথে লুটতরাজ হয় নি।

সেই সব গম ধান ও অন্যান্য শস্য যখন অহমদাবাদে পৌঁছল তখন শ্রেষ্ঠী তাঁর একাধিক হাভেলি—বিরাট চক মেলানো বাড়ি, একসঙ্গে গোষ্ঠীর বহু পরিবার একই বাড়িতে বসবাস করতেপারে—খুলে দিয়ে আঙ্গিনার উপর সেসব রাখলেন। তারপর সুবেদারের সঙ্গে হিসেব করলেন, কি দরে কেনা হয়েছে, রাহ-খর্চা (ট্রান্সপোর্ট) কত পড়েছে এবং তাহলে এখন কি দর বেঁধে দেওয়া যায়? সুবেদার বললেন, 'আর আপনার মুনাফা?' শ্রেষ্ঠী বললেন, 'যুগ যুগ ধরে মুনাফা করেছি ব্যবসা বাণিজ্যে। এ ব্যবসাতে করবো না। যা খর্চা পড়েছে সেই দর বেঁধে দিন। মুদীর সামান্য লাভ থাকবে।' দাম বেঁধে দেওয়া হল।

এবারে শুনুন, সব চেয়ে তাজ্জবকী বাৎ! শ্রেষ্ঠী শহরের তাবৎ মুদীদের ডেকে পাঠালেন এবং কোন্ মুদী কটা পরিবারের গম যোগায় তার শুমারী (গণনা) নিলেন। সেই অনুযায়ী তাদের শস্য দেওয়া হল। .সোজা বাঙলায় আজকের দিনে একেই বলে রেশনিং। এবং তাব সঙ্গে গোড়াতেই ব্যবস্থা, যাতে হোর্ডিং না হতে পারে। এবং ফেয়ার প্রাইস।

অহমদাবাদে চতুর্দিকে আনন্দোচ্ছ্বাস। ইতিমধ্যে শ্রেষ্ঠীর চর এসে জানালে অমুক মহল্লার দু'জন মুদী ন্যায্যমূল্য থেকে এক না দু' পয়সা বেশী নিয়েছে।

শ্রেষ্ঠী তৎক্ষণাৎ স্বয়ং সেই মহল্লায় গিয়ে সর্বজন সমক্ষে তদন্ত করলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে সোজা সুবেদারের বাড়ি গেলেন। সুবেদার তখন ইয়ার-বক্সী[২] সহ গমাগমন সেলেব্রেট করছিলেন। কিন্তু পূর্বপ্রতিজ্ঞা অনুযায়ী বেরিয়ে এসে সব কিছু শুনে সেপাই পাঠালেন মুদীদের ধরে আনার জন্য। সাক্ষীসাবুদও যেন সঙ্গে সঙ্গে আনা হয়।

২ বক্সী বা বখশী (বখ্শিশ কথা একই ধাতু থেকে) অর্থ, একাউন্টেন্ট জেনারেল, অডিটার জেনারেল ও ফৌজের চীফ পে-মাস্টার—এ তিনের সমন্বয়। কায়স্থরা প্রধানত এই দায়িত্বপূর্ণ চাকরি করতেন। প্রধান বা মীর বখ্শী নিয়োগ করতেন স্বয়ং দিল্লির বাদশা-সালামৎ। আর সরাসরি নিয়োগ হতেন কাজী উল কুজ্জাৎ অর্থাৎ চীফ জাস্টিস, সদ্র্-উস্-সদ্র্ (সেই অঞ্চলে বাদশা-সালামতের

তদ্দণ্ডেই সুবেদারের সামনে সাক্ষীসাবুদ তদন্ত-তফ্‌তীশ হয়ে গেল। প্রমাণ হয়ে গেল সত্যই তারা বেশী দাম নিয়েছে।

সুবেদার হুকুম দিলেন, বড্ড বেশী 'খেতে চেয়েছিল' বলে মুদী দুটোর পেট কেটে ফেলা হোক। তাই করা হল। নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেল।

সবাই যেন এই দৃষ্টান্ত থেকে সজাগ সতর্ক হুঁশিয়ার খবরদার হয় সেই উদ্দেশ্যে সুবেদার হুকুম দিলেন, শহরের সব চেয়ে উঁচু দুটো উটের পিঠে তাদের লাশ বেঁধে দিয়ে নগর-পরিক্রমা করা হোক।

সমস্ত রাত ধরে তাই করা হল।

এরপর ঐতিহাসিক যেন নিতান্ত সাদামাটা ডালভাতের কথা বলছেন, ঐভাবে মন্তব্য করছেন, 'অতঃপর আর কেউ অন্যায্য মুনাফা করার চেষ্টা করে নি।'

(আমার হাতে যে পাণ্ডুলিপিখানা পৌঁচেছিল তাতে দেখি এ জায়গাটায় এ যুগের কোন্ এক সুরসিক পাঠক লিখছেন, 'we are not surprised!')

* * *

আমি আর কি মন্তব্য করবো? রেশনিং, ফেয়ার-প্রাইস, নো চান্‌স্ ফর হোর্ডিং, তন্মুহূর্তে তদন্ত, তদ্দণ্ডে দণ্ড, জনগণকে হুঁশিয়ারী দেওয়া এসবই হয়ে গেল চোখের সামনে। অবশ্য আমি নিরীহ প্রাণী, পেট কেটে নাড়িভুঁড়ি বের করার আদেশ শুনলে আমার গা শিউরে উঠে। তবে যারা দিনের পর দিন রেশন-শপের লাইনে দাঁড়িয়েছেন, চোখের সামনে কালো-বাজার এবং যাবতীয় অনাচার দেখেছেন, পুত্রকন্যাকে কচুঘেচু খাওয়াতে বাধ্য হয়েছেন এবং বিত্তশালীরা কি কৌশলে তোফা খানাপিনা করছেন সবিশেষ অবগত আছেন, তাঁরা হয়তো উল্লাস বোধ করবেন। আমি আপত্তি করবো না—কারণ পূর্বেই বলেছি, আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি॥

আপন জমিজমা তদারকের জন্য, তথা কেউ নিঃসন্তান মারা গেলে তার সম্পত্তি অধিকার করতে)। সরকার=চীফ-সেক্রেটারী, কানুনগো=লিগেল রিমেম্‌ব্রেনসার পরে নিযুক্ত হতেন। বখ্‌শীর কাছ থেকে টাকা পেয়ে ব্যবসায়ীরা সঙ্গে সঙ্গে সামনের বাজারে হুণ্ডি কাটতো বলে সে বাজারকে 'বখ্‌শী বাজার' বলা হত। বখ্‌শী সরকার ইত্যাদি বড় বড় এডমিনিস্‌ট্রেটিভ চাকরি প্রধানত কায়স্থরাই করতেন। ইংরেজ মোটামুটি এই পদ্ধতিই চালু রাখে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়ে কথা হচ্ছিল। আর বলছিলুম, এতে করে আমার বড্ডই উপকার হয়েছে। ইতিহাস নিজেকে মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তি করে। চোখের সামনে যখন তাই কোনো কিছু একটা ঘটে, তখন স্মৃতিপথে আসে প্রাচীন দিনের ঐরকম কোনো একটি ঘটনা। প্রথম যৌবনে কোনো এক প্রাচীন ইতিহাসে পড়েছি। সে বই এখন আর পাবো না। একে ফার্সীতে লেখা, তদুপরি বইখানা হয়তো সে ভাষার পুস্তকের মাঝেও দুষ্প্রাপ্য। স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করলে হয়তো ঐতিহাসিকের প্রতি অবিচার করা হবে।

ইতিমধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস এসে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। কেউ যদি ত্রুটিবিচ্যুতি দেখিয়ে দেয় তবে নিঃশরমে বলবো, আমি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছি।

গুজরাতের ইতিহাস 'মিরাৎ-ই-আহমদী'র কথা হচ্ছিল। বইখানা লেখা হয়, নাদির শাহ যখন ভারতবর্ষ লণ্ডভণ্ড করে যান মোটামুটি সেই সময়। এ পুস্তক গ্রন্থকার আরম্ভ করেছেন জৈন সাধু মেরুতুঙ্গাচার্যের সংস্কৃতে লেখা গুজরাতের প্রাক্-মুসলিম যুগের ইতিহাসের[১] সারাংশ নিয়ে, তারপর আছে গজনীর সুলতান মাহমূদ[২] কর্তৃক সোমনাথ আক্রমণ।

সুলতান মাহমূদ এমনিতে বলতেন, তিনি কাফিরেব বিরুদ্ধে জিহাদ করেন, কিন্তু সিন্ধুদেশ সপ্তম অষ্টম শতাব্দী থেকে মুসলমান অধিকারে। সে দেশ কি করে আক্রমণ করা যায়? সুলতান বললেন, 'সিন্ধুদেশের মুসলমানরা যদিও কাফির নয়, তবু কাফির-তুল্য—তারা হেরেটিক; অতএব আক্রমণ করা যায়।'

তা সে যাই হোক, তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল কাঠিওয়াড়ের সোমনাথ মন্দিরের বিরাট ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করা। সেটা সিন্ধুদেশ জয় না করে হয় না।

কিন্তু তার পরই আসে কচ্ছের রাণ। সেটা অতিক্রম করা সিন্ধু-বিজয়ের চেয়েও কঠিন। মাহমূদের সাঙ্গোপাঙ্গ তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা দিয়ে নিষ্ফল হলেন।

কচ্ছের রাণ অতিক্রম করতে গিয়ে মাহমূদের ফৌজের অসংখ্য সৈন্য ও অশ্ব

---

১ সংস্কৃত বইখানার নাম আমার মনে পড়ছে না। বোধ হয় 'প্রবন্ধ চিন্তামণি'।

২ মাহমূদ ও মুহম্মদ দুই ভিন্ন নাম। যে রকম হাসন, হুসেন ও হাস্সান (সুহ্রাওয়ার্দী), তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নাম।

তৃষ্ণায় প্রাণ হারালো। চোরাবালিতেও অনেকে। তখনকার দিনের ঐতিহাসিকরা তার জন্য গাইডকে জিম্মেদার করেছেন; সে নাকি বিশ্বাসঘাতকতা করে। কিন্তু মাহমুদকে বাধ্য হয়ে ঐ পথেই ফিরে যেতে হয়েছিল। মাহমুদ ছিলেন ল্যাণ্ডলক্‌ট্‌ (অর্থাৎ যে দেশের সঙ্গে সমুদ্রের কোনো সংস্পর্শ নেই) দেশের লোক—হিটলারেরই মত।[৩] তাই দ্বারকা থেকে নৌবহর যোগাড় করে 'ঠাট্টা' (করাচীর কাছে প্রাচীন বন্দর) যাবার সাহস করেন নি।

* * *

এর পর পাগলা রাজা মুহম্মদ তুগলুক এই কচ্ছের রাণের কাছে মার খান।

ফার্সী ঐতিহাসিক লিখেছেন 'তগী', ফার্সীতে 'ঠ' ধ্বনি নেই—শব্দটা বোধ হয় তাই 'ঠগী'। সেই তগী মধ্য-পশ্চিম ভারতে লুটতরাজ আরম্ভ করে। বাদশাহী ফৌজ বার বার তার বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়ে বার বার বিফলমনোরথ হয়ে দিল্লি ফিরে আসে। মুহম্মদ রেগে টঙ। বললেন, 'আমি স্বয়ং যাবো।'

একটা সামান্য ডাকুর বিরুদ্ধে স্বয়ং হুজুর যাবেন!

না যাবোই।

হুজুর স্বয়ং আসছেন জেনে তগী অহমদাবাদ পালালো। হুজুর বললেন, চলো অহমদাবাদ। পারিষদরা মহা অসন্তুষ্ট। সেই সুদূর অহমদাবাদ—দিল্লি থেকে কত দিনের রাস্তা! হুজুর কিন্তু গোঁ ছাড়লেন না। অহমদাবাদে পৌঁছলে পর জানা গেল, তগী পালিয়েছে কাঠিয়াওয়াড়ে। হুজুর বললেন, 'চলো কাঠিয়াওয়াড়।' কিন্তু তখন বর্ষা নেমে গিয়েছে। এবং শ্রান্তি-ক্লান্তিতে হুজুরের হল জ্বর। কি জ্বর, আমি বর্ণনা থেকে বুঝতে পারি নি। ম্যালেরিয়া খুব সম্ভব নয়। ম্যালেরিয়া বোধ হয় এ-দেশে পরে এসেছে। তা সে যাই হোক, হুজুর তামাম বর্ষাকালটা অহমদাবাদে জ্বরে ধুঁকে ধুঁকে রোগা-দুবলা হয়ে গেলেন। কিন্তু বর্ষা-শেষেও গোঁ ছাড়লেন না—তাঁকে যে পাগলা রাজা বলা হত সেটা প্রধানত তাঁর গোঁর জন্যই—'চললেন কাঠিয়াওয়াড়। তগী পালালো কচ্ছে। হুজুর গেলেন কচ্ছ। তগী পালালো কচ্ছের রাণের উপর দিয়ে সিন্ধুদেশে। সে ডাকাত—রাণের কোথায় কি, জানে—সেখানে একাধিক বার আশ্রয় নিয়েছে। তদুপরি

---

৩ ফ্রান্স জয়ের পর হিটলার ইংলণ্ড আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। এর নাম অপারেশন 'সী লায়েন' (সমুদ্রসিংহ, 'জে লোয়ে') কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা বাতিল করে দেওয়া হয়। তার বহুবিধ কারণ নিয়ে নানা গুণী নানা আলোচনা করেছেন। অন্যতম কারণ বলা হয়, হিটলার ল্যাণ্ডলক্‌ট্‌ দেশের লোক ছিলেন

সে তো আর বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাচ্ছে না ; তার দানাপানির আর কত-টুকুই বা দরকার।

এবারে পারিষদরা তারস্বরে প্রতিবাদ জানালেন। গজনীর মাহমুদ বাদশা যে রাণে কি রকম নাজেহাল হয়েছিলেন সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সঙ্গে ছিলেন রাজসভার সরকারী ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনী (ইনি 'দিল্লি দূর অস্ত'-এর সাধু নিজামুদ্দীন আউলিয়া ও কবি আমির খুসরুর নিত্যালাপী বন্ধু ছিলেন); তিনিও নিশ্চয়ই প্রাচীন ইতিহাস কীর্তন করেছিলেন। তদুপরি তুগলুক নিজে ছিলেন সুপণ্ডিত। ইতিহাস ভূগোল উত্তমরূপেই জানতেন। কিন্তু হিটলার যদিও অত্যুত্তমরূপেই নেপোলিয়নের রুশ-অভিযান ও তার মারাত্মক ফলাফল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং যদিও তাঁর সেনাপতিরা তাঁকে বার বার রুশ-অভিযান থেকে নিরস্ত থাকতে উপদেশ দেন, তবুও তিনি সেই কর্মটি করেছিলেন। এখানেও তাই হল। তুগলুক নিরস্ত হলেন না।

কচ্ছের রাণে বাদশা মুহম্মদ তুগলুকের কী নিদারুণ দুরবস্থা হয়েছিল, তার বর্ণনা একাধিক ঐতিহাসিক দিয়েছেন। আজ আমার আর ঠিক মনে নেই, তাঁর সৈন্য এবং ঘোড়া খচ্চরের ক'আনা বেঁচেছিল, আর ক'আনা মরেছিল।

এ সময়ের একটি ঘটনা ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন। রোগে জীর্ণ দুর্বল দেহ নিয়ে ঘোড়ার উপরে বসে মুহম্মদ তুগলুক ধুঁকতে ধুঁকতে এগোচ্ছেন। এমন সময় তিনি ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনীকে ডেকে পাঠালেন—কাউকে ডেকে না পাঠালে হুজুরের কাছে যাবার কারো অনুমতি ছিল না। বরনী কাছে এলে তুগলুক তাঁকে বললেন, 'আচ্ছা বরনী, তুমি তো জানো আমি আমার প্রজাদের কতখানি ভালোবাসি। আমি যে-সব ফরমান-হুকুম জারি করেছি সে তো একমাত্র তাদেরই মঙ্গলের জন্য। তবে তারা একগুঁয়েমি করে আমার আদেশ অমান্য করে কেন ?' তারপর শুধোলেন, 'আচ্ছা বরনী, তোমার কি মনে হয়, আমি বড্ড কড়া হাতে শাসন করেছি, প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত শাস্তি দিয়েছি ? তবে কি এখন আমার উচিত আরো ক্ষমা-দয়ার সঙ্গে শাসন করা ?'

বলে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে দুআভুআ করতেন। গ্রীস জয় করার পর তিনি তাই মণ্টাদ্বীপ আক্রমণ ক্রমাগত পিছিয়ে দিয়ে ভুল করেন। ফলে রমেলও পুরো সাহায্য পেলেন না। এ-দেশের মোগল-পাঠান রাজাদের বেলাও তাই। নৌ-বাহিনীর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল না বলে তাঁরা ইংরেজকে অবহেলা করেন। ফলে ভারতবর্ষ সমুদ্রপথে বিজিত হয়।

বরনী লিখছেন, 'এই শেষকালে যদি হুজুর হঠাৎ তাঁর নীতি বদলান তবে হয় তো আরো বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে ভেবে আমি নীরব থাকাটাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করলুম।'

এদিকে দিল্লিতে বসে তুগলুকের প্রধান মন্ত্রী পড়েছেন মহাবিপদে। হুজুরের কোনো খবর নেই। রাণ থেকে তো দূত পাঠানো যায় না, যে দিল্লি আসবে। দূত আর তার পার্টি পথে জল পাবে কোথায়? পিছনপানে অবশ্য মৃত্যু—সম্মুখ দিকে তবু বাঁচবার আশা আছে। কাজেই দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, হুজুরের কোনো খবর নেই। প্রধান মন্ত্রীর ভয়, খবরটা রটে গেলে তুগলুকের কোনো আত্মীয় বা অন্য কোনো দুঃসাহসী রাজা মরে গেছেন এই সংবাদ রটিয়ে কিছু সৈন্যসামন্ত যোগাড় করে দিল্লির তখতে না বসে যায়। রাজকোষ তখন তার হাতে এসে যাবে এবং ফলে সে আরো সৈন্য সংগ্রহ করে নেবে। হুজুর যখন ফিরে আসবেন তখন তাঁর সঙ্গের সৈন্যদল পরিশ্রান্ত ক্লান্ত। হুজুর তখন লড়াই দেবেন কি করে? প্রধান মন্ত্রী তখন শুরু করলেন স্রেফ ধাপ্পা। হুজুর রোজ সকালে যে ঝরোকায় দাঁড়িয়ে দেখা দিতেন সেখানে প্রধান মন্ত্রী দাঁড়িয়ে বলতেন, 'বড় আনন্দের বিষয়, আজও হুজুরের চিঠি পেয়েছি। হুজুর বগাল তবীয়তে আছেন। শিগগীরই রাজধানীতে ফিরে আসছেন।' তারপর আঙ্গরখার (অঙ্গরক্ষা) ভিতরের জেব থেকে বগাস্ চিঠি বের করে, গভীর সম্মানের সঙ্গে সেটি চুম্বন করে উচ্চকণ্ঠে সেটি পড়ে শোনাতেন—আগাগোড়া নিছক গুল! তার পর আরো সসম্মানে চিঠিখানা চুম্বন করে পকেটে রেখে দিতেন।

প্রধান মন্ত্রী হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। ধাপ্পা, গুল, থিয়েটারি সব কিছুকা এলেম পেটে ধরতে হয়।

ওদিকে অশেষ ক্লেশ ভুগে হুজুর সিন্ধুনদের তীরে এসে পৌঁছলেন। তগীর কি হল আমার মনে নেই। পৌঁছেই হুজুর দিল্লি-পানে ঘোড় সওয়ার রওনা করলেন। তারা দিল্লি পৌঁছলে প্রধান মন্ত্রীর ধড়ে জান এল।

হুজুর আর কচ্ছের রাণ ধরে দিল্লি ফিরলেন না। স্থির হল, নৌকায় করে সিন্ধু উজিয়ে উজিয়ে তারই উপনদী দিয়ে লাহোর পৌঁছবেন। উত্তম ব্যবস্থা। ইতিমধ্যে রোজার মাস বা রমজান এল। হুজুর বললেন, 'উপোস করবো।' আমীর-ওমরাহ বললেন, 'হুজুর একে অসুস্থ, দুর্বল। তদুপরি ভ্রমণকালে উপবাস করা ইচ্ছাধীন—কুরান শরীফের আদেশ।' হুজুর তেড়ে বললেন, 'যে মুসাফিরীতে (ভ্রমণে) তকলীফ হয় আল্লাতালা সেইটের কথাই বলেছেন। আমরা তো যাচ্ছি আরামসে নৌকায় শুয়ে শুয়ে। আমি উপোস করবোই।'

পুনরায় গোঁ। তর্ক করবে কে? মুহম্মদ তুগলুকের সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে তর্ক করবার মত এলেম কারো পেটে ছিল না। (আরেক ধনুর্ধর পণ্ডিত ছিলেন ঔরঙ্গজেব)।

কয়েকদিন পরে ধরা পড়ল একটি চমৎকার মাছ। কিন্তু এ জাতের মাছ দিল্লিবাসীরা কখনো দেখেন নি। তারা বললেন, 'যে মাছ চিনি নে সেটা খাব না।' হুজুর বললেন, 'কুরান, হদীস কোনো শাস্ত্রে এ জাতীয় মাছের বর্ণনা দিয়ে খেতে যখন বারণ করা হয় নি তখন আমি ইটি খাবই।' আবার গোঁ।

খেলেন। দারুণ তেলওলা মাছ ছিল। হুজুরের শরীরও ছিল রোগা, রাণের ধকলে দুর্বল। পেট ছাড়লো। কিছুতেই বন্ধ হয় না। বোধ হয় তৃতীয় দিনে হুজুর ইন্তিকাল করলেন, অর্থাৎ পটল তুললেন।

ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন লিখছেন, 'এই প্রকারে হুজুর তাঁর অবাধ্য প্রজাকুলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে রক্ষা পেলেন; প্রজাকুলও হুজুরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বাঁচলো!'

* * *

আমি বঙ্গসন্তান। মাছের নামে অজ্ঞান। আমার মনে প্রশ্ন জাগলো, বাদশা-সালামৎ কি মাছ খেয়ে শহীদ হলেন!

বরনী, মিরাৎ দিয়েছেন মুসলিম চান্দ্র মাসের হিসাবে তুগলুকের মৃত্যুদিবস। তার থেকে কোন্ ঋতুতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ধরা যায় না। বিস্তর ক্যালেণ্ডার ঘেঁটে যোগবিয়োগ করে বের করলুম ঋতুটি।

আমার এক সিন্ধী দোস্ত আছেন, ইতিহাসে তাঁর বড়ই শখ। তার বাড়ি গিয়ে তাঁকে শুধালুম।

তিনি বললেন, 'নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, পাল্লা মাছ।'

* * *

গঙ্গা উজিয়ে যেটা আসে বা একদা আসতো, সেটা ইলিশ—হিল্‌সা। নর্মদা উজিয়ে ঐ মাছটা যখন আসে তখন ব্রোচের (broach—ভৃগুকচ্ছ) লোক এটাকে বলে মদার, পার্সীরা বলে বিম্। সিন্ধু উজলে এই মাছকেই বলে পাল্লা।

অনেকেই অনেক কিছু চড়ে স্বর্গে যান, ঐরাবত, পুষ্পকরথ, কত কি?

শাহ-ইন্-শাহ বাদশা-সালামৎ মুহম্মদ তুগলুক শাহ ইলিশ চড়ে স্বর্গে গেলেন। স্বর্গে যাবেন না তো কোথায় যাবেন? ইলিশ খেয়ে যে প্রাণ দেয় সে তো শহীদ—মার্টার!

দর্শনাতীত

ছন্নের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি বিরাট বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডরে। সবে এসেছি 'ছ্যাশ' থেকে—হাইকোর্টটি দেখিয়ে দেবার মতও কোনো খাটাশকে পাচ্ছি নে। কিন্তু রমণীজাতি দয়াশীলা—বেদরদীরা বলে হরবকৎ শিকার-সন্ধানী—আমার সঙ্গে কথা কইলে নিজের থেকে। আমি তখন বিবর্ণ বিস্বাদ বদখদ কোন এক মাংস, তদধিক বিজাতীয় হর্স-ক্যাবেজ (সচরাচর এ বস্তু ঘোড়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দেওয়া হয়) খাবার চেষ্টা করছি, চোখের জলে নাকের জলে। সব শুনে বললে, 'দর্শন? তাহলে শ্মিটকে মিস্ করো না; বুড়ার বয়স আশী পেরিয়ে গেছে, কখন যে পটল তুলবে (জর্মনে বলে 'আপজেগ্‌লেন') ঠিক নেই।'

পোড়ার দেশে লেকচার-রুমে সীট রিজার্ভ করতে হয়। পাগুক্ত যুবতীটি ধানী-লংকার মত এফিশেণ্ট। সাত দিন পরে প্রথম লেকচারে গিয়ে দেখি, একদম পয়লা কাতারে পাশাপাশি দু'খানা চেয়ার রিজার্ভ করে বসে আছে প্রফেসারের চেয়ার থেকে হাত আষ্টেক দূরে।

অধ্যাপক এলেন ঘণ্টা পড়ার মিনিট পাঁচেক পরে। বয়েস আশী না, মনে হবে সোয়া-শো—যেভাবে আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে ঘরে ঢুকলেন। ইয়া বিরাট লাশ। ফ্রলাইন উরজুল লাফ দিয়ে এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে। বুড়ো রোষকষায়িত লোচনে তাঁর দিকে তাকিয়ে হাত দু খানা অল্প তুলে ধরলেন। উরজুল এক দিকের ওভারকোটটা তাঁর দেহ থেকে মুক্ত করার পর তিনি অতি কষ্টে শরীরে একটু মোচড় দিলেন। এই গুহ্যতম তান্ত্রিক মুষ্টিযোগ প্রসাদাৎ তিনি তাঁর ওভারকোটের নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভ করলেন। শেষনাগকেও বোধ হয় তাঁর বাৎসরিক খোলস থেকে মুক্ত হতে এতখানি মেহন্নৎ বরদাস্ত করতে হয় না।

ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্মে উঠে চেয়ারে আসন নিলেন। সচরাচর অধ্যাপকরা প্ল্যাটফর্মের নিকটতম কোণে উঠেই বক্তৃতা ঝাড়তে আরম্ভ করেন। ইনি চুপচাপ বসে রইলেন ঝাড়া পাঁচটি মিনিট। ধবধবে সাদা কলারের উপর হাঁড়িপানা তাঁর বিরাট মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি তাতে অন্তত ডজনখানেক কাটাকুটির দাগ। লেকচার আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত ফিস্‌ফিস্ করে কথা কইতে বারণ নেই। আমি উরজুলকে শুধালুম, 'মুখে ওগুলো কিসের দাগ?'

'ফেনসিঙের। সিনেমাতে দেখ নি, লম্বা সরু লিকলিকে তলওয়ার দিয়ে

একে অন্যের কলিজা ফুটো করার পায়তারা কষে? পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তলওয়ার নাকের কাছে এলেও ইনি পিছু-পা তো হনই নি, মাথাটা পর্যন্ত পিছনের দিকে ঠেলে দেন নি। প্রত্যেকটি কাটাতে ক'টা স্টিচ লেগেছিল ওঁকে শুধোতে পারো।

আমি বললুম, 'উনি না দর্শনের অধ্যাপক!'

'হ্যাঁ, কিন্তু ওঁর বাপ-পিতামো ছিলেন কট্টর প্রাশান ঐতিহ্যের পাঁড় জেনারেল গুষ্টি। তাঁদের বর্মের মত শক্ত হৃদয় ভেঙে ইনি দর্শনের অধ্যাপক হয়ে গেলেন। কৈশোরে বোধ হয় সে মতলব ছিল না। তাই ছুঁদে ছুঁদে ফেনসারদের চেলেঞ্জ করে এসব অস্ত্র-লেখার কলেক্‌শন্ আপন মুখে নিয়ে বাকী জীবন দর্শন পড়াচ্ছেন। তাইতে বাপ-দাদার ততোধিক মনস্তাপ যে, এমন পয়লানম্বরী তলওয়ারবাজ হয়ে গেল মেনিমুখো মেস্টার-মেলের একজন।'

আমি বললুম, 'পেন্ ইজ মাইটিয়ার দেন সর্ড!'

'ছোঃ! ভদ্রলোক জীবনে এক বর্ণ কাগজে কলমে লেখেন নি—সাত ভলুমি কেতাব দূরে থাক, এক কলমের প্রবন্ধ পর্যন্ত না। কলমই ওর নেই। বোধ হয় টিপসই দিয়ে—'

অধ্যাপক ছাদ-ছোঁয়া গ্যালা'রর উপর-নিচ ডান-বাঁ'র উপর চোখ বুলিয়ে আরম্ভ করলেন—ওঃ, সে কি গলা! যেন নাভিকুণ্ডলী থেকে প্রণবনাদ বেরুচ্ছে, 'মাইনে ডামেন্ উন্‌ট্ হেরেন্!'—'আমার মহিলা ও মহোদয়গণ!' তার পর দম নিয়ে বললেন, 'অন্যবারের মত এবারেও আমি রেকটরকে'—তার পর গলা নামিয়ে বিড়বিড় করে বললেও সমস্ত ক্লাসই শুনতে পেল—'আস্ত একটা গাধা—'

আমার তো আক্কেল গুড়ুম। রেকটর যিনি কিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বময় কর্তা, তাঁকে গর্দভ বলে উল্লেখ করা—তা সে বিড়বিড় করেই হোক আর রাসভ-কণ্ঠেই হোক—এ যে অবিশ্বাস্য!

অধ্যাপক বলে যেতে লাগলেন, 'রেকটরকে আমি অনুরোধ জানালুম, আমাকে এই টাম থেকে নিষ্কৃতি দিতে। অবাচীন বলে কিনা, আমাকে না হলে তার চলবে না। এ উত্তর আমি ইতিপূর্বেও শুনেছি। তার পূর্বের রেকটর—' আবার বিড়বিড় করলেন, 'বলদ, বলদ! স্রেফ বলদ—তাকেও আমি একই অনুরোধ করেছিলুম, এবং একই উত্তর পেয়েছিলুম। তার পূর্বের রেকটর—কিন্তু কাহিনী সম্প্রসারিত করার প্রয়োজন নেই—এবং তার পূর্বেরও সবাই একই উত্তর দেয়। বস্তুত, মাইনে ডামেন্ উন্‌ট্ হেরেন্, গত বাইশটি বৎসর ধরে আমি এই একই উত্তর শুনে আসছি। মনে হচ্ছে, অরিজিনালিটি রেকটর সম্প্রদায়কে

এড়িয়ে চলেন। তা সে যাক, তাদের বক্তব্য, আমাকে ছাড়া চলবে না, আমি ইনডেস্‌পেন্‌সিবল।'

এবারে তিনি স্বয়ং সিন্ধী বলদের মত ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তবে কি সাতিশয় সন্তাপের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে, জর্মনি এমনই চরম অবস্থায় পৌঁছেছে যে, এদেশে আর দার্শনিক নেই? কিন্তু এই আমার শেষ টার্ম। আমি মনস্থির করে ফেলেছি।' তার পর চোখ বন্ধ করে খুব সম্ভব প্রথম বক্তৃতায় প্রথম কি বস্তু দিয়ে আরম্ভ করবেন তার চিন্তা করতে লাগলেন। উরজুল আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, 'তাঁর শেষ টার্ম। এ ভয় তিনি নিদেন পঁচিশ বচ্ছর ধরে দেখাচ্ছেন—প্রতি টার্মের গোড়ায়।' বুড়ার চোখ বন্ধ হলে কি হয়, কান দিব্য সজাগ। চোখ খুলে বললেন, 'নো, আবার নো। এই আমার শেষ টার্ম—কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

তার পর গ্রীক দর্শন নিয়ে আরম্ভ করলেন। তাঁর পড়াবার পদ্ধতি অনুকরণ করা অসম্ভব। কারণ, তাঁর পড়ানোটা সম্পূর্ণ নির্ভর করতো তাঁর স্মৃতিশক্তির উপর। সে স্মৃতিশক্তি বিদ্বিদত্ত। কোন্‌ সালের, কোন্‌ বইয়ের, কোন্‌ অধ্যায়ে, এমন কি মাঝে মাঝে কোন্‌ পাতায় কি তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে সেগুলো বলে যেতে লাগলেন কোনো প্রকারের নোট না দেখে। প্রত্যেকটি সেন্টেন্স স্বয়ংসম্পূর্ণ। ভাষা সরল। এবং মাঝে মাঝে প্লাতো, আরিস্ততল বোঝাতে গিয়ে হঠাৎ মারেন দু'হাজার বছরের ডুব-সাঁতার। এ যুগের কে তার সর্বোত্তম ব্যাখ্যা করেছেন, কোথায়, কোন্‌ পরিচ্ছেদে—তার সবিশদ বর্ণন। আমি হতভম্ব।

ঘণ্টা পড়তে আস্তে আস্তে উঠলেন। ফ্রলাইন উরজুল তাঁকে পুনরায় ওভার-কোট পরিয়ে দিলেন। ধীরে মন্থরে করিডরে নামলেন।

আমি উরজুলকে বললুম, 'এ কী কাণ্ড! গণ্ডাখানেক রেকটরকে ইনি গাধা-বলদের সঙ্গে—?'

'ওঃ! এঁরা সবাই এসব জানেন। এঁরা সবাই তাঁর ছাত্র।'

'ওকে ছুটি দেয় না কেন?'

'সকলেরই বিশ্বাস, সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাল তুলবেন বলে। মাধ্যাকর্ষণ নয়, দর্শনাকর্ষণ তাঁকে ইহলোকে আটকে রেখেছে।'...

এখানে রোল-কল হয় না। টার্মের গোড়াতে ও শেষে আপন আপন 'স্টুডেন্টস বুকে' অধ্যাপকের নাম দু'বার সই করিয়ে নিতে হয়।

গোড়ার দিকে ভিড় ছিল বলে হাল্কা হলে পর আমি আমার 'বুক' নিয়ে পাতলুম। এযাবৎ অন্য কারো সঙ্গে তিনি বাক্যবিনিময় করেন নি। আমাকে

দেখে চেয়ারে আরামসে হেলান দিয়ে বললেন, 'আঃ! বাঃ বাঃ! তার পর? আচ্ছা। বলুন তো আপনি কি জর্মন বেশ বুঝতে পারেন?'

আমি বললুম, 'অল্প, অল্প।'

'বেশ, বেশ। তা—তা, আপনি কোন্ দেশ থেকে এসেছেন?'

'ইণ্ডিয়া।'

কেন যে এতখানি তাজ্জব হয়ে তাকালেন বুঝতে পারলুম না। বললেন, 'ইণ্ডিয়া? কিন্তু ইণ্ডিয়াই তো দর্শনের দেশ। আপনি এখানে এলেন কেন?'

আমি সবিনয় বললুম, 'নিশ্চয়ই, কিন্তু আধুনিক দর্শনে জর্মনির সেবা ও দান তো অবহেলার বিষয় নয়।'

কী আনন্দে, কী গর্বে অধ্যাপকের সেই কাটাকুটি-ভরা মুখ যে প্রসন্ন হাস্যে ভরে গেল, সেটি অবর্ণনীয়। শুধু মাথা দোলান আর বলেন, 'বস্তুত তাই, প্রকৃতপক্ষে তাই।'

এবারেও যখন তিনি 'আপনি' বলে সম্বোধন করলেন তখন আমি যেন 'তুমি' শুনতে পেলুম। তাঁর বিরাট সাদা মাথাটা আমার দিকে ঠেলে কাছে এনে বেদনা-ভরা গলায় বললেন, 'কিন্তু জানো, ভারতীয় দর্শন—অবশ্য সব দর্শনই দর্শন—শেখবার সুযোগ আমি পাই নি। ব্যাপারটা হয়েছে কি, আমার যৌবনে ভারতীয় দর্শনের জর্মন-ইংরিজি অনুবাদ পড়তে গিয়ে দেখি সব পরস্পরবিরোধী বাক্যে পরিপূর্ণ। আমি বললুম, "এ কখনই হতে পারে না। ভারতের জ্ঞানী ব্যক্তিরা এরকম কথা বলতে পারেন না। যাঁরা অনুবাদ করেছেন তাঁরা কতখানি জর্মন জানেন জানি নে, কিন্তু দর্শন জানেন অত্যল্প, এবং ভারতীয় দর্শনে তাঁদের অপরিচিত যে দৃষ্টিভঙ্গি, দৃষ্টিকোণ সেটা আদৌ বুঝতে পারেন নি।" ছেড়ে দিলুম পড়া, বিরক্তিতে। কিন্তু জানো, বছর দশেক পূর্বে আমার ছাত্র—' তিনি রেকটরের নাম করলেন—'অমুক—ভারী ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে—আমাকে বললে, এখন নাকি কম্পিটেন্ট অনুবাদ বেরুচ্ছে। কিন্তু ততদিনে আমি বড্ড বুড়িয়ে গিয়েছি। নূতন করে নূতন "স্কুলে" যাবার শক্তি নেই। বড় দুঃখ রয়ে গেল।'

আমি একটু ভেবে যেন সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, 'তার জন্য আর অত ভাবনা কিসের, স্যর? হিন্দুরা পরজন্মে বিশ্বাস করে। আপনি এবারে জন্ম নেবেন কাশীর কোন দার্শনিকের ঘরে।'

এবারে তাঁর যে কী প্রসন্ন অট্টহাস্য! শুধু বলেন, 'ঐ তো! ঐ তো! বাঃ, বাঃ! বেশ, বেশ। যাক, শেষ দুশ্চিন্তা গেল।'

তারপর শুধালেন, 'বক্তৃতা সব বুঝতে পারো তো ?'

আমি বললুম, 'আজ্ঞে, জর্মন ভালো জানি নে বলে মাঝে মাঝে বুঝতে অসুবিধে হয়।'

অধ্যাপক বললেন, 'তখন হাত তুলো ; আমি সব ভালো করে বুঝিয়ে বলবো।'

আমি কাঁচু-মাচু হয়ে বললুম, 'আমার জর্মন জ্ঞানের অভাববশত সমস্ত ক্লাস সাফার করবে—এটা কেমন যেন – '

গুরু গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন—প্রত্যেকটি শব্দ যেন আমার বুকের উপর হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে—'আমি একশজনকে পড়াবো না একজনকে পড়াবো, কাকে পড়াবো আর কাকে পড়াবো না, সেটা স্থির করি একমাত্র আমি।'

* * *

আমার দুর্ভাগ্য, আমি খুব বেশী দিন তাঁর কাছ থেকে শিক্ষালাভের সুযোগ পাই নি। পরের টার্মেই তিনি ওপারে চলে যান।

তার পর প্রায় ৩৫ বৎসর কেটে গিয়েছে।

আমার ব্যক্তিগত সংস্কার যে, সৃষ্টিকর্তা মানুষকে পৃথিবী নামক জায়গাটিতে একবারের বেশী দু'বার পাঠান না। একই নিষ্ঠুর স্থলে একাধিকবার পাঠিয়ে একই দণ্ড দেওয়ার মধ্যে কোনও বৈদগ্ধ্য (রিফাইনমেণ্ট) নেই। তবু যখন কোনো যুবাজনের মুখে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা শুনে মনে হয়, এ-তরুণ এর কিছুটা গভীরে ঢুকতে পেরেছে, তখন আপন অজান্তে তার চেহারায় জর্মনগুরুর বিরাট কাটাকুটি-ভরা, হাঁড়াপানা চেহারার সাদৃশ্য খুঁজি॥

মা-মেরীর রিস্ট-ওয়াচ

একদা রম্য রচনা কি রীতিতে উত্তমরূপে লেখা যায়, এই বাসনা নিয়ে কলেজের ছেলের বয়সীরা আমাকে প্রশ্ন শুধাতো ; অধুনা শুধোয়, ঐতিহাসিক উপন্যাস কি প্রকারে লেখা যায় ? আমি বাঙালী, কাজেই বাঙালীর স্বভাব খানিকটে জানি—পাচু, ভূতো আর পাঁচজন যে ব্যবসা করে—যথা পাব্লিশিং হাউস কিংবা লণ্ড্রী—পয়সা কামিয়েছে, সে সেইটেই করতে চায়, নূতন ব্যবসার ঝুঁকি নিতে সে নারাজ। অতএব হাল-বাজারে যখন ঐতিহাসিক উপন্যাস ছেড়ে দিয়ে কালোবাজারের চেয়েও সাদা-বাজারে লাভ বেশী, তবে চলো ঐ লালকেল্লা ফতেহ্ করতে ; মা-মেরীতে বিশ্বাস রাখলে কড়ি দিয়েও কিনতে হবে না,

সায়েবের মুন্‌শীও ঐ আশ্বাস দিয়েছেন।

যাঁরা পণ্ডিত লোক, ইতিহাস জানেন ও উপন্যাস লেখার কায়দাটাও যাঁদের রপ্ত আছে, তাঁরাই ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে পারেন। আমি ও আমার মত আর পাঁচজন পারে না, আমরা পণ্ডিত নই। কিন্তু পণ্ডিত না হয়েও দিব্য বুঝতে পারি, ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে যাওয়ার বিপদটা কি?—পাখীর মত উড়তে না জেনেও চমৎকার বুঝতে পারি মনুমেণ্টের উপর থেকে লাফ দিয়ে পাখীর মত ওড়বার চেষ্টা করলে হালটা মোটামুটি কি হবে।

এই তো হালে একটি সাপ্তাহিকের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে অলস নয়নে পড়লুম, 'তুমি ওমরাহ নও।'

সর্বনাশ! এটা কি প্রকার হল? 'ওমরাহ' তো 'আমীরে'র সাদামাটা বহুবচন—যে রকম 'গরীব' থেকে 'গুরবাহ'; তাই বলি 'গরীব-গুরবো'। সেই আইনেই বলি 'আমীর-ওমরাহ' ('আমীর-ওমরো'ও শুনেছি; আকারান্ত শব্দ বাঙলায় 'এ' 'ও'-তে আকছারই পরিবর্তিত হয়, যেমন 'ফিতে' 'জুতো'—এর কোনো পাকা নিয়ম নেই)। আরবী বা ফার্সী শব্দের একবচন এবং বহুবচন পাশাপাশি বসিয়ে আমরা অনেক সময় বাঙলায় কালেকটিভ নাউন তৈরি করি—যেমন 'আমীর-ওমরাহ্' অর্থাৎ 'আমীরসম্প্রদায়' কিংবা 'গরীব-গুরবো' 'দীনসম্প্রদায়' 'দীনজন'। তা সে যাই হোক, 'ওমরাহ' কথাটা বরহক্ বহুবচনেই আছে। কাজেই যে রকম আপনি 'আমীরসম্প্রদায় নন' ব্যাকরণে ভুল, তুমি 'ওমরাহ্ নও' ভুল।

(ঠিক সেই রকম 'আলিম্' পণ্ডিতের বহুবচন 'উলেমা'—জমিয়ৎ-ই-উলাম-ই-হিন্দ; অনেকেই না জেনে ইংরিজীতে লেখেন ulemas।)

কাজেই প্রথম চোরাবালি শব্দ নিয়ে। ঠিক ঠিক অর্থ না জানলে আমাদের মত অপণ্ডিত জন খায় মার। ঠিক সেই রকম গুপ্তযুগের উপন্যাস লিখতে গিয়ে না ভেবে ফুটিয়ে দিলুম রজনীগন্ধা, কৃষ্ণচূড়া—শব্দ দুটো থেকে বিশেষ করে যখন সংস্কৃতের সুগন্ধ বেরিয়েছে—অথচ দুটো ফুলই এদেশে এসেছে অতি হাল আমলে। এবং শুধু শব্দার্থ জানলেই হয় না—রূঢ়ার্থে তার ব্যবহার জানতে হয়। তসবী[১]-

---

১ কত না হস্ত চুমিলাম আমি
তসবীমালার মত,
কেউ খুলিল না কিস্মতে ছিল
আমার গ্রন্থি যত।

খানা কথাটির দুটো শব্দই আমরা চিনি—যে ঘরে বসে বাদশা তসবীমালা জপ করেন। মোগল আমলে কিন্তু ঐ ঘর ছিল অতিশয় গোপন (top secret) মন্ত্রণালয়।

কেউ যদি লেখেন 'অতঃপর সম্রাট ঔরঙ্গজেব সমস্যা সমাধানের জন্য সমস্ত রাত কুরান শরীফ ঘেঁটেও কোনো হদীস পেলেন না', তবে বাঙালী পাঠক এ-বাক্যে কোনো দোষ পাবেন না। কারণ হদীস বা হদিশ বলতে বাঙ্গালা পাঠক প্রিসিডেন্স বা পূর্ব উদাহরণ বোঝে। কিন্তু কুরানে হদীস খোঁজা আর বেদে মনুসংহিতা খোঁজা একই রকমের ভুল। কুরানে আছে পয়গম্বরের কাছে প্রেরিত ঐশী বাণী—আপ্তবাক্য। আর হদীসে আছে পয়গম্বর কি ভাবে জীবন যাপন করতেন, কাকে কখন কি করতে আদেশ বা উপদেশ দিয়েছিলেন ইত্যাদি (এগুলোও অতিশয় মূল্যবান—কিন্তু আপ্তবাক্য নয়)। কাজেই এগুলোর (হদীসের) সন্ধান কুরানে পাওয়া যাবে কি করে? বস্তুত কোনো অর্বাচীন সমস্যা ও তার সমাধান কুরানে না পেলে আমরা হদীসে (শাস্ত্রে 'স্মৃতি'র সঙ্গে তুলনীয়) যাই। সেখানে না পেলে ইজমাতে এবং সর্বশেষে কিয়াসে। কিন্তু শেষের দুটো স্মৃতিশাস্ত্রের গভীরে—ঐতিহাসিক উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যল্প। তা সে যাই হোক, মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে যে কিছুটা জ্ঞান বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন, মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে পরিচয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসে সেটা প্রধানত বিস্ময়বোধক বাক্যে। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, ফরাসী উপন্যাসের ইংরিজী অনুবাদে 'মঁ দিয়ো' 'পার ব্লা' 'ভাত্র ব্লা'-গুলো ইংরেজ ফরাসীতেই রেখে দেয়; জর্মন উপন্যাসের অনুবাদে 'মাইন গট্' 'হ্যার গট্' 'ডনার ভেটার' মূলের মত রেখে দেয়। এগুলোর অনুবাদ সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়। অবশ্য স্মরণ রাখা উচিত, মঁ দিয়ো, মাইন গট্ এবং মাই গড একই জিনিস, একই বাক্য হলেও ইংরেজের পক্ষে 'মাই গড' বলা নিন্দনীয়; নিতান্ত বিপাকে না পড়লে ইংরেজ 'মাই গড' বলে না। পক্ষান্তরে ফরাসী জর্মন কথায় কথায় 'মঁ দিয়ো' 'মাইন গট্' বলে থাকে। তাই ইংরিজী অনুবাদের সময় মূলের আবহাওয়া রাখবার জন্য অনুবাদক এগুলো অনুবাদ করেন না।

অলহমদুলিল্লা, মাশাল্লা, ইয়া আল্লা, তওবা তওবা, বিসমিল্লা এগুলো অবস্থা-

অর্থাৎ তসবীমালা জপ করে এক সাধু অন্য সাধুর হাতে তুলে দেন, কিন্তু কেউই দয়া করে মালার সুতোটি কেটে মুক্তোগুলোকে মুক্তি দেন না।

ভেদে ব্যবহৃত হয়। 'আপনার ছেলে এম-এ পাস করেছে? তওবা তওবা!' (বা তোবা তোবা।) বললে যে ভুল হয় সেটা সাধারণ জনও বোঝে। তাই এসব বাক্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে অনেকটা কারো প্রথম বংশধর জন্মালে আপনি যদি উচ্চকণ্ঠে 'বল হরি, হরিবোল বলে ওঠেন' তা হলে যেরকম হয়। এসব ভুল সাধারণ সামাজিক উপন্যাসে থাকলে পাঠক শুধু একটুখানি মুচকি হাসে, কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস যিনি লেখেন তাঁর কাছ থেকে পাঠক একটু বেশী প্রত্যাশা করে।

'শার্ঙ্গদেবে'র মত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গভীরে যাঁরা গিয়েছেন তাঁরাই জানেন, পাঠান-মোগল যুগের সঙ্গীত তথা এদের আগমনের পূর্বে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রকৃত স্বরূপ কি ছিল; এ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের কতখানি ফার্সী ভাষার সঙ্গে পরিচিত হবার প্রয়োজন। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের অতখানি ফার্সী জানার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তিনি যদি রানী রিজিয়ার দরবারে সেতার বাজাতে আরম্ভ করেন তবে বোধ হয় সঙ্গীতজ্ঞদের অনেকেই আপত্তি জানাবেন। আমি বিশেষজ্ঞ নই, তাই পণ্ডিতেরা যখন কিছু বলেন তখন সেটা মনে রাখবার চেষ্টা করি। মৌলানা আজাদ আমাকে বলেন, 'সেতার তৈরি করেন আমীর খুসরো। এটা বীণার অনুকরণে তৈরি, কিন্তু বীণার চেয়ে সহজ।'

আমি উত্তরে বললুম, 'আমি আরেক পণ্ডিতের কাছে শুনেছি, বাদ্যযন্ত্র-নির্মাতার পক্ষে সেতার-নির্মাণ বীণার চেয়ে কঠিনতর। কিন্তু বাজানেওলার পক্ষে সেতার বাজানো সহজতর। ঐ পণ্ডিত আমাকে বলেন, "অনেক সময় যে জটিল বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ করা হয় সেটা বাজানেওলার পক্ষে বাজানো সহজ করে দেবার জন্য"।' (শার্ঙ্গদেব হয়তো খাঁটি খবর রাখেন।)

এসব ঝামেলার মাঝখানে পাঠান বা মোগল দরবারের গানের মজলিস বর্ণনা করা যে বিপদসঙ্কুল, সে কথা পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারবেন।

ঠিক তেমনি মোগল আমলের ফিষ্টির বর্ণনা। কোরমা, কালিয়া, কোফ্‌তা কবাব (শিক্‌-কবাব প্রাক-মুসলিম যুগেও ছিল—শূল্যপক্ক মাংস—কিন্তু সেটা আঁকাবাঁকা শিকের ভিতর ঢুকিয়ে করা হত, না শূলের ডগায় ঝুলিয়ে ঝলসানো হত, তা জানি নে,) যে সব কটাই যাবনিক খাদ্য তা জানি, কিন্তু মোগল ফিষ্টিতে বাঁধাকপির পাতার ভিতর কিমা দিয়ে যে দোলমা তৈরি হয়, সেটা কি চলবে? কপি জাতীয় জিনিস এদেশে এল কবে? এমন কি যে সিম জিনিসটা ঘরোয়া বলে মনে হয় সে সম্বন্ধেও একখানি চিরকুটে দেখি ঋষিতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রীকে শুধোচ্ছেন, 'সংস্কৃতে আপনি সিম জিনিসটার

উল্লেখ পেয়েছেন কি ?'

মোগল ছবিতে তাদের জামাকাপড় গয়নাগাঁটি পরিষ্কার দেখতে পাই। কিন্তু সব কটার নাম তো জানি নে। মা-দুর্গার নাকের নথ দেখে দ্বিজেন্দ্রনাথ চিত্রকারকে শুধান, 'নথ কি মুসলমান আগমনের পূর্বে ছিল ?'

কিন্তু আপত্তি কি ? গদাযুদ্ধে নামার সময় ভীমের পকেটে যদি ফাউন্টেনপেন দেখা যায়, তবে কী আপত্তি ! জেরুজালেমের এক মেরী মূর্তির বাঁ-কব্জিতে দেখি, ছোট্ট দামী একটি রিস্টওয়াচ। ভক্তের চোখে মা-মেরীর বাঁ-হাতখানা বড্ড ন্যাড়া-ন্যাড়া দেখাচ্ছিল, তাই। জানি নে, বারোয়ারি দুর্গাপূজোয় মা-দুর্গা নাইলন পরতে আরম্ভ করেছেন কি না !

অনুবাদ সাহিত্য

কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি, অনুবাদ যে অনুবাদ সেটা স্বীকার করতে প্রকাশক, সম্পাদক, স্বয়ং লেখকেরও কেমন যেন একটা অনিচ্ছা। কেন, এ প্রশ্ন শুধাতে একজন প্রকাশক সোজাসুজি বললেন, 'বাঙালী অনুবাদ পড়তে ভালবাসে না, তাই অসাধু না হয়ে যতক্ষণ পারি ততক্ষণ তথ্যটা চেপে রাখি।' কিছুকাল পূর্বে আমিও একটি বড়-গল্প অনুবাদ করি ও তার প্রথম বিজ্ঞাপনে সেটি যে অনুবাদ সে কথা প্রকাশিত হয় নি। আমি সেই সম্পাদককে বেনিফিট অব্ ডাউট দিয়ে মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছি এই বুঝিয়ে যে, দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনে এই গাফিলতি মেরামত করা হবে। ঐ সময়ে আমারই সহকর্মী (কারণ দু'জনাই 'দেশ'-সেবক, এবং তিনি অন্যার্থেও) শ্রীযুত বিদুর ঐ নিয়ে কড়া মন্তব্য করে যা বলেন তার নির্যাস, যত বড় লেখকই হোন না কেন, তিনি যদি অনুবাদ-কর্ম করেন তবে সেটা যেন পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়। অতিশয় হক্ কথা। তবে এটা আমি গায়ে মাখছি নে, কারণ আমি 'যত বড়' কেন অ্যাটটুন বড় লেখকও নই। আমি বরঞ্চ গোড়াতেই চেয়েছিলুম যে ফলাও করে যেন বলা হয়, এটি অনুবাদ। এবং সেই মূল প্রখ্যাত লেখকের অনুবাদ প্রসাদাৎ তাঁর সঙ্গ পেয়ে আমিও কিছুটা খ্যাত হয়ে যাবো—'রাজেন্দ্র সংগমে, দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে।'[১] কিংবা কালিদাস রঘুবংশের অবতরণিকায় যে কথা বলেছেন—বজ্র কর্তৃক মণি সছিদ্র

১ এই সুবাদে একটি ঘটনার কথা মনে পড়লো। গুরুদেব আমাকে কয়েক পাতা প্রুফ মেরামত করতে দেন। সেটা তৈরী হলে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে

হওয়ার পর আমি সুতো সুরুৎ করে বেতকুলিফ উৎরে যাবো।

এবং এস্থলে এটাও স্মরণ রাখা উচিত, কালিদাস বা মধুসূদন কেউই বাল্মীকির আক্ষরিক কেন, কোনো প্রকারেরই অনুবাদ করেন নি। সম্পূর্ণ নিজস্ব, মৌলিক কৃতিত্ব দেখিয়েও এঁরা অতখানি বিনয় দেখিয়েছেন। মডার্ন কবিতা যে আমার পিত্তি চটিয়ে দেয়, তার অন্যতম কারণ এঁদের অনেকেরই অভ্রংলিহ দম্ভ। 'আধুনিক' গাওয়াইদের কণ্ঠেও সেই সুর শুনতে পাই। আর মডার্ন পেন্টাররা কি করেন—অন্তত তাঁদের দু'জনার ব্যবহার সম্বন্ধে তো অনেক কথাই বেরিয়েছে।

কিন্তু সেকথা থাক। আমাব প্রশ্ন, অনুবাদ পড়তে বাঙালী ভালবাসে না কেন?

আমার কিন্তু কথাটা কেন জানি বিশ্বাস কবতেই ইচ্ছে যায় না।

বাংলা ভাষার কচিকাঁচা যুগে কালীপসন্ন সিংহ মহাভারতের অতি বিশুদ্ধ আক্ষরিক অনুবাদ করেন। আজ পর্যন্ত যে তার কত পুনর্মুদ্রণ হল তার হিসেব হয়তো আজ বসুমতীই দিতে পারবেন না। পাঠকদের শতকরা ক'জন নিছক পুণ্য-সঞ্চয়ার্থে এ অনুবাদ পড়েছে? এমন কি রাজশেখর বসুর অনুবাদও—যদিও একটি বারো বছরের ছেলেকে বলতে শুনেছি, 'ঐ বসুমতীরটাই ভালো। বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে লেখা—ধীরেসুস্থে পড়া যায়। রাজশেখর বাবুরটায় বড্ড ঠাসাঠাসি।' 'বেতালপঞ্চবিংশতি' 'বত্রিশ সিংহাসন' এ যুগের ছেলেমেয়েরাও তো গোগ্রাসে গেলে। (বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্রে'র আরবী অনুবাদ ইরাক থেকে মরক্কো পর্যন্ত আজও 'আরব্য রজনী'র সঙ্গে পাল্লা দেয়।) ঈশান ঘোষের জাতক জনপ্রিয় হওয়ার পূর্বেই বাজার থেকে উধাও হয়ে গেল—(পরম পরিতাপের বিষয় যে এখনো তার পুনর্মুদ্রণ হল না) অথচ তার থেকে নেওয়া বাচ্চাদের জাতক তাদের ভিতর খুব চলে। জ্যোতিঠাকুরের সংস্কৃত নাটক ও ফরাসী কথা-সাহিত্যের অনুবাদ এককালে বিদগ্ধ বাঙালীই পড়তো। ওদিকে এসলের বহু পূর্বে আলাওল অনুবাদ করলেন—যদিও আক্ষরিক নয়—জয়সীর 'পদুমাবৎ'। এবং তার পর,

---

গিয়ে দেখি তিনি ৺ক্ষিতিমোহন ও ৺বিধুশেখরের সঙ্গে গল্প করছেন। আমি থামের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে শুনি, তিনি বলছেন, 'বনমালী (কিংবা সাধুও হতে পারে, কিন্তু সে গুরুদেবের সঙ্গে ছিল অল্প দিন) তো গেল আমার সঙ্গে এলাহাবাদ। আমি বললুম, "ওরে বনমালী, প্রয়াগে এসেছিস; স্নান করে নিস্।" কিন্তু মশাই কি বলবো, সে ও-পাশই মাড়ালো না। বোধ হয়, আমার সঙ্গে থেকে থেকে দেবদ্বিজে ওর আর ভক্তি নেই। কিংবা ঐ ধরনেরই।' মাইকেলের কথা তা হলে সব সময়ে ফলে না।

পর পর বেরুলো 'ইউসুফ-জোলেখা', 'লায়লা-মজনু' ইত্যাদি। মোল্লার বাড়িতে এবং পূব-বাঙলার খেয়াঘাটে, বটতলায় এখনো তাদের রাজত্বের অবসান হয় নি। ওদিকে কাশীরাম, কৃত্তিবাস। 'আরব্যোপন্যাস', 'হাতিমতাই', 'চহারদরবেশ' উনবিংশ শতাব্দীতেই বাঙলা দেশে নাম করেছে। তারপর 'রবিনসন ক্রুসো', 'গালিভার্স ট্রেভল' এবং ফরাসী থেকে 'লে মিজেরাবল' এদেশে কী তোলপাড়ই না সৃষ্টি করলো।

আমি অতি সংক্ষেপে সারছি। কিন্তু আমার বয়েসী কোন্ পাঠক 'তীর্থসলিল' 'তীর্থরেণু'র কথা ভুলতে পারবেন? সত্যেন দত্ত অনুবাদের যাদুকর। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সত্যেন দত্তের শোকসভাতে বলেছিলেন, 'যে-দিন দেখলুম সত্যেন আমার চেয়ে ঢের ভালো অনুবাদ করতে পারেন ও ছন্দের উপর তাঁর দখল আমার চেয়ে অনেক বেশী, সেই দিনই অনুবাদ-কর্ম থেকে অবসর নিলুম। তারপর ভাল কবিতা চোখে পড়লেই সত্যেনকে অনুবাদ করতে বলতুম।' (এস্থলে যদিও অবান্তর তবু স্মরণে আনি, রবীন্দ্রনাথ নিজের মৌলিক রচনা কিছুক্ষণের জন্য ক্ষান্ত দিয়ে সত্যেন দত্তের 'চম্পা' কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ করেন।)

আর বর্তমান যুগের হীরেন দত্ত মশায়ের 'তিন সঙ্গী' যাঁরাই পড়েছেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন, এরকম অনবদ্য অনুবাদ হয় না।

এর একটু তথাকথিত 'নিম্নপর্যায়ে' নামলেই দীনেন্দ্রকুমারের 'রহস্যলহরী'। বাংলাদেশের হাজার হাজার নারী-নরকে এঁর অনুবাদ আনন্দ দিয়েছে। দীনেন্দ্রকুমার লিখতেন অতি সরল, ছলছল-গতির বাংলা—পাঠককে কোনো জায়গায় হোঁচট খেতে হত না। তাঁর মৌলিক গ্রন্থ 'পল্লীচিত্র'—নামটি আমার ঠিক মনে নেই—পড়লে তাঁর বাংলা-শৈলী ও ভাষার সরলতা ও আপন বৈশিষ্ট্য পাঠককে আরাম ও চমক দুই-ই দেয়। (অরবিন্দ ঘোষ যখন বরোদায় চাকরি নিয়ে বাংলা শেখার জন্য গুরুর সন্ধান করেন, তখন দীনেন্দ্রকুমারকে সেখানে পাঠানো হয়। পরবর্তী যুগে যখন তিনি তাঁর অতুলনীয় মধুর বাংলায় পাঠকের কৌতূহল সদাজাগ্রত রেখে তাঁর জীবনস্মৃতি— বিশেষ করে বরোদার ইতিহাস ও শ্রীঅরবিন্দের সাহচর্য সম্বন্ধে লেখেন, তখন তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে দু'একটি বিতর্কমূলক তথ্য বলে ফেলেন। আমার ব্যক্তিগত মতে তিনি সম্পূর্ণ সত্যভাষণই করেছিলেন। ও আমার অগ্রজ, কাঙাল হরিনাথ, দীনেন্দ্রকুমার, মীর মুশর্‌রফ হুসেন সম্বন্ধে কুষ্টিয়ায় সরজমিনে গবেষণা করে ঐ সিদ্ধান্তেই পৌঁছন। ফলে তখনকার দিনের মাসিক-সাহিত্য মহলের এক বলবান ক্লিক্ দীনেন্দ্রকুমারকে, জাস্ট হাউণ্ডেড্ হিম আউট অব বেঙ্গলী লিটারেচার। সেই অনুপম জীবনস্মৃতি শেষ করার সুযোগও তখন

তিনি পাননি। অথচ আমি যখন তাঁর লিখিত শ্রীঅরবিন্দের সহকর্মী খাসেরাও যাদব অংশ বরোদার যাদব গোষ্ঠী ও অন্যান্য মারাঠাদের অনুবাদ করে শোনাই তখন তাঁরা অশ্রুবিসর্জন করে বলেন, 'বাংলাদেশই শুধু সে যুগের মারাঠী বিপ্লবীদের স্মরণে রেখেছে। বাঙালী প্রাদেশিক, এ কুসংস্কার আমাদের ভাঙলো।' এর পর হঠাৎ যখন দীনেন্দ্রকুমারের ধারাবাহিক বন্ধ হয়ে গেল, তখনো তাঁরা উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনতে চাইলেন পরের পর্বের কথা। আমি কোন্ লজ্জায় স্বীকার করি কেন তাঁর লেখা বন্ধ হয়ে গেল।)

কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম! কিন্তু এই বিষয় নিয়ে আমার বহুদিনের মনস্তাপ—আজ বেমোকায় বেরিয়ে গেল, পাঠক ক্ষমা করবেন।

আমার মনে একটা সন্দেহ জাগে। প্রাচীন যুগের সব অনুবাদই যে উত্তম ছিল, একথা ঠিক নয়। কিন্তু এঁদের বেশীর ভাগই উত্তম সংস্কৃত ও তৎকালীন প্রচলিত বাঙলা ভাষার সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। এবং পণ্ডিতজন যত বাঁকা বাংলাতেই অনুবাদ করুন না কেন, তাঁদের শব্দভাণ্ডারে দৈন্য ছিল না বলে অনুবাদ মূল থেকে দূরে চলে যেত না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত পিয়ের লোতির 'ইংরেজবর্জিত ভারত-' এর অনুবাদ পড়লেই পাঠক আমার বক্তব্য বুঝতে পারবেন। লোতির শব্দভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত (উত্তর-মেরু-সমুদ্রের আলো-বাতাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি পর পর তিনটি শব্দ দিয়েছেন, ডায়াফনাস, এফিমেরাল, কাইমেরিক—এর অনুবাদ তো দীন শব্দভাণ্ডার নিয়ে হয় না!)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জানতেন অত্যুত্তম সংস্কৃত—ভাসের নাটক তখনো ছাপায় প্রকাশিত হয় নি বা তাঁর হাতে পৌছয় নি—ভাসকে বাদ দিলে তিনি সংস্কৃতের প্রায় সব নাট্য-লেখকের অনুবাদ করেছেন—তাই সে ভাষা থেকে তিনি অনায়াসে শব্দচয়ন করে মূলের বৈচিত্র্যের মর্যাদা রক্ষা করতে পারতেন। অক্ষম অনুবাদকের হস্তে সে-স্থলে অনুবাদ হয়ে যায় একেঘেয়ে—পড়তে গিয়ে পাঠকের ক্লান্তি এসে যায়।

অধুনা একাধিক যোগ্য ব্যক্তি অনুবাদ-কর্মে লিপ্ত হয়েছেন। এঁদের কেউ কেউ ইংরিজী ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। এঁরা আমার চেয়ে অনেক বেশী যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে পারেন, ইংরিজী সাহিত্য বহু ভাষা থেকে বহু বস্তু অনুবাদ করে কি ভাবে পরিপুষ্ট হয়েছে, নব নব অনুপ্রেরণা পেয়েছে, নব নব অভিযানে বেরিয়েছে—সেই আদিযুগের শুভক্ষণ থেকে।

আমি অনুবাদ করতে গিয়ে পদে পদে নিজের কাছে লাঞ্ছিত হয়েছি। এই লেখাটি তারই অভিজ্ঞতাপ্রসূত।

এদেশে তিন রকমের ইংরেজ এসেছিল। বড় দলের কাজ ছিল পৃথিবীর সামনে আমাদের হেয় প্রমাণ করে এদেশে শ্বেত (আমি বলি ধবল কুষ্ঠ) রাজত্ব যুক্তি ও নীতির উপর খাড়া করা। এক কথায় যাকে বলে, 'হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন' যে কী ভীষণ ভারী এবং ইংরেজ স্বদেশের বেকন-আণ্ডা ঘোড়দৌড়ের জুয়োখেলা, খেঁকশেয়ালি শিকার করা স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে এই 'নচ্ছার' দেশে এসে পৃথিবীর ইতিহাসে যে কী অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে, সেটা সপ্রমাণ করা। অতি দৈবে-সৈবে দু'একজন তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন সহৃদয় মহাজন এ ভণ্ডামি ধরতে পেরেছিলেন। তাঁরই একজন প্রখ্যাত হাস্যরসিক জেরম কে জেরম। তিনি মারাত্মক ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন—পড়ে মনে হয়, তিনি যেন সিকনি ঝাড়ছেন—'বার্ডেন যদি হেভিই হয় তবে ওটা বইছিস কেন, মাইরি? আমি তো খবর পেয়েছি, ইণ্ডিয়ানরা সেই সেবা, সেই হোলি ক্রুসেডের জন্য থ্যাঙ্ক্যু-টি পর্যন্ত বলে না। তবে ফেলে আয় না ঐ লক্ষ্মীছাড়া বোঝাটা ঐ হতভাগাদেরই ঘাড়ে।'

কিন্তু প্রাগুক্ত ঐ বড় দলের ইংরেজদের একটি 'আপ্তবাক্য' নিয়ে আজ আমার আলোচনা। এরা মোকা বেমোকায় বলতো, 'পাঠান-মোগল আদৌ ইতিহাস লিখতে জানতো না—শুধু লড়াই আর লড়াই।'

অন্য দল সংখ্যায় নগণ্য। এঁরা এসব কথায় কান না দিয়ে সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী শিখতেন, বাঙলায় বাইবেল অনুবাদ করতেন, এবং প্রাচ্যভাষায় লিখিত জ্ঞানবিজ্ঞানের বই ইংরিজীতে অনুবাদ করতেন। ফার্সী ইতিহাস যে শুধু 'লড়াই আর লড়াই' নয় (আহা। তাই যদি হত আর আমরা তাই পড়ে ক্ষেপে গিয়ে সেই আমলেই ইংরেজকে ঠ্যাঙাতে আরম্ভ করতুম!) সেটার বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ তাঁরা জানিয়েছেন ফার্সী ইতিহাস অনুবাদ করে।

এক তৃতীয় শ্রেণীর পিচেশও এদেশে এসেছিল। এরা প্রথম শ্রেণীর মত অশিক্ষিত বর্বর নয়, আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর মত নিরপেক্ষ সাধুজনও নয়। এরা অল্পবিস্তর সংস্কৃত আরবী ফার্সী চর্চা করে, অল্প বিদ্যা যে ভয়ঙ্করী সেইটে আপন অজানতে প্রমাণ করে দিত এই বলে, 'ওসব তাবৎ মাল আমাদের পড়া আছে; সব রাবিশ।'

দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশের ইংরিজী 'শিক্ষিতেরা' এদেরই বিশ্বাস করে বসলেন।

আমার বক্তব্য, নিজের মুখেই ঝাল চেখে নিলে পারেন। বিশেষত যখন কিছু দিন ধরে 'শেষ মোগলদের' সম্বন্ধে ঐতিহাসিক উপন্যাস বেশ কিছুটা জনপ্রিয়

হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে আমি ভারী খুশী হয়েছি, কারণ অনেক স্থলে সাধারণ পাঠক এই করেই উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত হয়। আমারই ন্যাওটা একটি ম্যাট্রিক-ফেল ছোকরা—কিন্তু ব্যাপিড রীডিঙের ফলে সে দিব্য শিলিং-শকার, পেনি-থ্রিলার পড়তে পারতো—আমার কাছ থেকে রোম সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'আই ক্লাউডিউস' পড়ে এমনই 'ক্ষেপে যায়' যে, সে তারপর দুনিয়ার যত রোমান ইতিহাস পড়তে আরম্ভ করে, এ্যেস্তক জুলিয়াস সীজারের 'ব্রিটন বিজয়' পর্যন্ত।

হালে বাবুর বাদশার আত্মজীবনী বেরিয়েছে—বাঙলা অনুবাদে। অবশ্য সে অনুবাদ এসেছে তিন ঘাটের জল খেয়ে। বাবুরের মাতৃভাষা ছিল তুর্কী—চগতাই-তুর্কী অর্থাৎ তুর্কোমানিস্তানের তুর্কী, টার্কির (যার রাজধানী আঙ্কারা) ভাষা ওসমানলি তুর্কী। আমার যতদূর জানা আছে, মোগল আমলে যদিও দরবারী ভাষা ছিল ফার্সী, তবু শেষ বাদশা বাহাদুর শাহ পর্যন্ত অন্তঃপুরে তুর্কীতেই কথা-বার্তা বলেছেন, উর্দুতে কবিতা লিখেছেন[১]—দিল্লীর বিখ্যাত বিখ্যাত মুশায়েরায় (কবি-সম্মেলনে) দত্ত মারফৎ আপন কবিতা পাঠিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন (সে আমলের প্রখ্যাত কবি ছিলেন উর্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি গালিব)—এবং রাজকার্য করেছেন ফার্সীতে।

বাবুরের সেই আত্মজীবনী অনূদিত হয় ফার্সীতে, ফার্সী থেকে ইংরেজীতে ও বিবেচনা করি, এই বাঙলা অনুবাদ সেই ইংরিজী থেকে। তাতে করে যে খুব মারাত্মক ক্ষতি হবে সে ভয় আমার নেই, কারণ অনুবাদে সবচেয়ে বেশী জখম হয় গীতিরস, এবং বাবুরের সাহিত্যসৃষ্টি গীতিরসপ্রধান নয়। এবং লড়াইয়ের কথা যদিও এটাতে আছে, তবু সেইটেই প্রধান কথা নয়। আসল কথা বাবুরের পর্যবেক্ষণশক্তি। ভারতবর্ষ—প্রধানতঃ দিল্লী-আগ্রা অঞ্চল—তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন এবং অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে তার বর্ণনা দিয়েছেন। আমি যখন কাবুলে ছিলুম তখন বাবুর বর্ণিত, কাবুল পাঞ্জশীর (পাঞ্জশীর অর্থ পঞ্চ-ক্ষীর, সংস্কৃত 'ক্ষীর' শব্দ ফার্সীতে 'শীর', কিন্তু অর্থ দুধ, আর পাঞ্জ অর্থ পঞ্চ—ঐ জায়গায় পাঁচটি নদী

---

১ 'শুনেছ, রাজা কবিতা লেখে, এ আবার কেমন রাজা!' এই বলে তখনকার দিনের ইংরেজ বাদশা-হাসালামৎকে নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতো। পরবর্তী যুগের এক জহুরী ইংরেজ এই নিয়ে মন্তব্য করে লেখেন, 'ঐসব বর্বর ইংরেজ জানতো না যে, ওয়ারেন হেস্টিংসও কবিতা লিখতেন, এবং বাহাদুর শা'র তুলনায় অতিশয় নিরেস।'

বয় ; আমাদের পায়েসকে কাবুলীরা বলে শীর-বিরঞ্জ্—বিরঞ্জ্ অর্থ চাল) ইত্যাদি আমি আপন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি। বস্তুত বাবুর বর্ণিত কাবুল ও আমার দেখা কাবুলে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। হালে যাঁরা কাবুল দেখে ফিরেছেন তাঁরা বলেন, গত দশ বৎসরে নাকি কাবুলের চেহারা একদম পালটে গিয়েছে।

কাবুলীরা বাবুরকে ঘৃণা করে। কারণ ইব্রাহিম লোদী ছিলেন আফগানিস্থানের পাঠান। তাঁকে পরাজিত করে হিন্দুস্থানের তখৎ ছিনিয়ে নেন তুর্কমানিস্থানের মোগল বাবুর। আমাকে এক সম্ভ্রান্ত, সুশিক্ষিত বিশ্বপর্যটক পাঠান কূটনৈতিক বেদনাবিকৃত কণ্ঠে বলেন, 'আপনি কি কল্পনা করতে পারেন, ডক্টর, এই বর্বর বাবুর কি করেছিল ? কল্পনা করতে পারেন, সেই নরদানব ইব্রাহিম লোদীর অন্তঃপুরের পুণ্যশীলা অসূর্যম্পশ্যাদের খোলা বাজারে ক্রীতদাসী হিসাবে বিক্রয় করেছিল ! এ শুধু বর্বর যাযাবর তুর্কীদের পক্ষেই সম্ভব।'

কাজেই আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত বাবুরের কবরের উপর না ছিল আচ্ছাদন (একদা নাকি ছিল, কিন্তু সেটা লুট হয়ে, কিংবা ভেঙে পড়ে যাওয়ার পর আফগানরা স্বভাবতই সেটা মেরামত করে দেবার কোন প্রয়োজন অনুভব করে নি), না ছিল কোনো অলঙ্কার-আভরণ ; কয়েক ফালি পাথর দিয়ে তৈরী অতিশয় সাদামাটা একটি কবর। হালে নাকি আফগান সরকার বাবুরের ঐতিহাসিক মর্যাদা অনুভব করতে পেরেছেন—জাত্যভিমান কিঞ্চিৎ সংযত করার ফলে—এবং কবরের সুব্যবস্থা করেছেন।

আজকের দিনের বাঙালী ইনফ্লেশন কারে কয়, সেটা চোখের জলে নাকের জলে শিখেছে। রোক্কা একটি টাকার ক্রয়মূল্য আজ কতখানি, সে তা বিলক্ষণ জানে। বাঙালী তাই বাবুরের ইনফ্লেশন-জ্ঞান দেখে আনন্দিত হবেন। দিল্লী-জয়ের পর বাবুরের আমীর-ওমরাহ্ বিস্তর ধনদৌলত লুট করে বললেন, 'এ বারে চলো কাবুল ফিরে গিয়ে নবাবী করা যাক।' বাবুর তখন তাদের বুঝিয়েছিলেন যে, তাদের সিন্দুকে কাঁড়া কাঁড়া টাকা থাকলেই সঙ্গে সঙ্গে কাবুল উপত্যকার শরাব-কবাবের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে না। যেখানে আণ্ডার দাম আগে এক পয়সা ছিল সেখানে ওদের এখন দিতে হবে আষ্ট গণ্ডা (কিংবা ঐ ধরনের কিছু-একটা —বইখানা আমার হাতের কাছে নেই)। কারণ সেপাই-পেয়াদারাও কিছু কম মাল লুট করে নি, তারাও এখন নিত্যি নিত্যি আণ্ডা খেতে চাইবে।

এর পর যে বইখানা পড়ে বাঙালী পাঠক আনন্দ পাবেন সেটি ফার্সীতে লেখা বাঙলার (খুব সম্ভব প্রথম পূর্ণাঙ্গ) ইতিহাস। 'বাহারিস্তানে গায়েবী'[২] —

২ বাঙলা আজগুবী অর্থ—'আজ' মানে 'হতে' 'from' ; 'গায়েবী' মানে

অজানা বসন্তভূমি। লেখক দিল্লী-আগ্রা-বিহারের শুকনো দেশ দেখে দেখে বাঙলার দেহলিপ্রান্তে এসে পেলেন, চতুর্দিকে শ্যামলে শ্যামল আর নীলিমায় নীল। তাঁর চোখ জুড়িয়ে গেল।

এর কথা আরেক দিন হবে।

ফের্ডিনাণ্ট্ জাওয়ারব্রুখ

বৈদ্যরাজ জাওয়ারব্রুখকে নিয়ে আবার সুইস জর্মন কাগজে বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ হয়েছে। প্রথম দলের বক্তব্য, সত্যই বৃদ্ধ বয়েসে তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছিল ; অন্য দলের বক্তব্য তিনি পূর্ব-বার্লিনের সোভিয়েৎ কূটনীতির বলির পাঁঠা হয়েছেন। বার্লিনের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল 'শারিতে' (charite—চ্যারিটি—খয়রাতি) প্রতিষ্ঠানের তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন, এবং বার্লিন ভাগাভাগির পর শারিতে পড়েছিল পূর্ব-বার্লিনে, রাশান আওতায়।

এই কলকাতা শহরের অন্তত একজন খ্যাতনামা চিকিৎসককে আমি চিনি, যিনি জাওয়ারব্রুখের শিষ্য। তিনি ম্যুনিকে তাঁর কাছে বুকের যক্ষ্মার অপারেশন শেখেন—জাওয়ারব্রুখ বহু বৎসর ম্যুনিক হাসপাতালেরও বড় কর্তা ছিলেন। এছাড়া তাঁর অন্যান্য শিষ্যও হয়তো কলকাতায় আছেন। অবশ্য বুকের, মাথার ও ক্যানসারের সার্জারি নিয়েই যাঁদের কারবার তাঁরাই জাওয়ারব্রুখের গবেষণার সঙ্গে অল্পাধিক পরিচিত

জর্মন সার্জন-সমাজ মনে করেন, পৃথিবীর তিনজন সার্জনের নাম করতে হলে জাওয়ারব্রুখের নাম কালানুক্রমে তৃতীয়। অন্য দুজন বোধ হয় হিপপোক্রাতেস ও নেপোলিওনের সার্জন—কিন্তু আমি কি চিকিৎসা-শাস্ত্র, কি সে শাস্ত্রের ইতিহাস কোনোটারই বিন্দুবিসর্গ মাত্র জানি নে বলে হলফ খেয়ে কিছুই বলতে পারবো না। তদুপরি এ ধরনের নির্ঘণ্ট নির্ণয় সব সময়ই কিঞ্চিৎ উদ্দাম হয়ে থাকে—যেরকম পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্য নির্ণয়ে ভিন্ন লোক ভিন্ন নির্ঘণ্ট দেয়।

অতএব অতিশয় সারবান আপত্তি উঠতে পারে, চিকিৎসা-শাস্ত্রের কিছুই যখন আমি জানি নে, তখন হাতের নাগালের বাইরে যে শল্যরাজ জাওয়ারব্রুখ বিরাজ করছেন, তাঁর প্রতি আমি উদ্বাহু হয়েছি কেন? উত্তর অতি সরল। এই শল্যরাজ মৃত্যুর পূর্বে একখানি নাতিবৃহৎ আত্মজীবনী লেখেন—বস্তুত পুস্তকখানি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর এবং সেটি আদৌ শল্যরাজ বা বৈদ্য-সম্প্রদায়ের 'অজানা' 'লুপ্ত' 'অদৃশ্য' 'বিধিকৃৎ'। অর্থাৎ অজানা থেকে আগত বলে অদ্ভুত।

উদ্দেশে রচা হয় নি; রচনা হয়েছে আপনার আমার মত মামুলী জনের জন্য। এমন কি সে পুস্তকে ক্যানসার সম্বন্ধে তাঁর দীর্ঘ জীবনব্যাপী গবেষণার ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ যে প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করেছেন, সেটিও সাধারণ জনের উদ্দেশে লিখিত, কারণ তিনি সেটি সর্বসাধারণের উপকারার্থে জর্মন রেডিও থেকে বেতারিত করেন। অতি সরল জর্মনে, সর্বপ্রকারের চিকিৎসা সংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দ সযত্নে বর্জন করে তিনি এই বেতার-ভাষণটি নির্মাণ করেছিলেন বলে সেটি জর্মন-বালকেও বুঝতে পারে—বাঙলায় অনুবাদ করলে বঙ্গবালকও বুঝতে পারবে।[১]

কিন্তু এইটেই সর্বপ্রধান বা সর্বশেষ তত্ত্ব নয়। তাঁর আত্মজীবনীর সাহিত্যিক মূল্য আছে, এবং তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে তাঁর হাস্যকৌতুকোজ্জ্বল নীল চোখ দুটি প্রকাশ পায়। তার সামান্য একটি উদাহরণ দি।

ব্যঙ্গরস অতিশয় প্রাচীন রস—করুণ ও বীর রসের সমবয়সী সে। প্রাচীনতম গ্রীক সাহিত্যে তার ভূরি ভূরি নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু অন্যথা সে-রসের উৎস বলে আমাদের রসপ্রিয় মনও সেটা সব সময় গ্রহণ করতে পারে না। বিশুদ্ধ হাস্যরস—যেটা সৃষ্টি করার জন্য কাউকে পীড়া দিতে হয় না, নট অ্যাট দি কস্ট্ অব এনি ওয়ান—আপন আনন্দে উচ্ছল এবং সেটা ব্যঙ্গরসের বহু পরবর্তী যুগের রস। এবং আমার ব্যক্তিগত শাবাসী সেই হাস্যরসের, সেই ব্যঙ্গরসের উদ্দেশে যেখানে রসস্রষ্টা নিজেকে নিয়ে নিজে হাসেন, নিজেকে ব্যঙ্গ করেন, লাফস অ্যাট হিজ ওন কস্ট। তারই একটি উদাহরণ দি:

জাওয়ারব্রুখ বলছেন, তাঁর সময়কার এক বিখ্যাত চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপক

---

১ এবং এর অনুবাদ করার বাসনা আমার ছিলও—অবশ্য সাবধানের মার নেই বলে ক্যানসার-রোগ-বিশেষজ্ঞ আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে দিয়ে সেটি সেনসর করিয়ে নিতুম। এ বেতারভাষণটি এখনো আদৌ গাজীমিয়ার বস্তানীতে আশ্রয় নেয় নি, অর্থাৎ আউট-অব-ডেট হয়ে যায় নি। ঐ ভ্রাতুষ্পুত্রীর আদেশে আমি সর্বাধুনা প্রকাশিত জর্মন-বিশ্বকোষে সবিস্তর লিখিত ক্যানসার প্রবন্ধটি পড়ি। এবং যদিও সব জিনিস বুঝতে পারি নি (বিশেষ করে কুআণ্টুম্ থিয়োরি দিয়ে ক্যানসার রোগের কারণ নির্ণয়ের আধুনিক প্রচেষ্টা!) তবু এটা লক্ষ্য করলুম যে ক্যানসারের পূর্বাভাস সম্বন্ধে জাওয়ারব্রুখ অজ্ঞজনকে যে সব দিকে লক্ষ্য রাখতে বলেছেন, সর্বাধুনিক জর্মন-বিশ্বকোষও তাই বলেছেন।...উল্লেখযোগ্য যে, ক্যানসার গবেষণা আরম্ভ করার পূর্বে জাওয়ারব্রুখ বার্লিনের ইণ্ডলজি ডিপার্টমেণ্টে গিয়ে খবর নেন, প্রাচীন ভারতীয় বৈদ্যেরা ক্যানসার সম্বন্ধে কি বলে গিয়েছেন।

ছাত্রদের মৌখিক (ভাইভা) পরীক্ষা নেওয়ার পর প্রতিবারেই অতিশয় গম্ভীর কণ্ঠে বলতেন, 'এই পৃথিবীতে বিস্তর গর্দভ নিজেদের ডাক্তার রূপে পরিচয় দিয়ে নির্ভয়ে অগুনতি লোক মেরে বেড়াচ্ছে ; তার উপর যদি আরো একটা গর্দভ বাড়ে তাতে করে কণামাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। তুমি পরীক্ষা পাস করলে।' জাওয়ারব্রুখও তাই তাঁর যুগের শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। কিন্তু অন্তত একবার তাঁরও শিক্ষা হয়ে যায় এ বাবদে। জাওয়ারব্রুখ লিখছেন, 'সকাল দশটায় তিনটি ছেলে আসবে আমার কাছে ভাইভা দিতে। আমি নার্সকে বললুম, ক্যাণ্ডিডেটরা এলে অমুক রোগীকে পাঠিয়ে দিয়ো—তার পেটে ছিল টিউমার। ওরা এলে আমি কাগজপত্র দস্তখৎ করতে করতে একজনকে বললুম, রুগীকে পরীক্ষা করে বলতে তার কি হয়েছে। আমি কাজে ডুব মারলুম। দশ মিনিট পরে শুধালুম, "কি হল ?" ছেলেটা ভয়ে ভয়ে বললে, "কিছুই তো পেলুম না, স্যর।" আমি হুঙ্কার দিয়ে বললুম, "গেট আউট"—আর নামে দিলুম ঢ্যাবা কেটে। তারপর একই আদেশ দিলুম দু নম্বর ক্যাণ্ডিডেটকে। একেও যখন শুধালুম, কি পেল সে—সে প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে একই উত্তর দিল। ছাড়লুম আরেক হুঙ্কার, কাটলুম আরেক ঢ্যাবা। এবারে তিন নম্বরের পালা। সে-ও যখন ফেল মারলে তখন আমি ছাড়লুম শেষ হুঙ্কার। এ ছেলেটি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া না হয়ে শান্ত কণ্ঠে বললে, "তা হলে আপনি দেখান না, স্যর, কি হয়েছে।" কী! এত বড় আস্পদ্দা! দেখাচ্ছি! লম্ফ দিয়ে গেলুম রুগীর কাছে, পেটে দিলুম হাত। ও হরি! কোথায় টিউমার! ভুলে অন্য লোক পাঠিয়েছে নার্স! তখন শুরু হয় আমার আর্তরব। "আরে, আরে, কোথায় গেল সেই দুই ক্যাণ্ডিডেট। নিয়ে এসো ওদের।" এস্থলে যে-ক্যাণ্ডিডেট বিশ্ববিখ্যাত জাওয়ারব্রুখকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল, তাকে বোধ হয় আর কোনো পরীক্ষাতে না ফেলে সঙ্গে সঙ্গে পয়লা নম্বরী ডিগ্রী দেওয়া উচিত।

এ রকম আরো বহু মজার মজার কথা আছে এই অসাধারণ পুস্তকে ; বস্তুত পুরো বইখানাই হাস্যরসের কুমকুমে কুমকুমে ভর্তি। পাঠকের চটুলহৃদয়ে একটুখানি চাপ পড়লেই আবীরে আবীরে ছয়লাপ। কিন্তু এর ফাঁকে ফাঁকে আবার ট্র্যাজেডির করুণ রসও আসে বলে সে রস যেন জল এনে দেয় চোখের পাতায়, বুক ভরে দেয় নিবিড়তর ব্যথায়—আরো বেশী।

একবার একটি মহিলা তাঁর কাছে এসে বললেন, তাঁর নিশ্চয়ই ক্যানসার হয়েছে। ডাক্তার তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন ভিন্ন ভিন্ন ল্যাবরেটরিতে যেখানে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রোগের জাতগোত্রের বিচার হয়। নানাবিধ

পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তাঁরা সবাই এক বাক্যে সমস্বরে বললেন, 'ক্যানসার নয়'।

সব শুনে মহিলাটি মাথা নেড়ে বললেন, 'না, হের প্রফেসর, এটা ক্যানসারই বটে।'

মহিলাটি কয়েক দিন পর আবার এসে ক্যানসারের ফরিয়াদ করলেন। আবার গোড়ার থেকে তাবৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হল, আবার নির্দ্বন্দ্ব নেতিবাচক উত্তর এল। এই করে করে ছ'মাস ধরে মহিলাটি আসেন—তাঁর মনে কোনো সন্দেহ নেই, তাঁর উদরবেদনা ক্যানসারজনিত।

শেষটায় জাওয়ারব্রুখ স্থির করলেন, কাটাই যাক পেট। মাদামকে তখন বলতে পারবেন, স্বচক্ষে দেখেছি পেটে কোনো ক্যানসার নেই। কিংবা হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, অনেক বর্ষীয়সী মহিলার এই অপারেশন-মেনিয়া থাকে; হয়তো তাঁরা আপন জানা-অজানায় সেণ্টার অব অ্যাট্রাকশন বা কৌতূহলের কেন্দ্র হতে চান। তাকে অস্ত্রোপচারের জন্য তৈরি করা হল।

তারপর কবিরাজ জাওয়ারব্রুখ যা বলেছেন, তার মোদ্দা কথা: 'আমরা তো নিশ্চিন্ত মনে পেট খুললুম। সর্বনাশ! এ কি দেখি! পেট ভর্তি ক্যানসার! এবং এখন যে চরমে পৌঁচেছে সে অবস্থায় অপারেশনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সন্তপ্ত চিত্তে আমরা পেট সেলাই করে দিলুম। মহিলা সম্বিতে ফিরলে আমি তাঁকে বললুম, 'হ্যাঁ, ক্যানসারই ছিল, আমরা সেটা কেটে সরিয়ে দিয়েছি।'

জাওয়ারব্রুখ তার পর বলেছেন, 'মহিলাটি প্রথম যেদিন আমার কাছে এসেছিলেন, তার সঙ্গে সঙ্গে যদি অপারেশন করতুম, তবে হয়তো তাঁকে বাঁচাতে পারতুম। কিন্তু প্রশ্ন, আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি যখন নঙর্থক উত্তর দেয়, তখন শুধুমাত্র রোগীর অনুমানের উপর নির্ভর করে পেট কাটা যায় কি প্রকারে?'

জাওয়ারব্রুখ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আপনাদের কাছে আরো নিবেদন-করার বাসনা রইল। কিন্তু আমার বিশ্বাস, কোনো বাঙলাভাষী সার্জন সেটা করলেই ভালো হয়; আমার মত আনাড়ী তা হলে অনধিকার-প্রবেশ থেকে নিষ্কৃতি পায়।

কলকাতা ও বোম্বাইয়ে যে সব ক্যানসার-প্রতিষ্ঠান আছে, তাঁরা মাঝে মাঝে খবরের কাগজে বিবৃতি প্রকাশ করে সাধারণ জনকে সাবধান করে দেন, শরীরে কোন্ কোন্ আকস্মিক বা মন্দগতিতে বর্ধমান পরিবর্তন দেখলে ক্যানসারের সন্দেহ করতে হয়। এগুলি আমি সর্বদাই শ্রদ্ধা ও মনোযোগ সহকারে পড়ি।

ঠিক ঐ একই সুবাদে প্রফেসর ডক্টর গেহাইম্‌রাট জাওয়ারব্রুখ অবতরণিকা হিসাবে কয়েকটি কথা বলেছেন এবং আপন বক্তব্য বোঝাতে গিয়ে এমন একটি

অত্যুৎকৃষ্ট বিরল তুলনা দিয়েছেন, যেটি ব্যবহার করতে পারলে যে কোন যশস্বী সাহিত্যিকও শ্লাঘা অনুভব করবেন। বৈদ্যরাজ যা বলেছেন, তার নির্যাস : অধিকাংশ রোগই কোনো না কোনো সাবধান-বাণী, ইঙ্গিত, ওয়ার্নিং দিয়ে আসে। যেমন, সামান্য মাথা ধরলো—সেইটে ওয়ার্নিং—পরের দিন জ্বর হল। কিন্তু ক্যানসার কোনো ওয়ার্নিং তো দেয়ই না, বরঞ্চ সে নিতান্ত নিরপরাধীর মত দেখা দেয়। যেমন, আপনার জিভে একটি দানা দেখা দিল। সেটাতে কোনো বেদনা নেই, আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, আপনি ভাবলেন, এরকম তো কত দানা এখানে সেখানে দেখা দেয় আবার মিলিয়ে যায়, এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার বা চিকিৎসকের কাছে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই। তারপর সেটা অতি ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলো, কিন্তু কোনো বেদনা বা অস্বস্তি নেই বলে আপনি তখনো কোনো প্রতিকার করলেন না। তারপর একদিন ঢোক গিলতে, খাবার গিলতে আপনার অসুবিধা হতে লাগলো। আপনি তখন গেলেন ডাক্তারের কাছে, কিন্তু হায়, ততদিনে বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে, তখন আর অপারেশন করা যায় না। আপনি যদি, দানা যখন ছোট ছিল, তখন আসতেন, তবে সার্জন আপনাকে অনায়াসে ক্যানসারমুক্ত করতে পারতেন—অবশ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর। তাই জাওয়ারক্রুখ বলছেন, 'দানাটি আদৌ অপরিচিত শত্রুরূপে বেদনা যন্ত্রণা সঙ্গে নিয়ে এল না। ক্যানসার এল যেন আপনার কোনো বন্ধুজনের চেহারার সঙ্গে হুবহু মিলিয়ে একটি মুখোশ তৈরি করে সেটা পরে। তার পর কাছে এসে হঠাৎ মুখোশ সরিয়ে ফেলে আপনার বুকে মারলো ছোরা!'

এর পরই অধ্যাপক কতকগুলো চিহ্নের উল্লেখ করেছেন—এগুলোকে তিনি ওয়ার্নিং বলেন নি বটে, কিন্তু সেগুলো দেখলেই তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। জিভেতে বা অন্য কোথাও দানা বা ঐ জাতীয় বস্তু বা পরিবর্তন, কণ্ঠস্বর অকারণে কর্কশ হয়ে যাওয়া, আপনার পেটের অসুখ ছিল না—হঠাৎ আরম্ভ হল দিনের পর দিন পেট খারাপ হতে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এটা আমার অনধিকারপ্রবেশ। আপনার উচিত, আমাদের যে কোনো ক্যানসার-প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁদের সুলিখিত প্রামাণিক বিবৃতি সংগ্রহ করা। বিবৃতিতে সব ক'টা চিহ্নের পরিপূর্ণ (exhaustive) লিস্ট থাকে। আমি এযাবৎ যা লিখেছি, সেটা ভুলে গিয়ে ঐ বিবৃতি মন দিয়ে পড়বেন। কারণ, এগুলো আমাদের জন্যই লেখা —ডাক্তারদের জন্য নয়[২] ॥

২ এ-প্রবন্ধ "দেশে" প্রকাশিত হওয়ার পর আমি চিকিৎসক অচিকিৎসক

হিডজিভাই পি মরিস্

একদা 'স্ট্র্যান্ড্' পত্রিকা একটি নূতন ধরনের অনুসন্ধানের সূত্রপাত করে সাহিত্যের মহা মহা মহারথীদের শুধোয়, তাঁরা সর্বজন-সম্মানিত, সর্বশিক্ষিতজনের অবশ্যপাঠ্য কোন্ কোন্ পুস্তক, যে কোনো কারণেই হোক, পড়ে উঠতে পারেন নি। উত্তরে এমন সব তথ্য আবিষ্কৃত হল যাকে 'মোহনে'র ভাষায় লোমহর্ষক বলা যেতে পারে: যেমন, কথার কথা কইছি— বার্নার্ড শ পড়েন নি অলিভার টুইস্ট, কিংবা মনে করুন—রবীন্দ্রনাথ পড়েন নি 'একেই কি বলে সভ্যতা'?

কাজেই বিখ্যাত সাহিত্যিকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এই অখ্যাত সাহিত্য-সেবক যে তাঁরা যেন তড়িঘড়ি শ্রীযুত বিশী মহাশয়ের শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বই-খানা পড়ে নেন।

এই পুস্তকে 'কাব্যের উপেক্ষিতা' জাতীয় দু'চারটি চরিত্রের উল্লেখ করে বিশী মহাশয় বহু প্রাক্তন শান্তিনিকেতনবাসীদের সাধুবাদ পেয়েছেন। তাঁদেরই একজন হিডজিভাই মরিস।

তাঁর পুরো নাম হিডজিভাই পেস্তনজি মরিসওয়ালা। গুজরাতীদের প্রায় সকলেরই পারিবারিক নাম থাকে; যেমন গাঁধী, জিন্না (আসলে ঝিঁড়া ভাই), হটিসিং ইত্যাদি। পার্সীদের অনেকেরই ছিল না বলে কেউ কেউ তাঁদের ব্যবসার নাম পারিবারিক নাম রূপে গ্রহণ করতেন। যেমন ইঞ্জিনীয়ার, কন্ট্রাক্টর ইত্যাদি। এই নিয়ে পার্সীরা ঠাট্টা করে একটি চরম দৃষ্টান্ত দেন—সোডাওয়াটার-বটল্ওপ্নারওয়ালা!

বোম্বাইয়ের পতীত্ পরিবার বিখ্যাত। এঁরা ফরাসী 'পতা' (Petit) ফার্মে কাজ করতেন বলে প্রথমে পতীত্ওয়ালা ও পরে পতীত্ নামে পরিচিত হন। ঠিক সেইরকম মরিস কোম্পানিতে কাজ করে আমাদের অধ্যাপক মরিসওয়ালা পরে শুধু মরিস নামে বোম্বাই অঞ্চলে নাম করেন।

অত্যুত্তম ফরাসী ও লাতিন শেখার পর না জানি কোন্ যোগাযোগে তিনি

একাধিক সজ্জন পাঠকের কাছ থেকে অনুরোধ পেয়েছি, ক্যানসার সম্বন্ধে জাওয়ারব্রুখের প্রাগুক্ত প্রবন্ধটি যেন আমিই অনুবাদ করি। আমি করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছি, কারণ অসুস্থতাবশত আমার দেহে শক্তি মনে উৎসাহ বড়ই হ্রাস পেয়েছে। তবে এটাও নিবেদন, আমৃত্যু দুটি প্রবন্ধ অনুবাদ করতে পারার দুরাশা আমি কখনো সম্পূর্ণ ত্যাগ করবো না; ক্যানসার সম্বন্ধে প্রবন্ধটি ও অধ্যাপক ভিন্টারনিত্স্ রচিত ক্ষুদ্রাকার রবীন্দ্র-জীবনী।

শান্তিনিকেতন পৌঁছে সেখানে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন।

দুটো বিষয়ে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী—সেন্টিমেন্টাল এবং আদর্শবাদী। আমার আশ্চর্য লাগতো, কারণ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে যেসব গুজরাতী ছেলেরা—এবং পাঠিকারা অপরাধ নেবেন না, মেয়েরাও—শান্তিনিকেতন আসে, তারা পর্যন্ত টাকা আনা পাই হিসেব করতো; শুনেছি, ছাত্রেরা আকছারই আদর্শবাদী হয়। (নইলে অত নিঃস্বার্থ ট্রাম-বাস পোড়ানোর সৎকর্মটা করে কে ? কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কথা না। হক্ কথা কইলে পুলিসে ধরবে।) তাই গুজরাতী মরিস সাহেবের আদর্শবাদ আমাকে বিস্মিত করেছিল।

সামান্য বাঙলা শেখার পরই মরিস সাহেবের প্রেম উপচে পড়ল রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি এবং তিনি সম্মোহিত হলেন

"তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার
নামাতে পারি যদি মনোভার" শুনে।

অন্যত্র আলোচনা করেছি, ভারতের বাইরে কোনো ভাষাই 'ত' এবং 'ট'-র উচ্চারণে পার্থক্য করে না; এমন কি ভারতীয়দের ভিতর যাঁদের গায়ে প্রচুর বিদেশী রক্ত তাঁরাও এ-দুটোতে গুবলেট করেন। উদাহরণ স্থলে, গুজরাতের বোরা সম্প্রদায়—এখানকার রাধাবাজারে এঁদের ব্যবসা আছে—ব্রহ্ম উপত্যকার আসাম-বাসী ও পার্সী সম্প্রদায়।

তাই মরিস সাহেবের উচ্চারণে ছত্র দু'টি বেরুতো :

"টাহাটে এ জগটে ক্ষটি কার
নামাটে পারি যডি মনোভার।"

আমরা আর কি করে ওঁকে বোঝাই যে 'ত' 'দ'-এর অনুপ্রাস ছাড়াও গুরুদেবের গান আছে।

মরিস সাহেব নূতন বাঙলা শেখার সময় যে না বুঝে বিশীদাকে 'বেটা ভূত' বলেছিলেন তার চেয়েও আরো মারাত্মকতম উদাহরণ আমি শুনেছি। তিনি আমাদের ফরাসী শেখাতেন, এবং শ্রদ্ধেয় বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন এবং আরো কিছু অধ্যাপকও তাঁর ক্লাসে যেতেন। আমার হাসি পেত যখন গুরু মরিস ছাত্র বিধুশেখরকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন ও ছাত্র বিধুশেখর তাঁকে 'তুমি' বলে। একদিন হয়েছে কি, ফরাসী ব্যাকরণের কি একটা কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলেছেন অধ্যক্ষ বিধুশেখর। মরিস সাহেব বললেন, 'চমৎকার। শাস্ত্রী মশায়। সত্যি, আপনি একটি আস্টো ঘুঘু।'

শাস্ত্রী মশাইয়ের তো চক্ষুস্থির। একটু চুপ করে থাকার পর গুরু, গুরু—

যদ্যপি ছাত্র, তথাপি গুরু-কণ্ঠে শুধালেন, 'মরিস, এটা তোমাকে শেখালে কে ?'

নিরীহ মরিস বোধ হয় কণ্ঠনিনাদ থেকে বিষয়টার গুরুত্ব খানিকটে আমেজ করতে পেরে বললেন, 'ডিন্‌ডা (দিনদা, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। উনি বলেছেন ওটার অর্থ "অসাভারণ বুড্‌ডিমান"। টবে কি ওটা ভুল ?'

শাস্ত্রী মশাই শুধু ঈষৎ কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'আচ্ছা, আমি দিনেন্দ্রনাথকে বোঝাবো।'

দিনুবাবু নাকি বিদেশীকে ভাষা শেখাবার সময় কর্তব্যবোধহীন চপলতার জন্য বেশ কিছুটা ভালোমন্দ শুনেছিলেন শাস্ত্রী মশাইয়ের কাছ থেকে।

ঐ সময় প্যারিস থেকে অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে আসেন। উভয়েই একাধিকবার বলেন, মরিস সাহেব উল্লেখ না করা পর্যন্ত তাঁরা কখনো বিশ্বাস করতে পারেন নি, ফ্রান্স না গিয়ে মানুষ কি করে এরকম বিশুদ্ধ ফরাসী শিখতে পারে। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে বড়ই কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাকে রলাঁর 'যীশুজীবনী' পড়ান। এ বই আমার মহদুপকার করেছে এবং করছে।

বলা বাহুল্য এই সরল সজ্জন যুবা পণ্ডিতটি সকলেরই হৃদয়ে স্থান পেয়েছিলেন। গুরুদেবের তো কথাই নেই, মরিস সাহেব ঋষিতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথেরও অশেষ স্নেহ পেয়েছিলেন। বড়বাবু বিদেশী পণ্ডিতদের সঙ্গে বাক্যালাপ কালক্ষয় বলে মনে করতেন ; বলতেন, 'এরা সব তো জানে কোন্ শতাব্দীতে প্রজ্ঞাপারমিতা কিংব একাক্ষরপারমিতা প্রথম লেখা হয়, প্রথম ছাপা হয়। ওসব জেনে আমার কি হবে ? তার চেয়ে নিয়ে আসো না ওদের কোনো একজন, যে কাণ্টের দর্শন সমর্থন করতে পারে, আর আমি নেব বিরুদ্ধ মতবাদ, কিংবা সে নেবে বিরুদ্ধ মতবাদ, আমি নেব কাণ্টপক্ষ—তার যেটা খুশী।' মরিস সাহেব তাঁকে তখন অনুনয়-বিনয় করে সম্মত করাতেন বিদেশী পণ্ডিতকে দর্শন দিতে। অবশ্য দু' মিনিট যেতে না যেতেই বড়বাবু সব ভুলে গিয়ে কোনো কিছু অন্য তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় তন্ময় হয়ে যেতেন। আমাদের মতন ছেলে-ছোকরাদের কিন্তু তাঁর কাছে ছিল অবাধ গমন। আমার মনে পড়ে তো খৃস্টের কথা ; তিনি যেহোভার মন্দির থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বিস্তর তথাকথিত কুলাঙ্গার ভি আই পি-কে, এবং আদেশ দিতেন 'লেট দি চিলড্রেন কাম্ আনটু মী'।

মরিস সাহেব প্রথমটায় সম্মত ছিলেন না ; আর সকলের চাপাচাপিতে তিনি প্যারিসের সরবনে গিয়ে ডক্টরেটের জন্য প্রস্তুত হতে রাজী হলেন।

প্যারিসের ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে তাঁর সঙ্গে আমার অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা।

আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করাতে আমি দুঃখ প্রকাশ করলুম। তিনি বললেন, 'তুমি এখন বড় হয়েছ ; জর্মনিতে ডক্টরেট করবে। আমিও এখানে তাই করছি। আমরা এখন এক-বয়েসি।' আমার বয়েস তখন চব্বিশ, তাঁর বত্রিশ। তারপর আমাকে রেস্তোরাঁয় উত্তমরূপে খানদানী ডিনার খাওয়ালেন। বিনয় এবং সঙ্কোচের সঙ্গে পরের দিন বললেন, 'তোমাকে ভালো করে এণ্টারটেন করতে পারলুম না। তোমাকে বলতে লজ্জা নেই, আমার এ মাসের টাকাটা এখনো দেশ থেকে আসে নি।' আমি তারস্বরে প্রতিবাদ জানালুম। বহু বৎসর পরে ঐ সময়কার এক প্যারিসবাসী ভারতীয়ের কাছে শুনতে পাই, মরিস সাহেব অন্যান্য দুঃস্থ ভারতীয় ছাত্রদের টাকা 'ধার' দিয়ে দিয়ে মাসের বেশীর ভাগ দেউলে হওয়ার গহ্বর-প্রান্তে পড়ি পড়ি করে বেঁচে থাকতেন। আসলে তাঁর পরিবার বিত্তশালী ছিল।...তাঁর সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। কিন্তু এখনো তাঁর সেই শান্ত সংযত প্রসন্ন বদনটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কিন্তু তার পূর্বের একটি ঘটনা চিরকাল ধরে আমার ও আমার সতীর্থদের চিত্তে কৌতুক রস এনে দেবে, প্রতিবার সেটার স্মরণে।

গুরুদেব শারদোৎসবের মোহড়া নিচ্ছেন। তিনি স্বয়ং, দিনুবাবু—এমন কি জগদানন্দবাবুর মত রাশভারী লোক—অজিন ঠাকুর এঁরা সব অভিনয় করবেন। এক প্রান্তে বসে আছেন শুষ্কাস্য বিষণ্ণবদন মরিস সাহেব। আমি হোম্‌টাস্‌ক্‌ না করলে তাঁর মুখে যে বিষণ্ণতা আসতো তিনি যেন তারই গোটাদশেক 'হেলপিং' নিয়েছেন। মোহড়ার শেষে দিনুবাবু কাচুমাচু হয়ে গুরুদেবকে অনুরোধ জানালেন, মরিস সাহেবকে ড্রামাতে একটা পার্ট দিতে।

গুরুদেবের ওষ্ঠাধর প্রান্তের মৃদুহাস্য সব সময় ঠাহর করা যেত না। এবারে গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে সব পার্টেরই বিলিব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। গুরুদেব বললেন, 'ঠিক আছে। একে শ্রেষ্ঠীর পার্ট দিচ্ছি।' হয় মূল নাটকে শ্রেষ্ঠীর পার্ট আদৌ ছিল না, ঐটে মরিস সাহেবের জন্য 'ইস্‌পিসিলি' তৈরি হয় কিংবা হয়তো তখন মাত্র বড় বড় পার্টগুলোর বণ্টনব্যবস্থা আছে।

তা সে যা-ই হোক, শ্রেষ্ঠীর অভিনয় করবেন 'নটরাজ' মরিস—শাস্ত্রী মশাই তাঁর নাম দিয়েছিলেন মরীচি (ব্রহ্মার পুত্র, কশ্যপের পিতা ও তিনি সূর্যকিরণও বটেন)—মরিসও সগর্বে কাঁচা-হাতে সেই নামই সই করতেন। এবারে শুনুন, পার্টটি কি ?

রাজা : ওগো শ্রেষ্ঠী !

শ্রেষ্ঠী : আদেশ করুন, মহারাজ !

রাজা : এই লোকটিকে হাজার কার্ষাপণ গুনে দাও।

শ্রেষ্ঠী : যে আদেশ।

ব্যস্! ঐটুকু! আমার শব্দগুলো ঠিক ঠিক মনে নেই, কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে মরিসকে ঐ পাঁচটি শব্দ বলতে হবে ; গুরুদেব সায়েবের বাঙলা উচ্চারণ সম্বন্ধে বিলক্ষণ ওকীব-হাল ছিলেন বলে। কিন্তু মরিস সাহেব বেজায় খুশ, জান্ তর্‌র্‌র্—ড্যাম্‌ম্যাড—হোক না পার্ট ছোট, তাতেই বা কি? বলেন নি স্বয়ং গুরুদেব, 'The rose which is single need not envy the thorns which are many?'

কিন্তু এইবারে শুরু হল ট্রবল। গুরুদেবের ভাষাতেই বলি, মরিসকে শুতে হল কণ্টকশয্যায়, গোলাপ-পাপড়ির আচ্ছাদিত পুষ্পশয্যায় নয়—যদিও থর্ন মাত্র একটি। গুরুদেব যতই বলেন 'আদেশ করুন, মহারাজ' মরিস বলেন, 'আডেশ করুন, মহারাজ।' মহা মুশকিল। মরিস আপন মরীচি-তাপে ঘর্মাক্তবদন। শেষটায় গুরুদেব বরাত দিলেন দিনুবাবুকে, তিনি যেন সাহেবের 'ত' 'ট'র জট ছাড়িয়ে দেন। আফটার অল—তিনিই তো খাল কেটে ঘরে কুমির এনেছেন; বিপদ, এক্‌স্‌কিউজ মি—বিপডটা টো টাঁরই টৈরি।

মরিস সাহেব ছন্নের মত হয়ে গেলেন। সেই প্রফেট জরথুস্ত্রের আমল থেকে কোন্ পার্সী-সন্তান এই 'ত' 'ট'য়ের গর্দিশ মোকাবেলা করেছে—এই আড়াই হাজার বছর ধরে—যে আজ এই নিরীহ, হাড্ডিসার মরিস বিদেশ-বিভুঁইয়ে একা একা এই 'ত'য়ের তাবৎ 'দ'য়ের দানব—আই মীন ডানব, টাবড ডানবের সঙ্গে লড়াই দেবে?

মরিস ছন্নের মত আশ্রমময় ঘুরে বেড়ান—দৃষ্টি কখনো হেথায় কখনো হোথায়, আর ঠোঁট দুটি বিড়বিড় করে কি যেন বলছে। আমি বললুম, 'নমস্কার, স্যার।' সম্বিতে এসে বললেন, 'আ! সায়েড (সৈয়দ)—' ও হরি! এখনো 'সায়েড'! তবে তো আডেশ এখনো মোকামে কায়েম আছে, রাজাদেশেরই মত —'শোনো টো ঠিক হচ্ছে কি না "আডেশ করুন, মহারাজ"।' আমি সন্তপ্ত চিত্তে চুপ করে রইলুম। বার দশেক আডেশ আডেশ করে বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে এগিয়ে গেলেন।

একটা ডরমিটরি-ঘরের কোণ ঘুরতেই হঠাৎ সমুখে মরিস—বিড়বিড় করছেন 'আডেশ আডে—।' রেললাইনের কাছে নির্জনে 'আডেশ—।' দূর অতি দূর খোয়াইয়ের নালা থেকে মাথা উঠছে সায়েবের, আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। চন্দ্রালোকে, খেলার মাঠে মরিস, আসন্ন উষার প্রদোষে শ্মশানপ্রান্তে কার ঐ

ছায়ামূর্তি ? মরিস। হিন্দী কবি সত্যি বলেছেন, গুরু তো লাখে লাখে, উত্তম চেলা কই। আশ্রমের ছেলেবুড়ো এখন সবাই সায়েবের গুরু। এস্তেক শিশু-বিভাগের কানাই, সাগর কেউ বাদ পড়ে নি। পড়ে থাকলে তাদের দোষ। সবাইকে টেস্ট করতে অনুরোধ করেন তাঁর আডেশ আডেশানুযায়ী হচ্ছে কি না। ইতিমধ্যে এক সন্ধ্যায় মোহড়া শেষে দিনুবাবু গুরুদেবকে ভয়ে ভয়ে অনুরোধ জানালেন 'আদেশে'র বদলে অন্য কোনো শব্দ দিতে, যেটাতে "ত" "দ" নেই। গুরুদেব বললেন, 'না ; মরিসকে "ত" "দ" শিখতেই হবে।'

এর পর দ্বিতীয় পর্ব। হঠাৎ সকলের সামনে এক দিন বেরিয়ে গেল 'আদেশ' অত্যুত্তম 'দ' সহ। আমি 'ইয়াল্লা' বলে লম্ফ দিলুম। কেউ 'সাধু সাধু', কেউ বা 'কনগ্রাচুলেশনস্' বললেন। কিন্তু হা অদৃষ্ট! আমরা বন থেকে বেরুবার পূর্বেই হর্ষধ্বনি করে ফেলেছি! সায়েব পরক্ষণে আডেশ-এ ল্যাপস্ করেছেন। তারপর তাঁর ক্ষণে আসে 'দ' ক্ষণে 'ড'। কলকাতার বাজারে মাছ ওঠা-না-ওঠার মত বেটিঙের ব্যাপার! এই করে করে চললো দিন সাতেক। সমুখে আশার আলো।

এর পর তৃতীয় পর্ব। দ্বিতীয় পর্বের মত এটাও অপ্রত্যাশিত। সায়েব এখন চাঁচাছোলা, ভোরবেলার নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক শিশিরবিন্দুর ন্যায় 'দ' বলতে পারেন। পয়গম্বর জরথুস্ত্র এবং তাঁর প্রভু আহুর মজদাকে অশেষ ধন্যবাদ!

আমরাও আমাদের সঙ্কটটা ভুলে গেলুম। মোহড়ায় প্রতিবার ঋষি মরীচি বৈদিক পদ্ধতিতে 'দ' উচ্চারণ করেন।

মরিস সাহেব স্টেজে নামলেন পার্সী দস্তুর বা যাজকের বেশ পরে। সব-কিছু ধবধবে সাদা। শুধু মাথার টুপিটি দাদাভাই নোরজী স্টাইলের লেটার-বক্স্ প্যাটার্নের কালোর উপর সফেদ বুট্টাদার। গুরুদেব এই বেশই চেয়ে বলেছিলেন, 'তোমরা পার্সীরা বাপু এ দেশের শ্রেষ্ঠী। তোমরা যা পরবে তাই হবে শ্রেষ্ঠীর বেশ।'

নাট্যশালা গম গম করছে। ওঃ, সে কী অভিনয়! গুরুদেবকে দেখাচ্ছে দেবদূতের মত। অজিনের চেহারা এমনিতেই খাপসুরত, এখন দেখাচ্ছে রাজ-পুত্রের মত। গুরুমশাই জগদানন্দ রায়ের কী বেত্রাস্ফালন! আশ্রমে বেতের বেসাতি বিলকুল বে-আইনি। এ মোকায় জগদানন্দবাবু যেন হৃতোপবীত-দ্বিজ লুণ্ঠিত যজ্ঞোপবীত ফিরে পেয়েছেন। তাঁর কঠিনদর্শন মুখচ্ছবি ঈষৎ স্নিগ্ধতা ধরেছে।

মরিস সাহেব প্রবেশ করলেন রঙ্গমঞ্চে।

রাজা দিলেন ডাক।

মরিস সাহেব—হে ইন্দ্র, তোমার বজ্র কেন তৎপূর্বেই অবতীর্ণ হল না?

উৎকণ্ঠা, উত্তেজনায় মরিস বলে ফেলেছেন, 'আ ডে শ।'

অট্টহাস্যে ছাদ যেন ভেঙে পড়ে। তিনি কিন্তু ঐ একই উত্তেজনার নাগপাশে বদ্ধ বলে সে অট্টহাস্য শুনতে পান নি।

সে সন্ধ্যার অভিনয়ের জন্য অধ্যাপক হিড্‌জিভাই মরিসই পেয়েছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনন্দন। আমাদের বিবেকবুদ্ধি সেই আদেশই দিয়েছিল—খুব সম্ভব আডেশই।[১]

'আধুনিক' কবিতা

'সুশীল পাঠক—'

ছেলেবেলায় এ ধরনের সম্বোধন পড়ে হৃদয়ে বড় আনন্দ হত। মনে হত, কত মহান লেখক এই কালীপ্রসন্ন সিঙি, যিনি কিনা মহাভারতের মত বিরাট গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন, তিনি আমাকেই সম্বোধন করে কথা বলেছেন! এটা যে নিছক সাহিত্যিক ঢং, বলার একটা আড়, সেটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না। বিশেষ করে যখন আমার ধারণা হল—সেটা হয়তো ভুল—যে দরদ-ভরা কথা কয়ে যখন তিনি আমার সহানুভূতি আকর্ষণ করতে চান, তখনই 'পাঠক' বলে সম্বোধন করেন। এবং আরো বেশী করে 'সহৃদয় পাঠক' বলে সম্বোধন করতেন সিঙি মশাইয়ের মত দরদী লেখককুল যখন তাঁরা এমন কোনো অভিজ্ঞতার বর্ণনা করতে যেতেন, যেটার মোক্ষম মার বেশীর ভাগ পাঠকই খেয়েছে। এ অধম প্রাচীনপন্থী। সে এখনো পাঁচকড়ি দে পেলে গোপনে পড়ে। এবং বটতলাতে কিছুক্ষণ হল একখানা 'সচিত্র প্রেমপত্র' কিনে সে বড় ভরসা পেয়েছে। যৌবনে ভাষার উপর দখল ছিল না—এখনই বা হল কই?—মরমিয়া প্রেমপত্র লিখতে পারতো না বলে রায়ের ভাষায়, "উনিশটি বার প্রেমেতে সে ঘায়েল করে থামলো শেষে।" আর ভয় নেই! এখন এই অমূল্য গ্রন্থ থেকে নকল করে ফিলিমস্টার থেকে মেয়ে-পুলিস সকলেরই 'সজল নয়নে হৃদয়-দুয়ারে ঘা' দেওয়া যাবে।

১ মরিস সর্বদাই ঈষৎ বিষণ্ণ বদন ধারণ করতেন—খুব সম্ভব এটাকেই বলে 'মেলানকলিয়া'। প্যারিস থেকে ফেরার পথে তিনি জাহাজ থেকে অন্তর্ধান করেন। আমার মত আর পাঁচজন তার কারণ জানে না। শুনেছি, তিনি উইল করে তাঁর সর্বস্ব বিশ্বভারতীকে দিয়ে যান।

বইখানার প্রথম চার লাইন পড়লেই বুঝতে পারবেন, মাইকেল রবীন্দ্রনাথ এর থেকে কতখানি পিছিয়ে আছেন :—

'প্রিয়তমা চারুশীলা পিতৃগৃহে গিয়ে
আছ তো সুখেতে তুমি গোষ্ঠিজন নিয়ে ?
তুমি মোর জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট ধন।
তুমি মোর হৃদয়ের শান্তিনিকেতন।'

জানি, জানি - বাধা দেবেন না, জানি আপনারা বলবেন, এই মডার্ন যুগে এসব পণ্য অচল। কিন্তু আপনারা কি এ তত্ত্বটাও জানেন না যে, ফ্যাশান হর-হামেশা বদলায় এবং আকছারই প্রাচীন যুগে ফিরে যায় ? পিকাস্সো ফিরে গেছেন প্রাগৈতিহাসিক গুহাবাসীর দেয়াল-ছবিতে, অবনঠাকুর মোগলযুগে, নন্দলাল অজন্তায়, যামিনী রায় কালীঘাটের পটে। কাব্যে দেখুন, দুর্বোধ্য মালার্মে র‍্যাঁবো যখন অনুবাদের মারফৎ ইংলণ্ডও জয় করে বসে আছেন, তখন হাউসম্যান লিখলেন সরল প্রাঞ্জল 'শ্রপশার ল্যাড'। বলা হয়, ইংলণ্ডে কবির জীবিতাবস্থায় তাঁর একখানা বইয়ের এত বিক্রির অন্য উদাহরণ নেই। কোনো ভয় নেই। বাঙলা দেশের মডার্ন কবিতাও একদিন 'পাখি সব করে রবে'র অনবদ্য শাশ্বত ভঙ্গিতে লেখা হবে।

আমি মডার্ন কবিতা পছন্দ করি নে, তাই বলে মডার্ন কবিতার কোনো 'রোজোঁ দেত্রর্' রীজন ফর এগজিস্টেনস্ অর্থাৎ পুচ্ছটি তার উচ্ছে তুলে নাচাবার 'রোজোঁ' রাজন, ন্যায্যহক্ক নেই এ কথা কে বলবে।

প্রথমেই নিন মিলের অত্যাচার। এবং এই মিলটা আমাদের খাটি দিশী জিনিস নয়। সংস্কৃতের উত্তম উত্তম মহাকাব্যে, কাব্যে মিল নেই। যদিস্যাৎ থাকে, তবে সেটা আকস্মিক দুর্ঘটনা, প্রায় কবির অনিচ্ছায় ঘটেছে। সংস্কৃতে প্রথমে মিল পাই—আমার জানা মতে—মোহমুদ্গরে। এবং তিনিও সেটা বহিরাগত ভাষা থেকে নিয়েছিলেন, এমত সন্দেহ আছে। সংস্কৃতে সহোদরা ভাষা গ্রীক লাতিনে কি মিল আছে ? এ দেশেই দেখুন, উর্দু তার জননী সংস্কৃত ভাষা থেকে বহু দূরে চলে গিয়েছে, জোব্বা-জাব্বা পরে প্রায় মুসলমান হয়েছে (প্রায় বললুম কারণ এখনো বহু হিন্দুর মাতৃভাষা উর্দু ; উর্দু কবি-সম্মেলনে তাঁরা সম্মানিত সক্রিয় অংশীদার। কিন্তু, পণ্ডিত নেহরু, তেজবাহাদুর সপ্রু ইত্যাদির মাতৃভাষা ছিল উর্দু), তথাপি আজও উর্দুতে বিনা মিলে দোঁহা রচনা করা হয়, সংস্কৃত সুভাষিতের অনুকরণে। 'মিল' শব্দটা কি শুদ্ধ সংস্কৃত ? সংস্কৃতে একে বলে 'অন্ত্যানুপ্রাস্'—স্পষ্ট বোঝা যায়, বিপদে পড়ে মাথায় গামছা বেঁধে ম্যানু-

ফেকচার্ড এরজাৎস্ মাল। অতএব যদি মডার্ন কবিরা সে-বস্তু এড়িয়ে চলেন তবে পাঠক তুমি গোস্‌সা করো ক্যান্? ওঁরা তো মাইকেলেরই মত আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য পুনর্জীবিত করছেন। এই যাবনিক ম্লেচ্ছাচারের যুগে সেটি কি চাট্টিখানি কথা!

তারপর ছন্দ? ছন্দহীন কবিতা হয় না, আপনাকে বলেছেন কোন্ অলঙ্কার-শাস্ত্রের গোসাঁই? উপনিষদ পড়েছেন? তার ছন্দটি কান পেতে শুনেছেন? ছন্দে বাঁধা কবিতা আসতে পারে তার কাছে? বস্তুত বেদমন্ত্রে ছন্দ মেনে মেনে হায়রান হয়ে ঋষিকবি উপনিষদে পৌঁছে কি যুগপৎ তাঁর আধ্যাত্মিক ও কাব্যিক মোক্ষ লাভ করলেন না? এ অধম অশিক্ষিত—তথাপি গুণীজনের কাছে শোনা উপনিষদের একটি সামান্য সাদামাটা প্রশ্ন নিন :—

'সূর্য অস্ত গেছে, চন্দ্রও অস্ত গেছে, অগ্নি নির্বাপিত (অর্থাৎ আগুন জ্বালিয়ে যে একে অন্যকে দেখবো তার উপায় নেই), কথাও বন্ধ (অর্থাৎ চিৎকার করে ডাকবারও উপায় নেই)। তখন কোন্ জ্যোতি নিয়ে মানুষ (বেঁচে) থাকে, বলুন তো যাজ্ঞবল্ক্য?'

এবার সংস্কৃতটা শুনুন :—

'অস্তমিতে আদিত্যে, যাজ্ঞবল্ক্য, চন্দ্রমস্যস্তমিতে, শান্তেঽগ্নৌ, শান্তায়াং বাচি, কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ?'

প্রচলিত মন্দাক্রান্তা বা শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে এই অতুলনীয় সঙ্গীতমন্দ্রিত-স্পন্দিত ছত্র বেঁধে দিলে কি প্রভু যীশুর ভাষায় লিলিফুলের উপর তুলি নিয়ে রঙ বোলানো হত না?

এতেও যদি আপনাদের মন না ভরে তবে পড়ুন ইংরিজী অনুবাদে বাইবেল—রাজা দায়ুদের গান, সুলেমান বাদশার গীতি (সং অব্ সংজ, সং অব্ সলোমন)। সে তো গদ্যে, এবং স্বয়ং বার্নার্ড শ বলেছেন, ঐ সলোমনের গীতিটি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা।

আবার আপনি যদি মুসলমান হন তা হলে তো কথাই নেই। আপনি জানেন প্রাক-পয়গম্বর যুগেও আরবদের ছিল বহু বিচিত্র ছন্দে, মিলের কঠোরতম আইনে বাঁধা অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যসৃষ্টি। গদ্য ছিল না, কিংবা প্রায় না থাকারই মত। তথাপি আল্লা-তালা পয়গম্বরকে যে কুরানের বাণী পাঠালেন সে তো গদ্যে। অথচ আরবী-ভাষা নিয়ে যাঁরা সামান্যতম চর্চা করেছেন তাঁরাই শপথ করে বলবেন, এঁর ছন্দোময় গদ্য যে কোনো বাঁধা কাব্যকে হার মানায়। পয়গম্বরকে যখনই তাঁর বিরুদ্ধপক্ষ কোনো প্রকারের মিরাকল্ (অলৌকিক কীর্তি) দেখাতে আহ্বান

করতো তখনই তিনি সবিনয় বলতেন, 'আমি নিরক্ষর আরব। তৎসত্ত্বেও আল্লা-তালা আমার কণ্ঠ দিয়ে যে কুরান পাঠালেন তার কাছে কি আসতে পারে তোমাদের শ্রেষ্ঠতম কাব্য? এইটেই হল সবচেয়ে বড় মিরাক্‌ল্।'

অতএব মর্ডান কবিরা যদি ছন্দ অস্বীকার করেন তবে আপনি চটেন ক্যান্?

তৎসত্ত্বেও মর্ডান কবিতার দুশ্‌মনরা হয়তো বলবেন, তারা সুন্দর সুন্দর জিনিসের সঙ্গে বিৎকুটে সব জিনিসের তুলনা দেয়—যেমন তালগাছের ডগায় চাঁদ দেখে লিখলে, এ যেন আকাশের সুচিক্কণ সুমসৃণ তাল। কিংবা প্রিয়ার বিনুনি দেখে কবির মনে এল পানউলীর দোকানে ঝোলানো অগ্নিমুখ নারকোলের পাকানো দড়ি—যার ডগায় লাগিয়ে আমি আকছারই বিড়ি ধরাই। সেই দড়ি হাওয়ায় দুলে কবির কুর্তা পুড়িয়ে দিয়ে পিঠে ছ্যাঁকা দিয়েছে, ঠিক তেমনি প্রিয়ার বিনুনি দেখা মাত্রই তাঁর বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে।

এটা পড়ে তাজ্জব মানছেন কেন?

রাজা শূদ্রকের 'মৃৎ-শকটিকা' পড়েন নি? জর্মনরা সংস্কৃতের সমজদার এস্তেক গ্যোটে হাইনে সংস্কৃত না জেনেও ভারতীয় নাট্যের স্মরণে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করতেন। শূদ্রকের এই নাটকটি জর্মন ভাষাতে ক'বার যে ভিন্ন ভিন্ন রসিকজন দ্বারা অনূদিত হয়েছে বলা কঠিন, ক'বার যে জর্মনিতে মঞ্চস্থ হয়েছে সেটা বলা তার চেয়েও কঠিন। সেই নাট্যে আছে, ক্ষুধিত সূত্রধার বাড়ি ফেরার সময় গভীর দুশ্চিন্তায় মগ্ন—বাড়িতে তো চালডাল কিছুই নেই, গৃহিণী কি আদৌ রন্ধন করতে পেরেছেন? বাড়ি ঢুকেই সূত্রধার সানন্দে সবিস্ময়ে দেখেন, সাদা মাটির উপর লম্বা লম্বা কালো কালো আঁজি আঁজি দাগ—কালিমাখা হাঁড়ি মাটিতে ঘষে ঘষে গৃহিণী সাফসুৎরো করেছেন। অতএব ধূম্র দেখলে যে রকম বহ্নির উপস্থিতি স্বীকার করতেই হয়, হাঁড়ি পারষ্কার করা হয়ে থাকলে রান্নাও যে হয়েছে সে বিষয়ে কি সন্দেহ? সূত্রধার তখন সোল্লাসে উপমা দিয়ে বললেন, ওহো! সাদা মাটির উপর এই কালো কালো আঁজি যেন তুষারধবলা গৌরীর ললাটে কৃষ্ণাঞ্জন-তিলক!

কী মারাত্মক গদ্যময় হাঁড়িকুঁড়ি, মাটিতে সেগুলো ঘষার ফলে নো রা কালো আঁজির সঙ্গে শিবানী গৌরীর অসিত তিলকের তুলনা! এ যে রীতিমত হেরেসি, এ হেন তুলনা চার্বাকের বেদ নিন্দার চেয়েও ধর্মঘ্ন কটু-ভাষণ।

এর পরও আপনি আপত্তি করে বলবেন মর্ডান কবিতা ন দেবায় ন ধর্মায়?

বুদ্ধিমান তথা না-ছোড়-বান্দা পাঠক, আমি বিলক্ষণ জানি, আপনার প্রধান আপত্তি কোন্‌খানে—ছোটখাটোগুলো উপস্থিত না হয় বাদই দিলুম। আপনি বলবেন ওদের কবিতা পড়ে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি নে। আম্মো পারি নে

—ধাপ্পা না মেরে হক্ক কথাই কই। সে তো আপনার দোষ, আমার দোষ। আপনি আমি পয়সাওলার ছেলে হয়ে জন্মালে সত্যকার অপ্‌টুডেট্‌, chic, dernier cri, লেটেস্ট মডেলের হাইয়ার এডুকেশন পেতুম; আপনি, আমি আমরা নিদেন যদি অধ্যাপক হতুম, তারো নিদেন যদি আমরা তাঁদের শিষ্য হবার সুযোগ পেতুম, তবে তো আজ এ প্রশ্ন তুলতুম না। কিন্তু এহ বাহ্য।

'বুঝতে পারি নে' কথাটার অর্থ কি? আপনি ভৈরবী বা পূরবী শুনে যদি রস না পান তবে কি গায়ককে এ প্রশ্ন শুধান, 'ভৈরবীর অর্থ আমায় বুঝিয়ে দাও?' আরো সহজ দৃষ্টান্ত দি। পদ্মাবক্ষে আপনি সূর্যোদয় দেখে মুগ্ধ হলেন, মাঝি হলো না। সে যদি আপনার তন্ময় ভাব দেখে শুধোয়, 'কত্তা', সূর্যযি তো উঠলেন, কিন্তু আপনি এমন বে-এক্তেয়ার হলেন কেন? এ সূর্যযি ওঠাতে কি আছে আমাকে বুঝিয়ে দেন', তাহলে আপনি কি বোঝাবেন? তাজমহল দেখে হাক্‌স্‌লি মুগ্ধ হন নি, কিন্তু তিনি তো গাইডকে এ প্রশ্ন শুধোন নি, 'তাজমহলের অর্থ আমায় বুঝিয়ে বলো'। কিংবা ভরতনাট্যম দেখে আপনি যদি 'অর্থ' বুঝতে চান, তবে হয়তো অভিনয়াংশের অর্থ আপনাকে বোঝানো যাবে কিন্তু বিশুদ্ধ নাট্যরসের (যেমন যন্ত্রসঙ্গীতের) 'অর্থ'-ই বা কি, আর বোঝাবেই বা কে? চিত্রে একদা লোকে কোনো বস্তুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য দেখে কিছুটা অর্থ পেত কিন্তু এখন ক্যুবিজম্‌, দাদাইজমে কেউ সাদৃশ্য খোঁজে না, অর্থও খোঁজে না। কাঠের একটা গুঁড়ি নিয়ে বিখ্যাত ভাস্কর ছ'মাস ধরে প্রাণপণ খাটলেন; প্রদর্শনীর মধ্যকক্ষে সেটি স্থাপিত করে তলায় নাম লিখলেন, কাঠের একটা গুঁড়ি। কাঠের গুঁড়ি, কাঠের গুঁড়ি; ভৈরবী, ভৈরবী। তার আবার অর্থ কি?

মনে হচ্ছে আপনি তন্ত্রের কিছুই জানেন না। তন্ত্রের নিগূঢ়তম মন্ত্রের অর্থ শোধান না গুরুকে? যদি তিনি প্রকৃত গুরু হন তবে আপনার হাড় ক'খানা আর আস্ত থাকবে না। আর অত গভীরে যাবার কি প্রয়োজন? এই যে পৃথিবীর কোটি কোটি নর-নারী উপাসনা করে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়, তার ক'টা ভাষা লোকে বোঝে? আপনি উত্তরে হয়তো বলবেন, আমরা রস নিয়ে বিচার করছি। তা হলে স্মরণে আনুন, সেই বুড়ি—দাড়িওয়ালা কথকঠাকুরের কথকতা শুনে হাউ-হাউ করে কেঁদেছিল—কথকতার এক বর্ণ না বুঝেও। তার স্মরণে কি এসেছিল সেটা অবান্তর। তার কান্নাটা সত্য। তার রসবোধটা সত্য।

অলঙ্কার-শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তলিয়ে দেখুন, অর্থ বোঝা মাত্রই রসোৎপন্ন হয় না—অর্থ পেরিয়ে যে ব্যঞ্জনা যে ধ্বনি যে অনির্বচনীয়তার সৃষ্টি হয়, রস সেই গভীর গুহায়। উপনিষদে আছে সত্য (এবং সত্যই অনুভূতির ক্ষেত্রে রস—

কারণ সৎ আনন্দ এবং চিৎ নিয়ে সচ্চিদানন্দ) আছেন সোনার পাত্রে লুকানো। সাধারণ জন সোনার পাত্র দেখেই মুগ্ধ, ভিতরে তাকিয়ে দেখে না। কাব্যে, সঙ্গীতে সর্বত্রই অর্থ জিনিসটা সুবর্ণপাত্র, তাই দেখে লোক মুগ্ধ। রস কিন্তু ভিতরে। তার সঙ্গে পাত্রের কি সম্পর্ক? পাত্রস্থিত অমৃতরসের সঙ্গে যে ধাতু (অর্থ) দিয়ে পাত্র নির্মিত হয়েছে তার কি সম্পর্ক? কিছুই না। তাই, এ সব বুঝেই কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গেয়েছিলেন,

'জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না **অর্থ**।'

মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা পণ্ডিতের নিদ্রা শ্রেয়ঃ

আমাকে অনেকেই প্রশ্ন শুধান, হিন্দু, ধর্ম, হিন্দু শাস্ত্র নিয়ে যে অফুরন্ত কাহিনী কিংবদন্তী আছে—যেরকম যমদূত একবার ভুল করে মৃত্যুর নির্ধারিত দিবসের পূর্বে এক নায়েবকে নরকে নিয়ে যাওয়ার ফলে কি রকম তুমুলকাণ্ড ঘটেছিল—মুসলমানদের ভিতরও তেমনি আছে কি না। আছে, কিন্তু সেগুলো প্রধানত লোকশিক্ষার জন্য এবং অনেকগুলোতেই প্রচুর হাস্যরসও আছে। এসব গল্পের প্রাচুর্য ইরানেই বেশী, এবং তুর্কীতে খুবই কম। তুর্কীরা নাকি বড্ড বেশী সিরিয়াস। অতএব গোড়া। অতএব রসকষহীন।

আমার একটি গল্প মনে পড়ল এবং সেটা সকলেরই কৌতূহল জাগাবে। কারণ কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইহুদি, কি খৃষ্টান—সকলেই জানতে চায় মহাপ্রলয় (আরবীতে কিয়ামৎ) কবে আসবে? সর্ব ধর্মের শাস্ত্র-গ্রন্থেই তার কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে, কিন্তু পাকাপাকি কোনো-কিছু জানার উপায় নেই। একদা নাকি খৃষ্টানদের বিশ্বাস ছিল, খৃষ্টজন্মের ১০০০ বৎসর পূর্ণ হলে মহাপ্রলয় আসবে শুনতে পাই, অনেক লোকেই নাকি তার কিছুদিন পূর্বে সর্বস্ব বিক্রয় করে দান-খয়রাতে উড়িয়ে দেয়।

১০০০ খৃষ্টাব্দ পূর্ণ হওয়ার দিনে শেষটায় যখন মহাপ্রলয় হল না তখন এরা পস্তিয়ে ছিলেন কি না জানি নে, তবে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হওয়া ভালো। এখন ১৯৬৬। যদি রটে যে, ২০০০-এ মহাপ্রলয়, তবে এখন যারা যুবা এবং বালক তারা যেন ঐ সময়টায় একটু ভেবেচিন্তে দান-খয়রাৎ করেন।

মহাপ্রলয় কবে আসবে, সে সম্বন্ধে আরবদের ভিতর একটি কাহিনী প্রচলিত আছে।

আল্লা-পাক নাকি একদিন প্রধান ফিরিশ্‌তা (বাঙলায় ফেরেস্তা লেখা হয়; অর্থ এঞ্জেল, দেবদূত) জিব্রাইলকে (ইংরিজিতে গেব্রিয়েল) ডেকে আদেশ দেবেন, যাও তো, মানুষের ছদ্মবেশ ধরে পৃথিবীতে। যে কোনো একজন মানুষকে শুধোও, জিব্রাইল এই মুহূর্তে কোথায় আছেন? জিব্রাইল পৃথিবীতে নেমে একজন মর্ত্যবাসীকে সেই প্রশ্ন শুধোলেন। লোকটা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে বললো 'এরকম বেফায়দা প্রশ্ন করে লাভটা তোমার কি? আমার এসব জিনিসে কোনো কৌতূহল নেই, তবে যখন নিতান্তই শুধোলে তবে—দাঁড়াও, বলছি।' লোকটি দুই লহমা চিন্তা করে বলল, 'হুঁ, ঠিক বলতে পারবো না—তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, সে (আরবীতে ইংরিজীর মত he-র সম্মানার্থে কোনো 'তিনি' শব্দ নেই এখন পৃথিবীতে। বেহেশ্‌তে নয়।' জিব্রাইল স্বর্গে ফিরে আল্লাকে উত্তরটা জানালে তিনি বলবেন, 'ঠিক আছে।' তার পর কেটে যাবে আরো বহু সহস্র বৎসর। তার পর আবার আল্লা-পাক ঐ একই প্রশ্ন একই ভাবে শুধোবার জন্য জিব্রাইলকে পৃথিবীতে পাঠাবেন। এবারে যে মর্ত্যবাসীকে শুধোনো হল, সে বিরক্ত হল আরো বেশী। বললে, 'কি আশ্চর্য! এখনো মানুষ এরকম সম্পূর্ণ বাজে বেকার প্রশ্ন করে! হিসেব কষলে যে এরকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না তা নয়, তবে দেখো, এসব ব্যাপারে আমার কোন উৎসাহ নেই। আচ্ছা…' এক সেকেণ্ড চিন্তা করে লোকটা বললে, 'স্বর্গে তো নয়, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে…', ফের দু'সেকেণ্ড চিন্তা করে বললে, 'পৃথিবীতেই যখন, দাঁড়াও, হাঁ, কাছেপিঠেই কোথাও—আমি চললুম।' জিব্রাইল বেহেশ্‌তে ফিরে এসে আল্লাকে সব কিছু বয়ান করলেন। আল্লা বললেন, 'ঠিক আছে।' তার পর কেটে যাবে আরো কয়েক হাজার কিংবা কয়েক লক্ষ বৎসর। আবার জিব্রাইল সেই হুকুম নিয়ে ধরাভূমিতে আসবেন। এবার যাকে শুধালেন সে তো রীতিমত চটে গেল—'এসব বাজে বাজে প্রশ্ন…ইত্যাদি।' জিব্রাইল বেশ কিছুটা কাকুতি-মিনতি করাতে সে নরম হয়ে বললো, 'তাহলে দেখি! হুঁঃ, স্বর্গ নয়, পৃথিবীতে।' তারপর আরেক সেকেণ্ড চিন্তা করে বললে, 'কাছে-পিঠে কোথাও।' তারপর আরো দু'সেকেণ্ড চিন্তা করে তাজ্জব মেনে বলবে, 'কী আশ্চর্য, যে এরকম মস্করা করো। তুমিই তো জিব্রাইল—তবে শুধাচ্ছো কেন?' এবারে জিব্রাইল সব খবর দিলে আল্লা-পাক হুকুম দেবেন মহাপ্রলয়ের শিঙা বাজাতে।

কথিকাটির তাৎপর্য কি?

প্রথমত, মানুষ তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে করে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে যে স্বর্গের খবর পর্যন্ত তার কাছে আর অজানা থাকবে না।

দ্বিতীয়ত, কিন্তু, তার তাবৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান বিদ্যাচর্চার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে সাংসারিক, বৈষয়িক, প্র্যাকটিকাল জিনিস নিয়ে।[১] ইহলোক ভিন্ন পরলোক, পাপপুণ্যের বিচার, সে স্বর্গে যাবে না নরকে জলে পুড়ে খাক হবে—এ সম্বন্ধে তার কোনো কৌতূহল থাকবে না, কারণ স্বয়ং জিব্রাইলকে হাতের কাছে পেয়েও সে এসবের কোনো অনুসন্ধান করলো না। এমন কি সৃষ্টিকর্তা আল্লা— দীন দুনিয়ার মালিক—যাঁকে পাবার জন্য কোটি কোটি বৎসর ধরে শত শত কোটি মর্ত্যের মানুষ স্বর্গের দেবদূত আমৃত্যু দেবদুর্লভ সাধনা করেছে, তাঁর প্রতিও সে উদাসীন।

তৃতীয়ত, যেহেতু সে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন অতএব কল্পনা করা কঠিন নয় যে, সে তখন বিশ্বভুবন তার খেয়াল-খুশী মর্জি মাফিক নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টায় লেগে যাবে। তারই ফলে হয়তো বেরুবে শত শত আইষমান কোটি কোটি ঈশ্বরসৃষ্ট জীবকে বিনাশ করতে।

* * *

ভরসা হচ্ছে, বিশ্ববিবর্তনে যদ্যপি সেই চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি, অর্থাৎ মানুষ ক্রমেই সত্যসুন্দরের অল্-হক্ অল্-জমীল) সাধনার পথ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে তবু এখনে বোধ হয় পরিপূর্ণ জড়বাদে পৌছতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। পক্ষান্তরে ইসলাম একথাও বলেন, কিয়ামৎ যে-কোনো মুহূর্তে আসতে পারে। তার অর্থ, মানুষ হয়তো হঠাৎ এক লম্ফে পরিপূর্ণ জড়বাদে পৌছে যেতে পারে।

পয়গম্বর বলেছেন, "আল্লার থেকে মানুষকে দূরে নিয়ে যায় শয়তান।" সেই শয়তান জড়বাদের প্রতিভূ এবং প্রতীক। অতএব প্রত্যেক সত্য-জ্ঞানান্বেষীর প্রধান কর্তব্য জড়বাদ অর্থাৎ শয়তানের কীর্তিকলাপ কি প্রকারে বাহ্যজগতে স্বপ্রকাশ হয় সে সম্বন্ধে সচেতন থাকা—তথা শয়তান প্রলোভন নিয়ে উপস্থিত হলে আত্মহারা না হয়ে জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা তার স্বরূপ চিনতে পারা। শুদ্ধমাত্র আচার-

---

১ ইমাম গজ্জালী মুসলিম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ—কেউ কেউ বলেন সর্বশ্রেষ্ঠ —মনীষী। তিনি একাধারে দার্শনিক, শাস্ত্রী ও সুফী (রহস্যবাদী ভক্ত) ছিলেন। আরব্যোপন্যাস যুগের বিখ্যাত বাগদাদ নগরীর বিশ্ববিদ্যালয় সে যুগের মধ্যপ্রাচ্যের সর্বোত্তম জ্ঞানকেন্দ্র ছিল। ইমাম গজ্জালী তার রেক্টর (শেখ) ছিলেন। অধুনা তাঁর একখানা বইয়ে দেখি, তিনি মনস্তাপ করছেন যে, তাঁর কালের (মৃত্যু ১১১১ খৃষ্টাব্দে) লোক শুধু প্র্যাকটিক্যাল বিদ্যা শেখে। আমি ভরসা পেলুম।

অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে সরল জীবন যাপনই যথেষ্ট নয়; জ্ঞানানুসন্ধান নিত্য-প্রয়োজনীয় অবশ্যকর্তব্য। এই মর্মে আরেকটি কাহিনী আছে :—

একদা শয়তানের রাজা, ধাড়ি শয়তান এক বাচ্চা শয়তানকে তালিম দিচ্ছিল, সৎপথগামীদের কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে বিপথগামী করা যায়। ধাড়ি শয়তান অতিশয় ধুরন্ধর গুরু এবং বিশ্বপর্যটক (জাহানদীদা) রূপে অপর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সম্যক অবগত আছে, কোন্ প্রকারের মানুষ কোন্ পদ্ধতিতে চলে, কাকে সমঝে চলতে হয়, আর কেই বা অগা আহাম্মুখ। ঐ অনুচ্ছেদে এসে ধাড়ি বললে, 'কিন্তু বৎস, হুঁশিয়ার। আচারনিষ্ঠ সাধুজনকে বরঞ্চ আমাদের পথে (মানবীয় ভাষায় কুপথে) নিয়ে যাবার চেষ্টা করো কিন্তু জ্ঞানী পণ্ডিতকে সমঝে-বুঝে চলো। ওরা বড়ই ভীষণ প্রাণী। সৃষ্টির আদিম কাল থেকে ওরাই আমাদের আদিম দুশমন।'

শাগরেদ ক্ষুদে শয়তান আশ্চর্য হয়ে বললে, 'সে কি কথা! আচারনিষ্ঠ জন তো সদাই জপতপ নিয়ে ব্যস্ত থাকে; আমার কথা ভাববার তার ফুরসৎ কই? আর পণ্ডিতদের কথা যখন বললেনই, প্রভু, তবে নিবেদন করি, আজকের দিনে তাদের অবস্থাটা একটু পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখুন। খেতে পায় না, পরতে পায় না আর আকাট-মুর্খ নিষ্কর্মারা বড় বড় চাকরির পদবী নিয়ে ওদের মাথায় ডাণ্ডা বোলায়। নিজে মেস্টার, ওদিকে ছেলেটাকে কলেজে পাঠাতে পারে না। এসব হাভাতেদের লোভ দেখিয়ে পথ ভোলাতে কতক্ষণ?'

ধেড়ে হেসে বললে, 'খুব তো মুখে মুখে হাই-জাম্প লঙ-জাম্প দেখালি। কাজের বেলা কি হয় সেটা বোঝা যাবে পরশু দিন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে।'

পরশু দিনের দিন প্র্যাকটিক্যাল। সে বড় কঠিন তালিম। তাবৎ হপ্তার এলেম হাতেনাতে বাৎলাতে হয়। আমাদের ইস্টুডেন্টরা টুকলি-নকল করলে আমরা যে রকম সেটাকে 'শয়তানী' নাম দিয়ে চোটপাট করি, এখানে তেমনি সাধু সরল পন্থায় কম উদ্ধার করতে গেলে সেটাকে 'সাধুমী' বলে গুরু কান মলে দেয় শিষ্যের।'

ধেড়ে আদেশ দিলেন, 'ঐ যে হোথা একটি সরল সাধু জপ করছে ওকে আমাদের পথে নিয়ে আসার ডিমন্স্ট্রেশনটি করো তো, বৎস।'

বাচ্চা শয়তান প্রমাদ গুনলো। এই সৌম্যদর্শন, কৃচ্ছ্রসাধনজনিতপাণ্ডুর তথাপি মধুরবদন সাধুকে ধর্মপথ থেকে বিচলিত করা কি তার মত চ্যাংড়া শাগরেদের কর্ম! না জানি, আজ কপালে কি আছে!

ক্লাসে যে নোট দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো সে দফে দফে স্মরণে আনলো। তার

পরে বিএলজব্‌ব, ইব্‌লিস, ডিয়াবলুস, শয়তান-উস্‌শয়াতীন সবাইকে মনে মনে হাজার হাজার আদাব-বন্দেগী জানিয়ে গেল বেশ ধারণ করতে।

আহা! সে কী চিত্তহারিণী ভূষা! ধেড়ে, আণ্ডা, সব শয়তানকে লড়তে হয় ফিরিশ্‌তা অর্থাৎ দেবদূতদের সঙ্গে—তাই ওঁদের চালচলন বেশভূষা তারা খুব ভালো করেই চেনে। এ যুগে হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করার পূর্বে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কিছু জর্মনদের পরিয়ে দেন পোলিশ সৈন্যের উর্দী। সেই উর্দী পরে তারা 'আক্রমণ' করে একটি জর্মন বেতারকেন্দ্র—পোলিশ-জর্মন সীমান্তে। সেই 'আক্রমণে'র ও 'আক্রমণে নিহত পোলিশ সৈন্যে'র ছবি হিটলার বিশ্বময় প্রকাশ করে সপ্রমাণ করেন যে, পোলরাই প্রথম জর্মনি আক্রমণ করে!

হিটলার, হিমলার, আইখমান, হোস এঁরা তো খাস শয়তানের তুলনায় শিশু।[২] ছদ্মবেশ ধারণে এনারা এমন আর কি 'কৈশল' দেখাবেন!

বাচ্চা শয়তান ধারণ করলো দেবদূত—ফিরিশ্‌তার বেশ।

অঙ্গ থেকে বেরুচ্ছে দিব্যজ্যোতি এবং নন্দনকাননমন্দারসৌরভ; তার প্রতি পদক্ষেপে ঝংকৃত হচ্ছে অপ্সরাবিনিন্দিত সঙ্গীত-নিক্কণ—সঙ্গে এসেছে বসন্তপবনের মৃদু হিল্লোল মলয়ানিল বিলোলানন্দোল্লাস!

বাচ্চা শয়তান সম্মুখীন হল সাধুর। বললে, 'তোমার তপশ্চর্যায় পরিতুষ্ট হয়ে আল্লা-তালা আমাকে পাঠিয়েছেন তোমাকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য। তুমি আমার স্কন্ধে আরোহণ করো।'

বলা মাত্রই সে বুরাকের বেশ ধারণ করলো।

বুরাক্‌ অনেকটা পক্ষীরাজের মত। সর্বাঙ্গ অত্যুত্তম অশ্বন্যায় এবং উভয় স্কন্ধে দুটি পক্ষ।[৩]

২ অনেকে মনে করেন এ-অধম নাৎসি দলের নির্ভেজাল দুশমন। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি, যুদ্ধের গোড়ার দিকে হিটলার যে ইংরেজকে বেধড়ক চড় কষায় সেটা এ অধমের চিত্তে সাতিশয় বিমলানন্দ দিয়েছিল। আমার মতে হিটলারের সব চেয়ে মারাত্মক ভুল হয়, তিনি ফ্রান্সের পতনের পর যখন ইংলণ্ড আক্রমণ করলেন না। না হয় তিনি নিলক্ষকাম হতেন। তাতেই বা কি! মহৎ কর্ম করতে গিয়ে নিষ্ফল হওয়া অপকর্মে (রুশ আক্রমণ) সফল হওয়ার চেয়ে শ্রেয়ঃ!

৩ মুসলমানী ও পার্সী রেস্তোরাঁতে নাত্যুন্নাসিক হিন্দু পাঠকও এই ছবি দেখে থাকবেন। পয়গম্বর হজরৎ মুহম্মদ সাহেব এই বুরাকে চড়েই সৃষ্টিকর্তা সন্নিধানে যান। বিরুদ্ধ পক্ষ বলেন, তিনি সশরীরে যান নি; তাঁর রূহ, অর্থাৎ আত্মা

কিন্তু বাচ্চা শয়তান ক্লাসের থিয়োরেটিকাল সর্ব আদেশ মেনে চলতে চলতে ভয়ে বেপথু-কম্প্রমান, এই সামান্য ফাঁদটা সাধু না ধরে ফেলেন!

কিন্তু ধেড়ে শয়তান দূর থেকে নিশ্চিন্ত মনে সব-কিছু দেখছে। সে বিলক্ষণ জানে, এসব আচারনিষ্ঠ জন বড় দম্ভী হয়। এরা ভাবে, সংসারের সর্বভোগ যখন ত্যাগ করেছি, তখন আর স্বর্গের সর্বসুখ আমি পাবো না কেন?

এই দম্ভই তাঁদের সর্বনাশ আনে, সে তত্ত্ব শয়তান দেখেছে, যুগ যুগ ধরে।[৪]

তপস্বী সাধু ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে চেপে বসলেন সেই ভেজাল বুরাকের স্কন্ধে।

তারপর কি হল, সেটা বর্ণনা করতে আমার বাধে। কারণ সেটাতে আছে বীভৎস রস। সংক্ষেপে বলি, সাধুর যখন জ্ঞান হল তখন তিনি বিষ্ঠাকুণ্ডে। বাচ্চা শয়তান একবার তাঁকে কাঁধে পেয়ে পেয়েছে বাগে। ক্লাসের নোট-মাফিক তাঁকে সর্বযন্ত্রণা দিয়ে অজ্ঞানাবস্থায় ফেলে দিয়ে গেল পুরীষ-গহ্বরে।

সুশীল পাঠক! তুমি বলবে, আচারনিষ্ঠ সজ্জনের এই অসদ্‌গতি হল কেন? আমিও গল্পের এই পর্যায়ে কাহিনী কীর্তনিয়া মৌলানাকে ঐ একই প্রশ্ন শুধোই।

তিনি শান্তকণ্ঠে বললেন, 'পুচ্ছাংশ দেখিয়াই সর্বাঙ্গ বিচার করা যায় না। অবহিত চিত্তে সর্বাঙ্গসুন্দর কাহিনীটি প্রণিধান করহ।'

এবারে ধেড়ে শয়তান বাচ্চাকে বললে, 'ঐ যে দেখা যাচ্ছে দূরে এক আলিম। এবারে বাবাজী, সাবধান!

বাচ্চা কিন্তু ভয় পাওয়ার মত কিছুই দেখলো না। পণ্ডিত বটে লোকটি, কিন্তু নামাজ রোজায় যে তাঁর মাঝে মাঝে ত্রুটি হয়ে যায়, সে তো জানা কথা। বইয়ের নেশায় তাঁর কাটে অষ্টপ্রহর। এটাকে বাগে আনতে আর কতক্ষণ?!

গিয়েছিল। অর্থাৎ বুরাক ইত্যাদি রূপকার্থে নিতে হবে।

৪ কবি রবীন্দ্রনাথ কৃচ্ছ্রসাধনে দম্ভ দেখে সর্বত্যাগী ভৈরব-শঙ্করকে উদ্দেশ করে বলছেন—

'আমাকে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্যবিলাসী
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খলখল ওঠে অট্টহাসি
দেখে মোর সাজ।'

সর্বত্যাগী শঙ্কর হিন্দুর উপাস্য। কিন্তু তাঁর সর্বস্ব ত্যাগের অন্ধানুকরণ ও তৎসহ তাই নিয়ে দম্ভ, সেই ত্যাগের luxury, যেমন মূর্খ চেলারা করেন, কবি সেইটে এই কবিতায় বুঝিয়েছেন।

পূর্ববৎ দেবদূত-বেশ ধারণ করে বাচ্চা শয়তান পণ্ডিতের সামনে এসে দাঁড়ালো। পূর্ববৎ তাঁকে স্বর্গে নিয়ে যাবার প্রস্তাব জানালো।

পণ্ডিত তখন রকে বসে বদনা থেকে জল ঢেলে মুখ ধুচ্ছিলেন।

ভুললে চলবে না, ইনি পণ্ডিত। সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার প্রস্তাব শুনেই তাঁর চড়াকসে মনে পড়ে গেল ইতিপূর্বে কে কে আল্লার সমীপবর্তী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মুসা (Moses), ঈসা (যীশু), হজরৎ পয়গম্বর—ব্যস্।

তাই পণ্ডিত উত্তমরূপেই জানতেন, তিনি এমন কিছু পুণ্যশীল মহাপুরুষ 'প্যাকম্বর' নন যে আল্লা তাঁকে স্বর্গে যাবার জন্য ডেকে পাঠাবেন।

'বটে রে, ব্যাটা!' মনে মনে বললেন পণ্ডিত। 'মস্করা করার জায়গা পাও না! আজ তোমারই একদিন, আর আমারই একদিন।'

সুহাস্য-আস্যে মৌলবী বললেন, 'কী আনন্দ, কী আনন্দ! স্বর্গে যাবার জন্য তো আমি হামেহাল তৈরি। কিন্তু, ভদ্র, এ যুগে বড় ভেজাল চলছে। কি করে জানবো, তুমি সত্যই দেবদূত। শুনেছি দেবদূতেরা মুআজিজা কেরামৎ (miracle) দেখাতে পারেন। তুমি কিছু একটা দেখাতে পারলেই আমি তোমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত।'

বাচ্চা শয়তান বলল, 'আপনি কি মিরাকল্ দেখতে চান, বলুন।' তার মনে বড় আনন্দ, অর্ধেক কেল্লা ফতেহ্ করে ফেলেছে!

পণ্ডিত বললেন, 'শুনেছি, দেবদূত অনায়াসে ক্ষুদ্র, বৃহৎ, সব আকার গ্রহণ করতে পারেন। তুমি পারো?'

'নিশ্চয়!'

'তাহলে তুমি ক্ষীণ কলেবর গ্রহণ করে আমার এই বদনার নালি দিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারো?'

বাচ্চা শয়তান উল্লাসে মনে মনে নৃত্য করছে, পণ্ডিত এর চেয়ে অন্য কঠিন কর্ম করতে ইচ্ছা জানান নি বলে। তাকে তো অনায়াসে তিনি আরবীস্তানের বিরাট মরুভূমি, কিংবা ইউফ্রাতেস নদী, কিংবা আকাশের সূর্য বা দিবাভাগে পূর্ণচন্দ্র হতে বলতে পারতেন।

পাছে তিনি মত পরিবর্তন করে ফেলেন, তাই সে তন্মুহূর্তেই পণ্ডিতের বদনার নালির ভিতর দিয়ে ঢুকে পড়লো।

যেই না ঢোকা, পণ্ডিতের আর কোনো সন্দেহ রইল না ব্যাটা বদমাশ। তিনি ভালো করেই জানেন, আল্লার আপন দূত একটা বদনাতে ঢুকতে যান না। তিনি বহুবিধ শাস্ত্র পড়েছেন, তাতে এমন মিরাকল্, কেরামতের উল্লেখ নেই।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাশের পিঁড়িটা বদনার উপর চেপে তার উপর আরো ভালো করে চেপে নিজে বসে পড়লেন এবং বদনার নালিতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন একটা খেজুর। বেশ মোলায়েম ফল; টায়ে টায়ে বদনায় সেঁটে যায়।

এবং চিৎকার :—

'গিন্নী, গিন্নী! নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি উনুনটা। ব্যাটাকে আজ সেদ্ধ করে হালুয়া বানাবো। ব্যাটা আমার সঙ্গে মস্করা করতে এসেছে! শা—, হা—জা—, বা—,[৫]

হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড! বুড়ো শয়তান দূর থেকেই বুঝেছে বেপারটা সঙ্গীন।

সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত-মৌলবীর পায়ে এসে পড়লো।

বাচ্চাটাকে বাঁচাবার জন্য সন্ধি-আপোস করতে চায়।

সন্ধির শর্ত হল, শয়তান এবং তস্য গোষ্ঠী ঐ মৌলবী-পণ্ডিত গোষ্ঠীর কাউকে প্রলোভিত করতে পারবে না।

* *

প্রথম গল্পের সঙ্গে এ গল্পের কি সম্পর্ক?

যতক্ষণ অবধি পণ্ডিত-মৌলবী-মৌলানা-রাব্বী-ফাদার-দস্তুর শুদ্ধমাত্র প্র্যাকটিকাল বিষয়ে মত্ত হবেন না, ততদিন মহাপ্রলয় আসবে না।

* *

কিন্তু পাঠক, তোমার মস্তিষ্কে, হৃদয়ে যে প্রশ্ন আমারো তাই। কী দরকার সেই মহা-মহাপ্রলয় ঠেকিয়ে? যেখানে পৌঁচেছি, চাল নেই, তেল নেই, মাছ নেই—

২।১০।৬৫

৫ পণ্ডিত মাত্রই কি ভারত, কি আরব সর্বত্র আমাদের আজকের দিনের বিচারে বড় অশ্লীল গালাগাল দেন। 'তোমার সঙ্গে আলোচনা বন্ধ্যাগমন' আমাকে একাধিক পণ্ডিত বলেছেন। আমি তখন শান্তিপুরে নব্যন্যায় শিক্ষার 'বন্ধ্যাগমন' করছি। দোষ আমারই, তাঁদের নয়। কাইরোতেও একই অবস্থা।

আলবের্ট শ্বোয়াইৎসার্

"আজিকে একেলা বসি শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে,
মৃত্যুতরঙ্গিণীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই,—আজি বাধা কি গো ঘুচিল চোখের
সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দনলোকের
আলোকে সম্মুখে তব,—উদয়শৈলের তলে আজি
নবসূর্য বন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নবছন্দে, নূতন আনন্দগানে ?"

এই কবিতাটি রচিত হবার পর প্রায় চল্লিশ বৎসর কেটে গিয়েছে। আমার চেনা-অচেনা অনেক প্রখ্যাত পুণ্যশ্লোক জন ইহলোক ত্যাগ করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এ প্রশ্নটি তাঁদের উদ্দেশে শুধাই নি। হয়তো ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু আজ আর এ প্রশ্ন না শুধিয়ে থাকা গেল না।

কারণ এই মহাপুরুষ জীবনে সত্য সুন্দর শিবের যে সাধনা করেছিলেন সেটা সর্বযুগেই বিরল। এবং তার চেয়েও আশ্চর্য, তিনি একই পথে আজীবন সাধনা করেন নি।

আল্‌সেসের কাইজারবের্ক অঞ্চলে ১৪ই জানুয়ারী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এঁর জন্ম।[১] সে অঞ্চল তখন জর্মন ছিল বলে তিনি জর্মন। ধর্মতত্ত্ব (প্রটেস্টান্ট বা এভানজেলিক) পড়ে তিনি চব্বিশ বছর সহপাদ্ররূপে ঈশ্বর-মানুষ-গির্জার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। কিন্তু বছর তিন যেতে না যেতেই খৃষ্টধর্মের মূলতত্ত্ব নিয়ে তাঁর মনে যে-সব প্রশ্নের উদয় হয় সেগুলো নিয়ে চিন্তা, গবেষণা ও সাধনা গির্জার সেবায় নিযুক্ত থেকে হয় না। তাই তিনি বিখ্যাত স্ট্রাসবুর্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হয়ে কাজে যোগ দেন। এই অল্প বয়সেই তিনি যে গবেষণা করেন সেটা খৃষ্টধর্মের ইতিহাসবিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবং সে গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য পাণ্ডিত্য সঞ্চয় বা পাণ্ডিত্য প্রকাশ আদৌ নয়। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কি প্রকারে খৃষ্টের বাণী ও তৎপরবর্তী খৃষ্টধর্মের প্রথম উৎপত্তিযুগের এমন একটি অর্থপূর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর ছবি পাওয়া যায় যেটা আজও এবং আবার নূতন করে খৃষ্টসমাজে নূতন প্রাণ, নূতন ভক্তি, চরিত্রসংগঠন ও সমাজবাস করার জন্য নূতন নীতি নির্মাণ করে দেবে।

এদেশে রামমোহন তাই করেছিলেন। অর্থাৎ উপনিষদের স্বর্ণযুগ পুনরায়

আলোকিত করতে চেয়েছিলেন।

সউদী আরবের রাজা ইব্‌ন্ সউদ যে-সম্প্রদায়ভুক্ত তার প্রতিষ্ঠাতা ওয়াহ্‌-হাবও তাই করেছিলেন।

শ্বোয়াইৎসার্ এই সব তত্ত্বচিন্তায় ধ্যানধারণায় নিযুক্তকালীন প্রচুর সময় ব্যয় করেন সঙ্গীতস্রষ্টা য়োহান্ সেবাস্টিয়ান্ বাখ্-এর উপর। এখানেও সেই নবাবিষ্কারের কথা। এটা সত্য যে, বহু বৎসর দু-চারিটি কেন্দ্র ভিন্ন অন্য সর্বত্র বাখ্ অনাদরে থাকার পর সঙ্গীতস্রষ্টা মেণ্ডেলজোন্ পুনরায় রসিকজনের দৃষ্টি বাখ-এর দিকে আকৃষ্ট করেন। এর পরেই বাখ-এর অন্যতম প্রধান ভাষ্যকার শ্বোয়াইৎসার্। গির্জার অর্গেনসঙ্গীত তাঁরই প্রচেষ্টা ও প্রচারের ফলে পুনরায় নবজীবন লাভ করে। (অর্গেন ও অর্গেল এদেশের সঙ্গীতকে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচুর প্রভাবান্বিত করে। এই নিয়েই কিঞ্চিৎ গবেষণা কিছুদিন পূর্বে এদেশে হয়। তার অন্যতম প্রশ্ন তখন ছিল, অর্গেনকে কেটে হারমোনিয়ামরূপে প্রবর্তিত করে কে জনপ্রিয় হন কি করে, এর প্রতি আকাশবাণীর এত রাগ কেন, যদিও খান আবদুল করীম খানের মত মহাপুরুষ যখন এরই সঙ্গতে গেয়েছেন? এ নিয়ে আরো আলোচনা হলে ভাল হয়। আবার কৃতজ্ঞচিত্তে শার্ঙ্গদেবের শরণ নিচ্ছি। এবং এর সঙ্গে আরেকটি নিবেদন, ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয়কামী নবীন ভারতীয় শাগরেদকে একাধিক ইয়োরোপীয় বাখ্ নিয়ে আরম্ভ করতে বলেন। বাখ-এর রস পাওয়া আমাদের পক্ষে সহজতর। এ বিষয় নিয়েও তুলনাত্মক সঙ্গীত-মহলে আলোচনা হওয়া উচিত।) এমন কি বলা হয় শ্বোয়াইৎসার্ স্বহস্তে উত্তম অর্গেনও নির্মাণ করতে শেখেন।

উপরের দুটি সাধনা—খৃষ্টের জীবনানুসন্ধান ও বাখ্—ভিন্ন তাঁর প্রধান অনুসন্ধান ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, রাষ্ট্রচালনায়, ধর্মনীতিকে পুনরায় দৃঢ় ভূমিতে স্থাপন করা।

* *

সাধনা, অধ্যয়ন, ধ্যানধারণা, বাখ-এর ভগবদ্‌সঙ্গীত এ সমস্ত নিয়ে যখন শ্বোয়াইৎসার্ তন্ময়, যখন তাঁর খ্যাতি জর্মনির বাইরে বহুদূরে চলে গিয়েছে, তখন এই মহাত্মা হঠাৎ একদিন ত্রিশ বৎসর বয়সে, অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে ভর্তি হলেন মেডিকেল কলেজে। কারণটি সরল অথচ সুদূরে নিহিত।

ফরাসী-কঙ্গ অঞ্চলে যে-সব অনাচার হয়ে গিয়েছে তার খেসারতি মেরামতি করতে হবে। কঙ্গর গভীরতম জঙ্গলে যে শত শত আফ্রিকাবাসী কুষ্ঠরোগে দিন দিন ক্ষয় হচ্ছে তাদের সেবা করতে হবে।

তার পূর্বে কিন্তু তা হলে তো চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হয়। ঠিক সেই জিনিসটিই সমাধান করে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মিশনারি ডাক্তাররূপে তিনি ফরাসী-কঙ্গর দুর্গম অরণ্যের লাঁবারেনে-অঞ্চলে গিয়ে কুষ্ঠরোগীদের জন্য হাসপাতাল খুললেন। তাঁর স্ত্রী দেশে নার্সের ট্রেনিং নিয়ে সেখানে সেবিকার কাজ গ্রহণ করলেন।

কিন্তু এই কঙ্গবাসী কুষ্ঠরোগীদের অর্থসামর্থ্য কোথায়? শ্বোয়াইৎসার্ আবার সর্বশ্রেষ্ঠ ওষধি, সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি, সর্বোত্তম সহকর্মী নিয়ে চিকিৎসা করতে যান! তার জন্য অর্থ কোথায়?

এর পরের ইতিহাস দীর্ঘ। তাতে আছে আদর্শবাদ, নৈরাশ্য, অকস্মাৎ অযাচিত দান এবং সর্বোপরি শ্বোয়াইৎসারের অকুণ্ঠ বিশ্বাস: "মানুষের জীবন বিধিদত্ত রহস্যাবৃত—এর প্রতি প্রত্যেকটি মানুষের ভক্তি বিস্ময় ভয় থাকা উচিত।" এই অটল বিশ্বাস নিয়ে তিনি কিছুদিন পর পর সেই দুর্গম জঙ্গল অতিক্রম করে, ইয়োরোপে এসে অত্যুৎকৃষ্ট স্বরচিত আপন অভিজ্ঞতাপূর্ণ (বিশেষ করে অন্ধকার-কঙ্গর) পুস্তক প্রকাশ করে. প্রাচীন দিনের বাখ-এর সঙ্গীত বাজিয়ে অর্থোপার্জন করতেন। প্রথম যুদ্ধের সময় তাঁর কাজে বাধা পড়ে; কারণ তিনি জাতে জর্মন হয়েও বাস করছেন ফরাসী কলনিতে—কিন্তু সেটা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি এতই ভুবনবিখ্যাত যে দুই যুযুধান সৈন্যদলই তাঁর হাসপাতালকে এড়িয়ে বাঁচিয়ে যুদ্ধ করে।

কিন্তু ১৯১৩ থেকে ১৯১৫—এই দীর্ঘ বাহান্ন বৎসরের একনিষ্ঠ সাধনা তো ক্ষুদ্র একটি প্রবন্ধে শেষ করা যায় না। যদি কখনো সে সাধনার সিকি পরিমাণ খবরাখবর সংগ্রহ করতে পারি তবে পুনরায় চেষ্টা নেব।[২]

মরহুম ওস্তাদ ফৈয়াজ খান

বিসমিল্লাতেই অতিশয় সবিনয় নিবেদন—আর্জ্ করে রাখি, এ অধম উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মারপ্যাঁচ বিলকুল বোঝে না, ভরত থেকে আরম্ভ করে ধুর্জটিপ্রসাদ ভক্

২ শ্বোয়াইৎসার্ ভারতীয় চিন্তাধারা সম্বন্ধে ১৯৩৫ সালে Die Weltanschauung der indischen Denker নামক একখানা বই লেখেন। এ বই সম্বন্ধেও অনেক-কিছু বলার আছে। আমি বহু বৎসর পূর্বে পড়েছি। সেখানি ফের পেলে কিছু লেখার দুরাশা আছে।

যে সব গুণীজ্ঞানী সঙ্গীতশাস্ত্র নির্মাণ করে গেছেন তাঁদের প্রতি আমার অগাধ ভক্তি, কিন্তু তাঁদের বর্ণিত রাগরাগিণীর পুত্রকন্যা গোষ্ঠীকুটুম কে যে কোন্ মেলে পড়েন, কিছুতেই মনে রাখতে পারি নে। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে মারাত্মক তত্ত্ব, আমি পূর্ণ একটি বছর রেওয়াজ করেও তবলার গভীরে কেন—কানি পর্যন্ত পৌঁছতে না পেরে নিরাশ হয়ে সাধনাটি ছেড়ে দি, অতি দুঃখে অতি অনিচ্ছায়। অবশ্য নিতান্ত সত্যের অপলাপ হবে—তাই এটাও ক্ষীণ কণ্ঠে বলে রাখি, দ্রুতের রেওয়াজ করতে গিয়ে আমার হাতের কড়াতে আর্তরাইটিস হয়।

দ্বিতীয়ত, এ ক্ষুদ্র রচনাটি মজলিস্-রৌশন সমঝদারদের জন্য নয়, নয়, নয়। আমি খান সাহেবকে পেয়েছিলুম মানুষ হিসাবে, বন্ধু হিসাবে। তিনি আমাকে মুগ্ধ করেছিলেন, সম্মোহিত করেছিলেন তাঁর মধুর ব্যক্তিত্ব দিয়ে—যদিও তিনি খুব ভালো করেই জানতেন, আমি তাঁর জয়-জয়ন্তীতে যত না রস পাই, তার চেয়ে বেশী পাই তাঁর কাফি হোলিতে।

তাই দয়া করে মেনে নিন, এ লেখাটি সাধারণ পাঁচজনের জন্য, যারা যুগর্ষি স্রষ্টাদের দৈনন্দিন জীবন, তাঁদের সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান সম্বন্ধে জানতে চায় মাত্র —কারণ তারা আমারই মত সুরকানা, তালকানা হওয়া সত্ত্বেও গান শুনতে ভালোবাসে এবং যেহেতু সঙ্গীতের গভীরে পৌঁছতে পারে না, তাই স্রষ্টাদের জীবনটা, তাঁদের চালচলন, ওঠনবৈঠন নিয়েই সন্তুষ্ট। অশ্বত্থামার সঙ্গে আমাদের তুলনা করুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই।

১৯৩৫ সালে, এই সময়ে, আজ হতে ঠিক ত্রিশ বৎসর আগে এ-অধম বরদা শহরে চাকরি নিয়ে পৌঁছয় এবং স্টেট্ গেস্ট্ হাউসে অতিথিরূপে স্থান পায়। মহারাজা স্বর্গত সয়াজীরাওয়ের সঙ্গে দেখা শেষ হওয়া মাত্রই আমার মনে যে অদম্য বাসনা জাগলো সেটা নিতান্ত স্বাভাবিক।

ওস্তাদের ওস্তাদ রাজানুগ্রহপ্রাপ্ত শ্রীযুত ফৈয়াজ খান বাস করেন এই বরদা শহরেই। তাঁর কণ্ঠসঙ্গীত শুনতে না পেলে এই দুনিয়াতে জন্মালুমই বা কেন, আর এই বরদা শহরে এলুমই বা কেন? তার চেয়ে বাঁ-হাতের তেলোতে জল নিয়ে সেটাতে ডুবে আত্মহত্যা করলেই হয়!

খবর নিয়ে শুনতে পেলুম, তাঁর বাড়িতে রোজ সন্ধ্যায় মহ্‌ফিল-জলসা বসে, আর প্রায় প্রতি সকালে শাগরেদান সহ রেওয়াজ।

ইতিমধ্যে একটি অতিশয় অজানা-অচেনা বঙ্গসন্তানের সঙ্গে আলাপ হল। তার নাম বলবো না, কারণ ছেলেটি এখনো বড় লাজুক। তবে সে যদি চিঠি লিখে আপত্তি না জানায় তবে অন্য সুবাদে তার নাম প্রকাশ করে দেব। উপস্থিত

ধরে নিন, তার নাম পরিতোষ চৌধুরী। ওস্তাদের শিষ্য—অবশ্য ন'সিকে পাকা কথা বলতে হলে, ওস্তাদের বড় ভাইয়ের কাছেই সে রেওয়াজ করে বেশী। কারণ একাধিক সমঝদার আমাকে বলেছেন—আমার টুটি চেপে ধরবেন না! —যে যদিও দাদাটি নিজে সভাস্থলে গাইতেন না, তবু সঙ্গীতশাস্ত্র তিনি জানতেন ওস্তাদ ফৈয়াজের চেয়ে বেশী। তাঁরাই বলেছেন, ওস্তাদ তাই শাগরেদদের কণ্ঠ স্বর সুললিত গম্ভীর মধুর করার ভার নিতেন নিজে—অন্য 'কাজে'র জন্য ভিড়িয়ে দিতেন দাদার কাছে, বিশেষ করে অচলিত, প্রায়-লুপ্ত রাগরাগিণীতে যাদের দিল্‌চসপী- শখ্‌ অত্যধিক।

চৌধুরী তার গুরু খান সাহেবকে কি বলেছিল জানি নে, এক রবিবার সকালে তিনি সশরীরে আমার ডেরায় এসে উপস্থিত! আমি হতভম্ব। কোথায় তাঁকে বসাবো, কী আপ্যায়ন করবো, আমার মাথায় কিছুই খেলছে না। মহারাজ সয়াজীরাও এলেও আমি এতখানি গর্ব এবং নিজেকে এত অসহায় অনুভব করতুম না।

আর ওস্তাদ—বিশ্বাস করবেন না—বার বার শুধু আমার হাত দু'খানা ধরে নিজের বুকে চেপে ধরেন। তিনি আমার চেয়েও বে-এক্তেয়ার! আর বার বার দরবারী (কানাড়া নয়!) কায়দায় আমাকে কুর্নিশ করেন।

বহুদিন ধরে সে বেইমান পাষণ্ডকে খুঁজেছি যে আমায় দুশমনী করে তাঁকে বলেছিল, আমি গুরুঘরের ছেলে এবং মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান কেন্দ্রভূমি কাইরোতে এ্যাসন্‌ মুসলিমশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি যে স্বয়ং মহারাজা আমাকে সেখান থেকে বরদা রাজ্যে নিয়ে এসেছেন!

আমি আদৌ অস্বীকার করছি নে আমি গুরুবংশের ছেলে, এ ভারতে সে রকম শতলক্ষ আছে। কিন্তু তার চেয়ে আমার গুরুতর আপত্তি, আমার ক' পুরুষ পূর্বে কে যে শেষ-গুরু হয়ে গেছেন, সেটাও প্রত্নতত্ত্বের বিষয়। এবং আমার সর্বাপেক্ষা মারাত্মক আপত্তি: কাইরোতে আমি যেটুকু আরবী শিখেছি সেটি আমি আপনাকে ছ' মাসে শিখিয়ে দিতে পারি।

এ বিষয়টা আমি উল্লেখ করলুম কেন? এই যে গানের রাজার রাজা, এই ফৈয়াজ খান কী অদ্ভুত সরল ছিলেন সেটা বোঝাবার জন্য। পরে আমি চিন্তা করে বুঝেছি, তিনি সঙ্গীতের সর্বোচ্চ শিখরে উঠে গিয়েছিলেন বলে সরল বিশ্বাসে ভাবতেন, সয়াজীরাও যখন আমাকে খাতির করেন তখন আমিও নিশ্চয়ই আমার শাস্ত্রের সর্বোচ্চ শিখরে। তাঁর সঙ্গীতজ্ঞানের জন্য তিনি যখন রাজবল্লভ হয়েছেন, তখন আমিও তাই। একই লজিক।

এর পর কতবার আমাদের দেখাশোনা হয়েছে—গানের মজলিস-মহ্‌ফিলের তো কথাই নেই। আমি প্রতিবার তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি, 'দেখুন ওস্তাদ! কত রাজা আসবে যাবে, কত শম্‌স্‌ উল্‌-উলিমা (মহামহোপাধ্যায়) কত পাণ্ডিত্য দেখিয়ে যাবেন—এমন কি এই যে আমাদের বরদার দেওয়ান সাহেব, যাঁর হাম্বাই-তাম্বাইয়ের অন্ত নেই—তিনিও চলে যাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরেক দেওয়ান এসে উপস্থিত হবেন, কিন্তু আপনার মত লোক আবার কবে আসবে কে জানে? আমি বেঁচে থাকলে আরো রাজা দেখব, আরো দেওয়ান দেখব, কিন্তু আপনার মত কাকে পাবো?'

আর কী সুদর্শন পুরুষ ছিলেন তিনি! চেহারা রং গোঁপ সব মিলিয়ে তিনি যেন তাঁরই গানের '(বন্দে) নন্দকুমারম্‌'—শুধু নন্দকুমার ছিলেন শ্যাম, আর ইনি গোরাচাঁদ।

আমাকে শুধোলেন, 'কবে এসে একটু গান—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'তওবা, তওবা! আপনি আসবেন এখানে! আমি যাবো যে কোনো সন্ধ্যায়, আপনার ইজাজৎ পেলেই।'

তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না।

কতবার তিনি সন্ধ্যে সাতটায় এসে ভোর পাঁচটায় উঠেছেন। আমাকে কতবার তিনি বেহেশৎ দেখিয়েছেন। তাঁর ওফাতের (মৃত্যুর) পর আর কেউ দেখায় নি।

বিশ্বাস করবেন না, আমি নন্দকুমার গানটি ভালোবাসি জেনে একদিন তিনি আমাকে—আবার বলছি আমার মত অতি-সাধারণ শ্রোতাকে—পুরো দেড় ঘণ্টা ধরে ঐ গানটি শুনিয়েছিলেন।

কিন্তু কত লিখব! আমার স্মৃতির কত বড় অংশ জুড়ে এখনো তিনি বিরাজ করছেন!

তাই একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করে শেষ করি।

একটি বরদাগত বাঙালী মহিলার অনুরোধে আমার বাড়িতে মহ্‌ফিল বসেছে। ওস্তাদ সেদিন বড় মৌজে।

দুপুরে বরদায় ১১৪ ডিগ্রী গরম পড়েছিল। রাতদুপুরেও অসহ্য গরম, বর্ষা নামতে তখনো দু'মাস বাকি। ওস্তাদ অনেক-কিছু গাওয়ার পর শুধোলেন, 'আদেশ করুন, কি গাইব।' সেই মহিলাটি অনেক চাপাচাপির পর ক্ষীণ কণ্ঠে অনুরোধ জানালেন, 'মেঘমল্লার।'

ওস্তাদ সঙ্গে সঙ্গে গান ধরলেন।

যেন তিনি তাঁর সমস্ত সাধনা, সমস্ত ঘরানা (হয়তো ভুল হল, কারণ 'রঙিলা' ঘরানা মেঘমল্লারের প্রতি কোনো বিশেষ দিল্‌চস্‌পী ধরেন কিনা আমার জানা নেই), সমস্ত সৃজনীশক্তি, বিধিদত্ত গুরুদত্ত সর্বকলাকৌশল সেই সঙ্গীত সম্মোহন ইন্দ্রজালে ঢেলে দিলেন। আমরা নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে যেন সর্ব লোমকূপ দিয়ে সে মাধুরী শোষণ করছি।

এমন সময় বাইরে নামল কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি!

মহ্‌ফিলে হুলস্থুল পড়ে গেল। কে কি ভাবে ওস্তাদকে অভিনন্দন জানিয়েছিল, কে সুদ্ধমাত্র কুমড়ো-গড়াগড়ি দিয়েছিল, কে ওস্তাদের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল মাত্র—এ সবের বর্ণনা দেওয়ার শক্তি আমার নেই। অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা তো শুধু তিনিই দিতে পারেন যাঁর লেখনীতে অলৌকিক শক্তি আছে।

অন্য দিন ওস্তাদ আমাদের অভিনন্দন, প্রশংসাবাদ, মরহাবা যতখানি ঝুঁকে ঝুঁকে সেলাম জানিয়ে গ্রহণ করতেন, আজ তিনি সেরকম করলেন না। দু-একবার সেলাম জানিয়ে গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। আমার একটু আশ্চর্য লাগলো।

অবশ্য তার পরও তিনি গেয়েছিলেন ভোর অবধি।

শেষ ভৈরবী গেয়ে তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এলেন। আমি বললুম, 'ওস্তাদ, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন ; একটু বিশ্রাম নেবার জন্য বসুন।'

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর যে কী বিষণ্ণতা মুখে মেখে আমার দিকে তাকালেন তার অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। করুণ কণ্ঠে বললেন, 'আচ্ছা, সৈয়দ সাহেব, লোকে আমাকে এরকম লজ্জা দেয় কেন বলুন তো? আমি কি গান গেয়ে বৃষ্টি নামাতে পারি?'

আমি ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে বললুম, 'সে জানেন আল্লা। আমি শুধু জানি, অন্তত আজ রাত্রে তিনি আপনার সম্মান রাখতে চেয়েছিলেন।'

৯।১০।৬৫

'পঞ্চাশ বছর ধরে করেছি সাধনা।'
'কটা ভাষা?' 'হা কপাল! বাঙলাই হল না।'

প্রথমেই নিবেদন জানাই, আকাশবাণীর বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত কোনো ফরিয়াদ নেই। কেন নেই, যখন চৌদ্দআনা পরিমাণ লোকের আছে এ-সব তর্কের ভিতর

আমি ঢুকতে নারাজ। বিশেষত যখন খুব ভালো করেই জানি, এই বিশ্ব-সংসারটা রিফর্ম করার গুরুভার আল্লা-তালা আমার স্কন্ধে চাপান নি। আমি শুধু আজ আকাশবাণী বাবদে একটি কাহিনী নিবেদন করবো। শোনা গল্প। সত্য না-ও হতে পারে। তবে ক্যারেকটিরিস্টিক—অর্থাৎ গল্পটি শুনেই চট করে চোখের সামনে ভেসে ওঠে আকাশবাণীর একটি বিশেষ স্থূলাঙ্গের ছবি।

'সুনন্দ' রাগে বিতৃষ্ণায় বিকৃত কণ্ঠে তাঁর জর্নালে ইন্টারভ্যু নামক প্রতিষ্ঠানটির ব্যঙ্গ করেছেন। হায় রে কপাল! তিনি কখনো ইন্টারভ্যুর রাজার রাজা 'অডিশনিং' নামক খাটাশ্‌টির দাঁত ভ্যাংচানি দেখেছেন—ঈভন ফ্রম এ ভেরি লঙ সেফ ডিসটেন্স? তা হলে বুঝতেন ঠ্যালা কারে কয়। আমি স্বয়ং একাধিক 'অডিশনিং' বোর্ডের বড়কর্তা ছিলুম বেশ কিছুকাল ধরে। আমার জানার কথা! কিন্তু আমি এ সুবাদে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটি কাহিনী কীর্তন করবো।

একদা 'গ্রামে গ্রামে এই বার্তা রটি গেল' যবে যে, কী বড় কী ছোট তাবৎ সঙ্গীতকাররা পরীক্ষা (এরই 'ভদ্র' নাম অডিশনিং) দিয়ে তবে গান গাইবার প্রোগ্রাম পাবেন, তখন পরীক্ষকদেরই একজন আপত্তি তুলে বললেন, 'বাজারে যাঁদের গ্রামোফোন রেকর্ড রয়েছে, এবং/কিংবা স্টুডিয়ো-রেকর্ড রয়েছে তাঁদের আবার অডিশনিং-এর কি প্রয়োজন? যাঁদের নেই তাঁদের কথা আলাদা।' কিন্তু তখনকার দিনের আকাশবাণী রাজাধিরাজ স্বাধিকারমত্ত। মোকা যখন পেয়েছেন তখন ছাড়বেন কেন?

তখন ধরুন, এই লখ্‌নৌ শহরে ছোট বড় তাবৎ গাওয়াইয়া বাজানেওলারা একজোটে স্থির করলেন, তাঁরা পরীক্ষা দেবেন না। তাঁদের আপত্তি, যারা পরীক্ষা নেবে তারাই বা সঙ্গীত-জগতের কী এমন বাঘ-সিঙ্গি?

আবার বলছি, এটা গল্প।

অবস্থা যখন চরমে, তখন দুনিয়ার হালচাল বাবদে সম্পূর্ণ বেখেয়াল, লখ্‌নৌয়ের সবচেয়ে বড় ওস্তাদ একদিন ভোরবেলা শিষ্য-সমাবৃত হয়ে রেওয়াজ করতে করতে হঠাৎ শুধোলেন, 'হ্যাঁ মিয়া, "আডিশনিং আডিশনিং" চারো তরফ লোগ শোরগোল মচা রহে হৈঁ, সো ক্যা ব্‌লা?' (পাঠক, আমার উর্দুজ্ঞান সঞ্চিত হয়েছে কলকাতার পানওয়ালাদের দোকান থেকে—অপরাধ নিয়ো না, বরায়ে মেহেরবানী!) মোদ্দা কথা তিনি জানতে চাইলেন, চতুর্দিকে যে এই অডিশনিং অডিশনিং রব উঠেছে, সেটা আবার কি বালাই (আপদ, গেরো)।

শিষ্যেরা প্রাঞ্জল ভাষায় সে 'বালাইয়ের' জন্ম, বয়োবৃদ্ধি ও বর্তমান পরিস্থিতি

গুরুকে বুঝিয়ে দিলেন, এবং তাঁদের কেউই যে এই অপমানকর প্রতিষ্ঠানের সম্মুখীন হবেন না সেটাও জানিয়ে দিলেন।

গুরু তাজ্জব মেনে বললেন, 'সে কি? ইম্‌তিহান্‌-পরীক্ষা দিতে তোমাদের কি আপত্তি? ভেবে দেখো আমি যখন বিরাট জলসায় গান ধরি তখন কি শেষ কাতারের পানওয়ালাটা পর্যন্ত আমার পরীক্ষা আরম্ভ করে দিয়ে ভাবে না, আমি রসসৃষ্টি করতে পারবো কি না, তার দিল ভিজিয়ে নরম করতে পারবো কি না? সোজা কথায় বলতে গেলে, মহ্‌ফিলের সবাই প্রতিবারেরই আমার পরীক্ষা নেয়। হাঁ, আল্‌বত্তা, তারা না বলে পরীক্ষা নেয়, এরা বলে কয়ে নিচ্ছে। তাতে কীই বা এমন ফারাক?'

শিষ্যেরা অচল অটল।

ওস্তাদ হেসে বললেন, 'মৈঁ তো জাউংগা জরুর।'

শিষ্যরা বজ্রাহত। আর্তরব ছেড়ে পাঞ্জাবী, যুক্তপ্রদেশী, বাঙালী, হিন্দু, মুসলমান তাবৎ শাগরেদ আর্‌জ্‌ করলে, 'আমরা যাচ্ছি নে ঐ সব পাঁ—দের সামনে পরীক্ষা দিতে, আর আপনি যাবেন হুজুর?'

হুজুর বললেন, 'য়েকীনান্‌— নিশ্চয়ই।'

শিষ্যেরা তখন 'ফারাম' (form)-এর ভয় দেখালে। তাতে মেলা অভদ্র প্রশ্ন আছে। ওস্তাদ বললেন, 'সে তো আদমশুমারীর সময়ও আমার বুড়টী বাবাকে শুধিয়েছিল, তিনি অন্য কোনো পন্থায় কিছু আমদানি করেন কি না? ওসব বাদ দাও। ফারাম ভর দো।'

* *

অডিশনিং-এর দিন টাঙা চড়ে গুরু চললেন, স্টুডিয়োর দিকে। সঙ্গে মাত্র একটি চেলা। বাকি চেলারা চালাকি করে আকাশবাণীকে জানায় নি যে তাঁদের ওস্তাদ অডিশনিঙে আসছেন—ওদের শেষ ভরসা এপয়েন্টমেন্ট নেই বলে শেষ-মেষ যদি সবকুছ বরবাদ-ভণ্ডুল হয়ে যায়। অবশ্য এ-কথাও ঠিক, ওস্তাদ ওদের পরীক্ষা দেবার জন্য হুকুম দেন নি। নইলে ওরা নিশ্চয়ই অমান্য করতো না।

লখ্‌নৌয়ের—কথার কথা বলছি—আকাশবাণী সেদিন কারবালার ময়দানের মত খাঁ-খাঁ করছে। এমন সময় নামলেন গুরু টাঙা থেকে।

আকাশবাণীর 'চ্যাংড়াদের' যত দোষ দিন, দিন—প্রাণভরে দিন, কিন্তু একথা কখনো বলবেন না, এরা ওস্তাদদের সম্মান করে না। আমার চোখের সামনে কত বার দেখেছি, প্রোগ্রাম-এসিসটেন্ট কুলীনস্য কুলীন ব্রাহ্মণসন্তান কী রকম মুসলমান গুরুর পায়ের কাছে কুমড়ো-গড়াগড়ি দিচ্ছে, মুসলমান পীরের ছেলে হিন্দু

গুরুর পায়ে ধরে বসে আছে। এঁদের অসম্মান করে—অবশ্য সেটা ওদেরই রুচির অভাব—ওপরওলারা যারা সঙ্গীত বাবতে দীর্ঘকর্ণ।১

ছোকরা কর্মচারীরা তো তন্মুহূর্তেই ওস্তাদকে তাদের চোখের পাতার উপর তুলে নিয়ে ঢুকিয়ে দিলো অডিশনিং রুমে—যেখানে 'পরীক্ষকরা' বেকার উকীলদের মত অনুপস্থিত মাছি মারছিলেন আর নিষ্ফল আক্রোশে আর্টিফিশেল দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় খাচ্ছিলেন।

ওস্তাদকে দেখে তাঁরা স্তম্ভিত। এ কী কাণ্ড! যে-সব আনাড়ী ছোকরা গাওয়াইয়ারা দিনকে দিন বেতারকেন্দ্রের ছারপোকা-ভর্তি বেঞ্চিতে বসে দশ রুপেয়ার প্রোগ্রামের জন্য ধন্না দেয় তারা পর্যন্ত আসে নি অডিশনিঙে—আর এই ওস্তাদের ওস্তাদ লখ্‌নৌয়ের কুৎব্‌ মিনার, তানসেনের দশমাবতার তিনি এসে গেছেন—এ যে অবিশ্বাস্য, বিলকুল গয়ের মুম্‌কিন্‌ তিলিস্‌মাৎ!

একথা অনস্বীকার্য তাঁরা ওস্তাদকে প্রচুরাধিক ইজ্জৎ দেখিয়ে ইস্‌তিক্‌বাল (অভ্যর্থনা) জানালেন, সর্বোত্তম তাকিয়াটি তাঁর পিছনে চালান দিলেন। ওস্তাদের মুখ যথারীতি পানে ভর্তি ছিল। একটি ছোকরা ছুটে গিয়ে ওগল্‌দান্‌

১ প্যারিসে একবার একটি উৎকৃষ্ট সঙ্গীতানুষ্ঠান কর্তাদেব নেকনজর পায় নি শুনে ভলতেয়ার সেই সঙ্গীতস্রষ্টাকে একটি চৌপদী লিখে সান্ত্বনা জানান, 'হায়, বড়লোকদের যে কানও বড় হয়' (অর্থাৎ গাধা)। আমি ব্যক্তিগতভাবে একটি উদাহরণ জানি। গুণী, ওস্তাদ রবিশঙ্কর তখন দিল্লি-আকাশবাণীর সঙ্গীতাধিনায়ক। গাঁধীর জন্মদিনে সেক্রেটারি তাঁকে ডেকে হুকুম দেন, ঐ উপলক্ষে তিনি গাঁধীর তাবৎ জীবনী—দক্ষিণ-আফ্রিকা, ববদলৈ, উপবাস, সল্‌ট্‌-মার্চ—প্রতিফলিত করে যেন নূতন কিছু 'কম্পোজ' করেন। বিহ্বল, প্রায়ান্ধ উদ্ভ্রান্তদৃষ্টি রবিশঙ্কর চলেছেন করিডর দিয়ে—আমার সঙ্গে আচমকা কলিশন। সম্বিতে এসে আমাকে দেখে করুণ হাসি হেসে তাবৎ বাৎ বয়ান করে শুধোলেন, 'এ কখনো হয়?' আমি বললুম, 'আপনি যখন বাজান তখন আমার মত সঙ্গীতে আনাড়ীরও মনে হয়, আপনার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তবে কি না—হেঁ, হেঁ—সেক্রেটারি বোধ হয় বিলিতী সিমফনি, পাস্তোরাল-টাস্তোরাল বই পড়ে (শুনে নয়) আমেজ করছেন, এ দেশেই বা হবে না কেন?' রবি শুধোলেন, 'করি কি?' আমি সবিনয়ে বললুম, 'একটা বাবদে আমার মত আকাটও একটা সজেশন দিতে পারে।' 'কি কি?' 'ঐ সল্‌ট্‌-মার্চের জায়গায় এসে আপনি যন্ত্রের তারগুলোতে করকচ-নুন মাখিয়ে নেবেন।'

(পিকদান) নিয়ে এসে সামনে ধরলো।

কেউ কিছু বলার পূর্বেই ওস্তাদ বললেন, 'সব যব্ জম্‌গয়ে তব কুছ হো জায়—' অর্থাৎ সঙ্গীতামোদীরা যখন একজোট হয়ে গিয়েছি তখন হোক কিঞ্চিৎ গাওনা-বাজনা। সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। নইলে কে তাঁকে সাহস করে পরীক্ষা দিতে বলতো? ওস্তাদ সবিনয় শুধোলেন, 'কি গাইবো?' তারস্বরে চিৎকার উঠলো, 'সে কি, সে কি? গজব কী বাৎ! আপনার যা খুশী।' (সাধারণ পরীক্ষার্থী জানে, এদের মামুলী পেশা বিৎকুটে, অচেনা রাগ বৎখৎ তালে গাইবার আদেশ দেওয়া।)

ইতিমধ্যে বেতারকেন্দ্রের যে পয়লা-নম্বরী সারেঙ্গীওয়ালা ও ওস্তাদ তবলচী অডিশনিং বয়কট করে কেন্টিনে চা খাচ্ছিল তারা টাট্টু ঘোড়ার মত ছুটে এসেছে সঙ্গত দিতে—কর্তারা এদের অভাবে যে দুটি আকাট যোগাড় করেছিলেন, তারা বহু পূর্বেই গা-ঢাকা দিয়েছে।

ওস্তাদ ধরলেন তোড়ি। আলাপের সময় প্রত্যেকটি ধ্বনি যেন বকুলগাছ থেকে এক একটি ফুল হয়ে এদিক ওদিক ছিটকে পড়তে লাগলো। যখন তালে এলেন তখন যেন ফুল নিয়ে সাতলহরা মালা গাঁথতে লাগলেন, প্রিয়ার কুন্তলদামে পরাবেন বলে।

আর সমস্তক্ষণ মুখে কী খুশীর ছটা! জান্‌টা যেন ফুর্তিতে ভরপুর! ক্ষণে সারেঙ্গীওলার দিকে মুখ বাড়িয়ে তার বাজনার তারিফ করে বলেন, 'ক্যা বাৎ, ক্যা বাৎ!' ক্ষণে তবলচীর দিকে দুই হস্ত প্রসারিত করে হুঙ্কার দেন, 'শাবাশ, শাবাশ, আফরীন, আফরীন!' যেন ওরাই সব জমিয়ে চলছে! ওঁর কোন কৃতিত্ব নেই!

গান থামলো। আনন্দে বিস্ময়ে সবাই এমনই স্তম্ভিত যে পুরো এক মিনিট পরে হর্ষধ্বনি ও সাধুবাদ রব উঠলো।

ইতিমধ্যে 'পরীক্ষক'দের একজন ওস্তাদের সঙ্গী ছোকরা শাকরেদের কাছ থেকে অন্য সকলের অজানতে সেই 'ফারাম্'খানা চেয়ে নিয়েছে। ঐটেতে পাস না ফেল, কোন্ হারে দক্ষিণা বেঁধে দিতে হবে সে-সব লিখে দিতে হয়।

হঠাৎ তার চোখে পড়লো, যেখানে প্রশ্ন, 'আপনি কোন্ কোন্ রাগ-রাগিণী জানেন?' তার উত্তরে লেখা মাত্র একটি শব্দ: 'তোড়ি'।

বিস্ময়! বিস্ময়!! এ কখনো হয়!!! পরশু দিনের কাঁচা গাওয়াইয়াও তো লিখতো ডজন দুই। ওস্তাদ জানেন কত শত, এ তো রসজ্ঞদেরও কল্পনার বাইরে।

অতিশয় বতরিবৎ এবং প্রচুর মাফ চেয়ে সেই 'পরীক্ষক'টি বৃদ্ধ ওস্তাদকে শুধোলেন—অল্প অবিশ্বাসের স্মিতহাসি হেসে, 'ওস্তাদ, এ কখনো হয় যে, আপনি একমাত্র তোড়ি ছাড়া আর কিছুই জানেন না ?'

সকলের মুখেই প্রসন্ন মৃদু হাস্য। সারেঙ্গী-তবলা মাথা নিচু করে জাজিমের দিকে তাকিয়ে।

যে কোনো বিদ্যাতেই তোমার যদি অভিমান থাকে তবে, পণ্ডিত পাঠক, এই বেলা তুমি কান পেতে শোনো,—আমার জীবনে তাঁর উত্তরটি নিবিড়ঘন আঁধারে ধ্রুবতারার মত জ্বলে—তিনি কি উত্তর দিলেন।

ঠণ্ডা সাস লে কর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ওস্তাদ বললেন, 'পচাস সালসে তোড়ি গা রহাহুঁ—অভী ঠিক তর্‌হ্‌সে নহী নিকলতী।'

অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর ধরে তোড়ি গাইছি। এখনও ঠিকমত বেরয় না। অন্য রাগ-রাগিণীর কথা কেন বৃথা শুধোও ॥

১৬।১০।৮৫

ইণ্টারভ্যু

'ইণ্টারভ্যু' নামক চরম বেইজ্জতীর মস্করা যে কত নব নব রূপে প্রকাশিত হয় তার বর্ণনা আরেক দিন দেব। 'দেশে' এই মর্মে একাধিক চিঠি বেরিয়েছে, এবং আগে-ভাগে কাকে চাকরি দেওয়া হবে সেটা ঠিক করে নিয়ে যে চোট্টামীর ইণ্টারভ্যু-প্রহসন করা হয় তারও বর্ণনা এ-চিঠিগুলোতে ও আমার সতীর্থের মূল প্রবন্ধে আছে। তবে এ বাবদে শেষ কথা বলেছে আমার এক তুখোড় তালেবর ভাগিনা। ডাক্তর নোকরি করে, ঢাউস যা গাড়ি ব্যাঙ্ক দিয়েছে তার ভিতর একপক্ষে মা সহ তার তিন মাসী অন্য পক্ষে তার তিন মামী রীতিমত ব্যূহ নির্মাণ করে কাশ্মীর-শিয়ালকোট-কচ্ছের রণের[১] রণমোহড়া দিতে পারেন (বলা বাহুল্য মামীরাই হারবেন, কারণ তাঁরা এসেছেন তিন ভিন্ন ভিন্ন পরিবার থেকে)। ভাগিনাটিকে প্রায়ই ইণ্টারভ্যু নিতে হয়—অর্থাৎ সিট্‌স্ অন দি রাইট্ সাইড্ অব দি টেব্‌ল্। একদিন বেজায় উত্তেজিত হয়ে সে আমাকে একটি কর্মখালির বিজ্ঞাপন পড়ে শোনালে। তাতে ওমেদারের বয়স কত হবে, কি কি পাস থাকা

১ আমার যদ্দূর জানা, কচ্ছবাসীরা জায়গাটার নাম কচ্ছী বা গুজরাতী বা কাঠিয়াওয়াড়ীতে বানান করে কচ্ছের 'রণ'—'রান' বা 'রাণ' নয়।

চাই, এপেন্‌ডিক্‌সের দৈর্ঘ্য তার কতখানি হবে, তার পরিবারে নিদেন কটা খুন হয়ে থাকা চাই ইত্যাদি বেবাক বাৎ ছিল। ভাগিনা তারপর ভ্রূকুঞ্চিত করে খানিকক্ষণ খুঁত খুঁত করে বললে, 'খাইছে! ফোডোগেরাপ্‌টা দ্যাওনের বাৎ বেবাক ভুল্যা গ্যাছে। হুইডার তলায় লেখা থাগ্‌বো, "None need apply whose appearance does not resemble the above photograph" কি কন, মামু?' আমি আর কি বলবো? এটা করলে তো অত্যন্ত সাধুজনোচিত আচরণ হত। এর চেয়ে ঢের ঢের নাস্টি (ইচ্ছে করে ন্যাস্টি উচ্চারণে করতে, সে উচ্চারণে যেন ঘেন্নাটার খোলতাই হয় বেশী যেমন 'পিশাচ' বা 'পিচাশ' না বলে সর্বোৎকৃষ্ট হয় 'পিচেশ' বললে!) উদাহরণ আমি একটা জানি।

ফার্সীর লেকচারার নেওয়া হবে। আমাকে স্পেশালিস্ট হয়ে যেতে হবে। আমি বে-কসুর না মঞ্জুর করে দিলুম। যদিও চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে মনে হল না, এর ভিতরে কোনো নষ্টামী আছে। তবু, আমি এই 'জামাই ঠকানো'র—সুনন্দের ভাষায়—ফিস্কিরি-মস্করার হিস্সেদার হতে চাই নে। দু'দিন পর মৌলানা আজাদ ফোন করে জানতে চাইলেন, আমি যেতে আপত্তি করছি কেন? তখন বুঝলুম, উনিই আমার নাম স্পেশালিস্ট-রূপে প্রস্তাব করেছিলেন এবং এখন আমি সেটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হচ্ছি বলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে সেটা জানিয়ে ফরিয়াদ করেছেন—। মৌলানার পাণ্ডিত্যের প্রতি আমার অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। তাই কাচুমাচু হয়ে এই ইন্টারভ্যু বাবদে পরীক্ষক হিসেবেই, আমার পূর্ব পূর্ব নোংরা (ন্যাস্টি!) তজরুবা-অভিজ্ঞতা জানালুম। দেখি, মৌলানা সমুচাহ্‌ ওয়াকিফ্‌-হাল। কোনো প্রকারের তর্কাতর্কি না করে বললেন, 'আপনি গেলে ওরা সোজা পথে চলবে। যদি অন্যায় আচরণ দেখেন, আমাকে জানাবেন।' ইন্টারভ্যুতে যে-সব অনাচার হয় তার কোনো বিচার নেই বলে, আমি টেবিলের কি এদিকে কি ওদিকে কোনো দিকে বসতে চাই নে (পেত্যয় না পেলে শ্রীযুত কালিদাস ভশ্চাযকে শুধোন!); কিন্তু এক্ষেত্রে মৌলানা আমার কাছ থেকে অনাচার-সংবাদ পেলে যে ওদের কান মলে দেবেন সেই ভরসায় গেলুম।

আমার সঙ্গে আরেকটি স্পেশালিস্ট ছিলেন। বাকীরা পাকা মেম্বার। তাদের একমাত্র কামনা, কাম খতম করে বাড়ি ফেরার। বিশেষত 'লেড়ে'র ব্যাপার—চাকরিটা মিম্বরুল্লা পেল না মৃদম খান পেল সে নিয়ে তাদের 'মাতাব্যাতা' হবে কেন, ছাই!

তবু ভদ্রতার খাতিরে তাঁরা দু-একটি প্রশ্ন শুধোলেন। সে ভারী মজা। যেমন,

'আপনার মাদ্রাসায় ইংরিজীও পড়ানো হত ?'—কথাবার্তা অবশ্য আংরেজীতেই হচ্ছে। কারণ প্রশ্নকর্তারা ফারসী ও ফরাসীর তফাৎ জানেন না।

'জী, হ্যাঁ।'

'কি পড়েছেন ?'

'জী, রাস্‌কিনের "সিসেম অ্যাণ্ড লিলিজ", মিলটনের "এরিয়োপেজি—",

'শেকস্‌পীয়র ?'

'জী।'

'কি ?'

'হ্যামলেট।'

এবারে প্রশ্নকর্তা দারুণ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'বাব্বা, বাব্বা! বেশ, বেশ। সুপ্রস্তাব!'

তার পর তিনি সোৎসাহে আরম্ভ করলেন, হ্যামলেটের আত্ম-আর্তনাদ—সলিলকি—"To be or not to be—"। তাকিয়ে আছেন কিন্তু আমার দিকে, ওমেদারের দিকে না—আমার অপরাধ ? ইংরিজী খবরের কাগজেও একটা অত্যন্ত বেকার খবর বেরিয়েছে, আমার কি একটা বই কি যেন একটা প্রাইজ পেয়েছে, এবং স্বয়ং রাষ্ট্রপতি নাকি আমাকে প্রাইজটি দেবেন স্বহস্তে। আমাকেই ইমপ্রেস করা এখন তাঁর জীবন্মৃত্যুর চরম কাম্য—বলা তো যায় না, এখন থেকেই যদি রীতিমত আমাকে তোয়াজ করে ইম্‌প্রেস্ করা যায় তবে তো আমি হয়তো প্রাইজ নেবার সময় কানে কানে রাষ্ট্রপতিকে বলে দেবো, 'হুঁজুরের আণ্ডার সেক্রেটারি অনন্তভূত-পরাশরলিঙ্গম্‌কে এখন একটি প্রমোশন দেওয়া উচিতস্য উচিত!' অবশ্য সেটা সেরকম মোকা নয়। কিন্তু বলা তো যায় না—যদি হয়েই যায়। নেপোলিয়ন (আজকালকার 'জ্ঞানীরা' যাঁকে নাপোলেওঁ বলেন, যেন আমাদের মত সে-যুগের রাম-পল্টকরা খাঁটি উচ্চারণ জানতো না বলে বাংলাতে তদনুযায়ী সঠিক বানান লিখতে পারে নি!) বলেছেন, অসম্ভব বলে কিছুই নেই। নিশ্চয়ই তিনি জানতেন, কখন কি ভাবে কাকে লুব্রিকেট-তেলাতে হয়!

তা সে যাই হোক, আমাকে ন'সিকে ইম্‌প্রেস করে হকচকিয়ে দেবার পর ওমেদারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাকিটা কও কি ? "Or to take arms against a sea of—" বাকিটা বলে যাও তো ?'

কালো চামড়ার তৈরী সর্বোৎকৃষ্ট স্প্রিং-সম্বলিত, পঞ্চাধিক ক্যুশন্‌বিজড়িত গভীর আরাম-কেদারার তলা থেকে তিনি হাস্যরসের তুফানে ওঠা-নাবা করতে

করতে বার বার বলেন, 'তার পর কি, go on! ইউ সেড্ ইউড্ রেড হ্যামলেট, against a sea of troubles—আরো সাহায্য করলুম তোমাকে। বাকিটা বলে যাও!' আবার তিনি সোফাতে বৃন্দাবনের রসরাজসুলভ হিন্দোল-দোলে দুলতে লাগলেন।

আমি তাজ্জব! বেচারী ওমেদার এসেছে ফার্সী ভাষার মেস্টারির চেষ্টায়। আঁ পাসাঁ, বেচারী একটুখানি ইংরিজী শিখেছিল বটে, কিন্তু সেইটেই তার ফর্, fort, সেইটেই তার pie´ce de re´sistance, সেইটেই তার বলতে গেলে, কিছুই নয়—ইংরিজীর মাধ্যমে ফার্সী পড়াতে গেলে যতখানি ইংরিজী জানবার প্রয়োজন তার চেয়েও সে বেশী জানে, সেটা তো ইতিমধ্যে তার কথাবার্তাতেই প্রমাণ হয়ে গেছে। তা সে যাকগে। ওমেদার বেচারী তো ঘেমে-নেয়ে ঢোল। আমি তখন তার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললুম, 'ওরকম নার্ভাস হবেন না। আপনি কতখানি ইংরিজী জানেন না-জানেন তার গুরুত্ব সামান্যই। ওটা আপনি ভুলে যান। এবারে চলুন ফার্সীতে। সেইটে কিন্তু আসল। ঐ যে আপনার সামনে ফার্সী বই কয়েকখানা রয়েছে তারই যে কোনো একখানা থেকে কয়েক লাইন পড়ুন—প্রথম আপন মনে চুপে চুপে, পরে আমাদের শুনিয়ে। অনুবাদ? না, না, অনুবাদ করতে হবে না। আপনার পড়ার থেকেই তো বুঝে যাবো, আপনি ফার্সী বোঝেন কি না। আর যেটা পড়বেন তার দু-একটা শব্দ আপনার জানা না থাকলে কোনো ক্ষতি নেই। সবাই কি আর সব ফার্সী শব্দ জানে? তা হলে দুনিয়াতে অভিধান লিখত কে, পড়ত কে? তা সে যাক। আমার আর কোনো প্রশ্ন-ট্রশ্ন নেই।'

এবারে ছেলেটার—হ্যাঁ, আমার ছেলের বয়েসি—মুখে শুকনো হাসি ফুটলো; একটুখানি ভর্সা পেয়েছে। সেই হ্যামলেটওলা লোকটিও আসলে কিন্তু মানুষ ভালো। পাঁচটা ক্যাশন্ দুলিয়ে ঠাঠা করে হেসে উঠলেন। বললেন—তাঁরই হ্যামলেটের স্মরণে—'জস্টিস্ ডিলেড হয় নি।. হা হা, হা হা।'

ছেলেটি সুন্দর উচ্চারণে গড় গড় করে ফার্সী পড়ে গেল। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ-সন্তান; এবং পরে দেখা গেল, আরো হিন্দু ওমেদার ছিল। ফার্সীর আবহাওয়াতে আপন ঠাকুদ্দার কাছে লেখাপড়া শিখেছে। চেয়ারম্যেন বললেন, 'আপনি এখন যেতে পারেন।' ছেলেটি সবাইকে মুসলমানী কায়দায় সেলাম জানালে, আমার দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতার একটু শুকনো হাসি হাসতে গিয়ে থেমে গেল—কি জানি ওটা ঠিক হবে কি না, যদি ওতে করে নম্বর কাটা যায়। আমি মনে মনে বললুম 'মারো ঝাড়ু, স্লা নোকরি ওর উসকী ইন্টারভ্যু পর্।'

উহুঁ! এটা শেষ নয়, এটা আরম্ভ মাত্র। ছেলেটির সেলামপর্ব শেষ হওয়ার পূর্বে আমার সঙ্গের দ্বিতীয় স্পেশালিস্টটি বললেন, 'একটু বসুন'—এবং সঙ্গে সঙ্গে আপন পকেট থেকে একটি চিরকুট বের করে তার হাতে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন।'

হায় বেচারা ক্যাণ্ডিডেট! ভেবেছিল, তার গর্দভযন্ত্রনা শেষ হল। এখন এ আবার কি ফাঁসি! বেচারী পর্চাখানির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। স্পেশালিস্ট দশ সেকেণ্ড অন্তর অন্তর গুঁতোচ্ছেন, 'পড়ুন। পড়ছেন না কেন?' ছেলেটি হোঁচট ঠোক্কর খেতে খেতে খানিকটে পড়লো। স্পেশালিস্ট বললেন, 'অনুবাদ করুন।' বাম পাঁঠা! পড়ার কায়দা থেকেই তো পরিষ্কার হয়ে গেছে যে পাঠ্যবস্তু তার এলেমের বাইরে, তবে স্যাডিস্টের মত মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা কেন?

ছেলেটা নড়বড় পায়ে বেরিয়ে গেল।

আমি পর্চাটির জন্য স্পেশালিস্টের দিকে হাত বাড়ালুম। তিনি 'কুছ নহী, কুছ নহী' বলে সেটি পকেটে পুরে নিলেন। দুস্‌রা ক্যাণ্ডিডেট এল। এবারে হ্যামলেটের বদলে গ্রে'র কবিতা। সর্বশেষে আবার ঐ অভিনয় সেই পর্চা নিয়ে। আমি স্পেশালিস্টের উদ্দেশে মনে মনে বললুম, 'তুমি ব্যাটা খোট্টা মুসলমান, আম্মো হালা বাঙাল পাঁতি ল্যাড়ে! দেখাচ্ছি তোমাকে।' এবারে ক্যাণ্ডিডেট পর্চাটি যেই ফেরত দিতে যাচ্ছে অমনি, তৈরী ছিলুম বলে, আমি সেটা নিয়ে নিলুম। ওমা! যত পড়ি, আগা-পাস্তালা ঘুরিয়ে দেখি, ততই কোনো মানে ওৎরায় না। ইতিমধ্যে আরেক ওমেদার এসে গেছে এবং চসার না পোণ্ড কি যেন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। আমার দৃষ্টি ঐ পর্চাটির দিকে নিবদ্ধ।

ইয়াল্লা! অব্ সমঝ্‌লন বা। যে দু'লাইন কবিতা ছিল সেটা অনেকটা আমাদের।

হরির উপরে হরি
হরি বসে তায়
হরিকে দেখিয়া হরি
হরিতে লুকায়!

'হরি' শব্দের কটা মানে হয়, আমি সত্যই জানি নে—কান ছুঁয়ে বলছি। কিন্তু ছিঃ! কারো বাংলা জ্ঞানের পরীক্ষা যদি নিতান্তই নিতে হয় তবে এই ধরনের 'জামাই-ঠকানো' কবিতাই কি ন্যায্যতম, প্রশস্ততম?!

কিন্তু এহ বাহ্য।

পরে, অন্তত আমি বুঝতে পারলুম দই খাচ্ছেন কোন্ রমাকান্ত আর বিকার

হচ্ছে কোন্ গোবদ্দনের ?

দু-একটি পাকা মেম্বরও হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন ব্যাপারটা কি। লেখা-পড়ায় এক-একটি আস্ত বিদ্যেসাগর বলেই ওঁদের নাসিকায় থাকে সারমেয়বিনিন্দিত গন্ধসন্ধানী অন্ধিসন্ধি।

ক্যাণ্ডিডেটের পরে ক্যাণ্ডিডেট—কেউ ভালো, কেউ মন্দ, কেউ মাঝারি, সংসারে যা হয়—ইণ্টারভ্যু স্বয়ংবরে আমাদের মত ইন্দুমতীর সামনে স্বপ্রকাশ হলেন। কিন্তু সবাই মার খেলেন, ঐ পর্চাটুকুর সামনে, ঐ চিরকুটটি সব্বাইকার ওয়াটারলু।

ইতিমধ্যে কী আশ্চর্য, কী তিলিস্মাৎ—একটি ওমেদার পর্চাটি পাওয়া মাত্রই সেটি গড়গড়িয়ে পড়ে গেল, আদ্যন্ত। যেন তার প্রিয়ার আড়াইশ' নম্বরী প্রেমপত্র।

* *

ইণ্টারভ্যু শেষে লাঞ্চ। সরকারী লাঞ্চকে আমি বলি লাঞ্ছনা। অবশ্য সর্বোচ্চ মহলে নয়। সেখানে লাঞ্চের অজুহাতে আপনার জন্য পেলেটে করে রোলস্-রয়েস গাড়ি আসতে পারে তন্বঙ্গী পরী-পয়্করী চালিতা। ড্রাইভারিণীটি ফাউ, থ্রোন্ ইন্ ফর গুড মেজার।

পালাবার চেষ্টা করার সময় ধরা পড়লুম সেই পঞ্চ-ক্যুশন-মর্দন মহাজনের হাতে। বললেন, 'হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ, আপনাদের ঐ স্পেশালিস্টটি আপন ওমেদারকে একটু ভালো করে রিহার্সেল করালেন না কেন ? ও যদি সাত বার ঢোঁক গিলতো, এগারো বার হোঁচট খেয়ে খেয়ে চিরকুটটির কবিতা পড়তো, তবে হয় তো, আমাদেরও বিশ্বাস জন্মাতো, সে ঐ কবিতাটি ইতিপূর্বে কখনো দেখে নি।'

অর্থং অর্থং

একটা 'ফরেন'-ওলার কথাই বলি।

ইণ্টারভ্যুতে আমিও ছিলুম। সেই ছাব্বিশ বছরের 'ফরেন'—বাট্ ড্যাম কালা আদমী ছোকরাটা তার বাপের বয়সী ওমেদার অধ্যাপককে যা বেহায়া প্রশ্ন শুধোতে লাগলো তাতে আমি স্তম্ভিত। কারণ সেই অধ্যাপকের কিছু কিছু লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। এ যুগে আর কটা হিন্দু ফার্সী শিখে ভারতবর্ষের সাতশ,' বছরের ইতিহাস অধ্যয়ন করে ? ইনি তাঁদেরই একজন। অথচ ওই

'ফরেন'-পন্টক ফার্সীর এক বর্ণও জানে না। শুধু ইতিহাসের অধ্যাপক—ঠিক ইতিহাসও নয়, ইণ্ডলজির—বলেই গুণধর বোর্ডে এসেছেন, এবং যে-মোগল ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি নিরেট আকাট, সেই সম্বন্ধে চোখাচোখা প্রশ্নবাণ ঝাড়ছেন। সেগুলো তৈরি করে নিয়ে এসেছেন গতকাল লাইব্রেরি থেকে, দু'তিনখানা মোগল ইতিহাসের ইংরেজী অনুবাদ পড়ে—প্রধান উদ্দেশ্য, বাদবাকী মেম্বরদের তাক্ লাগিয়ে দেওয়া। সে সব মেম্বররা এসেছেন অপরাপর য়ুনি থেকে। ফলে সে সব য়ুনিতে তিনি একস্‌টেন্‌শন লেকচারে নিমন্ত্রিত হবেন, এগ্‌জামিনার হবেন, বহুবিধ কনফারেন্সে নিমন্ত্রিত হবেন, তাঁর প্রিয় ছাত্রের অথাদ্য থীসিসে তাঁরা এক্‌স্‌টারনেল পরীক্ষক হিসেবে ডিটো মারবেন, তিন্নো এ-বাগে তাই করবেন, গয়রহ, ইত্যাদি, এট্‌সেটরা। কি কি প্রশ্ন শুধিয়েছিলেন, আমার ঠিক মনে নেই, তবে রেডুক্‌ৎসিয়ো আড্ আব্‌স্যুর্ডুমে পরিণত করতে যদি অনুমতি দেন তবে কাল্পনিক দু-একটি পেশ করতে পারি: 'আকবর যখন আহমদাবাদ আক্রমণ করছিলেন তখন সাবরমতী বেয়ে হাওয়া পুব না দক্ষিণ থেকে বইছিল ?' 'সিলেটের শাহজলাল মসজিদে পূর্বে যে জালালী কবুতর ছিল তারা এখন চলে যাচ্ছে কোথায় ?'

এবং এমনই খাজা ইংরিজী উচ্চারণে যে আমি একবার দু'প্রশ্নের ফাঁকে তাঁকে কানে কানে বললুম, 'I am glad, Oxbridge has not been able to damage your original pronunciation."

আমি সবিনয়ে নিবেদন করছি, আমি সে অধ্যাপককে বাঁচাতে পারি নি। সেই প্রাচীন গল্প তা হলে আবার বলি। বার্নার্ড শ'র একটি নাট্য করে থিয়েটার থেকে গম্ গম্ তুলে ধরেছে, দ্রষ্টাদের সপ্রশংস চিৎকার, 'নাট্যলেখককে স্টেজে বেরুতে বলো, আমরা তাঁকে দেখব।' শ' এলেন। মিনিট পাঁচ ধরে চললো তুমুল হর্ষরব, করতালি, যাবতীয়। সবাই যখন শান্ত হলেন, এবং শ' তাঁর ধন্যবাদ জানাবার জন্য মুখ খুলতে যাবেন এমন সময় সর্বশেষ সস্তা গ্যালারি থেকে একটা আওয়াজ এল 'বু বু বু বু!' শ' ওই দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ব্রাদার, ঠিক বলেছ; এ নাট্যটা রদ্দী। কিন্তু তোমাতে-আমাতে, মাত্র দুজনাতে, এই শত শত লোকের পাগলামি ঠেকাই কি করে!'

* *

তার পরই আমি বিদেশে চলে যাই। না, স্যর! Sorry, কোনো সোভিয়েট, মার্কিন, বার্লিন ডেলিগেশনে নয়। তা সে যাক্। ফিরে এসে বোম্বায়ে আমার বন্ধু প্রসাদদাস মানিকলাল শুক্লের বাড়িতে উঠলুম। ওই অক্‌সব্রিজওলার কথা কি

করে উঠলো জানি নে, কারণ লেখাপড়ির ব্যাপারে আমরা charleton-ধাপ্পা-বাজদের নিয়ে কখনো আলোচনা করতুম না।

শুক্র বললে, 'সে বড় মজার ব্যাপার। তোমার ওই ব্রাদার চৌধুরী শনৈঃ শনৈঃ উঠতে লাগলেন খ্যাতির শিখর পানে। আজ এই কলেজে, কাল অন্য য়ুনিভার্সিটিতে—আস্ত একটা হনুমানের মত চড় চড় করে পদোন্নতির অশথগাছের মগ-ডালে, বয়েস পঁইত্রিশ পেরুতে না পেরুতে। ইতিমধ্যে তাঁর নিজস্ব উম্‌দা গ্যোবেল্‌সী শানাই তাঁর গুণের রাগ-রাগিণী বাজাতে বাজাতে এটাও জাহির করেছে যে, ওই চৌধুরী স্বচেষ্টায় ফরাসী, জর্মন, রুশ গয়রহ ভাষাও আয়ত্ত করে ফেলেছেন।'

শুক্র ফিক করে একটুখানি হেসে বললে, 'সে বড় মজার। তোমার ওই চৌধুরীর তখন এমনই আস্পদ্দা বেড়ে গেছে যে, সে ছাপিয়ে দিলে বুর্নফের একটি অচলিত ছোট লেখার অনুবাদ ইংরিজীতে—চটি বই, ব্রশ্যুর বলতে পারো। আসলে সে সেটা করেছিলো এক আনাড়ি ছোকরার সাহায্যে, যার ফরাসী জ্ঞান ছিল অত্যন্ত কাঁচা—কিন্তু ছোকরা ধাপ্পা মারতে জানতো চৌধুরীর চেয়েও দুই বাঁও বেশী।

শুক্র বললে, 'ওঃ। সে বই নিয়ে এ দেশে কী তুলকালাম, ফাঁ ফাঁর! অবশ্য তার চোদ্দ আনার উৎপত্তি চৌধুরীর গ্যোবেল্‌সী কলসী থেকে। এবং এখনো এ দেশের লোকের বিশ্বাস এ রকম অনুবাদ হয় না। মাত্র দু'একটি প্রাণী জানে যে, কি করে যেন ওই অনুবাদ প্যারিসে পৌঁছে গেলে তাদের এক পত্রিকায় বেরোয়—"The originality of the translator has come out with extraordinary success in those passages where he has failed to understand the original!" অবশ্য তাতে করে চৌধুরীর রত্তিভর লোকসান হয় নি, কারণ এই ফরাসীতে লেখা সমালোচনা—তাও প্রকাশিত হয়েছে পণ্ডিতীয়া কাগজে—এ দেশে পড়ে কটা লোক! তা সে যাক।

'ইতিমধ্যে এ-দেশে একটি পোলিটিশিয়ানের প্রাণ হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলো জননী ভারতের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করার জন্য। আসলে তুমি তো জানো, এ সব নির্জলা ব্লাফ্। ভদ্রলোক চান, তিনি যেন 'কল্‌চর'-জগতেও সম্মানিত হোন। অবশ্য পরের হাত দিয়ে তামাক খেয়ে। সেই "পরে"রও অভাব হল না। এ অঞ্চলের শেঠীয়াদের টাকের ঠিক জায়গায় হাত বুলোতে পারলে গৌরীশঙ্করের শিখরে মরূদ্যান নির্মাণের জন্যও পিল পিল করে টাকা বেরিয়ে আসে।

তারপর শ্যানায় শ্যানায়[১] কুলোকুলি। তোমার এই প্যারা চৌধুরী—'

আমি বললুম, 'শট্ অপ্।'

'আহা, চটো কেন? তারপর সাড়ম্বর স্থাপিত হল, "জম্বুদ্বীপ-সমন্বিতাসমুদ্র—" যাক্‌গে যাক্, আমার নামটা ঠিক মনে নেই, ওই "কল্‌চর" "মল্‌চর" নিয়ে কি যেন একটা প্রতিষ্ঠান, আর চৌধুরী হলেন তার "সর্বাধিকারী" "মহাস্থবির" না কি যেন একটা।...কিছুদিন পর—ইতিমধ্যে অবশ্য প্ল্যান মাফিক দু-দশখানা ভালো-মন্দ-মাঝারি "কলচরল" বই "জম্বুদ্বীপসমন্বিত—" দুচ্‌ছাই আবার ভুলে গেলুম প্রতিষ্ঠানের নামটা—বই বেরিয়েছে। সর্বাধিকারী চৌধুরী প্রতিষ্ঠানের কর্তাকে বোঝালেন—

(ক) ঋগ্বেদের যে সব অনুবাদ গত এবং এই শতকে ইংরিজী-বাংলা-ফরাসী-জর্মনে বেরিয়েছে, সেগুলো ইতিমধ্যে বিলকুল বেকার ঔট অব্ ডেট হয়ে গিয়েছে, (খ) একটি নূতন অনুবাদ দরকার, (গ) সেটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে হলে বড় বড় পণ্ডিতদের সাহায্য নিতে হবে, (ঘ) এবং তাঁদের দক্ষিণা এবং ছাপা বাবদ লাগবে আশী হাজার টাকা।

আমি তাজ্জব মেনে বললুম, 'কি বললে, আশী হাজার টাকা? বলো কি!'

'বিলক্ষণ! আশী হাজার টাকা! ব্যাপারটা হল গিয়ে, ওই যে প্রতিষ্ঠাতা পলিটিশিয়ান কল্‌চরড্ হতে চান, তিনি শেয়ারবাজার, টেভয় টিন্ থেকে ওমরা তুলো, শিবরাজপুর মেঙ্গানীজ সব বোঝেন, কিন্তু—কিন্তু বড় বড় পণ্ডিতদের তেজীমন্দী বাবদে বিলকুল না-ওয়াকিফহাল। ঢেলে দিলেন টাকাটা। তার পর বেরুতে লাগলো কিস্তিতে কিস্তিতে বেদের নবীন ইংরিজী অনুবাদ। যে রকম আমাদের হরিবাবুর বাংলা কোষ বেরিয়েছিল। উত্তম প্রস্তাব! কিন্তু, ব্রাদার, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি এই দগ্ধ সংসারে কোথায়? হঠাৎ পুণার এক পণ্ডিত আমাদের কল্‌চর-প্রতিষ্ঠাতার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে অনুবাদের খুনিয়া খুনিয়া সব ভুল দেখাতে লাগলেন। যেমন মনে করো—কথার কথা কইচি, আমি তো ওখানে ছিলুম না—"রবিকর" অনুবাদে হয়েছেন, "সূর্য যে খাজনা দেন" কিংবা "রাজকর" অনুবাদে হয়েছেন, "রাজা যে রশ্মি দেন"!...এ রকম বিদকুটে বরবাদ অনুবাদ কেন হল কিছুই বোঝা গেল না। সামান্যতম বৈদিক ভাষা যে জানে সেও তো এরকম ভুল করবে না। হ্যাঁ, আলবৎ, 'ক্রন্দসী' 'রোদসী' ধরনের অচলিত শব্দ

১ 'চলন্তিকা' বলেন 'সজ্ঞান' থেকে সেয়ানা। বড়বাবু বলেন, শ্যেনদৃষ্টি রাখে যে জন তার থেকে শেয়ানা, শ্যানা।

নিয়ে সাতিশয় সাধু মতান্তর হতে পারে, কিন্তু এ ধরনের আকাট, বর্বর—? রহস্যটা তবে কি ?'

আমিও সায় দিয়ে বললুম, 'রহস্যটা তবে কি ?'

'ওই কল্‌চরকামী প্রতিষ্ঠাতা বেদবেদান্ত বাবদে বেকুব হতে পারেন, কিন্তু তিনি "ইঁদুরের গন্ধ পান"—শয়তানীর শ্বাস পান। নইলে সাদা-কালো-গেরুয়া বাজার কনট্রোল করছেন বৃথাই। তিন দিন যেতে না যেতে স্বয়ং চৌধুরীই এসে যা বললেন তার থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, তিনি কি ভারতীয়, কি ফরাসী, কি ইংরেজ, কি জর্মন কোনো পণ্ডিতকেই অনুবাদ-কর্মে নিযুক্ত করেন নি। তাবৎ কর্ম করিয়াছেন একটি দুঃস্থা জর্মন রমণীকে দিয়ে। সে বেচারী সংস্কৃতেরও এক বর্ণ জানে না—বেদের ভাষা মনোজের ভাষায় কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে! সে স্রেফ জর্মন পণ্ডিত গেল্টনার-কৃত কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত বেদের অনবদ্য জর্মন অনুবাদ ইংরিজীতে অনুবাদ করে গেছে। মেয়েটি ভালো জর্মন জানে বটে, কিন্তু তার ইংরিজী কাঁচা। কিন্তু সেইটেই মূলতত্ত্ব নয়। আসল বিপদ হয়েছে, বেদের অনেক বস্তু অস্পষ্ট, রহস্যময়, দ্ব্যর্থ কেন—বহু অর্থসূচক। সেগুলো জর্মন পণ্ডিত গেল্টনারও করেছেন সন্তর্পণে, আবছা-আবছা রেখে—যেন সান্ধ্যভাষায়। এ নারী তাই তার অনুবাদে—আদৌ সংস্কৃত জানে না বলে—রবিকর, রাজকর, নরকর, হাতীর কর (কথার কথা কইচি!) গুবলেট করে বসেছে। তখন পরিষ্কার হল রহস্যটা।

তস্য বিগলিতার্থ, চৌধুরী দশ-বিশজন পণ্ডিত লাগিয়ে, তাদের ন্যায্য দক্ষিণা দিয়ে অনুবাদ করান নি। মেমসাহেবকে দিয়ে কম্মটি করিয়ে নিয়েছেন।

আরো অর্থাৎ এবং সেখানেই অর্থ, মেমসাহেবকে তিনি দিয়েছেন এক হাজার টাকা, ছাপার খরচা বাদ দিয়ে তিনি পকেটস্থ করেছেন সত্তর হাজার টাকা। হল ?'

* *

চৌধুরী এখন ফট্‌কা-বাজারে ভালো পয়সা কামায়॥

অদ্যাপিও সেই খেলা খেলে গোরা রায়।
মধ্যে মধ্যে ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

এই 'দেশ' পত্রিকাতেই আমার এক সতীর্থ কিছুদিন পূর্বে 'ফরেন ডিগ্রী'-ধারীর দম্ভের প্রতি ক্ষণতরে ঈষৎ ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মর্মঘাতী আপন মূল

বক্তব্যে চলে যান। হয়তো সে-স্থলে এ বিষয় নিয়ে সবিস্তর আলোচনা করার অবকাশ ছিল না, অর্থাৎ তিনি শেখ চিল্লীর মত মূল বক্তব্যের লাভ এবং ঈষৎ অবান্তর বক্তব্যের ফাউ দুটোই হারাতে চান নি।

ওঃ! গল্পটি বোধ হয় আপনি জানেন না, কারণ শেখ চিল্লী জাতে খোট্টা এবং বাঙলা দেশে কখনো পদার্পণ করেন নি। যদ্যপি শ্রীযুক্তা সীতা এবং শান্তা এবং খুব সম্ভব তাঁদের অগ্রজও মিয়া শেখ চিল্লীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন উপকথার মারফতে—স্বর্গত রামানন্দের পরিবার যে খোট্টাই দেশে বাল্যকাল কাটিয়েছেন সে কথা আগে জানা না থাকলেও তাঁর শতবার্ষিকী উপলক্ষে লিখিত প্রবন্ধাদি পড়ে বহু বাঙালীই জেনে গিয়েছেন। কিন্তু এস্থলে আমার যে গল্পটি স্মরণে এল সেটি বোধ হয় তাঁরা ইতিপূর্বে সবিস্তর বয়ান করে আমাকে পরবর্তী যুগের 'চোর' প্রতিপন্ন করার সুব্যবস্থা করে যান নি—এই ভরসাতেই সেটি উল্লেখ করছি। করে গেলেও ঝুটমুট 'ঝেপবার' ভয় নেই—কারণ গল্পটি ক্লাসিক পর্যায়ের, অর্থাৎ এর বিষয়বস্তু সর্বসাধারণের কার্যকলাপে নিত্য নিত্য সপ্রকাশ হয় বলে এটি নিত্যদিনের ব্যবহার্য গল্প।

মা-সরস্বতীর বর পাওয়ার পূর্বে কালিদাস যে আক্কেল-বুদ্ধি ধারণ করতেন, হিন্দী-উর্দুভাষীদের শেখ চিল্লীও সেই রকম আস্ত একটি 'পল্টক' ('কণ্টক' থেকে 'কাঁটা'—সেই সূত্রানুযায়ী 'পল্টক' থেকে কি উৎপন্ন হয় সে তত্ত্ব সুচতুর পাঠককে বুঝিয়ে বলতে হবে না ; আসলে এই গূঢ় তত্ত্বটি আবিষ্কার করার ফলেই শ্রীযুত সুনীতি চট্টো অস্মদ্দেশীয় শব্দতাত্ত্বিকদের পঙ্‌ক্তিতে আপন তখ্‌ৎ-ই-তাউসে গ্যাঁট হয়ে বসবার হকক কব্জা করেন)।

সেই শেখ চিল্লীকে তাঁর মা হাতে একটি বোতল আর পয়সা দিয়ে বাজার থেকে তেল কিনে আনবার আদেশ দিলেন এবং পুত্রের পেটে কি পরিমাণ এলেম গজগজ করছে সেটা জানতেন বলে পই পই করে স্মরণ করিয়ে দিলেন, আসল তেলটা পাওয়ার পর সে যেন ফাউ আনতে না ভোলে। শেখ চিল্লী এক গাল হেসে বললেন, 'তা-ও কখনো হয়!'

আমি জানি, আজকের দিনের পাঠক কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না যে, কোনো জিনিসের দাম বাজারে কস্মিনকালে কখনো কমে। কিন্তু করতেই হবে, এই হালের সুকুমার রায়ের যুগেও 'বাড়তি' 'কমতি' ছিল—এমন কি বয়সের বেলাও। আমি যে যুগের বয়ান দিচ্ছি সেটা তারও বহু পূর্বেকার। তাই মিয়া চিল্লীর আম্মাজানের অজানতেই বাজারে তেলের দর হঠাৎ কমে গিয়েছিল। হয়তো কোনো 'রাধা'কে নাচাবার জন্য নবাব সাহেবের 'ন মন তেলে'র প্রয়োজন

হওয়াতে তিনিও শায়েস্তা খানের মত তেলের দর সস্তায় বেঁধে দিয়ে বাজার শায়েস্তা করেছিলেন। সেটা এ যুগের 'সন্দেশ' শায়েস্তা করতে গিয়ে স্বহস্তে স্বপৃষ্ঠে ভূতের কিল খাওয়া নয়।

তা সে যা-ই হোক্, তেল সস্তা হয়ে যাওয়ার দরুন মূল তেলেই বোতল কানায় কানায় ভরে গেল। শেখ চিল্লীর ঘটে বুদ্ধি কম ছিল সত্য কিন্তু তার স্মৃতিশক্তিটি আমাদের 'দাদখানী তেল, মসুরির বেল'-এর মত ছিল না! তিনি দোকানীকে বললেন, 'ফাউ?'

দোকানী বললে, 'কী আপদ, বোতলে জায়গা কোথায়?'

শেখ বললেন, 'বট্যে! চালাকি পেয়েছ? এই তো জায়গা।' বলে তিনি বোতলটি উপুড় করে, বোতলের তলার গর্তটি দেখিয়ে দিলেন। মেরি মাগডেলেন যে খৃষ্টের পদদ্বয় তৈলাক্ত করেছিলেন সেটাকেও হার মানালেন শেখ—অবশ্য স্বহস্তে। দোকানী মুচকি হেসে সেই গর্তটি এক কাঁচ্চা তেল নিয়ে ভরে দিয়ে শেখের ফাউয়ের খাঁইও ভরে দিল।

বোতলটি অতি সন্তর্পণে 'স্টাটুস কুয়ো' বজায় রেখে ধরে ধরে শেখ বাড়ি পৌঁছে মাকে বললেন, 'এই নাও আম্মা, তোমার ফাউ।' তারপর বোতলটি উল্টে খাড়া করে ধরে বললেন, 'আর ভিতরে তোমার আসল।'

আম্মা-জানের পদদ্বয় অবশ্য খৃষ্টের তুলনায় অল্পই অভিষিক্ত হল!

* *

দেশ থেকে যে বোতলটি নিয়ে এ-দেশের ছাত্র বিদেশে বিদ্যার তেল—না ভুল বললুম, ডিগ্রীর তেল—কিনতে যায়, সেটি নিয়ে সে কোন শেখ চিল্লীর মত কি বেসাতি করে সে তত্ত্বটি অনেকেরই জানা নেই। না জানারই কথা, কারণ ইংরেজ আমলের পূর্বে এ-দেশে কখনো এই 'ফরেন' ভূতের উপদ্রব হয় নি। মুসলমান আমলে কি হয়েছিল সেটা পরের কথা। তার পূর্বে কোনো ভারতসন্তান 'ফরেন' ডিগ্রীর জন্য কামচাটকা থেকে কাসাব্লাঙ্কা কোথাও গিয়েছে বলে শুনি নি। তবে জাতক পড়লে পাই, ঐ যুগে তক্ষশিলা ছিল বৌদ্ধ জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চার কেন্দ্র এবং বারাণসী ছিল সনাতন ধর্ম-জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চার জন্য সর্বপ্রসিদ্ধ তীর্থ। তাই জাতকের একাধিক গল্পে পাই, বৌদ্ধ কিংবা বৌদ্ধভাবাপন্ন বারাণসী গৃহী পুত্রকে তক্ষশিলায় বিদ্যার্জনের জন্য পাঠাতেন। তদ্রূপ কাশী সর্বকালেই সনাতন ধর্ম ও জ্ঞানবিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমি থাকা সত্ত্বেও হয়তো বিক্রমাদিত্যের যুগে সারা ভারতের কোনো কোনো অঞ্চল থেকে কিছু ছাত্র উজ্জয়িনীতে বিদ্যাভ্যাস করতে গিয়েছে।

মুসলমান আমলে রাজকার্য তথা জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ফার্সীতে হত। (বৌদ্ধধর্ম লোপ পাওয়ার ফলে বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো লোপ পায়; কিন্তু কাশী ও পরবর্তী যুগে বৃন্দাবনে হিন্দুশাস্ত্র চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল এবং এখনো আছে।) কিন্তু ফার্সী যদিও পারস্যের ভাষা, তবু এ-দেশের কোনো ফার্সী শিক্ষার্থী তেহ্‌রান বা মেশেদ্ শহরে ফার্সী শিখতে যেত না। ধর্মচর্চার জন্য ছাত্রেরা পড়তো আরবী, কিন্তু তারাও মক্কা, মদিনা বা কাইরোতে গিয়ে 'ফরেন' ডিগ্রী নিয়ে আসতো না। অবশ্য কোনো কোনো ছাত্র এ-দেশে পাঠ সমাপন করে মক্কায় গিয়ে হজ্ করার সময় কাবার চতুর্দিকে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দেওয়া হয়, সেগুলো শুনে নিত। অধীনের মাতামহ তাই করেছিলেন।

বিদেশে না যাওয়ার কারণ এ-দেশেই আরবী-ফার্সীর মাধ্যমে উত্তম জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা ছিল। এবং পাঠান-মোগল যুগেও কাবুল, কান্দাহার বা মজার-ই-শরীফে কোনো বড় কেন্দ্র গড়ে ওঠে নি—উঠেছিল দেওবন্দ, রামপুর, সুরট অঞ্চলের রাঁদেরে, হায়দ্রাবাদে, ঢাকায়, সিলেটে। বস্তুত কাবুল অঞ্চলের মেধাবী ছাত্র মাত্রই আমানুল্লার আমল পর্যন্ত দিল্লী অঞ্চলেই পড়াশুনো করতে আসত। আমি কাবুলে যাই ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে। তখন যে কয়টি আরবী-ফার্সীজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে সেখানে আমার আলাপ-পরিচয় হয় তাঁরা সকলেই উর্দু ও জানতেন, কারণ সকলেই বিদ্যাভ্যাস করেছিলেন ভারতে। ঠিক যে রকম বৌদ্ধ যুগে চীনা তথা অন্যান্য বৌদ্ধধর্মাবলম্বী শ্রমণরা এদেশে শিক্ষালাভের জন্য আসতেন, এখনো অল্পবিস্তর আসেন।

এমন কি, যে কাইরোর আজহর বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় এক হাজার পনরো বছর ধরে ধীরে ধীরে মুসলিম শাস্ত্রচর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ সর্ববৃহৎ সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী কেন্দ্ররূপে স্বীকৃত হয়েছে, সেখানেও ভারত থেকে কখনো খুব বেশী ছাত্র যায় নি। আমি যখন (১৯৩০।৩৫) কাইরোতে ছিলুম তখন পাক (বর্তমান) ভারত উভয়ে মিলিয়েও ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জনারও বেশী ছাত্র ছিল না। পক্ষান্তরে, সেখানে আরবী দর্শনের যে পাঠ্যপুস্তক সম্মানিত ছিল, সেটি জনৈক ভারতীয় মৌলানা দ্বারা লিখিত।

[এস্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে উল্লেখ করি, সাত শ বছর আরবী-ফার্সীর কঠিন একনিষ্ঠ সাধনা করে ভারতীয় মৌলবীরা জ্ঞানবিজ্ঞান ধর্মচর্চায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সত্য, কিন্তু আরবী দূরে থাক, ফার্সী সাহিত্যেও কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। তার এক মাত্র কারণ মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষায় সাহিত্যের কুৎব্‌মিনার গড়া অসম্ভব। তাই যখন দেখি, মাত্র এক শ বছর ইংরেজী

চর্চার পর এদেশে, কেউ কেউ সে সাহিত্যে ঢিপি তৈরি করে ভাবছেন সেটি মিনার, তখন বড়ই বিস্ময় বোধ হয়। তাঁরা কি সত্যই ভাবেন, সেই সাত শ বছরের তাবৎ গুণীজ্ঞানীরা—এবং তাঁরা রাজার্থানুকূল্য পেয়েছিলেন চেরাপুঞ্জির বর্ষণের চেয়েও বেশী—এঁদের তুলনায় অতিশয় কুক্কুটমস্তিষ্কধারী ছিলেন? তাই যখন দেখি র্যাবোর বদলে হ্র্যাবো—তা হলে 'rare' অর্থাৎ 'বিরল' হবে 'হ্রাহ্র', France হবে 'ফ্রহাঁস এবং যেখানে 'r' অক্ষরের সঙ্গে উ-কার যুক্ত, যেমন 'প্রুস্ত', সেখানে গতি কি? কারণ 'প'র নিচে 'হ' এবং তারও নিচে উ-কার দিয়ে তৈরি কোন 'হাঁসজারুই' (হাঁস+সজারু+রুই) জাতীয় অক্ষর তো বাঙলা ছাপাখানায় নেই—তখন শুধু সবিনয় সকাতর সভয়ে প্রশ্ন শুধোতে ইচ্ছা করে, 'আপনারা তরুণরা, যে নানাবিধ ভাষা শিখছেন সেটা বড়ই আনন্দের কথা, কিন্তু একবার একটু ভেবে নিলেই তো হয় যে মাইকেল, জ্যোতি ঠাকুর, বীরবল, ধ্বনিবিদ সুনীতি চট্টো, শহীদুল্লা এঁরা কেউই এই বিদকুটে ফরাসী 'র' ধ্বনি যে আলাদা সেটা লক্ষ্য করলেন না, এটা কি প্রকারে সম্ভবে?' এবং শেষ নিবেদন—জানি আপনারা পেত্যয় যাবেন না, ফরাসী জর্মন এমন কি ইংরাজি 'r'ও বাঙলা 'র'-এর মত নয় সেটা সত্য, কিন্তু তাদের 'r'র সঙ্গে যে আমাদের 'র' মিলছে না সেটা আমরা 'র'-এর উচ্চারণ করার সময় মুখগহ্বরের অন্য জায়গা থেকে করি বলে নয়—তাদের আপত্তি আমরা 'r' উচ্চারণের সময় সেটিকে 'ট্রিল' করি বলে, অর্থাৎ আমরা যখন বলি 'পারি' (প্যারিস) তখন ফরাসী শুনতে পায় যেন আমরা 'r'টা তিনবার উচ্চারণ করে বসে আছি। বিচক্ষণ ফরাসী গুরু তদ্দণ্ডেই বলেন, 'কিন্তু মসিয়ো Paris শব্দে মাত্র একটি "r" আপনি তিনটে "r" উচ্চারণ করলেন যে?' আমি আরো জানি—আপনারা আরো পেত্যয় যাবেন না যদি বলি, ফরাসী জর্মন উভয় অভিনেতাই [এবং উচ্চারণের ক্ষেত্রে ধ্বনিবিদ্ পণ্ডিতের চেয়ে এঁরাই সর্বসাধারণের কাছে অধিকতর সম্মান লাভ করেন—ইংলণ্ডেও বার্নার্ড শ-কে যে বি বি সি উচ্চারণ-বোর্ডে সসম্মানে নিমন্ত্রণ করা হত তাঁর কারণ তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি নয়, নাট্যে উচ্চারণ বাবদে তাঁর ওয়াকিফহালত্ব] চেষ্টা করেন বাঙালীর 'র'র মত আপন 'r' উচ্চারণ করতে!!! —কিন্তু ট্রিল না করে। অর্থাৎ জর্মনে যাকে বলে হ্যাল[১]—উজ্জ্বল—ফরাসীতে

---

১ কথাটা জর্মনে hell, কিন্তু বাঙলায় আমি 'হেল' না লিখে হ্যাল কেন লিখলুম সে বিষয় নিয়ে সুদূর ভবিষ্যতে আলোচনা করবার আশা রাখি। কারণ জনৈক পত্রলেখক ইটিকে আমার 'হিমালয়ান ব্লাণ্ডার' পর্যায়ে ফেলেছেন।

যাকে বলে ক্ল্যার—ক্লিয়ার, পরিষ্কার, স্বচ্ছ 'r' উচ্চারণ করাটাকে আদর্শ 'r' উচ্চারণ মনে করেন। তাই মোটামুটি ভাবে বলা যায় ফরাসী বা জর্মন এমন কি ইংরিজী 'r' উচ্চারণ করার সময় যদি জিভটাকে মুখের ভিতর ঝুলিয়ে রেখে—অর্থাৎ সেটাকে তালু, মূর্ধা বা দাঁতের পিছনে ছুঁতে না দিয়ে, এবং কাজে কাজেই কোনো প্রকারের ট্রিল বা ফ্ল্যাপ করবার সুযোগ না দিয়ে—বাঙলা 'র' ধ্বনি উচ্চারণ করা হয় তবে ঐ তিন ভাষায় ধ্বনিবিদ্ পণ্ডিতরাই আদর্শ "r" উচ্চারিত হয়েছে বলে মনে করেন। তার পর অবশ্য যদি কেউ সেটাকে খাঁটি প্যারিসিয়ান করতে চান তবে সেটা গলা থেকে আরবী 'গাইন' ঘেঁষা করবেন, দক্ষিণ-ফ্রান্সের মত করতে হলে ফার্সী 'খে' ঘেঁষা করবেন এবং জর্মন বলার সময় কলোন-বন্ অঞ্চলের 'r' উচ্চারণ করতে হলে সেটাকেও ঐ ফার্সী 'খে' ঘেঁষা করবেন। কিন্তু সর্বক্ষণ সাবধান থাকতে হবে যে, ট্রিলিং দুষ্কর্মটি যেন করা না হয়। বীরভূম অঞ্চলে যখন 'রাম'-এর পরিবর্তে 'আম' উচ্চারণ শোনা যায় তখন ঐ ট্রিলটি করা হয় না বলে—এবং রেডুকৎসিয়ো আড্ আব্‌সুর্ডুম হয়ে যাওয়ার ফলে 'র-এর সর্বনাশ হয়ে 'অ' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। ইংরিজীতেও তাই, কিংবা প্রায় তাই হয়—যখন 'r' কোনো স্বরবর্ণের পরে আসে। যথা 'hard'; এস্থলে 'r' শুধু আগের a-টিকে দীর্ঘ করে। 'r'-এর পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনধর্ম লোপ পায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে বলে কোনো কোনো ধ্বনিবিদ্ উচ্চারণ দেখাবার সময় তাই 'r' হরফটি উল্টো করে দিয়ে লেখেন এবং ছাপাখানায়ও হরফটি উল্টো করে ছাপা হয়—লাইনো বা টাইপ রাইটারে অবশ্য সেটা সম্ভব নয়। আর 'r' বলার সময় যদি বাঙলার মত সেটাকে ট্রিল করতে চান, তবে প্রাণভরে করা যায় ইতালির 'r' উচ্চারণ করার সময়। ইংরিজিতে যে স্থলে 'Irregular' বলার সময় প্রথম যে দুটো 'r' একসঙ্গে এল, সে দুটোকে দু'বার উচ্চারণ করতে তো দেয়ই না, একবারই—বাঙলার হিসেবে—প্রাণভরে করতে দেয় কই? সেখানে ইটালিয়ান 'birra' (বিয়ার) বলার সময় যদি 'r'-টা প্রেমসে ট্রিল না করেন—কম-সে-কম দুবার—তবে বিয়ারের বদলে সেই যে ফুটোয় ভর্তি এক রকম পনির হয় বেয়ারা তারই ফুটোগুলো শুধু প্লেটে করে হয়তো নিয়ে আসবে! এবং শেষ কথা: ফরাসী জর্মন ধ্বনিবিদ্ যে তাঁদের 'r' পরিষ্কার ক্ল্যার হ্যাল উজ্জ্বল রাখতে চান, তার অন্যতম কারণ, গ্রীক এবং লাতিন যে 'r' আছে সেটা সংস্কৃত 'র'-এরই মত পরিষ্কার উজ্জ্বল—এবং জানা-অজানাতে ইয়োরোপীয় পণ্ডিত মাত্রই গ্রীক- লাতিন থেকে খুব দূরে চলে যেতে চান না। এরই উদাহরণ 'গুড্‌বাই, মিঃ চিপ্‌স্ ফিল্মে আছে'।]

সত্য জ্ঞানলাভের জন্য তৃষ্ণার্ত জন যুগে যুগে বিদেশ গিয়েছে, বিধর্মীর কাছে গিয়েছে। পয়গম্বর বলেছেন, 'জ্ঞানলাভের জন্য যদি চীন যেতে হয় তবে সেখানে যেয়ো'—বলা বাহুল্য, তাঁর আমলে চীন দেশে কোনো মুসলমান ছিলেন না এবং তাই ধরে নিতে পারি বিধর্মী 'কাফেরে'র কাছ থেকে জ্ঞানসঞ্চয় করতেও তিনি আপত্তিজনক কিছু পান নি।

কিন্তু এই যে 'ফরেন' যাওয়ার হিড়িক আরম্ভ হল প্রায় শ' খানেক বছর আগে এবং স্বরাজ পাওয়ার পর—কিমাশ্চর্যমতঃপরম্—এখনো বাড়তির দিকে, তার বেশীর ভাগই ছিল 'ইস্টাম্বো' নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে – পেটটাকে এলেমে ভর্তি করার জন্য নয়। পাঠান এবং মোগল রাজারা এ-দেশেই বাস করতেন, এইটেই তাঁদের মাতৃভূমি, কাজেই বিদেশের ইস্টাম্বোর প্রতি তাঁদের কোনো অহেতুক মোহ ছিল না—যদিও বিদেশাগত হুনুরী গুণীকে তাঁরা আদর করে দরবারে স্থান দিতেন। কিন্তু ইংরেজ কলকাতায় বসেও চোখ বন্ধ করে তাকিয়ে থাকতো লণ্ডনের দিকে, Kedgeree ('কেজরী'—খিচুড়ি—কৃশর, কৃশরান্ন ?—) খাওয়ার সময় চিন্তা করতো আল্লায় মালুম কিসের!

অতএব সেখানে থেকে যদি কপালে একটি 'ইস্টাম্বো' মারিয়ে নিয়ে আসা যায় তবে পেটে আপনার এলেম গজ্‌গজ্ করুক আর নাই করুক, আপনি 'ফ্রেশ্ ফ্রম্ ক্রিস্টিয়ান হোম', আপনিও এখন গোরা রায়। তাই স্বরাজ লাভের পরও

অদ্যাপিও সেই খেলা খেলে গোরা রায়।
দিবাভাগে মন্দ ভাগ্যে তার মার খায়॥

সাবিত্রী

দক্ষিণ ভারতের একটি সানাটরিয়ামে আমার এক বন্ধুকে নিয়ে যেতে হয়েছিল। ব্যামো গোড়াতেই ধরা পড়েছিল বলে কেস্ খারাপ হতে পায় নি। আমাকেও তাই কোন প্রকারের সেবা-শুশ্রূষা করতে হত না। হাতে মেলা সময়। তাই কটেজে কটেজে—এ-সব কটেজে থাকে অপেক্ষাকৃত বিত্তশালীরা আর বিরাট বিরাট লাটের একাধিক জেনরেল ওয়ার্ড তো আছেই—ডাক্তাররা সকাল বেলাকার রোগী-পরীক্ষার রোঁদ সেরে বেরিয়ে যাবার পরই আমি বেরুতাম আমার রোঁদে। বেচারাদের অধিকাংশকেই দিনের পর দিন একা-একা শুয়ে

শুয়ে কাটাতে হয় বলে কেউ তাদের দেখতে এলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখ যে কী রকম খুশীতে উজ্জ্বল— এবং যে-ক'টি ফোঁটা রক্ত গায়ে আছে, সব ক'টি মুখে এসে যেত বলে রাঙা—হয়ে যেত, সেটা সত্যই অবর্ণনীয়।

করে করে প্রায় সব্বাইকেই আমি চিনে গিয়েছিলুম—তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীই বেশী।

একটি কটেজে আমি কখখনো যাই নি, ডাক্তার ভিন্ন আর কাউকে কখনো যেতেও দেখি নি। রোগীর পাশে সর্বক্ষণ দেখা যেত একটি যুবতী—বরঞ্চ তরুণী-ঘেঁষা যুবতী বললেই ঠিক হয়—মোড়ার উপর বসে উলের কাজ করে যাচ্ছেন; তাই বোধ হয় কেউ তাঁদের বিরক্ত করতে চাইতো না।

একদা রোদ শেষে, পথিমধ্যে হঠাৎ আচমকা বৃষ্টি। উঠলুম সেই কটেজ-টাতেই।

যুবতীটি ধীরে ধীরে মোড়া ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে অতি ক্ষীণ ম্লান হাসি হেসে বললেন, 'আসুন, বসুন। কী ভাগ্য বৃষ্টিটা নেমেছিল। নইলে আপনি হয়তো কোনদিনই এ-কটেজে পায়ের ধূলি দিতেন না।'

কী মিষ্টি গলা! আর সৌন্দর্যে ইনি রাজরানী হওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু সে কী শান্ত সৌন্দর্য! গভীর রাত্রে, ক্ষীণ চন্দ্রালোকে, আমি নিস্তব্ধ, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে দেখেছি এই শান্ত ভাব—দিক্-দিগন্ত জুড়ে। আমরা প্রাচীন যুগের বাঙালী। চট করে অপরিচিতার মুখের দিকে তাকাতে বাধো বাধো ঠেকে। এঁর দিকে তাকানো যায় অসঙ্কোচে।

রোগীও সুপুরুষ, এবং এই পরিবেশে খাটে শুয়ে না থাকলে বলতুম, রীতিমত স্বাস্থ্যবান। শুধু মুখটি অস্বাভাবিক লালচে—যেন গোরা অফিসারের মুখের লাল।

স্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে হেসে বললেন—গলাটা কিন্তু রোগীর—'রোজ চারবেলা দেখি আপনাকে এ-পথ দিয়ে আসতে যেতে। পাশের কটেজে শুনি আপনার উচ্চহাস্য। শুধু আমরাই ছিলুম অস্পৃশ্য! অথচ দেখুন, আমি মুখুজ্যে বামুন—'

আমি গল্প জমাবার জন্য বললুম, 'কোন্ মেল? আমার হাতে বাঁড়ুজ্যে ফুলের মেল একটি মেয়ে আছে।'

এবারে দুজনার আনন্দ অবিমিশ্র। এ লোকটা তাহলে পরকে 'আপনাতে' জানে। তিন্মুহূর্তে জমে গেল।

খানিকক্ষণ পরে আমি বললুম, 'আপনারা দুজনাই বড় খাঁটি বাঙলা বলেন, কিন্তু একটু যেন পুরনো পুরনো।'

মুখুজ্যে বললেন, 'আমি ডাক্তার—অবশ্য এখন অবস্থা "কবরাজ। ঠেকাও আপন যমরাজ।" তা সে যাকগে। আসলে কি জানেন, আমরা দুজনাই প্রবাসী বাঙালী। তিনপুরুষ ধরে লক্ষ্ণৌয়ে। আমার মা কাশীর, ঠাকুরমা ভট্ট-পল্লীর। সেই ঠাকুরমার কাছে শিখেছি বাঙলা—শাস্ত্রীঘরের সংস্কৃতঘেঁষা বাঙলা। সেইটে বুনিয়াদ। সবিতা আমাদের প্রতিবেশী। আমার ঠাকুরমার ছাত্রী। আমরা দুজনা হুবহু একই বাঙলা পড়েছি, শিখেছি, বলেছি। তবে ম্যাট্রিক পর্যন্ত উর্দু শিখেছি বলে মাঝে মাঝে দু-একটি উর্দু শব্দ এসে যায়—আমার ভাষাতে, সবিতার না। আপনার খারাপ লাগে?'

আমি প্রতিবাদ করে বললুম, 'তওবা, তওবা! আমি বাঙালী মুসলমান; আমরা ইও্হী দু-চারটে ফাল্তো আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করি।'

পাশ ফিরে, আপন দুই বাহু আমার দিকে প্রসারিত করে দিলেন। আমি আমার হাত দিলুম। দু'হাত চেপে ধরে, চোখ বন্ধ করে, গভীর আত্মপ্রসাদের দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বাঁচালেন। আপনি মুসলমান!'

আমি একটু দিশেহারা হয়ে চুপ করে রইলুম।

জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি যত্রতত্র খান এখানে? ডাক্তার হিসেবে বলছি, সেটা কিন্তু উচিত নয়।'

আমি বললুম, 'আমি যত্রতত্র যা-তা খাই, এবং ভবিষ্যতেও খাবো। অপরাধ নেবেন না।'

'বাঁচালেন!' এবারে আমি আরো দিশেহারা। আমি তাঁর পরামর্শ অমান্য করছি দেখে তিনি খুশী!

'বাঁচালেন! জানেন, প্রথম দিনই আপনার চেহারা দেখে, অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ করলুম আমার এক মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে।'

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমায় বলি নি, সবিতা?'

সবিতা একক্ষণ ধরে শুধু উল বুনে যাচ্ছিলেন। মাথা তুলে সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'এমন কি, চলার ধরনটি, গলার স্বরও!'

মুখুজ্যে বললেন, 'সেই বন্ধুটি যদি আজ এ-লোকে থাকতো, তবে আজ আমার এ-দুর্দশা হত না! সে কথা থাক। মূল বক্তব্য এই: ঠাকুরমা প্লাস তামাম পরিবার, প্লাস সেই সখার পরিবার—সবাইকে লুকিয়ে, বিস্তর ছলনা-জাল বিস্তার করে আমি ছেলেবেলা থেকে খেয়েছি ওর মায়ের তৈরী মুর্গী-মটন। সে খেত আমাদের বাড়িতে নিশ্চিন্ত মনে। আপনি বোধ হয় জানেন না—'

'বিলক্ষণ জানি, স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—আপনার ঠাকুরমার পাড়ার লোক -

বাড়িতে দিশী-বিদেশী সবাইকে খাওয়াতেন। তাঁর ছেলে, স্বর্গত বিনয়তোষ তিনিও নিষ্ঠাচারী ছিলেন। ঝাড়া আটটি বছর প্রতি রোববারে, তাঁর সামনে বসে, তাঁর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন করেছি আমি, মুসলমান।'

ডাক্তার বললেন, 'তারপর ঠাকুরমা মা আর সবাই গত হলেন। রইল ঐ দোস্ত-ইয়ার-সখা বেদার্-বখ্‌শ্। একই বছরে দুজনায় ডাক্তারি পাস করলুম। ইতিমধ্যে আমার বিয়ে হয়েছে। সবিতা রাঁধে ভালো, কিন্তু তার মা তাকে বলে দিয়েছিলেন, 'অন্তত রান্নার ব্যাপারে বাপের বাড়ির ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে, স্বামী যে-ভাবে খেতে চায় ঠিক সেইভাবে খাওয়াবি।' তাই সবিতা বেদারের মায়ের কাছ থেকে শিখলো বিরয়ানী থেকে ফালুদা, বুরহানী থেকে আজওয়ান রুটি। অতএব স্যার, কাল দ্বিপ্রহরে এখানে একটু হবিষ্যান্ন করবেন—' হেসে বললেন, 'অবশ্যই, মোগলাই! আসলে কি জানেন, এই যে চোখের সামনে সবিতা উদয়াস্ত উল বোনে, এটা, it gets on my nerves! আর সবিতা একটি পারফেকট আর্টিস্ট। রন্ধনে। তার অনুশীলন নেই, রেওয়াজ নেই। আপনার শোক হয় না? আমার তো ওসব খাওয়া বারণ। নিজের জন্য—'

আমি সবিতার দিকে তাকিয়ে আমার মাকে দেখতে পেলুম; বাড়িতে কেউ না থাকলে মা হাঁড়ি পর্যন্ত চড়াতো না। তেল-মুড়ি খেয়ে শুয়ে পড়তো। আর এই সবিতা নাকি বিস্বাদ বিবর্ণ মাছসেদ্ধ, কপিসেদ্ধ, পাতলাসে পাতলা যেন কড়াই-ধোয়া-জল সুপ নামে পরিচিত গব্বযন্ত্রণা স্বামীকে খেতে দিয়ে নিজে গণ্ডার-গ্রাসে খাবে বিরয়ানী, বুরহানী কাবাব-মুসল্লম!

আমি বললুম, 'ফিন্‌সে তওবা! তা-ও কখনো হয়! কিন্তু আমি একা-একা খাব?—কেমন যেন?'

আর্তনাদ করে বললেন, 'আপনি বিশ্বাস করতে পারেন না, রান্নাঘর থেকে সবিতার রেওয়াজের গন্ধ আমার নাকে আসবে—আচ্ছা, আপনি না-হয় আড়ালেই খাবেন, শুধু আমি পদগুলো কম্পোজ করে দেব। আপনাকে এ-নিমন্ত্রণ সাহস করে জানালুম, আপনি যত্রতত্র খান শুনে। নইলে—'

আমি বললুম, 'ডাক্তার, আমি জানি আপনাদের অনেকক্ষণ ধরে কথা বলা বারণ। কাল সকালের রোঁদ সেরেই আসবো। দুপুরে খাব।'

সবিতা রাস্তা অবধি নেমে এসে বললেন—মাথা নিচু করে, প্রায় হাতজোড় করে, 'এই দু'বছর ধরে আমরা এখানে আছি। এই প্রথমবার তিনি পুরো আধ ঘণ্টা ধরে খুশিতে আনন্দে সময় কাটালেন। আপনি দয়া করে আসতে ভুলবেন না। বড় ডাক্তার বলেছে, উনি ফুর্তিতে থাকলে তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন। আমি

ওঁকে বাঁচাতে চাই। আপনি আমার প্রতি দয়া করুন—'

হঠাৎ ধপ্ করে রাস্তার পাশে হাঁটু গেড়ে আমার পায়ের উপর তার মাথা ঠুকে দিল। এত দুঃখের ভিতরও আমি দেখলুম, বন্যার জলের মত একমাথা গোছা গোছা গাদা গাদা কালো চুল ঘোমটার বাঁধ সরিয়ে আমার দুই গোড়ালির হাড় পেরিয়ে, মাঝ-হাঁটু অবধি ছাপিয়ে দিল। এ-চুল আমি দেখেছি, অতিশয় শৈশবে, আজ মনে হয়, যেন আধাস্বপ্নে, যেন কুয়াশার ভিতর দিয়ে, আমার মায়ের মাথায়।

সতীসাধ্বী যুবতীকে স্পর্শ করা গুনাহ্। জাহান্নামে যাক গুনাহ্!

দু'হাত দিয়ে তাকে তুলে ধরলুম। বললুম, 'মা! ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখো।'

সীমন্তিনী বললে, 'আমি আল্লাকে ইয়াদ করি।' ॥

আধুনিকা

থেকে থেকে 'মর্ডান' মেয়েদের বিরুদ্ধে খবরের কাগজে নানা জাতের চিঠি বেরোয়। সেগুলোর মূল বক্তব্য কি, তার সবিস্তার বয়ান দেবার প্রয়োজন নেই এবং সেগুলো যে সর্বৈব ভিত্তিহীন সে-কথাও বলা যায় না। হালে পাড়ার বুড়োরা আমাকে দফে দফে মডার্নীদের 'কুকীর্তি'র কাহিনী কয়ে গেলেন। সেই সুবাদে আমার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল।

ত্রিশ বছর আগেকার কথা। তখনও এদেশে 'পেট-কাটা' 'নখরাঙানো' মডার্নীদের আবির্ভাব হয় নি, এ তো জানা কথা, কিন্তু 'মর্ডান' মেয়ে সর্বযুগে সর্বদেশেই থাকে। আমার মনে হত, সে যুগের মডার্নতম দেখা যেত চাঁদপুর—নারায়ণগঞ্জ—গোয়ালন্দী জাহাজে। এরা ঐসব অঞ্চলের ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়েথদের মেয়ে—তবে বৈদ্যই বেশী—কলকাতায় আসতো যেতো কলেজে পড়বে বলে। এক একটির চেহারা ছিল অপূর্ব। তন্বী, শ্যামাঙ্গী, স্বাস্থ্যবতী—আপন আনন্দে থার্ড ক্লাস ডেকের যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়, চায়ের স্টলে বসে খেতেও ওদের বাধে না। প্রাচীনরা ওদের দিকে একটু বাঁকা নয়নে তাকালেও একথা আমি কিছুতেই স্বীকার করবো না, ওরা বেহায়া বা বেশরম ছিল।

সে-আমলে ইণ্টার ক্লাস প্যাসেঞ্জারের জন্য দুটো জালে ঘেরা কামরা—বা খাঁচা থাকতো। একটা পুরুষ, একটা মেয়েদের। খুব যে আরামের ছিল তা নয়, তবে যে-সব লাজুক বউঝিরা পরপুরুষের সামনে কখনো বেরোয় নি তারা সেখানে

খানিকটে আরাম বোধ করতো।

সেকেণ্ড ক্লাসের কামরাতেই শুয়ে শুয়ে শুনতে পেলুম, থার্ড ক্লাস ডেক ও দুটো খাঁচা অঞ্চলে হঠাৎ আন্দোলন উত্তেজনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বয়েস আমার তখনো কম, তাই কৌতূহল ছিল বেশী। কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে শুধোই, ব্যাপারটা কি ?

হট্টগোল হচ্ছে বটে, কিন্তু যাকেই প্রশ্ন শুধোই সে-ই পাশ কাটিয়ে যায়। এস্তেক চা'র স্টলের দোকানটি পর্যন্ত এমন ভাব করলে যেন আমার প্রশ্নটা আদৌ শুনতে পায় নি।

স্যুর্‌রিয়ালিজম দাদাইজম যাঁরা জানেন তাঁরা বুঝতে পারবেন, আমি যদি তখনকার অবস্থার বর্ণনাটা দিতে গিয়ে বলি, ডেকের সর্বত্র যেন 'ছি ছি' আঁকা, কানে আসছে 'ছি ছি' স্বর, নাকের ভিতরও যেন 'ছি ছি' ঢুকছে।

টুয়েন্টিনাইন খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, দশ-পঁচিশের দান একদিকে অবহেলে পড়ে আছে, এদিকে ওদিকে ছোট ছোট দলের ঘোটালা, আর সারেঙ্গ জাহাজময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। কিন্তু সর্বোপরি ঐ ছি ছি ভাব।

তখন হঠাৎ চোখে পড়ল, মেয়েদের ইণ্টার ক্লাসের খাঁচা বেবাক ফাঁক—খানিকক্ষণ পূর্বেও যেটাকে কাঁঠাল-বোঝাই দেখে গিয়েছি—অবশ্য আড়নয়নে। আরো ভালো করে তাকিয়ে দেখি, খাঁচাটার এক কোণায় আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা কি যেন একটা বস্তু—মানুষই হবে—পড়ে আছে মেঝেতে। মনে হল, সেটা গোঙরাচ্ছে, কিন্তু ঐ 'ছি ছি'-র ভিতর দিয়ে ঠিক ঠিক ধরতে পারলুম না।

এমন সময় খানসামার সঙ্গে দেখা। পূর্বেই লোকটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—সে সিলেটি।

ইতিউতি করে বললে, 'কেলেঙ্কারি ব্যাপার। ইণ্টার ক্লাসের ঐ মেয়েটি গর্ভযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'সে কী ব্যাপার! একে কেউ সাহায্য করছে না কেন? স্টিমারে, তো গণ্ডায় গণ্ডায় বুড়ী-হাবড়ী রয়েছে যারা কুড়িবুড়িতে আণ্ডাবাচ্চা বিইয়েছে?'

খানসামার পো ঈষৎ লাজুক প্রকৃতি ধরে। আবার গাঁই-গুঁই করে বললে, 'ব্যাপারটা কি হয়েছে, হুজুর, মেয়েটার বিয়ে হয় নি।'

'তা হলে এল কোত্থেকে? সঙ্গীসাথী নেই?'

'যা শুনেছি, তাই বলছি হুজুর। কেউই সঠিক খবর জানে না। মেয়েটার সঙ্গে একটা ছোকরা ছিল ওরই বয়সী। সে মাঝে মাঝে ওকে চা-টা পৌঁছে

দিয়েছে। ছেলেটা আমার কাছেই মুর্গী-কারি খেয়েছে। মেয়েটা কোনো কিছুই খেতে রাজী হয় নি। শুধু চা-টি খেয়েছে অনেক চাপাচাপির পর—বোধ হয় জাতঘরের হিন্দু মেয়ে।'

আমি অসহিষ্ণু হয়ে বললুম, 'তা তো বুঝলুম, কিন্তু ছেলেটা কোথায়? সেই তো জিম্মেদার।'

'গর্ভযন্ত্রণার প্রথম লক্ষণ দেখা দিতেই সে গা-ঢাকা দিয়ে মাঝখানের স্টেশনে নেমে পড়ে পালিয়েছে। লোকে অনুমান করছে, মেয়েটাকে সে নিয়ে যাচ্ছিল কলকাতায় কোনো একটা ব্যবস্থা করার জন্য। দেশ থেকে বেরুতে দেরি হয়ে যায়, তাই হঠাৎ এ গর্দিশ এসে পড়েছে।'

আমি বললুম, 'সেও বুঝলুম, কিন্তু মেয়েটা বিপদে পড়েছে, আর কেউই সাহায্য করছে না! এটা একটা কথার কথা হল?'

অসহায় ভাব দেখিয়ে বললে, 'হিন্দুদের ব্যাপার, কি করে বুঝি বলুন! দু' একটি মুসলমান আছে। তারাও হিন্দুদের ঐ সব দেখে বোধ হয় সাহস পাচ্ছে না।'

আমি বললুম, 'জাহাজে ডাক্তার নেই? প্যাসেঞ্জারের ভিতরেও?'

'তারই সন্ধান চলছে, হুজুর।'

তারপর খানসামা বিজ্ঞভাবে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে যেন আপন মনে বললে, 'যত সব নাদান বেকুবের কারবার। আরে বাপু, মেয়েটার মাথায় এক থাবড়া সিঁদুর আগে লেপটে দিলেই তো পারতো!'

(জানি নে, তাতে করে কি হত! হালে এ্যারোপ্লেনে নাকি এমতাবস্থায় এ্যারহোস্টেস্ সাহায্য করতে রাজী হয় নি)।

আপন ক্যাবিনে ফিরে যাচ্ছি। এমন সময় এক সহৃদয় প্যাসেঞ্জার আমাকে পাকড়ে বললে, 'আপনি চলুন না, স্যার।'

তাজ্জব মেনে বললুম, 'আমি!'

'কেন? আপনি তো ডাক্তার!'

বুঝলুম, আমার ট্রাঙ্কে বা রিজার্ভেশন কার্ডে দেখেছে, লেখা, Dr.। কাতর কণ্ঠে বোঝাতে চেষ্টা করলুম, সেটা ভিন্ন বস্তু, বেকার, 'ফরেন'। এটা দিয়ে মাছিটার ছেঁড়া পাখনাও জোড়া দেওয়া যায় না। লোকটি বড়ই সরল। তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারি নে, চিকিৎসার ডাক্তার এক প্রাণী, আমার ডক্টরেট ত্রিসংসারে কারো কোনো কাজে লাগে না। এ ধরনের গেরো আমার জীবনে আরো দু'দুবার হয়ে গিয়েছে।

ইতিমধ্যে জাহাজে নূতন চাঞ্চল্য। কোত্থেকে পাওয়া গেছে এক না-পাস কম্পাউণ্ডার। সে বোধ হয় 'শ্মশান-চিকিৎসাটা' করতে রাজী হয়েছে। তবে বলছে, একটি মেয়েছেলের সাহায্য পেলে ভালো হত।

তারপর যা দেখলুম, সে দৃশ্যটি আমার জীবনে ভুলবো না।

ঐ যে পূর্বে বলছিলুম, জাহাজে তখনকার দিনের কলেজের দু'পাঁচটা 'আধুনিকা' নিঃসঙ্কোচে ঘুরে বেড়াতো, তাদেরই একটি—লম্বা, ছিপছিপে শ্যামবর্ণ, পরনে সাদামাটা শাড়ি ব্লাউজ—গমগম করে কম্পাউণ্ডারের দিকে এগিয়ে গেল, দু হাত দিয়ে ভিড় ঠেলে ঠেলে। তখন চতুর্দিক থেকে উঠেছে তার দিকে 'ছ্যা ছ্যা ছি ছি' রব। সকলের টার্গেট তখন ঐ আসন্নপ্রসবা নয়—তখন এই ভদ্রকন্যা।

আমি জীবনে দু'জন পরমহংস দেখেছি।

আর এই দেখলুম, একটি পরমহংসী। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নয়, সর্ব ধিক্কার, সব ব্যঙ্গ, সব বিদ্রূপ উপেক্ষা করে প্রসন্ন বদনে সে এগিয়ে যাচ্ছে !!

ফরাইজ্

'বাপের বাড়ি', 'শ্বশুরবাড়ি', 'পিতৃগৃহ', 'পতিগৃহ', 'মুখ্যগৃহ', 'গৌণ গৃহ' ইত্যাকার বহু প্রকার 'গৃহে'র নবীন নামকরণের প্রস্তাব পত্রান্তরে হয়ে যাচ্ছে। এই সুবাদে মুসলমানদের ভিতর কি রীতি প্রচলিত আছে সেটার উল্লেখ বোধ হয় সম্পূর্ণ অবান্তর হবে না। কারণ হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মের লোকাচারে, বিষয়-সম্পত্তি বণ্টন বাবদে যতই পার্থক্য থাক না কেন, উভয় ধর্মাবলম্বীরই ভাষা বাঙলা এবং মুসলমান মেয়েও বলে 'বাপের বাড়ি' 'শ্বশুরবাড়ি'। তবু একটা ব্যাপারে সামান্য তফাত আছে।

অল্প হোক, বিস্তর হোক, পিতার মৃত্যুর পর মুসলমান মেয়ে বাপের সম্পত্তির কিছুটা হিস্যে পায়। অর্থাৎ পৈতৃক ভদ্রাসনেও তার আইনত অংশ বিদ্যমান থাকে। একেই বলে 'ফরাইজ্'।

কার্যত কিন্তু সে এ-ফরাইজ্ দাবি করে না। এমন কি পতিগৃহে তার লোভী স্বামী যদি তাকে ন্যায্য হক পাওয়াব জন্য ক্রমাগত টুইয়ে দিতে থাকে তবু সে সেটার দাবি করে না, মোকদ্দমা করতেও রাজী হয় না—আর স্বামী নিজের থেকে কোনো দাবি-দাওয়া করতে পারে না, কারণ হক তার স্ত্রীর, তার নয়।

বোন কেন মোকদ্দমা করে না, তার একাধিক কারণ আছে। লোকাচারে বাধে (এতে হয় তো কিছুটা প্রতিবেশী হিন্দুর প্রভাব আছে), এবং দ্বিতীয়ত তার অন্য স্বার্থ আছে। সে যদি তার ন্যায্য পাওনা নিয়ে নেয়, তবে সে অর্থ হয়তো খর্চা হয়ে যাবে, এবং স্বামীর মৃত্যুর পর সে যদি কোনো কারণে অসহায় হয়ে যায় —দেবর ভাশুর তাকে অবহেলা করে—তবে তার অন্য আশ্রয় থাকে না। পক্ষান্তরে সে যদি ফরাইজ্ না নেয়, তবে সে তারই হক্কের জোরে বাপের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিতে পারে। এমন কি শ্বশুর ভাশুর স্বামীর জীবিতাবস্থায়ও যদি তার উপর অত্যধিক চোটপাট হয় তবে সে ফরাইজের হক্কে বাপের বা (বাপ মরে গিয়ে থাকলে) ভাইয়ের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিতে পারে।

আরো একটা কারণ আছে। মুসলমান মেয়ে মাত্রই আশা করে, সে যেন বছরে অন্তত একবার তার বাপ-মা, ভাইবোন, ছেলেবেলার পাড়াপ্রতিবেশীকে দেখতে যেতে পায়। এস্থলে স্মরণ করিয়ে দি, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান মেয়ের নাম পদবী বদলায় না। মুসলমান বিবাহ অনেকটা সিভিল ম্যারিজের মত কন্‌ট্রাক্‌ট্ ম্যারিজ—সেক্রেমেণ্টাল নয়। অপরাধ যদি না নেন, তবে উল্লেখ করি, আমার পিতার নাম ছিল সৈয়দ সিকন্দর আলী। অথচ আমার মা চিরকালই নাম সই করেছেন, আমতুল মন্নান খাতুন চৌধুরী। মিসেস আলী, মিসেস সৈয়দ —বা বেগম আলী এসব হালে ইংরেজের অনুকরণে হয়েছে।

* *

এবারে গরীব দুঃখী চাষীবাসীদের একটি উদাহরণ দি। পূব বাঙলার।

মনে করুন চাষা কেরামতুল্লা মারা গেছে। তার মেয়ে জয়নবের বিয়ে হয়েছে বেশ দূরে ভিন্ গাঁয়ে। জয়নবের বাল্যাবস্থায় তার মা মারা যায় বলে কেরামতুল্লা দুসরা শাদী করেছিল। সে পক্ষের ছেলে আকরম বিধবা মাকে নিয়ে, বিয়ে করে মোটামুটি সুখে-স্বচ্ছন্দেই আছে। সৎ বোনকে আর স্মরণেই আনে না। তার মাও সতীনের মেয়ে জয়নবকে দু' চোখে দেখতে পায় না। অতএব জয়নব বেচারী বাপের বাড়ির মুখ দেখতে পায় না। জয়নবের শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ের লোকে তাই নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করে। ওদিকে লোভী স্বামীও বলে, 'ফরাইজ্ চেয়ে নে।'

জয়নব বেচারী তখন যদি দৈবযোগে বাপের গাঁয়ের কাউকে পেয়ে যায় তখন তাকে দিয়ে ভাইকে খবর পাঠায় তাকে যেন এসে বাপের বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য নিয়ে যায়—একেই বলে 'নাইওর' যাওয়া। ভাই খবর পেয়েও গা করে না —আর সৎমার তো কথাই নেই। বেচারী জয়নব একাধিকবার খবর পাঠিয়ে

হয়রান হয়ে গেল। ওদিকে বাপের গাঁয়ের লোক তো আর তার শ্বশুরের গাঁয়ে নিত্যি নিত্যি আসে না যে নিত্যি নিত্যি খবর পাঠাবে।

তখন সে ধরে অন্য পন্থা। নদীতে জল আনতে গিয়ে সুযোগ পেলেই সময় কাটায় বিস্তর। এবং স্বভাবতই তার গাঁয়ের সব মাঝিদের সে চেনে। তাদের কাউকে দেখতে পেলে পাড়ে বসেই চিৎকার করে তার ফরিয়াদটি জানিয়ে দেয়। সবিস্তারে বলতে হয় না—সবাই সব খবর জানে।

তাতেও যদি ওষুধ না ধরে, তখন সে ধরে রুদ্রমূর্তি।

শাসিয়ে দেয়, তাকে নাইওর না নিয়ে গেলে সে ফরাইজের মোকদ্দমা করবে

এইবার ভাইয়ের কানে কিঞ্চিৎ জল যায়। তাও পুরোমাত্রায় না। ইতিমধ্যে গাঁয়ের মুরুব্বীদের কানেও তাবৎ ফরিয়াদ পৌঁচেছে—বিশেষত সেই সব বৃদ্ধদের কানে যাঁরা বিয়ের ঘটকালি করেছিলেন। তাঁরা তখন ছোকরাকে বুঝিয়ে বলেন, 'তোর আছে কুল্লে আড়াই বিঘত জমি—আচ্ছা, তার না হয় কিছুটা গেল; কিন্তু তোর বসত-বাড়িতেও যে ছুঁড়ির হিস্সে রয়েছে। সেইটেও তুই লাটে তুলবি নাকি? যা, যা, বোনকে নিয়ে আয়।'

আমি এতক্ষণ যা বললুম, এসব পূব-বাঙলার লোকসঙ্গীতেও আছে। তারই একটির শেষ দুই লাইনে আছে,

"থাকো গো বোন, থাকো গো বোন,
কিলগুঁতা খাইয়া,
আষাঢ়[১] মাসে লইয়া যাইমু
পঙ্খীরাজ ওড়াইয়া॥"

ভাই নৌকা নিয়ে আসার খবর পাওয়া মাত্রই বোন লেগে যায় নানারকম মিষ্টি পিঠে বানাতে। শাশুড়ী গজর গজর করে, কিন্তু জা-রা তো একই গোয়ালের গাই তারা সাহায্য করে।

নৌকা এল। বোন সগর্বে হাঁড়ি-ভর্তি মিঠে পিঠে নিয়ে নৌকায় চাপলো। গাঁয়ের মেয়েরা এখন আর তাকে খোঁটা দিতে পারবে না। এ তো সতীর নিঃসঙ্গ হিমালয়-যাত্রা নয়।

* *

---

১ লেখকের মনে ঈষৎ সন্দেহ আছে, এস্থলে ভাই বোধ হয় বোনকে কিঞ্চিৎ ধাপ্পা দিচ্ছে। বোনকে সচরাচর নাইওর নেওয়া হয় অঘ্রান মাসে ধান কাটার পর। কিন্তু আমি সঠিক বলতে পারবো না। কারণ দেশ ছেড়েছি দুই যুগ পূর্বে।

বুদ্ধিমতা মেয়ে বলে বাপের বাড়ি গিয়ে জয়নব পাড়াময় চর্কিবাজি মেরে দিন কাটায় না। অবশ্য সর্বপ্রথম মিঠে পিঠে নিয়ে আত্মীয়-স্বজন, সইটইদের সঙ্গে দেখা করতে যায়, কিন্তু তারপরই লেগে যায় নূতন ধানচাল যা উঠেছে তার দুরুস্ত-ব্যবস্থা করতে। অবশ্য একথাও ঠিক, কেউ তা সে যে কোনো স্ত্রীপুরুষই হোক যদি সুবো-শাম বেঘোরে ঘুমোয় তবে লোকে প্রবাদটা বলে, 'দেখো খোদার খাসিটা ঘুমুচ্ছে যেন "নাইওরী-মাগীটার" মত!'

এই করে করে 'নাইওর' বাস যখন শেষ হয়, তখন বাপের বাড়িতে আবার মিঠে পিঠে তৈরী আরম্ভ হয়—এগুলো সে নিয়ে যাবে শ্বশুরবাড়িতে। ভাই অন্তত একখানা শাড়ি, একটি কুর্তা কিনে দেবে বোনকে—জামা-ফ্রক ভাগ্নেভাগ্নিকে!

জয়নব কিন্তু ধান ভানা কোটাতে এমনই সাহায্য করে যেন ভাই, সৎমা ফ্রী চীপ-লেবারের প্রলোভনে তাকে আসছে বছর নিজের থেকেই 'নাইওর' নিয়ে আসে—ফরাইজের মোকদ্দমার শাসানি যেন মাঝি-মাল্লা মারফত না পাঠাতে হয় শ্বশুরবাড়ি ফিরে জয়নব আবার দেমাক করে, 'আমি মাগনা খাই নে পরি নে। যদ্দিন ওখানে ছিলুম সৎমাকে কুটোটি পর্যন্ত কুড়োতে দি নি!'

* *

এতক্ষণ যা নিবেদন করলুম এটা হিন্দুদের বেলাও প্রযোজ্য। প্যাটার্ন মোটামুটি একই, তবে তফাৎটা কোথায়?

তফাৎ ঐ ফরাইজের হক্ক, ড্যুরেস, ব্ল্যাকমেল (অবশ্য বেআইনী নয়) দিয়ে সে বাপের বাড়ি যাবার হক্ক আজীবন জিইয়ে রাখে। স্বামীর সঙ্গে না বনলে সেই হক্কের জোরে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাপের বাড়ি চলে আসে। অবস্থা চরমে পৌঁছলে সেখানে বসে স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ন্যায্য স্ত্রীধনের মোকদ্দমা লাগায়। কিংবা যদি স্বামীর মৃত্যুর পর ভাশুর-দেওর তাকে অসম্মান করে তবে সে চলে আসে বাপের বাড়িতে, ঠুকে দেয় ওদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা। এগুলোই আসল তত্ত্ব বলে পুনরাবৃত্তি করলুম।

* *

এ সব সম্ভব বাপের বাড়ির ফরাইজের জোরে।

তাই সেটি সে কখনো হাত-ছাড়া করে না। লোভী স্বামী যতই চোটপাট করুক না কেন।

হিন্দু মেয়েরা একটু চিন্তা করে দেখবেন॥

চোখের জলের লেখক

ইংরিজির শব্দভাণ্ডার অতুলনীয়। তন্মধ্যে একটি শব্দ 'গ্যাগা'—এর সঠিক উচ্চারণ না জানা থাকলেও ক্ষতি নেই। 'গ্যাগা' শব্দের অর্থ, লোকটার ব্রেন্-বক্সে যা আছে—যদি কিছু আদৌ থাকে—সেটা এমনই হযবরল গোবলেট পাকানোর জগা-খিচুড়ি যে কেউ কিছু বললে তার গলা দিয়ে যে ধ্বনি বেরয় সেটা 'গাগা', 'গ্যাগো' 'গ্যাগ্যা' গোঙরানো ঢপের—কাজেই শব্দটির যে কোনো উচ্চারণই মঞ্জুর। অর্থাৎ গাগার সঙ্গে ইম্‌বেসাইল, ইডিয়ট ('পণ্টক' বললুম না, কারণ সুনীতিবাবুর শব্দটির কপি-রাইট মেরে দিয়ে সেটার পাইরেটিং সংস্করণ বের করার দরুন পাড়ার ছোঁড়ারা আমাকে 'কণ্টক' থেকে 'কাঁটা', 'পণ্টক' থেকে 'পাঁঠা' বের না করে আড়াল থেকে আমাকে 'পন্‌ঠক্' বলতে আরম্ভ করেছে) গোবর-গণেশ যে কারো সঙ্গে তুলনা করলে শেষোক্তদের অপমান করা হয়।

সেই গ্যাগাদের গ্যাগা—গ্যাগায়েস্টের মত আমি শুধু অর্থহীন কতকগুলো ধ্বনি বের করলুম যখন আমার এক নিত্যালাপী গুণী বললেন, জনৈক অধ্যাপক[১] নাকি প্রকাশ্য সভাস্থলে রায় প্রকাশ করেন, স্বর্গত, প্রাতঃস্মরণীয় শিল্পীরাজ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নাকি থাড্ডোকেলাস্ 'চোখের জলের লেখক'। আচ্ছা, পাঠক তুমিও কও, সেস্থলে তুমি কি করতে! শরৎচন্দ্র কাঁদিয়েছেন! শরৎচন্দ্র হাসান নি! সামাজিক নিষ্ঠুরতার কাঁটাবনের উপর দিয়ে আমাদের কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যান নি!—কাঁদাবার জন্য নয়, যন্ত্রণায় চিৎকার করার জন্য। ব্যঙ্গ, শ্লেষ, বিদ্রূপ-বাণে আমাদের জর্জরিত করেন নি?

এই পুণ্য বঙ্গভূমিতে শতাধিক বর্ষ ধরে দুটি দল আছে। রামমোহন বনাম সতীদাহের দল, বিদ্যাসাগর বনাম নিরম্বু উপবাসের দল, রবীন্দ্রনাথ বনাম—তা সে যাই হোক্। সেই দল চেষ্টা করেছিলেন শরৎচন্দ্রকে নেতা বানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে অতিষ্ঠ করে তুলতে। তাঁরা মাষা পরিমাণ কৃতকার্য হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, শরৎচন্দ্র দলের বাইরে। শরৎচন্দ্র যেমন 'দত্তা'র 'রাসবিহারী' চরিত্র আঁকেন, ঠিক তেমনি 'নারীর মূল্য'ও লিখতে জানেন। (আশা করি বলার প্রয়োজন নেই যে শরৎচন্দ্র এই অমূল্য গ্রন্থ কাঁদাবার জন্য লেখেন নি; পাঠক, আপনি সে বই পড়ে কি ভেবেছেন সঠিক বলতে পারবো না; আমার মনে হয়েছে, আমি যেন দু গালে চড় খাচ্ছি এবং জানি যখন এ-ই আমার

---

১ যে-কোনো কারণেই হোক, বন্ধুবর নাম উল্লেখ করলেন না, আমিও শুধোই নি।

প্রাপ্য তাই আমি তখন কাঁদি নি—কারণ কাঁদবার হক্কও সঞ্চয় করতে হয়।)

এদিকে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'অন্ধভক্তে'র দল—ডেকে আন্ বললে যারা বেঁধে আনে—(যদিও আমি রবীন্দ্র-শিষ্য হিসেবে শপথ করে বলতে পারি, তিনি ডেকে আনতেও বলেন নি) লাগলেন শরৎচন্দ্রের পিছনে। তার জের আজও চলছে। অবশ্য এস্থলে আমি করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষাকরে নিবেদন করি, পূর্বোল্লিখিত অধ্যাপক এ-'দলে'র নাও হতে পারেন। তিনি হয়তো তাঁর স্বাধীন ধর্মবুদ্ধি অনুযায়ী তাঁর বক্তব্য বলেছেন।

কিন্তু এসব 'বৃথা বাক্য'। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একটি 'তুলনাহীনা' কবিতা লিখতে লিখতে হঠাৎ লিখেছেন, 'বৃথা বাক্য থাক্'। গুরুবাক্য স্মরণে এবং সেই নীতি অনুযায়ী আমারও মন তাই এতক্ষণ ধরে বৃথা বাক্য ভুলে গিয়ে শুধু ঝাঁকুবাঁকু করছে, মেজদার স্মরণে—যিনি দুর্দান্ত শীতের রাতে লেপের ভিতর কচ্ছপটির মত শুয়ে আছেন আর শ্রীকান্ত তাঁর জন্য পাতা উল্টে দিচ্ছেন, হঠাৎ ব্যাঘ্ররূপী 'বউরূপী'র আবির্ভাব, ভিরমি কাটলে পর মেজদা ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার'—ইতিমধ্যে খড়ম পেটাতে পেটাতে (আহা, কী সুন্দর ছবিটি।) কটুবাক্য, 'খোট্টার ব্যাটারা কাঁঠাল পাকা দিয়া'—এবং সবশেষে পিসীমার সাত পাকের সোয়ামীর প্রতি অত্যন্ত প্র্যাকটিকাল সময়োপযোগী সদুপদেশ,—কাটা ন্যাজটি ভবিষ্যতের সুব্যবহারার্থে তরিবৎ করে তুলে রাখার জন্য—সেকালে বোধ হয় ভাগলপুরে ব্যাঙ্কে ভল্টের ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু সাবধান! আমাকে সর্বক্ষণ সচেতন হয়ে থাকতে হবে যেন ফাঁদে পা না দি ;—শরৎচন্দ্র যে বাঙলা দেশকে হাসিয়েছেন তার উদ্ধৃতি দেবার প্রলোভন সম্বরণ না করলে বর্তমানে যাদের হাতে শরৎ-গ্রন্থাবলীর কপিরাইট তাঁরা আমাকে জেলে পুরবেন—পাতার পর পাতা নিছক পুনর্মুদ্রণ তাঁরা বরদাস্ত করবেন কেন? অথচ আমার বক্তব্য তো স্পষ্টতম হবে, যদি আমি একটি মাত্র বাক্যব্যয় না করে নিছক উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি দিয়ে যাই।

তর্কস্থলে স্বীকার করছি কাঁদানো সহজ। হাসানো কঠিন। টেকো ভদ্রলোক তাঁর বাদবাকি কুল্লে আড়াইগাছা চুল দিয়ে মাথার সামনের দিকের চালটা যেন খড় দিয়ে ছাওয়ার নিষ্ফল প্রচেষ্টা করেছেন—তাই দেখে রকে বসে আমার তিন ভাগনে যে 'সেব্রামীয়' টিপ্পনী কাটলে সেটি অনায়াসে অলিম্পিকে পাঠানো যায় এবং সেটি আমি ঘরের ভিতর থেকে স্পষ্ট শুনতে পেলুম। কিন্তু, হায়, ওদের সঙ্গে যোগ দিতে পারলুম না, কারণ, সরলতম কারণ, আমার আপন টাকটি—থাক, 'বৃথা বাক্য থাক্'। কিন্তু ঠিক ঐ সময় অন্য একটি ভদ্রলোক রাস্তা দিয়ে যাবার সময় রক্ থেকে যদি শব্দ আসতো, 'আহা বেচারা, কাল রাত্রে তার ছেলেটি

—জানিস, কি হয়েছে?'—বাকিটা শুনতে পেলুম না বলে হেঁকে শুধালুম, 'কেন রে, কি হয়েছে?' 'টাইফয়েডে একটা চোখ গেছে।' আমি তখন রকেরই একজন হয়ে গেলুম।

কিংবা সরলতর উদাহরণ দি।

ঐ বৈঠকখানায়ই বসে আছি। বাড়ির বউঝিরা রান্নাঘরে ফিস ফিস করে গালগল্প করতে করতে—রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না—হঠাৎ সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলো। আমি যত গ্যাগা-ই হই না কেন, উঠে গিয়ে শুধবো না, 'হ্যাঁ বউমা, তোমরা হাসছিলে কেন?'

কিন্তু তারা যদি হঠাৎ একসঙ্গে ডুকরে কেঁদে ওঠে তবে আমি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গিয়ে জানতে চাইবো তারা এরকম ধারা হঠাৎ কেঁদে উঠলো কেন? অর্থাৎ হাসি একে অন্যের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায়, কান্না কাছে টেনে আনে।

* *

শরৎচন্দ্র 'চোখের জলের লেখক'? আর বিদ্যেসাগর? বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সময় তিনি যে সব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন, তখন আমরা ঠাঠা করে হেসেছি?—না? তাঁর 'শকুন্তলা' পড়তে পড়তে আমি তো হেসেই গড়াগড়ি! রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস নিশ্চয়ই অত্যন্ত অপ্রচুর ছিল। নইলে তিনি লিখবেন কেন, 'কেহ দুঃখ পায় ইহা তিনি (শ্রীকণ্ঠবাবু) সহিতে পারিতেন না—ইহার কাহিনীও তাঁহার পক্ষে অসহ্য ছিল। এই বালকদের কেহ যখন কৌতুক করিয়া তাঁহাকে পীড়ন করিতে চাহিত তখন বিদ্যাসাগরের "সীতার বনবাস" বা "শকুন্তলা" হইতে কোনো একটা করুণ অংশ তাঁহাকে পড়িয়া শোনাইত, তিনি দুই হাত তুলিয়া নিষেধ করিয়া, অনুনয় করিয়া কোনো মতে থামাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।'

আশ্চর্য! আমি তো গ্রন্থ দু'খানা পড়ে হেসেই কুটিকুটি! তবে হ্যাঁ, আমি পূর্বেই স্বীকার করেছি আমি গ্যাগা।

সাহিত্যিক বিদ্যাসাগর মশাইকে লোকে চেনে তাঁর 'চোখের জলে'র বইয়ের জন্য। অবতার বিদ্যাসাগরকে বাঙালী চেনে তিনি মানুষের চোখের জল মুছিয়ে দিতেন বলে। বিদ্যাসাগর মশাই দুটোই পারতেন। কিন্তু সবাই তো তা পারে না। সমাজের অত্যাচার অনাচার দেখে সত্য সাহিত্যিক মানুষকে কাঁদায়। তাঁদের ভিতরে যাঁরা সত্যকার মানুষ তখন তাঁদের অনেকেই সে-সব অনাচারের বিরুদ্ধে নাঙ্গা তলওয়ার নিয়ে জেহাদ ঘোষণা করে। কারণ আমাদের অধিকাংশই জড়। সাহিত্যিক স্পর্শকাতর। সে যখন করুণ বর্ণনা দিয়ে আমাদের কাঁদায়,

তখন আমাদেরই মত জড়ভরতদের কেউ কেউ ঐ সম্বন্ধে সচেতন হয়।[২]

ড্রাইফুসের প্রতি নষ্টাধম ফরাসী মিলিটারী মদমত্ত হয়ে যে অবিচার করে তার প্রতিকারের জন্য তাঁর সতীসাধ্বী স্ত্রী প্যারিসের বড় বড় রাজনৈতিক শক্তিধর শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারে দ্বারে গিয়ে করুণ আর্তনাদ করেছে। কিন্তু সে বেচারী তো আমাদের 'তুলনাহীনা' লেখিকা আশাপূর্ণা নয়। শেষটায় চরম দীনজন যে রকম ভিক্ষুকের কাছে ভিক্ষা চায়, ঠিক সেই রকম সে গেল সাহিত্যিক এমিল জোলার কাছে। তাঁর তখন বয়স হয়ে গিয়েছে। তিনি মাফ চাইলেন। শেষটায় বেচারী তার কাগজপত্র জোলার টেবিলে ফেলে রেখে চলে গেল।

এই পৃথিবীর পরম সৌভাগ্য সেরাত্রে জোলার কোন কিছু করার ছিল না। এটা ওটা নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ সেই রমণীর কাগজপত্র চোখে পড়লো। অলস-ভরে পড়া আরম্ভ করে, বুড়া হঠাৎ সোজা হয়ে বসল—তারপর গেল ক্ষেপে। তখন লিখল জাক্যুজ (J'accuse) 'আই একুজ'। 'ফরাসী সরকারকে আমি একুজ করি'।

তারপর কি হল সেটা বলতে গেলে ঐ বইখানা ছাড়িয়ে আরো দুখানা বই লিখতে হয়।

মনে নেই, ক'বছর নির্বাসনের কারাযন্ত্রণা ভোগ করে 'কাঁদানো'র লেখক জোলার কৃপায় ড্রাইফুসের প্রতি সুবিচার হল।

শেষ কথা: বহু বহু প্রকৃত লেখক, 'চোখের জলের লেখক' নন কিংবা শুধু 'হাসাবার' লেখক নন। দুইই।

তবে কে কোথায় হাসবে, কে কোথায় কাঁদবে, বলা কঠিন। সেই "অরক্ষণীয়া" মেয়েটি যখন পড়ি-মরি হয়ে 'সেজেগুজে' কনে দেখবার পক্ষের সামনে বেরুতে যাচ্ছিল তখন একটি ছোট মেয়ে হাসি থামাতে না পেরে বলেছিল, পিসিমা সং সেজেছে।

আমি গ্যাগা। আমি ষোল বছর বয়সে কেঁদেছিলুম॥

৪।১২।৬৫

---

২ বিদ্যেসাগর ছদ্মনামে হাস্য—বরঞ্চ বলা উচিত—ব্যঙ্গরসও করে গেছেন। কিন্তু তাঁর খ্যাতি সেজন্য নয়। বস্তুত তাঁর সে সব ছদ্মনামে লেখা পুনরায় 'আবিষ্কৃত' হয় বছর বিশ-ত্রিশ পূর্বে।

ছাত্র বনাম পুলিশ

(১)

'দেখি! বের করো অভিজ্ঞান-পত্র—আইডেনটিফিকেশন কার্ড!'

কী আর করে বেচারী—দেখাতে হল কার্ডখানা। নামধাম ঠিকানা তো রয়েইছে, তদুপরি রয়েছে বেচারীর ফোটোগ্রাফ, তার নিচে ছোকরার দস্তখত, এবং দুটোর দু'কোণ জুড়ে য়ুনিভার্সিটির স্ট্যাম্প। হোমিওপ্যাথিক পাসপোর্ট আর কি!

হায় বেচারা! যখন য়ুনিভার্সিটিতে প্রবেশ করার ওক্তে সগর্বে কর্তৃপক্ষের সম্মুখে ফোটোগ্রাফের নিচে দস্তখত করেছিলে তখন কি জানতে এটা 'দস্তখত' নয়, এই 'কুকর্ম' করে তার 'দস্ত্' (হাত) 'ক্ষত' হয়েছিল—এ 'পান্'টি আমার নয়, বিদ্যেসাগর মশাইয়ের। তাঁর প্রোতেজে মাইকেল পান করতেন প্রচুর, স্বয়ং বিদ্যেসাগর 'পান্' করতেন অত্যল্পই!

প্রাগুক্ত সরস প্রেমালাপ হচ্ছিল জর্মানির কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং পুলিশম্যানে (চলতি জর্মনে 'শুপো')। ছোকরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে রাত দুটোর সময় কাঁকর ছুঁড়ছিল একটি বিশেষ জানলার শার্সিকে নিশান করে, এবং যেহেতু তৎপূর্বে—অর্থাৎ শনির সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দুটো অবধি চেন-স্মোকারদের মত এ্যাট্টুখানি, মানে ইয়ে, ঐ যাকে বলে বিয়ার—পান করেছিল বলে তাগটা স্বভাবতই টালমাটাল হয়ে পাশের যার-তার জানলার শার্সির উপর পড়ছিল। অবশ্য একথা অবিসম্বাদিত সত্য যে, সে কাপুরুষের মত শুপোর হাতে আত্মসমর্পণ করে নি—আপ্রাণ পলায়ন-প্রচেষ্টায় নিষ্ফল হয়ে তবে ধরা পড়ে।

ব্যাপারটা সবিস্তার কি?

অতি সরল। জর্মন ছাত্রছাত্রী ডিগ্রী লাভের পূর্বের তিন বৎসর ভূতের মত খাটে। কিন্তু শনির সন্ধ্যা থেকে রবির সকাল পর্যন্ত দল বেঁধে 'পাবে' ব'সে প্রেমসে বিয়ার পান করে। এবং যেহেতু বাড়াবাড়ি না করলে খৃষ্টধর্ম মদ্যপান সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করে না, তাই কোনো কোনো ধর্মানুরাগী ছেলে ভোর সাতটার 'মেস' (উপাসনায়) যোগ দিতে যায় 'পাব' থেকেই, সোজা গির্জার দিকে—শনির সন্ধ্যা থেকে রবির ভোর ছ'টা, সাড়ে ছ'টা অবধি বিয়ার পান করার পর। অবশ্যই মত্তাবস্থায় নয়—তবে ইংরিজীতে যাকে বলে ঈষৎ মডলিন।

তা সে যাক। এ লেখনের বিষয়বস্তু—পুলিশ বনাম স্টুডেন্ট ('স্টুডেন্ট' বলতে জর্মনে একমাত্র য়ুনিভার্সিটি স্টুডেন্টই বোঝায়—স্কুলবয়কে বলে 'শুলার')। এই দুই দলের মধ্যে হামেহাল—অবশ্য সাধারণত সন্ধ্যার পর থেকে ভোর পর্যন্ত

এবং বিশেষ করে শনির দিনগত রাতে—একটা অঘোষিত বৈরিতা বিরাজ করছে, য়ুনিভার্সিটি সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে। আমি যা নিবেদন করতে যাচ্ছি তার ঐতিহাসিক পটভূমিটি কিন্তু কিংবদন্তীমূলক, অর্থাৎ পুরাণ জাতীয়। সেইটুকু সয়ে নিন। তার পরই মাল।

আমরা সকলেই জানি কতকগুলো উপাধি মানুষের নামের অচ্ছেদ্য অংশ: যেমন (১) রেভারেণ্ড, (২) কর্নেল, বা (৩) ডক্টর (শুধু চিকিৎসক অর্থে নয়; যে কোনো বিষয়ে পি এচ ডি; ডি এস সি জাতীয় ডক্টরেট পাস করা থাকলে)। প্রথম শ্রেণীর উপাধিগুলো বিধিদত্ত, দ্বিতীয়গুলো রাজদত্ত এবং তৃতীয়গুলো য়ুনিভার্সিটি-দত্ত।

রাজাতে চার্চে লড়াই বহু যুগ ধরে চলেছে। এ-লড়াইয়ে শেষের দিকে এলেন য়ুনিভার্সিটি। তার পূর্বে শিক্ষা-দীক্ষার ভার ছিল প্রধানত পাদ্রীদের হাতে। কিন্তু মহামতি লুথারের আন্দোলনের ফলে বহু পিতা পুত্রকে আর 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন' যাজক সম্প্রদায়ের কাছে মানসিক, হার্দিক এমন কি আধিভৌতিক উন্নতির জন্য পাঠাতে চাইলেন না। এ ছাড়া আরো বিস্তর কারণ ছিল, কিন্তু সেগুলো এস্থলে অবান্তর না হলেও নীরস। মোদ্দা কথা, চার্চ ও রাজার লড়াইয়ের মধ্যিখানে য়ুনিভার্সিটিগুলো তক্কে তক্কে রইল আপন আপ- স্বয়ংসম্পূর্ণ-স্বাধীনতা-স্বরাজ লাভের জন্য। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল লুথারপন্থী এবং তাদের মূল নীতি ছিল অনেকটা—'যখন পোপের "গুরু-বাদ" ত্যাগ করে স্বয়ং স্বাধীনভাবে বাইবেল পড়তে চাও, এবং তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একমাত্র স্বাধীন চিন্তার উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করতে চাও, তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দিতে হবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, (অটোনমাস ইণ্ডিপেনডেন্স)—নইলে তারা স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন বিচার-বিশ্লেষণ করবে কি প্রকারে?'

যে করেই হোক সে স্বাধীনতা য়ুনিভার্সিটি-টাউনগুলোর (অর্থাৎ যে শহরগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্বপ্রধান সর্বজনমান্য প্রতিষ্ঠান) রাস্তাঘাটেও সক্রিয় হয়ে উঠলো। অর্থাৎ নিতান্ত খুন, ধর্ষণ জাতীয় পাপাচার না করলে স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয়ই ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আপন জেলে (?) পুরে দিতো—বিচারের ভার নিতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' বা আইন, জুরিস্প্রুডেন্সের প্রফেসরগণ—'ছাত্র আসামী' এঁদেরই একজন বা একাধিকজনকে আপন উকীল নিয়োগ করতো—এবং সবকুছ ফ্রী-গ্র্যাটিস-এ্যাণ্ড-ফর্-নাথিং!

সে-সব দিন গেছে। তবু শুনেছি, হাইডেলবের্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংবা অন্য কোনো একটা হতে পারে—আমার ঠিক মনে নেই—জেলখানাটি নাকি এখনো

মিউজিয়ামের মত বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। এবং সেটি নাকি সত্যই দ্রষ্টব্য বস্তু।

যে-পাঠক বাঙলা ভাষার অতুলনীয় (আমার মতে বাঙলা ভাষার 'অদ্বিতীয়') পুস্তক, উপেন বাঁড়ুয্যের 'নির্বাসিতের আত্মকথা' পড়েছেন, তিনি হয়তো স্মরণে আনতে পারবেন (আমিও স্মৃতির উপর নির্ভর করে বলছি ; তাই ভুলচুক হবে নিশ্চয়ই, এবং তার জন্য মাফ চাইছি) যে, যখন অরবিন্দ-বারীন-উল্লাস-উপেন-কানাই-সত্যেন এট আল্-এর বিরুদ্ধে আলীপুরে বোমার মামলা হয় তখন হাজতে থাকাকালীন ছোকরাদের মধ্যে যাদের অদম্য কবিত্বপ্রকাশব্যাধি ছিল. তারা লেখনীমস্যাধারাভাবাৎ কাঠকয়লা দিয়ে দেয়ালে পদ্য লিখত। তারই একটি,

'ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে পাট শরীর হইল কাঠ
সোনার বরণ হৈল কালি
প্রহরী যতেক ব্যাটা বুদ্ধিতে তো বোকা-পাঁঠা
দিনরাত দেয় গালাগালি।'

যতদূর মনে পড়ছে, 'উপীন'বাবু যেন মুচকি হেসে মন্তব্য করছেন, আহা কী 'সোনার বরণ'ই না বঙ্গসন্তানের হয়!

তারপর যা লিখছেন তার সারমর্ম ; মাঝে মাঝে দু'একটি ভালো কবিতাও চোখে পড়ত। উদাহরণ-স্বরূপ দিয়েছেন,

'রাধার দুটি রাঙা পায়ে
অনন্ত পড়েছে ধরা,
ওঠে ভাসে কত বিশ্ব
চিদানন্দে মাতোয়ারা।'

এবারে তিনি যেন তাঁর চোখে একফোঁটা জল আসতে না আসতে দুঃখ করছেন, 'হায় রে মানুষের মন! কারাগারের পাষাণ-প্রাচীরের ভিতরেও রাধার দু'টি রাঙা পায়ের জন্য সে আছাড় খায়।'[১]

* *

জর্মন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন যুগের আপন জেলখানার কথা হচ্ছিল। তার

১ অধীন পারতপক্ষে আপন বইয়ের বরাত দেয় না, কিন্তু এ-স্থলে নিতান্তই বাধ্য হয়ে নিবেদন, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'নির্বাসিতের আত্মকথা'র উপর মল্লিখিত প্রশস্তি ময়ূরকণ্ঠীতে পশ্য। তবে অনুরোধ এই, মূল বইখানা প্রথম পড়বেন। তারপর আমার বই পড়ার প্রয়োজন আশা করি আর হবে না।

অন্যতম প্রাচীনতমের নিঃসন্দেহ সর্বোৎকৃষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন মার্ক টুয়েন্। সে বর্ণনাটি এমনই সব-জাতের-বাড়া চৌম্বকীয় আকর্ষণীয় বর্ণনা যে তারই টানে আমারই চেনা এক সহযাত্রী জর্মন-সীমান্তে পৌঁছেই নাক-বরাবর চলে যান ঐ জেল দেখতে—সা সুসি প্রাসাদ, ড্রেসডেনে সঞ্চিত রাফায়েলের মাদোন্না নস্যাৎ করে!

আলীপুরের যে সব 'কবিরা' প্রহরীকে পাঁঠা নাম দিয়েছেন, কিংবা চোখ বন্ধ করে রাধার দুটি রাঙা পায়ের ধ্যানে মজে গেছেন, তারা কিন্তু বিলক্ষণ জানতেন, তাঁদের জন্য মৃত্যু জেলের চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করছে—শহীদ হওয়ার সম্ভাবনা কবি, অকবি সকলেরই প্রায় সমান। কিন্তু জর্মন-বিশ্ববিদ্যালয়-জেলে ছাত্রেরা যেত অল্প কয়েক দিনের জন্য, ফাঁসির তো কথাই ওঠে না। তাই মার্ক টুয়েনের পক্ষে সম্ভব হয়েছে অপূর্ব হাস্যরসে রঞ্জিত করে সেই জেলটির বর্ণনা দেবার। কাজেই উপস্থিত আলীপুরের কথা ভুলে যান।

* *

বিশ্ববিদ্যালয়ের জেলে ফাঁসি-কাঠ না থাকতে পারে, ক্যাবারে কাঁ কাঁ'র ব্যবস্থা না থাকতে পারে, কিন্তু লেখনী-মস্যাধারের অভাব!—এটা কল্পনাতীত। যদিস্যাৎ ঐ জর্মনীরই সর্বোৎকৃষ্ট দশ লিটার বিয়ার প্রসাদাৎ কল্পনাটা করেই ফেলি, তখন চোখের সামনে, বিকল্পে ভেসে উঠবে পেন্‌সিল্—এ-কথা তো ভুললে চলবে না, এদেশের কেতাবপত্রে মহামান্য কাইজারের (ভারতীয় কাইসর-ই-হিন্দ পদক, লাতিন সীজার ইত্যাদি) নাম পড়ার বহু পূর্বেই ভারতীয় ছেলেবুড়ো ব্যবহার করেছে, Koh-i-noor, made by L. & C. Hardmuth in Austria, graphite[২] drawing pencil, compressed lead.

তাই সেই পেনসিল অকৃপণ হস্তে ব্যবহৃত হয়েছে ছাত্র-'কয়েদী'র দল দ্বারা বংশপরম্পরায়—সাদা দেয়ালের উপর। শুধু কবিতা না বহুবিধ অন্যান্য চীজ্!

কিন্তু তৎপূর্বে তো জানতে হয়, এরা জেলে আসতো কোন্ কোন্ 'অপরাধ' করে। এর অনেকগুলোই আমি স্বচক্ষে দেখেছি, এবং সাতিশয় সন্তোষ

---

২ এসব বাবদে জর্মনী অস্ট্রিয়া একই ধরা হয়। হিটলার নিজে অস্ট্রিয়ান হয়েও জর্মনীর ফ্যুরার হয়েছিলেন, এ সব তো জানা কথা। উভয় দেশের ভাষাও এক।

সহকারে স্বীকার করছি, সবল সক্রিয় হিস্সেদারও হয়েছি বহু ক্ষেত্রে, অর্থাৎ গুপো-স্টুডেন্টেন, পুলিশ ভর্সস্ ছাত্র 'যুদ্ধে'—কিংবা যুদ্ধ আসন্ন দেখে দ্রুততম গতিতে পলায়নে। কিন্তু সেটা অন্য অধ্যায়।

॥ ২ ॥

'পাজীটা এখনো এল না যে, ব্যাপারটা কি? বলেছিল না, তার কাকা আসছে ডান্‌ৎসিগ থেকে, ওর জন্য নিয়ে আসবে কয়েক বোতল অত্যুৎকৃষ্ট ডান্‌ৎসিগার গোল্ট্ ভাসার্ (ডান্‌ৎসিগের স্বর্ণবারি—সোমালী সোমরস), আমরা সবাই হিস্সে পাবো।'

'একটা ফোন করলে হয় না?'

'হুঁ! সেই আনন্দেই থাকো! টেলিফোন! বুড়ির বাড়িতে এখনো দড়ি টেনে ভিতরের ঘণ্টা বাজাতে হয়। ইলেকট্রিক বেল্ পর্যন্ত নেই। তবে, হ্যাঁ, গার্ল ফ্রেণ্ডদের যখন তখন আপন কামরায় নিয়ে যেতে দেয়। তদুপরি বুড়ি বদ্ধ কালা। শুনেছি, পায়ের উপর গরম ইস্ত্রিটা হঠাৎ হাত থেকে ফসকে পড়ে গিয়েছিল—শুনতে পায় নি!'

রসালাপ হচ্ছিল শনির সন্ধ্যায় 'পাব'-এ। জনসাতেক মেম্বর জমায়েৎ হয়ে একটা গোল টেবিল ঘিরে বিয়ার পান করছেন। সেটার উপর কোনো টেবিল-ক্লথ নেই। আছে গত একশ বছরের স্টুডেন্ট খদ্দেরদের নাম, যারা প্রতি শনিবারে এই টেবিলটা ঘিরে গুলতানি করেছে—ছুরি দিয়ে খোদাই করা। আমাদের পলের বাপ ভিল্ হেল্‌মের নামও এই টেবিলে আছে। সমস্ত টেবিলটা নামে নামে সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে গিয়েছে—আর নূতন নাম খোদাই করার উপায় নেই।

এদের গুলতানির বর্ণনা বা ইতিহাস দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। কারণ সবাই জানেন, সেই সোক্রাতেসের যুগ থেকে ইয়োরোপের গুণীজ্ঞানী থেকে চোরচোট্টা সবাই মদ্যালয়ে বসে বিশ্রম্ভালাপ করেছেন, এবং সহজেই অনুমেয়, চোরচোট্টারা প্লাতোর 'আইডিয়া'র সংজ্ঞা খুঁজতে গিয়ে ছোরাছুরি করে নি, আর সোক্রাতেস প্রতিবেশীর তালাটি কি প্রকারে নিঃশব্দে বে-কার করা যায় তাই নিয়ে মদ্যপান করতে করতে শিষ্যদের সঙ্গে কূট ষড়যন্ত্রে ত্রিযামা যামিনী যাপন করেন নি। অর্থাৎ যে যার বৈদগ্ধ্য, জ্ঞানবুদ্ধি, যাতে তার চিত্তাকর্ষণ তাই নিয়ে কথাবার্তা কইতে ভালোবাসে। তবে হ্যাঁ, মদ্যপানের মেকদার

বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার বিষয়বস্তু যে ঈষৎ নিম্নস্তরে নেমে যায় সেটা অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। জর্মনির স্টুডেন্টদের বেলায়ও তাই।

আমার ছিল মেজাজমর্জি অত্যন্ত খারাপ। ঠিক সেদিনই খবর পেয়েছি ইংরেজ গোল্ড স্ট্যাণ্ডার্ডকে তালাক দিয়েছে। তারই ফলে আমার কুল্লে বচ্ছরের খরচার জন্য ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার এক-তৃতীয়াংশ (বেশী হতে পারে, কমও হতে পারে, এতকাল পর সঠিক বলা কঠিন) কর্পূর হয়ে গেল। অর্থাৎ এখন যে য়ুনিভার্সিটি রেস্তোরাঁর সবচেয়ে সস্তা ডিনারটি (সে যুগে দাম ছিল এদেশী পয়সায় কুল্লে বারো আনা) খাবো, তারো উপায় রইল না। কাল সন্ধ্যা থেকে রাত্তিরের খাওয়াটা নিজেকেই রাঁধতে হবে। ওদিকে দেশের ইয়াররা ভাবছেন, 'লেখাপড়ায় আস্ত একটা গর্দভ ঐ ছেলে জর্মনি গিয়ে তোপা মজাটা লুটে নিলে, মাইরি!'

ইতিমধ্যে এসব 'পাবে' শনির সন্ধ্যায় যা-সব হয় সে-সবই হয়ে গেছে। ঠেলায় করে গরম গরম সসেজ এসেছে, দু'চারটে আনাড়ি বাজিয়ে ব্যাঞ্জোর উপর উৎপাত করে যৎসামান্য কামিয়ে গিয়েছে, পিকচার পোস্টকার্ড জুতোর ফিতে বিক্রির ছলে ভিখিরি তার রোঁদ মেরে গেল।

করে করে রাত একটা বাজলো। বিস্ময়বোধক চিহ্ন দেবার জন্য ঐ চিহ্নেরই বিন্দুটির বিন্দুবৎ প্রয়োজন নেই। শনির রাত্রি জর্মনিতে আরম্ভ হয় বারোটায় —যদ্যপি গ্রিনিজ ফয়তা ঝাড়ে ঐ সময়টায় নাকি তার পরের দিন আরম্ভ। কিন্তু রাত একটার পর সাধারণ মদ্যালয় বন্ধ। এর পর করা যায় কি? আমি বিশেষ করে তাদেরই কথা ভাবছি যাদের তখনো তেষ্টা মেটে নি—জর্মনদের বিশ্বাস তারা বিয়ার পান করে তৃষ্ণা নিবারণার্থে। সাধারণ মদ্যালয় যখন বন্ধ তখন খোলা রইল অসাধারণ মদ্যালয়। সেগুলো একটু ইয়ে অর্থাৎ বিশেষ শ্রেণীর মহিলায় ভর্তি আর কি। তবে স্টুডেন্টরা দল বেঁধে যখন সেখানে ঢুকে আপন গালগল্পে মত্ত হয় তখন ঐ পূর্বোক্ত 'ইয়েরা' ওদের জ্বালাতন দূরে থাক্ —ডিস্টার্বও করে না। ওদের পকেটে আছেই বা কি?

ইতিমধ্যে সেই যে আমাদের টেওডর যাকে নিয়ে কাহিনী পত্তন করেছি, তার হঠাৎ পুনরায় শোক উথলে উঠলো ঐ ডান্‌ৎসিগ নগরীর প্রখ্যাত স্বর্ণবারির জন্য। বার বার বলে, 'দেখলে ব্যাটার কাণ্ডখানা! রাত একটা তক্ আমাদের বসিয়ে রাখলে একটা সুরালয়ে—যখন কিনা প্রত্যেক বাপের প্রত্যেক সুপুত্তুরের কর্তব্য আপন আপন সুনির্মিত স্নেহময় নীড়ে নিদ্রাদেবীর শান্ত্যঞ্চলে আশ্রয় নেওয়া।'

কে একজন বললে, 'এই খানিকক্ষণ আগেই না তুইই বললি, পেটারের

বাড়িটা আসলে অ্যাডাম এবং ঈভ তৈরী করেছিলেন ঝুরঝুরে থুরথুরে ?'

টেওডরের কিন্তু তখন কারো টিপ্পনীতে কান দেবার মত মরজি নয়—সে তখন মৌজে। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে, যেন এক নবীন রিলেটিভিটি আবিষ্কার করার উৎসাহ দেখিয়ে বললে, 'আর পেটার ব্যাটা নিশ্চয়ই আরামসে ঘুমুচ্ছে। চলো, ব্যাটাকে গিয়ে জাগানো যাক।'

এস্থলে কারো পক্ষে রণে ভঙ্গ দেওয়া জর্মন-স্টুডেন্ট-মনু-শাস্ত্রে গোমাংস ভক্ষণের চেয়েও গুরুতর পাপ। তুমি তা হলে আস্ত একটা কাপুরুষ! পুলিশকে —অর্থাৎ দুশমনকে—ডরাও। তোমার কলিজা বক্‌রির, তোমার সীনা চিড়িয়ার। অতিষ্ঠ হয়ে আপনি শুধোবেন, 'রাত্রি একটাই হোক্, আর তিনটেই হোক্, কেউ কাকে জাগালে পুলিশের পূর্বতর অধস্তন চতুর্দশ পুরুষের কিবা ক্ষতিক্ষয়, জখম-লোকসান? ওদেশে কি রেতে-বেরেতে টেলিগ্রাফ পিয়ন আসে না?'

দাঁড়াও পাঠকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এসব ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বলা বাহুল্য রাত তেরোটার সময়—গ্রিনিজ যদিও সেটাকে দিবাভাগ বলেন —আপনি যদি বাড়ির, অবশ্য অন্য বাড়ির, দোস্ত দুশমন—যে-ই হোক্ কাউকে জাগাবার চেষ্টা করেন, তা সে সীমেন-হালেস্কে-শুকের্টের নব্যতম বিজলি-বেল্ বাজিয়েই হোক্, আর পৌরাণিক যুগীয় ঘণ্টাকর্ণ কানে যে-ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখতো যাতে করে সে তার জন্মবৈরী শ্রীহরির নাম-কীর্তন শুনতে না পায়—সেই ঘণ্টাটিই বাজান, বাড়িউলী দরজা খুলে শনির রাতে ঐ জবাকুসুমসঙ্কাশ টেওডরের নয়নযুগল দেখতে পাবে—আমরা আর-সবাই না হয় পাশের গলিতে গা-ঢাকা দিয়েই রইলুম—তখন তার কণ্ঠ থেকে—ভুল বললুম, নাভিকুণ্ডলী থেকে যেসব মুরজ-মুরলীধ্বনি বেরুবে তার ঈষদ্‌তমাংশ শুনতে পেলে, ঐ যে খানিকক্ষণ আগে কি-সব 'ইয়ে'দের কথা বলছিলুম তারা পর্যন্ত নোকের সামনে নজ্জা পাবে। অতএব ঐ কবোষ্ণ অন্ধকারেও আমাদের কাছে জাজ্বল্যমান হল যে ফ্রণ্টাল এটাকের স্ট্রাটেজি বিলকুল ঔট্ অব্ ডেট্।

আমাদের হস্তে তৎসত্ত্বেও আশার একটি ক্ষীণ প্রদীপ মিদির্ মিদির্ করছে। পেটারের কামরাটা দোতলায়, এবং একদম রাস্তার উপরে। অতএব আমরা সেদিক বাগে যেতে যেতে হেথাহোথা ক্ষুদ্রাকারের নুড়ি, কাঁকর, সোডার ছিপি ইত্যাকার মারণাস্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে সুসজ্জিত হয়ে পৌঁছলুম পেটারালয়ে—বঙ্কিম সঙ্কীর্ণ পথ দুর্গম নির্জন পেরিয়ে।

পেটার থাকে মাউস ফাডে (সার্থক নাম, বাবা,—'ইঁদুরের পথ!')।

টেওডরই আমাদের হিণ্ডেনবুর্গ বলুন, লুডেনডর্ফ বলুন, আমাদের রাইষ মার্শাল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, যদিও সে পেটারের ঘরে আসে সপ্তাহে নিদেন দশ দিন, তবু তার জানলা যে ঠিক কোন্‌টা সেটা ঠাহর করতে পারছে না—আশা করি তার কারণ আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। অবশেষে হান্‌স্‌-ই লোকেট্‌ করলে জানলাটা। হান্‌স্‌ বটনির ছাত্র—পেটারের জন্মদিনে তাকে একটা অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ সাতিশয় বিরল ফণীমনসা উপহার দেয়। একটা জানলার বাইরের চৌকাঠ-পানা ফালি কাঠের উপর হান্‌স্‌ সেটি আবিষ্কার করলে—রাত্রের হিম খাওয়াবার জন্য পেটার সেটি ঐ সিল্‌ না লেজ্‌ কি যেন বলে ইংরিজীতে—তারই উপর রেখে দিয়েছিল। কালিদাসের যুগে দ্বারে আঁকা থাকতো ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন যেমন শঙ্খচক্র—হেথায় কেক্‌টাস্‌।

পয়লা রৌণ্ডে টেওডর ছুঁড়ে মারল সোডার ছিপি। লাগলো গিয়ে ডান-পাশের জানলাটায়। আমরা ফিসফিস করে পেটারকে সাবধান করতে কসুর করি নি, কিন্তু কেবা শোনে কার কথা, সে তখন জাঁদরেল জনরৈল সিং, আমরা নিতান্ত ডালভাত দাবাখেলার বড়ে-পেয়াদা। দুসরা রৌণ্ডে টেওডর বোধহয় 'ফইর' করেছিল একটা স্নো কৌটোর ঢাকনা। এটা ধন্‌-ন্‌-ন্‌ করে গিয়ে লাগলো বাঁ-পাশের জানলাটায়। আমরা তাকে কিছু বলতে যেতেই সে ধমক দিয়ে বললে, 'চোপ! এই হল আর্টিলারির আইন। প্রথম মারবে তাগের চেয়ে দূরে, তার পর তাগের চেয়ে কাছে, শেষটায় ম্যাথম্যাটিকলি মেজার করে ঠিক মধ্যিখানে।' হবেও বা। ও তো প্রাশান যুংকার ঘরের ছেলে—জানার কথা। এবং আমাদের তুলনায় তার পকেট-শস্ত্রাগার পরিপূর্ণ। কারণ আমরা জর্মনীর ধোপ-দুরস্ত রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি কীই বা এমন কামান-ট্যাঙ্ক। পক্ষান্তরে যুযুধান টেওডর ঘিনপিৎ উপেক্ষা করে 'পাবে'র সামনের 'বিন্‌' থেকে মেলা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে এনেছে। তাই এবারে ছুঁড়লে ছোট্ট একটি মার্কিং ইঙ্কের খালি শিশি। লাগলো গিয়ে তেতলার একটা জানলায়। তখন বুঝতে পারলুম জর্মনী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কেন জিততে পারে নি। দ্বিতীয়টা তখনো হয় নি। সে সময় হিট্‌লার যদি আমাকে কন্‌সল্‌ট করতো তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে বারণ করে দিতুম—বিশেষত এই অভিজ্ঞতার পর।

তার চেয়েও পষ্ট বুঝতে পারছি, টেওডর এখন যে অবস্থায় পৌঁচেছে সেখানে আপন নাক চুলকোতে চাইলে গুত্তা মারবে পিঠে। কিন্তু সে-তত্ত্বটি তখন তাকে বলতে গেলে সেই সুপ্রাচীন জর্মন কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি হবে মাত্র ; এক মাতাল রাত চৌদ্দটায় বাড়ি ভুল করে বার বার চেষ্টা করছে চাবি দিয়ে সদর দরজা

খোলবার এবং সঙ্গে সঙ্গে কটুকাটব্য। সেই শব্দে শেষটায় দোতলায় একজনের ঘুম ভেঙে গেল। নিচের দিকে মাতালকে দেখে বললে, 'হেই, তুমি ভুল বাড়ির তালা খোলবার চেষ্টা করছো'। মাতাল উপরের দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বললে, 'হে হে হে হে। তুমিই ভুল বাড়িতে ঘুমুচ্ছো।'

এই একতরফা লড়াই—আইনে যাকে বলে ইন্ আবসেন্শিয়া—কিংবা বলতে পারেন ডন্ কুইক্সটের জল-যন্ত্র-আক্রমণ আধঘণ্টাটাক চলার পর টেওডর ছাড়লে—বলতে গেলে তার প্রায় শেষ সিক্স্ পৌণ্ডার—সার্ডিনমাছের খালি একটা টিন। ঝন্ ঝন্ করে শব্দ হল। কিন্তু পরে মনে হয়েছিল সে যেন ওস্তাদ এনায়েৎ খানের সেতার—কারণ সঙ্গে সঙ্গে সব-কিছু ছাপিয়ে কানে গেল পুলিশের ভারি ভারি বুটের শব্দ! এটা হল কি প্রকারে? সচরাচর শানবাঁধানো রাস্তার উপর রোঁদের পুলিশের বুটের শব্দ সেই নিঝুম নিশীথে অনেক দূরের থেকে শোনা যায়, এবং টেওডর ছাড়া আমাদের আর সকলের আধখানা কান খাড়া ছিল তারই আশঙ্কায়। অতএব দে ছুট, দে ছুট! কোন্ মূর্খ বলে যুদ্ধে পলায়ন কাপুরুষের কর্ম! ইংরেজ আফ্রিদীদের সঙ্গে যুদ্ধে পালালে পর এ-দেশের জোয়ানদের বুঝিয়ে বলতো, 'এর নাম বাহাদুরীকে সাথ্ পিছে হঠনা।'

কিন্তু ছুটতে ছুটতে আমি শুধু ভাবছি, এতগুলো বুটের শব্দ এক সঙ্গে হল কি করে? রোঁদে তো বেরোয় প্রতি মহল্লায় হার্টের, sorry, হার্টলেস্ সিংগ্ল্টন। তা সে যা-ই হোক, এখন তো প্রাণটা বাঁচাই।

পূর্বেই বলেছি, পেটারের গলিটার নাম মুষিকমার্গ। আসলে কিন্তু বন্ শহরের আঁকাবাঁকা হাঁসুলি বাঁকের মোড়, পায়ের 'বেঁকি'-গয়নার প্যাঁচ-খাওয়া আড়াই বিঘৎ চওড়া নিরানব্বুইটি 'রাস্তাকেই' মুষিকমার্গ বলা যেতে পারে—তার জন্য কল্পনাশক্তিটিকে বহু সুদূরে সম্প্রসারিত করতে হয় না।

কিন্তু একটি তত্ত্ব সর্বজনবিদিত। এই গলিঘুঁচি কোথায় যে হঠাৎ বেঁকে গেছে, কোথায় যে রাস্তার একপাশে বহু প্রাচীন কালেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত একটি কারখানার অন্ধকার অঙ্গনে অশরীরী হওয়া যায়, অর্থাৎ লুকানো যায় (হংসমিথুনের কথা অবশ্য আলাদা), কোথায় যে একটা গারাজের আংটাতে পা দিয়ে সামান্য তকলিফেই ছাতে ওঠা যায়, এ সব তথ্য পুলিশ যতখানি জানে আমরাও ঠিক ততখানিই জানি। এমন কি লেটেস্ট খবরও আমরা রাখি: অমুক দেউড়ির ঠিক সামনের রাস্তার বাতিটি বরবাদ হয়ে গিয়েছে, এখনো মেরামত হয় নি, কিংবা অমুক জায়গায় পরশুদিন থেকে এক ডাঁই পিপে জুটেছে—পিছনে দিব্য অন্ধকার। অর্থাৎ পুলিশ তার আপন হাতের তেলো যতখানি

চেনে, আমরাও আমাদের তেলো ভতখানিই চিনি।

মূষিকমার্গ ধরে খানিকটে এগোলেই সেখানে তেরাস্তা। আমাদের স্ট্র্যাটেজি অতি সনাতন, সুপ্রাচীন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে দু'দিকে ছুট লাগালাম। আবার তেরাস্তা পেলে আবার দু' ভাগ হব। ধরা যদি পড়িই তবে দলসুদ্ধ ধরা পড়বো কেন? এবং যুদ্ধের নীতিও বটে, 'আক্রমণের সময় দল বেঁধে; পলায়নে একলা-একলি।' খুদে বন্ শহরে পুলিশ গিস্ গিস্ করে না—আর এই রাত চোদ্দটায় ফাঁড়ি-থানা ক'টাই বা স্পেয়ার করতে পারে? কাজেই প্রতি তেরাস্তায় তারা যদি আমাদেরই স্ট্র্যাটেজি অনুসরণ করে তবে যাদের 'মেন পাওয়ার' কম বলে, কয়েকটা রাস্তা ফোলো অপ্ করতে পারবে না বলে শেষ পর্যন্ত হয়ত কেউই ধরা পড়বে না। কিন্তু এই 'গুপো' নন্দনগণ ঘড়েল। এবম্প্রকার বহু যুদ্ধে তারা জয়ী এবং পরাজয়ী হয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে সেটা তাদের শেখায় অন্য স্ট্র্যাটেজি।

পাঠক, তুমি কখনো পোষা চিতে বাঘ দিয়ে হরিণ-শিকার দেখেছ? না দেখারই সম্ভাবনা বেশী, কারণ সেই রাজারাজড়াদের আমলেও এ খেলাটি অস্মদ্দেশে ছিল বিরল। আমাকে দেখিয়েছিলেন বরোদার বুড়ো মহারাজ।

মহারাজার খাস রিজার্ভ ফরেস্টে ছিল বিস্তর হরিণ। তাদের পিছনে লেলিয়ে দেওয়া হত একটা পোষা, ট্রেন্‌ড্ চিতে বাঘ। বাঘ দেখা মাত্রই হরিণের পাল দে ছুট দে ছুট। এবং মাচাঙের উপর থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, একটু সুবিধা পাওয়া মাত্রই তারা দু' ভাগ হয়ে গেল, তার পর আবার দু' ভাগ, ফের দু' ভাগ—ক'রে ক'রে হরিণের পাল আর পাল রইল না, হয়ে গেলো চিত্তিরমিত্তির।

কিন্তু আমাদের নেকড়ে মহাশয়টিও অতিশয় সুবুদ্ধিমান। এ ভাগ, ও ভাগকে খামোখা তাড়া করে সে বর্বরস্য শক্তিক্ষয় করলো না। সে প্রথম থেকেই তাগ করে নিয়েছে একটা বিশেষ হরিণ। প্রতিবারে পাল যখন দু' ভাগ হয়, তখন সে ঐ বিশেষ হরিণটার ভাগেরই পিছন নেয়। পরে চিতার ট্রেনার আমাকে বলেছিল, 'সব চেয়ে যে হরিণটা ধুমসো, চিতে সব সময়ই একমাত্র ঐটের পিছু নেয়—এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে শক্তিক্ষয় করে না, কারণ চিতে জানে ঐটেই হাঁপিয়ে পড়বে সকলের পয়লা। ধরতে পারলে পারবে ঐটেকেই—সব সময় যে পারে তাও নয়।'

বন্ শহরের গুপো সম্প্রদায় ঠিক তাই করলে। আমাদের মধ্যে যে দুটি ছিল সব চেয়ে হোঁৎকা ওরা প্রতি দু' ভাগ হওয়ার সময় ওদেরই পিছু নিল। শেষটায়

ধরতে পেরেছিল অবশ্য একজনকে। সে কিন্তু টেওডর নয়, এবং জস্ট্ টু কীপ কম্পানি, ছুঁড়ে ছিল মাত্র নিতান্ত খুদে দু'চারটি কাঁকর। তার কথাই আপনাদের খেদমতে ইতিপূর্বে পেশ করেছি।

আগের জমানায় পুলিশ তাকে দিয়ে দিত য়ুনিভার্সিটির হাতে—সে যেত য়ুনিভার্সিটির জেলে। শুনেছি, এস্তেক স্বয়ং প্রিনস আউটো এডওয়ার্ড লেওপোল্ড ফন্ বিস্‌মার্ক অবধি গেছেন। এবং সে তখন জেলের দেয়ালের উপর পেন্সিলযোগে আপন জিঘাংসা, কিংবা অনুশোচনা, কিংবা মধ্যিখানে, কিংবা কটুবাক্য—যথা যার অভিরুচি—কভু গদ্যে কভু ছন্দে, সেও কী বিচিত্র, কখনো আলেক্‌জেন্‌ড্রিয়ান কখনো—সে কথা আরেক দিন না হয় হবে—লিখতো: আমার আমলে আমাদের যেতে হত শহরের জেলে—একদিনের তরে (সেও এক মাসের ভিতর দিনটা বাছাই করে নেওয়া 'আসামী'র এক্তেয়ারেই ছেড়ে দেওয়া হত, বাইরে থেকে আপন খানা আনানো যেত, এবং যেহেতু যেসব সহযুযুধানবর্গ সে যাত্রায় পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা নেমকহারাম নন, তাঁরাই চাঁদা তুলে উত্তম লঞ্চ ডিনার বাইরে থেকে পাঠাতেন); কিংবা (ভারতীয় মুদ্রায়) সোয়া তিন টাকা জরিমানা দান—যথা অভিরুচি।

কিন্তু প্রশ্ন, এতগুলো পুলিশ সে রাত্রে হঠাৎ এক জোট হল কি করে?

খাঁটি বন্-বাসিন্দারা আমাদের যুদ্ধে নিরপেক্ষ। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট কাঁকর বা সোডার ছিপি যদি তার জানলায় লেগে গিয়ে তার নিদ্রাভঙ্গ করে তবে সে জানলা খুলে কটুবাক্য আরম্ভ করার পূর্বেই আমরা অকুস্থল ত্যাগ করি। কেউ কেউ আবার হঠাৎ এক ঝটকায় জানলা খুলে আমাদের মাথার উপর ঢেলে দেয় এক জাগ্ হিমশীতল জল। আমরা অবশ্য এজাতীয় অহেতুক উপদ্রবের জন্য সদাই সতর্ক থাকি।

কিন্তু আজ ছিল আমাদের পড়তা খারাপ। টেওডরের সক্কলের পয়লা বুলেট, বা সোডার ছিপি, যাই বলুন, পড়ে একদম পাশের ফ্ল্যাটে এক নবাগত বিদেশীর জানলায়—কেন যে বিদেশীগুলো বন-শহরটাকে বিষাক্ত করার জন্য আসে, আল্লায় মালুম—সে কিন্তু জানতো, বন্ শহরের খাস বাসিন্দারা এই (মোর্ দ্যান্) হান্‌ড্রেড্ ইয়ার ওয়ারে ভদ্র সুইটজারল্যাণ্ডের মত সেই যুদ্ধারম্ভের রাত্রি থেকেই নিরপেক্ষ, জোর কটুকাটব্য (অর্থাৎ ডিপ্লোমাটিক প্রটেস্ট)। কিংবা এক জাগ্ জল। তা সে এমন কীই বা অপকর্ম? ইউরোপীয়রা তো চান করে একমাত্র যখন জাহাজ-ডুবি হয়। জল ঢেলে সে তো পুণ্যসঞ্চয় করলো, ডাক্তারদের শ্রদ্ধাভাজন হল। কিন্তু আজকের এই বিদেশী পাপিষ্ঠটা কটুবাক্য করে নি, জল

চালে নি, করেছে কি, সে-ফ্ল্যাটে ফোন ছিল বলে চুপিসাড়ে ফাঁড়ি-থানাকে জানিয়ে দিয়েছে। ওদিকে আবার ইয়ার টেওডরের অগুনতি সখা এই শহরে। এবং বছর দুই ধরে সে প্রাগুক্ত পদ্ধতিতে শহরের এ-মহল্লায়, ও-মহল্লায় শনির রাতে—এবং সেটা যত গভীর হয় ততই উমদা—আজ একে, পরের শনিতে অন্য কাউকে জাগাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। পুলিশ বিস্তর গবেষণার পর লক্ষ্য করলো যে সর্বত্রই ওয়ার্কিং মেথড বা মডুস অপেরাণ্ডি হুবহু এক—বড় বড় ব্যাঙ্ক-ডাকাতরা যে রকম পুলিশের এই জাতীয় গভীর গবেষণার ফলেই শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে। তাই তারা সেই ডেঞ্জরস্ ক্রিমিনাল টেওডরের প্রতীক্ষাতেই ছিল।

আর আপনাদের সেবক এই অধম? সে কি কখনো ধরা পড়েছিল?

॥ ৩ ॥

অধীর পাঠক! শান্ত হও, তোমার মনে কি কুচিন্তা সে আমি জানি; ইতিমধ্যে ঐ বাবদে দু'খানা চিঠিও পেয়েছি, আমার কিন্তু কিন্তু-কিন্তু ভাবটা যাচ্ছে না। আমি জানি, তোমার জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল, তাই জানতে চাও আমি কখনো ধরা পড়ে শ্রীঘরবাস করেছিলুম কিনা। আমার সে 'দুরাবস্থা'র[৩] বর্ণনা শুনে তোমার হৃদয়মনে কোন্ প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হবে সেই নিয়ে আমার দুর্ভাবনা। তাহলে একটি ছোট্ট কাহিনী দিয়ে আমার সঙ্কোচটা বোঝাই।

মাত্র কয়েকদিন আগে, এই ১৬ই অগ্রহায়ণ, আমরা স্বর্গত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুদিন পালন করলুম। এঁর বহু বহু সদ্‌গুণ ছিল, তার অন্যতম, তিনি নিজে সাহিত্য নাট্য সৃষ্টি করুন আর নাই করুন সে যুগের সবাই মেনে নিয়েছিলেন যে তাঁর মত শাস্ত্রজ্ঞ রসজ্ঞ জন বাঙলা দেশে বিরল—এবং শুদ্ধমাত্র রসজ্ঞ হিসাবে অদ্বিতীয়। তাই কাঁচা পাকা সর্ব লেখকই তাঁকে তাঁদের বই পাঠিয়ে মতামত জানতে চাইতেন। ওদিকে গুরুদাস ছিলেন কর্মব্যস্ত পুরুষ। সেই ডাঁই ডাঁই বই পড়ে স্বহস্তে উত্তর লেখার তাঁর সময় কই? তাই একখানা পোস্টকার্ডে যা ছাপিয়ে নিয়েছিলেন তার মোটামুটি মর্ম এই :—'মহাশয়, আপনার

৩ এ-যুগের ছেলে-ছোকরারা বিদ্যাসাগর পড়ে না ব'লে বলতে দোষ নেই যে একদা এক পিতা-পুত্র বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে তাদের দুঃখের কাহিনী শেষ করলে এই বলে, 'আমাদের দুরাবস্থাটা দেখুন।' বিদ্যাসাগর নাকি মুচকি হেসে বললেন, 'তা সেটা আকার (আ-কার) থেকেই বুঝতে পারছি।'

পাঠানো পুস্তকের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি উহা মনোযোগ সহকারে পড়িয়াছি। সত্য বলিতে কি পড়িতে পড়িতে—' এখানে এসে থাকতো একটা লম্বা লাইন, এবং তার উপরে ছাপা থাকতো, 'হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই' এবং লাইনের নিচে ছাপা থাকতো 'অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই।' তিনি নাকি পাঠানো বইখানা পড়ে যথোপযুক্তভাবে হয় লাইনের উপরের 'হাস্য সম্বরণ' বা নিচের 'অশ্রু সম্বরণ' কেটে দিতেন। তিনি ছিলেন অজাতশত্রু, তাই নিশ্চয়ই কোনো বদরসিক কাহিনীটির সঙ্গে আরো জুড়ে দিত যে, অধিকাংশ স্থলেই তিনি নিজে বইখানি পড়তেন না, তাঁর সেক্রেটারি সেটি পড়ে বা না পড়ে উপরের 'হাস্য' কিংবা নিচের 'অশ্রু' কেটে দিত। [৪]

তাই আমার কিন্তু-কিন্তু, তুমি লাইনের উপরের না নিচের, কোন্ বাক্যটি কাটবে—আমার কাহিনী শুনে। তা সে যাক্‌গে, বলেই ফেলি। কোন্ দিন আবার দুম করে মরে যাবো।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, চিতে বাঘ হরিণের পালের গোদাটাকেই সব সময় ধরবার চেষ্টা করে তারই পিছনে ধাওয়া করে যখন সব কটা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে—শহরের পুলিশও ঠিক সেই রকম আমাদের মত 'পিশাচ-সম্প্রদায়ে'র সব চেয়ে হোঁৎকাটাকেই ধরবার চেষ্টা করতো, আমরা যখন তাড়া খেয়ে হরিণের টেকনিকই অনুসরণ করে ইদিকের ওদিকের গলিতে ছড়িয়ে পড়তুম। কিন্তু কিছুদিন পরে আমরা লক্ষ্য করলুম, একই গোদাকে বার বার শিকার করে পুলিশ যেন আর খাঁটি স্পোর্টসম্যানের নির্দোষানন্দ লাভ করছে না। তখন তারা দুসরা কিংবা তেসরা মোট্‌কাটাকে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলো। তাদেরও ট্রেনিং হচ্ছে, আম্মোগোরও। কখনো তারা জেতে, কখনো আমরা জিতি। সেই যে

৪ ভিক্টর য়্যুগো (Hugo) সম্বন্ধে বলা হয়, একবার এক অখ্যাতনামা কবি য়্যুগোকে তাঁর কবিতার বই পাঠিয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে য়্যুগোর সানন্দ অভিনন্দন এসে পৌঁছল সেই কবির হাতে, তাঁর কাব্যসৃষ্টির অজস্র প্রশংসাবাদ করে য়্যুগো শেষ করেছেন এই বলে, 'হে নবীন কবি, আমি তোমাকে সাদর আলিঙ্গন করে, ফ্রান্সের কবিচক্রের আমন্ত্রণ জানাই।' তিন দিন পরে বুক-পোস্টে পাঠানো কবির সেই কবিতার বই ফেরত এল তাঁর কাছে। উপরের পিঠে পোস্ট অফিসের রবর স্ট্যাম্পে ছাপ, 'যথেষ্ট টিকিট লাগানো হয় নি বলে গ্রহণকারী বেয়ারিং হারে ফালতো পয়সা দিতে নারাজ অতএব প্রেরকের কাছে ফেরত পাঠানো হল।'

গুলিখোর শিকারী বয়ান দিচ্ছিল, 'তারপর আমি তো ফইর করলুম বন্দুক, আর কুত্তাকেও দিলুম শিকারের দিকে লোলয়ে। তারপর বন্দুকের গুলি আর কুত্তাতে কী রেস্। কভী কুত্তা কভী গোলী, কভী গোলী কভী কুত্তা।' আমাদের বেলাও তাই, 'কভী ইস্টুডেন্ট কভী পুলিশ, কভী পুলিশ কভী ইস্টুডেন্ট।' আমার অবশ্য কোনই ডর ভয় ছিল না। কারণ আমি তখন এমনিতেই ছিলুম বেহদ্ রোগা টিঙটিঙে—পাঁচ ফুট সাড়ে ছ'ইঞ্চি নিয়ে একশ' পাঁচ পৌণ্ড ওজন—অর্থাৎ হোঁৎকা মোট্কা জর্মন সহপাঠীদের তুলনায় তো আধটিপ নস্যি। তদুপরি আমি সর্বদাই সুনির্মল বসুর সেই তিরস্কারটি মনে রাখি, 'বাঙালী হয়েছো, পালাতে শেখ নি।'

কিন্তু বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এই রাত্রে দেখি, পুলিশ অন্য ব্যবস্থা করেছে। এতদিন যেই আমি একা হয়ে যেতুম, পিছনে আর বুটের শব্দ শুনতে পেতুম না। সেরাত্রে দেখি, পুলিশ নিতান্ত আমাকেই ধরবার জন্য যে মনস্থির করেছে তাই নয়, আগের থেকে, বেশ সুচিন্তিত ফাইভ ইয়ারস প্ল্যানিং করে যেন জাল পেতেছে। আমি তাড়া খেয়ে যেদিকেই যাই, পিছনে তো বুটের শব্দ শুনতে পাই-ই, তদুপরি দেখি, ঐ দূরে গলির মুখে আরেকটা পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে—যেন বিরহজর্জরিত ফিলমের নায়ক প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকাকে আলিঙ্গনার্থে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু আমি মহাভারত পড়েছি, জানি, এ আলিঙ্গন হবে ধার্তরাষ্ট্র। অতএব মারি গুত্তা অন্য বাগে।

অনেকক্ষণ ধরে এই খেলা চললো। ইতিমধ্যে আমি কয়েক সেকেণ্ডের তরে সব পুলিশের দৃষ্টির বাইরে; এবং সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলুম একটা 'পাবে'। ঝটকা মেরে 'বার' থেকে অন্য কারো অর্ডারী এক কাপ কফি যেন ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে বসলুম, 'পাব'-এর সুদূরতম প্রান্তে। সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলো একটা পুলিশ।

খাইছে। এবারে এসে পাকড়াবে। বৈদ্যরাজ চরক বলেন, 'এ অবস্থায় হরিনামের বটিকা খেয়ে শুয়ে পড়বে।'

সে কিন্তু হাঁপাতে হাঁপাতে প্রথমটায় 'বার' কীপারের মুখোমুখি হয়ে, আমার দিকে পিছন ফিরে এক গেলাস বিয়ার কিনে একটা অতি দীর্ঘ চুমুক দিলে। আমি বুঝলুম, মাইকেল সত্যই বলেছেন, সীতাদেবীকে রাবণের রাক্ষসী প্রহরিণীরা কোনো গাছতলায় বসিয়ে বেপরোয়া ঘোরাঘুরি করতো,

'হীনপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে'

গদ্যময় ইংরিজীতে যাকে বলে নিতান্তই 'ক্যাট অ্যাণ্ড মাউস প্লে'। বরঞ্চ

রবীন্দ্রনাথেরটাই ভালো, 'এ যেন পাখি লয়ে বিবিধ ছলে শিকারী বিড়ালের খেলা'।

এবারে সে গেলাস হাতে করে 'বার'-এর দিকে পেছন ফিরে আমার দিকে মুখ করে তাকাল।

আমিও অলস কৌতূহলে একবার তার দিকে তাকালুম। 'পাব'-এ নূতন নিরীহ খদ্দের ঢুকলে যেরকম অন্য নিরীহ খদ্দের তার উপর একবার একটি নজর বুলিয়ে অন্য দিকে চোখ ফেরায়।

আমি যদিও তখন মাথা নিচু করে কাপের দিকে তাকিয়ে আছি—যেন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে বৈজ্ঞানিক অণুপরমাণু পর্যবেক্ষণ করছেন—তবু স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, লোকটা কি ভাবছে। তারপর শুনলুম, 'গুটে নাখট্'। আমি মাথা তুলে দেখি পুলিশ তার বিয়ার শেষ করে 'পাব'ওলাকে 'গুড নাইট' জানিয়ে চলে যাচ্ছে। (জর্মনীর অলিখিত আইন, 'বিয়ার খাবে ঢক ঢক করে, ওয়াইন খাবে আ-স্তে, আ-স্তে।')

ঠিক বুঝতে পারলুম না কেন? তবু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম বলি নি। এদের তো রাবণের গুষ্টি। এবার যিনি আসবেন, তিনি এঁয়ার মত বাপের সুপুত্তুর নাও হতে পারেন। আবার বাইরে যাবারও উপায় নেই। জাল গুটিয়ে সবাই চলে গেছেন, না ঘাপটি মেরে বসে আছেন, কে জানে?

ঘণ্টাখানেক পর যখন 'পাব' নিতান্তই বন্ধ হয়ে গেল, তখন দেখি সব ফাঁকা। তবু সাবধানের মার নেই। অকুস্থলের উল্টো মুখে রওয়ানা দিয়ে অনেকখানি চক্কর খেয়ে বাড়ি ফিরলুম 'তড়পত হুঁ জৈসে জলবিন মীন' হয়ে।

* *

তার দু-তিনদিন পর সকালবেলা যখন পাত্তাড়ি নিয়ে য়ুনি (ভার্সিটি) যাচ্ছি, তখন একজন পুলিশ হঠাৎ সামনে দাঁড়িয়ে বুটের গোড়ালি গোড়ালিতে ক্লিক্ করে আমাকে সেলুট দিলে। আমি হামেশাই পুলিশের সামনে ভারী সুবিনয়ী—বার তিনেক 'গুটেন মর্গেন গুটেন মর্গেন গুটেন মর্গেন' বললুম, যদ্যপি একবারই যথেষ্ট।

কোন প্রকারের লৌকিকতা না করে সোজা শুধোলে, 'তুমি ইণ্ডিয়ান?'

তালেবর পুলিশ মানতে হবে! বলেছে 'ইণ্ডার'। 'ইণ্ডিয়ানার' বা রেড ইণ্ডিয়ান বলে নি। এদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকও সে পার্থক্যটি জানে না। বললুম, 'হ্যাঁ।'—

শুধোলে, 'এখান থেকে ইণ্ডিয়া কতদূর?'

আমি বললুম, 'এই হাজার পাঁচেক মাইল হবে। সঠিক জানি নে, তবে

জাহাজে যেতে ১২।১৩ দিন লাগে।'

বললে, 'বাপ-মা এই পাঁচ হাজার মাইল দূরে পাঠিয়েছে বাঁদরামি শেখবার জন্যে ?'

এতক্ষণে আমার কানে জল গেল। বুঝলুম, উইথ রেফারেন্স্ টু দি কনটেকসট যে, লোকটা সেই রাত্রের আমাদের দলের দুষ্কর্ম এবং পরবর্তী লুকোচুরির কথা পাড়ছে। আমি তবু নাক-টিপলে-দুধ-বেরোয়-না গোছ হয়ে বললুম, 'কিসের বাঁদরামি ?'

জর্মনে 'ন্যাকা' শব্দের ঠিক ঠিক প্রতিশব্দ নেই। কিন্তু যে কটি শব্দ পুলিশম্যান প্রয়োগ করলে তার অর্থ ঐ দাঁড়ায়। তারপর নামলো সম্মুখসমরে। বললে, 'সেরাত্রে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চোখের আড়াল হয়ে যেতে পেরেছিলে বলে তোমাকে ধরি নি। এবারে কিন্তু ছাড়বো না।'

'অনেক ধন্যবাদ !' তারপর আমিও রণাঙ্গনে নেমে বেহায়ার মত বললুম, 'সে দেখা যাবে।'

যেন একটু দরদী গলায় বললে, 'কিন্তু কেন, কেন এসব করো ?'

আমিও তখন একটু নরম গলায় বললুম, 'এদেশে কি শুধু য়ুনিতে পড়তেই এসেছি ? ওদেশে বসেও তো এ-দেশের বই কিনে পড়া যায়। আমি এসেছি সব শিখতে, আর-সব স্টুডেণ্টরা যা করে, তাই করি।'

'সব ছেলে এরকম বাঁদরামি করে ?'

আমাকে বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হল সবাই করে না।

'তবে ?'

তখন বললুম, 'ব্রাদার, শোনো। এই স্টুডেণ্ট বনাম পুলিশ লড়াই সর্বপ্রথম আরম্ভ হয় চতুর্দশ শতাব্দীতে হাইডেলবের্গে। এখানে আরম্ভ হয় ১৭৮৬তে। তারপর কয়েক বছর য়ুনি বন্ধ ছিল—কেন, সঠিক জানি নে, বোধ হয় নেপোলিয়ন তার জন্য দায়ী—ফের য়ুনি খোলার সঙ্গে সঙ্গে ১৮১৮ থেকে। এবারে তুমিই কও, বুকে হাত দিয়ে, এই আমরা আজ যারা স্টুডেণ্ট, আমরা যদি আজ লড়াই ক্ষান্ত দি তবে ভবিষ্যৎ-বংশীয় স্টুডেণ্টরা ইতিহাসে লিখে রাখবে না "অতঃপর বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এক দল কাপুরুষ ছাত্র আগমনের ফলে—তাহাদের মধ্যে একটা অপদার্থ ইণ্ডিয়ানও ছিল—সেই সংগ্রাম বন্ধ হইয়া যায়—স্টুডেণ্টরা পরাজয় স্বীকার করিয়া লইল।" তারপর ভারতীয় নাটকীয় পদ্ধতিতে 'হা হতোস্মি হা হতোস্মি' করার পর বললুম, 'এই যে মহাকবি হাইনে, তিনি পর্যন্ত এখানে—'

এই করলুম ব্যাকরণে ভুল। বাধা দিয়ে শুধোলে, 'তুমি তার মত কবিতা লিখতে পারো ?'

নিশারণে সে জিতেছিল না আমি জিতেছিলুম, সেটা সমস্যাময়, সেটাকে 'ড্র' বললেও বলা যেতে পারে, কিন্তু দিবাভাগে এই তর্ক-যুদ্ধে আমি হার মেনে বললুম, 'বাকিটা আর একদিন হবে, ব্রাদার। এখন তোমার নামটা বলো। সেই শনির রাত্রে যেখানে আমাদের প্রথম চারি চক্ষুর মিলন হয়েছিল সেখানেই দেখা হবে। আমি ফোন করে ঠিক করে নেব। এখন চলি, আমার ক্লাস আছে।'

সে হেসে যা বললে সেটাকে বাঙলায় বলা চলে, 'ডুডু খাবে টামাকও ছাড়বে না।'

* *

এবারে ধরতে পারলে ছাড়বে না—সে তো বুঝলুম। ওদিকে এক মাস পরে আমার পরীক্ষা। তিনটে ভাইভা। শনির রাত জেগে তামাম রব্বার শুধু মুখস্থ আর মুখস্থ। হাসি পায় যখন এদেশে শুনি, এখানে বড্ড বেশী মুখস্থ করানো হয়; মুখস্থ না করে কে কবে কোন্ দেশে কোন্ পরীক্ষা পাশ করেছে। তা সে পেসতালদ্জির দেশেই হোক আর ফ্রোবেলের দেশ, এই জর্মনিতেই হোক। তাই আমাকে আর যুদ্ধে না ডেকে আমাদের ফীলড মার্শেল আমাকে রিজার্ভে রাখলেন। মাত্র এক রাত্রে ডাক পড়েছিল, তবে সেটা শহরের অন্য প্রান্তে। আর এক দিন, সেই দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ-পোটির সঙ্গেই একটা 'পাব'-এ বসে দু-দণ্ড রসালাপ করেছিলুম। লোকটি সত্যই অমায়িক।

* *

এদেশে পরীক্ষার পূর্বে এত সাতান্ন রকমের কাগজপত্র মায় থীসিস্ ডীনের দফ্তরে জমা দিতে হয় যে, সবাই শরণ নেয় আন্কোরা হালের যে দু'দিন আগে পাস বা ফেল করেছে। তারাই শুধু এসব হাবিজাবির লেটেস্ট খবর রাখে। সে রকম দুজনা অনেকক্ষণ ধরে বসে, দফে দফে, একাধিক বার মিলিয়ে নিয়ে এক বাণ্ডিল কাগজ, ফর্ম, সার্টিফিকেট আমাকে দিয়ে বললে, 'এইবারে যাও বৎস, ডীনের দফ্তরে। সব মিলিয়ে দিয়েছি। আর, শোনো, সব কাগজের নিচে রাখবে একখানা পাঁচ মার্কের (তখনকার কালে পাঁচ টাকার একটু কম) নোট। এটা কেরানীর অন্যায্য প্রাপ্য—কিন্তু পূর্ণ শত বৎসরের ঐতিহ্য।'

দুরু দুরু বুকে—প্রায় নার্ভাস ব্রেক ডাউনের সীমান্তে পৌঁছে—দাঁড়ালুম গিয়ে ডীনের দফ্তরে, কাউন্টারের সামনে। পাঁচ টাকার চেয়ে বেশীই রেখেছিলুম।

যে কেরানী এসে সম্মুখে দাঁড়ালেন তাঁর এ্যাব্বড়া হিণ্ডেনবুর্গী গোঁফ, আর

বয়েসে বোধ হয় তিনি মুনির সমান। সাতিশয় গম্ভীর কণ্ঠে আমার গুড্ মর্নিঙের কি একটা বিড়বিড় করে উত্তর দিয়ে দফে দফে কাগজ গুনলেন, টাকাটা কি কায়দায় যে সরালেন ঠিক ঠাহর করতে পারলুম না। কিন্তু মুখে হাসি ফুটলো না। বরঞ্চ গম্ভীর কণ্ঠে গম্ভীরতর করে শুধোলেন, 'অমুক সার্টিফিকেটটা কই ?'

আমি তো সেই দুই যোগানদারদের উপর রেগে টঙ্। পই পই করে আমি শুধিয়েছি, ওরা আরো পই পই করে বলেছে, সব কাগজ ঠিকঠাক আছে, এখন এ কা গেরো রে বাবা! বুঝলুম, কি একটা সার্টিফিকেট আনা হয় নি। কিন্তু সে সার্টিফিকেট কিসের, কোনোই অনুমান করতে পারলুম না। যোগানদারদের মুখেও শুনি নি।

ভয়ে ভয়ে শুধালুম, 'কি বললেন, স্যর!'

এবার যেন নাভিকুণ্ডুলি থেকে কৈয়াজখানি কণ্ঠে কি একটা বেরুলো।

গুরু-মুর্শীদ, ওস্তাদ-মুরুব্বীদের আশীর্বাদ-দোওয়া আমার উপর নিশ্চয়ই ছিল; হঠাৎ অর্থটা মাথার ভিতরে যেন বিদ্যুতের মত ঝিলিক মেরে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে আপন অজান্তে এক গাল হেসে বলে ফেলেছি, 'চেষ্টা তো দিয়েছি, স্যর, দু বচ্ছর ধরে প্রায় প্রতি শনির রাত্রে—মাফ করবেন স্যর—বলা উচিত রবির ভোরে। তা ওরা ধরতে না পারলে আমি কি করবো ? বললে পেত্যয় যাবেন না, স্যর—'

ইতিমধ্যে বুড়ো হঠাৎ ঠাঠা করে হেসে উঠেছেন। যেমন তাঁর গাম্ভীর্য তেমন তাঁর হাসি। বিশেষ করে তাঁর বিরাট গোঁপ জোড়ার একটা দিক নেমে যায় নিচে, তো অন্যটা উঠে যায় উপরের দিকে। সে হাসি আর থামে না। ইতিমধ্যে ছোকরা কেরানীরাও হাসির রগড় দেখে তাঁর চতুর্দিকে এসে দাঁড়িয়েছে। এবারে থেমে বললেন, 'ধরা দেবার চেষ্টা করলে, আর ওরা ধরতে পারলো না, এটা কি রকম কথা ?'

আমি বললুম, 'যে-পুলিশ আরেকটু হ'লে ধরতে পারতো, তাকে সাক্ষী স্বরূপ হাজির করতে পারি যে, আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নি, এই জেলে যাবার সার্টিফিকেট যোগাড় করার।'

সংক্ষেপে বললেন, 'খুলে কও।'

আমি সেই প্রকৃতির লোক যারা নার্ভাস ব্রেকডাউনের ভাঙন থেকে পড়ি-পড়ি করতে করতে বেঁচে গিয়ে হঠাৎ নিষ্কৃতি পেয়ে হয়ে যায় অহেতুক বাচাল—সেও আরেক রকমের নার্ভাস্‌নেস্। গড় গড় করে বলে গেলুম, পুলিশের সেই জাল পাতার কাহিনী—বিশেষ করে আমার উপকারার্থে—'পাব'-এর ভিতরকার বয়ান

ও সর্বশেষে সেই পুলিশম্যানের সঙ্গে পথিমধ্যে আমার যম-নচিকেতা কথোপকথন। বক্তৃতা শেষ করলুম, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, 'এর পর এই পরীক্ষার পড়া নিয়ে বড্ড ব্যস্ত ছিলুম বলে সলিড্ কিছু করে উঠতে পারি নি, স্যর। শুধু ঐ যে, দিন পনেরো আগে হঠাৎ এক সকালে দেখা গেল লর্ড মেয়ারের বিরাট দফতরের উচ্চতম টাওয়ারে একটা ছেঁড়া ছাতা বাঁধা, বাতাসে পৎপৎ করছে, ফায়ার ব্রিগেড পর্যন্ত নামাতে পারে নি, ঐ উপলক্ষে অধীন কিঞ্চিৎ, অতি যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করতে—'

একজন ছোকরা কেরানী আঁতকে উঠে বললে, 'সর্বনাশ! ওটার তালাশী যে এখনো শেষ হয় নি!'

বুড়ো বললেন, 'আমরা তো কিছু শুনছি না।'

বুড়োর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরুতে গেলে তিনি কাউন্টারের ফ্ল্যাপ্‌টা তুলে আমার সঙ্গে দোর পর্যন্ত এলেন—পরে শুনলুম, এ-রকম বিরল সম্মান ইতি-পূর্বে নাকি মাত্র দু'একজন বিদেশীই পেয়েছেন। আমি কিছু শুধাবার পূর্বেই তিনি যেন বুঝতে পেরে তাঁর মাথাটি আমার কানের কাছে নিচু করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো আঙুলের ডগা বুকে ঠুকে ঠুকে ফিস ফিস করে বললেন, 'আমি তিনবার, আমি তিনবার!' তারপর অত্যন্ত সিরিয়াসলি শুধোলেন, 'বছর তিনেক পূর্বে এক ডাচ্ স্টুডেন্ট বললে—বুঝতেই পারছো, এ রসিকতাটা আমি শুধু বিদেশী ছাত্রদের সঙ্গেই করে থাকি, সুদ্দু মাত্র জানবার জন্য, তারা কতখানি সত্যকার জর্মন ঐতিহ্যের য়ুনি ছাত্র হতে পেরেছে—স্টুডেন্টরা নাকি ক্রমেই হারছে!' কণ্ঠে রীতিমত আশঙ্কার উৎপীড়ন।

আমি তাঁর প্রসারিত হাত ধরে হ্যাণ্ডশেক করতে করতে বললুম, 'তিন বছর পূর্বে, ইয়া। কিন্তু তারপর জানেন তো, আমি আর আপনার মত মুরুব্বীকে কি বলবো, কৃষ্ণতম মেঘেরও রূপালী সীমন্তরেখা থাকে—এল জর্মনিতে অভূতপূর্ব বিরাট বেকার সমস্যা, যেটা এখনও চলছে। ফলে ছেলেরা ম্যাট্রিক পাস করে এদিক ওদিক কাজে ঢুকতে না পেরে বাধ্য হয়ে ঢুকছে য়ুনিতে, আগে যেখানে ঢুকতো একজন, এখন ঢোকে দশজন। ওদিকে সরকারের পয়সার অভাবে পুলিশের গুষ্টি না বেড়ে বরঞ্চ কমতির দিকে। আমরা এখন দলে ভারি। বস্তুতঃ আমরা এখন নিশাচরবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক দিবাভাগেই তাদের সম্মুখ-সমরে আহ্বান করতে পারি—করি না, শুধু শতাধিক বৎসরের ঐতিহ্য ভঙ্গ হবে বলে।' তারপর একটু থেমে গম্ভীরতর কণ্ঠে বললুম, 'আর যদি কখনো সে দুর্দিনের চিহ্ন দেখি, তবে সেই সুদূর ভারত থেকে ফিরে আসবো—আমি। সামনের পরীক্ষায়

পাস করি আর ফেলই মারি, সেই পরাজয় প্রতিরোধ করার জন্ত য়ুনিতে ঢুকে ছাত্র হব আবার—আ মি।'

'আম্মো।' ॥

রাসপুতিন

এক একটা দুঃখ মানুষ আমৃত্যু বয়ে চলে। আমার নিজের কথা যদি বলার অনুমতি দেন, তবে নিবেদন করি, অধ্যাপক বগ্‌দানফের আমাকে বলা তাঁর নিজের জীবনের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আমি যে কেন তখনই লিখে রাখি নি সেই নিয়ে আমার শোক, এবং এ-শোক আমার কখনো যাবে না। তারই একটি ১৯১৭-র কম্যুনিস্ট বিপ্লব। তিনি অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং সমস্ত ঘটনাটি বর্ণন করতে তাঁর লেগেছিল পুরো ন'টি ঘণ্টা। শান্তিনিকেতনে আশ্রমের ইস্কুলের শোবার ঘণ্টা পড়ে রাত ন'টার সময়; আমি কলেজে পড়তুম বলে অধ্যাপকের ঘরে ঐ সময়ে যেতে কোনো বাধা ছিল না। পর পর তিন রাত্রি ধরে রাত বারোটা-একটা অবধি তিনি আমাকে সে ইতিহাস বলে যান। অবশ্য অনেকেই বলতে পারেন, ঐ যুগপরিবর্তনকারী আন্দোলন সম্বন্ধে বিস্তর প্রামাণিক পুস্তক লেখা হয়ে গিয়েছে এবং অধ্যাপক বগ্‌দানফের পাঠটা খোয়া গিয়ে থাকলে এমন কাই বা ক্ষতি। হয়তো সেটা সত্য, কিন্তু ঐ বিষয়ে আমি যে কটি সামান্য বই পড়েছি তার সব কটাই বড়ই পাণ্ডিত্যপূর্ণ, বৈজ্ঞানিক। বগ্‌দানফ তাঁর কাহিনী বলেছিলেন একটি ষোল বছরের ছোকরাকে—ঘটনার মাত্র চার-পাঁচ বৎসর পরে এবং সেটি তিনি তাই করেছিলেন সেই অনুযায়ী রসময়, অর্থাৎ সাহিত্যরসে পরিপূর্ণ। এস্থলে বলে রাখা প্রয়োজন মনে করি, অধ্যাপকের বর্ণনভঙ্গিটি ছিল অসাধারণ, তাই পরবর্তী যুগে তাঁর ইরান ও আফগানিস্থান (এ দুটি দেশে তিনি দীর্ঘকাল বাস করেন) সম্বন্ধে লিখিত গবেষণামূলক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধরাজি পণ্ডিত-মণ্ডলীতে সাহিত্যিক খ্যাতিও পায়। মাতৃভাষা রাশানে তিনি লিখেছেন কমই—তাঁর পাণ্ডিত্যপ্রকাশ-যুগে রাশাতে এ ধরনের গবেষণার কোনোই মূল্য ছিল না বলে সেগুলো সেখানে ছাপানোই ছিল অসম্ভব। তিনি প্রধানত লেখেন ফরাসী ইংরাজী ও ফার্সীর মাধ্যমে। এবং সব চেয়ে বেশী সম্মান পান ফার্সী পণ্ডিতজন মধ্যে।[১]

১ এঁর উল্লেখ শ্রীযুত প্রভাত মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র-জীবনীতে' করেছেন। আমিও 'দেশে-বিদেশে' বইয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করেছি

তিনি যে দ্বিতীয় কাহিনী বলেন, সেটি রাসপুতিন সম্বন্ধে। প্রথমটির তুলনায় এটি অনেক হ্রস্ব। রাসপুতিনকে নিহত করা হয়, পুরনো ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ১৬ই ডিসেম্বর, নতুন ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ৩০ ডিসেম্বর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে। এর প্রায় কুড়ি বৎসর পর রাসপুতিনকে নিয়ে আমেরিকায় একটি ফিল্‌ম্‌ তৈরী হয় (এবং আমার যতদূর মনে পড়ে লায়োনেল বেরিমোর রাসপুতিনের অংশ কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেন) এবং ঐ সময় রাসপুতিন-হন্তা রাশার শেষ জারের নিকটাত্মীয় গ্র্যাণ্ড ডিউক ইউসুপফ (আরবী হীব্রুতে ইউসুফ, ইংরিজীতে জোসেফ) ইয়োরোপে। ১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের মধ্যে তিনি ও তাঁর স্ত্রী সেই সব ভাগ্যবানদের দুজনা, যাঁরা প্রাণ নিয়ে রাশা থেকে পালাতে সক্ষম হন। তিনি লণ্ডন আদালতে মোকদ্দমা করেন ফিল্‌ম্‌ নির্মাতাদের (বোধ হয় M G M) বিরুদ্ধে যে, তাঁরা যে ফিল্‌মে ইঙ্গিত দিয়েছেন, রাসপুতিন তাঁর অর্থাৎ ইউসুপফের স্ত্রীকে পর্যন্ত তাঁর কামানলের দিকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি মোকদ্দমাটি হেরে যান বটে, কিন্তু ঐ মোকদ্দমাটি তখন এমনই cause celebre কজ্‌ সেলেব্র রূপে—যেমন আমাদের ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মোকদ্দমা—প্রখ্যাতি লাভ করে যে তার অল্প দু'এক বৎসর পর ঐ মোকদ্দমায় প্রধান অংশগ্রহণকারী একজন উকিল মোকদ্দমাটি সম্বন্ধে একটি প্রামাণিক—এবং আমি বলবো—সাহিত্যিক উচ্চপর্যায়ের প্রবন্ধ লেখেন। তিনি যদিও ইউসুপফের বিরুদ্ধ পক্ষের উকিল ছিলেন, তবু আদালতে ইউসুপফ দম্পতির খানদানী সৌম্য আচরণের অকৃপণ প্রশংসা করেন। তারপর হয়তো আরো অনেক কিছু ঘটেছিল কিন্তু তার খবর আমার কানে পৌঁছয় নি। হঠাৎ গত মাসের 'আনন্দবাজারে'র এক ইস্যুতে দেখি, ইউসুপফ ফের মোকদ্দমা করেছেন—এবার কিন্তু আমেরিকায়, কলাম্‌বিয়া বেতার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রাসপুতিন ও তাঁর জীবন নিয়ে নাট্যপ্রচার করার জন্য—এবং আবার মোকদ্দমা হেরেছেন। সেই সুবাদে আমার মনটা চলে গেল ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে, যখন অধ্যাপক বগ্‌দানফ রাসপুতিন-কাহিনী আমাকে ঘণ্টা তিনেক ধরে শোনান।

পরবর্তী যুগে ফিল্‌ম্‌ বেরুলো, তার পর লণ্ডনের উকিল তাঁর বক্তব্য বললেন, এবং 'আনন্দবাজার' বিদেশ থেকে যে সংবাদ পেয়েছেন, তা-ই প্রকাশ করেছেন। এদের ভিতর পরস্পর বিরোধ তো রয়েইছে, কিন্তু আমার পক্ষ থেকে এ-স্থলে আসল বক্তব্য এই যে, বগ্‌দানফ বলেছিলেন, সম্পূর্ণ না হোক্‌ অনেকখানি ভিন্ন কাহিনী। আমি আদৌ বলতে চাই নে, তাঁর বিবরণী, জবানী বা ভার্শন—যাই বলুন—সেইটেই নির্ভুল আপ্তবাক্য; বস্তুত তিনি নিজেই আমাকে বার বার

বলেছিলেন, 'মাই বয়্! সেন্ট পেটেরসবুর্গে তখন এত হাজারো রকমের গুজোব নিত্য নিত্য ডিউক সম্প্রদায় থেকে আস্তাবলের ছোকরাটা পর্যন্ত গরমাগরম এ-মুখ থেকে ও-মুখ হয়ে রাশার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে যে আমারটাই যে অভ্রান্ত সেই বা বলি কোন্ সাহসে ? তবে এটা সত্য আমার জীবনের সর্বপ্রধান কাজ "টেক্স্ট্-ক্রিটিসিজ্ম্"—তখনো ছিল, এখনো আছে—অর্থাৎ কোনো পুস্তকের পেলুম তিনখানি পাণ্ডুলিপি, তাতে একাধিক জায়গায় লেখক বলেছেন পরস্পরবিরোধী তিনরকম কথা। আমার কাজ, যাচাই করে সত্য নিরূপণ করা, কিংবা সত্যের যতদূর কাছে যাওয়া যায় তারই চেষ্টা দেওয়া। অতএব, বুঝতেই পারছো, রাসপুতিন সম্বন্ধে গুজোবগুলো আমি সরলচিত্তে গোগ্রাসে গিলি নি, আমার বুদ্ধিবিবেচনা প্রয়োগ করে যেটা সর্বাপেক্ষা সত্যের নিকটতম সেইটেই বলছি।'

অধ্যাপক রাসপুতিনের প্রথম জীবনাংশ সংক্ষেপে সারেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এই চাষী পরিবারের ছেলে রাসপুতিনের জন্ম সাইবেরিয়াতে। 'রাসপুতিন' তাঁর আসল নাম নয়—সেটা পরে অন্য লোকে তাঁর উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, বিশেষ করে কামাদি ব্যাপারে, জানতে পেরে তাঁর উপর চাপায়। লেখাপড়ার চেষ্টা তিনি ছেলেবেলায় কিছুটা দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সেদিকে ছিলেন, ক্লাসের মামুলী চাষার ছেলেরও অনেক নিকৃষ্ট। এর পর তিনি তাঁর সমাজের ভদ্রঘরেই বিয়ে করেন—আর পাঁচটা ছেলের মত। কিন্তু তার কিছুকাল পরেই হঠাৎ তাঁর ঝোঁক গেল 'ধর্মে'র দিকে, কিন্তু প্রচলিতার্থে আমরা ধর্মাচরণ বলতে যা বুঝি সেদিকে নয়। হিন্দু ধর্মে যে-রকম একাধিক মতবাদ, শাখা-প্রশাখা—রশের প্রচলিত (অর্থডক্স) সনাতন খৃষ্টধর্মেও তাই। তারই একটার দিকে আকৃষ্ট হলেন গ্রেগরি (রাসপুতিন)। এস্থলে উল্লেখ প্রয়োজন বলে মনে করি, অধ্যাপক বগ্দানফ ছিলেন অতিশয় 'গোঁড়া'—আমি সজ্ঞানে শব্দটি ব্যবহার করছি—রাশার সরকারী ধর্ম 'গ্রীক অর্থডক্স' চার্চে বিশ্বাসী এবং আচারনিষ্ঠ খৃষ্টান। শান্তিনিকেতনে তাঁর কামরায় (তখনকার দিনের অতিথিশালা, এখন বোধ হয় 'দর্শন-ভবন') দেয়ালে ছিল ইকন এবং তার নিচে অষ্টপ্রহর জ্বলন্তো মঙ্গলপ্রদীপ এবং তারই নিচে তিনি অহরহ দাঁড়িয়ে স্বদেহে আঙুল দিয়ে ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কিত করতে করতে—ঠিক আমাদের বুড়িদের মত—বিড়বিড় করে দ্রুতগতিতে মন্ত্রোচ্চারণ করতেন। বলা বাহুল্য রাসপুতিন যে খ্লিস্তি (khlisti) সম্প্রদায়ে প্রবেশ করলেন সেটাকে অধ্যাপক অপছন্দ করতেন। এ সম্প্রদায় উন্মত্ত নৃত্য, সংগীত (এবং লোকে বলে যৌনাভিচার) ইত্যাদির মাধ্যমে পরমাত্মাকে মানবাত্মায় অবতীর্ণ করিয়ে স্বয়ং পরমাত্মায় পরিবর্তিত হওয়ার চেষ্টা

করে। এ মার্গ বিশ্বসংসারে কিছু আজগুবী নূতন চীজ নয়। তবে এঁরা বলতে কসুর করতেন না যে, স্ত্রী পুরুষের যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে এঁরা উদাসীন, অর্থাৎ এ বাবদে কে কি করে সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। রাসপুতিন এটাকে নিয়ে গেলেন তার চরমে। তিনি প্রচার করতে লাগলেন, 'পাপ না করলে ভগবানের ক্ষমা পাবে কি করে? অতএব পাপ করো!' এ ছাড়া তাঁর আরেকটি বক্তব্য ছিল, তিনি পরমাত্মার অংশাবতার, এবং তাঁর সঙ্গে দেহে মনে আত্মায় আত্মায় যে কেউ সম্মিলিত হবে তারই চরম মোক্ষ তদ্দণ্ডেই। তাঁর শিষ্যাগণের সঙ্গে তাঁর সেই সম্মিলিত হওয়াটা কোন্ পদ্ধতিতে হতো সেটা বলতে শ্লীলতায় বাধে, এবং একথা প্রায় সর্ববাদিসম্মত যে তিনি তাঁর শিষ্য-শিষ্যাগণকে নিয়ে একই কামরায় যে সব 'সম্মেলন' ঘটাতেন সেটা শুধু তিনি নিজেতেই সীমাবদ্ধ রাখতেন না, শিষ্য-শিষ্যাগণ নিজেদের মধ্যেও সম্মিলিত হতেন। ইংরিজীতে একেই 'অর্জি' 'সেটারনেলিয়া' ইত্যাদি বলে থাকে।

এটা সত্য, রাসপুতিনের কথা আমিই উত্থাপন করেছিলুম এবং অধ্যাপকও রাসপুতিন সম্বন্ধে তাঁর যা জানা ছিল সেটি সবিস্তর বলেছিলেন, কিন্তু তিনি রাসপুতিনের ধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁর পূর্ণ বক্তব্যের প্রায় অর্ধাংশ ব্যয় করেন ঐ সম্প্রদায় নিয়ে, এবং বিশ্বের অন্যান্য ধর্মে কোথায় কোথায় এ-প্রকারের 'অর্জি' স্বীকৃত এবং কার্যে পরিণত হয়েছে তাই নিয়ে। এ বাবদে তাঁর শেষ বক্তব্য আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে: ধর্মের নামে এ ধরনের অনাচার কেন যুগে যুগে হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, কিংবা গোপনে গোপনে বিশেষ কয়েকটি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে প্রাচীন ধারাটি অক্ষুণ্ণ রাখে, এ তত্ত্বটি সাতিশয় গুরুত্ব ধারণ করে এবং এর অধ্যয়ন প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন ধর্মশাস্ত্রীয় পুস্তক অধ্যয়ন করে হয় না, এর জন্য প্রথমত প্রয়োজন নৃতত্ত্ব এবং পরে সমাজতত্ত্বের গভীর অধ্যয়ন (এর পূর্বে Anthropology ও Sociology এ দুটো শব্দ আমি কখনো শুনিই নি)।

আমি তখন বুঝতে পারি নি, পরে পারি যে আর পাঁচজনের মত তিনিও রাসপুতিনের রগরগে কাহিনী কীর্তন করতে প্রস্তুত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল ওরই মাধ্যমে—ফাঁকি দিয়ে শটকে শেখানোর মত—আমাকে সাধারণ ভারতীয় ছাত্রের পাঠ্যবস্তুর গণ্ডি থেকে বের করে পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেওয়া। বলা বাহুল্য, এসব আমার সম্বন্ধে নিছক ব্যক্তিগত কথা হলে আমি এগুলো উল্লেখ করতুম না, আমার অন্যতম উদ্দেশ্য, এই সুবাদে তখনকার দিনের স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ-চালিত বিশ্বভারতীর (স্কুল ও কলেজ—যথাক্রমে 'পূর্ব' ও 'উত্তর বিভাগ') অধ্যাপকগণ

কি প্রকৃতি ধারণ করতেন তারই যৎকিঞ্চিৎ বর্ণন।

অধ্যাপক বলেছিলেন, এ ধরনের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ অবাধে করা যাচ্ছে এবং তদুপরি সেটা ধর্ম নামে প্রচারিত হচ্ছে, এটা যে জনপ্রিয় হবে—অন্তত জনগণের অংশবিশেষে—সেটা তো অতিশয় স্বাভাবিক। কিন্তু এই যে এক অজানা-অচেনা অর্ধলুপ্ত খ্লিস্তি সম্প্রদায় হঠাৎ নবজীবন লাভ করে খুদ জারের প্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেল, এটা তো আর একটা আকস্মিক অকারণ কর্তাবিহীন কর্ম নয়। এরকম একটা নবআন্দোলন আনয়নকারী পুরুষের কোনো-না-কোনো অসাধারণ গুণ, আকর্ষণ বা সম্মোহনশক্তি থাকা নিশ্চয়ই প্রয়োজন।

পূর্বেই বলেছি, অধ্যাপক ছিলেন কট্টর 'অর্থডক্স্ গ্রীক চার্চ'-এর অন্ধ ভক্ত। কিন্তু এস্থলে এসে তিনিও স্বীকার করলেন, রাসপুতিন একাধিক অলৌকিক শক্তি ধারণ করতেন। তিনি যে কঠিন কঠিন দুরারোগ্য রোগ, কোনো প্রকারের ঔষধ প্রয়োগ না করে প্রশম করতে পারতেন সেটারও উল্লেখ করলেন। কি প্রকারে? কেউ জানে না।

ইতিমধ্যে জার-প্রাসাদের উপর মৃত্যু যেন তার করাল ছায়া বিস্তার করেছে। হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে বালক যুবরাজ আহত হন। তাঁর রক্তক্ষরণ আর কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। ভিয়েনা বার্লিন থেকে বড় বড় চিকিৎসক এসেছেন। আমি অধ্যাপককে শুধিয়েছিলুম, 'চিকিৎসা শাস্ত্রে কি রাশা তখনো এতই পশ্চাৎপদ?' তিনি বলেছিলেন, 'বলা শক্ত। তবে সাহিত্যের বেলা চেখফ্ যা বলেছেন এস্থলেও হয়তো সেটা প্রযোজ্য: তোমার প্রিয় লেখক চেখফ্ বলেছেন, "হ্যাঁ, আলবৎ আমরা রুশ সাহিত্য পড়ি। কিন্তু সেটা ঐ যেরকম আমরা 'কুটির শিল্প'কে মেহেরবানী করে সাহায্য করি। আসল মালের জন্য যাই ফরাসী সাহিত্যে।" হয়তো চিকিৎসার বেলাও তখন তাই ছিল।'

দাসী না ডাচেস্—সমাজের দুই প্রান্তের দুজনা—কে প্রথম রাসপুতিনকে নিয়ে গেল জারের রাজপ্রাসাদে?

সে কি? যুবরাজ মৃত্যুশয্যায়, আপন 'কটেজ ইনডাসট্রি'র রাশান ডাক্তাররা তো হার মেনেছেনই, ভিয়েনা-বার্লিনের রাজ-বৈদ্যরাও, যাঁরা কি না কাইজারের, এমপেরার ফ্রানৎস যোজেফের প্রাসাদের গণ্যমান্যদের চিকিৎসা করে করে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন তাঁরা পর্যন্ত রাশা ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচেন। কারণ রুশ যুবরাজের যে রোগ হয়েছে সেটার নাম হ্যামোফিলিয়া—আমরা গরীবদের, না জানি কোন্ পুণ্যের ফলে, আমাদের হয় না—ব্যামোটা শব্দার্থেই রাজসিক, শুধু রাজা-

রাজড়াদের ভিতরেই সীমাবদ্ধ। পূর্বে ছিল এই বিশ্বাস; পরে দেখা গেল, গরীবদেরও হয়। আমরা বললুম, 'সেই কথাই কও। ভগবান যে হঠাৎ খামোখা এহেন দুরারোগ্য ব্যাধি শুধু বড়লোকদের জন্যই রিজার্ভ করে রেখে দেবেন, এটা তো অকল্পনীয়। ব্যামোগুলো তো আমাদের মতন গরীবদের জন্যই তৈরি হয়েছে। ভগবান স্বয়ং তো রাজাদের দলে। কিংডম অব্ দি হেভ্ন্ বা স্বর্গরাজ্যে যাঁর বাস তিনি তো ফেভার করবেন তাঁর জাতভাই তাঁদেরই, যাঁদের কিংডম্ অব্ দি আর্থ বা পৃথ্বীরাজ্য আছে।[২] তাই যদি হয়, তবে স্বর্গরাজ্যই হোক, আর ভূস্বর্গই হোক, ভিয়েনা-বার্লিনের অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেখানে রুগীকে হরি নামের গুলি দিয়ে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ার তালে, সেখানে দাসী 'ফার্সী পড়বে'? হয়তো ঠিক সেইখানেই, কিন্তু অন্য কারণও আছে।

আমরা এ-দেশে যত কুসংস্কারাচ্ছন্নই হই না কেন, একাধিক বাবদে অন্তত সে যুগে, অর্থাৎ এ-শতাব্দীর প্রারম্ভে জারের রাশা আমাদের অনায়াসে হার মানাতে পারতো। সে রাশার গ্রীক অর্থডক্স্ চার্চ ছিল শব্দার্থেই অর্থডক্স্ গোড়া, কট্টর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। আর চাষাভুষোদের তো কথাই নেই। তন্ত্রমন্ত্র, জড়িবড়ি, মাদুলী-কবচ থেকে আরম্ভ করে নিরপরাধ 'প্রভু যীশুর হত্যাকারী' ইহুদিদের সুযোগ পেলেই বেধড়ক মার, এবং সেখানেই শেষ নয়—আপন রক্তের, আপন ধর্মের জাতভাই যারা এসব কুসংস্কার থেকে একটুখানি মুক্ত হয়ে, অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ স্বাধীনভাবে প্রভু যীশুর বাণী জীবন দিয়ে গ্রহণ করার চেষ্টা করতো যেমন 'দুখবর', 'স্তান্দিস্ত' সম্প্রদায়—তাদের উপর কী বীভৎস অত্যাচার।[৩] এবং চাষাভুষোদের এই অত্যাচার-ইন্ধনে কাষ্ঠ সরবরাহ করতেন জার-সম্প্রদায় এবং তাঁদের অনুগ্রহে লালিত-পালিত বিলাস-ব্যসনে গোপন পাপাচারে আকণ্ঠ-নিমগ্ন অর্থডক্স্ চার্চ তার আপন 'পোপ'—হোলি সিনড্কে নিয়ে। যে ইউসুপফ এর

---

২ স্বয়ং স্বামীজী নাকি বলেছেন, 'যে ভগবান আমাকে এ-দুনিয়ায় এক মুঠো ভাত দেয় না, সে নাকি মৃত্যুর পর আমাকে স্বর্গরাজ্য দেবে—why, even an imbecile would not believe it; much less I!' তবে এটা প্রক্ষিপ্তও হতে পারে। তবু এ-কথা অতিশয় সত্য, তিনি এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য স্থাপনা করতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিম নাকি বলতেন, মানুষকে ভগবান হতে হবে, আর তিনি নাকি বলতেন, মানুষকে মানুষ হতে হবে।

৩ সে অত্যাচার-সংবাদে কাতর হয়ে তলস্তয় 'রেসারেক্শন' বই লিখে, টাকা তুলে এদের অনেককে কানাডা পাঠিয়ে দেন।

কয়েক বৎসর পর রাসপুতিনের ভবলীলা সাঙ্গ করেন, তিনি বা তাঁর ভাই, আরেক গ্র্যাণ্ড ডিউক প্রকাশ্য 'ডুমা' বা মন্ত্রণাসভায় প্রস্তাব করেন এবং বহু বিনিদ্র যামিনী যাপন করে স্বহস্তে নির্মিত পরিকল্পনা সঙ্গে সঙ্গে পেশ করেন, ইহুদিদের সবংশে বিনাশ করার জন্য কি প্রকারে, স্তরে স্তরে, শল্য প্রয়োগদ্বারা তাদের পুরুষদের সন্তান প্রজনন ক্ষমতা হরণ করা যায়? বগ্‌দানফ সাহেব বলেছিলেন, 'মাই বয়, হি সাব্‌মিটেড্ ইট ইন্ অল্ সিরিয়াসনেস্!' অবশ্য তৎসত্ত্বেও মার্জিত রুচিসম্পন্ন ভদ্রসন্তান অধ্যাপক বগ্‌দানফ ইহুদিদের ঘৃণা করতেন—হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে, ঐ জাতীয় আর পাঁচটা বর্বর রুশের মত। বিশ্বভারতীতে তখন একটি সুন্দরী, বিদেশিনী, ইহুদি অধ্যাপিকা ছিলেন; কি প্রসঙ্গে তাঁর কথা উঠতে বগ্‌দানফ তিক্ত অবজ্ঞায় মুখ বিকৃত করে বললেন, 'আই উড্ নট্ টাচ হার উইথ এ পেয়ার অব টংস!'—সাঁড়াশি দিয়েও তিনি তাঁকে স্পর্শ করতে রাজী হবেন না!

এ কথা সবাই বলেছেন, রাজধানী সেণ্ট পেটের্‌স্‌বুর্গে (তখন অবশ্য রাশা জর্মনীর সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত বলে তাদের সভ্যতায় জর্মনদের যে শতকরা আশী ভাগ অবদান, মায় তাদের ভাষায় প্রবেশপ্রাপ্ত জর্মন শব্দ, যেমন সেণ্ট পেটের্‌স্‌বর্গের জর্মন অংশ 'বুর্গ'—'প্রাসাদ', 'কাস্‌ল্'—সমূলে উৎপাটিত করে নামকরণ করেছে 'পেত্রোগ্রাদ'। সর্বশেষে এর নামকরণ হয় 'লেনিনগ্রাদ', কিন্তু ততদিনে রাজধানী চলে গেছে মস্কোতে। জারের 'উইণ্টার পেলেস' প্রাসাদে বিরাজ করতো কেমন যেন এক অদ্ভুত রহস্যময় (প্রধানত ধার্মিক—mysticism) বাতাবরণ। সম্রাজ্ঞী—জারিনা—ছিলেন অতিশয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আচার-অনুষ্ঠানে সদালিপ্ত, প্রতি মুহূর্তে পুত্রের পুনর্বার রক্তক্ষরণ রোগে আক্রান্ত হবার ভয়ে উদয়াস্ত সশঙ্কিত; বিশেষ করে যখন হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি এই কঠিন পীড়ার সম্মুখে সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে, তখন যে তিনি পাগলিনীর মত রাজ্যের যত প্রকারের টোটকামোটকা, তাবিজমাদুলীর সন্ধানে লেগে যাবেন সেটা অবাঞ্ছনীয় হলেও অবোধ্য নয়—এমন কি কট্টর বৈজ্ঞানিকও সেখানে সহানুভূতি দেখাবে। একেই তো শীত-প্রাসাদে বিরাজ করতো রহস্যময় বাতাবরণ, যেন সেখানে যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো প্রকারের অলৌকিক কাণ্ড ঘটে যেতে পারে, তদুপরি নানাশ্রেণীর কুটিল ভাগ্যান্বেষী সেই প্রাসাদে কোনো প্রকারের চতুরতা দ্বারা অর্থ সঞ্চয়ের জন্য গমনাগমন করছে, সেখানে যদি নিত্যসঙ্গিনী দাসীটিও যদি বলে যে, সে একজন 'হোলিম্যান', 'সাধুতপস্বী'কে চেনে যাঁর হৃদয়ে প্রভু যীশুর সামান্যাংশ প্রবেশ করার ফলে ('সেই শাশ্বত সত্তার একটি কণা আমাতে অবতার রূপে অবতীর্ণ হয়েছে'—রাসপুতিনের

আপন ভাষায়) তিনি প্রভুরই মত বহু দুরারোগ্য ব্যাধি, কোনো ঔষধ প্রয়োগ না করে অবলীলাক্রমে আরোগ্য করতে পারেন, তবে মহারানী যে নিমজ্জমানার ন্যায় সেই তৃণখণ্ডকেও দৃঢ়হস্তে ধারণ করবেন সেটা তো তেমন-কিছু অসম্ভব আচরণ নয়।

অন্যপক্ষ বলেন, দাসী নয় ডিউক।

রাসপুতিন দিগ্বিজয় করতে করতে পেত্রোগ্রাদ—সম্ভব হলে রাজপ্রাসাদ—জয় করবেন বলে মনস্থির করেছেন। এদিকে সেখানকার যাজক সম্প্রদায়ের কেউ বা তাঁর জনপ্রিয়তার সংবাদ শুনে, কেউ বা তাঁর ধর্মের নবজাগরণ প্রচেষ্টার খ্যাতি শুনে, কেউ বা তাঁর অলৌকিক কর্মক্ষমতার জনরবে আকৃষ্ট হয়ে সেটা সচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্য, এক কথায় অনেকেই অনেক কারণে তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করতে উদ্‌গ্রীব। রাসপুতিন সশিষ্য শিষ্যা পেত্রোগ্রাদে প্রবেশ করে—সে প্রবেশ প্রায় খৃষ্টের পূতপবিত্র জেরুজালেমের পুণ্যভূমিতে প্রবেশ করার সমতুল—সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠিত হলেন এক প্রভাবশালী শিষ্যের গৃহে। শীঘ্রই যোগসূত্র স্থাপিত হল পেত্রোগ্রাদের সর্বোৎকৃষ্ট ধর্মশিক্ষাশালার সুপণ্ডিত অধ্যক্ষের সঙ্গে। ইনি আবার মহারানীর আপন ব্যক্তিগত পুরোহিত—অর্থাৎ এঁরই সামনে মহারানী প্রতি সপ্তাহে একবার 'কনফেস্' করেন, ঐ সপ্তাহে তিনি যে সব পাপচিন্তা করেছেন, কর্মে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন সেগুলি স্বীকার করে শাস্ত্রাদেশ অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্তাদেশ গ্রহণ করেন—প্রায়শ্চিত্ত সাধারণতঃ উপবাস ও মালাজপের গণ্ডিতেই আবদ্ধ থাকে।[৪] এই কনফেশন গ্রহণ করে যে পুরোহিত প্রায়শ্চিত্তাদেশ প্রদান করেন তাঁর পদটি স্বভাবতই সাতিশয় গাম্ভীর্য ও গুরুত্ব ধারণ করে। তিনি সম্রাজ্ঞী-

---

৪ এই কনফেশন বা পদস্খলন স্বীকারোক্তি একাধিক ধর্মে প্রচলিত আছে। এদেশে জৈনদের ভিতর সেটি নিষ্ঠা সহকারে মানা হয়, এবং এরই নাম 'পর্যুষণ'। তবে আমাদের যতদূর জানা, পর্যুষণ বৎসরে মাত্র একবার হয় এবং সম্প্রদায়েয় সকলেই সেটা একই সময়ে করেন বলে বর্ষার শেষে সেটা পর্বদিবস রূপে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধ শ্রমণরাও বর্ষাকালে পর্যটন নিষিদ্ধ বলে কোনো সংঘে আশ্রয় নিয়ে বর্ষাযাপন-শেষে পাপ স্বীকারোক্তি করে পুনরায় পর্যটনে নেমে পড়েন। মুসলমানরা হজের সময় করে থাকেন, এবং মৃত্যু আসন্ন হলে 'তওবা' করেন। 'তওবা' শব্দার্থে 'প্রত্যাবর্তন'। অর্থাৎ তওবাকারী আপন পাপ সম্বন্ধে অনুশোচনা করে ধর্মমার্গে প্রত্যাবর্তন করলো।

হৃদয়-কন্দরের অন্তরতম রহস্য জানেন বলেন—এমন কি স্বীকারোক্তির সময় তিনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অধিকারও ধরেন—তাঁকে থাকতে হয় অতি সাবধানে।

তাঁর প্রধান কৌতূহল রাসপুতিন কোন্ কোন্ কারণে কি ভাবে হৃদয়ে ভগবানের প্রত্যাদেশ পেয়ে সমস্ত জীবনধারা পরিবর্তিত করে 'নবজন্ম' পেলেন। গ্রীক অর্থডক্স্ চার্চ, ক্যাথলিক তথা অন্যান্য সম্প্রদায়ের ইতিহাসে এই 'নব-জীবন' লাভ, গৃহী খৃষ্টানের সন্ন্যাস-গ্রহণের জন্য এই কনভার্সনের উপ-ইতিহাস এক বিরাট অংশগ্রহণ করে আছে। খৃষ্ট সাধু মাত্রই এটি মনোযোগ সহকারে বারংবার পাঠ করে তার থেকে প্রতি দিন নবীন উৎসাহ, তেজস্বী অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেন। মহারানীর আপন যাজক ধর্ম-একাডেমির অধ্যক্ষরূপে এই উপ-ইতিহাসে অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন, সেই পুস্তক তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর সম্মুখে সটীক প্রতিদিন পড়িয়ে শোনাতেন এবং স্বভাবতই সেই পুস্তকের ভিন্ন ভিন্ন সাধুসন্তদের নিয়ে গভীর এবং সূক্ষ্ম আলোচনা করতেন। কিন্তু কোনো পাপাত্মা কি ভাবে অকস্মাৎ দৈবাদেশ পেয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে ধর্মসঙ্ঘে প্রবেশ করে, কিংবা জনসেবায় আত্মনিয়োগ করে, অথবা পাণ্ডিত্য থাকলে সঙ্ঘে প্রবেশ ক'রে নির্জনে নিভৃতে বাইবেল বা অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থের এক নবীন টীকা নির্মাণে বাকী জীবন কাটিয়ে দেয় এ সম্বন্ধে তাঁর কোন ব্যক্তিগত অবধারিত অভিজ্ঞতা ছিল না, এবং অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে, এ রকম একটা আধ্যাত্মিক 'কনভার্সনে'র নায়ক যদি তাঁর আপন কর্মস্থলে হঠাৎ এসে পৌঁছন তবে তিনি হয়তো তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করবেন। পূর্বেই বলেছি, রাসপুতিনের ভিতর যেমন যেন একটা বৈদ্যুতিক আকর্ষণী শক্তি ছিল, তাঁর স্বাভাবিক অবস্থায়ও তিনি সাধারণ কেন, অসাধারণ জনকেও মন্ত্রমুগ্ধবৎ মোহাচ্ছন্ন করতে পারতেন। খৃষ্ট ধর্মশাস্ত্রে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞান-প্রজ্ঞা ছিল অতিশয় সীমিত, কিন্তু প্রভু যীশুর যে কটি সরল উপদেশ তিনি বহু কষ্টে কণ্ঠস্থ করতে পেরেছিলেন সেগুলি তিনি অতিশয় দৃঢ়-বিশ্বাসের বীর্যশীল সরলতায় প্রকাশ করতে পারতেন। সঙ্গে সঙ্গে এ সত্যটিও নিবেদন করা উচিত যে, রাশায় ধর্মশিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে যে পণ্ডিতকুলমান্য সর্বোত্তম শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যয়ন অধ্যাপনা করেন তিনি এই অশিক্ষিত হলধরসন্তানের কাছে আসবেন না শাস্ত্রের টীকাটিপ্পন' শ্রবণার্থে! তিনি আসবেন অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে। এ স্থলেও প্রভু যীশুর সঙ্গে রাসপুতিনের সাদৃশ্য আছে। ইসরায়েলের স্মার্তপণ্ডিতরা যখন প্রভু যীশুর সঙ্গে তর্কযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত তখন তিনি যেন তাচ্ছিল্যভরে বলেছিলেন, আমি শাস্ত্রকে কার্যে পরিপূর্ণ ভাবে দেখাবো।

এসব কারণ অনুসন্ধান অপ্রয়োজনীয়। যা বাস্তবে ঘটে সেটা সর্ব তর্কের

অবসান এনে দেয়। পণ্ডিতের পণ্ডিত রাসপুতিনকে দেখে, তাঁর আচার-ব্যবহার, তাঁর প্রতি শিষ্য-শিষ্যাদের সহজ ভক্তি ও সুদৃঢ় বিশ্বাস ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে বিস্মিত হলেন, কিন্তু মুগ্ধ হলেন যখন রাসপুতিনের কাছ থেকে শুনলেন, তাঁর আবেগভরা কণ্ঠে তিনি বলে যেতে লাগলেন, কি ভাবে এক দৈবজ্যোতি তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হল আর তিনি ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে স্বর্গীয় প্রভুর পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করলেন।

এ প্রকারের আকস্মিক পরিবর্তন ইতিহাস শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যক্ষ পড়েছেন, পড়িয়েছেন প্রচুর কিন্তু এ-জাতীয় পরিবর্তনের একটি সরল সজীব দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দেখা, স্বকর্ণে শোনা সে যে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন, অভিনব, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। যে-কোনো অধ্যাপক, যে-কোন শিক্ষক এ প্রকারের অভিজ্ঞতাকে অসীম মূল্য দেন, কারণ পরের দিন থেকেই ছাত্রমণ্ডলীতে বেষ্টিতাবস্থায় তিনি অর্ধবিশ্বাসী তর্কবাগীশদের উদ্দেশে সবল, আত্মপ্রত্যয়জাত সুদৃঢ় কণ্ঠে বলতে পারেন, 'পবিত্র রুশ দেশের পবিত্রতর সন্তদের যে অলৌকিক পরিবর্তনের কথা তোমরা পড়ছো, সেগুলো কাহিনী নয়, ইতিহাস, এবং শুষ্ক পত্রে লিখিত জীর্ণ ইতিহাস নয়, নিত্য-দিনের বাস্তব প্রত্যক্ষ সত্য; সে জিনিস ভাগ্যবান চক্ষুষ্মান দেখতে পায়।' অস্মদ্দেশীয় প্রচলিত নীতিবাক্য আছে:

"অদ্যাপিও সেই লীলা খেলে গোরা রায়।
মধ্যে মধ্যে ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

এবং তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন, এই সাধুপুরুষকে তিনি রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত সম্রাজ্ঞীর সম্মুখীন করবেন। সর্ব ধর্মের সর্ব ইতিহাস বলে, সাধুজনের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নেই। সম্রাজ্ঞীকে এই সাধু তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করে এনে দেবেন সান্ত্বনা, আত্মপ্রত্যয় এবং ধর্মবিশ্বাস স্থাপন করবেন দৃঢ়তর ভূমিতে।

অতি সহজেই তিনি রাসপুতিনের গুণমুগ্ধ রাজপরিবারের একাধিক নিকটতম আত্মীয়-আত্মীয়ার সহানুভূতি ও সহযোগ পেলেন। রাসপুতিন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

কেউ কেউ বলেন, সেটা ছিল আকস্মিক যোগাযোগ। অধিকতর বিশ্বাসীরা বলেন, 'না, যুবরাজের কঠিনতম সঙ্কটময় অবস্থান, যখন রাজবৈদ্যগণ তাঁর জীবন রক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ্বাস,তখন রাসপুতিন তাঁকে অনুরোধ করার পূর্বেই স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে শিষ্যগণকে প্রত্যয় দেন, তিনি যুবরাজকে সম্পূর্ণ নিরাময় করতে পারবেন।

এ তো কোনো হাস্যকর আত্মপ্রত্যয় নয়। অভিজ্ঞতম প্রবীণ চিকিৎসকও বার বার মস্তকান্দোলন করে স্বীকার করেন, কত অগুণিত রোগী যমদূতের দক্ষিণহস্ত ধরে যখন পরপারে যাত্রার জন্য প্রথম পদক্ষেপ করেছে, রূঢ় সরল ভাষায় ঐ সব রোগীদের সম্বন্ধে যখন বহু পূর্বেই সব বিশেষজ্ঞ একই বাক্যে আপন দৃঢ় নৈরাশ্য প্রকাশ করেছেন, ঠিক সেই সময় হঠাৎ অকারণে, চিকিৎসকের কোন প্রকারের সাহায্য না নিয়ে সেই জীবন্মৃত ব্যক্তি শ্মশান-সঙ্কট উত্তীর্ণ হয়ে ধীরে ধীরে পুনরায় লুপ্ত স্বাস্থ্য ফিরে পায়।

* *

সম্রাট এবং মহিষী উভয়েই নাকি সাধুর প্রথম দর্শন লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধ হয়ে যান। বিশেষ করে রাজমহিষী।

অধ্যাপক বগ্‌দানফের মতে, অর্থাৎ তিনি যে জনরব সর্বাপেক্ষা নির্ভরশীল বলে গ্রহণ করেছিলেন সেই অনুযায়ী রাসপুতিন নাকি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মহারানীকে আশ্বাস দেন, যুবরাজ রোগমুক্ত হবেন, এবং তিনিই তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। রাজমহিষী স্বয়ং তাঁকে নিয়ে রুগীর কক্ষের দিকে অগ্রসর হলেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ উচ্চকণ্ঠে, তারস্বরে প্রতিবাদ জানালেন। যে-ব্যক্তিকে সম্রাজ্ঞী নিয়ে যাচ্ছেন সে-ব্যক্তি যে চিকিৎসাশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ, সে-কথা সে-ই একাধিকবার স্বীকার করেছে, এমতাবস্থায় যখন তাঁরা আশা করছেন যে, যে-কোন মনুষ্য বা ইতর প্রাণীর ন্যায় যুবরাজও প্রকৃতিদত্ত শক্তিবলে—যে শক্তি সর্বজনের অলক্ষিতে জীবদেহে বেঁচে থাকার জন্য সর্বব্যাধির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম দ্বারা আপন কর্তব্য করে যায়—হয়তো নিরাময় হয়ে যেতে পারেন সেই সঙ্কটজনক অবস্থায় এই নবাগত হয়তো আপন অজ্ঞতাবশত সেই শক্তির প্রতিবন্ধক হয়ে তার কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দিতে পারে।

তৎসত্ত্বেও মহারাণী রাসপুতিনকে রোগীর কক্ষে নিয়ে গেলেন।

চিকিৎসকরাও সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করলেন। রাসপুতিন বললেন, তিনি কোনো তৃতীয় ব্যক্তির সম্মুখে চিকিৎসা করবেন না। তৃতীয় বলতে সম্রাজ্ঞীকেও বোঝায়, তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে দৃঢ় পদক্ষেপে দেহলীপ্রান্ত উত্তীর্ণ হলেন।

অতি অল্পক্ষণ পরেই রাসপুতিন দোর খুলে রানীর দিকে সহাস্য ইঙ্গিত করলেন। রানীমা কক্ষে প্রবেশ করে স্তম্ভিত। যেন কত যুগ পরে তিনি দেখলেন রাসপুতিনের দেওয়া কি যেন একটা জিনিস হাতে নিয়ে যে কোনো সুস্থ বালকের মত যুবরাজ খেলা করছেন।

রাসপুতিন প্রকৃতই যুবরাজকে তাঁর রক্তমোক্ষণ রোগ থেকে নিরাময়

করেছিলেন কি না সে-বিষয়ে মতানৈক্য আছে—তবে এটাও স্মরণে আনা কর্তব্য বিবেচনা করি যে, এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে গবেষণা, পাণ্ডিত্য, সত্যানুসন্ধান বললেই বোঝাতো—অবিশ্বাস। এই মূলমন্ত্র ঐ সময়ে এমনই সুদূরপ্রসারী হয় যে, তৎকালীন লিখিত পুস্তক, এনসাইক্লোপীডিয়াতে একাধিক যশস্বী লেখক স্বয়ং বুদ্ধ, মহাবীর, এমন কি তাঁদের আপন খৃষ্টের অস্তিত্ব পর্যন্ত সন্দেহাতীতরূপে সপ্রমাণ না হওয়ায় (দু' হাজার, আড়াই হাজার বৎসরের পরের একতরফা বা 'এক্‌স্‌পার্টে' তদন্তে!) তাঁদের জীবনী এবং বাণীকে কাল্পনিক কিংবদন্তী আখ্যা দিয়েছেন, এবং কেউ কেউ তাঁদের অস্তিত্ব পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেছেন। অতএব সে যুগের পুস্তক যে রাসপুতিনের মত চিকিৎসানভিজ্ঞজন যুবরাজকে রোগমুক্ত করেছেন সে কথা হয় অস্বীকার করে, কিংবা নীরব থাকে। তবে এ কথা সকলেই স্বীকার করেছেন, রাসপুতিনের প্রাসাদ গমনাগমনের পর থেকেই যুবরাজের স্বাস্থ্যোন্নতি দিনে দিনে সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়।

আর সে যুগের সম্রাজ্ঞীদের ভিতর ধনে-ঐশ্বর্যে খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে নিঃসন্দেহে সর্বাগ্রগণ্যা না হলেও যাঁকে ইয়োরোপের রাজন্যবর্গ রাজপরিবার সবাপেক্ষা সম্ভ্রমের চক্ষে দেখতেন সেই জারিনা? তিনি তো কৃতজ্ঞতার প্রতিদানস্বরূপ রাসপুতিনের পদপ্রান্তে কী যে রাখবেন তার সন্ধানই পাচ্ছেন না, কারণ সাধারণজনের মত ভবন-যানবাহন রজতকাঞ্চনে তাঁর লোভ ছিল না—তাঁর আসক্তি কিসে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন—ওদিকে জারিনা আবার জাতমিষ্টিক, অলৌকিক ক্রিয়াকর্মে তিনি বিশ্বাস করেন এবং যাঁদের এসব মিরাকল দেখাবার শক্তি আছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন তাঁদের কাছে তিনি তাঁর দেহ-মন-আত্মা সর্বস্ব নিয়ে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত।

জিতেন্দ্রিয় পরোপকারী সাধুসজ্জনদেরই না কত প্রকারের কুৎসা রটে—দু' হাজার বৎসর হয়ে গেল এখনো খৃষ্টবৈরীরা বলে, তিনি নাকি অসচ্চরিত্রা যুবতীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন ও মদ্যপানে তাঁর আসক্তি ছিল ঈষৎ মাত্রাধিক—সে-স্থলে রাসপুতিন! যিনি কিনা, তাঁর কামানল নির্বাপিত করার চেষ্টা তো করেনই না, তদুপরি ঐ বিশেষ রিপুর চরিতার্থতাকে তুলে ধরেছেন সর্বোচ্চ ধর্মের পর্যায়ে এবং ফলে শিষ্যশিষ্যাগণসহ বহুবিধ অনাচারে লিপ্ত হন—এসব 'অর্জি' 'সেটারনেলিয়া'র উল্লেখ আমরা পূর্বেই করেছি—তাঁর পূর্ববর্তী মফস্বল-জীবনের তুলনায় রাজধানীতে তাঁর বর্তমান কেলেঙ্কারির বিবরণ তথা পল্লবিত জনরব চতুর্দিকে যে অধিকতর ছড়িয়ে পড়বে তাতে আর কী সন্দেহ! কিন্তু ক্রমে ক্রমে মোক্ষমতর মারাত্মক কলঙ্ককাহিনী রটতে আরম্ভ করলো চতুর্দিকে; এসব

দলবদ্ধভাবে কৃত দুষ্কর্মের 'অর্জি' এখন নাকি রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে– এবং সেখানে তো সব-কিছুই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়—পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে! সম্রাস্ততম ডিউক ডাচেস, অর্থাৎ সম্রাটের নিকটতম আত্মীয়-আত্মীয়ারাও নাকি এই সব অনাচারে অংশ নিচ্ছেন। এবং সর্বশেষে যে কলঙ্ককাহিনী পেত্রোগ্রাদে জন্মলাভ করে সর্ব রুশের সর্ব সমাজের উচ্চতম থেকে অধস্তন শ্রেণী পর্যন্ত প্রচারিত হয়ে আপামর জনসাধারণকে দিল রূঢ়তম পদাঘাত সেটি আর কিছু নয়, স্বয়ং জারিনা তাঁর দেহ সমর্পণ করেছেন রাসপুতিনকে। অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহিলাদের তো কথাই নেই।

গ্র্যাণ্ড ডিউক ইউসপফের দু'টি মোকদ্দমাই ছিল এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে। এই সব কলঙ্ককাহিনীর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীকে জড়িয়ে প্রথমে ফিল্ম তৈরি করা হয়েছে, পরে টেলিভিশনে দেখানো হয়েছে, অথচ তাঁর মতে, তাঁর সতীসাধ্বী স্ত্রী পূর্বোল্লিখিত পাপানুষ্ঠানের সঙ্গে মোটেই বিজড়িত ছিলেন না। সে কথা পরে হবে।

আমি এতক্ষণ আপ্রাণ চেষ্টা দিয়ে রুশ রাজনীতি এড়িয়ে গিয়েছি কিন্তু এখন থেকে আর সেটা সম্ভবপর হবে না, কারণ, এই সময়েই কূটরাজনৈতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হলধর-সন্তান রাসপুতিন হিম্মে নিতে আরম্ভ করেছেন দেশ-বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ কঠিন কঠিন সংকটসমস্যায়। ইতিমধ্যে যে সব সরল ধর্মযাজকগণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁরা ধীরে ধীরে বিশ্বস্ততম সূত্রে তাঁর 'কীর্তিকলাপে'র সম্পূর্ণ বিবরণ অবগত হয়ে তাঁর সঙ্গে সর্ব সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছেন। কিন্তু স্বয়ং জারিনা এবং রাশার 'পোপ' হোলি সিনড যতক্ষণ তাঁর সম্মোহন-ক্ষমতায় অর্ধচেতন ততক্ষণ তাঁকে তো মুহূর্তেক তরে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। পাঠক, স্মরণ করুন সেই সুপ্রাচীন আরবী প্রবাদ: 'কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে, কিন্তু কাফেলা (ক্যারাভান) চলে এগিয়ে!' রাসপুতিন এই কুকুরগুলোর ঘেউ ঘেউকে থোড়াই পরোয়া করেন।

কিন্তু রাসপুতিন কি করে এরকম নির্বিকারচিত্তে উপেক্ষা করলেন রুশ দেশের জনগণের রাজনৈতিক নবজাগরণকে! জার দ্বিতীয় নিকলাস যত না রক্ষণশীল, সম্রাটের সার্বভৌমিকত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তাঁর চেয়ে শতগুণ স্থবির জড়ভরত ছিলেন তাঁর আমির-ওমরাহ। ওদিকে রুশ-সিংহ যখন সদম্ভে মূষিক জাপানের সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে তার কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে নির্মমরূপে পরাজিত হল, তখন আর 'হোলি' রাশার অন্তঃসারশূন্যতা গোপন রাখা সম্ভব হল না। জনমত নির্ভয়কণ্ঠে জারের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বায়ত্তশাসন দাবি করলো। ১৯০৪

খৃষ্টাব্দে যে বৎসর রাসপুতিন সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, ঠিক সেই বৎসরেই জার প্রথম 'বিধানসভা' (এরই নাম পূর্বোল্লিখিত 'ডুমা') নির্মাণের অনুমতি দিলেন। সে এক সত্যকার সার্কাস—নইলে তার কোন সম্মানিত সদস্য সেখানে অস্ত্রোপচার দ্বারা ইহুদিকুলকে শিখণ্ডীরূপে পরিণত করবার প্রস্তাব গুরুত্বপূর্ণ গাম্ভীর্যমণ্ডিত পদ্ধতিতে পেশ করতে পারেন ?

কিন্তু 'ডুমা' প্রতিষ্ঠান বন্ধ্যা হয়ে রইল কি না রইল সে তত্ত্ব রাসপুতিন-জীবনকে স্পর্শ করতে পারে নি যতদিন না রাজপ্রাসাদচক্রের দু-একজন ধুরন্ধর অতিশয় রক্ষণশীল রাজনৈতিক মনস্থির করলেন যে, রাসপুতিনকে দিয়ে তাঁরা এমন সব রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিয়ে নেবেন, যারা ডুমার প্রতি পদক্ষেপের পথে লৌহপ্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান হয়ে থাকবে। কূটনীতিতে আনাড়ি রাসপুতিনের হাত দিয়ে তামাক খাওয়াটা কিছুমাত্র দুঃসাধ্য হল না, কিন্তু এসব অপদার্থ নিয়োগের পশ্চাতে কে, সে তথ্যটিও গোপন রইল না। বস্তুত স্বয়ং রাসপুতিন প্রত্যেক পার্টিতে জালা জালা মদ আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুমিষ্ট কেক্‌খণ্ড (তাঁর জন্য বিশেষ করে কেকে তিন ডবল চিনি দেওয়া হত—এ বাবদে হিটলারের সঙ্গে তাঁর সম্পূর্ণ মিল) চাষাড়ে পদ্ধতিতে প্রচুর শব্দ আর বিরাট আস্তব্যাদানসহ চিবুতে চিবুতে দম্ভ করতেন, 'এই যে দেখছো স্কার্ফখানা, এটি আপন হাতে বুনেছেন স্বয়ং জারিনা, (কিংবা হয়তো তাঁর আদরের ডাকনাম সোহাগভরে উল্লেখ করতেন—আমার যেন মনে পড়ছে, তাই), কিংবা 'জানো হে, ভরনাভাকে পাঠালুম তবল্‌স্কের বিশপ করে।' প্রভু রাসপুতিনের অন্ধভক্ত, অত্যধিক মদ্যপানবশত অর্ধমত্ত শিষ্যেরাও নাকি দ্বিতীয় সংবাদটি শুনে অচৈতন্য হবার উপক্রম! কারণ প্রভুর নিত্যসঙ্গী ঐ ভরনাভা যে একেবারে আকাট নিরক্ষর! সে হবে বিশপ!

মরীয়া হয়ে অন্যতম প্রধান পাদ্রী নিযুক্ত করলেন গুপ্তঘাতক। রাসপুতিন শুধু যে অনায়াসে সংকট অতিক্রম করলেন তাই নয়, এ 'সুবাদে' রাজপ্রাসাদে তাঁর প্রভাব এমনই নিরঙ্কুশ হয়ে গেল যে, স্বয়ং জার পর্যন্ত আর এখন উচ্চবাচ্য করেন না। অবশ্য সমস্ত ইয়োরোপই বিলক্ষণ অবগত ছিল যে, জার অতিশয় দুর্বল চরিত্রের 'যাক্‌গে, যেতে দাও না'—ধরনের নির্বীর্য 'শাসক'। কার্যত তাঁকে শাসন করেন জারিনা। এবং তাঁর সম্মুখে রাসপুতিনের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করার মত সাহস তখন কারো ছিল না।

রাসপুতিনকে হত্যা করার চেষ্টা নিষ্ফল হওয়ার পরই তিনি জারিনাকে সর্বজনসমক্ষে গম্ভীর প্যাকস্বরীকণ্ঠে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন (বা শাসান), 'আমার মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে গোষ্ঠীসুদ্ধ রমানফ পরিবার (অর্থাৎ সপরিবারে

তখনকার জার) নিহত হবে।' নিহত তাঁরা হয়েছিলেন, এবং অতিশয় নিষ্ঠুর পদ্ধতিতেই, কিন্তু সেটা ঠিক এক বৎসরের ভিতরই কিনা, বলতে পারবো না, দু' বৎসরও হতে পারে।

কিন্তু জারিনা? তাঁর শোচনীয় অবস্থা তখন দেখে কে? কুসংস্কারাচ্ছন্ন অতিপ্রাকৃতে অন্ধবিশ্বাসী এই মূঢ় রমণীর যত দোষই থাক, একটা কথা অতিশয় সত্য, তিনি তাঁর পুত্রকন্যাকে বুকে চেপে ধরে রেখেছিলেন পাগলিনী-পারা। উদয়াস্ত তাঁর আর্ত সশঙ্ক দৃষ্টি, না জানি কোন্ অজানা অন্ধকার অন্তরাল থেকে কোন্ অজানা এক নূতন সংকট অকস্মাৎ এসে উপস্থিত হবে, তাঁর কোনো একটি বৎসকে ছিনিয়ে নেবার জন্য।

অতএব প্রাণপণ প্রহরা দাও রাসপুতিনের চতুর্দিকে। তিনিই একমাত্র মুশ্‌কিল্-আসান্। এই 'হোলিম্যান' আততায়ীর হস্তে নিহত হলে সর্বলোকে সর্বনাশ!

কিন্তু বিশ্বসংসারের সকলেই রাসপুতিনের সাবধানবাণী বা শাসানোতে বিশ্বাস করেন নি এবং ভয়ও পান নি। বিশেষ করে রাজপ্রাসাদের সর্বোচ্চস্তরের রাজরক্তধারী একাধিক ব্যক্তি। এঁরা ক্রমাগত জার-জারিনাকে রাসপুতিন সম্বন্ধে সাবধান হতে বলেছেন, এবং ফলে তাঁদের প্রতি বর্ষিত অপমানসূচক কটুবাক্য মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিদিন। রাজপ্রাসাদে এঁরা হচ্ছেন অপমানিত—অথচ রাসপুতিনের 'শুভাগমনে'র পূর্বে এঁরাই ছিলেন সেখানে প্রধান মন্ত্রণাদাতা। এখন তাঁদের এমনই অবস্থা যে, বাইরের সমাজে তাঁরা আর মুখ দেখাতে পারেন না। তাঁদের পদমর্যাদা, অভিজাত রক্ত প্রকাশ্য ব্যঙ্গবিদ্রূপ থেকে তাঁদের বাঁচিয়ে রেখেছে সত্য, কিন্তু ভিতরে বাইরে, স্ফুট-অস্ফুট নিত্যদিনের এ অপমান আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়! ওদিকে 'হোলি রাশা' যে কোন্ জাহান্নমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন কে জানে!

অপমানিত সর্বোচ্চ অভিজাতবংশজাত তিনজন বসলেন মন্ত্রণাসভায়।

স্থির হল, ইউসুপফই হত্যা করবেন রাসপুতিনকে। তাই আজও লোকে বলে, 'তোমার স্ত্রীকে রাসপুতিন ধর্ষণ করেছিল বলেই তো তুমি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলে, নইলে রাশাতে কি আর অন্য লোক ছিল না?' ইউসুপফ এটা অস্বীকার করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, প্রধানদের আদেশানুযায়ীই তিনি ঐ কর্মে লিপ্ত হন, আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় নিজকে ভলন্টিয়ার করেন যদিও তাঁর স্ত্রী ধর্ষিতা হন নি। এ সম্বন্ধে ইউসুপফের আপন জবানী পাঠক বিশ্বাস করতে পারেন, নাও করতে পারেন; আমি শুধু বগ্‌দানফ

সাহেবের জবানীটি পেশ করছি। না হয় সেটা ভ্রান্তই হল, তাতেই বা কি? তদুপরি আমার স্মৃতিশক্তি আমার কলম নিয়ে কি যে খেলা খেলছে, জানবো কি করে?

এবং আশ্চর্য! হত্যা করবেন আপন বাড়িতেই তাঁকে সসম্মান নিমন্ত্রণ করে! পুলিসকে ভয় করতেন এঁরা থোড়াই। কিন্তু জারিনা? তিনি যে শেষ পর্যন্ত হত্যাকারী কে, সে খবরটা প্রায় নিশ্চয়ই জেনে যাবেন, এবং তার ফলাফল কি হতে পারে, না পারে, সে নিয়েও বিস্তর আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এ ছাড়া গত্যন্তর নেই—নান্য পন্থা বিদ্যতে।

ইউসুপফ পক্ষ যে রাসপুতিনের শত্রু তিনি এটা জেনেশুনেও ইউসুপফের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে এলেন কেন? কেউ বলে, ইউসুপফের সুন্দরী স্ত্রী ইরেনে তাঁকে 'বিশেষ' প্রলোভন দেখিয়ে ফাঁদে ফেলেন, কেউ বলে, রাসপুতিন সত্যই আশা করেছিলেন, মুখোমুখি আলাপ-আলোচনার ফলে হয়তো প্রাসাদের এই শত্রুপক্ষের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপিত হতে পারে, কেউ বলে, রাসপুতিন প্রাসাদ জয় করেছিলেন বটে কিন্তু ইউসুপফের মত অভিজাতবংশের কেউ কখনো তাঁকে নিমন্ত্রণ করা দূরে থাক, বাড়িতে পর্যন্ত ঢুকতে দিতেন না। ইউসুপফ জয় অর্থই পেত্রোগ্রাদ-অভিজাতকুল জয়। তার অর্থ, নূতন শিষ্যা, নূতন ··একটা সম্পূর্ণ নূতন ভাণ্ডার!

প্রায় সবাই বলেছেন, মদে দেওয়া হয়েছিল প্রচুর পটাসিয়াম সায়েনাইড, কিন্তু অধ্যাপক বলেছিলেন, মধুভরা বিরাট কেকের সঙ্গে মিশিয়ে। আমার মনে হয় দ্বিতীয় পন্থাতেই আততায়ীর ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম। মহামান্য অতিথি রাসপুতিনকে অবশ্যই দিতে হত বংশানুক্রমে সযত্নে রক্ষিত অত্যুৎকৃষ্ট খানদানী মদ্য; এবং ভদ্রতা রক্ষার জন্য অতিথি-সেবককেও নিতে হত সেই বোতল থেকেই। এইটেই সাধারণ রীতি। কিন্তু পার্টিতে সবাই তো আর কেক খায় না—তাও আবার তিন-ডবল মধুভর্তি স্পেশাল 'রাসপুতিন কেক্'—তদুপরি, বিরাট কেকের দু-আধা দুই পদ্ধতিতে নির্মাণ করে জোড়া দেওয়া অতি সহজ।

তা সে কেক্ই হোক্ আর খানদানী মদই হোক্—রাসপুতিন তাঁর বীভৎস অভ্যাসমত সে-বস্তু খেয়ে গেলেন প্রচুরতম পরিমাণে, এবং তাজ্জব কী বাৎ! তাঁর কিছুই হল না। চোখের পাতাটি পর্যন্ত নড়লো না। আমার সুস্পষ্ট মনে আছে এস্থলে অধ্যাপকও আপন বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'মাই বয়! দেয়ার উয়োজ ইনাফ পয়জন টু নক্ অফ্ সিক্স্ বুল্জ।' অর্থাৎ ঐ বিষে ছ'টা আস্ত বলদ ঘায়েল হয়! কিন্তু রাসপুতিন নির্বিকার! ইউসুপফরা

জানতেন না, রাসপুতিনকে ইতিপূর্বে একাধিকবার বিষপ্রয়োগে হত্যা করার চেষ্টা নিষ্ফল হয়। ম্যাজিশিয়ানরা যে রকম ব্লেড খায়, রাসপুতিন ঠিক সেই রকম হরেক জাতের বিষ খেতে তো পারতেনই, হজমও করতেন অক্লেশে।

ষড়যন্ত্রকারীরা পড়লেন মহা ধন্দে। তাঁদের সব প্ল্যান ভণ্ডুল।

তখন ইউসুপফ অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের ফিস ফিস করে বললেন, 'এ রকম সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। আমি ওকে গুলি করে মারবো।'

পিছন থেকে ঠিক ঘাড়ের উপর, অর্থাৎ সবচেয়ে মারাত্মক জায়গায়, একেবারে কাছে এসে ইউসুপফ গুলি ছুঁড়লেন। রাসপুতিন রক্তাক্ত দেহে অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন।

সে তো হল। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা এখন সম্মুখীন হলেন এক সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নূতন সমস্যার। জখমহীন মৃতদেহ যত সহজে হস্তান্তর করা যায়, রক্তাক্ত দেহ নিয়ে কর্মটা তো অত সহজ নয়। এখন কি করা কর্তব্য সেটা স্থির করার জন্য দলের আর যাঁরা সন্দেহ না জাগাবার জন্য পার্টিতে যোগ না দিয়ে উপরের তলায় অপেক্ষা করছিলেন তাঁদের সঙ্গে ইউসুপফাদি যোগ দিলেন। তার পূর্বে তিনি লাশটা টেনে টেনে সেলারে (মাটির নিচে কয়লা এবং আর-পাঁচটা বাজে জিনিস রাখার গুদোম) রেখে এলেন। পাছে হঠাৎ কেউ ডাইনিংরুমে ঢুকে লাশটা আবিষ্কার করে ফেলে।

স্থির হল, রাসপুতিনের লাশ ইউসুপফের বাড়ির কাছে নেভা নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হবে। সেটা ডিসেম্বর মাস।[৫] নেভার উপরকার জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। সেইটে ভেঙে লাশ ভিতরে ঢুকিয়ে গায়েব করে দেওয়া কঠিন কর্ম নয়।

এইবার সবাই হলেন—যাকে বলে বজ্রাহত! এবং ভুলবেন না, এঁদের অধিকাংশই ফৌজের আপিসার। এঁদের কাউকে হকচকাতে হলে রীতিমত কস্ত করতে হয়, আর মৃত্যুভয়? ছোঃ![৬]

৫ রাসপুতিনের মৃত্যুদিবস ১৫।১৬ ডিসেম্বর ১৯১৬ বলা হয়, আবার ৩০ ডিসেম্বরও বলা হয়। তার কারণ অর্থডক্স রুশ ক্যালেণ্ডার ও কন্টিনেন্টের প্রাচীন ক্যালেণ্ডারে ১৩।১৪ দিনের পার্থক্য।

৬ অধ্যাপক আমাকে গল্পচ্ছলে একদা বলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রাশান অফিসারদের সবচেয়ে প্রিয় খেলা (প্যাস্টাইম) ছিল প্রচুর মদ্যপানের পর লটারিযোগে দুজন অফিসারের নাম স্থির করা। তারপর একজন একটা ঘরে

তা নয়। সবাই সেলারে ঢুকে দেখেন, রাসপুতিনের লাশ উধাও। ঘাড়ের সবচেয়ে মারাত্মক জায়গায় গুলি খেয়ে যে-লোকটা পড়ে গিয়ে 'মরলো', সে যে শুধু আবার বেঁচে উঠলো তাই নয়, আপন পায়ে হেঁটে বাড়ি ছেড়ে উধাও হয়ে গেল।

অবশ্য এ-কথা ঠিক, ইউসুপফ সেলারের দরজা বাইরের থেকে তালাবন্ধ করেন নি, এবং খামোকা বেশী লোক যাতে না জানতে পারে তাই সে রাত্রে অধিকাংশ চাকর-বাকরকে ছুটি দিয়ে রেখেছিলেন।

রাসপুতিন যদি এখন কোনো গতিকে জারিনার কাছে পৌঁছে সব বর্ণনা দেন—এবং নিশ্চয়ই তিনি করবেন তবে ইউসুপফের অবস্থাটা হবে কি?

কিন্তু তিনি অতশত ভাবেন নি—অন্যান্যদের জবানী তাই। তাঁরা বলেন, তিনি পাগলের মত পিস্তল হাতে নির্জন রাস্তায় ছুটতে ছুটতে হঠাৎ দেখেন, চতুর্দিকের সেই শুভ্র শুভ্রতাময় বরফের ভিতর দিয়ে টলতে টলতে রাসপুতিন এগিয়ে যাচ্ছেন। রক্তক্ষরণও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এবারে ইউসুপফ আর কোনো চান্‌স্ নিলেন না। পিস্তলে যে কটা গুলি ছিল সব কটা ছুঁড়লেন তাঁর ঘাড়ের উপর। তারপর সবাই মিলে তাঁকে টেনে নিয়ে, নেভা নদীর উপরকার জমে-যাওয়া বরফ ভেঙে লাশটা ঢুকিয়ে ঠেলে দিলেন ভাটির দিকে।

কিন্তু জারিনা সে-দেহ উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। চার্চেরই মত একটি বিশেষ উপাসনাগারসহ নির্মিত চেপলে তাঁর দেহ সযত্নে গোর দেওয়া হল একটি রমণীয় পার্কের ভিতর। মহারাণী প্রতি রাত্রে যেতেন সেই গোরের পাশে, নীরবে অঝোরে অশ্রুবর্ষণ করার জন্য, রাসপুতিনের আত্মার সদ্‌গতি কামনা করে॥

২২।১।৬৬॥

ঢুকে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় স্থান বেছে নিয়ে ঘরের সব আলো নিবিয়ে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকবে অন্য অফিসার, হাতে সবচেয়ে ছোট সাইজের পিস্তল নিয়ে। প্রথম অফিসার আশ্রয়স্থল থেকে কোকিলের মত ডাক ছাড়বে, "কু"; অন্যজন সঙ্গে সঙ্গে সেই অন্ধকারে শুদ্ধমাত্র ধ্বনির উপর নির্ভর করে পিস্তল মারবে। তখন সেই অন্ধকারে 'শিকার' জায়গা বদলাবে, কিন্তু "কু" ডাক না ছাড়া পর্যন্ত পিস্তল মারা বারণ। কতক্ষণ পরে দু'জনের পার্ট বদলায়, আমার মনে নেই।

মিশরের পসারী—গন্ধবণিক—যে রকম ভারতের শঙ্খচূর্ণ[১] এবং অগুরু আতর বিক্রি করে, ঠিক তেমনি কাইরোর পুস্তক-বিক্রেতা বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'বুদ্ধজীবনী' বিক্রি করে। কিন্তু সে 'বুদ্ধজীবনী' কে লিখেছেন, কেউ জানে না।

অবশ্য পঞ্চতন্ত্র সেখানে অন্য নামে পরিচিত। আরবীতে বলে 'কলীলা ওয়া[২] দিম্‌না'। এ দুটি—কলীলা ও দিম্‌না—দুই শৃগালের নাম। সংস্কৃতে করটক ও দমনক। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন, গোড়াতে পঞ্চতন্ত্রের ঐ নামই ছিল। পরবর্তী যুগে ওটিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে পঞ্চতন্ত্র নাম দেওয়া হয়। পাঁচ সংখ্যায় কেমন যেন একটা ম্যাজিক আছে কিংবা চোখের সামনে আপন হাতের পাঁচটা আঙুল যেন কোনো ইতস্তত প্রক্ষিপ্ত তথ্য, গল্প, প্রবাদ-সমষ্টিকে পাঁচের কোটায় ফেলতে চায়। বাইবেলের 'প্রাচীন নিয়মে' (ওল্ড টেস্টামেন্ট) হয়তো এই কারণই 'পেন্টাটয়েশ'='পঞ্চগ্রন্থ' আছে। এদানিং আমরা পাঁচ-শালার পরিকল্পনা করি।

তা সে যাই হোক, আমাদের এই তৃতীয়/দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত পঞ্চতন্ত্র ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন ইরানে পেহ্‌লেভি (সংস্কৃতে পহ্‌লভী) ভাষাতে অনূদিত হয়। তার একটা বাইরের কারণও ছিল। প্রাচীন ইরানের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীস রোমের সম্পর্ক বহুকালের। কখনো যুদ্ধের মারফতে, কখনো শান্তির। শান্তির সময় উভয়ে একে অন্যের উপর সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু দ্বিতীয়/তৃতীয় শতাব্দীতে ইরানীরা গ্রীসের উপর বিরক্ত হয়ে (ফেড্ অপ্) পূবের দিকে মুখ

১ এই শঙ্খচূর্ণ নিয়ে কয়েক বৎসর পূর্বে এদেশে একটা 'কেলেঙ্কারি' হয়ে যায়। যেসব শাঁখারী পূর্ব বাঙলা থেকে এসে পশ্চিম বাঙলায় আশ্রয় নিয়েছে তাদের দরকার শঙ্খের। শঙ্খ প্রধানত বিক্রি হয় মাদ্রাজ অঞ্চলে এবং তার অন্যান্য খরিদ্দার আরব দেশ, মিশর ইত্যাদি। তারা শাঁখ গুঁড়ো করে ওষুধ বানায়। আমাদের গরীব শাঁখারীরা যে দাম দিতে প্রস্তুত ছিল (সোজাসুজি, না পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মারফৎ, আমার ঠিক মনে নেই) আরবরা তার কিঞ্চিৎ বেশী দাম দিতে রাজী ছিল বলে মাদ্রাজ তাবৎ শঙ্খ বিক্রি করে দেয় ওদের। ফলে বহু শাঁখারী বেকার হয়ে যায়।

২ কোনো কোনো পণ্ডিতের ধারণা আরবীর এই 'ওয়া'—'অ্যাণ্ড'—এবং থেকে বাঙলা 'ও' এসেছে।

ফেরালে। ফলে ষষ্ঠ শতাব্দীতে পঞ্চতন্ত্র রাজা খুসরৌ অনুশিরওয়ানের[৩] আমলে পহ্‌লভীতে এবং অল্পকালের ভিতরই পহ্‌লভী থেকে সিরিয়াকে অনূদিত হল।

এই প্রথম—সর্বপ্রথম কিনা বলা কঠিন—একখানা আর্য ভাষায় লিখিত পুস্তক আর্যেতর ভাষায় অনূদিত হল,[৪] কারণ সিরিয়াক ভাষা হীব্রু, আরামায়িক ও আরবীর মত সেমিতি ভাষা। ইরাক সিরিয়া অঞ্চলে প্রচলিত এই সিরিয়াক ভাষা ও সাহিত্য (৩য় থেকে ১৪ শতাব্দী পর্যন্ত এর আয়ু) বরাবরই ইরানের সঙ্গে লেনদেন রাখতো বলে পহ্‌লভীতে কোনো উত্তম গ্রন্থ অনূদিত হলে সেটি সিরিয়াকেও অনূদিত হত। (পঞ্চতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আরেকখানি ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ পহ্‌লভী হয়ে সিরিয়াকে অনূদিত হয়, এর পরবর্তী যুগে মধ্যপ্রাচ্য ও ইয়োরোপে পঞ্চতন্ত্রের চেয়ে ঢের বেশী সম্মান পায়—তার কথা পরে হবে।)

বিষ্ণুশর্মা রচিত পঞ্চতন্ত্রের কপাল ভালো। পহ্‌লভীতে যিনি এ পুস্তক অনুবাদ করেন তিনি ছিলেন রাজ-বৈদ্য, অতএব সুপণ্ডিত। সিরিয়াকে যিনি তস্যানুবাদ করেন তিনিও জ্ঞানীজন, কারণ এ গ্রন্থ অনুবাদ করার পূর্বেই তিনি কিয়ৎপরিমাণ গ্রীক দর্শনও কৃতিত্বসহ সিরিয়াকে অনুবাদ করেছিলেন।

পহ্‌লভী অনুবাদটি লোপ পেয়েছে, কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে অনূদিত সিরিয়াক অনুবাদটি ("কলিলগ্ ও দমনগ্") এখনো পাওয়া যায়।

এর প্রায় দু'শ বৎসর পর—মোটামুটি হজরৎ মুহম্মদের জন্মের দেড় শ' বৎসর পর—জনৈক আরব আলঙ্কারিক পঞ্চতন্ত্র আরবীতে অনুবাদ করেন। আরবী সাহিত্যের তখন কৈশোরকাল। এই পুস্তক অনুবাদ করার সময় অনুবাদক আব্দুল্লা ইব্‌ন্ অল্-মুকাফ্‌ফার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তরুণ আরব সাহিত্যিকদের

৩ এই খুসরৌর আমলেই চতুরঙ্গ খেলা ভারত থেকে ইরানে যায়।

৪ তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে, এই সর্বপ্রথম সেমিতি জগতে ভারতীয় সাহিত্য পরিচিত হল। বস্তুত এর অনেক পূর্বেই জাতকের বহু গল্প কাফেলা [ক্যারাভান] ও চট্টির কথকদের [স্টরি-টেলার] মারফতে গ্রীস রোম পর্যন্ত চলে গিয়েছে। বৌদ্ধ শ্রমণরা খৃষ্টজন্মের পূর্বেই মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তারও পূর্বে লোহিত সমুদ্রের কূল ধরে ধরে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে; এমন কি প্রাচীনতম মোনজোদড়োর সঙ্গে ইরাকের সম্পর্ক ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু উপস্থিত এগুলো আমাদের আলোচনার বাইরে। এবং বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রবেশ করলে যে সব গ্রন্থ অনূদিত হয় সেও এ আলোচনার বাইরে।

শলী বৈ স্টাইল শেখানো—বিশেষ করে যারা 'ব্যাল-ল্যাৎর্' বা রম্যরচনায় হাত পাকাতে চান।[৫] পহ্লভী সিরিয়াক হয়ে আরবীতে পৌঁছতে গিয়ে বিষ্ণুশর্মা নামটি কিন্তু এমনই রূপান্তরিত হয়ে যায় যে আরবরা ভাবে, ইনি বিদ্যাপতি, এবং সেই অনুসারে তাঁর নাম লেখা হয় বীদ্‌বা বীদপা বীদপাই (আরবীতে 'প' অক্ষর নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে কাছাকাছি অন্য দুই অক্ষর দিয়ে 'প' ও 'চ' বোঝাবার চেষ্টা করা হয়)। আরবী অনুবাদ হয় অষ্টম শতাব্দীতে এবং তার হীব্রু অনুবাদ দ্বাদশ শতকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জনৈক ক্যাথলিক কার্ডিনালের জন্য এটি লাতিনে 'ডিরেক্টরিয়ুম ভিট্যে হুমান্যে' (অর্থাৎ মোটামুটি 'মানব-জীবনের জন্য হিতোপদেশ'—'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ' যে সংশ্লিষ্ট সে কথা মধ্যপ্রাচ্যে জানা ছিল) নাম নিয়ে ইয়োরোপে প্রচারিত হয়, এবং এই অনুবাদের উপর নির্ভর করে পরবর্তী কালে ইয়োরোপের প্রায় তাবৎ অর্বাচীন ভাষাতে 'বীদপাই-এর নীতিগল্প' বা 'কলীলা ও দিম্‌না' রূপে অনূদিত হয়ে প্রখ্যাতি লাভ করে।

'জাতক', 'পঞ্চতন্ত্র' 'হিতোপদেশে'র বিজয়-যাত্রা সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করছেন স্বর্গত ঈশান ঘোষ। তাঁর অতুলনীয় জাতক অনুবাদের ভূমিকায় তিনি লেখেন, 'পঞ্চতন্ত্রের কথাগুলি পৃথকভাবে কথিত নহে। এক একটি তন্ত্রে এক একটি কথাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহার আশেপাশে অন্য বহু কথা সংযোজিত হইয়াছে। উত্তরকালে অস্মদ্দেশে বেতাল পঞ্চবিংশতি ও হিতোপদেশ প্রভৃতি আরবে নৈশোপাখ্যানমালা এবং য়ুরোপে Decameron, Pentameron, Heptameron, Canterbury Tales প্রভৃতি গ্রন্থের রচনাতেই এই পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের কথাগুলি উক্তরূপে এক সূত্রে নিবদ্ধ না থাকিলে বোধ হয় দেশদেশান্তরে ভ্রমণের সময় ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইত।' এ অনুচ্ছেদ ঈশান

৫ অধীন এই উদ্দেশ্য নিয়েই বছর ষোল পূর্বে 'পঞ্চতন্ত্র' সিরিজ 'দেশ' পত্রিকায় আরম্ভ করে। নইলে বিষ্ণুশর্মার অনুকরণ করার মত দম্ভ আমার কখনো ছিল না। এর অল্প পরেই Indian Council for Cultural Relations-এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকাকালীন মরহুম মৌলানা আজাদের নেতৃত্বে আমরা একখানা আরবী ত্রৈমাসিক ('সকাফৎ-উল-হিন্দ্' 'ভারতীয় সংস্কৃতি') প্রকাশ করি ও ঐ সময় মিশরাদি একাধিক দেশ থেকে অনুরোধ আসে যে, যেহেতু অদ্যকার 'কলীলা ওয়া দিমনা' ও 'পঞ্চতন্ত্রে' প্রচুর তফাৎ, অতএব আমরা যেন একখানি নূতন অনুবাদ প্রকাশ করি। আমরা সে কাজ সানন্দে প্রাগুক্ত পত্রিকায় আরম্ভ করি।

ঘোষ শেষ করেছেন, এই বলে—'হিন্দুই হউন, বৌদ্ধই হউন, পঞ্চতন্ত্রকার অতি শুভক্ষণে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। লোকমুখে বা গ্রন্থাকারে তাঁহার কথাগুলি সভ্য অসভ্য সর্ব দেশে যেরূপভাবে পরিজ্ঞাত হইয়াছে, পৃথিবীতে অন্য কোনো পুস্তকের ভাগ্যে সেরূপ ঘটে নাই।'[৬]

অজহর বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে যে পুস্তক-বিক্রেতা আমাকে 'কলীলা ওয়া দিম্না' বিক্রি করে, সে ইঙ্গিত দেয়, আরেকখানি ভারতীয় পুস্তক কপ্ট খৃষ্টানরা (এঁরা নিজেদের ফারাওয়ের বংশধর বলে দাবি করেন) কিছুদিন পূর্বে আরবীতে পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

তখন কপ্ট বন্ধুদের কাছে অনুসন্ধান করে জানতে পারি, এর আরবী নাম 'সুৎরহ বার্লাম ওয়া য়ুআসফ'। এ পুস্তকের প্রধান নায়ক দু'জন খৃষ্টধর্মে সেণ্টরূপে স্বীকৃত হয়েছেন—ক্যাথলিক উভয়কে স্মরণ করেন ২৭ নভেম্বর ও য়ুআসফকে গ্রীক চার্চ স্মরণ করেন ২৬ অগস্ট (সেণ্টস্ ডে)।

তখন অনুসন্ধান করে দেখি, 'য়ুআসফ' নাম এসেছে 'বোধিসত্ত্ব' থেকে ও 'বার্লাম' এসেছে 'বুদ্ধ ভগবান'-এর 'ভগবান্' থেকে!

এ পুস্তকের কাহিনী পঞ্চতন্ত্রের চেয়েও বিস্ময়জনক॥

২।৪।৬৬

---

৬ ঈশান ঘোষের বাঙলা জাতক কী জর্মন, কী ইংরিজি, কী হিন্দী সব জাতকানুবাদের চেয়ে শত গুণে শ্রেষ্ঠ। অসাধারণ পরিশ্রম ও অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ঈশান এই অনুবাদ সম্পন্ন করে বঙ্গবাসীকে চিরঋণে আবদ্ধ করে গেছেন। এ অনুবাদ প্রকাশিত হলে পর পালিপাণ্ডিত্যে আরেক ধনুর্ধর বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ বিধুশেখর শাস্ত্রী এর সমালোচনা করেন। পরম লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় ঈশানের অনুবাদ বহু বৎসর পূর্বে নিঃশেষ হওয়া সত্ত্বেও এর পুনর্মুদ্রণ হয় নি। শুনতে পাই, সাহিত্য আকাদেমি স্বর্গত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙলা কোষ পুনর্মুদ্রণ করেছেন। তাঁরা যদি (বিধুশেখরের আলোচনা সহ) এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণে সহায়তা করেন তবে গৌড়জন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

বার্লাম ও য়োসাফট্

ইয়োরোপীয় ও মধ্যপ্রাচ্যের চার-পাঁচটি ভাষা নিয়ে প্রায় ষাটটি ভাষায় অনূদিত 'বার্লাম ও য়োসাফট্' ইয়োরোপে ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়া থেকে খৃষ্টান মঠে তথা সাধুসন্ত ও পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সমাদৃত হয়ে ক্রমে ক্রমে অসাধারণ জনপ্রিয় হয়ে দাঁড়ায়। তার প্রধান কারণ, অতি সুমধুর সরল গল্পচ্ছলে এই পুস্তকে বর্ণিত খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য ইতিপূর্বে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের কোনো ভাষাতেই রচিত হয় নি—এমন কি, খৃষ্টধর্মের প্রাচীনতম প্রধান বাহক গ্রীক, লাতিন এবং হীব্রুতেও না। তাই দেখতে পাই, ইংলণ্ডে ছাপাখানা নির্মিত হওয়ার পর উইলিয়াম ক্যাকস্টন যে-সব পুস্তক ছাপান, তার মধ্যে এই পুস্তকটিও ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী অনুবাদে আছে। অবতরণিকারূপে এখানে এ-পুস্তক সম্বন্ধে আরো বহু বিস্তর চিত্তাকর্ষক ও মূল্যবান তত্ত্ব তথ্য নিবেদন করা যায়, কিন্তু আমাদের ধারণা, পুস্তকের উপাখ্যানটি এস্থলে অতিশয়তম সংক্ষেপে বর্ণনা করে নিলেই সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করা হবে—পাঠক নিজের থেকেই অনেক-কিছু কল্পনা করে নিতে পারবেন।

ভারতবর্ষে এক পরাক্রমশালী নরপতি পুত্রহীন অবস্থায় অতিশয় মনোকষ্টে দীর্ঘকাল জীবনযাপন করার পর এক অভূতপূর্ব সর্বসুলক্ষণসম্পন্ন পুত্রসন্তান লাভ করেন। মহাসমারোহে তাঁর নামকরণ করা হল য়োসাফট্ (গ্রীক অনুবাদে Josaphat) এবং রাজা সে-যুগের শ্রেষ্ঠতম শ্যালডীয় (Chaldaean) জ্যোতিষীদের নিমন্ত্রণ ক'রে রাজপুত্রের জন্মকুণ্ডলী নির্মাণ করার আদেশ দিলেন। তাঁরা সবাই একবাক্যে রাজাকে জানালেন, নবজাত কুমারের ভবিষ্যৎ সর্ব গৌরব ধারণ করে এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তিনি হবেন বিরলতম মহাত্মাদের মধ্যে বিরল, কিন্তু তিনি পিতৃ-পিতামহের সনাতন ধর্ম পরিত্যাগ করে সত্যধর্মের সন্ধানে গৃহত্যাগ করবেন। বলা বাহুল্য, নৃপতি নিতান্ত ক্ষুব্ধ হলেন এবং এই মর্মন্তুদ ভবিষ্যদ্বাণী যাতে সফল না হয়, তার জন্য মন্ত্রণা গ্রহণ করে আদেশ দিলেন, রাজপুত্রকে যেন পরম রমণীয় এক রাজপ্রাসাদের ভিতর চিত্তাকর্ষণীয় সদানন্দময় পরিবেশে রাখা হয়। প্রাসাদ থেকে বাইরে এসে তিনি যেন কোনো অবস্থাতেই জরামৃত্যুর (ইংরেজী অনুবাদ আছে misery and death, জর্মনে আছে ঐ একই—Elend und Tod, খুব সম্ভব জরার প্রকৃত প্রতিশব্দ ইয়োরোপীয় কোনো ভাষাতেই নেই বলে তৎপরিবর্তে 'মিজরি' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে) সংস্পর্শে না আসতে পারেন; রাজা অনুমান করে নিয়েছিলেন, সদাসুখীজন যে

পরিবেশে আনন্দ লাভ করেছে, সেটা পরিবর্তন করে সে অন্য পরিবেশের সন্ধানে যাবে 'কোন্ দুঃখে' ?

কাহিনীর এই অংশটুকু শোনামাত্রই যে-কোনো ভারতীয়, সিংহলী, তিব্বত-চীন-জাপান-শ্যামবাসীর মনে উদয় হবে, এ-যেন বড় চেনা-চেনা ঠেকছে, এ কি যুবরাজ সিদ্ধার্থের জীবনী নয় ? তাই যদি হয়, তবে সে-কাহিনী সর্বধর্মের সর্ব-সজ্জনকে উৎসাহ এবং আনন্দ দান করলেও সেটি খৃষ্টধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থরূপে সম্মানিত হবে কি প্রকারে ? কাহিনীর পরের অংশটুকু শুনলেই সেটা আস্তে আস্তে পরিষ্কার হবে। কিছুটা আগেও বলা হয়েছে, সেটা আমি ইচ্ছে করেই আগে বলি নি, কারণ, তা হলে সিদ্ধার্থকে চিনতে পাঠকের অসুবিধা হত।

কাহিনীতে আছে, রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করার পূর্বেই ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল (এটা অবশ্যই সত্য নয়, এবং এরকম আরো পরিবর্তন পরিবর্ধন পাঠক পাবেন ; কি উদ্দেশ্য নিয়ে সেগুলো করা হয়েছিল, পাঠক ক্রমশ বুঝতে পারবেন)[১] কিন্তু যুবরাজের পিতা সে ধর্মের ঘোরতর শত্রু ছিলেন এবং রাজ্যে তার প্রসার বেড়ে যাচ্ছে দেখে রাজাদেশ প্রচারিত করেন যে প্রজাসাধারণ, পাত্র-অমাত্য যে কেউ এই নবীন ধর্ম গ্রহণ প্রচার প্রসার করবে, সে দণ্ডনীয় হবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রাজারই এক অন্তরঙ্গ সখা এবং মন্ত্রী খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে নির্জনে ধ্যান-ধারণা করার জন্য মরুভূমিতে চলে যান (মিশরের খৃষ্টান সাধুরা দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীতে প্রায়শ লীবিয়া-মরুভূমিতে অন্তর্ধান করতেন)। রাজাদেশে তাঁকে খুঁজে মরুভূমি থেকে ফিরিয়ে আনালে পর তিনি রাজসভায় তাঁর আচরণ বোঝাতে চেষ্টা করেন ও ক্ষমাভিক্ষাও করেন। রাজা আরো ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে নিজ রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেন।

এদিকে রাজপুত্র যৌবনে পদার্পণ করে আর প্রাসাদে বন্দী হয়ে থাকতে

১ ধর্মের ইতিহাসে এটা কিছু নূতন নয়। কাঠিয়াওয়াড়ের হিন্দু লোহানা রাজপুতদের ইসমাঈলীয়া (ইসলামেরই এক) সম্প্রদায়ের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য কাহিনী নির্মিত হয় যে, হিন্দুদের যে কল্কি অবতারের আবির্ভূত হওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, ইতিমধ্যে মক্কা নগরে হজরৎ আলীরূপে তিনি অবতীর্ণ হয়ে গেছেন। সত্যপীরও তুলনীয়।

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে যে ফন হফমান্‌স্‌টালের কবিতার বাংলা অনুবাদ নিয়ে আলোচনা হয় তিনিও এই গ্রন্থের গল্প মূলসূত্ররূপে নিয়ে তাঁর সৃজনীশক্তির প্রকাশ দেখিয়েছেন। নাম 'ইয়েডেরমান' = 'এভরিবডি'।

চাইলেন না; তাঁর ইচ্ছা, তিনি বাইরের বিশাল জগতে বেরিয়ে গিয়ে সেখানে নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন এবং সেই মর্মে পিতার অনুমতি ভিক্ষা করলেন। অতিশয় অনিচ্ছায় তিনি সম্মত হলেন। ফলে রাজপুত্র ক্রমে ক্রমে এক এক জন করে অন্ধ, কুষ্ঠরোগী, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ ও সর্বশেষে একটা মৃতদেহ দেখতে পেয়ে ব্যথাতুর হয়ে এর কারণ সম্বন্ধে কাতর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে থাকেন এবং উত্তরে শুনতে পান, এসব দুঃখ-দুর্দৈব মানুষমাত্রেরই ললাটে লেখা আছে। অত্যন্ত বিচলিত ও অভিভূত হয়ে তিনি অনুসন্ধানের ফলে আরো জানতে পান, এসব দুঃখ-দুর্দৈব থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি পাবার পন্থা জানেন শুধু এক শ্রেণীর সাধুসন্ত—তাঁরা সংসার ত্যাগ করে নির্জনে ধ্যান-ধারণায় মগ্ন থাকেন। রাজপুত্রের প্রবল ইচ্ছা হল, এঁদেরই মুখ থেকে তিনি তত্ত্বকথা শুনবেন, কিন্তু তাঁর সে-ইচ্ছা পূর্ণ করা অসম্ভব, কারণ তাবৎ সাধুসন্তকে রাজাদেশে দেশ থেকে নির্বাসিত করে দেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যে এক অতিশয় পূতপবিত্র তথা ধর্মজ্ঞ সাধু মণিকারের ছদ্মবেশ পরে রাজসভায় আবির্ভূত হলেন এবং রাজপুত্রের সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎ করে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বকথা তাঁকে বোঝাতে লাগলেন। সে সময় তিনি নানা গল্প, নানা কাহিনী কীর্তন করে সংসারের অসারতা ও প্রকৃতধর্ম কি, সে-সব সপ্রমাণ করেন।

(এই গল্পগুলো গ্রন্থের চিত্তাকর্ষক অংশ গ্রহণ করে আছে। এগুলোর অধিকাংশেরই উৎপত্তিস্থল যে ভারতবর্ষ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীতে সে নিয়ে ইউরোপে প্রচুর গবেষণা করা হয় তবু সবগুলোর মূল তখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি, হয়তো কখনো পাওয়া যাবে না। তবে কয়েকটি নিঃসন্দেহে জাতক থেকে নেওয়া হয়েছে [আশ্চর্য! স্বয়ং বোধিসত্ত্ব যে-সব গল্প জাতকে বলে গেলেন, য়োসাফট্‌রূপে তাঁকে আবার সেগুলোই উপদেশ-রূপে শুনতে হল।] এবং কিছু মহাভারত থেকেও। এদেশে কোথায় কি পরিমাণ গবেষণা হয়েছে সেকথা বলা কঠিন—এই গ্রন্থ নিয়ে কোনো গবেষণা আমার চোখে পড়ে নি। এ কর্ম করার সর্বাপেক্ষা শাস্ত্রাধিকার ছিল স্বর্গত ঈশান ঘোষের। তিনি তাঁর জাতক-অনুবাদের উপক্রমণিকায় এ পুস্তক নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছেন, কিন্তু সেখানে স্থান সংকীর্ণ এবং এর গল্পগুলো ইয়োরোপের ভিন্ন ভিন্ন পাঠে বড়ই ভিন্ন ভিন্ন—এমন কি জাপানী 'শক জিৎসু-রকু'ও যে এ-আলোচনায় স্থান পায় সে তত্ত্ব কয়েক বৎসর পূর্বে জর্মন গবেষক-গোষ্ঠী উল্লেখ করে গেছেন এবং এ দেশে বসে সেগুলো সংগ্রহ করা অসম্ভব না

হলেও সুকঠিন।)

যে-মণিকার রাজপুত্রকে উপদেশ দিলেন তিনিই এ গ্রন্থের বার্লাম। রাজপুত্র মনস্থির করলেন, তিনি বার্লামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন। এ সংবাদ শুনে রাজা ক্ষোভে ক্রোধে উন্মত্তপ্রায়। সর্ব প্রথমেই তিনি বার্লামকে বন্দী করবার আদেশ দিলেন, কিন্তু তিনি ততক্ষণে নগর ত্যাগ করেছেন। রাজা যখন দেখলেন পুত্র কিছুতেই সংকল্প ত্যাগ করবেন না তখন তিনি ধূর্ত পন্থা অবলম্বন করলেন। নাকোর নামক এক অচেনা জনকে তিনি নিযুক্ত করলেন, সে এসে সভাস্থলে খৃষ্টধর্মের স্বপক্ষে দুর্বল, ভ্রমাত্মক যুক্তি প্রয়োগ করে তর্কযুদ্ধে সভা-পণ্ডিতদের কাছে হেরে যাবে; এই করে খৃষ্টধর্ম সর্বজনসমক্ষে লাঞ্ছিত হলে যুবরাজ নিশ্চয়ই বার্লামের অনুসরণ করার ব্যর্থতা বুঝতে পারবেন। কিন্তু রাজপুত্র সংবাদ পেয়ে গোপনে নাকোরকে এমনই তিরস্কার করলেন যে, সে শেষ পর্যন্ত রাজসভায় বাগ্মিতাসহ অব্যর্থ যুক্তিজাল বিস্তার করে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করল। এর পর নাকোরও খৃষ্ট সাধুরূপে নির্জন ভূমিতে অন্তর্ধান করে। রাজা তখন জাদুকরের শরণাপন্ন হলেন। সে তখন পার্থিব ভোগ-বিলাসের মায়াজাল বিস্তার করে যুবরাজকে প্রলোভিত করার চেষ্টা দিয়ে নিষ্ফল তো হলই পক্ষান্তরে যুবরাজ তাঁকে একটি কাহিনী বলে স্বধর্মে দীক্ষিত করলেন। এর সঙ্গে মার-এর মিল দেখা যাচ্ছে, তবে বৌদ্ধশাস্ত্রে সে ধ্যানী বোধিসত্ত্বকে প্রচুর মারণাস্ত্র দিয়ে ভয়ও দেখায়।

সর্বশেষে রাজপুত্র বোধিসত্ত্ব বা য়োসাফট্‌রূপে রাজপুরী ত্যাগ করে বার্লামকে খুঁজে পেলেন। তাঁকে সখা ও সঙ্গীরূপে গ্রহণ করে উভয়ে ধ্যান-ধারণায় নিমজ্জিত হলেন।

* *

এ গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের কাহিনী নিয়ে তার সঙ্গে খৃষ্টধর্ম জুড়ে দিয়ে সে ধর্মের যে জয়জয়কার করা হল তার প্রণেতা কে জানবার উপায় নেই। পঞ্চতন্ত্রের মত এ-গ্রন্থও রাজা খুসরোর আমলে পহ্‌লবীতে অনূদিত হয় এবং ওরই মত, তারপর, সীরিয়াকে। তার থেকে হয় গ্রীক অনুবাদ এবং উপক্রমণিকায় বলা হয় 'একটি উপকারী কাহিনী···আবিসিনিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশ—যার নাম ভারতবর্ষ (!)—সেখান থেকে এটি আনয়ন করেন সাধু জন্।' ওদিকে আরবী অনুবাদও হয়ে গিয়েছে এবং সেখানে গ্রীক অনুবাদের চেয়েও স্পষ্টতররূপে ধরা পড়ে যে এর মূল ভারতে ও বৌদ্ধধর্মে। এর পর লাতিন অনুবাদ এবং তার থেকে ইয়োরোপীয় সর্বভাষায়।

'বিষ্ণুশর্মা' প্রসঙ্গে নিবেদন করছি য়োসাফট্ এসেছে 'বোধিসত্ত্ব' থেকে (আরবীতে আদ্যস্থলে 'ব' ও 'য়'-তে মাত্র একটি বিন্দুর পার্থক্য আছে বলে হয়ে যায় য়োদাসাফ) এবং বার্লাম (বুদ্ধ) 'ভগবান' থেকে।

অতএব এক বুদ্ধদেব যদি দুই মূর্তি ধারণ করে খৃষ্টধর্মে সেণ্ট বা সন্তরূপে পূজা পান তবে নিশ্চয়ই আমাদের আনন্দের কথা॥

৯।৪।৬৬

রবি-মোহন-এন্‌ড্রুজ

কয়েক দিন পূর্বে একখানা চটি বইয়ে রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাজী ও এন্‌ড্রুজ সম্বন্ধে একটি বিবরণীতে দেখি, আর সবই আছে, নেই শুধু একটি কথা :—এন্‌ড্রুজের পরলোকগমনের পর তাঁর স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে সচেতন হলেন কে, এবং সেই মহৎ চিন্তা মৃন্ময়রূপ দেবার জন্য সর্বপ্রথম উদ্যোগী হলেন কে, এবং এন্‌ড্রুজ ফাণ্ডের আজো সামান্য যেটুকু অবশিষ্ট আছে—যদি আদৌ থাকে—তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাবো কাকে ?

অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ[১] হয় যে সময়, তখন রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমে। শুনেছি, সে-সময় তিনি নাকি সে-আন্দোলনের প্রশংসাই করেছিলেন। ফেরার সময় বোম্বায়ে নেমে তাঁর মত পরিবর্তন হয়, এবং আন্দোলনের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ভাষায় একাধিক প্রবন্ধে আপন মতামত ব্যক্ত করেন (দ্বিজেন্দ্রনাথ কিন্তু বরাবরই গাঁধীকে উৎসাহ-হিম্মৎ যুগিয়ে যান)। এন্‌ড্রুজ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গাঁধীর

---

১ 'গুরুচণ্ডালী' নিয়ে আলোচনা একাধিক স্থলে দেখেছি। চলতি ভাষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে এটাকে অমার্জনীয় অপরাধের অনুশাসনরূপে সম্মান করা হত—যদিও যে দ্বিজেন্দ্রনাথকে কবি রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞরূপে সশ্রদ্ধ সম্মান জানাতেন, তিনি স্বয়ং সে অনুশাসন তাঁর কঠিনতম সংস্কৃত শব্দে পরিপূর্ণ বাংলা দর্শনগ্রন্থে পদে পদে লঙ্ঘন করতেন, এবং সকলকেই সে উপদেশ দিতেন। চলতি ভাষা চালু হওয়ার পর, পরলোকগমনের মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও লেখেন 'গুরুচণ্ডালী এখন আর অপরাধ নয় ('বাংলা-অলঙ্কারের পিনাল-কোড থেকে গুরুচণ্ডালী সরিয়ে দেওয়া হল'—ধরনের অভিব্যক্তি)। অধীন দ্বিজেন্দ্রনাথের আদেশ বাল্যাবস্থা থেকেই মেনে নিয়েছে, যদ্যপি সে সদাই 'লড়াই শুরু হল' এবং 'যুদ্ধ আরম্ভ হল' তথা 'মোকদ্দমা শুরু হল' এবং 'তর্কবিতর্ক আরম্ভ হল' এ'দুয়ে পার্থক্য মেনে চলেছে।

উভয়েরই অতিশয় অন্তরঙ্গ বন্ধু—(এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা সহকর্মী বিধুশেখর বা ক্ষিতিমোহনের মতো তো ছিল বটেই, বেশী বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না)—তাই অনেকেই তাঁকে 'শান্তিনিকেতন-সাবরমতী-সেতু' নাম ধরে উল্লেখ করতেন।

এন্‌ড্রুজের ধর্ম ছিল দীননারায়ণের সেবা। ধর্মসঙ্গত রাজনৈতিক আন্দোলন-বিবর্তন সর্বদাই দীনের উদ্দেশে নিয়োজিত হয়; তাই সাক্ষাৎ রাজনীতি এড়িয়ে চললেও এন্‌ড্রুজ গাঁধী-আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাই এই মহান আন্দোলনের ব্যাপারে ভারতবর্ষের দুই মনীষীর মধ্যে মতানৈক্য যে সর্ব-প্রকারের ক্ষতিসাধন করতে পারে, সে-বিষয়ে তিনি সচেতন হন; তিনি মন স্থির করলেন, পত্র-পত্রিকার মারফৎ উভয়ের মধ্যে যে বাদানুবাদ হচ্ছে, তার চেয়ে অনেক ভালো হয়, উভয়ে একসঙ্গে মিলিত হয়ে যদি ভাবের আদান-প্রদান করেন। বলা বাহুল্য গাঁধী-রবীন্দ্রনাথের সৌহার্দ্য জন্মায়, যখন গাঁধী এর কয়েক বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সহৃদয় আমন্ত্রণে আফ্রিকা ত্যাগ করে সদলবলে শান্তিনিকেতন আশ্রমে যোগ দেন ও স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে সেখানে ছয় মাস থাকেন (তখনো কলেজ-বিভাগ বা বিশ্বভারতীর জন্ম হয় নি)।

এ-আলোচনা হয় কলকাতায়, এবং এক এন্‌ড্রুজ ছাড়া সেখানে চতুর্থ ব্যক্তি ছিলেন না।

কিন্তু কবির মত চিত্রকরও শুধু যে নব নব সৃজন কর্মে লিপ্ত থাকেন তাই নয়, নব নব গোপন তত্ত্ব, সৌন্দর্য আবিষ্কার করে রসিকজনের সম্মুখে রাখতে চান। কবি রবির ভ্রাতুষ্পুত্র 'ছবি-রবি' অবন ঠাকুর তাই মনে মনে ভাবলেন, রবীন্দ্রনাথ ও গাঁধীর মত মনীষী এ দেশে নিত্যি নিত্যি জন্মায় না; নিভৃতে এ দোঁহার মিলনের অন্তত সামান্য কিছুটাও যদি না দেখতে পেলুম, তবে এ-জীবনে দেখলুমটা কি? কথাটা ঠিক; হিমালয় আল্‌প্‌সে মিলন হয় না,—কিন্তু এ-মিলন তো তারো বড়ো।

উপযুক্ত তাবৎ কাহিনী আমি অন্যত্র সবিস্তর দিয়েছি বলে এস্থলে সংক্ষেপে সারি, কারণ অন্যকার কীর্তন ভিন্ন। 'অবন-ঠাকুর' চুপসে দরজার চাবির ফুটো দিয়ে এক লহমার তরে স্থিরদৃষ্টিতে দেখে নিলেন ভিতরকার 'ছবিটি'। সেইটেই তিনি এঁকে পাঠিয়ে দিলেন শান্তিনিকেতনের কলাভবনে—যেখানে ঐ তিনজনের দুজনা, অর্থাৎ কবি ও এন্‌ড্রুজ স্থায়ীভাবে বাস করেন।

কিন্তু মূল কথায় ফিরে যাই—এটুকু শুদ্ধমাত্র এ-তিন মহাপুরুষের অন্তরঙ্গতা বোঝাবার জন্য পটভূমি নির্মাণ।

* *

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে (খুব সম্ভব) গ্রীষ্মকালে অকস্মাৎ মহাত্মাজী অবতীর্ণ হলেন বোম্বাইয়ের জুহুবীচে। যুদ্ধ এবং জনরবে ভারতবর্ষ তথা তাবৎ পৃথিবী তখন গমগম করছে। প্রায় সম্পূর্ণ পূর্ব ও উত্তর ইয়োরোপ জয় করার পর হিটলার তখন সদর্পে ককেশাসের তেল পানে ধাওয়া করবেন বা করেছেন—এমন সময় টলটলায়মান ইংরেজের চরম দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে ডমিনিয়ন বিয়ণ্ড দি সীজ-এর অন্যতম ভারতবর্ষ আরেকটা স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করবে কি? এই ছিল তখন দেশবিদেশে সর্বমুখে একমাত্র প্রশ্ন।

এমন সময় গাঁধী নামলেন জুহুবীচে। এবং তার চেয়েও বিস্ময়জনক ব্যাপার; —যে গাঁধীকে আপাতদৃষ্টিতে সরল, ভালোমানুষ বলে মনে হয়, তিনি যে সাংবাদিকদের এড়াবার জন্য কত হুম্বুর-হেকমৎ রপ্ত করে বসে আছেন, সে তত্ত্বটি হাড়ে হাড়ে বিলক্ষণ জানে ভুক্তভোগী সাংবাদিকরা—সেই গাঁধীই ডেকে পাঠিয়েছেন, নিজে যেচে, প্রেস-কনফারেন্স্। তিনি নাকি সর্বপ্রশ্নের উত্তর দেবেন।

এদিকে তিনি জুহুবীচে নেমেই খবর পাঠিয়েছেন বোম্বায়ের আশ্রমিক সঙ্ঘকে। তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনবেন।

বোম্বায়ে বিস্তর শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী আছে—তাঁদের প্রায় সবাই গুরুদেবের দু'দশটা গান গাইতে পারে, আর মহারাষ্ট্রবাসী হলে তো কথাই নেই, তারা গুরুদেবের কালোয়াতী গান পর্যন্ত গাইতে পারে, দু'একজন নিধুবাবু ঢঙে গুরুদেবের টপ্পা তক দখল করে বসে আছে। কিন্তু সব সময় সবাই তো আর বোম্বায়ে থাকে না। তবু ছিলেন সর্বাধিকারী স্বর্গত বচুভাই শুক্ল; ইনি শান্তিনিকেতনে প্রচলিত—অর্থাৎ সেখানে 'দৈনন্দিন এবং পালপরবে গীত—সব কটার এবং আরো প্রচুর অচলিত সুর আপন বিরাট দিলরুবাতে বাজাতে পারতেন। তারপর ছিলেন পিনাকিন ত্রিবেদী, গোবর্ধন মপারা, সুশীলা আসর ইত্যাদি। আমিও ছিলুম বচুভাইয়ের অতিথিরূপে। কিন্তু সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কারণ আমার মত 'বেতালাকে' কাবু করতে পারেন এমন বেতাল-সিদ্ধ এখনো জন্মান নি!

আশ্রমিক সঙ্ঘ, এবং অধিনায়করূপে বচুভাই পড়লেন দুশ্চিন্তায়। গাঁধীজী কোন্ কোন্ গান শুনতে চাইবেন, বা কেউ গাইলে শুনতে ভালোবাসবেন সে

সম্বন্ধে কারোরই কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা বা আপন ধারণা নেই—বস্তুত শান্তিনিকেতনে বাসকালীন এবং বিশেষ করে সে-স্থল ছাড়ার এত যুগ পরেও যে তাঁর রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ রয়েছে সে-তত্ত্ব প্রাক্তন ছাত্রদের প্রায় কেউই জানতো না। অবশ্য অনেকেই জানতো 'জীবন যখন শুকায়ে যায়—' গানটি তাঁর বড়ই প্রিয় (এবং সেই কারণেই নিউমেনের 'লীড কাইনড্‌লি লাইট এমিড্‌স্ট্ দি এন্‌সার্‌ক্লিং গ্লুম।')।

আমি বললুম, 'এটা তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, গাঁধীজী যে-সময়টা আশ্রমে কাটান, ঠিক সেই সময়ে রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতই পাবে পয়লা নম্বর—বা ফার্স্ট প্রেফারেন্‌স্ তারপর নিশ্চয়ই স্বদেশী গান (এখন যাকে গাল-ভরা নামে ডাকা হয় 'দেশাত্মমূলক সঙ্গীত'), তার পর মন্দিরে উপাসনার সময় যে কটি ব্রহ্মসঙ্গীত গাওয়া হয়। এর পরও আছে—কিন্তু অদ্দূর আমার এলেম যায় না, যেমন মনে করো গুরুদেব তাঁর আপন পছন্দের যে-সব গান বাছাই করে তাঁকে শুনিয়েছেন তাঁর হদীস পাবো কোথায়!' সবাই এক বাক্যে আমার বক্তব্য স্বীকার করে বললে, 'এই তিন দফেতে যে-সব গান পড়ে তারই সব কটা এত অল্প সময়ে কোরাসে তৈরি করা প্রায় অসম্ভব। অতএব এই নিয়েই উপস্থিত সন্তুষ্ট থাকা যাক।' আমি তখন স্কেল টি-স্কোয়ার সেট-স্কোয়ারসহ—কথার কথা কইছি—লেগে গেলুম জরিপ করতে, মহাত্মাজী যে-সময়টায় শান্তিনিকেতনে ছিলেন ঠিক সেই সময়ে গুরুদেব কোন্ কোন্ গান রচেছিলেন (এস্থলে একটি ফরিয়াদ জানিয়ে রাখি : যাঁরাই গুরুদেব নিয়ে কোনো কাজ করতে চান, তাঁরাই চান, গুরুদেবের কবিতা যে রকম কালানুক্রমিক পাওয়া যায়, গানের বেলাও ঠিক সেই রকম হওয়া উচিত, বরঞ্চ বেশী উচিত। আমার এক মিত্র 'রবীন্দ্রনাথের ধর্ম' নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে এরই অভাবে দিশেহারা হয়ে এগুতে পারছেন না। তাঁর মূল প্রশ্ন, একটা বিশেষ সময়ের পর—মোটামুটি ১৯১৮—রবীন্দ্রনাথ কি একেবারেই আর কোন ধর্মসঙ্গীত রচনা করেন নি? করে থাকলে কটি?) অবশেষে কষ্টেশ্রেষ্ঠে মোটামুটি একটি ফিরিস্তি তৈরি হল। বেশীর ভাগ গায়কই গুজরাতী ; তাদের পছন্দের ধর্মসঙ্গীত—যেগুলো কারো না কারো ভালো করে জানা ছিল—সেগুলোও কোরাসে শিখে নেওয়া হল। সকলেরই এক ভরসা—গাঁধীজীর সুরজ্ঞান খুব একটা টনটনে নয়, মহারাষ্ট্রের মত গাঁধীর জন্মভূমি কাঠিওয়াড়-গুজরাতে গান-বাজনার প্রাচীন সর্বব্যাপী কোনো ঐতিহ্য নেই।

"শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর" শেষটায় এল। ওরা ধরে নিয়েছিল আমি সঙ্গে যাব। আমার এক কথা 'ক্ষেপেছ! আমি না পারি গাইতে, না জানি

বাজাতে। আমাদ্বারা কোনোপ্রকারের শোভাবর্ধনই হবে না—"শোভা" জিনিসটাই গাঁধীজী আদৌ পছন্দ করেন না।'

* *

মহাত্মাজী বললেন, 'গাও।'

ওরা কাঁচুমাচু হয়ে বললে, 'কি গান···?'

'তোমাদের যা জানা আছে।'

এসব আমার শোনা কথা। তার উপর ইতিমধ্যে দীর্ঘকাল কেটে গিয়েছে। সঠিক মনে নেই, প্রাক্তনদল সকলের পয়লাই রঙের টেক্কা, অর্থাৎ 'জীবন যখন শুকায়ে যায়—' মেরেছিল, না সেটাকে তাঁর আদেশের জন্য জীইয়ে রেখেছিল। কিন্তু মোদ্দা, তারা এক একটা গান শেষ হলে যখন থামে, তখন তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানান, এবং আরো গাইবার ইঙ্গিত করেন। তারা দু'একবার চেষ্টা দিয়েছিল গাঁধীজীর আপন পছন্দ জানাবার জন্য—ফলোদয় হয় নি।

সর্বশেষে মহাত্মাজী দু'একটি প্রশ্ন শুধোন। কেউ উত্তর দিতে পারে নি। মারাঠী মপারা বাড়ি ফিরে তো আমাকে এই মারে কি তেঁই মারে! আমি থাকলে নাকি চটপট উত্তর দিয়ে দিতুম। আমি বললুম, 'এগুলোর উত্তর তো বচুভাইও জানে, তদুপরি সে ওয়াডওয়ান অর্থাৎ গাঁধীজীর মতই কাঠিওয়াড়ের লোক—গুজরাতী—না, খাস কাঠিওয়াড়িতেই উত্তর দিয়ে তাঁর জান ঠাণ্ডা করে দিতে পারতো!' সে নাকি নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল। 'আমি হতুম না, কি করে জানলে! ঐ সিংগির সামনে!'

কিন্তু এত বাহ্য!

আসলে পূর্বোল্লিখিত প্রেস-কন্‌ফারেন্স্ গাঁধীজী ডাকিয়েছিলেন ঐ দিনই, ঐ সময়ই, ঐ স্থলেই।

এখন আমি যা নিবেদন করবো, সেটা ঐ সময়কার খবরের কাগজ নিয়ে চেক্ অপ্ করে সন্দেহ-পিচেশ তথা গবেষক-পাঠক ধরে ফেলতে পারবেন, আমি কী "দারুণ" "গুল্‌মুগীর"! আলঙ্কারিকার্থে কিন্তু আমি "যদু" পতি বা "রাখাল" রাজা হওয়ার মত তাদের লক্ষাংশের একাংশ শক্তি ধরি নে বলে আমি নাচার; বেচারার পক্ষে গুল্ মারাই একমাত্র চারাহ্!

যতদূর মনে পড়ে সেই এণ্ডেমণ্ডে বিজড়িত ভারতের সর্বজাতের সাংবাদিক-গণই সেদিন রবীন্দ্র-সঙ্গীত শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল।

গান শেষ হলে মহাত্মাজী ওঁদের বললেন, 'তোমাদের কি কি প্রশ্ন আছে,

শুধোও।' আর যায় কোথায়! দুনিয়ার যত রকম প্রশ্ন; আবার নূতন করে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হবে কি, এই কি তার জন্য উৎকৃষ্টতম মোকা নয়—মিত্রপক্ষ চতুর্দিকে বেধড়ক মার খাচ্ছে, আরম্ভ হলে কি প্রকারে হবে, ট্যাক্স বন্ধ করে না নয়া কোনো টেকনীকে, ১৯২০-এর মত ছাত্রদের ডাকা হবে কি না, ইত্যাদি ইত্যাদি?

গাঁধীজী তাঁর চিরাচরিত ধৈর্যসহ উত্তর দিয়ে যেতে লাগলেন—যদ্যপি আমার মনের উপর তখনকার, অর্থাৎ পরের দিনের খবরের কাগজ পড়ার পর যে দাগ পড়েছিল সেটা বোধ হয় এই যে, মোক্ষম প্রশ্নগুলো মহাত্মাজী এড়িয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য ঐ সময়ে ভবিষ্যতের তাবৎ প্ল্যান ফাঁস করে দেওয়া যে সদ্বুদ্ধির কর্ম হত না, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

হঠাৎ মহাত্মাজী দু হাত তুলে প্রশ্নধারা নিরুদ্ধ করে বললেন, 'আমি বেনে। বেনে কাউকে কোনো জিনিস মুফতে দেয় না। আমিও খয়রাৎ করার জন্য তোমাদের ডাকি নি। রবীন্দ্র-সঙ্গীত তো শুনলে। এবার আমার কথা শোনো। পোয়েট গত হওয়ার পূর্বে (তখনো বোধ হয় এক বছর পূর্ণ হয় নি) আমাকে আদেশ করেন, আমাদের উভয়ের বন্ধু এন্‌ড্রুজের স্মৃতিরক্ষার্থে যা কর্তব্য তা যেন আমি আপন কাঁধে তুলে নি। এখন দেখতে পারছি, আসন্ন ভবিষ্যৎ বড়ই অনিশ্চিত। তাই আজই আমি "এন্‌ড্রুজ মেমোরিয়াল ফাণ্ড"-এর জন্য অর্থসঞ্চয় আরম্ভ করলুম। দাও।'

মপারা রিপোর্ট দিতে গিয়ে আমায় বলেছিল, 'গাঁধীজী অনেকক্ষণ ধরে এন্‌ড্রুজ সম্বন্ধে বলেছিলেন, in a very touching manner। আর তার পর মহাত্মাজীর সামনে পড়তে লাগল, টাকা, পুরো মনিব্যাগ, গয়না, রিস্টওয়াচ, আংটি, কত কী! যেন বানের জলে ভেসে আসছে দুনিয়ার কুল্লে মূল্যবান জিনিস। অনেকে এমনই যথাসর্বস্ব দিয়ে ফেলেছিল যে, বোম্বায়ে ফেরার জন্য টিকিট কাটার পয়সা পর্যন্ত তাদের কাছে অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু জানেন তো, রেলও এখন আর পুরোপুরি ইংরেজের নয়। ভিলেপার্লে থেকে চার্চ গেট স্টেশন—সবাই জানে, কেন এদের টিকিট নেই।'

ফাণ্ডের টাকা যখন জমে উঠছে, তখন কে একজন বললে, 'মহাত্মাজী, এখন এসব কেন? স্বরাজ পাওয়ার পর এসব কাজ তো রাতারাতি হয়ে যাবে।'

আজ সত্যই আমার হাসিকান্নায় মেশানো চোখের জল নেমে আসে—এই ব্যক্তিটির ঐ মন্তব্যটির স্মরণে। তারই মত আমরা সবাই তখন ভাবতুম,

ইংরেজই সর্ব নষ্টের মূল। বিহারে ভূমিকম্প হলে ইংরেজই দায়ী, মেদিনীপুরে সাগর জাগলে ওটা ঐ ইংরেজেরই দুষ্কর্ম! ইংরেজকে খেদিয়ে দিয়ে স্বাধীন হওয়া মাত্রই—

When we shall have attained liberty, all those will be mere trifles!

গাঁধীজী সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষম গরম, কড়া গলায় জবাব দেন, 'But Tagore did not wait to be born till India has attained her liberty!'

পরাধীন ভারতে যদি কবি জন্ম নেন, তবে তাঁর সখার স্মৃতিরক্ষার ভার পরাধীন ভারতের স্কন্ধেই!

তাই বলছিলুম, হাসি পায়, কান্নাও পায়—তখন আমরা কী naif (প্রায় 'ন্যাকার' মত)-ই না ছিলুম, যে বিশ্বাস করতুম—স্বরাজ পাওয়ার পরই 'পাঁচ আঙুল ঘিয়ে' আর 'ডেগ-এর ভিতর গর্দান ঢুকিয়ে ভোজন!'

তাই কি রবীন্দ্রনাথ সাবধানবাণী বলেছিলেন, (উদ্ধৃতিতে ভুল থাকলে ক্ষমা চাইছি) 'একদিন (স্বরাজ লাভের পর) যেন না বলতে হয়, ইংরেজই ছিল ভালো!'

* *

কিন্তু কোথায় গেল সেই 'এনড্রুজ ফাণ্ড' যার মোটা টাকাটা তুলেছিলেন গাঁধীজী?

তা সেটা যেখানে যাক, যাক! দুঃখ এই, সেই চটি বইয়ে এবং অন্যত্র 'এ্যানড্রুজ ফাণ্ডে'র কথা উঠলে কেউ আর গাঁধীকে স্মরণ করে না, তিনি যে সেই সুদূর বোম্বায়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনিয়ে ফাণ্ডের গোড়াপত্তন করেছিলেন সেটা সবাই ভুলে গেছে!!

'ইজরায়েল বিশ্বের প্রবাদ-সত্য রূপে গণ্য হবে'

—বাইবেল

ঘরে ঢুকতেই বললেন, এদিকে এসো। অসাধারণ পণ্ডিত লোক। আমি তাঁকে বড্ডই শ্রদ্ধা করি, বলতে কি, ভালোবাসি। তিনিও আমাকে স্নেহ করেন। সত্যকার পণ্ডিত কখনোই মূর্খকে অবহেলা করে না।

ঘরে আর কেউ নেই। তবু তিনি ফিসফিস করে বললেন, 'তোমরা কাল বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টিরহস্য নিয়ে আলোচনা করছিলে না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা তোমার আটকাচ্ছিল কোথায়?'

'আজ্ঞে, আমি শুধাচ্ছিলুম, আল্লা যদি না-ই থাকবেন তবে এই দুনিয়াটা পয়দা করলে কে? আপনারাও তো—'

বাধা দিয়ে বললেন, 'আমাদের কথা বাদ দাও—তোমার মুশ্‌কিলটা কোথায় সেইটে খুলে কও।'

'শরণঙ্করসাধু' হীনযানপন্থী বৌদ্ধ: সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তিনি বলছিলেন, সৃষ্টির আদিও নেই অন্তও নেই। অতএব সৃষ্টিকর্তারও প্রয়োজন নেই। তারপর বললেন, যদি তর্কস্থলে ধরেও নেওয়া হয় সৃষ্টিকর্তা আছেন, তবুও তো শেষ-সমস্যার সমাধান হয় না। প্রশ্ন উঠবে, সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টি করলেন কে? শুনুন আজগুবী কথা! তারপর তিনি তাঁর গেরুয়া আলখাল্লার ভিতর থেকে নোটবুক বের করে আঁকলেন একটা চক্কর—সার্কল। বললেন এই সার্কলের যেমন কোনো জায়গায় আরম্ভও নেই, শেষও নেই, সৃষ্টিও হুবহু তেমনি। তারপর আপনি ঘরে ঢুকলেন। পাছে আপনাকে ডিসটার্ব করা হয় তাই আমরা আরো খানিকক্ষণ ফিসফিস করে কথা বলার পর উনি চলে গেলেন।

ওরিয়েন্টাল সেমিনারি অর্থাৎ প্রাচ্য-বিদ্যায়তন। তারই একটা কামরায় আমরা তিনজনা কাজ করি। একজনের বিষয়বস্তু ইরানী ফাইয়াঁস-পর্সেলিন—বিশ্বকলাসৃষ্টিতে তার স্থান। অন্যজন বাইবেলের ওল্ড-টেস্টামেন্টের হীব্রু পাঠের নয়া সম্পাদনা করছেন। আর আমি—তা সে যাক্‌গে। দু'জনাই বছর দশেক পূর্বে সর্বোত্তম শ্রেণীর ডক্টরেট নিয়েছেন; একজন আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।

শুধোলেন, 'চক্কর এঁকে সাধু বললেন সৃষ্টি এরই মত আদিঅন্তহীন। তা, এতে আবার দুর্বোধ্য কি আছে? তবে হ্যাঁ, আরো সোজা করে বলা যেতে

পারতো। আচ্ছা, স্কচদের বিশেষত্ব কি—অন্তত তাদের কোন্ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশ্বের লোক হাসিঠাট্টা করে ?'

এক গাল হেসে বললুম, 'সে আর বলতে! কিপ্টেমী!'

'বিলক্ষণ! সেই গল্পটা জান তো—লণ্ডনের এক ইংরেজ কোম্পানি স্কট-ল্যাণ্ডের এবার্ডীন শহরে খুললে ট্রামওয়ে। হাড়কিপ্টে স্কচরা ট্রাম চড়বে না, কিছুতেই। কোম্পানি লাটে ওঠার উপক্রম। তখন লণ্ডন থেকে পাঠানো হল স্পেশালিস্ট—তাঁকে বের করতে হবে দাওয়াই, স্কচকে কি প্রকারে ট্রামে ঢোকানো যায়। তিনি এবার্ডীনে এসেই ট্রাম ভাড়া থ্রাপেন্স থেকে এক ঝটকায় এক পেনি কমিয়ে করে দিলেন টাপেন্স। পরের দিন তাঁর আপিসের সামনে মহাপ্রলয়ের ভিড়। তিনি তো ড্যাম্ গ্লাড্—নিশ্চয়ই তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছে, ভাড়া কমিয়ে দেবার জন্য। ইয়াল্লা, তওবা, তওবা! এরা যে তাঁরই জানলা তাগ করে পচা ডিম হাজা টমাটো ছুঁড়ছে আর চিৎকার করছে, "কোত্থেকে এসেছে এই নচ্ছার! আগে আমরা পায়ে হেঁটে, ট্রাম ভাড়ার তিন পেনি বাঁচাতে পারতুম, এখন কুল্লে দু'পেনি! নিকালো রাস্কেলকো এবার্ডীনসে।" আচ্ছা, হলো। এবার বলো তো ইহুদিদের বৈশিষ্ট্য কি? পারলে না? আমিই বলছি, হুবহু একই গাধার এ-কান ও-কান। কিপ্টেমীতে।'

ইহুদিদের কিপ্টেমী সম্বন্ধে আমি কোনো গল্পই জানি নে, অতখানি বে-খবর বেরসিক আমি নই, কিন্তু বিশেষ কারণে আমি চুপ করে রইলুম। সে-কারণ একটু পরে পাঠক নিজের থেকেই বুঝে যাবেন।

তিনি বলে যেতে লাগলেন, 'একবার এক ইহুদি আর স্কচে ঝগড়া লেগেছে, কে কতক্ষণ ধরে ডুবসাঁতার দিতে পারে—দু'জনা দুই সুইমিং পুলে কাজ করতো আর দুই পুলের মধ্যে ছিল উৎকট রেষারেষি। শেষ পর্যন্ত বাজি ধরা হল এক শিলিঙ। বাজে লোকের কৌতূহল এড়াবার জন্য তারা নদীর এক নিভৃত জায়গায় দিল ডুব।'

তিনি চুপ মারলেন। আমি ভাবলুম, ওস্তাদ কথকের মত তিনি পজ্ দিয়েছেন আমার মনের উপর গল্পটা কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সেইটে দেখবার জন্য। কিন্তু কই? তা তো নয়। তিনি দেখি, পকেট থেকে ছুরি বের করে আপন মনে দিব্য পেনসিল কাটতে আরম্ভ করেছেন। তখন থাকতে না পেরে আমি শুধালুম, 'তারপর?'

উদাস স্বরে বললেন, 'কি করে বলবো ভাই কও। দু'জনার কেউই তো উঠলো না জলের তলা থেকে।' তারপর হন্তদন্ত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, বলতে ভুলে

গিয়েছিলুম, ভাগ্যিস্, তারা বাজিটা পাকাপোক্ত করার জন্য তাদের এক উকীল বন্ধুর কাছে কাগজ-কলমে লিখিয়ে নিয়ে—অবশ্য সবকুছ মুফতমে—তারই জিম্মায় রেখে এসেছিল ; নইলে শহরের লোক কস্মিনকালেও জানতে পেতো না, এ দুটো শান্ত, অজাতশত্রু লোক হঠাৎ ইহসংসার থেকে কি করে কপ্পুর হয়ে গেল। হুঁ! এক শিলিঙ—বাপ্‌রে! চাট্টিখানি কথা!'

'কিন্তু—'

'এর মধ্যে "কিন্তু" "but" "mais" "aber" কিছুই নেই, ভাই। কিন্তু সেই যে, অন্তহীন চিরচক্রের দৃষ্টান্ত দিলেন সিংহলের মহাস্থবির, বলছিলুম কিনা, সেটা আরো সোজা করে বলা যেতে পারতো। তাই তোমাকে পয়লা বাজিয়ে নিলুম, তুমি ইহুদি স্কচ সম্বন্ধে চালু গল্পগুলোর খবর রাখো কিনা। সবাই বলে, ওরিয়েন্টালরা—এবং বিশেষ করে ইণ্ডিয়ানরা—নাকি সর্বক্ষণ মুখ গুমড়ো করে, নাসিকাগ্রে মনোনিবেশ করে আত্মচিন্তায় মগ্ন, রসকষের বালাই নেই। যতো সব! হ্যাঁ, অন্তহীন চিরচক্র সহজ করে বোঝাতে হলে বলতে হয়—স্কচ বিল শোধ করবে না আর পাওনাদার ইহুদিও তাকে ছাড়বে না। সে ধাওয়া করেছে স্কচের পিছনে। শহরটাও ছোট। তখন কি হয়? অন্তহীন চিরচক্র। এখনো যদি না বুঝে থাকো তবে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কোনো ইহুদির দোকানে এপ্রেন্টিসি করগে।'

আমি বললুম, 'একটি কথা শুধোতে পারি—অপরাধ যদি না নেন, ব্যক্তিগত কথা।'

তিনি বললেন, 'মাই লাইফ ইজ এন ওপ্‌ন্ বুক। যা-খুশি শুধোতে পারো।'

'আচ্ছা, আপনি তো, বোধ হয় ইজ্‌রায়েলাইট—'

বাধা দিয়ে মৃদু হাসি হেসে বললেন, 'অত ভদ্রতা করে, অন্য লোক হলে বলতুম ভণ্ডামি করে, ইজরায়েলাইট না বলে য়ুডে (Jude=ইহুদি) বলতে পারো, তার চেয়েও অবজ্ঞাসূচক Jut বলতে পারো, এমন কি পাঁচজন জর্মন আড়ালে যে "ফীজার য়োট" (মোটামুটি, "ঘৃণ্য ইহুদির বাচ্চা") ব্যবহার করে সেও করতে পারো। আমি নির্বিকার।'

আমি জিভ কেটে বললুম, 'ছি ছি, কি যে বলেন—'

ফের বাধা দিয়ে বললেন,, 'শোনো, ভদ্র! তুমি কি বললে, কি না বললে কিচ্ছুটি এসে যায় না। এই দেখ আমার নাকটা—কি রকম বেঁকে গিয়ে হুকের মত ঝুলে আছে, তারপর আমার কান দু'খানা—মাথার সঙ্গে লেপটে না গিয়ে একটা ডান দিকে আরেকটা বাঁ দিকে যেন উড়ে যাবার পণ করেছে, দাঁড়াও,

তোমাদের দেশের হাতীর বোধ হয় এ রকম কান হয়, তারপর আমার চুল—কানের কাছে কি রকম যেন কোঁকড়া কোঁকড়া, নিগ্রোদের মত, আমাদের মিশর-বাসের সামান্য অবশিষ্ট—'

'থাক না। প্লীজ।'

একটু হাসলেন, তাতে কোনো তিক্ততা ছিল না। বললেন, 'এক ফার্লং দূরের থেকে লোক চিনতে পারে, ঐ আরেক ব্যাটা ইহুদি আসছে। তুমি ইজরায়েলাইট বললে, না যুডে বললে তাতে কি যায় আসে? তা সে যাক্ গে। তুমি কি যেন শুধোচ্ছিলে?'

'আপনি তো ইহুদি—'

'বলে ইহুদি! রীতিমত খানদানী মনিষ্যি আমি। কেন, নাম থেকে বুঝতে পারছো না? তোমাদের কুরান শরীফেও যে প্রফেট ইয়াকুবের (জেকব্) উল্লেখ আছে তাঁর তৃতীয় পুত্রের নাম লেভি। কিংবা বাইবেলের প্রথম অধ্যায়, জেনেসিসেও পাবে এ-গোষ্ঠীর খবর। কিন্তু থাক্, প্রপিতামহের শুকনো হাড় চিবিয়ে বেঁচে থাকা যায় না। তবে এ-কথা ঠিক, আমাদের পরিবারের বংশানুক্রমে ইহুদি ধর্ম ও হীব্রুসাহিত্যের চর্চা আছে।'

'তা হলে আপনি ইহুদিদের কঞ্জুসী নিয়ে, আপন চেহারার ইহুদিলক্ষণ নিয়ে অত ঠাট্টা-মস্করা করেন কি করে?'

মিটমিট করে হেসে বললেন, 'কেন, শোন নি, স্কচদের সম্বন্ধে যে-সব নূতন নূতন গল্প বেরোয় তার অধিকাংশের জন্মস্থল এবারডান, জনক স্কচরা স্বয়ং? তত্ত্বটার সত্যি মিথ্যে জানি নে, কিন্তু ইহুদির কঞ্জুসী, সে নোংরা—স্নান করে না, যে-দেশে বাস করে সেটাকে মাতৃভূমিরূপে স্বীকার করে না, আরো কত কী—এসব নিয়ে যে-সব গল্প আছে তার একটা বিরাট ভাণ্ডার আছে আমার কাছে। পেয়েছি উত্তরাধিকারসূত্রে ঠাকুর্দার কাছ থেকে এবং এর অধিকাংশই ইহুদিদের তৈরি—কোনো সন্দেহ নেই সে-বিষয়ে। বাবার এসবেতে শখ নেই। তিনি পড়ে আছেন হীব্রুশাস্ত্র নিয়ে, আর অবসর সময়ে ঐ একই অভিনিবেশ সহকারে, জর্মন সাহিত্যচর্চা। কারো সঙ্গে মেশেন না বড় একটা, কিন্তু তোমাকে যতটুকু চিনতে পেরেছি তার থেকে মনে হয়, তোমাকে বাড়ি নিয়ে গেলে তিনি খুশী হবেন। প্রাণ ভরে তাঁর কাছ থেকে জর্মন সাহিত্যের খুঁটিনাটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করতে পারবে। আসবে একদিন ডিনারে? বেশ। মাকে শুধিয়ে দিন ঠিক করে তোমাকে বলবো।'

'আচ্ছা, বলুন তো, এদেশে নাকি একটা পোলিটিকাল পার্টি দিন দিন শক্তি

সঞ্চয় করে চলেছে, আর তারা নাকি নির্বিচারে সব ইহুদিদের এ-দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়—যারা পাঁচ শ' সাত শ' বছর ধরে জর্মনিতে আছে তাদেরও, যারা এক বর্ণ হীব্রু জানে না, সিনাগগে যায় না, নাস্তিক্যবাদের পক্ষ সমর্থন করে প্রামাণিক গ্রন্থ লিখেছে তাদেরও। দোষটা কি ওদের ?'

এই তার মুখ একটুখানি গম্ভীর হল। সেটা যেন মুছে ফেলে মুচকি হেসে বললেন, 'এ তো কিছু নূতন নয়। বাইবেলের "এস্টার" পুস্তিকা পড়েছ ?'

আমি অভিমানের সুরে বললুম, 'আমি অগা। কিন্তু এস্টার পড়ি নি, এ-সন্দেহ কেন করছেন ? তবে হ্যাঁ, ওল্ড-টেস্টামেন্ট পড়া উচিত, তারই নির্মাতা কোনো ইহুদি রাব্বির কাছ থেকে। আমি পড়েছি খৃষ্টান—তাও লুথেরীয় অর্থাৎ কি না প্রটেস্টান্ট্—পাদ্রির কাছে। ওনরা তো এস্টারের ঐতিহাসিকতায় আদৌ বিশ্বাস করেন না।'

'সে-কথা পরে হবে। উপস্থিত অন্তত এটুকু মেনে নিতে পারো, সেখানে যে চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে তার অনেকখানি খাঁটি সত্য—তা সে যার মুখ দিয়েই বলানো হয়ে থাক না কেন এবং ইরানের রাজা গ্রীস-মিশর-বিজয়ী Xerxes ইহুদি-বালা এস্টারকে বিয়ে করে থাকুন, আর না-ই করে থাকুন। সেখানে Xerxes (বাইবেলের 'অহস্‌ভেরুস')-এর মন্ত্রী তাঁকে একদিন বললেন, "মহারাজের বিশাল সাম্রাজ্যে এক শ্রেণীর লোক সর্বদাই পাওয়া যায় (ইহুদি) যাদের আইনকানুন অন্য সব জাতদের থেকে ভিন্ন, এমন কি রাজাদেশও তারা মানে না; অতএব এক বিশেষ দিনে এদের সবংশে নির্বংশ করা হোক।"... তখনও প্রভু যীশুর জন্ম হয় নি, খৃষ্টধর্মের সঙ্গে বৈরীভাবের প্রশ্নই ওঠে না, আর, ঐ যে নয়া পলিটিকাল পার্টির কথা বলছিলে, যারা জাতে অ্যারিয়ান—তাদের ভিতর আবার নীল চোখ, ব্লণ্ড চুল-ওলা সর্বশ্রেষ্ঠ নর্ডিক জাত সম্বন্ধে প্রচার করতে গিয়ে তারা পিঠপিঠ বলে ইহুদিরা মানুষ পর্যায়ের নিম্নে (untermensch = under-man) সে পার্টি তো পর্শু দিনের—নিতান্ত শিশু। তা সে যাক্ গে—এই আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস জেনে তোমার যে কি লাভ হবে জানি নে। তোমাদের দেশে—'

'হালে আমাদের দেশে ইহুদিরা এসেছে ইয়োরোপ থেকে। তার বহু শতাব্দী পূর্বে ঝড়ের মারে একখানা নৌকায় করে সাতজন পুরুষ আর সাতজন স্ত্রীলোক এসে পৌঁছয় বোম্বাইয়ের ত্রিশ মাইল দক্ষিণে, অধুনালুপ্ত চেমুল বন্দরের কাছে।[১]

১ মারাঠীতে 'চ' অক্ষরের উচ্চারণ 'ৎস'-এর মত। তাই টলেমি এ বন্দরকে তিমুলা, সিমুল্লা দুই উচ্চারণেই লিখেছেন। চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের (টিলক,

শাস্ত্রাদি সব লোপ পায় বলে লোকে এদের ইহুদি পরিচয় পায় নি ; শুধু শনিবারে এরা বিশ্রাম নিত বলে (ইহুদির সাব্বাৎ) এবং তেলীর ব্যবসা করতো বলে (বোধ হয় মধ্য-প্রাচ্যের অলিভ তেল তৈরির কায়দা এরা তিল-সর্ষের উপর চালায়) এদের নাম হয়েছিল "শনিবার-তেলী"। একশ' বছরও বোধ হয় হয় নি, তর্কাতীত সিদ্ধান্ত হয়েছে, এরা জাত-ইহুদি। কিন্তু এদের পিছনে তো কেউ কখনো লাগে নি—এস্টার কেতাবের পাইকিরি কচু কাটার নৃশংস প্রস্তাব কহাঁসে কঁহা !'

'জানি, তাই বলছিলুম, তোমার কি লাভ ? আর এদেশের আর্যেরা বলেন, ইহুদি লাভ, টাকা, সোনারূপো ভিন্ন অন্য চিন্তা অন্য বস্তু বোঝে না। রূপোর কথাই যদি উঠলো তবে একটি ইহুদি কথিকা—কঞ্জুসীবাবদ—ঠিক পপুলার গল্প নয়, হাফশাস্ত্র বাক্যের মত বলি,—শ্রবণ করো, এবং তারপর—'

ইঙ্গিত বুঝে বললুম, 'যাচ্ছি আপন টেবিলে হীব্রু ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করতে।'

ব্যাগ খুলে একটা আপেল বের করে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'একদা জনৈক অর্থ-পিচেশ মজ্জা-কিপটে কোটিপতি—কখনো কানা কড়িটি দান করেছে এ-কথা তার কোনো হাতই জানে না—এসেছে এক রাব্বির কাছে। জানলার কাছে নিয়ে গিয়ে রাব্বি তাকে বললেন, "বাইরের দিকে তাকিয়ে আমায় বলো, কি দেখতে পাচ্ছো।"

ধনী বললে, "লোকজন—বিস্তর মানুষ।"

রাব্বি বললেন, "উত্তম প্রস্তাব।" তারপর একটা আয়নার সামনে তাকে দাঁড় করিয়ে শুধোলেন, "এবারে কি দেখছ ?"

"আমি নিজেকে দেখতে পাচ্ছি—" বললে কিপটে।

গোখলে ও যদি বেয়াদপি মাফ করেন তবে উল্লেখ করি, অধীনের অধুনা প্রকাশিত 'দু-হারা' পুস্তকের চরিত্র কাণে) অনেকেরই নীল চোখ, কটা চুল ; এদের ভিতরেও কিংবদন্তী, এঁরাও ঝড়ের মারে কোঁকণ অঞ্চলে পৌছন।

বরদার সয়াজীরাও যেরকম রমেশ, অরবিন্দ, আম্বেডকরকে পৃষ্ঠপোষকতা দেন, ঠিক তেমনি এই সাত স্ত্রীপুরুষের বংশধর পণ্ডিত কাহিমকরকে বোম্বাই থেকে ধরে এনে বরদা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত করেন। ভারতবর্ষের এঁরা প্রাচীনতম ইহুদি। এঁরা ইয়োরোপীয় বহু ইহুদির ন্যায় 'ইহুদি' শব্দটাকে অত্যন্ত অপছন্দ করেন এবং নিজেদের 'বেনে-ইজরায়েল' [বেনে—আরবী বিন—ইবন=পুত্র ; ইবন্ বৎতুতা তুলনীয়]='ইজরায়েল-সন্তান' রূপে পরিচয় দেন। আমার পরম সৌভাগ্য বরদাবাসকালীন এই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা হয়। এই

"ততোধিক উত্তম প্রস্তাব"—বললেন রাব্বি, "এইবারে শোনো, বৎস, কান পেতে মন দিয়ে। জানলার শার্সি কাঁচের তৈরি, আয়নাও কাঁচের তৈরি—তফাৎ কি? আয়নার পিছনে রয়েছে অতিশয়, হাল্কার চেয়েও হাল্কা সা মা ন্য একটু রূপোর প্রলেপ—ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু বৎস, যেই না এল সামান্যতম রূপো, অম্নি তুমি আর অন্য মানুষকে দেখতে পাও না, দেখতে পাও শুধু নি জে কে॥[২]"

২৩।৪।৬৬

মাটির মানুষটির যৎপরোনাস্তি অনাড়ম্বরে প্রকাশিত বেনে-ইজরায়েল পুস্তিকা ইয়োরোপীয় পণ্ডিতসমাজে, বিশেষ করে রাব্বিদের ভিতর যেন টর্পেডোর মত পড়ে। বস্তুত তারপর যে যা লিখেছেন বিশেষ করে ভিন্ন ভিন্ন এনসাইক্লোপিডিয়ায় —তার বেশীর ভাগ জজ কাহিম্‌করের কাছ থেকে নেওয়া। সপ্রশংস কৃতজ্ঞতা সহ। বরদার দ্বিতীয় ইহুদি ছিলেন জর্মন। এ-লেখনের ডঃ লেভির মত, ডঃ কোন্‌-ভীনার ('কোন্‌-ভীনারের মা' পশু—পঞ্চতন্ত্র, ১ম)। —ইয়োরোপীয় ইহুদি ও কাহিম্‌করের কোঁকণী ইহুদিদের পাল-পরবের ক্যালেণ্ডার ভিন্ন ভিন্ন—আল্লাকে বে-শুমার শোকরিয়া। আমি কখনো বা জজ সাহেবকে নিয়ে কোন্‌-ভীনারের গৃহে, কখনো বা কোন্‌-ভীনারকে নিয়ে জজের বাড়িতে বহু বিচিত্র বহ্বান্ন ভক্ষণ করে—একই পরব দু'-দুবার যথা গোস্বামী মতে ইত্যাদি পালন করে, ধর্ম রক্ষা করতুম। বেনে-ইজরায়েলদের সম্বন্ধে আমার যেটুকু সামান্য জ্ঞানগম্যি সেটুকু সমূচহ জজের খয়রাৎ।

২ এ লেখনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও আমার অন্তরঙ্গ পাঠকদের না জানিয়ে কিছুতেই থাকতে পারলুম না যে ২৬ মার্চ (১৯৬৬) সন্ধ্যাবেলা প্যারিস বেতার থেকে ইন্দিরাজীর ফরাসীতে প্রদত্ত মঁসিয়ে দ্য গলের অভ্যর্থনার প্রত্যুত্তরের রেকর্ডিং। অনবদ্য রিসেপশনে—কলকাতা 'থ'-এর চেয়ে কোটিগুণে শ্রেয়। ইন্দিরাজীর ফরাসী উচ্চারণ অতি সুন্দর, পরিষ্কার। অনভ্যাসবশত মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছিলেন বটে, কিন্তু উচ্চারণে বিদেশী আড় প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। যুদ্ধের সময় আমি চার্চিলের ফরাসী ভাষণ বেতারে শুনেছি। ইংরিজীর জোরালো একসেণ্ট দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ফরাসী উচ্চারণ। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে, বেতার-যন্ত্রে কান সেঁটে না শুনলে মনে হবে, গাঁক-গাঁক করে ইংরেজ সাবলটর্ন কুচকাওয়াজের 'হুকুমদার' ঝাড়ছে। ফরাসীতে অনুনাসিকের ছয়লাপ। ইংরেজের কাছে সে বহু গোমাংস। অতএব বাংলার 'চাঁদ' যেন ইংরেজের মুখে 'চ্যানড্‌' হয়ে বেরুচ্ছিল। ইন্দিরাজীর ফরাসী উচ্চারণ চার্চিলের চেয়ে ইনফিনিটি পার্সেণ্ট শ্রেয়।

এমেচার ভার্সস স্পেশালিস্ট

সব ব্যাপারেই আজকাল স্পেশালিস্ট। সেদিন মার্কিন মুল্লুকে এক স্পেশালিস্টই আবিষ্কার করেন যে শোভাযাত্রা, বয়কট বা ধর্মঘটে যাঁরা কালো ঝাণ্ডা তুলে হই হই করে, তাদের অনেকেই ভাড়াটে। এ তত্ত্ব আমাদের কাছে নূতন নয়; দিল্লিতে থাকাকালীন স্বর্গত অশ্বিনী গুপ্ত আমাকে দিল্লিতে যে 'হাঙার স্ট্রাইকে'র জন্য প্রতিষ্ঠান আছে, যিনি হাঙার স্ট্রাইক করবেন তাঁর জন্য শামিয়ানা, তাকিয়া-বালিশ, নির্জলা না হলে নিম্বুপানি—তদভাবে জিন্ (যদি তিনি মদ্যপ হন), কারণ বলতে গেলে একমাত্র জিনই সহজলভ্য কড়া ড্রিঙ্কের ভিতর জলের রঙ ধরে, আহারাদি, হ্যাঁ, আহারাদিই বলছি কারণ লুকিয়ে লুকিয়ে হাঙার স্ট্রাইকার যদি খেতে চান তবে গভীর রাত্রে তার সুব্যবস্থা—সেদিকে আমার ভোঁতা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এবং যিনি আজো এ-প্রতিষ্ঠানটি চালিয়ে যাচ্ছেন, তিনি মার্কিনী স্পেশালিস্ট নন, নিতান্ত দিশী মাল—এবং সর্বোপরি তিনি 'এমেচার'।

এসব তো মস্করার কথা—যদিও দুটোই ভাহা 'ইমানসে' সত্য। তবে দিল্লির প্রতিষ্ঠানটি নাকি 'সদাচার কদাচারে'র উৎপাতে এদানিং বড়ই উৎপীড়িত ('তংগ্ আ গয়ে'); তার অর্থ অবশ্য এ-নয় যে 'হাঙার স্ট্রাইক' করার কারণের কিংবা/এবং অকারণের অজুহাত অছিলার অভাব ঘটেছে, কিংবা 'হাঙার-এর' হাঙরদের ক্ষুধা নিবৃত্তি ঘটেছে—আসল কারণ ওটা নাকি রেশন্ড্ হয়ে গিয়েছে, 'অর্থাৎ হাঙার স্ট্রাইক', 'ফাস্ট্ আন্ টু ডেথ' এসব করতে হলে সেগুলো এখন করবেন সরকার স্বয়ং! আনাড়ি এমেচারদের হাতে আর এ-সব টপ প্রায়োরিটির বস্তু ছেড়ে দেওয়া যায় না। দেশ-বিদেশে বড্ড বেইজ্জতী হয়। আইরল্যাণ্ডের কে যেন ম্যাকসুইনি না কি যেন নাম সে নাকি বাষট্টি বা বিরানব্বই দিন নাগাড়ে উপোস মেরেছিল—এমতাবস্থায় ভারত যদি বাহান্ন দিনের রেকর্ড দেখায় তবে সেটা হবে সত্যই 'শরম্কী—' থুড়ি 'লজ্জাকী, ঔর আফসোস—' থুড়ি 'পশ্চাত্তাপকী বাৎ'।

তৎসত্ত্বেও এমেচারকে ঠেকানো যায় না—বারট্রাণ্ড রাস্লের মত নিরহঙ্কার লোক পর্যন্তও চেষ্টা দিয়ে হার মেনেছেন।[১] স্বয়ং রবি ঠাকুর এই এমেচারি কর্মে

১ এ বাবদে তাঁর বিদকুটে রায়: সর্ব পণ্ডিত যখন কোনো তত্ত্ব এক বাক্যে স্বীকার করে নেন, তখন তুমি এমেচার সেখানে ফপরদালালী করতে যেয়ো না। আর যেখানে তাঁরাই একমত হতে পারছেন না সেখানে তুমি নাক গলাতে যাও কোন্ দুঃসাহসে? এর বিগলিতার্থ তুমি এমেচার ঠোঁট দুটি সেলাই করে বসে

বড্ডই সুখ পেতেন। আমি তামা-তুলসী স্পর্শ করে একশ' বার কিরে কাটতে রাজী আছি, তাঁকে মধ্যম শ্রেণীর হোমেওপ্যাথ ডাক্তার বললে তিনি সেটাকে কবিতায় নোবেল প্রাইজ পাওয়ার চেয়ে লক্ষ গুণে শ্লাঘনীয় বলে মনে করতেন। ঠিক তেমনি স্পেশালিস্ট সত্যেন বোস তাঁকে দিলেন টুইয়ে—বিজ্ঞান শিখতে নয়, সেও না হয় বুঝি—শেখাতে। অর্থাৎ 'মেস্টারি' করতে। তাহলে পাঠ্য-পুস্তকের প্রয়োজন। বাজারে যেগুলো মেলে সেগুলো লিখেছেন বটে বিশেষজ্ঞরা —একশ' বার মানি—কিন্তু যে বাঙলা ভাষায় লিখেছেন সেটা, ঐ যে ফরাসীতে বলে, 'ইল্‌জ এক্রিভ ফ্রাঁসে কম্ লে ভাশ্ এস্‌পানিয়োল'—তেনারা ফরাসী লেখেন স্প্যানিশ গাইয়ের মত।[২] রবি ঠাকুর আর যা করুন, তাঁর বাঙলাটা অন্তত বোধগম্য হবে। থাক না দু-পাঁচটা ভুল এদিক ওদিক। সেগুলো মেরামত করার জন্য তো ঐ হোথায় সত্যেন বোস বসে।

যৌবনে রবীন্দ্রনাথ একদিন শব্দতত্ত্ব নিয়ে তর্কাতর্কির দায়ে মজে যান। বৃদ্ধ বয়সে—বোধ হয় সুনীতিবাবু এবং/কিংবা গোঁসাইজীর প্ররোচনায়—তাবৎ বাঙলা ভাষাটা নিয়ে খুব একচোট তলওয়ার খেলা দেখিয়ে দিলেন। আহা সে কী স্বচ্ছ সুন্দর তরল ভাষা—যেন বোতল থেকে তেল ঢালা হচ্ছে। কে বলবে, বিষয়বস্তু নিরস শব্দতত্ত্ব—হুস্ হুস্ করে পাতার পর পাতা সিনেমার ডেলি ক্যালেণ্ডারের পাতার পর পাতা ওড়ার মত পেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দুম করে সম্বিতে ফিরে

থাকো। এমন কি কেউ যদি বলে, Fine Weather—eh? তুমি হাঁ না বলতে পারবে না। তুমি ওয়েদারের জানো কি? প্রথম গ্রীনিজকে শুধোবে আবহাওয়ার দফতরে। তারা যদি বলে 'ফাউল' তবে ফাউল—তা তুমি যেখান থেকে কথা বলছো সেখানে থাক না মলয় পবন আর সূর্যাস্তের লালিমায় রঙিন গোলাপী আকাশ। এস্তেক তোমার নাম যদি 'অতুল' হয়, তবে তোমার বিপদ প্রত্যাসন্ন। শিশির ভাদুড়ী বলতেন অ (ঘর-এ যে 'অ' উচ্চারণ), আর রবি ঠাকুর বলতেন 'ওতুল'—কিন্তু তিনিও আবার 'ওতুলনীয়' না বলে বলতেন 'অতুলনীয়'। অর্থাৎ বারট্রাণ্ড রাস্‌লের অনুশাসন মানলে তোমাকে নাম বদলে 'মাকাল-টাকাল' কিছু একটা 'দশদিশি নিরদ্বন্দ্ব' নাম রাখতে হবে।

২ আমার টায়-টায় মনে নেই তবে রাজশেখর লেখেন, 'নেত্রজনের উপস্থিতিতে অসিতলীনের উপর কুলহরনীর প্রতিক্রিয়া' শুনে মনে হয় সকলের সজাগ দৃষ্টির সামনে (এখানে পাঠক আমার তরফ থেকে একটা ভদ্রজনোচিত গলাখাঁকরি অনুমান করে নেবেন। ধন্যবাদ।) কোনো একটা বেহেড্

আসবেন। এমেচার আর্টিস্ট যেন লাজুক হাসি হেনে ঘন ঘন করতালির মধ্যিখানে শেষ বক্তব্য নিবেদন করছেন। কি বলছেন? বলছেন, তিনি শব্দতাত্ত্বিক নন্—নিতান্ত এমেচার—তাই খুব সম্ভব হেথা হোথা বিস্তর গলদ থেকে যাবে।

তারপর তিনি যে মুষ্টিযোগের শরণ নিয়েছেন সেইটে তিনি কালিদাসের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন। সেটা তাঁর শক্তি (fort)ও বটে, দুর্বলতাও —যদি অপরাধ না নেন—বটে কিন্তু এস্থলে তিনি যে তুলনাটি ব্যবহার করেছেন সেটি উপমা কালিদাসস্যকেও হার মানায়। তিনি বলছেন, 'কোনো কোনো বিখ্যাত রূপশিল্পী শরীরতত্ত্বের যথাতথ্যে ভুল করেও চিত্রকলায় প্রশংসিত হয়েছেন, (যেমন সেজানের ওয়েস্ট কোট-পরা ছোকরাটির হাত আজানুলম্বিত না বলে আগুলফ-লম্বিত বললেই ঠিক হয়—কিন্তু তৎসত্ত্বেও ছবিটি রসে ভর্তি—যাকে আজকের দিনে 'রসোত্তীর্ণ' বলা হয়।) ঠিক তেমনি কবির ভাষা সম্বন্ধে এ-বইয়ে দু-পাঁচটা ভুল বা অর্ধসত্য পরিবেশিত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এসব ভুল মেনে নিয়েও দেখা যায় এরকম তুলনাহীন প্রবন্ধ হয় না। কারণ তথ্য-পরিবেশনে অসম্পূর্ণতা থাক আর নাই থাক, সবসুদ্ধ মিলিয়ে প্রবন্ধটি বাঙলা ব্যাকরণ (খাঁটি বাঙলা ব্যাকরণ—বাঙলার ছদ্মবেশ পরে সংস্কৃত ব্যাকরণ নয়।) এবং খাঁটি বাঙলা অলঙ্কার নিয়ে এক অভূতপূর্ব রচনা। যেমন তিনি বলছেন, চলতি বাঙলাতে গুরুচণ্ডালী এখন আর দোষের মধ্যে গণ্য নয়।

ঠিক এই জিনিসটেই আমরা অন্যান্য সাহিত্যিকের কাছে প্রত্যাশা করি। কারণ সাহিত্যিকের সঙ্গে ভাষার যে পরিচয় হয় সেটা আদৌ শব্দতাত্ত্বিক বা ভাষাতাত্ত্বিকের মত নয়। সে ভাষা ব্যবহার করে নূতন নূতন সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই তার ভাষা সদা পরিবর্তনশীল। অত্যুত্তম গ্রন্থ লিখে ভাষাবাবদে আপামর জনসাধারণ তথা বৈয়াকরণিকের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেলেও লেখক তার পরবর্তী পুস্তকে সেই অনুমোদিত ভাষার পুনরাবৃত্তি করতে চায় না, রবীন্দ্রনাথের তুলনায়, আপনার মালের রিসীভার অব স্টোলেন প্রপার্টি হতে চায় না। তাই তাকে প্রতিদিন নিত্য নবীন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং সেখানে সে কোনো

বেলেল্লাপনা। উহুঁ, আপনার পাপ মন, পাঠক, আপনার পাপ মতি। ওর অর্থ হচ্ছে—আবার বলছি টায়-টায় মনে নেই—The reaction of chlorine (কুলহরনীর) on acitylene (অসিতলীন) where nitrogen (নেত্রজন) is present.

বৈয়াকরণিক, কোনো শব্দতাত্ত্বিকের সাহায্য পায় না। তাই প্রাচীন লেখক—যখন নূতন শব্দভাণ্ডার নূতন বচনভঙ্গী নিয়ে পুনরায় একখানা সার্থক গ্রন্থ লেখেন, তখন সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি হয়। এ কর্ম শব্দতাত্ত্বিক করতে পারেন না—অবশ্য তিনি যদি সাহিত্যিকও হন ও তাঁর তত্ত্বগ্রন্থখানি সাহিত্যের পর্যায়ে তুলতে পারেন তবে অন্য কথা।

তাই ভাষার নব নব রূপ দেখাবার জন্য সাহিত্যিককেও এমেচারি শব্দতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে হয়।

এবং শুধু সাহিত্যিকই না, যে-ব্যক্তিই জ্ঞান-বিজ্ঞান বা অন্য যে-কোনো চিন্ময় বিষয় নিয়ে চিন্তা করেন, আলোচনা করেন, তাঁকেই কিছু-না-কিছু শব্দতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে হয়। এই তত্ত্বটি আজ হঠাৎ আমার চোখের সামনে জলজল করে ফুটে উঠলো, মুসলমানদের সম্ভ ইমাম আবু হানীফার বিরাট ন'ভলুমী গ্রন্থের একটি জায়গা পড়ে।

ইমাম আবু হানীফা শিষ্যসমাবৃত হয়ে প্রতি প্রাতে বসতেন মুসলিম ধর্ম আলোচনায়। তাঁর রায় লিখে রাখা হত তো বটেই, তাঁর প্রধান শিষ্যদের কেউ ভিন্ন রায় (মিনিট অব ডিসেণ্ট) প্রকাশ করলে সেটিও সযত্নে পাশাপাশি লিখে রাখা হত।

একদা প্রশ্ন উঠলো, 'নগরে জুম্মার নমাজ অবশ্য পালনীয়; কিন্তু গ্রামে জুম্মার নমাজ হয় না'—এ-আদেশ শিরোধার্য করবো কি না? ইমাম সাহেব বললেন, 'শিরোধার্য করা, না-করার পূর্বে প্রথম দেখতে হবে "নগর" বলে কাকে, আর "গ্রাম" বলে কাকে?' জনৈক শিষ্য বললেন, 'অভিধান দেখলেই হয়।' এবারে ইমাম যা বললেন, সেটি মোক্ষম তত্ত্বকথা—সর্বভাষাতে সর্বকালে প্রযোজ্য। তিনি বললেন, 'কোষকার দেবে সাধারণ প্রচলিত অর্থ। পক্ষান্তরে আমরা ধর্মশাস্ত্রের অধ্যায়ন করে জনসাধারণের জন্য অনুশাসন প্রচার করি (অর্থাৎ আমরা theologians,); থিওলজিয়ানের দৃষ্টিবিন্দু থেকে কোন্‌টা শহর—যেখানে জুম্মার নমাজ সিদ্ধ—এবং কোন্‌টা গ্রাম যেখানে জুম্মার নমাজ অসিদ্ধ—তার শেষ বিচার তো আমাদের হাতে।'

অত্যন্ত খাঁটি কথা। যেমন ধরুন গরুর বাথান, যেখানে রাখালরা শীতকালে থাকে। সেটাকে হয়তো গ্রামের পর্যায়েও ফেলা যাবে না। কিংবা উত্তম মরুদ্যান পেয়ে হাজার লোকের কাফেলা (ক্যারাভান) কয়েক দিন বিশ্রাম করলো। সেখানে জুম্মার নমাজ সিদ্ধ না অসিদ্ধ?

ইমাম সাহেব বলছেন, থিয়োলজিকাল অর্থে কোন্‌টা গ্রাম, আর কোন্‌টা

শহর, তার সংজ্ঞার (definition-এর) জন্য কোষকার তো আসবে আমাদেরই কাছে।

ঠিক তেমনি আইনজ্ঞ পণ্ডিতরা সংজ্ঞা দেন কোন্‌টা crime, আর কোন্‌টাই বা tort ; তবে তো কোষকার সেটা তার অভিধানে লিপিবদ্ধ করে। সে তো আর বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেকটিতে বিশেষজ্ঞ নয় যে, নিছক আপন বুদ্ধির উপর নির্ভর করে প্রত্যেক শব্দের সংজ্ঞা দেবে, বর্ণনা দেবে, প্রতিশব্দ দেবে।

ঠিক এই জিনিসটি বাঙলা দেশে এখনো আরম্ভ হয় নি।

সবাই তাকিয়ে আছেন কোষকারের দিকে। সে পরিভাষা বানিয়ে দেবে। আর সে বেচারী তাকিয়ে আছে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা, আইন ইত্যাদির পণ্ডিতদের দিকে। তাঁরা সংজ্ঞা দেবেন—এবং তাঁদের অধিকাংশই শব্দ বা ভাষা-তাত্ত্বিক নন, সে বাবদে নিতান্তই এমেচার—তবে তো কোষকার সেগুলো লিপিবদ্ধ করবে॥

মিজোর হেপাজতী

নেফা অঞ্চল বাদ দিলে আসামে যে কটি পার্বত্য অঞ্চল গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, তার ভিতর পড়ে খাসিয়া, গারো নাগা ও লুসাই। এর সঙ্গে ত্রিপুরার কুকি অঞ্চলেরও নাম করতে হয়, কিন্তু নানা কারণে সেখানকার কুকিরা এযাবৎ কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে নি—এবং যেহেতু ত্রিপুরা আসামের অংশরূপে গণ্য হয় নি, তাই সে-দেশ এ প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। কিন্তু মণিপুর সম্বন্ধে এস্থলে কিছু না বললে তাদের ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম তথা বাঙালী ধর্মপ্রচারকদের প্রতি অবিচার করা হয়।

আসামের অন্যান্য পার্বত্য জাতির মত মণিপুর অনুন্নত নয়। মহাভারতের অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার মণিপুর ও বর্তমান মণিপুর একই কিনা সে নিয়ে তর্কাতর্কি করার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই—এবং যেহেতু মণিপুর অধীনের জন্মভূমির প্রত্যন্ত ভূমিতে অবস্থিত, সে তার প্রতিবেশীকে অহেতুক ক্ষুব্ধ করতে চায় না, কিন্তু এ কথা সত্য যে, যদ্যপি সাধারণ মণিপুরীদের চেহারার ছাপ মঙ্গোলীয়, ওদের ভিতর হঠাৎ বিশুদ্ধ আর্য টাইপও পাওয়া যায়—এবং যেহেতু পার্শ্ববর্তী আর্য বাংলা-ভাষাভাষী সিলেট কাছাড়ে এ টাইপ দুর্লভ, তাহলেই প্রশ্ন উঠবে, কান্যকুব্জ অঞ্চলের এই আর্য টাইপ হঠাৎ মণিপুরে আবির্ভূত হল কি প্রকারে? পশ্চিম-

বাংলার সঙ্গে মণিপুরের সরাসরি যোগসূত্র না থাকা সত্ত্বেও বাঙালী আজ মণিপুরী নৃত্যের কথা ও সে নৃত্য যে রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে জন্ম ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে, সে-কথা জানে—বস্তুত ভারতবর্ষে অধুনা যে চার রকমের শাস্ত্রীয় নৃত্যপদ্ধতি স্বীকৃত হয়, এ নৃত্য তারই অন্যতম—কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম মণিপুরে প্রচার ও প্রসার লাভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে, অতএব এ নৃত্যকে আড়াই হাজার বছরের ঐতিহ্য দিয়ে মহাভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করা কঠিন।[১]

কিন্তু এহ বাহ্য। আসল প্রশ্ন এই : ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে রাজাদেশে মণিপুর যে বৈষ্ণবধর্ম 'রাষ্ট্রধর্ম'-রূপে গ্রহণ করল সেটা সম্ভব হল কি প্রকারে? আসামের আর পাঁচটা পার্বত্য জাতি যে রকম আর্য জনপদ থেকে দূরে হাজার হাজার বৎসর ধরে আপন আপন প্যাটার্ন অব্ কালচার বুনে যাচ্ছিল মণিপুরও করছিল তাই। তাদের মাঝখানে একমাত্র মণিপুরই বা বৈষ্ণব হয়ে গেল কেন? এ কথা সত্য যে শিলচর থেকে মণিপুর পৌঁছানো সহজতর। কিন্তু মৈমনসিং থেকে গারো পাহাড় যাওয়াও তো কঠিনতর নয়, গারোরা অতিশয় শান্তিপ্রিয় এবং দু-একটি গারো মুসলমানের সঙ্গেও আমার আলাপ-পরিচয় হয়েছে। পক্ষান্তরে নেফার অধিবাসীদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করা কঠিনতর; অথচ লোকমুখে শোনা, সেখানকার কোনো কোনো উপজাতি সর্বৰাবদে অ-হিন্দু হয়েও মাথার এক দিকের খানিকটা চুল কামায় ও চিহ্নস্বরূপ দেখিয়ে বলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নাকি তাদের অর্ধ-হিন্দুরূপে পরিণত করে বলেন যে, তিনি আবার এসে তাদের পূর্ণ-হিন্দু করে দেবেন—তারা এখনো সেই প্রতীক্ষায় আছে। তা সে যা-ই হোক, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের বাঙালী শিষ্যেরাই যে মণিপুরে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মণিপুরী ভাষা বাংলা অক্ষরে লেখা হয়; পক্ষান্তরে পরবর্তী যুগে খৃষ্টান মিশনারিরা পার্বত্যবাসীদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার পর তাদের

---

১ দক্ষিণ ভারতের ভরতনাট্যম নিয়ে যতখানি গবেষণা এই উত্তর ভারতেই হয়েছে, এই উত্তর ভারতের ঘনিষ্ঠতর মণিপুরী নৃত্য নিয়ে তার এক-দশমাংশও হয় নি। এ নৃত্য সত্যই রহস্যময়। মূল নৃত্য শান্ত ও লাস্যরসাশ্রিত কিন্তু প্রারম্ভিক অবতরণ নৃত্য (এর টেক্‌নিকাল নামটি আমি ভুলে গিয়েছি) অত্যন্ত প্রাণবন্ত, দুর্দান্ত—তাণ্ডব নৃত্যের কাছাকাছি এবং পার্শ্ববর্তী অনুন্নত অঞ্চলের সংগ্রাম-নৃত্যের সঙ্গে সাদৃশ্য ধরে। হয় তো বৈষ্ণব হয়ে যাওয়ার পরও মণিপুরীরা তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যগত পার্বত্য নৃত্য ত্যাগ করতে চায় নি বলে 'অর দ্য ভ্র' রূপে—প্রস্তাবনারূপে—সেটিকে রক্ষা করেছে।

ভাষা রোমান বা অন্তকার দিনের ইংরিজী অক্ষরে লেখেন।[২]

কিন্তু সব চেয়ে বড় তত্ত্বকথা, মণিপুরবাসী বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করতে (এবং পরবর্তী যুগে কাছাড়ে আশ্রয়গ্রহণকারী কিছু মণিপুরী ইসলাম গ্রহণ করাতে) কোনো সভ্যতা-সংস্কৃতিগত বা অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্ট হয় নি। রাজনৈতিক সমস্যার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ বাঙালী মিশনারিরা মণিপুরের সিংহাসনে কোনো বাঙালীকে বসাতে চান নি। অর্থনীতির দিক দিয়ে দেখতে গেলে মণিপুরবাসী ও পার্শ্ববর্তী কাছাড়বাসীর মধ্যে দ্রব্যবিনিময়ের ফলে উভয়েই উপকৃত হন। এই অর্থনৈতিক দিকটা পাঠক বিশেষভাবে মনে রাখবেন। আমার মনে হয়, নাগা এবং মিজোদের অর্থনৈতিক সমস্যাটা কেউ সবিশেষ চিন্তা করে দেখেন নি।

আমার বাল্যকালে সিলেট জেলার একাধিক জায়গায় নিয়ত বর্ধিষ্ণু খৃষ্টান মিশন ছিল এবং সে যুগে ভারতের তাবৎ প্রটেস্টান্ট্ মিশনারিদের ভিতর দক্ষিণ-শ্রীহট্টে কর্মরত ওয়েল্‌শ্ মিশনের (এখনো মিজোদের ভিতর এই মিশনই সর্বপ্রধান এবং যে ক'জন মিশনারির খবর অধুনা পাওয়া যাচ্ছিল না তাঁরা খুব সম্ভব এই মিশনেরই।) রেভারেণ্ড পিন্‌গোয়র্ন জোন্‌স্ তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা—বাংলা, ইংরেজী, ওয়েল্‌শ্ তিন ভাষাতেই—চরিত্রবল ও ধর্মানুরাগের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। আমি পাঠশালা যাবার সময় থেকেই তাঁর গির্জা ও সান্‌ডে স্কুলের রীতিমত অনুরাগী অংশগ্রহণকারী ছিলুম বলে প্রায়ই টিলার উপরে অবস্থিত তাঁর ছিমছাম বাংলোতেও যেতুম। মিশনে বাস করতো আরো বিস্তর ছেলেমেয়ে—প্রধানত চা-বাগিচার সাহেব ও দিশী রমণীর মিলনজাত পুত্রকন্যা এবং কিছু কিছু খাসিয়া, গারো, নাগা ও লুসাই (মিজো) খৃষ্টান। খাস বাঙালী প্রায় চোখেই পড়ে নি। আমি বিশেষ করে এই পার্বত্য খৃষ্টানদের সম্বন্ধেই কৌতূহলী ছিলুম এবং হাইস্কুলে ঢোকার সময় একটি লুসাই ছেলের সঙ্গে হৃদ্যতা হয়। সে সময় লুসাই ভাষা

---

২ এ যুগে মণিপুরে যে রকম হঠাৎ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে হিন্দুধর্ম প্রচারিত হয়, সে রকম উদাহরণ কী অদূর অতীত কী বর্তমানে আমি অন্যত্র কোথাও পাই নি। মালকানা রাজপুতদের অল্পসংখ্যক লোকই বিংশ শতাব্দীতে 'আর্য-সমাজে' দীক্ষা নেয়। শিলঙ শহর প্রায় শত বৎসর ধরে হিন্দুপ্রধান। সেখানে ব্রাহ্ম ও ইসলাম মিশন স্থাপিত হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত খৃষ্টান মিশনারিরাই সব চেয়ে বেশী সাফল্য অর্জন করেন। এখনও আসামের সর্ব পার্বত্য অঞ্চলে খৃষ্টান মিশনারিই অগ্রগামী—এবং কোনো কোনো লাগোয়া সমতল ভূমিতেও।

শিখতে গিয়ে—যদিও শেখা হয় নি—আবিষ্কার করি যে, অন্তত লুসাই ভাষাতে বাংলার বহু বহু শব্দের কোনো প্রতিশব্দ নেই (পরে জানতে পারি, অলিখিত ভাষা মাত্রেরই সাধারণত এই হাল)।

জোন্‌স্ সায়েব থাকতেন ছিমছাম বাংলোয়, জানলায় পর্দা টানানো। সায়েব-মেম খানা খেতেন ছুরি-কাঁটা দিয়ে, ধবধবে সাদা টেবিলক্লথে ঢাকা খানা-টেবিলের পাশে। আমার বয়স তখন তেরো। কিন্তু তখনই মনে হয়েছিল, ধর্মযাজকের এতখানি বিলাস ভালো না—বিশেষ করে তিনি যখন মিশনের আর সবাইকে তাঁর মত 'বিলাসে' রাখতে পারেন না। (পরবর্তী যুগে ইংলণ্ড এবং কন্টিনেন্ট ঘুরে বুঝতে পারলুম, জোন্‌স্ সায়েব তাঁর দেশের পাদ্রী-ভাইদের তুলনায় কতখানি আত্মত্যাগ করে ওই বিদেশ-বিভুঁইয়ে কতখানি সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন ; তাঁর আত্মাকে স্মরণ করে আজ ক্ষমা ভিক্ষা কার)।

আমার এবং আমার হিন্দু-মুসলমান বন্ধুদের মনে পাদ্রী সায়েবের ছিমছাম বাড়ি, আসবাবপত্র কোনো প্রলোভনের উদ্রেক করতো না। আমরা যেন কিছুটা বুঝে কিছুটা না বুঝে মনে মনে যুক্তি করতুম, 'খৃষ্টান হলে এ সব পাওয়া যায় ; কিন্তু আমরা তো ধর্ম বেচতে চাই নে।' তাই বোধ হয় জোন্‌স্ সায়েব তাঁর জোরদার বাগ্মিতা-শক্তি দ্বারাও কোনো বাঙালী হিন্দু-মুসলমানকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে পারেন নি—করে থাকলেও অত্যন্ত দুঃস্থ দূর গ্রামাঞ্চলের তথাকথিত নিম্নতম শ্রেণীর মধ্যে। আমরা কখনো তার খবর পাই নি।

আমার কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগতো, মিশনের এই খাসি লুসাইরা কি জোন্‌স্ সায়েবের মত ফিটফাট বাড়িতে থাকতে চায় না ?

মণিপুরে যে সব বৈষ্ণব 'মিশনারিরা' গিয়েছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই সেখানে কোনো উচ্চতর মানের জীবনযাপন করেন নি। বস্তুত আজও মণিপুরের গ্রামবাসী সুর্মা উপত্যকার চাষার চেয়ে অনেক সচ্ছল। কাজেই এ নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব সেখানে উপস্থিত হয় নি।

কিন্তু নাগা-লুসাইদের মধ্যে কি হল ?

যারা লেখাপড়ায় সামান্য ভালো—এ কথা মানতেই হবে, খৃষ্টান মিশনারিরা তাঁদের সামর্থ্যে যতখানি কুলোয় ততখানি অর্থ শিক্ষার জন্য পাহাড়ে পাহাড়ে ঢেলে দিয়েছিলেন এবং একদা সেখানে সাক্ষরের সংখ্যা বাংলার তুলনায় ছিল বেশী—তারা কোহিমা আইজলে পড়তে এল, পরে শিলঙে এবং কেউ কেউ কলকাতা পর্যন্ত। এবং যারা আপন গ্রাম থেকে বেরুলো না, তারা অন্তত পাদ্রী সায়েবের বাড়ি, তাঁর তৈজসপত্র দেখেছে। শিলঙে যে দু-চারজন চাকরি

নিয়ে থেকে গেল তাদের কথা আলাদা, কিন্তু যারা বাড়ির টানে গাঁয়ে ফিরে গেল, এবং যারা গাঁয়েই ছিল এদের অনেকেই কি তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নততর করে পাদ্রী সায়েবের মানের কাছে আসতে চাইলো না ?

এ তো আমাদের চোখের সামনে নিত্য নিত্য ঘটছে। আমাদেরই গ্রামের ছেলে শহরে এসে আর গ্রামে ফিরে গিয়ে নিম্নমানের জীবনযাপন করতে চায় না। বস্তুত ফ্রান্স, জর্মনি সর্বত্রই ক্রন্দনরব উঠেছে, গ্রামের বুদ্ধিমান কর্মঠ ছেলে মাত্রই আর গ্রামে ফিরে যেতে চায় না। পড়ে থাকে নিষ্কর্মাগুলো। দি ভিলেজেস আর বীইং ড্রেনড্ অব দেয়ার ব্রেনস—শহর ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গ্রামের প্রতিভাকে। বিশ্বব্যাপী এই যে একতরফা ভাটা, এরই ফলে যে গ্রামোন্নয়ন করা যাচ্ছে না এ সম্বন্ধে 'উনেস্কো' বহুকাল ধরে সচেতন, বিস্তর গবেষণা করেছেন, দাওয়াই খুঁজে পাচ্ছেন না।

কিন্তু এই সমস্যা নিয়ে আমাদের মধ্যে মারামারি খুনোখুনি হয় না, কারণ, যে গ্রামের ছেলে শহরে থাকতে চায় তার জন্য আশেপাশে বিস্তর ছোট-বড় শহর আছে—বোলপুর, শিউড়ি, বর্ধমান, শেষটায় যদি তাতেও প্রাণ না ভরে, তবে কলকাতা। রেলের চাকরি করে ভাগলপুর, পাটনা হয়ে কত কী !

কিন্তু মিজো-লুসাইবাসী যাবে কোথায় ? আইজল, লুঙলে তাদের কি দিতে পারে ? তারপর শতাধিক মাইলের ধাক্কা পেরিয়ে শিলচর—সে আমাদের সিউড়ি-বর্ধমানের তুলনায় কসমপলিটান শহর বটে—কিন্তু তারই বা মুরদ কতটুকু ? তার নিজেরই দুঃখের অবধি নেই। আসাম সরকার তাকে—যাক্, আবার না আরেকটা বাঙ্গাল খ্যাদানো আরম্ভ হয়ে যায় (ভালো তো কারো করতেই পারি নে, মন্দটা না-ই বা করলুম !), আর কেন্দ্রীয় সরকার ? কতবার বুঝিয়েছি, এই শিলচরে বেতারের কেন্দ্র বানিয়ে নাগা-লুশাইদের কণ্ট্রোল করো—কে বা শোনে কার কথা (এস্থলে বলে রাখা ভালো আমার জন্মভূমি কাছাড় নয়) ! থাক সে কথা। মিজো যদি বা শিলচর পেরুতে চায় তবে সামনে যে খাঁড়া পাঁচিল—হিল্ সেক্শন—তারপর সেই সুদূর গৌহাটি। এখানে খাসিয়াদের সঙ্গে তুলনা করলেই দেখা যাবে, একে তাদের চাষের পদ্ধতি উন্নত, শিলঙ গৌহাটির ভাষা তারা মোটামুটি জানে, জিনিসপত্র সেখানে বেচতে পারে, চাকরিনোকরি মিস্ত্রিগিরি করে পয়সা কামাতে পারে। আর শিক্ষিত সম্পদশালী বহু খাসিয়া শিলঙ শহরের পাদ্রীর বাঙলোর চেয়েও ফিটফাট বাঙলোয় বাস করেন। তাই স্বভাবতই খাসিয়ারা অনেকখানি সন্তুষ্ট এবং তাই শান্ত।

কিন্তু মিজো যায় কোথায় ?

১৯১০।১৯১১ থেকে তাদের ভিতর আরম্ভ হয় খৃষ্টধর্ম প্রচার এবং ১৯৩১ নাগাদ অর্ধেক লুসাইবাসী হয়ে গেছে খৃষ্টান। তারপর কি হয়েছে জানি নে। নিশ্চয়ই বেড়েছে। কারণ মিশনারিদের কাজ বন্ধ হয় নি। আদমশুমারীর হিসাব দেখে লাভ নেই। ঐ সময় থেকেই আরম্ভ হয়, পরের সেনসাসে কার স্বার্থ অনুযায়ী কি দেখাতে হবে তাই নিয়ে ছিনিমিনি, ইংরিজীতে যাকে বলে 'কুকিং'।

পার্বত্যাঞ্চলবাসী অনেক সময় আমাদের হিসেবে নিষ্ঠুর কিন্তু তারা সরল। সরল বিশ্বাসে তারা মনে আশা পোষণ করেছিল, যারা তাদের খৃষ্টান করেছে তাদেরই জাতভাই ইংরেজ সরকার একদিন তাদের বাসনা-কামনা পূর্ণ করে দেবে। 'জুম' খেত করে যে তার পয়সায় পাদ্রীর বাঙলো বানানো যায় না সেটা তারা বোঝে না। আমার মনে হয়, ইংরেজ-রাজ থাকলেও আজ না হোক কাল বা পরশু মিজোদের রুদ্ধ আক্রোশ ইংরেজকেই আক্রমণ করতো। তবে ইংরেজ ধাপ্পা মারতে ওস্তাদ—বাঙালীর মত চালাক জাতকেও কতবারই না একটা কুমীরছানাকে বারোটা করে দেখিয়েছে! কবিগুরুর মত বিচক্ষণ জন এবং তাঁর চেয়ে দু'দে বহু পলিটিশিয়ান 'ব্রিটিশ জস্টিসে' বহুকাল ধরে বিশ্বাস রেখে আশা করতেন, সময় এলে আমরা ইংরেজের কাছ থেকে জস্টিস—সুবিচার পাবো।

অবশ্য এ-কথাও স্বীকার করি—যাঁরা আমার সঙ্গে একমত নন তাঁদের কাছে মাফ চাইছি যে, দেশ-শাসন ব্যাপারে ইংরেজের অনেকগুলো সদগুণ আছে এবং সেই অনুপাতেই আসাম সরকার,—থাক, আবার কেন? তবে আসাম সরকার না হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার মিজোদের ভার নিলেই যে মুশকিল আসান হয়ে যেত সেটা আমি বিশ্বাস করি নে। যাই বলুন, যাই কন, আসাম সরকার বাস করেন শিলঙে—খাসিয়াদের মধ্যিখানে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তরে নেফা অঞ্চলেও রয়েছে আরো গণ্ডায় গণ্ডায় উপজাতি। তাদের অনেকেই প্রতি হাটবারে নেমে আসে সমতলে, ক্ষেতের জিনিস, এটা-সেটা (তখনকার দিনে চামর, মৃগনাভি, হাতীর এবং 'গণ্ডারের দাঁত—ভয়ঙ্কর মূল্যবান জিনিস, মধ্যপ্রাচ্যে 'হারেম' পোষণের জন্য মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায় নিত্যকাম্য এফ্‌রডিসিয়াক ইত্যাদি) বিক্রি করে প্রধানত নুন, কেরোসিন[৩] (সর্বনাশ! আমাদেরই যা হাল, ওদের হচ্ছে

৩ এক সিলেটী মুসলমান ডাক্তার বহু বৎসর আইজল-লুঙলেতে কাটিয়ে এসে আমায় বলেন, মিজোরা দু-দিন তিন-দিনের পাহাড়ের চড়াই-ওৎরাই পথ পেরিয়ে লুঙলে আসতো কেরোসিন কিনতে। সে কেরোসিন আসতো শিলচর থেকে, বেশীর ভাগ পথ মানুষের কাঁধে, বাঁকে করে। একবার একজন বাহকের কলেরা

কি ? তবে হ্যাঁ, ডিগবয় ওদের অতি কাছে) কিসে নিয়ে যাবার জন্য। ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকাবাসী আসামীদের অনেকেই তাদের চেনেন। কাছাড়বাসী ক'জন সদস্য আসাম মন্ত্রিমণ্ডলীতে আছেন সঠিক জানি নে ; যে কজন আছেন একমাত্র তাঁরাই ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকাবাসীদের তুলনায় নাগা-মিজোদের বিলক্ষণ চেনেন, সদুপদেশ দিতে পারবেন, অবশ্য শর্ত, যদি কেউ চায়। এঁদের তুলনায় নাগা-মিজোদের সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের জ্ঞান সীমাবদ্ধ—এ বিষয়টি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে বুঝিয়েছিলেন নাগাদের প্রথম গ্র্যাজুয়েট, সে-সময় আপন মাতৃভূমি নাগা পাহাড়েই এস ডি ও শ্রীযুত কে ভি চুসা, ট্রেনে শেয়ালদা থেকে সিলেটের কুলাউড়া পর্যন্ত দিল্লি থেকে মুককচঙ ফেরার পথে। সুযোগ পেলে সে কাহিনী আরেক দিন হবে। শ্রীচুসা অর্থনৈতিক দিকটারও উল্লেখ করেন।

মিজোরা সরল বিশ্বাসে ভাবছে, আমরা—তা সে কেন্দ্রীয় সরকারই হোক, আর আসাম সরকারই হোক—বিধর্মী (নাগারাও কড়া সুরে বলে, 'যারা আমাদের সঙ্গে আমাদের গির্জায় গিয়ে উপাসনা করে না তারা আমাদের ঘৃণা করে।' সেটা না হয় করা গেল, কিন্তু খেতেও হবে তাদের সঙ্গে এবং স্বর্গস্থ প্রভু জানেন, একমাত্র চারপাই ছাড়া সর্ব চতুষ্পদই তারা খায়। সঙ্গে সঙ্গে পান করতে হবে শুকনো লাউয়ের পাত্রে ভর্তি ভাত পচিয়ে তৈরী লিটার লিটার বিয়ার। কোহিমার ছোকরা ইংরেজ শাসনকর্তা এ-তিনটির প্রথমটি করে পুণ্যসঞ্চয় করতেন, বাকি দুই বাবদেও তেনারা সমগোত্রীয়, এমন কি প্রয়োজন হলে village belle-কেও তাঁরা নিরাশ করতেন না—কারণ ব্যাচেলার ভিন্ন অন্য কাউকে সেখানে সচরাচর পাঠানো হত না) এবং যেহেতু আমরা বিধর্মী তাই আমরা তাদের ন্যায্য পাওনা দিচ্ছি না। আমরা সরে গেলেই তাদের সর্ব বাসনা কামনা পূর্ণ হয়ে যাবে। মোস্ট প্রিমিটিভ জুম চাষ করে যে এবসার্ড জীবনমান উচ্চ পর্যায়ে তোলা যায় না সেটা বোঝাবে কে ?

হয় নির্জন পথিমধ্যে। বাঁশের স্ট্রেচার বানিয়ে অন্য চারজন বেহারা রোগীকে নিয়ে লুঙলে পানে রওয়ানা দেয়—দশ টিন কেরোসিন পায়ে চলার 'পথের' উপর রেখে দিয়ে। গণ্ডায় গণ্ডায় কেরোসিনকামী খৃষ্টান অখৃষ্টান চলেছে লুঙলের দিকে, কিন্তু তাদের ধর্মবোধ এমনই প্রবল যে তারা কেরোসিনের দিকে ফিরেও তাকালো না। বেহারারা লুঙলে থেকে ফিরে এসে সমুচা সব কটা টিন যথাস্থানে পায়—তারাও জানতো, লোপাট হবে না, তাই লুকিয়ে রাখার প্রয়োজনও বোধ করে নি। সেই মিজোরাই এখন লুঙলেতে লুটতরাজ করলো।

অবশ্য মিজোদের অসন্তোষের অন্যান্য কারণও আছে। আমি শুধু একটা কারণ দেখালুম—অন্তত মার্কসিস্টরা খুশী হবেন—তাঁদের অনেকেরই মতে এইটেই একমাত্র কারণ। একমাত্র কারণই হোক আর প্রধানতম কারণই হোক, অর্থনৈতিক কারণটার সন্ধান নেওয়া সর্বক্ষেত্রেই বাঞ্ছনীয়। লেনিনের সমসাময়িক ভিয়েনার অর্থডক্স অর্থনীতি পণ্ডিত শুমপেটার এবং তাঁরই মত কট্টর বার্লিনের জমবার্ট কেউই এই দৃষ্টিবিন্দুটি অবহেলা করেন নি।

স্বীকার করে নিচ্ছি, আমার এ বিশ্লেষণ ভুল হতে পারে, কিন্তু তথ্যগুলো সঞ্চিত হয়েছে বিশ্বস্তজনের কাছ থেকে।[৪]

---

৪ (ক) মিজো প্রবন্ধটি লিখে 'দেশ' দপ্তরে পাঠিয়ে দেবার পর দুটি তাৎপর্যপূর্ণ খবর বেরিয়েছে। প্রথমটিতে মাদ্রাজের প্রাক্তন গভর্ণর শ্রীযুত বিষ্ণুরাম মেধী বলেছেন—'যাতে করে মাল চলাচল জাম্ না হয়ে যায় ("transport bottleneck"), মিজো, নাগা এবং অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলের সঙ্গে রেল-লাইন বসানো উচিত।' তিনি General council meeting of the All-India Railwaymen's Federation-এতে এ বিবৃতিটি দেন ও ২৭ ৩-[illegible]-ব কাগজে এটি বেরোয়। মিজো নাগারা যে রেলের অভাবে বাদবাকি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন, সে-কথা আমি প্রবন্ধে নিবেদন করেছি।

(খ) পার্বত্য-অঞ্চল সম্বন্ধে ব্যাপক রিপোর্ট দেবার জন্য যে পাটস্কর্ কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল তার রিপোর্টের কয়েকটি প্রধান সুপারিশ ৩১ মার্চ বেরিয়েছে। সম্পূর্ণ রিপোর্ট না পড়ে কিছু বলার উপায় নেই, কিন্তু যেটুকু বেরিয়েছে তার থেকে মনে হল 'আধুনিক ঘটনার আলোকে' রিপোর্টটি আউট অব ডেট—তামাদি না হলেও বর্তমানের প্রশ্নবাণ সইতে পারবে না।

১৬।৪।৬৬

গাড়োলস্য গাড়োল

আদরের ডাক-নাম য়প্‌প্‌ বা ইয়প্‌প্‌—সারা দেশটা জুড়ে। তোলা-নাম হার ডক্টর ইয়োজেপ (য়প্‌প্‌) গ্যোবলস্‌, রাষ্ট্রের প্রপাগাণ্ডা-মন্ত্রী, রাজধানী বার্লিনের গাও-লাইটার (অঞ্চলাধিকারী) এবং ফুরার অ্যাডল্‌ফ্‌ হিটলারের শেষ জুয়ো-খেলার পাশা যখন ব্লাঙ্কো মেরে মেরে যাচ্ছে, তখন সর্বাত্মক, টোটাল ওয়ারের জন্য কুল্লে তাগৎ 'ইকট্রে' করার জন্য সর্বাধিকারী। পার্টির ব্রেন-বাক্সো। শত্রু-মিত্র সবাই এক সুরে বলেছেন, 'হাঁ, প্রপাগাণ্ডা কারে কয়, সে-বস্তু দেখিয়ে গেছে ঐ ব্রেন-বাক্সোটা।' বাক্সোটির এক দিক দিয়ে ঢুকতো সাদামাটা তথ্য, হাফ-তথ্য, তাহা মিথ্যে, ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্ধন বেরিয়ে আসতো অন্য দিক দিয়ে। এক-একখানা চাঁছাছোলা, নিটোল, অব্রণ, অনিন্দনীয় কলাসৃষ্টি। দাঁড়ান, এই 'কলা-সৃষ্টি' রহস্যটা একটু গুছিয়ে বলতে হয়—কারণ, এ-বাবদ তাবৎ টেকনিক্যাল টার্ম একমাত্র ফরাসীর মারফতে প্রকাশ করা সম্ভবে। তদুপরি গ্যোবল্‌স্‌ সায়েবের দিলের দোস্ত থেকে জান্‌-এর দুশমন্‌ তক্‌ স্বীকার করেছেন, ভোঁতা হোঁৎকা টিউটন নাৎসী পাঁঠাদের ভিতর ঐ গ্যোবলস্‌ই ছিলেন একমাত্র জিনিয়াস, যাঁর স্কন্ধে বিরাজ করতো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মস্তিষ্ককুণ্ডলী পরিপূর্ণ লাতিন মাথা—তাই তাঁর লিখন-কথন উভয়েতেই ছিল, ফরাসীসুলভ স্ফটিক স্বচ্ছতা।[১] এ-কলাসৃষ্টিকে অ্যভ্‌র্‌ দা'র বলা যেতে পারে, মাস্টার পীস অব আর্ট বললে ঠিক ঠিক মানেটা ওৎরায় না। অব্‌জে দা'র শব্দসমষ্টি আমি শুনেছি; এটা বোধ হয় morale-এর মত ইংরিজিতে চালু ভেজাল ফরাসী মাল (আমরা যেরকম কলকাত্তাই উর্দুতে 'একঠো' 'দুঠো'র ভেজাল বরাব্বর ব্যবহার করে আসছি।) অর্থ, যে-কলাসৃষ্টি

১ অক্সফোর্ডের ইতিহাস-অধ্যাপক ট্রেভর-রোপারের মত জর্মনির জাতশত্রু শতেকে গোটেক; তদুপরি তিনি একটি আস্ত স্নবস্য স্নব। তিনি বলেন, 'and it was the Latin lucidity of his (Goebbels') mind, the un-German suppleness of his argument which made him so much more successful as a preacher than the frothblowing nationalists of the South.'

অবশ্য অধ্যাপককে বোঝা ভার। তিনি শতাধিক বার বলেছেন, জর্মনরা অতিশয় অগা জাত। উত্তরে বলি, অগারা পরিষ্কার যুক্তি বোঝে না; রহস্যের সন্ধানে কোটে মাথা। তাই জর্মন দার্শনিকদের ভিতর লাতিন ধরনের স্বচ্ছ লেখক শোপেনহাওয়ার ভোঁতা লেখক হেগেল্‌-এর তুলনায় অবহেলিত।

কোনো কাজে লাগে না, যেমন 'পাপিয়ে মাশে'তে তৈরী কাশ্মীরী ফুলদানি-পারা সৃষ্টিছাড়া বস্তু, যেটাতে ফুল রাখা যায় না বটে, কিন্তু দেখতে খাসা। গ্যোবলস্ সায়েবের বেতার বক্তৃতা বা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বিলকুল বেকার নয়—টায়-টায় কাজে লাগতো। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে তিনি টলস্টয়কে নিশ্চয়ই পরম আপ্যায়িত করতে পারতেন; পার্থক্য মাত্র এইটুকু যে, টলস্টয় তাঁর কলা দ্বারা নির্মাণ করতেন স্বর্গারোহণের সোপান, য়প্‌প্‌ নির্মাণ করতেন রসাতলের খাড্ডায় সবেগে নিপতিত হওয়ার তরে অত্যুত্তম পিচ্ছল সানুপ্রদেশ। আর ইহুদিকুলের কল্যাণার্থে গ্যাস-চেম্বার!

হিটলারের বক্তৃতা-গর্জনও রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্যতুল্য প্রলয়ঙ্কর, কিন্তু সেটাকে অত সহজে বিশ্লেষণ করা যায় না। সেটাও কলাসৃষ্টি এবং সেটি য়প্‌প্‌-মার্কার চেয়ে লক্ষগুণে কার্যকরী। কড়া পাক।

দুজনার মুখে একই জিগির: ইহুদিকুল সর্বনেশে। এদের সমূলে বিনাশ করতে হবে।[২]

কিন্তু দুজনের মনের ভিতর দু' প্রকারের যুক্তি। য়প্‌পের বিশ্বাস, ইহুদিরা সর্ব ব্যাপারেই সাতিশয় ধুরন্ধর। এদের সঙ্গে 'নর্ডিক আর্যরা' অর্থাৎ জর্মনর কিছুতেই পাল্লা দিতে পারবে না। পক্ষান্তরে হিটলার এটা মানতে পারেন না—জান্ কবুল। তাঁর মতে, এই বসুন্ধরায় যে-কটা ডাঙর ডাঙর জাত, গোষ্ঠী, বংশ—যা খুশি বলুন, ইংরেজীতে Race, জর্মনে Rasse—তার মধ্যে 'আর্য'-রেস সর্বোত্তম। এবং সেই আর্য রেসের ভিতর সর্বোত্তমেরও সর্বশ্রেষ্ঠ জর্মনির নর্ডিক, নীল চোখ, ব্লন্‌ড্‌ (সোনালী, কোনো কোনো ক্ষেত্রে রূপালীও—যেটাকে বলা হয় প্লাটিনাম ব্লন্‌ড্‌) চুলধারী 'আর্য' রেস। ইহবিশ্বের সর্ববাবদে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্পন্ন শক্তিমান যুবার শরীরেও যেমন ক্যানসার দেখা দিতে পারে, ঠিক তেমনি জর্মন সমাজে এসে ঢুকেছে ইহুদি গোষ্ঠী। এরা

২ ন্যুরনবেরগের মোকদ্দমায় যখন আসামী নাৎসিদের বিরুদ্ধে বলা হলো যে তাঁদের ফ্যুরার গুরুই ইহুদিদের ausrotten='সবংশে নির্বংশ' করবেন বলে একাধিকবার সর্বজনসমক্ষে পণ করেছিলেন, তখন আসামী পক্ষ বলে, 'ওসব কথার কথা। কেউ যখন বলে, "তোমার চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাবো" (বাঙলায় বলতে গেলে এই অনুবাদই জুৎসই) তখন অন্য পক্ষ সেটা সিরিয়াসলি শব্দার্থে নিয়ে বিশ্বের তাবৎ ডুগডুগি বানাবার যন্ত্রপাতি বিনষ্ট করতে মাথায় গামছা বাঁধে না।'

ছারপোকার মত ভার্মিন। ছারপোকা বেশী বুদ্ধিমান না মানুষ বেশী বুদ্ধি ধরে, এ প্রশ্ন বুদ্ধিমান মানুষ তুলবে না—বুদ্ধিমান বা মূর্খ ছারপোকা তুলবে কি না, সেটা হিটলার বলেন নি।

য়প্‌প্‌ বললেন, 'এটা হল তুলনা। তুলনা যুক্তি নয়।'

ফ্যুরার বললেন, 'তুলনা মাত্রই তিন ঠ্যাঙের উপর দাঁড়ায়। টায়-টায় যুক্তির স্থান নিতে পারে না সত্য, কিন্তু আপন বক্তব্য জোরদার ও প্রাঞ্জল করার জন্য তুলনার ব্যবহার করেছেন সর্বগুণীজ্ঞানীই।'

য়প্‌প্‌ বললেন, 'তর্কস্থলে মেনে নিলুম।' গ্যোবলস্‌ বড়ই প্রভুভক্ত ছিলেন। নইলে প্রভুর আত্মহত্যার চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর তাঁর ছ'টি শিশুপুত্রকন্যাদের ডাক্তার দিয়ে খুন করিয়ে সস্ত্রীক আত্মহত্যা করবেন কেন?[৩] বললেন, 'তাই সই। কিন্তু আমি আপনাকে হাতেনাতে দেখিয়ে দেব, ইহুদিরা অন্তত ব্যবসার ক্ষেত্রে আর্যের চেয়ে বেশী বুদ্ধি ধরে।'

'কোনো ক্ষেত্রেই না।'

'বাজী ধরুন।'

'বিলক্ষণ! কত?'

'এক লাখ।'

'গেমাখ্‌ট্‌—পাক্কী বাৎ।'

দুজনাতে ছদ্মবেশে বেরুলেন। তার জন্য বেশী বেগ পেতে হল না। এমনিতেই ঠোঁটকাটা বার্লিন-কক্‌নিরা বলতো ফ্যুরারের চুল নেবে পড়ে কপাল ঢাকে নি—এটা অকল্পনীয়; আর গ্যোবল্‌স্‌ এক লহমার তরে বকর বকর বন্ধ করেছে—এটা ততোধিক অবিশ্বাস্য। হিটলার তাই চ্যাটচেটে পমেটম দিয়ে যেন প্রায় ভৈরবচণ্ডীর মত চূড়ো-খোঁপা বাঁধলেন—এবারে আর চুল খসে পড়ে, কপাল ছাপিয়ে চোখ এস্তেক ঢেকে দেবে না। বাস্‌, এতেই হয়ে গেল ছদ্মবেশ। আর য়প্‌প্‌? তিনি বললেন, তিনি প্রতি দশ মিনিটে একটি মাত্র সেনটেনস বললেন। এ-রকম বিকট চুপচাপ লোককে কে চিনবে য়প্‌প্‌ বলে!

য়প্‌পেরই প্রস্তাবমত দুজনাতে ঢুকলেন এক পাঁচমিশিলি খাঁটি আর্য দোকানে। চাইলেন একটা টী সেট। দোকানী একটি রমণীয় ট্রের উপর সব কিছু সাজিয়ে সামনে ধরলো। গ্যোবলস্‌ তো তাঁর মুণ্ডটি ডান থেকে বাঁয়ে,

৩ সবিস্তর কাহিনী পাঠক পাবেন, অধীনের 'দু-হারা' পুস্তকে, হিটলারের 'শেষ দশ দিন' প্রবন্ধে।

ফের বাঁ থেকে ডাইনে নাড়িয়ে নির্বাক প্রশস্তি শুনিয়ে দিলেন। তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়লো ঐরকম ভাবখানা করে বললেন, 'কিন্তু আমার যে-দোস্তকে আমি এই জন্মদিনের সওগাৎটা দেব তিনি তো ন্যাটা; আপনাদের কাছে কি লেফট-হ্যাণ্ডারদের জন্যে কোনো-টী সেট আছে?' হিটলার বললেন, 'হুঁ।' ভদ্র আর্যসন্তান আমাদের দোকানী তো বেবাক বে-বাক্—অবাক। 'লেফটহ্যাণ্ডারস টী সেট?' সে আবার কি গব্বযন্তণা রে বাপু! বাপের জন্মে নাম এন্তেক শোনে নি। অনেকক্ষণ ঘাড় চুলকে, বিস্তর আন্দেশা করে আপসাআপসি করে সবিনয় জানালে,তার কাছে নেই।

হিটলার দিল্‌দরাজ আদমী। এক গাল হেসে বললেন, 'মাখ্‌ট্‌ নিক্‌স্‌, মাখ্‌ট্‌ নিক্‌স্‌—বিলক্ষণ, বিলক্ষণ! তাতে এসে যায় না। আমরা অন্য দিন দুসরা জিনিসের জন্য আসবো'খন—খাসা দোকানটি কিন্তু! কি বলো হ্যার ডক্—থুড়ি! ঔফ বীডার জেএন! গুটে নাখ্‌ট্‌! আসি তবে। হেঁ হেঁ, হেঁ হেঁ।'

এবারে য়প্‌প্‌ প্রভুকে নিয়ে ঢোকালেন এক ইহুদির দোকানে।

দোকানী ছিল না। তার চোদ্দ বছরের ছেলে ছুটে এসে অদৃশ্য শ্যাম্‌পুতে (কথাটা আজকাল বড্ডই 'ফেশিনিবিল' হয়েছে; আম্মো ব্যাভার করতে চাই) হাত কচলাতে কচলাতে একবারের জায়গায় তিন-তিনবার বলে বসলো, 'য়ুটন ময়েন, য়ুটন ময়েন, য়ুটন ময়েন (গুটন্‌ মর্গেনের অর্ধশিক্ষিত উচ্চারণ), মাইনে হেরেন্‌।'

উত্তরে হিটলার বিড়বিড় করে কি একটা বললেন, ঠিক ঠাহর করা গেল না। দক্ষিণের কোনো কোনো ব্রাহ্মণ নাকি একদা রাস্তায় ('সড়ক' 'সরকে' বা 'সরণিতে'—ওঃ! কী স্টর্ম ইন এ টী 'সেট'!) বেরলে চিৎকার করতেন, অস্পৃশ্য যেন সরে যায়, তার ছায়া যেন ওঁর গায়ে না পড়ে—তবে এদের পঞ্চাশ বা ষাট লক্ষকে বামুন গ্যাস চেম্বারে[৪] খুন করে পুড়িয়েছে একথা কখনো শুনি নি। অতএব হিটলার যে ইহুদি ছোকরাকে হেল-ফেলো-উয়েল-মেট (hail-fellow-well-met) করেন নি, সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়। ইহুদি

৪ এর অন্যতম বড়কর্তা হ্যোস হ্যুরনবের্গ মোকদ্দমায় সাক্ষী দেন, এবং পরে এঁর ফাঁসি হয়। দু'জন হাড়ে-পাকা মনস্তত্ত্ববিদ মার্কিন চিকিৎসক এঁকে আগা-পাশতলা পুন লুন পরীক্ষা করেও এঁর ভিতর কোনো কিছু অ্যাব নরমাল পান নি। ইনি বলেন, 'হাজার খানেক মানুষ গ্যাস দিয়ে মারতে আমার ১০ থেকে ১২ মিনিট সময় লাগতো, কিন্তু আসল মুশকিল ছিল এদের পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করা—

ছোকরা কাঁচুমাচু হয়ে বললে, 'আমার বলে দেওয়া উচিত, সরকারের হুকুম, কোনো "আর্য" যদি ইহুদির দোকানে ঢোকেন তবে দোকানদার যেন তাঁকে সতর্ক করে দেয়, এটা ইহুদির দোকান, এখানে কেনাকাটা করলে আর্যই দায়ী। সাইনবোর্ডেও স্পষ্ট করে লেখা আছে, আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেন নি।'

হিটলার বিড়বিড় করলেন, 'শোন্ গুট্ শোন্ গুট্'—অনেকটা যেন ঠিক আছে, ঠিক আছে, মেলা বকো না।

টী সেট চাওয়া হল। এল। গ্যোবলস্ ন্যাটার সেট্ চাইলেন।

ছোকরা প্রথমটায় হকচকিয়ে গেল।

পরমুহূর্তেই সম্বিতে ফিরে এক গাল হেসে বললে, 'এখখুনি নিয়ে আসছি, স্যার!' বলে যে সেট ট্রে'র উপর সাজিয়ে রেখে দেখিয়েছিল সেইটে তুলে নিয়ে গুদোমঘরে অদৃশ্য হলো। দু-মিনিট পরেই আরেকটা আরো বাড়িয়া ট্রে'র উপর সাজিয়ে নিয়ে এল ন্যাটাদের সেট্।

তালেবর ছোকরা করেছে কি, এবারে ঐ আগেকার সেটই উল্টো করে সাজিয়েছে, অর্থাৎ টী-কাপগুলোর আঙটাগুলো রয়েছে খদ্দেরের বাঁ দিকে; তার মানে, খদ্দের বাঁ-হাত বাড়ালে আঙুল ঠিক আঙটার যথাস্থানে পড়বে।

গ্যোবলস্ বাক্যব্যয়ে না করে যথামূল্যে সেট্ কিনে নিলেন।

বেরিয়ে এসে বললেন, 'দেখলেন ইহুদিটার চালাকিটা?'

হিটলার অতিশয় সরল দরদী কণ্ঠে বললেন, 'চালাকিটা আবার কোথায়? 'বেচারী আর্যের ন্যাটা সেট্ ছিল না স্টকে, তো সে আর করবে কি?'

* *

এবারে সিরিয়স কথা:—ব্যাটারা বলে, তারা নাকি আর্যোত্তম। আরে মোলো, আর্যোত্তম যদি হবিই, তবে সর্ব-আর্যের—তা সে গ্রীকই হোক, লাতিনই হোক কিংবা তাদের বহু পূর্বের মিটানির হিটাইটই হোক—সর্বপ্রাচীন সংহিতা চতুর্বেদ আছে ভারতীয় আর্যের শ্রুতিতে ভিন্ন অন্য কোন্ 'আর্য' গোসাইয়ের পট্টাঙ্গ প্রত্যঙ্গে?

দিনের পর দিন নাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা চুল্লিগুলো চালু রেখেও কাজ খতম হত না।' গ্যাস চেম্বারে ইহুদিদের চাবুক মেরে মেরে ঢোকানো থেকে, চুল্লি চব্বিশ ঘণ্টা চালু রেখে তাতে লাশ পুড়িয়ে ছাই করে জলে ভাসানো পর্যন্ত সব কাজ করতো কোনো কোনো স্থলে ইহুদিরাই। তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এই প্রলোভনে। পরে অবশ্য তাদেরও ঘাড়ে গুলি করে মারা হত, পিছন থেকে, অতর্কিতে।

কিন্তু, আমরা তো দিয়েছি আশ্রয়—প্রথম ইহুদিরা যখন জীবনমৃতাবস্থায় নিমজ্জমান তরণীতে করে বোম্বাই উপকূলে পৌঁছয়। গ্যাস-চেম্বারের কথা এই দু বা আড়াই হাজার বছর ধরে আমাদের মাথায়ই খেলল না! তবে, হ্যাঁ, এদানির কেউ কেউ বলেন, আমরা যে অস্মদ্দেশে ইজরায়েল প্রেসিডেন্টের শুভাগমনোপলক্ষে উদ্বাহু হয়ে 'লৃত্ত' করি নি সেটা গ্যাস-চেম্বারে পোরার চেয়েও সখ্‌ৎ গুনাহ্‌! তোবা! তোবা!!

ভাষা

হাট-বাজার, শাক-সবজি,[১] দান-খয়রাৎ, দুখ-দরদ, ফাঁড়া-গর্দিশ, মান-ইজ্জৎ, লজ্জা-শরম, ভাই-বেরাদর, দেশ-মুল্লুক, ধন-দৌলত, রাজা-বাদশা, ঝড়-তুফান, হাসি-খুশী, মায়া-মহব্বৎ, জন্তু-জানোয়ার, সীমা-সরহদ—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এস্থলে লক্ষ্য করার প্রথম তত্ত্ব এই যে, প্রত্যেক সমাসের প্রথম শব্দটি খাঁটি দিশী ভারতীয় শব্দ; হাট, শাক, দান, দুখ, মান, লজ্জা, দেশ ইত্যাদি এবং দ্বিতীয় শব্দটি যাবনিক (আরবী, ফার্সী, তুর্কী, হীব্রু গয়রহ্‌), যেমন বাজার, সবজী, খয়রাৎ, দর্দ্‌ ইত্যাদি। এবং দুটি শব্দই প্রায় সমার্থসূচক।

তাহলে প্রশ্ন, এ 'কুকর্মের' কি প্রয়োজন?

আমরা যখন সাধারণের কোনো অজানা ভাষা থেকে উদ্ধৃতি দিই, তখন বাঙলা অনুবাদটি দি তার পরে। তাই আমরা যদি ইংরিজী প্রবন্ধে সংস্কৃত বা বাঙলা উদ্ধৃতি দিই তবে ইংরিজী অনুবাদটি দি পরে। অর্থাৎ যাকে বোঝাতে যাচ্ছি, তার ভাষা আসে পরে।

তা হলে মনে করুন, মুসলমানের আগমনের কিছুকাল পরে কোনো হিন্দু (বা নবদীক্ষিত মুসলমানও হতে পারে, কারণ হিন্দু ধর্মবর্জন করে মুসলমান হয়ে গেলে রাতারাতি তার আরবী ফার্সী রপ্ত হয়ে যায় না) গেল মুসলমান শাসনকর্তার কাছে বিচারের আশায়। বললে, 'ধর্মাবতার, হুজুর!—দেশ—' বলেই থমকে দাঁড়ালো। ভাবলে 'হুজুর কি "দেশ" শব্দটা জানেন! হুজুর তো হাট-বাজারে ঘোরাঘুরি করে দিশী শব্দ শেখবার ফুর্সৎ পান না'—(অথচ আমাদের হিন্দুটি পেটের দায়ে, কাজের তাড়ায় বিদেশাগত মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা

১ কিন্তু শাক-ভাত, শাক-পাত, শাক-পাতেড়, শাকান্ন, শাক-মাছ অন্য সমস্যার অঙ্গ। স্থানাভাব না হলে সেটিরও আলোচনা করা হবে।

করার ফলে কিছু কিছু যাবনিক শব্দ শিখে গিয়েছে) তাই 'দেশ' বলে থমকে গিয়ে বললে 'মুল্লুক'—ওটা হুজুরের যাবনিক শব্দ। অতএব শেষ পর্যন্ত তার নিবেদন দাঁড়ালো, 'দেশ-মুল্লুক ছারখার হয়ে গেল। রাজা-বাদশা (আবার রাজা বলে থমকে গিয়ে যাবনিক "বাদশা" বললে) আমাদের মত কাঙাল-গরীবের (গরীব আরবী) দুখ-দরদ্ (দরদ্, দর্দ ফার্সী) কে বুঝবে ? আমাদের মান-ইজ্জৎ (ইজ্জৎ আরবী) ধন-দৌলত (দৌলত যাবনিক) সব গেল। মেয়ে-ছেলের লজ্জা-শরম (শর্ম যাবনিক)ও আর বাঁচে না। রাস্তায় বেরোলেই দেখতে পাবেন, কারো মুখে হাসি-খুশী (খুশী ফার্সী) নেই। হুজুর অনুমতি দেন —ভাই-বেরাদর (বেরাদর ফার্সী) নিয়ে মগের মুল্লুকে চলে যাই।'

মনে করুন, কথার কথা কইছি, হুজুর সত্যকার হুজুর ছিলেন। হুঙ্কার দিয়ে প্রতিবিধান করলেন।

আমাদের বঙ্গসন্তানটি বাড়ি ফিরে গৃহিণীকে আনন্দে ডগমগ হয়ে বললে, 'বুঝলে গিন্নী, হুজুর যা আমায় খাতির—' (বলেই থমকে দাঁড়ালো ; হুজুরের দরবারে 'খাতির' কথাটি খুবই চালু, সেইটেই এতক্ষণ ধরে দরবারে সে শুনেছে, তাই দুম্ করে সেটা ব্যবহার করে দুশ্চিন্তায় পড়লো, গিন্নী তো যাবনিক শব্দটা বুঝবে না, গিন্নী তো হাট-বাজারে গিয়ে যবনের সঙ্গে মেলা-মেশা করে এসব শব্দ শেখে নি—তাই সঙ্গে সঙ্গে বললে) 'যত্ন—হুজুর যা খাতির-যত্ন করলেন কি বলবো। আবার দোকান (ফের মুশকিল—দোকান ফার্সী শব্দ, তাই বললে "হাট" [হট্ট] হাট খুলবে,—কোনো চিন্তা করো না গিন্নী! নারায়ণ, নারায়ণ।'

এ যুগে আবার ফিরে আসবো। কিন্তু তার পরবর্তী যুগে দেখুন, ইংরেজ boss-কে বলছি, 'স্যার! আমি উকিল—(বলেই থমকে দাঁড়ালুম, উকিল যদ্যপি আসলে আরবী শব্দ, এদানির ইটি খাঁটি বাঙলা, স্যার কি বুঝবেন ?—তাই হন্তদন্ত হয়ে বললুম) ব্যারিস্টার (উকিল-ব্যারিস্টার) লাগিয়েছিলুম। ঘটি-(ঐ যা! স্যর বুঝবেন কি ?) গেলাস (glass—এবার স্যর বুঝবেন!)—ঘটি-গেলাস বন্ধক দিয়েছি— তেনাদের জন্য এরেক (ফের ইংরাজি 'ব্রাণ্ডি') ব্রাণ্ডি, বিড়ি-সিগারেট (দ্বিতীয়টা ইয়োরোপীয়) যা গেছে সে আর বলে কাজ নেই।'

এই সব বলে-কয়ে তো ছুটি নিয়ে দেশে গেলুম। প্রথমেই ঠাকুরমাকে পেন্নাম।

বললুম, 'ঠাকুমা, পরে সব গুছিয়ে বলবো, এই বেলা শুনে নাও সংক্ষেপে। বড় মাসীর গুণধর ছোট ভাইটি নিয়েছেন ফ্ল্যাট (আবার সেই হাঙ্গামা—ঠাকুমা তো 'ফ্ল্যাট' বুঝবে না, অতএব বললুম), ফ্ল্যাট-বাড়ি। আমাদের কাউকে না

শুনিয়ে করেছেন বিয়ে। কিন্তু ঠাকুমা, মেয়েটি কী সুন্দর! একেবারে ডল (doll—সর্বনাশ, ঠাকুমা তো বুঝবে না, তা হলে 'পুতুল' বলি)-পুতুলের মত। কিন্তু হলে কি হয়! গুরু আছেন, ধম্মো আছেন। ব্যাস! এল তেড়ে টাইফয়েড-জ্বর (টাইফয়েড তো জ্বরই বটে—তবু ঠাকুমা যদি না বোঝেন, অতএব 'জ্বর'টা বলতে হল) ; তুমি ভাবছো আমরা কিছুই করি নি। ডাক্তার (আবার সেই বিপদ, তাই বলতে হল) বদ্যি (ডাক্তার-বদ্যি) নিয়ে এলুম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।'

তাই আবার নিবেদন করছি, যাকে বোঝাচ্ছি তার বোধ্য শব্দটি আসে পরে।

এটা কিছু নূতন তত্ত্ব, আমাদের দেশের আজগুবী ব্যাপার নয়। ইংলেণ্ডেও নরমান বিজয়ের পর ইংরেজ যখন বিদেশী হুজুরের কাছে গিয়ে ফরিয়াদ বা রিপোর্ট দিত, তখন বলতো, 'He is very meek and humble (meek খাঁটি ইংরিজি, কিন্তু humble বিজয়ী নরমানদের শব্দ), Sir, but it is odd and strange (odd ইংরিজী, strange নরমান), that although we thought it meet & proper (meet ইংরিজী, proper নরমান) that we should search every nook and corner (nook ইংরিজী, corner নরমান), our sorrow and grief (sorrow ইংরিজী, grief নরমান) know no bound that we did not find him'

তফাৎ শুধু এইটুকু যে ইংরেজ তখন দিশী ও বিদেশী শব্দের মাঝখানে and বসিয়েছে—meek and humble, odd and strange ; আমরা বাঙালীরা 'and' 'এবং' বসাই নি ; আমরা বলেছি, হাসি-খুশী, মান-ইজ্জৎ, দেশ-মুল্লুক।

পাঠক কিন্তু ভাববেন না, আমাদের সব সমাসই এ রকম।

জল-পানি, বাজার-উটকো, মাল-মশলা, ঘটি-বাটি, টোল-চতুষ্পাঠী, মক্তব-মাদ্রাসা, ইস্কুল-কলেজ অন্য ধরনের সমাস ॥

কবিগুরু ও নন্দলাল

রসাচার্য নন্দলাল বসুর জীবন এমনই বহু বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছে, তিনি এতই নব নব অভিযানে বেরিয়েছেন যে তার পরিপূর্ণ পরিচয় দেওয়া অতি কঠিন, শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। তদুপরি যিনি সে পরিচয় দিতে যাবেন তাঁর সর্বরসসৃষ্টিতে অপর্যাপ্ত কৌতূহল ও সে রস আস্বাদন করার মত অপ্রচুর

স্পর্শকাতরতা থাকার একান্ত, অত্যন্ত প্রয়োজন। মানবসমাজে নন্দলাল ছিলেন স্বল্পভাষী তথা আত্মগোপনপ্রয়াসী—তাঁর নীরবতার বর্ম ভেদ করে তাঁকে সর্বজন সম্মুখে স্বপ্রকাশ করার মত ক্ষমতা, সে প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শৈলী ও ভাষার উপর অধিকার এ-যুগে অত্যল্প আলঙ্কারিকেরই আছে। আমাদের নেই; আমরা সে দুঃসাহস করি নে।

আমরা তাঁকে চিনেছি, গুরু রূপে, রসসৃষ্টির জগতে বহু বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সতত রত স্রষ্টা রূপে এবং কবিগুরুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও সহকর্মী রূপে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বভারতীতে প্রধানত পণ্ডিতদেরই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন—আচার্য বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন, অ্যানড্রুজ, কলিন্‌স, শ্যামের রাজগুরু, উইনটারনিৎস, লেভি, গোস্বামী নিত্যানন্দ, জগদানন্দ ইত্যাদিকে। এঁদের কেউই রসস্রষ্টা ছিলেন না, এমন কি যে দিনেন্দ্রনাথ সঙ্গীতে, কাব্যে অসাধারণ সৃজনশক্তি ধরতেন তিনি পর্যন্ত তাঁর নিজস্ব সৃজনশক্তির দ্বার রুদ্ধ করে সর্বক্ষমতা নিয়োজিত করেছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের রক্ষণাবেক্ষণ কর্মে। একমাত্র নন্দলালই এই পরিপূর্ণ পাণ্ডিত্যময় বাতাবরণের মাঝখানে অপ্রমত্ত চিত্তে আপন সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত ছিলেন।

রবি নন্দ সম্মেলন যেন মণিকাঞ্চন সংযোগ। এ তত্ত্ব অনস্বীকার্য যে রস কি, চিত্রে, প্রাচীরগাত্রে তথা দৃশ্যমান কলার অন্যান্য মাধ্যমে তাকে কি প্রকারে মূর্তায় করা যায় এ-সম্বন্ধে নন্দলাল তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথের কাছে উৎকৃষ্টতম শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেন। তাই নন্দলাল শান্তিনিকেতনে আগমন করার পূর্বেই বঙ্গদেশ তথা ভারতে সুপরিচিত ছিলেন ও পশ্চিমের বহু সদাজাগ্রত রসিকজনের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু কবিগুরুর নিত্যালাপী সখা, সহকর্মী ও শিষ্য রূপে শান্তিনিকেতনে আসন গ্রহণ করার পর তাঁর চিন্ময়ভুবন ধীরে ধীরে সমৃদ্ধতর হতে লাগলো ও রবীন্দ্রাহূত পণ্ডিতমণ্ডলীর সংস্পর্শে এসে তিনি এমন সব বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিতি হলেন যেগুলো সচরাচর সাধারণ আর্টিস্টকে আকৃষ্ট করে না। একটি মাত্র উদাহরণ নিবেদন করি: দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন, বিশ্বভারতীর সাহিত্য সভায় তথা অন্যান্য জ্ঞানচক্রে শতাধিকবার আলোচনা করেছেন, তর্কবিতর্ক উদ্বুদ্ধ করেছেন। ১৯২১ থেকে পূর্ণ কুড়িটি বৎসর এসব সম্মেলনে নন্দলাল উপস্থিত থাকতেন, কিন্তু আমি তাঁকে কখনো (১৯২১-২৬) এ সবেতে অংশগ্রহণ করতে দেখি নি।

অথচ ১৯৩৬।৩৭-এ বরোদার মহারাজা যখন তাঁকে সেখানকার কীর্তিমন্দিরে দেয়ালছবি (ম্যুরাল) আঁকতে অনুরোধ করলেন তখন তিনি চার দেয়ালে এঁকে

দিলেন 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'। ১। 'গঙ্গাবতরণ' (গঙ্গা বিনা যে ভারতে আর্যসভ্যতার পত্তন ও বিকাশ হত না সে কথা বলাই বাহুল্য), ২। 'কুরুক্ষেত্র', ৩। 'নটির পূজা', ৪। 'মীরাবাঈ' ('সন্তন সঙ্গ বৈঠ বৈঠ লোক লাজ খোঁঈ'—চিত্রে)। আর্য, হিন্দু, বৌদ্ধ, মধ্যযুগীয় ভক্তি এই চার দৃষ্টিবিন্দু থেকে নন্দলাল দেখেছেন ভারতের সমগ্র ইতিহাস।

কিন্তু এহ বাহ্য। আসলে যদ্যপি চিত্রের মাধ্যমে রসসৃষ্টি সম্বন্ধে নন্দলাল পরিপূর্ণ শিক্ষাদীক্ষা গুরু অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, সে রস কাব্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে কি ভাবে প্রকাশ পায় সেটি তিনি দেখতে পেলেন দিনের পর দিন, বহু বৎসর ধরে শান্তিনিকেতনে। রসের প্রকাশে কোন্ কলার অধিকার কতখানি নন্দলাল সে সম্বন্ধে পরিপূর্ণ মাত্রায় সচেতন হলেন শান্তিনিকেতনে, রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে। কারণ রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত আলঙ্কারিকের (নন্দনতত্ত্বজ্ঞের) ন্যায় রস নিয়ে আলোচনা করার সময় নিজেকে সাহিত্য, সঙ্গীত বা নাট্যরসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন না। স্বনামধন্যা স্টেলা ক্রামরিশের সঙ্গে তিনি দিনের পর দিন রস নিয়ে যে আলোচনা (হোয়াট ইজ আর্ট ?) করেন তাতে টলস্টয়ের অলঙ্কার শাস্ত্রও বাদ পড়তো না এবং তিনি বেটোফনের 'ক্রয়েৎসার সনাটা'-র বিরুদ্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন সেটিও উভয়ের মধ্যে আলোচিত হত। এসব আলোচনা সাধারণত হত বিশ্বভারতীর সাহিত্য সভায়—এবং নন্দলাল সে-স্থলে নিত্য-নীরব শ্রোতা। সে-সময় নন্দলালের চিন্তাকুটিল ললাটের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেই স্পষ্ট বোঝা যেত, আর্ট সম্বন্ধে তাঁর যা ধারণা, অভিজ্ঞতা, তাঁর যা আদর্শ সেগুলোর সঙ্গে তিনি এ-সব আলোচনার মূল সিদ্ধান্ত, মীমাংসাহীন জল্পনা-কল্পনা সব কিছু মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছেন।

স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, নৃত্য যতখানি গতিশীল (ডাইনামিক) চিত্র ততখানি হতে পারে না। পক্ষান্তরে নটনটী রঙ্গমঞ্চ থেকে অন্তর্ধান করার সঙ্গে সঙ্গেই তার ভানুমতী থেকে যায় শুধু স্মৃতিতে—বাস্তবে সে অবলুপ্ত। কিন্তু চিত্র চোখের সামনে থাকে যুগ যুগ ধরে—এবং চিত্রের মত চিত্র হলে প্রতিবারেই যে তার থেকে আনন্দ পাই তাই নয়, প্রতিবারেই সেই প্রাচীন চিত্রে নব নব জিনিস আবিষ্কার করি, নিত্য নিত্য নবীন রসের সন্ধান পাই। তাই কোনো নৃত্য-দৃশ্য যদি চিত্রে সার্থকরূপে পরিস্ফুট করা যায়, তবে মঞ্চ থেকে অন্তর্ধান করার সঙ্গে সঙ্গে যে-চিত্রের চিরতরে অবলুপ্ত হওয়ার কথা ছিল, সে হয়ে যায় অজর অমর। কিন্তু 'চিত্রে সার্থকরূপে পরিস্ফুট' করার অর্থ, সে যেন ফটোগ্রাফ না হয়—তা হলে মনে হবে, নর্তক-নর্তকী নৃত্যকলা প্রকাশ করার সময় হঠাৎ যেন মুহূর্তেক তরে পাষাণ-

পুত্তলিকায় পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। যাঁরাই নন্দলালের 'নটীর পূজা' চিত্রটি প্রাচীরগাত্রে দেখেছেন, তাঁরাই আমার সামান্য বক্তব্যটি সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন। সে চিত্র তো স্টাটিক নয়, 'স্তম্ভিত' নয়—বস্তুত তার দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে মনে হয়, এই বুঝি নটী আরেকখানি অলঙ্কার গাত্র থেকে উন্মোচন করে দর্শকের দিকে, আপনারই দিকে অবহেলে উৎক্ষেপ করবে, এই বুঝি মৃদঙ্গে ভিন্ন তাল ভিন্ন লয়ের ইঙ্গিত ভেসে উঠবে আর সঙ্গে সঙ্গে নটী তার নৃত্য দ্রুততর করে দেবে, লাস্য-নৃত্য তাণ্ডবে পরিণত হবে, মন্দমন্থর 'নমো হে নমো' অকস্মাৎ অতিশয় দ্রুত 'পদযুগ ঘিরে' 'চন্দ্রভানু'র মদমত্ত নৃত্যে নবীন বেশ গ্রহণ করবে।

বস্তুত আপন মনে তখন প্রশ্ন জাগবে, নন্দলাল মঞ্চে বিভাসিত যে-নৃত্য স্বচক্ষে দেখেছিলেন, সে-নৃত্য কি সত্যই এতখানি প্রাণবন্ত, উচ্ছ্বসিত—শান্ত থেকে মন্থর, মন্থর থেকে উন্মত্ত—প্লাবন বেগে ধাবিত ছিল, না তিনি অঙ্কন করেছেন তাঁর নিজস্ব কল্পলোকের মৃন্ময় নৃত্যের আদর্শ প্রকাশ।

* *

সুন্দরের পরিপূর্ণ আনন্দ-রূপের ধ্যানের বীজমন্ত্র নন্দলাল গ্রহণ করেন কবি-গুরুর কাছ থেকে। এবং তার সর্বোচ্চ বিকাশে সে বীজের যেন কোনো চিহ্নই নেই। সে যেন পত্রপুষ্পে বিকশিত মহীরূহ।

এবং একমাত্র নন্দলালই তাঁর গুরুর উপরও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সকলেই জানেন, পরিপূর্ণ বৃদ্ধ বয়সে কবি রবীন্দ্রনাথ চিত্রের মাধ্যমে আপন সৃজনী-শক্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু কবির প্রভাবে ছবির নন্দলাল তো কখনো কবিতা রচনা করেন নি!॥

খেলেন দই রমাকান্ত

ইহুদি যাজক সম্প্রদায়ের সুপুত্র শ্রীযুত লেভির সঙ্গে তাঁর বাড়িতে খানা খেতে যাচ্ছি। তাঁর আছে গল্পের অফুরন্ত ভাণ্ডার। তারই একটা ছাড়লেন:

"জারের আমলে রববার দিন গির্জেয় গেছে গ্রামের সবাই। রুশ জাতটা একদা ছিল বড়ই ধর্মানুরাগী। কুলোকে বলে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ভূতপ্রেত-তাবিজ-কবচে-বিশ্বাসী উজবুকের ভায়রাভাই। এবং সাতিশয় পাষণ্ডেরা বলে, সেই প্রাচীন কুসংস্কারই আজ তাদের টেনে নিয়ে যায় লেনিনের দর্গায় শির্ণী চড়াতে।

তা সে যাক্ গে—মোদ্দা কথা : তারা কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করে, তাদের গাঁয়ের পাদ্রি সায়েব যা বলেন তাই আপ্তবাক্য। যদ্যপি এসব পাদ্রিদের অনেকেই নিজের নামটি পর্যন্ত সই করতে পারে না—"

আমি শুধালুম, "নিরক্ষর জন গির্জায় ধর্মোপদেশ দেয় কি প্রকারে ?"

বললেন, "আশ্চর্য ! রাসপুতিন যে কী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কুল্লে আড়াই আউন্স বাইবেল গলাধঃকরণ করতে পেরেছিলেন সে না হয় পড়ো নি, তাই জানো না। নিচ্চেভো—অর্থাৎ কুছ পরোয়া নেহী। সেই আড়াই আউন্স বাইবেল ডাইলুট করে তিনি মহারাণী জারিনা মায় জার প্রাসাদ জয় করলেন। তাঁকেও নাম সই করতে হলে ঘেমে নেয়ে কাঁই হতে হত।

আর এরই উল্‌টো দিক—অর্থাৎ ভালোর দিকের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ খুঁজতে হলে অন্তত তোমাকে তো আর উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু অবধি মাকু মারতে হবে না। তোমার নবী পয়গম্বর তো ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর ! তা সে যাক্ গে !

সে রববারে পাদ্রি সায়েবের সারমন বা বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল ইহুদিরা কী অন্যায়ভাবে প্রভু যীশুকে ক্রুশের উপর খুন করলো। এ বিষয়ে বক্তৃতা শিক্ষিত অশিক্ষিত সব পাদ্রিই দেন। তফাৎ শুধু এইটুকু যে, শিক্ষিত পাদ্রি জানেন, প্রভু যীশু ক্রুশের উপর থেকে তাঁর হত্যাকারীদের ক্ষমা করে গিয়েছিলেন। তাই তিনি বক্তৃতা দেবার সময় সতত সতর্ক থাকেন, অজ্ঞ খৃষ্টানগণ যেন উত্তেজিত হয়ে ইহুদি নির্যাতন আরম্ভ না করে। কিন্তু ঐ যে রুশ পাদ্রির কথা বলছিলুম, তিনি সেদিন উঠে পড়ে লেগে গিয়েছেন, কি প্রকারে মূঢ় জনতাকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলা যায়। অবশ্য তার জন্য অত্যধিক বাগ্মিতাশক্তির কোনো প্রয়োজন নেই—কারণ রুশ দেশে আবহমান কাল থেকে ইহুদিবৈরিতা বংশানুক্রমে চলে আসছে। কাজেই সারমন শেষেই বিক্ষুব্ধ চাষীরা একজোট হয়ে ধাওয়া করলো মাঠের অন্য প্রান্তের খাস ইহুদি গ্রামটার দিকে। দূর থেকে তাদের চিৎকার হুঙ্কার শুনে ইহুদিরা ব্যাপার কি জানবার জন্য গ্রাম থেকে বেরিয়ে এল। তাদের চিৎকারে তখন পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে—'খুন করবো, ব্যাটাদের খুন করে রক্ত দিয়ে রক্তের দাদ নেব !'

সবাই একে অন্যকে চেনে। তাই ইহুদি গাঁওবুড়ারা করজোড়ে শুধালে, 'আমরা কি অপরাধ করেছি যে আমাদের খুন করবে, এতকাল ধরে পাশাপাশি গ্রামে বাস করছি—'

উত্তেজিত জনতা বললে, 'চালাকি রাখো। তোমরা আমাদের প্রভুকে খুন করেছ, তার দাদ আমরা নেবই নেব।'

যেন পর দিনের ঘটনা! লেভি গল্প বলা ক্ষান্ত দিলেন। কারণ হঠাৎ পিটির পিটির করে বৃষ্টি নামলো। এই পোড়ার দেশে মনসুন নেই বলে বারো মাসের যে কোনো দিন আচম্‌কা বৃষ্টি নামে। আমি বললাম, "চলুন, হ্যার ডক্টর, ট্রাম শেড্‌-এ আশ্রয় নি।"

বললেন, "ছোঃ! কিস্‌সু জানো না। ইহুদিরা ছাতা কেনে না কেন, তার খবর রাখো? খৃষ্টানদের বিশ্বাস, ইহুদিরা এমনই দুর্দান্ত চালাক যে, বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে জামাকাপড় বাঁচিয়ে দিব্য চলাফেরা করতে পারে। তারপর কি বলছিলুম? —সেই রুশ ইহুদিদের কথা। তারা ছিল সত্যই চালাক। চট করে ভেবে নিয়ে দেখলে, ঐ সব জড়ভরত কেরেস্তান রুশদের বোঝানো হবে অসম্ভব, ঘটনাটা ঘটেছে দু' হাজার বছর পূর্বে, রুশ দেশে নয়—বহু দূর-দূরান্তরের প্যালেস্টাইনে—যারা মেরেছিল, তারা সেই দেশ ছেড়ে কবে কোন্ আদ্যিযুগে ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর সর্বত্র, বিয়ে করেছে জাতেবেজাতে—এখন যাদের ঠ্যাঙাতে যাচ্ছো—"

আমি বললুম, "বুঝেছি। খেলেন দই রমাকান্ত, বিকারের বেলা গোবর্দ্ধন।"

লেভি বললেন, "লাখ কথার এক কথা।"

অতএব ইহুদি ডাক্তরিয়ারা হন্তদন্ত হয়ে বললে, 'ইহুদিরা প্রভু যীশুকে না হক খুন করেছিল. এ তো অতিশয় সত্য কথা—বিশ্ব-সংসার জানে। কিন্তু ভাই, তোমরা করেছ ভুল। আমরা, এ গাঁয়ের লোক, ওঁকে মারি নি—তা কখনো পারি! মেরেছ—' বলে আঙুল দিয়ে দেখালে পাশের গাঁ। বলল, 'মেরেছে ঐ ও—ই গাঁয়ের ইহুদি রাস্কেলরা!' বুঝলে তো ভায়া?" বলে লেভি গম্ভীর হয়ে গেলেন।

আমি একগাল হেসে বললাম, "যা শত্রু পরে পরে। কিন্তু গল্পটা তো সে রকম ঝাঁঝালো না—আপনার সেদিনকার রাব্বি, জানলার শার্সি আর আয়নাতে তফাৎ নিয়ে গল্পটার মত?"

লেভি বললেন, "ক্যারেকটারিস্টিক গল্পের ফান্‌কশন হচ্ছে কোনো বিশেষ জাত বা শ্রেণী বা যা-ই হোক না কেন, তার ক্যারেকটার, তার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা। ভেড়ার বাচ্চা আর নেকড়ে বাঘের মধ্যে তর্কাতর্কি নিয়ে যে গল্প ঈসপ লিখেছেন, সেটাতে ঝাঁঝ কোথায়? কিন্তু গল্পটা সাতিশয় ক্যারেকটারিস্টিক—অর্থাৎ ভেড়া আর নেকড়ের ক্যারেকটার ওতে চমৎকার ফুটে উঠেছে—নইলে গল্পটা দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়লো কি করে, আর এত যুগ ধরে বেঁচে আছেই বা কি করে? আমি রুশ ইহুদিদের সম্বন্ধে যে গল্পটা বললুম—গল্প না হয়ে সত্য ঘটনাও হতে পারে—সেটা কিন্তু সর্ব-ইহুদিদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। বিপদকালে তারা

এক হতে তো জানেই না, বরঞ্চ নিজেকে বাঁচাবার জন্য তার জাতভাই অন্য ইহুদিকে বিসর্জন দিতেও তার বাধে না।"

আমি বললুম, "উঁহু।"

"মানে?"

আমি বললুম, "আমার দেশ বাঙলার উত্তর প্রান্তে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁদের সম্বন্ধে বলা হয়, স্বার্থ থাক আর নাই থাক, তাঁরা একে অন্যের সাহায্য কস্মিনকালেও করেন না। একটা নদী পেরুবার সময় নাকি পর পর পাঁচজন ব্রাহ্মণ একটা পাথরে ঠোক্কর খান, কিন্তু কেউই পরের জনকে হুঁশিয়ার করে দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। শেষটায় একজন যখন 'বাপ রে' বলে অন্যদের সাবধান করে দিলে, তখন তাঁরা সবাই সমস্বরে চিৎকার করে বললেন, 'ব্যাটা নিশ্চয়ই আমাদের শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নয়।' তখন ধরা পড়লো, সত্যি, সে অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ—বর্ণচোরা আঁবের মত এঁদের সঙ্গে মিশে এঁদেরই একজন হতে চেয়েছিল। গল্পটা আপনারই সংজ্ঞা অনুযায়ী খুবই ক্যারেকটারিস্টিক বটে, কিন্তু আমার মনে এ বাবদে একটা ধোঁকা রয়ে গেছে।"

লেভি বললেন, "তুমি দেখি হেরোডকেও হেরোডত্ব শেখাতে চললে—অর্থাৎ যাকে বলে গুরুমারা বিদ্যেতে ওস্তাদ হয়ে উঠছো। বুঝিয়ে বলো।"

আমি বললাম, "যে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর গল্পটি আপনাকে বললাম, তাঁরা যে অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, এবং বুদ্ধিমান জীব মাত্রেই ঐক্যে বিশ্বাস করে। তাই আমি বহুকাল ধরে পর্যবেক্ষণ করে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলুম, এঁরা একে অন্যকে খুবই সাহায্য করে থাকেন—যে রকম ফ্রীমেসনরা একে অন্যের প্রতি বড়ই সদয়—কিন্তু সে সাহায্যটি করেন অতিশয় সঙ্গোপনে। এবং অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা যাতে করে এ-তত্ত্বটি আবিষ্কার না করতে পারেন, তাই তাঁরা নিজেরাই বাজারে একাধিক কামুফ্লাজ গল্প ছেড়েছেন এই মর্মে যে, তাঁদের ভিতর মারাত্মক ঐক্যাভাব। তাই আমার মনে হয়, আপনি যে গল্প দিয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন, ইহুদিরা সঙ্ঘবদ্ধ হয় না, সেটা স্বয়ং ইহুদিরাই তৈরি করেছেন, খৃষ্টানদের সন্দেহ না জাগানোর জন্য।"

ইহুদি আর স্কচমেনের একটা মহৎ গুণ—তাদের নিয়ে কেউ রসিকতা করলে সেটা তারা উপভোগ করতে পারে। লেভি আমার সত্য-সিদ্ধান্ত শুনে হেসে বললেন, "এটা আজ খানা-টেবিলে আমি পেশ করবো। দেখি, ঠাকুদা-বাবা কি বলেন। কিন্তু জানো, এর থেকে একটা গুরুতর সমস্যায় উপনীত হওয়া যায়। তুমিই সেদিন প্রশ্ন করেছিলে, ইহুদিরা যে প্যালেস্টাইনে 'হোম' বানাতে

চায়, সেটা ভালো না মন্দ? আমি বলেছিলুম, সময় এলে আলোচনা করা যাবে। তাই এস্থলে প্রশ্ন শুধানো যায়, পৃথিবীর সব ইহুদি এই হোম চায় কি না? এই দাবির পিছনে কি তারা ঐক্যবদ্ধ? তোমার প্যারা কবি হাইনে একদা এই আন্দোলনের সঙ্গে—ঠিক ঠিক বলতে গেলে ঐ আন্দোলনের আলোচনা-চক্রের সঙ্গে—সংযুক্ত হন। কিন্তু কিছুদিনের ভিতরই তিনি সে-চক্র থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফেলেন। তার থেকে অবশ্য এ'টা বলা চলে না, প্যালেস্টাইনে ইহুদি হোম নির্মাণের ব্যাপারে তাঁর কোনো ঔৎসুক্য ছিল না। আসলে ব্যাপারটা অন্য ধরনের; সংখ্যালঘুদের ভিতর এক রকম লোক থাকে, যারা আপন সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চায় না—তারা ভাবে, বাড়িতে বাপ-ভাই তো সে-গণ্ডি বানিয়ে রেখেছেনই, বাইরে গিয়েও তাঁদেরই জাতভাইদের সঙ্গে মিশে কি লাভ? আমার মনে হয়, হাইনের বেলা হয়েছিল তাই।" তারপর হঠাৎ রাস্তার উপরই থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, "তোমার দেশে তুমিও তো লঘু সম্প্রদায়ের লোক। তুমি দেশে কাদের সঙ্গে মেলামেশা করো?" উত্তর দেবার পূর্বেই তিনি বললেন, "এ-বিষয় নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা চলতে পারে, অতএব এটা এখন মুলতুবী থাক, কারণ, বাড়ি পৌঁছে গিয়েছি।"

বাউমশূল আলের শেষ প্রান্তে ছোট্ট একখানা ছিমছাম তেতলা বাড়ি।

ল্যাচ কী দিয়ে দরজা খুলে বললেন, "স্বাগত জানাই তোমাকে। মঙ্গল হোক, জয় হোক তোমার। তোমার বংশধর যেন অসংখ্য হয়।" ॥

চতুরঙ্গ

রবি-পুরাণ

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে প্রচুর বক্তৃতা প্রচুরতর প্রবন্ধ এবং অল্প-বিস্তর বেতার কার্যকলাপের ব্যবস্থা এদেশের গুণী-জ্ঞানীরা করে থাকেন। সেই অবসরে কেউ কেউ আমাকেও স্মরণ করেন। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে এঁরা আমার কল্যাণ কামনা করেন; সরল জনের পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব নয় যে এই করে হয়তো দেশে আমার নামটা কিঞ্চিৎ ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু আসলে যাঁরা আমাকে স্মরণ করেন তাঁরা আমার প্রাণের বৈরী। এঁরা আমাকে সর্বজন-সমক্ষে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলতে চান, 'দেখো, এ লোকটা কত বড় গণ্ডমূর্খ; কবি-গুরুর সংস্পর্শে এসেও এর কিছু হল না। সাধে কি আর তুলসীদাস রামচরিত-মানসে বলেছেন,

"মূরখ হৃদয় ন চেৎ, যদপি মিলয়ে
গুরু বিরিঞ্চি শত"
"শত ব্রহ্মা গুরুপদ নিলেও মূর্খের
হৃদয়ে চেতনা হয় না"

আমি মূর্খ হতে পারি কিন্তু এতখানি মূর্খ নই যে তাঁদের দুষ্টবুদ্ধিজাত নষ্টামির চিন্তা ধরতে পারবো না।

তাই ঐ সময়টায় আমি গা-ঢাকা দিয়ে থাকি। নিতান্ত কারো সঙ্গে দেখা হলে বলি, এন্‌জাইনা থ্রম্‌বোসিস হয়েছে। এন্‌জাইনা পিক্‌টরিস্ কিংবা করোনারি থ্রম্‌বোসিস-এর যে কোনো একটার নাম শুনলেই সুস্থ মানুষের হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম করে—আমার ঐ দ্বন্দ্ব সমাস শুনে আমাকে তখন আর কেউ বড় একটা ঘ্যাটায় না।

অথচ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলবার সাধ যে আমার হয় না, তাও নয়। অবশ্য তাঁর কাব্য, নাট্য কিম্বা জীবনদর্শন সম্বন্ধে নয়। অতখানি কাণ্ড-জ্ঞান বা কমনসেন্‌স্ আমার আছে। আমার বলতে ইচ্ছে করে সেই জিনিস, ইংরিজিতে যাকে বলে লাইটার সাইড। এই যেমন মনে করুন, তিনি গল্পগুজোব করতে ভালোবাসতেন কি না, প্রিয়জনের সঙ্গে হাস্যপরিহাস করতেন কি না, ডাইনিঙ-রুমে বসে চেয়ার টেবিলে ছুরিকাঁটা দিয়ে ছিমছাম ভাবে সায়েবী কায়দায় খেতেন, না রান্নাঘরের বারান্দায় হাপুস-হুপুস শব্দে মাদ্রাজী স্টাইলে পাড়া সচকিত করে পর্বটি সমাধান করে সর্বশেষে কাবুলী কায়দায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে বাঙালী কায়দায় চটি ফটফটিয়ে খড়কের সন্ধানে বেরতেন?

কেউ তাঁকে প্রেমপত্র লিখলে তিনি কি করতেন? কিম্বা ডিহি শ্রীরামপুর দুই নম্বর বাই লেন তাদের কম্বল-বিতরণী সভায় তাঁকে প্রধান অতিথি করার জন্ত ঝুলোঝুলি লাগালে তিনি সেটা এড়াবার জন্ত কোন্ পন্থা অবলম্বন করতেন? কিম্বা কেউ টাকা ধার চাইলে?

ভালোই হল টাকা ধারের কথা মনে পড়ল।

'দেহলী'র উপরে থাকতেন তিনি, নিচের তলায় তাঁর নাতি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ওরফে দিনুবাবু।

তাঁরই বারান্দায় বসে আশ-কথা-পাশ-কথা নানা কথা হচ্ছে। হতে হতে টাকা ধার নেওয়ার কথা উঠলো। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'বুঝলি, দিনু, আমার কাছ থেকে একবার একজন লোক দশ টাকা ধার নিয়ে গদগদ কণ্ঠে বললে, "আপনার কাছে আমি চিরঋণী হয়ে রইলুম"।' সভায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা পয়েন্টটা ঠিক কি বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলেন। আফ্‌টার অল্, গুরুদেবের পক্ষেও কালে-কস্মিনে কাঁচা রসিকতা করা অসম্ভব নাও হতে পারে।

খানিকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গুরুদেব বললেন, 'লোকটার শতদোষ থাকলেও একটা গুণ ছিল। লোকটা সত্যভাষী। কথা ঠিক রেখেছিল। চিরঋণী হয়েই রইল।'

শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী, নেপালচন্দ্র রায় ইত্যাদি মুরব্বীরা অট্টহাস্য করেছিলেন। আমরা, অর্থাৎ চ্যাংড়ারা, থামের আড়ালে ফিক্‌ফিক্ করেছিলুম।

এ গল্পটি আমি একাধিক লোকের মারফৎ পরেও শুনেছি। হয়তো তিনি গল্পটি একাধিক সভা-মজলিসে বলেছেন। এবং গল্পটি আদৌ তাঁর নিজের বানানো না অন্তের কাছ থেকে ধার নেওয়া সে-কথাও হলফ করে বলতে পারবো না। কারণ কাব্যানুশাসনের টীকা লিখতে গিয়ে আলঙ্কারিক হেমচন্দ্র বলেছেন, 'নাস্ত্য চৌরঃ কবিজনঃ নাস্ত্য চৌরো বণিক্‌জনঃ'—অর্থাৎ 'বড় বিদ্যা'টি বিলক্ষণ রপ্ত আছে স্যাকরার এবং কবি মাত্রেরই।

তা হক। মহাকবি হাইনরিষ্ হাইনে তাতে কণামাত্র আপত্তি না তুলে বলেছেন, 'যারা কবির রচনাতে "নির্ভেজাল" অরিজিনালিটি খোঁজে তারা চিবাক মাকড়ের জাল, কারণ একমাত্র মাকড়ই তার জালটি তৈরি করে আপন পেটের মাল দিয়ে, ষোল আনা অরিজিনাল; আমি কিন্তু খেতে ভালোবাসি মধু, যদিও বেশ ভালো ভাবেই জানি মধুভাণ্ডের প্রতিটি ফোঁটা ফুলের কাছ থেকে চোরাই করা মাল।'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পের ভিতর আমার সব চেয়ে ভালো লাগে

'গুরুদেব-ভাণ্ডারে' কাহিনী। অবশ্য আমার মনে হয়, গল্পটির নাম 'ভাণ্ডারে-গুরুদেব' কাহিনী দিলে ভালো হয়, কারণ কাহিনীটি সম্পূর্ণ নির্ভর করছে, ভাণ্ডারের একটি সৎকর্মের উপর। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু যখন তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার জগজ্জন সম্মুখে প্রকাশ করলেন তখন কালা আদমির কেরদানী বরদাস্ত না করতে পেরে ইংরেজ আবিষ্কারটার নামকরণ করলে 'আইন-স্টাইন-বোস থিয়রি'। স্বয়ং আইনস্টাইন তখন নাকি প্রতিবাদ জানিয়ে বলে-ছিলেন, ওটার নাম হয় হবে শুধুমাত্র 'বোস থিয়রি' নয় 'বোস-আইনস্টাইন থিয়রি'। এ-সব অবশ্য আমাদের শোনা কথা। ভুল হলে পুজোর বাজারের বিলাস বলে ধরে নেবেন।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ইংরেজ পছন্দ করতো না বলে শান্তিনিকেতন আশ্রমটিকে নষ্ট করার জন্য ইংরেজ একটি সূক্ষ্ম গুজোব বাজারে ছড়ায়—শান্তিনিকেতনের ইস্কুল আসলে রিফরমেটরি। অন্তত এই আমার বিশ্বাস।

খুব সম্ভব তারই ফলে আশ্রমে মারাঠী ছেলে ভাণ্ডারের উদয়।

ইস্কুলের মধ্য বিভাগে বীথিকা-ঘরে ভাণ্ডারে সীট পেল। এ ঘরটি এখন আর নেই তবে ভিতটি স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তারই সমুখ দিয়ে গেছে শালবীথি। তারই এক প্রান্তে লাইব্রেরি, অন্য প্রান্তে দেহলী। গুরুদেব তখন থাকতেন দেহলীতে।

দেহলী থেকে বেরিয়ে, শালবীথি হয়ে গুরুদেব চলেছেন লাইব্রেরীর দিকে। পরনে লম্বা জোব্বা, মাথায় কালো টুপি। ভাণ্ডারে দেখামাত্রই ছুটলো তাঁর দিকে। আর সব ছেলেরা অবাক। ছোকরা আশ্রমে এসেছে দশ মিনিট হয় কি না হয়। এরই মধ্যে কাউকে কিছু ভালো-মন্দ না শুধিয়ে ছুটলো গুরুদেবের দিকে।

আড়াল থেকে সবাই দেখলে ভাণ্ডারে গুরুদেবকে কি যেন একটা বললে। গুরুদেব মৃদু হাস্য করলেন। মনে হল যেন অল্প অল্প আপত্তি জানাচ্ছেন। ভাণ্ডারে চাপ দিচ্ছে। শেষটায় ভাণ্ডারে গুরুদেবের হাতে কি একটা গুঁজে দিলে। গুরুদেব আবার মৃদু হাস্য করে জোব্বার নিচে হাত চালিয়ে ভিতরের জেবে সেটি রেখে দিলেন। ভাণ্ডারে এক গাল হেসে ডরমিটরিতে ফিরে এল। প্রণাম না, নমস্কার পর্যন্ত না।

সবাই শুধালে, 'গুরুদেবকে কি দিলি?'

ভাণ্ডারে তার মারাঠী-হিন্দীতে বললে, 'গুরুদেব কৌন্? ওহ্ তো দরবেশ হৈ।'

'বলিস কি রে, ও তো গুরুদেব হায়।'

'ক্যা "গুরুদেব" "গুরুদেব" করতা হৈ। হম্ উসকো এক অঠন্নী দিয়া।'

বলে কি? মাথা খারাপ না বদ্ধ পাগল? গুরুদেবকে আধুলি দিয়েছে!

জিজ্ঞেসাবাদ করে জানা গেল, দেশ ছাড়ার সময় ভাণ্ডারের ঠাকুরমা তাকে নাকি উপদেশ দিয়েছেন, সন্ন্যাসী দরবেশকে দানদক্ষিণা করতে। ভাণ্ডারে তাঁরই কথামত দরবেশকে একটি আধুলি দিয়েছে। তবে হ্যাঁ, দরবেশ বাবাজী প্রথমটায় একটু আপত্তি জানিয়েছিল বটে, কিন্তু ভাণ্ডারে চালাক ছোকরা, সহজে দমে না, চালাকি নয়, বাবা, একটি পূরী অঠন্নী।

চল্লিশ বছরের আগের কথা। অঠন্নী সামান্য পয়সা, এ-কথা কেউ বলে নি। কিন্তু ভাণ্ডারেকে এটা কিছুতেই বোঝানো গেল না যে তার দানের পাত্র দরবেশ নয়, স্বয়ং গুরুদেব।

ভাণ্ডারের ভুল ভাঙতে কতদিন লেগেছিল আশ্রম পুরাণ এ-বিষয়ে নীরব। কিন্তু সেটা এ-স্থলে অবান্তর।

ইতিমধ্যে ভাণ্ডারে তার স্বরূপ প্রকাশ করেছে। ছেলেরা অস্থির, মাস্টাররা জ্বালাতন, চতুর্দিকে পরিত্রাহি আর্তরব।

হেড মাস্টার জগদানন্দবাবু এককালে রবীন্দ্রনাথের জমিদারী-সেরেস্তায় কাজ করেছিলেন। লেঠেল ঠ্যাঙানো ছিল তাঁর প্রধান কর্ম। তিনি পর্যন্ত এই দুঁদে ছেলের সামনে হার মেনে গুরুদেবকে জানালেন।

আশ্রম-স্মৃতি বলেন, গুরুদেব ভাণ্ডারেকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ রে, ভাণ্ডারে, এ কি কথা শুনি?'

ভাণ্ডারে চুপ।

গুরুদেব নাকি কাতর নয়নে বললেন, 'হ্যাঁ রে ভাণ্ডারে, শেষ পর্যন্ত তুই এসব আরম্ভ করলি? তোর মত ভালো ছেলে আমি আজ পর্যন্ত দেখি নি। আর তুই এখন আরম্ভ করলি এমন সব জিনিস যার জন্য সকলের সামনে আমাকে মাথা নিচু করতে হচ্ছে। মনে আছে, তুই যখন প্রথম এলি তখন কি রকম ভালো ছেলে ছিলি? মনে নেই, তুই দান-খয়রাত পর্যন্ত করতিস? আমাকে পর্যন্ত তুই একটি পুরো আধুলি দিয়েছিলি? আজ পর্যন্ত কত ছাত্র এল গেল কেউ আমাকে একটি পয়সা পর্যন্ত দেয় নি। সেই আধুলিটি আমি কত যত্নে তুলে রেখেছি। দেখবি?'

* *

তার দু'এক বৎসরের পর আমি শান্তিনিকেতনে আসি। মারাঠী সঙ্গীতজ্ঞ

স্বর্গীয় ভীমরাও শাস্ত্রী তখন সকালবেলার বৈতালিক লীড করতেন। তার কিছু-দিন পর শ্রীযুত অনাদি দস্তিদার। তারপর ভাণ্ডারে।

চল্লিশ বছর হয়ে গিয়েছে। এখনো যেন দেখতে পাই ছোকরা ভাণ্ডারে বৈতালিকে গাইছে,

এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার।
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা
সফল হল কার॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায়, কোনো সভ্য জাতির বিত্তশালী সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা কিংবা অন্য কোনো বোধ্য ভাষাতে যদি ধর্মচর্চা না থাকে তবে সে সম্প্রদায় ক্রিয়া-কর্ম ও পাল-পার্বণ নিয়েই মত্ত থাকে। এই তত্ত্বটি ভারতবাসীর ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য। কারণ, তারা স্বভাবতঃ এবং ঐতিহ্যবশতঃ ধর্মানুরাগী। তার কোনো বোধ্য ভাষাতে সত্যধর্মের মূলস্বরূপ সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ না থাকলে সে তখন সব কিছু হারাবার ভয়ে ধর্মের বহিরাচরণ অর্থাৎ তার খোলস ক্রিয়াকর্মকেই আঁকড়ে ধরে থাকে।[১]

কলকাতা অর্বাচীন শহর। যে সব হিন্দু এ শহরের গোড়াপত্তনকালে ইংরেজের সাহায্য করে বিত্তশালী হন, তাঁদের ভিতর সংস্কৃত ভাষার কোনো চর্চা ছিল না। বাঙলা গদ্য তখনো জন্মলাভ করে নি। কাজেই মাতৃভাষার মাধ্যমে যে তাঁরা সত্যধর্মের সন্ধান পাবেন তারও কোনো উপায় ছিল না। ওদিকে আবার বাঙালী ধর্মপ্রাণ। তাই সে তখন কলকাতা শহরে পাল-পার্বণে যা সমারোহ করলো তা দেখে অধিকতর বিত্তশালী শাসক ইংরেজ-সম্প্রদায় পর্যন্ত স্তম্ভিত হল। এর শেষ-রেশ 'হুতোমে' পাওয়া যায়।

জাতির উত্থান-পতনেও এ অবস্থা বার বার ঘটে থাকে। এবং সমগ্রভাবে

১ বর্তমান লেখকের মনে সন্দেহ আছে, শাক্য মুনির আবির্ভাবের ঠিক পূর্বেই এই পরিস্থিতি হয়েছিল। বৈদিক ভাষা তখন প্রায় অবোধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলেই ক্রিয়াকর্ম-যাগযজ্ঞ-পশুহত্যা তখন সত্য-ধর্মের স্থান অধিকার করে বসেছিল। বুদ্ধদেব তখন এরই বিরুদ্ধে সত্যধর্ম প্রচার করেন ও সর্বজন-বোধ্য লোকায়ত প্রাকৃত (পরে পালি নামে পরিচিত) ভাষার শরণ নেন।

বিচার করতে গেলে তাতে করে জাতির বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না। গরীব-দুঃখীর তথা সমগ্র সমাজের জন্য এর একটা অর্থনৈতিক মূল্য তো আছে বটেই, তদুপরি এক যুগের অত্যধিক পালপার্বণের মোহকে পরবর্তী যুগের ঐকান্তিক ধ্যান-ধারণা অনেকখানি ক্ষতিপূরণ করে দেয়।

কিন্তু বিপদ ঘটে, যখন ঐ ক্রিয়াকর্মের যুগে হঠাৎ এক বিদেশী ধর্ম এসে উপস্থিত হয়, তার চিন্তাধারা তার সত্যপথ সন্ধানের আন্দোলন-আলোড়ন নিয়ে। এবং এই ধর্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে যদি অন্যান্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক (কঁৎ, মিল ইত্যাদি) প্রশ্নের যুক্তিতর্কমূলক আলোচনা-গবেষণা বিজড়িত থাকে তবে ক্রিয়াকর্মাসক্ত সমাজের পক্ষে তখন সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়। বাঙালী সমাজের অগ্রণীগণ ইংরেজের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গিয়ে অনেকখানি ইংরেজী শিখে ফেলেছেন এবং খৃষ্টধর্মের মূলতত্ত্ব, তার মহান আদর্শবাদ, সেই ধর্মে অনুপ্রাণিত মহাজনগণের সমাজসংস্কার প্রচেষ্টা তাঁদের মনকে বার বার বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে—তাঁদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, আমাদের ধর্মে আছে কি, আছে তো শুধু দেখতে পাই অন্তঃসারশূন্য পূজা-পার্বণ, আর ওদের ধর্মে দেখি, স্বয়ং ভগবান পিতারূপে মানুষের হৃদয়দ্বারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে পেলে এই অর্থহীন জীবন আপন চরম মূল্য লাভ করে, দুঃখ-দৈন্য আশা-আকাঙ্ক্ষা এক পরম পরিসমাপ্তিতে অনন্ত জীবন লাভ করে।

হিন্দুশাস্ত্রের অতি সামান্য অংশও যাঁরা অধ্যয়ন করেছেন তাঁরাই জানেন, এ সব কিছু নূতন তত্ত্ব নয়। বস্তুতঃ জীবনসমস্যা ও ধর্মে তার সমাধান এই অবলম্বন করেই আমাদের সর্বশাস্ত্র গড়ে উঠেছে। একদিকে দৈনন্দিন জীবনের অন্তহীন প্রলোভন, অন্য দিকে সত্যনিষ্ঠার প্রতি ধর্মের কঠোর কঠিন আদেশ—এ দুয়ের মাঝখানে মানুষ কি প্রকারে সার্থক গৃহী হতে পারে, সেই পন্থাই তো আমাদের শাস্ত্রকারগণ যুগে যুগে দেখিয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু এ সব তত্ত্ব যাঁরা জানতেন তাঁরা থাকতেন গ্রামে, তাঁরা পড়তেন পড়াতেন টোল'চতুষ্পাঠীতে এবং তাঁরা ইংরেজের সংস্পর্শে আসেন নি বলে ওদের ধর্ম যে নাগরিক হিন্দুকে নানা প্রশ্নে বিচলিত করে তুলেছে সে সংবাদও তাঁদের কানে এসে পৌঁছয় নি।

আর সব চেয়ে আশ্চর্য, এই সব 'টোলো' 'বিটলে বামুন'রা যে শুধু পাদ্রী সাহেবদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে আপন ধর্মের মর্যাদা মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারতো তা নয়, তারা যে কাণ্ট-হেগেলের চেলাদের সঙ্গে বিশুদ্ধ দর্শনের ক্ষেত্রেও সংগ্রাম করতে প্রস্তুত ছিল—এ তত্ত্বটিও নাগরিক হিন্দুদের সম্পূর্ণ অজানা ছিল।

'ঘরের কাছে নিই নে খবর, খুঁজতে গেলাম দিল্লি শহর' লালন ফকিরের অর্থহীন গীত নয়।[২] এঁরা সত্যই জানতেন না, আমাদের টোলে শুধু স্মার্ত নন, নৈয়ায়িকও ছিলেন, এবং স্মার্তরাও যে শুধু তৈলবট নিয়ে বিধান দিতেন তাই নয়, তাঁরা সে বিধানের সামাজিক মূল্যও যুক্তি-তর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে পারতেন।

কলকাতায় চিন্তাশীল গুণীজন তখন এই পরিস্থিতি দেখে বিচলিত হয়েছিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময় রাজা রামমোহন রায়ের উদয় হল। তাঁর ব্রাহ্ম-আন্দোলন যে বাঙালী জাতির কি পরিমাণ উপকার করেছে, এই ব্রাহ্মসমাজের কীর্তিমান পুরুষসিংহ রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যকে যে কি পরিমাণ ঐশ্বর্যশালী ও বহুমুখী করে গিয়েছেন, তার সম্পূর্ণ হিসাব নিকাশ এখনো শেষ হয় নি। বাঙালী সাধক, বাঙালী লেখক, বাঙালী পাঠক সকলেই সে-কথা স্বীকার করেছেন। স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন—

এদানির ব্রাহ্মধর্ম যায় ছড়াছড়ি
তাহারেও বার বার নমস্কার করি॥

'ছড়াছড়ি' শব্দে তখনকার দিনে প্রচলিত একটু ক্ষুদ্র তাচ্ছিল্য লুকানো রয়েছে। পরমহংসদেব সেটিকেও 'নমস্কার' করেছেন।

রাজা রামমোহন খৃষ্টধর্মে মহাপণ্ডিত ছিলেন, মুসলমান ধর্মের 'জবরদস্ত মৌলবী' ছিলেন এবং সব চেয়ে বড় কথা, সে যুগে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে যে বস্তু সম্পূর্ণ অবান্তর এমন কি অন্তরায়, সেই হিন্দুধর্মশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় ব্যুৎপত্তি এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল।

রাজা জানতেন, সে যুগের হিন্দুকে তর্ক-বিতর্ক করতে হবে খৃষ্টধর্মের সঙ্গে। অর্থাৎ খৃষ্টান মিশনারীর সামনে 'ক' অক্ষরে 'কৃষ্ণনাম' স্মরণে 'একঘটি'[৩] চোখের জল ফেললেই আপন ধর্মের মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না—খুব বেশী হলে, ভদ্র মিশনারী হয়ত তাকে ভক্ত বলে স্বীকার করবে মাত্র। তাই তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, কলকাতার হিন্দুর ক্রিয়াকর্মের পিছনে রয়েছে, হিন্দুর ষড়দর্শন, বুদ্ধ এবং মহাবীরের বিশ্বপ্রেম এবং সর্বপশ্চাতে রয়েছে অহরহ জাজ্বল্যমান বেদ-

---

২ শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের গাওয়া গান এরই কাছাকাছি:

আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে
যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অনিল গুপ্ত সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ২১৩ পৃঃ।

৩ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় কথার আড়।

বেদান্তের অখণ্ড দিব্যদৃষ্টি।

দেশের আপামর জনসাধারণের ভিতর হিন্দু ধর্মের নব উন্মাদনা আনতে হলে রাজা রামমোহন হিন্দুধর্মের কোন্ কোন্ সম্পদ গ্রহণ এবং প্রচার করতেন সে কথা বলা শক্ত; কিন্তু এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সে যুগের কলিকাতাবাসী সুসভ্য অথচ আপন শাস্ত্রে অজ্ঞ হিন্দুর সামনে তিনি সর্বশাস্ত্র মন্থন করে উপনিষদগুলিই তুলে ধরে প্রকৃত ঋষির গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। উপনিষদ থেকেই শঙ্কর-দর্শনের সূত্রপাত এবং শঙ্করের অদ্বৈতবাদ অতিশয় অক্লেশে, পরম অবহেলায় খৃষ্টানের ট্রিনিটিকে সম্মুখ সংগ্রামে আহ্বান করতে পারে। উপনিষদের গুণকীর্তন এ ক্ষুদ্র এবং অক্ষম রচনার উদ্দেশ্য নহে,—অনুসন্ধিৎসু পাঠক তুর্কী পণ্ডিত অলবীরুণী, মোগল সুফী দারাশীকুহ্ (ঔরঙ্গজীবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা)[৪] এবং জর্মন দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের রচনাতে তার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাবেন।

ধর্মের যে সব বাহ্যানুষ্ঠান সত্যধর্ম থেকে অতি দূরে চলে গিয়ে অধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে রাজা সংগ্রাম আরম্ভ করলেন সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে এবং সে সংগ্রামের জন্য তিনি অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চয় করলেন হিন্দু স্মৃতি থেকেই। এ-স্থলে রাজা বিশ্বজনীন যুক্তিতর্ক ব্যবহার না করে প্রধানত ব্যবহার করলেন হিন্দুশাস্ত্রসম্মত ন্যায় এবং উদাহরণ। রাজা প্রমাণ করলেন যে তিনি দর্শনে যে রকম বিদগ্ধ, ক্রিয়াকর্মের ভূমিতেও অনুরূপ স্মার্ত মল্লবীর।

শাস্ত্রালোচনায় ঈষৎ অবান্তর হলেও এস্থলে বাঙলা সাহিত্যানুরাগীর দৃষ্টি তার অতি প্রিয় একটি বস্তুর দিকে আকর্ষণ করি। রাজাকে তাঁর আন্দোলন চালাতে হয়েছিল কলকাতার বাঙালীদের ভিতর। এঁরা সংস্কৃত জানেন না। তাই তাঁকে বাধ্য হয়ে লিখতে হয়েছিল বাঙলা ভাষাতে। পদ্য এ সব যুক্তি-তর্কের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বাহন। তাই তাঁকে বাঙলা গদ্য নির্মাণ করে তার-ই মাধ্যমে আপন বক্তব্য প্রকাশ করতে হয়েছিল। রাজার পূর্বে যে বাঙলা গদ্য লেখা হয় নি

---

৪ দারা তাঁর অতুলনীয় ধর্মগ্রন্থ আরম্ভ করেছেন এই বলে: "হে প্রভু, তুমি তোমার সুন্দর মুখ কুফ্‌র্ (অবিদ্যা। কিম্বা ইমান (বিদ্যা) দু'পাশের কোনো অলকগুচ্ছ জুল্‌ফ) দিয়ে ঢেকে রাখো নি।" এই শ্লোক ঈশোপনিষদের 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥'-রই অনুবাদ।

এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু হিন্দুধর্মের এই তুমুল আন্দোলন আকর্ষণ মন্থনের ফলে যে অমৃত বেরুল তারই নাম বাঙলা গদ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে এ জাতীয় ঘটনা বহুবার ঘটেছে; তথাগতের কৃপায় পালি, মহাবীরের কৃপায় অর্ধ-মাগধী। হজরৎ মুহম্মদের কৃপায় আরবী গদ্য, লুথারের কৃপায় জর্মন গদ্যের সৃষ্টি। পূর্বেই নিবেদন করেছি, গণবোধ্য মাতৃভাষাতে শাস্ত্রালোচনা না থাকলে ক্রিয়াকর্মের আত্যন্তিক প্রসার পায়; তার বিরুদ্ধে নবধর্ম পত্তন কিম্বা সনাতন ধর্মের সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়;[৫] এবং সে আন্দোলনকে বাধ্য হয়েই গণভাষার আশ্রয় নিতে হয়।

রাজার প্রচলিত সংস্কার উপনিষদে আপনার দৃঢ়ভূমি নির্মাণ করার ফলে কতকগুলি জিনিস সে অস্বীকার করল। তার প্রথম, সাকার উপাসনা। দ্বিতীয় বৈষ্ণবধর্মের তদানীন্তন প্রচলিত রূপ; এবং ক্রমে ক্রমে গণ-ধর্মের (Folk religion) প্রতি ব্রাহ্মদের অবজ্ঞা স্পষ্টতর হতে লাগল।[৬] প্রমাণ-স্বরূপ বলতে পারি, তখনকার দিনে কেন আজও যদি কেউ ব্রাহ্ম-মন্দিরের বক্তৃতা দিনের পর দিন শোনে তবু সে উপনিষদের পরবর্তী যুগের ধর্মসাধনার অল্প ইঙ্গিতই শুনতে পাবে। তার মনে হবে, উপনিষদ-আশ্রিত ধর্মদর্শনের শেষ হয়ে যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত হিন্দুরা আর কোনো প্রকারের উন্নতি করতে পারেন নি। এমন কি গীতার উল্লেখও আমি অল্পই শুনেছি। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের কথা প্রায় কখনোই শুনি নি। বৃন্দাবনের রসরাজ-রসমতীর অভূতপূর্ব অলৌকিক প্রেমের কাহিনী থেকে কোনো ব্রাহ্ম কখনো কোনো দৃষ্টান্ত আহরণ করেন নি।

ধর্ম জানেন, আমি ব্রাহ্মদের নিকট অকৃতজ্ঞ নই। পাছে তাঁরা ভুল বোঝেন

---

৫ বস্তুতঃ, সম্পূর্ণ নূতন ধর্ম পৃথিবীতে কোনো মহাপুরুষ কখনোই আরম্ভ করেন নি। বুদ্ধদেব বলতেন, তাঁর পূর্বে বহু বুদ্ধ জন্ম নিয়েছেন, মহাবীর জৈনদের সর্বশেষ তীর্থঙ্কর বা জিন। খ্রীষ্ট বলেন, তিনি বিধির বিধান ভাঙতে আসেন নি—তিনি এসেছেন তাকে পূর্ণরূপ দান করতে। হজরৎ মুহম্মদ বলতেন, তাঁর পূর্বে বহু সহস্র পয়গম্বর আবির্ভূত হয়েছেন। বস্তুতঃ এঁদের কেউ বলেন নি, আমি প্রথম। প্রায় সকলেই বরঞ্চ বলেছেন, আমিই শেষ।

৬ একটা অবিশ্বাস্য গল্প শুনেছি, কোনো ব্রাহ্ম ভক্ত নাকি কদম্বতরুকে 'অশ্লীল বৃক্ষ' নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু এর থেকে অন্ততঃ এইটুকু বোঝা যায়, হিন্দুরা ব্রাহ্মদের 'গোঁড়ামি' সম্বন্ধে তখনকার দিনে কি ধারণা পোষণ করতেন।

তাই বাধ্য হয়ে ব্যক্তিগত কথা তুললুম এবং করজোড়ে নিবেদন করছি, আমি মুসলমান, আমার কাছে হিন্দু যা ব্রাহ্মও তা, আমি হিন্দু ব্রাহ্ম উভয় পন্থার (আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস পন্থা ভিন্ন নয়) সাধু-সন্তদের বার বার নমস্কার করি।

ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ যতই অধ্যয়ন করি ততই দেখতে পাই, ব্রাহ্মরা যেন ক্রমে ক্রমেই জনগণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। জনগণকে ব্রহ্ম-মন্ত্রে দীক্ষিত করে এক বিরাট গণ-আন্দোলন আরম্ভ করার প্রচেষ্টা যেন তাঁদের ভিতর ছিল না। এ যুগেও তার উদাহরণ পাই নি। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত আমি বহু ব্রাহ্ম পরিবারের আতিথ্য লাভ করেছি, ফলে গভীর হৃদ্যতা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো ব্রাহ্ম পরিবারে হিন্দু চাকর-বাকরকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা দেখি নি। মুসলমান-খ্রীষ্টানরা সর্বদাই করে থাকেন বলেই এটা আমার কাছে আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়েছিল। আমার মনে হয়, ব্রহ্মমন্ত্র সর্বজনীন কিন্তু এ কথাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ব্রহ্মজ্ঞানীরা যে কোনো কারণেই হোক সর্ব-জনকে আহ্বান জানাতে পারেন নি। মুসলমানের নমাজে মুটে-মজুর চাকর-বাকরের সংখ্যাই বেশী, হিন্দুর সংকীর্তনে ভাবোল্লাসে নৃত্য করে 'নিম্নশ্রেণী'র প্রচুর হিন্দু, আর মন্দিরে আরতির সময় শিক্ষিত হিন্দুকে তো আজকাল দেখতেই পাওয়া যায় না। অথচ পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম-সম্মেলনে ব্রাহ্ম চাকর-নফর দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

তার জন্য আমি ব্রহ্মবাদীদের আদৌ ত্রুটি ধরছি না। এঁরা অক্ষম ছিলেন, একথা আমি কখনো স্বীকার করবো না। আমার মনে হয়, এঁরা প্রধানতঃ সমাজের নেতৃস্থানীয়দের নিয়েই আপন আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন এবং তাঁদের মাধ্যমে যে আমাদের মত বহু হিন্দু-মুসলমান প্রচুর উপকৃত হয়েছিলেন সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে হিন্দু-ধর্মের গণরূপ তখন একেবারেই অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল। তার জন্য ব্রাহ্মদের দোষ দিলে অত্যন্ত অন্যায় হবে; দোষ হিন্দুদের। তাঁদের নেতৃস্থানীয়েরা তখন হয় দীক্ষা নিয়েছেন, কিম্বা ব্রাহ্মদের প্রতি সহানুভূতিশীল, আপন গরীব জাত-ভাই কি ধর্মকর্ম করছে এবং তার কল্যাণে সত্যধর্মের সন্ধান পাচ্ছে কি না এ বিষয়ে তাঁরা তখন উদাসীন। যেন গণধর্ম ধর্মই নয়, যেন ধর্মে একমাত্র শিক্ষিত জনেরই শাস্ত্রাধিকার।

অতিশয় মারাত্মক পরিস্থিতি। দেশের দশের তা হলে সর্বনাশ হয়। শিক্ষিত-

জনকেও শেষ পর্যন্ত তার তিক্ত ফল আস্বাদ করতে হয়।[৭]

* *

ঠিক এই সময়ে করুণাময়ের কৃপায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব।

পরমহংসদেবকে সমগ্র এবং সম্পূর্ণভাবে ধারণা করা আমাদের মতো অতি সাধারণ প্রাণীর পক্ষে অসম্ভব, কারণ, আমরা সব কিছুই গ্রহণ করি আমাদের বুদ্ধি দিয়ে—যুক্তিতর্কের ছাঁচে ফেলে। অথচ কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে সাধু-সন্তদের ধারণা করতে গেলে আমরা পাই বরফের সেই অতি অল্প অংশটুকুর খবর, যেটি জলের উপর ভাসছে। অর্থাৎ বেশীর ভাগ বস্তুটি যে ষষ্ঠেন্দ্রিয় তৃতীয় চক্ষু দিয়ে দেখতে হয় সেটি আমাদের নেই। তৎসত্ত্বেও যারা তার বিচার করে তাদের নিয়ে মৃদু হাস্য করে বাউল গেয়েছেন

ফুলের বনে কে ঢুকেছে সোনার জহুরী
নিকষে ঘষয়ে কমল, আ মরি আ মরি।

যার যেমন মাপকাঠি। স্যাকরার ক্রাইটেরিয়ন তার নিকষ পাথর। সে তাই দিয়ে পদ্মফুলের গুণ বিচার করতে যায়। কিন্তু এর চেয়েও মারাত্মক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন স্বয়ং পরমহংসদেব—একাধিক বার। নুনের পুতুল সমুদ্রে নেমেছিল তার গভীরতা মাপবে বলে। তিন পা যেতে না যেতেই সে গলে গিয়ে জলের সঙ্গে মিশে গেল।[৮]

তাই নিয়ে কিন্তু কিছুমাত্র শোক করার প্রয়োজন নেই। স্বয়ং রামকৃষ্ণদেবই বলেছেন, তোমার এক ঘটি জলের দরকার। পুকুরে কত জল তা জেনে তোমার কি হবে?[৯]

তাই মা ভৈঃ। যারা বলে আমাদের মত পাপীতাপীর অধিকার নেই পরমহংসের মত মহাপুরুষের জীবন নিয়ে আলোচনা করার—তারা ভুল বলে।

---

৭ রাজনীতির ক্ষেত্রে এই শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ব্যবধানের জন্য আমরা যে কি কর্মফল ভোগ করেছি, সে তথ্যের উত্থাপন এ-স্থলে অবান্তর।

৮ আমাদের ব্যক্তিগত প্রার্থনা, তাই যেন হয়। বাউল গেয়েছেন, 'যে জন ডুবলো, সখী, তার কি আছে আর বাকি গো?' ঠাকুরও প্রায়ই গাইতেন 'ডোব ডোব, ডোব।'

৯। এক চীনা সাধক এরই কাছাকাছি এসে বলেছেন, 'মাই কাপ্ ইজ স্মল; বাট্ আই ড্রিঙ্ক অকনার।'

অধিকার আমাদেরই—এক মহাপুরুষ অন্য মহাপুরুষের জীবনী লিখতে যাবেন কেন? সে অধিকার গ্রহণ করতে গিয়ে ভুল-ত্রুটি হলে মহাত্মাদের কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। হীন প্রাণকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

পরমহংসদেবের কাছে আসার পূর্বেই চোখে পড়বে, লোকটি কী সরল। এগিয়ে এলে বোঝা যায়, এঁর বাহির-ভিতর দুই-ই সরল। এঁর শরীরটি যেমন পরিষ্কার, এঁর মনটিও তেমনি পরিষ্কার। মেদিনীপুর অঞ্চলে যাকে বলে 'নিখিরকিচ'—চাঁচা-ছোলা। যেন এইমাত্র তৈরী হয়েছে কাঁসার ঘটিটি—কোন জায়গায় টোল পড়ে নি।

এঁর মত সরল ভাষায় কেউ কখনো কথা বলে নি। এঁর ভাষার সঙ্গে সব চেয়ে বেশী সাদৃশ্য খ্রীষ্টের ভাষা ও বাক্যভঙ্গীর। আমাদের দেশের এক আলঙ্কারিক বলেছেন, 'উপমা কালিদাসস্য'। এর অর্থ শুধু এই নয় যে, কালিদাস উত্তম উপমা প্রয়োগ করতে পারতেন, এর অর্থ উপমামাত্রই কালিদাসের, অর্থাৎ উপমার রাজ্যে কালিদাস একচ্ছত্রাধিপতি। আমার মনে হয়, উপমাবৈচিত্র্যে পরমহংসদেব কালিদাসকেও হার মানিয়েছেন। কালিদাস ব্যবহার করেছেন শুধু সুন্দর মধুর তুলনা—যেগুলো কাব্যের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। রামকৃষ্ণের সেখানে কোনো বাছ-বিচার ছিল না। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, 'তার জাঁতায় যাই ফেলো না কেন, ময়দা হয়ে বেরিয়ে আসে।' পরমহংসের বেলাও ঠিক তাই। কিছু একটা দেখলেই হল। সময়মত ঠিক সেটি উপমার আকার নিয়ে বেরিয়ে আসবে। এমন কি, যেসব কথা আমরা সমাজে বলতে কিন্তু-কিন্তু করি, পরমহংসদেব সর্বজনসমক্ষে অক্লেশে সেগুলো বলে যেতেন। ভগবানকে পেতে হলে কি ধরনের 'বেগে'র প্রয়োজন সে সম্বন্ধে তাঁর তুলনাটির উল্লেখ এখানে না-ই বা করলুম।

ঠিক এইখানেই আমরা একটি মূল সূত্র পাব। তিনি জনগণের ধর্ম (ফোক রিলিজিয়ন) আচার-ব্যবহার, ভাষা—সব জিনিসকেই তার চরম মূল্য দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন বলেই জনগণের ভাষা, বাচনভঙ্গী সানন্দে ব্যবহার করে যেতেন। জনগণের অন্যায় অধর্ম তিনি স্বীকার করতেন না। কিন্তু যেখানে শুদ্ধমাত্র রুচির প্রশ্ন সেখানে তিনি 'ধোপদুরস্ত' 'ফিটফাট' হবার কোনো প্রয়োজন বোধ করতেন না। ভাষাতে সেদিনকার 'ছুঁৎবাই' রোগ আমরা পেয়েছিলুম ভিক্টোরীয় প্যুরিটানিজ্‌ম থেকে—তখন কে জানতো পঞ্চাশ বছর যেতে-না-যেতেই লরেন্স জয়েস এসে আমাদের ছুঁৎবাইয়ের 'ভণ্ডামি' লণ্ডভণ্ড করে

দেবেন।[১০]

পরমহংসদেব গণধর্ম স্বীকার করে তার চরম মূল্য দিলেন। সাকার উপাসনা গণধর্মের প্রধান লক্ষণ। বাঙালী সেই সাকারের পূজা করে প্রধানতঃ কালীরূপে। কালীমূর্তি দেখলে অ-হিন্দু রীতিমত ভয় পায়। পরমহংসদেব সেই কালীকে স্বীকার করলেন।

অথচ 'দূরের কথা' বিচার করলে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি বলে, পরমহংসদেব আসলে বেদান্তবাদী। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি এ-তিন মার্গ তিনি অবস্থাভেদে একে ওকে বরণ করতে বলেছেন। কিন্তু সব কিছু বলার পর তিনি সর্বদাই বলেছেন, 'কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্ম ব্যতীত সব কিছু মিথ্যা বলে অনুভব করতে পারো নি ততক্ষণ পর্যন্ত সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে পারবে না।' 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' বড় কঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হলে তুমিও মিথ্যা, যিনি বলেছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা।

'কি রকম জানো, যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না। কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকী থাকে। শেষ বিচারের পর সমাধি হয়। তখন "আমি", "তুমি", "জগৎ", এ সবের খবর থাকে না।'

অথচ গণধর্মে নেমে এসে বলছেন, 'যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী'। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এইসব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলছে দুলছে শক্তি বা কালীর উপমা। কালী 'সাকার আকার নিরাকারা'। তোমাদের যদি নিরাকার বলে বিশ্বাস, কালীকে সেইরূপ চিন্তা করবে।[১১] আর একটি কথা—তোমার

১০ বিদ্যাসাগর মহাশয় এ দ্বন্দ্বের সমাধান না করতে পেরে দু'রকম ভাষাই ব্যবহার করতেন। 'সীতার বনবাসে'র ভাষা সকলেই চেনেন, কিন্তু যেখানে তিনি রামা-শ্যামাকে বিধবা বিবাহের শত্রুদের বিপক্ষে ক্ষেপাতে চেয়েছেন, সেখানে 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য' এই বেনামীতে, 'ফাজিল-চালাক', 'দিলদরিয়া তুখোড় ইয়ার', 'তার একটি বেদড়া মন্ত্রী আছে—এটি তারই ত্যাঁদড়ামি', 'লোকটা লক্ষ্মীছাড়া বক্কেশ্বর আনাড়ির চূড়ামণি বে-অকুফের শিরোমণি'। ইত্যাদি 'গ্রাম্য' বাক্য পরমানন্দে ব্যবহার করেছেন। তিনি যে সব আদিরসাত্মক গল্প ছাপায় (!) প্রকাশ করেছেন সেগুলো সমাজে বললে এখনও সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

১১ শক্তিকে নানা দেশের কবি এবং সাধকগণ নানারূপে কল্পনা করেছেন। কাব্যে বিবেকানন্দের কবিতাই শ্রেষ্ঠতম।

নিরাকার বলে যদি বিশ্বাস, দৃঢ় করে তাই বিশ্বাস করো কিন্তু মতুয়ার (dogmatism) বুদ্ধি করো না। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর করে বলো না যে, তিনি এই হতে পারেন, আর এই হতে পারেন না। ব'লো আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার, আর কত কি হতে পারেন তিনি জানেন। আমি জানি না, বুঝতে পারি না।[১২]

"মৃত্যুরূপা মাতা

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ্যবায়ু-বেগ!
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হ'তে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে।
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিড়িচূড়া জিনি'
নভস্তল পরশিতে চায়। ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তা'র মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর!—দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,—
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে;
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো, আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,—মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কালনৃত্য করে উপভোগ,—মাতৃরূপা তা'রি কাছে আসে।"

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ)

ইংরেজীতে এর প্রথম ছত্র "The Stars are blotted out!"—আশ্চর্য বোধ হয় রবীন্দ্রনাথও অতি বাল্যবয়সে (১৪ ?) কালী সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখেছিলেন।'

১২ ডগমাটিজম্ না করে মনকে খোলা এবং জানা-অজানার মাঝখানেই যে সত্য পন্থা এর উৎকৃষ্ট প্রকাশ কেনোপনিষদে :—

"নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥"

'আমি এইরূপ মনে করি না যে, আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি; অর্থাৎ 'জানি না' ইহাও মনে করি না, এবং 'জানি' ইহাও মনে করি না। 'জানি না

জনগণপূজ্য শক্তির সাকার সাধনা ('পৌত্তলিকতা' শব্দটা সর্বথা বর্জনীয়—এটাতে তাচ্ছিল্য এবং ব্যঙ্গের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে) স্বীকার করে পরমহংসদেব তৎকালীন ধর্মজগতের ভারসাম্য আনয়ন করলেন বটে কিন্তু প্রশ্ন, জড়সাধনার অন্ধকার দিকটা কি তিনি লক্ষ্য করলেন না ?

এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব এবং মহত্ব। এই সাকার-সাধনার পশ্চাতে যে জ্ঞেয়-অজ্ঞেয় ব্রহ্মের বিরাট মূর্তি অহরহ বিরাজমান, পরমহংসদেব বার বার সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই ভারসাম্যই ব্রহ্মজ্ঞানী কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ এবং তাঁদের শিষ্যদের আকর্ষণ করতে পেরেছিল। তিনি যদি 'মতুয়া' কালীপূজক হতেন তবে তিনি পরমহংস হতেন না।

বস্তুতঃ একটি চরম সত্য আমাদের বার বার স্বীকার করা উচিত : যেখানেই যে কোনো মানুষ যে কোনো পন্থায় ভগবানের সন্ধান করেছে তাকেই সম্মান জানাতে হয়। এমন কি ক্ষুদ্র শিশু যখন সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে তাঁর সাহায্য কামনা করে (হায়, কলকাতায় সরস্বতী পূজার বাহ্য আড়ম্বর দেখে অনেক সময় মনে হয়, এরাই বুঝি এ যুগে দেবীর একমাত্র সাধক) তাকেও মানতে হয়,—গাছের পাতা, জলের ফোঁটা যখন মানুষ মাথায় ঠেকায় তারও বিলক্ষণ মূল্য আছে। গীতাতে এ সত্যটি অতি সরল ভাষায় বলা হয়েছে। .

কিন্তু সাকার-নিরাকার নিয়ে আজ আর তর্ক করে লাভ কি ? বাঙলা দেশে আজ আর ক'জন লোক নিরাকার পূজা করেন তার খবর বলা শক্ত—কারণ সে পূজা হয় গৃহকোণে, নির্জনে। আর কলকাতায় বারোয়ারী সাকার পূজার যা আড়ম্বর তা দেখে বাঙলার কত গুণীজ্ঞানী যে বিক্ষুব্ধ হন তার প্রকাশ খবরের কাগজে প্রতি বৎসর দেখি। এইমাত্র নিবেদন করেছি, এরও মূল্য আছে—তাই আমার এক জ্ঞানী বন্ধু বড় দুঃখে বলেছিলেন, 'কিন্তু কি ভয়ঙ্কর স্ট্রেন করে এস্থলে সে সত্যটি স্বীকার করি'।

সাকার নিরাকারের আধ্যাত্মিক মূল্য যা আছে, তা আছে, কিন্তু এই দ্বন্দ্ব সমাধানের সামাজিক মূল্য কি ?

হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম সকলেই বাঙালী সমাজে সমান অংশীদার। এঁদের ধর্মাচরণ যা-ই হোক না কেন, সমাজে তাঁরা মেলামেশা করেছেন অবাধে।

যে তাহাও নহে এবং জানি যে তাহাও নহে'—আমাদের মধ্যে যিনি এই বচনটির মর্ম জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানেন।'—গম্ভীরানন্দ

চতুর্থ পাদটীকা পুনরায় দ্রষ্টব্য।

একবার ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে এই সহজ মেলামেশা না থাকলে খ্রীষ্টান মাইকেল, মুসলমান মুশররফ হুসেন, নজরুল ইসলাম এবং জসীমউদ্দীন বাঙলা কাব্যে খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন না। সমঝদার ও রসিক জনের গুণগ্রাহিতা ও উৎসাহ লাভ না করে কম কবিই এ সংসারে সার্থক কাব্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এবং এঁদের সকলেরই উৎসাহী পাঠক এবং গুণগ্রাহী বন্ধু ছিলেন প্রধানতঃ হিন্দুরাই।[১৩]

আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক যে কোনো মতবৈষম্যের ফলে যদি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় একই সমাজের ভিতর অন্তরঙ্গ ভাব বর্জন করেন তবে সেই অখণ্ড, সমগ্র সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি—'মহতী বিনষ্টি' হয়; এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে সে যুগে কয়জন গুণী সচেতন ছিলেন? মুসলমান সাকার মানে না, কিন্তু তাই বলে তো সে যুগে বাঙালী সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মিলন ক্ষুণ্ণ হয় নি? তবে কেন ঐ কারণেই ব্রাহ্মে হিন্দুতে সামাজিক অন্তরঙ্গ গতিবিধি বন্ধ হবে?

পরমহংসদেব এই বিরোধ নির্মল করতে চেয়েছিলেন বলেই সাকার-নিরাকারের অর্থহীন, অপ্রিয় আলোচনা বর্জন করেন নি। তাই বার বার দেখি; তিনি আপন হিন্দু ভক্তবৃন্দ নিয়েই সন্তুষ্ট নন। বার বার দেখি, তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করছেন, বিজয় কোথায়, শিবনাথ যে বলেছিল আসবে, বলছেন কেশব আমার বড় প্রিয়। অথচ তিনি তো ব্রাহ্ম ভক্তদের 'কালী-কাল্টে কন্‌ভার্ট' করার জন্য কিছুমাত্র ব্যগ্র নন। তিনি সর্বান্তঃকরণে কামনা করেছিলেন, এদের বিরোধ যেন লোপ পায়।[১৪]

আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, এই দ্বন্দ্ব অপসারণে অদ্বিতীয় কৃতিত্ব পরমহংসদেবের।

১৩ পূর্ববর্তী যুগে পরাগল, ছুটি খাঁর মত মুসলমান গুণগ্রাহী ছিলেন বলেই হিন্দুরা মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন; পরবর্তী যুগে হিন্দু সমঝদার ছিলেন বলেই সৈয়দ মরতুজা প্রমুখ বহুতর মুসলমান বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবিগণ সম্বন্ধে অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

১৪ এ বিষয়ে পরমহংসদেব কতখানি 'নাছোড়বান্দা' ছিলেন তার সব চেয়ে ভালো উদাহরণ অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাবেন, অনিল গুপ্ত সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ ভাগে। পাঠক তখন 'নাছোড়বান্দা'র সত্যপ্রয়োগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবেন।

সামাজিক দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে এতখানি সচেতন পুরুষ যে তার অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে অচেতন থাকবেন এ কখনই হতে পারে না। পক্ষান্তরে, আবার অন্য সত্যও সর্বজনবিদিত—কামিনী-কাঞ্চনে পরমহংসের তীব্র বৈরাগ্য। তার থেকেই ধরে নিতে পারি, অর্থ-সমস্যা আপন সত্তায় (per se) তাঁর সামনে উপস্থিত হয় নি। যারা মুখ্যতঃ অর্থ কামনা করে, রামকৃষ্ণদেব তো তাঁদের উপদেষ্টা নন। যারা মুখ্যতঃ ধর্মজিজ্ঞাসু অথচ অর্থসমস্যায় কাতর তিনি তাঁদের সে দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। কাজেই পরোক্ষভাবে তিনি সমাজের অর্থনৈতিক প্রশ্নেরও সমাধান দিয়েছেন। যে যতখানি কাজে লাগাতে পেরেছে ততখানি উপকার পেয়েছে।

রামকৃষ্ণদেব বহুবার বলেছেন, 'কলিকালে মানবের অন্নগত প্রাণ'। এর অর্থ আর কিছুই নয়—এর সরল অর্থ, ইংরেজের শোষণনীতির শোচনীয় পরিণাম বাঙালীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে। অন্নাভাবে সে তখন এমনই কাতর যে অন্য কোন চিন্তার স্থান আর তার মস্তকে নাই। তবু যাঁরা ধর্মে অনুরক্ত তাঁরা বার বার পরমহংসদেবকে প্রশ্ন করেছেন, 'উপায় কি' ?

পূর্বেই বলেছি তিনি ছিলেন বেদান্তবাদী। তা হলে তাঁর কাছ থেকে উত্তর প্রত্যাশা করতে পারি যে জগৎ মায়া মিথ্যা অনুমিত হলেই অর্থের প্রয়োজন আপনার থেকেই ঘুচে যাবে। কিন্তু তিনি বলেছেন, পাখীর মতো দাসীর মতো সংসারের কাজ করে যাবে, কিন্তু মন পড়ে রইবে ভগবানের পায়ের তলায়। অর্থাৎ কলিযুগে সমাজের সে সচ্ছলতা নেই যে তোমাকে অন্ন জোটাবে আর তুমি নিশ্চিন্তমনে জ্ঞানমার্গে আপন মুক্তির সন্ধান পাবে। কলির মানুষের কর্ম থেকে মুক্তি নেই।

ওদিকে যে সব ব্রাহ্ম ভক্তের অর্থাভাব ছিল না,—যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানের তপস্বী তাঁদের বার বার বলেছেন, ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে ডাকো। কলিযুগে ভক্তি ভিন্ন গতি নেই।

আর সকলকেই এ কথা বলেছেন, এই জন্মেই যারা সাধনার সর্বশেষ স্তরে পৌঁছতে চায়—রাখাল, নরেন্দ্রের মত যারা জন্মাবধি জীবন্মুক্ত তাদের ক'জন বাদ দিলে আর ক'টি প্রাণী সে স্তরে পৌঁছতে পারবে সে বিষয়ে তাঁর মনে গভীর সন্দেহ ছিল—তাদের হতে হবে নিরঙ্কুশ জ্ঞানমার্গের সাধক। শুদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, ব্রহ্ম ভিন্ন নিত্যবস্তু কিছুই নেই।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমার নেই। এ-কথা স্বীকার করেও যদি দম্ভভরে কিছু বলি,

তবে বলবো, যে সাধক গীতোক্ত কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির সমন্বয় করতে পেরেছেন তিনি সমগ্র পুরুষ—পরম পুরুষ। কোনো মহাপুরুষকে যদি দস্তুভরে যাচাই করতে চাই, তবে এই তিনটির সমন্বয়েই সন্ধান করবো। তার কারণ গীতাতে এই তিন পন্থা উল্লিখিত হওয়ার পর আজ পর্যন্ত অন্য কোন চতুর্থ পন্থা আবিষ্কৃত হয় নি। এ তিন পন্থার সমন্বয়কারী শ্রীকৃষ্ণের সহচর। তাঁর নাম শ্রীরামকৃষ্ণ।

* *

যে পাঠক ধৈর্য সহকারে আমার প্রগল্‌ভতা এতক্ষণ ধরে শুনলেন তিনি কৌতূহলবশতঃ স্বতঃই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন, 'এ তো হল মানুষের সংসর্গে আগত সমাজে সমুজ্জ্বল রামকৃষ্ণদেব। কিন্তু যেখানে তিনি একা—তাঁর সাধনার লোকে তিনি কতখানি উঠতে পেরেছিলেন? সোজা বাঙলায়, 'তিনি কি ভগবানকে সাক্ষাৎ দেখতে পেয়েছিলেন?'

এর উত্তরে বলবো, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, এ প্রশ্নের উত্তর দেবার অধিকার আমাদের কারোরই নেই। এ প্রশ্নের উত্তর জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য। রামকৃষ্ণের সমকক্ষ জনই এর উত্তর দিতে পারেন।

রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছনোর পরও কোনো কোনো মানুষ লোকহিতার্থে এ সংসারে ফিরে আসেন। যেমন নারদ শুকদেবাদি'। এ কথা ভুললে চলবে না।

স্পষ্টত দেখতে পাচ্ছি, এ-কথাটি স্বামী বিবেকানন্দের মনে গভীর দাগ কেটে গিয়েছিল। লোকহিতার্থে তিনি যে বিরাট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন নির্মাণ করে যান, এরকম সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান প্রভু তথাগতের পর এযাবৎ কেউ নির্মাণ করেন নি।

* *

এইবারে শেষ প্রশ্ন দিয়ে প্রথম প্রশ্নে ফিরে যাই।

পরমহংসদেব গীতার তিন মার্গের সমন্বয় করেছিলেন। প্রকৃত হিন্দু সেই চেষ্টাই করবে। কিন্তু তিনি যে ধুতিখানাকে লুঙ্গীর মত পরে আল্লা-আল্লাও করেছিলেন এবং আপন ঘরে টাঙানো খ্রীষ্টের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতেন সে কথাও তো জানি। এসবের প্রতি তাঁর অনুরাগ এল কোথা থেকে? বিশেষতঃ যখন একাধিকবার বলা হয়েছে, অ-হিন্দু মার্গে চলবার সময় পরমহংসদেব কায়মনোবাক্যে সে-ই মার্গকেই বিশ্বাস করতেন।

অনেকের বিশ্বাস চতুর্বেদে বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস অর্থাৎ পলিথেইজমের বর্ণনা আছে। কিন্তু ম্যাক্সমুলার দেখিয়েছেন ঋগ্বেদের ঋষি যখন ইন্দ্রস্তুতি করেন তখন তিনি বলেন,—'হে ইন্দ্র, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই অগ্নি, তুমিই বরুণ, তুমিই

প্রজাপতি, তুমিই সব।'

আবার যখন বরুণমন্ত্র শুনি, তখন সেটিতেও তাই,—'হে বরুণ, তুমিই বরুণ, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই অগ্নি, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই সব।' অর্থাৎ ঋষি যখন যে দেবতাকে স্মরণ করেছেন তখন তিনিই তাঁর কাছে পরমেশ্বররূপে দেখা দিয়েছেন। এ সাধনা বহু-ঈশ্বরবাদের নয়। এর সন্ধান অন্য দেশে পাওয়া যায় না বলে ম্যাক্সমুলার এর নূতন নাম করেছিলেন, 'হেনোথেয়িজম'।

পরমহংসদেব বেদোক্ত এই পন্থাই বরণ করেছিলেন অর্থাৎ সনাতন আর্যধর্মের প্রাচীনতম শ্রুতিসম্মত পন্থা বরণ করেছিলেন। তিনি যখন বেদান্তবাদী তখন বেদান্তই সব কিছু, আবার যখন আল্লা আল্লা করছেন তখন আল্লাই পরমাল্লা।

এই করেই তিনি সর্বধর্মের রসাস্বাদন করে সর্বধর্ম সমন্বয় করতে পেরেছিলেন।

কোনো বিশেষ শাস্ত্রকে সর্বশেষ, অভ্রান্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ শাস্ত্র বলে স্বীকার করে তিনি অন্য সব কিছুর অবহেলা করেন নি।

অনেকের বিশ্বাস, হিন্দু আপন ধর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট, অন্য ধর্মের সন্ধান সে করে না।

বহু শতাব্দীর বিজয়-অভিযান ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে এ যুগের হিন্দু সম্বন্ধে এ কথা হয়ত খাটে। তাই পরমহংসদেব আপন জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, সনাতন আর্যধর্ম এ পন্থা কখনো গ্রাহ্য করে নি।

সত্য সর্বত্র বিরাজমান, ঋগ্বেদের এই বাণী, শ্রীরামকৃষ্ণে তারই প্রতিধ্বনি। সর্বত্র এর অনুসন্ধানে সচেতন থাকলে বাঙালী পরমহংসদেবের অনুকরণ অনুসরণ করে ধন্য হবে। বাকিটুকু দয়াময়ের হাতে।

পুষ্পধনু

রস কি?

অর্থাৎ যখন কোনো উত্তম ছবি দেখি, কিম্বা সরেস সঙ্গীত শুনি, অথবা ভালো কবিতা পড়ি, কিম্বা নটরাজের মূর্তি দেখি, তখন যে রসানুভূতি হয় সে রস কি, এবং সৃষ্ট হয় কি প্রকারে?

এ রসের কাছাকাছি একাধিক রস আছে। গোয়েন্দা কাহিনী পড়ে, ধাঁধার উত্তর বের করে, মনোরম সূর্যোদয় দেখে, প্রিয়াকে আলিঙ্গন করে যে সব রসের সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে যে পূর্বোল্লিখিত রসের কোনোই মিল নেই সে কথা জোর করে বলা চলে না। এমন কি,—শোনা কথা—বার্ট্রাণ্ড রাসল্ নাকি বলেছেন,

গণিতের কঠিন সমস্যা সমাধান করে তিনি যে আনন্দ অনুভব করেন সেটি নাকি হুবহু কলারসের মতই। কিন্তু এ-সব রসে এবং অন্যান্য রসে পার্থক্য কিসে আলোচনায় এবেলা মেতে উঠলে ওপারে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। আমার জ্ঞানও অতিশয় সীমাবদ্ধ, প্রকাশশক্তি ততোধিক সীমাবদ্ধ। (তাহলে অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে, আমি আদৌ লিখতে যাচ্ছি কেন? উত্তরে সবিনয় নিবেদন, বহুদিন সাহিত্য রচনা করার ফলে আমার একটি নিজস্ব পাঠকগোষ্ঠী জমায়েৎ হয়েছেন; এঁদের কেউই পণ্ডিত নন—আমিও নই—অথচ মাঝে-মধ্যে এঁরা কঠিন বস্তুও সহজে বুঝে নিতে চান এবং সে কর্ম আমার মত বে-পেশাদারী—নন-প্রফেশনালই—করতে পারে ভালো। রচনার গোড়াতেই এতখানি ব্যক্তিগত সাফাই হয়তো ঠিক মানানসই হল না, তবু পণ্ডিতজন পাছে আমার উপর অহমিকা দোষ আরোপণ করেন তাই সভয়ে এ ক'টি কথা কইতে হল)।

রস কি, সে আলোচনা অল্প লোকেই করে থাকেন। আলঙ্কারিকের অভাব প্রায় সর্বত্রই। কারণ রসের প্রধান কার্যকরণ আলোচনা করতে হলে অন্তত দুটি জিনিসের প্রয়োজন। একদিক দিয়ে রসবোধ, অন্যদিক দিয়ে রসকসহীন বিচার বিবেচনা যুক্তিতর্ক করার ক্ষমতা। তাই এর ভিতর একটি দ্বন্দ্ব লুকনো রয়েছে। যারা রসগ্রহণে তৎপর তারা তর্কের কিচিরমিচির পছন্দ করে না, আর যারা সর্বক্ষণ তর্ক করতে ভালোবাসে তারা যে 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে' হয়ে রসিকজনের ভীতির সঞ্চার করে সে তো জানা কথা।

সৌভাগ্যক্রমে এদেশে কিন্তু কখনো আলঙ্কারিকের অনটন হয় নি। ভরত থেকে আরম্ভ করে, দণ্ডিন মম্মট ভামহ হেমচন্দ্র অভিনব গুপ্ত ইত্যাদি ইত্যাদি অন্তহীন নির্ঘণ্ট বিশ্বজনের প্রচুর ঈর্ষার সৃষ্টি করেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনেছি, তাঁকে যখন রাস্‌ল্ প্রশ্ন শোধান, রস কি, হোয়াট ইজ আর্ট, তখন তিনি এঁদের স্মরণে রাস্‌ল্‌কে প্রচুর নূতন তত্ত্ব শোনান। অন্য লোকের মুখে শুনেছি, রাস্‌ল্ রীতিমত হকচকিয়ে যান।

বিদেশী আলঙ্কারিকদের ভিতর জর্মন কবি হাইনরিষ হাইনের নাম কেউ বড় একটা করে না। কারণ তিনি অমিশ্র অলঙ্কার নিয়ে আলোচনা করেন নি। জর্মন কবিদের নিয়ে আলোচনা করার সময় মাঝে মাঝে রস কি তাই নিয়ে তিনি চিন্তা করেছেন, এবং রস কি তার সংজ্ঞা না দিয়ে তুলনার মারফৎ, গল্পচ্ছলে সব কিছু অতি মনোরম ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে রকম কোনো কিছু বলতে গেলে সংজ্ঞা নিয়ে মাথা ফাটাফাটি না করে গল্প বলে জিনিসটা সরল করে দিতেন অনেকটা সেইরকম!

বাগদাদের শাহ্‌ইন্‌-শাহ্‌, দীনদুনিয়ার মালিক খলীফা হারুন-অর্‌-রশীদের হারেমের সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী, খলীফার জিগরের টুকরো, চোখের রোশনী রাজকুমারীটি ছিলেন 'স্বপনচারিনী', অর্থাৎ ঘুমের ঘোরে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতেন।

গভীর নিশীথে একদা তিনি নিদ্রার আবেশে মৃদু পদসঞ্চারণে চলে গিয়েছেন প্রাসাদ-উদ্যানে। সখীরা গেছেন পিছনে পিছনে। রাজকুমারী নিদ্রার ঘোরে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে সম্পূর্ণ মোহাবস্থায় ফুল আর লতাপাতা কুড়োতে আরম্ভ করলেন আর মোহাবস্থায়ই সেগুলো অপূর্ব সমাবেশে সাজিয়ে বানালেন একটি তোড়া। আর সে সামঞ্জস্যে প্রকাশিত হয়ে গেল একটি নবীন বাণী, নূতন ভাষা। মোহাবস্থায়ই রাজকুমারী তোড়াটি পালঙ্কের সিথানে রেখে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুম ভাঙতে রাজকুমারী দেখেন একটি তোড়া যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। সখীরা বললেন, ইটি তাঁরই হাতে তৈরী। কিছুতেই তাঁর বিশ্বাস হয় না। এমন কি ফুলপাতার সামঞ্জস্যে যে ভাষা যে বাণী প্রকাশ পেয়েছে সেটিও তিনি সম্পূর্ণ বুঝতে পারছেন না—আবছা আবছা ঠেকছে।

কিন্তু অপূব সেই পুষ্পস্তবক। এটি তাহলে কাকে দেওয়া যায়? যাঁকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। খলীফা হারুন্‌-অর্‌-রশীদ। খোজাকে ডেকে বললেন, 'বৎস, এটি তুমি আর্যপুত্রকে (খলীফাকে) দিয়ে এসো।'

খোজা তোড়াটি হাতে নিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, 'ও হো হো, কী অপূর্ব কুসুমগুচ্ছ! কী সুন্দর গন্ধ, কী সুন্দর রঙ! হয় না, হয় না, এ রকম সঞ্চয়ন সমাবেশ আর কোনো হাতে হতে পারে না।'

কিন্তু সে সামঞ্জস্যে যে বাণী প্রকাশিত হয়েছিল সে সেটি বুঝতে পারলো না। সখীরাও বুঝতে পারেন নি।

খলীফা কিন্তু দেখা মাত্রই বাণীটি বুঝে গেলেন। তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে গেল। দেহ শিহরিত হল। সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হল। অভূতপূর্ব পুলকে দীর্ঘ দাড়ি বয়ে দরদর ধারে আনন্দাশ্রু বইতে লাগলো।

এতখানি গল্প বলার পর কবি হাইনরিষ হাইনে বলছেন, 'হায় আমি বাগদাদের খলীফা নই, আমি মহাপুরুষ মুহম্মদের বংশধর নই, আমার হাতে রাজা সলমনের আঙটি নেই, যেটি আঙুলে থাকলে সর্বভাষা, এমন কি পশুপক্ষীর কথাও বোঝা যায়, আমার লম্বা দাড়িও নেই, কিন্তু পেরেছি, পেরেছি, আমিও সে ভাষা সে বাণী বুঝতে পেরেছি।'

এস্থলে গল্পটির দীর্ঘ টীকার প্রয়োজন। কিন্তু পূর্বেই নিবেদন করেছি সে শক্তি আমার নেই। তাই টাপেটোপে ঠারেঠোরে কই।

রাজকুমারী=কবি ; ফুলের তোড়া=কবিতা ; ফুলের রঙ পাতার বাহার= তুলনা অনুপ্রাস ; খোজা=প্রকাশক-সম্পাদক-ফিলিম-ডিস্ট্রিব্যুটর (তাঁরা সুগন্ধ সুবর্ণের রসাস্বাদ করতে পারেন, কিন্তু 'বাণীটি' বোঝেন না) ; এবং খলীফা= সহৃদয় পাঠক !

মরহুম মৌলানা

মরহুম (স্বর্গত) মৌলানা আবুল-কালাম মহী-উদ্দীন আহমদ অল্‌ আজাদ্‌ সম্ভ্রান্ত বংশের যোগ্য সন্তান। এ বংশের পরিচয় এবং বিবরণ বাদশা আকবরের আমল থেকে পাওয়া যায়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে এঁর পিতা জড়িয়ে পড়েন। দিল্লীর উপর ইংরাজের বর্বর অত্যাচার আরম্ভ হলে পর তিনি তাঁর অন্যতম ভক্ত রামপুরের নবাবের সাহায্যে মক্কাশরীফে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি এক আরব কুমারীকে বিবাহ করেন। আবুল কালাম এই বিবাহের সার্থক সন্তান।

তাঁর মাতৃভাষা আরবী, পিতৃভাষা উর্দু। পরবর্তী যুগে তিনি ফার্সী এবং তুর্কীতেও অসাধারণ পাণ্ডিত্য সঞ্চয় করেন। ইংরিজি থেকেও তিনি সে সঞ্চয়ে সাহায্য গ্রহণ করেছেন। তবে এদেশে ফেরার পর তিনি উর্দু সাহিত্যের এমনি একনিষ্ঠ সাধক ও প্রেমিক হয়ে যান যে শেষের দিকে আরবী বা ফার্সীতে নিতান্ত বাধ্য না হলে কথাবার্তা বলতেন না।

তাঁর বয়স যখন দশ তখন তাঁর পিতা ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। সমগ্র ভারতবর্ষেই তাঁর বহু শিষ্য ও ভক্ত ছিলেন। এই কলকাতা শহরেই তাঁর প্রচুর অনুরাগী শিষ্য ছিলেন এবং তাঁদেরই অনুরোধে তিনি এখানে স্থায়ী বাসভবন নির্মাণ করেন। পুত্র আবুল কালাম এখানেই তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তাঁর পরলোকগমনের পর বেতারে যে একাধিকবার বলা হয়, তিনি মিশরের অল আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন সে সংবাদ ভুল। উপরন্তু মৌলানা সাহেব নিজেকে সব সময়ই কলকাতার অধিবাসী ও বাঙালী বলেই পরিচয় দিয়েছেন। বাঙলা তিনি বলতেন না, কিন্তু বাঙলা কথোপকথনের মাঝখানে তিনি উর্দুতে প্রশ্নোত্তর করতেন এবং কিছুক্ষণ পর কারোরই খেয়াল থাকতো না যে তিনি অন্য ভাষায় কথা বলছেন।

চৌদ্দ বছর বয়সেই তিনি লিসান উল্-সিদ্‌ক্ (সত্য-বচন) নামক কাগজের সঙ্গে সংযুক্ত হন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি ভারতবর্ষের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে। চব্বিশ বৎসর বয়সে তাঁর 'অল্ হিলাল' (অর্ধচন্দ্র) পত্রিকা ইংরেজের মনে ভীতির সঞ্চার করতে আরম্ভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর তাঁর কাগজ ইংরেজের শত্রু তুর্কী এবং মুসলিম বিশ্ব-আন্দোলনের অকুণ্ঠ প্রশংসা করার ফলে তাঁকে অন্তরীণ হতে হয়। মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মহাত্মা গান্ধী ও অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হন এবং সে আন্দোলনের সঙ্গে সাদ্ জগলুল্ পাশার মিনারের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং গাজী মুস্তাফা কামাল পাশার তুর্কীর নবজাগরণের সঙ্গে সেতু নির্মাণ করেন।

এর পরের ইতিহাস ভারতীয় মাত্রই জানেন।

শ্বেত সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ এবং বিশ্ব-মুসলিম প্রেম মৌলানা আজাদের পরিবারে অবিচ্ছিন্ন অংশরূপে গণ্য করা হত। তিনি জন্মগ্রহণ করেন মক্কায়—যেখানে হজ্ উপলক্ষে বিশ্বের তাবৎ মুসলিম প্রতি বৎসর সম্মিলিত হয়ে প্রাচ্য ভূমি থেকে কি করে শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেত-স্বৈরাচার দূরীভূত করা যায় তার পরিকল্পনা করতো এবং ভারত, মালয়, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশকে আপন আপন কর্তব্য ও জিম্মাদারী ভাগ করে দেওয়া হত। এ-পরিকল্পনা কোনো বিশেষ দেশে সীমাবদ্ধ ছিল না বলে একে ন্যাশনালিজম না বলে প্যান্-ইস্‌লামিজম্ (বিশ্ব-মুসলিম-সংহতি) নামে পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্রই সুপরিচিত ছিল। দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত মৌলানা এ-মন্ত্রই অহরহ শুনেছিলেন।

কলকাতা আসার সঙ্গে সঙ্গেই মৌলানার পরিবর্তন আরম্ভ হয়। এ-কথা সত্য যে বিশ্ব-মুসলিমের প্রতি তাঁর দরদ কখনো শুকিয়ে যায় নি, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় উৎসাহ ও উদ্দীপনার উৎস হয়ে উঠল স্বদেশ-প্রেম। উর্দু ভারতবর্ষের ভাষা। তাঁর মাতৃভাষা আরবীকে তাঁর জীবনাদর্শ এবং রাজনৈতিক সাধনার মাধ্যমরূপে গ্রহণ না করে তিনি সর্বান্তঃকরণে বরণ করে নিলেন উর্দুকে। এ বড় সহজ কুরবাণী বা আত্মবিসর্জন নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগেই শুধু নয়, আজও দেখতে পাই বহু লোক স্বার্থলাভের জন্য স্বদেশী ভাষা বর্জন করে বিদেশী ভাষার সাধনা করেন এবং আমাদের মত বাঙালী তাঁদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে না বলে আমাদের প্রতি রুষ্ট হন।

এবং সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি, এই উর্দু গ্রহণের জন্য জীবনসায়াহ্নে মৌলানাকে আবার অকরুণ কটুবাক্য শুনতে হলো সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মণ্ডলীর কাছ থেকে। হিন্দী ভাষা কেন রাতারাতি ভারতবর্ষের তাবৎ ভাষার কণ্ঠরুদ্ধ

করে 'জাতীয় ভাষা' রূপে জগদ্দল প্রতিমার মত ভারতের মন্দিরে মন্দিরে পূজা পাচ্ছেন না, অপেক্ষাকৃত অনুন্নত শিশু ভাষাগুলোকে কেন কচি কচি পাঁঠার মত তাঁর সামনে বলি দেওয়া হচ্ছে না, তার কারণ অনুসন্ধান করে তাঁরা আপন 'বুদ্ধি'তে আবিষ্কার করলেন 'হিন্দী-বিদ্বেষী' 'হিন্দীভাষাকা কট্টর দুশ্‌মন্‌' মৌলানা আজাদকে। যেহেতু মৌলানা উর্দুভাষী তাই তিনি শিক্ষামন্ত্রীরূপে হিন্দীর প্রচার এবং প্রসার কামনা করেন না'—এই হল তখন তাঁদের 'যুক্তি'। হিন্দী যে দুর্বল, কমজোর ভাষা সে-কথা স্মরণ করবার অস্বস্তিকর প্রয়োজন কেউ বোধ করলেন না। পণ্ডিত নেহরুও যে উর্দুভাষী এ-কথা বলতে তাঁরা সাহস পেলেন না—এ-কথা বললে উভয়ের হৃদ্যতা বেড়ে যাবে যে!

মাত্র একবার মৌলানা লোকসভায় তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। এবং যাঁরা সেদিন এই সভায় ছিলেন তাঁরা সবাই দেখেছিলেন মৌলানার আবেগময়ী আন্তরিক বক্তৃতার ফলে প্রতিপক্ষ কি রকম লজ্জায় অধোবদন হয়েছিলেন—শত্রু-মিত্র কারো দিকেই মুখ তুলে তাকাবার সাহস পর্যন্ত সেদিন তাঁদের আর হয় নি।

জগলুল্‌ পাশা, কামাল আতাতুর্কের সঙ্গে মৌলানার পত্র বিনিময় সব সময়ই ছিল, কিন্তু মৌলানা ক্রমে ক্রমে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে। সে ইতিহাস লেখবার শক্তি আমার নেই; আমি শুধু এ-স্থলে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, মক্কা শরীফের প্যান-ইসলামী বালক যৌবনে পরিপূর্ণ জাতীয়তাবাদী হয়ে গেল। মৌলানার যে সব বিপক্ষ দল একদা মুসলিম জাহানের স্বপ্ন দেখতেন তাঁরা পর্যন্ত আজ কঠিন অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়ে বুঝতে পেরেছেন, সে স্বপ্ন গেছে—এখন তাঁরা পুরো পাকিস্তানী হয়ে গিয়ে জাতীয়তাবাদের আদর্শই বরণ করেছেন। দুঃখ এই, তাঁরা এ আদর্শটি কয়েক বৎসর আগে বরণ করে নিলেই তাঁদের মঙ্গল, আমাদের মঙ্গল, সকলেরই মঙ্গল হত।

এস্থলে কিন্তু আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করা উচিত।

স্বরাজলাভের পর মৌলানা তাঁর জাতীয়তাবাদ বিশ্ব-মানবের কল্যাণে নিয়োগ করেছিলেন। দেশ পর্যটন মৌলানা অত্যন্ত অপছন্দ করতেন, কিন্তু বিশ্বজনের সঙ্গে সক্রিয় যোগস্থাপনার জন্য তিনি কয়েক বৎসর পূর্বে পাকিস্তান ইরান হয়ে ইয়োরোপে যান—পূর্বে বহুবার বহু দেশে নিমন্ত্রিত হয়েও যান নি। এবং সব চেয়ে বড় কথা, জাতিসম্মেলন (ইউ. এন. ও.) এবং তার ভিন্ন ভিন্ন শাখার যে সব প্রতিনিধি ভারতে এসেছেন তাঁরা তাঁদের সর্বোত্তম সখারূপে চিনতে

শিখলেন মৌলানা আজাদকে। তাঁরা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, যে-মৌলানা ইংরেজের বিরুদ্ধে তিক্ততম লড়াই করেছেন আজীবন, তাঁর ভিতর সে তিক্ততা আর নেই। ইংরেজ হোক, মার্কিন হোক আর রুশই হোক, যে জন বিশ্বকল্যাণের জন্য সম্মুখীন হয়, তার বহু দোষ থাকলেও সে আজাদের বন্ধুজন। এবং আরো আশ্চর্য! ইংরেজ দেখে, মৌলানা ইংরেজী না বলেও ইংরেজের মিত্র, রাশা দেখে, তার ভাষা না জেনেও অন্যের তুলনায় মৌলানা রাশাকে চেনেন অনেক বেশী। তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলতেন উর্দুতে, কিন্তু সে উর্দু তো উর্দু নয়, সে উর্দু বিশ্বপ্রেমের সর্বজনীন ভাষা, কিম্বা বলবো, বিশ্বপ্রেমের ভাষা উর্দুর মাধ্যমে স্বপ্রকাশ হল। একদা তিনি আরবী বর্জন করে উর্দু গ্রহণ করেছিলেন; তখন তিনি উর্দু বর্জন করে অন্য এক ভাষা গ্রহণ করেছেন, যার নামকরণ এখনো হয় নি, কারণ সে ভাষাতে কথা বলতে আমরা এখনো শিখি নি।

অথচ তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁরই নির্দেশ অনুযায়ী চলতো তিনখানি ত্রৈমাসিক। প্রথমখানি আরবীতে—আরবভূমির সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগ-সূত্র স্থাপনা ও প্রাচীন যোগ দৃঢ়তর করার জন্য; দ্বিতীয়খানা ফার্সীতে—ইরান ও আফগানিস্থানের জন্যে; তৃতীয়খানা ইংরিজিতে—বৌদ্ধজগতের সঙ্গে যোগস্থাপনা করার জন্য (বৌদ্ধভূমি এক ভাষায় আশ্রিত নয় বলে তিনি মাধ্যমরূপে ইংরিজি গ্রহণ করেছিলেন)। এই তিনটি পত্রিকাই ইণ্ডিয়ান্ কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্স দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয় এবং মৌলানা ছিলেন তার প্রধান। শুধু প্রধান বললেই যথেষ্ট বলা হয় না—কোন্ দেশে ক'খানি পত্রিকা যাবে সেটুকু পর্যন্ত তাঁর নির্দেশানুযায়ী হত। আজ ভাবি, এ-সব কটি পত্রিকার নীতি-নির্দেশ, মানরক্ষা, তাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে এমন সর্বগুণ মেশানো আরেক পণ্ডিত পাওয়া যাবে কোথায়? ভারতবর্ষের ভিতরে, বাইরে?

বস্তুত আসলে এ-লোকটি হৃদয় এবং মস্তিষ্কের অন্তস্তলে ছিলেন পণ্ডিত। স্বাধীন মক্কা ত্যাগ করে পরাধীন ভারতে না এলে তিনি যে রাজনীতির চতুঃ-সীমানায় যেতেন না, সে কথা আমি স্থিরনিশ্চয় জানি। স্বাধীনতা লাভের পরও তিনি জ্ঞানমার্গেই ফিরে যেতেন কিন্তু দেশে তখন (এবং এখনো) উপযুক্ত লোকের অভাব। মৌলানা কখনো কর্তব্য অবহেলা করতে চাইতেন না। এমন কি যখন তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষ মুখর হয়ে উঠতেন, এবং আমরা ভাবতুম তিনি পদত্যাগ করলেই পারেন, তখনো তিনি কর্তব্যবোধের দায়েই আপন কাজ করে যেতেন—লোক-নিন্দার তোয়াক্কা-পরোয়া না করে। পূর্বেই বলেছি, মাত্র একবার তিনি হিন্দী-ওলাদের কর্কশ-কণ্ঠে ব্যথিত হয়ে, আপন কাহিনী নিবেদন করেছিলেন। এ

অবসরে আরেকটি ঘটনা মনে পড়লো। সেটা কিন্তু কিঞ্চিৎ হাস্যরসে মেশানো।

বিরুদ্ধ দল শিক্ষা-দফতরের বিরুদ্ধে দুনিয়ার তাবৎ অভিযোগ-ফরিয়াদ জটলা করে শেষটায় বললে, 'শিক্ষা-দফতরের দ্বারা কিছুই হবে না—তাদের মগজের বাক্সটি (ব্রেন-বক্স্‌টি) একদম ফাঁপা।'

মৌলানা স্পর্শকাতর লোক—পণ্ডিতগণ সচরাচর তা হন। উষ্মা প্রকাশ করে তিনি কিন্তু দাঁড়ালেন হাস্যমুখে। বার কয়েক ডান হাত দিয়ে মাথার ডান দিক চাপড়ে বললেন, 'না জী, এখানে তো আছে', তারপর হাত নামিয়ে নিয়ে দীর্ঘ আগুল্‌ফলম্বিত আচকানের ডান পকেটে থাবড়া মারতে মারতে বললেন, 'এখানে নেই, এখানে কিছুই নেই।' অর্থাৎ মগজে মাল যথেষ্ট আছে, কিন্তু পকেটে কিছুই নেই। তার আরো সরল অর্থ, কেবিনেট শিক্ষাবিভাগকে যথেষ্ট পয়সা দেয় না।

পূর্বেই বলেছি, মৌলানা আসলে পণ্ডিত। কর্তব্যের তাড়নায় তিনি প্রবেশ করেছিলেন রাজনৈতিক মল্লভূমিতে অতি অনিচ্ছায়। তাঁর সে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিতে আমার কুণ্ঠা বোধ হচ্ছে, কারণ তাঁর সে পাণ্ডিত্য-সায়রে সন্তরণ করার মত শক্তি আমার নেই।

আরবী এবং সংস্কৃত জ্ঞানচর্চায় বহু সাদৃশ্য রয়েছে। তার প্রধান মিল, উভয় সাহিত্যের পণ্ডিতগণই অত্যন্ত বিনয়ী। কারো কোনো নূতন কিছু বলার হলে কোনো প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের সাহায্যে তাঁরা সেটি প্রকাশ করেন। লোকমান্য টিলক গীতার ভাষ্য লিখে সপ্রমাণ করলেন, কর্মযোগই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ এবং এদেশ থেকে ইংরেজকে বিতাড়নই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম ; মহাত্মা গান্ধী তাঁর গীতাভাষ্য দিয়েই প্রমাণ করতে চাইলেন যে অহিংসাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, এবং শ্রীঅরবিন্দ গীতাপাঠ লিখে প্রমাণ করতে চাইলেন যে জ্ঞানযোগের দ্বারা চিত্তসংযম আত্মজয় করতে পারলেই স্বাধীনতা লাভ অনিবার্য। মৌলানা আজাদ তাঁর কুরান ভাষ্য দিয়ে বিশ্ব-মুসলিমকে মুক্ত করতে চাইলেন তার যুগ-যুগ সঞ্চিত অন্ধসংস্কার এবং ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে। এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে অতি কৌশলে তিনি তাকে তার কর্তব্য কোন্ দিকে সেইটে সহজ সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন।

এ ভাষ্য তিনি অনায়াসেই আরবীতে লিখতে পারতেন, এবং আরবী ভাষার মাধ্যমে তিনি পাঠকসংখ্যা পেতেন উর্দুর তুলনায় অনেক, অনেক বেশী। দ্বিতীয়ত, কুরান আরবী ভাষায় লেখা, এবং তাবৎ বিশ্ব-মুসলিম আরবীতেই তার ভাষ্য লিখে আসছে (গীতার ভাষ্য যে রকম এক শতাব্দী পূর্বেও সংস্কৃতেই রচিত হয়েছে)। তৃতীয়ত, মুসলিম-জাহানের কেন্দ্রভূমি মক্কার ভাষা আরবী, চতুর্থত, সে ভূমি

আজাদের জন্মস্থল—আপন জন্মস্থলে যশ প্রতিষ্ঠা করতে চায় না কোন্ পণ্ডিত ?

এ সমস্ত প্রলোভন উপেক্ষা করে মৌলানা তাঁর তফ্‌সীর ভাষ্য লিখলেন উর্দুতে। মক্কাতে জন্ম নিয়েছিল তাঁর দেহ, কিন্তু তাঁর চৈতন্য এবং হৃদয় গ্রহণ করেছিল তাঁর পিতৃ-পিতামহের ভূমি ভারতকে স্বদেশরূপে। তাই তিনি স্বদেশবাসীর জন্য তাঁর ভাষ্য লিখলেন উর্দুতে (টিলকও ইচ্ছা করলে তাঁর ভাষ্য সংস্কৃতে লিখতে পারতেন, কিন্তু লিখেছিলেন মারাঠীতে)। পরবর্তী যুগে আজাদ-ভাষ্য আরবীতে অনূদিত হয়, এবং তখন আরবভূমিতে সে ভাষ্যের যে জয়ধ্বনি উঠেছিল তা শুনে ভারতীয় মাত্রই না কী গর্ব, কী শ্লাঘা অনুভব করেছিল। পাকিস্তানীরাও এই পুস্তক নিয়ে গর্ব অনুভব করেন। তাঁরা পাকিস্তান যাবার সময় তাজমহল ফেলে যাওয়ার মত কিন্তু এ ভাষ্য ভারতে ফেলে যান নি। ১৯৪৭-এর পরও আজাদ-ভাষ্য লাহোর শহরে লক্ষাধিক সংখ্যক ছাপা এবং বিক্রি হয়েছে।

পাণ্ডিত্য ও সাহিত্য সচরাচর একসঙ্গে যায় না। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে মুগ্ধ হয়েছি মৌলানার সাহিত্য-রসবোধে, সাহিত্যসৃষ্টি দেখে। মৌলানার সঙ্গে লোকমান্য টিলকের বহু সাদৃশ্য বর্তমান, কিন্তু টিলকের চরিত্রে ছিলদার্ঢ্য, মৌলানার চরিত্রে ছিল মাধুর্য। টিলককে যদি বলা হয় কট্টর কঠিন শৈব, তবে মৌলানাকে বলতে হয় মরমিয়া মধুর বৈষ্ণব। কারণ মৌলানা ছিলেন সুফী অর্থাৎ ভক্ত, রহস্যবাদী (মিস্‌টিক্)। তাঁর সাহিত্যের উৎস ছিল মাধুর্যে, এবং কে না জানে মধুর রসই সর্বশ্রেষ্ঠ রস।

তাই তাঁর চেহারায় ছিল লাবণ্য, কুরান-ভাষ্যের মত পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তকে মাধুর্য, এবং তাঁর বক্তৃতায় অদ্ভুত অবর্ণনীয় সরলতার সৌন্দর্য।

কিন্তু তাঁর সে সরল সৌন্দর্যবোধ তার পরম প্রকাশ পেয়েছে তাঁর রম্য রচনাতে। উর্দুতে এরকম রচনা তো নেইই, বিশ্বসাহিত্যে এরকম সহৃদয় রসে ভরপুর লেখা খুঁজে পাই নে। তার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া বক্ষ্যমাণ অক্ষম লেখকের সাধ্যাতীত।

তবে এই শোকের দিনে একটি সান্ত্বনার বাণী জানাই। সাহিত্য আকাদেমি এ পুস্তকের বাঙলা অনুবাদকর্মে লিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু এর সঙ্গে একটি সাবধান-বাণীও শুনিয়ে রাখি। সে অনুবাদে বাঙালী পাবে কাশ্মীরী শালের উল্টো দিকটা। পাবে মূলের অসম্পূর্ণ পরিচয়, এবং হয়তো পাবে, অসম্পূর্ণের সম্পূর্ণ পরিচয় পাবার আকাঙ্ক্ষা। তাই যদি হয়, তবে হয়তো কোনো কোনো বাঙালীর অনাদৃত উর্দু ভাষা শেখার ইচ্ছাও হতে পারে। আমাদের সে প্রচেষ্টা

হয়তো শোকদুঃখের অতীত অমর্ত্যলোকে মৌলানা আবুল কালাম মহীউদ্দীন আহ্‌মদ অল্‌-আজাদকে আনন্দ দান করবে।

নসরুদ্দীন্ খোজা (হোকা)

ইস্তাম্বুল থেকে রয়টারের খবরে প্রকাশ, রসিক এবং মূর্খচূড়ামণি নসরুদ্দিন্ খোজার সপ্তশত জন্মদিবস মহা-আড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে।

ইংরিজি বর্ণমালার কল্যাণে 'খোজা' কিন্তু বাঙলায় 'হোকা' রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। অধুনা তুর্কী ভাষা ইংরিজি (লাতিন) হরফে লেখা হয় বলে তার রূপ hoca ; কিন্তু তুর্করা 'এচ' অক্ষরের নিচে একটি অর্ধচন্দ্র বা উল্টো প্রথম বন্ধনী দেয় এবং তার উচ্চারণ অনেকটা স্কচ 'লখ্', জর্মন 'বাখ্' বা ফার্সী 'খবরে'র মত, —কিন্তু 'হ্' ভাগটা বেশী এবং 'সি' অক্ষরের উপরে একটি হুক্ দেয়—এবং তার উচ্চারণ হয় পরিষ্কার 'জ'। ঠিক সেই রকম বাঙলা শব্দ (আসলে আরবী) 'খারিজ' তুর্কী ভাষায় haric লেখা হয়,—অবশ্য 'হ্'-এর নিচে পূর্বোল্লিখিত অর্ধ-চন্দ্র এবং 'সি'-র উপরে হুক্ দেয়। 'পররাষ্ট্রনীতি' তাই তুর্কীতে 'সিয়াসত খা রি জ।'

রয়টারের টেলিগ্রামে এই অর্ধচন্দ্র ও হুক্ বাদ পড়াতে 'খোজা' 'হোকা' হয়ে গিয়েছেন। খাজা নাজিমুদ্দীনের 'খাজা' ও আগা খানের 'খোজা' (সম্মানিত) সম্প্রদায়ের নামেও একই শব্দ—এটি আমাদের সম্পূর্ণ অজানা নয়।

এই ধ্বনি পরিবর্তনে আমাদের রাগত হওয়ার কারণ নেই। ক্রিকেটার মাঁকড়ের নাম যখন আমরা হামেশাই 'মনকদ', 'মানকদ' অনেক কিছুই লিখে থাকি, এবং ফড়্‌কর্‌-কে 'ফাদকর', 'ফদকর' লিখি, এমন কি এই কলকাতা শহরেই গোখলে-কে 'গোখেল' লিখি এবং উচ্চারণ করি তখন রসিকবর খোজা যে হোকা হয়ে আমাদের ধোঁকা দেবেন তাতে আর আশ্চর্য কি ?

খোজার জন্মদিন যে-বাইশ তারিখে উদ্‌যাপিত হচ্ছিল সেইদিনই ইস্তাম্বুল থেকে রয়টার আরেকটি তার পাঠিয়েছেন ; তাতে খবর এসেছে যে ঐদিন পাঁচ শ' বছর পরে তুর্কীতে এক সুপ্ত অগ্নিগিরি জেগে উঠে হা-হা করে হেসে উঠেছে।[১]

১ VOLCANIC ERUPTION AFTER FIVE CENTURIES

Istambul, July 22—Mount Soutlubiyan, in the Kars Province of Turkey has burst into what is believed to be

তা হলে বোঝা গেল মা ধরণীর পাকা দু'শ বছর লেগেছে খোজার রসিকতার মর্ম গ্রহণ করতে ; তাই বোধ হয় হাসতে হাসতে তাঁর নাড়িভুঁড়ি এখন ভূগর্ভ থেকে ছিঁড়ে বেরিয়েছে।

এদেশে আরবী এবং ফার্সীর চর্চা একদা প্রচুর হয়েছিল। আকবর বাদশাহের আমলে ইরানের এমনই দুরবস্থা যে সেখানকার পনেরো আনা কবি দিল্লী ধাওয়া করেছিলেন। আকবরের সভাকবি আব্দুর রহিম খানখানা নিজেই গণ্ডা গণ্ডা ইরানী কবি পুষেছিলেন, আর স্বয়ং আকবর যে কবি 'আমি' 'তুমি' মিল দিয়ে 'কবিতা' রচনা করতো তাকে পর্যন্ত নিরাশ করতে চাইতেন না।

ভারতবর্ষের ফার্সী নাম হিন্দ বা হিন্দুস্তান। 'হিন্দ' শব্দের অর্থ কালো। তাই এক কবি তাঁর দৈন্যের কালরাত্রি ইরানে ফেলে পূর্বাচল ভারতবর্ষ রওয়ানা হওয়ার সময় লিখলেন,

দুর্ভাবনার কালিমা ত্যজিয়া
চলিনু হিন্দুস্তান
কালোর দেশেতে কালো আমি কেন
করিতে যাইব দান ?

তাই এক ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিক ইরানের ঐ যুগকে শব্দার্থে 'ইণ্ডিয়ান সামার' বলেছেন। কারণ এর পরই ইরানী সাহিত্যের পতন আরম্ভ হয়।

তুর্কী ভাষার কিছুটা চর্চাও এদেশে হয়েছিল, কারণ বাবুর, হুমায়ুন এঁদের সকলেরই মাতৃভাষা তুর্কী। শেষ মোগল বাদশা-সালামৎ বাহাদুর শাহের হারেমেও কথাবার্তা তুর্কী ভাষাতেই হত এবং তুর্কী সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট না হলেও অন্যতম অত্যুৎকৃষ্ট কেতাব বাবুর বাদশার আত্মজীবনী। কিন্তু এ-তুর্কী ভাষা মুস্তফা কামালের টার্কির ওসমানলী তুর্কী নয়, বাবুরের ভাষা চুগতাই (বা জগতাই) তুর্কী। কোরমা, দোলমা এবং লড়াই-হাতিয়ারের কিছু শব্দ চুগতাই তুর্কী থেকে বাঙলাতে এসেছে। ওদিকে মোগল দরবার ফার্সীকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন বলে

Turkey's first volcanic eruption since the 15th century. A spokesman at the office of the Governor of Kars said the eruption of rock and smoke had caused anxiety and excitement among people living nearby, but there had been no serious damage yet.

তাঁদের তুর্কী এদেশে প্রচার ও প্রসার লাভ করে নি। যদিও প্রাচীন বাঙলাতে 'তুর্ক' বলতে মুসলমান বোঝাতো এবং তামিল ভাষাতে মুসলমান বোঝাতে হলে এখনও 'তুরুক্‌ম্‌' শব্দ ব্যবহার করা হয়। বাঙালী বেকার এখনো চাকরির সন্ধানে 'তুর্কী নাচন' নাচে।

আমরা ইংরিজী ফরাসী পড়ি, রাশান কথাসাহিত্যও আমাদের অজানা নয়, স্পেন পর্তুগাল দেনমার্কের লোক এদেশে এসেছিল এবং আরো অনেকেই,—কিন্তু আশ্চর্য ওসমানলি তুর্কী ভাষা এবং সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের কণামাত্র পরিচয় নেই। আমার জানামতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে পাবনা জেলার কবি ইসমাঈল হুসেন শিরাজী (নজরুল ইসলাম এঁর কাছে একাধিক বিষয়ে ঋণী বলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন) তুর্কীকে সাহায্য করার জন্য একটি মেডিকেল মিশন নিয়ে সে-দেশে গিয়েছিলেন এবং তুর্কী রাজনীতি, সমাজ, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বাঙলায় একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তুর্কীর সভাকবি হামিদ পাশার সঙ্গে সে সময়ে তাঁর হৃদ্যতা হয়, কিন্তু তুর্কী সাহিত্যের সঙ্গে বাঙলার পরিচয় করিয়ে দেবার পূর্বেই ইংরেজের চাপে তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হয়।[২]

তুর্কীর বাইরে ইরান, আফগানিস্থান, উজ্‌বেক, আজারবাইজান, তথা গ্রীস, বুলগারিয়া, রুমানিয়া ইত্যাদি দেশে নস্‌রুদ্দীন খোজা সুপরিচিত। ইরানের স্বর্ণযুগের একাধিক সুরসিক কবির উপর তাঁর প্রভাব সুস্পষ্ট। বল্কানের বাইরে ইয়োরোপে তিনি জর্মনিতে সব চেয়ে বেশী ভক্ত পাঠক পেয়েছেন। ইংরিজী এনসাইক্লোপীডিয়াতে তাঁর নাম নেই, জর্মন সাইক্লোপীডিয়া আকারে ইংরিজীর

২ 'সুপ্রভাত' পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্রকে (ইনি 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দের মেসোমশাই কৃষ্ণকুমার মিত্রের বড় মেয়ে) শিরাজী একটি কবিতা ও ছবি পাঠালে পর তিনি (কুমুদিনী) লেখেন, "আপনার কবিতা ও ছবি পাইয়া আমি পরম পুলকিত হইয়াছি। আপনার কবিতাটি 'সুপ্রভাতে' প্রকাশিত হইবে। তুরস্কের নারীদিগের অতীত ও বর্তমান অবস্থা, স্বদেশের কার্যে ও উন্নতিতে তাহাদের সাহায্যদান, তাহাদের শিক্ষা ও স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি সম্বন্ধে লেখা শীঘ্রই অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল যুবক আহতদিগের সেবার জন্য তথায় গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের কার্যের বিবরণ লিখিবেন।"

বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃঃ ৫৭।

অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও সেটাতে তাঁর সম্বন্ধে কয়েক ছত্র আছে। আর একাধিক অনুবাদ জর্মন ভাষাতে তো আছেই। অবশ্য আজকের দিনের রুচি দিয়ে বিচার করলে তাঁর বহু জিনিস শুধু কুট্টনীরসাশ্রিত লাতিনেই অনুবাদ করা যায়।

খোজার জীবনী নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করার উপায় নেই। কারণ তাঁর জীবন ও তাঁর হরেক রকমের রসিকতা এমনই জড়িয়ে গিয়েছে যে তার জট ছাড়ানো অসম্ভব। তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত দু'আনা পরিমাণ কিংবদন্তী বিশ্বাস করলে আমাদের কালিদাস সম্বন্ধে প্রচলিত সব ক'টাই বিশ্বাস করতে হয়। এমন কি তিনি পাঁচ শ' না সাত শ' বছর আগে জন্মেছিলেন সেই সমস্যারই চূড়ান্ত সমাধান এযাবৎ হয় নি। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে খোর্তো গ্রামে তাঁর জন্ম, সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এবং আক্‌শেহিরে তাঁর মক্‌বরহ্‌ বা সমাধিসৌধ দেখানো হয়। ইনি যে সুপণ্ডিত এবং সুকবি ছিলেন সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই, কারণ ধর্মশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি না থাকলে 'ইমাম' (ইংরিজীতে অন্ততপক্ষে বিশপ) হওয়া যায় না। অন্যান্য একাধিক ব্যাপারেও তিনি সমাজের অগ্রণীরূপে তুর্কী এবং তুর্কীর বাইরে সুপরিচিত ছিলেন।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তাঁর নামে প্রচলিত গল্পের কটি তাঁর নিজস্ব ও কটি উদোর শিব্‌নি বুধোর দর্গায় সে-বিচার অসম্ভব। দেশবিদেশের পণ্ডিতগণ হার মেনে বিক্রমাদিত্যের নামে প্রচলিত গল্প যে 'বিক্রমাদিত্য সাইক্‌ল্‌' খৈয়ামের নামে চলিত-অচলিত চতুষ্পদী 'খৈয়াম চক্র' নামে অভিহিত করেছেন ঠিক সেইরকম এখন খোজার নামে লিখিত, পঠিত, শ্রুত গল্পকে 'খোজা চক্র' নাম দিয়ে দায়মুক্ত হন। কিন্তু গল্পগুলো বিশ্লেষণ করে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে তার অনেকগুলোই আরবভূমি, প্রাচীন ইরান ও ভারতবর্ষ থেকে গিয়েছে। সিরিয়াক এবং প্রাচীন বল্কানেও এর অনেকগুলো প্রচলিত ছিল। অবশ্য এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সে সব বাদ দিলেও খোজার তহবিলে প্রচুর হাস্যরসের উপাদান উদ্বৃত্ত থেকে যায়। এবং তার চেয়েও বড় কথা— সুখে-দুঃখে, উৎসবে-ব্যসনে, মসজিদে-সরাইয়ে, বাজারে-বৈঠকখানায় খোজা যে ভাবে তাঁর গল্পে, আচরণে, ইঙ্গিতের মাধ্যমে নিজকে প্রকাশ করেছেন তারই একটি অতি সুস্পষ্ট হাস্যময়, সদানন্দ, দরদী ছবি তুর্কীদের বুকের ভিতর আঁকা। আজ যদি বেহশ্‌ৎ থেকে ফিরিশ্‌তা (দেবদূত) ইস্তাম্বুলে নেমে বিশ্বজনের কাছে সপ্রমাণ করে যান যে ইমাম নসরুদ্দীন্‌ খোজা নামক কোনো ব্যক্তি এ ধরায় জন্মগ্রহণ করেন নি তবুও তুর্কীর লোক অচঞ্চল চিত্তে সেই তসবীরই ধারণ

করবে, বিদেশীর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার কয়েক লহমার ভিতরেই খোজার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবে এবং যদি সেখানে একাধিক তুর্ক উপস্থিত থাকে, এবং আপনি যে খোজাকে চেনেন না সে-কথা বুঝতে পারে তবে আপসে পাল্লা লেগে যাবে কে কত বেশী খোজার গল্প বলতে পারে। এদেশে যেমন বিস্তর রবীন্দ্র-ভক্ত আছেন যাঁরা প্রত্যেক ঋতু পরিবর্তন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির রূপরসগন্ধ-স্পর্শ বিবর্তন রবীন্দ্রনাথের কোনো না কোনো গান, বা একাধিক গান দিয়ে প্রকাশ করতে পারেন, ঠিক তেমনি জীবনের সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ, দুর্ঘটনা, লটারি লাভ—সব কিছুই খোজার কোনো না কোনো গল্প দিয়ে রসরূপে প্রকাশ করা যায়। কারণ খোজা শুধু এলোপাতাড়ি রসসৃষ্টি করে যান নি—তার মারফতে খোজার পরিপূর্ণ জীবনদর্শন বা 'ভেন্টআনশাউঙ' পাওয়া যায়।

খোজার গল্প তিন রকমের। সহজেই অনুমান করা যায়, তিনি যেখানে চালাকি করে অন্যকে বোকা বানাচ্ছেন, কিম্বা মারাত্মক উত্তর দিয়ে প্রতি-পক্ষকে নিরস্ত্র করছেন তার সংখ্যাই বেশী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এন্তের গল্প আছে যেখানে তিনি একটি পয়লা নম্বরের ইডিয়েট, গাড়লস্য কুৎব্ মিনার। এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে বোঝা যায় না, তিনি বোকা না আমরা বোকা।

যেমন মনে করুন, খোজাকে অমাবস্যার রাতে শুধানো হল পূর্ণিমার চাঁদ গেল কোথায়? খোজা একগাল হেসে উত্তর দিলেন, 'তাও জানো না, পূর্ণিমার চাঁদকে প্রতি রাত্রে ফালি ফালি করে কেটে নেওয়ার পর এখন সেগুলো গুঁড়ো করে আকাশের তারা করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।'

খোজা বোকা বনতে চান, না বানাতে চান?

অবশ্য খোজার গীতিরস বা লিরিকরস অসাধারণ ছিল। এই কবিত্বময় ব্যাখ্যাটি দিয়ে তিনি যে গীতিরস সৃষ্টি করতে চান নি, বা যে-সব কবি অসম্ভব অসম্ভব তুলনা দিয়ে কাব্যরস সৃষ্টি করতে চান তাদের নিয়ে মস্করা করতে চান নি এ-কথা বলা কঠিন। কারণ আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রেও আছে,—

'প্রিয়ে, আকাশে চন্দ্রের মুখ দেখে
মনে হল তোমার মুখ,
তাই আমি চাঁদের পিছনে পিছনে ছুটছি।'

এ ধরনের তুলনাকে 'অসম্ভব তুলনা' বলে আলঙ্কারিক দণ্ডিন্ কাব্যাদর্শে নিন্দা করেছেন। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে এতে হাস্যরসের অবতারণা হওয়া বিচিত্র নয়। কথা নেই, বার্তা নেই, একটা লোক যদি চাঁদের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ খোয়াই-ভাঙা মাঠ-ময়দান ভেঙে ছুটতে আরম্ভ

করে আর বলতে থাকে, 'ঐ আমার প্রিয়া', 'ঐ আমার প্রিয়া' তাহলে পাড়ার ডন্ জোয়ানদেরও হেসে ওঠা অসম্ভব নয়।

তবু না হয় মেনে নেওয়া গেল, চাঁদকে গুঁড়ো করে খোজা ইচ্ছা করেই বোকা বনেছেন। কিন্তু এখন যেটা বলছি সেটাতে খোজা কি ?

দোস্তের বাড়ির দাওয়াতে খোজা খেলেন এক নতুন ধরনের মিশরী কাবাব। অতি সযত্নে এক টুকরো কাগজে লিখে নিলেন তার রেসিপি কিংবা পাকপ্রণালী কিংবা যাই বলুন। ততোধিক সযত্নে, ব-তরীবৎ সেটি রাখলেন জোব্বার ভিতরে গালাবিয়ার বুকপকেটে। রাস্তায় বেরিয়েই গেলেন তাঁর প্যারা কসাইয়ের দোকানে। আজ সন্ধ্যায়ই গিন্নীকে শিখিয়ে দেবেন কি করে এই অমূল্যনিধি রাঁধতে হয়। আর খাবেনও পেট ভরে। বন্ধুর বাড়িতে মেকদারটা একটু কম পড়েছিল। গোশ্‌ৎ কিনে খোজা রাস্তায় নামলেন।

হঠাৎ চিল এসে ছোঁ মেরে মাংস নিয়ে হাওয়া।

খোজা চিলের পিছনে ছুটতে ছুটতে আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে চিলকে বলতে লাগলেন, 'আরে কোরছ কি ? শুধু মাংসটা নিয়ে তোমার হবে কি ? রেসিপিটা যে আমার পকেটে রয়ে গেছে। কী উৎপাত! দাঁড়াও না।'

কিন্তু এভাবে গল্পের পর গল্প বলতে থাকলে খোজার সম্পূর্ণ গ্রন্থ নকল করে দিতে হয়। সম্পাদক আপত্তি জানাবেন।

এবারে তাহলে যে ধরনের গল্পের জন্য খোজা সুপ্রসিদ্ধ তারই একটি নিবেদন করি।

কথিত আছে, একদা খোজা জন্মভূমি তুর্কীর প্রতি বিরক্ত হয়ে দেশত্যাগ করে ইরান দেশে চলে যান। এতে আশ্চর্য হবার মত কিছুই নেই। কারণ খোজা ছিলেন কাণ্ডজ্ঞানহীন পরোপকারী—আমাদের বিদ্যাসাগরের মত দাগা খাওয়া বিচিত্র নয়।

তা সে যাই হোক,—লোকমুখে ইরানের রাজা সে খুশ-খবর শুনে বে-এক্তেয়ার। তড়িঘড়ি লোকলশ্‌করসহ উজীর-ই-আলাকে পাঠিয়ে দিলেন খোজাকে পরম যত্নসহকারে রাজদরবারে নিয়ে আসতে। খোজা আসামাত্র তখ্‌ৎ-ই-সুলেমান ত্যাগ করে বাদশা তাঁকে আলিঙ্গন করে পাশে বসালেন। মাথায় সোনার তাজ পরিয়ে দিলেন, গায়ে কাশ্মীরী শাল জড়িয়ে দিলেন, কোমরবন্ধে দমশ্‌কী তলওয়ার ঝুলিয়ে দিলেন। চতুর্দিকে জয়জয়কার।

সভাভঙ্গের পর বাদশা নিভৃতে ইতি-উতি করে, আশ-কথা পাশ-কথা কাড়ার

পর অতি সন্তর্পণে তাঁর জাগীরের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। খোজা করজোড়ে 'সে কি শাহ্-ইন-শাহ, আপনার যে পূত পবিত্র…' ইত্যাদি[৩] বলে তিনি নিবেদন করলেন, রাজসম্মানই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট।

বাদশাহ বিস্তর চাপাচাপি করার পর খোজা বললেন, 'হুজুরের যখন নিতান্তই এ হেন বাসনা তবে হুকুমজারী করে দিন কাল সকাল থেকে যারা বউকে ডরায় তারা আমাকে একটি করে ডিম প্রতি সকালে দেবে।'

দীন-দুনিয়ার মালিক বাদশা তো তাজ্জব। 'ওতে আপনার কি হবে? আমি খবর পেয়েছি, আপনি দান-খয়রাতে দাতাকর্ণ।'

খোজা এলবুর্জ পাহাড়ের মত অচল অটল। তবে তাই সই। ইরানী ভাষায় বলতে গেলে আলোচনার কার্পেট তখন রোল্ করে গুটিয়ে ঘরের কোণে খাড়া করে রেখে দেওয়া হল।

পরদিন ফজরের নমাজের সময় থেকেই হৈ-হৈ রৈ-রৈ। এস্তেক রাজবাড়িতেও মমলেট-অমলেট নেই। কি ব্যাপার? যাদের বাড়িতে মুর্গী নেই তারা ফজরের আজানের পূর্বে ছুটেছে বাজারপানে। ডিম কিনে ধাওয়া করেছে খোজার ডেরার দিকে।

সেখানে ডাঁই ডাঁই হুদো হুদো আণ্ডার ছয়লাপ! আণ্ডার নবীন ব্রহ্মাণ্ড!

পাইকিরী ব্যবসায়ীরা চতুর্দিকে বসে!

সাতদিন যেতে-না-যেতে খোজা ঢাউস তেতলা হাওয়া-মঞ্জিল হাঁকালেন। পক্ষাধিককাল মধ্যেই বোখারার কার্পেট, সমরকন্দের রেশমী তাকিয়া, মুরাদাবাদী আতরদান, গোলাপ-পাশ, বিদরী আলবোলা, রাজস্থানের গোলাপী মার্বেলের ফোয়ারা, সরণ-দীপের (স্বর্ণদ্বীপ সিংহল) হাতির দাঁতের চামর, ব্যজনী!

বাদশা তো আজব তাজ্জব মানলেন।

কুলোকে বলে, দু'একজন অমিতবীর্য অসীম সাহসী শের-দিল রুস্তম নাকি ডিম নিয়ে যায় নি দেখে তাদের (অথবা তার) স্ত্রী নাকি শুধিয়েছিল, 'ওঃ! তুমি বুঝি আমাকে ডরাও না?' তারপর আর দেখতে হয় নি!

ইরানের বাদশা খুশীতে তুর্কীর খাস খলীফাকে ছাড়িয়ে গেছেন।

এমন সময় রাজার মস্তকে বজ্রাঘাত। খোজা তিন মাসের ছুটি চান,—দেশ থেকে বউ-বাচ্চা নিয়ে আসবেন বলে। খোজা মারাত্মক একদারনিষ্ঠ। রাজা

৩ ইরানে বাদশার সামনে কোন্ মন্ত্র দিয়ে নিবেদন আরম্ভ করতে হয়, তার পুরো বিবরণের জন্য 'দেশে-বিদেশে' অধ্যায় পশ্য।

আর কি করেন, অতি অনিচ্ছায় ছুটি দিলেন, অবশ্য, তিন মাস রিট্রেঞ্চ করে দু'মাসের তরে। যাবার সময় বললেন, 'দোস্ত! দেরি করবেন না, আপনার বিরহে আমার—' বাদশার গলা জড়িয়ে এল। ততদিনে তাঁদের সম্পর্ক আর রাজা-প্রজায় নয়—দোস্তীতে এসে দাঁড়িয়েছে।

দু'মাসের কয়েক দিন পূর্বেই খোজা রাজসভায় পুনরায় উপস্থিত। রাজা পরমানন্দে রাজোচিত ভাষায় শুধালেন, 'তবে কি পুণ্যশ্লোকা বেগম-সাহেবা স্ব-ভবনে অবতীর্ণা হয়েছেন?'

খোজা বললেন, 'হ্যাঁ হুজুর! তবে কি না, ভবনটি তাঁর উপর অবতীর্ণ হলেই হত আরো ভালো।'

তদ্দণ্ডেই সভাভঙ্গের হুকুম হল। বাদশা নিয়ে গেলেন খোজাকে অন্দরমহলে।

'শতেক বছর পরে বঁধুয়া আসিল ঘরে—'

বাদশার তখন ঐ হাল। দোস্তের সঙ্গে নিভৃতে দুহুঁ দুহুঁ হয়ে কুহু কুহু করবেন।

দু-পাত্র শিরাজী খেয়ে বাদশা খোজার কাছে ঘেঁষে বললেন, 'দোস্ত্! রাজ্যের আর সকলের সঙ্গে আমার রাজা প্রজার সম্বন্ধ। তারা আমার কাছ থেকে চায়; আমি তাদের দি। কিন্তু আপনি আমার দোস্ত—আপনার সঙ্গে দোস্তীর সম্পর্ক। দোস্ত যখন দেশে ফেরে তখন দোস্তের জন্য—' বাদশা গলা সাফ করে বললেন, 'এই, ইয়ে, মানে, কোনো কিছু একটা সওগাত আনে। আপনি তো আনেন নি।'

বলে বাদশা খ্যাঁক খ্যাঁক করে বিশ্রী রকমের হাসতে লাগলেন।

না-হক্ বেইজ্জৎ হলে মানুষ যে রকম বেদনাতুর কণ্ঠে ককিয়ে ওঠে, খোজা সেইরকম বললেন, 'জহাঁপানা কুল্লে দুনিয়ার ইমান-ইনসাফের মালিক, এ সংসারে আল্লা-তালার ছায়া (জিল্লুল্লা)—আমার উপর অবিচার করবেন না। এনেছি, আলবৎ এনেছি। দেশে পৌঁছে সকলের পয়লা হুজুরেরই সওগাত সংগ্রহ করেছি। আজ সঙ্গে আনি নি। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হয়। কাল সন্ধ্যায় নিয়ে আসবো।'

একেই বলে দোস্ত্!

উদ্‌গ্রীব হয়ে রাজা শুধালেন, 'কি? কি? আমার যে তর সইছে না। আঃ, জীবনে এই প্রথম কিছু-একটা পেলুম।'

খোজা বললেন, 'নিজের আনা সওগাতের প্রশংসা করতে বাধছে, কিন্তু সত্যি হুজুর—অপূর্ব, অতুলনীয়। একটি অপরূপ সুন্দরী তুর্কী তরুণী আপনার জন্য

এনেছি হুজুর।'[৪]

ঝঙ্কারের জন্য ফার্সীটা শুনুন :

'অগর্ আন্ তুর্ক্-ই-শিরাজী
বদস্ত্ আরদ্ দিল-ই মারা
ব্-খাল-ই হিন্দো ওশ বখ্শম্
সমর্কন্দ্ ওয়া বুখারারা।'

কথিত আছে এ দোঁহা লিখে হাফিজকে তিমুর লেনের সামনে বিপদে পড়তে হয়েছিল। সেটা বারান্তরে হবে।

তারপর খোজা উচ্ছ্বসিত হয়ে সেই তরুণীর রূপবর্ণনা আরম্ভ করলেন, একেবারে আমাদের বিদ্যাপতি স্টাইলে, নখ্ থেকে শির পর্যন্ত—যাকে বলে নখ-শির বর্ণন। 'ওহো হো হো,—একটি তন্বঙ্গী চিনার গাছ হেন! কী দোলন, কী চলন!'

৪ ইরানে তুর্কী রমণীর বড়ই কদর।

'হে তরুণী হে তুরস্কী, হে সুন্দরী সাকি
এমনি হৃদয় মুগ্ধ করিয়াছ তুমি,
তব কপোলের ঐ কৃষ্ণ তিল লাগি
বোখারা সমরকন্দ দিতে পারি আমি।'

অনুবাদটি ভালো নয়। কিন্তু হাফিজের এই কবিতাটি এতই বিখ্যাত যে, তার একাধিক ইংরিজী অনুবাদ আছে,—

"If that unkindly Shirazi Turk
would take my heart in her hand
"I'd give Bukhara for the mole upon
her cheek, and Samarkand."

কিম্বা

"Sweet maid, if thou wouldst charm my sight ;
And bid these arms thy neck infold ;
That rosy cheek, that lily hand
Would give thy poet more delight
Than all Bokharas vaunted gold.
Than all the gems of Samarkhand."

বাদশা বললেন, 'আস্তে।'

কিন্তু খোজাকে তখন পায় কে, তিনি মৌজে। গলা চড়িয়ে বললেন, 'চিকুর কেশ তো নয়, যেন অমা-যামিনীর স্বপ্নজাল—আর্দ্র, স্নিগ্ধ, মৃগনাভি সম।'

উৎসাহের তোড়ে খোজা তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। যেন রাজকবি দরবারের সবাইকে শুনিয়ে কবিতা পাঠ করছেন।

বাদশা ব্যাকুল হয়ে খোজার জোব্বা টেনে কাতর কণ্ঠে বললেন, 'চুপ্, চুপ্, আস্তে আস্তে—পাশের ঘরে বেগম-সায়েবা রয়েছেন।'

ঝুপ্ করে বসে পড়ে খোজা বিনয়নম্র কণ্ঠে বললেন, 'হুজুর, কাল সকাল থেকে একটি করে আণ্ডা পাঠিয়ে দেবেন। আমার পাওনা।'

এইখানেই খোজা-কাহিনী শেষ করলে ঠিক হত। কিন্তু তাহলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। তিনি পরলোকগমনের পূর্বে যে শেষ রসিকতাটি করে গিয়েছেন, সেটি বাদ পড়ে যায়। কারণ সেটি আজও প্রথম দিনের মত তাজা, অতিশয় নব—ফার্সীতে যাকে বলে 'তাজা ব্-তাজা, নৌ-ব-নৌ'[৫]। দ্বিতীয়ত, আণ্ডার গল্পটি আমি শুনেছি আমার সর্ব-কনিষ্ঠা ভগিনী লুৎফুন্নিসার কাছ থেকে। আমার মত তার পায়েও চক্কর আছে। সে শুনেছে, লাহোর না পেশাওয়ার কোথায় যেন। এর থেকে এটাও বোঝা যায়, খোজার গল্প মুখে মুখে কতখানি ছড়িয়ে পড়েছে। এখন বাঙলা দেশেও পৌছল। সপ্তদশ অশ্বারোহী গাজা! দশ বাদ দিয়ে সপ্ত শতাব্দীতেই হয়।

এবারে শেষ গল্প। এটাতে আপনি আমি সবাই আছি।

যেমন মনে করুন, দৈবযোগে আপনি পৌচেছেন আক্‌শেহিরে। স্বভাবতই আপনার মনে বাসনা, দিলে ইরাদা জাগবে খোজার গোরস্তান দেখবার জন্য। একাই বেরিয়ে পড়ুন, কিচ্ছুটি ভাবনা নেই, সবাই রাস্তা চেনে।

সেখানে গিয়ে দেখবেন, সামনে এক বিরাট দেউড়ি—প্রবেশদ্বার। কোথায় লাগে তার কাছে ফতেহ্-পুর-সিক্রিতে আকবর বাদশার বুলন্দ-দর্‌ওয়াজ্। একেবারে শিশু। তা না হয় হল, কিন্তু অবাক হবেন দেখে যে বন্ধ দরজায় এক বিরাট তিন মণ ওজনের তালা!

গোরস্থানে আছেই বা কি, যাবেই বা কি? এই ভারতবর্ষেই লুটতরাজের ফলে যা কিছু ইমারৎ বেঁচে আছে, সেগুলো হয় কবর নয় মসজিদ—ওসবে লুটের

৫ সত্যেন দত্তের অনুবাদ আছে।

কিছু নেই বলে। তিন মণী তালা দিয়ে খোজার দেহরক্ষা—অন্তার্থে—করা হচ্ছে, মিশরী মমীর মত ? কিন্তু ইসলামে তো হেন ব্যবস্থা নেই।

নাচার হয়ে তালাটা বন্ধ দোরে বার কয়েক ঠুকলেন, এদিক ওদিক গলা বাড়িয়ে চেল্লাচেল্লি ঝরলেন।

তখন দরাজ-দেউড়ির একপাশ দিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে বেরিয়ে এল পাহারা-ওলা। আপনাকে সবিনয় নিবেদন করবে, 'কি হবে ঐ বিরাট তালা খুলে। ওটা কখনো খোলা হয় নি। চলুন পাঁচিল ডিঙিয়ে যাই।'

মানে ?

একশ' ফুট উঁচু দেউড়ি—চতুর্দিকের পাঁচিল উঁচুতে এক ফুট হয় কি না হয়।

মানে ?

খোজার আখেরী-শেষ-মস্বরা। উইলে এইভাবে তৈরী করবার আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন।

বলতে চেয়েছিলেন, 'এ জীবনে আমরা সামনের দিকটা আগলাতেই ব্যস্ত। ইতিমধ্যে আর সব দিক দিয়ে যে বেবাক কিছু চলে যায়, তার খবর রাখি নে।'

* *

আমি আক্‌শেহির যাই নি। কাজেই হলপ খেয়ে বলতে পারবো না, খোজার দর্গা এই পদ্ধতিতে নির্মিত কি না। যদি না হয় তবে বুঝবো খোজা আরো মোক্ষম রসিক। বিন খর্চায় আমাদের এখনো হাসাচ্ছেন আব বোকা বানাচ্ছেন।

নজরুল ইসলাম ও ওমর খৈয়াম

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, শ্রীরামপুর হুগলী এবং পরবর্তী যুগে কলকাতায় অনেকখানি আরবী-ফার্সীর চর্চা হয়েছিল বটে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এ চর্চা খুব ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। তার প্রধান কারণ অতি সরল—ইসলাম পশ্চিম-বঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পূর্ববাংলার মত ছড়িয়ে পড়তে পারে নি, কাজেই অতি সহজেই অনুমান করা যায়, চুরুলিয়া অঞ্চলে পীর-দরবেশদের কিঞ্চিৎ সমাগম হয়ে থাকলেও মৌলবী-মৌলানারা সেখানে আরবী-ফার্সীর বড় কেন্দ্র স্থাপনা করতে পারেন নি।

তদুপরি নজরুল ইসলাম ইস্কুলে সুবোধ বালকের মত যে খুব বেশী আরবী-ফার্সী চর্চা করেছিলেন তাও মনে হয় না। ইস্কুলে তিনি আদৌ ফার্সী (আরবীর সম্ভাবনা নগণ্য) অধ্যয়ন করেছিলেন কি-না, সে সম্বন্ধেও আমরা বিশেষ কিছু

জানি নে। শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ নিশ্চয়ই অনেক কিছু বলতে পারবেন।

তারো পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেওয়ার ফলে তিনি যে এ সব ভাষায় খুব বেশী এগিয়ে গিয়েছিলেন তাও তো মনে হয় না। পল্টনের হাবিলদার যে জাব্বা-জোব্বা পরে দেওয়ানা-দেওয়ানা ভাব ধরে হাফিজ-সাদীর কাব্য কিম্বা মৌলানা রুমীর মসনবী সামনে নিয়ে কুঞ্জে কুঞ্জে ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়াবে তাও তো মনে হয় না। এমন কি রঙীন সদরিয়ার উপর মলমলের বুটিদার অঙ্গরখা পরে হাতে শিরাজীর পাত্র নিয়ে সাকীর কণ্ঠে ফার্সী গজল আর কসীদা-গীত শুনছেন, এও খুব সম্ভবপর বলে মনে হয় না। কসম খেয়ে এ বিষয়ে কোনো কিছু বলা শক্ত, তবে এটা তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, কাব্যে যদ্যপি 'খাকী' এবং 'সাকী' চমৎকার মিল, তবু বাস্তব জীবনে এ দুটোর মিল এবং মিলন সচরাচর হয় না।

তবু নজরুল ইসলাম মুসলিম ভদ্রঘরের সন্তান। ছেলেবেলায় নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ আলিফ, বে, তে করেছেন, দোয়া-দরুদ (মন্ত্র-তন্ত্র) মুখস্থ করেছেন, কুরান পড়াটা রপ্ত করেছেন। পরবর্তী যুগে তিনি কুরানের শেষ অনুচ্ছেদ 'আমপারা' বাঙলা ছন্দে অনুবাদ করেন—হালে সেটি প্রকাশিত হয়েছে। সে পুস্তিকাতে তাঁর গভীর আরবী জ্ঞান ধরা পড়ে না—ধরা পড়ে তাঁর কবি-জনোচিত অন্তর্দৃষ্টি এবং আমপারার সঙ্গে তাঁর যে আবাল্য পরিচয়। বিশেষ করে ধরা পড়ে, দরদ দিয়ে সৃষ্টিকর্তার বাণী (আল্লার 'কালাম') হৃদয়ঙ্গম করার তীক্ষ্ণ এবং সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা।

এরই উপর আমি বিশেষ করে জোর দিতে চাই। ফার্সী তিনি বহু মোল্লা-মৌলবীর চেয়ে কম জানতেন, কিন্তু ফার্সী কাব্যের রসাস্বাদন তিনি করেছেন তাঁদের চেয়ে অনেক বেশী। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অনেক সংস্কৃত ব্যাকরণবাগীশদের চেয়ে কম সংস্কৃত জানতেন, কিন্তু তিনি লিরিকের রাজা মেঘদূতখানা জীবন এবং কাব্য দিয়ে যতখানি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন ততখানি কি কোনো পণ্ডিত পেরেছেন? বহু লোকই বাঙলা দেশের মাটি নিখুঁতভাবে জরিপ করেছে, কিন্তু ঐ মাটির জন্য প্রাণ তো তারা দেয় নি। কানাইলাল, ক্ষুদিরাম ভালো জরিপ জানতেন এ কথাও তো কখনো শুনি নি।

কাজী রোমান্টিক কবি। বাঙলা দেশের জল-বাতাস, বাঁশ-ঘাস যে রকম তাঁকে বাস্তব থেকে স্বপ্নলোকে নিয়ে যেত, ঠিক তেমনি ইরান-তুরানের স্বপ্নভূমিকে তিনি বাস্তবে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন বাঙলা কাব্যে। ইরানে তিনি কখনো যান নি, সুযোগ পেলেই যে যেতেন, সে কথাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না (শুনেছি, পণ্ডিত হয়েও মাক্সম্যুলার ভারতবর্ষকে ভালবাসতেন এবং তাই বহুবার সুযোগ পেয়েও এদেশে আসতে রাজী হন নি।) কিন্তু ইরানের গুল্ বুল্‌বুল্,

শিরাজী-সাকী তাঁর চতুর্দিকে এমনই এক জানা অজানার ভুবন সৃষ্টি করে রেখেছিল যে গাইড-বুক, টাইম-টেবিল ছাড়াও তিনি তার সর্বত্র অনায়াসে বিচরণ করতে পারতেন। গুণীরা বলেন, প্রত্যেক মানুষেরই দুটি করে মাতৃভূমি—একটি তাঁর আপন জন্মভূমি ও দ্বিতীয়টি প্যারিস। কাজীর বেলা বাঙলা ও ইরান। কীটস বায়রনের বেলা যে রকম ইংল্যাণ্ড ও গ্রীস।

আরবভূমির সঙ্গে কাজী সায়েবের যেটুকু পরিচয়, সেটুকু প্রধানতঃ ইরানের মারফতেই। কুরান শরীফের 'হারানো ইউসুফের' যে করুণ কাহিনী বহু মুসলিম অমুসলিমের চোখে জল টেনে এনেছে তিনি কবিরূপে তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন ফার্সী কাব্যের মারফতে।

দুঃখ করো না, হারানো য়ুসুফ
কাননে আবার আসিবে ফিবে।
দলিত শুষ্ক এ-মরু পুনঃ
হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে॥
ইউসুফে গুম্‌গশ্‌তে বা'জ্‌ আয়দ্‌ ব্‌ কিনান্‌
গম্‌ ম্‌ খুব।
কুল্‌বয়ে ইহ্‌জান্‌ শওদ্‌ রূজি গুলিস্তান্‌
গম্‌ ম্‌ খুর॥

কাজী সায়েবের প্রথম যৌবনের রচনা এই ফার্সী কবিতাটির বাঙলা অনুবাদ অনেকেরই মনে থাকতে পারে। 'মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়ে'র অনুকরণে 'শাতিল আরব শাতিল আরব' ঐ যুগেরই অনুবাদ।

কোনো কোনো মুসলমান তখন মনে মনে উল্লসিত হয়েছেন এই ভেবে যে, কাজী 'বিদ্রোহী' লিখুন আর যা-ই করুন, ভিতরে ভিতরে তিনি খাঁটি মুসলমান। কোনো কোনো হিন্দুর মনেও ভয় হয়েছিল (যাঁরা তাঁকে অন্তরঙ্গ ভাবে চিনতেন তাঁদের কথা হচ্ছে না) যে কাজীর হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি বোধ হয় বাঙলার জন্য নয়—তাঁর দরদ বুঝি ইরান-তুরানের জন্য। পরবর্তী যুগে—পরবর্তী যুগে কেন, ঐ সময়েই কবিকে যাঁরা ভালো করে চিনতেন, তাঁরাই জানতেন, ইরানী সাকীর গলায় কবি যে বার বার শিউলির মালা পরিয়ে দিচ্ছেন তার কারণ সে তরুণী মুসলমানী বলে নয়, সে সুন্দরী ইরানের বিদ্রোহী কবিদের নর্ম সহচরী বলে—ইরানের বিদ্রোহী আত্মা কাব্যরূপে, মধুররূপে তার চরম প্রকাশ পেয়েছে সাকীর কল্পনায়।

সে বিদ্রোহ কিসের বিরুদ্ধে ?

এস্থলে কিঞ্চিৎ ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন।

ইরানী ও ভারতীয় একই আর্যগোষ্ঠীর দুই শাখা। দুই জাতির ইতিহাসেই অনেকখানি মিল দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইরানীরা যে রকম দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে একদিকে মিশর প্যালেস্টাইন, অন্যদিকে গ্রীস পর্যন্ত হানা দিয়েছিল, ভারতীয়েরা সে রকম করে নি। দ্বিতীয়তঃ বিদেশী অভিযানের ফলে ইরানভূমি যে রকম একাধিকবার সম্পূর্ণ লণ্ডভণ্ড হয়েছে, ভারতবর্ষের ভাগ্যে তা কখনো ঘটে নি। এ সব কারণেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক ইরানীরা সভ্যতার প্রথম যুগ থেকেই সে এক উগ্র স্বাজাত্যাভিমানের সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষ যেখানে শান্তভাবে বিদেশীর ভালো-মন্দ দেখে-চিনে নিজকে মেলাবার, পরকে আপন করার চেষ্টা করেছে, ইরান সেখানে আদৌ সে চেষ্টা করে নি এবং শেষটায় যখন বাধ্য হয়ে সব-কিছু নিতে হয়েছে তখন করেছে পরবর্তীকালে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

গ্রীস-রোমের কাছে পরাজিত হওয়া এক কথা, আর প্রতিবেশী 'অনুন্নত', 'অর্ধসভ্য' আরবদের কাছে পরাজিত হওয়া আরেক কথা। তদুপরি গ্রীক রোমানরা ইরানে যে সভ্যতা এনেছিল, তাতে গরীব-দুঃখীর জন্য নূতন কোনো আশার বাণী ছিল না। যে নবীন ধন-বণ্টন পদ্ধতি দ্বারা হজরৎ মুহম্মদ আরব দেশের আপামর জনসাধারণকে ঐক্যসূত্রে গ্রন্থন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁর বাণী এসে পৌঁছল ইরানে। ফলে মুহম্মদ সাহেবের পরবর্তীগণ যখন একদিন অন্যান্য জাতির মত দিগ্বিজয়ে বেরোল তখন ইরানী শোষক সম্প্রদায় দেখে মর্মাহত ও স্তম্ভিত হল যে, ইরানের জনসাধারণ আরবের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হল না। তারপর আরবরা বিজিত দেশের ধর্মজগতে যে সাম্যবাদ ও অর্থের ক্ষেত্রে যে ধনবণ্টন পদ্ধতি প্রচার করলো, তাতে আকৃষ্ট হয়ে ইরানের জনসাধারণ মুসলমান হয়ে গেল। জ্ঞানাভিমানী ও ধর্মযাজক সম্প্রদায়ও শেষ পর্যন্ত ঐ ধর্ম গ্রহণ করল। তখনকার মত ইরানী সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রায় লোপ পেয়ে গেল।

কিন্তু বিদ্রোহ লুপ্ত হল না।

সেটা দেখা দিল প্রায় চারশ' বছর পরে ফিরদৌসীর মহাকাব্য 'শাহনামা'তে। রাষ্ট্রভাষা আরবীকে উপেক্ষা করে ফিরদৌসী গাইলেন প্রাক-মুসলিম যুগের ইরানী বীরের কাহিনী, রাজার দিগ্বিজয়, প্রেমিকের বিরহ-মিলন গাথা—নবীন অথচ সনাতন সেই ফার্সী ভাষায়। যে ফার্সী কাব্য-সাহিত্য পরবর্তী যুগে বিশ্বজনের বিস্ময় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, তার প্রথম সার্থক কবি ফিরদৌসী।

এই নূতন ভাষাতে, নবীন প্রাণে উন্মত্ত হয়ে যে সব কবি কাব্যের সর্ব বিষয়বস্তু নিয়ে নব নব কাব্যধারার প্রবর্তন করলেন তার কাছে পরবর্তী যুগের

ইউরোপীয় রেনেসাসও এতখানি সর্বমুখী ব'লে মনে হয় না। দু'শ বছর যেতে না-যেতেই বিশ্বের কাব্যজগতে ইরান তার অদ্বিতীয় আসন সৃষ্টি করে নিল।

এঁদের মধ্যে সত্য বিদ্রোহী কবি ওমর খৈয়াম।

* *

ইরানে ইসলাম প্রচারিত হওয়ার ফলে শিক্ষিত তথা পুরোহিত সম্প্রদায়ের ভিতর বিভিন্ন আন্দোলনের সৃষ্টি হল। তার প্রথম

(১) যাঁরা মুসলিম শাস্ত্রের চর্চা করে যশস্বী হলেন। ভাবলে আশ্চর্য বোধ হয়, ইরানীরা আরবীর মত কঠিন ভাষা আয়ত্ত করে সে শাস্ত্রে এতখানি ব্যুৎপত্তি অর্জন করলো কি করে? মুসলমানদের মনুর নাম ইমাম আবু হানীফা। পৃথিবীর শতকরা আশীজনেরও বেশী মুসলমান আজ নিজকে হানফী অর্থাৎ আবু হানীফার মতবাদে বিশ্বাসকারী বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু তাতে আশ্চর্য হবার মত কীই বা আছে? শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য তো শুনেছি ভারতবর্ষের দক্ষিণতম কোণের লোক, এবং তাঁর ধমনীতে যে অত্যধিক আর্যরক্ত ছিল তাও তো মনে হয় না, অন্ততঃ একথা তো অনায়াসে বলা যেতে পারে যে, আর্য উত্তর ভারতের তুলনায় মালাবারে সংস্কৃত-চর্চা ছিল অনেক কম। তবু যে তিনি শুধু তাঁর মাতৃভূমি মালাবারে বৌদ্ধদের পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাই নয়, আর্য উত্তর ভারতেও তিনি তাঁর বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইরানী আবু হানীফার মতবাদও একদা ইসলামের জন্মভূমি মক্কা-মদীনা তথা আরব দেশ জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। এ রকম উদাহরণ পৃথিবীতে আরো আছে।

(২) যাঁরা ক্রিয়াকাণ্ড, টীকা-টিপ্পনী, মন্ত্রতন্ত্রে সম্পূর্ণ আস্থা না দিতে পেরে 'রহস্যবাদ' বা সুফীতত্ত্বের প্রচার এবং প্রসার করতে লাগলেন, এঁরা ভগবানের আরাধনা করেন রসের মাধ্যমে এবং বাঙলার বৈষ্ণব তথা 'মরমিয়া'দের সঙ্গে এঁদের তুলনা করা যেতে পারে।

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা
কাজ নাই, সখি, তাঁদের কথায়
বা হয়ে থাকেন তাঁরা।

* *

ঐ চাহনিতে বিশ্ব মজেছে
পড়িয়াছে কত অশ্রুধার
পাগল করলি এ প্রমত্ত আঁখি
কুলমান রাখা হৈল ভার।

এ ধরনের কবিতা সূফী ও বৈষ্ণবদের ভিতর এতই প্রচলিত যে, কোন্‌টি সূফী কোন্‌টা বৈষ্ণব ধরে ওঠা অসম্ভব। যদি বলি,

প্রেম নাই, প্রিয় লাভ আশা করি মনে
রাধিকার মত ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে।

তবে চট করে কেউ আপত্তি করবেন না। অথচ আসলে আছে,

প্রেম নাই, প্রিয় লাভ আশা করি মনে
হাফেজের মত ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে।

('সদ্ভাব-শতক' কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের অনুবাদ)

বৈষ্ণবদের সঙ্গে এঁদের আরো বহু মিল আছে। এঁদের সূফীবাদ পরবর্তী যুগে তথাকথিত 'তুর্কী'রা গ্রহণ করে। বাঙলা দেশে প্রথম যে মুসলমানরা আসেন তাঁদের আমরা 'তুর্ক', 'তুরুক্' নাম দি (প্রাচীন বাঙলার 'মুসলমান' শব্দের প্রতিশব্দ 'তুর্ক'—তামিলে এখনো 'তুরুষ্ক') এবং তাঁদের চক্রাকারে নৃত্য করে আল্লার নাম জপ ('জিক্‌র'—যার থেকে বাঙলা 'জিগির' শব্দ এসেছে) করা দেখে 'তুর্কী-নাচন-নাচা' প্রবাদটি এসেছে। বৈষ্ণবদের মত এঁরাও জপ করতে করতে 'হাল' ('দশা') প্রাপ্ত হন,—অর্থাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন ও মুখ দিয়ে তখন প্রচুর ফেনা বেরয়। পূর্ব ইয়োরোপে এই নাচ দেখে ইয়োরোপীয়রা এদের নাম দিয়েছিল "ডানসিং দরবেশ"। ইংরিজীতে কথাটা এখনো চালু আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অত্যধিক বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন, কারণ আউল-বাউল, ভাটিয়ালি-মুর্শীদীয়া গীত যাঁরাই শুনেছেন, তাঁরাই এই ফার্সী, সূফী ভক্তিবাদের কিঞ্চিৎ গন্ধস্পর্শ পেয়েছেন।

(৩) দার্শনিক সম্প্রদায়। আর্যগোষ্ঠীর দুই সম্প্রদায়—ভারতীয় ও গ্রীকরাই প্রধানতঃ দর্শনের চর্চা করেছেন।

মাহমুদ বাদশার সভাপণ্ডিত 'ভারতবর্ষ' পুস্তকের (প্রাচীন তথা অর্ধাবাচীন ভারতের বহুমুখী কার্যকলাপ, চিন্তা, অনুভূতির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত হতে চান তাঁদের পক্ষে এ পুস্তক অপরিহার্য; বস্তুতঃ বর্তমান লেখক ব্যক্তিগত ভাবে এ পুস্তককে 'মহাভারতে'র পরেই স্থান দেয়) লেখক পণ্ডিত অল-বীরুনী মুক্তকণ্ঠে বলেছেন, 'দর্শনের চর্চা করেছেন গ্রীক এবং ভারতীয়েরা—আমরা (অর্থাৎ আরবী লেখকেরা) যেটুকু দর্শন শিখেছি তা এদের কাছ থেকেই।' কথাটা মোটামুটি সত্য, যদিও পণ্ডিতজনসুলভ কিঞ্চিৎ বিনয় প্রকাশ এতে রয়েছে, কারণ আরবরা গ্রীকদর্শনের আরবী অনুবাদ দিয়ে দর্শন-চর্চা আরম্ভ করেছিলেন সত্য কিন্তু পরবর্তী যুগে আভিচেন্না (বু আলী সিনা), আভেরস (আবু রুশ্‌দ্) ও গজ্‌জালী

(অল-গাজ্জেল- এঁর 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাঙলায় অনূদিত হয়ে রাজশাহীতে প্রকাশিত হয়) বহু মৌলিক চিন্তা দ্বারা পৃথিবীর দর্শন ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু স্মরণ রাখা ভালো, এঁদের দর্শন শঙ্কর দর্শনেরই ন্যায় ধর্মাশ্রিত এবং যে-স্থলে কুরানের বাণীর সঙ্গে গ্রীক দর্শনের দ্বন্দ্ব বেঁধেছে সেখানে তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন সে-দ্বন্দ্বের সমাধান করার এবং সময়ে সময়ে তখন তাঁরা নিও-প্লাতোনিজম অর্থাৎ ভারতের উপনিষদসম্মত অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর করেছেন। এ দের বিশেষ নাম 'মুতকল্লিমুন' এবং পরবর্তী যুগে এদেশের রাজা রামমোহন তাঁর বিশ্বদর্শন (ভেন্টানশাউউঙ) নির্মাণে এঁদের পরিপূর্ণ সাহায্য নিয়েছেন।

(৪) ঐতিহাসিক ও কবিগোষ্ঠী। ইতিহাস-চর্চায় আরবদের দক্ষতা সর্বজনমান্য, তবে ইরানীরাও এ-শাস্ত্র তাঁদের কাছ থেকে শিখে নিয়ে এর অনেক উন্নতিসাধন করেন। কিন্তু আমরা যে যুগের আলোচনা করছি তখনো ইরানীদের কাছে ইতিহাস ও পুরাণের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে ধরা দেয় নি। ফিরদৌসীর 'শাহনামা' (রাজবংশ) কাব্যের রাজা-মহারাজা, নায়ক-নায়িকারা অধিকাংশই কবিজনসুলভ কল্পনাপ্রসূত—অন্তত তাঁদের কীর্তিকলাপ তো বটেই। কিন্তু সব চেয়ে লক্ষ্য করার বিষয়, প্রাক-ইসলামী এই সব অগ্নিউপাসক নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে ফিরদৌসীর কী গগনচুম্বী গরিমা, দম্ভ এবং সময় সময় আস্ফালন। এ যেন বিজয়ী আরবদের বার বার শুনিয়ে শুনিয়ে বলা, 'কালনেমির বিরূপাবর্তনে আজ আমাদের পতন ঘটেছে বটে, কিন্তু এই কাব্যে দেখ, আমরা একদিন সভ্যতার কত উচ্চ শিখরে উঠেছিলুম। সে-দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখো। ওখানে তোমরা কখনো পৌঁছও নি, পৌঁছবেও না।' এ সুর কেমন যেন আমাদের চেনা-চেনা মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই ইংরেজকে শুনিয়ে শুনিয়ে বার বার এই গান গেয়েছে। ('অন্য জাতি দিগ্বসন পরিত যখন। ভারতে ঋগ্বেদ পাঠ হইত তখন।')। কিন্তু, আফসোস। শাহনামার মত মহাকাব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে নি। হেমচন্দ্র ও ইকবালকে ফিরদৌসীর আসনে বসানো কঠিন এবং অন্যান্য কবিরা যে 'নির্লজ্জতা' দেখালেন ('নির্লজ্জতা' শব্দটি ভেবেচিন্তেই কুটেশনের ভিতর ফেললুম, কারণ কাব্যে রসস্বরূপে প্রকাশ পেলে চরম নির্লজ্জতাও পাঠকের মনে বিদ্রোহ সঞ্চার করতে পারে না। আমাদের দুই মাইডিয়ার হীরো পবননন্দন ভীমসেন ও হনুমান যে সব দম্ভ এবং আস্ফালন করেছেন তা স্বকর্ণে শুনতে হলে 'রাম রাম' বলতে হত, কিন্তু কাব্যে পাঠ করে আনন্দাশ্রু বিগলিত

হয়, মনে হয়, ঐ সময়ে, ঐ অবস্থায় এ বাক্য ছাড়া অন্য কিছুই এঁদের মুখে মানাতো না, বলতে ইচ্ছে করে, 'ধন্য ধন্য যুগ্ম-কবি যাঁরা দম্ভকে বিনয়, লজ্জাকে শ্লাঘায় পরিণত করতে পারেন।') সেটা ঢাকবার প্রয়াস আজও ইরানে-তুরানে সহজেই চোখে পড়ে। সকলেই জানেন, মুসলমান ধর্মে মদ খাওয়া মানা আর সেই মদও যদি খাওয়া হয় তন্বঙ্গী তরুণী সাকীর সঙ্গে—যার সঙ্গে 'বে-থা' হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধেও কবিরা বড় মারাত্মক স্মৃতিশক্তিহীন—তাও আবার ঝরণা তলায়, নির্জনে, সাঁঝের ঝোঁকে, যখন কিনা 'মগরিবের আইন ওক্তে' নামাজ পড়ার কথা, আল্লা-রসুলের নাম স্মরণ করার আদেশ—এবং মনে মনে আওড়ানো,

"মত্ত, মাতাল ব্যসনী আমি গো আমি কটাক্ষ বীর"

তা হলে অবস্থাটা কি রকমের হয়?

কথা সত্য, মোল্লাবা সুবো-শাম ভালো ভালো কেতাবপুঁথি পড়েন, কিন্তু মাঝে-মধ্যে, নিতান্ত কালে-কস্মিনে দু'একখানা কাব্যগ্রন্থেব পাতাও তো তাঁরা ওলটান। কবি হাফিজ অবশ্য বিস্তর ঢলাঢলির পর ওকীবহাল হয়ে অভয়বাণী বলেছিলেন,

"মোল্লাব কাছে কোবো না কিন্তু মোর পিছে অনুযোগ,
তারো আছে, জেনো, আমারি মতন, সুরামত্ততা রোগ।"

তবু, এ-কথাও তো অজানা নয় যে, মোল্লারাই নীতিবাগীশ সাজে আর পাঁচজনের তুলনায় বেশী।

এবং কার্যতঃ দেখা গেল তারা এবং তাদের চেলাচামুণ্ডার দল ঝোপে-ঝাপে বসে আছে, শরাব-কবাব জান-কী-সাকী সুদ্ধ কবিদের বমাল গ্রেফতার করার জন্য।

কবিরা এবং বিশেষ কবে আমাদের মত তাঁদের গুণগ্রাহীবা, উচ্চকণ্ঠে তখন বললেন, এ-সব কবিতা রূপকে নিতে হয়। মদ্য অর্থ ভগবদ প্রেম, সাকী অর্থ যিনি সে প্রেম আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন, অর্থাৎ পীব, গুরু, মুরশীদ, পয়গম্বব। এবং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, হাফিজ, আত্তার, এমন কি ওমর খৈয়ামের বহু কবিতার কোনো অর্থই করা যায় না, যদি সেগুলো রূপক দিয়ে অর্থ না করা হয়। কিন্তু বাদবাকিগুলো?

আমাদের পদাবলীতেও তাই। এবং বিস্তব সব পদ আছে যাতে মর্ত্য আর অমর্ত্য প্রেম এমন ভাবে মিশে গিয়েছে যে, দুটোকে আদৌ আলাদা করা যায় না —সমস্ত হৃদয়-মন এক অদ্ভুত অনির্বচনীয় নবরসে আপ্লুত হয়ে যায়।

তোমার চরণে আমার পরাণে
লাগিল প্রেমের ফাঁসী
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী

মর্ত্য প্রেমই যদি হবে তো 'পরাণে' 'পরাণে' প্রেমের ফাঁসী লাগবে। 'পরাণে' আর 'চরণে' প্রেমের বাঁধ বেঁধে দিয়ে কী এক অপূর্ব অতুলনীয় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়েছে —যার অনুভূতি এ-জগতে আরম্ভ, আর পরিপূর্ণতা লাভ করবে সেই অমর্ত্যলোকে, 'ব্যর্থ নাহি হোক এ-কামনা।'

কিন্তু মাঝে মাঝে মনে দ্বিধা জাগে, সর্বত্রই কি রূপকের শরণাপন্ন হতে হবে? যথা:

অদ্যাপ্য-শোক-নব পল্লব-রক্ত হস্তাং
মুক্তাফল প্রচয়চুম্বিত-চুচুকাগ্রাম্।
অন্তঃস্মিতেন্দুসিত পাণ্ডুর গণ্ডদেশাং,
তাং বল্লভাং রহসি সংবলিতাং স্মরামি॥

বিদ্যাপক্ষে

অশোক-পল্লব নব সম পাণিতলে।
কুচাগ্র শোভিত হয়েছে মুক্তাফলে॥
অন্তরে ঈষৎ হাস গণ্ডে বিকসিত।
শরতের চন্দ্র যেন ত্রিলোক-মোহিত॥
নির্জনেতে বসি করি সদা সম্ভাবনা।
প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে নিতান্ত কামনা॥
তথাপি বিদ্যার নাহি পাই দরশন।
বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র করি ত্যজিব জীবন॥

দ্বিতীয়ার্থ কালীপক্ষে

রুধির-খর্পর হস্তে দিবানিশি যার।
রক্তবর্ণ করতল হয়েছে শ্যামার॥
উচ্চ পয়োধরপরি বান্ধিত কাঁচলী।
হীরক জড়িত হারে শোভে মুক্তাবলী॥
অন্তরে গভীর হাস্য ঈষদ্ধাস্য কালে।
কিরণে আছয়ে গণ্ড পাণ্ডুবর্ণা ভালে॥
অন্তর জগতে দেখি আলোক বিরাজে।
কি শোভা প্রকাশে কুলকুণ্ডলিনী মাঝে॥

অবজ্ঞত সংবলিতা বিশ্বের কারিণী।
নিদানে গর্জনে স্মরি তারে গো তারিণী॥
(চৌরপঞ্চাশৎ, ভারতচন্দ্র, বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ৮)

পূর্বোল্লিখিত এই সব তাবৎ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ওমরের বিদ্রোহ।

* *

গিয়াসউদ্দীন আবুল ফৎহ্ ওমর ইবন্ ইব্রাহিম অল-খৈয়াম ইরানদেশের নিশাপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মদিন কিংবা সন ঠিকমত জানা যায় নি, এমন কি তাঁর মৃত্যুর সনও মোটামুটি ১১২৩ খ্রীষ্টাব্দ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

খৈয়াম শব্দের অর্থ তাম্বু নির্মাতা। এ ওজনের শব্দ বাঙলায় আরো আছে। 'কত্তাল' থেকে বাঙলা কোতয়াল, এবং 'খম্মার' থেকে 'খোঁয়ারী' (ভাঙা) শব্দ এসেছে। রাস্তার মশলা-বিক্রেতা অর্থে বক্কাল শব্দও একদা বাঙলাতে সুপ্রচলিত ছিল—আরবীতে শব্দটির অর্থ 'মুদী' বা 'মশলা-বিক্রেতা'। ত্রিবর্ণের মূল ধাতুতে —যথা 'দ-খ-ল' 'দখল করা' 'ক-ত-ল' 'কোতল করা' দ্বিতীয় ব্যঞ্জনবর্ণকে দ্বিত্ব করে তাতে দীর্ঘ 'আ-কার যোগ করলে যে কর্তাবাচক শব্দ উৎপন্ন হয় তার অর্থ 'ঐ কর্ম সে পুনঃ পুনঃ করে থাকে।' তাই 'খম্মার' অর্থ 'যে ঘন ঘন মদ খায়' (বাঙলায় তাই সে সকালবেলা খম্মারী বা খোঁয়ারী ভাঙে) অর্থাৎ 'পাইকারী মাতাল', 'মদ খাওয়া তার ব্যবসা'। 'কতল' করা যার ব্যবসা সে কোতোয়াল ('কত্তাল'), 'জল্লাদ'ও ঐ অর্থে ব্যবহার হয়। 'খয়য়াম' অর্থ 'যে পুনঃ পুনঃ তাম্বু নির্মাণ করে'—'তাম্বু নির্মাণকারী'। বাঙলায় 'খইআম', 'খইয়াম' বা 'খৈয়াম' লিখলে মোটামুটি মূল উচ্চারণ আসে। অবশ্য 'খ'-র উচ্চারণ বাঙলা মহাপ্রাণ 'খ'র মত নয়—আমরা বিরক্ত হলে যে রকম 'আখ'-এর 'খ' অক্ষরটি উচ্চারণ করে থাকি অর্থাৎ ঘৃষ্ট্য কণ্ঠ্যব্যঞ্জন। স্কচের 'লখ' ও জর্মনের 'বাখ'-এর 'খ'-এর মত। আসামীতে 'অহমিয়া'র 'হ' অনেকটা সেই রকম।

কিন্তু কবি ওমর তাঁবুর ব্যবসা করতেন না। ওটা তাঁর বংশের পদবী মাত্র। আজকের দিনের কোনো সরকার যে রকম বাইটারজ বিল্ডিঙে চীফ সেক্রেটারী (সরকার) নন কিংবা কোনো ঘটকপদবীধারী যে-রকম সমাজে কুলাচার্যের কর্ম করেন না। ওমর কিন্তু তাঁর পরিবারের এই উপাধিটি নিয়ে তিক্ত ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি—

জ্ঞান-বিজ্ঞান ন্যায়-দর্শন সেলাই করিয়া মেলা
খৈয়াম কত না তাম্বু গড়িল, এখন হয়েছে বেলা

নরককুণ্ডে জ্বলিবার তরে। বিধি-বিধানের কাঁচি
কেটেছে তাম্বু—ঠোক্‌কর খায়, পথ-প্রান্তের ঢেলা।

(লেখকের এমেচারী অক্ষম অনুবাদে রসিক পাঠক অপরাধ নেবেন না। অন্য কারো অনুবাদ না পেয়ে বাধ্য হয়ে মাঝে-মধ্যে এ ধরনের 'অনুবাদ' ব্যবহার করতে হয়েছে।)

এস্থলে উল্লেখ প্রয়োজন রুবাঈ জাতীয় শ্লোকে প্রায়শ. প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ ছত্রে মিল থাকে—তৃতীয় ছত্রান্ত স্বাধীন। ইরান আলঙ্কারিকরা বলেন, তৃতীয় ছত্রে মিল না দিলে চতুর্থ ছত্রের শেষ মিলে বেশী ঝোঁক পড়ে এবং শ্লোক সমাপ্তি তার পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য ও তীক্ষ্ণতা পায়। কথাটা ঠিক, কারণ আমরাও তেতালা বাজাবার সময় তৃতীয়ে এসে খানিকটা কারচুপি করলে সম মনকে ধাক্কা দেয় আরো জোরে। পাঠককে এই বেলাই বলে রাখি, তৃতীয় ছত্রে মিলহীন এই জাতীয় শ্লোক পড়ার অভ্যাস করে রাখা ভালো। নইলে নজরুল ইসলামের ওমর-অনুবাদ পড়ে পাঠক পরিপূর্ণ রসগ্রহণ করতে পারবেন না। কারণ কাজী আগা-গোড়া ক ক খ ক মিলে ওমরের অনুবাদ করেছেন। কান্তি ঘোষ করেছেন বাঙলা রীতিতে, অর্থাৎ ক ক খ খ।

ভাগ্যক্রমে ওমরের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। পাকাপাকি শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে তিনি গণিতশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন এবং অবসর কাটাবার জন্য দৈবেসৈবে চতুষ্পদী লিখতেন·· তাঁর নামে প্রচলিত গজল, মসনবী বা অন্য কোনো শ্রেণীর দীর্ঘতর কবিতা আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এই-টুকু সংবাদ ছাড়া বাদবাকী কিংবদন্তী। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যাঁর জন্মের তারিখ কেন, সন পর্যন্ত জানা নেই, যাঁর পরলোক গমনের সন পর্যন্ত পণ্ডিতদের গবেষণাধীন, তাঁর সম্বন্ধে যে প্রচুর কিংবদন্তী প্রচলিত থাকবে তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই।

তবে তিনি যে উত্তম গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন সে-বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত স্মরণ রাখা ভালো যে, ছাপাখানার প্রচলন না হওয়া পর্যন্ত অল্প লোকই গুরুর সাহায্য বিনা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন।

কথিত আছে, বিখ্যাত পণ্ডিত ইমাম মুওয়াফফকের কাছে একই সময়ে তিন-জন অসাধারণ মেধাবী ছাত্র শিক্ষালাভ করেন। এঁদের ভিতর খেলাচ্ছলে চুক্তি হয় যে, এঁদের কোনো একজন পরবর্তী জীবনে প্রভাবশালী হতে পারলে তিনি অন্য দু জনকে সাহায্য করবেন। এঁদের একজন কালক্রমে প্রধান মন্ত্রী বা নিজাম-উল্-মুল্ক-এর পদ প্রাপ্ত হন। খবর পেয়ে দ্বিতীয় বন্ধু হাসন বিন্ সব্‌বাহ তাঁর

কাছে এসে তাঁর পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উচ্চ রাজকর্ম চান। বন্ধুর কৃপায় আশাতীত উচ্চপদ পেয়েও হাসন তাঁকে সরিয়ে নিজে প্রধান মন্ত্রী হবার জন্য ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। কিন্তু শেষটায় ধরা পড়ে বাদশার হুকুমেই রাজপ্রাসাদ থেকে বহিষ্কৃত হন। হাসন প্রতিশোধ নেবার জন্য এক গুপ্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে গোপন আততায়ী দিয়ে অনেক লোককে হত্যা করিয়ে প্রচুর অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। ক্রুসেডের একাধিক খ্রীষ্টান নেতা এইসব গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ দেন। এরা ভাঙ জাতীয় এক প্রকার হশীশ্ সেবন করতো বলে এদের নাম হয়েছিল 'হশীশীযয়ন' এবং ইংরিজি 'এ্যাসাসিন'—গুপ্তঘাতক—এই শব্দ থেকেই অর্বাচীন লাতিন তথা ফরাসীর মাধ্যমে এসেছে। অনেকে বলেন, পরবর্তীকালে নিজাম-উল্-মুল্ক যে গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ দেন, সেও হাসন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের সম্বন্ধে লেখকের 'অবিজিন অব দি খোজা' পুস্তক লেখকের বাল্য রচনা বলে দ্রষ্টব্যের মধ্যে ধর্তব্য নয়।

ওমরকে যখন নিজাম-উল্ মুল্ক উচ্চপদ দিতে চাইলেন তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে নির্জনে অনটনবিহীন জীবনযাপনের সুবিধাটুকু মাত্র চাইলেন এ তো জানা কথা। যে ব্যক্তি স্বর্গ-সুখ বলতে বোঝে,

সেই নিরালা পাতায় ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়,
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে, ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।
মৌন ভাঙ্গি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু স্বর—
সেই তো সখি স্বপ্ন আমার, সেই বনানী স্বর্গপুর।

(কান্তি ঘোষ)

কিংবা—

আমার সাথে আসবে যেথায়—দূর সে রেখে শহরগ্রাম
এক ধারেতে মরু তাহার, আর একদিকে শষ্প শ্যাম।
বাদশা-নফর নাইকো সেথা—রাজ্য-নীতির চিন্তা-ভার;
মামুদ শাহ?—দূরে থেকেই করব তাঁকে নমস্কার।

(কান্তি ঘোষ)

তার রাজপদ নিয়ে কি হবে? নিজাম-উল্-মুল্ক বিচক্ষণ লোক ছিলেন, বুঝতে পারলেন, ওমরের খ্যাতি-প্রতিপত্তি প্রত্যাখ্যান মৌখিক বিনয় নয় এবং তাঁর জন্য সচ্ছল জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করে দিলেন। কবিও কখনো তাঁর মত পরিবর্তন করেন নি। বস্তুতঃ তাঁর কাব্যের মূল সুর ঐটিই।

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর ডাক পড়লো রাজদরবারে—পঞ্জিকা সংশোধন করে

দেবার জন্য। ইরানীদের 'নওরোজ' বা নববর্ষ আসে বসন্ত ঋতুতে, কিন্তু বহু শত বৎসর লীপ ইয়ার গোনা হয় নি বলে তখন আর নববর্ষ বসন্ত ঋতুতে আসছিল না। ওমর ঐ কর্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করে দিলেন।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কবিরূপে যে ব্যক্তি বিশ্বজগতে বিখ্যাত তিনি আসলে ছিলেন বৈজ্ঞানিক। শুধু তাই নয়, ফিটস্‌জেরাল্ডের মাধ্যমে ইয়োরোপে প্রচারিত হবার পূর্বেই ওমরের বিজ্ঞানচর্চা ফ্রান্সে অনূদিত হয়ে সেখানে তাঁর খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। বর্তমান লেখক এসব লেখা দেখবার সুযোগ পায় নি, তাই এনসাইক্লোপিডিয়ার 'কোনিক্ সেক্শন' অনুচ্ছেদ থেকে ইয়োরোপে ওমরের বৈজ্ঞানিক যশ সম্বন্ধে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

"Greek mathematics culminated in Apollonius. Little further advance was possible without new methods and higher points of view. Much later, Arabs and other Muslims absorbed the classical science greedily, it was the Persian poet Omar Khayyam, one of the most prominent mediaeval mathematicians, with his remarkable classification and systematic study of equations, which he emphasized, who blazed the way to the modern union of analysis and geometry. In his "Algebra" he considered the cubic as soluble only by the intersection of conics, and the biquadratic not at all."

শেষ ছত্রটির বাঙলায় অনুবাদ মূল ইংরিজি, এমন কি আধুনিক বাঙলা কবিতার চেয়েও শক্ত হয়ে যাবে বলে গোটা টুকরোটাই অতি অনিচ্ছায় ইংরিজিতেই রেখে দিতে বাধ্য হলুম। বৈজ্ঞানিক পাঠক বিনা অনুবাদেই এটি বুঝতে পারবেন, প্রাঞ্জল অনুবাদেও আমাদের মত অবৈজ্ঞানিকের কোনো লাভ হবে না।

ইরানের অধিকাংশ গুণীই একমত যে, ওমর তাঁর জীবনের প্রায় সব সময়টুকুই কাটিয়েছেন বিজ্ঞানচর্চায় এবং অতি অল্প সামান্য সময় 'নষ্ট' করেছেন কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনায়। তাই দীর্ঘ কবিতা লেখবার ফুরসৎ তাঁর হয়ে ওঠে নি—এমন কি রুবাঈগুলোও গীতিরস দিয়ে সরস করবার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নি।

গণিত এবং বিশেষ করে জ্যোতিষচর্চার ফল ওমরের কাব্যে পদে পদে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ গ্রহ-নক্ষত্র যে অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মে চলে তার থেকেই তিনি দৃঢ় মীমাংসায় উপনীত হন যে, মানুষেরও কোনো প্রকারের স্বাধীনতা নেই, তার

কর্মপদ্ধতি স্বেচ্ছায় নিয়ন্ত্রণ করার কোনো অধিকারই সে পায় নি। তাই—

প্রথম মাটিতে গড়া হয়ে গেছে শেষ মানুষের কায়
শেষ নবান্ন হবে যে ধান্যে তারো বীজ আছে তায়।
সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে লিখে রেখে গেছে তাই,
বিচার-কর্ত্রী প্রলয় রাত্রি পাঠ যা করিবে ভাই।

(সত্যেন দত্ত)

পৃথ্বী হ'তে দিলাম পাড়ি, নভঃগেহে মনটা লীন—
সপ্ত-ঋষি যেথায় বসি ঘুমিয়ে কাটান রাত্রি দিন।
বিদ্যাটা মোর উঠলো ফেঁপে কাটলো কত ধাঁধার ঘোর—
মৃত্যুটা আর ভাগ্যলিখন—ওইখানে গোল রইল মোর।

(কান্তি ঘোষ)

কিন্তু এস্থলে আমি ওমর-কাব্যের মল্লিনাথ হবার দুরাশা নিয়ে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হই নি। ওমরের নামে প্রচলিত প্রায় ছ'শ'টি রুবাইয়াৎ ইরানী বটতলাতেও পাওয়া যায়—পার্টিশনের পূর্বে কলকাতার ফার্সী বটতলা তালতলা অঞ্চলেও পাওয়া যেত। তার অতি অল্পই অনুবাদ করেছেন ফিটস্‌জেরাল্ড এবং সেই ছ'শ'র কটি কবিতা ওমরের নিজস্ব, তাই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বাক্‌-বিতণ্ডা এখনো শেষ হয় নি—আমার বিশ্বাস কখনো হবে না। সেই ছ'শ' চতুষ্পদীর টীকা পড়ার উৎসাহ ও ধৈর্য বসিকজনের থাকাব কথা নয়—পণ্ডিতের থাকতে পারে। আমি বসিকের সেবা করি।

তাই আমিও ওমরের সামান্যতম ঐতিহাসিক পটভূমি নির্মাণ করার চেষ্টা করছি এবং তাও শুধু ওমবের বিদ্রোহী মনোভাব দেখাবার জন্য—কারণ ঐখানেই নজরুল ইসলামের সঙ্গে তিনি সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন।

ওমরের প্রধান বিদ্রোহ ধর্মগুরুদের বিরুদ্ধে :—

খা'জা! তোমার দরবারে মোর একটি শুধু আর্জি এই
থামাও উপদেশের ঘটা, মুক্তি আমার এই পথেই।
দৃষ্টি-দোষে দেখছ বাঁকা আমার সোজা সরল পথ,
আমায় ছেড়ে ভালো করো, ঝাপসা তোমার চক্ষুকেই।

(কাজী সাহেবের অনুবাদ)

O master! grant us only this, we prithee;
Preach not! But mutely guide to bliss,
we prithee!

"We walk not straight"—Nay,
it is thou who squintest !
Go, heal thy sight, and leave us in peace,
we prithee !

(কার্ণের অনুবাদ)

পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক রাজা-রাজড়ার শৌর্যবীর্য নিয়ে যে সব কবি ফিরদৌসীর ন্যায় আস্ফালন করে বর্তমানের আনন্দকে অবহেলা করতেন তাঁদের সম্বন্ধে বলছেন—

ভাগ্য-লিপি মিথ্যা সে নয়—ফুরোয় যা' তা ফুরিয়ে যাক্,
কৈকোবাদ আর কৈখ্‌স্রুর ইতিহাসের নামটা থাক।
রুস্তম আর হাতেম-তায়ের কল্পকথা—স্মৃতির ফাঁস—
সে-সব খেয়াল ঘুচিয়ে দিয়ে আজকে এস আমার পাশ।

(কান্তি ঘোষ)

দরবেশ-সুফীরা করতেন কৃচ্ছ্রসাধন এবং যোগচর্চা। পূর্বেই নিবেদন করেছি, তাঁরা নৃত্যের সঙ্গে চিৎকার করতেন নাম-জপ, তাঁদের বিশ্বাস, ঐ করেই ভগবদ্-প্রেম এবং চরম মোক্ষ পাওয়া যায়।

দ্রাক্ষালতার শিকড় সেটি তার না জানি কতই গুণ—
জড়িয়ে আছেন অস্থিতে মোর দরবেশী সাঁই যাই বলুন—
গগনভেদী চীৎকারে তাঁর খুলবে নাকো মুক্তিদ্বার,
অস্থিতে এই মিলবে যে খোঁজ সেই দুয়ারের কুঞ্চিকার।

(কান্তি ঘোষ)

কিন্তু সব চেয়ে বেশী চতুষ্পদী তিনি রচনা করেছেন দার্শনিক এবং পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে। সেখানে তিনি জ্যোতির্বিদ ওমরকেও বাদ দেন নি।

অস্তি-নাস্তি শেষ করেছি, দার্শনিকের গভীর জ্ঞান
বীজগণিতের সূত্র-রেখা যৌবনে মোর ছিলই ধ্যান,
বিদ্যারসে যতই ডুবি, মনটা জানে মনে (মানে ?) স্থির—
দ্রাক্ষারসের জ্ঞানটা ছাড়া রসজ্ঞানে নেই গভীর।

অর্থহীন, অর্থহীন, সমস্তই অর্থহীন। তাই ওমরের বার বার কাতর রোদন, দরদী ফরিয়াদ—

হেথায় আমার আসাতে প্রভু হন নি তো লাভবান
চলে যাবো যবে হবেন না তিনি কোনো মতে গরীয়ান।

এ কর্ণে আমি শুনি নি তো কভু কোনো মানবের কাছে
এই আসা-যাওয়া কি এর অর্থ—খামখা পোড়েন টান।

(লেখক)

তাই ওমরের শেষ মীমাংসা—একবার মরে যাবার পর তুমি আর এখানে ফিরে আসবে না। অতএব যতটুকু পাবো, যতক্ষণ পাবো দর্শন-বিজ্ঞান-সাই-সুফীদের ভুলে গিয়ে সাকী সুরা নিয়ে নির্জন কোণে আনন্দ করো।

মৃত্যু আসিয়া মস্তকে মোর আঘাত করার আগে
লে আও শরাব—লাও ঝটপট—রাঙানো গোলাপী রাগে।
হায়রে মূর্খ! সোনা দিয়ে মাজা তোর কি শরীর খানা—?
গোরা হয়ে গেলে ফের খুঁড়ে নেবে—? ও ছাই কি কাজে লাগে।

(লেখক)

কিন্তু একটা জিনিস ভুল করলে চলবে না। ওমর খাঁটি চার্বাকপন্থী এবং ঐ জাতীয় লোকায়তীদের মত নন। 'ঋণ ক'রে ঘি খাও, কারণ দেহ ভস্মীভূত হলে ঋণ তো আর শোধ করতে হবে না', অর্থাৎ ইহসংসারে কিংবা পরলোকে অন্য কারো প্রতি তোমার কোনো নৈতিক দায়িত্ব—মরাল রেসপনসিবিলিটি নেই—এ তত্ত্বেও ওমর বিশ্বাস করতেন না। তাই তাঁর একমাত্র উপদেশ—

কারুর প্রাণে দুখ্ দিও না, করো বরং হাজার পাপ,
পরের মনে শান্তি নাশি বাড়িও না আর মনস্তাপ।
অমর-আশিস্ লাভের আশা রয় যদি, হে বন্ধু মোর,
আপনি স'য়ে ব্যথা, মুছো পরের বুকের ব্যথার ছাপ।

(নজরুল ইসলাম)

গুণীরা বলেন, 'কুরানই কুরানের সর্বশ্রেষ্ঠ টীকা।' তরুণদের আমি প্রায়ই বলি, 'রবীন্দ্রনাথের রচনাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ টীকা—ঐ কাব্যই বার বার অধ্যয়ন করো, অন্য টীকার প্রয়োজন নাই।' ওমরই ওমরের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লিনাথ এবং কাজীর অনুবাদ সকল অনুবাদের কাজী।

ত্রিমূর্তি (চাচা-কাহিনী)

বার্লিন শহরের উলাণ্ড স্ট্রীটের উপর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে 'হিন্দুস্থান হৌস' নামে একটি রেস্তোরাঁ জন্ম নেয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর যা স্বভাব, রেস্তোরাঁর সুদূরতম কোণে একটি আড্ডা বসে যায়। আড্ডার চক্রবর্তী ছিলেন চাচা—

বরিশালের খাঁজা বাঙাল মুসলমান—আর চেলারা গোসাঁই, মুখুয্যে, সরকার, রায় এবং চ্যাংড়া গোলাম মৌলা, এই ক'জন।

চাচার ন্যাওটা শিষ্য গোসাঁই বললেন, 'যা বলো, যা কও, চাচা না থাকলে আমাদের আড্ডাটা কি রকম যেন দড়কচ্চা মেরে যায়। তা বলুন, চাচা, দেশের—না, ছ্যাশের—খবর কি? কি খেলেন, কি দেখলেন, বেবাক কথা খুলে কন।'

চাচা বরিশাল গিয়েছিলেন। তিন মাস পরে ফিরে এসেছেন। বললেন, 'কি খেলুম? কই মাছ—এক-একটা ইলিশ মাছের সাইজ, ইলিশ মাছ—এক-একটা তিমি মাছের সাইজ, আর তিমি মাছ—তা সে দেখি নি। তবে বোধ হয়, তাবৎ বাখরগঞ্জ ডিস্‌টিক্‌টাই তারই একটাব পিঠের উপর ভাসছে। ঐ যেরকম সিন্দবাদ তিমির পিঠটাকে চব ভেবে তারই পিঠের উপর রশুই চড়িয়েছিল।'

বাকি কথা শেষ হওয়ার পূর্বে সকলের দৃষ্টি চলে গেল দোরের দিকে দুটি জর্মন চ্যাংড়া একটি চিংড়িকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকল। ভারতীয় রান্নার ঝালের দাপটে জর্মনরা সচরাচর হিন্দুস্থান হৌসে আসতো না। পাড়ার জর্মনরা তো আমাদের লঙ্কা-ফোঁড়ন চড়লে পয়লা বিশ্বযুদ্ধেব ডিসপোজেলেব গ্যাস-মাস্‌ক পরতো। তবে দু'একজন যে একেবারেই আসতো না তা নয়—'ইণ্ডিশে রাইস-কুরি' অর্থাৎ ভারতীয় ঝোল ভাতেব খুশবাই জর্মনি হাঙ্গেরি সর্বত্রই কিছু কিছু পাওয়া যায়।

আলতো ভাবে ওদের উপব একটা নজব বুলিয়ে নিয়ে আড্ডা পুনরায় চাচার দিকে তাকাল। চাচা বললেন, 'খাইছে! আবার সেই ইটারনেল্ ট্রায়েঙ্গল্!'

পাইকিরি বিয়ার খেকো সুয্যি বায় বললে, 'চাচা হরবকতই ট্রায়েঙ্গল্ দেখেন। এ যেন ঘামের ফোঁটাতে কুমীর দেখা। দ্য ত্রো নিয়ে কি কেউ কখনো বেরয় না?'

রায়ের গ্রাম সম্পর্কে ভাগ্নে, সতেবো বছরেব চ্যাংড়া সদস্য লাজুক গোলাম মৌলা শুধালে, 'মামু, দ্য ত্রো কাবে কয়?'

রায় বললেন, 'পই পই কবে বলেছি ফরাসী শিখতে, তা শিখবি নি। ডি, ই দ্য, টি, আর, ও, পি ত্রো—পি সাইলেণ্ট। অর্থাৎ একজন অনাবশ্যক বেশী—One too many। এই মনে কর্, তুই যদি তোর ফিয়াঁসেকে—এ কথাটাও বোঝাতে হবে নাকি?—নিয়ে বেরোস আর আমি খোদার-খামোখা তোদের সঙ্গে জুটে যাই, তবে আমি দ্য ত্রো। বুঝলি?'

গোলাম মৌলা মাথা নিচু করে সেই বার্লিনের শীতে বরাব্বর লজ্জায় ঘামতে

লাগলো।

আড্ডার লটবর লেডি-কিলার পুলিন সরকার মৌলাকে ধমক দিয়ে বললে, 'তুই লজ্জা পাচ্ছিস কেন রে বুড়বক্? লজ্জা পাবেন রায়। ডাণ্ডা-গুলি খেলার সময় গুলিকে ভয় দেখাস্ নি ডাণ্ডাকে না ছোঁবার জন্য? তখন কি বলিস? 'ডাগ্নে-বৌ দুয়ারে—কোণা কেটে ফালদি যা।' বরঞ্চ সুয্যি রায় যদি তাঁর ম্যাডাম্‌কে নিয়ে বেরোন, আর তুই যদি সঙ্গে জুটে যাস, তবু কিন্তু তুই ছ্ত্রো নস্। রাধা কেষ্টর কি হন জানিস তো?'

গোলাম মৌলা এবারে লজ্জায় জল না হয়ে একেবারে পানি।

গোসাঁই বললেন, 'চাচা, আপনি কিন্তু যেভাবে ঘন ঘন মাথা দোলাচ্ছেন তাতে মনে হচ্ছে, আপনি একদম শোয়ার, এ হচ্ছে দুটো-জনো একটা-মেনীর ব্যাপার। তা কি কখনো হওয়া যায়?'

চাচা বললেন, 'যায়, যায়, যায়। আকছারই যায়। অবশ্য প্র্যাক্‌টিস থাকলে।'

আড্ডা সমস্বরে বললে, 'প্র্যাক্‌টিস!'

চাচা বললেন, 'হ। এবারে দেশে যাবার সময় জাহাজে হয়েছে।'

গল্পের গন্ধ পেয়ে আড্ডা আসন জমিয়ে বললে, 'ছাড়ুন, চাচা।'

চাচা বললেন, 'এবার দেখি, জাহাজ ভর্তি ইহুদির পাল। জর্মনি, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া থেকে ঝেঁটাই করে সবাই যাচ্ছে শাংহাই। সেখানে যেতে নাকি ভিজার প্রয়োজন হয় না। কি করে টের পেয়েছে, এবারে হিটলার দাবড়াতে আরম্ভ করলে নেবুকাডনাজারের বেবিলোনিয়ান ক্যাপটিভিটি নয়, এবারে স্রেফ কচু-কাটার পালা। তাই শাংহাই হয়ে গেছে ওদের ল্যাণ্ড অব মিল্‌ক্ এণ্ড হানি, ননীমধুর দেশ।

আমার ডেক-চেয়ারটা ছিল নিচের তলা থেকে ওঠার সিঁড়ির মুখের কাছে। ডাইনে এক বুড়ো ইহুদি আর বাঁয়ে এক ফরাসী উকিল। ইহুদি ভিয়েনার লোক, মাতৃভাষা জর্মন, ফরাসী জানে না। আর ফরাসী উকিল জর্মন জানে না, সে তো জানা কথা। ফরাসী ভাষা ছাড়া পৃথিবীতে অন্য ভাষা চালু আছে সে তত্ত্ব জাহাজে উঠে সে এই প্রথম আবিষ্কার করলে। এতদিন তার বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীর আর সর্বত্র ভাঙা-ভাঙা ফরাসী, পিজিন ফ্রেঞ্চই চলে -বিদেশীরা প্যারিসে এলে যে রকম টুকিটাকি ফরাসী বলে ঐ রকম আর কি।

তিনজনাতে তিনখানা বই পড়ার ভান করে এক একবার সিঁড়ি দিয়ে উঠনে-

ওলা নামলে-ওলা চিড়িয়াগুলোর দিকে তাকাই, তারপর বইয়ের দিকে নজর ফিরিয়ে আপন আপন সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করি।

একটি মধ্যবয়স্কা উঠলেন। জর্মন ইহুদি বললে, 'হাল্‌ব্‌-উন্‌ট্‌হাল্‌ব্‌—অর্থাৎ হাফাহাফি।' ফরাসী বললে, 'অঁ প্যো আঁসিয়েন্‌—একটুখানি এনশেণ্ট।' জর্মন আমাকে শুধালে, 'ফ্রেঞ্চি কি বললে?' আমি অনুবাদ করলুম। জর্মন বললে, 'চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ হবে। তা আর এমন কি বয়স—নিষ্‌ট্‌ ভার—নয় কি?' ফরাসী আমাকে শুধালে, 'ক্যাস্‌ কিল দি—কি বললে ও?' উত্তর শুনে বললে, 'মঁ দিয়ো—ইয়াল্লা—চল্লিশ আবার বয়স নয়! একটা কেথীড্রেলের পক্ষে অবশ্য নয়। কিন্তু মেয়েছেলে, ছোঃ!'

এমন সময় হঠাৎ একসঙ্গে তিনজনের তিনখানা বই ঠাস করে আপন উরুতে পড়ে গেল। কোর্ট মার্শালের সময় যে রকম দশটা বন্দুক এক ঝটকায় গুলি ছোঁড়ে। কি ব্যাপার? দেখ্‌তো না ছাখ্‌, সিঁড়ি দিয়ে উঠলো এক তরুণী!

সে কী চেহারা! এ রকম রমণী দেখেই ভারতচন্দ্রের মুণ্ডুটি ঘুরে যায় আর মানুষে দেবতাতে ঘুলিয়ে ফেলে বলেছিলেন, 'এ তো মেয়ে মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়।'

ইটালির গোলাপী মার্বেল দিয়ে কোদা মুখখানি, যেন কাজল দিয়ে আঁকা দুটি ভুরুর জোড়া পাখিটি গোলাপী আকাশে ডানা মেলেছে, চোখ দুটি সমুদ্রের ফেনার উপর বসানো দুটি উজ্জ্বল নীলমণি, নাকটি যেন নন্দলালের আঁকা সতী অপর্ণার আবক্ররেখা মুখের সৌন্দর্যকে দু'ভাগ করে দিয়েছে, ঠোঁট দুটিতে লেগেছে গোলাপ ফুলের পাপড়িতে যেন প্রথম বসন্তের মৃদু পবনের ক্ষীণ শিহরণ।'

চাচা বললেন, 'তা সে যাক্‌ গে। আমার বয়েস হয়েছে। তোদের সামনে সব কথা বলতে বাধো বাধো ঠেকে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, অপূর্ব, অপূর্ব।'

দেখেই বোঝা যায়, ইহুদি—প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয় সৌন্দর্যের অদ্ভুত সম্মেলন।

জর্মন এবং ফরাসী দুজনাই চুপ। আম্মো।

আর সঙ্গে সঙ্গে দুটি ছোকরা জাহাজের দু'প্রান্ত থেকে চুম্বকে টানা লোহার মত তার গায়ের দু'দিকে যেন সেঁটে গেল। স্পষ্ট বোঝা গেল, এতক্ষণ ধরে দু'জনাই তার পদধ্বনির প্রতীক্ষায় ছিল।

জাহাজে প্রথম দু'একদিন ঠিক আঁচা যায় না, শেষ পর্যন্ত কার সঙ্গে কার পাকাপাকি দোস্তী হবে। কোন মসিয়ো কোন্‌ মাদ্‌মোয়াজেলের পাল্লায় পড়বেন, কোন্‌ হ্যাব্‌ কোন্‌ ফ্রাউ বা ফ্রলাইনের প্রেমে হাবুডুবু খাবেন, কোন্‌ মিসিস কোন্‌ মিস্টারের সঙ্গে রাত তেরোটা অবধি খোলা ডেকে গোপন প্রেমালাপ করবেন।

এ তিনটির বেলা কিন্তু সবাই বুঝে গেল এটা ইটার্নল্ ট্রায়েঙ্গল। আমি অবশ্য গোঁসাইয়ের মত প্রথমটায় ভাবলুম, হার্মলেস ব্যাপারও হতে পারে।

মেয়েটা ফরাসিস, ছেলে দুটোর একটা মারাঠা, আরেকটা গুজরাতি বেনে। প্যারিস থেকেই নাকি রঙ্গরস আরম্ভ হয়েছে। বোম্বাই অবধি গড়াবে। উপস্থিত কিন্তু আমাদের তিনজনারই মনে প্রশ্ন জাগলো, আখেরে জিতবে কে?

শুনেছি, এহেন অবস্থায় দুজনাই স্পানিয়ার্ড হলে ডুয়েল লড়ে, ইতালীয় হলে একজন আত্মহত্যা করে, ইংরেজ হলে নাকি একজন অন্যকে গম্ভীর ভাবে ষ্টিক বাও করে দু'দিকে চলে যায়, ফরাসী হলে নাকি ভাগাভাগি করে নেয়।

প্রথম ধাক্কাতেই গুজরাতি গেলেন হেরে। মারাঠারা চালাকি করে ডবল পয়সা খর্চা করে দু'খানি ডেক-চেয়ার ভাড়া করে রেখেছিল পাশাপাশি। বেনের মাথায় এ বুদ্ধিটা খেললো না কেন আমরা বুঝে উঠতে পারলুম না। মারাঠা নটবর সেই হুরীকে নিয়ে গেল জোড়া ডেক-চেয়ারের দিকে—স্যর ওয়ালটর রেলে যে রকম রানী ইলিজাবেথকে কাদার উপর আপন জোব্বা ফেলে দিয়ে হাত ধরে ওপারের পেভমেণ্টে নিয়ে গিয়েছিলেন।

দু'জনা লম্বা হলেন দুই ডেক-চেয়ারে। বেনেটা ক্যাবলাকান্তের মত সামনে দাঁড়িয়ে খানিকটা কাঁই-কুঁই করে কেটে পড়লো।

আমার পাশের ফরাসী বললে, 'ইডিয়ট!' জর্মন শুনে বললে, 'নাইন, আখেরে জিতবে বেনে।' 'এ্যাপসিব্‌ল্!' 'বেট্!' 'বেট্!' 'পাঁচ শিলিঙ?' 'পাঁচ শিলিঙ!'

আড্ডার দিকে ভালো করে একবার তাকিয়ে নিয়ে চাচা বললেন, 'বিশ্বাস করো আর নাই করো, আস্তে আস্তে জাহাজের সবাই লেগে গেল এই বাজি ধরাধরিতে। বুকিরও অভাব হল না। আর সে বেট্ কী অদ্ভুত ফ্লাক্‌চুয়েট করে। কোনোদিন ভোরে এসে দেখি জর্মনটা গুম্ হয়ে বসে আছে—যেন জাহাজ একটা কনসান্‌ট্রেশন ক্যাম্প—আর ফরাসীটা উল্লাসে ত্রিং ত্রিং করে পল্‌কা নাচ নাচছে। ব্যাপার কি? পাক্কা খবর মিলেছে, আমাদের পরীটি কাল রাত দু'টো অবধি মারাঠার সঙ্গে গুজুর-গুজুর করেছেন। বেনে মনের খেদে এগারো-টাতেই কেবিন নেয়। ফরাসী এখন সক্কলের গায়ে পড়ে থ্রি টু ওয়ান্ অফার করছে। সে জিতলে পাবে কুল্লে এক শিলিং, হারলে দেবে তিন শিলিং। নাও, বোঝ ঠ্যালা! আর কোনোদিন বা খবর রটে, বেনের পো জাহাজের ক্যাম্বিসের চৌবাচ্চায় হুরীর সঙ্গে দু'ঘণ্টা সাঁতার কেটেছে—মারাঠা জলকে ভীষণ ডরায়। ব্যস্, সেদিন বেনের স্টক স্কাই হাই!

ইতিমধ্যে একদিন বেনের বাজার যখন বড্ড ঢিলে যাচ্ছে তখন ঘটলো এক নবীন কাণ্ড। হুরী ও মারাঠা তো বসতো পাশাপাশি কিন্তু লাইনের সর্বশেষে নয় বলে হুরীর অন্য পাশে বসতো এক অতিশয় গোবেচারা ভালো মানুষ নিগ্রো পাদ্রী। সে গিয়ে তার ডেক-চেয়ারের সঙ্গে বেনের ডেক-চেয়ারের বদলাবদলির প্রস্তাব করেছে। বেনে নাকি উল্লাসে ইয়াল্লা বলে আকাশ-ছোঁয়া লম্ফ মেরেছিল। বেটিঙের বাজার আবার স্টেডি হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠলো, এ বেটিঙের শেষ ফৈসালা হবে কি প্রকারে? বহু বাক্‌বিতণ্ডার পর স্থির হল, যেদিন হুরী মারাঠা কিংবা বেনের সঙ্গে তার কেবিনে ঢুকবেন সেদিন হবে শেষ ফৈসালা। যার সঙ্গে ঢুকবেন তার হবে জিত।

দু'একজন রুচিবাগীশ আপত্তি করেছিলেন কিন্তু ফরাসী উকিল হাত-পা চোখ-মুখ নেড়ে বুঝিয়ে দিল, 'C'est, c'est, এটা, এটা হচ্ছে একটা লিগাল ডিসিশন, একটা আইনত ন্যায্য হকের ফৈসালা। ঢলাঢলির কোনো কথাই হচ্ছে না।'

রেসের বাজি তখন চরমে। কখনো বেনে, কখনো মারাঠা। সেই যে চণ্ডুখোর গল্প বলেছিল, পাখিকে গুলি মেরে সঙ্গে সঙ্গে শিকারী কুকুরকেও দিয়েছে লেলিয়ে। তখন বুলেটে কুকুরে কী রেস্—কভী কুত্তা, কভী গুলি, কভী গুলি, কভী কুত্তা।

এমন সময় আদন বন্দর পেরিয়ে আমরা ঢুকলুম আরব সাগরে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আঠেরো হাজার টনের জাহাজকে মারলে মৌসুমী হাওয়া তার বাইশ হাজারি টনের থাবড়া। জাহাজ উঠলো নাগর বেনাগর সবাইকে নিয়ে নাগরদোলায়। আর সঙ্গে সঙ্গে সী সিক্‌নেস! বমি আর বমি! প্রথম ধাক্কাতেই মারাঠা হল ঘায়েল। রেলিঙ ধরে পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি বের করার চেষ্টা দিয়ে টলতে টলতে চলে গেল কেবিনে। বেনের মুখে শুকনো হাসি, কিন্তু তিনিও আরাম বোধ করছেন না। পরদিন সমুদ্র ধরলো রুদ্রতর মূর্তি। এবারে হুরী পড়ে রইলেন একা। তাঁর মুখও হরতালের মত হলদে। তার পরের দিন ডেক প্রায় সাফ। নিতান্ত বরিশালের পানি-জলের প্রাণী বলে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কোনোগতিকে আমি টিঁকে আছি আর কি! খাবার সময় পেটে যা যায় সে-সব রিটার্ন টিকিট নিয়ে মোকামে পৌঁছবার আগেই ফিরি ফিরি করছে। হুরী নিতান্ত একা বলে ফরাসী বন্ধু তাকে আদর করে ডেকে এনে আমাদের পাশে বসালে।

সে রাত্রে জাহাজ খেলো ঝড়ের মোক্ষমতম থাবড়া। ফরাসী গায়েব। হুরী এই প্রথম ছুটে গিয়ে ধরলো রেলিঙ। আমিও এই যাই কি তেই যাই। তবু

ধরলুম গিয়ে তাকে। হরী ক্ষীণকণ্ঠে বললে, "কেবিন।" আমি ধরে ধরে কোনোগতিকে তাকে তার কেবিনের দিকে নিয়ে চললুম। দুজনাই টলটলায়মান। আমার কেবিনের সামনে পৌঁছতেই ঝড়ের আরেক ধাক্কায় খুলে গেল আমার কেবিনের দরজা। ছিটকে পড়লুম দুজনাই ভিতরে। কি আর করি? তাকে তুলে ধরে প্রথম বিছানায় শোয়ালুম। তারপর কেবিন-বয়কে ডেকে দু'জনাতে মিলে তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেলুম তার কেবিনে। বাপ্‌স্!'

চাচা থামলেন। একদম থেমে গেলেন।

আড্ডায় সবাই একবাক্যে শুধালে, 'তারপর?'

চাচা বললেন, 'কচু, তারপর আর কি?'

তবু সবাই শুধায়, 'তারপর?'

চাচা বললেন, 'এ তো বড় গেরো। তোরা কি ক্লাইমেক্‌স্ বুঝিস নে? আচ্ছা, বলছি। ভোর হতেই বোম্বাই পৌঁছলুম। ডেকে যাওয়া মাত্রই সবাই আমাকে জাবড়ে ধরে কেউ বলেফেলিসিতাসিয়োঁ, মসিয়ো, কেউ বলে কন্‌গ্রাচুলেশনস্, কেউ বলে গ্রাতুলিয়েরে—দুচ্ছাই, এ-সব কি? কিন্তু কেউ কিচ্ছুটি বুঝিয়ে বলে না।'

শেষটায় ফরাসী উকিলটা বললে, 'আ মসিয়ো, কী কেরদানিটাই না দেখালে। ওস্তাদের মার শেষ রাতে। মহারাষ্ট্র গুজরাত দু'জনাই হার মানলে। জিতলে বেঙ্গল! ভিভ্ ল্যা বাঁগাল। লং লিভ বেঙল!'

'আমি যতই আপত্তি করি কেউ কোনো কথা শোনে না।

আর শুধু কি তাই? ব্যাটারা সবাই আপন আপন বাজির টাকা ফেরত পেল—বেনে কিংবা মাবাঠা কেউ জেতে নি বলে। কিন্তু আমার দশ শিলিং স্রেফ, বেপরোয়া, মেরে দিলে। বলে কি না, আমি যখন ঘোড়ায় চড়ে জিতেছি, আমার বাজি ধরার হক্ক নেই। টাকাটা নাকি তছরূপ হয়ে যায়।'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে চাচা বললেন, 'কিন্তু সেই থেকে আমার চোখ বলে দিতে পারে ইটার্নেল ট্রায়েঙ্গল কোথায়।'

এমন সময় সেই দুই জর্মন ছোকরায় লেগে গেল মারামারি। সেটা থামাতে গিয়ে আড্ডা সেদিন ভঙ্গ হল।

সংস্কৃত ভাষা আত্মনির্ভরশীল। কোনো নূতন চিন্তা, অনুভূতি কিংবা বস্তুর জন্য নবীন শব্দের প্রয়োজন হলে সংস্কৃত ধার করার কথা না ভেবে আপন ভাণ্ডারে অনুসন্ধান করে, এমন কোনো ধাতু বা শব্দ সেখানে আছে কি না যার সামান্য অদল বদল করে কিংবা পুরনো ধাতু দিয়ে নবীন শব্দটি নির্মাণ করা যায় কি না। তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে, সংস্কৃত কস্মিনকালেও বিদেশী কোনো শব্দ গ্রহণ করে নি। নিয়েছে, কিন্তু তার পরিমাণ এতই মুষ্টিমেয় যে, সংস্কৃতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা বলাতে কারো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়।

প্রাচীন যুগের সব ভাষাই তাই। হীব্রু, গ্রীক, আবেস্তা এবং ঈষৎ পরবর্তী যুগের আরবীও আত্মনির্ভরশীল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বয়ংসম্পূর্ণ।

বর্তমান যুগের ইংরিজি ও বাঙলা আত্মনিভবশীল নয়। আমরা প্রয়োজন মত এবং অপ্রয়োজনেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ নিয়েছি এবং নিচ্ছি। পাঠান-মোগল যুগে আইন-আদালত খাজনা-খারিজ নূতনরূপে দেখা দিল ব'লে আমরা আরবী ও ফার্সী থেকে প্রচুব শব্দ গ্রহণ কবেছি। পরবর্তী যুগে ইংরিজি থেকে এবং ইংরিজির মারফতে অন্যান্য ভাষা থেকে নিযেছি এবং নিচ্ছি।

বিদেশী শব্দ নেওয়া ভালো না মন্দ সে প্রশ্ন অবাস্তব। নিয়েছি, এবং এখনো সজ্ঞানে আপন খুশীতে নিচ্ছি এবং শিক্ষাব মাধ্যমরূপে ইংবিজিকে বর্জন করে বাঙলা নেওয়াব পব যে আরো প্রচুর ইউরোপীয় শব্দ আমাদের ভাষায় ঢুকবে, সে সম্বন্ধেও কারো কোনো সন্দেহ নেই। আলু-কপি আজ রান্নাঘর থেকে তাড়ানো মুশকিল, বিলিতি ওষুধ প্রায় সকলেই খান, ভবিষ্যতে আরো নূতন নূতন ওষুধ খাবেন বলেই মনে হয়। এই দুই বিদেশী বস্তুব ন্যায় আমাদের ভাষাতেও বিদেশী শব্দ থেকে যাবে, নূতন আমদানিও বন্ধ করা যাবে না।

পৃথিবীতে কোনো জিনিসই সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়। অন্তত চেষ্টা কবাটা অসম্ভব নাও হতে পারে। হিন্দী উপস্থিত সেই চেষ্টাটা কবছেন—বহু সাহিত্যিক উঠে পড়ে লেগেছেন, হিন্দী থেকে আরবী, ফার্সী এবং ইংবিজী শব্দ তাড়িয়ে দেবাব জন্য। চেষ্টাটার ফল আমি হয়তো দেখে যেতে পাববো না। আমাব তরুণ পাঠকেরা নিশ্চয়ই দেখে যাবেন। ফল যদি ভালো হয় তখন তাঁবা না হয় চেষ্টা কবে দেখবেন। (বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দে লিখেছেন, 'আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।' নজরুল ইসলাম 'ইনকিলাব',—'ইনক্লাব' নয়—এবং 'শহীদ' শব্দ বাঙলায় ঢুকিয়ে গিয়েছেন। বিদ্যাসাগর 'সাধু' রচনায় বিদেশী শব্দ ব্যবহার করতেন না, বেনামীতে লেখা 'অসাধু' রচনায় চুটিয়ে

আরবী-ফার্সী ব্যবহার করতেন। আর অতিশয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ৺হরপ্রসাদ আরবী-ফার্সী শব্দের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা 'আহাম্মুখী' বলে মনে করতেন। 'আলাল' ও 'হুতোম'-এর ভাষা বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল ; সাধারণ বাঙলা এ-স্রোতে গা ঢেলে দেবে না ব'লে তার উল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন এবং হিন্দীর বঙ্কিম স্বয়ং প্রেমচন্দ্র হিন্দীতে বিস্তর আরবী-ফার্সী ব্যবহার করছেন।)

এস্থলে আরেকটি কথা বলে রাখা ভালো। রচনার ভাষা তার বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে। শঙ্করদর্শনের আলোচনায় ভাষা সংস্কৃতশব্দবহুল হবেই, পক্ষান্তরে মোগলাই রেস্তোরাঁর বর্ণনাতে ভাষা অনেকখানি 'হুতোম'-ঘ্যাষা হয়ে যেতে বাধ্য। 'বসুমতী'র সম্পাদকীয় রচনার ভাষা এক—তাতে আছে গাম্ভীর্য, 'বাঁকা চোখে'র ভাষা ভিন্ন—তাতে থাকে চটুলতা।

* *

বাঙলায় যে সব বিদেশী শব্দ ঢুকেছে তার ভিতরে আরবী, ফার্সী এবং ইংরিজীই প্রধান। সংস্কৃত শব্দ বিদেশী নয় এবং পর্তুগীজ, ফরাসিস, স্প্যানিশ শব্দ এতই কম যে, সেগুলো নিয়ে অত্যধিক দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই।

বাঙলা ভিন্ন অন্য যে-কোনো ভাষার চর্চা আমরা করি না কেন, সে ভাষার শব্দ বাঙলাতে ঢুকবেই। সংস্কৃত চর্চা এদেশে ছিল ব'লে বিস্তর সংস্কৃত শব্দ বাঙলায় ঢুকেছে, এখনো আছে ব'লে অল্পবিস্তর ঢুকছে, যতদিন থাকবে ততদিন আরো ঢুকবে ব'লে আশা করতে পারি। ইস্কুল-কলেজ থেকে যে আমরা সংস্কৃত চর্চা উঠিয়ে দিতে চাই নে তার অন্যতম প্রধান কারণ বাঙলাতে এখনো আমাদের বহু সংস্কৃত শব্দের প্রয়োজন, সংস্কৃত চর্চা উঠিয়ে দিলে আমরা অন্যতম প্রধান খাদ্য থেকে বঞ্চিত হব।

ইংরিজীর বেলাতেও তাই। বিশেষ ক'রে দর্শন, নন্দনশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি জ্ঞান এবং ততোধিক প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানেরাও শব্দ আমরা চাই। রেলের ইঞ্জিন কি ক'রে চালাতে হয়, সে সম্বন্ধে বাঙলাতে কোনো বই আছে ব'লে জানি নে, তাই এসব টেক্‌নিকল শব্দের প্রয়োজন যে আরো কত বেশী সে সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা এখনো আমাদের মনের মধ্যে নেই। সুতরাং ইংরিজী চর্চা বন্ধ করার সময় এখনো আসে নি।

একমাত্র আরবী-ফার্সী শব্দের বেলা অনায়াসে বলা যেতে পারে যে, এই দুই ভাষা থেকে ব্যাপকভাবে আর নূতন শব্দ বাঙলাতে ঢুকবে না। পশ্চিম বাঙলাতে আরবী-ফার্সীর চর্চা যাবো-যাবো করছে, পূব বাঙলায়ও এ সব ভাষার প্রতি তরুণ

সম্প্রদায়ের কৌতূহল অতিশয় ক্ষীণ ব'লে তার আয়ু দীর্ঘ হবে ব'লে মনে হয় না এবং শেষ কথা, আরব-ইরানে অদূর ভবিষ্যতে যে হঠাৎ কোনো অভূতপূর্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হয়ে বাঙলাকে প্রভাবান্বিত করবে তার সম্ভাবনাও নেই।

কিন্তু যে সব আরবী-ফার্সী শব্দ বাঙলাতে ঢুকে গিয়েছে তার অনেকগুলো যে আমাদের ভাষাতে আরো বহুকাল ধরে চালু থাকবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং দ্বিতীয়তঃ কোনো কোনো লেখক নূতন বিদেশী শব্দের সন্ধান বর্জন ক'রে পুরনো বাঙলার—'চণ্ডী' থেকে আরম্ভ করে 'হুতোম' পর্যন্ত—অচলিত আরবী-ফার্সী শব্দ তুলে নিয়ে সেগুলো কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন। কিছুদিন পূর্বেও এই এক্সপেরিমেণ্ট করা অতিশয় কঠিন ছিল কিন্তু অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে বাধ্য হয়ে পুরনো বাঙলা পড়তে হয়—তারা এই সব শব্দের অনেকগুলো অনায়াসে বুঝতে পারবে ব'লে অচলিত অনেক আরবী-ফার্সী শব্দ নূতন মেয়াদ পাবে।

এই পরিস্থিতির সামনে জীবন্মৃত এসব শব্দের একটা নূতন খতেন নিলে ভালো হয়।

* *

সংস্কৃত, গ্রীক, বাঙলা আর্য ভাষা ; আরবী, হীব্রু সেমিতি ভাষা। ফার্সী, উর্দু, কাশ্মীরী, সিন্ধীও আর্য ভাষা, কিন্তু এদের উপর সেমিতি আরবী ভাষা প্রভাব বিস্তার করেছে প্রচুর। উত্তর ভারতের অন্যান্য ভাষাদের মধ্যে বাঙলা এবং গুজরাতিই আরবী ভাষার কাছে ঋণী, কিন্তু এই ঋণের ফলে বাঙলার মূল সুর বদলায় নি। গুজরাতির বেলাও তাই।

হীব্রু এবং আরবী সাহিত্যের ঐশ্বর্য সর্বজনবিদিত। ঠিক সেই রকম প্রাচীন আর্য ভাষা ফার্সী তার ভগ্নী সংস্কৃতের ন্যায় খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বেই সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। আববরা যখন ইরান জয় করে তখন তারা ইরানীদের তুলনায় সভ্যতা-সংস্কৃতিতে পশ্চাৎপদ। কিন্তু তারা সঙ্গে আনলো যে ধর্ম সেটি জরথুস্ত্রী ধর্মের চেয়ে প্রগতিশীল, সর্বজনীন এবং দুঃখীর বেদনা উপশমকারী। ফলে তাবৎ ইরান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো এবং আপন ভাষা ও সাহিত্য বর্জন করে আরবীকে রাষ্ট্রভাষা ও সংস্কৃতির বাহনরূপে স্বীকার ক'রে নিল। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাই ইরানীদের দান অতুলনীয়।

চারশত বৎসর পরে কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হল। ইরানীদের আপন ভাষা তখন মাহমুদ বাদশার উৎসাহে নবজন্ম লাভ ক'রে নব নব সাহিত্য-সৃষ্টির পথে এগিয়ে চললো। বাল্মীকি যে রকম আদি এবং বিশ্বজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি,

ফিরদৌসীও এই নব ইরানী (ফার্সী) ভাষার আদি এবং শ্রেষ্ঠ কবি। আরবী থেকে শব্দ এবং ভাবসম্পদ গ্রহণ ক'রে ফার্সী সাহিত্য যে অভূতপূর্ব বিচিত্র রূপ ধারণ করলো তা আজও বিশ্বজনের কাছে বিস্ময়ের বস্তু। রূমী, হাফিজ, সাদী, খৈয়াম আপন আপন রশ্মিমণ্ডলে সবিতাস্বরূপ। সেমিতি আরবী এবং আর্য ফার্সী ভাষার সংঘর্ষের ফলেই এই অনির্বাণ হোমানলের সৃষ্টি হল।

পরবর্তী যুগে এই ফার্সী সাহিত্যই উত্তর ভারতে ব্যাপকরূপে প্রভাব বিস্তার করলো। ভারতীয় মক্তব-মাদ্রাসায় যদিও প্রচুর পরিমাণে আরবী ভাষা পড়ানো হয়েছিল তবু কার্যত দেখা গেল ভারতীয় আর্যগণ ইরানী আর্য সাহিত্য অর্থাৎ ফার্সীর সৌন্দর্যে অভিভূত হলেন বেশী। উর্দু সাহিত্যের মূল সুর তাই ফার্সীর সঙ্গে বাঁধা—আরবীর সঙ্গে নয়। হিন্দী গদ্যের উপরও বাইরের যে প্রভাব পড়েছে সেটা ফার্সী—আরবী নয়।

একদা ইরানে যে রকম আর্য ইরানী ভাষা ও সেমিতি আরবী ভাষার সংঘর্ষে নবীন ফার্সী জন্মগ্রহণ করেছিল, ভারতবর্ষে সেই সংঘর্ষের ফলে সিন্ধী, উর্দু ও ও কাশ্মীরী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু আরবীর এই সংঘর্ষ ফার্সীর মাধ্যমে ঘটেছিল ব'লে কিংবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, ভারতবর্ষীয় এ তিন ভাষা ফার্সীর মত নব নব সৃষ্টি দিয়ে ঐশ্বর্যশালী সাহিত্যসৃষ্টি করতে পারলো না। উর্দুতে কবি ইকবালই এ তত্ত্ব সম্যক হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন ও নূতন সৃষ্টির চেষ্টা করে উর্দুকে ফার্সীর অনুকরণ থেকে কিঞ্চিৎ নিষ্কৃতি দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

* *

বাঙলা আর্যভূমি, কিন্তু এ ভূমির আর্যগণ উত্তর ভারতের অন্যান্য আর্যের মত নন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার স্থান এখানে নয়। তাই মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।

(১) বাঙলা দেশকে যখনই বাইরের কোনো শক্তি শাসন করতে চেষ্টা করেছে তখনই বাঙালী বিদ্রোহ করেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপন স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। পাঠান যুগে বাঙলা অতি অল্পকাল পরাধীন ছিল এবং মুগল যুগেও মোটামুটি মাত্র জাহাঙ্গীর থেকে আওরঙজেব পর্যন্ত বাঙলা দিল্লীর শাসন মেনেছে।

(২) অন্যান্য আর্যদের তুলনায় বাঙালী কিছুমাত্র কম সংস্কৃত চর্চা করে নি, কিন্তু সে-চর্চা সে করেছে আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে। আদিশূর থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সকলের বহু চেষ্টাতেও বাঙালী উত্তর ভারতের সঙ্গে স্ট্রীমলাইন্‌ড্‌ হয়ে সংস্কৃত পদ্ধতিতে সংস্কৃত বর্ণমালার উচ্চারণ করে নি এবং বাঙলাতে সংস্কৃত শব্দ

উচ্চারণ করার সময় তো কথাই নেই।

(৩) বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি তার পদাবলী কীর্তনে। এ সাহিত্যের প্রাণ এবং দেহ উভয়ই খাঁটি বাঙালী। এ সাহিত্যে শুধু যে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ বাঙলায় খাঁটি কানুরূপ ধারণ করেছেন তাই নয়, শ্রীমতী শ্রীরাধাও যে একেবারে খাঁটি বাঙালী মেয়ে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভাটিয়ালির নায়িকা, বাউলের ভক্ত, মুর্শীদীয়ার আশিক ও পদাবলীর শ্রীরাধা একই চরিত্র একই রূপে প্রকাশ পেয়েছেন।

বাঙালীর চরিত্রে বিদ্রোহ বিদ্যমান। তার অর্থ এই যে, কি রাজনীতি, কি ধর্ম, কি সাহিত্য, যখনই যেখানে সে সত্য শিব সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে তখনই সেটা গ্রহণ করতে চেয়েছে; এবং তখন কেউ 'গতানুগতিক পন্থা' 'প্রাচীন ঐতিহ্য'-এর দোহাই দিয়ে সে প্রচেষ্টায় বাধা দিতে গেলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। এবং তার চেয়েও বড় কথা,—যখন সে বিদ্রোহ উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হতে চেয়েছে, তখন তার বিরুদ্ধে আবার বিদ্রোহ করেছে।

এ বিদ্রোহ বাঙালী হিন্দুর ভিতরই সীমাবদ্ধ নয়। বাঙালী মুসলমানও এ কর্মে পরম তৎপর। ধর্ম বদলালেই জাতির চরিত্র বদলায় না।

* *

পাঠান আমলে বাঙলা দেশে আরবী-ফার্সীর চর্চা ব্যাপকভাবে হয় নি। সে-যুগে বাঙলাতে লিখিত সরকারী দলিলপত্রে পর্যন্ত আরবী-ফার্সী টেক্‌নিকল শব্দ প্রায় নেই। মহাপ্রভু এবং তাঁর শিষ্যদের কেউ কেউ মুসলমান ধর্মের সঙ্গে সুপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও সে যুগের বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফার্সী শব্দ অতি অল্প।

খাস পাঠান যুগে তো কথাই নেই, মোগল যুগের প্রারম্ভেও কবি আলাওল যে কাব্য রচনা করেছেন তাতে সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্যই লক্ষণীয়—

উপনীত হৈল আসি যৌবনের কাল।
কিঞ্চিৎ ভুকর-ভঙ্গে যৌবন রসাল॥
আড় আঁখি বঙ্ক-দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে হয়।
ক্ষণে ক্ষণে লাজে তনু যেন শিহরয়॥
সম্বরয় গিম-হার, কটির বসন।
চঞ্চল হইল আঁখি, ধৈরয-গমন॥
চোররূপে অনঙ্গ অঙ্গেতে আসে যায়।
বিরহ বেদনা ক্ষণে ক্ষণে মনে ভায়॥

এ ধরনের কাব্য তখন মুসলমানদের ভিতর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল

তার বর্ণনা পাই অন্য এক কবির কাছ থেকে। সৈয়দ সুলতান বলেন,

আপনা দীনের বোল্ এক না বুঝিল।
পরস্তব-সকল লৈয়া সব রহিল॥

(দীন=ধর্ম ; পরস্তব=পরধর্ম কীর্তন। এর পূর্বেই মুসলমানরা পদাবলী কীর্তন রচনা আরম্ভ করেছেন এবং কাজী ফয়জউল্লার 'গোরক্ষবিজয়' মুসলমানদের ভিতর লোকপ্রিয় হয়ে গিয়েছে।)

মুসলমানরা আপন ধর্মচর্চা না করে 'হিন্দুয়ানী' কাব্য নিয়ে মেতে আছে দেখে মুসলমান মোল্লা-মৌলবীগণ তারস্বরে আপন প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং আরবী-ফার্সীতে ধর্মচর্চা করবার জন্য বার বার কড়া ফতোয়া জারী করেছেন।

তখন সৈয়দ সুলতান বললেন, 'আমরা বাঙলা ছাড়বো না ; কিন্তু মুসলমান শাস্ত্রচর্চাও করবো। তাই বাঙলাতেই মুসলমান শাস্ত্রচর্চা হবে।'

আরবী-ফার্সী ভাষে কিতাব বহুত।
আলিমানে বুঝে, না বুঝে মূর্খসুত॥
যে সবে আপন বুলি না পাবে বুঝিতে।
পাঁচালী রচিলাম করি আছয়ে দূষিতে॥
আল্লায় বলিছে, 'মুই যে-দেশে যে-ভাষ,
সে-দেশে সে-ভাষে কইলুম রসুল প্রকাশ॥'

(আলিমান=আলিমগণ=পণ্ডিতগণ ; রসুল=আল্লার প্রেরিত পুরুষ, পয়গম্বর।)

অতি মোক্ষম জবাব। সৈয়দ সুলতান কুরানের বচন উদ্ধৃত ক'রে সপ্রমাণ করলেন, বাঙলাতেই বাঙালী মুসলমানের শাস্ত্রচর্চা করা ফরজ্—অবশ্য করণীয়।

সৈয়দ সুলতান কিন্তু আটঘাট বেঁধে পয়গম্বর সাহেবের বাণী বাঙলাতে প্রকাশ করেছেন। নিতান্ত যে কটি আরবী শব্দ ব্যবহার না করলেই নয়, তিনি মাত্র সেগুলোই ব্যবহার করেছেন এবং প্রচলিত হিন্দু ধর্মের মাধ্যমেই ইসলাম প্রকাশ করেছেন।

তোমার সবের মুই জানো হিতকারী।
ইমান-ইসলামের কথা দিলাম প্রচারি॥
যেরূপে সৃজন হইল সুরাসুরগণ।
যেরূপে সৃজন হইল এ তিন ভুবন॥
যেরূপে আদম ইবা সৃজন হইল।
যেরূপে যতেক পয়গম্বর উপজিল॥

বঙ্গেতে এসব কথা কেহ না জানিল।
নবী-বংশ পাঁচালীতে সকল শুনিল॥

এস্থলে দ্রষ্টব্য, হিন্দু মুসলমান উভয়কে মুসলমান ধর্ম বোঝাতে গিয়ে কবি এমন সব বস্তুর উল্লেখ করেছেন, যা মুসলমান ধর্মে নেই। 'সুর' 'অসুর' কল্পনা ইসলামে নেই। 'তিন ভুবন' ইসলামে নেই, আছে 'দুই ভুবন'। তাঁর পুস্তকের নাম 'নবীবংশ'ও হিন্দু 'হরিবংশে'র অনুকরণ—আরবীতে এই ধরনের নাম নেই।

এমন কি তিনি পয়গম্বর হজরৎ মুহম্মদকে 'অবতার' আখ্যা দিয়ে মোল্লাদের মতে পাপ করেছেন; কারণ মুসলিম শাস্ত্রমতে আল্লা মনুষ্যদেহ গ্রহণ ক'রে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন না, তিনি মানুষদের একজনকে বেছে তাঁকে তাঁর মুখপাত্র করেন। সৈয়দ সুলতান কিন্তু বলছেন,

মুহম্মদ রূপ ধরি নিজ অবতার।
নিজ অংশ প্রচারিল হইতে প্রচার॥

আর সব চেয়ে বড় তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন সৈয়দ সাহেব, এই দুইটি ছত্রে—

যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন।
সেই ভাষা তাহার, অমূল্য সেই ধন॥

এই দু'টি ছত্রে যে কত বড় সত্য নিহিত আছে, সে তত্ত্ব কি আমরা আজও বুঝতে পেরেছি? এই সৈয়দ সুলতানকে তখনকার দিনের মোল্লা-মৌলবীরা 'ইসলামের ঐক্য নষ্ট হয়ে যাবে', 'আরবীর মর্যাদা লোপ পাবে' এই সব ভয় দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে 'মুনাফিক' অর্থাৎ 'ভণ্ড' অর্থাৎ 'ধর্মধ্বংসকারী' আখ্যা দিয়ে 'ফতোয়া' পর্যন্ত জারী করেছেন। সাহসী কবি কিন্তু অকুণ্ঠ ভাষায় তাঁর মাতৃভাষা বাঙলার জয়গান গেয়ে গেছেন। এ লোক যদি প্রকৃত বাঙালী না হয়, তবে বাঙালী কে?

সে শুভবুদ্ধি, সে সাহস কি আজও আমাদের হয়েছে? কেউ বলে 'রাষ্ট্রের অখণ্ডতার জন্য হিন্দী গ্রহণ করো', কেউ বলে 'ইংরিজী বর্জন করলে আমরা বর্বর হয়ে যাব।' হায়, বাঙলার পদমর্যাদা কেউ স্বীকার করে না।

যখন দ্বন্দ্ব নেই, সংঘাত নেই, তখন মাতৃভাষার গৌরবগান গেয়ে লম্ফ-ঝম্প করে সবাই; কিন্তু যুগসন্ধিক্ষণে, নানা প্রলোভন-বিভীষিকার সম্মুখে মাতৃভাষাকে নিজের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা বলতে পারাতেই প্রকৃত সাহস, প্রকৃত জ্ঞান উপলব্ধির লক্ষণ। সৈয়দ সুলতানের দুইশত বৎসর পরে ইংরিজী ভাষা বাঙালীকে প্রলোভন দেখিয়েছিল আরেকবার। কিন্তু মুসলমান সুলতানের ন্যায় খৃষ্টান মাইকেল তখন

উচ্চকণ্ঠে বাঙলার জয়গান গেয়েছিলেন।

সৈয়দ সুলতানের অনুকরণকারীরা কিন্তু তাঁর মত বিচক্ষণ ভাষাবিদ ছিলেন না: ফলে বাঙলাতে যে পরিমাণে আরবী-ফার্সী শব্দ প্রবেশ করতে লাগল তাতে ভাষার বৈশিষ্ট্য বিপন্ন হতে লাগল। ইতিমধ্যে—মোগল যুগের শেষের দিকে—উর্দু ভাষাও বাঙলা দেশে প্রবেশ করেছে। তাই তখন যে বাঙলা পাচ্ছি তার উদাহরণ—

বিশ্বনাথ বিশ্বাসে বুঝায়ে বলে বাছা।
দুনিয়ামে এসাভি আদমী রহে সাচা॥
ভালা বাওয়া কাহে তেরা মৃত্যুকাল কাছে।...
রাতদিন যৈসা তৈসা সুখ দুঃখ হোয়ে॥
জানা গেল বাত বাওয়া জানা গেল বাত।
কাপড়া লেও আওর আও মেরা সাথ॥

যুক্তি নয়, অজুহাত হিসেবে বলা যেতে পারে, আকবরের আমল থেকে বহুল ফার্সী শিক্ষাদানের ফলে বাঙলা দেশে তখন প্রচুর লোক বিস্তর আরবী-ফার্সী শব্দ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে। এটা কিন্তু কোনো সৎযুক্তি নয়। কারণ আজ আমরা দৈনন্দিন জীবনে বিস্তর ইংরিজী শব্দ ব্যবহার করি: তাই ব'লে সাহিত্যসৃষ্টির সময় বে-এক্তেয়ার হয়ে যত্র-তত্র ভূরি ভূরি ইংরিজী শব্দ ব্যবহার করি নে।

কিন্তু সত্য কবি পথভ্রষ্ট হন না। তার প্রকৃত নিদর্শন আমরা পাই, চট্টগ্রামের মহিলা কবি 'শ্রীমতী রহীমুন্নিসা'র (আশা করি 'শ্রীমতী' লেখাতে কেউ আপত্তি করবেন না, কারণ তিনি নিজেই তাঁর কাব্যে আপন পরিচয় দেবার সময় লিখেছেন—

"স্বামী আজ্ঞা শিরে পালি লিখি এ-ভারতী।
রহিমুনিচা নাম জান আছে ছিরীমতী॥")

এই মহিলা কবির সঙ্গে হালে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন সুপণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, পূর্ববঙ্গের বাঙলা-একাডেমির প্রথম ডাইরেক্টর (বাঙলা-একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, পৌষ ১৩৬৩, পৃঃ ৫৩)। তাঁর মতে '১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই রহীমু-'ন্-নিসা আবির্ভূতা হয়েছিলেন।' ইনিও সৈয়দ সুলতানের মত সৈয়দ বংশের মেয়ে এবং পরিবারে প্রচুর আরবী-ফার্সীর চর্চা থাকা সত্ত্বেও সুস্থ, সবল এবং মধুর বাঙলায় কবিতা রচনা ক'রে গিয়েছেন।

এঁর হাতের লেখা খুব সম্ভব সুন্দর ছিল। তাই বোধ করি তাঁর স্বামী তাঁকে কবি আলাওলের 'পদ্মাবতী' নকল করতে আদেশ দেন :—

শুন গুণিগণ হই এক মন,
লেখিকার নিবেদন।
অক্ষর পড়িলে টুটা পদ হৈলে
শুধারিঅ সর্ব্বজন॥
পদ এই রাষ্ট্র হেন মহাকষ্ট
পুঁথি সতী পদ্মাবতী।
আলাওল মণি, বুদ্ধি বলে গুণী,
বিরচিল এ ভারতী॥
পদের উকতি বুঝি কি শকতি,
মুই হীন তিরী জাতি।
স্বামীর আদেশ মানিয়া বিশেষ
সাহস করিল গাঁথি॥

রহীমুন্নিসার স্বরচিত কাব্য অল্পই পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে তাঁর একটি 'বারমাস্যা' বড়ই করুণ এবং মধুর। পূর্ববঙ্গের কবিরা সচরাচর প্রিয়বিরহে বারমাস্যা রচনা করেছেন—রহীমুন্নিসা ভ্রাতৃশোকে তাঁর নব বারমাস্যা রচনা করেছেন।

আশ্বিনেতে খোয়াময় কান্দে তরুলতাচয়
ভাই বলি কান্দে উভরায়।
আমার কান্দনি শুনি বনে কান্দে কুরঙ্গিণী
জলে মাছ কান্দিয়া লুকায়॥
(খোয়া = কুয়াশা)

অন্য এক স্থলে 'কন্যাহারা জননী'র শোকাতুরার ক্রন্দন প্রকাশ করেছেন অতুলনীয় সরল বাঙলায়—

নয়া সন নয়া মাস ফিরে বারে বার
মোর জাদু গেল ফিরি না আসিল আর॥

এঁর রচনায় সত্যই মধুর কবি-প্রতিভা 'বারেবার' ধরা পড়ে। পাঠককে মূল প্রবন্ধটি পড়তে অনুরোধ জানাই।

* *

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বন্দ্ব প্রধানতঃ ইংরিজীর সঙ্গে। এবং সেই দ্বন্দ্ব বিদ্রোহ-

রূপ ধারণ করলো পূব বাঙলার ভাষা আন্দোলনে ১৯৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে। বাঙলা আবার জয়ী হল—কিন্তু এবারে তার জয়মূল্য দিতে হল বুকের রক্ত দিয়ে—কিন্তু আব্রু, ইজ্জৎ, ইমান দিয়ে নয়। পাকিস্তান হওয়া সত্ত্বেও পূব বাঙলার লোক বাঙলাতে আরেক দফে আরবী-ফার্সী শব্দ আমদানি করে ভাষাকে 'পাক' করতে প্রলোভিত হল না।

তাই এই প্রবন্ধের নাম দিয়েছি 'মামদো'র পুনর্জন্ম। 'মামদো'রই যখন কোনো অস্তিত্ব নেই, তখন তার পুনর্জন্ম হবে কি প্রকারে? পূব বাঙলার লেখকদের স্কন্ধে আরবী-ফার্সী শব্দের মামদো ভর করবে, আর তারা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে আরবী-ফার্সীতে অর্থাৎ "যাবনী মেশালে' কিচিরমিচির করতে আরম্ভ করবে, বিজাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করবে—যার মাথামুণ্ডু পশ্চিম বাঙলার লোক বুঝতে পারবে না, সে ভয় 'স্বপ্ন, মায়া, মতিভ্রম'।

দিল্লী স্থাপত্য

যাঁরা এই শীতে প্রথম দিল্লী যাচ্ছেন কিংবা যাঁরা পূর্বে গিয়েছেন কিন্তু পাঠান-মোগলের দালান-কোঠা, এমারত-দৌলত দেখবার সুযোগ ভালো করে পান নি, এ-লেখাটি তাঁদের জন্য। এবং বিশেষ করে তাঁদের জন্য যাঁদের স্থাপত্য দেখে অভ্যাস নেই বলে ঐ রস থেকে বঞ্চিত। লেখাটিতে কিঞ্চিৎ 'মাস্টারি মাস্টারি' ভাব থেকে যাবে বলে গুণীজনকে আগের থেকেই হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি তাঁরা যেন এটি না পড়েন।

কোনো-কালে যে ব্যক্তি গান শোনে নি সে যদি হঠাৎ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য না করে তা হলে চট করে তাকে বেরসিক বলা অন্যায়। বাঙলা দেশে এখানে-ওখানে ছিটেফোঁটা স্থাপত্য আছে বটে, কিন্তু একই জায়গায় যথেষ্ট পরিমাণে নেই বলে স্থাপত্যের যে ক্রমবিকাশ এবং সামগ্রিক রূপ তার রস বুঝতে সাহায্য করে তার সম্পূর্ণ অভাব। বিচ্ছিন্নভাবে যে বিশেষ একটি মন্দির, মসজিদ বা সমাধি রসসৃষ্টি করতে পারে না, তা নয়। তাই তুলনা দিয়ে বলতে পারি, জগতের কোনো সাহিত্যের সঙ্গে যদি আপনার কিছুমাত্র পরিচয় না থাকে, তবে সাধারণত ধরে নেওয়া যেতে পারে যে উটকো একখানা ফরাসী উপন্যাসের রস আপনি গ্রহণ করতে পারবেন না। রসবোধের জন্য ঐতিহাসিক ক্রম-বিকাশ-জ্ঞান অপরিহার্য কিনা এ প্রশ্ন নন্দনশাস্ত্রের অন্যতম কঠিন প্রশ্ন। সে গোলক-ধাঁধার ভিতর একবার ঢুকলে আর দিল্লী যাবার পথ পাবেন না,—আর 'দিল্লী

দূর অস্ত.' তো বটেই।

কবিতা, সঙ্গীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্যের মূল রস একই—ইংরিজীতে যাকে বলে ঈসথেটিক ডিলাইট। কিন্তু এক রসের চিন্ময়রূপ (যথা কাব্যের) যদি অন্য রসের মৃন্ময়রূপে (যথা ভাস্কর্য, স্থাপত্যে) টায়-টায় মিলছে না দেখেন তবে আশ্চর্য হবেন না। এদের প্রত্যেকেই মূল রস প্রকাশ করে আপন আপন 'ভাষায়', নিজস্ব শৈলীতে এবং আঙ্গিকে। একবার সেটি ধরতে পারলেই আর কোনো ভাবনা নেই। তার পর নিজের থেকেই আপনার গায়ে রসবোধের নূতন নূতন পাখা গজাতে থাকবে, আপনি উড়তে উড়তে হঠাৎ দেখবেন তাজমহলের গম্বুজটিও আপনার সঙ্গে আকাশপানে ধাওয়া করেছে—নীচের দিকে তাকিয়ে দেখবেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল যেন ক্রমেই পাতালের দিকে ডুবে যাচ্ছে।

স্থাপত্যের প্রধান রস—প্রধান কেন, একমাত্র বললেও ভুল বলা হয় না, অন্যগুলো থাকলে ভালো, না থাকলে আপত্তি নেই—তার কম্পজিশনে, অর্থাৎ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যেমন ধরুন, গম্বুজ, মিনার, আর্চ (দেউড়ি), ছত্রি (কিয়োস্ক্, পেভিলিয়ন্), ভিত্তি এমনভাবে সাজানো যে দেখে আপনার মনে আনন্দের সঞ্চার হয়। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, সঙ্গীতেও তাই। কয়েকটি স্বর—সা, রে, গা, মা, ইত্যাদি এমনভাবে সাজানো হয় যে শোনামাত্রই আপনার মন এক অনির্বচনীয় রসে আপ্লুত হয়।

এই সামঞ্জস্য যখন সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, তখনই স্থাপত্য সার্থক। এবং স্থাপত্যের এই অনিন্দ্য সামঞ্জস্য যদি কাব্যে কিংবা উপন্যাসে পাওয়া যায় তবে বলা হয়, কাব্যখানিতে আরকিটেক্টনিকাল্ মহিমা আছে—মহাভারতে আছে, ফাউস্টে আছে এবং উয়োর অ্যাণ্ড পীসে আছে; জঁ্যা ক্রিস্তফ উত্তম উপন্যাস কিন্তু এ-গুণটি সেখানে অনুপস্থিত। লিরিক বা গীতিকাব্যে যদিও কম্পজিশন থাকে—তা সে যতই কম হ'ক না কেন তাতে আরকিটেক্টনিকাল্ বৈশিষ্ট্য থাকে না।[১]

স্থাপত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তারপর গুণীরা বলেন, এবং সার্থক স্থাপত্যে স্থপতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর নিখুঁত সামঞ্জস্য করার পর সেগুলোকে অলঙ্কার সহযোগে সুন্দর করে তোলেন। অধম একথা সম্পূর্ণ স্বীকার করে না। কিন্তু এ গোলক-ধাঁধায়ও সে ঢুকতে নারাজ। দিল্লীর দিওয়ান-ই-খাস ও দিওয়ান-ই-আমে অলঙ্কারের ছড়াছড়ি, তুগলুক যুগের স্থাপত্যে অলঙ্কার প্রায় নেই—পাঠক দিল্লী

(১) 'আধেক ঘুমে নয়ন চুমে' গানটি সার্থক, এবং এই নীতির প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

দেখার সময় এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন[২]। অথচ দুইই সার্থক রসসৃষ্টি।

এই সামঞ্জস্য যদি খাড়াই চওড়াই—অর্থাৎ মাত্র দুই দিক—নিয়ে হয় তবে সেটা ছবি। শুধু সামনের দিক থেকে দেখা যায়। তিন দিক নিয়ে—তিন ডাইমেনশনাল—হলে সেটা ভাস্কর্য কিংবা স্থাপত্য। কিন্তু অনেক সময় মূর্তির পিছন দিকটা অবহেলা করা হয় বলে সেটাকে শুধু সামনের দিক থেকে দেখতে হয়। গড়ের মাঠের যে সব মূর্তি ঘোড়-সওয়ার নয় সেগুলো পিছন থেকে দেখতে রীতিমত খারাপ লাগে (বস্তুত এই সমস্যা সমাধানের জন্যই অনেক নিরীহ লোককে ঘোড়ায় চড়ানো হয়েছে) এবং বাস্‌টগুলো পিছন থেকে রীতিমত কদাকার বলে সেগুলোকে দেওয়ালের গায়ে ঠেলে দেওয়া হয়—যাতে করে পিছন থেকে দেখবার কোনো সম্ভাবনাই না থাকে। বিদ্যাসাগরের মূর্তিটি জলের কাছে রয়েছে বলেই ঐ সমস্যাটির সমাধান হয়েছে—জলে সাঁতরাতে সাঁতরাতে মূর্তির পিছন দিকে তাকাবে ক'জন লোকে?

কিন্তু স্থাপত্যের বেলা সেটি হবার জো নেই। স্থাপত্য এমন হবে যে সেটাকে যেন সব দিক থেকে এবং বিশেষ করে যে-কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়। কোনো জায়গা থেকে যদি, ধরুন, মনে হয়, দুটো মিনার এক হয়ে গিয়ে কেমন যেন দেউড়িটাকে ঢেকে অপ্রিয়দর্শন করে তুলেছে তবে বুঝবেন স্থপতি আর্টের কোনো একটা সমস্যার ঠিক সমাধান করতে পারেন নি বলেই এস্থলে তাল কেটেছেন, অর্থাৎ রসভঙ্গ করেছেন।

মসজিদ মাত্রেরই একটা খুঁত, ঠিক এই কারণে, থেকে যায়। শাস্ত্রের হুকুম মসজিদের পশ্চিম দিক যেন বন্ধ থাকে, যাতে করে নমাজীদের সামনে কোনো বস্তু তার দৃষ্টিকে আকর্ষণ না করতে পারে। ফলে বাধ্য হয়ে স্থপতিকে পশ্চিম দিকে দিতে হয় খাড়া পাঁচিল। এটার সঙ্গে আর বাদবাকি তিন দিক কিছুতেই খাপ খাওয়ানো যায় না বলে, মসজিদ শুধু তিন দিক থেকে দেখা যায়। ধর্মতলার টিপ্‌পু সুলতানের মসজিদ কিছু উত্তম রসসৃষ্টি নয়—দক্ষিণী ঢঙের গম্বুজগুলোই যা দেখবার মতো—কিন্তু পাঠক সেটাকে একবার প্রদক্ষিণ করলেই সমস্যাটা বুঝে যাবেন। দিল্লীর পুরনো মসজিদে-মসজিদে পাঠক দেখবেন, স্থপতি কত রকম চেষ্টা করেছেন এই সমস্যা সমাধানের।

২ 'তুলসীর মূলে যেন সুবর্ণ দেউটি উজলিল দশ দিক—' এবং 'পিকবররব নব-পল্লব মাঝারে' দুটিই সার্থক। প্রথমটিতে অলঙ্কার নেই। অলঙ্কারের বাড়াবাড়ি হলে কাব্য দুর্বল হয়ে পড়ে। মেঘদূতের তুলনায় যে রকম গীত-গোবিন্দ।

সমাধি, রাজপ্রাসাদ, বিজয়স্তম্ভ সম্বন্ধে শাস্ত্রের কোনো বাধাবন্ধক নেই। তাই সেগুলোতে এ অপরিপূর্ণতা থাকা মারাত্মক। সচরাচর থাকেও না।

পূর্বেই নিবেদন করেছি সার্থক স্থাপত্য যে-কোনো জায়গাতে, যে-কোনো দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখা যায়। কিন্তু তবু প্রশ্ন ওঠে, সব চেয়ে ভালো কোন্ জায়গা থেকে দেখা যায়? উচ্চাঙ্গ মোগল স্থাপত্যমাত্রেই স্থপতি এর নির্দেশ নিজেই দিয়ে গিয়েছেন। স্থাপত্যে পৌঁছবার বেশ কিছুটা আগে যে প্রধান তোরণদ্বার (দেউড়ি—গেটওয়ে) থাকে—এরই উপর নহ্‌বৎখানা—তার ঠিক নীচে দাঁড়ালেই স্থাপত্যের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন। সাধারণত ছবি এ-জায়গা থেকেই ভালো ওঠে। আর যদি নিজের রসবোধ তার সঙ্গে সংযোজন করতে চান, তবে একটু পিছিয়ে গিয়ে দেউড়ির আর্চসুদ্ধ ছবি তুললে তাতে 'ঈসথেটিক ইফেক্ট' আসবে—যদিও মূল স্থাপত্যের কিছুটা হয়ত তাতে করে কাটা পড়বে।

এ সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু আমার মনে হয় স্থাপত্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গত সে আলোচনা তোলাই সঙ্গত।

* *

দিল্লীর স্থাপত্য তার রাজবংশানুযায়ী ভাগ করা যায়।

॥ ১ ॥ দাস বংশ

কুতুব মিনার, কুওওতুল-ইসলাম মসজিদ, ইলতুতমিশের সমাধি। (কুওওতুল ইসলাম মসজিদের আঙ্গিনায়—সেহ্‌ন্—চন্দ্ররাজা নির্মিত একটি শতকরা নিরানব্বই ভাগের লৌহস্তম্ভ আছে। এটি ও মসজিদের থামগুলো হিন্দুযুগের।) —সব কটি কুতুবের গা ঘেঁষে।

॥ ২ ॥ খিলজী-বংশ

আলাউদ্‌দীন খিলজী নির্মিত 'আলা-ই-দরওয়াজা'—কুতুবের গা ঘেঁষে। আলাউদ্‌দীন কিংবা তাঁর ছেলের ('দেবল-দেবীর' বল্লভ) তৈরী মসজিদ—দিল্লী-মথুরা ট্রাঙ্ক রোডের উপর (নিউ দিল্লী থেকে মাইল খানেক) নিজামউদ্‌দীন আউলিয়ার[৩] দরগার ভিতর[৪]।

॥ ৩ ॥ তুগলুক-বংশ

গিয়াসউদ্‌দীন তুগলুক[৫] নির্মিত আপন সমাধি——কুতুব থেকে মাইল তিনেক

৩, ৫ 'দৃষ্টিপাতে' উল্লিখিত 'দিল্লী দূর অস্ত্' কাহিনীর নায়কদ্বয়। গিয়াসের ছেলে 'পাগলা' রাজা মহম্মদ তুগলুকের তৈরী 'আদিলাবাদ'-এর ভগ্নাবশেষে বিশেষ

দূরে তাঁর-ই নির্মিত তুগলুকাবাদের সামনে। তুগলুকাবাদ।

ফিরোজ তুগলুক নির্মিত হাউজ খাস—দিল্লী থেকে কুতুব যাবার পথে রাস্তার ডান দিকে। ফিরোজ নির্মিত ফিরোজশাহ-কোট্‌লা,—দিল্লী এবং নয়াদিল্লীর প্রায় মাঝখানে (অন্যান্য দ্রষ্টব্যের ভিতর এখানে আছে একটি অশোকস্তম্ভ; ফিরোজ এটাকে দিল্লীতে আনিয়ে উঁচু ইমারত বানিয়ে তার উপরে চড়ান)।

॥ ৪ ॥ সৈয়দ এবং লোদীবংশ

লোদী গার্ডেন্‌স্—নয়াদিল্লীর লোদী এস্‌টেটের গা ঘেঁষে—ভিতরে আছে, (ক) মুহম্মদ শাহ্ সৈয়দের কবর, খ) সিকন্দর লোদীর তৈরী মসজিদ এবং মসজিদের প্রবেশগৃহ, (গ) অজানা কবর এবং (ঘ) সিকন্দর লোদীর কবর।

ইসা খানের কবর—হুমায়ুনের কবরের বাইরে। যদিও পরবর্তী যুগের, তবু লোদীশৈলীতে তৈরী।

॥ ৫ ॥ মোগল-বংশ

বাবুর কিছু তৈরী করার সময় পান নি। কেউ কেউ বলেন, পালম এ্যারপোর্টের সামনে যে দুর্গের মতো সরাই এটি তাঁর হুকুমে তৈরী। এতে দ্রষ্টব্য কিছুই নেই।

হুমায়ুনও এক পুরনো কিলা (ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের পিছনে) ছাড়া কিছু করে যেতে পারেন নি। পুরনো কেল্লারও কতখানি তাঁর, কতখানি শের শা'র, বলা শক্ত। কেল্লার ভিতরে মসজিদটি কিন্তু শের শা'র তৈরী এবং এর শৈলী পাঠান মোগল থেকে ভিন্ন। সাসারামে শেরের কবর সৈয়দ-লোদী শৈলীতে।

হুমায়ুনের বিধবার—আকবরের মাতার—তৈরী হুমায়ুনের কবর। নিজামউদ্‌দীন আউলিয়ার দরগার সামনে, দিল্লী-মথুরা রোডের ওপাশে।

আকবরের কীর্তি-কলা আগ্রাতে—সেকেন্দ্রা ফতহ্-পুর সিক্রী, আগ্রা দুর্গ। ঐ সময়ে তৈরী দিল্লীতে আছে আৎকা খান, আজিজ কোকলতাশ, আব্দুর রহীম খান খানা ও আদ্‌হম্ খানের কবর।

শাহজাহান—দিল্লী দুর্গ বা লাল কিলা। তার-ই সামনে চাঁদনী চৌকের

কিছু দেখবার নেই। মুহম্মদ এবং নিজামউদ্‌দীনের মিত্র কবি-সম্রাট আমির খুসরো ('দেবল-দেবীর' প্রেমের কাহিনী ইনিই প্রথম ফার্সীতে লেখেন) এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনীর কবর নিজামউদ্দীনের দরগার ভিতর।

৪ ইলতুতমিশের কন্যা সম্রাজ্ঞী রিজিয়ার যে কবর দিল্লীতে আছে সেটি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা সন্দেহ প্রকাশ করেন।

কাছে জাম-ই মসজিদ।

ঔরঙ্গজেব—লাল কিলার ভিতর মোতী মসজিদ।

ঔরঙ্গজেবের ভগ্নী রৌশনারার নিজের তৈরী সমাধি—রৌশনারা-গার্ডেন্‌সের ভিতর।

ঐতিহাসিক মাত্রেই জানেন, ঔরঙ্গজেবের পরের বাদশাদের অর্থ ও প্রভাব দুই-ই কম ছিল বলে এঁরা প্রায় কিছুই করে যেতে পারেন নি। যেটুকু আছে তাতে আলঙ্কারিক সৌন্দর্য যথেষ্ট বটে, কিন্তু স্থাপত্যের লক্ষণ প্রায় নেই—স্থপতি সে-চেষ্টা করেনও নি। এর ভিতর উল্লেখযোগ্য জাহানারা, মুহম্মদ শাহ বাদশাহ রঙ্গীলা, এবং দ্বিতীয় আকবরের (ইনি রাজা রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে বিলেত পাঠিয়েছিলেন) কবর। তিনটিই নিজামউদ্‌দীনের দরগার ভিতরে। মোগল স্থাপত্যের 'শেষ নিশ্বাস' সফ্‌দর্‌-জঙ্গের সমাধি ও তৎসংলগ্ন মসজিদ—কুলোকে বলে এটার মার্বেল আব্দুর রহীম খান খানার কবর থেকে চুরি করা। ইমারতটি যদিও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ তবু তার সৌন্দর্য নিম্নশ্রেণীর, রুচির বিলক্ষণ অধোগতি এতে স্পষ্ট ধরা পড়ে। ছবিতে হুমায়ুনের কবর, তাজমহল, এমন কি আৎকা খানের ছোট কবরটির সঙ্গে তুলনা করলেই পাঠক আমার বক্তব্য বুঝতে পারবেন। আৎকা খানের কবরটি আমার বড় প্রিয় স্থাপত্য। দিল্লীর লোক এ-কবরটির খবর রাখে না, কারণ এটি নিজামউদ্‌দীন দরগার এক নিভৃত কোণে পড়ে আছে।

দিল্লীতে তিনটি বড় দরগা আছে। প্রথমটি কুৎবউদ্‌দীন বখতিয়ার কাকীর। ইনি কুৎবউদ্‌দীন আইবকের গুরু ছিলেন। অনেকের ধারণা আইবক গুরুর স্মরণে কুতুব মিনার নির্মাণ করেছিলেন। দরগাটি কুতুব মিনারের কাছেই এবং 'কুতুব-সাহেব' নামে পরিচিত।

দ্বিতীয়টি নিজামউদ্‌দীন আউলিয়ার এবং তৃতীয়টি নাসিরউদ্‌দীন 'চিরাগ দিল্লী'র। দরগাটি দিল্লী থেকে মাইল তিনেক দূরে।

প্রথমটির পত্তন দাস আমলে, দ্বিতীয়টির খিলজি আমলে এবং তৃতীয়টির তুগলুক আমলে। সেই যুগ থেকে শেষ-মোগল পর্যন্ত এসব দরগাতে বহু ভক্ত নানা ইমারত গড়েছেন বলে অল্পের ভিতর সব স্থাপত্যেরই নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু চোখ কিছুটা না বসা পর্যন্ত এসব জায়গায় গবেষণা করা বিপজ্জনক।

কুতুব মিনার পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মিনার। ইংরেজ পর্যন্ত একথা স্বীকার করেছে। আশ্চর্য মনে হয় যে, এর পূর্ববর্তী নিদর্শন এদেশে নেই, ইরান-তুরানেও নেই।

বহু স্থপতির বহু একসপেরিমেন্টের সম্পূর্ণ ফায়দা উঠিয়ে তাজ নির্মিত হল—কিন্তু মিনারের ক্ষেত্রে কুতুব প্রথম এবং শেষ একসপেরিমেন্ট। এ ধরনের বিজয়স্তম্ভ পূর্বে কেউ করে নি; কাজেই গুণীজনের বিস্ময়ের অবধি নেই যে, হঠাৎ স্থপতি এ সাহস পেল কোথা থেকে? কানিংহাম, ফার্গুসন, কার স্টিফেন, স্তর সৈয়দ আহমদ অনেক ভেবে-চিন্তেও এর কোনো উত্তর দিতে পারেন নি।

কুতুব পাঁচতলার মিনার। প্রথম তলাতে আছে 'বাঁশী' ও 'কোণে'র পর-পর সাজানো নকশা। দ্বিতীয় তলাতে শুধু বাঁশী, তৃতীয় তলাতে শুধু কোণ; চতুর্থ ও পঞ্চম তলাতে কি ছিল জানার উপায় নেই, কারণ বজ্রাঘাতে সে দুটি ভেঙে যাওয়ায় ফিরোজ তুগলুক (যিনি 'অশোক স্তম্ভ' দিল্লী আনেন; ইনি যেমন নিজে সোৎসাহে ইমারত বানাতেন ঠিক তেমনি অকাতরে অন্যের ইমারত মেরামত করে দিতেন—দিল্লীর অতি অল্প রাজাতেই এই দ্বিতীয় গুণটি পাওয়া যায়) সে দুটি মার্বল দিয়ে মেরামত করে দেন। পঞ্চমটিতে নাকি আবার সিকন্দর লোদীরও হাত আছে। মিনারের মুকুটরূপে সর্বশেষে (যেখানে এখন আলো জ্বালানো হয়) কি ছিল সে সম্বন্ধে রসিকজনের কৌতূহলের অন্ত নেই।[৬] দুনিয়ার সব চেয়ে সেরা মিনারকে স্থপতি কি রাজমুকুট পরিয়েছিলেন—সেখানেও তিনি তাল রেখে শেষরক্ষা করতে পেরেছিলেন কিনা, তাঁর যে অদ্ভুত কল্পনা-শক্তি মিনারের সর্বাঙ্গে স্বপ্রকাশ সে-কল্পনাশক্তি দিয়ে তিনি দর্শককে কোন্ দ্যুলোকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, কে জানে?

ইমারত তৈরি করা কত সোজা! কারিগরের হাতে সেখানে কত অজস্র মাল-মশলা! গম্বুজ, থাম, আর্চ, ছত্রি, মিনারেট, ছজ্জা (ড্রিপস্টোন), কার্নিস, ব্র্যাকেট কত কী! তার তুলনায় একটা সোজা খাড়া স্তম্ভে সৌন্দর্য আনা কত শক্ত! এখানে শিল্পী সফল হয়েছেন শুধু সেটাকে কয়েকটি তলাতে বিভক্ত করে, সামঞ্জস্য রেখে প্রতি তলায় তাকে একটু ছোট করে করে, গুটিকয়েক ব্যালকনি লাগিয়ে দিয়ে এবং মিনারের গায়ে কখনো 'বাঁশী', কখনো 'কোণে'র নকশা কেটে।

৬ গেল শতকের গোড়ার দিকে এক ইংরেজ মেজরের হাতে কুতুবের মেরামতির ভার পড়ে। ব্যালকনি (গ্যালারির) রেলিঙগুলো ছিল বলে তিনি সেখানে চারপাপড়ির নিজস্ব নকশা দিয়ে রেলিঙ বানান—নীচের হানিকুম্ অর্থাৎ মৌমাছির চাকের নকশা মূল স্থপতির—এবং মাথায় 'নিজস্ব' কল্পনাপ্রসূত একটা মুকুট পরান। সেইটে দেখে দিল্লী-ওলারা সত্রাসে তারস্বরে চিৎকার করেছিল। বহু বৎসর পরে লর্ড কার্জন সেই মুকুটি কেটে নীচে নামিয়ে দূরে সরিয়ে রাখেন।

'প্রপর্শনে'র এরকম চূড়ান্ত পৃথিবীর আর কোনো মিনারে পাওয়া যায় না।

আর তার গায়ের কারুকার্যও অতি অদ্ভুত। বাঁশী এবং কোণের উপর দিয়ে সমস্ত মিনারটিকে কোমরবন্ধের মতো ঘিরে রয়েছে সারি সারি লতা-পাতা, ফুলের মালা, চক্রের নকশা। এগুলো জাতে হিন্দু এবং এর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে এক সারি অন্তর অন্তর আরবী লেখার সার—সেগুলো জাতে মুসলমান। কিন্তু উভয় খোদাইয়ের কাজই যে হিন্দু শিল্পী করেছেন সে বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। গোটা মিনারটির পরিকল্পনা করেছে মুসলমান, যাবতীয় কারু-শিল্প করেছে হিন্দু—ভারতবর্ষে মুসলমানদের সর্বপ্রথম সৃষ্টিকার্যে হিন্দু-মুসলমান মিলে গিয়ে যে অদ্ভুত সাফল্য দেখিয়েছিল সে-মিলন পরবর্তী যুগে কখনো ভঙ্গ হয় নি, কভু বা মুসলমানের প্রাধান্য বেশী, কোনো ইমারতে হিন্দুর প্রাধান্য বেশী। আট শত বৎসর একসঙ্গে থেকেও হিন্দু-মুসলমান চিন্তার ক্ষেত্রে, রাজনীতির জগতে সম্পূর্ণ এক হয়ে যেতে পারে নি, কিন্তু কলার প্রাঙ্গণে (স্থাপত্য, সঙ্গীত এবং নৃত্যে) প্রথম দিনেই তাদের যে মিলন হয়েছিল আজও সেটি অটুট আছে।

কুতুবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর কোনো মিনার কখনো মাথা খাড়া করেনি। দীর্ঘ আট শতাব্দী ধরে বহু বাদশা বহু ইমারত গড়েছেন কিন্তু 'কুতুবের চেয়েও ভালো মিনার গড়বো' এ সাহস কেউ দেখান নি। যে ইংরেজ দিল্লীতে সেক্রেটারিয়েট, রাজভবন গড়ে, কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বানিয়ে নিজকে অতুল বিড়ম্বিত করেছে সেও বিলক্ষণ জানতো কুতুবের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কোনো স্থপতির কর্ম নয়।[৭]

আলাউদ্দীন খিলজীর মত দুঃসাহসী রাজা ভারতবর্ষে কমই জন্মেছেন। এক-মাত্র তিনিই চেয়েছিলেন, কুতুবের সঙ্গে পাল্লা দিতে। তাই কুতুবের দ্বিগুণ ঘের দিয়ে তিনি আরেকটি মিনার গড়তে আরম্ভ করেন—বাসনা ছিল মিনারটি কুতুবের দ্বিগুণ উঁচু হবে। ইমারত মাত্রেরই একটা অপটিমাম্ সাইজ আছে—অর্থাৎ যার চেয়ে বড় হলে ইমারত খারাপ দেখায়, ছোট হলেও খারাপ দেখায় (সর্ব কলাতেই এ সূত্র প্রযোজ্য; কিন্তু স্থাপত্যের বেলা এটা অন্যতম মূলসূত্র)—কাজেই আলাউদ্দীনের চূড়া ডবল হয়ে ফল কি ওতরাতো বলা কঠিন। তা সে যা-ই হোক, মিনারের কাঠামোর কিছুটা শেষ হতে-না-হতেই ওপারের ডাক খিলজীর

---

৭ অক্টরলনি মনুমেণ্টে কোনো কলাপ্রচেষ্টা নেই বলে সেটাকে কুতুবের সঙ্গে তুলনা করা অন্যায়—সেটাকে চটকলের চোঙার সঙ্গে তুলনা করা যায়। বড়বাজারের দালান কোঠার সঙ্গে কেউ তাজের তুলনা করে না।

কানে এসে পৌঁছল যে-পারে খুব সম্ভব মিনার হাতে নিয়ে লাঠালাঠি চলে না।

আপন মহিমায়, নিজস্ব ক্ষমতায় যে স্তম্ভ দাঁড়ায় তার নাম মিনার, এবং মসজিদ, সমাধি কিংবা অন্য কোনো ইমারতের অঙ্গ হিসেবে যে মিনার কখনো থাকে, কখনো থাকে না, তার নাম মিনারেট—মিনারিকা। কুতুবের পর পাঠান মোগল বিস্তর মিনারেট গড়েছে, কিন্তু সেগুলোও কুতুবের কাছে আসতে পারে না। তাজের মিনারিকা ভুবনবিখ্যাত, কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি শিল্পী সেখানে নতমস্তকে হার মেনে নিয়ে সেটাকে সাদামাটার চরমে পৌঁছিয়ে খাড়া করেছেন। পাছে লোকে তাঁর মিনারিকার সঙ্গে কুতুবের তুলনা করে লজ্জা দেয় তাই তিনি সেটাকে গড়েছেন এমন ন্যাড়া করে যে দর্শকের মন অজান্তেও যেন কুতুবকে স্মরণ না করে। না হলে যে-তাজের সর্বাঙ্গে গয়নার ছড়াছড়ি তার চারখানা মিনারিকা-হস্তে 'নোয়াটুকু'র চিহ্ন নেই কেন? ওদিকে দেখুন, হুমায়ুনের সমাধি-নির্মাতা ছিলেন আরওঘড়েল—তিনি তাঁর ইমারতটি গড়েছেন মিনারিকা সম্পূর্ণ বর্জন করে।

দিল্লী-আগ্রার বহু দূরে, কুতুবের আওতার বাইরে গুজরাতের রাজধানী আহমদাবাদে আমি একটি মিনারিকা দেখেছি যার সঙ্গে কুতুবের কোনো মিল নেই এবং বোধ হয় ঠিক সেই কারণেই তার নিজস্ব মূল্য আছে। রাজা আহমদের —এঁরই নামে আহমদাবাদ্—বেগম রানী সিপ্রির মসজিদে একটি মধুরদর্শন মিনারিকা বহু ভূপর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গুজরাত এবং রাজপুতানার মেয়েরা তাদের বাহুলতা মণিবন্ধে যে বিচিত্র-আকার, বিচিত্র-দর্শন অসংখ্য বলয়-কঙ্কণ পরে এ মিনারিকা যেন সেই কমনীয়তায় অনুপ্রাণিত। রাজেশ্বরী সিপ্রি যেন তাঁরই অনুপম হাতখানি নভোলোকের দিকে তুলে ধরেছেন ভুবনেশ্বরের ললাটে তিলক পরিয়ে দেবেন বলে।

কুতুবের সঙ্গে সঙ্গে—আসল কুতুব তৈরী হয় প্রথম তলা থেকে নমাজের আজানের জন্য—নির্মিত হয় কুওওতুল ইসলাম মসজিদ। এ মসজিদে এখন দর্শনীয় তার উন্নতদর্শন তোরণ (আর্চ) এবং স্তম্ভগুলি। ভারতীয় কারিগর তখনো জোড়ের পাথর (কী-স্টোন) তৈরী করে তার গায়ে গায়ে চৌকো পাথর লাগিয়ে আর্চ বানাতে শেখে নি বলে[৮] আর্চের সঙ্গে জোড়া বাকি ইমারত ভেঙে

---

৮ ইঞ্জিনিয়ারিঙ স্থাপত্যের অংশ বটে কিন্তু বিশুদ্ধ স্থাপত্য-রস আস্বাদনের সময় তার স্থান অতি নীচে। আর্চ, ডোম বানাতে 'কী-স্টোন'

পড়েছে; কিন্তু রসের বিচারে এ আর্চটি এখনো অতুলনীয়। এর শান্ত গাম্ভীর্য, আপন কৌলীন্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত ঋজু অবস্থিতি নিতান্ত অরসিক জনেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। পরবর্তী যুগে বহু জায়গায় বিস্তর আর্চ নির্মিত হয়েছে, কিন্তু এর প্রসাদগুণ এখনো অতুলনীয়।

এবং এর গায়ে যে হিন্দু কারুকার্য তার সুনিপুণ দক্ষতা, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং মন্দাক্রান্তা গতিচ্ছন্দ দেখে যেন শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। যেন অজন্তা ইলোরার চিত্রকর শিলাকর দুজনে মিলে প্রাণের আনন্দে এর প্রতিটি রেখা প্রতিটি বক্র প্রতিটি চক্র এঁকে চলেছে। এদের নিশ্চয়ই বলা হয়েছিল যে মুসলমান স্থাপত্যে পশুপক্ষী আঁকা বারণ। সেইটে মেনে নিয়ে কী আশ্চর্য নৈপুণ্যে 'শেষনাগ' মতিফকে এরা সাপ না বানিয়েও সাপ এঁকেছে সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় কলার সঙ্গে এরা কুরানের হরফও খোদাই করেছে সমান দক্ষতা নিয়ে। উভয়ের সংমিশ্রণ অপূর্ব, রসসৃষ্টি অসামান্য।

কুওওতুল ইসলাম মসজিদের থামগুলো হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন মন্দির থেকে নেওয়া। এদের গায়ে দর্শক বিস্তর পশুপক্ষী, বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্য এবং অন্যান্য দেব-দেবীর নানা মূর্তি দেখতে পাবেন। মসজিদ গড়ার সময় এগুলোর গায়ে পলস্তরা লাগিয়ে মূর্তিগুলো ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। পলস্তরা খসে যাওয়াতে এখন আবার দেখা যাচ্ছে।

এভাবে প্রতিটি ইমারত নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তা হলে দশ-ভলুমি কেতাব লিখতে হয়—এবং সেগুলো কেউ পড়বে না। আমার উদ্দেশ্য—বাকি ইমারতগুলো দর্শক যেন নিজে আরো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন।

যেমন, কুওওতুল ইসলামের গম্বুজ রসের ক্ষেত্রে নগণ্য—তার পরের ইমারত ইলতুৎমিশের সমাধিতে সেটা ভেঙে পড়ে গিয়েছে—খিলজী যুগে সেটা সুন্দর হতে

ইত্যাদি ইঞ্জিনিয়রী ব্যাপার পাঠক চেম্বার অভিধান দেখেই বুঝে নিতে পারবেন। এসব স্থাপত্যের পশ্চাতে কী অদ্ভুত ইঞ্জিনিয়ারিঙ স্কিল আছে তার আলোচনা আমি আদপেই করি নি। যেমন, কুতুবের আসল কেরামতি যে এত অল্প গোড়া (বেস্) নিয়ে এত উঁচু মিনার আর কোথাও হয় নি। অদ্ভুত ভারসাম্যই (ব্যালান্স্) তার কারণ। এ যেন বাজিকর হাতের আঙুলের ডগায় বিশগজী বাঁশ খাড়া করে রেখেছে। ইঞ্জিনিয়ারী হিসেবে কণামাত্র ভুল থাকলে কুতুব হুড়মুড়িয়ে পড়ে যেত।

আরম্ভ করেছে, তুগলুক যুগে গম্বুজ রীতিমত রসসৃষ্টি করে ফেলেছে, সৈয়দ-লোদী যুগে সে পৃথিবীর আর দশটা গম্বুজের সঙ্গে পাল্লা দিতে আরম্ভ করেছে, হুমায়ুনের গম্বুজকে তো কেউ কেউ তাজের চেয়েও ভালো বলেছেন, আর তাজের তন্বঙ্গ গম্বুজ, শুনি, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ। দেখলে পরে তার ক্ষীণ কটিকে নাকি জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে।

কিংবা আর্চের উত্থান-পতন দেখুন। কিংবা দেখুন ছত্রির আবির্ভাব ক্রমবিকাশ। হুমায়ুনের কবর ও তাজের ছাতের উপরকার ছত্রির মতো ছত্রি পৃথিবীর আর কোথাও পাবেন না। স্থাপত্যে ছত্রির ব্যবহার মুসলমানেরা এদেশে এসে শিখল। তাই এদেশের স্থাপত্যের স্কাই-লাইন ইরান তুরানের স্থাপত্যকে এ-বাবদে অনায়াসে হার মানায়।

কিংবা দেখুন, ভিতরকার কারুকার্য, যার পরিসমাপ্তি তাজের 'মর্মরস্বপ্নে'।

দাস-যুগের শেষের দিকে মুসলিম জিওমেট্রিক ডিজাইনের বাড়াবাড়ি হয়েছিল, খিলজি-যুগে আবার ভারসাম্য ফিরে পেল।

তুগলুক যুগে পাবেন দার্ঢ্য—শক্তিশালী স্থাপত্যের পরিপূর্ণতা। অলঙ্কার এখানে বাহুল্যরূপে বর্জিত। দেয়াল বাঁকা—যেন পিরামিডের ঢঙে ট্যারচা করে একে আরও মজবুত করার চেষ্টা হয়েছে, গম্বুজও শক্তির পরিচায়ক। লাল পাথর, কালো স্লেট (তখনো কালো মার্বেল এ-দেশে আসে নি) এবং মর্মরের ধবল এই তিন রঙের খেলা নিয়েই স্থপতি এখানে অলঙ্কারহীন দৃঢ়তার একঘেয়েমি ভেঙেছেন। গিয়াসউদ্দীন তুগলুকের কবর এরই প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

সৈয়দ-লোদী বংশদ্বয়ের অর্থ ও প্রতিপত্তি দুই-ই ছিল সামান্য। তাই এঁদের কলা-প্রচেষ্টা ছোট ইমারতের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। ওদিকে ইরান-তুরানের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল বলে সে-দিক থেকে নব নব অনুপ্রেরণাও আসছিল না। ফলে তাদের স্থাপত্যে হিন্দু প্রাধান্য বেশী এবং ছোট ইমারতে অলঙ্কারের প্রয়োজন বড় ইমারতের চেয়ে বেশী। কম্পজিশনেও এই প্রথম হিন্দু প্রভাব স্পষ্ট হয়ে এল। বস্তুত এই আটকোণওলা ইমারত এবং আট দিকের ঘেরা বারান্দা বৌদ্ধস্তূপ এবং তার প্রদক্ষিণচক্রের কথাই মনে করিয়ে দেয়। হিন্দুরা স্তম্ভ-নির্মাণে চিরকালই দক্ষ, ছত্রিও তাদেরই সৃষ্ট। হিন্দু ছজ্জা (ড্রিপ-স্টোন—এগিয়ে আসা কার্নিসের মত) ছাতের বৃষ্টি ছড়িয়ে দেবার জন্য এদেশে প্রয়োজন—ইরানে দরকার নেই বললেও চলে—সে-সব এসে এখানে ইমারতের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। তুগলুক প্রভাব এখানে অতি সামান্য—কেবল মাত্র ট্যারচা

স্তম্ভে কিছুটা পাওয়া যায়। সৈয়দ-লোদী স্থাপত্য দেখে মানুষ হতবাক হয় না সত্য, কিন্তু এর এমন একটা কমপেক্টনেস্ বা ঠাস-বুনুনি আছে যা অন্য স্থাপত্যে বিরল। অল্প দিয়ে রসসৃষ্টিতে সৈয়দ-লোদী প্রথম না হলেও প্রধানদের একজন।

মোগল-যুগ আরম্ভ হল হুমায়ুনের কবর দিয়ে। সেখানে ইরান-তুরানের প্রাধান্য। কিন্তু ছবি এবং পদ্মফুলের ডিজাইন এখানে প্রচুর এবং কারুকার্যেও হিন্দু প্রাধান্য বেশী। সিক্রিতে ইরাণী ভাব এত কমে গিয়েছে যে, কোনো কোনো ইমারতে কার প্রাধান্য বেশী কিছুতেই স্থির করা যায় না। সেকেন্দ্রার গম্বুজ শেষ করার পূর্বেই আকবর ইহলোক ত্যাগ করেন—তাই বলা শক্ত সম্পূর্ণ সমাধি মনে রসের কোন্ ভাবের উদয় করে দিত। দিওয়ান-ই-খাস ও আম্ যে অলঙ্কারের চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়েছে সে সত্য তো পৃথিবীর সবাই স্বীকার করে নিয়েছে। এত দিন বলা হত, পাঠান স্থাপত্যে স্থপতি ও স্বর্ণকার একজোটে কজে করেছেন। দিওয়ান-ই-খাস্ ও আম্ দেখে লোকে বলল, এইবারে এসে জহুরীও যোগ দিয়েছেন।

মোগল-কলা এত বিচিত্র ও ভিন্নমুখী যে, তাকে গুটিকয়েক সূত্রে ফেলা প্রায় অসম্ভব। তবে স্থাপত্যের বিকাশ দেখতে হলে সব চেয়ে উত্তম পন্থা হুমায়ুনের কবর ও তাজ দুটি মিলিয়ে দেখা। দুটোর গম্বুজ মিলিয়ে দেখুন, ছত্রিগুলো কার ভালো (এখানে বলা উচিত হুমায়ুনের ছত্রিগুলো নীল টাইলে ঢাকা ছিল; এখন উঠে গিয়ে কালো হয়ে গিয়েছে—তাই আগে ছিল গম্বুজ মর্মরের সাদা, পুরো ইমারত লাল পাথরের আর ছত্রিগুলোর গম্বুজ নীল, তাজে তিনই মার্বেলের), হুমায়ুনের ভিত্তিতে এক সার আর্চ (তার ভিতর দিয়ে নীচে যাওয়া যায়), তাজে তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে মাত্র, গুলদস্তাজ (মিনারিকারও ছোট মিনারিকা যার শেষ হয় অর্ধস্ফুট পদ্মকোরকে) দুই ইমারতেই এক রকম, নির্মাণকালে হুমায়ুনে ছিল লাল-সাদা-নীলের সামঞ্জস্য, তাজ শুভ্র-ধবল এবং সবচেয়ে বড় পার্থক্য—হুমায়ুনে মিনারিকা নেই, তাজের চার কোণে চারটি। আপনার কোন্‌টি ভালো লাগে? আর এই শৈলীর অধঃপতন দেখতে হলে দেখুন সফদরজঙ্গের কবর—ওয়েলিংডন অ্যারোড্রোমের কাছে।

স্পষ্ট দেখছি হুমায়ুনে দার্ঢ্য, তাজে মাধুর্য।

তার কারণ, অনেক ভেবে আমি মন স্থির করেছি, হুমায়ুনের সমাধি নির্মাণ করেছেন তাঁর বিধবা—স্বামীর জন্য। তাই তাতে পৌরুষ সমধিক। তাজ নির্মাণ করেছেন বিরহকাতর স্বামী—প্রিয়ার জন্য। তাই সেটিতে লালিত্য বেশী।

বেজো না চরণে চরণে

বিখ্যাত সাহিত্যিকদের কাছে নাকি নবীন সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখা নিয়ে গিয়ে চাঁইদের সার্টিফিকেট চান। বেচারীদের বিশ্বাস, চাঁইরা উত্তম সার্টিফিকেট দিলে তাঁরা সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি-প্রতিপত্তি পেয়ে যাবেন।

চাঁইদের কেউ-কেউ সার্টিফিকেট দেন, কেউ লেখককে অন্য চাঁইদের কাছে পাঠিয়ে দেন, কেউ বা অসুখের ভান করে দেখাই করেন না। এ বাবদে পূজনীয় রাজশেখরবাবু রাজকীয় পন্থাটি বেব করে আরামসে দিন কাটাচ্ছেন। তিনি সবাইকে অকাতরে সার্টিফিকেট দেন—এমন কি মাঝে-মধ্যে না চাইলেও দেন। তাঁর বয়স হয়েছে। শেষের কটি দিন শান্তিতে কাটাতে চান। সোজাসুজি 'দেব না' বললে তাঁকে আর বাঁচতে হবে না, এবং 'দেব-দিচ্ছি' 'দেব-দিচ্ছি' করে টাল-বাহানা দেবার মতো শক্তিও তাঁর নেই। রবীন্দ্রনাথ অমিতবীর্য পুরুষ-সিংহবৎ ছিলেন, উমেদওয়ারদের ঠেকাবার মতো তাঁর সেক্রেটারিও ছিলেন—তবু তিনিও অকাতরে সার্টিফিকেট দিতেন। প্রাণের প্রতি তাঁর অহেতুক কোনো মায়াও ছিল না—'মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান' এ গান তিনি রচেছেন অল্প বয়সেই—তবু তিনি 'না-চাহিতে যারে দেওয়া যায়' ভাবখানা মুখে মেখে পিলপিল করে সার্টিফিকেট বিলোতেন। আমাকে পর্যন্ত তিনি একখানা দিয়েছিলেন—অবশ্য সাহিত্যের জন্য নয়, চাকরির জন্য। আমি তাঁর 'কৃতী ছাত্র' এ ধরনের বহুবিধ আগড়ম-বাগড়ম লিখে তিনি আমাকে শ্যামাপ্রসাদবাবুর কাছে পাঠিয়েছিলেন। শ্যামাপ্রসাদবাবু বিচক্ষণ লোক, তিনি আমাকে চাকরি দেন নি। অন্যত্র চেষ্টা করার জন্য সার্টিফিকেটখানা ফেরত পেলুম না—কারণ চিঠিখানা ছিল নিতান্ত প্রাইভেট এবং পার্সনাল। শ্যামাপ্রসাদবাবু রবিবাবুর সার্টিফিকেটের মূল্য না দিলেও রবিবাবুর হাতের লেখা চিঠির মূল্য জানতেন। চিঠিখানা সযত্নে শিকের হাঁড়িতে তুলে রেখে দিয়েছিলেন।

এবং যাঁরা কিছুতেই সার্টিফিকেট দিতে রাজী হন না, তাঁদের দু-একজনকে আমি চিনি। এবং এ কথাও বিলক্ষণ জানি, তাঁরা যে-সব বইয়ের সার্টিফিকেট দেওয়া দূরে থাক, গাল-গালাজ পর্যন্ত করেছেন তারই অনেকগুলো বাজারে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছে। রাজশেখরবাবুর 'দুই সিংহ' গল্পে আছে কোনো লেখক তাঁর বই কিছুতেই বিক্রি হচ্ছে না দেখে কোনো এক বাঘা সাহিত্যিককে ঘুষ দিয়ে লিখিয়ে নেয়, বইখানা অতিশয় অশ্লীল এবং কদর্য। ফলে নাকি সে বইয়ের প্রচুর কাটতি হয়েছিল।

কিন্তু এ-সব শোনা কথা, কিংবা কাল্পনিক। রবিবাবু টাকের ওষুধের প্রশংসা

করাতে ওষুধের বিক্রি বেড়েছিল কি না তার সঠিক স্টাটিস্‌টিক্‌স্‌ এখনো দেখি নি। উল্টোটাও সঠিক জানবার উপায় নেই। এ যেন আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মতো। বেতারে আলিপুর বললে, 'সন্ধ্যায় বৃষ্টি হবে'। আপনি অবিশ্বাস করে ছাতা না নিয়ে বেরলেন। ফিরলেন ভিজে ঢোল হয়ে। তবেই দেখুন, এমনি লক্ষ্মীছাড়া দফ্‌তর যে, অবিশ্বাস করেও নিষ্কৃতি নেই, বিশ্বাস তো করা যায়ই না।

* *

কিন্তু একখানা বই পড়ে আমি এ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ হদিস পেয়েছি।

বইখানার নাম 'লিমিট অব্‌ আর্ট'। চল্লিশ টাকা দাম। ঢাউস মাল। কপিকল দিয়ে শেলফ্‌ থেকে ওঠাতে নাবাতে হয়।

কবিতার চয়নিকা। গ্রীক-লাতিন থেকে আরম্ভ করে, ফরাসী-জর্মন-ইংরিজী-স্প্যানিশ-রুশ তাবৎ ইয়োরোপীয় ভাষা থেকে কবিতা সঞ্চয় করে এ-চয়নিকাটি নির্মাণ করা হয়েছে।

গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক সবিনয় নিবেদন করেছেন, তিনি এ-চয়নিকার মাধুকরী করার সময় নিজের ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করেন নি। তবে কি তিনি বন্ধুবান্ধবদের রুচির উপর নির্ভর করেছেন? তাও নয়। তিনি লিখেছেন, বিখ্যাত প্রখ্যাত কবিরা যে-সব অন্যান্য কবির কবিতার প্রশংসা করেছেন তাই দিয়ে তিনি এ-'সঞ্চয়িতা' নির্মাণ করেছেন। যেমন মনে করুন, বায়রন বলেছেন, 'পেত্রাকের এ ছত্র কটি কী চমৎকার, কী অনির্বচনীয়!' চয়নিকাকার সেই কবিতাটি তুলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার বায়রনের প্রশস্তিটিও তুলে দিয়েছেন। ঠিক এইভাবেই, শেকস্‌পীয়র আছেন গ্যেটের প্রশংসাসহ, কীট্‌স আছেন শেলির তারিফযুক্ত, এবং আরো বিস্তর চেনা-অচেনা কবি।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এর চেয়ে আর উত্তম ব্যবস্থা কি হতে পারে?

কিন্তু বিশ্বাস করুন, আর নাই করুন, এ-রকম রদ্দি, ওঁচা কবিতার সঙ্কলন আমি জীবনে কো না ভাষাতে কখনো দেখি নি।

এবং শুধু তাই নয়, পৃথিবীর সর্বোত্তম বেশ কয়েকটি কবিতা তাতে বাদ পড়েছে। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, একবার এই বঙ্গভূমিতেই এ-ঘটনা ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের কোন্‌ কোন্‌ কবিতা বাঙালী পাঠকের ভালো লাগে তারই ভোট নিয়ে একখানি 'চয়নিকা' রচিত হয়েছিল। তাতে এত বেশী ভালো কবিতা বাদ পড়ে গিয়েছিল, এবং অপেক্ষাকৃত কাঁচা লেখা ঢুকে গিয়েছিল যে এর পর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে চয়ন করেন সেটিই 'সঞ্চয়িতা' এবং বাজারে সেইটেই চালু। এস্থলে পাঠক অবশ্য বলবেন, 'রাস্তার লোকের ভোট নিয়ে কি আর উত্তম

কবিতা-সঞ্চয়ন হয়? ওদের কীই বা বুদ্ধি, কীই বা রুচি।' অতএব যে বিদেশী চয়নিকা দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম সেইটেতেই ফিরে যাই।

অর্থাৎ ভালো ভালো কবি কর্তৃক নির্মিত সঞ্চয়নও উত্তম হল না কেন?

তার প্রধান কারণ, সাধারণ এবং সুরুচিসম্পন্ন পাঠক কবিতা পড়ে কিংবা গান শুনে যদি আনন্দ পায় তবেই সে বলে, কবিতা কিংবা গানটি ভালো। অর্থাৎ তার কাছে যে-কোনো বস্তু রসোত্তীর্ণ হলেই হল। কিন্তু কবি যখন অন্য কবির কবিতা পাঠ করেন তখন তাঁর নজর যায় কবিতার গঠন, ভাষা, ছন্দ, মিল—এক কথায় আঙ্গিকের দিকে। কবিতাটি রচনা করতে গিয়ে কবিতা-কার কি কি মালমশলা নিয়ে আরম্ভ করেছেন, তাঁকে কোন্ কোন্ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে সেগুলো তিনি কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন কি না পাঠক-কবির দৃষ্টি থাকে প্রধানতঃ সেই দিকে। কিংবা মনে করুন, আপনি আমি যখন গান শুনি তখন গানটি মিষ্ট এবং মর্মস্পর্শী হলেই হল। পক্ষান্তরে আকছারই দেখবেন, বদখদ গলা নিয়ে, বিদকুটে মান্ধাতার আমলের একটা সম্পূর্ণ অজানা রাগ ধরলে এক হাড়-চিমসে গাওয়াইয়া। তবলচীও বাজাতে লাগলো এমন এক তাল যে তার কোথায় সম, কোথায় ফাঁক কিছুই মালুম হচ্ছে না। আপনি বিরক্তিতে উঠি-উঠি করছিলেন, এমন সময় দেখেন হঠাৎ মহ্‌ফিলের অন্য গাওয়াইয়া শ্রোতারা 'আহা, আহা, ক্যাবাৎ, ক্যাবাৎ' বলে অচৈতন্যি প্রায়। কি হল? ব্যাপারটা কি? না এই ওস্তাদস্য ওস্তাদ এক অ্যাসন অতি-অতি কোমল এমন এক কঠিনস্য কঠিন জায়গায় লাগিয়ে দিয়ে অ্যাসা এক পানিপথ নাকি জয় করেছেন যা পূর্বে নাকি কেউ কখনো করতে পারে নি—না, তানসেন নাকি মাত্র দু'বার পেরেছিলেন, ওস্তাদ আব্দুল করীম কুল্লে একবার! ব্যস, হয়ে গেল!

অবশ্য সব পাঠক কবি কিংবা শ্রোতা-গাওয়াইয়াই যে শুদ্ধমাত্র আঙ্গিক এবং টেক্‌নিকল স্কিলের দিকে এক-চোখা দৈত্যের মতো তাকিয়ে থাকেন সে কথা বলছি না—তবে ঐ হল গিয়ে নিয়ম, এবং পূর্বোল্লিখিত 'লিমিট্ অব্ আর্ট' ঐ পর্যায়ের বই।

সমসাময়িক লেখক যখন অন্য লেখকের লেখা পড়েন তখন আরেক মুশকিল। দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা খোলসা করি।

এই মনে করুন, গৌরকিশোর ঘোষ রম্য-রচনা লিখে দেশে নাম করে ফেলেছেন। আমারও বাসনা গেল, ঐ লাইনে যখন খ্যাতি আছে, পয়সাও থাকতে পারে, তখন আমিই বা বাদ যাই কেন? গৌরকিশোরের লেখার

অনুকরণে আমিও কয়েকটি রম্য-রচনা লিখে নিয়ে গেলুম তাঁর কাছে। তিনি দেখলেন, তাঁর এক নবীন শাকরেদ্ জুটলো, তাঁর অনুকরণে এবার একটা 'স্কুল' 'ঘরানা' গড়ে উঠতে চললো। আমার রচনা যে আদপেই 'রম্য' হয় নি, এমন কি এরে 'রচনা'ও কওয়া যায় না সেদিকে তাঁর নজরই গেল না। তিনি সার্টিফিকেট দিলেন, 'তোফা লেখা, খাসা লেখা, বেড়ে লেখা।' আমিও খুশী। অবশ্য এ-সার্টিফিকেট আমি এখনো কাজে লাগাই নি। সাহিত্যিকের সার্টিফিকেট-হাল পাঠকের পানি পাবে কি না সে বাবদে আমার মনে এখনো ধোঁকা রয়ে গেছে।

পক্ষান্তরে ফরাসী কবি-সম্রাট মলিয়ের নাকি তাঁর তাবৎ কৌতুকনাট্য পড়ে শোনাতেন তাঁর নিরক্ষরা বাড়িউলীকে। বাড়িউলী যে-সব রসিকতা শুনে হাসতো, তিনি সে-সব রসিকতার মাত্রা বাড়িয়ে দিতেন, যেগুলো শুনে গম্ভীর-মূর্তি ধারণ করতো সেগুলো তিনি নির্মমভাবে কেটে দিতেন। অথচ আজ তো গুণীমূর্খ সবাই তাঁর নাট্য দেখে আনন্দ লাভ করে। এই কয়েকদিন মাত্র হল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কৃত তাঁর বাঙলা অনুবাদ কলকাতার রসিক সমাজকে যা হাসালো তা দেখলে স্বয়ং মলিয়েরেই অবাক হতেন।

তবে কি ঐ বাড়িউলী অতিশয় সুরসিকা ছিলেন? এ-পর্যন্ত কেউ তো তা বলেন নি। তবে কি ওঁকে না শুনিয়ে সে-যুগের নামকরা সমঝদারকে শোনালে মলিয়েরের কাব্য আরো রসোত্তীর্ণ হত? বলা অসম্ভব।

* *

যে নল চালিয়েছিলুম, সে তবে এখন এসে খাড়া হল কোথায়, পাকড়ালো কাকে? অর্থাৎ হরে-দরে দাঁড়ালো কি?

আমার বিশ্বাস এ-নল কোথাও দাঁড়াবে না। এ-আলোচনায় কস্মিনকালেও কোনো হদিস পাওয়া যাবে না।

তবে যদি শোধান, আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস কি, তবে আমি নবীন লেখককে অকুণ্ঠ ভাষায় বলবো, সার্টিফিকেট কুড়োতে যেয়ো না। ওতে কানাকড়ির লাভ নেই। ঐ যে পাঠক-সম্প্রদায় নামক কিম্ ভূত কিম্ আকার জীব আছে সে যে কখন কার প্রতি সদয়, কার প্রতি নির্দয়, কখন কাকে আশা-গাছের শাখায় চড়ায়, আর কখন কাকে নির্মমভাবে জিল্‌ট্ করে তার হদিস কেউ কখনো পায় নি।

অবশ্য আপনি যদি ভবিষ্যৎ যুগের পাঠকের জন্য লেখেন তবে আপনার কোনো ভাবনা নেই। তবে সে-কথাটা পুস্তকের অবতরণিকায় বলে দিলেই সাধু আচরণ হয়। এ বছরের তাজা মাছকে আসছে বছরের শুঁটকি বলে চালানোটা

জোচ্চুরির শামিল। পঞ্চাশ বছর পরে যে র মাল মেচ্যোর লিক্যোর হবে সেটা আজ বাজারে ছাড়া ধাপ্পা। তার জন্য আজ যে-লোক সার্টিফিকেট দেয় সেও ধাপ্পাবাজ।

* *

হালে আকাশে এক নয়া চিড়িয়ার উদয় হয়েছে।

নিজের সার্টিফিকেট নিজে লিখে, কিংবা/এবং চেলা-চামুণ্ডাদের সামনে নিজের লেখার গুণকীর্তন করতে গিয়ে পয়েন্ট বাংলে বিজ্ঞাপন লিখিয়ে নিয়ে কিংবা/এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের অন্যান্য লেখাতে সে লেখা সম্বন্ধে দারুণ-দারুণ রেফরেন্স্ ঝেড়ে—সব-কিছু প্রকাশককে দিয়ে বিজ্ঞাপনরূপে ছাপিয়ে দেওয়া।

এ সিস্টেমের সঙ্গে 'আধুনিক বাঙলা কবিতা'র বেশ মিল আছে। বাঙলা ভাষায় লেখা দেখে পড়তে গিয়ে মালুম হল যে কিছুই মালুম হচ্ছে না—এ ভাষার শব্দরূপ, ধাতুরূপ কৃৎ তদ্ধিত আপনি কিছুই জানেন না। অর্থাৎ বন্ধু বাঙলা ভাষার মুখোশ পরে অজানাজন এসে মেরেছে চাক্কু।

প্রকাশকের মুখোশ পরে এখানে আসে লেখক—হাতে চাক্কু। পাঠক, সাবধান !!

রবীন্দ্রনাথ কি যেন গেয়েছেন, দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমাকে ডরাবো না ? এ তার উল্টো পিঠ ; মিত্রের বেশে এসেছে বলে তোমারেই যত ভয়।

এ সিস্টেম পাঠক-ব্যাঙ্কারের চালানো জুয়ো-ভূমি মণ্টে কার্লোর ব্যাঙ্ক ভাঙতে পারবে কি না, সেই খবরের প্রত্যাশায় আছি। এযাবৎ তো কোনো সিস্টেম পারে নি।

আর যা করুন, করুন, কিন্তু পাঠকসাধারণকে আহাম্মুখ ঠাউরে আপন আহাম্মুখির পচা ডিম হাটের মধ্যিখানে ফাটাবেন না !!

ইভান সের্গেভিচ তুর্গেনেফ

গত ৩রা সেপ্টেম্বর ইভান তুর্গেনেফের ৭৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ-উপলক্ষে বহু দেশ তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আপন আপন সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছেন। কলকাতা বেতার কেন্দ্র পর্যন্ত সেদিন তাঁকে স্মরণ করেছেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আজ এঁর, কাল ওঁর কত লোকের মৃত্যুবার্ষিকী, জন্মবার্ষিকী নিত্য নিত্য হয়ে যাচ্ছে, সেগুলোর হিসেবরাখতে যাবে কে ?

যার যে রকম খুশী, এর বেশী কিছু বলা যায় না।

তাই জানি, আমরা যখন গোরস্তানে যাই, তখন খুঁজি আপন প্রিয় ও পরিচিতজনের কবর। যখন কোনোও নূতন লাইব্রেরিতে ঢুকি তখন খুঁজি আপন প্রিয় লেখকের বই। তাই তুর্গেনেফের শতবার্ষিকী না হয়ে ৭৫তম মৃত্যুদিনও আমার ও আমার মতো বয়স্কদের মনে দোলা লাগিয়েছে। তরুণরা লাইব্রেরিতে যে-রকম নূতন বইয়ের সন্ধান নেয়, ক্ল্যাসিক্স্ পড়ে না, ঠিক তেমনি তারা তুর্গেনেফ কিংবা হাইনের শতাব্দীপ্রয়াণও স্মরণ করে না ; তারা স্মরণ করে র‍্যাঁবো কবে হেঁচেছিলেন, ভেরেন কবে কেশেছিলেন।

তা তারা করুক। কিন্তু যখন দেখি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক এবং তথাকথিত শিক্ষিত লোকও সদম্ভে বলে বেড়াচ্ছেন র‍্যাঁবোর কাছে রবি ঠাকুর শিশু, মাইকেলের অমিত্রাক্ষর উডেন্ (কাষ্ঠরস) এবং সম্পাদক-মণ্ডলীও সেগুলো পরম শ্রদ্ধাভরে ছাপাচ্ছেন তখন এঁরা যে তুর্গেনেফকে স্মরণ করবেন না সে তো জানা কথা। শুধু তাই নয়, এখন আপনারা আমার পক্ষে তুর্গেনেফ কিংবা সত্যেন দত্তকে স্মরণ করতে হলে লণ্ডনে রঙিন হওয়ার মতো রীতিমতো সঙ্কট-সঙ্কুল—রাষ্ট্রভাষায় যাকে বলে 'খতরনাক্'—স্কন্ধোপরি যুগ্ম-শিবের প্রয়োজন।

আমি মুসলমান। আমার শাস্ত্রে আছে বিধর্মীর ভয়ে আল্লা রসুলকে বর্জন করা মহাপাপ। আমার সাহিত্যধর্মে গুরু-মুর্শীদ হয়ে আছেন রবি ঠাকুর, হাইনে, তুর্গেনেফ, মাইকেল। আজ এঁদের অস্বীকার করতে পারব না—র‍্যাঁবো-এলিয়ট সম্প্রদায় যতই শক্তিশালী হন না কেন।

এবং আমার মনের গোপন কোণে একটা অহেতুক ক্ষীণ আশা আছে যে, তুর্গেনেফ-প্রীতিতে আমি একেবারে একা নই। 'বুড়া রাজা প্রতাপ রায়ে'র মতো 'বরজলালে'র হাত ধরে আমাকে একাকী সভাস্থল ত্যাগ করতে হবে না। প্রতাপ রায়ের সমকালীন শ্রোতা সে-সভাতে আর কেউ ছিল না। আমার কিন্তু এখনও অনেক মুরুব্বী আছেন। তাঁরা তুর্গেনেফ সম্বন্ধে আমার চেয়ে ঢের ঢের ভালো লিখতে পারেন, কিন্তু লেখেন না, কারণ তাঁরা জানেন, পাগলাগারদে সুস্থ লোকের লক্ষণ দেখানো পাগলামি, ভেক যেখানে রব ছেড়েছে সেখানে কোকিলের পক্ষে মৌনতাই শ্রেয়—'ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিল জললদাগমে'।

তুর্গেনেফের মন্দ ভাগ্য সম্বন্ধে তিনি নিজেই সচেতন ছিলেন। তিনি থাকতেন বিদেশে—জার্মানী এবং ফ্রান্সে—এবং সেখানে বসে বসেই তিনি জানতে পেতেন কী ভাবে ক্রমে ক্রমে তিনি দস্তেফ্স্কি, তলস্তয় এমন কি কবি নেক্রাসফেরও বিরাগভাজন হয়েছেন। 'বিরাগভাজন' বললে বোধ করি কমই বলা হল। তুর্গেনেফ শেষের দিকে রীতিমত এঁদের বিদ্বেষভাজন হয়েছিলেন।

বিদ্বেষ আসে হিংসা থেকে। এঁদের সবাই বড় লেখক। জীবিতাবস্থায়ই এঁরা দেশে প্রচুরতম সম্মান পেয়েছিলেন। তবে দূর-দেশবাসী প্রবাসী নিরীহ ('নিরীহ' কেন সে কথা পরে হবে) তুর্গেনেফ তাঁদের ক্রোধের কারণ হয়েছিলেন কেন ?

এ-তত্ত্বটি বুঝতে পারলেই জানা যাবে লেখক হিসাবে তুর্গেনেফের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মাহাত্ম্য কোন্‌খানে ?

দস্‌তেফ্‌স্কি ও তলস্তয় জানতেন সৃষ্টির ক্ষেত্রে এঁদের আপন মাহাত্ম্য কোন্‌খানে। দস্‌তেফ্‌স্কি তাঁর প্রতি চরিত্রের গভীরতম অন্তস্তলে পৌঁছে গিয়ে তার সুখদুঃখ, তার দুর্বলতা মহত্ত্ব, তার প্রচেষ্টা এবং ভাগ্যে দ্বন্দ্ব' সমাজ-প্রবাহের খরস্রোতের বিরুদ্ধে তার উজান চলার আপ্রাণ প্রয়াস, কিংবা সে- স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে ভেসে যেতে যেতে তাকে প্রাণভরে অভিসম্পাত—এ সব-কিছু লোহার কলম দিয়ে পাথরের উপর খোদাই করতে পারেন, ভাস্করের মতো দৃঢ়পেশী সবল হস্তে। প্রত্যেকটি চরিত্র তাঁর হাতে যেন দৈত্যের হাতে প্রজাপতি। চোখে একসরে, বুকে অসীম করুণা। তাঁর লেখা পড়ে মনে হয়, একটা বিরাট এঞ্জিন আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। খেলার এঞ্জিন যত তেজেই এগিয়ে আসুক না কেন, জানি, ভালো করেই জানি, সামান্য কড়ে আঙুলটি তার সামনে ধরলেই সে থেমে যাবে, কিন্তু দস্‌তেফ্‌স্কির এঞ্জিন পিঁপড়ের গতিতে এলেও তার সামনে যা পড়বে তার আর উদ্ধার নেই। অরসিকতম পাঠকেরও সাধ্য নেই, তাঁর বর্ণনা পড়ে তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তা না শুনে বা বুঝে থাকতে পারে। কিংবা বলব, কুমির যে-রকম ছাগলের বাচ্চার ঠ্যাং কামড়ে ধরে ডুব দেয় নদীতে, দস্‌তেফ্‌স্কি সে-রকম পাঠককে নিয়ে ডুব দেন মানব-চরিত্রের অতল সায়রে। এবং আশ্চর্য, সেখানে মণি-মুক্তার সঙ্গে সঙ্গে যে ক্লেদ-পঙ্ক দেখি তার প্রতিও তো ঘৃণা হয় না। মাতাল বাপের উচ্ছৃঙ্খলতায় সরলা কুমারী রাস্তার বেশ্যা হয়ে বাপকে মাতলামোর পয়সা যোগাচ্ছে—কই লোকটাকে তো খুন করতে ইচ্ছে করে না। তার অসহায় অবস্থা দেখে শুধু ভগবানকে শোধাতে ইচ্ছে করে, 'একে বিবেকহীন পাষণ্ডরূপে জন্ম দিলে না কেন ? এরও তা হলে কোনো দুঃখ থাকত না, আমরাও অকরুণ হৃদয়ে তাকে খুন করতে পারতুম। কিন্তু এ সব বোঝে, এ তো সব-কিছু জানে। তবে এই ঝঞ্ঝা-ঝড়ের ঘূর্ণিবায়ুর মাঝখানে মানুষকে তুমি প্রজাপতির মতো সৃষ্টি করলে কেন ?' কিংবা হয়ত অতখানি চিন্তা করার শক্তিই পাঠকের থাকে না। মোহমান হয়ে যায় পাঠক সেই বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতার সামনে—সমস্ত জীবন বয়ে বেড়ায় তার অনপসরণীয় স্মৃতি।

তলস্তয়ের রঙ্গমঞ্চ ভুবন-জোড়া বিরাট। তার পাত্রপাত্রীদের নাম ভুলে যাই, কিন্তু চেহারা ভুলি নে। তারা রঙ্গমঞ্চে নাচছে যে যার আপন কোণে আপন আপন মণ্ডলী বানিয়ে। প্রত্যেকের আপন নৃত্য সামঞ্জস্য রেখেছে তার মণ্ডলীর সঙ্গে, মণ্ডলী সামঞ্জস্য রেখেছে আর আর মণ্ডলীর সঙ্গে—কখনও বা দুই কিংবা তিনটি মণ্ডলী একে অন্যকে ভেদ করে মিশে এক হয়ে গিয়ে আবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে—আর সব কটি মণ্ডলীর এ-কোণে ও-কোণে যে-কটি ছন্নছাড়া আপন মনে নাচছে তাদেরও সঙ্গে নিয়ে গড়ে তুলেছে সেই বিরাট ভুবন। বাস্তব জীবনেও আমরা এ-রকম ভুবনের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাই নে। তলস্তয় কতখানি পেয়েছিলেন কে জানে কিন্তু তাতে কীই বা যায় আসে। তাঁর কল্পনার ভুবন আমাদের বাস্তব ভুবনের চেয়ে ঢের ঢের বেশী প্রত্যক্ষ, অঙ্গে অঙ্গে প্রাণবন্ত।

তলস্তয় কখনও কবিতা রচনা করেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তিনি কবি। তাঁর ভানুমতী দণ্ড দিয়ে তিনি যে-রকম আমাদের কল্পনার অতীত বস্তু সৃষ্টি করতে পারেন ঠিক তেমনি আমাদের নিত্যকার চেনা বস্তু—যে বস্তু বহুদর্শনের ফলে তার বৈশিষ্ট্য তার নবীনতা হারিয়ে ফেলেছে—তিনি সামনে তুলে ধরেন সেই চেনা রূপেই, অথচ মনে হয়, 'কী আশ্চর্য, একে এত দিন ধরে লক্ষ্য করি নি কেন?' এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও জেনে যাই যে, একে আর কখনও ভুলব না। তাই তাঁর পাত্রপাত্রী দেশে কালে সীমাবদ্ধ নয়। দস্তেফ্স্কির চাষা কৃভাস ভদ্কা না খেলেও সে রুশ চাষা; তলস্তয়ের চাষা অন্তহীন স্তেপের উপর দিয়ে ভেঙে চলেছে বরফের পাথার, সরাইয়ে ঢুকে সে তার চামড়ার ছেঁড়া ওভারকোট স্টোভের পাশে শুকোতে দেয়, আইকনের সামনে বিড় বিড় করে সে মন্ত্র পড়ে ডান হাতের তিন আঙুলে ডাইনে থেকে বাঁয়ে ক্রস্ করে, কিন্তু বার বার ভুলে যাই সে বাঙালী চাষা নয়। অবাক হয়ে ভাবি, বসিরুদ্দি, পাঁচু মোড়ল, নিজ্নি নভ্গরদের দিকে চলেছে কেন?

মহাভারতের পরেই ওয়ার অ্যাণ্ড পীস্!

তুর্গেনেফ দস্তেফ্স্কির মতো প্রত্যেক চরিত্রের গোপনতম অন্ধকারে বিদ্যুল্লেখা দিয়ে আলোকিত করতে চান না। তার কারণ বোধ হয় তুর্গেনেফ নখ্-শির, আপাদমস্তক ভদ্রলোক। কোনো ভদ্রলোক পরিচিত অপরিচিত কারও গোপন চিঠি পড়ে না—হাতে পড়লেও, কারও হাতে ধরা পড়ার ভয় না থাকলেও। ঠিক তেমনি তার চরিত্রের গোপন দুর্বলতা তার অজানাতে সে জানতে চায় না, প্রকাশ করতে তার মাথা কাটা যায়—সে তো দুশমনের কাজ, গোয়েন্দার ব্যবসা। ভদ্র তুর্গেনেফ তাঁর নায়ক-নায়িকার দিকে তাকান শিশুর মতো সরল

চোখে ; তারা কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে যতখানি আত্মবিকাশ করে তাতেই তিনি সন্তুষ্ট, তাঁর পক্ষে সেই যথেষ্ট। শার্লক হোম্‌সের মতো আতশী কাচ দিয়ে তিনি তার জুতোর দাগ পরীক্ষা করেন না, পোয়ারোর মতো তাকে ক্রস-এগজামিনেশনের ঠেলায় কোণ-ঠাসা করে অট্টহাস্য করে ওঠেন না, 'ধরেছি, ধরেছি, তোর গোপন কথা কতক্ষণ লুকিয়ে রাখবি, বল্‌!'

অথচ শিশুর কাছে কেউ কোন জিনিস গোপন রাখে না। কবি মাত্রই শিশু। তার চোখে ছানি পড়ে নি। প্রতি মুহূর্তে সে এই প্রাচীন ভুবনকে দেখে নবীন রূপে।

রুশদেশে পুশ্‌কিনের পর যদি কোনো কবি জন্মে থাকেন, তবে তিনি তুর্গেনেফ। তলস্তয় কবি সৃষ্টিকর্তা হিসেবে, আবিষ্কর্তা রূপে, আর তুর্গেনেফ কবি অন্য অর্থে। পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কুৎসিত, কিংবা যার দিকে কারও দৃষ্টি যায় না এসব-কিছু তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর কবিত্ব দিয়ে। তিনি অন্য কবির মতো অবাস্তবকে বাস্তব করেন না, বাস্তবকে অবাস্তব করেন না। বাস্তব অবাস্তব দুইই তাঁর কবি-মনের স্পর্শ পেয়ে আপন আপন সীমা ছাড়িয়ে তৃতীয় সত্তায় পরিণত হয়। ঘৃত-প্রদীপ শুষ্ক কাষ্ঠ দুইই তাঁর কবিত্বশিখার পরশে আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে। কিংবা বলব, শীতের শিশির যেমন তার শুভ্র পেলব আস্তরণ দিয়ে মধুর করে দেয় সদ্য-ফোটা ফুলকে, শুকনো পাতার অঙ্গ থেকে ঘুচিয়ে দেয় তার সর্ব কর্কশতা। ওপারের ঝাউবন, এপারের কাশ, ঘাস, সর্বোচ্চ শাল বকায়ন থেকে আরম্ভ করে রাস্তায় পাশের নয়ানজুলি—সবাই যেন সূক্ষ্ম মসলিনের অঙ্গাভরণ পরে সৌন্দর্যের গণতন্ত্রে কৌলীন্য পেয়ে গিয়েছে।

এই কবিত্বপ্রতিভাকেই হিংসা করতেন দস্‌তেফ্‌স্কি, তলস্তয়, নেক্রাসফ ত্রিমূর্তি। নেক্রাসফ স্বয়ং কবি কিন্তু তিনি জানতেন যে-জিনিসের পরশ পেয়ে শুকনো গদ্য গান হয়ে নেচে ওঠে সেইটির পূর্ণ অধিকার আছে একমাত্র তুর্গেনেফের। আঙ্গিকের উপর এ-রকম অখণ্ড অধিকার ত্রিমূর্তির কারও ছিল না। তাঁদের কোনো বিশেষ রচনা হয়ত তুর্গেনেফের রচনা অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের কিন্তু তুর্গেনেফ তাঁদের শ্রেষ্ঠতর রচনাকে তাঁর আঙ্গিকের স্পর্শ দিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রচনা করে দিতে পারতেন। দস্‌তেফস্কি তলস্তয় যেন লিখেছেন কবিতা। তুর্গেনেফ যে-কোনো মুহূর্তে তার যে-কোনো একটিকে সুর লাগিয়ে গানের রূপ দিয়ে দিতে পারতেন। আর তুর্গেনেফের প্রত্যেকটি রচনা যেন গান, তার গায়ে আর হাত দেবার উপায় নেই—তা সে গানের মূল্য কবিতার চেয়ে কম হক আর বেশীই হক।

সে-যুগে ভাষা, ছন্দের রাজা ছিলেন ফ্রান্সের ঔপন্যাসিক ফ্লবের। তাঁর শিষ্য এবং মানসপুত্র মপাসাঁ তখনও গুরুর মজলিসে আতরদান, গোলাপ-পাশ এগিয়ে দেন। তুর্গেনেফ ফ্লবেবের বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধু। ফ্লবেরকে চিঠি লেখার সময় মপাসাঁ লেখেন 'গুরুদেব', তুর্গেনেফকে লেখার সময় লেখেন, 'গুরু এবং সখা'। ফ্লবেরের আকস্মিক মৃত্যুতে মপাসাঁ যখন শোকে অভিভূত হয়ে অন্ধের মতো এদিক ওদিক হাতড়াচ্ছেন তখন তুর্গেনেফ শেষবারের মতো দেশের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়েছেন রুশে। মপাসাঁ তাঁকে চিঠি লিখে খুঁজেছেন সান্ত্বনা। লিখেছেন, 'জীবনেব সব কটি আনন্দেব দিনও তো আমাব এই দুঃখের দিনটার ক্ষতিপূরণ করতে পারছে না।'

তার তিন বছর পর গত হলেন তুর্গেনেফ।

এবারেও হয়ত তিনি কোনো সাহিত্যিক বন্ধুকে চিঠি লিখে সান্ত্বনা খুজে-ছিলেন। তখনকার দিনের ফ্রান্সের সব বিখ্যাত সাহিত্যিকদেব সঙ্গেই তুর্গেনেফ, ফ্লবের, মপাসাঁর বন্ধুত্ব ছিল। ভিক্তব হ্যুগো, এদমোঁ দ গঁকুব, এমিল জোলা, আলফঁস দদে এঁদের কাউকে হয়ত তিনি লিখেছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয়, ফ্লবের গত হলে শোক নিবেদন কবা যায় তুর্গেনেফকে, কিন্তু তুর্গেনেফ গত হলে লেখা যায় আর কাকে? বঙ্কিমের মৃত্যু-সংবাদ ববীন্দ্রনাথকে জানিয়ে হয়ত সান্ত্বনাব বাণী চাওয়া যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গত হলে বাঙালী জানাবে কাকে?

মপাসাঁ এর অনেক আগেই ফ্রান্সের বিখ্যাত পত্রিকায় তুর্গেনেফ সম্বন্ধে প্রশস্তি লিখেছিলেন। এবারে তিনি যেটি লিখলেন, সেটি বড়ই করুণ। মপাসাঁব পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাবলীতে এ-দুটি থাকার কথা কিন্তু আজ যখন মপাসাঁকেই লোকে স্বীকার করতে চায় না—যদি বা করে তাও তাঁর তথাকথিত অশ্লীল গল্পের জন্য—তখন তাঁর প্রবন্ধ পড়তে যাবে কে? তবু বলি আনাতোল ফ্রাঁসের রম্য-রচনাকে যদি সত্য ও সুন্দরের অভূতপূর্ব অনির্বচনীয় সঙ্গম বলে ধবা হয়, তবে সে-দুটির উৎস খুঁজতে হবে মপাসাঁর রচনায়। তাঁর ছোটগল্পের সর্বত্র-পরিচিত শৈলীতেই সেগুলো লেখা। ছোট ছোট শব্দ, ছোট ছোট বাক্য আর তার মাঝে মাঝে অকস্মাৎ দীর্ঘায়তন দীর্ঘকলেবর উদ্দাম উত্তাল শৈলধারার মতো দ্রুতগামী বাক্য-বিন্যাস। মন্দাক্রান্তার পাঁচটা হ্রস্বের পর দুটো দীর্ঘ এলে যে-রসেব সৃষ্টি হয়।

এর অনুবাদ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। সারাংশ নিবেদন করি।

"রুশ দেশের মহান ঔপন্যাসিক ইভান তুর্গেনেফ ফ্রান্সকে আপন দেশরূপে বরণ করেছিলেন। এক মাস অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করার পর তিনি গত হয়েছেন।"

"এ-যুগের অত্যাশ্চর্য লেখকদের তিনি অন্যতম। সঙ্গে সঙ্গে সাধু, সৎ, অকপট ও বন্ধুবৎসল সমাজের তিনি ছিলেন সর্বাগ্রণী। এ রকম লোকের দেখা মেলে না।

"তাঁর বিনয় ছিল আত্মাবমাননার কাছাকাছি; কাগজে তাঁর সম্বন্ধে কেউ কিছু লিখলে তনি তা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। একাধিকবার তাঁর সম্বন্ধে উচ্চ প্রশস্তি সংবলিত রচনা তাঁকে যেন মর্মাহত করেছে; কারণ তিনি কিছুতেই স্বীকার করতে রাজী হতেন না যে, শুদ্ধ সাহিত্য ভিন্ন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে রচনা লেখা হক। সাহিত্য কিংবা কলা-সমালোচনাকে পর্যন্ত তিনি প্রগল্‌ভ বাক্যবিন্যাস বলে মনে করতেন। একবার কোনো এক সাহিত্য-সমালোচক তাঁর একখানা বই সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর জীবন নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাতে তিনি রীতিমত আহত হয়েছিলেন। তার সে বেদনা-বোধে ছিল লেখকের ব্রীড়া—শুদ্ধ বিনয় তার কাছে নতমস্তক হয়।

"আজ গত হয়েছেন এই মহান পুরুষ, তাঁর সম্বন্ধে সামান্য কিছু নিবেদন করি।

"প্রথমবার তাঁকে দেখি গুস্তাফ ফ্লবেরের পার্টিতে।

"দরজা খুলতে ঘরে ঢুকলেন দৈত্য বিশেষ। রুপালী মাথা—রূপকথায় যাকে বলে রজতশির। লম্বা-লম্বা সাদা চুল, রুপালী চোখের পলক আর বিরাট সাদা দাড়ি—সত্যই যেন খাঁটি রুপোর অতি মিহিন তার দিয়ে তৈরী। ঝকঝক চকচক করছে, প্রতিটি রশ্মিকণা যেন তার উপর থেকে ঠিকরে পড়ছে। আর সেই ধবলিমার মাঝখানে শান্ত সুন্দর মুখচ্ছবি। নাক চোখ যেন একটু বড্ড বেশী ধারালো। সত্যই যেন বরুণদেবের শির—চতুর্দিকে ধবল জলের ঢেউ তুলেছেন—কিংবা আরও ভালো হয়, যদি বলি, অনন্তদেব, বিশ্বপিতার মুখচ্ছবি।

"অতি দীর্ঘ দেহ—বিরাট, কিন্তু দেহে মেদচিহ্ন নেই। আর সেই বিশালবপু, অতিকায় পুরুষটির চলাফেরা, নড়াচড়া একেবারে শিশুটির মতো—বড় ভীরু-ভীরু ভাব। অতি মিষ্ট মৃদু কণ্ঠে কথা বলেন, কেমন যেন মনে হয়, পুরু জিভ শব্দের ভার যেন সইতে পারছে না। কখনও কখনও কথা বলতে বলতে একটু আটকে যান যেন, ঠিক মনের মতো কথাটি ফরাসীতে কি হবে সেটা খোঁজেন আর প্রতিবারেই চমৎকার ঠিক শব্দটি খুঁজে পান। এই সামান্য থমকে যাওয়াটা তার বচনভঙ্গীতে লাবণ্য এনে দিত।

"গল্প বলতে পারতেন অতুলনীয় মধুর ভঙ্গীতে। সামান্যতম ঘটনাকে তিনি সেই ভঙ্গীর পরশ লাগিয়ে রসের স্তরে তুলে নিতে পারতেন। তাঁর অসাধারণ

প্রতিভার মূল্য আমরা ভালো করেই জানতুম কিন্তু আসলে তিনি সর্বজনপ্রিয় ছিলেন অন্য কারণে। তাঁর চরিত্রের শিশুর মতো সরলতা ছিল সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য; এক দিক দিয়ে এই প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক পৃথিবী পরিক্রমা করেছেন, তাঁর যুগের তাবৎ গুণী-জ্ঞানীকে তিনি চিনতেন, মানুষের পক্ষে যা পড়া সম্ভব তার সব কিছুই তাঁর পড়া ছিল, ইয়োরোপের সব ভাষা আপন মাতৃভাষার মতো বলতে পারতেন অথচ অন্য দিক দিয়ে তাঁর আর পাঁচজন বন্ধু-বান্ধবের কাছে যা কিছু অতিশয় সামান্য সাধারণ তারই সামনে তিনি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে অবাক মানতেন, ভাবতেন, এটা হল কী করে?

"সাহিত্য বিচারের সময় তিনি আমাদের পাঁচজনের মতো সব কিছু বিশেষ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ হয়ে বিশেষ দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতেন না। পৃথিবীর তাবৎ সাহিত্য তাঁর খুব ভালো করে পড়া ছিল বলে সর্বসাহিত্যের সমন্বয় করে তারই বিরাট পটভূমিতে তিনি পৃথিবীর এক প্রান্তে প্রকাশিত একখানা বই তুলনা করতেন। অন্য প্রান্তে প্রকাশিত অন্য ভাষায় লিখিত আরেকখানা বইয়ের সঙ্গে তাই তাঁর সমালোচনা আমাদের কাছে তার বিশেষ মূল্য পেত।

"তাঁর বয়স হয়েছিল, তাঁর সাহিত্য-জীবন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল অথচ সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ছিল আধুনিকতম এবং সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল। প্লটের প্যাঁচ আর থিয়েটারী কৌশলে ভর্তি উপন্যাস তিনি দু চোখে দেখতে পারতেন না, তিনি বলতেন, কিছু না, শুদ্ধমাত্র জীবন হবে উপন্যাসের উপাদান—তাতে প্লটের ছলা কৌশল থাকবে না, থাকবে না অসম্ভব অসম্ভব কীর্তিকাহিনী।

"তাঁর মতে উপন্যাস আর্টের সর্বাধুনিক রূপ। গোড়ার দিকে রূপকথার ছলা-কলা তাতে ব্যবহার করা হত এবং উপন্যাস এখনও তার থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পায় নি। নানা রকম রোমান্টিক আর আকাশ-কুসুম কল্পনা উপন্যাসকে এতদিন ধর্মভ্রষ্ট করেছে। এখন আস্তে আস্তে মানুষের রসবোধ শুদ্ধ হতে চলেছে। এখন ওসব শস্তা ছলাকলা বর্জন করে উপন্যাসকে করতে হবে সরল, তাকে জীবনের আর্ট রূপে তুলে ধরতে হবে যাতে করে একদিন সে জীবনের ইতিহাস রূপে গণ্য হতে পারে।

"আজ তাঁর প্রতিভাপ্রসূত কাব্যসৃষ্টির বিশ্লেষণ করা যাবে না—যদিও জানি তাঁর সৃষ্টি রুশ সাহিত্যের সর্বোচ্চ সৃষ্টির সমপর্যায়ে স্থান পেয়েছে। তাঁর প্রিয়তম বন্ধু মহাকবি পুশ্‌কিন্, লেরমন্তফ এবং ঔপন্যাসিক গগলের সৃষ্টির পাশাপাশিই তাঁর রচনার স্থান। রুশ দেশ যাঁদের সৃষ্টি চিরকৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখবে ইনি তাঁদেরই একজন। ইনি রুশকে দিয়েছেন চিরঞ্জীব সম্পদ, অমূল্য নিধি। ইনি

দিয়েছেন এমনই সম্পূর্ণ আর্ট, এমন সব সৃষ্টি যার বিস্মরণ অসম্ভব; তিনি দিয়েছেন এমন এক গৌরব যে-গৌরবের মূল্য বিচার অসম্ভব, যার আয়ু অন্তহীন এবং রুশ দেশের অন্য সর্বগৌরব সে অনায়াসে অতিক্রম করে যায়। এঁর মতো লোকই দেশের জন্য এমন কিছু করে যান যার কাছে প্রিন্স্ বিসমার্ক তুচ্ছ; পৃথিবীর সর্বভূমির সর্বমহাজনের কাছে এঁরা নমস্য হন।"

গাঁজা

কিংবা গুলও বলতে পারেন। সদাশয় ভারত সরকার যখন আমাকে কিছুতেই 'পদ্মশ্রী' 'পদ্মবিভূষণ' জাতীয় কোনো উপাধিই দিলেন না, এবং শেষ পর্যন্ত শিশির ভাদুড়ী পেয়েও সেটি বেয়ারিং চিঠির মতো ফেরত দিলেন তখন হাজরা রোডের রক্‌ফেলাররা (অর্থাৎ যাঁরা রকে অন্তত এক লক্ষ গুল মেরে লক্ষপতি রক্‌ফেলার হয়েছেন) সাড়ম্বরে আমাকে 'গুলমগীর' উপাধি দিলেন।

হালের কথা। বর্ষার ছদ্মবেশ পরে শরৎ নেমেছেন, কলকাতার শহরে। বাড়ির আঙিনায় হাঁটুজল, রাস্তায় কোমর। সেই জল ভেঙে ভিজে জগঝম্প হয়ে তাবৎ 'ফেলাররাই' উপস্থিত, এসেই বসলেন টেলিফোনটি মাঝখানে রেখে। তারপর সবাই আপন আপন আপিস-আদালত কারখানা-শুঁড়িখানাতে খবর পাঠালেন, 'কী ভয়ঙ্কর জল দাঁড়িয়েছে রাস্তায়! বাড়ি থেকে বেরনো সম্পূর্ণ অসম্ভব। নৌকো ভাড়ার চেষ্টা করছি। আপিসে আজ না আসতে পারলে কয়েকটা ভিজিটার ফিরে যাবে। সর্বনাশ হবে। কি করি বলুন তো?'

মশাদার এরকম সকরুণ বেদনার গন্ধঢালা আপিস-প্রীতি এর পূর্বে আমি কখনো দেখি নি। রকে আসতে তাকে বুক ভেজাতে হয়েছে, এখন তার চোখ ভেজা অথচ তার বাড়ি থেকে যেদিকে আপিস সেদিকে যেতে হাঁটু পর্যন্ত ভেজাতে হয় না।

আমাদের রকটি সংমিশ্রিত; অর্থাৎ দু-চারটি চিংড়ি সদস্যও আছেন। আবার ফণি-কাকার বয়স ষাট পেরিয়েছে, গুড়গুড়ির বয়স পাঁচ পেরোয় নি। এরা মাঝে-মধ্যে থাকলে আমাদের একটু সামলে-সুমলে কথা কইতে হয়।

মশাদার প্যাঁচটা দেখে টেটেন মারলে ডবল প্যাঁচ। অজন সেনকে বললে, 'অজনদা, আমার আপিসকে ঝপ্ করে একটা ফোন করে দিন তো, আমি আপিসে বেরিয়ে গিয়েছি, পৌঁচেছি কিনা!'

অজনদা আরো তৈরী মাল। নম্বর পেয়ে খবরটা দিয়ে কি একটা শুনে

আঁতকে উঠে বললে, 'কী বললেন? পৌঁছয় নি? বলেন কি মশাই? বড় দুশ্চিন্তায় ফেললেন তো!'

নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

অজনদার নিজের কোনো ভাবনা নেই। তার আপিসে মাত্র একটি কল। সেটা সে প্রায়ই আপিস ছাড়ার পূর্বে বে-কল করে আসে।

এবারে আমরা শান্তমনে সমাহিত চিত্তে কর্তব্য-কর্মে মন দিলুম।

অজন বুঝিয়ে বলে, 'আলম অর্থাৎ দুনিয়া জয় করে পেলেন বাদশা আওরঙ্গজেব ঐ আলমগীর নাম। সেই ওজনে আপনি গুলম্‌গীর।'

আমি বললুম, 'হাসালি রে হাসালি! এ আর নূতন কি শোনালি? প্রথম আমি পরীস্তানে ছিলুম গুল্‌-ই-বকাওলী, তারপর লন্‌ডনে নেমে হলুম ডিউক অব গুলস্টার, তারপর ফ্রান্সে হলুম দ্য গুল, তারপর পাকিস্তানে হলুম গুল মুহম্মদ, এখানে এসে হলুম গুলজারিলাল নন্দ। তা ভালোভালো। গুলম্‌গীর! বেশ বেশ।'

বড়দা উপর থেকে রকে নামেন কচিৎ-কস্মিন। বললেন, 'ল্যাটে—ল্যাটে বুঝলেন।' বড়দার মুখ হামেহাল পানের পিকে ভর্তি। তারই মহামূল্যবান এক ফোঁটা পাছে বরবাদ হয়, সেই ভয়ে তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে, স্বর্গের দিকে ঠোঁট দুটি সমান্তরাল করে সেই দুটিকে মুখের ভিতরের দিকে বেঁকিয়ে দিয়ে 'ত', 'দ'-কে 'ট', 'ড' করে কথা বলেন—অল্পই।

তাঁর এসব কলকায়দা করা সত্ত্বেও আমরা তখন পাখা, খবরের কাগজ হাতের কাছে যা পাই তাই দিয়ে মুখ ঢাকি। আমি স্বয়ং ছাতা ব্যবহার করি।

অজনদা বললে, 'এবারে আপনি আপনার উপাধি-প্রাপ্তির সম্মানার্থে একটি সরেস গুল ছাড়ুন তো, চাচা।'

মশা বললে, 'কিংবা গাঁজা।'

আমি বললুম, 'যদি ছাড়ি গাঁজার গুল?'

ঘেণ্টু বললে, 'চাচাকে নিয়ে তোরা পারবি নে রে, ছেড়ে দে।' ঘেণ্টুর পাড়াদত্ত নাম ঘণ্টু। আমি নাম দিয়েছি ঘেণ্টু। যবে থেকে আমার চর্মরোগ হয়েছে। ঘেণ্টু চর্মরোগের জাগ্রতা দেবী। বিশ্বেস না হলে চলন্তিকা খুলে দেখুন।

আমি বললুম, 'তবে শোন। কিন্তু তার পূর্বে টেটেনকে সাবধান করে দিচ্ছি, সে যেন আমার গাঁজার গুল নিয়ে কোনো সোসিয়ো-পোলিটিকো-ইকনমিক-স্টাটিসটিকস সঞ্চয় না করে। সে আজকাল ঐ নিয়ে মেতেছে।'

টেটেন নানাবটি কেস পড়ছিল। বললে, 'আপনি কিস্‌সুটি জানেন না, চাচা। আপনার জানা নেই, এ সংসারে মিথ্যাবাদী আছে এবং তার চেয়ে বড় মিথ্যাবাদীও আছে এবং সর্বশেষে স্টাটিস্‌টিশিয়ানদের কথা ভুলবেন না। ওদের মাল নিয়েই তো সরকার গুল মারে। নিত্যি নিত্যি কাগজে দেখতে পান না? আমি আপনার দোরে যাব কেন?'

'তবে শোন্‌। নিশ্চিন্ত হয়ে বলি।

পার্টিশেনের বছর খানেক পরের কথা। আমার মেজদা ওতর বাংলার কোথায় যেন কি একটা ডাক্তর নোকরি করেন। তাঁর সঙ্গে দেখা। আমরা এখন দুই ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন দেশের অধিবাসী। কিন্তু আমাদের ভিতর কোনো ঝগড়া-কাজিয়া নেই। এই অ্যাদ্দিন বাদে নেহরুজী আর আইয়ুব খান সায়েব সেটা বুঝতে পেরে আমাদের শুভ-বুদ্ধি এক্তেয়ার করেছেন। তা সে যাক গে।

হিন্দুস্থানের বিস্তর দরদ-ভরা তত্ত্বতাবাশ করে মেজদা শুধলে, "তোদের দেশে গাঁজার কি পরিস্থিতি?"

আমি একগাল হেসে বললুম, "স্বরাজ পেয়ে বাড়তির দিকে।"

মেজদা আশ্চর্য হয়ে শুধালে, "সে কি রে। কোথায় পাচ্ছিস? আমি তো চালান দিতে পারছি নে!"

আমিও অবাক। শেষটায় বোঝা গেল, দাদা ছিলিম মেরে শিবনেত্র হওয়ার সত্যিকার গাঁজার কথা বলছে। আমি কি করে জানবো? আমি পাষণ্ড বটি, —দাদা ধর্মভীরু, সদাচারী লোক।

বললে, "শোন।"

পার্টিশেনের ফলে মেলা অচিন্তিত প্রশ্ন, নানা ঝামেলা মাথা চাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে উঠলো এবং তারই সর্বপ্রধান হয়ে উঠে দাঁড়ালো গঞ্জিকা-সমস্যা।

গাঁজার এত গুণ আমি জানতুম না। শুনতে পেলুম, স্বয়ং জাহাঙ্গীর বাদশা নাকি গাঁজা খেয়ে উভয়ার্থে অচৈতন্য হয়েছিলেন। সেটা নাকি তুজ্‌ক্‌-ই-জাহাঁ-গীরীতে আছে। গাঁজা ছাড়েন শেষটায় তিনি মনের দুঃখে। এর দাম অতি শস্তা বলে সেটা পোষায় না রাজা-বাদশাদের রাজসিক জাত্যাভিমানে। সে কথা যাক।

আমার এলাকায় পৃথিবীর বৃহত্তম গাঁজার চাষ এবং গুদোম। ভারতে গাঁজার চাষ প্রায় নেই। আমি এসব তত্ত্ব জানতুম না—সমস্ত জীবন কাটিয়েছি আসামে, বরঞ্চ চায়ের খবর কিছুটা রাখি। এসব গুহ্য রহস্যের খবর দিয়ে গাঁজা ফার্মের ম্যানেজার আমাকে একদিন দুঃসংবাদ দিলে, সে বচ্ছরের গাঁজা গুদোমে

পচে বরবাদ হব-হব করছে। ইণ্ডিয়াতে চালান দেবার উপায় নেই—অথচ সেখানেই তার প্রধান চাহিদা।"

আমি শুধলুম, "কেন? তুমি নিজে খাও না বলে অন্য লোকেও খাবে না? এ তো বড় জুলুম!"

দাদা বললে, "কী জ্বালা! আমি শ্রীঘরবাস পছন্দ করি নে; তাই বলে আমি জেল তুলে দিয়েছি নাকি? সাধে কি বলি তুই একটি চাইল্‌ড্‌ প্রডিজি—ওয়াণ্ডার চাইল্‌ড্‌—চল্লিশ বছরে তোর যা জ্ঞানগম্যি হল, আল্লার কুদরতে পাঁচ বছর বয়েসেই সেটা তুই অর্জন করে নিয়েছিলি।"

আমি চটে গিয়ে বললুম, "আর তুমি বিয়াল্লিশে।" দাদা আমার চেয়ে দু' বছরের বড়।

দাদা বললে, "তোর রসবোধ নেই। ঠাণ্ডা হ।"

রক্‌ফেলারদের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'এসব মাইনর বর্ডার ইন্‌সিডেন্ট আমাদের ভিতরে কালে-কস্মিনে হয়, কিন্তু মিটমাট হয়ে যায় "আকাশ-বাণী", "ঢক্কা-ডিংডমে" পৌঁছবার পূর্বেই।'

অজনদা শুধোলে, 'ঢক্কা-ডিংডমটা কি চাচা?'

'ডিংডম্‌ মানে জগঝম্প, বিরাট ঢাক, যার থেকে ইংরিজি "টম্‌টম্‌", "টমটমিং" শব্দ এসেছে। অর্থাৎ ঢাকার বেতার কেন্দ্র। তারপর শোন:

দাদা বললে, "ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। ভারতের ষাট হাজার সন্ন্যাসী নাকি রাষ্ট্রপতির কাছে সই, হাতের টিপ দিয়ে আবেদন জানিয়েছেন, গাঁজার অভাবে তাঁদের নানাবিধ কষ্ট হচ্ছে, আত্মচিন্তায় ব্যাঘাত হচ্ছে—"

আমি গোশ্‌শা করে বললুম, "দেখো দাদা, পিতা গত হওয়ার পর অগ্রজ পিতৃতুল্য। কিন্তু তুমি যদি আমাদের সন্ন্যাসীদের নিয়ে মস্করা করো—"

বাধা দিয়ে দাদা বেদনাতুর কণ্ঠে বললে, "দেখ ভাই, তুই কখনো দেখেছিস যে আমি কাউকে নিয়ে—"

এবারে আমি বাধা দিয়ে বললুম, "থাক্‌ থাক্‌। তুমি বলো।" দাদার ঐ গলাটা আমি বড়ই ডরাই। ওটা দাদা ব্যবহার করে পঞ্চাশ বছরে একবার। দাদার বয়স তখন বিয়াল্লিশ।

দাদা তো আমাকে মাফ করবার জন্য তৈরী। চশমার পরকলা দুটো পুঁছে নিয়ে বললে, "পূর্বেই বলেছি, পার্টিশেনের ফলে বিস্তর অভাবিতপূর্ব সমস্যা দেখা দিল—এটা তারই একটা। পার্টিশেনের পূর্বে সাস্তাহারের গাঁজা যেত হরিদ্বারে অক্লেশে, বাঙালোরের বিয়ার আসত ঢাকায় লাফিয়ে লাফিয়ে। এখন মধ্যিখানে

এসে দাঁড়ালো এক দুশমন। জিনীভাতে কবে কে আইন করেছিল বিশ্বজনের কল্যাণার্থে—কল্যাণ না কচু—তার সারমর্ম এই : আপন দেশে তুমি সার্বভৌম রাজা, যা খুশী করতে পারো, যত খুশী ততো আফিঙ ফলিয়ে বিক্রি করতে পারো, গাঁজা চালাতে পারো—কিন্তু ভুলো না, আপন দেশের চৌহদ্দীর ভিতর। এক্‌স্‌পোর্ট করতে গেলেই চিত্তির। তখন জিনীভার অনুমতি চাই। যেমন মনে কর, ফিনল্যাণ্ড জিনীভার মারফতে তোদের কাছে চাইলে দু' মণ আফিঙ—ওষুধ বানাবার জন্য। জিনীভা সন্দেহের গোয়েন্দা লাগাবে জানবার জন্যে, সত্যি ওষুধ বানাবার জন্য ফিনল্যাণ্ডের অতখানি প্রয়োজন কি না, কিংবা ওরি খানিকটে আক্রা দরে বাজারে বিক্রি করে, দেশের লোককে আফিঙখোর বানিয়ে দু'পয়সা কামিয়ে নিতে চায়। কারণ কোনো কোনো দেশ নাকি বিদেশের ওষুধ বানানেওলাদের সঙ্গে ষড় করে ওষুধের অছিলায় বেশী বেশী হশীশ, ককেইন রপ্তানি করে সে-সব দেশের বহু লোকের সবনাশ করেছে। আইনগুলো আমি পড়ে দেখি নি, তাই ঠিক ঠিক বলতে পারবো না—নির্যাসটি জানিয়েছিল, গাঁজা ফার্মের ম্যানেজার। এখন নাকি জিনীভার পারমিশন চাই, সেটা পেতে কতদিন লাগবে তার ঠিকঠিকানা নেই, কতখানি পাঠানো যাবে তার স্থিরতা নেই।

ইতিমধ্যে উপস্থিত হল আরেক সঙ্কট।

গেল বছরের গাজাতে গুদোম ভর্তি। এদিকে হাল বছরের গাঁজা ক্ষেতে তৈরী। তুলে গুদোমজাত করতে হবে। নূতন গুদোম এক ঝটকায় তৈরী করা যায় না—শেষটায় হয়তো জিনীভা কোনো পারমিটই দেবে না, কিংবা এত অল্প দেবে যে বেবাক ব্যবসাই গুটোতে হবে। নয়া গুদোমের কথাই ওঠে না।

তখন নানা চিন্তা, বহু ভাবনা, ততোধিক কর্তৃপক্ষকে আলোচনা করে স্থির করা হল, গেল বছরের গাঁজা পোড়াও—" '

আড্ডার কেউই গঞ্জিকা-রসিক নয়। তবু সবাই—টেটেনদি ছাড়া—এক কণ্ঠে হায় হায় করে উঠলো। খাই আর না-ই খাই, একটা ভালো মাল বরবাদ হতে দেখলে কার না দুঃখ হয়! রায়টের সময় পার্ক সার্কাসের মদের দোকানে বোতল ভাঙা হচ্ছে দেখে এক টেম্পারেন্স পাদ্রীকে পর্যন্ত আমি শোক করতে দেখেছি।

স্টাটিস্‌টিশিয়ান টেটেন বললে, 'আপনারা এতে এমন কি নূতন শোক পাচ্ছেন? মার্কিনরা যে দু'দিন অন্তর অন্তর অঢেল গম লিট্‌রিলি অ্যাণ্ড মেট্‌ফরিক্সি দরিয়ায় ভাসিয়ে দেয় সে বুঝি জানেন না?' টেটেনই আমাদের মধ্যে ইংরিজিতে এম-এ। ওর উচ্চারণ আমাদের বুঝতে কষ্ট হয়।

সবাই হ্যাঁ হ্যাঁ বলার পর আমি গল্পের খেই ধরে এবং সিগরেট ধরিয়ে বললুম, 'তারপর দাদা বললে, "গুদোমেতে নূতন মাল পোরা হবে। ম্যানেজারকে বললুম, আমি অমুক দিন যাবো, সেদিন পুরনো মাল পোড়ানো হবে। কারণটা তাকে আমি আর বললুম না। সেই যে—তুই জানিস না কি? বড়দা তোকে বলেছেন, তিনি যখন জাপানী বোমার সময় ট্রেজারি অফিসার ছিলেন তখন-হুকুম এল, জাপানী বোমা পড়লে, ব্যাপক বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে ট্রেজারির তাবৎ কারেন্সি নোট পুড়িয়ে ফেলবে! ভাইজাগ না কোথাকার এক সুবুদ্ধিমান একটি মাত্র বোমা পড়ামাত্রই সরকারকে খবর দিলে সে সব নোট পুড়িয়ে ফেলেছে। তারপর দু'বছর বাদে, তাজ্জবকী বাৎ, বাজারে সে-সব নোটের দর্শন পাওয়া যেতে লাগল। পোড়ায় নি। সরিয়ে ফেলেছিল। আমার তাই ভয়, গাঁজার বেলাও ঐ যদি হয়।

আগেভাগে দিনক্ষণ দেখে, অর্থাৎ টুর প্রোগ্রাম যথা-যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়ে বেরলুম গাঁজা পোড়াতে।"

আমি আঁৎকে উঠে বললুম, "কি বললে?"

দাদা ঈষৎ চিন্তা করে বললে, "হ্যাঁ তা তো বটেই। 'গাঁজা পোড়ানো' কথাটার অর্থ 'গাঁজা খাওয়া'ও হয়। তাই শুনেছি, ছোকরা নাতির হাতে সিগরেট দেখে যখন ঠাকুরদা গম্ভীর কণ্ঠে তাকে বললেন, 'জানিস, সিগরেট মানুষের সব চেয়ে বড় শত্রু'—সে তখন শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল, 'তাই তো ওকে পোড়াতে যাচ্ছি'।

মোকামে পৌঁছে দেখি বিরাট ভিড়। বিশখানা গাঁয়ের বাছাই বাছাই লোক জমায়েত হয়েছেন সেখানে গাঁজা পোড়ানো দেখবেন বলে। আমি তো অবাক। বাঁশ-পাতা পোড়ানো আর গাঁজা-পাতা পোড়ানোতে এমন কি তফাৎ যে দুনিয়ার লোক হদ্দমুদ্দ হয়ে জমায়েত হবে? তা সে যাক গে।

হুদো হুদো গাঁজা ওজন করে হিসেব মিলিয়ে ডাঁই ডাঁই করে মাঠের মধ্যি-খানে রাখা হল। তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে ম্যানেজারই মুখাগ্নি করলে। সে-ই তার জনক—একে দিয়ে তার বহু পয়সা কামাবার কথা ছিল।

সেদিন বাতাসটা ছিল একটু এলোমেলো। গাঁজার ধুঁয়ো ক্ষণে এদিকে যায়, ক্ষণে ওদিকে যায়। আর তখন দেখি অবাক কাণ্ড! পাতা পোড়াবার সময় যেদিকে ধুঁয়ো যায় মানুষ সেদিক থেকে সরে যায়। আজ দেখি উল্টো বাৎ। জোয়ান-বুড়ো, মেয়েমদ্দে—হ্যাঁ, কয়েকটি মেয়ে-ছেলেও ছিল—ছোটে সেদিকে।

আর সে কী দম নেওয়ার বহর! সাঁই সাঁই শব্দ করে সবাই নাভিকুণ্ডলী

পর্যন্ত ভরে নিচ্ছে সেই নন্দন-কাননের পারিজাত-পাপড়ি পোড়ানোর খুশবাই—অন্তত তাদের কাছে তাই। আমার নাকে একবার একটুখানি ঢোকাতে আমি তো কেশে অস্থির। আর ওরা ফেলছে কী পরিতৃপ্তির নিশ্বাস—'আঃ, আঃ'। কেউ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, কোমরে দু'হাত রেখে, আকাশের দিকে জোড়া মুখ তুলে নাসারন্ধ্র স্ফীত করে নিচ্ছে এক-একখানা দীর্ঘ দম, আর ছাড়ছে দীর্ঘতর 'আঃ—!' শব্দ। কেউ বা মাটিতে বসে ক্যাবলাকান্তের মতো মুখ হাঁ করে আস্ত মার্গ দিয়ে যৌগিকধূম্র গ্রহণ প্রশস্ততর মনে করছে।

হঠাৎ হাওয়া ওলটালো। তখন পড়িমড়ি হয়ে সবাই ছুটলো সেদিকে। আমি, ম্যানেজার, সেরেশ্‌তাদার ততোধিক পড়িমড়ি হয়ে ছুটলুম অন্যদিকে। দু' একটি চাপরাসী দেখি মনস্থির করতে পারছে না। তাদের আমি দোষ দিই নে।

ভেবে দেখ, পৃথিবীতে এ ঘটনা ইতিপূর্বে আর কখনো হয়েছে? গাঁজা তো আর কোথাও ফলানো হয় না। তারই মণ মণ পুড়িয়ে একচ্ছত্র গঞ্জিকাযজ্ঞ চতুর্দিকে গরীব দুঃখী বিস্তর। এক ছিলিমের দম বাজারে কিনতে গেলে এদের দম বেরিয়ে যায়। আর এখানে লক্ষ লক্ষ তাওয়া পোড়ানো হচ্ছে আকাশ বাতাস টৈটম্বুর করে। হয়ত ধরণীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই শেষ যজ্ঞ।

আমি তো সায়েন্সের ছাত্র ছিলুম। তোদের কোনো এক ঔপন্যাসিক নাকি সদর রাস্তায় মদের পিপে ফেটে যাওয়ার বর্ণনা দিয়েছে! আমি তার ট্রেলার বাইস্কোপে দেখেছি। কিছু না। ধুলোখেলা। সেখানে সবাই করছে মালের জন্য হুটোপুটি একই দিকে। এখানে বিরাট জিবগা-জলসার জনসমাজ দিকনির্ণয় যন্ত্রের অষ্টকোণ চষে ফেলছে—ধুঁয়ো যখন যেদিকে যায় সেদিকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে উল্টোদিকে ছুটছি আমরা কয়েকজন। রবীন্দ্রনাথ নাকি 'জাগ্রত ভগবানকে' ডেকেছিলেন তাঁকে 'জনসমাজ-মাঝে' ডেকে নেবার জন্যে। আমি পবিত্রাহি চিৎকার ছাড়ছি, অবশ্য মনে মনে—আল্লাতালা যেন এই আমামুন্নাস, এই 'জন-সমাজ' থেকে আমাকে তফাৎ রাখেন।"

আমি ততক্ষণে হাসতে হাসতে প্রায় কেঁদে ফেলেছি। দাদা আমার গম্ভীর রাশভারী প্রকৃতির লোক, চোখে-মুখে কোনো রকম ভাব প্রকাশ করে না, অবশ্য দরদী লোক বলে মাঝে মাঝে ঠোঁটের কোণে মৃদু হাস্য দেখা যায়—যা ই হোক, যা-ই থাক, আমার মতো ফাজিল-পঞ্চানন নয়। কোটপাতলুন তুর্কী টুপি পরা সেই লোক খনে এদিক খনে ওদিক ধাওয়া করছে, টুপির ফুন্না বা ট্যাসেল চৈতনের মতো খাড়া হয়ে এদিক ওদিক কম্প্রমান—এ দৃশ্যের কল্পনা মাত্রই বাস্তবের বাড়া।

দাদা বললে, "তুই তো হাসছিস। আমার তখন যা অবস্থা। শেষটায় দেখি, মাথাটা তাজ্জিম্ তাজ্জিম্ করতে আরম্ভ করেছে। এত হুটোপুটি সত্ত্বেও ঘিলুতে খানিকটে ধুঁয়ো ঢুকে গিয়েছে নিশ্চয়ই। তারপর মনে হল বেশ কেমন যেন ফুর্তি ফুর্তি লাগছে, কি রকম যেন চিত্তাকাশে উড়ুক্ক উড়ুক্ক ভাব। তারপর দেখি, ম্যানেজারটা আমার দিকে কি রকম বেয়াদবের মতো ফিক্ ফিক্ করে হাসছে। ওর তা হলে হয়েছে। কিংবা আমার। অথবা উভয়ের।

আর এস্থলে থাকা নয়।

টলটলায়মান, পড়পড়ায়মান হয়ে জীপে উঠলুম। সেও এক বিপদ। দেখি দুখানা জীপ। দুটোই ধুঁয়োটে কিন্তু হুবহু একই রকম। কোনটায় উঠি? শেষটায় দেখি আমার পাশে আমারই মতো কে একজন দাঁড়িয়ে। হুবহু আমারই মতো, তার টুপির ফুল্লাটি পর্যন্ত। দুজনাতে দুই জীপে উঠলুম।"

আমি বললুম, 'দু'টো জীপ না কচু!'

দাদা বললে, "বুঝেছি, বুঝেছি, তোকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। শান্ত হয়ে শোন। তারপর গাড়ি যায় কখনো ডাইনে ঢাকা, আর কখনো বাঁয়ে মতিহারী। তবে কি ড্রাইভারটা—? সে তো সর্বক্ষণ আমারই পিছনে ছিল। তারপর দেখি সেই অন্য জীপটাও ঢাকা মতিহারী করছে একদম পাশে পাশে থেকে। ওমা! তারপর দেখি চারটে জীপ। সেও না হয় বুঝলুম। কিন্তু তারপর, মোশয়, সে কী কাণ্ড! চারখানাই উড়তে আরম্ভ করল।"

আমি শুধালুম, "উড়তে!"

"হ্যাঁ, উড়তে। জীপটাই তো ছিল ঠায় দাঁড়িয়ে। ধুঁয়ো খেয়েছিল আমাদের চেয়েও বেশী।

হাওয়ায় উড়তে উড়তে ঘুমিয়ে পড়লুম। এবং শেষ পর্যন্ত বাঙলোয় পৌঁছলুম।

ভাগ্যিস বেশী ধুঁয়ো মগজে যায় নি। আপন পায়েই ঘরে ঢুকলুম।

সামনেই দেখি তোর ভাবী। আমার দিকে একদৃষ্টে তাকালেন। বাপ্স্! তারপর অতি শান্ত কণ্ঠে—কিন্তু কী কাঠিন্য কী দার্ঢ্য সে কণ্ঠে—শুধালেন, 'আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?' আমি কিছু বলি নি।"

দাদা থামলেন।'

আমি আড্ডাকে বললুম, 'আমার ভাবী সাহেবা অতিশয় পুণ্যশীলা রমণী, পাঁচ বেকৎ নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, তসবী টপকান। শমসুল্-উলেমার মেয়ে।'

রক শুধালে, 'ওটার মানে কি চাচা?'

আমি বললুম, 'পণ্ডিত-ভাস্কর। তোদের মহামহোপাধ্যায়ের অপজিট্ নাম্বার।'

রক শুধালে, 'তারপর?'

আমি বললুম, 'তদনন্তর কি হল জানি নে। বৌদি দাদার হাল থেকে কতখানি আমেজ করতে পেরেছিলেন তাও বলতে পারি নে, কারণ ঠিক সেই সময়ে ভাবী সায়েবা তাঁর স্পিশিলাটি চারপর্বতি পরোটা ও দেখতে বজ্রের মতো কঠোর খেতে কুসুমের মতো মোলায়েম শব ডেগ নিয়ে ঢুকলেন। আমরা খেতে পেলুম বটে কিন্তু কাহিনীটি অনাহারে মারা গেল।'

মশাদা বললে, 'বিলকুল্ গুল্।'

আমি পরম পরিতৃপ্তি সহকারে বললুম, 'সাকল্যে। তাই না বলেছিলুম, গাজার গুল। অর্থাৎ গুলের রাজা গুলমুগীর। তোরা আমাকে আজ ঐ টাইটিলটি দিলি না?'

হরিনাথ দে'র স্মরণে

বহু ভাষা শিখতে পারলে বহু সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হয়। তার মারফতে অনেক সভ্যতা, বিস্তর সংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয়—এ সব কথা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি।

উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি, বাঙালী ছেলেকে বাধ্য হয়ে অন্তত তিনটে ভাষা শিখতে হয়—বাঙলা, ইংরিজী এবং সংস্কৃত (কিংবা আরবী অথবা ফার্সী)। হয়ত তাকে হিন্দীও শিখতে হচ্ছে, কিংবা অদূরভবিষ্যতে শিখতে হবে। এ অবস্থায় আমি যদি প্রস্তাব করি, আরো গুটি দুই শিখলে হয় না? তাহলে ছেলেদের হাতে আমার প্রাণ বিপন্ন হবার সমূহ সম্ভাবনা—বাঙলা দেশে না থাকলেও এ খবরটি আমি বিলক্ষণ রাখি। বিশেষতঃ এই পূজোর বাজারে,—মানুষ যখন বলির পাঁঠার সন্ধানে থাকে।

তাই হট্টগোল আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই আমি নিবেদন করছি, এ প্রস্তাবটি শুধু তাদেরই জন্য, যারা বুঝে গিয়েছে যে সংস্কৃতে তারা বিদ্যাসাগর হতে পারবে না, ওটাকে নিতান্ত পরীক্ষা পাসের জন্য যেটুকু সম্মান দিতে হয় তাই দেবে, বাঙলা তো মাতৃভাষা, এবং ইংরিজীর চর্চা ততটুকুই করবে যতটুকু পাশের পর চাকরির জন্য নিতান্তই প্রয়োজন। এই সংজ্ঞা থেকেই সুচতুর পাঠক বুঝে যাবেন যে,

আমি মোটামুটি থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার ছেলেদের কথাই ভাবছি। অর্থাৎ এরা ক্লাসে (সেভেন-এটে) যে রকম পড়ি-মরি হয়ে তিনটে ভাষার পিছনে ছুটতো এখন আর তা করে না। বিশেষতঃ গোটা পাঁচেক ইয়ার্লি আর খান-দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাস করে এরা ভাষা না শিখে কি করে তার পরীক্ষা পাস করতে হয় সে 'বিদ্যায়' বিলক্ষণ রপ্ত হয়ে গিয়েছে।

এতখানি বলার পরও যদি কেউ লেমনেডের বোতল খোঁজে তবে আমার দ্বিতীয় নিবেদন, গোটা দুই ভাষা শিখলে চাকরি জোটার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। হল? এখন তবে আশা করতে পারি, পাঠক বোতলটি আমার মাথায় না ফাটিয়ে সেটার ভিতরকার জিনিস বরফের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে খাওয়াবার চেষ্টা করবেন।

দয়া করে সেটিও করবেন না; কারণ আমি যে প্রস্তাব করতে যাচ্ছি সেটা লটারির টিকিট কাটার চেয়ে মাত্র এক চুল ভালো—এই যা। ইংরিজিতে একেই বলে 'চেজিং দি ওয়াইল্ড গীজ্'—কিন্তু চাকরির বাজারে বাঙালী ছেলের সামনে যখন কোনো 'গুজ'ই নেই তখন আশা করতে পারি সে ঘরের না খেয়ে বনের হাঁস তাড়া করতে আপত্তি করবে না। বুঝিয়ে বলি।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভাষা শেখার কোনো অর্থকরী মূল্য এদেশে ছিল না। স্বরাজ লাভের পর অবস্থাটা বদলেছে। আমরা নানা দেশে আমাদের রাজপ্রতিনিধি, রাজদূত, হাই-কমিশনার, কন্সাল-জেনারেল, কন্সাল, ট্রেড কমিশনার এবং তাঁদের দফ্তরের জন্য কাউনসেলর, প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় সেক্রেটারি, মিলিটারি আতাশে, ট্রেড আতাশে, প্রেস আতাশে, কেরানী, দোভাষী ইত্যাদি পাঠাচ্ছি এবং দিল্লীর পরদেশী দফ্তর বা ফরেন অফিসেও ভাষা জানানে-ওলা লোকের প্রয়োজন হয়। তা ছাড়া বেতার-কেন্দ্র ফরাসী, ইরানী, ফার্সী, কাবুলী-ফার্সী, আরবী, পশতু, সুহেলী, গুর্খালী, বর্মী, ইন্দোনেশী ও চীনা ভাষায়ও প্রোগ্রাম দেন। আমাদের ফৌজী ইস্কুলেও অনেক ভাষা শেখানো হয়।

এই তিনটির প্রতিষ্ঠানে যে গণ্ডায় গণ্ডায় চাকরি খালি পড়েছে তা নয়, তবু আমার ব্যক্তিগত ধারণা উপযুক্ত ভাষাজ্ঞান থাকলে যোগ্য লোককে এ তিনটি প্রতিষ্ঠান খাতির করবে। আর পূর্বেই নিবেদন করেছি, আমার এ প্রস্তাব তাদেরই জন্য, যারা চাকরির বাজারে একটুখানি রিস্ক্, রতিভর ঝুঁকি নিতে রাজী আছে।

আমি যে খবরটি দিলুম সেটি কিছুমাত্র নূতন নয়। কারণ প্রায়ই বেকার

ছেলেরা এসে আমাকে অনুরোধ জানায় তাদের ফ্রেঞ্চ জর্মন শিখিয়ে দিতে। (এখানেই লক্ষ্য করে রাখুন 'ফ্রেঞ্চ-জর্মনই' বলে, অন্য কোনো ভাষার নাম তোলে না।) আমার সময়ের অভাব, দ্বিতীয়তঃ আমি বাঙলাটাই ভালো করে জানি নে—কাজেই ফরাসী-জর্মনের কথাই ওঠে না, তাই তাদের কিঞ্চিৎ সদুপদেশ দিয়ে বিদেয় দি।

এদের প্রশ্ন করে দেখলুম, এরা জানে না (ক) কোন্ ভাষার চাহিদা বাজারে কতখানি, (খ) কোন্ ভাষা শক্ত আর কোন্‌টা নরম, (গ) ভাষা শিখতে হয় কি করে এবং আরো অনেক কিছুই জানে না।

আমি দোষ দিচ্ছি নে। জানবার সুযোগ দিলে তো তারা জানবে। আর যদি জানতই তবে আজ আমি এ বিষয়ে লিখতে যাবো কেন ?

আমাকে এক উত্তম ব্যবসায়ী বলেছিল, 'জিনিস বেচা সোজা, কেনা শক্ত।' আমি তো তাজ্জব। বলে কি ? তখন বুঝিয়ে বললে, 'বাজারে ঠিক যে জিনিসের চাহিদা তাই দিয়ে যদি আমি আমার দোকান সাজিয়ে রাখি তবে সন্ধ্যে হতে-না-হতেই দোকান সাফ হয়ে যাবে। তাই বললুম, বেচা সহজ। কিন্তু আড়তদারদের কাছ থেকে যদি বে-আক্কেলের মতো বে-চাহিদার মাল কিনি তবে সেগুলো দোকানে পচবে, দোকান উঠে যাওয়ার পরও। তাই বললুম, 'কেনা শক্ত।'

এস্থলেও সেই নীতি প্রযোজ্য। অর্থাৎ প্রথম দেখতে হবে, আপনি কি মাল কিনবেন, অর্থাৎ কোন্ ভাষা শিখবেন।

সবাই বলে 'ফ্রেঞ্চ জর্মন'। এ যেন কথার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফ্রেঞ্চ ভুবন-বিখ্যাত ভাষা। এককালে ফ্রেঞ্চ না জেনে কূটনীতি মহলে যাওয়া বিনা পৈতেয় ব্রাহ্মণভোজে যাওয়ার মতো ছিল। এখনো পৃথিবীর যে কোনো দেশের পাসপোর্টে দেখতে পাবেন দুটি ভাষাতে সব কিছু ছাপা, প্রথমটি তার আপন ভাষা এবং দ্বিতীয়টি ফরাসী। কিন্তু এসব হচ্ছে উনবিংশ শতকের কথা। আপনি যদি সেই শতকের চাহিদা মেটাতে চান, তবে মেটান। আপনি যদি একশ' বছরের পুরনো বিজ্ঞাপন-মাফিক চাকরির জন্য দরখাস্ত করতে চান তো করুন।

তাই প্রথম দেখতে হবে :—এখন, এই মুহূর্তে চাহিদা কি এবং চাহিদার গতিটা কোন্ দিকে, অর্থাৎ আপনি ভাষাটাষা শিখে দু'তিন বছরে যখন বাজারে নামবেন তখন চাহিদাটা কি হবে ?

ভাষার প্রাধান্য তার লোকসংখ্যা থেকে বিচার করা ভুল। দৃষ্টান্তস্বরূপ চীনা

ভাষা নিন। ইংরিজী, রাশান, চীনা এ তিন ভাষায় কথা বলে পৃথিবীর সব চেয়ে বেশী লোক এ কথা সত্য, কিন্তু চীনা ভাষায় লোকসংখ্যা যত বেশীই হোক না কেন তারা সবাই মাত্র একটি রাষ্ট্রের অধিবাসী। কাজেই ঐ রাষ্ট্রে আমাদের থাকবে মাত্র একটি এম্বেসি। পক্ষান্তরে জর্মন ভাষার অবস্থা বিবেচনা করুন। জর্মন বলা হয় জর্মন রাষ্ট্রে (উপস্থিত সেটিও আবার দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত), অস্ট্রিয়া রাষ্ট্রে এবং সুইটজারল্যাণ্ডে। এই তিন দেশে আমাদের তিনটি রাজদূতাবাস আছে। তা ছাড়া জর্মন বলা হয়, উত্তর ইটালির টিরোল, ফ্রান্সের আলসেস-লরেন ও বেলজিয়ামের অয়পেন অঞ্চলে। এসব অঞ্চলে যদি কখনো রাজনৈতিক গোলমাল আরম্ভ হয় এবং আপনাকে তার রিপোর্ট লিখতে সেখানে যেতে হয় তবে জর্মন ছাড়া এক প ও এগুতে পারবেন না। এবং সর্বশেষ কথা : জর্মনী, অস্ট্রিয়া, সুইটজারল্যাণ্ড বেচে তৈরী মাল, ভারত বিক্রি করে কাঁচা মাল। এসব দেশের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা দ্রুতগতিতে বাড়তেই থাকবে ; বিস্তর কনসুলেট ও ট্রেডকমিশন ক্রমে ক্রমে ওসব জায়গায় আমাদের খুলতে হবে।[১] কিন্তু চীন ও ভারত সমগোত্রীয়, দুজনেই বেচে কাঁচা মাল, অতএব 'বৈবাহিক' বৈষয়িক কাজ আমাদের চলে না।

আমরা যে স্বার্থ নিয়ে এ আলোচনা করছি তার দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতে গেলে রাষ্ট্রীয় শক্তি ও ভাষার গুরুত্ব বিচার অবান্তর। সোভিয়েট রাশা বিরাট রাষ্ট্র কিন্তু ঐ দেশে আছে এবং বহুকাল ধরে থাকবে আমাদের একটি মাত্র রাজদূতাবাস। রাশা আবার মারাত্মক রকমের কেন্দ্রপ্রাণ রাষ্ট্র—মস্কোর নাম বদলে তাকে 'সেণ্টার' নাম দেবার প্রস্তাব ঐ কারণেই একবার হয়েছিল—তাই তার উপরাষ্ট্র যথা, তুর্কোমানিস্থান উজবেকিস্থানে যে আমাদের রাজদূত আস্তানা গাড়বেন তার আশু সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি নে। অবশ্য উত্তম সাহিত্যরস আস্বাদনের জন্য রাশানের মতো ভাষা পৃথিবীতে বিরল।

পক্ষান্তরে রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে আরবরা আজ পৃথিবীতে উঁচু আসনে বসে না। তার প্রধান কারণ, তারা নানা রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এবং ঠিক ঐ কারণেই আমাদের দৃষ্টিবিন্দু থেকে তাদের প্রাধান্য বেড়ে গেল। উপস্থিত আরব জাতি এই ক'টি রাষ্ট্রে বিভক্ত :—ইরাক, সিরিয়া (শাম), লেবানন, হাদ্রামুৎ

১ এখানে এম্বেসি, হাই কমিশন, লিগেশন ইত্যাদির পার্থক্য সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলে দেওয়া ভালো। এই তিনটিই রাজনৈতিক যোগাযোগ এবং কূটনৈতিক কাজকর্ম চালায়। এম্বেসি এবং হাই-কমিশন পদমর্যাদায়

ট্রানস্‌জর্ডন, সউদী আরব, ইয়েমেন, মিশর, সুদান, টুনিসিয়া, আলজিরিয়া, মরক্কো, লিবিয়া। তা ছাড়া কুয়েৎ বাহরেইন, ওমান ইত্যাদি। এদের সব কটি স্বাধীন নয়, কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদে আমরা যেদিন অ্যাংলো-আমেরিকান আড়কাটির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আড়তদারের কাছ থেকে সোজা পেট্রল কেনবার দুই নম্বরের 'স্বরাজ' পাব সেদিন আরবের আনাচে-কানাচেও আমাদের কনসুলেট বসাতে হবে। উপস্থিত, আমার যতদূর জানা, মিশর, সউদী আরব, ইরাকে আমাদের রাজদূতাবাস আছে। এদের সংখ্যা বাড়বে বই কমবে না।

কিন্তু রাষ্ট্রগুলোর এসব 'মেল' খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেলাতে গেলে আমরা পুজোর বাজার পেরিয়ে শ্যামা পুজোয় পৌঁছে যাব। তাই সংক্ষেপে বলি, আমার মনে হয়, আমাদের স্বার্থের জন্য উপস্থিত স্প্যানিশ-ই সব চেয়ে প্রয়োজনীয়। আপনি বলবেন, ঐটুকু দেশ স্পেন—তার ঐ 'ভাঙা নৌকায়' আমাদের কতখানি 'সোনার ধান' ধরবে!

আমি স্পেনের কথা আদপেই ভাবছি না। আমি ভাবছি দক্ষিণ আমেরিকার কথা। সেখানে ডজনখানেক সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র। তাদের ভাষা স্প্যানিশ—হিস্পানী। ওদের গুটিকয়েকে আমাদের রাজদূতরা বেশ কিছুকাল হল ডেরা গেড়ে বসেছেন। আমার বিশ্বাস সব কটাতে না হোক, বাকী অনেকগুলোতেই ক্রমে ক্রমে আমাদের রাজদূতাবাস বসবে। অতএব আমার সলা যদি নেন তবে স্প্যানিশ শিখুন।

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে অধমের জ্ঞান অতিশয় অপ্রচুর। তবু বলবো, ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমে ক্রমে এদেরই সঙ্গে আমাদের বাড়বে। সংক্ষেপে তার কারণটা বলি,—আমেরিকা, ইয়োরোপ এবং বাশা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, বলতে গেলে

একই—বৃটিশ ক্রাউনের আওতায় থাকলে এম্বেসির নাম হাই-কমিশন—লিগেশন পদমর্যাদায় ছোট। কনসুলেটের কাজ ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজন মতো একাধিক কনসুলেট থাকতে পারে—কিন্তু একাধিক এম্বেসি হয় না,—এবং সে স্থলে কনসুলেট-জেনারেলও থাকে। ট্রেড কমিশন কনসুলেটের চেয়ে জাতে ছোট—অনেকটা এক্সপেরিমেন্টাল পোস্ট-অফিসের মতো। ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়লে তার পদবৃদ্ধি হয়। কোনো কোনো দেশে আমাদের কনসুলেট না থাকলে, সেখানকার এম্বেসি-হাই-কমিশন-লিগেশন ঐ কাজও করে থাকে। এই সব তাবৎ প্রতিষ্ঠান আমাদের ফরেন অফিসের তাঁবেতে থাকে।

তাদের সম্পূর্ণ অর্থনীতি যুদ্ধ-প্রস্তুতির চতুর্দিকে এমনি কেন্দ্রীভূত করেছে যে তারা কিনতে চায় যুদ্ধের জন্য তাদের যে সব মালের দরকার এবং বেচতে চায় যুদ্ধের জন্য যার প্রয়োজন নেই। আর যুদ্ধ যদি লেগে যায় তবে আপনার অর্ডারগুলো তারা শিকেয় তুলে রাখবে, আপনার কাঁচা মাল বন্দরে বন্দরে পচবে। দক্ষিণ আমেরিকা এসব আওতার বাইরে। ওদের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়েই যাবে—আমাদের তৃতীয় 'স্বরাজ' লাভের পর। দশটা রাজদূতাবাস যদি তিনশটা চাকরি দিতে পারে তবে ব্যবসা-বাণিজ্য দেবে তিন হাজার কিংবা ত্রিশ হাজার। আর চাকরি ছেড়ে দিয়ে যদি ভাষার জোরে ব্যবসা চালান তবে তো আর কথাই নেই।

এস্থলে আরেকটি তত্ত্ব এবং তথ্যপূর্ণ ইঙ্গিত দি। ভাষা শেখার সময় গোড়ার দিকে সমগোত্রের ভাষা শিখে তাড়াতাড়ি ভাষার সংখ্যা বাড়িয়ে নেবেন। উদাহরণ-স্থলে বলি আপনি বাঙালী, আজ যদি আপনাকে নিছক ভাষার সংখ্যাই দেখাতে হয় তবে আপনার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে অসমীয়া এবং উড়িয়া নিয়ে। এ দুটি ভাষা বাঙলার এত কাছাকাছি যে আপনাকে বেগ পেতে হবে অতি কম। তারপর শিখবেন, হিন্দী, গুজরাটী মারাঠী, গুরুমুখী। ঠিক ঐ রকমই পর্তুগীজ ইটালিয়ান ও ফ্রেঞ্চ ভাষা স্পেনিশ ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আপনার বাঙলা জানা থাকলে অসমীয়া শিখতে কত দিন লাগার কথা? না হয় তারই ডবল ধরুন স্পেনিশ শেখা হয়ে গেলে পর্তুগীজ, কিংবা ফরাসিস্ শিখতে। ঠিক সেই রকম জর্মন ফ্লেমিশ এবং ডাচ পড়ে অন্য গোত্রে। একদা ব্রাসেল্স্ শহরে আমি একখানা ফ্লেমিশ খবরের কাগজ কিনে পড়ে দেখি মোটামুটি বক্তব্যটা ধরে ফেলতে পেরেছি—অল্পস্বল্প যা জর্মন জানি তার-ই কৃপায়। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আপনি অসমীয়া শিশুশিক্ষা কখনো পড়েন নি। একখানা অসমীয়া বই নিন। দেখবেন বারো আনা পরিমাণ অনায়াসে বুঝতে পারছেন। কিংবা বেতারে যখন 'অসমীয়া বাতরি' শোনেন তখন কি তার মোটামুটি অর্থ ধরতে পারেন না?

তাই এই অনুচ্ছেদের গোড়াতে ভাষার সংখ্যাবৃদ্ধির যে কথা তুলেছিলুম সেটাতে ফিরে যাই। অর্থাৎ গুরুর সাহায্যে যদি বিদ্যায়তনে আপনি স্পেনিশ আরম্ভ করেন তবে মাস দুই যেতে-না-যেতেই বাড়িতে, কারো সাহায্য ছাড়া পর্তুগীজ কিংবা ফরাসী আরম্ভ করে দেবেন। ব্যাকরণখানার দু-দশপাতা ওলটাতে-পালটাতেই দেখবেন একসঙ্গে দুটো ভাষা আয়ত্ত করা কিছুমাত্র কঠিন কর্ম নয়। গোড়ার দিকে কিছুটা গুবলেট হয়ে যাবে সন্দ নেই। কিন্তু কিছুদিন পরে যদি সেটা কাটিয়ে না উঠতে পারেন তবে বুঝবেন ঐদিকে ভগবান আপনার

প্রতি সদয় নন, তখন না হয় লেগে যাবেন মানুষ মারার ব্যবসাতে—যাকে অজ্ঞজন বলে ডাক্তারি, কিংবা রেলকলিশনের পরিপাটি ব্যবস্থা করাতে—যাকে অজ্ঞজন নাম দিয়েছে ইঞ্জিনিয়ারি। কিন্তু নিবেদন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ম্যাট্রিক বড় কঠিন পরীক্ষা। আপনি যদি সেটা পাস করে থাকতে পারেন তবে গোটাতিনেক ভাষা শিখতে পারবেন না কেন?

গোত্রবিচারে ফিরে যাই।

১। লাতিন গোত্র—স্পেনিশ, ফরাসিস্, পর্তুগীজ, ইটালিয়ান।

২। জর্মন গোত্র—জর্মন, ডাচ, ফ্লেমিশ।

৩। স্কাণ্ডিনেভিয়ান গোত্র—নরউইজিয়েন, সুইডিশ।

৪। তুর্কী গোত্র—তুর্কী (ওসমানলি তুর্কী, অর্থাৎ টার্কির ভাষা,—তুর্কমানিস্থানের ভাষা, জগতাই তুর্কী। প্রথমটা মুস্তফা কামালের মাতৃভাষা, দ্বিতীয়টা বাবুর বাদশার)—হাঙ্গেরিয়ান ও ফিনিশ কিন্তু এক হলেও শাখাতে বর্ণ-বৈষম্য প্রচুর।

৫। রাশান গোত্র—রাশান, পলিশ, ল্যাটাভিয়ান, স্লোভাক ইত্যাদি।

৬। ইরানী গোত্র—ইরানী ফার্সী ও কাবুলী ফার্সী—পার্থক্য সামান্য।

৭। আরবী গোত্র—আরবী, হীব্রু, ইডিশ (অধুনা প্যালেস্টাইনে প্রচলিত প্রাচীন হীব্রুর অর্বাচীন রাষ্ট্রভাষা), আহ্‌মেরিক (আবিসিনিয়ান ভাষা)।

৮। চীনা গোত্র—চীনা, জাপানী, কোরিয়ান ইত্যাদি।

৯। এছাড়া টিবেটো-বর্মন গোত্রের বর্মী ইত্যাদি। মালয়, থাই, ইণ্ডোনেশিয়ন ইত্যাদি।

অজানাতে এবং জানাতে ও ছোট এবং বড় কোনো কোনো ভাষা বাদ পড়ে গেল। তাই নিয়ে শোক করবেন না। উপস্থিত এগুলো শিখে নিন। তা হলে অন্যগুলোর খবর আপনার থেকেই জানা হয়ে যাবে।

এর ভিতর সহজ ১ এবং ৬নং গোত্রের ভাষা, তার চেয়ে কঠিন ২ এবং ৩নং গোত্রের ভাষা, তার চেয়ে কঠিন ৫ নম্বরের গোত্র, তার চেয়েও কঠিন ৭নং, পারতপক্ষে ৮ নম্বরের পাড়া মাড়াবেন না (অবশ্য জাপানী তেমন শক্ত নয়), ৪ আর ৯ নম্বরের খবর জানি নে, তবে খুব শক্ত হওয়ার কথা নয়।

দুই গোত্রের দুটো ভাষা একসঙ্গে শেখা যে খুব কঠিন তা নয়, তবে তার জন্য সৎপ্রতিষ্ঠান ও সৎগুরু প্রয়োজন। এই দুইটির বড়ই অভাব—এই দুঃসংবাদটি যতক্ষণ পারি চেপে গিয়েছিলুম; আর পারা গেল না। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে

এই সুসমাচারটিও বিতরণ করছি যে ভারতবর্ষের কোথাও এমন সুব্যবস্থা নেই যে তার পাল্লায় পড়ে আপনি হেরে যাবেন। এই যে আমাদের রাজধানী দিল্লী শহর, যেখানকার লোক কেন্দ্রের নোকরি বাবদে হামেহাল তেজ-নজর ওকীবহাল সেখানে যে দু'একটি প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলো অতিশয় রদ্দী অথচ টাকা লুটছে এস্তের। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, কলকাতায় নাকি গোটাদুত্তিন প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে বিদেশী ভাষা শেখানো হয়। খোঁজ করলে দেখবেন, খুড়ো-জ্যেঠার আমল থেকে বাড়িতে দু'চারখানা মার্লবর পড়ে আছে, কিন্তু ইংরিজী ছাড়া কোনো বিদেশী ভাষা কেউ শেখেন নি। আমিও ভূ-ভারতে এমন প্রাণীর সংস্পর্শে আসি নি যিনি ঐসব প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে কলকাতাতে বসে কোনো বিদেশী ভাষা শিখেছেন। তবে ইদানীং অবস্থা একটু ভালো হয়েছে।

অধমের শেষ সাবধান বাণী: সব কটা আণ্ডা একই ঝুড়িতে রাখবেন না—কুল্যে শিনি একই দরগায় উজোড় করে দেবেন না। তার সরল অর্থ বি-এ, এম-এ পাস অবহেলা করে হঠাৎ তেরিয়া হয়ে বিদেশী ভাষার পশ্চাদ্ধাবন করবেন না। এসব পড়াশুনো বি-এ, এম-এ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চালাবেন—আড্ডাটা সিকিটাক কমিয়ে দিয়ে ফুটবল দেখাটা একটু মুলতুবি রেখে দিয়ে। একদম ছেড়ে দিতে বলবো কেন, তওবা, তওবা, তাহলে আপনার বাঙালীত্বই যে উপে যাবে। ভাষা শিখে পরীক্ষা দিয়ে যদি সেদিকে নোকরি না জোটে তবে বি-এ, এম-এ পাস করে যা করতেন তাই করবেন। তা হলে অন্তত আমার গলায় গামছার ফাঁস লাগিয়ে বলতে পারবেন না, 'তবে রে—, তোর কথায় না—ইত্যাদি।'

অনুকরণ না হনুকরণ?

আগে-ভাগেই বলে রাখছি, এ-লেখা সমালোচনা নয়।

সমালোচনা লেখবার মতো শক্তি—দুষ্টলোকে বলে, শক্তির অভাব—আমার এবং আমার মতো অধিকাংশ লোকের নেই। গল্পছলে নিবেদন করি:—

প্রতি রববারে এক বঁড়শে সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি মাছ ধরে। বড় মাছের শিকারী, তাই ফাতনা ডোবে কালেকস্মিনে, আকছার রববারই যায় বিন্-শিকারে। তারই একটু দূরে আরেকটা লোক প্রতি রববারে এসে বসে, এবং তামাম দিনটা কাটায় গভীর মনোযোগের সঙ্গে ওর মাছধরা দেখে দেখে। দু'জনায় আলাপ-পরিচয় নেই। মাস তিনেক পর শিকারী লোকটার 'আলসেমি' দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার পর একটু বিরক্তির সুরে শুধালে, 'ওহে, তুমি

তাহলে নিজেই মাছ ধরো না কেন ?'

লোকটা আঁৎকে উঠে বললে, 'বাপস ! অত ধৈর্য আমার নেই।'

সমালোচনা লেখার ধৈর্য আমার নেই !

আর কি-ই বা হবে সমালোচনা লিখে ? কটা সুস্থ লোক সমালোচনা পড়ে ? কটা বুদ্ধিমান মাছ টোপ গেলে ? আলগোছে তফাতে থেকে সমালোচক প্রবন্ধে একটু-আধটু ঠোক্কর দেয় অনেককেই—অর্থাৎ রোক্কা পয়সা ঢেলে মাসিকটা যখন নিতান্তই কিনেছে তখন পয়সার দাম তোলবার জন্য একটু-আধটু খোঁচাখুঁচি করে। ফলে, চারের রস যত না পেল বড়শির খোঁচাতে তার চেয়ে বেশী জখম হয়ে "দুত্তোর ছাই" বলে তাস-পাশাতে ফিরে যায়।

সমালোচকরা ভাবেন, পাঠকসাধারণ বোকার পাল। ওরা তাঁদের মুখে ঝাল চেখে বই কেনে। তা হলে আর দেখতে হত না। মারোয়াড়ীরা সস্তায় রাবিশ পাণ্ডুলিপি কিনে পয়সা দিয়ে উৎকৃষ্ট সমালোচনা লিখিয়ে রাবিশগুলো খুচকারী (অর্থাৎ খুচরোর লাভে, পাইকারীর পরিমাণে) দরে বিক্রি করে ভুঁড়ি বাড়িয়ে নিতো—ফাও হিসেবে দেশে নামও হয়ে যেত, 'সৎসাহিত্য' তথা 'সমালোচকদে'র পৃষ্ঠপোষকরূপে।

আমার কথা যদি চট করে বিশ্বাস না করতে পারেন তবে চিন্তা করে দেখুন, আপ্তবাক্য নিবেদন করছি, 'পয়সা দিয়ে সমালোচনা লেখানো যায়, পয়সা দিয়ে কবিতা লেখানো যায় না।' না হলে আমেরিকায় ভালো কবির অভাব হত না। সমালোচকের অভাব সেখানে নেই এবং বর্ণে গন্ধে তাঁরা অস্মদ্দেশীয় সমালোচক-দেরই মতো।

পলিটিশিয়ানরাও ভাবেন প্রোপাগাণ্ডিস্ট (অর্থাৎ সমালোচক)-দের দিয়ে নিজ পার্টির প্রশংসা কীর্তন করিয়ে নিয়ে বাজিমাৎ করবেন। কিন্তু ভোটার—ভোটার যা পাঠকও তা—আহাম্মুখ নয়, যদিও সরল বলে সত্য বুঝতে তার একটু সময় লাগে। না হলে আওয়ামীরা মুসলিম লীগকে কস্মিনকালেও হটাতে পারতো না।

আমিও মাঝে-মধ্যে সমালোচনা পড়ি, কারণ আমিও আর পাঁচজন পাঠকের মতো পয়সা ঢেলেই কাগজ কিনি। তবে আমার পড়ার ধরন স্পানিয়ার্ডদের রুটি খাওয়ার মতো। শুনেছি, স্পানিয়ার্ডরা বছরের পয়লা দিন গির্জায় উপাসনা সেরে এসে এক টুকরো রুটি চিবোয়—কারণ প্রভু যীশুখৃষ্ট তাঁর প্রার্থনায় বলেছেন, 'আর আমাদের অদ্যকার রুটি দাও।' খানিকটে চিবিয়ে থু থু করে ফেলে দিয়ে বলে, 'তওবা, তওবা, সেই গেল বছরের রুটিরই মতো যাচ্ছেতাই সোয়াদ।'

তারপর বছরের আর ৩৬৪ দিন সে খায় কোর্মা-কালিয়া কটলেট মমলেট। আমিও সমালোচনার শুকনো রুটি বছরের মধ্যে চিবুই মাত্র একটি দিন এবং প্রতিবারই হৃদয়ঙ্গম হয়, সমালোচনার স্বাদ-গন্ধ সেই গেল বছরের মতো—এক বছরে কিছুমাত্র উন্নতি করতে পারে নি।

কথাটা যে ভাবে বর্ণনা করলুম, তাতে পাঠকের ধারণা হওয়া বিচিত্র নয় যে, এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। কিন্তু মোটেই তা নয়। অভিজ্ঞতাটা পাঠক-সাধারণ মাত্রেরই নিদারুণ নিজস্ব। অবশ্য সমালোচকদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা একে অন্যের সমালোচনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়ে থাকেন। কেন পড়েন? জ্ঞান সঞ্চয়েব জন্য? রাম রাম! শুধুমাত্র দেখবার জন্যে কে তার মতে সায় দিয়েছে, কে দেয় নি এবং সেই অনুযায়ী দল পাকানো, ঘোট বাড়ানো, শক্তি সঞ্চয় করে রুটিটা আণ্ডাটা—থাক্।

অবশ্য সমালোচকদের সমালোচনা করার কুবুদ্ধি যদি আমার কখনো হয়—এতক্ষণ যা করলুম সেটা তারই সেতার বাঁধা মাত্র—তা হলে সেটা আপনাদেরই পাতে নিবেদন করবো। তবে ধর্মবুদ্ধি তখনো আপনাদের সাবধান করে দেবে, ও-লেখাটা না পড়তে।

* *

মূল বক্তব্যে আসি। ইদানীং আমি বাঙলার বিভিন্ন জায়গা থেকে, এবং বাঙলার বাইরে থেকেও কয়েকখানা চিঠি পেয়েছি। এঁরা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন, 'কি প্রকারে ভালো লেখক হওয়া যায়?'

প্রথমটায় উল্লসিত হয়েছিলুম। যাক, বাঁচা গেল। বাঙলা দেশ তা হলে স্বীকার করেছে, আমি ভালো লেখক। এবারে তা হলে কলকাতা-দিল্লীতে গিয়ে কিঞ্চিৎ তদ্বির করলেই, দু'চারটে প্রাইজ পেয়ে যাব, লোকসভাব সদস্যগিরি, কলচেরল ডেলিগেশনের মেম্বরী এ-সবও বাদ যাবে না। বিদেশ যাবার সুযোগও হয়ে যাবে—বিলেত দেখার আমার ভারী শখ, অর্থাভাবে এতদিন হয়ে ওঠে নি। ইংরিজীটা জানি নে, এতদিন এই একটা ভয় মনে মনে ছিল। এখন বুলগানিন, চু-এন-লেইয়ের কল্যাণে সেটাও গেছে। এঁরা ইংরিজী না জেনে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু হায়, এত সুখ সইবে কেন? আমার গৃহিণী নিরক্ষরা—টিপসই করে লে আদালতে তালাকের দরখাস্ত করেছেন। তালাকটা মঞ্জুর না হওয়া পর্যন্ত আমার সঙ্গেই আছেন। তাঁর কাছে চিঠিগুলো পড়ে নিজের মূল্য বাড়াতে গিয়েছিলুম। তিনি করলেন উল্টো অর্থ। সেটা আরো সরল। ব্যবসাতে যে দেউলে

হয়েছে, তারই কাছে আসে লোক সলার সন্ধানে ; ফেল-করা ছেলে পাস-করার চেয়ে ভালো প্রাইভেট ট্যুটর হয়।

এর উত্তর আমি দেব কি ? গৃহিণী যে কটা গল্প জানেন সব কটাই আমার সঙ্গে টায়-টায় মিলে যায়। মনে হয় আমার পূজ্যপাদ শ্বশুর-শাশুড়ী ছেলেবেলা থেকে তাঁকে এই তালিমটুকুই শুধু দিয়েছেন, স্বামীর গোদা পায়ের গোদটি কি প্রকারে বারে বারে দেখিয়ে দিতে হয়। অবশ্য তার জন্য যে বিশেষ তালিমের প্রয়োজন হয় সেটা অস্বীকার করলেও চলে। ওটা তাদের বিধিদত্ত জন্মলব্ধ অশিক্ষিত পটুত্ব। যে-সব সমালোচকদের কথা পূর্বে নিবেদন করেছি, তাদের বেলাও এই নীতি প্রযোজ্য।

ব্রাহ্মণীর আপ্তবাক্য আমি মেনে নিয়েছি। তিনি তালাকের দরখাস্তটি উইথড্র করেছেন—শুনে দুঃখিত হবেন।

* *

শঙ্করাচার্য দর্শনরণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়ে বলেছিলেন, 'সাংখ্যমল্লকে আহ্বান করো। সেই মল্লদের অধিপতি। তাকে পরাজিত করলে অন্যান্য সফরী-প্রোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধ করে অযথা কালক্ষয় করতে হবে না।' আমি শঙ্কর নই। তাই সব চেয়ে সরল প্রশ্নটির উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

প্রশ্নটি এই : 'মপাসার ছোট গল্প অপার আনন্দ দেয়, কিন্তু তাঁর অনুকরণ-কারীদের গল্প এত বিস্বাদ কেন ? অপিচ, মপাসা ছোট গল্প লেখার যে কাঠামো তৈরি করে দিয়ে গিয়েছেন তার অনুকরণ না করে গল্প লিখিই বা কি প্রকারে ?'

যাঁরা সঙ্গীত আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেছেন তাঁরাই জানেন, ওস্তাদ যে-ভাবে গান গান তারই হুবহু অনুকরণ করতে হয় ঝাড়া দশটি বছর ধরে। ভারতনৃত্য শিখতে গেলে মীনাক্ষীসুন্দরম্ পিল্লের নৃত্য অনুকরণ করতে হত ততোধিক কাল। ব্যাকরার শাগরেদকে কত বছর ধরে একটানা গুরুর অনুকরণ করে যেতে হয়, তার ঠিক ঠিক খবর আমার জানা নেই। ভারতবর্ষে এই ছিল রেওয়াজ।

সাহেবরা এ দেশে এসে বললে, 'এত বেশী অনুকরণ করলে নিজস্ব সৃজন-শক্তি (অরিজিনালিটি) চাপা পড়ে যায়। ফলে কোনো কলার আর উন্নতি হয় না।' কথাটা হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এর মধ্যে অনেকখানি সত্য লুকনো আছে।

কিন্তু তার বাড়াবাড়িতে কি হয়, সেটাও তো নিত্য নিত্য স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। গুণীজনের উচ্চাঙ্গ সৃষ্ট অধ্যয়ন না করেই, আরম্ভ হয়ে যায় 'এপিক' লেখা, দু'কদম চলতে না শিখেই ডান্স্ 'কম্পোজ' করা, আরো কত কী, এবং

সর্বকর্মে নামঞ্জুর হলে সমালোচক হওয়ার পন্থা তো সব সময়েই খোলা আছে। সেই যে পুরনো গল্প—শহর-পাগলা ভাবতো, সে বিধবা মহারানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী। পাগলা সেরে গেছে এই রিপোর্ট পাওয়ার পর পাগলা-গারদের বড় ডাক্তার তাকে ডেকে পাঠিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে শুধালেন, 'তা তুমি খালাস হওয়ার পর করবে কি?' সুস্থ লোকের মতো বললে, 'মামার বড় ব্যবসা আছে, সেখানে ঢুকে যাবো।' 'সেটা যদি না হয়?' চিন্তা করে বললে, 'তা হলে আমার বি-এ ডিগ্রী তো রয়েছেই—টুইশনি নেব।' তারপরে এক গাল হেসে বললে, 'অত ভাবছেন কেন, ডাক্তার? কিছু না হলে যে কোনো সময়ই তো আবার মহারানীর স্বামী হয়ে যেতে পারবো।' সমালোচক সব সময়ই হওয়া যায়।

তৃতীয় দল অন্য পন্থা নিলে। ওস্তাদদের হুবহু নকল তারা করলে না—তাতে বয়নাক্কা বিস্তর। আবার বিন্-তালিমের 'অরিজিনালিটি' পাঠকসাধারণ পছন্দ করে না। উপায় কি? তাই তারা ওস্তাদদের কতকগুলো বাছাই বাছাই জিনিস অনুকরণ করলে এবং শুধু অনুকরণই না, বাছাই বাছাই জিনিসগুলোর মাত্রা দিলে বাড়িয়ে।

চার্লি চ্যাপলিন একবার নাম ভাঁড়িয়ে গোপনবাসের জন্য গেছেন চিলির এক অজানা শহরে। বেড়াতে বেড়াতে দেখেন, দেয়ালের গায়ে বিজ্ঞাপন 'সোমবার রাত্রে শহরের কনসার্ট ঘরে চার্লি চ্যাপলিনের নকল করার প্রতিযোগিতা হবে। ভ্যাগাবণ্ড চার্লির বেশভূষা পরিধান করে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে স্টেজের ইস্‌পাস্ উস্‌পার হতে হবে চার্লি ধরনে। সর্বোৎকৃষ্ট অনুকরণের পুরস্কার পাঁচশ টাকা।'

চার্লি ভাবলেন, এখানে তো কেউ তাঁকে চেনে না, দেখাই যাক না, প্রতিযোগিতায় ছদ্মনামে কি হয়।

ছাব্বিশ জন প্রতিযোগীর ভিতর চার্লি হলেন তেরো নম্বর!

তার সরল অর্থ, ঐ ছোট শহর. ধেড়ধেড়ে ডিহি গোষ্ঠীপুরে বারো জন ওস্তাদ রয়েছেন যাঁরা চার্লিকে হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলেন চার্লির পার্ট কি করে প্লে করতে হয়!

চার্লি শিরে করাঘাত করে বলেছিলেন, 'হে ভগবান, আমার অভিনয় যদি এই বারো জনের মতো হয় তবে আমি আত্মহত্যা করে মরবো।'

ব্যাপারটা হয়েছে, চার্লি যেখানে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা দিয়ে হৃদয়ের গভীর অনুভূতি প্রকাশ করেন এরা সেটাকে দশগুণ বাড়িয়ে দিয়ে মস্করাতে পরিণত করেছেন,

চার্লি যেখানে চোখের জলের রেশ মাত্র দেখিয়েছেন এঁরা সেখানে হাউমাউ করে আসমান-জমীন ফাটিয়ে আড়াই ঘটি চোখের জল ফেলেছেন, চারুকলার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে চার্লি যেখানে অখণ্ড সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রশান্ত শিব সৃষ্টি করেছেন সেখানে তাঁরা প্রত্যেক অঙ্গে ফাইলেরিয়ার গোদ জুড়ে বানিয়ে তুলেছেন এক একটি বিকট মর্কট।

ঘরোয়া উপমা দিতে হলে বলি, ভেজাল সরষের তেলেরই বড় বেশী সোনালী ঝাঁঝ—মারাত্মক তুখোড়।

রবীন্দ্রনাথের 'দোদুল-দোলা', 'ব্যাকুল বেণু', 'উদাস হিয়াকে', 'দোলাতর', 'বেণুতর' করে নিত্য নিত্য কত না নব নব মস্করা হচ্ছে। কিন্তু তবু চার্লি বেঁচে গেছেন। কারণ আর যা-ই হোক মার্কিন মুল্লুক পরশু দিনের গড়া নবীন দেশ। ভেজালে এদের অভিজ্ঞতা আর কতটুকু? প্রাচীন চীনের কাহিনী শ্রবণ করুন।

একদা চীন দেশে এক গুণীজ্ঞানী, চরিত্রবলে অতুলনীয় বৌদ্ধ শ্রমণের আবির্ভাব হয়। যেমন তাঁর মধুর সরল শিশুর মতো চলাফেরা-জীবনধারা, তেমনি তাঁর অদ্ভুত বচনবিন্যাস। বুদ্ধের কীর্তিকাহিনী তিনি কখনো বলতেন বলদৃপ্ত কণ্ঠে, কখনো সজল করুণ নয়নে—তথাগতেরই মতন তখন তাঁর সৌম্যবদন দেখে, আর উৎসাহের বচন শুনে বহু শত নরনারী একই দিনে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতো। ক্রমে ক্রমে তাঁর মাতৃভূমির সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের জয়ধ্বনি বেজে উঠলো, বুদ্ধের জীবনাদর্শ বহু পাপীতাপীকে ধর্মের মার্গ অনুসরণে অনুপ্রাণিত করলো।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করার পর তাঁর মৃত্যুক্ষণ কাছে এল। তাঁর মন কিন্তু শান্ত, তাঁর চিত্ত নিষ্কম্প প্রদীপ শিখাবৎ। শুধু একটি চিন্তা-বাত্যা ক্ষণে ক্ষণে তাঁর মুমূর্ষু প্রদীপশিখাকে বিতাড়িত করছে। শিষ্যেরা বুঝতে পেরে সবিনয় জিজ্ঞেস করলে, সেবাতে কোন ত্রুটি হচ্ছে কি না।

গুরু বললেন, 'না। ইহলোক ত্যাগ করতে আমার কোনো ক্ষোভ নেই। আমার মাত্র একটি ভাবনা। আমার মৃত্যুর পর আমার কাজের ভার কে নেবে?'

শিষ্যেরা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তাঁর চরিত্রবল কে পেয়েছে, তাঁর বক্তৃতাশক্তি কার আছে যে এ-কঠিন কাজ কাঁধে তুলে নেবে?

গুরু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

এমন সময় অতি অজানা এক নূতন শিষ্য সামনে এসে বললে, 'আমি এ ভার নিতে পারি।'

গুরুর বদনে প্রসন্নতার দিব্য জ্যোতি ফুটে উঠলো। তবু ঈষৎ দ্বিধার কণ্ঠে

শুধালেন, 'কিন্তু বৎস তোমাকে তো আমি চেনবার অবকাশ পাই নি। তুমি কি সত্যই এ কাজ পারবে? ঐ দেখো, আমার দীর্ঘদিনের শিষ্যেরা সাহস না পেয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা দেখি, তুমি অমিতাভের জীবনের যে কোনো বিষয় নিয়ে একটি বক্তৃতা দাও তো।'

বিস্ময়! বিস্ময়!—সেই শিষ্য তখন গলা খুলে গাধার মতো, হুবহু গাধার মতো চেঁচিয়ে উঠলো। কিছু না, শুধু গাধার মতো চেঁচালে।

সবাই বাক্যহীন নিস্পন্দ।

ব্যাপার কি?

গুরুর মাত্র একটু সামান্য ত্রুটি ছিল। তিনি বক্তৃতা দেবার সময় অন্য বক্তাদের তুলনায় একটু বেশী চিৎকার করে কথা বলতেন। ভুঁইফোঁড় শিষ্য ভেবেছে ভালো করে চেঁচাতে পারাতেই উত্তম বক্তৃতার গূঢ় রহস্য। ঐ কর্মটি সে করতে পারলে তাবৎ মুশকিল হবে আসান। তাই সে চ্যাচানোর চ্যাম্পিয়ন রাসভরাজের মতো চেঁচিয়ে উঠেছে।

আমার গুরুদেবের পিতৃতুল্য অগ্রজ সত্যদ্রষ্টা, প্রাতঃস্মরণীয় ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন,

> 'To imitate-এর বাঙলা, অনুকরণ।
>
> To ape-এর বাঙলা, হনুকরণ।'

এস্থলে রাসভকরণ।

ফরাসী-বাঙলা

রবীন্দ্রনাথ নাকি কোনো এক স্থলে খেদ করেছেন, আমরা ইয়োরোপের যে-টুকু চিনলুম সেটা ইংরেজের মারফতে।

তিনি ঠিক কি বলেছিলেন মনে নেই বলে অপরাধ মেনে নিয়ে নিবেদন করি, ইংরেজ বরঞ্চ চেষ্টা করেছে আমরা যেন ইয়োরোপকে না চিনতে পারি।

ইংরেজ যখন এদেশে রাজত্ব করতো তখন দু'টি প্রচারকর্মে মেতে থাকতে সে বড় আনন্দ পেত। তার প্রথম, বিশ্বজনকে জানানো যে, ভারতীয়েরা ড্যাম নিগার, কালা আদমী, তাদের কোনো প্রকারের কল্‌চর্ নেই। দ্বিতীয়, ভারতীয়দের জানানো, ইংরেজ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাত এবং তাই (আ ফর্তেরিয়রি) ইয়োরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ নেশন তো বটেই। প্রমাণস্বরূপ শেক্‌সপিয়রের নাম করলে।

আমরা তখন আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে যাচাই-পরখ করে দেখলুম, কথাটা ঠিক; শেক্‌স্‌পিয়রের মতো কবি পৃথিবীতে কম,—নেই বললেও চলে। ইংরিজিতেই পড়লুম, ফরাসী-জর্মন-ওলন্দাজ-দিনেমার সবাই এ-কথা স্বীকার করেছে। তাই আমরা ইংরেজের বাদবাকি দাবীগুলোও সুড়সুড় করে মেনে নিলুম। ঘড়েল মিথ্যে সাক্ষী—কনফিডেন্‌স্‌ ট্রিক্‌স্‌টার—এইভাবেই সরল জনকে আপন সব পচা মাল পাচার করে দেয়।

ইংরেজ কিন্তু এ-কথা বলতে ভুলে গেল, উপন্যাসে তার টলস্টয় নেই, গল্পে তার মপাসাঁ নেই, চিত্রকলায় তার রাফায়েল নেই, ভাস্কর্যে তার মাইকেল এঞ্জেলো নেই, দর্শনে কাণ্ট নেই, নৃত্যে পাভলোভা নেই, ধর্মে লুথার নেই, সঙ্গীতে বেটোফোন নেই।

বিশেষ করে বেটোফেনের কথাই তুললুম।

ইংরেজ জাত সুর-কানা। তাই সে বেটোফেনের নাম করে না। তাই ইংরেজের বাড়িতে সঙ্গীত-চর্চা নেই। যদি থাকতো তবে এ-দেশের বড় সায়েবদের বাড়িতেও সে-চর্চা আসন পেত। আমরাও ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত হতুম। ইংরেজ চর্চা করলে এবং আমাদের শেখালে—জ্যাজ্‌, যেটা তার খুড়তুতো ভাই মার্কিন শিখলে তাদের গোলাম নিগ্রোদের কাছ থেকে।

অতি অবশ্য আমাদেরও দোষ আছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা হাজারে হাজারে ফ্রান্‌স্‌-জর্মনী-ইতালি-রুশে যায় নি বটে, কিন্তু শতে শতে তো গিয়েছে। তাদের মধ্যে যে ক'জন ইয়োরোপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন তাদের সংখ্যা এক হাতের এক আঙুলে গোনা যায় (এবং আশ্চর্য, যে মহাজন আমাদের সঙ্গে ফরাসী সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতম পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন তিনি কখনো ফ্রান্সে যান নি—তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

'দেশ' পত্রিকার এ সংখ্যা ফরাসিস্‌ সাহিত্য নিয়ে। অতএব সেই বিষয়বস্তুর ভিতরেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করি।

ইংরিজী ভাষা গম্ভীর এবং জটিল কিন্তু তার প্রসাদগুণও আছে। ফরাসী চটুল ও রঙীন। অতিশয় গম্ভীর বিষয় আলোচনা করার সময়ও ফরাসী কেমন যেন একটুখানি তরল থেকে যায়। পক্ষান্তরে রসিকতা করার সময়ও ইংরেজী তার দাঢ্য সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারে না। চার্ল্‌স ল্যাম্‌, এমন কি জেরম্‌ কে জেরম্‌ পর্যন্ত যে ভাষা ব্যবহার করেছেন সেটা ধ্রুপদ। উড্‌ হাউসে এসে আমরা সর্বপ্রথম চটুলতা পাই।

কিন্তু এহ বাহ্য। ফরাসী ভাষার সর্বপ্রধান গুণ তার স্বচ্ছতা, তার সরলতা।

ফরাসীরা নিজেই বলেন, 'যে বস্তু স্বচ্ছ (ক্ল্যার, ক্লিয়ার) নয় সে জিনিস ফরাসী নয়।' আমাদের দেশে আজকাল যে দুর্বোধ্য অবোধ্য পদ্য বেরয় সে 'মাল' প্রথম যখন ফ্রান্সে বেরতে আরম্ভ করল তখন গুণী আনাতোল ফ্রাঁস বলেছিলেন, 'যে মধুর ললিত বয়সে মানুষ অবোধ্য জিনিস ভালোবাসে আমার সে বয়স পেরিয়ে গিয়েছে ; আমি আলো ভালোবাসি।' তাই আরেক গুণী শেষ কথা বলেছেন, 'স্বচ্ছতা, স্বচ্ছতা, পুনরপি স্বচ্ছতা।'

ফরাসী চটুলতা হয়ত অনেকেই অপছন্দ করতে পারেন কিন্তু ফরাসী স্বচ্ছতা বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যে যদি আসতো তবে আর কিছু না হোক, আমাদের মনন সাহিত্য যে অনেকখানি লোকপ্রিয় হত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শ্রীযুত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যদি আরো একটুখানি ফরাসী আওতায় আসতেন তবেই ঠিক বোঝা যেত তাঁর দেবার মতো সত্যিই কিছু ছিল কিনা। এ বিষয়ে বরঞ্চ বলবো, শ্রীযুত অন্নদাশঙ্করের লেখা অনেকখানি ফরাসিস্।

শব্দতত্ত্ব এবং ভাষাতাত্ত্বিকেরা ঠিক ঠিক বলতে পারবেন কিন্তু সাধারণ পাঠক হিসাবে আমার নিবেদন, বাঙলা ভাষার উপর ফরাসী ভাষার (language) প্রায় কোনো প্রভাবই পড়ে নি। বাঙলাতে ক'টি ফরাসী শব্দ ঢুকেছে সে কথা প্রায় পাঁচ আঙুলে গুনেই বলা যায়। অবশ্য এইটেই শেষ যুক্তি নয় ; আমরা বাঙলাতে প্রচুর আরবী এবং ফার্সী শব্দ নিয়েছি বটে কিন্তু ঐ দুই ভাষার প্রভাব আমাদের উপরে প্রায় নেই। কিন্তু অন্য কোনো বাবদেও ফরাসী ভাষার প্রভাব বাঙলার উপর আমি বড় একটা পাই নি।

সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমার ব্যক্তিগত দৃঢ়বিশ্বাস ইনি ফরাসী সাহিত্যের যতখানি চর্চা করেছেন ততখানি চর্চা বাঙলা দেশে তো কেউ করেনই নি, অল্প ইংরেজ জর্মন ইতালিয়ই—অর্থাৎ অফরাসিস—করেছে। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাট্য, কবিতা, ভ্রমণ-কাহিনী, কত বিচিত্র বস্তুই তিনি ফরাসী থেকে অনুবাদ করে বাঙলায় প্রচার করেছেন। এই যে ইংরিজী এবং ফরাসী পাশাপাশি জাতের ভাষা—সেই ইংরিজীতেই পিয়ের লোতির লেখা 'ভারত ভ্রমণ' অনুবাদ করতে গিয়ে ইংরেজ অনুবাদক হিমসিম খেয়ে গিয়েছেন অথচ জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের অনুবাদে মূল ফরাসী যে ঠিক ঠিক ধরা তাই পড়েছে নয়, প্রাচ্য দেশীয় আবহাওয়াও সম্পূর্ণ বজায় রয়েছে।

এই জ্যোতিরিন্দ্রের বাঙলা ভাষাতেই ফরাসী ভাষার কোনো প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় না।

বরঞ্চ ফরাসী শৈলীর (style) প্রভাব বেশ কিছুটা আছে।

বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা পাকাপাকি ভাবে বলতে পারবেন, বাঙলার কোন্ লেখক সর্বপ্রথম ফরাসীর সঙ্গে বাঙলার যোগসূত্র স্থাপনা করেছিলেন ; আমি শুধু সার্থক সাহিত্যিকদের কয়েকজনের কথাই তুলবো।

মাইকেলের সার্থক সৃষ্টিমাত্রই গম্ভীর—সংস্কৃত এবং লাতিনের ক্লাসিকাল গুণের সঙ্গে তিনি তাঁর বীণার তার বেঁধে নিয়েছিলেন। ওদিকে তিনি আবার অতি উত্তম ফরাসী জানতেন—নূতন ভাষা তিনি যে কত তাড়াতাড়ি শিখতে পারতেন, সে কথা আজকের দিনের ভাষার 'ব্যবসায়ী'রা কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না—কিন্তু সে 'রঙীলা ঘরানা' তাঁর ভাষার উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারে নি।[১] তাই কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি নে তিনি লা ফঁতেনের ধরনে 'ফাব্‌ল্' (ফেব্‌ল্) রচনা করলেন কেন ? লা ফঁতেন তাঁর অনেক গল্প নিয়েছেন ঈশপের গম্ভীর গ্রীক থেকে, কিন্তু লিখেছেন অতি চটুল ফরাসী কায়দায়। অথচ তাঁরই অনুকরণে যখন মাইকেল বাঙলাতে 'ফাব্‌ল্' রচনা করেছেন তখন তিনি গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলছেন,

'রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে—'

দুই সুর একেবারে ভিন্ন। অথচ মাইকেলের প্রায় সব ক'টি 'ফাবলে'র উৎস লা ফঁতেন।

প্রহসনেও তাই। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-র মূলে মলিয়ের। অথচ শৈলীতে গম্ভীর।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি। যদিও তাঁর আপন ভাষাতে ফরাসী প্রভাব নেই তবু তিনি অনুবাদের মারফতে যে শৈলী এবং বিষয়-বস্তুর অবতারণা করে গেলেন তার প্রভাব বাঙলা সাহিত্যের দূর-দূরান্ত কোণে পৌঁছে গিয়েছে এবং আরো বহুদিন ধরে পৌঁছবে।

তেয়োফিল গতিয়ে, এমন কি বাল্‌জাক্ ও মপাসাঁরা পূর্বে কয়েকটি সার্থক ছোট গল্প লিখেছেন কিন্তু আজ শুধু ফরাসিস না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্বীকার করে, মপাসাঁই ছোট-গল্পের আবিষ্কর্তা। তিনিই প্রথম দেখিয়ে দিলেন, দীর্ঘ উপন্যাস না লিখেও পাঠককে কি প্রকারে কাহিনী-রসে আপ্লুত করা যায় ('কণ্ঠহার' গল্প নিয়ে সাত-ভলুমী 'জাঁ ক্রিস্তফ' লেখা যায়)। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য

১ বরঞ্চ গৌর বসাককে লেখা চিঠিগুলোতে প্রচুর ফরাসী ফ্রিভলিটি পাবেন।

ডস্তেয়ফস্কির মতো ভলুম ভলুম না লিখেও 'সূত্ররূপে' সেই রস পাঠকের মনে সঞ্চারিত করা যায়।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ছোট-গল্প লেখক রবীন্দ্রনাথ যবে থেকে জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের মারফতে মপাসাঁকে চিনতে শিখলেন তবে থেকেই তাঁর গল্প ঋজু কাঠামো নিয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে আত্মপ্রকাশ পেল (অবশ্য প্রথম থেকেই তাঁর গল্পে থাকতো প্রচুর গীতরস এবং পরবর্তী যুগে তিনি অন্য এক মিস্টিক নবরসে ছোট-গল্পকে অপূর্ব এক নবরূপ দান করেন)।

* *

দান্তে, শেক্স্পিয়র, গ্যোটে, কালিদাস কেউই পৃথিবীর সুদূরতম সাহিত্যকে এতখানি প্রভাবান্বিত করতে পারেন নি মপাসাঁ যতখানি করেছেন। এটম্ বম্ হয়ত পৃথিবীর সব চেয়ে বড় আবিষ্কার কিন্তু বাইসিক্ল ওসেলাইয়ের কল যে রকম গ্রামে গ্রামে পৌঁচেছে এটম্ বম্ শেক্স্পিয়র সে রকম সাহিত্যে সাহিত্যে নব নব সৃষ্টির অনুপ্রেরণা দিতে পারেন নি।[২]

অথচ আজো যখন কোনো মানুষের জীবনে কোনো এক অদ্ভুত বিচিত্র অভিজ্ঞতা আসে সে তখন তার প্রকাশ দেবার চেষ্টা করে ছোট-গল্পের মাধ্যমে, অর্থাৎ মপাসাঁর কাঠামো নিয়ে। ইংরেজ, জর্মন, রুশ, বাঙলা এ-সব অর্বাচীন সাহিত্যের কথা বাদ দিন, অতিশয় প্রাচীন চীন আরবীর মতো ক্লাসিকাল্ সাহিত্যেও আজকের দিনে মপাসাঁ ছোট-গল্পে আদি গল্পগুরু বাল্মীকি। সবাই তাঁরই 'রাজেন্দ্র সঙ্গমে, দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।'

* *

বাঙলা সাহিত্যে মপাসাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য প্রভাত মুখোপাধ্যায়। তিনি ফরাসী জানতেন কি না শৈলী-আলোচনায় সে প্রসঙ্গ অবান্তর। তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তস্য শিষ্য রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন এবং এঁদের মাধ্যমে মপাসাঁর শরণ নিয়েছিলেন। বাঙলা দেশের কোনো গল্পলেখকই প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মতো মপাসাঁর এত কাছে আসতে পারেন নি। মপাসাঁর মতো প্রভাতের ছিল সমাজের নানা শ্রেণী, নানা চরিত্র, নানা পরিস্থিতি নিয়ে নিয়ে নবীন নবীন গল্প গড়ে তোলার অসীম ক্ষমতা। মপাসাঁর মতো তিনিও কয়েকখানি উপন্যাস লিখেছিলেন। সেখানেও দু'জনের আশ্চর্য মিল। ঔপন্যাসিক রূপে মপাসাঁ ফ্রান্সে

---

২ হেমচন্দ্র বিস্তর শেক্স্পিয়র অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু বাঙলাতে আজ পর্যন্ত কেউ শেক্স্পিয়রের অনুকরণ করেন নি।

বিশেষ কোনো সম্মান পান নি; বাঙলা দেশে প্রভাত মুখোপাধ্যায়েরও সেই অবস্থা।

এ প্রসঙ্গে সর্বশেষ নিবেদন, প্রভাত-পরবর্তী যুগের প্রায় সব বাঙালী গল্প-লেখকই মপাসাঁর অনুকরণ করেছেন প্রভাতের মাধ্যমে।

* *

এই সময়ে 'ভারতী'কে কেন্দ্র করে শক্তিশালী এক নূতন কথাসাহিত্যিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়। এ গোষ্ঠী অহরহ অনুপ্রেরণা পেত জ্যোতিরিন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। এঁদের ভিতর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য সত্যেন্দ্র দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি গাঙ্গুলী ও সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এঁরা প্রধানত ফরাসী সাহিত্য থেকে অনুপ্রেরণা সঞ্চয় করে বাঙলা দেশে এক নূতন ফরাসিস 'গুলস্তান' বানাতে আরম্ভ করলেন। এঁদের একটা মস্ত সুবিধে ছিল এই যে, এঁরা রবীন্দ্র-নাথের গড়া আধুনিকতম বাঙলার সম্পূর্ণ ব্যবহার করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সে সুযোগ পান নি বলে তাঁর ভাষা ছিল বিদ্যাসাগরী। এঁরা রবীন্দ্রনাথের সাবলীল ভাষা ব্যবহার করাতে তখনকার দিনের বাঙালী পাঠকের মর্মদ্বারে দরদী আঘাত হানতে পেরেছিলেন।

সব চেয়ে 'তাজ্জব ভেল্কি বাজি' দেখালেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তাও আবার কাব্যে! এক ভাষার কবিতা যে অন্য ভাষাতে তার আপন রূপরসগন্ধস্পর্শ নিয়ে এরকম ভাবে প্রকাশ পেতে পারে এর কল্পনাও বাঙালী পাঠক এর পূর্বে কখনো করতে পারে নি। সত্যেন্দ্রনাথের পূর্বে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হেম বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, এমন কি রবীন্দ্রনাথও বিদেশী কবিতার অনুবাদ করেছিলেন কিন্তু এক 'সদ্ভাবশতক' ছাড়া অন্য কোনো বই জনপ্রিয় হতে পারে নি। স্বামী বিবেকানন্দ নাকি বলেছেন, অনুবাদ মাত্রই কাশ্মীরী শালের উল্টো দিকের মতো; মূল নকশার সন্ধান তাতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আর-সব সৌন্দর্য উল্টো পিঠে ওতরায় না। সত্যেন্দ্রনাথ দেখিয়ে দিলেন, ওতরায়, এবং মাঝে মাঝে উল্টো দিকটাও মূলের চেয়ে বেশী মূল্য ধরতে জানে।

যাঁরা সত্যেন্দ্র দত্তের অনুবাদ মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পড়েছেন তাঁরাই আমার কথায় সায় দেবেন। অন্যতম বিখ্যাত অনুবাদক কান্তি ঘোষ বহুবার একথা বলেছেন। তিনি নেই। তাই আজকের দিনের সবে-ধন নীলমণি নরেন্দ্র দেবকে আমি সাক্ষী মানছি।

তোয়েফিল গতিয়ে, রঁসার ল্যাকঁৎ দ্য লিল্, ভেরলেন্, বদলের, য়্যুগো (Hugo), শেনিয়ে, মিস্ত্রাল, ভেরেরেন্, ভালমোর, বেরাজেঁ—কত বলবো?—

কত না জানা-অজানা কবির কত না কবিতা দিয়ে তিনি তাঁর কুম্ভ 'তীর্থ-সলিল' পূর্ণ করলেন, কত দেশের কত 'তীর্থরেণু' বাঙালীর কপালে ছুঁইয়ে দিলেন।

ঋগ্বেদে আছে, হে অগ্নি, তুমি আমাদের পুরোহিত, কারণ তুমি আমাদের সর্ব আহুতি দেবতাদের কাছে নিয়ে যাও। সত্যেন্দ্রনাথ বহু দেশের বহু কবির পুরোহিত।

* *

কথাসাহিত্যেও ঐ সময়ে প্রচুর ফসল ফললো। গতিয়ে, য়্যুগো, মেরিমে, দোদে, মপাসাঁ, দ্যুমা, বাল্‌জাক্‌ ইত্যাদি বহু লেখকের বহু ছোট-গল্প এবং উপন্যাসও বাঙলায় অনূদিত হল। এ গোষ্ঠীর কার্যকলাপ বাঙলা সাহিত্যে কতখানি স্থায়ী মূল্য ধরে তার বিচার একদিন হবে; উপস্থিত বলতে পারি এঁরা বাঙলা সাহিত্যে যে ফরাসী উদারতার আমন্ত্রণ জানালেন তার ফলে পরবর্তী যুগের অনেক বাঙালী লেখক গোড়ার থেকেই সঙ্কীর্ণতামুক্ত হয়ে সাহিত্যের আরাধনা করতে পেরেছিলেন। হঠাৎ একদিন বাঙলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের ফলে এঁদের লোকপ্রিয়তা ক্রমে ক্রমে কমে গিয়ে একদিন সম্পূর্ণ লোপ পায়। কিন্তু শরতের মোহ কেটে যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত কেন যে কেউ এঁদের হেমন্তের সফলতা সন্ধান করে না সে এক আশ্চর্যের বস্তু।

* *

বাঙলায় ফরাসী সাহিত্য প্রসঙ্গে শুধু প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ একটি প্রবন্ধ লিখতে হয়। ইনিই একমাত্র বাঙালী সাহিত্যিক যাঁকে সর্বার্থে ফরাসিস আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। একমাত্র এঁরই ভাষাটিতে 'ঈভনিং ইন্‌ প্যারিসে'র খুশবাই পাওয়া যায়। এঁর শৈলী ফরাসী শ্যাম্পেনের মতো বুদ্বুদিত, ফেনায়িত। এমন কি এঁর বিষয়বস্তুও মাঝে মাঝে ফরেসডাঙার ধুতি পরে মজলিসে এসে বসে। বাঙলা সাহিত্যে বহু পণ্ডিত, বহু দার্শনিক, বহু কলাবিদ এসেছেন, কিন্তু একমাত্র এঁকেই সত্য বিদগ্ধ জন বলা যেতে পারে। এবং সে বৈদগ্ধ্য ফরাসী বৈদগ্ধ্য।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফরাসিসের সঙ্গে বাঙালীর চারি চক্ষের মিলন ঘটিয়েছিলেন; প্রমথনাথে দুই সাহিত্যে গভীরতম প্রণয়ালিঙ্গন।

এঁর সাহিত্যসৃষ্টি হয়ত বাঙলাদেশ একদিন ভুলে যাবে কিন্তু এই বাঙালী ফরাসিস্‌ চরিত্রকে বাঙালী কখনো ভুলবে না।

প্রমথনাথের শেষ বয়সে ভারতী গোষ্ঠীর মুমূর্ষু অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ফরাসী পণ্ডিত সিলভাঁ লেভি এদেশে আসেন। তাঁর চতুর্দিকে তখন এক ফরাসী

পণ্ডিতমণ্ডলীর সৃষ্টি হয়। এঁদের প্রধান ফণী বোস [৩], প্রবোধ বাগচী, মণি গুপ্ত, শশধর সিংহ, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, ক্ষিতিমোহন সেন। এঁদের কেউই প্রচলিতার্থে সাহিত্যে নামেন নি কিন্তু এঁদের মাধ্যমে আমরা এদেশে সর্বপ্রথম ফরাসী পাণ্ডিত্যের সন্ধান পাই। এতদিন আমরা জানতুম, ইয়োরোপীয় 'প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব' বলতে বোঝায় ইংরেজ। এঁরাই প্রথম দেখিয়ে দিলেন, ফরাসিস্ ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে রাজত্ব না করেও ভারতীয় শাস্ত্রের চর্চা করেছে প্রচুর [৪]। বিশেষ করে আমাদের চিত্রকলা সঙ্গীতাদি। প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই বলেছি সাহিত্য ছাড়া অন্য রসে ইংরেজ বঞ্চিত। ফরাসীরা সেখানে যথার্থ গুণী। মণি গুপ্তের অনুবাদে বাঙালী তার সন্ধান পাবে। শান্তা দেবীএই সময়েই বিশ্বভারতীতে ফরাসী শেখেন।

এই গোষ্ঠীর বাইরে আর দু'জন পণ্ডিতের নাম করতে হয়। মহম্মদ শহীদুল্লা এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। দিলীপ রায় আর কালিদাস নাগও এই যুগের লোক।

* *

কিন্তু আমাদের জোড়া কুতুব-মিনার? বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ? তা হলে দীর্ঘতর প্রবন্ধ লিখতে হয়। এ যুগের ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, imitation-এর বাঙলা অনুকরণ; aping-এর বাঙলা কি? 'হনুকরণ'। যাঁরা ফরাসীর 'হনুকরণ' করেন তাঁদের উল্লেখ আমি এ প্রবন্ধে করি নি। পদস্খলন সকলেরই হয়। পূর্বোল্লিখিত লেখকদের কেউ কেউ হয়ত অজানাতে মাত্রাধিক্য করেছেন কিন্তু এ-দুটি লোক সম্বন্ধে অধম নিঃসংশয়।

বঙ্কিম কিঞ্চিৎ ফরাসিস্ জানতেন। কিন্তু তিনি ইংরিজীর মাধ্যমে কঁৎ-কে চিবিয়ে খেয়েছিলেন। পূর্বসূরীগণের প্রসাদাৎ কঁৎ ফরাসী তর্কালোচনায় যে শুদ্ধবুদ্ধির (rationality-র) চরমে পৌঁছেন; বঙ্কিম সেই শাণিত অস্ত্র নিয়ে হিন্দুধর্ম রণাঙ্গনে প্রবেশ করেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তার সবিস্তর আলোচনা অসম্ভব। তাই এই আক্ষেপ দিয়েই বঙ্কিমালোচনা শেষ করি, হায়, তাঁর এই

৩ ইনি যৌবনেই দেহত্যাগ করেন, কিন্তু এঁর রচনা তখনই বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

৪ পরবর্তী যুগে ভিন্‌টারনিৎস জর্মন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এবং তুচ্চি ইতালীয় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটান। এঁদের সবাই এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে, বিশ্বভারতীতে।

শুদ্ধবুদ্ধির অনুসরণ আর কেউ করলে না কেন? যে লোক ইস্তেক দয়াসাগরের খেলাফে তলোয়ার খাড়া করেছিল তার অনুকরণ অনুসরণ, এমন কি 'হনুকরণ'ও কেউ করলো না কেন?

রবীন্দ্রনাথের উপর মপাসাঁর ছায়া পড়েছিল সে-কথা পূর্বেই বলেছি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহকর্মীরূপে তিনি ফরাসী কবিতানাট্য এমন কি 'শারাদ'ও পড়েছিলেন। তারই ফলে

Celui qui me lira, dans les
siecle, un soir,
Troublant mes vers—

ইত্যাদি ইংরিজীতে শব্দে শব্দে অনুবাদ:

One who will read me, after centuries, one evening, turning over my verses—

'আজি হতে শতবর্ষ পরে' হয়ে বেরল। কিন্তু প্রথম কয়েক ছত্রের পরেই রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চলে গিয়েছেন।

ঠিক সেই রকম মেটারলিঙ্কের 'নীলপাখি' যে কাঠামোতে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর', 'অরূপ রতন' সেই কাঠামো নিয়ে, কিন্তু উভয় নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং রসনির্মাণে রবীন্দ্রনাথ মেটারলিঙ্ককে অনেক পিছনে ফেলে গিয়েছেন। এবং সর্বশেষ নাটকদ্বয় 'মুক্তধারা' এবং 'রক্তকরবী'-র কাঠামোও রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ নিজস্ব—ভাষা, শৈলী, রসনির্মাণ পদ্ধতি রাবীন্দ্রিক তো বটেই।

আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, অরবিন্দ ঘোষ (ইনি উত্তম ফরাসী জানতেন)—এঁদের মতো প্রতিভাবান লেখকের রচনাতে এঁর প্রভাব, ওঁর ছায়াপাতের অনুসন্ধান করে কোনো লাভ নেই। হীনপ্রাণ লেখক সর্বক্ষণ ভয়ে মরে, ঐ বুঝি লোকে ধরে ফেললে, সে অমুকের কাছ থেকে ধার নিয়েছে; তাই সে মহাজনদের বাড়ির ছায়া মাড়ায় না। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ নিজেরাই এত বড় মহাজন যে, তাঁরা যত্রতত্র অনায়াসে বিচরণ করেন। ক্ষুদ্রতম লেখকের বাড়িতেও পাত ফেলতে তাঁদের কণামাত্র ভয় নেই। তাঁদের ঘানিতে যাই ফেল না কেন, স্নেহঘন হয়ে বেরিয়ে আসবে।

এইবারে শেষ প্রশ্ন: ফরাসীর উপর বাঙলা কোনো প্রভাব ফেলতে পেরেছে কি?

'লোয়াজো ব্লা' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাঙলায় অনুবাদ করেন

রলাঁ যেরকম বহু বাঙালী লেখককে প্রভাবান্বিত করেছেন, ঠিক তেমনি তিনিও বাঙালী গুণী-জ্ঞানীদের সন্ধান রাখতেন। ব্রাহ্ম আন্দোলন, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান এবং এঁদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অকৃত্রিম। বহু ফরাসী এঁরই মারফতে বাঙলাদেশের অনেক কিছু চিনতে শিখেছে।

পূর্বেই বলেছি, লেভির সঙ্গ পেয়ে বাঙালী গুণী ফরাসী পাণ্ডিত্যের চর্চা করেছিল। লেভি নিজে করলেন উল্টোটা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ পেয়ে তাঁরই সাহায্যে করলেন 'বলাকা'র ফরাসী অনুবাদ। আজ যদি শুনি, পাণিনি কোনো এক চীনা কবির রচনা সংস্কৃতে অনুবাদ করেছিলেন তা হলে যে-রকম আশ্চর্য হব।

শ্রীমতী আঁদ্রে কার্‌পেলেজ ফরাসীতে একখানা সঞ্চয়িতা বের করেন। তার নাম 'ফ্যাই দ্য ল্যাঁদ'—'লীভ্‌জ্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়া'। এই চয়নিকায় বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য নিয়েই আলোচনা ছিল প্রধানত। দুর্ভাগ্যক্রমে বইখানা আমার হাতের কাছে নেই।

এবং নেই, শান্তিনিকেতনে ফরাসী ভাষার প্রাক্তন অধ্যাপক ফের্না বেনওয়ার রচনাবলী। অমিয় চক্রবর্তীর সহযোগিতায় তিনি 'মুক্তধারা'র ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন 'লা মাশিন' (দি মেশীন) নাম দিয়ে। এর পরবর্তী যুগে বাঙলা সম্বন্ধে আরো বিস্তর লেখা ফরাসীতে প্রকাশ ও প্রচার করেছিলেন।

এবং মারাত্মক নেই, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ফরাসী প্রেসের অভিমত, অভ্যর্থনা, অকুণ্ঠ প্রশংসা। রবীন্দ্রনাথ যতবার ফ্রান্সে গিয়েছেন, যখনই তাঁর চিত্রকলার প্রদর্শনী হয়েছে, ফ্রান্স তখনই বাঙলাদেশ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তাকে স্বীকার করেছে। প্যারিসে স্বীকৃতি পাওয়া সহজ কর্ম নয়। এ-সব প্রেস্‌-কাটিংস্‌ অনুসন্ধিৎসু পাঠক শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীতে পাবেন। সে এক বিরাট ব্যাপার!

অর্থাৎ হাতের কাছে কিছুই নেই—'ঢাল নেই তলোয়ার নেই'—

তাই আর কেউ বলার পূর্বেই স্বীকার করে নিই, এ লেখা সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ।

চার্লি চ্যাপলিন

আমার ছেলেবেলায় বায়স্কোপও ছেলেমানুষ ছিল। হরেক রকম ফিলিম তখন আসতো; ছোট, বড়, মাঝারি—এখনকার মতো স্টাণ্ডার্ডাইজ্‌ড নয়। সেনসর বোর্ড-ফোর্ডও তখন শিশু, এখনকার মতো 'জ্যাঠা' হয়ে ওঠে নি—'এটা অশ্লীল',

'ওটা কদর্য', 'সেটা বড় কর্তাদের নিয়ে মস্করা করেছে' বলে দেশের দশের রুচি মেরামত করার মতো হরিশ মুখুজ্যে দি সেকেণ্ড হয়ে ওঠে নি। কাজেই হরেক রুচির ফিলিম তখন এদেশে অক্লেশে আসতো এবং আমরা সেগুলো গোগ্রাসে গিলতুম। তার ফলে আমাদের চরিত্র সর্বনাশ হয়েছে, এ কথা কেউ বলে নি। এবং আজ যে সেনসর বোর্ডের এত কড়াক্কড়ি, তার ফলে এযুগের চ্যাংড়া-চিংড়িরা যীশুখেষ্ট কিংবা রামকেষ্ট হয়ে গিয়েছে এ মস্করাও কেউ করে নি। তবু শুনেছি সেনসর বোর্ডের বিশ্বাস, বিস্তর ছবি ব্যান্ করলে শেষটায় ভালো ছবি বেরবে। তাই যদি হয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একটা সেনসর বোর্ড লাগাও না কেন? কাকা-মামা-শালাদের চাকরি তো হবেই এবং সুবো-শাম হুদোহুদো বই ব্যান্ করার ফলে একদিন ইয়া দাড়িগোঁফ সমেত আরেকটি সমুচা রবিঠাকুর বেহেশৎ থেকে টুকুস্ করে ঢস্‌কে পড়বেন—এই যেরকম হাওড়া ইষ্টিশানের কল থেকে প্ল্যাটফর্ম টিকিট মিন্-ফর্সেপ্‌সে বেরিয়ে আসে।

আমি মাঝে মাঝে ভাবি, এরা কার রুচি রিফর্ম করতে চায়? আমার? সাবধান! পাড়ার ছোঁড়ারা আমায় মানে (ওরাই আমাকে মাঝে-মধ্যে বায়স্কোপে নিয়ে যায়), শুনলে ক্ষেপে উঠবে। বোর্ডেরও প্রাণের ভয় আছে। তবে কি টাঙাওলা বিড়িওলাদের? ওঃ! কী দম্ভ! ওদের রুচিতে ভণ্ডামি নেই। ঐটে পেলে আমি বর্তে যেতুম।

কিন্তু সে কথা থাক্। এই সেনসরিং ব্যাপারটা দেশে-বিদেশে কি প্রকারে সমাধান হয় সে সম্বন্ধে আরেকদিন সবিস্তর আলোচনা করবো। ইতিমধ্যে ছোটা হিটলারদের স্মরণ করিয়ে রাখি বড়া হিটলাররা জর্মানিতে 'অল কোয়ায়েট' ফিলিম ব্যান্ করেছিল!

সেই যুগে হঠাৎ দেখা দিলেন মহাকবি চার্লি চ্যাপলিন—ভগবান তাঁকে দীর্ঘায়ু করুন।

সাহিত্য বলুন, সঙ্গীত বলুন, চিত্রকলা বলুন, ভাস্কর্য বলুন, এ রকম একটি তাজমহলের-সামনে-দাঁড়িয়ে-নটরাজ পৃথিবীতে আর কখনো উদয় হয় নি। এঁর প্রতিভা অতুলনীয়। বাগ্দেবী এঁর কণ্ঠে, উর্বশী পদযুগে, এঁর দক্ষিণ হস্তে বিষ্ণুর চক্র (গ্রেট ডিক্‌টেটর), বাম হস্তে দাক্ষিণ্যের বরাভয় (সিটি লাইট)! ইনি বিশ্বকর্মা (মডার্ন টাইমস), ইনি নীলকণ্ঠ (মসিয়ো ভেরদু)। 'অতি বড় বৃদ্ধ' বলেই ইনি 'সিদ্ধিতে নিপুণ' এবং লগ্ন এলে শঙ্করের মতো নবীন বেশে সজ্জিত হতে জানেন (লাইম লাইট)।

রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে শরৎচন্দ্র একদা বলেছিলেন, 'তোমার দিকে চাহিয়া

আমাদের বিস্ময়ের অন্ত নাই।' সেই রবীন্দ্রনাথ সিন্ধুপারের হিস্পানী বিদেশিনীকে দেখে মুগ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন,

'সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।'

চার্লির দিকে তাকিয়ে সর্বক্ষণ এই দোহাটি মনে পড়ে।

সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে জগদ্বিখ্যাত হওয়ার পর টলস্টয় একখানি প্রামাণিক অলঙ্কার-শাস্ত্রের গ্রন্থ লেখেন। পুস্তকের প্রথম এবং শেষ প্রশ্ন, 'হোয়াট ইজ্ আর্ট?' অর্থাৎ 'রস কি?' মধুর সঙ্গীত শুনে, উত্তম কাব্য পাঠ করে, দেবীর মূর্তি দেখে আমরা যে আনন্দরসে নিমজ্জিত হই সে বস্তুটি কি?

তার সংজ্ঞা দেওয়ার পর টলস্টয় বলেন, গুটিকয়েক উন্নাসিককে যে রস আনন্দ দান করে সে রস হীন রস। আচণ্ডাল, (আ-সেনসর বোর্ড?)[১] জনসাধারণকে যে কাব্য আনন্দ দেয় সেই কাব্যই প্রকৃত কাব্য, উত্তম কাব্য। যথা, মহাভারত। পণ্ডিত-মূর্খ, বৃদ্ধ-বালক, পাপী-পুণ্যবান সকলেই এ কাব্য শুনে আনন্দ পায়।

অবশ্য সব পাঠক যে একই কাব্যে একই বস্তুতে আনন্দ পাবে এমনটা নাও হতে পারে। বালক হয়ত কাব্যের কাহিনী বা প্লট শুনে মুগ্ধ, বলদৃপ্ত যুবা হয়ত কর্ণার্জুনের যুদ্ধবর্ণনা শুনে বীর রসে লুপ্ত, বৃদ্ধ হয়ত শ্রীকৃষ্ণে অর্জুনের আত্মসমর্পণ দেখে ভক্তিরসে আপ্লুত, এবং উদারচরিত সবরসে রসিকজন হয়ত প্রতি ঝঙ্কারে প্রতি মীড়ে প্রকৃত কাব্যরসে নিমজ্জিত।

তা হলে প্রশ্ন, মানুষের বর্বর রুচিকে কি মার্জিত করা যায় না? হয়ত যায়, কিংবা হয়ত যায় না, কিন্তু চেষ্টা আলবৎ করা যায়। সে চেষ্টা ভরত, দণ্ডিন, মম্মট, আরিস্ততেল, রবীন্দ্রনাথ, ক্রোচে করেছেন, কিন্তু এঁদের গলা কেটে ফেললেও এঁরা কোনো বোর্ডের মেম্বর হতে রাজী হতেন না। মানুষের রুচিপরিবর্তন এঁরাই করিয়েছেন—কোনো বোর্ড কখনোই কিছু পারে নি।

বর্তমান যুগে চার্লি সেই রসই সবজনকে উপহার দিয়েছেন। এ যুগের সাহিত্যে, কাব্যে, ভাস্কর্যে, রঙ্গমঞ্চেও কুত্রাপি কেউই চার্লির বৈচিত্র্য, বিস্তার, গভীরতা, সবজনমর্মস্পর্শদক্ষতা দেখাতে পারেন নি। এ যুগে শার্লক হোমস

১। পাঠক ভাববেন না, আমি কলকাতা বা দিল্লীর বোর্ডের কথা ভাবছি। আমি সর্বাবশ্বের জীবিত ও মৃত সর্ব বোর্ডের কথা ভাবছি। শ' যে রকম 'রুইন্‌জ্ রীডার অব্ প্লেজ'-এর স্মরণে আপন মন্তব্য বিশ্ব-বোর্ডের উদ্দেশে লিখেছিলেন।

পৃথিবীর সর্বত্রই সম্মান পেয়েছেন, কিন্তু মানুষের কোমলতম স্পর্শকাতরতাকে তিনি তার চরম মূল্য দিতে পারেন নি; ওমর খৈয়ামও প্রকৃত ধর্মভীরুকে বিচলিত করতে পারেন নি।

চার্লিকে বিশ্লেষণ করি কি প্রকারে?

তার সৃষ্টি, কিংবা তিনি নিজে, এই যে 'লিট্‌ল্‌ ম্যান', সামান্য জন, যেন পাড়ার জগা, টম্‌, ডিক্‌, হ্যারি; 'কেউ-কেটা' তো নয়ই একেবারে, 'কেউ-না' কি করে সকলকে ছাড়িয়ে এক অসাধারণ জন হয়ে সকলের হৃদয়ে এমন একটি আসন গ্রহণ করলো, যে আসন পূর্বে শূন্য ছিল এবং যেখানে আর কেউ কখনো আসতে পারবে না?

কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি?

ভ্যাগাবণ্ড চার্লি একটি শুকনো ফুল দেখতে পেয়ে সেটি তুলে নিয়ে শুঁকতে লাগল। ঝাঁট-দিয়ে-ফেলে-দেওয়া ফুল—তার ফুল্ল যৌবন গেছে, সে পথপ্রান্তে অবহেলিত, পদদলিত। সামান্য যেটুকু গন্ধ তখনো তার অঙ্গে সুষুপ্ত ছিল চার্লি তাই যেন তার 'সহৃদয়' নিশ্বাস দিয়ে জাগিয়ে তুলে বুক ভরে নিচ্ছে। এ ফুল কি কখনো বিশ্বাস করতে পেরেছিল যে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে—রবীন্দ্রনাথের কবি যে রকম আত্মহত্যার পূর্বমুহূর্তে রাজকন্যার বরমাল্য পেল—সে তার চরম সম্মান পাবে?

এমন সময় রাস্তার দুষ্ট ছোঁড়ারা মোকা পেয়ে পিছন থেকে চার্লির ছেঁড়া পাতলুনের ভিতর হাত ঢুকিয়ে শার্টে দিল টান। চচ্চড় করে ছিঁড়ে গেল পাতলুনের অনেকখানি—এই তার শেষ পাতলুন, এটাও গেল—আর বেরিয়ে এল ছেঁড়া শার্টের শেষ টুকরো।

আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে ভ্যাগাবণ্ড চার্লি ছোঁড়াদের দিকে তাকালে। তারা তখন 'শুভকর্ম' সমাধান করে ছুটে পালাচ্ছে।

তখন ভ্যাগাবণ্ডের চোখে কী বেদনাতুর করুণ ভাব!

ভিয়েনা, বার্লিন, প্যারিস-প্রাগে আমি বিস্তর থিয়েটার প্রচুর অপেরা দেখেছি, কাব্যে সাহিত্যে টন মণ করুণ রসের বর্ণনা পড়েছি, কিন্তু ভ্যাগাবণ্ডের সে করুণ চাউনি এদের সবাইকে কোথায় ফেলে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে চলে যায়।

আর সেই নীরব চাউনিতে বলছে, 'কেন, ভাই, তোরা আমাকে জ্বালাস? আমি তো তোদের সমাজের উজীর নাজির হতে চাই নে। কুকুর বেড়ালটাকে পর্যন্ত আমি পথ ছেড়ে দিয়ে কোনো গতিকে দিন গুজরান করছি। আমায় শান্তিতে ছেড়ে দে না, বাবারা!' তারপরে যেন দীর্ঘনিশ্বাস—'হে ভগবান!'

এখানেই কি শেষ ? তা হলে চার্লি দস্তয়েফ্স্কির মতো সুদ্ধ মাত্র করুণ রসের রাজা হয়ে থাকতেন।

অন্ধ ফুলওয়ালী মিষ্টি হেসে চার্লিকে একটি তাজা ফুল দিতে যাচ্ছে। তাকে ? চার্লিকে ? অবিশ্বাস্য !

আইনস্টাইন একবার কোনো শহরের বড় স্টেশনে নেমে দেখেন বিস্তর লোক তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে—যেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে চায়। বিনয়ী আইনস্টাইন শুধু পিছনের দিকে তাকান আর ডাইনে বাঁয়ে সরে যান। নিশ্চয়ই তাঁর পিছনে কোনো ডাকসাইটে কেষ্টবিষ্টু আসছেন, সবাই এসেছে তাঁকেই বরণ করতে, আইনস্টাইন শুধু আনাড়ির মতো মধ্যিখানে বাধার সৃষ্টি করছেন।

কই ? কেউ তো নেই ? রাস্তা একদম ভো ভোঁ—কলকাতার রেশনশপের গুদামের মতো। এরা এসেছে আইনস্টাইনের জন্যই।

আমাদের ভ্যাগাবণ্ডটিও পিছনে তাকালে। এক্স্ট্রিমস মীট্। আইনস্টাইন খ্যাতির সবোচ্চ ধাপে, চার্লি নিম্নতম মাপে।

ফুল পেয়ে চার্লির মুখের ভাব ! স্মিত হাস্যে মুখের দুই প্রান্ত দুই কানে ঠেকে গিয়েছে, শুকনো গাল দুটো ফুলে গিয়ে উপরের দিকে উঠে চোখ দুটো চেপে ধরেছে, চোখের কোণ থেকে রগ পর্যন্ত চামড়া কুঁচকে গিয়ে কাকের পায়ের নকশা ধরেছে, সে চোখ দুটো কিন্তু বন্ধ—আমার যেন মনে হল ভেজা-ভেজা, ঠিক বলতে পারবো না, কারণ আমার চোখও তখন ঝাপসা হয়ে গিয়েছে।

সবক্ষণ ভয় হচ্ছিল, এইবার না চার্লি ভ্যাক্ করে কেঁদে ফেলে !

কে বলে সংসারে শুধু অকারণ বেদনা, নিদারুণ লাঞ্ছনা ! পকড়্কে লে আও উস্কো। এলিসের রানীর হুকুম, 'অফ্ফ্ফ্ উইদ্ হিজ্ হেড্।'

মানুষের কলিজায় চার্লি পুকুর খোঁড়েন কি করে ? দুঃখ, সুখ, করুণা, কৃতজ্ঞতা এসব রস আমাদের কলিজার গভীরতম প্রদেশে চার্লি সঞ্চারিত করেন কোন্ পদ্ধতিতে ?

এক ইরানী কবি বলছেন, 'সব জিনিসের হদ্দ—অর্থাৎ সীমা জানাটাই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তার লক্ষণ।'

অর্থাৎ তাঁর বর্ণনায়, তাঁর অভিনয়ে চার্লি বাড়াবাড়ি করেন না। কারণ কে না জানে, একঘেয়েমির চূড়ান্তে পৌঁছয় মানুষ যখন ভ্যাচর-ভ্যাচর করে সব কিছু বলতে চায়, সামান্যতম জিনিস বাদ দিতে চায় না।

তাই অভিনব গুপ্ত, আনন্দবর্ধন বলেছেন, 'ধ্বনি দিয়ে প্রকাশ করবে ধ্বনি বলতে তাঁরা ব্যঞ্জনা, ইঙ্গিত, সাজেস্টিভ্নেস অনেক কিছুই বুঝেছেন।

যথা :

কুলটা রমণী পথিককে বলছে, 'হে পথিক, এই ঘরে রাত্রিকালে আমার বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ী শয়ন করেন, ঐ ছোট ঘরে আমি একা থাকি, আমার স্বামী বিদেশে। তুমি এখন যাও।'

ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

অর্থাৎ চার্লি যেটুকু অভিনয় করেন, সে তো করেনই ; সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই অনেকখানি অভিনয় করে নিই।

হালে চার্লি সুখবর দিয়েছেন, তিনি আবার সেই 'লিটল ম্যান', সেই ভ্যাগাবণ্ডকে পুনর্জন্ম দেবেন। তাঁর যা বলবার তিনি তারই মারফতে শোনাবেন। শুনে আমরা উল্লসিত হয়েছি। 'মঁসিয়ো ভের্দু', 'লাইম-লাইট' উৎকৃষ্ট অতুলনীয় রসসৃষ্টি কিন্তু আমরা সেই ভ্যাগাবণ্ডকে বড্ড মিস্ করছি।

চার্লি ভ্যাগাবণ্ডকে বর্জন করেছিলেন কেন ?

হয়ত ভেবেছিলেন সব কথা ঐ একই জনের মারফতে বলা চলে না। আমাদের ভ্যাগাবণ্ডের পক্ষে সবাইকে তো বিষ খাইয়ে খাইয়ে—'বিজনেস ইস্ বিজনেস্' বলে এলোপাতাড়ি বিধবাহনন করা যায় না—তাই ভের্দুর সৃষ্টি।

ঠিক এই কারণেই কোনান ডয়েল শার্লক হোমস্‌কে মেরে ফেলে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার সৃষ্টি করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথও তাই গদ্য কবিতা ধরেছিলেন। এই উদাহরণটাই ভালো।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পদে পদে দেখলেন তাঁর কবিতায় পদে পদে মিল এসে যাচ্ছে, ছন্দ এসে যাচ্ছে। যাবেন কোথায় ? পঞ্চাশ বছরের অভ্যাস। নাচার হয়ে মিলগুলো লাইনের শেষে না এনে মাঝখানে ঢুকিয়ে দিতে লাগলেন—শাক ঢাকা দিয়ে মাংস খাওয়ার মতো।

শেষটায় বললেন, 'দুত্তোচ্ছাই ! যাই ফিরে ফের মিল ছন্দে।' রবীন্দ্রনাথের গবিতা নিকৃষ্ট নয়, রবীন্দ্রনাথের উত্তম কবিতা, এই বাঙলা দেশে একমাত্র তিনিই সাথক 'গবি', কিন্তু সোজা কথা—তিনি বুঝে গেলেন যে কবিতার মিল ছন্দ বজায় রেখেও তাঁর যা বক্তব্য তা তিনি বলতে পারবেন। ফিরে গেলেন কবিতায়।

চার্লি যখন ভের্দু করছেন, তখন আমরা পদে পদে দেখতে পাচ্ছি তাঁর পিছনে ভ্যাগাবণ্ডকে। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তাকে লুকোবার জন্যে—রবীন্দ্রনাথ যে রকম মিল লুকোবার চেষ্টা করেছিলেন গবিতায়—কিন্তু আমরা তাকে বার বার

দেখতে পাচ্ছি। বার বার মনে হয়েছে, 'আহা এ জায়গায় যদি আমাদের ভ্যাগাবণ্ডটি থাকতো তবে সে সিচুয়েশনটা কি চমৎকারই না এক্স্‌প্লয়েট করতে পারতো!'

চার্লিও সেটা বুঝেছেন। যে ভ্যাগাবণ্ডকে এতদিন একটুখানি জিরিয়ে নিলেন, তাকে চার্লি আবার ঘরের ভিতর থেকে টেনে আমাদের চোখের সামনে তাকে দিয়ে বাউণ্ডুলীপনা করাবেন।

সুসংবাদ!!

ফল্গুর ভাষা

থিয়েটারের কপাল মন্দ, পাঠান-মোগলের আপন দেশে ওটার রেওয়াজ নেই। তাই পাঠান রাজারা এদেশে জমে বসার পর গাইয়ে-বাজিয়েদের ডেকে পাঠালেন, পটুয়াদেরও ডাক পড়লো, নাচিয়েরাও বাদ গেল না আর এমারৎ বানানেওলাদের তো কথাই নেই। সংস্কৃত যদি তখন এ-দেশের চালু এবং সহজ ভাষা হত তাহলে সংস্কৃত নাট্যও যে বাদশার দরবারে কদর পেত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ হিন্দী কদর পেয়েছিল এবং এ-দেশে বাঙলা কদর পাওয়ার ফলে পরাগল খান, ছুটি খানের মহাভারত লেখা হয়েছিল।

সংস্কৃতে লেখা আমাদের নাট্য ঠিক মুসলিম আগমনের শুরুতে এদেশে কতখানি চালু ছিল বলা কঠিন। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বলেন, সংস্কৃত তখন মৃত ভাষা, ওসব নাট্য তখন প্রায় উঠে গিয়েছে। আমি কিন্তু কিঞ্চিৎ ভিন্ন মত পোষণ করি।

পূর্বেই স্বীকার করেছি, পাঠান আমলে সংস্কৃত মৃত ভাষা, কিন্তু সংস্কৃত নাটক তো সম্পূর্ণ সংস্কৃতে লেখা হয়। তুলনা দিয়ে কথাটা পরিষ্কার করি।

শেক্‌স্‌পিয়র জানতেন, তিনি রাজা-রাজড়া এবং শিক্ষিতজনদের জন্যই আপন নাটক লিখছেন। কিন্তু অন্য একটি তত্ত্বও বিলক্ষণ জানতেন যে তাঁদের সংখ্যা কম, এবং বেঞ্চি গ্যালারি ভরভরাট ক'রে নাটকটাকে জম-জমাট করে তোলে টাঙাওলা-বিড়িওলার দল। কাজেই তাঁর নাটকে ওদেরই মতো চরিত্র ওদেরই ভাষায় কথা কয়, বিশেষ করে ভাঁড়টি সব সময়ই রাজা-প্রজা দু'দলকেই খুশী করতে জানে।

ঠিক সেই রকম গুপ্ত যুগের কালিদাসও জানতেন যে, তাঁর যুগের 'টাঙাওলা'

'বিড়িওলা' সংস্কৃত বোঝে না, অথচ রাজা-রাজড়ারা নাটক চান সংস্কৃতে। ওদিকে তিনি শেক্‌স্‌পিয়রের মতো বুঝতেন যে, জনসাধারণকে খুশী না করে কোনো নাটকই বক্‌স্‌-আপিস ভরতে পারে না। গোলাপফুল খাপসুরৎ জিনিস। কিন্তু পাতা-কাঁটা ওটাকে খাড়া করে না ধরলে ওটা শুধু শূন্যে শূন্যে ঝুলতে পারে না। তাই তিনি তাঁর নাটকে ব্রাহ্মণ আর রাজা ছাড়া আর সবাইকে দিয়ে কথা কওয়াতেন তখনকার দিনের চালু ভাষা প্রাকৃতে। আর শুধু কি তাই? রাজার সংস্কৃতে শোধানো প্রশ্নের উত্তর দাসী যখন প্রাকৃতে দিত তখন কালিদাস তার উত্তরের ভিতর রাজার প্রশ্নটি এমনভাবে জড়িয়ে দিতেন যে সংস্কৃত না-জাননেওলা শ্রোতাও দুই পক্ষের কথাই পরিষ্কার বুঝে যেত। দাসীর তুলনা দিয়েই যদি জিনিসটা বোঝাতে হয় তবে বলতে হবে, এ-যেন 'বাঁদীকে ঠেঙিয়ে বিবিকে সোজা রাখার' মতো রাজা এবং প্রজা উভয় দর্শককে সোজা রাখা।

তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কালিদাসের নাটক সর্বজনপ্রিয় ছিল।

তার পর প্রশ্ন উঠতে পারে, ঠিক মুসলমান আগমনের প্রাক্কালে জনসাধারণ কি কালিদাসের আমলের প্রাকৃত বুঝতো? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো এলেম আমার পেটে নেই। তবে তার একশ' বছর পেরবার পূর্বেই আমীর খুসরো যে-হিন্দী ব্যবহার করেছেন সে-হিন্দী অনেকটা ঐ প্রাকৃতের মতোই। এবং এখানে আরো একটি কথা আছে। জনসাধারণ ততদিনে কালিদাসের নাটক দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, এবং নিরক্ষর দর্শক একটা ফিলিম তিন বার দেখবার পর যে কতখানি মনে রাখতে পারে সে-কথা শিক্ষিত জন জানেন না। আমার এক চাকর (বস্তুত এই গণতন্ত্রের ইন্‌কিলাবী যুগে 'মনিব' বলাই ভালো) পাড়াতে নয়া ছবি এলেই একটানা সাত দিন ধরে সেই ছবি দেখতে যেত। আমি অবাক হয়ে ভাবতুম, নাগাড়ে সাতদিন ধরে একই ছবি দেখে কি করে? পরে তার গুনগুনোনি থেকে বুঝলুম, ছবির চৌদ্দখানা গানই সে রপ্ত করতে চায় এবং করে ফেলেছেও। অনেক হিন্দী গানের বিস্তর কথা না বুঝতে পেরেও। অবশ্য আমার এ-মন্তব্যে ভুল থাকতেও পারে। কারণ আমি এ-জীবনে তিনখানা হিন্দী ছবিও দেখি নি এবং অন্য কোনো পুণ্য করি নি বলে এই পুণ্যের জোরেই স্বর্গে যাবো বলে আশা রাখি। তবে বলা যায় না, সেখানে হয়ত হিন্দী ছবি দেখতে হবে! কারণ এক ইরানী কবি মহাপ্রলয়ের পরে যে শেষ বিচার হবে তারই স্মরণে অনেকটা এই ভয়ই করেন,—

"শেষ-বিচারেতে খুদার সমুখে দাঁড়াবো তো নিশ্চয়,
মানুষের মুখ আবার দেখিব! এইটুকু মোর ভয়।"

"মরা ব্ রূজ-ই কিয়ামৎ গামী কি হস্ত্ ঈন্ অস্ত
কি রূ-ই মরদুমে আলম্ দু বারা বায়দ দীদ"[১]

যদি প্রশ্ন শোধান সে কি করে হয় ?—তুমি হিন্দী ফিলিম্ বর্জন করার পুণ্যে স্বর্গে গেলে ; সেখানে আবার তোমাকে ঐ 'মাল'ই দেখতে হবে কেন ? তবে উত্তরে নিবেদন, কামিনীকাঞ্চনসুরা বর্জন করার ফলে আপনি যখন স্বর্গে যাবেন তখন কি ইন্দ্রসভায় ঐগুলোরই ছড়াছড়ি দেখতে পাবেন না ?

তখন যদি আপনি এক কোণে মুখ গুমড়ো করে বসে থাকেন তবে কি সেটা খুব ভালো দেখাবে ?

থাক্। কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম ! মূর্খকে চটালে এই তো বিপদ। আবোল-তাবোল বকে।

মোদ্দা কথা এই, পাঠান-মোগল যুগে নাট্যাভিনয় রাজানুকম্পা পেল না বলে আমরা এখনো তার খেসারতি ঢালছি। এবং দ্বিতীয় কথা—নাটো, ফিলিমে ভাষা জিনিসটাকে অবহেলা করলে ক্ষতি হয়। এমন কি যদিও বহু গুণী বলে থাকেন 'সাইলেন্স্ ইজ গোল্ডেন' তবু সাইলেন্ট ফিলিম চললো না। বাঙলা ফিলিম যখন সে সাইলেন্স্ ভাঙলো তখন থেকে আজ পর্যন্ত যে ভাষা সে বললে তারই দিকে এ-প্রবন্ধের নল চালনা।

সাতশ' বছর পরে ইংরেজ আমলে হল ঠিক তার উল্টো। কলাজগতে ইংরেজের প্রধান সম্পদ তার থিয়েটার। শেক্স্পিয়রের মতো নাট্যকার নাকি পৃথিবীতে নেই। ইংরেজ বললে, 'চালাও থিয়েটার।' কিন্তু প্রশ্ন, কে করবে থিয়েটার ?

ইতিমধ্যে বাঙালী বিলেত যেতে আরম্ভ করেছে। সেখানে একাধিক নেশার সঙ্গে সে থিয়েটারের নেশাটাও রপ্ত করে এল।

বাঙলা গদ্য এবং পদ্য তখন দুইই বড় কাঁচা।

আর জনসাধারণের ভাষা ? তারও মা-বাপ নেই। একদিকে শেষ-মোগলের ফার্সী উর্দুর শেষ রেশ, অন্যদিকে সুতোনুটি-গোবিন্দপুরের ঐতিহ্যহীন স্ল্যাঙ—দুয়ে

---

১ The only thing which troubles me about the Resurrection day is this,
That one will have to look once again on the faces of mankind.

মিলে তার যা চেহারা সেটা কিছুদিন পরে পাওয়া যায় হুতোমের নকশায়। অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের অতি ভদ্র অতি মার্জিত ভাষা।

এ-যুগের নাটকের ভাষা তাই শব্দতত্ত্বের স্বর্গভূমি। কিন্তু নাটকে যে স্বচ্ছন্দ ভাষার প্রয়োজন তার বড়ই অভাব। সব নাট্যকারই যেন ঠিক মানানসই ভাষাটির জন্য চতুর্দিকে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।[২]

মাইকেলের পৌরাণিক নাট্যে বিদ্যাসাগরী ভাষা; তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা'তে কলকাতার স্যাঙ, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে গ্রামাঞ্চলের একাধিক ভাষা; এবং দীনবন্ধু মিত্রের ভাষাতে বিদ্যাসাগরী ও গ্রাম্য দুইই।

নীলদর্পণ সে যুগের বাঙলার বেদনা প্রকাশ করেই যে বিখ্যাত হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার মনে হয়, বিদ্যাসাগরী ভাষা ও মুসলমান চাষার ভাষা এ-দুয়ের সম্মেলনও তার জন্য অনেকখানি দায়ী। অবশ্য শুধুমাত্র ভাষার বাহার যদি শুনতে চান তবে 'বুড়ো শালিকের' মতো নাটক হয় না। হিন্দু গৃহস্থ, হিন্দু চাকর, মুসলমান চাষা, চাষার বউ, হিন্দু দাসী এদের সকলের আপন আপন ভাষার সূক্ষ্মতম পার্থক্য মাইকেল যে কী কৃতিত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন তার তুলনা বাঙলা সাহিত্যে কোথাও নেই। নাটক হিসেবে এ-বই উত্তম—সাহিত্য হিসেবে ভাষার বাজারে এ-বই কোহিনুর।

অবাঙালীর জন্য পার্শী থিয়েটার কবে প্রতিষ্ঠিত হয় আমি ঠিক জানি নে, কিন্তু বিস্তর বাঙালীও সেখানে যেত ও উর্দু-গুজরাটীতে মেশানো নাটক বুঝতে যে তাদের বিশেষ অসুবিধে হত না সে তথ্য কিছু অজানা নয়। 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল' জাতীয় জনপ্রিয়, বাঙলা-উর্দুতে মেশানো খিচুড়ি ঠাট্টা ব্যঙ্গের ভাষা কিছুটা হুতোম আর কিছুটা পার্শী থিয়েটারের কল্যাণে।

ইতিমধ্যে ভাষাসমস্যার অনেকখানি সমাধান হয়ে যায় বঙ্কিমের কল্যাণে। বঙ্কিমের ভাষানির্মাণে কোন্ কোন্ উপাদান আছে সে-কথা আজ ইস্কুলের ছেলে পর্যন্ত জানে। ডি এল. রায় শ্রেণী এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন।

এইখানে এসে আমাদের সবাইকে—বিশেষ করে রবীন্দ্র-শিষ্যদের একটু বিপদে পড়তে হয়। রবীন্দ্রনাথের চলতি ভাষা যে তাঁর ছোটগল্প উপন্যাসের মাধ্যমে

২ শুনেছি সর্বপ্রথম নাকি এক রাশান এদেশে থিয়েটার করেন। তিনি তখন ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতা কতখানি পেয়েছিলেন, তার প্রভাব পরবর্তী যুগের বাঙলা থিয়েটারে কতখানি পড়েছিল, এ-সব প্রশ্ন ভাষার বিচারে অবান্তর।

আমাদের দৈনন্দিন কথ্য ভাষাকে প্রভাবান্বিত করেছে সে-কথা আমরা সবাই জানি, এবং তার প্রভাব যে আমাদের রঙ্গমঞ্চেও পড়েছে সেও প্রতি মুহূর্তে কানে বাজে। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর নাটকের ভাষা এত বেশী মার্জিত, এত বেশী সূক্ষ্ম যে নাট্যশালার আটপৌরে কাজ তা দিয়ে চালানো যায় না। তাই বোধহয় তাঁর নাটকের মূল্য সাহিত্য হিসাবে যত না সম্মান পেয়েছে এবং পাবে, নাট্য হিসাবে ততখানি পায় নি, পাবে কি না সন্দেহ।

* *

গোড়ার দিকে ফিলিমের কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। কারণ সে তখন ভাষণ না করে শোভা বর্ধন করতো। টকি আসার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশীল চিত্রচালককেই মনস্থির করতে হল টকির ভাষা ও উচ্চারণ হবে কি? এ-মুশকিলের একটা অতি সহজ সমাধান আছে। শরৎবাবুর 'নিষ্কৃতি' করতে হলে তাঁর ডায়ালগের ভাষা দিলেই হল। এর আর ভাবনা কি?

মুশকিল আসান অত সহজ হয় না। প্রথমত কোনো কোনো বর্ণনা ডায়ালগে প্রকাশ করতে হয়; তখন উপায়? সেটা তৈরি করে দেবে কে? সে-কলম আছে কার? রবীন্দ্রনাথের বারোটি গান নিয়ে যখন দম্ভী লেখকেরা মাঝখানে মাঝখানে 'আপন' গদ্য জুড়ে দিয়ে কিমপিয়ার (কঁপের) করেন, এবং দুই পাকা গানের মাঝখানে সেই কাঁচা বাঙলা শুনতে হয় তখন মনে হয় না, থাক্, বাবা, বাড়ি যাই?

কিন্তু সেইটেই প্রধান শিরঃপীড়া নয়। আসল বেদনা অন্যখানে। বইয়ের লেখা ডায়ালগ আর সিনেমায় উচ্চারিত কথাবার্তা এক জিনিস নয়। বই বন্ধুজনের সঙ্গে পড়ে শোনানো যায়—তার পাল্লা অদূর অবধি। নাট্যে, পর্দায় সেটা অত্যধিক 'সাহিত্যিক'। অবশ্য নিছক ফিলিমের জন্য লেখা রাবিশের কথা এখানে হচ্ছে না।

অন্যদিকে সিনেমার ভাষাতে যদি কোনো সাহিত্যিক মূল্যই না থাকে তবে সে ইস্থেটিক পর্যায়ে উঠতে পারবে না। এই হল আমাদের দু-মুখো সাপ, ডিলেমা, প্যারাডক্স্—যা খুশি বলতে চান বলুন।

প্রথম যখন মানুষ পাথরের বাড়ি তৈরি করতে শিখল তখন পূর্বতর যুগের কাঠের বাড়ির অনুকরণে পাথরের বাড়ি তৈরি করতো; বাঙলা দেশে ইঁট চালু হওয়ার পর প্রথমটায় সে খড়ের চাল অনুকরণ করেছে; বেতারের বয়স হয়েছে—এখনো সে নাটক করার সময় 'থিয়েডারে'র (থিয়েটারের নয়) অনুকরণ করে—ফিলিম কেন অনুকরণ করতে যাবে?

- "শ্যামার নামের মন্ত্রগুণে
উতলা নগররক্ষী আমন্ত্রণ শুনে
রোমাঞ্চিত ; সত্বর পশিল গৃহ মাঝে
পিছে বন্দী বজ্রসেন নতশির লাজে
আরক্ত কপোল। কহে রক্ষী হাস্য ভরে,
'অতিশয় অসময়ে অভাজন 'পরে
অযাচিত অনুগ্রহ'।"

ওঃ ভাষার কী জেল্লায়! 'অতিশয় অসময়ে অভাজনে অযাচিত অনুগ্রহ—' 'অ'-য়ে 'অ'-য়ে ছয়লাপ! তাও ইন্‌স্‌পেক্‌টর জেন্‌রেল্‌ অব্‌ পুলিসের মুখে!

গল্পটি সকলেরই জানা। রবীন্দ্রনাথ এটি কণেবর জাতক থেকে নিয়েছেন। আজকের দিনের ভাষায় বলতে গেলে রাজ্যপালের মেয়ের আঙটি হারিয়েছে। তুমুল কাণ্ড। স্বয়ং আই জি যখন চোর ধরে গবর্নমেণ্ট হৌসের দিকে যাচ্ছেন তখন মনে করুন মাতাহারি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি কি তখন 'উতলা' এবং 'রোমাঞ্চিত' হবেন না? তাঁর মুখে কি তখন খৈ ফুটবে না, চোখ দুটো পলকা নাচ নাচবে না! অবশ্য সামান্য 'অ' দিয়ে কবিত্বের প্রকাশ—রবীন্দ্রনাথ অতি মোলায়েম ইঙ্গিত দিয়েছেন যে পুলিস এর বেশি আর কি কবিত্ব করবে? তবে কিনা রবীন্দ্রনাথ যখন কবিতাটি লিখেছিলেন সেদিনের তুলনায় আজকের পুলিস বড্ড বেশী লেখা-পড়া করে আপন সর্বনাশ টেনে আনছে!

আমার অবস্থা হয়েছিল বজ্রসেনের। সে চোর।

আমি তখন বোম্বায়ে। আমার এক বন্ধু ব্যাঙ্কার। নাম জভেরী—অর্থাৎ জহুরীর গুজরাটী সংস্করণ। এক বাঙালী 'ফিলিম-এস্টারে'র শাদী। তিনি তাঁর ব্যাঙ্কার জভেরীকে নেমতন্ন করেছেন। জভেরী ব্যাচেলর; আমার সঙ্গে চম্‌ করে। স্টার সেটি জানতেন। লক্ষ্ণৌয়ে প্রতিপালিত বঙ্গরমণী এটিকেট-দুরুস্ত হয়, যত না প্রয়োজন তার চেয়েও বেশী। বিবেচনা করি আমারও নিমন্ত্রণ ছিল—কিন্তু কসম খেতে পারবো না।

রোশনাই বাদ্যি বাজনা যা ছিল তা এমন কিছু মারাত্মক খুনিয়া ধরনের নয়। কন্যা কুরূপা হলে এসবের প্রয়োজন। ইংরিজীতে বলে লিলি ফুলকে তুলি দিয়ে রঙ মাখাতে হয় না,—আজকের দিনের ভাষায় লিপিষ্টিক্‌-রুজ্‌ মাখাতে হয় না। যাঁরা আছেন এবং যাঁরা আসছেন তাঁদের এক এক জনই এক ধামা লিলি—না, দুই ধামা।

দরিদ্র আবুহোসেন ঘুম ভাঙতে দেখে, সে, সুন্দরীদের হাটে। কূজনে গুঞ্জনে গন্ধে অনুমান করলে সে খলীফা হরূন-অর্-রশীদের হারেমের ভিতর। সাক্ষাৎ পরীস্তান।

আর আমি? অধুনা মৃত ভাস্কর এপ্‌স্টাইন আমাকে 'বৃদ্ধ নিগ্রো'র মডেল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সুন্দরীরা আমাকে অবহেলা করেন নি। তাঁরা ভেবেছিলেন, আমিও বুঝি ফিলিম স্টার—'স্যাটিঙে'র ('স্তটিঙ্' সাদামাটা সিনেমা বাবদে অজ্ঞজনের শুদ্ধ উচ্চারণ!) ড্রেস না ছেড়েই দাওয়াতে এসেছি।

আমি ভাল করেই জানি, আপনারা সব স্টারদেরই চেনেন, কিন্তু সবাইকে একসঙ্গে দেখেছেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ। তদুপরি আরেকটি ছোট কথা আছে। তারকার তুলনা দিয়েই নিবেদন করি। অরুন্ধতী আকাশের ক্ষুদ্রতম তারকা। কিন্তু তিনি বশিষ্ঠের পাশে বসে যখন সপ্তর্ষির সাতটি তারকার একজন হয়ে দেখা দেন তখন মনে হয় ইনি না থাকলে সপ্তর্ষির সাতটি তারকাই মিথ্যা হতেন।

শাদী মজলিসে তাই ক্ষুদ্রতম তারকাটিও চিত্তহারিণী হয়ে দেখা দিয়েছিলেন।

এলেন, মনে করুন,—নামগুলো একটু উল্টেপাল্টে দিচ্ছি—শমশাদ বানু লায়লা। পরনে সাটিনের পাজামা। পায়ের এক একটি ঘের অন্তত দু'হাত। স্বচ্ছন্দে যে-কোনো বঙ্গসন্তানের তিনটি পাজামা বা পাঁচটি পাতলুন হতে পারে। শমশাদ বানুর কোমরটি বঙ্গরমণীর কাঁকনের সাইজ। তাই কোমর থেকে পর্দার মতো ফোল্ডে ফোল্ডে সে পাজামা নেমে আসাতে বোঝা গেল না তিনি মাডাম পম্পাডুরের ফ্রক পরেছেন, না ভাওয়ালের জমিদারবাড়ির লুঙ্গী পরেছেন, না ইরানী বেদেনীদের তাম্বু-পানা ঘাঘরা পরেছেন। আসলে নাকি একে লক্ষ্ণৌঈ বড়ী মুরী পাজামা বলে। তা সে যে নামই হোক আমার মনে হল আমি যেন খাসিয়া পাহাড়ে মুশমই জলপ্রপাতের সামনে দাঁড়িয়ে। বিজলির আলো প্রতি ফোল্ড বেয়ে যেন গলা রূপোর মতো ঝরনাধারায় পায়ের কাছে নেমে এসে শততরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে শমশাদ বানু লয়লা যেন আস্বচ্ছ দুগ্ধকুণ্ডে কটিতটটি ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

এর সঙ্গে সে-যুগে লম্বা কুর্তা পরা হত। ইনি পরেছেন কঞ্চুলিকা বা চোলী। আমি মাত্র একবার সেদিকে তাকিয়েছিলুম।

মোগল বাদশা মারা গেলে যে ছেলে রাজা হত সে অন্যদের চোখ চোখেরই সুরমা পরার শলা দিয়ে কানা করিয়ে দিত। আমার দুটি চোখই যেন কানা হয়ে গেল। ও রকম কিংখাব আমি দেশ-বিদেশের কোনো জাদুঘরেও দেখি নি।

সোনা রূপোর জরি দিয়ে সে কিংখাবে এমনই কারুকার্য করা হয়েছে যে কিংখাবের একটি টানা-পোড়েনের রেশমী সুতোও দেখা যাচ্ছে না।

ঘাঘরাটি ছিল যেন শীতল ঝরণা ; এ যেন সাক্ষাৎ অগ্নিকুণ্ড।

চোলির হেথাহোথা দু-একটি মুক্তো গাঁথা। যেন বহ্নি নির্বাপিত করার জন্য ক্ষুদ্র হিমিকার নিষ্ফল প্রয়াস।

দু' কাঁধ বেয়ে নেমে এসেছে বুল্‌বুল্‌-চশ্‌ম্‌ ওড়না।

সেই ছেলেবেলায় দাদীমাকে বুল্‌বুল্‌-চশ্‌ম্‌ শাড়ি পরতে দেখেছি। আর আজ তার-ই ওড়না। অতি সূক্ষ্ম মসলিনের এখানে ওখানে দুটি দুটি করে বুলবুলের চোখের (চশ্‌ম্‌) মতো ফুটো করে সে দুটি অতি ফাইন মুগা সিল্ক দিয়ে বোতামের ফুটোর মতো কাজ করা হয়। এ রমণীর রুচি আছে। ক্ল্যাসিক্‌স্‌ পড়ে। বুল্‌বুল্‌ চশ্‌ম্‌ কালিদাসের যুগের, তার মূল্য ইনি জানেন।

আশ্চর্য! এলো খোঁপা। গান্‌মেটল রঙের কৃষ্ণনীল চুলের খোঁপাটি কাঁধে শুয়ে আছে যেন কৃষ্ণকরবীর স্তবক শুভ্র ফুলদানিতে ঘুমিয়ে আছে।

* *

হঠাৎ দেখি এক চোখ-ঝলসানো সুন্দরী, বিধবার থান পরে! ইনি বিয়ের পরবে কেন? আমাদের দেশে তো কড়া বারণ। তখন আবার দেখি তাঁর হাতে ফেনা-ভর্তি শ্যাম্পেনের গেলাস। নাঃ, ইনি সদ্য স্টুডিয়ো থেকে শুটিঙ অর্ধসমাপ্ত রেখে এসেছেন।

* *

আরো অনেকেই ছিলেন। বেবাক বর্ণনা দিতে হলে তামাম পুজো সংখ্যাটা আমাকেই লিখতে হয়। খর্চায় পুষাবে না—সম্পাদক জানেন।

ইতিমধ্যে কৃষ্ণলাল জভেরী এসে আমাকে নিয়ে চললেন সেই তারকা যজ্ঞশালার প্রান্তদেশে অনাদৃতা উর্মিলার অবস্থা থেকে টেনেহিঁচড়ে অন্য প্রান্তে। কি ব্যাপার? জভেরী উত্তেজনার মধ্যিখানে ইংরিজী ভুলে গিয়ে গুজরাটীতে কি যেন 'সুঁসুঁ' করলে। কে যেন আমাকে ইন্টারভ্যু দেবে। আমি বেকার। বিধি তবে দক্ষিণ। অদ্য প্রভাতের সবিতা প্রসন্নোদয় হয়েছেন। আম্মো ইস্টার হব।

শমশাদ বানু লায়লা মৃদু হাস্য করলেন। ফিল্‌ম্‌-স্টারের ধবধবে সাদা দাঁত নয়। গোলাপীর চেয়েও গোলাপী রঙের অতি ক্ষীণ একটি ফিল্‌ম্‌—ফিল্‌ম্‌-স্টারের দাঁতের উপর। কি সুন্দর! তাই বুঝি কালিদাস তাঁর নায়িকার দাঁতের সঙ্গে রাঙা অশোকের তুলনা দিয়েছেন—শুভ্র বন-মল্লিকার সঙ্গে দেন নি। আগেই

বলেছি, ইনি ক্ল্যাসিক্‌ল্‌। পানের রস গ্রহণ করতে জানেন। অন্য পান কিন্তু জানেন না। হাতে লেমন-স্কোয়াশ।

শুধালেন, 'আপনি দার্শনিক ?'

আমি জভেরীকে ধমক দিয়ে বললুম, 'জভেরী !'

জভেরী ভীরু। বললে, 'আমি কিচ্ছু বলি নি।'

আমি বীবী সাহেবাকে চালাকি করে শুধালুম, 'আমাকে কি এতই বিজ্ঞ মনে হয় ?'

'বুদ্দু মনে হয়। বিজ্ঞ মনে হয় খ্রিস্টাবকে, ব্যাঙ্কারকে, পোকার খেলাড়ীকে।'

বাধ্য হয়ে বললুম, 'না। আমি দার্শনিক নই। আমি দর্শনের শত্রু ধর্ম নিয়ে নাড়াচাড়া করি।'

শমশাদ বানুর মুখে তৃপ্তির চিহ্ন ফুটলো।

এত দিনে আমার নীরস শাস্ত্রচর্চা ধন্য হল।

বললেন, 'সে তো আরো ভালো। আমি তাই খুঁজছিলুম। আচ্ছা বলুন তো—' বলে তিনি যেই একটু থেমেছেন, আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'বীবী সাহেবা, এই জায়গা কি ধর্ম-চর্চার পক্ষে প্রশস্ত ?'

অবহেলার সঙ্গে বললেন, 'নয় কেন ? পাপীরাই তো ধর্মচর্চা করবে। ধার্মিকদের তো ওসব হয়ে গিয়েছে। তেলো মাথায় ব্রিলেন্টাইন ? সে-কথা থাক্‌। আমি শুধোতে চাই, কেউ যদি মরে যায় (আমার মনে হল শমশাদ কেমন যেন একটু শিউরে উঠলেন) তবে আমি মরে গেলে তাঁকে দেখতে পাবো কি ?'

আমি শুধালুম, 'কোন্‌ ধর্মমতে ?'

'সে আবার কি ?'

'আমি "তুলনাত্মক ধর্মশাস্ত্র" চর্চা করি।'

'তার মানে ?'

'এই মানে ধরুন, পৃথিবীতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান মেলা ধর্ম আছে। আমি প্রত্যেক ধর্মের জন্ম, যৌবন, বর্তমান অবস্থা,—কে কি বলে তাই পড়ি। যেমন প্রত্যেক দেশের ইতিহাস হয়, তেমনি প্রত্যেক ধর্মেরও ইতিহাস হয়।'

একটু অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'আমি অতশত বুঝি না। আমি ফিল্মে কাজ করি, আমি পণ্ডিত নই। আমি জানতে চাই, এত সব ধর্ম পড়ার পর এ-বিষয়ে আপনার ব্যক্তিগত, পার্সনাল মতটা কি ?'

মহা ফাঁপরে পড়লুম। বললুম, 'আমি কখনো ভেবে দেখি নি। মুসলমান ধর্ম বলে—'

বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক। আপনি তাহলে একটি আস্ত চিনির বলদ। ধর্ম বয়ে বেড়াচ্ছেন—কখনো কাজে লাগান নি।'

আমি বললুম, 'ধর্ম কি মশলা বাটার জিনিস! নামাজের কার্পেট দিয়ে কি মানুষ বিছানা বাঁধে?'

অতি শান্তকণ্ঠে বললেন, 'না। কিন্তু নামাজের কার্পেটে মানুষ নামাজ পড়ে; ওটা শিকেয় তুলে রাখে না।'

আমি বললুম, 'আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়াতে ফিল্ম্-স্টারদের সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে গেল। আপনি নিশ্চয়ই বিস্তর লেখাপড়া করেছেন।'

'কী আশ্চর্য! এ তো কমন্-সেন্সের কথা। এটা না থাকলে প্রডুসার, ডিরেক্টর, এডমায়ারার, লাভারের দল আমাকে কুটিকুটি করে ফেলতো না! ওসব কথা থাক্। আপনি আমার কথার উত্তর বেশ চিন্তা করে দিন।' তারপর জভেরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওহে জভেরী, ওঁকে একটা শ্যাম্পেন দাও না?'

আমি মাথা নেড়ে বললুম, 'থাক্। আপনার পাল্লায় পড়ে আমার বিশ বছরের নেশা কপ্পুর হয়ে গেছে। আড়াই ফোঁটাতে আর কি হবে, লায়লীবানু।'

একটু হেসে বললেন 'আপনার মুখে "লায়লী" বেশ মিষ্টি শোনায়।'

সব্‌বোনাশ! সব্‌বোনাশ!! এ যে ডবল এটাক। পিনসার মুভমেণ্ট।

ওড়নাটি ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে চেয়ারে যে ভাবে চেপে বসলেন তাতে বুঝলুম যে এঁর গায়ে কাবুলী রক্ত আছে। উত্তর না নিয়ে উঠবেন না।

মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, চোখ দুটি বন্ধ—বড় শান্ত প্রশান্ত নিস্তব্ধ ভাব। ঐ বেশ পরা না থাকলে মনে হত তপস্বিনী, কঠোর ব্রতচারিণী সুফী রমণী।

আমি আস্তে আস্তে বললুম, 'আমার মনে হয়,—' থামলুম। কোনো উত্তর নেই।

কিছুক্ষণ পর ফের বললুম, 'আমার মনে হয়—'

অল্প একটু 'উঁ' শুনতে পেলুম।

'—যে পুণ্যবান লোকের কোনো কামনা আল্লাতালা অপূর্ণ রাখেন না।'

* *

আমি জানি, চতুর্দিকে তখন হৈ-হুল্লোড়। কিন্তু আমার মনে হল যেন আমি মরুভূমির মাঝখানে দুপুর রাত্রে জেগে উঠেছি। দিবাভাগের আতপতাপে দগ্ধ

সর্ব কাফেলার মানুষ উট গাধা ঘোড়া সবাই অকাতরে ঘুমুচ্ছে। আকাশের নৈস্তব্ধ্যকেও যেন মরুভূমির নৈঃশব্দ্য হার মানিয়েছে। কোথা থেকে এল এ শান্তি, এ বিধান? তাকিয়ে দেখি, লায়লার মুখ থেকে।

ততক্ষণে জভেরী শ্যাম্পেন নিয়ে ফিরেছে।

লায়লা উঠে বললেন, 'আপনার কথা ঠিক।'

তারপর জভেরীকে রাজেশ্বরীর কণ্ঠে বললেন, 'তুমি থাকো। আমি এঁকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।'

গাড়িতে একটি কথাও হয় নি।

আমি নামবার সময় তাঁকে 'আদাব আরজ, খুদা হাফিজ' বললুম। তিনি সযত্নে আমার ডান হাত আপন দু'হাতে ধরে মৃদু চাপ দিলেন। সে চাপে ছিল বন্ধুত্ব, সহৃদয়তা। ফিল্ম্-স্টারের হাতের চাপ আমি এর আগে, এখন এবং এর পরেও কখনো পাই নি।

মধ্যরাত্রি অবধি খাটে শুয়ে শুধু শান্তি অনুভব করেছিলুম।

রাত তিনটেয়, বোধহয়, একবার ধড়মড় করে জেগে উঠে ফের শুয়ে পড়েছিলুম।

* *

সকালে উঠে দেখি, জভেরী ব্যাঙ্কে চলে গিয়েছে।

তারপর দেখি, পূব রাত্রির প্রসন্নতা মন থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

কী যেন এক অজানা অস্বস্তির ভাব সর্ব দেহমন অসাড় বিকল করে দিয়েছে।

ফোন বাজল। জভেরী চিৎকার করে কি বলছে।

'শোনো, কাল রাত তিনটেয় শমশাদ আত্মহত্যা করেছে। দুটো চিঠি রেখে গিয়েছে। একটা পুলিসকে, একটা তোমাকে। তোমার চিঠিটার নকল যোগাড় করেছি। লিখেছে, 'মাই ডিয়ার এম, তোমার কথাই ঠিক। আমি চললুম। দেখা যখন তাঁর সঙ্গে হবেই তখন আর দেরি করে লাভ কি? আমি জানি আত্মহত্যা পাপ। আমার সব পুণ্যের বদলে এটা মাফ হয়ে যাবে।'

এখন মনে পড়ছে সন্ধ্যার সময় জভেরী বাড়ি এসে আমার হাত থেকে ফোন নামিয়েছিল।

এ-জীবনে এই প্রথম ধর্মোপদেশ দিয়েছিলুম। আর এই শেষ॥

ছুছুন্দর কা সির্‌পর চামেলি কা তেল

লিঙ্গোয়াফোন রেকর্ডের কথা অনেকেই শুনেছেন। এ-রেকর্ডগুলোর সাহায্যে দিশী-বিদেশী যে-কোনো ভাষা অতি চমৎকার রূপে শেখা যায়। রেকর্ডগুলোতে বড় বড় ভাষা এবং উচ্চারণবিদরা গোড়ার দিকে খুব সহজ ভাষায় কথাবার্তা বলেছেন, ক্রমে কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে শেষের রেকর্ডগুলোতে এমন বেগে বলেছেন যে, সেটা আয়ত্ত করতে পারলে আপনি সে ভাষায় নিজেকে ওকীবহাল বলে পরিচয় দিতে পারবেন। প্রথম একখানা রেকর্ড নিয়ে বার বার সেটা শুনতে হয়। তারপর প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতার সঙ্গে সঙ্গে গলা মিলিয়ে, সামনে পাঠ্যপুস্তকের দিকে চোখ রেখে উচ্চারণ করে যেতে হয়। পাঠ্যপুস্তকে আবার 'অনুশীলন'ও থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোও করতে হয়। 'কী' দেওয়া আছে। তাই দিয়ে ভুলগুলো মেরামত করে নিতে হয়।

বুদ্ধি-শুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন নেই। শুধু গাধার খাটুনি আর সহিষ্ণুতা বা নিষ্ঠা কিংবা বলতে পারেন 'লেগে থাকা'র প্রয়োজন।

আমার অভিজ্ঞতাপ্রসূত ব্যক্তিগত সুদৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীর বেশীর ভাগ জিনিস শেখার জন্য আক্কেল-বুদ্ধির প্রয়োজন অতি সামান্য। আসলে প্রয়োজন গাধার খাটুনি। বাঙলায় বা অন্য যে-কোনো ভাষাতে শব্দ-ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করতে হলে বুদ্ধির প্রয়োজন কোথায়? 'পদ্ম' শব্দের প্রতিশব্দ 'কমল', 'সরোজ', 'পঙ্কজ' শিখতে হলে কাউকে মাইকেলের মতো মেধাবী হতে হয় না, প্রয়োজন হয় ঐ কর্মে রোজ লেগে থাকার। কারো মুখস্থ হয় এক দিনে, কারো লাগে তিন দিন। তফাৎ ঐটুকু মাত্র। স্বয়ং মাইকেলই নাকি বলেছেন, জিনিয়াসের ৯৯% পার্সাপরেশন, অর্থাৎ মাথার ঘাম পায়ে ফেলা, আর মাত্র এক পার্সেন্ট ইন্‌স্পিরেশন, অর্থাৎ বিধিদত্ত প্রতিভা।

শুধু মাত্র মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাইকেলের মতো কাব্য রচনা করা যায় না। কিন্তু নিছক খাটুনির জোরে যে কোনো ভাষার অন্ততঃ এতখানি আয়ত্ত করা যায় যে, দেশের ৯৯% লোক তাকে ঐ ভাষায় পণ্ডিত বলে মেনে নেয়।

এবং এই সোনার বাঙলার ৯৯% লোক খাটতে রাজী নয়। রেওয়াজ না করেই সে গাওয়াইয়া হয়ে যায়, নিত্য নবীন নাচ 'কম্পোজ' করতে থাকে।

কিন্তু সে-কথা থাক। পরানিন্দা বা আপন নিন্দা—আমিও তো বাঙালী বটি—করে আমি পুজোর বাজারে রসভঙ্গ করতে চাই নে। তাই মূল কথা আরম্ভ করি।

এই লিঙ্গোয়াফোন রেকর্ড পত্তনের প্রথম যুগে বার্নার্ড শ' চারটি বক্তৃতা দেন। সেগুলো কিনতে পাওয়া যায়। অতি সুস্পষ্ট উচ্চারণে সুমধুর ভাষণ। ব্যঙ্গ-কৌতুক, রস-সৃষ্টি, আর তথ্য-পরিবেশ তো আছেই।

কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলছেন,

"...হয়ত তুমি চালাক ছেলে। আমাকে শুধালে, তা হলে কি আমি সব সময় একই ধরনে কথা বলি?

"আমি সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকার করে নিচ্ছি, আমি কবি নে। কেউই করে না। এই তো এই মুহূর্তে আমি হাজার হাজার গ্রামোফোনওলাদের সামনে কথা বলছি, এদের অনেকেই আমার প্রত্যেকটি শব্দ, প্রত্যেকটি কথা প্রাণপণ বোঝবার চেষ্টা করছে। বাড়িতে আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে যে রকম বেখেয়ালে কথা কই, এখন যদি তোমাদের সঙ্গে সেরকমধারা কথা কইতে যাই, তা হলে এ রেকর্ডখানা কারো এক কড়ির কাজে লাগবে না; আর এখন তোমাদের সঙ্গে যে রকম সাবধানে কথা বলছি, সেরকম যদি স্ত্রীর সঙ্গে বাড়িতে বলি তা হলে তিনি ভাববেন আমার বদ্ধ পাগল হতে আর বেশী বিলম্ব নেই।

"জনসাধারণের সামনে আমাকে বক্তৃতা দিতে হয় বলে আমাকে সাবধান থাকতে হয় যে, বিরাট হলের হাজার হাজার লোকের শেষ সারির শ্রোতাও যেন আমার প্রত্যেকটি কথা পরিষ্কার শুনতে পায়। কিন্তু বাড়িতে ব্রেকফাস্টের সময় আমার স্ত্রী আমার থেকে মাত্র দু'ফুট খানেক দূরে বসে আছেন। তাই বেখেয়ালে এমন ভাবে কথা বলি যে, তিনি আমার কথার উত্তর না দিয়ে প্রায়ই বলেন, 'ও রকম বিড়বিড় করো না; আর দেখো, কথা বলার সময় অন্য দিকে ঘাড় ফিরিয়ো না। তুমি যে কি বলছো আমি তার কিছু শুনতে পাচ্ছি নে।' এবং তিনিও যে সব সময় সাবধানে কথা বলেন তা-ও নয়। আমাকেও মাঝে মাঝে বলতে হয়, 'কি বললে?'[১] আর তিনি সন্দেহ করেন যে, আমি ক্রমেই কালা হয়ে যাচ্ছি, অবশ্য তিনি সেটা আমাকে বলেন না। আমি সত্তর পেরিয়ে গিয়েছি—কথাটা হয়ত সত্যি।

"কিন্তু এ-বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহ নেই যে, রাজরাণীর সঙ্গে কথা বলার মতো আমি যেন আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা কই এবং তাঁরও বলা উচিত যেন তিনি রাজার

১ এখানে শ' ইচ্ছে করেই 'আই বেগ ইয়োর পাডন' কিংবা 'এক্সকিউজ মি' বলেন নি। ইঙ্গিত রয়েছে যে, বাড়িতে স্ত্রীকে আমরা পোশাকী আদবকায়দা দেখাই নে।

সঙ্গে কথা বলছেন। তাই উচিত; কিন্তু আমরা তা করি নে।

"আমাদের আদব-কায়দা দু'রকমের—একটা পোশাকী, অন্যটা ঘরোয়া। কোনো অপরিচিতের বাড়িতে গিয়ে যদি দরজার ফাঁক দিয়ে ওদের কথাবার্তা শোনো—অবশ্য আমি আদপেই বলতে চাই নে যে এরকম অভদ্র আচরণ তোমার পক্ষে আদৌ সম্ভব—কিন্তু তবু, ভাষা শেখার অত্যধিক উৎসাহে তুমি যদি কয়েক মুহূর্তের তরে এরকম অপকর্ম করে শোনো, পরিবারের লোক বাইরের কেউ না থাকলে আপোসে কি ধরনে কথা বলে এবং পরে যদি ঘরে ঢুকে ওদের কথা শোনো তাহলে তোমার সামনে ওদের কথা বলার ধরন দেখে রীতিমত অবাক হয়ে যাবে। এমন কি, আমাদের ঘরোয়া কায়দা-কেতা পোশাকী কায়দার মতো উত্তম হলেও—আসলে আরো ভালো হওয়া উচিত—তাদের মধ্যে সব সময়ই পার্থক্য থাকে এবং সে পার্থক্য অন্য সব কায়দা-কেতার চেয়ে কথাবার্তাতেই বেশী।

"মনে কর ঘড়িটাতে দম দিতে ভুলে গিয়েছি; ওটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কাউকে তা হলে জিজ্ঞেস করতে হয়, ক'টা বেজেছে? অপরিচিত কাউকে জিজ্ঞেস করলে বলবো, 'কটা বেজেছে, বলতে পারেন?' সে তখন প্রত্যেকটি কথা পরিষ্কার শুনতে পায়, কিন্তু যদি স্ত্রীকে ঐ কথাই শুধাই তবে তিনি সর্বসাকুল্যে শুনতে পান 'কটা বেচ্চে?' তাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট; কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞেস করলে ওরকম বললে চলবে না। তাই এখন তোমাদের সামনে কথা বলছি স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার চেয়ে অনেক বেশী সাবধানে! কিন্তু লক্ষ্মীটি, ওকে সেটি বলো না।"

* *

শ' কথাগুলি বলেছেন প্রধানত উচ্চারণ সম্বন্ধে। কারণ, তিনি রেকর্ডের মারফতে বিদেশীকে ভালো ইংরিজী উচ্চারণ শেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই নীতি যে 'আমরা সর্বত্রই একই উচ্চারণে কথা বলি নে', ভাষা সম্বন্ধে আরো বেশী প্রযোজ্য। শব্দ, ইডিয়ম, প্রবাদ ইত্যাদি আমরা সকলের সামনে একই ভাবে বাছাই করে প্রয়োগ করি নে।

শ্বশুর মশায়ের সামনে ঘাড় নিচু করে, হাত-পা দিয়ে বায়ু সমুদ্র মন্থন করা কিছুক্ষণের মত স্থগিত রেখে বলি,

'আজ্ঞে, রামবাবু বললেন, ঐ ব্যাপার নিয়ে আমি যেন দুশ্চিন্তা না করি।'

পিতাকে বলি, 'রামবাবু বললে, যাও, ও-কথা তোমাকে ভাবতে হবে না।'

রকের ইয়ারকে বলি, 'স্লা রেমোটা কি বললে জানিস্? বললে, "যা যা

ছোঁড়া, মেলা ভেঁপোমি করতি হবে না, আপন চরকায় তেল দে গে যা।" '

শ' সর্বোচ্চ উদাহরণ দিয়েছেন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে। সেটা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। তিনি যে তাঁর স্ত্রীকে সমঝে চলতেন, এমন কি ডরাতেনও, সে-কথা কারো অজানা নেই। আর ডরায় না কে? 'পঞ্চতন্ত্র' পড়ে দেখুন—বিষ্ণুশর্মার লেখাটা নয়, অন্য একজনের। লাইব্রেরী থেকে ধার করে নয়, কিনে। লোকটা অন্নাভাবে আছে।

তাই প্রশ্ন উঠবে, উপরের যে রিপোর্টটি পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করছে, সেটি যদি বউয়ের কাছে নিবেদন করি, তবে সেটা কি রূপ নেবে?

সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে, বউ কি শুনতে চান। তিনি যদি শুনতে চান, 'রামবাবু ঐ কাজের ভারটা আপন কাঁধে তুলে নিয়েছেন, আপনাকে তাই নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না, তাহলে তো আপনি নিশ্চিন্তো হয়ে গিয়ে তেরিয়া মেরে চড়াকসে বলবেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ গিন্নী, যা কয়েছো।" আমি যতই বলি, "রামবাবু, আপনাকে কিচ্ছুটি চিন্তা করতে হবে না। আমি সব বোঝা কাঁধে নিচ্ছি", তিনি ততই আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন, "না ভায়া, ও কাজ আমার—তোমাকে দেখতে হবে না।" কি আর করি? ওঁর হাতেই সব ছেড়ে দিয়ে এলুম।'

আর যদি গিন্নী উল্টোটা আশা করে থাকেন? অর্থাৎ আপনি যদি মিশনে ফেল মেরে এসে থাকেন? তাহলে? তাহলে 'ঈশ্বর রক্ষতু'।

গলা সাফ করে ইদিক-উদিক তাকিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, "—"

আবার বলছি তখন ঈশ্বর রক্ষতু। আমি আর কি বলবো। চল্লিশ বছর হল বিয়ে করেছি। এখনো সে ভাষা শিখতে পারি নি।

মূল কথায় ফিরে যাই।

এ তো হল কথাবার্তায়। সাহিত্যে এ জিনিসটি আরো প্রকট।

সেখানে কাকে উদ্দেশ করে লিখছেন সেটা তো আছেই, তার উপরে আছে বিষয়বস্তু।

কালীপ্রসন্ন সিংহ যখন মহাভারতের অনুবাদ করেছেন তখন ব্যবহার করেছেন সংস্কৃতশব্দবহুল ভাষা, কারণ বিষয়বস্তু এপিক, গুরুগম্ভীর। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় তিনি ব্যবহার করেছেন 'রকে'র ভাষা। কারণ সেখানে বিষয়বস্তু 'বেলেল্লাপনা', অতএব চটুল এবং সেই কারণেই 'মেঘনাদবধে'র ভাষা এক, 'একেই কি বলে সভ্যতা'র ভাষা অন্য। 'কৃষ্ণচরিত্রে'র ভাষা এক, 'কমলাকান্তে'র ভাষা অন্য।

এমন কি ধরুন, বিষয়বস্তুও এক, কিন্তু সেখানে পরিবেশ এবং পাত্র ভিন্ন বলে ভাষাও ভিন্ন হল। 'পারস্য ভ্রমণে' রবীন্দ্রনাথ কথা বলছেন ঐ দেশের অভিজাত সম্প্রদায়, গুণীজ্ঞানীদের সঙ্গে—তাই তার ভাষা এক এবং 'মরুতীর্থ-হিংলাজে'র পাত্রপাত্রী অতি সাধারণ জন—এমন কি রিফ্‌র্যাফ্‌—তাই তার ভাষা অন্য; 'মরুতীর্থ' 'পারস্যে'র চেয়ে ভালো না মন্দ সে-কথা উঠছে না। দুটোই রসসৃষ্টি, কিন্তু দুটো আলাদা জিনিস।

অর্থাৎ বিষয়বস্তু—কন্‌টেনট্‌—তার শৈলী এবং ভাষা—স্টাইল—নির্বাচন করে। সেখানে উল্টোপাল্টা করলে রসসৃষ্টি হয় না।

'বঙ্কিমের ভাষার অনুকরণ করবে'—ছেলেবেলা থেকেই সে উপদেশ শুনেছি এবং ধরে নিয়েছি সে ভাষা 'বাজসিংহ', 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষা।

ঐ ভাষা দিয়ে পাড়ার কানাই-বলাইয়ের কাহিনী লিখতে গেলে ফর্ম ও কন্টেন্টের যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তার ফলে বারে বারে তাল কাটে। শরৎ চাটুজ্জের প্রথম যৌবনের লেখাতে তার নিদর্শন প্রচুর পাওয়া যায়। প্রৌঢ় বয়সে তিনি তার আপন ভাষা পেয়ে বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাল রেখে অদ্ভুত তরলা শোনালেন।

এমন কি 'গোরা', 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা'র ভাষা দিয়ে 'কচিসংসদ' লেখা যায় না।

তাই রবীন্দ্রনাথ বা বঙ্কিমের অনুকরণ (ইমিটেশন) সহজেই হনুকরণ (এপিং) হয়ে যেতে পারে॥

আর্ট না অ্যাক্‌সিডেন্ট

আর্ট বলতে আমরা আজকাল মোটামুটি রস ই বুঝি। তা সে কাব্যে, চিত্রে, ভাস্কর্যে, সঙ্গীতে যে কোনো কলার মাধ্যমেই প্রকাশিত হোক না কেন।

এখন প্রশ্ন আর্ট বা রসের সংজ্ঞা কি? সে জিনিস কি? তার সঙ্গে দেখা হলে তাকে চিনব কি করে? অন্যান্য রস থেকে তাকে আলাদা করব কি করে? সবেস আর্ট কোন্‌টা আর নিরেসই বা কোন্‌টা?

প্রাচীন ভারত, গ্রীস এবং চীন—এই তিন দেশেই এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে এবং অধুনা পৃথিবীর বিদগ্ধ দেশ মাত্রেই এ নিয়ে কলহ-বিসংবাদের অন্ত নেই। বিশেষ করে যবে থেকে 'মডার্ণ আর্ট' নামক বস্তুটি এমন সব 'রস' পরিবেশন করতে আরম্ভ করলে যার সঙ্গে আমাদের কণামাত্র পরিচয় নেই।

এলোপাতাড়ি রঙের পোঁছকে বলা হল ছবি, অর্থহীন কতকগুলো দুর্বোধ শব্দ একজোট করে বলা হল কবিতা, বেসুরো বেতালা কতকগুলো বিদঘুটে ধ্বনির অসমন্বয় করে বলা হল সঙ্গীত। বলছে যখন তখন হতেও পারে, কিন্তু না পেলাম রস, না বুঝলাম অর্থ, না দিয়ে গেল মনে অন্য কোনো রসের ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিত। তাই বোধহয় হালের এক আলঙ্কারিক মডার্ণ ভাস্কর্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, যখন ভাস্কর এক বিরাট কাঠের গুঁড়ি নিয়ে তার উপর ছ'মাস ধরে প্রাণপণ বাটালি চালানোর পর সেটাকে কাঠের গুঁড়ির আকার দিতে পারেন, এবং নিচে লিখে দেন "কাঠের গুঁড়ি"—তখন সেটা 'মডার্ণ ভাস্কর্য'।

ইতিমধ্যে এই মডার্ণ আর্টের বাজারে একটি নূতন জীব ঢুকেছেন এবং সেখানে হুলস্থুল বাধিয়ে তুলেছেন—এর নাম অ্যাক্সিডেন্ট, বাঙলায় দুর্ঘটনা, দৈবযোগ, আকস্মিকতা যা খুশী বলতে পারেন।

এঁর আবির্ভাব হয়েছে সুইডেনের মতো ঠাণ্ডা দেশে—যেখানে মানুষ ঠাণ্ডাভাবে ধীরে-সুস্থে কথা কয়, চট করে যা-তা নিয়ে খামখা মেতে ওঠে না।

* *

সুইডেনের মহাসম্মানিত ললিত কলা আকাদেমির বিজ্ঞ বিজ্ঞ প্রফেসর, কলা-রসিক গুণীজ্ঞানীরা অকস্মাৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কর্ণমূলের পশ্চাদ্দেশ কণ্ডুয়ন করতে লাগলেন। তাঁদের মহামান্যবর প্রেসিডেন্ট তো খুদাতাল্লার হাতে সব-কিছু ছেড়ে দিয়ে সোজাসুজি বলেই ফেললেন, 'কি করি, মশাইরা, বলুন। কে জানত শেষটায় এ-রকমধারা হবে? আজকাল নিত্য নিত্যি এত সব নয়া নয়া এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে যে, কোন্‌টা যে এক্স পেরিমেন্ট আর কোন্‌টা যে অ্যাক্সিডেন্ট কি করে ঠাওরাই? আমরা ভেবেছি, চিত্রকর ফাল্‌স্ট্র্যাম্ আর্টের ক্ষেত্রে একটা অভিনব নবীন পন্থা আবিষ্কার করতে পেরেছেন এবং তাই ভেবে ঐ ছবিটাও এক্‌জিবিশনের অন্যান্য ছবির পাশে টাঙিয়ে দিয়েছি—'

ওদিকে আর্টিস্ট ফাল্‌স্ট্র্যাম্ রেগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সর্বত্র চেঁচামেচি করে বলতে লাগলেন, তাঁকে লোকচক্ষে হীন করার মানসে দুষ্ট লোক কুমতলব নিয়ে এই অপকর্মটি করেছে।

অপকর্মটি কি?

ফাল্‌স্ট্র্যাম্ ছবি আঁকার সময় একখানা ম্যাসনাইটের টুকরোয় মাঝে মাঝে তুলি পুঁছে নিতেন। কাজেই সেটাতে হরেক রকম রঙ লেগে থাকার কথা। ঐ সময়ে সুইডিশ ললিত-কলা আকাদেমি এক বিরাট মহতী এক্‌জিবিশনের ব্যবস্থা করেন—'স্বতঃস্ফূর্ত কলা (স্পন্টানিস্‌মুস বা Spontaneous art) ও

তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ' এই নাম দিয়ে সে চিত্রপ্রদর্শনীতে সুইডেন তথা অন্যান্য দেশের স্পণ্টানিস্‌মুস কলার উত্তম উত্তম নিদর্শন তাতে থাকবে। (ক্যুবিজম,, দাদাইজমের মতো স্পণ্টানিয়েজম-ও এক নবীন কলাসৃষ্টি পদ্ধতি—আমি অবশ্য এখানে সে প্রশ্ন তুলছি নে যে সার্থক কলাসৃষ্টি মাত্রই স্পণ্টানিয়াস বা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে থাকে,—বিশেষ পদ্ধতিকে এ নাম দিলে তাকে চেনবার কি যে সুবিধে হয় বোঝা কঠিন।)

এখন হয়েছে কি, আর্টিস্ট ফাল্‌স্ট্রোম্‌ তাঁর অন্য ছবি যাতে করে ডাকে যাবার সময় জখম না হয় সেই উদ্দেশ্যে ঐ রঙবেরঙের ম্যাসনাইটের টুকরোখানা তাঁর ছবির উপরে রেখে চিত্রপ্রদর্শনীতে পাঠিয়েছিলেন। আকাদেমির বড় কর্তারা ভাবলেন, এটাও মহৎ আর্টিস্টের এক নবীন মহান কলানিদর্শন এবং পরম শ্রদ্ধাভরে সেই ম্যাসনাইটের টুকরোটির নিচে আর্টিস্টের স্বনামখ্যাত নামটি লিখে ঝুলিয়ে দিলেন আর্টিস্টের অন্য ছবির পাশে।

ব্যাপারটা যখন ধরা পড়ল তখন আর্ট সমালোচকরা কি যে করবেন ঠিক করতে না পেরে চুপ করে গেলেন আর সুইডেনবাসী আপনার আমার মতো সাধারণজন মুখ টিপে হাসলে যে বাঘা বাঘা পণ্ডিতেরা ঐ 'স্বতঃস্ফূর্ত' রসিকতাটা ধরতে না পেরে ফাঁদে পা ফেলেছেন বলে।

কিন্তু এইখানে ব্যাপারটার গোড়াপত্তন মাত্র।

সুইডেনের কাগজে কাগজে তখন আলোচনা আরম্ভ হল এই নিয়ে: একখানা উটকো কাঠ জাতীয় জিনিসের উপর এলোপাতাড়ি রঙের ছোপকে যদি পণ্ডিতেরা আর্ট বলে মেনে নিতে পারেন তবে তাঁদের ঢাক ঢোল পেটানো এই মহাসাধনার 'মডার্ণ আর্টে'র মূল্যটা কি?

* *

ওইভিন্দ ফাল্‌স্ট্রোম্‌ সুইডেনের নামকরা তরুণ চিত্রকর। তিনি সম্প্রতি এই 'স্বতঃস্ফূর্ত কলা মার্গে' প্রবেশ করেছেন এবং কলা নির্মাণের ক্রমবিকাশে তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর ঢং একাধিকবার আগাপাস্তলা বদলিয়েছেন। সুইডেনে এখন এই 'কনক্রীট', 'স্থূল', বা 'বাস্তব' মার্গের খুবই নামডাক, এঁরা নিজেদের অনুভূতি স্বতঃস্ফূর্ত অনব্যবহিত ভাবে রঙের মারফতে প্রকাশ করেন—সে প্রকাশে কোনো বস্তু বা কোনো কিছুর প্রতিকৃতি থাকে না, কোনো কিছু রূপায়িত করে না, ছবির নাম পর্যন্ত থাকে না—এবং দর্শক তাই দেখে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে, সরাসরি আর্টিস্টের অনুভূতি বুঝে গিয়ে তার অর্থ করে নেয়,—কিংবা ঐ আশা করা হয়।

এই হল মোটামুটি তার অর্থ—অর্থাৎ অর্থহীন জিনিসকে যদি অর্থ দিয়ে বোঝাতে হয় তবে যে 'অর্থ' দাঁড়ায়।

ফাল্‌স্ট্রোম্‌ চিত্রপ্রদর্শনীতে দু'খানি ছবি পাঠাতে চেয়েছিলেন, এবং পূর্বেই বলেছি, সে দুখানি ছবি যাতে করে পোস্টাপিসের চোট না খায় তাই সঙ্গে সেই ম্যাসনাইটের টুকরো দিয়ে সেগুলোকে প্যাক্‌ করে তিনি চলে যান গ্রামাঞ্চলে ছুটি কাটাতে। এদিকে আকাদেমির বাঘ-সিঙ্গিরা ছবি তিনখানা (আসলে অবশ্য দুখানা) ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার নিরীক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে বাছাই করে নিলেন দু'খানা,—এবং তার মধ্যে মনোনীত হয়ে গেল তুলি পোঁছার সেই ম্যাসনাইটের পট্টি। ক্রিটিকদের কারোরই কাছে ঐ ম্যাসনাইটের 'অঙ্কিত' তুলিপোঁছা রঙ-বেরঙ করা জিনিসটির স্টাইল বা বিষয়বস্তু অদ্ভুত বা মূল্যহীন ঠেকে নি। তার অর্থ, একদিকে চিত্রকরের 'ন্যায়ত' 'ধর্মসঙ্গত' আঁকা ছবি ও অন্যদিকে তাঁর তুলি পোঁছার এলোপাথাড়ি রঙের ছোপ—এ দুয়ে কোনো পার্থক্য নেই।

তাই লেগেছে হুলস্থুল তর্কবিতর্ক, 'সে আর্ট তবে কি আর্ট যেখানে "ভুল" জিনিস অক্লেশে খাঁটি আর্ট বলে পাচার হয়ে যায়?'

এটা ধরা পড়ল কি করে? ফাল্‌স্ট্রোম্‌ ছুটি থেকে ফিরে একদিন স্বয়ং গিয়েছেন চিত্রপ্রদর্শনী দেখতে। সেখানে ঐ 'ম্যাসনাইট ছবি'র কাণ্ড দেখে যখন ভুলটা ধরা পড়ল তখন কোথায় না তিনি বিচক্ষণ জনের মতো চুপ করে থাকবেন—তিনি উল্টে আরম্ভ করলেন তুলকালাম কাণ্ড।

ফলে জ্ঞানগর্ভ পণ্ডিতমণ্ডলী, তীক্ষ্ণচক্ষু কলাসমালোচকদের দল, ঝানু ঝানু আর্টসংগ্রহকারিগণ, সরলচিত্ত সাধারণ দর্শক এবং সবশেষে নিজেকে আর তামাম ঐ 'স্বতঃস্ফূর্ত-কলা-পন্থী'কে বিশ্বজনের সম্মুখে তিনি হাস্যাস্পদ করে ছাড়লেন।

এর কয়েক বছর পূর্বে এক বিদগ্ধ বিদূষক চিড়িয়াখানার শিম্পাঞ্জীর 'আঁকা' একখানি 'ছবি' ঐ রকম এক চিত্রপ্রদর্শনীতে পাঠিয়ে শহরের লোককে বোকা বানিয়েছিল—তখনও কেউ ধরতে পারেন নি, ওটা বাঁদরের মস্করা।

কিন্তু প্রশ্ন, এই ধরনের তামাশা চলবে কতদিন ধরে? এই যে স্পণ্টানিস্টের দল, কিংবা অন্য যে-কোনো নামই এদের হোক—এরা আর কতদিন ধরে আপন ব্যবহার দিয়ে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় প্রকাশ করবেন যে এদের আর্ট কোনো কিছু সৃজন করার দুরূহ শক্তিসাধনায় আয়ত্ত নয়, আকস্মিক দৈবদুর্বিপাক বা অ্যাক্‌সিডেণ্ট বা ঘটনাচক্র এদেরই মতো উত্তম উত্তম ছবি আঁকতে পারে, শ্রেষ্ঠ গান গাইতে পারে, সার্থক কবিতা রচনা করতে পারে—এতদিন যা শুধু সরস্বতীর

বরপুত্রেরাই বহু সাধনার পর করতে পারতেন ?

এই প্রশ্নটি শুধিয়েছেন এক সরলচিত্ত, দিশেহারা সাধারণ লোক—সুইডেনের কাগজে।

উত্তরে আমরা বলি, কেন হবে না ? এক কোটি বাঁদরকে যদি এক কোটি পিয়ানোর পাশে বসিয়ে দেওয়া হয়, এবং তারা যদি এক কোটি বংশপরম্পরা ওগুলোর উপর পিড়িং পাড়াং করে তবে কি একদিন একবারের তরেও একটি মনোমোহন রাগিণী বাজানো হয়ে যাবে না ? সেও তো অ্যাক্সিডেন্ট !

আমার ব্যক্তিগত কোনো টীকা বা টিপ্পনী নেই। মডার্ণ কবিতা পড়ে আমি বুঝি না, আমি রস পাই না। সে নিয়ে আমার কোনো খেদ নেই। পৃথিবীতে যে অতশত ভালো জিনিস রয়েছে যার রসাস্বাদন আমি এখনো করে উঠতে পারি নি, ওগুলো আমার না হলেও চলবে।

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন

আমরা যারা বাল্য বয়স থেকে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের স্নেহচ্ছায়ায় বড় হয়েছি এবং আশ্রমবাসী সকলেই যাঁকে সেদিনও পর্যন্ত এখানকার সর্বজনপূজ্য আচার্যশ্রেষ্ঠ রূপে পেয়ে সঙ্কটের সর্বশ্রেষ্ঠ কাণ্ডারী ও আনন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী জেনে মনে মনে গভীর পরিতৃপ্তি অনুভব করতাম, আজ তাদের শোক সব চেয়ে বেশী।

ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং ভারতের বাইরে তাঁকে অসংখ্য লোক কত না ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। হয়ত তাঁদের অনেকেই আমাদের চেয়ে তাঁকে পূর্ণতররূপে দেখেছেন, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের এবং সমগ্রভাবে আশ্রমের সত্তাতে যে আঘাত লেগেছে তার কঠোরতা আজ এই প্রথম আমরা বুঝতে আরম্ভ করলুম। এতদিন আমাদের এমন একজন ছিলেন যিনি বিশ্বভারতীর কর্ম থেকে বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তারপরেও সেদিন পর্যন্ত তিনি আশ্রমবাসীদের সবাগ্রণীরূপে আমাদের মধ্যে ছিলেন। আশ্রমের দৈনন্দিন সমস্যাতে তাঁকে জড়িত করা হত না, কিন্তু তিনিই ছিলেন গুরুতর সমস্যাতে আমাদের সর্বোত্তম পথপ্রদর্শক।

এখানকার শিক্ষাভবনের (অর্থাৎ ইস্কুলের) শিক্ষকরূপে তিনি কর্মজীবন আরম্ভ করেন—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সেখানে তাঁর এই কর্মভার গ্রহণ যে উভয়ের পক্ষেই পরম শ্লাঘার বিষয়, সে-কথা দুজনেই জানতেন।

পরবর্তীকালে উত্তর বিভাগ বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে তিনি অধ্যাপক হলেন ও সর্বশেষে বিশ্বভারতী রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার পর তিনি উপাচার্যরূপে আশ্রম পরিচালনা করেন। 'উপাচার্য' শব্দ এখানে প্রয়োগ করাতে কেউ যেন ভুল না বোঝেন। এটি একটি রাষ্ট্রীয় অভিধা—বস্তুত তিনি আচার্যোত্তম ছিলেন। আমি বলতে পারি, পৃথিবীর যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রধান আচার্য রূপে পেলে ধন্য হত।

এবং এই তাঁর একমাত্র কিংবা সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়।

বস্তুত এরকম বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তি সর্বদেশেই বিরল। কেউ তাঁকে জানেন সংস্কৃত শাস্ত্রের পণ্ডিত রূপে, কেউ মধ্যযুগীয় সন্তদের প্রচারক রূপে, কেউ রবীন্দ্রপ্রতিভার সম্যক রসজ্ঞ ও টীকাকাররূপে, কেউ চৈনিক-ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারার্থী গবেষকরূপে, কেউ বাউল-ফকীরের গূঢ় রহস্যাবৃত তত্ত্বজ্ঞানের উন্মোচকরূপে, কেউ শব্দতত্ত্বের অপার বারিধি অতিক্রমণরত সন্তরণকারীরূপে কেউ সুখ-দুঃখের বৈদিকার্থে পুরোহিতরূপে, কেউ এই আশ্রমের অনুষ্ঠানাদিকে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যানুযায়ী রূপ দিবার জন্য উপযুক্ত মন্ত্র আহরণে রত ঋষি রূপে.—আমরা তাঁকে চিনেছি গুরুরূপে।

বিনয়বশত প্রকৃত গুণীজন তাঁর গুণ আচ্ছাদিত রাখেন, কিন্তু শিষ্যের কাছে তাঁর সর্বগুণ উন্মোচন করে দেন। তিনি সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন, অলঙ্কারশাস্ত্র তাঁর নখাগ্রদর্পণে ছিল এবং ভরতমম্মটসম্মত প্রাচীনতম আলঙ্কারিক সূত্র তিনি অতি সাধারণ, অতিশয় গ্রাম্য গীতিকাতে আরোপণ করে সে যে রসোত্তীর্ণ হয়েছে সে-কথা বার বার সপ্রমাণ করতে জানতেন। বৈদ্যসন্তান বৈদ্যরাজও ছিলেন। রন্ধনশাস্ত্রে তাঁর অনুরাগ ছিল। অভিনয়ে তিনি সুদক্ষ নট। ভারতের ঐক্যানুসন্ধানের পর্যটকরূপে চৈতন্য ও বিবেকানন্দের পরেই তাঁর নাম করতে হয়।

তাঁর আরো বহু গুণ ছিল। তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া আমার শক্তির বাইরে। আজ সেদিন নিশ্চয়ই নয়। এই এখন আমার কানে ভেসে আসছে ক্ষিতিমোহনের বিহারক্ষিতি শালবীথিকায় তাঁর স্মরণে শোকতপ্ত আশ্রমবাসিগণের সশ্রদ্ধ 'আগুনের পরশমণি' বৈতালিক গীতি।

* *

চিত্রে নন্দলাল। সঙ্গীতে দিনেন্দ্রনাথ। শাস্ত্রে বিধুশেখর। শব্দতত্ত্বে হরিচরণ। শিক্ষকতায় জগদানন্দ। রসে ক্ষিতিমোহন।

শুনেছি বিশ্বভারতী এঁদের সম্বন্ধে প্রামাণিক পুস্তক প্রকাশ করবেন। তার ভিতরই পাওয়া যাবে বিশ্বভারতীর নাতিসম্পূর্ণ ইতিহাস। এ কর্মে সংখ্যাতীত

শিষ্যের সহযোগিতার প্রয়োজন। আমি শুধু সেটুকু বলতে পারি যা স্বচক্ষে দেখেছি।

শাস্ত্র এবং রসালোচনায় রবীন্দ্রনাথের দুই বাহু ছিলেন বিধুশেখর এবং ক্ষিতিমোহন।

সকলেই আশা করেছিলেন কাশীর শাস্ত্রী ক্ষিতিমোহন সংস্কৃত চর্চায় যশস্বী হবেন। কিন্তু তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করে দিলেন বাঙলার জনবৈদগ্ধ্য চর্চায়। আজ আর মধ্যযুগের সন্তরা যে পৃথিবীর সর্বসন্তদের সমকক্ষ এ কথা নিয়ে কেউ তর্কাতর্কি করে না, এ দেশের আউল-বাউলরা যে সাধনার গভীরতম অতলে পৌঁছে প্রাচীন যুগের মুনি ঋষিদেরই ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন করেছিলেন সে-কথাও কেউ অস্বীকার করে না, এমন কি কোনো কোনো অর্বাচীন ঐ বিষয়ে বিরাট গ্রন্থ লিখে এখন সপ্রমাণ করতে চায় যে, সে ক্ষিতিমোহনকেও ছাড়িয়ে গেছে, তাঁর 'অসম্পূর্ণ' জ্ঞান 'সম্পূর্ণতর' করে দিয়েছে। বিরাটকায় ক্ষিতিমোহনের স্কন্ধে দাঁড়িয়ে বামনও হয়ত একটু বেশী দূর অবধি দেখতে পায় অস্বীকার করি নে, কিন্তু সে বামন ক্ষিতি-অতিকায়ের বিরাট মস্তিষ্ক আর বিরাটতর হৃদয় পাবে কোথায়! তবে আজ এই বিতর্কমূলক প্রস্তাব (অবশ্য আমার কাছে নয়) উত্থাপন করব না—আজ শোকের দিন।

এবং সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ক্ষিতিমোহন আউল-বাউল গান নিয়ে আলোচনা করার সময় যে পদ্ধতি অবলম্বন করলেন সেটি সম্পূর্ণ শাস্ত্রচর্চা পদ্ধতি। অর্থাৎ উপনিষদ বা গীতার টীকা লেখার সময় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যে রকম অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাঠোদ্ধার করেন, অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেন, ঐ সব শাস্ত্রের মূল উৎসের অনুসন্ধান করেন, ঠিক সেই পদ্ধতিতে তিনি আউল-বাউলের 'শাস্ত্র' অধ্যয়ন করে, টীকা লিখে তাদের জীবনদর্শন অধ্যাত্মদর্শন লোকচক্ষের সামনে তুলে ধরলেন।

এই কর্মে লিপ্ত হয়ে ক্ষিতিমোহন দেখতে পেলেন, আউল-বাউলের মূল উৎস যে শুধু বেদ উপনিষদ গীতা ভক্তিবাদে রয়েছে তা নয়, তার সঙ্গে মিলে গিয়েছে মুসলিম সুফীবাদ। তিনি তারই অনুসন্ধানে সুফীবাদের এমনই গভীরে পৌঁছলেন যে, বহু সুপণ্ডিত সুফী পর্যন্ত আশ্চর্য হলেন যে, সুফী আবহাওয়ার এত দূরে থেকে এই লোকটি একে আপন প্রাণ-নিশ্বাসে ভরে নিল কি করে? রামমোহনকে যদি বলা হয় জবরদস্ত মৌলবী, এঁকে তাহলে বলতে হয় 'খবরদস্ত'—বা 'খবর্-দার-সুফী'। পূব বাঙলার অনাদৃত মুসলিম চাষীকে ক্ষিতিমোহন ছেলেবেলা থেকেই অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন—তিনি প্রমাণ করলেন তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা কুরান ও

সুফীবাদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত এবং আশ্চর্য প্রাণশক্তিবলে সে তার চতুর্দিকের ভিন্ন সাধনাও আপন করে নিতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, হিন্দু সাধকের কাছে সে ঋণীও বটে, উত্তমর্ণও বটে। এবং সর্বশেষে সপ্রমাণ করলেন, হিন্দু মুসলমান সাধনার মিলন হয়েছে এই 'চাষাভুষো'দের কল্যাণেই—মৌলভী ভশ্‌চাযে যে ভাবনা-সাধনার আদান-প্রদান অতি অল্পই হয়েছে সেটা পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

গণসাধনাব প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা গভীরতর হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিন্দু ক্রিয়া-কর্মের দিকে আকৃষ্ট হলেন। 'মেয়েলী' বলে আমরা যে সব পালপার্বণ ব্রত-পূজা অবহেলা করে আসছিলুম সেগুলো একটি একটি করে বিশ্লেষণ করে তিনি দেখাতে লাগলেন যে, এগুলোব ভিতরও অতি প্রাচীন ঐতিহ্য লুকোনো রয়েছে, এব অনেকগুলোই চলে যায় আমাদের ধর্মানুসন্ধানের প্রাচীনতম যুগে। সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ করলেন যে, আমাদের অনেকগুলোই আবার আমাদের প্রতিবেশী 'অনার্য'দের কাছ থেকে নেওয়া।

সে এক বিপরীত দর্পণ! আমরা যে সব পালপার্বণকে ভেবেছিলুম অতিশয় খানদানী 'আর্য', ক্ষিতিমোহন প্রমাণ করলেন তার অনেকেই 'অনার্য' এবং তথাকথিত 'অনার্য' ক্রিয়াকর্মের মূল রয়েছে নৈকষ্য আর্যসাধনার গভীরে।

এর সব-কিছুই প্রেমী গবেষককে নিয়ে যায় ভারতবর্ষের ধর্মানুপ্রাণিত দর্শন-চর্চায়—কাবণ একমাত্র দর্শনশাস্ত্রই বহুর বাহ্যরূপ উন্মোচন করে অন্তরের ঐক্য দর্শন করাতে পারে। সেখানে তিনি পেলেন জ্ঞানী দ্বিজেন্দ্রনাথের[১] উপদেশ এবং সহযোগিতা—গুণী রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য যে তিনি অহরহ পেতেন সে জানা-কথা

১ এই ঋষি সম্বন্ধে বাঙলা সাহিত্যে প্রায় কোনো আলোচনাই হয় নি। এ যুগে এঁব ভগবৎ-উপলব্ধি তুলনাহীন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অদ্বিতীয় দার্শনিক ছিলেন। ক্ষিতিমোহনের সঙ্গে এঁর যোগ হওয়াতে উভয়েই প্রচুর লাভবান হয়েছিলেন। নিম্নে ক্ষিতিমোহনকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের একখানি চিঠি ক্ষিতিমোহনেব পুত্র শ্রীমান ক্ষেমেন্দ্রের অনুমতি নিয়ে উদ্ধৃত করছি:

"হিরাক্লিটসের প্রকল্পিত অগ্নিব্রহ্মবাদের গোড়ার বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আপনার বিচারে যাহা সত্য বলিয়া মনে হয়, তাহা আমাকে ব্যক্ত করিয়া বলুন, এইটে আমি লিখিতে ইচ্ছা করি।

প্রবর্তিত না বলিয়া প্রকল্পিত বলিলাম এইজন্য যেহেতু হিরাক্লিটসের মত জনসাধারণের মধ্যে প্রচারযোগ্য নহে—তাহা একটা তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধান্ত মাত্র।

পূর্বেই নিবেদন করেছি। এরই ফলে তিনি আবিষ্কার করলেন যে, আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন ক্রিয়াকাণ্ড, যোগ ও তন্ত্রের রহস্যবাদ ও দর্শনের মূল তত্ত্বে রয়েছে একই নির্দ্বন্দ্ব সত্য।

এই সত্যের ভানুমতী-দণ্ড হাতে নিয়ে ক্ষিতিমোহন প্রবেশ করলেন হীনযান, মহাযান এবং তারই ভিন্ন ভিন্ন তান্ত্রিক যান, নেপাল-তিব্বত-চীনের ভিন্ন ভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মজগতের ভিতর। সেই এক সত্য কখনো বৌদ্ধদর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তাধারায়, তন্ত্রের বিকৃত কর্মকাণ্ডের পিছনেও সেই সত্য ভস্মাচ্ছাদিত, সেই সত্যই চর্যাপদে, সেই সত্যই পূর্ববঙ্গের লোকসঙ্গীতে, পশ্চিমবঙ্গের আউল-বাউলের গানে কখনো স্বপ্রকাশ, কখনো শাস্ত্রানধিকারীর উৎপাতে লুক্কায়িত—কখনো সরলতম ভাষায় স্বচ্ছ, কখনো রহস্যাবৃত রূপকে আস্বচ্ছ কুহেলিকাঘন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পাবে, এতে আর এমন নূতন কথা কি? আমরা তো চিরকালই স্বীকার করে এসেছি, সর্বধর্মেই সত্য সমাহিত।

সত্যই কি আমরা তা জীবনে স্বীকার করেছি? ধর্মের বাহ্যরূপে যে বিকট বিকট প্রভেদ অহরহ দেখতে পাচ্ছি, সে কি যুগ যুগ ধরে আমাদের ভিতর দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি করে নি? না হলে চৈতন্য, রামমোহন, রামকৃষ্ণের কি প্রয়োজন ছিল?

দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং ক্ষিতিমোহন এঁদের মতো ধর্মসংস্কারক ছিলেন না। এঁদের প্রধান কর্ম ছিল, যুগ যুগ সঞ্চিত আমাদের ঐতিহ্যের ধন যার প্রায় সব-কিছুই আমরা দৈনন্দিন জড় অভ্যাসের ফলে সম্পূর্ণ অবহেলা করে বসে আছি, সাধনাবিহীন মন্ত্রতন্ত্রই সর্বপাপহর বলে বিশ্বাস করে বসে আছি, মুখে 'সর্বভূতে নারায়ণ', কর্মে সে 'নারায়ণ'কে ডোম-চণ্ডালের কলুষতার ভয়ে সমাজ থেকে দূরে ঠেলে রেখেছি, স্বর্গে-পর্গে, ধর্মে-অধর্মে প্রভেদ করার শক্তি প্রায়

'প্রকল্পিত' অপেক্ষা আরো বেশী সঙ্গতমাফিক বিশেষণ আমাকে দিতে পারেন তো ভালো হয়।

'অগ্নিব্রহ্ম-বাদ' হয় কি না? এরূপ একটি কথা চলিতে পারে কি না—তাহাতে কি বুঝায়?

'প্রকল্পিত' ইহার পরিবর্তে মনোভিমত, প্রস্তাবিত, উপন্যস্ত—এ তিনটির কোনোটি খাটে না। যেহেতু তাহা শুধু মনোভিমত বা প্রস্তাবিত বা উপন্যস্ত নহে। কাশীর পণ্ডিতেরা এরূপ স্থলে কিরূপ তান্ত্রিক ভাষা ব্যবহার করেন?

এই বিষয়ে উচিতানুচিত আমাকে লিখিয়া পাঠান।"

হারিয়ে ফেলেছি—এই নিদারুণ অবস্থায় আমাদের দৃষ্টি সেই সত্যের দিকে আকৃষ্ট করা যে-সত্য আমাদের হাতের কাছেই আছে,—লালন ফকীরের ভাষায়—

"হাতের কাছে—পাইনে খবর
খুঁজতে গেলেম দিল্লী শহর—!"

যাকে চাইলেই পাওয়া যায়।

ক্ষিতিমোহনের প্রধান কর্ম ছিল, সমাজের তথাকথিত নিম্নতম সম্প্রদায়েও যে সে সত্য যুগপৎ লুক্কায়িত ও উদ্ভাসিত আছে, তারই দিকে তথাকথিত শিক্ষিত জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। মধ্যযুগের সন্তদের নিয়ে তিনি তাঁর সাধনা আরম্ভ করে নিচের দিকে নেমে এলেন আউল-বাউলে এবং সেখানে যে সব মণিমুক্তা পেলেন, তাদের প্রাচীনত্বের সন্ধানে উপরের দিকে গেলেন বেদ-উপনিষদে। এই অবিচ্ছিন্ন তিন লোকে তাঁর গমনাগমন গতিধারা ছিল অতিশয় স্বতঃস্ফূর্ত আয়াসহীন। এটা পণ্ডিতজন-দুর্লভ—ধর্মলোকে বিধিদত্ত স্পর্শকাতরতা না থাকলে এ জিনিস সম্ভবে না।

ক্ষিতিমোহন পথ প্রদর্শন করার পর আরো অনেকেই আউল-বাউল নিয়ে চর্চা করেছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ক্ষিতিমোহন একক।

তার কারণ ক্ষিতিমোহনের এমন একটি গুণ ছিল যা এ যুগে আর কারও ছিল না—আমার অভিজ্ঞতায় পৃথিবীর কুত্রাপি আমি এ গুণটি দ্বিতীয় জনে দেখি নি।

কঠিনতম জিনিস সরল ভাষায় মধুর রূপে প্রকাশ করার অলৌকিক 'খুদা-দাদ্'-বিধিদত্ত ইন্দ্রজাল-শক্তি।

ক্ষিতিমোহন লিখেছেন যতখানি, বলেছেন তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী। কারণ তিনি জানতেন পুস্তক সর্বগামী নয়, লিখিত অক্ষরের শক্তি সীমাবদ্ধ।

বিদ্যালয়ের অজাতশ্মশ্রু বালক থেকে আরম্ভ করে শুভ্রকেশ বৃদ্ধ, অভ্যাগত-রবাহূত সকলকে, সভাস্থলে, বন্ধুসমাগমে, ট্রেনে-জাহাজে, হিমালয়ের চটিতে, নর্মদার পারে পারে, দেশে-বিদেশে তিনি যেখানেই থেকেছেন, যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই তিনি এই অভূতপূর্ব বাচনভঙ্গী দ্বারা তাঁর বক্তব্য নিবেদন করে সকলকেই মুগ্ধ করেছেন। শত শত লেখক হাজার হাজার গম্ভীর পুস্তক লিখেও যা করতে সক্ষম হবেন না, কথকসম্রাট ক্ষিতিমোহন একাই তা করে গেছেন তাঁর খুদা-দাদ্ এই সওগাতের দৌলতে।

সবিনয় নিবেদন করছি, আচার্য ক্ষিতিমোহনের বহুমুখী কর্ম এবং চিন্তাধারার সম্যক বিশ্লেষণ আমার সীমাবদ্ধ শক্তির বাইরে। যে-টুকু আছে তাও শোকাচ্ছন্ন।

তবু আশ্রমবাসী, তাঁর শিষ্যরূপে তাঁরই স্মরণে তাঁর অসংখ্য অনুরাগী পাঠক ও শ্রোতাদের উদ্দেশে এই কথা কয়টি নিবেদন করি।

আমার অক্ষমতম রচনাও তাঁর স্নেহাশীর্বাদ লাভ করত। পুণ্যলোক থেকে আগত তাঁর সে আশীর্বাদ থেকে আমার এ দান শ্রদ্ধাঞ্জলি অকিঞ্চন গুরুদক্ষিণা বঞ্চিত হবে না—এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

॥ শেষ ॥

শৈলজানন্দ রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৮

সম্পাদক
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
সুমথনাথ ঘোষ
সবিতেন্দ্র নাথ রায়
মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা
চুনী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ
সিল্ক স্ক্রীন ও
চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস এন রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ শশী প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে অশোক কুমার ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

ভূমিকা — সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় — [ক]

টুনি মেম

টুনি মেম ... ৩
এক পুরুষ ... ২২
কবিরাজ চেখফ ... ৬৬
॥ দুলালী ॥ ... ৭২
(দুলালীর সমালোচনা) ... ৮৫
আন্তন চেখফের "বিয়ের প্রস্তাব" ... ৯০
উল্টা রথ ... ১০৫
ওঘাটে যেও না বেউলো ... ১১২
সুখী হবার পন্থা ... ১১৭
বিষের বিষ ... ১২০
রাজহংসের মরণগীতি ... ১২৫
হিটলার ... ১৩৩
নব-হিটলার ... ১৩৭
শাঁসালো জর্মনি ... ১৪০
দশের মুখ খুদার তবল ... ১৪৪
হাসির অ-আ, ক-খ ... ১৪৭
হাসি-কান্না ... ১৫৪
রসিকতা ... ১৫৭
নানাপ্রশ্ন ... ১৬২
জাতীয় সংহতি ... ১৬৭
ভারতীয় সংহতি ... ১৭০
ভাষা ... ১৭৩
ভ্যাকিউয়াম ... ১৭৫
ধর্ম ... ১৭৯
ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা ... ১৮২
ধর্ম ও কম্যুনিজম ... ১৮৫
এক ঝাণ্ডা ... ১৮৮
"রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না ?" ... ১৯১
ওয়ার এম ... ১৯৪
দ্য গল্ ... ১৯৮
তলস্তয় ... ২০৩
প্রিন্স গ্রাবিয়েলে দান্নুন্দ্জিয়ো ... ২০৬

খৈয়ামের নবীন ইরানী সংস্করণ ... ২১১
"ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার/সম্মুখে ঘন আঁধার" ... ২১৫

রাজা উজীর

হিটলারের প্রেম ... ২২৩
পূর্ণপ্রেম ... ২৩৪
গেলীর প্রবেশ ... ২৩৯
গেলীর আত্মহত্যায় হিটলারের শোক ... ২৫৯
লক্ষ মার্কের বরমান ... ২৬৬
কনরাট্ আডেনাওয়ার ... ২৭২
বিদ্রোহী ... ২৮৬
প্রোটকল ... ২৯০
পপ্লারের মগডালে ... ৩০১
হাতে কমণ্ডলু, মাথায় তুর্কী টুপি ... ৩০৮
ভূতের মুখে রাম নাম ... ৩১২
শিলা জলে ভাসি যায়/বানরে সঙ্গীত গায় ... ৩১৭
'অভাবে শয়তানও মাছি ধরে খায়' ... ৩২২
"—ন্যাংটাকে ভগবানও ডরান—" ... ৩২৬
ল্যাটে ... ৩৩০
আঁদ্রে জিদ ... ৩৩৩
আড্ডা ... ৩৩৬
পাসপরট্ ... ৩৪১
আড্ডা-পাসপরট্ ... ৩৪৫
'ঈস্ট্ ইজ্ ঈস্ট্ অ্যান্ড্—' ... ৩৫১
বিষবৃক্ষ ... ৩৫৪
"দুঃখ তব যন্ত্রণায়" ... ৩৫৭
সাঙ্গ হয়েছে রণ—' ... ৩৬৩
জেরুসলেম ... ৩৬৭
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর ... ৩৭১
রোদন প্রাচীন ক্লাগে মাত্তার ... ৩৭৫
অল্পে তুষ্ট ... ৩৭৯
ভঙ্গ বনাম কুলীন ... ৩৯১
অর্থমর্থম ... ৩৯৫
আবার আবার সেই কামান গর্জন ... ৪০১
প্রেম ... ৪১৭
গ্রন্থ-পরিচয় ... ৪২১

ভূমিকা

আমাদের ছেলেবেলা থেকেই এরকম ধারণা ছিল যে ভাষায় গুরু-চণ্ডালি মেশামিশি হলে সেটা একটা খুব দোষের ব্যাপার। ভাষাকে শুদ্ধ রাখার জন্য বঙ্কিমের আমল থেকেই এরকম একটা শমন জারি হয়েছিল।

আসলে কোনটা যে গুরু ভাষা আর কোনটা যে চণ্ডালি ভাষা সে সম্পর্কে স্পষ্ট আলাদা কোনো সীমারেখা কেউ টানতে পারেনি এ পর্যন্ত। এককালে সাধু ক্রিয়াপদ এবং চলতি ক্রিয়াপদের একটা ব্যবধান ছিল। এখন সাধু ক্রিয়াপদ প্রায় লুপ্তই বলা যায়—অন্তত সাহিত্যে। আবার, রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর অত্যন্ত পরিশীলিত নায়ক নায়িকার মুখে করিনে, পারিনে, যাইনে, কিংবা বললেম, করলেম, গেলেম—এইরকম ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন, তখন আমরা খেয়াল করিনি, ওগুলি আসলে বীরভূমের গ্রাম্যভাষা থেকে নেওয়া।

এখন আমরা জেনেছি, ভাষা বহতা নদীর মতন। যদি তার স্বাস্থ্য ভালো থাকে, তা হলে যেখান থেকে যাই-ই সংগ্রহ করুক, কিছুতেই তার অঙ্গে মলিনতার স্পর্শ লাগে না। এই ব্যাপারটি আমাদের সবচেয়ে স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন সৈয়দ মুজতবা আলী। এই দিক থেকে তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর সার্থক উত্তরাধিকারী। সৈয়দ মুজতবা আলীর ভাষাশিল্প সম্পর্কে গভীর আলোচনা হওয়া উচিত। আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তিদের ওপর সে ভার রইলো।

আলী সাহেব বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে অসংখ্য ছোট ছোট লেখা লিখেছেন, সেগুলির সাধারণ নাম দেওয়া হয়েছে রম্যরচনা। আমার মতে, এই নামটি খুবই ভুল। তিনি যা লিখেছেন, সেগুলি আসলে প্রবন্ধ। যেহেতু সেগুলি আমাদের পড়তে ভাল লাগে, কিংবা মজা পাই, কখনো একলা একলা হেসে উঠি, তাই কি ওগুলো প্রবন্ধ হতে পারবে না?

এক সময় ঠাট্টা করে বলা হতো, যে লেখা পড়লে কিছুই মানে বোঝা যায় না, তারই নাম আধুনিক কবিতা। সেই রকমই, এক সময় এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, যখন, যে-লেখা পড়তে ইচ্ছেই করে না, তারই নাম ছিল প্রবন্ধ। সৈয়দ মুজতবা আলীই প্রবন্ধকে সেই অকাল মৃত্যুদশা থেকে বাঁচিয়েছেন। তিনি অন্তত এক-শোটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে, অন্তত সাতটি ভাষা সেঁচে যে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন, তা-ই বিতরণ করেছেন তাঁর রচনায়। এগুলি প্রবন্ধ ছাড়া আর কি? তাঁর অনেক বক্তব্য সম্পর্কে মতান্তর আছে, তাতে কি আসে যায়? কোন প্রাবন্ধিক অমোঘ বাক্য উচ্চারণ করতে পারেন? তাঁর রচনার পর থেকেই, তথাকথিত প্রাবন্ধিকদের দুর্বোধ্য, কষ্টকল্পিত বাক্যের রচনা পাঠকরা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। যথার্থ পণ্ডিতরাও এখন আস্তে আস্তে বুঝতে পারছেন, শুধু নিজের বিষয়ের ওপর দখল থাকাই বড় কথা নয়, সাবলীল ভাষায় তা প্রকাশ করতে না জানলে লেখক হওয়া যায় না।

বিচারপতির মতন একটা উঁচু জায়গায় বসে থাকবেন লেখক, আর সেখান থেকে পাঠকদের উদ্দেশে জ্ঞান কিংবা উপদেশ দান করবেন, সাহিত্যের এই ভূমিকা এখন আর নেই। সারা পৃথিবীতেই পাঠকরা এখন সাহিত্যিককে গুরু হিসেবে দেখতে চায় না, বন্ধু হিসেবে চায়। সেই দিক থেকে আলী সাহেব ছিলেন সমস্ত শ্রেণীর পাঠকদের বন্ধু। তাঁর ভাষা যেন অবিকল আড্ডার ভাষা। আমরা কখনো কখনো তাঁর সাহচর্য বা সঙ্গ পেয়েছি। তিনি আমাদের চেয়ে জ্ঞানে, গুণে, প্রতিষ্ঠায় এবং বয়েসে অনেক বড় ছিলেন। কিন্তু ঘরে ঢোকা মাত্রই তিনি যেই 'এসো ব্রাদার' বলে ডাক দিতেন, অমনি আমরা তাঁর সমসাময়িক হয়ে যেতাম। তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। এমন বহু বিষয়ের অবতারণা করতেন, যা আমরা আগে কখনো শুনিনি। অথচ তাঁর পাণ্ডিত্যের মধ্যে কোনো রকম দম বন্ধ করা আবহাওয়া ছিল না। মুহুর্মুহু হাসিতে ঘর ফেটে যেত, কখনো চোয়ালে ব্যথা হয়ে যেত আমাদের। তাঁর জানা প্রত্যেকটি বিষয়েই নিশ্চিত আরও অনেক বড় বড় পণ্ডিত আছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে, অগাধ পণ্ডিতের চেয়ে এরকম খোলামেলা পণ্ডিত হওয়া অনেক ভালো।

আমাদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল, কিন্তু এমন আরও হাজার হাজার পাঠক নিশ্চিত আছে, যারা সৈয়দ মুজতবা আলীকে কখনো চোখেও দেখেনি। সেই সব পাঠকরাও তাঁর লেখার মধ্যে পেয়েছে দরাজ বন্ধুত্বের আহ্বান। পত্র পত্রিকা খুলে প্রথমেই যাঁর লেখা পড়তে ইচ্ছে করতো, তিনিই মুজতবা আলী। এবং এই আকর্ষণ তিনি প্রায় তাঁর মৃত্যু-বছর পর্যন্ত বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

যাঁরা হাস্যরসাত্মক রচনা লেখেন, তাঁদের একটি বিশেষ গুণ নিশ্চিত থাকা দরকার। আমাদের দেশে অনেকেই এটা জানেন না বলেই আমাদের সরস সাহিত্যের শাখাটি এত দুর্বল। সেই গুণটি হলো নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করার ক্ষমতা। সামান্য একটু আত্মম্ভরিতা কিংবা স্বপ্রচারে হাস্যরস একেবারে চুপসে যায়। সৈয়দ মুজতবা আলীর কোনো লেখাতে এর বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। একবার এক জার্মান পণ্ডিত তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, শেক্সপীয়রের কোন্ রচনাটি তাঁর সবচেয়ে ভালো লাগে। আলী সাহেব উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যামলেট। সঙ্গে সঙ্গে যোগ করেছিলেন, শেক্সপীয়রের ঐ একটাই বই আমি পড়েছি কি না! এই শেষের বাক্যটি বলার মতন বুদ্ধি কিংবা রসিকতা-বোধ যে-সে লোকের থাকে না।

এক জায়গায় তিনি নিজের চেহারা সম্পর্কে এই রকম বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

"আমার ছবি তুলতে গিয়ে তাদের তিনখানা লেনস্ বার্স্ট করলো। আমার শ্যাটারিং সৌন্দর্য সইতে না পেরে।...

"ফোটো হলো না। অইল পেণ্টিং-ওলা বলেন, কালো হলেও চলতো তা সে মিশই হোক না। কিন্তু এ যে বাবা খাজা রঙ। কালো কালির ওপর পিলা মসনে। তার উপর কলাইয়ের ডালের পিছলে পারা, না-সবুজ, না-নীল, না-কিছু। আমার প্যালেট লাটে।"

এই বর্ণনা পড়ার পর পাঠক একবার সৈয়দ মুজতবা আলীর যৌবন বয়েসের ছবি মিলিয়ে দেখুন।

আলী সাহেব সর্বাধিক পরিচিত তাঁর সরস প্রবন্ধগুলির জন্যই। উপন্যাস বা গল্প খুব বেশী লেখেননি। যে-কটি লিখেছেন, তাতেই প্রমাণিত হয়েছে, চরিত্র সৃষ্টি এবং কাহিনী নির্মাণে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। এবং আর একটি বিস্ময়কর ব্যাপার, তাঁর ছোট ছোট লেখাগুলিতে প্রচুর হাস্যরস থাকলেও, তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস এবং গল্পে করুণ রসই বেশী। শবনম্ উপন্যাস পড়তে পড়তে যে অনবরত চোখের জল মোছে না, সে পাষণ্ড ছাড়া আর কিছুই না। কয়েকটি গল্পের কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। সেই যে গল্পে আছে পূর্ব-বঙ্গের এক ছোট স্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিতমশাইয়ের কথা। লাটসাহেবের পরিদর্শন উপলক্ষে যে পণ্ডিতমশাইকে জীবনে প্রথম জামা গায় দিতে হয়েছিল। লাট-সাহেবের প্রিয় কুকুরটির ছিল একটি পা কাটা। সেই কুকুরের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ শুনে পণ্ডিতমশাই হিসেব করেছিলেন, তিন-ঠেঙে কুকুরের প্রতিটি পায়ের জন্য যা খরচ হয় তার থেকে কম খরচে তাঁকে আটজনের একটি সংসার কি করে চালাতে হয়। গল্পটির নাম মনে নেই, কিন্তু এইসব গল্পই সারা জীবন মনে রাখে। কিংবা সেই শিলেটি খালাসীটির কাহিনী, যে দেশের স্ত্রী এবং জাহাজের চাকরি পরিত্যাগ করে মেম বিবাহ করে আত্মগোপন করে আছে। লেখক গিয়ে ছিলেন তাকে ফিরিয়ে আনতে কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রী এবং শিশুদের দেখে মুখ ফুটে বলতে পারলেন না সেকথা। আশ্চর্য করুণ মধুর সে কাহিনী।

আমাদের দুঃখ এই, ঢিলেঢালা স্বভাব বা আলস্যের জন্য তিনি দীর্ঘ কাহিনী বেশী লিখে যেতে পারেননি। তাতে ক্ষতি হয়েছে বাংলা সাহিত্যেরই। আমার সবচেয়ে বেশী দুঃখ লাগে, বিশেষ একটি রচনার কথা ভেবে। এটির নাম 'এক পুরুষ'। এটির মধ্যে একটি মহৎ উপন্যাসের সম্ভাবনা ছিল। সিপাহী যুদ্ধের শেষে একজন দিল্লীবাসী মুসলমান সুবেদার আত্মগোপন করে রইলেন বীরভূমের এক গ্রামে, বৈষ্ণবের ছদ্মবেশে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের নামে আমাদের দেশে প্রচুর অখাদ্য লেখা হয়েছে। আলী সাহেবের কাছ থেকে আমরা একটি সার্থক লেখা পেতে পারতাম। তা ছাড়া, আর একটি বিরাট সম্ভাবনাও ছিল। সাধারণত হিন্দু লেখকদের রচনায় মুসলমান চরিত্র থাকে না, মুসলমান লেখকদের লেখায় থাকে না হিন্দু চরিত্র—প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবেই। আলী সাহেব দুই সমাজকেই জানতেন খুব ভালো ভাবে, দু'দিকের শাস্ত্র-ধর্মগ্রন্থই পড়েছেন খুব মন দিয়ে। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সমাজের সার্থক রূপায়ণ তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল।

কিন্তু "এক পুরুষ" নামের কাহিনীটি তিনি হঠাৎ দুম করে থামিয়ে দিলেন। এটা অন্যায় ছাড়া আর কিছুই না। নিজের সাফাই গাইলেন এইভাবে; এখানেই 'এক পুরুষ' শেষ।

"বইখানা তিন-পুরুষে সমাপ্ত করার বাসনা ছিল; কিন্তু আমার গুরুই যখন 'তিন পুরুষ' লিখতে গিয়ে এক পুরুষে সমাপ্ত করে সেটিকে 'যোগাযোগ'

নাম দিলেন, তখন যাঁর কৃপায় 'মূক বাচাল হয়' তাঁরই কৃপায় এস্থলে বাচাল মূক হল।" এটা কি স্রেফ অলস লোকের কু-যুক্তি নয় ?

যাই হোক, ক্ষোভ বা অভিমান করে আর কি হবে ! তাঁর রচনা যতখানি পেয়েছি, তাও তো অমূল্য। এমন রচনা পৃথিবীর যে কোনো ভাষাতেই দুর্লভ। আমাদের বাংলা ভাষাতেই তিনি লিখে গেছেন, এজন্য আমরা গর্ব করতে পারি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

টুনি মেম

শ্রীমতী ডাক্তার শ্রীলা ঘোষের

করকমলে—

টুনি মেম

বেশী দিনের কথা নয়, হালের। পড়িমড়ি হয়ে শেয়ালদায় আসাম লিঙ্কে উঠেছি। বোলপুরে নাববো। কামরা ফাঁকা। এককোণে গলকম্বল মান-মুনিয়া দাড়িওলা একটি সুদর্শন ভদ্রলোক মাত্র। তিনি আমার দিকে আড়নয়নে তাকান, আম্মো।

একসঙ্গেই একে অন্যকে চিনতে পারলুম।

আমি বললুম, 'খান না রে?'

সে হাঁকলে, 'মিতু না রে?'

যুগপৎ উল্লম্ফন, ঘন ঘন আলিঙ্গন। পাঠশালে পাশাপাশি বসতুম। তারপর এই তিরিশটি বচ্ছর পরে দেখা। প্রথম উচ্ছ্বাস সমাপ্ত হলে জিজ্ঞেস করলুম, 'তুই এ রকম বদ্‌খদ দাড়ি-দাড়া রেখেছিস কেন?'

খানটা ঐ পাঠশালার যুগেও ছিল হাড়ে টক শয়তান। প্রশ্ন শুধোলে ইহুদিদের মত পাল্টা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, উত্তরটা এড়িয়ে যায়। শুধালে, 'দাড়া কারে কয়?'

'হাঁড়ি বড় সাইজের হলে হাঁড়া হয়, গাড়ি গাড়া। দাড়ি হিন্দী উর্দুতে স্ত্রীলিঙ্গ!—কিন্তু দাড়া পুংলিঙ্গ। তোরটা দাড়ি নয়, দাড়া।'

অবশ্য অস্বীকার করিনে, তাকে দেখাচ্ছিল গত শতাব্দীর ফরাসী খানদানীদের মত। খানের রং প্যাটপেটে ফর্সা। গায়ে প্রচুর পাঁঠার রক্ত। শুধালুম, 'তা তোর পাকিস্তান ছেড়ে এই না-পাক দেশে এসেছিস কি করতে?'

'আজমীরের খাজা মুঈন-উদ্‌-দীন চিশতীর কাছে মানত করেছিলুম, বাবার আশীর্বাদে আল্লা যদি আমাকে এস্‌ পিতে প্রোমোশন করেন তবে বাবার দরগা দর্শনে যাবো, ভালো-মন্দ যা আছে তাই দিয়ে শীর্নী চড়াবো। সেই সেরে ফিরছি। এই নে প্রসাদী-গোলাপের পাপড়ি।'

আমি মাথায় ছুঁয়ে বললুম, 'ও! তুই বুঝি পুলিসে ঢুকেছিলি?'

বললে, 'হ্যাঁ, সাব-ইন্‌স্‌পেকটার হয়ে।'

আশ্চর্য হয়ে শুধালুম, 'বলিস কি রে? আর এরই মধ্যে এস্‌ পি!'

প্রসাদীর পাপড়ি মাথায় ঠেকিয়ে বললে, 'খোজা মুঈন-উদ্‌-দীন চিশতীর দোওয়া আর হিন্দুদের কৃপায়!'

'হিন্দুদের কৃপায়!'

"হ্যাঁ ভাই, তেনাদেরই কেরপায়। তেনারা যদি পুব বাঙলার পুলিসের ডাঙর ডাঙর নোকরি ছেড়ে ঝেঁটিয়ে পশ্চিম বাঙলা আর আসামে না চলে যেতেন তা হলে আমি গণ্ডায় গণ্ডায় প্রোমোশন পেতুম কি করে? তারা থাকলে হয়তো অবিচার করে আমাকে দু'একটা না-হক প্রোমোশন দিত, কিন্তু একদম দিনকে রাত, রাতকে দিন তো করা যায় না। আর তুই তো বিশ্বাস করবি নে—তুই চিরকালই সন্দেহপিচাশ, যে কটি হিন্দু রয়ে গেল তারা গণ্ডায় গণ্ডায় না হোক জোড়ায় জোড়ায় প্রোমোশন পেয়েছে। জানিস, মণ্ডল সিভিল সার্জন হয়েছে?'

আমি ভিরমি যাই আর কি। গাড়ল ফোড়াটি পর্যন্ত কাটতে জানতো না।

খান বললে, 'সব তো শুনলি। তোর বইও আমি দু'চারখানা পড়েছি। আচ্ছা বল তো, এসব বানিয়ে বানিয়ে লিখিস, না কিছু কিছু দেখা-শোনার জিনিস, অভিজ্ঞতার বস্তু?'

'কিছুটা বানিয়ে, কিছুটা অভিজ্ঞতা থেকে।'

'তাজ্জব! আমি তো ভাই বিস্তর খুন-খারাবী দেখলুম। এক-একটা এমন যে, আস্ত একখানা উপন্যাস হয়। কিন্তু তারই রিপোর্ট লিখতে গেলে আমার তালুর জল আর নিবের কালি শুকিয়ে যায়। কি করে যে তুই লিখিস।'

আমি বললুম, 'আমাকেও যদি সুদ্ধমাত্র ফ্যাক্টের ভিতর নিজেকে সীমাবদ্ধ করে লিখতে হত তাহলে আমার রিপোর্টটা হত তোর চেয়েও ওঁচা। কল্পনা এসে উৎপাত করতো। তা সে কথা যাক্ গে। আমার দিনকাল বড্ডই খারাপ যাচ্ছে—প্লটের অপর্যাপ্ত অনটন। সম্পাদক মিঞা আবার গল্পই চান, 'ইলসট্রেট' করবেন। বল না একটা।'

দাড়ির ভিতর দিয়ে আঙুল চালাতে চালাতে বললে, 'কোনটা বলি, কেসগুলো তো মাথার ভিতর আব-জাব করেছে। আচ্ছা দাঁড়া, ভেবে নি।'

এমন সময় সিগনেল অভাবে ট্রেন খামোকা মাঝপথে দাঁড়ালো। খান বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'এরা কি জাত রে?'

তাকিয়ে দেখি, মিশকালো সাঁওতাল মেয়ে—তার উপর মেখেছে প্রচুর তেল। শাড়ির উপর বেঁধেছে গামছা, উত্তমাঙ্গে চোলিফোলি কিছু নেই, নিটোল দেহ, সুডোল ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষেরটা বোঝা গেল পরিষ্কার, কারণ হাত দুটি যতদূর সম্ভব উঁচু করে পলাশ ফুল পাড়বার চেষ্টা করছিল খোঁপায় গুঁজবে বলে। হলদে পলাশ। এ অঞ্চলে লালের তুলনায় ঢের কম। কি জানি, মেয়েটা হয়তো ভেবেছে, লাল কালোর চাইতে হলদে কালোর কনট্রাস্টে খোলতাই বেশী।

বললুম, 'সাঁওতাল। হ্যাঁ, আমাদের দেশে অতদূর ওরা পেঁছিয়নি। কিংবা হয়তো ছিল এককালে। কাল যে-রকম হিন্দু পূব বাঙলা ছেড়ে চলে এল, এরা হয়তো পরশু।'

খান দেখি, আমার কথায় বিশেষ কান দিচ্ছে না। আপন মনে কি যেন ভাবছে। ওস্তাদ গাওয়াইয়া যে রকম গান শুরু করার পূর্বে হঠাৎ কেমন যেন আনমনা হয়ে যান। তখন বিরক্ত করতে নেই।

গাড়ি ছাড়লো। একটু কাছে এসে বললে, 'ঐ কালো মেয়ে আরেকটি মেয়ের কথা আমার স্মরণে এনে দিল। তার রঙ ছিল এর চেয়েও কালো। কিন্তু সে কী কালো! সব রঙের অভাবে নাকি কালো হয়! হ্যাঁ তাই; কোন রঙই সাহস করে তার শরীর চড়াও করতে পারেনি। আমি তাকে দেখেছিলুম তার শারীরিক মানসিক চরম দুরবস্থায়। তবু চোখ ফেরাতে পারিনি। হিন্দুরা কেন যে "কালী" "কালী" করে তখন বুঝতে পেরেছিলুম।'

গাড়ি বর্ধমানে এসে থামলো। বর্ধমানে আমি গত সাত বছর ধরে অর্ডার দিয়ে কখনো কেলনারের কাছ থেকে চা-আণ্ডা পাইনি। কাজেই ফর সেফটিস সেক প্রথমই ভাঁড়ের চা কিনে রাখলুম। বিস্তর ছুটোছুটি করে কিছু-কিঞ্চিতের যোগাড় হল। স্থির করলুম, বোলপুরে খানকে একটা পুরা পাক্কা খানা তুলে দেব। সেখানকার গোঁসাই আমাকে নেক-নজরে দেখে।

গাড়ি ছাড়তে খান বললে, 'আমি তখন আব্রুগড়ে। এস্ আই—আমরা বাঙলায় লিখি এছাই। রোজ থানায় বসে ভাবি, ইয়া আল্লা, চাকরির এ দুস্তর দরিয়া পেরিয়ে কবে গিয়ে এমন মোকামে পেঁছিব যেখানে হরহামেশা পয়সাটা আধলাটার হিসেব না করতে হয়। ঘুষ খেতে তখনও শিখিনি—'

আমি শুধালুম 'এখন শিখেছিস? তা—'

বললে, 'হ্যাঁ, তবে সে অন্য ধরনের। পরে তোকে বুঝিয়ে বলবো।

আব্রুগড় বড় মনোরম জায়গা। অনেকেটা শিলঙের মত উঁচু-নিচুতে ভর্তি, টিলাটালার টক্কর। কোন্ এক সায়েব নাকি মালয় না কোথা থেকে কৃষ্ণচূড়া এনে এখানে পুঁতে দেয়। এখন শহরটা আগাপাস্তলা তাই দিয়ে ভর্তি। শহরটা এমনিতেই সবুজ, তার উপর এল গোলমো'রের কালো সবুজ আর তার মাঝখানে ফুটে ওঠে বাড়িগুলোর পোড়া লালের টাইলের ছাদ।

চতুর্দিকে অজস্র চা-বাগান আর তেলের খনি। সায়েব-সুবো, বেহারী মারওয়াড়ীতে শহরটা গিসগিস করছে। আর খাস আসামীদের তো কথাই নেই—তারা বড় নম্র, বড় সরল। আব্রুগড়ের বটতলাতে চার আনা দিয়ে মিথ্যে সাক্ষী পাওয়া যেত না। আমাদের দেশে আকছারই যা যায়। এখন কি অবস্থা তা অবশ্য জানি নে।

বড়কর্তা বলেছিলেন, কিছু একটা জবরদস্ত নূতন না করতে পারলে কুইক প্রোমোশন হয় না। জবরদস্ত নূতন করবোটাই বা কি? এখানে খুন-খারাবী হয় অত্যল্প। উঠোনই নেই তো আমি নাচি কি করে?

তাই থানায় বসে বসে পুরনো দিনের খাতাপত্র দেখি, ফাইল পড়ি। সেই-টেই একদিন লেগে গেল কাজে। পরে বলছি।

আমার চেনা এক রাজমিস্ত্রী আমায় রাস্তায় দাঁড় করিয়ে একদিন বললে, মোল্লাবাজারের পিছনে উঁচু টিলার উপর যে খালি বাঙলো আছে তার বাবুর্চীখানার ভিত মেরামত করতে গিয়ে সে একটা লাশ আবিষ্কার করেছে—ঠিক লাশ নয়, কঙ্কালই বলা যেতে পারে—পচা ছেঁড়া কম্বল জড়ানো।

রক্তের সন্ধান পেয়ে বললুম, "তুমি ওখানে যাও। হঠাৎ যেন আবিষ্কার করেছ এই ভাব করে আমাকে খবর পাঠাও।"

তা না হলে পরে প্রমাণ করতে হবে, ওটা সত্যই সেখানে ছিল, বাইরের থেকে এনে কেউ চাপায়নি।

জিনিসটা যে খারাবী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাবুর্চীখানার নিচে কম্বলে জড়ানো পোঁতা কঙ্কাল! এখানে কস্মিনকালেও কোনো গোরস্তান ছিল না—টিলার ঢালুর দিকে কতটুকু জায়গা যে, ওখানে মানুষ গোরস্তান

বানাতে যাবে। তাহলে এটা নিশ্চয়ই খুনের ব্যাপার। শুধু খারাবী নয়, খুন-খারাবী।'

আমি বললুম, 'সাক্ষাৎ শার্লক হোমস।'

শুধোলে, 'সে আবার কে?'

আমি প্রথমটায় হকচকিয়ে পরে সামলে নিয়ে বললুম, 'তুমি এগোও; আমি আর রসভঙ্গ করবো না।'

বললে, 'প্রথম রক্তের সন্ধান পেয়ে আমি যেন হন্যে হয়ে উঠলুম। সমস্ত রাত ঘুম হল না। মাথার ভিতর ঘুরছে, কতরকম নর-হত্যার ছবি, যেন স্বয়ং পাঁচকড়ি দে সেগুলো এঁকে যাচ্ছেন, আর দীনেন্দ্রকুমার রায় আপন হাতে রঙ গুলে দিচ্ছেন। বেবাক লালে লাল।'

আমি বললুম, 'রসভঙ্গ করতে হল। অপরাধ নিসনি। হোম্‌স্‌ হল বিলিতী অরিন্দম।'

খান বললে, 'তাই বল। কিন্তু তুই ভাবিস নে, তোকে একটা রগরগে খুনের কাহিনী শোনাতে যাচ্ছি মাত্র। এতে আছে বড় দুঃখের কথা। বড় বিষাদ বেদনা। স্বর্গ আমি দেখিনি, কিন্তু স্বর্গচ্যুত হতভাগ্য একজনকে আমি দেখেছি। সে দৃশ্য আর কারো দেখবার দরকার নেই।'

কি বলছিলুম? হ্যাঁ। ভোর হতে-না-হতেই আমি থানায় এসে উপস্থিত। কিন্তু মূর্খের মত আমি রাজমিস্ত্রীকে বলে রাখিনি, সে কখন আসবে। সে যদি এসে ফিরে যায়; কিংবা কেসটা হাতছাড়া হয়ে যায়!

আজ হাসি পায়। রাতদুপুরে এখন যদি জমাদার এসে খবর দেয়, পদ্মার চরে ডাকাতিতে পাঁচটা চরুয়া আর তিনটে ডাকাত মারা গিয়েছে, আমি তা হলে পাশবালিশ জাবড়ে ধরে বলি, "যা-যা, দিক্‌ করিসনি!"

রাজমিস্ত্রী হেলে দুলে বেলা প্রায় বারোটায় এলেন—আমাকে আষ্ট ঘণ্টা দণ্ধানোর পর।

যেন সদ্য এইমাত্র ফার্স্ট ইনফর্মেশন পেয়েছি, এরকমধারা মুখের ভাব করে দুটি "কণ্টস্বল" সঙ্গে নিয়ে অকুস্থলের দিকে রওনা দিলুম। গিয়ে দেখি অত্যন্ত কুস্থান, অর্থাৎ অকুস্থানই বটে।'

আমি বললুম, 'ঐ ম'লো। অকুস্থান হয়েছে আরবী "ওয়াকেয়া", অর্থাৎ "ঘটনা" আর "স্থান" নিয়ে।'

খান বললে, 'থাক্‌ থাক্‌ আর বিদ্যে ফলাতে হবে না। অকুস্থলের হালটা ভালো করে শোন।'

তিন বছর ধরে বাঙলোটায় বসতি ছিল না বলে বাবুর্চীখানার দোর-জানালা চুরি গিয়েছে, ঘরটা পড়ো-পড়ো। কে এক নূতন সাহেব আসবে বলে ওটার ভিত মেরামত করতে গিয়ে বেরিয়েছে একটা কঙ্কাল, পচা কম্বলে জড়ানো। মাথার চুল ছাড়া আর সব পচে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। আমি নয়া শিকারীর মত সন্তর্পণে এগোলুম বলে খুলির ভিতর মাটির মধ্যে পেয়ে গেলুম একটা বুলেট—তখন ভালো করে তাকিয়ে দেখি, খুলির পিছনের দিকে

একটা ঐ সাইজের গর্ত।

আব্রুগড়ে গণ্ডায় গণ্ডায় স্পেশ্যালিস্ট নেই যে, আমায় তদ্দণ্ডেই বাৎলে দেবে, ব্যাপারটা কি, অন্তত এই যে কঙ্কাল, এর লাশটা কবে মাটিতে পোঁতা হয়েছিল। শহরের অ্যাসিস্টেন্ট সার্জন আমাদেরই জেলার ধীরেন সেন। তাঁকে ধরে এনে শুধালুম। বললেন, অন্তত তিন বছর। বিচক্ষণ লোক। রায়টা দিলেন কঙ্কাল উপেক্ষা করে, কম্বলটা উত্তমরূপে পরখ করে।

তা হলে প্রশ্ন, তিন বছর পূর্বে ঐ বাঙলোয় থাকতো কে—যার সময় ঘটনাটা ঘটেছিল?

খবর পাওয়া গেল, আইরিশম্যান পেট্রিক ও'হারা সাহেব। সে এখন কোথায়? জেলে। কেন? সে-কথা জেনে কি পুলি-পিঠের নেজ গজাবে?

আমার মন খনে এদিকে ধায়, খনে ওদিকে ধায়। বন্ধ ঘরে আগুন লাগলে মানুষ যেমন মতিচ্ছন্ন হয়ে খনে এ-দরজায়, খনে ও-জানালায় ধাক্কা দেয়—কোনো একটাও ভালো করে একাগ্রমনে খোলবার চেষ্টা করে না—আমার হল তাই। কোনো একটা ক্ষুদ্র পাঁচ মিনিটের তরেও ঠিকমত ফলো আপ করতে পারি নে।

এখন জ্ঞানগম্যি হয়েছে ঢের। এখন বুদ্ধি হয়েছে বলে বুঝেছি যে, এসব রহস্য সমাধান বুদ্ধির কর্ম নয়। রুটিনের ঘানিতে সব-কিছু ফেলে দিতে হয়। তেল বেরিয়ে আসবেই আসবে, সমস্যা সমাধান হবেই হবে।

যে-কাজ আজ পাঁচ মিনিটে করতে পারি, তখন লেগেছিল এক হপ্তা। ততদিনে প্রশ্নগুলো মোটামুটি সামনে খাড়া করে নিয়েছি:

(১) লোকটা কে?

(২) এটা খুন তো?

(৩) কে খুন করলে?

(৪) কার বন্দুকের গুলি?

কঙ্কাল থেকে মানুষ সনাক্ত অসম্ভব না হলেও বড়ই কঠিন। তন্ন তন্ন করেও আঙটি-টাঙটি, বাঁধানো দাঁত, ডেন্টিস্টের কোনো প্রকারের কেরদানী কিছুই পাওয়া গেল না। ব্লাঙ্কো।

আমি তো এ-শহরে এসেছি মাত্র কয়েক মাস হল, কিন্তু পুরনো বাসিন্দাদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু জানে, কিন্তু অহমিয়ারা সরল হলেও এ-তত্ত্বটি বিলক্ষণ জানে যে, পুলিসের ঝামেলাতে খোদার খামোখা জড়িয়ে পড়তে নেই। ব্লাঙ্কো।

ইতিমধ্যে রিপোর্ট পেঁছিল, খুলির ভিতর যে বুলেট পাওয়া গিয়েছিল, সেই বুলেটই খুলির ফুটোটার জন্য দায়ী।'

আমি বাঁকা হাসি হেসে বললুম, 'মারাত্মক আবিষ্কার! এ তো কানাও বলতে পারে। আর ঐ দেখ, তোর কৃষ্ণসুন্দরী আর একপাল সাঁওতালী। ওদের বসতির দিকে এগোচ্ছি এখন।'

গাড়ি তখন খানা জংশনে 'লুপ' লাইনে ঢুকবে বলে ধীরে ধীরে চলছিল।

খান অনেকক্ষণ ধরে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'নাঃ, টুনি মেমের পায়ের নখের কণাও এরা হতে পারে না।'

আমার অভিমান হল। সাঁওতালী আমাদের প্রতিবেশী মেয়ে।

লক্ষ্য না করেই খান বললে, 'বুলেটে যে খুলি ফুটো করেছে, সে তো তুই বুঝিস, আমিও বুঝি, কিন্তু আদালত কি বুঝবে? তারা প্রমাণ চায়। হুঃ, আদালত তো আদালত! অডিটের বেলা জানো না কি হয়? পেনশন্ নেবার জন্য তুমি সার্টিফিকেট দাখিল করলে যে, তুমি এপ্রিল মাসে জীবিত আছ। অডিট শুধালে, "কিন্তু মার্চ মাসের সার্টিফিকেট কই? আপনি যে মার্চ মাসে জীবিত ছিলেন, তার প্রমাণ কি? না হলে যে মার্চ মাসের পেনশনটা পাবেন না।"'

আমি বললুম, 'সেটা কিন্তু ঠিক। দিল্লীর যাদুঘরে কেন্দ্রের এক মন্ত্রী বিদেশী ভিজিটরকে ছোট্ট একটি শিশুর খুলি দেখিয়ে বললেন, "ইটি শঙ্করাচার্যের খুলি।" ভিজিটর অবাক হয়ে শুধালে, "তাঁর খুলি এত ছোট ছিল?" মন্ত্রী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "এটা তাঁর শিশু বয়সের খুলি। দু'টো কিংবা ছ'টা খুলি যখন হতে পারে, তখন দুটো কিংবা ছ'টা জীবন হবে না কেন? তা হলে একটা মার্চ মাসে গ্যাপ পড়াটাই বা বিচিত্র কি? ওসব কথা থাক্; তারপর কি হল বল্।'

'তখন অনুসন্ধান করতে লাগলুম খুনটা হয়েছে ও'হারা সাহেব এই বাঙলোয় থাকাকালীন, না তার পরে কেউ খুন করে লোকটাকে নির্জন পোড়ো বাড়িতে পুঁতে গেছে?

ও'হারা জেলে। দীর্ঘ মেয়াদে।

থানার পুরনো ফাইল কাগজপত্র ঘেঁটে যা আবিষ্কার করলুম, সেও বিচিত্র। সাহেব ছটা ইংরেজ পরিবারকে চকোলেটের ভিতর বিষ ঠেসে তাই খাইয়ে মারবার চেষ্টা করেছিল। প্রমাণের অভাব হয়নি! আব্রুগড় থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরের এক ছোট্ট ডাকঘর থেকে ও'হারা পাঠিয়েছিল ছ'টি রেজেস্ট্রি পার্শেল ছ'জন ইংরেজের নামে—পোস্ট মাস্টার সেই মর্মে সাক্ষী দিয়েছিল।

এঁদের দুজন থাকতো আব্রুগড়ে, বাকিরা কাছে-পিঠের চা-বাগানে। একই সঙ্গে একই জিনিস খেয়ে সবাই মর-মর হয়েছিল বলে সিভিল সার্জন বুদ্ধি করে সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে যে চকোলেটের মধ্যে গড়বড় সড়বড় আছে। তাই তারা সে-যাত্রা রক্ষা পায়। কেউ মরেনি।

কিন্তু ছ'টা কেন, একটা পরিবার—একটা পরিবারই বা কেন—একজন লোককে খুন করার চেষ্টা করলেও দীর্ঘ মেয়াদের জন্য শ্রীঘর। ও'হারা আলিপুরে।'

ইতিমধ্যে বীরভূমের খোয়াইডাঙা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। খান বললে, 'এদের সঙ্গে আমাদের সবুজ সিলেটের কোনো মিল নেই বটে কিন্তু তবু এর রুক্ষ শুষ্ক একটা কঠোর সৌন্দর্য আছে। তারপর মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, হ্যাঁ, কি যেন

বলছিলুম। মনে পড়েছে। হঠাৎ আমার মাথায় এক নূতন বুদ্ধির উদয় হল। ও'হারা যখন আইরিশম্যান তখন তার বন্দুক থাকাটা অসম্ভব নয়। খবর নিয়ে জানতে পারলুম, ছিল। আমি জানতুম কারো দীর্ঘ মেয়াদের জেল হলে তার বন্দুক সরকারী তোষাখানায় জমা দেওয়া হয়। সেটা সেখানে পাওয়া গেল। বিশেষজ্ঞেরা বললেন, খুলির মাথায় যে বুলেট পাওয়া গেছে, সেটা নিঃসন্দেহে ঐ বন্দুক থেকেই ছোঁড়া হয়েছে।

যাক। এতক্ষণে এক কদম এগোলুম কিন্তু সব চেয়ে বড় প্রশ্ন যে লোকটা খুন হয়েছে সে কে?

কলকাতায় যখন কলেজে পড়তুম তখন আমাদের হস্টেলে রামানন্দ চাটুয্যে একবার জর্নালিজম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আসেন। মেলা কথা কওয়ার পর তিনি শেষ করেন এই বলে যে, যে-কোনো জ্ঞান যে-কোনো খবর, তার মূল্য যত সামান্যই হোক না কেন, কোনো না কোনো দিন জর্নালিজমের কাজে সেটা লেগে যেতে পারে।

পুলিসের কাজেও দেখলুম তাই। সেই যে আমি অবসর সময়ে থানায় বসে বসে পুরনো ফাইলের কাসুন্দি ঘাঁটতুম তাই লেগে গেল কাজে।

থানায় থানায় একখানা খাতাতেলেখা থাকে কেকবে নিরুদ্দেশ হল—অবশ্য যদি আত্মীয়স্বজন খবর দেয়। বিরাট দেশ ভারতবর্ষ—কত লোক কত রকমে 'কপুর' হয়ে যায়, কে বা রাখে তার খবর। তবু মনে পড়ল তিন বছর আগে এক বিহারী মজুর নিখোঁজ হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, কঙ্কালটা জড়ানো ছিল একটা চেক্ কম্বলে, এ ডিজাইনটা বিহারীদের ভিতর খুবই পপুলার!

যে পাড়াতে সে থাকতো সেখানে জোর অনুসন্ধান চালালুম। অবশ্য ছদ্মবেশে। চায়ের দোকানে আশ কথা পাশ কথা কওয়ার পর একে ওকে তাকে শুধোই, সেই বিহারী রামভজনের কি হল?

যা খবর পাওয়া গেল সেটা আমাকে আরো কয়েক কদম এগিয়ে দিলে। তার নির্যাস ঃ—

"রামভজনের বউ টুনি মেম—"

আমি আশ্চর্য হয়ে বাধা দিয়ে বললুম, 'বিহারী মজুরের বউ মেম হয় কি করে?'

খান বললে, 'সেই কথাই তো হচ্ছে। টুনি ও'হারা সাহেবের বাঙলোয় কাজ করতো। পরে সায়েবের রক্ষিতা হয়ে যায়। তাই বিহারীরা তার নাম দেয় "টুনি মেম।"

রামভজন নাকি একদিন তার দেশের ভাই-বেরাদরকে বলে, সে দেশে চলে যাচ্ছে; যা জমিয়েছে তাই দিয়ে খেত-খামার করবে। হয়তো তারো বাড়া আরেকটা কারণ ছিল। সামনাসামনি না হোক আড়ালে-আবডালে অনেকেই টুনি মেমকে নিয়ে মস্করা-ফিস্কিরি করতো। অতি অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে রাম-ভজনকে বাদ দিয়ে নয়।

এবং শেষ খবর, টুনি মেম আর তার স্বামীকে স্টেশনে নিয়ে যাবার সময় নাকি ওদের দুজনকে ও' হারার বাঙলোয় গেটের সামনে দেখা যায়।'

আমি শুধালুম 'তারপর ?' কৌতূহল তখন আমার মাথায় রীতিমত চাড়া দিয়ে উঠেছে।

আমাকে হতাশ করে খান বললে, 'ব্লাঙ্কো। মাস তিনেক পর যখন রামভজনের পরিচিত নূতন মজুররা আব্রুগড়ে এল—ওরা কিস্তিতে কিস্তিতে আসছে যাচ্ছে হামেশাই—তখন তারা বললে, রামভজন আদপেই দেশে পেঁছিয়নি। আব্রুগড়ের কেউ বললে, টুনি মেমের বেহায়াপনায় তিতিবিরক্ত হয়ে সন্ন্যাস নিয়েছে, কেউ বললে দার্জিলিং না কোথায় যেন চা-বাগানে কাজ নিয়েছে।'

'আর টুনি মেম ?'

'সে তখন ও'হারার রক্ষিতা। কিন্তু "রক্ষিতা" বললে হয়তো ও'হারা ও টুনি মেম দুইজনারই প্রতি অবিচার করা হয়। ও'হারা টুনি মেমকে রেখেছিল রাণীর সম্মান দিয়ে আর টুনি মেম ও'হারাকে ভালোবেসেছিল লায়লী যে-রকম মজনুনকে ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু এ-সব আমি পরে জানতে পেরেছিলুম।'

আমি তখন মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটার একটা আবছা আবছা ছবি এঁকে ফেলেছি।

টুনি মেম স্বামীকে স্টেশনে নিয়ে যাবার পথে ও'হারার বাঙলোয় নিয়ে যায়। শীতকাল ছিল বলে রামভজন তার সেই চেক কম্বলখানা গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিল। তার পর যে-কোনো কারণেই হোক ও'হারা তাকে গুলি করে মেরে বাবুর্চীখানার ভিতের ভিতর পুঁতে ফেলে। যে-লোক ছ'টা পরিবারের খুনের চেষ্টা করতে পারে তার পক্ষে এটা ধুলো খেলা।

চায়ের দোকানে তদন্ত শেষ হলে পর একদিন থানা থেকে সরকারীরূপে চায়ের দোকানে যে সব চেয়ে বেশী ওকীবহাল ছিল তাকে ডেকে পাঠালুম। সে বললে কসম খেয়ে কোন কিছু তার পক্ষে বলা অসম্ভব তবে রামভজনের ঐ রকম একখানা চেক কম্বল ছিল।

তাহলে মোদ্দা কথা দাঁড়াল এই, ও'হারা যদি রামভজনকে খুন করে থাকে তবে তার একমাত্র সাক্ষী টুনি মেম।

টুনি মেম কোথায় ?

খবর পেলুম ও'হারার জেল হওয়ার পর টুনি মেম বড় দুরবস্থায় পড়ে। শেষটায় কোন পথ না পেয়ে ও'হারা সাহেবের বাবুর্চীর সঙ্গে উধাও হয়ে যায়।

এইবার সত্যি আমার সামনে যেন পাথরের পাঁচিল খাড়া হল। বহু অনুসন্ধান করেও কিছুমাত্র হদিস পেলুম না, খানসামা আর টুনি মেম গেল কোথায়।

তখন মনে মনে চিন্তা করলুম, সাহেবদের এই যে বাবুর্চী ক্লাসের লোক এরা বাঙালী হিন্দু-মুসলমানদের বাড়িতে চাকরি পায় না। পুডিং-পাডিং রোস্টো-মোস্টো দুনিয়ার যত সব অখাদ্য এরা রাঁধে, শুয়ার গোরুর ঘ্যাঁট এরা যেসব

বানায় সেগুলো দূর থেকে দেখেই শেষ বিচারের দিন স্মরণ করিয়ে দেয়—খায় কোন্ বঙ্গ সন্তানের সাধ্যি ! অতএব এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, ও'হারার বাবুর্চী নিশ্চয়ই অন্য কোন সায়েবের চাকরি নিয়েছে।

তোকে পূর্বেই বলেছি, আব্রুগড়ের চতুর্দিকে মাইলের পর মাইল জুড়ে চা-বাগান আব-জাব করছে। আমি প্রতি উইক-এন্ডে আজ এটা কাল সেটায় তদন্ত করতে লাগলুম। পরনে খানসামা বাবুর্চীর পোশাক। সবাইকে শুধোই, বাবুর্চীর চাকরি কোথাও খালি আছে কিনা। আরো শুধাই, আমার এক ভাই নাম ভাড়িয়ে এক কুলী রমনীর সঙ্গে বসবাস করছে—আসল কারণ অবশ্য আমি ও'হারার খানসামাটার নাম আবিষ্কার করতে সক্ষম হইনি—আমাদের মা তার জন্য বড্ড কান্নাকাটি করছে—তার খবর কেউ জানে কি না ?

বাগানের পর বাগান ব্লাংকো ড্র করেই যাচ্ছি আর আমার রোখও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে।

শেষটায় আল্লার কুদরৎ, পয়গম্বরের মেহেরবানী, আর মুর্শীদের 'দোয়ার' তেরস্পর্শ ঘটে গেল।

এক চা-বাগিচার কম্পাউন্ডার শুধু যে খবরটা দিলে তাই নয়, বাঁকা হাসি হেসে বললে, 'ও ! টুনি মেম ! দেখে এসো গে তোমার বউদি কী সুখেই না আছেন !'

আমি মেলা তর্কাতর্কি না করে ধাওয়া করলুম ম্যানেজার সায়েবের বাঙলোর দিকে। সেখানে গিয়ে শুনি, বাবুর্চী পরশু দিন থেকে উধাও, তার 'বউ' কুলী লাইনের একটা কুঁড়েঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য।

পড়ি পড়ি এই পড়ি, ত্রিভঙ্গ মুরারী-গোছ অতিশয় জরাজীর্ণ একখানা ছন বাঁশের তৈরী কুঁড়েঘর। ঝাঁপের তৈরী দরজাখানা পাশের মাটিতে পচছে।

ভিতরের দৃশ্য আরো মারাত্মক। স্যাঁতসেঁতে নয়, রীতিমত ভেজা মাটির ভিত। হেথায় গর্ত, হোথায় গর্ত। আল্লার মালুম গর্তে সাপ না ইঁদুর আছে। এক কোণে একটা ভাঙা উনুন। কবে যে তাতে শেষ রান্না হয়েছিল ছাই দেখে অনুমান করতে পারলুম না। তারই পাশে একটা সানকি গড়াগড়ি দিচ্ছে। দু'একটা ভাত শুকিয়ে কাঠ হয়ে তলানিতে গড়াচ্ছে। তারই পাশে মলমূত্র। নোংরা দুর্গন্ধে ঘরটা ম-ম করছে।

দেয়ালে হেলান দিয়ে একটি হাড্ডিসার বছর তিনেকের ছেলে চোখ বন্ধ করে ধুঁকছে। ছেলেটিকে কিন্তু তবুও যে কী অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল সেটা আমার চোখ এড়ায়নি। কেউনা বললেও আমি চট্ করে বলে দিতে পারতুম ইটি ও'হারার সন্তান। শুনেছি স্বর্গের দেবশিশুরা অমর, কিন্তু এই মরলোকে এসে যদি তাঁদের কাউকে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হত তবে বোধ হয় তার চেহারা এরকমই দেখাতো।

আমি যে গলা খাঁকরি দিয়ে ঘরে ঢুকলুম সে একবারের তরে চোখও খুলল

না। সে শক্তিটুকুও তার গেছে।'

অল্পক্ষণের জন্য নীরব থেকে খান বললে, 'বহু বৎসর পুলিসে কাজ করে করে আমি এখন সঙ্গ-দিল—পাষাণ হৃদয়। তখন সবে পুলিসে ঢুকেছি—আমি ওদিক থেকে চোখ ফেরালুম।

সে আরো নিদারুণ দৃশ্য। একটা বছর দেড়েকের বাচ্চা তার মায়ের সায়া ধরে টানাটানি করছে। তারও সর্বাঙ্গে অনাহারের কঠিন ছাপ। ভালো করে কাঁদতে পর্যন্ত পারছে না। আর সে কী বীভৎস গোঙরানো—থেকে থেকে হঠাৎ অনাহারের দুর্বলতা যেন তার গলা চেপে ধরে আর কক্ করে গোঙরানো বন্ধ হয়ে যায়। তখনকার নীরবতা আরো বীভৎস।

চ্যাটাইয়ের উপরে শুয়ে টুনি মেম। পরনে মাত্র একটি সায়া—শতছিন্ন, বুক ঢেকে একখানা গামছা—জরাজীর্ণ। হাত দুখানা বুকের উপর রেখে চোখ বন্ধ করে—কি জানি জীবন-মরণ অনশন কিসের চিন্তা করছে।

স্পষ্ট দেখতে পেলাম, আসন্ন-প্রসবা।

ক্ষণতরে পুলিসের কর্তব্য ভুলে গিয়ে আমার ভিতরকার মানুষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চেয়েছিল। আমি সবলে তার কণ্ঠরোধ করে পুলিসের কর্তব্যে মন দিলুম। অর্থাৎ এ-রমণী যেন টের না পায় আমি পুলিস। ও'হারার বিরুদ্ধে সাক্ষাৎপ্রমাণ যোগাড় করতে এসেছি।

তাই খানসামার ভাইয়ের পার্ট প্লে করে চিৎকার চেঁচামেচি আরম্ভ করলুম "কোথায় গেল লক্ষ্মীছাড়াটা আপন বউকে ফেলে?"

খান আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'জানিস মিতু, এত দুঃখের ভিতরেও মেয়েটি আমার দিকে একবার তাকিয়েছিল। কারণটা বুঝতে পেরেছিস? জানিস তো, আমরা সিলেটিরা যদি কুলী-রমণী গ্রহণ করি তবে সে হয় রক্ষিতা, কিংবা লোকে বলে খানকি-নটীর বেলেল্লাপনা, কুলী রমণীকে স্ত্রীর সম্মান সেও দেয় না, আর পাঁচজনের তো কথাই নেই। তাই এত দুঃখের ভিতরও বিবাহিত স্ত্রীর সম্মান পেয়ে তার চোখেমুখে তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠেছিল।

আমি ক্রমাগত চিৎকার করে যাচ্ছি, "কোথায় গেলেন আমার পরাণের ভাই? আচ্ছা আমার খবর নিস নে, নিসনি, কিন্তু হতভাগার মা যে কেঁদে কেঁদে দেশটা ভাসিয়ে দিলে তার পর্যন্ত তোয়াক্কা করলে না! এদিকে আবার বউ-বাচ্চা পোষবার ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছে!"

আমার চেঁচামেচি শুনে কুঁড়েঘরের সামনে একপাল কুলী মেয়েমদ্দ জমায়েত হয়ে গিয়েছে। আমি দোরে দাঁড়িয়ে বললুম তোমাদের মধ্যে কেউ রাজী আছ, এদের জন্যে রান্নাবান্না করে দিতে, ঘর সাফসুৎরো করতে, আর বেচারী বউটার সেবা-টেবা করতে? এখখুনি তাকে পাঁচ টাকা দিচ্ছি। মাসের শেষে ফের পুরো মাইনে পাবে। আর এই আরো দু'টাকা হাঁড়িকুড়ি চাল-ডালের জন্য।"

সবাই চেঁচিয়ে বললে, "মুন্সি, মুন্সি!"

মুন্নি এগিয়ে এল। পুরনো ময়লা ছেঁড়া শাড়ি পরা। পরে জানতে পারলুম, এই গরীব বিধবা একমাত্র মুন্নিই যতখানি পারে টুনি মেমেদের দেখ-ভাল্ করেছে। সেও নিঃসম্বল, কীই বা করতে পেরেছে! কিন্তু জানিস মিতু, দুর্দিনে দুটি দরদের কথাই বলে কটা লোক!

আর জানিস্, সেই মুন্নি আমাকে মৃদুকণ্ঠে কি বললে? বললে, 'আমাকে মাইনে দিতে হবে না সাহেব। ওদের জন্যে যা রান্না করবো তার থেকে দুমুঠো আমাকে খেতে দিলেই হবে।"

এর পরও যে খুদাতালায় বিশ্বাস করে না তাকে চড় মারতে ইচ্ছে করে।

মুন্নিকে বললুম, "এই নাও আট আনা। তাড়াতাড়ি গিয়ে মুড়ি-মুড়কি যা পাও নিয়ে এসো।"

চায়ের কথা বললুম না। ঐ একটিমাত্র জিনিস চা-বাগানে দুর্লভ। বিস্তর কুলী বিনা দুধ-চিনি সুগন্ধমাত্র চায়ের লিকার খেয়ে ক্ষিদে মারে।

পাঁচজন সাধারণ মানুষের স্বভাব, কেউ বিপদে পড়লে এগিয়ে এসে সাহায্য না করার, কিন্তু তখন যদি এরই একজন বুকে হিম্মত বেঁধে সাহায্য করতে আরম্ভ করে তখন অনেকেই তার পিছনে এসে দাঁড়ায়।

একজন ইতিমধ্যে বসবার জন্য আমাকে একটা মোড়া এনে দিয়েছে। আমি বললুম, "আমি একটা চারপাই কিনতে চাই। বেচবে?"

চারপাই বলতে-না-বলতে এসে গেল। ভিজে ভিত থেকে উদ্ধার পেয়েও কিন্তু টুনি মেমের মুখের ভাব বদলালো না।

তোকে বলেছি—হার্ড-বয়েল্ড পুলিসম্যান আমি তখনো হইনি, এমন কি অতিশয় সফ্ট্-বয়েল্ডও না, তাই এই পুলিসের ভণ্ডামি করতে আমার বাধো বাধো—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'এইবারে তুই আরম্ভ করলি সত্যি সত্যি মিথ্যে ভণ্ডামি। ভুলে গেছিস নাকি, ইস্কুলে আসবার সময় কাঁধে করে মা-হারা একটা কাঠবেড়ালিকে সঙ্গে নিয়ে আসতিস? মাস্টারমশাই সেটার জন্য চোটপাট করাতে "গফ্ট" ইস্কুল ছেড়ে নবাবী তালাবের ওপরে "রাজার ইস্কুলে" ট্রেনস-ফার নিলি?'

খান যেন আদৌ শুনতে পায়নি। বললে, 'আসন্নপ্রসবা রমণী পুরুষের চিত্তহারিণী হয় না। কিন্তু তোকে কি বলবো, মিতু, ওরকম সুন্দরী মেয়ে আমি জীবনে কখনো দেখিনি।

অনাদর, অবহেলা এবং সর্বোপরি অনাহার তাকে ম্লান করে দিয়েছে সত্য কিন্তু খাঁটি সোনার উপরকার ময়লা কতক্ষণ থাকবে! একে দু-দিন খেতে দিলে দুটি মিষ্টি কথা বললে এ তো চোখের সামনে কদম গাছের মত বেড়ে উঠবে, সর্বাঙ্গে সৌন্দর্যের ফুল ফোটাবে। এই তো এখ্খুনি যখন মুড়ি এল আর ছেলেটি এই প্রথমবার প্রসন্ন নয়নে তার দিকে তাকালো, তখন তার মায়ের সৌন্দর্য যেন সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠলো।

গয়ার কালো পাথরে কোঁদা মূর্তিটি যেন টুনি মেম। হিন্দুদের যে সুন্দর

সুন্দর কালো পাথরের মূর্তি আছে সেগুলো সুন্দর আমি জানি, কিন্তু কালো বলে আমার মন কখনো সাড়া দেয়নি। টুনি মেমকে দেখে বুঝলুম, মরা কালো পাথর জ্যান্ত টুনির রঙের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে কী মারই না খেয়েছে!

আমি তো তেমন ফর্সা নই, আমিই মজেছিলুম টুনির রঙ দেখে। আর ও'হারা তো আইরিশম্যান। সে যে পাগল হবে তাতে আর আশ্চর্য কি! গৌরী শ্রীরাধা কেন কৃষ্ণ-লীন হয়েছিলেন টুনি মেমকে দেখে বুঝতে পারলুম। তা সে যাক গে, তোকে আর কি বোঝাব? দেখাবার হলে দেখাতাম। ঐ একটি মেয়ে এ-রঙ নিয়ে জন্মেছিল। তার আগেও না, পরেও না।

ইতিমধ্যে মুন্নি খিচুড়ি চড়িয়েছে। ঘরটা পরিষ্কার করা হয়েছে। একটা টেমি টিম টিম করে জ্বলছে। আমি কিছুক্ষণের জন্য বিদায় নিলুম।

বাগানের ছোটবাবু মুসলমান। তাকে সার্টিফিকেট দেখাবার ছল করে আমার পুলিসের পরিচয় দিলুম। খাওয়া-দাওয়া করলুম কিন্তু তাঁর বাবুর্চীর সঙ্গে, পাছে কোনো সন্দেহের উদ্রেক হয়।

রাত ন'টার সময় টুনি মেমের ঘরে ফিরে দেখি মুন্নি তাকে আরো চারটি খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছে। আমাকে বললে, "ক'দিন ধরে কিছুই জোটেনি, সাহেব; আজ হঠাৎ খাবেই বা কী করে! তবু বলছি, পেটের বাচ্চার জন্য দুটি খেতে।"

টুনির পরনে শাড়ি। সেদিকে তাকাতে মুন্নি বললে, "আট আনা পয়সা দিয়ে মুদির দোকান থেকে ছাড়িয়ে এনেছি।"

আমি বললুম, "খুব ভালো করেছ।"

মুন্নি আপন কাঁথাখানা নিয়ে এসেছে। সেটা চেটাইয়ের উপর পেতে বাচ্চা দুটিকে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

আমি মোড়াটা চারপাইয়ের পাশে এনে বসলুম। টুনি সেই আগের মত শুয়ে আছে। হাত দু'খানা বুকের উপর।

আমি উঠি উঠি করছি এমন সময় টুনি চোখ বন্ধ রেখেই কোনো প্রকারের ভূমিকা না নিয়ে বললে, 'আপনি সব কিছু জানতে চান—না?'

আমি হকচকিয়ে উঠলুম। কিন্তু তার পরের কথাতেই আশ্বস্ত হলুম। বললে, "কি করে এ অবস্থায় পেঁছিলুম!"

খান বললে, 'উত্তেজনা ঔৎসুক্যে আমি তখন অর্ধমৃত। "না,না,না, তোমার এখন শরীর দুর্বল, তুমি—" ঐ ধরণের কিছু একটা বলা-না-বলার মত কি যেন একটা অর্ধপ্রকাশ করেছিলুম।

টুনি বললে, "আমি আপনাদের ভাষায় কুলী। আপনারা আমাদের মানুষ বলেই গণ্য করেন না, অথচ জানেন, আমি একদিন রাজরানীর সম্মান পেয়েছিলুম।"

খান বললে, 'বিশ্বাস করবি নে, মিতু, ঠিক এইরকম ধরনের মার্জিত ভাষায় কথা বলেছিল। আমি তো অবাক।'

আমি বললুম, 'আম্মো।'

খান বললে, 'সেটা পরে পরিষ্কার হল। তোকে সব বলছি, টুনি মেম যা বলেছিল।'

বললে, "অনেক অপমান নির্যাতন সয়েছি। হেন অপমান নেই যা আমায় সইতে হয়নি—মুখ বুজে। নূতন অপমান আর কি হতে পারে? তাই মনে হচ্ছে আমার যাবার সময় বুঝি ঘনিয়ে এল।"

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। বাচ্চা দুটো ঘুমিয়ে পড়েছে। মুন্নির নাক অল্প অল্প ডাকছে। টিমেটা বাতাসে এদিক-ওদিক নাচছে।

টুনি বললে, "ও'হারা সায়েবের বোন এসেছিল বিলেত থেকে এ দেশের হাতী-গণ্ডার দেখবে বলে। তারই আয়া হয়ে আমি ও বাড়িতে ঢুকি। মেম চলে যাওয়ার পরও তিনি আমায় ছাড়লেন না।

"আপনি মুরুব্বী, আপনাকে সব কথা বলতে আমার বাধছে। তবু যে বলছি, তার কারণ আপনি এসেছেন আমার ত্রাণ-কর্তা, আমার বন্ধুরূপে। আপনাকে না বলবো তো বলবো কাকে? আর এ যে আমার বুকের উপর বোঝা হয়ে চেপে বসে আছে। এ-বোঝা না নামিয়ে তো আমার নিষ্কৃতি নেই। আপনি শুনুন।

"আমাদের প্রণয় হয়েছিল। আমি স্বীকার করছি, স্বামী বর্তমান থাকতে পরপুরুষের দিকে তাকানোই পাপ, প্রণয় সে তো মহাপাপ। তার জন্য যে সাজা পরমাত্মা আমায় দেবেন তার জন্য আমি তৈরি।

"কিন্তু ভাবো দিকিনি ভাই সাহেব, আমি কুলী-কামিন্। আমি কালো, কিন্তু প্রতিবেশিনীরা বলতো, আমার সর্বাঙ্গ নাকি চুম্বক, পুরুষকে টানে। টানতো নিশ্চয়ই—বিশেষ করে ছোঁড়ারা যখন হ্যাংলার মত আমার দিকে তাকাতো তখনই সেটা বুঝতে পারতুম। কিন্তু ওরা কি চায়, সেটা আমি আরো ভালো করেই বুঝতে পারতুম। আমাকে রক্ষিতা করে রাখবার সাহসও এদের ছিল না। যাক, এসব কথা আর খুলে বলার প্রয়োজন নেই।

"তখন যদি কেউ আমাকে রানীর সম্মান দেয় তখন সে প্রলোভন জয় করা কি সহজ পরীক্ষা? সায়েব আমাকে প্রথম দিন থেকেই ইংরেজী পড়াতে শুরু করলে, বললে, 'তোমাকে আমি আমার মনের মতো করে গড়ে তুলবো।' ভালোবাসলে মানুষ কি না করতে পারে। কিংবা হয়তো পূর্বজন্মে আমি কোন পাঠশালা-মক্তবের আঙ্গিনা ঝাঁট দিয়ে সেবা করেছিলুম বলে এ জন্মে তারই পুণ্যের ফলে আমার লেখা-পড়া যে গতিতে এগিয়ে চললো সেটা দেখে স্বয়ং সায়েবই অবাক।"

এতক্ষণ পরে টুনি মেম আমার চোখের দিকে তাকালো। বোধ হয় দেখে নিল এসব সূক্ষ্ম জিনিস বোঝবার স্পর্শকাতরতা আমার কতখানি আছে? আফ্‌টার অল্, সে তো আমাকে জানে খানসামার ভাই খানসামা হিসেবে!

আমার চোখে কি দেখল কে জানে। আজও আমার কাছে রহস্য।

কিন্তু বলে যেতে লাগলো ঠিক সেই ভাবেই।

বললে, "বিদ্যাবুদ্ধি কতখানি ছিল বলতে পারি নে, কিন্তু একটা জিনিস

Library

আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আমরা, কুলী-মজুররা যে ভালোবাসি, একে অন্যের প্রতি আমাদের যে টান হয়, সেটাকে আমি নিন্দা করছি নে, কিন্তু সায়েবের পাশে বসে প্রেমের ভালো ভালো গান আর কবিতা পড়ে পড়ে আমি এক নূতন ভাবে তাকে ভালোবাসতে লাগলুম, আর সে যে আমাকে কত দিক দিয়ে কতখানি ভালোবাসে সেটাও দিনের পর দিন আমার কাছে পরিষ্কার হতে লাগলো।"

টুনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল তাকে থামাই। কিন্তু সে তখন আপন মনে যেন কথা বলছে। আবার কখনো বা সংবিতে ফিরে চোখ দুটি মেলে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে আপন কথা বলে যায়।

"সায়েবের মত এরকম মানুষ আমি আর দেখিনি। সামান্য কয়েক ঘণ্টা দিনে কাজ করতো চা-গাছের সার নিয়ে, আর তার জন্য পেত কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। আর খরচ করতো বেহুঁশের মতো। আমি কিছু বললে হেসে উত্তর দিত, যত খুশি যে যখন কামাতে পারে তখন যত খুশি খরচ করবে না কেন?

এই তো আমার স্বামীকে দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল—"

খান বললে, 'আমি তখন উত্তেজনার চরমে। এইবারে জানতে পারবো, সেই টাকা নিয়ে টুনি মেমের স্বামী দেশে ফিরে গিয়ে খেতখামারের প্ল্যান করছিল কি না? সে টাকা পেয়েছিল কি? না ও'হারা ডবল ক্রসিং করছিল! রামভজন গুলি খেল কি করে, কেন, কার হাতে? কিন্তু হঠাৎ কেন জানি নে, টুনি মেম কথার মোড় ফিরিয়ে নিল। আমি শুধু লক্ষ্য করলুম, টুনির মুখ কেমন যেন ঈষৎ বিকৃত হয়ে গেল। পাছে সে সন্দেহ করে বসে, আমি কি মতলব নিয়ে এসেছি, তাই আমিও ঐ ব্যাপারটার উপর চাপ দিলুম না। মনকে সান্ত্বনা দিলুম এতখানি যখন বলেছে, পরে মোকা পেলে বাকিটুকু পাম্প করে নেব।

কারণ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, টুনি মেম তো সাধারণ কুলী-কামিন্ নয়ই, সে অসাধারণ বুদ্ধিমতী মেয়ে এবং সব চেয়ে বড় কথা, সে ভীষণ শক্ত মেয়ে। খুদাদাদ্ (বিধিদত্ত) চরিত্রবল তার নিশ্চয়ই ছিল, তার উপর এত বেশী তুফান-ঝড় এত বেশী বিচিত্র ভাগ্যবিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে মার খেয়ে খেয়ে আজ এই স্যাঁতসেতে কুঁড়েঘরে এসে পেঁছেছে যে এখন সে নির্ভয়—তার আর যাবে কি, তার আর হারাবার মত কি আছে যে সে তারই ভয়ে আপন গোপন কথা ফাঁস করবে? সে যদি নিজের থেকে কিছু না বলে তবে আমার চতুর্দশ পুরুষের সাধ্য নেই যে আঁকশি দিয়ে তার পেটের কথা বার করি। এই এক ফোঁটা দুবলা পাতলা মেয়ে, পুলিসের এক ফুঁয়ে সে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে উড়ে যাবে, কিন্তু আমি এ-তত্ত্বটাও জানি যে সে ভাঙবে না, তার দার্ঢ্য অবিশ্বাস্য।

টুনি মেম বললে, "কিন্তু সাহেব ছিল পাগল। আমি ভেবে-চিন্তেই বলছি, সাহেব ছিল পাগল। দুটো জিনিসে যে তার পাগলামি কত বিকট রূপ ধারণ করতে পারতো সে যারা দেখেছে তারাই বলতে পারবে।"

তারই স্মরণে টুনি মেম যেন আঁতকে উঠলো। বললো, "বেশ ভালমানুষের

মতো দিব্যি দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, আমাকে আদর-সোহাগ করার অন্ত নেই, সারা সকালটা হয়তো কাটালো ক্যাটালগ দেখে বিলেত থেকে আমার জন্য কি সব আনাবে বলে, তারপর হঠাৎ আরম্ভ হয়ে গেল একটানা মদ খাওয়া। চললো দিনের পর দিন। কাজ কর্ম তো বন্ধ বটেই, নাওয়াখাওয়ারও খোঁজ নেই। একটুখানি সুব্যবস্থায় পেয়ে যদি বললুম, 'দুটি মুখে দাও,' তবে সে কাতর স্বরে হয় বলতো, 'নেশা কেটে যাবে,' নয় বলতো 'মুখ দিয়ে কিছুই নামবে না।' ঘুম আর মদ, মদ আর ঘুম। আমার জাতভাইরা এদেশে এসে মদ খেতে শেখে। তাদের কেউ কেউ খায়ও প্রচুর। ও জিনিস আমার সম্পূর্ণ অজানা নয়, কিন্তু ওরকম বেহদ মদ কাউকে আমি খেতে দেখিনি, শুনিনি। সে তখন মানুষ নয়, পশুও নয়, যেন কিছুই নয়।

"আমি তার পা জড়িয়ে ধরে বলেছি কতবার—তুমি যদি ঐ মদটা না খেতে তবে আমি নির্ভয়ে বলতে পারতুম, আমার মত সুখী পৃথিবীতে কেউ নেই। সুস্থ অবস্থায় থাকলে সেও আমার পা জড়িয়ে ধরে প্রতিজ্ঞা করতো, আর কখনও খাবে না। কী লজ্জা! যাকে আমি মাথার মণি করে রেখেছি, সে দেবে হাত আমার পায়ে! অবশ্য এ কথাও ঠিক, আস্তে আস্তে তার এই মদের বান কমতির দিকে চললো। আমার আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু আমার কপালে এত সুখ সইবে কেন?"

খান দম নিয়ে বলল, 'দেখ্ মিতু, এর পর বহুকাল চা অঞ্চলে কাজ করার ফলে বিস্তর সায়েবকে প্রচুর কালো মেয়ে নিতে দেখেছি, এবং ছেড়ে যেতেও দেখেছি, কাচ্চা-বাচ্চা থাকলে তাদের মিশনারির কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা আমাকেও মাঝে মাঝে করতে হয়েছে,—এসব ওদের ডালভাত। কিন্তু টুনি মেম স্বতন্ত্র।'

আমি বললুম, 'সে আর তোকে বলতে হবে না। তার পর কি হল, তাই বল। বোলপুর আর বেশী দূর নয়।'

খান বললে, 'টুনির কাহিনীও শেষ হতে চললো। শোন্। টুনি বললে, "আমার দ্বিতীয় দুঃখ ছিল, সায়েবের অসম্ভব রাগ। ঐ মদেরই মত। বেশ দিন কাটছে, হাসিখুশির মানুষ সায়েব। হঠাৎ কোনো আরদালি বা বেয়ারা একটা কিছু বললে, আর সায়েব রেগে পাগলের মত বন্দুক হাতে নিয়ে তাকে করলে তাড়া। আমি কতবার যে ছুটে গিয়ে তার পায়ে জড়িয়ে ধরে তাকে ঠেকিয়েছি তার হিসেব নেই। তবু বুঝতুম, যদি মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় এ-রকম ধারা করতো। তা নয়। সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় আমার নিজের কোনো ভয় ছিল না, কারণ আমার উপর সে একবার মাত্র রেগে গিয়ে পরে এমনই লজ্জা পেয়েছিল যে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ ছিল না যে সে আমার উপর রাগবে না। কিন্তু চাকরবাকরকে নিয়ে হত মুশকিল। আমার স্বামীকে—"'

খান থামলো। আমি তেড়ে বললুম, 'ঐ রাগের মাথায় খুন করেছিল না কি?'

খান বললে, 'ভাই এবারেও আমাকে প্রলোভন সম্বরণ করতে হল। ঠিক

যখন আমার মনে হল, এবারে টুনি আসল কথায় আসবে ঠিক তখন সে আবার তার কথার মোড় ঘোরাল। আমি নাচার। আবার মনকে সান্ত্বনা দিলুম, এই নিয়ে দু'বার হল ; তিনবারের বার নিশ্চয়ই বলবে। কিন্তু টুনি পাড়লো অন্য কথা। বললে, "ঐ রাগই আমার সর্বনাশ করলো।" তারপর আমাকে শুধালে আমি এদেশে অনেকদিন ধরে আছি কি না ? আমি বললুম, না, ভাইয়ের সন্ধানে হালে এসেছি। তখন টুনি বললে, "তাহলে, জানতে, যা সবাই জানে। ঐ নিয়ে মোকদ্দমা হয়েছিল।

"সায়েব ক্লাবে বড় একটা যেত না। একদিন ফিরে এল চিৎকার করতে করতে বদ্ধ মাতালের মত, অথচ মদ খায়নি। পাগলের মত শুধু চেঁচাচ্ছে, 'আমাকে অপমান, এত বড় সাহস ! আমাকে অপমান, এত বড় সাহস ! আমি দেখাচ্ছি, আমি কি করতে পারি। আমি কাউকে ছাড়বো না। আমি দেখাচ্ছি, আমি কি করতে পারি।' আমি চেষ্টা করেছিলুম সায়েবকে ঠাণ্ডা করতে কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারলুম না। টাকা নিয়ে মোটরে করে ফের বেরিয়ে গেল।

"ত্রিসংসারে আমার কেউ নেই। তাই নিয়ে আমি কখনো দুঃখ করিনি। আমার সায়েবকে পেয়েই আমি খুশি ছিলুম, আমি সুখী ছিলুম, কিন্তু রাত যখন ঘনিয়ে এল আর সায়েব ফিরল না তখন যে আমি কি করি, কার কাছে গিয়ে সাহায্য চাই, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলুম না। এর পূর্বে সায়েব আমাকে কখনো একা ফেলে যায়নি। একা থাকতে আমার ভয় করে না। কিন্তু সে রাত্রে কেমন যেন এক অজানা ভয় এসে আমাকে অসাড় করে দিল। সে রাত্রিটা আমার কি করে কেটেছিল আজ আর বলতে পারবো না।

"পর দিন সায়েব সন্ধ্যের দিকে ফিরে এল। আমি তাকে হাত ধরে নিয়ে যেতে চাইলুম বাথরুমের দিকে। সে কিন্তু আমাকে দু হাতে শূন্যে তুলে নিয়ে বসালো উঁচু একটা চেয়ারের উপর। নিচে আমার পায়ের কাছে ছোট্ট একটি মোড়ার উপর বসে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে আমার দিকে। সায়েব এ-ভাবে প্রায়ই আমাকে বসাতো, আর একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো। আমার বড় লজ্জা করতো। আমি কে, আমি কি ?

"ভাই সাহেব, তুমি কিছু মনে করো না, আমাকে সব কথা বলতে দাও।

"ঠিক তার চারদিন পর পুলিস তাকে ধরে নিয়ে গেল।

"কুকুর-বেড়ালকেও মানুষ এরকম লাথি মেরে বাড়ি থেকে খেদায় না। আমি সায়েবের রক্ষিতা, আমার তো কোনো হক নেই। পুলিস বাড়ি তালাবন্ধ করে সিল-মোহর মেরে চলে গেল। আমি এক বস্ত্রে বাঙলোর বারান্দা থেকে বাগানের বকুলতলায় এসে বসে রইলুম। সেখানে সায়েব আমার জন্য একটা সিমেন্টের বেদী বানিয়েছিল।

"যে চাকর নফর সেদিন সকাল বেলা পর্যন্ত আমার পা চেটেছে, তারাই এখন আমাকে লাথিঝ্যাটা মারলো। চাকরি গেছে যাক কিন্তু ঐ 'কুলী মেম'টাকে যতখানি পারি অত্যাচার-অপমান করে তার দাদ তুলে নিয়ে যাই।

"আমি একটি কথাও বলিনি।

"মোকদ্দমাতে সব কথা বেরুল। সবাই জানে। সেই যেদিন সায়েব ক্লাবে গিয়েছিল সেদিন ক্লাবের কয়েকজন মুরুব্বী তাকে নাকি আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে, অনেক চা-বাগিচার ইংরেজ ছোকরা দিশী মেয়ে রাখে কিন্তু আমার সায়েব আমাকে নিয়ে খোলাখুলি যে মাতামাতি করছে সেটা ইংরেজ সমাজের পক্ষে বড়ই কেলেঙ্কারির ব্যাপার।

"আমি জানতুম, আমার সায়েব এ-সব চা-বাগিচার সায়েবদের ঘেন্না করতো। কতবার তাকে বলতে শুনেছি যে-সব নেটিভদের উপর সায়েবরা ডাণ্ডা মেরে বেড়ায়, তারা শিক্ষাদীক্ষার কোনো সুযোগই পায়নি, তাই তারা আজ মজুর, আর ঐ সায়েবরা আপন দেশে সব সুযোগ পেয়েও নিতান্ত অপদার্থ হতভাগা বলে কিছুই করে উঠতে পারেনি। আপন দেশে মজুরের কাজ করতে হলে যেটুকু ধাতুর প্রয়োজন সেটুকুও এসব লক্ষ্মীছাড়াদের নেই বলে তারা এদেশে এসে নেটিভদের উপর দাবড়ে বেড়ায়।

"তোমাকে বলেছি, ভাইয়া, আমার সায়েব অপমানিত বোধ করে রেগে একেবারে পাগলের মত হয়ে যেত। সে নাকি তখন যে কটা সায়েবকে হাতের কাছে পেয়েছে তাদের গালে ঠাস ঠাস করে চড় কষিয়েছে আর চিৎকার করে একই কথা বার বার বলছে, 'আমি তোমাদের মত ভণ্ড ছোটলোক নই। আমি যাকে নিয়েছি তাকে আমি আমার স্ত্রীর সম্মান দিয়েই রেখেছি।' এখানে বলে রাখি, ভাই সায়েব, এরা সবাই জানতো কথাটা সত্যি। আব্রুগড়ের পাদ্রী সাহেব আমাদের বিয়ের মন্ত্র পড়তে নারাজ জেনে সায়েব ঠিক করেছিল, কলকাতায় আমাদের বিয়ে হবে।" '

খান অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললে, 'তিনবারের বারও ঘোড়া জল খেল না। কারণ আমি তখন থাকতে না পেরে টুনিকে শুধালুম, তার স্বামী সম্বন্ধে যখন কোনো খবর নেই তখন তাদের বিয়ে হত কি করে? অবশ্য আমি ভাবখানা করেছিলুম যেন ওটা অমনি একটা কথার কথা, যেন নিছক একাডেমিক প্রশ্ন। আজও বুঝতে পারিনি টুনি মেম আমাকে সন্দেহ করেছিল কি না। টুনি শুধু বললে, সায়েব নাকি তাকে বলেছিল, সে কলকাতার উকিলদের কাছ থেকে তাদের সম্মতি আনিয়েছে তবে সেটা নাকি খুব পরিষ্কার নয়। চুলোয় যাক্ গে সে-সব কথা, আমার ইচ্ছে শুধু জানবার তার স্বামীর নিখোঁজ হওয়া সম্বন্ধে সে কি জানে কিন্তু সেই যে ও'হারার বদমেজাজীর কথা বলার সময় সে তার স্বামীর কথার আভাস দিয়েছিল, এবারে সেটুকুও না।'

আমি বললুম, 'ঐ কথাটুকু আমিও তো জানতে চাই।'

খান বললে, 'টুনি জল খেয়ে নিয়ে খেই তুলে বললে, "সায়েবকে ক্লাব বাড়ি থেকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়। সেদিন বাড়ি ফিরে সায়েব আমাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখেছিল—সে তো বলেছি—তারপর মোকদ্দমায় বেরুল, সায়েব পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরের একটা ছোট্ট পোস্টআপিসে গিয়ে যে ছ'জন সায়েব তার

গায়ে হাত তুলেছিল তাদের নামে ছ'প্যাকেট বিষ-মাখানো চকলেট বিজ্ঞাপন হিসাবে পাঠায়। আচ্ছা, বল তো ভাইয়া, আমি যে বলেছিলুম সাহেবের মাথার ছিট ছিল সেটা কি ভুল বলেছি? এটা কি ধরা পড়তো না? পাঁচটা পরিবারের লোক যদি একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়ে আর—সাহেবলোগের ব্যাপার—সঙ্গে সঙ্গে সিভিল সার্জনকে ডাকা হয় তবে কি তার মূল ধরা পড়বে না? পার্সেলের উপর যে পোস্ট অফিস থেকে সেগুলি এসেছিল তার খেই ধরে পুলিস দু'দিনের ভিতর ধরে ফেলল যে সে-ই পার্সেলগুলো পাঠিয়েছিল। পোস্টমাস্টার আদালতে তাকে সনাক্ত করলে।" '

খান মন্তব্য করে বললে, 'টুনি মেমের নরম আর শক্ত দুটো দিকই দেখতে পেলুম তার পরের কথাতে। বললে, "মানুষ মারা পাপ, আর ভাবো দিকিনি ঐ সব পরিবারের ছোট্ট ছোট্ট কাচ্চাবাচ্চাগুলো। আবার পাঠিয়েছিল একটা ছোট ডাকঘর থেকে। ধরা পড়তে কতক্ষণ। কিন্তু একথাও তোমাকে বলছি, ভাইয়া, আমি ঘুণাক্ষরেও সায়েবের এই দুর্বুদ্ধির কথা অনুমান করতে পারলে তার সামনে গলায় দা দিতুম।

"আদালতে সায়েব একটি কথাও বলেনি।

"শুধু শহরময় ছড়িয়ে পড়লো, সায়েব নাকি হাজতে যাবার সময় তার উকিলকে বলেছিল, সে তার 'স্ত্রী'র ন্যায্য সম্মান রাখবার চেষ্টা করেছে মাত্র। একথা শুনে শহরের লোক কি বলেছিল জানি নে, কিন্তু ঐ আমি আমার শেষ সম্মান পেলুম।

"সেই সম্মানের উঁচু আসন থেকে আরম্ভ হল আমার পতন।

"আমি তখন যাই কোথায়? দেশের দশের চোখে আমি সায়েবের রক্ষিতা। রক্ষিতাকে রক্ষা করনেওলা যখন আর কেউ নেই তখন সে যাবে কোথায়? যাবার জায়গা নয়, মরার জায়গা একটা আছে। বেশ্যাপাড়া। কিংবা মরতে পারি ফাঁস দিয়ে। কিন্তু—"

টুনি মেম খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "কিন্তু তখন সায়েবের বাচ্চা আমার পেটে। তার প্রাণ নিই কি করে?" '

খান বললে, 'এর পর টুনি মেম কি করে ধাপের পর ধাপ নামতে নামতে সেই জাহান্নমের রদ্দি কুঁড়েঘরে এসে পেঁছিল তার বর্ণনা দেয়নি। তুই সেটা যে রকম খুশি কল্পনা করে নিতে পারিস।'

আমি বললুম, 'আমি স্যাডিস্ট নই। আমি বীভৎস রসে আনন্দ পাই নে। তারপর কি হল তুই বলে যা।'

খান বললে, 'টুনি সে রাত্রে আর কিছু বলেনি। তার ক্লান্তি দেখে আমিও আর খোঁচাখুঁচি করিনি।

ওদিকে আমার বসের সঙ্গে কথা ছিল, টুনিকে আবিষ্কার করতে পারলে যেন সঙ্গে সঙ্গে তাকে টেলিগ্রাম করে জানাই। অতি অনিচ্ছায় পরের দিন তাঁকে কোড টেলিগ্রাম করে জানালুম। গেলুম স্টেশনে তাঁকে রিসীভ করতে।

সন্ধ্যাবেলা তিনি নামলেন পুলিসের য়ুনিফর্ম পরে। আমি অবাক হয়ে বললুম, "স্যার, করেছেন কি? টুনি বড় শক্ত মেয়ে। পুলিসকে সে একটি কথাও বলবে না। এমন কি আপনি চাকর নফরের বেশ পরলেও ধরে ফেলতে পারে।"

খেলুম উৎকট ধমক। বললেন, "রেখে দাও ওসব জ্যাঠামো। এই ঘোষাল-বান্দা ঘড়েল ঘড়েল খুনীদের পেটের নাড়ির 'কিরমি' বের করেছে একশ' সাতান্ন বার, আর আজ তুমি এলে শোনাতে, কি করে এক ফোঁটা ছুঁড়ির ঠোঁটের কথা বের করতে হয়। চল, তোমাকে হাতেকলমে দেখিয়ে দিচ্ছি।" আমি তাঁকে বহুৎ বোঝাবার চেষ্টা করলুম। খেলুম গণ্ডা তিনেক ধাঁতানি। কীই বা করি আমি? তিনি দুঁদে অফিসার। পাঠান আসামীকে তিনি খুন কবুল করাতে পেরেছেন বলে তাঁর খুশ-নাম ছিল—পাঠানকে "বেইমান" বলে অপমান করলে সে রেগেমেগে সব-কিছু ফাঁস করে দেয়, এই অজানিত প্যাঁচটি জানতেন, বলে। আমি চুপ করে গেলুম।

গট্ গট্ করে মিলিটারি বুটে পাড়া সচকিত করে তিনি ঢুকলেন টুনি মেমের কুঁড়েঘরে। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম।

তারপর, মশাই, আরম্ভ হল দুঁদে পুলিসের যত রকম কায়দা-কেতা ফন্দি-ফিকির সন্ধি-সড়ুক তার নির্মম প্রয়োগ। দুনিয়ার ভয়-প্রলোভন, মৃদু ইঙ্গিত, কটু সম্ভাষণ সব-কুচ্ চালালেন ঘড়েল পুলিস-কর্তা।

কিন্তু সেই যে পুলিস দেখে টুনি মেম মুখ বন্ধ করেছিল সে মুখ আর সে খুললে না। ঝাড়া ছ'টি ঘণ্টা পুলিস সাহেব তাঁর শেষ চেষ্টা দিয়ে ঘেমে নেয়ে বেরুলেন সেই কুঁড়েঘর থেকে ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে। টুনি মেম একটা হ্যাঁ-না পর্যন্ত বলেনি।

আমার লজ্জাটুকু পর্যন্ত পুলিসকর্তা রাখলেন না। আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলুম তিনি যেন প্রকাশ না করেন যে আমার কাছ থেকে সব কিছু জানতে পেরে তিনি তার সন্ধান পেয়েছেন। আমি যে খানসামার ভাই সেই খানসামার ভাইই থেকে যাই। কিন্তু টুনি মেমের নীরবতার পাঁচিলে মাথা ঠুকে ঠুকে পুলিসকর্তা ঘায়েল হয়ে গিয়ে সেকথাটাও প্রকাশ করে দিলেন। এমন কি তিনি আমাকে ভিতরে ডেকে পাঠালেন। যেতে হল—বস্ যে।

টুনি একবার আমার দিকে এক লহমার তরে তাকিয়েছিল।

কি বলবো, মিতুয়া, সে দৃষ্টিতে ঘৃণা তাচ্ছিল্য কি ছিল, কিছুই বলতে পারবো না। শুধু মনে হয়েছিল রহস্যময় সে দৃষ্টি।'

খান বললে, 'তার পরদিন প্রসবের সময় টুনি মেম এই দুঃখের সংসার ত্যাগ করলো।'

এটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। আমি অবাক হয়ে বললুম, 'সে কি?'

'হুঁ।'

আমি শুধালুম, 'তাহলে ঐ যে লোকটা খুন হয়েছিল তার কোন হিল্লে হল না?'

খান অনেকক্ষণ কোন উত্তরই দিলে না। শেষটায় বললে, 'সে যাক্ গে। এর পরও আমি বহু রহস্যের সমাধান করতে পারিনি—সে নিয়ে আমার শোক নেই। আমি শুধু এখনো টুনি মেমের শেষ চাউনির কথা ভাবি। সে চাউনিতে কি ছিল?

দুর্দশার চরমে বাচ্চা দুটো যখন ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে তখন আমি এসে তাদের চোখের জল মুছে দিলুম, টুনি তখন নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্তাকে তার সর্ব দেহমন নিয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছিল—তিনি যে তার ডুবুডুবু ভাঙা নৌকোখানিকে পারে এনে ভিড়ালেন। আমাকে সে দেখেছিল তাঁরই দূতরূপে, তাঁরই ফিরিশতারূপে। তারপর হঠাৎ দেখে, আমি দেবদূত নই, আমি শয়তান। তার দুর্দিনে যেসব চাকর-বাকর তাকে লাঞ্ছিত অপমানিত করেছিল আমি তাদের চেয়েও অধম। আমার মতলব ছিল তার বাচ্চা দুটোকে খাইয়ে-দাইয়ে তাকে খুশী করে, তার জীবনের চরমধন তার "স্বামীকে" ঝোলাবার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করা।'

এর পর আর কোনো কথা হয়নি। গাড়ি বোলপুরে এসে থামল।

চেল্লাচেল্লিতে ম্যানেজার গোসাঁই স্বয়ং এসে খানকে ডবল খানা দিলে। গাড়ি যখন চলতে আরম্ভ করেছে তখন আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল টুনি মেমের বাচ্চা দুটোর কথা। চেঁচিয়ে খানকে শুধালাম, 'ওদের কি হল?' খান শুনতে পেল না। হাসিমুখে শুধু হাত নাড়লে।

এক পুরুষ

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের শেষের দিক।

বিদ্রোহ শেষ হয়ে গিয়েছে। আজকের দিনের যুদ্ধে যাকে ইংরাজিতে বলে 'মপিং অপ্,' যেন স্পঞ্জ দিয়ে মেঝের এখান ওখান থেকে জল শুষে নেওয়া—তাই চলেছে। আজ এখানে ধরা পড়ল জন দশেক সেপাই, কাল ওখানে জন বিশেক। কাছাকাছি কামান থাকলে পত্র-পাঠ বিদ্রোহীগুলোকে তাদের মুখের সঙ্গে বেঁধে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিম্বা ফাঁসি। গাছে গাছে লাশ ঝুলছে, যেন বাবুই পাখীর বাসা।

পাঁচ শ' দু-আস্পা (দ্বি-অশ্বা) অর্থাৎ এক হাজার ঘোড়া রাখার অধিকারী বা মনসবদার গুল বাহাদুর খান বর্ধমানের কাছে এসে মনস্থির করলেন, এখন আর সোজা শাহী সরকারী রাস্তায় চলা নিরাপদ নয়। তিনি অবশ্য আপদ কাটাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেননি। তিনি ততক্ষণে বুঝে গিয়েছেন গদর (মিউটিনি) শেষ হয়ে গিয়েছে—তাঁরা হেরে গিয়েছেন। তিনি কেন, তাঁর সেপাইরা আশা ছেড়ে দিয়েছিল, তিনি নিজে নিরাশ হওয়ার বহু পূর্বেই। সলাহ্‌পরামর্শ করার জন্য তিন রাত্রি পূর্বে যে জলসা বসেছিল তাতে তারা অনুমতি চায়, অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে গরীব-গুরবো,

ফকীর-ফুকরো সেজে যূথভঙ্গ হয়ে যে যার আপন শহরের দিকে রওয়ানা হবে। এলাহাবাদ, কনৌজ, ফর্রুখাবাদ, লক্ষ্ণৌ, মলীহাবাদ, মীরট—যার যেখানে ঘর।

গুল বাহাদুর খান বলেছিলেন, সেটা আত্মহত্যার শামিল। পথে ধরা পড়বে, আর না পড়লেও বাড়িতে পেঁছানোর পর নিশ্চয়ই। তাঁর মনের কোণে, হয়তো তাঁর অজানতে, অবশ্য গোপন আশা ছিল বেঁচে থাকবার। সুধু মাত্র বেঁচে থাকবার জন্য নয়,—তাঁর বয়স বেশী হয়নি, হয়তো আবার নূতন গদর করার সুযোগ তিনি এ জীবনে পাবেন। কিন্তু যখন দেখলেন, সেপাইদের শিরদাঁড়া ভেঙে গিয়েছে—আজকের দিনের ভাষায় যাকে বলে 'মরাল' টুটে গিয়েছে—তখন তিনি তাদের প্রস্তাবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। শেষ রাত্রে আধোঘুমে অনুভব করলেন, সেপাইরা একে একে পায়ে চুমো খেয়ে বিদায় নিলে—তিনি আগের দিন মগরিবের নামাজের পর অনুরোধ করেছিলেন, বিদায় নেওয়া-নেওয়ির থেকে তাঁকে যেন রেহাই দেওয়া হয়।

শুনলেন, সেপাইরা চাপা গলায় একে অন্যকে শুধোচ্ছে, কাজটা কি ঠিক হল, বাড়ি পেঁছানোর আশা কতখানি, সেখানে পেঁছেই বা কিস্মতে আছে কি, এ রকম সর তাজ্ (মাথার মুকুট) সর্দার পাবো কোথায় ?

গুল বাহাদুর খানের কিন্তু কোনো চিত্তবৈকল্য হয়নি। তাঁর কাছে এরা সব নিমিত্ত মাত্র। তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাঁর প্রাণের একমাত্র গভীর ক্ষুধা—জাহান্নমী শয়তান ইংরেজকে এ দেশ থেকে তাড়িয়ে শাহানশাহ বাদশা সরকার-ই-আলা বাহাদুর শাহের প্রাচীন মুগলবংশগত শান্‌শৌকৎ, তখ্‌ৎদৌলৎ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। আজ যদি এই সেপাইদের দিল্ দেউলে হয়ে গিয়ে থাকে তো গেছে। এরা তো আর কিছু কাপুরুষ নয়। কিন্তু এরা কাকের মত একবারই বাচ্চা দিতে জানে। একবার তারা চেষ্টা দিয়েছিল। সফল হতে পারেনি। দু'বার চেষ্টা দেওয়া তো এদের কর্ম নয়। তাই নিয়ে আফসোস্ করে কি ফায়দা ! খুদা যদি বাঁচিয়ে রাখেন, আল্লার যদি মেহেরবানী হয় তবে আবার নয়া সেপাই জুটবে, নয়া দামামা পিটিয়ে জেগে উঠবে—তার আশা তিনিই করতে পারেন, এরা করবে কি করে ?

গদর আরম্ভ হয়েছিল এলোপাতাড়ি কিন্তু পরে দিল্লীতে লালকেল্লার তসবী খানাতে যে মন্ত্রণাসভা বসেছিল সেখানে স্থির হয়, গুল বাহাদুরকে পাঠানো হবে বাঙলা দেশে। সেখানকার বান্দীরা এককালে ছিল বাদশাহের সেপাহী। ইংরেজ তাদের বিশ্বাস করতো না বলে ইংরেজ ফৌজে তাদের স্থান হয়নি। শুধু তাই নয়, ইংরেজ তাদের অন্য কোনো রকম কাজ তো দিলই না, উল্টে হুকুম করলে তারা যদি আপন জমি নিজে চাষ না করে তবে সে জমি কোম্পানি বাজেয়াপ্ত করবে। বান্দীদের আত্মসম্মানে লাগে জোর ঘা। যে তলোয়ার দিয়ে সে দুশমনের কলিজা দু'টুকরো করে দেয়, তাই দিয়ে সে খুঁড়বে মাটি ! তার চেয়ে সে তলোয়ার আপন গলায় বসিয়ে দিলেই হয়, কিম্বা মোকা পেলে

দুশমনের গলায়—

গুল বাহাদুরকে বাঙলাদেশে পাঠানো হয়, এই বান্দী ডোমদের জমায়েৎ করে এক ঝাণ্ডার নিচে খাড়া করবার জন্য।

আফসোস্, আফসোস্! হাজার আফসোস্! একটু, আর একটু আগে আরম্ভ করলেই তো—গুল মহম্মদ নিজের মনেই বললেন, 'থাক্ সে আফসোস্। এখন বর্তমানের চিন্তা করা যাক্।'

বান্দীদের সাহায্যেই তিনি যোগাড় করলেন ধুতি নামাবলী। তিনি এখন বৃন্দাবনের বৈষ্ণব। বাঙলা জানেন না, জানেন হিন্দী। আসলে সেটাও ঠিক জানেন না। তিনি ছেলেবেলা থেকে বাড়িতে বলেছেন দিল্লীর উর্দু, মকতবে শিখেছেন ফার্সী, আর বলতে পারেন দিল্লীর আশপাশের হিন্দীর অপভ্রংশ হরিয়ানা। কিন্তু তাই নিয়ে অত্যধিক শিরঃপীড়ায় কাতর হবার কোনো প্রয়োজন নেই। এই রাঢ় দেশে কে ফারাক করতে যাবে, দিল্লীর হরিয়ানা থেকে বৃন্দাবনের ব্রজভাষা।

দাড়িগোঁফ কামাতে গিয়ে একটুখানি খটকা বেধেছিল, এক লহমার তরে। তারপর মনে মনে কান্নার হাসি হেসে বলেছিলেন, 'তা কামাবো বইকি, নিশ্চয়ই কামাবো। লড়াই হেরেছি, তলওয়ার ফেলে দিয়েছি, পালাচ্ছি মেয়েছেলের মত —এখন তো আমাকে মেয়েমানুষ সাজেই মানায় ভালো।'

শেষটায় হঠাৎ অট্টকণ্ঠে চেঁচিয়ে বলেছিলেন, 'ইয়াল্লা, আমি কি গুনা করে ছিলাম যে এ সাজা দিলে?'

ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্টও মৃত্যুর পূর্বে চিৎকার করে বলেছিলেন, 'হে প্রভু, তুমি আমাকে বর্জন করলে কেন?'

বান্দীরা তাঁর হাহাকার হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিল। তেঁতুলতলায় শুইয়ে দিয়ে ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে সান্ত্বনা দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল।

দুপুর রাতে চাঁদের আলো মুখে পড়াতে ঘুম ভাঙলো। দেখলেন, ঘুমিয়েও ঘুমোননি। ঘুমন্ত মগজও তাঁর জাগ্রত অবস্থার শেষ হাহাকারের খেই ধরে মাথা চাপড়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তার সান্ত্বনাও খুঁজে পেয়েছে। কি সান্ত্বনা? গুল বাহাদুর, এ কি তোমার ফাটা কিস্মৎ, না তোমার বাপ-ঠাকুর্দার ভাঙা কপাল? মনে নেই, দেওয়ান-ই খাসের যেখানে লেখা,

"অগর ফিরদৌস বররুয়ে জমীন অস্ত
ওয়া হমীন অস্ত, হমীন অস্ত, হমীন অস্ত"
"ভূস্বর্গ যেখানে খুশী বলো, মোর মন জানে
এখানে, এখানে দেখো তারে, এই তো এখানে।"

তারই সামনে নাদির কর্তৃক হৃতসর্বস্ব, লাঞ্ছিত, পদদলিত বাদশা মুহম্মদ শাহ কপালে করাঘাত করে কেঁদে উঠেছিলেন,

'শামাতে আমাল ই-মা সুরতে নাদির গিরিফ্‌ৎ।'
'কপাল ভেঙেছে, আমারই কর্মফল
নাদির মূর্তিতে দেখা দিল।'

তখন কি তোমার পিতামহ তাঁর নুন-নিমকের মালিক শাহিনশার সে দুর্দৈব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেননি ? বাদশার খাস আমীর সর্-বুলন্দখান, হাজার দু-আস্পা মনসবের মালিক তোমার পিতামহ তখন কি করতে পেরেছিলেন ? আলবত্তা, হাঁ, হাবেলীতে ফিরে এলে তাঁর জননী তাকে শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, 'দাড়িগোঁফ কামিয়ে ফেল, আর তলওয়ারখানা শাহিনশাহকে ফেরত দিয়ে এসো।'

তারপর দীন-দুনিয়ার মালিক আকবর-ই-সানী (দ্বিতীয় আকবর) যখন ইনিয়ে বিনিয়ে বিলাতের বাদশার কাছে দরখাস্ত পেশ করলেন তাঁর তনখাহ্ বাড়িয়ে দেবার জন্য—মেথর যে-রকম জমাদারের কাছে তন্খা বাড়াবার জন্য আর্জী পেশ করে—তখন সে বেইজ্জতী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন তোমার বাপ। শোনোনি যে বাঙালীন্ বাবু[১] সে দরখাস্ত নিয়ে বিলায়েত গিয়েছিলেন তিনি পর্যন্ত নাকি তার জবান, ঢং আর শৈলী দেখে শরম বোধ করেছিলেন।

তাই বলি তুমি এত বুক চাপড়াচ্ছো কেন ?

তাঁদের তুলনায় তোমার মনসবই (পদমর্যাদা) বা কি, বাদশাহ তোমাকে চেনেনই বা কতটুকু ? নানাসায়েব, লছমীবাঈ এঁরা সব গায়েব হয়েছেন, আর তুমি তাঁতী এখন ফার্সী পড়বে ! হয়েছে, হয়েছে, বেহদ হয়েছে। গিদড়ের গর্দানে লোম গজালেই সে শের-বাবর হয় না।

আল্লা জানেন, এসব তত্ত্বকথা চিন্তা করে গুল বাহাদুর খান কতখানি সান্ত্বনা পেয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনেও তাঁর আচার-ব্যবহার থেকে অনুমান করা যেত না, তিনি তাঁর কপালের গর্দিশ কতখানি বরদাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বড় রাস্তা থেকে নেমে ডান দিকে মোড় নিয়ে, ফের বাঁ দিকে পুরো পাক খেয়ে তিনি পেরলেন অজয় নদ। উঁচু পাড়ি বেয়ে উঠেই দেখলেন, সমুখে দিকদিগন্ত প্রসারিত খরদাহে দগ্ধ সবিতার অগ্নিদৃষ্টিতে অভিশপ্ত চিতানল— ভস্মীভূত প্রান্তর।

অবাঙালী তো কথাই নাই, এ দেশের আপন সন্তানও এই তেপান্তরী মাঠের সামনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে। এর নাম 'বাঙলা' রেখেছে কোন্ কাষ্ঠরসিক !

কিন্তু গুল বাহাদুর শিউরে ওঠেননি ; তাঁর জীবনে কেটেছে দিল্লী আগ্রার চারদিকের খাকছার দেশ দেখে দেখে। সেরেফ উনিশ-বিশের ফারাক।

তাবৎ তেপান্তরের ওপারেও লোকালয় থাকে। সাহারার মত মরুভূমি পেরিয়েও বেদুয়িন যখন ওপারে ডেরা পাততে পারে তখন এই তেপান্তরের পরেও নিশ্চয়ই বসতি আছে। কিন্তু সেখানে থাকে কী সর্বহারা লক্ষ্মীছাড়ারাই। যাদের প্রাণ ছাড়া আর কিছু দেবার নেই শুধু তারাই তো পারে এ রকম ডাক-ডাকিনীর মাঠে পা ফেলতে !

ভালোই। ভালোই হল। এই তেপান্তরই তাঁর ও ইংরেজের মাঝখানে

---

১ রাজা রামমোহন রায়।

দাঁড়িয়ে রইবে অচল অভেদ্য দুর্গবৎ। সেই হতভাগাদের সঙ্গেও তাঁর বনবে ভালো, hail fellow well-met, 'এক বাথানের গরু'।

গুল বাহাদুর বললেন, 'শুক্‌রু, অলহমদুলিল্লা'।

মাঠে ফেললেন পা।

॥ দুই ॥

সংসারের অধিকাংশ লোক না গোলাম না বাদশাহ। বাদবাকীর কেউ সর্দার কেউ চেলা। ওদের কেউ কেউ জন্মায় হুকুম দেবার জন্য, আর কেউ কেউ সে হুকুম তামিল করার জন্য। ভাগ্যচক্রে অবশ্য কখনো হুকুম-দেনেওলাও জন্মায় হুকুম-লেনেওলা হয়ে। তখনো কিন্তু তার গোত্র বুঝতে অসুবিধা হয় না। সে তখন বাদশা হয়ে জন্মালে উজীরের হুকুমমত ওঠ-বস করে, উজীর হলে সর্বক্ষণ তাকিয়ে থাকে কোটালের দিকে—তার আদেশ কি। আবার উল্টোটাও হয় ঠিক ঐ রকমই। সে পাইক হয়ে জন্ম নিয়েও ফৌজদারকে হামেহাল বাৎলে দেয় তার কর্তব্য কোন্ পথে।

দুঁদে জমিদারের জেল হলে সে তিন দিনের মধ্যেই চোর-ডাকাত নিয়ে কয়েদীখানায় দল খাড়া করে, সপ্তাহের মধ্যেই জেল সুপরিন্‌টেন্‌ডেন্ট তার কথায় হাঁচে, তার হুকুমে কাশে। মোকা পাওয়া মাত্রই উপরওলাকে জানায়, 'অমুক কয়েদীর কণ্ডাকট্ ভেরি ভেরি গুড ; অ্যামনেস্টির সময় একে অনায়াসে খালাস দেওয়া যেতে পারে।' জমিদার বেরিয়ে গেলেই সে তখন খালাসী পায়।

গুল বাহাদুরের জন্ম হয়েছিল হুকুম দেবার জন্য। নামাবলী গায়ে দিয়েই আসুন আর রাইডিং বুট পরেই আসুন, ডোমের দল তাকে ঢট করে চিনে ফেলল। পিঠে থাবড়া খেয়েই ঘোড়া চিনতে পারে ভালো সোওয়ার কে ?

তেপান্তরের মাঠের প্রত্যন্ত প্রদেশে, গ্রাম যেখানে শুরু, সেখানে এক পোড়ো বাড়িতে আশ্রয় নিলেন গুল বাহাদুর। চালের ভিতর দিয়ে আসমান দেখা যায়। রাতে আকাশের তারা তাঁর দিকে মিটমিটিয়ে তাকায়, দিনে কাঠ-বেরালী। ঘরের কোণের গর্ত থেকে একটা সাপ মাথা তুলে তার দিকে জুল জুল করে তাকিয়েছিল। গুল বাহাদুর বলেছিলেন, 'তশরীফ নিকালিয়ে', 'আত্মপ্রকাশ করতে আজ্ঞা হোক।' গদরের সময় তিনি নিমকহারামী দেখেছেন প্রচুর। সাপ তো তাঁর নুনিনমক খায়নি যে তাঁকে কামড়াতে যাবে।

ডোমরা তাঁর ঘর মেরামত না করে দিলে গুল বাহাদুর কদাচ এই গর্ত বন্ধ করতেন না।

চিকনকালা গ্রামে আসার পরদিন গুল বাহাদুর গিয়েছিলেন গ্রামের ভিতর একটা রোঁদ মারতে—দিল্লীর চাঁদনীচৌকে যাওয়ার মত। এক জায়গায় দেখেন ভিড়। তিনি ভিতরে যাওয়ার উপক্রম করতেই ডোমরা তড়িঘড়ি পথ করে দিলে। একটা ছেলে গাছ থেকে পড়ে পা মচকিয়েছে। তার মা হাঁউমাউ করে

আসমান ফাটিয়ে টুকরো টুকরো করে জমিনের উপর ফেলছে।

গুল বাহাদুর বরিশাল গান্ ফাটিয়ে বললেন, 'চোপ!'

মা'র কথা দূরে থাক সুবে ডোমিস্থান সে হুংকারে কে কার ঘাড়ে পড়বে ঠিক নেই। এই যে খুদাতালার এত বড় দুনিয়া, তার আধেকখানাই তো ঐ তেপান্তরী মাঠ, সেখানেও যেন তারা পালাবার পথ পাচ্ছে না। হুংকার তারা বিস্তর শুনেছে, নামাবলীও বিস্তর দেখেছে, কিন্তু নামাবলীর তলা থেকে এ রকম অট্টরব! নিরীহ গোপীযন্ত্র থেকে গদরের কামান ফাটে নাকি!

'চোপ্' বলে গুল বাহাদুরের হাত গোঁপের দিকে উঠেছিল। তখন মনে পড়ল তিনি গোঁপ কামিয়ে ফেলেছেন।

গুল বাহাদুর ছেলেটার পায়ে হাত বুলোতে লাগলেন।

কে এক ওলন্দাজ না অন্য জাতের আর্টিস্ট্ বলেছেন, 'যারা এচিং কিংবা অন্য কোনো প্রিন্টিঙের কাজ করে তাদের হাতের তেলো হবে রাজকুমারীর মত কোমল, পেশী হবে কামারের মত কট্টর। প্লেট থেকে ফালতো রঙ তোলার সময় রাজকুমারীর মখমলী তেলো দিয়ে আলতো আলতো করে তুলবে রঙ, আর প্রিন্ট করার সময় দেবে কামারে পেশীর জোরে মোক্ষম দাবাওট্!

গুল বাহাদুর তাঁর মোলায়েম তেলো দিয়ে ছোঁড়াটার গোড়ালি বুলোতে বুলোতে হঠাৎ পা'টা পাকড়ে ধরে কামারের পেশী দিয়ে দিলেন হ্যাঁচকা ঝাঁকুনী। ছেলেটা আঁৎকে উঠে রব ছাড়লে, 'কক্!'

তিনি বললেন, 'ঠীক্ হৈ, বেটা, আরাম হো জায়েগা। ফির বন্দর জৈসা কুদেগা।'

এতক্ষণ ছেলেটার পা'টা উরু থেকে কাঠের মত শক্ত হয়ে উপর-নিচ করছিল না; এবারে গুল বাহাদুর সেটাকে কব্জা-ওলা বাক্সের ডালার মত উপর-নিচু করলেন। তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তীন্ দন সোলাকে রাখবে।'

'রাখবে' শব্দটা বর্ধমান অঞ্চলে তাঁর বাঙলা শেখার প্রচেষ্টার ফল। ডোমরা বুঝলে। 'সোলাকে'ও বুঝলে—'শুইয়ে', 'তীন' তো সোজা 'তিন' কিন্তু 'দন্'-টা কি চীজ্?

গুল বাহাদুরকে গদরের সময় জাত-বেজাতের সেপাইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা কইতে হয়েছিল। তিনি তাই শিখে গিয়েছিলেন, বিদেশী কোনো শব্দ না বুঝতে পারলে তাকে শোনাতে হয় ঐ শব্দের সম্ভব অসম্ভব যাবতীয় প্রতিশব্দ। যেমন 'ইনসান' বললে যদি না বোঝে তবে বলতে হবে 'আদমী', তারপর 'মানস' 'লোগ' 'বেটা' 'বাচ্চা' ইত্যাদি। একটা না একটা বুঝে যাবেই।

গুল বাহাদুর বললেন, 'তীন্ দন্, তীন্ শাম, তীন্ রোজ।'

এক ডোম চিৎকার করে বললে, 'বুঝেছি গো, বুঝেছি। তিন দিন, তে রাত্তির।'

জীবনের দীর্ঘতর অংশ চিকনকালা গ্রামে কাটিয়ে গুল বাহাদুর বীরভূমী ডোমী ভাষা শিখেছিলেন কিন্তু শেষদিন পর্যন্ত তাঁর হিন্দুস্থানী হ্রস্ব দীর্ঘ স্বর

থেকে তিনি নিষ্কৃতি পাননি। তাঁর 'দিন' শোনাতো 'দন', 'কিতাব' 'কতাব', 'হিন্দু' 'হন্দু', 'বিলকুল' 'বল্‌কল্‌'—বাঙ্গীদের কানে।

অঙ্গারখার দামন্‌ (চাপকানের নিম্নাঞ্চল) ওঠাতে গিয়ে গোঁপে তা দিতে যাবার মত তাঁর খেয়াল হল, তিনি ধুতি উত্তরীয়ধারী!

সেদিন সন্ধ্যায় তিনি আঙ্গিনায় পলাশতলায় চ্যাটাইয়ের উপর শুয়ে। আসমানে দেখেছেন মীজান্‌ (দাঁড়িপাল্লা, মধ্যিখানে তিনটে তারা কাঁটার মত, দু'দিকে ভার—আমাদের কালপুরুষ)। তখন খেয়াল গেল, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, সবই আগের থেকে উদয় হয়েছেন। মনে মনে বিড়বিড় করতে লাগলেন, মীজান, অকরব, কওস, সম্বুলা জদী, দলো, হুৎ—!

দিল্লীতেও তিনি ছাতের উপরই থাকতেন বেশীর ভাগ।

ঠাকুরদা শখ করে বানিয়েছিলেন যমুনার উপর একখানি চক-মেলানো বাড়ি। বাড়িখানি ছোট কিন্তু উচ্চতায় সে বাড়ি ও-পাড়ার সব বাড়ি ছাড়িয়ে উঠেছিল। আজকের দিনের ভাষায় একেই বলে বাড়ি হাঁকানো। বৃদ্ধ বয়সেও ঠাকুরদার চোখের জ্যোতি ক্ষীণ হয়ে যায় নি। নাতিকে কোলে বসিয়ে বলতেন, ঐ দেখো, ঐ দেখো, ঐ দূরে, যমুনার ওপারে শাহদারা, গাজীয়াবাদ, নাতি দেখতো ওপারে শুকনো মাঠ খাঁ খাঁ করছে, আর তার মাঝে মাঝে ঝোপ-ঝাড়। কুৎবউদ্দীন আইবক থেকে আরম্ভ করে বাবুর, হুমায়ুন, রফীউদ্দৌলা মুহম্মদ শাহ সবাই গিয়েছেন ওপারে হরিণ শিকার করতে। বুড়ো বাদশাহের হরিণ-শিকারের বয়স গেছে—তিনি এখন লাল কেল্লার ছাতের উপর থেকে ওড়ান ঘুড়ি। শাহজাহাদারা এখনো যান, তিনিও বহুবার গিয়েছেন।

বাহাদুর শাহ ভালো কবিতা লিখতে পারতেন। অবশ্য সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি জওক ও গালিবের তুলনায় তাঁর রচনা নিম্নাঙ্গের। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কবিতায় এমন একটা সরল সহৃদয়তার গুঞ্জন থাকতো যেটা কারো কান এড়িয়ে যেত না। এবং তাঁর মধ্যে ছিল এমন একটা সদগুণ যেটা জওক কিংবা গালিব কারোরই ছিল না। জওক গালিবের মধ্যে হামেশাই হ'ত লড়াই। তৎসত্ত্বেও একে অন্যের প্রশংসা করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হতেন না। শোনা যায় শ্রেষ্ঠতর কবি গালিব নাকি এক মুশায়েরাতে (কবি সম্মেলনে) জওকের কোন কবিতার দু'ছত্র শুনে তাঁকে সর্বসমক্ষে বার বার কুর্নিশ করতে করতে বলেছিলেন, 'আপনার এ দুটি ছত্র আমাকে বকশিশ দিন; আমি তার বদলে আমার সমস্ত কাব্য আপনাকে দিয়ে দেবো।' কিন্তু এঁদের কাব্যের চিকন কাজ বাদশাহ বাহাদুর শাহ যতখানি অনুভব করতে পারতেন এঁরা একে অন্যের ততখানি পারতেন না। বাহাদুর শাহ ছিলেন সে যুগের—সে যুগের কেন তাবৎ উর্দু যুগের—সবসে বড়িয়া সমজদার।

গদর আমলের ইংরেজরা তাঁর কাব্যপ্রেমকে নিয়ে কত যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ঠাট্টা-মস্করা করেছে তার অন্ত নেই। তাদের রাজদরবারেও পোইট লরিয়েট নামক একটি প্রাণী পোষা হয়। তাদের কুরান-পুরানে আছে, গ্রেট ন্যাশনাল অকেশনে তিনি টপ্পা-ফপ্পাভী লিখতে পারেন, ঐ সব অকেশনে দর্জী-ওস্তাদরা যে রকম

রাজা রাণীর পাতলুন-ব্লুসার্জ বানায়, কিংবা বলতে পারেন হটেন্‌টট্‌দের রাজদরবারে পালপরবে যে রকম পোষা বাঁদর দুচক্কর 'নাচভী লেচে ল্যায়'।

আসলে তাদের রাজারা দেবসেনাপতি, অসুরমর্দন, রুদ্রাত্মজ কার্তিকের বংশ-অবতংস। তারা তীব্রতম চিৎকারে আকাশ বাতাস সসাগরা পৃথিবী (যে রাজত্বে সূর্য অস্তমিত হন না) প্রকম্পিত করে শিকার করেন খ্যাকশ্যালী। দি লর্ড বি থ্যান্‌ক্‌ট—তাদের কাণ্ডজ্ঞান আছে।

তাবৎ ইংরেজই অগা, ও-কথা বলা বোধহয় অন্যায় হবে। কারণ পরবর্তী যুগের এক ইংরেজই দুঃখ করে বলেছেন, 'যে সব গাড়লরা গদরের সময় ভারতবর্ষ শাসন করতো তাদের সামনে শেলি কিংবা কীটস এলে যে সম্মান বা অসম্মান পেতেন কবি বাহাদুর শাহ সেই সব গবেটদের কাছে সেই মূল্যই পেয়েছেন। এবং সে সব সম্বন্ধীরা এই মামুলী খবরটুকুও জানতো না যে, তাদের দুই নম্বরের মাথার মণি ওয়ারেন হেস্টিংসও কবিতা লিখতেন এবং ইংরেজ লেখক জোর গলায় বলেছেন সে কবিতা বাহাদুর শাহের কাব্যের তুলনায় অতিশয় নিকৃষ্ট এবং ওঁচা।

গুল বাহাদুরের মনে পড়ল, গদর শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক মাস আগে নওরোজের রাতে যে মুশায়েরা বসেছিল তাতে সভাপতির আসন নিয়েছিলেন বাদশা সালামৎ বাহাদুর শাহ। সেই শেষ মুশায়েরা!

থাক্‌ থাক্‌ কি হবে ভেবে?

ভাববোই না কেন? আমার অতীতকে আমি আঁকড়ে ধরে থাকবো না, আর ভবিষ্যৎকেও আমি আলিঙ্গন করতে ভয় পাবো না।

রাজত্ব বধূরে যেই করে আলিঙ্গন
তীক্ষ্ণধার অসি'পরে সে দেয় চুম্বন।

কি ভয় তাতে? আমার রথ চলবে এগিয়ে, রথের পতাকা পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে কাঁপবে অতীতের স্মরণে। তাই বলে কি আমার এগিয়ে চলা বন্ধ হবে?

বরঞ্চ বলবো নবজন্ম লাভ, অবশ্য আমি জাতিস্মর।

এই তো সেই আকাশ। এ-আকাশ আর দিল্লীর আকাশে তো কণামাত্র তফাৎ নেই। এ-আকাশ তো আমার। হেসে মনে পড়লো ফিরদৌসীর একটি দোঁহা। সম্পত্তির ভাগাভাগির সময় একজন অন্য বখরাদারকে বললে,

আজ্‌ ফর্শ-ই-খানা তা ব্‌ লব্‌-ই বাম্‌ আজ্‌ আন্‌-ই-মন্‌
আজ্‌ বাম্‌-ই খানা তা ব্‌ সুর্‌ইয়া আজ্‌ আন্‌-ই-তো।
মেঝের থেকে ছাতটুকু তাই নিলেম কুল্লে আমি
ছাতের থেকে আকাশ তোমার সেইটে তো ভাই দামী।

প্রথম যখন দোঁহাটি পড়েছিলেন তখন তার মনে হয়েছিল এ কি কাষ্ঠ-রসিকতা। আজ হৃদয়ঙ্গম হল, এ শ্লেষ নয়, বিদ্রূপ নয়—ছাত থেকে আকাশই মূল্যবান—সেখানেই মুক্তি, সেখানেই নির্বাণ।

ঐ তো আকাশের তারা। তাঁর পেয়ারা ঘোড়ার জিনের সামনের উঁচু দিকটা ঠিক এই রকমই পেতলের স্টাড দিয়ে তারার মত সাজান ছিল। এ তো

কিছু অজানা সম্পদ নয়। দার্শনিক গজ্জালীও তাঁর 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' (কিমিয়া সাদৎ) গ্রন্থে বলেছেন, 'আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে দেখো, আর আপন অন্তরের দিকে তাকাও—বুঝতে পারবে সৃষ্টির মাহাত্ম্য।'

দুইই অলঙ্ঘ্য নিয়ম অনুসারে চলে। শুধু হৃদয়ের আইন বোঝা কঠিন। স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে ভাবি, স্বেচ্ছায় করছি—তারারাও হয়তো তাই ভাবে।

তরল অন্ধকার। এ অন্ধকার বুকের উপর দুঃস্বপ্নের মত চেপে বসে না। এর চেয়ে অনেক বেশী মসীকৃষ্ণ দেখাচ্ছে পলাশের ডালগুলো। তারা আঁকা-বাঁকা শাখা দিয়ে অন্ধকারের গায়ে এঁকেছে বিচিত্র আলিম্পন। গাছের শক্ত ডাল, অশরীরী অন্ধকার, দূরদূরান্তের তারার দেয়ালি—সবাই একসঙ্গে মিলে গিয়ে পেলব মধুর স্পর্শ দিয়ে শান্তি এনে দিচ্ছে গুল বাহাদুরের দগ্ধ ভালে। এইটুকু তাঁর চোখের মণিতে ধরা দিয়েছে সে সন্ধ্যার অনন্ত আকাশ থেকে পলাশের ডগাটুকু পর্যন্ত। যমুনার পারে প্রাসাদের উপরে এরা তাঁকে যেমন করে সোহাগ জানাতো ঠিক তেমনি তারা এসে ধরা দিল ছেঁড়া চ্যাটাইয়ের উপর শায়িত ফকীর গুল বাহাদুরের কাছে।

কৃতজ্ঞ গুল বাহাদুর তাঁর দীর্ঘ দুই হাত তাদের দীর্ঘতম প্রসারণে উচ্চ বিস্তার করে আসমানের দিকে তুলে মোনাজাৎ করলেন,

তোমার আমার মাঝখানে, বিভু, নাই কোনো বাধা আর
তোমার আশিস বহিয়া আনিল তরল অন্ধকার।

॥ তিন ॥

আরব্য রজনীর গল্পে আছে, কোথায় যেন দমস্কস্ না বাগদাদ শহরে, এক ঝুড়ি আণ্ডা সামনে নিয়ে বসে অন্-নশ্ শার স্বপ্ন দেখছিল। হুবহু স্বপ্ন না, দিবা-স্বপ্ন। ঐ ডিমগুলোই তার সাকুল্য সম্পত্তি। এক ডিম বিক্রি করে মুনাফা দিয়ে সে কিনবে আরো ডিম। তারই লাভে পুষবে মুর্গী। তারই লাভে সে যাবে হিন্দুস্থান, সদাগরী করতে। তারই লাভে সে হয়ে যাবে শেষটায় শহরের সবচেয়ে মাতব্বর আমীর। তখন প্রধানমন্ত্রী—ওজীর-ই-আলা—যেচে-সেধে তাঁর মেয়েকে দেবেন তার সঙ্গে বিয়ে। তারপর আরো অনেক কিছু হবে। হয়ে হয়ে একদিন এই এমনি খামোখা তার রাগ হয়েছে বেগম সায়েবার উপরে। তিনি অনেক সাধাসাধি করেছেন তার মান ভাঙাবার জন্য। অন্-নশ্ শার মানিনী শ্রীরাধার মত অচল অটল। বরঞ্চ হঠাৎ আরো বেশী ক্ষেপে গিয়ে মারলেন বেগম সায়েবাকে এক লাথ। হায়রে, হায়! এতক্ষণ ছিল শুধুমাত্র খেয়ালের পোলাও খাওয়া,—দিবা-স্বপ্ন—এখন অন্-নশ্ শার মেরে দিয়েছে সত্যিকার লাথি। সেটা পড়ল সামনে-রাখা ডিমের ঝুড়ির উপর। কুল্লে আণ্ডা ভেঙে ঠাণ্ডা।

এ-গল্প কখনো ফ্রক্ পরে ইংলণ্ডে কখনো দাড়ি রেখে আফগানিস্থানে সর্বত্রই প্রচলিত আছে। এবং সর্বযুগের সর্বদেশের প্র্যাকটিকেল পাণ্ডারা

বেচারী অননশ্ শারকে নিয়ে কতই না ব্যঙ্গোক্তি করেছেন। সেও লজ্জায় রা'টি কাড়ে না।

কিন্তু এ-কথাটা কেউ ভেবে দেখে না যে এ-সংসারে অহরহই প্রাত্যহিক জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে যাঁরা বৃহত্তর ভুবনে চলে যেতে জানে তাঁদের সবাই অন্-নশ্ শার—ঐ শেষ লাথিটুকু বাদ দিয়ে। যারা আপন নাকের ডগার বাইরে তাকাতে জানে না তারাই দৈনন্দিন দৈন্যে শেষদিন পর্যন্ত নাকানি-চুবোনি খায়। দিবা-স্বপ্ন আলবৎ দেখতে হয়—কিন্তু শেষ লাথিটুকু বাদ দিয়ে। গুল বাহাদুর ঠেকে শিখেছেন। গদরের আণ্ডা বিক্রী হওয়ার পূর্বেই তাঁরা স্বাধীনতার উজীরকুমারীকে লাথি মেরে বসিয়েছিলেন। তিনি সাবধান হয়ে গিয়েছেন। এখন আর কুঁড়েঘরে বসে বালাখানা-রাজপ্রাসাদের স্বপ্ন নয়, গদরের খেয়ালী পোলাও নয়। এখন দেখতে হবে নাকের ডগা ছাড়িয়ে ত্রিশ গজ দূরের স্বপ্ন মাত্র—সাংসারিক সচ্ছলতার স্বপ্ন।

তার প্রথম আণ্ডা এল অযাচিত, অপ্রত্যাশিতভাবে।

ডোমেরা এসে সভয়ে তাঁকে নিবেদন জানালে, শিবু মোড়ল যায় যায়। মরার আগে বাবাজীর চরণ-ধূলি চায়।

গুল বাহাদুর পড়লেন বিপদে। ওপারে যাওয়ার সময় মুসলমান যে সব তওবা-তিল্লা করে থাকে—অনেক হিন্দুদের প্রায়শ্চিত্ত কিংবা জৈনদের পর্যুসনের মত—সেগুলো তিনি কোনো মতে সামলে নিতে পারেন, কিন্তু হিন্দুধর্মের তিনি জানেনই বা কতটুকু? তাঁর আমলে দিল্লীর হিন্দুরা তো শিক্ষা-দীক্ষায়, সংস্কৃতিসভ্যতায় পুরো-পাক্কা মুসলমান বনে গিয়েছে। তারা পরে চোস্ৎ চুড়িদার পাজামা, লম্বা শেরওয়ানী, মাথায় দুকল্লী কিস্তি টুপী আর মুশাইরায় হাঁটু গেড়ে বসে বয়েৎ আওড়ায়—'মক্কা-মদীনার মালিক, ইয়া আল্লা, আমাকে ডেকে নাও নবীর নূর হজরত মুহম্মদের পদপ্রান্তে।'

বরন্দাবন্ (বৃন্দাবন)-কে কুন্জ্ গলিয়ামে (কুঞ্জ গলিতে) কিসন্জী (শ্রীকৃষ্ণ) কভি কভি বান্সরী (বাঁশরী) বজাওৎ (বাজান), এই তো হিন্দুধর্ম বাবদে তাঁর এলেম! ঐটুকু জ্ঞানের ন্যাজ তিনি শিবু মোড়লের হাতে তুলে দিয়ে তাকে নির্ভয়ে বৈতরণীতে নামতে ভরসা দেবেন কি প্রকারে?

ধরা পড়ার ভয় আছে, অথচ না গিয়েও উপায় নেই। গুল বাহাদুর মনে মনে বললেন, 'চুলোয় যাক্ গে। এ রকম ভয়ে ভয়ে কাটাবো আর কতদিন!' মৃত্যু যে অহরহ মানুষের চুলের ঝুঁটি পাকড়ে ধরে আছে সেটা স্মরণ করে কটা লোক? কিংবা বলা যায়, গুল বাহাদুর ভাবলেন, গায়ে গু মেখে বসে থাকলেই কি আর যম ছেড়ে দেবে?

শিবু মোড়লের ইঙ্গিতে সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল—মায় তার ছ'বচ্ছরের ছেলেটাও। অবাক ইশারায় গুল বাহাদুরকে তক্তপোশের একদম কাছে ডেকে নিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, 'আমার ছেলেটাকে তুমি মানুষ করো। সব তোমাকেই দিলুম।'

গুল বাহাদুর ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছেন। ছেলেটার ভার কাঁধে তুলতে

তাঁর কণামাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি যে আসলে মুসলমান।

মোড়ল বললে, 'আমার অনেক শত্রু ; ছেলেটাকে মেরে ফেলবে।'

দুশ্চিন্তার ভিতরও গুল বাহাদুরের মনে পড়লো, হজরৎ মহম্মদের পূর্বেও আরবরা ছিল বর্বর। তারাও নির্ভয়ে অনাথকে মেরে ফেলে তার টাকাকড়ি উট তাম্বু কেড়ে নিত। তাই হজরতের নবধর্ম স্থাপনার অন্যতম প্রধান ভিত্তি ছিল অনাথের রক্ষা। মনে পড়ল, স্বয়ং আল্লা হজরতকে 'মধ্যদিনের আলোর দোহাই, নিশির দোহাই, ওরে' ব'লে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে তিনিও অনাথরূপেই জন্ম নিয়েছিলেন,—

'অসহায় যবে আসিলি জগতে তিনি দিয়েছেন ঠাঁই,
তৃষ্ণা ও ক্ষুধা আছিল যা সব মুছায়ে দেছেন তাই।
পথ ভুলেছিলি, তিনিই সুপথ দেখায়ে দেছেন তোরে
সে-কৃপার কথা স্মরণ রাখিস্। অসহায় শিশু, ওরে,
দলিস্‌নে কভু। ভিখারী-আতুর বিমুখ যেন না হয়
তাঁর করুণার বারতা যেন রে ঘোষিস জগৎময়।'

এ তো আল্লার হুকুম, রসুলের আদেশ। মানা-না-মানার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তোমার ঘাড় মানবে।

কিন্তু তিনি যে মুসলমান। ডোম হোক আর মেথরই হোক, মোড়লের ছাবালের মুখে তিনি জল তুলে দেবেন কি প্রকারে ? গুল বাহাদুর চুপ।

শিবু তার লাল ঘোলাটে চোখ মেলে তাঁর দিকে তাকালে কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'গোসাঁই, তুমি গোসাঁই নও, সে-কথা আমি জানি। তুমি কি, তাও আমি জানি। কিন্তু আর কেউ জানে না। জানার দরকারও নেই।'

'কি করে জানলে ?' এ প্রশ্ন গুল বাহাদুর শুধালেন না। তিনি পল্টনের লোক ; বললেন, 'আমি মুসলমান, জানো ?'

শিবুর শুকনো মুখ খুশীতে তামাটে হয়ে উঠলো। গুল বাহাদুরের হাত-খানা আপন হাড্ডি-সার দু'হাত তুলে নিয়ে বললে, 'বাঁচালে, গোসাঁই, তরালে আমাকে।' তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'মুসলমানেরই এক দর্গায় মানত করে মা পেয়েছিল আমাকে। আমি পেয়েছি আনন্দীকে। পীর সৈয়দ মরতুজার ভৈরবীর নাম ছিল আনন্দী।'

মুসলমান পীরের দরগায় যে হিন্দু বন্ধ্যা সন্তানের আশায় যায়, এ দৃশ্য গুল বাহাদুর বহুবার দেখেছেন দিল্লীতে নিজাম উদ্‌দীন আউলিয়ার দরগায় কিন্তু পীরের আবার ভৈরবী হয় কি করে, আর ভৈরবীই বা কি চীজ, আনন্দী শব্দটাও হিঁদু হিঁদু শোনায়, এ সব গুল বাহাদুর কিছুই বুঝতে পারলেন না। কে জানে মুসলমান ধর্ম বাঙলা দেশে এসে কি রূপ নিয়েছে।

'বাচ্চাকা ভালা বোলনা-চোলনা, বহুড়ীকা ভালা চুপ'—বাচ্চার ভালো বক্‌বকানো, কনের ভালো চুপ—ভালো সেপাইও বহুড়ীর মত চুপ করে শুনে যায়, গুল বাহাদুর চুপ করে শুনে যেতে লাগলেন।

মোড়লের দম ক্রমেই ফুরিয়ে আসছিল। তাই আশকথা-পাশকথা সম্পূর্ণ বর্জন করে শুধু তার ইচ্ছাগুলো বলে যাচ্ছিল, 'বিষয়-আশয় বোঝবার বয়স হলেই তাকে মামার বাড়ি বিষ্টুপুরে পাঠিয়ে দিয়ো। সেখানে তার জমিজমা এখানকার চেয়ে ঢের বেশী।'

গুল বাহাদুর পুরনো কথায় ফিরে গিয়ে শুধালেন, 'তোমার ছেলে আমার সঙ্গে থাকলে মুসলমান হয়ে যাবে না?'

মোড়ল বললে, 'না। আমরা জাতে ডোম। মুসলমানের হাতে খেলেও আমাদের জাত যায় না, আমরা মুসলমানও হই নে। থাক্ অতশত কথা। তুমি নিজেই জেনে যাবে। শোনো, আর যা করতে হয় করো, ছেলেটাকে কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়ো না, ওকে ভদ্রলোক বানিয়ো না।'

'সে কি!'

'না, ভদ্রলোক বানিয়ো না। আর শোনো, জলের কলসীর-তলায় মাটির নিচে কিছু টাকা আছে। তোমাকে দিলুম।'

গুল বাহাদুরের আবার মনে পড়ল, হজরত তাঁর যৌবন আরম্ভ করেছিলেন, এক বিধবার ব্যবসায়ের কর্মচারীরূপে। বললেন, 'টাকা ব্যবসাতে খাটাবো। তোমার ছেলে পাবে মুনাফার আট আনা।'

মোড়ল বললে, 'যা খুশী করো, কিন্তু লগ্নীর ব্যবসা করো না।'

গুল বাহাদুরের মুখ লাল হয়ে উঠল। ভদ্র মুসলমান সুদের ব্যবসা করে না।

মোড়ল বললে, 'আর শোনো, খুশ বিরামপুরের ঘোষালদের মেজো বাবুর সঙ্গে আলাপ ক'রো। তোমারই মত। কিন্তু সাবধানে। আর শোনো, তোমারই মত আরেকজন আশ্রয় নিয়েছে বর্ধমানের কাছে, দামোদরের ওপার—'

এবারে গুল বাহাদুর আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তবু উত্তেজনা চেপে রেখেই তাড়াতাড়ি শুধালেন, 'কোন্ গ্রামে?'

মোড়ল তখন হঠাৎ চলে গিয়েছে ওপারে, যেখানে খুব সম্ভব গ্রামও নেই, শহরও নেই।

গুল বাহাদুর দু'হাত দিয়ে ধীরে ধীরে মোড়লের চোখ দুটি বন্ধ করে দিলেন। মনে মনে আবৃত্তি করলেন,

'ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন।'

'আল্লার কাছ থেকে এসেছি, আর তাঁর কাছে ফিরে যাবো।'

কাফেরের মৃত্যু-সংবাদ শুনলে কট-মোল্লারা উল্লাসভরে এ-মন্ত্র উচ্চারণ না করে বলে ওঠে ভিন্ন মন্ত্র—

ফী নারি জাহান্নামা।

একমাত্র ইংরেজের মৃত্যু সংবাদ শুনলে গুল' বাহাদুর মন্ত্রটি একশবার আবৃত্তি করতেন। আল্লার একশ' নাম—মানুষ তার নিরনব্বুই জানে—সেই নিরনব্বুই নামের উদ্দেশ্যে নিরনব্বুই বার আর শয়তানের উদ্দেশ্যে একবার।

দাহ-কর্ম শ্রাদ্ধ, তাও আবার ডোমের, এসব কোন-কিছুই গুল বাহাদুর জানতেন না, জানবার চেষ্টাও করলেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব-কিছু দেখলেন। তবে তাঁর গম্ভীর আঁট-সাট মূর্তি আনন্দীর হাত ধরে না দাঁড়িয়ে থাকলে হয়তো ঝগড়াঝাঁটি হতে পারতো। মোড়লের মরে যাওয়ার পর বাড়ির সামনে যে ভিড় জমেছিল তার দিকে একবার তাকিয়েই তিনি বুঝতে পারলেন, শাহ্-ইন-শাহ্ বাহাদুর শা'র দরবারে যদি দৈবপাকে চিকনকালা গ্রামের মাতব্বরদের কুর্নিশ জানাবার অনুমতি লাভ হত তবে তাতে দুই নম্বর হত কে? পয়লা নম্বর তো চলে গিয়েছেন, দুই নম্বর হতেন ঝিঙে সর্দার। ভিড়ের মধ্যে ঝিঙের দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করে ভারী গলায় হুকুম দিলেন, 'ইধর আও।'

ঝিঙে ভয়ে ভয়ে, লোকলজ্জায় কিছুটা বুক ফুলিয়ে, এগিয়ে এল—ভিড় রাস্তা করে দিলে। ঝিঙের সঙ্গে শিবুর সদ্ভাব ছিল না।

গুল বাহাদুর বললেন, 'সব-কিছু চালাও।'

- ঝিঙে গলে গেল। তার মনে কোনো সন্দ ছিল না, শিবু গত হলেই সে হবে গাঁয়ের মোড়ল। মধ্যিখানে বাদ সাধলে এই লক্ষ্মীছাড়া বাবাজী। শিবু নিশ্চয়ই মরার সময় এ-ব্যাটাকে বিষিয়ে গেছে। তা হলে এটা হল কি করে? থাক্ এখন, পরে জানা যাবে।

ঝিঙে ডবল উৎসাহে সব-কিছু সামলালে। বেশীর ভাগ ব্যবস্থা শিবু মরার আগেই করে গিয়েছিল।

শ্মশান থেকে ফিরে এসে ঝিঙে সর্দার শিবু মোড়লের দাওয়ায় গুল বাহাদুরের কাছে এসে বসলো। গাঁয়ের দু'চারজন তাদের কথাবার্তা শোনবার জন্য এগিয়ে এলে ঝিঙে দিলে তাদের জোর ধমক। তারা গুল বাহাদুরের দিকে আপিল-নয়নে তাকালে কিন্তু তাঁর কোনো ভাব-পরিবর্ত্তন না দেখে আস্তে আস্তে সরে পড়লো।

তখন তিনি অতি শান্তকণ্ঠে, ধীরে ধীরে বললেন, 'মোড়ল, ধমক না দিয়েই যেখানে কাজ চলে সেখানে ধমকের কি দরকার! কিন্তু সে তুমি বোঝো। আমি বলবার কে? আমি তো এদের চিনি নে। এদের কি করে সামলাতে হয় তার খবর রাখো তুমি।'

'মোড়ল' সম্বোধনে ঝিঙে একেবারে পানি হয়ে গেল—জল তো হয়ে গিয়েছিল আগেই। হাত জোড় করে বললে, 'দেবতা, অপরাধ হয়েছে। কিন্তু ওদের থাকতে বললে না কেন?'

গুল বাহাদুর প্রথমেই লক্ষ্য করলেন ঝিঙে তোতলা। তোতলাকে মোড়ল বানানো কি ঠিক? তখন মনে পড়লো, একাধিক পেগম্বরও ছিলেন তোতলা।

ঝিঙের কথার উত্তরে বললেন, 'তুমি মুরুব্বী, একটা হুকুম দিয়েছ। আমি উল্টো কথা বললে তোমার মুখ থাকতো কি?'

ঝিঙে কিন্তু শিবুর মতো বিচক্ষণ লোক নয়। ভ্যাবাচাকা খেয়ে খানিক ক্ষণ তাকিয়ে থেকে শুধালে, 'শিবু তোমাকে বলে যায়নি আমাকে মোড়ল না করতে?'

গুল বাহাদুর বললেন, 'না।'

শিবুর মত বিচক্ষণ নয় ঝিঙে, কিন্তু সে শিবুর চেয়ে অনেক বেশী ঘড়েল। ভাবখানা করলে, 'ওঃ! শিবু যদি বলতো তবে তুমি আমায় ডাকতে না।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'শোনো সর্দার, শিবু সব-কথা বলে যাবার ফুর্সৎ পায়নি। পেলেও যে তোমার কথা বলতো, তাও তো জানি নে। আর ওর বলাতে না-বলাতে কিছু আসে যায় না। সে গেছে, এখন গাঁ চালাবো আমরা। ওর ইচ্ছে বড়, না গাঁ-চালানো বড়? ও যদি বলে যেত, আনন্দী গাঁ চালাবে, তাহলে তোমরা কি সেটা মানতে?'

গুল বাহাদুরের মনে পড়লো হজরত মুহম্মদও ইহলোক ত্যাগ করার সময় মুসলমানদের জন্য কোন খলীফা নিয়োগ করে যাননি। গুল বাহাদুর আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, তবে কি অনুন্নত সম্প্রদায়ে এই ব্যবস্থাই বেশী কার্যকরী? তবে কি বংশগত রাজ্যাধিকার পরবর্তী যুগের সৃষ্টি? তারপর মনে পড়লো, ঐতিহাসিক ইবনে খলদুন তাঁর পৃথিবীর ইতিহাসে এই নিয়ে কি যেন এক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। ভাবলেন, দেখতে হবে। তারপর মনে পড়লো, এখানে তো বই-পত্র কিছুই নেই। যাক্ গে এ-সব কথা।

ঝিঙেকে বললেন, 'কানাবুড়ী বাতাসীকে বলো সে এ-ভিটেয় থাকবে।'

ঝিঙে অবাক। বাতাসীর মত অথর্ব-অচল ঝগড়াটে সাড়ে ষোল আনা অন্ধ এ তল্লাটে দুটি নেই। তার গলাবাজির চোটে দুঁদে মোড়ল শিবুও তার তল্লাট মাড়াতো না।

ঝিঙে গুল বাহাদুরের মতলব আদপেই বুঝতে পারেনি। তিনি জানতেন, শিবুর যে কিছু লুকনো টাকা আছে সেটা সকলের অজানা নাও হতে পারে। রাত্রে ভিটে খোঁড়ার জন্য চোর আসতে পারে। বাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে না আসতে বুড়ী চিৎকার করে করে পাঁচখানা গাঁয়ের লোক জড়ো করে ফেলবে। অন্ধের শ্রবণ-শক্তি চক্ষুষ্মানের চেয়ে বেশী। দিল্লীর জামি মসজিদের দেউড়িতে এক অন্ধ শুধু গলা শুনে হাজার লোকের জুতো সামলায়। মাদ্রাসার ছোঁড়াদের কেউ মজা দেখবার জন্য অন্যের গলা নকল করলে অন্ধ দু'জোড়া জুতো বাড়িয়ে দিয়ে বলতো, 'এই নাও তোমার জোড়া, আর এই নাও যার নকল করছিলে।' লোকে বলতো, আগ্রাতে শুকনো পাতা ঝরে পড়লে এ অন্ধ দিল্লীর চাঁদনি চৌকে বসে শুনতে পায়। বাতাসী অতখানি কেরদানী হয়তো দেখাতে পারবে না, কিন্তু দু'টি বেগুন বাঁচাবার জন্য যে বেটি সমস্ত রাত দাওয়ায় বসে কাটায় তার চেয়ে ভালো পাহারাওলা পাওয়া যাবে কোথায়? এখন কয়েক রাত তো পাড়া-প্রতিবেশীরা কান খাড়া রেখে ঘুমুবে—শিবুর ভিটেতে খোঁড়াখুঁড়ির শব্দ হচ্ছে কি না শোনবার জন্যে। কয়েকটা রাত যাক, তারপর তিনি সুবিধে-মত তার ব্যবস্থা করবেন।

কিছুক্ষণের ভিতরই শোনা গেল পাড়ার শেষপ্রান্ত থেকে বাতাসীর চিৎকার। চিকনকালা গ্রামটাকে সে বেতারকেন্দ্র বানিয়ে বিশ্বভুবনকে জানাচ্ছে, শিবু গেছে বেশ হয়েছে, আগে গেলেও কেউ মানা করতো না, বাতাসী তো নয়ই,

কিন্তু এ কি গেরো, সে কেন সামলাতে যাবে শিবুর গোয়াল খামার, ঐ দিক-ধিড়িঙে মিনসে বাবাজীটা আছে কি করতে, তাকেই তো শিবু ঘটিবাটি চুলো-হাড়ি সব-কিছু দিয়ে দিয়েছে, মরে যাই, আর লোক পেল না, কোথাকার হাড়-হাভাতে শতেক খোয়ারী—আরো কত কি !

গলার শব্দ কিন্তু এগিয়ে আসছে শিবুর বাড়ীর দিকেই।

মোগল শাসনেও চার্জ দেওয়া-নেওয়া নামক মস্করাটা চলতো। গুল বাহাদুর সে-মস্করাটা বাতাসীর সঙ্গে করার প্রয়োজন বোধ করলেন না। তাঁর ঘাড়েও তো মাথা মাত্র একটা। সেটা তো চায় ইংরেজ। বুড়ীকে দিয়ে চলবে কেন ?

আনন্দীকে হাতে ধরে নিয়ে বললেন, 'চলো।'

যেতে যেতে আনন্দী বললে, 'দাদু, বাবা আমাকে বলেছিল, বাতাসী পিসিকে বাড়ি নিয়ে আসতে। সে তো বলছে, আসবে না।'

গুল বাহাদুর ভারি খুশি হলেন। প্রথমত শিবু যে আহাম্মুখ ছিল না, তার শেষ প্রমাণও পাওয়া গেল বলে এবং তার চেয়েও বড় কথা, ছ'বছরের আনন্দীর বুঝ-সমঝ আছে দেখে। বাপকা ব্যাটা না হলেও তার ঘোড়া তো নিশ্চয়ই। জোর গলায় হেসে বললেন, 'কুছ পরোয়া নহী, দাদু, ও বেটি সব-কুছ সম্‌হালেগী', তারপর বললেন, 'সম্‌হালেগা।' মনে মনে বললেন, 'দুচ্ছাই ভাষা, স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গে ফারাক নেই।' তারপর বললেন 'সেই তো ভালো। এরা তো আর দিল্লী দরবারে মুশায়েরা করতে যাবে না যে ভাষাতে পঁয়ষট্টি রকমের বয়নাক্কার প্রয়োজন। ঐ করেই তো আমাদের সব গেল।' তারপর মনে পড়লো, কই, তাই বা কেন ? মাহমুদ বাদশা তো তাঁর সভাপণ্ডিত ফির-দৌসীর সঙ্গে বয়েৎ-বাজী করতেন। তাঁর রাজত্ব তো যায়নি। বাহাদুর শা গালিবের সঙ্গে করলেই বা কি দোষ ! ফার্সীর কথাতে তখন মনে পড়লো, সে ভাষাতেও তো পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গের তফাৎ নেই। বিরক্ত হয়ে তখন বললেন, 'কী আশ্চর্য ! চলছি ডোম বস্তির মধ্যিখান দিয়ে, আর স্বপ্ন দেখছি গজনীর। অন্‌নশ্‌ শারও এর চেয়ে ভালো। আমাকে এখন দেখতে হবে, ছেলেটার পেটে ক্রিমি।'

গুল বাহাদুর পড়েছেন এ বাবদে বিপদে। ক্রিমির নুস্‌খা (প্রেসক্রিপ্‌সন) তিনি দু'মিনিটেই লিখে দিতে পারেন। কিন্তু সেটা লিখতে পারেন উর্দু কিংবা ফার্সীতে। এবং তার জন্য যেতে হবে ইউনানী দাওয়াখানায় হেকিমের কাছে। এ তল্লাটে তো এসব জিনিস থাকার কথা নয়। আর বোষ্টম বাবাজী লিখবেন, ফার্সী নুস্‌খা ! যদিও গুল বাহাদুর জানতেন, বৃন্দাবন অঞ্চলের বাবাজীরা ফার্সীতে ইউনানী নুস্‌খা বিলক্ষণ লিখতে জানেন।

গুল বাহাদুরের ভুল নয়। চৈতন্যদেব ইসলামী শাস্ত্রের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি একাধিকবার ইসলামী শাস্ত্র দিয়েই মোল্লাদের কাছে প্রমাণ করেন যে তাঁর প্রচলিত ধর্ম ইসলামের মৌলিক সিদ্ধান্তের সম্মতি পায়।

আনন্দী বললে, 'দাদু, ঐ দেখো হলদে পলাশ।'

ততক্ষণে তাঁরা গ্রামের বাইরে চলে এসেছেন। আর একটু দূরেই গুল বাহাদুরের 'রাজপ্রাসাদ'।

দূরদূরান্তে চলে গেছে লাল খোয়াই। বাঁ দিকের উঁচু ডাঙা ভেঙে ভেঙে চলেছে খোয়াইয়ের অগ্রগতি। গুলবাহাদুরের আপন দেশ দোয়াবে প্রকৃতির হাত থেকে মানুষ অহরহ অনুর্বর জমি সওগাত পাচ্ছে চাষের জন্য, আর এখানে খোয়াইয়ের খাঁই আধা-বাঁজা আধা-ফসলের জমির উপর। খোয়াইটা চলে গিয়েছে কতদূরে প্রকাণ্ড একটা লাল সাপের মত এঁকেবেঁকে। মাঝে মাঝে ডাঙার ফালিটুকরো এসে যেন সাপের খানিকটে গতিরোধ করছে। ফের যেন অজগরের গ্রাসটা আরো দূরে এগিয়ে গিয়েছে।

সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিটুকুও যেন এ খোয়াই শুষে নিতে জানে। খোয়াইয়ের শুরু থেকে সূর্যাস্তের মোকাম পর্যন্ত গাছপালার কোনো বালাই নেই। পাতার আড়াল থেকে বিকেলের আলোটুকু এখানে এসে কোনো কালো কেশে পড়ে না। সাঁওতালিনীরাও সন্ধ্যের পরে ভয়ে ঘর থেকে বেরোয় না।

কিন্তু মাধুর্য আছে—সে মাধুর্য রুদ্রের।

কিয়ামতের (মহাপ্রলয়ের) যে বর্ণনা কুরান শরীফে আছে সেটিও রুদ্রমধুর, আশ্চর্য! আল্লাতালা মানুষের মনে ভয় জাগাবার জন্য কিয়ামতের বর্ণনা দিয়েছেন কুরানে, কিন্তু তার প্রকাশ দিয়েছেন কাব্যরসের মারফতে। কেন? সোজা কথা। ঐতিহাসিক যখন লড়াইয়ের খবর লিপিবদ্ধ করে কত হাজার লোক মরলো তার বর্ণনা দেয়, তাতে তো মানুষ ভয় পায় না। কারণ তাতে কাব্যরস নেই। ভয় অনুভূতিবিশেষ। সেটা জাগাতে হলে কাব্যরসের প্রয়োজন। ইতিহাসের শুকনো ফিরিস্তি থেকে মন করে জ্ঞান সঞ্চয়, তাতে ভয় সঞ্চার হয় না।

এই রুদ্র-রসই এখন গুল বাহাদুরের জন্য প্রশস্ত।

ভাগ্যিস, তাঁকে পূব-বাংলার ঘনশ্যাম, কচিসবুজ, শিউলিভরা, শিশির-ভেজা, পানাঢাকা বেতেসাজা পূব-বাংলায় আশ্রয় নিতে হয়নি!

গাঁয়ের শেষ গাছ পেরিয়ে এসে তাঁর খেয়াল গেল আনন্দী যেন কি একটা বলেছে। শুধালেন, 'কি বললে, দাদু?'

পিছনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, 'ঐ যে, হলদে পলাশ!'

পলাশ হলদে হতে পারে, বেগুনী হতে পারে, সবুজও হতে পারে, এই হল গুল বাহাদুরের ধারণা। কিন্তু তাঁর মনে তবু ধোঁকা লাগলো। গাঁয়ের ভিতর দিয়ে আসবার সময় দু'চারটে ফুল গাছ তাঁরা পেরিয়ে এসেছেন, কিন্তু আনন্দী কিছু বলে নি। এখনই বা বলছে কেন? এ-গাছটার তেমন তো কিছু জৌলুসও নয়। মাত্র গোটা পাঁচ গুচ্ছো ফুল ফুটেছে। গাছটাও বেঁটে। যেন থাবড়া মেরে চেপটে দেওয়া। এর তুলনায় গাঁয়ের ভিতরকার শিমুলে তো ডালে ডালে ফুল ছিল অনেক বেশী। বললেন, 'পলাশ—উয়ো তো ফুল। হলদে—পিলা। তো ক্যা হল?'

আনন্দী কেমন যেন একটু ভয়ে ভয়ে বললো, 'সব পলাশ লাল, এটা হলদে।'

বলে সে আঙুল দিয়ে গাঁয়ের ভিতরকার উঁচু উঁচু গাছের লাল পলাশ দেখিয়ে দিলে।

এতক্ষণে বীরভূমের বৃক্ষ-বৃত্তান্তবাবদে আকাট অগা গুল বাহাদুরের খেয়াল হল, 'তাই তো, আর সব পলাশ লাল, এটা হলদে।'

উদ্ভিদতত্ত্বে এই তাঁর প্রথম পাঠ। আনন্দীর কাছে। বললেন, 'চলো দুটি ফুল পেড়েই নি।'

ছ'বছরের ছেলে আনন্দীর উল্লাসের অন্ত নেই। বাপ যদিও বলেছিল, 'বাবাজীকে ডরাসনি' তবু তার মন থেকে ওঁর সম্বন্ধে ভয় কাটেনি। একে তো গম্ভীর লোক, তার উপর ঐ যে দুশমনের মত বদমেজাজী ঝিঙেও যার পায়ের কাছে বসে ভয়ে কাঁচুমাচু—তার সঙ্গে সাহস করে কথা কওয়া যায় কি প্রকারে। তবে তার শিশুবুদ্ধি শিশুযুক্তিতে একটা ভরসা ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছিল। সেটা কি? বাবাজীও বাতাসী বুড়ীকে ডরায়। দ্বিতীয় ভরসা পেল এখন। যখন বললে, 'চলো দুটো ফুল পাড়ি।' তার বাপ তাকে ভালোবাসত। তার সম্বন্ধে আনন্দীর কোনো ভয় ছিল না, কিন্তু তাকেও ফুল কুড়োতে বললে ঘাড় বাঁকিয়ে বলতো, 'যা যা, খেলা করগে যা।'

ফুল পাড়তে পাড়তে গুল বাহাদুরের মনে পড়ল, 'গুল' অর্থাৎ 'ফুল' আর প্রাচীন ফার্সীতে 'অপ্' অর্থ 'জল'। 'গোলাপী' আর 'জোলাব' একই শব্দ। আরবী ভাষায় 'গ' আর 'প' নেই বলে আরবীতে 'গোলাপ' লেখা হয় 'জোলাব'। বিরেচক অর্থে। ছেলেটাকে তাই খাওয়ালেই হবে। কিন্তু এই অজ জায়গায় গোলাপ পাওয়া যাবে কি?

আনন্দীকে শুধালে বহুদূরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বোঝালে ওখানে পাওয়া যায়। কিন্তু যে-ভাবে ইশারা করলে তাতে সে দূরের গ্রাম হতে পারে, বেহেশ্তের গুল-ই-স্তান, ফুলের বাগানও হতে পারে।

॥ চার ॥

এতক্ষণে গুল বাহাদুর আসলে ভাবনা নিয়ে চিন্তা করার ফুর্সৎ পেলেন। ছেলেটা নিশ্চিন্ত চেহারায় ঘুমুচ্ছে দেখে তিনি ফিরে গেলেন সকালবেলাকার ঠেলে-রাখা সমস্যাগুলোতে।

শিবু মোড়ল বুঝতে পেরেছে তিনি বৈরাগী নন, তিনি যে মুসলমান সেটা জানতো না। কিন্তু আর কেউ বুঝতে পেরেছে কি? আর ঐ ঘোষালই বা কে? সেই বর্ধমানের ওপারের লোকটাই বা ওখানে এল কোথা থেকে? তাকেই বা খুঁজে পাওয়া যায় কি করে?

অনেক চিন্তা করেও তিনি কোনো হদিস পেলেন না। এমন কি ঘোষাল পদবী যে ডোমের হয় না, ওটা ব্রাহ্মণের পদবী এবং অতএব কাছে-পিঠে ব্রাহ্মণ পরিবার আছে, অর্থাৎ শিক্ষা-সভ্যতার পত্তনও আছে, এইটুকু পর্যন্ত গুল বাহাদুর বিচার করে ধরতে পারলেন না।

তবে শিবু যখন বলেছে সাবধান, তখন তার অর্থ তাড়াহুড়ো করলে বিপদের সম্ভাবনা। আর এখন তো বর্ধমান যাওয়ার কোনো কথাই ওঠে না। এ দেশের আচার-ব্যবহার এ ক'মাসে শিখেছেন কতটুকুই বা? ডোমেদের ভাল করে চিনে নিতে পারলে পরে ডোম সেজে চলাফেরা করা যাবে। তার আগে শিখতে হবে ওদের ভাষা। এযাবৎ তাতেও তো খুব বেশী উন্নতি হয়নি।

আর এই ডোমেদের নিয়ে তিনি করবেন নূতন গদর! দেশ কি, রাজা কারে কয়, ইংরেজ যে শয়তান ভিন্ন অন্য কোনো প্রাণী নয়—এ-সব খবর তো এরা কিছুই রাখে না। পেটের ধান্দায় এদের কাটে সুবো-শাম। খুব যে তারা শান্ত এ-কথা বলা চলে না, কিন্তু জীবন-মরণ পণ করে দিনের পর দিন লড়াই চালিয়ে যাবার মত ধাতু কি এদের শরীরে আছে?

কিন্তু থাকবেই না কেন? গজনীর মাহমুদ, ঘোরের মুহম্মদের আমলে গ্রামাঞ্চলের পাঠানরা কি এদের চেয়ে বেশী সঙ্গীন জঙ্গীলাট ছিল? কিংবা বাবুদের আমলে ফরগনা বদখশানের আশপাশের গামড়িয়ারা? কিংবা হাতের কাছের মারাঠারা? একবার কি একটা সামান্য গুজোব রটাতে এই দিল্লীবিজয়ী বীরের দল দিল্লী থেকে যেন পালাবার পথ পায়নি। ঐতিহাসিক খাফী খান ব্যঙ্গ করে লিখেছেন তখন দিল্লীর এক বুড়ী নাকি একাই তিনজন মারাঠাকে নিরস্ত্র করেছিল। ঐতিহাসিক খুশ-হাল চন্দ্‌ও বলেছেন, তারা নাকি তখন হাতিয়ার তলোয়ার ফেলে দিয়ে ছোট বাচ্চার মত 'মাগো, ওমা' বলে শহর ছেড়ে পালাচ্ছিল। কিন্তু এসব কাহিনীর বিশ্বাস করা যায় কতটুকু? দিল্লী একদিন এদের হাতে খেয়েছিল মার। সেই বেইজ্জতী ঢাকবার জন্য পরবর্তী যুগে হয়তো তিলকে তাল বানিয়েছে।

তা বানাক, আর নাই বানাক, এরাই তো একদিন সাহস করে আবদালীর মুকাবেলা করেছিল। অবশ্য লড়াইয়ের আগে রাত্রে মারাঠা সেনাপতি ভাব-সাহেব আপন রোজ-নামচায় লিখেছিলেন,'আমাদের পেয়ালা পূর্ণ হয়েছে। কাল অবশ্য-মৃত্যুর মুখোমুখি হতে যাচ্ছি। আমরা মারাঠারা তো কখনো সম্মুখ যুদ্ধ লড়িনি; আমাদের রণকৌশল, শত্রুকে অতর্কিতে আক্রমণ করে তার যথা-সম্ভব ক্ষতি করে পালিয়ে যাওয়া—বার বার। সর্বশেষে তার সর্বস্ব লুঠ করা।'

এ সব-কিছু ভাবসাহেব সত্যই লিখেছিলেন কিনা, সে-কথা গুল বাহাদুর জানতেন না। তবে এ কথা জানতেন, মারাঠারা সম্মুখ সংগ্রাম সব-সময়ই এড়িয়ে চলে।

কিন্তু একথাও অতি অবশ্য ঠিক, ভাবসাহেব অবশ্য-মৃত্যু জেনেও আব-দালীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধই লড়েছিলেন। কেন লড়েছিলেন? পেশওয়ার হুকুমে। তাঁর প্রতি আনুগত্য বশ্যতার দরুন। তাঁর নুন-নেমক খেয়েছি। সে নুনের শেষ কড়ি শোধ না করে দেশের লোকের সামনে মুখ বের করবো কি করে? কিন্তু দিল্লীর বাদশার প্রতি বাঙালী ডোমের কি আনুগত্য, কি বশ্যতা?

তবে কি এদের তাতাতে হবে বাবুর কিংবা মাহমুদের মত লুঠতরাজের লোভ দেখিয়ে ? তার সরল অর্থ, দিল্লীর বাদশাহ খেদমৎ করতে গিয়ে তারা করবে দিল্লী লুঠ ! এ তো চমৎকার ব্যবস্থা !

তখন বড় দুঃখে তাঁর মনে পড়লো, গদরের সিপাহীরাও বেপরোয়া ভাবে যত্রতত্র লুঠতরাজ করেছে। যাদের জন্য স্বাধীনতার সংগ্রাম লড়েছে, লুঠ করেছে তাদেরই। কি মূল্যে সে স্বাধীনতার !

গুল বাহাদুরের মাথা গরম হয়ে উঠলো। সুরাহীর জল ঢেলে মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবলেন, 'যারা গদর ইন্‌কিলাব করে তারা অতশত ভাবনা-চিন্তা করে না। তিমুর নাদির বিজয় অভিযান আরম্ভ করার পূর্বে বু আলী সিনা কিংবা আবু রুশদের দর্শন আর তর্ক শাস্ত্রের কেতাব-পুঁথি নিয়ে বিনিদ্র যামিনী যাপন করেন না।'

ইংরেজ এ-দেশের দুশমন, এ-দেশের বাদশার দুশমন। তাকে খেদাতে হবে। কি ভাবে তাড়াতে হবে তার জন্য মোল্লা-মৌলবীর কাছ থেকে ফতোয়া আনবার প্রয়োজন নেই। তাহলে পাড়ার পদী পিসির কাছেও যেতে হয়। তিনি ইতু ঘেঁচুর পুজো-পাটা করে দিন-ক্ষ্যাণ বাৎলে দেবেন—তবে হবে অভিযান শুরু ! তওবা, তওবা !! শয়তানের খুন পিনেওলা তলোয়ারকে পয়মন্ত করতে হবে চড়ুই পাখীর ন্যাজের পালক দিয়ে !

কিন্তু একটা জিনিস সর্বক্ষণ গুল বাহাদুরের মনে পীড়া দিচ্ছিল। এই যে ছদ্মবেশ পরে আত্মগোপন করে থাকাটা, এভাবে কাপুরুষের মত কতদিন প্রাণ বাঁচিয়ে থাকতে হবে ? দেশ স্বাধীন করার জন্য একটা বড় আদর্শ সামনে ধরেছি বলে এই নীচ আচরণ সর্বক্ষণ হজম করে করে চলতে হবে ? ডোমকে তাতানোর জন্য লুঠতরাজের লোভ কেউ দেখালে সেটা না হয় বরদাস্ত করে নিলুম কিন্তু নিজে একটা নীচ আচরণ করবো—এ-ঢেঁকি ঢেঁকি গিলে হজম করি কি করে ? তাও একদিন নয়, দু'দিন নয়—কত বছর ধরে কে জানে ?

চুলোয় যাক্ গে অত ভয়। চুলোয় যাক্ গে শিবুর হুঁশিয়ারীর পরামর্শ। আমি বেরবো ঘোষালের সন্ধানে।

কিন্তু ইতিমধ্যে একটা কাজে ডুব না মারলে চিন্তা করে করে পাগল হয়ে যাবো যে।

কাজও এসে হুড়মুড়িয়ে পড়লো তাঁর ঘাড়ে।

শিবুর খেতখামার ছিল সামান্যই কিন্তু গুল বাহাদুরের পক্ষে ঐটুকুই যথেষ্ট। সে সব সামলাতে গিয়ে তিনি প্রবেশ করলেন এক নূতন ভুবনে। এটা ধরলে ওটা হাতছাড়া হয়ে যায়, ছাগল দুটোকে সামলাতে গাইটা না-পাত্তা হয়ে যায়। মরাইয়ের ইঁদুর মারতে হলে বেরাল পুষতে হয়, বেরালকে পেট ভরে খেতে দিলে সে আবার ইঁদুর মারার প্রয়োজন বোধ করে না। পচা গোবরের গন্ধে মাথা তাজ্জিম তাজ্জিম করে, অথচ সে গোবরের বরবাদ হবে তাও প্রাণ সইতে পারে না।

ইতিমধ্যে ঝিণ্ডে এসে খবর দিলে একপাল সাঁওতাল কোশখানেক দূরে নদী-

পারে আস্তানা গেড়েছে। ওদের দিয়ে একটা নূতন আবাদ করানো যায় কি না।

গুল বাহাদুর লম্ফ দিয়ে উঠলেন। এ একটা কাজের মত কাজ বটে। এ-বিষয়ে তাঁর কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতাও আছে। ভাওলপুর না পাটিয়ালা কোথা থেকে একপাল মেয়ো এসে আশ্রয় নিয়েছিল পালমে যেখানে বাবুর শাহের পাথরের তৈরী সরাঈ—তারই পিছনে। তাঁরই চাচা দানিশমন্দ খান তাদের দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন একটা সুন্দর আবাদ। চাচার সঙ্গে থেকে থেকে তিনি তখন শিখেছিলেন অনেক কিছু। আজ দেখা যাবে চাচাকা ভাতিজা সে এলেমের কিছুটা স্মরণ রেখেছে কি না।

কিঞ্চিৎ অর্থের প্রয়োজন। শিবুর কলসীর তলায় পাওয়া গিয়েছে, শ' আড়াই টাকা। এত টাকা শিবু পেল কোথায়? তবে কি গুপ্তী ডাকাতি করতো? তা আসুক সে টাকা জাহান্নাম থেকে। ঐ দিয়ে আবাদ আরম্ভ করা যাবে অক্লেশে। তারপর বরাৎ। আল্লা ভরোসা।

প্রথম দিনের কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে গুল বাহাদুর আনন্দীকে সেলাম করে বললেন, 'হুজুর, আজ থেকে আপনি জমিদার। আপনাকে সমঝে চলতে হবে।'

জমিদার হওয়ার রৌদ্ররস আনন্দী জানে না কিন্তু সে চালাক ছেলে। গুল বাহাদুরের মেজাজ আজ খুশ দেখে সে কোলের কাছে ঘেঁষে এসে বললে, 'দাদু, আমাকে কেঁদুলীর মেলায় নিয়ে যাবে?'

গুল বাহাদুরের প্রাণ-যমুনায় তখন আনন্দের উজান তরঙ্গ লেগেছে। আনন্দী তখন শয়তানের জন্মভূমি বিলেত যেতে চাইলেও তিনি তখন ঘিনপিত বাদ দিয়ে সেখানে তাকে নিয়ে যেতেন। শুধালেন, 'সে কোথায়?'

বললে, 'অনেক দূরে। ঐ হোথা অজয় দিয়ে।'

শীতের শেষে অজয়ের পারে কেঁদুলীর মেলা। বাঙলাদেশের হাজার হাজার বাউল সেখানে জমায়েৎ হয়ে তিন রাত ধরে আউল-বাউল-কেত্তন গান গায়। কেনা-কাটাও হয় প্রচুর।

সেখানে গুল বাহাদুরের আরেক অভিজ্ঞতা।

এই যে হাজার হাজার ষণ্ডামার্কা লোক দিনরাত্তির ধেই ধেই করে নৃত্য করছে, খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুমুচ্ছে কোনো কিছু করছে কম্মাচ্ছেন না, সমাজের তোয়াক্কা করে না, ধর্মের নামে অকাতরে গরীব-দুঃখীর অন্নে ভাগ বসাচ্ছে, দরকারে অদরকারে এক অন্যে কামড়াকামড়ি পর্যন্ত করছে—এ তামাশা তৈরী করলো কোন্ মহাজন? কার আদেশে এরা এসব করে, কার হুকুমে গৃহী এদের সব-কিছু যোগায়? এর কি অর্থ, কি মূল্য?

অথচ গুল বাহাদুরের চট করে মনে পড়া উচিত ছিল যে মুসমলান পীর দরবেশরাও ঠিক এই কর্মই করে থাকে, তাঁরই হীরের টুকরো দিল্লী শহরে—নিজামউদ্দীনের দরগায়, মেহেরোলীর কুৎবসাহেব, নাসিরউদ্দীন চিরাগদিল্লীর

আস্তানায়। সেখানেও তো বাউণ্ডুলে খোদার খাসীরা ঠিক এদেরই মত ধেই ধেই করে নৃত্য করে। যীশুখৃষ্টের ভাষায় 'তারাও সুতো কাটে না, মেহন্নতও করে না।' এবং তাই শুধু নয়, এখানকার এই বাউলদের ভিতর আছে মুসলমানও।

ছেলেবেলা থেকে আপন ধর্মে যে সব জিনিস গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, সেগুলো একটু ভিন্ন বেশে দেখা দিলেই মানুষ চমকে ওঠে। তারপর হুঁশ হয়, দুটোই হুবহু এক বস্তু। এ-ও যা, ও-ও তা। কালীঘাটের পাঁঠা কাটাতে আর ইদগার পাশে গোরু জবায়ে তফাৎ কী? গুরুকে মাথায় তুলে তাকে অবতার বলা, আর পীরের পায়ে চুমো খেয়ে তাকে আল্লার নূর বলে আত্মতৃপ্তি পাওয়া একই, একই, সম্পূর্ণ একই জিনিস।

গুল বাহাদুরের মনে যখন এ চৈতন্যের উদয় হল তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাজ্জব মুল্লুক হিন্দুস্তান। এই এদের আমরা যুগ যুগ ধরে শিরতাজ, মাথার মুকুট করে পরে আসছি আর এদের মনের কোণে কণামাত্র উদ্বেগ নেই এদেশের লোকের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে। এদের কাছে আমরা সব মায়াবদ্ধ জীব (ফানী দুনিয়ার ক্রিমি), আমরা মরলেই কি, বাঁচলেই কি! ইয়া আল্লা মেহেরবান! তোমার কেরামতি বুঝে ওঠা ভার। এ-সংসার থেকে মুক্তি পাওয়াই যদি মানব-জীবনের চরম আদর্শ হয় তবে এ-সংসারে তুমি তাকে পাঠালে কেন?'

হঠাৎ খেয়াল গেল, আনন্দী বাউলদের অনুকরণে ধুতিটাকে লুঙ্গির মত কোমরে বেঁধে এক হাত উপরের দিকে তুলে অদৃশ্য এক-তারা ধরে নাচছে। দিলেন এক ধমক। শিবুর কথা মতো একে 'ভদ্রলোক' না হয় নাই বানালুম, কিন্তু—একে কখনো বৈরাগী হতে দেব না।

'কি রে আনন্দী, কি রকম আছিস্?'

গলা শুনে পিছনে তাকিয়ে দেখেন—বাঙালী বাবু। লম্বা লিকলিকে চেহারা, গৌরবর্ণ, সরু বাঁকা নাক, বাদামী—প্রায় নীলরঙের দুটি হাসি-হাসি চোখ, উপরের ঠোঁটটি চাপা—নিচেরটি উপকী ছুঁড়িদের মত একটু পুরুষ্টু এবং রস-ভর-ভর, পানের লাল না এমনিতেই লাল ঠিক বোঝা গেল না, এক মাথা কোঁকড়া বাবরী চুল কিন্তু একেবারে রুক্ষশুষ্ক, পরনে কটকি জুতো, ধুতি মেরজাই আর কাঁধের উপর বীরভূমি কেটের চাদর।

বললেন, 'এই যে বাবাজী, ঝিঙের মুখে তোমার কথা শুনলুম।'

গুল বাহাদুর অচেনার আগমনে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'বসুন।' মনে মনে ভাবলেন, 'ঝিঙের মুখে? তবে কি শিবু কিছু বলেনি!'

গদরের সেপাইদের মধ্যে একে অন্যকে পরিচয় দেবার জন্য গোপন সংকেত ছিল হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে শরীরের কোন এক জায়গায় কেমন যেন আনমনে আস্তে আস্তে চক্কর কেটে যাওয়া—তারা যে গোল চাপাটি দিয়ে খবর পাঠাতো তারই অনুকরণে। গুল বাহাদুর মাটিতে বসে তাঁর আপন হাঁটুর উপর যেন বেখেয়ালে চক্কর আঁকতে লাগলেন।

বাবুটি চমকে উঠে আপনি হাঁটুতে একটা চক্কর এঁকেই উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'চল।'

দুজনা নদীপাড়ের বটগাছ-তলায় বসলেন।

পূর্ণিমা রাত্রি। সামনে, উঁচু পাড়ির অনেক নিচে অজয়ের ক্ষীণধারা। তার গতিবেগ প্রায় নেই। যেন মরা অজগর সাপ শুয়ে আছে। চাঁদের আলোতে তার আঁশ যেন চিক্‌চিক্ করছে। দু'একটি মেয়েছেলে সেই আঁশ যেন আঁজলা আঁজলা করে মাথায় মাখছে। তাদের কালো চুল থেকে ছোট ছোট ঝরণা চিক্‌চিক্ করে পড়ছে। জলের ওপারে বিরাট বালুচরের আরম্ভ। তারপর কাশের ঝোপ, নিচু পাড়, যাত্রীদের আস্তানা সব-কিছু চাঁদের আলোতে ম্লান কুয়াশার হিমিকার গ্লানিতে মিশে গিয়েছে। মেলার কোলাহলকে শান্ত নদীর নৈস্তব্ধ্য এখানে গ্রাস করে ফেলেছে।

গুল বাহাদুর বললেন, 'জিন্দাবাদ বাহাদুর শাহ!'

'জিন্দাবাদ বাহাদুর শাহ! জিন্দাবাদ কুমার সিং!'

কুমার সিং?

॥ পাঁচ ॥

অনেকক্ষণ ধরে দুজনাই চুপ। একে অন্যের সঙ্গে এই তাদের প্রথম পরিচয়, কিন্তু বাহাদুর শাহ আর কুমার সিং যেন তাদের হাতে হাত, বুকে বুক মিলিয়ে দিলেন, যেন কত দিনকার পরিচয়। দীর্ঘ বিরহের পর মিলন হলে মানুষ যেমন একে অন্যের নিঃশব্দ সঙ্গসুখ প্রথমটায় শুষে নেয়, এদের বেলা তাই হল।

একবার কথা আরম্ভ হলে সে-সুখ যেন ক্ষীণ হয়ে আসে।

গুল বাহাদুর বললেন, 'সব খতম!'

'সব খতম। কিন্তু আবার সব শুরু।'

দুজনায় আবার চুপ।

গুল বাহাদুর বললেন, 'আমি দিল্লী থেকে এসেছি। আমার নাম—'

'থাক! নামের প্রয়োজন হলে পরে শুধিয়ে নেব। আমি ঘোষাল।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'বুঝেছি।'

আশ্চর্য হয়ে ঘোষাল শুধালে, 'কি করে?'

'শিবু বলেছিল। আমার কথা আপনাকে বলেনি?'

'না। বোধ হয় সময় পায়নি।'

গুল বাহাদুর আফসোস্ করে মনে মনে ভাবলেন, 'এরকম একটা বিচক্ষণ লোক চলে গেল। বেঁচে থাকে শুধু গাধা-খচ্চরগুলো।'

ঘোষাল বললেন, 'শোনো আমার কথা সব বলি।'

এবার ঘোষাল অতি বিশুদ্ধ উর্দুতে আপন বক্তব্য আরম্ভ করলেন।

'আমি ছেলেবেলায় যাই বেহারে। সেখানে অনেক জায়গায় কাজকর্ম

করি—এমন কি ইংরেজের সঙ্গেও। শিউরে উঠো না। পরে বুঝবে। ওদের সঙ্গে কাজ না করলে আমি কখনো এ-রকম গভীরভাবে বুঝতে পারতুম না, এরা কি বজ্জাৎ, কি ধড়িবাজ। কিন্তু সেকথা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করার দরকার এখন নেই। তুমি ফার্সীতে যে-সব বই পড়েছ, আমিও পড়েছি সেগুলোই। আমরা ব্রাহ্মণ কিন্তু আমাদের বংশে বহুকাল ধরে চলে আসছে ফার্সীর চর্চা। কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলুম ইতিহাস চর্চার ফলে নয়। আমার পূর্বপুরুষেরা পাঠানদের হয়ে মোগলদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন পূর্ব-বাঙলায়। হেরে গিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নেন, বীরভূমে। জাহাঙ্গীর, শাজাহান, ঔরঙ্গজেব—ব্যস্—মাত্র এই তিন বাদশার আমলে বাঙলা পরাধীন ছিল, অর্থাৎ দিল্লীর হুকুম মাফিক চলেছে। তারপর আমরা আবার সরকারী কাজ করেছি। তারপর এল ইংরেজ। পলাশী থেকে এই এক'শ বছর আবার আমরা বাড়ি থেকে বেরোইনি।'

গুল বাহাদুর অনেক কিছুই জানতেন না। এই ন'মাস ধরে তিনি চিনেছেন শুধু ডোম আর সাঁওতালদের। এদেশেও ব্রাহ্মণ আছে, এ কথা তিনি মোটামুটি জানতেন। কিন্তু তারা যে গদরে লড়ে এ খবর তাঁর জানা ছিল না। দিল্লীর ব্রাহ্মণেরা পরে চুড়িদার পাজামা, লম্বা শেরওয়ানী, আর মাথায় কিস্তিটুপি। তারা করে পুরুতের কাজ। বিয়ে-শাদীতে এসে মন্ত্রফন্ত্র পড়ায়—তাও সে-মন্ত্র কাগজে লিখে আনে ফার্সী হরফে। তারা আবার লড়াই করে কি করে? লড়াই তো করে রাজপুতরা, মারাঠারা, ক্ষত্রিয়রা। তা সে যাক গে। তাঁর মনে তখন লেগেছে আর এক ধোঁকা। শুধালেন, 'তোমরা কি শুধু বাঙলার স্বাধীনতা চাও? বাহাদুর শাহকে শাহ-ইন-শাহ বলে মানো না?'

ঘোষাল বললেন, 'ঐ তো আরম্ভ হয়ে গেল, হিন্দুস্থানবাসীদের ঝগড়া-কাজিয়া। এ-সব কথা পরে হবে। উপস্থিত দেখতে পাচ্ছো না, আমাদের ভিতরে মিল বেশী, অমিল কম। যদি খুশী হও, তবে না হয় মেনেই নিলুম তোমার বাহাদুর শাহকে। কুমার সিংকে তো মেনেছিলুম। তোমাকেও মানছি। সবাইকে মেনে নেব—দরকার হলে এবং হবেও। তুমি কি মনে করো, আমরা জিতলে সেই পুরনো মোগলাই রাজত্ব আসবে—বাহাদুর শাহকে বাদশা করতে পারলেও? না বাবাজী, দেশের হাওয়া বদলাচ্ছে। বাবুর বাদশার মত রাজত্ব বাহাদুর কখনো করেননি, আর কখনো কেউ পারবে না।'

গুল বাহাদুর শোধালেন, 'আপনারা হেরে গেলেন কেন?'

ঘোষাল হাতজোড় করে বললেন, 'ঐ একটি প্রশ্ন শুধিয়ো না। এর উত্তর দিতে গেলে আবার নূতন করে সেই মর্মন্তুদ পীড়ার ভিতর দিয়ে যেতে হয়, যা ভুলতে পারা একটা জীবনের কর্ম নয়। কোন্ কোন্ ভুল না করলে আমরা জিতে জেতুম সে প্রশ্নও তুলো না। আমি নিশ্চয়ই জানি, সে ভুলগুলো না করলে পরে অন্য ভুল করতুম। না বাবাজী, গলদের মূল উৎস কোথায় ছিল তখনো বুঝতে পারিনি, এখনো পারিনি। আমরা এখানে পাথর চাপা দিয়েছি তো ওদিক দিয়ে জল বেরিয়েছে, সেখানে পাথর চাপা দিয়েছি তো অন্য দিক

দিয়ে বেরিয়েছে। সর্বাঙ্গে ঘা, মলম লাগাই কোথায় ?'

'এখন তবে কর্তব্য কি ?'

ঘোষাল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'বিলকুল কোনো ধারণা নেই। এখনো মনে মনে জমা-খরচ মিলোচ্ছি। তুমি এসেছো, ভালই হয়েছে। দিল্লী ফিরে যাচ্ছ না তো ?'

প্রশ্নটা যেন নিতান্তই ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞেস করা হোল। ঘোষালই জানতেন এর উত্তর কি ? গুল বাহাদুরও কোনো কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

ঘোষাল বললেন, 'ছদ্মবেশটা মন্দ ধরনি। বাঙলাটাও খুব যে মন্দ শিখছো তাও নয় কিন্তু ডাহা ডোম-ডুমে। এই বেলা ওটাতে লেখা-পড়াও আরম্ভ করে দাও। নিজেই করে নিতে পারবে। কোন ভাবনা নেই। ওতে সাহিত্য বলে কোনো বালাই নেই। আশ্চর্য, সাতশ' না আটশ' বছর ধরে বাঙলাতে বই লেখা আরম্ভ হয়েছে অথচ এক গণ্ডা কবি বেরোয়নি যাদের ইরানী কবিদের সামনে দাঁড় করানো যায়। ফার্সীতে তিনশ' বছর যেতে-না-যেতেই ফিরদাসী, হাফিজ, সাদী, রুমী, আত্তার, নিজামী, আরো কত কে ?'

গুল বাহাদুর মৃদু আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'বাঙালীরা হয়তো মনে করে, তাদের কবি হাফিজ সাদীর চেয়ে বড়।'

ঘোষাল তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, 'তা করতে পারে। সাঁওতালরা হয়তো মনে করে, তাদের তীর ধনুক নিয়ে বন্দুক কামানের সঙ্গে লড়া যায়।'

তুলনাটার ঢপ দেখে গুল বাহাদুর একটু হাসলেন।

ঘোষাল বললে, 'হাসলে ? তা হাসো। আমারও বলার বিশেষ হক্ক নেই। আমিও তেমন কোনো চর্চাও করিনি। কিন্তু জানো, সাতশ' বছর বাঙলা চর্চা করার পর তারা গদ্য লিখতে আরম্ভ করেছে এই মাত্র সেদিন। পঞ্চাশ বছরও হয়নি। ঐ যে রাজা রামমোহন রায়—'

গুল বাহাদুর চমকে উঠে বললেন, 'কে ?'

'রাজা রামমোহন রায়। চেন না কি ?'

গুল বাহাদুর বললেন, 'হ্যাঁ, আমার পিতার কাছে শুনেছি, বাদশা দুসরা আকবরের চিঠি নিয়ে তিনি বিলেত গিয়েছিলেন। আমি তো শুনেছি, উনি জানতেন অতি উত্তম ফার্সী এবং আরবী।'

ঘোষাল বললেন, 'তা তিনি জানতেন। এদেশের মুসলমান পণ্ডিতরা তাঁকে নাম দিয়েছেন "জবরদস্ত মৌলবী"।' তারপর একটু অবজ্ঞার সুরে বললেন, 'লোকটা মৌলবীই বটে। ধর্ম সম্বন্ধে বই লেখে। ফার্সীতে একটা লিখেছে। আমার কাছে বোধ হয় এখনো আছে। কিন্তু ধর্মে আমার রুচি নেই। তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু তাজ্জব কী বাৎ, লোকটা দেশের সবাইকে ইংরিজি শেখাতে চায়।'

'সে কি ?'

'আশ্চর্য। আরবী ফার্সীর রস চেখেছে, শুনেছি ইবরানী সুরয়ানী ইস্তেক

(হিব্রু, সিরিয়াক্) জানে—তার পর এই রুচি! ইংরেজ ব্যাটারা তো পায়খানা ফিরে জল পর্যন্ত—থাক্ গে। জানো, বাবাজী, এক ব্যাটা ইংরেজের সঙ্গে আমাকে একদিন নিতান্ত বাধ্য হয়ে হাত-নাড়ানাড়ি করতে হয়েছিল। হাতে যেন এখনো গন্ধ লেগে আছে। বেসন দিয়ে কত মেজেছি, ঝামা দিয়ে তার চেয়েও বেশী ঘষেছি।'

বলে ডান হাতখানা অতি সন্তর্পণে নাকের ইঞ্চি তিনেক সামনে ধরে দু'বার শুঁকে বলে উঠলেন, 'তোবা তোবা! এখনো গন্ধ বেরুচ্ছে!'

গুল বাহাদুর সহানুভূতির সুরে বললেন, 'আমিও পাচ্ছি। তা ঐ অপকর্ম করতে গেলেন কেন?'

'সাধে? ঐ করে তো সম্বন্ধীকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আর পাঁচজনের চোখের আড়াল করলুম।' ঘোষাল চুপ করে গেলেন।

গুল বাহাদুর শোধালেন, 'তারপর?'

ঘোষাল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উদাস সুরে বললেন, 'তারপর কে কোথায় যায় সে তো আল্লাই জানেন। কেউ যায় বেহেস্তে, কেউ যায় দোজখে, কেউ যায় বৈকুণ্ঠে, কেউ যায় কৈলাসে!'

'সে আবার কোথায়?'

'বাবাজী, ধরা পড়ে যাবে। বৈকুণ্ঠটা কোথায় সেটা অন্তত তোমার জানা উচিত। বাবাজীরা মরে গেলে বৈকুণ্ঠ যায়—নামাবলীর কার্পেট পেতে তারি উপরে বসে। আরব্য রজনীতে যেরকম আছে। কিন্তু থাক ওসব। ধর্মে আমার রুচি নাই—তোমাকে তো বলেছি।'

অনেকক্ষণ পর গুল বাহাদুর শোধালেন, 'ইংরেজ মেরেছেন; ইংরেজ আপনাকে তালাশ করছে না?'

'তা করছে, কিন্তু আমি ইংরেজ মারলুম কখন?'

গুল বাহাদুর আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'এই যে বললেন।'

'তাজ্জব বাৎ শোনালে! আমি বেটাকে নিয়ে গেলুম যেখানে তার বরাতে লেখা ছিল যাবার। তারপর আমাদের সেপাইরা তাদের কাজ করলে। আমি কি জল্লাদ?'

'আপনি তবে কি করতেন?'

'আমি? আমার কাজ ছিল তাপ্পা, রিপুকর্ম। আজ বন্দুক নেই, যোগাড় করো। কাল বারুদ নেই, ঠ্যালা সামলাও। পরশু খোরাক নেই, আমার নাভিশ্বাস। আরো কত কি? লুঠের মাল বখরা করা, গাঁয়ের লোককে মিথ্যে দিব্যি-দিলাশা দিয়ে তাতানো, চিঠি জাল করা—'

'সে আবার কি?'

ইংরেজের গুপ্তচর আমাদের সেপাইদের ভিতর জাল চিঠি পাচার করালে, যেন সে-চিঠি কুমার সিং ইংরেজকে লিখেছেন আত্মসমর্পণ করে, অবশ্য তাঁর ধনপ্রাণ যেন রক্ষা হয় এই শর্তে। আমি তখন পাল্টা চিঠি জাল করাতুম, ইংরেজ আত্মসমর্পণ করেছে এই মর্মে সেটা চালিয়ে দিতুম আমাদের সেপাইদের

ভিতর। কিন্তু ইংরেজ সেপাইদের ভিতর ভিতর এরকম জালিয়াতি আমরা করতে পারিনি অতখানি বাড়িয়া ইংরাজি লেখা জাল করনেওলা আমাদের ভিতর কেউ ছিল না।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'তাই বোধহয় রাজা রামমোহন আমাদের ইংরিজি শেখাতে চান।'

ঘোষাল গোস্‌সাভরে বললেন, 'কচু হবে ইংরিজি শিখে। যেন ইংরিজি চিঠি জাল করতে পারলেই আমরা গদর জিতে যেতুম। যেন কাঠবেরালির ধুলো না হলে—থাক্ গে—ওসব কেচ্ছা তুমি জানো না।'

চাঁদ অনেকখানি ঢলে পড়েছে। বাউলদের গীতও ঝিমিয়ে এসেছে। নদীর জলের রুপোলি ঝিকিমিকি লোপ পেয়েছে, কিংবা সরে গিয়েছে। ওপার থেকে পাড়ি দিয়ে একটা দমকা হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস দুজনার ভিতর দিয়ে চলে গেল। কিংবা হয়তো গদরেরই দীর্ঘনিঃশ্বাস, হায় হায় আফসোস্।

গুল বাহাদুর বললেন, 'যাক্। তবু ভালো। আমি তো শুনেছিলুম, কুমার সিং সত্যি আত্মসমর্পণ করে ইংরাজকে চিঠি লিখেছিলেন। সেগুলো তাহলে জাল।'

ঘোষাল হেসে বললেন, 'সব-কটা জাল হতে যাবে কেন? কিছু সত্যিও ছিল।'

গুল বাহাদুর আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'সে কি?'

'নিশ্চয়। যখন দেখলুম, ইংরেজ চিঠি চালাচ্ছেই তখন আমরাও ইংরেজকে দু-চারখানা লিখে পাঠালুম। নানারকম ভুল খবর দিয়ে। নিছক ধাপ্পা মারার জন্য। ঝাঁসীও তাই করেছিলেন।'

'কিন্তু এতে করে যে পরে দেশের লোকের মনে ভুল ধারণা হল, কুমার সিং সত্যি সাহস হারিয়ে ফেলেছিলেন। সে ভুল ধারণা সরাবে কে?'

'দেখ বাবাজী, গদর জিতলে এ ভুল ধারণা থাকতো না। আর হারলে তো গাল খাবই। তখন কাজ ছিল লড়াই জেতা। তার জন্য যা প্রয়োজন তাই করেছি। হেরে গিয়েছি সেইটে হল সবচেয়ে বড় গাল। তার উপর এ-বদনাম তো বোঝার উপর শাকের আঁটি। এবং তার চেয়েও বড় কথা, "পকড়ে তলওয়ার দামনকো সম্‌হালে কোঈ"? তলোয়ার নিয়ে হামলা করার সময় রক্তের ছিটে পড়ার ভয়ে কেউ তো কুর্ত্তার অঞ্চল সামলায় না—অর্থাৎ একবার মনস্থির করবার পর ছোটোখাটো চিন্তা করতে নেই।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'সে তো বিলকুল ঠিক। কিন্তু, ইংরেজ আপনার সন্ধান পাবে কি না সেও কি ঐ পর্যায়ের?'

ঘোষাল বললেন, 'প্রায় তাই। কিন্তু আসলে কি জানো, বাবাজী, বেঁচে থাকার উপর আমি খুব বেশী দাম দিই নে। এই গদরে চলে গেল মানুষগুলো, আর বেঁচে রইল যারা, তাদের আমি দোষ দিই নে, কিন্তু তাদের নিয়ে আমি করবো কি? ঝড়ে মোটা আমগুলো ঝরে পড়ে সে তো জানা কথা। আমি নিজে অত্যন্ত সামান্য প্রাণী কিন্তু ঐ মহাজনদের সম্পর্কে এসে আমি কয়েক

দিনের জন্য কি যে হয়ে গিয়েছিলুম তোমাকে বোঝাই কি প্রকারে ? আমি যেন রোগা-পটকা হাড্ডিসার গঙ্গাযাত্রায় জ্যান্ত মড়া হয়ে যাচ্ছিলুম উদ্ধারণপুরের ঘাটে। আমরা ঘাড়ে এসে করলে ভর এক উড়োনচণ্ডী দানো। আমি উঠলুম লম্ফ দিয়ে, মড়ার খাটিয়া ছেড়ে, আর তারপর সে কি তিড়িং বিড়িং ভুতের নৃত্য করলুম ক'দিন। তখন আমি সব জানি, সব পারি। ঐ আনন্দী ছোঁড়াটা তখন যদি আমাকে আব্দার করতো, "দাদু বেহেস্ত থেকে এনে দাও না আমাকে খুদাতালার কুর্সীখানা", আমি তা হলে একগাল হেসে বলতুম, "রঃ ! ডাঁড়া ! এনে দিচ্ছি, এ আর এমন কি চাইলি ?" তারপর দিতুম এক আকাশ-ছোঁয়া লম্ফ। স্বপ্নে যে-রকম মানুষ মিন-পাখনায় পায়ের কড়ে আঙ্গুলে অল্প একটু ভর দিলেই হুশ কড়ে উড়ে গিয়ে ঠুকে যায় তার মাথা চাদের বুড়ীর চরকাতে।

'জানো বাবাজী, এ যেন স্বপ্নের মাঝে সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা পেরিয়ে আল্লার পায়ের কাছে ফেরেশ্‌তা বনে যাওয়া। আর আমার চতুর্দিকে কুমার সিং আর তার সঙ্গী-সাথী। কী সব বাঘ, কী সব সিংহ ! আমরা যেন সবাই, অন্ধ-প্রদীপ আপন আপন সেজে পলতের মতো পড়ে ঘুমুচ্ছিলুম। এল কুমার সিংয়ের দীপ্ত দীক্ষা। তাঁর আলো আমাদের এক-একজনকে স্পর্শ করে, আর আমরা প্রদীপ-শিখার মত জ্বলে উঠি। আবার আমাদের শিখা জ্বালিয়ে দেয় অন্য প্রদীপ। তাই বলছিলুম, এ তো দীপ্ত-দীক্ষা—এ তো স্পর্শদীক্ষা নয়, সে তো সামান্য জিনিস। পরশ পাথরের স্পর্শ লেগে লোহা হয় সোনা, কিন্তু সে সোনা তার পরশ দিয়ে অন্য লোহাকে সোনা করতে পারে না,—তাই তার নাম স্পর্শ-দীক্ষা, তার মূল্য আর কি ?

'সে কী দেয়ালি জ্বালিয়েছিলুম আমরা !

'আর আজ, অন্ধকার অন্ধকার—সব অন্ধকার !'

হঠাৎ বলা-নেই, কওয়া-নেই, ঘোষাল দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাঁটুতে মাথা গুঁজে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

গুল বাহাদুর স্তম্ভিত। বয়স্ক লোক, বিশেষ করে ঘোষালের মত কট্টর গদর-প্রাণ লোক যে এরকম বে-এক্তেয়ার হয়ে যেতে পারে, তিনি তার জন্য তৈরী ছিলেন না। গুল বাহাদুর তখনো জানতেন না, বাঙালী কতখানি দরদী, ভাবালু, অনুভূতিপ্রবণ।

তিনি চুপ।

ঠিক যে রকম হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন সেই রকমই হঠাৎ মাথা তুলে হেসে বললেন, 'কিন্তু আমাকে ধরিয়ে দেবে সেই ইংরেজরই ভুত।' বলে ডান হাতখানা নাকের কাছে এনে বার দুই শুঁকে বললেন, 'তোবা, তোবা, এখনও গন্ধ বেরুচ্ছে।'

পূর্বের মত গুল বাহাদুর মমতামাখা সুরে বললেন, 'আমিও পাচ্ছি।'

ঘোষাল উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'তবেই বোঝো ঠ্যালা। ঐ ইংরেজ ব্যাটার ভুত এসে ভর করেছে আমার পাঁচ আঙুলে। তারই বোটকা গন্ধ ডেকে আনবে আর পাঁচটা ইংরেজকে, ধরিয়ে দেবে আমাকে। না হলে কে জানবে বীরভূমের

ঘোষাল আরা জেলার মহম্বৎ খান! ভূতই শুধু সব-কিছু জানতে পারে।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'ইংরেজ মাত্রই জ্যান্ত ভূত। মরে গিয়ে তার আর ছের-ফের হয় না।'

ঘোষাল একেবারে ছেলেমানুষের মত আরো যেন উৎসাহ পেয়ে বললেন, 'যা বলেছ, গোসাঁই। হিন্দু মরে গিয়ে হয় ভূত, মুসলমান মরে গিয়ে হয় মামদো। কথায় কয়, "ভূতের উপর মামদোবাজী"। অর্থাৎ হিন্দুর উপর মুসলমানের কেরদানী। কিন্তু মামদোর উপর অন্য ভূত কই? সে রকম কোন প্রবাদ তো এখনো হল না। তাহলে বাহাদুর শা'র উপর শেষ পর্যন্ত উপর-চাল মারতে পারবে না তো ইংরেজ। বাবাজী, তোমারই জিৎ। জিন্দাবাদ বাহাদুর শাহ্!'

গুল বাহাদুর বললেন, 'তুমি যে বলেছিলে বাঙলাতে কিছুই নেই। কিন্তু "ভূতের উপর মামাদোবাজী" তো খাসা প্রবাদ।'

ঘোষাল গম্ভীর হয়ে বললেন, 'একেবারে কিছু নেই সে-কথা বলবে কে? একটা জিনিস আছে সেটি মহা মোক্ষম। বাঙলার কেত্তন। "হরিবোল, হরিবোল" বলে নাচন-কুদন নয়। পদকীর্তন। ওর মত জিনিস হয় না। ঝাড়া পাঁচশ' বছর ধরে হাজার হাজার বাঙালী তার প্রেমের গীত আপন গলায় গায়নি —গেয়েছে রাধার গলা দিয়ে, কিংবা কৃষ্ণের বাঁশীর ভিতর দিয়ে। ফার্সীতে প্রেমের গান গাওয়া হয়েছে লায়লী মজনু, শীরীন ফরহাদ, ইউসুফ জোলেখার ভিতর দিয়ে—দেখতেই পাচ্ছো, বিস্তর বখরাদার, ভাগের মা গঙ্গা পায় না, প্রেমটা তেমন জমজমাট ভরভরাট হয়নি। তাই কীর্তনে পাবে ঠাসবুনোট। তার গোড়াপত্তন হয় এইখানেই, এই কেঁদুলীতেই—তবে সংস্কৃতে। জয়দেবের গীতগোবিন্দে। আমি শুনেছি। বিশেষ ভালো লেগেছে, বলতে পারবো না। বড় কথার ঝলমলানি। আমি সংস্কৃত বুঝিও না। কিন্তু বাঙলায় পেয়েছে ঐ বস্তুই তার আসল খোলতাই। হ্যাঁ মনে পড়লো, মুসলমান কীর্তনীয়াও বিস্তর আছে। তারই একজন আমাদেরই পাশের সৈয়দ মরতুজা।'

গুল বাহাদুর এ নামটি ভালো করে মনে রেখেছিলেন, শিবু মরার সময় তাঁকে বলে গিয়েছিল বলে। বললেন, 'এঁর নাম শুনেছি শিবুর কাছে। তাঁরই কে যেন কি—আনন্দী তাঁর নাম, তাঁর মেহেরবানীতে পেয়েছিল বলে শিবুর ছেলের নাম আনন্দী।'

ঘোষাল বললেন, 'তাই বলো। আনন্দ নাম হয়, কিন্তু ডোমপাড়াতে আনন্দী নামের হদিস আমি এতক্ষণ পাইনি। তা সে কথা পরে হবে। এখন শোনো, এই কেত্তন গান বোষ্টমদের জান-প্রাণ। আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে প্রায়ই হয়। তুমি এলে কেউ কিচ্ছু ভাববেই তো না, উল্টে তোমার গোঁসাইগিরি আরো ফলাও হয়ে ফুটে উঠবে।'

গুল বাহাদুর একটু কিন্তু-কিন্তু করে বললেন, 'আমি তো ওসবের কিছুই জানি নে।'

'জানবে আবার কি? বসে বসে মাথা নাড়বে, আর মাঝে মাঝে আহাহা

করে উঠবে। তোমাকে তো আর গাইতে হবে না। মুসলমানদের কাওয়ালীতে যখন হিন্দু হম্‌দ্‌ ও নাৎ (আল্লা রসুলের প্রশস্তি) শুনতে যায়, তখন তারা সে গীতে পোঁ ধরে নাকি ? বেন্দাবনের বাবাজী বসে আছেন, ঐ তো ব্যাস্‌। আর হজরৎ মুহম্মদই তো বলেছেন, "মুর্খের উপাসনা অপেক্ষা গুণীর নিদ্রা শ্রেয়ঃ।" কেত্তন চলে অনেক রাত অবধি। ভালো কেত্তনীয়া হলে তো কথাই নেই—ভোর অবধি। কথাবার্তা তখন হবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ঘোষাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আর কীই বা আছে কথা-বার্তা বলার।'

এ-রকম নৈরাশ্য গুল বাহাদুরের সয় না। বললেন, 'অতো কাতর হয়ো না বাবুজী। আল্লার উপর একটু বিশ্বাস রাখতে শেখো।'

ঘোষাল হেসে বললেন, 'আমি তো বিশ্বাস রাখি গোঁসাই, কিন্তু আল্লা যে আমাকে বিশ্বাস করলেন না। গদরের মেওয়া তো আমার কোঁচড়ে ফেললেন না। আচ্ছা এখন তবে আসি।'

গুল বাহাদুর ফার্সীতে চাপান বললেন,

'দুঃখ করো না, হারানো ইসুফ
কিনানে আবার আসিবে ফিরে।'

ঘোষাল ওতর হাঁকলেন,

'দলিত শুষ্ক এ মরু পুনঃ
হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে ॥'

কেঁদুলী থেকে ডুবসাঁতারে চিকনকালা গাঁয়ে পেঁছানো যায়। সন্ধ্যার সময় গোরুর গাড়িতে উঠে দোলানি-ঝাঁকুনির ভিতর নিদ্রা—সকালবেলা চিকনকালা। সন্ধ্যার সময় চাঁদ থাকবে পায়ের দিকে, ঘুম ভাঙলে দেখবে, তিনিও ডুবসাঁতার মেরে চিকনকালা গাঁ পেরিয়ে পশ্চিমাকাশে ডুবুডুবু।

গুল বাহাদুর ভেবেছিলেন, সন্ধ্যার সময় রওয়ানা দেবেন, কিন্তু ঘোষালের সঙ্গে গা ঘষাঘষি করে যখন রওয়ানা হলেন তখন রাত প্রায় কাবার। দিনের বেলা গরমে গোরু দুটোর কষ্ট হবে, কিন্তু গাড়োয়ান গণি মিয়া বললে, বরঞ্চ দুপুরে গরমটা গাছতলায় কাটানো যাবে, কিন্তু এখানে থাকা নয়, ওলা বীবীর দয়া হয়েছে, অর্থাৎ কলেরা আরম্ভ হয়েছে।

ওলা বীবী ! সে আবার কি ! গণি মিয়া পণ্ডিত নয়, তাই ঘোষালের মত এর কথায় সব-কিছু বলে দিতে পারলো না। অনেক সওয়াল করার পর বেরল, শেতলা মনসার মতো ইনি ওলাওঠার দেবী কিংবা বীবী। কিন্তু আর সব দেবী যখন হিন্দুর মৌরশী পাট্টা, তখন ইনিই বা মুসলমানী হয়ে বীবী খেতাব নিলেন কেন ?

গুল বাহাদুর জানতেন না, বাঙলাদেশ তাজ্জব দেশ। ভাগ্যিস তিনি তখনো দখিন বাঙলায় যাননি। সেখানে তাহলে আলাপ পরিচয় হত জলের দেবতা বদর পীরের সঙ্গে, বড়মেঞা ওরফে বাঘের দেবতা গাজী পীরের সঙ্গে।

এই ঘোষালের সঙ্গেই আলাপ করে তিনি যত না শিখলেন তথ্য, তার চেয়েও বেশী প্রশ্ন। যথা ;—

এ দেশের খানদানীরাও কিছু কিছু তাহলে গদরে যোগ দিয়েছিল, কিন্তু প্রশ্ন, সে কি শুধু বাঙলাদেশের বাইরে? দেশের ভিতর অন্য খানদানীদের মতিগতি তা হলে কি? তারা যদি ইংরেজকে এ-দেশ থেকে খেদাতে না চায় তবে তো কোনো কিছু করা অসম্ভব, কারণ তারা যদি নেতৃত্ব না নেয় তবে ডোম-চাঁড়ালেরা কি আপন হিম্মতে নয়া গদরের তাজা ঝাণ্ডা উঁচু করতে পারবে? তারপরের প্রশ্ন, এই খানদানী অর্থাৎ বামুন এবং চাঁড়ালদের ভিতর কি অন্য কোনো সম্প্রদায় নেই? দিল্লীতে যে রকম ব্রাহ্মণ আর বেনের মাঝখানে আছে ক্ষত্রিয়রা? আর দিল্লীর ব্রাহ্মণ আর এখানকার ঘোষাল ব্রাহ্মণেই বা মিল কোথায়? দিল্লীর বামুনরা তো করে স্রেফ পুরুতগিরি, এ বামুন তো একদম 'আগখুর' অর্থাৎ আগুনগিলনেওলা। কিন্তু মারাঠী ব্রাহ্মণ পেশওয়ারাও তো পুরুতগিরি করে না। তবে কি তারা হাতিয়ার নেয়, না শুধু আড়ালে বসে কল-কাঠি নাড়ে?

আনন্দীর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে গুল বাহাদুর ভাবলেন, এসব জাত-বেজাত আর তাদের ফ্যাচাঙ-ফেউ শিখতেই তো যাবে একটা আস্ত জীবন। তা আর কি করা যায়, অন্য কোনো পন্থা যখন আর নেই। আরব্য উপন্যাসের জিনও তো বোতলের ভিতর বন্ধ হয়ে কাটিয়েছিল তিনশ' না চারশ' বছর। পরমাত্মার কৃপায় তবু তো তিনি মুক্ত—অন্তত বোতলের জিন্নির তুলনায়।

দূরের শালবনের ফাঁকে কে যেন ছোট্ট একটি আগুন জ্বালিয়েছে। না, সূর্যঠাকুর ঘুম ভেঙে চোখ কচলে কচলে লাল করে ফেলেছেন? আকাশে চাঁদের আলো কখন মিললো, সূর্যের আলো দেখা দিল তিনি লক্ষ্যই করেননি। পুব থেকে একটুখানি ঠাণ্ডা বাতাস এগিয়ে চলেছে পশ্চিমপানে দেবতার পায়ে পেন্নাম করতে। কিন্তু এ দেবতা বড়ই জাগ্রত বদমেজাজী পীর! ভক্তকে অভ্যর্থনা জানান ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে। পূর্ব-বাঙলা থেকে বেরিয়ে-আসা এই তীর্থযাত্রী পুরবিয়া-হাওয়াকে তিনি আদর করে গায়ে মাখেন না, উল্টে ছেড়ে দেন পচ্ছিমিয়া গরম বাতাস। আল্লাওয়াদী খানের আমলে মারাঠা দস্যুর মত তারা পশ্চিম দিগন্ত থেকে আসে ঝড়ের মত হু হু করে, ঘোড়ার খুরে বালি পাথর শুকনো পাতার হাজারো দ' জাগিয়ে দিয়ে। একেবারে আকাশজোড়া নিরন্ধ্র, তমসাঘন, সূর্যাচ্ছাদিত একচ্ছত্রাধিপত্য।

দানিশপুর গাঁ ডাইনে রেখে চিকনকালা যেতে হয়। সে গাঁয়ের বাইরে আসতে-না-আসতেই গাড়ির উপর হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল চৌষট্টি পবন মারাঠাদের চৌষট্টি হাজার হর্স-পাওয়ার নিয়ে।

সামাল সামাল বলতে-না-বলতেই, গোরু গাড়োয়ান, গুল বাহাদুর খান কারো কোনো খবরদারী হুঁশিয়ারীর তোয়াক্কা না করে গাড়ি ঢুকলো দানিশপুর গাঁয়ের ভিতর। তারপর বাঁ দিকে চক্কর খেয়ে শিমুল পলাশ মহুয়ার আড়ালের

এক আঙ্গিনায় গিয়ে ছিটকে ফেলে দিলে আনন্দী, গুল বাহাদুর, গণি মিয়া মায় দুটো গোরুকে একে অন্যের ঘাড়ে। মায়ের সুপুত্তুর যে রকম বস্তা বস্তা চাল ডাল নুন চিনি আঙ্গিনায় আছাড় মেরে হুঙ্কার দিয়ে কয়, 'দেখো, মা, তোমার জন্যে কি এনেছি।' কোথায় লাগে এর কাছে পঞ্চপাণ্ডবের দ্রৌপদীকে বাড়ি এনে মাতা কুন্তীকে আনন্দ সংবাদ জানানো!

চতুর্দিকে, আকাশ বাতাসে তখন লাল ধুলো-বালির ভূতের নৃত্য। ঝড়টা এমনি অসময়ে এবং অতর্কিতে এসে আক্রমণ করেছে যে ধূর্ত বায়সকুল পর্যন্ত আশ্রয় নেবার ফুর্সত পায়নি। সেই ঝড়ের তীব্র সিটির শব্দের ভিতরও ক্ষণে ক্ষণে ভেয়ে উঠছে তাদের তীক্ষ্ম মরণাহত আর্তরব।

গুল বাহাদুর সব-কিছু ভুল উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'শাবাশ, শাবাশ! একেই বলে আক্রমণ; একেই বলে হামলা। বিলকুল বে-খবর এসে বে-এক্তেয়ার করে দিল দুশমনকে।'

গোরু দুটো গাড়ি থেকে খালাস করে আনন্দীকে কোলে করে আঙ্গিনার অন্য প্রান্তরে কুঁড়েঘরের দাওয়াতে উঠতেই গুল বাহাদুরের চোখ পড়ল আরেক ঝড়। ঝড়েরই বেগে ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিনায় এল এক রমণী। শাড়ির এক অংশ কোমরে বাঁধা, দীর্ঘতর অংশ সোজা উঠে গেছে আকাশের শূন্যে, মাথার চুলও উঠেছে আকাশের দিকে তালগাছের সক্কলের উঁচু পাতাটার মতো ঢপ নিয়ে। তার বগলে একটি ছোট্ট ছাগলের বাচ্চা। এই লালচে অন্ধকারের ভিতরও গুল বাহাদুরের নজরে পড়লো ছাগল-বাচ্চাটার দুটো ভয়ার্ত চোখ। আর, আর তার পাশে, একে অন্য থেকে বেশ দূরে আরও দুটি লাল-কালো চোখ। মেয়েটি আসমান থেকে শাড়ি নামিয়ে বুক ঢাকার চেষ্টা না করে সোজা উঠলো ঘরের দাওয়ায়। ঝটাৎ করে শিকলি খুলে ঘরের ভিতর ঢুকে এক লহমার তরে দরজা ফাঁক করে ধরলো। এহেন প্রলয় নৃত্যের ওক্তে 'আপ যাইয়ে,' 'আপ বৈঠিয়ে' বলে কে? পেছন থেকে গণির বেধড়ক ধাক্কা খেয়ে গুল বাহাদুর পড়লেন মেয়েটার উপর। সে চোট না সামলাতে পেরে পড়ে যাচ্ছে দেখে তাকে জাবড়ে ধরলেন দু হাত দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে। মেয়েটা 'আ মর মিনষে' ঐ ধরনের কি যেন একটা বললে। ইতিমধ্যে গণি মিয়া কোনো গতিকে দরজাতে হুড়কো দিয়ে ফেলেছে।

ভিতরে ঘোরঘুট্টি অন্ধকার। শুধু চালের সঙ্গে যেখানে মাটির দেয়াল লেগেছে তারই ফাঁক দিয়ে কেমন যেন একটা লাল আভা দেখা যাচ্ছে—গাঁয়ে আগুন লাগলে রাতের বেলা অন্ধকার ঘরে যে-রকম বাইরের আগুনের আভাস পাওয়া যায়, বিদ্যুৎ ঝলমল করে উঠলে সক্কলের মুখের উপর সোনালী আবীর মাখিয়ে দেয়।

একটা মোড়া ঠেলে দিয়ে রমণী বললে, 'বসো গোঁসাই।' গণি এক কোণে চ্যাটাইয়ের উপর বসেছে। আনন্দী গুল বাহাদুরের হাঁটু জড়িয়ে ধরে ভীত নয়নে এ-দিক ও-দিক তাকাচ্ছে।

গুল বাহাদুর দিল্লী শহরে বিস্তর খাপসুরৎ রমণী দেখেছেন। খাঁটি তুর্কী

মেয়ের ড্যাবডেবে চোখ, খানদানী পাঠান মেয়ের ধনুকের মত জোড়া ভুরু, নিকষ্যি কুলীন ইরাণী তন্বঙ্গীর দোলায়িত দেহসৌষ্ঠব, এমন কি প্রায় অমিশ্র আর্যকন্যা ব্রাহ্মণকুমারী সরল বুদ্ধিদীপ্তশান্তসৌন্দর্য তিনি বহুবার দেখেছেন, কিন্তু আজ যে রমণী তাঁর সামনে আধা আলো-অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, তার লাবণ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ সৌন্দর্য ছ'শ বছরের মিশ্রণের সওগাত। এর গায়ের রঙ এদেশের কচি বাঁশপাতার সবুজ দিয়ে আরম্ভ, তাতে মিশে গিয়েছে পাঠান-মোগলের কিঞ্চিৎ তাঁবা-হলুদের রঙ। চুল ইরাণীদের মত কালো হয়ে গিয়ে যেন নীলের ঝিলিক পড়েছে। কিন্তু তার আসল সৌন্দর্য তার আটসাঁট গড়নে—সাঁওতাল মেয়ে দেখে যেমন মনে হয় এর দেহ তৈরী হয়েছে গয়ার কালো পাথর দিয়ে। পেটে পিঠে কোনো জায়গায় এক চিমটি ফালতো চর্বি নেই। আলগোছে কোমরে জড়ানো এর শাড়ির আঁচল কোমরটিকে যা ক্ষীণ করে দিয়েছে দিল্লীর তন্বঙ্গী তার ইজের-বন্ধ কষে বাঁধলেও এ ক্ষীণ কটি পেত না।

প্রথম তরুণ বয়সে গুল বাহাদুর যখন সবে বুঝতে আরম্ভ করেছেন যুবতীর দেহে কি রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে, তখন তাঁর এক ইয়ার তাঁকে একখানা চিত্রিত ইউসুফ-জোলেখার বই দিয়েছিল। পাতার পর পাতা উল্টে সে বইয়ে তিনি দেখেছিলেন শিল্পী কি ভাবে প্রতি পাতায় জোলেখার সৌন্দর্য ধীরে ধীরে উদ্ঘাটন করেছেন। প্রতি ছত্র, প্রতি রঙ তাঁর অঙ্গে অঙ্গে তখন কি অপূর্ব শিহরণ এনে দিয়েছিল। রোমাঞ্চ কলেবরে কাটিয়েছিলেন অর্ধেক যামিনী।

আজ ঠিক সেই রকম বিদ্যুতের প্রতি ঝলক যেন মেয়েটির সৌন্দর্য পাতার পর পাতা খুলে তাঁর মুগ্ধ আঁখির সামনে তুলে ধরছিল। আর চতুর্দিকে তখন ঝঞ্ঝা-বাত্যার প্রলয় নর্তন। তারই মাঝখানে এই কমলিনীর ক্ষণে ক্ষণে আত্ম-বিকাশের মন্দমধুর প্রস্ফুরণ।

কিন্তু আজ আর প্রথম তারুণ্যের সেই রোমাঞ্চ শিহরণ গুল বাহাদুরের দেহে মনে হিল্লোলিত হল না। আজ এই সৌন্দর্যের পট পরিবর্তন তিনি গভীর তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করলেন—শান্ত মনে, সমাহিত চিত্তে।

বিদ্যুতালোকে গুল বাহাদুরের চোখে চোখ পড়তে রমণী শুধালো, 'কি দেখছ গোঁসাই?'

অতিশয় অনাবশ্যক প্রশ্ন। কণ্ঠে লজ্জা দেবার কিংবা পাওয়ারও কোন রেশ নেই। এমন সময় আকাশ থেকে কক্কড় করে নামলো শুকনো দেশের ভরাট অকাল বৃষ্টি। গুল বাহাদুরকে কোনো উত্তর দিতে হল না।

মেয়েটি মাটিতে বসে দু হাতে হাঁটু জড়িয়ে গুল বাহাদুরের মুখের দিকে আবার তাকালো। চিবুক যে জোড় হাঁটুর উপর রাখবে তার যেন উপায় নেই। মাঝখানে সুবিপুল মৃন্ময় মর্ম-বিগ্রহ যুগল।

হঠাৎ রমণী দু বাহু তুলে খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে গুল বাহাদুরকে শুধালো, 'গোঁসাই, তোমার বয়স কত?'

যেন প্রশ্নের জন্য তৈরী ছিলেন। কিন্তু উত্তর না দিয়ে পাল্টে শুধালেন, 'কোন্ বয়স?'

রমণী হেসে উঠলো। বললো, 'সে আবার কি? বয়স আবার কত রকমের হয়?'

গুল বাহাদুর বললেন, 'অনেক রকমের হয়। আমার বয়স তেইশ।' গদরের নৈরাশ্য এই নাতিদীর্ঘ তেইশকে যেন কত দীর্ঘ তেইশে সম্প্রসারিত করে দিয়েছে।

এবারে রমণী খল খল করে হেসে উঠলো। 'ইয়া আল্লা, ইয়া রসুল, তোমার বয়স তেইশ। আমার-ই তো এক কুড়ি হয়!'

গুল বাহাদুর চমকে উঠলেন। এ মেয়ে কি মুসলমান? শুধালেন, 'তোমার নাম কি?'

হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বললো, 'তোমার যেমন অনেক রকমের বয়স, আমার তেমনি অনেক নাম। লোকে বলে "মিছার মা"।'

'সে আবার কি?'

'বুঝলে না? আমি সাচ্চা মা নই, তাই আমি মিছার মা।'

বৃষ্টি নেমেছে দেখে গণি মিয়া গাড়ি-গোরুর খবর নিতে বাইরে যাচ্ছিল। এতক্ষণ সে কোন কিছুতে কান দেয়নি। এবারে একটুখানি দাঁড়িয়ে গুল বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমাকে যা তা বলছে, বাবাজী। ওর নাম আসলে মিঠার মা।'

মিঠার মা গণির দিকে তাকিয়ে রাগত কণ্ঠে বললে, 'হ্যাঁরে গণ্যা, আমি যা তা বলি? আমি মিছার মা না তো কি? আল্লার কিরে কেটে ক' তো?'

গণি বাইরে যেতে যেতে বললে, 'তা তুই নিকে করে বাচ্চা বিয়োলেই পারিস।' গুল বাহাদুরকে বললে, 'আসলে ওর নাম মোতী।'

গুল বাহাদুর ভাবলেন, 'এ-নাম যে দিয়েছেন সে আর যাই হোক্ মিছের বাপ নয়— সত্যি নামই দিয়েছে। কিন্তু এর জাত কি তার হদিস গুল বাহাদুর তখনো পেলেন না।

কিন্তু এক মুহূর্তেই পাওয়া গেল। তাও অনায়াসে।

আনন্দী বললে, 'দাদু, জল খাবো।'

মোতী শুনতে পেয়েছে। ভাবখানা যেন শুনতে পায়নি।

গুল বাহাদুর বললেন, 'মোতীর মা, একে একটু পানি খেতে দাও।'

মোতীর মুখ শুকিয়ে গেল। একটু শুকনো হাসি হেসে বললে, 'আমি যে মুসলমান।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'তুমি পানি দাও।'

মোতী চীনে মাটির বাটিতে করে আনন্দীকে জল দিলে। সঙ্গে দুটি বাতাসা। গুল বাহাদুরের কাছে এসে বললে, 'এ তো তোমার ছেলে নয়, ঠাকুর। কার ছেলের জাত মারছো?'

এই জাত মারামারিতে গুল বাহাদুর একটু বিরক্ত হয়েছিলেন। বললেন, 'শিবু মোড়লের ছেলে। ও জাত—'

আনন্দের চোটে আনন্দীকে জড়িয়ে ধরে মোতী বললে, 'কোজ্জাব মা, তুই

শিবুর ব্যাটা। তাই ক। কি খাবি বল্।'

মোতীর মা ভারী খুশি। অচেনাজন চেনা লোককে যখন চেনে তখন আর সে অচেনা নয়। আসলে তাও নয়—চেনা-অচেনার পার্থক্য মোতীর মা কখনো করেনি। মোতী খুশী হয়েছে, কথা কইবার মতো দুজনারই একজন চেনা লোক পাওয়া গেল বলে। গুল বাহাদুরকে বললে, 'ওর কথা আর তুলো না, গোঁসাই, ওর মত হতচ্ছাড়া হাড়হাভাতে এ মুল্লুকে দু'টো ছিল না। ক' বছরের কথা ? আমার সোয়ামী রেখেছে রোজা, জষ্ঠি মাসের গরমে। ইফতারের জন্য আমি করেছি শরবৎ। র র, থাম্ থাম্ বলতে না বলতে শিবু মেরে দিল বেবাক ঘটি। ওর আবার জাত। ওর জাত মারে কে ?'

তারপর গুল বাহাদুর প্রায় গা ঘেঁষে বসে ফিস্ ফিস, করে বলতে আরম্ভ করলো, যেন কতই না লুকনো কথা, 'ওর জাত ছিল সোনা বাঁধানো। এক ঘটি তেঁতুলের শরবৎ ঢাললে তার জেল্লাই বাড়ে বই কমে না। আর আসলে ছিল, আমারই মত বদ্ধ পাগল। জানো আমার বিয়ের দিনে এক জ্বালা তাড়ি খেয়ে এসে জুড়ে দিল কান্না। আমার বাবা নাকি তাকে বলেছিল আমার সঙ্গে তার বিয়ে দেবে। সবাই হেসে গড়াগড়ি। শেষটায় আমার মামা বললে, "তা মোড়ল, বিয়ে করবে তো তোমার পাটরাণীকে খবর দাও তিনি এসে বাঁদী বরণ করে নিয়ে যাবেন !" যেই না শোনা অমনি শিবু জল। নেশা কেটে পানি হয়ে গেল। শিবুর বউ ছিল এ তল্লাটের খাণ্ডার। মারমুখী বঁটিদা। তারপর শিবু গলায় ঢোল ঝুলিয়ে শুরু করল নাচতে। পাঁচখানা গাঁয়ের লোককে সেদিন যা হাসিয়েছিল। বিয়ের পর আকছারই আসতো আমাদের বাড়িতে। "কই গো নাগর" বলে আমার সোয়ামীর হাত থেকে হুঁকো কেড়ে নিয়ে একদমে দিত ছিলিম ফাটিয়ে। আসলে ও খেত বড়তামাক।'

গুল বাহাদুরের দুঃখ আরো বেড়ে গেল। এরকম একটা গুণরাজ খান চলে গেল। আর কেউ যেতে পারলো না ?

মোতী আরো গলা নামিয়ে বললে, 'কিন্তু জানো ঠাকুর আমার সোয়ামী চলে যাওয়ার পর একদিনও এ বাড়িতে আসেনি। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত। একদিন বাঁধের কাছে ধরা পড়ে গেল। তখন আমায় মনের কথা বললে। ওরা দুজনে নাকি কোম্পানীর সঙ্গে লড়তে যাবার মতলব করেছিল। তারপর শিবু কোথায় উধাও হয়ে গেল। ফিরে এসে বেশী দিন বাঁচলো না। কিন্তু ওসব কথা আর কেউ জানে না।'

বাইরে আসমান-ফাটা বরসাৎ নেমেছে, হাওয়ার মাতামাতি বন্ধ হয়ে গিয়ে চাল দিয়ে জলের ধারা ঝালরের মত ঝুলে পড়ছে। গণি মিয়া দাওয়ায় বসে আছে গালে হাত দিয়ে। বাইরে জলের ধারার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মিঠার মা তার বড় বড় ডাগর চোখে—শুকনো চোখে।

হঠাৎ হেসে উঠে বললে, 'লোকে যে আমায় পাগলী বলে, ভুল বলে না। তুমি পায়ের ধুলো দিয়েছ এ বাড়িতে, আর আমি একবার জিজ্ঞেসবাদও করছিনে, তোমার সেবার কি হবে ?'

গুল বাহাদুর তাড়াতাড়ি বললেন, 'তার জন্যে তুমি চিন্তে করো না, মিঠের মা। গাড়িতে চিঁড়ে মুড়ি আছে। না হয় তুমিই কিছু দেবে।'

অবাক হয়ে মোতী শুধালে, 'তুমি জাত মানো না?'

একটুখানি ভেবে নিয়ে গুল বাহাদুর বললেন, 'আমার ধর্মে জাত মানামানি বারণ।'

মোতী প্রথম একটু অবাক হয়ে তাকাল। তারপর বললো, 'বুঝেছি। খুচব যারা উঁচুতে উঠে যায়, তারা বোধ করি ওসব আর মানে না। আমার বাপের বাড়ির পাশের গাঁয়ে বামুনরা থাকতো। ভয়ঙ্কর-জাত-বামুন। আমার বাবা বলতো, তাদের কেউ কেউ নাকি জাত মানতো না। বাবার হাতে তামাক খেত।'

গুল বাহাদুরের জানবার ইচ্ছে হল, এই ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটা মোতী কোন্ চোখে দেখে। শুধালেন, 'এ জিনিসটে কি ভালো?'

মোতী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, 'কি জানি—ভালো, না, মন্দ। যার যেমন খুশি। আমাদের পীর সাহেবও তাঁর বীবীর হাতে ছাড়া খান না। ভালোই করেন নিশ্চয়। তিনি যা জায়গা-বেজায়গায় নিত্যিনিত্যি আড়াই কুড়ি দাওয়াত পান, ওসবের সিকিটাক খেলেও দেখতে হত না। ঐ হোথায় বাসা বাঁধতে হত। সেখানে আবার বাবুর্চীখানা নেই।' বলে মিটমিটিয়ে হাসতে লাগল।

গুল বাহাদুর বুঝতে না পেরে বললেন, 'কোথায়?'

ডান হাতে আঁচল দিয়ে মুখ চেপে, বাঁ হাতে খোলা দরজা দিয়ে কোথায় যেন দেখিয়ে দিলে। গুল বাহাদুর তবু বুঝলেন না।

'গোরস্তান, গো, গোরস্তান। ঐ যেখানে মিছার বাপও ঘুমুচ্ছে।'

গুল বাহাদুর মরমী, দরদী লোক নন—অন্তত এই তাঁর বিশ্বাস। তবু শুকনো মুখে বললেন, 'কেন তুমি এ দুঃখের কথা বার বার তুলছো মিঠার মা?'

মোতী যেন আশ্চর্য হয়ে গেল। দু'হাত জুড়ে বললে, 'মাপ করো, গোসাঁই, কিন্তু দুঃখের কথা বললো কে? ও তো ওখানে বেশ আরামে ঘুমুচ্ছে। আর যাবার সময় ও তো ভারী হাসি মুখে গিয়েছে। চোখ বুজলো, কিন্তু মুখের হাসিটুকু মিলালো না। জিজ্ঞেস করো না, এই গাঁয়ের পাঁচজনকে, যারা তাকে গোসল করালে কাফন পরালে।'

'থাক।'

'হ্যাঁ, থাক। দাঁড়াও, আনন্দীর গায়ে একটা কাঁথা চাপা দিয়ে আসি।'

তারপর দুজনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ।

গুল বাহাদুর মাঝে মাঝে খোলা দরজা দিয়ে দেখছিলেন, জল ধরার কোনো চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে কি না। মোতী লক্ষ্য করে বললে, 'সে আশা ছেড়ে দাও আজ। জল ধরলেও বেরতে পারবে না। এ গাঁ ও গাঁর মাঝখানে যে খোয়াই তার ভিতর বিষ্টি থেমে যাওয়ার পরও জল যা তোড়ে বয় তাতে হাতী ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আর কত শ "দ"। একবার একটাতে মজে গেলে বিনা

মেহমতে বেরিয়ে যাবে এক ঝটকায় ঐ দূরের অজয়ে, তবে জানটা আর সঙ্গে যাবে না। না, থাক্। ওসব কথা তুমি ভালোবাসো না। আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়। সামলে-সুমলে কথা বলতে হয়।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'তুমি তো কিছু খেলে না।'

'আমি তো দিনের বেলা খাই নে।'

'সে কি? তামাম বৎসর রোজা রাখো নাকি?'

'ঐ দুই ঈদের ছটা দিন বাদ দিয়ে। তবু দেখো তো গতরখানা।'

ছাড়-পত্র পাওয়ার পূর্বেও গুল বাহাদুর অনেকবার সীমা লঙ্ঘন করেছেন, তবু নতুন করে 'গতরখানা' দেখে খুশীই হলেন। কোনো প্রকারের সহানুভূতি জানাবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। বললেন, 'কার ওজন কতখানি তাই মাপবার জন্য ভগবান দাঁড়ি-পাল্লা নিয়ে স্বর্গে বসে থাকেন না।'

মোতী বললে, 'হক্ কথা। কিন্তু আমাদের একটা মুর্শীদীয়া গীত আছে, ঐ নিয়ে। শুনবে?' বলেই গুন গুন করে ধরলে—মিষ্টি গলায় কিন্তু কেমন যেন কান্না ভর-ভর সুরে—

দীপ নাই শলিতা নাই,
জ্বলে শখের বাতি
কইয়ো গিয়া মুরশীদের ঠাঁই।
জ্বলে দিবা জ্বলে রাতি
কইয়ো গিয়া ও ভাই—

ঘুরে ফিরে, এখানে ধরে, ওখানে ছেড়ে, আবার নূতন করে ধরে মোতী অনেকক্ষণ ধরে গানটি গাইল। সমস্ত প্রাণ দিয়ে। ঝরঝর বারিধারা যে রকম সহজ পথে আকাশ থেকে নেমে আসে, এর গানও হৃদয়ের উৎস থেকে নেমে এসে ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে। রসকষহীন গণি মিয়া পর্যন্ত সরে এসে চৌকাঠের কাছে বসেছে।

গুল বাহাদুর গানের পুরো অর্থ বুঝতে পারলেন না, কিন্তু রস পেতে খুব যে অসুবিধে হল তা নয়। বাচ্চারা যে রকম গল্প শোনার সময় ভাষার দৈন্য কল্পনা দিয়ে পুষিয়ে নিয়ে পুরো রসই পায়, নূতন ভাষা শেখার সময় বয়স্ক লোকও তাই করতে পারে, যদি সে ইতিমধ্যে কল্পনা-শক্তি হারিয়ে না ফেলে থাকে। 'জ্বলে শখের বাতি' বলার সময় মোতীর দেহ যেন আরো সুন্দর হয়ে দেখা দিচ্ছিল, আর 'দীপ নাই শলিতা নাই' গাইবার সময় মোতীর চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, গুল বাহাদুরও সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলেন।

তবু বললেন, 'বুঝিয়ে বলো।'

'এতে আবার বোঝাবার কি আছে! গুরুকে খবর পাঠাচ্ছি, মহব্বৎ দরদের তেল শলতে নেই ভিতরে, তবু দেহের বাতি জ্বলছে। তা আবার খামোখা দিনের বেলাও জ্বলে। তাই তো তোমাকে বলছিলুম, "গতরটার পানে চেয়ে দেখো।"

গুল বাহাদুর মনে মনে বললেন, 'দেশের প্রতি ভালোবাসা, আত্মোৎসর্গ

করার তেল শলতে তৈরী করেই আমরা জ্বালিয়েছিলুম গদরের প্রদীপ। সে মিথ্যা, মায়া ফানী।'

কিন্তু মোতীর এই সুন্দর দেহ। এর ভিতরে সুন্দর হিয়ার প্রদীপ নেই—অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব।

বললেন, 'মোতী, সবই ভগবানের দান। তাচ্ছিল্য করতে নেই। রোজা ভালো জিনিস, কিন্তু তারও বাড়াবাড়ি করতে নেই। মীরাবাঈয়ের ভজন তুমি শুনেছ,

'নিত্য নাহিলে হরি যদি মিলে
জল-জন্তু আছে ঢের
কামিনী ত্যজিলে হরি যদি মিলে
তবে হরি খোজাদের।'

মোতী গদগদ কণ্ঠে বললে, 'এ তো ভারী মধুর, গোসাঁই। আমি কখনো শুনিনি।'

যমুনার পারে রাজপুতানার এক বৈরাগী মীরার ভজন গাইত। গুল্ বাহাদুর আনমনে তার গান শুনেছেন, মাঝে-মধ্যে, কিন্তু সে গান যে তাঁর মনের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে, তা তিনি নিজেই জানতেন না। ভক্তিরস, ভাবালুতা গুল বাহাদুর কখনো খুব নেকনজরে দেখেননি। বাড়াবাড়ির ভয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজ তবে চলি, মিঠের মা। খোয়াইয়ের জলটা আমার দেখবার ইচ্ছে আছে। গণি আর আনন্দী রইল। কাল সকালে গাড়িতে করে পাঠিয়ে দিয়ো।'

মোতী বাধা দিল না। গোঁয়ারদের নিয়ে তার জীবনের কেটেছে অনেকখানি—তার বাপ-ভাইরা ছিল এক একটি দুঁদে গোঁয়ার।

শিমুলতলায় এসে শুধু গম্ভীর কণ্ঠে বললো, 'আচ্ছা গোসাঁই, একটা কথার উত্তর দেবে? এই গণির স্বভাব-চরিত্র কি তা তুমি জানো না। সে আমার বাড়িতে থাকলে তোমার কোনো আপত্তি নেই। সে আমাকে নিয়ে যা-খুশি করুক। কিন্তু তুমি থাকলেই আসমান মাথার উপর ভেঙে পড়ে। কেন বলো তো। ছোটজাতে ছোটজাতে যা-খুশি করুক—নয় কি?'

সত্যি বলতে কি, গুল বাহাদুর পরিস্থিতিটা এভাবে চিন্তা করে দেখেন নি। কিন্তু মোতীর কথাগুলো এমনি সোজাসুজি তাঁর কানের ভিতর দিয়ে মগজের উপর ঠনাঠন হাতুড়ী পিটিয়ে দিল যে তাঁকে চিন্তা করে কথাগুলো বুঝতে হল না। প্রথমটায় থ মেরে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমায় সত্যি বলছি, আমাকে বিশ্বাস করো, আমি অতখানি চিন্তা করে এ-ব্যবস্থা করিনি। বোধ হয়, এ ব্যবস্থা আমাদের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর তুমি যে কারণটা দেখালে সেটাও হয়তো ঠিক, কিন্তু আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো তবে বলবো, আমি ভদ্রলোক সাধারণ লোক সকলের সঙ্গেই মিশেছি এবং এ-বাবদে আমি গণি মিয়াদের ঢের-ঢের বেশী বিশ্বাস করি। এদের হ্যাংলামো অনেক কম। গরীবের সুন্দরী মেয়েকে মোকায় পেলে "ভদ্রলোক"-

এর মাথায় বদ-খেয়াল চাপবেই। ভদ্রলোকের মেয়ে হলেও তাই—তবে সেখানে একটু লাইয়ের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। তাই দেখো, ভদ্রলোকের মেয়েকেও আমরা চাকর-বাকরের হেপাজতিতে রাখা পছন্দ করি।—আর—'

'থামলে কেন? বলো।' কঠিন গলা একটু মোলায়েম হয়েছে বলে মনে হল।

'আর গণি ভালো-মন্দ কিছু একটা করতে গেলে তাকে যে রকম ঠাস করে তুমি চড় মারতে পারবে, আমাকে কি—'

ধমক দিয়ে বললে, 'থাক থাক্। কে কাকে চড় মারতো কে জানে!' বিকেল বেলার বৃষ্টিশেষের কনে-দেখার আলো সবটুকু মুখে মেখে এতক্ষণ-গোপন-রাখা তার সবচেয়ে মিষ্টি গলায় বললে, 'তবে এসো ঠাকুর।'

* * *

জলের তোড় গুল বাহাদুর অতি উত্তমরূপেই দেখলেন। বাদশা মুহম্মদ তুগলুক যে রকম দিল্লীর জাহানপানা শহরে সাততলা মঞ্চের উপর বসে তাঁর হাজার হাজার সৈন্যস্রোত বয়ে যেতে দেখতেন অর্থাৎ এর্থাৎ একটা উঁচু ঢিপির উপর বসে জলের তোড়, স্রোতের দু', উঁচু উঁচু ঢিপির উপর রাগী ঢেউয়ের ছোবল তাবৎ বস্তুই দেখলেন, এবং তার চেয়েও উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করলেন, মোতীর—মিছার মা'র কথা গল্প নয়। এর যেখানে হাঁটুজল সেখানেও দাঁড়ায় কার সাধ্য?

সন্ধ্যের সময় আবার বৃষ্টি নামলো। ষোড়শীর রাত কিন্তু মেঘে মেঘে সব অন্ধকার। সমস্ত রাতটা কাটাতে হল ঢিবির উপর।

অভিসম্পাত দিতে দিতে বললেন, 'মহাজনগণ বলেছেন, মেয়েদের বুদ্ধিতে চলো না। হক্ কথা। কিন্তু না চললে কি হয় তাও বেশ টেরটি পেলুম। ওদের কথা শুনলে বিপদ, না শুনলে আরো বিপদ। এ জাতটাই বজ্জাৎ।'

॥ ছয় ॥

কৌতূহল চেপে না রাখতে পেরে পাণ্ডোরা খুলে ফেললে কৌটোটি, আর অমনি তার থেকে পিল পিল করে বেরোতে লাগলো দুঃখ, দৈন্য, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, আরো কত কী—আর তারই চোখের সামনে ছড়িয়ে পড়লো ভুবনময়। পাণ্ডোরা ভয়ে ভয়ে যখন ভিরমি যাবো-যাবো করছে তখন সর্বশেষ বেরলো—আশা। তারই জোরে মানুষ সব দুঃখদৈন্য সয়। আত্মহত্যার দৃঢ় দড়িতে নিজেকে না ঝুলিয়ে দিয়ে ঝুলতে থাকে সেই আশার ক্ষীণ সুতোটিতে।

সুলেমন যখন তাঁর স্বাধিকার-প্রমত্ত জিনকে শাস্তি দিয়ে বোতলে পুরে সমুদ্রে ফেলে দেন তখন তাকে পাণ্ডোরার শেষ দৌলতটি নিতে বাধা দেননি। সেই তাঁর চরম করুণা। জিন্নি যদি বোতলের ভিতর বন্দীদশার প্রথম প্রহরেই জানতে পেত তাকে ক'শ বছর ধরে বোতলের ভিতর প্রহর নয়—শতাব্দী গুণতে হবে, সে নিশ্চয়ই থম্বসিসে মারা যেত।

গুল বাহাদুর যদি চিকনকালাতে আশ্রয় নেবার দিন জানতে পেতেন, তাঁকে ক'যুগ ওখানে কাটাতে হবে, তাহলে তিনি নামাবলীতে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়তেন। পাণ্ডোরার যে ক্ষীণ অংশটি নিয়ে তিনি নামাবলী গায়ে দিয়েছিলেন, সেটি ওরই মত এত জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছে যে ওটিকে আর পরা চলে না।

কিন্তু
কেশের আড়ালে জৈছে
পর্বত লুকাইয়া রৈছে

ঠিক তেমনি তাঁর দিন-আনি-দিন খাই-য়ের আড়ালে আশা-নিরাশা সবকিছুই ঢাকা পড়ে গিয়েছিল বলে সেটা দিব্য যেন ক্লোরফর্ম কিংবা আফিঙের কাজ করে যাচ্ছিল। পরম ধার্মিকজনও যখন দিনযামিনী এটা-সেটার চিন্তায় মশগুল থেকে শেষের দিনের কথা সম্বন্ধে অচেতন হয়ে যেতে পারে, তখন সামান্য প্রাণী গুল বাহাদুর যে পলাশতলায় খাটিয়ার উপর শুয়ে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেবেন তার আর বিচিত্র কি?

কালটাও ছিল ধীরমন্থর। কারো সঙ্গে দেখা করতে হলে তোড়জোড় করতেই লেগে যেত তিন মাস। বিয়ের আলাপ পাকাপাকি করতে নিদেন তিন বছর। এমন কি মরার সময় গঙ্গাযাত্রায় বেরিয়ে সেখানে দিনসাতেক না কাটালে মুরুব্বীরা রীতিমত বেজার হতেন। অত তাড়া কিসের রে বাপু? দু-পাঁচ দিন হরিনাম শুনবি, চন্দন বেটে ধীরেসুস্থে সর্বাঙ্গে হরিনাম ছাপা হবে, ইষ্টিকুটুম খবর পেয়ে ঘরসংসার গুছিয়ে-গাছিয়ে দেখা করতে আসবে, শুনতে পাবি কবে যাবি, ক'দিন আর আছিস তাই নিয়ে চাপা গলায় আলোচনা হচ্ছে, বাজী ধরা হচ্ছে;—তা না, চললি হুট করে যেন ডাক পড়ার পূর্বেই হাড়-হাবাতে আপন হাতে আসন পেতে বসে গেল যজ্ঞির দাওয়াতে। কিংবা যেন বাসর ঘরে পাঁচজনের সামনে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে ফেললি কনে বউয়ের ঘোমটাখানি। কিংবা তারো বেশী।

হিসেব করো দিকিনি গুল বাহাদুর, শান্ত মনে—শুদ্ধ-বুদ্ধ চিত্তে। ক'বছর হল? দশ, বিশ, ত্রিশ? পিছনের দিকে না সামনের দিকে? তুমি বসে, আর তারা সামনে দিয়ে চলে গেল, না তুমি তাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছ, না পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছ? না তুমি কাজের মাঝখানে এমনি যোগসাধনায় তুরীয় ভাব অবলম্বন করেছিলে যে কাল, না কাল কেন, হেন স্বয়ং মহাকালই ধূর্জটির জটার ভিতর প্রথম উর্বশীর মত বেশ খানিকটা নেচে কুঁদে, তারপর গঙ্গার মতন এদিক ওদিক পথ না পেয়ে বিষ্ণুর মতন উত্তম ডানলোপিলোর বিছানাতে অনন্ত শয়নে নেতিয়ে পড়েছেন?

কে জানে কি হয়? যেখানে বছরে একদিনও স্মরণ করতে হয় না আজ কোন্ তারিখ, সেখানে একটা বৎসরই একদিন। আর যেখানে দিনে বত্রিশবার স্মরণ করতে হয় আজ অমুখ তারিখ, সেখানে একটা দিনই এক বৎসর। কে জানে সময় কোন্ দিক দিয়ে যায়? দশ, বিশ, ত্রিশ বৎসর।

এই মোতীর সঙ্গেই আবার দেখা হতে লেগে গেল দেড় মাস।

সকাল থেকেই পুবের আকাশে মেঘ জমে উঠেছে—সাঁওতাল দেশের সাঁওতালী মেয়ের গায়ের রঙ মেখে। মেঘের পর মেঘ জমেই উঠছে। যেন আকাশের ভরা গেলাসে পর্জন্য এক এক ফোঁটা করে জল ঢালছেন আর দেখছেন, এইবার উছলে পড়ল কি না। ক্ষণে ক্ষণে কালো মেঘের উপর দিয়ে খেলে যাচ্ছে বিদ্যুতের ঝলমলানি। যেন ঐ সাওতালনীরই শ্যামবদনে টগর-ফুলের সফেদ হাসি। কিংবা যদি ইন্দ্রপুরীতেই ফিরে যাই তবে মনে হবে, মেঘের কালো টানার উপর উর্বশী বিদ্যুতের রুপোর পোড়েন টানছেন, বাসররাতের কাঁচুলির কিংখাপ বুনতে। নাঃ! এ সব তুলনাই অতি কাঁচা। মোক্ষম তুলনাটির চড় বিশ্বসাহিত্যের গালের উপর মেরে দিয়ে গিয়েছেন রাজা শূদ্রক। বিদ্যুৎ যেন শ্যামাম্বু নীলকণ্ঠের গলা জড়িয়ে গৌরীর শুভ্রধবল বাহুলতা।

গৌরী ভুজলতা যত্র বিদ্যুল্লেখেব রাজতে

হায় রে শূদ্রক! একটু টেনে সামলে উপমাগুলো ছাড়লে না কেন হে পৃথ্বীরাজ, কাব্যসম্রাট? এ যুগের মধ্যমজনকেও যে একদিন রসসৃষ্টি করে নিষ্ক সঞ্চয় করতে হবে সেটা কি তিনি খেয়ালই করলেন না? রাজা হলেই কি এ রকম দান করতে হয়? তাই দেশের রাজা হাতিমতাই অন্নদান করে হয়েছিলেন অন্নরাজ, কিন্তু তিনিও তো বীচির ধান খাইয়ে ভবিষ্যৎ বংশীয়দের নিরন্ন করে যাননি। উপমার বেলা শূদ্রক শেষে নবান্নের বীচিও যে খতম করে গেলেন।

তা যাক্। কিন্তু দয়াদাক্ষিণ্য, স্নেহ-প্রেম, বিশেষ করে আসঙ্গলিপ্সা—এ জগৎ থেকে এখনো লোপ পায়নি।

গুল বাহাদুর দেখলেন, তেপান্তরী মাঠ যেখানে ফালি হয়ে বাঁ দিকে ঢুকেছে, তারই অপর প্রান্তে, মেঘের আড়াল থেকে কে যেন বেরিয়ে এসে একটা উঁচু ঢিবির উপর ক্ষণিকের তরে দাঁড়ালে। মাঠ-ঘাট জনহীন। বৃষ্টি নামি-নামছি, নামি-নামছি করছে। এ অবেলায় লোকটার আহম্মুখী দেখে গুল বাহাদুর ভুরু কোঁচকালেন।

আধা আলো-অন্ধকারে বেলা কতখানি গড়িয়েছে ঠাহর হচ্ছে না। ঘরে ঢুকে গুল বাহাদুর আনন্দীকে শুধালেন, 'কি খাবে আনন্দী?' দিল্লীতে 'তুই' 'তু' শব্দটা প্রায় উঠে গিয়েছে।

আনন্দীর আটপৌরে পোশাকী একই মেনু। বললে, 'খিচুড়ি আর আলুর দম।' ঐ একটি মাত্র রান্না যার সঙ্গে দিল্লীর রান্নার কিঞ্চিত ঐক্যসখ্য আছে—গরম মশলার কৃপাতে—অবশ্য আনন্দীর অজানতে। গুল বাহাদুর সাজ-সরঞ্জামের চতুরঙ্গ বাহিনী তোড়জোড় করে যোগাড় করতে লাগলেন। আনন্দী কখনো মায়ের আদর পায়নি। পাওয়ার মধ্যে পেয়েছে বাপের ধাঁতানি। সেও এটা সেটা যোগান দিতে লাগলে।

বৃষ্টি নামবার আগে আরো কিছুটা জল এনে রাখলে ভালো হয় ভেবে গুল বাহাদুর ঘর থেকে বেরিয়েই থমকে দাঁড়ালেন। দাওয়ার এক প্রান্তে খুঁটিতে

হেলান দিয়ে মোতী বসে।

'তুমি!'

নিরুত্তর।

'কখন এসেছ? ডাকলে না কেন?'

দেওয়ালের থেকে চোখ না ফিরিয়েই বললে, 'তুমি আমাকে ঢিপির উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভিতরে চলে গেলে কেন?'

গুল বাহাদুর হেসে বললেন, 'তাজ্জব কী বাত! অতদূর থেকে আমি তোমাকে চিনবো কি করে? আমি ভাবলুম—'

'দত্যি, দানো, মামদো! তোমাদের কাছে সব মুসলমানই মামদো, না?'

গুল বাহাদুর বিরক্ত হয়ে ভাবলেন, 'এ কী জ্বালা! হিন্দু নই, তবু হিন্দু অপরাধের হিস্যে আমাতেও অর্শায়?'

গম্ভীর মুখে বললেন, 'তোমাকে আমি বলিনি, আমার ধর্মে জাত মানা-মানি বারণ। চলো ভিতরে, ঐ দেখ বৃষ্টি আসছে।'

এবারে মারাঠা সৈন্যের অতর্কিতে আক্রমণ নয়। দূরদিগন্ত থেকে হেলে-দুলে বিলম্বিত তালে এগিয়ে আসছে আকাশ-জোড়া পাতাল-ছোঁয়া শ্যামসুন্দর মেঘ-বৃষ্টি। এই রকম অগণিত করীযূথ সমাবৃত গাঙ্গেয় চমূ অগ্রসর হচ্ছে শুনেই আলেক্সান্দর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সমীচীন গণনা করেছিলেন।

এবারে মোতী খিলখিল করে হেসে উঠলো। কিছুতেই থামতে চায় না। যেন পেটের ভিতর হামানদিস্তে দিয়ে কেউ পাথর কুটছে। সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে দুলে-দুলে ফুলে-ফুলে কাঁপন। গায়ের বসন যেন সে কাঁপন সামলাতে না পেরে পড়ে যেতে চায়। কার যেন বিরহ-বেদনায় কনকবলয়ভ্রংশ, অর্থাৎ বাজু-বন্দ খোল খোল যাউত হয়েছিল, আজ হাসির হররায় এ রমনীর বসনাঞ্চলপ্রান্ত বিস্রস্ত। এবং স্মরণ রাখা কর্তব্য, গ্রামাঞ্চলে অঞ্চল প্রায়শ উপকণ্ঠিত থাকে না।

চোখের জল মুছতে মুছতে বললো, 'ঠাকুর, তুমি মস্করা-ফিস্কিরি একেবারে বুঝতে পারো না। ওদিকে কথা কও পাকা পাকা। তুমি একটি আস্ত মেড়া।' তারপর গম্ভীর হয়ে বললে, 'আল্লা করুন, তুমি ঐ রকম মেড়াই থাকো।' আল্লার স্মরণে ডান-বাহু উঁচুতে তুলে আঁচল দিয়ে ঘোমটা টানলে। আজান শুনলে বাঙালী মুসলমান মেয়ে যে রকম করে থাকে।

ওদিকে তখন বৃষ্টির মোটা মোটা ফোঁটা গুল বাহাদুরের ধুলো-ভরা আঙ্গিনায় হরিন্নুটের বাতাসা ছড়াতে আরম্ভ করেছে।

গুল বাহাদুর নিজের অপ্রতিভ ভাব কাটাবার জন্য গলা একটু শক্ত করে বললেন, 'ভিতরে চলো।'

মিঠার মা মিশ্রির মিঠা। শক্ত। বললে, 'জোর করে টেনে নিয়ে যাবে নাকি?' সঙ্গে সঙ্গে হাত দুখানি এগিয়ে দিয়ে বললে, 'নাও।' এবং তারি সঙ্গে সঙ্গে উঠি-উঠি ভাব। টান দিলেই সুড়সুড় করে ভিতরে চলে যাবে।

গুল বাহাদুর দ্বিধায় পড়লেন। কি আর করেন? সুরটি যতদূর পারেন মমতাময় করে বললেন, 'মেহেরবানি করো।' 'মেহেরবানি' কথাটার আমেজ

উর্দু এবং বাঙলাতে এক নয়। সে-কথা না জেনেও আশা করলেন, মুসলমানের মেয়ে সুরটি ধরতে পারবে।

মোতী গুনগুন করে গান ধরে ভিতরে গেল। বুঝলো গুল বাহাদুরের হার হয়েছে, কিন্তু এ-লোকটা নিজে যখন বুঝতে পারেনি যে তার হার হয়েছে, তখন সে জেতাতে কি আনন্দ? আর হেরে যাওয়ার দুঃখের ছাপ যদি তার মুখের উপর পড়তো তাহলেই কি মোতী আনন্দ পেত?

এবারে গুল বাহাদুরকে শুনিয়ে একটু উঁচু গলায় গাইলে,

ও মুর্শীদ তোমার লগে নাই তো অভিমান
আইলে আও, যাইলে যাও, ঠেলে মারো টান
ও মুর্শীদ নাই তো অভিমান।
বাচ্চারে যে ঠ্যালা মারলে কান্দ্যা পড়ে মায়ের কোলে
যতো মারো বাঁচ্যা উঠে তত পরাণখান।
ও গুরু নাই তো অভিমান।
তুলাধুনা কর্যা, মোলা, ফেলাও না ফের জান।
করো না খান্ খান্।
জানুক না জাহান্।
মস্তান ফকিরে কয় হেন আমার মনে লয়
গুরুর মনে হৈল ভয়, পায়ে দিল স্থান।
ও মুর্শীদ গেল অভিমান।

এবারে গুল বাহাদুরের গীতটি বুঝতে কোন অসুবিধা হল না। কিন্তু খটকা লাগলো 'অভিমান' শব্দটি নিয়ে।

মোতী বললে, 'এতে আবার মুশকিল কোথায়? এই মনে করো আনন্দী যদি তোমার উপর রাগ করে খিচুড়ি আলুরদম না খেয়ে শুতে যায় তবে সে তোমার উপর অভিমান করল।'

গুলবাহাদুর বললেন, 'সে তো হল রাগ।'

মোতী বললে, 'তা নয়। যদি সে তখন তোমার ভাতে ছাই মিশিয়ে দেয় তবে হবে রাগ।'

এবারে গুল বাহাদুর অনেকখানি বুঝতে পেরে বললেন, 'ওঃ, তাই তুমি আমার উপর অভিমান করে বাইরে বসে ছিলে?'

মোতী উত্তর দিলে না।

গুল বাহাদুর শোধালেন, 'এ গীত তুমি কাকে শোনালে?'

মোতী নির্ভয়ে উত্তর দিলে, 'তোমাকে, মুর্শীদকে, আর কাকে?'

'তোমার মুর্শীদ কে?'

মোতী হেসে উঠলো। বললো, 'আজ দেখি, তুমি অনেক কথাই শুধচ্ছো। কেন, হিংসে হচ্ছে নাকি? হ্যাঁ, আছে একজন। কিন্তু সে বড্ড বুড়ো। সব রসকষ শুকিয়ে গিয়েছে। আমার দিকে ফিরেও তাকায় না।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'ছিঃ, গুরুকে নিয়ে কি এ ধরনের মস্করা করতে

আছে ?'

মোতী বললে, 'মস্করা কিসের ? এই তো আমার সব। আমার জান ভরে দেবে মহব্বৎ দিয়ে সে তো সব গীতেই আছে। আর আমার শরীরটা ? সে বুঝি কিছু নয় ? গুরু আমার সব আশা পূর্ণ করবে না ?'

গুল বাহাদুর নিরাশ হয়ে বললেন, 'তুমি সব সময় কেমন যেন হেঁয়ালিতে কথা কও। তোমার আশা যদি পাপে ভরা হয় তবে সেটাও গুরু পূর্ণ করবেন নাকি ?'

মোতী চিন্তা না করেই বললে, 'নিজেই জানি নে কি চাই। কখনো ইচ্ছে করে মা হয়ে ছেলে কোলে নিতে, কখনো বা স্বামী পেতে ইচ্ছে করে, আর কখনো মনে হয় দুচ্ছাই, এসব দিয়ে কি হবে ? তার চেয়ে একটি নাগর পেলে হয়। ঐ যে রকম তোমাদের রাধা ঠাকুরাণী কেষ্ট-মুরারিকে পেয়েছিলেন। রসের সায়রে সুবো-শাম ডুবে থাকবো। আমার শরীর ওর শরীরে মিশে যাবে।'

গুল বাহাদুর হাসিমুখে বললেন, 'যাক, বাঁচালে। মনের কেষ্টকে দিলের হরি বানিয়ে পড়ে থাকো। কোন বদনাম হবে না।'

অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মোতী বললে, 'ছোঃ ! বদনাম ! ডপকী রাঁড়ী। নিকে করি নে। একলা পড়ে আছি। আমার বদনাম তো লেগেই আছে। নাগর নিলে তার আর বাড়বে কি ? মড়ার গোরের উপর এক মণও মাটি শ' মণও মাটি। আমি তাকে সাঁজ-সকাল কোলে নিয়ে দাওয়ায় বসবো—হাটে যাবার পথের পাশে।'

গুল বাহাদুর ভাবলেন, মেয়েটা বদ্ধ পাগল। তারপর ভাবলেন, কিন্তু এরকম সাদা যার দিল তার আর ভাবনা কি ? এর ভিতর বাহির দুইই সাফ। বললেন, 'এসব খেয়ালী পোলাও খেয়ে তুমি খুব সুখ পাও, না ? কিন্তু যত্র-তত্র বলে বেড়িয়ো না।'

মোতীর মা সেদিকে খেয়াল না দিয়ে শুধালে, 'তোমার সম্বন্ধে বেবাক বাৎ আমার শুনতে ইচ্ছে করে, কিন্তু বাবাজীদের তো ঘর-গেরস্তীর কথা শোধানো বারণ। তবে যদি অভয় দাও তয় একটি কথা শুধাই।'

গুল বাহাদুর হেসে বললেন, 'নির্ভয়ে জিজ্ঞেস করো। আমার কিচ্ছুটি লুকোবার নেই।' তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল গোঁফে চাড়া দেবার। কিন্তু গোঁফ তো আর নেই।

'তোমার বিয়ে-শাদী হয়নি ?'

'না।'

'কারোতে মজোনি ?'

'না। তবে লক্ষ্ণৌ থেকে একবার একটি বাঈজী এসেছিল। যেমন নাচতে পারতো, তেমনি গান জানতো, তেমনি ছিল চেহারাটি। তাকে বড় ভালো লেগেছিল।

'তারপর কি হল ?'

'কিছুই হল না। আমি অন্য কাজে জড়িয়ে পড়লুম। তারপর এখানে চলে এলুম।'

'ও। কোনো কেলেঙ্কারি করে ভেক নাওনি?'

বোষ্টমদের প্রতি গুল বাহাদুরের কোনো অহেতুক প্রেম ছিল না, কিন্তু তারা 'কেলেঙ্কারি' করলেই শুধু ভেক নেয়, এ ইঙ্গিতটা তাঁর ভালো লাগল না। বললেন 'কুল্লে বোষ্টমরা পাষণ্ড?'

'অতো রাগো কেন? আমাদের মুসলমান পীরসায়েবদের দেখোনি? তাঁরা যে তাঁদের চতুর্দিকে আগুন জ্বালিয়ে রাখেন?'

'সে আবার কি?'

'ঐ, আমার মতো গোটা দশেক খাপসুরৎ ডপকী ছুঁড়ির মধ্যিখানে বসে ভাবখানা করেন, "হেরো, হেরো আগুন আমারে ছোঁয় না"।'

'তারপর?'

'তারপর—আর কি, তারপর বিস্তর ঘি গলে যায়।'

গুল বাহাদুর খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি অতশত বলছো-কইছো, শুনছো-শোনাচ্ছো কেন বলো তো? আসলে তোমার মতলবটা কি খুলে বলো তো?'

মোতী গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভাবছিল। বললে, 'মতলব কিছুই নয় গোঁসাই। আমি ভেবেছিলুম, তুমি নষ্টামি করে বেরিয়ে এসেছো। তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। তোমার সঙ্গে নষ্টামি করে আমি নষ্ট হব। এই আমার শরীর, এই আমার দিল। ওগুলো যখন কোনো কাজেই লাগলো না, তখন না হয় ভেঙ্গেই দেখি, কি হয়। তা আর হলো না। তুমি বড় সরল, বড় সাদা। তোমার সঙ্গে বনলো না।'

গুল বাহাদুর আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'ওটা মিথ্যে কথা! তোমার সবই ভালো। আমি অনেক দেখেছি, আমি ঠিক ঠিক বলতে পারি। অবশ্য আমার সঙ্গে বনলো কিনা সে অন্য কথা।'

মোতী আপত্তি জানিয়ে বললে, 'আমার যদি সবই ভালো তবে তাই হোক ঠাকুর। এবারে তোমাকে শেষ প্রশ্ন শুধাই। তোমার সংসারে মন বসলো কেন, সেইটে আমায় বলো।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'সংসারে আমার রত্তিভর অরুচি হয়নি, মোতী। আসলে আমি শিবুর মতো গদরের সেপাই। তোমার স্বামীর যা হওয়ার কথা ছিল। লড়াইয়ে হেরে গা-ঢাকা দিয়েছি। ভেক নিয়েছি যাতে করে দুশমন চিনতে না পারে—আমি মুসলমান।'

* * *

লেখকের নিবেদন ঃ

এখানেই 'এক পুরুষ' শেষ।

বইখানা 'তিন পুরুষ'-এ সমাপ্ত করার বাসনা ছিল; কিন্তু আমার গুরুই যখন 'তিন পুরুষ' লিখতে গিয়ে এক পুরুষে সমাপ্ত করে সেটিকে 'যোগাযোগ'

নাম দিলেন তখন যাঁর কৃপায় 'মূক বাচাল হয়' তাঁরই কৃপায় এস্থলে 'বাচাল মূক হল।'

কবিরাজ চেখফ

উত্তম গুরুর সদুপদেশ পেলেই যদি সার্থক লেখক সৃষ্টি হতেন তবে ইহসংসারে আমাদের আর কোনো দুর্ভাবনা থাকতো না। কারণ আমার বিশ্বাস, এতাবৎ বহুতর গুরু অপ্রচার পুস্তকে নানাবিধ সদুপদেশ দিয়ে গিয়েছেন, এবং সদুপদেশতিয়াষী তরুণ সাহিত্যযশাভিলাষীরও অনটন এই বঙ্গদেশে নেই।

আমি সার্থক সাহিত্যিক নই, তবে কিছুটা লোকায়ত ('জনপ্রিয়' বললে বড্ড বেশি দম্ভভাষণ হয়ে যায়) বটি। ট্রেনে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তিনি সোল্লাসে বলেছিলেন, 'আপনার লেখা পড়লেই পাঁচকড়ি দে'র কথা আমার মনে আসে।'

আমি সাতিশয় শ্লাঘা অনুভব করেছিলুম। আমি জানি আপনারা পাঁচজন পাঁচকড়িকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না। যদিও শুধোই, বুকে হাত দিয়ে উত্তর দিন তো, পনেরো বছর বয়েসে পাঁচকড়ি পড়ে আপনার পঞ্চেন্দ্রিয়স্তম্ভন হয়নি? আপনার চৈতন্যকে এরকম সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ একাগ্রমনা করতে পেরেছেন ক'জন লেখক? এবং স্বয়ং গীতা বলেন, চৈতন্যকে সর্বপ্রথম নিষ্কম্প প্রদীপশিখার ন্যায় একাগ্র করে তবে ধ্যানলোকে প্রবেশ করবে। স্বয়ং পতঞ্জলিও বলেন, 'ধ্যানের বিষয়বস্তু অবান্তর।' তা সে যাক্। আসল কথা সে বয়সে পাঁচকড়ি আপনাকে এমনি একাগ্রমনা করে দিয়েছিলেন যে আপনি তখন দেশকালপাত্র ভুলে গিয়েছিলেন। এবং এটা যে আর্টের অন্যতম লক্ষণ সেটি সর্বজনবিদিত। তা হলে আজ আপনি পাঁচকড়ির নামে নাক সেঁটকান কেন? পাঁচকড়ি পড়ার পূর্বে সাত বছর বয়েসে আপনি রূপকথা পড়েছিলেন, আজ পড়েন না, কিন্তু তাই বলে তো আপনি ওর পানে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হাসেন না, কেন?

টলস্টয় বলেন, যে বই সর্বযুগে সর্ববয়সের লোক পড়ে আনন্দ পায় সেই বইই উত্তম বই। সে রকম বই ইহসংসারে অতিশয় বিরল। টলস্টয় মহাভারতের নাম করেছেন। আমরা সম্পূর্ণ একমত। (তিনি তাঁর নিজের বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস 'যুদ্ধ ও শান্তি'র নিন্দা করেছেন। আমরা একমত নই।)

অতি অল্প লেখককেই টলস্টয় আর্টিস্ট বা সৃষ্টিকর্তা রূপে স্বীকার করেছেন। চেখফ তাঁদেরই একজন।[১] তাঁকে তিনি বলেছেন, রিয়েল আর্টিস্ট ;—

---

১ টলস্টয় চেখফকে এত গভীর ভাবে ভালোবাসতেন যে একদিন টলস্টয়ের বাড়ি ইয়াসানা পলিয়ানাতে যখন তিনি আর গর্কি বসে গল্প করছেন তখন চেখফ বাগানের অন্য প্রান্ত দিয়ে চলে যাচ্ছেন দেখে টলস্টয় গর্কিকে বলেন, জানো গর্কি, চেখফ যদি মেয়েছেলে হত তবে আমি ওকে বিয়ে না করে থাকতে

পাঠক সেটি পরে সবিস্তর শুনতে পাবেন।

চেখফের দিকে তাকিয়ে আমার বিস্ময়ের অন্ত নেই।

প্রথম ছবি দেখি, রুশের এক গণ্ডগ্রামে ঘরের ছেলে চেখফ গাঁয়ের পাঁচজন মাতব্বরের চালচলন কথাবার্তার ভঙ্গির অনুকরণ করে বাড়ির পাঁচজনকে হাসাচ্ছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে সে ক্লাসের সর্দার পড়ুয়াও বটে।

তার পরের ছবি দেখি মস্কোতে। গরীব পরিবারে। একটা ছোট্ট ঘরে মা কচুঘেঁচু রাঁধছেন, বাবা অর্থাভাবের কথা চিন্তা করে আপন মনে গজ্ গজ্ করছেন, ভাইবোনেরা কিচিরমিচির করছে, আর মেডিকেল কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র চেখফ—বয়স উনিশ—তারই এককোণে, হট্টগোল সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, খস্ খস্ করে পাতার পর পাতা ফার্স লিখে যাচ্ছেন। তিনি জানেন, খুব ভালো করেই জানেন, রসিকতাগুলো কাঁচা,কিন্তু তার চেয়েও ভালো করেই জানেন, খবরের কাগজের গ্রাহক রামাশামা এ ধরনের রসিকতাই পছন্দ করে, সম্পাদক মশাইও সেই মালই চান। লেখা শেষ হল। রান্না তখনো শেষ হয়নি। চেখফ ছোট ভাইকে বললেন, 'লেখাটা নিয়ে যা তো অমুখ পত্রিকার আপিসে। দু'পাঁচ টাকা যদি দেয় তবে কিছু কাবাব-টাবাব কিনে আনিস। কচুঘেঁচু গেলার সুবিধে হবে।'

এর পাঁচ বছর পর চেখফ মেডিকেল কলেজ পাস করলেন।

কিন্তু ভালো করে প্র্যাকটিস করা চেখফের আর হয়ে উঠলো না। ইতিমধ্যে রুশদেশ জেনে গিয়েছে, চেখফের সার্জিকাল ছুরির চেয়ে তাঁর কলমের ধার বেশী। তবু সরকার তাঁকে পাঠালেন সাখেলিন দ্বীপের কয়েদীদের সম্বন্ধে মেডিকেল তদন্ত করতে। সে রিপোর্ট তিনি এমনই বুকফাটানো জোরালো ভাষায় লিখেছিলেন যে তারই ফলে সরকার কয়েদীদের জন্য বহু সুব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। এ রিপোর্টখানা আমি কিছুতেই সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি। আমার বড় বাসনা ছিল দেখবার, সাহিত্যিক যখন মেডিকেল রিপোর্ট লেখে তখন তার কলম কি ভাবে চালায়? সংযত করে? যাতে করে লোকে না ভাবে সাহিত্যিক তার হৃদয়-উচ্ছ্বাস দিয়ে তথ্যের দীনতা ঢাকতে চেয়েছে—কেসে পয়েন্ট না থাকলে উকীল যে রকম গরম লেকচার ঝাড়ে আর টেবিল থাবড়ায়। কিংবা তাঁর জোরদার কলম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে? কিংবা উভয়ের অভূতপূর্ব সংমিশ্রণে? রবীন্দ্রনাথ যখন সভ্যতার সংকট লিখেছিলেন তখন তাঁর লেখনে কতখানি রাষ্ট্রদর্শন আর কতখানি কবির তীব্র হৃদয়-বেদনার পরিপূর্ণ প্রকাশ!

তারপর একবার লেগে যায় রুশ দেশে জোর কলেরা। সেই এক বছর চেখফ ডাক্তারি করেন প্রাণপণ। ব্যস।

পারতুম না।' যাঁরা বর্তমান লেখকের অত্যধিক বাগাড়ম্বর অপছন্দ করেন, তাঁরা বাকী প্রবন্ধ না পড়ে সোজা চেখফের দুলালী গল্পের অনুবাদে চলে যাবেন।

খাস পশ্চিমের লোক বয়েস হওয়ার পর বিয়ে-শাদী করে কস্মিনকালেও বাপ-মায়ের সঙ্গে বসবাস করে না। ভিন্ন সংসার পাতে। রুশদের বোধ হয় কিছুটা প্রাচ্যের আমেজ ধরে।

কিছুটা প্রতিষ্ঠা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই চেখফ গ্রামাঞ্চলে কিঞ্চিত জমিজমা ও ছোট্ট একটি বসতবাড়ি কিনলেন। বাপ-মায়ের সঙ্গে সেখানে ছ'টি বৎসর চেখফ বড় আনন্দে কাটালেন। চেখফের সমগোত্রীয় আরেকজন অতিশয় দরদী লেখক, আলফঁস দোদেও ঠিক ঐরকমই মোটামুটি ঐ সময়েই অসুরের মত খেটে পয়সা রোজগার করে গরীব বাপ-মাকে গ্রাম থেকে এনে প্যারিসে আরামে রেখেছিলেন। জীবনের এই ছ'টি বৎসর চেখফের বড় শান্তি আর আনন্দের মধ্যে কাটে। এর পরই দেখা দিল তাঁর শরীরে ক্ষয়রোগের চিহ্ন এবং বাকি জীবনের অধিকাংশ তাঁকে কাটাতে হয় ক্রিমিয়ার স্বাস্থ্যনিবাসে, সমুদ্র পারে। চেখফের বয়স তখন একচল্লিশ। তাঁর ক্ষয়রোগের কথা জেনেশুনেও তাঁরই নাট্যের অসাধারণ সুন্দরী এক অভিনেত্রী তাঁকে বিয়ে করেন। তিন বৎসর পর খ্যাতির মধ্যগগনে চেখফ-ভাস্কর অস্ত গেল। দাম্পত্য জীবনে সুখ বলতে তাঁর স্ত্রী পেয়েছিলেন স্বামীকে সেবা করার আনন্দ। অভিনেত্রীদের চরিত্র সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলে। তাই বলে নেওয়া ভালো, চেখফের স্ত্রী বিধবা হওয়ার পর বাকি জীবন নির্জনে অতিবাহিত করেন। মর্ডান গল্প-উপন্যাসের পাঠক-পাঠিকারা বোধ হয় তাজ্জব না বনে। চেখফের বিধবা তখন যুবতী। রুশে বিধবা বিবাহ নিন্দনীয় তো নয়ই, যুবতী বিধবা পুনরায় বিবাহ না করলে তাকে 'আহাম্মুখ' আখ্যা দেওয়া হয়। মা হওয়ার গৌরব থেকে তিনি নিজেকে বঞ্চিত করলেন। তিনি ত্যাগ ও প্রেমের নিষ্ঠায় বিশ্বাস করতেন। এ কথাটা বলতে হল চেখফ-চরিত্র বোঝাবার জন্য। তিনি নিশ্চয়ই এমনই গভীর প্রেম দিয়ে তাঁর স্ত্রীর জীবন উদ্দীপ্ত করে দিয়েছিলেন যে সেই দীপ্ত দীক্ষায় প্রজ্বলিত তাঁর প্রেম-প্রদীপ চেখফের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নির্বাপিত হল না। তারই অনির্বাণ বহ্নিতে তাঁর ভবিষ্যতের পথ আলোকিত হয়ে রইল।

চেখফের জীবন সংক্ষিপ্ত ও আদৌ ঘটনাবহুল নহে। যে কটি ছবি আমাদের চোখের সামনে আসে সেগুলিই মধুর। শুধু শেষের চিত্রটি বড় করুণ। রঙ্গমঞ্চ থেকে চিরতরে বিদায় নিয়ে আজীবন বিলাসে লালিতা এই যে অসাধারণ গুণবতী রমণী তাঁর স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য কন্টিনেন্টের খ্যাতনামা স্বাস্থ্যনিবাস থেকে স্বাস্থ্যনিবাস, এক ধন্বন্তরী থেকে অন্য ধন্বন্তরীর পদপ্রান্তে পাগলিনীর মত ছুটোছুটি করলে, আপন হৃদয়াবেগ শান্ত মুখের আড়ালে লুকিয়ে রেখে, কত না বিনিদ্র যামিনী স্বামীর শয্যাপার্শ্বে কাটালে, অসীম ধৈর্যে মিশ্রিত অক্ষয় সেবায় ক্ষয়রোগীর প্রতিটি পীড়িত মুহূর্তের যন্ত্রণাভার লাঘব করলে - এ ছবিটি একাধিক রুশ লেখক এঁকেছেন।

টলস্টয়ের বৃদ্ধ বয়সে চেখফের তিরোধান তাঁর বুকে বড় বেজেছিল—চেখফকে তিনি কতখানি স্নেহ করতেন সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। গর্কি

তখন লেখেন চেখফ সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। ইয়াসানা পলিয়ানাতে এই ত্রিমূর্তির আলোচনা, হৃদ্যতার আদান-প্রদান সম্বন্ধে অত্যন্ত মনোরম একাধিক প্রবন্ধ রুশ ভাষায় বেরিয়েছে। চেখফ স্বয়ং তাঁর 'নোটবুকে' কিছু কিছু লিখে গিয়েছেন। টলস্টয়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অকৃত্রিম। অবশ্য সে-শ্রদ্ধা তাঁকে মোহাচ্ছন্ন করতে পারেনি। মাত্র অল্প কিছুদিনের জন্য তিনি টলস্টয়ের 'নীতি-মূলক' (স্টরি উইথ এ মরাল) গল্পের অনুকরণ করেছিলেন। কিন্তু রিয়েল আর্টিস্ট (টলস্টয়ের ভাষায়) তো বেশীদিন অন্যের পথে চলতে পারে না—তা সে পথ যতই শান বাঁধানো প্রশস্ত হক না কেন।

গর্কি তাঁর নাট্যরচনায় চেখফের অনুকরণ করেছেন। এস্থলে পাঠক-পাঠিকার স্মরণার্থে উল্লেখ করি,

টলস্টয় ঃ জন্ম ১৮২৮ মৃত্যু ১৯১০
চেখফ ঃ „ ১৮৬০ „ ১৯০৪
গর্কি ঃ „ ১৮৬৮ „ ১৯৩৬

চেখফ আমাকে এমনই মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছেন যে তাঁর সম্বন্ধে আমি এক যুগ ধরে লিখে যেতে পারি। তাঁর প্রতিটি গল্পে টীকা লিখতে লিখতেই আমার বাকী জীবন কেটে যাবে। অথচ এই প্রবন্ধ শেষ করতে হবে, এবং কি উদ্দেশ্য নিয়ে এটা লিখছি সেটি ভুললেও চলবে না।

পূর্বেই বলেছি, বঙ্গসাহিত্যে আমি যশস্বী লেখক নই, কিন্তু পপুলার বটি। সেই কারণেই বোধ হয়, আমি কিছু অনুরোধ পেয়েছি, পত্র-লেখকদের জানাতে, কোন্ কোন্ লেখক পড়লে তাঁরা লাভবান হবেন। বিদায় নেবার প্রাক্কালে নিবেদন, ছোট গল্প দিয়েই সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ করা প্রশস্ত এবং সম্মুখে চেখফের ফোটোগ্রাফ টাঙিয়ে নিয়ে। এমন কি যাঁরা পরবর্তীকালে উপন্যাস লিখবেন তাঁরাও চেখফ চেখে, শুঁকে, সর্বাঙ্গে মেখে উপকৃত হবেন। এ প্রবন্ধটি তাঁদেরই উদ্দেশ্যে লেখা।

কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, রুশ সাহিত্যে চেখফের অনুকরণ করেছেন অনেকেই, কিন্তু 'টলস্টয়-ঘরানা', 'ডস্টয়েফস্কি ঘরানা'র মত 'চেখফ-ঘরানা' কখনো নির্মিত হয়নি। তার কারণ চেখফকে অনুকরণ করা অসম্ভব।

তবে সে উপদেশ দিচ্ছি কেন ?

কারণ অসম্ভবের চেষ্টা করলেই সম্ভবটা হাতে আসে, সম্ভব হয়।

* * *

চেখফের আছে কি ?

অদ্ভুত সহানুভূতি। সমবেদনা। সহানুভূতি সমবেদনা বললে কমই বলা হয়। মপাসাঁর 'বুল্ দ্য সুইফ্' । 'চর্বির গোলা', 'এ বল অব্ ফ্যাট' যখন ঘোড়া-গাড়িতে ফিরে অঝোরে কাঁদছে তখন মপাসাঁও সঙ্গে সঙ্গে কাঁদছেন, কিন্তু চেখফ যখন তাঁর কোচম্যানের দুঃখের কাহিনী বলেন তখন মনে হয় তিনি স্বয়ংই যেন সেই কোচম্যান।

গল্পটির প্লট এতই সরল যে কয়েক ছত্রে বলা যায়। এক ছ্যাকড়া গাড়ির

কোচম্যান শহরে গাড়ি খাটায়, একমাত্র ছেলে থাকে গ্রামে। হঠাৎ খবর পেলে তার সে জোয়ান ছেলে মারা গিয়েছে। বুড়োর তিন কুলে কেউ নেই যাকে সে তার দুঃখের কাহিনী বলে। পেটের ধান্দায় বেরোতে হয়েছে গাড়ি নিয়ে। উঠেছে এক সোয়ারি। বুড়ো কোচম্যান আস্তে আস্তে আলাপচারী জমিয়ে যখন তার পুত্রশোকের কাহিনী বলতে যাবে, তখন ঘাড় ফিরিয়ে দেখে সোয়ারি ঘুমিয়ে পড়েছে। থামতে হল। তারপর উঠলেন এক জেনরেল। 'জলদি চলো, জলদি চলো' আর ধমকের চোটে সে তার কাহিনী আরম্ভ করেও শেষ করতে পারলো না। তারপর উঠল জনাতিনেক ছাত্র। তাদের হৈ-হল্লার মাঝখানে বুড়ো কোন পাত্তাই পেল না। তার উপর উঠলেন আর এক ভদ্রলোক —ভারী দরদী। তাঁকে যখন দুঃখের কাহিনী বলতে বলতে পুত্রের মৃত্যু-সংবাদটা দেবে ঠিক তখনই তিনি বলে উঠলেন, 'থ্যাংক গড্। ঐ আমার বাড়ি। পেঁছে গিয়েছি।' বলা হল না। রাত তখন ঘনিয়ে এসেছে। বুড়ো বাড়ি ফিরল। ঘোড়াটাকে দানা দিয়ে ডলাই-মলাই করতে করতে আপন মনে বিড় বিড় করতে লাগল, 'তোকে কি আর আমি ভালো করে ডলাই-মলাই করতে পারি, বাছা। বুড়ো হাড়ে আর কি আমার তাগৎ আছে? থাকতো আমার ছেলে! তাকে তো তুই চিনিস নে। হ্যাঁ, তার ছিল গায়ে জোর। হ্যাঁ, সত্যি বলছি। সে যদি থাকতো আজ, তবে বুঝিয়ে দিত ডলাই-মলাই কারে কয়।' ঘোড়াটা আপন খেয়ালে গর্‌গর্ করে নাক দিয়ে শব্দ ছাড়লো। কেমন যেন দরদ ভরা—অন্তত বুড়োর তাই মনে হল।

তখন—তখন—? বুড়ো ঘোড়াটাকে তার শোকের কাহিনী বলে দিল।[২]

যতবার গল্পটি পড়ি চোখে জল ভরে আসে—এখন আরো বেশী, কারণ আমার বয়েস ঐ কোচম্যানেরই কাছাকাছি···আর মনে হয়, কে বলে চেখফ ডাক্তার ছিলেন, কে বলে তিনি রূপসী অভিনেত্রী বিয়ে করেছিলেন, কে বলে তিনি টলস্টয়ের বন্ধু? তিনি নিশ্চয় ছিলেন ঐ কোচম্যান।

অনুকরণ করুন এই গল্পটির। কিংবা আরম্ভ করুন অন্যভাবে।

যেমন মনে করুন আপনার প্রিয়া সর্বাংশে আপনার চেয়ে গুণবান একটি 'লভার' পেয়ে ড্যাং ড্যাং করে চলে গেলেন তার সঙ্গে। আপনি ঘন ঘন 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে' পড়ে হৃদয়বেদনায় মালিশ করছেন, কিন্তু কোনো ফায়দা ওৎরাচ্ছে না। হঠাৎ মনে পড়ল আপনার এক-বান্ধবীর এক বান্ধবী আছেন এবং তাঁর সঙ্গে পরিচিত আরেক ভদ্রলোকও আপনার বন্ধু। আপনি ভাবলেন, 'তাঁদের কাছে গিয়ে আমার দুঃখের কাহিনী কই।' দুজনেই বড় দরদী। দুজনাই আপনার আপসাআপসি সাতিশয় মনোযোগ সহকারে শুনলেন। কিন্তু হায়, শেষটায় দেখলেন, ওদের দুজনারই পাকা রায়, আপনাকে কলার খোসাটির মত রাস্তায় ফেলে দিয়ে আপনার প্রিয়া অতিশয় বিচক্ষণার কর্ম করেছেন!

২ গল্পটির প্লট আমার ঠিক ঠিক মনে নেই; তবে হরেদরে এই

এটা আপনি ব্যঙ্গ করে লিখতে পারেন, হাস্যরসে ভর্তি করে লিখতে পারেন, দু ঘটি চোখের জল ফেলে করুণ রসে ঢেলে বানিয়ে লিখতে পারেন, যৌন-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ দিয়েও লিখতে পারেন—কিন্তু আপনি চেখফ হবেন তখনই যখন পাঠক পড়ে মনে করবে এটি একান্ত আপনারই অভিজ্ঞতা। অথচ আপনার এই নিদারুণ অভিজ্ঞতা আদপেই হয়নি, আমার কাছে প্লটটি শুনে, এবং চেখফের কোচম্যানের গল্পটি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে লিখেছেন মাত্র।

এবারে টেকনিকাল দিক।

এখানে এসে সর্ব আলঙ্কারিকের ওয়াটারলু।

রস কি, এস্থলে কথাসাহিত্যে কি সে-বস্তু যা আমার মনে কলারসের সঞ্চার করে—সেখানে যদি বা কোনো গতিকে সংজ্ঞাবদ্ধ বর্ণনা করা যায়, তবু করা যায় না রসসৃষ্টি হয় কোন্ উপাদানে, কোন্ প্রক্রিয়ায়!

কাজেই আমি সামান্য দুটি নির্দেশ দেব।

প্রথম বাকসংযম। 'সে বলে বিস্তর মিছা যে বলে বিস্তর'—বলেছেন ভারতচন্দ্র। এ-স্থলে 'সে রচে নিরস রস যে বলে বিস্তর।'

এখানে চীনা চিত্রকরদের কথা স্মরণে আনবেন। পাঁচটি আঁচড়ে আঁকা বাঁশের মগডালে একটি পাতা—আপনি স্পষ্ট শুনতে পেলেন পাতাটি ফর ফর করছে। তিনটে আঁচড়ে আঁকা একটি উড়ন্ত হাঁস। আপনি দেখতে পেলেন যেন নীলাকাশে শরতের সাদা মেঘ—ভালো করে তাকানোই যায় না, চোখ ঝলসে দেয়।

তার অর্থ উড়ন্ত হাঁস আঁকার সময় চিত্রকর সম্পূর্ণ হাঁস আঁকেন না। ঠিক কোন্ কোন্ জায়গায় বিন্দু ও বক্ররেখা (পইন্ট কার্ভ) দিলে পাঠকের মন নিজেই বাকিটা এঁকে নেবে, পাঠকের চোখ নিজেই বাকিটা দেখে নেবে ঠিক সেই সেই জায়গায় চিত্রকর তুলি ছুঁইয়েছেন।

চেখফও ঠিক তাই করতেন। কয়েকটি পইন্ট ও কার্ভ—শব্দের মারফতে—এমনই ভাবে এঁকে দিয়েছেন যে সম্পূর্ণ ছবিটি চোখের সামনে জ্বলজ্বল করতে থাকে। শুধু তাই নয়, এমনই সূক্ষ্ম দানাওলা ফিলমে তোলা ফটোগ্রাফ যে যার যেমন কল্পনার লেন্স্ সে তেমনি বিরাট আকারে সেটিকে এনলার্জ করতে পারে। কোচম্যান চেষ্টা করেছিল তিন না চার টাইপের সোয়ারির কাছে তার হৃদয়বেদনা প্রকাশ করার; আপনি দেখতে পাবেন সে তাবৎ মস্কো শহরের লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়দুয়ারে শির হেনে হেনে হতাশ হচ্ছে। আর সেই দরদী ঘোড়ার গর্‌র্‌র্ শব্দ যে শুধু জানতে পাবেন তাই নয়, শুনতে পাবেন সে যেন বহু আবেগ থেকেই কোচম্যানকে বলছে, 'কেন তুমি আজেবাজে লোকের কাছে এসব দুঃখের কথা বলতে যাও? কে বুঝবে তোমার হৃদয়-বেদনা? সবাই আপন স্বার্থ নিয়ে মগ্ন। বলো আমাকে। হাল্কা হবে।' তারপর হয়তো আপন মনে বলছে, 'জানি তো সবই। কিন্তু হায় করি কি? এ যে ভগবানের মার।'

গুণীরা বলেন সর্বনিম্নে জড়জগৎ, তারপর তৃণজগৎ, তারপর পশুজগৎ—

সর্বোচ্চে মানুষ। চেখফের গল্পটি পড়ার পর মত পালটাতে হয়।

এস্থলেই ক্ষান্ত হোক আমার অক্ষম লেখনীর ক্ষীণ প্রচেষ্টা।

এইবার পড়ুন চেখফের একটি গল্পের বাঙলা অনুবাদ। অনুবাদটি করেছেন আমারই অনুরোধে, আমার সখা মৌলানা খাফী খান। 'যন্দৃষ্টং' এবং 'প্রিয়াঙ্গী'র লেখক।

॥ দুলালী ॥

ওলেংকা অবসরপ্রাপ্ত অ্যাসেসর প্লেমুইয়ান্নিকভের মেয়ে। সে ভাবনায় ডুবে বসেছিল উঠোনের সামনে ছোট্ট বারান্দাটিতে।

গরম, মাছিগুলো আঠার মত লেগে আছে, বিরক্ত করছে। একটু বাদেই যে সন্ধ্যে হবে সে কথা ভাবতে ভালোই লাগছে। পুব দিক থেকে ঘন কালো মেঘ এসে জমা হচ্ছে, সেই সঙ্গে থেকে থেকে ভিজে হাওয়ার আমেজ আসছে।

উঠোনের মধ্যিখানে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কুকিন। লোকটি থিয়েটারের ম্যানেজার, প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় এক বাগানে একটি আনন্দমেলার আসর জমায়—নাম 'তিভলি প্রমোদ উদ্যান'। থাকে ওলেংকাদের বাড়ির একপাশে ভাড়া নিয়ে।

কুকিন্ হতাশ হয়ে বলল, "আবার! আবার এল বৃষ্টি। রোজ বৃষ্টি, রোজ, যেন আমাকে নাকাল করার জন্যেই নামে! গলায় দড়ি দিই না কেন? সর্বস্ব গেল। দিন দিন লোকসান আর লোকসান!"

দু হাত জুড়ে ওলেংকার দিকে ফিরে কুকিন্ আবার বলতে লাগল, "এই তো জীবন আমাদের, ওল্‌গা সেমুইয়নভ্‌না। দু চোখ ফেটে জল আসে। খেটে মরি, যতদূর সাধ্য চেষ্টা করি, সারারাত জেগে ভাবি কী করে জিনিসটাকে উঁচুদরের করে তোলা যায়। হয় কী? এদিকে দেখ, লোকগুলোকে—আহাম্মুখ, বর্বর।

"আমি ওদের দেখাই সেরার সেরা ছোট ছোট অপেরা, কথা-ছাড়া শুধু ভঙ্গী দিয়ে বোঝানো নাটক, অপূর্ব অপূর্ব ভ্যারাইটি আর্টিস্ট। কিন্তু ওরা কি ও জিনিস চায়? বোঝে তার মর্ম? ওরা শুধু চায় হৈ-হুল্লোড়! ওদের দেখাতে হয় রদ্দি চীজ।

"আবার ইদিকে দেখ আবহাওয়াখানা! প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় বৃষ্টি। ১০ই মে থেকে শুরু হল, চলছে রোজ, গোটা মে-জুন মাসটাই! দর্শকের দেখা নেই, অথচ বাগান-ভাড়াটা? সেটি ঠিক ধ'রে দিতে হয়। আর গাইয়ে-বাজিয়েদের মাইনেটা?"

পরদিন সন্ধ্যের দিকে আবার দেখা দিল মেঘ। হি হি করে হেসে উঠল কুকিন্। বললে, "এসো, এসো বৃষ্টি! দাও ভাসিয়ে আমার প্রমোদ উদ্যান। সব ডোবাও, তারপর আমাকেও ডোবাও। আমার ইহলোক পরলোক দুইই মজুক! মামলা করুক আমার আর্টিস্টরা আমার নামে, পাঠাক জেলে— সাই-

বীরিয়ার নির্বাসনে—ফাঁসিকাঠে ! হাহা হাহাঃ।"

তার পর দিন আবার ঐ।

ওলেংকা চিন্তিত মুখে, নীরবে কুকিনের কথাগুলি শুনত। মাঝে মাঝে তার চোখে জল এসে পড়ত। এত উতলা হয়ে উঠত তার মন কুকিনের দুর্ভাগ্যে যে শেষ অবধি সে ওর প্রেমেই পড়ে গেল।

কুকিন্ মানুষটি বেঁটে, রোগা। মুখখানা ফ্যাকাশে। চুল আঁচড়ে রগের ওপর টেনে নামানো। সরু গলায় কথা কয়, মুখ একপাশে বেঁকিয়ে। চেহারায় চিরকেলে নৈরাশ্যের ছাপ। তবু সে ওলেংকার মনে গভীর এবং অকৃত্রিম একটি ভাব জাগিয়ে তুলল।

ওলেংকা সর্বদাই কারো না কারো প্রেমে অভিভূত হয়ে থাকত। প্রথমে ছিল বাবা। এখন তিনি রুগ্ণ ; অন্ধকার একখানা ঘরে সারাদিন আরাম-কেদারায় বসে তাঁর দিন কাটে। শ্বাসকষ্টে কাতর।

তারপর সে ভালোবাসলো তার এক খুড়িমাকে। তিনি থাকতেন ব্রিয়ান্স্কে, দু বছরে একবার করে আসতেন। তার আগে, যখন সে ইস্কুলে পড়ত, তখন তার প্রেমপাত্রী ছিল তার ফরাসী শিক্ষিকা।

ওলেংকা মেয়েটি শান্ত, সহৃদয়—বড় ভালো স্বভাবের। চোখ দুটি ভীরু নিরীহ। নিটোল স্বাস্থ্য। তার টলটলে, লাল্চে গাল দুখানি, ধপধপে সাদা নরম তুলতুলে ঘাড়ের উপর ছোট্ট কালো তিলটি, আর সরল স্নিগ্ধ যে হাসিটি ফুটে উঠত তার মুখে খুশীর কোনো কথা শুনলেই, তা দেখে ছেলেরা ভাবত "মন্দ নয় তো মেয়েটি"। বেশ হাসতও। আর মেয়েরা তার সঙ্গে কথা কইতে কইতে হঠাৎ তার হাতখানি ধরে বলে উঠত, কথার মধ্যিখানে, আনন্দের উচ্ছ্বাসে "ও দুলালী !"

জন্ম থেকে যে বাড়িতে ওলেংকার বাস, তার বাবার উইল অনুযায়ী সেটি তারই প্রাপ্য। বাড়িখানা ছিল শহরের একটু বাইরের দিকে। জিপ্সী রোডের উপর। প্রমোদ উদ্যান "তিভলি" থেকে বেশী দূরে নয়। সেখানে যখন সন্ধ্যে-বেলায় বা রাত্রে বাজনা বাজত, বাজি ফুটত, ওলেংকার মনে হত যেন যুদ্ধ বেধেছে কুকিনের সঙ্গে তার নিয়তির। কুকিন্ লড়ছে, তার প্রধান শত্রু নিঃসাড় দর্শকগুলোর সঙ্গে। অমনি ওলেংকার মন গলে যেত। ঘুমোতে ইচ্ছে করত না। ভোররাত্রে কুকিন্ যখন বাড়ি ফিরত, তখন ওলেংকা তার শোবার ঘরের জানালায় আস্তে আস্তে টোকা দিত, আর পরদার ফাঁক দিয়ে শুধু তার মুখখানা আর কাঁধের একটুখানি দেখিয়ে তার দিকে চেয়ে হাসত, নরম হাসি।

কুকিন্ বিয়ের প্রস্তাব করল, বিয়ে হয়ে গেল। তারপর দেখল, বেশ ভালো করে, ওলেংকার ঘাড়খানি আর তার সুন্দর মোটা-সোটা কাঁধ দুটি। দেখে বলে উঠল "দুলালী।"

কুকিন্ খুশী হল, তবে তার বিয়ের দিন এবং রাত্রেও বৃষ্টি হল, তাই মুখের নিরাশ ভাবটা বদলালো না।

দুজনের বনে গেল বেশ। ওলেংকা টিকিট বিক্রির দিকটা দেখত, হিসেব

রাখত, মাইনে-পত্তর দিত। তার ছলাকলাবর্জিত হাসিটিতে কখনো টিকিট-ঘর, কখনো খাবার দোকানটি, কখনো রঙ্গমঞ্চের দুটি পাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

বন্ধুদের সে বলতে আরম্ভ করল, পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মধ্যে সর্বপ্রধান সর্বাধিক প্রয়োজনীয় এবং উল্লেখযোগ্য বস্তু হল নাট্যশালা—প্রকৃত আমোদ একমাত্র এরই মধ্য দিয়ে পাওয়া যেতে পারে। এর দ্বারাই মানুষ হয়ে উঠতে পারে ভদ্র এবং মানবতাবোধসম্পন্ন।

"কিন্তু লোকে কি তা বোঝে?" বলত ওলেঙ্কা। ওরা চায় "হৈ-হুল্লোড়। কাল আমরা দেখালাম 'উল্টোপাল্টা ফাউস্ট'—বক্সগুলোর প্রায় সব কটিই খালি রইল। কিন্তু যদি ভানিচ্‌কা আর আমি দেখাতাম ওঁচা একটা কিছু, দেখতে লোকে লোকারণ্য হয়ে যেত রঙ্গালয়। কাল ভানিচ্‌কা আর আমি দেখাচ্ছি 'নরকে অর্ফেউস্'—নিশ্চয়ই এসো কিন্তু।'

কুকিন্ থিয়েটর সম্বন্ধে অভিনেতাদের সম্বন্ধে যাই বলত ওলেঙ্কা তারই পুনরাবৃত্তি করত। কুকিনের মতোই সেও দর্শকদের অজ্ঞতা এবং রসবোধের অভাবকে ঘৃণা করত। মহড়ায় আসত ওলেঙ্কা, অভিনেতাদের ভুল শোধরাত, বাজিয়েদের গতিবিধির দিকে চোখ রাখত। খবরের কাগজে যদি খারাপ কিছু মন্তব্য করা হত তবে সে কেঁদে ফেলত, যেত সম্পাদকের কাছে, কৈফিয়ৎ চাইত।

অভিনেতারা তাকে ভালোবাসত, ডাকত "ভানিচ্‌কা" আর আমি, "দুলালী" বলে। ওলেঙ্কার ওদের জন্য কষ্ট হত, মাঝে মাঝে টাকা ধার দিত অল্প-স্বল্প, ঠকালে গোপনে চোখ মুছত, স্বামীর কাছে নালিশ করত না।

শীতের মরসুমেও ওদের গেল ভালোই। মিউনিসিপ্যালিটির থীয়েটরখানা ওরা ভাড়া নিল, নিয়ে অল্পদিনের মেয়াদে ভাড়া দিল উক্রাইন-দেশী একটা দলকে, এক জাদুকরকে, স্থানীয় একটি নাটুকে সংঘকে।

ওলেঙ্কা হয়ে উঠল আরো গোলগাল, মুখে ফুটল কায়েম একটা খুশীর জৌলুস, কুকিন্ হয়ে গেল আরো রোগা, মুখ হল আরো হলুদে। ভয়ানক লোকসানের বুলি তার মুখে লেগেই রইল, যদিও শীতের বাজারে ব্যবসা তার মোটেই খারাপ চলেনি।

কুকিন্ রাত্রে কাশে। ওলেঙ্কা ফলের রসের সঙ্গে ফুল মেড়ে তাকে খাওয়ায়, বুকে তেল মালিশ করে, নিজের নরম নরম শালগুলো দিয়ে তার গা ঢাকে।

বলে, "কী মিষ্টি তুমি মণি।" চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। বলে, অন্তর থেকেই, "আমার সুন্দর, আমার বুকের ধন।"

শীতের শেষে কুকিন্ গেল মস্কো, নতুন একটা দল নিয়ে আসতে। ওলেঙ্কা কুকিন্ বিহনে ঘুমোতে পারে না। সারারাত জানালার ধারে ব'সে তারার দিকে চেয়ে থাকে। ঘরে মোরগ না থাকলে মুরগী যেমন সারারাত অস্বস্তিতে কাটায়, জেগে থাকে, ওলেঙ্কারও তেমনি হয়।

মস্কোয় কুকিন্ আটকা পড়ে গেল। চিঠি দিল ওমাসে ইস্টারের আগেই সে ফিরবে। তিভলির কাজকর্ম বুঝিয়ে লিখল।

যে সময় কুকিনের ফেরার কথা সেই সময়েই একদিন, দিনটা সোমবার, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, হঠাৎ দরজায় অলুক্ষণে রকমের একখানা ঘা পড়ল। সে কী আওয়াজ। যেন কেউ ঢাক পিটছে। দড়াম দড়াম দমাদ্দাম। রাঁধুনী মেয়েটা ঘুম-চোখে খালি পায়ে থৈ থৈ জল ভেঙে ছুটল খেড়ার দরজা খুলতে।

দরজার ওধার থেকে হেঁড়েগলায় কে বলল, "দরজাটা খোলো তো, তোমার নামে তার এসেছে।"

ওলেংকা আগেও পেয়েছে টেলিগ্রাম তার স্বামীর কাছ থেকে, কিন্তু এবারে কেমন যেন সে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। থর্-থর্ কাঁপা হাতে টেলিগ্রাম খুলে সে পড়ল ঃ

"ইভান্ প্যেত্রোভিচ আজ হঠাৎ মারা গেল আগ্রা নির্দেশ সাপেক্ষ মঙ্গলবার শেষকৃত্য।"

ঠিক এই ছিল টেলিগ্রামে, "শেষকৃত্য" আর অবোধ্য কথাটা "আগ্রা"। টেলিগ্রামে সই নাটুকে দলের বড়কর্তার।

ওলেংকা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, "আমার মণি, ভানিচ্কা, মনি আমার, প্রিয়তম। কেন দেখা হলো আমাদের? কেন তোমায় জানলাম, ভালবাসলাম? তুমি তো ছেড়ে গেলে আমাকে, এখন তোমার দুঃখিনী ওলেংকা কার পানে চাইবে?"

মঙ্গলবার কুকিন্কে ভাগান্কোভো গোরোস্থানে কবর দেওয়া হল। ওলেংকা বাড়ি ফিরে এলো বুধবার, এসেই বিছানায় আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল, এমন চেঁচিয়ে যে রাস্তা আর আশেপাশের বাড়ির উঠোন থেকে সে কান্না শোনা গেল।

পাড়াপড়শীরা ক্রুসের চিহ্ন এঁকে বুকে মাথায় কাঁধে আঙুল ছোঁয়াল আর বলল, "বেচারী দুলালী, ওল্গা সেম্ইয়ানভ্না। আহা, দুঃখে বুকটা ফেটে যাচ্ছে বাছার।"

তিন মাস বাদে একদিন গির্জা থেকে ফিরছে ওলেংকা। শোকে দুঃখে জর্জর। ঘটনাচক্রে বাবাকায়েভ্ কাঠগোলার গোমস্তা ভাসিলি আন্দ্রেয়িচ্ পুস্তভালভ, সেও ফিরছিল গির্জা থেকে, তারই সঙ্গে হেঁটে এল। পুস্তভালভের মাথায় কেতাদুরস্ত শাদা টুপী, পরনে শাদা ওয়েস্টকোট—তার ওপর ঝুলছে সোনার ঘড়ি চেন। লোকটিকে দেখে মনে হয় না ব্যবসায়ী, দেখায় জমিদারের মতো।

সে বললে গম্ভীর সুরে "যা কিছু ঘটে ওল্গা সেম্ইয়নভ্না, সে সব ঘটে তাঁরই আদেশে।" স্বরে সমাবেদনার রেশ। "প্রিয়জনদের কেউ যদি চলে যায়, তবে তার কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা। বুক বেঁধে মাথা নত করে তা আমাদের মেনে নিতে হবে।"

ওলেংকাকে বাড়ির দরজা অবধি পেঁছে দিয়ে পুস্তভালভ বিদায় নিল। ওলেংকা সারাদিন ধরে শুনল তার গম্ভীর গলার আওয়াজ। চোখ যখন জুড়ে এল, স্বপ্নে দেখল তার কালো দাড়ি। বড় ভালো লাগলো তাকে ওলেংকার।

পুস্তভালভের মনে বোধ হয় ওলেংকা একটা দাগ ধরিয়ে দিল, কারণ দুদিন না যেতেই একটি আধবয়সী মহিলা, যাকে ওলেংকা প্রায় চেনেই না এল তার সঙ্গে কফি খেতে, আর খেতে বসেই পুস্তভালভের গল্প জুড়ে দিল। বলল, অতি চমৎকার শক্তপোক্ত লোকটি, বিয়ের বয়সী যে কোনো মেয়ে ওকে বিয়ে করে সুখী হবে। তিন দিন বাদে পুস্তভালভ নিজেই এল। রইল বেশীক্ষণ নয়, মিনিট দশেক হবে, কথা বলল অল্পই, কিন্তু ওলেংকা তার প্রেমে পড়ে গেল—এতদূর যে সারারাত তার ঘুম হল না, জ্বরের মত জ্বালায় জ্বলল, এবং সকাল হতে সেই আধবয়সী মহিলাটিকে ডেকে পাঠাল। কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি বিয়েও হয়ে গেল।

বিয়ের পর দুজনের বনিবনা খুব ভালো হল। নিয়মিত পুস্তভালভ কাঠ-গোলায় বসত দুপুরের খাওয়া অবধি, তারপর যেত কাজে বেরিয়ে, ওলেংকা এসে বসত তার জায়গায়, আপিসে ব'সে সন্ধ্যে অবধি বিল তৈরী করত, আর অর্ডার মাফিক মাল চালান দিত।

খদ্দেরদের এবং পরিচিত লোকদের ওলেংকা শোনাত "কাঠের দর ফী বছর শতকরা কুড়ি টাকা হিসেবে বাড়ে। আগে আমরা কাঠ নিতাম এখান থেকেই, কিন্তু এখন ভাসিচ্‌কাকে প্রতি বৎসর যেতে হয় মগিলেভ্‌ অঞ্চলে, কাঠের বন্দো-বস্ত করতে। আর ভাড়া কী!" তাজ্জব হয়ে গালে হাত দিয়ে ওলেংকা বলতো "কী খরচা গাড়িভাড়ার!"

তার মনে হত সে কাঠের ব্যবসায় আছে যুগ যুগ ধরে; কাঠ জীবনের সর্বপ্রধান এবং সার বস্তু। গার্ডার, কড়ি, বরগা, তক্তা, বাটাম, বাক্সের কাঠ, ল্যাথ, পীস্‌, স্ল্যাব কথাগুলো তার কাছে বড় আদরের মনে হত, শুনে মন-কেমন করত। রাত্রে সে স্বপ্ন দেখত পাহাড়প্রমাণ বোর্ড আর তক্তা, অসংখ্য গাড়ি-ভর্তি কাঠের গুঁড়ি সার বেঁধে কোন্‌ দূরে দেশে যাত্রা করেছে, ৮ ইঞ্চি চওড়া ২৮ ফুট লম্বা কড়িকাঠের একটা দল খাড়া দাঁড়িয়ে ধেয়ে চলেছে কাঠ-গোলার দিকে, কড়িতে কড়িতে, গার্ডারে স্ল্যাবে ঠোকাঠুকি হচ্ছে, শুকনো কাঠে কাঠে খটাখটির বোদা আওয়াজ হচ্ছে, সবাই পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠছে, এর ওর ঘাড়ে চেপে স্তূপের মতো জমা হচ্ছে ··

ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে ওঠে ওলেংকা। পুস্তভালভ আদর ক'রে বলে, "ওলেংকা, কী হল দুলালী? মাথায় কাঁধে বুকে ক্রুসচিহ্ন ছোঁয়াও!"

যে ধারণাই তার স্বামীর হত ওলেংকারও তাই হত। পুস্তভালভ যেই বলত ঘরে বড় গরম, অথবা ব্যবসায়ে মন্দা পড়েছে, ওলেংকারও মনে হত তাই। আমোদ-প্রমোদ পুস্তভালভের ভালো লাগত না, ছুটির দিন কাটাত বাড়ি বসে। ওলেংকাও তাই করত।

বন্ধু বান্ধবেরা বলত, "তুমি সবটা সময় কাটাও বাড়িতে বা আপিসে। থীয়েটরে সার্কাসে যাওয়াও তো উচিত।"

মুরুব্বিয়ানার সুরে ওলেংকা বলে, "ভাসিচ্‌কা আর আমি থীয়েটরের ধার মাড়াই না। আমরা খাটিয়ে লোক, ওসব ছ্যাবলামির দিকে আমাদের মন নেই।

কী হয় ওসব থীয়েটর দিয়ে ?"

প্রতি শনিবার সন্ধ্যাবেলায় আর ছুটির দিনে সকাল সকাল তারা গির্জায় যেত, পাশাপাশি হেঁটে ফিরত, দুজনেরই মুখে ফুটে থাকত উপাসনার আবেগ। দুজনেরই অঙ্গে লেগে থাকত মনোরম সুবাস। ওলেংকার রেশমী পোশাক থেকে বেরোত একটা খুশী-খুশী খস্‌খস্‌ শব্দ।

বাড়িতে তাদের খাদ্য ছিল চা, মিষ্টি রুটি, আর রকম রকম জ্যাম। তারপর কিমার 'পাই'। রোজ দুপুরবেলা তাদের বাড়ির সামনের উঠোনে, গেটের বাইরে, রাস্তায়, সুরুয়ার ভুরভুরে গন্ধ ছড়াতো, ভেড়ার বা হাঁসের ঝলসানো মাংসের কিংবা উপবাসের দিনে মাছের। যে-ই যেত ওবাড়ির পাশ দিয়ে, তারই খিদে পেয়ে যেত।

আপিসে, সামোভারে চায়ের জল সর্বদাই চড়ানো থাকত—খদ্দের এলে দেওয়া হত চায়ের সঙ্গে কড়াপাকের পিঠে।

সপ্তাহে একদিন করে তারা যেত স্নানাগারে, ফিরত এক সঙ্গে টকটকে রাঙা-বরণ হয়ে।

ওলেংকা বলত বন্ধুদের, "সত্যি, ঈশ্বরের কৃপায় আমরা সব দিক থেকে বেশ ভালোই আছি। যেমন সুখে-স্বচ্ছন্দে আছি ভাসিচ্‌কা আর আমি, তেমনি যদি সবাই থাকত তো বেশ হত।"

পুস্তভালভ যখন কাঠ কিনতে মগিলেভে যেত, ওলেংকার ভীষণ মন-কেমন করত। সারারাত সে জেগে কাটাত, কাঁদত।

মাঝে মাঝে স্মিরনিন্‌ তার সঙ্গে দেখা করতে আসত। স্মিরনিন্‌ ছিল সৈন্য-দলের পশু-চিকিৎসক। সে ওলেংকাদেরই বাড়ির একপাশটা ভাড়া নিয়ে থাকত। তার অল্প বয়স। সে এসে গল্প-সল্প করত, তাস খেলত, ওলেংকার মনটা ভুলে থাকত।

স্মিরনিনের নানা কথার মধ্যে ওলেংকার সব চেয়ে বেশী ভালো লাগত তার ঘরের খবর। স্মিরনিন্‌ বিবাহিত, আর একটি ছেলে আছে। তবে স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক চুকে গেছে, কারণ পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম। বৌকে সে দুচক্ষে দেখতে পারে না, তবু মাস মাস টাকা পাঠায় চল্লিশ রুবল, তার ছেলের খোরপোশ বাবদ। এসব শুনে ওলেংকা মাথা নাড়ে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ওর জন্য বড় দুঃখ হয় তার মনে।

যাবার সময় ওলেংকা স্মিরননকে মোমবাতি হাতে করে সিঁড়ি অবধি পেঁছে দেয়। বলে, "ভগবান করুন, তোমার যেন কোনো বিপদ-আপদ না হয়। তুমি যে রইলে এতটা সময় আমার সঙ্গে, তার জন্য ধন্যবাদ। স্বর্গের রাণী মেরী তোমাকে অটুট স্বাস্থ্যে রাখুন।"

তার স্বামীর যেমন চারিদিকে বিবেচনা করে গম্ভীরভাবে কথা কইবার ধরন, ওলেংকা তারই অনুকরণ করে। ডাক্তার সিঁড়ির নিচেকার দরজা দিয়ে বেরোচ্ছে, তখন ওলেংকা তাকে ডেকে ফেরায়, আর বলে, "দেখ ভ্লাদিমির প্লাতোনিচ্‌, স্ত্রীর সঙ্গে তোমার মিটমাট করে ফেলাই উচিত; তাকে ক্ষমা করো, ছেলের

মুখ চেয়ে। ছেলেটি হয়তো সবই বোঝে।"

পুস্তভালভ যখন ফিরে এল, ওলেংকা তাকে ঘোড়ার ডাক্তারের দুঃখময় জীবনের সমস্ত কাহিনী শোনাল—গলা খাটো করে! স্বামী-স্ত্রী দুজনেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, মাথা নাড়ল। দুজনেই বলাবলি করতে লাগল ছেলেটির বিষয়ে। বলল, নিশ্চয়ই ছেলেটির বাবার জন্য মন-কেমন করে। তারপর দুজনেরই মনে যেন কেমন করে এলো একই কথা, তারা দাঁড়ালো এসে গৃহ-বিগ্রহের সামনে। প্রার্থনা করলো মাটি অবধি নুয়ে, ভগবান যেন তাদের সন্তান দেন।

এমনিভাবে পুস্তভালভ পরিবার ছটি বছর কাটাল, পরম শান্তিতে, বিনা আড়ম্বরে, ভালোবেসে, পরস্পরের সঙ্গে মিল সম্পূর্ণ বজায় রেখে। তারপর একদিন, শীতকালে, ভাসিলি আন্দ্রেয়িচ্ আপিসে বসে গরম চা-খাওয়ার পর মাথায় টুপি না এঁটে বেরিয়ে গেল কিছু কাঠ চালান দিতে। তার ঠাণ্ডা লেগে গেল, অসুখ করল। সব চেয়ে বড় বড় ডাক্তার তার চিকিৎসা করলেন, কিন্তু রোগ কিছুতেই সারল না। চার মাস ভোগের পর পুস্তভালভ মারা গেল। ওলেংকা আবার বিধবা হল।

স্বামীর গোর দিয়ে ওলেংকা ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করল, "কার কাছে যাব আমি, ওগো তোমাকে ছেড়ে কী করে থাকব আমি অভাগী দুঃখিনী? ওগো তোমরা সবাই আমাকে দেখ'সে।"

কালো শোকবস্ত্র পরে ওলেংকা চলাফেরা করে। মাথায় টুপি নেই, হাতে দস্তানা পরে না। চোখের জলের ধারার নকশায় তৈরি শাদা ঝালর অঙ্গে ধরে। বাইরে বেরোয় কদাচিৎ; যদিও বা যায় কোথাও তো সে গির্জায় কিংবা স্বামীর কবর দেখতে। বাড়িতে বাস করে যেন সন্ন্যাসিনী।

ছটি মাস কেটে যাবার পর সে বিধবার বেশ ছাড়ল। তার ঘরের জানলার খড়খড়ি উঠতে আরম্ভ করল। কখনো-সখনো তাকে বাজারের পথেও দেখা যেতে লাগল, সকালের দিকে রাঁধুনীর সঙ্গে। কি যে সে করে, বাড়িতে কি করে তার দিন কাটে তা নিশ্চয় করে কেউ জানল না, তবে আন্দাজ একটা করা গেল। দেখা যেত, ওলেংকা বাগানে বসে চা খাচ্ছে ঘোড়ার ডাক্তারটির সঙ্গে, ডাক্তার ওলেংকাকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাচ্ছে। এসব দেখে লোকে অনুমান একটা করে নিত।

আরও একটা ঘটনা ঘটল। ডাকঘরে ওলেংকার একটি চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হল। তাকে সে বললে, "আমাদের এই শহরে গোরু-ঘোড়ার কি হয় না হয় দেখবার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই, তাই এত ব্যামো। প্রায়ই শোনা যায় দুধ খেয়ে মানুষের অসুখ করে, গোরু-ঘোড়ার ছোঁয়াচ লেগে এটা হয়, সেটা হয়। গৃহপালিত পশুর স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে, যেমন মানুষের জন্য, ঠিক তেমনি নজর রাখা উচিত।"

পশুর ডাক্তারটির মনে যা ধারণা ওলেংকার বক্তব্যও তাই। সকল বিষয়েই ডাক্তারের যা মত তারও আজকাল সেই মত। স্পষ্টই দেখা গেল,

কোন একটা আকর্ষণ বিনা ওলেংকার একটি বৎসরও কাটে না। আর, এবারে সে নতুন করে খুঁজে পেয়েছে আনন্দ একেবারে তার নিজের বাড়িরই একপাশে।

মেয়েটি আর কেউ হলে তার নিন্দে হত, কিন্তু ওলেংকার সম্বন্ধে কেউ কুকথা ভাবতে পারত না—সবটাই তার এত সহজ স্বাভাবিক। কি ডাক্তার কি সে—কেউই খুলে বলেনি যে আগে তাদের মধ্যে যে সম্পর্কটা ছিল তা বদলেছে। বরং ওটা ওরা ঢেকে রাখতেই চেষ্টা করত, কিন্তু পারত না, কারণ ওলেংকার কথা গোপন রাখার ক্ষমতা ছিল না।

যখন ডাক্তারের সহকর্মীরা তার সঙ্গে দেখা করতে আসত, ওলেংকা তাদের চা ঢেলে দিতে দিতে বা যাবার সময় তুলত জীবজন্তুর মড়কের কথা। কিংবা বলত পশুদের কোন ব্যায়রাম অথবা সরকারী কসাইখানার বিষয়। ডাক্তার বেজায় অপ্রস্তুত হয়ে পড়ত। বন্ধুরা চলে যেতেই সে ওলেংকার হাত চেপে ধরে ফোঁস করে উঠত, "বার বার তোমাকে মানা করেছি যা তুমি বোঝ না তা নিয়ে কথা না বলতে। আমরা পশু-চিকিৎসকেরা যখন আলাপ-আলোচনা করি, দয়া ক'রে তুমি তার মধ্যে এসে পড়ো না। সত্যি ভারি রাগ হয়।"

ওলে'কা স্তম্ভিত হয়ে তার দিকে তাকাত, চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেসা করত, "তা হলে কী বিষয়ে কথা বলব, ভলদচ্‌কা?" তারপর জলভরা চোখে সে ডাক্তারকে জড়িয়ে ধরত, ডাক্তারকে দিব্যি দিত রাগ না করতে। তারপর দুজনেরই খোশমেজাজ ফিরে আসত।

এ আনন্দ বেশি দিন রইল না। ডাক্তার তার সৈন্যদলের সঙ্গে কোথায় গেল, একেবারের মতো। গোটা দলটাই বদলি হয়ে গেল দূর দেশে—হয়তো বা সাইবীরিয়াতেই। ওলেংকা একা পড়ে গেল।

এবারে সে একেবারেই একলা পড়ে গেল। তার বাবা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন, তাঁর সেই আরামকেদারাটা পড়ে আছে চিলকোঠার গুদোমে, ধুলোয় ভর্তি, একটা পায়া ভাঙা। ওলে'কা রোগা হয়ে গেল, তার চেহারায়ও আর সে শ্রী রইল না। রাস্তায় দেখা হলে আর তার দিকে কেউ আগের মত চাইত না, হাসত না। বোঝা গেল তার জীবনের সব চেয়ে ভালো দিনগুলো চলে গেল। সে দিন রইল পিছনে পড়ে, এখন যে জীবন শুরু হল তা আলাদা, অনিশ্চিত, তার কথা ভাবতেও বুক কেঁপে ওঠে।

সন্ধ্যেবেলায় বারান্দায় বসে ওলেংকা শুনত 'তিভোলি'তে বাজনা বাজছে, বাজি ফুটছে, কিন্তু তা শুনে তার কোনো কথাই মনে হত না। ফাঁকা উঠোনটার দিকে সে নির্লিপ্ত চোখে চেয়ে থাকত, কোন কথা ভাবত না, চাইত না কিছুই। দিন ফুরিয়ে গেলে ওলেংকা শুয়ে পড়ত, স্বপ্নে দেখত ফাঁকা উঠোনটা। খাওয়া-দাওয়া করত, যেন অনিচ্ছায়।

সব চেয়ে বড় আর বিশ্রী ব্যাপার হল যে তার আর কোন রকম মতামত রইল না। চোখে পড়ত নানা জিনিস, বুঝত কি হচ্ছে না হচ্ছে, কিন্তু কোন কিছু

সম্বন্ধেই একটা মতামত তার মনে গড়ে উঠত না। কি নিয়ে কথা বলা যায় তাও সে বুঝত না।

কী ভয়ংকর ব্যাপার—মতামত না থাকা! ধরো, দেখছ একটি বোতল অথবা বৃষ্টি, কিংবা দেখছ চাষী চলেছে গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে, কিন্তু বোতল, বৃষ্টি বা চাষী কি নিমিত্ত, কী তাদের তাৎপর্য—কিছুই বলতে পারছ না, হাজার রুপিয়া কবুল করলেও নয়!

যখন তার কুকিন্ ছিল অথবা পুস্তভালভ কিংবা পরে তার কাছে থাকত পশুর ডাক্তারটি—তখন ওলেংকা সব কিছুই বুঝিয়ে দিতে পারত, যা চাও তারই সম্বন্ধে একটা মত দিতে পারত। কিন্তু এখন তার মনটা ফাঁকা উঠোনটার মতো। বড় কষ্টমাখা, বড় বিস্বাদ এ জীবন।

শহরটা একটু করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। খোলামেলা রাস্তা জিপ্সী রোড্ হয়ে উঠল শহুরে সড়ক। যেখানে ছিল তিভোলির বাগানগুলো আর কাঠের গোলা, সেখানে বাড়ির সারির ফাঁকে ফাঁকে গলিঘুঁজি গজিয়ে উঠল। কী তাড়াতাড়ি কেটে যায় সময়!

ওলেংকার বাড়িটা শ্রীহীন হয়ে পড়ল। ছাতে মরচে ধরল, কুঁড়েঘর এক পাশে ঝুলে পড়ল, সারা উঠোনটা ভরে গেল লম্বা ঘাস আর বিছুটির ঝোপে। ওলেংকার নিজেরও বয়স হল, চেহারায় সে লাবণ্য আর রইল না।

গ্রীষ্মকালে সে বসত বারান্দাটায়, মন শূন্য, নিরানন্দ, বিরস। শীতে সে বসত জানলার ধারে, তাকিয়ে থাকত বরফের দিকে। কখনও বসন্তের বাতাসে অথবা হাওয়ায় ভেসে আসা গির্জার ঘণ্টাধ্বনিতে স্মৃতির বন্যা জেগে উঠত, তখন তার মন গলে যেত, চোখে জল ভরে আসত—কিন্তু তাও মুহূর্ত-স্থায়ী, সেটা চলে গেলেই আবার ফিরে আসত সেই শূন্যতা, জীবনের উদ্দেশ্যের সেই অনিশ্চয়তা।

কালো বেড়ালের বাচ্চা ব্রিস্কা তার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াত, ঘড়র ঘড়র শব্দ করত, কিন্তু ওসব বেড়ালী আদরে ওলেংকার মন সাড়া দিত না। ওর কি ঐটুকুরই দরকার? সে চাইত এমন ভালোবাসা যা তার সমস্ত আত্মা, তার মনকে দখল করবে, মনে জন্ম দেবে ধারণার, জীবনে আনবে গতিমুখ, পড়ন্ত বয়সের রক্তে এনে দেবে উষ্ণতা।

কালো বেড়ালবাচ্চাটাকে ওলেংকা তার কোল থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলত, "যা এখান থেকে, যাঃ! এখানে কী তোর? এখানে কিচ্ছু নেই।"

এমনি ভাবে চলত দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, কোনো মত নেই, অমত নেই, আনন্দের ছিটেফোঁটা নেই। রাঁধুনী মাভ্রা যা বলত, ওলেংকা তাই মেনে নিত।

একদিন—জুলাই মাস, গরম পড়েছে, সন্ধ্যের দিকে, গরুগুলো যখন ঘরে ফিরছে সারা উঠোনে ধুলো উড়িয়ে—সেই সময় কে যেন আচম্কা দরজায় ঘা দিল। ওলেংকা নিজেই গেল ফটক খুলতে, খুলে যা দেখল তাতে সে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল—দরজায় দাঁড়িয়ে পশুর ডাক্তার স্মিরনিন্। তার চুলে পাক

ধরেছে, পরনে বেসামরিক পোশাক।

এক মুহূর্তে ওলেংকার সব কথা মনে পড়ে গেল। সে নিজেকে সামলাতে পারল না, কেঁদে ফেলল। একটি কথাও না বলে সে স্মিরনিনের বুকে তার মাথা রাখল। এত ওলোট-পালোট হয়ে গেল তার মন যে, কখন যে স্মিরনিনকে ঘরে নিয়ে গিয়ে সে তার সঙ্গে চা খেতে লাগল তা সে বুঝতেই পারল না।

আনন্দে সে কেঁপে উঠল, মুখে কথা ফুটল, "ওগো ভ্লাদিমির প্লাতনিচ্, কী জন্যে এলে এখানে?"

স্মিরনিন্ বলল, "আমি এসেছি এখানে থাকব বলে। সৈনিকের চাকরি আমার শেষ হয়েছে। এবারে এখানেই বসবাস করে নিজে রোজগার করবার চেষ্টা দেখব; তা ছাড়া ছেলেটিও বড় হল, তাকে উচ্চশিক্ষা দিতে হবে। আর জানো, স্ত্রীর সঙ্গে মিটমাট করে ফেলেছি।"

ওলেংকা বললে, "কোথায় সে?"

"হোটেলে, আমার ছেলের সঙ্গে। আমি বেরিয়েছি একটা আস্তানা খুঁজতে। ভাড়া নেব।"

"সে কি কথা গো! আমার বাড়িটা নাও। ভাড়া! একটি পয়সা ভাড়া নেব না।" ওলেংকার মন আবার চঞ্চল হয়ে উঠল, সে কাঁদতে শুরু করলে। বলল, "তোমরা এখানে থাকো। আমার পক্ষে বাড়ির একটা ধারই যথেষ্ট। ওঃ কি আনন্দ যে হচ্ছে আমার!"

পরদিনই তারা ছাতে দু-এক পোঁচ রঙ আর দেয়ালে চুনকাম করতে লেগে গেল। ওলেংকা কোমরে হাত দিয়ে উঠোনটার চারদিক ঘুরে কাজের খবরদারী করতে লাগল। সেই পুরনো দিনের হাসি আবার তার মুখে ফুটে উঠল। মনে হল যেন লম্বা একটানা ঘুমের পর তার শরীর তাজা হয়ে প্রাণ ফুটে উঠেছে।

পশুর ডাক্তারের স্ত্রী এল। রোগা মেয়েটি, সাদাসিদে ছোট করে ছাঁটা চুল, মুখে একটা খামখেয়ালী ভাব। সঙ্গে তার ছোট ছেলেটি, সাশা, বয়স প্রায় দশ, কিন্তু সে আন্দাজে মাথায় খাটো। ফুলো ফুলো গালে টোল, উজ্জ্বল নীল চোখ। উঠোনে ঢুকেই সে বিড়ালটার পিছনে ছুটতে আরম্ভ করল, সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল খিল খিল হাসি—খুশী মনের ফুর্তির।

ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, "মাসি, এটা কি তোমার বেড়াল? ওর যখন বাচ্চা হবে, আমাকে দিও। মা ইঁদুর দেখে ভয়ানক ভয় পায়।"

ছেলেটির সঙ্গে ওলেংকার গল্প শুরু হল। চা খাওয়াল সে ছেলেটিকে। হঠাৎ তার বুকটা ভরে উঠল। মধুর একটা ভারে তার বুক কনকন করতে লাগল—ছোট্ট ছেলেটি যেন তার নিজের।

সন্ধ্যেবেলায় সে যখন খাবার ঘরে তার পড়া তৈরি করতে বসল, ওলেংকা তার দিকে চেয়ে রইল। মন মুখ তার স্নেহমমতায় ভরে উঠল। সে বলতে লাগল, নিচু গলায়, "আমার দুলাল, আমার মানিক, কত বুদ্ধি তোমার—কী

সুন্দর দেখতে তুমি !"

ছেলেটি জোরে জোরে পড়তে লাগল, বই দেখে, "দ্বীপ একটি ভূখণ্ড, সম্পূর্ণরূপে জলবেষ্টিত।"

ওলেংকা পুনরাবৃত্তি করল, "দ্বীপ একটি ভূখণ্ড।"

বহুদিনের ফাঁকা মন থেকে একটি কথা না ব'লে সে আজ এই প্রথম একটি মত প্রকাশ করল যাতে তার বিশ্বাস আছে।

এইবারে তার নিজস্ব মতামত গড়ে উঠতে আরম্ভ করল। রাত্রে খাবার সময় সে সাশার বাবা-মাকে শোনাতে লাগল যে, হাইস্কুলে ছেলেপিলেদের যা পড়ানো হয় তা কী রকম শক্ত। অবশ্য শুধু কারিগরীর কাজ শেখানোর চেয়ে উচ্চশিক্ষা ভালো, কারণ তার দ্বারা সমস্ত পথই খুলে যায়—চাও তুমি ডাক্তার হতে পারো···এঞ্জিনীয়ার হতে পারো···

সাশা হাইস্কুলেই যেতে শুরু করল। তার মা খারকভে তার বোনের বাড়ি গেল, গিয়ে আর ফিরল না। বাবা তার পশুর পাল দেখতে বেরোত, কখনো কখনো এক নাগাড়ে বাইরে থাকত। ওলেংকার মনে হত সবাই সাশাকে ছেড়ে চলে গেল, কেউ তাকে চায় না, না খেয়ে ছেলেটি মরে যাচ্ছে। ওকে সে সরিয়ে আনল নিজের পাশটিতে ছোট একটি কামরায়। সেখানেই তার থাকবার বন্দোবস্ত করে দিল।

ছ মাস হয়ে গেল। সাশা থাকে তার পাশেই। রোজ সকালে ওলেংকা যায় সাশার ঘরে। সাশা তখনও শুয়ে, গালের তলায়, হাতটি রেখে গভীর ঘুমে অচেতন, নিঃশ্বাস নিঃশব্দে উঠছে পড়ছে। ওলেংকার মনে কষ্ট হয় সাশার ঘুম ভাঙাতে। তবু বলে, আস্তে আস্তে, "সাশেনকা, উঠে পড়ো সোনা। ইস্কুলে যাবার সময় হল।"

সাশা ওঠে, পোশাক পরে প্রার্থনা সেরে খেতে বসে। খায় তিন গ্লাস চা, দুটো বড় কড়া কেক, মাখন-মাখানো আধখানা ছোট রুটি। ঘুম তখনও তার পুরোপুরি কাটেনি, তাই মেজাজটি তখনও ধাতস্থ হয়নি।

ওলেংকা বলে, "সাশেনকা, গল্পটা তোমার কিন্তু ভালো তৈরী হয়নি।"

এমন ভাবে চেয়ে থাকে সে তার দিকে, যেন ছেলেকে সে বিদায় দিচ্ছে দূর যাত্রার পথে।

"তোমার জন্য আমি ভেবে মরি। প্রাণপণ চেষ্টা করো সোনামণি, ভালো করে পড়াশুনো করো। মন দিয়ে মাস্টারদের কথা শুনো।"

সাশা বলে, "আঃ, আমাকে ছেড়ে দাও দিকি।"

তারপর হেঁটে রওনা হয় স্কুলে।

ছোট মূর্তিটি পথে চলেছে, মাথায় মস্ত একটা টুপি, কাঁধে একটা ঝুলি। ওলেংকা নিঃশব্দে পিছু পিছু যায়। ডাকে, "সাশেনকা—আ।"

সাশা যেই পিছন ফিরে তাকায় ওলেংকা ওর হাতে গুঁজে দেয় একটি খেজুর বা কারামেলের একটি টুকরো।

স্কুলের গলি এসে পড়ে। সাশেনকার বিশ্রী লাগে, লম্বা মোটা-সোটা একটি

মহিলা তার পিছু পিছু আসছেন, দেখে তার লজ্জা করে। পিছন ফিরে সে বলে, "মাসি, বাড়ি ফিরে যাও। এখন আমি একা যেতে পারব।"

ওলেংকা থামে, কিন্তু তার চোখ সরে না। স্কুলে ঢোকার পথটিতে ছেলে পেঁছে চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত সে তার দিকে তাকিয়েই থাকে। আঃ, কী ভালোই বাসে সে ছেলেটিকে। মায়ার ফাঁদে সে আগেও পড়েছে, কিন্তু কেউই তাকে এমন করে বাঁধতে পারেনি। আজ তার মায়ের মন জেগে ওঠে যত আনন্দে, যেমন করে তার আত্মাটাকে একেবারে বিলিয়ে দিয়েছে, তেমন কখনো হয়নি আগে। এই ছোট্ট ছেলেটি তার নিজের নয়, তবু তার গালের টোলটি, মাথার টুপিটার জন্য সে তার জীবন দিতে পারে, আনন্দে, মমতায়, জলভরা চোখে। কেন? কেন তা কে বলতে পারে?

সাশাকে স্কুলে পেঁছে দিয়ে ওলেংকা শান্ত মনে বাড়ি ফিরে যায়। মনভরা তার তৃপ্তি, প্রশান্তি, ভালোবাসা। গেল ছ মাসে বয়স যেন তার কমে গেছে, মুখে উজ্জ্বল আনন্দ। লোকে তাকে দেখে খুশী হয়, বলে, "সুপ্রভাত গো ওল্‌গা সেমইয়নভ্‌না, দুলালী, কেমন আছ দুলালী?"

সে বলে, "ইস্কুলে আজকাল এত শক্ত পড়া দেয়!" বাজারে ঘুরে কেনাকাটার ফাঁকে ফাঁকে সে বলতে থাকে, "ঠাট্টা নয়। কাল প্রথম ঘণ্টায় ওকে পড়া দিয়েছে একটা গল্প মুখস্থ, লাতিন থেকে একটা তরজমা আর একটি সমস্যাপূরণ। ঐটুকু একটা ছেলের পক্ষে এটা বড্ড বাড়াবাড়ি, বাস্তবিকই।"

তারপর সে আরম্ভ করে মাস্টারদের কথা, পড়ার কথা, পাঠ্য বইগুলোর কথা—সাশা যা বলে ঠিক তাই বলে।

তিনটের সময় ওরা একসঙ্গে খায়। সন্ধ্যেবেলায়, মাস্টাররা যে বাড়ির পড়া দেন তা ওরা পড়ে একসঙ্গে, একই সঙ্গে কাঁদে। সাশাকে বিছানায় শুইয়ে ওলেংকা প্রার্থনায় আর ক্রুসচিহ্ন আঁকায় অনেকক্ষণ লাগিয়ে দেয়। তারপর সে নিজে শুতে যায় আর স্বপ্ন দেখে সেই দূর, অস্পষ্ট ভবিষ্যতে, যখন সাশার পড়া শেষ হয়েছে, সে ডাক্তার বা এঞ্জিনীয়ার—তার মস্ত একটা বাড়ি, ঘোড়াগাড়ি। বিয়ে হয়েছে, ছেলে মেয়ে হয়েছে·· এই কথাই ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমন্ত চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। পাশে কালো বেড়ালটা শুয়ে আওয়াজ করে···ঘড়র···ঘড়র।

হঠাৎ দরজায় জোরে ঘা পড়ে। ওলেংকার ঘুম ভেঙে যায়। ভয়ে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, বুক ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। আধ মিনিট বাদে আবার ঘা।

ওলেংকার সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে থাকে। সে ভাবে, "খারকভ্‌ থেকে এসেছে তার। সাশার মা তাকে চেয়ে পাঠিয়েছে। হা ভগবান!"

সমস্ত আশাভরসা তার উবে যায়, মাথা হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে, মনে হয়, তার মত অভাগিনী জগতে আর কেউ নেই।

কিন্তু আরও এক মুহূর্ত কেটে যাবার পর সে কার যেন গলা শুনতে পায়; কিছু নয়, পশুর ডাক্তার ক্লাব থেকে ঘরে ফিরল।

ওলেঙ্কা মনে মনে বলে, "যাক। ধন্য ভগবান!" ক্রমে ক্রমে তার বুকের ওপর থেকে ভারটা সরে যায়। আশ্বস্ত হয়ে সে ফিরে যায় বিছানায়, আর সাশার কথা ভাবে। পাশের ঘরে ঘুমোয় সাশা আর মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠে ঘুমের ঘোরে, "দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা! এই, ওকি, মারামারি নয়!"

* * *

গল্পটি চেখফের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। কেউ কেউ বলেন, দি বেস্ট্ শর্ট স্টরি অব চেখফ। আবার কেউ কেউ বলেন, পৃথিবীর সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠ গল্প।

কেন?

তারই টীকা করেছেন স্বয়ং টলস্টয়। এরকম একটা ঘটনা এই বাংলাদেশেই ঘটেছিল। প্রভাত মুখুয্যে একটা ছোট গল্প লিখেছিলেন। তার মূলে বক্তব্য ছিল, হিন্দুর 'নীচ' জাতির একটি ছেলে অপমানিত বোধ করে খৃষ্টান হবে বলে মনস্থির করলে। তখন দেখে, খৃষ্টানদের ভিতরও জাতিভেদ রয়েছে। নেটিভ খৃষ্টানদের জন্য আলাদা ক্লাব, এমন কি ধর্মমন্দির—চার্চ সেও আলাদা, এবং সবচেয়ে অবিশ্বাস্য মৃত্যুর পরও জাতিভেদ যায় না: গোরার জন্য ভিন্ন গোরস্থান, নেটিভের ভিন্ন গোরস্থান। গল্পটি পড়ে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ, সে যুগের ঋষিপ্রধান দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একটি সমালোচনা লেখেন—'ডাঙায় বাঘ জলে কুমীর'। হিন্দুর বর্ণাশ্রম সমস্যা নিয়ে এরকম প্রামাণিক প্রবন্ধ এর পূর্বে বা পরে কখনো লিখিত হয়নি। 'হরিজন' আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার বহু বহু পূর্বে।

টলস্টয়ের টীকা পড়ে পাঠক বুঝবেন, আমরা, সাধারণ-পাঠক, কত সহজেই গল্পটির মূল বক্তব্য মিস করে যেতে পারি। অনবদ্য এই টীকাটি।

টীকাটি প্রকাশিত হওয়ার পর চেখফ সর্বসাধারণকে অনুরোধ জানান তাঁর গল্পটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন টীকাটি পড়েন এবং প্রকাশকদের অনুরোধ করেন, তাঁরা যেন সর্বসময়ই গল্পটির সঙ্গে টীকাটিও ছাপেন। ইটিও অনুবাদ করেছেন সখা খাফী খান।

দুলালী ("দুশেচকা")র সমালোচনা

তলস্তয়

বাইবলের গণনাপুস্তকে একটি গল্প আছে, তার অর্থ অতি গভীর। গল্পটিতে বলা হয়েছে, ইস্রাএলীরা যখন মোআবের রাজ্যসীমায় এসে উপস্থিত হল, মোআবীয়দের রাজা বালাক্ তখন নবী বালআমকে ডেকে পাঠালেন ইস্রাএলীদের অভিসম্পাত দেবার জন্য ; কাজটি সেরে দিলে বালাক্ বালআমকে বহু পুরস্কার দেবেন। তার লোভে বালআম বালাকের কাছে গেলেন এবং তাকে নিয়ে উঠলেন পর্বতে। সেখানে একটি বেদী তৈরী করা হল, গোবৎস ও মেষ উৎসর্গ করা হল অভিশাপের উদ্যোগে। বালাক্ রইল অভিশাপের প্রতীক্ষায়, কিন্তু বালআম ইস্রাএলের লোকদের অভিসম্পাত না দিয়ে তাদের আশীর্বাদ করলেন।

২৩ পরিচ্ছেদ ১১ চরণ ঃ "বালাক্ বালআমকে কহিল, তুমি আমার প্রতি এই কি করিলা ? আমার শত্রুগণকে শাপ দিতে তোমাকে আনিলাম, কিন্তু দেখ তুমি তাহাদিগকে সর্বতোভাবে আশীর্বাদ করিলা।"

তাহাতে সে উত্তর করিল, পরমেশ্বর আমার মুখে যা কথা দেন, সাবধান হইয়া তাহাই কহা কি আমার উচিত নহে ?

"১৩। পরে বালাক্ কহিল, আমি মিনতি করি, অন্যস্থানে আমার সহিত আসিয়া সেখানে থাকিয়া আমার নিমিত্ত তাহাদিগকে শাপ দেও।"

কিন্তু আবার শাপ না দিয়ে বালআম আশীর্বাদ করলেন। তৃতীয় বারেও তাই।

২৫ পরিচ্ছেদ ১০ম চরণ, তখন বালআমের প্রতি বালাকের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, সে আপনা হস্তে হস্তের আঘাত করিল এবং ··বালআমকে কহিল, শত্রুগণকে শাপ দিতে আমি তোমাকে আনিলাম, কিন্তু দেখ তুমি তিন বার সর্বতোভাবে তাহাদের আশীর্বাদ করিলা।

"১১। অতএব তুমি এখন স্বস্থানে পলায়ন কর ; আমি তোমাকে অতিশয় সম্মানিত করিব ভাবিয়াছিলাম কিন্তু দেখ পরমেশ্বর তোমায় সম্মান পাইতে নিবৃত্ত করিলেন।"

তখন বালআম পুরস্কার লাভ না করেই প্রস্থান করলেন, কারণ তিনি বালাকের শত্রুদের অভিসম্পাতের পরিবর্তে দিলেন আশীর্বাদ।

বালআমের যা হয়েছিল প্রকৃত কবি ও রসস্রষ্টাদের প্রায়ই তা হয়। বালাকের পুরস্কার জনপ্রিয়তার লোভে কিংবা ভ্রান্ত ধারণার বশে কবি দেখে না যে তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে দেবদূত, গাধাও যাকে দেখতে পায়।[১] চায় সে

---

১ বালাকের আমন্ত্রণে বালআম যখন যাত্রা শুরু করে তখন তার পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল য়িহুহের দূত। বালআম তাকে দেখতে পায়নি, কিন্তু যে গাধার পিঠে চড়ে সে আসছিল সে পেয়েছিল দেখতে—অনুবাদক।

অভিশাপ দিতে, কিন্তু অহো ! সে দেয় আশীর্বাণী।

ঠিক তাই হল খাঁটি কবি এবং রসস্রষ্টা চেখফের মনোহর এই "দুলালী" গল্পটি লেখবার বেলায়।

লেখক নিশ্চিত চেয়েছিলেন কৃপার পাত্রী এই জীবটিকে উপহাস করতে। হৃদয় দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেছিলেন দুলালীকে—যে প্রথমে কুকিনের দুশ্চিন্তার বোঝা কাঁধে তুলে নেয়, তারপর কাঠ কেনা-বেচার বিষয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে,তারপর পশুর ডাক্তারের আওতায় এসে গরু-মহিষের ব্যামোকেই পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার বলে ঠিক করে, আর শেষে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ব্যাকরণের প্রশ্ন এবং মস্ত টুপি পরা ছোট্ট বাচ্ছাটির ভালোমন্দ নিয়ে।

কুকিন্ পদবীটি উদ্ভট, তার অসুখ, যে টেলিগ্রামে তার মারা যাবার খবর জানানো হল তাও উদ্ভট, কাঠের ব্যাপারী আর খানদানী ঠাট পশুর ডাক্তার, এমন কি ছোট্ট ছেলেটি, সবাই, সবই উদ্ভট, কিন্তু দুলালী, তার অন্তর, যাকেই সে ভালবাসে তারই মধ্যে তার সমস্ত সত্তার নিবেদন—এ উদ্ভট নয়, অনির্বচনীয় পবিত্র।

আমার বিশ্বাস, "দুলালী" গল্পটি লেখার সময়ে লেখকের—হৃদয়ের নয়—মনে ছিল একটি অস্পষ্ট মূর্তি, নব্য নারীর, স্বয়ং পুরুষের সমকক্ষ, মানসিক উৎকর্ষসম্পন্ন, শিক্ষিতা, সমাজহিতব্রতে স্বয়ং-নিযুক্ত দক্ষতায় পুরুষের তুল্য কিংবা আরও সুদক্ষ, নারীসমস্যা কথাটা যে তুলেছে এবং তোলে।

"দুলালী" লিখে লেখক দেখাতে চেয়েছিলেন মেয়েদের কী হওয়া উচিত নয়। জনমত বালাক্-চেখফকে বলেছিল, দুর্বল, একান্ত অনুগত, অনুন্নত, পুরুষসেবায় নিয়োজিত স্ত্রীদের অভিশাপ দাও। চেখফ পর্বতে উঠলেন, বেদীর উপর গোবৎস এবং মেষ রেখে দেওয়া হল, কিন্তু যখন তাঁর মুখ খুলল, তখন, যাদের শাপ দিতে এসেছিলেন তাদের তিনি শোনালেন আশীর্বচন।

অনবদ্য স্বচ্ছ পরিহাসের রসে লেখা অপরূপ এই গল্পটি ঃ তবু, এর কোনো কোনো অংশ পড়তে গিয়ে আমি অন্ততঃ আমার চোখের জল সামলাতে পারি নি। মন ভিজেছে—কুকিন্, যা কিছু নিয়ে কুকিন্ মেতে থাকে, কাঠ-ব্যবসায়ী, পশুর ডাক্তার এসবের প্রতি দুলালীর একান্ত অনুরাগ ও অভিনিবেশের বিবরণ পড়ে ; আরও বেশী যখন সে একা, আর তার ভালোবাসার কেউ নেই—তখন তার যে যন্ত্রণা, তার বিবরণ, আর সবার শেষে, নারীর মাতৃত্বের যে অনুভূতি তার নিজের জীবনে সে পায়নি তার সমস্ত শক্তি এবং অপরিসীম প্রেম যখন সে নিয়োগ করে ভবিষ্যতের মানব মস্ত বড় টুপি-পরা ইস্কুলের ছেলেটির মধ্যে, তার বিবরণ প'ড়ে।

লেখক মেয়েটিকে ভালোবাসালেন উদ্ভট এক কুকিন্‌কে, নগণ্য এক কাঠ-ব্যবসায়ীকে, কাঠখোট্টা এক পশুর ডাক্তারকে, কিন্তু প্রেমের পাত্র একটা কুকিনই হোক আর একটি স্পিনোজা পাস্কাল বা শিলারই হোক, প্রেমাস্পদ ঘন ঘন বদলাক—যেমন দুলালীর বেলায়—অথবা চিরকাল একই থাক, প্রেম তাতে কিছু কম পবিত্র হয় না।

কিছুদিন আগে আমি 'নোভোয়ে ভ্রেম্‌ইয়া' কাগজে নারী সম্বন্ধে চমৎকার একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। প্রবন্ধটিতে লেখক নারীদের সম্বন্ধে অতি চতুর এবং বড় গভীর একটি মতবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, "মেয়েরা আমাদের দেখাতে চেষ্টা করছে যে যা কিছু আমরা পুরুষেরা পারি, তারাও পারে। এ নিয়ে আমার বিবাদ নয়; আমরা মানতে রাজি যে পুরুষেরা যা পারে মেয়েরাও তার সবই পারে, হয়তো পুরুষের চেয়ে ভালোই পারে। কিন্তু মুশকিল এই যে, মেয়েরা যা পারে পুরুষদের কীর্তি তার ধারেকাছেও যেতে পারে না।"

ঠিক, কথাটি যে সত্য তাতে সন্দেহ নেই। এবং এটি যে শুধু শিশুর জন্মদান, লালন-পালন ও বাল্যশিক্ষার ক্ষেত্রেই সত্য তাই নয়। পুরুষ সেই সর্বাধিক উন্নত শ্রেষ্ঠ কার্যটি সাধন করতে পারে না যার দ্বারা মানুষ ঈশ্বরের নিকটতম সন্নিধানে আসতে পারে—এই কীর্তি—প্রেম, প্রেমাস্পদে একনিষ্ঠ আত্মনিয়োগ। এটি শ্রেষ্ঠ নারী পেরেছে, পারে এবং পারবে—অতি উত্তমভাবে এবং সহজ স্বাভাবিক উপায়ে। কী হত এই জগতের যদি মেয়েদের এই ক্ষমতাটি না থাকতো এবং যদি এর প্রয়োগ তারা না করতো!

মেয়ে ডাক্তার, টেলিগ্রাফের কেরানী, নারী বৈজ্ঞানিক, মেয়ে উকীল, লেখিকা—এ সব না থাকলেও আমাদের চলতো, কিন্তু যারা মানুষের মধ্যে যা সর্বোত্তম তাকে ভালোবাসে এবং সেইটিকে অগোচরে তার মধ্যে সঞ্চালিত, উদ্বুদ্ধ করে তার সহায় হয়, সেই মা, সহায়িকা, সান্ত্বনাদাত্রী—তারা না থাকলে জীবনটা বিপরীত একটা ব্যবহার হয়ে উঠতো। যীশুখ্রীষ্টের কাছে কোনো মগ্‌দলীনি আসত না, সাধু ফ্রান্সিসের সঙ্গে ক্লারা থাকত না, ডিসেম্বরের বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাদের পত্নীরা সাইবীরিয়ায় যেত না, দুখবরদের স্ত্রীরা যে তাদের স্বামীদের সত্যের জন্য আত্মদানের পথ থেকে না সরিয়েদিয়ে বরং সেইপথেই তাদের প্রবৃত্ত করেছিল, তাও হত না। থাকত না সেই হাজার হাজার অজানা মেয়েরা—নারীকুলশ্রেষ্ঠা এরা—অজ্ঞাতেরা চিরকালই যা হয়—যারা সান্ত্বনা দেয় মদ্যপ, দুর্বল, উচ্ছৃঙ্খল জনকে, প্রেমস্নিগ্ধ সান্ত্বনার প্রয়োজন যাদের সবার চেয়ে বেশী। এ প্রেম যাতেই প্রযুক্ত হোক্, কুকিনে বা খ্রীষ্টে, এইটেই নারীর প্রধান, মহীয়সী, অনন্যলভ্যা শক্তি।

কী প্রচণ্ড বোঝার ভুল, এই সব তথাকথিত নারীসমস্যা—যার কবলে পড়েছে শুধু মেয়ে নয়, পুরুষদেরও বেশীর ভাগ। অর্বাচীন যে কোনো ধারণার কবলে এরা পড়বেই।

"মেয়েদের মন চায় নিজেদের উন্নতি।" এর চেয়ে ন্যায় যুক্তিসঙ্গত কথা আর কী হতে পারে?

কিন্তু স্বভাবগুণে মেয়েদের কাজ পুরুষদের কাজ থেকে ভিন্ন। অতএব মেয়েদের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের আদর্শ এবং পুরুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের আদর্শ এক হতে পারে না। মেনে নেওয়া যাক যে মেয়েদের আদর্শ কী তা আমরা জানি না। যাই হোক সেটা, এটা নিশ্চিত যে সেটা পুরুষের চরম উৎকর্ষের আদর্শ নয়। অথচ, নারীজাতির পথকণ্টক এই শৌখীন নারী আন্দোলনের সমস্ত

উদ্ভট কার্যকলাপের লক্ষ্য হচ্ছে ঐ পুরুষালী আদর্শে পেঁছিনো।

আমার মনে হয়, এই ভুল বোঝার প্রভাব চেখফের উপর পড়েছিল "দুলালী" লেখবার সময়।

বালআমের মতো তিনি চেয়েছিলেন অভিশাপ দিতে, কিন্তু কাব্যদেবতা তাঁকে নিষেধ করলেন, আদেশ দিলেন আশীর্বাদ করতে। আশীর্বাদই তিনি করলেন এবং অজ্ঞাতে এমন অপূর্ব প্রভামণ্ডিত করলেন এই মাধুরীময়ী প্রাণী-টিকে যে সে চিরকালের মতো একটি দৃষ্টান্ত হয়ে রইল—যে নিজে আনন্দ চায় এবং নিয়তি যাকেই তার সান্নিধ্যে আনে তাকেই আনন্দ দিতে চায়, এমন একটি নারী যে কী হতে পারে তার।

গল্পটি যে এত অপরূপ তার কারণ, এর পরিণতি পূর্বকল্পিত নয়।

আমি বাইসিকেল চালাতে শিখেছিলাম একটা হলঘরে। সেটা এত বড় যে তার মধ্যে একটি সৈনবাহিনী কুচকাওয়াজ করতে পারে। অপর প্রান্তে একটি মহিলা শিখছিলেন বাইসিকেল চড়া। আমি ভাবলাম, হুঁশিয়ার থাকব, ওঁর উপর চোখ রাখলাম। চেয়ে থাকতে থাকতে ক্রমেই আমি ওঁর দিকে এগিয়ে পড়তে লাগলাম। উনি বিপদ দেখে তাড়াতাড়ি পিছু হটতে আরম্ভ করলেন। তবু আমি গিয়ে পড়লাম ওঁর ঘাড়ের উপর, ধাক্কা মেরে বাইসিকেল থেকে তাঁকে ফেলে দিলাম—অর্থাৎ যা চেয়েছিলাম তার উল্টোটাই করে বসলাম—শুধু এই কারণে যে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মহিলাটির উপর।

চেখফেরও তাই হল, বিপরীত মুখে। উনি চেয়েছিলেন দুলালীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে, কিন্তু তাঁর কবির দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ থাকায় তিনি দিলেন তাকে তুলে।

এই টীকাটি পড়ার পর আর কার কি বলবার থাকে?

[চেখফ বলেছিলেন, এর চেয়ে বড় সম্মান আমি আমার জীবনে আর কী আশা করতে পারি?

সত্যেন্দ্রনাথ যখন একদিন দেখলেন, কবিগুরু তাঁর একটি বাঙলা কবিতা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ইংরিজিতে অনুবাদ করেছেন (অর্থাৎ নিজের সৃজনীকর্ম মুলতুবী রেখে) তখন তাঁর হৃদয়ে কী শ্লাঘার উদয় হয়েছিল তার কি কল্পনাও আমরা করতে পারি!]

ধন্য 'দুলালী'র প্রেম। তা সে যাকেই বাসুক না, যতবারই বাসুক না কেন। রমণীর এই প্রেমই তো জগৎকে শ্যামল করে রেখেছে।

কিন্তু আমার মনে একটি প্রশ্নের উদয় হয়। সহৃদয় পাঠক আমার দম্ভ ক্ষমা করবেন।

আন্তন চেখফ: 'The Darling and other short stories', রুশ কনস্ট্যান্স গার্নেটের তরজমা, London, Chatto & Windus, 1918.

'দুলালী' যখন ভানিচ্‌কাকে ভালোবাসছে তখন যদি হঠাৎ ভাসিলিকে দেখে তার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে হৃদয়হীনার মত হৃদয় খান খান করে তার প্রেমকে পদদলিত করে (ইংরিজিতে যাকে বলে তাকে 'জিল্‌ট্‌' করে) ভাসিলিকে বরণ করতো তখনও 'দুলালী'র সে-প্রেম ধন্য ?

ঠাকুর-দেবতার কার্যকলাপ আমাদের সমালোচনার বাইরে। এই যে কেষ্ট-ঠাকুর রাধাকে জিল্‌ট্‌ করে মথুরা গিয়ে একাধিক প্রণয় এবং শুধু তাই নয়, রাধার কানের কাছে ঢাকঢোল বাজিয়ে বিয়ে করলেন, সেগুলোও ধন্য ? অথচ আমাদের হৃদয় তো পড়ে রইল শ্রীরাধার রাঙা পায়ে। শত শত বৎসর ধরে এই বাঙলাদেশে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরা আপন আপন বিরহবেদনা আপন আপন পদদলিত প্রেমের নিবিড়তম পীড়া তুলে দিলেন রাধার মুখে। তাই দিয়ে 'মাথুর' আর সেই জিনিসই পদাবলীর হৃদয়খণ্ড,—মেরুদণ্ড—যে নামেই তাকে ডাকা যাক। পৃথিবীর ইতিহাসে এর তুলনা আমি পাইনি ঃ শত শত বৎসর ধরে হাজার হাজার কবি (এবং সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়, তার ভিতর নাকি প্রায় শ'তিনেক বিধর্মী মুসলমান কবি ! ভাবলে আশ্চর্য বোধ হয়, এই অভাগিনী জিলটেড রাধার প্রেমে কী যাদুমন্ত্র লুকনো ছিল যে শত শত বিধর্মী কবিকেও তার সামনে নতমস্তক হতে হল !) আপন আপন হৃদয়বেদনা—যার মূল্য বিশ্বাসঘাতক, প্রেমঘ্ন নিরতিশয় স্বার্থপর, নীচ দয়িত দিল না—নিজের মুখে প্রকাশ না করে সর্ব বৈভব নত নমস্কারে রেখে দিল পাগলিনী শ্রীরাধার অধরোষ্ঠে। তার হয়তো একমাত্র কারণ, উপনিষদ বলেছেন, 'তাকে ত্যাগ করে ভোগ করবে'। শ্রীরাধা প্রেম দিয়ে আনন্দ পেতে চাননি, মাতৃত্বের বিগলিত মধুরিমা, যশোদার মতো বিশ্বজয়ী পুত্রের গৌরবও তিনি কামনা করেননি। তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে ভোগ করলেন। এ ভোগ 'দুলালী'র ভোগ নয়। এ শচীপতি ইন্দ্রের ভোগ নয়, এ শ্মশানবাসী নীলকণ্ঠের বৈরাগ্য। কিন্তু আশ্চর্য, রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে পদদলিত প্রেমের উদাহরণ নেই। যাঁর জন্য তাঁর বিরহবেদনা তাঁর শত শত গানে প্রকাশ পেয়েছে তিনিও কবিকে ভালোবাসেন—তাঁর 'প্রেমের বেদনা'তে কবির 'মূল্য আছে'—শুধু তিনি চলে গেছেন দূরে। রবিপ্রেম কখনো লাঞ্ছিত হয়নি। সে অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না।

কিন্তু এ তো একটা দিক। আমার মূল প্রশ্ন এখনো পাঠকের কাছে রইল, অতি ঘরোয়া ভাষায় শুধোই, এই যে আমাদের সোসাইটি লেডি, আজ মুখুয্যেকে জিল্‌ট্‌ করে কাল সেনকে, পরশু সেনকে জিল্‌ট্‌ করে ঘোষকে—তাঁর প্রত্যেক প্রেমের জয়ধ্বনি গাইবেন টলস্টয় ?

সর্বশেষে পুনরায় বিস্ময় মানি চেখফের এই গল্পটির সামনে। বিস্ময় মানি টলস্টয়ের টীকার সম্মুখে। আমাদের মত জড় পাষাণ-হৃদয়কে বিগলিত করে বইয়ে দিল শত শত প্রশ্নধারায়।

আন্তন চেখফের "বিয়ের প্রস্তাব"
অনুবাদকের টিপ্পনী

আন্তন চেখফের রচনায় রাশার যে-যুগের বর্ণনা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে আমাদের জমিদার-যুগের প্রচুর মিল দেখতে পাই। সেই কারণেই বোধ হয় আমাদের শরৎচন্দ্র প্রচুর রাশান উপন্যাস, ছোট গল্প অতিশয় মনোযোগ সহকারে পড়েছিলেন। শরৎচন্দ্র অসাধারণ শিল্পী, তাই তাঁর পরিণত বয়সের লেখাতে অন্যের প্রভাব খুঁজতে যাওয়া নিষ্ফল। তবে যদি কোন সাহিত্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করে থাকে তবে সেটা রুশ সাহিত্য। তাঁর 'দত্তা'র সঙ্গে এ-নাটিকার কোন মিল নেই, কিন্তু দুটিতেই আছে একই জমিদারির আবহাওয়া।

চেখফ যে যুগের বর্ণনা দিয়েছেন সে সময় একই লোককে ভিন্ন ভিন্ন জন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ডাকত। যেমন এই নাটিকার নাম নাতালিয়া স্তেপানভনা চুবুকফ। অতি অল্প পরিচয়ে লোক তাকে ডাকবে মিস চুবুকফ বলে। যাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়েছে, তারা ডাকবে নাতালিয়া স্তেপানভনা (স্তেপানভনা = স্তেপানের মেয়ে)। যাদের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় তারা ডাকবে শুধু নাতালিয়া, এবং যারা নিতান্ত আপন জন তারা ডাকবে নাতাশা। এখনো বোধ হয় এই রীতিই প্রচলিত আছে, তবে যে-স্থলে মিস চুবুকফ বলা হত আজ বোধ হয় সেখানে কমরেড চুবুকফ বা চুবুকভা বলা হয়।

পাত্র-পাত্রীগণ ঃ

স্তেপান স্তেপানভিচ্ চুবুকফ—জমিদার।

নাতালিয়া (ডাকনাম নাতাশা) স্তেপানভ্না চুবুকফ—ঐ জমিদারের কন্যা ; বয়স ২৫।

ইভান ভাসিলিয়েভিচ্ লমফ—চুবুকফের প্রতিবেশী জমিদার, স্বাস্থ্যবান হৃষ্ট-পুষ্ট লোক, কিন্তু সমস্তক্ষণ ভাবেন তিনি বড্ডই অসুস্থ (হাইপোক্রোন্ডিআক)।

ঘটনা চুবুকফের জমিদারীতে।

[চুবুকফের ড্রইংরুম। চুবুকফ এবং লমফ ; ঈভনিং ড্রেস এবং সাদা দস্তানা পরে লমফের প্রবেশ]

চুবুকফ ঃ [লমফের দিকে এগিয়ে গিয়ে] এস, এস, বন্ধুবর ! এ যে একেবারে অপ্রত্যাশিত, ইভান ভাসিলিয়েভিচ্ ! কিন্তু বড় আনন্দ হল, বড়ই আনন্দ হল [হ্যাণ্ডশেক্]। সত্যি একেবারে তাক লাগিয়ে দিলে, ভায়া। কি রকম আছ ?

লমফ ঃ ধন্যবাদ। আর আপনি কি রকম আছেন ?

চুবুকফ ঃ মোটামুটি আমাদের ভালোই যাচ্ছে, বাছা—তোমাদের প্রার্থনা আর-যা-সব-কি-সব তো রয়েছে। বসো, বসো। জানো, এরকম করে পুরনো দিনের প্রতিবেশীকে তোমার ভুলে যাওয়া উচিত নয় ? বড় খারাপ, বড্ডই খারাপ। কিন্তু বলো দিকিনি, এত সব ধড়াচুড়ো পরে কেন। পুরোপাক্কা

ফুল ডিনার ড্রেস, হাতে দস্তানা আর-যা-সব-কি-সব ? কারো সঙ্গে পোশাকী দেখা করতে যাচ্ছো নাকি, না অন্য কিছু ভায়া ?

লমফ ঃ আজ্ঞে না, শুধু আপনাদের সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি।

চুবু ঃ তবে ফুল ডিনার ড্রেস কেন, ভায়া। মনে হচ্ছে তুমি যেন নববর্ষে পোশাকী মোলাকাৎ করতে এসেছ !

লমফ ঃ ব্যাপারটা হচ্ছে (চুবুকফের হাত ধরে)···আমি কি না, আমি এসেছি আপনার কাছ থেকে একটা অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে, স্যার—শুধু আশা করছি আপনি বিরক্ত হবেন না। আপনার কাছ থেকে এর আগেও আমি সাহস করে কয়েকবার সাহায্য চেয়েছি এবং আপনিও, সব সময়েই, বলতে কি··· কিন্তু মাফ করুন, আমার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমি একটুখানি জল খাই। [জলপান]

চুবু ঃ [নেপথ্যে] টাকা ধার চাইতে এসেছে নিশ্চয়ই। দেব না। [লমফকে] কি হয়েছে, বলো না ভায়া।

লমফ ঃ দেখুন স্যার,···কিন্তু মাফ করুন, স্যার···আমার সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে ···দেখতেই পাচ্ছেন···মানে কি না, আপনিই একমাত্র লোক যিনি আমায় সাহায্য করতে পারেন, যদিও সত্যি বলতে কি, আমি এযাবৎ আপনার জন্য এমন কিছু করতে পারিনি যার জন্য আপনার কাছ থেকে সাহায্য প্রত্যাশা করতে পারি, সত্যি, আমার সে হক্ক আদপেই নেই···

চুবু ঃ কী বিপদ ! অত সুতো ছাড়ছ কেন ভায়া। বলেই ফেল না, কি হয়েছে বলো।

লমফ ঃ বলছি, বলছি, এখুখুনি বলছি···ব্যাপারটা হচ্ছে এই, আমি আপনার মেয়ে নাতালিয়া স্তেপানভ্নাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

চুবু ঃ (সোল্লাসে) ইভান ভাসিলিয়েভিচ্ ! প্রাণের বন্ধু আমার ! ফের বলো তো, কি বললে। আমি ঠিক ঠিক শুনতে পাইনি।

লমফ ঃ অতিশয় সবিনয় নিবেদন জানাচ্ছি ··

চুবু ঃ (বাধা দিয়ে) সোনার চাঁদ ছেলে ! আমি যে কী খুশী হয়েছি আর-যা-সব-কি-সব। নিশ্চয় নিশ্চয় আর-যা-সব-কি-সব। [লমফকে আলিঙ্গন ও চুম্বন] ঠিক এই জিনিসটিই আমি বহুকাল ধরে চাইছিলুম [এক ফোঁটা চোখের জল] তোমাকে আমি চিরকালই আপন ছেলের মত স্নেহ করেছি। ভগবান তোমাদের হৃদয়ে একে অন্যের জন্য প্রেম দিন, তোমাদের মনের মিল হোক, আর-যা-সব-কি-সব। সত্যি বলতে কি, আমি সব সময়েই চেয়েছিলুম···কিন্তু আমি এখানে বেকুবের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছি কি ? আমাকে কেউ যেন আনন্দের ডাঙশ মেরেছে—আমার মাথায় কিছু আসছে না ! আহা, আমার সমস্ত হৃদয় ঢেলে—আমি গিয়ে নাতাশাকে ডাকছি, আর-যা-সব-কি-সব—

লমফ ঃ স্যার, উনি কি বলবেন আপনার মনে হয় ? তিনি সম্মতি দেবেন, আশা করতে পারি ?

চুবু ঃ কি বললে ? নাতাশা যদি রাজী নাও হতে পারে ! অবাক করলে ! আর তোমার চেহারাটাও চমৎকার নয় ? ধরো বাজি, ও তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, আর-যা-সব-কি-সব। আমি এখুনি তাকে বলছি গে।

[নিষ্ক্রমণ]

লমফ ঃ [একা] আমার শীত-শীত করছে···আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছে,যেন পরীক্ষার হলে যাচ্ছি। আসল কথা হচ্ছে, মন স্থির করা। বেশী দিন ধরে শুধু যদি ভাবতেই থাকো, এর সঙ্গে ওর সঙ্গে শুধু আলোচনা করো, গড়িমসি গড়িমসি করতে থাকো, আর কোন এক আদর্শ রমণীর জন্য, কিংবা খাঁটি সত্য প্রেমের জন্য পথ চেয়ে থাকো, তবে তোমার কখ্খনো বিয়েই হবে না। উহুহুহু··· কী শীত করছে আমার ! নাতালিয়া স্তেপানভ্না সংসার চালায় চমৎকার, লেখাপড়ি করেছে আর দেখতেও খারাপ নয়···এর বেশী আমার কীই বা চাই ? কিন্তু আমি ভয়ংকর উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। মাথাটা তাজ্জিম মাজ্জিম করছে। [জলপান] কিন্তু আমার আইবুড়ো হয়ে থাকা চলবে না। পয়লা কথা, আমার বয়েস পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় ঃ আমাকে মেপেজুকে ছকে কাটা জীবন চালাতে হবে···আমার বুকের ব্যামো রয়েছে, ভিতরটা সর্বক্ষণ ধড়ফড়···আমি কত সহজেই রেগে কাঁই হয়ে যাই আর কত সহজেই উত্তেজনার চরমে পেঁছে যাই···এই তো, এই এখ্খুনি আমার ঠোঁট কাঁপছে আর ডান চোখের পাতাটা নাচছে ··কিন্তু সব চেয়ে বিপদ হল আমার ঘুম নিয়ে। বিছানায় যেই শুয়েছি আর চোখ দুটো জুড়ে আসছে অমনি কি যেন কি একটা আমার বাঁ পাশটায় ছোরা মারে। একেবারে ছোরা মারার মত ! আর সেটা সরাসরি আমার কাঁধের ভিতর দিয়ে গিয়ে মাথা অবধি পেঁছে যায়···আমি খ্যাপার মত লাফ দিয়ে উঠি, খানিকটা পায়চারি করি, ফের শুয়ে পড়ি ··কিন্তু যেই না আবার ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে এল আর অমনি আবার পাশের দিকটায় সেই ছোরার ঘা—আর ঐ একই ব্যাপার নিদেন কুড়িটি বার ··

[নাতালিয়ার প্রবেশ]

নাতালিয়া ঃ ও, আপনি ! অথচ বাবা বললেন ঃ যাও খদ্দের মাল নিতে এসেছে। কি রকম আছেন, ইভান ভাসিলিয়েভিচ্ ?

লমফ ঃ আপনি কি রকম, নাতালিয়া স্তেপানভ্না ?

নাতালিয়া ঃ কিছু মনে করবেন না, আমার এপ্রন পরা রয়েছে, ভদ্রদুরুস্ত জামা কাপড় পরিনি বলে। আমরা মটরশুঁটির খোসা ছাড়াচ্ছিলুম রোদ্দুরে শুকোবার জন্যে। এতদিন আমার সঙ্গে যে বড় দেখা করতে আসেননি ? বসুন না···[দুজনেই বসলেন] দুপুর বেলা এখানে খাবেন ?

লমফ ঃ না। অনেক ধন্যবাদ। আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে।

নাতালিয়া ঃ সিগরেট খাবেন না ? এই তো দেশলাই···আজকের দিনটা চমৎকার, কিন্তু কাল এমনি জোর বৃষ্টি হল যে মজুররা সমস্ত দিন কিছুই করতে পারলো না। জানেন, আমরা কাল ক'গাদা খড় তুলতে পেরেছি ?

বিশ্বাস করবেন না, আমি সব খড় কাটিয়ে নিয়েছিলুম, আর এখন তো আমার প্রায় দুঃখ হচ্ছে—ভয় হচ্ছে, সব খড় পচে না যায়। হয়তো অপেক্ষা করলে ভালো হত। কিন্তু এসব কি? আমার মনে হচ্ছে আপনি ধড়াচুড়ো পরেছেন। এ তো নতুন দেখলুম। আপনি কি বল্ নাচ কিংবা অন্য কিছু একটায় যাচ্ছেন? হ্যাঁ, কি বলছিলুম, আপনি বদলে গেছেন—ভালো দেখাচ্ছে আগের চেয়ে!·· কিন্তু, সত্যি, আপনি ধড়াচুড়ো পরেছেন কেন?

লমফ ঃ [উত্তেজিত হয়ে] ব্যাপারটা কি জানেন, নাতালিয়া স্তেপানভ্না··· আসলে কি জানেন, আমি মনস্থির করেছি, আপনাকে · মন দিয়ে শুনুন··· আপনি নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবেন, হয়তো বা রাগ করবেন, কিন্তু আমি··· [নেপথ্যে] আমি শীতে জমে গেলুম।

নাতালিয়া ঃ কি বলুন তো! [একটু থেমে] বলুন।

লমফ ঃ সংক্ষেপেই বলি। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন, শ্রীমতী নাতালিয়া স্তেপানভ্না, যে, আমি বহুকাল ধরে আপনাদের পরিবারের সান্নিধ্য পেয়ে কৃতকৃতার্থ হয়েছি—ছেলে বয়েস থেকে, সত্যি বলতে কি। আমার যে পিসিমার কাছ থেকে তিনি গত হলে পর তাঁর জমিদারী পেয়েছি, তিনি আর পিসেমশাই দুজনাই আপনার পিতা এবং স্বর্গত মাতাকে গভীর সম্মানের চক্ষে দেখতেন। লমফ আর চুবুকফ পরিবারে বরাবরই বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, এমন কি ঘনিষ্ঠতাও ছিল, বলা চলে। তা ছাড়া, আপনি জানেন, আমার জমিদারী আপনাদের জমিদারীর একেবারে গা ঘেঁষে। আপনার হয়তো মনে পড়বে আমার ভলোভী মাঠ আপনাদের বার্চ বনের লাগাও।

নাতালিয়া ঃ মাফ করবেন, কিন্তু এখানে আমাকে বাধ্য হয়ে আপনার কথা কাটতে হল। আপনি যে বলেছেন, 'আমার' ভলোভী মাঠ···কিন্তু ওটা কি সত্যি আপনার?

লমফ ঃ হ্যাঁ, আমার···

নাতালিয়া ঃ তাই নাকি! এর পর আর কি চেয়ে বসবেন! ভলোভী মাঠ আমাদের, আপনার নয়।

লমফ ঃ না। ওটা আমার, নাতালিয়া স্তেপানভ্না।

নাতালিয়া ঃ এটা আমার কাছে নূতন খবর বলে ঠেকছে। ওটা আপনার হল কি করে?

লমফ ঃ তার মানে? আমি তো সেই ভলোভী মাঠের কথা বলছি যেটা আপনাদের বার্চ বন এবং পোড়া-বনের মাঝখানটায়···

নাতালিয়া ঃ হ্যাঁ, সেইটের কথাই তো হচ্ছে···ওটা আমাদের।

লমফ ঃ না, আপনি ভুল করেছেন নাতালিয়া স্তেপানভ্না, ওটা আমার।

নাতালিয়া ঃ পাগলামি ছাড়ুন ইভান ভাসিলিয়েভিচ্! ওটা ক'দিন ধরে আপনাদের হয়েছে?

লমফ ঃ ক'দিন ধরে মানে? যতদিন ধরে আমার মনে পড়ে—ওটা তো চিরকালই আমাদের।

নাতালিয়া ঃ আমাকে মাফ করতে হচ্ছে, আমি একমত হতে পারছি নে।

লমফ ঃ কিন্তু আপনি ইচ্ছে করলেই দলিলপত্রে জিনিসটা স্পষ্ট দেখতে পাবেন। একথা অবশ্য সত্য, যে ভলোভী মাঠের স্বত্ব নিয়ে একসময় মতবিরোধ হয়েছিল কিন্তু এখন তো কুল্লে দুনিয়া জানে, ওটা আমার। তা নিয়ে তর্কাতর্কি করার এখন আর কোনো প্রয়োজন নাই। আপনাকে জিনিসটা বুঝিয়ে বলছি—আমার পিসির ঠাকুরমা আপনার প্রপিতামহের রায়তদের ঐ মাঠাটা বিনা খাজনায়, অনির্দিষ্টকালের জন্য ভোগ করতে দেন; তার বদলে ওরা তাঁর ইঁটের পাঁজা পোড়াবার ব্যবস্থা করে দেয়। আপনার প্রপিতামহের চাষারা প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে ওটা লাখেরাজ ভোগ করে করে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে মনে করে ওটার স্বত্ব ওদেরই। কিন্তু দাস-প্রথা উঠে যাওয়ার পর যখন নূতন বন্দোবস্ত হল···

নাতালিয়া ঃ আপনি যা বলছেন সেটা আদপেই ও রকম ধারা নয়। আমার পিতামহ এবং প্রপিতামহ জানতেন যে তাঁদের জমিদারীর হদ্দ পোড়া-বন অবধি—কাজেই ভলোভী মাঠ আমাদের সম্পত্তির ভিতর পড়ল বইকি। তা হলে সেটা নিয়ে খামখা তর্ক করছেন কেন? আমি সত্যি আপনার কথার মাথা-মুণ্ডু বুঝতে পারছি নে। হক কথা বলতে কি, আমার বিরক্তি বোধ হচ্ছে।

লমফ ঃ আপনাকে আমি দলিল-দস্তাবেজ দেখাব নাতালিয়া স্তেপানভ্না!

নাতালিয়া ঃ না। আমার মনে হচ্ছে, আপনি মস্করা করছেন কিংবা আমাকে চটিয়ে মজা দেখছেন···বাস্তবিক, এটা একটা তাজ্জব ব্যাপার। জমিটা প্রায় তিনশ' বছর ধরে আমাদের স্বত্বে, আর আজ হঠাৎ একজন বলে উঠলো, ওটা আমাদের নয়। মাফ করবেন, ইভান ভাসিলিয়েভিচ্, আমি আমার আপন কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না···অবশ্য আমি ঐ জমিটার কোনো মূল্যই দিই নে। কত আর হবে—পনেরো একরটাক, তিনশ' রুবলের বেশী ওর দাম হবে না, কিন্তু ওটা নিয়ে এই নাহক অবিচার আমার পিত্তি চটিয়ে দেয়। আপনি যা খুশী বলতে পারেন, কিন্তু আমি অন্যায় অবিচার বরদাস্ত করতে পারি নে।

লমফ ঃ আপনাকে মিনতি করছি, আমার সব কথা শুনুন। আপনার প্রপিতামহের চাষারা আমার পিসির ঠাকুরমার ইঁট পোড়াবার ব্যবস্থা করে দেয়—একথা আমি পূর্বেই আপনাকে নিবেদন করেছি। আমার পিসির ঠাকুরমা তার বদলে ওদের অনুগ্রহ দেখাতে গিয়ে···

নাতালিয়া ঃ ঠাকুদ্দা, ঠাকুমা, পিসি···আমার মাথায় ওসব কিছুই ঢুকছে না। মাঠটা আমাদের, ব্যস!

লমফ ঃ ওটা আমার!

নাতালিয়া ঃ ওটা আমাদের! আপনি ঝাড়া দুদিন ধরে তর্ক করুন, যদি সাধ যায় পনেরোটা ধড়াচুড়ো সর্বাঙ্গে চড়ান, কিন্তু তবু ওটা আমাদেরই, আমাদেরই, আমাদেরই!···আপনার জিনিস আমি চাইনে, কিন্তু যে জিনিস

আমার সেটা আমি হারাতে চাই নে···আপনার যা ইচ্ছে তাই ভাবতে পারেন।

লমফ ঃ ও মাঠ আমি চাই নে, নাতালিয়া স্তেপানভ্না, কিন্তু এটা হচ্ছে ন্যায়-অন্যায়ের কথা। আপনি যদি চান তবে ওটা আমি আপনাকে উপহার দিতে পারি।

নাতালিয়া ঃ কিন্তু ওটা যদি বিলিয়ে দিতে হয় তো সে হক্ক তো আমার—কারণ ওটা তো আমার জিনিস। আপনাকে খোলাখুলি বলছি, ইভান ভাসিলিয়েভিচ্ আমার কাছে সব-কিছু বড্ডই আজগুবী মনে হচ্ছে। এতদিন অবধি আমরা আপনাকে ভালো প্রতিবেশী বলেই মনে করেছি, আমাদের বন্ধুরূপেই আপনাকে গণ্য করেছি। গেল বছরে আমরা আপনাকে আমাদের গম-মাড়াইয়ের কলটা দিলুম ; ফলে আমাদের আপন গম তুলতে তুলতে নভেম্বর হয়ে গেল। আর এখন আপনি আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার আরম্ভ করলেন যেন আমরা রাস্তার বেদে। আমাকে উপহার দিচ্ছেন আমার নিজের জমি ! কিছু মনে করবেন না, কিন্তু এটা কি প্রতিবেশীর আচরণ ? আমি বলবো, এটা রীতিমত বেয়াদবী—যদি শুনতেই চান···

লমফ ঃ আপনি বলতে চান, আমি তছরূপ করি ! আমি কখনো অন্যের জিনিস চুরি করিনি, ম্যাডাম, আর কেউ এ কথা বললে আমি কিছুতেই সেটা বরদাস্ত করবো না···[দ্রুতগতিতে জগের কাছে গমন ও জলপান] ভলোভী মাঠ আমার !

নাতালিয়া ঃ কচু ! ওটা আমাদের !

লমফ ঃ ওটা আমার !

নাতালিয়া ঃ ডাহা মিথ্যে ! আপনাকে আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি। আজই আমি আমার লোকজনকে ঐ মাঠে ঘাস কাটতে পাঠাচ্ছি।

লমফ ঃ কি বললেন ?

নাতালিয়া ঃ আমার লোকজন আজই ওখানে কাজ করবে।

লমফ ঃ আমি ওদের লাথি মেরে খেদিয়ে দেব !

নাতালিয়া ঃ আপনার সে মুরদ নেই।

লমফ ঃ [বুক আঁকড়ে ধরে] ভলোভী মাঠ আমার ! এই সামান্য কথাটা বুঝতে পারছেন না ? আমার !

নাতালিয়া ঃ দয়া করে চ্যাঁচাবেন না। আপন বাড়িতে বসে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে আপনার দম বন্ধ হয়ে যাক, কিন্তু এখানে বাড়াবাড়ি করবেন না।

লমফ ঃ আমার বুকের ভিতর যদি ওরকম মারাত্মক ব্যথা আর ধড়ফড়ানি না থাকতো, ম্যাডাম, রগ দুটো যদি দপদপ না করতো, আমি তা হলে আপনার সঙ্গে অন্য ভাবে কথা বলতুম। [চিৎকার করে] ভালোভী মাঠ আমার !

নাতালিয়া ঃ আমাদের !

লমফ ঃ আমার !

নাতালিয়া ঃ আমাদের !

লমফ ঃ আমার !

[চুবুকফের প্রবেশ]

চুবুকফ ঃ ব্যাপার কি ? তোমরা চ্যাঁচাচ্ছ কেন ?

নাতালিয়া ঃ বাবা, তুমি এই ভদ্রলোককে একটু বুঝিয়ে বলো না, ভলোভী মাঠটা কার—ওঁর, না আমাদের !

চুবু ঃ [লনফকে] মাঠটা আমাদের, বাবা ।

লমফ ঃ মাফ করবেন, স্যার ; ওটা আপনাদের হল কি করে ? আপনি অন্তত হক্কের বিচার করবেন । আমার পিসির ঠাকুরমা আপনার ঠাকুরদার চাষাদের জমিটা কিছুদিনের জন্য লাখেরাজ ভোগ করতে দেন । চাষারা প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে সেটা ভোগ করে । ফলে আস্তে আস্তে ওদের বিশ্বাস হয়ে যায় ওটা ওদেরই । কিন্তু পরে যখন নূতন বন্দোবস্ত হল···

চুবু ঃ কিছু মনে করো না, বাবা···তুমি ভুলে যাচ্ছো যে ঐ জমিটার স্বত্ব আর-যা-সব-কি-সব নিয়ে ঝামেলা ছিল বলেই চাষারা তোমার ঠাকুরমাকে কোনো খাজনা দেয়নি, আর-যা-সব-কি-সব···আর এখন গাঁয়ের কুকুরটা পর্যন্ত জানে যে ওটা আমাদের – হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই । তুমি নিশ্চয়ই জরিপের ম্যাপ-গুলো দেখোনি !

লমফ ঃ কিন্তু আমি আপনাকে প্রমাণ করে দেখাব, জমিটা আমার !

চুবু ঃ সে, বাছা, তুমি পারবে না ।

লমফ ঃ নিশ্চয় পারবো ।

চুবু ঃ কিন্তু চ্যাঁচাচ্ছো কেন, লক্ষ্মীটি ! চ্যাঁচালেই কি কোনো জিনিস প্রমাণ হয় ? তোমার যা হক্কের মাল তা আমি চাইনে, কিন্তু যে জিনিস আমার সেটা ছাড়বার বাসনা আমার কণামাত্র নেই । ছাড়বো কেন ? অবশ্য আখেরে যদি তাই দাঁড়ায়, অর্থাৎ তুমি যদি ঐ জমি নিয়ে ঝগড়া-কাজিয়া আরম্ভ করতে চাও, আর-যা-সব-কি-সব, তা হলে আমি বরঞ্চ আমার চাষাদের ঐ জমিটা বিলিয়ে দেব, কিন্তু তোমাকে না । এই হল পাকা কথা ।

লমফ ঃ আমি তো বুঝতে পারলুম না । পরের সম্পত্তি বিলিয়ে দেবার কি হক্ক আপনার ?

চুবু ঃ আমার কি হক্ক আছে, না আছে সেটা স্থির করার ভার দয়া করে আমার হাতে ছেড়ে দাও । আর শোনো, ছোকরা, আমি এরকম ধরনের কথা বলা আর-যা-সব-কি-সব শুনতে অভ্যস্ত নই···আমার বয়েস তোমার ডবল, তবু তোমায় অনুরোধ করছি ওরকম মাথা গরম করে আর-যা-সব-কি-সব ওরকম ধারা আমার সঙ্গে কথা কয়ো না···

লমফ ঃ না । আপনারা ভেবেছেন আমি একটা আস্ত গাড়ল আর আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছেন । আমার জমি বলছেন আপনাদের আর তারপর আশা করছেন আমি সুবোধ ছেলেটির মত শান্ত কণ্ঠে আর পাঁচজনের মত কথা-

বার্তা বলবো। ভালো প্রতিবেশী এরকম কথা বলে না, স্তেপান স্তেপানভিচ্ মশাই! আপনি প্রতিবেশী নন, আপনি পরের জমির বেদখলকারী!

চুবু ঃ মানে? কি বললে?

নাতালিয়া ঃ বাবা, এখ্খুনি মজুরদের মাঠে ঘাস কাটতে পাঠাও।

চুবু ঃ [লমফকে] আপনি আমাকে কি বলছিলেন, স্যর?

নাতালিয়া ঃ ভলোভী মাঠ আমাদের আর ওটা আমি ছাড়ব না, ছাড়ব না, ছাড়ব না।

লমফ ঃ সে আমরা দেখে নেব। আমি আদালতে সপ্রমাণ করে ছাড়ব ও মাঠ আমার।

চুবু ঃ আদালতে? আপনি আদালতে যান না, স্যর, আর-যা-সব-কি-সব। যান না, যান। আমি আপনাকে বিলক্ষণ চিনি—এতদিন ধরে শুধু অপেক্ষা করেছিলেন আদালতে যাবার জন্য, একটা মোকা পাওয়ার আর-যা-সব-কি-সব। তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মাতামাতি করা—ঐ তো তোমাদের স্বভাব। তোমাদের পরিবারের সব কজনাই মামলাবাজীতে ওস্তাদ! সব কটা।

লমফ ঃ দয়া করে আমার পরিবারের লোককে অপমান করবেন না। লমফগুষ্টির সবাই ভদ্রসন্তান, আপনার কাকার মত তহবিল তছরুপের দায়ে কাউকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি।

চুবু ঃ লমফ পরিবারের সব কটা বদ্ধ-পাগল!

নাতালিয়া ঃ সব কটা—সাকুল্যে!

চুবু ঃ তোমার ঠাকুরদা ছিলেন পাঁড় মাতাল, আর তোমার ছোট মাসি নাতাসিয়া মিহাইলভনা—হ্যাঁ, হ্যাঁ, একদম খাঁটি কথা—এক রাজমিস্ত্রির সঙ্গে পালিয়ে যায়, আর-যা-সব-কি-সব।

লমফ ঃ আর আপনার মা ছিলেন কুঁজো! [হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে] আমার বুকের সেই বেদনাটা চিলিক মারছে···সব রক্ত আমার মাথায় উঠে গেছে · হে ভগবান জল, জল!

চুবু ঃ তোমার বাবা ছিলেন জুয়াড়ি আর পেটুকের হদ্দ।

নাতালিয়া ঃ তোমার পিসি ছিলেন একটি সাক্ষাৎ নারদ—গাঁ উজাড় করলে ওঁর জুড়ি মেলা ছিল ভার!

লমফ ঃ আমার বাঁ পা-টা অবশ হয়ে গিয়েছে···আর আপনার পেটে জিলিপির প্যাঁচ···ও, আমার বুকটা গেল···আর সবাই জানে, নির্বাচনের আগে আপনি···আমার চোখের সামনে বিজলি খেলে যাচ্ছে···আমার টুপিটা গেল কোথায়?

নাতালিয়া ঃ এসব ছোটলোকমি! ধাপ্পাবাজি! নোংরামির চূড়ান্ত!

চুবু ঃ আর তুমি কুচুটে, ভণ্ড, ছোটলোক! হ্যাঁ তা-ই।

লমফ ঃ হ্যাটটা পেয়েছি···ও আমার বুকের ভিতরটা···কোন্ দিক দিয়ে বেরুবো? দরজাটা কোথায়? ও, আমি আর বাঁচবো না···আমার পা যে আর নড়ছে না। [দরজা পর্যন্ত গমন]

চুবু ঃ [লমফকে পিছন থেকে চেঁচিয়ে] আমার বাড়িতে আর কখ্খনো পা ফেলবে না।

নাতালিয়া ঃ আদালতে যান! আমরাও দেখে নেব!

[টলতে টলতে লমফের প্রস্থান]

চুবু ঃ জাহান্নমে যাক! [উত্তেজনার সঙ্গে পায়চারি]

নাতালিয়া ঃ এ রকম একটা ছোটলোক দেখেছ কখনো? এর পরও লোকে বলে প্রতিবেশীর উপর ভরসা রাখতে!

চুবু ঃ আস্ত একটা সং! বদমাইশ!

নাতালিয়া ঃ পিচেশ! অন্যের জমি বেদখল করে উল্টে দেয় গালাগাল?

চুবু ঃ সৃষ্টিছাড়া ব্যাটা চক্ষুশূল—জানো, ব্যাটার বেয়াদপী কতখানি? এখানে এসেছিল প্রস্তাব পাড়তে, আর-যা-সব-কি-সব! বিশ্বাস হয় তোমার? প্রস্তাব করতে?

নাতালিয়া ঃ কিসের প্রস্তাব?

চুবু ঃ হ্যাঁ, ভাবো দিকিনি, এসেছিল তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে!

নাতালিয়া ঃ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে? আমাকে বিয়ে করতে? আমাকে আগে বললে না কেন?

চুবু ঃ তাই তো ধড়াচুড়ো পরে এসেছিল! বাঁদর খাটাশ!

নাতালিয়া ঃ আমাকে বিয়ে করতে? বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে? ও! [চেআরে পতন—গুঙরে গুঙরে] ওকে ডেকে নিয়ে এস। ওকে ডেকে নিয়ে এস। ও!—ডেকে নিয়ে এস।

চুবু ঃ কাকে ডেকে নিয়ে আসবো?

নাতালিয়া ঃ শিগগির করো, জলদি যাও। আমি যে ভিরমি যাব। ওকে ডেকে নিয়ে এস। [ছাগের মত আর্তরব]

চুবু ঃ কি বলছো! কি চাও তুমি? [দু হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে] এ কী অভিসম্পাত! আমি বন্দুকের গুলিতে মরব। আমি নিজের হাতে ফাঁস পরবো। সবাই মিলে আমার সর্বনাশ করেছে।

নাতালিয়া ঃ আমি মরে যাচ্ছি। ওকে ডেকে নিয়ে এস।

চুবু ঃ বাপ্স্! যাচ্ছি, যাচ্ছি। ও রকম হাউমাউ করো না। [ধাবমান]

নাতালিয়া ঃ [একা, গুঙরে গুঙরে] আমরা কি করে বসেছি! ওগো, ওকে ডেকে নিয়ে এস, ফিরিয়ে নিয়ে এস।

চুবু ঃ [দ্রুতপদে প্রত্যাবর্তন] এখ্খুনি আসছে ও—আর-যা-সব-কি-সব। জাহান্নমে যাক ব্যাটা। আখ্! তুমি ওর সঙ্গে নিজে কথা বলো; আমার দ্বারা হবে না, পষ্ট বলে দিলুম।

নাতালিয়া ঃ [গুঙরে গুঙরে] ওকে ডেকে নিয়ে এস!

চুবু ঃ [চিৎকার করে] ও আসছে, আসছে, তোমায় বলছি তো। হে ভগবান, আইবুড়ো মেয়ের বাপ হওয়া কী গবদ্বন্ত্রণা! আমি আমার গলায় দা বসাব। হ্যাঁ, আলবৎ। আমি আমার গলাটা কেটে ফেলব। আমরা

লোকটাকে গালাগাল দিয়েছি, অপমান করেছি, লাথি মেরে বাড়ি থেকে খেদিয়ে দিয়েছি—আর এসবের মূলে তুমি—তুমিই করেছ এসব।

নাতালিয়া ঃ না, তুমি।

চুবু ঃ ও! এখন দোষ আমার! আর কি শুনতে হবে তারপর?

[লমফের প্রবেশ]

লমফ ঃ [অবসন্ন] আমার বুক ভীষণ ধড়ফড় করছে ··আমার পা অবশ হয়ে গিয়েছে···বাঁ পাশটায় অসহ্য যন্ত্রণা···

নাতালিয়া ঃ আমাদের মাফ করুন, ইভান ভাসিলিয়েভিচ্, আমরা ঝোঁকের মাথায়···আমার এখন মনে পড়ছে, ভলোভী মাঠ সত্যিই আপনার।

লমফ ঃ আমার বুকটায় যেন হাতুড়ি পিটোচ্ছে ··মাঠটা আমার···আমার দুটো চোখ করকর করছে ··

নাতালিয়া ঃ হ্যাঁ মাঠটা আপনার, আপনারই···বসুন [উভয়েরই উপবেশন] আমাদেরই ভুল হয়েছিল।

লমফ ঃ আমার কাছে এটা ন্যায়-অন্যায়ের কথা···জমিটার আমি কোনো মূল্য দিই নে, কিন্তু ন্যায়ের মূল্য আমি দিই ··

নাতালিয়া ঃ সত্যিই তো ন্যায়-অন্যায় বোধের কথা···ওসব বাদ দিন···অন্য কথা পাড়ুন।

লমফ ঃ বিশেষত আমার কাছে যখন প্রমাণ রয়েছে। আমার পিসিমার ঠাকুরমা আপনার বাবার ঠাকুরদার চাষাদের ··

নাতালিয়া ঃ হয়েছে, হয়েছে, ওসব কথা তো হয়ে গিয়েছে··· [স্বগত] কি করে আরম্ভ করবো, বুঝতে পারছি নে · [লমফকে] আপনি কি শিগগিরই শিকারে বেরুচ্ছেন?

লমফ ঃ ভাবছি, নবান্নের পরই বন-মোরগ শিকারে বেরবো···মনে পড়ল ; আপনি কি শুনেছেন, আমার কি মন্দ কপাল···আমার ট্রাইয়ার বেচারী—আপনি তো ওকে চেনেন—ওর পা খোঁড়া হয়ে গিয়েছে।

নাতালিয়া ঃ আহা, বেচারা! কি করে হল?

লমফ ঃ আমি ঠিক জানি নে···বোধ হয় পায়ের থাবা মচকে গিয়েছে, কিংবা হয় তো অন্য কুকুর তাকে কামড়ে দিয়েছে ·· [দীর্ঘনিশ্বাস] আমার সবচেয়ে ভালো কুকুর, টাকার কথা না হয় বাদই দিলুম। জানেন, মিরনফকে একশ' পঁচিশ রুবল দিয়ে ওকে কিনি।

নাতালিয়া ঃ বড্ড বেশি দিয়েছিলেন, ইভান ভাসিলিয়েভিচ্।

লমফ ঃ আমার তো মনে হয়, সস্তাতেই পেয়েছি। ওর মত কুকুর হয় না।

নাতালিয়া ঃ বাবা তাঁর ফ্লাইয়ারের জন্য পঁচাশি রুবল দিয়েছিলেন। আর ফ্লাইয়ার আপনার ট্রাইয়ারের চেয়ে ঢের ঢের ভালো।

লমফ ঃ ফ্লাইয়ার ট্রাইয়ারের চেয়ে ভালো? কি যে বলছেন! [হাস্য] ফ্লাইয়ার ট্রাইয়ারের চেয়ে ভালো!

নাতালিয়া ঃ নিশ্চয়ই ভালো। অবশ্য স্বীকার করছি, ফ্লাইয়ার বাচ্চা—এখনো

পুরো বয়েস হয়নি—কিন্তু যেমন বুদ্ধি তেমনি আর সব দিক দিয়ে। ভলচানিয়েৎস্কিরও এমন একটা কুকুর নেই।

লমফ : মাফ করতে হল, নাতালিয়া স্তেপানভ্না, কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন, ও থ্যাবড়া-মুখো, আর থ্যাবড়া-মুখো কুকুর কখ্খনো ভালো করে কামড়ে ধরতে পারে না।

নাতালিয়া : থ্যাবড়া-মুখো ? এই প্রথম শুনলুম।

লমফ : আপনাকে পাকা কথা বলছি, ওর নিচের চোয়াল উপরের চোয়ালের চেয়ে ছোট।

নাতালিয়া : বটে ? আপনি মেপে দেখেছেন নাকি ?

লমফ : হ্যাঁ। শিকার তাড়া করতে অবশ্য সে ভালো, কিন্তু কামড়ে ধরার বেলা ওটাকে দিয়ে বিশেষ কিছু হবে না।

নাতালিয়া : প্রথমত, আমাদের ফ্লাইয়ার খানদানী কুকুর। হার্নেস আর চিজল ওর বাপ-মা। আর আপনার ট্রাইয়ারের গায়ে এমনই পাঁচমেশালি রঙ যে বলাই যায় না, ওটা কোন্ জাতের কুকুর। বিশ্রী চেহারা, বুড়ো-হাবড়া হয়ে গিয়েছে···

লমফ : ও বুড়ো হয়েছে বটে, কিন্তু ওর বদলে আমি আপনাদের পাঁচটা ফ্লাইয়ারও নেব না স্বপ্নেও না। ট্রাইয়ার যাকে বলে সত্যিকার কুকুর, আর ফ্লাইয়ার ··কিন্তু এ-নিয়ে তর্ক করাটাই বেকুবি · আপনাদের ফ্লাইয়ারের মত কুকুর প্রত্যেক শিকারীরই গণ্ডায় গণ্ডায় আছে। ওর জন্য পঁচিশ রুবল দিলেও বড্ড বেশী দেওয়া হয়।

নাতালিয়া : সব কথা প্রতিবাদ করার শয়তান আজ আপনার ঘাড়ে চেপেছে, ইভান ভাসিলিয়েভিচ্। প্রথম আরম্ভ করলেন ভলোভী মাঠের উপর খামকা হক্ক বসিয়ে, আর এখন বলছেন, ট্রাইয়ার ফ্লাইয়ারের চেয়ে সরেস। কেউ কিছু বিশ্বাস করে না বললে আমার ভারী বিরক্তি বোধ হয়। যা বলেন, যা কন, আপনি খুব ভালো করেই জানেন, ফ্লাইয়ার আপনার—কি যেন ওর নাম—ঐ বোকা ট্রাইয়ারের চেয়ে শতগুণে ভালো। তা হলে খামকা উল্টোটা বলছেন কেন ?

লমফ : আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, নাতালিয়া স্তেপানভ্না, আপনি ভাবছেন আমি কানা কিংবা আহাম্মুখ। আপনি কি কিছুতেই বুঝবেন না যে আপনাদের ফ্লাইয়ার থ্যাবড়া-মুখো ?

নাতালিয়া : মিথ্যে কথা।

লমফ : ওটা থ্যাবড়া-মুখো ?

নাতালিয়া : [চিৎকার করে] মিথ্যে কথা !···

লমফ : আপনি চ্যাঁচাচ্ছেন কেন, ম্যাডাম ?

নাতালিয়া : আপনি আবোল-তাবোল বকছেন কেন ? পিত্তি একেবারে চটে যায়। ট্রাইয়ারকে গুলি করে মারার সময় হয়ে গিয়েছে আর আপনি ওটাকে ফ্লাইয়ারের সঙ্গে তুলনা করছেন !

লমফ : মাফ করবেন, আমি আর এ আলোচনা করতে পারবো না। আমার বুক ধড়ফড় করছে।

নাতালিয়া : আমি লক্ষ্য করেছি, যে শিকার সম্বন্ধে যত কম বোঝে সে-ই শিকার নিয়ে তর্কাতর্কি করে বেশী।

লমফ : মাদাম, দয়া করে চুপ করুন···আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে।···[চিৎকার করে] চুপ করুন।

নাতালিয়া : আমি চুপ করবো না, যতক্ষণ না আপনি স্বীকার করছেন, ফ্লাইয়ার ট্রাইয়ারের চেয়ে শতগুণে সরেস।

লমফ : শতগুণে নিরেস। ওর এত দিনে মরে যাওয়া উচিত ছিল—ঐ আপনাদের ফ্লাইয়ারের কথা বলছি। ও, আমার মাথাটা···আমার চোখ দুটো···আমার কাঁধটা···

নাতালিয়া : আর আপনাদের ঐ হাবা ট্রাইয়ারটা—আমাকে তার মৃত্যু-কামনা করতে হবে না ; ওটা তো আধমরা হয়েই আছে।

লমফ : [কেঁদে কেঁদে] চুপ করুন। আমার বুকটা যে ফেটে যাচ্ছে।

নাতালিয়া : আমি চুপ করবো না।

[চুবুকফের প্রবেশ]

চুবু : এখন আবার কি ?

নাতালিয়া : আচ্ছা বাবা, তুমি খোলাখুলি বলো তো, ধর্ম সাক্ষী করে বলো তো—কোন্‌টা সরেস—আমাদের ফ্লাইয়ার, না ওঁর ট্রাইয়ার ?

লমফ : স্তেপান স্তেপানভিচ্, স্যর, আপনার পায়ে পড়ছি, মাত্র একটি কথা আমাদের বলুন, ফ্লাইয়ার থ্যাবড়া-মুখো, কিংবা থ্যাবড়া-মুখো নয় ? হ্যাঁ কি না ?

চুবু : হলেই বা ? যেন তাতে কিছু এসে যায় ! যাই বল, যাই কও, ওর মত কুকুর তামাম জেলাতেও একটা নেই, আর যা-সব-কি-সব।

লমফ : কিন্তু আমার ট্রাইয়ার ওর চেয়ে সরেস। নয় কি ? ধর্ম সাক্ষী করে বলুন।

চুবু : ও রকম মাথা গরম করো না, বাছা আমার · বুঝিয়ে বলছি আমি ·· তোমার ট্রাইয়ারের বিস্তর সদগুণ আছে, কেউ অস্বীকার করবে না—জাতে ভালো, পাগুলো জোরদার, গড়ন চমৎকার আর-যা-সব-কি-সব। কিন্তু হক্ কথা যদি শুনতে চাও, বাছা, তবে বলি ওর দুটো মারাত্মক খুঁৎ আছে—সে বুড়ো হয়ে গিয়েছে আর তার প্যাঁচা-নাক।

লমফ : মাফ করবেন, আমার বুক ধড়ফড় করছে···কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কি সেইটে দেখা যাক ··আপনার হয়তো স্মরণ থাকতে পারে, আমরা যখন মারুস্‌কিনের মাঠে শিকার করতে গিয়েছিলুম, আমার ট্রাইয়ার কাউন্টের স্পটারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানে সমানে ছুটেছিল, আর আপনাদের ফ্লাই-য়ার নিদেনপক্ষে পাকি আধটি মাইল পিছনে পড়ে ছিল।

চুবু : কাউন্টের শিকারী তাকে চাবুক মেরেছিল বলে সে পিছিয়ে পড়ে।

লমফ ঃ সেইটেই তার প্রাপ্য। আর সব কটা কুকুর খেঁকশিয়ালকে তাড়া লাগাচ্ছিল আর ট্রাইয়ার জ্বালাতন করতে লাগলো ভেড়াগুলোকে।

চুবু ঃ বাজে কথা। শোনো বাছা, আমি বড্ড সহজে চটে যাই, তাই তোমায় অনুরোধ করছি, এ আলোচনাটা থাক। লোকটা ফ্লাইয়ারকে চাবুক মেরেছিল, কারণ মানুষের স্বভাব অন্যের কুকুরের প্রতি হিংসুটে হওয়া··· হ্যাঁ, পরের কুকুরকে কেউ দুচক্ষে দেখতে পারে না। আর আপনিও, স্যর, ওর ব্যত্যয় নন। হ্যাঁ, যেই দেখলে আর কারো কুকুর তোমার ট্রাইয়ারের চেয়ে সরেস, ব্যস, অমনি জুড়ে দিলে কিছু একটা···আর-যা-সব-কি-সব··· দেখলে, আমার সব মনে থাকে।

লমফ ঃ আমারও।

চুবু ঃ [ভেংচিয়ে] আমারও !

লমফ ঃ বুক ধড়ফড় করছে · আমার পা অবশ হয়ে গিয়েছে···আমি কিছুই···

নাতালিয়া ঃ [ভেংচিয়ে] বুক ধড়ফড় করছে ! কী রকম শিকারী মশাই, আপনি ? আপনার উচিত শিকারে না গিয়ে আগুনের পাশে শুয়ে শুয়ে আরশুলা মারা। বুক ধড়ফড় করছে, হুঃ !

চুবু ঃ হ্যাঁ, হক্ কথা বলতে কি, শিকারে-টিকারে বেরোনো আদপেই তোমার কম্ম নয়। বুকের ধড়ফড়ানি আর-যা-সব-কি-সব দিয়ে ঘোড়ার পিঠে ঝাঁকুনি খাওয়ার চেয়ে তোমার পক্ষে বাড়িতে বসে থাকাই ভালো। অবশ্য তুমি যদি সত্যই শিকার করতে যেতে তাহলে কোনো কথা ছিল না, কিন্তু তুমি তো যাও নিছক তর্কাতর্কি করার জন্য, আর অন্য পাঁচজনের কুকুরগুলোর সামনে পড়ে তাদের বাধা দেবার জন্য আর-যা-সব-কি-সব···আমি বড্ড সহজেই চটে যাই, কাজেই এ আলোচনা বন্ধ করাই ভালো। তুমি আদপেই শিকারী নও, ব্যস্।

লমফ ঃ আর আপনি—আপনি বুঝি শিকারী ? আপনি তো যান কাউন্টকে নিছক তেল মালিশ করার জন্য, আর পাঁচজনের বিরুদ্ধে ঘোটালা পাকাবার জন্য · ওঃ ! আমার বুকের ব্যথাটা ! আসলে আপনি কুচুটে।

চুবু ঃ কি ? আমি—কুচুটে ? [চিৎকার করে] চুপ করো।

লমফ ঃ কুচুটে !

চুবু ঃ ভেড়ে, বখা ছোকরা !

লমফ ঃ বুড়ো-হাবড়া ! ভণ্ড !

চুবু ঃ চুপ করো, না হলে আমি একটা নোংরা বন্দুক দিয়ে তোমাকে তিতির মারার মতো গুলি করে মারবো। ফক্কিকার কোথাকার !

লমফ ঃ দুনিয়াসুদ্ধ জানে—ও, ফের আমার হার্টটা !—আপনাকে আপনার স্ত্রী ঠ্যাঙাতো ! ··আমার পা-টা ··আমার মাথাটা···চোখের সামনে বিদ্যুৎ খেলছে !···আমি পড়ে যাব ··আমি পড়ে যাচ্ছি ··

চুবু ঃ আর যে মাগী তোমার বাড়ি চালায় সে তোমাকে চেপে রেখেছে বুড়ো আঙুলের তলায়।

লমফ : ও, ও, ও ! আমার হার্টটা ফেটে গিয়েছে। আমার কাঁধটা যে আর নেই···আমার কাঁধটা কোথায় ?···আমি মরলুম। [আরাম-চেআরে পতন] ডাক্তার ! (মূর্ছা)

চুবু : ভেড়ে ! বকা ! ফক্কিকার ! আমি জোর পাচ্ছি নে। [জলপান] ভিরমি যাচ্ছি নাকি !

নাতালিয়া : শিকারী, হুঁ ! ঘোড়ার উপর কি রকম বসতে হয়, তাই জানেন না আপনি ! [পিতাকে] বাবা কি হল ওর ? বাবা ! দেখ বাবা, [চিৎকার করে] ইভান ভাসিলিয়েভিচ্ ! ইনি মরে গেছেন।

চুবু : আমি মূর্ছা যাচ্ছি···আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। বাতাস, আমাকে বাতাস দাও !

নাতালিয়া : ইনি মারা গেছেন। [লমফের আস্তিন ধরে টানাটানি] ইভান ভাসিলিয়েভিচ্ ! ইভান ভাসিলিয়েভিচ্ ! আমরা কি করে বসলুম ! ইনি মারা গেছেন। [আর্ম-চেআরে পতন] ডাক্তার ! ডাক্তার ! [ছন্নের মত কখনো ফোঁপানো, কখনো হাসি]

চুবু : ব্যাপার কি ? কি হয়েছে ? তুমি কি চাও ?

নাতালিয়া : [গোঙরাতে গোঙরাতে] মারা গেছেন···উনি মারা গেছেন।

চুবু : কে মারা গেছে ? [লমফের দিকে তাকিয়ে] সত্যি ও মারা গেছে ! হে ভগবান, জল জল ! ডাক্তার ! [লমফের ঠোঁটের কাছে এক গ্লাস জল ধরে] জল খাও ! না, ও জল খাচ্ছে না···তাহলে মারাই গেছে, আর-যা-সব-কি-সব···হায়, হায়, আমার কী পোড়া কপাল ! আমি আমার মগজের ভিতর দিয়ে গুলি চালিয়ে দিলুম না কেন ? এর অনেক আগেই আমার গলাটা কেটে ফেললুম না কেন ? আমি কিসের জন্য অপেক্ষা করছি ? আমাকে একখানা ছোরা দাও। বন্দুক দাও। [লমফ একটু নড়লো] মনে হচ্ছে, সেরে উঠছে···একটু জল খাও তো, বাছা ! হ্যাঁ, ঠিক···

লমফ : আমার চোখের সামনে বিদ্যুৎ খেলছে···কুয়াসা না কি···আমি কোথায় ?

চুবু : তুমি যত শিগগির পারো বিয়ে করে ফেলো আর জাহান্নামে যাও···ও রাজী আছে [দুজনের হাত মিলিয়ে দিয়ে] ও রাজী আছে, আর-যা-সব-কি-সব, আমি তোমাদের আশীর্বাদ—আর-যা-সব—করছি। শুধু আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও।

লমফ : এ্যাঁ ? কি ? [দাঁড়িয়ে উঠে] কে ?

চুবু : ও রাজী আছে। আবার কি হল ? চুমো খাও···আর জাহান্নামে যাও !

নাতালিয়া : [গোঙরাতে গোঙরাতে] উনি বেঁচে আছেন···হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি রাজী···

চুবু : এসো, চুমো খাও, একজন আরেক জনকে।

লমফ : এ্যাঁ, কাকে ? [নাতালিয়াকে চুম্বন] আমার কী আনন্দ ! মাফ করবেন, ব্যাপারটা কি ? ওঃ ! হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি···আমার হার্ট···

বিদ্যুৎ···আমি কি সুখী, নাতালিয়া স্তেপানভ্না···[নাতালিয়ার হস্ত চুম্বন] আমার পা-টা যে অবশ হয়ে গেল···

নাতালিয়া ঃ আমি···আমিও বড় সুখী ··

চুবু ঃ ওঃ ! পিঠের থেকে কী বোঝাটাই না নামলো ! আহ্ !

নাতালিয়া ঃ কিন্তু ··যাই বলো, তোমাকে এখন স্বীকার করতেই হবে, ট্রাইয়ার ফ্লাইয়ারের মত অত ভালো না ।

লমফ ঃ সে ভালো ।

নাতালিয়া ঃ সে খারাপ ।

চুবু ঃ এই লাও ! পারিবারিক সুখ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে । শ্যাম্পেন নিয়ে আয় ।

লমফ ঃ সে সরেস !

নাতালিয়া ঃ ওটা নিরেস, নিরেস, নিরেস !

চুবু ঃ [চিৎকার করে দুজনার গলা চাপবার চেষ্টাতে] শ্যাম্পেন ! শ্যাম্পেন নিয়ে আয় !

যবনিকা

শেষ চিন্তা

উল্‌টা-রথ

অবতরণিকা।

কত না কসরৎ, কত না তকলীফ বরদাস্ত করে কত চেষ্টা দিলুম, দেশে নাম কেনবার জন্য,—আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পিছন পানে তাকিয়ে দেখি সব বরবাদ, সব ভণ্ডুল। পরের কথা বাদ দিন, নিতান্ত আত্মজনও আমার লেখা বই পড়ে না। গিন্নীকে—না, সে কথা থাক, তাঁর সঙ্গে ঘর করতে হয়, ওঁয়াকে চটিয়ে লাভ নেই। অথচ আমার জীবনে মাত্র একটি শখ ছিল, সাহিত্যিক হওয়ার। আপনাদের মনের বেদনা কি বলবো—তবে হ্যাঁ, আপনারাই হয়তো বুঝবেন, কারণ সিনেমায় দেখেছি, নায়িকা যখন 'হা নাথ, হা প্রাণেশ্বর, তুমি কোথায় গেলে ?' বলে হন্যে-পারা স্ক্রীনে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি টাট্টু ঘোড়ার মত ছুটোছুটি লাগান তখন আপনারা হাপুস-হুপুস করে অশ্রুবর্ষণ করেন (যে কারণে আমি হলের ভিতরেও রেনকোট্ খুলি নে) তাই আপনারা বুঝবেন।

যখন দেখি প্রখ্যাত সাহিত্যিক উচ্চাসনে বসে আছেন, তাঁর গলায় মালার পর মালা পরানো হচ্ছে, খাপসুরৎ মেয়েরা তাঁর অটোগ্রাফের জন্য হন্দমুন্দ হচ্ছে, তাঁর জন্য ঘন ঘন বরফজল শরবৎ আসছে, সভা শেষে হয়তো আরো অনেক কিছু আসবে তখন আমার কলিজার ভিতর যেন ইঁদুর কুরকুর করে খেতে থাকে, আমার বুকের উপর যেন কেউ পুকুর খুঁড়তে আরম্ভ করে। সজল নয়নে বাড়ি ফিরি। পাছে গিন্নী অট্টহাস্য করে ওঠেন তাই দোরে খিল দিয়ে বইয়ের আলমারির সামনে এসে দাঁড়াই—তাকিয়ে থাকি আপন মনে আমার, বিশেষ করে আমার নিজের পয়সায় মরক্কো লেদারে বাঁধানো সোনার জলে আমার নাম ছাপানো আমার বইয়ের দিকে।

আমার মাত্র একজন বন্ধু—এ সংসারে। কিন্তু আর কিছু বলার পূর্বে আগেভাগেই বলে নিই ইনিও আমার বই পড়েননি। তিনি এসে আমায় একদিন শুধোলেন, 'ব্রাদার, "আমিয়েলের জুর্নাল" পড়েছ ?'

'সে আবার কি বস্তু ? বই-ই হবে। না ? তা সে কি আমার বই পড়েছে যে আমি তার বই পড়বো ?'

'আহা চটো কেন ? জল্লাদ যখন কারো গলা কাটে তখন তার মানে কি এই যে, সে লোকটা আগে জল্লাদের গলা কেটেছিল ? অভিমান ছাড়ো। আমার কথা শোনো। এই আমিয়েল সায়েব প্রফেসর ছিলেন। তার বাড়া আর কিছু না। যশ-প্রতিপত্তি তাঁর কিছুই হয়নি। নিঃসঙ্গ জীবনে নির্জনে তিনি লিখলেন তাঁর জুর্নাল।'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'জুর্নাল-জুর্নাল করছো কেন ? উচ্চারণ হবে "জার্নেল"। উচ্চারণ সম্বন্ধে আমি বড্ডই পিটপিটে।'

বন্ধু বললেন, 'কী উৎপাত ! ওটার উচ্চারণ ফরাসীতে "জুর্নাল"। এসেছে

"ডায়ার্নাল" থেকে, সেটা এসেছে লাতিন "দিয়েস" থেকে—যেটা সংস্কৃতে "দিবস"। ফরাসীতে তাই "দিন দিন প্রতি দিন" নিয়ে যখন কোনো কথা ওঠে তখন ঐ "জুর্নাল" শব্দ ব্যবহার হয়। তাই দৈনিক কাগজ "জুর্নাল", আবার প্রতিদিনের ঘটনা লিখে রাখলে সেটাও "জুর্নাল" অর্থাৎ "ডাইরি"। ফার্সীতে "দিন"কে বলে "রোজ", তাই প্রতিদিনের ঘটনার "নাম" যেখানে লেখা থাকে সেটা "রোজনামচা"। আবার—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'হয়েছে, হয়েছে।'

'সেই আমিয়েল লিখলেন তাঁর জুর্নাল। মৃত্যুর পর সে-বই বেরোতে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর বসত শহর জিনীভাতে হয়ে গেলেন লেখক হিসেবে প্রখ্যাত। বছর কয়েকের ভিতর তামাম ইউরোপে। ইস্তেক তোমাদের রবি ঠাকুর সে বয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তাই বলি কিনা, তুমি একখানা জুর্নাল লেখো।'

আমি শুধালুম, 'তুমি পড়বে?'

বন্ধু উঠে দাঁড়ালেন। ছাতাখানা বগলে চেপে বললেন, 'চললুম, ভাই। শুনলুম পাড়ার লাইব্রেরিতে পাঁচকড়ি দে'র কয়েকখানা অপ্রকাশিত উপন্যাস এসেছে। পড়তে হবে।'

ভালোই করলেন। না হলে হাতাহাতি হয়ে যেত।

কিন্তু বিশ্বাস করবেন না, তার সেই মোস্ট ইনসেন সাজেশনের পর থেকে এই জুর্নালের চিন্তাটা কিছুতেই আমি আমার মগজ থেকে তাড়াতে পারছি নে। যে রকম অনেক সময় অতিশয় রদ্দি একটা গানের সুর মানুষকে দিবা-রাত্তির হন্ট করে। এমন কি ঘুম থেকে উঠে মনে হয় ঘুমুতে ঘুমুতেও ঐ সুর গুন গুন করেছি।

কিন্তু জুর্নাল লিখতে যাওয়ার মধ্যে একটা মস্ত অসুবিধে রয়েছে—আমার। সংস্কৃতে শ্লোক আছে ঃ—

শীতেঽতীতে বসনমশনং বাসরান্তে নিশান্তে
ক্রীড়ারম্ভং কুবলয়দৃশং যৌবনান্তে বিবাহম্।
শীতকাল গেলে শীত-বস্ত্র পরিধান
আহার গ্রহণ যবে দিন অবসান
রাত্রিকাল শেষ হলে প্রেম আলিঙ্গন!
বিবাহ করিতে সাধ যাইলে যৌবন!

(কবিভূষণ পূর্ণচন্দ্র)

একশ' বছর বয়সে আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে অন্তর্জলি অবস্থায় সাততলা এমারৎ বানাবার জন্য কেউ টেণ্ডার ডাকে না।

জুর্নাল লেখা আরম্ভ করতে হয় যৌবনে। তাহলে বহু বৎসর ধরে সেটা লেখা যায়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে পর পাঠক তার থেকে লেখকের জীবনক্রম-বিকাশ, তার সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব পড়ে পরিতৃপ্ত হয়।

আজ যদি আমি জুর্নাল লিখতে আরম্ভ করি তবে আর লিখতে পাবো কটা

দিন ? তাই কবি বলেছেন, এ যে যৌবনান্তে বিবাহম্ !

তাহলে উপায় কি ?

তখন হঠাৎ একটি গল্প মনে পড়ে গেল।

এক বেকার গেছে সায়েব বাড়িতে। কাচুমাচু হয়ে নিবেদন করলে, 'সায়েব, আপনার এখানে যে কি ভয়ে ভয়ে এসেছি, কী আর বলবো ! এক পা এগিয়েছি কী তিন পা পেছিয়েছি !' সায়েব বললে, 'ইউ গাগা, তাহলে এখানে পেঁছিলে কি করে ?' বেকারটি আদৌ গাগা—অর্থাৎ যে বদ্ধ পাগল শুধু 'গাগা' করে গোঙরায়—ছিল না। বরঞ্চ বলবো হাজির-জবাব—অর্থাৎ সব জবাবই তার ঠোঁটে হাজির। বললে, 'হক কথা কয়েছেন, হুজুর। আমিও তাই মুখ করলুম আপন বাড়ির দিকে। এক পা এগুই তিন পা পেছোই। করে করে এই হেথা হুজুরের বাঙলোয় এসে পেঁছে গেলুম।'

তাই যখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, জুর্নাল লেখার মত দীর্ঘ দিনের ম্যাদ যমরাজ আমায় দেবেন না তখন ঐ কেরানীর মত পিছন ফিরলে কি রকম হয় ? অর্থাৎ বিগত দিনের জুর্নাল ? সেই বা কি করে হয় ? পোস্ট-ডেটেড চেক্ হয়, কিন্তু প্রি-ডেটেড দলিল করার নামই তো জাল। আজ আমি তো আর লিখতে পারি নে ঃ—

> জন্মাষ্টমী ১৩১১
>
> আজ আমার জন্ম হল। মা তখন তাঁর বাপের বাড়িতে।
>
> হায়, আমাকে দেখবার কেউ ছিল না। কী হতভাগ্য আমি।

পুলিসে ধরবে না তো !

বিবেচনা করি আপনারা ক্লাসিক্স্ পড়েছেন—ঋগ্বেদ, মেঘনাদ, হ য ব র ল ইত্যাদি। শেষোক্তখানাতে এক বুড়ো ত্রিশ না চল্লিশ হতে না হতেই বয়েসটা ঘুরিয়ে দিতো। তখন তার বয়েস যেত 'কমতি'র—ফটকা বাজারে যাকে বলে 'মন্দি' বা 'বেয়া'র—দিকে। তখন তার বয়েস হত ত্রিশ, ঊনত্রিশ, আটাশ করে করে আট হয়ে গেলে ফের 'বাড়তি' বা 'তেজী'র দিকে চালিয়ে দিয়ে নয়, দশ, এগারো করে বয়েস বাড়াত।

কিন্তু এ কৌশল রপ্ত করার জন্য মুষ্টিযোগটা শিখি কার কাছ থেকে ? হ য ব র ল সৃষ্টিকর্তা ওপারে যাবার সময় তাঁর ব্যাটা বাবাজী সত্যজিৎকে কি এটা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন ? তাতেই বা কি ? বাবাজী তো তারো আগে ওঁরই কাছ থেকে শিখে নিয়েছেন, 'গেছোদাদা' হওয়ার পন্থাটি—আমি যদি তাঁর সন্ধানে যাই মতিহারি তখন তিনি ছিকেন্টপুর। আমি ফিলাডেলফিয়ায় তো তিনি ভেরমন্টে। উঁহু হল না।

ইরানের কবি অন্য মুষ্টিযোগ বাৎলেছেন—তাঁর বৃদ্ধ বয়সে ঃ

'আজি এ নিশীথে প্রিয়া অধরেতে চুম্বন যদি পাই
জোয়ান হইব ; এ জীবন তবে গোড়া হতে দোহরাই ॥'

'শবী আগর আজ লবে ইয়ার বোসে এ তলবম
জওয়ান শওম জসেরো জিন্দেগী দু বারা কুনম্ ॥'

পাড়ার ছোঁড়ারা ঢিল ছুঁড়বে।

আমার গুরু রবীন্দ্রনাথ তাহলে কি বলেন ?—

'শিশু হবার ভরসা আবার
জাগুক আমার প্রাণে,
লাগুক হাওয়া নির্ভাবনার পালে,
ভবিষ্যতের মুখোশখানা
খসাব একটানে,
দেখব তারেই বর্তমানের কালে।'

তারপর তিনি কি করবেন ?

'জমিয়ে ধুলো সাজিয়ে ঢেলা
তৈরী হবে আমার খেলা—'

সর্বনাশ ! এই বৃদ্ধ বয়সে যদি সকলের সামনে তাই করি তবে ডাঃ ঘোষ আমাকে রাঁচি পেঁছিয়ে দেবেন।

মোদ্দা কথায় তা হলে ফিরে যাই। আমাকে খামাখা মেলা বকর বকর করাবেন না। অবশ্য আমার মা বলতো, আমার দোষ নেই। আমাকে টিকা দেবার সময় ডাক্তার ছুরি আনেনি বলে একটা গ্রামোফোনের নীড্‌ল্ দিয়ে টিকা দিয়েছিল।

তাহলে একটা মাস চিন্তা করতে দিন। সামনে হোলি। গায়ে রঙ মাখাবো। মনেও।

স্লিস্টলার অর্থ নিম উকীল। উকীলের কাছে যাবার পূর্বে আমার একটি ঘটনার কথা মনে পড়লো। সেটি হয় তো পূর্বেও কোনো-কোথাও উল্লেখ করেছি। তাই সেটি আবার বলছি। কারণ মানুষ বিশ্বাস করতে ভালোবাসে যা সে পূর্বেও একাধিকবার শুনেছে—নয়া কথা তার ভালো লাগে না। তাই দেখুন—এটাও আমি আরেকবার বলেছি—একই প্লট নিয়ে ক'গণ্ডা ফিলিম নিত্যি নিত্যি বেরুচ্ছে তার হিসেব রাখেন ?

ঘটনাটি সংক্ষেপে এই ঃ -

নরক আর স্বর্গের মধ্যিখানে মাত্র একটি পাঁচিলের ব্যবধান। নরক চালায় শয়তান, আর স্বর্গ চালান সিন্ট পীটার। পাদ্রীসায়েবের মুখে শোনা, তাঁরই হাতে থাকে স্বর্গদ্বারের সোনার চাবি।

পাঁচিলটি ঝুরঝুরে হয়ে গিয়েছে দেখে পীটার একদিন শয়তানকে ডেকে বললেন, দেয়ালটা এজমালি। তাই এটার মেরামতি আমি করবো এক বছর, তুমি করবে আর বছর। আসলে তোমারই করা উচিত প্রতি বছর। কারণ তোমার দিকে সুবো-শাম জ্বলছে আগুনের পেল্লাই পেল্লাই চুলো। তারই চোটে দেয়াল হচ্ছে জখম। আর আমার দিকে সর্বক্ষণ বয় মন্দমধুর মলয় বাতাস। দেয়াল বিলকুল জখম হয় না।

বিস্তর তর্কাতর্কির পর স্থির হল, ইনি এ বছর আর উনি আর বছর দেয়াল মেরামত করবেন। শেষটায় বিদায় নেবার সময় শয়তান ঘাড় চুলকে বললে, 'দাদা, কিছু যদি মনে না করো, তবে এ বছরটায় তুমিই মেরামতিটা করাও। একটু অভাবে আছি।'

পীটার মাই ডিয়ার লোক। রাজী হয়ে গেলেন।

তারপর এক বছর যায়, দু'বছর যায়, পাঁচ বছর যায়, দেয়াল পড়ো-পড়ো—শয়তানের সন্ধান নেই। পীটার রেজেস্ট্রি করে চিঠি লিখলেন। ফেরত এল। উপরে লেখা, 'মালিক না পাইয়া ফেরত।' পীটার তখন একাধিকবার শয়তানের বাড়ি গিয়ে কড়া নাড়লেন। ভিতর থেকে তীক্ষ্ন বামাকণ্ঠ বেরলো—'কত্তা বাড়ি নেই। পীটার বাড়ির সামনে 'লটকাইয়া শমন জারী' করলেন। কোনো ফায়দা ওৎরালো না।

এমন সময় পীটারের বরাৎ জোরে হঠাৎ শয়তানের সঙ্গে রাস্তায় মোলাকাৎ। শয়তান অবশ্য তাড়াহুড়ি পাশের গলিতে গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এঞ্জেলদের ডানা থাকে। ফুরুৎ করে উড়ে গিয়ে পার্ফেক্ট ল্যান্ডিং করে দাঁড়ালেন তার সামনে। খপ্ করে হাত ধরে বললেন, 'বড় যে পালিয়ে বেড়াচ্ছ? দেয়াল মেরামতির কী হবে।'

শয়তান গাঁইগুঁই টালবাহানা আরম্ভ করলে। পীটার চেপে ধরলেন, 'পাকা কথা দিয়ে যাও।'

তখন শয়তান শেষ কথা বললে, 'কিছু মনে কোরো না ভাই, কিন্তু আমি আমার উকিলদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনো পাকা কথা দিতে পারবো না।'

নিরাশ হয়ে পীটার শয়তানের হাত ছেড়ে দিয়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বাড়ি ফেরার মুখ করে বললেন, 'ঐখানেই তো তোর জোর। সব কটা নিয়ে বসে আছিস। আমার যে একটাও নেই।'

আমার উকিল অবশ্য নরকে যাবেন না। তিনি বলেন, 'নরক নেই, স্বর্গ আছে।'

আমি বললুম, 'সে কি কথা! লোকে হয় দুটোতেই বিশ্বাস করে, নয় একটাতেও না।'

উকিল বললেন, 'ঐখানেই তো ভুল। তোমরা দর্শনের কিছুই জানো না। বুঝিয়ে বলছি। স্বর্গ জিনিসটের কল্পনা আমি করতে পারি। খাসা জায়গা, না গরম না ঠাণ্ডা। তোমাদের পরশুরামই তো বলেছেন, ঝোপে-ঝাপে চপ কাটলেট ঝুলছে। পাড়ো আর খাও, খাও আর পাড়ো। হুরী-পরীদের সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ করো, কেউ কিছু বলবে না। অতএব স্বর্গ আছে। কিন্তু এই পৃথিবীর চেয়ে বেদনাময় জায়গা আমি কল্পনাই করতে পারি নে। অতএব সেটা নেই। যে জিনিস আমি কল্পনা করতে পারি নে সেটা থাকবে কি করে?'

যুক্তিটা আমার কাছে কেমন যেন ঘোলাটে মনে হল। তবে ঈশ্বরের

অস্তিত্ব সপ্রমাণ করতে গিয়ে মুনিঋষিরা যে-সব যুক্তি দেন তার চেয়ে অবশ্য বেশী ঘোলাটে নয়। কিন্তু সে-কথা থাক। ওটা নিয়ে আমার শিরঃপীড়া নয়। কথায় বলে, বিপদে পড়লে শয়তানও মাছি ধরে ধরে খায়—আমার উকিলটি নরকে না গেলেও শয়তান তার বাঁ হাতের তেলোতে জল রেখে তাতে ডুবে আত্মহত্যা করবে না। বরঞ্চ, একটা উকিলকে যদি কোনোগতিকে স্বর্গরাজ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারে তা হলেই তো চিত্তির। ক্লাইভ তো আর গণ্ডায় গণ্ডায় জন্মায় না! এক ক্লাইভে যা করলে, তার ধকল আমরা এখনো কাটাচ্ছি। দ্যাখ তো না দ্যাখ, সেন্ট পীটারের পেটের ভাত চাল হয়ে যাবে, তন্দুরী মুর্গী ডানা গজিয়ে পেটের ভিতর ফুরুৎ-ফুরুৎ করতে থাকবে।

আমার শিরঃপীড়া ঃ—আমি যদি প্রি-ডেটেড চেক সই করি, অর্থাৎ শুঁটকিকে তাজা মাছ বলে পাচার করি, অর্থাৎ প্রাচীন দিনের ডায়ারি নবীন বলে চালাই তবে কি আমি ভেজালের ভিটকিলিমিতে ধরা পড়বো না?

উকিল পরম পরিতোষ সহকারে বললে, 'কিচ্ছু ভয় নেই। তবে যা লিখবে তার ন'আনার বেশী যেন সত্য কথা না হয়। মিথ্যে লিখতে হবে নিদেন সাত আনা। নূতন আইন।'

আমার মিথ্যে বলতে কণামাত্র আপত্তি নেই। লেখক মাত্রই মিথ্যেবাদী। এবং মিথ্যেবাদীকেও সংজ্ঞা দিতে গিয়ে গুণীরা বলেছেন, 'যে-লোক দুর্ভাগ্যক্রমে লেখক হওয়ার সুযোগ পেল না',—হতাশ-প্রেমিকের মত হতাশ-লেখক। তবু অবাক হয়ে বললুম, 'সে কি কথা?'

উকিল বললে, 'ক্যারেট্ কারে কয় জানো? ২৪ ক্যারেটে খাঁটি সোনা হয়। এখন আইন হয়েছে, চোদ্দ ক্যারেটের বেশী সোনা দিয়ে গয়না গড়ানো চলবে না। বাকি দশ ক্যারেটের বদলে দিতে হবে খাদ।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'আমি কি স্যাকরা যে আমাকে এ-আইন শোনাচ্ছেন!'

উকিল আমার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকালে। যেন আমি 'ফিয়ারলেস নাদিরা' বা কাননবালার চেয়েও খাপসুরৎ। নিজের চেহারার প্রতি ভক্তি বেড়ে গেল।

বললে—এবারে অতিশয় শান্তকণ্ঠে—'সোনা ভারতবাসীর চোখের মণি, জিগরের টুকরো, কলিজার খুন। তাই দিয়ে যখন আরম্ভ হয়েছে, তখন সর্বত্রই এটা ছড়াবে। যাও, আর মেলা বকর বকর করো না। আর শোনো, তোমার মাথায় যা মগজ তা দিয়ে পুঁটি মাছেরও একটা টোপ হবে না। তুমি নির্ভয়ে লেখো। কেউ পড়বে না। তুমিও পড়বে না—অর্থাৎ ধরা পড়বে না।'

আঁতে ফের লাগল। তবে খুব বেশী না। আমার আঁতে গণ্ডারের চামড়ার লাইনিং।

তা সে যাক্ গে। আইন বাঁচিয়ে লিখব।

* * *

আমার শত্রু চতুর্দিকে। বরঞ্চ আমাকে 'অজাতশত্রু' না বলে 'অজাতমিত্র'

বলা যেতে পারে। তারা যে আমার কী বদনাম করে বেড়াচ্ছে তার লেখাজোখা নেই। না, ভুল বললুম। পাড়ার ছোঁড়াদের কাছে আছে। 'তৃষ্ণার্ত ছাত্রদের বিয়ারদার সমিতি'তে চাঁদা দিইনি বলে তারা সেগুলো জিগির বা স্লোগান রূপে ব্যবহার করে। মহরমের 'হায় হাসান, হায় হোসেন' রোদন রব এর তুলনায় অট্টহাস্য।

তারই একটা—আমি নাকি অতিশয় সুপুরুষ। আপনারা অবশ্য এ-কথা শুনে সরল চিত্তে শুধোবেন, 'এটা আবার কুৎসা হল কি প্রকারে?'

ঐ তো! ছোঁড়াদের পেটে কী এলেম তা তো আপনারা জানেন না। সূক্ষ্ম তালেবরদের দুষ্টবুদ্ধি। বেদে নাকি আছে, 'স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু' —তার এক অর্থ নাকি, 'দেবতা শুভ বুদ্ধি দ্বারা আমাদের সংযুক্ত করুন—এক করুন।' অশুভ বুদ্ধি যে আরো কত বেশী সংযুক্ত করে, ঋষি সেটা জানতেন না। কারণ আমাদের বঁড়শে ব্যালার বুদ্দু খানসামা লেনের ছোঁড়াদের ঐক্য তিনি দেখেন নি।

তাহলে আরো বুঝিয়ে বলি। রবীন্দ্রনাথের লেখাতে আছে, এক হাড়-কিপ্টেকে শিক্ষা দেবার জন্য পাড়ার ছোঁড়ারা কাগজে মিথ্যে মিথ্যে ছাপিয়ে দেয়, তিনি নাকি অমুখ চ্যারিটি ফাণ্ডে বিস্তর টাকা খয়রাৎ করেছেন। আর যাবে কোথা? চ্যারিটি না করে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাড়ির সামনে চ্যারিটি ম্যাচের ভিড়।

হুবহু ঐ একই মতলব।

তখন স্থির করলুম, একটা ফটো তুলে এই 'উল্টো-রথে'র সঙ্গে ছাপিয়ে দেব। শুনলুম, কালীঘাটের কাছে 'ফোটো ফ্ল্যাসে'র নাকি বাসটিং বিজিনেস—ফেটে পড়ার উপক্রম। গিয়ে দেখলুম, কথাটা খাঁটি, ছাব্বিশ ক্যারেট খাঁটি আমার ছবি তুলতে গিয়ে তাদের তিনখানা লেন্স্ কার্স্ট্ করলো। আমার শ্যাটারিঙ সৌন্দর্য সইতে না পেরে।

সেই নব্বুই বছরের থুরথুরে ফরাসী বুড়ীর কাছে বাজ পড়াতে তিনি ভিরমি যান। হুঁশে ফিরে এসে বিড়বিড় করে বলেছিলেন, 'বাজের কি দোষ? আমি যে বড্ড বেশী এ্যাট্রাক্টিভ্।'

ফোটো হল না। অইল পেণ্টিং-ওলা বলেন, 'কালো হলেও চলতো, তা সে যত মিশই হোক্ না। কিন্তু এ যে, বাবা, খাজা রঙ। কালো কালির উপর পিলা মসনে। তার উপর কলাইয়ের ডালের পিছলপারা, না-সবুজ না-নীল না-কিচ্ছু। আমার প্যালেট লাটে।'

সেই থেকে ভাবছি কি করি?

তা হলে আবার একটা মাস ভাবতে দিন।

কিন্তু তাতেই বা কি? দশ ঘণ্টা বাতি জ্বালিয়ে রাখার পর সেটা নিভিয়ে দিলে ঘরে যে অন্ধকার, এক মিনিট জ্বালিয়ে রাখার পর নিভিয়ে দিলেও সেই অন্ধকার।

এক মাস চিন্তা করলেই বা কি, আর এক মিনিট চিন্তা করলেই বা কি?

আমার 'উল্টা-রথ' তৈরী হচ্ছে। নিশ্চিন্ত থাকুন। পাকা লোক লাগিয়েছি। খাস মার্কিন। ওরা গ্রেতা গার্বো থেকে আরম্ভ করে ড্যুক্ অব উইনজার—আলকাপোনে থেকে শুরু করে আর্চবিশপ অব নটিংহাম সকলেরই কোরা কাপড় ধুয়ে কেচে মলমল করে তুলতে জানে। ওটা বেরোলে আর কেউ 'জীবনস্মৃতি' পড়বে না।

ইতিমধ্যে—ইতিমধ্যে কেন—বহুদিন ধরেই আমি বহু লোকের কাছ থেকে বহু পাণ্ডুলিপি পেয়েছি। প্রেরকদের কেউ কেউ চান আমি যেন তাবৎ বস্তু পড়ে সেটি মেরামত করে দি। কেউ কেউ অল্পতেই সন্তুষ্ট। বলেন, আমার মতামত জানাতে। আর কেউ বা সরাসরি শুধান, সার্থক-সাহিত্য কি প্রকারে সৃষ্টি করতে হয়?

উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে, রিপুকর্ম-মেরামতিকরে যদি লেখক গড়া যেত তাহলে এই যে শান্তিনিকেতন, যেখানে রবীন্দ্রনাথ প্রায় চল্লিশ বৎসর ঐ সব কর্ম লেখক এবং শিক্ষক উভয়রূপেই করে গেলেন, এখান থেকে বেরিয়েছেন ক'টি সার্থক সাহিত্যিক? আমি তো একমাত্র প্রমথনাথ বিশীর নাম জানি। পক্ষান্তরে শরৎ চাটুয্যে তো কারো কাছ থেকে এক রত্তি সাহায্য পাননি। ও'র মত সার্থক লেখক ক'জন? উত্তরে সবাই বলবেন, উনি এক্সেপশন—ব্যত্যয়। আমি বলবো, সার্থক সাহিত্যিক হওয়া মানেই ব্যত্যয়।

কিন্তু তৎপূর্বে প্রশ্ন, আপনি সাহিত্যিক হতে চান কেন?

টাকা রোজগার করতে? হয় না, তা এদেশে হয় না।

অনুসন্ধান করে দেখুন, এই বাঙলা দেশে ক'জন লোক একমাত্র কলমের জোরে মোটামুটি সচ্ছল অবস্থায় আছেন। অধিকাংশই কোনো না-কোনো ধান্দায় নিযুক্ত থেকে মাসের শেষে পাকা মাইনে পান। লেখার আমদানি ঘুষের মত। কখন আসে কত আসে তার উপর কণামাত্র নির্ভর করা যায় না। ঘুষের টাকা থাকেও না।

অর্থাৎ, কপালজোরে হয়তো মাসতিনেক আপনি প্রায় পাঁচশ' টাকা করে মাসে কামালেন—এর বেশী এদেশে আশা করবেন না—কিন্তু তার উপর নির্ভর করা চলবে না। পাঠকের মতিগতি কোন্ দিন কোন্ দিকে মোড় নেবে তার কোনো স্থিরতা নেই। আপনাকে তবু লিখে যেতে হবে, নূতন বই তৈরী করতে হবে, ঐ দিয়ে যদি ভাঁটার টান ঠেকাতে পারেন। ইতিমধ্যে আপনার পুঁজি ফুরিয়ে এসেছে, অর্থাৎ যে অভিজ্ঞতার 'মূলধন' নিয়ে লেখার 'ব্যবসা' আরম্ভ করেছিলেন সেটা তলানিতে এসে ঠেকেছে। নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন কি করে? বয়েস হয়ে গিয়েছে—বন্ধ প্রেমের হাট। লোটাকম্বল নিয়ে ঘোরাঘুরিও করতে পারেন না—কোমরে বাত।

এই অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের ব্যাপারে আরেকটা জিনিস মনে পড়লো—সে বড় মজার। ইয়োরোপে যে কোনও চিত্রকরের বাড়িতে নিত্যি নূতন রমণী মডেল হয়ে আসছে। তারা বিবসনা হয়ে 'পোজ্' দেয়। কেউ কিছু বলে না। ওটা

নাকি ওদের দরকার। চিত্রকরদের সবাই যে ভীষ্মদেব, শুকদেব ঠাকুর নন সে-কথাও সবাই জানে। বস্তুত কোনো চিত্রকর যদি একটুখানি শুকদেবীয় হন তবে তাঁর তাবৎ জীবনীকার সেটা চিৎকার করে বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়ে দিয়ে আমাদের কানে তালা লাগিয়ে দেন। বাদবাকিদের কেউ গাল-মন্দ করে না। ঐ যে বললুম, ওটা নাকি ওদের দরকার।

এদেশে গুরুমহারাজদের এ-অধিকার আছে। ভৈরবী, নর্মসখীরূপে এঁরা গুরুমহারাজদের সাধন-সঙ্গিনী হন। এ প্রথা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত।

কিন্তু যদি ইয়োরোপের পাদ্রীসাহেব ভৈরবী ধরেন তবে তাঁকে তিনদিনও সমাজে টিঁকতে হবে না। এদেশের গেরস্তপাড়ায় কোনো আর্টিস্টকে মডেলসহ বাস করতে দেবে না।

আমি কোনো ব্যবস্থার নিন্দা বা প্রশংসা করছি নে। সাহিত্যিক হিসেবে সে অধিকার আমার নেই। এর বিচার করবে সমাজ। সমাজ গুরু চায়, চিত্রকর চায়, সাহিত্যিক চায়। সমাজই স্থির করবে, কার কোন্‌টাতে অধিকার। সমাজ ভুলও করে। সোক্রাতেসকে বিষ, খৃষ্টকে ক্রুশ দেয়।

এটা কিছু নূতন কথা নয়। সামান্য একটি আলাদা উদাহরণ দি। বৈজ্ঞানিকদের সাধ্যি নেই জাহাজ জাহাজ টাকা যোগাড় করে এটম বম বানাবার। মার্কিন সমাজের সর্বপ্রধান মুখপাত্র রোজোভেল্ট দেশের টাকা বৈজ্ঞানিকদের পায়ে ঢেলে দিয়ে বললেন, ওটা আমার চাই। বৈজ্ঞানিকরা তৈরী করে দিলেন। ওটা জাপানে ফেলা হবে কি না, সেটা স্থির করলেন ট্রুমান—বৈজ্ঞানিকদের হাতে সে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত করার ভার দেওয়া হয়নি। তাঁদের মতামত চাওয়া হয়েছিল মাত্র। এবং শুনলে আশ্চর্য হবেন, বৈজ্ঞানিকদের অধিকাংশই বিপক্ষে মত দিয়েছিলেন।

দার্শনিকদের বেলাও তাই। কেউ হয়তো প্রামাণিক বই লিখে প্রমাণ করলেন, ঈশ্বর নেই। কিন্তু তাঁর সাধ্য কি সে বই ইস্কুলে ইস্কুলে কলেজে কলেজে পড়ান! সেটা স্থির করবে সমাজ। কিংবা মনে করুন, বুদ্ধদেব বলেছেন ঈশ্বর নেই। সেটা সিংহল বর্মার ইস্কুলে পড়ানো হয়। এদেশে পড়াতে গেলে সমাজ আপত্তি করবে।

কিংবা এই ফিল্মের কথাই নিন। প্রডুসার ডিরেক্টর দর্শক তো স্থির করেন না, কোন্ ফিল্ম দেখানো চলবে আর কোন্‌টা চলবে না। স্থির করে সমাজ—সেন্সার বোর্ডের মারফতে। কিন্তু সে আলোচনা উপস্থিত মুলতুবী থাক। আপনি কেন সাহিত্যিক হতে চান, সেই কথায় ফিরে যাই।

তা হলে কি আপনি সাহিত্য সৃষ্টি করে খ্যাতি-প্রতিপত্তি সঞ্চয় করতে চান?

প্রতিপত্তি হবে না। সে-কথা গোড়া থেকেই বলে রাখি।

আমি সামান্য লেখক। 'দেশে-বিদেশে' বইখানা প্রাইজ পেয়েছে। আমি তাই নিয়ে গর্ব করছি নে, ঈশ্বর আমার সাক্ষী। নিতান্ত এই প্রতিপত্তির কথা উঠলো বলে সে-কথাটা বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে। আমার বন্ধুবান্ধব এবং

আপনাদের মত সহৃদয় পাঠক কেউ কেউ বলেন, 'কাবুলে তো ছিলে মাত্র দু'-বছর। তবু বইখানা মন্দ হয়নি। জর্মনিতে তো ছিলে অনেক বেশী। সে-দেশ সম্বন্ধে ঐ রকম একখানা বই লেখ না কেন?' আমি ভাবলুম, প্রস্তাবটা খুব মন্দ নয়। মোটামুটি একটা খসড়াও তৈরী করলুম। কিন্তু বিপদ হল হিটলারকে নিয়ে। বিপদ হল ১৯৩৯-৪৪-এর যুদ্ধ নিয়ে। আমি ১৯৩৮-এর পর সেখানে আর যাইনি। আর আজ হিটলার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাদ দিয়ে জর্মনি সম্বন্ধে লেখা, এ যেন মুরারজী দেশাইকে বাদ দিয়ে চৌদ্দ ক্যারেট গোল্ডের কথা লেখা।

তাই মনে করলুম, আরেকবার না হয় হয়েই আসি। কুড়ি বছরের বেশী হতে চললো, বিদেশ যাইনি। হার্টও ট্রবল দিচ্ছে। জর্মন ডাক্তাররা যদি কিছু একটা ভালো ব্যবস্থা করে দেয়। পাবলিশারদের বললুম, কিছু টাকা আগাম দিতে। যাঁদের অনুরোধ করলুম তাঁরা সোল্লাসে টাকা পাঠালেন—এঁরা সজ্জন।

এবারে ফরেন্ এক্স্চেঞ্জ বা বিদেশী মুদ্রার পালা।

উত্তর এল, ফেলেট্ 'নো'—তিন না চার লাইনে, ঠিক মনে নেই।

কোথায় রইল প্রতিপত্তি? কোথায় রইল খ্যাতির মূল্য? আমি যেতে চাইছিলুম নিজের টাকায়—সরকারের টাকায় নয়। বলুন তো, ক'জন বাঙালী লেখক নিজের টাকায় (অবশ্য সেই আগাম টাকা নেওয়ার ফলে নির্ভর করতে হবে আমার চাকরির মাইনের উপর) বিদেশ যেতে পারে? যে পারলো সেও সুযোগ পেল না।

পাঠক ভাববেন না, আমি কর্তৃপক্ষকে দোষ দিচ্ছি। মোটেই না। তাঁরা তো আমার দুশমন নন। তাঁরা যা ন্যায্য মনে করেছেন তাই করেছেন।

আমি বলতে চাই, কোথায় রইল লেখকের প্রতিপত্তি! আমি চেয়েছিলুম, কুল্লে দু হাজার টাকার বিদেশী মুদ্রা। আমার প্রতিপত্তির মূল্য তা হলে দু-হাজার টাকাও নয়। অবশ্য এতে আমার দুঃখিত হওয়া অত্যন্ত অনুচিত। স্বয়ং যীশুখৃষ্টকে ধরিয়ে দিয়েছিল তাঁর শিষ্য জুডাস্ ত্রিশটি মুদ্রার বিনিময়ে!

ঈষৎ অবান্তর হলেও বলি, তবু আমি গিয়েছিলুম। জানেন তো, নেড়ের গোঁ। পকেটে ছিল পঞ্চাশ না ষাটটি জর্মন মুদ্রা। সেখানে চললো কি করে? ওঃ! সেখানে আমার কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি আছে। তবে কি জর্মনরা খুব বাঙলা বই পড়ে? মোটেই না। তবে? আমার প্রতিপত্তি অন্য বাবদে—এবং সেটা এ-স্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর। ধরে নিন, আমি সার্কাসের দড়ির উপর নাচতে পারি—না, সেটা বিশ্বাস হল না, আমার কোমরে বাত বলে?—তা হলে ধরুন, আমি চিত্তনের পঞ্জাকে হত্তনের গোলাম বানাতে পারি!

এই তো গেল প্রতিপত্তির কথা। এবারে খ্যাতি। আমার খ্যাতি অত্যল্প, তাই আমার কথা তুলবো না। আমার ইয়ার পাহাড়ী সান্যালের (ওঃ! বলতে গর্বে বুকটা কি রকম ফুলে উঠেছে!) খ্যাতি সম্বন্ধে তো আপনাদের কোনো সন্দেহ নেই। তাকে গিয়ে শুধোন, সে কি আরামে আছে। অত্যন্ত গোবেচারী লোক—অন্তত আমার যদ্দুর জানা—দুটি পয়সা কামিয়ে, কোনো ভালো হোটেলে ইয়ার বক্সীসহ একটুখানি মুর্গী-কারি খেয়ে পান চিবোতে চিবোতে—তার পানের

ঝাঁপিটি দেখেছেন তো—বাড়ি যাবে। শুধোন গিয়ে তাকে, হোটেলে বসা মাত্রই আকছারই তার কি অবস্থা হয়।

অটোগ্রাফ, ফটোগ্রাফ, গুষ্টির পিণ্ডি-গ্রাফ কি চায় না লোকে তার কাছ থেকে! গোড়ায় আমি জানতুম না। আমার এক ভাগ্নের জন্য চাইলুম অটোগ্রাফ। সে যা করুণ নয়নে তাকালে—ভাবখানা 'এট্ টু ব্রুটি'!—যে আমার দয়া হল। তাড়াতাড়ি বললুম, না, না থাক।

বেশ কিছুদিন তাকে দেখিনি। তার কারণ অবশ্য, আমার নিবাস মফস্বলে। শহরে গিয়েছি। রেস্ত কম। তাই বসেছি তন্দুরী মুর্গীর হোটেলে একলা-একলি। মুর্গীটা খেয়ে প্রায় শেষ করেছি এমন সময় গলকম্বল মানমুনিয়া দাড়ি সমেত সমুখে দাঁড়ালেন এক মহারাজ। আমার মুখে বোধ হয় কিঞ্চিৎ বিরক্তি ফুটে উঠেছিল। লোকটাও রস্টিক,—হোটেলে এত টেবিল খালি থাকতে আমার সামনের চেয়ারখানায় ধপ করে বসে পড়বেন কেন?

শুধোলে, 'কেমন আছ ভাই?'

আরে! এ যে পাহাড়ী। দাড়ি-ফাড়ি নিয়ে এ্যাদ্দিন বাদে খাঁটি পাহাড়ী বনলো। বললুম, 'খুলে কও।'

কাতর কণ্ঠে বললে, 'আর কি উপায়, বলো!'

আমি দরদী গলায় বললুম, 'বড্ড পাওনাদার লেগেছে বুঝি?'

পাহাড়ী খাসা উর্দু বলে। সেও বলে বেড়ায়, আমি ভালো উর্দু বলতে পারি। এই করে আমার নিজের জন্য বেশ একটা সুনাম কিনে ফেলেছি।

পাহাড়ী বললে, 'তওবা, তওবা। ওয়াস্তাগ্ ফিরুল্লা। পাওনাদার হলেও না হয় বুঝতুম। আর সে কি আমার নেই? এস্তের। কিন্তু তারা ভদ্রলোক। খাবার সময় উৎপাত করে না।'

বুঝলুম, মামেলা ঝামেলাময়। বললুম, 'তা তুমি এক কাজ করো না কেন? এডমায়ারারদের কেউ ধরলে বলো না কেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, মিলটা ধরেছেন ঠিকই। তবে আমি পাহাড়ী সান্যাল নই, আমি তার ছোট ভাই, আমার নাম জংগলী সান্যাল"।' দাড়িটাই অবশ্য 'জংগলী'র ইন্সপিরিশন জুটিয়েছিল।

ঠাণ্ডী সাঁস লেকর—অর্থাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে—পাহাড়ী ফরাসীতে বললে, 'সা ন ভা পা, শের—না, ডিয়ার সে হয় না।'

আমি বললুম, 'কেন? তুমি কি আডোনিসের মত খাবসুরৎ।'

তেড়ে বললে, 'কামাল কীয়া, ইয়ার। নামে কি আপত্তি? তা নয়। একবার তাই করেছিলুম। ফল কি হল, শোনো। এই হোটেলেই, হ্যাঁ, এই হোটেলেই একদিন বসে আছি একলা। এমন সময় কে এক অচেনা লোক এসে শুধালে, "আপনি কি পাহাড়ী সান্যাল?" আমিও তোমারই মত—গ্রেট মেন থিঙ্ক এলাইক—এক গাল হেসে বললুম, "আজ্ঞে, মিলটা ধরেছেন ঠিকই, তবে আমি পাহাড়ী সান্যাল নই, আমি তাঁর ছোট ভাই।" লোকটা খানিকক্ষণ ইতিউতি করে বললে, "কি করি বলুন তো! ম্যানেজারবাবু আমাকে তাঁর কাছে পাঠালেন তিনশ' টাকা দিয়ে যেতে। তাঁকে পাই কোথায়?" তারপর

আমি তাকে যতই বোঝাই আমিই পাহাড়ী সান্যাল, সে আর মানতে চায় না।'

আমি ভেবে বললুম, 'তা তো বটেই। আমিই সে অবস্থায় মানতুম না।'

সোৎসাহে বললে, 'ইয়েহ্!' তারপর আরো ঠাণ্ডী সাঁস লেকর বললে, 'ভাই, সে টাকাটা আর কখনো পাইনি। ম্যানেজার লোকটি ছিল ভালো। অন্তত আমার টাকাটা শোধ করে লাটে উঠতে চেয়েছিল—আমি কি আর জানি। পরদিন সেখানে গিয়ে দেখি সব ফর্সা।'

হ্যাঁ। একটা কথা বলতে ভুলে গেলুম। আমার মুর্গীর বিলটা পাহাড়ীই দিয়েছিল। কিন্তু এটা বলে কি পাহাড়ীর দুশমনী করলুম না? এ যাবৎ তো লোকে শুধু অটোগ্রাফ চাইত, এখন যদি—?

আরেকটি কথা। আমাদের এত দোস্তী কেন? সে আমার বই পড়ে না, আমি তার অভিনয় দেখি না। একেবারে খাঁটি হল না কথাটা। আমি 'বড়-দিদি' দেখেছি—সে বোধ হয় 'দেশে-বিদেশে'র পাঁচ পাতা পড়েছে।

পাঠক সর্বশেষে অবশ্য শুধোবেন, আমি এত বাখানিয়া আপনাদের সাহিত্যিক হতে বারণ করছি কেন। তার কারণ সোজা। আমার বিশ্বাস, একমাত্র জিনিয়াসরাই আমার লেখা পড়ে। অর্থাৎ আপনারা। বাজারে নামলে আমার রুটি মারা যাবে বলে।

আচ্ছা, আমার কথা ছাড়ুন। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র কি বলেছেন,

অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কিং কিং ন ক্রিয়তে ময়া।
বানরীমিব বাগ্‌দেবীং নর্তয়ামি গৃহে গৃহে॥

ওরে পোড়া পেট, কত না কিছুই করি আমি তোর তরে।
বাঁদরীর মত সরস্বতীরে নাচাচ্ছি ঘরে ঘরে॥

(লেখকের অনুবাদ)

পেটের জন্যই হোক, আর খ্যাতির জন্যই হোক, সরস্বতীকে বানরের মত নাচাবেন না। আপনারা বলবেন, 'এটা তো বড় সিরিয়াস কথা হয়ে গেল।' সে-ই তো চেষ্টা করছি গত চৌদ্দ বছর ধরে। সিরিয়াস কথা হেসে হেসে বলার।

কিন্তু পারলুম কই? এখন আবার বৃদ্ধ বয়সে ধাতই বা যায় কি করে?

উম্র সারী তো কটী ইশকে বুতাঁ মে, মোমিন!
আখেরী ওয়ক্ত মে ক্যা খাক মুসলমাঁ হোংগে?

'সমস্ত জীবন তো কাটালে মিথ্যা প্রতিমার প্রেমে,
হে মোমিন!
এই শেষ সময়ে আর কি ছাই মুসলমান হব?'

বরঞ্চ লেখা বন্ধ করাই ভালো। উৎসও শুকিয়ে এসেছে।

সুখী হবার পন্থা

সুখী হবার পন্থা ? সর্বনাশ ! সে পন্থাটা এ অধমের যদি জানাই থাকতো তবে —যাক্ গে। ইতিমধ্যে একটা গল্প মনে পড়লো। এক ছোকরার বিয়ে করার বড় শখ। কিন্তু কিছুতেই হয়ে উঠছে না। ওদের পরিবারে একমাত্র শ্রীহনুমানের পুজো হয়—অন্য কোনো দেবতা সেখানে কল্কে পান না—তাই ত্রিসন্ধ্যা তাঁরই পুজো করে আর কাকুতি-মিনতি করে, 'হে ঠাকুর আমার একটি বউ জুটিয়ে দাও।' ওদিকে এরকম ঘ্যানর ঘ্যানর শুনে হনুমানের পিত্তি চটে গিয়েছে। শেষটায় একদিন স্বপ্নে দর্শন দিয়ে হুঙ্কার দিলেন, 'ওরে বুদ্ধু, বউ যদি জোটাতে পারতুম, তবে আমি নিজে বিয়ে না করে confirmed bachelor হয়ে রইলুম কেন ?'

তাই বলছিলুম, সুখী হবার পন্থাটা যদি আমার জানাই থাকতো তবে আমি এই টক্ দিতে যাব কেন ? স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে আমি যে টক্ দিচ্ছি সেটা হয় আপনাদের আনন্দ দেবার জন্য, নয় অর্থাগমের জন্য, কিংবা উভয়তঃ। আপনাদের আনন্দ দেবার ইচ্ছাটা তৃষ্ণা বিশেষ এবং বুদ্ধদেব সেটাকে তন্‌হা অর্থাৎ তৃষ্ণা বলেছেন, এবং এই তন্‌হা থেকেই সর্ব দুঃখের উৎপত্তি। এই তন্‌হাজনিত দুঃখ নিবারণই সুখ। আমাদের শাস্ত্রেও আছে, 'ভারাদ্যপগমে সুখীসংবৃতোঽহমিতিবৎ, দুঃখাভাবনে সুখিত্বপ্রত্যয়াৎ।' বাঙলা কথায়, আমার ঘাড়ে বোঝা ছিল, সেটা নেবে যেতেই বললুম, আহা কি আরাম, এসো ক্ষুদিরাম ঃ আহা কী সুখ, ঘুচে গেছে দুখ। অর্থাৎ দুঃখের অভাবই সুখ বলে প্রতীয়মান হয়। তাই পরদুঃখকাতর ফরাসী গুণী ভলতের এক অন্ধ মহিলাকে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লেখেন, Nous avons un grand sujet a traitor : it sagit de bonheur on du moins d'etre le moins malheureux qu'on peut dans ce monde.

আমাদের আলোচনার বস্তু বিপুলাকার এবং মহত্ত্বপূর্ণ ঃ প্রশ্ন এই, 'সুখী হওয়া যায় কিসে, কিংবা অন্ততপক্ষে এ সংসারে অল্পতর দুঃখী হওয়া যায় কি প্রকারে ?'

এটাকে আরো সোজা করে বলি। এক ক্ষ্যাপা ক্রমাগত মাথায় হাতুড়ি ঠুকছে। আমি শুধালুম, 'ওরে পাগল মাথায় হাতুড়ি ঠুকছিস কেন ?' এক গাল হেসে বললে, 'যখন ঠুকি না তখন কী আরাম !' সেই সংস্কৃত প্রবচনেই ফিরে এলুম, 'ঘাড়ের বোঝা নেবে যাওয়াতে কী আরাম !' মহাকবি হাইনেকে আমি বড়ই শ্রদ্ধা করি, কিন্তু এস্থলে তিনি যেটা বলেছেন, সেটা আমাদের পাগলার হাতুড়ি পেটার চেয়ে অনেক ফিকে। তিনি বলেছেন, 'কড়া ঠাণ্ডার রাতদুপুরে লেপের তলা থেকে পা বের করতে বেজায় শীত লাগলো। ফের পা দু'খানা ভিতরে টেনে নিয়ে বললুম, 'আঃ, কী সুখ !'

কিন্তু এরকম নেতিবাচক সুখ—অর্থাৎ দুঃখের অভাবে সুখ—এটাতে সবাই সন্তুষ্ট নন্। তাই অনেকেই সুখ বলতে কি বোঝেন সেটা স্পষ্ট ভাষায়

বলে গেছেন। সর্বপ্রথমই অবশ্য মনে পড়ে ওমর খৈয়াম। কান্তি ঘোষ অনুবাদ করেছেন,

সেই নিরালা পাতায় ঘেরা
বনের ধারে শীতল ছায়
খাদ্য কিছু পেয়ালা হাতে
ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।
মৌন ভাঙ্গি মোর পাশেতে
গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর
সেই তো সখী স্বর্গ আমার
সেই বনানী স্বর্গপুর।

শুনতে বেশ লাগে, কিন্তু অনুবাদটা আক্ষরিক নয়। বরঞ্চ সত্যেন দত্তের

সে বিজনে মোর পার্শ্বে বসিয়া
গাহো গো মধুর গান
বিজন হইবে স্বর্গ, আমার
তৃপ্তি লভিবে প্রাণ।

ফিট্‌জিরাল্ডেও তাই আছে

Beside me singing in the wilderness
And wilderness is paradise enow!

কান্তিবাবুর 'বিজন ছায়া' নয়, উল্টে বলা হয়েছে, মরুপ্রান্তরেও তুমি, সখী, যদি থাকো তবে সেই স্বর্গ।

এইবারে মূল ফার্সীটা শুনুন ঃ

গর দস্ত্ দহদ্ খগজ-ই গন্দুমে নানী—
ওয়াজ ময় দোমনীজ গোসফন্দি রানী—
ওয়া আনগেহ মন্ ওয়া তো নিশস্‌তে দর ওয়রাণী
এ্যায়শী বুদ আন না হন্দ-ই-হর সুলতানী—

ফার্সী ফিরিস্তিতে খৈয়াম চেয়েছেন, 'ভালো গমের উত্তম রুটি; দুই মণ মদ ধরে এরকম একটি পাত্রভরা মদ্য—হ্যাঁ বিশ্বাস করুন, ফার্সীতেই আছে 'দো মণী' এবং যে ফিট্‌জিরাল্ড নিতান্ত গদ্যময় ভেবে অনুবাদ করেননি—আছে, একখানা আস্ত দুম্বার ঠ্যাং।' এবং সর্বশেষে বলেছেন, 'তখন যা সুখ, সেটা কদাচ কখনো কোনো সুলতানের ভাগ্যে জোটে কিনা সন্দেহ।'

এগুলো আমাদের অজানা নয়। কারণ আমাদেরই মহর্ষি চার্বাক সুখী হওয়ার নির্ঘণ্ট আরো সস্তায় সেরেছেন, তিনি বলেছেন,

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ
ঋণং কৃত্ব ঘৃতং পিবেৎ!

অর্থাৎ ঋণ করেও ঘি খাও। ফেরত তো দিতে হবে না, কারণ এ দেহ ভস্মীভূত হবে, পুনর্জন্ম তাই হতে পারে না, পুনরাগমনং কুতঃ? এখানে কিন্তু খৈয়ামের সঙ্গে তাঁর তফাৎ। খৈয়াম বার বার বলেছেন, পরের মনে কষ্ট দিয়ে

সুখী হওয়া যায় না।

কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিই বলবেন—যদিও আমি আদপেই চিন্তাশীল নই এবং আমি খৈয়ামের ফিরিস্তিতেই সুখী—কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিই বলবেন, এ আবার কি সুখ? লোক-ব্যবহারেও দেখা যায়, 'আমি যে-সে সুখ চাই নে।'

সামান্য একটি মেয়েছেলে। বহু যুগ পূর্বে তাঁর স্বামী যখন তাঁকে বিস্তর ধন-দৌলত দিয়ে বনে যেতে চাইলেন তখন তিনি তাচ্ছিল্য করে বলেছেন, 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম।' যা দিয়ে আমি অমৃত হব না, পাব না, সে দিয়ে আমার কি হবে?

দেখুন দিকি, মেয়েছেলের কী বায়নাক্কা! সুখ পেয়েও সুখী হতে চায় না—অথচ দেখুন চীনেরা কী সুবুদ্ধিমান। লিং য়ুটাঙ বলেছেন, 'রাত্রের অন্ধকারে ঘরের ভিতর ঘুমিয়ে আছি। চতুর্দিকে আমার মহামূল্যবান প্রাচীন পাণ্ডুলিপি। হঠাৎ শুনি একটা ইঁদুর কুট্‌কুট্‌ করে সেগুলো কাটছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এমন সময় শুনি, আমার বেড়ালটা হুঙ্কার দিয়ে ম্যাও করে উঠেছে—আহ্‌—কী সুখ।'

কিন্তু না,—ভারতবর্ষ অমৃত চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, 'সুখের খেলায় বেলা গেছে, পাইনি তো আনন্দ।' আনন্দটা তবে কি? অমৃত। চণ্ডীদাসও বলেছেন, 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল।' এবং সুখের পরও শ্রীরাধা চেয়েছিলেন অমৃত, অমিয়া, তাই 'অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।'

অমৃতের অত্যুত্তম বর্ণনা পেয়েছি আমি একটি শ্লোকে।

কেচিদ্‌ বদন্তি অমৃতোস্তি সুরালয়েষু,
কেচিদ্‌ বদন্তি বনিতাধরপল্লবেষু,
ব্রুমো বয়ং সকল শাস্ত্র বিচারদক্ষা,
জম্বীরনীরপূরিত মৎস্যখণ্ডে॥

আহা-হা! কেউ কেউ বলেন অমৃত আছে সুরালয়ে—মদের দোকানে। কেউ কেউ বলেন, না অমৃত বনিতার অধর-পল্লবে। আর আমরা—আসলে 'আমি' এখানে সম্মানার্থে বহুবচন আমরা, কারণ আমি সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি—সকল শাস্ত্র বিচারদক্ষা—আমরা বলি জম্বীরনীর পূরিত—অর্থাৎ নেবু, জম্বীর, জামীর—সিলেটিতে—নেবু—নেবুর রসে পূরিত—ভর্তি—মৎস্যখণ্ডে! সোজা বাংলায় মাছের উপর কষে ঠেসে নেবুর রস—সেই অমৃত।

এ কবি শুধু কবি নন্‌—মহর্ষি, দিব্যদ্রষ্টা—কী করে সেই যুগেই জানলেন, বাঙলাদেশে এমন দিন আসবে যেদিন শুধু লক্ষপতিরাই শ্বশুরবাড়ি এলে মাছ কিনবেন। আর ইতরজনা—আমরা মাছের কাঁটাটি পর্যন্ত পাবো না, সধবার একাদশী ভাঙবার জন্যে!

আরেকটি কথা। কালিদাস ভবভূতি পড়ে আমেজ করতে পারি নে, এঁরা কোন্‌ প্রদেশের লোক। কিন্তু যে গুণী জম্বীরনীরপূরিত মৎস্যখণ্ডকে অমৃত বলে সে নিশ্চয়ই বাঙালী। মাছের তত্ত্ব কি বিহারী, মারওয়াড়ী, গুজরাতি

রাদাররা জানেন ?

সুখ বলুন, আনন্দ বলুন, অমৃত বলুন, সেটা পাবো কোথায় ? একটি মাত্র পথ নির্দেশ করি।

মহাকবি গ্যোটে বলেছেন,

দূরে দূরে তুমি কেন খুঁজে মরো ?
সুখ তো আছে হাতের কাছে,
শিখে নাও শুধু তারে ধরিবারে,
সুখ সে তো রয় সদা কাছে কাছে।

Willst du immer weiter schweifen
Sieh, das Gute liegt so nah,
Lerne nur das Gluck ergreifen,
Denn das Gluck ist immer da !

আর আমাদের প্রতিবেশী বাঙালী লালন ফকীর বলেছেন,

হাতের কাছে পাইনে খবর
খুঁজতে গেলাম দিল্লী শহর !

বিষের বিষ

আগা আহমদের প্রাণ অতিষ্ঠ। এক ফোঁটা মেয়ে তার বউ মালিকা খানমটা, ফুঁ দিলে উড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু সেই যে সাতসকাল ভোরবেলা থেকে ক্যাট-ক্যাট্ আরম্ভ করে তার থেকে আগা আহমদের নিষ্কৃতি নেই। 'মিনষে', 'হাড়-হাভাতে,' 'ড্যাকরা'—হেন গাল নেই যেটা আগা আহমদকে দিনে নিদেন পঞ্চাশবার শুনতে হয় না। আর গয়নাগাঁটি নিয়ে গঞ্জনা—সে তো নিত্যিকার রুটি পনীর। এবং সেই সামান্য রুটি পনীরটুকুও যদি ভালো করে আগা আহমদের সামনে ধরতো তবুও না হয় সে সব-কিছু চাঁদপানা মুখ করে সয়ে নিত, কিন্তু সে রুটিও অধিকাংশ দিন পোড়া, এবং পনীরের উপরে যে মসনে পড়েছে সেটা চেঁচে দেবার গরজও বাঁবীজানের নেই। আগা আহমদ দিন-মজুর ; খিদে পায় বড্ডই।

ব্যাপারটা চরমে পেঁছিল বিয়ের দশ বছর পর একদিন যখন আগা আহমদ কি একটা খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করলো, মালিকা খানম নিজের খাবার জন্য লুকিয়ে রেখেছে মুরমুরে রুটি, ভেজা-ভেজা কাবাব, টনটনে সেদ্ধ ডিম এবং তেল-তেলে আচার !

সে রাত্রে আগা আহমদ খেল না। বউ ঝঙ্কার দিয়ে বলল, 'ও আমার নবাব-পুত্তুর রে—রুটি পনীর ওঁয়ার রোচে না। কোথায় পাব আমি কাবাব আণ্ডা আমার আগাজানের জন্যে—'

সেই কাবাব আণ্ডা ! যা বউ নিজে খেয়েছে !

স্থির করলো ওকে খুন করবে। নূতন করে তালাক দিয়ে লাভ নেই। অন্তত একশ' বার দেওয়া হয়ে গিয়েছে। মালিকা খানম মুখ বেঁকিয়ে আপন কাজে চলে যায়। ওরা থাকে বনের পাশে—পাড়া-প্রতিবেশীও কেউ নেই যে মালিকা খানমকে এসে বলবে, 'তোমার স্বামী যখন তোমাকে তালাক দিয়েছে তখন তার পর ওর সঙ্গে সহবাস ব্যভিচার।' আর থাকলেই বা কি হত? কেউ কি আর সাহস করে আসত? আগা আহমদের মনে পড়ল গত পনেরো বছরের মধ্যে কেউ তাদের বাড়িতে আসেনি।

শুয়ে শুয়ে সমস্ত রাত ধরে আগা আহমদ প্ল্যান করলো, খুন করা যায় কি প্রকারে।

সকালবেলা বনে গিয়ে খুঁড়লো গভীর একটা গর্ত। তার উপর কাঁচা কাঠ ফেলে উপরটা সাজিয়ে দিল লতা পাতা দিয়ে।

বিকেলের ঝোঁকে বউকে বললে, 'গা-ম্যাজম্যাজ করছে। একটু বেড়াতে যাবে?'

বউ তো খল খল করে হাসলে চোঁচা দশটি মিনিট। তারপর চেঁচিয়ে উঠলো, 'কোজ্জাবো মা—মিনষের পেরাণে আবার সোয়াগ জেগেছে!'

আগা আহমদ নাছোড়বান্দা। বহু মেহনৎ করে গা-গতর পানি করে গর্তটা তৈরী করেছে।

বউ রাজী হল। বেড়াতে নিয়ে গেল বনে। কৌশলে বউকে স্টিয়ার করে করে গর্তের কাছে নিয়ে গিয়ে দিল এক মোক্ষম ধাক্কা। তার পর ফের বাঁশ-কাঁচা লতাপাতা সহযোগে গর্তটি উত্তমরূপে ঢেকে দিয়ে আগা আহমদ তার পীর-মুরশীদকে 'শুক্‌রিয়া' জানাতে জানাতে বাড়ি ফিরল।

রান্না করতে গিয়ে বাড়িতে অনেক-কিছুই আবিষ্কৃত হল। হালুয়া, মোরব্বা, তিন রকমের আচার, ইস্তেক উত্তম হরিণের মাংসের শুঁটকি। পরমানন্দে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের আগা রান্নাবান্না সেরে আহারাদি সমাপন করলে। ক্যাটক্যাটানি না শুনে না শুনে আজ তার চোখে নিদ্রা আসবে—এ-কথাটা যত বার ভাবে ততই তার চিত্তাকাশে পুলকের হিল্লোল জেগে ওঠে।

পরদিন কিন্তু আগা আহমদের শান্ত মনের এক কোণে কালো মেঘ দেখা দিল। হাজার হোক্—তার বউ তো বটে। তাকে ওরকম মেরে ফেলাটা—? বিয়ের সময় হজরৎ মুহম্মদের নামে সে কি শপথ নেয়নি যে তাকে আজীবন রক্ষণাবেক্ষণ করবে? কিন্তু ওদিকে আবার সেই দুশমনটাকে ফের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে তো মন চায় না।

এ অবস্থায় আর পাঁচজন যা করে আগা আহমদও তাই করলে। 'যাক্ গে ছাই, গিয়ে দেখেই আসি না, বেটী গর্তের ভিতর আছে কি রকম। সেই দেখে মনস্থির করা যাবে।'

গর্তের মুখের পাতা সরাতেই ভিতর থেকে পরিত্রাহি চিৎকার! 'আল্লার ওয়াস্তে রসুলের ওয়াস্তে আমাকে বাঁচাও।' কিন্তু কী আশ্চর্য! এ তো মালিকা খানমের গলা নয়। আরো পাতা সরিয়ে ভালো করে তাকিয়ে আগা আহমদ

দেখে—বাপ রে বাপ, এ্যাবড়া কালো-নাগ, কুলোপানা-চক্কর গোখরো সাপ ! সে তখনো 'চেঁচাচ্ছে, 'বাঁচাও বাঁচাও, আমি তোমাকে হাজার টাকা দেব, লক্ষ টাকা দেব, আমি গুপ্তধনের সন্ধান জানি, আমি তোমাকে রাজা করে দেব।'

সম্বিতে ফিরে আগা আহমদের হাসিও পেল। সাপকে বললে, 'তা তুমি তো কত লোকের প্রাণ নির্ভয়ে হরণ করো—নিজের প্রাণটা দিতে এত ভয় কিসের?'

ঘেন্নার সঙ্গে সাপ বললে, 'ধাত্তর তোর প্রাণ ! প্রাণ বাঁচাতে কে কাকে সাধছে ! আমাকে বাঁচাও এই দুশমন শয়তানের হাত থেকে। এই রমণীর হাত থেকে।' তারপর ডুকরে কোঁদে উঠে বললে, 'মা গো মা, সমস্ত রাত কী ক্যাট-ক্যাট কী বকাটাই না দিয়েছে। আমি ড্যাকরা, আমি মন্দা মিনষে হয়ে একটা অবলা—হ্যাঁ অবলাই বটে—নারীকে কোনো সাহায্য করছি নে, গর্ত থেকে বেরোবার কোনো পথ খুঁজছি নে, আমি একটা অপদার্থ, ষাঁড়ের গোবর। আমি—'

আগা আহমদ বললে, 'তা ওকে একটা ছোবল দিয়ে খতম করে দিলে না কেন?

চিল-চ্যাঁচানি ছেড়ে সাপ বললে, 'আমি ছোবল মারব ওকে ! ওর গায়ে যা বিষ তা দিয়ে সাত লক্ষ কালনাগিনী তৈরী হতে পারে। ছোবল মারলে সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়তুম না? সারাতো কোন্ ওঝা? ওসব পাগলামি রাখ। আমাকে তুমি গর্ত থেকে তোলো। তোমাকে অনেক ধনদৌলত দেব। পশুপক্ষী সাপ-বিচ্ছুর বাদশা সুলেমানের কসম।'

রূপকথা নয়, সত্য ঘটনা বলে দেখা গেল মালিকা খানমেরও অনেকখানি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে—এক রাত্রি সর্পের সঙ্গে সহবাস করার ফলে। কারণ এতক্ষণ ধরে একটিবারও স্বামীকে কোনো কড়া কথা বলেনি। এটা একটা রেকর্ড, কারণ ফুলশয্যার রাত্রেও নাকি সে মাত্র তিনটি মিনিট চুপ করে থেকেই ক্যাটক্যাটানি আরম্ভ করে দিয়েছিল।

মালিকা খানম মাথা নিচু করে বললে, 'ওরা গুপ্তধনের সন্ধান জানে।'

আমাদের আগা আহমদের টাকার লোভ ছিল মারাত্মক। সাপকে সুলেমানের তিন কসম খাইয়ে গর্ত থেকে তুলে নিল। বউকেও তুলতে হল—সেও শুধরে গেছে জানিয়ে অনেক কিরে কসম কেটেছিল।

সাপ বললে, গুপ্তধন আছে উত্তর মেরুতে—বহু দূরের পথ। তার চেয়ে অনেক সহজ পথ তোমাকে বাৎলে দিচ্ছি। শহর কোতয়ালের মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরবো আমি। কেউ আমাকে ছাড়াবার জন্য কাছে আসতে গেলেই মেয়েকে মারতে যাবো ছোবল। তুমি আসা মাত্রই আমি সুড়সুড় করে সরে পড়বো—তোমাকে দেবে বিস্তর এনাম, এস্তের ধন-দৌলত। কিন্তু খবরদার, ঐ একবার। অতি লোভ করতে যেয়ো না।'

ভূতের মুখে রাম নাম?
সাপের দ্বারা ভালো কাম?

শহরে এমনই তুল-কালাম কাণ্ড যে তিন দিন যেতে-না-যেতে সেই বনের

প্রান্তে আগা আহমদের কানে পর্যন্ত এসে পেঁছিল কোতয়াল-নন্দিনীর জীবন-মরণ সমস্যার কথা। তিন দিন ধরে তিনি অচৈতন্য। গলা জড়িয়ে কাল-নাগ ফোঁস ফোঁস করছে। কোতয়াল লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। তবু সাপুড়েরাও নাকি কাছে ঘেঁষছে না, বলছে উনি মা-মনসার বাপ।

প্রথমটা তো আগা আহ্‌মদকে কেউ পাত্তাই দেয় না। আরে, ওঝা-বদ্যি হন্দ হল এখন ফার্সী পড়ে আগা! কী বা বেশ, কী বা ছিরি!

কোতয়ালের কানে কিন্তু খবর গেল,

বন থেকে এসেছে ওঝা
পেটে এলেম বোঝা বোঝা।

ছবি-চেহারা দেখে তিনিও বিশেষ ভরসা পেলেন না। কিন্তু তখন তিনি শ্মশান-চিকিৎসার জন্য তৈরী—সে চিকিৎসা ডোমই করুক, চাঁড়ালও সই।

তারপর যা হওয়ার কথা ছিল তাই হল। 'ওঝা' আগা আহমদ ঘরে ঢোকা-মাত্রই সেই কাল-নাগ কোথা দিয়ে যে বেরিয়ে গেল কেউ টেরটি পর্যন্ত পেল না। কোতয়াল-নন্দিনী উঠে বসেছেন, তাঁর মুখে হাসি ফুটেছে। ভীষণ-দর্শন কোতয়াল সাহেবের চেহারা প্রসন্ন বদান্যতায় মোলায়েম হয়ে গিয়েছে। আগাকে লক্ষ টাকা তো দিলেনই, সঙ্গে সঙ্গে তাকে করে দিলেন তাঁর বাড়ির পাশের বনের ফরেস্‌ট্‌ অফিসার। এইবার আগা দু'বেলা প্রাণ ভরে বাচ্চা হরিণের মাংস খেতে পারবে।

আগা সুখে আছে। সোনাদানা পরে মালিকা খানমও অন্য ভুবনে চরছেন—ক্যাটক্যাট করে কে? তা ছাড়া এখন তার বিস্তর দাসীবাঁদী। ওদের তম্বি-তম্বা করতে করতেই দিন কেটে যায়। কর্তাও বৈঠকখানায় ইয়ার-বক্সী নিয়ে।

ওমা! এক মাস যেতে না যেতে খবর রটলো, উজীর সাহেবের মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরেছে একটা সাপ। কোন্‌ সাপ?—সেই সাপটাই হবে, আর কোন্‌টা?

এবারে দশ লাখ টাকার এনাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাইক-বরকন্দাজ পেয়াদা-নফর ছুটেছে আগা আহমদের বাড়ির দিকে,

হাতের কাছে ওঝা,
সহজ হল খোঁজা।

কিন্তু আগা আহমদের বিলক্ষণ স্মরণে ছিল, কাল-নাগ খবরদার করে দিয়েছে অতি লোভ ভালো না,—সাপ সরাতে একবারের বেশী না যায়। সে যতই অমত জানায়, ইয়ার-বক্সী ততই বলে, 'হুজুরের কী কপাল! বাপ-মার আশীর্বাদ না থাকলে এমন ধারা কখনো হয়!'

আগাকে জোর করে পাল্কিতে তুলে দেওয়া হল।

এবারে সাপ জুলজুল করে তার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার খাঁই বড্ড বেড়েছে—না? তোমাকে না পই পই করে বারণ করেছিলুম, একবারের বেশী আসবে না। তবু যে এসেছ? তা সে যাক্‌ গে—তুমি আমার উপকার করেছ বলে তোমাকে এবারের মত ছেড়ে দিলুম। কিন্তু এই শেষ বার। আর যদি আসো, তবে তোমাকে মারবো ছোবল। তিন সত্যি।'

দশ লাখ টাকা এবং তার সঙ্গে পাঁচশ' ঘোড়ার মনসব পেয়েও নওয়াব আগা আহমদের দিল-জান সাহারার মত শুকিয়ে গিয়েছে। মুখ দিয়ে জল নামে না, পেটে রুটি সয় না। কাল-নাগ আবার কখন কোথায় কি করে বসে আর সে ছোবল খেয়ে মরে! স্থির করলো, তিন্ দেশে পালাবে।

ঠিক সেই দিনই স্বয়ং কোতায়াল সাহেব এসে উপস্থিত। বিস্তর আদর-আপ্যায়ন, হস্তচুম্বন-কণ্ঠালিঙ্গন। কোতয়াল সাহেব গদগদ কণ্ঠে বললেন, 'ভাই নওয়াব সাহেব, তোমার কী কপাল! তামাম দেশের চোখের মণি, দিলের রোশনী, রাজকুমারীর প্রাণ উদ্ধার করে তুমি হয়ে যাবে দেশের মাথার মুকুট। চলো শিগ্‌গির! সেই হারামজাদা কাল-নাগ এবার জড়িয়ে ধরেছে শাহাজাদীর গলা।'

নওয়াব আগা আহমদ জড়িয়ে ধরলেন কোতয়ালের পা। হাউহাউ করে কেঁদে নিবেদন করলে সে কোন্ ফাটা বাঁশের মধ্যিখানে পড়েছে।

কোতয়ালদের হৃদয় মাখম দিয়ে গড়া থাকে না। ব্যাপারটা বুঝে নিতেই শহরদারোগাকে হুকুম দিলেন, 'চিড়িয়া বন্ধ করো পিঞ্জরামে।'

পাল্কিতে নওয়াব আগা আহমদ। দু পাশের লোক তার জয়ধ্বনি জিন্দাবাদ করছে। এক বরোকা থেকে কোতয়াল-নন্দিনী অন্য বরোকা থেকে উজীর-জাদী তাজাসের উপর পুষ্পমাল্য বর্ষণ করলেন।

আগা আহমদ মুদ্রিত নয়নে মুর্শীদমৌলার নাম আর ইষ্টমন্ত্র জপছে।

স্বয়ং বাদশা তাকে হাতে ধরে রাজকুমারীর দোরের কাছে নিয়ে এলেন।

আগা আহমদ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

কাল-নাগ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, 'আবার এসেছিস, হতভাগা? এবারে আর আমার কথার নড়চড় হবে না। তোর দুই চোখে দুই ছোবল মেরে ঢেলে দেব আমার কুল্লে বিষ।'

আগা আহমদ অতি বিনীত কণ্ঠে বললে, 'আমি টাকার লোভে আসিনি। তুমি আমাকে অগুনতি দৌলত দিয়েছো। তুমি আমার অনেক উপকার করেছ, তাই তোমার একটা উপকার করতে এলুম। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, শুনলুম তুমি এখানে। ওদিকে সকালবেলা বীবী মালিকা খানম আমাকে বলেছিলেন তিনি রাজকন্যাকে সেলাম করতে আসছেন। বোধ হয় এক্ষুণি এসে পড়বেন। তুমি তো ওঁকে চেনো,—হেঁ, হেঁ—তাই ভাবলুম, তোমাকে খবরটা দিয়ে উপকারটাই না কেন করি। তুমি আমার—'

'বাপ রে, মা রে' চিৎকার শোনা গেল। কোন্ দিক দিয়ে যে কাল-নাগ অদৃশ্য হল আগা আহমদ পর্যন্ত বুঝতে পারলো না।

এর পর আগা আহমদ শান্তিতেই জীবনযাপন করেছিল।

গল্পটি নানা দেশে, নানা ছলে, নানা রূপে প্রচলিত আছে। আমি শুনেছিলুম এক ইরানী সদাগরের কাছ থেকে, সরাইয়ের চারপাইতে শুয়ে শুয়ে।

কাহিনী শেষ করে সদাগর শুধোলেন, 'গল্পটার "মরাল" কি, বলো তো?'

আমি বললুম, 'সে তো সোজা। রমণী যে কি রকম খাণ্ডারনী হতে পারে তারই উদাহরণ। এ-দুনিয়ার নানা ঋষি নানা মুনি তো এই কীর্তনই গেয়ে গেছেন।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সদাগর বললেন, 'তা তো বটেই। কিন্তু জানো, ইরানী গল্পে অনেক সময় দুটো করে "মরাল" থাকে। এই যে-রকম হাতীর দুজোড়া দাঁত থাকে। একটা দেখাবার, একটা চিবোবার। দেখাবার "মরাল"-টা তুমি ঠিকই দেখেছে। অন্য "মরাল"-টা গভীর ঃ—খল যদি বাধ্য হয়ে, কিংবা যে-কোনো কারণেই হোক, তোমার উপকার করে তবে সে উপকার কদাচ গ্রহণ করবে না। কারণ খল তারপরই চেষ্টায় লেগে যাবে, তোমাকে ধনেপ্রাণে বিনাশ করবার জন্য, যাতে করে তুমি সেই উপকারটি উপভোগ না করতে পারো।'

অবশ্য তোমার বাড়িতে যদি মালিকা খানমের মত বিষ থাকে অন্য কথা।

কিন্তু প্রশ্ন, 'ক'জনের আছে ও-রকম বউ?'

রাজহংসের মরণগীতি

॥ এক ॥

জর্মনির চরম শত্রু ফ্রান্সের একাধিক লেখক সবিস্ময়ে স্বীকার করেছেন যে, এমন দিন আসবে, যেদিন রণবিদ্যার চর্চাশীল ব্যক্তি মাত্রেই যে রকম ফ্রিডরিক দি গ্রেট ও নেপোলিয়নের রণকলা অক্ষরে অক্ষরে অধ্যয়ন করে থাকেন, ঠিক তেমনি হিটলারের রণকলাও অধ্যয়ন করবেন।

আমরা রণচর্চা করি না; তৎসত্ত্বেও আমাদের মনেও এ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্নের উদয় হয়। যেমন, যে হিটলার দুবৎসরের ভিতর ইংলিশ চ্যানেল থেকে প্রায় মস্কো অবধি রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তিনি যখন তিন বৎসরের ভিতর তাঁর মাটির তলার আশ্রয় ('বুংকার') থেকে খবর পেলেন যে, বিজয়ী রুশ-সেনা সে আশ্রয় থেকে মাত্র পাঁচশ' গজ দূরে, আর চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরই, রক্তলোলুপ কেশরীর মত তাঁর বুংকারে এসে প্রবেশ করবে, তখন তাঁর মনে কি চিন্তার উদয় হয়েছিল? সঞ্জয় যখন বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে খবর দিলেন যে, দুর্যোধনের পরাজয় ঘটেছে, তখন তাঁর ব্যালাডের (আমার বিশ্বাস, চারণদের মুখে গীত এই ব্যালাডকে কেন্দ্র করেই ধীরে ধীরে মহাভারত রচিত হয়) ধুয়ো ছিল, 'যখন অমুকটা ঘটল, তখন আমরা জয়াশা করিনি, যখন তমুকটা ঘটল, তখনও আমরা জয়াশা করিনি',—এবং মূল ধুয়ো ছিল, 'আমরা জয়াশা করিনি, তখনও আমরা জয়াশা করিনি।' হিটলারের বেলাও কি তাই ঘটেছিল? কারণ তাঁর পরাজয়ও তো একদিনে হয়নি—তিনি কি দিনে দিনে বুঝতে পেরেছিলেন, 'এখন আর জয়াশা নেই', 'এখন আর জয়াশা নেই, না তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দুরাশা পোষণ করে কোন অলৌকিক পরিবর্তনের আশা করে-

ছিলেন ?—দুর্যোধন যেরকম উরুভঙ্গের পরও জয়াশা করে অশ্বত্থামাকে পঞ্চ-পাণ্ডবের গোপন নিধনের জন্য পাঠিয়েছিলেন ?

আরো ছোটখাটো কত প্রশ্নই না মনে উদয় হয়।

যেমন মনে করুন, হিটলার যখন পোল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্স, ওদিকে নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম জয় করে ফেলেছেন, বাঙলা কথায় একমাত্র রুশ ছাড়া এমন কোনো শক্তি ইউরোপে আর নেই যে তার মোকাবেলা করতে পারে এবং পরাজিত ইংলণ্ড আপন দ্বীপে ফিরে গিয়ে এমনি ক্লান্ত যে, জখমগুলো পর্যন্ত চাটতে পারছে না, তখন হিটলার ইংলণ্ড অভিযানে বেরোলেন না কেন ? স্বয়ং চার্চিল স্বীকার করেছেন, তখন হিটলার সে অভিযান করলে ইংলণ্ড অনায়াসে জয় করতে পারতেন।

এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন বহু ঐতিহাসিক, বহু জঙ্গীলাট, বহু কূটনীতিবিদ্, এমন কি, হিটলারের বহু সাঙ্গোপাঙ্গ। তাঁর সেনাপতিরা পর্যন্ত এ সম্বন্ধে হাজার হাজার না হোক, শত শত পুস্তক লিখেছেন।

কিন্তু আমাদের মনে তবু কৌতূহল জাগে, স্বয়ং হিটলার কি ভেবেছিলেন ? অবশ্য তাঁর উত্তরই যে শুদ্ধ হবে, এমন কোনো কথা নেই। আমাদের বন্ধু-বান্ধব যখন পরীক্ষায় ফেল করবার পর দফে দফে ফেল মারার কারণ দর্শায়, তখন আমাদেরই দুএকজনা তার অনুপস্থিতিতে আমাদের প্রকৃত কারণ দর্শিয়ে দেয়, আর তখন আমরা অনেক স্থলেই ওদেরই বিশ্বাস করি বেশী—সর্বস্থলে না হোক, অনেক স্থলেই 'স্পেকটেটর সীজ মোর অব দি গেম।'

তবু মনে বড়ই কৌতূহল হয়, নেপোলিয়ন কি ভেবেছিলেন, হিটলার কি ভেবেছিলেন ?

অধুনা তারই খানিকটে উত্তর মিলেছে।

১৯৪১-৪২ এর শীতে হিটলার গৌরবের মধ্যগগনে। ফ্রান্স পদানত—তিনি মস্কো লেলিনগ্রাদের দরজায় সদম্ভে ধাক্কা দিচ্ছেন। আত্মপ্রসাদে পরিপূর্ণ হিটলার তখন লাঞ্চ-ডিনার খাওয়ার পর সমবেত ইয়ারবক্সীদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন—জর্মন মনের উপর বহিরাগত খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব, ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নেহেরু না সুভাষ, বর্ণসংকরের কুফল, কুকুর মনিবের খাটের নিচে শোবে না অন্য কোথাও,—বস্তুত আকাশপাতালে হেন বস্তু নেই, যা নিয়ে তিনি তখন আলোচনা করেননি। 'আলোচনা' বলে ভুল করলুম—আসলে ইয়ার-দোস্ত দু'একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে না করতেই হিটলারের পঞ্চমুখ পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী শোনাতে আরম্ভ করতো। এ যেন নব গীতা—শুধু আমাদের গীতাতে প্রশ্ন করেন একা অর্জুন, এখানে অর্জুন একাধিক।

হিটলারের সেক্রেটারি মার্টিন বরমান তখন হিটলারের অনুমতি নিয়ে ঘরের এক কোণে স্টেনো রাখতে আরম্ভ করলেন। তাঁর টাইপ করা কাগজের উপর তখন বরমান তাঁর মন্তব্য ও মেরামতি করে দিলে পর শেষ সরকারী কপি তৈরি হত।

হিটলার যুদ্ধে জয়ী হলে পর এগুলো কি ভাবে প্রকাশিত হত, আদৌ প্রকাশিত হত কি না, সেকথা বলা কঠিন। যুদ্ধের পর যখন চতুর্দিকে লুঠতরাজ, তখন এ-হাত সে-হাত ঘুরে শেষটায় সে পাণ্ডুলিপি প্রথম জর্মনে ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি অনুবাদে—'হিটলারজ টেবিল-টক্' নামে প্রকাশিত হয়। প্রায় সাতশ' পাতার বই।

হিটলার 'মাইন কাম্ফ' কিংবা বক্তৃতায় তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন বিশ্বজনের সম্মুখে সরকারী ভাবে, কিন্তু এই টেবিল-টক্ ঘরোয়া। এতে হিটলার-মনের অন্য একটা দিক দেখতে পাওয়া যায়।

হিটলারের অনুচরবর্গ বলেন, যখন পরাজয় আরম্ভ হল, তখন হিটলার যে-কোনো কারণেই হোক তাঁর জেনারেল, কর্ণেল, ইয়ার-বক্সীদের সঙ্গে খানা খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে খেতে লাগলেন, নিরামিষ রান্নায় সিদ্ধহস্তা তাঁর পাচিকা এবং তাঁর মহিলা-টাইপিস্টদের সঙ্গে। তাই ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত 'টেবিল-টক' প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল।

১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসেই হিটলালের কাছে না হোক তাঁর শত্রু-মিত্র বহুজনের কাছেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আর জয়াশা নেই। তাঁর সেক্রেটারি বরমান অন্তত সে-সম্ভাবনাটার আতঙ্ক ভালোভাবেই অনুভব করেছিলেন। খুব সম্ভব, তাঁরই অনুরোধে হিটলার ফের 'টেবিল-টক' দিলেন। কিন্তু এগুলোকে আর 'টক্' বলা চলে না। তাঁর শেষ বাণী, তাঁর শেষ 'টেস্টামেন্ট' বললেই ভালো বলা হয়।

॥ দুই ॥

প্রথম প্রশ্ন ঃ ফ্রান্সের পরাজয়ের পর হিটলার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড আক্রমণ করলেন না কেন? পূর্বেই বলেছি, এ বিষয়ে নানা মুনি নানা মত দিয়েছেন ঃ এবারে হিটলারের মুখে শুনুন ঃ

'জুলাইয়ের (১৯৪০) শেষের দিকে, অর্থাৎ ফ্রান্সের পরাজয়ের এক মাস

---

1 The Testament of Adolf Hitler, (February-April 1945, The Hitler-Borman Documents, Cassell, London. pp, 115).

পরে আমি হৃদয়ঙ্গম করলুম, শান্তি আবার আমাদের মুঠোর বাইরে চলে গেল। তার কয়েক সপ্তাহ পরেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে শরৎ-হেমন্তের ঝড়-ঝঞ্ঝার পূর্বে আমরা ব্রিটেন অভিযান করতে পারবো না, কারণ আকাশযুদ্ধে আমরা সম্পূর্ণ বিজয়ী হতে পারিনি। তার সরল অর্থ, আমরা ভবিষ্যতেও আর কখনো ব্রিটেন অভিযানে সক্ষম হব না।'

(টীকা: হিটলার এবং গ্যোরিঙের চাল ছিল, ইংলণ্ডের উপর বেধড়ক বোমা বর্ষণ করলে ইংলিশ জঙ্গী বিমান আকাশে উঠবে জর্মান বিমারু বিমান নিধন করবার জন্য। তখন সেগুলোকেও বিনাশ করা হবে। ফলে আকাশে ইংলণ্ডের আর কোনো আধিপত্য থাকবে না বলে তখন সহজেই সমুদ্রপথে ব্রিটেন অভিযান সম্ভবপর হবে। ইংরেজ এই চালটি বুঝতে পেরে, বরঞ্চ বেধড়ক বোমার মার খেল, কিন্তু জঙ্গী বিমান আকাশে তুললো অত্যল্পই—বাকিগুলো বাঁচিয়ে রাখলো হিটলারের সমুদ্র অভিযানের জাহাজগুলাকে ঘায়েল করার জন্য।)

হিটলার পুনরায় অন্যত্র বলেছেন,

'ইংলণ্ড-অভিযান ও ফলে যুদ্ধ শেষ করে শান্তি স্থাপনের আশা ত্যাগ করেছিলুম। কারণ ইংলণ্ডের মূর্খ নেতারা কিছুতেই ইয়োরোপে আমাদের একছত্রাধিপত্য স্বীকার করে নিত না—যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে আমাদের সঙ্গে বৈরীভাবাপন্ন শক্তিশালী একটি রাষ্ট্রও (অর্থাৎ রুশ) বেঁচে থাকতো। যুদ্ধের তা হলে শেষই হত না—চলতেই থাকতো। এবং ইংরেজের পিছনে মার্কিন এসে জুটে তার কর্মতৎপরতা বাড়িয়ে তুলতো। মার্কিনের আবার যুদ্ধ করার জন্য সব বলই প্রচুর, যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে তারাও আমাদেরই মত প্রচুর এগিয়ে যেত; ইংলণ্ড থেকে কণ্টিনেণ্ট দূরে নয় (অর্থাৎ মার্কিন-ইংরেজ তৈরী হয়ে যাওয়ার পর তারাও কণ্টিনেণ্টে নেমে আমাদের আক্রমণ করতে পারবে)—এ সমস্ত কারণে আমাদের পক্ষে ইংলণ্ড অভিযান করে এক সুদীর্ঘকালব্যাপী লড়াইয়ের দ'য়ে মজে যাওয়া মোটেই সমীচীন হত না। কারণ স্পষ্ট দেখতে পারছো, সময়—কাল, ক্রমেই আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষের সাহায্য করে যেত বেশী। ইংলণ্ডের শেষ আশা ছিল রুশ—কারণ রুশ আমাদেরই মত শক্তিশালী—এবং তাকে খাড়া করানো আমাদের বিরুদ্ধে। এই রুশকে ঘায়েল করতে পারলেই ইংরেজ বুঝতো যে তার আর আশা নেই, এবারে সন্ধি করতেই হবে।'

হিটলার এস্থলে পরিষ্কার বুঝিয়ে বললেন, কেন ইংলণ্ড আক্রমণ না করে তিনি রুশ আক্রমণ করেন।

এ যুক্তিগুলো কতখানি বাস্তব তার বিচার রণ-পণ্ডিতেরা করবেন। ঈষৎ অবান্তর হলেও অন্য একটি যুক্তির কথা এস্থলে উল্লেখ করি, কারণ সেটি জানা থাকলে ভারতের ইতিহাস বুঝতে অনেকখানি সুবিধা হয়।

একাধিক রণ-পণ্ডিত বলেছেন, হিটলার এমন দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যার সঙ্গে সমুদ্র ও সমুদ্রাভিযানের যোগসূত্র বা ঐতিহ্য ছিল না। অস্ট্রিয়াকে ইংরেজ, স্পানীয় বা আরবের মত ম্যারিটিম্ নেশন বলা চলে না। তাই ইংলণ্ড

অভিযানের সব-কিছু তৈরী করেও[১] হিটলার শেষ মুহূর্তে কিন্তু-কিন্তু করে থেমে গেলেন।

অর্থাৎ জলাতঙ্ক না থাকলেও হিটলারের সমুদ্রাতঙ্ক ছিল—অন্তত সমুদ্র-প্রীতি যে ছিল না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য মানতে হবে এইটেই সর্বপ্রধান কারণ নয়।

পাঠান-মোগল বংশের রাজাদেরও হিটলারের অবস্থা ছিল। এঁরা এসেছিলেন ল্যান্ড-লক্‌ট্‌ দেশ থেকে। সমুদ্রের সঙ্গে তাঁদের কণামাত্র সম্পর্ক ছিল না। আমার যতদূর জানা আছে, মোগলদের ভিতর প্রথম আকবরই গুজরাত জয় করে চাক্ষুষ সমুদ্রদর্শন করেন। 'আকবর-নামা'র ইংরিজী অনুবাদক সেই সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে সমুদ্র আকবরের মনে কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারেনি। তাও আকবর প্রভৃতি বাদশারা যদি সমুদ্রপারে কিংবা অদূরে রাজধানী করতেন তা হলেও না হয় কিছুটা হত। তাঁরা থাকতেন আগ্রা-দিল্লীতে যেখানে সমুদ্রের লোনা হাওয়া পর্যন্ত পেঁছিয় না।

ফলে এদের বিপুল ঐশ্বর্য জনবল থাকা সত্ত্বেও আমাদের নৌবহর তৈরী হল না।

হোয়াট এ ট্র্যাজেডি! এঁরা যদি নৌবহর তৈরী করতেন, তবে পর্তুগীজ ইংরেজ এদেশে যে এক রত্তি পাত্তা পেত না তাই নয়, আমাদের পণ্যসম্ভার আমাদের জাহাজে করে দুনিয়ার বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়াত। আজ আমরা মার্কিন ইংরেজদের সঙ্গে পাল্লা দিতুম। এবং পরম পরিতাপের বিষয়, আজও আমাদের মন সমুদ্র-সচেতন নয়—রাজধানী সেই দিল্লীতে যে।

অথচ আমরা সবাই জানি, সমুদ্র-যাত্রায় ভারতের খ্যাতি একদা ছিল।

সে দীর্ঘ কাহিনী তুলবো না। মহাভারতের মাত্র সামান্য একটি কথার উল্লেখ করি। শান্তিপর্বে ভীষ্ম রাজ্যচর্চা সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেবার জন্য প্রজাপতিকৃত লক্ষ অধ্যায়যুক্ত এক বিরাট শাস্ত্রের উল্লেখ করে বলেছেন, "ঐ বিরাট শাস্ত্রে···নৌকা নিমজ্জনাদি দ্বারা নৌকার পথরোধ···সবিশেষ কীর্তিত হইয়াছে (শান্তিপর্ব)।" অর্থাৎ কয়েক বৎসর পরে অ্যান্টনি ইডন সুয়েজ কানালের মধ্যে জাহাজ ডুবিয়ে যে-ভাবে খালের মুখ বন্ধ করলেন! এ সংসারে নূতন কিছুই নয়।

নৌবহর বাবদে ভারতের তখনই সর্বশক্তি গেছে যখনই কেন্দ্রীয় সরকার

---

১ যাঁরা হিটলার-সখা ফোটোগ্রাফার হফ্‌মানের বই 'হিটলার উয়োজ মাই ফ্রেন্ড' পড়েছেন তাঁরাই জানেন, ইংলন্ড অভিযানের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়ার পর কথা ছিল, এক বিশেষ সন্ধ্যায় রাত দশটায় হিটলার অভিযান আরম্ভের ফাইনাল অর্ডার দেবেন। হিটলার হফ্‌মান ও অন্যান্য সাঙ্গোপাঙ্গের সঙ্গে রাত বারোটা অবধি গালগল্প করে শুতে গেলেন। কোন অর্ডারই দিলেন না। অভিযান নাকচ হল।

নৌশক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ, কারণ তখন তাঁরা বাঙলা এবং গুজরাত প্রদেশকে নৌবহর তৈরী করার জন্য অর্থ দিতেন না—এর মূল্য জানেন না বলে, সেকথা পূর্বেই বলেছি। অথচ ঐ সময়ে, যেমন মনে পড়ে তীমুর-অভিযানের পর আকবর-জাহাঙ্গীর পর্যন্ত বাঙলা গুজরাত স্বাধীন। নৌবহরের মূল্য জানেন বলে গুজরাতের স্বাধীন সুলতান মাহমুদ বেগড়া থেকে আরম্ভ করে শেষ সুলতান বাহাদুর শাহ পর্যন্ত সকলেই নৌবহর রেখেছেন এবং একাধিকবার নৌসংগ্রামে পর্তুগীজদের বেধড়ক মার মেরেছেন। গুজরাতের শেষ স্বাধীন বাদশা বাহাদুর শাহ মারা যান, তিনি যখন হুমায়ুন এবং শের শা'র ভয়ে পর্তুগীজদের সঙ্গে সন্ধি করতে তাদের জাহাজে যান। পর্তুগীজদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দেন—পর্তুগীজরা বৈঠার ঘায়ে তাঁকে খুন করে।

বাঙলাও যখন স্বাধীন তখন পর্তুগীজদের সঙ্গে লড়েছে। যদিও তারা সুন্দরবন অঞ্চল ছারখার করেছে, তবু বাঙলায় গোয়া দমন দিউ-র মত রাজ্য স্থাপন করতে পারেনি।

আকবর থেকে আওরঙজেব পর্যন্ত বাংলা-গুজুরাত আর্তকণ্ঠে বার বার চিৎকার করে কেন্দ্রের হুজুরদের জানিয়েছে, পর্তুগীজরা সর্বনাশ করছে। আমাদের পণ্যসম্ভার হারমদদের ভয়ে বিদেশে রপ্তানি হতে পারছে না। বাধ্য হয়ে জলের দরে পর্তুগীজদের বেচে দিতে হচ্ছে। আমরা যখন স্বাধীন ছিলুম তখন আমাদের আপন টাকা দিয়ে নৌবহর গড়েছি। এখন কুল্লে টাকা চলে যায় কেন্দ্রে। দয়া করে টাকা দিন ; নৌবহর গড়ি।

কিন্তু কেবা শোনে কার কথা! হুজুররা হিটলারের চেয়ে অধম ল্যান্ড লকট্ দেশের লোক, এবং এখন থাকেন দিল্লীতে। নৌবহরের মূল্য কি বুঝবেন?

ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষালাভ করি। আজও যদি কেন্দ্র বাঙলাদেশকে বাণিজ্য-নৌবহর তৈরী করবার জন্য বিশেষ মোটা টাকা না দেয়, তবে বুঝব ইতিহাস বৃথাই পড়ছি।

১৯৪১।

।। তিন ।।

হিটলার আত্মহত্যা করার এক মাস পূর্ব পর্যন্ত বার বার করুণ আর্তনাদ করে বলেছেন, এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমি চাইনি, আমি চাইনি, আমি চাইনি। আমি চেয়েছিলুম জর্মনির জন্য তার বেঁচে থাকার মত (লেবেন্স্রাউম) 'দুই বিঘে জমি।' জমিটা আসবে চেকোশ্লোভাকিয়া, পোলান্ড ও উক্রানিয়া থেকে। তাতে ইংলন্ডের কি, ফ্রান্সেরই বা কি? আমি তো ফ্রান্স কিংবা তার উপনিবেশে হাত দিতে চাইনি। ইংরেজকেও শতবার বলেছি, তার বিশ্বজোড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিও কণামাত্র লোভ আমার নেই। রুশরা বর্বর, তারা বিশ্বশান্তির শত্রু। তার পশ্চিমাঞ্চল দখল করে নিতে পারলে তার শক্তিক্ষয়

হয়ে যাওয়ায় সে বিশ্বশান্তি নষ্ট করতে পারবে না ; জর্মনরাও খেয়ে-পরে বাঁচবে, ফ্রান্সের উপনিবেশ বা ব্রিটেনের বিশ্বরাজ্যের দিকে হ্যাংলার মত তাকাবে না।

কিন্তু ফরাসী-ইংরেজ চায় না, আমরা খেয়ে-পরে বাঁচি। তারা বোঝে না, রুশ বিশ্বশান্তির কত বড় দুশমন। তাই যুদ্ধ করলো তারা। আমি যুদ্ধ করিনি।

এবং এই ফ্রান্স, ব্রিটন ও মার্কিনের পিছনে রয়েছে বিশ্বইহুদিসম্প্রদায়। আমি যেদিন (জানুয়ারী ১৯৩৩) জর্মনির কর্ণধার হলুম সেদিন থেকেই ইহুদিরা আমার ও জর্মনির বিনাশ চেষ্টায় তৎপর হয়ে উঠলো। আমিও তাদের একাধিক বার স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলুম, তারা যদি জর্মনকে নিধন করার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আহ্বান করে তবে আমি তাদের সমূলে নির্মূল করবো। বেদরদ হৃদয়ে। মানুষ যেরকম ছারপোকা মারার সময় দয়া-মৈত্রীর কথা ভাবে না।

(ন্যুরনবের্গ মকদ্দমায় গ্যোরিঙ, কাইটেল, রিবেনট্রপ ও অধুনা আইসম্যান যখন বলেন ইহুদি-নিধন ইত্যাদি ব্যাপারে স্বয়ং হিটলার সম্পূর্ণ স্বাধীন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, তখন তাঁরা কণামাত্র অতিরঞ্জন করেননি।)

যুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে হিটলারের এইটেই মোটামুটি বক্তব্য।

দুনিয়ার কুল্লে অশান্তি, বিশ্ব-জোড়া লড়াই এ সব-কিছুর জন্য একমাত্র ইহুদি সম্প্রদায়ই দায়ী—এ কথা একমাত্র গোঁড়া নাৎসি ভিন্ন কেউ স্বীকার করবে না, (অবশ্য আরবরা প্যালেস্টাইন হারিয়ে যাওয়ার ফলে করতে পারে, কিন্তু তাদের সরকারও ইহুদিদের আপন ভিন্ন ভিন্ন আরব রাষ্ট্র থেকে ব্যাপক ভাবে তাড়াবার চেষ্টা করেনি—নিধন করার তো কথাই ওঠে না) কিন্তু আমাদের মনে তবু প্রশ্ন জাগে, সত্যই ইহুদিরা কতখানি শক্তি ধরে, বিশ্বযুদ্ধের জন্য তারা কতখানি দায়ী? আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস এর সদুত্তর কেউ কখনও পাবে না—উপস্থিত শুধু এইটুকু বলতে পারি সুদ্ধমাত্র টাকার জোরে প্যালেস্টাইনের মত একটা রাজ্যস্থাপনা করা ইহুদি ভিন্ন আর কেউ কখনো করতে পারেনি।

এখানে আরেকটি অপেক্ষাকৃত সামান্য ব্যাপারের উল্লেখ করি।

সকলেরই বিশ্বাস ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ম্যুনিকে ফরাসী-ইংরেজ যখন অকাতর-চিত্তে চেকোশ্লোভাকিয়ার অংশবিশেষ হিটলারের হাতে তুলে দেন, তখন এদের মান-মর্যাদা উচ্ছন্ন যায়, এবং হিটলারের পরিপূর্ণ বিজয় ও বিশ্বজোড়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। এই জয়ে গোটা জর্মনির জনসাধারণ তখন এমনি উল্লসিত, হিটলারের জয়গানে এমনি মুখরিত যে জর্মনির ভিতরে যে-সব জর্মন হিটলারের পতনের গোপন ষড়যন্ত্র করছিলেন তাঁরা পর্যন্ত নিরাশ হয়ে তাঁদের চক্রান্ত কিছু-দিনের জন্য মুলতুবী রাখেন।

এই-ম্যুনিক ব্যাপারে হিটলারের মত কি?

তিনি খাপ্পা হয়ে বলেছেন ঃ

'সেই কট্টর ক্যাপিটালিস্ট বুর্জুয়া চেম্বারলিন যখন তার ভণ্ডামির ছাতা-খানা নিয়ে সর্ব তকলীফ বরদাস্ত করে সেই সুদূর বের্গহফে (হিটলারের নিবাস) হিটলারের মত হঠাৎ-নবাবের (আপস্টার্ট) সঙ্গে পরামর্শ করতে এল, তখন সে বিলক্ষণ জানতো যে তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমাদের বিরুদ্ধে নির্মম যুদ্ধ চালানো। আমার সন্দেহ মোচনের জন্য সে তখন যা খুশি তাই বলবার জন্য তৈরী। বের্গহফে আসার তখন তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, কোনো গতিকে সময় পাওয়া (অর্থাৎ যুদ্ধটা মুলতুবী করা)। আমাদের তখন উচিত ছিল ১৯৩৮-এই যুদ্ধ আরম্ভ করে দেওয়া। কিন্তু তারা (চেম্বারলেন সম্প্রদায়)—সেই নির্বীর্য কাপুরুষের দল—আমরা তখন যা চাইলুম তাই দিতে লাগলো। এ-অবস্থায় গায়ে পড়ে যুদ্ধ আরম্ভ করা যায় কি প্রকারে (অর্থাৎ জর্মনির জনসাধারণ বলতো ইংরেজ ফরাসী যখন আমাদের সব খাঁই-ই মিটিয়ে দিচ্ছে তখন আমরা খামকা লড়াই করতে যাব কেন)? তাই আমরা ম্যুনিকে অতি সহজ ও দ্রুত লড়াই জেতার সুযোগ হারালুম। যদিও আমরা তখন যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলুম না, তবু শত্রুর চেয়ে বেশী প্রস্তুতি আমাদের ছিল। ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরই আমাদের পক্ষে প্রশস্ততম সময় ছিল।'

মুস্সোলীনির মধ্যস্থতায় যে ম্যুনিকপর্ব সমাধান হয়েছিল সে কথার উল্লেখ হিটলার করেননি। এস্থলে আরেকটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য—১৯৩৯-এ হিটলার পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধারম্ভের পূর্বে বলেন, 'আশা করি এবারে আবার হঠাৎ কোনো বদমায়েশ (শুয়াইন-হুণ্ট) ম্যুনিকের মত শেষ মুহূর্তে এসে সব-কিছু না ভণ্ডুল করে দেয়।"

এবারে শেষ প্রশ্ন।

যুদ্ধ হারার জন্য তিনি কাকে দায়ী করলেন?

ইতিপূর্বেই আমাদের জানা ছিল, ন্যুরেনবের্গের মকদ্দমার সময় যে-সব দলিল-পত্র পেশ করা হয় তাতে হিটলারের উইলটিও ছিল। এ-উইলের সততা সম্বন্ধে শত্রু-মিত্র কেউই কোনো প্রকারের সন্দেহ প্রকাশ করেননি। এটি তিনি তৈরি করেন আত্মহত্যা করার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে। জর্মনির জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এটি লিখিত।

এ উইলে হিটলার নৌসেনার প্রশংসা করেছেন (বস্তুত তিনি মৃত্যুর পূর্বে নৌবহরের বড় কর্তাকেই তাঁর পদে বসিয়ে যাবার জন্য অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, এবং সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন নাকি বড় কর্তা স্বয়ং), যে বিমান বহরের অকৃতকার্যতার জন্য অন্তত অংশত তাঁকে পরাজয় মানতে হল তারও প্রশংসা করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করেছেন তাঁর 'ব্লিৎসক্রীগ' করনেওলা ল্যাণ্ড-আর্মির জেনারেল ফীল্ড্-মার্শালদের। সাধারণ সৈনিকের উচ্চ প্রশংসা তিনি করেছেন, কিন্তু তাঁর সর্ব ক্রোধ আর্মি আপিসারদের উপর।

তারাই তাঁর সর্বনাশ করেছে। তারা তাঁর হুকুম অমান্য করেছে। তারা প্রতিক্ষণে পরাজয় মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে। তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পদে পদে সপ্রমাণ করেছে, তারা যেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লড়ছে। অর্থাৎ নূতন

যুগে নূতন লড়াইয়ে যে নূতন কায়দায় লড়তে হবে সেটা তারা আদপেই বুঝতে পারেনি।

হিটলারের যদি সুকুমার রায় পড়া থাকতো তবে নিশ্চয়ই বলতেন, এ যেন 'ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা!' সোজা বাংলায়, জাঁদরেলরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ছায়ার সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়েছেন!

তা হলে প্রশ্ন: পোলান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে সম্পূর্ণ জয় করে মস্কোর চৌকাট পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল কারা? ওই জেনারেলরাই তো!

তবে?

১৯৫১।

হিটলার

এই গত রবিবারের 'আনন্দবাজারে'ই দেখি, আমাদের শিবুদা হিটলারকে নিয়ে একখানা 'পান্' ছেড়েছেন। 'হের হিটলার নাকি নিজের গোঁফ কামিয়ে ছদ্মবেশে বহাল তবিয়তে আর্জেন্টিনায় বিরাজ করছেন।' এর উপর শিবুদার 'পান্'—'তাঁর গোঁ গেছে, এখন গোঁফও গেল।'[১]

আমি কিন্তু পান্‌টার দিকে নজর দিচ্ছি না। আমার নজর ঐ তত্ত্ব কথাটির দিকে যে, হিটলার এখনো বেঁচে আছেন।

সত্যি নাকি?

আমি এবার জর্মনিতে বেশী লোককে এ প্রশ্ন শুধোইনি। তার কারণ আমি নিজে যখন নিঃসংশয় যে হিটলার বেঁচে নেই তখন এ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে আমার লাভ কি? যে দু'একজনকে শুধিয়েছিলাম তারাও নিঃসংশয়—বেঁচে নেই।

তা হলে প্রশ্ন, তিনি যে বেঁচে আছেন এ-গুজবের উৎপত্তি কোথায়?

হিটলার মারা যাওয়ার মাস তিনেক পর বার্লিনের কাছে শহর পৎসদামে মিত্রশক্তির এক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে নাকি স্তালিন বলেন, তাঁর বিশ্বাস, হিটলার মারা যাননি, গা-ঢাকা দিয়ে আছেন। এর কিছুদিন পর রাশান

---

১ হিটলার গোঁফ কামালেই যে তাঁর পক্ষে সেইটেই সর্বশ্রেষ্ঠ ছদ্মবেশ এই নিয়ে ১৯৩৩-চৌত্রিশেই একটি কাঁচা রসিকতা চালু ছিল। একদা হিটলার গ্যোরিঙ, গ্যোবেলস ও র‍্যোম ছদ্মবেশে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া ঠাহর করার জন্য বেরোলেন। হিটলার গোঁফ কামালেন, গ্যোরিঙ সিভিল ড্রেস পরলেন, গ্যোবেলস কথা বন্ধ করে দিলেন ও র‍্যোম একটি প্রিয়দর্শন তরুণী সঙ্গে নিলেন। এস্থলে বলে দেওয়া প্রয়োজন গ্যোরিঙ বড্ড বেশী য়ুনিফর্ম ভালোবাসতেন, গ্যোবেলস প্রপাগান্ডা চীফ বলে সমস্তক্ষণ বকর বকর করতেন আর র‍্যোম সমরতিগামী অর্থাৎ হোমোসেকসুয়েল ছিলেন।

এনসাইক্লোপীডিয়ার নূতন সংস্করণের প্রকাশ হয় এবং তাতে বলা হয়, হিটলার অদৃশ্য হয়েছেন—তিনি যে মারা গেছেন এ-কথা রুশ কর্তৃপক্ষ সরকারীভাবে অস্বীকার করলেন। ইতিপূর্বে দুনিয়ার সর্বত্র কত রকমের যে গুজব রটল তার ইয়ত্তা নেই। আর্জেন্টাইন সউদী আরব কোনো জায়গাই বাদ পড়লো না, যেখানে হিটলার নেই। এমন কি এক কাষ্ঠরসিক প্রকাশ করলেন, তিনি প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের মাঝখানে বিরাজ করছেন! সে যুগে স্পুটনিক জাতীয় কোনো কিছু আবিষ্কৃত হয়নি। না হলে হয়তো বলা হত, তিনি চন্দ্রলোকে বাস করছেন। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। চন্দ্রের লাতিন নাম লুনারিস—যা থেকে লুনাটিক—উন্মাদ শব্দটা এসেছে এবং অনেকেই বিশ্বাস করেন যে পরাজয়ের চরম অবস্থায় হিটলার নাকি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন—তবে বদ্ধ উন্মাদ নয়, মুক্ত উন্মাদ। তাই আপন আদি বাসভূমে চলে গেছেন।

তা সে যাই হোক, ইংরেজ ভাবলে, হিটলারকে নিয়ে পৃথিবীতে না এক নূতন লীজেন্ড সৃষ্টি হয়—১৯১৮ সালে জর্মনিতে যে-রকম এক লীজেন্ড চালু হয় যে জর্মন সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে হারেনি, ঘরশত্রু বিভীষণ (অর্থাৎ ইহুদি, সোশাল ডেমোক্রেট, কম্যুনিস্ট—যার যাকে অপছন্দ) যদি তার 'পিছন থেকে পিঠে ছোরা' না মারতো। হিটলার স্বয়ং এ লীজেন্ডের প্রচুরতম 'সদ্ব্যবহার' করেন। ইংরেজের তাই ভয় হল, হিটলারকে কেন্দ্র করে নয়া এক লীজেন্ড যেন সৃষ্ট না হয় যার জোরে এক নব-নাৎসি আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে ওঠে। অতএব উত্তমরূপে তদন্ত করা হোক, হিটলার বেঁচে আছে কি নেই।

এ কাজের ভার এক অতিশয় যোগ্য ব্যক্তির উপর পড়ে। ট্রেভার রোপার সাহেব খুব সম্ভব অক্সফোর্ডের অধ্যাপক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি সেনাবাহিনীর ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ বা গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করতেন।

দীর্ঘদিন ধরে অতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি তদন্ত চালান। সেই তদন্তের রিপোর্ট পাঠক পাবেন তাঁর লেখা 'লাস্ট ডেজ অব হিটলার' পুস্তকে। অতি উপাদেয় সে পুস্তক। এক দিক দিয়ে খাঁটি ঐতিহাসিকের মত প্রতিটি ঘটনা প্রতিটি সাক্ষীর বক্তব্য তিনি যাচাই করেছেন অতিশয় সন্তর্পণে, অন্য দিক দিয়ে তিনি সে সব তথ্য পরিবেশন করেছেন প্রকৃত ক্রিয়েটিভ আর্টিস্টের মত সরল ভাষায়, মনোরম শৈলীতে। পাঠকের কৌতূহল বাড়িয়ে বাড়িয়ে তাকে কি করে উৎকণ্ঠিত উদ্‌গ্রীব অবস্থায় পেঁছিয়ে সর্বশেষে সর্বাঙ্গসুন্দর সমাপ্তিতে রসসৃষ্টি করতে হয়, ঐতিহাসিক হয়েও ট্রেভার রোপার এই কৌশলটি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নিয়েছেন। বস্তুত এরকম রোমাঞ্চকর পুস্তক আমার জীবনে অল্পই পড়েছি।

কোনো কোনো অরসিক অবশ্য বলেছেন, বইখানা লুরিড, অর্থাৎ রগরগে, কিংবা বলতে পারেন, পুস্তকে বীভৎস রসের প্রাধান্য। এটা অবশ্য রুচির কথা; তবে আমার বিশ্বাস, বিষয়বস্তু নিজের থেকেই তার রসরূপ নির্ণয় করে। প্রকৃত ক্রিয়েটিভ আর্টিস্ট সে-স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। সে যেন নিতান্ত মিডিয়াম ভিন্ন অন্য কিছু নয়। রানী চন্দ যেভাবে ঘরোয়া লিখেছেন। এস্থলে

অবশ্য অবন ঠাকুরের স্থলে ঘটনা-প্রবাহই তার রসরূপ নির্ণয় করে দিয়েছে।

তৎসত্ত্বেও বহুতর লোক বিশ্বাস করতে নারাজ হলেন যে, হিটলার গত হয়েছেন। এঁরা যে সব আপত্তি তুললেন, ট্রেভার রোপার তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলোকে দফে দফে হালুয়া করে ছেড়েছেন। ভদ্রলোক ব্যঙ্গ করতেও জানেন। তাঁর বক্তব্য অনেকটা এই ঃ শীতকালে যখন য়ুরোপের লোক গরম জায়গায় যেতে চায় তখন দেখা গেল যাঁরা—এঁদের অধিকাংশই খবরের কাগজের রিপোর্টার—ট্রেভার রোপারের রায়ে সায় দিচ্ছেন না, তাঁরা বলছেন হিটলারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে আর্জেন্টিনায়, এবং গ্রীষ্মকালে বলেন, তাঁর খোঁজ পাওয়া গিয়েছে (গ্রীষ্মে শীতল, মনোরম) সুইটজারল্যাণ্ডে ! ট্রেভার রোপার বলেননি, কিন্তু ইঙ্গিত করেছেন,—অতএব পত্রিকার পয়সায় শীতে গরম জায়গা এবং গরমে শীত জায়গায় দিব্য কয়েকটা দিন পরমানন্দে কেটে গেল।

তবে এ-কথা বলা যেতে পারে যে, বইখানাকে কেউ সিরিয়াসলি চ্যালেঞ্জ করেননি। এবং ট্রেভার রোপার তাঁর সর্বশেষ শিরোপা পেলেন রাশার কাছ থেকে। হালে রাশান এন্‌সাইক্লোপীডিয়ার যে নূতন সংস্করণ বেরিয়েছে তাতে বলা হয়েছে হিটলার মৃত।

শুধু এই বই নয়, হিটলারের সঙ্গে যাঁরা তাঁর 'বুংকারে' (বোমারু বিমানের বোমা থেকে আত্মরক্ষার্থে নির্মিত ভূগর্ভস্থ আশ্রয়গৃহ) শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন তাঁদের জীবিতজন মাত্রই পরবর্তী কালে বই লিখেছেন, বিবৃতি দিয়েছেন অথবা খবরের কাগজে মাসিক প্রবন্ধাদি লিখেছেন। এঁদের সকলে মিলে একজোট হয়ে হিটলারের মৃত্যুর একটা মিথ্যা কাহিনী রচনা করে নানা ঘড়েল পুলিস, রিপোর্টার ইত্যাদির ক্রস এগজামিনেশনে পাস করে এখনো সেটা আঁকড়ে ধরে আছেন—এটা অবিশ্বাস্য। আরো নানাবিধ কারণ আছে এবং ট্রেভার রোপার সেগুলো সবিস্তর আলোচনা করেছেন। হালে শায়রার (Shirer) নামক একজন মার্কিন কর্তৃক লিখিত হিটলারের রাজত্ব সম্বন্ধে বিরাট একখানা বই বেরিয়েছে এবং ইতিমধ্যে তার জর্মন অনুবাদও হয়ে গিয়েছে। বইখানা মোটের উপর ভালোই। কিন্তু ওভার সিম্প্লিফিকেশনের দোষে দুষ্ট। শায়রার ও হিটলারের অন্যান্য জীবনী-লেখকগণও ঐক্যনাদে স্বীকার করেন, হিটলার মৃত।

কিন্তু হিটলার জীবিত না মৃত সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা এই, জর্মন জনগণ হিটলার সম্বন্ধে কি ভাবে, আবার যদি অন্য রঙ ধরে আরেক হিটলার দেখা দেন তবে সে তার অধুনালব্ধ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা বর্জন করে পুনরায় গড্ডলিকাস্রোত বওয়াবে কিনা ? এবং ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত সে যে এক বিরাট অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গেল সে সম্বন্ধে তার মতামত কি ?

যাদের বয়েস পঁচিশ-ত্রিশের চেয়ে কম তাদের জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই, কারণ যুদ্ধের বিভীষিকা তাদের কারো কারো কিছুটা মনে আছে বটে, কিন্তু হিটলারের চিন্তাধারা কর্মপদ্ধতি আপন বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করার মত বয়েস তাদের তখনো হয়নি। যাদের বয়েস তাদের চেয়ে বেশী তারা একদম চুপ ; কোনো কিছু বলতে চায় না। এরা যে ভয়ে মুখ খোলে না তা নয়,

কারণ আমি যাদের চিনি তাদের অধিকাংশই ছিলেন সোশাল ডিমোক্রেট, কিংবা ক্যাথলিক সেণ্টার (আজ আডেনাওয়ার যার দলপতি) এবং হিটলার-বৈরী। ১৯৩৭।৩৮-এ বরঞ্চ এঁরা ফিসফিস করে আমার কানে কানে হিটলার-রাজ্যের তীব্রতম নিন্দা করেছেন। কিন্তু আজ আর কোনো জর্মনই অতীত নিয়ে আলোচনা করতে চায় না। এ যেন একটা দুঃস্বপ্নের মত কেটে গিয়েছে, এটাকে নিয়ে আর আলোচনা করে লাভ কি?

আমার কোনো পাঁড় নাৎসি বন্ধু ছিল না, একজন মোলায়েম নাৎসির সঙ্গে বেশ কিছুটা হৃদ্যতা হয়েছিল। তার সন্ধান পেলুম না। তার আমার দুজনার অন্য এক বন্ধু বললে—খুব সম্ভব মারা গিয়েছে।

তবু আমি প্রাচীন পরিচয়ের একাধিক জর্মন মিলিত হলে কথার মোড় ঐ দিকে ঘোরাতুম। কিন্তু তাতে কোন লাভ হত না। পাঁচ মিনিটের ভিতর সবাই যুদ্ধ বাবদে আপন আপন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে শুরু করত। তাতে আর যা হোক, হিটলার দর্শনের উপর নূতন কোনো আলোকপাত হত না।

একদা যারা কট্টর নাৎসি ছিল তাদের বৃহৎ অংশ নিশ্চয়ই নাৎসিবাদ ত্যাগ করেছে কিন্তু বেশ কিছু নাৎসি এখনো গোপনে ঘাপটি মেরে বসে আছে চিন্তার জগতে; বাইরে অবশ্য আর পাঁচজনের মত তারাও দরকার হলে হিটলারের নিন্দা করে, কারণ নাৎসি-উইচ-হাণ্টিং, অর্থাৎ ডি-নাৎসিফিকেশন এখনো শেষ হয়নি (এই তো মাস তিনেক পূর্বে ইয়োরোপ-বিখ্যাত এক শহর-প্ল্যানার জর্মনকে ধরা হয়েছে—সে নাকি ১৯৪৫ সালে প্রায় ত্রিশজন ইটালিয়ান মজুরকে গুলি করে মারার আদেশ দেয়)।[১] এরা পুনরায় এক নূতন হিটলারের পিছনে জড়ো হবে সে সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আমার মনে হয়, গুরুবাদ জিনিসটা একবার শিকড় গাড়লে সমূলে সম্পূর্ণ বিনাশ পায় না।—হিটলারকে জর্মনি যেভাবে পূজা করেছে আমাদের চরম কর্তাভজারাও এতখানি করেনি।

উপস্থিত এদের কথাও কেউ শুনবে না – অবশ্য সাহস তাদের এখনো হয়নি, হতে হলে বেশ কিছুদিন লাগবে। কারণ জর্মনি এখনো অবসন্ন। রাজনৈতিক উত্তেজনা তার যথেষ্ট হয়ে গিয়েছে।

নব-হিটলার

আত্তিলা, চেঙ্গিস, নাদির যখন রক্তের বন্যায় পৃথিবী ভাসিয়ে দিয়েছেন তখন অসহায় মানবসন্তান কাতরকণ্ঠে রুদ্রকে স্মরণ করে তাঁর দক্ষিণ মুখের কামনা করেছে, কিংবা হয়তো ভগবানকে অভিসম্পাত দিয়েছে। কিন্তু সাহস করে এ আশা করতে পারেনি, ভবিষ্যতের আত্তিলা-নাদিরকে ঠেকানো যায় কি প্রকারে?

আজ কিন্তু মানুষের চিন্তা, এমন কী ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে করে আবার যেন আরেকটা হিটলার দেখা না দিতে পারে? কারণ এই 'সুসভ্য' বিংশ শতাব্দীতে হিটলার যে রক্তপাত করে গেলেন, তার সামনে খুব সম্ভব চেঙ্গিস নাদির হার মানেন। তাই আমি যে হিটলার নিয়ে আলোচনা করি সেটা কিছু একাডেমিক ইন্‌ট্রেস্‌ট্‌ নয়—অর্থাৎ 'অমাবস্যার অন্ধকার অঙ্গনে অন্ধের অনুপস্থিত অসিত অন্ধডিম্বের অনুসন্ধান,'[১]—সমস্যাটা শত লক্ষ্য নিরীহ মানুষের জীবনমরণ নিয়ে।

হিটলারকে আমি যে বিশেষ করে বেছে নিয়েছি তার দুটি কারণ আছে। প্রথমতঃ তিনি এমন সব কীর্তিকর্ম করে গেছেন যা আত্তিলা চেঙ্গিসের পক্ষে সম্ভব হয়নি। (সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে বোধ হয় রুদ্রের 'নবমাবতার' হিটলারের পর 'দশমাবতার' চীনের গোকুলে বাড়ছেন—নেফার সংবাদ থেকে আমার এই অনুমানটি হয়েছে।) এখানে সামান্য একটি উদাহরণ দি। পাঠককে আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—অপরাধ নেবেন না—এটা অন্ধের অন্ধ-ডিম্বের অনুসন্ধান নয়। চেঙ্গিস-নাদির যখন কোনো শহর দখল করে পাই-কারী কচু-কাটার হুকুম দিতেন তখন দেখা যেত তাঁদের সৈন্যরা তলোয়ার দিয়ে যুবা-বৃদ্ধ-শিশুর গলা কেটে কেটে শেষটায় হয়রান হয়ে গিয়ে ক্ষান্ত দিত, শুধু তাই নয়, যুদ্ধের উত্তেজনাহীন আপন-জীবনমরণ-সমস্যাবিহীন এরকম একটানা কচুকাটা কেটে কেটে তাদের এক অদ্ভুত মানসিক অবসাদ দেখা যেত, যার ফলে নিষ্ঠুর রক্তপিপাসু—পিপাসারও তো একটা সীমা আছে—বর্বরও নিস্তেজ হয়ে যেত। এ তত্ত্বটি বুঝতে হিটলারের বেশী সময় লাগেনি। হিটলার, হিমলার, হাইড্রিষ ··আইস্‌ম্যান[২] গোড়ার থেকে লক্ষ্য করলেন যদিও বাছাই

বাছাই ব্ল্যাক-কোট পল্টনের পর-পীড়ন-উল্লাসী (স্যাডিস্ট)-দের উপর ভার দেওয়া হয়েছিল বালবৃদ্ধবনিতা ইহুদিদের গুলি করে মারার—তারাও শেষ পর্যন্ত মানসিক অবসাদের স্নায়বিক জটিলতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তখন হিটলার হিমলার বের করলেন এক নয়া কল—যে কল চেঙ্গিস-নাদিরের পক্ষে আবিষ্কার করা সম্ভব ছিল না, কারণ সে যুগে বিজ্ঞান তার বাল্যাবস্থায়। বিরাট একখানা এ্যারটাইট ঘরে ইহুদিদের ঢুকিয়ে দিয়ে ছাতের উপর থেকে ভেণ্টিলেটরপানা ছিদ্র দিয়ে ছোট্ট একটিন বিষে-ঠাসা গ্যাস ফেলে দেওয়া হত—দশ মিনিটেই ঘরের সব-কুছ বিলকুল ঠাণ্ডা। এতে করে যে গ্যাসের টিনটা ফেলল তার কোনো মারাত্মক স্নায়বিক 'ঝামেলা' হওয়ার কথা নয়।

হালে আইসম্যান সম্বন্ধে একখানা বাঙলা বই পড়েছিলুম। তাতে লেখক বলেছেন, পাঁচ লক্ষ ইহুদির প্রাণহরণের জন্য হিটলার সম্প্রদায় দায়ী। পাঁচ লাখ নয়, হবে পঞ্চাশ লাখ। ফাইভ মিলিয়ন পাঁচ লাখ নয়। হয়তো লেখক আশ্চর্য হয়ে ভেবেছেন, পঞ্চাশ লাখ কি করে হয়—এত অসংখ্য লোক মেরে ফেলা অসম্ভব—পাঁচ লাখই হবে। আমরাও আশ্চর্য হই। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। একাধিক সহানুভূতিশীল এবং একাধিক নিরপেক্ষ জন বহু গবেষণার পর যে-সব গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তার থেকে দেখা যায়, আমেরিকার প্রকাশিত হিসেবে পঞ্চাশ লক্ষ আটাত্তর হাজার, প্যারিসের হিসেবে পঞ্চাশ লক্ষ ত্রিশ হাজার, লণ্ডনের হিসেবে চল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। অন্য আরেক হিসেবে পঞ্চাশ লক্ষ সাতানব্বুই হাজার। নাৎসিরা যে-সব কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলতে পারেনি সেগুলো ন্যুরনবের্গের মকদ্দমায় মিত্রপক্ষ পেশ করেন। সেগুলো থেকে অনায়াসে চল্লিশ লক্ষের হিসেবে পেঁছিনো যায় (আত্মহত্যা, অনাচার ও অকালরোগে যারা মরেছে তাদের হিসেব এতে বা অন্যান্য হিসেবে ধরা হয়নি)।

তাই আমি হিটলারকেই বেছে নিয়েছি। আমাদের সম্মুখে প্রশ্ন—এই বিরাট নরমেধ যজ্ঞ কি আবার অনুষ্ঠিত হতে পারে? কিংবা বিরাটতর?—এটম বমে যখন হাত বাড়ন্ত নয়? সে সম্ভবনা যদি থাকে তবে আগেভাগে সময় থাকতে এমন কোনো এক কিংবা একাধিক ব্যবস্থা তার বিরুদ্ধে কি গ্রহণ করা যায়?

চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছি, আরেক হিটলার খাড়া হয়ে উঠেছেন। এবং ইনি হিটলারেরও বাড়া। কারণ হিটলার মেরেছেন প্রধানত ইহুদিদের, এবং শেষের দিকের যুদ্ধে পরাজয়ের বিভীষিকার সম্মুখীন হয়ে হন্যে হয়ে গিয়ে জর্মন জাতকে—১৩।১৪ বছরের বালকরাও বাদ যায়নি—পাঠিয়েছেন রণক্ষেত্রে, জয়ের আশা যখন সমূলে নির্মূল হয়ে গিয়েছে তখনো। আর এক চৈনিক নব হিটলার গোড়ার থেকেই পাঠাচ্ছেন লক্ষ লক্ষ চীন যুবককে লস্ অব ম্যানপাওয়ারের কোন চিন্তা বিবেচনা না করে। আমাদের অফিসাররাই বলেছেন, ওরা নেমে আসে একেবারে পিঁপড়ের মত। আফটার অল্ হাউ মেনি আর ইউ গোয়িং টু কিল্, হাউ মেনি ক্যান ইউ কিল্! আমি শুনেছি কোরিয়াতেও

চীনেরা এইভাবে নেমে এসেছিল। শুনেছি প্রথম সারির হাতে বন্দুক থাকে, দ্বিতীয় সারির হাতে তাও না। শত্রুপক্ষ প্রথম সারিকে কচুকাটা (মো ডাউন —আমি শব্দার্থে 'কচুকাটা' বলছি, কারণ এদের ফ্রন্ট লাইনে পাঠানো হয়েছে, শুধু বন্দুক দিয়ে মেশিনগানের মোকাবেলা করতে, তাতে করে সামান্য একটি ঘাঁটি দখল করতে কত হাজার আপন সৈন্য অযথা মারা গেল বিলকুল তার কোনো পরওয়া না করে) করে ফেললে দ্বিতীয় সারি সেই সব বন্দুক তুলে নিয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে কচুকাটা হয়। কোরিয়াতে নাকি একটা সুরক্ষিত ঘাঁটি থেকে শ'তিনেক মার্কিন সেপাই—এখানেও মেশিনগান বনাম রাইফেল—চীনাদের কচুকাটা করতে করতে শেষটায় তাদের প্রায় নার্ভাস ব্রেকডাউন হতে চললে কমান্ডার আদেশ দেন, ঘাঁটি ত্যাগ করে পিছনে হটে যেতে। অর্থাৎ যেখানে লস্ অব ম্যানপাওয়ার সম্বন্ধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যুযুধান নব-হিটলার অগ্রসর হতে চান সেখানে তাঁর উপস্থিত জয় হবে, কিন্তু আখেরে সমূলস্তু বিনশ্যতি—কিন্তু অগণিত আপনজন ও বিস্তর পরজনকে মৃত্যু, অনাহার, মহামারীর কবলে তুলে ধরে ও বহু বহু গৃহে শোকের ঝঞ্ঝা বইয়ে দিয়ে।

হিটলারের একাধিক সেনানায়ক শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করার পর বলেন, 'যেদিন আমি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করলুম, লস্ অব জর্মন মেনপাওয়ার হিটলার আর হিসেবে নেন না, সেদিন থেকেই আমি আত্মসমর্পণের চিন্তা আরম্ভ করি।' স্তালিনগ্রাদে পাউলুস তাই করেছিলেন—যদিও হিটলারের কড়া হুকুম ছিল কচুকাটা হয়ে মরার। স্পের কলকারখানা, পুল ধ্বংস করতে নারাজ হয়েছিলেন ও মোডেলের মত একাধিক সেনানায়ক আত্মহত্যা বরণ করেন।

মৃত্যুর আটাশদিন পূর্বে হিটলার কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। চীন যে একদিন মারমূর্তি ধারণ করবে সেটা তিনি জানতেন। তবে ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে এ তত্ত্বটা তাঁর জানা ছিল না। তিনি বলেছিলেন—From the point of view of both justice and history they (চীনারা) will have exactly the same arguments, or lack of arguments to support their invasion of the American continent as had the Europeans in the sixteenth century. Their vast and undernourished masses will confer on them the sole right that history recognizes—the right of starving people to assuage their hunger—provided always that their claim is well-backed by force.

হিটলারের এই শেষ ভবিষ্যদ্বাণী। এরপর তিনি কিছু বলে থাকলে সেটা আমাদের কাছে পেঁছিয়নি।

হিটলারের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত নই। তিনি মনে করেছিলেন, রুশ এবং মার্কিনে লড়াই লাগবে। ফলে আমেরিকা ছারখার হবে। তখন চীনারা সে দেশ দখল করবে। সেই দখল করার ভিতর অন্যায় বা অধর্ম কিছু নাই। কারণ ইতিহাস মাত্র একটি সত্য স্বীকার করে—ক্ষুধিত পঙ্গপালের মত যে জন-

সমাজ কাতর সে যত্রতত্র বেদখলী করে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করার হক ধরে।

অর্থাৎ হিটলারের মতে ইতিহাস ধর্ম এবং অধর্মের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করে না। আমরা করি। শাস্ত্রে আছে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অধর্ম দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়, মঙ্গল দেখা যায়, শত্রু (সপত্ন = প্রতিদ্বন্দ্বী, সপত্নী এরই স্ত্রীলিঙ্গ এবং বাঙলায় চলিত) পরাজিত হয়, কিন্তু সমূলে বিনাশ পেতে হয়।

এই তত্ত্বকথাটি অভিজ্ঞতাপ্রসূত—আ পস্তেরিয়োরি—এবং অভিজ্ঞতা থেকে নীতিসূত্র বের করা ইতিহাসের কর্ম, অথবা ইতিহাসের দর্শন (ফিলজফি অব হিস্ট্রী) এটি করে।

হিটলার ফ্রান্স হল্যান্ড ইত্যাদি এমন কি রুশের বহুলাংশ জয় করতে ভদ্র, মঙ্গল দেখেছিলেন, সপত্নগণকে পরাভূত করেছিলেন, কিন্তু বিনাশ যখন এল তখন সেটা সর্বস্ব সমূলে উৎপাটন করলো।

এর আরেকটি গৌণ অর্থ আছে। আমরা যে ছোটোখাটো পাপ-অবিচার করে থাকি তার জন্য এই পৃথিবীতেই অল্পস্বল্প সাজা পাই—কারণ আমরা হিটলার কিংবা লাই সায়েবের মত ডাঙর প্রাণী নই। আমাদের বিনাশ সমূলে হয় না। কিন্তু ওদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা।

ভারতবর্ষের ইতিহাস আদ্যন্ত গৌরবময় নাও হতে পারে, কিন্তু আমরা ক্ষুধার তাড়নায় বা অন্য কোনো কারণেই স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে পররাজ্য আক্রমণ করিনি।

বড়া হিটলার, ছোটা হিটলারের ডরাবার কারণ নেই।

কিন্তু বারুদ শুকনো রাখতে হবে।

শাঁসালো জর্মনি

এ রকম ধন-দৌলতের ছড়াছড়ি আমি এ-জীবনে কখনো দেখিনি।

ত্রিশ-বত্রিশ বছর ধরে ইয়োরোপ যাওয়া-আসা করছি। সব-কিছু দেখেশুনে মনে হয়েছে, ধনদৌলত এবং তার বণ্টন-ব্যবস্থা সুইটজারল্যান্ডেই সব চেয়ে ভালো। ১৯২৯।৩০ সালের কথাই ধরুন। ইংলন্ডের তখন প্রচুর কলনি, বিস্তর দৌলত বিদেশ থেকে আসছে। সুইটজারল্যান্ডের কলনি নেই; সে পয়সা কামায় মালপত্র রপ্তানী করে। কিন্তু ইংলন্ড বেশী ধনী হওয়া সত্ত্বেও তার সে ধনের অনেকখানি চলে যায় গুটিকয়েক পরিবারের হাতে, কিন্তু সুইটজারল্যান্ডে সে ধনের ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় অনেক বেশী ধর্মানুমোদিতরূপে। সে-দেশেও লক্ষপতি কোটিপতি আছে, কিন্তু দেশের অধিকাংশ ধনের হিস্যা পায় আপামর জন-সাধারণ।

ফ্রান্স খুব ধনী দেশ নয়। কিন্তু সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত দেশ।

আর জর্মনি যেন জুয়াড়ীর দেশ। কখনো তার সামনে হুদোহুদো টাকা আর কখনো সে লাটে উঠি-উঠি করছে। কখনো রেস্তোরাঁকাবারে গমগম করছে, কখনো রাস্তায় রাস্তায় মেয়ে-মদ্দ কাজের সন্ধানে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এমনই যখন তার দুর্দিন প্রায় চরমে, তখন,১৯২৯ সালে, প্রথম আমি জর্মনি যাই। তার দুরবস্থা চোখে পড়ল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করলুম যে, এরা একদিন রীতিমত ধনী ছিল। ঘরের আসবাবপত্র সেই প্রাচীন দিনের খানদানী মজবুত চালে তৈরী এবং রুচিসঙ্গত। ওয়ালপেপার পর্দা, টেবলক্লথ পুরনো হয়ে এসেছে বটে কিন্তু স্পষ্ট দেখা যায় এগুলো দামী এবং একদা এরা বিদেশীর চোখ ঝলসে দিয়েছে। ১৯২৯-এ কিন্তু রিপুকর্মের পালা।

আর ১৯৬২তে দেখি—দাঁড়ান একটা গল্প মনে পড়ে গেল।

বাঙলায় যখন বলি, 'অমুক কাকের ছানা কিনেছে'—তার অর্থ সে দু হাতে পয়সা ওড়াচ্ছে। জর্মনে বলা হয়, সে জানলা দিয়ে পয়সা ছুঁড়ছে।

এ দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী সম্বন্ধে নানা রকমের আহাম্মুখের কেচ্ছা শুনতে পাওয়া যায়। জর্মন ভাষাভাষী দেশগুলোতে আহাম্মুখের রাজার নাম পল্‌ডি।

ল্যাণ্ডলেডির সঙ্গে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে পল্‌ডি দেখে এক দুদিনের চ্যাংড়া ছোকরা জব্বর দামী একখানা স্পোর্টস মোটর হাঁকিয়ে যাচ্ছে। পল্‌ডি শুধোলে, 'কে ও?' ল্যাণ্ডলেডি বললে, 'রেখে দিন ওর কথা। বাপ মরেছে। ছোকরা দেদার টাকা পেয়েছে। এখন জানলা দিয়ে পয়সা ছুঁড়ছে।'

পল্‌ডি বেজায় উত্তেজিত হয়ে বার বার শুধোয়, 'কোথায় থাকে সে? ঠিকানা কি?'

এবারে জর্মন গিয়ে দেখি, সবাই জানলা দিয়ে টাকা ছুঁড়ছে। কুড়োবার লোক নেই।

এইটুকু বললেই যথেষ্ট, জর্মনির কুত্রাচ কোনো রেল স্টেশনে আর পোর্টার, মুটে নামক নিরতিশয় প্রয়োজনীয় প্রাণীটি নেই। আমারই চোখের সামনে আমারই আড়াই-মণী ইয়া লাস ভাতিজা নামল এক ঢাউস সুটকেস নিয়ে। মুটে নদারদ্। ওপারে যেতে হবে ওভারব্রিজের উপর দিয়ে। বাবাজী সুটকেস টানছে আর বলছে, 'দুটো সুটকেসে ভাগাভাগি করে নিয়ে এলেতবু না হয় ব্যালান্‌স্‌ড হয়ে চলতে পারতুম।' বাবাজী ওপারে যখন পেঁছিলেন তখন পিঠের ঘাম কোটের বাইরে চলে এসেছে—হামবুর্গে সে-সন্ধ্যায় টেম্পারেচার ছিল পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মাঝামাঝি। ধকল কাটাতে বাবাজীকে খেতে হয়েছিল তিন লিটার বিয়ার। অবশ্য জর্মনিতে বিয়ার সস্তা।

আর দাসী-চাকরাণী? তবে শুনুন।

সবসুদ্ধ আটটি পরিবারে ডিনার লাঞ্চের নিমন্ত্রণ খেয়েছি—কারো বাড়িতে দাসী দূরে থাক, একটি হেলপিং হ্যাণ্ডও দেখতে পাইনি। কেন নেই, সেই প্রশ্ন শুধোলে পর আমার অধ্যাপকের বিধবা বললেন, মেড্? তা রাখা যায় বই কি। চার শ পাঁচ শ টাকা মাইনে। তাঁকে একখানা ঘর দিতে হবে—রেডিয়োটা অবশ্য

তিনি নিজেই আনবেন। সিনেমায় ক'দিন যাবেন, ছুটি ক'দিন দিতেই হবে সেটাও আগেভাগে ঠিক করে নেওয়া হবে, পাকাপোক্ত। তারপর তিনি নেমে এলেন ঘরের কাজে—নখে ঝাঁ-চকচকে নেলপলিশ, এইমাত্র লাগানো হয়েছে, এখনো পেন্টের গন্ধ বেরুচ্ছে। তাই কাজ করেন অতি সন্তর্পণে, পাছে বার্নিশে জখম লাগে। খানিকক্ষণ বাদে দেখবে তিনি নেই। বীবী আপন কামরায় গেছেন সিগারেট খেতে। সেটা দিনে ক'বার হয়, না হয়, সে তোমার কপাল! তার উপর মোটা দড় কাজ তিনি করবেন না—যেমন মনে করো জানলার সার্শি-গুলো জল দিয়ে ধুয়ে পোঁছা। তার জন্যে সপ্তাহে একবার করে তোমাকে অন্য লোক আনতে হবে। কি হবে অত সব বয়নাক্কার ভিতর গিয়ে!

* * *

ট্যাক্সিওয়ালাকে শুধোলুম, 'ওটা কি হে?' দেখি হামবুর্গের মত শহরে—যেখানে কিনা প্রতি ইঞ্চি জমি মহামূল্যবান—সেখানে এক জায়গায় হাজারখানেক মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে।

বললে, 'সেকেন্ড-হ্যান্ড কার্। একটা কিনবেন? মাত্র হাজার থেকে আরম্ভ। গত বছর, জোর আগের বছরের মডেল। টিপ্‌টপ্ কন্ডিশন। ট্যাঙ্ক পেট্রলে ভর্তি। দুটি কথা কইবেন—সাঁ করে তেড়ে হেঁকে বেরিয়ে যাবেন।'

বলতে না বলতে সে ঢুকে গেছে ঐ মোটরের মেলায়। ওর কথা ঠিক। গাড়িগুলো যেন কাল-পরশু কেনা। আমি শুধোলুম, 'তা গাড়িগুলো এই খোলা-মেলায় জলঝড় খাচ্ছে?'

বললে, 'ঐ তো, স্যর, রগড়। হামবুর্গে গাড়ি পাবেন সহজে—গারাজ পাবেন খুব যদি কপালের জোর থাকে।' তারপর শুধোলে, 'আপনার দেশে হাল কি রকম?'

আমি বললুম, 'আমাদের দেশের অনেক লোক পূর্বজন্মে বিশ্বাস করে।' —পূর্ব-জন্মটা কি চীজ্ সেটা তাকে বুঝিয়ে বলতে হল। শেষ করলুম এই বলে, 'সেই পূর্ব-জন্মে যদি অশেষ পুণ্য করে থাকো, তবে এ জন্মে তোমার কপালে মোটর থাকলে থাকতেও পারে। মোটরই যখন নেই তখন গারাজের তো কথাই ওঠে না।'

পরের ঘটনা, কিন্তু এই সুবাদে বলে ফেলি। এর কিছুদিন পর গিয়েছি সেই বন্ শহরে যেখানে ছাত্রজীবনের কয়েক বৎসর কাটিয়েছিলুম। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে যেতে দেখি, সামনে অগুনতি মোটর। আমার সতীর্থ—এখন নামজাদা স্লিস্টার—সঙ্গে ছিল। শুধোলুম, 'পরবটরব আছে নাকি রে? হ্যার আডেনাওয়ার এলেন নাকি? তিনি না কাছে-পিঠে কোথায় যেন থাকেন?'

শুধোল, 'কেন?'

'ঐ যে অত মটোর গাড়ি।'

'সে তো স্টুডেন্টদের।'

বলে কি! ত্রিশ-বত্রিশ বছর পূর্বে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ' তিনেক অধ্যাপকদের ক'জনার মোটর গাড়ি আছে আমরা আঙুলে গুনে বলতে পারতুম। আর আজ!

হামবুর্গে ফিরে যাই।

আমার এক প্রবীণ বন্ধু ছিলেন আমার চেয়ে বছর পনরো বড়। তিনি যুদ্ধের পর গত হন। উঠেছিলুম তাঁরই বিধবার বাড়িতে। তাঁরই এক মেয়ে কথায় কথায় বললে, 'জানেন, আজকাল এ দেশে অনেক ছেলেমেয়ে স্টুডেন্ট থাকাকালীনই বিয়ে করে ফেলে। কর্তাগিন্নী চললেন মোটর হাঁকিয়ে কলেজে—যেমন মনে করুন মেডিকেল কলেজ। পিছনের সীটে একটি বাচ্চা, কোলে আরেকটি। কলেজে পেঁছে ছোটটি রাখলেন ধাইয়ের জিম্মায়, অর্থাৎ ক্রেশে। বড়টা গেল বাগানে খেলতে।'

ওদের খেলার জন্য নাকি স্পেশাল বাগান আছে। সত্যি আছে কিনা সেটা আমি চেক্ আপ্ করার সুযোগ পাইনি। তবে এ-কথা সত্য এখন বেশ-কিছু ছেলেমেয়ে পাঠ্যাবস্থাতেই বিয়ে করে।

বললুম, 'আগে তো এরকম ছিল না, এখনই বা হল কি করে?'

বললে, 'আগে বাপ-মায়ের এত টাকা ছিল কোথায় যে ছেলেকে বলবে "তুই বিয়ে কর্। নাতি পোষার পয়সা আমার আছে।" আমিও বলি, সেই যখন বিয়ে করবেই একদিন তখন শুকিয়ে শুকিয়ে পুঁইডাঁটাটি হয়ে যাবার কি প্রয়োজন?'

আমার মনে পড়ল এক বিয়েতে স্বর্গতা ইন্দিরা দেবী একটা জোয়ান ছোকরাকে বললেন, 'দেখ দিকিনি, ছেলেটা কি রকম বুদ্ধিমানের মত বিয়ে করে ফেলল। তোরা যে পিত্তি না চটিয়ে খেতে পারিস নে।'

কিন্তু এস্থলে বলে রাখা ভালো, জর্মনিতে কোনো ছেলেই বিয়ে করে বউ নিয়ে বাপের সঙ্গে থাকে না—ভিন্ন বাসা বাঁধে।

অতএব বাপ দুটো সংসার পুষবে। এস্তের টাকা না থাকলে পারে কেডা?

কিন্তু ইতিমধ্যে আমার মাথার ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। তবে কি এই ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহে আমরা পেঁচেছিলুম এই পদ্ধতিতেই—ধাপে ধাপে! কারণ জানি, অতি প্রাচীন যুগে এদেশে বাল্যবিবাহ ছিল না। তারপর বোধ হয় হঠাৎ একদিন ধনদৌলত বেড়ে যায়—আজ যে-রকম জর্মনিতে। তখন আমরাও ছেলেছোকরাদের বিয়ে দিতে লাগলুম, তারা নিজের পায়ে দাঁড়াবার পূর্বেই। আস্তে আস্তে, ধাপে ধাপে ক'রে গৌরীদান!

এ পৃথিবীতে নূতন কিছুই নেই।

দশের মুখ খুদার তবল

ইংরেজ খায় জবর একখানা ব্রেকফাস্ট। শুধু তাই নয়, অনেক ইংরেজ ঘুম থেকে উঠে বেড-টীর সঙ্গে খায় একটি কলা কিংবা আপেল এবং একখানা বিস্কুট।

তারপর ব্রেকফাস্ট। দীর্ঘ সে ভোজন; আমি সংক্ষেপে সারি। যদি সে ইংরেজ ঈষৎ মার্কিন-ঘেঁষা হয়, তবে সে আরম্ভ করবে গ্রেপ ফ্রুট দিয়ে। তারপর খাবে পরিজ কিংবা কর্নফ্লেক, মেশাবে এক জগ্ দুধের সঙ্গে, কেউ কেউ আবার তার সঙ্গে দেবে চাকতি-চাকতি কলা এবং চিনি। ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে যাবে তবলা বাদ্য, অর্থাৎ, সঙ্গে সঙ্গে টোস্ট-মাখন খাওয়া। শেষ সময় পর্যন্ত এই তবলা বাদ্য বন্ধ হবে না। তারপর ভোজন-রসিক খাবেন কিপারস (মাছ) ভাজা—অনেকটা লোনা ইলিশের ফালির মত—তারপর খাবেন এ্যাব্বড়া এ্যাব্বড়া দুটো আণ্ডা ফ্রাই (আকারে এ-দেশী চারটে ডিমের সাইজ) তৎসহযোগে বেকন—আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, টোস্ট-মাখনের তবলা কখনো বন্ধ হবে না—এবং এর পর টেনে আনবে মার্মলেডের বোতল। খাবে নিদেন আরো খানচারেক টোস্ট ঐ মার্মলেড সহ। এবং চা কিংবা কফি তো আছেই। বাপ্‌স!

ফরাসী-জর্মন ব্রেকফাস্টে খায় যৎসামান্য রুটি মাখন আর কফি। খানদানী ফরাসী মাখনও খায় না—বলে, ফরাসী রুটির যে আপন উত্তম সোয়াদ আছে সেটা মাখনের স্পর্শে বরবাদ হয়ে যায়।

লাঞ্চের বেলা ইংরেজ খায় যৎকিঞ্চিৎ। ফরাসী-জর্মন করে গুরুভোজন।

রাত্রিবেলা ইংরেজ করে গুরুভোজন। জর্মন খায় অত্যল্প। রুটির সঙ্গে সসিজ, কিংবা চীজ এবং ফিকে পানসে চা। যা সব খাবে সাকুল্যে মালই ঠাণ্ডা, শুধু চা-টাই গরম।

এবারে গিয়ে দেখি হইহই রইরই কাণ্ড ডিনারের বেলায়ও। অবশ্য সব-কিছুই ঠাণ্ডা খাওয়ার ঐতিহ্য সে এখনো ছাড়েনি।

এবারে দেখি পাঁচ রকমের সসিজ, তিন রকমের চীজ এবং ট্যুবের খাদ্যের ছড়াছড়ি। আমরা যে রকম ট্যুব থেকে টুথপেস্ট বের করি, এরা তেমনি বের করতে থাকে কোনো ট্যুব থেকে মাস্টার্ড, কোনোটা থেকে টমাটো সস, কোনোটা থেকে মাছের পেস্ট। শুনেছি, দেখিনি, মাংসের পেস্ট ভর্তি ট্যুবও হয়। কোনো জিনিসের অভাব নেই। দামের পরোয়া ক'রো না, যত পার খাও।

রাস্তায়ও দেখি, আগে যে রাস্তায় ছিল একখানা খাদ্যদ্রব্যের দোকান (লেবেন্‌স্ মিটেল গেশেফ্‌ট্—কলোনিয়াল ভারেন) এখন সেখানে চারখানা। কারো বাড়িতে যাওয়া মাত্রই সে কোনো কথা না বলেই বের করে উত্তম রাইন মজেল (হক্ রেনিশ) তাজা বিয়ার—ইস্তেক স্কচ্ হুইস্কি, মার্কিন সিগারেট।

বড় আনন্দ হল এসব দেখে—খাক না বেচারীরা প্রাণ ভরে। এই যে সেভন ডেজ ওয়াণ্ডার—তিনদিনের ভেল্কিবাজি—এ যে কখন বিনা নোটিসে বন্ধ হয়ে যাবে কে জানে। অতএব খাও-দাও ফুর্তি করো। হেসে নাও, দু'দিন বই তো নয়।

এ তত্ত্বটি জর্মনরাও বিলক্ষণ জানে।

হামবুর্গে আমি যে পাড়ায় থাকতুম সেটা শহরতলীতে। অন্যত্র যেমন, এখানেও পাড়ার 'পাব'টি ঐ অঞ্চলের সামাজিক কেন্দ্রভূমি। দেশের লোকে কি ভাবে, কি বলে, পাবে না গিয়ে জানার উপায় নেই। গুণীজ্ঞানীরা কি ভাবেন, সেটা জানা যায় অনায়াসে—বই, খবরের কাগজ পড়ে। কিন্তু পাবের গাহকরা গুণী-জ্ঞানী নয়; তারা বই লেখে না, লেকচার ঝাড়ে না। অথচ এরাই দেশের মেরুদণ্ড।

এখানে কায়দামাফিক একে অন্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় না। পাশের লোকটির সঙ্গে গালগল্প জুড়ে দিলুম।

বললুম, 'যুদ্ধের পর ঠিক এই যে প্রথম এলুম তা নয়। বছর দুই পূর্বে এসেছিলুম মাত্র দু'দিনের তরে। কোনো একটা পাবে যাবার ফুরসৎ পর্যন্ত হয় নি। এবারে তার শোধ নেব।'

শুধোল, 'কিরকম লাগছে পরিবর্তনটা?'

আমি বললুম, 'অবিশ্বাস্য! এত ধন-দৌলত যে কোনো জাতের হতে পারে, আমি কল্পনাও করতে পারিনি।'

লোকটি হেসে বললে, 'তা তোমরাও তো এককালে খুব ধনী ছিলে। সেদিন আমি খবরের কাগজে একটা ব্যঙ্গ-চিত্র দেখছিলুম তোমাদের তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে এক মার্কিন টুরিস্ট তার স্ত্রীকে বলছে, ফ্যান্সি! এসব জিনিস তারা এমেরিকান "এড্" ছাড়াই তৈরী করেছিল।'

আমি বললুম, 'রাজরাজড়ারা ধনী ছিলেন নিশ্চয়ই—আজ যেরকম সউদী আরব, কুয়েৎ, বাহরেনে শেখরা জলের মত টাকা ওড়ায়,—কিন্তু আর পাঁচজনের সচ্ছলতা কি রকম ছিল অতখানি আমি জানি নে।'

আমাদের কথায় বাধা পড়লো। দেখি এক বৃদ্ধ আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে বিয়ারের গেলাস, পরণে মোটামুটি ভালো স্যুটই, তবে ফিটফাট বলা চলে না। ফিসফিস করে যেভাবে কথা আরম্ভ করলে তাতে মনে হল, এখনো বুঝি নাৎসি যুগের গেস্তাপো গোয়েন্দার বিভীষিকা সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। নাঃ, আমারই ভুল। হামবুর্গে যখন বেধড়ক বোমা ফেলে তখন কি জানি কি করে তার গলার সুর বদলে যায়। এ তত্ত্বটা জানা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার ফিসফিসিনিতে বলা কথাগুলো কেমন যেন উচাটন মন্ত্রে উচ্চারিত নিদারুণ ভবিষ্যদ্বাণী বলে মনে হচ্ছিল।

ডান হাত তুলে ধরে গেলাস দিয়ে জানলার দিকে নির্দেশ করে শুধোলে, 'কি দেখছ?'

আমি বললুম, 'এস্তের মোটর গাড়ি।'

আবার সেই ফিসফিস। বললে, 'এদের ক'জন সত্যি সত্যি মোটর পুষতে পারে জানো? শতেকে গোটেক। তোমার দেশের কথা বলছিলে না, রাজ-রাজড়ারা ধনী ছিলেন বাদবাকিদের কথা বলতে পারছো না। এখানেও তাই। এই যে মোটর দাবড়ে বেড়াচ্ছেন বাবুরা, এদের ক'জন মোটরের পুরো দাম

শোধ করেছেন কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু আমি জানি, সব ইন্‌স্‌টল্‌মেন্টের ব্যাপার। জী লেবেন য়্যুবার ঈরে ফেরহেল্টনিসে—যে আর লিভিং বিঅন্ড দেয়ার মীনস্‌—আনে সিকি, ওড়ায় টাকা।'

আমি বললুম, 'সে কথা বললে চলবে কেন? কট্টর অবজেকটিভ বিচারেও বলা যায়, তোমাদের ধনদৌলত বিস্তর বেড়েছে।'

বুড়ো অসহিষ্ণু হয়ে বললে, 'কে বলেছে ধনদৌলত বাড়েনি। বেড়েছে নিশ্চয়ই। আলবৎ বেড়েছে। কিন্তু প্রথম কথা, যা বেড়েছে তার তুলনায় খরচ করছে অনেক বেশী। এবং দ্বিতীয় কথা, এ ধনদৌলতের পাকা ভিত নেই। ১৯১২-১৯১৪-এ আমাদের যে ধনদৌলত ছিল তার ছিল পাকা বুনিয়াদ।'

আমি বললুম, 'তাতেই বা কি ফয়দা হল? ইনফ্লেশন এসে সে পাকা বুনিয়াদও তো-ঝুরঝুরে করে দিয়ে চলে গেল।'

বুড়ো শুধু মাথা নাড়ে আর বার বার বলে, 'জী লেবেন য়্যুবার ঈরে ফের-হেল্টনিসে, জী লেবেন য়্যুবার ঈরে ফেরহেল্টনিসে—কামায় সিকি, ওড়ায় টাকা।'

বুড়ো আমাদের ছেড়ে বারের দিকে এগোলো খালি গেলাস পূর্ণ করার জন্য।

আমি যার সঙ্গে প্রথম কথা আরম্ভ করেছিলুম, সে এতক্ষণ হাঁ-না কিছুই বলে নি। এবারে নিজের গেলাসের দিকে তাকিয়ে বললে, 'বুড়োর কথা একে-বারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। তবে তুমি যে এই ইনফ্লেশনের কথা তুললে না, সেইটেই হচ্ছে আসল ভয়। ইনফ্লেশনের বন্যা এসে একদিন সব-কিছু ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়, তারই ভয়ে সবাই টাকা খরচ করছে দু'হাতে। এমন কি, যে কড়ি এখনো কামানো হয়নি সেটাও ওড়াচ্ছে।'

আমি বললুম, 'যে কড়ি এখনো কামানো হয়নি, সেটা ওড়াবে কি করে? তারপর বললুম, 'ওঃ! বুঝেছি! ধার করে।'

বললে, 'ঠিক ধার করে নয়। কারণ, ধার করলে সে পয়সা একদিন না একদিন ফেরত দিতে হয়। না দিলে পাওনাদার বাড়ি ক্রোক করে। কিন্তু ইন্‌স্‌টল্‌মেন্টের কেনা জিনিসে সে ভয়ও নেই। বড় জোর যে জিনিসটা কিনেছে সেটা ফেরত নিয়ে যাবে।'

ইতিমধ্যেই সেই ফিস্‌ফিস্‌-গলা বুড়ো ফিরে এসেছে। বললে, 'টাকা ধার পর্যন্ত নেওয়া যায়। আমি রোক্কা টাকার কথা বলছি, ইন্‌স্‌টল্‌মেন্টের কথা হচ্ছে না। টাকা শোধ না দিলে যদি ক্রোক করতে আসে, তবে লাটে তুলবে কি? বাড়ির তাবৎ জিনিসই তো ইন্‌স্‌টল্‌মেন্টে কেনা। সেগুলো তো ক্রোক করা যায় না।'

আমি বুড়োকে বললুম, 'আপনি সব-কিছু বড্ড বেশী কালো চশমার ভিতর দিয়ে দেখছেন।'

বুড়ো বললে, 'আমি কি একা? আমাদের প্রধানমন্ত্রী আডেনাওয়ারও তো

ঐ পরশু দিন দেশের লোককে সাবধান করে দিয়েছেন, "এ সুদিন বেশীদিন থাকবে না। হুঁশিয়ার, সাবধান!" পড়োনি কাগজে?'

আমি বললুম, 'অতশত বুঝি নে। পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সবাই খাসা ফুর্তিতে আছে। ঐটেই হল বড় কথা।' তারপর যার সঙ্গে প্রথম কথা বলতে আরম্ভ করেছিলুম, তাকে শুধোলুম, 'তোমাদের শহরের মধ্যিখানে যে হাজার খানেক সেকেন্ড-হ্যান্ড কার্ ফর সেল্ দেখলুম, সেগুলো কি ইন্স্টলমেন্টে কেনা ছিল, আর কিস্তি খেলাপ করেছে বলে বাজেয়াপ্ত হয়ে ঐখানে গিয়ে পেঁছেছে?'

বললে, 'নিশ্চয়ই তার একটা বড় অংশ।' বুড়ো আবার মাথা দোলাতে দোলাতে বললে, 'তোমাকে বলিনি, জী লেবেন য়্যুবার ঈরে ফেরহেল্টনিসে! কামায় সিকি, ওড়ায় টাকা!'

* * *

সুবুদ্ধিমান পাঠককে সাবধান করে দিচ্ছি, আমি অর্থনীতি জানি নে, এসব মতামতের কতখানি ধোপে টেকে, বলতে পারবো না। আমি যা শুনেছি, সেইটেই রিপোর্ট করলুম। এবং আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এসব 'পাবে' শুম্পেটার, কেইনস্, শাখ্ট্ আসেন না। আসে যেদো মেদো। কিন্তু ভুললে চলবে না, কথায় বলে, দশের মুখ খুদার তবল।

হাসির অ-আ, ক-খ

॥ এক ॥

হাসির অ-আ, ক-খ।

হাসির 'চুটকিলা' (উইট্, হিউমার, এনেকডোট) নিয়ে যে-সব সংকলন বেরোয়, সেগুলো বেশীর ভাগ আপনার আমার মত সাধারণ জনই করে থাকে। অবশ্য এদের নির্মাতারা, অর্থাৎ যারা সব উইট্ বা রসিকতা প্রথম পাঁচজনকে হাসিয়ে কিংবা একজনকে চটিয়ে আর পাঁচজনকে হাসিয়ে নির্মাণ করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই ওয়াইল্ডের মত বিখ্যাত সাহিত্যিক, কিংবা হুইস্লারের মত চিত্রকর নন। আবার এ কথাও অতি সত্য যে, বেশীর ভাগ চুটকিলাই অতি সাধারণ জনই করে থাকে—সাহিত্যে, কাব্যে, দর্শনে, এমন কি সমাজেও তাঁরা বিখ্যাত নন। পাড়ার চায়ের দোকানে যে-লোক রসিয়ে গল্প বলে, কারো কথার উত্তরে হাসির-জবাব দিয়ে আর পাঁচজনকে হাসিয়ে মারে, সে-লোকটি দোকানের বাইরে হয়তো কোনো কিছুতেই সার্থক হয়নি—হয়তো বা পাড়ার মুরুব্বী তাকে 'বিশ্ব-বকাটে' পদবী দিয়ে বসে আছেন, কারণ চায়ের দোকান থেকে ছেলের মারফৎ খুড় গৃহিণী তার কয়েকটি রসিকতা তাঁর কানে এসে পেঁছেছে, এবং হয়তো বা তাঁরই মত দু-একটি মুরুব্বীকে নিয়েই।

অথচ পৃথিবীর অধিকাংশ চুটকিলা নির্মাণ করেছে এরাই। লোকমুখে ঘুরেফিরে এ-দেশ ও-দেশ হয়ে হয়ে বিশ্বময় এরা ছড়িয়ে পড়ে। বরঞ্চ ওরই মত যে লোক-সঙ্গীত মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে, তাদেরও নির্মাতার সন্ধান

কোনো কোনো স্থলে পাওয়া যায়, কিন্তু এদের বৃহৎ অংশের মূল অনুসন্ধান কেউ করে না, ক'রে কোনো লাভও নেই।

লোকসঙ্গীত, রূপকথার মত এই সব হাসির চুটকিলার সৃষ্টিকর্তা প্রধানত জনগণ। অবশ্য গুণী, জ্ঞানী, রসিক সাহিত্যিকরাও এতে আপন আপন মৃদু-হাস্য, অট্টহাস্য, বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ মিশিয়ে দিয়েছেন।

তা ছাড়া এমন সব ঘটনাও ঘটে, যা দেখে বা শুনে মনে হাস্যরসের উদ্রেক হয়। যারা ঘটনাটা দেখলো বা শুনলো, তাদের কারো একজনের সামান্যতম রসবোধ থাকলে এবং সে ঘটনাটি 'ব্রডকাস্ট' করলেই হল। যেমন আইনস্টাইনের গৃহিণী ছেলেন অতিশয় সরলা নারী।[১] কী-এক পরব উপলক্ষ্যে, স্বামী অসুস্থ বলে, তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে একা গেছেন আমেরিকার বিশাল এক ল্যাবরেটরিতে। সেখানে দৈত্য-দানবের মত ভীষণদর্শন বিরাট বিরাট যন্ত্রপাতি। বিমূঢ়ের মত এটা-সেটা দেখতে দেখতে একজন কর্তাব্যক্তিকে তিনি শুধোলেন, 'এগুলো—এগুলো দিয়ে কি হয়?' কর্তাব্যক্তি বিগলিত হয়ে সুমধুর মৃদুহাস্য হেসে মুরুব্বীর সুরে বললেন, 'কেন ম্যাডাম, এইসব যন্ত্রপাতি দিয়েই তো আপনার স্বনামধন্য স্বামীর থিয়োরি সব সপ্রমাণ করা হয়।' ম্যাডাম তো 'দশ হাত বরফপানিমে'। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'কিন্তু—কিন্তু আমার স্বামী তো এসব টোকেন পুরনো খামের উল্টো দিকে।'

এ গল্প বানানোর ভিতর কারো কোনো কেরদানী নেই।

এই রকম দুনিয়ার যত রকমের হাস্যরসের উপাদান থাকতে পারে, তারই একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন জর্মনির এক উত্তম সাহিত্যিক। পূর্বেই বলেছি, সাধারণতঃ এরকম সংকলন করে থাকেন আপনার আমার মত সাধারণ জন, তাই সংকলনগুলো অসাধারণ হয় না। এটা অবশ্য একটা paradox পূর্বে যখন বলেছি, পৃথিবীর বেশীর ভাগ চুটকিলাই নির্মাণ করে সাধারণ জন, তখন তার সংকলন করবে সাধারণ জন—এ তো বাঙলা কথা। কিন্তু এইখানেই প্যারাডক্স্। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মধু তার নিজ মূল্য নাহি জানে।' এক ইরানী কবিও বলেছেন, 'যে-শুক্তি মুক্তার জন্ম দিয়েছে আপন প্রাণরস দিয়ে, সে-শুক্তিকে তো মুক্তার মূল্য বিচারের সময় ডাকা হয় না—ডাকা হয় জহুরীকে।' কিংবা বলতে পারি, নেপোলিয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনী যে তাঁর জননীই লিখবেন, এমন কোনো কথা নয়।

বর্তমান পুস্তকের নাম, 'আ বে ৎসে ডেস লাখেনস্,—হাসির অ-আ ক-খ। (এক্স ওয়াই জেড—যদি কখনো বেরোয়, তবে 'দেশে'র পাঠককে জানাব।) লেখকের নাম জিগিসমুণ্ট ফন্ রাডেকি। ল্যাট্‌ভিয়ার রাজধানী রিগা শহরে এঁর জন্ম ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে। পড়াশুনা করেন সেণ্ট পিটার্সবুর্গে, পরে এঞ্জি-

---

১ এঁর সরল হৃদয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথও আমাদের ছেলেবেলায় কিছু কিছু শুনিয়েছেন। বারান্তরে সে-কথা হবে।

সীয়ারিং পাস করেন জর্মনিতে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়টা কাটান তুর্কিস্থানে এঞ্জিনীয়ার রূপেই। সাহিত্য-রস কিন্তু বরাবর ছিল। ওদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বার্লিনে আসার পর তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে অভিনেতা চিত্রকর এবং সাহিত্যিকরূপে। উত্তম ইংরেজী জানেন। জি. কে. চেস্টারটনের ইনি পরম ভক্ত এবং হিলের বেলকের উৎকৃষ্ট জর্মন অনুবাদ তিনি করেছেন—যদিও জর্মনিতে অনুবাদকরূপে তাঁর সর্বোত্তম খ্যাতি রুশ ঔপন্যাসিক গগলের বই জর্মনে তর্জমা করার ফলে।

এঁর জীবনীকার বলেন, রাডেকির বীণায় প্রচুর কোমল এবং অতিকোমল। তার প্রতিটি ধ্বনিতে তত্ত্ব-দার্শনিকের ক্ষীণ মধুর স্মিতহাস্য।

জর্মন, ফরাসী, রুশ, ইংরিজী তথা ইয়োরোপীয় ক্লাসিক্স্ নখাগ্রদর্পণে এবং বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন বলে বহু বৎসর ধরে সঞ্চিত এঁর সংকলন হাসির 'অ-আ, ক-খ' সত্যিই যেন হাস্যরসের কনসার্ট। ব্যালাকত্তাল থেকে আরম্ভ করে ডুগডুগি পিয়ানো কোনো যন্ত্রই বাদ যায়নি।

পাঠক হয়তো অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। ভাবখানা, দু'একটা গল্পই শোনাও না। তার থেকেই তো এঁর পরিচয় পাওয়া যাবে। সেখানেই তো মুশকিল। আমার বিশ্বাস গোটা সংকলনটি আপনি যদি পড়েন, তবে আপনি খুশী হবেন, যে-কোনো লোক খুশী হবে। কিন্তু আমি যেগুলো বাছাই করে দেব, সেগুলো আপনার পছন্দ না-ও হতে পারে। আপনার সংকলন আমার পছন্দ না-ও হতে পারে। সংকলনের সংকলন বিপদসঙ্কুল। তবু চেষ্টা দিতে ক্ষতি নেই এবং গুণীরা যখন 'অরুন্ধতী ন্যায়ের' অর্থাৎ 'চেনা জিনিস থেকে অচেনা জিনিসে' যাবে বলে উপদেশ দিয়েছেন তখন আপনার আমার পরিচিত শার্লক হোমস্ দিয়েই বিসমিল্লা করি ঃ

মরুভূমিতে শার্লক হোমস্ (অবশ্য আমার জানামতে হোমস্ কখনো কোনো মরুভূমিতে যাননি—বর্তমান লেখক)। ১৯১৭ সালের হেমন্তকাল। কয়েক মাস ধরে এক ইংরেজ রেজিমেণ্ট প্যালেস্টাইনের দুরন্ত গরমে মরুভূমিতে থানা গেড়েছে। মদ্যাদি তো প্রায় নেই-ই, জলও কম, আর খাবার সময় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সেই এক কর্নড্ বীফ! শেষটায় এমন হল যে, শব্দটা শুনলেই জোয়ানদের বমি আসে।

এলেন এক সন্ধ্যায় এক নূতন অফিসার। রান্নাঘরে ঢুকে তদারক তদন্ত করছেন, যাকে বলে ইন্সপেকশন – শুঁকলেন, চাখলেন এবং সর্বশেষে অতিশয় বিজ্ঞের মত অভিমত প্রকাশ করে বললেন, 'হুম···আজ ডিনারে তা হলে কর্নড্ বীফ!'

জোয়ানদের সবাই চুপ—কেউ একটি রা-ও কাড়লে না। ছুঁচ পড়লেও শোনা যায়। শেষটায় এক কোণ থেকে কোন্ এক কক্নির ব্যঙ্গের গলা শোনা গেল, 'আ মরি! ওয়াটসন।'

একটু সূক্ষ্ম রসিকতা। এ যেন 'এ কথা বলার জন্যে তো ভূতের দরকার হয় না হুজুর।' আস্ত না হলেও ওয়াটসন যে একটি হাফ-গবেট ছিলেন, সেটা

হোমস্‌পিয়াসীদের জানা। এটি প্রধানতঃ তাঁদের জন্যই। আসছে বারে নিবেদন করব হরেকরকম্বা। পূর্বোক্ত আইনস্টাইন-গৃহিণীর গল্পটি রাডেকির সঙ্কলন থেকেই নেওয়া।

॥ দুই ॥

সিগিসমুন্ট্‌ ফন রাডেকি তাঁর হাস্যরস সঙ্কলনের পুস্তিকায় একটি ক্ষুদ্র অবতরণিকা দিয়েছেন। সে অবতরণিকায় আর পাঁচজন মোকা-বেমোকা-উদাসীন জর্মনের মত তিনি পাণ্ডিত্য ফলাতে যাননি। জর্মনদের যে পাণ্ডিত্য ফলাবার ব্যামোটা আছে সে-বিষয়ে স্বয়ং জর্মনরাই সচেতন। ভিন্ন ভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা যেরকম হক্ক না-হক্ক গল্প বানাই—মারোয়াড়ীদের পয়সার লোভ, পূর্ববঙ্গবাসীদের খামোখা চটে যাওয়া নিয়ে—ইয়োরোপীয়েরাও সে রকম করে থাকে। গ্যোরিঙ যখন ন্যুরনবের্গ মোকদ্দমার জন্য সেখানকার হাজতে, তখন তিনি মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ্‌ ডাঃ কেলিকে নিম্নের চুটকিলাটি বলেন ঃ

একজন ইংরেজ—একটা আস্ত ইডিয়ট। দুজন ইংরেজ একত্র হলে সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্লাবের পত্তন। তিনজন হলে নূতন এক সাম্রাজ্যজয়।

একজন ইতালিয়ান—উত্তম গাইয়ে। দুজন হলে ডুয়েট। তিনজন হলে রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন। (এটা যে কি রকম খাঁটি কথা সেটা গত বিশ্বযুদ্ধে বার বার সপ্রমাণ হয়েছে।)

একজন জর্মন, পণ্ডিত।[১] দুজন জর্মন—একটা রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করে বসবে। তিনজন হলে যুদ্ধ ঘোষণা।

অন্যান্য জাতও গ্যোরিঙের গল্পে স্থান পেয়েছে কিন্তু সেগুলো নিয়ে উপস্থিত আমাদের প্রয়োজন নেই। তা সে যাই হোক, রাডেকি তাঁর অবতরণিকায় অহেতুক পাণ্ডিত্য ফলাননি।

'ইহ সংসারে আমাদের কত জিনিসেরই না অভাব, এবং তাই নিয়ে একমাত্র মানুষই রোদন করে কিন্তু ঐ অভাবের ক্ষতিপূরণ হিসাবে একমাত্র মানুষই হাসতে জানে। মানুষের যে দেহাতীত সত্তা আছে সে-ই আমাদের দেহ থেকে অশ্রুজল ঝরায় এবং সে-ই আমাদের দেহের দুপাশ এবং ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসায়।

---

১ রবীন্দ্রনাথও প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, 'জার্মান পণ্ডিতের কেতাবে তত্ত্বজ্ঞানের যে-সকল চরম সিদ্ধান্ত আছে তাহাকে ঔষধের বটিকা বলিতে পার কিন্তু মানসিক শুশ্রূষা তাহার মধ্যে নাই।' এস্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে উল্লেখ করি, রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে 'জর্মন' লিখতেন—যদিও এখানে 'জার্মান' লিখেছেন। হালে জনৈক পত্রলেখক 'জর্মন' লেখার জন্য আমাকে বিদ্রূপ করেছেন বলে এ-কথাটি বলতে হল। 'জর্মন' লেখার অন্য কারণও অবশ্য আছে।

কিন্তু এই পৃথিবীতে সে জিনিস কি, যা হাস্যকৌতুক রসের সৃষ্টি করে ?'

প্রশ্ন শুধিয়ে উত্তরে রাডেকিই বলছেন, 'সব, সব কিছুই···। যেমন সব কিছুই কাঁদাতেও পারে। তারা, ফুল, পশুপক্ষী এদের নিজেদের সত্তা দিয়ে কৌতুকরস সৃষ্টি করে না, কিন্তু মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ামাত্রই এগুলো কৌতুকরসের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে—কারণ এই মানুষই বিশ্ব-সংসারের হাসি এবং কান্নার কেন্দ্র। কারণ এই মানুষ নির্মিত হয়েছে অর্ধেক পশু থেকে এবং অর্ধেক চৈতন্য দিয়ে। এই যে কাদামাটি আর সৃষ্টিকর্তার মুখের ফুঁ দিয়ে তৈরি মানুষ—তার হাসি এবং কান্না উভয়ের মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মার খেলে মানুষ কাঁদে—এ কান্না অতি সাধারণ সরল,—আর গভীর মনোবেদনায় যখন মানুষ কাঁদে তখন তার সে-রোদন সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ের। হাসির বেলাও তাই। মানুষ যখন ফুর্তিতে থাকে তখন সে হাসে কিন্তু কৌতুকরসের সৃষ্টি হওয়াতে মানুষ অকস্মাৎ যে অট্টহাস্য করে ওঠে সে হাসি ভিন্ন। কিন্তু ফুর্তিতে থাকলেই যে কৌতুকের সৃষ্টি হয় এমন কোনো কথা নয়। সেখানে মানুষ হাসে সে ফুর্তিতে আছে বলে, আর এস্থলে তার উল্টোটা—এস্থলে মানুষ হেসে ফুর্তি পায়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখানে রাডেকির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত নন। তিনি বলছেন, 'সুখে (অর্থাৎ যখন ফুর্তিতে আনন্দে আরামে—লেখক) আমরা স্মিতহাস্য হাসি, কৌতুকে আমরা উচ্চহাস্য হাসিয়া উঠি। একটি আন্দোলনজনিত স্থায়ী, অপরটি সংঘর্ষজনিত আকস্মিক।' এবং তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরেকটি তত্ত্বও যোগ দিয়েছেন—'আমি বোধ করি, যে কারণ-ভেদে একই ঈথরে আলোক ও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাহা আবিষ্কৃত হইলে তাহার তুলনায় আমাদের সুখহাস্য ও কৌতুক-হাস্যের কারণ বাহির হইয়া পড়িবে।'[২]

আর বর্তমান লেখক শুধোয় তাহলে বেদনাজনিত অট্টহাস্যও কি ঐ একই পর্যায়ে পড়বে ? কিংবা দেখবো, আকাশের জল, চোখের জল আর গোলাপের জল একই কারণে ঝরছে ?

মূল কথায় ফিরে যাই। রাডেকি বলেছেন, 'একদা সর্ব প্রকারের কাব্যই

---

২ পঞ্চভূত, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড ৬১৭। পঞ্চভূত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৩০৪ সালে। তারপর ১৩২৮ এবং ১৩৩৩-এর মাঝামাঝি কোনো সময়ে "আমরা হাসি কেন ?" এই নিয়ে বিশ্বভারতীর সাহিত্য সভায় আলোচনা করেন। তার অনুলেখন আমার কাছে ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্যান্য আরো বহু অনুলেখনের সঙ্গে এটিও কাবুল বিদ্রোহের সময় হারিয়ে যায়। সে-সভায় ক্ষিতিমোহন সেন উপস্থিত ছিলেন। তাঁর পাণ্ডুলিপিতে কিংবা হয়তো ঐ সময়কার "শান্তিনিকেতন" পত্রিকায় এর অনুলেখন পাওয়া যাবে।

ইতিমধ্যে জনৈক লেখক একটি অত্যুত্তম প্রবন্ধে প্রমাণ করেছেন, হাস্যের কারণ সম্বন্ধে আঁরি বের্গসঁ ও রবীন্দ্রনাথ প্রায় একমত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখাটি বের্গসঁর পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল।

আবৃত্তি করা হত কিংবা গাওয়া হত। এর বহু পরে মানুষ এগুলো লিখে রাখার প্রয়োজন অনুভব করলো। এবং এরও পরে ছাপাখানায় সে কৃষ্ণমৃত্যু প্রাপ্ত হল (আমরা বলবো মা কালী কালির চরণাশ্রয় পেল) এবং আজ সে শুধু মানুষের চিত্তাকাশেই জাগরিত হতে পারে। একমাত্র কৌতুকরসই এখনো মুখে মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছাপাখানায় সে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয় না। এ যেন কলকল উচ্চহাস্যে এগিয়ে চলেছে পাহাড়ের ঝরণা—মাঝে মাঝে এক পাশে গুটিকয়েক পাথরের মাঝখানে যে সে স্তব্ধ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সেই হল তার ছাপায় প্রকাশিত রূপ, কিন্তু সে অতি সামান্য এবং তার উদ্দাম গতিবেগকে কণামাত্র ব্যাহত করে না। এবং অন্য সর্ব কাব্যকলা যেমন যেমন ছাপার গোরস্তানে নীরব হতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে কৌতুক-কথিকা এগুলো নিজের ভিতর সংহরণ করে তাদের পুনর্জীবন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে লাগলো। তাই কৌতুক-কথিকা চুটকিলা, কখনো বা কথক ঠাকুরের রূপকথা, কখনো বা (বিষ্ণু শর্মার) উপকথা, দশ-ছত্রের উপন্যাস, কাহিনী, কবিতা এমন কি রোমাঞ্চকর নাট্য। সংবাদপত্রের শক্তি এ ধরে এবং কয়েকটি শব্দের সাহায্যে যত্রতত্র যখন তখন এক লহমায় নাট্যশালার বাতাবরণ সৃষ্ট করতে পারে। সে একাধারে রাজদূত, লোকদূত, চারণ এবং নাট্যকার। কৌতুক-কথিকা হাস্যগাথা রচনা পেশাদারের একচেটিয়া নয়, বরঞ্চ বলতে হবে এটি পাঞ্চজন্য রসসৃষ্টি। "হাস্যরস-লেখক বলতে যা বোঝায় তাঁদের মত একটি ছত্র না লিখেও মানুষ তার জীবনে হাস্যরস সঞ্চয় করতে পারে ও সৃষ্টি করতে পারে—" জ্যাঁ পল বলেন।'

লোকমুখে এই হাস্যরস সৃষ্টির ঐতিহ্য বেঁচে রইল কি করে ?

রাডেকি বলেন, 'সমাজের বাঙ্ময় রূপ নিত্য প্রয়োজনীয়। স্ফুট বাক্য দ্বারা মানুষ আপন মনের চিন্তা হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশ করে, আপন অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়। তার লীলাভূমি—রাজনৈতিক সভা-সমিতি, থিয়েটার, বারোয়ারী পুজো ইত্যাদি। কিন্তু সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মচেতনা প্রকাশ পায় তখনই যখন রামাশ্যামা সবাই সমান অংশীদার হয়ে হাস্যকলার সৃষ্টি করে (এস্থলে বর্তমান লেখকের টীকা—শুধু তাই নয়, চুটকিলা-ভূমিতে গণতন্ত্রের এমনই কট্টরতা যে অতিসাধারণ জনও আকছারই ছোট্ট একটি টিপ্পনী কেটে গেরেমভারী মাতব্বর-জনকে ডিগবাজী খাইয়ে দেয়)। তারপর রাডেকি এ-অনুচ্ছেদ শেষ করেছেন এই বলে ঃ—'হাস্যরস মানুষে মানুষে যোগসূত্র স্থাপন করে।'

আমি সম্পূর্ণ একমত নই। হাসির চেয়ে কান্না, আনন্দের চেয়ে বেদনাই আমাদের একে অন্যকে কাছে টানে বেশী। এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হতে পারে। কিন্তু এস্থলে একটি সামান্য উদাহরণ দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে। বৈঠক-খানায় বসে শুনতে পেলুম, বাড়ির বউ-ঝিরা রান্নাঘরে কাজ করতে করতে হঠাৎ একসঙ্গে হেসে উঠলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে হাসির হিস্যাদার হতে কিংবা কারণ অনুসন্ধান করতে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ির ভিতর ছুটে যাই নে। কিন্তু সবাই যদি একসঙ্গে ডুকরে কেঁদে ওঠে তবে অবশ্যই যাই।

এ বড় অদ্ভুত সমস্যা। দুঃখ-বেদনা আমরা দেখতে চাই নে, কিন্তু কাব্যে

ঠিক সেই জিনিসটেই আমরা খুঁজি।

কৌতুক-হাস্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথও 'পঞ্চভূতে' লিখেছেন, 'রামায়ণের সীতা বিয়োগে রামের দুঃখে আমরা দুঃখিত হই, ওথেলোর অমূলক অসূয়া আমাদিগকে পীড়িত করে, দুহিতার কৃতঘ্নতাশরবিদ্ধ উন্মাদ লিয়রের মর্মযাতনায় আমরা ব্যথা বোধ করি—কিন্তু সেই দুঃখপীড়া বেদনা উদ্রেক করিতে না পারিলে সে সকল কাব্য আমাদের নিকট তুচ্ছ হইত।' এতখানি বলার পর রবীন্দ্রনাথ সূত্র দিচ্ছেন 'বরঞ্চ দুঃখের কাব্যকে আমরা সুখের কাব্য অপেক্ষা অধিক সমাদর করি।' আমরা সম্পূর্ণ একমত। তবে তিনি যে কারণ দিয়েছেন—'কারণ, দুঃখানুভবে আমাদের চিত্তে অধিকতর আন্দোলন উপস্থিত করে'—সেখানে সবাই একমত নাও হতে পারেন।

আজ যে বাঙলা দেশে রাজশেখরের এত খ্যাতি তার কারণ 'গড্ডলিকা' 'কজ্জলী' নয়—তার কারণ তাঁর 'চলন্তিকা', রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ, হয়তো বা তাঁর প্রবন্ধাবলী। যদিও আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর হাস্যরস অতুলনীয়, কিন্তু তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করার মত—তা সে শ্রেষ্ঠতর কিংবা নিকৃষ্টতরই হক—লেখন বাঙলা দেশে আছে। চলন্তিকার চেয়ে ভালো অভিধান ইংরিজীতে আছে কিন্তু হাস্যরসিক রাজশেখর জেরম কে জেরম, উড-হাউসের বহু বহু ঊর্ধ্বে।

তা সে যাক্। কিন্তু এই যে রবীন্দ্রনাথ বললেন, এবং আমরাও স্বীকার করলুম, 'দুঃখের কাব্যকে আমরা সুখের কাব্য অপেক্ষা অধিক সমাদর করি'—তাই যদি হয় তবে ফিলিমওয়ালারা কেন বলেন ট্রাজেডি অচল, দর্শক কমেডি দেখতে চায় এবং শুধু এ-দেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই নাকি অল্পবিস্তর তাই!

তার কারণ বোধ হয় এক হতে পারে যে শিশুর রূপকথা কখনো ট্রাজেডিতে সমাপ্ত হয় না, এবং যেহেতুক সিনেমা-দেখানেওয়ালারা ত্রিশ বছর বয়সেও শিশু-মন ধরেন তাই তাঁরা ট্রাজেডি পছন্দ করেন না। কিন্তু এস্থলে সে আলোচনা কিঞ্চিৎ অবান্তর।

* * * *

রাডেকি তাঁর অবতরণিকায় আরো অনেক মধুর এবং জ্ঞানগর্ভ কথা বলেছেন। এবং শেষ করেছেন এই বলে, 'হাস্যকথিকার (চুটকিলার) প্রাণরস কিন্তু ঐ বস্তু শব্দের মাধ্যমে বলাতে—ছাপাখানার মারফতে নয়।' তুলনা দিয়ে বলেছেন, 'প্রথমটা যেন উচ্ছল প্রাণরসে সঞ্চারিত উড়ন্ত প্রজাপতি—ছাপাখানার মাল যেন পিন দিয়ে বেঁধা কাঁচের বাক্সের ভিতর মৃত প্রজাপতি।'

রাডেকি অবতরণিকা শেষ করেছেন তাই এই বলে, 'আমি হালে একটি চমৎকার রসিকতার গল্প শুনতে পেলুম। তদ্দণ্ডেই সেটি লিখে নিলুম। পরে সেটি ছাপায় প্রকাশিত হল। যিনি সেই গল্পটি বলেছিলেন সে কথক সেটি পড়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশ হয়েছে—কিন্তু স্বরলিপি কই?'

অর্থাৎ এ যেন কেউ রবীন্দ্রসঙ্গীত না গেয়ে আবৃত্তি করে শোনাল। স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী। তিনি নাকি এরই কাছাকাছি অন্য একটি তুলনা

দিয়েছেন। অনুবাদ যেন কাশ্মিরী শালের উল্টো পিঠ। ডিজাইনটা বোঝা যায় কিন্তু অন্য সব কিছু লোপ পায়।

হাসি-কান্না

তরুণ লেখককে সাবধান করে দি, তিনি যদি ইহজগতে অজরামর যশ অর্জন করতে চান তবে যেন তিনি হাস্যরসের বেসাতি না করে ঢালেন অঢেল করুণ রস। আর বাঙালীর হৃদয়ের উপর যদি 'জগরনটের' মত তিনি মোক্ষম আসন চেপে বসে থাকতে চান তবে যেন সেটিকে চেপটে, থেৎলে, নিংড়ে, একদম সমুচিহ্ন তিস্তের চেয়েও তেতো করে পরিবেশন করেন। দেবদাস রক্তবমি করছে আর গাড়োয়ানকে বার বার শুধোচ্ছে আর কত বাকি, কিংবা অরক্ষণীয়ার 'সাজ' দেখে বাচ্চা বলছে, 'পিসিমা সং সেজেছে'—ছাড়ুন এ-রকম কিছু মাল, আর দেখতে হবে না, আপনি আমাদের ডিহি শ্রীরামপুর সেকেণ্ড বাইলেন কম্বল বিতরণী সভা থেকে যাত্রা আরম্ভ করে 'ভায়া' মাদ্‌রা কালীবাড়ি প্রসাদ-বিতরণী সমিতি হয়ে নাক বরাবর পেঁছে যাবেন পদ্মশ্রী, আকাদেমি প্রাইজে। কেউ ঠেকাতে পারবে না। আহা, বাঙালী বড্ডই কোমল হৃদয়। শুনেছি, এক বাঙালী ছোকরা লণ্ডনে বাসকালীন তিনটি বছর মাত্র অবশ্য-কর্তব্য ব্যারিস্টারি ডিনারটি খাবার জন্য—ভুল বললুম, খাবার জন্য নয়, নিছক এটেণ্ড করার জন্য—হস্টেল থেকে বেরতো; ফিরে এসে ফের ধুতি গেঞ্জি পরে লেপের তলায় ঢুকে দেবদাস পড়তো আর তার তলায় যতখানি সম্ভব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে কেঁদে কুমড়ো গড়াগড়ি দিত।

আল্লা রসুলের কসম খেয়ে আমি মুসলমানের ব্যাটা বাঙালী মুসলমান ফের বলবো, রাজশেখরের খ্যাতি-প্রতিপত্তির কারণ তাঁর 'গড্ডলিকা' 'কজ্জলী' নয়। তাঁর খ্যাতির কারণ 'চলন্তিকা' এবং রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ। অথচ চলন্তিকার চেয়ে বহুগুণে শ্রেয় অভিধান ইংরিজী জর্মনে আছে, ইংরিজীতে গ্রীক কাব্যের অনুবাদ করে একাধিক লেখক রাজশেখরকে আগের থেকেই ছাড়িয়ে বসে আছেন। অথচ হাস্যরসে রাজশেখরের যে কৃতিত্ব তার সঙ্গে তুলনা করি কার সঙ্গে। সেরভান্তেস, মলিয়ের, জেরম, উডহাউস কেউই কাছে দাঁড়াতে পারেন না। গ্রীক সাহিত্যের কথা আর তুলছি নে, সেখানে আছে ব্যঙ্গ, সেটায়ার,—বিশুদ্ধ হাস্যরস নয় এবং সেগুলোও রাজশেখরের কাছে আসতে পারে না। এটা ডবল কসম খেয়ে বলছি।

বাঙলা কথা শুনুন। আপনাকে একটা সোনার মোহর দিলে আপনি খুশী হবেন, কিন্তু ভুলে যাবেন দুদিন বাদেই। ওদিকে কেউ যদি পাঁচ টাকা হাওলাত নিয়ে শোধ না করে তবে সে কলিজার ঘা দগদগ্ করবে বহু-বহুকাল অবধি। শারীরিক স্তরে নেবে বলতে পারি, আপনাকে কেউ সুড়সুড়ি দিয়ে হাসাতে চাইলে আপনি বিরক্ত হবেন কিন্তু কেউ যদি শরীরে পিন ফোটায় তবে মার-মুখো হবেন।

আরেকটি কথা ; করুণ রস বুঝতে হলে বিদ্যেবুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন নেই। হাস্যরসের বেলা ভাষাজ্ঞান (বিশেষ করে 'পান্' বোঝবার বেলা) ভিন্ন ভিন্ন সমাজের আচার ব্যবহার, অনেক-কিছুই জানতে হয়। যেমন মনে করুন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই ছোট হাস্যরসের চুটকিলাটি।

একটি ছোট্ট মেয়ে ঠিকমত হাঁটতে পারছে না দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কড়ে আঙুলটি বাড়িয়ে দিলেন, সে যেন ওটা ধরে সোজা হয়ে চলে। মেয়েটি খপ করে তাঁর গোটা হাত ধরে নিলে। রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, 'দেখলে, মেয়েকে একটি আঙুল দিয়েছি কিনা, সে তখ্খুনিই পাণিগ্রহণ করতে চায়।' এস্থলে পাণিগ্রহণের অর্থ যদি কেউ না জানে তবে সে বুঝতেই পারবে না, এর রস কোথায়।

এরই পিঠ-পিঠ একটি মার্কিন রসিকতা আছে, কিন্তু অতখানি সূক্ষ্ম নয়। তারা বলে, 'গিভ এ ডেম এন ইঞ্চ···এ্যান্ড শী উয়োন্টস টু বী এ রুলার।' 'মেয়েছেলেকে এক ইঞ্চি (লাই) দিয়েছ, কি সে অম্নি রুলার হতে চায়।' এখানে রুলারের যে দুটো অর্থ আছে সে তত্ত্ব যদি শ্রোতার জানা না থাকে তবে সব গুড় বরবাদ।

এদেশে উত্তম ক্লাস রসিকতা করে গেছেন আরেকটি ব্যক্তি। তাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—পুণ্যশ্লোক, সায়ংসন্ধ্যা স্মরণীয়। তিনি তাঁর ঠাট্টা-মস্করা ছদ্মনাম 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য' নিয়ে করেছেন বলে অনেকেই এ-তত্ত্ব জানেন না। তাঁর একটি গল্প অতুলনীয়—দুর্ভাগ্যক্রমে বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলী হাতের কাছে নেই। মোটামুটি যা বলেছেন তা এই, অমুককে আমি নদীয়ার চাঁদ উপাধি দেওয়ার পর শুনিতে পাইলাম অন্য অমুককে ইহার পূর্বেই নদীয়ার চাঁদ উপাধি দেওয়া হইয়া গিয়াছে। আমি মহা ফাঁপরে পড়িলাম—কারণ আকাশে একসঙ্গে দুইটি চাঁদ কখনই দেখা যায় না। এক্ষণে এই উপাধি লইয়া দুইজনে হাতাহাতি গুঁতাগুঁতি হউক তাহা আমি চাহি না। বিদ্যাবুদ্ধিতে অবশ্য দুইজনই একই প্রকার (অর্থাৎ দুটোই আস্ত পাঁঠা—লেখক)। অতএব, স্থির করিয়াছি আকাশের চাঁদটি লইয়া, সেইটিকে দুই ভাগ করিয়া, দুইজনকে দুইটি অর্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করিব।

অর্ধচন্দ্র এস্থলে কেউ যদি শুধু 'ক্রেজ্‌ন্‌ট্‌ মুন' অর্থে নেন তা হলেই তো চিত্তির !

এ-পৃথিবীতে ধর্ম নিয়ে যত হই-চই হয়েছে—অর্থাৎ ধর্ম যে রকম সম্মান পেয়েছে সে রকম গালাগাল খেয়েছেও সে বিস্তর—অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান নিয়ে অতখানি হয়েছে বলে জানি নে। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনেকখানি খুঁটিনাটি না জানলে তাদের নিয়ে একে অন্যকে যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছে সেগুলো ঠিকমত রসিয়ে রসিয়ে চাখা যায় না।

প্রথম একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ দি।

'মোল্লার দৌড় মসজিদ তক্।' শ্রীযুক্ত সুশীল দে এটিকে 'বাঘে মোষে (রাজায় রাজায়) যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়', এরই সমার্থে ধরেছেন। শ্রীযুত দে তাঁর 'বাংলা প্রবাদ' গ্রন্থখানা রচনা করে আমাদের যে কী উপকার

সাধন করেছেন সেটি অবর্ণনীয় ; কাজেই আমি যদি এস্থলে আমার জানা অন্য অর্থটি নিবেদন করি তবে তাঁর পাণ্ডিত্য-জ্যোতি কিছুমাত্র ম্লান হবে না।

মোল্লাকে কড়া কথা শোনালে বা তার উপর চোটপাট করলে সে তো আর জমিদার নয় যে, সঙ্গে সঙ্গে তার দাদ নেবে। সে বেচারী ছুটে যায় মসজিদে। সেখানে গিয়ে আল্লার কাছে সে তার ফরিয়াদ জানায় ও অপরাধীর সাজা কামনা করে। কিন্তু কথায় বলে, 'শকুনির শাপে কি গরু মরে' (সুশীল দে, ৭৮১১)—অপরাধীর কিছুই হয় না। মোদ্দা কথা তা হলে দাঁড়ায়, মোল্লার আর কী মুরদ! সে ঐ মসজিদ তক্ ছুটে গিয়ে চেল্লাচেল্লি মাত্রই করতে জানে ; তাতে কারো ক্ষয়ক্ষতি হয় না।

ঠিক ঐ রকম শাক্ত-বৈষ্ণবের ঝগড়াঝাঁটি জানা না থাকলে নিচেরটা বুঝবেন কি করে ?

(শাক্ত-বৈষ্ণব উভয়ের কাছে সবিনয় ক্ষমা-ভিক্ষা করতঃ)

বৈষ্ণব ঃ আচ্ছা, ভাই তোমরা তো বলো, 'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা'—তবে পাঁঠাটাকে যখন বলি দাও তখন তার ভিতরের 'শক্তিটাকে' কি বলি দেওয়া হয় না ? লক্ষ্য করোনি পাঁঠার কী অসাধারণ প্রাণশক্তি—লম্ফঝম্প !

শাক্ত ঃ না, ভাই, তা নয়। পাঁঠাকে যখন ধরে বেঁধে হাড়িকাঠে পুরি তখন সে নির্জীব। তখন আর তার শক্তি কই ? আছে শুধু চৈতন্য। তখন শুধু ওইটুকুকেই বলি দি।

এ বছরে প্রতিটি লেখার সময় স্বামীজীর কথা মনে পড়ে। তিনি যে শুষ্ককাষ্ঠ অরসিকজন ছিলেন না সেইটে এই সুবাদে মনে পড়ল। নিম্নের রসিকতাটি ঈষৎ দীর্ঘ কিন্তু জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দীর্ঘতর শুনতেও কারো আপত্তি থাকার কথা নয়।

(মুসলমানদের শীয়া সম্প্রদায়ের কাছে গোস্তাকীর বেহদ্ মাফ চেয়ে)

'লক্ষ্ণৌ শহরে মহরমের বড় ধুম। বড় মসজেদ ইমামবাড়ায় জাঁকজমক রোশনির বাহার দেখে কে। বেসুমার লোকের সমাগম। হিন্দু-মুসলমান, কেরানী য়াহুদী ছত্রিশ বর্ণের স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা, ছত্রিশ বর্ণের হাজারো জাতের লোকের ভিড় আজ মহরম দেখতে। লক্ষ্ণৌ শীয়াদের রাজধানী। আজ হজরত হাসান-হোসেনের নামে আর্তনাদ গগন স্পর্শ করছে—সে ছাতি-ফাটানো মর্সিয়ার কাতরানি কার না হৃদয় ভেদ করে ? হাজার বৎসরের প্রাচীন কারবালার কথা আজ ফের জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই দর্শকবৃন্দের ভিড়ের মধ্যে দূর গ্রাম হতে দুই ভদ্র রাজপুত তামাশা দেখতে হাজির। ঠাকুর সাহেবদের—যেমন পাড়াগেঁয়ে জমিদারের হয়ে থাকে—বিদ্যাস্থানে ভয়েবচ।

সে মোসলমানি সভ্যতা, কাফগাফের বিশুদ্ধ উচ্চারণ সমেত লস্করী জবানের পুষ্পবৃষ্টি, আবা কাবা চুস্ত পায়জামা তাজ মোড়াসার রঙ্গ-বেরঙ্গ শহরপসন্দ ঢঙ অতদূর গ্রামে গিয়ে ঠাকুর সাহেবদের স্পর্শ করতে আজও

পারেনি। কাজেই ঠাকুররা সরল সিধে, সর্বদা শিকার করে জমামরদ কড়াজান আর বেজায় মজবুত দিল্।

ঠাকুরদ্বয় তো ফাটক পার হয়ে মসজেদের মধ্যে প্রবেশোদ্যত, এমন সময় সিপাহী নিষেধ করলে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিলে যে, এই যে দ্বারপার্শ্বে মুরদ্ খাড়া দেখছ, ওকে আগে পাঁচ জুতা মার তবে ভিতরে যেতে পাবে। মূর্তিটি কার? জবাব এলো—ও মহাপাপী ইয়েজিদের মূর্তি। ও হাজার বৎসর আগে হজরত হাসান-হোসেনকে মেরে ফেলে; তাই আজ এ রোদন, শোকপ্রকাশ। প্রহরী ভাবলে, এ বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর ইয়েজিদ-মূর্তি পাঁচ জুতার জায়গায় দশ তো নিশ্চিত খাবে। কি কর্মের বিচিত্র গতি! উল্টা সমঝলি রাম—ঠাকুরদ্বয় গললগ্নীকৃতবাস ভূমিষ্ঠ হয়ে ইয়েজিদ-মূর্তির পদতলে কুমড়ো-গড়াগড়ি আর গদগদ স্বরে স্তুতি—"ভেতরে ঢুকে আর কাজ কি? অন্য ঠাকুর আর কি দেখব? ভালা বাবা অজিদ্ দেবতা তো তুঁহি হ্যায়, অস্ মারো শারোকো কি অভিতক্ রোবত। (ধন্য বাবা ইয়েজিদ্, এমনি মেরেচো শালাদের—কি আজও কাঁদছে!!")'।[১]

রস তো পেলেনই, কিন্তু পাঠক স্বামীজীর গল্প বলার টেকনিকটি লক্ষ্য করুন।

রসিকতা

হাসতে হয়, না হেসে উপায় নেই। এমন কি যারা 'হাতুড়ি আর কাস্তে'র নিচে বসে আছে, তারাও হাসে। তবে প্রাণ খুলে নয়, কিংবা 'পাবে' বসে বেপরোয়া গাল-গল্প গুল-গ্যাস ছাড়বার মাঝে মাঝে নয়। সন্তর্পণে টাপেটোপে। এই কিছুদিন পূর্বেই লৌহ-যবনিকার অন্তরালে একটি রসের গল্প মুখে মুখে ফিরতে ফিরতে এই হেথা বাঙলা দেশে পেঁছেছে—অবশ্য একে বাঁচিয়ে, ওকে এড়িয়ে।

এক কম্যুনিস্ট আরেক কম্যুনিস্টকে সোল্লাসে খবর দিলে, 'জানিস ভাই "প্রাভদা" কাগজ সব চেয়ে সেরা পলিটিকাল রসিকতার জন্য একটা প্রাইজ দেবে কাগজে ঘোষণা করেছে।'

দ্বিতীয় কম্যুনিস্ট: (অধিকতর সোল্লাসে) 'পয়লা প্রাইজ কত কমরেড?'

---

১ বেসুমার = অগুনতি; আদমশুমারী তুলনীয়। মর্সিয়া = শোকগীতি। কাফগাফের উচ্চারণ = কাফ আরবী বর্ণমালার অক্ষর। আরব ইহুদী ছাড়া অন্যের পক্ষে উচ্চারণ কঠিন। গাফ উচ্চারণ সহজ। তবে কাফ-গাফ সংযুক্তভাবে সমষ্টি অর্থে ব্যবহার হয়। জবান = ভাষা। আবা কাবা = ঝোলা জামা। চুস্ত = টাইট। তাজ মোড়াসা = বাঁধা তৈরী পাগড়ি। শহরপসন্দ = শহরের সকলেই যে বস্তু পছন্দ করে। জমামরদ = জওয়ান মর্দ। ইয়েজিদ = আজকাল এজিদই লেখা হয়, কিন্তু ইয়েজিদ মূল উচ্চারণের অনেক নিকটবর্তী।

প্রথম কম্যুনিস্ট ঃ 'কুড়ি বছর সাইবেরিয়া নির্বাসন।'

'নির্বাসন' না 'উইন্টার স্পোর্টস্ অ্যান্ড হলিডে' আমার সঠিক মনে নেই। তবে নিখরচায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এর থেকে অবশ্য পাঠক মনে করতে পারেন, রুশ চীনে বুঝি মানুষ মুখ বন্ধ করে আছে। যেমন হিটলার আমলে জর্মনিতে একটি রসিকতা বেশ প্রসার লাভ করেছিল। এক জর্মন আরেক জর্মনকে শুধোলে, 'তুই নাকি ভাই, ডেন্‌টিস্‌ট্রি পড়া ছেড়ে দিয়েছিস? কেন?'

'কি আর হবে? দাঁতের চিকিৎসা করবো কি করে? কেউ যে মুখ খুলতে আদৌ রাজী হয় না।'

তা নয়। লোকে মুখ খোলে। কারণ যে কর্তাব্যক্তিরা রুশ-চীনের ফুটন্ত জলের কাৎলির উপরে বসে আছেন তাঁরাও জানেন, মাঝে মাঝে ঢাকনাটা একটু ফাঁক না করে দিলে তাঁদেরও উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তবে এঁরা মোটামুটি ঠিক করে নিয়েছেন, কোন্ ধরনের রসিকতা একটুখানি বরদাস্ত করে নিতে হয়, আর কোন্ ধরনের রসিকতা 'হারাম' বিধান দিয়ে সাইবেরিয়া ব্যবস্থা করতে হয় —চীন দেশে, শুনেছি, নেফা অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, গুলি খেয়ে মরবে, নয় শীতে জমে গিয়ে।

সব চেয়ে বরদাস্ত করা হয়, বাসস্থানের অভাব, আহারাদির অনটন, বাধ্য হয়ে অর্ধ-দিগম্বর বেশ ধারণ সম্বন্ধে। কারণ চোখের সামনে এগুলো এমনই জাজ্বল্যমান, সবাই এগুলো সম্বন্ধে হাড়ে হাড়ে এমনই সচেতন যে এ নিয়ে মস্করা করে তাই সবাই কিছুটা মনের ভার নামাক—একটা নূতন অক্টোবর রেভলুশন অদ্যকার কর্তাব্যক্তিদের পক্ষে আরামদায়ক অভিজ্ঞতা নাও হতে পারে। এবং বাসস্থান-আহারাদির অনটন সম্বন্ধে পোলান্ড-রুমানিয়ার কাষ্ঠ-রসিকেরা বলে, 'সোশালিস্ট রাজ্যের বর্তমান ক্ষণস্থায়ী অভাব-অনটন ভবিষ্যতের চিরস্থায়ী অভাব-অনটনের পথে পথে বিজয়স্তম্ভ।'

ভবিষ্যতে কি রকম হবে তাই নিয়ে বলা হয়, আরো তিনটি ফাইভ ইয়ার প্ল্যান চিন্ময় থেকে মৃন্ময় রূপ ধারণ করার পর এমনই সুদিন আসবে যে, সকলের আপন আপন সলুন মোটরগাড়ি, এমন কি আপন আপন হেলিকপ্টার থাকবে। সেই সময় মস্কোর উপরে শূন্যমার্গে আপন হেলিকপ্টারে দুই কমরেডের দেখা। একজন আরেকজনকে শুধোলে, 'কোথায় চললি কমরেড?'

'তুই যদি আমার পিছু না নিস তবে বলছি। অতি গোপনীয় সূত্রে খবর পেয়েছি, কৃষ্ণসাগরের পারে ওডেসার রেশন শপে আড়াই আউন্স মাখন পাওয়া যেতে পারে। সেখানে যাচ্ছি।'

এ তো হল ভবিষ্যতের কথা। আর বর্তমান দিনে?

হঠাৎ বাড়ি ফিরে কমরেড দেখেন তাঁর স্ত্রী উপপতির সাথে রসকেলিতে মত্ত। হুঙ্কার দিয়ে স্বামী বললে, 'এই বুঝি প্রেম করার সময়! ওদিকে যে রেশন শপে এক ঘণ্টা ধরে নেবু বিক্রি হচ্ছে।'

সত্যই তো। প্রেম তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, কিন্তু নেবু কিছু আর

নিত্যি-নিত্যি মেলে না।

এই মর্মে আরেকটি চুটকিলা আছে।

গৃহবন্টন বিভাগের কর্তা বললেন, 'কি বললেন কমরেড, আপনার স্ত্রীর ফ্ল্যাটখানা পছন্দ হচ্ছে না? তা আর এমন কি? আমার উপদেশ নিন। স্ত্রী বদল করুন। ঢের কম হাঙ্গামায় পাবেন। ফ্ল্যাট পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা!'

কিংবা বাড়ি বাবদে :—

ক্লাস টিচার শুধোলেন, 'লেলিনের যে ছবিখানা দিলুম সেটি কোথায় টাঙিয়েছো?'

'আজ্ঞে কোথাও না।'

'কেন?'

'আজ্ঞে চার দেয়াল ঘেঁষে চারটি পরিবার বাস করে। আমরা থাকি মধ্যিখানে। আমাদের তো দেয়াল নেই।'

কিংবা ধরুন—এটা নাকি চীন দেশের—মন্ত্রী মশায় বেতারে বক্তৃতা দিচ্ছেন, ১৯৪৭এ আমরা আগের চেয়ে ১১০ গুণ বিজলি বাড়াতে পেরেছি। ১৯৪৭ এ বছরে দুশ' গুণ—দাঁড়ান, কি হল? আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে, কমরেড স্টুডিয়ো অ্যাসিস্টেন্ট্, একটি মোমবাতি নিয়ে আসো দিকিনি।'

তবে কোনো কোনো বাবদে বর্তমানে যে অবস্থা অনেকখানি ভালো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ গল্পটাও হলদে, না লাল জানি নে। এক কমরেড রিপোর্ট লিখছেন, 'পূর্বের চেয়ে এখন অবস্থা অনেক ভালো। আগে গৃহিণী যখন জামা-কাপড় কাচতেন, আমাকে তখন সাহায্য করতে হত। এখন সে দুর্দিন গেছে। এখন স্ত্রী বলেন, তোমার পাতলুন আর শার্টটা দাও তো। আর তুমি বিছানায় গিয়ে চাদর ঢাকা দাও।'

[এই স্ত্রীকে সাহায্য করার ব্যাপার নিয়ে মার্কিন মুল্লুকে অন্য পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।। গত যুদ্ধে বহু মার্কিন কাপড় কাচা, বাসন মাজা, রান্না করা, আরো পাঁচটা কাজ শিখে এসে বাড়িতে যখন দেখে স্ত্রী আনাড়ির মত কাজ করছে তখন তারা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে বাৎলে দেয় কিভাবে কর্মগুলো সুষ্ঠুরূপে করতে হয়। ফলে বউরা তাদের খাটিয়ে মারতে শুরু করে। সেটা পরের পুরুষেও সংক্রামিত হয়। হালে যখন মার্কিন দেশে প্রস্তাব পাড়া হয়, ওভার প্রোডাকশন হচ্ছে বলে সকলকে হপ্তায় দু দিন করে ছুটি দেওয়া হবে, তখন বিস্তর মার্কিন তারস্বরে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে, 'বউরা খাটিয়ে মরবে। তার চেয়ে আপিসের কলম পেষা ঢের ভালো।' এরা বলে, নিগ্রো-দাসত্ব উঠে যাওয়ার পর এটা নাকি এক নূতন ধবল-দাসত্ব।]

কম্যুনিস্ট দেশে নাকি রাজনৈতিক কারণের গ্রেফতারি হয় অতি ভোরবেলা—এদেশে যে রকম ১৯৪৭-এর আগে হত, আর হিটলারী জর্মনিতে তো নিজে দেখেছি। এ ব্যাপার নিয়ে নাকি ঠাট্টা-মস্করা খুব বেশী বরদাস্ত করা হয় না।

ভোর পাঁচটার সময় বাড়িওলা ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে ঘণ্টা বাজিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলছে,

'কমরেড, অযথা ভয় পাবেন না। আমি শুধু বলতে এসেছি, বাড়িতে আগুন লেগেছে মাত্র।' কিংবা,

'কি বললে? ইভান ইভানোভিচ মারা গিয়েছে? কই, আমি তো তার গ্রেফতার হওয়ার খবরটা পর্যন্ত পাইনি।' কিংবা খবরের কাগজে শোকসংবাদ কলমে পিতামাতা প্রকাশ করলেন, 'আমাদের স্বর্গস্থ সৃষ্টিকর্তা তাঁর অসীম করুণায় আমাদের কন্যাকে কল্যাণতর লোকে নিয়ে গিয়েছেন।' আপন সোশালিস্ট দেশকে অপমান করার জন্য দুজনাই পরের দিন গ্রেফতার হন।

সবচেয়ে বিপজ্জনক হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক রসিকতাই সবচেয়ে বেশী আদর পায়। পূর্বেই প্রাভদা প্রসঙ্গে তার একটি নিবদন করেছি। এগুলো সচরাচর তৈরী হয় কতকগুলো বিশেষ বিষয়বস্তু নিয়ে; পার্টির দুর্নীতি, বড়কর্তাদের বিলাসব্যসন (হালে চীনও খ্রুশ্চফকে গালাগাল দিয়েছে এই বলে যে, তাঁর দুখানা আপন মোটরগাড়ি আছে), ধর্মবিশ্বাসে অসহিষ্ণুতা, স্বাধীন-চিন্তার নিপীড়ন, চাষাদের বেগার খাটানো, উপরাষ্ট্র-ধর্ষণ ইত্যাদি। যারা কম্যুনিজমে বিশ্বাস করে না কিংবা কম্যুনিস্টদের কার্যকলাপে দুর্নীতি সহ্য করতে পারে না তাদের আত্মাভিমান রক্ষা করার একমাত্র উপায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শরণ নেওয়া।

এক কয়েদী আরেক কয়েদীকে, 'তোর কি মাথা খারাপ? আদালতে কেন স্বীকার করলি, কালোবাজারে চিনি কিনেছিস?'

দ্বিতীয় কয়েদী, 'কি করি বল। সরকার পক্ষের উকিলই যে আমাকে চিনি বেচেছিল।' কিংবা শিক্ষামন্ত্রীকে 'পাগল' বলার অপরাধে একজনের কুড়ি বছরের জেল হয়। পাঁচ বছর হয় সরকারী কর্মচারীকে অপমান করার জন্য, বাকি পনেরো বছর রাষ্ট্রের গোপন খবর প্রকাশ করে দেবার জন্য। কিংবা,

রুশ কর্মী কথায় কথায় বললে, 'আমি সব চেয়ে ভালোবাসি কম্যুনিস্ট পার্টির মেম্বারদের জন্য কাজ করতে।' সরকারী কর্মচারী প্রশংসা করে বললেন, 'বড় আনন্দের কথা। তা, আপনি কি কাজ করেন?' 'আজ্ঞে, আমি গোর খুঁড়ি।'

কিংবা,

চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে প্রাপ্ত ঃ—

খবরের কাগজের হকাররা রাস্তায় চেঁচাচ্ছে, 'রুশেরা চাঁদে পেঁছে গেছে, রুশেরা চাঁদে পেঁছে গেছে।' রাস্তায় একাধিক উল্লসিত কণ্ঠস্বর, 'সবাই? সবাই?'

কিংবা,

ট্রামগাড়ির কণ্ডাক্টর ঃ 'এগিয়ে চলুন, মশাইরা, এগিয়ে চলুন।'

'আমরা "মশাইরা" নই, আমরা কমরেড।'

'মস্করা ছাড়ুন। কমরেডরা ট্রামগাড়ি চড়েন না, তাঁরা চড়েন আপন আপন মোটরগাড়ি।'

কিন্তু পূর্বেই বলেছি, এসব রসিকতা করতে হয় টাপেটোপে নিতান্ত

আপনজনের মাঝখানে। নইলে ঃ—

তিন বৃদ্ধ পার্কের বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে। তার মধ্যে দু'জনা ওয়াক্ থুঃ ওয়াক্ থুঃ বলে থুথু ফেলছে। তৃতীয়জন বললে, 'দয়া করে কোনো প্রকারের রাজনৈতিক আলোচনা আরম্ভ করবেন না। নইলে আমাকে গোয়েন্দা বিভাগে খবর দিতে হবে।'

ইংরিজীতে বলে, 'নীরবতা হিরণ্ময়।'

ইহুদিরা আসলে প্রাচ্যদেশীয় বলে বহু শত বৎসর ইয়োরোপে থাকার পরও তাদের রসিকতায় বিদ্রূপ ও তিক্ততা থাকে অনেক বেশী। ওদিকে হিটলার যে রকম একদা ইহুদিদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিলেন, তার দশ ভাগের এক ভাগ না হলেও কম্যুনিস্ট দেশে ইহুদি নির্যাতন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে—অনেক দিন। ইহুদিরাও বাধ্য হয়ে বাইরের দিক দিয়ে যত দূরে সম্ভব গা বাঁচিয়ে চলে ও 'অন্তরে অন্তরে অন্তরীণ' হয়ে থাকে।

'চতুর পোলিশ ইহুদি মূর্খ পোলিশ ইহুদির সঙ্গে কিভাবে আলাপ করে?'

'নিউ ইয়র্ক থেকে, টেলিফোনযোগে।' কিংবা,

সরকারী কর্মচারী ইহুদিকে বললেন, 'কমরেড লেভি, আপনি ফর্মে লিখেছেন, আপনার কোনো আত্মীয় বিদেশে বসবাস করে না। ওদিকে আমরা খবর পেয়েছি, আপনার আপন ভাই ইসরায়েলে বাস করে।'

'তা তো করেই। সে আছে আপন দেশে, আমিই তো আছি বিদেশে।'

সবচেয়ে কম শুনতে পাওয়া যায় 'বড় পাণ্ডাদের' নিয়ে রসিকতা। তার কারণ উৎপীড়িত জনেরাও অতি অল্প দিনের অভিজ্ঞতায়ও বুঝে যায়, যাকে নিয়ে রসিকতা করা হয়, গৌণভাবে তারই বিজ্ঞাপন করা হয় মাত্র। এ কথাটা উভয় পক্ষই বিলক্ষণ জানে বলে হিটলারের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ গ্যোরিঙ তাঁর সম্বন্ধে বাজারে রসিকতা চালু হওয়া মাত্রই সেটি সংগ্রহ করে রাখতেন এবং এ ধরনের রসিকতা নিজেই যে শুধু বলে বেড়াতেন তাই নয়, অন্য সকলকেও নয়া নয়া রসিকতা বানাবার জন্য টুইয়ে দিতে কসুর করতেন না।

রুশ দেশও ব্যত্যয় নয়। তাই খ্রুশ্চফ্ ইত্যাদিকে নিয়ে রসিকতার বাড়াবাড়ি নেই তবু দু-একটি যা শুনতে পাওয়া যায় সেগুলো উপাদেয়। তারই একটি দিয়ে শেষ করি।

শীর্ষ সম্মেলন শেষ করে নিকিতা খ্রুশ্চফ্ ও পুলিসকর্তা (আসলে গোয়েন্দা বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ) সাখারফ্ একসঙ্গে উড়োজাহাজে করে দেশে ফিরছেন। সাখারফ্ বললেন, 'কেনেডির অলঙ্কারগুলো লক্ষ্য করেছিলি? একদম সাচ্চা।'

নিকিতা বললেন, 'না কই, দে তো।'[১]

---

১ 'ভেন্টভখের' (ব্রুরিষ) ১৯৫২ সংখ্যার সাহায্যে লেখা।

নানাপ্রশ্ন

যতই বয়েস বাড়ছে, কোথায় না মনের ভিতর যে-সব প্রশ্ন জাগে তার সংখ্যা কমবে, উল্টে তার সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। এই তো কয়েকদিন পূর্বে বাঙলায় লেখা কয়েকখানি মুসলমানি কেতাব বা পুঁথি হাতে পড়লো। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্য। বিষয়বস্তু ফার্সী, যদিও নায়ক-নায়িকা কোনো কোনো মূল কাব্যে আরবদেশের—ফার্সীর মাধ্যমে বাঙলা দেশে এসে পেঁছেছেন। সঙ্গে এনেছেন ইরানী মেজাজ। সেটা মধুর,—আরবী কাব্যের মূল সুর দার্ঢ্য।

বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়, যে সব কবি বাঙলায় এ-সব কাব্য 'স্বাধীন অনুবাদ' করেছেন এঁদের অনেকেই উত্তম ফার্সী জানতেন। কেউ কেউ ভালো আরবী ও সংস্কৃত জানতেন, এবং প্রায় সকলেই তখনকার দিনের প্রচলিত বাঙলা কাব্যের ভাষা জানতেন। ছন্দও হয় পয়ার নয় ত্রিপদী। এমন কি কবিদের একজন পয়ার লিখতে লিখতে এমনই আনন্দে নিমগ্ন হয়ে গেছেন যে একঘেয়েমি কাটাবার জন্য যে মাঝে মাঝে ত্রিপদী ভী আমদানি করতে হয় সে বাৎ বেবাক ভুলে গেছেন এবং কাব্য সমাপ্তির পর যখন কানে জল গেল তখন কুছ্ কুছ্ ত্রিপদী-ভী-বগ্‌হার দিয়ে কবি-ধর্মের ইমান দুরুস্ত রাখলেন।[১]

তাই প্রশ্ন, সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাঁরা বাংলা কাব্যে বিদেশী সুর আনলেন, তাঁরা উত্তম ফার্সী এবং আরবী শব্দ বাঙলাতে আমদানি করলেন না কেন?

দর্শনের অনুশাসনে, যে প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে তোমার কণামাত্র ধারণা নেই, যে উত্তর কোন্ দিক দিয়ে আসতে পারে না আসতে পারে সে সম্বন্ধে তুমি কণামাত্র কল্পনা করতে পারো না, সে প্রশ্ন প্রশ্নই নয়, সে প্রশ্ন বাতিল ইনভ্যালিড। তাই আমার মনে যে কাল্পনিক 'উত্তর' এসেছে সে দুটির ইঙ্গিত দিই।

প্রবন্ধান্তরে বলেছি, বাঙলা দেশ চিরকালই বিদ্রোহী। এ-দেশ মুসলমান আগমনের পর থেকে সুভাষ বসু পর্যন্ত একমাত্র জাহাঙ্গীর থেকে আওরঙ্গজেবের আমলে কেন্দ্রের অর্থাৎ দিল্লী-আগ্রার হুকুম তামিল করেছে। বস্তুত পাঠান মোগল প্রায় সব বাদশাকেই এ-দেশে আসতে হয়েছে 'বিদ্রোহ দমন করতে'—আমরা অবশ্য বলবো, আমাদের স্বাধীনতা হরণ করতে। বিশেষত বাঙলার স্বাধীন পাঠান রাজাদের আমলের তো কথাই নেই। তখন বাংলা দেশ চীনের সঙ্গে রাজদূত বিনিময় করছে, প্রতিবেশী জৌনপুরী রাজাদের সঙ্গে কখনো লড়াই করছে, কখনো আশ্রয় দিচ্ছে, এবং জনশ্রুতি যে, বাঙলা দেশে স্বাধীন রাজা ইরানের কবি হাফিজকে বিস্তর সওগাৎ পাঠিয়ে দাওয়াৎ করেছেন এদেশে। অবশ্য নৌপথে।

---

১. ইনি অবশ্য অনেক পরের কবি।—সুকুমার সেন, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১৯০, ১৯৯ পশ্য।

এখানেই হয়তো রহস্যদ্বারের গুপ্ত কুঞ্চিকা।

স্থলপথে ইরান যাবার কথাই ওঠে না। মাঝখানে জৌনপুর, দিল্লী, লাহোর, কান্দাহার, হিরাত কত না স্বাধীন রাজত্ব! একে অন্যের সঙ্গে লড়ছে হরবকৎ। নিরীহ কবি, চিত্রকর, গায়কের তো কথাই ওঠে না, ইরান-তুরানের ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধারা পর্যন্ত মেরে কেটে হয়তো দিল্লী অবধি দু'একজন এসে পেঁছেছে, 'দিল্লী দূর অস্ত্' বরঞ্চ 'দিল্লী নজ্দীক্ মীশওদ' (দিল্লী কাছে এল), কিন্তু 'বাঙলা দূর অস্ত্' শুধুই নয় 'দূরাস্তর অস্ত্।'

এদিকে বাঙলার স্বাধীন সুলতানদের মাতৃভাষা ফার্সী নয়, ফার্সী তাদের কোর্ট লেনগুইজ মাত্র—এমন কি স্টেট লেনগুইজও নয়—যত দিন যাচ্ছে ততই তাঁরা সে ভাষা ভুলে যাচ্ছেন, ওদিকে ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে বিদেশাগত নূতন কবি নূতন লেখক সে ভাণ্ডারের মাল নিয়ে আসছেন না, রাজদরবারেই যখন ফার্সী দিনের পর দিন শুকিয়ে আসছে তখন জনসাধারণে সে-ভাষা প্রচলিত ও প্রসারিত হবে কি করে?

দু-চারজন পণ্ডিতদের কথা সব সময়ই আলাদা। রামমোহন হীব্রু জানতেন, হরিনাথ দে না জানি ক'টা বিদেশী ভাষা সে-সব দেশে না গিয়ে এমন কি সে-সব ভাষার পণ্ডিতদের সংস্পর্শে না এসেও শিখতে পেরেছিলেন। অবশ্য স্বাধীন বাঙলায় তাঁর চেয়ে অনেক বেশী আলিম-ফাজিল ছিলেন কিন্তু এঁদের প্রায় সকলেরই ছিল 'কাফিরদের' ভাষা বাঙলার প্রতি গভীর অশ্রদ্ধা (ঐ যুগের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদেরও বাঙলার প্রতি বিশেষ কোনো শ্রদ্ধা ছিল না)। এঁরা বাঙলায় কাব্য এমন কি ধর্মালোচনা করতেও কড়া বারণ করতেন। কিন্তু যেখানে স্টেটের খানিকটে উৎসাহ পাওয়া যাচ্ছে সেখানে ওটাকে কিছুটা উপেক্ষা করা যায়। তাই দৌলত কাজী, আলা-ওল, সৈয়দ সুলতান ইত্যাদি কবিদের আবির্ভাব।[২] পূর্বেই বলেছি এঁরা ফার্সী জানতেন উত্তম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ তত্ত্বটিও বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে তাঁদের পাঠকমণ্ডলী, কি মুসলমান কি হিন্দু কেউই বিদেশী আরবী ফারসীর সঙ্গে সুপরিচিত নন। কাজেই আসল উদ্দেশ্য সমাধান হবে না আদপেই।

(এর সঙ্গে আজকের দিনের একটি তুলনা দিতে পারি। খবরের কাগজে মাঝে মাঝে দেখি, কোনো পশ্চিমবঙ্গবাসী ঢাকার কোনো উটকো খবরের কাগজ

২ 'সৈয়দরা' নিজেদের মহাপুরুষ মুহম্মদের বংশধর বলে দাবী করেন। মুসলমান ধর্মে যদিও সৈয়দদের বিশেষ কোনো সম্মান দেখাবার নির্দেশ নেই তবু কার্যত এঁরা অনেকটা ব্রাহ্মণদের সম্মান পান। তার কারণ অবশ্য অংশত এই যে এঁদের ভিতরই ইসলামী শাস্ত্রচর্চার প্রচলন ছিল বেশী। এবং ঠিক যে রকম, ব্রাহ্মণরাই শাস্ত্র বানায়, এবং শাস্ত্র ভাঙ্গে তারাই—রামমোহন বিদ্যাসাগরের কথা স্মরণ করুন—ঠিক সেই রকম ধর্ম, সমাজ-সংস্কার, সাহিত্য-সৃষ্টিতেও সৈয়দের ভাঙ্গা-গড়ার সাহস বেশী। হিন্দুর বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় যে মুসলমান কবি সম্মানের সর্বোচ্চ আসন পেয়েছেন তাঁর নাম সৈয়দ মোর্তুজা।

থেকে আরবী-ফার্সী মিশ্রিত বাঙলা উদ্ধৃত করে আর্তরব ছাড়ছেন, এত বেশী আরবী-ফার্সী শব্দ যদি ঢাকার লেখকরা ব্যবহার করেন তবে এক নূতন ভাষার উদ্ভব হবে এবং বঙ্কিম-রবির বাঙলা 'দ্বিখণ্ডিত' হয়ে যাবে। এঁরা যদি অনুগ্রহ করে ঢাকার নিত্যকার খবরের কাগজ পড়েন, লেখকদের সাহিত্য রচনা পড়েন তবে দেখতে পাবেন ঢাকা সেই বাঙলাই লিখেছে কলকাতা যে বাঙলা লেখে—দু'চারটি 'আব্বা', 'আম্মা', 'ফজরের নামাজে'র কথা হচ্ছে না, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী আরবী-ফার্সী শব্দ আলাল হুতোমে আছে—এবং তার কারণ দৌলত কাজী, আলাওলের বেলায় যা হয়েছিল তা-ই। ঢাকার উত্তম ফার্সী জাননেওয়ালা লেখকও বোঝেন যে তিনি ফার্সী জানলে কি, তাঁর পাঠকের অধিকাংশই যে ফার্সী জানেন না। এস্থলে অবশ্য মর্ডান কবিদের মত যাঁরা মনে করেন, যত দুর্বোধ্য লেখা যায় ততই 'সুবোধ পাঠক' প্রশংসা করবে বেশী, তাঁদের কথা হচ্ছে না।)

আকবরের আমলেই প্রথম অবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হয়। কিন্তু তার আগে আমার আরেকটি প্রশ্ন আছে।

ইংরিজি শব্দ যখন প্রথম বাঙলাতে ঢুকতে আরম্ভ করে তখন লেখা হয়েছিল 'লভ', 'কালেজ' ইত্যাদি; আজ আমরা লিখি 'লাভ' 'কলেজ'। আজ আবার দেখতে পাই, 'স্যুটিং' 'শুটিং', 'হাসপাতাল' 'হাঁসপাতাল' একই শব্দ দুই বা তিন রকমে লেখা হচ্ছে। তার উপর জুটেছে এসে আরেক আপদ। ছেলেছোকরারা ফরাসী, জর্মন ভাষাতে ওকীব-হাল হয়ে উঠেছে, 'পারি' 'পারী' এমন কি দু-আঁসলা 'প্যারি' পর্যন্ত দেখা দিচ্ছে,—'প্যাঁসনে', 'পাঁশনে' আরো কত কী?

দৌলত কাজী ইত্যাদি লেখকগণ মাত্রাধিক আরবী-ফারসী শব্দ বে-এক্তেয়ার ভাবে গ্রহণ করেননি সত্য কিন্তু কিছু পরিমাণে তো করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তখন তাঁরা আমাদেরই মত এলোপাতাড়ি যাঁর যা খুশী করেছিলেন, না কতকগুলো সুস্পষ্ট আইন বেঁধে নিয়ে সেগুলো যতদূর সম্ভব মানাবার চেষ্টা করেছিলেন?

যেমন মনে করুন এ যুগের মরমিয়া কবি হাসন রাজা গাইলেন,

"মম আঁখি হৈতে পয়দা আসমান জমিন,
কানেতে করিল পয়দা মুসলমানী দিন।"

এখানে 'দিন'-কে যদি বাঙলা 'দিবস' অর্থে দেওয়া হয় তবে ছত্রটির কোনো ব্যাখ্যা করা যায় না। আসলে শব্দটি আরবী 'দীন' অর্থাৎ ধর্ম। অর্থ দাঁড়ালো 'আমার কানে এসে মুসলমানী ধর্মের খবর পেঁছিল বলে সে ধর্ম তার অস্তিত্ব পেল, যেরকম আমি যখন আঁখি মেলে চাইলুম তখনই দ্যুলোক ভূলোকের সৃষ্টি হল।' কট্টর আদর্শবাদীর (আইডিয়ালিস্ট স্কুল) মত হাসন রাজা বলেছেন, 'ত্রিলোকের চিন্ময় মৃন্ময় জগৎ তাদের অস্তিত্বের জন্য আমার চিত্ত ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করছে। আমি না থাকলে এসবের অস্তিত্ব নেই।'

পুনরায় বলেছেন,

"আমা হইতে আসমান জমিন, আমা হইতে সব
আমা হইতে ত্রিজগৎ, আমা হইতে রব।"

এখানে 'রব' আওয়াজ এই অর্থে নিলে সদর্থ হয় না। আরবী 'রব' শব্দের অর্থ 'ভগবান'। হাসন রাজা বলতে চান, 'আমার চৈতন্য যদি ভগবানের অস্তিত্বের কল্পনা না করতো তবে তাঁর স্বয়ম্ভূ অস্তিত্বই হত না।'

॥ দুই ॥

টকির কল্যাণে আমরা একটা জিনিস সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। টকি আসার পূর্বে আমরা ভাবতুম, আমরা রকে বসে বেহারী মুটের সঙ্গে যে উচ্চারণে হিন্দী কথা বলি, সেইটেই অতি বিশুদ্ধ হিন্দী উচ্চারণ, এবং ক্লাসে মাস্টার মশাই যে ইংরিজি উচ্চারণে টেনিসন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ পড়েন সেই উচ্চারণই অক্সফর্ড কেমব্রিজে চালু।

পৃথিবীর সর্ব আর্য ভাষা, এমন কি সেমিতি ভাষাতেও একটি ধ্বনি কথায় কথায় আসে, কিন্তু বাঙলায় (এবং ওড়িয়া, আসামীতে) নেই। ইংরিজিতে 'the'-র 'ই' উচ্চারণ; ফরাসীতে 'le'-র 'e'; জর্মনের 'gegeben'-এর তৃতীয় 'e'-উচ্চারণ, আরবী ফার্সী, হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠীতে 'কলম' শব্দে 'ক' এবং 'ল'-এর মধ্যে, 'ল' এবং 'ম'-এর মধ্যে যে উচ্চারণ আছে, সেটি বাঙলাতে নেই।

সোজা কথায় হিন্দীর 'আমি' বা 'আমরা' বলতে যে হম শব্দটি আছে তার 'হ' এবং 'ম'-এর মাঝখানে যে ধ্বনিটি আছে সেটা আমাদের কেউ শুনেছেন 'অ' এবং তাই লিখেছেন 'হম্' এবং অধিকাংশই শুনেছেন 'আ' এবং তাই লিখেছেন 'হাম'। এ যুগে সচেতন হয়ে আমাদের অনেকেই লিখতে আরম্ভ করেছেন 'হ্যম'। (উপস্থিত আমরা এই ধ্বনিটির নাম দিলুম 'অস্পষ্ট স্বর')।

দৌলত কাজী, আলাওলের সামনে সর্বপ্রথম এই 'অস্পষ্ট ধ্বনি' নিয়েই এল সমস্যা। কলম জবরদস্ত, মক্কা, মদিনা ধরনের অসংখ্য আরবী ফার্সী শব্দে আছে এই অস্পষ্ট ধ্বনিটি; এটাকে প্রকাশ করেন কোন্ চিহ্ন দিয়ে? 'কলম', না 'কালাম', না 'কল্যম' (আজকে পূর্বোল্লিখিত 'হ্যম'-এর মত)?

আলাওলরা অনেকেই সংস্কৃত জানতেন, এবং এটাও জানতেন যে সংস্কৃতে এ ধ্বনিটি আছে বটে, কিন্তু বাঙালী উচ্চারণ করে 'অ' রূপে। যেমন সংস্কৃতে 'কমল' শব্দের 'ক' এবং 'ম'-এর মাঝখানে আছে সেই 'অস্পষ্ট স্বর', কিন্তু বাঙালী সেই অস্পষ্ট ধ্বনির পরিবর্তে 'কমল' উচ্চারণ করে 'অ' দিয়ে, অর্থাৎ বাঙলা শব্দ 'ঘর' উচ্চারণ করতে যে 'অ' উচ্চারণ করি সেই 'অ' দিয়ে।

তাই তাঁরা মনে মনে আন্দেশা করলেন, সংস্কৃতের 'কমল' এবং আরবী-ফার্সী'র 'কলমে' যখন একই উচ্চারণ তখন এই ধ্বনি প্রকাশের সময় বাঙলায় কোনো পরিবর্তন না করাই ভাল। অবশ্য তাঁরা 'কলম' না লিখে 'কালাম' লিখতে পারতেন (আজকে যে রকম কেউ কেউ 'হদিস' না লিখে 'হাদিস' লেখেন, 'বরকৎ' না লিখে 'বারাকৎ' লেখেন) কিন্তু তা হলে বিপদ হত যে, দীর্ঘ আ-কার -যুক্ত 'কালাম' নামক যে ভিন্ন শব্দ আছে (সেটার অর্থ 'বাণী'—

আবুল কালাম আজাদ-এর অর্থ 'বাণীর পিতা, যিনি স্বাধীন') সেটাতে এবং 'লেখনী'-তে (অর্থাৎ 'কলম'-এ) যে পার্থক্য আছে সেটা আর লেখাতে দেখানো যেত না।'

অবশ্য তাঁরা 'ক্যলাম' (কলমের জন্য, এবং 'কালাম' বাণীর জন্য) লিখতে পারতেন কিন্তু সেটা করতে গেলে অন্যান্য নানা বিপদের সম্মুখীন হতে হয়— এবং সে দীর্ঘ আলোচনার জন্য এ-স্থলে স্থানাভাব।

এই আইন তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু বাঙালী কি ভাবে 'অ' এবং 'আ' উচ্চারণের ভিতর পার্থক্য করে সে-সম্বন্ধেও বিলক্ষণ সচেতন ছিলেন বলে একটি ব্যত্যয় তাঁরা করে দিয়েছিলেন। আরবী ফার্সী শব্দের আদ্যক্ষরে 'আলিফ', 'আয়েন', বা 'হে' থাকলে সেখানে 'আ' ব্যবহার করেছেন —অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। তাই 'অল্লা' 'অহমদ' না লিখে লিখেছেন 'আল্লা', 'আহমদ' ; 'অব্দুলে'র বদলে 'আব্দুল' এবং 'হমিদে'র 'হসেনে'র পরিবর্তে 'হামিদ' 'হাসেন'।

দ্বিতীয় সমস্যা ছিল দীর্ঘ হ্রস্ব নিয়ে। সংস্কৃত 'দিন' এবং 'দীন' উচ্চারণে, 'কুল' এবং 'কূল' উচ্চারণে আমরা কোনো পার্থক্য করি না, এমন কি সংস্কৃত পড়ার সময়ও না। তাই তাঁরা স্থির করলেন যে, বাঙলাতে আরবী-ফার্সী শব্দ লেখার সময় তাঁরা সব শব্দই হ্রস্ববর্ণ দিয়ে লিখবেন। কাজেই আরবী 'ধর্ম' অর্থে 'দীন' শব্দ যদিও দীর্ঘ উচ্চারণে আছে তবু তাঁরা বাঙলাতে দিন-ই লিখলেন, এবং ঠিক সেই মত 'নূর' 'রসূল' না লিখে 'নুর' 'রসুল' লিখলেন।

তৃতীয় সমস্যা, সংস্কৃতে শ, ষ, স-এর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ। আমরা বাঙলাতে তিনটেকেই এক উচ্চারণ 'শ' অর্থাৎ 'sh'-এর মত করে থাকি। শুধু সংযুক্তের বেলা এবং অন্যান্য কোনো কোনো স্থলে ইংরিজি s-এর উচ্চারণ, অর্থাৎ খাঁটি সংস্কৃত 'স'-এর উচ্চারণ করে থাকি। মস্তক, পুস্তক, আস্তে, শ্রাবণ, প্রশ্ন ইত্যাদিতে আমরা 'শ' উচ্চারণ না করে 'স', অর্থাৎ 'sh' না করে 's' করে থাকি। আরবী-ফার্সীতে আছে চার রকমের ঐ ধরনের উচ্চারণ। মুসলমান আদি-লেখকেরা বাঙলা উচ্চারণপদ্ধতি মেনে নিয়ে একটি 'স' দিয়েই সব কারবার চালাবার চেষ্টা করেছেন। তবে পূব বাঙলায় 'ছ' অক্ষর 'স'-এর মত উচ্চারিত হয় বলে মাঝে মাঝে (পরবর্তী যুগে এবং আধুনিক কালে আকছারই) 'ছ' এসে 'স'-এর স্থান নিয়েছে।

এ আলোচনার সর্বশেষে কিন্তু নির্ভয়ে একটি কথা বলা যেতে পারে। মুসলমান আদি-লেখকেরা বাঙলা উচ্চারণকে পরিপূর্ণ সম্মান দিয়ে তারই রীতিনীতি মেনে নিয়েছিলেন। উদ্ভট বিদকুটে বানান লিখে নূতন নূতন ধ্বনি আমদানির বন্ধ্যাগমন করেননি। আরবী-ফার্সী শব্দের বাঙলা বানানে প্রথম ভূতের নৃত্য আরম্ভ হল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন ১৯৩৬ সালে বাঙলা বানান 'নিয়ন্ত্রণ ও সরল' করতে চাইলেন। কিন্তু সে আলোচনা অতিশয় দীর্ঘ হয়ে পড়বে, আমার জ্ঞানও অতিশয় সীমাবদ্ধ এবং তদুপরি আমার বিলক্ষণ জানা আছে, এ আলোচনায় অধিকাংশ পাঠকেরই কোনো উৎসাহ নেই। তবু যে

আমি করছি, তার কারণ, বাঙলা বানানের অরাজকতার মাঝখানে একথাও সত্য যে, বাঙলার একাধিক তরুণ নানা ভাষার দিকে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে নানা শব্দ ও ধ্বনির প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। তাঁরা যদি এসব বিষয়ে গবেষণা করেন তবে আমার 'নানা প্রশ্নে'র কিছুটা উত্তর আমি হয়তো পাব।

এটা অবশ্য একেবারে সম্পূর্ণ নূতন নয়। গত শতাব্দীর শেষের দিকে বানানের অরাজকতা দূর করার জন্য সাহিত্য-পরিষদ (?) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে (?) অনুরোধ করেন, তিনি ঐ সম্বন্ধে নির্দেশ দেন। আমার যতদূর জানা আছে, তিনি সে কার্য শেষ করে উঠতে পারেননি। আমার এ মন্তব্যে ভুল থাকতে পারে, কারণ সমস্ত জিনিসটা আমার আবছা-আবছা মনে আছে।

শেষ প্রশ্ন :—

বাঙলা বাক্যগঠন, পদবিন্যাস অর্থাৎ সিনটেক্স্ এল কার অনুকরণে?

ফার্সীতে বলি, চুন (যখন) পাদশা (বাদশা) মরা (আমাকে) দীদন্দ (দেখলেন) উনহা (উনি) মরা (আমাকে) গুফতন্দ (বললেন) তু (তুই) কুজা (কোথায়) মীরওয়ী (যাচ্ছিস্) ?

হুবহু একই সিনটেক্স?

ফার্সী থেকে?

এবং সবশেষে প্রশ্ন :—

আমরা যে গোটা গোটা বাঙলা লেখার সময় এবং সাইন-বোর্ডে বাঙলা অক্ষরের কোনো জায়গায় মোটা কোনো জায়গায় সরু করি সেটা এল কোথা থেকে? ফার্সী লেখার কলম (—আমাদের প্রাচীন লেখনী বা লোহার স্টিলো না—) ব্যবহার করেছিলুম বলে?

জাতীয় সংহতি

মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়।

এই যে ফার্সী নামক ভাষা এটি সাতশ' বছর ধরে ভারতের রাষ্ট্রভাষা ছিল। যদিও পাঠান ও মোগল কারোরই মাতৃভাষা ফার্সী ছিল না। শেষ বাদশা বাহাদুর শা' বাদশার অন্তঃপুরেও তুর্কী বলা হত। যদিও রাজদরবারে ফার্সী চলতো, কিন্তু কবি সম্মেলনে প্রধানত উর্দু।

ইংরেজও প্রথম একশ' বছর এ দেশে ফার্সী দিয়েই কাজ চালায়। ১৮৪০-এর কাছাকাছি একদিন তারা ফার্সী নাকচ করে দিয়ে ইংরিজি চালালে। যে হিন্দু কায়স্থরা একদা অত্যুত্তম ফার্সী শিখে পদস্থ রাজ-কর্মচারী হতেন, তাঁরা ৫০।৬০ বছরের ভিতর ফার্সী বেবাক ভুলে গিয়ে ইংরিজির মাধ্যমে রাজকর্ম চালিয়ে যেতে লাগলেন। অনেকের মুখে শুনি, কলকাতা হাইকোর্টে নাকি এখনো তাঁদের প্রাধান্য অতুলনীয়। বাদবাকি ভারতবর্ষে এখন কজন লোক

ফার্সী জানেন সেটা বের করতে হলে দিনের বেলাও লণ্ঠন নিয়ে বেরুতে হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই কথা হচ্ছে—অবশ্য এই দুই সম্প্রদায়েরই যাঁরা উর্দুর শক্ত গোড়াপত্তন করতে চান তাঁরা ফার্সী শেখেন—বাঙালী যেমন আপন বাঙলাকে জোরদার করতে হলে সংস্কৃত শেখে।

যে ফার্সী প্রায় সাতশ' বৎসর ধরে ভারতবর্ষে দাবড়ে বেড়াল, হাজার বছর ধরে তুর্কীস্থান থেকে তাইগ্রীস নদ অবধি রাজত্ব করলো (লাতিনের মতই ফার্সীকে সে যুগের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা বলা যেতে পারে) সেই ফার্সীই পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর ভারতবর্ষে লোপ পেল!

ইংরিজি মাত্র একশ' বছর রাজত্ব করেছে। তার লোপ পেতে কত দিন লাগবে?

শ্রদ্ধেয়া বিজয়লক্ষ্মী সেদিন বলেছেন, 'ইংরিজি আমাদের লিগেসি, ওটা আমরা ছাড়ব কেন? তাঁর পুণ্যশ্লোক স্বর্গীয় পিতা মোতীলাল ফার্সীকে তাঁর লিগেসি মনে করতেন। ইংরেজ আমলে একদা দিল্লীর বিধানসভায় দুই ইংরেজ একে অন্যকে প্রচুর অহেতুক প্রশংসা করলে পর মোতীলালজী বললেন, 'ফার্সীতে একটি সুন্দর প্রবাদ আছে; "মন্ তোরা হাজী মীগোইমু, তো মরা কাজী বগো!" অর্থাৎ আমি তোমাকে হাজী বলে সম্বোধন করবো, আর তুমি আমাকে কাজী বলে সম্বোধন ক'রো—অথচ ইনিও মক্কাতে গিয়ে হজ করেননি, উনিও কাজী বা ম্যাজিস্ট্রেট নন।' সেই ফার্সী ভাষার লিগেসি গেছে,—ইংরিজির কবে যাবে?

পাঠক ভাববেন না, আমি ইংরিজি তাড়াবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছি। আদপেই না। নিজের স্বার্থেই আমি চাই, ইংরিজি থাকুক—এই বৃদ্ধ বয়সে কোথায়, মশাই, হিন্দীর 'গাড়ী আতী হৈ, জাহাজ জাতা হৈ' লিঙ্গ মুখস্থ করে করে হিন্দী যাঁদের মাতৃভাষা তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিতে যাব! যে কটা দিন বেঁচে থাকবো, ইংরিজি ভাঙিয়েই খাব। সে কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে, আমি আপনি চাইলে না চাইলেও ইংরিজির ভাগ্যে যা আছে তা হবেই।

আরেকটি উদাহরণ নিন। এ-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ ওকীবহাল নই—যা শুনেছি তাই বলছি। ইংলণ্ডে নাকি নরমান বিজয়ের ফলে ফরাসী রাষ্ট্রভাষা হয়ে যায়, এবং তামাম ইংলণ্ডের লোক নাকি পড়িমরি হয়ে ফরাসী শেখে। কবি চসারের সামনে নাকি সমস্যার উদয় হয়, তিনি ফরাসী না ইংরিজিতে কাব্য রচনা করবেন? (ভাগ্যিস ইংরিজিতে করেছিলেন, কারণ ফরাসী লিখে কোনো ইংরেজ যশ অর্জন করেছেন বলে শুনিনি; এদেশে যেমন আটশ' বছর ফার্সী চর্চার পর এক আমীর খুসরোই কিছুটা নাম করতে পেরেছেন—তাও তাঁর মাতৃভাষা ছিল ফার্সী)।

নরমান বিজয় খতম হওয়ার পরও ইংরেজ আপ্রাণ চেষ্টা করেছে তার ফরাসী লিগেসি যেন মকুব না হয়ে যায়। কোটি কোটি পৌণ্ড খর্চা করে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ফরাসী শিখিয়েছে, কাচ্চা-বাচ্চার জন্য ফরাসী গভার্নেস

রেখেছে, ছুটিছাটা পেলেই প্যারিস পানে ধাওয়া করেছে। আর তার ভাষার ভাই মার্কিনও ফরাসী মত্ততায় কিছুমাত্র কম নয়। শুনেছি, মার্কিনী ইংরিজিতে নাকি প্রবাদ আছে, 'সাধু মার্কিনেরই মৃত্যুর পর প্যারিস-প্রাপ্তি হয়—' সেই তার স্বর্গপুরী, মুসলমানের বেহেশৎ, হিন্দুর কৈলাস-বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির মত।

ফরাসী শেখানোর বাজে খর্চা যাঁরা কমাতে চান তাঁরা নাকি হালে হাতে-কলমে সপ্রমাণ করেছেন যে, লণ্ডনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে শিক্ষিত ইংরেজকে ফরাসীতে প্রশ্ন শুধোলে শতেকে গোটেক ফরাসীতে উত্তর দিতে পারে, কি না পারে।

শুনছি ব্রিজ দিয়ে নাকি ফ্রান্স-ইংলণ্ডে যোগ করে দেওয়া হবে। হায় রে কপাল! যখন ভাষার সেতু ছিল, তখন লোহার সেতু ছিল না; এখন লোহার সেতু হচ্ছে তো ভাষার সেতু নেই!

আরেকটি উদাহরণ দিই। খৃষ্টধর্ম ইয়োরোপে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হবার পর খৃষ্টভক্তগণের বাসনা হলো, খৃষ্টধর্মের কল্যাণে সমস্ত ইয়োরোপে যে এক নবীন ঐক্য দেখা দিয়েছে, সেটা যেন লোপ না পায়। তাই তাঁরা আপ্রাণ লাতিন আঁকড়ে ধরে রইলেন। পাছে সেই ঐক্য লোপ পায়, তাই দেশজ অনুন্নত ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ পর্যন্ত করতে দেওয়া হত না (মুসলমানরাও বহুকাল কোরাণের ফার্সী কিংবা উর্দু, বাঙলা অনুবাদ করতে দিতে চাননি, ঐ একই কারণে)। লুথারের অন্যতম প্রধান সংস্কার ছিল জর্মন ভাষায় বাই-বেলের অনুবাদ প্রচার। ফলে শেষ পর্যন্ত ফরাসী লাতিনের স্থানটি কেড়ে নিল—এই সেদিন পর্যন্ত জর্মনভাষী ফিড্রিক দি গ্রেট ফরাসী কবি ভলতেয়ারকে নিমন্ত্রণ করে তাঁর অতি-কাঁচা ফরাসী কবিতা মেরামত করিয়ে নিতেন—এবং সর্বশেষে ইয়োরোপের সর্বভাষা আপন আপন দেশে মাথা খাড়া করে দাঁড়ালো। ইস্তেক ডেনিশ, ফিনিশ পর্যন্ত। লাতিন-ফরাসী সংহতি গেল। অনেক পর্যটকের মুখে শুনতে পাবেন—সে আসন এখন ইংরিজি নিচ্ছে। শুনে হাসি পায়। হোটেলবয়রা কিছুটা ইংরিজি বলতে পারে বইকি, যেমন মাদুরার হোটেলবয়ও কিঞ্চিৎ হিন্দুস্থানী কপচায়, কিন্তু প্যারিস কিংবা ভিয়েনার রাস্তায় ঐসব দেশবাসীর সঙ্গে ইংরিজিতে দুদণ্ড রসালাপ করবার চেষ্টা দিন না, দেখুন না ফলটা কি হয়।

আমি যদি বলি, সমস্ত ইয়োরোপে যতখানি ইংরিজি বলা হয়, তার তুলনায় ভারত পাকে বেশী হিন্দুস্থানী বলা হয়, তবে ভুল বলা হবে না—অবশ্য বই পড়ার কথা হচ্ছে না, সেটা নির্ভর করে জনসাধারণে শিক্ষার বিস্তৃতির উপর।

অর্থাৎ ইংরিজি ও লাতিন সংহতি এনে দিতে পারবে না।

কিন্তু সব চেয়ে চমৎকার উদাহরণ আরব-আফ্রিকা ভূখণ্ডে। ইরাক থেকে আরম্ভ করে সিরিয়া, লেবানন, মিশর, তুনিস, আলবজজরিয়া, মরক্কো, এদিকে কুয়েইত, বাহরেন, মক্কা-মদিনা, ইয়েমেন, জর্ডন, সর্বত্রই আরবী প্রচলিত। লেবানন বাদ দিলে এদের প্রতিটি রাষ্ট্রে চৌদ্দ আনা পরিমাণ লোক মুসলমান

এবং উত্তর আফ্রিকার কিছুটা বেরবের, কপ্তীক ও নিগ্রো রক্ত বাদ দিলে সকলের ধমনীতেই প্রায় অভেজাল সেমিতি রক্ত।

কিন্তু কোথায় সেই আরব সংহতি ?

প্রাচীন দিনের কাহিনীতে ফিরে যাব না। এই আপনার আমার চোখের সামনেই দেখতে পেলুম, ইরাক সে-সংহতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে, কুয়েইত জাতভাই কাসেমের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বিধর্মী (কারো কারো মতে 'কাফের') ইংরেজকে দাওয়াত করে খানা খাওয়ালে, এবং পরশু না তরশু দিন সিরিয়াও নাসেরের মিশরীদের গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিলে। এমন কি, সিরিয়ার মসজিদে মসজিদে নাকি মোল্লারা নাসেরকে অভিসম্পাত দিচ্ছেন, নাসের নাস্তিক, টিটোর সঙ্গে কোলাকুলি করে, তারই আশকারায় মিশরের টেলিভিশন অশ্লীল ছবি, অর্ধনগ্না রমণী দেখায় !

এক ধর্ম, এক রক্ত, এক ভাষা। এক ভাষা, বিশেষ করে বললুম, কারণ সিরিয়া, ইরাক, মিশরের কথ্য ভাষাতে প্রচুর পার্থক্য থাকলেও ওসব জায়গায় কোনো উপভাষা সৃষ্টি হয়নি—সেই এক হাজার বছরের পুরনো ক্লাসিকাল আরবীই সর্বত্র চলে। তবু আর মিলন হয়ে উঠছে না।

* * *

কাজেই সংহতির সন্ধানে অন্যত্র যেতে হবে। গুজরাতী, বাঙালী, হিন্দু, মুসলমান, সবাই মিলে হিন্দী কপচালেই যে রাতারাতি আমাদের জাতীয় সংহতি গড়ে উঠবে, এ-দুরাশা যেন না করি।

রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী বলেই বলছি তা নয়, আমার মনে হয়, তিনিই এ-বিষয়ে সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার চিন্তা করেছেন।

ভারতীয় সংহতি

ভারতীয় সংহতি তবে কোথায় ?

এস্থলে নিবেদন করে রাখি যে আমার ধারণার সঙ্গে অল্প লোকেরই ধারণা মিলবে ও যাঁদের সঙ্গে মিলবে তাঁরা এবং আমিও এ দুরাশা পোষণ করি না যে বিংশ শতাব্দীর লোক আজ অথবা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের বক্তব্য কান দিয়ে শুনবে।

বেদ উপনিষদ নমস্য কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষেই এসবের চর্চা অতি কম। এমন কি পণ্ডিতদের মুখে শুনেছি, গীতা পর্যন্ত এদেশে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বিশেষ প্রচলিত ছিল না।

আপনি ভারতবর্ষের যে কোনো গ্রামে যান না কেন, তা সে মালাবারে আসামে পাঞ্জাবেই হোক—সেখানকার লোকনাট্য চারণ গানে সর্বত্রই মহাভারত রামায়ণ বিরাজিত। জনপদবাসীর রসাস্বাদনের প্রধান উৎস রামায়ণ মহাভারত। আমি একবার মালাবারের গ্রাম্য কথাকলি দেখতে এবং শুনতে গিয়ে তিন মিনিটেই বুঝে যাই, হনুমান সভাজনকে সালঙ্কার বর্ণনা করছেন, তিনি কি

করে লঙ্কায় উপস্থিত হলেন, নগর পরিদর্শন করলেন, লঙ্কার কদলীবনে কি প্রকারে লঙ্কাকাণ্ড ঘটালেন, অবশেষে রাবণের অনুচর তাঁর পুচ্ছটিতে অগ্নি-সংযোগ করলে তিনি কি প্রকারে গৃহ থেকে গৃহান্তরে লম্ফপ্রদান করে নগরীতে ব্যাপকভাবে বহ্নি প্রজ্বলিত করলেন। মালায়ালম ভাষার এক বর্ণ না জেনেও আমি স্বচ্ছন্দে গল্পটি উপভোগ করলুম।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যাঁরাই পরিভ্রমণ করেছেন তাঁরাই জানেন, রামায়ণ মহাভারত ভারতীয় জীবনের কতখানি গভীর অতলে প্রবেশ করেছে।

এবং এই নাট্যনৃত্য উপভোগ করে শুধু হিন্দু না, মুসলমানও। কারণ ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের মাতৃভাষা এক। বাঙ্গলার মুসলমানের মাতৃভাষা যেমন বাঙলা, গুজরাতী মুসলমানের মাতৃভাষাও গুজরাতী। লক্ষ্ণৌয়ের মুসলমানের মাতৃভাষা যেমন উর্দু, হিন্দুরও তাই—এখন অবশ্য হিন্দী ক্রমে ক্রমে উর্দুর জায়গা দখল করে নিচ্ছে। মাতৃভাষায় আমোদ-আহ্লাদ করাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা—শুনেছি দেশবিভাগের পরও 'হরহর মহাদেব' ফিল্ম ঢাকাতে যে বক্স আপিস ভরলে তাতে সিনেমার মালিকগণ বিস্মিত হন।

কিন্তু অমিলও আছে।

ধর্মজগতে হিন্দু ভীষ্ম-কর্ণকে আদর্শ বলে ধরে নেয়, মুসলমান নেয় না। গোব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা করবার কোনো কারণও মুসলমানের নেই। অবশ্য আউল-বাউল মুর্শিদীয়া মিস্টিকগণের গানে কিছুটা রামায়ণ-প্রীতি পাওয়া যায়, কিন্তু ভারতীয় মুসলমান ব্যাপকভাবে সেটা গ্রহণ করেনি।

* * *

রামায়ণ-মহাভারতের উৎস থেকে সঞ্জীবনী-সুধা আহরণ করে হিন্দু সংহতি পুনর্জীবিত করা যায়—অবশ্য যদি সাহিত্যিক, সমাজপতি, রাজনৈতিক নেতাদের এ পন্থায় আস্থা থাকে এবং সেই কর্মে নিজেদের নিয়োগ করেন, বিনোবাজী যে রকম করেছেন, কিন্তু যদি ভারতীয় সংহতির কথা তোলা যায় তবে সমস্যাটা কঠিন হয়, কারণ ভারতবর্ষে মুসলমান খৃস্টান পার্শী গারো নাগা আদিবাসীও আছেন। জৈনদের কথা তুলছি নে, কারণ একমাত্র উপাসনা পদ্ধতি বাদ দিলে তাঁরা সর্বার্থে হিন্দু।

সর্বপ্রথম প্রশ্ন, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য কোন্ জায়গায়? রসের ক্ষেত্রে যে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ সে-কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি।

এখন যা বলতে যাচ্ছি, সেটি আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থেকে।

ছেলেবেলা থেকেই আরব দেশাগত দু'একটি আরব মুসলিমের জীবনযাত্রা ও চিন্তাপদ্ধতির সঙ্গে আমার পরিচয়। পরবর্তী যুগে আরব দেশে থাকবার আমার সুযোগ হয়েছিল।

এঁদের ধর্মবিশ্বাস সরল। এঁরা বিশ্বাস করেন, আল্লাতালা এই বিশ্ব মানুষের আনন্দের জন্য সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু পাছে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত লাগে তাই তিনি ধর্মের সৃষ্টি করেছেন। সেই ধর্মে কতকগুলি বস্তু ও আচরণ

আল্লা বেআইনী বলে হুকুম দিয়েছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, আল্লা-তালা হুকুম দিয়েছেন, তুমি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারো, যদি সকলকে সমান সম্মান সমান প্রেমের চোখে দেখতে পারো। না পারলে তোমার পক্ষে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা অন্যায়।

আরব ভূমি তথা অন্যান্য মুসলিম ভূখণ্ডে তাই যদি কেউ বৃদ্ধ বয়সেও পুনরায় ভার্যা গ্রহণ করে তবে তাই নিয়ে লোকনিন্দা হয় না। সমাজ ভাবে, সে একাধিক স্ত্রীকে সমান চোখে দেখতে পারবে কিনা, সে দায়িত্ব তার স্কন্ধে।

কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলমান অর্থাগম হলেই দ্বিতীয় দারা গ্রহণ করে না। তার ভিতরে কেমন যেন একটা ত্যাগের আদর্শ আছে। তার বক্তব্য, 'আল্লাতালা আমাকে এটা সেটা অনেক কিছুই উপভোগ করতে দিয়েছেন সত্য কিন্তু আমি চেষ্টা করে দেখি না, আমার এগুলো না হলে চলে কিনা?'

এ-কথা বলা আমার আদৌ উদ্দেশ্য নয় যে কোরানে ত্যাগের আদর্শ নেই। বিস্তর আছে। বস্তুত জকাৎ (বাধ্যতামূলক দান-খয়রাত) ইসলাম সৌধের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ এবং নিতান্ত দীন-দুঃখী ছাড়া সকলকেই কিছুটা দান করতে হয়। তদুপরি সুফী এবং সাধুসন্ত সম্প্রদায় তো চূড়ান্ত ত্যাগের আদর্শই বরণ করে নেন। উপস্থিত এঁদের কথা হচ্ছে না। আমার বক্তব্য ভারতীয় মুসলিম যতখানি ত্যাগের আদর্শ বরণ করেছে—সে শুধু ধনদৌলতের বেলায়ই নয়, আমোদ-আহ্লাদ পরিতোষ-আনন্দের আভ্যন্তরীণ জগতেও—অন্যান্য মুসলিম ততখানি করেনি।

এই ত্যাগের মন্ত্র ভারতবর্ষে বহুকাল ধরে প্রচলিত।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা—অর্থাৎ তাকে ত্যাগের দ্বারা ভোগ করতে হবে।

* * * *

এস্থলে ঈষৎ অবান্তর হলেও ত্যাগ সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে।

যার কিছু নেই, উপার্জন করার কোনো ক্ষমতা নেই, তার মুখে 'ত্যাগ ত্যাগ' শোভা পায় না। বিশেষত এই বিংশ শতাব্দীতে। যখন অক্ষম জন সর্বদায়িত্ব এড়িয়ে 'ত্যাগে'র অছিলা ধরে সোশাল সার্ভিসের নাম করে আশা করেন, সমাজ তাঁকে পুষবে, এবং ভালো ভাবেই পুষবে, কারণ তিনি 'সর্বস্ব' (!) 'ত্যাগ' করেছেন, তখন আমার মন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে (এরই অন্য উদাহরণে মহাত্মাজী বলেছেন – 'শক্তিহীনের ক্ষমা ক্ষমা নয়')। সোজা কথা, বিড়লা-টাটার দৌলত তাঁরাই ত্যাগ করতে পারেন,—আমি পারি নে, কারণ ও-দৌলত আমার নয়।

ওদিকে আবার উপনিষদ বলেছেন 'মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্!' অন্যের ধনের উপর লোভ করো না।

অর্থাৎ চাষা, মজুর, সাহিত্যিক, মাস্টার আপন আপন পরিশ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জন করতে পারে, অন্যের ধনের প্রতি লোভ না করেও।

সেই ধন অর্জন করে ত্যাগের মাধ্যমে তাকে উপভোগ করতে হবে।

এই আদর্শ হিন্দু-মুসলমান দুইয়েরই আছে, এবং বহু যুগ ধরে জীবনে

উপলব্ধি করেছে বলে এই দৃঢ়ভূমির উপর জাতীয় ঐক্য গঠিত হতে পারে। তাহলে আর কোনো দ্বন্দ্ব থাকবে না।

শুধু তাই নয়, তা হলে ভারতবর্ষ যে শুধু শক্তিশালী রাষ্ট্র বলেই গণ্য হবে তা নয়, সে ভদ্রতম সম্ভ্রান্ততম রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃত হবে।

ভাষা

আমার আর একটি প্রশ্ন আছে :—

এই যে লাকসমবার্গের মত ক্ষুদে রাষ্ট্র কিংবা জনবিরল ফিনল্যাণ্ড, কিংবা ঐ ধরনের ছোট-বড় নানারকমের রাষ্ট্র রয়েছে, কোন্‌খানে দেশটা সে দেশের আপন ভাষায় না চালিয়ে অন্য কোনো বিজাতীয় ভাষায় চালানো হচ্ছে?

সুইজারল্যাণ্ডের লোক তিন অঞ্চলের তিন ভাষায় কথা বলে। জর্মান, ফরাসী এবং ইতালীয়। রোমান্‌শ্‌ ভাষায় এত কম লোক কথা বলে যে সেটার কথা না হয় নাই তুললুম। এদের সকলের পক্ষে একটি ভাষা শিখে নিয়ে, সেটাকে 'রাষ্ট্রভাষা'র সম্মান দিয়ে— তা সে ভাষা দিশীই হোক আর বিদেশীই হোক—কাজ চালাতে যে বিস্তর সুবিধা হত সে বিষয়ে কি সন্দেহ? কত পয়সা খরচ করে তিন-তিনটে ভাষায় সরকারী-বেসরকারী বিস্তর জিনিস ছাপাতে হয়, তিন ভাষায় লোকে বক্তৃতা দেয় বলে পার্লামেণ্টের কাজ দ্রুতগতিতে এগোয় না, এক অঞ্চলের জিনিস অন্য অঞ্চলে বেচতে হলে তার জন্য আলাদা বিজ্ঞাপন, আলাদা এজেণ্ট রাখতে হয়, এবং আরো কত যে ঝামেলা তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু ওরা হাসিমুখে সব-কিছুই মেনে নিয়েছে।

তার কারণ মাত্র একটি, এবং সে-কারণ পৃথিবীর সর্বত্রই প্রযোজ্য।

মাতৃভাষা ছাড়া আর অন্য কোনো ভাষায় কাজ চালানো যায় না।

অবশ্য আজ যদি বাঙলা দেশ চালানোর জন্য একজন রাজা, তাঁর জন্য পঁচিশ মনসবদার এবং একটি পুরুষ্টু সৈন্যদল থাকলেই যথেষ্ট হত—তাহলে ইংরিজি হিন্দী যে-কোনো ভাষা দিয়েই অল্পায়াসেই কাজ চালিয়ে নেওয়া যেত। যেমন ধরুন একটা চা-বাগানের ইংরেজ ম্যানেজার, গুটিকয়েক কেরানীতে ইংরিজির মারফতে দিব্য কাজ চালিয়ে নেয়। কিন্তু আজ পৃথিবী অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে, আজ বাঙলা দেশের গ্রামে গ্রামে সাড়া পড়ে গিয়েছে যে রাষ্ট্রের প্রতি প্রত্যেক গ্রামবাসীর যেমন কর্তব্য আছে, তেমনি কতকগুলো হক্ক এবং দাবিও আছে। এরা প্রত্যেকেই যে শহরে এসে মন্ত্রী হতে চায় তা নয়, কিন্তু আস্তে আস্তে এদের মনে একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে গা-গতর খাটানোর পর যদি দু'মুঠো না খেতে পায় তবে রাষ্ট্র অবিচার করছে।

গণতন্ত্রের সামনে এই বড় পরীক্ষা।

এবং আমি এর উপরই সবচেয়ে বেশী জোর দিতে চাই।

গ্রামবাসীর সক্রিয়, সতেজ এবং দরদী সহযোগিতা না পেলে বাঙলার কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

কিন্তু প্রশ্ন, নেতারা, সমাজপতিরা এদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করবেন কোন্ ভাষার মাধ্যমে? ইংরিজির কথা পূর্বেই আলোচনা করেছি; এইবার হিন্দীতে আসি।

প্রথমেই একটা সাফাই গেয়ে নিই। আমি হিন্দী-প্রেমী এবং ঐ ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়। হিন্দী বাঙলার বুকের উপর চেপে বসে একদিন 'হিন্দী ইম্‌পিরিয়ালিজ্‌ম' কায়েম করবে এ দুর্ভাবনা আমার মনের কোণেও আসে না। বস্তুত স্বরাজ-লাভের পর কলকাতা তথা বাঙলা দেশে হিন্দী প্রচারের যেটুকু ব্যবস্থা হয়েছে তাতে আমি আদৌ সন্তুষ্ট নই—এর চেয়ে ঢের ব্যাপকতর চেষ্টার প্রয়োজন হবে—কিন্তু সে-কথা পরে হবে, উপস্থিত ফের গ্রামে ফিরে যাই।

গ্রামে গ্রামে পাঠশালে পাঠশালে হিন্দী শেখাতে হলে যে কতখানি রেস্তোর প্রয়োজন হবে সেটা একবার শিক্ষামন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। এ নিয়ে দীর্ঘ বাগাড়ম্বর করতে চাই নে—জিনিসটা এতই সরল এবং স্বতঃসিদ্ধ।

দ্বিতীয়ত, যে দেশের লাখের মধ্যে একজন গ্রামবাসীও আপন প্রদেশের বাইরে যায় না, তার পক্ষে ভিন্ন ভাষা শেখার প্রয়োজন নেই।

সবসুদ্ধ মিলিয়ে দেখা গেল, নেতারা তা হলে এঁদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করবেন বাঙলার মারফতেই।

কিন্তু নেতারা যদি পরিপুষ্ট হন হিন্দী চর্চা করে, তাহলে ইংরেজ আমলে যা হয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি হবে—তাঁরা জানতেন ইংরিজি, শ্রোতারা জানত বাঙলা, দুজনার চিন্তা-জগৎ, অনুভূতি ক্ষেত্র ভিন্ন। শেষটায় নেতারা যে অতি কষ্টে বাঙলা শিখে কাজ চালালেন, সে তো চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলুম।

ওদিকে ভারতীয় ঐক্য, জাতীয় সংহতি তো চাই। এই যে প্রদেশে প্রদেশে দ্বন্দ্ব, একই প্রদেশের ভিতর সংখ্যালঘুর উপর সংখ্যাগুরুর অবিচার, এ তো ক্রমাগতই বেড়ে চলছে, এর বিরুদ্ধে তো কিছু-একটা করা চাই।

এর সরল সহজ রাস্তা নেই।

ভাষা এক না করেও সংহতি হয়—যেমন সুইজারল্যাণ্ডে, বেলজিয়ামে আছে—এবং ভাষা এক হলেও সংহতি না হতে পারে—যেমন নাসের, কাসেম, মক্কার বাদশা, কুয়েতের শেখ সকলেরই ভাষা আরবী কিন্তু এদের ভিতর দ্বন্দ্ব-কলহের অন্ত নেই। এই যে এত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সংযুক্ত আরবরাষ্ট্র (UAR) করা হল তার সূতিকাগৃহ তো শ্মশান-শয্যায় পরিণত হতে চলল।

মহাত্মাজীকে এক ইংরেজ সাংবাদিক শুধিয়েছিল, 'তোমরা আপসে এত লড়ো কেন?' মহাত্মাজী বলেন, 'ইংরেজ লড়ায় বলে।' ফের প্রশ্ন—'ইংরেজ লড়তে চাইলেই তোমরা লড়ো কেন?' উত্তর হল, 'আমরা মূর্খ বলে!'

সেই হল মুখ্য কথা! আমরা মূর্খ!

এখন তো আর ইংরেজ নেই, কেউ ওস্কাচ্ছে না, আমরা তবু লড়ে মরছি!

তাহলে প্রশ্ন—এই মূর্খতা ঘুচাই কি করে?

বিদ্যাদান করে, ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত করে, রাষ্ট্রের প্রতি তার কর্তব্য সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে।

এইখানেই অধীনের সবিনয় নিবেদন—সেটি মাতৃভাষার মারফতেই করতে হবে, অন্য কোন পন্থা নেই, নেই, নেই।

ভ্যাকিউয়াম

কবি এবং বৈজ্ঞানিকে প্রায়ই বিরোধ উপস্থিত সে-কথা আমরা জানি। কবি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, 'অহো-হো! কী সুন্দর সূর্যোদয়।' বৈজ্ঞানিক গম্ভীর কণ্ঠে টিপ্পনী কাটলেন, 'হস্তীমূর্খ! সূর্যের আবার উদয়, অস্ত কি? পৃথিবীটা ঘুরে যাওয়াতে মনে হল সূর্যোদয় হয়েছে।'

কিন্তু কোনো কোনো স্থলে উভয়েই এক মত পোষণ করেন।

কবি গাইছেন,

'কে বলে সহজ, ফাঁকা যাহা তারে
সহজ কাঁধেতে সওয়া
জীবন যতই ফাঁকা হয়ে যায়
ততই কঠিন বওয়া।।'

বৈজ্ঞানিকও উচ্চকণ্ঠে বলেন, 'প্রকৃতি শূন্যতাকে ঘৃণা করে'—

'নেচার এবরজ ভ্যাকিউয়াম।'

ধর্মের উচ্ছেদ যাঁরাই কামনা করেন তাঁরাই এ তত্ত্বটি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারেন। প্রাচীন যুগের চার্বাকপন্থী বা তার পরবর্তী যুগের মক্কার কাফির-দের কথা হচ্ছে না। এ যুগের কথা বললেই এ যুগের লোক সাড়া দেয়। এ যুগে ধর্মের প্রধান শত্রু টোটেলিটেরিয়ান স্টেট, একচ্ছত্র রাষ্ট্র—'জগদ্দল রাষ্ট্র' বললে জিনিসটা আরো পরিষ্কার হয়। তা সে রাষ্ট্র ফাসিস্টই হোক আর কম্যুনিস্টই হোক।

হিটলার বা স্তালিনের ভাবখানা অনেকটা এই: 'কী! আমার রাষ্ট্রে আমি ভিন্ন অন্য কার মুরদ যে আমার কথার উপর কথা কইতে যাবে? আপন রাষ্ট্রের প্রতি, ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি—অবশ্য আখেরে সেটাও আমি দখল করবো—তোমার আচরণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, কলা-দর্শনে তোমার আদর্শ ঠিক করে দেব আমি।' এ যেন বাইবেল বর্ণিত যেহোভার তীব্র তীক্ষ্ণ আদেশ, 'আমা ভিন্ন তোর অন্য কোনো উপাস্য দেবতা থাকবে না।'

এর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ উঠলো সেটা প্রধানতঃ ধর্ম নামক প্রতিষ্ঠান থেকে। শিল্পী-দার্শনিকের সে রকম কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। আর বৈজ্ঞানিক অর্থনৈতিক পণ্ডিতেরা জীবনদর্শন চিন্তা করেন কমই। গবেষণার ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা পেলেই তাঁরা সন্তুষ্ট। আইন-আদালত নিয়ে যাঁদের কারবার তাঁরা গোড়ার দিকে কিছুটা আপত্তি জানান বটে, কিন্তু দেশের ডিক্টেটর একবার জোর করে, ভয় দেখিয়ে, যে করেই হোক—যদি 'আইনত' পাস করিয়ে নিতে

পারেন যে তিনিই সর্ব আইনের মূলাধার, তা হলে এদের আর আইনত কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। মিলিটারির বেলাও হুবহু তাই। ডিক্টেটর যখন দেশের সর্বোচ্চ সামরিক উর্দি পরে তাঁর সেনাবাহিনীর সামনে এসে দাঁড়ান তখনই সেনানায়করা শপথ নেন যে তাঁর কোন আদেশ তাঁরা ভঙ্গ করবেন না। সকলেই জানেন, হিটলারকে নিধন করার জন্য বড় বড় সেনাপতিরা যখন ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন তখন তাঁদের প্রধান অন্তরায় ছিল এই শপথ।

শেষ পর্যন্ত যখন অকথ্য অত্যাচার, নির্যাতনের ফলে ধর্ম ভূগর্ভে আশ্রয় নেয়, তখন ধর্মবৈরী ডিক্টেটররা সম্মুখীন হয় পূর্ববর্ণিত ঐ 'ভ্যাকিউয়ামে'র সম্মুখে। এতদিন ধরে ধর্ম মানুষের জীবনে বৃহৎ এক অংশ জুড়ে বসে ছিল, এখন ধর্ম চলে যাওয়াতে সে জায়গাটা যে ফাঁকা হয়ে গেল সেটা পূর্ণ করা যায় কি প্রকারে?

হিন্দুর ধর্মজীবনে বাধ্যবাধকতা অত্যল্প (তাও ব্রাহ্মণের); তার বাধ্য-বাধকতা সামাজিক জীবনে। মুসলমান এবং খৃষ্টানের ঠিক তার উল্টোটা। তারা সমাজে স্বাধীন, কিন্তু ধর্মে প্রচুর বাধ্যবাধকতা।[১] ডিক্টেটর বনাম ধর্মে যে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয় এবং এখনো চলেছে, সেটা প্রধানতঃ খৃষ্টান দেশেই সীমাবদ্ধ বলে আমরা সেইটে নিয়ে আলোচনা করব। তবে এ দেশের হিন্দু পাঠকেরা খৃষ্টধর্মের চেয়ে ইসলামের সঙ্গে বেশী পরিচিত বলে তার থেকেও কিছু কিছু দৃষ্টান্ত নেব।

খৃষ্টধর্ম ও ইসলামের সর্বপ্রথম মূল সিদ্ধান্ত—ইমান। অর্থাৎ তোমার বিশ্বাস—faith কি? তুমি যদি বলো, ঈশ্বর নেই—জৈন ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা যে রকম বলে,—কিংবা বলো, ঈশ্বর আছেন বটে কিন্তু দেবদেবীও আছেন অসংখ্য কিংবা বলো যীশুতে বিশ্বাস না করেও মোক্ষলাভ সম্ভবে—তা হলে তুমি শুধু পাপী না, তুমি অখৃষ্টান (খৃষ্টান দৃষ্টিবিন্দু থেকে 'কাফির') হয়ে গেলে। ডিক্টেটররা এ সবেতে যে খুব বেশী আপত্তি করেন তা নয়, তাঁদের আপত্তি, তুমি যখন বলো, কর্তব্য নির্ধারণার্থে তুমি ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের উপর নির্ভর করো, তখনই তাদের আপত্তি। হিটলার স্তালিন বলেন, তোমার কর্তব্য নির্ধারণ করে দেব আমি। বাইবেল কুসংস্কারাচ্ছাদিত, বুর্জুয়ানির্মিত, প্রলে-তারিয়া-শোষক গ্রন্থ। আসল কেতাব 'মাইন কাম্‌পফ' কিংবা 'ডাস্‌ কাপিটাল'। বিশ্বাসী খৃষ্টান যে রকম স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন না, যীশু কোনো ভুল করে থাকতে পারেন, বিশ্বাসী কম্যুনিস্ট ঠিক তেমনি কিছুতেই স্বীকার করবেন না, মার্ক্স-লেনিন প্রচারিত ডাইলেক্টিক্যাল ম্যেটিরিয়ালিজ্‌মে কোনো ত্রুটি-

---

১ স্বামী বিবেকানন্দ তাই আমেরিকা থেকে তাঁর শিষ্যদের একাধিক চিঠিতে লেখেন, হিন্দুর ধর্ম ও খৃষ্টানদের সমাজ নিয়ে নূতন হিন্দু-জীবন গড়তে হবে। বঙ্কিমও এই ধরনের মন্তব্য করেছেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে বহু-বিবাহনিরোধ ব্যাপারে বলেছেন, এ জিনিস খারাপ, ধর্ম দিয়ে প্রমাণ করেই বা লাভ কি? হিন্দু চলে সামাজিক লোকাচার মেনে।

বিচ্যুতি থাকতে পারে।

কিন্তু এই ইমান বা faith ভিতরকার জিনিস—ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। ইমান চলে গিয়ে ভ্যাকিউয়াম সৃষ্ট হল কিনা, হলপ করে কিছু বলা যায় না।

আসল শিরঃপীড়া ধর্মের ক্রিয়াকর্ম নিয়ে। সেখানে যে ভ্যাকিউয়াম তৈরি হয় সেটা ভরাট করা যাবে কি দিয়ে?

আবালবৃদ্ধ নরনারী যায় রবিবারে চার্চে। বুড়োরা যাক্—মরুক গে, কিন্তু জোয়ানদের নিয়ে করা যায় কি? ঠিক ঐ সময়েই লাগিয়ে দাও—কুচকাওয়াজ, মার্চ। হিটলার-পন্থীরা দাঁড়াও চক্রাকারে। নেতা মাঝখানে দাঁড়িয়ে তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করবে 'হাইল (জয়তু!)!' জোয়ানরা সমস্বরে তীব্রতর কণ্ঠে উত্তর দেবে—'হিটলার!' ফের 'হাইল!' ফের 'হিটলার!' ফের 'হাইল!' ইত্যাদি। টকটকে লাল মুখ যতক্ষণ না নীল হয়ে যায়। গির্জাতেও তো ঐ রকমই হয়। পাদ্রীসাহেব মন্ত্রোচ্চারণ করেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে, বিশ্বাসীরা উত্তর দেন দুই-চারিটি শব্দে কিংবা শুধু 'আমেন' (তথাস্তু) বলে।

ক্রিসমাস, ঈস্টারের উপাসনা জবর ভারী রকমের। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পার্টি-ডে ন্যুরনবের্গে। সপ্তাহব্যাপী মোচ্ছব! ঝাড়া চারটি ঘণ্টা হিটলার দক্ষিণ বাহু উত্তোলিত প্রসারিত করে দাঁড়ালেন বেদী—থুড়ি—প্ল্যাটফর্মের উপর। বিশ্বাসী দল ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁর সামনে দিয়ে মার্চপাস্ট করলেন। কী উত্তেজনা, কী উৎসাহ! বিদেশাগত 'কাফির' (অর্থাৎ এখনো যে নাৎসী-ধর্ম গ্রহণ করেনি) তো বে-এক্তেয়ার—ইস্তেক জর্মনীর দুশমন ইংরেজের রাষ্ট্রদূত হেন্ডারসন। অবশ্য পাঁড় কাফির এসব পরবে আসে না—যেমন ফরাসী রাষ্ট্রদূত মসিয়ে ফ্রাঁসোয়া পঁসে। তিনি ফাঁড়া এড়াবার জন্য ঐ সময় ছুটি নিয়ে চলে যেতেন স্বদেশে, জমিদারী তদারক করতে।...রুশ দেশেও এসব 'পরব' হয়।

ধর্মের আরেক অঙ্গ কৃচ্ছ্রসাধন—উপবাস। প্রবর্তিত হল 'আইন-টপ্‌ফ্—গরিস্ট'। সপ্তাহে একদিন খাবে শুধু এক পদের খানা। মাংস আলু, ফুলকপি, চর্বি সবসুদ্ধ মিলিয়ে ঘ্যাঁট। 'অর দ্যভ্‌র' দিয়ে আরম্ভ করে 'সেভরি' পর্যন্ত অষ্টাদশপদী খানা মানা। (কিন্তু বিপদে পড়লে আমরা, ধর্মভীরুজনও, 'ডুবে ডুবে জল খাই', ঠিক তেমনি প্রচুর নাৎসী প্রেসার কুকারের মত একটি পাত্রে তিন খোপে তিন রকমের খাদ্য রান্না করে খেল—কারণ বলা হয়েছে, 'আইন টপ্‌ফ্'—অর্থাৎ 'এক হাঁড়িতে' রান্না খাদ্য—এক হাঁড়িতেই তো রান্না হয়েছে, আপত্তি আর কি?) হিটলারের কর্তাভজা শিষ্য পার্টি সেক্রেটারি আরেক কাঠি সরেস। হিটলার 'মীটলেস্', তিনি 'কাটলেস্'। অর্থাৎ নিরামিষাশী হিটলারের সঙ্গে নিরামিষ ঘ্যাঁট খেয়ে হুজুরের সম্মুখে 'ধর্মরক্ষা' করে আপন ঘরে গিয়ে খেতেন তিনখানা শুয়োরের 'কাটলেস্' (কটলেট্)।

খৃস্টান যায় জেরুজালেমে যীশুর কবর দেখতে, মুসলমান যায় পীরের দর্গা জিয়ারৎ করতে, বৌদ্ধ যায় তথাগতের অস্থিদন্তের আধার দেখতে—(হিন্দুর ও বিষয়ে কিঞ্চিৎ অসুবিধা, কারণ সে মৃতদেহ দাহ করে) এসব

তীর্থযাত্রায় প্রচুর পুণ্য।

এদের সবাই হার মানে রুশের কাছে। হাজার হাজার নরনারী নাকি দুরন্ত শীতে রেড স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে থাকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা—লেনিন-স্তালিনের 'মামি' দেখবে বলে। আর 'মামি' যে কাস্কেট্ বা গোরস্তানের চেয়ে হৃদয়মনের উপর বেশী দাগ কাটবে তাতে কি সন্দেহ?

এ বিষয়ে কম্যুনিস্টরা আমাদের হারিয়েছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্তত আরেকটি রিচুয়ালে তারা সর্বাগ্রণী ঃ—

ক্যাথলিক যারা তারা পাদ্রীর সামনে আপন পাপ স্বীকার করে (কন্‌ফেশন), জৈন-বৌদ্ধ বর্ষশেষের পর্যুষণে আপন আপন দুষ্কৃতি স্বীকার করে, মুসলমান সর্বজনসমক্ষে আল্লার কাছে তওবা করে ক্ষমা চায়।

রুশদেশের দেশদ্রোহীরা ধরা পড়লে এই কনফেশনের ধুন্দুমার লেগে যায়। কে কত বেশী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাই নিয়ে লেগে যায় কাড়াকাড়ি। সবাই সমস্বরে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে চিৎকার করে, 'না না, আমি সবচেয়ে পাপী, আমি সর্বনিকৃষ্ট।'

এ সম্বন্ধে একটা চুটকিলাও হালে শুনেছি, রুশ প্রত্যাগত জনৈক বাঙ্গালীর কাছ থেকে।

আর পাঁচটা দেশের মত রুশও পণ্ডিতগোষ্ঠী পাঠালে মিশরে প্রত্নতত্ত্বের চর্চা করতে। খুঁড়তে খুঁড়তে তাঁরা একটা 'মামি' পেয়ে গেলেন। খ্রুশ্চফ খুশী হয়ে শুধোলেন, 'ওটা কত দিনের পুরনো?' পণ্ডিতেরা নিরুত্তর। খ্রুশ্চফ শাসালেন, 'চব্বিশ ঘণ্টা ম্যাদ। উত্তর না দিতে পারলে সাইবেরিয়া।' পরদিন সব পণ্ডিত ম্যাদ-শেষের পূর্বেই হাজির। চোখেমুখে খুশী উপচে পড়ছে। খ্রুশ্চফ বললেন, 'হুঁ?' পণ্ডিতেরা সমস্বরে ঃ 'চার হাজার দু'শ বৎসর।' 'বেশ, কি করে জানলে?' পণ্ডিতেরা ঐক্যতানে, 'মামি স্বীকার করেছে (কন্‌ফেশন)।'

* * *

এরকম প্রচুর উদাহরণ আমি টায়-টায়, দফে দফে, প্রো ফর্মা দিতে পারি। কিন্তু রচনাটি ইতিমধ্যেই, আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় বেসামাল হয়ে গিয়েছে।

সর্বশেষে নিবেদন ঃ

'হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা যেন মনে না করেন, আমি ঐসব ধর্মের কর্মকাণ্ড (রিচুয়ালের) এবং নাৎসী-কম্যুনিস্টদের কর্মকাণ্ড সব কটাকে একই মূল্য দিই। কম্যুনিস্টরাও যেন বিরক্ত না হন যে আমি তাঁদের 'বিজ্ঞানসম্মত' 'র‍্যাশনাল' কর্মকাণ্ড 'ধর্মের আফিঙে' মাখানো কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে তাদের প্রতি অবিচার করেছি। আমি শুধু প্যারালেল দেখিয়েছি।

এস্থলে সেই ফরাসী প্রবাদবাক্য স্মরণ করি ঃ—'প্লু সা শাঁজ, প্লু সে লা মেম শোজ্।' 'যতই সে বদলায়, ততই তাকে আগের মত দেখায়।'

কিন্তু এহ বাহ্য।

ধর্ম তবে কি?

ধর্ম

প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে, আজকের দিনে ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় কে, ওটার কী-ই বা প্রয়োজন ? প্রশ্নটির ভিতর অনেকখানি সত্য লুকানো আছে।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ধর্ম তাঁর রাজত্ব ভাগ-বাঁটোয়ারা করে প্রতিদিনই ভিন্ন ভিন্ন রাজপুত্রকে বিলিয়ে দিচ্ছেন। একদা গঙ্গাস্নান পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হত বলে সেটি ধর্মের আদেশ রূপে মেনে নেওয়া হত, কিংবা বলা যায়, ধর্মের আদেশ বলে সেটি পুণ্য বলে বিবেচিত হত। এখন সেটা ডাক্তারই "স্ট্রংলি রেকমেন্ড" করেন, এবং অধুনা বিজ্ঞানও নাকি সপ্রমাণ করেছে, গঙ্গাজলে কতকগুলো বিশেষ গুণ আছে যেগুলো অন্য জলে নেই। ধর্ম এখানে বৈদ্যের হাতে এ পুণ্যকর্ম করার আদেশ ছেড়ে দিয়েছেন, কিংবা বলা যায়, বৈদ্য সেটা কেড়ে নিয়েছে। আর কিছুটা কেড়ে নিয়েছে ম্যুনিসিপ্যালিটি—কোনো কোনো দেশে ম্যুনিসিপ্যালিটিই ফরম্যান জারি করে, বাড়ি বানাবার সময় প্রতি কখানা ঘর পিছু একটি বাথরুম রাখতেই হবে। না হলে প্ল্যান মঞ্জুর হবে না। আহারাদিতেও তাই। ডাক্তারই বলে দেয় কোন্‌টা খাবে, কোন্‌টা খাবে না—অর্থাৎ কোন্‌টাতে পুণ্য আর কোন্‌টাতে পাপ। এবং আকছারই তিনি ধর্মের বিরুদ্ধে অনুশাসন দেন। যেমন খেতে বলেন চিকেন-সুপ—হিন্দুধর্মে, অন্তত বাঙলা দেশের হিন্দুধর্মে সেটা পাপ।

দান করা মহাপুণ্য। ধর্মের সনাতন আদেশ। কিন্তু আজকের দিনে আপনি আমি এ-অনুশাসন মেনে চলি আর নাই চলি, সরকার কান পকড়কে তার ইনকাম এবং অন্যান্য বহুবিধ ট্যাক্স তুলে নেবেই নেবে এবং সভ্যদেশে তার অধিকাংশই ব্যয় হয় দীন-দরিদ্রের জন্য। (আজ যে মুরারজীভাই দিবারাত্র, "অস্তি নাস্তি ন জানাতি দেহি দেহি পুনঃপুনঃ" করছেন তাতে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু তিনি যদি সে পয়সা দু হাতে খরচা করে যুদ্ধের জন্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বাড়ান—সঙ্গে সঙ্গে বেকার-সমস্যা অনেকখানি ঘুচবে, বেকার-সমস্যা ঘুচলো বলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে—তিনি যদি কঞ্জুষি করেন, তবেই হবে আমাদের চরম বিপদ—কিন্তু এটা অর্থনীতির একটা উৎকট সমস্যা এবং হিটলারই সর্বপ্রথম এর সমাধান করেন দু হাতে পয়সা খরচ করে ; পক্ষান্তরে অন্যান্য দেশের প্রাচীন-পন্থী অর্থমন্ত্রীরা তখন দেশের দুরবস্থা দেখে আকুল হয়ে, পাছে ভবিষ্যতে আরো কোনো নূতন বিপদে পড়তে হয় সেই ভয়ে সরকারের খরচা প্রাণপণ কমিয়ে "রিজার্ভ ফান্ড" নামক দানবের ভুঁড়ি মোটার চেয়ে মোটা করতে থাকেন। তাদের দেখাদেখি ব্যাংকার সাহুকাররাও ক্রেডিট দেওয়া বন্ধ করে কিংবা কমিয়ে দেয়। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য আরো কমতে থাকে এবং সৃষ্ট হয় "দুষ্টচক্র"—ভিশাস্ সারকল। সরকার ব্যাংকার টাকা দেয় না বলে দেশের উৎপাদন শক্তি বাড়ে না, আর দেশের উৎপাদন শক্তি

বাড়ে না বলে সরকার খাজনা ট্যাক্সো পায় আরো কম এবং তারস্বরে চিৎকার করে, "আরো ছাঁটাই করো, আরো ছাঁটাই করো।")[১]

এই পরিস্থিতি হতে পারে বলেই ধর্ম প্রাচীন দিনে তার একটা ব্যবস্থা করেছিল।

দোল-দুর্গোৎসবে দান। এতে মহাপুণ্য।

বহুকাল পূর্বে আমি বাচ্চাদের মাসিকে একটি অনুপম প্রবন্ধ পড়ি। অসাধারণ এক পণ্ডিত সেই প্রবন্ধ লিখেছিলেন। দুর্গোৎসবের সময় প্রতিমা নির্মাণ থেকে আরম্ভ করে জমিদারকে অন্ন, বস্ত্র, ছত্র, তৈজসাদি, পাদুকা, খটব, অলঙ্কার—দুনিয়ার কুল্লে জিনিস দান করতে হত। এতে করে চাষা, জোলা, ছাতাবানানেওলা, কাঁসারি, কামার, মুচি, মিস্ত্রি—বস্তুত গ্রামের যাবতীয় কুটির-শিল্প এক ধাক্কায় বহু-বিস্তর বিক্রি করে রীতিমত সচ্ছল হয়ে যেত। শুধু তাই নয়, কাঁসারি দু পয়সা পেত বলে সে ছাতা কিনত, ছাতাওয়ালার চার পয়সা হল বলে সে শাঁখা কিনত—ইত্যাদি ইত্যাদি, আদ্ ইনফিনিতুম্। এবারে আর "নষ্টচক্র" বা "ভিশাস সারক্ল" নয়—এখন যাকে বলে স্পায়ারেল মুভমেণ্ট—"চক্রাকারে স্বর্গ-বাগে!"

তারপর লেখক দুঃখ করেছিলেন, আজ যদি বা জমিদার পুণ্য-সঞ্চয়ার্থে পূর্ববর্ণিত সর্বদানই যথারীতি করেন তবু মূল উদ্দেশ্য সফল হয় না। বস্ত্র এসেছে বিলেত থেকে (তখনকার দিনে দিশী কাপড় অল্পই পাওয়া যেত), ছত্র রেলি ব্রাদার্সের, বাসনকোসন অ্যালুমিনিয়ামের এবং অন্যান্য আর সব জিনিসের পনেরো আনা এসেছে হয় বিদেশ থেকে, নয় দেশেরই বড় বড় শহর থেকে (শাঁখা জাতীয় মাত্র দু-একটি জিনিস আপন গ্রামের কিংবা গ্রামের বাইরের কুটিরশিল্প থেকে)। মোদ্দা মারাত্মক কথা—জমিদারের গ্রাম এবং/কিংবা আর পাঁচখানা গ্রাম নিয়ে যে অর্থনৈতিক স্বাধীনগোষ্ঠী (ইউনিট) সে কোনো সাহায্যই পেল না। আখেরে দেখা যাবে কোনো কুটিরশিল্পই ফায়দা-দার হল না, হল শিল্পপতিরা—দিশী এবং বিদেশী।

---

১ এ রকম ক্রাইসিসের সময় আরো একটা মজার ব্যাপার ঘটে। ঐ সময় বড় বড় প্রাচীন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যখন ব্যাঙ্কের কাছে আরো ক্রেডিট চায় তখন ব্যাঙ্ক ভাবে, "এদের বিস্তর টাকা দিয়েছি—আর কত দেব? এত কালের বড় ব্যবসা—নিশ্চয়ই টিকে যাবে।" ব্যাঙ্কার তখন ছোট ব্যবসাকে টাকা দেয়, পাছে তারা দেউলে হয়ে যায়, এবং ব্যাঙ্কের আগের দেওয়া সব টাকা মারা যায়। ফলে বিপদ কাটার পর দেখা যায় অনেক প্রাচীন, খানদানী ব্যবসা দেউলে হয়ে গিয়েছে, আর ছোট ব্যবসাগুলো টিকে গেছে। অবশ্য এর একটা নৈসর্গিক—অতএব দুর্বোধ্য—কারণও থাকতে পারে। মহামারীতে বাড়ির রোগা-পটকাটাই যে মরে এমন কোনো কথা নয়। অনেক সময় তাগড়াটাই মরে। হয়তো মা রোগা-পটকাটারই যত্ন বেশী করেছিল বলে! ব্যাঙ্কার বড় ব্যবসাকে যে রকম যত্ন না করে করেছিল ছোটটার!

এবং লাওৎসে বলেছেন—অবশ্য বর্তমান চীনা সরকার সেটা মানে না—যখনই দেখতে পাবে বড় শহরে বড় বড় ইমারত তখনই বুঝতে হবে, এগুলো গ্রামকে শুষে রক্তসঞ্চয় করেছে। পতন অনিবার্য।

ধর্ম এখন পুণ্যের দোহাই দিয়ে দানের কথা জমিদারের সামনে তোলে না—আর জমিদারকে সে পাবেই বা কোথায়? হয়তো তিনি শহরে থাকেন, কিংবা সরকারের নূতন নীতির ফলে লোপ পেয়েছেন। তা সে যাই হোক, এ কথা তো ভুললে চলবে না, দান মাত্রই দান, "পেরসে", পুণ্য নয়। গ্রাম পোড়াবার জন্য কেউ যদি দেশালাই চায় তবে আমি তো তাকে দেশালাই দান করে পুণ্যসঞ্চয় করি নে!

শিল্পের উন্নতির জন্য অর্থব্যয় করলেই যে দান হত তা নয়। জামি মসজিদ নির্মাণ করে শাহ্-জাহান নিশ্চয়ই পুণ্যসঞ্চয় করেছিলেন, কিন্তু তাজ বানাতে—অর্থাৎ খাসপেয়ারা বেগম সাহেবের জন্য গোর বানাতে—কোনো পুণ্য আছে বলে ইসলাম ফতোয়া দেয় না। তাই বোধ হয় পাশে মসজিদ বানিয়ে দিয়ে একটুখানি পুণ্যের ছোঁয়াচ লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

শুধু যে রাজা-বাদশা-জমিদারই এ সব পুণ্যকর্ম করতেন তাই নয়। বছর কুড়ি পূর্বে আমি মোটর-বাসে করে সিলেট থেকে সুনামগঞ্জ যাওয়ার পথে "পাগলা" গ্রামের কাছে এসে দেখি এক বিরাট মসজিদ। ড্রাইভার বললে, এক জেলে হাওর-বিলের ইজারা নিয়ে বিস্তর পয়সা জমানোর পর এ মসজিদ গড়িয়েছে।[২]

এই বীরভূমে যে শান্তিনিকেতন গড়ে উঠেছে তার পরোক্ষ কারণে কিছুটা পুণ্য কিছুটা স্বার্থ আছে। মহর্ষিদেব এখানে আশ্রম গড়ার সময় সর্বপ্রথম জলের চিন্তা করেছিলেন। কুয়ো তো খোঁড়াবেন, সে তো পাকা কথা, কিন্তু যদি সেটা শুকিয়ে যায়? শান্তিনিকেতনের অতি কাছে ভুবনডাঙা। রাইপুরের জমিদারবাবু ভুবনমোহন সিংহ সেখানে খাদের মাটি খনন করে নীচু জমির উপরে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি উঁচু বাঁধ (দীঘি) পূর্বেই তৈরী করে দিয়েছিলেন। (মতান্তরে এটি রাইপুরের ঘোষালদের—এরা সিংহ পরিবারের পুরোহিত—ব্রহ্মত্র ছিল।) এই পুণ্য-স্বার্থে মেশানো বাঁধের উপর ভরসা

---

২ ঈষৎ অবান্তর হলেও এই নিয়ে একটি সমস্যার কথা তুলি। রোজার মাসে অসুস্থ ছিল বলে একজন লোক উপবাস করতে পারেনি। এখন ঈদ পরবের পর সে রোজা রাখতে যাবে, এমন সময় সে মসজিদ (কিংবা কুয়ো, কিংবা পান্থশালা—এ সবকে "সবীল-আল্লা" "ঐশ মার্গ", 'যে পথ আল্লার দিকে নিয়ে যায়' বলা হয়) বানাতে চাইলে। তখন প্রশ্ন, সে উপবাস করা মুলতুবী রেখে মসজিদ বানাবে কি না? ভারতের মুসলমান যে "মানবধর্মশাস্ত্র" মানেন তাঁর মতে, রোজা পরে রাখবে। এ অনুশাসন যিনি দিয়েছেন, তিনি আসলে ইরানী।

রেখে মহর্ষিদেব এখানে আশ্রম গড়েন।[৩]

এখন আর কেউ বাঁধের জন্য ধর্মের দোহাই দেয় না। এখন অন্য পন্থা। গত নির্বাচনের সময় এই বীরভূমেরই একটি গ্রাম তিনজন প্রার্থীকে বলে, সরকারের সাহায্যে বা অন্য যে কোনো পন্থায় যে প্রার্থী তাদের গ্রামে ছটি টিউবওয়েল করে দেবে তাকে তারা একজোটে দেবে ভোট!

ভাবি, কোন্ শ্রাদ্ধের—না, কোন্ বাঁধের জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়! ধর্ম তারই সঙ্গে ভেসে যায়।

ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা

শুধু এ-দেশে নয়, সব দেশেই ধর্ম তার তালুক-মুলুক হারায় যখন তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যায়। আসলে কিন্তু 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটা তার প্রকৃত পরিচয় বাতলায় না। ধর্মনিরপেক্ষ আমরা 'সেকুলার' শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ হিসাবে নিয়েছি, এবং সেই সেকুলার শব্দের অন্য অর্থ 'প্রোফেন'—'হিরেটিক্যাল'ও বলা যেতে পারে। অর্থাৎ সেকুলার শিক্ষাপদ্ধতি ধর্মবৈরী এমন কি ধর্মঘ্নও হতে পারে।

কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যায়তন ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে না। করলে বরঞ্চ ভালো হত। ধর্ম তাহলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো বা জিতে যেত। কিন্তু সে সুযোগ ধর্ম পায় না—তার জয়াশা অতি অত্যল্প হলেও। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, সে ধর্মকে তাচ্ছিল্য করে, অবহেলা করে, এমন কি তার অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করে না। তার ভাবখানা অনেকটা এই ঃ—ধর্ম বাদ দিয়ে যদি শিক্ষাদীক্ষা সব কিছুই হয়, ছাত্রেরা পরীক্ষা পাসের পর যদি কাজকর্ম করে দু'পয়সা কামাতে পারে—তবে ধর্ম অপ্রয়োজনীয় অবান্তর।

এক ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিক যখন আঁক কষে ম্যাপ এঁকে বুঝিয়ে দিলেন সৌরজগৎটা কি ভাবে চলে তখন কে এক ধার্মিকজন শুধালে, 'কিন্তু তোমার সিস্টেমে তো ভগবান নেই।'—উত্তরে বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন, 'ওঁকে বাদ দিয়েই যখন সিস্টেমটা নিটোল ত্রুটিহীন, তখন তাঁকে লাগাবার কি প্রয়োজন?' কিন্তু ঐ বৈজ্ঞানিকটি ব্যক্তিগত জীবনে কিঞ্চিৎ ধর্মভীরু ছিলেন বলে আস্তে আস্তে যোগ করলেন, 'কিন্তু দরকার হলে তাঁকে টেনে আনতাম বইকি।' সে দরকার অদ্যাবধি হয়নি। সেকুলার শিক্ষাপদ্ধতি ধর্মের সেই কাল্পনিক প্রয়োজনীয়তাটুকু স্বীকার করে না।

বেদের বড় বড় দেবতা ইন্দ্র বরুণ, এঁরা যে লোপ পেলেন তার কারণ এ নয় যে কোনো বিশেষ যুগে এঁদের অস্তিত্ব অস্বীকার করে ধর্ম-সংস্কারকগণ জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। আসলে মানুষ আস্তে আস্তে দেখতে পেল, প্রকৃতি তার

৩ অঘোর চট্টোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন আশ্রম, পৃঃ ৯ ও পরবর্তী।

নিয়ম অনুযায়ী চলছে। বৃষ্টি-বর্ষণ, ফসল উৎপাদন, গোধনবৃদ্ধি ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজন এঁদের না ডেকেও সমাধান হয়। তবে বিশ্বাসীজনের কথা স্বতন্ত্র। দীর্ঘদিনব্যাপী অনাবৃষ্টি হলে এখনো তাঁরা হোমযজ্ঞাদি করে থাকেন, বিশ্বাসী মুসলমান এখনো মোকদ্দমা জেতার জন্য মৌলাআলীর দর্গায় গিয়ে ধর্না দেয়।[১] ভলটেয়ারকে কে যেন শুধিয়েছিল, 'মন্ত্রোচ্চারণ করে এক পাল ভেড়া মারা যায় কি না?' তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'অবশ্যই যায়। তবে প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিক খাইয়ে দিলে সন্দেহের আর কোনো অবকাশই থাকে না।'

তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, ইন্দ্র বরুণ চলে যাওয়ার পরে কালী হনুমান এলেন কি করে? কুরান হদীসে যখন স্পষ্ট লেখা রয়েছে, আল্লা মানুষকে তার ন্যায্য হক্কাহক্ক (হক্+না+হক্, অ+হক্) ইন্সাফের সঙ্গে বিতরণ করেন, মধ্যস্থতা করার জন্য উকিল ধরে কোনো লাভ নেই, তখন মানুষ নৌকা ছাড়ার পূর্বে বদরপীর কিংবা পুত্রলাভের জন্য সোনা গাজীর শরণাপন্ন হয় কেন?

উত্তরে পণ্ডিতেরা বলেন, অনার্যদের স্বধর্মে আকর্ষণ করার জন্য আর্যরা অনার্যদের অনেক দেবদেবীকে আপন ধর্মে স্থান করে দেন। অনার্যরা অনুন্নত। তারা ঐসব দেবীর সহায়তায় তখনো বিশ্বাস করে। যারা করে করুক, ক্ষতিটা কি? বদর পীর মৌলাআলীর বেলাও তাই। এবং সবচেয়ে মোক্ষম 'যুক্তি'—পুরুত মোল্লাদেরও তো খেয়ে বাঁচতে হবে। পরমে ব্রহ্মণি যোজিত চিত্তঃ তো আর পূজাপাটা করেন না, আল্লাকে যে-সাধক নূর বা জ্যোতিরূপে অনুভব করে আপন ক্ষীণ জ্যোতি-শিখা তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন—'কোণের প্রদীপ মিলায় যথা জ্যোতিঃসমুদ্রেই'—তিনি তো আর মোল্লা ডেকে শীর্ণি চড়ান না। তাই ঘেঁটু-মনসা মৌলাআলী সোনা গাজীর দরকার। সত্যপীর তো আরো শহর-পসন্দ, জনপদবল্লভ—উভয় ধর্মেরই বিশ্বাসীজনকে পাওয়া যায়। মোল্লা পুরুত দুজনারই সুবিধা।

সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে, এস্থলে আরেকটি প্রশ্ন তুলি। তবে কি আজ আর বেদাধ্যয়নের কোনো প্রয়োজন নেই? অবশ্যই আছে। ঋষি কবিরূপে বেদে যে মধুর এবং ওজস্বিনী ভাষায় তাঁর উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন সেটি বড়ই মূল্যবান। বুদ্ধি দিয়ে যেটা বুঝেছি সেইটে কবির্মনীষীর প্রসাদাৎ তখন হৃদয় দিয়ে অনুভব করে সম্যক অনুপ্রাণিত হই। অনুভূতির হৃদয়াবেগ তখন ধ্যানলোকে অগ্রসর হওয়ার শক্তি সঞ্চারিত করে।

---

১ দক্ষিণ মিশরে ক্রমাগত কয়েক বৎসর বৃষ্টি না হওয়াতে একবার বিশেষ প্রার্থনার ব্যবস্থা করা হয়। শহরের কাজী (চীফ জাস্টিস) সে নামাজের ইমাম (প্রধান) হবেন। ইনি ছিলেন মারাত্মক ঘুষখোর। নামাজে যাবার পথে হঠাৎ বৃষ্টি নামলো। কাজী যখন আল্লাকে শুকরীয়া (ধন্যবাদ) জানাবার জন্য মিম্বরে (পুল্‌পিটে) উঠলেন তখনই, সঙ্গে সঙ্গে, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। টীকাকার বলছেন, 'টিটকারির ভয়ে কাজী মসজিদের পিছনের দরজা দিয়ে পালালেন।'

এরই তুলনায়—যদিও এর চেয়ে অনেক নিম্নস্তরের—একটি উদাহরণ দিই। তিক্ত অভিজ্ঞতার পর বুদ্ধি দিয়ে বুঝলুম, দুরাশা করে শুধু বঞ্চিত হতে হয়। তখন যদি কেউ এসে আবৃত্তি করে—

'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়, তাই ভাবি মনে।'

তখন কেমন যেন সেই নিরাশার মাঝখানেও অনেকখানি সান্ত্বনা লাভ করি।

ফ্রান্স যখন অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য দৃঢ়সংকল্প, তখন 'মার্সে ইয়েজ' গীতি কী অভূতপূর্ব অনুপ্রেরণাই না তাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করেছিল!

অনেকখানি দাগা খাওয়ার পর যখন মাইকেল 'আশার ছলনা'র কথা ভাবছেন তখন যদি কুরান শরীফের 'উষস্' সুরা পড়তেন তবে কি অনেকখানি সান্ত্বনা পেতেন না?

৯৩ অধ্যায়
উষস্
(অদ্—দুহা)
মক্কায় অবতীর্ণ
(একাদশ পংক্তি)

আল্লার নামে আরম্ভ—তিনি করুণাময়, দয়ালু।

উষালগনের আলোর দোহাই,
নিশির দোহাই ওরে,
প্রভু তোরে ছেড়ে যাননি কখনো
ঘৃণা না করেন তোরে।
অতীতের চেয়ে নিশ্চয় ভালো
রয়েছে ভবিষ্যৎ
একদিন তুই হবি খুশী লভি
তাঁর কৃপা সুমহৎ।
অসহায় যবে আসিলি জগতে
তিনি দিয়েছেন ঠাঁই
তৃষ্ণা ও ক্ষুধা দুঃখ যা ছিল
মুছায়ে দেছেন তাই।
পথ ভুলেছিলি তিনিই সুপথ
দেখায়ে দেছেন তোরে।
সে কৃপার কথা স্মরণ রাখিস।
অসহায় জন, ওরে—
—দলিস নে কভু। ভিখারী-আতুর
বিমুখ যেন না হয়।
তাঁর করুণার বারতা যেন রে
ঘোষিস জগৎময়॥

সত্যেন দত্তের অনুবাদ

সত্যেন দত্তের অনুবাদে আরম্ভ, 'মধ্য দিনের আলোর দোহাই নিশির দোহাই ওরে।' অথচ আরবীতে 'অদ্-দুহা' অর্থ 'উষা'। ইংরেজি অনুবাদের সর্বত্রই 'আর্লি আওয়ার অব দি মর্নিং।' হয়তো সত্যেন দত্ত ভেবেছিলেন, আরবের মধ্যাহ্নসূর্য অতুলনীয়। আল্লা যদি কোনো নৈসর্গিক বস্তুকে সাক্ষী ধরে দোহাই দেন, তবে তিনি মধ্যাহ্ন-সূর্যকেই নেবেন। আমাদের মনে হয় উষা নেওয়া হয়েছিল এই অর্থে যে, রাত্রির অন্ধকার যতই সূচীভেদ্য এবং নৈরাশ্যজনক হ'ক না কেন, উষার আলো প্রভাসিত হবেই হবে। আল্লা এস্থলে বলছেন, সেটা যে রকম সত্য, আমার বাক্যও তেমনি ধ্রুব।

যাঁরা কুরান শরীফকে 'মেটাফরিকালি' ও 'সিম্বলিকালি' (অর্থাৎ দ্বিতীয় 'পক্ষে') রূপকে ব্যাখ্যা করেন (যেমন পরবর্তী ওমর খৈয়ামের মদকে ভগবৎ-প্রেম অর্থে ধরেন, কিংবা ভারতচন্দ্র চৌরপঞ্চাশিকা 'কালী-পক্ষে'ও অনুবাদ করেছেন) তাঁরা বলেন এখানে 'প্রভাতসূর্য' (উষস্, অদ্-দুহা) হজরৎ মুহম্মদের (দ) প্রেরিত-পুরুষ রূপে আগমনের সূচনা করেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমান কিন্তু কুরান শরীফকে এ রকম রূপক অর্থে নেন না।

ধর্ম ও কম্যুনিজম্

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে রুশে প্রলেতারিয়ারাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এক মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। সভার আলোচ্য বিষয়বস্তু—কিংবা কর্মসূচী-এজেণ্ডাও বলতে পারেন—ছিল মাত্র একটি। ভগবান আছেন কি নেই? বিস্তর তর্কা-তর্কির পর স্থির হল, জনমত নেওয়া হ'ক, প্লেবিসিট্ করো।

আজকের দিনের ভাষায় আমরা যাকে বলি 'বিপুল ভোটাধিক্যে' ভগবানের পরাজয় হল। 'বিপুল' কেন,—ভগবান অতিকষ্টে পেলেন শতকরা মাত্র একটি ভোট। ভগবান থাকলেও বোঝা গেল তাঁর পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্ট অতিশয় রদ্দী, তাঁর 'মাথুর' সত্যসত্যই মথুরা চলে গিয়েছেন; জীপ, মাইক ইত্যাদির সুব্যবস্থা তাঁর ছিল না; তাঁর টাউটরা উভয় পক্ষের পয়সা খেয়ে শেষটায় ভোট দিয়েছে গণ্ডায় আণ্ডা ফেলে দুশ্মন কাফিরদের সঙ্গে। তবুও হয়তো তিনি আরও দু'চারখানা বেশী ভোট পেতেন, যদি পোলিং বুথের একটু দূরে সামান্য কামুফ্লাজ করে কিঞ্চিৎ ধান্যেশ্বরী গমরাজ ভদ্কার ব্যবস্থা রাখতেন। এসব কোনো তরীবৎ না করে আজকের দিনে ভোটের আশা! হুঃ! তাঁর ডিপজিটও মারা যায়। সে নিয়ে অবশ্য তাঁর কোনো ক্ষোভ নেই। কারণ তাঁর ম্যানিফেস্টোতে ছিল তিনি ধর্মাচারিগণকে মৃত্যুর পর স্বর্গরাজ্যে নেবেন। অর্থাৎ পোস্ট-ডেটেড্ চেক অন এ নন-একজিস্টিং ব্যাঙ্ক! তবে এস্থলে নিছক সত্যের খাতিরে আমাদের স্বীকার করতেই হবে: গডের দুশ্মনরাই যে শুধু এই জিগির তুলেছিল তা নয়, এর কম-সে-কম পঁচিশ বছর আগে প্রাতঃস্মরণীয় আস্তিক স্বামী বিবেকানন্দ নিউইয়র্কে বসে তাঁর শিষ্য

আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখেছিলেন, 'অন্ন! অন্ন! যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখবেন —ইহা আমি বিশ্বাস করি না।'

তা সে যাই হোক, ভগবান দশচক্রে ভূত হয়ে রুশ থেকে বিদায় নিলেন।

'উন্মাদ, উন্মাদ, বদ্ধ উন্মাদ!' পাঁড় আস্তিকেরা অবশ্য বলবেন, 'ভোট দিয়ে ভগবানের অস্তিত্ব অথবা তদ্বিপরীত প্রমাণ করার চেষ্টা বাতুলতা। এ সেই পুরনো লোকসঙ্গীত স্মরণ করিয়ে দেয়,

ফুলের বনে কে ঢুকেছে
সোনার জহুরী
নিকষে ঘষয়ে কমল
আ মরি আ মরি ॥

আত্মার উপলব্ধির চরম কাম্য ঈশ্বর। তিন কোটি গাধা-গরু-খচ্চর একজোট হয়ে ম্যাঁ, ম্যাঁ, না, না করলেই কি তিনি লোপ পেয়ে যাবেন!'

আমি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ধর্মের বিরুদ্ধে রুশের এই সশস্ত্র সংগ্রাম পছন্দ করি। সংগ্রামে পরাজিত, এমন কি নিহত হলে আপাতদৃষ্টিতে ধার্মিকজনের পরাজয় হয় বটে, কিন্তু তাতে করে ধর্ম লোপ পান না। তাই যখনই হিন্দুরা তারস্বরে চিৎকার করেন, 'ধর্ম গেল', 'ধর্ম গেল', কিংবা মুসলমানরা জিগির তোলেন 'ইসলাম ইন ডেনজার', তখন অধমের নিবেদন, পৃথিবীর তাবৎ হিন্দু লোপ পেলেও হিন্দুধর্মের এতটুকু সত্য বিনষ্ট হবে না, তাবৎ মুসলমান মারা গেলেও শব্দার্থে লুপ্ত হবেন না। 'ইসলামে'র শব্দার্থ, 'সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার সম্মুখে আত্মসমর্পণ করা।' শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে সর্বধর্ম ত্যাগ করে তাঁরই শরণ নিতে আদেশ করছেন, তখন ঐ অর্থেই করেছেন। 'সর্বধর্ম' বলতে আজকের দিনে আমরা বুঝি different ideals, different values। আমাদের ভুল বিশ্বাস, ভিন্ন ভিন্ন 'আদর্শ' বুঝিবা একে অন্যকে contradict করে ও সবাই সত্য। তা নয়। সত্য এক। সত্যে দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না। তাই বিদ্যাপতির ভাষায় কৃষ্ণলাভ করে শ্রীরাধা বললেন, 'দশদিশ ভেল নিরদ্বন্দ্ব'।

তাই সত্য নিরূপণার্থে দ্বন্দ্বের প্রয়োজন হয়তো হয়। কিন্তু অবহেলা ভয়ংকর জিনিস।

আমার মাঝে মাঝে মনে প্রশ্ন জাগে, রোমকরা যদি প্রথম খৃষ্টানদের অত্যাচার না করে অবহেলা করতো, মক্কাবাসিগণ যদি মহাপুরুষ ও তাঁর সঙ্গীদের নির্যাতন না করতো তাহলে কি হত?

উনবিংশ শতাব্দীর স্কুল-কলেজে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মকে অবহেলা করা হল। গোড়ার দিকে যখন খৃষ্টানরা হিন্দুধর্মকে চ্যালেঞ্জ করে, তখন বস্তুত হিন্দুধর্মের পুনর্জীবন লাভ হয়। ঐ চ্যালেঞ্জের ফলে হিন্দুদের ভিতর আরম্ভ হল আত্মজিজ্ঞাসা—যে সতীদাহ, বহুবিবাহ, অবরোধ-প্রথা নিয়ে হিন্দু শত শত বৎসর ধরে আপনমনে কোনো চিন্তাই করেননি, তাই নিয়ে

আরম্ভ হল তীব্র আলোড়ন আন্দোলন। আজকের দিনের ছেলে-ছোকরারা যে-রকম রাজনীতি, সাহিত্য ও ফুটবল-সিনেমা নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করে, ঠিক সেইরকম প্রায় একশ' বছর ধরে চললো ধর্ম এবং সমাজ নিয়ে আলোচনা। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'সমাজে যে সব অনাচার প্রচলিত আছে, এর পিছনে ধর্মের সম্মতি নেই।' তাই নিয়ে চললো কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে জোর আলোচনা, প্রচুর আন্দোলন।

পক্ষান্তরে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়—যেখানে দেশের সর্বোৎকৃষ্ট হৃদয় এবং মন একত্র হয়, সেখানে যদি ধর্ম অবহেলিত হয়, সেখানে যদি ধর্ম নিয়ে তর্ক আলোচনা না হয়, তাহলে শহরের গলিতে গলিতে এবং গ্রামে গ্রামে পুরুত-মোল্লারা পেয়ে যান প্রায় অবারিত রাজত্ব—উর্দুতে বলে, তখন তাদের 'দোনো হাত ঘি মে ঔর গর্দন ডেগ্‌মে'—ডেগ্‌চির ভিতর মাথা ঢুকিয়ে তারা তখন পোলাও খায়। ধর্মের নামে তখন সমাজে জমে ওঠে কুসংস্কারের স্তূপ। বিবেকহীন রাজনৈতিকরা নেয় তার চরম সুযোগ। বারোয়ারি পূজার নাম করে তহবিল তছরুপাৎ, মা-দুর্গা চেহারা নেন ফিল্ম স্টারের কিংবা পূজা-কমিটি-সেক্রেটারির লেটেস্ট গার্ল ফ্রেন্ডের। আমার চোখের সামনে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে নামলেন এক মহিলা। পেটকাটা ব্লাউজ, শাড়িখানা যেন রবারের তৈরী, সর্বাঙ্গে সেঁটে আছে—তাকাতে লজ্জা করে, লিপস্টিক-রুজের কথা বাদ দিন—কী আপদ, আপনারা জানেন, আমি কোন্ টাইপ মীন করছি—ইনি বাড়ির মহিলাদের নিয়ে মিলাদ শরীফ পরব করতে এসেছেন! পরে বন্ধুর স্ত্রীর কাছে শুনলাম, দোয়াদরুদ পড়ার সময় মাথায় ঘোমটা টানার যে প্রয়োজন, সেটা নাকি ঐ মহিলা করে উঠতে পারছিলেন না, শাড়ি ছোট, বার বার খসে পড়ছিল, বার বার হাত ওঠাচ্ছিলেন বেয়াড়া ঘোমটা দুরস্ত করতে। শেষটায় নাকি সকলের দৃষ্টি পড়ে রইল মোল্লানীর হাত-কসরৎ দেখার দিকে।

শুনেছি রুশের সংবিধানে নাকি আছে, 'ধর্মনিরপেক্ষ কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার অধিকার সর্ব কম্যুনিস্টের আছে।' ফলে ঐ সময়কার একখানা রুশভাষায় লিখিত ইংরেজী শিক্ষার দ্বিতীয় সোপানের পাঠ্যপুস্তকে নিম্নলিখিত কথোপকথন:

প্রথম ছাত্র: ঈশ্বর নেই।

দ্বিতীয় ছাত্র: ওটা একটা বুর্জোয়া কুসংস্কার—ভূতেরই মত। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কাবুলে থাকাকালীন স্নিয়েশকফ নামক একটি পরিবার—বাপ, মা, ছেলে—তিনজনাই আমার কাছে ইংরেজী পড়ত। যখন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ঐ জায়গাটি এল, তখন স্নিয়েশকফ একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, 'এটা থাক।' ব্যাপারটা ১৯২৭ সালের। তখনো কম্যুনিস্ট রেভলুশন হার্ডবইলড এগ্ হয়নি। জোয়ানদের সকলেই 'ইকনে'র সামনে বিড় বিড় করে বড় হয়েছে। আমি বললুম, 'থাকবে কেন? আমি তো বৌদ্ধধর্মের বই পড়ি। সেখানেও ঈশ্বরকে অস্বীকার করা

হয়।'

তাপরে ১৯৪১।৪২ সনে রুশ যখন হিটলারের হামলায় যায়-যায়, তখন স্তালিন খুলে দিলেন বেবাক চার্চ, বিস্তর মঠ, নিমন্ত্রণ করলেন মিত্র ইংলন্ডের ডাঙর পাদ্রীকে। আবার গির্জায় গির্জায় প্রার্থনা উঠলো, 'হে ঈশ্বর, হোলি রাশাকে ("হোলি"?—তওবা, তওবা) বাঁচাও।'

সেই অরণ্যের মত জনসমাগম, ধর্মোচ্ছ্বাস দেখে স্তালিন খুশী হয়েছিলেন, না পাঁড় কম্যুনিস্টের যা হওয়া উচিত—ব্যাজার হয়েছিলেন, জানি নে। হয়তো বা বিষাদে হরিষ, কিংবা হরিষে বিষাদ। কে জানে।

আমার মনে হয়, ১৭ থেকে ৪১ পর্যন্ত যদি ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা না করে তাকে অবহেলা করা হত, তবে বোধ হয় ঠিক এতটা হত না।

এক ঝাণ্ডা

বহু শক্তিকামী জন, দেশ যখন স্বাধীন, তখন রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন না। কারণ সে সময় রাজনীতির ক্ষেত্রে নানা মুনির নানা মত, নানা পাণ্ডার নানা দল। এসব ঝামেলার ভিতর ঢুকতে হলে প্রথমত দরকার গণ্ডারের মত চামড়া, দ্বিতীয়ত বিপক্ষকে নির্মমভাবে হানবার মত ক্ষমতা, তৃতীয়ত দেশের নেতা হওয়ার মত এলেম এবং তাগদ আমার আছে—এই দম্ভ। যাঁদের এ-সব নেই, তাঁরা হয়তো আপন গণ্ডির লোককে তাঁদের মতামত জানান, বড়-জোর কাগজে লিখে সেগুলো প্রকাশ করেন, কিন্তু দৈনন্দিন রাজনীতি যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলেন।

কিন্তু এমন সময়ও আসে, যখন তাঁরা এক ঝাণ্ডার নিচে এসে দাঁড়ান। সেদিন এসেছে।

পরাধীন জাতের একমাত্র রাজনীতি স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করা। স্বাধীন জাতি আক্রান্ত হলে তার একমাত্র রাজনীতি আক্রমণকারীকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা। সে বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত সে দেশের অন্য কোন রাজ-নীতি থাকতে পারে না। বিধানসভা, রাজ্যসভা, ট্রেড ইউনিয়ন, এমন কি পাড়ার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানে তখন বিরুদ্ধ পক্ষ বলে কিছু থাকতে পারে না। দেশের লোক যাকে নেতা বলে মেনে নিয়েছে তাকে তখন প্রশ্নজালে উদ্ব্যস্ত না করা, কিংবা গুরুগম্ভীর মাতব্বরী ভর্তি উপদেশ দিয়ে তাঁর একাগ্র মনকে অযথা চঞ্চল না করা। যদি সে নেতার প্রতি দেশের আস্থা চলে যায়, তবে তাঁকে তাড়াবার জন্য গোপনে দল পাকাতে হয় না। দেশের সর্বসাধারণ তখন চিৎকার করে ওঠে ও সে সময় তাঁকে সরে দাঁড়াতে হয়। ১৯৪০-এ চেম্বারলেন যেরকম মানে মানে সরে দাঁড়ালেন।

এটা শুধু সম্ভব, যেখানে গণতন্ত্র আছে। ডিক্‌টেটরদের স্বৈরতন্ত্রে এ ব্যবস্থা নেই। সেখানে গেস্তাপো, ওগপু বজ্রহস্তে জনসাধারণের কণ্ঠ রুদ্ধ করে রাখে—যতদিন পারে। তারপর একদিন মুসোলিনিকে মরতে হয় গুলি খেয়ে

এবং মাথা নিচের দিক করে ঝুলতে হয় ল্যাম্পপোস্ট থেকে, হিটলারকে মরতে হয় আত্মহত্যা করে।

রবীন্দ্রনাথ একস্থলে বলেছেন, 'আমি যে আমার ভগবানে বিশ্বাস করি তার কারণ তাঁকে অবিশ্বাস করার স্বাধীনতা তিনি আমাকে দিয়েছেন'—ঠিক-ঠিক কথাগুলো আমার মনে নেই বলে পাঠক অপরাধ নেবেন না।

আমি যে পণ্ডিতজীর নেতৃত্বে বিশ্বাস করি, তার কারণ তাঁকে অবিশ্বাস করার অধিকার তিনি আমাকে দিয়েছেন। তিনি গণতন্ত্র, ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন বলেই সে-স্বাধীনতা আমাকে দিয়েছেন। তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন বলেই আপনাকে, আমাকে, আর পাঁচজনকে বিশ্বাস করেছেন—আমরা যে-রকম তাঁকে বিশ্বাস করেছি। আমাদের একান্ত প্রার্থনা, আমরা যেন তাঁর সে বিশ্বাস ভঙ্গ না করি। শত্রু দেশ থেকে বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরই ভাষায় বলি, "আরাম হারাম হ্যায়!"

* * *

আমার দুঃখের অবধি নেই, শেষ পর্যন্ত চীনদেশ আমাদের আক্রমণ করল! প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে জাপান যখন চীন আক্রমণ করে, তখন ভারতবাসীমাত্রেই মর্মাহত হয়েছিল। সদয় পাঠক এস্থলে আমাকে একটি ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখ করতে অনুমতি দিন। আমি তখন জর্মানীতে পড়াশুনা করি। সে সময় আমাকে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে চীন-জাপানের' কথা ওঠে। আমি বলেছিলুম, 'এই যে অর্বাচীন জাপান সংস্কৃতি, ঐতিহ্যে তার পিতামহ চীনের বুকে বসে তার দাঁড়ি ছিঁড়ছে, এর চেয়ে অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস আর কি হতে পারে!' পরদিন দুই বয়স্ক চীনা ভদ্রলোক আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত—এঁরা দুজনেই আপন দেশের অধ্যাপক। জর্মানী এসেছিলেন ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক জন আমার দুহাত চেপে ধরে বললেন, 'জাপান শক্তিশালী জাতি। অক্ষম চীনের প্রতি দরদ দেখিয়ে তার বিরাগভাজন হতে যাবে কে? আপনি কাল সন্ধ্যায় যা বললেন, সে শুধু ভারতবাসীই বলতে পারে।' অন্য জনের চোখ দিয়ে হঠাৎ ঝরঝর করে জল বেরিয়ে এসেছে। আমি জানতুম, চীনা ভদ্রসন্তান অত্যন্ত সংযমী হয়, সহজে আপন অনুভূতি প্রকাশ করে না, কিন্তু এখানে এ কী করুণ দৃশ্য! আর আমি পেলুম নিদারুণ লজ্জা। আমি পরাধীন দেশের জীবন্মৃত অর্ধ-মনুষ্য। আমার কী হক এসব বিষয় নিয়ে মতামত প্রকাশ করবার!

আজ জানতে ইচ্ছা করে, এই দুই অধ্যাপক এখনো বেঁচে আছেন কি না! থাকলে তাঁরা কি ভাবছেন!

কিন্তু এ-সব কথা বলার প্রয়োজন কি? ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের যে কত যুগের হার্দিক সম্পর্ক, সে তো ইস্কুলের পড়ুয়াও জানে। শুধু এ-দেশ নয়, চীন দেশেও। কারণ চীন দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আছে; আজ যদি চীনের টুথব্রাশ-মুস্টাশহীন নয়া হিটলাররা সে-ঐতিহ্য অস্বীকার করে বর্বর অভি-

যানই কাম্য মনে করেন, তবে যে-সব সভ্য-ভূমিতে এখনো ঐতিহ্য সংস্কৃতির মর্যাদা আছে, তারা চীনের এই অর্বাচীন আচরণ দেখে স্তম্ভিত হবে। অবশ্য এ-আচরণ সম্পূর্ণ নূতন নয়। রুশ দেশ যখন প্রথম কম্যুনিজম ধর্ম গ্রহণ করে, তখন সে-দেশও তার গগল, পুশকিন, তুর্গেনিয়েভ, চেখফকে 'বুর্জুয়া', 'শোষক', 'প্রগতিপরিপন্থী' বলে দেশ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছিল, কিন্তু কিছু-দিন যেতে-না-যেতেই দেখতে পেলে, কূপমণ্ডূক হয়ে থাকতে চাইলে অন্য কথা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—মানবসভ্যতার যে চিরন্তন দেয়ালী উৎসব চলছে, তাতে যদি রুশ তার ঐতিহ্যের প্রদীপ নিভিয়ে বসে থাকে, তবে সে অন্ধকার কোণ থেকে কেউ তাকে টেনে বের করবে না। তাই আজ আবার রুশ দেশ বিনা বিচারে তার সাহিত্যিকদের পুস্তক ছাপে—সেগুলোতে সে যুগের অনা-গত কম্যুনিজমের জয়ধ্বনি থাক আর নাই থাক।

তাই যখন কম্যুনিজম গ্রহণ করার পর চীন বললে, 'পৃথিবীতে হাজার রকমের ফুল ফুটুক'—তখন আমরা মনে করেছিলুম, অপরের প্রতি সহিষ্ণুতার ঐতিহ্য স্মরণ করেই চীন এ-কথা বলেছে, কিয়ৎকালের জন্যে রুশ আপন ঐতিহ্য অস্বীকার করে যে মূর্খতা দেখিয়েছিল, তার থেকে সে শিক্ষালাভ করেছে, এবং এখন লাওৎসে কনফুৎস এবং বৌদ্ধ-ঐতিহ্যের সঙ্গে কম্যুনিজম মিশে গিয়ে এক অভিনব সমাজ-ব্যবস্থা, ধন-বণ্টন পদ্ধতি দেখা দেবে। তার সঙ্গে আমাদের মনের মিল হওয়ার সম্ভাবনা কম; কিন্তু সে এক্‌সপেরিমেণ্ট যে বিশ্বজনের কৌতূহল আকর্ষণ করবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই 'হাজার রকমের ফুল ফুটুক' যে নিতান্ত মুখের কথা, সেটা তিন দিনেই ধরা পড়ে পেল। আমরাই যে শুধু ধরতে পেরেছি তাই নয়, চীনা আক্রমণের পরের দিনই এক সুইস কাগজে একটি ব্যঙ্গচিত্র বেরোয়। ছবিতে জনমানবহীন বিরাট বিস্তীর্ণ এক বরফে ঢাকা মাঠে মাত্র একটি ফুল ফুটেছে। তার নীচে লেখা 'ভারতবর্ষ'। তারই পাশে দাঁড়িয়ে চু এন-লাই। পাশে যে সখা দাঁড়িয়ে, তাকে বলছেন, 'এ-ফুলটি আমি তুলে নেব।'

অত সহজ নয়।

একদিন জাপান তার উত্তমর্ণ চীনকে আক্রমণ করেছিল। আজ চীন তার উত্তমর্ণ ভারতকে আক্রমণ করেছে।

চীন দেশ কখনো কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেনি। লাওৎসে, কনফুৎস যে জীবনদর্শন প্রচার করেছেন, তাতে আছে কি করে সাধু, সৎ জীবন যাপন করা যায়, কিন্তু ইহলোকে পরলোকে মানুষের চরম কাম্য কি, এই পঞ্চভূত পঞ্চেন্দ্রিয়াশ্রিত নরদেহ-চৈতন্যের ঊর্ধ্বলোকে কি আছে, কি করে সেখানে তথাগত হওয়া যায়, এ সম্বন্ধে তাঁরা কোনো চিন্তা করেননি।

অথচ বুদ্ধের বাণী যখন মৃদু কাকলি রবে চীন দেশে পেঁছিল, তখন থেকেই বহু চীনা এদেশে এসেছেন। ইৎসিং, ফা-হিয়েন, য়ুয়ান চাঙ, আরো সামান্য কয়েকটি নাম আমরা সকলেই জানি, কিন্তু এঁরা ছাড়া এসেছেন আরো বহু বহু চীনা শ্রমণ। বিশেষ করে য়ুয়ান চাঙের ভ্রমণ-কাহিনী পড়লে আজও

মনে হয়, যেন পরশু দিনের লেখা ! বৌদ্ধ শ্রমণ যেমন যেমন ভারতের নিকটবর্তী হতে লাগলেন, তখন তাঁর হৃদয়মনে কি উত্তেজনা, ভারতবর্ষে পৌঁছে তার প্রতিটি তীর্থ দর্শন করে তিনি কী রকম রোমাঞ্চ-কলেবর ! কামরূপের রাজা যখন তাঁকে পাহাড়ের উপরে নিয়ে গিয়ে পূর্বদিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন ঐ আপনার মাতৃভূমি, পঁচিশ মাইল হয় কি না হয়, তখন বুদ্ধ শ্রমণ চিন্তা করেছিলেন, কত না বিপদের সম্মুখীন হয়ে, কত না ঘোরালো পথে তাঁকে তথাগতের জন্মভূমিতে আসতে হয়েছে।

ভারতের রাজা হর্ষবর্ধন তাঁকে সসম্মানে সখারূপে গ্রহণ করেছিলেন।

আজ যদি চীন সে সখ্য ভুলতে চায়, ভুলুক।

ভারতও তার রুদ্র রূপ দেখাতে জানে।

জয় হিন্দ্।

"রাঁধে মেয়ে কী চুল বাঁধে না ?"

চীনেদের ঠেঙিয়ে বের করতে হবে, এ তো বাঙলা কথা। কিন্তু 'রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না ?'—এর অর্থটি সরল। যে মেয়ে রাঁধছে তার যদি খোঁপাটি তখন ঢিলে হয়ে যায় তবে সে কি রাঁধতে রাঁধতেই চুল বাঁধে না ? রান্না বড়ই প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান, কিন্তু চুল বাঁধাটা এমন কিছু মারাত্মক অপরিহার্য শুভকর্ম নয় যে, তদভাবে বাড়িসুদ্ধ লোক মারমুখো হয়ে চেলি নিয়ে বাড়ির বউয়ের দিকে তাড়া লাগাবে। তবু বাড়ির বউ জানে, রাঁধতে হয়, চুলও বাঁধতে হয়।

অর্থাৎ চীনাকে ঠ্যাঙাবার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আরো পাঁচটা কাজ আছে। সেগুলো আপাতদৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় মনে না হলেও দেশসুদ্ধ লোকের কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে লিপ্ত হয়ে শিবনেত্র হয়ে যাওয়ারও কোনো অর্থ হয় না। অবশ্য এ কথা সত্য, যুদ্ধের বাজারে কোন্‌টা যে 'রাঁধা' অর্থাৎ অত্যাবশ্যক আর কোন্‌টা যে 'চুল বাঁধা' অর্থাৎ দোহার, এ দুটোতে আকছারই ঘুলিয়ে যায়। ধড়িবাজ মেয়ে যে চুল বাঁধার ছল করে রান্নার গাফিলি করে এটা জানা কথা, এবং কট্টর গিন্নী যে বেধড়ক রান্নার তোড়ে খাটাশের মত চেহারা বানিয়ে তোলেন সেও জানা কথা।

এ দুটোর তফাত করবেন দেশের কর্তাব্যক্তিরা। আমার শাস্ত্রাধিকার নেই। তবে কিঞ্চিৎ অতি সামান্য অভিজ্ঞতা আছে। একবার আমি অতিশয় অনিচ্ছায় এক খণ্ড যুদ্ধের মাঝখানে তুচ্ছ উলুখড়েরও জীবন যে কি মর্মান্তিক নিদারুণ হতে পারে তার প্লীহাতঙ্কী—পীতাতঙ্কের সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলবেন না, ওটা আমার নেই—অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলুম। সে দুর্দিনে পেটের ভাত জুটছিল না বলে ভয়ের চোটে সেটা শুকিয়ে চাল হতে পারেনি। তার বর্ণনা পুস্তকাকারে ছাপিয়েও ছিলুম। তবে আপনারা সেটি পড়েছেন বলে মনে হয় না—বঙ্কিম চাটুয্যে স্টাইল তো তাই বলে।

দ্বিতীয়বার আমি স্যানা হয়ে গিয়েছি—কথায় বলে, 'একবার ঠকলে ঠকের দোষ, দুবার ঠকলে তোমার দোষ।' সন ১৯৩০ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত উভয় পক্ষের যুযুধানকে উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করার পর যখন আমার প্রীহা দ্বিতীয়বার উলুখড় হতে কবুল জবাব দিল, তখন নিরপেক্ষ স্থল অকুস্থলে পরিণত হওয়ার পূর্বেই আমি আমার যুবতী স্ত্রী নিয়ে পলায়ন করি ('য পলায়তি স জীবতি' —কে বলে আমি সংস্কৃত জানি নে!)।

দেশে ফিরেই কানটি সেঁটে দিলুম বেতারের লাউড্‌স্পীকারের সঙ্গে। জর্মন কি বলছে না বলছে সে তো ইংরেজ এই কালা আদমীকে সদয় হয়ে শোনাবে না। তারপর মস্কো বেতার। সেটা যখন হিটলার গুঁড়িয়ে দিল তখন কুই-বিশেফ। সেটাও যখন দাঁতমুখ খিঁচিয়েও শোনা যায় না, তখন রুশদেশেরই ছোট্ট বেতার কেন্দ্র আজারবাইজান- ভাগ্যিস তারা ফার্সিতেও খবর প্রচার করত।

যুদ্ধের পর হালের বলদ নৌকোর পাল বিক্রী করে যুদ্ধ বাবদে জর্মন এবং ফরাসী বই কিনেছি দেদার। ইংরিজি বই এদেশে পাওয়া যায়। চুরি করে চালিয়ে নিই।

মোকা পাওয়া মাত্রই দু'বার জর্মনি ঘুরে এসেছি। ১৯৫৮ এবং এই গ্রীষ্মের ১৯৬২-তে। এবং জোর গলায় পরিষ্কার করে ফের বলতে হল, প্রধানত মিশেছি নিম্নমধ্যশ্রেণী এবং ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে তাদের সঙ্গে—তাদেরই মিলন-কেন্দ্র ক্লাইপেতে, লকালে বা বিয়ারখানায়, যা খুশি বলতে পারেন। বড়লোক-দের সঙ্গে মিশেছি অল্পই। তবে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে কিছুটা ইচ্ছায়, কিছুটা অনিচ্ছায় মিশতে হয়েছে খানিকটা। ক্রুপ্‌ স্টীনেসদের সঙ্গে মেশবার কোনো সুযোগই হয় নি। আমার লেখা গোগ্রাসে না গিলে আস্তে আস্তে পড়লেই এ কথাটা পাঠক মাত্রই বুঝতে পারবেন। জর্মনি সম্বন্ধে আমার যা জ্ঞান-গম্যি তার ৯০ নঃ পঃ বিয়ারখানা থেকে সংগৃহীত, বাকিটা বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি থেকে। তাদের সকলেরই মোটরগাড়ি ছিল কিন্তু দাসী, হাউস-টখটর, এমন কি হেল্পিং হ্যান্ডও ছিল না।

এর থেকে আমার যা সামান্য অভিজ্ঞতা হয়েছে, তারই জোরে দু'একটি কথা নিবেদন করি।

এই 'চুল বাঁধার' কথাই ধরা যাক্‌।

১৯৩৯-এ হিটলার যখন লড়াইয়ের জিন্‌ বোতল থেকে বের করে আসমানে ছেড়ে দিলেন তখন যুদ্ধ বাবদে তাঁরও অভিজ্ঞতা ছিল কম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি করপরেলরূপে লড়েছিলেন সত্য, কিন্তু তাতে করে তো 'অল আউট ওয়ার' সম্বন্ধে ওকীব-হাল হয়ে যাওয়ার কথা নয়। তাই তিনি ভাবলেন, সর্বপ্রথম উচিত-কর্ম হচ্ছে, বিলাসব্যসন ত্যাগ করা। তাই বন্ধ করে দাও হেয়ার ড্রেসিং সলুনগুলো।

এস্থলে একটুখানিক সবিস্তর বুঝিয়ে বলতে হয়, জর্মনির শহুরে মেয়েরা এই ড্রেসিং সলুনের উপর কতখানি নির্ভর করে। এবং আজকের চেয়ে ১৯৩৯

সালে নির্ভর করত আরো অনেক বেশী। তখনো পার্মানেন্ট ওয়েভ-এর জোর রেওয়াজ। সলুনওলী প্রথম চুলে ঢেউ খেলিয়ে দিয়ে পরিয়ে দেয় এক মুকুট, চালিয়ে দেয় ইলেক্‌ট্রিরি যন্ত্র। এসবের মারপ্যাঁচ আমি বুঝি নে। তবে মুকুট খোলার পর দেখা যায়, দিব্য ঢেউ-খেলানো চুল হয়ে গিয়েছে। নূতন করে গোড়ার দিকের চুল বেশ খানিকটে না গজানো পর্যন্ত এ ঢেউ লোপ পায় না।

যারা সলুনে ঢেউ-খেলানো চুলের মাথা বানিয়ে নিয়ে আসে, তাদের মস্তকে হল বজ্রাঘাত—হিটলারের এই হুকুম শুনে। শহরের বহু বহু মেয়ে আপন চুলের তদারকি নিজে করতে পারে না। এক মাসের ভিতরই দেখা গেল মাথায় মাথায় বাবুইয়ের বাসা। কিন্তু কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে হুজুর হিটলারের কাছে এর প্রতিবাদ জানায়! সবাই গিয়ে কেঁদে পড়লেন ফ্রাউ গ্যোবেল্‌সের পায়ে। এভা ব্রাউন, রীফেনটালের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পূর্বে হিটলার প্রায় প্রতিদিন গ্যোবেল্‌স্‌দের বাড়ি যেতেন। শেষ দিন পর্যন্ত হিটলারের উপর ছিল তাঁর অসাধারণ প্রতিপত্তি—স্বৈরতন্ত্রের সর্বাধিনায়কের উপর যতখানি হতে পারে। (তাই ফ্রাউ গ্যোবেল্‌স্‌ যখন জানতে পারলেন হিটলার আত্মহত্যা করবেন, তখন তিনি বললেন, 'ফ্যুরার-হীন পৃথিবীতে বেঁচে থেকে কি লাভ, আমিও আত্মহত্যা করব', এবং তিনি তাই করেও ছিলেন।)

ফ্রাউ গ্যোবেল্‌স্‌ হিটলারের সামনে গিয়ে বললেন, 'মাইন ফ্যুরার (প্রভু আমার)! আপনি কি চান যে আপনার জওয়ানরা রণক্ষেত্র থেকে ছুটিতে ফিরে এসে দেখুক কতকগুলো উস্কোখুস্কো চুলওলী খাটাশীদের?'

হিটলার আইন নাকচ করে দিলেন।

তাই বলছিলুম রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না?

* * *

এখন প্রশ্ন, কোন্‌ কোন্‌ কর্ম স্থগিত রাখতে হবে, আর কোন্‌ কোন্‌ কর্ম আরো জোরসে চালাতে হবে। পূর্বেই এ-প্রশ্নের আভাস দিয়েছি এবং এখনো বলছি, আমি সমাজপতি নই, কাজেই আমি এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। তবে একটা কথা বলতে পারি, বুক ঠুকে বলতে পারি—আমরা যেন হাসতে ভুলে না যাই। অর্বাচীন চীনের আচরণে ব্যথিত হয়ে আমাদের শিবুদা (শিবরাম চক্রবর্তী) যদি মশকরা করতে ভুলে যান তবে আমি হাসতে হাসতে তাঁকেই জবাই করব।

এই হাসতে পারাটা গণতন্ত্রের প্রধান লক্ষণ। পণ্ডিতজী চীনকে বিশ্বাস করে যে ঠকেছেন তাই নিয়ে সুবে বিলেত-মার্কিন পশ্চিম ইয়োরোপ হাসছে। কত না কার্টুন ব্যঙ্গচিত্র বেরোচ্ছে। আমরা প্রাণ খুলে হাসতে পারছি নে সত্য কিন্তু শীতকালে ঠোঁট ফেটে গেলে লোক যে রকম হাসে সে রকম হাসছি তো সত্য। কারণ একা পণ্ডিতজী তো চীনকে বিশ্বাস করেননি, আপনি আমি রামা-শ্যামারাও করেছিলুম। এখন সবাই আমাদের নিয়ে হাসছে। এ অবস্থায় আমাদের চটে যাওয়াটা অতিশয় অরসিকের কর্ম হবে। আমরাই শুধু দুনিয়ায় পাগলামি, দুষ্টামি দেখে হাসব, আর আমাদের সরলতা আমাদের ভালো-মান-

যামী দেখে অন্য লোকের হাসি আমরা সইব না, এটা কোনো ভালো কথা নয়।

এই তো সেদিন একটা রসিকতা পড়ছিলুম।

পূর্ব জর্মনীর এক কুকুর পশ্চিম জর্মনীর মামাতো ভাইয়ের বাড়িতে কয়েকটা দিন কাটাতে এসেছে। অতিথিবৎসল দাদা শুধোলে, 'তোকে কি খেতে দেবো বল দিকিনি, ভাইয়া! গুটিকয়েক সরেস, তাজা খাজা হাড্ডি চিবুবি?'

পূর্ব জর্মনীর কুকুর বললে, 'না, থ্যাঙ্কু! আমাদের ওদিকে মেলাই খাবার রয়েছে! তোদের চেয়ে অনেক ভালো!'

দাদা শুধোলে, 'তবে, তবে, কিছু একটা চাটবি? জল? শরবৎ? দুধ? মদ?

'না, ওসবে আমার দরকার নেই। বাড়িতে ঢের রয়েছে।'

'তাহলে চল্, আমার ঘরে একটু জিরিয়ে নে।'

'কিচ্ছু দরকার নেই। আমার দিব্য সুন্দর ঘর রয়েছে বাড়িতে।'

বড়দা তখন চটে গিয়েছে। হুঙ্কার ছেড়ে বললে, 'তবে এখানে মরতে এসেছিস কেন? তোর যখন সবই রয়েছে?'

'ও দাদা! এখানে যে প্রাণভরে ঘেউ ঘেউ করা যায়। আমি ঘেউ ঘেউ করব।'

* * *

ঐ হল লৌহ-যবনিকার ওপারের দেশের আইন। সেখানে আপন আপত্তি-অজুহাত চেঁচিয়ে জানানো বারণ। সেখানে আইনকানুন সর্বনেশে। আমরা এদিকে যত খুশি ঘেউ ঘেউ করতে পারি—কিন্তু হাসতে যেন না ভুলি।

ওয়ার এম

রাজা প্রজাগণকে কহিলেন,

'দেখ, আমার রাজ্যে শত্রুভয় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা ফলিত[১] বংশের[২] ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইবে। শত্রুগণ আত্মবিনাশের নিমিত্তই আমার রাজ্যে আক্রমণ করিতে অভিলাষ করিতেছে। এক্ষণে এই ঘোরতর ভয়াবহ আপদ সমুপস্থিত হওয়াতে আমি তোমাদিগকে পরিত্রাণার্থ অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। উপস্থিত ভয় নিরাকৃত হইলে তোমাদিগকে পুনরায় প্রদান করিব।[৩] আর শত্রুগণ যদি বলপূর্বক তোমাদের ধন গ্রহণ করে, তাহা হইলে তোমরা কদাচ উহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে না। বিশেষতঃ অরাতিগণ রাজ্য আক্রমণ করিলে তোমাদের পুত্রকলত্রাদিও বিনষ্ট হইবে। তাহা হইলে তোমাদের অর্থ আর কে ভোগ করিবে! তোমরা আমার পুত্রের ন্যায়, আমি তোমাদের সমৃদ্ধি-দর্শনে যার-

---

১. ২ ফলবান্ বংশের—বাঁশের ফল হইলে বাঁশ মরিয়া যায়। অনুবাদকের টীকা। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ। 'বসুমতী'।

৩ আজকের দিনের 'উয়োর-বনড, ডিফেন্স্ সার্টিফিকেট্'।

পরনাই পরিতুষ্ট হইয়া এই আপৎকালে রাজ্যরক্ষার্থে তোমাদিগের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা যথাশক্তি ধন-উৎপাদনপূর্বক[৪] রাজ্যের উপদ্রব নিবারণ কর। বিপদকালে ধনকে প্রিয় বোধ করা অত্যন্ত অকর্তব্য।'

রাজ্যপালন সম্পর্কে যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভীষ্মকে প্রশ্ন করায় ভীষ্মের উত্তর। মহাভারত, শান্তিপর্ব, সপ্তাশীতিতম অধ্যায়। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে তৃতীয় খণ্ড, ৪৫০ পৃঃ॥

যুদ্ধ কাম্য নয়। একথা সত্য, যুদ্ধের সময় অনেকেই আপন শৌর্য, বীরত্ব দেখিয়ে আপন জাতকে গৌরবান্বিত করেন, কিন্তু শেষ বিচারে দেখা যায়, যুদ্ধে অমঙ্গলের অংশই বেশী।

তাই যখন কোনো জাতিকে বাধ্য হয়ে সংগ্রামে নামতে হয়—আজ আমরা যে-রকম নেমেছি—তখন তাকে খুব ভালো করে, অতিশয় সুস্থ মস্তিষ্কে আবেগ-উচ্ছ্বাসরহিত হৃদয়ে চিন্তা করে নিতে হয়, তার উদ্দেশ্য কি? সে কি চায়? একে বলা হয় ওয়ার এম্।

তার খানিকটা নির্ভর করে বিপক্ষের মতলবটা কি, সে কি চায়—তার ওপর।

চীন প্রাচ্যদেশের জনবলে বলীয়ান মহারাষ্ট্র। কিন্তু জন থাকলেই ধন হয়

৪ ধন উৎপাদনের একমাত্র পন্থা, প্রোডাক্‌শন্ বাড়ানো। অর্থাৎ ইন্‌ডাসট্রিয়াল ও এগ্রিকালচরল তৈজসপত্র বাড়ানো। না হলে শুধুমাত্র ধনে সর্ব সমস্যার সমাধান হয় না। কথিত আছে, বর্বর মঙ্গলরা যখন প্রবল প্রতাপশালী আব্বাসী খলিফার রাজধানী বাগ্‌দাদ দখল করে খলিফাকেও বন্দী করতে সক্ষম হ'ল, তখন মঙ্গল সেনাধ্যক্ষ খলিফাকে নিমন্ত্রণ করলেন। ভোজনের জন্য খলিফার সামনে রাখলেন থালা থালা সোনা-জহরৎ। নিজের সামনে রাখলেন উত্তম উত্তম আহারাদি। খেতে খেতে খলিফাকে শুধোলেন, 'হুজুর, খাচ্ছেন না কেন?' হুজুর চুপ করে রইলেন। পুনরায় সেই প্রশ্ন। পুনরায় 'নো রিপ্লাই'। তৃতীয় বারে নিরুপায় হয়ে খলিফা বললেন, 'এগুলো তো খাবার জিনিস নয়।' মঙ্গল বললেন, 'সে কি হুজুর, আপনার রাজত্ব জয় করবার পর আপনার ধনাগার বোঝাই পেলুম এই সব সোনা-জহর। ভাবলুম এগুলো বুঝি আপনি খান। অন্য কোনো কাজে লাগাননি তাই।'

অর্থাৎ, শুধু ধন দিয়ে সব-কিছু হয় না।

তা হলে ধনী লোকের বাড়িতে ডাকাতি হত না।

হিটলার কি আদর্শ নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন সেটা জানবার আমাদের প্রয়োজন নেই, কিন্তু সম্পূর্ণ দেউলে রাষ্ট্রকে তিনি কি করে জোরদার করলেন সেটা জানা উচিত। তিনিও বলেছিলেন, 'আমার ব্যাঙ্কে সোনা-জহর নেই। বয়ে গেল! আমি চাই জোয়ান মেয়েমদ্দ। যারা উৎপাদন করতে পারে। আপন বাহুবলে। আমি রাজা, তখন সেগুলো কিনব।' তাই ভীষ্মদেব ধন উৎপাদনের আদেশ দিয়েছিলেন।

না। চীন গরীব দেশ। তাই গত দশ-বারো বৎসর ধরে সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে, কি-করে সে আপন ধনদৌলত বাড়াতে পারে। প্রধানত রুশের সাহায্যে।

ইতিমধ্যে এই নয়া কম্যুনিস্ট জাত অর্থাৎ চীন—খানদানী কম্যুনিস্ট জাত অর্থাৎ রুশকেও খানদানিত্বে এক কাঠি ছাড়িয়ে যেতে চাইল। এটা পৃথিবীর ইতিহাসে আকছারই হয়েছে। পূর্ববাংলায় মুসলমানরা বলে, 'নয়া মুসলমান গোরু খাওয়ার যম হয়।' অর্থাৎ শ্মশানের চাঁড়াল যদি হঠাৎ দৈবযোগে পৈতে পেয়ে যায় তবে তার বাড়িতে যা সন্ধ্যা-আহ্নিকের ঘটা লাগে তা দেখে জাত-ব্রাহ্মণ পরিত্রাহি রব ছাড়ে। চীন বেশ কড়া গলায় রাশাকে বললে, 'তুমি যেভাবে মার্কিনিংরেজের সঙ্গে দহরম-মহরম করছ সেটা মার্কস্-লেনিনবাদের বিশ্ব-কম্যুনিজম আশু আনয়ন করার বিপক্ষে যায়। তুমি শান্তি চাইছ; এ করে এখনকার মত শান্তি পাচ্ছ বটে, কিন্তু চিরন্তন শান্তি আসবে একমাত্র বিশ্ব-কম্যুনিজমের ফলরূপে। তার জন্য দরকার আপন "ধর্মে"—অর্থাৎ কম্যুনিজমে—বিশ্বাস। তার অর্থ শান্তির মারফতে ইহসংসারে কোনো প্রকারের প্রগতি হয় না। সর্ব প্রগতি যুদ্ধের মাধ্যমে। অতএব মার্কিনিংরেজ যেখানে বলবে "শান্তি চাই", তুমি সঙ্গে সঙ্গে বলবে "যুদ্ধ চাই"। এই করে আসবে বিশ্ব-কম্যুনিজম।

রুশ বললে, 'হক্ কথা। কিন্তু মার্কস্-লেনিনের আমলে অ্যাটম বম্ ছিল না। এখন যদি যুদ্ধ চালাই তবে আখেরে যে সব-কুছ্ লণ্ডভণ্ড ছারখার হয়ে যাবে। বেঁচে থাকবে কে?'

এখানে এসে চীন কিছু বলে না। কারণ চীন জানে, রুশ ইংলণ্ড-আমেরিকার জনসংখ্যা ৯৯ পার্সেণ্ট মরে গেলেও তার আপন দেশে থাকবে লক্ষ লক্ষ লোক। কারণ তার জনসংখ্যা সকলের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশী। তারাই তখন পৃথিবীর রাজত্ব করবে।

এটা কিছু নূতন তত্ত্ব নয়। ১৯৩৮-এ ইংরেজ-ফরাসী চেয়েছিল হিটলারে-স্তালিনে লড়াই লাগিয়ে দুই ব্যাটাই মরে; তাঁরা পরমানন্দে বিশ্বসংসারটা চষে বেড়াবেন।

কট্টর কম্যুনিস্ট বিশ্বাস করে যে, যারা কম্যুনিজমে বিশ্বাস করে না তারা সবাই এক গোয়ালের গরু। তার কাছে মার্কিন যা ভারতবাসীও তা। ইংরিজীতে কথায় কথায় বলে যে আমার স্বপক্ষে নয় সে আমার শত্রু—নিরপেক্ষ বলে কোনো জিনিস নেই। কাজেই আমরা যে ভারতীয়েরা চীনের শত্রু-মিত্র কিছুই নই, আমরাও তার শত্রু—আমাদের একমাত্র 'অপরাধ' আমরা কম্যুনিস্ট নই—অথচ ধর্ম জানেন, আমরা কম্যুনিস্টদের প্রতি যতখানি সহনশীল, চেকোশ্লোভাকিয়া কিংবা পোল্যাণ্ড অতখানি হবে না। যদি আজ পূর্ণ স্বাধীনতা পায় তবে কম্যুনিস্টদের ঠেঙিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবে। এই যে পশ্চিম জার্মানী গণতান্ত্রিক দেশ, সেও কম্যুনিস্টদের বরদাস্ত করে না।

খ্রুশ্চভ এ তত্ত্বটি ভালো করেই জানেন। তাই তিনি ভারতকে শত্রুর চোখে

দেখেন না। তাঁর বিশ্বাস তিনি এবং অন্য কম্যুনিস্টরা যদি আমাদের দিকে চোখ রাঙায়—আক্রমণ দূরে থাক—তবে আমরা পুরোপাক্কা ক্যাপিটালিস্ট হয়ে গিয়ে মার্কিনকে আমাদের দেশে বিমানঘাঁটি বানাতে দেব, এবং শেষ হিসেবের দিন তার হয়ে রুশের বিরুদ্ধে লড়ব।

চীন যখন রাশাকে আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন করতে পারলো না, এবং শুধু তাই নয়, রুশ যখন চীনের বাড়াবাড়ি বরদাস্ত না করতে পেরে তার সর্ব সাহায্য বন্ধ করে দিল—শুনতে পাই রাশানরা চীন ত্যাগ করার ফলে তাদের তৈরী কারখানাগুলো চালকের অভাবে খাঁ খাঁ করছে—তখন চীন বললে, 'এটার একটা ইস্পার-উস্পার করতে হবে। আমি ভারত আক্রমণ করে দেখি রুশ তখন কি করে? সে তো আর কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অকম্যুনিস্ট রাষ্ট্র—অর্থাৎ ভারতকে সাহায্য করতে পারবে না।'

এইটে চীনের গৌণ ওয়ার এম্—যুদ্ধের উদ্দেশ্য।

মুখ্য ওয়ার এম্ তবে কি?

পোলাণ্ড-রুশের বিরুদ্ধে হিটলারের ওয়ার এম্ ছিল, (১) ওদের সৈন্য-বাহিনীকে সমূলে ধ্বংস করা, (২) ওদের নেতৃস্থানীয় কমিসারদের নিধন করা—তারা যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করুক আর নাই করুক, অর্থাৎ কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার। (৩) তাদের রাজত্বে জর্মনদের বসতি স্থাপনা করে তাদের দিয়ে দাসের কাজ করানো।

রুশভেল্ট ঠিক অতখানি চাননি। তবে তিনিও জর্মনদের কাছ থেকে শর্তহীন আত্মসমর্পণ চেয়েছিলেন—আন্‌কণ্ডিশনাল সারেণ্ডার। অর্থাৎ তিনি নাৎসী গুণ্ডা ও জর্মন জনসাধারণের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেননি। চার্চিল এটা পছন্দ করেননি—তিনি চেয়েছিলেন নাৎসী রাষ্ট্রের পতন ও গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—ঐ ছিল তাঁর ওয়ার এম্।

চীন আমাদের সমূলে ধ্বংস করে এ-দেশে চীনা চাষাভুষোর বসত করতে চায় নি, কিন্তু চীনের অন্যতম ওয়ার এম্ ছিল এদেশে কম্যুনিস্ট রাজ বসানো। চীন আশা করেছিল, সে ভারতে হামলা দেওয়া মাত্রই এ-দেশের কম্যুনিস্টরা দেশের জনসাধারণকে তাতিয়ে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র বসাতে পারবে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সেটা হল না। এমন কি অনেক খাঁটি কম্যুনিস্ট, চীনের এ আচরণে অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছেন এবং অনেকেই পণ্ডিতজীর ঝাণ্ডার নীচে এসে দাঁড়িয়েছেন—আর খুশ্চভ-পন্থীরা তো রীতিমত উষ্মা প্রকাশ করেছেন।

স্মরণ রাখা উচিত, চীনাদের এ ওয়ার এম্ উপস্থিত মুলতবী থাকলেও সেটাকে সে কখনো বর্জন করবে না। আমাদের তার জন্য হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হবে—হয়তো বা বহু বৎসর ধরে।

আমার মনে হয় চীন চায় আমাদের পঙ্গু করে রাখতে। প্রাচ্য দেশের দুই বিরাট ভূখণ্ড চীন এবং ভারত। ভারত কম্যুনিস্ট না হয়েও দেশের ধনদৌলত বাড়াতে চেয়েছে, আর চীন কম্যুনিজমের মাধ্যমে। এবং চীন যে বিশেষ সফল হয়নি এ কথা বিশ্বসুদ্ধ সবাই জেনে গিয়েছে। পক্ষান্তরে আমরা যে অনেক-

খানি এগিয়ে গিয়েছি সেও জানা কথা। আখেরে তা হলে আমরাই প্রাচ্য দেশগুলোর নেতৃস্থানীয় হবো। চীনের কর্তারা এটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছেন না।

তাই তাঁদের মতলব আমরা যেন আমাদের ধনদৌলত বাড়ানো বন্ধ করে বন্দুক-কামানের দিকে মন দিই। তাই নিয়ে চীনের কোনো আশঙ্কা নেই, কারণ চীন বিলক্ষণ জানে, আমাদের বন্দুক-কামান যতই বাড়ুক না কেন, আমরা কখনো চীন আক্রমণ করবো না। মাঝের থেকে বন্ধ্যা বন্দুক-কামানের সেবা করে আমাদের ধনদৌলত বৃদ্ধি ক্ষান্ত হবে।

দুঃখের বিষয়, আমাদের বন্দুক-কামান বাড়াতে হবে।

কিন্তু আমাদের ওয়ার এম্ চীনার বিনাশ-সাধন নয়। আমাদের ওয়ার এম্ অত্যন্ত লিমিটেড—সঙ্কটকালে আক্রমণকারীকে দেশ থেকে বিতাড়ন করা। এবং ভবিষ্যতে যেন সে দম্ভ-ভরে পুনরায় আক্রমণ করার সাহস না পায়। তার জন্যে বেশ কয়েক বৎসর ধরে বন্দুক-কামান বানাতে হবে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গরীব-দুঃখীর মুখে অন্ন তুলে দেবার জন্য আমাদের ধন-দৌলতও বাড়াতে হবে।

তাই বলছিলুম, রাঁধবো এবং চুলও বাঁধবো।

দ্য গল্

একপাল কাকের মধ্যিখানে ডাণ্ডা ছুঁড়ে মারলে যা হয়, কয়েক দিন পূর্বে ইউরোপামেরিকায় তাই হয়ে গেল। বারোয়ারী বাজার, বারোর হাট, যুক্তহট্ট —যা খুশি বলুন—তারই দিকে তাগ করে জেনেরাল শার্ল দ্য গল্ ইংরেজকে জল-চল করার বিরুদ্ধে যে ডাণ্ডাখানি হালে ছুঁড়লেন, তারই ফলে ইউরোপা-মেরিকায় তো কা-কা রব উঠেছেই, এদেশেও কা-কা রব ছাড়িয়ে উঠছে স্বস্তির প্রশ্বাস। এ অধম অর্থনীতির খবর রাখে যতখানি নিতান্ত না রাখলেই নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও সবিনয়ে বলবো, যত দিন যাচ্ছে ততই অর্থবিদ 'পানডিট'দের প্রতি ভক্তি আমার কমছে।[১] মূল বক্তব্য থেকে সরে যাচ্ছি, তবু এই সুবাদে নিবেদন, এদেশের কর্তারা যে ভয়ে আঁতকে উঠেছিলেন, ব্রিটন্ বারোর বাজারে ঢুকে পড়লে ভারতীয় মাল অনায়াসে ব্রিটেনে ঢুকতে

---

১ হিটলার এঁদের নিয়ে বড় মস্করা করতেন। তিনি বলেছেন, 'আমি যখন দেশের ভার কাঁধে নিয়ে বেকার-সমস্যা সমাধান করার জন্য কাজ আরম্ভ করলুম তখন দাড়িওলা অর্থবিদ অধ্যাপকরা ভল্যুম ভল্যুম কেতাব লিখে সপ্রমাণ করলেন, দেশের সর্বনাশ হবে। যখন সমাধান করে ফেললুম, তখন ফের ভল্যুম ভল্যুম কেতাব বেরোলো যাদের মূল বক্তব্য, "বলেছিলুম, তখনই বলেছিলুম, এই সমস্যার এই সমাধানই বটে"।' কেইনস্, শাখ্ট, শুমপেটার কজন?

পারবে না, আমার হৃদয় সে ভয়ে কম্পিত নয়। বস্তুত আমি কাফেরের মত বলবো, এই বিলিতী তথাকথিত সুখ-সুবিধেই আমাদের সর্বনাশ করছে। দুনিয়ার সর্বত্র আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নিজের মাল চালাবার চেষ্টা করছি নে। আমাদের লক্ষ্মীছাড়া ক্যাপিটালিস্টরা ইংরেজের হাতে সর্বস্ব সঁপে দিয়ে লক্ষ্মীলাভ করছেন। কিন্তু ওদেরই বা দোষ দিই কেন? স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বার বার এ নির্জন প্রান্তরে আমি চিন্তা করছিলুম, তাঁর সব কিছুই তো অল্পস্বল্প বুঝি, তাঁর 'রাজযোগ' আমার নিত্যপথ-প্রদর্শক,—কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় কথা, বড় কাজ কি ছিল? যে সিদ্ধান্তে পেঁছিলুম সেটি জড়ত্বনাশ। চিন্তায়, অনুভূতিতে এবং কর্মে আমরা জড় হয়ে গিয়েছি। বিশেষ করে কর্মে। গীতায় আছে, কর্মেই আমাদের অধিকার, ফলে নেই। আমরা গীতার উপর আরেক কাঠি সরেস হয়ে গেলুম। বললুম, 'কর্মেও আমাদের অধিকার নেই।'

'এতকাল উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা জাতের বুলবুলি এসে বেবাক ধান খেয়ে গেল, কারো হুঁস[২] ছিল না। জগতে যারা হুঁশিয়ার[৩] এরা তাদের কাছে ঘেঁষতে চায় না, পাছে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। কিন্তু তারা অকস্মাৎ এদের অত্যন্ত কাছে ঘেঁষে, এবং প্রায়শ্চিত্তও করে না। শিরোমণি-চূড়ামণির দল পুঁথি খুলে বলেন, বেহুঁশ[৪] যারা তারাই পবিত্র, হুঁশিয়ার যারা তারাই অশুচি, অতএব হুঁশিয়ারদের প্রতি উদাসীন থেকো, "প্রবুদ্ধমিব সুপ্তঃ"।'

সুপ্তি তবু ভালো। তার থেকে জাগৃতি আছে। কিন্তু জড়ত্বের কোনো ম্যাদ নেই।

এই জড়ত্বেরই অন্য শব্দ ক্লৈব্য।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ।"

পণ্ডিতজীও তাই উদ্বিগ্ন হয়ে বার বার বলছেন—'আমরা যেন কমপ্লেসেন্সের স্রোতে গা ঢেলে না দিই—ক্ষণতরে চীন এদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে বলে।' কমপ্লেসেন্স্ জড়ত্বেরই ভদ্র নাম।

আমাদের ছাত্রেরা গাইডবুক মুখস্থ করে পাস করে, আমরা—অধ্যাপকরা—ত্রিশ বৎসর পূর্বে কলেজে যা শিখেছিলুম তাই পড়িয়ে কর্তব্য সমাধান করি, আমাদের ধার্মিকজন কোনো এক গুরুতে আত্মসমর্পণ করে ধর্মজীবন পালন হল বলে আশ্বস্ত হন, যে-বই লিখে আমাদের সাহিত্যিক বিখ্যাত হন তিনি বার বার সেইটেরই পুনরাবৃত্তি করেন, আমাদের ফিল্ম-পরিচালকেরা একই প্লট সাতান্ন বার দেখান, এবং যে ব্যবসায়ীদের কথা নিয়ে এ-অনুচ্ছেদ আরম্ভ

২, ৩, ৪ বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী ষড়্‌বিংশ খণ্ডের ১৩১ পৃঃ থেকে আমি উদ্ধৃত করছি। কেউ বলতে পারেন রবীন্দ্রনাথ 'হুঁস', সঙ্গে সঙ্গে 'হুঁশিয়ার' এবং 'বেহুঁশ' লিখলেন কেন? খনে 'স' খনে 'শ'? স্পষ্টত একই মূল থেকে তিনটি শব্দ তো এসেছে।

করেছিলুম—একই বাজারে বছরের পর বছর মাল পাঠিয়ে পরমানন্দে শয্যায় গা এলিয়ে দেন। 'নব নব সংকটের অভিযানে' পদক্ষেপ করার জন্য যে বিধিদত্ত প্রাণশক্তি আমাদের রয়েছে সেটা জড়ত্বের বল্মীকে আচ্ছাদিত।

আমাদের 'জীর্ণ আবেশ' 'সুকঠোর ঘাতে' কাটাবার জন্য স্বামীজী এনেছিলেন 'জড়ত্ব-নাশা মৃত্যুঞ্জয় আশা'।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, স্বামীজীর উদ্দাম অফুরন্ত স্বতশ্চল প্রাণশক্তি দেখে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ভয় পেয়ে বললেন, 'এ আমি কি গড়লুম!' তাই সে 'ভুল শোধরাবার' জন্য তাঁকে তাড়াতাড়ি নিজের কাছে টেনে নিলেন। শংকরাচার্যকে যে-রকম টেনে নিয়েছিলেন, চৈতন্যকে যে-রকম।

* * *

আশা করি কেউ ভাববেন না দ্য গল্‌কে আমি চৈতন্য স্বামীজীর পর্যায়ে তুলছি: কিংবা আমি দ্য গলের গলে মালা পরাবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছি। স্বল্পবিস্তর নিবেদন করি।

ইংরেজের যে-রকম রাজকীয় সেণ্ডহার্স্ট সামরিক বিদ্যালয়, ফরাসীর তেমনি স্যাঁ সীর। দ্য গল সেখানে শিক্ষালাভ করেন। ছাব্বিশ বছর বয়সে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি জর্মনদের কাছে বন্দী হন। এই সময় বন্দী অবস্থায় তিনি জর্মন ভাষা শিখে নেন। হালে তিনি জর্মনগণ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে ঐ দেশ ভ্রমণের সময় একাধিক শহরে জর্মন ভাষায় বক্তৃতা দেন। ইতিপূর্বে ফ্রান্সের কোনো রাষ্ট্রপতি জর্মনীতে যাননি—নেপোলিয়নের কথা বাদ দিন, তিনি গিয়েছিলেন বিজেতারূপে—তার উপর ইনি বলছেন তাদেরই মাতৃভাষা, জর্মনরাতর। তাদের হর্ষধ্বনি বেতারে শুনেছি।

কিন্তু পুরানো কথায় ফিরে যাই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে তিন ফরাসী বীর দেশের সম্মান পেতেন। ফক, জফ্‌র এবং পেতাঁ। প্রথম দুজন মারা যাবার পর পেতাঁই ফ্রান্সের রক্ষণবিভাগের সর্বদায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, উত্তম অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত প্রাকার নির্মাণই ফ্রান্স সংরক্ষণের জন্য প্রশস্ততম—ফলে কোটি টাকা খরচা করে তৈরী হল মাজিনো লাইন—বহুশত বৎসর পূর্বে চীনারা যে-রকম দেওয়াল গড়েছিল।

দ্য গল্‌ ছিলেন পেতাঁর সহকর্মী। কিন্তু পদে পদে তিনি পেতাঁর সঙ্গে দ্বিমত। তিনি বার বার বলেছেন, এরকম পাঁচিল তুলে, জড়ভরতের মত পিছনে বসে থাকলে আত্মরক্ষা হয় না। পেতাঁ তাঁর কথায় কান দেননি।

তারপর যখন ১৯৪০-এ ফ্রান্স নির্মমভাবে পরাজিত হল তখন সবাই বুঝলো প্রাচীন যুগের দেয়াল-বাঁধার জড়ত্ব সত্য সংরক্ষণ নয়।

এইখানেই দ্য গলের মাহাত্ম্য!

॥ দুই ॥

ফরাসী বিদ্রোহ শেষ হলে পর এক ফরাসী নাগরিক জনৈক নামজাদা জাঁদরেলকে শুধোয়, 'মসিয়ো ল্য জেনারেল, এই যুগান্তকারী বিদ্রোহে আপনার ক'ন্ত্রিবিউসিয়োঁ—"অবদান"—কি ছিল?' মসিয়ো ল্য জেনেরাল গোঁফ মোচড়াতে মোচড়াতে সপ্রতিভ মৃদু হাস্য হেসে বলেছিলেন, 'পৈতৃক প্রাণটি বাঁচাতে সক্ষম হয়েছি।'

বাস্তবিকই তখন ঘড়ি ঘড়ি কর্ণধার বদল, এবং এক এক কর্ণধার প্রাক্তন অন্য কর্ণধারের কর্ণকর্তন করেই সন্তুষ্ট নন, কানের সঙ্গে মাথাও চান।[৫] হালে ইরাকে যা।

১৯১৮ এবং ১৯৪০-এর মাঝখানের সময়টাতে একই ধুন্ধুমার। তবে মাথা কাটাকাটি আর হত না। শুধু 'মন্ত্রিসভার পতন' নিয়েই উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট হতেন। এবং এ-সব পতন সর্বক্ষণ লেগে থাকত বলে ১৯৩৮-এ এক ফরাসী কাফেতে চুকুশ চুকুশ করতে করতে বলেছিল, 'এই প্যারিসেই অন্তত হাজার খানেক প্রাক্তন মন্ত্রী আছেন। একটু কান পাতলেই শুনতে পাবে, পাশের টেবিলে কেউ বলেছে, "ক'ৎ জেতে ল্য মিনিস্‌ৎর্"—আমি যখন মন্ত্রী ছিলুম—ইত্যাদি।' তারপর সেই ফরাসী আমাকে সাবধান করে দেয়, আমি যেন বেশী দিন ফ্রান্সে না থাকি; বলা-নেই কওয়া-নেই হঠাৎ হয়তো একদিন ক্যাক করে পাকড়ে নিয়ে মন্ত্রী বানিয়ে দেবে। তাঁর উপদেশ আমি পুরোপুরি নিইনি। তবে কাফেতে বসে প্রায়ই অজানা জনকে বলতুম, 'ক'ৎ জেতে ল্য মিনিস্‌ৎর্—আমি যখন মন্ত্রী ছিলুম—ইত্যাদি।' আশ্চর্য কারো চোখে অবিশ্বাসের আমেজ দেখিনি। ফরাসী কলনী আলজেরিয়া থেকে কালা আদমী ভী মসিয়ো ল্য মিনিস্‌ৎর্ হতে আপত্তি কি?

তা সে কথা থাক্।

আসল কথা হচ্ছে, দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে ইংরেজী, ফরাসী, জর্মন, ইতালিয়ানে বিস্তর বই বেরোয়, ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ কি তাই নিয়ে! এতদিন পর আমার আর ঠিক মনে নেই, তবে বোধ হয় মাদাম তাবুই লিখিত একখানা বই বাজারে বেশ নাম কেনে।

ইংরিজী অনুবাদে তার নাম ছিল, 'পেরফিডিয়াস আলবিয়েন অর্ আঁতাঁৎ-কর্দিয়াল?'—'বিশ্বাসঘাতক ইংরেজ কিংবা তার সঙ্গে দোস্তী?'

বৈঠে মেরেছি সমস্ত রাত; ভোরবেলা দেখি, বাড়ির ঘাটেই নৌকা বাঁধা। ব্যাপার কি? যে-দড়িতে নৌকা বাঁধা ছিল সেটা খুলিনি।

---

৫ ম্যাট্রিকের বাঙলা পরীক্ষায় একটি ছেলে লিখেছেন,

নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইলা
পদ নাক কান তাঁর

এও তাই। দ্য গল আবার ফিরে এসেছেন যেখানে মাদাম তাবুই আপন সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। এই লক্ষ্মীছাড়া ইংরেজকে বিশ্বাস করে তার সঙ্গে পাকাপাকি কোনো দোস্তী করা যায় কি না? পূর্বেই বলেছি, দুই যুদ্ধের মাঝখানে ফ্রান্সে এতই ঘন ঘন মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হত যে, ভেবেচিন্তে ইংরেজের সঙ্গে কোনো একটা চুক্তি—আঁতাঁৎ—করা, কিংবা আরো মনস্থির করে না-করা, কোনোটাই করা যেত না। মাদাম তাবুইয়ের বিশ্লেষণ—যতদূর মনে পড়ছে—একটু অন্য ধরনের ছিল। তিনি বলেছিলেন, উভয় দেশেরই দুর্ভাগ্য যে আমরা কোনো পাকাপাকি সমঝাওতায় আসতে পারছি না। তার কারণ, আমাদের এখানে যখন গরমপন্থীরা (কনজারভেটিভ) মন্ত্রিসভা গড়চেন, তখন বিলেতে নরমপন্থীরা (লিবরেল অথবা লেবার), এবং আমরা যখন নরম তখন ওরা গরম।

তা সে যে-কোনো কারণেই হ'ক, দুই যুদ্ধের মাঝখানে কোথায় না ফরাসী-ইংরেজ একজোট হয়ে বিশ্বশান্তির জন্য লীগ অব নেশন্‌স হ'ক, কিংবা অন্যত্রই হ'ক পাকা বুনিয়াদ গড়ে তুলবে, না আরম্ভ হল দু-জনাতে খ্যাচা-খেঁউ। এর উদাহরণ তো মাদাম তাবুই প্রচুর দিয়েছেন। তাঁর বই বেরোনোর পরের শেষ উদাহরণ আমরা দিই। হের হিটলার যখন সগর্বে সদম্ভে রাইনল্যাণ্ডকে সমরসজ্জায় সাজাতে আরম্ভ করলেন তখন ফ্রান্স আর্তকণ্ঠে সেদিকে ইংরেজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। ভের্সাইয়ের চুক্তি অনুযায়ী কথা ছিল, জর্মন এ কর্মটি করতে পারবে না, এবং সে চুক্তির বরাত ফরাসী ইংরেজ দুজনের উপর ছিল। ইংরেজ সে আর্তরব শুনে সাড়া তো দিলই না, উল্টে দেখা গেল, সে গোপনে গোপনে হিটলারের সঙ্গে একটা নৌচুক্তি করে বসে আছে। ইংরেজের দৃষ্টিভঙ্গী এস্থলে বোঝা কঠিন নয়—তা আপনারা সেটাকে 'বিশ্বাসঘাতকতা' 'পারফিডি' বলুন আর নাই বলুন। তার শক্তি জলে। হিটলার যদি তাকে কথা দেয়, সে সেখানে লড়ালড়ি করবে না, তবে চুলোয় যাক রাইনল্যাণ্ডের সমরসজ্জা।

তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এল। ফ্রান্স গেল। ব্রিটন যায়-যায়। প্রথমবারের মত এবারও মুশকিল-আসান মার্কিন সবাইকে বাঁচালে।

কোথায় না এখন এ-দুজাত শিখবে একজোটে কাজ করতে, যাতে করে ফের না একটা লড়াই লাগে, উল্টে দ্য গল লেগে গেলেন ইংরেজকে বাদ দিয়ে ইয়োরোপের উপর সর্দারী করতে!

দ্য গলের বিশ্বাস, ইংরেজ তার সর্বস্ব বেচে দিয়েছে মার্কিনের কাছে। তাই মার্কিন ইংরেজের কাঁধে ভর করে ইয়োরোপে নেবে সেখানে সর্দারী করতে চায়। পক্ষান্তরে ফ্রাঁস, লা ফ্রাঁস, তুজুর লা ফ্রাঁস। বাঙলা কথায়, সভ্যতা-ঐতিহ্য-বৈদগ্ধ্যের মক্কামদিনা ফ্রাঁস। ইয়োরোপ তথা তাবৎ দুনিয়ার কেউ যদি সর্দারী করার হক ধরে তবে সে ফ্রাঁস।

তাই তিনি করতে চাইলেন জর্মনীর সঙ্গে দোস্তী। তা তিনি করুন। খুব ভালো কথা। দোস্তী ভালো জিনিস।

তারপর তিনি হাত বাড়ালেন খ্রুশ্চফের দিকে। সেও ভালো কথা। আমরা —অন্তত আমি—রাশার শত্রু নই।

ইংরেজ চাইলে, চতুর্দিকে এত সব দেদার দোস্তী হচ্ছে, সে-ই বা বাদ যায় কেন? বারোয়ারী বাজারে সে-ই বা ঢুকবে না কেন?

দ্য গল মারলেন ইংরেজের গালে চড়।

এখন কি হবে?

আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি, ফ্রান্স যে সর্দারী করতে চাইছে তার মত কোমরের জোর তার নেই। জর্মনির সঙ্গে তার দোস্তীও বেশীদিন টিকবে না। কারণ জর্মনি চায়, পূর্ব-পশ্চিম জর্মনির সম্মেলন। রাশা তার প্রতিবন্ধক। দ্য গলকে একদিন তার বোঝাপড়া করতে হবে। তখন হয় জর্মনি না হয় রাশাকে হারাতে হবে! তখন কোথায় রইল ইয়োরোপের উপর সর্দারী?

তলস্তয়

"কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।" রবীন্দ্র-জীবনের সপ্ততি বৎসর পূর্ণ হলে শরৎচন্দ্র এ কথাটি বলেছিলেন। সমস্ত বাঙলা দেশ তখন জয়ধ্বনি করে এই বিস্ময়ে আপন বিস্ময় প্রকাশ করেছিল।

কবিগুরু তলস্তয়ের[১] মৃত্যু-সংবাদ যখন রুশ সাহিত্যের তখনকার দিনের শরৎচন্দ্র গর্কির কাছে পেঁছিল, তখন তিনি তাঁর শোকলিপি শেষ করার সময় লিখেছিলেন, 'তাঁর দিকে তাকিয়ে—যে আমি ঈশ্বর বিশ্বাস করি নে—মনে মনে বলেছিলুম "এই লোকটি ঈশ্বরের মত (গড-লাইক)"।'

প্রতি ধর্মেই একটি প্রশ্ন বার বার উঠেছে। ভগবান যখন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনা করতে চান, তখন তা করেন কোন্ পদ্ধতিতে? ভারতীয় আর্যরা উত্তরে বলেছেন, স্বয়ং ভগবান তখন মানুষের মূর্তি ধরে অবতাররূপে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধ এবং মহাবীর হয়তো নিজেরা এই মতবাদকে স্বীকৃতি দিতেন না, কিন্তু বহু বৌদ্ধ এবং জৈন ওঁদের পূজা করেন অবতার-রূপে এবং হিন্দুরাও বুদ্ধকে অবতারের আসনে বসাতে কুণ্ঠিত হননি।

সেমিতি জগতে বিশ্বাস, ভগবান তখন মানুষের মধ্যে একজনকে বেছে নিয়ে তাঁকে তাঁর 'প্রফেট', 'পয়গম্বর', 'রসুল', 'প্রেরিত পুরুষ' নাম দিয়ে নবধর্ম প্রচার করতে আদেশ দেন। ইহুদী এবং মুসলমানদের বিশ্বাস, এঁরা কখনো কখনো অলৌকিক দৈবশক্তির আধার হন, কখনো হন না।

খৃষ্টের আসন মাঝখানে। তিনি কখনো বা ঈশ্বরের পুত্ররূপে, কখনো ঈশ্বর-রূপে কখনো বা সুদ্ধমাত্র 'প্রেরিত পুরুষ' রূপে অর্ঘ্য পেয়ে থাকেন। ইসলাম তাঁকে অলৌকিক শক্তিধারী ('মুআজিজা বা 'মিরাকল' করার অধিকারী) পয়গম্বররূপে স্বীকার করে। খৃষ্ট যে অবতাররূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন, তার

---

১ লেয়ো নিকোলায়েভিচ তলস্তয়। জন্ম—ইয়াস্নায়া পলিয়ানা (তুলা) ৯-৯-১৮২৮; মৃত্যু আস্তাপভো (তামবভ) ২০-১১-১৯১০।

পিছনে হয়তো প্রাচীন ভারতীয় আর্যধর্মের প্রভাব আছে।

এ তথ্য প্রমাণ করা সহজ নয়, কিন্তু হিটাইটদের আমল থেকেই পূর্ব ভূমধ্য-সাগর তটাঞ্চলে আর্যপ্রভাব বিস্তৃত ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ভারতবর্ষে যে দুজন অবতার সর্বজননমস্য, তাঁরা শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ।

রামচন্দ্র রাবণকে শাসন করে দুষ্কৃতির বিনাশ করেন ও পুণ্যাত্মা জনের মনে সাহস বাড়িয়ে দেন। এবং এই সত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অস্ত্রধারণ করতে বিমুখ হননি। পরবর্তী যুগে বোধ করি প্রশ্ন উঠেছিল যে, সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রাণনাশ কি নিতান্তই অপরিহার্য? এ যুগে তাই দেখতে পাই মাইকেল যখন সীতাকে দিয়ে রামের বর্ণনা করাচ্ছেন তখন বলছেন, 'মৃগয়া করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীবননাশে সতত বিরত।'

কৃষ্ণ অবতীর্ণ হবার পূর্বে হয়তো প্রশ্নটা আরো সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ লক্ষ্য বা আদর্শ (এণ্ড) মহান হলেই কি যা খুশি সে পন্থা (মীনস্) অবলম্বন করা যায়? মহাভারতে তাই কি শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রধারণ করছেন না, কিন্তু অবশ অর্জুনকে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন?

এরপর বুদ্ধদেব। তিনি সর্ব অবস্থাতেই জীবননাশ করতে মানা করেছেন। কিন্তু রামকে যেরকম এক রাষ্ট্রের অধিপতিরূপে অন্য রাষ্ট্রের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কৃষ্ণকে যেরকম অধর্মচারী রাষ্ট্ররাজ দুর্যোধনের মোকাবেলা করতে হয়েছিল, বুদ্ধদেবকে সেরকম কোনো রাষ্ট্রের বৈরীভাবের বিরুদ্ধে সম্মুখীন হতে হয়নি। সমাজের ভিতর ব্যক্তিগত জীবনে প্রাণনাশ না করেও প্রাণধারণ করা অসম্ভব নয়, কিন্তু যদি বর্বর প্রতিবেশী রাষ্ট্র এসে লুণ্ঠন, নরহত্যা, ধর্ষণ ও অন্যান্য পাপাচারে লিপ্ত হয়, তবে কি আক্রান্ত নৃপতি ক্ষমা ও মৈত্রী নীতি অবলম্বন করে নিষ্ক্রিয় তুষ্ণীম্ভাব দ্বারা রাজধর্ম প্রতিপালন করবেন?

বুদ্ধদেবের পর খৃষ্ট যখন সে যুগের অধর্মাশ্রিত রাষ্ট্রগঠন প্রেম ও মৈত্রী দ্বারা পরিবর্তিত করতে চাইলেন, তখন দ্বন্দ্ব বাধলো সে রাষ্ট্রের স্তম্ভদ্বয় ধনপতি ও ধর্মাধিকারীদের সঙ্গে। তিনি অস্ত্র ধারণ করতে অসম্মত হন। ক্রুশের উপর তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। (পাঠক কিন্তু ভাববেন না, তাই বলে খৃষ্টধর্ম প্রচারে বাধা পড়ে গেল—বস্তুত খৃষ্টান মাত্রেরই বিশ্বাস, প্রভু যীশু ক্রুশে জীবন দেওয়াতেই তাঁর বাণী জনগণের সম্মুখে জাজ্বল্যমান হল, তাঁর জীবন-দানের ফলেই আমরা জীবন লাভ করলুম, কিন্তু এ প্রস্তাবনা আমাদের বর্তমান আলোচনায় অবান্তর।)

এরপর ঐ সেমিতি জগতেই হজরৎ মুহম্মদ। মক্কাতে যতদিন ছিলেন, ততদিন তিনি অস্ত্রধারণ করেননি। মক্কার রাষ্ট্রপতিরা যখন তাঁকে মেরে ফেলা সাব্যস্ত করলেন, তখন তিনি মদিনার নাগরিকদের আমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে তাদের দলপতি হলেন—তারা অস্ত্রধারণে পরাঙ্মুখ ছিল না।[২]

---

২ বার্নার্ড শ খৃষ্ট মুহম্মদের এক কাল্পনিক কথোপকথনের বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর অতুলনীয় ভঙ্গীতে।

আপন ধর্মকে উচ্চতর আসনে বসানোর জন্য কোনো কোনো অমুসলমান ধর্মযাজক হজরৎ মুহম্মদকে রক্তলোলুপ উৎপীড়করূপে অঙ্কিত করেছেন (যেন অন্যের পিতার নিন্দাবাদ না করে আপন জনকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা যায় না।) কিন্তু তার চেয়েও বেশী ক্ষতি করেছে লুণ্ঠনকারী বর্বর নামে মুসলমানরা তুর্ক অভিযানকারীরা (এস্থলে ফিরোজ, আকবরের কথা হচ্ছে না)। বার্নার্ড শ মুহম্মদ-চরিত মন দিয়ে পড়েছিলেন বলে তাঁর এক কাল্পনিক কথোপকথনে এ সম্বন্ধে একটি মন্তব্য করেছেন। মুহম্মদকে দিয়ে বলাচ্ছেন, "I have suffered & sinned all my life through an infirmity of spirit which renders me incapable of slaying."

বস্তুত নানাদিক দিয়ে দেখতে গেলে হজরৎ মুহম্মদ শ্রীরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের মাঝখানে আসন নেন (এঁরা গীতা ও কুরান দিয়ে গিয়েছেন) এবং মোদ্দা কথা এই দাঁড়ায় যে, রাষ্ট্র যখন তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করল, তখন তিনি যুদ্ধ করতে পরাঙ্মুখ না হয়ে 'শর সংহরণে' প্রস্তুত রইলেন। মহাপুরুষ মুহম্মদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পূর্ণতম বিকাশ দেখতে পাই বিরুদ্ধাচরণকারীর সম্মুখে সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করার সময়।

এরপর তেরশত বৎসর ধরে কেউ আর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তাব উত্থাপন করেনি। পাণ্ডা পুরোহিতদের টীকা-টিপ্পনীর ভিতর খৃষ্টের বাণী নানা বিকৃত রূপ ধারণ করল – পাদ্রী সায়েবরা প্রতি যুদ্ধে পরমোৎসাহে বন্দুক কামান মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা পূত-পবিত্র করে যুদ্ধে পাঠালেন।

এযুগে তলস্তয়ই পুনরায় খৃষ্টকে আবিষ্কার করলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে সমাজে তথা সাহিত্যে[৩] সম্পূর্ণতম খ্যাতি অর্জন করার পর তিনি করলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত ইউরোপীয় সভ্যতা-বৈদগ্ধ্যের মূলে কুঠারাঘাত। তার অর্থনীতি, সাহিত্য, সমাজ এবং বিশেষ করে ধর্ম—

"Who is to be the judge of our fitness to live? said Christ. "The highest authorities, the imperial governors, and the high priests find that I am unfit to live. Perhaps they are right."

"Precisely the same conclusion was reached concerning myself", said Muhammad. "I had to run away and hide until I had convinced a sufficient number of athletic young men that their elders were mistaken about me: that, in fact, the boot was on the other leg."

Bernard Shaw, The Black Girl in Search of God, P. 57.

৩ যাঁরা নোবেল প্রাইজের নাম শুনলেই চৈতন্য হারান তাঁদের বলে দেওয়া ভালো যে, ঐ প্রাইজ যদিও ১৯০১ খৃঃ থেকে দেওয়া আরম্ভ হয়, ও তলস্তয় ১৯১০-এ গত হন, তিনি এটি পাননি।

এগুলোর পিছনে যে কত বড় ভণ্ডামি লুকানো রয়েছে, সেটা দেখাতে গিয়ে তিনি যে দার্ঢ্য, মেধা ও কঠোর সত্যনিষ্ঠা দেখালেন, তার সামান্যতম বর্ণনা দেওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। 'ওয়র এণ্ড পীস' তিনি লিখেছিলেন হীরার কলম নিয়ে সোনার কালি দিয়ে—আর তাঁর জীবনের এই চরম উপলব্ধি তিনি লিখলেন দধীচির অস্ত্র-নির্মিত দমশ্‌কী তলওয়ার দিয়ে আপন বুকের রক্ত মাখিয়ে।

'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ মহাপাপ' তাঁর এ-বাণী 'দুখবর' সম্প্রদায় মেনে নিয়েছিল এবং বহু দুখবরণ করার পর তলস্তয়েরই সাহায্যে নির্বাসন স্বীকার করে মাতৃভূমি ত্যাগ করে। শেষ পরীক্ষা সেখানে হয়নি।

রুশ রাষ্ট্র তলস্তয়কে কখনো সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করেনি ব'লে বলা অসম্ভব, তাঁকে শেষ পর্যন্ত ক্রুশবরণ করতে হত কি না। তবে একথাও ঠিক, আপন আদর্শের চরম মূল্য দেবার জন্য তিনি আত্মজন পরিত্যাগ করে পথপ্রান্তের অবহেলায় প্রাণত্যাগ করেন।

তলস্তয়-কাহিনী এখানেই হয়তো শেষ, কিন্তু সেই চিরন্তন কাহিনী আরো এগিয়ে গিয়েছে এবং কখনো শেষ হবে কিনা জানি নে।

গাঁধীকে বহু অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন তলস্তয়। তিনিই এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম, যিনি বিদেশী পাপী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র সংগ্রাম করে জয়লাভ করেন।

আবার এটম বোমা তৈরী হচ্ছে।

প্রিন্স গ্রাবিয়েলে দ'আন্নুন্‌জিয়ো

গ্রীকের উত্তরাধিকারী লাতিন। লাতিন তার অনুপ্রেরণা, প্রাণরস, কলাসৃষ্টির আদর্শ ও তাকে মৃন্ময় করার পদ্ধতি সব কিছুই নিয়েছে গ্রীক থেকে। বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যও সংস্কৃতের এতখানি পদাঙ্ক অনুগমন করেনি। বরঞ্চ বলবো উর্দুর সঙ্গে ফার্সীর যে সম্পর্ক, লাতিনের সঙ্গে গ্রীকের তাই। অহমিয়ারা যদি রাগ না করেন তবে বলবো, বাঙলা ও অহমিয়ার মধ্যে ঐ সম্পর্কই বিদ্যমান, যদিও বাঙলার মৃত্যু হওয়ার পর অহমিয়া তার উত্তরাধিকারী হয়নি—বাঙলা তার উৎকর্ষের এক বিশেষ চরম স্তরে পেঁছিনোর পর অহমিয়া তার রস-সৃষ্টিতে বাঙলা সাহিত্যকে তার আদর্শরূপে ধরে নেয় (এখানে বুরুঞ্জী বা দলিল-দস্তাবেজের গদ্যের কথা হচ্ছে না)।

বহুশত বৎসর ধরে লাতিন পাশ্চাত্ত্যভূমির সর্ব চিন্তা সর্ব অনুভূতির মাধ্যম ছিল। এমন কি লাতিনের উত্তরাধিকারী ইতলীয়, ফরাসী, স্প্যানিশ ইত্যাদি ভাষা পূর্ণ সমৃদ্ধি পাওয়ার পরও—এমন কি গত শতাব্দীতেও, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা যখনই চেয়েছেন যে তাবৎ ইয়োরোপ তাঁদের রচনার ফললাভ করুক তখনই তাঁরা আপন আপন মাতৃভাষা—জর্মন, ফরাসী ইত্যাদি না লিখে লিখেছেন লাতিনে। ইবন খলদুনের (ইনি মার্কসের বহু পূর্বে ইতিহাসের অর্থনৈতিক

কারণ অনুসন্ধান করেছিলেন) আরবী পুস্তকের অনুবাদক মাতৃভাষা ব্যবহার না করে খলদুনের 'মোকদ্দমা'—'প্রলেগমেনন' অনুবাদ করেছেন লাতিনে। এ শতাব্দীতেও জলালউদ্দীন রুমীর ফার্সী থেকে ইংরিজীতে তর্জমা করার সময় ইংরেজ তথাকথিত অশ্লীল অংশগুলো অনুবাদ করেছেন লাতিনে—উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল অপ্রাপ্ত-বয়স্কের হাতে এ বই পড়লে তারা যেন বুঝতে না পারে।

খাস লাতিনের জন্মভূমি ও লীলাস্থল যদিও ইতালীতে এবং ইতালীয় সাহিত্যের অতি শৈশবাবস্থায়ই দান্তের মত অতুলনীয় মহাকবির আবির্ভাব, তবু কার্যত দেখা গেল লাতিনের অন্য উত্তরাধিকারী ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য যেন তাকে ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। তার অন্যতম কারণ অবশ্য এই হতে পারে যে, ইতালীয়রা তখন শুধু সাহিত্য নয়, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারুশিল্পেও আপন সৃজনীশক্তির বিকাশ করছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্যারিস ক্রমে ইয়োরোপের কলাকারদের মক্কা হয়ে দাঁড়ায়। ঐ সময় রুশের তুর্গেনিয়েফ, জর্মনির হাইনে, পোলাণ্ডের শোপা, এমন কি ইতালীর রসসীনি—এঁরা সকলেই প্যারিসে বসবাস করতেন।

এর পরই ফরাসীতে যাকে বলা হয় ফ্যাঁ দ্য সিয়েক্‌ল্‌—'শতাব্দীর সূর্যাস্ত'।

দ'ান্নুন্‌দ্‌জিয়ো খ্যাতিলাভ করেন ঐ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে—কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকাররূপে এবং কর্মযোগী—ফিউমের 'রাজা'রূপে তিনি খ্যাতির চূড়ান্তে ওঠেন ১৯১৯এ, অর্থাৎ আমাদের শতাব্দীতে। আরবী ভাষায় এঁদের বলা হয় 'জু অল্‌ করনেন'—'দুই শতাব্দীর অধিপতি'।

বহু রাগরঙ্গে রঞ্জিত বৈচিত্র্যপূর্ণ এঁর জীবন। ইস্কুলে থাকাকালীন তিনি তাঁর প্রথম কবিতার বই প্রকাশ করে রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে রোমে এসে ছোট গল্প, উপন্যাস, নাট্য তিন ক্ষেত্রেই তিনি অতুলনীয় বলে স্বীকৃত হলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি পদাতিক, নৌবাহিনী ও বিমান-বহরে সর্বত্রই সমান খ্যাতি অর্জন করেন। বিশেষ করে বিমান পরিচালনায়। আজ যেটাকে স্টান্ট্‌ ফ্লাইং বলা হয়, তার প্রধান পথপ্রদর্শক দ'ান্নুন্‌দ্‌জিয়ো। অমর খ্যাতির জন্য তাঁর এমনই অদম্য প্রলোভন ছিল যে, তার জন্য তিনি সর্বদাই প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তারপর মিত্রশক্তি যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফিউমে বন্দরকে ইতালী থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইলেন, তখন কবি দ'ান্নুন্‌দ্‌জিয়ো তাঁর রুদ্রতম রূপ ধারণ করলেন। ফিউমে বন্দর দখল করে তিনি সেখানে এক রাজ্য স্থাপনা করে নিজেকে 'অধিপতি রূপে ঘোষণা করলেন। কবি, সৈনিক, নেতা তিন রূপেই তিনি স্বপ্রকাশ হলেন। মাত্র ১৫ মাস তিনি সেখানে 'রাজত্ব' করেছিলেন বটে, কিন্তু ইতালীর লোক আজও তাঁকে 'ফিউমের বীর', জাতির গর্বরূপে স্বীকার করে।

প্রেমের জগতেও দ'ান্নুন্‌দ্‌জিয়ো অভূতপূর্ব কীর্তি রেখে গেছেন। লোকে বলে, তিনি নাকি একসঙ্গে পাঁচটি রমণীর সঙ্গে প্রেম করতে পারতেন। একসঙ্গে পাঁচসেট প্রেমপত্র লিখেছেন (কু-লোকে বলে, সেক্রেটারীকে ডিক্‌টেট করতেন)

এবং প্রত্যেক সেটই একেবারে অরিজিনল, অন্যান্য সেট থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস 'লে ভের্জীনি দেল্লে রক্কে' 'গিরিকুমারীত্রয়'-এ। সেখানে উপন্যাসের নায়ক কিছুতেই মনস্থির করতে পারছেন না, তিন নায়িকা, আনাতোলিয়া, ভিয়োলান্তে, মাসসিমিল্লা, কাকে তিনি বরণ করবেন। এ উপন্যাসটি পড়ে আমার মনে হয়েছিল, তাঁর পক্ষে একই সময়ে এই তিনজনকে তিন ধরনের প্রেমপত্র লেখা মোটেই অসম্ভব নয়। কারণ এই তিন বোনের চরিত্র তিনি এমনই অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন, দৃঢ় রেখায় অংকন করেছেন যে, প্রত্যেকটি চরিত্র আপন মহিমায় স্বপ্রকাশ। তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে তিন ধরনের প্রেমপত্র লেখা চারুশিল্পী দ'ান্নুন্দ্জিয়োর পক্ষে অসম্ভব তো নয়ই, খুবই সহজ বলতে হবে।

দ'ান্নুন্দ্জিয়ো চরিত্র বুঝতে ভারতবাসীর খুব অসুবিধা হয় না। কিছুদিন পূর্বেও আমরা পরাধীন ছিলুম। আমরা যদি হটেনটট বা বণ্টুর মত ঐতিহ্য-সভ্যতা-সংস্কৃতিহীন জাত হতুম, তা হলে আমাদের অপমানবোধের বেদনা এতখানি নির্মম হত না। ফ্যাঁ দ্য সিয়েক্‌লে ইতালী স্বাধীন বটে, কিন্তু সে তখন তার গৌরবময় নেতার আসন ছেড়ে দিয়েছে ফ্রান্স, জর্মনি, ইংলণ্ডকে। এমন কি যে অন্নবস্ত্র সমস্যা তাকে তখনো (এখনো) কাতর করে রেখেছে—সেটাকে ঐতিহ্যহীন সুইটজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে ততদিনে সমাধান করে ফেলেছে। জাত্যভিমানী স্পর্শকাতর ইতালীয় মাত্রই যখন দেখত প্রতি বছর হাজার হাজার ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন তার প্রাচীন কীর্তিকলা দেখবার জন্য রোম নেপল্‌স্ ভেনিস পরিক্রমা করে, গ্যোটে বায়রন কেউই বাদ যান না[১] এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখে ছিন্নবস্ত্র, নগ্নপদ আপন ইতালীয় ভ্রাতা

---

১ এবং এ যুগে—

ইটালিয়া

কহিলাম, "ওগো রাণী,
কত কবি এল চরণে তোমার উপহার দিল আনি।
এসেছি শুনিয়া তাই,
ঊষার দুয়ারে পাখির মতন গান গেয়ে চলে যাই।"

রবীন্দ্রনাথ, পূরবী।

পক্ষান্তরে ইতালীয় কবি ফিলিকাজা গেয়েছেন—

ইতালি, ইতালি! এত রূপ তুমি
কেন ধরেছিলে হায়!
অনন্ত ক্লেশ লেখা ও-ললাটে
নিরাশার কালিমায়।

সত্যেন দত্তের অনুবাদ

(Italia, Italia, o tu cui feo la sorte.)

এঁদের কাছে ভিক্ষা চাইছে, তখন ঐতিহ্যচেতন ইতালিয়ার মরমে মরাটা কি হৃদয়ঙ্গম করাটা আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন? দ'ান্নুন্দ্জিয়ো তাঁর দেশকে ভালোবাসতেন শুধু তার পূর্ব গৌরব, প্রাচীন ঐতিহ্যের জন্যই নয়, তাঁর সদাজাগ্রত পঞ্চেন্দ্রিয় অহরহ তাঁকে সচেতন রাখতো দেশের অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে। ভেনিস দেখে বহু দেশের বহু কবি আপন মাতৃভাষায় তার প্রশস্তি গেয়েছেন, কিন্তু দ'ান্নুন্দ্জিয়োর উপন্যাস 'ইল্ ফুয়োকো'—'অগ্নিশিখা', 'ফ্লেম অব লাইফে'—তাঁর যে বর্ণনা এবং দরদবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, সে জিনিস ইতালীয় সাহিত্যে অতুলনীয় তো বটেই, অন্য সাহিত্যেও আছে কিনা সন্দেহ—অন্তত আমার চোখে পড়েনি।

ইয়োরোপে রেনেসাঁস যাঁরা আনয়ন করেন, তাঁদের শেষ প্রতিভূ দ'ান্নুন্দ্জিয়ো। মাঝখানে কত শত বৎসরের ব্যবধান, তবু তাঁর লেখা পড়ে মনে হয়—এবং যাঁরা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন তাঁরা বলেছেন তাঁর কথাবার্তা শুনে মনে হত—তিনি কি স্বচ্ছন্দে রেনেসাঁস সৃষ্টিকর্তা অতিমানবদের মধ্যে বিচরণ করেছেন। ওদিকে তিনি নিজেও মনে করতেন যে, তিনি প্রাচীন গ্রীক ক্লাসিক্সের পরবর্তী পুরুষমাত্র। একটি ফোয়ারার বর্ণনা দিতে গিয়ে দ'ান্নুন্দ্জিয়ো সে ফোয়ারার পাথরে খোদাই কতকগুলি লাতিন প্রবাদ তুলে দিয়েছেন। লাতিন অনেকখানি পড়া না থাকলে এরকম একটি অনবদ্য সংকলন অসম্ভব।

কর ত্বরা, ওগো,
তোল ফুলগুলো
ভরা মধু গন্ধে।
পলাতকা ঐ
মুহূর্তগুলির
পরা নীবিবন্ধে॥

PRAECIPITATE MORAS,
VOLUCRES CINGATIS,
UT HORAS NECTITE FORMOSAS, MOLLIA SERTA, ROSAS.

Hasten, hasten! Weave garland of fair roses to girdle the passing hours.

সেই ফোয়ারার জল নিচের আধারে জমেছে; সে বলছে:—

জীবন সলিল
পান করিবে কি?
এ যে বড় মধুভরা—
আঁখিজলে করো
লবণসিক্ত
তবে হবে তৃষা-হরা॥

FLETE HIC OPTANTES. NIMIS ESS ACQUA DULCIS AMANTES. SALSUS, UT APTA VEHAM, TEMPERE HUMOR EAM.

Weep here, ye lovers who come to slake your thirst. Too sweet is the water. Season it with the salt of your tears.

গ্রীক এবং লাতিন থেকে তিনি নিয়েছিলেন তাঁর ভাষার অলংকার। আজ যদি বাংলাতে কেউ পদে পদে কালিদাস শূদ্রকের মত উপমা ব্যবহার করতে পারেন এবং সে তুলনাগুলো হয় এ যুগের বাতাবরণেরই—কারণ দ'ান্নুন্দ্জিয়ো ক্লাসিক্সে নিমজ্জিত থাকা সত্ত্বেও নিশ্বাস নিতেন বর্তমান যুগের আবহাওয়া থেকে—তা হলে তার সঙ্গে দ'ান্নুন্দ্জিয়োর তুলনা করা যাবে। এ যুগের লেখকদের মধ্যে প্রধানত নীৎশে, শোপেনহাওয়ার, দস্তেয়ফস্কি এবং সুরকারদের মধ্যে ভাগনার তাঁর উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

তাই এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে 'অতিমানব', 'সুপারম্যান' বা 'য়্যুবারমেনশে'র যে ধারণা ফিষটে দিয়ে আরম্ভ হয় এবং কার্লাইল মাদ্জানি হয়ে নীৎশেতে পেঁছিয়—যার সাহায্যকারী ছিলেন ট্রাইশকে, কীপলিং, হাউস্টন, চেম্বারলেন এবং বের্গসোঁ—দ'ান্নুন্দ্জিয়ো এঁদেরই একজন। এঁরা সকলেই যে সুপারম্যান চেয়েছেন তা নয়, কেউ কেউ চেয়েছেন, সুপাররেস—শ্রেষ্ঠ জাতি, যেমন হিটলার চেয়েছিলেন 'হেরেন-ফল্ক্' 'প্রভুর জাত'—কেউ কেউ চেয়েছেন সুপারস্টেট।

রাস্ল্ বলেন, 'তবু ফিষটে, কার্লাইল, মাদ্জীনিতে মুখের মিষ্টি কথায় কিছুটা নীতির দোহাই আছে, কিন্তু নীৎশেতে এসে তাও নেই।[২] সেখানে উলঙ্গ রুদ্ররূপে 'সুপারম্যানে'র আপন শক্তিসঞ্চয়ই সর্বপ্রধান কর্তব্য, 'স্বধর্ম'। হিটলারের গ্যাস চেম্বার তারই এক কদম পরে।

আমার মনে হয়, দ'ান্নুন্দ্জিয়ো এসব কট্টরের সমধর্মী নন। তাঁর ভিতরকার আর্টিস্টই বোধ হয় তাঁকে সে বর্বরতা, নৃশংসতা থেকে বাঁচিয়েছে। পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে যে রসিক প্রতি মুহূর্তে পঞ্চভূতকে নিঃশেষে শোষণ করেছে, যার রচনার প্রতিটি ছত্রে প্রতিটি শব্দে রূপরসগন্ধস্পর্শধ্বনির সমাবেশ, তুলনা-ব্যঞ্জনা মধুরতম সামঞ্জস্য যার অরুণ-নিটোল সুডৌল নির্মাণপদ্ধতিতে—সে সৃষ্টিকর্তাকে কোনো বিশেষ পর্যায়ে ফেলা যায় না।

দ'ান্নুন্দ্জিয়োর সৃষ্টিতে আমি যদি কোনো ত্রুটি লক্ষ্য করে থাকি তবে সেটা মাধুর্যের অতিরিক্ততায়—'কাদম্বরীতে' যে-রকম।[৩]

---

২ বার্ট্রাণ্ড রাস্ল—দি এনসেস্ট্রী অব ফ্যাসিজ্ম্।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, 'দেবপ্রিয়' 'বিধিদত্ত' 'সকলের সেরা জাতের' ধারণা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ইহুদীরাই সৃষ্টি করে। সে ধারণার দলিলে বাইবেল ভর্তি। খৃষ্ট তার প্রতিবাদ করেন।

৩ প্রিন্স গ্রাবিয়েলে দ'ান্নুন্দ্জিয়ো—১২ই মার্চ, ১৮৬৩—১লা মার্চ, ১৯৩৮

খৈয়ামের নবীন ইরানী সংস্করণ

গিয়াস্-উদ্-দীন আবু-ল ফৎহ্ ওমর ইব্‌ন্ ইব্রাহীম অল খৈয়াম প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যে সুপরিচিত। তাঁকে নিয়ে ইরানের ভিতরে বাইরে সর্বত্র আজও পূর্ণোদ্যমে নানাপ্রকারে গবেষণা চলছে। এবং অত্যধিক গবেষণার মন্থনে যে বিষ ওঠে, তাও দেখা দিয়েছে। কোনো কোনো জর্মন গবেষক বলেন, 'খৈয়াম নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক ছিলেন, কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু সে খৈয়াম কোনো কবিতা রচনা করেননি।' জনৈক রুশ গবেষক বলেন, 'কিন্তু খৈয়ামের ঠিক পরবর্তী যুগের ইতিহাসে যে এই বাক্যটি পাচ্ছি—"তিনি খুরাসানের কবিদের অন্যতম"—এটার অর্থ কি?' তাই বোধ হয় জনৈক ভারতীয় পণ্ডিত—তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বললেও অত্যুক্তি হয় না—মাত্র নয়টি রুবাইয়াৎ[১] (চতুষ্পদী) ওমরের বলে নিঃসন্দেহে স্বীকার করেছেন। অথচ পার্টিশনের পূর্বেও কলকাতার তালতলায় যে বটতলা সংস্করণ খৈয়ামের রুবাইয়াৎ পাওয়া যেত তাতে থাকতো প্রায় বারো-শ'টি।[২] তবে অতিশয় এক-নজর ফেললেও ধরা পড়ে, এর শত শত রুবাইয়াৎ ইরানের একাধিক কবির কাব্যসংকলনে—বিশেষত হাফিজের—ওদেরই নামে চলেছে। কোনো কোনো রুবাঈ (রুবাইয়াতের একবচন) তো পাওয়া যায় দু' তিন চার কিংবা ততোধিক কবির কাব্যে। এক জর্মন পণ্ডিত তাই এক বিরাট নিঘণ্টু (কনকরডেন্স, ক্রস্‌রেফরেন্স সম্বলিত কার্ড-ইনডেক্স—যা খুশি বলুন) নির্মাণ করেছেন। খৈয়ামের নামে প্রচলিত প্রত্যেকটি রুবাঈ কোন্ কোন্ কবির কাব্যেও আছে তারই পরিপূর্ণ ফিরিস্তি। টাইমটেবিলের মত কলামের পর কলাম গেঁথে গেঁথে পাতার পর পাতা।

আমাদের মত সাধারণ পাঠক ভীত হয়ে সে রণাঙ্গন পরিত্যাগ করে।

কিন্তু আমাদের দলটি নিতান্ত ছোট নয়। এমন কি, আশ্চর্যের বিষয়, খুদ খৈয়ামের দেশে ইরানেও আমাদের মত বিস্তর নিরীহ পাঠক আছেন, যাঁরা কোন্ রুবাঈটি খাঁটি আর কোন্‌টা মেকী তাই নিয়ে কালক্ষেপ করতে চান না।

এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, ফিট্‌স্‌জেরাল্ড যে কটি রুবাইয়াৎ অনুবাদ করেছেন তার কতগুলো ওমরের নয়। তৎসত্ত্বেও ইরানে তাঁরই উপর নির্ভর একটি খৈয়াম সংস্করণ বেরিয়েছে।

কিন্তু এই সংস্করণের আরো বৈশিষ্ট্য আছে।

এদেশে ফরাসী জর্মন শেখার প্রতি অনেকের উৎসাহ দেখা দিয়েছে।

---

১ তাপসী রাবেয়া নাম এদেশে অজানা নয়। তার অর্থ 'চতুর্থ কন্যা'। 'রুবাইয়াৎ', 'রাবেয়া' ইত্যাদি শব্দ আরবী, 'আরবাৎ' অর্থাৎ 'চার' থেকে এসেছে।

২ ইরানে ১৪০১ পর্যন্ত পাওয়া যায়। ১২০৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ খৈয়ামের মৃত্যুর প্রায় ৮৮ বৎসর পরে লিখিত এক পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় ২৫১টি—এটি এখন অক্সফর্ডে।

খৈয়ামের এই ইরানী সংস্করণে আছে ঃ ১) ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের ইংরিজি অনুবাদ, ২) সেই অনুবাদের যতটা কাছাকাছি পাওয়া যায় তারই ফার্সী মূল (ফিট্‌স্‌জেরাল্ড অনেক সময় ভাবানুবাদ করেছেন বলে বলা কঠিন, ঠিক কোন্ ফার্সী রুবাঈটি অনুবাদ করেছেন, আবার এমনও দেখা যায়, একাধিক রুবাইয়াৎ থেকে তিন-চারটি ছত্র যোগাড় করে ইংরিজি একটি কোয়াট্রেন 'সৃষ্টি' করেছেন), ৩) ফরাসী অনুবাদ—কখনো মূল ফার্সির অনুবাদ অর্থাৎ ফিট্‌স্‌জেরাল্ড যে স্বাধীনতা নিয়েছেন অনুবাদক তা নেননি, আর কখনো বা ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের ইংরিজি থেকে ফরাসী অনুবাদ, ৪) জর্মন অনুবাদ—একাধিক জর্মন অনুবাদ থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে, এবং ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের অনুকরণ এঁরা প্রায়ই করেন নি, ৫) আরবী অনুবাদ সরাসরি ফার্সী থেকে, তবে অনেক স্থলেই স্বাধীন। অনুবাদ করেছেন এক আরব কবি যদিও তিনি জাতে ইরানী।

এ ছাড়া সংকলনে কয়েকটি মূল্যবান অবতরণিকাও একাধিক ভাষায় সংযোজিত হয়েছে। বিখ্যাত জর্মন ফার্সীবিদ্ রোজেন, ফিট্‌স্‌জেরাল্ড, আরব পণ্ডিত আদীব অলতুগা, ইরানী পণ্ডিত হিদায়ৎ ও সঈদ নফীসী (ইনি কয়েক বৎসর ভারতে বাস করে গেছেন) এঁদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পড়ে খৈয়ামপ্রেমী পাঠক মাত্রই মুগ্ধ হবেন। অবশ্য ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের অবতরণিকা পড়া হয় 'পুরাতত্ত্ব' হিসেবে।

আমরা যখন ফরাসী বা জর্মন কোনো নূতন ভাষা শিখতে যাই তখন আমাদের হাতে দেওয়া হয় যে পাঠ্যপুস্তক তাতে থাকে ঘরের আসবাবপত্রের নাম, পিতা-মাতা-ভ্রাতার প্রতিশব্দ, স্টেশন, টিকিট, প্ল্যাটফর্ম, খাদ্যাদি, বাগানের সাজসরঞ্জামের যাবতীয় জিনিসপত্র এদের নাম, লিঙ্গ ইত্যাদি ইত্যাদি। এতে বয়স্ক পড়ুয়ারা—এবং আমরা সচরাচর একটু বয়েস হওয়ার পরেই এ-সব ভাষা আরম্ভ করি—পায় অল্পই মনের খোরাক। লাগে একঘেয়ে—শিখে যাই গতানুগতিক ভাবে। আমি জানি একেবারে গোড়ার থেকে মন এবং হৃদয়েরই খাদ্য দেওয়া যায় না—কিন্তু কিছুটা শেখার পরেই তো মৃন্ময় বিষয়বস্তু থেকে চিন্ময়ে চলে যাওয়া অসম্ভব নয়। বয়স্কদের জন্য এরকম পাঠ্যপুস্তক বিদেশে আমি দু'একখানা দেখেছি। এস্থলে আমার মূল বক্তব্য এই, আট বছরের বাঙালী ছেলে ফরাসী শিখতে চাইলে তার পাঠ্যপুস্তক হবে একরকম, আঠারো বছরের কিশোর শিখতে চাইলে হবে অন্যরকম।

যাদের কিছুটা ফরাসী বা জর্মন, অথবা উভয়েরই কিছুটা শেখা হয়ে গিয়েছে—আর খৈয়ামে আসক্তি থাকলে তো কথাই নেই—তাঁরা এই সংকলনটি পড়ে আনন্দ তো পাবেনই, ভাষা-শিক্ষার কাজও অনেকখানি দ্রুত এগিয়ে যাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা ওমরের সবচেয়ে পরিচিত চতুষ্পদীটি নিচ্ছি ঃ···

ফার্সীতে আছে—

গর দস্ত দহদ জ্ মগজে গন্দুমে নানী
ওজ্ মৈ দোমনী জ্ গুসফন্দী রানী

ও আনগে মন ও তো নিশসস্তে দর ওয়রানী
ত্রয়েশী বুদ ওয়া আন নহদ-হর সুলতানী

Here with a Loaf of Bread beneath the Bough
A Flask of Wine, a Book of Verse—and Thou
Beside me singing in the Wilderness—
And Wilderness is Paradise enow.

Pour celui qui possede un morceau de bon pain
Un gigot de mouton, un grand flacon de vin.
Vivre avec une belle au milieu des ruines,
Vaut mieux qu d'un Empire etre le souverain

Wein, Brot, ein gutes Buch der Lieder :
Liess ich damit selbst unter Truemmern
mich nieder,
Den Menschen fern, bei Dir allein,
Wuerd'ich gluecklicher als ein koenig sein [৩]

মূল ফার্সীতে আছে :

হাতে (দস্ত) যদি থাকে
গমের মগজের (মগজ্) রুটি (নান)
দুই মনী (দো মনী) মদ ও
ভেড়ার একখানা ঠ্যাঙ (রান্),
তোমাতে আমাতে যেখানে বসেছি
সেটি যদি ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণও হয়

---

৩ বাঙলায় :

বনচ্ছায়ায় কবিতার পুঁথি পাই যদি একখানি,
পাই যদি এক পাত্র মদিরা আর যদি তুমি রাণী,
সে বিজনে মোর পার্শ্বে বসিয়া গাহো গো মধুর গান
বিজন হইবে স্বর্গ আমার তৃপ্তি লভিবে প্রাণ ॥

সত্যেন দত্ত

সেই নিরালা পাতায় ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়
মৌন ভাঙি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর
সেই ত সখী স্বর্গ আমার, সেই বনানী স্বর্গপুর।

কান্তি ঘোষ

(তবুও) আনন্দ (আয়েস) যা হবে
সে সুলতানের রাজত্বের (হদ্) চেয়েও বেশী।

ইংরিজিতে দেখা যাচ্ছে, ভেড়ার ঠ্যাঙ বাদ পড়েছে (বোধ হয় অনুবাদক এটাকে বড্ড গদ্যময় মনে করেছেন), কবিতার বই যোগ করা হয়েছে, প্রিয়ার সঙ্গীতও বাড়ানো হয়েছে ; সুলতানের রাজত্বের বদলে স্বর্গপুরী। কিন্তু একটা জিনিস আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। প্রথম ছত্রে আছে, 'বিনীৎ দ্য বাও'—পরে আবার সেটাই 'উইলডারনিস' হয় কি করে ? (সত্যেন দত্ত বুদ্ধিমানের মত 'বিজন' ব্যবহার করেছেন, 'উইলডারনিস' ও 'বনচ্ছায়া' দুই-ই বিজন। কান্তি ঘোষ উইলডারনিস বর্জন করে দ্বন্দ্বমুক্ত হয়েছেন।)

ফরাসীটিতে আছে ভালো রুটি, ভেড়ার ঠ্যাঙ ও তবে মদের পাত্রকে গ্রাঁ (grand ফরাসীতে বিরাট অর্থে) বলা হয়েছে, 'দু মনী' বাদ পড়েছে এবং ফার্সীতে যেখানে সুধু 'তুমি' আছে, সেটা ফরাসীতে সুন্দরী তরুণী (belle) হয়ে গিয়েছে। অনুবাদ মোটামুটি আক্ষরিক।

জর্মনে মদ (Wein), রুটি (Brot) আর কবিতার বই (Buch)। দুম্বা বাদ পড়েছে, তবে 'বাও' নেই—আছে ফার্সীর সরল অনুবাদ 'ভগ্নাবশেষ মধ্যে' (Truemmern)।

ইরানী চিত্রকর চতুষ্পদীটি বর্ণে অলংকৃত (ইলস্ট্রেট) করার সময় যুবক-যুবতীকে বসিয়েছেন ভাঙাচোরার মাঝখানে বিধ্বস্ত প্রাসাদের অবশিষ্ট একটি দেউড়ির কাছে। দূরের পটভূমিতে আবছা-আবছা দেখা যাচ্ছে, সপারিষদ সুলতান বসেছেন সিংহাসনে, সম্মুখে গায়িকা—কিন্তু সমস্তটাই যেন কোন প্রেতলোকের আবহাওয়াতে ভাসছে।

চিত্রকর ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের প্রভাবে পড়েছেন—কিঞ্চিৎ। যুবক-যুবতীর সম্মুখে দুম্বার ঠ্যাঙ আছে, মদের পাত্রও আছে, তবে সেটা বিরাট নয়, 'দু মনী' তো নয়ই এবং সেটি ইটালিয়ান পদ্ধতিতে খড় দিয়ে প্যাঁচানো—ইরানে সে-রেওয়াজ আছে বলে জানতুম না—কিন্তু যুবকের হাতে দিয়েছেন একখানি পুস্তিকা—ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের ফিরিস্তিমাফিক—তবে তরুণী সে-মাফিক গান গাইছেন না। পায়ের কাছে আমাদের খোয়াই-ডাঙার বুনো ফুল। তেরঙা ছবি, রেজিস্ট্রেশন খারাপ।

আমাদের কৈশোর-যৌবনে বহু তরুণ-তরুণী ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের ওমর প্রায় কণ্ঠস্থ করে রাখতেন। সে রেওয়াজ এযুগেও হয়তো সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। যেটুকু স্মরণে রয়েছে তারই উপর নির্ভর করে ফরাসী-জর্মন অনুবাদ পড়লে ভাষাশিক্ষা দ্রুততর হবে, পাঠক আনন্দও পাবেন। হয়তো বা তারই ফলে আমরা আরেকখানা খৈয়ামের বাঙলা অনুবাদ পাবো।

পুস্তকে পঁচাত্তরটি চতুষ্পদীর জন্য পঁচাত্তরখানা তিনরঙা ছবি তো আছেই, তার উপর এদিক ওদিক সর্বত্র ছড়িয়ে আছে কারুকার্য, আবছা তুলিতে আঁকা নানা প্রকারের অর্ধসুপ্ত চৈতন্যের স্বল্পপ্রকাশ—কাব্য পড়ে

চিত্রকরের প্রতিক্রিয়ার রূপ। ছবিগুলি রবি বর্মা স্টাইলে আঁকা—তবে তার চেয়ে ঢের ঢের কাঁচা। একটি ব্যাপারে কিন্তু সর্বচিন্তাশীল দর্শকই সন্তুষ্ট হবেন—জামাকাপড়, বাড়িঘর, গাছপালা, আসবাবপত্র প্রায় সবই খাঁটি ইরানী। অবশ্য বিদেশী প্রভাব কিছুটা যে পড়েনি তা নয়, তবে সে সামান্য। বিদেশী—বিশেষ করে ইয়োরোপীয় চিত্রকর—যে রকম নিছক কল্পনার উপর নির্ভর করে কিম্ভূত বদখৎ 'হাঁসজারু' তৈরী করেন, তিনি তার থেকে স্বভাবতই মুক্ত। এবং তাঁর ছবিতে যে এক নূতন পরীক্ষার প্রচেষ্টা রয়েছে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েই চিত্রকর ভাঙা-ভাঙা ইংরিজিতে উপক্রমণিকায় লিখেছেন ঃ

"At the end, I hope the Patrons of art find this gift amusing and this could be an Ideal Ideas (sic) for the young artists, and the old and experience (sic) artists could forgive some of the scenes which lacking the Proper Techniques (sic), I wish they call them to my attention, I'll be most greatful (sic)"...Akbar Tajvidi

এ পুস্তক সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু মনোরম আলোচনা করা যেত, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল, এটির সঙ্গে শুধু আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।[৪]

The quatrains of Abolfath Ghiat-e-Din Ebrahim KHAYYAM of Nishabur, Published by Tahir Iran Co, 'Kashani Bros' Teheran, Lalezar-Istanbul Sq.

"ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার সম্মুখে ঘন আঁধার"—

খাচ্ছে, দাচ্ছে, বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, কখনো হতাশ হয়, কখনো বা খুশী, বউ বাপের বাড়ি গেল তো মুখে ব্যাজার ভাব, এমন সময়ে চ্যারিটি ম্যাচের একখানা টিকিট ফোকটে পাওয়াতে সে বেদনা না-পাত্তা ঘুচে গেল—এই নিয়ে আমরা পাঁচজন আছি। সৃষ্টিকর্তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই আমরাই পৃথিবীতে ম্যাজরিটি। আমাদের বেদনা সামান্য, সেটা ঘুচতেও বেশীক্ষণ লাগে না।

অথচ মুনিঋষি পীর-প্যাকম্বর বলেন, 'তোমরা অমৃতের সন্তান, অমৃতের সন্ধান করো।' একফোঁটা একটি মেয়েও নাকি বিস্তর ধনদৌলত পাবার পর বলেছিল, 'যা দিয়ে আমি অমৃত হব না, তাতে আমার কি প্রয়োজন!'

চাকরি বজায় রাখার জন্য আমাকে সমস্ত জীবন ধরে দুনিয়ার তাবৎ ধর্মের, (বেশী না, আল্লার দয়ায় মাত্র সাতটি) বিস্তর বই পড়েতে হয়েছে। কিন্তু আমি এখনো বুঝে উঠতে পারিনি, এই আমরা সাধারণ পাঁচজন তো অমৃত না পেয়েও দিব্য বেঁচে আছি, ওর পিছনে ছুটোছুটি করার আমাদের কী

৪ খৈয়াম ও নজরুল ইসলাম কৃত তাঁর অনুবাদ নিয়ে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি।

প্রয়োজন। আর বাঙলা কথা বলতে কি, আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত মত, তখন ঐ অমৃতটা আমাদের ঘাড়ে চাপানোই অন্যায়। অন্তত একটি মহাপুরুষ—আমাদের মতে—এ খাতায় একটি মুক্তো জমা রেখে গেছেন; তিনি বলেছেন, 'শুয়োরের সামনে মুক্ত ছড়িয়ো না।' তাই সই। গালাগালটা বরদাস্ত করে নিলুম। আর, মহাপুরুষ একথাটা বলার সময় ক্ষণেকের তরে আমার দিকে একবার তাকিয়ে ছিলেন তো? তাতেই হয়ে যাবে। 'মোক্ষ' নামক 'অমৃত' বলে কোনো পদার্থ যদি থাকে তবে ঐ একটি চাউনিতেই সকলং হস্তগতং। অবশ্য সে 'অমৃতে'র জন্য কোনো অসম্ভব ভবিষ্যতে যদি আমার প্রাণ আদৌ কাঁদে!

রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ এঁরা দেখতে মানুষের মত বটেন, কিন্তু আসলে এঁরা মানুষ নন। নইলে বলুন দেখি, তুমি কবি, দু পয়সা তোমার আছে, পদ্মায় বোটে ভাসতে তুমি ভালোবাসো, কী দরকার তোমার ইস্কুল করার আর তার খাঁই মেটাবার জন্যে বৃদ্ধ বয়সে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দিল্লী, বোম্বাই চষার? কিংবা বিবেকানন্দ। অসাধারণ জিনিয়স। পঁচিশ হতে না হতেই প্রাচীন অর্বাচীন দিশী-বিদেশী সর্বশাস্ত্র নখাগ্রদর্পণে? কী দরকার ছিল সেই সুদূর আমেরিকায় গিয়ে—শেকস্‌পীয়ারের ভাষায়—টু টেক্‌ আর্মস্‌ এগেন্‌সট্‌ এ সী অব ট্রাবল্‌স্‌?[১] কি দরকার ছিল অরবিন্দের নির্জনে ধ্যানে ধ্যানান্তরে ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বতর লোকে ব্রহ্মের কাছ থেকে অমৃতবারি আহরণ করে নিয়ে, তারো নিয়ে এসে এই ভস্মীভূত ভারতসন্তানকে পুনর্জীবিত করার?

এঁদের কথা বাদ দিলুম। এঁরা আমাদের মতন নন।

কিন্তু—এখানেই একটা বিরাট কিন্তু।

এই যে আমরা রামাশামা, আমাদের ভিতর বিবেক-রবি নেই, কিন্তু তাই বলে আমাদের সকলেরই কি ওঁদের চেয়ে স্পর্শকাতরতা কম? ওঁদের মত কীর্তি আমরা রেখে যাই না, তাই বলে বেদনাবোধ কি আমাদের সকলেরই ওঁদের চেয়ে কম? বরঞ্চ বলবো, বিধি-প্রসাদাৎ, কিংবা আপন সাধনবলে তাঁরা চিত্তজয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে বেদনাবোধ তাঁদের ভেঙে ফেলতে পারেনি। কিন্তু আমাদের কেউ কেউ যেন টুকরো টুকরো হয়ে যায়। যেন জীবন্ত অবস্থায়ই হঠাৎ তাদের জীবন-প্রদীপ নিবে যায় আর চোখের সামনে সে যেন শূন্যে বিলীন হয়ে যায়। যেন বিরাট নবাব-বাড়ি আধ ঘণ্টার ভিতর চোখের সামনে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল। আমরা যে ক'টি অকর্মণ্য গাছ তার চতুর্দিকে ছিলুম—যাবার সময় আমাদেরও ঝলসে দিয়ে গেল।

হয়তো ঠিক অতখানি না। আমার এক অতি দূর সম্পর্কের ভাগ্নে ছিল।

---

১ ইদানীং রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ নিয়ে তুলনাত্মক আলোচনা হচ্ছে। অন্য কেউ দেখিয়ে না দিয়ে থাকলে আমি একটা মিল দেখাই। দুজনেই প্রথমেই আমেরিকা গিয়েছিলেন ভারত-সেবার জন্য অর্থ আনতে। দুজনাই নিরাশ হয়েছিলেন।

ডিগডিগে লম্বা পাতলা, কাঁচা সোনার বর্ণ, ভারী লাজুক। বিধবা মায়ের এক ছেলে। তাঁর মানা না শুনে পড়াশুনো করতে এসেছে শহরে। সে-গাঁয়ের আর কোনো ছেলে কখনো বাইরে যায়নি। এর বোধ হয় উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল। ছেলেটি কিন্তু তোৎলা। হয়তো সেই কারণেই বেশী লাজুক।

এক মাসও যায়নি। ইন্‌স্‌পেক্টর এসেছেন ইস্কুল দেখতে। তাকে শুধিয়েছেন একটা প্রশ্ন। উত্তরটা সে খুব ভালো করেই জানে। কিন্তু একে তো তোৎলা, তার উপর উত্তর জানে বলেই হয়ে গেছে বেজায় নার্ভাস্‌। 'তোৎ তোৎ' করে আরম্ভ করতে না করতেই ইন্‌স্‌পেক্টর তার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি ফেলে চলে গেলেন এগিয়ে।

ব্যাপারটা হয়েছিল বেলা তিনটেয়।

রাত সাতটায় পাওয়া গেল তার লাস! গাছ থেকে ঝুলছে।

ভাবুন তো, ইস্কুল থেকে ফিরে যাবার পথে, তার মায়ের স্নেহের আঁচল থেকে দূরে, সেই আপন নির্জন কক্ষে ঘণ্টা তিনেক তার মনের ভিতর কী ঝড় বয়ে গিয়েছিল? অপমানের কালনাগিনীর বিষ যখন তার মস্তিষ্কের স্নায়ুর পর স্নায়ু জর্জর করে করে শেষ স্নায়ু কালো বিষেই রূপান্তরিত করেছে তখনই তো সে দড়িগাছা হাতে তুলে নেয়। সে তখন সহ্য-অসহ্যের সীমার বাইরে চলে গিয়েছে। আচ্ছা, সে কি তখন তার বিধবা মায়ের কথা একবারও ভাবেনি? কিন্তু, দয়াময়, আমাকে মাফ করো, আমি বিচারকের আসনে বসবার কে?

অতি গরীব মধ্যবিত্ত ঘরের মৌলিক কায়েত, আমার প্রতিবেশী হাতে যেন স্বর্গ পেল যখন তার সাদা-মাটা মেয়েকে বিয়ে করলে এক 'মহাবংশের' ঘোষ—বিনা পণে। ছেলেটি গরীব এই যা দোষ কিন্তু ভারী বিনয়ী আর বড়ই কর্মঠ। প্রেসের কাজ জানে। আমরা হিন্দু মুসলমান সবাই শতহস্ত তুলে তাকে আশীর্বাদ করেছিলুম।

বিয়ের কিছুদিন পরে কি জানি কি করে ধরে নিয়ে এল এক পার্টনার। খুললো ছোট্ট একখানা প্রেস। হ্যাণ্ডবিল বিয়ে-শ্রাদ্ধের চিঠি ছাপায়, কখনো বা মুন্সেফী আদালতের ফর্ম ছাপবারও অর্ডার পায়। জল নেই, ঝড় নেই, দুই দুপুরই বরাবর, সর্বত্রই তাকে দেখা যায় প্রুফের বোন্দা বগলে। হেসে বলে, 'এই হয়ে এল।' অর্থাৎ শিগ্‌গিরই ব্যবসাটা পাকা ভিতে দড় হয়ে দাঁড়াবে। একটু যাকে দরদী ভাবতো তাকে বলতো, 'মাকে নিয়ে আসছি।' গরীব মা গাঁয়ে থাকে। হয়তো বা গতর খাটিয়ে দুমুঠো অন্ন জোটায়।

দশ বৎসর পর দেশে ফিরেছি। বাড়ি পেঁছিবার পূর্বেই রাস্তায় সেই ছোকরা—না, এখন বুড়োই বলতে হবে, অকালে—দেখি উল্টো দিক থেকে আসছে, পরনে মাত্র শতচ্ছিন্ন গামছা। বগলে ছেঁড়া খবরের কাগজের বোন্দা। ছন্নের মত চেহারা। আমার কাছ থেকে সিগরেট চাইলে। আমি তো হতভম্ব। তার স্ত্রী আমার ছোট-বোনের ক্লাসফ্রেণ্ড। আমি তার মুরুব্বী। সিগারেট দিলুম। সেটা ধরিয়ে আমার দেশলাইটা ফেলে দিলে নর্দমায়। এক গাল হেসে বললে, 'মাকে নিয়ে আসছি।' মনটা বিকল হয়ে গেল। দশ বৎসর পর আমার

শহর এই দিয়ে আমায় ঘরে তুলছে ?

বোন বললে, 'প্রেস যখন রীতিমত পয়সা কামাতে আরম্ভ করেছে তখন তার পার্টনার তাকে দিলে ফাঁকি। একটা আদালত পর্যন্ত লড়েছিল। তারপর পয়সা কোথায় ? পাগল হয়ে গেছে।'

তবু এখনো তার 'মাকে শহরে এনে পাকা বাড়িতে তুলছে।' মা কবে ভুত হয়ে গিয়েছে। গাঁয়ের আর পাঁচটা বিধবা যেরকম দুঃখ-দুশ্চিন্তায় মরে।

আর মাধবী ? আমার বোন শ্বশুরবাড়ি থেকে এলে সে তাকে দেখতে আসে। আমি তখন মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে বৈঠকখানায় আশ্রয় নিই।

আর যে আত্মহত্যা করল না, পাগলও হল না, তার অবস্থা যে আরও খারাপ।

সরকার আমাকে অনর্থক একটা টেলিফোন দিয়েছিল। তবে সেটা কাজে লাগতো তেতলার একটি মেয়ের। আমরা যৌবনে যে সুযোগ পেলুম না তা যদি ঐ মেয়েটি পেয়ে থাকে তবে, আহা, ভোগ করুক না সে আনন্দ—তার ইয়ংম্যান প্রায়ই তাকে ফোন করে।

তারপর হঠাৎ মাসাধিক কাল কোনো ফোন নেই। ভাবলুম, আমি যখন আপিসে তখন বোধ হয় ফোন করে। তারপর একদিন বাথরুমের দরজায় দমাদ্দম ধাক্কা আর আমার চাকরের ভীত কণ্ঠস্বর। তাড়াতাড়ি খুলে দেখি, তেতলার মেয়েটি মেঝেতে পড়ে—ভিরমি গেছে—পাশে টেলিফোনের রিসীভার।

সন্ধ্যাবেলা আমার লোকটা বললো, 'ভিরমি কাটাতে বেশীক্ষণ লাগেনি, তবে কিছু খেলেই সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে যাচ্ছে।'

আমার ঘরে এসে টেলিফোন করতো বলে আমি ইচ্ছে করেই কোনো কৌতূহল দেখাইনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও খবরটা কানে এসে পেঁছিল। এসব ব্যাপার পাড়াতে জানাজানি হয়ে যায়। মেয়েটির পরিবারের ডাক্তারও আমার ভালো করে চেনা। ইংরিজিতে বললেন, 'He walked out on her to another girl !'

কেমন যেন চোখের সামনে দেখতে পেলুম, ঐ ভিরমি-যাওয়া মেয়েটার উপর পা দিয়ে যেন সেই ছেলেটা পার হয়ে আরেকটা মেয়ের হাত ধরে চলে গেল। Walk on তো তাই মানে হয় ! না ?

আজ আর মনে নেই—কতদিন ধরে মেয়েটা কিছু খেলেই বমি করতো।

দু বছর তাকে দেখিনি। তারপর একদিন সিঁড়িতে দেখা। আগেকার মতই সেই সাজগোজ করেছে। মনে হল চীনে ফানুস দেখছি, কিন্তু প্রদীপটি নিবে গেছে।

ঐ বেদনাই তো সবচেয়ে বড় বেদনা।

মা যখন বাচ্চাকে মারে তখন সে বার বার ঐ মায়ের কোলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আশ্রয়ের জন্য—যেখান থেকে আঘাত আসছে সেখানেই। আশ্চর্য, কিন্তু আশ্চর্য হবার কীই বা আছে, কারণ মারুক আর যাই করুক অজানার মাঝেও অবুঝ জানে সে তার মা-ই। কিন্তু যখন দয়িত walks out on her, তখন

বেচারী আশ্রয় খুঁজবে কোথায় ? সে দয়িত তো এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন লোক, সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা। এতদিন ধরে তার সামান্যতম বেদনা যখনই কোনো জায়গা থেকে এসেছে—বাপ মা সমাজ যেখান থেকেই হোক—তখনই ছুটে গিয়ে বলেছে তার দয়িতকে। ঐ বলা-টুকুতেই পেয়েছে গভীর সান্ত্বনা। আর আজ ? আজ তার সেই শেষ নির্ভর গেল। বরঞ্চ পাষাণ-প্রাচীরের উপর বল ছুঁড়লেও সেটা ফিরে আসে। কথা বললেও প্রতিধ্বনি আসে। কিন্তু এখন শূন্যে, মহাশূন্যে সব বিলীন।…(অবশ্য মডার্নরা বলবেন, 'ওসব রোমাণ্টিক প্রেম আজ আর নেই। আজ এক মাস যেতে না যেতেই সবাই অন্য লাভার পেয়ে যায়।' তাই হোক্, আমি তাই কামনা করি। আমার সর্বান্তঃকরণের আশীর্বাদ তাদের উপর।)

ধর্মের সমুখে উপস্থিত হলুম এই তিনটি মাত্র দৃষ্টান্ত নিয়ে। কেউ বলেন, 'এসব মায়া। তুমিও নেই, আমিও নেই, এই পৃথিবীও নেই, তথাপি কেন শোকাতুর হও।' কেউ বলেন, 'লীলা। ঈশ্বরে সর্বস্ব সমর্পণ করো। সান্ত্বনা পাবে।' কেউ বলেন, 'মনই সর্ব দুঃখের উৎপত্তিস্থল। সেই চিত্তের বৃত্তি নিরোধ করো। তাতেই শান্তি।' আরো অনেক মত আছে।

আমি নতমস্তকে সব কটাই মেনে নিচ্ছি। মা-ঠাকুরমারা এসবে বিশ্বাস করতেন, কিংবা আরো ভাল হয় যদি বলি, ধর্ম তখন সজীব ছিল, সে তখন সে-বিশ্বাস জাগাতে পারতো—তাই তাঁরা শান্তি পেয়েছেন।

কিন্তু ধর্ম কেন আমার সেই ভাগ্নেকে চিত্তবল দিল না আত্মহত্যা না করার জন্য, প্রেসের পাগলকে রুখলো না সেই দারুণ দুর্দৈব থেকে, প্রতিবেশীর মেয়েকে দিল না শক্তি সইবার—ফের স্বাভাবিক সুস্থ সবল হওয়ার ? শুধু তাদেরই দোষ ? ধর্মের আত্মশক্তি কমে যায়নি কি ? কিংবা দোষ উভয়ের ?

কম্যুনিজম তাই বুঝি। সে বলে রাষ্ট্রই সব। তোমার ব্যক্তিগত শোক কিছুই না। তুমি বেশী গম ফলাও, বেশী কামান বানাও রাষ্ট্ররক্ষার জন্য। সব ভুলে যাবে। কম্যুনিস্টরা এ 'ধর্মে' বিশ্বাস করেন কিনা তা জানিনে কিন্তু এ-কথা জানি, রাষ্ট্র এ বিশ্বাস তাদের হৃদয়-মনে দৃঢ় করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। অন্য ধর্মেরা করে ?

* * *

আমরা কয়েকজন মিলে চা খাচ্ছিলুম। নানা রকম দুঃখ সুখের কথা হচ্ছিল। আমাদের মধ্যে একজন অল্পবয়সী বড্ডই স্পর্শকাতর ডাক্তার। হঠাৎ বললে, 'জানেন, আলী সাহেব, আমাদের হাসপাতালে একটি চার বছরের ছেলে বড্ড ভুগে খানিকটা সেরে বাড়ি গিয়েছিল, আজ আবার ফিরে এসেছে। ও সারবে না। আমি যখন ইনজেক্শন তৈরী করছিলুম তখন আমার গা ঘেঁষে যেন করুণা জাগাবার জন্য বললে, "দাক্তার, দিয়ো না, বদ্দো লাগে"।'

হে ধর্মরাজগণ, এ শিশুকে কি দিয়ে কে বোঝাবে ?

দুপুর রাতে যখন তার ঘুম ভেঙে যায়, ইনজেক্শনের ভয়ে শিউরে উঠে চেয়ে দেখে, এই বিশাল পুরীতে কেউ নেই, তার কেউ নেই—তখন ?

হয়তো বা বিজ্ঞান পারবে। বিজ্ঞান একদিন তাকে সারিয়ে দেবে। না পারলেও হয়তো বা তাকে কোনো প্রদোষ-নিদ্রায় (আমি এসব জিনিস জানি না, তবে twilight sleep না কি যেন একটা আছে এবং আশা, সেটা আরো উন্নতি করবে) ঘুম পাড়িয়ে দেবে। হাসপাতালে গিয়ে দেখব, সে ঘুমিয়ে আছে, পুতুলটি বুকে চেপে ঘুমিয়ে আছে, নন্দনকাননের অপ্সরীদের আদর পেয়ে তার মুখে মিঠে হাসি।

জয় বিজ্ঞানের !

কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে তো জীবনের কোনো comprehensive philosophy নেই যা ভাগ্নেকে রুখবে, প্রতিবেশীর মেয়েকে নর্মাল করে তুলবে।

হে ধর্মরাজগণ, বিজ্ঞানের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করে, তাকে আশীর্বাদ দিয়ে এবং আপন আত্মশক্তি দৃঢ়তর করে আমাদের বাঁচাও।

আমি জানি, আমার জীবনে সে দিন আমি দেখে যেতে পারবো না।

এই নির্জন প্রান্তরে এ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থেকে থেকে 'নিশির ডাকে'র মত শুনতে পাবো, 'দাত্তার, দিয়ো না, বন্দো লাগে—', দেখতে পাবো সেই প্রদীপহীন চীনা ফানুস ॥

রাজা উজীর

বন্ধুবর

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

করকমলে

হিটলারের প্রেম

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ১লা মে জর্মনির জনসাধারণ পেল তার মোক্ষমতম শক্—যেন দেশবাসী আবালবৃদ্ধবনিতার মস্তকে স্বয়ং মুষ্টিযোদ্ধা ক্লে একখানি সরেসতম ঘুঁষি মেরে তাদের সবাইকে টলটলায়মান পড়পড়ায়মান করে দিলেন। ঘুঁষিটাএল হামবুর্গ বেতারকেন্দ্র থেকে—ইতিমধ্যে মিত্রশক্তি আকাশ থেকে জর্মনির বৃহৎ বৃহৎ বেতারকেন্দ্রগুলো, বিশেষ করে শর্টওয়েভের—প্রায় সবগুলোকেই খতম করে দিয়েছেন।

বেতারে তখন সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। সেই অনুষ্ঠান ক্ষণতরে বন্ধ করে বলা হল, 'আপনারা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খবরের জন্য তৈরী থাকুন।' কিছুক্ষণ পরেই বেতারে ঘোষিত হল, 'আমাদের ফ্যুরার আডল্‌ফ্ হিটলার ইহলোক ত্যাগ করেছেন।'

এরপর যে শক্‌টা পেল সেটা তাদের খুলি ভেঙ্গে দিল না বটে, কিন্তু মাথার মগজ দিলে ঘুলিয়ে। যেন অমলেট্ বানাবার কল ব্রেন-বকস্‌টার মধ্যখানে তুর্কিনাচন লাগিয়ে দিলে।

হিটলার মৃত্যুর চল্লিশ ঘণ্টা পূর্বে শ্রীমতী এফা ব্রাউন নাম্নী—তাবৎ জর্মনদের কাছে অজানা অচেনা এক কুমারীকে বিয়ে করেছিলেন। সমস্ত জর্মনি যেন বুদ্ধিভ্রষ্ট-জনের মত একে অন্যকে শুধালো, সে কি! গত বারোটি বৎসর ধরে যে ফ্যুরারের ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল, সে তো সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ছবি। যিনি সুখময় নীড় নির্মাণ করেননি, বল্লভার সন্ধান করেননি, এমন কি বংশরক্ষা করে উত্তরাধিকারীরূপে কাউকে স্বহস্তনির্মিত ফ্রেডারিক দ্য গ্রেটের সিংহাসন বিনিন্দিত সহস্রায়ু রাইষের (নাৎসি রাজ্যের) সিংহাসনে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে চাননি। অথচ তিনি কী ভালোই না বাসতেন শিশুদের,—যখনই জনসাধারণের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়েছেন, তখনই দেখেছি তিনি কী হাসিমুখে শিশুদের আদর করে বাহুতে তুলে নিয়েছেন, তাদের মাতাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। দেশের শ্রেষ্ঠা নর্তকী, অভিনেত্রী, গায়িকা, সুন্দরীদের জন্মদিনে তাঁদের বাড়িতে দিশী-বিদেশী বিরল ফুলের স্তবক পাঠিয়েছেন। প্রোপাগাণ্ডা মন্ত্রী গ্যোবেলস আমাদের বেতারে কতশত বার বলেছেন, 'এই সন্ন্যাসীর হৃদয়কন্দরে কিন্তু নিভৃতে বিরাজ করেন সৌন্দর্যের দেবতা। এ তপস্বী সেই বিশ্বকল্পনাময়ী চিন্ময়ীর উপাসক। সে চায়, নিভৃতে নির্জনে একাগ্র মনে তাকেই রঙে রেখায় ফুটিয়ে তুলতে, তোমাদের গৃহ সুন্দরতররূপে নির্মাণ করে তারই প্রতিষ্ঠা করে তোমাদেরই গৃহ মধুময় করে তুলতে। কিন্তু হায়, তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল না। জর্মনির ভাগ্যবিধাতা তাঁর স্কন্ধে তুলে দিলেন বিরাট বিশাল রাইষের গুরুভার। তাকে বিরাটতর, বিশালতর এবং সর্বোপরি তাকে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে নির্মাণ করার গুরুভার। এবং সে রাষ্ট্র এমনই প্রাণবন্ত, দীর্ঘজীবী হবে যে এযাবৎ পৃথিবীতে যে-সকল সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র আপন নাম ইতিহাসে রেখে

গেছে তাদের সবারই হতে হবে, আমাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের তুলনায় বালখিল্যবৎ —এ রাষ্ট্রের পরমায়ু হবে সহস্র বৎসর—থাউজেন্ড-ইয়ার-রাইষ।'

আরো অনেক কথা বলেছেন ফ্যুরার সম্বন্ধে, অনেক ছবি এঁকেছেন আডল্‌ফ্‌ হিটলারের তিনি, একের পর এক বিজয়মুকুট পরে ফ্যুরার যখন মস্কোর দ্বারপ্রান্তে—যেন রাশার মৃত্যুদূত এসেছে তার আত্মাকে শয়তানের অতল গভীরে চিরতরে বিলীন করে দিতে—তাঁর সে বিজয়-গর্বিত ছবি ; এবং তারপর যখন পরাজয়ের পর পরাজয় দ্রুততর গতিতে চারিদিক থেকে বজ্রমুষ্টিতে তাঁকে ধরতে গেছে তখনও চিরাশাবাদী গ্যোবেলস তাঁর বীণাযন্ত্র ভেঙে ফেলেননি, উচ্চতর কণ্ঠে গেয়ে উঠেছেন তাঁর প্রভু, ফ্যুরারের প্রশস্তি-সঙ্গীত। সেখানে ফ্যুরার কৃচ্ছ্রসাধন-রত যোগী। তিনি সর্বসুখ বিসর্জন করে, সর্বধ্যান নিয়োজিত করে নির্মাণ করেছেন সেই ব্রহ্মাস্ত্র (প্রায় শব্দার্থ, প্রথমা বিজয়িনী victory one, অনুজা বিজয়িনী V II)—এবারে দধীচির অস্থি নিষ্প্রয়োজন (অর্থাৎ অন্য কোনো মিত্রশক্তির সাহায্যে জয়লাভ নয়, কারণ ইতিমধ্যে তাঁর মিত্র ইতালী ও জাপান তাদের অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ রণাঙ্গনেও কোনো বিজয়চিহ্নের আভাস দেখতে পাচ্ছে না)। তিনি এই বার্লিন নগরী ত্যাগ করবেন না। এই ধ্যান-পীঠের সম্মুখে এসেই শত্রুসঙ্ঘ হবে অবলুপ্ত, লীন হবে মহাশূন্যে।

এবং বিশ্বের ইতিহাসে এই অতুলনীয় 'ধর্ম' প্রচারক বক্তা, জনগণমনজয়ের বীর গ্যোবেলস প্রায় প্রতিবারই তাঁর ভাষণ শেষ করতেন এই বলে, 'বিশ্বের ইতিহাসের এই সর্বোত্তম আত্মত্যাগ বিশ্ববিধাতা কর্তৃক লাঞ্ছিত হবে না।' (কানে কানে বলি, গ্যোবেলস ছিলেন নিরঙ্কুশ নাস্তিক ; বরঞ্চ তাঁর প্রভু হিটলার অন্তত অদৃশ্য অজ্ঞেয় অন্ধ নিয়তিতে—'শিক্‌জাল'—বিশ্বাস করতেন)।

আজ হিটলার চিতাশয্যায় (বস্তুত তাঁর ও পত্নী এফার দেহ তাঁরই সর্বশেষ আদেশানুসারে দেশাচারানুযায়ী গোর না দিয়ে পেট্রল দিয়ে পোড়ানো হয়) প্রবেশকালের প্রাক্কালে বিবাহ করলেন তাঁর 'রক্ষিতা'কে—যার সঙ্গে তিনি লোকচক্ষুর অগোচরে সর্ববিলাসবৈভবে পরিপূর্ণ সুসজ্জিত শৈলাবাসে কাটিয়েছেন কত না ক্লান্তিহীন দিবস, নিদ্রাহীন রভস যামিনী, বৎসরের পর বৎসর, অন্তত চোদ্দটি বৎসর, অর্থাৎ নেতৃত্ব গ্রহণ করার প্রায় দু-বছর আগের থেকে !

কই, গ্যোবেলসের অঙ্কিত সেই বিলাসবিমুখ জিতেন্দ্রিয় সর্বত্যাগী রাইষের মঙ্গল কামনায় ধ্যানমগ্ন তপস্বীর সঙ্গে তো বেতারে প্রচারিত, একগুণকে শত-গুণে বর্ধিত করে বিজয়ী মার্কিন সেনা—উপস্থিত তারা জর্মানিতে থানা গেড়ে তার উপর সার্বভৌম রাজত্ব করছে—এবং তাদের অভ্যাসার্জিত 'কেলেঙ্কারি কেচ্ছা' বর্ণনের সুমেরু শিখরে তথাগত তথাকথিত জার্নালিস্টের প্রকাশিত জর্মন এবং ইংরাজি ভাষাতে প্রচারিত দৈনিক, সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হিটলারের ছবি আদৌ মিলছে না।

বের্ষটেশগাডেনে হিটলারের শৈলাবাস ছিল দশাধিক বৎসর ধরে সর্ব 'ধার্মিক' নাৎসি, এমন কি মধ্যপন্থী সরলহৃদয় লক্ষ লক্ষ জর্মনেরও পুণ্যতীর্থ-ভূমি। হিটলার সচরাচর থাকতেন নিরস বিরস বৈশ্যভূমি বার্লিনে ; সম্মুখে

কৃষ্ণকঠিন প্রস্তর-নির্মিত অপ্রিয়দর্শন বস্তুতান্ত্রিক রাজবর্ত্ম, চতুর্দিকে অভেদ্য পাষাণপ্রাচীর, পাষাণতর হৃদয়নির্মিত, বদনমণ্ডলে সর্বপ্রকারের অনুভূতি-প্রকাশবর্জিত, শীতল কৃষ্ণধাতুতে নির্মিত অস্ত্রহস্তে রক্ষীদল, পাত্র-অমাত্যের স্বতশ্চল শকটের যন্ত্রীরব-বিঘোষ-নিনাদ, সদাই ফ্যুরারের পরিদর্শনের জন্যে বিকটতম শব্দ করে দ্রুতগতিতে গমনাগমনরত দৈত্যসম পর্বতপ্রমাণ ট্যাংক-বর্মপরিহিত সাঁজোয়া যান, আরো কত না নবীন নবীন বৃহৎ বৃহৎ মারণাস্ত্র, এবং ফ্যুরার-ভবনের প্রশস্ত মর্মর সোপান বেয়ে উঠছেন নামছেন অভিজাত শ্রেষ্ঠ-তর মুকুটমণি রাজদূতরাজি—তাঁদের বেশভূষার দিকে তাকালে অন্ধ হয়ে যাবার আশংকা। বেশের উত্তমার্ধ স্বর্ণস্তরণে এমনই অলংকৃত—যে তার পটভূমি চীনাংশুক, পট্টবস্ত্র, না কিংখাপে নির্মিত সে তত্ত্ব নির্ণয় করা অসম্ভব। প্রত্যেকেরই সেই স্বর্ণাস্তরণের উপর হীরকখচিত ভিন্ন ভিন্ন মহার্ঘ্য ধাতুনির্মিত সারি সারি মেডেল—বিজয়-লাঞ্ছন—মনে হয় তার যে-কোনো একটা সারির উপর দিয়ে দ্রুতগতিতে একটিবার আঙুল চালিয়ে নেওয়া মাত্রই বেজে উঠবে যেন জলতরঙ্গে স্বরসপ্তক।

মানুষের ভক্তি যতই গভীর হোক, সেটা অতল নয়—গভীরতম মহাসমুদ্রেরও তল আছে। যতই গগনচুম্বী হোক গৌরীশংকর নয়—এবং তিনিও চুম্বন করেন মহাউর্ধ্বের পদরেণুকণা অভ্রংরাশিমাত্র। কাজেই সেই ভক্তি বার্লিনের ঐ মারণাস্ত্র 'যক্ষপুরী'কে পুণ্যতীর্থভূমিতে পরিণত করতে পারেনি।

তারা ছুটে আসতো বের্ষটেশগাডেনে। তার পরিবেশ, তার বাতাবরণ, তার চতুর্দিকে দীর্ঘশির অভিজাত শ্যামল বনস্পতি, উচ্চতায় সেই সব বনবৃক্ষের তুলনায় সহস্রগুণে উচ্চ পর্বত, মেখলাকার শৈলমালা, তাদের অনেকেই শীতে-গ্রীষ্মে তুষারাবৃত, আর শীতকালে হিটলার ভবনের চতুর্দিকে হয়ে যায় ধবল বরফাচ্ছন্ন। গ্রীষ্মের দীর্ঘদিনে বনস্পতিরাজি নিরবচ্ছিন্ন বন্য বিহঙ্গ-সঙ্গীতে পরিপূর্ণ।

লক্ষ লক্ষ নরনারী শোভাযাত্রা করে লাইন বেঁধে হিটলারের সামনে দিয়ে গৃহীর সরলতামাখা—অর্থাৎ কর্কশ মিলিটারি কেতায় নয়—'মার্চ পাস' করতো—হিটলার বিদেশাগত লয়েড জর্জ, জন স্যামুয়েল, অ্যান্টনি ইডেন জাতীয় অভ্যাগতদের আপ্যায়নে বা চপেটাঘাত প্রদানে অত্যধিক তৎপর না থাকলে পর।[১] নইলে এমনিতে দৈনন্দিন গেরস্তালি জীবনে হিটলার ছিলেন আদর্শ

---

১ আমার আশ্চর্য বোধ হয় এইসব ডিপ্লোমেটরা সেই নরঘাতন হিটলারের সম্মুখে তখন কী বেহদ্ বেহায়া, বেশরম, বেইজ্জৎ বাঁদর-নাচ, আবার বলছি, কোমরে ছিটের ঘাগরা পরে বাঁদর-নাচ নেচেছেন! পরে এঁদের অনেকেই বলেছেন,—শিশুর মত গদগদ সরল কণ্ঠে—'আমরা তখন জানতুম না, মাইরি, লোকটা ও-রকম একটা আস্ত নর-পিশাচ!' বটে! ন্যাকামির জায়গা পাওনি? তোমরা fool তো বটেই তদুপরি knave! তোমরা বুকে হাত দিয়ে বলো, তোমরা জানতে না, হিটলার রাজাসনে বসার প্রথম দিনই কম্যুনিস্টদের উপর

অতিথিসেবক, এবং এসব অপরিচিত লক্ষ লক্ষ অতি সাধারণ তীর্থযাত্রীদের প্রতি মাত্রাধিক সদয়। হিটলারের সেই বাড়ি নূতন জমিতে গড়া হয়েছিল বলে তখনো ছায়া দেবার মত বিস্তৃত ও দীর্ঘ বৃহৎ বৃক্ষ একটিও ছিল না। সেই কঠোর রৌদ্রে (উঁচু পাহাড়ের উপর রোদ বড় কড়া হয়) কখনো কখনো তিনি পুরো-পাক্কা দু'ঘণ্টা ধরে হিটলারি হাইল সেলুটে ডান হাত সম্মুখদিকে প্রসারিত করে স্কন্ধাবধি উত্তোলিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতেন—পুরো প্রসেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত। একদিন তাঁর সখা ওস্তাদের ওস্তাদ ফোটোগ্রাফার হফ্‌মান (এঁর নামটি মনে রাখবেন, পাঠক, ইনি হিটলারের প্রেম-মঞ্চে বিদূষক— বিশুদ্ধ সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী তিন অঙ্ক নাটিকার শেষের দুই অঙ্কে অভিনেতা মাত্র তিনজন,—নায়ক, নায়িকা ও বিদূষক হফ্‌মান) হিটলারকে শুধোন, তিনি কি করে পুরো দু'ঘণ্টা ধরে, এরকম হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন! হিটলার উত্তরে বলেন, নিছক মনের জোরে।

দ্বিতীয় 'শকে'র পর এই সব লক্ষ লক্ষ তীর্থ-প্রত্যাবর্ত ও 'ভগবান' হিটলারের শ্রীমুখ-দর্শনপ্রাপ্ত নরনারী বিহ্বল, সামান্য দুটি অসংলগ্ন বাক্য সংযোজিত করতে সম্পূর্ণ অক্ষম, কর্তাভজাদের ন্যায় গুরু কাণ্ডারীতে যারা সর্ব প্রত্যয় সর্ব আত্মোৎসর্গ করে আপন আপন নোঙর ভবনদীতে অবহেলায় বিসর্জন দিয়ে বসেছিল, তারা তখন কি ভেবেছিল?

এই গম্ভীর 'মার্চ পাস', হিটলারের সৌম্যস্মিত বদন (অবশ্য তাঁর টুথব্রাশ মুস্টাশ বাদ দিয়ে—এফা ব্রাউনও ছিলেন এটির জন্মবৈরী—কিন্তু ভক্তের কাছে তো 'বিটকেল গোঁপো গুরু ট্যারা চোখে চায়। তথাপি সে মোর গুরু নিত্যানন্দ রায়॥') স্বস্তিবাচক আশীর্বাদসূচক, অভয়মুদ্রার উত্তোলিত দক্ষিণ বাহু—তাঁর পিছনের পূত শান্ত সজ্জন ভবন, যেখানে গুরু অহোরাত্র জর্মন-মঙ্গল-কামনায় অহরহ তপস্যামগ্ন—তার পিছনে ছিল এত বড় ধাপ্পা! একটা রক্ষিতা রমণী নিয়ে সঙ্গোপনে ঢলাঢলি! তার জন্য অতিশয় সযত্নে জর্মনির সর্বশ্রেষ্ঠরও শ্রেষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে নির্মিত হয়েছে ঐ বাড়ির একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ আস্ত wing!

মার্কিনরা মেতে উঠেছে, এবং রুচিবিহীন একাধিক জর্মন যোগ দিয়েছে সেই ভূতের নৃত্যে (আমি দোষ দিচ্ছি নে, জর্মনি তখন চরমতম দৈন্যপঙ্কে

কী অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করে, তারপর ইহুদিদের নিয়ে, তারপর ২০শে জুলাই ১৯৩৪-এ তাঁর সহকর্মীদের—র‍্যোম, এর্নস্ট, হাইন্‌ৎস (আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস এরা ছিল নির্দোষী)—mass murder without any trial (শব্দার্থে নির্বিচারে পাইকারী হারে খুন), তোমরা তো তখন নিতম্ব বাজিয়ে নৃত্য করেছ! কণ্টক কণ্টকে নাশ! মুখে যতই ধানাই-পানাই করো, ইহুদিদের প্রতি তোমাদের মনোভাব অন্তত আমার অজানা নয়।

আর যদি এ-সব না জানতে তবে নিজেদের 'ডিপ্লোমেট' বলে পরিচয় দাও কেন? রাস্তার মেথরানী আর তোমাতে তাহলে কি তফাৎ!

এমনি নিমগ্ন যে বেটাবেটির দু'মুঠো অন্ন যোগাড় করার জন্য অনেক কিছু করতে সে প্রস্তুত—আমার আপন দেশের দৈন্য কি আমি চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে দেখিনি, পরে বুঝিনি ? এখন ঘাড় ফেরাই) হিটলারের ব্যক্তিগত জীবনের অন্তরঙ্গতম গোপন কথা বের করে রগরগে পর্নোগ্রাফ ছেড়ে টু ক্রোর পাইস্ কামাতে।

আর জর্মানি খায় শকের পর শক্। অবশ্য তখন জর্মানির এমনই দুরবস্থা যে প্রেস নেই, নির্জলা মিথ্যার বিরুদ্ধেও প্রকৃত সত্য দিবালোকে প্রকাশ করার উপায় নেই। এবং সমূহ বিপদও তাতে আছে! লেখককে যে কোনো মুহূর্তে বিন্-ওয়ারেণ্টে, যদিও সে নাৎসি ছিল না—ধরে নিয়ে যাবে denazification (of delousing) কোর্টে,[২] এবং অন্য কিছু সাক্ষীসাবুদ

---

২ এরা যখন মার্কিন জেল থেকে মুক্তিলাভ করলো, ততদিনে আবার জর্মানিতে আপন আধা-স্বাধীন সরকার, মায় আদালতসুদ্ধ বসে গেছে। এই আদালত এদের এবং অন্য বহু লোককে ধরে আবার আরম্ভ করলে denazification (অর্থাৎ দেশকে ভুতপূর্ব নাৎসি-মুক্ত করা) মোকদ্দমা—গণ্ডায়-গণ্ডায়। এনারা আবার ওঁয়াদের চেয়ে এক কাঠি সরেস। কারণ জজদের অনেকেরই সামনে এসে দাঁড়ালেন এমন সব নাৎসি যাঁদের হাতে বিচারকরা নাৎসি-রাজত্বে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। (অবশ্য লাঞ্ছিত হওয়ার সময় তাঁরা জজ ছিলেন না, কিংবা ডিসমিস হয়েছিলেন) এঁরা নিলেন তাঁদের পূর্ণ প্রতিহিংসা—জেল, নাগরিকাধিকার লোপ এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হল বহু লোকের—এমন কি যাদের মার্কিন কোর্ট কোনো প্রমাণ না পেয়ে বেকসুর ছেড়ে দিয়েছিল। আবার উল্টোটাও হল। যেখানে জজ নির্বাচিত হলেন কোনো 'প্রচ্ছন্ন নাৎসি', তখন তিনি পাঁড় নাৎসিদের অনেককেও ছেড়ে দিলেন কিংবা দিলেন মোলায়েমতম সাজা। তারপর হল আরেক ফার্স। জর্মন আইনে নিয়ম (এ আইন রোমান আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত—ব্রিটিশ আইন তা নয়) কোনো অপরাধের বিশ বৎসর পরে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো মোকদ্দমা হতে পারে না। হিটলার আত্মহত্যা করেন ৩০ এপ্রিল ১৯৪৫। মোটামুটি বলা যেতে পারে হিটলার নির্বাচিত নবীন চ্যান্সেলর মিশ্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন ৮ই মে। অতএব লেগে গেল ধুন্দুমার। তা হলে ৮ ৫. ৬৫ তারিখে দেশে-বিদেশে লুক্কায়িত খুনিয়া খুনিয়া সব নাৎসি 'অজ্ঞাতবাস' থেকে বেরিয়ে আবার নবীন নাৎসি সঙ্ঘ তৈরী করবার চেষ্টা করবে। হয়তো বা এই কুড়ি বৎসরে যারা নাৎসিদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত কড়াকড়ি ব্যবস্থা করেছিল তারা প্রাণ দেবে গুপ্ত নাৎসি ঘাতকের হাতে, অন্ততপক্ষে গোপনে অপমানিত লাঞ্ছিত এবং প্রহৃত হবে। কারণ এদের অনেকেই ছিলেন পয়লা নম্বরী নাৎসি যেমন হিটলারের সেক্রেটারি মার্টিন বরমান্, এবং ইহুদী নিধনের গ্যাসঘর তথা কনসানট্রেশন ক্যাম্পের চোপদার (ন'টি ল্যাজতলা চাবুক মারনেওলা), কমাণ্ডান্ট্, কয়েদীদের উপর মারাত্মক (এদের ৯৫°/০ মারা যায়) সব ব্যারাকের

না নিয়ে, তুমি যে পাঁড় নাৎসি ছিলে সেইটে মার্কিন জংলী পদ্ধতি 'প্রমাণ' করে পাঠিয়ে দেবে শ্রীঘরে (অবশ্য তখন সেই বীভৎস খাদ্যাভাবের করাল কালে জেলে ভালো হোক, মন্দ হোক দু'মুঠো জুটতো)।

কিন্তু সুইটজারল্যাণ্ডের বৃহত্তম অংশের ভাষা জর্মন। বহু নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্প এবং জেলমুক্ত নাৎসিবৈরী লেখক সেখানে গিয়ে আপন আপন বই বের করতে লাগলেন। তখন পরিপূর্ণ সত্য জানার ফলে জর্মনরা ধীরে ধীরে আপন আপন শকমুক্ত হতে লাগল। এঁদের অনেকেই যদ্যপি হিটলার-যুগে মানব-দুর্লভ সাহস দেখিয়ে নাৎসি-বিরোধিতা করার ফলে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ও জেল বরণ করেন, (এবং সেখানে প্রায় সকলেই অসহ্য যন্ত্রণাভোগের পর মারা যান) আজ তাঁরা সত্য বলতে গিয়ে অনেক স্থলে নাৎসি-বিরোধী এবং মিথ্যা হিটলার কেলেঙ্কারি প্রচারের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার হিটলারের প্রাইভেট লাইফ সম্বন্ধে অনেক তথ্য ও তত্ত্ব বেরুলো, যেগুলো nosy American and peeping British—and some French thrown in the bargain for good measure—বহু পরিশ্রম করেও বের করতে পারেনি।

তারই অন্যতম, হিটলারের প্রেম সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য বেরুলো যা দিয়ে প্রকৃত সত্য আজ হয়তো কিছুটা নিরূপণ করা যেতে পারে। এই যে মৃত্যুর চল্লিশ ঘণ্টা পূর্বে ১৪।১৫ বছরের রক্ষিতাকে হিটলার বিয়ে করলেন, সেটা কেন? সত্যই কি তিনি তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসতেন, যাকে আমরা বাংলায় প্রেম বলতে পারি, কিংবা এফা কি নিম্নস্তরের হাপ্‌গেরস্ত (দেমি মঁদেন), তাঁর সঙ্গে হিটলার কি প্লাটনিক প্রেম করেছিলেন (when "just nothing happens"), তাদের যৌন-জীবন কি সম্পূর্ণ নরম্যাল ছিল, হিটলার পারভার্স ছিলেন না কি না, এফাকে যদি সত্যই ভালবাসতেন তবে তাঁকে বহু পূর্বেই বিয়ে করলেন না কেন?—এবং জর্মনির জনসাধারণ বিশেষ করে মাতারা তো

---

experiment করনেওলা ডাক্তার, অথবা পাঁড় নাৎসি সম্পূর্ণ বিবেকহীন আইন বাবদে পরিপূর্ণ নাৎসি কর্তাদের মেহেরবানীতে নিযুক্ত জজ যারা কারো বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ (নাৎসি) মোকদ্দমা আনা মাত্র আসামীকে অপমানিত লাঞ্ছিত করে—মুক্ত অথবা গুপ্ত আদালতে হয় ফাঁসির হুকুম, নইলে চোদ্দ বছরের জেল। এদের অনেকেই বা অজ্ঞাতবাস থেকেই বেনামীতে নাৎসিবৈরীদের শাসিয়েছে।

তাই বহু আন্দোলনের পর—এমন কি ক্যাবিনেটে এ-বাবদে দ্বিধা ছিল যে, যদ্যপি ৮।৫।৪৫-এর পর কোনো নাৎসি-রাজ ছিল না, এবং ফলে তারপর কোনো নাৎসি অপরাধ হয়নি—এবং বিশ বৎসর পর সব খতম হওয়ার কথা। তবু—আরো দশ না কুড়ি বছর ধরে (আমার ঠিক মনে নেই) পূর্ব নাৎসিরা ধরা পড়লে মোকদ্দমা চলবে।

চাইতেনই যে ফ্যুরার হোন আর যাই হোন, ফ্যুরার হলেই তো আর দেহ পাষাণ হয়ে যায় না (এটা বিদ্যাসাগরের নকল ; তিনি বলেছেন, "বিধবা হইলেই তো তার 'দেহ' পাষাণে পরিণত হয় না", তার পূর্বের সমাজ-সংস্কারকরা বলতেন, "বিধবা হইলেই তো আর 'হৃদয়' পাষাণে পরিণত হয় না"), অতএব তাঁরও বিয়ে করে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা উচিত। এস্থলে বলা বাহুল্য, সেটা পূর্বেই বলেছি, যে এফার সঙ্গে হিটলারের প্রকৃত-সম্পর্ক এতই মাত্রাধিক মিলিটারি টপ্ সীক্রেটের মত তিনি লুকিয়ে রাখতেন, এবং তাঁর নিত্য সঙ্গীদের এবং চাকর-বাকরদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন যে তাঁরাও প্রাণের ভয়ে এ বিষয়ে ঠোঁট সেলাই করে রাখতেন। এবং সর্বশেষে প্রশ্ন, এফাই কি তাঁর প্রথম প্রেম, না এ বিষয়ে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতাও ছিল ? সেইটেই আজকার বিষয়বস্তু।

ন্যুরন্বের্গের মোকদ্দমার সময় (মিত্রপক্ষ বনাম নাৎসি রাইষের প্রধান প্রধান প্রতিভূ, যেমন হিটলারের পরের সম্মানিত জন ফিল্ড মার্শেল গ্যোরিঙ—হিটলার হঠাৎ মারা গেলে হিটলারের ফরমান অনুযায়ী তিনিই 'ফ্যুরার' হতেন ; তাবৎ জঙ্গী বিভাগের বড়কর্তা—হিটলারের পরেই—কাইটেল, তার পরের জন য়োড্ল্, ইত্যাদি ইত্যাদি সর্বসুদ্ধ ডজন দুই) আদালতের সামনে প্রাগুক্ত প্রশ্নগুলো আসামীরা দোষী না নির্দোষ সে বিচারে 'অল্পে'র চেয়ে 'বিস্তর' অবান্তর ছিল বলে সেগুলো আদালত সাতিশয় সংক্ষেপে সারেন। (অথচ পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কেন,—কোটি কোটি লোক বললেও আমি সংখ্যাটাকে অস্মদ্দেশীয় গঞ্জিকা-নির্গত বলে পত্রপাঠ বাতিল করে দেবো না—জানতে চেয়েছিল হিটলারের 'প্রেম' সম্বন্ধে এবং আজও জর্মনির ভিতরে বাইরে বিস্তর লোক এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন।) সৌভাগ্যক্রমে মার্কিনরা তাঁদের দেশের রীতি অনুযায়ী তাঁদেরই গুটিকয়েক সর্বোত্তম সাইকিয়াট্রিস্টকে সঙ্গে এনেছিলেন। আসামীদের একাধিকজন হিটলার ও এফাকে অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন—হিটলারের বের্ষটেশগাডেনের বাড়ি বের্কহফে এঁরা হিটলারের অতিথিরূপে একাধিকবার গিয়েছেন এবং নিতান্ত বাইরের (বেগানা) লোক না থাকলে তাঁরা হিটলার ও এফার সঙ্গে খেয়েছেন, বেড়াতে গিয়েছেন, পিকনিক করেছেন, বাড়ির প্রাইভেট ফিল্ম শো প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই একসঙ্গে বসে দেখেছেন।

তাই মার্কিন ডাক্তাররা মোকদ্দমায় অবান্তর হিটলারের যৌনজীবন সম্বন্ধে আপন আপন কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এঁদের শুধিয়েছেন অনেক প্রশ্ন। যেমন ডাক্তার গিলবার্টের প্রশ্নের উত্তরে গ্যোরিং বেশ বিরক্ত হয়ে বলেছেন, 'Of course, he was normal like any one of us', অর্থাৎ হিটলার ছিলেন এ সব বাবদে আর পাঁচজনের মতই নর্মাল।

সেই সময়ই জর্মন জনগণ—অবশ্য প্রধানত জর্মন সাক্ষীদেরই মারফতে—একটি তরুণীর কথা জানতে পায়, নাম, গেলী (Angelika—এবং Geli এঁর ডাক-নাম) রাউগল্।

আমার ব্যক্তিগত মতে হিটলার ভালোবেসেছিলেন ½+1+½ (হাফ প্লাস ওয়ান প্লাস হাফ) অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে দুবার।

প্রথম হাফটা সচরাচর রোমান্টিক 'কাফ্ লভ্', অর্থাৎ বাছুরের মত করুণ নয়নে তাকানো, ম্যা-ম্যা রব ছাড়া—যার অর্থ গোপনে অজস্র অশ্রুবর্ষণ করা, এবং সব চেয়ে বড় কথা বাছুর যে-রকম শিং গজাবার সময় যত্রতত্র ঢুঁ মেরে নিজের মস্তকদেশই জখম করে, বেশী চ্যাংড়ার বেলাও অবিচারে যত্রতত্র 'প্রেমে পড়ে' নাস্তানাবুদ হওয়া।

কিন্তু হিটলারের কাফ্ লভ্ প্রচলিত প্যাটার্ন নকল করেনি—এমন কি তাঁর প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বাল্যজীবনের একমাত্র জীবনী-লেখক হিটলারের অতি প্রিয় একমাত্র বাল্যসখা—তিনি যা লিখেছেন সেখানে অনেকগুলো লক্ষণ দেখা যায় যেগুলো স্পষ্ট প্রমাণ করে, এ স্থলের নায়ক কিন্তু অসাধারণ প্রেমিক। আমি আজ সে কাহিনী কীর্তন করবো না, আমার উদ্দেশ্য সেই কাহিনী কিঞ্চিৎ শুনিয়ে দেওয়া যেটাকে হিটলারের ম্যুনিক যুগের (১৯২০ থেকে ১৯৩৩) সর্বঅন্তরঙ্গ জন—সংখ্যায় অতিশয় কম—এক বাক্যে হিটলারের 'ওয়ান এন্ড গ্রেট লভ্' বলেছেন—'গ্রেটেস্ট' বলেননি কারণ তাহলে অন্যগুলো অর্থাৎ যেগুলোকে আমি উপরে প্রথম 'হাফ' ও দ্বিতীয় 'হাফ' রূপে চিহ্নিত করেছি, ও ঐ একমাত্র গ্রেট লভের সঙ্গে একাসন না পেলেও একই শ্রেণীতে বসবার অনর্জিত সম্মানলাভ করে। কিন্তু সেই কাহিনীর নান্দী গাইবার পূর্বে, পাঠকের কৌতূহল কিঞ্চিৎ প্রশমিত করার জন্য উল্লেখ করি, হিটলার তাঁর প্রথম প্রেমের নায়িকাকে চার বৎসর ধরে প্রায় প্রতিদিন রাস্তায় অন্তত দুবার করে দুরু-দুরু বুকে ক্রস করেছেন, হ্যাট তুলে ভিয়েনার ভদ্রজনসম্মত পদ্ধতিতে গভীরতম বাও করেছেন—তিনি (জীবনী-লেখক—সে মহিলা এখনো জীবিতা এবং বিধবা, এখন বয়স প্রায় পঁচাত্তর—তাই ছদ্মনামে তাঁর 'পরিচয়' দিয়েছেন) যেদিন মৃদু হাস্য সহকারে প্রতিনমস্কার করেছেন সেদিন অষ্টাদশ-বর্ষীয় হিটলার

'আশার বাতাসে করি ভর ফিরে যেত আডল্‌ফ্ কুটিরে'

আর যেদিন প্রিয়া সঙ্গের আর্মি-অফিসার উমেদার নাগরের প্রতি ঈষৎ সম্মোহিত বলে হিটলারের প্রতি ভ্রূ-কুঞ্চিৎ করতেন সেদিন হিটলার—ইংরিজিতে যাকে বলে 'saw red', অর্থাৎ তিনি মহাপ্রলয় ডেকে এনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট করার জন্য সেই শিঙাটি খুঁজছেন। বাল্যবন্ধু বলছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সে কী চিৎকার! অভিসম্পাত দিচ্ছে সবাইকে, আর বিশেষ করেই ঐ হতভাগা 'আর্মি-র পাপাত্মা অফিসারদের'[৩] বন্ধু বলছেন, বুর্জুয়া

৩ ঐ সময় থেকেই হিটলার আর্মি-অফিসারদের ঘৃণা করতে আরম্ভ করেন বললে হয়তো অত্যুক্তি তথা 'বিনা যুক্তিতে সমস্যাকে অত্যধিক সরল করে ফেলা'র—ওভার-সিম্প্লিফিকেশন—অকর্ম করা হবে। তবে এ-কথা সত্য, পরবর্তীকালে জর্মন আর্মি ছিল তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় প্রতিষ্ঠান—except the army officers, এবং এটাও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য যে আত্মহত্যা করার ঠিক ২২ ঘণ্টা পূর্বে তিনি তাঁর জীবনের যে সর্বশেষ পত্র লেখেন সেটি আর্মির

সম্প্রদায়ের প্রতি হিটলার অতি বাল্য বয়স থেকে সমস্ত সত্তা দিয়ে নিকৃষ্টতম ঘৃণা প্রকাশ করতেন—এবং বিশেষ করে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সম্রাট-সেনাবাহিনীর অফিসারদের এবং তাদের উদ্ধত ভাব, দাম্ভিক আচরণের প্রতি—যত্রতত্র সর্বোত্তম সর্বোৎকৃষ্ট বস্তু, আদর-আপ্যায়ন যেন তাঁদেরই সর্বপ্রথম প্রাপ্য, যেন স্বর্গ থেকে স্বয়ং সেন্ট পীটার স্বহস্তে তাঁদের জন্যে সে শাহ্-ইন্-শাহী ফরমান লিখে দিয়ে নিজেই ধন্য হয়েছেন—এই ভাব।[৪]

সর্বপ্রধান কর্তা—অবশ্য তাঁর পরে—কাইটেল্‌কে। সে চিঠির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জর্মন আর্মি-অফিসারমণ্ডলীকে, আমাদের ভাষায় যেন পৈতে ছিঁড়ে, 'উচ্ছন্ন যাও, উচ্ছন্ন যাও' বলে ব্রহ্মশাপ দেওয়া। সে পত্রে তিনি বলেন, 'গত (প্রথম) বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পাই, এ যুদ্ধের জর্মন অফিসার-গণের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধের অফিসারদের কোনো তুলনাই হয় না। এ যুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে সংগ্রামকারী জোয়ানদের সাফল্যের তুলনায় অফিসারগণ যেটুকু সামান্য করতে পেরেছেন সেটা জোয়ানদের কর্মসিদ্ধির তুলনায় তুচ্ছ।'

৪ হিটলারের খাস চাকর—valet—ছিলেন জনৈক হাইন্‌ৎস লিঙে। ইনি হিটলারের জামাকাপড় দুরুস্ত রাখা, ওষুধপত্র হামেহাল হাজির রাখা এসব শত কাজ তো করতেনই—এমন কি ইভ্‌নিং-ড্রেস পরার সময় বো-ওটি তিনিই বেঁধে দিতেন। কিন্তু তাঁর সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ—এবং গরিমাময় কর্মও বটে—জর্মনির ফ্যুরার ও তার প্রিয়া এফার বিছানা তৈরী করা। একদা তিনি দুজনকে এমন অবস্থায় পান—হিটলার ব্যত্যয়-বিহীন অভ্যাসমত মাত্র সেই এক দিন দোরে চাবি দিতে ভুলে গিয়েছিলেন—যে তাঁর চাকরি যাবার যোগাড় হয়েছিল। এই কর্মের জন্যে তাঁকে বাছাই করা হয় হিটলারের অতিশয় খাস সেনাবাহিনীর (এস্. এস্=শুৎস্‌স্টাফেল) সর্বশ্রেষ্ঠ এক হাজার সৈন্য থেকে। প্রভুকে পূর্ণ দশটি বছর সেবার পর যখন হিটলার মিত্রশক্তির নিপীড়নে বার্লিনে প্রায় অবরুদ্ধ হতে যাচ্ছেন তখন অবশ্য মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি দেবার জন্য হিটলার তাঁকে ডেকে আপন পরিবারে চলে যাবার অনুমতি দেন। প্রভুভক্ত লিঙে যাননি। ফলে হিটলারের শেষ পর্বের আত্মহত্যার বুলেটশব্দ পর্যন্ত তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনতে পান, তাঁর মৃতদেহ চিতাস্থলে বয়ে নিতে যেতে, চিতাতে অগ্নিসংযোগ করতে সাহায্য করেন। এফাও এঁকে বড়ই বিশ্বাস করতেন এবং প্রাণের কথাও খুলে বলতেন।

হিটলারের ভূগর্ভস্থ, বিরাটতম বোমার আক্রমণেও নিরাপদ 'বুঙ্কার' তিনি প্রভুর শবদাহ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরিত্যাগ করেননি। সে কর্ম সমাধান করে তিনি যখন রুশ সেনানী ভেদ করে—রাশানরা তখন বুঙ্কার থেকে তিনশ গজ দূরে—মার্কিন অধিকৃত এলাকায় আপন পরিবারের সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা করেন তখন বার্লিনেই রুশদের হাতে বন্দী হন। পূর্ণ দশটি বৎসর তিনি ঐ দেশের ডাকসাইটে সব কারাগারে—(কিছুকালের জন্য সাইবেরিয়া বাস করে তিনি বিশ্ববন্দীমণ্ডলীতে যেন সোনার তাজ পেয়েছেন!)—বহু

পুষ্পোৎসবের প্রভাতে হিটলার তাঁর সর্বোত্তম সজ্জা পরে পথপার্শ্বে অপেক্ষা করছেন, তাঁর প্রিয়ার জন্যে, তিনিও আসবেন শব্দার্থে পুষ্পরথে, পুষ্পাভরণ পরিধান করে। সময় যেন কিছুতেই কাটতে চায় না। অবশেষে তিনি এলেন। হিটলার হ্যাট তুলে অন্যদিনের তুলনায় প্রচুরতর সসম্ভ্রম অভিবাদন জানালেন। সেই ভিড়ের মধ্যেও প্রিয়া তাঁকে লক্ষ্য করে তাঁর হাতের পুষ্পগুচ্ছ থেকে একটি ফুল তুলে নিয়ে তাঁর দিকে ছুঁড়ে ফেলে প্রসন্ন মৃদুহাস্য করলেন।

সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করে—বরঞ্চ বলা ভালো 'সে মহালগনে' তিনি সপ্তম স্বর্গেও যেতে সম্মত হতেন না—হিটলার বাড়ি ফিরলেন।

এই চার বৎসরের ভিতর হিটলার ঐ তরুণীটির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তাঁর সখার কাছে, তিনিও যতখানি পারেন উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু হিটলার তাঁর কোনো উপদেশ, কিংবা নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী কোনো কৌশলই হাতে-কলমে ফলপ্রসূ করার চেষ্টা দেননি! এ বড় আশ্চর্যের কথা। এ নিয়ে প্রাগুক্ত জীবনীকার বিস্তর গবেষণা, বিস্তর চিন্তা করেছেন, কিন্তু এস্থলে তার স্থানাভাব এবং ঈষৎ অবান্তর বলে বর্জন করতে অনিচ্ছায় বাধ্য হলুম। শান্তি, সময় ও সুযোগ পেলে পরে চেষ্টা করবো। কারণ যদিও দুজনাতে কোনো কথা হয়নি, পত্র-বিনিময় পর্যন্ত হয়নি, তবু ঘটনাটি সত্যই চিত্তাকর্ষণ করে—কারণ হিটলার তাঁর 'স্বর্গীয় প্রেমে'র অভিব্যক্তি, প্রিয়াকে এক শুভদিনে দাম্পত্য বন্ধনে বন্ধন করার শুভেচ্ছা, সবই বন্ধুকে বলতেন। গৃহনির্মাণের স্কেচ আঁকাতে হিটলার সেই তরুণ বয়সেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন (ফ্যুরার রূপে পরবর্তী জীবনে তিনি শতকর্মের মাঝখানে, এমন কি আত্মহত্যার কয়েক দিন পূর্বেও বহু অভূতপূর্ব বিরাট প্রাসাদ, সৈন্যদের জন্য য়ুনিফর্ম, মেডেল, নৌবহরের জন্য সাবমেরিন ইত্যাদি নানা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর স্কেচ করেছেন এবং প্রায় সব স্কেচই কর্মে পরিণত করা হয়েছিল) এবং তাই

যন্ত্রণা ভোগ করে ১৯৩৪-এ পশ্চিম বার্লিনে ফিরে আসেন। এসেই তিনি হিটলার সম্বন্ধে প্রচলিত বহুবিধ গুজোব বিনাশার্থে একখানা চটি বই লেখেন। তার এক স্থলে আছে, বিদেশের কোনো হোমরা-চোমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁব পদলেহন করার পর তিনি অতিশয় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন, 'দেখলে লিঙে (ইনি কোনো কোনো সময় অভ্যাগতের জন্য পানাদি নিয়ে যেতেন—লেখক), ব্যাটারা কি রকম গত যুদ্ধের সামান্য এক জোয়ানের (হিটলার কর্পোরেল ছিলেন) সামনে হাঁটু নিচু করছে। আর বিদেশী কোনো জঙ্গীলাট হলে তো কথাই নেই। বস্তুত হিটলার প্রকৃত মহান পুরুষদের মত এসব 'বুর্জুয়া স্নব'দের উপেক্ষা না করে তাদের 'সাষ্টাঙ্গ প্রণামে' পরিতৃপ্ত হতেন—যেন তাঁর তরুণ বয়স ও যৌবনকালের আহত আত্মাভিমান সান্ত্বনা-প্রলেপ পেয়ে বেদনা দাগটা (তখনো!) লাঘব করে দিত। লিঙে সম্বন্ধে আমি 'হিটলারের শেষ দশ দিন' নামক প্রবন্ধে, 'দু-হারা' গ্রন্থে ঈষৎ সবিস্তার লেখবার সুযোগ পেয়েছিলুম।

বিবাহের পর যে ভবনে কপোতকপোতী বাস করবেন তার অসংখ্য স্কেচ আঁকতেন হিটলার সমস্ত দিন ধরে।

হিটলার যখন স্কেচের উচ্চতম নভলোকে উড্ডীয়মান তখন কিন্তু তাঁর সখা, জীবনী-লেখক প্রখর ব্যবসায়-বুদ্ধিধারী—তাঁর পিতাও ব্যবসায়ী—ঘোর বস্তুতান্ত্রিক গুস্তাফ্—এক কথায় স্বপ্নলোকনিবাসী ডন কুইক্সোটের যেমন হুবহু উল্টো কড়া সংসারী তামসিক সাংকো পান্জা, এস্থলে হিটলারের সাংকো পান্জা ভিন্ন গোত্রের বসওয়েল, স্কেচের পাশে দাঁড়িয়ে বলতো, 'হুঃ! সবই বুঝলুম, কিন্তু সেই বস্তুটি টাকা!' তিনি জানতেন হিটলারের বৃদ্ধা মাতার অতি ক্ষুদ্র পেনশন ভিন্ন সে পরিবারে একটি কানাকড়িরও আমদানি ছিল না।

হিটলার স্বপ্নভঙ্গে বিরক্ত হয়ে বলতেন, 'আখ্, তোমার শুধু টাকা, টাকা!'[৫]

কিন্তু এ কাহিনী এখানেই থাক। আমি শুধু ভাবি, কবিসম্রাট দান্তের কথা।

৫ আসলে কিন্তু এই সখা অতিশয় সদাশয় ভদ্র নির্লোভ ব্যক্তি। ওঁদের বয়েস যখন প্রায় কুড়ি (১৯১০।১১ গোছ) এবং একসঙ্গে একই কামরায় ভিয়েনায় বাস করতেন তখন হিটলার দৈন্যপঙ্কে নিমজ্জিত হতে হতে শেষটায় এমন অবস্থায় পেঁছিলেন যে অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী সখা গুস্তাফকে বিব্রত না করার জন্যে—হিটলার আম্ত্যু ছিলেন এমনই আত্মাভিমানী, touchy, যেটাকে নিশ্চয়ই morbid বলা চলে—একদিন সখাকে কিচ্ছু না বলে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেলেন। তার প্রায় ২৫ বৎসর পর হিটলার লোকচক্ষের সম্মুখে রাজনৈতিক নেতারূপে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছেন, তখন গুস্তাফ্ খবরের কাগজ মারফৎ তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানতে পারলেন। তারপর ১৯৩৩-এ যখন হিটলার চ্যান্সেলর হলেন তখন দীর্ঘ ২৩ বছর পর গুস্তাফ্ তাঁকে চিঠি লিখলেন। উত্তরও পেলেন। ১৯৩৪-এ হিটলার অস্ট্রিয়া দখল করে যখন বিজয়ী বীরের মত লিন্ৎসে পেঁছিলেন তখন দুই সখাতে দেখা হল। গুস্তাফ্ ছোট্ট সরকারী চাকরি করতেন এবং অল্পেই সুখী ও সন্তুষ্ট ছিলেন বলে হিটলারের big offer তিনি গ্রহণ করলেন না। তবে প্রতি বছর দু'একবার হিটলারের নিমন্ত্রণে প্রধান প্রধান সঙ্গীতের জলসা-উৎসবে একসঙ্গে যেতেন। বস্তুত হিটলারের সর্বজীবনীকার একবাক্যে বলেছেন, গুস্তাফই একমাত্র হিটলার-সখা যিনি তাঁদের বন্ধুত্ব পৌণ্ড শিলিঙে পরিবর্তিত করেননি। জলসাতে যে যেতেন তার একমাত্র কারণ এক জলসাতেই আপন ছোট শহরে তাঁদের প্রথম পরিচয় হয়—সঙ্গীতই ছিল উভয়ের প্রাণতুল্য প্রিয়। গুস্তাফের ভদ্র আত্মবিসর্জন কতখানি, পাঠক এর থেকেই বুঝতে পারবেন যে তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন সঙ্গীত, কিন্তু সে পথে সুযোগ না পেয়ে একটি ছোট্ট দফতরে চাকুরি নেন। হিটলার তাঁকে বলেন, 'যেখানে খুশী বলো, আমি সরকারী সঙ্গীতালয়ে তোমাকে প্রধান সঙ্গীতচালক করে দিচ্ছি। তুমি পাবে, সর্বসময়, সর্বাবস্থায় আমার প্রটেক্শন্!' গুস্তাফ্ সে লোভও সম্বরণ করেন।

তাঁর প্রিয়া বেয়াত্রিচে সখীজনসহ রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে শুধু একবার মাত্র প্রেম-বিহ্বল কবির দিকে স্মিতহাস্য করেছিলেন। আরেকবার পুষ্পের জন্য বিখ্যাত ফ্লরেন্স্ (flora) নগরীর পুষ্পোৎসবে যখন সবাই সবাইকে পুষ্পোপহার দিচ্ছে, এমন কি অচেনা জনকেও, তখন—হয়তো—কিছুমাত্র না ভেবেচিন্তেই প্রেমোন্মাদকে একটি ফুল এগিয়ে দেন। ব্যস্! আর তো কিছু জানবার উপায় নেই। তাই বোধ হয়, তথ্য যেখানে যত কম, কিংবদন্তী সেখানে, সেই অনুপাতে তত বেশী। সেই শত শত কিংবদন্তীর মাঝখানে একটি সত্য প্রোজ্জ্বল : দান্তের সুপ্ত কবিসত্তা তাঁকে সচেতন করে দিয়ে বলল, 'তোমার প্রেমে আর এই নগরীর শত শত প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমে পার্থক্য কোথায়?' বিনয়ভরে যেন সেই পরমাত্মার সম্মুখে মস্তক নত করে দান্তে রচনা করলেন তার 'স্বর্গীয় কাব্য' (দভীনা কম্মেদিয়া = ডিভাইন কমেডি)।

দান্তে আপন জন্মের নগর থেকে বিতাড়িত হন—রাজনীতির জুয়াখেলাতে হেরে গিয়ে। হিটলার স্বেচ্ছায় (বা অনিচ্ছায়) স্বদেশ অস্ট্রিয়া ত্যাগ করে জর্মনি গিয়ে সেখানে পূর্ণ বারোটি বৎসর 'রাজমুকুট' পরার পর নিজ হাতে আপন প্রাণ নিলেন। আমি শুধু ভাবি হিটলার যদি রাজনীতিতে দান্তের মত নিষ্ফল হতেন তবে হয়তো তিনিও তাঁর বেয়াত্রিচেকে কাব্যলক্ষ্মীর স্বর্ণমন্দিরে অজরামর করে রেখে যেতেন, অবশ্য নরদানব হিটলার নিশ্চয়ই দান্তের ইন্‌ফেরনো (নরক) অধ্যায়টা লিখতেন বেশী ফলাও করে। কিংবা হয়তো কাব্যলক্ষ্মীর জন্য নবীন মন্দির নির্মাণ করে—স্থাপত্যেই হিটলারের সর্বাধিক প্রতিভা ছিল, এ সত্য তাঁর শত্রুমিত্র সবাই স্বীকার করেন।

পূর্ণপ্রেম

ভিয়েনাতে সর্বপ্রচেষ্টায় পরিপূর্ণ নিষ্ফলতা অর্জন করে হিটলার দেশত্যাগ করে চলে গেলেন জর্মনির বাভারিয়া প্রদেশের প্রধান নগর ম্যুনিকে। সেখানেও তিনি বেকার, এমন সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেলে তিনি স্বেচ্ছায় জর্মন সৈন্যবাহিনীতে জওয়ান রূপে প্রবেশ করলেন। যুদ্ধশেষে ম্যুনিকে ফিরে এসে জওয়ানদের কী যেন এক কালচারাল বা ঐ জাতীয় অস্পষ্ট কি এক ট্রেনিং দেবার জন্য নিযুক্ত হলেন। এই সময়ে তিনি আবিষ্কার করলেন, সরস্বতী তাঁর রসনায় বিরাজ করেন তাঁকে একদিন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বক্তারূপে জনসমাজের অভিনন্দন গ্রহণ করাবার জন্য। এই সময় ম্যুনিক শহর রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবাত্যায় বিক্ষুব্ধ। অসংখ্য রাজনৈতিক দল, এবং রাস্তায় রাস্তায় গণবিক্ষোভের কোলাহল। হিটলার এরই একটার সদস্য হলেন। যে দলের সভ্যসংখ্যা দশ হয় কি না হয়! ১৯১৯ থেকেই তিনি এই দল (National Sozialictiche Deutsche Arbeitspartei—এরই প্রথম শব্দের Na এবং দ্বিতীয় শব্দের zi নিয়ে বিপক্ষ বা নিরপেক্ষ দলের অজানা কে একজন Nazi—নাৎসি নামকরণ করে) গড়ে তুলতে আরম্ভ করলেন, অচিরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ

করলেন, এবং বাভারিয়া প্রদেশের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক কম্যুনিস্টবৈরী রূপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দুসরা জঙ্গীলাট, পয়লা নম্বর হিণ্ডেনবুর্গের (ইনি পরবর্তী যুগে জর্মনির প্রেসিডেণ্ট হন) সহকর্মী জেনারেস এরিষ্ লুডেন্‌ডর্ফের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিন-চার বৎসর যেতে না যেতে পার্টির সভ্যসংখ্যা আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় হিটলারের এতখানি শক্তিসঞ্চয় হল যে তিনি সবলে বাভারিয়া প্রদেশের তদানীন্তন রাষ্ট্রপ্রমুখদের অপসারণ করে প্রদেশের রাজ্যভার গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন—এই বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় হল। এই উদ্দেশ্যে লুডেন্‌ডর্ফকে পুরোভাগে নিয়ে এই ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি সদলবলে প্রধান রাজকার্যালয়ের দিকে অগ্রসর হলেন। রক্ষীরা গুলি ছোঁড়াতে সমস্ত দল পালালো, স্বয়ং হিটলার কিঞ্চিৎ আহত হলেন (কিন্তু বন্দুকের গুলিতে নয়), কিছুদিন পর, রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে পাঁচ বছরের জেল হল। কিন্তু ইতিমধ্যে এবং বিশেষ করে কারাবাসের সময় তিনি ম্যুনিক তথা বাভারিয়া প্রদেশের সর্বত্র এমনই জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন, (এবং তথাকার সরকার ইতিমধ্যে কম্যুনিস্টদের শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্তি দেখে, রীতিমত শঙ্কিত হয়ে 'কণ্টক দ্বারা কণ্টক উৎপাটনার্থে') হিটলারকে অল্প কিছুদিন যেতে না যেতেই, অর্থাৎ ১৯২৩ সালেরই ডিসেম্বর মাসে এবং শুভেচ্ছার প্রতীক রূপে বড়দিনের অল্প কয়েকদিন পূর্বে কারামুক্ত করে দিলেন।

হিটলার নবোদ্যমে ইতিমধ্যে নেতার অভাবে দ্বিখণ্ডিত পার্টিকে দিনে দিনে শক্তিশালী করে তুলতে লাগলেন।

রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে হিটলার সম্বন্ধে কোনো কিছু বললে সেটা যথেষ্ট বোধগম্য হয় না বলে সংক্ষেপে কয়েকটি বৎসরের বর্ণনা দেওয়া হল।

এখন প্রশ্ন ইতিমধ্যে হিটলার আর কাউকে প্রেম নিবেদন করেছিলেন কিনা। ভিয়েনায় এসে হিটলার কিছুদিন তাঁর বন্ধুর মারফতে উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁর প্রিয়ার (লেখক ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন 'স্তেফানি') খবর নিতেন। তারপর সেই বন্ধু, গুস্তাফও ভিয়েনায় এসে একই কামরায় বাসা বাঁধলেন। স্তেফানি হিটলারের তুলনায় বহু উচ্চবংশের কন্যা। পাত্র হিসাবে হিটলারের চেয়ে অযোগ্যতর পাত্র তখন বোধ হয় লিন্‌ৎস শহর খুঁজলেও দ্বিতীয়টি পাওয়া যেত না। ম্যাট্রিক ক্লাসে ওঠার পূর্বেই সে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে, জাতে প্রায় মজুর শ্রেণীর, অর্থসম্বলে প্রায় 'ধনুর্গুণ ভক্ষণে'র অবস্থা। হিটলার ভিয়েনা থাকাকালীন স্তেফানির বিয়ে হল সুযোগ্য বরের সঙ্গে। হিটলার সে খবর কখন পেয়েছিলেন—আদৌ পেয়েছিলেন কিনা, কারণ বন্ধু গুস্তাফ্ তাঁর সঙ্গে তখন ভিয়েনাতে এবং এঁদের দুজনার পরিবারের কেউই স্তেফানিকে চিনতেন না—এ সম্বন্ধে সব ঐতিহাসিকই নীরব।

কারণ তখন হিটলার বিরাট ভিয়েনা শহরের ঘূর্ণাবর্তে প্রায় বিলীন হবার উপক্রম!

কিন্তু এস্থলে তাঁর স্থাপত্য শিক্ষালয়ে প্রবেশ করতে অক্ষম হওয়া, তাঁর নিদারুণ দৈন্য, পাবলিক লাইব্রেরি থেকে অবিচারে নানা জাতের বই এনে সে-গুলো গোগ্রাসে ভক্ষণ—এর কোনোটাই আমাদের বিষয়বস্তু নয়। আমরা জানতে চাই, ওয়াইন-উইমিন-সং—মদ্যমৈথুনসঙ্গীত—এই তিন বস্তুতে যে রাজসিক প্রিয়দর্শন ভিয়েনা নগর প্যারিসের সঙ্গে পাল্লা দিত, উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে তো বহু পূর্বে সে প্যারিসকে ছাড়িয়ে গিয়েই ছিল, সেই ভিয়েনাতে নারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে হিটলারের কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল কিনা।

গুস্তাফ্ দৃঢ়কণ্ঠে বলছেন, যতদিন হিটলার তাঁর সঙ্গে বাস করেছেন তত-দিন ওদিকে তাঁর কণামাত্র উৎসাহও তিনি কখনো দেখেননি। বস্তুত দীনবেশে সজ্জিত হলেও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনরত সন্ন্যাসীর চোখেমুখে যে দীপ্তি পথিক-জনেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ভিয়েনার ভদ্র, দৌম ম'দেন, গণিকাদের চোখেও সেটা ধরা পড়তো হিটলারকে দেখে। এবং তরুণ হিটলারের দিকে কটাক্ষনয়নে তাকিয়ে বিশেষ ইঙ্গিতও দিত। সাদামাটা, কিঞ্চিৎ ঈর্ষান্বিত গুস্তাফ্ সেদিকে হিটলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, তিনি তাঁর বাহু ধরে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলতেন, 'চল, চল, গুস্‌ৎল্, বাড়ি চলো।'

পূর্বেই বলেছি তারপর তিনি উধাও হলেন।

সেই ১৯০৮ থেকে ১৯১৯।২০ পর্যন্ত যে যা-কিছু লেখেন তার পনের আনা কাল্পনিক। অবশ্য ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হিটলার যখন জওয়ানরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে, তাঁর সম্বন্ধে সে সময়কার খবর সরকারী কাগজ-পত্রে রয়েছে, কিন্তু সেগুলো আমাদের কাছে অবাস্তব।

বস্তুত এ-কথা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, ১৯০৮ থেকে ১৯২৫।২৬ পর্যন্ত কোনো রমণী তাঁর উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি।[৬]

---

৬ এমন কি পরবর্তী কালে এফা ব্রাউনও না।

এস্থলে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করি। ১৯৪১ এর গ্রীষ্মকালে হিটলারের সেনাদল যখন বীরবিক্রমে জয়ের পর জয় লাভ করে মস্কোপানে এগিয়ে চলেছে তখন তিনি প্রতিদিন লাঞ্চ-ডিনারের পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতেন। ১৯৪২-৪৩-এর শীতে স্তালিনগ্রাদের পরাজয়ের পর জেনারেলদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি শুধু তাঁর মহিলা সেক্রেটারি-স্টেনোদের সঙ্গে খেতেন। (এফার হেডকোয়ার্টার্সে আসার অনুমতি ছিল না। হিটলার সময় পেলে বের্ষটেশগাডেনের বাড়ি বের্গ-হফে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতেন) কিন্তু ঐ ১৯৪১।৪২ এক বা দেড় বৎসর তিনি যে-সব গালগল্প করেছেন সেটি লিখে রাখা হয়েছিল স্টেনোদের দ্বারা। প্রকাশিত হয়েছে 'হিট্‌লার্‌স্ টেবিল-টক' শিরোনামায়। প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠার কেতাব। এ-পুস্তকের বহুস্থলে পাওয়া যায় রমণীজাতি সম্বন্ধে তাঁর অভিমত। কিন্তু ভিয়েনা বাসকালীন কিংবা ১৯২৫।২৬ পর্যন্ত তিনি যে কোনো রমণীকে কাছের থেকে চিনতে পেরেছেন, এর কোনো ইঙ্গিত নেই। অবশ্য এ-দ্বারা কোনো কিছু নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায় না।

পরিচয় হয়েছিল তাঁর বহু রমণীর সঙ্গে—একে ভিয়েনায় তাঁর যৌবনের বেশ কিছুকাল কেটেছে, যে-ভিয়েনা রমণীজাতিকে খাতির করতে তার সঙ্গে প্রেমে পড়ার জন্য সর্বক্ষণ সচেতন, কিংবা 'অচৈতন্য', দুটোই বলতে পারেন, এক কথায় ভিয়েনা গ্যালান্ট নগর—তদুপরি ১৯২২ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত তিনি ম্যুনিকের রাজনৈতিক আকাশে অন্যতম জ্যোতিষ্মান গ্রহ, কম্যুনিস্টদের মোকাবেলা করতে পারেন একমাত্র তিনি, রাস্তাঘাটে নাৎসি আর কম্যুনিস্ট দলে প্রায় প্রতিদিন মারামারি হয় এবং উভয় পক্ষে কয়েকটা গুপ্ত প্রকাশ্য খুনও হয়ে গিয়েছে—এ সবার নেতা তো বীর্যবান না হয়ে যায় না। তদুপরি মহিলাদের প্রতি কি প্রকারের ব্যবহার করতে হয়, তাদের প্রতি ব্যবহার্য সব আদব-কায়দা-এটিকেট-গ্যালানট্রি তিনি জানেন—ভিয়েনাতে অবশ্যই তার বেশীর ভাগ তিনি দেখে শিখেছিলেন, কিন্তু হিটলারের মত অসাধারণ জিনিয়াসের পক্ষে সেইটে যথেষ্টর চেয়েও ঢের বেশী। এবং সর্বশেষ কথা, তাঁর যে একটা ম্যাগনেটিক চার্ম—চৌম্বিক আকর্ষণ শক্তি ছিল সেটা তো জর্মন ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বহু বিদেশী রমণীও বলেছেন।

আমি পূর্বেই নিবেদন করেছি, হিটলার-জীবনে প্রেম হাফ প্লাস ওয়ান প্লাস হাফ।

স্তেফানির প্রতি তাঁর প্রেম প্রথম হাফটা, শেষ হাফটা এফা ব্রাউন, যাঁকে তিনি শেষ মুহূর্তে বিয়ে করেন এবং সেই সূত্রে পৃথিবীর বহুলোক এ প্রেমের খবর পায়। কিন্তু আমরা এস্থলে যে দৃষ্টিবিন্দু—অর্থাৎ প্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে—হিটলারকে দেখছি, সেভাবে কেউ দেখেননি, লেখেননি। হয়তো সেই হাফটি এস্থলে আগে বর্ণনা করে মাঝখানের ফুল ওয়ানটিতে গেলে ভাল হত, পাঠক পুরো পার্সপেক্টিভ পেতেন, কিন্তু শেষটায় অনেক চিন্তা করে দেখলুম বিশেষ কারণ না থাকলে এ ধারার খেলাতে কালানুক্রমিক অগ্রসর হওয়াই প্রশস্ত (সিনেমার ফ্লাশবেক কিংবা ফ্লাশ ফরওয়ার্ড টেকনিক অবশ্য আজকাল বড়ই জনপ্রিয়)। দ্বিতীয়, এফার সঙ্গে হিটলারের সর্বশেষ প্রেম ১৯৩৯-৪৫এর যুদ্ধাদি দ্বারা এতই বিক্ষুব্ধ যে বহু অবান্তর নরনারীকে সেখানে টেনে এনে প্রবন্ধর কলেবর বাড়াতে হয়। তৃতীয়ত, অনেকেই সে-প্রেম সম্বন্ধে অল্পবিস্তর পড়েছেন বলে স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে মূল ঘটনাগুলো শুধু আবার তাঁরা শুনতে পাবেন মাত্র—অর্থাৎ, সে প্রেম বর্ণাতে হলে পূর্ণ পুস্তকের প্রয়োজন।

এস্থলে নিবেদন করা কর্তব্য মনে করি, রমণীর প্রতি পুরুষের একনিষ্ঠ প্রেম এদেশের এবং ওদেশের বহু কাব্যকাহিনীতে আছে কিন্তু বাস্তবে যদ্যপি যে কোনো কারণেই হোক। কুলীন প্রথার কথা তথা শ্রীকৃষ্ণ বা দশরথের কথা এস্থলে স্মরণে আনছি নে। আমরা আজ এদেশে একদারনিষ্ঠতাকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখি, ইয়োরোপে বহুকাল যাবৎ একই রমণীকে আজীবন পুজো করার বিশেষ মূল্য দেয়নি। অতএব পাঠক যেন স্তেফানির কথা স্মরণে এনে হিটলারের

সর্বমহৎ, সর্বগ্রাহী প্রেমকে তার যথোপযুক্ত সম্মান দিতে কুণ্ঠিত না হয়।

ঠিক কোন্ সালে সে প্রেমের সূত্রপাত হয় সে কথা তাঁর অন্তরঙ্গতম ব্যক্তিও জানেন না—যদিও আমার সুদৃঢ় অচল বিশ্বাস, বয়সে পরিণত হওয়ার পর তিনি কারুর সঙ্গেই অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব স্থাপন করেননি, ফোটোগ্রাফার হফ্‌মান ছিলেন তাঁর একমাত্র নিত্যালাপী বিদূষক—তবে নিশ্চয়ই ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্বে।

ইতিমধ্যে হিটলারের একটি বিশিষ্ট স্বভাবের উল্লেখ না করলে সে প্রেমের যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব।

পূর্বেই নিবেদন করেছি মোটামুটি ১৯২৭, পাকাভাবে বলতে গেলে তার দু'তিন বছর আগের থেকেই হিটলার মুনিকাঞ্চলে এমনই প্রখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি যেখানে যেতেন সেখানেই তাঁর চতুর্দিকে ভিড় জমে যেত। দিনের পর দিন বিশাল জনতার সামনে তিনি ওজস্বিনী বক্তৃতা দ্বারা দেশের দুঃখদৈন্যের নিদারুণ বর্ণনা দিচ্ছেন, বিশেষ করে শিশু পুত্রকন্যার জন্য আহার বসন সংগ্রহার্থে মা-জননীদের কঠোর সংগ্রাম (মেয়েরা দু হাত দিয়ে মুখ চেপে কাঁদলেও তার সম্মিলিত ধ্বনি হিটলারকে কখনো কখনো পুরো দু-তিন মিনিট বক্তৃতা বন্ধ করতে বাধ্য করতো) এবং সমসাময়িক রাষ্ট্রনায়কের ক্লৈব্য তথা পাপাচার (করাপশন) নিয়ে তাঁর সুতীক্ষ্ন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ—এবং সর্বোপরি তাঁর আত্মবিশ্বাস, তাঁর আশাবাদ যে তিনিই মেসায়া (কল্কি, যিনি পুনরায় পৃথিবীতে ধর্মস্থাপনা করবেন) তিনিই ভের্সাঈ ডিকটাট্ (ডিকটাট্—ডিক্‌টেশন থেকে, অর্থাৎ ক্রীতদাসদের প্রতি যে কোনো অন্যায় পশুবলপ্রযুক্ত অলঙ্ঘ্য আদেশ, যে আদেশ পালন না করলে আদিষ্ট ব্যক্তিকে সবংশে নির্বংশ করা হবে এবং জর্মন রাষ্ট্র থেকে সমূলে উৎপাটিত করা হবে) ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে জর্মনিকে পুনরায় সার্বভৌম এবং ধীরে ধীরে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নেশানরূপে পরিণত করবেন।[৭]

ব্যক্তিগত জীবনেও হিটলার আর কাউকে আমল দিতেন না। প্রায় প্রতিদিনই তিনি তাঁর প্রিয় তিনটে কাফের একটাতে কয়েকজন বন্ধুসহ বসতেন। কিন্তু আমরা যাকে বলি আড্ডা মারা, কিংবা গালগল্প করা—যে কর্মে ভিয়েনা বাঙ্গালীর চেয়েও এক কাঠি সরেস—এবং যে ভিয়েনায় হিটলার প্রথম যৌবন কাটান—সেটি হত না। হিটলার ভিয়েনাতে অনেক কিছু শিখেছিলেন, শুধু এই সমাজনন্দন আচরণটি রপ্ত করতে পারেননি। সর্বক্ষণ তিনিই কথা বলতেন, একমাত্র তিনিই।

এসব মণ্ডলীতে মহিলাদের নিরঙ্কুশ 'প্রবেশ নিষেধ' না হলেও তাঁদের মাত্র

---

৭ হিটলারের বক্তৃতা দেবার ভঙ্গি ও বিষয়বস্তু নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ লেখা যায়—লেখক তাঁর বহু বক্তৃতা শুনেছে। এ বাবদে একটি অত্যুত্তম—সর্বোৎকৃষ্ট বললেও অত্যুক্তি হয় না—পরিচ্ছেদ লিখেছেন জর্নলিস্ট মার্কিন মাউরার তাঁর 'জর্মনি পুট্‌স্ দি ক্লক ব্যাক্' পুস্তিকায়।

দু'একজন আহ্বান পেতেন অতিশয় কালেভদ্রে। হিটলার ভিয়েনার কায়দায় তাঁদের হস্তচুম্বন করতেন (যদিও জর্মনিতে তখন সেটা বিলকুল আউট্ অব্ ডেট্), তাঁদের সুখ-সুবিধার প্রতি নজর রাখতেন, সামান্য হাঁ, হুঁ কিংবা অতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করতে দিতেন, কিন্তু একটা দিকে তিনি কঠোর কঠিন দৃষ্টি রাখতেন, কোনো রমণী যেন ভ্যাচর ভ্যাচর করতে আরম্ভ না করে—তা তিনি যত বুদ্ধিমতীই হোন, মাদাম পম্পাডুর, ইজাবেলা ডানকান, মাদাম দ্য স্তাল যেই হোন না কেন।

গেলীর প্রবেশ

সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়, অবিশ্বাস্য—অতিপ্রাকৃত বা মিরাক্‌ল্‌ই বলা যেতে পারে।

নিতান্ত একটা চিংড়ি (চ্যাংড়ার স্ত্রীলিঙ্গ) মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এলেন হিটলার তাঁর অন্যতম কাফেতে। অতি ভদ্রভাবে সে সবাইকে নমস্কারাদি করলে। সে তো স্বাভাবিক। কিন্তু তাজ্জব কি বাৎ। পাঁচ মিনিট যেতে না যেতে তাবৎ কথাবার্তা সে-ই বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে—ওদিকে এতই বিবেচনা ধরে, যে একে কথা বলতে দেয়, ওকেও কথা বলতে দেয়, কাউকে অস্বাভাবিক আড়ষ্ট হতে দেয় না—সবাই, ইংরিজিতে যাকে বলে ভেরি মাচ্ অ্যাট ঈজ—কিন্তু সব মন্তব্য, সব আলোচনা ঘুরে ফিরে যায় ঐ মেয়েটিরই কাছে।

আর অতিপ্রাকৃত, মিরাক্‌ল্ হল এই যে, স্বয়ং হিটলার চেয়ারে আরামসে হেলান দিয়ে সুমধুর পরিতৃপ্তির মৃদুহাস্য বদনমণ্ডলে ছড়িয়ে দিয়ে বসে আছেন।

হিটলারকে যখনই তাঁর চেয়ে বয়সে বড় মুরুব্বীস্থানীয় পার্টি-মেম্বরেরা শুধোতেন, 'বয়েস তো হল, বিয়ে-শাদীর কথা—'

হিটলার বাধা দিয়ে বলতেন, 'জর্মনি আমার বধূ!'

ঠাট্টাছলে বললেও এর ভিতর যে অনেকখানি সত্য লুক্কায়িত আছে সে তত্ত্বের কিছুটা সে-সব মুরুব্বীরা জানতেন। নইলে এ-জাতীয় প্রশ্ন ব্যক্তিগত জীবনে দ্বিরদরদ-নির্মিত শিখরবাসী হিটলারকে জিজ্ঞেস করবে কে? কারণ তাঁরা এবং পার্টির অন্য সবাই জানতেন, হিটলার জাত-ব্যাচেলার। তা সে ভিয়েনীজ কেতায় সুন্দরীদের সামনে যতই গ্যালানট্রি, শিভালরি দেখান না কেন, রমণী-দের কথা উঠলে টেবিলে দু'হাত রেখে, সুমুখের দিকে ঝুঁকে যতই সিরিয়াসলি তিনি কোথায় কোন্ সুন্দরী রমণী দেখেছেন, যে-বেভেরিয়াকে তিনি এত ভাল-বাসেন যে আপন মাতৃভূমি ত্যাগ করে এখানে এসে স্থায়ী আবাস নির্মাণ করেছেন সেই বেভেরিয়া মায় তার মুনিক সুন্দরীর ব্যাপারে যে ভিয়েনার কাছেই আসতে পার না—এসব নিয়ে যত ধানাইপানাই তিনি করুন না কেন, পার্টির উঁচু মহলের প্রায় সবাই জানতেন যে হিটলারের পক্ষে কোনো সুন্দরীকে নিয়ে পার্টির অতি সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতর কিছুটা ঢলাঢলি বরঞ্চ সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়, কিন্তু বিয়ে করে বউ কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘর বাঁধবার মত মানুষ হের হিটলার

নন। মাঝে মাঝে তাঁকে এ মন্তব্যও করতে শোনা গেছে : 'সুন্দরীদের ভালোবাসবো না—সে কি ? আমি কি এতই রসকষবর্জিত আকাট ! যা বলুন, যা কন্ আপনারা তো জানেন, আমার সত্তার অন্তস্তলে যে পুরুষ লুকানো আছেন তিনি আর্টিস্ট ! এবং আমি ফুলও ভালোবাসি কিন্তু তাই বলে কি আমাকে বাগানের মালী হতে হবে ?' প্রায় এ সত্যটিই চার্লস ল্যাম্ বলছেন, 'আমার ঘরে ফুল নেই কেন, শুধোচ্ছেন ? আমি কি ফুল ভালোবাসি নে ? নিশ্চয় বাসি। অমি শিশুদেরও ভালোবাসি—তাই বলে তাদের মুণ্ডুগুলো কেটে ঘরের ভিতর ফুলদানীতে সাজিয়ে রাখি নে।' আর এ বিষয়ে পরিপূর্ণ সত্যের শেষ শব্দটি বলতে হলে বাঙলা প্রবাদেরই শরণাপন্ন হতে হয়—'বাজারে যখন দুধ সস্তা তখন গাই পোষার কি প্রয়োজন ?'

পূর্বেই বলেছি, সত্যকার অন্তরঙ্গ বন্ধু হিটলারের কেউ ছিল না। তবু মোটামুটি যাঁকে বলা যেতে পারে তিনি তাঁর ফটোগ্রাফার হফ্মান। এঁকে তিনি এই প্রসঙ্গে খাঁটি বৈষয়িক তত্ত্বকথাটি বলেন, 'জর্মনিকে গড়ে তোলা আমার জীবনের একমাত্র কাম্য, আদর্শ। একবার আমার জেল হয়েছে, আবার যে কোনো মুহূর্তে আমার ছ'বছরের জেল হতে পারে। তখন বউ-বাচ্চা বাইরে, আমি গরাদের ভিতর। এটা কি খুব বাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি ?'

তবু বেশীর ভাগই এই নবাগতা সুন্দরী, ব্লণ্ডিনী, মধুরভাষিণী, আত্মসচেতন অথচ বিনয়ী মেয়েটিকে দেখে (এবং বিশেষ করে লক্ষ্য করে যে হিটলার কফি-চক্রের চক্রবর্তীর সম্মানিত আসন সানন্দে তাঁকে ছেড়ে দিয়েছেন) ভাবলেন, তবে কি হিটলারের 'জর্মনি আমার বধূ' নীতিটি পরিবর্তন করার সময় এসেছে ?

মেয়েটির নাম আঙেলিকা রাউবাল। হিটলারের সৎবোনের মেয়ে—ভাগ্নী। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে কিঞ্চিৎ অসুবিধা আছে সত্য কিন্তু তেমন কোনো অলঙ্ঘ্য আপ্তবাক্যপ্রসূত নিষেধ নেই।[৮] মেয়েটির মা বিধবা, সামান্য যে পেনসন পায় তাতে দুই কন্যাসহ জীবনযাপন সহজ নয় ; এদিকে যে ছোট বৈমাত্রেয় ভাই আডল্ফকে, তার বহু দোষ—তার মারাত্মক গোটা তিনেক পূর্বেই নিবেদন করেছি—থাকা সত্ত্বেও, তাকে ছেলেবেলা থেকেই গভীরভাবে স্নেহ করেছেন, সেই আডল্ফ, এখন স্বচ্ছল হওয়ার দরুণ আপন জন্মভূমি অস্ট্রিয়ার কাছেই—সীমান্তের লাগোয়া অঞ্চলে ম্যুনিক থেকে একশ মাইল দূরে বের্ষটেশগাডেনে বাড়ি কিনে তাঁকে অনুরোধ করেছে সীমান্তের এপারে এসে সে বাড়ির জিম্মা নিতে। বেচারা আডল্ফকে বেশীর ভাগ সময় কাটাতে হয় ম্যুনিক শহরে রাজনীতি নিয়ে, সময় পেলে ঐ গ্রামের নূতন বাড়িতে গিয়ে যেন

---

৮ এই ভারতের অন্ধ্র অঞ্চলে হিন্দুসমাজে আপন সহোদরা ভগ্নীর মেয়েকে বিয়ে করা খুবই স্বাভাবিক, ও নিত্য নিত্য হয়। বস্তুত প্রথমেই মামাকে কন্যাদানের প্রস্তাব করতে হয়—যেন ন্যায্য হক তারই। সে রাজী না হলে অন্যত্র তার বিয়ে হয়।

একটুখানি আরাম পায়। তদুপরি এ তথ্য সর্বজনবিদিত যে আঙেলিকা রাউবালের মা, হিটলারের এই সৎবোনটি যেমন বাড়ি চালাতে জানে, অতিথি-সজ্জনের সেবা করাতে নিপুণা, তেমনি পাচিকা রূপে সমস্ত নগরীতে অতুলনীয়া।৯ স্বভাবতই সঙ্গে নিয়ে এলেন দুই মেয়েকে। এদের বড়টিই আঙেলিকা বা গেলী।

---

৯ হিটলার-পরিবারের কুলুজীটি দিশী-বিদেশী কোনো ঘটক-ঠাকুরেরই অমলানন্দের কারণ হবে না। প্রথমত হিটলারের (Hitler, Hiedler, Huetler, Huettler—আমাদের দেশের অল্পশিক্ষিত চাষাদের মত হিটলারের ঠাকুর্দারা নানাভাবে এ নাম বানান করেছেন ; স্বয়ং হিটলারের পিতা—তাঁর জন্ম জারজরূপে—সেকথা পরে হবে, গোড়াতে Hiedler এবং পরে Hitler বানান করেছেন) পিতা এবং মাতা উভয়েই দুই ভাই, অর্থাৎ হিটলার পদবী ধরেন এমন দুজনার বংশগত, এবং এই কারণে হিটলারের পিতা যখন তাঁর মাতাকে বিয়ে করেন তখন চার্চের পক্ষে থেকে বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ ফ্যুরার আডল্‌ফ হিটলারের পিতামহ বিবাহ করেন Mari Anna Schicklgruber-কে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে, কিন্তু তার পাঁচ বৎসর পূর্বে Schicklgruber একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন কুমারী অবস্থাতেই ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন। এই পুত্রই ফ্যুরার আডল্‌ফ হিটলারের পিতা। এবং যেহেতু নবজাত শিশুর মাতা বিবাহিত নয় তাই রীতি অনুযায়ী তাকে দেওয়া হয় মাতা-মাতামহের পরিবারিক নাম Alois Schicklgruber। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, বিয়ের পরও পিতা তাঁর পুত্রের নাম Hiedler (তিনি এভাবেই বানান করতেন) —এ পরিবর্তন করার মেহন্নৎটুকু আপন স্কন্ধে তুলে নেননি। অবশ্য একথা যেমন প্রমাণ করা যায় না, তেমনি বাতিলও করা যায় না যে Alois সত্যই ফ্যুরারের পিতামহ Johann Georg Hiedler-এর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিনা, তবে সে অঞ্চলের সাধারণজনের বিশ্বাস ছিল Alois-এর জন্ম Johann Georg-এর ঔরসেই। Alois-এর মাতা Maria ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মারা যেতেই Johann Hiedler অন্তর্ধান করেন। ত্রিশ বৎসর পর তিনি পুনরায় দেখা দিলেন এবং তিনজন সাক্ষী ও নোটারির (উকিলের) সামনে শপথ নিলেন যে, Alois Schicklgruber তাঁহাই ঔরসজাত পুত্র বটে। ঐদিন থেকে তাঁর নাম হল Alois Hitler (বা Hiedler)। ইনিও একাধিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে তাঁর পিতারই মত। এদিক ওদিক বিস্তর ঘোরাঘুরির পর বিয়ে করেন শুল্ক বিভাগের এক পালিতা কন্যা Anna Glasl-Hoerer-কে। এ বিয়ে সুখের হয়নি। এবং এঁকে তালাক দেওয়ার পূর্বেই Alois 'বন্ধুত্ব' করেন কুমারী Franziska Matzelsberger-এর সঙ্গে। ফলে একটি পুত্রসন্তান হয়। এর নামও Alois। ইনিও জারজ ; পরে আইনতঃ পিতার নাম পান। এঁর পিতা তাঁর মাতা Franziska-কে বিয়ে করেন তাঁর তালাকপ্রাপ্তা প্রথম স্ত্রী Anna Glasl-Hoerer-এর মৃত্যুর পর। বিয়ের তিন মাস পর Franziska

মেয়েটি অসাধারণ সুন্দরী ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এর সম্বন্ধে এবং মামা আডল্‌ফের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ছিল সে সম্বন্ধে একাধিক লেখক আপন আপন মতামত দিয়েছেন। এর ভিতর দু'জন দুই মত পোষণ করেন, এবং পঁয়ত্রিশ বছর পর আজ সত্য নিরূপণ করা অসম্ভব। তবে দুজনাই একমত যে ঐ গেলী-ই হিটলারের 'ওয়ান গ্রেট লাভ্‌'! এঁদের একজন হিটলারের ফোটোগ্রাফার বন্ধু হাইনরিষ হফ্‌মান। হিটলারের মৃত্যুর দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে ইনি হিটলার সম্বন্ধে একখানা বই লেখেন। বইখানার নাম 'হিটলার উয়োজ মাই ফ্রেন্ড' (ইংরিজি অনুবাদ)। বলা বাহুল্য যে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দেও তিনি সব কথা প্রাণ খুলে বলতে পারেননি, তবে এ-কথা সত্য, সব তত্ত্ব—গ্যাস চেম্বারে ইহুদী পোড়ানো ইত্যাদি—জেনে-শুনেও তিনি হিটলারের নিন্দার চেয়ে প্রশংসাই করেছেন বেশী—তবে এ কথাও বলে রাখা ভালো, রাজনৈতিক ব্যাপারে হফ্‌মানের কোনো চিত্তাকর্ষণ ছিল না,—ঐ বিষয়, যুদ্ধবিগ্রহ, কনসানট্রেশন ক্যাম্প ইত্যাদি নিয়ে দুই বন্ধুতে আলোচনা হত খুবই কম। ফটোগ্রাফার হলেও হফ্‌মান উত্তম উত্তম ছবির কদর ও সন্ধান জানতেন, এবং হিটলারেরও রুচি ছিল স্থাপত্যে, চিত্রে ও ভাস্কর্যে। দুজনার আলাপ-আলোচনা হত আর্ট নিয়ে।

অন্যজনের নাম পুৎসি হান্‌ফ্‌স্টেঙেস। এঁর বইয়ের নাম 'আনহার্ড

একটি কন্যাসন্তান প্রসব করেন (এঁর নাম Angela এবং ইনিই পরবর্তীকালে হিটলারের নতুন বাড়ি দেখাশুনো করার ভার নেন ও সঙ্গে নিয়ে আসেন কন্যা, হিটলারের প্রেয়সী Angelica, ডাক নাম Geli)। কিন্তু Angela-র জন্মের এক বৎসর পরে Franziska ক্ষয়রোগে মারা যান। এর চার বৎসর পর ফ্যুরার আডল্‌ফ হিটলারের পিতা Alois Hitler বিয়ে করেন তাঁর ঠাকুন্দার ভাইয়ের নাত্নী শ্রীমতী Klara Poetzl-কে, ৭ই জানুয়ারী ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে। এ বিয়ের চার মাস দশ দিন পরে জন্মান ফ্যুরারের সর্বজ্যেষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা Gustav এবং বাল্যকালেই মারা যান, এবং তার পরের কন্যা Idaও অল্পবয়সে মারা যান। ফ্যুরার আডল্‌ফ হিটলার তৃতীয় সন্তান (পিতার তৃতীয় বিবাহের)। তাঁর ছোট ভাই Edmund এ পৃথিবীতে মাত্র ছ'মাস ছিল। সর্বশেষ সন্তান—পঞ্চমা—Paula ফ্যুরারের মৃত্যুর পর, কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত চিরকুমারী অবস্থায় Salzburg-এ বাস করতেন। এই পাউলা একবার ভ্রাতার (হিটলার তখন ফ্যুরার) বাড়িতে তাঁকে দেখতে আসেন, কিন্তু দীর্ঘদিন (হিটলারের হিসেবে) থাকেন বলে ভ্রাতা আডল্‌ফ তাঁকে আর কখনো নিমন্ত্রণ জানাননি।

সৎভাই (পিতার ২য় বিবাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র Alois) বার্লিনে মদ বেচতেন। তাঁর সম্বন্ধে হিটলার কখনো একটি বর্ণও উচ্চারণ করেননি। তাঁর ছোট বোন Angela বেশ কয়েক বৎসর হিটলারের গ্রামের বাড়ি চালানোর পরে ঝগড়া করে চলে যান, এবং এক ইঞ্জিনিয়ারকে বিয়ে করেন। হিটলার এমনই চটে যান যে বিয়েতে কোনো উপহার পর্যন্ত পাঠাননি।

উইটনেস'। হিটলার যখন ম্যুনিকে তাঁর দল গড়ে তুলতে আরম্ভ করেন তখন উভয়ের পরিচয় হয়। পুৎসি বিত্তশালী খানদানী ঘরের ছেলে বলে তিনি হিটলারকে নানাভাবে সাহায্য করতে সক্ষম হন। হিটলার ফ্যুরার হওয়ার পরও বেশ কিছুকাল তিনি 'দরবারে' আসা-যাওয়া করতেন, এবং প্রায়ই নিভৃতে হিটলারকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনাতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি 'দরবারে'র কূটনৈতিক মারপ্যাঁচে হেরে যান এবং সুইটজারল্যাণ্ডে পালিয়ে গিয়ে সেখানেই ঘর বাঁধেন। ইনি তাঁর পুস্তকে হিটলার এবং গেলী উভয়েরই বিরুদ্ধে প্রচুর বিষোদগার করেছেন। তাঁর মতে গেলী অতিশয় সাধারণ আর পাঁচটা মেয়ের মত ফ্লার্ট করার জন্য আকুল, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিকরা হিটলার সম্বন্ধে আপন আপন বই লেখার পর, এই দুজনার বই বেরিয়েছে এবং ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ধারণা হফ্‌মানের কাছাকাছি।

তা সে যা-ই হোক, এ-কথা সত্য হিটলার তাঁর ভাগ্নীকে নিয়ে কাফেতে যেতেন এবং আগে কাজের চাপে সিনেমা, থিয়েটার, অপেরায় অল্প যেতেন—এখন গেলীর চাপে সেগুলো বেড়ে গেল। কিন্তু আসলে হিটলার সব চেয়ে বেশী ভালোবাসতেন গেলীকে মোটরে করে নিয়ে পিকনিক করতে—ম্যুনিকের চতুর্দিকে পিকনিকের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট স্থল বিস্তর। পাহাড়, উপত্যকা, হ্রদ, নদী, বনফুলে ভর্তি মোলায়েম ঘাসের ঢালু মাঠ, মহান বনস্পতি—কোনো বস্তুরই অভাব নেই। হফ্‌মান পরিবার প্রায়ই সঙ্গে যেতেন।

সোজা বাংলায় বলতে গেলে হিটলার এই কুমারীকে যেন দেবতার আসনে বসিয়ে পুজো করতেন। এবং তাই লোকজনসমক্ষে তিনি কখনো বে-এক্তেয়ার হয়ে এমন কোনো আচরণ করেননি যা মুগ্ধ প্রণয়ী ইয়োরোপে মাঝে মাঝে করে থাকে। গেলীর কণ্ঠস্বর মিষ্ট ছিল,—হিটলার সে স্বর তালিম দিয়ে অপেরার জন্য গেলীকে তৈরি করতে চাইলেন এবং উপযুক্ত গুরু নিয়োগ করলেন। পুৎসি বলেন অন্য কাহিনী। তিনি বলেন, মেয়েটা ছিল অত্যন্ত বাজে ফ্লার্ট টাইপের। অপরার উপযুক্ত কণ্ঠস্বর প্রস্তুত করতে হলে যে রেওয়াজ এবং বিশেষ করে যে কঠোর অধ্যবসায়ের প্রয়োজন ছিল, গেলীর চরিত্রে তার কণামাত্র উপাদান ছিল না। প্রায়ই গুরুকে ফোন করে রেওয়াজ নাকচ করে দিত এবং এই ফাঁকে ফ্লার্ট করার তালে লেগে যেতো। পুৎসির মতে শেষ পর্যন্ত গানের ক্লাস সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

তবে এ-কথা সর্ববাদিসম্মত যে ভিয়েনায় যে গুরুর কাছে গেলী সর্বপ্রথম গান গাইতে শেখা আরম্ভ করে সে তাঁর কাছে ফিরে যেতে চাইতো। জনশ্রুতি এ-কথা বলে, সেখানে নাকি গেলীর দয়িত বাস করতো।

এবং ঠিক এইখানেই ছিল হিটলারের ঘোরতর আপত্তি। শুধু তাই নয়, যদিও গেলীকে খুশী করার জন্যে হিটলার সব কিছুই করতে রাজী ছিলেন—যেমন গেলীর সঙ্গে টুপি-জুতো কিনতে যাওয়ার মত পীড়াদায়ক মারাত্মক একঘেয়ে ঘণ্টানিও তিনি বরদাস্ত করে নিতেন (হিটলার নিজেই বলেছেন, গেলীর সঙ্গে হ্যাট টুপি কাপড় কিনতে যাওয়ার চেয়ে কঠিনতর অগ্নিপরীক্ষা

ত্রিসংসারে আর নেই। আধঘণ্টা একঘণ্টা ধরে সে দোকানের মেয়েকে দিয়ে বস্তার পর বস্তা কাপড় নামাবে, তার সঙ্গে সে সব নিয়ে প্রাণ ঢেলে দিয়ে আলোচনা করবে এবং শেষ পর্যন্ত কিছুটি না কিনে গট গট করে বেরিয়ে চলে যাবে অন্য দোকানে। হিটলার ততক্ষণ বোধ হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা বসে বসে আঙুলের নখ কামড়াতেন, কিন্তু যা-ই করুন আর না-ই করুন, তার পরের বারও বাছুর ছানাটির মত গেলীর সঙ্গে কেনা-কাটা করতে যেতেন ঠিকই) কিন্তু একটা বিষয়ে তিনি অচল অটল। তাঁর অনুমতি ভিন্ন গেলী যার-তার সঙ্গে আলাপচারী করতে পারবে না। এমন কি পরিচিতজনের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কিও চলবে না। এবং এই ফরমান্ যে কত সুদূরপ্রসারী সেটা স্বয়ং গেলীও জানতো না।

গেলী অবশ্যই জানতো হিটলার তাকে ভালোবাসেন, তার প্রেমমুগ্ধ, সে প্রেম যে কত অতল গভীর সে-সম্বন্ধে বেচারীর কোনো ধারণাই ছিল না। একদিন সেটা সে বুঝতে পারলো রীতিমত ভীতশঙ্কিত হয়ে।

হিটলারের পার্টির সদস্যগণ যে যে কাজই করুন না কেন, সমাজে তাদের যে-স্থানই হোক না কেন, পার্টির ভিতর একটা প্রশংসনীয় সাম্যবাদ ছিল। হিটলারের মোটর ড্রাইভার এমিল মরিস ছিল প্রাচীন দিনের পার্টি-মেম্বার। সে একদিন কাঁপতে কাঁপতে হফ্‌মানের সামনে এসে বললে, সে গেলীর সঙ্গে ঠাট্টা-ঠুট্টি করছিল, এমন সময় হঠাৎ হিটলার ঘরে ঢুকে রাগে, জিঘাংসায় যেন সর্ব আত্মকর্তৃত্ব হারিয়ে চিৎকারের পর চিৎকারে মরিসকে গালাগাল দিতে আরম্ভ করেন। মরিস তো রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে ভাবলো, হিটলার যে কোনো মুহূর্তে পিস্তল বের করে গুলি চালাতে পারেন। ঘটনাটি হফ্‌মানকে বলার সময় সে তখন ভয়ে কাঁপছে।

হফ্‌মানের মতে গেলী ছিল পূত, পবিত্র পুষ্পটির মত। তিনি বলেন, অপরাধ তার দিক দিয়ে নিশ্চয়ই কিছু ছিল না। কিন্তু মরিসটি ছিলেন ঈষৎ নটবর। কিন্তু সেও যে ফ্যুরারের ভাগ্নীর সঙ্গে বাড়াবাড়ি করবে সেটা অবিশ্বাস্য। করতে গেলে তার বহু পূর্বেই মরিসের বন্ধুবান্ধব তাকে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন করে দিত।

হিটলারের শত্রুর অভাব কোনো কালেই ছিল না। এমন কি তাঁর প্রধান শত্রু কম্যুনিস্ট দলের কিছু কিছু সদস্য পার্টির আদেশানুযায়ী নাৎসি মেম্বার-শিপ নিয়ে হিটলারের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে যথাস্থানে তাদের রিপোর্ট পাঠাতো। এদের তো কথাই নেই, আরো কেউ কেউ বলেন, সমস্ত ব্যাপারটা এতখানি ধোয়া তুলসীপাতা ছিল না।[১০] তা সে যাই হোক, হিটালার আত্ম-কর্তৃত্ব ফিরে পেলেন বহু কাল পরে—ইতিমধ্যে মরিস গা ঢাকা দিয়ে থাকতো

---

১০ হিটলারের প্রখ্যাত জীবনী-লেখক বুলক্ বলেন—'He (Hitler) discovered that she (Geli) had allowed Maurice to make love to her', ইংরিজিতে to make love হয়তো একাধিক অর্থ ধরে।

—হঠাৎ সামনে পড়ে গেলে তুলকালাম কাণ্ড লেগে যেত।

ইতিমধ্যে আরেটা কাণ্ড ঘটে গেল। হিটলার প্রোপাগাণ্ডা-সফরে বেরুলে গেলী মায়ের কাছে, হিটলারের গ্রামের বাড়িতে চলে যেত। বোধ হয় তারই কোনো এক সময়ে হিটলার প্রিয়া গেলীকে একখানা চিঠি লেখেন—সেটাতে নাকি যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে হিটলার অতিশয় প্রাঞ্জল—শত্রুপক্ষের অভিমতে—অশ্লীল ভাষায় আপন কাম্য আদর্শ যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন। যৌনবিজ্ঞানীরা বলেন অত্যাচারী শাসকদের (টাইরেন্ট) অনেকেই নাকি মাজোকিস্ট হয়ে থাকেন—অর্থাৎ স্বাভাবিক যৌনসঙ্গমের পরিবর্তে উলঙ্গ রমণী সে স্থলে পুরুষকে তীব্র কশাঘাত করে, কিংবা তলায় সূক্ষ্ম লোহা লাগানো রাইডিং বুট পরে পুরুষের স্কন্ধোপরি ঘন ঘন বুটাঘাত করে, তবেই নাকি পুরুষ তার যৌনানন্দ পায়।[১১] শত্রুপক্ষের মতে হিটলারের চিঠি মাজোকিস্ট দর্শন বিবৃত করেছিল। সে চিঠি নাকি দুর্ভাগ্যক্রমে পড়ে যায় অন্য লোকের হাতে। অতি কষ্টে, বহু অর্থ নিয়ে (বলা হয় পার্টি-ফাণ্ড থেকে) এক ক্যাথলিক পাদ্রী—ইনি তাঁর ইহুদি-বিদ্বেষ নাৎসি পার্টিতে যোগ দিলে কার্যে পরিণত করতে পারবেন এই আশায় পার্টিতে যোগ দেন—তারই বিনিময়ে চিঠিখানা কিনে নেন। (কথিত আছে, ৩০ জুন ১৯৩৪-এ হিটলার যখন বিনা বিচারে এক তথাকথিত 'বিদ্রোহী' দলের নেতা রোম্, হাইনৎস ইত্যাদিকে গুলি করে মারবার আদেশ দেন তখন সেই মোকায় আরো জনা চারশ'র সঙ্গে এই ফাদার স্টেমপ্‌ফলেকেও খুন করা হয়। তাঁর দোষ তিনি ঐ চিঠির সারমর্ম স্বমস্তিষ্কে সীমাবদ্ধ না রেখে দু'একজন অন্তরঙ্গ পার্টি-মেম্বারকে বলে ফেলেন। হিটলার-সখা হফ্‌মান অবশ্য এ চিঠি উল্লেখ করেননি, বরঞ্চ স্টেম্‌প্‌ফলে ও অন্যান্য নাৎসি নেতা নিহত হওয়ার কয়েকদিন পর হিটলারের সঙ্গে যখন দেখা করতে যান তখন তাঁকে দেখা মাত্রই নাকি হিটলার বলে ওঠেন, 'জানো হফ্‌মান, শুয়োরের বাচ্চারা আমার প্যারা ফাদারকেও খুন করেছে!' অবশ্য এ-কথা সত্য যে, জুন ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে হিটলারের আদেশে যে পাইকারি খুন 'জুন পার্জ' বা 'জুন মাসের জোলাপ' হয়—এ লেখক তখন জার্মানিতে ও ধুম্ধুমারের যতখানি আর পাঁচটা রাস্তার নাগরিক দেখতে পেয়েছিল, সেও

---

১১ লণ্ডন পুলিস নাকি বেশ্যাবাড়িতে হামলা চালালে মাঝে মাঝে চাবুক, লোহার গুলিওয়ালা রাইডিং বুট, ইত্যাকার যন্ত্রণাদায়ক সাজসরঞ্জাম পায়, বেশ্যাদের বক্তব্য, 'খদ্দের ভদ্রলোক'। তিনি স্ত্রীকে এসব করতে আদেশ দিতে পারেন না—স্বাভাবিক লজ্জাবশতঃ। তাই এ ধরনের লোক আমাদের কাছে আসেন। আমরাও সাজসরঞ্জাম তৈরী রাখি। স্ত্রীলোক মাজোকিস্টও আছে, এবং যেসব রমণী স্বামী মারপিট করলে চিৎকার করে, কিন্তু যৌনানন্দ পায়, তাদের 'নরমতর' মাজোকিস্ট বলা হয়। অনেকের মতে অনেক রমণী বাড়িতে এমন সব কাজ করে থাকে বা করে না (যেমন ঘর ঝাঁট দিল না রান্না করলো না, বা স্বামীর গামছাখানা লুকিয়ে রাখলো) যাতে করে স্বামী তাকে ঠ্যাঙায়!

পেয়েছে, কিন্তু সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পর হিটলার জাতির সম্মুখে যখন আপন সাফাই গেয়ে বক্তৃতা করলেন, তখন আর পাঁচজন নাগরিকের মত সে সেটা বিশ্বাস না করে অবিশ্বাস করেছিল এবং পরবর্তী ইতিহাস-উদঘাটন লেখককেই সমর্থন করে—তখন গ্যোরিং, হিমলার আদেশদাতা হিটলারকে না জানিয়ে, পরে মিথ্যে অভিযোগ এনে, আপন আপন ব্যক্তিগত শত্রুও খতম করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, ফ্যুরারের গোপনীয় কেলেঙ্কারি বাবদে যখন ফাদার এতই অসতর্ক তখন এ মোকায় তাঁকে সরিয়ে ফেলাই ভালো —এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁকেও খুন করা হয়। কিন্তু এই 'পার্জ' বা জোলাপ গেলী-প্রেমের ছ'বছর পরের কথা, আমরা ১৯২৮-এ ফিরে যাই)।

তা সে চিঠি আদৌ হিটলার লিখেছিলেন কিনা সে তর্ক উত্থাপন না করলেও জানা যায়, ঐ সময়ে পার্টি-সদস্যদের ভিতর কানাঘুষা আরম্ভ হয়। কারণ ইতিমধ্যে হিটলার আরো ভালো রাস্তায় বৃহৎ ভবন কিনে সেখানে গেলীর জন্য রাজরানীর মত আবাস নির্মাণ করে সেইটেকে আপন স্থায়ী আবাস-বাটি করেছেন, গেলীকে যত্রতত্র সর্বত্র সঙ্গে নিয়ে যান, এবং নিতান্ত সরল পার্টি-সদস্যও দু-চারবার লক্ষ্য করলেই বলতো, নিশ্চয়ই ফ্যুরার এ মেয়েতে মজেছেন। তা তিনি মজুন, কিন্তু একে বিয়ে করলেই তো পারেন। নইলে শত্রুপক্ষ যে বলছে হিটলার রক্ষিতা পোষণ করেন, দু'কান কাটার মত স্বভবনে তার সঙ্গে বাস করেন, তিন কান কাটার মত সগর্বে সদম্ভে তাকে নিয়ে সর্বত্র—এমন কি পোলিটিকাল পার্টি মিটিঙেও—যাতায়াত করেন, এবং আপন ভাগিনীর—তা হোক না সে সৎবোনের মেয়ে—ভবিষ্যৎটি যে ঝরঝরে করে দিচ্ছেন সে বিষয়ে তাঁর কোনো বিবেকদংশন নেই; আর এতদিন ধরে প্রচার যে, হিটলারের মত সর্বত্যাগী, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ আর হয় না, তিনি যে ঊনচল্লিশ বছর বয়সেও দারগ্রহণ করেননি তার একমাত্র কারণ, দারাপুত্রপরিবার দেশের জন্যে তাঁর আত্মোৎসর্গে অন্তরায় হবে বলে। জিতেন্দ্রিয় না কচু!

এই 'কেলেঙ্কারি'তে পার্টির কতখানি ক্ষতি হচ্ছিল বলা কঠিন, কিন্তু এ কথা সত্য যে নাৎসি পার্টির ভ্যুরটেম্বের্গ অঞ্চলাধিপতি মুরুব্বী, পার্টির এক অতি প্রাচীন সদস্য যখন হিটলারের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করলেন তখন তিনি রাগে ক্রোধে চিৎকার করে তাঁকে পার্টি থেকে স্রেফ খেদিয়ে দিলেন।

এদিকে হিটলারের কড়া পাহারা গেলীর উপর। হফ্‌মানের মতে তিনি আদৌ জানেন না যে গেলী অন্যজনকে অতি গভীরভাবে ভালোবাসে—ভিয়েনায় নাকি দয়িতের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। এবং এ কথাও সত্য, গেলী বার বার সঙ্গীতচর্চা করার জন্য তার প্রাচীন গুরুর কাছে ভিয়েনায় যেতে চায়—এবং হিটলারের কবুল জবাব, 'নাইন' অর্থাৎ নো। যে ম্যুনিকের সহস্র সহস্র নরনারী হিটলারের উচ্ছ্বসিত ভক্ত, সেই হিটলার যখন গেলীর পদপ্রান্তে তাঁর প্রণয় রাখলেন তখন আর কিছু না হোক, এত বড় সর্বজনপ্রশংসিত একটা গ্রেটম্যানের বশ্যতা গেলিকে নিশ্চয়ই মুগ্ধবিহ্বল করেছিল। (প্রেমের প্রতিদান দিক আর না-ই দিক) এবং হয়তো হিটলার সেই বিহ্বলতাকেই প্রণয়ের

প্রতিদান হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। হফ্‌ম্যানের মতে হিটলারের 'গ্রেট লভ্‌' ছিল স্বার্থপর প্রেম—অনেক মুনিঋষিরাও বলেন, 'গ্রেট লভ্‌' কখনো নিঃস্বার্থ হতে পারে না, সে 'লাভার' অন্য সকলের প্রতি হয়ে যায় হিংসাপরায়ণ, তার বুভুক্ষা অসীম। বার্নার্ড শও বলেছেন, 'গ্রেট লভ্‌' সামলে-সুমলে অল্প মেকদারে ধীরে ধীরে প্রকাশ করতে হয়। নইলে দয়িতার দম বন্ধ হয়ে আসে। যেন কোনো 'ম্যানিয়াক' প্রেমোন্মাদ তাকে অষ্টপ্রহর আলিঙ্গনাবদ্ধ করে নিরুদ্ধনিশ্বাস করে তুলছে।

ম্যুনিকের বছরের সব চেয়ে বড় নাচের পরব এগিয়ে আসছে। প্রাণচঞ্চলা গেলী কেন, নিতান্ত অর্থাভাব না হলে, কিংবা প্রেমিকও দরিদ্র হলে, ম্যুনিকের কোনো তরুণী সে নাচ বর্জন করে? প্রথমটায় হিটলার তো কানই দেন না। আর গেলীও ছাড়বে না। শেষটায় বাধ্য হয়ে হিটলার রাজী হলেন, কিন্তু শর্ত রইল দুটি। সঙ্গে যাবেন দুই গার্জেন এবং দুই গার্জেনদের প্রতিজ্ঞা করতে হল যে রাত এগারোটার ভেতর গেলীকে ফের বাড়ি পেঁছে দিতে হবে।

সেই ডান্‌সের জন্য যে পারে সে-ই নূতন হালফেশানের ফ্রক তৈরী করায়। ম্যুনিকের সর্বশ্রেষ্ঠ ডিজাইনার-দর্জি ডাঁই ডাঁই অতি অরিজিন্যাল ডিজাইন রেখে গেল। হিটলার এক নজর বুলিয়েই সব কটা নামঞ্জুর করে দিলেন। এগুলো বড্ড বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে—বড্ড বেশী সালংকার—যদ্যপি ফ্রক হিসাবে অত্যুৎকৃষ্ট। গেলী যাবে সাধারণ ইভনিং ড্রেস পরে।

তাই হল। স্বয়ং হফ্‌মান ও তাঁর চেয়ে বুড়ো পার্টির প্রাচীন সদস্য আমান্‌ গেলীর 'চরিত্ররক্ষকস্বরূপ' তাকে মধ্যিখানে নিয়ে গেলেন নাচের মজলিশে। এক্ষেত্রে তরুণীরা প্রায় সর্বদাই আপন আপন লভারের সঙ্গে এ নাচে কেন—সব নাচেই যায়।

এবং ফিরতে হবে রাত ১১ টায়। বলে কি? মাথা খারাপ!

হফ্‌মান বলেছেন—এবং এ লেখকও আপন একাধিক অভিজ্ঞতা থেকে অসংকোচে সায় দেবে—এ-সব নাচে ফুর্তি-ফার্তি ফষ্টি-নষ্টি এমন কি কিঞ্চিৎ বেলেল্লাপনা আসলে আরম্ভ হয় রাত বারোটার পর। আমার মতে জমে প্রায় দুটোয় এবং নাচ ভাঙ্গে ছ'টায়।

অনুমান করা কঠিন নয় যে গেলী অত্যধিক আপ্যায়িত বা সন্তুষ্ট হয়নি। নাচের মাঝে মাঝে ফাঁকে ফাঁকে কপোত-কপোতীরা জোড়ায় জোড়ায় ফোটো-গ্রাফ তোলায়। গেলীর যথেষ্ট কাষ্ঠরস ছিল। সে-ও ছবি তোলালে ঐ দুই প্রহরী 'ডালকুত্তা'র মাঝখানে। কপোত-কপোতীর এক হাতে থাকে সফেন শ্যাম্পেন গ্লাস, অন্য হাতে গোটাপাঁচেক বেলুনের সুতো, মাথায় ঐ বলডান্‌সেই কেনা রঙ-বেরঙের ফুল্‌স্‌ ক্যাপ, গাধার টুপি ইত্যাদি। গেলী ছবি তোলালে এমন কায়দায় যেন মনে হয় ফাঁসির আসামীকে তার দুই জল্লাদ তাকে ফাঁসি-কাঠে নিয়ে যাবার সময় প্রেস ফোটোগ্রাফার যে ভাবে ছবি তোলে।

হফ্‌মান বিরক্তির সঙ্গে কাঁটায় কাঁটায় এগারোটার সময় হিটলারের গচ্ছিত মহামূল্যবান গেলীকে মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন।

পরদিন সকাল বেলা সাড়ম্বরে 'সরকারী' কায়দায় গেলী ফোটোগ্রাফখানা মামাকে উপহার দিলেন। হিটলার এ সব নাচ এককালে বিস্তর না হোক অল্প-বিস্তর নিশ্চয়ই দেখেছিলেন। তাঁর মত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যে ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ না করাই ভাল।

বৈমাত্রেয় মামা হলেও গেলী পেয়েছিল হিটলারের একটি মহৎ গুণ ; সে তার পেটের কথা কাউকে বলতো না। যে-পুৎসি হান্‌ফ্‌স্টেঙেল তাঁর পুস্তকে হিটলার ও গেলীর বিরুদ্ধে প্রচুরতম বিষোদ্গার করেছেন তিনি সে সময়ে নিত্য নিত্য হিটলারের বাড়িতে আসতেন, এবং গেলীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। তৎসত্ত্বেও তিনি তাঁর পুস্তকে গেলীকে দিয়ে রামগঙ্গা কিছুই বলাতে পারেননি। শুধু একবার নাকি তিনজনা যখন একসঙ্গে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন হিটলার কি একটা রূঢ় মন্তব্য করলে, পুৎসি শুনতে পেলেন, গেলী দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট কণ্ঠে বললে, "ব্রুট"—পশু !

গেলীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল হফ্‌মান পরিবারের প্রতি এবং সমস্ত ম্যুনিক শহরে ঐ পরিবারের কর্ত্রী এর্না হফ্‌মানের সঙ্গে তার ছিল অন্তরঙ্গতা। কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত আগাপাস্তলা কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি, স্বামীকেও বোঝাতে পারেননি। পুৎসি তাঁর বিষোদ্গারের সময় গেলীর যত নিন্দাই করে থাকুন না কেন, এর্না পাঁচজনকে যা বলেছেন তার থেকে বোঝা যায়, তিনি, এর্না নিজে আর্টিস্ট ছিলেন বলে শুধু যে গেলীর অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে মজে-ছিলেন তাই নয়, তার মানসিক ও চারিত্রিক একাধিক বিরল সৎগুণ তাঁকে সত্যই মুগ্ধ করেছিল। এমন যে বয়স্কা বান্ধবী যাঁর কাছে সান্ত্বনা পাওয়া যায়, বিপদে আপদে উপদেশ পথনির্দেশ চাওয়া যায় পাওয়া যায় তাঁর কাছেও গেলী তার সুখ-দুঃখের কথা বলত না। শুধু একদিন মাত্র, কেমন যেন আত্মহারা হয়ে সে স্বীকার করে যে, সে যখন ভিয়েনায় ছিল তখন কোনো একজনকে গভীরভাবে ভালবেসেছিল। সামান্য এই, এতটুকু বলার পর সে হঠাৎ থেমে গেল, যেন সম্বিতে ফিরে এসে বুঝতে পারল, বড্ড বেশি বলা হয়ে গিয়েছে, তাই সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'আর যা আছে, সেটা আছেই। আপনিও কিছু করতে পারবেন না, আমিও কিছু করতে পারবো না। অতএব অন্য কথা পাড়ি।' এর্না দুঃখিনী গেলীকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন, সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দিলেন—এর্না বাস্তবিকই দৃঢ় চরিত্রের রমণী ছিলেন, অনেকের জন্য অনেক কিছু করেছিলেন, নাৎসি পার্টিতে যোগ দেননি, এবং যদিও হিটলারকে সমীহ করে চলতেন তবুও অন্যান্য বাবদে দু একবার তাঁকেও খাঁটি অপ্রিয় সত্য কথা শোনাতে কসুর করেননি—কিন্তু গেলী তার শামুকের খোল থেকে বেরুতে রাজী হল না। পরবর্তী ঘটনা থেকে মনে হয়, সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল, সে যা চায় হিটলার তার ঘোরতর বিরোধী এবং এই নিরীহ হফ্‌মান দম্পতি এখনও হিটলারের স্বরূপ চেনে না, হিটলার তাঁর মর্জিমাফিক যে সব সম্ভব-অসম্ভব কার্য করতে ও করাতে পারেন সে সম্বন্ধে এঁদের কণামাত্র ধারণা নেই—হিটলারের যে-'স্বরূপ' সে তার প্রতিদিনের সান্নিধ্যে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হয়েছিল।

সেদিন এর্না শুধু এইটুকু জানতে পেরেছিল যে গেলী ভিয়েনায় একজন আর্টিস্টকে ভালবোসে, কিন্তু সে কে, তাদের দুজনার মধ্যে কি আদান-প্রদান হয়েছে গেলী যদি তার ভালবাসার প্রতিদান পেয়ে থাকে তবে উভয়ের বিবাহের প্রতিবন্ধকই বা কি— এ-সব হফ্‌মানরা জানতে পারেননি, পরে অন্য কেউও জানতে পারেনি।

এদিকে গেলীর মুখ সদা প্রফুল্ল, মামার বুড়া-বুড়া প্রাচীন দিনের পার্টি-সদস্যরা তার উপর বড়ই প্রসন্ন, মামার বানানো সেই কাঁটাজালের ভিতরও তার বিধিদত্ত সরসতা লোপ পায়নি। পুৎসি এটাকেই ঘৃণা করে বলেছেন 'ককেটরি' —এর বাংলা প্রতিশব্দ কি? ঢলাঢলিপনা? কি জানি! হফ্‌মান বলেন, তাঁর মনে সন্দেহ নেই যে এটা ছিল তার বাহিরের মুখোশ। এই প্রাণবন্ত, প্রকৃতিদত্ত সদাচঞ্চলা, আনন্দে হাসিতে যে কোন মুহূর্তে কারণে অকারণে শতধা হয়ে ফেটে যাওয়া যার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, তার চতুর্দিকে বিধিনিষেধের কাঁটার জাল! ম্যুনিকের মত স্বাধীন শহরে—যেখানে নর-নারী কি রকম অবাধে মেলামেশা করে সেটা এদেশে বসে কল্পনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব—গেলী কারো সঙ্গে কথা কইতে পারবে না মামার অজান্তে, কারো সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে পারবে না মামার পরিষ্কার অনুমতি ভিন্ন, এমন কি ঐ বয়সের আর পাঁচটা মেয়ে যে সামাজিকতা করে থাকে, যে লোকাচারসম্মত ভদ্রতা-সৌজন্য করে পাঁচজনের সাহচর্য সঙ্গসুখ পায়—এর কোন একটা সে করতে পারে না, মামাকে না জানিয়ে, মামার অনুমতি ছাড়া।

সেই 'ডালকুত্তা'—শব্দটা হফ্‌মান তিক্ততার সঙ্গে নিজেই ব্যবহার করেছেন —দুটিকে নিয়ে ডান্‌সে যাওয়ার ফার্সের পরের দিন হফ্‌মান আর সহ্য না করতে পেরে হিটলারকে বললেন, 'আপনি গেলীর চতুর্দিকে যে পাঁচিল খাড়া করে তুলেছেন তার ভিতর মেয়েটার যে দম বন্ধ হয়ে আসছে। যে নাচে কাল রাত্রে তার ফুর্তি করার কথা ছিল, সেটা শুধু তার অবরুদ্ধ জীবনের তিক্ততা তিক্ততর করে তুলেছিল।'

হিটলার উত্তরে বললেন, 'আপনি জানেন, হফ্‌মান, গেলীর ভবিষ্যৎ আমার কাছে এমনই প্রিয়, এমনই মূল্যবান যে তাকে সর্বক্ষণ চোখে চোখে রাখা আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি। এ-কথা খুবই সত্য আমি গেলীকে ভালবাসি এবং আমি তাকে বিয়েও করতে পারি, কিন্তু বিয়ে করা সম্বন্ধে আমার মতামত কি আপনি ভালো করেই জানেন, এবং আমি যে কদাপি বিয়ে করবো না বলে দৃঢ় সিদ্ধান্ত করেছি সে-কথাও আপনি জানেন। তাই আমি এটাকে আপন ন্যায়সম্মত অধিকার বলে ধরে নিয়েছি যে যতদিন না গেলীর উপযুক্ত বর এসে উদয় হয় ততদিন পর্যন্ত সে যার সঙ্গে পরিচয় করতে চায় এবং যারা তার পরিচিত তাদের উপর কড়া নজর রাখা। আজ গেলী যেটাকে বন্ধন বলে মনে করছে সেটা প্রকৃতপক্ষে বিচক্ষণ আত্মজনের সুচিন্তিত সতর্কতা। আমি মনে মনে দৃঢ়তম সংকল্প করেছি গেলী যেন জোচ্চোরের হাতে না পড়ে বা এমন লোকের পাল্লায় না পড়ে যে গেলীকে দিয়ে আপন ভবিষ্যৎ গুছিয়ে নেবার

অ্যাড্‌ভেঞ্চারের তালে আছে।'

হফ্‌মান এস্থলে যোগ দিচ্ছেন, হিটলার অবশ্য জানতেন না, যে গেলী গোপনে গোপনে ভিয়েনাবাসী এক তরুণকে মনপ্রাণ দিয়ে গভীর ভালবাসে।

হিটলার গিয়েছিলেন ম্যুনিকের বাইরে—গেলীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মায়ের কাছে—আবার যাবেন দূর হামবুর্গে, মাঝপথে কয়েক ঘণ্টার জন্য ম্যুনিকে থামবেন এবং গেলীকে গ্রাম থেকে আনিয়েছেন। হামবুর্গের দীর্ঘ সফরে সহযাত্রী হওয়ার জন্য তিনি পূর্বেই হফ্‌মানকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এস্থলে হফ্‌মানের বিবরণী মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর (অর্থাৎ ম্যুনিক সমাজে হিটলার গেলীকে পরিচয় করিয়ে দেবার চার বৎসর পর—কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি গেলীকে ম্যুনিক সমাজে উপস্থিত করেন, তাহলে হবে সাত বৎসর পর, কিন্তু এ বাবদে আমি হফ্‌মানকেই বিশ্বাস করি, এবং এসব ঐতিহাসিকদের বই বেরিয়েছে হফ্‌মানের বই বেরুবার পূর্বেই) হফ্‌মান এলেন হিটলারের বাড়িতে। গেলী মায়েরই মতো ভালো ঘরকন্না করতে জানত, তাই সে তখন হিটলারের স্যুটকেস গুছিয়ে দিচ্ছে। হিটলার সখাসহ যখন সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নামছেন, তখন উপরের তলার রেলিঙের উপর ভর করে, নিচের দিকে ঝুঁকে গেলী বলতে লাগল, 'ও রেভোয়া মামা অ্যাডল্‌ফ, ও রেভোয়া, হ্যার হফ্‌মান!' হিটলার দাঁড়ালেন, তারপর উপরের দিকে তাকিয়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে দোতলার দিকে চললেন। হফ্‌মান বাইরে এসে পেভমেণ্টে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

হিটলার এলে পর মোটরে উঠে দুজনা চললেন উত্তর দিকে ন্যুরন্‌বের্গ পানে। শহর থেকে বেরুবার সময় হিটলার বন্ধু হফ্‌মানকে বললেন, 'কেন জানি নে আমার মনটা যেন অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে।'

হফ্‌মান বিবেচক লোক। তিনি নিজেই ঠাট্টা করে বলেছেন, 'অনেকেই আমাকে আড়ালে হিটলারের কোর্টজেস্টার (গোপালভাঁড়) বলত, এবং হয়তো সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়।' তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'এ সময়কার দখিণা "ফ্যোন" বাতাসটা সক্কলেরই বুকের উপর চেপে বসে সবাইকে মনমরা করে দেয়।' কিন্তু হিটলার চুপ করে রইলেন, এবং দীর্ঘ ন্যুরন্‌বের্গের রাস্তা ড্রাইভ করার পর সেখানকার পার্টি-মেম্বারদের প্যারা হোটেলে উঠলেন।

পরের দিন ন্যুরন্‌বের্গ শহর ছেড়ে যখন তাঁরা বায়রট্‌ শহরের দিকে এগুচ্ছেন তখন হিটলার ড্রাইভিং সীটের সামনের ছোট্ট আয়নাটিতে লক্ষ্য করলেন, আরেকখানা মোটর দ্রুততর বেগে ক্রমশই তাঁদের গাড়ির কাছে এগিয়ে আসছে। নিরাপত্তার জন্য হিটলারের হুকুম ছিল কোনো গাড়ি যেন তাঁর গাড়ি ওভারটেক না করতে পায়, কারণ ঐ সময় দুটো গাড়িই কিছুক্ষণ পাশাপাশি চলে বলে অন্য গাড়ি থেকে হিটলারের উপর গুলি চালানো কঠিন নয়। হিটলার সোফার শ্রেক্‌কে সেই আদেশ দিতে যাচ্ছেন সেই সময় তিনিই লক্ষ্য করলেন, যে-গাড়ি পশ্চাদ্ধাবন করছে সেটা ট্যাক্সি এবং ড্রাইভারের পাশে

হোটেলের উর্দিপরা একটি ছোকরা ক্ষিপ্তের ন্যায় দু হাত নাড়িয়ে তাঁদের থামবার জন্য সংকেত করেছে। শ্রেক্ গাড়ি দাঁড় করালে ছেলেটি উত্তেজনায় হাঁফাতে হাঁফাতে বললে, 'হ্যার হেস (ইনি তখন এবং ১৯৪১-এ যখন অ্যারোপ্লেনে করে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে লণ্ডন যান তখনও হিটলারের পরেই তাঁর স্থান ছিল) ম্যুনিক থেকে ট্রাংককল করে অত্যন্ত জরুরী বিষয় নিয়ে হিটলারের সঙ্গে কথা বলতে চান। তিনি ফোনে না পেঁছিনো পর্যন্ত হেস লাইন ছাড়বেন না।' দুই বন্ধু মোটর ঘুরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে চললেন ন্যুরন্বের্গ পানে।

গাড়ি ভাল করে থামতে না থামতেই হিটলার লাফ দিয়ে মোটর থেকে বেরিয়ে ছুটে ঢুকলেন হোটেলের ভিতর এবং তারপর টেলিফোনের বাক্সে (বুথে) —বুথের দরজা পর্যন্ত তিনি বন্ধ করেননি। পিছনে পিছনে ছুটে এসেছেন হফ্মান এবং টেলিফোন বুথের দরজা খোলা বলে হিটলারের প্রত্যেকটি শব্দ শুনতে পেলেন।

'এখানে হিটলার—কি হয়েছে?' উত্তেজনায় হিটলারের গলা খসখসে কর্কশ হয়ে গিয়েছে। 'হে ভগবান! এ কী ভয়ংকর!' অপরপ্রান্ত থেকে কি একটা খবর শুনে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, এবং তাঁর কণ্ঠস্বরে পরিপূর্ণ হতাশা। তারপর দৃঢ়তর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, এবং সে কণ্ঠস্বর শেষটায় প্রায় চিৎকারের পর্যায়ে পেঁছিল, 'হেস! আমাকে উত্তর দাও—হাঁ কিংবা না—মেয়েটা এখনো বেঁচে আছে তো?...হেস, তুমি অফিসার, সেই অফিসারের নামে দিব্যি দিচ্ছি—আমাকে সত্য করে বলো—যেয়েটা বেঁচে আছে, না মরে গেছে?... হেস!...হেস!' এবারে হিটলার তীব্রতম কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন। মনে হল তিনি অপর প্রান্ত থেকে কোনো সাড়া পাচ্ছেন না। হয় লাইন কেটে গেছে, নয় হেস উত্তর দেবার দুর্বিপাক এড়াবার জন্য রিসীভার হুকে রেখে দিয়েছেন। হিটলার টেলিফোন বুথ থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এলেন, তাঁর চুল নেমে এসে কপাল ঢেকে ফেলেছে (এ কথাটা তাঁর খাস চাকর লিঙে একাধিকবার বলেছে, যে, হিটলার তাঁর মাথার চুল কিছুতেই বাগে রাখতে পারতেন না—অল্পেতেই সেটা কপাল ঢেকে ফেলত), তাঁর চাউনি ছন্নের মত, তাঁর চোখ দুটো যে উজ্জ্বল হয়ে ঝকঝক করছে সেটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।

শ্রেকের দিকে মুখ করে বললেন, 'গেলীর কি যেন একটা কি ঘটেছে। আমরা ম্যুনিক ফিরে যাচ্ছি। গাড়ির যা জোর আছে তার শেষ আউন্স্ পর্যন্ত কাজে লাগাও। গেলীকে জীবিত অবস্থায় আবার আমাকে দেখতেই হবে।'

'টেলিফোনের বুথ থেকে ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো টুকরো যে সব কথা ভেসে এসেছিল তার থেকে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলুম, গেলীর কিছু একটা হয়েছে, কিন্তু ঠিক ঠিক কি সেটা বুঝতে পারিনি, এবং হিটলারকে জিজ্ঞেস করার মত সাহসও আমার ছিল না।'—বলছেন স্বয়ং হফ্মান।

হিটলারের উন্মাদ উত্তেজনা যেন সংক্রামক। শ্রেক্ চেপে ধরেছে

অ্যাকসিলীরেটর। মোটরের মেঝে পর্যন্ত তার গাড়ি তীব্র আর্তনাদ করে ছুটে চলেছে ম্যুনিকের দিকে। হফ্‌মান মাঝে মাঝে মোটরের ছোট্ট আর্শিতে দেখছেন হিটলারের চেহারা—ঠোঁট দুটো চেপে তিনি উইণ্ডস্ক্রীনের ভিতর দিয়ে সম্মুখপানে তাকিয়েও যেন কিছু দেখছেন না। আমাদের মধ্যে একটি মাত্র বাক্য বিনিময় হল না—যে যার বিমর্ষ চিন্তা নিয়ে ডুবে আছে আপন মনের গহনে।

অবশেষে আমরা তাঁর বাড়িতে পেঁছিলুম এবং সেই ভয়ংকর দুঃসংবাদ জানতে পেলুম। চব্বিশ ঘণ্টা আগে গেলী মারা গিয়েছে। সে তার মামার অস্ত্রভাণ্ডার থেকে একটি ৬·৩৫ পিস্তল নিয়ে হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি জায়গায় গুলি করেছে। ডাক্তারদের মতে যদি সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা হত তবে হয়তো তাকে বাঁচানো অসম্ভব হত না। কিন্তু সে দরজা বন্ধ করে গুলি ছুঁড়েছিল, কেউ সে শব্দ শুনতে পায়নি এবং ধীরে ধীরে রক্তক্ষরণে সে ইহলোক ত্যাগ করেছে।

ইতিমধ্যে পোস্টমর্টেম, করোনারের তদন্ত সব কিছু হয়ে গিয়েছে এবং পুলিস মৃতদেহ ফেরত দিয়েছে। ডাক্তারের রিপোর্ট থেকে বোঝা গেল, হিটলারের বিদায়ের অল্প পরেই গেলী আত্মহত্যা করে। সে দেহ এখন আনুষ্ঠানিক ভাবে সুসজ্জিত করে কবরস্থানে রাখা হয়েছে—তিন দিন পর গোর হবে—এ সময় আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব মৃতকে শেষবারের মত দেখে নেন এবং আত্মার সদ্গতির জন্য আপন আপন প্রার্থনা জানান।

গেলীর মা ইতিমধ্যে বের্ষটেশগাডেন থেকে এসে গেছেন। পার্টির মুরুব্বীদের একাধিকজন ও হিটলার-ভবনের বন্ধু প্রাচীন দিনের 'গৃহরক্ষিণী' ফ্রাউ ভিন্‌টারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। গেলীর মা নির্বাক অশ্রুধারে সিক্ত হচ্ছিলেন।

* * *

'গৃহরক্ষিণী' ফ্রাউ ভিন্‌টার যা বললেন তার সারমর্ম এই, হিটলার বাড়ি ছাড়ার পূর্বে সিঁড়ি দিয়ে আবার দোতলায় উঠেছিলেন—এর বর্ণনা আমরা হফ্‌মান মারফৎ আগেই দিয়েছি—গেলীকে আরেকটু আদর করার জন্য, কারণ তিনি সেদিনই ম্যুনিক ফিরেছিলেন এবং সেদিনই আবার ন্যুরন্‌বের্গ হয়ে হামবুর্গ চলে যাচ্ছিলেন বলে গেলীর প্রতি যথেষ্ট যত্নবান হতে পারেননি। সেই অনিচ্ছাকৃত অবহেলাটা যেন খানিকটা দূর করার জন্য তিনি উঠে গেলীর গালের উপর হাত দিয়ে আদর করতে করতে কানে কানে সোহাগের কথা কইছিলেন কিন্তু গেলী যেন কোনো সান্ত্বনা মানতে চায়নি, তার রাগও পড়েনি।

দু'জনার চলে যাওয়ার পর গেলী ফ্রাউ ভিন্‌টারকে বলে, 'সত্যি বলছি, আমার ও মামার মধ্যে কোনো জায়গায় মিল নেই (নাথিং ইন্‌ কমন্‌)।'

ফ্রাউ ভিন্‌টার কিন্তু এ-কথা বললেন না, হফ্‌মানও নীরব, যে সেদিনই হিটলারে গেলীতে তুমুল কথা-কাটাকাটি হয়, এবং সেপ্টেম্বর মাসে অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত নাহলে—এবং সেদিন আদৌ হয়নি—অনেকেরই জানলা খোলা থাকে

বলে একাধিক প্রতিবেশী সে কলহের উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনতে পান। শাইরার প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা বলেন, (Shirar : The Rise & Fall of the Third Reich ; Aufstieg und Fall des dritten Reiches 1960/61) যে, গেলী ভিয়েনা গিয়ে গলা সাধবার জন্য আবার অনুমতি চাইছিল, এবং হিটলার পূর্বের ন্যায় কণ্ঠে অসম্মতি জানাচ্ছিলেন।

এই ব্যথাটা অস্বাভাবিক অপ্রত্যাশিত নয়, কারণ গেলীর মৃত্যুর পর তার ঘরে ভিয়েনার গুরুর উদ্দেশে তার লেখা একখানা অর্ধসমাপ্ত চিঠি পাওয়া যায়। যেটাতে সে গুরুকে জানাচ্ছে, সে আবার ভিয়েনায় এসে তাঁর কাছে কণ্ঠসঙ্গীত শিখতে চায়।

ফ্রাউ ভিন্‌টার আরো বললেন যে, মিত্রসহ হিটলার চলে যাওয়ার পর গেলী তাঁকে বলে যে সে এক বন্ধুর (বা বান্ধবীর) সঙ্গে সিনেমায় যাচ্ছে, এবং তার জন্য যেন রাত্রের কোনো খাবার তৈরী করা না হয়। সে রাত্রে তিনি তাই গেলীকে আবার দেখতে না পেয়ে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা করেননি। গেলী ব্রেকফাস্ট খেত ভোরেই, এবং সে যখন তার অভ্যাসমত ঐ সময়ে ব্রেকফাস্ট করতে এল না, তখন ফ্রাউ ভিন্‌টার তার ঘরে গিয়ে টোকা দিলেন। কোনো উত্তর না পেয়ে তিনি চাবির ফুটো দিয়ে ভিতরের দিকে তাকাবার চেষ্টা দিলেন, কিন্তু চাবি ফুটোতে লাগানো এবং ঘর ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে তিনি তাঁর স্বামীকে ডাকেন। তিনি দরজা ভেঙে যখন ভিতরে ঢুকলেন, তখন সম্মুখে ভয়ানক দৃশ্য। গেলী এক ডোবা রক্তে পড়ে শুয়ে আছে, তার পিস্তলটা সোফার এক কোণে। ফ্রাউ ভিনটার তৎক্ষণাৎ গেলীর মাকে খবর দেন, এবং হেস্‌ ও পার্টির কোষাধ্যক্ষ শ্বার্ৎসকে জানান।

অনেকেই এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু হফ্‌মানের আত্মচিন্তা এস্থলে বিশেষ মূল্য ধরে। তিনি বলছেন, 'হিটলার কি গেলীর আত্মহত্যার প্রকৃত কারণ জানতেন ? তিনি যে শহর ছাড়ার সময় বলেছিলেন, "কেন জানি নে, আমার মনটা যেন অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে" সেটা কি ইন্দ্রিয়াতীত কোনো অনুভূতিসঞ্জাত অস্বস্তিবোধ, অথবা কি গেলীর কাছ থেকে শেষ বিদায় নেবার সময় এমন কিছু একটা ছিল যেটা তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ?'

তার চেয়ে যে জিনিস হফ্‌মানের কাছে একবারেই দুর্বোধ্য ঠেকেছিল সেটা এই : ফ্রাউ ভিন্‌টার বলেন, হিটলার এবং তিনি চলে যাওয়ার পর গেলী অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে নুয়ে পড়ে। এ তথ্যটা বুঝতে তাঁর কোনো অসুবিধা হল না, কিন্তু তারপর ফ্রাউ ভিন্‌টার যা বললেন সেটা তাঁর বিচার-বিবেচনাকে দিল একদম ঘুলিয়ে। ফ্রাউ ভিনটার বার বার জোর দিয়ে বললেন, গেলী হিটলার—একমাত্র হিটলারকেই ভালোবাসতো ; বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা, গেলীর বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকি-টাকি মন্তব্য ফ্রাউ ভিনটারকে দৃঢ়নিশ্চয় করেছিল হিটলারকেই গেলী ভালবাসে। হফমান বলছেন, 'কিন্তু আমার যতদূর জানা এবং ভালো করেই জানা—গেলী ভালাবাসতো অন্য একজনকে।'

এর সঙ্গে তাহলে আরেকটি তথ্য জুড়তে হয়, হফমানের ফোটো কর্মশালায়

তার কিছুদিন পূর্বে হিটলার শ্রীমতী এফা ব্রাউনের সঙ্গে পরিচিত হন[১২], যে এফাকে তিনি মৃত্যুর অল্প পূর্বে বিয়ে করেন, এবং হফ্‌মানের মতে তাঁদের বন্ধুত্ব নিবিড়তর হয় বেশ কিছুকাল পরে এবং গেলী মামাকে লেখা এফার একখানা চিঠি দৈবযোগে মামার কোটের পকেটে পেয়ে যায়। তাহলে বলতে হবে, ফ্রাউ ভিন্‌টারের রহস্য সমাধান হয়তো সম্পূর্ণ ভুল নাও হতে পারে।

একটা কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। যদিও সেটা পরের এবং অনেক দিন ধরে চলছিল। গেলীর মা এমনিতেই এফা ব্রাউনকে পছন্দ করতেন না, এবং গেলীর মৃত্যুর পর সে অপছন্দটা পরিপূর্ণ ঘৃণায় গিয়ে পেঁছিল। হফ্‌মান এবং অন্যান্যরা তাঁকে যতই বোঝাবার চেষ্টা করতেন তিনি ততই অকুণ্ঠ ভাষায় জোর দিয়ে বলতেন, তাঁর মনে কণামাত্র দ্বিধা নেই যে, তাঁর মেয়ে হিটলারকেই ভালোবাসতো এবং ঐ এফা ব্রাউনের অস্তিত্ব ও হিটলারের উপর তার প্রভাব গেলীকে গভীরতর নৈরাশ্যে নিমজ্জিত ক'রে দেয়, এবং এইটেই গেলীর অকাল মৃত্যুর অন্যতম প্রধানতম কারণ।

* * *

এদেশের জোরালো গোটা দু'তিন দল তাদের বেপরোয়া আপন আপন দৈনিক নেই বলে বহু কেলেঙ্কারি-কেচ্ছা অনায়াসে চাপা পড়ে। ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশে অবস্থাটা ভিন্ন প্রকারের। বিশেষতঃ ভাইমার রিপাবলিক যুগে —এই খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশকে, হিটলার চ্যানসেলার না হওয়া পর্যন্ত (১৯৩৩) জর্মনির খবরের কাগজে কাগজে নরক ছিল গুলজার, বিশেষত জর্মনরা যখন ইংরেজী খবরওলাদের 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই' 'থীভ্‌স্‌ এগ্রীমেণ্টে' আদৌ বিশ্বাস করে না। তাই মুনিকের খবরের কাগজগুলোর অস্বাভাবিক মৃত্যু যেন মৌচাকের উপর ঢিলের মত হয়ে এসে পড়ল। আর কাফে কাফে বারেতে বারেতে গুজোবগুঞ্জরণের তো কথাই নেই। এমন কি নাৎসি পার্টির ভিতরও নানা মুনি নানা মত দিতে লাগলেন। যারা সরাসরি দুশমন তাদের একদল বেশ জোর গলায় বললে, 'নাৎসি পার্টি' তার প্রভাব ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে অটপসি আদৌ করাতে দেয়নি, করোনারের সামনে যা-কিছু ঘটেছে তার সমস্তটাই আগাগোড়া থাড্ডো কেলাসী থিয়েডারের ফার্স', এবং এক দল বললে, 'তাই হবে, কারণ এটা আত্মহত্যা নয়, আসলে খুন, এবং খুনী স্বয়ং হিটলার। তিনি হামবুর্গ পানে রওয়ানা হয়েছিলেন সত্য কিন্তু সেটা ছিল ফাঁদ পাতার মত। সন্ধ্যার সময় ফের বাড়ি ফিরে আসেন, এবং গেলীকে অন্য পুরুষের সঙ্গে এমন অবস্থায় পান যে তখন হিটলারের মত হিংস্র প্রাণীর মাথায় যে খুনচাপবে তাতে আর বিচিত্র কি?' অন্য দলের বক্তব্য, 'না, পরপুরুষ ছিল না, শুধু গেলীর ভিয়েনা যাওয়ার ইচ্ছে নিয়ে কথা-কাটাকাটি এমনই চরমে পেঁছিয় যে হিটলার আত্মকর্তৃত্ব সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেন এবং উন্মাদাবস্থায়

---

১২ শাইরার বলেন, হিটলার ও ব্রাউনের পরিচয় হয় গেলীর মৃত্যুর এক বা দুই বৎসর পরে। কিন্তু এ বিষয়ে হফমানের বক্তব্যই অধিকতর বিশ্বাস্য।

গেলীকে খুন করেন।' আবার কেউ কেউ বললেন, 'না, খুন করেছেন হিমলার। পার্টির মুরুব্বীরা যখন দেখলেন যে হিটলারের খোলাখুলি বেলেল্লাপনার ঠেলায় পার্টির ইজ্জৎ যায়-যায় (যদিও আমি যতদূর জানি জনসমাজে গেলীর সঙ্গে হিটলারের আচরণ ছিল ভদ্র, সংযত, ইংরিজিতে যাকে বলে 'করেক্ট্'; অন্যপক্ষের বক্তব্য আমরা যদি মিনিমাম্‌টাও নিই সেটাও যথেষ্ট খারাপ, কারণ এ-কথা তো আর মিথ্যে নয় যে, 'তুমি মেয়েটাকে ভালোবাসো এবং তাকে নিয়ে একই বাড়িতে বাস করো, আর তার মাকে রেখেছ দূরে গাঁয়ের বাড়িতে যখন তুমি তাঁকেও অনায়াসে এখানেই রাখতে পারতে—'), ওদিকে হিটলার ছাড়া যে পার্টি দুদিনেই কাত হয়ে যাবে সেটাও অবিসংবাদিত সত্য, তখন তাঁরা পার্টি বাঁচাবার জন্য হিমলারের উপর গেলীকে সরাবার ভার দিলেন। কর্মটি করেছেন হয় স্বয়ং তিনি বা তাঁর কোনো গুণ্ডাকে দিয়ে (পার্টিতে যে গুণ্ডার অভাব ছিল না সে তথ্যটি সবাই জানতেন, এবং না থাকলে নাৎসি পার্টি যে রাস্তায় কম্যুনিস্টদের ঠেলায় একদিনও টিকতে পারতো না সেটা আরো সত্য)। ইত্যাকার নানাপ্রকারের গুজোবে তখন জর্মনি ম-ম করছে, কারণ গেলীর মৃত্যুর পূর্বেই নাৎসি পার্টি এমনই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে রাস্তার উপর কারণে অকারণে যাকে তাকে চ্যালেঞ্জ করে, এবং কম্যুনিস্টদের কাউকে একা পেলে তাকে পেটাতেও কসুর করে না; প্রতিদিন আবার কানে আসছে, এই বুঝি প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গ নাৎসি নেতা হিটলারকে ডেকে পাঠাবেন, হয় আপন মন্ত্রিসভা গড়ে প্রধানমন্ত্রী—চ্যানসেলর হতে, কিংবা কোয়ালিশন সরকার নির্মাণ করতে।

আমি তখন ম্যুনিকে বাস না করলেও জর্মনিতে, এবং প্রতিদিন লাঞ্চ-টেবিলে বন্ধুদের আলোচনা, কথা-কাটাকাটি শ্রবণই ছিল আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের রীডিং রুম ম্যুনিক তথা জর্মনির সব বড় বড় শহরের প্রধান প্রধান খবরের কাগজ রাখতো, তদুপরি আমাদের কেউ না কেউ ম্যুনিক আসা-যাওয়া করছে, আর একজন তো খাস ম্যুনিকবাসী—সে শহরের বিরাট ম্যাপ খুলে হিটলারের বাড়ি, তিনি যে যে কাফেতে যান, সবগুলো পিন্ ডাউন করতে পারতো। কাজেই আমাদের লাঞ্চ-টেবিলে গুজবেরও অনটন ছিল না। কিন্তু এটাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে এতদিন পরে আজ আমি তার অধিকাংশই ভুলে গিয়েছি। তবে, ঘটনার প্রায় কুড়ি বৎসর পর থেকে যখন হিটলার সম্বন্ধে নানাপ্রকার পুস্তক বেরুতে আরম্ভ করলো (গেলী আত্মহত্যা করে ১৯৩১-এ; হিণ্ডেনবুর্গ হিটলারকে ডেকে পাঠান তার তিন সপ্তাহ পরে এবং আলাপচারী যে নিষ্ফল হয় তার একমাত্র কারণ স্বরূপ নাৎসিরা বলেন, হিটলার গেলীর মৃত্যুশোক তখনো সম্পূর্ণ সামলে উঠতে পারেননি বলে সমস্ত চিন্তাশক্তি একাগ্রচিত্তে ব্যবহার করতে পারেননি—ঘন ঘন আনমনা হচ্ছিলেন; ১৯৩৩-এর জানুয়ারী মাসে হিটলার চ্যানসেলর হন, ১৯৩৯-এ তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ করেন, ৩০ এপ্রিল ১৯৪৫-এ তিনি আত্মহত্যা করেন;

খৃষ্টাব্দে, এবং অধুনা ১৯৬১—প্রকাশিত শাইরারের ১১৭৪ পৃষ্ঠার যে বিরাট বই বাজারে নাম করেছে তাতে কোনো মৌলিকতা নেই এবং আমার মনে হয় তিনি হফ্‌মানের বইখানা হয় পড়েননি, নয় একপেশে বলে খারিজ করেছেন। বলা বাহুল্য বুলক, শাইরার এবং শতকরা ৯০ খানা বই রাজনৈতিক তথা যুদ্ধবিদ্‌ হিটলারকে নিয়ে আলোচনা করে বলে তার মধ্যে প্রেম অল্প স্থানই পায়, এবং তারও অধিকাংশ পান এফা ব্রাউন, গেলী সত্যিই এখনো 'কাব্যের উপেক্ষিতা'!) তখন দেখে বড় আশ্চর্য বোধ হল যে তখনকার দিনে যেসব গুজোব আমরা সেফ্‌ গাঁজা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলুম তার অনেকগুলোই এসব পুস্তকে রীতিমতো সম্মানের আসন পেয়েছে, এবং যেগুলোকে আমরা সত্য বা সত্যের নিকটতম বলে স্বীকার করে নিয়েছিলুম সেগুলোর উল্লেখ পর্যন্ত নেই!

অবশ্য এ-কথা উঠতে পারে যে, হফ্‌মানের মতে হিটলার গেলীর আত্মহত্যার জন্য নিতান্ত পরোক্ষভাবে দায়ী, আদৌ যদি তাকে দায়ী করা হয়, তিনি গেলীকে কড়া শাসনে রাখতেন (হিটলারের সাফাই 'আজ গেলী যেটাকে বন্ধন বলে মনে করছে সেটা বিচক্ষণ আত্মজনের সুচিন্তিত সতর্কতা') আবার ওদিকে বলেছেন, 'গেলী ছিল হিস্টিরিয়াগ্রস্ত সদাই আত্মহত্যার জন্য মুখিয়ে থাকা টাইপের একদম খাঁটি উল্টোটি। তার প্রকৃতি ছিল বেপরোয়া, জীবনের মুখোমুখি হত সে প্রতিদিন নিত্য নূতন সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে—এসব ভাবলে তো কিছুতেই বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে সে আপন জীবন আপন হাতে নিতে নিজেকে বাধ্য অনুভব করলো।'

হফ্‌মান কৃত তাঁর সখা হিটলারের জীবনী হয়তো অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখবেন, ভাববেন, রাজনৈতিক এবং গ্যাস-চেম্বারের প্রবর্তন ও সফলীকরণ-কর্তা হিটলারকে তিনি সমর্থন করতে না পেরে—অবশ্য এটা সবাই স্বীকার করেছেন যে আর্ট ভিন্ন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে তিনি অতি বেবেসেবে হিটলারের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং আরো সত্য যে হিটলার, বিশেষ করে গ্যোবলসের শত চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি ডাঙরতম সরকারী চাকরি বা পার্টিতে কোনো গণ্যমান্য আসন নিতে নারাজের চেয়ে নারাজ সম্পূর্ণ নারাজ ছিলেন, অতএব রাজনৈতিক হিটলারকে দোষী বা নির্দোষী প্রমাণ করার হাত থেকে তিনি (সানন্দে) অব্যাহতি পেয়েছেন—তিনি 'মানুষ হিটলার'কে অযথা অপবাদ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ-নেমকহালালী প্রশংসনীয়, কিন্তু সে কর্ম করতে গিয়ে তিনি কতখানি সত্যবাচন করেছেন সেটা অনেকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করবে।

আমি তাঁকে মোটামুটি বিশ্বাস করেছি, এবং দৈনন্দিন জীবনে হিটলার যেখানে 'ছোট লোক' সেখানে পুৎসি হান্‌ফ্‌স্টেঙ্গেলের—হিটলারের বিরুদ্ধে তাঁর বহুস্থলে অহেতুক বিষোদ্‌গার সত্ত্বেও—অনেক কথা মেনে নিয়েছি।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে আমার মনে হয়েছিল এবং এখনও মনে হয়, হিটলার জানতেন এবং ভাল করেই জানতেন যে গেলী ভিয়েনার এক আর্টিস্টকে গভীর ভাবে ভালোবাসতো (আমার মনে হয়, হফ্‌মান যে বলছেন, হিটলার সে-

খবরটি জানতেন না, এটা তাঁর ভুল এবং গেলীর ভিয়েনা যাবার জন্য উৎসাহ এবং মামাকে পীড়াপীড়ি সেখানে যাবার অনুমতির জন্য)। এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে গেলী বরাবরই ম্যুনিকের রাজসিক বাসভবন, অতি সাধারণ মেয়ের জন্য সমাজে সর্বোচ্চ আসন, ম্যুনিকের সর্বজন সম্মানিত মামার 'গরবে গরবিনী' হওয়া, সেই গ্রেট মামার প্রেমনিবেদন তারই পদপ্রান্তে, সে মামা আবার তার কথায় কথায় ওঠ-বস করেন, সর্বোত্তম থিয়েটার অপেরায় সর্বশ্রেষ্ঠ আসনাধিকার, এক কথায় বলতে গেলে ম্যুনিকের মত সুখৈশ্বর্য, সর্বপ্রকারের বিলাস, চিত্তহারিণী আমোদ-প্রমোদ দিতে সক্ষম—এসব ছেড়ে ভিয়েনাতে তাকে থাকতে হত সাধারণ—অবশ্য অপেক্ষাকৃত বিত্তশালিনী—ছাত্রীর মত। এ দুয়ের আশমান জমীন ফারাক। শুধু সঙ্গীতে পারদর্শিনী হওয়ার জন্য এত বড় সুখসম্মান বিসর্জন? আমার বিশ্বাস হয় না। পুলিস যখন কটুবাক্য ব্যবহার করে বলেন, 'মেয়েটা পয়লা নম্বরের স্ফূর্তিবাজ ফ্লার্ট, কণ্ঠসঙ্গীত উচ্চতম পদ্ধতিতে আয়ত্ত করতে হলে যে অধ্যবসায় ও ফুর্তিফার্তি বিসর্জন অবশ্য প্রয়োজনীয় সে-দুটো গেলীর ছিল কোথায়?' তখন আমার মনে হয় গেলীর মন পড়ে থাকতো ভিয়েনায়, যেখানে সে অধ্যবসায়ের সঙ্গে রেওয়াজ করবে ও সন্ধ্যায় পাবে তার আর্টিস্ট দয়িতের কাছে অনুপ্রেরণা, যদি সেখানে দৈন্যেও বাস করতে হয়, সেটা সে ভাগাভাগি করবে তারই সঙ্গে; তার তুলনায় ম্যুনিকে মামার সঙ্গে বাস করে, মনে মনে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ থেকে উৎকৃষ্টতম বিলাসভোগ শতগুণে নিকৃষ্ট। ভিয়েনার ছাত্রজীবনের স্বাধীনতা, তরুণ-তরুণীর সঙ্গে সম্মিলিত আনন্দোল্লাস নিশ্চয়ই ম্যুনিকের বন্দীশালা এবং প্রতি সন্ধ্যায় কাফেতে মামা এবং তার বুড়োহাবড়া ভারিক্কি-ভারিক্কি রাজনৈতিক পার্টি-মেম্বারদের সঙ্গে বসে প্রসন্নতা এমন কি উল্লাসের ভান করার চেয়ে শতগুণে শ্রেয়, কিন্তু সেইটেই তত্ত্বকথা নয়—তত্ত্বকথা ঐ দয়িতের সঙ্গ-সুখ। সঙ্গীতই যদি বড় কথা হবে তবে ম্যুনিক কি অজ পাড়াগাঁ? ম্যুনিকে ঠিক সে সময়ে হয়তো কোনো 'মেস্ত্রো' 'ওস্তাদের ওস্তাদ' ছিলেন না, কিন্তু গেলী যে ভিয়েনাতে কোনো মেস্ত্রোর কাছে সঙ্গীতাধ্যয়ন করেছিল এ-কথা তো কেউ বলেনি। না, সঙ্গীত তার শেষ বচসার এবং সবশেষে নিরুপায় হয়ে আত্মহত্যার কারণ নয়।

হফ্‌মান বুঝতে পারেননি, কিংবা বলতে ভুলে গেছেন—সেটা পরবর্তী যুগের সহচরগণ বার বার উল্লেখ করেছেন—হিটলার ঝান্ডুঝান্ডু সুপক্কতম রাজনৈতিক-দের পেটের কথা টেনে বের করার কৌশলটিতে সুপটু ছিলেন। আর এ তো চিংড়ি ভাগ্নি! হয়তো মামা তাঁর প্রেম নিবেদন করার পূর্বেই আবেগ-বিহ্বল তরুণী মামার সহানুভূতি ও আনুকূল্য পাবার আশায় পূর্বাহ্নেই সব কিছু বলে বসে আছে। কিংবা হয়তো হিটলার যখন লক্ষ্য করলেন, গেলী তাঁর প্রেমের উপযুক্ত প্রতিদান দিচ্ছে না তখন সেটা চেপে দিয়ে আঁকশি চালিয়ে বের করলেন গেলীর পেটের কথা—বরঞ্চ বলা উচিত হৃদয়ের ব্যথা। এবং তারই বা কী প্রয়োজন? সেই ১৯৩১ সালেই তাঁর পার্টির অসংখ্য স্পাই ছিল

ভিয়েনায়—যে নগরে তিনি নিজে যৌবনের একাংশ রাস্তায় রাস্তায় স্বহস্তে অঙ্কিত পিকচার পোস্টকার্ড ফেরি করেছেন—নইলে ১৯৩৪এ, এ ঘটনার মাত্র আড়াই বৎসর পরে তিনি তাঁর পার্টির লোকের দ্বারা ভিয়েনা শহরের জন-সমাগমে পরিপূর্ণ দফতরে অস্ট্রিয়ান প্রধানমন্ত্রী ডলফুস্‌কে খুন করলেন কি প্রকারে? এবং তার চার বৎসর পরে একটিমাত্র গুলি না চালিয়ে ভিয়েনা দখল করলেন কি কৌশলে? তার তুলনায় একটি সাদামাটা ছাত্রী ভিয়েনাতে কি ভাবে জীবন-যাপন করেছিল সেটা বের করা তো অতি সহজ। ভিয়েনাতে সে-যুগে বিস্তর প্রাইভেট ডিটেকটিভও ছিল।

আমার মনে হয়—বিশ্বাস করুন আর নাই করুন—বুদ্ধিমতী গেলী তার মামার চরিত্রের একটা দিক আবিষ্কার করতে পেরেছিল তখনই, যেটি বিশ্বমানব আবিষ্কার করে স্তম্ভিত হল পুরো পনেরোটি বৎসর পরে, এবং তাও সম্ভব হত না, যদি যুদ্ধে হিটলার পরাজিত না হতেন এবং ফলে গ্যাসচেম্বার ইত্যাদি আবিষ্কৃত না হত। সে তত্ত্বটি—হিটলার কী অবর্ণনীয় নিষ্ঠুর দানব!—এই তত্ত্বটি গেলী আবিষ্কার করে এক বিভীষিকার সম্মুখীন হল। হিটলার যে কোনো মুহূর্তে, কারো সুখদুঃখের কথা মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করে তার দয়িতকে নিষ্ঠুরতম পদ্ধতিতে খুন করাতে পারেন। আজ যদি কেউ বলে, এই ভয় দেখিয়েই ব্ল্যাকমেল করে হিটলার গেলীকে ১৯২৭ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত তাঁর মুনিকের বাড়িতে—আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীন কিন্তু বস্তুত পরাধীনের চেয়েও পরাধীন ভাবে—আটকে রেখেছিলেন, তবে সেটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য মনে হবে কেন? এবং হয়তো ঐ চার বৎসর ধরে তাকে বাধ্য হয়ে 'রক্ষিতার লীলাখেলা'ও খেলতে হয়েছিল। হফ্‌মান বলেছেন, গেলীর চরিত্রবল ছিল দৃঢ় এবং সে ছিল 'স্পিরিটেড গার্ল'। মুনিক থেকে অস্ট্রিয়ার পথ কতখানি? আর বের্ষটেশ-গাডেনের বাড়ি থেকে তো অস্ট্রিয়ান সীমান্ত আরো কাছে। পায়ে হেঁটে ওপারে যাওয়া যায়। বস্তুত হিটলার সেই কারণেই বেছে বেছে ঐ জায়গাটিতেই বাড়ি কিনেছিলেন। এপারে, অর্থাৎ রাজনৈতিক বাতাবরণ বড় বেশী উষ্ণ হয়ে পড়লে, কাউকে না জানিয়ে, বনের ভিতর দিয়ে দিয়ে অক্লেশে ওপারে যেতে পারবেন বলে—অঞ্চলটাও অস্বাভাবিক নির্জন এবং ঐ যুগে পাসপোর্টের কড়াকড়ি তো ছিল না, এসব জায়গায় যারা নিত্য নিত্য ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে এপার-ওপার করতো তাদের তো পাসপোর্ট আদৌ থাকতো না।

এমন অবস্থায়ও 'স্পিরিটেড' গেলী গ্রামে থাকাকালীন ওপারে চলে গিয়ে ভিয়েনা যেতে পারলো না?—সেখান থেকে ভিয়েনাও তো রেলে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। না, তা নয়। অমতে যাওয়ার মানেই হত, দয়িতের অবশ্য-মৃত্যু। এবং পরে সে নিজেও হয়তো কিড্‌ন্যাপ্‌ট্‌ হতে পারতো। তাই সে আপন কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বলেছিল, হফ্‌মানের স্ত্রীকে: 'Well that's that! And there's nothing you or I can do about it. So let's talk about something else.' এ কথোপকথনের উল্লেখ আমি পূর্বেই করেছি।

হয়তো আমার নিছক কল্পনা। কিন্তু আমার মনে হয় গেলী দিনের পর দিন অভিনয় করে গেছে (যেটা হফ্‌মান ঠিক ধরতে পেরেছিলেন, কিন্তু পুৎসি বুঝতে না পেরে 'ঢলাঢলি' বলেছেন), যদি শেষ পর্যন্ত মামার মন গলানো যায়। যখন দেখল কোনো ভরসাই নেই তখন করেছিল শ্মশান-চিকিৎসা—পুরোপুরি ঝগড়া, যেটা একাধিক প্রতিবেশী শুনতে পেয়েছিল, এবং হয়তো বা—হয়তো বা আত্মহত্যার ভয়ও দেখিয়েছিল এবং হয়তো তার চোখে-মুখে তখন এমন ভাব ফুটে উঠেছিল যে চতুর—শঠ—হিটলার বুঝেছিলেন, এ ভয় দেখানোটা নিতান্ত শূন্যগর্ভ নয়, এটা আর পাঁচটা হিস্টেরিক (এবং হফ্‌মান বলেছেন, গেলী আদপেই হিস্টেরিক ছিল না) মেয়ের মত নিতান্ত অর্থহীন প্রলাপ নয়। তাই বোধ হয় মুনিক শহর থেকে বেরোবার সময় সখাকে বলেছিলেন, 'কেন জানি নে আমার মনটা যেন অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে, 'I don't know why, but I have a most uneasy feeling' তাই তাঁর পরবর্তী বিষণ্ণতা। পথিমধ্যে টেলিফোনের কথা শুনেই যেন বুঝতে পেরেছিলেন, এ টেলিফোনে থাকবে গেলী-সম্বন্ধে দুঃসংবাদ।

এ অনুমান যদি সত্য হয় তবে বলতে হবে গেলী যে ভয় দেখিয়েছিল সেটা শূন্যগর্ভ, ফাঁকা আওয়াজ ছিল না। সে সেটা কাজে পরিণত করেছিল প্রথমতম সুযোগেই।

গেলীর আত্মহত্যায় হিটলারের শোক

হিটলারের চরিত্রবল ছিল অসাধারণ এবং তাঁর ভেঙে পড়াটাও ছিল অসাধারণ। তবে যে দুটো ভেঙে পড়ার কারণ ইতিহাসের জানা আছে, তার শেষটা আত্মহত্যা করার কয়েক দিন আগের থেকে—তাঁর খাসচাকর (ভ্যালে) লিঙে সেটির কিছুটা বর্ণনা দিয়েছেন, এবং আর একটা, গেলীর মৃত্যুর পর। দুটো প্রায় একই প্রকারের।

প্রথম দুদিনের খবর কেউ ভালো করে লেখেননি, তবে তখনকার দিনের অন্যতম প্রধান নাৎসী নেতা গ্রেগর স্ট্রাসার পরে বলেন যে, এ দুদিন তিনি এক মুহূর্ত হিটলারের সঙ্গ ত্যাগ করেননি, পাছে তিনিও আত্মহত্যা করেন।[১৩]

এরপর তাঁর সঙ্গে ছিলেন, একমাত্র সাক্ষীরূপে, আমাদের পূর্বপরিচিত হফ্‌মান। এবার তাঁকে অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ ভিন্ন গত্যন্তর নেই। এটা সত্যই ওয়ান ম্যান্‌স্‌ স্টোরি। তিনি বলছেন, মুনিক্যে ফেরার পর দুদিন পর্যন্ত

---

১৩ বোধহয় তারই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ স্ট্রাসারকে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন 'জোলাপে'র (এটার উল্লেখ আমরা একাধিকবার করেছি) সময় মেরে ফেলা হয়।

হিটলারকে আমি আদৌ দেখতে পাইনি। তাঁর স্বভাব আমি ভালো করেই জানতুম এবং বর্তমান শোচনীয় পরিস্থিতিতে আমি উত্তমরূপেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলুম যে, তিনি হয়তো নির্জনে একা একা থাকাটাই বেশী পছন্দ করবেন—আমিও তাই তাঁর পাশ ঘেঁষিনি। তারপর হঠাৎ মাঝরাতে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজলো। নিদ্রাজড়িত অবস্থায় আমি গেলুম উত্তর দিতে।

হিটলারের গলা। 'হফ্‌মান, এখনো জেগে আছ কি? কয়েক মিনিটের তরে আমার এখানে আসতে পারো কি?' হিটলারেরই গলা বটে কিন্তু কেমন যেন অদ্ভুত অচেনা।, সে কণ্ঠস্বর ক্লান্ত আর সর্ব অনুভূতি গ্রহণে জড়ত্বে চরমে গিয়ে পেঁচেছে। পনরো মিনিট পরেই আমি তাঁর কাছে পেঁছিলুম।

দরজা তিনি নিজেই খুলে দিলেন। অভ্যর্থনাসূচক কোনো কথা না বলে নীরবে তিনি আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন—তাঁকে দেখাচ্ছে বিরস, যেন সর্ব আত্মজন-বিবর্জিত। বললেন, 'হফ্‌মান, আমাকে তুমি সত্যিকার একটি মেহেরবানি করবে কি? আমি এ বাড়িতে আর টিকতে পাচ্ছি নে, যেখানে আমার গেলী মরে গেছে, ম্যুলার টেগার্নজে হ্রদের উপর তার সেণ্ট কুইরীনের বাড়ি আমাকে থাকতে দিতে চেয়েছে; তুমি আমার সঙ্গে আসবে? গেলীর কবর না হওয়া পর্যন্ত সে কটা দিন আমি সেখানেই থাকতে চাই। ম্যুলার কথা দিয়েছে, সে ও-বাড়ির চাকর-বাকর সব কটাকে ছুটি দিয়ে ওখান থেকে সরিয়ে দেবে। একমাত্র তুমিই সেখানে থাকবে আমার সঙ্গে। আমাকে এ অনুগ্রহটা তুমি করবে কি?' তাঁর কণ্ঠস্বরে ছিল সনির্বন্ধ মিনতির অনুনয়; বলা বাহুল্য, আমি তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানালুম।

সেণ্ট কুইরীন বাড়ির প্রধান ভৃত্য বাড়ির চাবিটা আমার হাতে তুলে দিল। বিস্ময় এবং সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে শোকাঘাতে ভেঙে-পড়া হিটলারের দিকে একবার তাকিয়ে সে চলে গেল। সোফার শ্রেক্ আমাদের সে বাড়িতে পেঁছিয়ে দেওয়ার পর তাকেও ফেরত পাঠানো হল। চলে যাওয়ার আগে সে কোনো গতিকে সুযোগ করে আমাকে কানে কানে বলে গেল, সে হিটলারের রিভলবার সরিয়ে নিয়েছে, কারণ তার ভয় পাছে নৈরাশ্যের চরমে পেঁছে তাঁর আত্মহত্যা করার প্রলোভন হয়। এবারে রইলুম সুদ্ধ মাত্র আমরা দুজন—আর একটিমাত্র জনপ্রাণী নেই। হিটলার উপরের ঘরে আর আমি ঠিক তার নীচের ঘরটায়।

সে-বাড়িতে হিটলার আর আমি—মাত্র এই দুজন। আমি তাঁকে তাঁর ঘর দেখিয়ে বেরিয়ে যেতে না যেতেই তিনি দু'হাত পিছনে নিয়ে এক হাতে আরেক হাত ধরে পাইচারি করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলুম, তাঁর খেতে ইচ্ছে করছে কিনা। একটিমাত্র শব্দ না বলে তিনি শুধু মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি জানালেন। আমি তবু এক গেলাস দুধ আর কিছু বিস্কুট উপরে নিয়ে তাঁর ঘরে রেখে এলুম।

আমি আপন কামরার জানলার কাছে দাঁড়িয়ে শুনছিলুম উপরের পাইচারির তালে তালে ওঠা ভারী শব্দ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চললো সেই পাইচারি,—এক-

বারও ক্ষান্ত দিল না, একবারও জিরুলো না। রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এল—আমি তখনো শুনছি তাঁর একটানা পাইচারি, ঘরের এ প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্ত, ফের ঐ প্রান্ত থেকে এ-প্রান্ত। সেই একটানা শব্দের মোহে আমি অল্প কিছু-ক্ষণের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্নই হয়ে গিয়েছিলুম। হঠাৎ কি যেন আমাকে আচমকা ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ সচেতন করে দিল। পাইচারি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আর যেন মৃত্যুর নীরবতা চতুর্দিকে বিরাজ করছে। আমি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। তবে কি করছেন হিটলার এখন ··? অতি সন্তর্পণে এবং মৃদু পদক্ষেপে আমি যেন লুকিয়ে উপরের তলায় গেলুম। ওঠবার সময় কাঠের সিঁড়ি অল্প অল্প ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করলো। আমি দরজায় পেঁছিতেই—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আবার পাইচারিটা আরম্ভ হল। বুকের বোঝা যেন অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল ; আমি চুপিসাড়ে আপন ঘরে ফিরে এলুম।

এবং এইভাবে চললো সমস্ত দীর্ঘরাত ধরে সেই পাইচারি—ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্তহীন দীর্ঘ ঘণ্টা। আমার মন চলে গেল আমাদের বিগত একাধিকবার এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-পরিপূর্ণ টেগের্নজে হ্রদের কোলে লালিত বাড়িতে আসার স্মরণে। তখন সব কিছু কতই না সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল!

গেলীর মৃত্যু আমার বন্ধুর গভীরতম সত্তাকে নাড়া দিয়ে কাঁপিয়ে তুলেছে। তবে কি তিনি নিজেকে তার জন্য দায়ী অনুভব করছিলেন? তিনি কি অনুতপ্ত আত্ম-অভিযোগ দিয়ে আপন সত্তাকে কঠোরতম যন্ত্রণা দিচ্ছিলেন? তিনি এখন করবেনই বা কি? এ ধরনের অনেক প্রশ্ন আমার মাথার ভিতরে ক্রমাগত হাতুড়ি পেটাচ্ছিল, আর আমি খুঁজে পাচ্ছিলুম না একটারও উত্তর।

ঊষার প্রথম আবির্ভাব অন্ধকার আকাশকে আলোকিত করে তুলছিল, এবং আমি আমার জীবনে ঊষাগমনের জন্য হৃদয়ের ভিতর কখনো এতখানি কৃতজ্ঞ অনুভব করিনি। আমি আবার উপরে গিয়ে তাঁর দরজায় মৃদু করাঘাত করলুম। কোনো উত্তর এল না। আমি ভিতরে গেলুম কিন্তু হিটলার আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে বিস্মৃতিতে নিমগ্ন হয়ে আমাকে লক্ষ্যমাত্র করলেন না। দেহের পিছনে এক হাত দিয়ে অন্য হাত ধরে, সুদূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে কিন্তু কোনো জিনিস না দেখে, তিনি তাঁর অন্তহীন পাইচারি চালিয়ে যেতে লাগলেন। যন্ত্রণায় তাঁর মুখের রঙ পাঁশুটে, ক্লান্তিতে সেটা ঝুলে পড়েছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি চেহারাটাকে করে দিয়েছে বিসদৃশ, চোখ দুটো ডুবে গিয়েছে কোটরের গভীরে, সেগুলোর নিচের অংশ কালো ছায়ায় কৃষ্ণমসীলিপ্ত, আর ঠোঁট দুটো একটা আরেকটাকে চেপে ধরে এঁকেছে যেন তিক্ত অভিশপ্ত একটি রেখা। দুধ আর বিস্কুট স্পর্শ করা হয়নি।

চেষ্টা করেও সামান্য একটা কিছু খাবেন না তিনি, প্লীজ? আমি শুধালুম। আবার কোনো উত্তর এল না, শুধু সামান্য একটু মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালেন। আমি মনে মনে ভাবলুম, অন্তত অল্প কিছু একটা ওঁকে খেতেই হবে, নইলে তিনি যে হুমড়ি খেয়ে ভিরমি যাবেন। আমি ম্যুনিকে আমার বাড়িতে ফোন

করে শুধালুম, স্পাগেত্তি[১৪] কি করে রাঁধতে হয় ? হিটলারের অন্যতম প্রিয় খাদ্য এটি। সেখান থেকে পাকপ্রণালীর যে দিকনির্দেশ পেলুম বর্ণে বর্ণে সেই অনুযায়ী আমি রন্ধনকলায় আমার নৈপুণ্য আছে কিনা সেই পরীক্ষাতে প্রবেশ করলুম। আমার নিজের মতে ফলটা ভালোই ওৎরালো। কিন্তু আবার আমার ভাগ্য বাম। যদিও এই ধরনের স্পাগেত্তি তাঁর প্রিয় খাদ্য, যদিও আমি আমার রন্ধন-নৈপুণ্য প্রশংসা-প্রশংসায় সপ্তম স্বর্গ অবধি তুলে দিয়ে তাঁকে অনুনয়-বিনয় করলুম, চেষ্টা দিয়েও অতি অল্প একটুখানি মুখে দিতে—আমার মনে হল আমি যা কিছু বলেছি, সে তাঁর দুপাশ দিয়ে চলে গেছে, তিনি তার এক বর্ণও শোনেননি।

ধীরে মন্থরে দিনটা তার সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলল, তারপর এল আরেকটা রাত্রি, সেটা আগেরটার চেয়েও বিভীষিকাময়। আমি আমার সহ্যশক্তি, আত্মকর্তৃত্বের শেষ সীমানায় পেঁছে গিয়েছি। জেগে থাকা আমার পক্ষে এখন প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে ; ওদিকে উপরে সেই পাইচারি চলেছে তো চলেছে অবিরাম, আর তার শব্দ যেন কেউ তুরপুন দিয়ে আমার খুলি ফুটো ক'রে ভিতরে ঢোকাচ্ছে। যেন এক ভয়াবহ উত্তেজনা তাঁকে তাঁর পায়ের ওপর রেখে চলেছে এবং কিছুই তাঁকে ক্লান্ত করতে পারে না।

তারপর এল আরেকটা দিন। আমি নিজেই তখন যে কোনো মুহূর্তে আপন সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় জড়নিদ্রায় অভিভূত হয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতে পারি। আমার নড়াচড়া আমার কাজকর্ম করা সব কিছু যন্ত্রচালিত বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত অন্ধশক্তির প্রকাশ মাত্র। কিন্তু মাথার উপর পদধ্বনি কক্‌খনো থামেনি।

সন্ধ্যা ঘনানোর পর আমরা শুনলুম, গেলীর গোর হয়ে গিয়েছে, এবং হিটলারের সে-গোরের দিকে তীর্থযাত্রারম্ভ করতে কোনো অন্তরায় নেই। সেই রাত্রেই আমরা রওয়ানা দিলুম। নিঃশব্দে হিটলার ড্রাইভার শ্রেকের পাশে বসলেন। আমার উপরে যে অসহ্য চাপ আমাকে ধরে রেখেছিল সেটা যেন হঠাৎ ছিঁড়ে দু-টুকরো হয়ে গেল আর আমি গাড়ির ভিতর সেই অবসাদজনিত অঘোর নিদ্রায় ঘণ্টাখানেক কিংবা ঘণ্টা-দুই ঘুমিয়ে নিলুম। ভোরের দিকে আমরা ভিয়েনা পেঁছিলুম, কিন্তু এই সমস্ত দীর্ঘ চলার পথে হিটলার একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করেননি।

আমরা সোজা নগরের ভিতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে কেন্দ্রীয় গোরস্থানে পেঁছিলুম। এখানে এসে হিটলার একা গোরের দিকে গেলেন। সেখানে পেলেন তাঁর নিজস্ব দুই এডিকং শ্বার্ৎস এবং শাউব—তারা সেখানে তাঁর জন্য

---

১৪ ইতালিয়দের স্টেপ্‌লফুড্—আমাদের ভারতের মত নিত্য খাদ্য। মাক্কারনী, স্পাগেত্তি, ভেরমিচেল্লি ইত্যাদি। সবই ময়দার তৈরী, অনেকটা মুসলমানদের সেঁওইয়ের মত। রান্না করা হয় নানা পদ্ধতিতে, তার শত শত রেসিপি (পাকপ্রণালী) আছে।

অপেক্ষা করছিলেন। আধঘণ্টার ভিতরই তিনি ফিরে এলেন এবং গাড়ি ওবেরজাল্‌ৎস্‌বের্গে চালিয়ে নিতে হুকুম দিলেন।

গাড়িতে উঠতে না উঠতেই তিনি কথা আরম্ভ করলেন। উইণ্ডস্ক্রীনের ভিতর দিয়ে তিনি স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে যেন আত্মচিন্তা করছিলেন, কিন্তু স্পষ্ট কথা বলে বলে। 'আচ্ছা! তাই সই!' বললেন তিনি। 'আরম্ভ হোক তবে এখন সংগ্রাম—যে সংগ্রাম শিরোপরি কৃতকার্যতার বিজয়মুকুট পরবেই পরবে, পরতে বাধ্য।' আমরা সকলেই বিধির এক বিরাট আশীর্বাদ-প্রাপ্ত স্বস্তি অনুভব করলুম।...

এরপর হিটলার ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর বক্তৃতাসফরে। আজ এখানে কাল সেখানে, এমন কি একই দিনে দু'তিন ভিন্ন ভিন্ন নগরে বক্তৃতা দিয়ে যেতে লাগলেন। সেগুলো আগের চেয়ে যেন শ্রোতাদের করে দেয় অনেক বেশী আত্মহারা, যেন তাদের চিন্তাধারাকে তিনি হুকুম দিয়ে বাধ্য করছেন তারা যাবে কোন্ পথে। এবং শ্রোতাকেও বক্তৃতা দিয়ে আপন মতে টেনে আনার শক্তি যেন তাঁর বেড়ে গেছে শতগুণে। হফ্‌মান বলছেন, এই শহর থেকে শহর ছুটোছুটি, প্রথমে জর্মনির সব চেয়ে শক্তিশালী মোটর মের্ৎসেডেজে করে, পরে আপন অ্যারোপ্লেনে (অনেকেই বলেন রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডার জন্য ইওরো-আমেরিকায় হিটলারই সর্বপ্রথম নিজস্ব হাওয়াই জাহাজ ব্যবহার করেন—এই ব্লিৎস্ প্রোপাগাণ্ডা যেন পরবর্তী যুগের ব্লিৎস্‌ক্রীগের পূর্বাভাস!); সেখানে বিরাট বিরাট জনসভা, শ্রোতাদের চিৎকার করতালি, মিটিঙশেষে উন্মত্ত জনতার প্ল্যাটফর্ম আক্রমণ—ফ্যুরারকে কাছের থেকে দেখবার জন্য—এসব হট্টগোল ধুন্ধুমারের ভেতর হিটলার যেন গেলীর শোক নিমজ্জিত করে দিতে চাইছিলেন।

এর তিন সপ্তাহ পরে প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গ আলাপ-আলোচনার জন্য হিটলারকে ডেকে পাঠান, সে কথা পূর্বেই বলেছি। যাঁরা বলেন, সে আলোচনা নিষ্ফল হওয়ার কারণ গেলীর শোকে হিটলার এমনই মোহাচ্ছন্ন ছিলেন তাঁর দাবী তিনি যথোপযুক্ত ভাষা ও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করতে পারেননি, ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। আমি বরঞ্চ হফ্‌মান যা বলেছেন তার সঙ্গে একমত। আমার মনে হয়, তখনো হিণ্ডেনবুর্গ তাঁর চিরপরিচিত প্রাচীনপন্থী আপন চক্রের ভিতরকার নেতাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হননি। তখনো হিটলারের 'সময় হয়নি'।'

* * *

গেলীর জীবন, তার মৃত্যু, তার স্মৃতি সব কিছু ধর্মে উদাসীন হিটলারকে যেন এক নূতন অনুষ্ঠানবেষ্টিত সংস্কার-বিশ্বাসী করে তুললো। তিনি স্বহস্তে গেলীর কামরা চাবি দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে হুকুম দিলেন, একমাত্র গৃহরক্ষিণী ফ্রাউ ভিন্টারেরই সেখানে প্রবেশাধিকার। বহু বৎসর ধরে তিনি প্রতিদিন গেলীর প্রিয় ফুল তাজা ক্রিসেনথিমাম সে ঘরে রাখতেন। বের্ষটেশ-গাডেনের বাড়িতে এবং পরবর্তী যুগে ফ্যুরার যখন দেশের সর্বাধিকারী (তিনি

প্রথমে চ্যানসেলর বা প্রাইম মিনিস্টার রূপে রাজ্যভার গ্রহণ করেন, এবং বছর দেড়েক পর প্রেসিডেন্ট গত হলে তিনি সে পদ পূর্ণ না করে নিজেই গ্রহণ করে পরিপূর্ণ ডিকটেটর—নিরঙ্কুশ নেতা—ফ্যুরার হন) তখন রাজভবনে গেলীর ছবি বিরাজ করতো সর্বত্র। বৎসরে দুই দিন—তার জন্মদিন আর মৃত্যুদিন রুচিসম্মত আড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হত। সর্বোৎকৃষ্ট চিত্রকর ও ভাস্করদের দেওয়া হল গেলীর নানা অবস্থায় তোলা নানাবিধ ফোটোগ্রাফ। সেগুলোর উপর নির্ভর করে উত্তম উত্তম ওয়েলপেন্টিং ও মূর্তি নির্মিত হল। জর্মনির অন্যতম উৎকৃষ্ট শিল্পী তখনকার দিনের সর্বোৎকৃষ্টদের একজন—গেলীর একটি অনবদ্য ব্রোন্‌জ্‌ মূর্তি নির্মাণ করেন। এদের একটা না একটা হিটলারের প্রতি বাসভবনে সর্বোচ্চ সম্মানের স্থানে রাখা হত।

এর প্রায় তেরো বৎসর পর এই আর্টিস্টদের অন্যতম, ৎসিক্‌লার যখন যুদ্ধে পরাজয় মনোবৃত্তি প্রকাশের ফলে নাৎসি গেস্তাপো পুলিসের হাতে ধরা পড়ে দীর্ঘ কারাবাসের পর মুক্তির আশা সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে গিয়েছেন তখন তিনি যে একদা গেলীর ছবি এঁকেছিলেন (যদিও কারো কারো মতে তিনি আর্টিস্ট হিসাবে ছিলেন অতিশয় মামুলী) সে কথা হিটলারকে স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি তাঁকে তদ্দণ্ডেই মুক্তি দেন।

হফ্‌মানের বিশ্বাস, গেলীর সঙ্গে হিটলারের যদি পরিণয় হত তবে হিটলারের জীবন এরূপ শোচনীয় পরিসমাপ্তি পেত না। তাঁর মতে শতধাবিভক্ত জর্মনিকে একাঙ্গ করে তাকে নবজীবনরস দিয়ে তিনি পুনরুজ্জীবিত করতেন নিশ্চয়ই, কিন্তু জর্মনির বাইরে যে সব বিবেচনাহীন অভিযানে বেরুলেন সেখানে পারিবারিক শান্তি এবং তৃপ্তি—হিটলার যেটাকে অসীম মূল্য দিতেন—তথা গেলীর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, হিটলারের উপর তার অসীম প্রভাব তাঁকে সংযত করে নিরস্ত করতো—তাঁর অন্তিম নিঃশ্বাস বীভৎসতাময় পরিবেশে ত্যাগ না করে শান্তিতেই ফেলতে পারতেন।

হফ্‌মান বলেন, তারপর যখনই গেলীর কথা উঠেছে, হিটলারের চোখ জলে ভরে যেত। এবং একাধিক পরিচিতজনকে হিটলার স্বয়ং বলেছেন, জীবনে ঐ মাত্র একবারই তিনি ভালোবেসেছিলেন।

* * *

গেলীর মৃত্যুর চৌদ্দ বৎসর পর, হিটলার, আত্মহত্যা করার প্রায় দেড়দিন পূর্বে, এফা ব্রাউনকে বিয়ে করেন এবং তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল পৃথিবীবাসীর এখনো যায়নি। কিন্তু তার বর্ণনা এর সঙ্গে যায় না।

আমি হিসেব করে দেখেছি, হিটলারের জীবনে তিনটি দুর্দৈব দেখা দেয়। প্রথম দুটিতে তিনি প্রায় ভেঙে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যেতেন—পাঠক আদৌ ভাববেন না, গ্যাস-চেম্বার নির্মাতার অন্য কোনো দিকে কোনো প্রকারের স্পর্শকাতরতা থাকে না, (তাহলে কসাইয়ের ছেলে মরলে সে কাঁদতো না) এবং এঁরা অসাধারণ জীব বলে যে সব স্থলে তাঁদের স্পর্শকাতরতা হয় অসাধারণ সূক্ষ্ম, তাঁদের বেদনানুভূতি প্রায় অনৈসর্গিক তীব্র—তৃতীয়বারের ঘটনা সকলেই জানেন।

সেবারে তিনি নিষ্কৃতি পাননি। আত্মহত্যা ছাড়া তখন তাঁর আর অন্য কোনো গতি ছিল না। প্রথম দুর্দৈব তাঁর মাতার মৃত্যু। হিটলার তখন বালক, কিন্তু সেই বালকই তার মাকে যা সেবা করেছে সেটা অবর্ণনীয়, অবিশ্বাস্য—শুধু বলা যেতে পারে, স্বর্গজাত ভক্তি-প্রেমরস যেন ঐ মাত্র একবার পৃথিবীতে হিটলার-জননীর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। তাঁর বাল্যবন্ধু তখনকার দিনের হিটলার ও মাতার মৃত্যুর পর তাঁর অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। এরকম বর্ণনা আমি আর কোথাও পড়িনি। সেবারে তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত মাতার শয্যাপার্শ্বে টুলের উপর বসে বসে কাটিয়েছিলেন দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, সেবা করেছেন সমস্ত হৃদয় ঢেলে দিয়ে।

দ্বিতীয় দুর্দৈব—গেলীর আত্মহত্যা।

তৃতীয়বারে—এবং শেষবারের মত—তিনি সুযোগ পেলেন সেই পাইচারি করার।

তাঁর খাস চাকর লিঙে তার বর্ণনা দিয়েছেন। শুধু লিঙে দেখেছিলেন কাছের থেকে বলে তন্ন তন্ন করে বর্ণনা দিতে পেরেছেন, আর হফ্‌মান নিচের তলা থেকে শুনতে পেয়েছিলেন শুধু।

কিন্তু হায়, তাঁর শেষ পদচারণার পূর্বেই তাঁর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। তাঁর শরীরের সম্পূর্ণ বাঁ দিকটা সমস্তক্ষণ কাঁপে (পার্কিনসন ব্যাধি কিংবা সেণ্ট ভাইরাসের নৃত্য রোগ), বাঁ হাতটা এত বেশী স্বেচ্ছায় স্বাধীন ভাবে ঘন ঘন ওঠে নামে যে পাইচারি না করার সময়ও সেটাকে প্রায়ই তিনি ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে শান্ত করার চেষ্টা দিতেন। বাঁ পা-টাকে ঘষ্টে ঘষ্টে টেনে টেনে তাঁকে চলাফেরা করতে হয়, আর দুচোখের উপর কখনো বা ফিল্‌মের মত বাষ্পাভাস, আর কখনো বা অস্বাভাবিক তীব্র, উজ্জ্বল জ্যোতির মত।

এই বেদনাদায়ক অবস্থায় যখন সাধারণ জন শুয়ে বসেও শান্তি পায় না, তখন হিটলার দু হাত পিছনে নিয়ে সজোরে ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত চেপে ধরে বাঁ পা টেনে টেনে—যেন কোনো জড়পদার্থ তিনি আপন দেহ দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন—আরম্ভ করলেন সেই প্রাচীন দিনের পাইচারি। মাঝে মাঝে দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে তার ওপর মুষ্ট্যাঘাত করেন—কারাবাসী-জন যে রকম করে থাকে ; তবে কি তিনি শহরের চতুর্দিকে শত্রুসৈন্য বেষ্টিত হয়ে কারাবন্দীর অনুভূতিই অনুভব করছিলেন ? – কিন্তু হায়, এখন তিনি শক্তিহীন জরাজীর্ণ। প্রহরের পর প্রহর, দিনের পর দিন পদচারণা করার দৈহিক শক্তি তাঁর আর নেই। তাই মাঝে মাঝে বসেন চেয়ারের উপর—আর শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন দেয়ালের দিকে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

কিন্তু এখন আর কি প্রয়োজন পদচারণের ?

সেদিন গেলীর মৃত্যুর পর উত্তেজিত হয়ে তুমি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলে এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাইচারি করে সে উত্তেজনা বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলে। এবারে সে ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অন্ধকার ! শত্রুর হাতে অসীম যন্ত্রণা, অশেষ অপমানের পর হয়তো ফাঁসি। এবারে তোমার আত্মহত্যার পালা।

তবু পদচারণ করো, হিটলার !

একদা গেলী চলে যাওয়ার পর করেছিলে অস্থির পদক্ষেপ, এবার গেলীর সঙ্গে পুনর্মিলনের প্রাক্কালে অবশ দেহ টেনে টেনে !

লক্ষ মার্কের বরমান

সম্প্রতি জর্মন সরকার ঘোষণা করেছেন যে কেউ যদি এমন খবর দিতে পারে যার সাহায্যে মার্টিন বরমান নামক লোকটাকে গ্রেপ্তার করা যায় তবে তাকে এক লক্ষ জর্মন মার্ক পুরস্কার দেওয়া হবে।

তাই নিয়ে একখানি মাসিক পত্রিকা ফলাও করে উক্ত হ্যার বরমান সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। পত্রিকাখানি চোদ্দটি ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং শতাধিক দেশে পড়া হয় বলে পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দম্ভ করে থাকেন। প্রবন্ধ-লেখক তাই বলেছেন, হয়তো বা আপনিই বরমানকে ধরার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন, কারণ হিটলারের মৃত্যুর পর বরমান কোথায় যে উধাও হয়ে গিয়েছেন কেউ জানে না। সর্বশেষে প্রবন্ধ-লেখক বরমানের একটি বর্ণনা দিয়েছেন যাতে করে আপনি তাঁকে অল্পায়াসে বা অনায়াসে চিনে নিতে পারেন।

আমরা বরমান সম্বন্ধে যেটুকু জানি, তাতে মনে গভীর সন্দেহ হয়, লেখক বরমানের যে বর্ণনা দিয়েছেন সে অনুযায়ী চললে তাঁকে আদৌ চিনতে পারবেন কিনা,—বরঞ্চ হয়তো তাঁকে পালাবার সুযোগ দেওয়া হবে বেশী।

ইতিমধ্যে আরেকটি কথা বলে রাখি, উক্ত পত্রিকার ভারতীয় সংস্করণ বলেছেন, এক লক্ষ জর্মন মার্ক যে আপনি পাবেন তার ভারতীয় মূল্য এক লক্ষ টাকা। আমরা যতটুকু জানি, তার মূল্য অন্তত এক লক্ষ দশ হাজার টাকা—সাদা বাজারেই। এই হল প্রবন্ধটির বিসমিল্লাতে গলদ। এর পর অন্য সব গলদে আসছি। তার পূর্বে বরমানটির পরিচয় কিঞ্চিৎ দি।

হিটলারের জীবনের শেষের দু বৎসর বরমান ছিলেন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি। তার পূর্বেই তিনি নাৎসি পার্টির সেক্রেটারি হয়ে গিয়েছিলেন। নাৎসি পার্টিই যে জর্মনি চালাতো সে-কথা সবাই জানেন—অন্য কোনো পার্টির অস্তিত্ব পর্যন্ত বেআইনী বলে গণ্য হত—এবং হিটলার ছিলেন তার সর্বময় কর্তা। এবং তার পরেই বরমান।

আইনত হিটলার হঠাৎ মারা গেলে কিংবা কোনো কারণে কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেললে তাঁর জায়গায় বসার কথা ছিল গ্যোরিঙের। ওদিকে নাৎসি পার্টির সশস্ত্র বাহিনীর (এস্ এস্) বড়কর্তা ছিলেন হিমলার। তিনি আবার ছিলেন দেশের সামরিক বেসামরিক সর্ব রিজার্ভ ফোর্সের অধিপতি এবং সর্ব কনসানট্রেশন ক্যাম্প ছিল সম্পূর্ণ তাঁরই জিম্মায়। শেষের দিকে গ্যোরিঙ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন এবং দেশের আপামর জনসাধারণ জানতো, হিটলারের

হঠাৎ কিছু একটা হয়ে গেলে হিমলারই দেশের ফ্যুরার—লীডার—বা নেতা হবেন। আইখমান যা কিছু করেছেন সেসব হিমলারের হুকুমেই।

তা ছাড়া ছিলেন গ্যোবেলস। যদিও তিনি প্রোপাগাণ্ডা মিনিস্টার কিন্তু তিনি হিটলারের বিশেষ প্রিয় আমীর ছিলেন। শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ও হিমলার যদি হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে চাইতেন তবে বরমনও সেটা ঠেকাতে পারতেন না। বিশেষ করে গ্যোবেলসকে। বরমান সেটি জানতেন, এবং হিমলারকে যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত কোণ-ঠাসা করে এনেছিলেন তবু গ্যোবেলসকে ঠেকাতে পারবেন না জেনে তাঁর সঙ্গে একটা চুক্তি (ওয়ার্কিং এরেঞ্জমেন্ট—মডুস ভিভেণ্ডি) করে নিয়েছেন।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, হিটলারের জীবনের শেষের বছরখানেক বরমান ছিলেন সর্বেসর্বা। হিটলারের তাবৎ হুকুম তাঁরই মারফতে বেরুতো। তাঁর ইচ্ছেমত তিনিও হিটলারকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিতেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী খৃষ্টধর্মের এমনই কট্টর শত্রু ছিলেন যে তাঁরা খৃষ্টানদের দমাবার জন্যে যে-সব ব্যবস্থা করতে চাইতেন তার দু-একটা হিটলারের মত ধর্মদ্রোহীর মনেও বিরক্তির সঞ্চার করেছিল।[১]

এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই, গ্যোরিঙের পতনের জন্য বরমানই দায়ী। এমন কি হিটলারের বিনানুমতিতে তিনি হুকুম পাঠান যেন গ্যোরিঙকে গুলি করে মারা হয়। কিন্তু নাৎসি রাজ্য পতনের দিন আসন্ন দেখে যে-কাপ্তানের উপর সে আদেশ দেওয়া হয়েছিল তিনি সেটা অমান্য করেন।

হিটলারের মাত্র একটি খাস দোস্ত ছিলেন। চক্রান্ত করে বরমান তাঁকেও প্রায় ছ'মাস ধরে হিটলারের কাছ থেকে দূরে রাখেন। হিটলারকে বলেন, তিনি সংক্রামক টাইফুসে ভুগছেন। হিটলারের মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তিনি কোনো গতিকে হিটলারের সাক্ষাৎ পান—শেষ বারের মত। চক্রান্ত ধরা পড়ে। হিটলার কিন্তু বরমানকে কিছুই বললেন না। বরঞ্চ দোস্ত হফ্‌মানকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন দয়া করে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন না করেন।[২]

---

১ "অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস" বলতে হবে, নাৎসি সাম্রাজ্য পতনের প্রায় এক বৎসর লুকিয়ে থাকার পর বরমানের স্ত্রী এক ক্যাথলিক পাদ্রির সাহায্য নেন, এবং মৃত্যুর পূর্বে আপন ডজনখানেক ছেলেমেয়েকে তাঁরই হাতে সঁপে দেন। এবং "নির্মমতম পরিহাস"—তাঁর বড় ছেলে ক্যাথলিক পাদ্রী হয়েছে!

২ এই দোস্ত হফ্‌মানকেই হিটলার পাঠিয়েছিলেন মস্কোতে, রিবেনট্রপের সঙ্গে, নাৎসি-কম্যুনিস্ট চুক্তি সই করার সময়—স্তালিন কি রকম লোক সে তত্ত্ব পর্যবেক্ষণ করার জন্য। হিটলারের মৃত্যুর পর ইনি 'হিটলার উয়োজ মাই ফ্রেণ্ড' নামক একটি পুস্তক লেখেন। ইনিই হিটলারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন তাঁর ফোটোগ্রাফ ল্যাবরেটরির এ্যাসিসটেণ্ট শ্রীমতী এফা ব্রাউনের সঙ্গে। আত্মহত্যা করার চল্লিশ ঘণ্টা পূর্বে হিটলার এফাকে বিয়ে করেন—পনেরো

এই যে এত শক্তিশালী বরমানকে লোকে খুঁজে পাচ্ছে না কেন? আইবমান তাঁর অনেক নিচের নিচে কর্মচারী ছিলেন। তাঁকেও ইহুদীরা ধরতে পেরেছে। এঁকে পারছে না কেন?

যে বিখ্যাত মাসিকপত্রের উল্লেখ করে এ প্রবন্ধ আরম্ভ করেছি সেখানে এ প্রশ্নটির উল্লেখ নেই। যদিও হিটলার-বরমান নিয়ে যাঁরাই আলোচনা করেন তাঁদের সবাই এর উত্তর জানেন।

তার একমাত্র কারণ বরমান পাবলিসিটি বা খ্যাতি চাইতেন না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল শক্তি, ক্ষমতা—মানুষের জীবনমরণের উপর অধিকার আয়ত্ত করা।

হেস্, গ্যোরিঙ, গ্যোবেলস, হিমলার, রিবেনট্রপ এমন কি হিটলারের আমীর-ওমরাহ চুনোপুঁটিরাও কাগজে-কাগজে যখন আপন আপন ফোটোগ্রাফ ছাপাচ্ছেন, যত্রতত্র ভাষণ দিচ্ছেন, বেতারে তরো-বেতরো বক্তৃতা ঝাড়ছেন, মোকা-বেমোকায় কেতাব ছাপাচ্ছেন, পরট্-পার্টি ডে-তে চোখ-ঝলসানো য়ুনিফর্ম পরছেন, তখন বরমান হিটলারের ছায়ায় দাঁড়িয়ে—তাও বাড়ির বাইরে জন-সমাজে না—কলকাঠি নাড়ছেন, দিনের পর দিন আপন শক্তি বাড়িয়ে যাচ্ছেন। বড় বড় জেনরেল সিভিলিয়ানরা যখন ডাঙর ডাঙর মেডেলের জন্য হিটলারের সামনে হুটোপুটি করছেন তখন বরমান তাঁর স্ত্রীকে লিখেছেন—'এ কী পাগলামি!'[৩]

তাই জর্মন-অজর্মন সাধারণজন তাঁকে চিনতো না। তখনকার দিনে এবং আজও তাঁর ফোটোগ্রাফ দুষ্প্রাপ্য ছিল এবং আছে।

হিটলার যখন তাঁর খ্যাতির মধ্যগগনে অর্থাৎ স্তালিনগ্রাদের পরাজয় তখনো তাঁকে স্বীকার করে নিতে হয়নি সে সময় খানাপিনার পর হিটলার ইয়ারবক্সীদের সঙ্গে গালগল্প করতেন। অবশ্য হিটলারই কথা বলতেন বেশী। বরমান তখন ব্যবস্থা করেন যে দুজন শর্টহ্যাণ্ড এককোণে বসে সেগুলো

বছরের 'বন্ধুত্বে'র পর। এফাও একই সঙ্গে আত্মহত্যা করেন। উভয়কে একই চিতায় পোড়ানের পর একই কবরে গোর দেওয়া হয়। রাশানরা স্কেলিটেনগুলো খুঁড়ে বের করে।

৩ বরমান এতই গোপনে থাকতেন যে তাঁর সম্বন্ধে কেউই সবিস্তার কিছু লিখতে পারেননি। ন্যুরনবের্গ মকদ্দমায় সবাই তাঁর বিরুদ্ধে গায়ের ঝাল ঝেড়েছেন বটে কিন্তু তথ্য বিশেষ কিছু দিতে পারেননি। এ ছাড়া আছে: ১) 'বরমান লেটার্স'—স্ত্রীকে লেখা বরমানের পত্রগুচ্ছ। স্ত্রীর মৃত্যুর পর এগুলো প্রকাশিত হয়েছে। ২) ট্রেভার-রোপার লিখিত 'লাস্ট ডেজ্ অব্ হিটলার'। ৩) প্রাগুক্ত হফ্মান লিখিত, 'হিটলার উয়োজ মাই ফ্রেণ্ড'। ৪) গেরহার্ট বল্ট্ কৃত 'ডি লেৎসতেন টাগে ড্যার রাইষ্স্কান্ৎস্লাই' (অর্থাৎ 'জর্মন প্রধানাবাসের শেষ কটি দিন')। এই বল্ট্ হিটলার ভবন (মাটির গভীরের এ্যার রেড শেলটার বা 'বুঙ্কার') ত্যাগ করেন হিটলারের মৃত্যুর মাত্র ছাব্বিশ ঘণ্টা পূর্বে।

যেন লিখে নেন। পরে বরমান সেগুলো কেটেছেঁটে ধোপ-দুরস্ত করে দিতেন। এগুলো হিটলারের মৃত্যুর পর তাঁর 'টেব্‌ল্‌-টক্‌' (table talk) রূপে প্রকাশিত হয়েছে। প্রাগুক্ত বিশ্ববিখ্যাত মাসিকের প্রবন্ধ-লেখক বলেছেন, বরমান যে এ ব্যবস্থা করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল so that he could know and fulfil Hitler's every whim. এ উদ্দেশ্যও হয়তো তাঁর ছিল কিন্তু এই টেব্‌ল্‌-টক পড়লেই বোঝা যায় সেটা অত্যন্ত গৌণ। আসলে বরমান মনে করতেন হিটলার যা করেন যা বলেন তার চিরন্তন ঐতিহাসিক মূল্য আছে এবং পরবর্তী যুগের নাৎসি তথা বিশ্ববাসীর জন্য অমূল্য নিধি। নিধি হোক আর না-ই হোক—এ-কথা সত্য, যারা হিটলারকে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে চিনতে চান তাঁদের পক্ষে হিটলারের স্বরচিত 'মাইন কাম্‌প্‌ফ্‌' পুস্তকের পরেই এর স্থান। এসব ১৯৪১-৪২-এর কথা।

১৯৪৫ সালে হিটলার যখন আসন্ন পরাজয়ের সম্মুখীন তখন বরমান হিটলারকে দিয়ে আবার কথা বলিয়ে নেন। এ-কথা সত্য, আত্মহত্যার কুড়ি-বাইশ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত হিটলার জয়াশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারেননি। তবু এই শেষ talk-গুলোতে হিটলার যেন আপন মনে চিন্তা করছেন, কেন তাঁর পরাজয় হল? এবং শুধু তাই নয়, পরাজয় যদি নিতান্তই হয়ে যায় তবে ভবিষ্যতে ইয়োরোপ-আমেরিকার কি অবস্থা হবে, তখন জর্মন রাজনীতি কোন্‌ পন্থা অনুসরণ করবে সে সম্বন্ধেও হিটলার ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছেন। আশ্চর্য, তার অনেকগুলোর আজ ফলে যাচ্ছে। চীন যে চিরকাল জড় হয়ে পড়ে থাকবে এটা তিনি স্বীকার করেননি। বরঞ্চ বলেছেন, চীনের কোটি কোটি লোক ঐ দেশে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে না। তবে তাঁর বিশ্বাস ছিল, চীন আমেরিকা-পানে ধাওয়া করবে (তার পূর্বে রুশ-মার্কিনে যুদ্ধ হয়ে আমেরিকা ছারখার হয়ে যাবে); চীন যে ভারতপানে ধাওয়া করবে সে ভবিষ্যৎবাণী তিনি করেননি।

বলতে গেলে এই টেব্‌ল-টক্‌ও বরমানেরই 'অবদান'।

কিন্তু এহ বাহ্য।

প্রাগুক্ত প্রবন্ধ-লেখক বলেছেন, 'বরমান মদ এবং কফি খেতেন না, পাতলা চা খেতেন এবং ক্বচিৎ কখনো মাংস খেতেন (drinking neither alcohol nor coffee, just weak tea, and eating sparingly of meat)'।

অর্থাৎ কাল যদি আপনি কলকাতায় (প্রবন্ধ-লেখক বলেছেন he could be in Canada or Mexico—even in India), কিংবা কেউ যদি আর্জেন্টাইনে দেখে একটা লোক ঢাউস গেলাস-ভর্তি বিয়ারের সঙ্গে বিরাট একটা কট্‌লেট্‌ খাচ্ছে তবে তার বরমান হবার সম্ভাবনা নেই।

বস্তুত বরমান মাংস খেতেন প্রচুর। মদের তো কথাই নেই।

তবে প্রবন্ধ-লেখকের এ ভুল ধারণা এল কোথা থেকে?

সকলেই জানেন হিটলার মাছ মাংস মদ খেতেন না। তিনি যখন সাঙ্গোপাঙ্গ

নিয়ে খেতে বসতেন তখন তাঁর সামনে থাকতো নিরামিষ, এবং অন্যদের জন্য মাছ মাংস মদ। অবশ্য কেউ যদি হিটলারের মত নিরামিষ খেতে চাইত তবে তাকে সানন্দে তাই দেওয়া হত।

হিটলার-সখা হফ্‌মান—যাঁর পুস্তকের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি—বলছেন, 'গ্যোরিঙও এসব খানাতে প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন না। তিনি বলতেন, "আহারাদির ব্যাপারে প্রভুর সঙ্গে আমার রুচির অমিল।" এবং এসব নিরামিষ অন্য কেউই কখখনো খেতে চায়নি। এক বরমান ছাড়া। প্রভুকে খুশী করার জন্য সেই কর্তাভজাটা তার সঙ্গে ঐ 'কচুঘেঁচু' খেত। এবং তারপর আপন কামরায় গিয়ে—সেটা কাছেই ছিল—পরমানন্দে শুয়োরের চপ্‌ (বিরাট মাংসের টুকরো—এর সঙ্গে আমাদের আলুর চপের কোনো মিল নেই) বা বাছুর মাংসের কট্‌লেট্‌ গবগব করে গিলতো।'[৪]

প্রাগুপ্ত প্রবন্ধ-লেখক তাঁদেরই উপর নির্ভর করেছেন যাঁরা বরমানকে শুধু বাইরের থেকে দেখেছেন। তাই কবি বলেছেন, বাহ্যদৃশ্যে 'ভোলো না রে মন।'

প্রশ্ন উঠতে পারে, হফ্‌মান আর বরমানে ছিল আদায় কাঁচকলায়। তাই তিনি দুশমনী করে এসব নিন্দে রটিয়েছেন। কিন্তু ভুললে চলবে না, যখন হফ্‌মানের বইখানি প্রকাশিত হয় তখন বরমানের প্রাইভেট সেক্রেটারি, স্টেনো, চাকর, প্রাপ্তবয়স্ক একাধিক ছেলেমেয়ে স্বাধীন ভাবে জর্মনিতে চরে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের কেউই কোনো আপত্তি জানাননি।

এবারে মদের ব্যাপার।

হিটলারের খাস চাকর (ভ্যালে) লিঙে দশ বৎসর রুশদেশে কারাবাস করে, ১৯৫৫ সালে খালাস পেয়ে দেশে ফিরে হিটলার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন। হিটলার নাকি প্রায়ই তাঁকে বলতেন, 'দেখো লিঙে, রাত্রে আপন ঘরে তুমি যত খুশী মদ খেয়ে যেমন খুশী মাতলামো করো, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু সমাজে সাবধানে খেয়ো।' বরমানও তাই সাবধানে মদ খেতেন।

আমার এই প্রবন্ধের তিন নম্বর ফুটনোটে যে চার নম্বরের লেখকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তিনি বল্‌ট্‌।

পূর্বেই বলেছি হিটলার আত্মহত্যা করার ছাব্বিশ ঘণ্টা পূর্বে তিনি হিটলার আর সাঙ্গোপাঙ্গদের ভূগর্ভ-নিবাস (বুঙ্কার) ত্যাগ করে প্রাণ বাঁচান। এই ভূগর্ভ-নিবাস বহু কামরায় বিভক্ত ছিল। তারই একটাতে থাকতেন তিনি আর তাঁর

---

৪ "Goering too was a rare guest. Hitler's culinary confections he declared was not to his taste. But the lick-spittling Borman dutifuly consumed raw carrots and leaves in his master's company,—and then he would retire to the privacy of his own room and devour with relish his pork chop or a fine Wiener Schnitzel (calf cutlet). Hoffmann, p 202.

সহকর্মী লরিংহফেন্। হিটলারের আত্মহত্যার দু'তিন রাত্র পূর্বে ভোরের দিকে তাঁর সহকর্মী তাঁকে জাগিয়ে বলেন, 'কান পেতে শোন্, কি সব হচ্ছে।' পাশের কামরায় তিন ইয়ার—বরমান, জেনারেল বুর্গডর্ফ আর জেনারেল ক্রেব্স্[৫] মদ্যপানের সঙ্গে তর্কাতর্কি করছেন। রাশানরা তখন বার্লিনে ঢুকে গিয়েছে এবং কয়েকদিনের ভিতর যে তাদের জীবনমরণ সমস্যা দেখা দেবে সেটা জানতে পেরে বিশেষ করে বুর্গডর্ফের আত্মগ্লানি দেখা দিয়েছে এবং তার জন্য তিনি প্রধানত নাৎসি পার্টি ও তার কর্তা বরমানকে দায়ী করছিলেন। বরমান আত্ম-পক্ষ সমর্থন করতে করতে বলছেন, 'এস, দোস্ত, আরেক পাত্তর হয়ে যাক'—বুর্গডর্ফ অধিকাংশ সময়ই মত্তাবস্থায় থাকতেন।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বল্ট্ তার পর ঘুমিয়ে পড়েন।

দুপুরের দিকে বল্ট্ তাঁর সহকর্মীর সঙ্গে গেলেন মিলিটারি কনফারেন্স্ রুমে—বুঙ্কারের ক্ষুদ্র-পরিসর কামরাগুলোর মধ্যে এইটেই ছিল সব চেয়ে প্রশস্ত। সেখানে গিয়ে দেখেন, হিটলার, এফা এবং গ্যোবেলস বসে আছেন, আর সামনের তিনখানা সোফাতে হিটলারের তিন ওমরাহ—বরমান, বুর্গডর্ফ, ক্রেব্স্—লম্বা হয়ে, পা ফাঁক করে সর্বাঙ্গে কম্বল জড়িয়ে, সোফার ফাঁকা জায়গাগুলো কুশন (তাকিয়া-বালিশ) দিয়ে ভর্তি করে ঘড়ঘড় করে প্রচুর নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন।

পূর্বরাত্রির এবং সেই সকালের অত্যধিক সুমিষ্ট দ্রাক্ষারস পানের ধকল কাটিয়ে তখনো তাঁরা জেগে উঠতে পারেননি। মদ্যপানশেষে তিন ইয়ার এক-সঙ্গে শোবার জন্য এই বড় ঘরটাই বেছে নিয়েছিলেন। বল্ট্ বলছেন, 'গ্যোবে-লস তাঁর দিকে এগুতে গিয়ে এঁদের নিদ্রাভঙ্গ না করার জন্যে প্রায় সার্কাস খেলোয়াড়ের মত তাঁদের পা বাঁচিয়ে এক রকম ডিঙিয়ে এলেন। তাই দেখে এফা একটু মৃদু হাস্য করলেন।' (পৃ ৮১, ৮২)

এর পরও যদি প্রাগুক্ত প্রবন্ধ-লেখক বলেন বরমান মদ খেতেন না তাহলে আমরা সত্যিই নিরুপায়।

অবশ্য একথা ঠিক যে বরমান যতক্ষণ না হিটলার ঘুমিয়ে পড়েন ততক্ষণ সচরাচর মদ খেতেন না। পাছে হিটলার ডেকে পাঠান। এমন কি স্বয়ং বরমানই তাঁর স্ত্রীকে লিখছেন (ফেব্রুয়ারি মাসে—হিটলার আত্মহত্যা করেন ৩০

---

৫ অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস, হিটলারের মৃত্যুর দু'দিন পরে যখন বুঙ্কার রাশান সৈন্য দ্বারা অধিকৃত হয় তখন বুর্গডর্ফ এবং ক্রেব্স্ আত্মহত্যা করেন। বরমান পালান। গোড়ায় তাঁর সঙ্গে পলায়মান যাঁরা পরে বন্দী হন তাঁরা বলেন, বরমান রাশান দ্বারা নিহত হন। পরে নানা সন্দেহের অবকাশ দেখা দিল। তাই আজ জর্মন সরকার এক লক্ষ মার্ক পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। তাঁর পলায়ন সম্বন্ধে সবিস্তর বর্ণনা, তিনি বেঁচে আছেন কিনা সে সম্বন্ধে সব চেয়ে ভালো আলোচনা পাঠক পাবেন, ট্রেভার-রোপার লিখিত পুস্তকে, পৃ ২২১।

এপ্রিল ১৯৪৫, অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটেয়; হিটলারের ভ্যালে—খাস চাকর—লিঙের মতে ৩'৫০), 'ভাগ্যিস কাল রাত্রে এফার জন্মদিন পরবে আমি মদ্যপান করিনি, কারণ রাত সাড়ে তিনটেয় হিটলার আমাকে ডেকে পাঠালেন ; আমি তাই সাদা চোখেই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কইতে পারলুম।'

প্রাগুক্ত প্রবন্ধ-লেখক বলেছেন, 'বরমান হাল্কা চা খেতেন।'

সেও সর্বজন সমক্ষে, হিটলারকে খুশী করার জন্য যেমন তিনি 'কচুঘেঁচু' খেতেন তেম্নি। কারণ, আর-সবাই যখন মদ্যপান করতেন তখন হিটলার ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাল্কা চা খেতেন,—চীনারা, রুশোরা, কাবুলীরা যে রকম করে থাকে।

বরমান যে মদ্যপান করেন সে-কথা হিটলারের অজানা ছিল না। বস্তুত বুঙ্কারের অনেকেই শেষের দিকে পরাজয় আসন্ন জেনে সুরাতে দুশ্চিন্তা ভোলবার চেষ্টা করছিলেন। সখা হফ্‌মান যখন হিটলারকে এপ্রিলের মাঝামাঝি শেষবারের মত দেখতে আসেন তখন তাঁর জন্য স্যাম্পেন অর্ডার দিয়ে হিটলার এই মন্তব্য করেন।

* * *

এ প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য আমার এ নয় যে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করে বরমানকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করা। তদুপরি বরমানের এই বঙ্গদেশে আগমন অসম্ভব। ধরা পড়লে ভারত সরকার তাঁকে পয়লা প্লেনেই জর্মনি পাঠিয়ে দিতে কোনো আপত্তি করবেন না। তিনি থাকবেন ঐ সব দেশেই যে সব দেশ আসামী বদলের চুক্তি জর্মনির সঙ্গে করেনি—অর্থাৎ নাৎসিদের প্রতি এখনো যাদের কিছুটা দরদ আছে। অবশ্য বরমান তাঁর প্রাপ্য শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পান সেটাও আমার উদ্দেশ্য নয়।

আমার উদ্দেশ্য, এই সব চোদ্দ আর বাইশ ভাষায় প্রকাশিত মার্কিন কাগজগুলোকে যেন বঙ্গসন্তান চোখ-কান বন্ধ করে বিশ্বাস না করেন। বিশেষ করে যখন তারা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানা প্রকারের উপদেশ দেয়।

কন্‌রাট্‌ আডেনাওয়ার

চার্‌চিল নাকি একদা বলেছিলেন, বিসমার্‌কের পরবর্তী যুগে জর্মনিতে মাত্র একটি রাষ্ট্রবিদ (স্টেট্‌সম্যান, রাষ্ট্রনির্মাতা) জন্মেছেন—তিনি কন্‌রাট্‌ আডেনাওয়ার।

এ প্রশস্তি আডেনাওয়ারের পক্ষে অবশ্যই আনন্দদায়িনী (এবং আমরাও চার্‌চিলের সঙ্গে একমত), যদ্যপি এ তথ্যটি সর্বজনবিদিত যে স্বয়ং আডেনাওয়ার ইংরেজ জাতটাকে আদৌ নেকনজরে দেখতেন না।

চার্‌চিলের মন্তব্যে কিন্তু একটা স্থূলাঙ্গুলির রূঢ় ইঙ্গিত রয়ে গিয়েছে।

তিনি বলতে চান, বিসমার্‌ক এবং আডেনাওয়ারের মাঝখানে রাজনীতির (স্টেট্‌সম্যানশিপের) শস্যশ্যামল ভূখণ্ড নেই, আছে সাহারার মরুভূমি।

অর্থাৎ বহু বহু বৎসর ধরে জর্মন দেশে রাষ্ট্রনির্মাতার বড়ই অভাব। বিসমার্কের জন্ম ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে, রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ও মৃত্যু ১৮৯৮। যদি ধরা হয়, তিনি রাজনীতি সংগ্রামে নামেন ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তা হলে বলতে হয় প্রায় একশ' বছর ধরে জর্মনিতে একমাত্র রাষ্ট্রপিতা ছিলেন বিসমার্কই। জর্মনির মত চিন্তাশীল তথা শক্তিশালী দেশের পক্ষে এক শতাব্দীতে মাত্র একজন রাষ্ট্রস্রষ্টা—এ যেন অবিশ্বাস্য। জর্মনি না কান্ট্, হেগেল, কার্ল মার্কসের দেশ! তাঁদের পরিকল্পনা কেউই বাস্তবে পরিণত করতে পারলো না?

এবং হিটলার?

এর উত্তর সুদীর্ঘ, কিন্তু সংক্ষেপে সারি। যে-ডিক্টেটারের মৃত্যুকালে তাঁর দেশের অধিকাংশ ভস্মস্তূপে পরিণত, যাঁর সংগ্রামনীতির ফলে লক্ষ লক্ষ সৈন্য দেশেবিদেশে নিহত হয়েছে; যুদ্ধে বোমারু আক্রমণে আরো লক্ষ লক্ষ আহত রক্তাক্ত নরনারী চিৎকার করছে—তাঁকে নিশ্চয়ই অতিমানব, নরদানব সবই বলা যেতে পারে; শুধু বলা যায় না—রাষ্ট্রনির্মাতা, পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার যুগযুগ-ধাবিত যাত্রীর 'চিরসারথি' তাঁকে কিছুতেই বলা যায় না।

বিনষ্ট রাষ্ট্রের ভস্মস্তূপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যে লোক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় তাকে রাষ্ট্রনায়ক, রাষ্ট্রনির্মাতা বলা চলে না।

এমন কি কোনো রাষ্ট্রাদর্শও তিনি রেখে যেতে পারেননি যেটা ভবিষ্যদ্বংশীয়রা মৃন্ময় করে তুলতে পারে। তাঁর রাষ্ট্রাদর্শ ঃ—পররাজ্য জয় করে সে দেশের 'বর্বর' (উন্টর্মেন্ষ্) জনসাধারণকে দাসস্য দাস রূপে পরিণত করে —যে সুপরিকল্পিত পৈশাচিক শোষণ-সংহার পদ্ধতি দর্শনে আন্কল্ টম পর্যন্ত গোরশয্যায় চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান হবেন—আপন দেশের বিলাসব্যসনের জন্য অধিকতর শূকরমাংস, সূক্ষ্মতর চীনাংশুক, অগণিত স্বতশ্চলশকট সংগ্রহ —সাতিশয় বস্তুতান্ত্রিক জড়ত্বের চরম আরাধনা।

এ-প্রসঙ্গে তাই বলে নিতে পারি যদিও এটা সর্বশেষের কথা, হিটলার বারো বৎসরে যে জর্মনিকে বিনাশ করেন, আডেনাওয়ার তাঁর ১৯৪৯ ব্যাপী 'রাজত্ব'কালে সেটি পুনর্নির্মাণ করেন। শুধু পুনর্নির্মাণ নয় এবং চৌদ্দ বৎসরও নয়, আডেনাওয়ার দশ বৎসরেই জর্মনিতে যে সুখসমৃদ্ধি গড়ে তুললেন সেটা হিটলারের ভস্মস্তূপে দাঁড়িয়ে ১৯৪৫ সালে বাতুলতম আশাবাদীও কল্পনা করতে পারেনি। এবং বলতে কি, এহ বাহ্য, তিনি দিলেন এমন ধন যার উল্লেখ করে খৃষ্ট একদা বলেছিলেন—শুধু রুটি খেয়েই মানুষ জীবনধারণ করে না। সে-কথা পরে হবে, আগেই বলেছি।

* * *

কলন[১] শহরের নাম বিশ্ববিখ্যাত। আর কিছু না হোক পৃথিবীর সর্বত্রই

---

১ এখানে রোমান জাত একটা কলনি স্থাপন করে ও নেরোর (যিনি রোম পুড়িয়েছিলেন) মা, মহারানী (Colonia) Claudia Ara Agrippinensis-

Eau de Cologne জিনিসটি পাওয়া যায়, এবং আজকের দিনে ও দ্য কলন্ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই নির্মিত হয়। কলন শহর যে 'কলন-জলে'র (Eau = Water, de = of, Colojne = Coloyne = Koeln) আবিষ্কারক তাও নয়, কিন্তু কলনের ও দ্য কলন্ই এখন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কলন-জল।

কলন জর্মানির অন্যতম বৃহৎ নগর। এর গির্জাটি স্থাপত্যশিল্পের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। গম্ভীর এবং মধুর উভয় রস এই বিরাট গির্জাতে সম্মিলিত হয়েছে। দূর-দূরান্ত হতে গির্জার শিখরদ্বয় পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এ নগরের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি তার ওবার্বুরগার্মাইস্টার বা প্রধান লর্ড মেয়ার। কলন শহরের উপর তাঁর প্রভাব অসীম। বস্তুত তাঁকে কলনের 'রাজা' বললে কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হয় না। ভাইমারের পূর্ববর্তী যুগে কলনের লর্ড মেয়ার প্রতি পরবে কাইজার কর্তৃক নিমন্ত্রিত হতেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে আডেনাওয়ারের জন্ম এই কলন শহরে। আইন অধ্যয়ন করার পর তিনি এ শহরের লর্ড মেয়ারের দফতরে ঢোকেন এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং ওবার্বুগার্মাইস্টার নিযুক্ত হন। ১৯৩৩ পর্যন্ত তিনি ঐ পদে থেকে তাঁর আপন শহরের সেবা করেন। এ-রকম একাগ্র সেবা তাঁর পূর্বে বা পরে কোনো মেয়ারই করেননি। ১৯৩৩-এ হিটলার জর্মানির প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েই তাঁকে সরাসরি ডিসমিস করে দেন।

আডেনাওয়ারের দীর্ঘ একানব্বুই বৎসরের জীবনকে যদি দুই পর্যায়ে ভাগ করা যায় তবে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তার প্রথম পর্যায় সমাপ্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের আরম্ভ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে এবং সমাপ্তি ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে।

জর্মানি, হিটলার তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে যাঁদেরই কৌতূহল আছে তাঁদের সকলের মনেই প্রশ্ন জাগবে, হিটলার এঁকে ডিসমিস করলেন কেন? নাৎসি আন্দোলন যখন ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তখন আডেনাওয়ার তার উপর কি কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি?

জীবনের প্রথম পর্যায়ে, অর্থাৎ ১৯৩৩ অবধি আডেনাওয়ার প্রকৃত পলিটিশিয়ান বলতে যা বোঝায় তা ছিলেন না। লর্ড মেয়ারের পদ ছাড়াও তিনি কাইজারের রাজত্বে ও পরবর্তী ভাইমার রিপাবলিকে একাধিক সর্বোচ্চ আসন গ্রহণ করেন বটে কিন্তু কখনো রাইষটাগ বা জর্মন পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার জন্য জনসমাজের সম্মুখে প্রার্থী হয়ে দাঁড়াননি। তিনি ক্যাথলিক সেন্টার পারটির সদস্য ছিলেন এবং সে দলের উপর তাঁর প্রভাব ছিল প্রচুর কিন্তু সেটা প্রধানত তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের বলে ও প্রখ্যাত কলন শহরের লর্ড মেয়ারের পদমহিমায়। এবং ক্যাথলিক সেন্টার পারটির প্রতি হিটলারের ছিল ক্রোধ ও ঘৃণা।

এর Colony (Colonia) নাম দেয়। এই Colonia থেকে ফরাসী ইংরিজি Cologne, জর্মনে Koeln.

কিন্তু ১৯২৯-৩০ থেকে ১৯৩৩ অবধি ক্ষমতালাভের জন্য যখন নাৎসি পারটি শহরে গ্রামে, রাস্তায় রাস্তায়, মদের দোকানে লড়াই চালাচ্ছে তখন যে-সব নাৎসিবিরোধী রাজনৈতিকদের নাম শোনা যায়, যেমন ফন পাপেন, হুগেনবুর্গ, শ্লাইষার, ব্রুনিঙ, ট্যালমান, টর্গলার, শ্রোডার—এদের ভিতর আডেনাওয়ারের নাম নেই। ১১৭৪ পৃষ্ঠা জুড়ে শ্রীযুক্ত শাইরার 'নাৎসি আন্দোলনের উদয়াস্ত' সম্বন্ধে যে বিরাট গ্রন্থ লিখেছেন তাতে আডেনাওয়ারের নাম নেই।

অথচ আডেনাওয়ার ছিলেন ধর্মভীরু লোক—হিটলার যে ধর্মমাত্রকেই এবং বিশেষ করে খৃষ্টধর্মকে, জর্মন টিউটন চরিত্রের সর্বনাশা শত্রুরূপে ঘৃণা করতেন সে তত্ত্ব তিনি কখনো গোপন রাখার প্রয়োজন বোধ করেননি।[২] হিটলারের করাল ছায়া যে ক্যাথলিক গির্জা ক্রমেই ছেয়ে ফেলছে সেটা আডেনাওয়ারের দৃষ্টি এড়ায়নি।

কিন্তু আডেনাওয়ার ছিলেন ধর্মভীরু, শিক্ষিত, বিদগ্ধ নাগরিক।

একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। কলন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে ; নেপোলিয়নের নেতৃত্বে যখন ফরাসী সেনা জর্মনিতে ঢুকলো তখন সারা জর্মনির শিক্ষাদীক্ষার উপর নামলো দুর্দিনের অন্ধকার। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে কলন বিশ্ববিদ্যালয়েরও দরজা বন্ধ হয়ে গেল ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে।

আপ্রাণ চেষ্টা করে, লর্ড মেয়ারের সর্ব প্রভাব সর্ব কর্তৃত্ব বিস্তার করে কন্‌-রাট্‌ আডেনাওয়ার ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কলনে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। ১২৩ বৎসর পরে।

বন্‌ শহর কলনের অতি কাছে। বন্‌-এর বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত। আডেনাওয়ার বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি বন্‌-কলনের পথে র‍্যোনডর্‌ফে তাঁর আবাস নির্মাণ করেন। এখান থেকেই তারো পরবর্তীকালে—হিটলারের পতনের পর—তিনি মোটরে করে রাজধানী বন্‌-এ রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর কর্তব্য সমাধান করতে যেতেন।

সেই ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে, বস্তুত প্রায় ষাট বছর ধরে বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছাত্রদের কাছে তিনি ছিলেন সুপরিচিত।[৩] বন্‌-এর এত কাছে একটি

---

২ হিটলারের বিশ্বাস ছিল, ইহুদী ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নির্বীর্য কাপুরুষের আশ্রয়স্থল খৃষ্টধর্ম ইয়োরোপের সর্বনাশ করেছে, এবং এ ধর্ম ইয়োরোপে ছড়ানোর পিছনে রয়েছে ইহুদীদেরই (!) এক অভিনব কৌশল। আবার হিটলার মনে করতেন খৃষ্টজন্মের পূর্বে যে সব রোমান সৈন্য প্যালেস্‌টাইনে মোতায়েন ছিল খৃষ্ট তাদেরই কোনো একজনের জারজ সন্তান!

৩ ঐ সময়ে আমি বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করি ও আডেনাওয়ারের খ্যাতি প্রতিপত্তি সম্বন্ধে সতীর্থদের কাছ থেকে বহু প্রশস্তি শুনতে পাই। তাঁর সম্বন্ধে যে-সব সংবাদ খবরের কাগজে ও লোকমুখে এসে পৌঁছত সেগুলো ১৯৩৩ পর্যন্ত যাচাই করে নেওয়া যেত। ঐ বছরে হিটলার ক্ষমতা গ্রহণ করার ফলে

নূতন বিশ্ববিদ্যালয় খোলাতে বন্-এর কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা হয়নি, কারণ বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আডেনাওয়ারের সখ্য ছিল অবিচল। বস্তুত উত্তর রাইন অঞ্চলের (বন-কলন-ড্যুসেল্ডর্ফ্) প্রায় সব রকমের কৃষ্টি আন্দোলন তথা ক্যাথলিক ধর্মজীবন এবং তার প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আডেনাওয়ার তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

হিটলারের জন্মভূমি যদিও অস্ট্রিয়ায়, তবু তিনি বেভেরিয়ার ম্যুনিক্ শহর বেছে নিয়েছিলেন তাঁর রাজনৈতিক কর্মকেন্দ্ররূপে। সেখানে বিরাট বিরাট মিটিঙে হিটলার লম্বা লম্বা লেকচার ঝাড়তেন, রাস্তায় রাস্তায় কম্যুনিস্টদের ঠ্যাঙাবার ব্যবস্থা করাতেন, এমন কি গুম্ খুন করাতেও তাঁর বাধতো না এসব পাঠক মাত্রই জানেন।

বেভেরিয়া প্রদেশের পরেই হিটলারের জনপ্রিয়তা ছিল উত্তর রাইনের কয়লা ও লোহা ব্যবসার জায়গা রুর অঞ্চলে—এবং কলনের পাশে এই উত্তর রাইনের ড্যুসেল্ডর্ফ্ শহরে বিশ্বপ্রপাগান্ডা সরদার ডকটর গ্যোব্লসের জন্ম। রুরের গা ঘেঁষে কলন শহর এবং এই অঞ্চলের সব চেয়ে বড় নগর। গ্যোব্লস্ স্বভাবতই চাইতেন তাঁর বাড়ির পাশের কলন শহর যেন প্রভু হিটলারকে উৎকৃষ্ট আসন তৈরী করে দিতে পারেন—হিটলারের কাশী যদি হয় ম্যুনিক তবে কলন হবে বৃন্দাবন।

কিন্তু বাদ সাধতেন আডেনাওয়ার। পূর্বেই বলেছি, ওবার্বুল্গার্-মাইস্টারের ক্ষমতা অসীম। তাই নামমাত্র আইন বাঁচিয়ে তিনি কলন অঞ্চলে এমন সব কলাকৌশল করে রাখতেন যে হিটলার এমন কি রাইনের ছেলে স্বয়ং গ্যোব্লস্ও সেখানে সুবিধে করে উঠতে পারতেন না।

নাৎসি পার্টির ক্ষমতা সঞ্চয় করে উদ্দেশ্য সফল করাতে বাধা দিয়েছিল প্রধানত দুইটি সংঘ: ক্যাথলিক এবং দ্বিতীয়ত প্রটেস্টানট্ যাজক সম্প্রদায়। কিন্তু ক্যাথলিক সম্প্রদায় প্রটেস্টান্দের তুলনায় শতগুণে সংঘবদ্ধ এবং পোপকে কেন্দ্র করে তাদের বিশ্বজোড়া প্রতিষ্ঠান। হিটলারও বার বার তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গকে বলেছেন, 'ঐ ক্যাথলিকদের সমঝে চলো—প্রটেস্টান্ট্রা এমনিতেই টুকরো টুকরো হয়ে আছে, তাদের খানখান করা এমন কিছু কঠিন কর্ম নয়।'

প্রেসের স্বাধীনতা লোপ পায়। কাজেই যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত হিটলার-বৈরীদের সম্বন্ধে কোনো পাকা খবর পাওয়া যেত না। যুদ্ধের পর শ্রীযুত ভাইমার আডেনাওয়ার সম্বন্ধে একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ লেখেন। সেখানা যোগাড় করতে পারিনি বলে আমার জানা তথ্য ও তত্ত্ব যাচাই করে নিতে পারছি নে। বিশেষ করে ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত আডেনাওয়ার গোপনে নাৎসিদের বিরুদ্ধে কি কি করেছিলেন সে-সব খবর নিশ্চয়ই এই বইয়ে আছে। আডেনাওয়ারের মৃত্যুর পর থেকে কলন রেডিয়ো মাঝে মাঝে ঐ বই থেকে কিছু কিছু পড়ে শোনায়। এ প্রবন্ধে আমি তার সাহায্য নিয়েছি।

কলন শহরে পোপের অন্যতম আর্চবিশপের বিরাট প্রতিষ্ঠান। আডেনাওয়ার সেখানে সুপ্রীম লর্ড মেয়ার। ক্যাথলিক রাজনৈতিক দলের উপর তাঁর প্রচুর প্রভাব—যদিও, পূর্বেই বলেছি, তিনি সে রাজনৈতিক দলের টিকিট নিয়ে ভোটমারে কখনো নামেননি। তাঁর জীবনের প্রথম পর্যায় কেটেছে ম্যুনিসিপাল বা করপোরেশন পলিটিক্সে। ক্যাথলিক সংগঠনের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তিনি নাৎসিদের প্রচারকর্মে বাধা দিলেন কলন তথা উত্তর রাইনের সর্বত্র। অথচ হিটলার তাঁরে ধরা-ছোঁওয়াতে পান না, কারণ তিনি রাজনৈতিক কোনো দলের নেতা, এমন কি চারআনী সক্রিয় নিষ্ক্রিয় কোনো মেম্বারও নন। তিনি যদি ভোটমারে নামতেন তবে তাঁকে ভোটে হারিয়ে বিপর্যস্ত অপদস্থ করা যেত। নাৎসি ডন কুইক্সট্ তলওয়ার হানবার মত ড্র্যাগন খুঁজে পায় না—পায় উইন্ড্মিল্!

গ্যোব্ল্স্-এর প্রচারকর্মের একটা প্রধান উর্বরা জমি ছিল ইস্কুল-কলেজ-য়ুনিভারসিটি। কলনের অধিকাংশ স্কুল ক্যাথলিকদের তাঁবুতে—সেকুলার ভাইমার রিপাবলিক জর্মনির শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে সেকুলার করে তুলতে পারেনি কিংবা হয়ত সত্য সত্য তা করতে চায়নি—সেখানে আডেনাওয়ারের ধর্মবল অর্থবল দুইই রয়েছে। আর য়ুনিভারসিটির তো কথাই নেই। সোয়াশ' বছরের হারানো মানিক তার বিশ্ববিদ্যালয় ফের ফিরে পেয়েছে—আডেনাওয়ারের তপস্যায়, তখনো পুরো দশ বছর হয়নি। এটাকে কলনবাসী বাঁচিয়ে রাখবে সর্বপ্রকার কট্টরপন্থীর র‍্যাডিকাল ছোঁয়াচ থেকে। গ্যোব্ল্স্ কলনের কলেজে কল্কে পেতেন না।

ওদিকে বেকার সমস্যা দিন দিন তার চরম সংকটের দিকে দ্রুতপদে এগিয়ে চলেছে—এবং সব চেয়ে বেশী মার খাচ্ছেন রুর কয়লাখনির শ্রমিক দল। তাই দেখা যায়—হিটলারের খাস পাইলট তার পুস্তকে এর বর্ণনা দিয়েছেন—[৪] হিটলার প্রচারকর্মের জন্য প্লেনে উড়ে যাচ্ছেন রুরের এসেন্ শহরে। পাশেই বিরাট কলন। কিন্তু তিনি সেটি বাদ দিয়ে চলে যাচ্ছেন বন্-এর কাছে তাঁর প্রিয় গোডেসবের্গে নামক গণ্ডগ্রামে (এখন শহর এবং এখানেই পরবর্তী যুগে হিটলার প্রাথমিক কথাবার্তা বলেন চেম্বারলেনের সঙ্গে—চেকোস্লোভাকিয়ার সুডেটেন বাবদে)। নিশ্চয়ই হিটলারের এই কলন বর্জনে প্রতিবারই গ্যোব্লস লজ্জায় মাথা নিচু করেছেন। তাঁর সান্ত্বনা এইটুকু—এসেন্ তথা রুর তাঁর প্রতিবেশী, সেখানে তিনি প্রতিবারেই হিটলারকে রাজাসনে বসাতেন।

* * *

হিটলার চ্যান্সেলার হয়েই আডেনাওয়ারকে ডিসমিস করলেন। এটা হবে আমরা জানতুম। কারণ নাৎসিরা বহুদিন ধরে তাঁর নিন্দা-কুৎসা গেয়ে বেড়াচ্ছিল। তার একটা: 'আডেনাওয়ার তনখা টানেন বিরাট (রীজে)! তাঁর মাইনে ঢের ঢের কম হওয়া উচিত।' এবং সব চেয়ে মজার কথা, হিটলার

৪ বাওর, "হিটলার'জ্ পাইলট"।

যাঁকে লর্ড মেয়ার করলেন তিনি তাঁর মাইনে এক পাই তক না কমিয়ে টানতে লাগলেন আডেনাওয়ার যে তনখা নিতেন সেইটেই। এই মহাশয়ের নাম ছিল 'রীজে' (বাঙলায় আমরা বলব 'বিরাট' বাবু)। তখন কলন-বন্-এ একটা শিবরামীয় পান্ চালু হল—'আডেনাওয়ার নিতেন বিরাট তনখা; এখন (মিস্টার) বিরাট নিচ্ছেন আডেনাওয়ার-তনখা!'

* * *

হিটলার কি ভাবে জর্মনিকে বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন এবং তার অবশ্যম্ভাবী শেষ ফল যে দেশের সর্বনাশ, সে সত্য আডেনাওয়ার দিব্যদৃষ্টি দিয়েই দেখেছিলেন কিন্তু শান্ত-সমাহিত স্বভাব-ও আচরণ সম্পন্ন আডেনাওয়ার জানতেন, চীনা ঋষি লাওৎসের মতই জানতেন, জর্মন-নিয়তি রহস্যাবৃত তারই কোনো এক মানববুদ্ধির অগম্য 'কারণে'। জর্মনির উপর দিয়ে যে টর্নাডো বল্গামুক্ত করেছেন, সে যেন

"লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দীশালা হতে
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে"

তার সামনে দাঁড়ালে সেটাকে বন্ধ করা তো দূরের কথা, তিনিও মহাশূন্যে বিলীন হবেন। এটা ফরাসী সম্রাটের 'আপ্রে মোয়া ল্য দেলুজ' ('আমি মরে যাওয়ার পর বন্যা') নয়, এটা 'দেলুজ পুর শাঁকা আ ল্যাসতাঁ ('বন্যা এখনই, এবং সবাইকে নিয়ে যাবে ভাসিয়ে, কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে'!)।

বরঞ্চ বন্যার পর ফের-ঘরবাড়ি তুলতে হবে, খেতখামার করতে হবে—শিবের তাণ্ডব শেষ হলে অন্নপূর্ণার আবাহন।

পরাজয় যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল বুদ্ধিভ্রষ্টের ন্যায় হিটলার ততই অবিচারে, নির্বিচারে—শত্রুজন, নিরপেক্ষজন, এমন কি মিত্রজনকেও 'মরণ-থানায়' (কন্সান্ট্রেশন ক্যাম্পে) পাঠাতে লাগলেন—হ্যাঁ, ইব্রাহিম তাঁর প্রিয় পুত্রকে, আগামেম্নন্ তাঁর প্রিয় কন্যা এফিগেনিয়েকে দেবতার তুষ্টির জন্য বলি দিয়েছিলেন—কিন্তু আডেনাওয়ারের অদৃষ্টে 'মরণ-থানার' দুর্দৈব লেখা ছিল না। যুদ্ধের শেষের দিকে তাঁকে কিছুদিন কারাগারে, পরে তাঁর আপন গৃহে নজরবন্দী করা হয়েছিল মাত্র। কিন্তু তিনি শত্রুমিত্রনির্বিশেষে এতই অসংখ্য জনের উপকার করেছিলেন যে তাঁরা কলাকৌশলে ছলে (হিটলারকে) বলে আডেনাওয়ারকে কারামুক্ত করেন।

"সাঙ্গ হয়েছে রণ,
অনেক যুঝিয়া অনেক খুঁজিয়া শেষ হল আয়োজন"
"The fight is ended!
Cries of loss bewilder the sky"

১৯৪৫ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে জর্মনি 'বে-এক্তেয়ার' আত্মসমর্পণ করলো। ঐ বছরেই জুলাই মাসে প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক স্টিভন্ স্পেন্ডারকে ব্রিটিশ সরকার পাঠালে জর্মনিতে, সেখানকার ঝড়তিপড়তি ইনটেলেকচুয়েলদের চিন্তাধারার সম্বন্ধে খবর নিতে। সে-কর্ম সমাধান করে তারই বিবরণী তিনি

প্রকাশ করেন 'ইয়োরোপীয়ান উইটনিস' নামক পুস্তকে।[৫]

বীভৎস বই। কলনের রাস্তার পর রাস্তা, দুদিকে একটি মাত্র বাড়ি নেই—ধ্বংসস্তূপ, ভগ্নস্তূপ। তার তলায় এখনো হাজার হাজার মড়া পচছে গলছে। শহর-জোড়া দুর্গন্ধ থেকে নিষ্কৃতির উপায় নেই। একরকম ক্ষুদে সবুজ পোকা এই সব হাজা-পচা লাশ থেকে জন্ম নিয়েছে এবং শহরময় এমনই ঘন স্তরে ছেয়ে আছে যেন মনে হয় লন্ডনের ধুঁয়াশা। হাত দিয়ে মুখের সামনে থেকে তাড়াতে গেলে মুখে লেগে গিয়ে পিছলে আঠার মত চোখেমুখে সেঁটে যায়।

লড়াইয়ের শুরুতে কলনে বাস করতো প্রায় আট লক্ষ্য লোক। তারা ক' হাজার বাড়ি, ভিলা ফ্ল্যাটে বাস করতো তার হিসেব স্পেন্ডার দেননি। শুধু বলেছেন, মাত্র তিনশ খানা (!) তখনো বাসের উপযোগী। "Actually there are a few habitable buildings left in Cologne, theree hundred in all (!)"

এ শহর তথা গোটা দেশের আর আর শহর গড়ে তুলবে কে, কারা?

দুষ্ট হোক শিষ্ট হোক যে-সব নাৎসি একদা নরওয়ে থেকে ইটালি, আতলান্তিক থেকে ককেশাস পর্যন্ত অধিকার করেছিল তারা কৃতবিদ্য, করিৎকর্মা, অভিজ্ঞ—নির্মাণ-ধ্বংস উভয় কর্মেই সিদ্ধহস্ত। তাদের কিছু মারা গেছে, অধিকাংশ মিত্রশক্তির শিবিরে শিবিরে বন্দী, কিছু পলাতক, অনেক আন্ডার-গ্রাউন্ড।

হিটলারের বৈরীপক্ষের অধিকাংশ অন্যলোকে। হিটলার তার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। আডেনাওয়ার গোত্রের নির্মাণতৎপর নেতা অতিশয় বিরল,—মুষ্টিমেয়।

আডেনাওয়ার ভগ্নস্তূপের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। একদা চার্চিল যেরকম লন্ডনের ভাঙাচোরার মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন—যদিও সে বিনাশ কলনের সহস্রাংশও ছিল না।

এখানে আমাকে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিতে হবে। এটি পড়ে নিলে আডেনাওয়ারের চরিত্রগুণটি পাঠকের সামনে স্পষ্ট রেখায় ধরা দেবে। বিশেষত স্পেন্ডারের মত লোক যখন এ ছবিটি এঁকেছেন।

দু'দফে অনুবাদ করে লাভ নেই, এবং বিবেচনা করি এ প্রবন্ধের পাঠক অন্তত আমার চেয়ে ভালো ইংরিজি জানেন।

এটা যুদ্ধবিরতির দু'তিন মাস পরের কথা। স্পেন্ডার বলছেন :—

Adenauer is a prominent Catholic in the Rheinland, who was Mayor of Cologne before Hitler came to power. It is

৫ Stephen Spender, European Witness, 1946. মাসখানেক পূর্বে যখন কেলেঙ্কারি-কেচ্ছা বেরলো যে মারকিন গুপ্তচর বিভাগ "Encounter" কাগজকে গোপনে অর্থসাহায্য করে, তখন তিনি কাগজের সম্পাদকপদ ত্যাগ করেন।

now with a special personal emotion that he takes up the restoration of that Cologne which was a broken trayload of crokery when it was taken out of his hands. When he was last Lord Mayor he was in his fifties, he is now a man of seventy. He has an energetic, though some what insignificant appearance; a long lean oval face, almost no hair, small blue active eyes, little button-nose and a reddish complexion. He looks remarkably young and he has the quietly confident manner of a successful and attentive young man.

'There are two aspects of reconstruction which we consider of equal importance,' he said, 'one, the material rebuilding of the city. But just as important is the creation of a new spiritual life. You can't have failed to notice that the Nazis have laid German culture just as flat as the ruins of the Rheinland and the Ruhr. Fifteen years of Nazi rule have left Germany a spiritual desert, and perhaps it is more necessary to draw attention to this than to the physical ruins, for the spiritual devastation is not so apparent. There is hunger and thirst now for spiritual values in Germany. This is especially true of Cologne because here, in the past, we have had such a significant spiritual life and activity. Here it is possible to-day to do a great deal. Only the best should be our aim. We should have in Cologne the best education, the best books, the best newspapers, the best music.'

The point that Adenauer came back to again and again —his whole position rested on it—was that the Germans were really starving spiritually, and that it was therefore of the utmost importance to give their minds and souls some food.

এ বই যখন আমি পড়ি তখনো আমরা স্বাধীনতা পাইনি।

সে দুর্দিনে কি কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল, দশ-বারো বৎসর যেতে না যেতেই তিনি কলন তথা সারা জর্মনিতে এমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শিল্পোন্নতি, আত্মচর্চা, ধর্মজীবনে নব জাগরণ এনে দেবেন, যে হিটলার তাঁর গৌরবের মধ্যগগনেও সুধমাত্র সাংসারিক দিক দিয়েও এতখানি উন্নতি করতে পারেননি ?

কেউ কল্পনা করতে পারবে না, এ তত্ত্বটা আডেনাওয়ার জানতেন বলেই স্পেনডারকে বিদায় দেবার বেলা তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, 'The imagination

has to be provided for.

কবিগুরুর কথা মনে পড়ে, স্বদেশী আন্দোলনের সময় ও পরবর্তী অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি বার বার বলেছেন, 'আত্মার দিকটা অবহেলা করো না।' অধিকাংশ রাজনৈতিকরা তখন মুচকি হেসে বলতেন, 'আগে তো ইংরেজকে খেদাই।'

ইংরেজ তো বহুকাল হল গেছে। তবে ?

আসলে আমাদের 'imagination,' চরিত্র, আত্মা দেউলে।

এর পরের ঘটনাবলী হালে কাগজে কাগজে বেরিয়েছে। সেগুলো সংক্ষেপে সারি।

যুদ্ধশেষের পরই মার্কিন সেনাপতি আডেনাওয়ারকে কলনের লর্ড মেয়ার করে দিল। কিছুদিনের মধ্যেই পূর্বের চুক্তি অনুযায়ী মার্কিনরা কলন ইংরেজের হাতে দিয়ে সরে পড়ল। যে-ইংরেজ সেনাপতির হাতে কলনের ভার পড়লো তিনি ছিলেন একটি আস্ত গণ্ডমূর্খ গাড়োল। আডেনাওয়ারকে নগর পুনর্নির্মাণ বাবদে এমন সব সর্বনেশে অবাস্তব জঙ্গীলাটী অর্ডার দিতে লাগলেন যে পরাজিত জর্মনির নগণ্য সরদার আডেনাওয়ার বিজয়মদে মত্ত 'প্রভুর' আদেশ পালন করতে কিছুতেই সম্মত হলেন না। এই নয়া হিটলার তখন তাঁকে স্রেফ ডিসমিস করে দিলেন। বিবেচনা করি সিপাহী বিদ্রোহের আমল হলে তাঁকে বাহাদুর শা'র মত বাকী জীবন জেলে কাটাতে হত!

অনেকের বিশ্বাস, সেই যে আডেনাওয়ার ইংরেজের উপর চটে গেলেন, তার পর তিনি জর্মনির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গড়তে লাগলেন মারকিন ফরাসীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে—ইংরেজিতে যাকে বলে 'কাট্ হিম্ ডেড,'—ইংরেজকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেলেন।

জর্মনির নব সংবিধান নির্মাণের জন্য যে বৈঠক বসল বছর তিন পরে ১৯৪৮ সালে, তিনি হলেন প্রেসিডেন্ট। ১৯৪৯-এ যে নবীন রাষ্ট্র নির্মিত হল তার প্রথম প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হলেন আডেনাওয়ার। কিন্তু তখন বিশ্ববাসীর মনে প্রশ্ন, জর্মনির জন্মবৈরী ফ্রান্স কি এ রাষ্ট্রকে স্বাধীন সার্বভৌম রাজারূপে স্বীকার করবে ?

আডেনাওয়ার আজীবন ফ্রান্সের প্রতি ভ্রাতৃভাব পোষণ করতেন। তিনি হাত এগিয়ে দিলেন ফ্রান্সের দিকে। যে-ফ্রান্স চিরকাল জর্মনিকে অবিশ্বাস করেছে সে পর্যন্ত বুঝে গেল যুগের পরিবর্তন হয়েছে। দম্ভী দ্য গল আলিঙ্গন করলেন বৃদ্ধ আডেনাওয়ারকে। ইংরেজ মর্মাহত হল। জর্মন ফরাসীকে বিভক্ত রেখে, অর্থ-সংগ্রহার্থে দু'দলকে লড়িয়ে দিয়ে, সে দাবড়াতো ইয়োরোপময়।

জর্মনি ইয়োরোপ আমেরিকার জাতিসমাজে আসন পেল।

যে জর্মন জনসাধারণকে বিশ্বজন নরাধম দানব বলে ধরে নিয়েছিল তারা ভদ্রজনরূপে স্বীকৃত হল।

পশ্চিম ইয়োরোপ তথা আমেরিকা যে-সব অর্থনৈতিক, সামরিক, রাজনৈতিক সন্ধিচুক্তি তৈরী করছিল তার সর্বোচ্চ স্তরের সব কটিতেই জর্মনি আসন পেল।

এবং আমরা—যারা—এ-দেশে বাস্তুহারা সমস্যা নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত—অবিশ্বাস্য বলে মনে করি যে আডেনাওয়ারের নেতৃত্বে পশ্চিম জর্মনি স্থান করে দিল তার আপন শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে, পূর্ব জর্মনি থেকে আগত এক কোটি বিশ লক্ষ্য বাস্তুহারাকে—তাদের জীবনমানে ও পশ্চিম জর্মনির জীবনমানে আজ আর এতটুকু পার্থক্য নেই, আমি স্বচক্ষে ১৯৫৮ এবং পুনরায় ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে দেখে এসেছি। কোনো লক্ষ্মীছাড়া দণ্ডকারণ্যে গিয়ে বাস্তুহারাদের বাস্তুভিটে-ঘুঘু-রূপ ধারণ করতে হয়নি।

এবং বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়, এই, আপাতদৃষ্টিতে নৈরাশ্যপূর্ণ গুরুভার আডেনাওয়ার এগিয়ে গিয়ে আপন স্কন্ধে তুলে নিলেন তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে, রাষ্ট্রজনকরূপে, তেয়াত্তর বৎসর বয়সে।

এ যুগকে সমসাময়িক জর্মন ইতিহাসে বলা হয়, 'আডেনাওয়ার এ্যারা'—'আডেনাওয়ার যুগ'।

এবং এ যুগের এখনো শেষ হয়নি। বিসমার্ককে বিতাড়িত করার পর কাইজার তাঁর রাজনীতি সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিলেন ; ৮৭ বছর বয়সে বৃদ্ধ (?) অবসর গ্রহণ করার পর যে দুজন চ্যান্সেলার পর পর নিযুক্ত হলেন তাঁরাও বৃদ্ধের কর্মাদর্শ কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছেন।[৬]

অবসর গ্রহণের পর তিনি বৃহৎ তিন খণ্ডে লেখেন তাঁর জীবনস্মৃতি। তৃতীয় খণ্ড প্রেসে পাঠানোর কয়েক সপ্তাহ পর তিনি গত হন।

মৃত্যুর আটদিন পূর্ব পর্যন্ত তাঁর কর্মক্ষমতা অটুট ছিল। বর্তমান প্রধান-মন্ত্রী কীজিংগার আডেনাওয়ারের শোকসভাতে বলেন, 'কয়েক দিন পূর্বেও র‍্যোনডর্‌ফ্‌ গ্রামে যান, "বৃদ্ধের" কাছ থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ করতে।'[৭] এই শেষ দর্শনের সময় তিনি কীজিংগারকে বিভক্ত জর্মনি সম্বন্ধে দুঃখপ্রকাশ করেন। শেষ কথা বলেন, 'আজ যে ধুলো আর কুয়াশাতে পৃথিবী ঢাকা সেটা যখন পরিষ্কার হবে তখন যেন কেউ না বলে, আমি আমার কর্তব্য করিনি।'

* * *

---

৬ জর্মনগণ বৃদ্ধ আডেনাওয়ারকে ভক্তি ও ভালবাসা সহ ডাকনাম দেয় 'ড্যার আলটে (ওল্‌ড ম্যান), তাঁর পরের চ্যানসেলারকে সহাস্যে ডাকনাম দেয়, 'ড্যার ডিকে' (ফ্যাট ম্যান)।

৭ আডেনাওয়ার গত হন ভারতীয় সময় অনুযায়ী বিকেল ৫.৫১ মিনিটে। যে জর্মন বেতার ভারতের জন্য প্রোগ্রাম দেয় সেটি আডেনাওয়ারের প্রিয় কলনেই অবস্থিত—সে ভারতের প্রোগ্রাম আরম্ভ করে বিকেল ৬.৫০ মিনিটে। আমি তখনই খবরটা শুনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এর পর, পর পর কয়েকদিন সন্ধ্যায় কালবৈশাখীর দরুন হয় বিজলি বন্ধ হয়ে যায় বলে, নয় রিসেপশন খারাপ ছিল বলে ল্যুবকে, গার্‌স্‌টেনমায়ার তথা চ্যানসেলার কীজিংগারের বক্তৃতা ভালো করে বোঝা যায়নি। ২৫ এপ্রিল গোরের দিনও আবহাওয়া খারাপ ছিল।

বিশ্বজন সম্পূর্ণ একমত যে ঃ—

১) আডেনাওয়ার পদদলিত জর্মনিকে লুপ্ত-আত্মসম্মানবোধ এনে দেন ও ইওরোমেরিকার রাষ্ট্রসমাজে তার জন্য গৌরবের আসন নির্মাণ করেন,

২) চিরবৈরী ফ্রান্সের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনা করেন,

৩) এক কোটি বিশ লক্ষ্য বাস্তুহারাকে পরিপূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেন।

তিনি মাত্র একটি আশা সফল করতে পারেননি ঃ—

দ্বিখণ্ডিত জর্মনিকে একত্র করতে পারেননি।

* * *

এস্থলে আমি শুধু দুইটি বিষয় উল্লেখ করবো ঃ—

হ্যার ভাইমার স্বর্গত আডেনাওয়ারের উত্তম জীবনী লিখেছেন। আর পাঁচখানা বিদেশী বইয়ের মত এটিও আমার পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব হয়নি—বিদেশী মুদ্রা ও বিদেশী পুস্তক-বিক্রেতাদের 'কৃপায়'।

জর্মন বেতার এই উৎকৃষ্ট পুস্তক থেকে একাধিক অনুচ্ছেদ পড়ে শোনায়।

তারই একটিতে আছে, আডেনাওয়ারের পুত্র উক্ত লেখককে বলেন, 'আমার পিতার মাথার উপর যখন সমস্ত জর্মনির দায়িত্ব তখন আমার মা গত হন। সঙ্গে সঙ্গে পিতা তাঁর দৈনন্দিন রুটিন আমূল পরিবর্তন করে দিলেন, যাতে করে আমরা আরো বেশি সময় ধরে তাঁর সঙ্গলাভ করতে পারি। এর পর থেকে সফরে গেলে আমাদের জন্য প্রতিটিবার সওগাৎ আনতে কখনো তাঁর ভুল হত না।'

আডেনাওয়ার আপন দেশকে বঞ্চিত করেননি, পরিবারের প্রিয়জনকেও বঞ্চিত করেননি।

যে উচ্চাকাংক্ষা স্বার্থপরতা তথা আত্মম্ভরিতার বিকৃত রূপ ধারণ করে, সে কখনোই কোনো প্রকারের ত্যাগ বরণ করতে পারে না, কিন্তু যে উচ্চাকাংক্ষার সঙ্গে আদর্শবাদ অঙ্গাঙ্গী বিজড়িত সেখানে প্রকৃত মহাপুরুষ সামান্য শিশুটির দাবীর মূল্যও দিতে জানেন। 'রাজকার্য', 'সমাজসেবা', 'রাষ্ট্রের আহ্বান'—এসব গালভরা কথার দোহাই দিয়ে যারা শিশু, বৃদ্ধ, আতুর-অকর্মণ্য জনকে অবহেলা করে তাদের আদর্শবাদ-এর অস্থিমজ্জা তাদের আপন স্বার্থপরতার উচ্চাকাংক্ষা দিয়ে গঠিত।

শিষ্যসমাবৃত হয়ে প্রভু যীশু ইহজীবনের উচ্চতম আদর্শ, পরজীবনের চরম কাম্য নিয়ে যখন আলোচনা করছেন, উপদেশ দিচ্ছেন, তখনো তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি যে শিশুরা তাঁর কাছে আসতে চায়। আদেশ দিলেন—'শিশুদের আসতে দাও আমার কাছে।'

শিষ্যেরা যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, "Who is the greatest in the Kingdom of heaven ?"

And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them.

* * *

হিটলারের আত্মহত্যার কাহিনী আমি অন্যত্র লিখেছি। তাঁর আত্মহত্যার পর কি হয়েছিল সেটা তার চেয়ে কিছুমাত্র কম বিস্ময়জনক বা কৌতূহলোদ্দীপক নয়, বিশেষত নরদানব মারটিন বরমান তার সঙ্গে বিজড়িত আছেন বলে। কিন্তু সে কাহিনী ভিন্ন এবং এখানেও আমি মাত্র সেইটুকুরই সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করবো যেটুকু আডেনাওয়ারের ব্যক্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করার জন্য নিতান্তই প্রয়োজন।

হিটলার যে সময়ে আত্মহত্যা করেন (বেলা ১৫'৩০।৪৫, ৩০শে এপ্রিল ১৯৪৫), সে সময়ে রুশবাহিনী মাত্র কয়েকশ' গজ দূরে তাঁর বাসভবনের চতুর্দিকে ব্যূহ নির্মাণ করেছে। এ ব্যূহ ভেদ করে মারকিন অধিকৃত অঞ্চলে পেঁছিবার চেষ্টা করেন তাঁর নিতান্ত অন্তরঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গ এবং কর্মচারীবৃন্দ যাঁরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেননি। এঁদের ভিতর ছিলেন সেক্রেটারি বরমান, দুই মহিলা স্টেনো, পাচিকা, খাসচাকর লিঙে, দেহরক্ষী-দল, সার্সন, শোফার ইত্যাদি ইত্যাদি। এঁদের অন্যতম হিটলারের খাস পাইলট বাওর—সৈনবাহিনীতে তাঁর র‍্যাঙ্ক ছিল জেনারেলের। ইনি পালাবার সময় শুধু যে ধরা পড়েন তাই নয়, মেশিনগানের গুলিতে একখানা পা এমনই জখম হয় যে পরে সেটা কেটে ফেলতে হয়।

দীর্ঘ দশটি বৎসর রাশার খ্যাত কুখ্যাত বহু প্রকারের জেল, সেল, বন্দী-শিবিরে অবর্ণনীয় কষ্টযন্ত্রণা ভোগ করার পর ইনি মুক্তি পান। পূর্বেই বলেছি দেশে ফিরে একখানা বই লেখেন যার নাম, "হিটলার'জ পাইলট"। পূর্ণ দশটি বৎসর বাওর এবং অন্যান্য জর্মন বন্দীরা কী নিদারুণ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরতে সক্ষম হন তার বর্ণনা দেবার মত কল্পনাশক্তি, স্পর্শকাতরতা, কলমের জোর আমার কিছুই নেই। যে নিপীড়নে মানুষ হাঙারস্ট্রাইক করে, ছুটে গিয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকে আত্মহত্যার চেষ্টা দেয় তার বর্ণনা দিয়েছেন বাওর। আমার কাছে যেটা নিদারুণতম বলে মনে হয় সেটা —পরিপূর্ণ নৈরাশ্যের তমিস্র অন্তহীন রজনী—'এ বন্দীদশা থেকে ইহজন্মে আমার মুক্তি নেই'।

এবং আমার মনে হয়, তার চেয়েও 'কষ্টের বিকৃত ভান ত্রাসের বিকট ভঙ্গি' যদি কিছু থাকে তবে সেটা ঐ 'অন্ধকারের ছলনার ভূমিকা'! কি সে ছলনা? মাঝে মাঝে খবর গুজোব রটে বন্দীদের হয়তো বা মুক্তি দেওয়া হবে। আলেয়ার আলো দপ করে জ্বলে ওঠে ক্ষণতরে—আবার আবার সেই সুদীর্ঘ নিরন্ধ্র অমানিশা।

জর্মনিতে চিরকালই দুটি দল। একদল পূর্বপন্থী—রাশার সঙ্গে মৈত্রী কামনা করে। আডেনাওয়ার পশ্চিমপন্থী, রুশবৈরী। বিশেষত যে রুশ হাজার হাজার যুদ্ধবন্দী জর্মনদের দশ বৎসর পরেও কিছুতেই মুক্তি দেবে না।

রুশ 'ঘোড়া-বিক্‌কিরী'র ব্যবসা করতে চায়। যুদ্ধবন্দী বাওর ইত্যাদি 'ঘোড়া'র বদলে সে চায় আডেনাওয়ার কর্তৃক রুশকে রাষ্ট্রহিসাবে স্বীকৃতিদান,

এবং পূর্ব জর্মানিকেও সে পশ্চিম জর্মানির সঙ্গে সম্মিলিত হ'তে দেবে না। হয়তো এটা অন্যায় নয়। হিটলার রুশ দেশে যা করে গেছেন তার বদলে এ তো সামান্যই। কিন্তু আডেনাওয়ার তো আর হিটলারের প্রিয়পুত্র যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস রূপে পিতার সিংহাসনে বসেননি যে হিটলারের সর্ব অপকর্মের জন্য তার 'মূল্য' দেবেন। বরং হিটলার তাঁকে করেছিলেন লাঞ্ছিত, অপমানিত কারারুদ্ধ।

এবং তার চেয়েও বক্র পরিহাস—যে নাৎসি পারটির মারফৎ তিনি আডেনাওয়ারকে কারারুদ্ধ করেছিলেন সেই পারটিরই বহু গণ্যমান্য সদস্য, জাঁদরেল, অ্যাডমিরাল, হিটলারের আপন বয়স্যসখা রয়েছেন এই যুদ্ধবন্দীদের ভিতর। আডেনাওয়ারকে নতিস্বীকার করতে হবে এদেরও মুক্তির জন্য! এবারে শুনুন বাওর কি বলছেন: "But the-then the much-abused (অর্থাৎ নাৎসি কর্তৃক অপমানিত—লেখক) Adenauer came to Moscow, and our camp was wild with rumours. Our hopes rooketed from zero to feverpoint—and then fell back again This Latter was when Bulganin publicly proclaimed that we were the scum of the earth, and that our crimes had robbed us of all human semblance We cautiously but closely followed the course of Adenauer's hard-fought negotiations, and we could sense that even the Russians respected the determination and integrity of the old man," ('বৃদ্ধ' সাদরে বলা হল—লেখক)

সৃষ্টিকর্তার লীলা বোঝে কে? একদিন সত্য সত্যই খবর এল বাওরাদি অনেকেই মুক্তিলাভ করবেন। একদল বন্দী যাবেন মস্কো থেকে পশ্চিম জর্মানির মুনিক—যেখানে বাওরের মা-বউ আছেন। এ মুক্তি-যাত্রার বর্ণনা দিতে গিয়ে বাওর বলছেন, 'the memory of that journey is like a film that keeps breaking off.' প্রতিটি জর্মান গ্রামের ভিতর দিয়ে ট্রেন যাবার সময় উল্লাসে উত্তেজিত জনতা ছুটে আসছে ট্রেনের দিকে, বাচ্চাদের হাতে রঙিন ফানুসের জ্বলন্ত মোমবাতি, গির্জায় গির্জায় চলেছে অবিরত হর্ষোল্লাসের ঘণ্টাধ্বনি। নার্সরা ছুটে আসছে খাবার নিয়ে—

থাক্। আমার কলম অতি সাধারণ; এসবের সার্থক বর্ণনা দিতে পারেন যাঁদের লেখনী অসাধারণ, কিংবা বাওরের মত লোক যাঁরা লেখক নন কিন্তু অভিজ্ঞতাটা আছে।

এবং এর করুণ দিকটা বাওর চেপে গেছেন। যেসব পিতা মাতা জায়া এসেছিল আপন আপন আত্মজনের প্রত্যাশায়—যদিও তাদের বলা হয়েছে যে, সেসব আত্মজনের অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত, কিংবা মিসিং, কিংবা মুক্তি পাবে কিনা স্থির নেই—এবং যারা ফিরেছে তাদের নাম উচ্চকণ্ঠে পড়া শেষ হয়ে গেলে যখন বুঝলো তাদের আত্মজন ফেরেনি, তখন—।

* * *

আডেনাওয়ারের কীর্তিকলাপ একদিন হয়তো বিশ্বজন ভুলে যাবে, কিন্তু বহু বহু জর্মন পরিবার কি বংশপরম্পরা স্মরণে আনবে না—কে তাদের পিতা, পিতামহ, বা প্রপিতামহকে একদা ফিরিয়ে এনেছিল তার বিস্মৃতপ্রায় সুখনীড়ে, দারাপুত্র পিতামাতার মাঝখানে ? যার অবশ্যম্ভাবী গোর ছিল সুদূর সাইবেরিয়ার অন্তহীন তুষারাস্তরণের নিম্নে, সে কার দৈববলে হঠাৎ একদিন ফিরে এসে মুছে দিল জননীজায়ার আঁখিবারি !

জুন, ১৯৬৭ ॥

বিদ্রোহী

ইংরেজ কবি পার্সি বিশ্ শেলির মধ্য-শব্দটি আমরা উচ্চারণ করতুম বিশী, কারণ অন্তে রয়েছে 'ঈ' অক্ষরটি এবং তাই আমরা বাল্যবয়সে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে ইংরেজ কবি শেলির সাদৃশ্য দেখতে পেতুম। তিনি মোলায়েম প্রেমের কবিতা লিখতেন, কিন্তু ওদিকে তিনি আবার ছিলেন মাহমুদ বাদশার মত প্রতিমা-বিনাশধর্মী—এ সংসারে যত প্রকারের false idols, false ideals, অন্ধবিশ্বাস, ভক্তিভরে কুমড়ো গড়াগড়ি, যা-কিছু বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করে না—তার বিরুদ্ধে ছিল বিশীদার জিহাদ। তাই তিনি কবিতাগুলিকে পরাতেন প্রাচীন আসামের ছদ্মবেশ। নজরুল ইসলাম তখন সবে ধূমকেতুর মত আত্মপ্রকাশ করেছেন। বিদ্রোহী কাজীকবি পরশুরাম হলে (ক্ষত্রিয়, ফিরিঙ্গি বিনাশার্থে তাঁর অবতরণ) প্রমথনাথ তাঁরই অনবিচ্ছিন্ন পূর্ববর্তী বামনাবতার। তাই তিনি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই হয়ে যান বারনারড শ'র প্রতি আসক্ত। এখানে আরো একটি সাদৃশ্য পাঠক পাবেন। বারনারড শ' ছিলেন প্রতিমা-বিনাশী। তাঁর আদর্শ চরিত্র, সেই ব্ল্যাক গার্ল ওলড টেসটামেনটের দেবতাগুলোকে তার ডাণ্ডা দিয়ে ক্রমাগত ভেঙে যাচ্ছে আর খুঁজে বেড়াচ্ছে শাশ্বত ভগবানকে।

প্রমথনাথ তাঁর ডাণ্ডা—নবুকেরি নিয়ে আক্রমণ করতেন—প্রধানত বাঙালীর জড়ত্বকে। শান্তিনিকেতন আশ্রমও রেহাই পেত না।

এটা এল কোথা থেকে !

আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের চতুর্দিকে যে-সব অন্ধস্তাবক সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথকে প্রায় কর্তাভজাদের গুরুর আসনে বসাতে চাইতেন তার বিরুদ্ধে ছিল কিশোর প্রমথর ঘোরতর 'উষ্মা'। এদেরও ছাড়িয়ে যেতেন বাইরের থেকে—প্রধানত কলকাতা থেকে—আসতেন যে-সব স্তাবক সম্প্রদায়। এঁদের কেউ কেউ বিলিতি ডিগ্রীধারী, জামাকাপড় চোস্তদুরুস্ত—কাঁধে ক্যামেরা ঝোলানো।

এদেরই মুখ দিয়ে ডি এল রায় বলিয়েছিলেন, কবিগুরুর উদ্দেশে :

'মর্তভূমে অবতীর্ণ কুইলের কলম হস্তে
কে তুমি হে মহাপ্রভু নমস্তে নমস্তে !'

কিন্তু এর পর-পরই রায় করলেন ভুল ; রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে বলালেন ঝুট কথা :

'আমি একটা উচ্চ কবি, এমনিধারা উচ্চ,
শেলি ভিক্টোর য়ুগো মাইকেল আমার কাছে তুচ্ছ!'

এরকম ধারণা রবীন্দ্রনাথ তো পোষণই করতেন না—বলা দূরে থাক্। তিনি ছিলেন শেলির ভক্ত। বস্তুত তিনি বার বার আমাদের পড়িয়েছেন শেলির কবিতা। আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথই বিশীদাকে শেলির প্রতি অনুরক্ত হবার পথ দেখিয়ে দেন।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথ এই অন্ধস্তাবকদের নিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। এবং তাঁর ধৈর্যচ্যুতি যখন ঘটলো তখন দুর্ভাগ্যক্রমে একাধিক সত্য গুণগ্রাহীকেও তাঁর কাছ থেকে অযথা কটুবাক্য শুনতে হল। ইরাণী কবি তাই বলেছেন ঃ

দাবানল যবে দগ্ধদাহনে বনস্পতিরে ধরে
শুষ্কপত্রে, আর্দ্রপত্রে তফাৎ কিছু না করে।

পাঠকের স্মরণে আসতে পারে রবীন্দ্রনাথের অপ্রিয় সত্যভাষণ—যখন তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়া উপলক্ষ্যে কলকাতা থেকে বহুলোক শান্তিনিকেতনে এসে তাঁকে অভিনন্দন জানান। আমার যতদূর জানা, বালক প্রমথনাথ সে-সভায় উপস্থিত ছিলেন।

কিন্তু এহ বাহ্য। অন্ধস্তাবকদের চিনতে আমাদের বেশী সময় লাগেনি। কারণ এদের কেউ কেউ—বিশেষত বিলেতফের্তারা, শ'র ভাষায় উয়েল শেভ্‌ড্ এ্যান্ড উয়েল সোপ্‌ড্, আসতেন আমাদের মত ডর্মিটারিবাসী নিরীহদের উপর ফপরদালালী করতে। তখন অনেক ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে যেত, শব্দসমন্বয় দ্বারা যে আলিম্পন সৃষ্ট হয়ে লিরিক উচ্ছ্বসিত হয় সে রসে তাঁরা বঞ্চিত, রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুর এবং কথা কি রকম অদ্ভুত অদ্ভুত এক্সপেরিমেন্টের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে অভূতপূর্ব সমন্বয়জনিত রসসৃষ্টি করেছে সে বিষয়ে পরিপূর্ণ জড়ভরত। এঁদের কেউ কেউ ছিলেন আবার পয়লা-নম্বরী ব্লাফমাস্টার। তিনি যে অন্ধস্তাবক নন সেইটে বোঝাবার জন্য একজন আমাকে বলেন, "পুব হাওয়াতে দেয় দোলা, মরি মরি—এই 'মরি মরি'টা কেমন যেন বস্তা-পচা বলে মনে হয় না।" আমি বিস্ময়ে নির্বাক। অতি মহৎ কবিই যে হ্যাকনিড ক্লিশের নূতন ব্যবহার করে নবীন রস সৃষ্টি করেন এ তত্ত্বটা ফিরিঙ্গি-মার্কা গ্র্যাডুয়েট জানে না? আমার তো মনে হত, এস্থলে 'মরি মরি' ভিন্ন অন্য কিছুই মানাতো না।

কিন্তু বিশীদা ছিলেন কালাপাহাড়। আশ্রমের সে সময়কার ভাষায় এদের হুট্ করে দিতে তাঁকে অতিমাত্রায় বেগ পেতে হত না। তাঁকে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হত আশ্রমের ভিতরকার অন্ধস্তাবকদের নিয়ে। বিশেষ করে বিচার-সভায় অর্থাৎ আশ্রম পরিচালনার ব্যাপার নিয়ে।

শান্তিনিকেতনের বয়স তখন কত? একুশ-বাইশের মত। এত অল্প সময়ের মধ্যে কোনো ট্র্যাডিশন, ঐতিহ্য, আচার নির্মিত হতে পারে না। বিশেষত গুরু রবীন্দ্রনাথই করে যাচ্ছেন নানা প্রকারের এক্সপেরিমেন্ট। একবার ভেবে দেখলেই হয়, আশ্রম প্রবর্তনের সময় ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণে একই পংক্তিতে ভোজন করতো না, কিছুদিন পরে একজন কায়স্থ শিক্ষক আসছেন শুনে কর্তৃপক্ষ সন্ত্রস্ত, ব্রাহ্মণ

শিষ্য এই অব্রাহ্মণ গুরুর পদধূলি প্রতি প্রাতে নেবে কিনা! তারই পনেরো বৎসর পর আমি যখন পেঁছিলুম তখন সে-সব সমস্যা অন্তর্ধান করেছে। ইতি-মধ্যে মৌলানা শওকৎ আলী সাধারণ ভোজনালয়ে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ ব্রাত্য সকলের সঙ্গে একই পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করে গেছেন।

তবু হিন্দু মন সর্বক্ষণ খুঁত খুঁত করে আচারের সন্ধানে। সে চায়, সর্ব সমস্যার সামনে সে যেন নজীর দেখাতে পারে, 'এটা পূর্বে এ রকম পদ্ধতিতে হয়েছে, অতএব এবারেও সেই রকম হওয়া উচিত—এটা এ রকম হয়নি, অতএব এবারে হবে না'; তাতে করে নবাগত ছাত্রের অসুবিধা হোক আর না-ই হোক। মুসলমান যে এ বাবদে দুর্দান্ত প্রগতিশীল তা নয়, সেও ইনোভেশনকে ডরায় এবং তাকে বলে 'বিদা 'ৎ', কিন্তু ইসলাম মাত্র ১৩০০ বছর পুরনো বলে অতখানি লোকাচার দেশাচারের দোহাই দেয় না।

প্রমথনাথ বিশী ছিলেন এই ট্র্যাডিশন নামক প্রতিষ্ঠানটির দুশমন। বিচার সভা তথা অন্যান্য স্থলে তিনি প্রিসীডেনসের দোহাই শুনতে চাইতেন না। তাঁর বক্তব্য—এবং সেটা সব সময়ই উত্তেজিত কণ্ঠে, পঞ্চমে, তদুপরি তাঁর কণ্ঠ-স্বরটি ঠিক আব্দুল করীম খানের মত নয়—শুনে আমার মনে হত, তাঁর নীতি; —নূতন সমস্যা যখন এসেছে তখন তার নূতন সমাধান খুঁজতে হবে—এবং যুক্তিবুদ্ধি প্রয়োগ করে—পূর্বে হয়নি, তাই এখন হবে না. এটা কোনো কাজের কথা নয়। অবশ্য তিনি যে সব সময় 'রেশনালিটি এবাভ্‌ অল' সচেতন ভাবে ভলতেরের মত নীতিরূপে গ্রহণ করতেন তা নাও হতে পারে।...এমন কি গুরু রবীন্দ্রনাথের মতের বিরোধিতাও তিনি করেছেন। এই নিয়ে বোধ হয় গুরু-শিষ্যে মনোমালিন্যও হয়েছে। তবে নিশ্চয় চিরস্থায়ী তো নয়ই, দীর্ঘস্থায়ীও নয়।

প্রমথনাথ জাত সাহিত্যিক। শান্তিনিকেতনে যখন ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কলেজ স্থাপিত হল—সাধারণ জন একেই বিশ্বভারতী বলে, যেন গোড়ার ইস্কুলটি বিশ্বভারতীর সোপান নয়—তখন রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ জানালেন বিশ্বাচার্যদের। তাঁরা এসে পুণোদ্যমে আরম্ভ করলেন, প্রধানত প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা (এবং সর্বপ্রধানত ইংলজি)—চীনা, তিব্বতী ভাষাও বাদ গেল না, এবং লাতিন, ফরাসী, জর্মন ইত্যাদি ইউরোপীয় ভাষা চর্চা। সবাই সেই দয়ে মজলেন। বাঘা বাঘা পণ্ডিত যেমন বিধু শাস্ত্রী, ক্ষিতি শাস্ত্রী, সাহিত্যিক অমিয় চক্র, এস্তেক ক্ষিতিমোহনের সহধর্মিণী 'ঠানদি'—কেউ ফরাসী, কেউ জর্মন, কেউ চীনা, কেউ বা তিব্বতী শিখছেন মাথায় গামছা বেঁধে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নোটবই হাতে নিয়ে লেভির ক্লাসে শিখছেন একাক্ষরপারমিতার ঠিকুজি আর অহিবুধনিয় সংহিতার কুলজি।

শুধু শ্রীপ্রমথ নিশ্চল নির্বিকার। তিনি বেঙ্গলি লিতেরাতোর পার একসে-লাঁস (litterateur par excellence) বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক। তাঁর 'কোন প্রয়োজন, রজত কাঞ্চন'? এমন কি সংস্কৃত ব্যাকরণ ঘাঁটতেও তিনি নারাজ। হরিবাবু ইস্কুলে যেটুকু শিখিয়ে দিয়েছেন তারই প্রসাদাৎ তিনি কালিদাস শুদ্রক পড়ে নেবেন'খন। শুনেছি লক্ষ্ণৌয়ের খানদানী ঘরের ছেলেকে

উর্দু ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা বলতে দেওয়া হয় না—পাছে বিজাতীয় ভাষা বলতে গিয়ে উর্দুর তরে বিধিনির্মিত তার মুখের ডোল অন্য ধ্বনির খাতিরে এডজাসটেড হয়ে বিকৃত হয়ে যায় !

বিশ্বভারতীর উত্তর-বিভাগকে (কলেজকে) এহেন নিরঙ্কুশ বয়কট করার পিছনে বিশীদার হৃৎ-কন্দরে সেই 'বিদ্রোহ' ভাব ছিল কিনা হলফ করে বলতে পারবো না।

কিন্তু বি. এ এম. এ. তো পাস করতে হয় ; নইলে গ্রাসাচ্ছাদন হবে কি প্রকারে ?

অতিশয় অনিচ্ছায় তিনি কলকাতার কলেজে ঢুকলেন। তাঁর কলেজ-জীবন সম্বন্ধে আমি বিন্দুবিসর্গ পর্যন্ত জানি নে। এই মর্মান্তিক অধ্যায় তিনি বোধ হয় তাঁর জীবন-পুঁথি থেকে ছিঁড়ে ফেলেছেন। তবে আমি নিঃসন্দেহ, প্রক্সি-প্রতিষ্ঠান-প্রসাদাৎ তিনি তাঁর কলেজ-জীবনের ন'সিকে কাটিয়েছেন চায়ের দোকানে, মেসের রকে এবং ইহলোক পরলোকের সর্ববিশ্ববিদ্যালয়কে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ্য অভিসম্পাত অনবরত দিতে দিতে। এবং আমি তার চেয়েও নিঃসন্দেহ, এম. এ পাস করার পর তিনি বঙ্গভাষাসাহিত্য ও তজ্জড়িত তত্ত্ব ও তথ্য ব্যতিরেকে বিশ্ববিদ্যালয়ার্জিত—সাতিশয় বিতৃষ্ণা ও চরম জুগুপ্সাসহ অর্জিত—'জ্ঞানগম্যি' শেষনাগের মত, প্রাগুক্ত অহিবুধনিয় সংহিতায় অহির বাৎসরিক ত্বকবর্জনন্যায় অক্লেশে পরম পরিতোষ সহকারে ত্যাগ করেছেন—চিরকালের তরে। লোকে যখন শুধোয়, কালচার কি—উত্তরে গুণীজন বলেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়লব্ধ 'জ্ঞানগম্যি' বিস্মৃত হওয়ার পর যেটুকু অবশিষ্ট থাকে সেই কালচার। কিন্তু, প্রমথনাথের কালচার অত্যন্ত কনসানট্রেটেড—নির্যাসেরও নির্যাস। মাত্র একবার, তাও অযত্নে ডেসটিল করা গোড়ী (rum) বা মধ্বী (mead, meth) খেয়েই মানুষ হয় গড়াগড়ি দেয় নয় ল্যাম্পপোস্ট ধরে চুমো খায়—যেন লঙ লস্ট ব্রাদার। রাজা জহানগির খেতেন 'ডবল ডেসটিলড্ এরেক'। প্রমথনাথের ব্রুয়ারিতে পাক বড় কড়া—শতগুণে কড়া।

কিন্তু সেই বিদ্রোহীর কি হয় ?

শ'র 'কৃষ্ণা'ও একদিন হৃদয়ঙ্গম করলো, 'এলোপাতাড়ি লাঠির বাড়ি ধুপুস-ধাপুস মারাতে' কোনো তত্ত্ব নেই। নিছক 'বর্বরস্য শক্তিক্ষয়'। প্রমথ তাই প্রমথেশের মত ধ্যানতাণ্ডবে সম্মেলন করেছেন।

কিন্তু বিদ্রোহী থাকবেই।

কেন ?

প্রমথর প্রিয় কবি শেলি। তাঁর প্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ নায়ক প্রমিথিয়ুস আনবাউন্ড। তিনি দেবাদিদেব দ্যোঃ পিতর, জুপিটারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বর্গলোক হতে অগ্নি নিয়ে এসে মানবসন্তানকে উপহার দেন—যার জন্য তাবৎ সভ্যতাসংস্কৃতির সৃষ্টি। প্রমথগণ ধূর্জটির অনুচর বা 'ইয়েস-মেন' বটেন কিন্তু প্রমথগণ অগ্নিবাহ রূপেও পরিচিত—এঁরা মরীচির পুত্র ও সপ্ত পিতৃগণের প্রমথ। তাই প্রমথ অগ্নির পুত্র। অপরঞ্চ গ্রীক পুরাণে আছে প্রমিথিয়ুস

নলের (reed,—এবং স্যাকরারা এখনও নল ব্যবহার করে, তথা অগ্ন্যস্ত্র অর্থে নালাস্ত্র, নালিকও ব্যবহৃত হয়) মাধ্যমে পৃথিবীতে অগ্নি আনয়ন করেন। এবং আমাদের কাহিনীতে আছে, নলরাজ ইন্ধন প্রজ্বালনে সুচতুর ছিলেন।[১] এবং এই নলের বিরুদ্ধে দেবতারা যে-রকম লেগেছিলেন (প্রমিথিয়ুসের বিরুদ্ধে জুপিটার) অন্য কারো বিরুদ্ধে না ; আমার পুরাণাদির জ্ঞান অতিশয় সীমাবদ্ধ, তাই শপথ দিতে পারছি না, অন্য কোনো মানবীর স্বয়ংবরে স্বয়ং দেবতারা সপত্নরূপে অবতরণ করেছিলেন কিনা—দময়ন্তীর বেলা যে রকম করেছিলেন। এবং নলের অন্য নাম প্রমন্থ।[২]

প্রাচীন গ্রীকেরা প্রমিথিউস শব্দের অর্থ করতেন ঃ পূর্বে (প্র)+মতি, চিন্তাকারী (methe), কিন্তু অধ্যাপককুল প্রমিথিয়ুস নিয়েছেন সংস্কৃত 'প্রমন্থ' =অরণি বা সমিধ অর্থে ; যে দণ্ড মন্থন, ঘর্ষণ করে অগ্নি জ্বালানো হয়। দ্বিতীয়টিই শুদ্ধ। কারণ—metheus থেকে মথ, মন্থ। নইলে th=থ-এর অর্থ হয় না।

প্রমিথিয়ুস, নল—প্রমথ কখনো বিদ্রোহ করেন, কখনো বশ্যতা স্বীকার করেন। আমাদের প্রমথ শেষ পর্যন্ত কি করেন তার জন্য অত্যধিক অসহিষ্ণু না হয়ে বলি।

শতং জীব, সহস্রং জীব।

প্রোটকল

শ্রীল শ্রীযুক্ত জলসা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

মহাত্মন,

স্বভাবতই সর্বপ্রথম প্রশ্ন উঠবে, উপরিস্থ পদ্ধতিতে আপনাকে সম্বোধন করবার হক্ক আমার আছে কিনা ? অর্থাৎ এটিকেটে বাধে কিনা ? আরো সরল আন্তর্জাতিক পরিভাষা ব্যবহার করতে হলে বলবো, আমার এ আচরণ 'প্রোটকল'-সম্মত কিনা।

ভয় নেই। আমি শব্দতত্ত্ব নিয়ে অযথা মাথা ফাটাফাটি করবো না। সামান্যতম যেটুকু নিতান্তই না হলে চলে না তারই দিকে আপনার তথা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। ভোজনারম্ভে তিক্তবস্তুর ন্যায় যৎসামান্য।

কোনো কোনো শব্দের পরিধি পরিব্যাপ্তি দিন দিন বেড়ে যায়—কোনোটার আবার কমে। এই ধরুন না, 'কনটাক্ট' শব্দটি। একদা বোঝাত নিতান্ত

---

১ 'তিনি (নল) এক মুষ্টি তৃণ গ্রহণপূর্বক সূর্যদেবকে ধ্যান করিবামাত্র ঐ তৃণে সহসা হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।' দময়ন্তী সকাশে সৈরিন্ধ্রী কেশিনীর প্রতিবেদন। বনপর্ব।

২ এ তত্ত্বটি আমার গুরু আমাকে বলেন, কিন্তু আমি এটি কোথাও পাইনি। কেউ জানাতে পারলে বাধিত হব।

স্থূল ভাবে শারীরিক সংস্পর্শে আসা।

সে আমলে যদি কেউ লিখত 'উপমন্ত্রী সুশীলাবালা দাসী গত রাত্রে শ্রীযুক্ত নটবর নায়ককে কনটাক্ট্ করেছেন' তবে সেটা প্রায় অশ্লীলতার পর্যায়ে পড়ে যেত। আজ স্বচ্ছন্দে বলি, 'প্রাচীর নব্যন্যায় অধুনা প্রতীচীর এপিস্টমলজির কন্টাক্টে আসাতে উভয়ই উপকৃত হয়েছেন।' অবশ্য তার অর্থ কি, আল্লায় মালুম।

প্রোটকল শব্দটির বেলাও তাই হয়েছে। একদা গ্রীক ভাষাতে বোঝাতো;—যেমন ধরুন, আপনার একখানা টাইম-টেবিল আছে। হঠাৎ ইশ্টিশানে পেয়ে গেলেন, হ্যান্ড-বিল-পারা একখানা নোটিশ। তাতে ট্রেনের সময় পরিবর্তনের নবীন ফিরিস্তি রয়েছে। আপনি সেটি আপনার টাইম-টেবিলের যথাস্থলে গঁদ দিয়ে সেঁটে দিলেন। তখন এ কাগজের টুকরোটি পেয়ে গেলেন পৈতে। হয়ে গেলেন প্রোটকল। গেরেমভারী নাম। এ-পাড়ার মেধো হয়ে গেলেন ভিন্-পাড়ার মধুসূদন।

সরকারি না-হক ট্যাকশো যে রকম বাড়তে বাড়তে পর্বতপ্রমাণ হয়ে যায় এ শব্দটিও আড়াই হাজার বছর ধরে বাড়তে বাড়তে তার 'তনু'টিকে অদ্যকার 'বপু' করে তুলেছে। বেশ এক যুগ পূর্বে এটিকেটের মহানগরী প্যারিসে পররাষ্ট্র বিভাগ বা ফরেন আপিসে একটি ভিন্ন বিভাগ খোলা হয়েছে; তার নাম 'প্রোটকল বিভাগ'। একটা পুরো পাক্কা আস্ত ডিপারট্মেন্ট্।

রাজ্যচালনার কোন্ গুরুভার এঁদের স্কন্ধে সমর্পিত হয়েছে?

বহুবিধ। এমন কি আমার মত লোক না পারলেও আপনি এদের সাহায্য তলব করতে পারেন। অবশ্য কলকাতাতে এরকম পুরো-পাক্কা প্রোটকল বিভাগ আছে কিনা, আমি সঠিক জানি নে। ধরুন আছে। আরো ধরুন, আপনি, সম্পাদক মশাই, কোনো পারটিতে নর্থ পোলের কনসাল জেনরেলের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। কথায় কথায় বেরিয়ে গেল তিনি ভারতীয় ফিলমে বড়ই ইনটেরসটেড। পরিচয় নিবিড়তর হল। ইতিমধ্যে তিনি আপনাকে একটি খাসা ডিনারও খাইয়ে দিয়েছেন। সেটি রিটারন্ করতে হয়। কনসাল্ বিপত্নীক। একটি অবিবাহিত মেয়ের বয়স একুশ—অর্থাৎ 'সোসাইটি করা'র বয়স হয়েছে। অন্য মেয়েটি পল্টনের কেপটেনকে বিয়ে করেছেন। তিনি একা এসেছেন কলকাতায়, বাপের কর্মস্থলে। ওদিকে আপনি সাউথ পোলের কনসুলেট জেনরেল শার্জে দাফেরকেও ঐ দিনই নিমন্ত্রণ করেছেন। তাঁর ভামিনী ও এক কন্যাও সঙ্গে আসছেন। কন্যাটির স্বামী ছিলেন। তিনি স্বামীর কাছ থেকে সেপারেশন নিয়ে পিতার সঙ্গে বাস করেন। ডিনারে আরো ইনি উনি তিনি আসবেন।

এইবারে আমরা আসছি—ইংরিজিতে যাকে বলে—থিক্ অব্ দ্য বেট্ল-এ। অর্থাৎ মূল সমস্যায়। আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন প্রিসীডেনস বস্তুটি সাংঘাতিক। আপনার ড্রইংরুমে ককটেলাদি পান করার শেষের দিকে যখন বাটলার এসে আপনার স্ত্রীর সামনে বাও করবে তখন তিনি মুচকি হাসবেন

প্রধান অতিথির দিকে। সেই মসিয়ো ল্য কন্‌স্যুল জেনরেল যেন পবনে ভর করে আপনার স্ত্রীকে এসে দান করবেন তার দক্ষিণ বাহু। তারই উপর 'নির্ভর' করে দুজনাতে এগোবেন খানা-কামরার দিকে। এরপর যাবেন আপনি। কিন্তু দক্ষিণ বাহু দান করবেন কাকে? সাউথ পোলের শার্জে দাফেরের স্ত্রীকে, না নর্থ পোলের অবিবাহিতা কন্যাকে, না কেপটেনের স্ত্রীকে, না কর্নেলের তালাক-প্রাপ্ত মহিলাকে? ··এবং তারপর আসবেন কোন্ জোড়া, তারপর, ইত্যাদি।

তাই আপনি সুবুদ্ধিমানের মত পূর্বাহ্নেই ফোন করেছেন, শ্যাফ্ দ্য প্রোট-কলকে—অর্থাৎ প্রোটকলের বড় কর্তাকে। অতি অমায়িক লোক। তদুপরি আপনি সম্মানিত কাগজের তারই মত শ্যাফ্, বড় কর্তা। কে কতখানি সম্মান পাবেন, তাদের দফতর ফিষ্টি দিলে আপনার প্রিসীডেনস কি—অর্থাৎ কার আগে কার পরে আপনি খানা-কামরায় ঢুকবেন—তার প্রোটকলে আপনার নাম উঁচুর দিকে। অতএব একগাল হেসে বলবেন,—'সে কি মসিয়ো—(ভুললে চলবে না, আন্তর্জাতিক প্রোটকলের ভাষা এখনো ফরাসিস্!)—আপনি অত-খানি আঁবায়াসে (এমবারাস্‌ট্) হচ্ছেন কেন? এ যে একেবারে ডিমের খোসায় কালবোশেখী। আপনি তো আর অফিশিয়াট ডিপ্লোমেটিক ডিনার দিচ্ছেন না। কি বললেন? না, না, না—পারদোঁ, আমি আপনার ব্যান-কুয়েটটাকে মোটেই হেনস্তা করছি নে। তবু বলছি, ওটা তো—'

ঐ আনন্দেই থাকুন, সম্পাদক মশাই, ওঁকে বিশ্বাস করেছেন কি মরেছেন।

যতই 'ঘরোয়া' 'বাড়ির ব্যাপার' 'ফেমিলি ওয়ে' বলে নেমন্তন্ন করুন না কেন, —এবারে খাঁটি দিশী তুলনা দিচ্ছি—সেখানে যদি মাছের মুড়োটা আপনার দিদির শ্বশুরকে না দিয়ে দেওয়া হয় আপনার ভাগ্নের শ্যালাকে, তদুপরি উনি কুলীনস্য কুলীন, আর কালো ছোকরা মৌলিকস্য মৌলিক, তা হলে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে? আমি বলছি না, শ্বশুরমশাই বাড়ি ফিরে এ্যাট হিজ আরলিএস্ট কনভিনিয়েন্‌স্ আপনার দিদির পিঠে—ছি, ছি, তিনি আবার বৌমা —দু ঘা, না না, তা বলছি নে।

প্রোটকলের শ্যাফ্ সবিশেষ অবগত আছেন যে আপনি তার স্তোকবাক্য সিরিয়সলি নেননি। তিনিই বলবেন।

'সে তো হল। কিন্তু ঐ যে বললেন সাউথ পোলের ডিভোর্স কন্যা—স্বামী ছিলেন কর্নেল—তিনি এখন কি নামে পরিচয় দেন? ঠিক ডিভোর্স তো হয় নি—হয়েছে সেপারেশন।'

'সেটা কি ইমপরটেন্ট?'

'ভেরি, ভেরি। মহিলাটি যদি স্বামীর নাম ত্যাগ করে পুনরায় তাঁর মেডেন (কুমারী) নাম, অর্থাৎ তাঁর পিতার নাম গ্রহণ করে থাকেন তবে তিনি পাবেন সেই পরিবারের র‍্যাংক, নইলে পাবেন কর্নেলের বিবাহিতা স্ত্রীর র‍্যাংক। তার পর দেখতে হবে—'

ততক্ষণে আপনার মাথাটি তাজ্জিম মাজ্জিম করছে। ভাবছেন, এবারে আর ডিমের খোসাতে টর্ণাডো নয়, আপনার কানের টিম্‌পেনামে চলেছে মহা-

বেগে যুগ্ম রুশমার্কিন নির্মিত স্পুটনিক।

আম্মো ভাবছি আজ যদি ডাচেস অব উইনজর তৃতীয় বারের মত যদি, মানে, ইয়ে হয়ে যান তবে তাঁর নাম কি হবে? শুনেছি, হালে নাকি তিনি লণ্ডনে 'জলচল' হয়ে গেছেন। ড্যুককে বিয়ের পূর্বে মিসেস সিমসন অবস্থাতে তিনি রাজবাড়িতে দাওয়াৎ খেয়েছেন—যদ্যপি রাজমাতা মেরি সে দাওয়াৎ বর্জন করেন। তাঁর সে 'বামনাই' নাকি প্রোটকল-নিন্দিত অপকর্ম হয়েছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি দেহরক্ষা করেছেন। এখন প্রশ্ন, ডাচেস যদি আরেকটা ডিভোর্স নেন তবে তিনি লণ্ডনে সাধনোচিত ধাম পাবেন কিনা, অর্থাৎ বকিংহম ধামে নিমন্ত্রিত হবেন কি না?

হাসছেন? হাসবার জিনিস মোটেই নয়। চাকরি যেতে পারে। রুটি মারা যেতে পারে।

নিন্ হিটলারের যে কোনো প্রামাণিক জীবনী। পড়ুন ঘটনাটা। হিটলার গেছেন ইতালি—স্টেট ভিজিটে। সঙ্গে গেছের ফরেন আপিসের শ্যাফ্ দ্য প্রোটকল। শ্যাফ্টি সাতিশয় খানদানী ঘরের ছেলে। পোষা বেরালটাকে আগে দুধ দিতে হয়, না কুকুরটাকে হাড্ডি—সে প্রোটকল তিনি সাত বছর বয়সেই পারিবারিক কাস্লে যুক্তিতর্কসহ সপ্রমাণ করে দিয়েছিলেন।

ইতালির রাজা সর্বান্তঃকরণে ঘেন্না করতেন হিটলারকে—অবশ্য অনুভূতিটা ছিল উভয়পক্ষীয়, সাতিশয় 'বরাবরেষু'! রাজা পাতলেন ফাঁদ, হিটলারকে অপদস্থ করার জন্য। শেষ মুহূর্তে কি একটা হয়ে গেল রদবদল। যার ফলে হিটলার উপস্থিত হলেন কি এক পরবে সিভিল ড্রেস পরে, যেখানে আর সবাই য়ুনিফর্মে! কিংবা উল্টোটা!

বিশ্বসংসার জানে হিটলার ছিলেন অত্যন্ত বদ-মেজাজী লোক—যদিও একথাও সত্য যে মিষ্টি ব্যবহার করতে চাইলে তিনি পার্মিট-প্রার্থী মেবার-বাসীকে তিন লেনথে হারাতে পারতেন—দুষ্টলোকে বলে, তিনি তখন মেঝেতে শুয়ে পড়ে কারপেট চিবুতে আরম্ভ করতেন—তাঁকে নাকি বলা হত The Carpet-Eater!

প্রোটকল শ্যাফ্ বরখাস্ত হয়ে প্রথমতম ট্রেনে নাক বরাবর আপন গাঁয়ে। হিটলার তাঁর মুখদর্শন পর্যন্ত করেননি।

অবশ্য এর সরস দিক নিয়েও একাধিক কাহিনী আছে। বাল্যকালে হিটলার যে অস্ট্রিয়ার নগণ্য প্রজা ছিলেন সেই বিরাট অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরির মহিমান্বিত সম্রাট ছিলেন কাইজার ফ্রানৎস য়োজেফ। তাঁর 'ভাব-ভালবাসা' ছিল সুন্দরী অভিনেত্রী শ্রীমতী শ্রাটের সঙ্গে। তিনি প্রায়ই কাইজারকে বলতেন, 'আপনি স্টেজের উপর গিরার্ডির রসিকতা শুনে হাসতে হাসতে কাত হয়ে পড়েন। স্টেজে আবার রসিকতা করার সুযোগ পান গিরার্ডি কতটুকু? পাব্-এ, বার-এ, চায়ের মজলিসে তিনি যা একটার পর একটা ছেড়ে যান তার তুলনায় কেউ কখনো করতে পেরেছেন বলে কোনো কিংবদন্তী পর্যন্ত এই বিরাট ভিয়েনা শহরে নেই।' তাই গিরার্ডিকে কফি পানে নিমন্ত্রণ করা হল। কাইজার তো এলেন বিরাট

প্রত্যাশা নিয়ে। ওদিকে কী আশ্চর্য! গিরার্ডির কোটের বোতাম ওপরবাগে উঠতে উঠতে যেন তাঁর ঠোঁট দুটোকেও বোতামিত করে দিয়েছে! নিজের থেকে কথা কন না আদৌ, প্রশ্ন শুধলে মহা সসম্ভ্রমে যেটুকু বলেন সেটি তার গোঁপের ছাঁকনিতেই আটকা পড়ে যায়।

কফি পান খতম হতে চলেছে। শেষটায় থাকতে না পেরে হতাশ কাইজার ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বললেন, 'মাই ভেরি ডিয়ার গিরার্ডি! আপনার মজলিস-জমানো কথার ফুলঝুরি সম্বন্ধে আমি কত মুখে কতই না বেহদ্দ তারিফ শুনেছি—আর এ কি?'

রুমাল দিয়ে মাথার ঘাম মুছতে মুছতে এক্কেবাম্যে গ্রাম্য ভাষায় গিরার্ডি বললেন, 'হুজুর জাঁহাপনা! অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরির কাইজারের লগে এ্যাগ্‌বার আপনে কফি খাইতে বহয়া দ্যাহেন্ না!'

বেচারি গিরার্ডি প্রোটকলকে কনসল্ট করে কফি খেতে এসেছিলেন!

তাঁর শেষ বাক্যটি ঠিক প্রোটকলসম্মত কিনা সে নিয়েও আমার মনে ধোঁকা আছে।

একদম হালের ঘটনায় চলে আসি।

এই গত ৯।১০ই জুন তারিখে আরব রাষ্ট্রগুলো এবং ইজরাএল সকলেই যখন অস্ত্রসম্বরণ (সীস ফায়ার) করতে রাজী হয়ে গেছেন তখন রাশা ইউনাইটেড নেশনের সিকুরিটি কৌনসিলের বিশেষ জরুরী সভা ডাকার জন্য প্রস্তাব পাঠালে; তার অভিযোগ, ইজরাএল সীস ফায়ার করেনি—ক্রমাগত সিরিয়ার ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সীটিং বসলো সকাল ন'টা-দশটায়। এদেশে তখন রাত বারোটা। মিটিঙে বসানো মাইকের মারফত তার প্রত্যেকটি বাক্য ভইস অব আমেরিকার নিউজ রুমে আসছে। সেইটে ফের বেতারিত হয়ে রিলের পর রিলের মারফত ভারতে পেঁচচ্ছে। অধমের অনিদ্রা ব্যাধি আছে।

এই সিকুরিটি কৌনসিলের কর্মপদ্ধতি অতিশয় ছিমছাম। যে যার বক্তব্য বলে যান সাধারণত অতিশয় শান্ত-কণ্ঠে। কেউ কাউকে বাধা দিয়ে আপন কথা বলতে চায় না—অতি দৈবেসৈবে কেউ যদি কখনো করে তবে বার বার মাফ চেয়ে, ও বাধাপ্রাপ্ত বক্তাও সঙ্গে সঙ্গে থেমে যান। চেল্লাচেল্লি হৈ-হুল্লোড়ের কথাই ওঠে না।

প্রেসিডেণ্ট গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আমি এখন সোভিয়েত রাশিয়ার মহামান্য ('ডিস্‌টিংগুইস্‌ট্‌' শব্দটি প্রতিবার প্রতি মেম্বারের উল্লেখ করবার সময় ব্যবহার করাটা প্রোটকলানুযায়ী নিরঙ্কুশ বাধ্যতামূলক) ডেলিগেটকে "ঘরের ফ্লর" ছেড়ে দিচ্ছি।' অর্থাৎ তখন ঘরের ফ্লর—মেঝেটাতে দাঁড়িয়ে কথা বলার হক্ক সোভিয়েত ডেলিগেটের। অবশ্য তিনি ফ্লর গ্রহণ নাও করতে পারেন।

মহামান্য রাশান ডেলিগেট দাঁড়িয়ে বললেন, 'স্পাসিব'—কিংবা 'স্লাগোদারিয়ু ভাস'ও বলে থাকতে পারেন। অর্থ একই; 'থ্যাঙ্ক্যু'। অর্থাৎ তিনি ফ্লর গ্রহণ করলেন।

তারপর এখন যে বিবৃতি নিবেদন করছি সেটা স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর

করে। 'সন্দেহপিচেশ' পাঠক আমার অত্যল্পই। তাঁরাও ঐ সময়কার খবরের কাগজ পড়ে চেক্-অপ্ করে নিতে পারবেন, তাঁদের হাত দিয়ে আমি দা-কাটা তামাক অর্থাৎ সাতিশয় স্থূল ভুল—খেয়েছি কিনা। কিন্তু আমি অতি সংক্ষেপে সারছি।

রুশ ঃ 'থ্যাঙ্ক্যু, মিঃ প্রেসিডেন্ট! আমি বলতে চাই, এই সম্মানিত কৌনসিল আরব এবং ইজরাএল উভয়কে আদেশ দিয়েছে সীস-ফায়ার মেনে নিতে। সিরিয়ার মহামান্য ডেলিগেট বলেছেন, সীস-ফায়ার মেনে নেওয়া সত্ত্বেও ইজরাএল সিরিয়ায় অনুপ্রবেশ করে, ট্যাংক সাঁজোয়া গাড়িসহ ক্রমাগত রাজধানী দিমিশকের (ডিমেস্কাস্, দামা, ডামাস্কুস) দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, বোমারু বিমান অনবরত রাজধানীর উপর বোমাবর্ষণ করছে! আমি প্রস্তাব করি, কৌনসিল সর্বসম্মতিক্রমে ইজরায়েলের এ আচরণের নিন্দা করুক। ধন্যবাদ, মিঃ প্রেসিডেন্ট!'

(বক্তৃতা শেষ করে কোন কোন সদস্য ভবিষ্যতে তাঁর বক্তৃতার কি ভাষ্য হবে না হবে সে বাবদে তাঁর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার দাবী জানান। পক্ষান্তরে বক্তব্য স্পষ্ট 'হ্যাঁ', 'না' বা নিতান্ত দ্ব্যর্থহীন হলে সে অধিকার যে রাখছেন না, সে-কথাও বলে দেন। এটার প্রয়োজন এই কারণে যে কৌনসিলের বাহান্ন রঙের নানান চিড়িয়া নানান বুলি কপচান। অনুবাদ নিয়ে পরে তাই নানা হক্ক না-হক্ক তর্ক ওঠে)।

প্রেসিডেন্ট বললেন, 'আমি এখন ইজরাএলের মহামান্য ডেলিগেটকে ফ্লর ছেড়ে দিচ্ছি!'

ইজরাএল ডেলিগেট ঃ 'আমার মহামান্য সরকার যখন সীস-ফায়ারে স্বীকৃতি দেন তখন তিনি স্পষ্ট বলেন, "আমরা সীস-ফায়ার মানবো, কিন্তু শর্ত (অন কন্ডিশন) যে আরবরাও তাই মানবে।" অতএব সীস-ফায়ারটা ম্যুচুয়াল করতে হবে। ইতিমধ্যে আমার মহামান্য সরকার তাঁর সেনাবাহিনীতে সীস-ফায়ারের হুকুম দিয়েছেন।'

এ উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে হয়তো বা রুশ ডেলিগেট নিন্দাসূচক প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে পারেন। সে-সম্ভাবনা দেখে প্রেসিডেন্ট ফের রুশকে ফ্লর দিলেন।

রুশ ঃ (অতি সামান্য অসহিষ্ণু কণ্ঠে) 'মিঃ প্রেসিডেন্ট! এ তো বড় তাজ্জবকী বাত! এই "ম্যুচুয়াল সীস-ফায়ার" রহস্যটা কি? মহামান্য ইজরাএল ডেলিগেট কি বলতে চান, প্রথমে, পয়লা, সিরিয়া সিস-ফায়ার করবে, তবে ইজরাএল অস্ত্রসংবরণ করবেন? তদুপরি, মিঃ প্রেসিডেন্ট, 'ম্যুচুয়াল' শব্দটাই আমাদের অনুশাসনে নেই। এবং আসল তত্ত্ব, ইজরাএলই আক্রমণ করেছে প্রথম। সীস-ফায়ার করতে হবে তাকেই প্রথম। আচমকা ঐ ম্যুচুয়াল শব্দ আমদানি করে ইজরাএল কথার মারপ্যাঁচ (কজিস্ট্রি) আরম্ভ করে মূল সত্য এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন? (তারপর অতি সামান্য ব্যঙ্গের সুরে—লেখক) এরপর বুঝি সফিস্ট্রি আরম্ভ হবে! (কথার প্যাঁচে সত্য গোপন ও মিথ্যা ভাষণের ভদ্র নাম সফিস্ট্রি—রুশ সদস্য ফেদেরেন্কো 'কজিস্ট্রি' ও 'সফিস্ট্রি'

দুটো শব্দই ব্যবহার করেছিলেন যৎসামান্য ব্যঙ্গের সুরে —কারণ ইজরাএল সদস্য যে সত্যিসত্যিই পাঁকাল মাছের গা মোচড়ানো আরম্ভ করে দিয়েছেন সেটা ততক্ষণ শত্রুমিত্র সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে—লেখক)। মিঃ প্রেসিডেন্ট! আমি আদৌ অবিশ্বাস করছি নে যে, ইজরাএল সরকার তাঁর সেনাবাহিনীকে সীস-ফায়ারের হুকুম দিয়েছেন, কিন্তু মহামান্য ইজরাএল সদস্য বলুন, তারা সেটা মেনে নিয়েছে কিনা, তিনি বলুন, তারা সিরিয়ায় ক্রমাগত আরো অনুপ্রবেশ করছে কিনা? থ্যাঙ্ক্যু মিঃ প্রেসিডেন্ট।'

প্রেসিডেন্ট: 'আমি মহামান্য ইজরাএলের ডেলিগেটকে ফ্লর দিচ্ছি।'

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর শোনা গেল ফের প্রেসিডেন্টের কণ্ঠস্বর: 'আমি মহামান্য বুলগেরিয়ার ডেলিগেটকে ফ্লর দিচ্ছি।' স্পষ্ট বোঝা গেল মহামান্য ইজরাএল 'ফ্লর গ্রহণ' করলেন না। প্রোটকলানুযায়ী প্রেসিডেন্ট তাঁকে হুকুম দিতে পারেন না।

বুলগেরিয়া (ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে—বস্তুত একমাত্র ইনিই কিঞ্চিৎ উত্তেজনা দেখান—যদিও সর্বভদ্রতা বজায় রেখে। ইজরাএল কথা বলেছে স্বভাবতই বিজয়ীর গর্বিত কণ্ঠে, সিরিয়া করুণ ফরিয়াদভরা সুরে—আর ইজরাএলের জয়ে খুশীতে ডগমগ মার্কিন তথা তার ফেউ ইংরেজ করেছে, 'হে*-হে*-হে*-হে*') : 'মিঃ প্রেসিডেন্ট! ইজরাএল উত্তর দিচ্ছেন না কেন? আমি শুধু জানতে চাই, ইজরাইলি বাহিনী এখন কোথায়? সিরিয়াতে? "হ্যাঁ" কি "না" তিনি স্পষ্ট বলুন! তিনি যদি কথা বলেন তবে আমাদের যা বলার বলবো, তিনি যদি না বলেন তবে আমরা ভেবে নিয়ে জেনে যাবো।' (ডিলেমাটি সুন্দর "If Israel speaks, we shall speak; if Israel does not speak we shall know,"—লেখক)

প্রেসিডেন্ট পুনরায় ইজরাএলকে ফ্লর দিলেন। খানিকক্ষণ চুপচাপ।

প্রেসিডেন্টর গলা: 'আমি মালির মহামান্য ডেলিগেটকে ফ্লর দিচ্ছি।'

এর থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, ইজরাএল ফ্লর গ্রহণ করেননি, করতে চানও না। এরপর বোধ হয় কর্মসূচীতে মালি রাষ্ট্রের নাম ছিল।

মালি: 'মিঃ প্রেসিডেন্ট! আমরা সবাই এখানকার সদস্য। এক সদস্য যদি অন্য সদস্যের কাছে কিছু জানতে চান তবে আপনি তাঁকে সেটা শুধোচ্ছেন না কোন্ বিধি অনুসারে? থ্যাঙ্ক্যু!' (বা ঐ ধরনের)

প্রেসিডেন্ট: 'আমি সম্মানিত মালি সদস্যের কাছে জানতে চাই, আমি যে সম্মানিত ইজরাএলী সদস্যকে সম্মানিত রুশের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো তা কোন্ বিধি অনুযায়ী?' মালি কোন উত্তর দিতে চান কিনা ঠাহর হল না। কারণ ইতিমধ্যে রুশ সদস্য ফ্লর চাইলেন। প্রেসিডেন্ট সসম্মানে তাই দিলেন।

রুশ: 'মিঃ প্রেসিডেন্ট! সভার কাজ সুষ্ঠুরূপে চালাবার জন্য আমরা ওয়ার্কিং এরেঞ্জমেন্ট মেনে নিয়ে থাকি। সেই অনুযায়ী যে কোনো সদস্য যে কোনো খবর যে কোনো সদস্যের কাছে চাইতে পারেন। এই তো আমরা

সভার সদস্য সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্তকে অনুরোধ করলুম সিরিয়া থেকে তাজা খবর আনিয়ে দিতে। তিনি দিলেন।' ইত্যাদি ইত্যাদি!

তৎসত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট সম্মানিত ইজরাএলী সদস্যকে প্রশ্নটি শুধোলেন না। তিনি কিন্তু একাধিক বার তাঁকে সসম্মানে ফ্লর ছেড়ে দিলেন। ইজরাএল ফ্লর গ্রহণ করলেন না।

তবেই বুঝুন, সম্পাদক মশাই, প্রোটকলের ঠেলা কী চীজ!

কিন্তু চিন্তা করলে দেখতে পাবেন: প্রেসিডেন্ট—থুড়ি—সম্পাদক মশাই (ক্ষণতরে ভাবছিলুম, আমি বুঝি সেকুরিটি কৌনসিলে পেঁছে গিয়েছি!) এটা কিছু নূতন তত্ত্ব নয়। আমি প্রাচীনপন্থী পদি পিসির অপজিট পুংলিঙ্গ। যা নাই ভারতে—! খুলে বলি।

সেকুরিটি কৌনসিলের কার্যকলাপ যখন আমি সরাসরি বেতারে শুনছি তখন ক্ষণে ক্ষণে মনে হচ্ছিল এই রকমই একটি ধুন্ধুমার যেন আমি সশরীর কোথাও দেখেছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঐ ধুন্ধুমার কথাটাই সব মনে করিয়ে দিল। যে মধুকৈটভ-নিধন শ্রীবিষ্ণুকে আর্যভদ্রগণ সায়ংপ্রাতঃ স্মরণ করেন সেই বিষ্ণু তথা অন্যান্য দেবাদিকে প্রচণ্ড নিপীড়ন আরম্ভ করে মধুকৈটভের পুত্র ধুন্ধুমার এবং অবশেষে নৃপতি কুবলাশ্ব কর্তৃক নিহত হয়। মহাভারতের আপ্তবাক্যমধ্যে সেটি লিপিবদ্ধ আছে।

ধুন্ধুমার স্মরণ করিয়ে দিলে সেই সভা, যেখানে দ্রৌপদী লাঞ্ছিতা হয়েছিলেন। আমি জাতিস্মর। আমি সে-সভায় উপস্থিত ছিলুম তখনকার দিনের পি-টি-আই চীফ রিপর্টার মুলগায়েন সঞ্জয়ের দোহার রূপে।

পৃথিবীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে দুইটি নিরপরাধ ব্যক্তি যেভাবে আত্মসমর্থন করেছেন তার তুলনা আজো ইহসংসারে অলভ। ঐতিহাসিক যুগে সোক্রাতেস, তার বহু পূর্বে দ্রৌপদী।

কিন্তু অবিস্মরণীয় তত্ত্ববাক্য:—সোক্রাতেস জাত দার্শনিক, পাঁড় তার্কিক। তিনি যে আত্মপক্ষ সমর্থনকালে শাণিত শাণিত তর্কবাণে অ্যাথিন্স্ নগরীর নভোমণ্ডল দিবাভাগে তমসাচ্ছন্ন করে দেবেন তাতে আর বিচিত্র কি? সেকুরিটি কৌনসিল প্রসঙ্গে পূর্বেই নিবেদন করেছি রুশ প্রতিনিধি ফেদেরেনকো ইজরাএলকে 'সফিস্ট্' আখ্যা দিতে চেয়েছিলেন। সোক্রাতেস এই সব সফিস্ট্-দেরই নগরীর মুক্ত হট্টে বাক্যেতর্কে নিত্য নিত্য অমৃতক্র পান করাতেন। তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন অত্যাশ্চর্য অবিস্মরণীয় হলেও সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য নয়।

কিন্তু একবস্ত্রা যাজ্ঞসেনী আত্মসমর্থন হেতু দুর্যোধনের সভামধ্যে যে যুক্তি-জাল বিস্তার করে কতিপয় সূচ্যগ্র তীক্ষ্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন তার সম্মুখে তদানীন্তন ভারতের গুনীজ্ঞানী শূরবীর সমন্বিত সর্ববৃহৎ সভা নিরঙ্কুশ নিরুত্তর। অসূর্যম্পশ্যা কৃষ্ণা যে আইনকানুন প্রোটকল সম্বন্ধে কতখানি অনভিজ্ঞা ছিলেন তা তাঁর সভামধ্যে রোদনের সময়ই ধরা পড়েছে: 'হায়, আমি স্বয়ংবরকালে রঙ্গমধ্যে ক্রমাগত ভূপালগণের নেত্রপথে একবার নিপাতিত হইয়াছিলাম, ইতিপূর্বে যাঁহারা আর আমাকে দেখেন নাই, এক্ষণে আমি তাঁহাদেরই

সম্মুখে সভামধ্যে উপস্থিত হইয়াছি, যাহাকে পূর্বে বায়ু ও আদিত্য পর্যন্ত দেখিতে পান নাই…' (আমরা বলি) তিনি যে সোক্রাতেসের মত সেকালের কোন প্রটো-আকাডেমির সদস্যা ছিলেন না অথবা ডক্টরেট অব্ জ্যুরিসপ্রুডেন্স পাস করেননি সে বাবদে আমরা স্থিরনিশ্চয়, দৃঢ়প্রত্যয়। তাই পাঞ্চালীর ডিফেন্স আমাদের কাছে 'ঘৃত-লবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্ধনসমস্যাহীন কলিকাতা মহানগরীর' মত সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

এ যেন সেকুরিটি কৌনসিলের ঠিক উল্টো পিঠ। হেথায় তাবৎ সভা কা কা রবে চিৎকার করছে কিন্তু ডিসটিংগুইশ্ট্ ইজরাএল প্রতিনিধি নিশ্চুপ, নীরব। অথচ তাঁর জিভে ফোস্কা পড়েনি, তাঁর টনসিলে বাত হয়নি। সভায় ৯৫ নয়াপয়সা মেম্বর কোনো প্রোটকল খুঁজে পাচ্ছেন না যেটা গজাঙ্কুশের মত প্রয়োগ করে ইজরাএলের দাঁতকপাটি খুলতে পারেন।

আর হেথায় দ্রুপদতনয়া বারংবার একটিমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন, ধর্মরাজ দ্যূতক্রীড়ায় 'অগ্রে আমাকে কি নিজেকে বিসর্জন করেছেন?' (ইজরাএলকেও মাত্র একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল 'ইজরাএলি বাহিনী এখন কোথায়?') যুক্তিটি অতি সুস্পষ্ট। ধর্মরাজ যদি নিজেকে স্টেক্ করে আগেভাগেই খুইয়ে ফেলে দুর্যোধনের দাস হয়ে গিয়ে থাকেন তবে যেহেতু দাসের কোন সম্পত্তিতে অধিকার থাকতে পারে না অতএব 'দাস' যুধিষ্ঠির কৃষ্ণাকে স্টেক করতে পারেন না (দাস হবার পূর্বেও তিনি মাত্র ২০% মালিক—কিন্তু এ ল'পইনট্ বোধ হয় তখন ওঠেনি)।'[১]

তা সে যা-ই হোক, ঐ একটিমাত্র প্রশ্নের উত্তরই তিনি পাচ্ছেন না। এবং হা অদৃষ্ট! কোনো প্রোটকলও খুঁজে পাচ্ছেন না যার চাপে তিনি সভাসদদের মুখ খোলাতে পারেন। বরঞ্চ ভীষ্ম যে প্রোটকল উত্থাপিত করলেন তার মোদ্দা: ডিস্টিংগুইশ্ট্ দ্রুপদতনয়া তাঁদের প্রশ্ন শুধিয়েছেন (ইংরিজিতে এস্থলে বলে 'বার্কিং আপ দি রং ট্রী')। তাঁর উচিত তাঁর স্বামী ধর্মরাজকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা। তিনিই বলতে পারেন, কৃষ্ণা 'জিতা বা অজিতা'।

কিন্তু বিদুর যে জিনিসের আশ্রয় নিলেন, সেটাকে প্রীসিডেনস, নজীর বা হদিস বলা যেতে পারে, ঠিক প্রোটকল নয়। তাঁর মতে মহর্ষি কশ্যপ দৈত্যকুলের প্রহ্লাদকে অনুশাসন দেন 'হে প্রহ্লাদ, যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়াও প্রশ্নের প্রত্যুত্তর না দেয় এবং যে সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দান করে তাহারা সহস্র সংখ্যক বারুণ-পাশ দ্বারা বন্ধন পায়।'[২] অর্থাৎ silence সর্বাবস্থায় golden নয় (অবশ্য এস্থলে gold is silent, কারণ সভাসদদের আয় সকলেই দুর্যোধনের

---

১ ইসলামে দাস যেমন আইনত পূর্ণ নাগরিক নয় (সেখানেও সে কোনো কিছু স্টেক করতে পারে না) ঠিক তেমনি সে কোনো আইনভঙ্গ করলে (চুরি, ডাকাতি) তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হয় না। খেসারতি দিতে হয় মুনিবকে।

২ জ্বর-জ্বালাদি রোগকেও 'পাশ' বলে ধারণা করা হত বলে অথর্ববেদে ঋষি পাশমুক্তির জন্য বরুণদেবকে আহ্বান জানাতেন।

gold পেয়ে silent !)।

কিন্তু এ নজীর ধোপে টিকল না। মহাভারতকার বলছেন, বিদুরের বাক্য কর্ণগোচর করিয়া সভাস্থ পার্থিবরা কিছুই প্রত্যুত্তর করিলেন না !!!

কিন্তু এ সব চুলচেরা বাগ্‌বিতণ্ডার মূলে কে ?

দ্রৌপদী যে প্রশ্ন শুধিয়েছিলেন সেটা তো কেউ সেকেণ্ড করবে। নইলে সেটা উল্‌ট্রা ভিরেস, নাকচ।

নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁকে সেকেণ্ড করে বসল দুর্যোধনের ছোট ভাই চ্যাংড়া অর্বাচীন বিকর্ণ ! তিনি স্পষ্ট গলায় বললেন, 'যাজ্ঞসেনী যাহা কহিয়াছেন কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, ইঁহারা আসিয়া এ বিষয়ে কিছু বলুন।' তারপর তিনি যখন দেখলেন 'সভাসদবর্গের কোনো ব্যক্তিই সাধু অসাধু কিছুই কহিলেন না' তখন 'হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন', অর্থাৎ অনেক যুক্তিতর্ক দেখিয়ে রায় দিলেন, 'এইসকল বিচার করিয়া দেখিলে দ্রৌপদীকে জয়লব্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।'

সর্বনাশ ! আজকের দিনের ভাষায় বলতে গেলে এ যেন নিতান্ত চ্যাংড়া ঘানা বা মালি রাষ্ট্র সেকুরিটি কৌনসিলে বলে বসল, 'এই সকল বিচার করিয়া দেখিলে (অর্থাৎ যেহেতু ইজরাএলই প্রথম আক্রমণ করেছে) সাইনাইকে ইজরাএলের (প্রাচীন দিনের ভাষায় দুর্যোধনের) জয়লব্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।'

ধুন্ধুমার লেগে গেল সভায়, মহাভারতের ভাষায় 'সঙ্কুলরবে' (একসুরে) 'তুমুল নিনাদ' উঠলো সভাস্থলে। এখানে আমার বলা উচিত যে, বিদুরাদি কেউ কিছু বলার পূর্বেই বিকর্ণ আপন রায় দিয়ে বসে আছেন। তাঁর ভয় হয়েছিল, প্রবীণরা নীরবতা দিয়ে দ্রুপদনন্দিনীর প্রশ্নটি পিষে ফেলবেন— 'নীরবতা' যে শুধু মাত্র 'হিরন্ময়' তাই নয়, সরব প্রশ্নকে নিধন করার মারণাস্ত্রও বটে।

অনেকেই বিকর্ণের পক্ষে সায় দিচ্ছেন দেখে কর্ণ 'ফ্লর' গ্রহণ করলেন। বললেন, 'হে বিকর্ণ এই সভায় বহুবিধ বিকৃতি দৃষ্ট হইতেছে বটে—'

আমরাও বলি, 'সেই কথাই কও।' 'বিকৃতি' মানে প্রোটকল-সম্মত নয় !

কর্ণ বললেন, 'তুমিই কেবল বালস্বভাবসুলভ অসহিষ্ণুতায় অধৈর্য হইয়া স্থবিরোচিত বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। তুমি দুর্যোধনের কনিষ্ঠ, পর্ব বিষয়ে যথাবৎ অভিজ্ঞ হও নাই—'

এইবারে কর্ণ মারলেন পেরেকটার ঠিক মাথার উপর মোক্ষম ঘা। এই পর্ব বস্তুটি কি ? কারণ মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের যে নির্ঘণ্ট আছে তার প্রথমটার মতে বিকর্ণের নম্বর আট, দ্বিতীয়টার মতে উনিশ।

আর 'পর্ব' অর্থই হচ্ছে 'নির্দিষ্ট'—আমাদের 'পরব' মাত্রই হয় নির্দিষ্ট দিন ক্ষ্যাণে। তাই 'পর্ব'ই হচ্ছে প্রোটকল। যা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, যার থেকে নড়চড় নেই। বিকর্ণ সেই প্রোটকল ভঙ্গ করেছেন। কিন্তু তাঁর ও

দ্রৌপদীর কার্যোদ্ধার অংশত হয়ে গেছে। ওদিকে আবার কর্ণ স্বয়ং করে বসেছেন প্রোটকলে গলদ!

কারণ সভারম্ভেই মিঃ প্রেসিডেন্ট দুর্যোধন প্রোটকল ধার্য করে দিয়েছেন—কর্ণ যাকে 'পর্ব' বলেছেন—যে, 'কৌরবগণ দ্রৌপদীর সমক্ষে তাহার প্রশ্নের উত্তর করুন।' অর্থাৎ তিনি ফ্লর দিয়েছেন কুরু সদস্যদের। অপিচ কর্ণ আইনতঃ (ডে জুরে) রথচালক শ্রেণীর লোক—আজকের ভাষায় 'শোফার সর্দারজী ক্লাস' [যদ্যপি প্রকৃতপক্ষে (ডে ফাক্টো) তিনি কুন্তীনন্দন প্রথম পাণ্ডব; কিন্তু সদস্যগণ সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলে এ-বিবেচনা এস্থলে উঠতে পারেনি, কস্মিনকালে ওঠেওনি] তিনি ফ্লর গ্রহণ করতে পারেন না। তবে বিকর্ণ যে প্রোটকল ভঙ্গ করেছেন সেটা হয়তো তিনি দেখিয়ে দিতে পারেন—কারণ পইন্ট্ অব্ অরডার সভাসীন যে-কোনো সদস্য যে-কোন সময়ে তুলতে পারেন। কিন্তু তারপর কর্ণ যখন বললেন, 'দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণের যাহা কিছু আছে সে সমুদয়ই শকুনি ধর্মতঃ জয় করিয়াছেন' তখন তিনি বিলকুল আউট অব্ প্রোটকল কারণ প্রেসিডেন্ট রুলিং দিয়েছেন, উত্তর দেবেন কৌরবরা।

অতএব দ্রোণ যে ফ্লর গ্রহণ করেননি সেটাও অতিশয় করেক্ট্। কারণ তিনি ও অন্যান্য কৌরবেতররা অবগত আছেন ব্যাপারটা বহুলাংশে কুরু-পাণ্ডবের ঘরোয়া ব্যাপার। যে শকুনি সর্বস্ব জয়লাভ করেছেন তিনিও তাঁর হক্কের দাবী করে ফ্লর চাননি।

বস্তুত সভাপতিরূপে ডিস্‌টিংগুইশ্‌ট্ প্রেসিডেন্ট মিঃ দুর্যোধনের আচরণ অক্ষরে প্রোটকলসম্মত। তিনি কুরুকুলকে ফ্লর দিয়েছেন কিন্তু কী ভীষ্ম কী বিদুর কাউকে কিছু বলার জন্য কোনো চাপ দিচ্ছেন না।

অবশেষে তুমুল বাগ্-বিতণ্ডার পর প্রেসিডেন্ট দুর্যোধন যখন স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে কুরুকুলের কেউই আপন সুচিন্তিত অভিমত দিচ্ছেন না, যাজ্ঞসেনী যে 'জিতা' সে রায় দূরে থাক (কর্ণের রায়ের মূল্য নেই, এবং দুঃশাসন তখন 'প্রতিহারী' বা 'বেলিফ' বা সভার 'মারশাল'; এবং তিনিও সুদ্ধমাত্র দ্রৌপদীকে অপমানার্থে 'দাসী দাসী' বলে সম্বোধন করছেন, যুক্তিতর্ক দ্বারা শকুনির লিগেল-রাইট্ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেননি। তখন তিনি যে রুলিং দিলেন সেটাও অতিশয় ন্যায্য। তিনি জানতেন যে যদিও তিনি আইনত প্রেসিডেন্ট, তবুও এ-তত্ত্ব অনস্বীকার্য যে কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম কুরুকুলের সর্বোচ্চ আসন ধরেন। তিনি যখন স্পষ্ট বলেছেন, স্বয়ং ধর্মরাজ এর মীমাংসা করুন তখন এ সিদ্ধান্ত এক হিসাবে তাবৎ কুরুবংশের সিদ্ধান্ত। এবং যেহেতু দুর্যোধন সভারম্ভেই বলেছেন কুরুকুল উত্তর দেবেন তখন যুক্তিযুক্তভাবেই শেষ উত্তর দিলেন, কুরুকুলের সিদ্ধান্ত; ধর্মরাজ উত্তর দেবেন। কিন্তু ধর্মরাজ যখন ফ্লর গ্রহণ করলেন না, তখন তিনি দ্রৌপদীকে বললেন, (ধর্মরাজ যখন ফ্লর নিচ্ছেন না তখন প্রোটকলানুযায়ী তাঁর কনিষ্ঠেরা ফ্লর পাবেন—হুবহু যেরকম অপর পক্ষে বিকর্ণ পেয়েছিলেন) 'হে যাজ্ঞসেনী, ভীষ্ম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের

মত-ই আমার মত।'

এবং এঁরাও ফ্লর গ্রহণ করলেন না। অর্থাৎ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন না।

এখানেই সভা শেষ।

সম্পাদক মহাশয়, যতই চিন্তা করি, পুনরায় মহাভারত অধ্যয়ন করি, পুনরায় চিন্তা করি, তখন দেখি, সেই অতি প্রাচীনকালে আমরা কতখানি ন্যায়-ধর্ম ও প্রোটকল মেনে সভা চালাতুম! যদি দুঃশাসনের অনাযাচরণের কথা তোলেন তবে বলবো সেটা অবশ্যই নিন্দনীয়, দুর্যোধন কর্তৃক দ্রৌপদীকে 'উরুমধ্য' প্রদর্শন অনুচিত কিন্তু সেগুলো 'ইনট্রিগেল পার্ট অব দি প্রসীডিংস অব দ্য মিটিং' নয়, 'সভার কর্মসূচীর অন্তর্গত অবর্জনীয় অংশ' নয়। দুঃশাসন ও দুর্যোধন শুধু অতিশয় রূঢ় পদ্ধতিতে দেখাতে চেয়েছিলেন, তাঁদের মতে দ্রৌপদী জিতা। সভার কার্যকলাপে প্রোটকল আদৌ লাঞ্ছিত হননি।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, সম্পাদক মহাশয়, সে-যুগে ফিলিমি ছিল না, তার মাসিক ছিল না, তস্য সম্পাদক ছিলেন না। কাজেই তাঁকে কি ভাবে সম্বোধন করতে হয় সে-বাবদে কোনো প্রোটকল খুঁজে পেলুম না। তবু খুঁজছি, কারণ 'দুধ' না পেলেও 'পিটুলি' পাবো নিশ্চয়ই !!

পপ্‌লালের মগডালে

দুই মহা 'চাণক্যে' বিশ্রম্ভালাপ হচ্ছিল। নিদাঘের মধ্যরাত্রি আসন্ন। প্রচুর সুরা পান হয়েছে। ফলে সর্বাঙ্গ দিয়ে অজস্র স্বেদ ও তজ্জনিত বাষ্প বিনির্গত হচ্ছে। এমতাবস্থায় সেই স্টীম থেকে যে স্পিরিট বেরুচ্ছে সেটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সামান্যতম স্পর্শ পেলেই দপ করে জ্বলে উঠবে ব'লে চাণক্যদ্বয় সিগার ধরাচ্ছেন না।

ইতিমধ্যে একজন গভীরতম চিন্তায় নিমজ্জিত থাকার পর দ্বিতীয়জনকে প্রশ্ন করলেন, "একটা সমস্যা নিয়ে আমি অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি, ভ্রাতঃ! ভেবে ভেবে কোনো কুলকিনারা পাচ্ছি নে। মার্শাল থেকে শুমপেটার হয়ে কেইনস রবিনস সবাইকে চষেছি—বেকার বেকার। তা আপনার কাছে তো কিছুই অজানা নেই—"

"হুম।"

"এই ডাক-বিভাগটা চলে কি প্রকারে? অত অঢেল টাকা পায় কোথায়? ভাবুন দিকিনি, বিরাট বিরাট মাইনের ডাঙর ডাঙর আপিসাররা রয়েছেন, দশাসই সব আপিস দপ্তর, অগুনতি ভ্যান, লম্বা দৌড়ের রেলগাড়ি হলেই তার আধখানা জুড়ে ডাকের জন্য খাস ব্যবস্থা—এ তো আর ফোকটেমুফতে হয় না! হ্যাঁ, মানলুম, তারা কোটি কোটি টাকার ডাকটিকিট বেচে। কিন্তু ওটাকে তো আর ব্যবসা বলা চলে না। ১০ পয়সার ডাকটিকিট বেচে ১০ পয়সায়, ১৫ পয়সার টিকিট বেচে ১৫ পয়সায়, কুড়ির কুড়ি পয়সায়ই। এক কানাকড়িও তো মুনাফা নেই ওতে,—যা দর তাতেই বিক্রি! লাভ রইল

কোথায় ? তা হলে ডাক-বিভাগটা চলে কি করে ?"

"অতি হক কথা কয়েছেন, আমিও সানন্দে স্বীকার করছি, টিকিট বিক্রি করে ডাক-বিভাগের রত্তিভর মুনাফা হয় না। যে দাম আছে, তাতেই সে বিক্রি করতে বাধ্য। কিন্তু জানেন তো, দাদা, বড় বড় মুনাফার ব্যবসা মাত্রেই লাভের পথটা থাকে লুকানো—যেদিকে সরল জনের নজর যায় না, তার মনে কোনো সন্দেহই হয় না। আচ্ছা! এইবারে দেখুন সমস্যাখানার রহস্য। পনেরো গ্রাম ওজনের খামের জন্য পোস্টাপিস চায় পনেরো পয়সা টিকিট—নয় কি ? এইবারে আপনাকে আমি শুধোই—হক্ক কথা কন। প্রত্যেকখানি চিঠির ওজনই কি টায়-টায় পনেরো গ্রাম ? হাজারখানার ভিতর একখানারও হয় কি না হয়—এ তো কানায়ও দেখতে পায়। একটার ওজন হয়তো বারো গ্রাম, কোনোটার আট, কোনোটার বা তেরো। এইবারে বুঝলেন তো, এই যে তফাতটা—এই যে ফারাকটুকু, এর থেকেই ডাকবিভাগের নিরেট লাভ—ঐ দিয়ে তার দিব্যি চলে যায়।"

পাঠক ভাবছেন, আমি অর্থশাস্ত্রের জটিলতম সমস্যায় কণ্টকিত এই প্রস্তাবটি উত্থাপিত করলুম কেন ? আমিও তাই ভাবছি। বস্তুত আমি মেহতা-চৌধুরী-জনসুলভ এই পঞ্চতন্ত্র কাহিনীটি যখন শ্রবণ করে কৃতকৃতার্থ হই তখন, কিংবা আমার বাতুলতম মুহূর্তেও আমি ওহেন সম্ভাবনার কণামাত্র আভাস পাইনি যে, ইটি একদিন আমার কাজে লাগবে।

লেগেছে। টায়-টায় না হলেও হরেদরে। সর্ব কাহিনী, তাবৎ উপমাই দাঁড়ায় তিন ঠ্যাঙের উপর ভর করে। চার পায়েই যদি দাঁড়ায়, তবে তো সে হুবহু একই বস্তু হয়ে গেল। উপমা রূপক, প্রতীক হতে যাবে কেন ?

বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ দেখি, এক দরদী সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় বিকট চিৎকার করে চিল্লি দিয়ে কেঁদে উঠেছেন, বিদেশী পুস্তক বিক্রেতাদের জন্য। হায় হায় হায়, এদের কি হবে ? এরা কোজাবে, মা !

কান্নার বহর দেখে মনে হল, এঁরা যেন ফুটপাথের পুরনো বই বিক্রিরী-ওলাদের চেয়েও বিকটতর বিপাকে পড়েছেন। এদের দুরাবস্থা (প্রেস ! হ্যাঁ, আমি আকার দিয়ে দুরাবস্থাই লিখছি) দেখে সেই সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলছেন।

আম্মো দরদী। কিন্তু এই ডুকরে-ওঠা, চিল-চ্যাঁচানো মড়া-কান্না শুনে আমার হৃদয়ে 'মিলক অব হ্যুমেন কাইণ্ডনিস' না বয়ে লেগে গেল সেথায় অন্য ধুন্ধুমার। খাঁটি মড়া-কান্না আমি বিলক্ষণ চিনি। আমার বসত-বাসা শ্মশানের লাগোয়া।

* * *

মহাকবি হাইনরিষ হাইনের মরমিয়া প্রেমের গীতি কবিতা সম্বন্ধে একাধিক বার লেখবার সুযোগ আমি পেয়েছি। ইনি সাক্ষাৎ চণ্ডীদাস। পাঠককে শুধোই, 'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু', 'তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি' শুনে কি তোমার কখনো মনে হয়েছে, এ কবি '…চিঠির' মত

(এ-মাসিকের বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত কোনো ফরিয়াদ নেই—অস্মদ্দেশে শত্রু মিত্র উভয় ভাবেই পুজো করার পদ্ধতি ঐতিহ্যসম্মত) কিংবা কংগ্রেস কম্যুনিস্টের মত কটুকাটব্য কস্মিনকালেও করতে পারে ?

তাই যখন বিঘ্নসন্তোষী, পরশ্রীকাতর একপাল (লুমপেন-পাক) ফেউ লাগলো হাইনের পিছনে তখন তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। সবাই ভাবলে, যার মুখ দিয়ে সদাই মধু ঝরে সে আবার এসব বেতালা বদখদ বেক্তমীজী বাতের কীই বা জবাব দেবে। ভুল ভুল ! সম্বাই করলেন ক্ষ-তে গলদ।

এঝদিন তাঁর হল ধৈর্যচ্যুতি।

কি যেন একটা—আমার ঠিক স্মরণে আসছে না—ভ্রমণ-কাহিনী না কি যেন কিসে মোলায়েম প্রাকৃতিক বর্ণনা দিতে দিতে তিনি বললেন, সবাই জানেন, আমি সাতিশয় সাধারণ কবি, তাই আমার খাঁইও অতিশয় সাধারণ। কবি মানুষ, দয়াময় ভগবান যদি নদীপারে আমাকে একখানা কুঁড়েঘর দেন, তা হলেই আমার দিব্যি চলে যাবে। আর ঘরের তৈরি সাদামাঠা কিঞ্চিৎ রুটি—শহুরে বান, ক্রোআঁশা[১] কিসসুটি না—আর ঘরেই তৈরি মাষা পরিমাণ মাখম, ব্যস। তদুপরি দয়াময় ভগবান যদি আমাকে আরো খুশী করতে চান, তবে তিনি যেন ঐ নদীপারে উঁচাসে উঁচা একসারি পপ্‌লার লাগিয়ে দেন। সর্বশেষে, তাঁর অসীম করুণাবশে যদি দয়াময় আমাকে পরিপূর্ণ কৈবল্যানন্দ দিতে চান, তবে তিনি যেন আমার পিছনে যারা লেগেছে ঐ দুশমনদের পপ্‌লারের মগডালে ফাঁসি দেন। অন্তবিহীন আনন্দরসে ভরপুর হৃদয় নিয়ে, কুটিরের দাওয়ায় বসে আমি তখন উপরপানে তাকিয়ে দেখব, সাতিশয় মনঃসংযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করবো, আহা কী রমণীয় দৃশ্য ! দুশমনদের পাগুলো মৃদুমন্দ পবনে দুলছে—দোদুল দোলায় হিল্লোল লাগিয়ে।[২] হ্যাঁ, আলবৎ প্রভু যীশুখৃষ্ট আদেশ দিয়েছেন[৩] শত্রুকে ক্ষমা করবে, তাকে প্রেম দেবে। নিশ্চয় করব, নিশ্চয়ই দেব—আমার সর্বসত্তা উজাড় করে, কিন্তু ঐ যে বললুম, ওদের ফাঁসি হয়ে যাবার পর।"

* * *

---

১ ক্রোআঁশা = ক্রেসেণ্ট—অর্ধচন্দ্রের ন্যায় দুধেমাখমে তৈরি ফিনসি রুটি। তুর্করা ভিয়েনা যুদ্ধে পরাজিত হলে পর, ভিয়েনাবাসী তুর্কদের পতাকা-লাঞ্ছন অর্ধচন্দ্র আকারে রুটি বানিয়ে তাদের জয় সেলেব্রেট করে। আজ যদি ইস্টবেঙ্গল একটি কেকের উপর মার্শপেনের "বাগান" বানিয়ে সেটা খায়—অনেকটা সেই রকম ! আমি কিন্তু মোহনবাগানী।

২ যাঁরা আর্ট হিস্ট্রির চর্চা করেন, তাঁদের স্মরণে আসবে গোয়ার ছবি, যেখানে গাছে ঝোলানো শত্রুকে পর্যবেক্ষণ করছেন এক অফিসার—টেবিলে কনুই রেখে হাতে আরামসে মাথা রেখে। বস্তুত এ ছবি বেরোবার (১৮১০—১৩) কয়েক বছর পরই হাইনে তাঁর প্রবন্ধ লেখেন।

৩ হাইনে ইহুদি। ইহুদিরা খৃষ্টকে স্বীকার করে না।

কিন্তু যে গল্পটা দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম সেটা গেল কোথায় ?

যাঁরা বিদেশী বই বেচনেওলাদের তরে ঘটি ঘটি অশ্রু বর্ষণ করছেন তাঁদের একজনের ভাবখানা অনেকটা ঃ পাঁচ শিলিঙের বই যদি তারা তারই ন্যায্য এক্সচেঞ্জে ভারতীয় টাকায় বেচে, তবে তাদের মুনাফা রইল কোথায় ? এক ডলারের দাম সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা (কথার কথা কইছি, আমি সঠিক ভাও জানি নে), যদি সাত টাকা পঞ্চাশেই বেচে, তবে লাভ রইল কোথায়—ঐ সেই ডাকটিকিট বিক্রির মত !

তিনি তারপর আরেক ঘটি এক্স্ট্রা চোখের জল ফেলে বলছেন, তাদের কত খর্চা। চিঠি লিখতে হয় (মরে যাই !), ডাকমাশুল দিতে হয় (ও বাছারে !) এবং তারপর আর কি সব ধানাইপানাই করেছেন আমার মনে নেই। কিন্তু এইবারে অসহিষ্ণু পাঠক, ক্ষণতরে মেহেরবানী করে তুমি নিচের মোক্ষম তত্ত্বটি মনোযোগ সহকারে পড়ো।

উপরের উল্লিখিত ঐ একজনই না, যাঁদের হাত দিয়ে বিলিতি বইওলারা তামাক খাচ্ছেন তাঁদের কেউই তো বলছেন না (কিংবা আমার হয়তো চোখে পড়েনি)—অন্তত সেই সরল বিপ্রসন্তান (ইনি পণ্ডিত তথা বিপ্র—এ দুয়ের সংযোগে মানুষ বড় সরল, neif হয়) বলেননি—

বিলিতি বইওলারা কত কমিশন পায় ?

আমানউল্লার মাতা রাণীমার আদেশে তাঁর বন্দী চাচা নসরউল্লাকে খুন করা হয়। সর্বত্র খবর রটলো, কফি খেয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

সংবাদদাতা বিলকুল ভুলে গেলেন মাত্র একটি সামান্যতম তথ্য পরিবেশন করতে। কফিতে ছিল সেঁকো বিষ।

এঁনারা এই সেঁকো বিষ অর্থাৎ কমিশনটির বাৎ বেবাক ভুলে যাচ্ছেন।

কত কমিশন পায় ? জানি নে। তবে বঙ্গসন্তানদের ধারণা ২৫% ৩০%-এর বেশী হবে না, কারণ বাঙলা পুস্তক বিক্রেতা সচরাচর এর বেশী পায় না (হালে জনৈক প্রখ্যাত পুস্তক-বিক্রেতা গুদোম সাফ করার জন্য শতকরা ৪০।৫০ দিচ্ছেন বলে—পাঠক পরম পরিতোষ পাবেন, ওর মধ্যে আমার বইও ছিল—বাঙলা বইয়ের বাজারে ধুন্ধুমার লেগে যায়)। তাই প্রশ্ন, যে-স্থলে বাঙালী প্রকাশক দু' হাজার বই ছাপিয়ে শতকরা ২৫।৩০ কমিশন দেয়, সে স্থলে মার্কিন ইংরেজ এক ঝটকায় পঞ্চাশ হাজার এক লক্ষ ছাপিয়ে কত দেয় ? কুইক টার্নঅভার নামক একটি বস্তুও আছে। শুনেছি এরা ষাট পার্সেণ্ট পর্যন্ত দেয়। আমি বলতে যাচ্ছিলুম আশী। তা বলবো না কেন ? তোমরা যখন এই জীবনমরণ ভাইটাল তত্ত্বটি চেপে যাচ্ছো। দেখাও না কাগজপত্র। আমি অবশ্য বিশ্বাস করবো না। তোমরা সব পারো।

ঈশ্বর সাক্ষী, স্বরাজ লাভের পর থেকে সরকার বিস্তর বিস্তর আইন পাস করেছেন—আমি চাঁদপানা মুখ করে সব সয়েছি, রা-টি কাড়িনি। কিন্তু সরকার যখন এই কমিশন ব্যাপারের গুহ্য, সযত্নে লুক্কায়িত কমিশন তত্ত্বটি জানতেন বলে হুকুম দিলেন, "বাপধনরা যখন দশ টাকার বই চার টাকায়

পাচ্ছো তখন আর লাভ করতে যেয়ো না, শিলিঙের দাম ১'০৫, এক পাঁচেই বেচো, কিনছো তো অষ্ট গণ্ডা পোহা দিয়ে—" তখন উল্লাসে নৃত্য করে উঠলুম। আহা হাহা হা! কী আনন্দ, কী আনন্দ!

সস্তায় বই পাবো বলে? মোটেই না। বই এমনিতে পাবো না, অমনিতেও পাবো না। ডিভ্যালুয়েশনের পূর্বেও পাইনি, এখনো পাবো না। শুনবেন, কেন? বছর দুই ধরে আমি ধন্না দিচ্ছি, কয়েকখানা ফরাসী ও জর্মন বইয়ের জন্য (হিটলারের জীবনীটি সম্পূর্ণ করবো বলে। যুদ্ধের কয়েকটা বছর বাদ দিলে ১৯৩৪ থেকে অবধি আমি এ-বিষয়ে বই কিনেছি—কয়েক হাজার টাকার)। সম্প্রতি কলকাতার বইয়ের বাজারে এক ঝাণ্ডু শ্রী—রায় (ইনি এম-এ, সুশিক্ষিত সুপণ্ডিত) আমাকে জানালেন, আমি যদি প্রত্যেক বইয়ের—অর্থাৎ একই বইয়ের—পাঁচখানা করে কপি কিনি (!), তবে বিলিতি বইয়ের বুকসেলার আমাকে আমার প্রার্থিত বই আনিয়ে দিতে পারবেন। তাঁর 'যুক্তি', একসঙ্গে পাঁচখানা বই না কিনলে বুকসেলার কমিশন পান না!

এ প্রস্তাবটি এমনই উন্মাদের বাতুলতা যে, কোনো পাঠকই এটা বিশ্বাস করবেন না। একই বইয়ের পাঁচখানা করে কপি নিয়ে আমি করবো কি? পঞ্চবীর-পতিগর্বিতা দ্রৌপদীর পাঁচটি স্বামীই যদি একই রবর স্ট্যাম্পের পঞ্চ-লাঞ্ছন, পাঁচ এ্যানকোর হতেন তবে তিনিও যে খুব সন্তুষ্ট হতেন না, অনুমান করা যায়। পাঁচ কেন, দুটো হলেই চিত্তির। আমার শোনা মতে এক রমণীর বিয়ে হয়, যমজ ভাইয়ের একজনের সঙ্গে। ভাশুর ভাদ্রবধূ উভয়ই সন্ত্রস্ত। শেষটায় সাবধানী ভাশুর আরম্ভ করলেন টিকিটিতে পুজোর সময় একটি জবা ফুল বেঁধে নিতে। শয্যায় পদ্মনাভকে স্মরণ না করা পর্যন্ত ক্ষণে ক্ষণে চৈতন-প্রত্যন্তে হাত বুলিয়ে চেক অপ করে নিতেন, ফুলটি স্থানচ্যুত হয়নি তো! কাহিনীটি শুনে 'ইন্দ্রজিৎ' শিব্রামীয় একখান 'পান' ছেড়ে মন্তব্য করলেন, "টিকিতে ফুল! তাহলে স্বামী নিয়ে fooling বন্ধ হল।"

পাঁচখানা বই—একই বই (পাঁচখানা ভিন্ন ভিন্ন বই নয়, যে-ব্যবস্থাতে তো আমি হরবকৎ রাজী)—না কিনলে নাকি বাবুরা কমিশন পান না!

তবে আইস পাঠক, শুন্বন্তু বিশ্বে—

কারণ বিশ্বজোড়া ছড়িয়ে-পড়া একটি মাসিক থেকে (জুলাই, ১৯৬৮) বিজ্ঞাপনটি তুলে দিচ্ছি:

"Published in England at Rupees 105·00 you have the chance of buying them (the book is in six volumes)—under our NO-RISK money-back guarantee for a mere Rs. 72·00—a saving of 30% on the published price."

অস্য বিগলিতার্থ—সাদামাটা খদ্দের হিসাবেই তুমি ৩০% কমিশন পাবে; এবে শুধোই—অনাথা, অবলা বিলিতি বুকসেলাররা কত পাবেন? যে দিশী কোম্পানি বোম্বায়ে বসে, বিলেত থেকে প্রাগুক্ত বই আনিয়ে এ-দেশে বিক্রি করছেন, তিনি বুঝি আলা খয়রাতি হাসপাতাল খুলেছেন। তা হলে সাধু!

সাধু !! সাধু !!!

বিস্ময়ে অধম নির্বাক ! তবু অতি কষ্টে ক্ষীণ কণ্ঠে চিঁ চিঁ করে বলছি, অবিশ্বাস্য, অবিশ্বাস্য, স্বপ্ন নু মায়া নু মতিভ্রম নু—আপনাকে শ্রীরায়ের তম্বী. মাফিক একই বইয়ের পঞ্চগব্য খেতে হবে না,—হল না—পাঁচ ঢ্যালা গোবর খেতে হবে না—একই বইয়ের পাঁচ কপি কিনতে হবে না।

এস্থলে আরেকটি নিবেদন—বিলিতি পুস্তক-বিক্রেতার বিরুদ্ধে আমার পুঞ্জীভূত বহুবিধ আক্রোশ আছে, গত পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে জমে উঠেছে ঘোরতর বিতৃষ্ণা এবং আমি তাই আদৌ নিরপেক্ষ নই, আমি প্রাইভেট এবং পাবলিক প্রসিকিউটর উভয়ই—দিশী পুস্তক বিক্রেতা ২৫% কমিশন পেয়ে, রোক্কা টাকা ঢেলে বই কিনে নিয়ে যায় আপন রিস্‌কে ; সে-বই বিক্রি না হলে তার পুরোপুরি সমুচিত লোকসান। প্রকাশক বই ফেরত নেবে না। বিলিতি বাবুরা অর্ডার নিয়ে, কোনো কোনো স্থলে পুরো দাম বায়না পকেটস্থ করে বইয়ের জন্য বিদেশে অর্ডার দেন। সিকি কানাকড়ির রিস্‌ক নেই। এ যে কত বড় ঈশ্বর-প্রতিশ্রুত স্বর্গরাজ্য সে জানে বিক্রেতা।

* * *

এবারে একটি ব্যক্তিগত নিবেদন ; একমাত্র তাঁদেরই উদ্দেশে—যাঁরা আমার অক্ষম লেখনীপ্রসূত মন্দ-ভালো পড়েন। তাঁরাই বলুন, এই যে প্রায় কুড়ি বৎসর ধরে আমি লিখছি, কখনো দলাদলিতে ঢুকেছি ? কখনো কাউকে আক্রমণ করেছি ? এমন কি আমি যখন আক্রান্ত হয়েছি, তখন আত্মপক্ষ সমর্থন করেছি ? হ্যাঁ, দু'একবার বাদ-প্রতিবাদে নেমেছি, যখন দেখেছি কোনো নিরীহ, বেকসুর, অখ্যাত লেখক আক্রান্ত হয়েছেন কোনো 'বুলি' দ্বারা, যিনি তাঁর নামের পিছনে জুড়ে দিয়েছেন তাঁর সবকটা ডিগ্রীর ফিরিস্তি যাতে করে সাধারণ পাঠক, প্রাগুক্ত নিরীহ লেখক এবং সম্পাদক স্তম্ভিত, বিস্মিত এবং সর্বোপরি আতঙ্কিত হন—সেই নিরীহের পক্ষ সমর্থন করে। তখন সেই ফিরিস্তি-পুচ্ছধারী হামলা করেছেন আমার প্রতি। আমি তদ্দণ্ডেই নিরুদ্দেশ, কারণ, আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করার কোনো প্রয়োজনবোধ করিনি, সেকথা পূর্বেই সবিনয় নিবেদন করেছি। ইতিমধ্যে সেই নিরীহ কিছুটা সান্ত্বনা পেল যে এ-দুনিয়ায় অন্তত আরেকটা মূর্খ আছে, যে তার মতে সায় দেয়।

কেন নামিনি ? আমার কলমে বিষ নেই ?

কিন্তু এবারে নামতে হল। ১৯২১ সালে যখন সর্বপ্রথম জর্মন ফরাসী পাঠ্যপুস্তক কিনতে গিয়েছি, তখন বিলিতি বই বিক্রি করতো শুধু বিলিতিরা, এবং তারা কান পাকড়কে নিয়েছে ঢালাও হিসেবে এক শিলিঙের জন্য এক টাকা। তখন বোধ হয় শিলিঙের দাম ছিল দশ আনা। এটা নিশ্চয়ই 'দুর্নীতি' নয়। সেই সবল বিপ্রসন্তান বলেছেন, 'এতদিন পর্যন্ত বই এর ব্যবসার মধ্যে দুর্নীতি ছিল না বললেই হয়।' মোক্ষম তত্ত্ব এবং তথ্য। কারণ সে যুগে, এবং এই পশ্চাদ্দিন তক সরকার পুস্তকের ব্যাপারে কোনো নিরিখ, প্রাইস-শেডুল বা কেনা-বেচার সময় এক শিলিঙের জন্য কত ভারতীয় মুদ্রা নেবে তার কোনো

আইন করে দেননি (controlled price)। কাজেই 'দুর্নীতির' কোনো প্রশ্নই ওঠেনি। কিন্তু সাধারণ গেরস্ত এ নীতিটি মানবে কি? তুলনা দিয়ে শুধোই, আজ মাছের বাজারে আর কন্ট্রোল নেই; মাছওলা যদি কাদা চিংড়ির জন্য ১০ টাকা কিলো চায় তবে তো সেটা 'দুর্নীতি' নয়—মানবে গেরস্ত? দমদমা তো মানছে না। তাদের উপর এ-বৃদ্ধের আশীর্বাদ রইল।

তখন কলকাতায়, বিলিতি বইয়ের ব্যবসাতে প্রাক্তন 'সুনীতিতে' টেটম্বুর টাকার হরিলুট দেখে সে-বাজারে নাবলেন 'লেটিভ'রা।

কিন্তু সেই ১৯২১ থেকে -র ইতিহাস লিখতে হলে তো এক কিস্তিতে হবে না। তবে লিখব।[৪]

এ-সুবাদে সদাশয় সরকারকে আবার বলি তোমার রেশনের চাল অখাদ্য, তুমি ভেজাল কালোবাজার ঠেকাতে পারছো না, বিদেশ গিয়ে দু'মাসের জন্য রিসার্চ করে আমার দু'খানা বই শেষ করার জন্য কুল্যে দু হাজার মার্ক চেয়েছিলুম তুমি দাওনি, বিদেশী বই কেনার জন্য তুমি ক্রমাগত একসচেঞ্জ কমাচ্ছো (এবং যা দিচ্ছো সেও ছুতোর-কামারের টেকনিকাল বই আর পাঠ্য পুস্তকের জন্য—আমার কাজে লাগে না), ফলে মৃত্যুর পূর্বে আমাকে তুমি বিদেশী বইয়ের দুর্ভিক্ষ লাগিয়ে অন্নহীনবৎ মারছো—আমি রত্তিভর প্রতিবাদ করিনি, করছি না, করবোও না। কিন্তু তুমি যে সেই বিদেশী বইয়ের দাম কন্ট্রোল করছো, তার জন্য আমি তোমাকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করি। শঙ্কর তোমাকে জয়যুক্ত করুন।

ভেবো না আমি স্বার্থপর। আমি বই পাবো না, এমনিতে না, অমনিতেও না। তুমি অঢেল হার্ড কারেন্সি ছেড়ে দিলেও না, না ছেড়ে দিলেও না। কেন, তার ইঙ্গিত বক্ষ্যমানে দিয়েছি। বারান্তরে সবিস্তর।

হায়! কোথায় সেই কুটির আর সামনের সুদীর্ঘ পপলার গাছ! সরকার না একবার বলেছিলেন, তাঁরা কালোবাজারীদের ল্যাম্পপোস্টে ঝোলাবেন! পপলার গাছ অনেক ভালো। অনেক দূর থেকে দেখা যায়।

হ্যাঁ, আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল। যদ্যপি আমি বৃদ্ধ এবং শঙ্কর খেদ করেন, 'বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্ন' আমি কিন্তু 'তরুণে আরক্ত'। তাদের প্রতি এই সুবাদে একটি সদুপদেশ দিই; দুষ্টেরা তোমাদের বিদেশী ভাষা শেখার জন্য উপদেশ দেবে; সরল কনস্যুলেটগুলো তার জন্য ব্যবস্থা করবে এবং করছে।

---

৪ এস্থলে নিবেদন, বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা তথা দুর্বলতাবশত আমাকে মাঝে মাঝে পত্রিকায় 'পঞ্চতন্ত্র' বন্ধ করতে হয়। সাতিশয় শ্লাঘা সহকারে স্বীকার করছি তখন কোনো কোনো পাঠক সম্পাদকও আমার কাছে কৈফিয়ত চেয়ে কখনো মিঠে কখনো কড়া চিঠি লেখেন। (যে সব বিচক্ষণ জন আমার লেখা অপছন্দ করেন, তাদের সান্ত্বনার্থে বলি, I am a fool; এবং প্রবাদ আছে "One fool raiseth a hundred")। কাজেই পরের কিস্তির গ্যারাণ্টী দিতে পারি না বলে আমি সন্তপ্ত।

কিন্তু অমন কম্মটি কোরো না। বিদেশী বই না কিনতে পারলে বিদেশী ভাষা শিখে তোমার লাভ? এ যেন একগোচ্ছা চাবি নিয়ে বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছ—সিন্দুক কিন্তু একটাও নেই! এ যেন রশি নিয়ে হাওয়ার কোমর বাঁধার মত বন্ধ্যাগমন? এবং পারলে বাঙলাটাও শিখবে না। বলা তো যায় না, সে-বাজারেও কোনদিন কি হয় না হয়! হয়তো একই বই পাঁচ কপি কেনবার বায়নাক্কা বাঙলা পুস্তক বিক্রেতাও করবেন এবং—অথবা পাঁচ টাকার বইয়ের জন্য সাত টাকা চাইবেন। আগের থেকে সাবধান হওয়া বিচক্ষণের কর্ম। কেন, নিরক্ষরদের দিন কাটে না এদেশে? টিপসই দিয়ে চালাবে।

আমি ভালো করেই জানি, এ প্রবন্ধ ইংরিজিতে লিখলে ধুন্ধুমার লেগে যেত। কারণ, তাহলে হয়তো বিদেশী পুস্তক বিক্রেতাদের চাঁই, বোম্বাইবাসী শ্রীল শ্রীযুক্ত সদানন্দ বিটকল এটি পড়তেন (শুনেছি, বোম্বাইওয়ালারা নাকি এ বাবদে কলকাতাকে কল্কে দেয় না—বড় আনন্দ হল)। যাঁরা বাঙলা জানেন, তাঁরা যদি হুহুঙ্কার সচিৎকার 'যুদ্ধং দেহি' রব ছেড়ে আসরে নামেন তবে আমি প্রস্তুত।

শুধু দয়া করে পরের হাত দিয়ে তামাক খাবেন না।[৫]

সুপণ্ডিত বিপ্রসন্তানকে ডোবাবেন না। অবশ্য তাঁর যদি ব্যবসাতে শেয়ার থাকে তো আলাদা কথা। আমার বিশ্বাস তাঁর নেই।

আর সরকার যদি শেষটায় কণ্ট্রোল তুলে নেন—মাছের বেলা যা হয়েছে—তা হলে আম্মো শেয়ারের সন্ধানে বেরুব। টাকা নিয়ে কথা, মশাই। তার আবার সুনীতি দুর্নীতি কি?

ঝুলবই না হয় একদিন পপলারের মগডালে। ক্রুশবিদ্ধ ক্রাইস্টের দুদিকে আরো কে যেন দুজন ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল।

হাতে কমণ্ডলু, মাথায় তুর্কী টুপি

প্রবাসের লোক বড়ই অনাড়ম্বর। তাই স্যুটের বড়ফাট্টাই নিয়ে সেখানে মস্করা জমে ভালো।

স্যুট বাবদে একদা মহামুশকিলে পড়েছিলেন লর্ড কার্জন।

আমি জানি আমার নগণ্যতম—অর্থাৎ আমার প্রিয়তম পাঠকও প্রত্যয় যাবেন না যে, লর্ড কার্জনের মত বিলেতের খানদানী পরিবারের নিকষ্যি কুলীন

---

৫ যেসব ভারতীয় বিদেশী বইয়ের ব্যবসা করেন, তাঁদের সম্বন্ধে একটি আপ্ত বাক্য প্রযোজ্য। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে এসেছেন এক সদ্য বিলেত-ফের্তা—ইভনিং জ্যাকেট, বয়েলড শার্ট পরে। অতি কষ্টে পিঁড়িতে বসতে বসতে বললেন, 'মুশকিল, বাঙলাটা ভুলিয়া গেইছি।' রবিঠাকুর নাকি শুনে বললেন, 'সত্যি মুশকিল হে ভড়, ইংরিজিটাও শিখলে না; বাঙলাটাও ভুলে গেলে!'

স্যুটের মত ডালভাত—সরি, আই মীন বেকন-আণ্ডা—নিয়ে গর্দিশে পড়তে পারেন। টাকাকড়ির অভাব এমনিতেই ছিল না, তদুপরি বিয়ে করেছিলেন মার্কিন কোটিপতির দুহিতা—নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়িতে আসার সময় (আবার ভুল করলুম, মার্কিনিংরেজ মেয়ে শাদি করে শ্বশুরবাড়ি যায় না, স্বামীকে সেখান থেকে ছোঁ মেরে শিকার করে ঘর বাঁধে অন্য মোকামে) পিতাকে উত্তমরূপে দোহন করেই এসেছিলেন। তাই স্বীকার করে নিচ্ছি গল্পটি অন্য কারো বাবদে হতে পারে এবং ডিটেলে ভুল থাকবে এস্তের। কিন্তু আমার নিপীড়িত কর্মক্লান্ত স্মৃতিশক্তি তবু যেন ক্ষীণ কণ্ঠে বার বার অভিমানভরে বলছে, এটা লর্ড কার্জন অব্ কিডলস্টনেরই কাহিনী—কার্জনের মুসলমান-প্রীতি দেখে অনেকেই বলতেন লর্ড কার্জন অব্ খিদিলস্তান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুর্কীকে কচুকাটা করা হল সেভ্র্-এর সন্ধিচুক্তিতে (তখনই এ-দেশে খেলাফত আন্দোলনের দানা বাঁধে), কিন্তু ঐ সময় উদয় হল মুস্তফা কামাল পাশার, (পরে আতা তুরক) এবং তিনি সে সন্ধিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে খেদিয়ে বার করে দিলেন গ্রীকদের তুর্কী থেকে। তখন আবার নয়া করে সন্ধিপত্র তৈরী করতে হবে। ইউরোপময় হাহাকাররব উঠেছে, 'বর্বর' মুসলমান তুর্ক 'সুসভ্য' খ্রীষ্টান গ্রীকদের তাড়িয়ে দিয়েছে তার 'হক্কের' (বে-) দখলী জমি থেকে- নূতন সন্ধিতে এটা মানা চলবে না (ফ্যাতাঁক'প্লি নয়)। তাই নয়া সন্ধিটা যাতে চোস্ত-দুরস্ত হয় সেজন্য লজান বৈঠকে পাঠানো হল তামাম ইওরোপের কুটিলস্য কৌটিল্য মহামান্য কার্জনকে।

গণ্ডা দশেক স্যুটকেশ ট্রাঙ্ক নিয়ে নামলেন পরমপ্রতাপান্বিত কার্জন লজান শহরে। দুনিয়ার রিপোর্টার জড় হয়েছে তাঁর অবতরণভূমিতে।

মালপত্র যখন নামছে তখন দেখা গেল, সেই বাষট্টি ভাজা লগেজের সঙ্গে আলাদা করে অতি সন্তর্পণে নামানো হল একখানি ছোট্ট ফুট-স্টুল—লর্ড কার্জন মিটিং-মাটিং সর্বত্রই এই জিনিসটির উপর পা না রেখে দু'দণ্ড বসতে পারেন না। ঐটে দেখা মাত্রই এক ঠোঁট-কাটা ফরাসী সাংবাদিক টিপ্পনী কাটলে—"ভোয়ালা ল্য ত্রোন দ্য দামা!" (Voila le trone de Damas!) —"ঐ হেরো, দামাস্কাসের সিংহাসন"—অর্থাৎ নয়া মাহমুদ কার্জনের 'চলচৌকি, পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন নগর (স্থান পরিবর্তন না করে একটানা এক জায়গায় আছে) দমস্কের সমতুল্য।...তা সে যাক্ গে, এটা ঈষৎ অবান্তর।

তুর্কীর পক্ষ থেকে এসেছেন জেনারেল ইসমেৎ পাশা (পরে প্রেসিডেন্ট ইনেনু)।

জোর কনফারেন্স, জোরালো উপ-কনফারেন্স, সাবকমিটি আরো কত কী। কার্জন বজ্রনির্ঘোষে—থানডারিং—লেকচার ঝাড়লেন টেবিল থাবড়ে। ইসমেৎ দিব্য ইংরিজি বোঝেন,—ভান করলেন বোঝেন না, তদুপরি তিনি কানে খাটো। থানডারিং লেকচারের প্রতিটি তাঁর কানের কাছে অনুবাদ করে দিতে হয়—গণ্ডার ততক্ষণে ঠাণ্ডা। গরমাগরম উত্তর দিতে হল। সেপাই ইসমেৎ

পারবেন কেন অরেটর কার্জনের সঙ্গে ? তবু চললো লড়াই।[১]

সন্ধ্যেবেলা এঁরা সবাই একটুখানি আমোদ-আহ্লাদ করে নিতেন। আজ এখানে ডিনার, কাল সেখানে ডান্স, পরশু জীনিভা হ্রদে নৈশভ্রমণ।

এক সন্ধ্যায় কার্জনের ভ্যালে তাঁকে যথারীতি অত্যুত্তম ডিনার স্যুট পরিয়ে দিয়ে, সাদা বো-টি নিখুঁত বেধে দিলে পর সদাশয় লর্ড বললেন, "আজ আর তুমি আমার জন্যে জেগে থেকো না ; ফিরতে অনেক রাত হবে। আমি কোনো রকমে ম্যানেজ করে নেবো'খন।" এ যে কত বিরাট সদাশয়তা সেটা সাধারণ পাঠক বুঝতে পারবেন না। এসব লর্ডরা ভ্যালে-র সাহায্য বিনা জামা-কাপড় পরতে তো পারেনই না—আর বো বাঁধার বেলা তো ৯৯% স্রেফ ঘায়েল—ছাড়তে পর্যন্ত পারেন না।

ভ্যালেটি ছিল কার্জনের চেয়েও খানদানী—অবশ্য তার আপন ভ্যালে সম্প্রদায়ে। বো বাঁধাতে তার ছিল বিশ্ব রেকর্ড। ১১ সেকেন্ডে সে যা বো বাঁধতো, মনে হত, একদম মেশিনে তৈরী, রেডিমেড বো। অন্য লোক এ স্থলে সে সন্দেহ এড়াবার জন্য বো-টি একটু ট্যারচা করে নেয়। খানদানী কার্জনের বেলা অবশ্য এ সন্দেহ করতে যাবে কে ? বহু বৎসর পরে হিটলারের ভ্যালে লিঙে এর কাছাকাছি অর্থাৎ ১২ সেকেন্ডে আসতে পেরেছিলেন। লিঙে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, হিটলার প্রতিবার চোখ বন্ধ করে এক, দুই গুনতেন এবং লিঙের বো বাঁধা হলে সোল্লাসে বলতেন, "লিঙে, এবার কেল্লা ফতে করেছ —মাত্র বারো সেকেন্ড !"···উপস্থিত এ বো অনুচ্ছেদ থাক।

কার্জন তো গেলেন ব্যানকুয়েটে wined and dined হতে—সঙ্গে 'ত্রোন দ্য দামা' বা 'দিমিশ্কের ময়ূর সিংহাসন বগলে করে নিয়ে গিয়েছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে ইংরেজী এন্সাইক্লপীডিয়া, ফরাসী লিত্রে, জর্মন ব্রকহাউস—চরম পরিতাপের বিষয়—সবাই নীরব। বিবেচনা করি নিমন্ত্রণ-কর্তাই সেটি সাপ্লাই করেছিলেন। কিন্তু সে রাত্রে কিসে যেন কি হয়ে গেল, কার্জন অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন এবং রাত দশটা-এগারোটার মধ্যেই হোটেলে ফিরে এলেন।

হোটেলে ঢুকতেই দেখেন বিরাট হল জুড়ে লেগেছে ধুন্ধুমার নৃত্য—সে রাত্রে সে হোটেলে ছিল গ্যালা ড্যান্স। তারই এক পাশ দিয়ে পেরিয়ে গিয়ে তাঁকে উঠতে হবে লিফ্টে। যেতে যেতে হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন—কে ঐ লোকটি ? বড্ডই যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। উৎকৃষ্টতম স্টাইলের নিখুঁত ফুল ডিনার-ড্রেস পরে সাতিশয় রুচিসম্মত পদ্ধতিতে নাচছে একটি সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া যুবতীর সঙ্গে।

সর্বনাশ ! ও গড ! ! এ যে তাঁরই ভ্যালে !! নাচছে তাঁরই ঈভনিং

১ কার্জন-ইসমেতের দ্বন্দ্বযুদ্ধে ইসমেতের শেষ পর্যন্ত নিরঙ্কুশ জয় হলে পর সাংবাদিকরা তাঁকে অভিনন্দন জানাতে আসেন। অতিশয় সবিনয় তিনি নিবেদন করেন, "না, না, আমার আর কী কীর্তি ! আমি কালা—আল্লাকে অসংখ্য শোকরীয়া ধন্যবাদ।"

ড্রেস পরে।

আহা, সদয় সহৃদয় পাঠক, তুমিও আমার সঙ্গে সবেদন কণ্ঠ যোগ দিয়ে বলবে, আহা, বেচারী ভেবেছিল কত্তার ফিরতে যখন দেরি হবে তখন সে-ই বা দু'চক্কর নেচে নেয় না কেন?

কিন্তু এ যে ডবল মহাপাপ—খাস বিলেতে নিশ্চয়ই, এ স্থলে ডবল ফাঁসির চেয়েও কড়া আইন আছে।

তুলনা দিয়ে কি প্রকারে বোঝাই? কোনো নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ যদি হঠাৎ কোন এক পরিচিতের বাড়িতে গিয়ে দেখেন তাঁরই এক চেনা চাঁড়াল তাঁরই গরদ পরে বামুন সেজে পুজোর ঘণ্টা বাজিয়ে ধুমধাম লাগিয়েছে আর বউ-ঝিরা তাকে ঢিপঢিপ করে পেন্নাম করছে তা হলে তাঁর মনের অবস্থাটা কোন্ রস দিয়ে বর্ণাতে হয়?

* * *

কার্জন হুকুম জারি করলেন, ব্যাটাকে যেন অতি ভোরের ট্রেনে চাপিয়ে দেওয়া হয়—নাক বরাবর লণ্ডন। একটা ঠিকে ভ্যালে যেন তদ্দণ্ডেই যোগাড় করা হয়।

এখানেই শেষ? আদৌ না। এ তো সবে শুরু।

পরদিন সকালে কার্জন খাটে শুয়ে শুয়ে দেখেন, ঠিকে ভ্যালে ওয়ার্ডরোবের দরজা খুলে তার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঘাড় চুলকোচ্ছে। অচেনা, নয়া ঠিকে—কার্জনও দরদী-দিল আদমী শুধোলেন, "কি হল?"

কাঁচুমাচু হয়ে বললে, "হুজুর, সঠিক ঠাহর হচ্ছে না। পাতলুনগুলো গেল কোথায়!"

লম্ফ মেরে কার্জন গিয়ে দেখেন, সত্যিই তো পাতলুনগুলো গেল কোথায়? আছে বটে অনেকগুলো, কিন্তু স্ট্রাইপ্‌ট্ অর্থাৎ ডোরাকাটা পাতলুনগুলো কোথায়? সেগুলোর যে এক জোড়াও নেই। আর সেই পরেই তো তিনি যাবেন দুপুরের কনফারেন্সে। খাঁটি ফুল মর্নিং ড্রেস। সামনের দিকে ট্যারচা করে কাটা হাঁটুঝুল কোট, সেই কাপড়েরই তৈরী ম্যাচ করা কিংবা ফেনসি ওয়াস-কিট—এই ওয়াসকিটেই সাদা পাইপিং লাগাবেন কিনা তাই নিয়ে জীবনমরণ সমস্যায় পড়েছিলেন আমার সুবন্ধু স্যার সিরিল হবজন-জবসন ফর্বস-রবার্টসন লণ্ডনে—এবং তাঁর সঙ্গে সাদায় কালোয়, কিংবা ঈষৎ ধূসর রঙের ডোরাকাটা স্ট্রাইপ্‌ট্ ট্রাউজারজ—তার তো কোন চিহ্নই নেই।

সর্বনাশ! এখন উপায়?

গাঁইয়া পাঠক—যতই ধানাইপানাই করি না কেন, আম্মো এখনো তাই—তুমি বলবে, কেন অন্য পাতলুন পরে গেলে হয় না? নিশ্চয়ই হয়। যান না আপনি নিচে কম্পিন, উপরে দুশালা-শাল, মাথায় তুর্কী টুপি, হাতে কমণ্ডলু নিয়ে আধুনিকদের ব্যুফে লানচ পার্টিতে টালিউডে—কে বারণ করছে? সে কথা থাক।

কিন্তু ব্যাটা ভ্যালের চুরি করারই যদি মতলব ছিল তবে কোর্ট-ওয়েসকিট

ম্যাচিং-টাই-কলার পেটেন্ট-লেদার জুতো মায় স্প্যাটস এগুলো ফেলে গেল কেন? এস্তেক ডাইমণ্ড পিনও যথাস্থানে রয়েছে। উঁহু, তা নয়। নিশ্চয়ই সুধমাত্র তাঁকে রাম-ইডিয়েট বানাবার জন্য।

ঝাড়ো টেলিগ্রাফ। পাকড়ো রাসকেলকো কঁহী ভী হোয় টেরেন্ মে—চাহে প্যারিস, চাহে লনদন!

সে না-হয় হল। কার্জনের রোআবে বাঘের দুধের অর্ডার আকছারই যায় টেলিগ্রামে।

কিন্তু স্ট্রাইপ্‌ট্ ট্রাউজারজ তো আর বাঘের দুধ নয়, বাঘিনীর দুধও নয়। আপাতক সে বস্তু মেলে কোথা? ওদিকে প্লেনারি কনফারেন্সের সময় যে ঘনিয়ে আসছে। হে ভগবান! প্রতি মুহূর্তের এ কী গন্ধযন্ত্রণা!

* * *

এমন সময় করিডোরে শতকণ্ঠে বাইশটে ভাষায় চিৎকার হই-হুল্লোড়।

পাওয়া গেছে! পাওয়া গেছে! কোথায়? কোথায়?

যে মেয়েটি ভ্যালে, চাকরবাকরদের কুটুরিগুলোতে তাদের বিছানাপত্র ঝেড়ে-ঝুড়ে দেয়, সে কার্জনের ভ্যালের তোশক ঝাড়তে গিয়ে দেখে তার নিচে পরিপাটিরূপে টান-টান করে সাজানো চার জোড়া স্ট্রাইপ্‌ট্ পাতলুন। আমরা, গরীব দুঃখীরা যাদের বাধ্য হয়ে মাঝেমধ্যে স্যুট পরতে হয়, তারা জানি, পাতলুনের ক্রীজ দুরস্ত করার জন্য এর চেয়ে মহত্তর মুষ্টিযোগ নেই।

কিন্তু সর্বজ্ঞ কার্জনের সেদিন নবীন জ্ঞানসঞ্চয় হল॥[২]

ভূতের মুখে রাম নাম

যে-কোনো ভদ্রসন্তান স্তম্ভিত হবে। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ঝাড়া দশটি মিনিট গা-গা রব ছাড়বে। অপেক্ষাকৃত রোগাপটকা ভিরমি যাবে। খবরটা এমনই অবিশ্বাস্য।

মানুষের তৈরী বেঙ্গল ফ্যামিনের সময় এক অজানা কবি রচেন,

দেখো না আজব হ্যায়,
এ হেন ভূতের পায়
স্বস্তিবাচন
করা নিবেদন।
এ যেন প্রেতের গায়
উম্‌দা উম্‌দা আতর মাখানো ভুরভুরে খুশবায়।
এ যেন দুখিনী মায়
Amerya র কাছে শিশুটির তরে
ভিক্ষার চাল চায়।

২ কাহিনীটি যিনি আমাকে সর্বপ্রথম বলেন তাঁর মতে লিটন স্ট্রেচিই নাকি ইটি সঙ্কলের পয়লা লিপিবদ্ধ করেন। আমি ভিন্ন ভিন্ন কীর্তন শুনেছি।

খবরটা এর চেয়েও বিৎকুটে।

ফ্রান্সের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ফ্লোবেরের[১] বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস মাদাম বভারি ফ্রান্সে এখন থেকে ছাপা যাবে, বেচা যাবে বটে কিন্তু বিজ্ঞাপন দেওয়া তথা বইয়ের দোকানে পেটি রেখে খদ্দের আকৃষ্ট করা বেআইনি!

কেন?

বইখানা এ্যামরাল, ইমরাল (immoral) অর্থাৎ দুর্নীতিপূর্ণ, এক কথায় অশ্লীল। বইখানা লিখতে ফ্লোবেরের লেগেছিল পূর্ণ চারটি বৎসর—কিঞ্চিৎ অধিক—১৮৫২ থেকে ১৮৫৬। প্লটটি নিয়ে চিন্তা করেছিলেন তার পূর্বে তিনটি বৎসর। এই ছোট বইখানা লিখতে ফ্লোবারের এতখানি সময় লাগলো কেন? তার প্রথম কারণ, তিনি ছিলেন মাত্রাধিক পিটাপিটে পারফেক্শনিস্ট। বাস্তব জগতের পরিবেশ যেমন তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন, (অন্য উপন্যাসে একটি রোমান ভোজের নিখুঁত বর্ণনা দেবার জন্য তিনি নাকি প্রাচীন ক্ল্যাসিক্স ঘাঁটেন—কেউ বলে ছ'মাস, কেউ বলে দু'বছর)[২] ঠিক তেমনি তাঁর স্বপ্নলোক কাগজকলমে মৃন্ময় করার সময় তিনি চাইতেন সেটা যেন বাস্তবের চেয়েও বাস্তব হয়, এবং সর্বশেষ প্রত্যেকটি বাক্য, প্রত্যেকটি সেন্টেন্স যতক্ষণ না তার নিখুঁত ভারসাম্য পায়, তার প্রত্যেকটি শব্দ অন্য শব্দগুলোর সঙ্গে মিলে গিয়ে যতক্ষণ না উন্নয়নাতীত হয়, নিটোল সুডোল না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি পরের সেন্টেন্সে যেতেন না, কিংবা বলবো, যেতে পারতেন না, যেন আগের সেন্টেন্স্ তাঁকে জোর করে আঁকড়ে ধরে বলছে, 'আমাকে পরিপূর্ণতায় পেঁছে দিয়ে তবে তুমি এগোও।'

এমন দিন বহুবার গেছে, যে দিন ফ্লোবের মাত্র একটি ছত্রের বেশী লিখতে পারেননি! এটা কিংবদন্তী নয়। নইলে চারশ' পাতার বই লিখতে চারটি বৎসর লাগবার কথা নয়। এবং স্মরণ রাখা উচিত, 'ফ্লোবের যখন কোনো বই লিখতে আরম্ভ করতেন, তখন সেইটে নিয়েই অষ্টপ্রহর মেতে থাকতেন। পেটের ধান্দা তাঁর ছিল না, তাঁর দেখভাল করার জন্য লোকের অভাব ছিল না, তিনি চিরকুমার, প্রতিদিন নিয়মিতভাবে লেখার টেবিলে বসতেন, বাড়ি ছেড়ে পারতপক্ষে রাস্তায় পর্যন্ত নামতেন না, অথচ চল্লিশ বৎসর সাধনার ফলস্বরূপ তিনি লিখেছেন মাত্র খান-আষ্টেক বই।

---

১ উচ্চারণ ফ্লো, তার পর ব্যার। ফ্লোব্যার লিখলে সাধারণ বাঙালী ফ্লোব্ব্যার পড়ে বসতে পারে; সেটা হবে ভুল। ঐটে বাঁচাবার জন্য পূর্বসূরিগণ লিখতেন ফ্লোবেয়ার বা ফ্লোবের।

২ এদেশের উপন্যাসে প্রায়ই পড়ি, বিলিতি বড়সাহেব বা বিলেতফের্তা ন'সিকে এটিকেট-দুরস্ত সাহেব 'জুতো মস্ মস্ করে চলে গেলেন।' জুতো জোড়া মস্ মস্ করলে এদেশের ট্যাঁশসাহেবও সেটা ভেজাছালার উপর রাতভর পেতে রাখে। সামান্যতম মস্ করলেও বন্ধুজন মস্করা করে বলে, 'দাম দাওনি বুঝি! বেচারী যে চিৎকার করে করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।'

মোটামুটি ভালো বই হলেই আমরা সেটাকে বলি 'রসোত্তীর্ণ', খেয়াল না করেই বলি 'পীস অব আর্ট', কিন্তু সত্য সত্য যদি কোনো একখানি বইকে শব্দার্থে পীস অব আর্ট বলতে হয় তবে সে মাদাম বভারি। এর সর্বোৎকৃষ্ট পরিচিতি লিখেছেন ফ্লোবেরের পুত্রপ্রতিম প্রিয়শিষ্য মোপাসাঁ। তাঁর ভুবন-বিখ্যাত 'নেকলেস' গল্পে পাঠক ফ্লোবেরের প্রভাব দেখতে পাবেন। বস্তুত বভারি বেরুবার পর সে-যুগের ফরাসী কৃতী লেখকদের বড় কেউই এর প্রভাব থেকে নিষ্কৃতি পাননি। একমাত্র এরকম বইকেই পীস অব আর্ট বলা চলে। সিপাহী বিদ্রোহের বছরে এই 'কাব্য' প্রকাশিত হয়—আজো নবীন লেখক নবীন পাঠক এ-পুস্তকের শরণ নেন।

মোপাসাঁ তাঁর গুরু সম্বন্ধে দু'টি প্রবন্ধ লিখেছেন। আজো যাঁরা ফ্লোবের নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা এ দু'টি প্রবন্ধের বরাত না দিয়ে পারেন না।[৩]

---

৩ প্রবন্ধ দুটি বেরোয় মোপাসাঁর চিঠি-চাপাটির (করেস্পঁদাস্) সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাকারে। এ-পুস্তকে পাঠক পাবেন মোপাসাঁর অন্যান্য রচনা সংগ্রহ। গল্প-লেখক মোপাসাঁর খ্যাতি 'ব্যাল্ ল্যাংরিস্ং' ('রম্যরচনা' তথা প্রবন্ধ-লেখক) মোপাসাঁকে এমনই ম্লান করে দিয়েছে যে, ফ্রান্সের বাইরে কেউ মোপাসাঁর এসব লেখার সন্ধান বড় একটা করে না। এ পুস্তকে পাঠক পাবেন, বালজাক, জোলা, তুর্গেনিফ (একাধিক), সুইনবার্ন এবং অন্যান্য সম্বন্ধে প্রামাণিক প্রবন্ধ। এবং সব চেয়ে কৌতূহল-উদ্দীপক—পাঠক এতে পাবেন, মোপাসাঁ কোন্ আকস্মিক যোগাযোগের ফলে কথাসাহিত্যে প্রবেশ করেন। জোলার গ্রামের বাড়িতে একদিন গল্প বলার আর্ট, এবং সে আর্টের রাজা তুর্গেনিফ ও মেরিমে (চারু বাঁড়ুয্যে এঁর বই 'কলবাঁ' 'আগুনের ফুলকি' নাম দিয়ে প্রায় ৪৫ বৎসর হল অনুবাদ করেন,) সম্বন্ধে কথা উঠলে জোলা প্রস্তাব করেন, সে-মজলিশের সবাইকে একটি একটি করে গল্প বলতে হবে। গল্প বলেন জোলা, হ্যোসমান্স সেআর, এনিক এবং সব চেয়ে বড় কথা মোপাসাঁ স্বয়ং। সেই তাঁর প্রথম গল্প। সেটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় অন্যান্য গল্প-লেখকদের রচনাবলী সংগ্রহের সঙ্গে। যেহেতু জোলার বাড়ি মেদাঁতে গল্পগুলো বলা হয়, চয়নিকার নাম হয় 'মেদাঁর সোয়ারে'। সঙ্গে সঙ্গে রাতারাতি মোপাসাঁ ফ্রান্সে বিখ্যাত হয়ে যান। ফ্লোবের তখনো বেঁচে। আন্তরিক অভিনন্দন ও অকুণ্ঠ প্রশংসা জানালেন তরুণ লেখককে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, জোলার চাপে না পড়লে কি হত! কারণ এর পূর্বে মোপাসাঁ নিজেই জানতেন না, কথাসাহিত্যে তিনি কী অভূতপূর্ব সৃজনীশক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মোপাসাঁর চিঠি-চাপাটি ও প্রবন্ধাবলীর পরিচয় আমি অন্যত্র অতি সংক্ষেপে দিয়েছি। এ বাবদে দু'টি সংকলন আছে এবং যেহেতু এ-দুটির ইংরিজি অনুবাদ আমার চোখে পড়েনি, তাই পুনরুল্লেখ প্রয়োজন বোধ করি:

* 1. Rene Dumesnil, chroniques, Etudes, Correspondance de Guy de Maupassant, publiees pour la premiere fois

এ ছাড়াও তিনি কাগজে-কলমে ফ্লোবেরের মৃত্যুর পর তাঁর হয়ে একাধিক লড়াই দিয়েছেন। এসব উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আইস, পাঠক, প্যারিস যাই।

কিন্তু প্যারিসের বর্ণনা দেবার মত কোথায় আমার বীর্যবল, কীই বা অধিকার! তাই আমার যেটুকু দরকার সেটুকু নিবেদন করি।

সেই ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে প্যারিস যত না কাজ করেছে তার চেয়ে বেশী চেঁচিয়ে দুনিয়া ফাটিয়েছে, লিবেরতে (liberty), লিবেরতে, তুজুর (চিরন্তন) লা লিবেরতে। সে চিৎকারে মোহাচ্ছন্ন হয়েছেন গ্যেটে থেকে শুরু করে মিশর-ইণ্ডিয়া পেরিয়ে চীন দেশের সুন ইয়াট সেন পর্যন্ত। ক্রমে ক্রমে তার বিকৃত রূপ দেখা দিল তার সামাজিক জীবনে তার আমোদ-আহ্লাদে। পুরীর নুলিয়ারা যে বহ্বাড়ম্বর পরিপূর্ণ বহ্বাভরণ পরিধান করে সমুদ্রে নামে, কিংবা আমাদের জেলেরা মাছ ধরার সময়, সেই পরে মেয়েরা প্যারিসে নৃত্যাদি আরম্ভ করলেন। এবং শুধু যে আপন-ভোলা নটরাজের জটার বাঁধন খুলে যায় তাই নয়, দিব্য সচেতন অবস্থায়—যাক্ গে, পূর্বেই বলেছি, যতখানি 'জ্ঞাতাস্বাদো বিপুল-জঘনাং' হলে পর প্যারিস বর্ণনের শাস্ত্রাধিকার জন্মে, আমার ততখানি নেই।

এই বাতাবরণের মাঝখানে ফ্লোবের এতই সংযত সমাহিত যে, আজকের দিনের 'মডার্ন'রা তাঁকে রীতিমত চেঁচিয়ে গালাগাল দেবেন, কাপ্রুস তোমার সাহস নেই (কাপুরুষ! তোমার সাহস নেই—পাঠক 'সামবাজারের সসীবাবুর' মত 'স'-গুলো উচ্চারণ করবেন!)।

বইখানা পত্রিকায় কিস্তিতে কিস্তিতে বেরিয়ে পুস্তকাকারে ছাপা হবে এমন সময় ঘটলো বিপর্যয়।

আল্লায় মালুম কোন্ শুকদেব ঠাকুরের সুপরামর্শে—তখনো তো দ্য গল জন্মান নি—ফরাসী সরকার লাগিয়ে দিলেন ফ্লোবেরের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা। ফরাসী সরকারের শিক্ষা বিভাগ—মিনিস্ট্রি অব পাবলিক ইন্‌সট্রাকশন, ওই সময় থেকেই বোধ হয় প্যারিসের যদো-মেধো ওর নাম দেয়, মিনিস্ট্রি অব পাবলিক ডিস্‌ট্রাক্‌শন।

ফ্লোবেরের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নাকি বভারি পুস্তকের মাধ্যমে দেশের দশের নীতিধর্মের সর্বনাশ করছেন! সোজা বাংলায় তাঁর বইখানা অশ্লীল, কদর্য!!

'অশ্লীল' শব্দটা এ-কথা শুনে হেসে উঠলো না তো?

সেই যে-রকম ঢাকাতে সোয়ারি কম ভাড়া হাঁকলে রসিক কুট্টি কোচম্যান ফিসফিস করে বলে, 'আস্তে কন, কত্তা, ঘোড়ায় হাসবো!'

এবং কার মুখে এই অভিযোগ?

---

avec de nombreux documents inedits, Gruend, Paris, 1938.

2. Artine Artinian & Edouard Maynial, Correspondance inedite de Guy de Maupassant Wapler, Paris, 1951.

প্যারিসের মুখে ! তাজ্জব, তাজ্জব ! গজব, গজব !!
প্যারিসিনীর পরনে তখন কি ? A la নুলিয়া নয় তো ?
তাই বলছিলুম,

এ যেন প্রেতের গায়
শানেল আর উ (h) বিগাঁ মাখানো
ভুরভুরে খুশবায় !

কিংবা রাষ্ট্রভাষায় ঃ

আরে তেরা লড়কেকা
আজব তরেহ্ কা খেল
ছুচ্ছুন্দর কা সিরপর
চামেলী কা তেল !

("তোর ছেলেটার আজব কীর্তি ! ছুঁচোর গায়ে মাখিয়েছে চামেলির তেল।" কি রকম চামেলি ? 'বাদল শেষে করুণ হেসে, যেন চামেলি কলিয়াঁ !')

পাঠক ভাবছেন, আমি রগড় দেখে, the utter absurdity of it ভূতের মুখে রামনাম শুনে বে-এক্তেয়ার হয়ে উচ্ছ্বসিত গঞ্জিকা বিলাস করছি ?

আদৌ না। আর করলেও আমি আছি সৎসঙ্গে, ইন গুড কামপনি !

মোপাসাঁ মোকদ্দমার সাতাশ বৎসর পরে মস্করা করে বলেন, "সরকারী পক্ষের উকীল যে-ভাবে ফ্লোবেরকে আক্রমণ করে বজ্রনির্ঘোষ 'বস্তিমে' ঝাড়েন, একমাত্র সেই কারণেই তাঁর নাম মার্কা-মারা (marque) হয়ে থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন, উকিল মসিয়োটি মোকদ্দমা আরম্ভের প্রাক্কালে তাঁর নাম — Pinard-টি—বদলালেন না কেন ?"[৪]

পিনার এক রকম মদ।

মোপাসাঁর বক্তব্য ঃ বস্তিমে ঝাড়বি ঝাড়। হামলা করবি, কর। কিন্তু দোহাই ধর্মের, সাদা চোখে কর। পিনার—হুঃ—শুঁড়ি এলেন শ্লীলতা বাঁচাতে। এ যে দুঃশাসন এল নুলিয়াকে জোশ্ব পরাতে।

এর পরও মোপাসাঁ আরেকখানা সরেস মাল ছেড়েছেন। কিন্তু হায়, সেটা তুলে দিলে লালবাজার চোখ লাল করেই ক্ষান্ত হবে না !! দে উইল বি আফটার মাই রেড্ ব্লাড !!!

---

৪ ফ্লোবেরের মৃত্যুর পর জর্জ সান্ড্ (George Sand)-কে লিখিত তাঁর পত্রাবলীর ভূমিকারূপে মোপাসাঁ একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন ; উদ্ধৃতিটি সেই প্রবন্ধ থেকে।

সান্ড্, সাঁড, সাঁদ—এ তিনটেই শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু দিল্লীবাসীর সদম্ভ-প্রদত্ত ফতোয়া যে ইটি স্যান্ড্—কোথাও নেই। সাদামাটা "a" হরফটির উচ্চারণ একমাত্র ইংরিজী ছাড়া কোনো ভাষাতেই এ্যা হয় না। অবশ্য ai, au, ae বা a-র উপর দুটি ফুটকি থাকলে (উমলাউট) ভিন্ন কথা।

"শিলা জলে ভাসি যায়/বানরে সঙ্গীত গায়"

স্বাধীনতা বলুন, উচ্ছৃংখলতা নাম দিন, প্যারিস একটি সৎ গুণের জন্য বিখ্যাত। সে চিরকালই স্বাধীন চিন্তা, তথা পীড়িত বিদ্রোহী জনকে আপন নগরে আশ্রয় দিয়েছে। জর্মন কবি হাইনের প্রগতিশীল মতবাদ কাইজার সহ্য করতে পারেননি বলে তাঁকে আশ্রয় নিতে হল প্যারিসে—এবং জীবনের বেশীর ভাগই তিনি কাটান সেখানে। আর এই বছর পঞ্চাশ পূর্বেই বীর সাবরকরকে ফ্রান্সভূমি থেকে ইংরেজ ধরে নিয়ে যায় বলে ফরাসী সরকার তারস্বরে প্রতিবাদ জানায়।[১]

এ শতকে আমাদের পক্ষে সব চেয়ে বড় আরামদায়ক তত্ত্ব-কথা ছিল এই যে, যেসব কূপমণ্ডুক দেশ কোনো বিশেষ ধরণের বই ছাপতে দিত না, সেগুলো ছাপা হত প্যারিসে। তার কিছুটা পাচার হত—যেমন ধরুন লেডি চ্যাটার্লি—ইংলণ্ড, আমেরিকা, ভারত ইত্যাদিতে, আর বাদবাকিটা ফ্রান্সাগত ইংরিজী পড়নেওয়ালা টুরিস্ট গিলত গোগ্রাসে। তখনকার দিনে রোক্কা একটি টাকাতে উত্তম উত্তম গ্রন্থ পাওয়া যেত। এদেশে যারা বিলিতী বই বিক্রী করে, তারা চিরকালই ছিল শাইলকের বাবার বাবা (আশা করি শাইলক জীবিত থাকলে অপরাধ নেবেন না)। 'ওয়ান সিনার রেইজেৎ এ হানড্রেড'—'এক পাপীকে দেখে এক'শ জন পাপ পথে যায়' আমিও তাই তাদেরই অনুকরণে, যত পারি এসব বই পাচার করে দেশে নিয়ে আসতুম। আমার পক্ষে প্রক্রিয়াটি কঠিন ছিল না। আমি তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্বের ছাত্র। কস্টম কর্মচারী সে-যুগে সচরাচর হত গোয়ানীজ ক্যাথলিক। আমি ট্রাঙ্কের সর্বোচ্চ স্তরে রাখতুম একখানা ক্যাথলিক প্রেয়ার বুক এবং একটি মনোহর রোজারি—অর্থাৎ ক্যাথলিক জপ-মালা। ম্লেচ্ছ মুসলমানদের খৃষ্টপ্রীতি দেখে ক্যাথলিক কর্মচারী বে-এক্তেয়ার।

সেই প্যারিস মহানগরীতে শত বৎসর পূর্বে ডকে উঠলেন ফ্লোবের—মাদাম বোভারি বগলমে*। অভিযোগ! তিনি "ইমরাল" (দুর্নীতি প্রচারকারী), অশ্লীল কেতাব লিখেছেন। সরকার পক্ষের উকীল গাঁটের ছ পণ খেয়ে যে বক্তৃতা ঝাড়লেন, সেটা শুনে সকলেরই মনে হল, গাঁয়ের পাদ্রীকে বউবাচ্চাসহ খুন করে ঐ গাঁয়ের যে একটিমাত্র কুয়ো আছে, তাতে সে লাশগুলো ফেলে

---

১ সাবরকরকে যখন বন্দী করে ইংরেজ ভারতে পাঠাচ্ছে, তখন তিনি ফরাসী বন্দরে পালিয়ে গিয়ে ডাঙায় উঠেন। ইংরেজ সেলার তাড়া করলে সাবরকর ফরাসী পুলিসম্যানকে বোঝাতে পারলেন না যে, তিনি রাজনৈতিক বন্দী—ফরাসী ভাষা জানতেন না বলে। সাধারণ খুনী আসামী ভেবে পুলিস তাকে ইংরেজের হাতে সমর্পণ করে। পরে ইংরেজ বলে, ফরাসী পুলিস ফরাসী সরকারের প্রতিভূরূপে সাবরকরকে ইংরেজের হাতে যখন সমর্পণ করেছে, তখন পরে ফরাসী সরকারের আপত্তি করার কোনো হেতু নেই।...এ সব কিন্তু আমার শোনা কথা।

দিয়ে জল বিষিয়ে দিলেও বুঝি ফ্লোবেরের অপরাধ এর তুলনায় সোনার পাথর বাটিতে আকাশকুসুম সাজানোর মত হত।

মোপাসাঁ লিখলেন, "ধন্য ধন্য এডভোকেট জেনারেল পিনার! (শুঁড়ি মশাই—অবশ্য তিনি মীন করেছেন "শুঁড়ির শালা চামার!")। ফ্রান্সের ইতিহাসে তুমি অমর হয়ে রইলে!"

ফ্লোবের খালাস পেয়েছিলেন। আদালতের উপর জনমত হয়তো প্রভাব বিস্তার করেছিল। কারণ শুধু ফ্রান্স নয়, ফ্রান্সের বাইরেও তখন ঐ বই এমনই চাঞ্চল্য জাগিয়েছে যে, তার পূর্বে বা পরে এমনতরো কবার হয়েছে সেটা আঙুলে গুনে বলা চলে। গুণীরা বললেন, "যা বলো, যা কও, বইখানা নিঃসন্দেহে পীস অব আর্ট, শেফ দ্যভ্র্, মাস্টারপীস।"

মোপাসাঁ অতিশয় সবিনয় লিখলেন, "সাহিত্যে নীতি? সে আবার কী চীজ? বেরুলুম সেই চীজের সন্ধানে যাঁরা মহামানব, যাঁরা সাহিত্যাচার্য তাঁদের কাছে। আরিস্তোফানেস, তেরেনৎস, প্লাউট্স, আপুলেয়ুস, ওভিড, ভের্গিল, শেকসপীয়ার, রাবলে, বক্কাচ্চো, লা ফঁতেন, স্যাঁতামাঁ, ভলতের, জ্যাঁ জ্যাঁক রুসো, দিদেরো, মিরবো, গোতিয়ে, ম্যুসে[২] ইত্যাদি ইত্যাদি—একটিমাত্র উদাহরণও পেলুম না এঁদের কাছে।"

ফিরিস্তিটা উচ্চাঙ্গের সন্দেহ নেই। গ্রীক, লাতিন, ইতালীয়, ইংরেজ এবং সর্বোপরি ফরাসী—কারণ মোপাসাঁ স্বয়ং ফরাসিস—মহারথীরা এতে রয়েছেন। কিন্তু সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, চীনা কোনো মহারথীর নাম তিনি করেননি। আরব্য রজনী পর্যন্ত না। কিন্তু আমার আশ্চর্য বোধ হয়, ওল্ড টেস্টামেণ্টটির কথা মোপাসাঁর স্মরণে এলো না কেন? যদিও আশ্চর্য হবার বোধ হয় কোনো কারণ নেই। অধুনা আমি আঁদ্রে জিদ-এর "জুর্নাল" বা রোজনামচাখানা ফের উল্টে-পাল্টে দেখছিলুম, ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত।[৩]

---

২ Aristophanes, Terence. Plautas, Apleus, Ovid, Virgil, Shakespeare, Rabelais, Boccacio, La Fontaine, Saint-Amant, Voltaire, J. J Rousseau, Diderot, Mirabeau, Gautier, Musset etc. etc.

ফরাসি জাতটা বিদেশী নাম বিকৃত করতে ওস্তাদ—অনেকটা বাঙালীর মত কিংবা বলতে পারেন, পরকে "আপনাতে" জানে॥

৩ অধুনা এদেশে নাকি 'তুলনাত্মক সাহিত্যচর্চা" পড়ানো হয়। এ চর্চাতে যাদের হাতখড়ি হচ্ছে, তাদের স্মরণ করিয়ে দি যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেক লোকই রোজনামচা লেখেন। এদের ভিতর একজন ফরাসী—জিদ, দ্বিতীয়জন জর্মন—য়্যুঙার (স্ট্রালুঙেন) এবং তৃতীয়জন স্যুইস—ফ্রিশ (টাগেবুখ)—যদিও যুদ্ধের পর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তবু তার মূল Weltanschauuang যুদ্ধ ও তৎপরবর্তী ধ্বংসকে কেন্দ্র করে। এঁরা তিন দেশের সর্বোত্তম না হলেও তারই কাছাকাছি লেখক।...পাঠক সবিস্ময়ে লক্ষ্য করবেন, ফরাসী

পুস্তকান্তের নিঘণ্টুতে দেখি, জিদ প্রায় ছ'শ জন লোকের নাম করেছেন। শতকরা আশিজন সাহিত্যস্রষ্টা। প্রাচ্যদেশীয় একজন লেখকের নামও তাঁর আত্মচিন্তায়, বন্ধুমিলনে, সাহিত্য পাঠে উল্লিখিত হয়নি। অথচ গুণগ্রাহী এই জিদই "গীতাঞ্জলি" অনুবাদ করেন। ইয়োরোপের প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবদের কথা হচ্ছে না ; ম্যাক্সমুলার, লেভি, উইনটারনিৎস, সাষাও (অল-বীরুনীর অনুবাদক) এঁদের কথা আলাদা, কিন্তু যাঁরা সাহিত্য-রস, কলাসৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করেন, তাঁদের অল্পজনই সে-সব বস্তুর জন্য অস্তাচলে বসে পূর্বাচলের পানে তাকান—গ্যোটে রোলাঁ (তিনিও সুন্দরের চেয়ে সত্যের সন্ধান করেছেন অধিকতর) বড়ই বিরল। প্রতিদিন বিরলতর হচ্ছে। কিছুদিন পরে অবশ্য এঁদের সম্বন্ধে আমরা আর কোনো খবরই পাবো না। বিদেশী বই আসবে না। বিজলি বন্ধ হয়ে গেলে রেডিয়ো সেটের মত অবস্থা হবে আমাদের।

মূল কথায় ফিরে যাই ঃ মোপাসাঁ লিখছেন, "রীতিমত চটে যেতেন ফ্লোবের, যখন আর্ট সমালোচকরা সাহিত্যে "নীতি" "সাধুতার" দোহাই পাড়তেন। তিনি (ফ্লোবের) নিজেই বলেছেন, 'যবে থেকে মানব জাতির সৃষ্টি হয়েছে, সর্বমহান লেখকই তাঁদের সৃষ্টির মাধ্যমে এই সব ক্লীবদের 'সদুপদেশের' (উদ্ধৃতি চিহ্ন অনুবাদকের) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।'

("Depuis qu'existe I'humanite, disait-il, tous les grands ecrivains ont proteste per leurs oeuvres contre ces conseils d'impuissants")[৪]

গুরুদত্ত এই আপ্তবচনটি সসম্মান উদ্ধৃত করে মোপাসাঁ বলছেন, "সুষ্ঠু, প্রতিষ্ঠিত সমাজজীবনের জন্য সুনীতি তথা সাধু আচরণ অপরিহার্য, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের তো কোন সম্পর্ক নেই। ঔপন্যাসিকের প্রধান লক্ষ্য, মানুষের প্রবৃত্তি পর্যবেক্ষণ করে সেগুলো বর্ণনা করা—তা তার প্রবৃত্তি সুপ্রবৃত্তিই হোক আর কুপ্রবৃত্তিই হোক। নীতিগর্ভ উপদেশ বিতরণ করা

জিদ কী মৈত্রীর চোখে জর্মনদের এবং জর্মন য়ুঙার ফরাসীদের শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন ! এর সঙ্গে পাঠক আইজেনহাওয়ারের ক্রুসেড ইন ইয়োরোপ মিলিয়ে পড়লে উপকৃত হবেন।

এস্থলে উল্লেখ করা কর্তব্য মনে করি, শেষের ইংরিজি বই ভিন্ন বাদবাকি তিনখানা বই আমি এদেশের বিদেশী-পুস্তকবিক্রেতাদের 'কেরপায়' পাইনি। ঈশ্বরাদেশে যারা পপলার গাছ পোঁতে, তাদেরই একজনের বদান্যতায়। তা সে যাক গে। কিন্তু এই সুবাদে আমি আমার বিশেষজ্ঞ পাঠকদের শুধোই—আমার বাস মফস্বলে -আচ্ছা আজ যদি কোনো বন্টু বা হটেনটট বিদেশী বই কিনতে চায়, তবে তাকেও কি একসচেঞ্জের জন্য পণ্টকদের পায়ে তেল দিতে হয় ? বোধ হয় না। কারণ তারা যে বর্বর। আর আমরা সভ্য। "মহামানবের তীরে" বাস করি।

৪ Dumesnil, Correspondance, পৃ ১০৯।

কিংবা অভিসম্পাত দেওয়া, অথবা তত্ত্বতথ্যের প্রচার করার জন্য জীবন উৎসর্গ করা তো তার কর্ম নয় (অর্থাৎ এসব প্রচারকর্মের 'মিশনারি' সে নয়)। এ জাতীয় উদ্দেশ্যমূলক কোনো গ্রন্থই আর্টের পর্যায়ে উঠতে পারে না।

তৎসত্ত্বেও কোনো সার্থক গ্রন্থ যদি সুশিক্ষা দানে সক্ষম হয়, তবে সেটা লেখক সেই উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রন্থ লিখেছিলেন বলে নয় (সেটা 'malgre l'auteur' 'inspite of the author', সেটা লেখকের ইচ্ছা—এমন কি অনিচ্ছাবশত নয়), তিনি যে-ভাবে ঘটনাগুলি বর্ণনা করেছিলেন, তার অন্তর্নিহিত শক্তির বলেই সে সেই সুশিক্ষা দানে সক্ষম হয়েছে।"

অর্থাৎ "আন্‌কল টম'স্‌ ক্যাবিন" যদি দাসত্ব প্রথাকে নির্মম আঘাত দিয়ে থাকে, যদি এমিল জোলার 'জাঁ ক্যুজ' ('আই একুজ' = 'আমি ফরিয়াদ জানাই') ৫ মিলিটারি স্বৈরতন্ত্রকে দ্বিখণ্ডিত করে থাকে, তবে তার কারণ, পুস্তকদ্বয় অনুভূতি সঞ্চারণে এমনই কৃতকার্য হয়েছিল যে, এগুলি তখন আর্টের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আরোহণ করেছে।

মোপাসাঁ বিশুদ্ধ আর্ট, আর্টে শ্লীলতা-অশ্লীলতা নিয়ে আরো অনেক কিছু লিখেছেন, কিন্তু সেগুলো উপস্থিত থাক।

ছুঁৎবাই রোগে আক্রান্ত 'পদি পিসি' সব দেশেই আছেন—তবে ফ্লোবের-মোকদ্দমায় হেরে গিয়ে ফ্রান্সের পদি পিসিরা বড়ই মুষড়ে যান। বস্তুত ফ্লোবের-শতাব্দীর শেষের দিকে পেণ্ডুলাম অন্য প্রান্তে চলে গিয়েছে। ফ্রান্সের যে মিনিস্ট্রি অব পাবলিক ইনসট্রাকশন একদা ফ্লোবেরের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করেছিলেন, তাঁরাই তখন আইন করেছেন, যে-সব পুস্তকে ভগবানের উল্লেখ থাকবে, মিনিস্ট্রি সেগুলো তাঁদের পাবলিক লাইব্রেরীর জন্য কিনবেন না। সে খবর শুনতে পেয়ে কট্টর জাত-নাস্তিক আনাতোল ফ্রাঁস উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, "এ আবার কি রকমের লিবার্টি—যে লিবার্টি মানুষকে ভগবানের নাম প্রচার করতে দেয় না ?"

বভারি মোকদ্দমার একশ' বছর পর আবার পেণ্ডুলাম অন্য প্রান্তে গেছে। টপ্‌লেস ডাইনি পোড়াবার জন্য ফ্রান্সেই এখন সব চেয়ে পুলিসের দাপট, নাইটক্লাব টাইট দেওয়াতে এদের উৎসাহ-উত্তেজনার অন্ত নেই। আমাদের অবশ্য তাতে কিচ্ছুটি বলবার নেই।

কিন্তু একশ' বছর পূর্বে যে বভারির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করে মার খেল

---

৫ বইখানা অবশ্য মোপাসাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়ে শুধু ফ্রান্সে নয়, সর্ব সভ্য বিশ্বে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। আমি বিশেষ করে এ-বইখানা যে উল্লেখ করলুম তার কারণ, প্রবাদে আছে "পেন ইজ মাইটিয়ার দ্যান সর্ড" "লেখনী তরবারি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী"—এবং এই বইখানি তৎকালীন ফরাসী সেনাবাহিনীর স্বেচ্ছাচারী মদমত্ততাকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে প্রবাদবাক্যটি সপ্রমাণ করে। আমার জানামতে এটি লেখনী তরবারিতে একমাত্র সরাসরি যুদ্ধ।

ফ্রান্স, সেই ফ্রান্সই চেষ্টা করছে এখন, আবার মাদাম বভারির সর্বাঙ্গে বোরকা চাপিয়ে তুর্কীপাশার হারেমবন্ধ করতে! হিটলার যখন 'পবিত্র' জর্মন ন্যাশনালিজমের দোহাই কেড়ে ইহুদি বই পোড়াতে আরম্ভ করেন তখন এক মার্কিন গুণী বলেছিলেন, "জর্মনী-পুটস দি ক্লক ব্যাক!" ফ্রান্সে যে তারই পুনরাবৃত্তি! এ-ও এক নয়া নাৎসিবাদ।

দ্য গল লোকটিকে আমার খুব পছন্দ নয়। যদ্যপি গত যুদ্ধের সময় তাঁর আদর্শ এবং চার্চিলের আদর্শে কোন পার্থক্য ছিল না, তবু চার্চিল পদে পদে দ্য গলের দম্ভ দেখে অতিষ্ঠ হতেন। প্রধান অভিনেত্রী বা প্রিমা দন্নার মত তিনি এমনই অতি অল্পেতে ঠোঁট ফোলাতেন, গোসাঘরে আশ্রয় নিতেন[৬] যে, আইজেনহাওয়ারের মত মাথা ঠাণ্ডা মানুষ পর্যন্ত—যিনি কি না মণ্টীর মত দেমাকি লোককেও সামলাতে পেরেছিলেন—তাঁর এদিকটা লক্ষ্য করে লেখেন "We felt that his qualities were marred by hypersensitiveness and an extraordinary stubbornness in matters which appeared inconsequential to us. My own wartime contacts with him never developed the heat that seemed to be generated frequently in his meetings with many others."[৭]

মোগল পাঠান হদ্দ হল ফার্সী পড়ে তাঁতী। চিতে বাঘের চিত্তির মুছতে লেগে গেছেন মঁসিয়ো ল্য জেনেরাল শার্ল দ্য গল। না হলেই তো 'চিত্তির'! তবে শুনেছি, এ রবির পিছনেও নাকি একটি বিরাট ছায়া আছে। তিনি নাকি মাদাম। তিনিই নাকি ফ্রান্সের নব জোয়ান অব আর্ক পদি পিসি।

এ-সুবাদে আমার মনে পড়লো, এমিল জোলারও নাকি কয়েকটি পদি পিসি দোস্ত ছিলেন। তাঁরা নাকি একাধিকবার বায়না ধরে তাঁকে বলেন, "ভাই, তুমি লেখো ভালো; কিন্তু তোমার কোন বই-ই নিঃসংকোচে পুত্রকন্যার হাতে তুলে দেওয়া যায় না। একখানা 'ক্লীন' বই লেখো না কেন?"

জোলা ঢোঁক গিললেন।

সে বইয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে আনাতোল ফ্রাঁস বলেন, মসিয়ো জোলা যখন শুয়ারটার মত কাদাতে গড়াগড়ি দেন তখন তিনি সেটি করেন বড়ই গ্রেসফুলি (অর্থাৎ প্রকৃত সমঝদার আর্টিস্টের মত), কিন্তু তিনি যখন বন্ধুজনের অনুরোধে পাখনা গজিয়ে দেবশিশুপারা স্বর্গোপানে ওড়বার চেষ্টা করেন তখন সেই "এলোপাতাড়ি ড্যানার বাড়ি" দেখে হাসি সামলানো রীতিমত মুশকিল হয়—হি ডাজ ইট্ মোস্ট গ্রেস্‌লেস্‌লি। তারপর তিনি বলেন, আই

---

৬ আজকের দিনের সম্মানিত মহিলারা যে খাস কামরায় অতিথি-অভ্যাগতকে "আপ্যায়িত" করেন তার নাম 'বুদোআর'। শব্দটির ব্যুৎপত্তি নিয়ে সন্দেহ আছে। অনেকেই মনে করেন এই "বুদোর"="to Sulk"="অভিমান করা" থেকে এসেছে।

৭ ক্রুসেড ইন্ ইউরোপ, পৃ. ৪৫৬।

প্রেফার মসিয়ো জোলা ওয়ালোইং ইন মাড্—মসিয়ো জোলার নর্দমাতে হুটো-পুটি করাটাই আমি পছন্দ করি বেশী ।।৮

* * *

প্যারিস ড্যানা গজিয়ে ফেরেশতার মত বেহেশৎ পানে ওড়বার চেষ্টা করছে—ইয়াল্লা !!

'অভাবে শয়তানও মাছি ধরে খায়'

অভিজ্ঞতাজনিত বিজ্ঞতা আসে ল্যাটে। তখন ওটা আর কোন কাজে লাগে না। বিলকুল বেকার। কিরকম? প্রকৃতির নিয়ম ঃ মাথায় বিপর্যয় টাক পড়ে যাওয়ার পর চিরুনি-প্রাপ্তি। ইরানী কবি একটু ঘুরিয়ে বলেছেন ঃ বৃদ্ধ বয়সে অনুশোচনায় দাঁত কিড়মিড় করছি? কিড়মিড়ি করার জন্য, হায়, দাঁতও যে আর নেই।

ল্যাটে বুঝলুম, মাতৃভাষা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আর নিতান্তই যদি আরেকটি ভাষা শিখতে হয় তবে সেটি হবে, তোমার মাতৃভাষা যার কাছে সব চেয়ে বেশী ঋণী সেইটি শেখা ঃ বাঙলার বেলা সংস্কৃত, ফার্সীর বেলা আরবী, ফরাসীর বেলা লাতিন। তার বেশী ভাষার পিছনে ছুটোছুটি করা নিছক আহাম্মুখি। মাসান্তে যে দু'একখানা বিদেশী বই কিনবে, তার আর উপায় রইল না। কেন?—কলকাতাতে কি বিদেশী বই পাওয়া যায় না? পাওয়া যায় বই কি, এন্তের অঢেল। অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো তো দিবারাত্তির গান গাইছে। মুশকিল শুধু, আপনার পছন্দের গান গায় না।

ইতিমধ্যে আমি দু'খানি চিঠি পেয়েছি। দুটি তরুণ আমার সদুপদেশ পাওয়ার পূর্বেই ফরাসী জর্মনে সার্টিফিকেট নিয়ে বসে আছে। তাদের সামনে সমস্যা, এখন এগোয় কি প্রকারে? তারা থাকে মফস্বলে—কি করে বলি, কলকাতার কোনো কোনো লাইব্রেরির লেনডিং সেকশন আছে, তাদের শরণাপন্ন হও, যখন জানি, কলকাতার খাস বাসিন্দার পক্ষেও কর্মটি সুকঠিন।

তখন হঠাৎ খেয়াল গেল, এরা মফস্বলে বাস করে। তার একটা মস্ত সুবিধে, ইলেকট্রিকের উৎপাত সেখানে নেই, কিংবা নগণ্য। বেতার যন্ত্রটির পুরো ফায়দা সেখানে ওঠানো যায়। কলকাতা বাসীও অবশ্য খানিকটে পারবে।

উপস্থিত বেতার খুললেই শর্টওয়েভে পাবেন, গাঁক গাঁক করে আপন পরিচিতি জানাচ্ছেন চীন। চীন আমাদের অতি কাছে বলেই তাকে পাওয়া যায়

---

৮ কাতরকণ্ঠে নিবেদন; দুনিয়ার কুল্লে বই—তা আমার জরুর যত কমই হোক—আমি যোগাড় করি কি প্রকারে? তাই অনেক স্থলেই স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু সরস্বতী সাক্ষী, সজ্ঞানে স্বেচ্ছায়, কারো প্রতি অধম অবিচার করে না। এসব মহাজনদের বচন খাঁটি সোনার মোহর, উদ্ধৃতির চাপে ব্যাকাট্যাড়া হয়ে গেলেও সোনা সোনাই থাকে।

হরবকৎ, কিন্তু আমাদের কাজে লাগে অত্যল্পই), রুশ, আমেরিকা (VOA — Voice of America), ব্রিটেন (B B C), এবং অস্ট্রেলিয়া। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের যেগুলো দরকার, যেমন ফ্রান্স, জর্মনি, ইতালি সেগুলো জোরদার নয় এবং আমাদের উপকারার্থে তারা ব্রডকাস্ট করে অল্প সময়।

এই বেতারের সাহায্যে পুস্তকের অভাব খানিকটা পুষিয়ে নেওয়া যায়।

এর পূর্বে দু'একটি কথা অবতরণিকা হিসেবে বলে নেওয়া ভালো।

ভারতবর্ষে যে নিরক্ষরতা দ্রুতগতিতে লোপ পাচ্ছে না, তার প্রধান কারণ এ নয় যে, গ্রামে গ্রামে আমরা পাঠশালা খুলতে পারছি নে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার আসল কারণ, যারা পাঠশালা পাস করে বেরোয় তারা পুনরায় নিরক্ষর হয়ে যায়—পড়বার জন্য বই খবরের কাগজের অভাবে। যে গ্রামে পঞ্চাশ বছর ধরে পাঠশালা আছে, সেখানে যে-কোনো সময়ে অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবেন, মাত্র যারা দু-এক বছর হল পাস করে বেরিয়েছে তারাই এখনো লিখতে পড়তে আঁক কষতে পারে ("থ্রী আর"=রীডিং, রাইটিং, রেকনিং)। বাদ্-বাকিরা কিংবা তাদের অধিকাংশই পুনরায় নিরক্ষর হয়ে গিয়েছে। এই বিষয় নিয়ে বছর কুড়ি পূর্বে আমি সপ্তাহের পর সপ্তাহ জোর প্রোপাগানডা-ক্যামপেন চালিয়েছিলুম ; সুযোগ পেলে মৃত্যুর পূর্বে আরেকবার চালাবো—মা ফলেষু কদাচন মন্ত্র স্মরণ করে।

তাই বৎস, তুমি যে ফরাসী, জর্মন বা রুশ ভাষায় সার্টিফিকেট পেয়েছ সেটা উত্তম কর্ম, কিন্তু যেটুকু শিখেছ সেও ভুলে যাবে, ঐ গ্রামের পড়ুয়ার মত পুস্তকাভাবে। তাই বলছিলুম, বেতার তোমাকে খানিকটে বাঁচাতে পারে।

তার পূর্বে কিন্তু একটি ভেরি ভেরি ইম্পরটেন্ট তত্ত্বকথা বলে নিই। এটা আমার নিজের উপদেশ নয়—পৃথিবীর যে-কোনো বেতার কেন্দ্র তোমাকে এই উপদেশ দেবে।

রুম অ্যারিয়েল শর্ট ওয়েভের জন্য সম্পূর্ণ বেকার না হলেও ছাতের উপর বাঁধা দীর্ঘ, দীর্ঘতম বাঁশের অ্যারিয়েলের তুলনায় নগণ্য। আমার উপদেশে যারাই কান পাতছো, তাদেরই বলি, যারা মফস্বলে থাকো তারা নেবে দীর্ঘতম বাঁশ (শহরে বোধ হয় এর একটা সীমা আছে, কিন্তু যেহেতু তুমি চোদ্দতলা বাড়িতে বাস করো না, সেটা তোমার উপরে প্রযুজ্য নয়) এবং নির্মাণ করবে সর্বোত্তম অ্যারিয়েল। এস্থলে বলে রাখা ভালো, তিন-চারশ' টাকা সেট+আউটসাইড ব্যামবু অ্যারিয়েলে যে রিসেপশন পাবে, হাজার টাকা সেট+রুম অ্যারিয়েলে পাবে তার চেয়ে ঢের নিকৃষ্ট রিসেপশন। অবশ্য দামী সেটে যে রকম ধ্বনিকে—বিশেষ করে সঙ্গীতের বেলায় ইচ্ছেমত কড়া মোটা করা যায়, সস্তা সেটে সেটা করা যায় না। কিন্তু ভাষার বেলা—যাকে বলে স্পোকেন ওয়ার্ড—সস্তা সেটও+দীর্ঘতম আউটসাইড অ্যারিয়েল ১০০% কাজ দেবে। "আমার সেট আরো দামী হলে আরো ভালো রিসেপশন হত" এটা ভুল ধারণা। যে-কোনো দিন সকাল সাতটা-আটটা গোছ সময় ১৩ মিটার ব্যান্ডে অস্ট্রেলিয়া শুনে নিয়ে (ঐ সময় ১৩ মিটার মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাট) অন্য বাড়িতে দামী

সেট শুনে এসো—দেখবে তফাৎ নেই। পুনরায় সন্ধ্যে ৬-৩০-এ ১৩ মিটারে প্যারিসের ইংরেজীর প্রোগ্রাম খানিকটা শুনে (প্রোগ্রাম মাত্র আধ ঘণ্টার, ৭টা থেকে ফরাসী ভাষাতে প্রোগ্রাম শুরু হয়ে যায়) দামী সেটের রিসেপশনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। প্যারিস দুবলা স্টেশন, তদুপরি ঐ সময় ১৩ মিটারে বিস্তর স্টেশন ঝামেলা লাগায়—গোটা তিনেক বি বি সি, একটা VOA, ভাটিকান, সুইজারল্যাণ্ড, পাকিস্তান, রুশ, হল্যাণ্ড, আরো কে কে আছেন—কাজেই তুমি যদি তখন প্যারিসের ইংরিজী প্রোগ্রাম পরিষ্কার বুঝতে পারো তবে আর চিন্তা করো না, তোমার সেট এবং অ্যারিয়েল দুই-ই ঠিক। অবশ্য বর্ষার অতি নিকৃষ্ট আবহাওয়া হলে দামী, সস্তা কোনো সেটেই, শহর মফস্বল কোনো জায়গাতেই হয়তো প্যারিস ধরতে পারবে না।

আপন দেশের ভাষা শেখাবার জন্য সব চেয়ে উৎসাহী ইংরেজ। কিছু দিন থেকে বাংলার মাধ্যমে পর্যন্ত ইংরিজী শেখাতে আরম্ভ করেছে। যারা ইংরেজীটা মোটামুটি জানো, তারা অ্যাডভান্স কোর্সটি শুনলে উপকৃত হবে।

প্যারিস একদা, বোধ হয়, ইংরিজীর মাধ্যমে ফরাসী শেখাতো। এখন সাড়ে ছটা থেকে সাতটা পর্যন্ত যে ইংরিজী প্রোগ্রাম দেয় তাতে তো সে আইটেম শুনিনি। তবু নিরাশ হবার কারণ নেই। প্রথম ১৮'৩০ থেকে ১৯'০০ অবধি (আমি সর্বত্রই ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম দিচ্ছি) মনোযোগ সহকারে ইংরিজী প্রোগ্রামটি বিশেষ করে সংবাদ—শুনে নেবে। তারপর সেই সংবাদই ফরাসীতে শুনতে পাবে ১৯.০০ থেকে ১৯.৩০-এর ভিতর কোনো এক সময়। ইংরিজীতে খবরটা বুঝে নিয়েছ বলে ফরাসীতে সেটি ধরতে সুবিধে হবে। মাসখানেক প্র্যাকটিসের পরও যদি না বুঝতে পারো তবে মেনে নিয়ো, যে ফরাসী জ্ঞানের পুঁজি নিয়ে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছিলে সেটা যথেষ্ট নয়। দুপুরেও প্যারিস ফরাসী প্রোগ্রাম দেয়—প্রধানত ইণ্ডোচায়নার জন্য। তবে রিসেপশন সব সময় ভালো হয় না।

সুইজারল্যাণ্ডও ফরাসীতে প্রোগ্রাম দেয়। ইংরেজীতেও। আমাদের জন্য (অর্থাৎ ফর ফার ঈস্ট অ্যাণ্ড সাউথ ঈস্ট এশিয়া) তাদের স্টেশন খোলে ১৬'৩০ ঐ ১৩ মিটার ব্যাণ্ডেই। ওরা কিন্তু ব্রডকাস্ট করে (১) জর্মন, (২) সুইস জর্মন, (৩) ফরাসী, (৪) ইতালীয়, (৫) ইংরিজী এবং কোনো কোনো দিন এস্পেরান্তোতেও। প্যারিসের বেলা যে প্রক্রিয়ার সুপারিশ করেছি এস্থলেও সেটি প্রযোজ্য। তোমাকে শুধু তক্কে তক্কে থাকতে হবে, কখন কোন্ ভাষায় প্রোগ্রাম দেয়।* এ ছাড়া রুশ, চীন, জাপান এরাও ফরাসীতে ব্রডকাস্ট করে,

* সব স্টেশনই কোনো না কোনো সময় আপন ঠিকানা দেয়। সে ঠিকানায় চিঠি লিখলে তারা প্রোগ্রাম ফ্রী পাঠায়। যারা ভাষা শেখায় তারা কেউ কেউ ফ্রী চটি পাঠ্যবইও পাঠায়, কোনো কোনো স্থলে পয়সা দিতে হয়। কখন কোন্ মিটারে কে ব্রডকাস্ট করে তার সবিস্তর বর্ণন পাওয়া যায় World Radio Handbook, Lindorffs, Allee 1, Hellerup, Denmark

(বি বি সি-ও করে, কিন্তু এ দেশে শীতকালে রাত ঘনিয়ে এলে কখনো কখনো পাওয়া যায়—আসলে ওটা আমাদের উদ্দেশে বেতারিত হয় না—ওটা পূর্ব ইয়োরোপের জন্য, জর্মনের বেলাও তাই)।

কিন্তু সর্বোত্তম ব্যবস্থা অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ফরাসী প্রোগ্রাম শোনা। রাত ঘনিয়ে এলে ও বোধ হয় সন্ধ্যার দিকেও ইটি বেতারিত হয়। এটা শোনার সুবিধা এই, রিসেপশন মোটামুটি ভালো; কি কি খবর মোটামুটি দেবে সেটা আগের থেকে জানা আছে বলে বুঝতে সুবিধে হয়, এবং যে দু-চারটে কথিকা দেয়—যেমন রবীন্দ্রনাথ বা ভারত ইতিহাসের কিছু একটা—আমাদের কিছুটা জানা বলে ঐ একই সুবিধে। এদের উচ্চারণ সব সময় ১০০% খাঁটি হয় না—তবে আপনার আমার কাজের জন্য "যথেষ্টর চেয়েও প্রচুর"। এস্থলে উল্লেখ করি, যাঁরা কনভারসেশনাল আরবী এবং ফার্সী বুঝতে নিজেকে অভ্যস্ত করাতে চান তাঁরা যেন আকাশবাণীর আরবী ফার্সী প্রোগ্রাম শোনেন। এঁদের উচ্চারণ অত্যুৎকৃষ্ট। কিছুদিন আগেও মক্কার এক উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক ও মদিনাগতা তাঁর স্ত্রী অ্যানাউনসার ছিলেন।···

ধার্মিকজন মিশরে গৃহীত রেকর্ডে অত্যুত্তম কুরান পাঠও শুনতে পাবেন। ···রাজনৈতিক তথা প্রাকৃতিক আবহাওয়া ভালো থাকলে ফরাসী ইকোয়েটরিয়াল আফ্রিকার ব্রাজভিল শহরের উত্তম ফরাসী ব্রডকাস্ট এদেশে পাওয়া যায়। শীতকালে রাত ঘনিয়ে এলে ত্যুনিস আলজেয়ারস থেকেও মিডিয়াম ওয়েভে ফরাসী প্রোগ্রাম পাওয়া যায়। এবং রাত দশটা এগারোটা থেকে ভোরবেলা পর্যন্ত মন্তে কার্লো—ফরাসীতে। শীতকালে মিডিয়াম ওয়েভে ২০৫ মিটার (=১৪৬৬ কি. সা) ব্যাণ্ডে। আমার জানামতে এটিই ইয়োরোপের সব চেয়ে জোরদার মিডিয়াম ওয়েভ স্টেশন। এর জোর ৪০০ কি ও। ফরাসীটা সড়গড় হয়ে গেলে শীতকালে অনিদ্রায় এর প্রোগ্রাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরমানন্দে শোনা যায়। তবে কমার্শিয়াল বলে উৎপাতও আছে।···ওয়েস্ট বার্লিনও ৩০০ কি. ও. স্টেশন, কিন্তু কে জানি নে একে বড় জ্যাম করে।

জর্মনির যে বেতার স্টেশন বিদেশের জন্য বেতার ছাড়ে তার নাম ডয়েচশে ভেলে (Deutsche Welle) এবং তিনি কলোনে (Koeln-Cologne যেখান থেকে অডিকলোন আসে)। ভারতের জন্য এদের প্রোগ্রাম ১৮'২০ থেকে '১৫ পর্যন্ত, ১৯ এবং ১৬ মিটারে কিন্তু নিরেট জর্মন ভাষায়। তবে ইংরিজী, হিন্দী উর্দু এবং ফের ইংরেজীতে ব্রডকাস্ট করে একবার সকালে ৮'৩০ থেকে ৯'১০ পর্যন্ত এবং দুপুরে একটা থেকে মাঝে মাঝে ক্ষান্ত দিয়ে রাত্রি প্রায় দশটা অবধি ওই সব ভাষায়। এরই যে কোনো একটা শুনে নিয়ে জর্মন প্রোগ্রাম শুনে নিলে ভালো হয়। কিছুদিন পূর্বে একটি তাজ্জব খবর পেলুম। জর্মনি মাসে দুই বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা থেকে ১'৩৫ পর্যন্ত সংস্কৃতে ব্রডকাস্ট করবে! তবে

বইয়ে। দাম পাঁচ টাকার মত। এবং সকরুণ নিবেদন, আমাকে দয়া করে চিঠি লিখিবেন না। আমি অসুস্থ। সেক্রেটারি নেই।

ওয়েভ লেন্‌থটা জানি নে। আশা করছি, খুঁজে-পেতে পেয়ে যাবো।... বর্ষাকালে এ দেশে জর্মনি ভালো পাওয়া যায় না। বরঞ্চ ১২·১৫ থেকে ১৫·০০ অবধি জর্মনি যে বেতার অস্ট্রেলিয়ার জন্য ২৫, ১৯, ১৬ মিটারে ছাড়ে তার ১৬টা ভালো পাওয়া যায়। জর্মনি একদা ইংরেজীর মাধ্যমে জর্মন শেখাতো —এখনও শেখায় কিনা অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

এ ছাড়া পূর্বোক্ত সুইজারল্যান্ড অনেকক্ষণ ধরে জর্মনে ব্রডকাস্ট করে। এককালে পূর্ব জর্মনিও (DDR) শুনতে পেতুম। দুপুরবেলা জাপানও উত্তম জর্মনে (১৯ মি) এবং রাত ঘনিয়ে এলে মস্কো, বুখারেস্ট, প্রাগ, সোফিয়া ইত্যাদি শহরও ফরাসী জর্মনে ব্রডকাস্ট করে। এদের সকলেরই প্রায় এক সুর, কিন্তু আমাদের তাতে কিছুটি যায় আসে না। আমাদের ভাষা শেখা নিয়ে কথা।

দুঃখের বিষয়, ভিয়েনা—জর্মন ভাষার বড় কেন্দ্র—এখনো এক্‌সপেরিমেন্টাল স্টেজে, এবং ফরাসী কৃষ্টির বৃহৎ কেন্দ্র ব্রাসল্‌স্‌ আমি কখনো পাইনি।

মস্কো একদা অতি সযত্নে রুশ ভাষা শেখাতো। আরবী, ফার্সীতে যাঁদের দিল্‌চস্‌পী, তাঁরা অনায়াসে বাগদাদ, কাইরো এবং তেহেরান খুঁজে পাবেন। কাবুল ফরাসী ও ইংরেজীতে অল্পক্ষণের জন্য ব্রডকাস্ট করে। ফার্সী এবং পশতু প্রচুর।

আমি শুধু সেসব স্টেশনের কথাই উল্লেখ করেছি, যেগুলো এ দেশে মোটামুটি ভালোই পাওয়া যায় এবং বিদেশী ভাষা-জ্ঞান সড়গড় রাখতে সাহায্য করবে।

"—ন্যাংটাকে ভগবানও ডরান—"

কি করে হঠাৎ একরাশ টাকা আমার হাতে এসে পেঁছিল, সেটা দফে দফে বুঝিয়ে বলা শক্ত। দরকারও নেই। মোটামুটি বলতে পারি, অনেকটা লটারি জেতার মত।

কিন্তু বিপদ হল, টাকাটা যাঁর মারফৎ এসেছিল, তাঁকে নিয়ে। তিনি লন্ডনের বিকটতম উন্নাসিক এক দর্জীর "দোকানে" কাজ করেন। সে দোকান নাকি রাজ-পরিবারের বাইরে কারো জন্য অর্ডার নেয় না। সেই কর্ম-প্রতিষ্ঠানে না আছে সাইনবোর্ড, না আছে টেলিফোন-কেতাবে তাদের নাম, নম্বর। তাদের প্রাইভেট নম্বর শুধু রাজ-পরিবার জানেন। অন্য লোকে সন্ধান পাবেই বা কি করে!

আমি বাস করতুম তাঁরই বাড়িতে। বাড়ির জেল্লাই কিছু কম নয়। বাকিংহাম প্যালেস পেরিয়ে হাইড পার্ক গেটে তাঁর ভবন। সে রাস্তাতেই থাকেন আর্টিস্ট এপ্‌স্‌টাইন (না রোটেন্‌স্‌টাইন, ঠিক জানি নে) ও চার্চিল সাহেব। আমি সেথায় আশ্রয় পেলুম কি করে? সেই খলিফের খলিফে গিয়ে-

ছিলেন হল্যাণ্ডে। সেথাকার রাজকন্যার বিয়ে হবে। বরের বিয়ের বেশভূষা তৈরি করতে। অতিশয় অনিচ্ছায়, দেশের আপন রাজার আদেশে। সেই বিদেশের রাজধানীতে পথ, হোটেলের নাম সব হারিয়ে যখন গা গা'র মত ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন আমি তাকে কিছুটা সাহায্য করতে পেরেছিলুম। ব্যস্! হয়ে গেল। তিনি সেখান থেকে পকড়কে আমাকে লণ্ডন নিয়ে এলেন। তদবধি তাঁর ভবনে বাস। অবশ্য স্বীকার করবো লোকটি ভদ্র। আমি অন্যত্র সস্তা জায়গায় থাকলে যে কড়ি গুনতুম, তিনি সেটি সপ্তারম্ভে সহাস্যে নিতেন। পাছে আমি লজ্জিত হই, আমি মুফতে আছি।

আমি বললুম, "কি ধরনের কাপড়ে স্যুটটি হবে সে বাবদে আমারও তো কিছু রুচি থাকতে পারে। দেখি, কাপড়ের নমুনা।"

পাগলামিতে হাতেখড়ি হচ্ছে হেন লোককে যেভাবে ডাক্তার প্রণব রায়ের মত লোক হ্যাণ্ডিল করেন, সেইভাবে সদানন্দ হাস্য হেসে বললেন, "বৎস, তোমাকে গুটিকয়েক প্রশ্ন শুধোই। তোমার যখন বিয়ে হয়, তখন গুরুজন তোমার ঐ 'রুচি'র কথা শুধিয়েছিলেন?"

সত্যের অনুরোধে আমাকে নিরুত্তর থাকতে হল।

"আর এ তো সামান্য স্যুট। অবশ্য তুমি কুতর্ক করতে পারো, সামান্য জিনিসেই বরঞ্চ আপন রুচিমাফিক জীবনানন্দ লাভ করা যায়। কিন্তু এ তো সামান্য জিনিস নয়, এ ব্যাপারটি অসামান্য। ভেরি ভেরি ইমপরটেণ্ট। নইলে কণ্ড, এরই মেহেরবানীতে আমি বাড়ি গাড়ি হাঁকালুম কি প্রকারে? অতএব বুঝিয়ে কই।"

গভীর দম দিয়ে মিঃ সিরিল হজসন-জবসন ফবজ-রোবসন বললেন, "উপস্থিত নববসন্ত সমারম্ভ। তুমি এসব স্যুট পরবে নিদাঘের অন্তিম নিশ্বাস থেকে হেমন্তের শেষান্ত পর্যন্ত। এইবারে শোন বৎস, তত্ত্বকথা। শিশির বসন্ত নিদাঘ হেমন্ত প্রতি ঋতু অনুযায়ী বকিঙহম প্রাসাদ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করেন। কিন্তু প্রতি বসন্তে একই বর্ণনা, প্রতি শিশিরে একই সর্ষপবর্ণ—অর্থাৎ নুন-হলদে না, একই বর্ণ না, একই বর্ণনা করা চলবে না।

প্রতি ঋতুর সমারম্ভে আমাদের একটি গুহ্যতম—টপমোস্ট-সীকরিট সভা বসে আসছে ঋতুর বর্ণ স্থির করার জন্য। যে বর্ণ স্থির করা হল, সেটা অত্যন্ত গোপনে রাখতে হয়। নইলে রাস্তার যেদো-মেধো সেই রঙের স্যুট পরে যত্রতত্র ঘোঁত ঘোঁত করে ঘুরে বেড়াবে। তা হলে ড্যুক অব এডেনবরা যখন অ্যাসকটে নামবেন—না, সেখানে হাঙ্গামা কম, প্রশ্ন শুধু ওয়েসকিট নিয়ে—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "ওয়েসটকিট কি?"

"চ্যাংড়ারা হালফিল যাকে ওয়েস্টকোট বলে।"

আমি চুপ করে ভাবলুম, আমাদের দর্জীরা যখন 'ওয়াসকিট' বলে, তখন মোটামুটি শুদ্ধ উচ্চারণই করে, এবং 'লাট্-সাহেবে'র 'লাট্' উচ্চারণের মতই প্রাচীন শুদ্ধ উচ্চারণ। বললুম, তা "ওয়েসকিট্ নিয়ে দুর্ভাবনা কিসের?"

তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "তোমার ব্লাইণ্ড স্পটগুলো যে খোদায়

কোথায় কোথায় রেখেছেন বলা শক্ত। এদিকে শেক্‌স্‌পীয়র-বাইরন পড়েছ, অন্যদিকে মর্নিং স্যুটের ওয়েসকিটের মহিমা জানো না।"

আমি একগাল হেসে বললুম, "টায় টায় মিলে যাচ্ছে। ফ্রান্সের শ্যামপেন প্রভিনসের এক সমঝদার আমায় বলেছিল, 'তাজ্জব লাগে মসিয়ো, এদিকে আপনি মলিয়ের সারৎর পড়েছেন অন্য দিকে আপনি উত্তম মদ্য বর্দো বুর্গন্‌নের 'বুকে'র (bouquet) তফাত ধরতে পারেন না!' তা সে যাক গে। স্যুটের রঙের কথা কি যেন বলছিলে!"

"হুঁ, আসছে সীজনে সমঝদাররা যেসব রঙের উপর—রঙের উপর ঠিক না, রঙের শেডের উপর ন্যুয়ান্স-এর উপর কৃপা করবেন সেই অনুযায়ী তোমার স্যুটগুলো তৈরি করা হবে।"

আমি শঙ্কিত হয়ে বললুম, 'গুলো মানে? কটা?"

আপন ওয়েসকিটের সর্বনিম্ন বোতামটির উপর—ইটি কখনো খাঁজে ঢোকানো হয় না, যবে থেকে ড্যুক অব উইনজার ফ্যাশানটি প্রবর্তন করেন—হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "তা, তা, গোটা বিশেক। আপাতক। পরে দেখা যাবে।"

এর পর আর শঙ্কার কোনো কথা ওঠে না। আমি বললুম, "যে টাকাটা ফোকটে পেয়েছিলুম সেটা গেল। উপস্থিত লণ্ডনে, একটা নাতিভদ্র লাউনজ স্যুটের কেমৎ নিদেন—£50/-/-, আড্‌ভালোরেম, আমাদের দিশী টাকায় প্রায় আটশ'—"

বাধা দিয়ে বললেন, "পাগোল! একটা সুস্থ (সোবার) স্যুটের দাম নিদেন £120/—/,—"

যখন পুনরায় চৈতন্যময় জগতে ফিরে এলুম তখন মিঃ (পরে তিনি স্যর হন) হজসন-জবসন ফবজ-রোবসন আমার গলায় সাইফন থেকে সোডা-জলের সঙ্গে কড়া ব্রাণ্ডি মিশিয়ে তাই দিয়ে চোঁ—ও"—ও"—করে চাঁদমারী মারছেন—দমকলের লোক যে-রকম হোজ দিয়ে আগুন মারে।

আমার কোনো কিছু বলার মত অবস্থা নয়। মিঃ হজসন (ইত্যাদি) বললেন, "আকছারই এরকম ধারা হয়। আমরা দমকল ডাকি নে। সাইফন দিয়ে কাজ চালাই। এই পর্শুদিনই ড্যুক্‌ অব কে—"

আমি ক্ষীণকণ্ঠে বললুম, "তা হলে আমার এই দিশী কোত-পাৎলুন বন্ধক দিয়ে দেশের টিকিট কাটতে হবে নাকি?"

সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "প্যাট কেম দি রিপ্লাই, খোলা বাজারে না, কিস্‌সুটি পাবে না। তবে হ্যাঁ, আলবত, ব্রিটিশ ম্যুজিয়াম পুর্না সব আরকিওলজিকাল ক্যুরো কিনছে। অশোকের দাস্তানা, অর্জুনের পোর্টেবল অ্যাটম বম, দৌপদীর প্রেসারকুকার-কম্‌-ফ্রিজ—। কিন্তু তুমি ভয় পাচ্ছো কেন? আচ্ছা বল তো, পর্শুদিন রোদাঁর যে মূর্তিটি বিক্কিরি হল, তার পাথরের দাম কত? বুঝতে পারলে তো প্রশ্নটা? স্রেফ পাথরের দাম? প্লেন মেটেরেলের দাম?"

আমি মিনমিনিয়ে বললুম, "পাথরের দাম আর কত হবে? মার্বেল বটে। টাকা তিরিশেক।"

ওস্তাদ সোৎসাহে বললেন, "ইয়েহ্! আর মূর্তিটি বিক্রি হল £50,000/-। এইবারে একটু চিন্তা করো। তোমাকে যে ডজন দুই স্যুট বানিয়ে দেব, বাজারে তার দাম হবে, নিদেন, হাজার তিনেক পৌণ্ড। কিন্তু মেটেরেলের দাম? প্রেফ উলের দাম কত হবে? বঢ়ীয়াহ সে বঢ়ীয়াহ? £50/-/-? £100/-/- অর্থাৎ ১৪০০ টাকা? আমি আরটিস্ট, আমি রোঁদা।"

একটুখানি ভরসা পেয়ে বললুম, "তা, তা, ডজন দুই, মানে কিনা, অতগুলো সুটের কি সত্যই দরকার?"

* * *

এর পর ওস্তাদ অত্যন্ত টেকনিকাল ভাষায় যে-কথা বলেন সে আমি বুঝতে পারিনি, মনেও নেই। অতএব এখন যদি তাঁর ফিরিস্তি ঠিক ঠিক না দিতে পারি, তবে পাঠক অপরাধ নেবেন না।

তিনি হুড়হুড় করে বলে যেতে লাগলেন—

"মর্নিং স্যুট—স্ট্রাইপ্‌ট্ ট্রাউজারস—অরিজিনাল ওয়েসকিট—তার টপ্-এন্‌ডে সাদা সিলকের পাইপিং দেব কি?—টাইয়ের উপরে ডাইমনড পিন্ না পার্ল দেবো?—কোণভাঙা কলারের জন্য কোন্ কোমপানি উত্তম? স্প্যাটার ডেশেজ!

"তার পর দেমি। পাতলুন যথা পূর্বং। কিন্তু কোটটা টেল নয়।

"সে না হয় হল। দুপুরের লাউন্‌জ্ স্যুটটি কি প্রকারের হবে?

"সন্ধেয়? ডিনার জ্যাকেট? টেলস্?

"ইতিমধ্যে যদি গল্‌ফ খেলতে লোকটা গিয়ে থাকে?

"কিংবা সাঁতার কাটতে?

"কিংবা খেঁকশেয়াল শিকার করতে ঘোড়ায় চড়ে, জোড়্‌পুরী?

"কিংবা সে যদি অসুস্থ হয়ে তাবৎ দিন বিছানায় শুয়ে থাকে, তবে তার ড্রেসিং গ্রাউন কি হবে?"

আমার মুখে বিরক্তি দেখে বললেন, "এই যে তুমি এখন লাউনজ স্যুট পরে আছ, এ তো ইংরেজের ডাল-ভাত। এর উপর তার কি ধরনের ক'টা স্যুট দরকার হয় তার ফিরিস্তি দেওয়া বড়ই শক্ত। সে থাক। উপস্থিত তোমার সঙ্গে কিঞ্চিৎ ভাষা বাবদে আলোচনা হোক। আচ্ছা বল তো স্মর্কা কাকে বলে?"

"জানি নে।"

"তাহলে বানান করছি, s m o k i n g?"

"এ রকম বিৎকুটে উচ্চারণ হতে যাবে কেন?"

"ফরাসীরা তাই করে। অবশ্যি যারা অল্পস্বল্প দুনিয়ার খবর রাখে তারা বলে স্মকিন্‌ন! তা সে যাক গে, কিন্তু ফরাসীতে অর্থ হল ডিনার জ্যাকেট, টেল্‌জ্ না। আবার ইংরিজীতে স্মোকিং-জ্যাকিট অন্য জিনিস। অসকার ওয়াইল্‌ডের বড় প্রিয় ছিল, আর ছিল ফিনসি ওয়েসকিট—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "ওয়াইলডের কথা কও, শুনতে রাজী আছি।

কিন্তু তোমার এই বাহান্ন রকমের স্যুটের স্নবারিক দেমাক আমার আর বরদাস্ত হচ্ছে না।"

সিরিল বললেন, "বট্যো ? তুমি যখন পাঁচ রকম 'ঔচে' (উচ্ছে) বর্ণনা দিতে দিতে স্নবারির চূড়ান্তে পেঁছে গিয়ে বলো, ইংরেজ রাস্টিক, তেতোর কদর বোঝে না, তখন আমি বাধা দিই ? তুমি যখন বারো রকম অ্যামবল (অম্বল)—"

* * *

শ্রীযুক্ত নীরদ চৌধুরী যাই বলুন, যাই কন, জামাকাপড় বাবদে আমরা মুক্ত।

রাস্তা দিয়ে নাগা সন্ন্যাসী যখন যায়, তখন তো আমরা শুধোই নে, এটা হিন্দু না মুসলমান 'ড্রেস' !!

'ল্যাটে'

"রদাঁগৎ কাকে বলে জানো ?"

"এক রকমের ফরাসি লম্বা কোট। প্রায় ফ্রককোটের কাছাকাছি। এর বেশী কিছু জানি নে, কখনো দেখিনি।"

"শব্দটা—রাদার, সমাসটা—কোত্থেকে এসেছে ?"

আমার ইংরেজ বন্ধু সিরিল বেশভূষা বাবদে পয়লা নম্বরি, কিন্তু শব্দ, ভাষা এসব বাবদে তাঁর অণুমাত্র ইনট্রেস্ট্ নেই। তাই একটু উৎসাহ দেখিয়ে বললুম, "কোত্থেকে ?"

"চেনবার জো'টি নেই। ইংরেজী 'রাইডিং কোটে'র এই হল ফরাসি উচ্চারণ। শুধু তাই নয়, এতে আরো মজা। সেই রদাঁগৎ যখন ফের বিলেতে এল তখন তার ইংরিজী উচ্চারণ হয়ে গেল রেডিংগট এবং ফ্রান্সে নবজন্মপ্রাপ্ত এ-পোশাক এদেশে আবার এক নবজন্ম লাভ করে হয়ে গেল মেয়েদের পোশাক—পুরুষ আর এটি এদেশে পরে না, অন্তত এ নামে পরিচিত পোশাকটি পরে না। কিন্তু রদাঁগৎ এখনো ফ্রান্সের ভারিক্কি পোশাক। তোমারও তো বয়স হতে চললো, আর যাচ্ছোও ফ্রান্সে—"

আমি বললুম, "থাক, আমার সাদামাটা লাউনজ স্যুটেই চলবে।"

* * *

ফ্রান্সের একটি জায়গা দেখার আমার অনেককালের বাসনা।

বহু বৎসর পূর্বে আমরা একবার মার্সেলস বন্দরে নামি। সঙ্গে ছিলেন দেশনেতা স্বর্গত আনন্দমোহন বসুর পুত্র ডঃ অজিত বসু ও তাঁর স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া মায়া দেবী।

বড়ই দুঃখের বিষয় এই গুণী, জ্ঞানী কর্মবীর অজিত বসু সম্বন্ধে কেউ কিছু লেখেননি। আসলে ইনি চিকিৎসক ছিলেন কিন্তু তাঁর জ্ঞানসাম্রাজ্য যে

কী বিরাট বিস্তীর্ণ ছিল সেটা আমি আমার অতি সীমিত জ্ঞানের শিকল দিয়ে জরিপ করে উঠতে পারিনি।

তাঁর কথা আরেক দিন হবে।

তখনকার মত আমাদের উদ্দেশ্য ছিল জিনীভা যাওয়া। কিন্তু খবর নিয়ে জানলুম, সন্ধ্যার আগে তার জন্য কোন থ্রু ট্রেন নেই।

গোটা মধ্য এবং পশ্চিম ইয়োরোপ তিনি চিনতেন খুব ভালো করে। এবং বিখ্যাত শহর হলেই তিনি ইয়োরোপের ইতিহাসে সে শহর কি গুরুত্ব ধরে ধাপে ধাপে বলে যেতে পারতেন, কারণ তাঁর মত 'পুস্তক কীট' আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি।

বললেন, "তার আর কি হয়েছে! চলুন, ততক্ষণে এ্যাক্স্ হয়ে আসি। মাইল আঠারো পথ।"

আমি বললুম, "সে কি? এ্যাক্স্-লে ব্যাঁ তো অনেক দূরে।"

তিনি হেসে বললেন, "আমার জানা মতে তিনটে এ্যাক্স্ আছে। উপস্থিত যেটাতে যেতে চাইছি সেটা আগা খানের প্যারা জায়গা এ্যাক্স-লে-ব্যাঁ নয়—এটার পুরো নাম এ্যাক্স্ আঁ-প্রভাঁস!"

আমি বললুম, "প্রভাঁস? তাহলে এ জায়গাতেই তো আমার প্রিয় লেখক আলফঁস দোদে তাঁর 'লেটারজ্ ফ্রম মাই মিল' লিখেছিলেন, এখানকারই তো কবি মিস্ত্রাল যিনি নোবেল প্রাইজ পান—"

ডঃ বোস বললেন, "পুব বাঙলার যে লোকসাহিত্য আছে সেটা প্রভাঁসের আপন ফরাসি উপভাষায় রচিত সাহিত্যের চেয়ে কিছু কম মূল্যবান নয়। অথচ দেখুন, মিস্ত্রাল যে রকম একটা উপভাষা—একটা ডায়লেকটে, অবশ্য আজ এটাকে ডায়লেকট বলছি—কাব্য রচনা করে বিশ্ববিখ্যাত হলেন, নোবেল প্রাইজ পেলেন, ঠিক তেমনি পুব বাঙলায় কেউ সেই ভাষা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে, গর্ব অনুভব করে, মিস্ত্রালেরই মত পরিশ্রম স্বীকার করে, সেটিকে আপন সাধনার ধন বলে মেনে নিয়ে নূতন সৃষ্টি নির্মাণ করে না কেন? জানেন, আমি বাঙাল?"

ইতিমধ্যে যান এসে গেছে।

এদেশের বর্ণনা আমি কি দেব? এ্যাক্স্ও নাকি দু হাজার বছরের পুরনো শহর। কই, মেয়েগুলোকে দেখে তো অত পুরনো বলে মনে হল না! তাহলে বলতে হয়, শহরটা দু' হাজার বছরের 'নূতন'।

পার্কের একটি বেঞ্চিতে বসে ভাবছিলাম, এই তো কাছেই তারাসক* শহর যাকে বিখ্যাত করে দিয়েছেন দোদে তাঁর তারতারাঁ দ্য তারাসক* লিখে।[১] তারই পাশে ছোট্ট জায়গাটি—মাইয়ান্ (জানি নে, প্রভাসালে তার উচ্চারণ কি) যেখানে কবি মিস্ত্রাল তাঁর সমস্ত জীবন কাটালেন। তারই মাইল সাতেক দূরে

১ বছর চার পূর্বে বোধ হয় থগেন দে সরকার এর অনুবাদ "দেশে" প্রকাশ করেন।

বাস করতেন দোদে—ফঁভিয়েই গ্রামের কাছে। কবি মিস্‌ত্রালের বর্ণনা লিখে একাধিক ফরাসি লেখক নিজেদের ধন্য মেনেছেন। কিন্তু অপূর্ব দোদের বর্ণনাটি। —এক রববারের ভোরের ঘুম থেকেই উঠে দেখেন, বৃষ্টি আর বৃষ্টি, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি। গোটা পৃথিবীটা গুমড়ো মুখ করে আছে। সমস্ত দিনটা কাটাতে হবে একঘেয়েমিতে। হঠাৎ বলে উঠলেন, কেন, তিন লীগ আর কতখানি রাস্তা? সেখানে থাকেন কবির কবি মিস্‌ত্রাল। গেলেই হয়।

কিন্তু দোদে যেভাবে (তাঁর লেয়'-এ Letters de mon Moulin-এর ইংরিজী অনুবাদ কতবার কত লোক যে করেছেন তার হিসেব নেই, পাঠক অনায়াসে পুরনো বইয়ের দোকানে মূল অনুবাদ যোগাড় করতে পারবেন)[২] সেই জলঝড় ভেঙ্গে পয়দল মিস্‌ত্রালের গাঁয়ে গিয়ে পেঁছিলেন তার বর্ণনা আমি দেব কি করে? দোরে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে পেলেন কবি উঁচু গলায় কবিতা রচনা করে যাচ্ছেন—কী করা যায়?—নিরুপায়—ঢুকতেই হবে—

মিস্‌ত্রাল যেন লাফ দিয়ে তাঁর ঘাড়ে পড়লেন—"এঁ্যা! তুই এসেছিস! আর ঠিক আজকেই! কী করে তোর মাথায় সুবুদ্ধিটা খেললো, বল দিকিনি।"

তারপর কি হল? বলবো না।

শুধু একটি কথার উল্লেখ করি।

খানিকক্ষণ পরে গির্জা থেকে ফিরে এলেন মিস্‌ত্রালের মা। বুড়ী বড়ই সরলা, রান্নাতে পাকা, কিন্তু হায়, প্রভাঁসাল ছাড়া কোনো ভাষা বলতে পারেন না। তাই কোনো 'ফরাসি' (যেন প্রভাঁসের লোক ফরাসি নয়!) ছেলের সঙ্গে খেতে বসলে তিনি তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতেন না—কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা, তিনি রান্নাঘরে না থাকলে তো রসুইয়ের নিখুঁত তদারকি হবে না।

আরেকটি কথা। মিস্‌ত্রালের শোবার ঘরটি ছিল বড্ডই ন্যাড়া। ফরাসি একাডেমি যখন মিস্‌ত্রালকে তিন হাজার ফ্রাঙ্ক উপহার দিলে, তখন বুড়ী চাইলেন ঘরটিকে একটু 'ভদ্রস্থ' করতে।

"না, না, সে হয় না"—বললেন মিস্‌ত্রাল—"এ যে কবিদের কড়ি; এটা ছুঁতে নেই।" ঘরটি ন্যাড়াই থেকে গেল। দোদে বলেছেন, "কিন্তু যতদিন ঐ 'কবিদের কড়ি' ফুরোয়নি, ততদিন কেউ তাঁর বাড়ি থেকে রিক্ত হস্তে ফিরে যায়নি!"

বৃষ্টি হচ্ছিল না? না, আমি স্বপ্ন দেখছিলুম।

তবে কি আমি ডাঃ বসুর সঙ্গে বসে? না, সেও স্বপ্ন।

আমি এসেছি মিস্‌ত্রালের গ্রামে, বহু সৎসর পরে, সেই "রদাঁগৎ" পরে।

আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। শুধু একটি দুঃখ রয়ে গেল। যাঁকে এখানে আসার খবরটি পিকচার পোস্টকার্ডে জানালে খুশী হতেন তিনি এখন এমন জায়গায় যেখানে এখনো ডাক যায় না।

২ এ লেখক দোদের একটি লেখা সম্প্রতি অনুবাদ করেছে। 'দু-হারা' গ্রন্থ পশ্য। কিন্তু আমার অনুবাদ থেকে মূল যাচাই করতে যাবেন না।

আঁদ্রে জিদ

দুনিয়ার লোক হন্দমুন্দ হয়ে প্যারিস যায়, এবং প্যারিসের ধনীদরিদ্র সকলেরই কামনা, কি করে গ্রামাঞ্চলে একখানা কুটিরাবাস নির্মাণ করা যায়। প্যারিসের ফ্ল্যাটখানাও থাকবে এবং সেখানে মাঝে মধ্যে আসবেন থিয়েটার অপেরা দেখবার জন্য, বন্ধুজনের (বান্ধবী তো নিশ্চয়ই) সঙ্গে মিলিত হবার জন্য।

খাঁটি স্ট্যাটিস্টিক্স দেওয়া কঠিন,—ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, যে কজন মহৎ ফরাসি লেখক আমার প্রিয় তাঁদের প্রায় সকলেই জীবনের অধিকাংশ ভাগ কাটিয়েছেন 'মফস্বলে'। যাঁরা নিতান্তই কোনো না কোনো কারণে পেরে ওঠেননি—যেমন আলফাঁস দোদে—তাঁরা সুযোগ পেলেই ছুটে যেতেন গ্রামাঞ্চলে, কোনো সখার বাড়িতে।

প্রভাঁসের যে-জায়গাটিতে দোদে বার বার গেছেন সেখানে দিন পাঁচেক কাটানোর পর এক অপরাহ্নে বসে আছি, যে-'ইন্'টিতে উঠেছিলুম (এসব 'ইন্' এমনই গাঁইয়া যে এগুলো না হোটেল, না ডাক-বাংলো, না সরাই, না চটি—সব-কটিরই অল্প-বিস্তর সুবিধে অসুবিধে দুইই এগুলোতে পাবেন) তারই জানালার কাছে বাইরের দিকে তাকিয়ে। ঢেউখেলানো উঁচু-নিচুর টক্করে ভর্তি জনপদ ধরিত্রীর দূরত্ব যেন আরো বাড়িয়ে দেয়—আপন দৃষ্টি যে কত দূরান্তে যেতে পারে সে সম্বন্ধে মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং আশ্চর্য, সমুদ্র যদ্যপি দিগন্ত-বিস্তৃত তার পারে বসে মানুষের এ-অভিজ্ঞতা হয় না।

ইন্‌কীপার, পাত্র (Patron), মালিক—যে নামে খুশী ডাকুন—কাছে এসে দাঁড়াতেই আমি প্রসন্ন বদনে বললুম "এ ব্যাঁ, আলর্—" এ শব্দগুলোর মানে অভিধানে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই, যেমন "এই যে, হেঁহেঁ বেশ বেশ—" শব্দগুলো নিশ্চয়ই কোনো না কোনো মানে ধরে কিন্তু আসলে এগুলো ফাসী ভাষাতে যাকে বলে "তাকিয়া-ই-কালাস' অর্থাৎ "কথার তাকিয়া" অর্থাৎ যার উপর ভর করে কথাবার্তা আরাম পায়—জমে ওঠে।

তার পর বললুম, "বসবে না ? একটা কিছু খাও।"

বললে, "এ ব্যাঁ, আমি আপনাকে 'দেরাঁজ' ('ডিসএরেঞ্জ' শব্দার্থে অর্থাৎ ডিসটার্ব বা বদার) করছি না তো ?"

আমি প্রসন্নতর বদনে বললুম, "পা দ্য তু—বিলকুল না—।"

বললে, "মসিয়ো, আমি আদৌ 'নোজি' না। বিশেষত যখন দেখতে পাচ্ছি, আপনি যখন আপন মনে, মনের সুখে আছেন। ও লা লা—কাল সন্ধ্যায় আমাদের আড্ডাটি যা জমেছিল ! আর আপনি যা হাসাতে পারেন—"

একদম গুল্। হাসাতে পারার মত তেমন কোনো স্টাক্ আমার নেই। আসলে ব্যাপারখানা হয়েছিল এই যে, আমাদের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত কতকগুলো গল্প, গোপালভাঁড় ইত্যাদি আমি তাদের শুনিয়েছিলুম আপন ভাঙা ভাঙা ফরাসিতে। তাদের কাছে লেগেছে 'এপাঁতা' (ভয়ঙ্কর মজাদার) এবং অরি-

জিনাল। অবশ্য এসব গল্প যখন প্যারিস-লণ্ডনেই পেঁছিয়নি তখন প্রভাঁসের 'পাণ্ডব-বর্জিত' অজ পাড়াগাঁয়ে যে অরিজিনাল মনে হবে তাতে আর বিচিত্র কি? গোপালের দু'একটি 'রিসকে' (risky আদিরসাত্মক) গল্প বলতেও ছাড়িনি, এবং তখন গাঁয়ের পাদ্রি সাহেবই—এবং তিনিই ছিলেন আসরের চক্রবর্তী—সব চেয়ে বেশী চোখের ঠার মেরে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন।

বললে, "মসিয়ো, আমাদের গ্রামে ক'জন বিদেশী এসেছে সে আমি এক আঙুলে বলতে পারি—তাও তারা পাশের দেশ স্পেন বা ইতালির বাউণ্ডুলে—আর আপনি তো এসেছেন কোথায় সেই সুদূর ল্যাঁদ (L Inde) থেকে। এখানে আপনি কি মধু পেলেন, বলুন তো?"

আমি বললুম, "তুমি তো বলেছিলে, তুমি কখনো প্যারিস তক্ দেখোনি। তোমাকে বোঝানো হবে শক্ত। তবে সংক্ষেপে বলতে পারি, এটা অনেকটা রুচির কথা। আপন দেশেও আমি গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে, বাস করতে ভালোবাসি। তা ছাড়া এটা কবি মিস্ত্রালের দেশ।···আচ্ছা, অন্য লোক আসে না এখানে মিসত্রালের জন্মভূমি দেখতে?"

বেশ গর্বভরে বললে, "নিশ্চয়ই, তবে তারা সবাই ফরাসি—"

তারপর কি যেন মনে পড়ে যাওয়াতে হঠাৎ থেমে গিয়ে এবারে সে উৎসাহভরে বললে, "ও লা লা। সে এক কাণ্ড।"

"দুই লেখকের লড়াই। সে হল গিয়ে ১৯৪৪-এর শেষের দিকের কথা। মার্কিনিংরেজ নরমাঁদিতে নেমে প্রায় সমস্ত ফ্রান্স দখল করে ফেলেছে, ঐ সময় কি কারণে, কি করে যেন দুই লেখক—হ্যাঁ খাঁটি ফরাসি—এসে উঠেছেন আমার এখানে। আর এই ঘরেই, আমরা কাল যেখানে দুপুর রাত অবধি কত আনন্দে হইহুল্লোড় করলুম, এসে বসেছেন, সেই দুই লেখক; কিন্তু তাঁরা তাঁদের চতুর্দিকে যে আবহাওয়া নির্মাণ করলেন সেটি ঠিক তার উল্টো। এ্যাম্বড়া বড়া গেরেমভারী হাঁড়িপানা গম্ভীর এক জোড়া মুখ দেখে আমার গাঁইয়া খদ্দেররা তো আশ্রয় নিলে ঘরের অন্য কোণে।

"ওঁরা গুরুগম্ভীর আলোচনা করে যাচ্ছেন নিজেদের ভিতর—আমরা ওদিকে কান দিইনি। কিছুক্ষণ পরে তাঁদের গলা চড়তে লাগলো, তারপর আরম্ভ হল রীতিমত ঝগড়া। তারপর আরম্ভ হল আমাদের ঐ পাহাড়ী বকরীতে বকরীতে যে রকম লড়াই হয়।[১] তারপর বলদে বলদে। অবশ্য আমাদের বলদ প্রতিবেশী স্প্যানিশদের বলদের তুলনায় তেমন কিছু না।[২]

"কি নিয়ে ঝগড়া, মসিয়ো? জান কী নিয়ে—ছুঁড়ি নিয়ে? তা হলেও তো বাঁচতুম। সে তো হর-হামেশাই হচ্ছে। এ ঝগড়া সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস নিয়ে। বলি ঃ—

১ প্রভাঁসের বকরী সম্বন্ধে লিখেছেন স্বয়ং দোদে—Le Chevre de M. Seguin.

২ এও পাঠক পাবেন প্রাগুক্ত পুস্তকে।

ঐ সময়—অর্থাৎ তখনো যুদ্ধ শেষ হয়নি, অবশ্য হিটলারের পরাজয় সম্বন্ধে তখন সবাই নিঃসন্দেহ—এক ফরাসি লেখক লিখেছেন, এই যে আমরা ফরাসিরা 'পাত্রি' (স্বদেশ), 'পাত্রি', 'লিবেরতে' 'লিবেরতে বলে চেঁচাই তার মূল্য কতটুকু ? তিনি নাকি তারপর লিখেছেন, ফরাসি চাষা যদি তার গম দু পয়সা বেশী দামে বিক্রী করতে পারে তবে সে থোড়াই পরোয়া করে দেকার্ত আপন জাতভাই ফরাসি না দুশমন জরমন।

"এর নিয়ে লেগেছে তুলকালাম ঝগড়া ! এক লেখক বলছেন, যারা ফরাসি জাতের দেশপ্রেম নিয়ে এরকম বিদ্রূপ করে তাদের ফাঁসি হওয়া উচিত। অন্য লেখক বলেছেন, কথাটা টক হলেও হক। এবং যে ফরাসি লেখক একথা বলেছেন তিনি তো জর্মন বা তাদের 'দোস্ত' পেতাঁর সহযোগিতা করতে রাজী হননি। তাঁর সততা সম্বন্ধে যারা সন্দেহ করে তাদের হওয়া উচিত ফাঁসি। তখন প্রথম জন বললেন, 'আজ যদি আমাদের ক্লেমাসোঁ বেঁচে থাকতেন তবে ঐ যে ব্যাটা ফরাসির দেশপ্রেম নিয়ে মস্করা করেছে তাকে তাঁর নোংরা বন্দুকটা দিয়ে পরিষ্কারটা দিয়ে নয়, সেটা দিয়ে তিনি বুনো শুয়ার মারেন—গুলি করে মারতেন'।"

এতক্ষণ মালিক ভায়া যে গম্ভীর সুরে কথা বলছিলেন, তার থেকে আমার মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং ক্লেমাসোঁই লীগ অব নেশনসে প্রতিবেদন পাঠ করছেন।

এবারে হঠাৎ হেসে উঠে বললে, "তারপর যা হল, মসিয়ো, সে সত্যি যাকে বলে কু দ্য তেয়াৎর[৩]—নাটকীয় ব্যাপার—, ইতিমধ্যেই যে আমাদের পাদ্রি সাহেব কখন এখানে এসে এক কোণে দাঁড়িয়ে এঁদের তর্কাতর্কি শুনছিলেন সেটা লক্ষ্যই করিনি।

"তিনি এগিয়ে গিয়ে বললেন, "মেসিয়ো, আমি আপনাদের দেরাজ করতে চাই নে ; সামান্য একটি বিষয়ের উল্লেখ করে আপন পথে চলে যাবো। আপনারা শহুরে সজ্জন—শুনেছি, আপনারা ব' দিয়োর (ভগবানের) অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। আমার শুধু বক্তব্য, আপনাদের একজন বলছিলেন, আজ ক্লেমাসোঁ বেঁচে থাকলে তিনি নাকি কাকে যেন গুলি করে মারতেন। এ-ভোওয়ালা, মেসিয়ো—আজই সন্ধ্যায় এই কাগজখানা আমার কাছে এসেছে আমাদের কলোনি ট্যুনিস থেকে। তাতে প্রকাশিত হয়েছে একখানি চিঠি। ইটি লিখেছেন মসিয়ো ক্লেমাসোঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী—তার বয়স, এখন চুরাশি। তিনি লিখেছেন,—'শের মসিয়ো জিদ, আমি আমার জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে বহু বৎসর বাস করেছি। আমি বলতে পারি, আজ তিনি বেঁচে থাকলে আপনার পক্ষ নিতেন। তাঁকে কতবার বলতে শুনেছি, জমি ! জমি !! শুধু জমি !! আর টাকা। ব্যস, মাত্র এ দুটো বস্তুই আমাদের চাষীরা চেনে !'

---

৩ Coup d'etat' cout de palais তুলনীয়। আজকাল পৃথিবীর সর্বত্র নানারকম 'কু' (অনেক সময়ই কিন্তু সেগুলো শিল্পমীর 'সু' !) হচ্ছে বলে এটা উল্লেখ করলুম।

"পাদ্রি সায়েব বললেন, 'তা সে যাক ! কিন্তু এটা কি ব' দিয়োর মিরাকল নয়, যে আজই আমি এ কাগজখানা পাবো, আজই আপনারা এ আলোচনা তুলবেন, আজই আমি সেই পত্রিকাটি পকেটে করে আজই এখানে আসবো—এবং আপনাদের দ্বন্দ্বের সমাধান করে দেব !···ও রভোয়া মেসিয়ো ! কাল রববার গির্জে'য় দেখা হবে' ।"

কাহিনীটি শেষ করে মালিক মিটমিটিয়ে হেসে বললে, "এই যে বিরাট ফ্রান্স-ভূমি—এদেশের কারো বিশ্বাস, প্রভাঁসের লোক বড় সরল, বিশ্বাসী, ধর্মপ্রাণ, আর কারো বা বিশ্বাস তারা কুসংস্কার কুণ্ডে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ।···আপনার কি মনে হয় ? আপনি তো এসেছেন ধর্মের দেশ L'Inde থেকে ।"

আমি তার মিটমিটে হাসি থেকে তারই বিশ্বাস কোন্ দিকে বুঝতে পারলুম না ।।৪

আড্ডা

কি বললেন স্যার ? বাড়ি বিক্রি করতে এসেছেন ? আমি কিনবো ? আমি ! বাড়ি নিয়ে করবোটা কি আমি ? জন্ম নিলুম হাসপাতালে, পড়াশুনো করলুম হস্টেলে, প্রেম করেছি ট্যাক্সিতে, বিয়ে হল রেজিস্টারের আপিসে। খাই ক্যানটিনে—কিংবা যারে কয় 'ভোজনং যত্রতত্র'—, সকালটা কাটে কর্তাদের তেলাতে, তেনাদের তরে বাজার করে দিতে···হাটে-র্যাশনে, দুপুরটা আপিসে, মাঝে মিশেলে সিনেমা হলে—সন্ধ্যেটা। পটল তুললে শুইয়ে দেবে নিমতলায়। বাড়ি নিয়ে কি আমি গুলে খাবো ? তার চেয়ে বলি, আসলে আমার দরকার একটি আড্ডার। একটি অত্যুৎকৃষ্ট আড্ডার। তার খবর দিতে পারেন ? তবে বুঝবো, আপনি একটি তালেবর ব্যক্তি !

কথাটা ন' সিকে খাঁটি। অত্যুৎকৃষ্ট ('কৃষ্ট' যদি 'কিষ্ট' বা 'কেষ্ট' হয় তবে 'উৎকৃষ্ট'ই বা হবে না কেন ?) আড্ডা প্রতিষ্ঠানটি হালফিল পুরো-হাতা ব্লাউজের মত ডাইয়িং ইনডাস্ট্রি—মৃতপ্রায়।

এহেন অবস্থায় অকস্মাৎ বিনামেঘে পুষ্পাঘাত ! দিল্লী থেকে খবর এসেছে সদ্যভূমিষ্ঠ শিক্ষামন্ত্রী প্রতিজ্ঞা করেছেন, বাঙালীকে তিনি 'আড্ডাবাজ' করে ছাড়বেন !

দিল্লী থেকে আসা খবরের সঙ্গে আমি প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ি না—বয়স হয়েছে। খবরটা ফলাও করে প্রকাশিত হবে, সঙ্গে সঙ্গে দেমাঁতি (dementi) বেরুবে, ফের তস্য দেমাঁতি বেরুবে দলিলপত্রসহ, চোপরা-ভাটিয়া আফ্টার এডিট লিখবেন, পারলিমেনটে গোটা তিনেক মন্ত্রী নাকুনি-চুবুনি খাবেন, ঐ নিয়ে খানদানী আড্ডায় (আমাদের যৌবনে) তর্কাতর্কির ফলে গোটা তিনেক 'পেয়ারে' মুখ দেখাদেখি বন্ধ হবে—তবে আমি ব্যাপারটার মোটামুটি

৪ আঁদ্রে জিদ্-এর ডাইরি, Journal 1939-42, 1942-42, Appendice 200ff.

আবছা-আবছা ধুঁয়াশাপারা একটা 'উন্‌মান্‌' ('অনুমান' নয়, তার আউটলাইন বড্ড ধারালো) করে নিই যে, ব্যাপারটা কি হয়ে থাকতে পারে। গোলন-দাজদের কায়দা-করীনা নাকি এই দস্তুরেই হয়। প্রথম বোমা তাগ করবে লক্ষ্যবস্তু থেকে দূরে, পরেরটা কাছে, তার পর দুটোতে যোগ দিয়ে হাফাহাফি করে মোক্ষম মধ্যিখানে।

কিন্তু এ সংবাদখণ্ডটি নিয়ে কিঞ্চিনমাত্র দেমাঁতি ডুয়েল হয়নি। দিল্লীর লালাজী, মিয়াসাহেবরা খবরটা পরিবেশন করা সত্ত্বেও ব্যাপারটির গুরুত্ব 'এহমীয়ৎ' সম্বন্ধে বিলকুল বে-খবর। 'আড্ডা'? সো ক্যা বলা? মজলিস, মহফিল, মুশাএরা, জলসা, বয়েৎ-বাজী—আলবৎ—লেকিন 'আড্ডা'? সো ক্যা আফৎ, গজব? ওদের আড্ডা ভিন্ন বাথানের গোরু—ওদের ভাষায় ভিন্ন ঝোপের চিড়িয়া—যেমন ওদের গোলাব জামুন আর আমাদের গোলাপ জাম।

তা সে যাই হোক যাই থাক, খবরটা যদি গুজোরব বা 'আফওয়া' না হয় (হলে আগের থেকেই কলমে খৎ দিচ্ছি!) তবে বড় দুঃখের সঙ্গে শ্রীযুত ত্রিগুণা স্যানকে তাঁরই দ্যাশ করিমগঞ্জের একটি পদাবলী ঘেঁষা লোক-সঙ্গীত স্মরণ করিয়ে দেব ঃ—

'দেখা হইল না রে, শ্যাম
আমার এই নত্তুন বয়সের কালে—'

রসরাজের স্মরণে শ্রীমতী বলছেন, 'ঠাকুর! তুমি নির্দয় নও; আমাদের সাক্ষাৎ একদিন না একদিন হবেই হবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার এই নূতন (নত্তুন) বয়সে যে দেখা হল না, সে-ই আমার মর্মবেদনা।'

'ডাক্তারেতে বলে যখন মরেছে এই লোক
তাহার তরে বৃথাই করা শোক
কিন্তু যখন বলে জীবন্মৃত
তখন শোনায় তিতো।'

খানদানী আড্ডা এখন জীবন্মৃত। তার নত্তুন বয়স বহু কাল হল গেছে। এখন আর তার " 'কোন্ গুণ আছে', 'তিন-গুণী'?"

আড্ডা সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য সে আমি বহুবার বহু স্থলে নিবেদন করেছি। বহু সিন্ধু পেরিয়ে বহু দেশ ঘুরেছি আড্ডার সন্ধানে—পাপ মুখে কি করে বলি, গিয়েছিলুম লবজো কপচাতে; আখেরে সর্বত্র সর্ব পরীক্ষাতে নাগাড়ে ফেল মেরে মেরে বিলক্ষণ বুঝে গেলুম, আমার যদি জ্ঞানগম্যি কখনো হয়—তা সে ঝুটাই হোক আর সাচ্চাই হোক—সেটা হবে 'আড্ডাতে'—শিক্ষা-মন্ত্রী যে তত্ত্বটি কনফারম করলেন এই অ্যাদ্দিন পরে।...ফের বহু সিন্ধু পেরিয়ে দেশে এসে দেখি, সেই আড্ডার 'বিন্দুটি' খরতাপে বাষ্পপ্রায়।

খানদানী আড্ডা যে জীবন্মৃত সে তথ্য তর্কাতীত। এই যে কলকাতা শহরে ঝাঁকে ঝাঁকে পাঁস্তলা-দস্তলা হামে হাল উঠছে তো উঠছেই এর কটাতে রক থাকে, বৈঠকখানা আছে? রক উঠেছেন ডাক-এ, আর বৈঠকখানার বদলে ড্রইংরুম। এদিকে ক্ষুদে একটি পেগটেবিলের উপর অতি পাতলা ডিমের খোলস-

পরা পরসেলেনের প্লেটে স্ন্যাক, অন্য দিকে ফঙ্গবেনে টিপয়ের উপর বেলজিয়াম কাঁচের ঢাউস ফ্লাওয়ার 'ভাজ'। সোফাতে আরামসে হেলানও দিতে পারবেন না, পাছে মাথার তেল লেগে সোফাভরণ চিটচিটে হয়ে যায়। বত্রিশটি দাঁতের মধ্যিখানে বেচারী জিভকে যে রকম অতিশয় সন্তর্পণে 'হাফিজ, খবরদার' হয়ে নড়াচড়া করতে হয় আপনাকেও করতে হবে তাই। তবে সান্ত্বনা, ভুগন্তি বাড়ীর মালিকেরই সব চেয়ে বেশী। পাছে মহামূল্যবান কোনো জোড়াবাঁধা বস্তুর একটি ভেঙে যায়! বিলিতি মাল—এখন আর বাজারে পাওয়া যায় না।

গালগল্প যে একেবারেই হয় না, সে-কথা বলা যায় না। তাকে সোয়ারে, মাতিনে (ম্যাটিনি) কনভেরজাৎসিয়োনে [১] যা খুশি নাম দিতে পারেন, এমন কি আজকের দিনের ভাষায় সেমিনার বললেও দোষ নেই—কিন্তু একে আড্ডা নাম দিলে আমাদের নকিষ্যি কুলীন আড্ডার মেম্বারগণ একবাক্যে বলবেন, ক'হা আসমানকা তারা, আর ক'হা পিঠকা (আসলে ভদ্রসমাজে মূল শব্দটা অচল। পাঁচড়া!'

গঙ্গাস্নান কমে যাচ্ছে কেন? পুণ্যবানরা নূতন নূতন ঘাট বানাচ্ছেন না তাই।

আড্ডা কমে গেল কেন? মডারনরা রক বানান না বলে। পাল্লায় পড়ে কেউ কেউ বা প্রাচীন দিনের অগোছালো বৈঠকখানাকে ড্রইংরুমের সাত চাপের কারবন কপি বানাচ্ছেন—দিল্লীতে বলে 'বুড়ো ঘোড়ার গোলাপী ন্যাজ' কিংবা 'বুড়ী দাদীমার হাতে বাহারে মেহদি'।

কিন্তু এহ নিরতিশয় বাহ্য।

গুহ্য সমস্যা অপিচ সরলতম প্রশ্ন: এই যে আমাদের মন্ত্রিবর তরুণদের আড্ডাবাজ করে তুলবেন বলে যমুনা পুলিনে দাশরথির শপথ গ্রহণ করলেন সেটা কি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে কিংবা প্রকৃত আড্ডাবাজের ন্যায় 'ধ্যত্তর ত্তোর অগ্রপশ্চাৎ' হুঙ্কার ছেড়ে?

ঝাড়া আঠারোটি দিন আমাদের আড্ডাটি এই নিয়ে কুস্তি করেছে। নানা প্রশ্ন, বহুবিধ সপ্লিমেনটরি, ততোধিক এফিডেভিট—সর্বশেষে এস্তের 'বুলু পিরিণ্ট' (আমাদের মন্ত্রী মশাই এ বস্তুটি বিলক্ষণ চেনেন) ডাঁই ডাঁই তৈরি হল, অবশ্য আড্ডাধারী মাত্রই জানেন, আমাদের হাইজাম্প লঙ-জাম্প মুখে মুখে।

---

১ প্রথম দুটো শব্দ ফরাসী, তৃতীয়টি ইতালীয়। অর্থাৎ রসালাপ করার তত্ত্বটি বরঞ্চ লাতিন জাত কিছুটা জানে। শুনেছি, অ্যাংলো সেক্শনদের এমন ক্লাবও নাকি আছে যেখানে কোনো মেম্বার কথাটি বলা মাত্র তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। একদা একজন মেম্বার নাকি আগুন লাগা মাত্রই 'আগুন আগুন' বলে চেঁচিয়ে ওঠাতে ক্লাববাড়ি রক্ষা পায়। তাঁকে অনেক ধন্যবাদ জানাবার পর (অবশ্য লিখিতভাবে) খাতা থেকে তাঁর নামটি কিন্তু কেটে দেওয়া হয়।

প্রতি প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই পাল্টা প্রস্তাব উঠেছিল ; তবে একটি বিষয়ে সকলেই একমত হয়েছেন।

যদ্যপি মন্ত্রী মহাশয় এলেমদার ব্যক্তি তথাপি এ-হেন কঠিন গুরুভার তিনি যেন 'ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া'র মত এজমালি বা বারো-ইয়ারী পদ্ধতিতে উত্তোলন করেন। বিগলিতার্থ ;—তিনি যেন

১। একটি কমিশন নিয়োগ করেন।

এ-স্থলে আমার অতিশয় গোপনীয় একটি অভিজ্ঞতা থেকে জানাই, হাই-কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত জজকে আমি ব্যক্তিগতভাবে অন্তরঙ্গরূপে চিনি, যিনি একবার একটি আড্ডাবাজ ছোকরাকে অধ্যাপক পদের জন্য সুপারিশ করে জনৈক ভাইস্-চ্যানসেলারের কাছে হুট্ হয়েছিলেন। ভি সি যখন জিভ কেটে বললেন, 'ছোকরা পাঁড় আড্ডাবাজ' তখন তিনি জরডন জলে ধোয়া তুলসী পাতাপানা মুখ করে 'নাঈফ' উত্তর দিয়েছিলেন 'ঐ তো তার আসল এলেম।'

এঁকে কমিশনের চ্যারম্যান করতে পারলে সর্বরক্ষা—সকলং হস্ততলং !

২। ইতিমধ্যে দেখা গেল আরেকটি বিষয়ে আমাদের 'দশদিশি নিরদ্বন্দ্বা'—প্রকৃত আড্ডাপ্রাণ ব্যক্তিকে কাট্যা ফালাইলেও সে কোনো কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে যেতে পারবে না। হরহামেশা হাজামৎ করছি আমরা উইলসন জনসনের, আর আমরা যাবো কমিশনের সম্মুখে !

আড্ডাযজ্ঞের আমরা অভিশপ্ত (পুত, যাই বলুন) ভস্ম। আমরা যেতে পারবো না, নীলকণ্ঠের চড়াই উতরাই পেরিয়ে জটার ভিতর গঙ্গার সন্ধানে।

তিনিই আসতেন। আমি যাঁর প্রতি দু লহমা পূর্বে ইঙ্গিত করেছি তিনিই আসবেন, স্বেচ্ছায় সানন্দে। শ্যামবাজার থেকে শুরু করে আড্ডা মেরে মেরে তিনি হেসেখেলে পেঁছে যাবেন টালিগঞ্জে। রিপোর্ট যা লিখবেন সে এক অভিনব মেঘদূত ! শ্যামবাজার-রামগিরি থেকে টালি-অলকা !

কিন্তু আমরা কমিশনকে বিভ্রান্ত বা প্রেজুডিস করতে চাই নে বলে অত্যধিক বাগবিস্তার থেকে নিরস্ত হচ্ছি। তবে একটি বিষয়ে তাবৎ গৌড়ভূমি যখন বিলক্ষণ সচেতন, সেটি যেন কমিশন বিস্মৃত না হন।

আড্ডা জীবন্মৃত কিনা, যদি হয় তবে তার অমরুতাঞ্জন সঞ্জীবনী সুধা কি, সে নিয়ে তো কমিশন চিন্তা করবেনই—যথেষ্ট সুযোগ পাবেন, আজকাল প্রায়ই বিজলি ভ্রষ্টা রমণীর মত সাঁঝের ঝোঁকে চোখ মারতে মারতে আঁধারে গায়েব হয়ে যায়, তখন আত্ম-অন্বেষণী, বিশ্বভাবনা ভিন্ন গতি কি ?—কিন্তু আমরা আগে-ভাগেই বলে রাখছি ;—

বঙ্গসন্তান চাহে না অর্থ, চাহে না মান, চাহে না জ্ঞান—সে চায় ডিগ্রী !

আড্ডাবাজরূপে সে যদি স্বীকৃতি পায় এবং উমেদার মাত্রেই জানেন—খানদানী আড্ডাতে সীট পাওয়াটাই কী কঠিন কর্ম—তবে সে ডিগ্রী না নিয়ে ছাড়বে না !

এবং ঐ সব বস্তাপচা পি-এচ ডি, ডিফিল, হনোরিস কাউজা, সুম্মা কুম

লাউডে, দকত্যোর অ্যাস লেৎর, ফাজিল-অল-মুহদ্দিসীন, শমশীর-ই-জমশীদই আলিমান, সাংখ্যবেদান্ততর্কচুঞ্চু—এসব উপাধি-খেতাব-ডিগ্রী বিলকুল না-পাশ।

তাহলে সে ডিগ্রীর নাম কি হবে ?

এ-বাবদে ইহসংসারে সর্বাভিজ্ঞ মহাজনকে আমরা চিঠি লিখেছি।

ইনি স্ট্রাসবুরগ্ শহরের সরকারী উপাধিদাতা।

শহরের সদর দেউড়ি দিয়ে ঢুকলেন এক অশ্বারোহী—ইয়া মোছ, ইয়া তলওয়ার।

সামনেই সদররাস্তা-বুলভার জোড়া একটা টেবিলের পিছনে দাঁড়িয়ে ফ্রক-কোট, টপ-হ্যাট, আতশী-কাঁচের চশমা পরা এক—স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—সরকারী কর্মচারী। আমাদের আই এ এস গোছ।

হুংকারিলেন, 'তিষ্ঠ !'

'? ? ?'

'আপনি ডক্টরেট উপাধি ধরেন ?'

অশ্বারোহী অবতরণ পূর্বক সবিনয় ঃ 'আজ্ঞে না।'

গম্ভীর নিনাদ ঃ 'এ শহরে ডকটরেট না থাকলে "প্রবেশ নিষেধ"।'

কাতর রোদন ঃ 'তাহলে উপায় ?'

মোলায়েম সান্ত্বনা ঃ 'উপায় আছে বই কি। এই তো হেথায় টেবিলের উপর রয়েছে সর্ব গোত্রের উপাধিপত্র। আপনার দেশ ?'

আশাভরা কণ্ঠ ঃ 'এজ্ঞে, লুক্সেম-বুরগ্।'

নুড়ি-চাপা ভিন্ন ভিন্ন ডাঁই থেকে একখানা করকরে কাগজ তুলে নিয়ে ঃ 'আ-া-সুন, আসুন, স্যর। বিতে শ্যোন, প্লীজ !)। দক্ষিণা ঃ পঞ্চাশৎমুদ্রা।'

বিগলিত আপ্যায়িত কণ্ঠ ঃ 'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ (ডাংকে শ্যোন, মেনি থ্যাংকস)। এই যে।'

অশ্বারোহী নগরকেন্দ্রে প্রবেশ করতে করতে ভাবলে, 'আমার এই অশ্বিনীটি আমার বিস্তর সেবা করেছে। এর জন্য একটা হনোরিস কাউজা ডক্টরেট আনলে মন্দ হয় না।' ঘোড়া ঘুরিয়ে উপাধিদাতার কাছে এসে তার সদিচ্ছা জানালে। আই এ এস দুঃখ-ভরা কণ্ঠে বললেন, 'ভেরি ভেরি সরি, হের ডকটর ! এ শহরে ডকটরেট দেওয়া হয় শুধু গাধাদের। ঘোড়ার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই।'

আমরা এঁরই উপদেশ চেয়ে পাঠিয়েছি। আমেন !

পাসপরট্

গল্পটি পূব বাঙলার বিশেষ একটি জেলা সম্বন্ধে। মনে করুন তার নাম 'লোহাভরা'।

পূর্ব বাঙলার সাধারণ জন মাত্রেরই দৃঢ়তম বিশ্বাস 'লোহাভরা' জেলার লোকমাত্রই অতিশয় ধুরন্ধর। এদের কেউ একা বা দল বেঁধে ঢাকা স্টেশনে নামলে বিদগ্ধ, হাজির-জবাব কুট্টি পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে এদের রীতিমত সমঝে চলে। সর্বশেষে বলা হয়, ঐ জেলাতে কখনো দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সেখানে স্বয়ং শয়তান সে-জেলার যে প্রধান প্রতিভূ সে পর্যন্ত মাছি ধরে ধরে খায়—কারো গোলায় হাত দিতে হিম্মৎ পায় না।

তামাম পূব বাঙলার চাণক্য-মাকিয়াভেলিরা যে এদের সম্মুখীন হলে হুঁশিয়ারির খাতিরে তদ্দণ্ডেই তাঁদের কানাকড়িটি পর্যন্ত স্টেট ব্যাংকে জমা দিয়ে আসেন সে তত্ত্বটি লোহাভরাবাসী বিলক্ষণ অবগত আছে বলে তারা সহজে আপন বাসভূমির খবর দেয় না ; লোহাভরার পার্শ্ববর্তী কোনো এক জেলার বাসিন্দা বলে পরিচয় দেয়।

* * *

পারটিশনের ফলে কলকাতা এবং ঢাকাতেও নানা নয়া নয়া সমস্যা দেখা দিল।

ঢাকা সেকরেটারিয়েটে খবর এল আমেরিকা থেকে—ভারতের বিস্তর জানোয়ার-দরদী মহাজনরা বাধা দিচ্ছেন, বাঁদর যেন মারকিন মুল্লুকে চালান না দেওয়া হয়, মারকিনরা নাকি ডাক্তারী এক্স্পেরিমেণ্টের অছিলায় এদের উপর পাশবিক অত্যাচার (ভিভিসেকশন) করে। মারকিন ডাক্তাররা তাই ঢাকাকে অনুরোধ করেছেন, তাঁরা যদি ন্যায্যাধিক মূল্যেও মর্কট সরবরাহ করেন। পশ্চিম ও পূব বাঙলার মর্কটে মর্কটে নাকি রত্তিভর ফারাক নেই এবং এরা কোনো প্রকারের মাইগ্রেশন সারটিফিকেট নিয়ে দেশত্যাগী হয়েছে বলে জানা যায়নি !

সংশ্লিষ্ট সেকরেটারি মহোদয়—তিনিই আমাকে সংক্ষেপে ইতিহাসটি কীর্তন করেন—তাঁর দফতরের ঝানু-ঝান্ডু এসিসটেনট তস্য এসিসটেনটদের এত্তেলা দিয়ে তাদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা ফরেন ইক্স্চেনজের সাতিশয় গুরুতর ব্যাপার !'

দফতর ভুশুণ্ডিরা এক বাক্যে উত্তর দিলেন ঃ 'বাঁদর ধরার কৈশল অতিশয় প্যাঁচাল। এর স্পেশালিস্ট ছিলেন হিঁদুরা। তাঁরা ইণ্ডিয়া চলে গেছেন।'

অনেক তর্কাতর্কির পর স্থির হল জেলায় জেলায় খবরের কাগজে যেন নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনটি ফলাও করে ছাপানো হয় ;

বাঁদর ! বাঁদর !! বাঁদর !!!

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, মারকিন-মুল্লুকের অনু-

রোধে এই দেশ হইতে জীবন্ত বাঁদর আমেরিকায় রফতানী করা হইবে। তজ্জন্য উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হইবে।

স্বাক্ষর সেকরেটারি
সবুজপুরা, ঢাকা-১১।

আমি সচিব মহোদয়কে শুধালাম, 'উত্তম ব্যবস্থা। তারপর?'

বললেন, 'যেই না বিজ্ঞাপনটি লোহাভরা জেলায় বেরিয়েছে অমনি দেখা গেল, তাবৎ জেলার লোক লুঙ্গি ফেলে ফেলে গুয়া গাছের ডগায় চড়ে বসে আছে। সবাই মারকিন মুল্লুকে যাবে। মুশকিল! জানেন তো, লোহাভরার লোকের যা কাত্তিকের মত চেহারা, তাতে কোন্‌টা বাঁদর কোন্‌টা মানুষ ঠিক ঠাহর করা—'

* * *

ইতিহাস-দার্শনিক শ্রীযুক্ত টইনবি বলেছেন, দেশকালপাত্রের যোগাযোগের ফলে নিত্য নিত্য প্যাটারন্‌ তৈরি হচ্ছে বটে, কিন্তু সেগুলো আকছারই প্রাচীন প্যাটারনের পুনরাবৃত্তি মাত্র। তফাত ডীটেলে।

অতএব, যখন সবিশেষ অবগত আছি, উভয় বাঙলার দেশকালপাত্রে ফারাক যৎসামান্য তবে পূর্বোল্লিখিত পূর্ববঙ্গীয় প্যাটারনের পুনরাবৃত্তি পশ্চিমবঙ্গে প্রতিভাসিত হবে না কেন? আমরা কিসে কম?

অবশ্য স্বীকার করছি ডীটেলে উনিশ-বিশ হওয়া বিচিত্র নয়।

এবং তাই হয়েওছে।

কারণে, কিংবা অকারণে, অথবা বলতে পারেন, কিসমতের মারে এদেশে পাশপরট্‌ যোগাড় করাটা ক্রমশ কঠিন হতে কঠিনতর হতে লাগলো, স্বরাজ পাওয়ার অল্প কিছুকালের মধ্যেই। শেষটায় হাল এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে তখন কেউ আর নিতান্ত বিপদে না পড়লে ঐ সাপের পায়ের সন্ধানে বেরুতো না। অবশ্য লক্ষপতি, কালোবাজারী, বিদেশে যার আচার-করা ফরেন কারেন্‌সি আছে তাদের কথা আলাদা। এসব কাহিনী দফে দফে বয়ান করার প্রয়োজন নেই। খবরের কাগজে অনেক খবর বেরোয় সাদা কালিতে ছাপা। সেগুলো পড়ার জন্য একটি তৃতীয় নয়নের প্রয়োজন—ইংরিজীতে যাকে বলে টু রীড বিটুইন দ্য লাইনজ। যাঁদের সেটা আছে—আমার নেই—তাঁরা আপনাকে অনায়াসে দুকলম শেখাতে পারেন। সে কথা থাক।

ইতিমধ্যে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল।

লোকটার নিশ্চয়ই কোমরের জোর, কড়ির ওজন ও বুকের পাটা আছে, নইলে সরকারের সঙ্গে লড়তে যাবে কেন? কটা আদালতে হারার পর লোকটি সুপ্রীম কোরটে পেঁছিল জানি নে। সেখানে প্রধান বিচারপতি (তৎকালীন) শ্রীযুত সুব্বা রাও যা রায় দিলেন তার বিগলিতার্থ, কোনো ভারতীয় যদি আপন দেশ ছেড়ে বিদেশে যেতে চায় তবে তাকে ঠেকাবার এখ্‌তেয়ার ভারত সরকারের নেই। সেটা হবে সংবিধান-বিরুদ্ধ।

বাস্‌। আর যাবে কোথা।

আমাগো দ্যাশে কয়, একে তো ছিল নাচিয়ে বুড়ী তার উপর পেল মৃদঙ্গের তাল।

পূব বাঙলার প্যাটারনে এস্থলে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে গাছের মগডালে না চড়ে মেয়েমদ্দে আণ্ডাবাচ্চায় ধাওয়া করলে পাসপরট ফরমের জন্য। বাঁদরের জন্য ও-বস্তুর প্রয়োজন নেই—তাকে খাঁচায় পুরে প্লেনে ঢুকিয়ে দিলেই হল। মানুষের বেলা জাহাজের কাপতান, প্লেনের টিকিট বেচনেওয়ালা, ভূপৃষ্ঠে বর্ডারের উভয়পক্ষের পুলিস শুধোত, অভিজ্ঞান-পত্রটি কোথায় ?

ইতিমধ্যে নাকি আরো দুজন জজ সাহেবের রায় বেরলো ঃ আইনত নাকি পাসপরটের কোনো প্রয়োজনই নেই। এটা আমি বুঝতে পারিনি, কাজেই এটি নিয়ে তড়িঘড়ি আলোচনা করা আমার শোভা পায় না।[১] পয়লা তো ঝামেলাটা বুঝে নিই।

উপস্থিত একটি কথা বলে রাখি।

আইন অবশ্যই সর্বজনমান্য। কিন্তু কার্যত কি হয় ?

আইনত (ডেজুরে) পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই তার নাগরিককে অবাধ চলাফেরা করার ক্ষমতা দেয়, কিন্তু কার্যত (ডে ফাকটো) কোনো দেশ দেয় বলে জানি নে।

এই তো হালের কথা। মার্কিন দেশে যে জোর গণতন্ত্রের রাজত্ব সে-কথা আমরা সবাই জানি। অন্তত সেই নিয়ে তাদের বড়-ফাটাইয়ের অন্ত নেই। দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েৎনাম সর্বত্রই তাঁরা যে গণতন্ত্র তথা ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিচ্ছেন একথা তাঁরা বিশ্ববাসীকে অহরহ শোনাচ্ছেন। সত্যি হতে পারে, মিথ্যা হতে পারে, কিংবা হয়তো মারকিনগণ নিজেদের এটা বোঝাবার চেষ্টা করছেন। এবারে সেই হালের কথাতেই আসি।

দার্শনিক বারট্রানড রাসল্ কিছুদিন হল স্থির করলেন, একটা বেসরকারী আদালত বসিয়ে সেখানে ভিয়েৎনামে 'মারকিন পাপাচারের' বিচার করা হবে। খোলা আদালতে যে রকম যে-কোনো মানুষ, হয় আসামী নয় ফরিয়াদি পক্ষে দাঁড়াতে পারে বা আদালতের দোস্ত (আমিকুস কুরিএ) হিসেবে নিরপেক্ষভাবে কথা বলার হক্ক ধরে—রাসলের বেসরকারী বে-আইনী (বা অ-আইনীও বলতে পারেন) আদালতেও সেই ব্যবস্থা থাকবে।

এ আদালতে হাওয়া কোন্ দিকে বইবে সেটা ঠাহর করার জন্য হ্যামলেট নাটকের ভূতের প্রয়োজন হয়নি। তৎসত্ত্বেও মার্কিন জুজুর ভয়ে সব রাষ্ট্রই মুখে কাঁথা চাপলেন। অর্থাৎ সে আদালতের জন্য আসন দিতে (ভেনু) রাজী হন না—'তোমার আসন পাতবো কোথায়' হে অতিথি'—অবশ্য ভিন্নার্থে।

১ কাগজে রিপোর্ট বেরিয়েছে ঃ "Giving their reasons the minority said that there was no compulsion of law that a passport must be obtained before leaving India." আমারই মত জনৈক সম্পাদক ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি এবং ঐ নিয়ে সম্পাদকীয় লিখেছেন।

শেষটায় সরল সুইডেন লাজুক কনেটির মত কবুল পড়লো—এবং আখেরে পস্তালো, কিন্তু সে কথা থাক।

সেই 'উয়োর ক্রাইমস ট্রিবুনালে' সাক্ষ্য দিলেন ৭ই মে তারিখে এক ভদ্রলোক—এঁর নাম রাল্‌ফ্‌ শ্যোমান। মারকিন নাগরিক, এবং রাসলের খাস নায়েব (পারসনাল সেকরেটারি)। ভিয়েৎনামে মারকিনদের 'পাশবিক অত্যাচারে'র দফে দফে বয়ান দিয়ে—যার সঙ্গে এ রচনার কোনো সম্পর্ক নেই—তিনি বলেন, তিনি স্বয়ং হানয় গিয়েছিলেন এবং অনুমান করেন, যেহেতু তিনি ঐ জায়গায় মারকিন সরকারের বিনানুমতিতে গিয়েছিলেন তাই সে-সরকার এক্ষণে তাঁর পাসপর্ট রদ করবে (অর্থাৎ বাতিল বা বাজেয়াপ্ত করে নেবে)।

যদি করে তবে সেটা আইনসঙ্গত কিনা, সেটা বিচার করার মত আইন জ্ঞান আমার কেন, বহু ধুরন্ধরেরও নেই।

(১) এই দেখুন না, কেন্দ্রীয় সরকার পাসপর্ট্‌ বাবদে যে আইন এতদিন মেনে চলতেন তারও একটা রেজোঁ দেৎর্‌ (raison detre) নিদেন একটা ভিত ছিল (২) তিনজন মহামান্য জজ সেটা অস্বীকার করলেন (৩) অন্য দুজন মহামান্য জজ ঐ তিনজনের সঙ্গে একমত হলেন না। এদিকে পাসপর্ট্‌ দরখাস্তের বন্যায় হিল্লী দিল্লী যায়-যায়। সেটা ঠেকাবার জন্য সরকারকে বাধ্য হয়ে জারী করতে হয়েছে, (৪) অরডনন্‌স্‌—সাময়িক আইন। এ আইনের আয়ুষ্কাল মেরে কেটে ছ'মাস। ইতিমধ্যে সরকার এই অরডনন্‌স্‌টি মেজে ঘষে (৫) বিল রূপে পরিবর্তন করে পেশ করবেন পারলিমেনটের সমুখে।

তখন লাগবে ধন্ধুমার, ইংরিজীতে যাকে বলে দ্য ফ্যাট উইল বি ইন দ্য ফায়ার। উপরের প্যারায় আমি পাঁচ রকমের দৃষ্টিবিন্দু পরিবেশন করেছিলুম—এবারে পারলিমেনটে জুটবে এসে আরো পাঁচশ!

আমার ঘাড়ে কি ৫০৬টি মাথা যে আমি রা'টি কাড়বো!

কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

পারলিমেনটে বিস্তর বেদরদ ধোলাইরের পর ইস্ত্রি হয়ে বেরবেন বিলটি তখন আইনরূপে।

আমরা শঙ্খ বাজাবো হুলুধ্বনি দেব।

কিন্তু হায়, এ পোড়ার সংসারে শান্তি কোথায়? এই নয়া তুলতুলে তুলোয়-ভরা তাকিয়া-পারা আইনটার উপর ভর করে যে দু'দণ্ড জিরিয়ে নেবেন তারই বা মোকাফুরসৎ কোথায়?

আবার এক 'পাষণ্ড' হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই—সে আইনকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রীম কোর্টে দাঁড়াবে।

এবং এবারও যদি মহামান্য বিচারপতি··· ?

তা হলে শুরুসে, ফিনসে, সেই ঔড্র পদ্ধতিতে ঃ—

ক-রে কমললোচন শ্রীহরি,

খ-রে খগ-আসনে মুরারি

গ-রে··· !

আড্ডা—পাসপরট্

'এত দেরিতে যে ?'

শোনো কথা ! আড্ডাতেও আসতে হবে পাঙট্যুয়ালি ?

'হ্যাঁ, সেই কথাই তো হচ্ছে। তুমি তো হামেশাই পাঙট্যুয়ালি অন-পাঙট্যুয়াল।'

আড্ডা প্রতিষ্ঠানের কাশীবৃন্দাবন কাইরো শহরে। এ সম্বন্ধে আমার গভীর গবেষণামূলক একাধিক গেরেমভারী প্রবন্ধ খানদানী অকসব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাত্মক বনেদী ত্রৈমাসিকে বেরুবার কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ কর্তাদের খেয়াল গেল যে আমার ঐ সাতিশয় উচ্চপর্যায়ের লেখাগুলো যদি একবার তাঁদের কাগজে বেরয় তবে সে-কাগজের মান বা স্ট্যান্ডার্ড চড়াকসে এমনি সুপুরি গাছের ডগায় উঠে যাবে যে আর পাঁচজন লেখক সে মগডালে উঠতে পারবে না। অথচ পয়লা নম্বরী পাঠকমাত্রই আমার উচ্চাঙ্গ লেখায় পেয়ে গেছেন তাজা রক্তের সন্ধান, হয়ে গেছেন ম্যানঈটার। সম্পাদকমণ্ডলী তখন আর পাঁচজনের লেখা বাসি মড়া পাচার করবেন কি প্রকারে ! একবার ভাবুন তো, স্বয়ং কবিগুরু যদি কোনো সপ্তাহের দেশ পত্রিকায় 'ট্রামেবাসে', 'সুনন্দর জারনল' এবং 'পঞ্চতন্ত্র' সব কটাই লেখেন, তারপর আমাদের তিনজনের—এক কথায় সৈয়দ সুনন্দ করের কি হাল হবে ? পচা ডিম ছুঁড়বে আমাদের মাথায় পাঠকগুষ্টি—কাগজ হয়ে যাবে বন্ধ। সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকর, লেখক সবাইকে বসতে হবে রাস্তায়। আমাদেরও তো কাচ্চাবাচ্চা আছে। ডাল-ভাত যোগাতে হয়।

আমার অত্যুৎকৃষ্ট রচনার মূল্য অকসব্রিজের কর্তৃপক্ষ বুঝুন আর নাই বুঝুন—এটা কিন্তু ভুললে চলবে না তারা ইংরেজ। ইংরেজ ব্যবসা বোঝে। নেপোলিয়ন একদা বলেছিলেন 'নেশন অব শপ-কীপারজ্'—এখন বলা হয় 'নেশন অব শপলিফটারজ্'[১] (ভদ্রবেশী 'দোকান-লুটেরা')। ব্যবসা বোঝে বলেই তারা আমার 'লা-জবাব' প্রবন্ধগুলো ইনশিওর করে সবিনয়, সকাতর ফেরত পাঠায়—ছাপালে তারা, তাদের আড্ডাবাচ্চারা বেবাক-আড্ডাহীন হবে সেই কারণ দর্শিয়ে।

তখন করি কি ?

---

১ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবেদন ঃ আশকথা পাশকথা (আড্ডার সেটা প্রাণধর্ম) না শুনে যে-সব বে-আড্ডাবাজ অথচ গুণী পাঠক মূল গল্পের খেই ছিনেজোঁকের মত আঁকড়ে ধরে রাখতে চান তাঁরা যেন ফুটনোটগুলো না পড়েন ; কণামাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। অবশ্য তার অর্থ এও নয়, যে, মূল লেখা না পড়লে তাঁর সর্বনাশ হবে।

'শপ-লিফটারজ্' কথাটা ইংরেজের উপর প্রথম আরোপ করেন ছদ্মনামধারী সরস লেখক 'সাকী'।

কথিত আছে, একদা লণ্ডনে এসে মার্কিন হেনরি ফোরড দাবড়ে বেড়াচ্ছিলেন খাসা রহিসী রোলস রইস। পঞ্চম জর্জ তাঁকে শুধোলেন, 'এ কি মিসটার ফোরড! আপনি বিজ্ঞাপনে বলেন "ফোরড গাড়ি দুনিয়ার চীপেস্ট এবং বেস্ট গাড়ি", তবে রোলস চড়েন কেন?' ফোরড বাও করে বললেন, 'আমার ম্যানেজারকে বহুবার বলেছি, আমাকে একখানা ফোরড গাড়ি দিতে। তার মুখে ঐ এক কথা—ফোরড গাড়ি তৈরি হতে না হতেই সঙ্গে সঙ্গে বিক্রী হয়ে যায়; সে খদ্দের সামলাবে না মালিককে গাড়ি দেবে। খদ্দের মোর ইমপরটেনট দ্যান মালিক। অতএব, হুজুর, বাধ্য হয়ে বাজারের সেকেনড বেস্ট্ মোটর—রোলস—কিনেছি।'

গল্পটি মিশরের পিরামিডের চেয়েও প্রাচীন—যে পিরামিডের দিকে পিছন ফিরে আমরা কাইরোর কাফেতে বসি। কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল কাহিনীর ভালে ঐ তো চন্দন-তিলক! নিত্য নিত্য নব নব ফাঁড়া গরদিশে সাক্ষাৎ মুশকিলআসান।

আমি জানতুম, অকসব্রিজ ত্রৈমাসিকের পরেই সেকেণ্ড বেস্ট্ কাগজ 'দেশ'।

সেখানে পাঠালুম। ছাপা হয়ে গেল (সম্পাদক-ম্যানেজার হয়তো সোল্লাসে ভেবেছিলেন, ওটা পয়সা কামানেওলা বিজ্ঞাপন), বই হয়েও বেরুলো। পাঠক সাবধান! চীনেবাদামের ঠোঙা কদাচ অবহেলা করবেন না। একমাত্র ঐ কাগজেই একখানা তাবল্লোক মল্লিখিত কাইরোর কাফে আড্ডা সম্বন্ধে নিবন্ধগুলি পড়তে পায়।

অতএব কাইরোর কাফে-আড্ডার সবিস্তর বর্ণনা নূতন করে দেব না। শুধু এইটুকু বলবো কাইরোর কাফের তুলনায় আমাদের আড্ডা, ইংরেজের ক্লাব, জরমানের পাব, কাবুলির চা খানা, ফরাসীর বিস্ৎরো—এস্তেক অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীর জমজমাট ঘাট—সব শিশু শিশু। বৈজ্ঞানিক বলেন, আমাদের জীবনের এক-তৃতীয়াংশ কাটে শয্যায়—নিদ্রায়। কাইরোর কাফে হাসবে—কুট্টির ঘোড়ার মত—আস্তে বলুন। তাদের জীবনযাত্রা একপ্রকার ঃ—

সকাল ৬টা থেকে ১০টা কাফে=৪ ঘণ্টা। ১০টা থেকে ১টা দফতর। ১টা থেকে ২টা কাফে=১ ঘণ্টা। ২টা থেকে ৫টা দফতর, ৫টা থেকে ১২টা কাফে=৭ ঘণ্টা। ১২ টা থেকে ৬টা ভোর নিদ্রাযোগে গৃহবাস অতিশয় অনিচ্ছায়।

একুনে, সর্বসাকুল্যে কাফেতে ১২ ঘণ্টা। জীবনের এক-তৃতীয়াংশ না ঘণ্টা! হোলি রাশার সেই ফাটা ঘণ্টা যেটা কখনো বাজেনি।

কাইরো সজ্জনের জীবনের হাফ কাটে কাফেতে—অবশ্য বেটার হাফ-কে বাড়িতে রেখে! আর ছুটিছাটা, স্ট্রাইক—রাজা ফারুকের মেহেরবানীতে হরবকৎ লেগেই আছে[২]—লটারি উত্তোলন দিবসচয় যদি হিসেবে নেন তবে সেই

---

২ আমার কাইরো-কাফে আশ্রম ঐ সময়ে।

প্রথম প্রবন্ধের প্রথম তত্ত্বে ফিরে যাই :—বাড়ি নিয়ে কি গুলে খাবো, পারেন তো দিন একটি নন্‌স্টপ-আড্ডার সন্ধান। তাহলে অবশ্যই প্রশ্ন উঠতে পারে, কাইরোতে লোক বাড়ি বানায় কেন? মিশরবাসী তখন বিদেশীকে বুঝিয়ে বলে, প্রাচীন যুগে তারা আদৌ বানাতো না, বানাতো গোরের জন্য স্রেফ পিরামিড—চোখ মেললেই এখনো চতুর্দিকে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কই সে যুগের বাড়ি? বাড়ি বানানোর বদ অভ্যাস বাজে খরচা তারা শিখেছে হালে, ইংরেজর কাছ থেকে, তার 'হোম' নাকি তার কাসল (অ্যাণ্ড হি ইজ দ্য টাইরেণ্ট ইনসাইড)। আর বাড়ি বানানোটাই যদি এমন কিছু জম্বর মহৎকর্ম, বাবুইকেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী বলা উচিত, ওর মত নিটোল, নিখুঁত বাড়ি বানিয়েছে আর কেউ? ছাত ধসে না, ট্যাকশো দিতে হয় না।—ইত্যাদি।[৩]

তা সে থাকগে, কোন্ কথা থেকে কোন্ কথায় চলে এলুম, ঐ তো আড্ডার দোষ।

কাইরোর কাফে আমাকে বোঝাচ্ছিল, আমি পাঙট্যুয়াল, অর্থাৎ কথা দিয়ে থাকি ঘণ্টায় আসবো বলে, আর আসি কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ঘণ্টায় অর্থাৎ পাঙট্যুয়ালি···ইত্যাদি।

এরপর কাফে বলে কিনা, আমি নাকি অন্-পাঙট্যুয়ালও বটে!

সেটা কি প্রকারের?

টুটেনখামেন-এর আমল থেকে এদেশের অলিখিত আইন, মীটিং যদি ধার্য হয়ে থাকে সাতটায়, তবে শুরু হয় আটটায়, দিল-হামেশাই হচ্ছে। আমি নাকি উপস্থিত হই কাঁটায় কাঁটায় সাতটায়। এটা নাকি অন-পাঙট্যুয়াল পাঙট্যুয়ালিটি।

সেটা নাকি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার একচেটে কারবার। নীলনদে কখন প্রচুর জল আসার ফলে কাফের সকলে গায়ে রেশমের স্যুট চড়ায়, কখন মাত্র কৌপিনটুকু সম্বল; কখন সাহারায় ঝড়ের ঠেলায় ছ ফুট বালি জমে বাড়ির দেউড়ি বন্ধ হয়ে যাবে এবং তারই ফলে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক পরিস্থিতি—কাফেতে আসার জোটি নেই—এসবের হদীসান্বেষীরা নাকি পরবর্তীকালে আবহাওয়া দফতরের ডিরেকটার জেনরেল হয়।

ইতিমধ্যে আমাদের টার্ক—(তুর্কী বললে মানুষটাকে ভদ্র বলে মনে হয়) —ইংরিজি অর্থে টার্ক, সদস্য তওফীক এসে উপস্থিত।

পয়লা নম্বরের ধুরন্ধর এবং গোঁয়ার। আমাকে শুধোলে 'কি বাবাজী, খানিকক্ষণ আগে তোমাকে দেখলুম এক আজব চিড়িয়ার সঙ্গে—ওহেন মাল কস্মিন্‌কালে বাবা, এই বহুতর চিড়িয়ার শহর কাইরোতেও দেখিনি!

---

৩ ভারতের বাইরের বেদে মাত্রেরই বিশ্বাস তাদের আদিমতম পিতৃভূমি ভারতবর্ষ। তা হতেও পারে। এবং তাদের আর একটি বিশ্বাস, ভারতবর্ষ আগাপাস্তলা বেদেদের দেশ, সবাই ঘুরে বেড়ায় সুতরাং কেউ বাড়ি-ঘরদোর বাঁধে না!

ব্যাপারটা কি ?'

আমি বললুম, 'আর কও কেন ? সেই কথাই তো এদের বোঝাতে যাচ্ছিলুম। সমস্ত বৈকেলটা কেটেছে ব্রিটিশ কনসুলেটে—বুনো হাঁস ধরার চেষ্টা কখনো করেছ ? তাইতেই হেথায় হাজিরাতে দেরি ?'

'বুনো হাঁস ! সে আবার কি ?'

'নয় তো কি ? কিন্তু আমার সঙ্গে যে চিড়িয়া দেখেছিলে সে সম্পূর্ণ ভিন্ন চীজ। আমার দেশের লোক।'

কাফে অবাক। 'সে কি ? আমরা তো জানতুম, তুমি কোথাকার সেই বাঙ্গলা না, কি যেন বলে, সেই দেশের একমাত্র লক্ষ্মীছাড়া এসেছ এদেশে।'

'সে কথা পরে হবে। উপস্থিত শুধোই, বিদেশে-বিভুঁইয়ে কেউ কখনো পাসপরট্ হারিয়েছ ?' সকলেই একসঙ্গে শিউরে উঠলেন, কারো কপালে ঘাম দেখা দিল, কেউ বা চোখ বন্ধ করে আল্লারসুলের নাম স্মরণ করছেন।

পাঠককে বুঝিয়ে বলি, এ সংসারে নানান ভয়াবহ অবস্থা আমরা দেখি, কাগজে পড়ি,—শ্রবণ বা স্বপ্নলব্ধ জ্ঞান না হয় বাদই দিলুম। কিন্তু এ সব কটাকে হার মানায় মাত্র একটি নিদারুণ দুর্দৈব—বিদেশে পাসপরটি হারানো।

ছুটুন কনস্যুলেটে। তারা কানই দেবে না। লিখুন আপন দেশে। নো রিপলাই। কিংবা শুধোবে, পাসপরটের নম্বর, ইস্যুর তারিখ গয়রহ জানাও। সেগুলো আপনি ডাইরিতে টুকে রাখেননি। আবার কনস্যুলেটে ধন্না। সঙ্গে নিয়ে গেছেন দু-পাঁচজন ভারতীয়। তাঁরা হলপ খেলেন, আপনি যে ভারতীয় সে বাবদে তাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই। কনস্যুলেট বলবে, মাডাগাসকারের বিস্তর লোক ভারতীয় ভাষার কথা কয় ; তাই বলে তারা ভারতীয় ? ইনডিয়ান নেশনালিটির প্রমাণ কোথায় যে আমরা নয়া পাসপরট্ দেব ? বের করুন বার্থ সারটি'ফকেট, এবং প্রমাণ করুন সেটা আপনারই।

হাজারোগণ্ডার হাবিজাবী হেনাতেনা চাইবে। এবং তাদের চাওয়াটা সম্পূর্ণ ন্যায্যতঃ হক্কতঃ। না চাইলে দুনিয়ার যত ভাগাবণ্ড ভ্লাডিভসটক থেকে আলস্কা—এসে কিউ লাগাবে একখানা করকরে, ঝাঁ চকচকে, সোঁদা সোঁদা গন্ধওলা ইনডিয়ান পাসপরটের লোভে। এক ঝটকায় হয়ে যাবে ইনডিয়ান ন্যাশনাল, সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনে গিয়ে মহারাণীর মোলাকাৎ চাইবে। যে বেচারাকে টারক তওফীক দেখেছিল পথিমধ্যে, সে সত্যি সিলেটের লোক।

আমি গিয়েছিলুম কনস্যুলেটে, প্যালেসটাইন যাবার জন্য অনুমতির ('ভিজার') সন্ধানে। সেই জরাজীর্ণ লোকটাকে জবুথবু হয়ে এক কোণে বসে থাকা অবস্থাতে দেখেই বুঝে গেলুম লোকটা সিলেটি।

এবং তাই। আমার মুখে সিলেটি শুনে ভ্যাক করে কেঁদে ফেললে। আমি একপাল লোকের সামনে মহা অপ্রস্তুত।

ব্যাপারটা সরল, কিন্তু পরিণামে হয়ে গেছে বেজায় জটিল। মাসখানেক পূর্বে আলেকজান্দরিয়া বন্দরের কিছু দূরে একটা জাহাজডুবি হয়—ঐ কোনো

গতিকে বেঁচেছে, সম্পূর্ণ উলঙ্গাবস্থায়, গায়ের চামড়াও কিছুটা পুড়েছে। পাসপরট্ তো সাপের মণি—রক্তিভর ডকুমেণ্ট তার কাছে নেই। আর ঐ একমাত্র 'সিলট্যা' ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় একটি শব্দও সে বুঝতে পারে না।

কুল্লে কাফে মাথা নেড়ে সায় দিলে, ব্যাপারটা সঙ্গীন।

ভাগ্যিস, ডেপুটি কনসালটি ছিলেন আমার পরিচিত—অতিশয় অমায়িক খানদানী ইংরেজ ভদ্রলোক। আমার আপন কাজ শেষ হয়ে গেলে খালাসিটার কথা পাড়লুম। সায়েব মাথা নেড়ে বললেন, 'বিলকুল হুমবগ্। আমি কলকাতায় কাজ করেছি পাঁচটি বৎসর। বাঙলা শুনলে বেশ বুঝতে পারি। ও যা বললে সে তো বাঙলা নয়।'

মনে মনে আমাকে বলতে হল, 'পোরা কপাল আমার।' সাহেবকে বললুম 'ওকে একটু ডাকলে হয় না?' সায়েব সদাশয় লোক, বললেন, 'আলবৎ।'

লোকটা আসামাত্রই আমি চালালুম তোড়সে সিলেটি। কিঞ্চিৎ কটুকাটব্যের কাঁচা লঙ্কা মিশিয়ে। উদ্দেশ্য তাকে একটু অতিশয় তাতিয়ে দেওয়া, নইলে যে রকম ন'সিকে ভিলেজ-ইডিয়ট, পেটে বোমা মারলেও··। দাওয়াই ধরলো। কাঁইকুঁই করে বলে গেল অনেক দুঃখের কাহিনী—চোখে সাত দরিয়ার নোনা-জল। মিনিট পাঁচেক চললো 'রসালাপ'। সায়েব খালাসীকে বললেন, 'টুম্ যাও।' আমাকে শুধোলেন, 'এও বাঙলা'? আমি বললুম, 'লণ্ডনের সঙ্গে উত্তর স্কটল্যাণ্ডের ভাষায় যে মিল—এ বাঙলার মিল কলকাত্তাইর সঙ্গে তার চেয়েও কম।'

এরপর সায়েব যা বললে, তার থেকে পরিষ্কার বুঝে গেলুম, লোকটি সত্যকার ডিপলমেট। বললেন, 'দু-একটা শব্দ যে একবারই বুঝতে পারিনি তা নয়। তবে কি জানো, ব্যাবু, ব্যাপারখানা আসলে কি? কোনো বিশুদ্ধ স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষা··যেমন মনে করো প্যারিসের ফরাসী, কিংবা ধরো লণ্ডনে প্রচলিত খানদানী ঘরের ইংরেজী—সেটা শেখা কিছু অত্যধিক কঠিন কর্ম নয়। হাজার হাজার রুশ, পোল, হাঙগেরিয়ান চোস্ত ইংরিজী বলে, খাসা ফরাসী কপচায়—কার সাধ্যি বলে কোন্‌টা কার মাতৃভাষা নয়—এবং প্রসঙ্গত বলি, এরাই হয় বেস্ট স্পাই। কিন্তু মশাই, বিশুদ্ধ গাঁইয়া ডায়লেকট রপ্ত করাটা বড়ই কঠিন, প্রায় অসম্ভব। লণ্ডনের কটা খানদানী ইংরেজই বলতে পারে খাঁটি ককনি?'

সায়েবটি ছিল একটু দুঁদে টাইপ। খালাসিটার জন্মভূমির গ্রাম থানায় চিঠি না লিখে রেডটেপিজেমের মূর্ত প্রতীক 'এনকোয়ারি' না করেই আপন জিম্মায় ছেড়ে দিলে একখানা পাসপরট্।

নইলে ঐ হতভাগা ক'মাস ধরে কে জানে, হয়তো বারো বছর ধরে আপিসে দফতরে ধন্না দিত, রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াতো, খেত কি, মাথা গুঁজতো কোথায়?

আর ইতিমধ্যে যদি কোনো সমধিক কর্মনিষ্ঠ তথা অত্যুৎসাহী উৎকোচাশ্রয়ী মিশরী পুলিসম্যানের নজর পড়ে যেত? কাঁধে খাবলা মেরে শুধতো 'তুমি তো বিদেশী বলে মনে হচ্ছে হে—নিকালো বাসবর' (আরবীতে 'প' নেই বলে 'ব'

আদেশ, এবং শব্দটি আরবরা ফরাসী থেকে নিয়েছে বলে শেষের 'টি' উচ্চারিত হয় না—একুনে পাসপরট্ উচ্চারিত হয় 'বাসবর', বা 'বাসাবর') তাহলে ?

শ্রীঘর। তাতে যে আমাগো সিলট্যা মোতিমিয়ার খুব একটা ভয়ংকর আপত্য (আপত্তি শব্দের সিলেটি রূপ) আছে তা নয়; জাহাজের কয়লাঘরের কারবালায় কারবার করছে যে লোক তার পক্ষে কাইরোয় কারাগার করীমা বখশায় বর হাল-ই-মা—আল্লার কৃপা তার উপরে এসেছে।

কিন্তু ততোমধ্যে তার নয়া বাসবরের জন্যে যেটুকু ধর্না দেওয়া, তদবির করা সেটুকুনই বা করবে কে ? অবশ্য আখেরে এস্থলে তদবির করা না করা—বরাবর বসুন্ধরা সর্বত্রই তদ্বীর-ভোগ্যা নন—এখানে প্রকৃতি তার আপন গতি নেয়।

সাঁইমুরশীদ কবুল, আমি স্নব নই। কিন্তু আপনার আমার মতো ক্ষীণ-কায় মধ্যশ্রেণীর ভদ্রসন্তানকে যদি বিদেশের জেলে ঠেসে দেয় তবে টেঁসে যেতে কতক্ষণ ? না হয় সপ্রমাণ হল, কাইরোর জেলকে আপনি হার মানিয়ে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু বেরনো মাত্রই তো আপনি সেই ক্রাইমটি ফের করে ফেলেছেন, বিদেশে বিনা পাসপরটে আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

অবশ্য আপনি তর্ক তুলতে পারেন, মিশর সরকারই আপনাকে রাস্তায় নামিয়ে ক্রাইমটি করছে, সে-ই কাজের আপনি ইফেকট মাত্র। ততোধিক কুতর্ক করতে পারেন, আজ যদি মিশর সরকারের প্রতিভূ পুলিসম্যান আপনাকে চোদ্দ-তলা বাড়ির ছাদ থেকে পেভমেণ্টে ফেলে দেয় তবে সেটা আত্মহত্যা নয়।

* * *

কাফেতে এ নিয়ে বিস্তর মাথা-ফাটাফাটি হয়।

একমাত্র তওফীক আফেন্দী চরম অবহেলাভরা সুরে পরম তাচ্ছিল্য সহ মাঝে মাঝে বলছিল 'যত সব !' কিংবা 'আদিখেত্তায় মানওয়ারী' অথবা ডিমের খোসায় কালবৈশাখী !

শেষটায় বললে, ছোঃ ! আমার কাছে নিয়ে এলে না কেন ?

নিবেদন করলুম, 'জানি তুমি একদা ছিলে মুস্তাফা কামালের 'বিবেকরক্ষক', অধুনা ইসমেৎ ইনেনুর অমনিবাস এমবেসডর, কিন্তু তথাপি—'

বললে, যাঃ ! এইটুকু মশা মারতে বাঘের উপরে টাগ !—না। কিনে দিতুম। কী আর এমন ক্লেওপাতার গুপ্তধন প্রয়োজন ঐ সাসিটুকুর জন্য ?'

আমি অবাক হয়ে শুধোলুম, 'সে কি ? পাসপরট্ কি হাটের বেসাতি, যে—'

গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'দেখো, বৎস ! তুমি আজহর মাদরাসার ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করো ; না-ই বা জানলে এসব জাল-জচ্চুরির কায়দা-কেতা।' ॥

'ঈস্ট ইজ ঈস্ট অ্যান্ড্—'

ইজ্‌রাএল (ইসরাইল) নিমিত্ত মাত্র। অর্‌-রঈস জমাল্‌ আবদুন নাসিরও নিমিত্ত মাত্র। দুজনের পিছনে রয়েছে দ্বিধা বসুন্ধরা—যাকে আমরা এতদিন প্রাচী তথা প্রতীচী নামে চিনেছি। ইংরেজ ফরাসী গয়রহ বলেছে, অরিএনট এবং অকসিডেণ্ট। জর্মনরা এ দুটো শব্দ ব্যবহার করে বটে, কিন্তু খাঁটি জরমনে বলা হয় মরগেন্‌লান্‌ট (উদয়াচল) ও আবেন্‌ট্‌লান্‌ট (অস্তাচল—অবশ্য লান্‌ট্‌ = ভূমি, দেশ); আরবরা হুবহু ঐ রকমই মশরিক্‌ ও মগরিব[১] (মগরিব বলতে আবার দক্ষিণ আফরিকাকেও বোঝায়) বলে থাকে।

এই দুই ভূখণ্ড নিজেদের ভিতর প্রায় সম্মিলিত হয়ে একে অন্যের সম্মুখীন হয়েছে—যুদ্ধং দেহি।

এ-লেখা বেরুবার পূর্বেই হয়তো উভয় পক্ষ অস্ত্রসংবরণ করে নেবেন। কিন্তু এর শেষ অতি অবশ্যই এখানে নয়। এ শুধু আরম্ভ মাত্র।

প্রতীচীর শক্তিশালী যুযুধান বলতে উপস্থিত বুঝি জনসন, উইলসন[২] ও দ্য গল। প্রাচীর ভীষ্ম কর্ণ বলতে বুঝি কসিগিন মাও।

ইজ্‌রাএলের পিছনে দাঁড়িয়েছেন মারকিন ও ইংরেজ। আরব রাষ্ট্রপুঞ্জের পশ্চাতে রুশ ও চীন।

দ্য গল বাত্যায়। অনেকটা শ্রীকৃষ্ণের মত। অনেকটা শ্রীকৃষ্ণেরই মত তিনি একটা শান্তিসভার প্রস্তাব পেশ করেছিলেন এবং সে প্রস্তাবের পশ্চাতে তাঁর কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু কূট কসিগিন সঙ্গে-সঙ্গেই অনুমান করে নিলেন যে ধড়িবাজ মারকিন ইংরেজ এই সভাটাকেই মুষলে পরিবর্তিত করে আরব বংশ ধ্বংস করতে চাইবে। তাই কসিগিন যা বললেন, যার ব্যঞ্জনা দিলেন, এবং যা বললেন না কিন্তু মীন করলেন তার সব কটা একুনে দাঁড়ায়ঃ 'শান্তির প্রস্তাব তো উত্তম প্রস্তাব', কিন্তু প্রশ্ন, তুমি জনসন, এবং উনি উইলসন যে দুটি আপন আপন খাসা নৌবহর ভূমধ্যসাগরে রোঁদ মারিয়ে ফেরাচ্ছো,

---

১ বাঙলা গরিব শব্দ ও মগরিব মূলে একই ধাতু থেকে। গরিব আরবীতে 'বিচিত্র' 'অদ্ভুত' অর্থ ধরে।

২ একদা এ দেশে বলা হত বাঙালীর জাত মারছে তিন 'সেন'-এ মিলে। উইলসেন-এর হোটেলে বাঙালী খেত নিষিদ্ধ মাংস, কেশব সেন তাদের করে ফেলত 'বেম্মজ্ঞেনী', আর ইস্টিসেনে বাহান্ন জাত-বেজাতের সঙ্গে মেলা-মেশা এড়ানো যেতো না। এখন পৃথিবীর জাত মারার জন্য এসেছেন অন্য তিন সেন। মার্কিন জনসেন, ইংরেজ উইলসেন এবং কানাডার পিয়ারসেন। তৃতীয়োক্ত ব্যক্তিটি নিতান্তই চুনোপুঁটি। কিন্তু স্বয়ং জনসেন মুক্তকচ্ছ হয়ে এঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে এঁকে বেজাতে তুলেছেন, কিংবা বলবো এঁর জাত মেরেছেন।

দুনিয়ার সর্বত্র ছড়ানো বাদবাকিগুলোকে নোঙর ভেঙে ফেলে ফুল ইস্টীমে ওদিক-বাগে ধাওয়া করতে হুকুম দিচ্ছো (মুখে যদিও বলছো, 'ওরা তো চলাফেরা করছে কবেকার সেই ঈসু করা প্রাচীন দিনের টাইম-টেবিল অনুযায়ী) তারা কি ওখানে আসছে ফেরেস্তাদের প্যাটারনে পিঠে ড্যানা গজিয়ে, হাতে হারপ যন্ত্র নিয়ে "হাল্লেলুইয়া" কীর্তন সহ যীশুদত্ত আপ্ত আপ্ত শান্তি সঙ্গীত গাইতে ঃ

"অগ্রসর হও আজি খৃষ্টসেনাগণ
সবে মিলি আইস—"

থাক না, বাছারা, ওসব সন্-ডে ইস্কুলের মোলায়েম মোলায়েম মধুরসের মোরব্বা! আর সেই যদি কইছ, ভূমধ্যসাগরে, ইজরাএলের ধারে ধারে, মিশরের বন্দরে বন্দরে মানওয়ারিদের কোনো প্রকারের ভালোমন্দ মতলব নেই তবে একটা সরল কর্ম করলেই তো হয়। বেচারী খালাসীমাল্লারাও লক্ষ্য-হস্ত তুলে তোমাদের আশীর্বাদ করবে আপন আপন দেশের বন্দরে দারাপুত্রপরিবার সহ সম্মিলিত হয়ে—যাক না এরা ফিরে আন্‌কল্ স্যামের সোনার দেশে, ডিফেনডার অব-ফেৎ-রুল-ব্রিটানিয়ার অক্ষয় স্বর্গে—আহা! ন্যু ইয়রক সাউত্যামটনে ফুল কত না অজস্র, আসব কত না সুলভ, আর ললনারা কতই না উন্মুক্ত হৃদয় (পাঠক, আমি শব্দার্থে বলছি না!—খেয়াল থাকে যেন—লেখক)। শান্তি সম্মেলনে তো যাবো, ওদিকে যারা তোমাদের দলে নয়, তাদের প্রত্যেকের পিছনে থাকবে ছোরা-হাতে একটি একটি করে মানওয়ারী গুণ্ডা (হিটলার রাইষটাগে এই ব্যবস্থা করাতেন গোড়ার দিকে, বিপক্ষ দল নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত)। ঐ আনন্দেই থাক।"

সরল পাঠক হয়তো এই বলে প্রশ্ন শুধোবেন, আমরা তো জানি, রুশরাও ইউরোপীয়, অকসিডেণ্টাল, প্রতীচ্য জাত। আদৌ তা নয়। রুশ কেন, চেক পোল ইত্যাদিকেও অনেকে ইয়োরোপীয় ঈসটারন বলে থাকে। এই তো সেদিন জরমনির কন্‌স্টান্‌ৎস্ শহরে এক সাহিত্য সম্মেলন হয়—তাতে 'ইসটে'র প্রতিভূ হয়ে আসেন এক চেক, অন্যজনা পোল্ বা রাশান। আর হিটলার তো যুদ্ধ লড়তে লড়তে বরাবর চিৎকার করে গেছেন, 'এ সংগ্রামে এক পক্ষে সভ্য ঐতিহ্যশীল ইউরোপীয়, অন্যপক্ষে বর্বর ঈসটারন্—রুশ।' মৃত্যুবরণের পূর্বে বলেন, 'আমি ছিলুম ইউরোপের শেষ আশা। কিন্তু সপ্রমাণ হল, প্রাচী আমার চেয়ে শক্তিশালী।'

সরল পাঠককে বোঝাই, তাঁরই মত সরল—অবশ্য ওদেশে বিরল—ইয়োরোপীয় মাত্রই একটি অতি বাস্তব, ধরা-ছোঁওয়ার জিনিস দিয়ে প্রতীচী প্রাচীর তফাত করে। জামার সামনের দিকটা পাতলুনের ভিতর যে গুঁজে দেয় সে ইয়োরোপীয়, যে বাইরে ঝুলিয়ে রাখে সে প্রাচ্যদেশীয়। রুশরা যখন তাদের খাঁটি দিশী পোশাক—বাতুশ্‌কা, স্তালিন যা পরতেন—গায়ে চড়ায় তখন তাদের কারুকার্য-করা শারটটি (ব্লাউজও বলা হয়) পাতলুনের উপরে ঝুলিয়ে দেয়, আমরা যে রকম পাঞ্জাবির সামনের দিকটা (দামন, অঞ্চল) ধুতির উপরে

ঝুলিয়ে রাখি।[৩] এখানে বুশ্-শারটের 'রেজো দেৎর' নিয়ে আলোচনা করাটা সমীচীন, কিন্তু তাহলে মূল বক্তব্য থেকে অনেক দূরে চলে যাবো ; তবে পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, উত্তম বুশ্-শারটের দামন ভিতরে গুঁজে টাইপরা যায়, আবার বাইরে ঝুলিয়ে মিন্-টাই হওয়াও যায়।

মধ্য-প্রাচ্য উপলক্ষ মাত্র।

এক দিকে জনসন-উইলসন চালিত ইয়োরোপ—লক্ষ্য করেছেন চ্যাংড়া ডেন্ মার্ক তক্ বাঁদর নাচ নেচে রুশের কাছে ধমক খেয়েছে ?—অন্য দিকে রুশ-চীন চালিত এশিয়া, এবং আফরিকাও এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। অর্থাৎ এক দিকে সাদা, অন্যদিকে কালো—বা রঙিন বলতে পারেন। সাদার পাল এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে, ইউরোপের বাইরের সবাইকে কলর্ড্ নাম দিয়ে কী থানডারিং ব্লানডারই না সে করছে ! পীলা চীন, কালা নিগ্রো, তাঁবাটে আরব, আধা-পিলা রুশ (ইংরেজাদির দৃঢ় সংস্কার, রুশের গায়ে প্রধানত মন্গোল-তাতার রক্ত) হয়েছে এক-জোট -ওদিকে মার্কিন নিগ্রো মুহম্মদ আলী (কেসিয়াস ক্লে) বলছে, মারকিনের হয়ে লড়তে তার বিবেক-জাত ঘোরতর অধর্মবোধ রয়েছে -পিছনে রঙ-বেরঙের ভারতীয়-পাকিস্তানীও সায় দিয়ে মাথা নাড়ছে ; এস্তেক যে, লেবানন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র—কারণ সে আধা ক্রিশ্চান আধা মুসলমান—যে কিনা এতদিন সর্বসংঘাতে গা বাঁচিয়ে 'দেহ রক্ষা' করেছে, সেও আব্দুন নাসিরের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু লক্ষ্য করার মত দেশ, জাপান। পশ্চিমের দ্য গলের মত [illegible]ও এতাবৎ নিরপেক্ষ। তা, এরকম দু'একটা ব্যত্যয় না থাকলে মাথাভরা চুলের প্রকৃত বাহার মালুম হয় না।

হাজার চার-পাঁচেক বছর পূর্বে ঠিক এই প্যাটার্ন্টিই ভারতবর্ষে রূপ নিয়েছিল—যার প্রতি ইঙ্গিত, যার সঙ্গে বর্তমান সমস্যা—প্যাটার্নের তুলনা আমি এই ক্ষুদ্র লেখায় এতক্ষণ দিলুম ঃ বিরাট দেশ ভারতবর্ষ, নানা বর্ণ[৪]—বিশুদ্ধ সংমিশ্রিত—নানা জাতি, নানা সভ্যতার লোক একদা কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়েছিল। এক দিকে দুর্যোধনের পশুবল ; অন্য দিকে ধর্মরাজের ধর্মবল।

---

৩ মধ্য বা পশ্চিম ইয়োরোপে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বেরুলে একাধিক সজ্জন আপনার কানে কানে ফিসফিস করে বলবে, 'স্যার ! শার্টটা গুঁজতে ভুলে গিয়েছেন।' তাঁর মনে হয়েছে, আপনি শৌচাগারের প্রয়োজনীয় কর্মটি করার পর দামনটি গুঁজতে ভুলে গেছেন—বুড়া অধ্যাপকরা যে রকম ক্ষুদ্রতর কর্মের পর পাতলুনের বোতাম লাগাতে ভুলে যান।

৪ অনেকের বিশ্বাস, কৃষ্ণের যদুবংশ ছিল কালো, কৌরবেরা ছিলেন গোরা আর পাণ্ডবরা ছিলেন পাণ্ডু, অর্থাৎ পিলা, হলদে। পাণ্ডবরা নাকি আসলে তিব্বতের মঙ্গোলীয়ান। (Winternitz পশ্য। এ বাদ বা বিবাদে যোগ দেবার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই।) মহাভারতের যুদ্ধ নাকি কৃষ্ণ-পাণ্ডু বনাম গোরা-কৌরব।

আজ সেই প্যাটারনই বোনা হচ্ছে গোটা বিশ্বের নানা রঙের সুতো দিয়ে।

হয়তো শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ লাগবে না। কিন্তু সে 'শান্তি' দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

তেইশ বৎসর পূর্বে—তখন স্বরাজ হয়নি—'আনন্দবাজারে' আমি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি—মারকিন-ইংরেজের এই বে-আদপী বেতমিজীকে 'ধবলদম্ভ' নাম দিয়ে। ইংরেজ যে-রকম একটা চীনকে 'পীতাতঙ্ক' (ইয়েলো পেরিল) নামে ডাকত, আজ বিশ্ব জুড়ে তারই পুনরাবির্ভাব!

হাজার পাঁচেক বৎসর পূর্বে হয় মহাভারত; আজ না-হোক, দুদিন বাদে হবে বিশ্বভারত।

বিষবৃক্ষ

নিতান্ত বাধ্য হয়ে আমাকে কিছু ব্যক্তিগত কথা বলতে হচ্ছে। আমি খবরের কাগজের সম্মানিত রিপরটার নই। তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টা, যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক (ইম্পারসনাল) ভাবে আপন বয়ান পাঠকের সম্মুখে পেশ করা। তৎসত্ত্বেও তাঁরা মাঝে মাঝে কটুবাক্য শুনতে পান। পাঠকসাধারণ ভুলে যান, রিপরটারও মাটির মানুষ, তারও ধর্মবুদ্ধি আছে, সেও অন্যায় অবিচারের সামনে কখনো-কখনো আত্মসংযম না করতে পেরে উত্তেজিত ভাষা ব্যবহার করে। ফলে কখনো বা কটুবাক্য শুনতে হয়, কখনো বা হাততালিও পেয়ে যায়। প্রকৃত রিপরটার অবশ্য কোনোটারই তোয়াক্কা করে না। সে আত্ম-প্রসাদ অনুভব করে যদি দেখে যে, সে নির্ভয়ে সত্য প্রকাশ করতে পেরেছে।

রিপরটার হওয়ার মত শক্তি আমার নেই। তদুপরি দৈনন্দিন যে-সব ঘটনা রিপরটেড হচ্ছে, তার যদি কোনো ঐতিহাসিক মূল্য না থাকে, সে যদি আমাকে মানবসমাজের পতন-উত্থান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ চিন্তার খোরাক না যোগায় তবে সে জিনিসের প্রতি আপনার আমার মত সাধারণজনের চিত্ত আকর্ষিত হয় না।

যেমন ধরুন আরব-ইজরাএল দ্বন্দ্ব। কথার কথা কইছি, কাল যদি মার্কিন, ইংরেজ, ফরাসী, রুশ সবাই একজোট হয়ে একটা সমাধান করে দেন—যার চেষ্টা এখন প্রতিদিনই হচ্ছে—তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, উভয় পক্ষই যখন শান্ত হয়ে গেছেন তখন আমরাও নিশ্চিন্ত মনে আর পাঁচটা খবরের দিকে নজর বুলাই। আর রিপরটারদের তো কথাই নেই। দুই প্রতিবেশী শান্তিতে আছে—এটা খবর নয়। দুই প্রতিবেশীতে খুনোখুনি হচ্ছে সেটা খবর। সংবাদ-সরবরাহ-ভুবনের আপ্তবাক্য—কুকুর মানুষকে কামড়ালে সেটা খবর নয়, মানুষ কুকুরকে কামড়ালে সেটা খবর।

অথচ আমি বিলক্ষণ জানি, আরব-ইজরাএল সমস্যার প্রকৃত সমাধান যে কি, তার সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি। নাসির বলছেন, আমি ইজরাএলকে সমূলে উৎপাটন করবো। ওদিকে ইজরাএল যেটুকু জমির উপর এখন রাজত্ব

করছেন তা নিয়ে যে তিনি একদম সন্তুষ্ট নন, সে কথাও তিনি গোপন রাখেন না। অ্যানটনি ঈডন-এর গোঁয়ার অভিযানের ফলে যখন ইজরাএল সৈন্য সবলে মিশরের সাইনাই (সিনাই, আরবীতে[১] সীনিন, সীনা) অধিকার করে তখন আনন্দে উল্লাসে কম্পিত, ভাবাবেগ দমনে অশক্ত ইজরাএল-প্রধান বেন গুরিয়ন যাজকসুলভ গম্ভীর কণ্ঠে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন তার অর্থ, আমরা আমাদের ন্যায্য ভূমি অধিকার করেছি, এ-ভূমি আমরা আর কখনো পরিত্যাগ করবো না। তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল (এবং আজ সেখানে পুনরায় দুই দল সম্মুখীন হয়েছেন), কিন্তু তাঁর বাক্যের প্রথমার্ধ, অর্থাৎ সাইনাই ইজরাএলের প্রাপ্য, এটা ইজরাএল-দৃষ্টিবিন্দু থেকে সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। রাজা সলমনের (আরবীতে সুলেমান) আমলে ইহুদি রাজত্ব কতখানি বিস্তৃত ছিল সেটা পাঠক বাইবেলের পিছনে যে প্রাচীন যুগের ম্যাপ দেওয়া থাকে সেইটে দেখলেই কিছুটা বুঝতে পারবেন। আজ তার বৃহৎ অংশ লেবানন, সীরিয়া, জর্ডন, মিশরের দখলে। কিন্তু হায়, বিশ্বের আদালত ইজরাএলের আড়াই হাজার বছরের তামাদি এ দাবি মানবে না। প্রায় দু' হাজার বছর ধরে ইহুদিরা তাদের পুণ্যভূমি প্যালেসটাইন ত্যাগ করে দলে দলে সেই সুদূর রুশ দেশ থেকে আমেরিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এ-কথাও সত্য, ইহুদিদের যাজক-সম্প্রদায় কখনোই আপন পুণ্যভূমিতে ফিরে যাবার স্বপ্ন দেখা বন্ধ করেননি। কারণ, স্বয়ং ইহুদির সদাজাগ্রত প্রভু য়াহবে ধর্মগ্রন্থ তোরাতে প্রতিজ্ঞা করেছেন, 'আমি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবো, সেই দুগ্ধ-মধু'র দেশে।' এ-স্বপ্ন বাস্তবে দানা বাঁধতে আরম্ভ করে প্রধানত ঊনবিংশ শতাব্দীতে—এরই নাম জায়োনিজম এবং এর প্রধান কেন্দ্র ছিল জরমনিতে। মহাকবি হাইনে কিছুদিন বারলিনে এ আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন কিন্তু পরে সেটা ত্যাগ করেন; বস্তুত জায়োনিজমের গোড়াপত্তনের সময় থেকেই একদল শক্তিশালী ইহুদি এ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। তাঁদের বক্তব্য ছিল: 'প্যালেস্টাইনে স্বাধীন ইহুদি রাজ্য নির্মাণের প্রস্তাব দূরে থাক, সেখানে ইহুদিদের জন্য কোনো ধরনেরই খাস 'ন্যাশনাল হোম' করা হবে ভুল। কারণ সে দেশ ছেড়েছি আমরা দু' হাজার বছর পূর্বে, এখন (১৯/২০ শতাব্দীতে) সেখানে শতকরা দশজন ইহুদিও বাস করে না বাদবাকি শতকরা ৭০/৮০ মুসলমান, ১৫/২০ খৃষ্টান (হিসেবটা খুবই মোটামুটি, কারণ সে-যুগে এ-অঞ্চলের তুর্কী শাসনকর্তারা আদমসুমারিতে বিশ্বাস করতেন না) এখানে শত শত বৎসর ধরে বাস করছে (এবং এঁরা না বললেও আমরা জানি, এই মুসলমান এবং খৃষ্টানদের অনেকেই গোড়াতে ইহুদি ছিল, পরে ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলমান খৃষ্টান হয়। প্রভু যীশু স্বয়ং ইহুদি ছিলেন এবং তিনি যাঁদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দেন তার ৯৯% ছিলেন জাত-ইহুদি। পরবর্তী যুগে এঁদের অনেকেই হয়ে যান মুসলমান)। এঁদের

---

১ ইহুদি আরব উভয়ের কাছেই এ গিরি পূতপবিত্র। কুরানশরীফে আল্লাতালা এর নাম নিয়ে শপথ গ্রহণ করেছেন। ৯৫ সুরা, ২য় ছত্র।

অধিকাংশই চাষা, জেলে। এঁদের ভিটেমাটি কেড়ে না নিয়ে নবাগত ইহুদিদের বসাবে কোথায়?…তার চেয়ে বহুতর গুণে কাম্য আমরা, ইহুদিরা, যেন যে-সব দেশে বাস করি সেই সব দেশের পূর্ণ নাগরিক হয়ে যাই।' আমার যতদূর মনে পড়ছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন লয়েড জরজ ইহুদির জন্য 'ন্যাশনাল হোমে'র খসড়া বানাচ্ছেন তখন ভারত-খ্যাত ইহুদি (?) মনটাগু এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং বার বার বলেন, এতে করে আখেরে ইহুদিকুলের অমঙ্গল হবে।

কিন্তু যুক্তিতর্ক এক জিনিস আর অনাগত যুগের সুখস্বপ্ন দেখা অন্য বিলাস। রাজকুমারী মীরাকে রাজসভার গুণীজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই অত্যুত্তমরূপে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, বৃন্দাবনের পেভমেণ্ট (!) সোনা দিয়ে গড়া নয়, যদ্যপি বর্ষারম্ভে মেঘাগমনে তথাকার আকাশ মেদুর হয় অতি অবশ্য, ঘন তমালদ্রুম-রাজি জনপদভূমিকে শ্যামল করে রাখে নিঃসন্দেহেই, কিন্তু সেস্থলে বিষধর সর্পও ঠিক ওই সময়েই গোপগোপীদের প্রাণহরণ করে, তদুপরি—তদুপরি নিশ্চয়ই সভাসদরা বিস্তর অকাট্য যুক্তিতর্ক দ্বারা সপ্রমাণ করেছিলেন যে, ওই সাতিশয় অগণ্ড-গ্রাম রাজকন্যার বাসভূমি হওয়ার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, তথাপি তিনি স্বপন দেখছেন,

চাকর রহসুঁ বাগ লাগাসুঁ
নিতি উঠি দরশন্ পাসুঁ
বৃন্দাবনকে কুঞ্জগলিমে
তেরী লীলা গাসুঁ!

পিস্তলের বুলেট দিয়ে যে-রকম ভূত মারা যায় না, যুক্তিতর্কের খাণ্ডায় দিয়েও সুখস্বপ্ন খণ্ডবিখণ্ড করা যায় না।

স্বপ্ন দিয়ে তৈরী আর স্মৃতি দিয়ে গড়া মেলা ঝামেলার ভিতর রিপরটার অনুপ্রবেশ করে খামখা হায়রান হতে চান না—তাই বলেছিলুম, আমি রিপরটার নই, হবার মত এলেম ও হক্কও আমার নেই।

কিন্তু সেই ১৯২৯ থেকে আমি গণ্ডায় গণ্ডায় ইহুদিদের সংস্পর্শে এসেছি। বোম্বাই অঞ্চলে 'শনিবারের তিলী' নামে পরিচিত এ-দেশে অতি প্রাচীনকালে আগত ইহুদিদের সঙ্গে আমি বাস করেছি (ব্যক্তিগতভাবে আমি এঁদেরই ইহজগতের সর্বোত্তম ইহুদি বলে মনে করি), দ্বিগ্বিজয়ী ইহুদি পণ্ডিতের কাছে হীব্রু শেখার নিষ্ফল প্রচেষ্টা আমি দিয়েছি (দোষ রাব্বির নয়, আমার), ইহুদির (তথা খৃষ্টান ও মুসলমানেরও) পুণ্যভূমিতে আমি বাস করেছি, জরডনের পাক পানিতে ওজু করেছি, গ্যালিলিয় হ্রদের অতিশয় সুস্বাদু মৎস্য আমি দিনের পর দিন দুবেলা পরম তৃপ্তি সহকারে ভক্ষণ করেছি, বস্তুত প্যালে-স্টাইনের উত্তরতম সীমান্ত থেকে—যেখানে সীরিয়া আজ সৈন্য সমাবেশ করেছে—দক্ষিণতম সীমান্ত গিজা অবধি, তথা পূর্বতম সীমান্ত (ট্র্যান্স্) জরডন থেকে পশ্চিমতম সীমান্তের খাস ইহুদি নগরী তেল আবিব ('বসন্তগিরি') পর্যন্ত অবাধে যাতায়াত করেছি।

* * *

পরম পরিতাপের বিষয় উপরের ছত্রের কালি শুকোতে না শুকোতে মর্মান্তিক দুঃসংবাদ এসেছে যে আরবে ইহুদিতে কোনো প্রকারের সমঝওতা সম্ভবপর হল না বলে সশস্ত্র যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

এ দুঃসংবাদের পর বিমূঢ় মুহ্যমান হয়ে আমার এ অক্ষম লেখনী আর এগোতে চায় না।

যদি ইজরাএল হারে তবে তার তিনদিকে আরব বেদুইন ও বাস্তুহারা আরব (প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার) যারা জরডন অঞ্চলে কেউ কুড়ি বৎসর ধরে, কেউ বা এগারো বৎসর ধরে তাঁবুতে তাঁবুতে দুঃখদৈন্যের জীবন কাটাতে কাটাতে এই মহালগ্নের অপেক্ষা করছিল তারা পঙ্গপালের মত সমস্ত ইজরাএলে ছেয়ে পড়ে বালবৃদ্ধনারী কাউকে নিষ্কৃতি দেবে না। হিটলারকে ছাড়িয়ে যাবে।

আর সম্মিলিত আরব জাতিপুঞ্জ যদি হেরে যায় তবে তাদের সে অবমাননা —ক্ষয়ক্ষতির চেয়েও—তাদের সে অবমাননা, তাদের আত্মসম্মান-বোধের পরিপূর্ণ পদদলিত বিনাশ—তাদের করে তুলবে নিষ্ঠুরের চেয়ে নিষ্ঠুর, সর্বনেশে ভবিষ্যতের প্রতিশোধকামী জিঘাংসু জীবন্ত প্রেতাত্মার মত।

মধ্যযুগের সেই নির্মম ক্রুসেডের মত এর প্রস্তুতি চলবে পুনরায় শত বৎসর ধরে, পরিণাম হবে শত শত বর্ষব্যাপী।

প্রথম লেখনেই আরম্ভ করেছিলুম এই বলে যে, এ তো শুধু অবতরণিকা। মনে মনে দুরাশা করেছিলুম, এই বিষবৃক্ষের চারাটাকে বিশ্বমানবের শুভবুদ্ধি হয়তো বা উৎপাটিত করে দেবে; এখন দেখছি, এই শিশু বিষবৃক্ষ মহীরুহ হয়ে উঠবে একদিন—শত শত বৎসর ধরে এ বিষবৃক্ষ পাবে উভয়পক্ষের ক্রোধোন্মত্ত প্রতিশোধ কামনার অপবিত্র শুকররক্তের উর্বরতাদায়ক খাদ্যনিষ্কর্ষ।

এ বিষবৃক্ষকে তখন আর সমূলে উৎপাটিত করা যাবে না।

যদি যায়, কিংবা বিধির আদেশে কোনো দৈবাগত ঝঞ্ঝায় সে ভূপাতিত হয় তবে সে মৃত্যু বরণ করার পূর্বে সঙ্গে নিয়ে যাবে অসংখ্য নরনারী বালবৃদ্ধকে নিষ্পিষ্ট করে তাদের প্রাণবায়ু॥

আরব-ইজরাএল যুদ্ধারম্ভ দিবস।

"দুঃখ তব যন্ত্রণায়"

আমাদের কৈশোরে রমা রলাঁ ছিলেন অতিশয় জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। বস্তুত এমনও একটা সময় গিয়েছে, যখন বাঙলা দেশে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় উপন্যাস বলতে রলাঁর জাঁ ক্রিস্তফই বোঝাত।

সে-যুগে ঔপন্যাসিক ছাড়া অন্য কোনো রূপে রলাঁ আত্মপ্রকাশ করেছেন কিনা, সে সম্বন্ধে আমরা কোনো কৌতূহল প্রকাশ করিনি।

অথচ ইয়োরোপের ভাবুকজন মাত্রই রলাঁকে চেনেন আরো অন্য একটি রূপে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার বহু আগের থেকেই রলাঁ ইউরোপে ক্রমবর্ধমান উৎকট জাতীয়তাবাদ (শভিনিজিম) যে ভিন্ন ভিন্ন দেশকে অবশ্যম্ভাবী প্রলয়ংকরী যুদ্ধের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সে-সম্বন্ধে সচেতন হয়ে যান এবং দেশবাসী ফরাসী তথা জরমনদের (রলাঁ ছিলেন জরমন সংগীতের আবাল্য একনিষ্ঠ ভক্ত) এ বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন সাবধানবাণী শোনান। বলা বাহুল্য, এহেন পরিস্থিতিতে সর্বত্র, সর্বকালে যা হয়ে থাকে, তাই হল। উভয় দেশই তাঁকে আপন আপন শত্রু বলে ধরে নিল।

বিশ্বযুদ্ধ লাগার সময় রলাঁ ছিলেন সুইজারল্যাণ্ডে। তিনি রেডক্রসে যোগ দিলেন এবং দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, প্রায় সমস্ত যুদ্ধকালটা ফ্রান্সের উদগ্র শভিনিজমের বিরুদ্ধে দৈনিক মাসিকে প্রচার-সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগলেন। যুদ্ধশেষের সময় ভগ্নোৎসাহ ক্লান্ত রলাঁ খুঁজলেন শান্তির সন্ধান। ডুব দিলেন তাঁর স্বদেশের শত্রু জরমন জাতের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতসৃষ্টিকার বেটোফেনের সংগীতের আরও গভীরে। বেটোফেন জরমন হয়েও জরমনদের বহু ঊর্ধ্বে – তাঁর সংগীত মানুষকে তুলে নিয়ে যায় নভঃলোকে, যেখানে ক্ষুদ্র-নীচ শভিনিজম পেঁছিতে পারে না। একদা তিনি তাঁরই মত মহামানব কবি গ্যোটেকে বলেছিলেন, 'আপনি আমি দেবদূতঃ আমাদের কাজ—মাটির মানুষকে স্বর্গলোকের দিকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া।'

রলাঁ যে বেটোফেনের আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেটাকে মডার্ন উন্নাসিক 'ইসকেপিজম, পলায়নী-মনোবৃত্তি' নাম দিয়ে সস্তায় কিস্তিমাত করবেন। কিন্তু ভুললে চলবে না, রলাঁ অবগাহন করতে নেমেছিলেন সুরগঙ্গায় ক্লান্ত দেহমন স্নিগ্ধ করে নিয়ে পুনরায় তাঁর কর্তব্য-কর্মে মনোনিবেশ করার জন্য। তিনি গঙ্গা নদীর মীন হয়ে ইসকেপিজমের নদীগর্ভে বিলীন হতে চাননি।

* * *

আঁদ্রে জিদ-এর কপালে ছিল নিদারুণতর দুর্দৈব। তিনিও জাতি-ধর্ম-দেশের ঊর্ধ্বে বিরাজ করতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রলাঁ যেরকম আশু দুর্যোগের

১ দুঃখের বিষয়, মূল পাঠটি আমার কাছে নেই। উভয় মহাপুরুষের পরিচয় হয় কারলস বাড-এ (চেক নাম Karlovy Vary)। ছোট গলির মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে উভয়ের দেখা হয় জনা দু-তিন রাজপুত্রের সঙ্গে। গ্যোটে সসম্মানে তাঁদের পথ ছেড়ে দেন। বেটোফেন পাগলা ষাঁড়ের মত সোজা চলতে থাকলে রাজপুত্ররা সবিনয় তাঁর জন্য পথ ছেড়ে দিয়ে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে যান। গলির শেষে পেঁছে বেটোফেন প্রতীক্ষা করেন গ্যোটের জন্য। তিনি পেঁছলে পর রাজপুত্রদের প্রতি ইঙ্গিত করে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেন, 'এরা কারা ? আপনি আমি দেবদূত—ইত্যাদি।' সমস্ত ঘটনাটিই হয়তো কিংবদন্তীমূলক। এর একাধিক 'পাঠ' (ভারসন) আমি কারলস বাডে বাসকালীন শুনেছি। তবে রলাঁও তাঁর বেটোফেন-গ্যোটে সম্বন্ধে পুস্তকে ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন।

পূর্বাভাস সুস্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন তিনিও তেমনি পেয়েছিলেন দ্বিতীয়ের পূর্বাভা। যুদ্ধ লাগার পর তাঁকে যখন বেতারে প্রোপাগাণ্ডা করতে বলা হল, তিনি অসম্মতি জানালেন। দেশকে ভালবাসতেন রলাঁ, জিদ উভয়েই, কিন্তু যে স্থূল পদ্ধতিতে অশ্রাব্য কটু ভাষণে যুদ্ধের সময় এক জাতি অন্য জাতিকে গালাগাল দেয়, স্পর্শকাতর বিশ্ব-নাগরিক এবং সর্বোপরি বিদগ্ধ কলাকার জিদ তার সঙ্গে সুর মেলাবেন কি করে! জিদ তাঁর জুরনালে (রোজনামচাতে) লিখছেন, ণ'। দেসিদেমাঁ, জ্য ন্য পারলরে পা আ লা রাদিয়ো—'না, আমার স্থির সিদ্ধান্ত, আমি বেতারে বক্তৃতা দেব না। ··খবরের কাগজগুলো এমনিতেই যথেষ্ট দেশপ্রেমের ঘেউ-ঘেউয়ে ভর্তি। নিজেকে যতই ফরাসী বলে অনুভব করি ততই আমার ঘেন্না করে।' এর পর জিদ বড় সুন্দর করে বলেছেন; তিনি নিজেকে যেভাবে ফরাসী মনে করে গর্ব অনুভব করেন, এই স্থূল পদ্ধতির সঙ্গে তো তার কোনো মিল নেই।

জিদের স্মরণে এল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময়কার কথা। তখন কিছু লোক এমনই হাস্যকর 'প্রচারকার্য' আরম্ভ করে যে, তখনকার দিনের অন্যতম খ্যাতনামা লেখক ল্যুসিআঁ জাক্ বলেন, 'চুপ করে থাকাটা কি তবে এমনই কঠিন?'—'সে দ'ক্ সি দিফিসিল দ্য স্য ত্যার?'

তারপর জিদ বলছেন, 'কিন্তু হৃদয় যখন ফেটে পড়তে চায়, তখন নীরব থাকটা যে বড়ই বেদনাময়।' এটা স্বীকার করে তিনি শেষ করেছেন এই বলে, 'কিন্তু আমি তো চাই নে আজ এমন কিছু লিখতে, যার জন্য কাল আমাকে মাথা হেঁট করতে হয়'!

এই সময় জিদ পড়ছেন জরমন কবি ও ঔপন্যাসিক আইসেনডরফের বই 'নিষ্কর্মা';

অবিশ্বাস্য সব ঘটনা ঘটে যেতে লাগল জিদের চোখের সম্মুখে। অবিশ্বাস্য মনে হল বিশ্বজনের কাছে যে, নেপোলিয়নের দেশ ফ্রান্স মাত্র পাঁচ-ছয় সপ্তাহের একতরফা যুদ্ধের পর—বস্তুত ফ্রান্স একবার মাত্রও পুরো জোর হামলা করতে পারেনি!—বিজয়ী জরমনির পদতলে লুণ্ঠিত হল।

জিদ বলছেন, 'শত্রু যখন প্রচণ্ড শক্তিশালী, তখন তার কাছে পরাজিত হওয়াতে নিশ্চয়ই কোনো লজ্জা নেই; এবং আমিও কোনো লজ্জা অনুভব করি নে। কিন্তু যখন ভাবি আমরা কি-সব স্তোকবাক্যের উপর নির্ভর করে কর্তব্য-কর্ম অবহেলা করে পরাজয় ডেকে এনেছি—তখন যে গভীর বেদনা অনুভব করি সেটা ভাষাতে প্রকাশ করতে পারি নে, অস্পষ্ট মূর্খ আদর্শবাদ, প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে মোহাচ্ছন্ন অপরিচয়, অপরিণামদর্শিতা, মূর্খের মত অর্থহীন এমন সব বাগাড়ম্বরে অন্ধবিশ্বাস—যার মূল্য আছে শুধু অপোগণ্ডের কল্পরাজ্যে।'

নিরঙ্কুশ পরাজয়ের পরের দিন জিদ লিখছেন:

'একমাত্র গ্যোটের সঙ্গে কথোপকথনই আমাকে দুশ্চিন্তার এই মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে কিঞ্চিৎ মুক্তি এনে দেয়'—

'Seules les Conversations avec Goethe parviennent a distraire un peu ma pensee de Pangoisse.'

পাঠক লক্ষ্য করবেন, 'গ্যোটের সঙ্গে কথোপকথন' 'Conversation with Goethe' (মূল জরমনে Gaspraeche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens')

গ্যোটে সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক অত্যুত্তম 'জীবিত' জীবনী লিখেছেন গ্যোটের সখা এবং শিষ্য একেরনান (অনেকটা 'শ্রীম')। কথোপকথন হয়েছে গ্যোটে এবং একেরমানে। অথচ জিদ ইচ্ছে করে এমনভাবে বাক্যটি রচনা করেছেন যে মনে হয় তিনি, জিদ-ই, যেন স্বয়ং কথাবার্তা বলছেন জরমন মহাকবি ঋষি গ্যোটের সঙ্গে, ইঙ্গিত করছেন, তিনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন ঋষির বাণী, তাঁর কণ্ঠস্বর। দুশ্চিন্তার বিভীষিকায় যে-টুকু সান্ত্বনা তিনি আদৌ পাচ্ছেন সেটি তাঁরই কাছ থেকে।

জিদ ঋষি নন—গ্যোটের মত। কিন্তু তিনি তখন ফ্রান্সের গ্রাঁ ম্যৎর্—গ্র্যান্ড্ মাস্টার—অর্থাৎ ফ্রান্সের পথদ্রষ্টা সাহিত্যসম্রাট। সেই ফরাসী সম্রাট সঞ্জীবনী সান্ত্বনা নিচ্ছেন—যে জরমনি নির্মমভাবে ভুলুণ্ঠিত করেছে গরবিনী ফ্রান্সকে, তারই ঋষি কবির কাছ থেকে!

* * *

মিশরের আড্ডা সম্বন্ধে পক্ষাধিককাল পূর্বে যখন লিখি তখন কল্পনাও করতে পারিনি, এই মিশরই দু-পাঁচদিনের ভিতর লেগে যাবে জীবনমরণ সংগ্রামে। সেই আড্ডাতে যিনি ছিলেন আমাদের 'কবিসম্রাট' তাঁর কবিতা পড়লে মনে হত তিনি যেন ইসলাম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ববর্তী যুগের বেদুইন ভাট। কথায় কথায় 'বিশাল মরু দিগন্তে বিলীম', 'ছুটছে ঘোড়া উড়ছে বালি' আর জাত ইহুদি ইব্রাহিমের পুত্র মিশররাজ ইউসুফ ও জোলেখার সাহারার উষ্ণশ্বাস-ভরা নীলনদের দুকূল-ভাঙা প্রেম।[২] আলট্রা মডারন কাইরো শহরের শিক্ পশ্ কাফের বাতাবরণে আমাদের কবিরাজ আহমদ ইবন শহরস্তানী অল্-মুকদ্দসী যখন তার সেই ফারাও যুগের প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতো, তখন আমার মনে হত এ রস রোমান্টিক, ক্লাসিক, এপিক, বৈদিক, প্রাগৈতিহাসিক সব কিছু ছাড়িয়ে গিয়ে সোজা বেআনডারটালে পেঁছে গেছে। কবিও তাই চাইতেন।

আমাদের মুকদ্দসী কিন্তু আর্ট্ কি, অলঙ্কার কাকে বলে, আর্ট্ অনুভূতিপ্রধান না তাতে অন্য কোনো মনোবৃত্তি চিত্তবৃত্তি প্রবেশ করতে পারে কি না সে নিয়ে কোনো আলোচনা করতে চাইতো না, পারতোও না। এ কিছু

২ আমরা যে গ্রন্থকে ওলড টেস্টামেণ্ট বলি সেইটেই ইহুদিদের 'তোরা' ইত্যাদি। সেসব গ্রন্থে বর্ণিত অনেক পয়গম্বর কুরানেও বর্ণিত হয়েছেন। ইউসুফ তাঁদেরই একজন। নজরুল ইসলাম হাফিজের অনুবাদ করেছেন:

দুঃখ করো না, হারানো ইউসুফ কিনানে আবার আসিবে ফিরে।

নূতন তত্ত্ব নয়। মা-ঠাকুরমার রূপকথা শুনে আমরা, হ্যাঁ, বয়োবৃদ্ধরা পর্যন্ত বিমোহিত হয়ে ভাবি, রূপকথা কল্পনা করার, তাকে অনাড়ম্বর ভাষায় প্রকাশ করার রহস্যটা কোন্‌খানে। প্রশ্ন শুধিয়ে দেখি ঠাকুরমাও জানেন না। মুকদ্দসীর বেলাও হুবহু তাই।

শুধু একটি কথা মাঝে মাঝে মাথা দোলাতে দোলাতে বলতো, কবি হওয়ার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে হে, কবি হওয়ার একটা বিশেষ মূল্য আছে। সে মূল্য কিন্তু অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি কোনো-কিছুর মাপকাঠি দিয়েই বিচার করা যায় না। কোন্ এক ইরানী কবি নাকি পেয়েছিলেন লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা, দান্‌তে পেয়েছিলেন বেয়াৎরিচের কাছ থেকে একটি ফুল, কিংবা কি জানি, কার ঠোঁটের কোণে স্বীকৃতির একটুখানি স্মিতহাস্য, কি জানি—।'

* * *

কবি মুকদ্দসী বড় স্পর্শকাতর। সে আরব। ইহুদিদের কাছে তারা নির্দয়ভাবে লাঞ্ছিত অপমানিত হয়েছে। তাকে চিঠি লিখেছি, 'সখা তুমি ইহুদিকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হাইনরিষ হাইনে পড়ো।'

* * *

যে একেরমান গ্যোটের সঙ্গে কথোপকথনের বিবৃতি দিয়ে বিশ্ববিখ্যাত হন তিনি ছাত্রাবস্থায় গ্যোটিঙেন শহরে হাইনের বন্ধুত্ব লাভ করেন। এক জহুরিকে চিনতে অন্য জহুরির বেশীক্ষণ সময় লাগেনি। প্রথম দর্শনেই প্রেম হয়।

ছাত্রাবস্থাতেই হাইনের সরল মধুর কবিতা জরমানির সর্বত্র খ্যাতিলাভ করে। অতিশয় সাধারণ জন-দফতরের কেরানী, ম্যাট্রিকের মেয়ে, ছাপাখানার ছোকরা—তাকে যেন দু বাহু মেলে আলিঙ্গন করে নেয়। আর ওদিকে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত আলংকারিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ফন্ শ্লেগেল তো তাকে প্রথম দিনই বিজয় মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন।

ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন একেরমান; ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। তারপর সেটি লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে।

গ্যোটিঙেন থেকে ঘোড়ার গাড়িতে ঘণ্টাখানেকের পথ—লানট্‌ভের বিয়ের-গারটেন। খোলামেলাতে বিয়ারের আড্ডা। রববার দিন গ্যোটিঙেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সেখানে এসে জালা জালা বিয়ার খায়, হইহুল্লোড় করে, আর নৃত্যগীত তো লেগেই আছে।

একেরমান, হাইনে এবং কলেজের আরো কয়েকজন ইয়ার বক্‌সী গেছেন সেখানে ফুর্তি করতে।

হাইনে আগের থেকেই মৌজে—বোধ হয় হামবুর্গের ব্যাংকার কাকার কাছ থেকে বেশ কিছু পেয়েছেন।[৩] তিনি ছেড়ে দিয়েছেন তাঁর আনন্দোল্লাসের

---

৩ টাকাকড়ি বাবদে হাইনে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছিলেন অত্যন্ত বেহিসেবী। তিনি স্বয়ং এক জায়গায় লিখেছেন, কে বলে আমি টাকার মূল্য বুঝি নে? যখনই ফুরিয়ে গিয়েছে তখনই হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।

লাগাম—বাক্যস্রোত ছুটেছে তুরুক সোওয়ারের মত। বিয়ার তাদের টেবিলে দিয়ে এসেছে পাব্-এর খাবসুরুত কোমলাঙ্গী তরুণী লটে (Lotte), হাইনে ফুর্তির চোটে জড়িয়ে ধরেছেন সুন্দরী লটেকে। কিন্তু একেরমান ও অন্যান্য ইয়াররা পূর্বাভিজ্ঞতা থেকে জানতেন, এই লটেটি বিয়ার-খানার আর পাঁচটা বার্-গার্লের মত ঢলাঢলির পাত্রী নয়। রাগে তার বাঁশীর মত নাকের ডগাটি হয়ে গেছে টুকটুকে রাঙা, চোখ দিয়ে বেরুচ্ছে আগুনের হল্কা, আর সে এমনই ধস্তাধস্তি আর পরিত্রাহি চিৎকার ছাড়তে আরম্ভ করেছে যে ইয়ারগোষ্ঠী কানে আঙুল দিয়ে চেপে ধরেছেন। হাইনে ওটা মস্করা হিসেবেই ভেবে নিয়েছিলেন গোড়ার দিকে, কিন্তু একটু পরেই কি যেন ভেবে অপ্রতিভ হয়ে চুপ মেরে গেলেন —যেন কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।৪

পরের সপ্তাহে একেরমানরা যখন হাইনেকে তুলে নিতে এলেন, তখন তিনি তাঁদের সঙ্গে যেতে কবুল নারাজ। শেষটায় একরকম গায়ের জোরে জাবড়ে ধরে তাঁকে গাড়িতে তুলতে হল।

কাফেতে আসন নিয়ে হাইনে মাথা হেঁট করে রইলেন চুপ। ঘাড় তুলে মেয়েটির দিকে তাকাবার মত সাহস পর্যন্ত তাঁর নেই।

কিন্তু কী আশ্চর্য! লটে স্বয়ং এসে উপস্থিত হাইনেদের টেবিলে। মধুর হাসি হেসে হাইনের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ালে। ইয়ার-দোস্তরা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

লটে হাইনের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমার উপর রাগ করবেন না, স্যর। আপনি অন্য ছাত্রদের মত নন। আমি আপনার কবিতা পড়েছি। কী সুন্দর! কী সুন্দর!! আপনার যদি ইচ্ছে যায়, তবে এই সব ভদ্রলোকের সামনাসামনি আমাকে আলিঙ্গন করতে পারেন—কিন্তু ঐসব মধুর কবিতা আপনাকে রচনা করে যেতেই হবে।'

বলেই লটে তার গাল বাড়িয়ে দিলে হাইনের দিকে। আর হাইনে?—কে জানতো হাইনের মত সপ্রতিভ লোকও লজ্জায় লাল হয়ে যেতে পারেন—লজ্জায় লাল হয়ে তিনি চুমো খেলেন।

একেরমান বলেছেন, 'লক্ষ্য করলুম (নটবর) বন্ধু স্পিটা হিংসেয় একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।'

* * *

হাইনের চোখ দু'টি ভিজে গিয়েছে। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'এ জীবনে এর চেয়ে সুখী আমি আর কখনো হইনি। এই আমি প্রথম হৃদয়ঙ্গম করলুম, কবি হওয়ার মূল্য আছে, কবি হওয়া সার্থক।'

* * *

সখা মুকদ্দসী, কবি হওয়া সার্থক!

৪ কনটিনেনটের ছাত্র-পাবে এ ঘটনা নিত্য নিত্য ঘটে। কেউ বড় একটা সিরিয়াসলি নেয় না। চেঁচামেচিটা অনেক ক্ষেত্রেই 'ন্যাকরা' বলে ধরা হয়।

'সাঙ্গ হয়েছে রণ—'

রবীন্দ্রনাথ

এ-রণ সাঙ্গ হয়নি। সবে আরম্ভ মাত্র। কত শতাব্দী ধরে চলবে কেউ বলতে পারে না। কিংবা, কত হাজার বছর ধরে। 'হাজার বছর ধরে' বলছি ভেবেচিন্তেই। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে প্যালেস্টাইনের ইহুদি জাত আপন রাষ্ট্র আপন স্বাধীনতা হারায়। সেই সময় থেকে ইহুদিরা পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে। ফলে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্যালেস্টাইনের ইহুদি জনসংখ্যা শতকরা পাঁচ থেকে দশের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। ১৯১৯।২০ থেকে পুনরায় ইহুদিদের বহু লোক প্যালেস্টাইনে ফিরে আসতে লাগলো। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে (ইহুদি গণনায় ৫৭০৮ সালে—অবশ্য এর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে) ইউনাইটেড নেশনসের অনুশাসনানুসারে প্রাচীন প্যালেস্টাইনের একাংশ নিয়ে ইজরাএল রাষ্ট্র (Erez Jissrael) গঠিত হয়। অর্থাৎ অন্তত আড়াই হাজার বছর লাগলো একটা মৃত রাষ্ট্রকে পুনরুজ্জীবিত করতে। তাই এ রাষ্ট্র যদি আবার লোপ পায় তবে হয়তো লাগবে আরো হাজার দুই তাকে পুনরায় প্রাণ দিতে। তাই গোড়াতেই বলেছি, এ সংগ্রাম হয়তো চলবে আরো কয়েক হাজার বছর ধরে।

কিন্তু প্রশ্ন, এ-রাষ্ট্র কি আবার লোপ পেতে পারে? অতি ক্ষুদ্র যে রাষ্ট্র এতগুলো বিরাট বিরাট আরব রাষ্ট্রকে চারদিনের ভিতর চূড়ান্ত পরাজয় দিল (বস্তুত এক ঘণ্টার ভিতরেই আরবশক্তির চোদ্দ আনা জঙ্গী বিমান নষ্ট হয়, এবং ফলে আরবরা কোনো যুদ্ধক্ষেত্রেই সামান্যতম সার্থক আক্রমণ চালাতে পারেনি) সে কি কস্মিনকালেও এদের কাছে পরাজিত হবে? অবিশ্বাস্য।

মাত্র একটি যোগাযোগের ফলে এ বিপর্যয় ঘটতে পারে। এবং উপস্থিত আরবরা যে সন্ধিপত্রেই দস্তখৎ করুক না কেন, তারা সেই মহালগনের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনবে।

সকলেই জানেন, আরব ইজরাএল দুই পক্ষই লড়েছেন পশ্চিমাগত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। কোনোদিন যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে যায় (এবারে আব্দুন নাসির তাই চেয়েছিলেন কিন্তু রুশ তাঁকে ডোবাল) তবে ইজরাএলের সর্ব সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবে—এমন কি খাদ্যশস্যও। মিশর ইরাক তখন লড়বে অনেকটা রুশ যে রকম হিটলারের সঙ্গে লড়েছিল। ইরাক জরডন হটে হটে যতদূর খুশি যেতে পারে, মিশরের বেলাও তাই। আরব বাহিনী হুবহু রুশদের মতই কোনো জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে নিজেদের কিছুতেই বিধ্বস্ত হতে দেবে না। এবারেও কোনো কোনো আরব রাষ্ট্র মিশরকে এই ট্যাকটিক বরণ করতে বলেছিল। কিন্তু নাসের জানতেন, ইজরাএল কালক্রমে যদি পরাজয়ের সম্মুখীনও হয় তবে মার্কিনিংরেজ শেষ মুহূর্তে তার পক্ষে নামবেই। আর ইতিমধ্যে প্লেন, তেল বোমার সাপলাই তো চালু থাকবেই। তাই ভবিষ্যতে আরব রাষ্ট্রপুঞ্জ শুধু তখনই ইজরাএল আক্রমণ করবে যখন গোড়াতেই দেখবে মার্কিনিংরেজ রুশ বা

চীনের কিংবা উভয়ের সঙ্গে 'মরণ-আলিঙ্গনে/কণ্ঠ পাকড়ি ধরেছে আঁকড়ি/দুইজনা দুইজনে/'। তখন ইজরাএলের সাহায্যের জন্য এরা কড়ে আঙুলটি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে পারবে না। ইজরাএল অবশ্যই তার প্রতি-ব্যবস্থা বছরের পর বছর করে যাবে, কিন্তু যুদ্ধবিশারদ তথা অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলেন ঃ ক্ষুদ্র একটি রাষ্ট্র যার লোকবল যৎসামান্যেরও কম, যার প্রায় তাবৎ 'উপার্জন' বিশ্ব ইহুদি সংঘের দান-খয়রাত থেকে, যার আপন উৎপাদনী শক্তি প্রয়োজন মেটানোর চেয়েও ঢের ঢের কম তার পক্ষে এহেন অর্থনৈতিক পলিসি আত্মহত্যার শামিল। তাই আজ থেকে আরব ঠিক এইটেই কামনা করছে।

আর আরব সম্পূর্ণ নিরাশ হবেই বা কেন? ক্রুসেডের সময় আরবভূমির এক ক্ষুদ্রাংশ তিনশ বছর ধরে লড়েছে পোপের নেতৃত্বে জমায়েত তাবৎ ইয়োরোপের সঙ্গে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা হোলিল্যাণ্ড ত্যাগ করে ফিরে যান যাঁর যাঁর দেশে—পোপের কাতর ক্রন্দন, তীব্র অভিসম্পাত উপেক্ষা করে। ইহুদি যদি দু হাজার বছরের মড়া রাষ্ট্রের প্রাণ দিতে পারে, তবে আরবই বা তার মাত্র এক হাজার বছরের পুরনো রাষ্ট্রশক্তিতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না কেন?

তা হলে প্রশ্ন, এ সমস্যার কি কোনো সমাধান নেই?

আছে হয়তো। কিন্তু যে-সমাধান এক পক্ষ কিছুতেই স্বীকার করবে না সেটাকে সমাধান বলি কি প্রকারে? তবু দেখা যাক।

যুদ্ধবিরতির সঙ্গে-সঙ্গেই মারকিনিংরেজের শুধু একটি চিন্তা ঃ এই যে আরববলদের মড়াটা পড়েছে পায়ের কাছে এর কতটা অংশ পাবো আমি—সিংহ-আন্‌কল-স্যাম, কতটা পাবে জনবুল-নেকড়ে, আর কতটা পাবে ইহুদি-ফেউ?—যদ্যপি বেচারী ফেউটাই এস্থলে করেছে লড়াই। কিন্তু সে ফালতো জমিজমা নিয়ে করবে কি? অত ইহুদি পাবে কোথায়? হাতের চেয়ে যে আঁব বড় হয়ে যাবে! আর সে যদি নিতে চায়, নিক। আমরা নেব সীনা, গুর্দা, কলিজা! শাঁসালো বস্তু। সেগুলো কি, এখখুনি নিবেদন করছি।

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, বি বি সি যুদ্ধবিরতির প্রথম খবর দেবার ঠিক আট মিনিট দশ সেকেণ্ড পর একটি talk-টিপ্পনী বেতারিত করলে। বক্তা ইংরেজ ইহুদি কিনা জানি নে; তাকে ইহুদি বলে ধরে নিয়ে আমি ইহুদিজাতকে অপমান করতে চাই নে।

নাকি-নাকি ন্যাকা সুরে নিজের স্বার্থ যতখানি গোপন করা যায় তাই ক'রে—এবং ইংরিজী ভাষা যে ভণ্ডামির জন্য প্রকৃষ্টতম ভাষা সে-কথা যে-হটেনটট্ সাত অবধি গুনতে পারে না সেও জানে—যা বললেন তার বিগলিতার্থ, 'এ-রকম লড়াই বড়ই খারাপ, বড়ই খারাপ। এরকম ফের হতে দেওয়া উচিত নয় উচিত নয়। এই দেখুন না, এরই ফলে আরব জাত বন্ধ করে দিলে সুয়েজ খাল—বলুন তো আমাদের জাহাজ চলাচল করবে কি করে? আবার কসম খেয়ে বসলো, তেল বেচবে না আমাদের কাছে—ওঃ! আমাদের বাস্-কারখানা তা হলে চলবে কি করে! আর গাল্‌ফ-অব-আকাবা, শর্‌ম্-উশ্-শেখ সে তো বটেই বটেই। অতএব এ-হেন অঘটন যাতে পুনরায় না ঘটে

তার জন্য ক) সুয়েজ খাল আন্তর্জাতিক কনট্রলে নিয়ে নাও, খ) তাবৎ আরবভূমির তেলেরও এমন ব্যবস্থা করো যাতে করে আসছে দুর্যোগে আরব জাত বস্তুটা নিয়ে ছিনিমিনি না খেলতে পারে এবং গ)—কিন্তু 'গ'—অর্থাৎ গালফ্ অব আকাবা সম্বন্ধে টীকাকারের উৎসাহ কম কারণ সেখানে প্রধান স্বার্থ ইজরাএলের। এর অর্থ কি? সুয়েজ খাল কনট্রলে এলে ইংরেজকে মাশুল বাবদ এক পৌণ্ডের জায়গায় দিতে হবে একটি ফার্দিং (ও! ফার্দিং বুঝি অধুনা দুর্লভ? তা সেটা দারুণ স্বার্থত্যাগ করে ফের টাঁকশালে বানাতে হবে বই কি! Oh Albion! Consider thy historical self-sacrifice!)। তেল কনট্রলে এলে হয় কোনো রয়েলটিই দেব না, নয় ঐ দু'একটা ফার্দিং থ্রোন টু দি অ্যারাব-বয়!

লড়াই করে ম'লো ইজরাএল আর লুটের বেলা এলবিয়ন। এর ঠিক উল্টো-টাকে বাঙলায় বলে—হায়, বাঙলা বড়ই নাঈফ শিশুর আধো-আধো ভাষা, ও নিয়ে আদৌ ভণ্ডামি করা যায় না—'খেলেন দই রমাকান্ত বিকারের বেলা গোবন্দন।' এস্থলে ইজরাএল আগেভাগেই বিকার করে বসে আছে, এবারে দই খাবেন গোবন্দন ইংরেজ মহাজন। তবে এর মধ্যে একটুখানি আশার আলো দেখা যাচ্ছে। অ্যান্দিন ইংরেজ 'বিজিনেস' বা শপ্-লিফটিং করেছেন অগা ভারতীয়দের সঙ্গে, শিশু নিগ্রোদের সঙ্গে, ক্যাবলাকান্ত আরবদের সঙ্গে, এবারে চাচা, নয়া ওঝার নয়া নয়া খেল। এরা আণ্ডা না ভেঙে মামলেট বানাতে পারে, দেখলে না, নেই নেই তো নেই, সেই নেই নেই থেকে দ্যাখ তো না দ্যাখ একটা নয়া চনমনে সমুচ্চ রাষ্ট্র ইজরাএল পয়দা করে দিয়ে সপ্রমাণ করে ফেললে, তোমাদের আড়াই হাজার বছরের পুরনো পদার্থবিদ্যা দর্শনের স্বতঃসিদ্ধ something cannot come out of nothing আগাপাস্তলা ভুল, বিলকুল ভণ্ডুল। জানি তোমরা 'হর্স্ ডীল' বা 'ঘোড়া বিক্রি'র জন্য পাঠাবে তোমাদের ঝানু ঝানু স্কটস্ম্যানদের কিন্তু ওদের খোঁয়াড়েও আছে গণ্ডায় গণ্ডায় ঝাণ্ডু ঝাণ্ডু স্কটিশ জুঁ—যারা ক্রমান্বয়ে চতুর্দশ পুরুষ স্কটল্যাণ্ডে জন্মমৃত্যু বিবাহ সেরে স্কটস্ম্যানদের চুষেছে এবং চুষে ভর্তি পকেটে হুইসিল দিতে দিতে পশুদিন এই হেথা ইজরাএলে এসেছে। তোমরা যদি সুয়েজখালে 'নাও চল কইরা দু পয়সা কামাও তবে ইহুদি গোপাল সেখানে স্রেফ ঢেউ গুনে দু আঁজি।'

কিন্তু এ সবেতে কিছু যায় আসে না। সুয়েজ, শরম্ উশ্-শেখ, তেল এ সব নিয়ে আরব লেনদেন করতে হরবকৎ তৈরি। এস্তেক—আমার বিশ্বাস—ইজরাএলের চতুর্দিকের জমাজমি নিয়েও সে দরদস্তুর করতে রাজী আছে, কিন্তু তার একটি মাত্র শর্ত মেনে নিতে হবে।

সে শর্তটি: যে-সব আরব চাষা জেলেদের প্যালেস্টাইন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ইজরাএল তৈরি করেছো তাদের ফিরিয়ে নিয়ে পূর্ণ নাগরিক অধিকার দিতে হবে।

ইহুদিদের প্যারিস তেল-আভিভ শহর হেসে গড়াগড়ি দেবে। তা

কখনো হয় !

উত্তরে আরব বলে, 'কেন হবে না ? তেরশ' বছর নয়, তারও বহুপূর্বের থেকে আরব ইহুদি পাশাপাশি বাস করেছে। পয়গম্বর হজরৎ মুহম্মদ ইহুদিদের বিশেষ সম্মানের চোখে দেখতেন। নিউ টেস্টামেন্টে পাই, ইহুদিরা প্রভু খৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরেছে এবং তারই ফলস্বরূপ যুগ যুগ ধরে খৃষ্টানরা তোমাদের অত্যাচার করেছে, এখনও কোনো কোনো দেশে করে—আর হিটলারের কথা তুলবো না, সে তো বিশ্বজন জানে। অথচ কুরান শরীফে স্পষ্ট বলা হয়েছে, প্রভু যীশু আদৌ ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যাননি। যে কলঙ্ক থেকে আমাদের নির্ভুল আপ্তবাক্য কুরান শরীফ তেরশ' বছর পূর্বে তোমাদের বেকসুর মুক্তি দিয়েছে, সেই কলঙ্ক থেকে খৃষ্টানদের প্রতিভু হিজ হোলিনিস পোপ তোমাদের মুক্তি দিয়েছেন বছর দুই হয় কি না হয়। গ্রীক অর্থডক্স, কপট্, লুথেরিয়ান ইত্যাদি চার্চ এখনো দেয়নি। অর্থাৎ প্রায় এক হাজার ন' শ' ত্রিশ বছর ধরে পৃথিবীর সর্ব খৃষ্টান তোমাদের অপরাধী ধরে নিয়ে যেখানে সেখানে ঠেঙিয়েছে। তোমাদের নামে কুৎসিত কেলেঙ্কারি কেচ্ছা রটিয়েছে যে, তোমরা তোমাদের এক বিশেষ পরবের দিনে একটি নিষ্পাপ খৃষ্টান শিশুর গলা কেটে তার রক্তপান করাটা অবশ্য কর্তব্য পুণ্য বলে স্বীকার করো।[১] খৃষ্টানদের এই ইহুদি বিদ্বেষের জন্য বিশেষ ইংরিজী শব্দ 'এন্টি-সেমিটিজম'। এবং এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে ইংরিজী ভাষা জরমন থেকে নিয়েছে 'যুডেনহেৎসে', সুদূর রুশ থেকে নিয়েছে 'পগ্রম'। আরবীতে সে রকম কোনো শব্দ আছে, না আমরা তোমাদের উপর কখনো কোনো অত্যাচার করেছি ? বস্তুত আমাদের নবী মদ খাওয়া এবং সুদ নেওয়া বারণ করে দেওয়াতে এ দুটো মুনাফার ব্যবসা তোমরা একচেটে চালিয়েছ তেরশ' বছর ধরে তামাম মধ্য প্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা জুড়ে। এই যে ১৯১৯ থেকে তোমরা মধ্যপ্রাচ্যের ইহুদিদের বার বার তোমাদের হোলি ল্যাণ্ডে নিমন্ত্রণ জানিয়েছ তাদের সবাই এসেছে ?[২] এই গত যুদ্ধের সময়ও আমরা কোনো কোনো জায়গায় বিশেষ পুলিস মোতায়েন করেছি পাছে উত্তেজিত জনতা তাদের মারধোর করে। আর তোমাদের সঙ্গে লড়াই করে তো

---

১ দুর্বল স্মৃতিশক্তির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা বরে নিবেদন, চসার বোধ হয় ঐ ধরনের একটি নিষ্পাপ বালকের কাহিনী লিখেছেন। ইহুদিরা নাকি তার গলা পুরোপুরি কেটে ফেলতে পারেনি বলে সে বেঁচে যায় ও তার করুণ কাহিনী খৃষ্টানদের সামনে বর্ণনা করে।

২ আসলে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ইজরাএল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যখন ইহুদিরা সে রাজ্যের চাষীদের সঙ্গীনের খোঁচায় তাড়িয়ে দিয়ে, তাদের জমিতে বিদেশাগত জাতভাইদের বসালে তখন ইরাক, সিরিয়া ইত্যাদিতে (মিশর ও উত্তর আফরিকায় অপেক্ষাকৃত অনেক কম) আরবরা সেখানকার ইহুদি বাসিন্দাদের উপর দাদ তুলতে লাগলো। ফলে বাধ্য হয়ে এরা ইজরাএলে চলে যেতে লাগলো।

আমরা জেরুজালেম দখল করিনি। লড়াই হয়েছিল খৃষ্টানদের সঙ্গে। শত্রু যদি আমাদের কেউ থাকে তবে সে খৃষ্টান। অথচ এই খৃষ্টানদের সঙ্গে আমরা সম্মিলিতভাবে অক্লেশে লেবাননে রাষ্ট্র পরিচালনা করছি।

'তোমরাই বা আমাদের সঙ্গে একই রাষ্ট্রে বাস করতে পারবে না কেন?'

অসম্ভব! অসম্ভব! ইহুদি জানে সে আড়াই হাজার বছর ধরে ইজরাএলে যে নবীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুখস্বপ্ন গড়েছে সে-রাজ্য দাউদ (ডেভিড) সুলেমানের রাজ্যের হুবহু ফটোগ্রাফ। সে রাজ্য পূত-পবিত্র। তাতে কোনো বিধর্মী নেই। যারা ছিল তাদের বহু পূর্বেই নির্মূল করা হয়েছে। সলমনের গুরি তো তার বিধর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে নির্মিত হয়নি। এসব প্রস্তাব শুনলেই কানে আঙুল দিতে হয়।[৩]

তাই বলেছিলুম, আরব ইহুদি সমস্যার সমাধান কোথায়?

জেরুসলেম

আইস, সুশীল পাঠক, যুদ্ধবিগ্রহ তথা রাষ্ট্রপুঞ্জের বৈঠকে যে মেছোহাটার গালাগালি এবং দর কষাকষি হচ্ছে সেগুলো ভুলে গিয়ে পুণ্যভূমি জেরুসলেমে তীর্থ করতে যাই।

অতি প্রাচীন নগর জেরুসলেম। খৃষ্টের দু'হাজার বছর পূর্বে জেরুসলেম মিশরীয়দের অধীনে ছিল। তখন তার নাম ছিল উরুসালিমুমু ('শান্তিনিকেতন' ত্রাণদুর্গ)। পরবর্তী রোমানযুগে রাজা হাদ্রিআন এর নাম দেন অ্যালিয়া কাপিতলিনা। খৃষ্টের প্রায় দেড়শ' বছর পর থেকে ইহুদিরা দলে দলে, কখনো রোমানদের দাসরূপে কখনো বা স্বেচ্ছায় জেরুসলেম ত্যাগ করে।[১] ঐ সময় থেকে সে নগরী আর ইহুদি ধর্মের কেন্দ্রভূমি হয়ে রইল না। সপ্তম শতাব্দীতে দ্বিতীয় খলীফা ওমরের আমলে যখন মক্কামদীনার আরবরা এ নগর

---

৩ অতীতের কোনো বিশেষ পূত পবিত্র যুগে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখাটা ইহুদিদের একচেটে নয়। মুসলমানদের ওয়াহ্হাবী আন্দোলন এককালে তাই চাইত। অবশ্য তাদের প্রোগ্রামে বিধর্মীদের খেদাবার ব্যবস্থা নেই। কারণ তাহলে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করবার জন্য লোক পাবে কোথায়? শুনেছি স্বামী শ্রদ্ধানন্দও বৈদিক যুগ পুনরুজ্জীবিত করতে চাইতেন কিন্তু সেই ধর্মরাজ্যে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের 'শুদ্ধি' করে নেবার ব্যবস্থা ছিল ('ব্রাত্য' ব্যবস্থা তুলনীয়)। এটাকেই যখন 'বিজ্ঞান'সম্মত পদ্ধতিতে পেশ করা হয় তখন তার জিগির "Back to nature!"

১ পুণ্যনগরী জেরুসলেম যে ইহুদিদের একদিন ত্যাগ করে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়তে হবে সে কথা এর প্রায় ৮০০ বৎসর পূর্বে ইহুদি প্রফেটরা বার বার ভবিষ্যদ্বাণী করে ইহুদিদের সাবধান করেছেন; তারা কান দেয়নি; আচার-আচরণ বদলায়নি। এই 'বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ার' নামই 'ডিসপারসেল', গ্রীক 'দিয়াসপরা'।

দখল করে তখন শহরের ৯৫% বাসিন্দা খৃষ্টান। এবারে প্রায় সকলেই ধীরে ধীরে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। মক্কামদীনা ত্যাগ করে যে সব আরব এখানে আসে তাদের সংখ্যা ১%-ও হবে না। যে ৯১% মুসলমান হয়ে যায় তারা যুগ যুগ ধরে জেরুসলেম তথা প্যালেস্টাইনের (আরবীতে ফলস্তীন) আদিমতম বাসিন্দা (বস্তুত ইহুদিরা বাইরের থেকে এসে এদেশ জয় করে) এবং ইহুদি কর্তৃক যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত হয়েও আপন ধর্ম ত্যাগ করেনি, পরবর্তী যুগে খৃষ্টান হয়ে যায় এবং সর্বশেষে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে বিজয়ী সেনাপতি ইংরেজ লর্ড অ্যালেন্‌বি যখন প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করেন[২] তখন সেখানে শতকরা ৮৫ মুসলমান, ১০ খৃষ্টান ও ৫ জন ইহুদি। সে ইহুদিরা ততদিনে ধর্ম ছাড়া সর্ব বাবদে আরব হয়ে গিয়েছে—হিব্রু ভাষা বলতে পারে না, বলে আরবী। একাধিকজন কবিতা লিখে আরবী সাহিত্যে সেরা লেখকদের মধ্যে স্থান পেয়ে গিয়েছেন।

প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাজত্ব কায়েম হয়ে 'ইজরেএল' (আরবীতে ইসরাঈল) নাম ধরার তেরো বছর পূর্বে, অর্থাৎ ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে আমি একদিন কুদ্‌স (জেরুসলেমের আরবী নাম) শহরের নগরপ্রাচীরের বাইরে দূর যাত্রীর বাস্‌-স্ট্যান্‌ডে দাঁড়িয়ে আছি, তোরঙ্গটি মাটিতে রেখে। বাসনা, যাবো ন্যাজারিথ (নাজরেৎ, আরবীতে অর্থাৎ বর্তমান যুগে প্রচলিত নাম 'অন্‌-নসীরা' —আদি যুগের খৃষ্টানদের ঐ নাম থেকে 'ন্যাজরীন' নামে ডাকা হত। মুসলমানরা আজো ওদের 'নসারা' নামে পরিচয় দেয়) যেখানে প্রভু যীশু বাল্যকাল কাটান, মা মেরি (আরবীতে 'মরিয়ম') যে কুয়োথেকে জল আনতে যেতেন সেটা নাকি তখনো আছে! আরো নাকি আছে, মা-মেরির বর জোসিফ-এর (আরবীতে ইউসুফ) ছুতোরের কারখানা। ইনি যীশুর পিতা নন। কারণ প্রভুর জন্ম হয়েছিল কুমারী-গর্ভে, পবিত্র আত্মা দ্বারা। নিউ টেসটামেনট ও কুরান শরীফ, দুই-ই এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, মা-মেরির বর জোসিফ র‍্যাঁদা দিয়ে কাঠ পরিষ্কার করে কাঠে কাঠে জোড়া দিতেন আর প্রভু যীশু মানুষের চরিত্র পরিষ্কার করে মানুষে মানুষে জোড়া দিতেন। যে

---

২ ইংরেজ অ্যালেন্‌বি যখন জেরুসলেমে প্রবেশ করেন তখন সে-খবর একজন অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যকে দিলে পর সে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে বলে, 'তাই তো! প্রভু খৃষ্টের জন্মকালে যে সব মেষপালককে দেবদূত সে-সুসমাচার জানান, তাদের বংশধরদের একটু হুঁশিয়ার করে দিলে হয় না যে—ইংরেজ ভেড়ার পালে ঢুকেছে—মতলবটা ভালো নয়।' 'শপ্‌-লিফ্‌টার' ইংরেজ 'শীপ্‌-লিফটিঙে'ও যে কিছু কম যান না সেতত্ত্ব আউসি বিলক্ষণ জানতো। তার হুঁশিয়ারি কিন্তু পরবর্তী যুগে টায় টায় ফলেনি। ইংরেজ যখন দেখলে যে সে 'নেটিভদের' সঙ্গে পেরে উঠবে না, তখন তাদের পিছনে ইহুদিদের লেলিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে গেল। আর ইহুদি যে শুধু ভেড়াগুলো মেরে দিলে তাই নয়, নেটিভদের জর্ডনের 'হে-পারে' (আমরা যেরকম বলি 'পদ্মার হে-পারে) খেদিয়ে দিলে।

স্যামারিটানদের প্রভু যীশুর গোষ্ঠী এবং তাঁর কট্টর ইহুদি সম্প্রদায়ের শিষ্যরা দু চক্ষে দেখতে পারে না তিনি করেছেন তাদের প্রশংসা—গুড স্যামারিটান। এই স্যামারিটানরাও ইহুদি, কিন্তু যেসব ইহুদিরা ইজরাএল সৃষ্টি করেছে এদের সঙ্গে স্যামারিটানদের দ্বন্দ্ব চলেছে প্রায় তিন হাজার বছর ধরে। জেরুসলেমে প্রতিষ্ঠিত রাজা সলমনের (আরবীতে সুলেমান) মন্দির যে ইহুদির পরমেশ্বর য়াহভের (জেহোভা, ইলোহিম) পীঠস্থল একথা স্বীকার করেনি। আজ সেখানে নাবলুস শহর (বাইবেলের 'শেখেম') তারই পাশে গেরিজিম পাহাড়ের উপর ছিল তাদের আপন মন্দির।[৩]

একদা এই স্যামারিটান জাতি সংখ্যায়, খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে মূল ইজরা-এলিদের চেয়ে কোনো অংশে হীন ছিল না। তাবৎ ইহুদি যখন প্যালেস্টাইন পরিত্যাগ করে তখন শত অত্যাচার সহ্য করে দেশের মাটি কামড়ে ধরে এরা পড়ে থাকে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে 'স্বগোত্রে' বিবাহের ফলে এদের সংখ্যা কমতে কমতে এখন মাত্র চারশতে এসে দাঁড়িয়েছে।

---

৩ এ জায়গাটা ছিল জরডন এলাকায়। হালে ইজরাএল বাহিনী সেখানে পেঁছে গেরিজিম মন্দিরের ভগ্নাবশেষের উপর ইজরাএলের জাতীয় পতাকা তুলতে গেলে স্যামারিটানদের সঙ্গে হাতাহাতির উপক্রম হয়। পরধর্ম বাবদে ইহুদিরা ঈষৎ অসহিষ্ণু এ তত্ত্বটি ইংরেজ জানতো বলেই ইজরাএল রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় (১৯৪৮) তারা খৃষ্টান মুসলিম গির্জা মসজিদে ভর্তি প্রাচীন জেরুসলেম (ইহুদিদের বিশেষ কোনো স্থাপত্য এ শহরে আজ আর নেই, কারণ রাজা হাদরিয়ান শব্দার্থে এ নগরের উপর হাল চালিয়েছিলেন এবং ঐ সময়ই ইহুদিকুল শেষবারের মত জেরুসলেম পরিত্যাগ করে বলে পরবর্তী যুগে কিছু নির্মাণ করার সুযোগ পায়নি) ইজবাএলের শত মিনতিভরা কাতর রোদনে কর্ণপাত না করে মুসলমান জরডনরাজকে দিয়ে দেন। হালের যুদ্ধের ফলস্বরূপ ইজরাএল যখন প্রাচীন জেরুসলেম অধিকার করে তখন এ-যুগের ইংরেজ লেবার (অর্থাৎ ঐতিহ্যহীন অনভিজ্ঞ) সরকার কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। কিন্তু স্যামারিটানদের মন্দিরে ইজরাএলের ব্যভিচারের খবর ইংলণ্ডে পেঁছিনো মাত্রই লেবার-বাবুদের কানে জল গেছে। নিরাপত্তা পরিষদে চিৎকার করে ইংরেজের ফরিনমন্ত্রী ব্রাউন একাধিকবার বলেছেন, ইহুদিকে প্রাচীন জেরুসলেম ছেড়ে দিতেই হবে। এই প্রাচীন নগরের ভিতরে রয়েছে খৃষ্টের বিরাট—সত্যই অতি বিরাট—সমাধি। সৌধ (হোলি সেপালকর), গেৎসিমেনের বাগান যেখানে প্রভু যীশুর দেহ থেকে স্বেদের পরিবর্তে রক্ত বেরোয়, মাউণ্ট অলিভ এবং ভিয়া দলরসা—যে পথ দিয়ে প্রভু ক্রুশ বহন করে বধ্যভূমিতে পেঁছন। (মুসলমানদের হরমশরীফ, মসজীদ-উল-আকসা বাদ দিচ্ছি—এগুলোর জন্য ইংরেজের কোনো দরদ না থাকাই স্বাভাবিক)। ইজরাএলের 'সাতিশয় বিবেচক করুণ করে' এগুলো সঁপে দিতে ব্রাউন হিম্মৎ পাচ্ছেন না। কিসের হাতে যেন কি সমর্পণ!

আমি যখন পুণ্যভূমিতে যাই তখন দেখি খবরের কাগজে একটা তর্কবিতর্ক চলেছে। যদ্যপি আজ খবর-প্রতিষ্ঠানগুলো বলছেন, স্যামারিটানদের সংখ্যা আনুমানিক প্রায় চারশ', আমাকে কিন্তু তখন বলা হয়েছিল প্রায় আশী। খবরের কাগজে আলোচনা হচ্ছে, এই স্যামারিটানদের 'প্রধান রাব্বি'-র (পণ্ডিত পুরোহিতের) একমাত্র জোয়ান ব্যাটা—ইনিই পরে প্রধান রাব্বি হবেন—'সোমত্ত' হয়েছেন, এখন তাঁকে বিয়ে করতে হবে। কিন্তু হায়, কনে কোথায়? মাসীপিসীদের অর্থাৎ অগম্যাদের বাদ দিলে তিনি যে দুটি বধূকে বিয়ে করতে পারেন তাদের একটির বয়স ষাট এবং তিনি তারস্বরে চিৎকার করে বলছেন—আমাদের আইবুড়ো জাতকুলীন বৃদ্ধারা যা বলে থাকেন—'তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে! এখন সাজবো কনে বউ! কী ঘ্যান্না। কী ঘ্যান্না'। এবং তদুপরি দ্রষ্টব্য, এই বৃদ্ধাকে বিয়ে করলে বংশ রক্ষা হবে না, এবং এ স্থলে সেইটেই সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় বধূটি বোবাকালা ইডিয়েট।...স্যামারিটানরা আড়াই হাজার বছর ধরে ইজরাএলিদের সঙ্গে বিয়েশাদী করেনি। এখনই বা করে কি প্রকারে? এসব গুল-গ্যাশ আমি শুনেছি প্রাচীন জেরুসলেমের হেরোদ গেটের কাছের (এখানেই ভারতীয় হস্পিস্—সরাইখানা, চট্টি যা খুশী বলুন—অবস্থিত) কাফে—আড্ডাতে। এর শতকরা ৯৯% পাঠক বাদ দিতে পারেন। মোদ্দাটুক্ শুধু এই ঃ যুবক রাব্বিপুত্রের জন্য বিবাহযোগ্যা বধূ সে-কুলে নেই।

অতএব স্থির হল, ঐ জাতশত্রু ইজরাএলি ইহুদিদেরই কোনো মেয়ে বিয়ে করো। হাজার হোক, ওরা তো ইয়াহভে মানে, ধর্মগ্রন্থ পেনটাটয়েশ স্বীকার করে। খৃষ্টান, মুসলমান তো আর বাড়িতে তোলা যায় না।

ন্যাজরিথ যাবার পথে পড়ে স্যামারিটানদের নাবলুস; নিশ্চয়ই দেখে যেতে হবে। নিঃসন্দেহে যারা অন্তত তিন হাজার বছর ধরে ভিটের মাটি (ওঃ! আর সে কী মাটি, বালি পাথরে ভর্তি!) কামড়ে ধরে পরে আছে, তারা দ্রষ্টব্য বই কি।

* * *

সে-আমলে প্যালেস্টাইনে চলতো তিন রকমের বাস্। আরব বাস্ ইহুদি বাস্ আর স্টেট বাস্। কাট্যা ফালাইলেও ইহুদি চড়তো না আরবের বাস্ এবং ভাইস্ ভার্সা। দু'দলেই চড়তো স্টেট বাস্।

আত্মচিন্তায় নিমগন আমার সামনে এসে হঠাৎ দাঁড়ালো একখানা করকরে নতুন ট্যাক্সি। আরব ড্রাইভারের পাশে দেখি গোটা পাঁচেক মেল-ব্যাগ। পিছনের সীটে জাব্বা জোব্বা পরা ইয়া মানমনোহর গলকম্বল দাড়িওলা দুই রাব্বি। এক রাব্বি পিছনের দরজা খুলে বার বার বলে যাচ্ছেন, 'উঠে পড়ো, উঠে পড়ো'।

আমি ক্ষণে সালাম জানিয়ে, ক্ষণে জোড়-হাতে নমস্কার করে (এটা ভারতীয়দের পেটেন্ট মাল—বিদেশী মাত্রই চেনে!), ক্ষণে ডান হাত বুকের বাঁ দিকের উপর রেখে ঝুঁকে ঝুঁকে ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, 'ট্যাক্সিতে যাবার মত

কড়ি আমার গ্যাঁটে নেই। আমি যাবো বাস্-এ।'

দুই রাব্বি যা বলেছিলেন—আহা কী সুন্দর অত্যুৎকৃষ্ট বিদগ্ধ নাগরিক আরবী ভাষাতে—তার তাৎপর্য 'কী উৎপাত, কী জ্বালাতন! উঠে পড়ো, উঠে পড়ো। আমরা কি কানা! দেখতে পাচ্ছি নে, তুমি ভিনদিশী? আমরা তো ট্যাক্সিটার সাকুল্যে পিছন দিকটা ভাড়া নিয়েছি। উঠে পড়ো উঠে পড়ো। কী মুশকিল! আচ্ছা বাপু, তুমি বাস্-এ যে ভাড়া দিতে সে-ই না হয় আমাদের দেবে।' এই বেলা বলে নি, পরে, বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও সেটা তাঁরা নেননি।)

কিন্তু ইয়া আল্লা, বসি কোথায়! গোটা তিনেক মোরগামুরগী ক্যাঁক মাক করছে, দু'তিন ঝুড়ি আলু-টমাটো-মটরশুঁটি-কপি, দু খালুই ডিম, আর কি কি ছিল খোদায় খবর।

রাব্বিরা বরাম্বর বলে যাচ্ছেন, 'হয়ে যাবে, হয়ে যাবে।'

এক রাব্বি কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন, 'মেয়ের শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছি। তাই এত সব।'

আমি চোখের তারা কপালে তুলে বললুম, 'বলেন কি মশাই! এই তিনটে আণ্ডা, গোটা কয়েক মুরগীতেই আপনাদের দেশের কন্যাপক্ষ খুশী হয়ে যায়! তাজ্জব! তাজ্জব!! আমাদের মোশয়, সিনাই পর্বত প্রমাণ মাল নিয়ে গেলেও হালাদের মুখে হাসি ফোটে না।'

আমার জেবে একটা হাতির দাঁতের ডিবাকার নস্যির কৌটো ছিল। নস্যা-ভাবে সেটাতে রাখতুম মিশরীয় সুগন্ধি। সেইটা তুলে ধরলুম তাদের সামনে।

দুই রাব্বি আমাকে জাবড়ে ধরে চুমো খেতে লাগলেন।

বিস্তর কথাবার্তা হল। নাবলুস, ন্যাজারিথ গল্পের তোড়ে পেরিয়ে গিয়ে তখন পেঁছে গিয়েছি গেলিলিয়ান লেক-এ।

দুই রাব্বি আমার মাথার উপর হাত রেখে বিস্তর মন্ত্র পড়ে গেলেন। তাঁদের আশীর্বাদের এক কণাও যদি সফল হয় তবে আমি ভারতবর্ষের রাজা হব।

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর

সুইটজারল্যান্ডের রামগাড়ল হ্যার পল্ডি নাকি একদা একটা দাঁড়কাক পুষেছিল।

বন্ধু শুধালে, এ কী ব্যাপার! কাক আবার কেউ পোষে নাকি? বৈজ্ঞানিক-সুলভ অর্ধমুদ্রিতনয়নে পল্ডি বললে, ঐ যে লোকে বলে দাঁড়কাক একশ' বছর বাঁচে, সেটা ঠিক কিনা আমি হাতে-নাতে নিজে দেখে নিতে চাই।

মুচকি হাসুন, আপত্তি নেই। কিন্তু আমি নিজেই পল্ডির মতই বটি।

চিন্তা করুন তো এই যে ইহুদি জাত—বিস্তর ঘোরাঘুরি করে, হাজার দুই

বছর ধরে এ-জাত, ও-জাত সে-জাতের কাছে মার খেয়ে খেয়ে গোলামী করে করে প্রথম আপন রাজ্য গড়ে তোলার সুযোগ পেল খৃষ্টজন্মের হাজারখানেক বছর পূর্বে, রাজা সুলেমানের আমলে। কিন্তু হায়, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সেই 'গ্লরি' খানখান হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু তিনি ইহুদিদের সদাপ্রভু য়াহ্‌ভের জন্য যে 'বিরাট' মন্দির গড়েছিলেন তার স্মৃতি ইহুদিরা আজও প্রতি শনির স্যাবাৎ পরবে স্মরণ করে।[১]

তারপর খেল মার ফের ঝাড়া একটি হাজার বছর ধরে। আর বাবিলনের রাজা তো একবার প্রায় গোটা গোষ্ঠীটাকে ধরে নিয়ে গোলাম বানিয়ে রেখে দিলেন আপন দেশে। দু' পুরুষ সেখানে কাটিয়ে কোনোগতিকে প্রাণ নিয়ে তারা ফিরলো ফের প্যালেস্টাইনে।

সুলেমানের হাজার বছর পর ফের তারা পেল আরেকটা চানস। প্রভু যীশুর জন্মের কয়েক বছর পূর্বে, রাজা হেরডের আমলে (এরই পুত্রের সামনে 'বিচারের' জন্য প্রভু যীশুকে পাঠানো হয়), আবার জেরুসলেম তথা ইহুদি জাতের মুখে হাসি ফুটলো। ধনদৌলত তো বাড়লোই, তদুপরি সুসভ্য বাবিলনে তারা যে-সব জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয় তারই কাঠামোতে ফেলে আপন প্রাচীন শাস্ত্রাদির নূতন নূতন টীকাটিপ্পনী রচনা করলে। হেরড আবার নূতন করে য়াহ্‌ভের মন্দির গড়লেন।

কিন্তু এবারে যে দুর্দৈব এল, তার সঙ্গে পূর্বেকার কোনো অভিজ্ঞতারই তুলনা হয় না।

খৃষ্টজন্মের ৭০ বৎসর পর রোমানরা জেরুসলেম আক্রমণ করে শহর এবং দুর্গ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে য়াহ্‌ভের মন্দির পুড়িয়ে ছাই করে দিল ; এক ইহুদি ঐতিহাসিকের ভাষায় "Amid circumstances of unparalelled horror, Jerusalem fell. The temple was burnt and the Jewish State was no more."

এই কি শেষ ? হ্যাঁ, কিন্তু ইহুদি রাষ্ট্র লোপ পাওয়া সত্ত্বেও ইহুদিরা জেরুসলেম নগরে বসবাস করতে লাগল। ওদিকে তাদের উপর রোম সম্রাটের কুশাসন ক্রমে ক্রমে এমনই বেড়ে যেতে লাগল যে শেষটায় ১৩২ খৃষ্টাব্দে তারা রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো—অবশ্য স্মরণ রাখা কর্তব্য, ইহুদিদের অনেকেই এ রকম বছরের পর বছর ধরে বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করতে মানা করেছিলেন। আমরা জানি স্বয়ং খৃষ্ট রোমানদের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা

---

১ তিন হাজার বছর ধরে ইহুদিরা এই মন্দিরের গুণকীর্তন করে করে তার পরিধি ও ঐশ্বর্য এমনই বাড়িয়েছে যে বাস্তবের সঙ্গে আজ আর তার কোনো মিলই নেই। বাইবেল অনুযায়ীই দেখা যাচ্ছে, মন্দিরটির দৈর্ঘ্য ২০০ ফুট, প্রস্থ ৭০-এর একটু বেশী (বাইবেল, কিংজ ১ ; ৬ অধ্যায়)! এ যেন সেই—'লোক মরে লক্ষ লক্ষ কাতারে কাতার! গুনিয়া দেখিনু শেষে আড়াই হাজার॥'

করার পক্ষপাতী ছিলেন না।

এবারে রোমানরা যা করল তার সঙ্গে ৭০ খৃষ্টাব্দের মন্দির পোড়ানোরও তুলনা হয় না। হাদ্‌রিয়ানের আদেশে সমস্ত শহর পুড়িয়ে খাক করে দিয়ে তার উপর হাল চালানো হল। খুব সম্ভব হাদ্‌রিয়ানের উদ্দেশ্য ছিল, রাজা দায়ুদের গোর, সুলেমানের মন্দির এমনই নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, যাতে করে পরবর্তী যুগে ইহুদিরা সেগুলো খুঁজে বের করে সমাধিসৌধ এবং নূতন মন্দির গড়ে তাদেরই চতুর্দিকে নবীন বিদ্রোহ, নবীন রাষ্ট্রের সূত্রপাত না করে।

এবং তার চেয়েও মারাত্মক হুকুম জারি হল ঃ ইহুদি মাত্রেরই হাদ্‌রিয়ান নির্মিত নবীন জেরুসলেমে প্রবেশ নিষেধ। অর্থাৎ রোমান, খৃষ্টান, আরব, গ্রীক ও অন্যান্য নানা সম্প্রদায় নানা শেমিতি তথা মিশরীয়রা সেখানে স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারবে কিন্তু য়াহ্‌ভের উপাসকরা সেখানে প্রবেশাধিকারও পাবে না।

এর পরই ইহুদিরা ব্যাপকভাবে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়লো।

আজ ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দ। জেরুসলেমের উপর হাদ্‌রিয়ান হাল চালান ১৩২ খৃষ্টাব্দে, হেরডের মন্দির ধ্বংস হয় ৭০ খৃষ্টাব্দে। অর্থাৎ আজ ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে বিজয়ী বীর রূপে যে ইহুদিরা জেরুসলেমে প্রবেশ করলো সেটা যথাক্রমে আঠারো বা উনিশশ' বছর পর। কিন্তু এই তৃতীয় পর্যায়ের কথা পরে হবে।

প্রথম পর্যায়ে রাজা সুলেমান যে ইহুদি-প্রাণাভিরাম মন্দির নির্মাণ করেছিলেন সেটা সম্ভব হয়েছিল প্রতিবেশী ফিনিশিয় রাজা টায়ার-(বর্তমান লেবানন অঞ্চল)-অধিপতি রাজা হিরমের সাহায্যে। বস্তুত রাজা সুলেমান স্বাধীন হলেও তাঁর চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী হিরমকে তিনি অনেক প্রকারে সেবা করে সে সাহায্য পান। এচ. জি. ওয়েলস তো তাঁর ইতিহাসে তাচ্ছিল্যভরে বলছেন, "There is much in all this (অর্থাৎ সুলেমানের সেবা) to remind the reader of the relations of some Central African chief to a European trading concern."

অর্থাৎ অর্ধ বর্বর নীগ্র চীফ যে রকম শক্তিশালী ইয়োরোপীয়কে কাঁচা মাল সস্তা লেবার যুগিয়ে সভ্য জগতের এটা সেটা পায়, সুলেমানের বেলাও তাই। এবং তার পরই বলছেন, "এবং বাইবেল পড়লেই দেখা যায়, সুলেমানের রাজ্য was a pawn between (হিরমের) Phoenicia and Egypt." এবং বাইবেলেই আছে সুলেমান তাঁর রাজ্যের উত্তরার্ধ হিরমকে দিয়ে দেন বা দিতে বাধ্য হন।[২]

---

২ বাইবেল, কিংজ ১।২১। উত্তর গ্যালিলির এই অঞ্চলেই ইজরায়েল সিরিয়ার হালে সংঘর্ষ হয়। অনুর্বর প্রস্তরময় এই ভূমি কিন্তু বড় ঐতিহাসিক মূল্য ধরে। গ্যালিলি হ্রদের এই উত্তর তীরে যীশু তাঁর প্রথম ও প্রধান প্রচারকার্য আরম্ভ করে টিলার উপরে বসে 'সারমন অব দ মাউনট' ('ধন্য যাহারা আত্মাতে দীন-হীন, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই') উপদেশ দেন। এখানেই তিনি সাত-

পূর্বেই বলেছি, এর হাজার বছর পর দ্বিতীয় চান্স্ পান রাজা 'হেরড দা গ্রেট'।

ইনি আবার সংস্কার করে গড়ে তুললেন নব জেরুসলেম। সুদৃঢ় নগর প্রাচীর, বিরাট রাজপ্রাসাদ, নানা অট্টালিকা—এবং সব চেয়ে বড় কথা—সুলেমানের মন্দির নব মহিমামণ্ডিত করে-গড়ে তুললেন। এ ছাড়া প্যালেস্টাইনের সর্বত্র প্রাচীন নগরী সংস্কার ও বহু নূতন নগর স্থাপনা করলেন। বস্তুত ইহুদিদের এ যুগকে দ্বিতীয় সত্যযুগ বলা যেতে পারে।

কিন্তু 'রাজা' হেরড ছিলেন সুলেমানের চেয়ে পরমুখাপেক্ষী। তিনি ছিলেন রোম সম্রাটের অধীনে পরাধীন রাজা। মিশর রাণী ক্লেওপাত্রা-বল্লভ-রোমশাসক অ্যানটনির কৃপায় তিনি 'রাজা' উপাধি পান ও তাঁকে রোম সাম্রাজ্যের 'ক্লাএন্ট প্রিন্স' হিসাবে প্যালেস্টাইন শাসন করতে হত। অ্যানটনির আত্মহত্যার পর তিনি পান রোম রাষ্ট্রপ্রধান (কার্যত সীজার) অক্টাভিয়ানের পৃষ্ঠপোষকতা।

অতএব দেখা যাচ্ছে, প্রথম দফায় সুলেমান তাঁর গ্লরি গড়লেন ফিনিশিয় রাজা হিরমের সহায়তায়; তার এক হাজার বছর পর দ্বিতীয় দফেতে 'রাজা' হেরড ইহুদিকুলের গৌরব বৈভব পূর্ণ করে তুললেন রোম শাসকের সাহায্যে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সেটাও বিনষ্ট হল ৭০ বছরের ভিতর ও তারপর কেটে গেল আরও দু হাজার বৎসর। এবারে তৃতীয় দফাতে, ১৯৬৭-এর জুন মাসে ইহুদি প্রবেশ করল বিজয়ী বীরের বেশে প্রাচীন জেরুসলেম নগরে। পুরোভাগে জঙ্গীলাট দায়ান। বিশ্ব ইহুদি উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি করে উঠলো, ইনিই "মাশীয়হ্।"—মিসায়া (Meesiah), খৃষ্টানের যীশু (খৃষ্ট শব্দের অর্থেও 'মিসায়া') মুসলমানের মসীহ =মাহ্দী, হিন্দুর কল্কি।

এবারে তৃতীয় দফাতে এ-'মাশীয়হ্' এ-কল্কির পিছনে কে?

আন্কল স্যাম—জনসন!

* * *

কিন্তু এবারেও যদি ইহুদিরা ফেল মারে তবে আগের এক হাজার, তারপর দু'হাজার সেই হিসেবে ফোর্থ চান্স পাবে চার হাজার বছর পরে।

লেখনারম্ভের পল্ডি হয়ত বা দেড়শ বছর পরমায়ু পেয়ে দাঁড়কাক একশ' বছর বাঁচে কিনা পরখ করে যেতে পারবে, কিন্তু 'ইওরস অবিডিয়ান্ট্লি' এ অধম তো চার হাজার বছর বাঁচবে না! আল্লাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমেন॥

খানি রুটি ও ছোট্ট কয়েকটি মাছ দিয়ে চার হাজার লোককে খাওয়ান। এরই কাছে মগদলা গ্রাম, যেখান থেকে নর্তকী, পরে তাপসী মেরি মগডলীন (অক্স্ফরডের মডলিন কলেজ। maudlin tears; কেম্ব্রিজের মডলিন বানানে পিছনে e অক্ষর আছে। যীশুর কাছে আসেন। পাঠক যদি অপরাধ না নেন তবে বলি, এখানেই আমি সর্বপ্রথম গ্যালিলি হ্রদের মাছ খাই। তার অপূর্ব স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে এ অঞ্চল সম্বন্ধে সবিস্তর লেখার বাসনা আছে।

রোদন-প্রাচীর—ক্লাগে-মাস্তার

প্রাচীরটা যে প্রাচীন সেটা দেখা মাত্রই বোঝা যায়। কত প্রাচীন, সেটা অবশ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ঐতিহাসিক গবেষণা না করে বলতে যাওয়াটা অবিবেচকের কর্ম হবে। তবে এ নগরে যারা বাস করে তারা ছেলেবেলা থেকেই চতুর্দিকের এত সব প্রাচীন দিনের ভগ্নাবশেষ দেখে আসছে যে তাদের চোখ যেন বসে গেছে; আপন অজানতেই অবচেতন মন জরাজীর্ণ পাষাণ-স্তূপের একটার সঙ্গে আরেকটা তুলনা করে করে যেন প্রাচীনত্ব নির্ণয়ের কতগুলো সাদামাটা কাঁচা-পাকা সূত্র নির্ণয় করে ফেলে। এমন কি যে বিদেশী প্রাচীন ভগ্নস্তূপ অতি অল্পই দেখেছে—যেমন ধরুন মামুলী মারকিন—সে পর্যন্ত এখানে কিছু-দিন থাকার পর এটা-ওটার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বেশ কিছুটা ওয়াকিফহাল হয়ে যায়—অবশ্য যদি 'গাঁইয়া' মারকিনের মত চোখে ফেটা কানে তুলো মেরে 'টুরিজম' কর্ম না করে।

মোটা, দড়, ভারিক্কি প্রাচীর। প্রায় বিশ গজ উঁচু, অন্তত পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন গজ লম্বা। রোদে জলে পাথরের চাঁই তার মসৃণতা হারিয়ে খোওয়া-খাওয়া হয়ে গিয়েছে কিন্তু পাথরে পাথরে যে জোড়া লাগানো আছে সেটা আজো যেন প্রথম দিনের মত মোক্ষম। রঙ প্রায় কালো।

কিন্তু আশ্চর্য, এ প্রাচীর যে এখানে কি করতে আছে সেটা কিছুতেই অনুমান করতে পারলুম না। অন্য প্রাচীরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সে কোনো চত্বর বা বাড়ির বেষ্টনী নির্মাণ করেনি। শহরের মাঝখানে না হয়ে যদি ফাঁকা মাঠে এটা দেখতুম তবে হয়তো বলতুম, এটা চাঁদমারির (টারগেট শ্যুটিঙের) দেয়াল। এখানে এটার—স্থাপত্যে যাকে বলে আরকিটেকচরল ফংশন কি?

একটি প্রৌঢ়া মহিলা—সর্বাঙ্গ লম্বা ভারী কালো জোব্বায় ঢাকা, মাথায় কপাল পর্যন্ত অবগুণ্ঠন, শুধু মুখের লালচে হলুদ রঙের আভা দূর থেকে দেখা যাচ্ছে—এক হাত উপরে তুলে দেয়ালে রেখেছেন, দেয়ালে হেলান দিয়ে, মাথাটিও দেয়ালের উপর কাত করে রেখে যেন কোনো গতিকে দাঁড়িয়ে আছেন। খানিকটে এগিয়ে যেতে দেখি, তাঁর দু' চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে, আর ঠোঁট দুটি অল্প-অল্প কাঁপছে যেন, কেমন মনে হল, মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। কোনো প্রিয়জনের স্মরণে? কিন্তু কই, কাছে-পিঠে কোথাও তো কোনো গোরস্তান নেই। আমি আর এগোলুম না। রোদ চড়তে আরম্ভ করেছে। বাঁদিকে মোড় নিয়ে হেরড গেটের কাছে ভারতীয় ধর্মশালার দিকে রওয়ানা হলুম।

একটা ছোট বাজারের ভিতর দিয়ে যেতে হয়।

প্রায়ান্ধকার রাস্তা—হাত ছয় চওড়া। দুদিকে দোকানের সারি—আর রাস্তার উপরটাও ঢাকা বলে মনে হয় গোধূলির অন্ধকার যেন নেমে আসছে। তবু ফলের দোকানে কী রঙের বাহার! সব চেয়ে চোখে পড়ে আমাদের

কমলানেবুর তিনগুণ সাইজের জাফা অরেনজ্। মধুর মত মিষ্টি রসে টইটম্বুর। দুপুরে একটা খেলে সে-বেলা আর যেন অন্নে রুচি হয় না। দুটো খেলে গা বিড়োয়।

একটা কিউরিওর দোকান। টুকিটাকি অলঙ্কার, তাবিজ, তসবী, রেকাবি, গেলাস, তীর, ধনু, আরো কত কি! কোনোটা নাকি পাঁচশ, কোনোটা নাকি পাঁচ হাজার বছরের পুরনো! আমি অবশ্য জানতুম, এগুলোর ৯৯%কাইরোর কারখানায় তৈরি হয়। কোনো-কোনোটাতে এস্তেক সরকারী ক্ষুদে শীলমারা আছে: সরকারী মিউজিয়াম গ্যারান্টি দিচ্ছেন, এটা প্রাচীন দিনের কোনো পিরামিডে বা গোর খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে। বলে আর কি হবে, মাল যেমন জাল, শীলও তেমনি।

সামনে দাঁড়িয়ে সেই জরমন টুরিস্ট্ ছোকরা। পরশুদিন আমি এদেশে এসেছি—ছোকরা বেশ কয়েক সপ্তাহ হল। আলাপ হয়েছে কাল সকালে, খৃষ্টের সমাধিসৌধে অর্থাৎ হোলি সেপাল্কর-এ। অবাক হয়ে বললুম, 'এ কি ভায়া, এসব যে বিলকুল ডাড্—জাল মাল।'

একগাল হেসে বললে, 'আমার নোটও জাল।'

একসঙ্গে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলুম।

খানিকক্ষণ পরে আমি সেই দেয়ালের ধারের মহিলাটির কথা পাড়লুম।

বললে, 'সে তো ক্লাগে-মাত্তার।'

জর্মন ভাষায় 'ক্লাগে' অর্থ 'লেমেনটেশন' অর্থাৎ 'বিলাপ': 'মাত্তার' অর্থ 'প্রাচীর'। বিলাপ করার প্রাচীর। আমি বললুম, খুলে বলো।

পরম তাচ্ছিল্যভরে ঘেঁৎ করে উঠলো, ইহুদিদের কি যেন একটা কী, আমার ও নিয়ে কোনো শিরঃপীড়া নেই। ঐ যে, কে এক হিটলার, সে শিখেছে ইহুদিদের কাছ থেকে একটা মারাত্মক তত্ত্ব—ইহুদিরাই এ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম বলে তারা বিশ্বেশ্বর য়াহ্ভের "নির্বাচিত সর্বোৎকৃষ্ট জাতি"—অন্যেরা বলতো, অমর ঈশ্বরের নির্বাচিত প্রিয় জাতি আমরা। ওনরা বিশ্বেশ্বরের। হিটলার ওদেরই কাছ থেকে এই অদ্ভুত, প্রলয়ংকরী, জাতে জাতে রক্তাক্ত সংগ্রামসৃষ্টিকারী বীজমন্ত্র শিখে নিয়ে বললে, "বটে! এত বড় মিথ্যে কথা! সার সত্য কিন্তু, হে বিশ্বজন, জেনে নাও:—আমরা, আর্যরা, এবং তাদের ভিতরও নীল চোখ, সোনালী চুলওলা নরডিকরা ত্রিলোকের সর্বোৎকৃষ্ট জাত।" এবং এইখানেই হিটলার থামলো না; বললো, "এবং ইহুদিরা এ জগতে কাফরী নীগ্রোর মত উন্টর মেন্শ (মানব পর্যায়ের নিম্নস্তরের সৃষ্টি)ও নয়। তারা ভার্মিন, নরকের কীট! যথেষ্ট হয়েছে; আমি ওসব কেঁদলে নেই।'

* * *

নিরপেক্ষ ইতিহাস বলেন, হেরড দ গ্রেট খৃষ্টজন্মের মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে জেরুসলেমে যে বিরাট বিচিত্র য়াহ্ভের মন্দির নির্মাণ আরম্ভ করেন সেটা আকারে-প্রকারে সর্বভাবে হাজার বছর পূর্বেকার সুলেমানের টেম্পলের

চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিল।[১] রোমানরা এ মন্দির ৭০ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে।

'পরিপূর্ণ সম্পূর্ণ বিনষ্ট' করেনি। বিরাট মন্দির-চত্বরের চতুর্দিকে যে প্রাচীর একে পরিবেষ্টন করে ছিল তার একটি ক্ষুদ্র অংশ, কি কারণে জানি না, আজ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে—এরই বর্ণনা দিয়ে এ-লেখা আরম্ভ করেছি।

কবে এ প্রথা, অনুষ্ঠান বা আচারটা আরম্ভ হয় সেটা বলা কঠিন। অন্তত ষোলশ' বছর তো হবে।

প্রতি শুক্রবারের বিকালে দেড়/দুই হাজার বছর ধরে ইহুদিরা এই দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে বিলাপ রোদন করছেন। অনেকক্ষণ ধরে যে দীর্ঘ মন্ত্রোচ্চারণ করেন সেটিতে বার বার যে ধুয়া আসে (আমার যত দূর স্মরণে আসছে তারই উপর নির্ভর করে বলছি, কারণ বহু চেষ্টা করেও এই সুন্দর 'কিনোৎ'—ইংরিজি 'এলিজি' মন্ত্রটি যোগাড় করতে পারিনি) তার নির্যাস 'আমাদের সর্বগৌরব-মহিমার যে মন্দির ধ্বংস হয়েছে আমরা তারই স্মরণে এই বিজনে রোদন করি'।

যত দূর মনে পড়ছে রাব্বি—পুরোহিত সে 'গৌরব-মহিমার' কিছুটা বর্ণনা দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আর সবাই উপরের ধুয়াটি বলে। ফের রাব্বি আরো খানিকটা বর্ণনা দেন, ফের উপাসক-মণ্ডলী ঐ ধুয়ার পুনরাবৃত্তি করে। বিলাপের সঙ্গে সঙ্গে সকলের চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রুধারা বয়।

প্রতি শুক্রবারের বিকালে ইহুদিরা এই প্রাচীরের দিকে মুখ করে এই 'কিনোৎ' বিলাপ করেন। অন্যান্য দিনও যে কোনো সময় দু'একজনকে কাঁদতে দেখা যায়। আমি যে মহিলাটিকে দেখেছিলুম ইনি তাঁদেরই একজন। আর ইহুদি পঞ্জিকা অনুসারে তাঁদের 'আব্' মাসের ৯ তারিখ মন্দির ধ্বংসের সাম্বাৎসরিক কিনোৎ।

প্রাচীন জেরুসলেমের যে অংশে এই প্রাচীরটি পড়েছে সেটি মন্দির ধ্বংসের বহু পূর্ব থেকে গত জুন মাস পর্যন্ত ছিল হয় রোমান না হয় খৃষ্টান নয় আরবদের অধীনে। গত জুন মাসে আরব-ইজরাএল যুদ্ধের সময় আরব শাসনকর্তা ও প্রজাকুল নগর ত্যাগ করে জরডন নদীর পূর্ব পারে চলে যায়।

বিজয়ী ইহুদি প্রধান সেনাপতি দায়ান ও পুরোহিত বংশজাত (লেভি) প্রধানমন্ত্রী এশকল্ দুই/আড়াই হাজার বছরের পরাধীনতার পর 'বিলাপ প্রাচীর'-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে হাজার হাজার ইহুদি। অতিশয় পরিতাপের বিষয়, যে মহোৎসব সমাধিত হল তার খবর এসেছে মাত্র কয়েক ছত্রে।

আমার মনে প্রশ্ন জাগেঃ এশকল্-দায়ান্ এরা কি সেই প্রাচীন দিনের

---

১ নির্মাণ আরম্ভ খৃঃ পূঃ ২০; নির্মাণ শেষ খৃষ্টাব্দ (খৃষ্টের পর) ৬২। কী ট্রাজেডি! যে মন্দির গড়তে লাগলো প্রায় ৮২ বৎসর, সেটা ভাঙতে (প্রধানত লুট করতে—কারণ ইহুদি মন্দিরে তাদের 'কোষাকুষি' হয় বিরাট আকারের ও নিরেট সোনায় তৈরি) ৮২ ঘণ্টাও লাগেনি! প্রফেট নোআ র (আরবী বাঙলায় নূহ) আরক্ বা নৌকা তুলনীয়।

কিনোৎ-বিলাপ করেছিলেন? করার কি প্রয়োজন? সুলেমান হেরডের মন্দির যেখানে ছিল সেখানে নূতন মন্দির গড়ে তুলে সর্ব গৌরব-মহিমা ফিরিয়ে আনলেই হয়—তাহলে অবশ্য শত শত শতাব্দীর প্রাচীন 'কিনোৎ' পরবটি মারা যায়। আজ যদি ভারতে সর্পকুল লোপ পায় তবে কি মনসা পূজা বন্ধ হয়ে যাবে?

কিন্তু যে জায়গায় প্রাচীন মন্দির ছিল সেখানে তেরশ' বছর ধরে যে মসজিদ!

হজরৎ মুহম্মদের পরলোকগমনের পর আরবদের দ্বিতীয় খলীফা হজরৎ ওমরের সময় ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে বাইজেনটাইন খৃষ্টানদের হারিয়ে স্বয়ং ওমর জেরুসলেমে প্রবেশ করেই প্রশ্ন করলেন, নবী সুলেমানের মন্দির ছিল কোথায়? সেখানে তখন শহরের তাবৎ ময়লা-আবর্জনা ভর্তি ভগ্নস্তূপ। খলিফা স্বয়ং স্বহস্তে ময়লা আর পাথর সাফ করতে লাগলেন। দেখাদেখি তাঁর সেনাপতিরা ও সৈন্যদল সে কাজে যোগ দিল। অত্যল্প সময়েই কর্ম সমাধান হলে পর ওমর সেখানে একটি মসজিদ গড়ার হুকুম দিলেন। কারণ মুসলমান শাস্ত্রানুযায়ী মক্কার কাবার পরই এ স্থানটি দ্বিতীয় পুণ্যভূমি। এরই নাম হরমশরীফ এবং এরই কাছে যেখানে মসজিদ উল্-আকসা[২] সেটিও অতিশয় পুণ্যভূমি কারণ হজরৎ মুহম্মদকে তাঁর জীবিতাবস্থায় বেহেশতে আল্লার কাছে যখন নিশাভাগে নিয়ে যাওয়া হয় (সশরীর না শুধু আত্মা এ নিয়ে মতভেদ আছে) তখন তাঁকে আরবদেশ থেকে প্রথম এই মসজিদ উল্-আকসা ভূমিতে নিয়ে আসা হয়েছিল।

৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ওমর যে সাদামাটা মসজিদ নির্মাণ করেন তার পরিবর্তে খলীফা আব্দুল মালিক আনুমানিক ৭০০ খৃষ্টাব্দে যে মসজিদ সেখানে নির্মাণ করলেন সেটি সত্যই অতুলনীয়। বিশ্ববিখ্যাত স্থপতিদের মতে পৃথিবীর আটটি স্থাপত্যকলার নিদর্শন উল্লেখ করতে হলে এটিকে বাদ দেওয়া যায় না। তবে এটি ঠিক মসজিদ নয়, এটাকে 'পুণ্যসৌধ' বলা চলে—আরবীতে এর নাম কুব্বৎ উস্-সখ্রা (ডোম্ অব্ দ্ রক্)।

এ দুটি না ভেঙে তো সুলেমানের টেম্পল্ গড়া যায় না।

ইতিমধ্যে খবর এসেছে ইহুদিরা জেরুসলেমে প্রবেশ করেই মসজিদ উল্-আকসার উপর ইহুদি পতাকা তুলে পূর্ণ এক দিবস সেটা সেখানে রাখে। অনেকেই এই ঝাণ্ডা ওড়ানোটাকে ইহুদির আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন স্বত্বাধিকার দাবী করার পূর্বাভাস মনে করে শঙ্কিত হয়েছেন। খৃষ্টান উইলসন শঙ্কিত হননি, এবং খৃষ্টান জনসন তো ইহুদির পিছনে রয়েছেনই। যা শত্রু পরে পরে। লেড়েতে শাইলকে লড়াই।

কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে ইহুদিরা চালে করলে একটা ভুল। দায়ান এশকল্

---

২ বছর চল্লিশেক পূর্বে হায়দরাবাদের নিজাম প্রায় পাঁচ লক্ষ (পাকা অংকটি কেউ আমাকে বলতে পারেনি) মুদ্রা ব্যয় করে মসজিদটির আমূল সংস্কার করেন।

সম্প্রদায়ের জাতবৈরী আরেক ইহুদি সম্প্রদায়ের নাম স্যামারিটান। তাদেরও আড়াই হাজার বছরের পুরনো একটা ভাঙা মন্দির পড়ে আছে একটা টিলার উপর। ১৯৪৮ সালে প্যালেসটাইন বিভাগের সময় স্যামারিটানরা কিছুতেই দায়ান হিস্যায় পড়তে চায়নি। তারা জরডনের আরব হিস্যাতে যেতে চেয়েছিল এবং যায়। জুন মাসে আরব সেখান থেকে পালালে পর এ মন্দিরেও দায়ানরা 'দাবি'র ঝাণ্ডা ওড়াতে গেলে হাতাহাতির উপক্রম হয়—যদ্যপি সেস্থলে মাত্র তিন-চারশ' স্যামারিটান বাস করে (তাবত দুনিয়ায় এ সম্প্রদায়ের সাকুল্য সংখ্যাই মাত্র তিন থেকে পাঁচশ') তবু তারা সাহস করে এ 'গুণ্ডামি' রোকতে যায়।

তখন খৃষ্টজগৎ—মাইনাস জনসন—শঙ্কিত হল।

জেরুসলেমে যে রয়েছে প্রভু যীশুর সমাধি মন্দির—এবং গণ্ডায় গণ্ডায় গির্জে। ক্যাথলিক, গ্রীক অরথডকস্, আরমেনিয়ান, কপ্‌ট, হাবশী, সীরিয়ান, লুথেরিয়ান আরো কত জাত-বেজাতের (মুসলমানদের তো মাত্র দুটো—হরম শরীফ আর আকসা)। আজ ঝাণ্ডা ওড়ায়নি বটে কিন্তু মুসলমানের দুটো দখল করার পর ইহুদির হিম্মত বেড়ে যাওয়াতে যদি সে খৃষ্টানগুলোও—?

পোপ শঙ্কিত হন সর্বপ্রথম। তারপর উইলসেন। তিনি হুঙ্কারিলেন, 'বেরিয়ে যাও, প্রাচীন জেরুসলেম থেকে।' দায়ান উত্তরিলেন, 'ইয়ারকি পায়া হৈ? যাব না।'

স্নাব্‌ড্ উইলসন চুপ-ed !!

অল্পে তুষ্ট

॥ ১ ॥

আমার পরিচিত জনৈক সমাজসেবী ভদ্রসন্তান রাত করে বাড়ি ফিরছিলেন। শরট্‌ কট্‌ করার জন্য যে গলি ধরেছিলেন সেটা প্রায় বস্তি অঞ্চলের মাঝখান দিয়ে এসেছে। হঠাৎ শুনতে পেলেন, পরিত্রাহি চিৎকার—যা এ অঞ্চলে রাত-বিরেতে আকছারই শোনা যায়। সমাজসেবীটি একটু কান পাততেই বুঝতে পারলেন, যুগ যুগ ধরে সমাজ স্বামীকুলকে যে হক্ক দিয়েছে এস্থলে সে-কুলেরই জনৈক বস্তি-সন্তান সেটি তার স্ত্রীর উপর কিঞ্চিৎ পশুবল সহ প্রয়োগ করছে। এস্থলে সুবুদ্ধিমান মাত্রই তিলার্ধ কাল নষ্ট করে না, কিন্তু আমাদের সমাজ-সেবীটি এ-কালের যারা 'সেবার' নামে মস্তানী করে তাদের দলে পড়েন না। দরমার ঝাঁপ ধাক্কা মেরে খুলে হুঙ্কার ছাড়লেন, 'ব্যস, থামো। এসব কী বেলেল্লাপনা হচ্ছে!' আমাদের পাব্‌লিক স্পিরিটেড ইয়ংম্যানটি নাটকের এর পরের দৃশ্যে অবশ্যই আশা করেছিলেন সেই অবলা মুক্তি পেয়ে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে অঝোরে কৃতজ্ঞতাশ্রু ঝরাবে, এবং তিনিও তাঁর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অদৃশ্য বাতাসের একাংশ অবহেলে দ্বিখণ্ডিত করে, 'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ'

(ইংরিজিতে যাকে বলে 'নটেটোলনটেটোল') বলতে বলতে আত্মপ্রসাদাৎ ডগমগ হয়ে বাড়ি ফিরবেন। ও হরি। কোথায় কি? স্বামী-স্ত্রী দুজনাই প্রথমটায় একটুখানি থতমতিয়ে তারপর বিপুল বিক্রমে হামলা করলে তাঁর দিকে। তিনি প্রায় পালাবার পথ পান না। ইতিমধ্যে বস্তির আরো দু-পাঁচজন জড়ো হয়ে গিয়েছে। সমাজসেবী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন ওদেরও দরদ যুযুধান দম্পতির প্রতি।

এটা কিছু একটা উটকো ফ্যাচাং নয়। পরবর্তী যুগে আমি দেশবিদেশে—এস্তেক অতিশিক্ষিত মধ্য ও পশ্চিম ইয়োরোপেও এহেন কীর্তন একাধিকবার শুনেছি। দুজনার কাজিয়া মেটাতে গিয়েছ কি মরেছ। দুজনা একজোট হয়ে তোমাকে মারবে পাইকিরি কিল।

এ তো গেল সাদামাটা পশুবল প্রয়োগের বর্বরতা ঠেকাবার প্রচেষ্টা। কিন্তু যে স্থলে দুই পক্ষই সাতিশয় শিক্ষিত—বলতে কি, যেন দেশমাতৃকার উচ্চতম অনবদ্য শিক্ষিত সন্তান—এবং যা হচ্ছে সেটি মার্জিততম বাকযুদ্ধ, সেস্থলেও আপনি যদি ফৈসালা করে দিতে চান তবে ফল একই। উভয়পক্ষ একে অন্যের প্রতি নিক্ষিপ্ত আপন আপন বাক্যবাণ তন্মুহূর্তেই সংবরণ করে আপনাকে করে তুলবেন এজমালি চাঁদমারির টারগেট।

এ তো হল সে-দুর্দৈবের কীর্তন যে-স্থলে আপনার নিজস্ব—আপন বিশ্বাস অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তৃতীয় মত আপনি পোষণ করেন না; আপনি সেফ্ উভয়পক্ষের যুক্তিতর্ক সুবিবেচনাসহ প্রণিধান করে সুলে-সুপারিশসহ একটা মধ্যপন্থা বাতলাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যেস্থলে আপনি তৃতীয় মত পোষণ করেন সেখানে—ঈশ্বর রক্ষতু!—আপনার অকালমৃত্যু অনিবার্য।

ভূমিকাটি আমার অনিচ্ছায় দীর্ঘ হয়ে গেল, কিন্তু প্রয়োজনাতীত বৃহল্লাঙুল নয়। কারণ ভবিষ্যতেও বহু-বহুবার বহু বাদানুবাদের সম্মুখে আমাকে ঠিক এইভাবেই সরকারী প্রাণ (আজকালের ফ্যামিলি প্ল্যানিঙের জমানায় ওটা আর পৈতৃক নয়, এ জন্মের পরও দুগ্ধাভাবে, অন্নাভাবে ওটা সরকারের হাতেই সমর্পিত) হাতে নিয়ে এগোতে হবে।

* * *

একদল গুণীজ্ঞানী বলছেন প্রত্যেক—আমি প্রত্যেক শব্দটির উপর বিশেষ জোর দিতে চাই—অধমের যা কিছু বক্তব্য সে ঐ প্রত্যেক (বা তাবৎ, কুল্লে) শব্দটি নিয়ে—ছাত্রটিকে শিখতে হবে নিদেন দুটি ভাষা। কেউ কেউ বলেন, সে শিখবে (ক) আপন মাতৃভাষা ও ইংরিজি, কেউ কেউ বলেন (খ) মাতৃভাষা এবং হিন্দী। এঁরা ইহলোকের তাবল্লোককে দোভাষী বানাতে চান একেবারে শব্দার্থে নয় (ইহ সংসারে কটা লোকের মাত্র একবারের তরেও প্রফেশনাল দোভাষীর প্রয়োজন হয়?), ভাবার্থে। তফাত এঁদের মধ্যে এইটুকু: একদল মাতৃভাষা ও তদুপরি ইংরিজি শেখাতে চান, অন্য দল ইংরিজির বদলে হিন্দী। (আর যাঁদের মাতৃভাষাই হিন্দী তাঁদের কি হবে? সেটা এখনো স্থির হয়নি। তাঁরাই স্থির করবেন। অবশ্যই। কই সে মরদ যার মাতৃভাষা হিন্দী নয় এবং

তৎসত্ত্বেও সে হিন্দীভাষীদের সামনে কোনো 'বাৎ প্রস্তাবও' করবে? হায়, আপসোস! কেন হিন্দীভাষী হয়ে জন্মালুম না?)

এ তো গেল দোভাষীর দল।

অন্য দল ত্রিভাষী। এঁরা বলেন, অত ঝগড়া ফ্যাসাদের কী প্রয়োজন? বিদ্যার্থী তিনটে ভাষাই শিখবে। (গ) মাতৃভাষা, হিন্দী এবং ইংরিজি অর্থাৎ মাতৃভাষা শিখতেই হবে, তারপর কেউ বলছেন সেকেন্ড ল্যানগুইজ হবে হিন্দী, কেউ বলছেন, না, ইংরিজী, আর এই ত্রিভাষীর দল মাতৃভাষা তো খাবেনই, তদুপরি ডুডুও খাবেন টামাকও খাবেন।

এই দোভাষী ও ত্রিভাষীতেই ঝগড়া।

এ ছাড়া আরো বহুবিধ আছেন। যেমন কেউ কেউ বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি, বৈদগ্ধ্য সভ্যতার প্রধান ভাণ্ডার সংস্কৃতে। সেই সংস্কৃতই যদি বিদ্যার্থী না শিখল তবে সে নিজেকে ভারতীয় বলে কোন্ মুখে? যে বেদ উপনিষদ ষড়দর্শন নিয়ে আমরা নিজে গর্ব অনুভব করি, বিশ্বজনের সামনে তুলে ধরি, সে-সবই তো সংস্কৃতে। এবং এই সংস্কৃতই একমাত্র বিদগ্ধ ভাষা যে-ভাষা একদা আসমুদ্রহিমাচল আর্য-অনার্য সকলকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে রেখেছিল। আজ যদি আমরা সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় আমাদের কারিকুলামে সংস্কৃতকে স্থান না দি এবং ফলে তার মৃত্যু ঘটে তবে ঐতিহ্যবিহীন হটেন্‌টটে ও ভারতীয়তে একদিন আর কোনো পার্থক্য থাকবে না। যুক্তিগুলো যে খুবই সত্য এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ সম্প্রদায় রণাঙ্গন থেকে ক্রমেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। সংগ্রামে পরাজিত হওয়ার ফলে নয়। কারণ এঁদের বিরুদ্ধে কেউই সংগ্রাম ঘোষণা করে না—দেশের কর্তাব্যক্তিরা এঁদের সেফ্ অবহেলা করে, just by ignoring এদের hors de combat, রণাঙ্গন থেকে অপসারিত করেন। কারণ সংস্কৃত বাবদে এইসব কর্তাব্যক্তিদের বৃহত্তমাংশ ১০০% ignoramus। ...এরই পিঠ পিঠ মুসলমানরা বলেন, তাজমহল। কোনো মারকিন টুরিস্ট যখন তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে কোনো ভারতীয় হিন্দুকে ঐ ইমারতের প্রশংসা করে অভিনন্দন জানায় তখন সে তো মুখ বাঁকিয়ে বলে না, 'না মশাই এটা আমার দেশের মাটিতে আছে বটে কিন্তু আমার ঐতিহ্যগত সম্পদের অংশ নয়, এটা মোচলমানদের—ইউ আর বারকিং আপ দি রঙ্ ট্রী!'), মোগল চিত্রকলা, খেয়াল, ঠুংরি, ফারসীতে লিখিত ভূরি ভূরি ইতিহাসাদি অমূল্য গ্রন্থরাজি ভারতীয় সংস্কৃতির অংশবিশেষ—এদের সম্যক চর্চার জন্য ফারসী শেখানো উচিত, এবং ধর্মচর্চার জন্য যে আরবী ভাষা শিক্ষা ভিন্ন নান্য পন্থা বিদ্যতে সে তো স্বতঃসিদ্ধ। সংস্কৃতওলাদের মত এঁরাও বারোয়ারিতে কল্কে পান না—উপরে উল্লিখিত একই কারণে।...এর পরে আছেন জৈন ধর্মাবলম্বী। এঁদের ধর্মগ্রন্থ অর্ধমাগধীতে। পার্সীদের ধর্মগ্রন্থ প্রধানত আবেস্তার প্রাচীন পারসীকে। এদেশে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর সংখ্যা নগণ্য কিন্তু তাঁদের শাস্ত্রীয় ভাষা পালিকে নিরঙ্কুশ উপেক্ষা করলে আমরা 'বৃহত্তর ভারতে'

মুখ দেখাতে পারবো না। আমার এ নগণ্য জীবনে যে দুটি বিদেশীর সঙ্গে আমি একই ডরমিটরিতে কিছুকাল বাস করি তাঁদের উভয়ই ছিলেন সিংহলের বৌদ্ধ শ্রমণ। শ্রমণ ধর্মপাল ও শরণাঙ্কর: এদেশে এসেছিলেন পালি ও সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্য। এ ছাড়া শ্যামের রাজগুরুও বার্ধক্যে এদেশে এসেছিলেন তথাগতের আপন দেশে নির্বাণ লাভার্থে। হিন্দুর বার্ধক্যে বারাণসীর ন্যায়।...এবং আছেন খৃষ্টসম্প্রদায়, যদ্যপি বাইবেলের আদিমাংশ (পূর্ব মীমাংসা?) হীবরুতে ও নবীনাংশ (উত্তর মীমাংসা?) গ্রীকে, তথাপি খৃষ্টানদের সর্বজনমান্য বাইবেলের অনুবাদ 'ভুলগাতে' লাতিন ভাষায়। লাতিন ভিন্ন খৃষ্ট পাদরির শিক্ষাদীক্ষা অসম্পূর্ণ।

হালফিল বিজ্ঞানের জয়জয়কার! এ 'বিদ্যা' ষোল আনা রপ্ত করতে হলে নাকি জরমন ভাষা অবর্জনীয়।

অতি অবশ্য এখানে একটি কথা বলে রাখা উচিত। নিতান্ত কট্টর ভিন্ন কোনো মহামহোপাধ্যায়ই বিধান দেন না যে সর্ববিদ্যার্থীকে ঘাড়ে ধরে সংস্কৃত শেখাতে হবে, কট্টর ভিন্ন কোনো মোল্লা তাবল্লোকের কল্লা ধরে বিসমিল্লা শেখাতে চায় না। প্রাগুক্ত দোভাষী এবং ত্রিভাষীরা কিন্তু যেসব ভাষা শেখাতে চান, সেগুলো ঘাড়ে ধরে শেখাতে চান। অতএব এই ভাষার রেস্-এ সংস্কৃত ফারসী পালিওয়ালাদের উপস্থিত also ran বলে খারিজ করে দেওয়া যেতে পারে। আমি শুধু নির্ঘণ্ট নিরঙ্কুশ করার জন্য এদের উল্লেখ করলুম।

* * *

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত ত্রিগুণা সেন আসলে বৈজ্ঞানিক বটেন, কিন্তু হিউম্যানিটিজেও তাঁর আবাল্য অনুরাগ। তদুপরি তাঁর কমনসেন্স আছে। অতএব তিনি সার্থকনামা ত্রিগুণধারী (সেন-এর বহুবচন সেন্স বা sense)।

দোভাষী ত্রিভাষীদের সামনে আরেকটি জীবনমরণ সমস্যা: বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম কি হবে? ইংরিজী, হিন্দী, আঞ্চলিক ভাষা—তিনটেরই সমর্থক আছেন।

এই সুবাদে আঞ্চলিক ভাষার সমর্থন করতে গিয়ে শ্রীসেন বলেন (হুবহু বাক্যগুলো আমার মনে নেই বলে শ্রীসেন তথা পাঠকের প্রতি যদি অবিচার করে ফেলি তবে কোনো সজ্জন যেন আমার মেরামতী করে দেন), পৃথিবীর কোন্ সভ্য স্বাধীন দেশে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়? শিক্ষামন্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে আমাদের নিবেদন:—

একশ' বছরও হয়নি কবি হেম বাঁড়ুয্যে লিখেছিলেন—

"চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান।"

সেই জাপানেও কি কখনো জাপানী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়েছে? বস্তুত পাঠক প্রত্যয় যাবেন না, মাত্র কিছুদিন হল ক্যান্সার রোগের এক স্পেশ্যালিস্ট্ আমাকে বলেন, ঐ রোগের গবেষণা জাপানে যা হয়েছে সেটা না জেনে সে সম্বন্ধে আপটুডেট হওয়া যায় না। এবং

ওর সব কিছুই হয় জাপানী ভাষাতে।···কিন্তু অত দূরে যাবার কি প্রয়োজন? আফগানিস্তানের জনসংখ্যা কত? দেশটা কি খুবই মডার্ন? না তো। আমি যখন সে-দেশে পেঁছিই (১৯২৭) তখন সেখানে সবে প্রথম কলেজের প্রথম বর্ষ আরম্ভ হব-হব করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অরুণোদয় হতে ঢের ঢের দেরি। অথচ পরের বছর যখন ঐ ফার্স্ট ইয়ার চালু হল তখন তার মাধ্যম হল ফারসী। কিন্তু বৃথা বাক্যব্যয়। পাঠক একটু অনুসন্ধান করলেই জানতে পারবেন ক্ষুদ্র ফিন্‌ল্যাণ্ডই বলুন আর বলিভিয়াই বলুন, শিক্ষার বাহন সর্বত্রই মাতৃভাষা।

* * *

এইবারে আমরা পেঁছিলুম রণাঙ্গনের কেন্দ্রভূমিতে।

এই যারা দোভাষী ত্রিভাষী—হয় ইংরেজী নয় হিন্দী কিংবা উভয়ই নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করছেন তাঁদের শুধোই—শিক্ষামন্ত্রীর মন্ত্র এবং যন্ত্রের সঙ্গে টায় টায় গলা মিলিয়ে 'পৃথিবীর কোন্ সভ্য স্বাধীন দেশের ক'জন উচ্চ-শিক্ষিত লোক মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য একটি ভাষা—উত্তমরূপে না হোক মধ্যম বা অধম রূপেই—জানে?'

আমি জনপদবাসী বা নগরের অর্ধশিক্ষিতদের কথা তুলছিনে। যারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গিয়ে রীতিমত বি-এ পাস করেছে, তাদেরই ক'জন মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য আরেকটি ভাষা পড়তে পারে, শুনলে বুঝতে পারে লিখতে পারে এবং মোটা-মুটি সাদামাটা কথাবার্তা বলতে পারে? বলা বাহুল্য, যারা কোনো বিদেশে বেশ কিছুকাল কাটিয়েছে তাদের কথা হচ্ছে না। সেস্থলে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত লোকও বিদেশী ভাষা অনেকখানি রপ্ত করে ফেলে আপন আপন মেধা অনুযায়ী।

এ-দেশের কথাও হচ্ছে না। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি মাত্র সেদিন (যদ্যপি এই কুড়ি বৎসরেই আমরা কী তীব্র গতিতেই না ইংরিজির খোলস বর্জন করছি—এ বর্জনের জন্য কোনো মেহনৎ-কেরামতি করতে হয় না, আমাদের চৌকশ গোঁপখেজুরে আলস্যই এর পরিপূর্ণ ক্রেডিট পায়।[১] এবং এই দেশেই প্রায় সাতশ' বছর ফারসী ছিল স্টেট ল্যাঙ্গুইজ—সেইটে একদম পালিশ করে তুলতে আমাদের একশ' বছরও লাগেনি।

ফরাসী দেশের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির কত পারসেণ্ট ইংরিজী বই পড়তে পারে? বলতে পারে? এক পারসেণ্টও না। মারকিন উচ্চশিক্ষিত লোক—স্কুল-কলেজে আট বছর ফরাসী শিখেছে—ক' পারসেণ্ট ফরাসী পড়তে বলতে পারে? ঠিক

১ 'গোঁপখেজুরে'র গল্পটি অতি প্রাচীন ক্ল্যাসিক পর্যায়ের ঃ খেজুর গাছ-তলায় একটা লোক শুয়েছিল। একটা খেজুর কপালে পড়ে গড়াতে গড়াতে তার গোঁপে এসে ঠেকল। কিন্তু লোকটা এমনই হাড়-আলসে যে জিভ দিয়ে সেটা টেনে নিয়ে মুখে না পুরে অপেক্ষা করতে লাগল। দিনশেষে পদধ্বনি শুনে বিড়বিড় করে বললে, 'দাদা, এদিকে একটু ঘুরে যাবার সময় যদি দয়া করে তোমার পা দিয়ে ঐ খেজুরটা আমার মুখের ভিতর ঠেলে দাও! থ্যাংকয়ু!'

বি-এ পাসের পর ? তার দশ বছর পর ?

অর্থাৎ স্বাধীন দেশের শিক্ষিত লোককেও দোভাষী করা যায় না। ওটা একটা ফ্যাশান—ইস্কুল-কলেজে সেকেন্ড ল্যাংগুইজ পড়ানো।

পেটের ধান্ধায় অনেকে দোভাষী হয়—স্কুলে না গিয়েও। মারওয়াড়ি ব্যবসায়ী তামাম আসাম চষে খায়। ও ! মারওয়াড়ের গ্রামে গ্রামে বুঝি সুবো-শাম ইস্কুলে ইস্কুলে আসামী ভাষার দিগগজ পণ্ডিত বানানো হয় !

তাই বলি, দোভাষী ত্রিভাষী—এদেশের শিক্ষিত লোকও হবে না। থাকবে একভাষী। এবারে দোভাষী ত্রিভাষীর দল আপসের চুলোচুলি ভুলে গিয়ে এক-জোট হয়ে আমাকে—আমি, একভাষীকে - মারবেন পাইকিরি কিল। এখন বলুন, আমার ভূমিকাটি কি অতি দীর্ঘ হয়েছিল ?

॥ ২ ॥

ব্যক্তি-বিশেষের বেলা পুরুষকারই যে রকম শেষ কথা নয়, একটা জাতি বা দেশের বেলাও তাই। আমরা যতই ভেবেচিন্তে পারলিমেন্টে তর্কাতর্কি করে, কাগজে কাগজে পাবলিসিটি দিয়ে আটঘাঁট বেঁধে একটা প্রোগ্রাম বা প্ল্যান চালু করি না কেন, শেষ পর্যন্ত তার ফল যে কি উতরাবে সে-সম্বন্ধে আগের থেকে দৃঢ়নিশ্চয় হওয়া যায় না। একটা দেশের ধর্ম, খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এগুলো এমনই বিরাট বিরাট ব্যাপার যে এগুলোকে মানুষ আদৌ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিনা সে নিয়ে আমার মনে গভীর সন্দেহের উদয় হয় ; মনে হয় কি যেন এক অদৃশ্য নিয়তি মানব সমাজকে শাসন করে চলেছে, তার উপর আমাদের কর্তৃত্ব যদি বা থাকে সে অতিশয় যৎসামান্য। তাহলে প্রশ্ন উঠবে, এসব বিষয় নিয়ে আমাদের কি তবে চিন্তা করবার কিছুই নেই ? অন্ধ নিয়তিই সব ? তার নাম অদৃষ্ট, কর্মফল, কিস্মৎ—যে নামেই তাকে ডাকুন।

হজরৎ মুহম্মদ একদিন বেদুইনদের সামনে পুরুষকার ও অদৃষ্ট সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার পর এক বেদুইন তাঁকে শুধালে, 'তবে কি, হজরৎ, উটগুলোকে আমরা দড়ি দিয়ে না বেঁধে আল্লার ভরসায় (কিস্মতের উপর) ছেড়ে দেব ?' হজরৎ বললেন, 'না, দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে তারপর আল্লার উপর ভরসা রাখবে।' অর্থাৎ আমরা আটঘাঁট বেঁধে যতই প্ল্যানিং করি না কেন, সকালবেলা বেদুইনের মতই হয়তো দেখবো, উট হাওয়া, প্ল্যান ভণ্ডুল। কিন্তু তবু উট বাঁধতে হয়, প্ল্যানিং করতে হয়।

বৌদ্ধধর্মও নাকি বলেন, মানুষের জীবন নদীস্রোতে নিচের দিকে চলমান গাছের গুঁড়ির মত ; ধাক্কাধাক্কি করে সেটাকে খানিকটে ডাইনে বাঁয়ে সরানো যায় কিন্তু স্রোতের উল্টোদিকে চালানো যায় না।

এবং কার্ল্ মারক্স্ও নাকি বলেছেন, ইতিহাসের নিয়তি নানা সামাজিক প্যাটার্ন্ পরিবর্তিত করতে করতে সর্বশেষে প্রলেতারিয়া-রাজ আনবেই

আনবে। মানুষ সজ্ঞানে আপন চেষ্টা দ্বারা তার গতি দ্রুততর করে দিতে পারে মাত্র।

অতএব তর্কবিতর্ক করি, চেষ্টা দিই :—কিন্তু জানি, শিক্ষার্থী আজ দোভাষীই হোক, আর ত্রিভাষীই বলুক—আখেরে সে একটি ভাষাই শিখবে, তাই দিয়ে জ্ঞানার্জন করবে, কাজকর্ম চালাবে।

পাঠককে ফের বলছি, এখানে আমি বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলছি। অর্থাৎ জোর করে দেশের তাবৎ ইস্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীকে দুটো বা তিনটে ভাষা শেখাবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম। তারা নিছক পরীক্ষা পাস করার জন্য ভাষা শিখবে কিন্তু পরবর্তী জীবনে দ্বিতীয় বা/এবং তৃতীয় ভাষার চাবি দিয়ে ঐ সব ভাষার জ্ঞানভাণ্ডার খুলে ওই জ্ঞান জীবনে সঞ্চারিত করে চিন্তাধারাকে বহুমুখী করবে না—অথচ বিদেশী ভাষা শেখার প্রধান উদ্দেশ্য তো ওইটেই।

এবারে একটা উদাহরণ নিই।

নরমানরা ইংলণ্ড জয় করে সেখানে চালালো ফরাসী ভাষা। শুধু যে রাজদরবারেই ভাষা ফরাসী হয়ে গেল তাই নয়, শিক্ষাদীক্ষার বাহন, সংস্কৃতি বৈদগ্ধ্যের মাধ্যম, নাট্যশালা সঙ্গীতের ভাষা—সব কিছুই তখন ফরাসী এবং ফরাসীর মাধ্যমে তার জননী লাতিন। পাকা তিনশটি বছর চললো ফরাসী ভাষার একচ্ছত্রাধিপত্য। ইংরিজীতেও যে কোনো প্রকারের চিন্তা বা অনুভূতি প্রকাশ করা যায় সে-কথা দেশের ভদ্রজন সম্পূর্ণ ভুলে গেল। ফরাসী ভাষা নাকি আল্লাতালা স্বয়ং এমনই মধুর পরমপ্রিয় করে নির্মাণ করেছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি (এদেশেও আমরা সংস্কৃতকে দেবভাষা খেতাব দিয়েছি এবং সন্ত তুকারাম তাই বক্রোক্তি করেছিলেন, "সংস্কৃত যদি দেবভাষা হয়, মারাঠী কি তবে চোরের ভাষা ?")।··পুরো তিনশ'টি বছর পর ইংলণ্ডের রাজার মাতৃভাষা আবার হল ইংরেজী কিন্তু হলে কি হয় ফরাসী যদিও ক্রমে ক্রমে হটে যেতে লাগলো তবু দেখা যাচ্ছে এই সেদিন—১৭ শতাব্দী অবধি আইন-আদালতের ভাষা ছিল ফরাসী।[২]

২ আইন-ব্যবসায়ীদের মত রক্ষণশীল প্রাণী ত্রিলোকে দুর্লভ। ইংরিজী অবহেলিত বা বিতারিত হলে এই বেহেশ্‌তী ভারতভূমি যে কোন্ দোজখে পরিণত হবে তারই কল্পনায় অধুনা শ্রীযুত ছাগলা [ওটা ছাগলাই, স্যর, চাগলা নয়। পর পর পুত্রসন্তান মারা গেলে যে রকম আমরা 'এককড়ি' 'ফকির' 'নফর' নাম রাখি গুজরাতীরা তেমনি 'ছাগলা' (ছাগল), মাঁকড় (পিঁপড়ে, ক্রিকেটার), ঝিঁড়া (জিন্না, ছোট) রাখে] করুণ আর্তনাদ করে বলেছেন : এই একশ' বছর ধরে আইন ব্যবসা যে (পর্বতপ্রমাণ) আইনের কেতাবপত্র ইংরিজীতে রচনা করেছেন সেটা লোপ পাবে, তার ব্যবহার থেকে ভারতবাসী বঞ্চিত হবে। এর উপর দীর্ঘ মন্তব্য না করে শুধু বলবো, 'এদেশ থেকে ইংরিজীকে নিরঙ্কুশ বিতাড়িত করার জন্য এই একটি মোক্ষম যুক্তি পাওয়া গেল বটে!' এবং ছাগলা সম্প্রদায়কে সবিনয় প্রশ্ন : 'তবে কি প্রলয়াবধি এদেশে

ইংরিজী একদিন পদ পেল বটে, তাই বলে কি ফরাসী 'কর্তার ভূত' কাঁধ থেকে অত সহজে নামে? ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত M. Ed রা বলতে পারবেন কবে বিলেত থেকে ফরাসী কমপাল্‌সরি সবজেক্‌টরূপে লোপ পেল। কিন্তু তারপরও, আজ অবধি, ঐ ফরাসী অপ্‌শনাল হিসেবে পড়াবার জন্য বিলেত প্রতি বৎসর কত খরচা করে?

এবং আজও ইংরেজ ফরাসীকে নিয়ে যতই মস্করা করুক না কেন, জেবে দুটো কড়ি জমামাত্রই হলিডে করার জন্য 'পরাণ ভয়ে হরিণে'র মত ছুট লাগায় প্যারিস পানে[৩]—মনে আশা সেই সব কুকীর্তি করবে, যেগুলো আপন দেশে করা যায় না—সিম্‌প্‌লি নট ডান্‌। ইংরেজী সাহিত্য যে ফরাসী সাহিত্যের কাছে কতখানি ঋণী তার জরিপ করা আমার কর্ম নয়। শব্দবিদ না হয়েও বেপরোয়া আন্দাজে বলি, ইংরিজীর শতকরা নব্বইটি চিন্ময় শব্দ (অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌ট ভকাবুলারি) হয় ফরাসী নয় ওরই মারফৎ লাতিন গ্রীক থেকে নেওয়া।

আরো কত শত বাবদে আজো ইংরিজী ভাষা, সাহিত্য, রান্নাবান্না (মেনুটা এখনো ৮০% ফরাসিস; বীফ, মাটন্‌, পর্‌ক্‌, ভীল, ভেন্‌জন্‌=গরু, ছাগল, শুয়োর, বাছুর, হরিণের মাংস—সব কটা শব্দ ফরাসী থেকে এসেছে), আদব-কায়দা (R. S. V. P থেকে P. P. C.), মদ্যাদি (কন্যাক্‌ থেকে শ্যামপেন) ফরাসীর কাছে ঋণী—বস্তুত বিলেতে, আজো সভ্যতা ভদ্রতার কোন্‌ না বস্তু ফরাসী প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল বা আছে?

* * *

একদা কতিপয় শিক্ষাবিদ ইংরেজের মনে প্রশ্ন জাগলো, এই যে আমরা ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য শেখানোর জন্য আমাদের দেশে প্রায় হাজার বছর ধরে এত টাকা ঢেলেছি, দেখি তো, তার ফলটা কি হয়েছে? জনৈক ফরাসী ভদ্রলোককে নাবানো হল লণ্ডনের রাস্তায়। যারই বেশভূষা আচার-আচরণ দেখে মনে হল লোকটি মার্জিত উচ্চশিক্ষিত তাকেই ফরাসী ভদ্রলোক ফরাসীতে শুধলো, 'আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি, বলতে পারেন, কোন্‌দিকে গেলে সব

আইনের বাহন ইংরিজীই থাকবে?' কারণ যত দিন যাবে, পর্বত যে 'পর্বততর' হতে থাকবে! মায়া যে 'মায়াতর মায়াতম' হতে থাকবে! অবশ্য আমি ইংরিজী বিতাড়নের জন্য হন্যে হয়ে উঠিনি, একটি বিশেষ স্বার্থান্বেষী সম্প্রদায়ের মত।

৩ এস্থলে বক্ষ্যমান রচনাটি যদি আমাকে কপালের গর্দিশবশত ইংরিজীতে লিখতে হত তবে 'পরাণভয়ে হরিণের ছোটা'টা হুবহু ফরাসী ইডিয়মে লিখতুম—Ventre a terre—অর্থাৎ with belly to ground; এমনি সামনের দিকে বুঁকে প্রাণপণ ছুটছে যে মনে হয় মানুষটার পেটটা বুঝি মাটি ছুঁয়ে ফেলেছে! (ফরাসি শব্দতাত্ত্বিকদের জন্য 'ভাঁর' ভেনট্রিলোকুইস্‌ট্‌, পেট থেকে যে কথা বের করে; 'তের' টেরেস্ট্রিয়াল=পার্থিব তুলনীয়)

চেয়ে কাছের ট্যুব স্টেশনে পেঁছিব ?' কথিত আছে, ৯৩ না ৯৭ নম্বরের ভদ্রলোক প্রশ্নটা বুঝতে পারলেন বটে কিন্তু ফরাসীতে উত্তর দিতে পারলেন না। ১০৩ না ১০৭ নম্বরের জনা বুঝি কোনোগতিকে অতি ভাঙা-ভাঙা ফরাসীতে উত্তরটা দিলেন।

এরপর আরো নানা উদাহরণ, নানা যুক্তি দেখিয়ে প্রাগুক্ত গবেষকগণ অতিশয় ন্যায্য প্রশ্ন শুধিয়েছেন, তাহলে ঐ 'পোড়া'র ফরাসী শেখাবার জন্য এদেশে অত কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালার কি প্রয়োজন ?

* * *

এ বিষয়টি আরো সবিস্তর আরো উদাহরণ দিয়ে গুছিয়ে বলতে হয়। আমার শক্তি অতিশয় সীমাবদ্ধ। তদুপরি যখন জানি, যা হবার তা হবেই, তখন কেমন যেন উৎসাহের অভাবে কলমের কালি শুকিয়ে যায়। তবু লিখছি, এলোপাতাড়ি হাবিজাবি বিস্তর বেহুদা এক্সপেরিমেণ্ট করার পর মার খেয়ে খেয়ে যখন মাত্র একটি ভাষাই বাধ্যতামূলক করা যায় এ-তত্ত্বটি আবিষ্কার করবো, যা অন্যান্য স্বাধীন দেশে করে ফেলেছে, তখন কেউ যেন না বলে, এ-যুগের, অর্থাৎ আমাদের বর্তমান যুগের লোকের বিন্দুপরিমাণ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা শক্তি ছিল না।

ইংরিজী তো এদেশে প্রায় একশ' বছর ধরে কমপালসারি ছিল। ইংরিজী শিখলে আর্থিক সামাজিক উন্নতি হবে বলেই লোকে ইংরিজী শিখেছে। জ্ঞানার্জন করে চিত্তপ্রসারের জন্য ইংরিজী শিখেছে এ-কথা বললেও আমি বিশ্বাস করবো না। এখন বলুন কটা লোক অবসর সময় ইংরিজী বই পড়ে, ইংরিজী বই কেনে ? এ তো সাধারণ জনের কথা, কিন্তু প্রত্যয় যাবেন না, আমার পরিচিত একটি ছোকরা ইংরিজীর লেকচারার সর্বক্ষণ বাঙলা বাঙলা করছে, রবীন্দ্রসাহিত্যে তার সুন্দর দখল, কৌতুহল প্রশংসনীয়। ওদিকে ইংরিজীর বেলা সেখানে পড়াশুনো করে আরো চৌকশ হবার কোনো চাড় নেই জানে যেটুকু ইংরিজী রপ্ত আছে সেইটে ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে সে একদিন রীডার ও যথারীতি প্রফেসরও হবে।

এই সেমি-কমপালসরি সংস্কৃত, ফারসী, আরবী (বা পালি লাতিন) নিন। সায়েনসে সীট পায়নি বলে, বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, প্রায় অনিচ্ছায় বি-এ পাসের সময় সংস্কৃত ছিল। হয়তো বা অনার্সও ছিল। তাদের কজনকে আপনি অবসর সময় সংস্কৃত (বা ফারসী) পড়তে দেখেছেন, তার শেলফে নূতন কেনা সংস্কৃত বই দেখেছেন ? ফারসী তো অতি সরল ভাষা—কজন ফারসী অনার্সওলা গ্রাজুয়েট ফারসী 'আউট-বুক' পড়ে ?

অবশ্য যাঁরা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় দুই বা তিনটি ভাষা শেখেন—বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, তাঁদের কথা সম্পূর্ণ আলাদা। অধ্যাপক সত্যেন বোস স্বেচ্ছায় ফরাসী জরমন শিখেছেন। এখনো ওই দুই ভাষায় বই পড়েন।

॥ ৩ ॥

অগুনতি দফে প্রশ্ন শুনতে হয়েছে, 'ইংরিজীতেই চলবে তো ? অন্য কোনো ভাষা না জানলেও চলবে—না ? কনটিনেনটে তো সবাই ইংরিজী বোঝে,—না ?'

হুঁ, বোঝে। খুব বোঝে ! তবে শুনুন। গল্পটি অবশ্য প্যারিস সংক্রান্ত নয়—যদিও খুদ প্যারিসেরই কোনো একটা মুদির দোকানে তেল নুন কেনার চেষ্টা করে দেখুন না ইংরিজীর মারফৎ—তবে এটি পৃথিবীর যে-কোনো জায়গা সম্বন্ধে প্রযোজ্য, সেটা পৃথিবী প্রদক্ষিণ না করেও বলা যায়।

প্রভাঁসের একটি দোকানের সামনে বেশ মোটা মোটা হরফে লেখা ঃ 'ENGLISH SPOKEN'। এটার উদ্দেশ্য মারকিন ট্যুরিস্টকে আকর্ষণ করা। ইংরেজকে নয়। কারণ ফরাসী জাত বিস্তর মার খেয়ে খেয়ে ভালো করেই জানে, ইংরেজ কিপটেমিতে প্রায় তাকেও হার মানায় এবং জাতটার আগাপাস্তলা বেনেদের হাড্ডি দিয়ে তৈরি বলে দোকানের প্রত্যেকটি জিনিসের পাইকিরি ভাও, খুচরো দর, কমিশন, সেল ট্যাক্স দফে দফে জানে। তা সে-কথা থাক গে।···এস্থলে ঢুকেছে এক মারকিন। খাজা মারকিন ড্রল (আড়) সমেত একাধিকবার মারকিন জবানে বলে গেল তার প্রয়োজন অথচ কাউনটারের পিছনে ফরাসী দোকানউলী শুধু মিটমিটিয়ে মৌরী হাসি চিবোয়—মাল কাড়-বার কোনো নিশানাই নেই। মারকিন বার বার একই কথা বলতে বলতে হঠাৎ বুঝতে পারলো, মাদাম তার কথার এক বর্ণও বুঝতে পারছে না। বিরক্ত হয়ে তখন সে সেই সাইনবর্ড-টার দিকে আঙুল তুলে বললে, 'তবে ওটা ওখানে ঝুলিয়েছ কি করতে ? ইংরিজী যখন বোঝো না এক বর্ণও ?' এবারে যেন মাদাম ব্যাপারটা বুঝেছে—নিশ্চয়ই এ ফারুস্ আকছারই হয়—একগাল হেসে তার ইংরিজীভাষা ভাণ্ডারের শেষ শব্দটি খরচা করে বললে, 'উই, উই, ইয়েস ইয়েস, "এঙলিশ স্পোকেন !" সারতেনলি। আওয়ার কস্তোমারস্ স্পীক—উই নৎ স্পীক'—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, "ইংরিজী বলা হয়" বই কি ! আমাদের খদ্দেররা বলেন। আমরা বলি না।'

এটি মনে রাখবেন। আপনার অন্য কোনো কাজে না লাগলেও এটি দিয়ে ব্যাকরণের প্যাসিভ ভইস এবং তস্য প্রসাদাৎ কি কি সুখ-সুবিধে হয় সেটা বাচ্চাদের শেখাতে পারবেন। মাদাম তো আর নোটিশে বলেনি, 'উই স্পীক ইংলিশ', বলেছে 'ইংলিশ স্পোকেন'—এবং ইহসংসারে কে কোথায় ইংরিজী বলে কি না বলে, সেটা কুইনজ ইংলিশ না সাউথ ক্যারোলাইনার নিগার ইংলিশ সে খতিয়ান দেবার জিম্মেদারি তো বেচারী প্রভাঁসিনী দোকানউলীর নয় !

খোদ প্যারিসের মুদির কথা বলছিলুম। আপনি হয়তো বিরক্ত হয়ে বলবেন, 'তুমিও য্যামন ! আমি কি প্যারিস যাচ্ছি ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলের জন্য !' এস্থলে আমাকে একটু কথা কাটতে হল। বলতে কি, আমার মনে

হয়, এই সব বস্তু আপনি যদি প্যারিসে কিনে এদেশে চালান দিতে পারেন—অবশ্য অস্মদ্দেশীয় সদাশয় সরকার যদি তার উপর বেদরদ ট্যাক্‌শো না চাপান—তবে আপনার প্যারিস ভ্রমণের খরচটাই উঠে যাবে। আর ইতালির ব্রিন্‌দিসি, বারী অঞ্চলে চালের কিলো নিশ্চয়ই আড়াই/তিন টাকা নয়! সর্বোপরি অলিভ তেল! লাল হয়ে যাবেন, মোয়াই, লাল হয়ে যাবেন। ফ্রান্‌সের মার্সেই অঞ্চলের পাঁচসিকের তেল হেলায়—কালো বাজারে—নিদেন পঞ্চবিংশতি তংকা! তা সে যাক্‌ গে! ইংরেজের সঙ্গে দু-শ' বছর ঘর করে আমি—সৈয়দের ব্যাটা—আমিও বেনে বনে গিয়েছি—প্যারিস পেঁছে কোথায় না সন্ধান নেবো উবিগাঁ কোতি'র ভুরভুরে খুশবাই—তা না, ত্যালের কেলো, চেলের ভাও! লাও!

প্যারিসের—প্যারিসের কেন—পৃথিবীর পয়লা নম্বরী সর্ব হোটেলের ওয়েটার, 'রুমবয়', কাউন্টারের কেরানী এরা সবাই অল্প-বিস্তর ইংরিজী বলতে পারে। কিন্তু আপনি সে-সব হোটেলে উঠবেন না—গ্যাঁটে আপনার অত রেস্তো নেই, থাকলে আমার লেখা পড়তেন না। আর যদি বলেন, না, আপনার সে রেস্তো আছে, তাহলে আর ভাবনা কি? আপনি কোন্‌ দুঃখে প্যারিস বার্‌লিনে কে কতখানি ইংরেজী বোঝে না বোঝে তাই নিয়ে মাথা ঘামাবেন? রেখে দিন হাজার দুই আড়াইয়ের মাইনের একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি—সে নিদেন আধা ডজন কন্‌টিনেনটাল ভাষা ঝাড়তে পারে, আপনাকে আর দেখতে হবে না। স্বপ্নেই যখন খাচ্ছেন তখন পোলাওই খান, ভাত খাচ্ছেন কেন, আর সে পোলাওয়ে ঘি ঢালতেই বা কঞ্জুসী কচ্ছেন কেন? বরদার মহারাজাকে দিনের পর দিন অনায়াসে মিশরে চলাফেরা করতে দেখেছি। কবীন্দ্র রবীন্দ্র যখন প্রাগ বা বুডাপেশটে বক্তৃতা দিতেন তখন সেখানকার য়ুনিভারসিটির সব চেয়ে সেরা ইংরাজীবাগীশ অধ্যাপক হতেন তাঁর দোভাষী। এঁদের কথা আলাদা। আপনি যদি সে পর্যায়ের হন তবে আমার লেখা পড়ছেন কোন্‌ বদ্‌কিসমতের গেরোতে?

পক্ষান্তরে দেখুন, জলপাইগুড়ি থেকে বেরিয়ে অন্ধ খঞ্জ শ্রীধামে পেঁছয় না, কেদার-বদরীর পুণ্যসঞ্চয় করে না! ভারতীয় কত কালা বোবা কপর্দকহীন প্রতি বৎসর মক্কায় গিয়ে হজ করে! রাখে আল্লা, মারে কে!

চলে যাবে, প্যারিসে ইংরিজী জানা না থাকলেও চলে যাবে, জানা থাকলে অল্পস্বল্প সুবিধে হতে পারে। লনডনে যদি শতেকে একজন লোক ফরাসী বলে, তবে দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্বে প্যারিসের রাস্তায় হাজারে একজন ইংরিজী বলতো কিনা সন্দেহ। তাই আঁদ্রে মোরোয়া যিনি এই হালে গত হলেন, বা ল্যাগুঈ কাজাম্যাঁ ফ্রান্স দেশের আজব চিড়িয়া। প্যারিসবাসী তাজ্জব মেনে শুধোবে 'ওরা ইংরিজী শিখেছিল! কি করতে? মরতে?'

জরমনিতে অবশ্য আপনার ইংরিজীজ্ঞান একটু বেশী কাজে লাগবে। যদ্যপি ওই দেশ ইংরেজের প্রতিবেশী নয়। তার অনেকগুলো কারণ আছে। তার একটা কারণ আমাদের মূল বক্তব্যের সঙ্গে বিজড়িত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জরমনির আপন ভূমির উপর কোনো সংগ্রাম হয়নি, অর্থাৎ কোনো বিদেশী সৈন্য সেখানে পদার্পণ করেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মারকিনিংরেজ লড়াই করতে করতে, কদম কদম এগোতে এগোতে জরমনির এক বৃহদংশ দখল করে সেখানে থানা গাড়ে এবং কয়েক বৎসর সেখানে বাস করে। গোড়ার দিকের মারকিনিংরেজ চালিত মিলিটারি শাসনকর্তাদের ভাষা তখন যে অতি সামান্যও বলতে পেরেছে সে-ই রেশন সহজে পেয়েছে, ফালতো রুটিটা আণ্ডাটাও তার কপালে নেচেছে। আমার এক জরমন সতীর্থ ধরা পড়ে মারকিন দল জরমন সীমান্তে প্রবেশ করা মাত্রই। ইংরেজী বলাতে তার ভালো অভ্যাস ছিল বলে (তার জন্য আমি স্বয়ং কিছুটা দায়ী। আমাদের পরিচয়ের গোড়ার দিকে আমি জরমন জানতুম না বলে সে তার টুটিফুটি ইংরেজী চালিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে আমার জরমন খানিকটে সড়গড় হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে পুরনো অভ্যাস ছাড়েনি) মারকিনরা তাকে 'পত্রপাঠ' দোভাষীর—শব্দার্থে—নোকরি দিয়ে দেয়। ফলে তার বাচ্চাদের দুধের অভাব হয়নি, বৃদ্ধা রুগ্না শাশুড়ীর ওষুধপত্রের অভাব হয়নি। আর সে ভসভস করে অষ্টপ্রহর হাভানা সিগার ফুঁকেছে যা ইতিপূর্বে তার জীবনে কখনো জোটেনি। মার্কিন সৈন্য চলে যাওয়ার পর মনোদুঃখে সে ধূমপান সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছে। আমি তার জন্য গেল বারে বিড়ি নিয়ে গিয়েছিলুম। তার পুনরপি সেই মনস্তাপ। তবে আমি মাঝে-মধ্যে এখনো তাকে দু'পাঁচ বাণ্ডিল পাঠাই। ভয়ে বেশী পাঠাতে পারিনে—জরমন কসটম্‌স আমাদের চেয়ে কম যান না।

১৯৪৪ থেকে জরমনির যা দুর্দিন গেছে বিশ্বের অর্বাচীন ইতিহাসে সেটা উল্লেখযোগ্য। মারকিনিংরেজ সেখানে থানা গাড়ার পর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাকে না রেশনের সন্ধানে ছুটতে হয়েছে ওদের পিছনে? সবাই পড়িমরি হয়ে তখন শিখেছে ইংরিজী। কবে কোন ঠাকুন্দা একবার বেখেয়ালে একখানা 'গাইডবুক টু ইংলিশ' কিনেছিলেন, এ আমলের ঠাকুন্দা তারই গা থেকে সন্তর্পণে ধুলি ঝেড়ে এক-পরকলাওলা চশমা নাকে চড়িয়ে লেগে গেলেন ইংরিজী অধ্যয়নে—ছাপাখানা আবার কবে বসবে, চশমার দোকান কবে খুলবে কে জানে?

এর পর আর কি আশ্চর্য যে প্রথম ইস্কুল ফের খোলা মাত্রই আণ্ডাবাচ্চারা ইংরিজী শিখতে আরম্ভ করলো, তার তুলনায় আমাদের ঊনবিংশ সালের ইংরিজী শেখার প্রচেষ্টা ধুলির ধুলি।

একমাত্র পরাধীনতাই মানুষকে মাতৃভাষা ভিন্ন দ্বিতীয় ভাষা শেখায়। চোখের জলে নাকের জলে শেখায়।

এই পরাধীনতার পিঠ পিঠ আসে আর্থিক পরাধীনতা। আজ জগৎজোড়া মারকিনি ডলারের গরমাই। ইংরেজের তম্বী কমেছে, কিন্তু তিনিও আছেন। উভয়ের ভাষা মোটামুটি একই—ইংরিজী।

তাই আমরা আজ কল্পনাও করতে পারি নে ইংরিজী না শিখে গুষ্টিসুদ্ধ দোভাষী না হয়ে আমাদের চলবে কি করে?

এ-কথা খুবই সত্য, ইংরিজী নিরঙ্কুশ বর্জন করা অনুচিত।

কিন্তু দুনিয়াসুদ্ধ লোককে ঘাড়ে ধরে দোভাষী বানিয়ে সে-সমস্যার সমাধান নয়।

ভঙ্গ বনাম কুলীন

যে-ভাষার প্রশংসায় এক শ্রেণীর মহাজন অধুনা পঞ্চমুখ সেই ভাষায় একটি প্রবাদ আছে: 'হে গভীর-সংকট-সঙ্কুল-অরণ্যের-পথভ্রান্ত-পথিক, অরণ্য ভেদ করে জনপদে না পেঁছিবার পূর্বে হর্ষধ্বনি করো না। অধম আপ্তবাক্যটি বিস্মরণ করে হর্ষোল্লাস করে বসেছি, এমন সময় দেখি, আমি গভীরতম অরণ্যে। সেই শ্রেণীর সজ্জনগণ এখন আরো প্রাণপণ লড়াই দিচ্ছেন, ইংরিজী যেন সর্বাবস্থায় কলেজাদিতে শিক্ষার মাধ্যমরূপে বিরাজমান থাকে। বোধ হয়, অধুনা শিক্ষামন্ত্রী যে প্রাদেশিক ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করে দেখবেন বলে মনস্থির করে বসেছেন, এ সংবাদ এঁদের বিচলিত করেছে।

এই শ্রেণীর একাংশ কোনো তর্কাতর্কি না করে তারস্বরে ইংরিজী ভাষা-সাহিত্য ও তার প্রসাদগুণ কীর্তন করেন। সে কীর্তনের ঢংটি বড়ই মজাদার। সর্বপ্রথম তাঁরা বলেন, যাঁরা বাংলা বা অন্য কোনো ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করতে চান তাঁরা অজ্ঞ; তাঁরা ভাষাতত্ত্বের মূল নীতিই জানেন না। যেহেতু এঁদের প্রবন্ধাদি ও ইংরিজী কাগজে ছাপা চিঠিতে এঁদের নাম থাকে তাই প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগে, এঁরা বুঝি সুনীতি চাটুয্যের গুরুসম্প্রদায়। কারণ এনারা যখন বলেন, আমরা লিনগুইস্টিক্স জানি না, তখন আমরা ধরে নিই, আমরা জানি আর নাই জানি, তেনারা অতি অবশ্যই জানেন। এবং লিনগুইস্টিক্স তো আর মাত্র একটি বা দুটি ভাষা শিখেই আয়ত্ত করা যায় না—অতএব এঁরা নিশ্চয়ই এন্তের, বিশেষ করে ইয়োরোপীয় ভাষা, বিলক্ষণ রপ্ত করার পর আমাদের 'অজ্ঞ' বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছেন। কিন্তু কই, এঁদের নাম তো ভাষাবিদ্ পণ্ডিতদের নাম করার সময় কেউ বলে না। এঁরা তা' হলে নিশ্চয়ই ইংরেজ কবির আদেশানুযায়ীতে

অসংখ্য রতনরাজি বিমল উজ্জ্বল
খনির তিমির গর্ভে রয়েছে গভীরে।
বিজনে ফুটিয়া কত কুসুমের দল
বিফলে সৌরভ ঢালে মরুর সমীরে॥

'বিফলে' নয় 'বিফলে' নয়—আমরা সন্ধান পেয়ে গিয়েছি। এবং চুপিচুপি বলছি, তাঁরা যে-প্রকারের ঢক্কানিনাদ করছেন তার থেকে সন্দ হয়, তাঁরাও নিঃসন্দেহ ছিলেন, আবিষ্কৃত হবেনই।

আইস সুশীল পাঠক, এবারে আমরা সেই সব 'জেম্'দের জলুস দেখে হতবাক হই (ইংরিজীতে অবশ্য 'জেম্' বক্রোক্তিতে ব্যবহার হয়; যেমন কেউ যখন বলে, 'এই প্রেশাস "জেম্"টি তুমি পেলে কোথায়?' তখন তার অর্থ

'এই আকাট পণ্টকটিকে তুমি আবিষ্কার করলে কোত্থেকে ?' আমি কিন্তু, দোহাই ধর্মের, সেভাবে বলছি নে), এঁদের সৌরভ শুঁকে কৃতকৃতার্থ হই ।

কেউ কেউ বলেন, বহু শতাব্দীর ভিতর দিয়ে ইংরিজি ভাষার বৃদ্ধি (গ্রোথ) অধ্যয়ন করলে রোমাঞ্চ হয় (এ থ্রিলিং স্টাডি) ! অবশ্যই হয় ! আমরা শুধোব, কোন্ ভাষার ক্রমবৃদ্ধির ইতিহাস পড়লে রোমাঞ্চ হয় না ? তবে ইংরিজীর বেলা একটু বেশী হয় । কেন বেশী হয় ? এই সম্প্রদায় বলেন, ইংরিজী তার শব্দসম্পদ আহরণ করেছে অন্যান্য বহু ভাষা থেকে—যেমন লাতিন, গ্রীক, ফরাসী, হীব্রু, আরবী, হাঙ্গেরিয়ান, চীনা—এস্তেক হিন্দী-বাংলা থেকে । তবেই নাকি সম্ভব হয়েছে, এঁদের মতানুসারে—শেক্সপীয়র, মিলটন, ওয়ারড্স্ওয়ারথ্, টেনিসন ইত্যাদি ইত্যাদি ।

বিস্তর ভাষা থেকে এস্তের শব্দ নিয়েছে বলে ইংরিজীতে অত-শত উত্তম কবি—এ সিদ্ধান্তটি পরে আলোচনা করা যাবে ।

এই যে থ্রিলিং স্টাডি সেটা সম্ভব হয়েছে ইংরিজী অন্যান্য ভাষা থেকে বিস্তর শব্দ নিয়েছ বলে । সাধু প্রস্তাব !···এস্থলে আমরা তা'হলে এ তথ্যের আরেকটু পিছনে যাই—যথা, ইংরিজী অত বিদেশী শব্দ নিল কোথায়, কেন, কি প্রকারে ? আমি কথা দিচ্ছি, এটা আরো থ্রিলিং হবে ।

(১) কোনো দেশ পরাধীন হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার ভাষাও পরাধীন হয়ে যায় । নরমান বিজয়ের পর ইংরিজী যে প্রায় তিনশ' বছর অবহেলিত অপাঙক্তেয় ছিল সে কথা পূর্বেই বলেছি । এস্থলে বিজয়ী জাত যদি শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতায় বিজিত জাতের চেয়ে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ হয় তবে বিজিত ভাষা ক্রমে ক্রমে বিদেশী ভাষার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে যায় । তাই আজো ইংরেজ সব চেয়ে বেশী ঋণী ফরাসীর কাছে । এমন কি, যে সব গ্রীক লাতিন শব্দ নিয়েছে তার চোদ্দ আনা ফরাসীর মারফৎ ।

হুবহু এই ঘটেছিল ইরানে, সে দেশে আরব বিজয়ের ফলে । তাদের শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যম হুবহু তিনশ' বছর ছিল আরবী । সে ভাষার প্রভাব ফারসীর উপর এতই প্রচণ্ড যে, আজ আরবী শব্দ বর্জন করলে ফারসী এক কদমও ('কদম' শব্দটাও আরবী) চলতে পারবে না । হুবহু তেমনি উর্দুর উপর (বা প্রাকৃত হরিয়ানার উপরও বলতে পারেন) ফারসীর প্রভাব পড়েছিল ও ফারসীর মারফৎ আরবীর ।

পক্ষান্তরে ফ্রান্স বা জরমনির উপর কোন বিদেশী বেশী কাল রাজত্ব করেনি বলে ফরাসী-জরমনে বিদেশী শব্দ—ইংরিজী যে রকম বে-এস্তেয়ার হয়ে গিয়েছে তার তুলনায় মুষ্টিমেয় ।

(২) এর পর যদি সেই বিজিত জাত—এস্থলে ইংরেজ—বিধির লেখনে আপন দেশ ছেড়ে বাণিজ্য করতে বেরয়, সেই বাণিজ্য রক্ষা করতে গিয়ে রাজ্য জয় করতে আরম্ভ করে, এবং সর্বশেষে রাজত্ব করার ছলে ডাকাতি করে—চরকা পুড়োয়, আফিঙ গেলাবার জন্য সঙীন চালায়, শত্রু ঠেকাবার জন্য কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে, ড্রাই-আরথ পলিসি এস্তেয়ার করে, নিরস্ত্র বাগ-আবদ্ধ

অসহায় নর-নারীকে যারা পাশবিক হুহুংকারবলে গুলি করে মারে, তারা দেশে ফিরে স্বয়ং সম্রাটের আশীর্বাদাভিনন্দনসহ সুপপ্লেট সাইজের মেডেল পায়—তবে, তখনই, সেই 'বাণিজ্য' সেই 'রাজত্ব' সেই ডাকাতি—এক কথায় সেই রক্তশোষণ, সেই এক্সপ্লয়টেশনের চৌকশ সুবিধার জন্য সেই সব মহাপ্রভুরা বহু ভাষা শেখেন এবং তারই ফলে তাদের আপন ভাষাতে বেনোজলের মত হুড়হুড় করে বিদেশী শব্দ ঢোকে।

এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার জিনিস, যে-বিজিত জাত ইতিপূর্বেই বিজয়ী জাতের কাছ থেকে অকাতরে শব্দ নিয়ে নিয়ে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, তারাই পরবর্তীকালে অন্য জাতকে শোষণ করার সময় আরো অকাতরে শব্দ নিতে পারে। এদের তুলনায় ফরাসী-জরমন অনভিজ্ঞ বাল্যখিল্য। তদুপরি এরা চেয়েছিল প্রধানত রাজত্ব করতে ; 'বাণিজ্য' করতে নয়। এরা 'নেশন অব্ শপ্‌কীপার্‌জ' বা 'শপ্‌-লিফ্‌টার্‌জ' নয়। 'বণিকের মানদণ্ড' যখন 'পোহালে শবরী দেখা দেয় রাজদণ্ডরূপে' তখন সে 'রাজদণ্ডে'র সর্বাঙ্গে বেনে-দোকানের কালি-ঝুলির চিত্র-বিচিত্র ছোপ আর সপসপে ভেজাল তেলের দুর্গন্ধ।

শুনেছি, কোনো কোনো আন্তর্জাতিক গণিকা বাইশটি ভাষায় অনর্গল কথা কইতে পারে। তাদের সেই ভাষাজ্ঞান নমস্য কিন্তু পদ্ধতিটা গ্রহণ না করাই ভালো। ইংরেজের শব্দভাণ্ডার হয়তো বা নমস্য—আমি এস্থলে তর্ক করবো না, কিন্তু তার পদ্ধতিটা ঘৃণ্য। পাঠক এটা দয়া করে ভুলবেন না। যদ্যপি এস্থলে এটা ঈষৎ অবান্তর তবু মনে রাখবেন, প্রথম গোলাম হতে হবে, পরে ডাকাত হবেন, তবেই শব্দ ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়। এবারে চরে খান্ গে—যার যা খুশী করুন। এবং স্বীকার করুন, এ স্ট্রাডি থিলিংতর নয় কি না ?

কিন্তু দোহাই ধর্মের, পাঠক ভাববেন না, গোলামির কড়ি তথা লুটের মাল দিয়ে ভরতি ইংরিজী ভাষা ব্যবহার করতে আমি অনিচ্ছুক। ডাকাতির মোহরও মোহর, পুণ্যশীলের মোহরও মোহর। ফোকটে পেয়ে গেলে ব্যবহার করবো না কেন ? মধুভাণ্ডের রস তো আগাপাস্তলা চোরাই মাল—সেটা জেনেও তো কবিগুরু সিলেটের কমলালেবুর জন্য ছোঁক ছোঁক করতেন। এটা তো তবু নির্দোষ উদাহরণ। শাহ-জাহানের হারেম ছিল ফেটে-যাওয়ার-মত ভরতি। তথাপি তিনি মাঝে-মধ্যে বাজার থেকে রমণী আনতেন। অনুযোগ করাতে বলতেন, 'হালওয়া মিষ্টি, তা সে যে কোন দোকান থেকেই আসুক।' 'হালওয়া নীক অস্‌ত্‌,—আজ্ হর্ দুকান্ বাশ্‌দ'—না কি যেন বলে ফারসীতে।

কিন্তু প্রশ্ন, মিশ্রিত ভাষা হলেই বুঝি তিনি অতুলনীয় সর্বশ্রেষ্ঠ একচ্ছত্রাধিপতি ? ফরাসী ভাষা লাতিনসম্ভূতা, এবং সে কিছু গ্রীক শব্দ নিয়েছে। ইটিকে প্রায় অবিমিশ্র ভাষা বলা চলে। তবে কেন মিশ্রিত ভাষার পদগৌরবদম্ভমদমত্ত 'সায়েব-লোগ' হন্যে হবে অবিমিশ্রা ফরাসী ভাষার পিছনে পড়িমরি করে ? আসলে ভঙ্গজ চৌষট্টি-আঁসলা সর্বত্রই কুলীনের জন্য ছোঁক ছোঁক করে।

মিশ্র বলেই নাকি ইংরিজী শেক্সপীয়র, মিলটন পেয়ে ধন্য হয়েছে।

তা' হলে হায় কালিদাস ! তোমার কি গতি হবে, বাছা ? তোমার শকুন্তলা,

রঘুবংশ, মেঘদূতের পেটে বোমা মারলেও যে তাদের জবান থেকে বিদেশী লবজো বেরুবে না !

হায় হোমর, ইস্‌কিলস, আরিসতোফানেশ, ইউরিপিদিশ !

(কিন্তু আশ্চর্য, ইংরেজ তো এখনো প্রতি বৎসর এঁদের কাব্য লক্ষ লক্ষ ছাপায়—নয়া নয়া অনুবাদ করে !)

প্রাচীন যুগের আধা-মিশ্র আরবী ভাষায় কবিকুল, ওল্‌ড টেস্‌টামেন্‌টের সল্‌, দায়ুদ সলমনের 'সঙ অব্‌ সঙ্‌জ'—তোমরা তো বানের জলে ভেসে গেলে। দান্‌তের স্মরণে দীর্ঘনিশ্বাস দীর্ঘতর হল। সান্ত্বনা, চীন-জাপানের কবিদের সঙ্গে পরিচয় নেই। তাঁরা অন্‌-ওয়েপ্‌ট, অন্‌-অনর্‌ড, অন্‌সাঙ হয়ে রইলেন।

পাপমুখে কি করে আর বলি, এক পাল্লায় মিশ্রিত ভাষার কবি, অন্য পাল্লায় অবিমিশ্র ভাষার কবিকুল তুললে কোনটা ওজনে ভারি হবে সে নিয়ে আমার মনে সন্দ আছে। অবশ্য প্রতিপক্ষ বলতে পারেন, ইংরিজী কাব্যে যে ভেরাইটি আছে অন্য কাব্যে নেই। উত্তরে বলি, ফরাসী গদ্যে যে ভেরাইটি আছে, ইংরিজী গদ্যে তা নেই। এবং অনেকে বলতে পারেন, 'বত্রিশ-ভাজা'ই দুনিয়ার সর্বোত্তম খাদ্য নাও হতে পারে। 'সিংহের এক বাচ্চাই ব্যস !'

বী বী সী সম্প্রতি এক্‌সবারের মত পুনরাবৃত্তি করলেন, 'ইংরিজীই এখন পৃথিবীর সব চেয়ে চালু ভাষা।' অবশ্যই। কিন্তু কোন্‌ পদ্ধতিতে সেটি চালু হল—যার বয়ান এইমাত্র দেওয়া হল – সেটি বলতে ভুলে গেলেন। হয়তো বা সে-স্থলে সেটি অবান্তর ছিল। তারপর সগর্বে বললেন, 'হালের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন –থুড়ি, সেমিনারে—দশটি প্রবন্ধ পড়া হয় ; তার ন'টি ছিল ইংরেজীতে।'

আমি বলি, 'অধুনা ডাক্তারদের একটি সেমিনারে দশটি প্রবন্ধ পড়া হয়। তার ন'টি ছিল ক্যানসার সম্বন্ধে', তবে নিশ্চয়ই ক্যানসারের গর্ব অনুভব করা উচিত।

পদ্ধতিটা কি সম্পূর্ণ অবান্তর ?

ইংরেজ তার মিশ্রিত ভাষার প্রশংসা করে। তাই শুনে শুনে এদেশের অনেকেই ইংরেজের গলার সঙ্গে বেসুরো গলা মেলান। কিন্তু তর্কস্থলে একবার যদি ধরে নিই, ইংরেজের ভাষা যদি ফরাসীর মত অপেক্ষাকৃত ঢের ঢের অবিমিশ্র হত, তা' হলে কে কি করতো ? নিশ্চয়ই উচ্চতর কণ্ঠে বলতো, 'ভো ভো ত্রিভুবন ! শৃণ্বন্তু বিশ্বে···ইত্যাদি ইত্যাদি · এই যে আমাদের ভাষা সে কী নির্মল কী নির্ভেজাল ! সে কোনো ভাষার কাছে ঋণী নয়, সে স্বয়ংপ্রকাশ। ওহো হো হো, সে কী পূত, পবিত্র—পর্বতনির্ঝরিণীর ন্যায় অপাপবিদ্ধ। আইস, ইহাতে অবগাহন করিবা !'

এতে আশ্চর্য হবার কি আছে ? সে তার আপন রক্ত অমিশ্র রাখতে চায়, ইস্তক তার ঘোড়া, তার কুকুরটাকে পর্যন্ত দো-আঁসলা হতে দেয় না। এদেশের হুদো হুদো পকেট-ছুঁচোর-কেত্তনওলা মী লাট্‌রা আপন আপন রক্তের বিশুদ্ধতা (অবশ্য কিঞ্চিৎ নরমান বেআইনী তেজাল আছে বইকি !) ভাঙিয়ে

মারকিন মুল্লুকে পয়সাউলী শাদী করছেন। প্রত্যয় যাবেন না, এই হালে বী বী সী-তেই এক ইংরেজ চারচিলের বিদেশী মাতার প্রতি ইঙ্গিত করে (যদ্যপি মাতা অধিকাংশ মারকিনের মত গোড়াতে ইংরেজই বটেন) বলেন, 'হী উয়োজ নেভার কুআইট ওয়ান অব আস।' শুনেছি চারচিল পার্লামেন্টে তাঁর জীবনে মাত্র একবার হুট্ হয়েছিলেন, তাঁর বক্তৃতা চিৎকারে অসমাপ্ত থেকে যায়—তিনি যখন ড্যুক অব্ উইন্জারের মারকিন রমণী বিবাহ-প্রস্তাব সমর্থন করতে চান।

সব বাবদে ইংরেজ অবিমিশ্র থাকতে চায়—শুধু ভাষার বাবদে ব্যত্যয়!

আসলে ভাষাটা বর্ণসংকর হয়ে গিয়েছে যে! এখন এরই প্রশংসায় আসমান ফাটাও!

আমরাও হুক্কা হুয়া করি। দু-একটা নরস্মেন, গোটা-দুই ফরাসীও করেছে। কেউ কিছু বললে, ওদের দোহাই দেব।

হিটলার পঞ্চাশ লক্ষ ইহুদি পোড়ালে নরডিক্ রক্ত অমিশ্র রাখার জন্য।

ইংরিজী ভাষা নির্মিত হল কত পরাধীন জাতের রক্তশোষণের পিঠ পিঠ।

কিন্তু ইহসংসারের সর্বাপেক্ষা মিশ্রিত, বর্ণসংকর ভাষা কোন্‌টি—ইংরিজী যার একশ' যোজনের পাল্লায় আসতে পারে না? বেদে-দের, জীপসিদের ভাষা। নর্থ-পোল থেকে সাউথ-পোল, পৃথিবীর নগণ্যতম ভাষার অবদানও এ-ভাষাতে আছে। বস্তুত, মূলত ইটি কোন্ দেশের ভাষা, আর্য সেমিতি না মঙ্গোলীয় জাতের, সেই তর্কেরই সমাধান হয়নি।

বিবেচনা করি, এ ভাষাতে আরো ডাঙর ডাঙর শেক্সপীয়র-মিলটন গণ্ডায় গণ্ডায়—'অসংখ্য রতন, ডেজার্ট-ফ্লাউয়ারের ন্যায়'—ঘাপটি মেরে আপসে আপসে আব্জাব্ করছেন!

একাধিক গুণী বলেন, বেদেদের ভাষা মূলে ভারতীয়। বৎস! আর কি চাই! কেল্লা ফতেহ। আইস ভ্রাতঃ! সবে মিলি বেদেদের ভাষা শিখি॥

অর্থমর্থম্

বিশ্বের অন্যতম অসাধারণ লেখক, প্রত্নতাত্ত্বিক, যোদ্ধা টমাস এড্ওয়ার্ড লরন্স্ (Lawrence) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আরব জগতে যে সুখ্যাতি অর্জন করেন তার কিংবদন্তী আজও সে অঞ্চলে সুপ্রচলিত। সে-যুদ্ধের সময় তুর্কী রাষ্ট্রের পরাধীন আরব ভূমি তুর্কীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মনোভাব দেখালে পর তাঁর উপর ভার পড়ে আরবদের গেরিল্লা ও সাবোতাজ্ কর্মে পাকাপোক্ত করে তোলার। ...একদা তুর্কী থেকে বেরিয়ে একখানা হজযাত্রী ট্রেন মদীনা যাবে। ওটাকে বিস্ফোরক দিয়ে কি করে ওড়াতে হয় তারই তালিম দিচ্ছেন লরন্স্ আরবদের।

আসলে নিরীহ যাত্রীবাহী গাড়ি চুরমার করতে তাঁর মন মানছিল না কিন্তু 'নবগীতা'য় নাকি 'সান্ধ্যসংস্কৃতে' আছে 'রণে চ প্রেমে চ দাক্ষিণ্য নৈব নৈব চ।' এস্তের তোড়জোড় করে লরন্স্ তো রেল লাইনের তলায় বিস্ফোরক পোঁতার কায়দাকেতা আরবদের শেখালেন বিশেষজ্ঞের গাম্ভীর্য ও তাচ্ছিল্য সহকারে। তারপর সবাই বিস্ফোরকের আওতার বাইরে এসে আশ্রয় নিলেন মরুভূমির একটা বালির ঢিপির পিছনে। দেখা গেল, দূরে থেকে আসছে খেলনার গাড়ির মত হেলে দুলে মান্ধাতার আমলের ধাপামার্কা যাত্রীগাড়ী। সকলের চোখ গাড়িটার উপর ডাকটিকিটের মত সাঁটা। এই এল—এই এল—এই এসে গেল—বিস্ফোরকের বিসুভিয়াসটার উপর—ঐব্‌ষা—কোথায় কি! গাড়িখানা দিব্য ঝ্যাক ঝ্যাক করে কাশতে কাশতে ফাঁড়াটা মোলায়েমসে পেরিয়ে গেল। ...আরবরা 'বিশেষজ্ঞে'র দিকে আড়নয়নে তাকিয়ে মুচকি হেসেছিল কিনা বলতে পারব না। লরন্স্ বলেছেন, 'দ আরটিসট ইন মি ওয়োজ ফ্যুরিয়স, দ ম্যান ইন মি ওয়োজ হ্যাপি।' ইংরিজীটা আমার হুবহু মনে নেই, কিন্তু এটা পরিষ্কার এখনো যেন কানে বাজছে, ভাষাটি তাঁর ছিল চমৎকার আর বলার ধরনটি সরেসেরও সরেস।...যেখানে লরন্স্ হুনুরির মত ফাঁদ পাতছেন সেখানে তিনি আর্‌টিসট্ 'পার-একসেলাঁস', সেখানে বেবাক বন্দোবস্ত বরবাদ-ভণ্ডুল হলে ভিতরকার আর্‌টিসট্ সত্তা তো চটে যাবেই। কিন্তু সেই আর্‌টিস-টের পাশেই যে দরদী মাটির মানুষটি রয়েছে সে তো কতকগুলো নিরীহ বাল-বৃদ্ধকে খুন করতে চায়নি। সে তখন বগল বাজিয়ে নৃত্য করছে।

ঘটনাটি যে এতখানি ফলিয়ে বললুম তার কারণ, এ ব্যাপারটা একটুখানি ভোল বদলে আমাদের জীবনে নিত্য নিত্য ঘটে। যেমন মনে করুন, আপনি উদ্ভিদ বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ, তদুপরি শখের বাগান করেছেন বহু বহু বৎসর ধরে। আপনার প্রতিবেশী একটা আস্ত জানোয়ার—পাড়াটা অতিষ্ঠ করে তুলেছে। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আপনি একদিন দেখেন, পণ্টকটার প্রাণে শখ জেগেছে, কোত্থেকে একটি অতি সুন্দর কামিনীর চারা যোগাড় করে সেটা পুঁততে যাচ্ছে এমনভাবে যে, সজ্ঞানে চেষ্টা করলেও এর চেয়ে বেশী ভুল করা যায় না! জায়গাটা বাছাই করেছে ভুল, গর্ত যা করেছে এবং সেটাতে জল আর কাঁচা গোবর যা ঢেলেছে তাতে দিল্লীর মিঞা কুৎব্‌মিনার একবার পা হড়কে পড়ে গেলে কাগজে বেরুবে মিঞা কুৎব্ জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছেন। পূর্বেই বলেছি—না বলিনি?—ফাঁসুড়েটার আশু পঞ্চত্ব কামনা করে আপনি কালীঘাটে শির্নি মানত করেছেন।...কিন্তু তখন আপনি আর থাকতে পারবেন না। আপনার ভিতরে যে হুনুরি, যে আর্‌টিস্‌ট ঘুমিয়ে আছে সে মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠে চিৎকার করে বলবে, 'ওরে, ও আহাম্মুখ, কামিনী এ ভাবে পোঁতে?'—তারপর ইন্‌স্পাইট অব ইওর সেল্‌ফ্ অর্থাৎ আপনার ভিতরকার হুনুরি আপনার ভিতরকার দুশমন মানুষটাকে পরোয়া না করে তাকে বাৎলে দেবে চারা পোঁতার কায়দাকেতা!!!

ভূমিকাটা মাত্রাধিক দীর্ঘ হয়ে গেল; তা হবেই। কথায় বলে

বাইরে যাদের লম্বা কোঁচা
ঘরেতে চড়ে না হাঁড়ি।
খেতে মাখতে তেল জোটে না
কেরোসিনে বাগায় তেড়ি॥

কালোবাজারীকে আমি আমার দুশমন বলে বিবেচনা করি। কালোবাজারী মাত্রই ক্যাপিটালিস্ট্; অবশ্য সর্ব ক্যাপিটালিস্ট্ই কালোবাজারী নয়। কম্যুনিস্ট্রা আবার সর্ব ক্যাপিটালিস্ট্কেই দুশমন সমঝেন। অর্থাৎ কম্যুনিস্ট্রা আমার দুশমনের দুশমন। ফারসীতেও বলে,

'দোস্ৎনীস্ত (নাস্তি), দুশমন-ই দুশমন অস্ৎ (অস্তি)'—দোস্ত নয়, কিন্তু আমার দুশমনের দুশমন!···

পূর্বেই বয়ান দিয়েছি, মানুষের ভিতরকার আর্টিস্ট্ দুশমনকেও সাহায্য করে, আর আমি দুশমনের দুশমনকে করবো না? কারণ আমার ভিতরেও একটা আর্টিস্ট্ রয়েছে। আত্মশ্লাঘা? আদৌ না। কোন্ মানুষের রক্তে আর্টিস্টের ছোঁয়াচ বিলকুল লাগেনি বলতে পারেন? এমন কি আমরা যাকে অভদ্র ভাষায় মিথ্যুক বলি সেও তো বেচারা সুযোগ থেকে বঞ্চিত—ইংরিজীতে যেমন দড়কচ্চা-মারা গাছের বেলা বলে 'এটার গ্রোৎ স্টান্টিড্'—ঔপন্যাসিক, কবি, এক কথায় আর্টিস্ট্। নোট যে লোক জাল করে সেও সুযোগ-থেকে-বঞ্চিত রবিবর্মা।

অতএব আমি যখন কম্যুনিস্ট্ ভায়াদের সদুপদেশ দিই তখন সেটা দম্ভ-জনিত আত্মশ্লাঘা বশত নয়। অবশ্য তাঁরা সেটা নেবেন কিনা, সেটা নিতান্তই তাঁদের বিবেচ্য। এবং আমি মনের কোণে এ-আশাও পোষণ করি যে তথাকথিত ধর্মভীরুজনও এদিকে খেয়াল করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। অর্থনীতিবিদ শুমপেটার বলেছেন ঃ—মারক্স্ যখন বিশ্বশ্রমিক সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন তখন অনুমান করতে পারেননি যে, পৃথিবীর যে-কোনো স্থলে প্রথম ইন্কিলাবের ফলস্বরূপ প্রথম প্রলেতারিয়া-রাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্রই অন্যান্য দেশের ক্যাপিটালিস্ট্রা সেটা দেখে তার থেকে লেস্ন্ ড্র করে নিজেদের সেই অনুযায়ী এড্জাস্ট্ করে নেবে, মানিয়ে নেবে।[১] অর্থাৎ এযাবৎ যে যে বেধড়ক শোষণ নীতি চালিয়েছিল সেটাকে মডিফাই করে প্রলেতারিয়াকে কিছু পরিমাণে ব্যবসাতে হক দিয়ে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শেয়ার, পেনশন, বেকারীর সময় ডোল,

১ আমার বাড়ির সামনে দিয়ে গত সপ্তাহে বিড়িওলাদের মিছিল গেল—বিড়ির পুঁজিপতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে। তারা ইনকিলা।।।ব দোহাই পেড়ে বলছিল 'ইনক্লাব জিন্দা।বাদ।' শিক্ষিত লোককেও আমি 'ইনক্লাব' উচ্চারণ করতে শুনেছি। আসল উচ্চারণ ইন্কিলা।।।ব্—'লা'টা যতদূর চান দীর্ঘ করবেন। তারপর জিন্দাটা হ্রস্বে হ্রস্বে সারবেন। তারপর 'বাদ'টা বাাাদ্ যতদূর খুশী দীর্ঘ। অর্থাৎ ইন্। কি লা।।।ব্॥ জিন্। দা। বা।।।।দ্॥

চিকিৎসার ব্যবস্থা, নানাবিধ ইনসিওরেনস দিয়ে এমনই তার স্বার্থ নিজের স্বার্থে জড়িয়ে ফেলবে যে "একদিন সে দেখবে হি হ্যাজ মোর টু লুজ দ্যান মিয়ারলি ফেটারজ" অর্থাৎ ইন্‌কিলাব এনে সে অর্থনৈতিক পায়ের রেডি হাতের কড়ার দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শেয়ার ইনসিওরেন্‌সের সুবিধাও হারাবে। নবীন প্রলেতারিয়া রাষ্ট্র বিনা মেহনতে ফোকটে পয়সা কামানোটা বিলকুল বরদাস্ত করে না। ক্যাপিটালিস্‌ট্‌দের এই এড্‌জাস্‌ট্‌ করে নেওয়াটাকে শুমপেটার তুলনা করেছেন রোগের বীজাণুর সঙ্গে ; তারা যে রকম প্রাণঘাতী ওষুধের ইনজেকশন খেয়ে খেয়ে কালক্রমে ওষুধের সঙ্গে নিজেদের এড্‌জাস্‌ট্‌ করে নেয় তারপর সহজে নির্মূল হতে চায় না।

প্রশ্ন উঠবে, আমি কি তবে কম্যুনিস্‌ট্‌ ভায়াদের লেলিয়ে দিচ্ছি ধর্মের পিছনে, আর ওদিকে ধর্মানুরাগীজনকে বলছি, 'সাধু সাবধান !' ?

পাঠক যদি অনুমতি দেন, তবে এ প্রশ্নের উত্তরটি আমি উপস্থিত মুলতবী রাখবো। কারণ শুধু এরই জন্য আমাকে পুরো এক কিস্তি 'পঞ্চতন্ত্র' লিখতে হবে। উপস্থিত যেটা লিখছি তাতে এর স্থান সংকুলান হবে না।

* * *

কম্যুনিস্‌ট্‌রা একটা মোক্ষম তত্ত্ব-কথা বলেন যেটা সকলেরই বিচার করে দেখা উচিত। বস্তুত এ অধম এ-বাবদে গত ত্রিশ বছর ধরে চিন্তা করেছে, দলিল-দস্তাবেজ সন্ধান করেছে, ফের চিন্তা করেছে, এখনো করছে, উপকৃত হয়েছে ও হচ্ছে।

তাঁরা বলেন, 'পৃথিবীর ইতিহাসে যে-সব প্রগতিশীল আন্দোলন—ইন্‌কিলাব—যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখতে পাই তার পিছনে থাকে অর্থনৈতিক কারণ—ইকনমিক্‌ কন্‌ডিশন্‌।'[২]

সকলেই স্বীকার করবেন, পৃথিবীতে সাতটি বড় বড় আন্দোলন—পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। তার ফলে সাতটি প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়, এবং তার পাঁচটি এখনো পৃথিবীতে নানা আলোড়ন সৃষ্টি করে।

সে-সাতটি সচরাচর 'ধর্ম' নামে পরিচিত। ধর্মের নাম শুনে পাঠক অসহিষ্ণু হবেন না। 'আগে কহি'।

তার তিনটির জন্ম এ-দেশে—হিন্দু (সনাতন), বৌদ্ধ, জৈন। এ তিনটি আর্যধর্ম। শেষের জৈনধর্ম এখন পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে আর প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। বৌদ্ধধর্মের রঙ্গভূমি বহু যুগ ধরে ভারতের বাইরে।

আর তিনটি আরব-প্যালেস্‌টাইন নিয়ে যে সেমিতি (সেমেটিক) ভূমি সেখানে : ইহুদি, খৃষ্টান ও 'মুসলমান ধর্ম' (ইসলাম)। এ-তিনটি সেমিতি ধর্ম। ইহুদিধর্মের বিশ্বাসীজন প্রায় দু' হাজার বছর নিষ্ক্রিয় থাকার পর

---

২ সর্ব ইনকিলাবের পিছনে যে অর্থনৈতিক কারণ থাকে সেটাই বিপ্লবের একমাত্র কারণ কিনা, কিংবা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ কিনা, সে আলোচনা এস্থলে থাক।

অধুনা সগৌরবে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন, '—বিশ্বলোক ভাবিছে বিস্ময়ে,/ যাহার পতাকা/অম্বর আচ্ছন্ন করে, এতকাল এত ক্ষুদ্র হয়ে/কোথা ছিল ঢাকা/'।

সপ্তমটির জন্মস্থল ভারত এবং সেমিতি ভূখণ্ডের মাঝখানে। এটিও খাঁটি আর্যধর্ম। প্রাচীন ইরানে এর জন্ম ও জরথুস্ত্রী বা জরথুস্ত্রের ধর্ম নামে পরিচিত। লোকমুখে এরা 'অগ্নি-উপাসক' আখ্যায় পরিচিত। ভারতবর্ষে এখন এই পারসীদের—একমাত্র না হলেও—প্রধান নিবাসস্থল। ইহুদিদের সাত শত বৎসর পূর্বে এঁরা রঙ্গভূমি থেকে বিদায় নেন। কিন্তু আজ যদি এঁরাও ইহুদিদের মত দুই সেন—মারকিন জনসেন আর ইংরেজ উইলসেনকে হাত করে প্রাচীন-ইরানে অধুনা আফগানিস্তানে অবতীর্ণ হয়ে বল্খ্ (সংস্কৃতে হিল) বদখ্শান দখল করে 'আরিয়ানা' (আর্য) রাষ্ট্র প্রবর্তন করেন তবে অন্তত আমরা আশ্চর্য হব না। বল্খ্ অঞ্চল রুশ সীমান্তের এ-পারে—মাঝখানে মাত্র আমুদরিয়া (নদী)—এবং এশিয়ার বুকের মধ্যিখানে। এখানে মারকিন-ইংরেজের একটি কলোনী বা ঘাঁটির বড়ই প্রয়োজন!···লাওৎসে, কন্ফুৎসর নীতিবাদ 'ধর্ম' নামে পরিচিত হয় না।

যে অর্থনৈতিক বাতাবরণের দরুন নবীন ধর্ম সৃষ্টি হয় তার অনুসন্ধান করতে গেলে ইসলাম নিয়ে আরম্ভ করাই প্রশস্ততম, কারণ এটি সর্বাপেক্ষা নবীন এবং ইসলামের পরে আর কোনো বিশ্বধর্ম জন্মগ্রহণ করেনি। তদুপরি আরবরা গোড়ার থেকেই জাত-ঐতিহাসিক। তারা হজরৎ সম্বন্ধে যতখানি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখে গেছে তার তুলনায় খৃষ্ট বা বুদ্ধের জীবনী অনেক কাঁচা হাতে মহাপুরুষদের তিরোধানের প্রচুর সময়ের ব্যবধানে লেখা হয়েছে। ফলে তাঁদের ছবিগুলো আইডিআলাইজড—আর্টিসট্ কল্পনার উপর নির্ভর করেছেন বিস্তর।[৩]

৩ আমি এস্থলে বুদ্ধ যীশুর একমাত্র চিন্ময় রূপের মধ্যেই (অর্থাৎ আমরা যে কল্পনার বা আইডিয়ালাইজড বর্ণনার বুদ্ধ যীশুর ধারণা করি) নিজেকে সীমাবদ্ধ করছি। ওয়েল্স্ মৃন্ময় দিকটা নিয়ে মন্তব্য করেছেন—

'Jesus was a penniless teacher, who wandered about the dusty sun-bit conntry of Judea, living upon casual gifts of food; yet he is always represented (অর্থাৎ ইয়োরোপীয় চিত্রে ভাস্কর্যে) as clean, combed and sleek in spotless raiment, erect and with something motionless about him as though he was gliding through the air'. এর পর ওয়েল্স্ দেখাচ্ছেন, এই মৃন্ময় ছবির উপরও চিন্ময় ছবির প্রভাব ফেলেছে—

'This alone has made him unreal and incredible to many people who cannot distinguish the core of the story from the ornamental and unwise additions of the unintelligently devout.'

হজরৎ যখন মক্কায় একেশ্বরবাদ প্রচার করলেন তখন মক্কাবাসী সাড়ে তিনশ' দেবতা স্বীকার করতো। আরেকটি বাড়লে আপত্তিটা কি? আর নামাজ রোজাতেই বা কি? পুজোপাট তারাও করে, আর উপোসটাও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যুত্তম প্রতিষ্ঠান।

কিন্তু যে-ই তিনি প্রচার করলেন, ধনীর উপর ট্যাকশো বসিয়ে সে-ধন তিনি গরীবদের, 'হ্যাভনট'দের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন তখনই লাগলো গণ্ডগোল। ওদিকে 'হ্যাভনট'রা জুটলো তাঁর চতুর্দিকে—টাকাকড়ি নয়া করে ভাগাভাগি হলে তারাই হবে লাভবান! ধনী আদর্শবাদী জুটলেন অত্যল্পই, মক্কাবাসীরা তখন স্থির করলো, একে খুন না করে নিষ্কৃতি নেই।

খৃষ্টের বেলাও তাই।

তিনিও তাঁর প্রচারকার্য আরম্ভ করেছিলেন সমাজের দরিদ্রতম স্তরের গরীব জেলেদের নিয়ে। অধ্যাত্ম জগৎ তথা নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সব উপদেশ তিনি দিলেন সেগুলো আজও পূর্ণ জীবন্ত কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলছেন কেউ তোমার জামাটি অন্যায়ভাবে কেড়ে নিলে তাকে স্বেচ্ছায় জোব্বাটিও দিয়ে দিয়ো। এক পুণ্যশীল ধনীকে বলছেন, তোমরা সব-কিছু বেচে ফেলে গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দাও।

জেরুসলেমের ইহুদি পুঁজিপতির দল তবু এসব গ্রাহ্য করেনি। ইতিমধ্যে সুলেমানমন্দিরের ভগ্নস্তূপের উপর রাজা হেরড দ গ্রেট নির্মাণ করেছেন এক বিরাট নবীন ঐশ্বর্যমণ্ডিত য়াহভে-মন্দির। কিন্তু মন্দির হোক আর সিনাগগই হোক জাত-ইহুদি ওটাকে দুদিন যেতে না যেতেই ব্যবসায়ের কেন্দ্রভূমি করে তুলেছে। সেখানে চলেছে গরুবলদের কেনাবেচা এবং তার চেয়েও মারাত্মক—সুদখোর ইহুদি মহাজনরা সেখানে চালিয়েছে টাকার লেনদেন, সরুরাফের (ক্ষুদে ক্ষুদে বাঙ্কারের) বাট্টা নিয়ে টাকাকড়ির বদলাবদলি। বস্তুত এই সব পুঁজিপতিরাই তখন পুণ্যভূমির অধিকাংশ তাদের টাকার জোরে কব্জায় এনে ফেলেছে।

ইহুদিভূমির প্রত্যন্ত-প্রদেশ থেকে সহস্র-সহস্র শিষ্যশিষ্যা, বিশ্বাসী গ্রামবাসী অনুগতজনকে নিয়ে প্রভু যীশু সগৌরবে প্রবেশ করলেন জেরুসলেমে। সেখানে গেলেন সেই সর্বজনমান্য মন্দিরে। ব্যবসায়ীদের কারবার দেখে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন কিনা বলা কঠিন, তবে তাঁর আচরণ থেকে কিছুটা অনুমান করা যায়।

মহাজন, ক্রেতা-বিক্রেতাদের তিনি ঝেঁটিয়ে বের করে দিলেন মন্দিরের বাইরে। চতুর্থ সুসমাচার-লেখক সেণ্ট জন্ বলছেন (St. John) তিনি সুতোর দড়ি পাকিয়ে চাবুক বানিয়ে তাদের চাবকাতে চাবকাতে সেখান থেকে তাড়ালেন। টাকার থলেগুলো উজাড় করে ঢেলে দিলেন মাটিতে, ব্যাঙ্কারদের টেবিল করে দিলেন চিৎপাত। বললেন, 'শাস্ত্রে আছে: আমার ভবনের নাম

বুদ্ধের সম্বন্ধেও তিনি অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। এ বাবদে হজরৎ অতিশয় সাবধান ছিলেন।

হবে "উপাসনা ভবন"; আর তোরা এটাকে করে তুলেছিস "চোরের আড্ডা" (ডেন্ অব থীভ্জ্)।'

সেই সময়েই স্থির করলে পুঁজিপতি ও তাদের ইয়ার যাজকসম্প্রদায়—যীশুকে বিনষ্ট করতে হবে, ক্রুশবিদ্ধ করে মারতে হবে।

* * *

ধনদৌলত-টাকাকড়ি।

অর্থমনর্থম্ বলেন গুণীজন। কিন্তু এও সত্য,—অর্থের সন্ধানে বেরুলে অর্থ (টাকাকড়ি) নাও পেতে পারেন, কিন্তু অর্থ পেয়ে যাবেন অর্থাৎ অর্থটা—মানেটা—বুঝে যাবেন। তাই অর্থমর্থমও বটে॥

আবার আবার সেই কামান গর্জন!

খুন করার পরই খুনীর প্রধান সমস্যা মড়াটা নিশ্চিহ্ন করবে কি প্রকারে? সমস্যাটা মান্ধাতার চেয়েও প্রাচীন। আমাদের প্রথম পিতা আদমের বড় ছেলে কাইন তাঁর ছোট ভাই আবেলকে খুন করেন। তাঁর সামনেও তখন ঐ একই সমস্যা, মৃতদেহটা নিয়ে করবেন কি? সাধারণ সাদামাটা বুদ্ধি খাটিয়ে তিনি সেটাকে পুঁতে ফেললেন মাটির ভিতর। কিন্তু মাটিকে আমরা মা-টিও বলি; তিনি সইবেন কেন এক পুত্রের প্রতি অন্য পুত্রের এ রকম নৃশংসতা। তাই পরমেশ্বর কাইনকে বললেন, 'এ তুমি করেছ কি? মাটির (মা ধরণীর) তলা থেকে তোমার ভাইয়ের রক্ত যে আমাপানে চিৎকার করছে।' অর্থাৎ মাটিতে পুঁতেও নিস্তার নেই। তাই পৃথিবীর একাধিক ভাষাতে এটা যেন প্রবাদ হয়ে গিয়েছে। সন্দেহ-বশত গোর খুঁড়ে লাস বের করে পোস্ট-মরটমের ফলে যখন ধরা পড়ে লোকটার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল তখন ঐসব ভাষাতে বলা হয়, মৃতের রক্ত বা মা ধরণী মাটির তলা থেকে চিৎকার করছিল প্রতিশোধের জন্য।[১], [২]

---

১ মূল গল্পের ধারা অনেক ক্ষেত্রে ফুটনোটের আধিক্যবশত বাধা পায়। অধম কিন্তু ফুটনোট শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে দেয়—অর্থাৎ কোনো পাঠক যদি ফুটনোট আদৌ না পড়েন তবে তিনি মূল গল্পের (টেক্স্টের) কোনো প্রকারের সারবস্তু থেকে বঞ্চিত হবেন না। ফুটনোটে থাকবার কথা মূল গল্পের—বক্তব্যের—সঙ্গে সম্পর্কিত নানাপ্রকারের আশ-কথা পাশ-কথা, যেগুলো অত্যধিক কোতূহলী পাঠক পড়েন যাতে করে কিঞ্চিত ফালতো জ্ঞান সঞ্চয় হয় কিংবা/এবং যাঁরা বইখানা পয়সা দিয়ে কিনেছেন বলে বিজ্ঞাপনতক্ বাদ দেন না। অন্যদের জন্য মিষ্টান্নই যথেষ্ট—অর্থাৎ আটপৌরে পাঠক টেক্স্ট্ পড়েই সন্তুষ্ট। ফুটনোটে এমন কিছু দেওয়া যেটা না পড়লে মূল কাহিনী বুঝতে অসুবিধা হয়—লেখকের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ।

২ ভ্রাতৃহত্যার চিহ্নস্বরূপ সদাপ্রভু কাইনের কপালে একটি লাঞ্ছনা এঁকে দেন। লেখকের 'প্রেম' অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

খুন-খারাবীর ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন লাস গায়েব করার জন্য যুগ যুগ ধরে খুনী কত না আজব-তাজ্জব কায়দাকেতা বের করেছে। অবশ্য খুনী যদি ডাক্তার হয় (না পাঠক, ডাক্তার-বদ্যি-হেকিম 'চিকিৎসা'র অছিলায় যে 'খুন' করে তার কথা হচ্ছে না) তবে তার একটা মস্ত বড় সুবিধা আছে। বছর বিশেক পূর্বে বিলাতবাসী এক 'কালা-আদমী' সার্জন তার মেম বউকে খুন করে; বাথটাবে লাস ফেলে সেটাকে ডাক্তারি কায়দায় টুকরো টুকরো করে কেটে ড্রইংরুমের চিমনিতে ঢুকিয়ে দিয়ে সমুচিত লাসটা পুড়িয়ে ফেলে। কিন্তু 'পাক প্রণালীতে' করলো একটা বেখেয়ালির ভুল। তখন ভর গ্রীষ্মকাল —ড্রইংরুমে আগুন জ্বালাবার কথা নয়। দু'একজন প্রতিবেশী ঐ ঘরের চিমনি দিয়ে যে ধুঁয়ো উঠছে সেটা লক্ষ্য করলো। ডাক্তারের বউ যে হঠাৎ গায়েব হয়ে যায়, সে যে মাঝে মাঝে ডাইনে-বাঁয়ে 'সাইড-জাম্প' দিত, স্বামী-স্ত্রীতে যে ইদানীং আকছারই বেহদ্দ ঝগড়া-ফসাদ হত এসব তত্ত্ব পাড়াপড়শীর অজানা ছিল না। পুলিস সন্দেহের বশে সার্চ করে চিমনিতে ছোট্ট ছোট্ট হাড় পেল, চানের টাব্‌টা যদিও অতিশয় সযত্নে ধোওয়া-পোঁছা করা হয়েছিল তবু সূক্ষ্ম পরীক্ষা করে মানুষের রক্তের অভ্রান্ত চিহ্ন পাওয়া গেল। ...মোদ্দা ডাক্তারকে ইহলোক ত্যাগ করার সময় মা ধরণীর সঙ্গে সমান্তরাল (হরাইজন্‌টাল) না হয়ে লম্বমান (পারপেণ্ডিকুলার) হয়েই যেতে হয়েছিল।

অবশ্য ডাক্তারের ফাঁসি হওয়ার পর তার আপন লাস নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তার কারণ ছিল না—কারোরই। যে সরকারী কর্মচারী—অশ্লীল ভাষায় যাকে বলে 'হ্যাঙম্যান'—ডাক্তারের গলায় প্রয়োজনাতীত দীর্ঘ প্রয়োজনাধিক দৃঢ় একটি নেক্‌টাই সযত্নে পরিয়ে ডাক্তারের পায়ের তলার টুলটি হঠাৎ লাথি মেরে ফেলে দেয় সে এই 'অপকর্ম'-টি করেছিল জজসাহেবের আদেশে, সামনে ঐ ডাক্তারেরই পরিচিত আরেক ডাক্তারকে এবং জেলারসাহেবকে সাক্ষী রেখে। শুনেছি, এদেশের সরকারী ফাঁসুড়ে আসামীর গলায় দড়ি লাগাবার সময় তাকে মৃদুকণ্ঠে বলে, 'ভাই, আমার কোনো অপরাধ নিয়ো না; যা করছি সরকারের হুকুমে করছি।' ইউরোপীয় ফাঁসুড়েদের এ-রকম ন্যায়ধর্ম-জাত কোনো সূক্ষ্মানুভূতি নেই। সেখানে ফাঁসুড়ে তার মজুরির উপর ফাঁসির দড়াটা বকশিশ পায় এবং সে সেটা ছোট ছোট টুকরো করে পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে আক্রাদরে বেচে—ফাঁসির দড়ি নাকি বড্ড পয়মন্ত।

কিন্তু সরকার, রাজা বা ডিক্‌টেটর যেখানে বেআইনী খুন করে সেখানে এদের সামনেও সেই সমস্যাই দেখা দেয়। যখন পাইকিরি হিসেবে খুন করা হয় তখন দেখা দেয় আরো দুটি সমস্যা ঃ

(১) যাদের খুন করা হবে তাদের মনে সন্দেহ না জাগিয়ে কি প্রকারে তাদের একজোট করা যায়?

(২) খুন করার জন্য অল্প খরচে অল্প সময়ে কি প্রকারে বিস্তর লোকের ভবলীলা সাঙ্গ করা যায়?

জরমন মাত্রই স্ট্যাটিস্টিকসের ভক্ত। একশটি মেয়েছেলের মধ্যে যদি

নব্বুইটি কুমারী হয়, এবং দশটি গর্ভবতী হয় তবে তারা টরেটক্কা হিসেব করে বলে এই একশটি মেয়ের প্রত্যেকটি নব্বুই পারসেন্ট্ অক্ষতযোনি কুমারী এবং দশ পারসেন্ট্ গর্ভবতী।

হিটলার এই ন্যায়শাস্ত্র অবলম্বন করে বললেন, 'নব্বুই পারসেন্ট্ তো ইহুদি—বাদবাকি দশ পারসেন্ট্ জিপ্সি, পাগল (বসে বসে শুধু খায়, লড়াইয়ের ব্যাপারে কোনো সাহায্যই করে না) ইত্যাদি। ঐ হল!—জিপ্সিও নব্বুই পারসেন্ট্ ইহুদি।' হিসেবে মিলে গেল।

দেখা গেল, হিটলারের তাঁবেতে ১৯৪১-৪২ সালে যে-সব রাষ্ট্র এসেছে এবং আসছে তাতে আছে প্রায় আশি লক্ষ ইহুদি—এখানে আমি জিপ্সি, পাগল, হিটলারবৈরী ফরাসী-জরমন-রুশ ইত্যাদিকে বাদ দিচ্ছি। হিটলার ডাকলেন হিমলারকে। ইনি পুলিস, সেকুরিটি, ইনটেলিজেন্স, হিটলারের আপন খাস সেনাদল (এরা দেশের সরকারী সৈন্য-বিভাগের অংশ নয়) কালো কুর্তীপরা এস এস এবং আরো বহু সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিকারী 'ফুয়রার'। হিটলার এঁকেই হুকুম দিলেন 'চালাও, কৎল্-ই-আম্।' অর্থাৎ পাইকারি কচুকাটা! নাদির তীমুর যখন দিল্লীতে এই পদ্ধতির প্রবর্তন করেন তখন 'কৎল-ই-আম'ই করেছিলেন। 'আম' = সাধারণ (দিওয়ান-ই-আম তুলনীয়) আর 'কৎল' = কতল। অবশ্য নাদির-তীমুর কৎল্-ই-আম্ করেছেন প্রকাশ্যে, হিটলার-হিমলার করলেন অতিশয় সঙ্গোপনে।[৩] বস্তুত হিমলার ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গো যে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন সেটা যেমন অভিনব এবং কুটিল, তেমনি ক্রূর এবং মোক্ষম। তদুপরি বাইরের থেকে তাবৎ ব্যাপারটা যেন করুণাময়ের স্বহস্তে নির্মিত নিষ্পাপ কবুতরটি; ভিতরে ছিল শয়তানের সাঙাৎ কালকুটেভরা বেইমান, অশেষ পাপের পাপী পঞ্চম পাতকী তার চেয়ে বেশী পাপী বিশ্বাসঘাতকী, কালনাগিনী। এ এক অভিনব সমন্বয়ঃ বাইরে কবুতর, অন্তরে বিষধর।

পূর্বেই বলেছি, প্রথম সমস্যাঃ তাবৎ ইহুদি একত্র করা যায় কোন্ পদ্ধতিতে? এই মর্মে একটি গোপন সভা আহ্বান করলেন হিমলারের ঠিক নীচের পদের কর্তা হাইডেরিষ বার্লিনের উপকণ্ঠে তাঁর শৌখিন ভিলা ভানজে-

৩ হিটলারের খাস 'ভালে' ছিলেন লিঙে। তিনি এতই বিশ্বাসী ভৃত্য ছিলেন যে হিটলার-প্রিয়া (পর-স্ত্রী) এফা ব্রাউনের বিছানা পর্যন্ত করে দিতেন। যুদ্ধশেষে দশ বৎসর রুশদেশে বন্দীজীবন কাটিয়ে জরমনি ফিরে হিটলার সম্বন্ধে একখানি চটি বই লেখেন। 'হিটলারের প্রেম' ও 'হিটলারের শেষ দশ দিবস' (পুস্তকাকারে প্রকাশিত) প্রবন্ধে এঁর পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। লিঙেকে যখন পরবর্তীকালে শুধনো হয়, ইহুদি নিধন সম্বন্ধে বহু জরমন কিছুই জানতো না কেন, তিনি বলেন, হিটলার-হিমলার বহুবার সম্পূর্ণ একলা একলা গোপন সলাপরামর্শ করতেন। সে সময়ে সেখানে লিঙের চা-কফি নিয়ে যাওয়াও মানা ছিল।

তে। এ-সভায় আইষমানকেও ডাকা হয়, যদিও পদগৌরবে তিনি এমন কিছু কিষ্টবিষ্টু ছিলেন না। কিন্তু হাইডেরিষ ছিলেন সত্যিকার 'আদম-শনাস' মানুষের জৌরি—তিনি জানতেন আইষমান তালেবর ছোকরা, যতই ঝুটঝামেলার ঝকমারি ব্যাপার হক না কেন সেটার বিলিব্যবস্থা করে সব কিছু ফিটফাট করে নিতে সে পয়লা নম্বরী! সেই সুদূর স্তালিনগ্রাদ থেকে ফ্রান্সের পূর্ব উপকূল, ওদিকে নরওয়ে থেকে উত্তর আফরিকা অবধি সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ইহুদিগোষ্ঠী। আইষমানের উপর ভার পড়লো আড়কাঠি হয়ে এদের কয়েকটি কেন্দ্রে জড়ো করা।

আইষমান সম্বন্ধে বাঙলাতেও বই বেরিয়েছে; কাজেই তাঁর সম্বন্ধে আমাকে বিশেষ কিছু বলতে হবে না। শুধু একটি কথা এখানে বলে রাখি; বাঙলা বইয়ে আছে আইষমান পাঁচ লক্ষ ইহুদির মৃত্যুর জন্য দায়ী। এটা বোধ হয় স্লিপ। পাঁচ লক্ষ নয়, হবে পাঁচ মিলিয়ান অর্থাৎ পঞ্চাশ লক্ষ।

শব্দার্থে ছলে বলে এবং কৌশলে আইষমান যে-ভাবে ইহুদিদের জড়ো করে ছিলেন সেটা এত সুচারুরূপে আর কেউ সম্পন্ন করতে পারতো না এ-কথা তাবৎ নাৎসি, অ-নাৎসি সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন।

অনেকেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা, ইহুদিদের প্রতি হিটলারের এই যে আক্রোশ এর তো তুলনা পাওয়া ভার। এর কারণটা কি?

এর উত্তর দিতে হলে তিনভলুমী কেতাব লিখতে হয়। খৃষ্টধর্ম প্রবর্তনের কিছুকাল পর থেকেই আরম্ভ হয় খৃষ্টান কর্তৃক ইহুদি নিপীড়ন (এবং এরাই সর্ব প্রথম নয়—সেই খৃষ্টজন্মের হাজার তিন বছর আগে থেকে পালা করে মিশর, আসিরিয়া, ব্যাবিলনিয়া, রোমান সবাই এদের উপর অত্যাচার করেছে)। মধ্যযুগে স্পেনে একবার এক লক্ষ ইহুদিকে খেদিয়ে আফরিকায় ঠেলে দেওয়া হয়, এবং হাজার হাজার ইহুদিকে স্রেফ ধর্মের নামে খুন করা হয়।

কিন্তু হিটলার তো খৃষ্টান কেন কোনো ধর্মেই বিশ্বাস করতেন না। পারলে তিনি এ সংসারে কোন ধর্মেরই অস্তিত্ব রাখতেন না।

হিটলার ইহুদিদের বিরুদ্ধে মাঝে-মিশেলে যুক্তিতর্কের অবতারণা করতেন কিন্তু সেগুলো আকছারই পরস্পরবিরোধী। একদিকে বলতেন, ইওরো-আমেরিকার অধিকাংশ ক্যাপিটাল ইহুদিদের হাতে—যত বেকার সমস্যা, যত রক্তাক্ত বিপ্লব, যত যুদ্ধ ইওরোপে হচ্ছে তার পিছনে রয়েছে ইহুদি পুঁজিপতি। আবার একই নিশ্বাসে বলতেন, যে রুশ-কম্যুনিজম ইওরোপের সভ্যতা সংস্কৃতি ধনদৌলত সমূলে বিনাশ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে তার আগাপাস্তলা ইহুদি প্ররোচনায়। অর্থাৎ ইহুদি একাধারে কম্যুনিস্ট এবং ক্যাপিটালিস্ট। এবং যাঁরা তাঁর একমাত্র 'বই 'মাইন কাম্প্‌ফ্‌' (মাই স্ট্রাগল'—এর ঠিক ঠিক অনুবাদ নয়—'আমার জীবন সংগ্রাম' বললে অনুবাদটা মূল জরমনের আরো কাছাকাছি আসে। মোদ্দা 'আমি আমার জীবন আদর্শ বাস্তবে পরিণত করার জন্য সর্বপ্রকার বাধা-বিপত্তি সর্ব দুশমনের সঙ্গে যে লড়াইয়ের পর লড়াই যুঝেছি তার ইতিহাস') পড়েছেন তাঁরা জানেন

তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত দলিলপত্র পেশ করে কখনো সপ্রমাণ করেননি, করবার চেষ্টা দেননি। এর কারণটি অতিশয় সরল।

ইহুদি যে এ পৃথিবীর সর্ব দুঃখের কারণ এটা হিটলারের কাছে স্বতঃসিদ্ধ টেনেট অব ফেৎ (অন্যতম 'মৌলিক বিশ্বাস')। খৃষ্টান মুসলমান যে রকম যুক্তিতর্কের অনুসন্ধান না করে সর্ব সত্তা দিয়ে বিশ্বাস করে ইহসংসারের সর্ব পাপ সর্ব দুঃখ সর্ব অমঙ্গলের জন্য শয়তানটাই দায়ী, হিন্দু যেমন বিশ্বাস করে মানবজাতির সর্ব যন্ত্রণার জন্য তার পূর্বজন্মকৃত কর্মই দায়ী, ঠিক তেমনি হিটলার তাঁর সর্ব অস্তিত্ব দিয়ে বিশ্বাস করতেন বিশ্বভুবন জোড়া সর্ব অশিবের জন্য ইহুদি জাতটা দায়ী—অন্ধ খঞ্জ বৃদ্ধ অবলা শিশু ইহুদি, সব সব, সবাই দায়ী। তাঁর অন্তরঙ্গ জনকে তিনি অসংখ্যবার বলেছেন ইহুদিকুল ছারপোকা ইঁদুরের মত প্রাণী (ভারমিন)। ছারপোকা ধ্বংস করার সময় তো কোনো করুণা মৈত্রীর কথা ওঠে না, ইঁদুরের বেলাও কোনটা ধেড়ে কোনটা নেংটি সে প্রশ্নও অবান্তর।

এ-কথা সত্য আমরা ছারপোকা নির্বংশ করার সময় কোনো রাছবিচার করি নে; এবং যে কোনো প্রকারের প্রাণী হত্যা করলেই যে এদেশের কোনো কোনো সম্প্রদায় আমাদের 'খুনী' বলে মনে করেন সে তত্ত্বও আমাদের অজানা নয়। তৎসত্ত্বেও প্রশ্ন থেকে যায়, সত্যিই কি মানুষে ছারপোকাতে কোনো পার্থক্য নেই? ওদিকে আবার বহু খৃষ্টান সাধুসজ্জন ইহুদি ছারপোকাতে পার্থক্য করতেন বটে কিন্তু সেটা সামান্যই। আমি কাইন এবং আবেলের যে-বাইবেল কাহিনী দিয়ে এ নিবন্ধ আরম্ভ করেছি সেটিকে রূপকার্থে নিয়ে ঐসব সাধুসজ্জন কাইনকে ধরেন ইহুদিদের সিনাগগ (ধর্ম প্রতিষ্ঠান) রূপে এবং আবেলকে খৃষ্ট চার্চরূপে—অর্থাৎ ইহুদি তার আপন ধর্মবিশ্বাস দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে যেখানে খৃষ্টানকে খৃষ্টধর্মকে পায় সেখানেই তাকে নিধন করে। ইহুদি ভ্রাতৃহন্তা, সে বিশ্বঘ্ন।...পাঠক স্বপ্নেও ভাববেন না, আমি হিটলারের ইহুদি নিধন সমর্থন করছি। আমি এ প্রবন্ধ লিখছি অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে এবং এস্থলে আমি শুধু তাঁর বিশ্বাসের পটভূমিটির প্রতি ইঙ্গিত করছি; তাঁর মত আরো বহু 'বিশ্বাসী' যে পূর্ববর্তী যুগেও ছিলেন তারই প্রতি ইঙ্গিত করছি।

তা সে যাই হোক, এইসব ইহুদিদের এক জায়গায় জড়ো করতে মোটেই বেগ পেতে হয়নি—ছারপোকাতে ইহুদিতে ঐখানেই তফাৎ, ছারপোকা এক জায়গায় জড়ো করতে পারলে তো আধেক মুশকিল আসান! গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ইহুদি মুরুব্বীদের বলা হত, তাবৎ ইহুদি পরিবার যেন এক বিশেষ জায়গায় জড়ো হয়। তাদের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় কলনি পত্তন করা ববে। তারপর ট্রেনে মোটরে করে কানসানট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে তাদের দিয়েই একটা লম্বা নালা খোঁড়ানো হত। তারপর আদেশ হত, নালার প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াও। একদল এস্ এস্ ('ব্ল্যাক শার্ট'—হিটলারের খাস সেনাবাহিনী) পিছন থেকে গুলি করতো। অধিকাংশ ইহুদি গুলির ধাক্কায় সামনের নালাতে পড়ে যেত। বাকিদের লাথি মেরে মেরে ঠেলে ঠেলে নালাতে ফেলা হত।

সবাই যে সঙ্গে সঙ্গে মরে যেত তা নয়—সব সময় তাগ অব্যর্থ হয় না। এদের কেউ কেউ নালা থেকে হাত তুলে বোঝাবার চেষ্টা করতো তারা মরেনি—উদ্ধারলাভের জন্য চিৎকারও শোনা যেত। ওদিকে দৃকপাত না করে তাদের উপর নালার মাটি ফের নালাতে ফেলা হত এবং সর্বশেষে তার উপর স্টীমরোলার চালিয়ে দিয়ে মাটিটা সমতল করা হত।

নালা খোঁড়া, তার উপর ফের মাটি ফেলা এ-সব কাজের জন্য ইহুদিই যোগাড় করার জন্য কোনো বেগ পেতে হয়নি। একদল ইহুদিকে এই নিধন কর্মটি দাঁড় করিয়ে দেখানোর পর বলা হত তারা যদি গুলি করা ছাড়া অন্য সর্ব কার্যে সহায়তা করে তবে তারা নিষ্কৃতি পাবে।·· বলাই বাহুল্য এরা নিষ্কৃতি পায়নি। আখেরে ওরা ঐ একই পদ্ধতিতে প্রাণ হারায়—সাক্ষীকে ছেড়ে দেওয়া কোনো স্থলেই নিরাপদ নয়।

এইসব নিহতজনের অধিকাংশই বুড়োবুড়ী, ছেলেমেয়ে, কোলের শিশু এবং রুগ্ন অসমর্থ যুবক-যুবতী। সমর্থদের বন্দীদশায় একাধিক বড় বড় কারখানায় বেগার খাটার জন্য নিয়ে যাওয়া হত। আখেরে, অর্থাৎ ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে, যুদ্ধশেষের কিছুদিন পূর্বে এ:দেরও মেরে ফেলা হয়। যুদ্ধপূর্বে জরমনিতে ছিল ৫,৫০,০০ ইহুদি, যুদ্ধশেষে রইল ৩০,০০০। পোলান্ডের সংখ্যা বীভৎসতর; যুদ্ধপূর্বে সেখানে ছিল তেত্রিশ লক্ষ, যুদ্ধশেষে মাত্র ত্রিশ হাজার। এবং আশ্চর্য এই, ত্রিশ হাজারের চোদ্দআনা পরিমাণ লোক আপন দেশ ছেড়ে পুণ্যভূমি ইহুদি স্বর্গ ইজরাএলে যেতে রাজী হয়নি। অনেকেই বলে, 'জরমনি আমার পিতৃভূমি (ফাটেরলান্ট্), এদেশ ছেড়ে আমি যাব কেন? যে পিতৃভূমিতে সে তার অধিকাংশ আত্মজন হারালো তার প্রতি এই প্রেম প্রশংসনীয় না কাণ্ডজ্ঞানহীন একগুঁয়েমির চূড়ান্ত—জানেন শুধু সৃষ্টিকর্তা!

আমি বর্ণনাটা সংক্ষেপে সারলুম, কারণ ইহুদি নিধনের এটা অবতরণিকা মাত্র—'চলি চলি পা পা' মাত্র। যেমন যেমন এস এস-দের নিধনকর্মে অভিজ্ঞতা বাড়তে লাগল হননকর্ম তেমন তেমন সূক্ষ্মতর, বিদগ্ধতর ও ব্যাপকতর হতে লাগল।

ভিন্ন ভিন্ন ক্যাম্পের অধিকর্তা, যাঁরা গুলি মারার আদেশ দিতেন তাঁদের কয়েকজন যুদ্ধশেষে ধরা পড়েন। তাঁদের একজন ওলেনডর্ফ্। মিত্রশক্তি কর্তৃক জরমনির ন্যুরন্বের্গ শহরে সাক্ষ্যদানকালীন ওলেনডর্ফ্ আসামীপক্ষের উকিল আমেনের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'আমি এই পদ্ধতির সমর্থন করিনি।'

উকিল আমেন: 'কেন?'

ওলেনডর্ফ্: 'এ পদ্ধতিতে নিহত ইহুদি এবং যারা গুলি ছুঁড়তো উভয় পক্ষেরই মাত্রাহীন অসহ মানসিক যন্ত্রণা বোধ হত। ইহুদিদের প্রতি কসাই ওলেনডর্ফের এই 'দরদ' অভিনব, বিচিত্র। এই কুম্ভীরাশ্রুর একমাত্র কারণ তিনি তখন নিজেকে ফাঁসিকাঠ থেকে বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা দিচ্ছেন।

কিন্তু এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য, যে-সব এস এস সৈন্য গুলি ছুঁড়তো তাদের অনেকেই এই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার ফলে হঠাৎ সাতিশয় মন-মরা হয়ে যেত, মদ্য-মৈথুন ত্যাগ করতো, অবসর সময়ে সঙ্গীসাথী বর্জন করে এককোণে বসে বসে শুধু চিন্তা করতো। হিটলারের আদেশে তাদের গুলি ছুঁড়তে হবে—এ-কথা তাদের স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে। কাজেই তাঁর আদেশ লঙ্ঘনের কোনো প্রশ্নই উঠে না—বছরের পর বছর তারা ট্রেন্‌ড্‌ হয়েছে 'বশ্যতা'মন্ত্রে—অবিডিয়েন্‌স্‌ এবাভ অল—ফ্যুরারের আদেশে কোনো ভুল থাকতে পারে না, আপ্তবাক্যের ন্যায় তাঁর আদেশ অভ্রান্ত, ধ্রুব সত্য।

কিন্তু ঐ ভয়ংকর অভিজ্ঞতাটাও তো নির্মম সত্য!

হাল বয়ান করে হিমলার-যমকে জানানো হল। ইস্পাতের তৈরি সাক্ষাৎ যমদূত-পারা ক্বচিৎ এস এস-এর নার্ভাস ব্রেক-ডাউনের খবর পেয়ে তিনি উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন কিনা সে খবর জানা নেই। তবে একটা 'কেলেঙ্কারি'র খবর অনেকেই জানতো: ইহুদি নিধন যজ্ঞের গোড়ার দিকে হিমলারের একবার কৌতূহল হয়, 'ম্যাস-মারডার'—'পাইকারি কচু-কাটা' দেখার! একশ জন ইহুদি নারী-পুরুষকে সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে গুলি চালানো হল। সে দৃশ্য দেখে স্বয়ং শ্রীমান হিমলার ভিরমি যাচ্ছিলেন। সঙ্গীরা তাঁকে ধরে দাঁড় করিয়ে রাখলো। স্বয়ং যম যদি মৃত্যু দেখে চোখে-মুখে পাঙাস মারেন তবে বাল্যখিল্য যমদূতেরা 'কোঙ্গাবে' মা?[১] এবং আশ্চর্য! স্বয়ং হিটলারও চোখের সামনে রক্তপাত সহ্য করতে পারতেন না। এবং প্রাণীহত্যা আদৌ বরদাস্ত করতে পারতেন না বলে তিনি ছিলেন কড়া নিরামিষভোজী। মাংসাসীদের বলতেন 'শবাহারী'।

হিমলারের আদেশে দুখানা বিরাট মোটর ট্রাক তৈরি করা হল। দেখতে এমনি সাধারণ ট্রাকের মত, তবে চতুর্দিক থেকে টাইট ঢাকা এবং বন্ধ। শুধু বাইরের থেকে একটা পাইপ ভিতরে চলে গেছে। মোটর চালানোমাত্র বিষাক্ত গ্যাস ভিতরে যেতে থাকে, এবং দশ-পনেরো মিনিটের ভিতর অবধারিত মৃত্যু। ততক্ষণ অবধি ভিতর থেকে চাপা চীৎকার আর দরজার উপর ধাক্কা আর ঘুষির শব্দ শোনা যেত। প্রাচীন পাপী ওলেনডর্‌ফ্‌কে আদালতে শুধানো হল, 'ওদের তোমরা ট্রাকে তুলতে কি করে?'

---

৪ এই একশ' জনের ভিতর এক যুবতীকে দেখে হিমলার রীতিমত বিস্মিত হন। চেহারা, চুল, নাক আদৌ ইহুদির মত নয়। যে নরডিক্‌ (বিশুদ্ধতম আর্যরক্তের জরমন) জাত হিটলার হিমলার আদর্শ বলে ধরতেন তাদেরই মত ব্লনড চুল, নীল চোখ, ব্রিজহীন সোজা নাক ইত্যাদি। হিমলারের ডাকে সে এগিয়ে এলে হিমলার তাকে বললেন, 'তুমি ইহুদি নও।' গর্বিত উত্তর: 'না, আমি ইহুদি।' 'তুমি বলো, তুমি ইহুদি নও, আমি তোমাকে নিষ্কৃতি দেব।' গর্বিততর কণ্ঠে, 'না, আমি ইহুদি।' তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে ফিরে গিয়ে আপন জায়গায় দাঁড়ালো।

ওলেনডরফ্ঃ 'ওদের বলা হত তোমাদের অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

কিন্তু এ পন্থাতেও এস এস-দের কেউ কেউ সেই প্রাচীন চিত্তাবসাদে ভুগতে লাগলো। ট্রাক থেকে বের করার সময় দেখা যেত মৃতদেহের মুখ বীভৎস রূপে বিকৃত। গাড়িময় রক্ত মলমূত্র। একে অন্যের শরীরে জামাকাপড়ে পর্যন্ত—। একে অন্যকে এমনই জড়িয়ে ধরে আছে যে লোহার আঁকশি আর ফাঁস দিয়ে ছাড়াতে শরীর ঘেমে উঠতো, মুখ চকের মত ফ্যাকাসে হয়ে যেত, মগজে ভূতের নৃত্য আর চিন্তাধারায় বিভীষিকা।

অকল্পনীয় এই খুনে গাড়ি দুটোর অভাবনীয় মৌলিক আবিষ্কারক ডক্টর বেকারকে জানানো হল। আসলে ইনি এস এস-দের চিকিৎসক (এবং স্বয়ং এস্ এস্)। ইনি কিন্তু আমাদের সেই স্ত্রীহন্তা ডাক্তারের মত নন। তিনি 'এক-মেবা' করেই প্রসন্ন। ইনি 'ভূমার' সন্ধানে আবিষ্কারক হয়ে গিয়েছিলেন!

ঈষৎ বিরক্তির সুরে তিনি লিখলেন, 'আমি যে "ব্যবহার পদ্ধতি" লিখে দিয়েছিলুম (ঠিক যেভাবে তিনি ওষুধের প্রেসক্রপশনে 'সেবন পদ্ধতি' ডাই-রেকশন ফর ইউজ' লিখে থাকেন!) সেভাবে কাজ করা হয়নি। অপ্রিয় কর্ম তড়িঘড়ি শেষ করার জন্য গ্যাসযন্ত্র পরিচালক গ্যাস ছাড়ার হ্যাণ্ডিলটা একধাক্কায় সর্বশেষ ধাপে নিয়ে যায়; ফলে ইহুদিরা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। হ্যাণ্ডিল ধীরে ধীরে চালালে এরা আস্তে আস্তে আপন অলক্ষ্যে মৃদুমধুর নিদ্রায় প্রথম ঘুমিয়ে পড়ে, শেষনিদ্রা আস্তে আস্তে এবং এতে করে আরো কম সময়ে এদের মৃত্যু হয়। দরজায় ঘুষি, মলমূত্র ত্যাগ, বিকৃত মুখভঙ্গি, একে অন্যে মোক্ষম জড়াজড়ি—এসব কোনো উৎপাতই হয় না'।

অত্যুত্তম প্রস্তাব। কিন্তু তাহলেও তো বিরাট সমস্যার সমাধান কণা পরিমাণও হয় না। কারণ ফি ট্রাকে মাত্র পনেরো থেকে পঁচিশ জন প্রাণী লাদাই করা যায়। ওদিকে হিটলার হিমলার যে বিরাট সংখ্যার দিকে ঊর্ধ্বনেত্রে তাকিয়ে আছেন, এসব গাড়ি গণ্ডায় গণ্ডায় বানিয়েও তো সেখানে পেঁছিনো যাবে না। ঐ সময়েই রাশার কিয়েফ শহরের কাছে প্রায় চৌত্রিশ হাজার প্রাণীকে—এদের অধিকাংশই ইহুদি—মাত্র দু'দিনের ভিতর খতম করার হুকুম এল, এবং জরমন কর্মতৎপরতা সে কর্ম সম্পূর্ণ করলোও বটে। গ্যাসভান দিয়ে এত লোক এত অল্পসময়ে নিশ্চিহ্ন করা যেত না।

হিটলার হিমলারের আদেশ জরমনির ভিতরে বাইরে—বিশেষ করে পোলানডে অনেকগুলো কনসানট্রেশন ক্যাম্প্ (ক ক) নির্মাণ করা হয়। সর্ব-বৃহৎ ছিল আউশ্ ভিৎস্-এ। তার বড়কর্তা ছিলেন শ্রীযুক্ত হএস্।[৫] হিমলার তাঁকে ডেকে বললেন, 'ফ্যুরার (হিটলার) হুকুম দিয়েছেন, ইহুদিদের খতম করতে হবে, প্রথমত—খুব তাড়াতাড়ি, দ্বিতীয়ত—গোপনতম গোপনে।' কি পরিমাণ

---

৫ ইনি হিটলারের ডেপুটি রুডল্ফ্ হেস (Hess) নন, যিনি সন্ধিপ্রস্তাব নিয়ে ইংলণ্ডে যান। এঁর নাম Hoess।

ইহুদিকে খতম করতে হবে তার মোটামুটি হিসেব হিমলার দিলেন। ইয়োরোপে তখন এক কোটি ইহুদি; অবশ্য বহু জায়গা হিটলারের তাঁবেতে নয় বলে অসংখ্য ইহুদিকে পাকড়াও করা যাবে না।

ইতিমধ্যে ছোটখাটো দু-চারটি ক ক-তে ইহুদি নিধন সমস্যার খানিকটে সমাধান হয়ে গিয়েছে। মাঝারি রকমের একটা নিরন্ধ্র হলঘরে ইহুদিদের চাবুক মেরে মেরে ঢোকানো হয়। দরজা বন্ধ করে ছেড়ে দেওয়া হয় মনক্সাইড গ্যাস। আধঘণ্টার ভিতর এদের মৃত্যু হয়। কিন্তু এসব জায়গায় ছ মাসে আশী হাজারের বেশী প্রাণী নিশ্চিহ্ন করা যায় না। তা হলে তো হল না।

হয়েস্ খাঁটি জরমনদের মত পাকা লোক। কাজ আরম্ভ করার পূর্বে সব কটা ক ক দেখে নিলেন। (যুদ্ধশেষে হয়েস এক চাষা-বাড়িতে আশ্রয় নেন; সেখানে ধরা পড়েন। ন্যুরনবেরগ শহরে গ্যোরিঙ, হেস্, রিবেনট্রপ ইত্যাদির বিরুদ্ধে যখন মিত্রশক্তি মোকদ্দমা চালাচ্ছেন তখন হয়েস্ সাক্ষীরূপে যা বলেন তার নির্গলিতার্থ—)

'আমি ক ক-গুলো পরিদর্শন করে আদপেই সন্তুষ্ট হতে পারলুম না। প্রথমত মনক্সাইড গ্যাস যথেষ্ট তেজদার গ্যাস নয়, দ্বিতীয় চাবুক মেরে মেরে গ্যাস-ঘরে ঢোকাতে হলে বিস্তর লোকের প্রয়োজন, তৃতীয় সেই প্রাচীন সমস্যা লাসগুলোর সর্বোত্তম ব্যবস্থা কি হতে পারে?

কারণ ইতিমধ্যে দেখা গেল, গ্যাস-ভর্তি লাস পুঁতলে তারই ঠেলায় গোরের উপরের মাটি ফুলে ওঠে—কয়েকদিন অপেক্ষা করে তবে স্টীম-রলার চালানো যায়। তদুপরি লক্ষ লক্ষ লাসের 'বেশাতি'। অতখানি জায়গা কোথায়? আউশ-ভিৎস জায়গাটি ছিল নিকটতম গ্রাম থেকে কয়েক মাইল দূরে, নির্জনে এবং কাছেপিঠে লোক চলাচলের কোন সদর রাস্তাও তার গা ঘেঁষে যায়নি। তবু কেউ সেদিক দিয়ে যাবার সময় সেই বিরাট প্রতিষ্ঠানের দেউড়ির উপরের দিকে তাকালে দেখতে পেত লেখা রয়েছে 'স্নান প্রতিষ্ঠান', গেট দিয়ে দেখতে পেত, প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ পথের দু'পাশে কাতারে কাতারে শৌখিন মরসুমী ফুলের কেয়ারি। দূর থেকে 'নৃত্যসম্বলিত' হাল্কা গানের কনসারট সঙ্গীত ভেসে আসছে। কে বলবে সেখানে পৃথিবীর অভূতপূর্ব বিরাটতম নরনিধনালয়!

মেন রেল লাইন থেকে একটা সাইড লাইন করিয়ে নিলেন হের হয়েস্ তাঁর ক ক পর্যন্ত। যেদিনে যে সংখ্যার নরনারী শেষ করা সম্ভব সেই সংখ্যার ইহুদি গরুভেড়ার মালগাড়ির ট্রাকে করে নিয়ে আসা হয়েছে পোলাণ্ড থেকে, হাঙগেরি থেকে সুদূর রুশ থেকে। এদের খেতে দেওয়া হয়নি, ট্রাকে পানীয় জলের শৌচের ব্যবস্থা নাই। ট্রাক খোলা হলে দেখা যেত শতকরা আট থেকে দশজনা—বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে—মরে আড়ষ্ট হয়ে আছে। শীতকালে শুধু জমে গিয়েই এর সংখ্যা দেড়া হয়ে যেত।

এদের নামানো হত রেলকর্মচারীদের বিদেয় দেওয়ার পর।

ইহুদিদের বলা হয়েছে, এখানে এদের বিশেষ ওষুধ মাখানো জলে স্নান করিয়ে গা থেকে উকুন সরানো হবে (ডিলাউজিং)। তারাও দেউড়িতে দেখতে

পেত লেখা রয়েছে 'স্নান প্রতিষ্ঠান'। ফুলের কেয়ারি, ঘনসবুজ লন্, আর আবহাওয়া উত্তম হলে সেই লনের উপর বসেছে সুবেশী তরুণীদলের কনসারট। চটুল নৃত্য-সঙ্গীত শুনতে শুনতে তারা এগুতো রেসেপসনিস্ট্-এর কাছে। ইতিমধ্যে দুজন এস এস ডাক্তার ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, কারা কর্মক্ষম আর কারা যাবে গ্যাস চেম্বারে। শতকরা পঁচিশ জনের মত কর্মক্ষম যুবক-যুবতীকে আলাদা করে নিয়ে যাওয়া হত অন্য দিকে। যুবতী মা-দের কেউ কেউ আপন শিশু হতে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না বলে আপন স্কারটের ভিতর লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করতো, কিন্তু হয়েস বলেছেন, এস এস-দের তারা ফাঁকি দিতে পারতো না। এদিকে যারা গ্যাস চেম্বারে যাবে তাদের বলা হয়েছে তাদের টাকাকড়ি, গয়না ঘড়ি, মণিজওহর—মূল্যবান যাবতীয় বস্তু আলাদা করে রাখতে যাতে করে স্নানের শেষে যে যার মূল্যবান জিনিস ঠিক ঠিক ফিরে পায়। দেশ থেকে এদের নিয়ে আসার সময় তাদের বলা হয়েছে,—তারা ভিন দেশে নূতন, কলনি [দণ্ডকারণ্য ?] গড়ে তুলবে ; আপন দেশে ফেরবার কোনো সম্ভাবনা নেই, তাই—হীরাজওহর টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়ে যেতে)। ওদিকে কনসারটে পলকা নৃত্যসঙ্গীত বেজেই যাচ্ছে, বেজেই যাচ্ছে। 'তামাশা'টা পরিপূর্ণ করার জন্য কোনো কোনো দিন এদের ভিতর আবার স্থানীয় নৈসর্গিক দৃশ্যের পিকচার পোস্ট কার্ড্ দেওয়া হত—আত্মীয়স্বজনকে পাঠাবার জন্য। তাতে ছাপা রয়েছে 'আমরা মোকামে পেঁচেছি এবং চাকরি পেয়েছি ; এখানে খুব ভালো আছি ; তোমাদের প্রতীক্ষা করছি।' ইতিমধ্যে কয়েকজন অফিসার হন্তদন্ত হয়ে বলতেন, 'একটু তাড়াতাড়ি করুন ; নইলে পরের ব্যাচকে খামখা বসে থাকতে হবে যে!' তারপর সবাই সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় ঢুকতো সেই গ্যাস চেম্বারে।

হয়েস্ বলেছেন, 'ব্যাপারটা যে কি কখনই কেউই বুঝতে পারতো না তা নয়। তখন ধুন্ধুমার, প্রায় বিদ্রোহের মত লেগে যেত। তখন অন্যান্য ছোটখাটো ক ক-তে যে-রকম বেধড়ক চাবুক মেরে মেরে ঢোকানো হয় তাই করা হত।

একটা হল্-এ প্রায় দু'হাজারের মত লোক ঠাসা যেত।

এত লোককে একসঙ্গে শাওয়ার-বাথে ঢোকানো হল—তাই দেখে অন্তত তখন, অনেকেরই মনে বিভীষণ সন্দেহ জাগতো। কিন্তু ততক্ষণে 'টু লেট।' ফ্রিজিডেরের দরজার মত নিরন্ধ্র বিরাট দু' পাট দরজা তখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দেয়ালের কাছে যারা দাঁড়িয়েছে তারা শাওয়ারের চাবি খুলে দেখে জল আসছে না।...এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আসতে লাগল অন্য জিনিস ... দরজা বন্ধ করে দেওয়ার পর লন-এ উপস্থিত একজনের দিকে ইসারা দেওয়া হত। সঙ্গে সঙ্গে সেই এস এস সেখানে একটা পাইপ খুলে ছেড়ে দিত এক টুকরো নিরেট ক্রিসটেলাইজড 'সাইক্লন বী' গ্যাস।৬ এই বস্তুটি অক্সিজেনের

৬ কোন্ প্রকারের গ্যাস, কেমিকেল ইত্যাদি সম্বন্ধে এ-লেখকের বিন্দুমাত্র

সংস্পর্শে আসামাত্রই মারাত্মকতম গ্যাসে পরিবর্তিত হয়ে পাইপের ভিতর দিয়ে উন্মুক্ত শাওয়ারের ছিদ্র দিয়ে বেরুতে থাকতো। এক নিশ্বাস নেওয়া মাত্রই মানুষ ক্লরফরম্ নেওয়ার মত সংজ্ঞা হারায়। যাদের নাকে তখন গ্যাস ঢোকেনি তারা তখন চিৎকার আর ধাক্কাধাক্কি করতো বন্ধ দরজার দিকে এগোবার জন্য আর যারা দরজার কাছে, তারা আপ্রাণ ঘুষি মারতো বন্ধ দরজার উপর। সেই মৃত্যুভয়ে ভীত প্রাণাতঙ্কে উন্মত্ত জনতা দরজার দিকে ঠেলে ঠেলে সেখানে মনুষ্য-পিরামিডের আকার ধারণ করতো।

মোক্ষম পুরু কাঁচের ছোট্ট একটি গবাক্ষের ভিতর দিয়ে 'করুণাসাগর' এস্ এস্-রা (তিন থেকে পনরো মিনিটের মধ্যেই সব শেষ—আবহাওয়া ও মৃত্যোৎসর্গিত প্রাণীর উপর নির্ভর করতো সময়ের তারতম্য।) যখন দেখতো অচৈতন্য শরীরগুলো আর থেকে থেকে হ্যাঁচকা টান দিচ্ছে না, তখন ইলেকট্রিক পাম্প দিয়ে ভিতরকার গ্যাস শুষে নেওয়া হত। বিরাট দরজা খোলা হত।

গ্যাস মাস্ক্ (ছিদ্রহীন মুখোশ), রবারের হাঁটু-ছোঁয়া বুট পরে হাতে হোস পাইপ নিয়ে ঢুকতো একদল ইহুদি—পূর্বেই বলেছি এদের লোভ দেখানো হয়েছে, প্রয়োজনীয় কাজ করে দিলে এদের মুক্তি দেওয়া হবে।

দরজা খোলামাত্র লাশের পিরামিড, এমন কি যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরেছে তারাও, মাটিতে পড়ে যেত না। একে অন্যকে তখনো তারা জাবড়ে আঁকড়ে ধরে আছে। নাকমুখ দিয়ে বেরোনো রক্ত, ঋতুস্রাবের রক্ত, মলমূত্র সব লাশ ছেয়ে আছে, মেঝেতেও তাই। ইহুদিদের প্রথম কাজ হত হোস দিয়ে সব কিছু সাফসুৎরো করা। তারপর আঁকশি আর ফাঁস দিয়ে মৃতদেহগুলো পৃথক পৃথক করা। এরপর লাশগুলোর হাত থেকে আংটি সরানো হত, ডেনটিস্টরা এসে সাঁড়াশি দিয়ে মুখ খুলে সোনার, সোনা বাঁধানো দাঁত—দরকার হলে হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে—বের করে নিত। মেয়েদের মাথার চুল দু-চারবার কাঁচি চালিয়ে কেটে নিয়ে বস্তায় পোরা হত—পরে কৌচসোফা এই দিয়ে তুলতুলে করা হবে এবং যুদ্ধের অন্যান্য কাজে লাগবে। সর্বশেষ ইহুদি 'জমাদাররা' স্ত্রী পুরুষ উভয়ের গোপনস্থলে 'পরীক্ষা' করে দেখে নিত হীরকজাতীয় মহা মূল্যবান কোন বস্তু লুকনো আছে কিনা।

ন্যুরনবের্গ মোকদ্দমায় বলা হয় যে কোনো কোনো ক ক-তে লাসের চর্বি

ধারণা নেই। জরমন এন্সাইক্লপীডিয়া বলেন Zyklon (ৎসাইক্লন) এক প্রকারের অতি মারাত্মক বিষাক্ততম প্রাসিক (হাইড্রো সায়েনিক) এসিড। হয়েন্-এর উৎসাহে এক বৈজ্ঞানিক 'ৎসাইক্লন বা' Zyklon B আবিষ্কার করেন। এরই অন্য নাম Zyanwasserstoffkristalle; অর্থাৎ Zyankali Cyanide of Potassium, Wasserstoff = hydrogen॥ মূল ৎসাইক্লন ব্যবহার করা হত খাদ্যশস্যবিনাশকারী কীট পতঙ্গ ইঁদুর মারার জন্য। নামটা ব্যবসায়ে ব্যবহৃত।

ছাড়ানো হত সাবান ইত্যাদি তৈরী করার জন্য, এবং কোনো এক বিশেষ ক ক-র প্রধান কর্মচারীর শৌখিন পত্নী মানুষের চামড়া দিয়ে ল্যাম্প-শেড্ তৈরী করাতেন। কিন্তু এগুলো সপ্রমাণ হয়নি। অধমের নিবেদন, অনাহারে অত্যাচারে রোগব্যাধি তথা অসহ মানসিক ক্লেশে ইহুদিদের দেহে তখন যেটুকু চর্বি অবশিষ্ট ছিল, তা দিয়ে একটি কবরেজী বড়িও হয় না।

মণিমাণিক্য অলংকারাদি জরমন স্টেট ব্যাংকে পাঠানো হত। এ পদ্ধতিতে স্টেট ব্যাংক কি পরিমাণ মাল পেয়েছিলেন তার হিসাব যুদ্ধশেষে নির্ধারিত করা যায়নি। তবে ব্যাংক বেশীর ভাগ বিক্রি করে দেওয়ার পরও যা পাওয়া গিয়েছিল তাই দিয়ে যুদ্ধশেষে মারকিনরা তিনটে বিরাট বিরাট ভলট কাঁঠাল-বোঝাই করেছিল। এবং একখানা চিঠি থেকে কি পরিমাণ মাল যোগাড় করা হয়েছিল তার কিছুটা হদিস মেলে। স্টেট ব্যাংক সরকারী লগ্নী প্রতিষ্ঠানকে সে চিঠিতে লেখেন, 'এই দুসরা কিস্তিতে আমরা যা পাঠাচ্ছি তার মধ্যে আছে, ১৫৪ সোনার পকেট-ঘড়ি, ১৬০১ সোনার ইয়ারিং, ১৩২ ডায়মন্ড আংটি, ৭৮৪ রুপোর পকেট ঘড়ি, ১৬০ বিশুদ্ধ ও মিশ্রিত সোনার দাঁত, ইত্যাদি ইত্যাদি—অতি দীর্ঘ সে ফিরিস্তি। চিঠি লেখা হয় ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪২-এ। এবং ইহুদি নিধন চালু ছিল 'ফুল্ (গ্যাস) স্টিমে' ১৯৪৪-এর শেষ পর্যন্ত—এবং তারপর মন্দগতিতে। মারকিনরা এখনো তাই ঠিক ঠিক 'মোট-জমা' প্রকাশ করতে পারেননি।

কিন্তু এসব জিনিস থাক। যে-জিনিসটা জনৈক মারকিন অফিসারকে অত্যন্ত বিচলিত করেছিল (এবং আমাকেও করেছে) সেটা নিবেদন করার পূর্বে বলি, এই অফিসারটি রীতিমত হারড্ বয়েল্ড ঝাণ্ডু—বিস্তর লড়াই লড়েছেন, বীভৎস সব বহু বহু দৃশ্য দেখেছেন, গণ্ডায় গণ্ডায় গুপ্তচরকে তাঁর সামনে তাঁরই আদেশে গুলি করে মারা হয়েছে (যুদ্ধের সময় গুপ্তচর নিধন আন্তর্জাতিক আইনে বাধে না); সে-সবের ঠাণ্ডা-মাথা হিমশীতল বর্ণনা পড়ে মনে হয়, ওসব ক্ষেত্রে ভদ্রলোকের নেকটাইটি পর্যন্ত এক মিলিমিটার এদিক-ওদিক হয়নি কিন্তু তার 'ওয়াটারলু' এল যুদ্ধের পর, আউশভিৎস দেখতে গিয়ে, টুরিস্টরূপে (এখনো ওটি সে-অবস্থাতেই রাখা আছে—পাঠক নেকস্ট্ ট্রিপে সেটা দেখে নেবেন। আমি হিম্মৎ করতে পারিনি)। মারকিন অফিসার গ্যাস চেম্বার পোড়াবার জায়গা, বন্ধ চুল্লি খোলা চুল্লি সব—সব দেখলেন। সর্বশেষে গাইড নিয়ে গেল একটা গুদোম ঘরে যেখানে নিহত ইহুদিদের অপেক্ষাকৃত কম দামী জামা-পাপড়, জুতো-মোজা সারে সারে সাজানো ছিল।

তারই এক অংশে তিনি দেখতে পেলেন চল্লিশ হাজার জোড়া জুতো। ক্ষুদে ক্ষুদে। নিতান্ত কাঁচা-কচি শিশুদের।

এবারে আমরা যে-প্রসঙ্গ নিয়ে এ নিবন্ধ আরম্ভ করেছি সেখানে ফিরে যাই।

মারকিন মনস্তত্ত্ববিদ ডঃ গিলবারট আউশ্‌ভিৎস ক্যাম্পের কর্তা হয়েস্‌কে আশ্চর্য হয়ে শুধোন, 'এত অসংখ্য লোককে তোমরা মারতে কি করে?' হয়েস্

বাধা দিয়ে শান্তকণ্ঠে বললেন, 'আপনি তাবৎ জিনিসটাকে ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন। মারাটা তো সহজ। মিনিট পনেরো লাগে কি না লাগে, দু' হাজার লোককে মেরে ফেলতে (হয়েস্ বোধ করি জানতেন না যুদ্ধের শেষের দিকে এক জরমন ডাক্তার 'চমৎকার' একটি ইনজেকশন বের করেন, এবং মোদ্দা কথা তার দাম ফীনলের চেয়েও কম ;—ঘাড়ের কাছে সে ইনজেকশন আনাড়িতেও দিতে পারে, শিকার খতম হয় মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ভিতর)। কিন্তু আসল সমস্যা লাশগুলো নিশ্চিহ্ন করা যায় কি করে। বিরাট বিরাট চুল্লি তৈরী করে এবং সেগুলো চব্বিশ ঘণ্টা চালু রেখেও আমরা ঐ সময়ের ভিতর দশ হাজারের বেশী লাশ নিশ্চিহ্ন করতে পারতুম না। মনে রাখতে হবে চুল্লি থেকে মাঝে মাঝে হাড় আর ছাই বের করতে হত। হাড়গুলো মেশিনে গুঁড়ো করে ছাইসুদ্ধ পাশের নদীতে ফেলে দেওয়া হত (শুনেছি তো হাড়ের গুঁড়ো আর ছাই উত্তম সার—তবে জরমনরা এটা বরবাদ করতো। কেন ?—যেস্থলে চুল পর্যন্ত কাজে লাগানো হচ্ছে—লেখক)। মোটামুটি বলতে গেলে আমরা আউশভিৎসে ২৭ মাসে ২৪৩০০০০ (প্রায় সাড়ে চব্বিশ লক্ষ) লোক মেরেছি।'

আইষম্যান গর্ব করে বলেছিলেন, সব কটা ক ক-তে মিলে সবসুদ্ধ পঞ্চাশ লক্ষ প্রাণী খতম করা হয়। হয়েস্ স্বীকার করেছেন, শত চেষ্টা সত্ত্বেও লাশ নিশ্চিহ্ন করার কাজটা গোপন রাখা যায়নি। অর্থাৎ গ্যাস চেম্বারে নিধন কর্মটি গোপন রাখা যায়, কিন্তু মাটিতেই পোঁতো আর পুড়িয়েই ফেল—সেটা কিন্তু গোপন রাখা যায় না। লাশ-পোড়ানোর তীব্র উৎকট গন্ধ, আর চিমনির চোঙ্গা থেকে যে ধুঁয়ো বেরুচ্ছে তার ছাই ছড়িয়ে পড়তো কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত চতুর্দিকের গ্রামে। তারা বুঝে যেত ঐ নিরীহ "স্নান-প্রতিষ্ঠান" কোন্ 'বিশ্ব-প্রেমের খয়রাতী রাজকার্যে' লিপ্ত আছেন এবং শুধু সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করতো বাতাস যেন তাদের আপন বসত গ্রামের দিকে না যায়! এটা কিছু নূতন নয়। যুদ্ধের গোড়াতেই এই নিধনযজ্ঞ হিটলার আরম্ভ করেন জরমনির পাগলা-গারদগুলো দিয়ে—পাগলদের ভিতর অবশ্য কিছু ইহুদিও ছিল, কিন্তু অধিকাংশই খাঁটি জরমন। নামকে ওয়াস্তে একটা কমিশন বসলো—এত অল্প-সংখ্যক পাগল রেহাই পেল, যদি আদৌ কেউ পেয়ে থাকে, যে সেটার কোনো উল্লেখ পর্যন্ত নেই—এবং পাগলদের কতকগুলো কেন্দ্রে জড়ো করে গ্যাস মার-ফৎ মেরে পুড়িয়ে দেওয়া হল। এটা স্রেফ খুন। জরমন আইনে নিকটতম তিনজন আত্মীয়ের অনুমতি ভিন্ন পাগলকে এক প্রতিষ্ঠানথেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে সরানো পর্যন্ত যায় না—নিধন করার (যাকেভদ্রভাষায় বলা হয় 'মার্সি কিলিং' = 'অনন্ত যন্ত্রণা থেকে রেহাই দেবার জন্য দয়াবশত কাউকে হত্যা করা' কিংবা 'অনারোগ্য ক্যানসারের অসহ যন্ত্রণায় রোগী যখন বিষ খেতে চায় তাকে বিষ এনে দেওয়া।' ডাক্তারি আইনে একে বলা হয়—Euthanasia, গ্রীক সমাস) তো কোন কথাই ওঠে না! পাগলদের মেরে পুড়িয়ে ফেলার প্রধান কেন্দ্র ছিল হাডামার নামক গ্রামে। তারই পাশের লিম্বুরগ্ শহর। সেখানকার বিশপ জরমনির আইন-মন্ত্রীকে একখানা চিঠিতে জানান, "ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা

পর্যন্ত সেই বন্ধ বাসগুলো চেনে, যার ভিতরে করে পাগলদের হাডামারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এর কোনো একটাকে দেখলেই ছেলেরা বলে ওঠে—ঐ যাচ্ছে 'খুনের বাক্স' = 'মার্ডার বক্স'। তাচ্ছিল্যভরে কথায় একে অন্যকে বলে, 'ক্ষেপলি নাকি ?—যাবি নাকি হাডামারের বেকিং বক্সে (যাতে কেক বানানো হয় ; এস্থলে লাশ পোড়াবার চুল্লি) ?' হাডামারের চিমনি ছাড়ে ধুঁয়ো আর সেখানকার অধিবাসীরা are tortured with the ever-present thought of depending on the direction of the wind. তবু এ কথা সত্য এ-সব খুন-খারাবী লাশ পোড়ানোর খবর দেশময় ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। যারা জানতো, তারা জানতো। অন্য কাউকে বলতে গিয়ে কেউ গেস্তাপোর ('গোপন পুলিস'—এদের প্রধানতম কর্ম ছিল রাজনৈতিক, অনেকটা রুশের 'ওগপু'র মত—এদের কাহিনী ক ক-র চেয়েও বীভৎসতর) হাতে ধরা পড়লে প্রথম তার কল্পনাতীত নানা অত্যাচার এবং এতেও যদি সে না মরে তবে সর্বশেষে তাকে কোনো একটা ক ক-তে সমর্পণ এবং সেখানে গ্যাস-চেম্বারে মৃত্যু। কাজেই হাডামার বা ক ক-গুলোতে কি হচ্ছে সে-সম্বন্ধে মুখ খুলে কেউ রা-টি কাড়তো না। তাই ঐ আমলে একটা চুটকিলা রসিকতা সৃষ্ট হয়—

'তুই নাকি, ভাই, ডেনটিস্ট্রি পড়া ছেড়ে দিয়েছিস ?'

'বাধ্য হয়ে ছাড়তে হল। কেউ যে মুখ খুলতে রাজী হয় না।'

লিমবুরগ্-এর বিশপের চিঠি পেয়ে আইনমন্ত্রী হিটলারের আপন আইন উপদেষ্টার কাছে এ-বাবদে অনুসন্ধান করলেন। আইন-উপদেষ্টা হিটলারের সেই চিঠি দেখালেন। আইনমন্ত্রী বললেন, 'এটা তো তাঁর নির্দেশ। এটা তো আইন নয়। আপনারা তা হলে এটাকে আইনের রূপ দিন, সেটাকে তারপর দেশে প্রবর্তিত করুন।'...তা হলে তো চিত্তির ! কারণ, জরমন পারলিমেণ্ট আইন করার সর্বক্ষমতা সর্ব অধিকার হিটলারকে দিয়েছিল বটে, কিন্তু আইন মাত্রই সরকারী গেজেটে প্রকাশ করতে হয়। তারপর এক বছর কেটে গেল, আইনমন্ত্রী কোন উত্তর পেলেন না। ইতিমধ্যে দেশের সব পাগল খতম। সমস্যাটার সুচারু সমাধান হয়ে গেল আপ্সে আপ্। কোনো কোনো দেশে যে রকম দুর্ভিক্ষের সমস্যা আপ্সে আপ্ সমাধান হয়ে যায় কয়েক লক্ষ লোক না খেয়ে মরে যাওয়ার পর।

লাখ তিরিশ বা পঞ্চাশেক ইহুদিকে যে ওপারে পাঠানো হল তার জন্যও কোনো 'আইন' বিধিবদ্ধভাবে তৈরী করা হয়নি। কিন্তু সে মামেলা নিয়ে কখনো কোনো লেখালেখি হয়নি,—ফরিয়াদ করবে কে ?—হলেও সেটা লোক-চক্ষু গোচর হয়নি। পবিত্র পিতা পোপের কাছে কোনো নিধনই অজানা ছিল না। তিনি থেকে থেকে বিশ্বজন তথা সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে হিটলারের কাছে 'এপীল' করতেন 'ক্রিস্টিয়ান চ্যারিটি' দেখবার জন্য। এর বেশী তিনি কিছু করে উঠতে পারেননি।[৭]

৭ যুদ্ধের পর হিটলারের প্রতি পোপের আচরণ নিয়ে তুমুল বাগ্বিতণ্ডা

হিটলার ক ক-তে কত লক্ষ ইহুদি, রুশ, বেদে ইত্যাদিকে নিহত করেন সেই সংখ্যা নিয়ে যখন ন্যুরনবের্গ মোকদ্দমায় তুমুল তর্কাতর্কি হচ্ছে তখন আসামীদের একজন ছিলেন ফ্রানক্। (এঁরই আদেশে অসংখ্য ইহুদিকে আইষমানের হাতে সমর্পণ করা হয় এবং বিচারে ফাঁসি হয়। ঐ বিচারে উনিই একমাত্র আসামী যিনি নিজেকে 'দোষী বলে স্বীকার করেন) সেই তর্কাতর্কির ভিতর আসামীদের কাঠগড়ার পিছনে যে মারকিন সান্ত্রী দাঁড়িয়েছিল সে শুনতে পেল (যে-সব মার্কিন জোয়ান উত্তম জরমন জানতো তাদেরই এ-কাজে নিয়োজিত করা হত এবং এরা ভাবখানা করতো যেন জরমন বিলকুল বোঝে না—ফলে আসামীরা নিজেদের ভিতর এমন সব কথা বলে ফেলত যেগুলো সান্ত্রীরা ফরিয়াদি পক্ষের মারকিন উকীলকে জানিয়ে দিত। আমার মনে হয় এটা অত্যন্ত বেআইনী ব্যাপার। কিন্তু মারকিন 'আইনকানুন' যেন 'শিবঠাকুরের আপন-দেশে/আইন কানুন সব নেশে।') ফ্রানক্ ফিসফিস করে তাঁর সহ-আসামী হিটলারের অন্যতম মন্ত্রী রোজনবের্গকে বলছেন, 'এরা—অর্থাৎ মারকিনিংরেজসহ মিত্রশক্তি—চেষ্টা করছে, আউশ্‌ভিৎসে দৈনিক যে দু হাজার ইহুদি মারা হত তার কুল্লে গুনাহ্ কাল্‌টেনব্রুনারের উপর চাপাবার।[৮] কিন্তু ঐ যে মার্কিনিংরেজের বোমাবর্ষণের ফলে ঘণ্টা দুয়েকের ভিতর হামবুর্গ বন্দরে ত্রিশ হাজার লোক মারা গেল তার কি? এদের বেশীর ভাগই তো ছিল শিশু এবং অবলা। তার পর ঐ যে জাপানে এটম্ বম্ ফেলে আশী হাজার লোক মারা হল তার কি? এই বুঝি ন্যায়, এই বুঝি ইনসাফ্?

হয়—তামাম ইওরোপ আমেরিকা জুড়ে। পোপবেরীরা তাঁকে যে পরিমাণে দোষী সাব্যস্ত করেছেন সেটা সাধারণ রাজনৈতিকের পক্ষে মারাত্মক হত। এঁরা স্মরণ করিয়ে দেন, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে হিটলার জরমন রাষ্ট্রের চ্যান্‌সেলর (সর্বাধিকারী) হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পোপ জরমনিতে আপন রোমান ক্যাথলিক চার্চ্ ও তস্য বিশ্বাসীগণকে নাৎসি নিপীড়ন থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে হিটলারের সঙ্গে একটি চুক্তি (কন্‌করডাট্) করেন। এতে করেই বিশ্বজন সমাজ মাঝে হিটলারের জল চল হয়ে যায়। তারপর আর সে 'পাগলা জগাই'-কে আর ঠেকায় কে? এই তাবৎ মামেলা নিয়ে মধ্য ইওরোপে ফিলিম এবং নাট্যও দেখানো হয়। ক্যাথলিক সমাজ স্বভাবতই অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। কলকাতাবাসীদের মনে থাকতে পারে, বহু বৎসর পূর্বে অংশতম পোপ-বিরোধী 'মারটিন লুথার' নামক একটি ফিলিম দেখবার সময় তথাকার ক্যাথলিকগণ ফিলিমটির বিরুদ্ধে রচিত ছাপা হ্যান্‌ড্-বিল বিতরণ করেন, এবং সেটাকে বয়্‌কট্ করার জন্য অনুরোধ জানান।

৮ নাৎসি রাজত্বে ক্ষমতার ধাপগুলো ছিলঃ হিটলার—হিমলার—কাল্‌টেন্-ব্রুনার—আইষম্যান্। হিটলার হিমলার আত্মহত্যা করেন—আইষমান তখন ফেরার। ফলে সব চাপ গিয়ে পড়ে কাল্‌টেন্ ব্রুনারের উপর। এরও ফাঁসি হয়। নিষ্ঠুরতায় এর সমকক্ষ লোক পাওয়া কঠিন।

রোজেনবের্গ হেসে উত্তর দিলেন, আমরা যুদ্ধে হেরেছি যে !৯

ইতিপূর্বে যে মনস্তত্ত্ববিদ মারকিন ডাক্তার গিলবারটের উল্লেখ করেছি, তিনি এই কথোপকথনের উপর ফোড়ন দিয়ে বলেছেন, 'এ হল গে টিপিক্যাল নাৎসি যুক্তিপদ্ধতি।'

বট্যে? তা সে যাক্ গে—আমরা এস্থলে আউশ্‌ভিৎস হিরোশিমার তুলনামূলক আলোচনা করবো না।১০ শুধু একটি সামান্য খবর পাঠককে দিই।

হিরোশিমায় এটম বম ফাটানো হয় ৬ই অগস্ট ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে। এর পক্ষাধিক কাল পূর্বে মহাভারতের সঞ্জয়ের ন্যায় জাপান জয়াশা ত্যাগ করে যুদ্ধে নিরপেক্ষ দেশ সুইডেনের মারফৎ যুদ্ধবিরতি কামনা করে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠায় (এর মাসতিনেক পূর্বে হিটলারের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হিমলার তাঁর প্রভু হিটলারকে না জানিয়ে ঐ সুইডেনের মারফৎই মিত্রশক্তির নিকট সন্ধি-প্রস্তাব পাঠান, কিন্তু দুই মহাপ্রভুর কেউই খৃষ্টের উপদেশ মানতেন না বলে বাম হস্তটি অর্থাৎ হিটলার খবরটা জানতে পান এবং আত্মহত্যার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে হিমলারকে পদচ্যুত করেন) কিন্তু মারকিন তখন হন্যে হয়ে উঠেছে, নবাবিষ্কৃত এটম বম্ একটা ঘন-বসতিওলা শহরে ছাড়লে তার প্রতিক্রিয়া কি হয় সেটা জানবার জন্য। জাপানদত্ত সন্ধিপ্রস্তাব গ্রহণ করলে তো আর বোমাটার এক্সপেরিমেণ্ট চালানো যায় না—অতএব, চালাও যুদ্ধ আরো কয়েকদিন, বোমা ফাটিয়ে দেখা যাক ক'হাজার লোক স্রেফ পুড়ে মরে, শহর কতটা ধ্বংস হয়। বলা নিতান্তই বাহুল্য হিটলারের ক ক-তে গ্যাসে মৃত্যু ছিল সম্পূর্ণ যন্ত্রণাহীন, এটম বমে জাপানীরা জ্বলন্ত জামাকাপড় নিয়ে ছুটোছুটি করে মরেছে বহু সহস্র, এবং অসংখ্য জন মরেছে বোমার ফলে নানাবিধ অজানা অচেনা রোগের যন্ত্রণায় বৎসরের পর বৎসর জীবন্মৃত হয়ে।...এবং কর্তারা একটা বোমা ফেলেই প্রসন্ন দক্ষিণং মুখং ধারণ করেননি। আমরাও জানি, এক সংখ্যাটাই বড্ডই অপয়া--নিদেন দুটো বাতাসা খেতে হয়।

---

৯ রোজেনবের্গকে নাৎসী দলের 'চিন্ময় নেতা' = 'স্পিরিচুয়াল ফ্যুরার' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। তাঁর প্রখ্যাততম গ্রন্থ 'বিংশ শতাব্দীর মিথ্' গ্রন্থে তিনি উঠে পড়ে লাগেন, আর্যরাই যে পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট জাতি সেইটে প্রমাণ করার জন্য।

১০ হিরোশিমার এটম বম্ বর্ষণ বাবদে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জাপানী চিকিৎসকের একটি বয়ান আমার হাতে এসে পেঁচেছে—inspite of the sharks, popularly and mistakenly known in Calcutta as Foreign Book-seller।

সুযোগ পেলে সেটি পাঠকের হস্তে সমর্পণ করবো। ডাক্তারটি বোমা পতনের ফলে আহত হয়ে কয়েক বৎসরের ভিতরই অসহ যন্ত্রণা ভোগ করে মারা যান।

স্পর্শকাতর পাঠক এতক্ষণে হয়তো কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু হয়ে ভাবছেন, আমি এ-সব পুরনো কাসুন্দী ঘাটছি কেন। তবে কি আমি মডার্ন লেখকদের পাল্লায় পড়ে বীভৎস রসের অবতারণা করে শিঙ ভেঙে বাছুরের দলে ভিড়তে চাই? 'ঈশ্বর রক্ষতু!' আমার সে-রকম কোনো উচ্চাশা নেই। বরঞ্চ বলবো, মডার্নদের এই যে নূতন টেকনিক—আগেভাগে সব কিছু বলে দিয়ে, কোনো প্রকারের সারপ্রাইজ এলিমেণ্ট না রেখে পানসে মারা 'ধুসর' মারকা প্লট্ বিবর্জিত গল্প লেখা (এদের বক্তব্য; বাস্তব জীবনে সারপ্রাইজ নেই—আছে একঘেয়েমির ধুসরিমা, পান্তাভাতের পানসেমি, মরা ইঁদুরের পাঙাশ-মারা পেট)—এটা আমি রপ্তো করতে পারবো না। আমার যেটা মূল বক্তব্য সেটাতে আসি সর্বশেষে।

এই মাস, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮, আজকের ঠিক ২০ বৎসর পূর্বে শ্রীযুত চেম্বারলেন ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ে, দুজনাতে, গণতন্ত্রের প্রতিভূ হিসেবে চেকোশ্লোভাকিয়াকে হিটলারের করকমলে সমর্পণ করেন।

গুণ্ডামি আরম্ভ হয় সেই সময় থেকে। ক ক তার শেষ।

আজ আবার এরা—গণতন্ত্র দেশের লক্ষ্মীছাড়া সব পলিটিশানরা—চেক-শ্লভাকদের তাড়াচ্ছে।

অথচ, পাঠক, দেখো, চেক-শ্লভাকদের সাহায্য করার রত্তিভর ক্ষ্যামতা ওদের নেই।

তাই তারা জর্মনির দুই লক্ষ সৈন্যকে তিন লক্ষ, না পাঁচ লক্ষে ওঠবার অনুমতি দিয়েছেন।

একদা যে রকম গণতন্ত্রের মুনিব চেম্বারলেন-দালাদিয়ে চেক-শ্লভাকদের হিটলারের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন, আজ ঠিক তেমনি তাদের বংশধররা, চেক-শ্লভাকদের তাড়িয়ে দিয়ে, রুশদের হাতে ছেড়ে দেবেন।

আবার শুরু হবে ক ক।

গ্যাস চেম্বার!

শা-লা!

প্রেম

কি কায়দায় আলাপ হয়েছিল সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

ছোকরা আইন পড়ে।

"একদিন বললে চ, একটা ইনট্রেসটিং মোকদ্দমা হচ্ছে।" এদেশের নিয়ম, আইন পরীক্ষা দেবার পূর্বে ছ'বার না দশবার—আমার সঠিক মনে নেই—আদালতে হাজিরা দিতে হয়, বোধ হয় সরকারী উকিলের অ্যাসিসট্যাণ্টরূপে দু'চারবার কাগজপত্রও দুরস্ত করে দিতে হয়।

সুইস্ আদালত আদৌ ভীতি উৎপাদক নয়। কেমন যেন ঘরোয়া ঘরোয়া ভাব।

অথচ মোকদ্দমাটা বেশ গুরুতর বিষয় নিয়ে।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে একটি যুবতী। সুন্দরী বলা চলে না, সাদামাটা, তবে দেখতে ভালই। এবং তার চেয়ে বড় কথা, মেয়েটি বেশ স্বাস্থ্যবতী। মুখের রঙটি যেন শিশিরে ভেজা। জানা গেল, মেয়েটি সুইস ইতালিয়ান।

দোস্ত ফিস্ ফিস্ করে বললে, "জানিস তো, জাতে সুইস হলেও এই ইতালিয়ানরা একটু আনস্টেডি—" অর্থাৎ 'উড়ুক্কু' ভাব ধরে।

প্রেমট্রেমের ব্যাপার আদালত সংক্ষেপেই সারে। তবে এ-স্থলে বিবরণীটি নিশ্চয়ই কোনো রোমাণ্টিক ছোকরা পুলিস লিখেছিল। প্রেমটা হয়েছিল গভীরই। প্রতি ছুটির দিনে উইক-এণ্ড, এমন কি কাজকর্মের ফাঁকেফিকিরে সিনেমা-কাবারে-সুইমিং পুল। বেশ স্ফূর্তিতে কেটেছে দিনগুলো—কোনো সন্দেহ নেই। এবং কোনো সন্দেহ নেই মেয়েটাই মজেছিল মরমে মরমে।

সরকারি উকিল গলাখাঁকরি দিয়ে বললেন, "এবং খর্চাটা মেয়েটির কষ্টে জমানো টাকা থেকে।"

আমার কান ছিল বিবরণীর দিকে, চোখ মেয়েটির পানে। এতক্ষণ তার মুখে কোনো ভাবের পরিবর্তন হয়নি। এবারে তার ঠোঁটের কোণে যেন ঈষৎ অসহিষ্ণুতার ভাব দেখা গেল। ··উকিল পড়ে যেতে লাগলেন, "দুর্ভাগ্যক্রমে আসামী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। প্রকাশ, ছেলেটা প্রতিজ্ঞা করেছিল, আসামীকে বিয়ে করবে। আসামীর পিতামাতা ধর্মভীরু, সেও প্রতি রববারে গির্জেয় যেত। আসামী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে জানামাত্রই ছেলেটা পালায়।"

এবারে বিবরণী প্রথম পুরুষে—মেয়েটির বাচনিক।

"আমার এই বিপদে আমাকে সাহায্য করবার মত সে-শহরে কেউ ছিল না; জমানো কড়িও ফুরিয়ে গিয়েছে। তখন স্থির করলুম, গ্রামে ফিরে গিয়ে বাবা-মাকে সব খুলে বলবো। তাঁরা আঘাত পাবেন জানতুম, কিন্তু এছাড়া আমি অন্য পথ খুঁজে পেলুম না।

বাড়ি ফিরে যে অবস্থা দেখলুম তাতে বাবা-মাকে সব-কিছু খুলে বলার সাহস আমার আর রইল না। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমার দু'বছরের ছোট বোনটি—সেও শহরে গিয়েছিল কাজ নিয়ে, সেও ফিরে এসেছে পেটে বাচ্চা নিয়ে। তাকে কে দাগা দিয়েছে শুধোইনি। আমি কী কষ্টের ভিতর দিয়ে গিয়েছি সে শুধু আমিই জানি। সে বাবা-মাকে সব খুলে বলেছে। আমাকে বললে, তাঁরা বড় আঘাত পেয়েছেন, কিন্তু তাকে গ্রহণ করেছেন, বাচ্চাটাকেও মানুষ করবেন।

আমি তখন করি কি? দু'দুটো মেয়ে কুপথে গেল—অথচ তাঁরা কত যত্নেই আমাদের মানুষ করেছিলেন। আমি তাঁদের কি করে বলি, আমিও কুপথে গিয়েছি। আর দু'দুটো বাচ্চা তাঁরা পুষবেনই বা কি করে?

আমি স্থির করলুম, আমার বাচ্চাটাকে আমি বিসর্জন দেব। হাজার হোক,

আমার ছোট বোন। তার হক্ক বেশী। আমি তাকে ভালোবাসি। আমি তাকে সাহায্য করতে চাই।—সে বেচারী একেবারে ভেঙে পড়েছে। আমিও যদি মুখে কলঙ্কের ছোপ মাখি তবে তার হয়ে পাঁচজনের সঙ্গে লড়াই দেব কি করে?

আমি মেয়েটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলুম। সে যেন একেবারে পাষাণ হয়ে গিয়েছে।

এবারে সরকারী উকিল বললেন, "নদীপারে নির্জনে আসামী বাচ্চা প্রসব করে তাকে জলে ফেলে দেয়।" তারপর একটু থেমে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "কিন্তু সেখানে আর কেউ ছিল না বলে প্রমাণ করা অসম্ভব না হলেও সুকঠিন, বাচ্চাটা মৃতাবস্থায় জন্মেছিল কি না।"

সমস্ত আদালত-ঘর নিস্তব্ধ, নীরব।

এইবারে প্রথম জজ মুখ খুললেন। সামনের দিকে শূন্য দৃষ্টি ফেলে শুধোলেন, "বাচ্চাটা জন্মের সময় জীবিত না মৃত ছিল?"

মেয়েটি একবার মুখ তুলে তাকিয়ে ফের মাথা নিচু করলো। বললে, "আমি সত্যই শপথ করে বলতে পারবো না। আমি—আমার—আমি তখন সব-কিছু বুঝতে পারিনি।"

আশ্চর্য, জজ তো নয়-ই, সরকারি উকিল পর্যন্ত কোনো রকম জেরা বা চাপাচাপি করলেন না, প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করার জন্য। কারণ এটা তো আইনত স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বাচ্চা জ্যান্ত জন্মে থাকলে এটা খুন—হয়তো মারডার নয় ম্যানস্লটার—আর মৃতাবস্থায় জন্মে থাকলে বা জন্মের পরেই যদি মরে গিয়ে থাকে তবে বাচ্চা প্রসবের কথা পুলিসকে জানায়নি বলে অপরাধটা কঠিন নয়—হাইডিং অব্ এভিডেন্স্, সত্য তথ্য নির্ধারণের প্রমাণ গোপন করেছে শুধু।

মোকদ্দমা এখানেই শেষ বলা যেতে পারে। কিন্তু জজ তবু একটা প্রশ্ন শুধোলেন, "আচ্ছা, তুমি সেই ছেলেটার সন্ধান নিলে না কেন? তাকে বিয়ে করাতে বাধ্য করালে না কেন?"

কুণ্ডুলি পাকানো গোখরো সাপ যে রকম হঠাৎ ফনা তুলে দাঁড়ায় মেয়েটা ঠিক সেই রকম বলে উঠলো, "কী! সেই কাপুরুষ—যে আমাকে অসহায় করে ছুটে পালালো! তাকে বিয়ে করে আমার বাচ্চাকে দেব সেই কাপুরুষের, সেই পশুর নাম!" তারপর দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললে। গোঙরানোর শব্দ কানে এল।

আমি তার মুখের দিকে আর তাকিয়ে থাকতে পারিনি।

প্রেম যে কী দ্বেষ, কী ঘৃণায় পরিণত হতে পারে তার বিকৃত মুখে দেখলুম—পূর্বেও দেখিনি, পরেও দেখিনি।

আমি বসেছিলাম একেবারে দরজার পাশে। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলুম।

দু'দিন পরে দোস্তের সাথে ফের দেখা।

বললে, "ছোঃ, তুই বড্ড কাঁচা। পালালি?"

"কি সাজা হল ?"

"চার মাস। কিন্তু জেলে যেতে হবে না। গাঁয়ের পাদ্রি সাহেবের কাছে প্রতি সপ্তাহে একবার করে হাজিরা দিতে হবে—গুড্ কনডাকটের রিপোর্ট দেবার জন্য। আদালত বললেন, "সমস্ত পরিবার যে বদনামের পাবলিসিটি পেল, সেই যথেষ্ট সাজা—আর যার ফাঁসি হওয়া উচিত সে তো আদালতে নেই।"

প্রেম যে কী দ্বেষ, কী ঘৃণার—

———

৪

রচনাবলী

সৈয়দ মুজতবা আলী

“ আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস
ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ প্রাদেশিক ভাষাকে
বর্জন ক'রে নয়,
তার সম্যক উন্নতি সাধন ক'রে,
এবং আমার আরো বিশ্বাস
প্রাদেশিক সংস্কৃতি নির্মাণ করলে
বৃহত্তর ভারতীয় ঐক্য ক্ষুণ্ণ হবে না। ”

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

চতুর্থ খণ্ড

BIRA NIDRA STATE CENTRAL LIBRARY
79111
22.5.84
AGARTALA

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

পিকাসো সম্পর্কে যেসব তথ্য এ রচনায় সংগ্রহ করা হয়েছে তা পড়লে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভূতের গল্পের সঙ্গে তাঁর নিজের ভূতে অবিশ্বাস বিষয়ে মন্তব্যের কথা মনে পড়ে যাবে। পিকাসো বলেছেন, লোকে চায় তাই আমি আর্টের নামে বাঁদরামি করি। আর ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর ইউরোপ দর্শন বইতে বলেছেন, আমি কোনো ভূতেই বিশ্বাস করি না, জীবিত বা মৃত কোনো ভূতেই না।

তবে দুইয়ের তুলনা চলে না, কারণ পিকাসো জ্ঞানপাপী, টাকার জন্য আর্টের নামে লোক ঠকিয়েছেন এতকাল। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের ভূত লোকঠকানোর জন্য নয়।

মুজতবার এ রচনাটি বিশেষ মূল্যবান নানা দিক থেকে। এতে তাঁর 'আধুনিকতা' বিষয়ে চিন্তায় কিছুমাত্র অস্পষ্টতা নেই।

কত না অশ্রুজলের অন্যান্য রচনাও বিষয়বৈচিত্র্যে এবং পাঠকের চিত্ত-আকর্ষণকারী ক্ষমতায় কিছুমাত্র কম নয়। 'হিটলারের শেষ প্রেম' তথ্যপূর্ণ রচনা। সব চেয়ে মজার 'দ্বন্দ্ব পুরাণ'। কীর্তিমানদের জীবনে যা ঘটে তা থেকে ক্রমে কিভাবে লেজেণ্ড তৈরি হয় তার আলোচনা হৃদয়গ্রাহী। শান্তিনিকেতনের গাঙ্গুলীমশাই-এর আসন্ন গান্ধী আগমনের প্রস্তুতির জন্য প্রাণান্তকর কর্মতৎপরতা, অসম্ভব সব আয়োজন, এবং তার অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স, যে কোন রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মতো চিত্তগ্রাহী। এবং গান্ধীজীর ইটালিয়ান জাহাজে ভ্রমণও এর সঙ্গে তুলনীয়। বর্ণনাগুলি এমন কৌতুককর, এবং রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজী এবং গাঙ্গুলিমশাই প্রভৃতির চরিত্র উদ্ঘাটক যে, শুধু এই জাতীয় রচনাতেই মুজতবার একটা দিকের পরিচয় অতি সুন্দর ভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু গুরুদেবের ঠাকুর্দার উক্তি ভুল করে গুরুদেবের পিতার মুখে দেওয়া হয়েছে। Babu often changes his mind—এটি প্রিন্স দ্বারকানাথের কথা, মহর্ষি-দেবের কথা নয়।

দু-একটি শব্দের যথাযথ ব্যবহার অনেকেই করতে পারেন না, মুজতবাও সেই দলে পড়েছেন। 'উদ্দেশ্য' ব্যবহৃত হয় ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকলে। দর্শনের উদ্দেশ্যে, ক্রয়ের উদ্দেশ্যে, আহারের উদ্দেশ্যে। আর 'উদ্দেশে' ব্যবহৃত হয় ব্যক্তি স্থান বা বস্তু সম্পর্কে। কলকাতার উদ্দেশে, রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে। মুজতবার লেখায় ঐ শব্দটি ভুল এবং নির্ভুল দু রকমই আছে। ঐ যে চারিত্রিক অসতর্কতা, তা নইলে মুজতবার পরিচয় সম্পূর্ণ হবে কেন?

মুজতবা নাৎসি জার্মানির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাই হিটলার বিষয়ে

—কুড়ি টাকা—

সম্পাদক

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সুমথনাথ ঘোষ

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা

শ্রীচুনী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ

সিল্ক-স্ক্রীন ও

চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা ৯ হইতে পি. কে. পাল কর্তৃক মুদ্রিত

॥ নিবেদন ॥

এই খণ্ডের তৃতীয় গ্রন্থ "হিটলার" বইয়ের হিটলারের প্রেম, মস্কোযুদ্ধ ও হিটলারের পরাজয়, গাড়োলস্ত্য গাড়োল, লক্ষ মার্কের বরমান, কনরাট আডেনাওয়ার, রাজহংসের মরণ-গীতি, আবার আবার সেই কামানগর্জন, হিটলার—এই প্রবন্ধগুলি পূর্বেই অন্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল? তদনুযায়ী রচনাবলীর পূর্ববর্তী খণ্ডগুলিতে ও ৪র্থ খণ্ডের পূর্বাংশে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই কারণে উক্ত প্রবন্ধগুলি 'হিটলার' অংশে আর অন্তর্ভুক্ত করা হইল না।

রচনাবলী-সম্পাদক

সূচিপত্র

ভূমিকা শ্রীপরিমল গোস্বামী ৵০

বড়বাবু

বড়বাবু ৩
রবীন্দ্রনাথের আত্মত্যাগ ২২
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৩২
সরলাবালা ৩৫
হাসনোহানা ৩৮
বঙ্গে মুসলিম সংস্কৃতি ৪৩
পরিচিতি ৫১
হতভাগ্য কাছাড় ৫৬
নেতাজী ৬০
মস্কোযুদ্ধ ও হিটলারের পরাজয় ৬৩
কুট্টি ৭০
দরখাস্ত ৭৭
সর্বাপেক্ষা সঙ্কটময় শিকার ৮২
অপর্ণার পারণা বা স্যালাড ১০৯
রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মিদ্বয় ১১৩
রাষ্ট্রভাষা ১২১
বন্ধ-বাতায়নে ১৩৫
এ্যারোপ্লেন ১৪১
চরিত্র-বিচার ১৫১
গান্ধীজীর দেশে ফেরা ১৫৫
তপঃশান্ত ১৫৮
মৃত্যু ১৬০

কত না অশ্রুজল

কত না অশ্রুজল	...	....	১৭১
আন্ ফ্রাঙ্ক	...	...	২২২
ভরা ডুবি (আন্ ফ্রাঙ্ক)	...	...	২২৫
ধন্য অবাঙালী !	...	...	২৩৫
নট গিলটি	...	...	২৩৯
ব্রেন-ড্রেন	...	...	২৪২
বনে ভূত না মনে ভূত	...	...	২৪৬
স্পাই	...	...	২৪৯
আধুনিকের আত্মহত্যা	...	...	২৫৬
দর্পণ	...	...	২৭৫
চুম্বন	...	...	২৮৮
মরহুম অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল হাই	...	...	২৯৫
সিংহ-মূষিক কাহিনী	...	...	৩০০
রাবাৎ-ইনসণ্ট	...	...	৩০৫
অল-মসজিদ্-উল-আক্সা	...	...	৩ ৮
ন্যাকামো	...	..	৩১২
বিশ্বভারতী প্রাগ	...	...	৩১৬
ত্রিমূর্তি	...	...	৩১৮
রহস্য-লহরী	..	...	৩২২
দ্বন্দ্ব পুরাণ	...	...	৩২৬
মাভৈঃ	...	...	৩৫৩
হিটলারের শেষ প্রেম	...	...	৩৫৬

হিটলার

হিটলারের শেষ দশ দিবস	...	...	৩৭৫
(৩০ এপ্রিল—শেষ দিন)	...	...	৪০২
(উত্তর-হিটলার)	...	...	৪১০
গ্রন্থ-পরিচয়	...	...	৪১১

ভূমিকা

পুরীর সমুদ্রে যাঁরা স্নান করতে নেমেছেন, অথবা যাঁরা সেখানে নুলিয়াদের নৌকো নিয়ে দূর সমুদ্রে এগিয়ে গিয়ে মাছ ধরা দেখেছেন তাঁরা জানেন তীরের কাছাকাছি এসে সমুদ্রের ঢেউগুলি পাহাড়-প্রমাণ উঁচু হয়ে দুইয়েরই বাধা সৃষ্টি করে। স্নানার্থীরা সেই ব্রেকার বা উত্তাল তরঙ্গভঙ্গের আগেই ডুবে গিয়ে তা থেকে আত্মরক্ষা করে, আর নুলিয়ারা বহু দুঃখ সহ্য করে অনেক সময় নৌকো সমেত ডিগবাজি খেয়ে প্রথম বাধাগুলি পার হয়ে গেলে অনেকটা শান্ত সমুদ্রে গিয়ে উত্তীর্ণ হয়।

ঠিক এর সঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলীর ভাষাভঙ্গির তুলনা করতে পারলে পাঠককে তা বোঝাবার পক্ষে সুবিধাজনক হত। কিন্তু মুজতবার ভাষাভঙ্গি, বানান, উচ্চারণ, লিপ্যন্তর, ইডিয়ম প্রভৃতি তাঁর অধিকাংশ রচনার মধ্যে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতোই মাঝে মাঝে ধাক্কা মারে, এবং তা শুধু তীরভূমিতে নয়। এ ধাক্কা অবশ্য অভ্যস্ত পাঠকের সহ্য হয়ে যায় এবং পাঠক তখন তাঁর রচনা-সমুদ্রের শান্ত গাম্ভীর্যের স্তরে ডুবে গিয়ে অনায়াসে লেখককে ক্ষমাও করতে পারেন। এবং শুধু তাই নয়, লেখককে ভালবাসতেও পারেন।

লেখার কোন্ গুণে এটি সম্ভব সে আলোচনা পরে করছি। কিন্তু তার আগে এই চরম খেয়ালি অথচ নিরহঙ্কার লেখকটির ভাষা খেয়ালের কিছু নমুনা দিই। কারণ নতুন পাঠক এই সব অপরিচিত ইডিয়ম ইত্যাদিতে ধাক্কা খেয়ে লেখককে ভুল না বোঝেন।

মুজতবা সব স্থানে লিখেছেন চেষ্টা দেওয়া অথবা প্রচেষ্টা দেওয়া। অনভ্যস্ত কানে বিষম লাগে। অথবা man proposes-এর বাংলা করা হয়েছে মানুষ প্রস্তাব পাড়ে। অজ্ঞতা নয়, এ তাঁর নিজস্ব ভাষা। বেপমানের স্থলে বেপথুমান, অপর্যাপ্ত অর্থে অপ্রচুর, অপরিচ্ছিন্ন শব্দের সঙ্গে কেন লিখলেন 'মলিন অর্থে নয়'? উপামত ও উপমেয়-এর স্থলে তুল্য ও তুলনীয় কেন? তারপর লিপ্যন্তর। এ, অ্যা, এ্য ও এ্যা এই চার রকম বানান আছে। ভাষাবিজ্ঞান মতে অ্যা হওয়া উচিত। পার্লিমেণ্ট সর্বত্র। পেলেস (প্যালেস), এশেমড্ (অ্যাশেমড)। সাইকোঅ্যানালেসিস, ক্যারেবিয়ান লিপ্যন্তরে অ্যানালিসিস এবং ক্যারিবিয়ান হওয়া উচিত। Function ফন্‌কশন কেন? Zinc জিনক কেন? গ্যোয়েবলস, গ্যোয়েরিং গ্যোয়েটে হয়েছে গ্যোবলস, গ্যোরিং, গ্যোটে, Roosevelt

রোজোভেলট কেন? রুজভেলট বা রোজভেলট হওয়া উচিত ছিল। Concentration কনসানট্রেশন কেন? ফ্রয়লাইন ফ্রলাইন কেন? মহারাজাকে 'মহরাটশা' কেন বলবে জার্মানরা? মাহারাজা বলবে। Maharazah হলে 'মাহারাৎসা' হতে পারত। তবু মহা নয়, মাহা। Valet ভ্যালে কেন সর্বত্র? এটি না ইংরেজি না ফরাসী না জার্মান উচ্চারণ। উদ্ধৃতিতেও গণ্ডগোল আছে। Dog and the manger নয়—in the manger হবে। এ রকম কত যে আছে!

এ রকম ধাক্কা নতুন পাঠকের পক্ষে অসুবিধেজনক হতে পারে। কিন্তু এ সবও তুচ্ছ হয়ে যায় যখন লেখক মানুষটির সমস্ত মধুর ব্যক্তিত্বের গভীর স্পর্শ পাওয়া যায় তাঁর রচনাগুলির ভিতর দিয়ে। এ থেকে পাঠকের মুক্তি নেই। মুজতবা এত জনপ্রিয় তার অনেকগুলি কারণ। প্রথম কারণ কৃত্রিমতাহীন সরল বলার ভঙ্গি। দ্বিতীয় কারণ তাঁর আপন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অহঙ্কারহীনতা। তৃতীয় কারণ যাঁর বিষয়ে বলতে গেছেন তাঁর প্রতি আছে তাঁর গভীর মমত্বপূর্ণ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। অনেক ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়ে কৌতুক ও নিজের প্রতি মৃদু ব্যঙ্গ বর্ষণ। চতুর্থ কারণ লঘু বিষয়ে লঘু চাল ও গুরু বিষয়ে যথার্থ চিন্তাশীলতার প্রকাশ। সবার প্রতি গোঁড়ামি বর্জিত অভিগম বা অ্যাপ্রোচ। যেখানে বেদনা, সেখানে তিনি অন্যের বেদনার অংশীদার হয়েছেন। অনেক সময় হৃদয় থেকে যেন রক্ত ঝরেছে বেদনা প্রকাশ করতে গিয়ে। তাঁর মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, বন্ধুবাৎসল্য তুলনাহীন।

মুজতবা প্রকৃত কথা-শিল্পী, কথা বলার আর্ট তাঁর জন্মগত। এ বিষয়ে আমার নিজেরও কিছু অভিজ্ঞতা আছে তাঁর বিষয়ে। আমার বয়স যখন বাইশ-তেইশ, আর মুজতবার ষোল, সেই সময় (১৯২১) আমরা কিছুদিন পাশাপাশি বিছানায় কালযাপন করেছি। তখনই দেখেছি তাঁর অবিরাম কথা বলে ও নানা ম্যাজিক দেখিয়ে (প্রায় টম সইয়ারের মতো) আত্মপ্রকাশের চেষ্টা। তারপর দীর্ঘ ৩২ বছর পরে দেখা। গার্স্টিন প্লেসে, অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে। ঘণ্টা দুই একত্র কাটিয়েছি। এর মধ্যে আমি কথা বলার সময় পেয়েছি বোধ হয় পনেরো মিনিট মোট। প্রথম পরিচয় ১৯২১, শেষ দেখা ১৯২১। এর মধ্যে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে। স্থান আমার বাড়ি। আড়াই ঘণ্টা ছিলেন, সেদিনও আমি শ্রোতা, তিনি বক্তা।

তাঁর মুখের মতো তাঁর কলমও অবিরাম কথা বলতে চায়। এদিক থেকে দেখলে মনে হয় তাঁর যে তিনখানা বই বিষয়ে আমি আলোচনা করছি, তার

অনেকগুলি রচনাই এই অবিরাম কথা বলার দৃষ্টান্ত। আর ঠিক এই কারণেই সে-সব রচনায় ব্যাকরণ গৌণ হয়ে পড়েছে। কিন্তু পাঠকের পক্ষে সেটি যে বড় বাধা হয়ে ওঠেনি, মুজতবার জনপ্রিয়তাই তার প্রমাণ। তাঁর সমস্ত চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে প্রকট।

অন্যের বেদনা তাঁর মনে যে বেদনার সঞ্চার করেছে, তাই থেকে কত না অশ্রুজলের প্রথম দিকের অনূদিত রচনাগুলি। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যারা বলি —তরুণ-তরুণীই অধিকাংশ, তারা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাদের নিকটতম প্রিয়-জনকে যে সব অপূর্ব সুন্দর চিঠি লিখে গেছে তারই একটি সংকলন গ্রন্থ থেকে অনেকগুলি চিঠি এ বইয়ের গোড়ার দিকে দেওয়া হয়েছে। চিঠিগুলি স্বভাবতই মর্মস্পর্শী। মুজতবার প্রধানত হাল্কা মেজাজের নিচের স্তরে যে একটি গভীর সং-বেদনশীল মন আছে, তার প্রতিটি তন্ত্রীতে যেন এই চিঠিগুলির বেদনা ঘা দিয়েছে, তাই তিনি এগুলি বেছে নিয়েছেন বাঙালী পাঠকদের দেখাবার জন্য। এই সঙ্গে পটভূমিরূপে প্রথম মহাযুদ্ধের বলি তরুণ কবি ওয়েনের ডায়ারি এবং রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর মায়ের চিঠির উল্লেখ থাকলে ভাল হত।

কিন্তু সব রচনাই অশ্রু নয়। সৈয়দী ভঙ্গি ও মেজাজের রচনাও আছে, প্রায় টেবিলে বসে বলা, শুনতে বেশ লাগে। 'নট গিলটি' এই জাতীয় রচনা। পরবর্তী কয়েকটিও তাই। একেবারে শূন্যগর্ভ নয়, চিন্তার পরিচয় আছে, ভাববার কথাও আছে। স্পাইদের গল্পগুলিও চমকপ্রদ, ভাল লাগে পড়তে।

'আধুনিকের আত্মহত্যা' যেমন কাজের কথায় তেমনি মজার কথায় ভরা। আধুনিকতা নিয়ে মুজতবা যেসব দিকে ইঙ্গিত করেছেন, তা আমার বিশেষ ভাল লেগেছে। এর সঙ্গে বিশ্বভারতীর স্মৃতি আছে এবং শেষ পর্যন্ত পিকাসো বিষয়ে যেসব চমকপ্রদ কথা মুজতবা সংগ্রহ করে এতে উদ্ধৃত করেছেন, তা পড়লে শিল্পী-জগৎ স্তম্ভিত হবে। এবং প্যারিসের ডি-লিট পাওয়াও অতি মনোরম। আমি কিছু উদ্ধৃত করছি—

> "...শেষটায় ভিটেমাটি বেচে, কালোবাজারে ফরেন এক্সচেঞ্জ কিনে যদি প্যারিসে চলে যান, ভুলবেন না ফেরার সময় মঁ পলিয়ে থেকে একটা ডি-লিট নিয়ে আসবেন, এ দেশে কাজে লাগবে। প্ল্যাটফর্মেই বোধ হয় সনদ বিক্রি হয়, নয়তো দু'একদিন বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় বাস করে রেডিমেড থীসিস কিনে সেটা পেশ করা মাত্রই সনদটা পেয়ে যাবেন সঙ্গে সঙ্গে। ডট করা লাইনের সঠিক জায়গায় নাম সই করতে কিংবা টিপসই দিতে যেন ত্রুটি না হয়।"

পিকাসো সম্পর্কে যেসব তথ্য এ রচনায় সংগ্রহ করা হয়েছে তা পড়লে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভূতের গল্পের সঙ্গে তাঁর নিজের ভূতে অবিশ্বাস বিষয়ে মন্তব্যের কথা মনে পড়ে যাবে। পিকাসো বলেছেন, লোকে চায় তাই আমি আর্টের নামে বাঁদরামি করি। আর ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর ইউরোপ দর্শন বইতে বলেছেন, আমি কোনো ভূতেই বিশ্বাস করি না, জীবিত বা মৃত কোনো ভূতেই না।

তবে দুইয়ের তুলনা চলে না, কারণ পিকাসো জ্ঞানপাপী, টাকার জন্য আর্টের নামে লোক ঠকিয়েছেন এতকাল। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের ভূত লোকঠকানোর জন্য নয়।

মুজতবার এ রচনাটি বিশেষ মূল্যবান নানা দিক থেকে। এতে তাঁর 'আধুনিকতা' বিষয়ে চিন্তায় কিছুমাত্র অস্পষ্টতা নেই।

কত না অশ্রুজলের অন্যান্য রচনাও বিষয়বৈচিত্র্যে এবং পাঠকের চিত্ত-আকর্ষণকারী ক্ষমতায় কিছুমাত্র কম নয়। 'হিটলারের শেষ প্রেম' তথ্যপূর্ণ রচনা। সব চেয়ে মজার 'দ্বন্দ্ব পুরাণ'। কীর্তিমানদের জীবনে যা ঘটে তা থেকে ক্রমে কিভাবে লেজেণ্ড তৈরি হয় তার আলোচনা হৃদয়গ্রাহী। শান্তিনিকেতনের গাঙ্গুলীমশাই-এর আসন্ন গান্ধী আগমনের প্রস্তুতির জন্য প্রাণান্তকর কর্মতৎপরতা, অসম্ভব সব আয়োজন, এবং তার অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স, যে কোন রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মতো চিত্তগ্রাহী। এবং গান্ধীজীর ইটালিয়ান জাহাজে ভ্রমণও এর সঙ্গে তুলনীয়। বর্ণনাগুলি এমন কৌতুককর, এবং রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজী এবং গাঙ্গুলিমশাই প্রভৃতির চরিত্র উদ্ঘাটক যে, শুধু এই জাতীয় রচনাতেই মুজতবার একটা দিকের পরিচয় অতি সুন্দর ভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু গুরুদেবের ঠাকুর্দার উক্তি ভুল করে গুরুদেবের পিতার মুখে দেওয়া হয়েছে। Babu often changes his mind—এটি প্রিন্স দ্বারকানাথের কথা, মহর্ষি-দেবের কথা নয়।

দু-একটি শব্দের যথাযথ ব্যবহার অনেকেই করতে পারেন না, মুজতবাও সেই দলে পড়েছেন। 'উদ্দেশ্য' ব্যবহৃত হয় ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকলে। দর্শনের উদ্দেশ্যে, ক্রয়ের উদ্দেশ্যে, আহারের উদ্দেশ্যে। আর 'উদ্দেশে' ব্যবহৃত হয় ব্যক্তি স্থান বা বস্তু সম্পর্কে। কলকাতার উদ্দেশে, রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে। মুজতবার লেখায় ঐ শব্দটি ভুল এবং নির্ভুল দু রকমই আছে। ঐ যে চারিত্রিক অসতর্কতা, তা নইলে মুজতবার পরিচয় সম্পূর্ণ হবে কেন?

মুজতবা নাৎসি জার্মানির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাই হিটলার বিষয়ে

তাঁর পড়াশোনার আগ্রহ স্বভাবতই হয়েছে। এবং তাঁর নানা রচনায় হিটলার বিষয়ক বহু তথ্য এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও রাজনৈতিক জীবনের অনেক তথ্য তিনি তাঁর বইতে দিতে পেরেছেন। এবং হিটলার নামক পৃথক একখানি পুস্তকই লিখেছেন। হিটলারের ট্র্যাজিক জীবনের খুঁটিনাটি শুধু নয়, তাঁর বন্ধু হিমলারের হাতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ ইহুদিকে গ্যাস চেম্বারে পুড়িয়ে মারার বিবরণে শিউরে উঠতে হয়। ঠিক যেমন পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালীদের সঙ্গে যুদ্ধে ইয়াহিয়া খাঁর হাজার হাজার বুদ্ধিজীবী বাঙালী নিধনের বর্বরতার কথায় আমরা শিউরে উঠেছি। এবং তার সঙ্গে অ্যামেরিকান সাপ্তাহিকে ছাপা সেই বর্বরতার ছবিও দেখেছি।

এ খণ্ডে অবশ্য হিটলারের শেষ দশ দিবসের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির রোমাঞ্চকর কাহিনী বিবৃত হয়েছে। হিটলার বহুদিন নেই, তাঁর বিষয়ে লোকের আগ্রহও বিশেষ আর নেই, কিন্তু এ বইয়ের বর্ণনা যে-কোনো ট্র্যাজিক নাটককে হার মানাবে। এবং এখানে হিটলার শুধু ঐতিহাসিক একটি চরিত্র নন, এখানে তিনি ঐ মর্মান্তিক নাটকের প্রধান চরিত্র।

বড়বাবু নামক পুস্তকখানি, এবং যেমন কত না অশ্রুজল নামক পুস্তক—নামের দিক থেকে খুব সঙ্গত হয়েছে মনে হয় না। বিশেষ করে বড়বাবু। নামের সঙ্গে 'ও অন্যান্য রচনা' জুড়ে দিলে ভাল হত। কারণ বড়বাবু এ বইতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক প্রথম রচনা। স্যালাড তৈরির ব্যবস্থাপত্রও আছে একটি রচনায়। কাজেই বড়বাবু কিছু ভ্রান্তি ঘটায়।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পড়লে পুস্তকের নাম কি তা আর মনেই পড়বে না। এই একটি মানুষ এ দেশে আর হয় নি, হওয়া সম্ভব কিনা তাও জানি না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে দূর তুলনা হয়তো একটুখানি চলতে পারে। দ্বিজেন্দ্রনাথ আমার একটি মস্ত বড় বিস্ময়। তাঁর বিষয়ে মুজতবা তাঁর বড়বাবু রচনাটি যত দূর সম্ভব তথ্যে ভরে দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিভার যত দিক প্রায় সবই তিনি ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছেন। এক দিকে তাঁর বিরাট পাণ্ডিত্য, অন্য দিকে তাঁর বক্সোমেট্রির খেলা। এর তুলনা হয় না। বাংলা শটহ্যাণ্ড নিয়ে তাঁর কত গবেষণা। এবং অনেক নির্দেশ ও বলবার কথাই ছন্দে লেখা। গভীর চিন্তাশীলতার সঙ্গে শৈশবের মিলন ঘটতে দেখা যায় না সহজে। "আপন স্বপন মাঝে বিভোল ভোলা"—বিশেষণটি মনে হয় দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বেশি খাটে।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পিতৃস্মৃতিতে এই শিশু ভোলানাথ বিষয়ে অনেক চমকপ্রদ সংবাদ দিয়েছেন। সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর লেখা শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বইতেও অনেক মজার ঘটনার উল্লেখ আছে। ঠাকুর পরিবারের অনেকেই

ছিটগ্রস্ত ছিলেন। উন্মাদ সীমানার একচুল এদিক ওদিক। একখানা পা সম্পূর্ণ ঐ সীমানার দিকে বাড়ানোই ছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ এই উন্মাদ ব্যাধির উদারা মুদারা তারা—এই তিন সপ্তকের প্রত্যেকটি সুর ছুঁয়ে গেলেও কোন্ দৈবশক্তিতে সুস্থ মানুষ রূপেই পরিচিত ছিলেন, এও এক পরমাশ্চর্য ঘটনা। কোন্ মন্ত্রবলে তিনি ঘোষিত উন্মাদ হন নি, এ আমার বোধের অতীত। তাঁর সমস্ত আচরণ, সমস্ত পাণ্ডিত্য, সমস্ত সাধনার স্থিতি ছিল সকল লোভ লালসা স্বার্থের ঊর্ধ্বে। তাঁর সমস্ত আচরণের ভিতরে ভিতরে একটি শিশু খেলা করে বেড়াত। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, সভায় পঠিতব্য কোনো রচনা (দর্শন বিষয়ে) লেখা শেষ হলে সভায় পাঠের আগে কাউকে পড়ে শোনাতেন। একদিন কাউকে না পেয়ে বাড়ির বুড়ো ঝিকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। সে এক পরম দুর্লভ দৃশ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ 'সার সত্য' নামক কঠিন প্রবন্ধ পড়ছেন আর ঝি মাথায় ঘোমটা টেনে ধৈর্যের সঙ্গে তা শুনছে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় পল্লীগ্রামে যেখানে-সেখানে নানারকম দেহচর্চা আরম্ভ হতে দেখেছি। তার মধ্যে একটি, সোজা দাঁড়িয়ে দেহটাকে চক্রাকারে ঘুরিয়ে মাথা সমেত হাত দুটি পা স্পর্শ করার খেলা। দেহের সম্মুখভাগটা আকাশের দিকে। এ ব্যায়াম খুব কঠিন, (আমি চেষ্টা করে পারি নি)। যাই হোক, মাথাটা পায়ের সঙ্গে স্পর্শ করানোর সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের মগজ ও পা এক সমতলে এনে ব্যবহারের ক্ষমতায়। এক প্রান্তে পণ্ডিত ও অন্য প্রান্তে শিশু।

মুজতবা এ মানুষটির অনেক দিকের পরিচয়ই দিয়েছেন দৃষ্টান্ত সমেত—অবশ্য সংক্ষেপে যতটা দেওয়া সম্ভব। দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতি আমার নিজের কিছু দুর্বলতা আছে, তাই আরও ভাল লাগল রচনাটি। আজও মনে পড়ে সেই ঋষিতুল্য ব্যক্তির চেহারাটি—রিকশয় তাঁকে ছুটে আসতে দেখেছি বিধুশেখর শাস্ত্রীর সঙ্গে দার্শনিক-তত্ত্ব আলোচনার জন্য।

লেখক একটি প্রশ্ন তুলেছেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ কেন বাংলায় শর্টহ্যাণ্ড প্রচলনের জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। আমার মনে হয় যিনি বক্সোমেট্রি তৈরিতে এত যত্নবান ছিলেন, তাঁর পক্ষে শর্টহ্যাণ্ড পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। অঙ্কের খেলাও তাঁর প্রিয় ছিল। শর্টহ্যাণ্ড উপলক্ষে তাঁর বাংলা বানান সংস্কারের নির্দেশ পরবর্তীকালে অনেক ক্ষেত্রে গৃহীত হয়েছে।

"কর্মের ম-এ মফলা অকর্ম বিশেষ
কার্য্যের য-এ যফলা অকার্যের শেষ।..."

এখন আর এই রেফের ক্ষেত্রে দ্বিত্ব বর্জন অস্বাভাবিক মনে হয় না।

এই রচনার একস্থানে আছে: "লোকমুখে শুনেছি সকলের অজান্তে এক ভিখিরি এসে তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইলে তিনি বললেন, আমার কাছে তো এখন কিছুই নেই, তুমি এই শালখানা নিয়ে যাও।...ভিখিরি প্রথমটায় নাকি নিতে চায়নি।"

তারপর দিনেন্দ্রনাথ বোলপুর থেকে শালখানা উদ্ধার করেন। আমি অনুরূপ আর একটি কাহিনী পড়েছি, পার্ক স্ট্রীটে থাকতে দ্বিজেন্দ্রনাথ একখানা ট্রাইসাইকেলে ময়দানে ঘুরতেন। একদিন এক ভিখিরিকে অন্য কিছু দেবার মতো না পেয়ে সেখানা দান করেন। দুটি ঘটনাই সত্য কিনা বোঝা যায় না। হয়তো একটা সত্য। প্রণাম, দ্বিজেন্দ্রনাথকে। Others abide our question, Thou art free.

পরবর্তী রচনা 'রবীন্দ্রনাথের আত্মত্যাগ'। রবীন্দ্রনাথ জীবনে যে দুঃখ পেয়েছেন, যে দুঃখ দেখেছেন এবং তার শরিক হয়েছেন, তার কিছু কিছু পরিচয় আছে এতে। এ সব দুঃখ-বেদনা রবীন্দ্রনাথের মতো অতি স্পর্শচেতন মনে কি মর্মভেদী আঘাত হেনেছে তার অংশবিশেষ মাত্র আমরা জানতে পারি, তাঁর গানের ভিতর দিয়ে, কাব্যের ভিতর দিয়ে। সে কি মর্মান্তিক ভাষা ও প্রকাশ। অথচ কত সংযত। কবি সমস্ত জীবন একের পর এক আঘাত পেয়েছেন, কিন্তু কখনও ভেঙে পড়েন নি। নীরবে সব মেনে নিয়ে তার ঊর্ধ্বে মাথা তুলেছেন। দুঃখ-বেদনাকে দার্শনিকতা অথবা কাব্যের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করে তবে মনকে শান্ত করেছেন।

সকল জখম যে এড়িয়ে যাওয়া যায় না, সে কথা বোঝাপড়া নামক কবিতাতে স্পষ্ট বলেছেন যৌবন বয়সেই। বলেছেন—

অনেক ঝঞ্ঝা কাটিয়ে বুঝি
এলে সুখের বন্দরেতে,
জলের তলে পাহাড় ছিল
লাগল বুকের অন্দরেতে,
মুহূর্তেকে পাঁজরগুলো
উঠল কেঁপে আর্তরবে
তাই নিয়ে কি সবার সঙ্গে
ঝগড়া করে মরতে হবে?

এমনি অতর্কিতে আঘাত এসেছে। এবং অনেক সময় এমনও গেয়েছেন—

আরো আঘাত সইতে হবে সইবে আমারো—। এমন কত আত্মসান্ত্বনা, এবং যিনি বলতে পারেন—

ক্ষত যত ক্ষতি যত মিছে হতে মিছে,
নিমেষের কৃশাঙ্কুর পড়ে রবে নিচে।
কী হল না কী পেলে না, কে তব শোধেনি দেনা,
সে সকলি মরীচিকা মিলাইবে পিছে।

তাঁর জীবনে বেদনা-আঘাতের আর নতুন সংবাদ কি শোনানো যাবে? অথচ যখনই এই অপরূপ জীবনদর্শনের কথা আলোচনা করা যায়, তখনই তা নতুন বোধ হয়। নতুন বিস্ময়। নতুন একটি ব্যক্তির মহৎ পরিচয়। যে ব্যক্তি অনন্যসাধারণ, যিনি আর সবার ঊর্ধ্বে।

এই রচনাটির নাম রবীন্দ্রনাথের আত্মত্যাগ হওয়া ঠিক মনে হয় না। ত্যাগের প্রশ্ন কোথায়? সর্বত্র বেদনাকে গ্রহণের প্রশ্নই আলোচিত হয়েছে। সর্বত্রই ভাগ্যের হাতে বঞ্চনা।

মুজতবার আর একটি মন্তব্য আলোচনার যোগ্য। তিনি এই রচনাটির এক স্থানে বলেছেন—

> আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হয়, পৃথিবী নিশ্চল এবং ধ্রুবতারা ধ্রুবস্থির। বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু বলেন, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—মায় ধ্রুবতারা প্রচণ্ড গতিবেগে কোন অজানার দিকে যে ধেয়ে চলেছে সে খবর কেউ জানে না। তাই বলে রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন
>
> দেখিতেছি আমি আজি
> এই গিরিরাজি,
> এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
> দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।
>
> তখন তিনি কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য মস্তিষ্ক দিয়ে বুঝে, তারপর হৃদয় দিয়ে অনুভব করে সেটি কবিতার রসে প্রকাশ করছেন না। এটা প্রত্যক্ষ অনুভূতি পুত্রশোকে মাতার কাতরতা যেমন সোজা অনুভূতি, প্রিয়জন-বিরহ আমাদের বুকে যেমন সরাসরি বেদনার অনুভূতি এনে দেয়, সেই রকম।

এর মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা immediate perception অথবা experience বোঝাতে শুধু বিচ্ছেদ-বেদনার প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা এলো কেন? কিন্তু আসল কথা, বলাকা কবিতার "দেখিতেছি আমি আজি"—

ইত্যাদির মূলে কোনো পূর্বলব্ধ বৈজ্ঞানিক সত্য অথবা উপনিষৎ থেকে পাওয়া সত্যের সম্পর্ক নেই, মুজতবার এ কথা বিভ্রান্তিকর। গিরিরাজি বন ইত্যাদির ছুটে চলা কল্পনার 'প্রত্যক্ষ দর্শন' ছাড়া কখনও ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষ দর্শন বা immediate perception হতেই পারে না। পূর্বলব্ধ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই এই কবিসুলভ 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা'। মনটা tabula rasa হলে এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হতে পারত কি ?

রবীন্দ্রমানসে পূর্বলব্ধ জ্ঞান কি ভাবে ছিল তার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

১। আমরা বীজকে ক্ষুদ্রকালের মধ্যে বীজরূপে দেখিতেছি, কিন্তু বৃহৎ কালে তাহাকে দেখিতে গেলে তাহা গাছ হইয়া অরণ্য পরম্পরার মধ্য দিয়া নানা বিচিত্ররূপে ধাবিত হইয়া পাথুরে কয়লার খনি হইয়া আগুনে পুড়িয়া ধোঁয়া হইয়া ছাই হইয়া ক্রমে যে কী হইয়া যায় তাহার উদ্দেশ পাওয়াই শক্ত। (রূপ ও অরূপ)

২। যদি এমন হতে পারত যে আমি যে কালটাতে আছি সেটা যেমন আছে তেমনি থাকত অথচ গাছের ঐ পাতাটার সম্বন্ধে এক মাসকে এক মিনিটে ঠেসে দিতে পারতুম, তবে পাতা হওয়ার পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে পাতা হওয়ার পরবর্তী অবস্থা পর্যন্ত এমনি হুস করে দৌড় দিত যে আমি ওকে প্রায় দেখতে পেতুম না। জগতে যে সব পদার্থ আমাদের কাল থেকে অত্যন্ত ভিন্ন কালে চলছে তারা আমাদের চারদিকে থাকলেও তাদের দেখতেই পাচ্ছিনে, এমন হওয়া অসম্ভব নয়। (আমার জগৎ)

এ ছাড়াও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে (ক্ষিতিমোহন সেনের 'বলাকা' হতেও) যে, তাতে নিশ্চিত বোঝা যেত রবীন্দ্রনাথ ছোট কালকে বড় কালের মধ্যে ফেলে এবং বড় কালকে ছোট কালের মধ্যে ফেলে দেখার চিন্তা কত ভাবে করেছেন। একটাতে কাল যেন চলছে না, অন্যটাতে কাল নক্ষত্রবেগে ছুটে চলেছে। "তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে—সে চলেও বটে চলে নাও বটে, সে দূরেও বটে নিকটেও বটে।" বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে একই জিনিস বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়—এ কথা আইনস্টাইনের তত্ত্বও স্বীকার করছে। অতএব মুজতবার প্রত্যক্ষ দর্শনের সিদ্ধান্তটা খুব স্পষ্ট হয় নি তাঁর লেখায়। তাছাড়া slow motion ও rapid motion-এ সিনেমা ছবি তুলে একই কালকে অতি সচল ও অতি অচল রূপে দেখানোর ঘটনা অনেক দিনের।

এ বইতে এই দুটি ছাড়া আরও নানা শ্রেণীর এবং নানা আকারের ১৯টি

রচনা আছে। বিষয়বস্তুর চরিত্র অনুযায়ী কোনোটি নিতান্তই ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা নিবেদন, কোনোটা বিশেষ ভেবেচিন্তে লেখা, কোনোটা ভাষা বিষয়ে কোনোটা বা অন্য লেখক বা শিল্পী বিষয়ে। কিন্তু যে বিষয়ে হোক, মুজতবা মুখ খুললে তা শ্রোতার না শুনে উপায় থাকে না। এক্ষেত্রে অবশ্য পাঠকের কথা বলছি। যদিও মুজতবা বার বার বলেছেন তিনি চাকরি পেলে লেখেন না. চাকরি না থাকলে লেখেন, তবু তাঁর নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি প্রায় সব স্থানেই উপস্থিত। এবং চাপে পড়ে লেখা অনেক লেখকের ক্ষেত্রেই সত্য, এবং তা আছে বলেই অনেক ভাল লেখার জন্ম হয়েছে।

হাসনুহানা নিয়ে গবেষণামূলক রচনাটি অনেক তথ্যে সমৃদ্ধ এবং উপাদেয়। যে-কোনো বিষয়ে চিন্তা করতে গেলেই মুজতবার মনে একই সঙ্গে আরও দশ রকম চিন্তা ভিড় করে আসে, কিন্তু তাতে রচনার স্বাদ আরও বাড়িয়েই দেয়।

ঢাকার কুট্টিদের বিষয়ে রচনাটি বেশ। কিন্তু কুট্টির উৎপত্তি বিষয়ে কিছু সন্দেহ রয়ে গেল। ওদের বিষয়ে একটি কাহিনী এই রচনায় আছে। ঘোড়া-গাড়ির ভাড়া নিয়ে দর কষাকষি। দেড় টাকা সাধারণ ভাড়া, কিন্তু বাবুর জন্য এক টাকাতেই রাজি। বাবু বললেন, বল কি, ছ আনায় হবে না? কুট্টি গাড়োয়ান বলল, আস্তে কন কত্তা, ঘোড়ায় শুনলে হাসবো।—আমি গল্পটা আর একরকম শুনেছি। ছ আনা শুনে কুট্টি বলল, ওরে, বাবুরে চাকার লগে বাঁইধা ল।

দরখাস্ত নামক রচনার এই ঘটনাটি পড়ে আমার একটি গল্প মনে পড়ল। মুজতবা লিখছেন—

একবার ফ্রান্সে ঢোকবার ফর্মে প্রশ্ন ছিল—তোমার জীবিকানির্বাহের উপায় কি?

উত্তরে লিখেছিলুম কিছুদিন অন্তর অন্তর চাকরি রিজাইন দেওয়া।

তাহলে চলে কি করে?

তুমি রেজিগনেশনগুলো দেখছ আমি চাকরিগুলো দেখছি।

আমার যে গল্পটি মনে পড়ল:

এক চাকরিপ্রার্থিনীর সঙ্গে নিয়োগকর্তার কথা হচ্ছিল।

"তুমি কি অবিবাহিত?"

"তিন বার।"

মাঝে মাঝে চাকরি ছাড়া এবং স্বামী ছাড়া প্রায় একই। অবশ্য নতুন দেশে প্রবেশের মুখে যে সব মজার কাণ্ড ঘটে তা চেস্টারটনের একটি রচনায় পড়েছিলাম

এককালে। প্রত্যেকেরই মজার অভিজ্ঞতা আছে এ বিষয়ে।

মুজতবার ভাষা ব্যবহারের খামখেয়ালির কথা আর একবার বলি। তাঁর যে সব শব্দ বা ইডিয়ম বাংলা নয়, তার অনুকরণ অন্যের দ্বারা অসম্ভব, অতএব তাতে ভয়ের কারণ কিছু নেই। কিন্তু যে সব ভুল শব্দ ব্যবহারে তিনি অন্য লোকের অনুকরণ করেছেন সেখানে সাবধান হওয়া দরকার। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তিনি একস্থানে লিখেছেন "ঢেলে সাজানো"। এই ইডিয়মটি ভুল। কারও সাজ ঠিক না হলে তা 'ঢেলে' অন্য সাজ পরানো বলে না। 'খুলে ফেলে' বা 'বদলে ফেলে' বলে। ঢালা এবং সাজা এ দুটি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। কলকে থেকে পোড়া তামাক ঢেলে নতুন করে সাজা থেকে এসেছে কথাটা। তামাক সাজানো নয়, সাজা (যেমন পান সাজানো নয়, পান সাজা)। এখানে ঢালা মানেই কলকে থেকে পোড়া তামাক ঢালা। অতএব নতুন সাজ পরানোর কথায় 'ঢেলে' ব্যবহার করলে তার সঙ্গে 'সাজা' ব্যবহার্য। সাজানো নয়, 'ঢেলে সাজা দরকার' বলতে হবে তামাক সাজিয়ে আন কেউ বলে না, সেজে আন প্রকৃত বাংলা ইডিয়ম। মুজতবা হুঁকো টানলে বুঝতে পারতেন। তাছাড়া তাঁর নিজস্ব উচ্চারণে কনফিড্যাণ্টকে কনফিডেণ্ট বলা কিছু বিপজ্জনক হয়েছে। 'কনফিড্যাণ্ট' ব্যক্তিকে বোঝায়, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা যে রক্ষা করবে। কিন্তু বাংলায় সেই অর্থে তাকে কনফিডেণ্ট উচ্চারণ করলে তার মানে তো ঠিক রইল না? একটি confidant, অন্যটি confident। অতএব উচ্চারণ পৃথক। তেমনি অপ্‌রা কম্পনিস্ট কি, বোঝা গেল না। ইংরেজি অপেরার সঙ্গে জারমান কম্পোনিস্ট জুড়ে কি লাভ হল? দুটো শব্দই জার্মান অথবা ইংরেজি হলে ক্ষতি ছিল কি? আরও অনেক আছে এ রকম।

এই বইয়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মিদ্বয়' রচনাটি সব দিক থেকে সার্থক। বিধুশেখর শাস্ত্রী ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী এই দুই প্রধান সহকর্মীকে অতি নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত করা হয়েছে। বিশেষ করে বিধুশেখরের পবিত্র হাসিমুখখানা পড়তে পড়তে যেন চোখের সামনে নতুন করে জীবন্ত হয়ে উঠল। এই প্রবন্ধটি রচনার সময় মুজতবা তাঁর স্বভাব অনুযায়ী এঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। সেই সময়কার সমস্ত পটভূমিটিও সামগ্রিক ভাবে ছবির মতো ফুটে উঠেছে তাঁর বর্ণনাভঙ্গিতে। রবীন্দ্রনাথ অনেক বিষয়ে এই দুজনের উপর কতখানি নির্ভরশীল ছিলেন সে কথা ছাড়াও আনুষঙ্গিক অনেক তথ্য এতে পরিবেশিত হয়েছে।

রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে দীর্ঘ রচনাটিতে রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা—নানা দিক থেকে করা হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও রচনাটি সম্পূর্ণতা পায় নি, অনেক

সমস্যা পরে এসেছে এবং আরও আসবে, কাজেই বহু সৎ কথা এবং কাজের কথা থাকা সত্ত্বেও পরবর্তী সিদ্ধান্তে পাঠককেই পৌঁছাতে হবে। রাষ্ট্রভাষা শেষ পর্যন্ত প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে কোণঠাসা করে প্রধান হয়ে উঠবেই, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। সেই জন্যই ইংরেজি বিদায়ের জন্য এত উৎসাহ। ইংরেজি যখন রাজভাষা ছিল তখন প্রাদেশিক ভাষার স্থান ছিল দ্বিতীয়। কিন্তু তা সত্যই ছিল আশীর্বাদ স্বরূপ। সে অনেক কথা। শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ্ সুনীতিকুমার যে ভয়ে বর্তমানে ক্রমে ভীত হয়ে উঠছেন, তা অকারণ নয়। মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের মতো সৎকর্মের পিছনে যে ষড়যন্ত্র কাজ করছে তা যেদিন সবাই বুঝবেন সেদিন আর ভ্রম সংশোধনের উপায় থাকবে না। মুজতবা আলী এই শেষ পরিণামের আভাসটুকু দিয়ে যেতে পারলেন না এটি দুর্ভাগ্যজনক।

অন্যান্য ছোটখাটো অনেকগুলি রচনার পৃথক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, আগেই বলেছি প্রত্যেকটি রচনাই সুখপাঠ্য। শুধু এ বইতে একটি বিদেশী রোমাঞ্চকর গল্পের অনুবাদ স্থান না পেলেই আমার ভাল লাগত।

পরিমল গোস্বামী

বড়বাবু

নগরপাল বন্ধুবর

শ্রীযুত সুধীন্দ্র ও

শ্রীযুক্তা নীলিমা দত্তের

বোলপুর

ফাল্গুন, ১৩৭২

চতুর্ভদ্রচরণে

—সৈয়দ মুজতবা আলী

নিবেদন

এই সঞ্চয়নের কোনো কোনো প্রবন্ধে পুনরাবৃত্তি দোষ একাধিকবার ঘটেছে। তার প্রধান কারণ, তাবৎ প্রবন্ধ একই সময় পর পর লেখা হয়নি। ফলে কোনো প্রবন্ধের মূল বক্তব্য বহু বৎসর পরে লিখিত অন্য প্রবন্ধের পটভূমি নির্মাণে পুনরায় ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু, আমার যাবতীয় প্রবন্ধের তাবৎ বিষয়বস্তু পাঠকমাত্রই স্মরণ রেখে পরবর্তী প্রবন্ধ পড়বেন, এ হেন দুরাশা আমার মত নগণ্য লেখক করতে পারে না। এমতাবস্থায় স্মৃতিধর পাঠকের কাছে অধম কিঞ্চিৎ ক্ষমাভিক্ষা করতে পারে। কিন্তু এর সঙ্গে অন্য কথাটি না বললে সত্য গোপন করা হবে যে, স্মৃতিশক্তির দুর্বলতাবশতঃ অহেতুক পুনরাবৃত্তিও ঘটেছে যার জন্য আমি কোনো প্রকারের ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারি না। তবে ভরসা রাখি, ভবিষ্যৎ সংস্করণে, যতখানি সম্ভব, ভ্রমের পুনরাবৃত্তি সংশোধন করে নিতে পারবো।

বিনীত—

মুজ্‌তবা আলী

বড়বাবু

॥ অবতরণিকা ॥

প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ; পিতার চেয়ে তেইশ বছরের ছোট এবং তাঁর জন্মের সময় তাঁর মাতার বয়স চৌদ্দ। কনিষ্ঠতম ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথ তাঁর চেয়ে একুশ, বাইশ বছরের ছোট।

আমি এ জীবনে দুটি মুক্ত পুরুষ দেখেছি ; তার একজন দ্বিজেন্দ্রনাথ।

এঁর জীবন সম্বন্ধে কোনো-কিছু জানবার উপায় নেই। তার সরল কারণ, তাঁর জীবনে কিছুই ঘটেনি। যৌবনারম্ভে বিয়ে করেন, তাঁর পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা। যৌবনেই তিনি বিগতদার হন। পুনর্বার দারগ্রহণ করেননি।[১] চতুর্থ পুত্র সুধীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত সৌম্যেন্দ্রনাথ এ দেশে সুপরিচিত। দুঃখের বিষয় সুধীন্দ্রনাথের স্থায়ী কীর্তিও বাঙালী পাঠক ভুলে গিয়েছে।

দ্বারকানাথ যে যুগে বিলেত যান সে-সময় অল্প লোকই আপন প্রদেশ থেকে বেরত। তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ তো প্রায়শ বাড়ির বাইরে বাইরে কাটাতেন। (ছোট ছেলে রবীন্দ্রনাথের তো কথাই নেই।) তাই স্বতঃই প্রশ্ন জাগবে, ইনি কতখানি ভ্রমণ করেছিলেন।

একদা কে যেন বলেছিলেন, বাংলায় মন্দাক্রান্তা ছন্দে লেখা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে তিনিই লিখে দিলেন :

ইচ্ছা সম্যক্ জগদরশনে[২] কিন্তু পাথেয় নাস্তি
পায়ে শিক্লি মন উড়ু উড়ু এ কি দৈবের শাস্তি!

---

১ এ তথ্যগুলো প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী থেকে নেওয়া।

২ আমি 'ভ্রমণগমনে' পাঠও শুনেছি। কিন্তু স্পষ্টত 'জ' অক্ষর 'ভ্র'-র চেয়ে ভালো।

এই কবিতাটির আর একটি পাঠ আমি পেয়েছি। কোনটা আগের কোনটা পরের বলা কঠিন। মনে হয় নিম্নলিখিতটাই আগের। এটি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত :

দীন দ্বিজের রাজ-দর্শন না ঘটিবার কারণ।
'টঙ্কা দেবী কর যদি কৃপা
না রহে কোন জ্বালা।
বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই কিছু না
খালি ভস্মে ঘি ঢালা॥

টঙ্কা দেবী করে যদি কৃপা না রহে কোনো জ্বালা।
বিদ্যাবুদ্ধি কিছু না কিছু না শুধু ভস্মে ঘি ঢালা ॥[৩]

চারটি ছত্রের চারটি তথ্যই ঠাট্টা করে লেখা। কারণ আজ পর্যন্ত কাউকে বলতে শুনিনি, বড়বাবুর (দ্বিজেন্দ্রনাথের) বেড়াবার শখ ছিল। বরঞ্চ শুনেছি, তাঁর প্রথম যৌবনে তাঁর পিতা মহর্ষিদেব তাঁর বিদেশ যাবার ইচ্ছা আছে কি না, শুধিয়ে পাঠান এবং তিনি অনিচ্ছা জানান। 'পাথেয় নাস্তি' কথাটারও কোনো অর্থ হয় না ; দেবেন্দ্রনাথের বড় ছেলের টাকা ছিল না, কিংবা কর্তা গত হওয়ার পরও হাতে টাকা আসেনি, এটা অবিশ্বাস্য।

আমার সামনে যে ঘটনাটি ঘটেছিল সেটি তা হলে নিবেদন করি। ১৩৩১-এর ১লা বৈশাখের সকালে রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে উপাসনা সমাপন করে যথারীতি সর্বজ্যেষ্ঠের পদধূলি নিতে যান। সেবারে ঐ ১লা বৈশাখেই বোঝা গিয়েছিল, বাকি বৈশাখ এবং বৃষ্টি না নামা পর্যন্ত কি রকম উৎকট গরম পড়বে। প্রেসের পাশের তখনকার দিনের সব চেয়ে বড় কুয়োর জল শুকিয়ে গিয়ে প্রায় শেষ হতে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সর্বাগ্রজকে বললেন যে, এবারে গরম বেশী পড়বে বলে তিনি হিমালয়ের 'ঘুমে' বাড়ি ভাড়া করেছেন, 'বড়দাদা' গেলে ভালো হয়। আমার স্পষ্ট মনে আছে, বড়বাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, 'আমি ? আমি আমার এই ঘর-সংসার নিয়ে যাবো কোথায় ?' যে-সব গুরুজন আর ছেলেরা গুরুদেবের সঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁরা একে অন্যের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছিলেন। হয়তো বা মুখ টিপে হেসেও ছিলেন। তাঁর ঘর-সংসার ! ছিল

ইচ্ছা সম্যক্ তব দরশনে
কিন্তু পাথেয় নাস্তি
পায়ে শিক্লি মন উড়ু উড়ু
এ কি দৈবের শাস্তি ॥'

৩ এর থেকে কিছুটা উৎসাহ পেয়েই বোধ হয় সত্যেন্দ্রনাথ রচেন 'পিঙ্গল বিহ্বল, ব্যথিত নভতল,—'। চতুষ্পদীটি আমি স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে উদ্ধৃত করছি বলে ছন্দপতন বিচিত্র নয়। সংস্কৃত কাব্যের আদি ও মধ্যযুগে মিল থাকতো না (মিল জিনিসটাই আর্য ভাষা গোষ্ঠীর কাছে অর্ধপরিচিত। পক্ষান্তরে সেমিতী আরবী ভাষাতে মিলের ছড়াছড়ি। মিলের সংস্কৃত 'অন্ত্যানু-প্রাস' শব্দটিই কেমন যেন গায়ের জোরে তৈরী বলে মনে হয়। এ নিয়ে গবেষণা হওয়া উচিত।)

তো সবে মাত্র দু-একটি কলম, বাক্স বানাবার জন্য কিছু পুরু কাগজ, দু'একখানা খাতা, কিছু পুরনো আসবাব! একে বলে ঘর-সংসার! এবং তার প্রতি তাঁর মায়া! 'জীবনস্মৃতি'র পাঠক স্মরণে আনতে পারবেন, নিজের রচনা, কবিতার প্রতি তাঁর কী চরম ঔদাসীন্য ছিল![৪] লোকমুখে শুনেছি সকলের অজান্তে এক ভিখিরি এসে তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইলে তিনি বললেন, 'আমার কাছে তো এখন কিছু নেই। তুমি এই শালখানা নিয়ে যাও।' প্রাচীন যুগের দামী কাশ্মিরী শাল। হয়তো বা দ্বারকানাথের আমলের। কারণ তাঁর শালে শখ ছিল। ভিখিরি প্রথমটায় নাকি নিতে চায়নি। শেষটায় যখন বড়বাবুর চাকর দেখে, বাবুর উরুর উপর শালখানা নেই, সে নাতি দিনেন্দ্রনাথকে (রবীন্দ্রনাথের 'গানের ভাণ্ডারী') খবর দেয়। তিনি বোলপুরে লোক পাঠিয়ে শালখানা 'কিনিয়ে' ফেরত আনান। ভিখিরি নাকি খুশী হয়েই 'বিক্রী' করে ; কারণ এ রকম দামী শাল সবাই চোরাই বলেই সন্দেহ করতো। কথিত আছে, পরের দিন যখন সেই শালই তাঁর উরুর উপর রাখা হয় তখন তিনি সেটি লক্ষ্যই করলেন না, যে এটা আবার এল কি করে!

আবার কবিতাটিতে ফিরে যাই। 'পায়ে শিকলি, মন উড়ু উড়ু' আর যার সম্বন্ধে খাটে খাটুক, দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে খাটে না। এ রকম সদানন্দ, শান্ত-প্রশান্ত, কণামাত্র অজুহাত পেলে অট্টহাস্যে উচ্ছ্বসিত মানুষ আমি ভূ-ভারতে কোথাও দেখিনি। আমার কথা বাদ দিন। তাঁর সম্বন্ধে বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন, হরিচরণ যা লিখে গেছেন সে-ই যথেষ্ট। কিংবা শ্রীযুত নন্দলালকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

'টঙ্কা দেবী করে যদি কৃপা'—ও বিষয়ে তিনি জীবন্মুক্ত ছিলেন।

আর সবচেয়ে মারাত্মক শেষ ছত্রটি। তাঁর 'বিদ্যাবুদ্ধি' 'কিছু না কিছু না' বললে কার যে ছিল, কার যে আছে সেটা জানবার আমার বাসনা আছে। অবশ্য সাংসারিক বুদ্ধি তাঁর একটি কানাকড়িমাত্রও ছিল না। কিন্তু সে অর্থে

---

৪ 'বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে, তেমনি 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই। বড়দাদার কবিকল্পনার এত প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল যে, তাঁহার যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে তিনি ফলাইতেন অনেক বেশি। এই জন্য তিনি বিস্তর লেখা ফেলিয়া দিতেন। সেইগুলি কুড়াইয়া রাখিলে বঙ্গসাহিত্যের একটি সাজি ভরিয়া তোলা যাইত।'—জীবনস্মৃতি।

আমি নেব কেন? 'বুদ্ধি' বলতে সাংখ্যদর্শনে যে অর্থে আছে সে অর্থেই নিচ্ছি—যে গুণ প্রকৃতির রজঃ তম গুণের জড়পাশ ছিন্ন করে জীবকে 'পুরুষে'র উপলব্ধি লাভ করতে নিয়ে যায়।[৫] তাঁর বিদ্যা সম্বন্ধে পুনরাবৃত্তি করে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দি, রবীন্দ্রনাথ একদিন আমাদের বলেন, তিনি জীবনে দুটি পণ্ডিত দেখেছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং তাঁর বড়দাদা; কিন্তু রাজেন্দ্রলাল পণ্ডিত ইয়োরোপীয় অর্থে। তাঁর বড়দাদা কোন্ অর্থে, কবি সেটি বলেননি। এবং খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমরা যেন না ভাবি তাঁর বড়দাদা বলে তিনি একথা বললেন।

বর্তমান লেখকের বিদ্যাবুদ্ধি উভয়ই অতিশয় সীমাবদ্ধ। তবে আমারই মত অজ্ঞ একাধিকজনের জানবার বাসনা জাগতে পারে আমি কাদের পণ্ডিত বলে মনে করি। আমি দেখেছি দুজন পণ্ডিতকে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। ইয়োরোপবাসের পরও।

অনেকের সম্বন্ধেই বেখেয়ালে বলা হয়, অমুকের বহুমুখী প্রতিভা ছিল। আমি বলি সত্যকার বহুমুখী প্রতিভা ছিল দ্বিজেন্দ্রনাথের। বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়েরই চর্চা করেছেন তিনি সমস্ত জীবন ধরে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গণিতচর্চা বিদেশে প্রকাশিত করার জন্যে উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু 'বড়দাদা' বিশেষ গা করেননি।[৬] এদেশের অত্যল্প লোকই এ যাবৎ গ্রীকলাতিনের প্রতি মনোযোগ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ গ্রীকলাতিনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে শব্দতত্ত্বে সংস্কৃত উপসর্গ, তথা মুখুয্যে, বাঁড়ুয্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁর সুদীর্ঘ রচনা অতুলনীয়। কঠিন, অতিশয় কঠিন—পাঠককে সাবধান করে দিচ্ছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটারও উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি যে, এরকম কঠিন জিনিস এর চেয়ে সরল করে স্বয়ং সরস্বতীও লিখতে পারতেন না।

৫ অবশ্য শেষ পর্যন্ত কৈবল্য লাভের পর এটিও থাকে না। গীতাতে আছে, 'ভূমিরাপোৎজলো বায়ুঃখং মনোবুদ্ধিরেবচ/অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টকা॥' ভূমি জল অগ্নি বায়ু আকাশ মন বুদ্ধি অহঙ্কার (আমিত্ববোধ) এ প্রকৃতি অপরাপ্রকৃতি। প্রবন্ধের কলেবর দীর্ঘ হয়ে যাবে বলে কৈবল্য লাভে 'বুদ্ধি'র কতখানি প্রয়োজন সেটি এস্থলে না বলে পাঠককে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথামৃত, পঞ্চম খণ্ডের ৪৭ পৃষ্ঠায় বরাত দিচ্ছি।

৬ দ্বিজেন্দ্রনাথের এক আত্মীয়ের (ইনি রবীন্দ্র সদনে কাজ করেন) মুখে শুনেছি, রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ আরম্ভ করেন তখন

আমার যতদূর জানা, খাঁটি ভারতীয় পণ্ডিতের ন্যায় ইতিহাসকে তিনি অত্যধিক মূল্য দিতেন না—ইতিহাস 'পের সে', বাই ইট্‌সেলফ্‌। অথচ পরিপূর্ণ অনুরাগ ছিল 'ইতিহাসের দর্শন'-এর (ফিলসফি অব হিস্ট্রির) প্রতি।

সাহিত্য ও কাব্যে তাঁর অধিকার কতখানি ছিল সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। বিশেষ বয়সে তিনি খাঁটি কাব্য রচনা বন্ধ করে দেন। কিন্তু দর্শন ছাড়া যে কোন বিষয় রচনা করতে হলে (যেমন শব্দতত্ত্ব বা রেখাক্ষর বর্ণমালা অর্থাৎ 'বাংলায় শর্টহ্যাণ্ড') মিল, ছন্দ ব্যবহার করে কবিতা-রূপেই প্রকাশ করতেন। বস্তুত কঠিন দর্শনের বাদানুবাদ ভিন্ন অন্য যে কোনো ভাবানুভূতি তাঁর হৃদয়মনে সঞ্চারিত হলেই তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া হত সেটি কবিতাতে প্রকাশ করার। এবং তাতে যদি হাস্যরসের কণামাত্র উপস্থিতি থাকতো, তাহলে তো আর কথাই নেই।

নিচের একটি সামান্য উদাহরণ নিন :

তাঁরই নামে নাম, অধুনা অর্ধবিস্মৃত, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (বরঞ্চ ডি. এল. রায় বললে আজকের দিনের লোক হয়তো তাঁকে চিনলে চিনতেও পারে) 'একদা তদীয় গণ্যমান্য বিখ্যাত ও অখ্যাত বহু বন্ধু-বান্ধবকে একটা বিরাট ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহার যে আহ্বান-লিপি 'জারি' হইয়াছিল তাহা এ স্থলে অবিকল মুদ্রিত করিয়া দিতেছি।—

"যাঁহার কুবেরের ন্যায় সম্পত্তি, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধি, যমের ন্যায় প্রতাপ—এ হেন যে আপনি, আপনার ভবনের নন্দন-কানন ছাড়িয়া, আপনার পদ্মপলাশ-বসনা ভামিনী-সমভিব্যাহারে (sic), আপনার স্বর্ণশকটে অধিরূঢ় হইয়া, এই দীন অকিঞ্চিৎকর, অধমদের গৃহে, শনিবার মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্ণে আসিয়া যদি শ্রীচরণের পবিত্র ধূলি ঝাড়েন—তবে আমাদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়। ইতি,

শ্রীসুরবালা দেবী
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মজুমদার।"[৭]'

দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁকে একদিন বলেন, 'এ সব কাজ তুই করছিস কেন? যার দরকার সে অনুবাদ করিয়ে নেবে। তুই তোর আপন কাজ করে যা না।'

৭ দেবকুমার রায়চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ৩২০।

এর উত্তরে দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখলেন,

'ন চ সম্পত্তি ন বুদ্ধি বৃহস্পতি,
যমঃ প্রতাপ নাহিক মে।
ন চ নন্দনকানন স্বর্ণসুবাহন
পদ্মবিনিন্দিত পদযুগ মে।
আছে সত্যি পদরজরত্তি—
তাও পবিত্র কে জানিত মে
চৌদ্দপুরুষ তব ত্রাণ পায় যদি,
অবশ্য ঝাড়িব তব ভবনে।
কিন্তু—মেঘাচ্ছন্নে শনি অপরাহ্ণে
যদি গুরু বাধা না ঘটে মে।
কিম্বা (sic) যদ্যপি সহসা চুপিচুপি
প্রেরিত না হই পরধামে॥'[৮]

গুরুজনদের মুখে এখানে শুনেছি যে সময় তিনি এই মিশ্র সংস্কৃতে নিমন্ত্রণ পত্রের উত্তর দেন তখন তিনি গীতগোবিন্দ নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন বলে ঐ ভাষাই ব্যবহার করেন। কেউ কেউ বলেন, জয়দেবই প্রকৃতপক্ষে বাঙলা ভাষার কাঠামো তৈরী করে দিয়ে যান। তাই দ্বিজেন্দ্রনাথের উত্তরও শেষের দিকটি বাঙলায়। আবার কোনো কোনো গুরুজন দ্বিতীয় ছত্রটি পড়েন, 'ন চ নন্দনকানন স্বর্ণসুবাহন পদ্মপলাশলোচনভামিনী মে।'

কবিতাতে সব-কিছু প্রকাশ করার আরো দুটি মধুর দৃষ্টান্ত দি।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শারীরিক শাস্তি দেওয়া নিষেধ ছিল। একদিন দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রাতর্ভ্রমণের সময় দূর হতে দেখতে পান, হেডমাস্টার জগদানন্দ রায়

৮ যদিও দেবকুমার মহাশয় লিখেছেন তিনি এগুলো 'অবিকল মুদ্রিত' করে দিয়েছেন, তবু আমার মনে ধোঁকা আছে যে তাঁর নকলনবীস কোনো কোনো স্থলে ভুল করেছেন। এমন কি শান্তিনিকেতন লাইব্রেরিতে যে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী রয়েছে সেটিতে 'চৌদ্দপুরুষ তব ত্রাণ পায় যদি' স্থলে 'চৌদ্দপুরুষাবধি ত্রাণ পায় যদি' কে যেন মার্জিনে পাঠান্তর প্রস্তাব করছেন, হস্তাক্ষরে। তাই বোধ করি হবে। কারণ প্রতি ছত্রে ভিতরের মিল, যথা 'সম্পত্তি'র সঙ্গে 'বৃহস্পতি', 'কানন'-এর সঙ্গে 'বাহন', 'সত্যি'-র সঙ্গে 'রত্তি' রয়েছে। বস্তুত দ্বিজেন্দ্রনাথের

একটি ছেলের কান আচ্ছা করে কষে দিচ্ছেন। কুটিরে ফিরে এসেই তাঁকে লিখে পাঠালেন :

'শোনো হে, জগদানন্দ দাদা,
গাধারে পিটিলে হয় না অশ্ব
অশ্বে পিটিলে হয় যে গাধা—'

'গাধা পিটলে ঘোড়া হয় না'—এটা আমাদের জানা ছিল, কিন্তু 'ঘোড়াকে পিটলে সেটা গাধা হয়ে যায়' এটি দ্বিজেন্দ্রনাথের 'অবদান'। এর সঙ্গে আবার কেউ কেউ যোগ দিতেন,

'শোন হে জগদানন্দ,
তুমি কি অন্ধ!'

এটির লিখিত পাঠ নেই। তাই নির্ভয়ে উদ্ধৃত করলুম। এর পরেরটি কিন্তু ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেটে বেরিয়েছে। এর মধ্যে ভুল থাকলে গবেষক সেটি অনায়াসে মেরামত করে নিতে পারবেন। রবীন্দ্রনাথের ৬৫ বৎসর বয়স হলে তিনি ভোরবেলা চিরকুটে লিখে পাঠালেন :

চমৎকার না চমৎকার!
সেই সেদিনের বালক দেখো,
পঞ্চষট্টি হল পার।
কাণ্ডখানা চমৎকার,
চমৎকার না চমৎকাব!

পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যতদিন বেঁচে ছিলেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ততদিন কলকাতাতেই ছিলেন। মোটামুটি বলা যেতে পারে, ১৮৭০ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত তিনি কলকাতার বিদ্বজ্জনসমাজের চক্রবর্তী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ধর্ম (তিনি ধর্মের স্মৃতিশাস্ত্রটুকু ব্যবহার করেছেন মাত্র; মোক্ষপথ-নির্দেশক ধর্ম ও দর্শনে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল না) ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করতেন না বলে সে যুগের অন্যতম চক্রবর্তী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথের নিত্যালাপী—প্রায়ই ঠাকুরবাড়িতে এসে তাঁর সঙ্গে তত্ত্বালোচনা করে যেতেন।[৯]

এ সব রসরচনা কখনো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি বলে শুদ্ধপাঠ যোগাড় করা প্রায় অসম্ভব।

৯ ব্রাহ্মসমাজ ও বঙ্কিমে তখন যে বাদ-বিবাদ হয় সে সময় প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিম লেখেন, '১৫ই শ্রাবণ আমার ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তারপর অনেক

ঐ সময় বঙ্কিমের বিরুদ্ধ-আলোচনা হলে পর তাঁর কিঞ্চিৎ ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং ফলে, এঁর মধ্যে একজন ঠাকুরবাড়িতে কাজ করতেন বলে বঙ্কিম লেখেন, 'শুনিয়াছি ইনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর মহাশয়দিগের একজন ভৃত্য—নাএব কি কি আমি ঠিক জানি না।' অথচ দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন—আমার মনে হয় অনিচ্ছায়—বঙ্কিম সম্বন্ধে আলোচনা করেন তখন বঙ্কিম গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে বলেন, 'তত্ত্ববোধিনীতে "নব্য হিন্দু সম্প্রদায়" এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধে আমার লিখিত "ধর্ম-জিজ্ঞাসা" সমালোচিত হয়। সমালোচনা আক্রমণ নহে। এই লেখক বিজ্ঞ, গম্ভীর এবং ভাবুক। আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা সব শুনিয়া যদি প্রথম সংখ্যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া (বঙ্কিমের রচনাটি ধারাবাহিক-রূপে প্রকাশিত হচ্ছিল—লেখক) তিনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তবে তাঁহার কোনো দোষই দিতে পারিতাম না। তিনি যদি অকারণে আমার উপর নিরীশ্বর-বাদ প্রভৃতি দোষ আরোপিত না করিতেন, [১০] তবে আজ তাঁহার প্রবন্ধ এই গণনার ভিতর (অর্থাৎ যাঁরা বঙ্কিমের প্রতিবাদ করেন, 'নগণ্য' অর্থে নয়—লেখক) ধরিতে পারিতাম না। তিনি যে দয়ার সহিত সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আমার ধন্যবাদের পাত্র। বোধ হয় বলায় দোষ নাই যে, এই লেখক স্বয়ং তত্ত্ববোধিনী-সম্পাদক বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

আমি জানি আমার কথায় কেউ বিশ্বাস করবেন না, তাই আমি এঁর সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণার উল্লেখ করলুম। বস্তুত বাঙলা দেশের এই উনবিংশ শতকের শেষের দিক (ফ্যাঁ দ্য সিএক্‌ল্) যে কী অদ্ভুত রত্নগর্ভা তা আজকের দিনের অবস্থা দেখে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

আমি সে আলোচনা এস্থলে করতে চাই নে। আমি শুধু নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা তত্ত্বান্বেষী তাঁদের দৃষ্টি দ্বিজেন্দ্রনাথের দিকে আকৃষ্ট করতে চাই।

পিতার মৃত্যুর পর তিনি প্রায় এক বৎসর তাঁর সখা সিংহ পরিবারের সঙ্গে রাইপুরে কাটান। তারপর ১৯০৭-এর কাছাকাছি শান্তিনিকেতন আশ্রমের

বার রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রতিবারে অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা হইয়াছে। কথাবার্তা প্রায় সাহিত্য বিষয়েই হইয়াছে।' (বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্যসংসদ, ২ খণ্ড, পৃঃ ৯১৬।১৭।) বলাবহুল্য বঙ্কিম যেতেন দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে।

১০ বস্তুত তখন বাঙলা দেশে প্রচলিত ধারণা ছিল, বিদ্যাসাগর ও 'কঁৎ-এর শিষ্য' বঙ্কিমের ঈশ্বরবিশ্বাস দৃঢ় নয়।

বাইরে (এখন রীতিমত ভিতরে) এসে আমৃত্যু (১৯২৬) বসবাস করেন। কলকাতার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। এখানে তিনজন লোক তাঁর নিত্যালাপী ছিলেন, স্বর্গত বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন ও রেভরেণ্ড এণ্ড্রুজ। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অত্যন্ত সমীহ করে চলতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রায়ই ভুলে যেতেন যে রবীন্দ্রনাথের বয়সও ষাট পেরিয়ে গেছে (আমি শেষের পাঁচ বৎসরের কথা বলছি —স্বচক্ষে যা দেখেছি) এবং শাস্ত্রীমশাই যদি দ্বিজেন্দ্রনাথের কোনো নূতন লেখা শুনে মুগ্ধ হয়ে বলতেন, 'এটি গুরুদেবকে দেখাতেই হবে', তখন তিনি প্রথমটায় বুঝতেনই না, 'গুরুদেব' কে, এবং অবশেষে বুঝতে পেরে অট্টহাস্য করে বলতেন, 'রবি? রবি তো ছেলেমানুষ! সে এসব বুঝবে কি?' ভুলে যেতেন, বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। আবার পর দিনই হয়তো বাঙলা ডিফথং সম্বন্ধে কবিতায় একটি প্রবন্ধ (!) লিখে পাঠাতেন রবীন্দ্রনাথকে। চিরকুটে প্রশ্ন, 'কি রকম হয়েছে?' রবীন্দ্রনাথ কি উত্তর দিতেন সেটি পাঠক খুঁজে দেখে নেবেন।

শিশুর মত সরল এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে সে যুগে কত লেজেণ্ড প্রচলিত ছিল তার অনেকখানি এখনো বলতে পারবেন শ্রীযুত গোস্বামী নিত্যানন্দবিনোদ, আচার্য নন্দলাল, আচার্য সুরেন কর, বন্ধুবর বিনোদবিহারী, অনুজপ্রতিম শান্তিদেব, উপাচার্য সুধীরঞ্জন। দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র দীপেন্দ্রনাথ তাঁরই জীবদ্দশায় গত হলে পর তিনি নাকি চিন্তাতুর হয়ে পুত্রের এক সখাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তা দীপু উইল-টুইল ঠিকমতো করে গেছেন তো?' এ গল্পটি বলেন শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত ও উপাচার্য শ্রীযুত সুধীরঞ্জন। সুধীরঞ্জন চীফ-জাস্টিস ছিলেন বলে আইনের ব্যাপারে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'দুশ্চিন্তা' স্বতই তাঁর মনে কৌতুকের সৃষ্টি করে—এবং গল্পটি বলার পর তিনি বিজ্ঞভাবে গম্ভীর হয়ে চোখের ঠার মানেন।

তাঁর অপকট সরলতা নিয়ে যে-সব লেজেণ্ড (পুরাণ) প্রচলিত আছে সে সম্বন্ধে একাধিক আশ্রমবাসী একাধিক রসরচনা প্রকাশ করেছেন। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সামান্য। একবার আমার হাতে একটি সুন্দর মলাটের খাতা দেখে শুধোলেন, 'এটা কোথায় কিনলে?' আমি বললুম, 'কোপে'। 'সে আবার কি?' আমি বললুম, 'কো-অপারেটিভ স্টোর্সে'। তিনি উচ্চহাস্য[১১]

১১ তিনি একাধিকবার গীতা থেকে, 'প্রসন্নচেতসো হ্যস্ত বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে' 'প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি লক্ষ্যবস্তুতে স্থিরভাবে নিবিষ্ট হয়', ছত্রটি উদ্ধৃত করেছেন।

(এ উচ্চহাস্য কারণে অকারণে উচ্ছ্বসিত হত এবং প্রবাদ আছে 'দেহলী'তে বসে গুরুদেব তাই শুনে মৃদুহাস্য করতেন) করে বললেন, 'ও! তাই নাকি! তা কত দাম নিলে?' আমি বললুম, 'সাড়ে পাঁচ আনা।' আমি চলে আসবার সময় একখানা চিরকুট আমার হাতে দিলেন। তাতে লেখা ছিল, 'বউমা (কিংবা ঐ ধরনের সম্বোধন), আমাকে তুমি (কিংবা 'আপনি', তিনি কখন কাকে 'আপনি' কখন 'তুমি' বলতেন তার ঠিক থাকতো না—'তুই' বলতে বড় একটা শুনিনি) সাড়ে পাঁচ আনা পয়সা দিলে আমি একখানা খাতা কিনি।' তাঁর পুত্র-বধূ তখন বোধ হয় দু'একদিনের জন্য উত্তরায়ণ গিয়েছিলেন।

তাঁর এক আত্মীয়ের মুখে শুনেছি, একবার বাম্পার্-ক্রপ্ হলে পর সুযোগ বুঝে পিতা মহর্ষিদেব তাঁকে খাজনা তুলতে গ্রামাঞ্চলে পাঠান। গ্রামের দুরবস্থা দেখে তিনি নাকি তার ক'লেন, 'সেণ্ড ফিফ্‌টি থাউজেণ্ড'। (তাঁর 'গ্রামোন্নয়ন' করার বোধ হয় বাসনা হয়েছিল।) উত্তর গেল, 'কাম ব্যাক!'

* * *

তাঁর সাহিত্যচর্চা, বিশেষতঃ 'স্বপ্নপ্রয়াণ', মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ ও অন্যান্য কাব্য শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে অত্যুত্তম আলোচনা করেছেন। বস্তুত তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথকে উপেক্ষা করেননি বলে বঙ্গজন তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এ নিয়ে আরো আলোচনা হলে ভালো হয়।

আশ্চর্য বোধ হয়, এই সাতিশয় অন্-প্র্যাকটিক্যাল, অধ্যবসায়ী লোকটি কেন যে বাঙলায় 'শর্টহ্যাণ্ড' প্রচলন করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন! এ কাজে তাঁর মূল্যবান সময় তো একাধিকবার গেলই, তদুপরি আগাগোড়া বইখানা—দু'দু'-বার—ব্লকে ছাপতে হয়েছে, কারণ তিনি যেসব সাঙ্কেতিক চিহ্ন (সিম্‌বল) আবিষ্কার করে ব্যবহার করেছেন সেগুলো প্রেসে থাকার কথা নয়। তদুপরি মাঝে মাঝে পাখী, মানুষের মুখ, এসবের ছবিও তিনি আপন হাতে এঁকে দিয়েছেন।

প্রথমবারের প্রচেষ্টা পুস্তকাকারে প্রকাশের[১২] বহু পরে তিনি দ্বিতীয় প্রচেষ্টা দেন। তার প্রাক্কালে তিনি ৺বিধুশেখরকে যে পত্র দেন সেটি প্রথম (কিংবা দ্বিতীয়) প্রচেষ্টার পুস্তকের ভিতর একখানি চিরকুটে আমি পেয়েছি। তাতে লেখা,

'শাস্ত্রী মহাশয়,

আমি বহু পূর্বে হোল্‌দে কাগজে রেখাক্ষর স্বহস্তে ছাপাইয়াছিলাম[১৩]—লাইব্রেরীতে তাহার গোটা চার-পাঁচ কপি আছে। তাহার একখানি পাঠাইয়া

১২, ১৩ এ-পুস্তক বোধ হয় কখনো সাধারণে প্রকাশ হয়নি। প্রাইভেট

দিন্।' নীচে স্বাক্ষর নেই। শুনেছি, স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে তিনি দ্বিতীয়বার একখানি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনা করেন। প্রথমখানির সঙ্গে দ্বিতীয়খানি মিলালেই ধরা পড়ে যে তিনি এবারে প্রায় সম্পূর্ণ নূতন করে বইখানা লিখলেন। এটির প্রকাশ ১৩১৯ সনে।

এবং বই দুইখানি না দেখা পর্যন্ত কেউ বিশ্বাস করবেন না, যে, শর্টহ্যাণ্ডের মত রসকশহীন বিষয়বস্তু তিনি আগাগোড়া লিখেছেন পদ্যে—নানাবিধ ছন্দ-ব্যবহার করে।

প্রথমেই তিনি লেগেছেন বাঙলার অক্ষর কমাতে; লিখেছেন,

রেখাক্ষর বর্ণমালা

প্রথম ভাগ ॥

বত্রিশ সিংহাসন।

বাঙলা বর্ণমালায় উপসর্গ নানা।
অদ্ভুত নূতন সব কাণ্ডকারখানা ॥
ষ-যে শূন্য, ড-য়ে শূন্য, শূন্য পালে পাল!
দেবনাগরিতে নাই এসব জঞ্জাল ॥
য যবে জমকি বসে শবদের মুড়া।
জ বলে সবাই তারে—কি ছেলে কি বুড়া ॥
মাজায় কিম্বা ল্যাজায় নিবসে যখন।
ইয় উচ্চারণ তার কে করে বারণ ॥
ময়ূর ময়ূর বই মজুর তো নয়!
উদয় উদজ নহে, উদয় উদয় ॥

এর পর তাঁর বক্তব্য ছবি দিয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তিনি ড ঢ ও ড় ঢ় নিয়ে পড়লেন:

কেন এ ঘোড়ার ডিম ড-য়ের তলায়?
বুঢ়াটাও ডিম পাড়ে! বাঁচিনে জ্বালায়!
একি দেখি! বাঙ্গালার বর্ণমালী যত
সকলেই আমা সনে লড়িতে উদ্যত!
ব্যাকরণ না জানিয়া অকারণ লড়।
শবদের অন্তে মাঝে ড ঢ-ই তো ড় ঢ়।

সার্কুলেশনের জন্য ছিল। তার অন্যতম কারণ তাতে প্রকাশক বা প্রকাশস্থানের নাম নেই।* এবং লেখক বলছেন, তিনি 'স্বহস্তে' ছাপিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় সংস্করণে ব্যাপারটি তিনি আরো সংক্ষেপে সারছেন :

শূন্যের শূন্যত্ব।

শবদের অন্তে মাঝে বসে যবে সুখে।
বেরোয় য়-ড়-ঢ় বুলি য-ড-ঢ'র মুখে॥
জানো যদি, কেন তবে শূন্য দেও নীচে ?
চেনা বামুনের গলে পৈতে কেন মিছে !
নীচের ছত্তর চারি চেঁচাইয়া পড়—
যাবৎ না হয় তাহা কণ্ঠে সড়গড়॥

পাঠ

আষাঢে ঢাকিল নভ পযোধর-জালে।
বাযস উডিযা বসে ডালের আডালে॥
ঘনরবে ময়ূরের আনন্দ না ধরে।
খুলিযা খডম জোডা ঢুকিলাম ঘরে॥

একেই বোধ হয় গ্রীক অলঙ্কারের অনুকরণে ইংরাজিতে 'বেথস্' বলা হয়। প্রথম তিন লাইনে নৈসর্গিক বর্ণনার মায়াজাল নির্মাণ করে হঠাৎ খড়ম-জোড়ার মুদ্গর দিয়ে আলঙ্কারিক মোহ-মুদ্গর নির্মাণ।

ছন্দ মিল ব্যঞ্জনা অনুপ্রাস—কবিতা রচনার যে কটি টেকনিক্যাল স্কিল প্রয়োজন তার সবটাই কবির করায়ত্ত। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা নিই! এর পরেই দেখুন স্বাদামাটা পয়ার ভেঙে ১১ অক্ষরের (!) ছন্দ :

চারি বর্গপতি

ক চ-বরগের ক মহারথী :
ত প-বরগের ত কুলপতি ;
ন ট-বরগের ন নটবর ;
র স-বরগের র গুণধর ;—
চারি বরগের চারি অধিপ
বরণমালার ফুলপ্রদীপ॥

শুধু তাই নয়, পাঠক লক্ষ্য করবেন, প্রথম চার ছত্রের প্রথম অংশে ছ' অক্ষর, শেষের অংশে চার অক্ষর ; ফলে জোর পড়বে সপ্তম অক্ষর ক, ত, ন, র-এর উপর। এবং সেইটেই লেখকের উদ্দেশ্য, জোর দিয়ে শেখানো।

ঐ যুগে অনেকেই বৈষ্ণবদের "ঢলাঢলি" পছন্দ করতেন না। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁদের বহু ঊর্ধ্বে। তাই :

'এই' 'এউ' 'আউ' ইত্যাদি ডিফ্‌থং-এর অনুশীলন করাতে এগুলো নিয়ে কি রকম কবিতা ফেঁদেছেন, দেখুন :

আউলে গোঁসাই গউর চাঁদ
ভাসাইল দেশ টুটিয়া বাঁধ
দুই ভাই মিলি আসিছে অই[১৪]
কি[১৫] মাধুরী আহা কেমনে কই ॥
পাষাণ হৃদয় করিয়া জয়
আধা-আধি করি বাঁটিয়া লয়
শওশ হাজার দোধারি লোক।
দোঁহারে নেহারে ফেরে না চোক ॥
কুল ধসানিয়া প্রেমের ঢেউ
দেখেনি এমন কোথাও কেউ
এই নাচে গায় দু'হাত তুলি
এই কাঁদে এই লুটায় ধুলি ॥

কে বলবে এটা নিছক রসসৃষ্টি নয়, অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে রচনা? নিতান্ত গদ্যময় শর্টহ্যাণ্ড—পদ্যে!

এর পর তিনি যেটা প্রস্তাব করেছেন সেটি বহু বৎসর পরে মেনে নেওয়া হল :—

শুনিবে গুরুজি মোর কি বলেন? শোনো!
তেলা শিরে তেল দিয়া ফল নাই কোনো ॥
আর্‌-ত দিলে "আর্ত"-এ ছাড়িবে আর্তরব।
আর-দ চাপাইলে পিঠে রবে না গর্দভ ॥
ইষ্ট করিও না নষ্ট বোঝা করি পুষ্ট।
অদ্ধে[১৬] দিয়া জলে ফেলি অর্ধে থাক' তুষ্ট ॥

১৪ এটি বহু বৎসর পরে বানান-সংস্কার-সমিতি গ্রহণ করেন।

১৫ পরবর্তী যুগে তিনি প্রধানত বিস্ময় স্থলে (যেমন এখানে) কী লিখতেন। অবশ্য বানান-সংস্কার-সমিতির বহু পূর্বে।

১৬ এখানে দ্ধ আছে। আজকাল প্রেসে তার উপর রেফ দেবার ব্যবস্থা আছে কি না, অর্থাৎ দ+ধ+রেফ, জানি না।

কর্ম্মের ম এ ম ফলা অকর্ম বিশেষ।
কার্য্যের যয়ে য ফলা অকার্যের শেষ॥

প্রথম পাঠ সাঙ্গ হলে 'কবি-মাস্টার' ভরসা দিচ্ছেন 'পুরো লেখা সাঙ্গ হবে অর্ধেক পাতায়।' এবং তদুপরি

কাগজ বাঁচিবে ঢের নাহি তায় ভুল।
বাঁচিতেও পারে কিছু ডাকের মাশুল॥

এ না হয় হল। কিন্তু গড়ের মাঠে যখন কংগ্রেসিরা (তখনো কমুনিস্টি আসেননি), বাক্যের ঝড় বওয়াবেন তখন? তখন কি সেটা শব্দে শব্দে তোলা যাবে? না।

ওবিদ্যার কর্ম নহে—যখন বক্তার
মুখে ঝড় বহি চলে ছাড়ি হুহুঙ্কার—
তার সঙ্গে লেখনীর টক্কর লাগানো
এ বিদ্যা দ্বিতীয় খণ্ডে হয়েছে বাগানো।

তখন

মস্তকে মথিয়া লয়ে পুস্তকের সার,
হস্তকে করিবে তার তুরুক-সোআর॥
হইবে লেখনী ঘোড় দোউড়ের ঘোড়া।
আগে কিন্তু পাকা করি বাঁধা চাই গোড়া॥

এবং দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে পুস্তক সমাপ্তিতে বলছেন:

তখন তাহাকে হবে থামানো কঠিন।
ছুটিবে—পরাণ ভয়ে যেমতি হরিণ॥

এ বইয়ের প্রতিটি ছত্র তুলে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু স্থানাভাব। তবে সর্বশেষে কয়েকটি ছত্র না তুলে দিলে সে আমলের কয়েকটি তরুণ—আজ তাঁরা বৃদ্ধ—মর্মাহত হবেন। কারণ রেখাক্ষর তাঁরা না শিখলেও এ-কবিতাটি মুখে মুখে এতই ছড়িয়ে পড়েছিল যে আজো সেটি কিয়জ্জনের কণ্ঠস্থ:—

আনন্দের বৃন্দাবন আজি অন্ধকার।
গুঞ্জরে না ভৃঙ্গকুল কুঞ্জবনে আর॥[১৭]
কদম্বের তলে যায় বংশী গড়াগড়ি।
উপুড় হইয়া ডিঙ্গা পঙ্কে আছে পড়ি।

১৭ প্রথম সংস্করণে এর পাঠ: বন্ধ হলো বৃন্দাবনে যাহার যা কাজ।
ভঙ্গ হল ভৃঙ্গগীত কুঞ্জবন মাঝ॥

কালিন্দীর কূলে বসি কান্দে গোপনারী,
তরঙ্গিনী তরাইবে কে আর কাণ্ডারী ॥[১৮]
আর কি সে মনোচোর দেখা দিবে চক্ষে
সিন্ধিকাঠি থুয়ে গেছে বিন্ধাইয়া বক্ষে ॥

কৃষ্ণ গেছে গোষ্ঠ ছাড়ি রাষ্ট[১৯] পথে হাটে।
শুষ্ক মুখ রাধিকার দুশ্‌খে বুক ফাটে ॥
কৃষ্ণ বলি ভ্রষ্ট বেণী বক্ষে ধরি চাপি।
ভূপৃষ্ঠে লুটায় পড়ে মর্মদাহে তাপি ॥
কষ্ট বলে অষ্ট সখী মর্মদাহে কোলে
চিন্তা করিও না রাই কৃষ্ণ এল ব'লে ॥
এত বলি হাহু করে বাষ্প আর মোছে।
সবারই সমান দশা কেবা কারে পোছে ॥
দুষ্ট বধে পূরে নাই কৃষ্ণের অভীষ্ট
অদৃষ্টে অবলাবধ আছে অবশিষ্ট ॥[২০]

কে বলবে প্রথমাংশ লেখা হয়েছে ন, ঙ, ম-প্রধান যুক্তাক্ষর ও দ্বিতীয়টি স্ব-প্রধান যুক্তাক্ষরের অনুশীলনের জন্য! আরেকটি কথা এই সুবাদে নিবেদন করি—আমার এক আত্মজনের মুখে শোনা: বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্রে' প্রমাণ করতে চাইলেন, গীতার শ্রীকৃষ্ণ আর বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ এক ব্যক্তি নন, তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ নাকি রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে বলেন, 'বঙ্কিমবাবু, এসব কি আরম্ভ করলেন, রবি? বৃন্দাবনের রসরাজকে মেরে ফেলছেন যে!' বাঙলা সাহিত্য বৈষ্ণব-পদাবলীর উপর কতখানি খাড়া, আজ সেটা স্বীকার করতে আমাদের আর বাধে না। কিন্তু সেই মারাত্মক পিউরিটান যুগে, যখন কেউ কেউ নাকি কদম্ববৃক্ষকে 'অশ্লীলবৃক্ষ' (এটা অবশ্য বিরুদ্ধ পক্ষের ব্যঙ্গ—'রিডাকসিও অ্যাড আবসার্ডাম' পদ্ধতিতে) বলতেন তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ জানতেন, বৃন্দাবনের

---

১৮ ডোঙ্গাখানি ভাসিতেছে নবেন্দুসুঠাম/পারাপার হইবার নাহি আর নাম। কালিন্দী বহিয়া যায় কান্দ কান্দ স্বরে/কুঞ্চিত কুন্তল প্রায় মন্দানিল ভরে ॥

১৯ দ্বিজেন্দ্রনাথ বরাবর 'রাষ্ট' লিখতেন; 'রাষ্ট্র' লেখেননি।

২০ বলা বাহুল্য 'কৃষ্ণ' শব্দ 'কৃষ্ট' বা কেষ্ট পড়তে হবে।

শ্রীকৃষ্ণকে গীতার শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন করে ফেললে বৃন্দাবন-লীলা নিতান্তই মানবিক প্রেমে পর্যবসিত হয় ; ভক্তজন তাঁদের আধ্যাত্মিক অমৃত থেকে বঞ্চিত হবেন।

প্রথম যৌবন থেকেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর্ম-সঙ্গীত রচনা আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন তাঁর এগারো বছর বয়সে 'আমি বেহাগে গান গাহিতেছি—

তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে
কে সহায় ভব-অন্ধকারে

তিনি (পিতা) নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন—সেই সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।'

এই গানটি দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা ; এবং রেখাক্ষর বর্ণমালাতেও তিনি অনুশীলন হিসাবে এটি উদ্ধৃত করেছেন। যদিও 'ব্রহ্মসঙ্গীতে' তাঁর মাত্র ত্রিশটি গান পাওয়া যায়, তবু এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই তিনি বিস্তর গান রচনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের রচনা সম্বন্ধে এমনই উদাসীন ছিলেন—একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি—যে সেগুলো বাঁচিয়ে রাখবার কোনো প্রয়োজন বোধ করেননি।

ধীরে ধীরে তিনি সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত, শব্দতত্ত্ব, ইতিহাসের দর্শন সব জিনিস থেকে বিদায় নিয়ে ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞান ও তার অনুশীলনে নিযুক্ত হলেন। এ যে কী অভ্রভেদী দুর্জয় সাধনা তার বর্ণনা দেবার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই। এক দিকে ইয়োরোপীয় দর্শন তাঁর নখাগ্রদর্পণে ছিল—অন্যদিকে বেদান্ত, সাংখ্য এবং যোগ—উপনিষদ, গীতা এবং মহাভারতের তত্ত্বাংশ। ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞান শুধু স্পেকুলেট তথা তর্কবিতর্ক করতে শেখায় না। গোড়ার থেকেই ধ্যানধারণা, সাধনা করতে হয়। ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞান মেণ্টাল্ জিমনাস্টিক নয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রচর্চার সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানধারণায় মগ্ন হলেন।

এখনো বাঙলা দেশে বিস্তর না হোক, বেশ কিছু লোক বেঁচে আছেন যাঁরা তাঁর সে ধ্যানমূর্তি দিনের পর দিন দেখেছেন। সূর্যোদয়ের বহু পূর্বেই তিনি আগের দিনের বাসি জলে স্নান করে ধ্যানে বসতেন। সে সময় ছোটো ছোটো পাখী, কাঠ-বেরালি তাঁর গায়ের উপর এসে বসতো, ওঠা নামা করতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। পাখীরা অপেক্ষা করতো, ধ্যান ভঙ্গের পর তিনি তাদের খাওয়াবেন। ময়দার গুলি বানিয়ে মুনীশ্বর তার ব্যবস্থা করে রাখতো।

বহু বৎসর একাগ্রচিত্তে ধ্যানধারণা ও শাস্ত্র-চর্চার ফলস্বরূপ তাঁর গ্রন্থ, বাঙলা তত্ত্বকথার অতুলনীয় সম্পদ, 'গীতাপাঠ'।

এখানে এসে আমার ব্যক্তিগত মত অসঙ্কোচে বলছি—বিড়ম্বিত হতে আপত্তি

নেই, যদি শাস্ত্রজ্ঞরা বলেন, আমার মতের কীই বা মূল্য—বাঙলা ভাষায় এরকম গ্রন্থ তো নেই-ই, ভারতীয় তথা ইংরিজি, ফরাসী, জর্মনেও ভারতীয় তত্ত্বালোচনার এমন গ্রন্থ আর নেই।

যাঁদের সামনে (এবং খুব সম্ভব তাঁদের অনুরোধেই তিনি এ-গ্রন্থখানি লেখেন) তিনি এই গ্রন্থখানি পাঠ করে শোনান (পুস্তকের ভূমিকায় আছে 'এই "গীতাপাঠ" তত্ত্ববোধিনী এবং প্রবাসীতে ছাপাইতে দিবার পূর্বে সময়ে সময়ে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ের আচার্যগণের সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে উত্তরোত্তর-ক্রমে শুনানো হইয়াছিল') তাঁদের অনেকেই ইয়োরোপীয় দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাই তাঁদের বোঝার সুবিধার জন্য (আজো তাই ইয়োরোপীয় দর্শনের পণ্ডিতদের কাছে এ-বইটি অমূল্য) তিনি প্রয়োজনমত ইয়োরোপীয় দার্শনিকদের অভিমতও প্রকাশ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করি: উপনিষদে আছে 'অবিদ্যা' শব্দটি; সেটি বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'বেদান্ত এবং সাংখ্য ছাড়া আরেক শাস্ত্র আছে; সে শাস্ত্রে বলে এই যে, ১। সাংখ্যের অচেতন প্রকৃতি, ২। কাণ্টের Thing-in-itself, ৩। Schopenhauer-এর অন্ধ Will, ৪। Mill-এর ইন্দ্রিয়-চেতনার অধিষ্ঠাত্রী নিত্যা শক্তি, ইংরাজী ভাষায় —Permanent Possibility of Sensation, ৫। বেদান্তের সদসদ্‌ভ্যামনির্বাচনীয়া অবিদ্যা; পাঁচ শাস্ত্রের এই পাঁচ রকমের বস্তু একই বস্তু।' পূর্বেই বলেছি, দ্বিজেন্দ্রনাথের মূল উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, বেদান্ত (দর্শন) সাংখ্য ও যোগ। পাঠক আরো পাবেন, বেন্থাম, চার্বাক, সফিস্ট, স্টয়িক্, ডারুইন, ভোজরাজ, যাজ্ঞবল্ক্য, জনক, ভাস্করাচার্য, সেণ্ট আইগুস্টিন, নীলকণ্ঠ, স্পেন্‌সার প্রভৃতি।

সম্পূর্ণ পুস্তিকায় পাঠক পাবেন কি? এর নাম নাকি গোড়াতে ছিল 'গীতাপাঠের ভূমিকা'—পরে 'গীতাপাঠ'-এ পরিবর্তিত হয়। সাংখ্য বেদান্ত তথা তাবৎ ইয়োরোপীয় জ্ঞান (এবং বিজ্ঞান) ও দর্শনের ভিতর দিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ তরুণ সাধককে গীতাপাঠ এবং তার অনুশীলনে নিয়ে যেতে চান।

তাই তিনি আরম্ভ করেছেন সাংখ্য নিয়ে।

'দুঃখত্রয়াভিঘাতজ জিজ্ঞাসা।'

অর্থাৎ 'ত্রিবিধ দুঃখের (বাইরে থেকে, নিজের থেকে এবং দৈবদুর্বিপাকে ঘটিত দুঃখ) কিরূপে বিনাশ হইতে পারে, তাহাই জিজ্ঞাসার বিষয়।' এবং সেটা যেন 'একান্তাত্যন্ততোৎভবাৎ' ক্ষণিক বা আংশিক বিনাশ না হয়; হয় যেন ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক বিনাশ। কারণ, দুঃখ লোপ পেলেই সুখ দেখা দেবে।

যে রকম শরীর থেকে সর্বরোগ দূর হলে স্বাস্থ্যের উদয় হয়। তা ভিন্ন স্বাস্থ্য বলে অন্য কোনো জিনিস নেই। এবং এ-সুখ যা-তা সুখ নয়। উপনিষদের ভাষায় অমৃত, আনন্দ।

গ্রন্থের মাঝামাঝি এসে তিনি এই তত্ত্বটি গীতা থেকে উদ্ধৃত করে আরো পরিষ্কার করে বলেছেন :

আপূর্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ
প্রবিশন্তি যদবৎ।
তদ্বৎকামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স
শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।

অর্থাৎ 'স্বস্থানে অবিচলিত ভাবে স্থিতি করিতেছেন যে আপূর্যমান সমুদ্র, তাহাতে যেমন নদনদী সকল প্রবেশ করিয়া বিলীন হইয়া যায়, তেমনি, যিনি আপনাতে স্থির থাকেন, আর, চতুর্দিক হইতে কামনা সকল যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া বিলীন হইয়া যায়, তিনিই শান্তি লাভ করেন ; যিনি কামনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হ'ন—তিনি না।'

এরই টীকা করতে গিয়ে তিনি তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য, মানবমাত্রেরই জীবনের উদ্দেশ্য অতি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন :

'আত্মসত্তার রসাস্বাদ-জনিত এক প্রকার নিষ্কাম প্রেমানন্দ যাহা মনুষ্যের অন্তঃকরণের অন্তরতম কোষে নিয়তকাল বর্তমান রহিয়াছে, তাহা জীবাত্মার অনন্তকালের পাথেয় সম্বল, এবং সেইজন্য তাহারই পরিস্ফুটন মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।' (গীতাপাঠ পৃঃ ১৬২)

এই চরম মোক্ষকেই মুসলমান সাধকেরা বলে থাকেন, ফানা ও বাকা। খৃষ্টীয় সাধকরা এরই বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'As the bridegroom rejoiceth over the bride, so shall the Lord rejoice over thee।'

এদেশে একাধিক সাধকও ঐ একই বর্ণনা দিয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ খুব ভাল ক[illegible] যুগে কেন, সর্বযুগেই মানুষ সাধনার এই কঠিন পথ বরণ ক[illegible] চায় না। তাই তি[illegible] পাঠের তৃতীয় অধিবেশনের অন্তে বলেছেন :

'আনন্দ সম্বন্ধে [illegible] আমি কথা-প্রসঙ্গে ব[illegible]—এটা সাধন-পদ্মানদীর ওপারের কথা ; অ[illegible] কিন্তু রহিয়াছি এপারে কা[illegible]বদ্ধ ; কাজেই আমাদের পক্ষে ওরূপ উচ্চ আ[illegible] কথাবার্তার আন্দোলন অ[illegible] প্রকার "গাছে কাঁটাল—

79111 21 W 22.9.87 AGARTALA

গোঁফে তেল।" এ-রকম বাক্যবাণ আমার সহা আছে ঢের; সুতরাং উহা গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়া আমার যাহা কর্তব্য মনে হইল তাহাই আমি করিলাম; —যাত্রীরা পাছে নৌকাযোগে পদ্মানদী পার হইতে অনিচ্ছুক হ'ন—এই জন্য পদ্মানদীর ওপার যে কিরূপ রমণীয় স্থান তাহা দুরবীন যোগে (অর্থাৎ প্রথম তিন অধিবেশনে তিনি যে অবতরণিকা নির্মাণ করেছেন তা দিয়ে—লেখক) তাঁহাদিগকে দেখাইলাম। এখন নৌকা আরোহণ করিবার সময় উপস্থিত; অতএব যাত্রী ভায়ারা পোঁট্‌লাপুঁটুলি বাঁধিয়া প্রস্তুত হউন।[২১]

এই অমূল্য পুস্তকের গুণাগুণ বিচার করা আমার জ্ঞানবুদ্ধির ত্রিসীমানার বাইরে। তবে বর্ণনা দিতে গিয়ে এইটুকু নিবেদন করতে পারি, জড়-প্রকৃতি, জীব-প্রকৃতি, তথা জীবের সুখদুঃখ বিশ্লেষণ করার সময় তিনি প্রধানত শরণ নিয়েছেন সাংখ্যের, সাধনার যে পন্থা অবলম্বন করেছেন সেটি যোগের এবং আস্থা ও আশা রেখেছেন বেদান্তের উপর।

তবে এ পুস্তিকায় মৌলিকতা কোথায়? ছত্রে ছত্রে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। তিন দর্শন এক করে (প্রয়োজনমত ইউরোপীয় দর্শন দিয়ে সেটা আমাদের আরো কাছে টেনে এনে) তার সঙ্গে নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমজনিত দীর্ঘকালব্যাপী সশ্রদ্ধ সাধনা-লব্ধ অমূল্য নিধি যোগ করে, কবিজনোচিত অতুলনীয় তুলনা, ব্যঞ্জনা, বর্ণনা দিয়ে অতিশয় কালোপযোগী করে তিনি এই পুস্তকখানি নির্মাণ করেছেন।

সকলেই বলে, এ পুস্তক বড় কঠিন। আমিও স্বীকার করি। তার প্রধান কারণ, দ্বিজেন্দ্রনাথ একই সময়ে একাধিক ডাইমেনশনে বিচরণ করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও পুনরায় সবিনয় নিবেদন করি, এ রকম কঠিন জিনিস এতখানি সরল করে ইতিপূর্বে আর কেউ লেখেননি।

২১ দ্বিজেন্দ্রনাথ বলতেন, বাংলা ভাষা এখনো এমন দুর্বল যে সূক্ষ্ম চিন্তা প্রকাশ করা কঠিন; তাই আমাদের প্রধান কাজ হবে টু বি কনসাইজ, টু বি প্রিসাইজ, টু বি ক্লিয়ার। সেটা করতে গিয়ে যদি একটি কঠিন সংস্কৃত শব্দের পরেই একটি জুতসই—mot juste—সহজ বাংলা শব্দ আসে, তবে নির্ভয়ে সেখানে লাগানো উচিত। অর্থাৎ তিনি 'গুরুচণ্ডালী' অনুশাসন মানতেন না।

রবীন্দ্রনাথের আত্মত্যাগ

কেউ দেশের জন্য প্রাণ দেয়, কেউ বা দয়িতের জন্য, কেউ বংশের সম্মানরক্ষার্থে আত্মোৎসর্গ করে। যাঁরা প্রাণ দিয়ে শহীদ হন তাঁদের অনেকেই তখন সুদ্ধমাত্র কর্তব্যবোধ থেকে, বিবেকের অলঙ্ঘ্য আদেশ পালন করার জন্যই নিজের জীবন বিসর্জন দেন। আবার কেউ কেউ ভাবেন, কর্তব্যকর্ম না করলে তাঁরা মুক্তি-মোক্ষ-নির্বাণ থেকে বঞ্চিত হবেন।

এদেশে সাধারণজনের ধারণা, মুক্তি বা মোক্ষের অর্থ নাসিকাগ্রে মনোনিবেশ করে কঠোর-কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন। অথচ আমাদের দেশে সর্ব দার্শনিক সর্ব ঋষি একবাক্যে বলেছেন মানুষের চরম কাম্য বা মোক্ষ বলতে বোঝায় পরিপূর্ণ, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ—যে আনন্দের সঙ্গে পার্থিব কোন সুখেরই তুলনা হয় না। মুসলমান সাধকরা ঐ কথাই বলেছেন, এবং ইহুদি মহাপুরুষ তো স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "As the bridegroom rejoiceth over the bride, so shall the Lord rejoice over thee" এবং এইটিই খৃষ্টানদের মূলমন্ত্র।

কয়েক মাস পূর্বে আমি 'মৃত্যু'—হয়তো 'শোক' বললে ভালো হত—নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনে মৃত্যুদূত বার বার এসে তাঁকে যে কী গভীর বেদনা দিয়েছে তার বিবরণ দি। আরো বহু, বহু বেদনা তিনি পেয়েছেন, যার স্মরণে আপন জন্মদিন উপলক্ষে পিছন পানে তাকিয়ে বলছেন,

'পায়ে বিঁধেছে কাঁটা
ক্ষতবক্ষে পড়েছে রক্তধারা।
নির্মম কঠোরতা মেরেছে ঢেউ
আমার নৌকার ডাইনে বাঁয়ে,
জীবনের পণ্য চেয়েছে ডুবিয়ে দিতে
নিন্দার তলায়, পঙ্কের মধ্যে।'[১]

১ সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন,

'যে খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিন্ধুপারে
আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে
হয়েছে আমার চেনা।' —পূরবী

এ-সব-কিছু তিনি সয়ে নিয়েছিলেন তাঁর অসাধারণ চরিত্রবল দিয়ে।

কিন্তু সবচেয়ে বেদনা পেয়েছেন, যখন তাঁর আত্মজন পেয়েছে আঘাত। যেখানে তাঁকে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়েছে, বেদনা-বেদনায় সে আত্মজনের ধূলিতলে অবলুণ্ঠন। সান্ত্বনা দেবার মত ভাষাও খুঁজে পাননি তখন। নিজের বেলা তিনি অন্তরের দিকে তাকিয়ে নিরাশ হননি, কিন্তু আত্মজনের বেলা?

বলা হয়, পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন শোক পায় মা, যখন সে পুত্রহারা হয়। এবং সে মাও যদি দুঃখিনী হয়, এবং ঐ পুত্রই যদি একমাত্র পুত্র হয়। এবং তার চেয়ে নির্মম আঘাত পান যদি সে মাতার আপন পিতা জীবিত থাকেন তবে তিনি। রবীন্দ্রনাথের বেলা তাই হয়েছিল। 'দুর্ভাগিনী'কে মনশ্চক্ষুর সামনে রেখে বলছেন,

'তোমার সম্মুখে এসে, দুর্ভাগিনী, দাঁড়াই যখন
নত হয় মন।
যেন ভয় লাগে
প্রণয়ের আরম্ভেতে স্তব্ধতার আগে।
এ কী দুঃখভার,
কী বিপুল বিষাদের স্তম্ভিত নীরন্ধ্র অন্ধকার
ব্যাপ্ত করে আছে তব সমস্ত জগৎ
তব ভূত ভবিষ্যৎ!
প্রকাণ্ড এ নিষ্কলতা
অভ্রভেদী ব্যথা
দাবদগ্ধ পর্বতের মতো
খররৌদ্রে রয়েছে উন্নত
লয়ে নগ্ন কালো শিলাস্তূপ
ভীষণ বিরূপ।'

কী হৃদয়ভেদী তুলনা! যেন আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে এসেছে 'লাভা' হয়ে মাতার বাৎসল্যরস! তারপর সে মায়ের আকুলিবিকুলি,

'সব সান্ত্বনার শেষে সব পথ একেবারে
মিলেছে শূন্যের অন্ধকারে;
ফিরিছ বিশ্রামহারা ঘুরে ঘুরে,
খুঁজিছ কাছের বিশ্ব মুহূর্তে যা চলে গেল দূরে
খুঁজিছ বুকের ধন সে আর তো নেই
বুকের পাথর হল মুহূর্তেই।'

এর চেয়ে নিদারুণতর বর্ণনা আর মানুষ কি দিতে পারে—মায়ের পুত্র-শোকের? আমার লেখাপড়া সীমাবদ্ধ। পাঠক, তুমি যদি পেয়ে থাকো, তবে সেটি আমায় পাঠিয়ো। না, ভুল বললুম, পাঠিয়ো না। পড়ে দরকার নেই।

'চিরচেনা ছিল চোখে চোখে
অকস্মাৎ মিলালো অপরিচিত লোকে।'

স্বল্পপরিচিত জনের মৃত্যুসংবাদ শুনেই আমরা শোকে, এক অজানা আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে যাই—আর, এখানে কল্পনা করুন যে বাচ্চাটিকে মা ক্ষণতরে চোখের আড়াল হতে দিত না, যার কণ্ঠস্বরের সামান্যতম রেশ, যার ক্ষুদ্রতম অঙ্গভঙ্গী তার চেনা, আর সে যখন হঠাৎ খেলা ছেড়ে ছুটে এসে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলতো, 'মা', সে হঠাৎ নেই হয়ে গেল? চিরতরে? এ মহাশূন্যতা—কল্পনায়—এ যে আপন মৃত্যুযন্ত্রণার চেয়েও নির্মম!

কিন্তু তারপর শুনুন, বীভৎসতার চূড়ান্ত:

দেবতা যেখানে ছিল সেথা জ্বালাইতে গেলে ধূপ,
সেখানে বিদ্রূপ।

চরম দুঃখে মা যখন কোনো সান্ত্বনা পেয়ে তার পুজোর ঘরে মাথা কুটতে গেল—ইষ্টদেবতার সামনে—, যে-দেবতা যুগ যুগ ধরে এ-বংশের কত না দুঃখী, কত না দুঃখিনীর চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছেন, সে-দেবতা তখন যদি লজ্জায় গা ঢাকা দিতেন তাও কিছু বিচিত্র হত না, কিন্তু তার চেয়েও পৈশাচিক পরিস্থিতি। দেবতার জায়গায় হনুমান বসে মায়ের শোকের দিকে ভেংচি কাটছে!

* * * *

এ-সব দুঃখ থেকে নিষ্কৃতির পথ কি রবীন্দ্রনাথ জানবেন না? জানতেন, খুব ভাল করেই জানতেন—অন্তত আমার মনে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

একাডেমিক অর্থে রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক ছিলেন না। অর্থাৎ কাণ্টের 'থিং ইন্ ইট্-সেল্ফ্' এবং বেদান্তের 'অ-সত্য' একই বস্তু কি না, ব্রহ্ম যেখানে নির্গুণ সেখানে ত্রিগুণ তাঁর ভিতরে লোপ পায়, না, তিনি তখন ত্রিগুণের অতীত এ-সব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কালক্ষেপ করতেন না। কিন্তু এ-কথা তিনি খুব ভাল করেই জানতেন ভারতীয় দর্শনের চরম আদর্শ আনন্দ। এবং সাংখ্য দর্শনের গোড়ার কথাই হচ্ছে, দুঃখের কারণ কি ভাবে, ঐকান্তিকরূপে সমূলে বিনষ্ট করা যায়। আমার সঙ্গে সকলে একমত না হলেও নিবেদন করি, যোগ যত না ব্রহ্মানন্দের পথ নির্দেশ করেছেন, তার চেয়ে বেশী পথ নির্দেশ করেছেন আপনাতে স্থির হয়ে আপন 'আনন্দময় কোষ' থেকে আনন্দ আহরণ করতে।

'দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।'

তখন তিনি কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য মস্তিষ্ক দিয়ে বুঝে, তারপর হৃদয় দিয়ে অনুভব করে সেটি কবিতার রসে প্রকাশ করছেন না। এটা প্রত্যক্ষ অনুভূতি, পুত্রশোকে মাতার কাতরতা যেমন সোজা অনুভূতি, প্রিয়জনবিরহ আমাদের বুকে যেরকম সরাসরি বেদনার অনুভূতি এনে দেয়, সেইরকম।

তাই যখন কবি বলছেন 'তোমার সৃষ্টির পথ' 'বিচিত্র ছলনাজালে আকীর্ণ' করে রেখেছ তখন তিনি একটি সহজ সত্য অনুভব করেছেন। এটি দার্শনিক গবেষণা নয়।

এখন প্রশ্ন, এই 'ছলনাময়ী'টি কে?

তিনি পরব্রহ্ম হতে পারেন না, কারণ তাঁর লিঙ্গ নেই, এবং এ-স্থলে শব্দটি পরিষ্কার স্ত্রীলিঙ্গে আছে।

তাই এখানে সাংখ্যদর্শনের আশ্রয় নিলে কবিতাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বোঝবার সুবিধে হয়—রসগ্রহণ অবশ্য অন্য ক্রিয়া।

'কপিল মুনির চরম বক্তব্য কথা এই যে, প্রকৃতিই আপন অধিষ্ঠাতা পুরুষকে অর্থাৎ জীবাত্মাকে মোহে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে সুখ-দুঃখাদির গুণদ্বারা বন্ধন করেন, এবং প্রকৃতিই মোহান্ধকার ক্রমে ক্রমে অপসারণ করিয়া সুখ-দুঃখাদির হস্ত হইতে জীবকে নিষ্কৃতি প্রদান করেন।'[১]

১ ঠাকুর রামকৃষ্ণ বোঝাতেন উপনিষদ দিয়ে: 'বিদ্যারূপিণী স্ত্রীও আছে আবার অবিদ্যা-রূপিণী স্ত্রীও আছে। বিদ্যারূপিণী স্ত্রী ভগবানের দিকে লয়ে যায়; আর অবিদ্যা-রূপিণী ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, সংসারে ডুবিয়ে দেয়। তাঁর মহামায়াতে এই জগৎ সংসার। এই মায়ার ভিতর বিদ্যামায়া, অবিদ্যামায়া দুই-ই আছে। বিদ্যামায়া আশ্রয় করলে সাধুসঙ্গ, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য এই সব হয়। অবিদ্যামায়া পঞ্চভূত আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, যত ইন্দ্রিয়ের ভোগের জিনিস; এরা ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।'

উপনিষদে আছে: 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে,
ততো ভূয়ো ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।'

অর্থাৎ,

'যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা অন্ধ তিমিরে প্রবেশ করে

আবার অন্তরের পথে ফিরে যাই। এ-প্রবন্ধের সেইটেই মূল বক্তব্য।

এই অন্তরের পথের শেষ প্রান্তে আছেন জ্যোতির্ময় পুরুষ। কুরান শরীফও বলেন তিনি জ্যোতিস্বরূপ।[৪]

তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর জীবনে কতবার উল্লেখ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তিনিই জীবন-দেবতা। যে-পাঠক 'জীবন-দেবতা' জাতীয় কবিতা কঠিন বলে মনে করেন তিনি যেন গল্পে গল্পে বলা—ঐ বিষয় নিয়েই—'সিন্ধুপারে' (চিত্রা) কবিতাটি পড়েন। কবি এক গভীর রাত্রে হঠাৎ ডাক শুনতে পেয়ে, ঘুম থেকে জেগে উঠে, 'দুরু-দুরু বুকে' বাইরে এসে দেখেন, 'কৃষ্ণ অশ্বে' বসে আছে এক 'রমণীমূরতি'—'আরেক অশ্ব দাঁড়ায়ে অদূরে পুচ্ছ ভূতল চুমে।' কবিকে নিয়ে রমণী উধাও—'বিদ্যুৎ বেগে ছুটে যায় ঘোড়া।' তার পর কি হল, পাঠক নির্ভয়ে পড়ে নেবেন, ঠিক 'কথা ও কাহিনী'র গল্পেরই মত সরল—সাস্‌পেন্‌স নষ্ট হবে বলে আমি আর বাকিটা বললুম না।

এঁকে তিনি ঠিক চিনতে পারেননি বলে রবীন্দ্রনাথ বার বার দুঃখ করেছেন:

'জানি, জানি আপনার অন্তরের গহনবাসীরে
আজিও না চিনি।'

এবং এই ধরনের ক্ষোভ ও আক্ষেপ কবি বহু শত বার করেছেন। এ নিয়ে কৌতূহলী তরুণ পাঠক চর্চা করলে উপকৃত হবেন।

তাহলে প্রশ্ন, এই 'অন্তরের পথ' ধরে তিনি সেই 'অন্তরের গহনবাসী'র সম্মুখীন হলেন না কেন?

তাঁর অসাধারণ চরিত্রবল ছিল, জীবনমরণ পণ করে যে-কোনো সাধনার পথে এগিয়ে যাবার মত বিধিদত্ত বীর্যবল তাঁর ছিল, তিনি জিতেন্দ্রিয় পুরুষোত্তম ছিলেন—এসব কথা নূতন করে বলার প্রয়োজন নেই। ঋষিতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর কনিষ্ঠতম ভ্রাতার সম্বন্ধে এখানকারই এক গুরুজনকে বলেন, 'আমাদের সকলেরই পা পিছলিয়েছে—রবির কখনো পা পিছলোয়নি!'

তবে শেষদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সে সাধনা করলেন না কেন, যাতে করে তিনি

৪ কুরান শরীফ, ২৪ অধ্যায়, 'অন্‌-নূর' (জ্যোতিঃ) মণ্ডল দ্রষ্টব্য। বাইবেলেও মহাপুরুষ তাঁর প্রভু ইয়াহ্‌ভেকে অগ্নিরূপে দেখেছিলেন। সর্বকলুষ পুড়ে গিয়ে জীবাত্মা যখন অগ্নিশিখারূপে পরিবর্তিত হয় তখন ব্রহ্মাগ্নিতে লীন হতে মাঝখানে আর কোনো প্রতিবন্ধ থাকে না। রবীন্দ্রনাথ তাই গেয়েছেন,

'কোণের প্রদীপ মিলায় যথা জ্যোতিঃ সমুদ্রেই।'

দুঃখবেদনার ওপারে চলে যেতে পারেন ?

আমার মনে হয়—এবং পাঠককে সাবধান করে দিচ্ছি, এইখানে আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল নাও হতে পারে—তাহলে তাঁকে কাব্যের কাছ থেকে বিদায় নিতে হয়। আমার দুঃখানুভূতি হবে, আমার আনন্দোচ্ছ্বাস হবে, পুত্রবিয়োগে, সন্তানহারা মাতার হাহাকারে আমার অনুভূতির কেন্দ্র, আমার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে তবে তো আমি সেটা রসস্বরূপে প্রকাশ করতে পারব। যদি মহাপুরুষের বাণী

'সর্বদা নিত্য প্রত্যক্ষ আত্মনে তন্ময় হয়ে থাকবে'

বরণ করে নি, তবে সুখদুঃখ আমাকে স্পর্শ করবে কি করে ?

প্রাচীন যুগের কথা বলা কঠিন। এ যুগে দেখতে পাচ্ছি, যে-দ্বিজেন্দ্রনাথ (শুনেছি মধুসূদনের মত কবি তাঁর কবিতা পড়ে বলেছিলেন, ঐ একটিমাত্র লোক কবিতা লিখতে পারে ; হ্যাট্ অফ্ টু দ্যাট্ ম্যান্—তাকে নমস্কার) 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র মত অতুলনীয় কাব্য রচনা করে বাগ্দেবীর বরপুত্ররূপে স্বীকৃত হলেন, তিনি যেদিন থেকে তাঁর 'অন্তরের পথে'র প্রয়াণ আরম্ভ করলেন, সেদিন রুদ্ধ হল—কিংবা আপন হাতেই তিনি রুদ্ধ করলেন—গোলাপের-পাপড়ি-ছড়ানো পথের শেষের ('প্রিম্‌রোজ্ পাথ টু ইটার্নেল বন-ফায়ার') কাব্যলক্ষ্মীর দেউল-দ্বার। স্বামী বিবেকানন্দের অতুলনীয় সৃজনীশক্তি ছিল ; প্যারিসে (বোধ হয়) তিনি একখানা উপন্যাসও আরম্ভ করেছিলেন—শেষ করলেন না কেন ? শ্রীঅরবিন্দও কবিতা রচেছিলেন, কিন্তু সে তো গায়ত্রীর সমগোত্র—আপনার আমার নিত্যদিনের হাসিকান্নার সন্ধান তাতে কোথায় ? ঠাকুর রামকৃষ্ণ, দক্ষিণভারতের রমণ মহর্ষি উভয়ই এ-যুগের বিখ্যাত পরমহংস, জীবন্মুক্ত। সাধারণজনের সুখদুঃখ নিয়ে এঁরা আলোচনা করেছেন অতি ললিত মধুর ভাষায়—কিন্তু সে তো রসসৃষ্টি নয়।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, দাসী মুনিব-বাড়িতে কাজ করে নিখুঁতভাবে, কিন্তু তার মনে পড়ে থাকে আপন বাড়িতে আপন বাচ্চার কাছে। আমরা এ-সংসারের কর্তব্য কর্ম করবো দাসীর মত, কিন্তু মন পড়ে রইবে ব্রহ্মার পদতলে !

এই উপদেশ নিয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। কিন্তু প্রশ্ন, দাসীকে যদি আদেশ করা হয়, তাকে কাপড় কাচা বাসন-মাজার মেকানিক্যাল্ রুটিন কাজ নয়, তন্ময় হয়ে গাইতে হবে গান, কিংবা উদ্ভাবন করতে হবে কাঁথা সেলাইয়ের নিত্য নব প্যাটার্ন—পারবে কি সে ? দাসী কেন যদি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে বলা হত, জমিদারী চালানো বা ছাত্র-অধ্যাপনা নয়—

মুটি মেকানিক্যাল্ কাজ—তোমাকে তন্ময় হয়ে গাইতে হবে গান কিংবা হবে কবিতা অথচ তোমার সর্বসত্তা পড়ে থাকবে পরব্রহ্মের পদপ্রান্তে, তবে ন কি সেটা পারতেন? এই ডবল তন্ময়তা কি সম্ভবপর? হয়তো ধর্মসঙ্গীত নার সময় সম্ভবপর (যদিও কেউ কেউ বলেন, তাঁর ধর্মসঙ্গীত অনবদ্য হলেও র প্রেম বা প্রকৃতি সঙ্গীতের তুলনায় নিচে) কিন্তু হৃদয়ের গভীরতম বেদনার রণে তন্ময় হয়ে সে-বেদনাকে সর্বাঙ্গসুন্দর, বিশ্বজননমস্য রূপ দিয়ে সৃষ্টি করা কি ম্ভবপর? দুঃখে যে-জন অনুদ্বিগ্নমনা, সুখে যে-জন বিগতস্পৃহ সে তো শান্ত; শান্ত রস কি রস? খৃষ্টান মিস্টিক্ তরুণ সাধককে বলেছেন, 'যা বলার এই বেলা লে নাও। ব্রহ্মপ্রাপ্তির পর যে অভূতপূর্ব আনন্দ পাবে তখন আর-কোনো-কিছু বলতে চাইবে না।'

চতুর্দিক থেকে তারস্বরে প্রতিবাদ উঠবে—আমি জানি—তবু ক্ষীণকণ্ঠে নিবেদন করে যাই, রবীন্দ্রনাথ সেই ব্রহ্মানন্দে লীন হতে চাননি। তিনি আমাদের মত পাপীতাপীদের যে ভাঙা নৌকা, সেটা ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে চাননি। সুখের মলয় বাতাসে ঝঞ্ঝাবাতের ক্রুর আঘাতে নিমজ্জমান তরীতে বসে তিনি আমাদের শুনিয়েছেন, আমাদেরই হৃদয়ের গীতি—যে গীতির প্রকাশক্ষমতা আমাদের নেই।

যুধিষ্ঠিরের মত তিনিও স্বর্গারোহণ করতে চাননি।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রাপ্য সম্মানের শতাংশের একাংশও পাবেন বলে আমি আর আশা করি না।

এই যে আজ আমরা অজন্তা বাঘ গুহার ছবি নিয়ে এত দাপাদাপি করি, অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ নন্দলাল বসুর কীর্তিকলাপ নিয়ে গর্ব অনুভব করি—আমাদের চোখের সামনে এঁদের তুলে ধরলো কে? এবং তখন তাঁকে কী অন্যায় প্রতিবাদের সামনে না দাঁড়াতে হয়েছিল! শুধু প্রতিবাদ নয়, নীচ আক্রমণ।

আজ আর তাই নিয়ে ক্ষোভ করি না। তার কারণ, প্রতিবাদ এবং ভিন্নমত (অপজিশন) না থাকলে অসৎ মানুষ যে আরো কতখানি অসততার দিকে এগিয়ে যায় সে তো আজ চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পারছি। রামানন্দের [illegible] থাকতে পারে কিন্তু তিনি অসৎ একথা বললে আমাদের মত লোক

বেদান্ত প্রণবমন্ত্রের অনুসরণে ত্রিভুবনে—অর্থাৎ ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ—যা-কিছু আনন্দ আছে তা ব্রহ্মে লীন আছে জেনে সেই ব্রহ্মে যোজিত হয়ে অনন্তকালব্যাপী অনন্ত-দেশব্যাপী পরিপূর্ণানন্দে লীন হতে আদেশ দেয়।

পাঠক! মা ভৈঃ! আমি তোমাকে দর্শনশাস্ত্রের গোলকধাঁধাঁয় ঢুকিয়ে অযথা হায়রান করতে চাই নে—যদিও আমার বিশ্বাস পতঞ্জলি, কপিল, শঙ্কর তাঁদের মূল বক্তব্য আমাদের মত সাধারণজনের জন্যই বলে গেছেন, এবং সামান্য একটু শ্রদ্ধাভরে এঁদের মূল বক্তব্য বার বার পড়লে আপাতদৃষ্টিতে যা কঠিন বলে মনে হয় সেটি সরল হয়ে যায়। অবশ্য এঁরা প্রত্যেকেই যেস্থলে আপন বক্তব্য সপ্রমাণ করতে, অন্যের বক্তব্যের সঙ্গে আপন বক্তব্যের কোন্‌খানে গরমিল সেটা বোঝাতে গিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্কের অবতারণা করেছেন—সেগুলো বোঝা পরিশ্রম-ও ধ্যান-সাপেক্ষ। যেমন স্বাস্থ্যবান হতে হলে বৈদ্যরাজ প্রদত্ত কয়েকটি মূলসূত্র পালনই যথেষ্ট; পুরো আয়ুর্বেদ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অধ্যয়ন করা পরিশ্রমসাপেক্ষ ও নিষ্প্রয়োজন।

এ-সব তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ খুব ভালো করেই জানতেন।

এবং সেটা সপ্রমাণ করা কঠিন নয়।

* * * *

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ কবিতা রচনা করে যান অস্ত্রোপচারের কয়েক ঘণ্টা পূর্বে। এবং সকলেই জানেন, সে অস্ত্রোপচার ব্যর্থকাম হয়, ও কবি অন্য কোনো রচনাতে হাত দিতে পারেননি। এ কবিতা সকলেই পড়েছেন, তবু আলোচনার সুবিধার জন্য এটি তুলে দিচ্ছি:

'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে!
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত;
তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে-পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,

সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চির সমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে না পারে তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

শেষ লেখা, ৩০ জুলাই ১৯৪১।

এস্থলে প্রথমেই বলে রাখা ভালো, রবীন্দ্রনাথ কোনো বিশেষ দার্শনিক তত্ত্ব বা বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণ করবার জন্য কবিতা লিখতেন না। একথা তিনি নিজেও একাধিক বার বলেছেন। কবিতা তার নিজের মহিমায় মহিমময়ী,—দর্শন বিজ্ঞান এমন কি ধর্মর সেবা-দাসী হয়েও সে তার চরম মোক্ষের অনুসন্ধান করে না (ধর্মও ঠিক সেই রকম দর্শন বা বিজ্ঞানের মুখাপেক্ষী নয়)। কাল যদি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ ঐতিহাসিক কড়ায় কড়ায় প্রমাণ করে দেন যে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ আদৌ হয়নি, কৃষ্ণার্জুন সংবাদের তো কথাই ওঠে না, তাহলেও গীতার মূল্য কানাকড়ি কমবে না। মধুসূদন যখন উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন,

'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়!'

তখন তিনি এ-কথা সপ্রমাণ করতে কোমর বাঁধেননি যে 'আশার ছলনে' ভুলতে নেই। বস্তুত তিনি তারপরও আশার ছলনে ভুলেছেন, বেঁচে থাকলে আরো ভুলতেন—এবং না ভুললে আমাদের ক্ষতি হত।

আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হয়, পৃথিবী নিশ্চল এবং ধ্রুবতারা ধ্রুবস্থির। বৈজ্ঞানিকরা কিন্তু বলেন, এ-বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—মায় ধ্রুবতারা—প্রচণ্ড গতিবেগে কোন্ অজানার দিকে যে ধেয়ে চলেছে সে খবর কেউ জানে না। তাই বলে রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন,

এ টীকাটি করেছেন রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গীতা-পাঠ' গ্রন্থে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মতে এঁর মত তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ তিনি তাঁর জীবনে আর দেখেননি।[২] পাছে পাঠক ভাবেন আমি আমার নিজস্ব টীকা দিয়ে তাঁকে অতিশয় কঠিন বস্তু সাতিশয় সরল করে বুঝিয়ে দিচ্ছি তাই দ্বিজেন্দ্রনাথের টীকা উদ্ধৃত করলুম।

তাহলে দাঁড়ালো এই :

'হে ছলনাময়ী' (অয়ি প্রকৃতি!), তুমি তোমার আপন হাতে 'সৃষ্টির পথ' (যে-পথ দিয়ে মানুষ চলে) 'বিচিত্র ছলনা' দিয়ে কণ্টকাকীর্ণ করে রেখেছ (যেমন দড়ির টুকরো দেখে সাপ ভেবে আঁৎকে উঠি, আবার ঝিনুকের টুকরোটাকে কোম্পানির টাকা ভেবে উল্লাসে নৃত্য করি)। তারপর কবি এই 'বিচিত্র ছলনা' উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার করছেন, চতুর্থ ছত্রে,—'মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে।' যে 'জীবন সরল' বলে মনে হয়, সেখানে রয়েছে 'মিথ্যা বিশ্বাসে'র ছলনা (তাই প্রকৃতি 'ছলনাময়ী')। এই 'মিথ্যা বিশ্বাস' কি সেটা রবীন্দ্রনাথ এ-কবিতা লেখার সতেরো বছর পূর্বে বর্ণনা করেছেন—তাঁর আপন জীবনে,

'পিপাসার জলপাত্র নিয়েছে সে
মুখ হতে, কতবার ছলনা করেছে সে হেসে হেসে,
ভেঙেছে বিশ্বাস, অকস্মাৎ ডুবায়েছে সে ভরা তরী
তীরের সম্মুখে নিয়ে এসে।'

তাহা অপেক্ষা আরো ঘোরতর অন্ধ তিমিরে প্রবেশ করে যাহারা বিদ্যায় রত।'

দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুবাদ।

এখানে স্পষ্টত একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে। সেটা সরল হয়, কাণ্ট যেটাকে thing-in-itself বলেছেন সেটাকে অবিদ্যা অর্থে নিলে। দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই অর্থে নিয়েছেন। তাঁর মতে, 'এই জিনিসই সাংখ্যের অচেতন প্রকৃতি, শোপেন-হাওয়ারের অন্ধ Will, Mill-এর ইন্দ্রিয়চেতনার অধিষ্ঠাত্রী নিত্যাশক্তি, ইংরাজীতে Permanent possibility of sensation, বেদান্তের সদসদ্-ভ্যাসমনির্বাচনীয়া অবিদ্যা।' সাংখ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি বুঝবার চেষ্টা করলে সরল হয় বলে আমি সাংখ্য নিয়েছি।

২ সুদ্ধমাত্র পণ্ডিত হিসাবে রবীন্দ্রনাথ নাম করতেন স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের।

আর এ-কথা বুঝতে তো কণামাত্র অসুবিধা হয় না, সরলকেই ফাঁকি দেয় ধুরন্ধর! বিদ্যাসাগরের মত সরল লোকই ঠকেছেন সব চেয়ে বেশী!

এর পর আবার একটুখানি সাংখ্যদর্শনে আসতে হয়। সাংখ্যাদি শাস্ত্রে যার নাম মহান্ দেওয়া হয়েছে সেই মহান্ শব্দের অর্থ অবাধিত অপরিচ্ছিন্ন (বাঙলা মলিন অর্থে নয়, সংস্কৃত অর্থে অখণ্ডিত) বুদ্ধিতত্ত্ব।

এই মহান্-ই চিরানন্দের পথ দেখায়।

সেই মহান্-কে, 'হে ছলনাময়ী,' তুমি 'মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ' পেতে

'প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত'

অর্থাৎ মহান্-কে আচ্ছাদিত করেছ। সাংখ্যের সেই মহান্-কে এখানে কবি 'মহত্ত্ব'রূপে ব্যবহার করেছেন। এর পর বোঝার সুবিধার জন্য একটি 'কিন্তু' যোগ দিতে হবে।[৩] পড়তে হবে,

(কিন্তু) 'তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।'

এর পর বাকি কবিতাটুকু সহজ; তাতে তিনটি কথা আছে:

১। যে-পথ দিয়ে জীব ছলনা থেকে মুক্ত হয়ে 'শান্তির অক্ষয় অধিকার' পায়, সেটা তার ভিতরেই আছে। সেটা তার 'অন্তরের পথ'।

২। সে যখন মানুষকে সরল বিশ্বাস করে ঠকবে, সে হয়তো জানতেই পারবে না যে বুদ্ধিমতী (ছলনাময়ী) তাকে ঠকাচ্ছে, এবং অন্য লোক তার সরলতা ও ছলনাময়ীর নষ্টামি দেখে তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবে—'লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।'

৩। সে-ই শুধু 'শান্তির অক্ষয় অধিকার পায়' যে 'অনায়াসে' 'ছলনা সহিতে' পারে। সেই লোক যে ছলনাময়ীকে—তা সে রমণীরূপেই দেখা দিক, আর পুরুষরূপেই দেখা দিক [সে ছলনা—সে বেদনা—তিন প্রকারের হতে পারে: ক) বাহ্যবস্তু-ঘটিত খ) আপনা-ঘটিত কিংবা গ) দেবতা-ঘটিত—অর্থাৎ অ্যাক্সিডেণ্টাল] সে যখন তার বেদনার জন্য দায়ী দুষ্টকে কঠোর সাজা দিয়ে প্রতিহিংসা নেয় না, হাসিমুখে ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে নেয়—সে-ই পায় 'শান্তির অক্ষয় অধিকার।' (অবশ্য সে যখন লোকের কাছে আরো বেশী হাস্যাস্পদ, বিড়ম্বিত।)

৩ মনে রাখতে হবে এ-কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ডিক্টেট্ করেন। যখন সেটি read-back করা হল তখন তিনি বলেছিলেন যে ওটাকে আবার দেখে দিতে হবে। সে সুযোগ তিনি পাননি।

মানবজাতির উপর শ্রদ্ধা হারাবে। তিনি সৎ ছিলেন তৎসত্ত্বেও তাঁর অপজিশনের দরকার ছিল। পেয়েছিলেন পূর্ণমাত্রার চেয়েও বেশী।

এই বক্তব্যটি আবার উল্টো করেও দেখা যায়।

আশুতোষ কৃতী পুরুষ। রামানন্দ ও আশুতোষের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন। কিন্তু একটি বিষয়ে দুজনাতে বড়ই মিল। দুজনাই জহুরী। ভারতের সুদূরতম প্রান্তের কোন্ এক নিভৃত কোণে কে কোন্ গবেষণা নিয়ে পড়ে আছে, আশুতোষ ঠিক জানতেন। তাকে কি করে ধরে নিয়ে আসা যায় সেই সন্ধানে লেগে যেতেন। রামানন্দের বেলাতেও ঠিক তাই। কোথায় কোন্ এক অখ্যাতনামা কাগজে তার চেয়েও অখ্যাতনামা এক পণ্ডিত তিন পৃষ্ঠার একটি রচনা প্রকাশ করেছে—ঠিক ধরে ফেলতেন রামানন্দ! আপন হাতে চিঠি লিখে তাঁকে সবিনয় অনুরোধ জানাতেন তাঁর কাগজে লেখবার জন্য। শুধু তাই নয়, এ-পণ্ডিত কোন্ বিষয়ে হাত দিলে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিপূর্ণ জ্যোতি বিকশিত হবে সেটি ঠিক বুঝতে পারতেন—সে দিকে ইঙ্গিতও দিতেন কোনো কোনো স্থলে।

তাই রামানন্দ ছিলেন আশুতোষের অপজিশন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তখন কৈশোরে পা দিয়েছে। ত্রুটি-বিচ্যুতি অতিশয় স্বাভাবিক। আশুতোষ তার গুরু, রামানন্দ তার গার্জেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় সৌভাগ্য যে সে এই মণিকাঞ্চন সংযোজিত বিজয়মাল্য একদিন পরতে পেয়েছিল।

* * * *

সে যুগের প্রবাসীতে এক মাসে যা নিরেট সরেস বস্তু বেরুতো, এ যুগের কোনো মাসিক সাপ্তাহিত পত্রিকা পূর্ণ এক বছরেও তা দেখাতে পারবে না। অবশ্য এ কথাও স্বীকার করি,—ঈশান ঘোষ 'জাতক' অনুবাদ করলেন বাঙলায় (জর্মন, হিন্দী বা অন্য কোনো অনুবাদ তার শত যোজন কাছেও আসতে পারে না) এবং তার সমালোচনা করলেন বিধুশেখর। এ যুগে কই ঈশান, কোথায় বিধুশেখর? এ সুবাদে আরেকটি কথার উল্লেখ করি। রামানন্দের উৎসাহ না পেলে বহু পণ্ডিতই হয়তো তাঁদের গবেষণা ইংরেজিতে প্রকাশ করতেন; বাঙলা সাহিত্যের বড় ক্ষতি হত।

* * *

রামানন্দ ছিলেন চ্যামপিয়ন অব্ লস্ট কজেস—তাবৎ বাঙলা দেশে দু'জন কিংবা তিনজন হয়তো লেখাটি পড়বেন, তিনি দিতেন ছাপিয়ে, কারণ দার্শনিক

রামানন্দ জানতেন 'কাণ্টিয় দর্শন ও পতঞ্জলির পথমধ্যে কোলাকুলি'[১] জাতীয় প্রবন্ধ লিখতে পারে এমন লোক দ্বিজেন্দ্রনাথের মত আর কেউ নেই। আমাদের বড় সৌভাগ্য যে রামানন্দ মাসের পর মাস দ্বিজেন্দ্রনাথের 'অপাঠ্য' প্রবন্ধরাজি প্রকাশ করেছিলেন, কারণ দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রায়ই কোনো প্রবন্ধ লেখার কিছুদিন পরেই সেটি ছিঁড়ে ফেলতেন। (ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে আমার যেটুকু সামান্য জ্ঞান সে দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছ থেকে। বাকিটুকু রমন মহর্ষির কাছ থেকে ও বিবেকানন্দ পড়ে। হিন্দু দ্বিজেন্দ্রনাথ আমাকে সুফীতত্ত্বের মূল মর্মকথা বুঝিয়ে দেন। সুফীতত্ত্বে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে)।

এই দ্বিজেন্দ্রনাথ বাঙলায় শর্টহ্যাণ্ড বই ছাপিয়েছিলেন। তার ১২।১৪ বছর পর রামানন্দের অনুরোধে বৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথ সেটি আবার নূতন করে লেখেন। রামানন্দ তাবৎ বইখানা নিজের খর্চায় ব্লক করে ছাপান (কারণ এতে প্রতি লাইনে এত সব সিম্‌বল্‌ বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন ছিল যে এছাড়া গত্যন্তর ছিল না)। এটা আরেকটা লস্‌ট্‌ কজ্‌। এরকম বই কেউ পড়েও না। কিন্তু রামানন্দ ঘন ঘন তাড়া না লাগালে এই অতুলনীয় পুস্তক সৃষ্ট হত না।

আবার অন্য দিকটা দেখুন। পাবলিসিটি কারে কয় সেটা মার্কিনদের পূর্বেই রামানন্দ জেনে গিয়েছিলেন। সে যুগের যে কোনো 'প্রবাসী' সংখ্যা নিলেই পাঠক তত্ত্বকথাটি বুঝে যাবেন।

রামানন্দ কোহিনূর বেচতেন আবার সঙ্গে সঙ্গে মুড়িও বেচতেন। কিন্তু কখনো ভেজাল বেচেননি।

এই পাবলিসিটি ব্যাপারে স্বর্গত চারু বাঁড়ুয্যেকে স্মরণে এনে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানানো উচিত।

'প্রবাসী'র কথা (এবং সুদ্ধমাত্র যে কথা লিখতে গেলেই পুরোপুরি একখানি ভলুম লিখতে হয়; আমার মনে হয় প্রবাসীর কর্মকর্তারা যদি 'প্রবাসী সঞ্চয়ন' জাতীয় একটি ভলুম বের করেন তবে বড় ভালো হয়—এতে থাকবে প্রবাসী থেকে বাছাই বাছাই জিনিস) বাদ দিলেই আসে 'মডার্ন রিভ্যু'র কথা। তখনকার দিনে মডার্ন রিভ্যু খাস লণ্ডনে প্রচারিত যে কোনো কাগজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতো। আজও প্রাচ্যভূমিতে এর চেয়ে সেরা ইংরিজি মাসিক বেরোয় নি।

১ হুবহু শিরোনামটি আমার মনে নেই বলে দুঃখিত।

* * * *

প্রবাসী ও মডার্ন রিভ্যু ('বিশাল ভারতে'র সঙ্গে আমি পরিচিত নই ; পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে—'হিন্দীর পৃষ্ঠপোষক রামানন্দ'—লিখবেন) এই একাধিক পত্রিকার মাধ্যমে রামানন্দ ভারতের রাজনৈতিক চিন্তায় এনে দেন স্পষ্ট চিন্তন, স্পষ্ট ভাষণ ও সর্বোপরি নির্ভীকতম সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার প্রচার। আমার মত বহু মুসলমান তখন রামানন্দকে চিন্তার জগতে নেতা বলে মেনে নিয়েছিলেন।

তারপর এমন একদিন এল যখন তাঁকে অনুসরণ করা আমার পক্ষে আর সম্ভবপর হল না। কিন্তু একশ বার বলবো, তিনি তাঁর বিবেকবুদ্ধিতে যেটি সত্য পথ বলে ধরে নিয়েছিলেন সেই পথেই এগোলেন। কোন সস্তা রাজনীতির চাল তাতে এক কানাকড়িও ছিল না।

বিশ্বভারতীতে আমি ছাত্র থাকার সময় পরম শ্রদ্ধেয় স্বর্গত রামানন্দ কিছু-দিনের জন্য অধ্যক্ষ ছিলেন। সে-সময়ে তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য না হয়েও তাঁর সংস্পর্শে এসে ধন্য হয়েছি। অন্য সব কথা বাদ দিন, আমাকে স্তম্ভিত করেছিল তাঁর চরিত্রবল। এবং সঙ্গে সাতিশয় মৃদুকণ্ঠে কঠোরতম, অকুণ্ঠ সত্যপ্রচার।

* * * *

এদেশে এরকম একটি লোক আজ চাই। কর্তাদের কানে জল ঢেলে দেওয়ার জন্য।

* * * *

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ, শান্তিঃ।

সরলাবালা

সরলাবালার অমরাত্মার উদ্দেশে বার বার প্রণাম জানাই।

বাঙলার সংস্কৃতি জগতে তিনি এতই সুপরিচিতা যে, বহু কীর্তিমান লেখক তাঁর জীবনী নিয়ে আলোচনা করবেন, তাঁর বহুমুখী প্রতিভার অকুণ্ঠ প্রশংসা করবেন, তাঁর সরল জীবনাদর্শ তিনি দেশের দশের চিন্ময় জগতে যে কতখানি সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন, তা দেখে বার বার বিস্ময় মানবেন।

কিন্তু আমরা যারা তাঁর স্নেহ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছি—আমাদের শোকের অন্ত নেই যে, আজ আমরা যাঁকে হারালুম, তাঁর আসন নেবার মত আর কেউ রইলেন না। সাহিত্য জগতে তিনি ছিলেন আমাদের স্নেহময়ী

মাতার মত। আমরা জানতুম, যে সাপ্তাহিক-দৈনিক পত্রিকার জগতে আমরা বিচরণ করি, সেখানে নানা বাধাবিঘ্ন আছে, কিন্তু এ-কথাও আরো সত্যরূপে জানতুম যে, শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের ফরিয়াদ-আর্তনাদ এমন একটি মাতার কাছে নিয়ে যেতে পারবো, যেখানে সুবিচার পাবই পাব।

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না।

১৯৪৪ ইংরিজিতে আমি 'সত্যপীর' নাম নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় পরবর্তী স্তম্ভে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করি। দুটি লেখা প্রকাশিত হওয়ার পরই সরলাবালার এক আত্মীয়, আমার বন্ধু এসে আমাকে জানালেন, আমার লেখা তাঁর মনঃপূত হয়েছে।

নিজেকে ধন্য মনে করেছিলুম। ঐ দিনই আমার আত্মবিশ্বাসের সূত্রপাত।

তাই আজ স্বর্গত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কথাও বার বার মনে পড়ছে। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা এবং সরলাবালার অনুমোদন না পেলে বাঙ্গালীকে আমার সামান্য যেটুকু বলার ছিল, সেটুকু বলা হত না।

একটুখানি ব্যক্তিগত কথা বলা হয়ে যাচ্ছে, সেটা হয়তো দৃষ্টিকটু ঠেকবে, কিন্তু আজ যদি আমার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা সর্বজনসমক্ষে উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ না করি, তবে অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ-নেমকহারামের আচরণ হবে। বরঞ্চ সে-আচরণ দৃষ্টিকটুকর হোক।

এ-কথা সত্য, 'আনন্দবাজার', 'হিন্দুস্থান', 'দেশ' পত্রিকায় আমার একাধিক বন্ধু ও স্নেহভাজন ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁদেরই একজনের—এঁর কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি—মাধ্যমে সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। কিন্তু এ-কথা আরো সত্য যে, এঁরা সকলেই সহৃদয় বলে আমার মত আরো বহু বহু অচেনা অজানা লেখককে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছেন। সুরেশচন্দ্র যেমন এক দিকে পাকা জহুরীর মত কড়া সমালোচক ছিলেন, অন্য দিকে ঠিক তেমনি অতিশয় সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। এই দ্বন্দ্বের সমাধান না করতে পেরে তিনি অনেক সময় অভাজন জনকেও গ্রহণ করতেন—আমি তাদেরই একজন।

সুরেশচন্দ্রকে আমি বাঘের মত ডরাতুম, যদিও খুব ভালো করেই জানতুম যে, তাঁকে ডরাবার কণামাত্র কারণ নেই। কঠিন কথা দূরে থাক—যে ক'বৎসর আমি তাঁর স্নেহ-রাজত্বে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলুম, তার মধ্যে একদিন একবারও তিনি আমার লেখার সমালোচনা করেননি, কোনো আদেশ বা উপদেশও দেননি।

মনে পড়ছে ১৯৪৪-৪৫ কলকাতায় একবার একটা অশান্তির সৃষ্টি হয়।

আফ্‌টার-এডিট না লিখে লিখলুম একটি কবিতা। মনে ভয় হল, আফ্‌টার-এডিটের এরজাৎস্‌ তো কবিতায় হয় না! তাই এ নিয়ে গেলুম সুরেশবাবুর কাছে স্বহস্তে। তিনি মাত্র দুটি ছত্র পড়েই প্রেসে পাঠিয়ে দিলেন। 'ওরে—এঁকে চা দে, আর কি দিবি দে, আর'—বাক্য অসমাপ্ত রেখে তিনি ফের কাজে মন দিলেন।

তবু তাঁকে আমি ডরাতুম। কিন্তু যেদিন শুনলুম, সুরেশচন্দ্র অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন সরলাবালাকে এবং তিনি আমার রচনার উপর আশীর্বাদ রেখেছেন, সেদিন আমার মনে এক অদ্ভুত সাহস সঞ্চার হল। আমার মনে হল, পত্রিকা জগতের সুপ্রীম কোর্টের (তখন বোধ হয় প্রিভি কৌন্সিল ছিল) চীফ জস্‌টিসের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেল—সে জগতে যদি আমার মনোবেদনার কারণ ঘটে, তবে আপীল করবো খুদ সুপ্রীম কোর্টে! অবশ্য আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমাকে কখনো স্মল-কজ কোর্টেও যেতে হয়নি। হবে না, সে বিশ্বাসও ধরি।

এটা আমার ব্যক্তিগত কথা নয়। বহু কর্মী, প্রচুর সাহিত্যিক আমার কথায় সায় দেবেন।

সরলাবালা ফ্যাঁ দ্য সিয়েক্লের (এণ্ড অব দি সেঞ্চুরির) লোক। গত শতাব্দীর শেষ এবং এ শতাব্দীর অর্ধাধিক তিনি দেখেছেন। ফরাসীতে যেমন এঁদের ফ্যাঁ দ্য সিয়েক্লের প্রতিভূ বলে, আরবাতে ঠিক তেমনি বলে জুঁঅল্‌-করনেন্‌—'দুই শতাব্দীর মালিক'। এঁদের সম্বন্ধে লেখা কঠিন। বঙ্কিম রমেশের মধ্যাহ্ন গগন, রবীন্দ্রনাথ শরচ্চন্দ্রের উদয় সরলাবালা চোখের সামনে দেখেছেন—এবং আর পাঁচজনের তুলনায় অনেক বেশী ভালো করে দেখেছেন, কারণ সাহিত্যে তাঁর রসবোধ ছিল তো বটেই, তদুপরি তাঁর আসন ছিল ঘোষ সরকার উভয় পরিবারের পত্রিকা-জগতের মাঝখানে। এদিকে বৈষ্ণবধর্মের রসকুণ্ডে তিনি আবাল্য নিমজ্জিতা, অন্য দিকে শ্রীরামকৃষ্ণের আন্দোলন, বিবেকানন্দের কর্মযোগ এবং সর্বশেষ শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় তিনি ছিলেন সক্রিয় কর্মী। অত্যন্ত উদারচিত্ত না হলে মানুষ এ তিনটেকে একসঙ্গে গ্রহণ করতে পারে না। আমার কাছে আরো আশ্চর্য বোধ হয়, যে রমণী কোনো বিদ্যালয়েও কখনো যাননি, চিরকাল অন্তঃপুরের অন্তরালেই রইলেন, তাঁর পক্ষে এতখানি উদার, এতখানি ক্যাথলিক হওয়া সম্ভব হল কি প্রকারে?

ফ্যাঁ দ্য সিয়েক্ল সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু পড়েছি, কিন্তু তার অধিকাংশ—অধিকাংশ কেন, প্রায় সমস্তটাই পুরুষের লেখা। তার মাঝখানে সরলাবালার কোমল নারীহৃদয় সব কিছু অনুভব করছে হৃদয় দিয়ে, মাতৃরসে সিক্ত করে।

ইংরিজিতে বলতে গেলে বলবো, তাঁর বর্ণনা 'রিচ্ উইদ্ নলেজ' না হতে পারে সর্বক্ষেত্রে, কিন্তু নিশ্চয় নিশ্চয় অতিনিশ্চয় 'রেডিয়েণ্ট উইদ্ লাভ্'।

অথচ তাঁর লেখাতে ভাবালুতা উচ্ছ্বাসপ্রবণতা নেই। অত্যন্ত মধুর, আন্তরিক লেখার মধ্যেও সর্বক্ষণ পাই, কেমন যেন একটা বৈরাগ্যের—ডিটাচমেণ্টের ভাব। আমার মনে হয়, তিনি বাল্যকাল থেকে অনেক শোক পেয়েছিলেন বলেই বৈরাগ্য-যোগে আপন চেষ্টায় সেসব শোক সংহরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর রচনাতে পদে পদে তারই পরিচয় পাই।

ছেলের হৃদয়ের আঁকুবাঁকু মা কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারেন, এবং তিনি যখন সেটা সরল ভাষায় প্রকাশ করেন, তখন ছেলে বিস্ময় মানে, যে জিনিস সে-ই ভালো করে বুঝতে পারেনি, মা বুঝল কি করে এবং এত সরল ভাষায় প্রকাশ করলো কি করে?

বাঙলার চিন্ময় জগতে সরলা ছিলেন মাতৃরূপা। অতি অল্প বয়সেই তিনি মাতৃক্রোড় পেতে দিয়েছিলেন বাঙলার তরুণকে। তাই শুনতে পাই, বাঙালীর উপর যখনই অত্যাচার এসেছে, তিনি ক্ষুব্ধা মাতার মত অনশন করেছেন। এবং তাই তিনি শেষ দিন পর্যন্ত বাঙালীর মনোবেদনা হৃদয় দিয়ে অনুভব করে অতি মহৎ ভাষায় সেটি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন।

সে ভাষায় আছে দার্ঢ্য অথচ মাধুর্য।

এবং সর্বোপরি সে ভাষা অতিশয় সরলা।

সার্থক নাম সরলাবালা॥

হাসনোহানা

বছর বারো পূর্বে ভারতীয় একখানা জাহাজ সুয়েজের কাছাকাছি লোহিত সাগরে আগুন লেগে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। কাপ্তেন সারেঙ্গ মাঝিমাল্লা বেবাক লোক মারা যায়। আশপাশের জাহাজ মাত্র একটি অর্ধদগ্ধ জীবন্মৃত খালাসীকে বাঁচাতে সক্ষম হয়। তাকে সুয়েজ বন্দরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবরের কাগজে মাত্র কয়েক লাইনে সমস্ত বিবরণটা প্রকাশিত হয়, এবং সর্বশেষে লেখা ছিল, সেই অর্ধদগ্ধ খালাসীটি কাতর কণ্ঠে জল চাইছে কিন্তু বার বার জল এগিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও জল খাচ্ছে না।

অলস কৌতূহলে আমি আর পাঁচজনের মত খবরটি পড়ি। কিন্তু হঠাৎ মগজের ভিতর ক্লিক্ ক্লিক্ করে কতকগুলো এলোপাতাড়ি ফেলে-দেওয়া টুকরো

টুকরো তথ্য একজোট হয়ে কেমন যেন একটা প্যাটার্ন তৈরি করে ফেললে।

প্রথমত, সুয়েজ বন্দরের কাছে-পিঠে আমি আমার প্রথম যৌবনের একটি বছর কাটিয়েছিলুম। সেখানে 'জল'-কে 'মা-ই' বলা হয়; যদিও খাঁটি আরবীতে 'জল'-কে 'মা-আ' বলা হয়। দ্বিতীয়ত ভারতীয় জাহাজের খালাসী পুব বাঙলার মুসলমান হওয়ারই কথা। এবং পুব বাঙলায়, বিশেষ করে সিলেট মৈমনসিং অঞ্চলে 'মা'-কে 'মা-ই' বলে।

অতএব খুব সম্ভব ঐ অর্ধ-দগ্ধ খালাসী বেচারী আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে কাতরকণ্ঠে আপন মাতাকে স্মরণ করে বার বার যে 'মা-ই' 'মা-ই' বলছিল তখন সে সুয়েজের আরবীতে জল চাইছিল না। তাই জল দেওয়া সত্ত্বেও সে সে-জল প্রত্যাখ্যান করছিল।

অর্থাৎ একই শব্দ একই ধ্বনি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ধরতে পারে।

তাই একটি শব্দ নিয়ে আমি হালে অনেক চিন্তা করেছি।

হাস্নোহানা। রাজশেখরবাবু এইভাবেই বানান করেছেন। কিন্তু বানান নিয়ে আমার মাথাব্যথা নয়। শিরঃপীড়া শিকড়ে। অর্থাৎ শব্দটার রূট কি? ব্যুৎপত্তি কি?

রাজশেখর বলছেন, [জাপানী। = পদ্মফুল] সাদা সুগন্ধ ছোট ফুল বিঃ (অশুদ্ধ কিন্তু সুপ্রচলিত)।

সুবল মিত্র বলছেন, জাপানী। একরকম ছোট সুগন্ধী ফুল।

বাঙলায় আর যে দুখানা উত্তম অভিধান আছে তার প্রথম, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ এবং দ্বিতীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙলা ভাষার অভিধান। উভয় অভিধানেই শব্দটি নেই। এটা কিছু বিচিত্র নয়। পঞ্চাশ-ষাট বছর মাত্র হল শব্দটা লেখাতে ঢুকেছে—আমার যতদূর জানা।

শুনেছি, বাঙলা থেকে সংস্কৃতাগত শব্দ বাদ দিলে শতকরা ষাটটি শব্দ আরবী ফার্সী কিংবা তুর্কী। ডজন দুত্তিন পর্তুগীজ এবং শ' কয়েক ইংরিজি। ফরাসী ইত্যাদি নগণ্য। জাপানী আর কোনো শব্দ বাঙলাতে আছে বলে জানি নে। আমরা শান্তিনিকেতনের লোক 'কিমোনো'—জাপানী আলখাল্লা—শব্দটা ব্যবহার করি, কিন্তু সেটি কোনো অভিধানে ঢুকেছে বলে জানি নে, সাহিত্যে তো নয়ই। কিমোনো পরিহিত সত্যপ্রকাশ ও রবীন্দ্রনাথের ছবি রবীন্দ্ররচনাবলীতে পাওয়া যায়।

তাই প্রশ্ন, হঠাৎ দুম্ করে একটা জাপানী শব্দ বাঙলায় ঢুকল কি করে? তবে কি জাপান থেকে এসেছে হাসনোহানা ফুল? সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা? চিত্রকর

বিনোদ মুখুজ্যে, নন্দলালের নন্দন বিশ্বরূপ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জাপান দেখে এসেছেন। অন্ধ্রের বীরভদ্র রাও, মালাবারের হরিহরণ। এঁরা সবাই শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। তাই এঁদের চিনি। এঁরা সবাই অজ্ঞভাবে মাথা নেড়ে বলেন হাসনো-হানা ফুল জাপানে নেই—অর্থাৎ আমরা এদেশে যেটাকে হাসনোহানা বলে চিনি—এবং শব্দটার ব্যুৎপত্তি জাপানী এ সম্বন্ধে সকলেই গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেন। তার অন্যতম কারণ এঁরা সকলেই বাঙলা জানেন—বীরভদ্র হরিহরণ শান্তিনিকেতনে নন্দলালের সাহচর্যে অত্যুত্তম বাঙলা শিখেছেন—এবং জাপানী আর কোনো শব্দ হুট্ করে বাঙলায় ঢুকে গিয়ে থাকলে তাঁরা এ প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন।

কলকাতার উর্দুভাষী, তথা বাঙলা এবং উর্দু দোভাষীরা বলেন, হুস্‌ন্-ই-হিনা। 'হুস্‌ন্' শব্দটি আরবী, অর্থ সৌন্দর্য, খুবসুরতী—যার থেকে আমাদের মহরমের হাসন হোসেন জিগির—স্লোগান—শব্দদ্বয় এসেছে। 'হিনা' শব্দ বাঙলায় হেনা। রবীন্দ্রনাথের গান আছে হেনা, হেনার মঞ্জরী। হেনা শব্দের অর্থ মেহদি। হাসনোহানার পাতা অনেকটা মেহদি-পাতার মত। তাহলে দাঁড়ালো এই—'হেনার সৌন্দর্য'। অর্থাৎ সুন্দরতম হেনা। অর্থাৎ হেনা par excellence। কিন্তু জিনিসটা তো আর 'হেনা' নয়।

উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু বিহার, উত্তরপ্রদেশ লক্ষ্ণৌ-দিল্লি, আজমীর-বরদা সর্বত্রই এ ফুলটি ডাকা হয় রাতকী রানী নাম ধরে। গুজরাতে অবশ্য রাত-নী রানী ধরে। অর্থ, রাতের রানী। হুস্‌ন্-ই-হিনা সমাস এরা চেনেন না। দিল্লিতে আপনি হাসনোহানার আতর কিনতে পাবেন। কিন্তু চাইবার সময় বলতে হবে, রাতকী রানীর আতর। হাসনো-হানা বা হুস্‌ন্-ই-হিনা বললে চলবে না। খাস হেনার আতর আলাদা।

কাবুল কান্দাহার তব্রীজ তেহরানে এ ফুল নেই। ত্রিশ বছর পূর্বে ছিল না এ-কথা আমি বুক ঠুকে বলতে পারি। হেনা অর্থাৎ মেহদি পাতা অবশ্য আছে। এবং ইরানের কবিরা ভারতের মেহদির প্রচুর গুণ-গান গেয়েছেন। যথা—

পরিপূর্ণতা পাবে তুমি কোথা
ইরাণ দেশের ভূঁয়ে,
মেহদীর পাতা রুড়া লাল হয়
ভারতের ভুঁই ছুঁয়ে।
নীস্ত দর্ ঈরান্ জমীন্ সমান-ই
তহসীল-ই কামিল

তা নিয়ামিদ্ সোঈ হিন্দোস্তান
হিনা রঙীন ন্ শুদ্।[১]

হাসনোহানা গাছ ইরান-তুরানে নেই কিন্তু শব্দটা তো অভিধানে থাকতে পারে—যেমন 'আকাশ কুসুম' কিংবা 'অশ্ব-ডিম্ব' ত্রিভুবনে নেই বটে (যদিও তার অনুসন্ধান চলে, যেমন পূর্বেই উল্লেখ করেছি, শোপেনহাওয়ার দর্শনচর্চার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'অমাবস্যার অন্ধকার অঙ্গনে অন্ধের অনুপস্থিত অসিত অশ্ব অণ্ডের অনুসন্ধান') তবু অভিধানে শব্দগুলো পাওয়া যায়। হাতের কাছে রয়েছে স্টাইনগাস্ সাহেবের অত্যুৎকৃষ্ট—এমন কি সর্বোৎকৃষ্ট বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না—অভিধান। আর রয়েছে ক্যাথলিক পাদ্রী হাভা সাহেবের আরবী কোষ, বেইরুৎ থেকে প্রকাশিত। এই ফার্সী আরবী কোনো কোষেই হুস্ন্-ই-হিনা নেই। 'হুস্ন্' ও 'হিনা'র মাঝখানে যে 'ই' আছে এটি খাঁটি ফার্সী। কাজেই এই সমাসটি আরবী অভিধানে থাকার কথা নয়। তবু, যেহেতু আরবরা ইরান বিজয়ের পর বহু ফার্সী শব্দ আপন ভাষায় গ্রহণ করে, তাই ভাবলুম, হয়তো শব্দটা থাকতেও পারে। বিশেষ করে ফুলের মামেলা যখন রয়েছে। কারণ 'গুল্' ফার্সীতে 'ফুল'।

'আপ' (সংস্কৃত অপ্) ফার্সীতে 'জল'। অর্থাৎ আমরা যাকে বলি গোলাপ ফুল। আসলে কিন্তু গোলাপ (গুলাপ) অর্থ রোজওয়াটার। আরবীতে 'গ' এবং 'প' ধ্বনি নেই বলে গোলাপ হয়ে গেল 'জুলাব'। গোলাপ-জল বিরেচক। তাই বাঙলাতে 'জোলাপ' 'গোলাপ' দুটি সমাসই প্রবেশ করেছে।

তা সে যাই হোক, আরবরা যখন 'গুল' নিয়েছে তখন হাসনোহানা নিতে আপত্তি কি ?

কিন্তু আরবী অভিধান নীরব। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় উর্দু অভিধানও শব্দটির উল্লেখ করে না। উত্তর প্রদেশের উর্দুভাষীরা হাসানোহানাকে 'রাতকী রানী' বলেন বলুন, কিন্তু কোষকার কলকাতায় প্রচলিত হুস্ন্-ই-হিনা তাঁর অভিধানে দিলে ভালো করতেন।

উর্দুতে হেনা নিয়ে অজস্র দোহা কবিতা আছে। হেনা বলছে-

পিস্ গয়ী তো পিস্ গয়ী,
ঘুঁ হো গয়া তো হো গয়া
নাম তো বর্গে হিনাকা
ভুল্‌হিনোঁ মে হো গয়া

তাই আমার সমস্যা :—

(১) হয় শব্দটা জাপানী থেকে এসেছে।

(২) নয়, এটি কলকাতার উর্দুভাষীদের নিরবদ্য 'অবদান'।

পাঠক ভাববেন না আমি রাজশেখরের ভুল দেখাবার জন্য এ আলোচনা তুলেছি। রাজশেখর শত ভুল করলেও তাঁর অভিধান চলন্তিকা শতায়ু—সহস্রায়ু। চলন্তিকা চলে এবং চলবে।

আমার নিবেদন, বাঙলা দেশে এখন গোটা চারেক বিশ্ববিদ্যালয়। সেগুলোতে বাঙলা ভাষা পুরো সম্মান পাচ্ছে। বাঙলায় আরবী, ফার্সী, তুর্কী শব্দ নিয়ে পয়লানম্বরী গবেষণা হওয়া উচিত।

ইতিমধ্যে কোন পাঠক-পাঠিকা যদি বিষয়টির উপর আলোকপাত করেন তবে বড় উপকৃত হই।[২]

'আমায় পিষে ফেললে তো ফেললে, আমি রক্তাক্ত হয়ে গেলুম তো গেলুম। কিন্তু কনেদের ভিতর তো মেহদি পাতার নাম রাষ্ট্র হল।' ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলে হিন্দু মুসলমান কনেদের মেহদি দিয়ে হাত রাঙা করতে হয়। আরেক কবি বলেছেন, 'হেনার পাতার উপর হৃদয়-বেদনা লিখি ; হয়তো পাতাটি একদিন প্রিয়ার হাতে পৌঁছবে।'

২ 'হাসনোহানা' যখন "দেশে" বেরয় তখন এ বিষয়ে "দেশ" পত্রিকায় একাধিক পত্র 'আলোচনা' বিভাগে প্রকাশিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার বাড়ির লোক আমার লেখার কাটিং রাখে, আলোচনার রাখে না। যতদূর মনে পড়ছে, একাধিক লেখক আপ্রাণ চেষ্টা দেন, আমাকে বোঝাবার জন্য, 'হাসনো-হানা' ও 'হেনা' ভিন্ন। আমার রচনাটি একটু মন দিয়ে পড়লে আমি যে দুটোতে ঘুলিয়ে ফেলিনি সেটা পরিষ্কার হবে। 'হেনা—par excellance' এস্থলে ঐ দুটি ফরাসী শব্দ বোঝায় যে par excellence রূপে যে বস্তু ধারণ করে, সে সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্র ও বর্ণের হতে পারে। একটি মহিলা সুদূর 'হৈদ্রাবাদ' থেকে 'হেনা' ও 'হাসনোহানা'র পাতা আলাদা করে, নিশ্চয়ই অনেকখানি কষ্ট স্বীকার করে, পাঠান। তাঁকে ধন্যবাদ। দুটি গাছই আমার বাগানে আছে॥··· অন্য একজন লেখেন, "সুনীতিবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, হাসনোহানা জাপানী শব্দ।" সুনীতিবাবু দৃঢ় না ক্ষীণকণ্ঠে বলেছিলেন সেটা গুরুত্বব্যঞ্জক নয়, গুরুত্ব ধরতো যদি পত্রলেখক সুনীতিবাবুর যুক্তিগুলোর উল্লেখ করতেন। কারণ আমার এক সহকর্মী হিন্দী ও উর্দু বাবদে তাঁর আপন কর্মক্ষেত্রে, সুনীতিবাবুরই মত যশস্বী

বঙ্গে মুসলিম সংস্কৃতি

আজ যদি শুধুমাত্র সংস্কৃত পুস্তকপত্র থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখতে হয় তা হলে এ দেশে মুসলমান ধর্ম আদৌ প্রবেশ করেছিল কি না সে নিয়ে বিলক্ষণ তর্কের অবকাশ থাকবে। অথচ আমরা ভালো করেই জানি, মুসলমান-আগমনের পরও প্রচুর সংস্কৃত পুস্তক লেখা হয়েছে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা পাননি সত্য, কিন্তু তাঁদের ব্রহ্মোত্তর-দেবোত্তর জমিজমার উপর হস্তক্ষেপ না হওয়ার ফলে তাঁদের ঐতিহ্যগত বিদ্যাচর্চা বিশেষ মন্দীভূত হয়নি। কিন্তু এইসব পণ্ডিতগণ পার্শ্ববর্তী মুসলমানদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন থেকেই আপন আপন লেখনী সঞ্চালনা করেছেন।[১] অল্লোপনিষদ্ জাতীয় দু-চারখানা পুস্তক নিতান্তই প্রক্ষিপ্ত। বরঞ্চ এরা সত্যানুসন্ধানকারীকে পথভ্রষ্ট করে।

পণ্ডিত (নাম বলে কাউকে 'বুলি' করার কী দরকার।) দৃঢ়তর কণ্ঠে বলেন, সমাসটা ফার্সী—এদেশে নির্মিত।...তবে এস্থলে বিশ্বকোষের শ্রীযুত পূর্ণ মুখুয্যে আমাকে সাহায্য করেছেন। তিনি লেখেন যে, যে সময়ে এদেশে হাসনোহানা ফুল বিদেশ থেকে আসে তখন জাপনীরা কলকাতার বাজারে 'হাসনোহানা' নাম দিয়ে একটি সুগন্ধি পদার্থ (সেণ্ট) ছাড়ে। তাঁর চিঠির ভাবার্থ এই ছিল। তাই আমার মনে হয়, সেই সেণ্টের নাম নিয়ে ঐ সময় আগত বিদেশী ফুলকে 'হাসনোহানা' নাম দেওয়া হয়। এটা অসম্ভব নয়। প্রাগুক্ত উর্দু পণ্ডিত সেটা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, তিনি ছেলেবেলা থেকেই 'হুস্‌ন্-ই-হিনা' শুনেছেন। ঐ সেণ্ট কলকাতা আগমনের বহু পূর্ব থেকে।

১ টয়িনবি সাহেব যে রীতিতে পৃথিবীর সর্বত্র একই প্যাটার্নের অনুসন্ধান করেন বর্তমান লেখক সে নীতি অনুসরণে বিরত থাকবে। শুধু যেখানে প্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি দেখিয়ে দিলে আলোচ্য বিষয়বস্তু স্পষ্টতর হবে সেখানেই এই নীতি মানা হবে। এস্থলে তাই শুধু উল্লেখ করি, যখনই কোন জাতি বৈদেশিক কোনো ভিন্নধর্মাবলম্বী দ্বারা পরাজিত হয় তখন নূতন রাজা এঁদের পণ্ডিতমণ্ডলীকে কোনো প্রধানকর্মে আমন্ত্রণ জানান না বলে এঁদের এক মানসিক পরিবর্তন হয়। এঁদের চিন্তাধারা তখন মোটামুটি এই: 'আমাদের ধর্ম সত্য, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে আমরা ম্লেচ্ছ বা যবন কর্তৃক পরাজিত হলুম কেন? এর একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে, আমরা আমাদের ধর্মের প্রকৃত রূপ বুঝতে পারিনি। ধর্মের অর্থকরণে (ইণ্টারপ্রিটেশনে) নিশ্চয়ই

এ এক চরম পরম বিস্ময়ের বস্তু। দশম, একাদশ শতাব্দীতে গজনীর মাহমুদ বাদশার সভাপণ্ডিত আবু-র্‌-রইহান মুহম্মদ অলবীরুনী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর প্রামাণিক পুস্তকে একাধিকবার সবিনয়ে বলেছেন, 'আমরা (অর্থাৎ আরবীতে) যাঁরা জ্ঞানচর্চা করি, দার্শনিক চিন্তা আমাদের মজ্জাগত নয়। দর্শন নির্মাণ করতে পারে একমাত্র গ্রীক ও ভারতীয়েরা।'

সেই ষড়দর্শননির্মাতা আর্য মনীষীগণের ঐতিহ্যগর্বিত পুত্রপৌত্রেরা মুসলমান-আগমনের পর সাত শত বৎসর ধরে আপন আপন চতুষ্পাঠীতে দর্শনচর্চা করলেন, কিন্তু পার্শ্ববর্তী গ্রামের মাদ্রাসায় ঐ সাত শত বৎসর ধরে যে আরবীতে প্লাতো থেকে আরম্ভ করে নিওপ্লাতনিজম তথা কিন্দী, ফারাবী, বূ আলীসিনা (লাতিনে আভিসেনা), অল-গজ্জালী[২] (লাতিনে অল-গাজেল), আবূ রুশ্‌দ্‌ (লাতিনে আভেরস) ইত্যাদি মনীষীগণের দর্শনচর্চা হল তার কোনো সন্ধান পেলেন না। এবং মুসলমান মৌলানারাও কম গাফিলী করলেন না। যে মৌলানা অমুসলমান প্লাতো-আরিস্ততলের দর্শনচর্চায় সোৎসাহে সানন্দে জীবন কাটালেন তিনি একবারের তরেও সন্ধান করলেন না, পাশের চতুষ্পাঠীতে কিসের চর্চা হচ্ছে। তিনিও জানতে পেলেন না যে, তিনি প্লাতোর আদর্শবাদ দৃঢ়ভূমিতে নির্মাণ করার জন্য যেসব যুক্তি আকাশ-পাতাল থেকে আহরণ করেছেন তাঁর পাশের চতুষ্পাঠীতেই হিন্দু দার্শনিক শঙ্করাচার্যের আদর্শবাদ সমর্থনার্থে সেইসব যুক্তিই খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তিনি 'গুলাত' নাস্তিকদের জড়বাদ যেভাবে খণ্ডন করছেন, ব্রাহ্মণও চার্বাকের নাস্তিকতা সেইভাবেই খণ্ডন করছেন। এবং সবচেয়ে পরমাশ্চর্য, তিনি যে চরক-সুশ্রুতের আরবী অনুবাদে পুষ্ট বূ আলী সিনার চিকিৎসাশাস্ত্র—'য়ূনানী' নামে প্রচলিত (কারণ তার গোড়াপত্তন গ্রীক [আইওনিয়ান = য়ূনানী] চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর)—আপন মাদ্রাসায় পড়াচ্ছেন, সুলতান বাদশার চিকিৎসার্থে প্রয়োগ করছেন, সেই চরক-সুশ্রুতের মূল পাশের টোলে পড়ানো হচ্ছে। সিনা উল্লিখিত যে-ভেষজ কি, তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না, কিংবা সিনা বলেছেন, ফলানা ওষধিবনস্পতি এ দেশে (অর্থাৎ

আমাদের ভুল রয়ে গিয়েছে। আমরা তা হলে নূতন করে ব্যাখ্যা করে দেখি, ত্রুটি কোন্ স্থলে হয়েছে।' ফলে পরাজয়ের পরবর্তী যুগে তাবৎ সৃষ্টিশক্তি টীকাটিপ্পনী রচনায় ব্যয় হয়।

২ ইসলামের অন্যতম প্রখ্যাত পথপ্রদর্শক বা ইমাম। ইনি দার্শনিক—কিয়ৎকালের জন্য নাস্তিক—এবং পরিণত-বয়সে সুফী (মিস্টিক, ভক্তিমার্গ ও

আরবে) জন্মে না, সেগুলো যে তাঁর বাড়ির পিছনের আস্তাকুঁড়ে গজাচ্ছে তারও সন্ধান তিনি পেলেন না। কিঞ্চিৎ কল্পনাবিলাস করলে, এ পরিস্থিতিও অনুমান করা অসম্ভব নয় যে মৌলানার বেগমসায়েবা সিনা-উল্লিখিত কোন শাক তাঁকে পাক করে খাওয়ালেন, আর তিনি সেটি চিনতেই পারলেন না।

পক্ষান্তরে ভারতীয় আয়ুর্বেদ মুসলমানদের ইউনানী চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে বিশেষ কিছু নিয়েছে বলে আমার জানা নেই।

এই দুস্তর মরুভূমির মাঝখানে মাত্র একটি লোক দেখতে পাই। আওরঙ্গজেবের অগ্রজ যুবরাজ মুহম্মদ দারাশীকুহ্। ইনিই সর্বপ্রথম দুই ধর্মের সমন্বয় সম্বন্ধে বহুতর পুস্তক লেখেন। তার অন্যতম মজমা'-উল্-বহরেন, অর্থাৎ দ্বিসিন্ধু-সঙ্গম। দারাশীকুহ্ বহু বৎসর অনাদৃত থাকার পর তাঁর সম্বন্ধে প্রামাণিক গবেষণা বিশ্বভারতীতেই হয়। শ্রীযুত বিক্রমজিৎ হসরৎ ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 'দারাশীকুহ্ : লাইফ অ্যাণ্ড ওয়ার্কস' নামক একখানি অত্যুত্তম গ্রন্থ লেখেন এবং বিশ্বভারতী কর্তৃক সেটি প্রকাশিত হয়। প্রয়োজনমত আমরা এই পুস্তকখানি সদ্ব্যবহার করব।

আরও তিন শত বৎসর পর প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামমোহন রায় ফার্সীতে রচনা করেন তাঁর সর্বপ্রথম পুস্তক, 'তুহ্ফতু অল্-মুওয়াহ্হিদীন' : 'একেশ্বরবাদীদের প্রতি উৎসর্গ'। রাজা খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গেও সুপরিচিত ছিলেন বলে তাঁর পুস্তককে 'ত্রিরত্ন'ধারী বা ত্রিপিটক বললে অত্যুক্তি হয় না। ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাঁরা সামান্যতম অনুসন্ধান করেছেন তাঁরাই জানেন রাজার শিক্ষাদীক্ষা ইসলাম ও মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতির নিকট কতখানি ঋণী এবং পরবর্তী জীবনে যদিও তিনি উপনিষদের উপর তাঁর ধর্মসংস্কারসৌধের দৃঢ়ভূমি নির্মাণ করেছিলেন তবু শেষদিন পর্যন্ত ইসলামের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার কণামাত্র হ্রাস পায়নি। প্রয়োজনমত আমরা তাঁর রচনাবলীরও সদ্ব্যবহার করব।

প্রায় ছ'শ বৎসর ধরে এ দেশে ফার্সীচর্চা হল। হিন্দুরা না হয় বিদেশাগত

যোগের সমন্বয়কারী) হয়ে যান। এঁর জনপ্রিয় পুস্তক 'কিমিয়া সাদৎ' এই শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলায় অনূদিত হয়ে রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয়। বিশ্বভারতীর সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ স্বর্গত বিধুশেখর শাস্ত্রী এই পুস্তকের বড়ই অনুরাগী ছিলেন এবং আমাদের মন্দিরের উপাসনায় একাধিকবার ব্যবহার করেছেন। বিধুশেখর অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ 'টোলো পণ্ডিত' ছিলেন। স্মরণ রাখবার সুবিধার জন্য উল্লেখযোগ্য—গজ্জালীর মৃত্যু ১১১১ খ্রীষ্টাব্দে।

ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি কৌতূহল না দেখাতে পারেন, কিন্তু যাদের রাজ্যচালনা করতে হয়েছে তাদের বাধ্য হয়ে এ দেশের ভাষা রীতিনীতি অল্পবিস্তর শিখতে হয়েছে। উত্তম সরকারী কর্ম পাবার জন্য বহু হিন্দুও ফার্সী শিখেছিলেন। মাত্র একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে: এ দেশে বহু হিন্দুর পদবী মুনশী। আমরা বাঙলায় বলি, লোকটির ভাষায় মুন্সিয়ানা বা মুন্‌শীয়ানা আছে, অর্থাৎ সে নাগরিক বিদগ্ধ চতুর (স্কিলফুল) ভাষা লেখে। এর থেকেই বোঝা যায়, কতখানি ফার্সী জানা থাকলে তবে মানুষ বিদেশী ভাষায় এ রকম একটা উপাধি পায়। তুলনা দিয়ে বলা যেতে পারে: আমরা প্রচুর ইংরিজি চর্চা করেছি, কিন্তু ইংরেজ মুন্‌শী-জাতীয় কোনো উপাধি আমাদের কাউকে দেয়নি—বরঞ্চ আমাদের 'ব্যাবু-ইংলিশ' নিয়ে ব্যঙ্গই করেছে। কিন্তু এ বিষয়ে সবিস্তর আলোচনা পরে হবে, উপস্থিত এইটুকু উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই মুন্‌শী-শ্রেণীর যাঁরা উত্তম ফার্সী শিখেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই কায়স্থ, সংস্কৃতের পটভূমি তাঁদের ছিল না, কাজেই উভয় ধর্মশাস্ত্রের সম্মেলনে করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। উপরন্তু এঁরা ফার্সী শিখেছিলেন অর্থোপার্জনের জন্য—জ্ঞানান্বেষণে নয়। তুলনা দিয়ে বলা যেতে পারে, আমরা প্রায় দুই শত বৎসর ইংরিজি বিদ্যাভ্যাস করেছি বটে, তথাপি খ্রীষ্টধর্মগ্রন্থ বাঙলায় অনুবাদ করার প্রয়োজন অতি অল্পই অনুভব করেছি।

শ্রীচৈতন্যদেব নাকি ইসলামের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। কথিত আছে বৃন্দাবন থেকে সশিষ্য বাঙলা দেশে আসার সময় পথিমধ্যে এক মোল্লার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সেই মোল্লা নাকি তাঁকে প্রশ্ন করেন, তিনি তাঁর শিষ্যদের ভ্রান্ত ধর্মপথে চালনা করছেন কেন? শ্রীচৈতন্যদেব নাকি তখন মুসলমান শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেন যে তিনি ভ্রান্ত ধর্মপ্রচার করছেন না। মুসলমান ধর্মে বলা হয়, যে লোক আর্তের সেবা করে, মিথ্যাচরণ বর্জন করে সৎপথে চলে—অর্থাৎ কুরান-শরীফ-বর্ণিত নীতিপথে চলে—তাকে 'পয়গম্বরহীন' মুসলমান বলা যেতে পারে, হজরৎ মুহম্মদকে পয়গম্বররূপে স্বীকার করেনি বলেই সে ধর্মহীন নয়। (আমরা এস্থলে 'কাফির' না বলে 'ধর্মহীন' শব্দ ইচ্ছা করেই ব্যবহার করছি, পরে এর বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন হবে)। অতএব অনুমান করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয় যে, বোধ হয় চৈতন্যদেব ঐ মতবাদেরই আশ্রয় নিয়েছিলেন। তদুপরি চৈতন্যদেবের মত উদার প্রকৃতিবান ব্যক্তির পক্ষে হজরৎ মুহম্মদকে অন্যতম মহাপুরুষ বা পয়গম্বররূপেও স্বীকার করে নিতে আপত্তি থাকার কথা নয়। বস্তুত সে যুগে, এবং এ যুগেও বহু হিন্দু সজ্জন মহাপুরুষ মুহম্মদকে আল্লার প্রেরিত পুরুষরূপে স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।

দ্বিতীয় ঘটনা, কাজী-কর্তৃক সংকীর্তন বন্ধ করা নিয়ে। কথিত আছে, সেবারেও তিনি যুক্তিতর্কে কাজীকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন। পূর্বের অনুমান এস্থলেও প্রযোজ্য।

কিন্তু চৈতন্যদেব উভয় ধর্মের শাস্ত্রীয় সম্মেলন করার চেষ্টা করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। বস্তুত তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দুধর্মের সংগঠন ও সংস্কার, এবং তাকে ধ্বংসের পথ থেকে নবযৌবনের পথে নিয়ে যাবার।

তবুও এ বিষয় নিয়ে সবিস্তর গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

এ যাবৎ আমাদের মূল বক্তব্য ছিল, মুসলমান যে জ্ঞানবিজ্ঞান ধর্মদর্শন সঙ্গে এনেছিলেন, এবং পরবর্তী যুগে, বিশেষ করে মোগল আমলে আকবর থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত মঙ্গোল-জর্জরিত ইরান-তুরান থেকে যে সব সহস্র সহস্র কবি পণ্ডিত ধর্মজ্ঞ দার্শনিক এ দেশে এসে মোগল রাজসভায় আপন আপন কবিত্ব পাণ্ডিত্য নিঃশেষে উজাড় করে দিলেন তার থেকে এ দেশের হিন্দু ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত, দার্শনিকরা কণামাত্র লাভবান হননি। এবং বিদেশাগত পণ্ডিত দার্শনিক এ দেশে এসেছিলেন একমাত্র অর্থলাভের উদ্দেশ্যে—কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের পর এঁদের অধিকাশ তাঁদের চরম নিমক-হারামীর পরিচয় দিয়েছেন পঞ্চমুখে এ দেশের নিন্দাবাদ করে। নিন্দা করেছেন মুসলমান রাজা এবং আমীর-ওম্‌রাহেরই—হিন্দু পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁদের কোনো যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি।

ফার্সী সাহিত্যের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্রাউন উপরে উল্লিখিত যুগকে ফার্সী সাহিত্যের 'ইণ্ডিয়ান সামার' 'পুনরুচ্ছলিত যৌবন' নাম দিয়েছেন। বস্তুত বর্বর মঙ্গোল অভিযানের ফলস্বরূপ ফার্সী সাহিত্যের যে অনাহারে মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল সে তখন অন্নজল পায় মোগল-দরবারে। ইরান আজকের দিনে ভারতের কাছে কতখানি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে সে খবর আমাদের কাছে পৌঁছয় না, কিন্তু ভারতবর্ষে ফার্সী সাহিত্যের এই যুগ নিয়ে অতি অল্প আলোচনাই হয়েছে, তাও উর্দুতে, বাঙলাতে কিছুই হয়নি।

এ তো প্রধানত সাহিত্য ও অন্যান্য বাঙ্ময়ের কথা, কিন্তু আমাদের কাছে ভারতবর্ষের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি বলে মনে হয় এই দেখে যে, ভুবন-বিখ্যাত ষড়দর্শনের দেশের লোক মুসলমান মারফতে প্লাতো-আরিস্ততল, সিনা-রুশ্‌দ্‌ নিয়ে সপ্তম দর্শন নির্মাণ করল না। কল্পনা করতে এক অদ্ভুত অনুভূতির সঞ্চার হয়—ভারতবর্ষ তা হলে দর্শনের ক্ষেত্রে কত না দিক্‌চক্রবাল উত্তীর্ণ হয়ে যেত—দেকার্ত কাঁণ্টের অগ্রগামী পথপ্রদর্শক এ-দেশেই জন্মাতেন!

পক্ষান্তরে মুসলমান যে-আরবী দর্শন সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তাই নিয়ে পড়ে রইলেন। মঙ্গোল কর্তৃক বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হওয়ার পর, এবং স্পেন থেকে মুররা বিতাড়িত হওয়ার ফলে আরব-জগতে দর্শনের অপমৃত্যু ঘটে। এ দেশের মুসলমান দার্শনিককে অনুপ্রাণিত করার জন্য বাইরের সর্ব উৎস সম্পূর্ণ শুষ্ক হল। হায়, এঁরা যদি পাকে-চক্রে কোনোগতিকে ষড়দর্শনের সন্ধান পেতেন!

এ তো কিছু অসম্ভব কল্পনা-বিলাস নয়। আজকের দিনের হিন্দু দার্শনিক এক দিকে নব্যন্যায় চর্চা করেন, অন্য দিকে দেকার্ত অধ্যয়ন করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এঁদের পথ-প্রদর্শক। কবি ইক্‌বালের ঐতিহ্যভূমি আভেরস-আভেচেন্নার উপর—তাঁর সৌধনির্মাণে তিনি সাহায্য নিয়েছেন কাণ্ট-হেগেলের।

আমরা এতক্ষণ যে অবস্থার বর্ণনা করলেম তার থেকে আপাতদৃষ্টিতে সিদ্ধান্ত করা সম্পূর্ণ অনুচিত নয় যে, ভারতবর্ষে তা হলে হিন্দু-মুসলমানের মিলন হয়নি। যেহেতু ব্রাহ্মণের দেবোত্তর বাদশা কেড়ে নেননি তাই তিনি নিশ্চিন্ত মনে আপন শাস্ত্র চর্চা করে যেতে লাগলেন, এবং যেহেতু আলিম-ফাজিলরা ওয়াক্‌ফ্‌-সম্পত্তি পেয়ে গেলেন তাই তাঁরাও পরমানন্দে তাঁদের মক্তব-মাদ্রাসায় কোরান-হদীসের চর্চা করে যেতে লাগলেন। একে অন্যের সঙ্গে মেলামেশা করার কোনো প্রয়োজন অনুভব করলেন না।

কিন্তু দেশের সকলের তো লাখেরাজ ব্রহ্মোত্তর ওয়াক্‌ফ্‌-সম্পত্তি নেই। চাষা তিলী জোলা কাঁসারী মাঝি চিত্রকর কলাবৎ বৈদ্য কারকুন এবং অন্যান্য শত শত ধান্দার লোককে অর্থোপার্জন করে জীবনধারণ করতে হয়। সে স্থলে হিন্দু মুসলমানকে বর্জন করে চলতে পারে না, মুসলমানকেও হিন্দুর সংস্পর্শে আসতে হয়। তদুপরি উচ্চাঙ্গের চিত্রকলা সংগীত স্থাপত্য বাদশা ও তাঁর অর্থশালী আমীর-ওমরাহের সাহায্য বিনা হয় না। বাদশারও দরকার হিন্দু রাজ-কর্মচারীর। কোনো দেশ জয় করা এক কর্ম, সে দেশ শাসন করা সম্পূর্ণ ভিন্ন শিরঃপীড়া। বাদশা ইরান-তুরান থেকে দিগ্বিজয় করার সময় রাজকর্মচারী সঙ্গে আনেননি। আর আনবেনই বা কি? তারা এ-দেশের ভাষা জানে না, রাজস্বব্যবস্থা বোঝে না, কোন্ দণ্ডনীতি কঠোর আর কোন্‌টাই বা অতি সদয় বলে দেশের লোকের মনে হবে—এ সম্বন্ধে তাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। বখ্‌শী (চীফ পে-মাস্টার, অ্যাকাউণ্টেন্ট্‌-কম্‌-অডিটার জেনারেল), কানুনগো (লিগেল রিমেমব্রেন্‌সার), সরকার (চীফ সেক্রেটারি), মুন্‌শী (হুজুরের ফরমান

লিখনেওলা, নূতন আইন নির্মাণের খসড়া প্রস্তুতকারী), ওয়াকে'-নওয়ীস্ (যার থেকে Waqnis), পর্চা-নওয়ীস্ (রাজকর্মচারীর আচরণ তথা দেশের জনসাধারণ সম্বন্ধে রিপোর্ট তৈরী করনেওলা) এসব গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করবে কারা ?

আমরা জানি, কায়স্থরা স্মরণাতীত কাল থেকে এসব কাজ করে আসছেন। এঁরাই এগিয়ে এলেন। মুসলমানপ্রাধান্য প্রায় দু-শ বৎসর হল লোপ পেয়েছে, কিন্তু আজও এসব পদবী—প্রধানতঃ কায়স্থদের ভিতর—সম্পূর্ণ লোপ পায়নি।

এ দেশের উচ্চাঙ্গ সংগীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য, উর্দু ভাষা এবং অন্যান্য বহু জিনিস যে হিন্দু-মুসলমানের অনিবার্য মেলামেশার ফলে হয়েছিল সে কথা সকলেই জানেন।

শুধু ভাস্কর্য ও নাট্যকলা বাদশা-আমীর-ওমরার কোনো সাহায্য পায়নি। তার কারণ, ইসলামে মূর্তি নির্মাণ নিষিদ্ধ এবং নাট্যকলা ভারতের বাইরে মুসলিম জগতে সম্পূর্ণ অজানা।

হিন্দুধর্ম ভিন্নধর্মাবলম্বীকে আপন ধর্মে গ্রহণ করে না। কাজেই অন্য ধর্ম সম্বন্ধে তার ঔৎসুক্য নেই। মুসলমান বিধর্মীকে মুসলমান করতে চায়। উভয়ের মিলনের চিন্তা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কিংবা মুসলমান মৌলবী কেউ করেন না। হিন্দু পণ্ডিত মুসলমানকে বলেন, 'তুমি দূরে থাকো'। মুসলমান মৌলবী হিন্দুকে বলেন, 'এসো, তুমি মুসলমান হবে'। তৃতীয় পন্থাও যে থাকতে পারে সেটা কারো মনে উদয় হয় না। হিন্দু হিন্দু থাকবে, মুসলমান মুসলমান থাকবে অথচ উভয়ের মধ্যে মিলন হবে, হৃদ্যতা হবে।

এ পন্থার চিন্তা করেছিল জনগণ। এটাতে ছিল তাদের প্রয়োজন। তাই এলেন ধর্মের জগতে জননেতা, জনাবতার কবীর দাদূ নানক ইত্যাদি। পরম শ্লাঘার বিষয়, শান্তিনিকেতনেই এঁদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। এত দিন ধরে ভারতের হিন্দু-মুসলমান গুণী-জ্ঞানীরা যেসব মহাপুরুষদের সম্পূর্ণ অবহেলা করেছিলেন, শান্তিনিকেতনেই সে-সময়ের ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ক্ষিতি-মোহন সেনশাস্ত্রী তাঁদের নিয়ে সমস্ত জীবন ব্যয়িত করেন। তাঁর 'দাদূ' 'কবীরে'র পরিচয় এস্থলে নূতন করে দেবার প্রয়োজন নেই।

সে পুণ্যকর্ম এখনো বিশ্বভারতীতে পূর্ণোদ্যমে অগ্রগামী। ক্ষিতিমোহনের বৃদ্ধ বয়সের সহকর্মী বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীযুত রামপূজন তিওয়ারীর 'সুফীমত-সাধনা ঔর সাহিত্য' সুচিন্তিত স্বয়ং-সম্পূর্ণ পুস্তক হিন্দী সাহিত্য তথা মধ্যযুগীয়

লোকায়ত ধর্ম-চর্চার গৌরব বৃদ্ধি করেছে। পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সরল ভাষায় লিখিত এ ধরনের গ্রন্থ সর্ব ভাষায়ই বিরল।

কিন্তু চিন্তাজগতে—দর্শন-ধর্মশাস্ত্র-জ্ঞানবিজ্ঞানে—হিন্দু-মুসলমানের মিলনভাব অথচ অনুভূতির ক্ষেত্রে—চারুকলা সঙ্গীত লোকসাহিত্যে গণধর্মে—আশাতীত মিলন। এ বিষয়ে অধ্যয়ন এবং চর্চা করতে হলে উভয় জনসমাজের মূলধর্ম, সামাজিক আচার-ব্যবহার গোড়া থেকে অধ্যয়ন করতে হয়। হিন্দু ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু মুসলমান ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় প্রায় কিছুই নেই। যা-কিছু আছে তা সরল ধর্মোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ এবং স্বধর্মবিশ্বাসীর হৃদয়-মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চার করার জন্য—বিধর্মীর সম্মুখে আপন ধর্ম যুক্তিবিচারের উপর নির্মাণ করে তাকে আকর্ষণ করার কোনো প্রচেষ্টা তাতে নেই, আপন ধর্মের স্বতঃসিদ্ধ নীতিও যে বিধর্মীর কাছে প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ হতে পারে সে দুশ্চিন্তাও এ-সাহিত্যকে বিক্ষুব্ধ করেনি। উপরন্তু ইংরেজ-আগমনের পর এ দেশের ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দুরা ইংরেজির মারফতে পেলেন ইসলামের এক বিকট বিকৃত রূপ। সরল হিন্দু জানত না, খ্রীষ্টান এবং মুসলিমে স্বার্থসংঘাত লেগে যায় মহাপুরুষের মৃত্যুর অল্প দিন পরেই, শত শত বৎসর ক্রুসেডের নামে একে অন্যের মরণালিঙ্গনে তারা সম্পিষ্ট; ফলে খ্রীষ্টান কর্তৃক ইসলাম ও হজরৎ মুহম্মদের বিরুদ্ধে অকথ্য কটুবাক্য এ দেশে এসেছে 'নিরপেক্ষ গবেষণা'র ছদ্মবেশ ধরে। সাধারণ সরল হিন্দু এ ছদ্মবেশ বুঝতে পারেনি। (এস্থলে বলে রাখা ভালো, মুসলমান কিন্তু খ্রীষ্টানকে প্রাণভরে 'জাত তুলে' গালাগাল দিতে পারেনি, কারণ কুরান-শরীফ যীশুখ্রীষ্টকে অন্যান্য মহাপুরুষদের একজন বলে যে স্বীকার করে নিয়েছেন তাই নয়, তিনি মুহম্মদের পূর্বে সর্বপ্রধান পয়গম্বর বলে তাঁকে বিশেষ করে 'রূহুল্লা' 'আল্লার আত্মা' 'পরমাত্মার খণ্ডাত্মা' উপাধি দেওয়া হয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে খ্রীষ্টান যুগ যুগ ধরে হজরৎ মুহম্মদকে 'ফল্‌স্ প্রফেট' 'শার্লট্যান' ইত্যাদি আখ্যায় বিভূষিত করেছে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বেও 'ঐতিহাসিক' ওয়েল্‌স্ তাঁর 'বিশ্ব-ইতিহাসে' মুহম্মদ যে ঐশী অনুপ্রেরণার সময় স্বেদসিক্ত বেপথুমান হতেন তাকে মৃগীরুগীর লক্ষণ বলে মহাপুরুষকে উভয়ার্থে লাঞ্ছিত করেছেন)।

রামমোহন রামকৃষ্ণ রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ সর্বদেশেই বিরল। এ দেশে তো অবশ্যই।

ইতিমধ্যে আর-একটি নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

এতদিন যে হিন্দু পণ্ডিত দার্শনিক মুসলমানের ধর্ম আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে

কোনো কৌতূহল প্রকাশ করেননি তাতে হয়তো তাঁদের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি, কিন্তু স্বরাজলাভের পর তাঁদের সে দৃষ্টিবিন্দু পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আফগানিস্থান ইরান ইরাক সিরিয়া সউদী-আরব ইয়েমেন মিশর তুনিস আলজীরিয়া মরক্কো তথা মুসলমানপ্রধান ইন্দোনেশিয়া ও নবজাগ্রত মুসলিম অধ্যুষিত আফ্রিকার একাধিক রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতা স্থাপনা করতে হবে। মুসলিমপ্রধান পাকিস্তানও এ ফিরিস্তির অন্তর্ভুক্ত। এদের ধর্ম, তার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক বাতাবরণ-পার্থক্যে তাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ-পরিবর্তন—এসব এখন অল্পবিস্তর অধ্যয়ন না করে গত্যন্তর নেই। সত্য, আমাদের ইস্কুল-কলেজে এখনো আরবী-ফার্সীর চর্চা সম্পূর্ণ লোপ পায়নি, কিন্তু এই নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়াটা সমীচীন হবে না। কিছু কিছু হিন্দুদেরও আরবী-ফার্সী শিখতে হবে। এবং এই সাত শ বৎসরের প্রাচীন আরবী-ফার্সীর শিক্ষাপদ্ধতিও পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ যতই প্রয়োজনীয় হোক, এস্থানে কিঞ্চিৎ অবান্তর।

আমরা যে মূল উৎসের সন্ধানে বেরুচ্ছি তার জন্য আজ আর প্রাচীন মানচিত্র কাজে লাগবে না। ভাবোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ অথবা সন্দেহে সন্দেহে কণ্টকাকীর্ণ প্রাচীন কোনো পদ্ধতির অনুসরণ করলে আজ আর চলে না। ধর্মকেও আজ রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতির কষ্টিপাথর দিয়ে যাচাই করতে হয়।

কিন্তু অনুসন্ধিৎসু মনের সঙ্গে থাকবে সহানুভূতিশীল হৃদয়॥

পরিচিতি

কিছুদিন পর পরই নূতন করে আলোচনা হয়—এখনো লোকে মপাসাঁ পড়ে কিনা, পড়লে কারা পড়ে? ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন, রুশ? ফ্রান্সের লোকের কথা বাদ দেওয়া যেতে পারে। তারা অল্পবিস্তর সব সময়ই পড়বে। উপস্থিত শুনতে পাই, মার্কিন দেশেই নাকি তাঁর সব চেয়ে বেশী কদর। যাঁরা এসব আলোচনা করেন তাঁরা প্রাচ্যদেশীয় সাহিত্যগুলোর সঙ্গে আদৌ পরিচিত নন বলে সেগুলোকে হিসেবেই নেন না। আমার জানামতে আরব দেশে এখনো তাঁর প্রচুর সম্মান; তার অন্যতম কারণ আরবী প্রচলিত মিশর থেকে বাইরুৎ-দামাস্কস পর্যন্ত ফরাসীর প্রচলন ইংরিজির তুলনায় বেশী। অধুনা মার্কিন ভাষা ঐসব দেশে প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে, কিন্তু তাতে মপাসাঁর কোনো ক্ষতি হবে না; কারণ পূর্বেই নিবেদন করেছি, মার্কিনজাত মপাসাঁ-ভক্ত।

তা সে যা-ই হোক, ফ্রান্সের বাইরে কিন্তু তাঁর রচনা (essays) নিয়ে কখনো কোনো আলোচনা হতে দেখিনি। এ যেন অনেকটা কনান ডয়েলের মত। তাঁর শার্লক হোম্‌স নিয়ে সবাই এমনই মুগ্ধ যে তাঁর অন্যান্য লেখার দিকে কেউই বড় একটা নজর দেন না। শার্লক হোম্‌সে এমনই ঝাল যে তার পর বাকি তাবৎ রান্না অতিশয় সুনিপুণ হলেও ফিকে বলে মনে হয়।

আমার বলার উদ্দেশ্য এ নয় যে মপাসাঁর প্রবন্ধ তাঁর ছোট গল্পকে হার মানায়। বস্তুত তাঁর সর্বোত্তম উপন্যাসদ্বয়ই—'য়্যুন্ ভী' এবং 'বেল্ আমি'[১]—তাঁর ছোট গল্পকে হার মানাতে পারেনি।

তাঁর নাট্য ও কবিতাও নিম্নাঙ্গের। পক্ষান্তরে চেখফ্ ছোট গল্প এবং নাটক, উভয়েই অদ্বিতীয়।

আমার নিজের মনে হয়, মপাসাঁর প্রবন্ধগুলি অত্যুত্তম। তাঁর গুরু ফ্লোবের ও গুরুসম—ফ্লোবেরের অন্তরঙ্গ বন্ধু—তুর্গেনিয়েফ সম্বন্ধে তিনি যে দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন সেগুলি অতুলনীয়। মপাসাঁর ছোট গল্প বা উপন্যাসে পাঠক পাবেন দেহ ও যৌন ক্ষুধার ছড়াছড়ি কিন্তু সত্যকার প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা, কিংবা সে-শ্রদ্ধার প্রতি সহানুভূতি, অথবা স্নেহের প্রতি অনুরাগ, মানুষের এসব তাবৎ মহামূল্যবান বৈভবের প্রতি মপাসাঁর কোনো আকর্ষণ নেই। তিনি যা চান তাই ফুটিয়ে তুলতে পারেন বলে যখন এগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন তখন সেগুলি প্রকাশ করেছেন তাঁর যাদুকাঠির পরশ দিয়েই কিন্তু তখন তাঁর উদ্দেশ্য অন্য, ঐ সব বৈভবকে সম্মান দেখানো নয়, ওগুলো ব্যবহার করা হয়েছে যেন প্যাডিং রূপে। অথচ আমরা জানি মপাসাঁ তাঁর মাকে ভালোবাসতেন গভীর রূপে—বস্তুত এরকম মাতৃভক্ত পুত্র সর্বকালেই সর্বদেশেই বিরল—যে-লোক প্রতিদিন ভালো-মন্দ-মাঝারি, ডাচেস থেকে স্বৈরিণী পর্যন্ত বিচরণ করে, আপন ফুর্তির জন্য কাঁড়া কাঁড়া টাকা ছড়ায়, হেন দুষ্কর্ম নেই যা তার অজানা এবং যার জন্য সে পয়সা খর্চা করতে রাজী নয়—সেই লোক ঠিক নিয়মিত মাকে মোটা টাকা পাঠায়, নিয়মিত মধুর চিঠি লেখে, পাছে মা টের পেয়ে যান তাই অতিশয় অসুস্থ শরীর নিয়েও প্রাচীন

---

১ অনেকেরই বিশ্বাস, যেহেতু মপাসাঁ মেয়েদের 'ইটার্নেল হার্লট' বলেছেন তাই পুরুষদের তিনি খুব সম্মানের চোখে দেখতেন। বস্তুত 'বেল্ আমি' পড়ার পর পুরুষকুলকেও 'ইটার্নেল জিগলো' (পুং বেশ্যা) বলা যেতে পারে। তবে যৌনক্ষুধাতুর মপাসাঁ স্বভাবতই মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন বেশী এবং তাদের সম্বন্ধে লিখেছেন বেশী।

প্রথামত নববর্ষের পরব রাখতে গাঁয়ে মায়ের বাড়িতে যায় (তার পাঁচ দিন পরই তাঁর মাথার ব্যামো—সিফিলিসজনিত উন্মাদরোগ—তাঁকে এমনি বিভ্রান্ত করে যে তিনি ছুরি দিয়ে গলা কেটে আত্মহত্যা করার চেষ্টা দেন ; অনুগত ভৃত্য ফ্রাঁসোয়া পিস্তলের গুলি আসন্ন সর্বনাশের আশঙ্কায় সরিয়ে রেখেছিল), সে যে শ্রদ্ধা ভালোবাসার সম্মান দিত না, এ তো হতেই পারে না।

শুধু তাই নয়, সেই শ্রদ্ধার 'নির্লজ্জ' উচ্ছ্বাস পাঠক পাবেন ফ্লোবের ও তুর্গেনিয়েফ সম্বন্ধে লিখিত মপাসাঁর প্রবন্ধে।

তুর্গেনিয়েফ সম্বন্ধে লেখা তাঁর প্রবন্ধটি অন্য দেশ কতখানি সম্মান দেয়, আমার জানা নেই। তবে রুশ দেশ তার চরম সম্মান দেয় ও দিয়েছে। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তুর্গেনিয়েফের মৃত্যুর পঁচাত্তর বৎসর পূর্ণ হলে সারা রুশদেশব্যাপী তাঁকে স্মরণ করা হয়। সেই উপলক্ষে তুর্গেনিয়েফের ভাইয়ের মেয়ে (কিংবা আপন জারজ, পরে আইনসম্মত কন্যা) দেশবাসী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধ আরম্ভ করেন তুর্গেনিয়েফ সম্বন্ধে মপাসাঁর প্রশংসাকীর্তন নিয়ে। তুর্গেনিয়েফ সম্বন্ধে রুশ দেশ এবং রুশ দেশের বাইরে বিস্তর প্রবন্ধ বের হয়েছে (এবং আশ্চর্য, মপাসাঁ যখন তাঁর খ্যাতির চরমে, যখন তাঁর ছোট গল্প ইয়োরোপের প্রায় সর্ব ভাষায় অনূদিত হচ্ছে তখন তিনি খাতির পাননি এক রুশ দেশে, যদিও রুশ দেশ সব সময়ই ফ্রান্স-পাগল, কারণ রুশে তখন তলস্তয়, তুর্গেনিয়েফ, লেস্‌কফ[২], দস্তয়েফ্‌স্কি, চেখফ্‌ কেউ বা তাঁর বিজয়শঙ্খ বাজাচ্ছেন বিপুল বিক্রমে, কারো বাণী দূর-দূরান্তরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, কারো বা মধুর কণ্ঠের প্রথম কাকলি দেশের সর্বত্র নবীন চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলেছে—মপাসাঁকে লক্ষ্য করবার ফুর্সৎ তাদের নেই) কিন্তু ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তুর্গেনিয়েফ পরিবারের প্রতিভূ স্মরণ করলেন মপাসাঁকে—সেই মপাসাঁ যাঁর প্রবন্ধ পৃথিবীর সর্বত্র অপরিচিত।[৩]

তাই বলছিলুম, মপাসাঁর 'নির্লজ্জ' উচ্ছ্বাস পাঠক পাবেন এ-দুটি প্রবন্ধে এবং

২ লেস্‌কফের একটি দীর্ঘ গল্প আমি অনুবাদ করেছি, বিশ্বসাহিত্যে এ গল্পটি অতুলনীয় ব'লে—যদিও আমি পাঁচটা বাবদের ন্যায় এটাতেও অক্ষম। একাধিক গুণীকে অনুরোধ করার পরও তাঁরা যখন সেটি অবহেলা করলেন, তখন বাধ্য হয়ে আমাকেই করতে হল। 'প্রেম' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

৩ মপাসাঁর এই প্রবন্ধটি আমি অনুবাদ করি একই সময়ে—পঁচাত্তর বৎসরের পরব উপলক্ষে।

তাঁর অন্যান্য রচনায়। মানুষ মপাসাঁকে চেনবার ঐ একমাত্র উপায়। সাহিত্য নিয়ে আলোচনা মপাসাঁ বন্ধুদের সঙ্গে তো করতেনই না, লেখাতে যা করেছেন তাও পঞ্চাশ লাইনের বেশী হয় কি না হয়।

আর আছে তাঁর চিঠি। কিন্তু সেগুলোতে তিনি তাঁর হৃদয়ের গভীর ব্যথা, তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে নিরব। তার কারণ গুরু ফ্লোবের কর্তৃক জর্জ সান্‌ড্‌কে লেখা তাঁর অন্তরঙ্গ চিঠি যখন ছাপাতে প্রকাশিত হয়, তখন ফ্রান্সের মত দেশেও তাই নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে। মপাসাঁ তখনই সাবধান হয়ে যান। পারলে মপাসাঁ ফ্লোবেরের চিঠিগুলো প্রকাশিত হতে দিতেন না। শেষটায় যখন দেখলেন প্রকাশ হবেই হবে তখন মপাসাঁ সে সংকলনের ভূমিকা লিখতে রাজী হন। তিনি আশা করেছিলেন গুরুর পদতলে তাঁর শ্রদ্ধা অর্ঘ্য নিবেদন দেশের পাঁচজনকে বুঝিয়ে দেবে, ফ্লোবেরকে কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে দেখে তাঁর সত্য মূল্য দিতে হয়।

তবুও মপাসাঁর চিঠিগুলো যে অমূল্য, তুলনাহীন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আমার জানা মতে তাঁর সর্বশেষ চিঠি তাঁর ডাক্তারকে লেখা—এইটি সর্বশেষ না হলেও এটিতে পাঠক পাবেন 'রাজহংসের মরণগীতি'।

তাঁর চিকিৎসক ডাক্তার আঁরি কাজালি (জাঁলাওর)-কে লিখিত,

"কান, ইজের কুটির।

আমি একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছি। তারও বেশী। আমি এখন মৃত্যুর শেষ যন্ত্রণায়। নাকের ভিতর নোনা জল ঢেলে সেটা ধুয়েছিলুম বলে তারই ফলে আমার মগজ নরম হয়ে গিয়েছে। সেই নুন মাথার ভিতর গাঁজিয়ে ওঠায় (ফের্মাতাসিয়োঁ—ফার্মেন্‌টেশন্) সমস্ত রাত ধরে আমার মগজ গলে গিয়ে চ্যাটচেটে পেস্টের মত নাক আর মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। এ হচ্ছে আসন্ন মৃত্যু, আর আমি উন্মাদ।[৪] আমি প্রলাপ বকছি। শেষ-বিদায় বন্ধু, বিদায়! তুমি আমাকে আবার দেখতে পাবে না……"[৫]

আমি ডাক্তার নই, তাই বলতে পারবো না, মানুষের জীবিতাবস্থায় কিংবা মৃত্যুর পরও তার নাক কান দিয়ে মগজ গলে বেরয় কি না, নুনের ফার্মেন্টেশন হয় কিনা তাও জানি নে। স্পষ্টতঃ এ চিঠি উন্মাদের প্রলাপ। কিন্তু প্রশ্ন, উন্মাদ কি-স্বীকার করে সে প্রলাপ বকছে?

৪-৫ এই দুটি ছত্র ক্যাপিটাল অক্ষরে।

* * * *

ফরাসী ভাষায় মপাসাঁর দু'খানি অত্যুত্তম রচনা ও পত্রসংগ্রহ আছে। ইংরিজিতে এগুলোর অনুবাদ হয়েছে কি না জানি নে।

(১) CHRONIQUES, ETUDES. CORRESPONDANCE
DE GUY DE MAUPASSANT
Recueillies Prefacees et Annotees par
RENE DUMESNIL
avec la collaboration de Jean Loize
et publiees pour la premiere fois avec nombreux
DOCUMENTS INEDITS
LIBRAIRIE GRUEND, 60, RUE MAZARINE, 60,
PARIS, VI, 1938

(২) CORRESPONDANCE INEDITE
DE
GUY DE MAUPASSANT
Recueiliie et presentee
ARTINE ARTINIAN
avec la collaboration d'
EDOURAD MAYNIAL
Editions Dominique Wapler,
6, Rue de Londres,
Paris, 1951

বছর কুড়ি পূর্বে একটি আন্তর্জাতিক পত্রিকা নানা দেশের চুয়াত্তর জন খ্যাতনামা লেখককে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ কোন্ লেখক তাঁদের সৃষ্টির উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন। উত্তরে মপাসাঁ—জর্মন কবি হাইনে, এবং হোমার হুইট্‌মানের সমান সম্মান পান এবং ইব্‌সেন ও স্তাঁদালের চেয়ে বেশী।

এদেশেও মপাসাঁ নিয়ে কৌতূহল আছে।

কয়েকদিন পূর্বে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অধুনা লিখিত সাহিত্যিকদের জীবনী সম্বলিত সাহিত্যালোচনার একখানা অত্যুত্তম পুস্তক আমার হাতে এসে পৌঁছল। 'সোনার আল্‌পনা' (এভারেস্ট বুক হাউস, ১৯৬০)।

বইখানিতে অন্যান্য মনোরম প্রবন্ধের ভিতর গী দ্য মপাসাঁ ও ইভান

তুর্গেনিয়েফ সম্বন্ধেও দুটি রচনা রয়েছে।

আজকাল এদেশে অনেকেই ফরাসী শিখছেন। উপরের দুখানা মূল গ্রন্থ ও বাঙলা বইখানা নিয়ে আলোচনা হলে বাঙলা সাহিত্য উপকৃত হবে।

হতভাগ্য কাছাড়

প্রশ্ন উঠতে পারে, কাছাড়ের ভাষা আন্দোলন যখন তার চরমে তখন সম্পূর্ণ নীরব থেকে আজ এতদিন পরে সেই পুরোনো কাহিনী নিয়ে পড়ি কেন? কাছাড়ীতেও আছে,

স্বামী মরলো সন্ধ্যা রাত!
কেঁদে উঠলো দুপুর রাত!!

(খাস কাছাড়ীতে লিখলে পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হতে পারে বলে 'সংস্কৃত' করা হল।)

আসলে তখন ভাষা আন্দোলন রাজনৈতিক রেষারেষি তিক্ততায় রূপান্তরিত হয়েছে, এমন কি কোনো কোনো স্থলে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির আশ্রয় নিয়েছে—অথচ কাছাড়ে কস্মিনকালেও কোনো প্রকারের সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। হিন্দু, মুসলমান, মণিপুরী (তাদের ভিতরেও হিন্দু মুসলমান দুই-ই আছে), নাগা, লুসাই এবং আরো কত যে জাত-বেজাত কাছাড়ে সখ্যভাবে বসবাস করে সে সম্প্রীতি না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

তখন আমার জানা ছিল, এ আন্দোলন বেশীদিন চলবে না, একটা রফারফি হয়ে যাবেই, এবং তারপর কাছাড়বাসীরা ভাষার কথা বেবাক ভুলে গিয়ে আবার সুখ-নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়বে। পারি যদি তখন তাকে জাগাবার চেষ্টা করবো। সর্বত্রই দেখেছি, পাকা বুনিয়াদ গঠনের কাজ আরম্ভ হয় তখনই।

* * *

কাছাড়ের উত্তর, পুব, দক্ষিণে পাহাড়। তার বেরবার পথ মাত্র পশ্চিম দিকে—পুব পাকিস্তানের সিলেটের ভিতর দিয়ে। সে পথ আজ বন্ধ। হিল্ সেকশন নামক যে রেলপথটি কাছাড়কে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে সেটি নির্মিত হয়েছিল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার চা চট্টগ্রাম বন্দর তথা চাঁদপুর হয়ে কলিকাতার বন্দরে পাঠাবার জন্য। ওটা কখনো কাছাড়ীদের বিশেষ কোনো কাজে লাগেনি।

এর পূর্বে বলে রাখা ভালো, কাছাড় ঐতিহ্যহীন দেশ নয়। সিলেট-কাছাড়ের

ঐতিহ্য এক সঙ্গে জড়িত ছিল বলে এতদিন ধরে সবাই 'সিলেট সিলেট' করেছে এবং কাছাড় তারই তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল।

কাছাড়ের বৈশিষ্ট্য এই যে, সে আর্য-সভ্যতার শেষ পূর্বভূমি। এবং বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতির শেষ পূর্ব প্রত্যন্ত প্রদেশ। এর পরই মণিপুর—এঁরা বৈষ্ণব হলেও এঁদের রক্ত এবং ভাষা ভিন্ন। তারপর বর্মা। এবং আর্যসভ্যতা বাদ দিয়েও কাছাড়ের প্রাচীন আদিবাসীরাও আপন সভ্যতা নির্মাণ করে গিয়েছেন —তার নিদর্শন আজও কাছাড়ে দেখতে পাওয়া যায়। কাছাড়ের রাজারা দীর্ঘকাল পূর্বেই বাঙলা ভাষা গ্রহণ করেন।[১] বস্তুত জয়ন্তিয়া (পাঠান-মোগল কেউই এ রাজ্য অধিকার করতে পারেননি), ত্রিপুরা, কাছাড় ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আহম রাজারাই আসাম প্রদেশের চারিটি প্রধান রাজবংশ। আমার যতদূর জানা আছে, মণিপুরে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করার সময় কাছাড়কেই কেন্দ্রভূমি করে সে কর্ম করা সম্ভবপর হয়েছিল।

কাছাড়ের নৈসর্গিক দৃশ্য অপূর্ব। যাঁরা হিল-সেকশন দিয়ে রেলেও গিয়েছেন মাত্র, তাঁরাও এ বাবদে আমার মতে সায় দেবেন।

এবং সবচেয়ে বড কথা, কাছাড়ে জমিদাররা কখনো দাবড়ে বেড়াননি বলে সেখানকার সমাজে অতি সুন্দর গণতন্ত্র প্রচলিত। জমিদার নেই বলে লেঠেলও ছিল না। তাই কাছাড়ীরা বড় শান্ত, নিরীহ। এমন কি সোনাই অঞ্চলে যেসব নাগারা বাস করে তারাও মাঝে-মধ্যে বাঙালী জনপদবাসীর কুকুর ধরে নিয়ে ভোজ-দাওয়াৎ করলেও এরা দা হাতে করে মানুষের মুণ্ডুর সন্ধানে বেরোয় না।

দেশ বিভাগের ফলে কত সহস্র, কিংবা লক্ষাধিক শরণার্থীকে কাছাড় আশ্রয় দিয়েছে সে সম্বন্ধে কেউ উচ্চবাচ্য করে না। 'পূর্ববঙ্গের রেফুইজী'দের আশ্রয় দেওয়ার প্রায় পুরো ক্রেডিট্ নেন পশ্চিম বাঙলা। শিলঙে অবস্থিত অহমিয়া সরকার 'বঙাল' কাছাড়ের আত্মত্যাগ সম্বন্ধে যে অত্যধিক লম্ফঝম্ফ করবেন না সে তো বেদ থেকে পাঁচকড়ি দে তক্ স্বর্ণাক্ষরে লেখা—আমিও দোষ দিই নে।

বস্তুত চৈতন্যভূমি শ্রীহট্টের শত শত ব্রাহ্মণকে কাছাড় আশ্রয় দিয়ে সংস্কৃত চর্চা যে কতখানি বাঁচিয়ে রাখলো তার খতিয়ান হওয়া উচিত। অথচ দেশ বিভাগের ফলে কাছাড়ের সর্বনাশ হয়েছে। তার ধনদৌলত, ধান, কাঠ, ছন, বাঁশ, চা

১ সৈয়দ মরতুজা আলী, A History of Jaintia, ও এঁর লেখা ঐ যুগের আসাম ও বাঙলার চার রাজবংশের মধ্যে বাঙলায় লেখা চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

প্রাকৃতিক আরো নানা সম্পদ সবই পাঠানো হত সিলেটের মাঝখান দিয়ে। আজ সে পথ বন্ধ। পূর্বেই বলেছি, তার তিন দিকে পাহাড়। হিল সেকশন দিয়ে যে খর্চা পড়বে তার অর্ধেক মূল্যে এসব বস্তু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় পাওয়া যায়।

* * * *

দেশ বিভাগের পূর্বে কাছাড়-শ্রীহট্ট অর্থাৎ সুর্মা-উপত্যকা আসাম রাজ্যে প্রধান স্থান দখল করে ছিল। সিলেট পাকিস্তানে চলে যাওয়াতে কাছাড়ের বঙ্গভাষীগণ হয়ে গেল নগণ্যাধম মাইনরিটি—এবং যেটুকু তার ন্যায্য প্রাপ্য ছিল তাও সে পেল না—সেনসাস নিয়ে কারসাজি করার ফলে।[২]

ইউনাইটেড নেশনস বলেন, তাঁদের প্রধান সমস্যা, পৃথিবীর সর্বত্র, মাইনরিটি নিয়ে। কাজেই আজ যদি অসমীয়ারা কাছাড়বাসীর মাতৃভাষা ভুলিয়ে সেখানে অসমীয়া চালাতে চান তবে কেউ আশ্চর্য হবেন না। অবশ্য সেটা যে অন্যায় সে-কথা নিশ্চয়ই বলতে হবে।

কাছাড়ীরা বাঙলা ভাষা ও তাদের বাঙালী ঐতিহ্য কখনো ছাড়তে পারবে না—অহমিয়া ঐতিহ্য অনেকগুণ শ্রেষ্ঠ হলেও পারবে না।

ভাষার উপর এ অত্যাচার নূতন নয়।

এর বিরুদ্ধে ঔষধ কি?

অধম আকাশবাণীকে বার বার বোঝাবার চেষ্টা করেছে, শিলচরে একটি বেতার কেন্দ্র হওয়ার অত্যন্ত প্রয়োজন। কাছাড়ের লোক সচরাচর ঢাকা বেতার শোনে, কারণ কলকাতার আকাশবাণী সেখানে ভালো করে পৌঁছয় না। গৌহাটি কেন্দ্রের ভাষা অসমীয়া। ওদিকে আরেকটি মজার জিনিস। গৌহাটি কেন্দ্র নাগাকে শান্ত করার জন্য সেখান থেকে প্রচারকার্য করেন। আশ্চর্য হই, তাঁরা 'আর্তিস্ত' পান কোথায়? প্রথমত টেপ-রেকর্ডার নিয়ে নাগা অঞ্চলে ঢোকা অনেকখানি হিম্মতের কাজ, দ্বিতীয়ত শুধুমাত্র টেপ-রেকর্ডারের জোরে প্রচারকার্য চলে না। পক্ষান্তরে খাস কাছাড়েই মেলা নাগা রয়েছেন। মাঝখানে পাহাড় আছে বলে গৌহাটির বেতার-গলা, নাগা পাহাড়ে ভালো করে পৌঁছয় না। ওদিকে নাগা পাহাড় কাছাড়ের প্রতিবেশী।

কাছাড়ের দক্ষিণে লুসাই পাহাড়। লুসাইরা নিরীহ। কিন্তু অহমিয়ারা

---

২ আমার অগ্রজ পূর্বোল্লিখিত সৈয়দ মরতুজা আলী আসামে রাজকর্মচারী ছিলেন। তিনি আমাকে ১৯৪১ সালেই (!) বলেন যে সেনসাস নিয়ে কারসাজি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

যেভাবে রাজত্ব চালাচ্ছেন তাতে কখন কি হয় বলা যায় না। এখন থেকেই সাবধান হওয়া উচিত। লুসাইদের সর্ব আমদানি-রপ্তানি একমাত্র কাছাড়ের সঙ্গে। লুসাইদের জন্য প্রচারকর্ম করার জন্য শিলচরই সর্বোত্তম কেন্দ্র—গৌহাটি বা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অন্য কোনো স্থল নয়।

আরো নানা রাজনৈতিক এবং অন্যান্য কারণ আছে। স্থানাভাব।

শিলচরে এই বেতার কেন্দ্র নির্মাণের জন্য তীব্রকণ্ঠে দাবি জানাতে হবে। জনমত গড়ে তুলতে হবে। আসাম সরকার সাহায্য করবেন না। বাধা দিলে আমি আশ্চর্য হব না, দোষও দেব না।

কিন্তু এ তো বহুবিধ আশ্চর্য তথ্যের মধ্যে সামান্য জিনিস।

আমার মনে পড়ছে, অষ্ট্রিয়ার রাজা হাঙ্গেরির ভাষা নিধন করতে চেয়েছিলেন। ফলে বুদাপেস্তের হাঙ্গেরীয় স্টেজ পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই বোধ হয় রাজা আপন পায়ে কুড়োল মারলেন। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বেরিয়ে পড়ল জিপসি ক্যারাভানে—শহরে শহরে, গাঁয়ে গাঁয়ে তারা এমন ভাষার বান জাগিয়ে তুললে যে, সমস্ত দেশ মনেপ্রাণে অনুভব করলো মাতৃভাষা মানুষের জীবনে কতখানি জায়গা জুড়ে আছে, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার জন্য ঐ তার একমাত্র গতি। যে সভ্যতা-সংস্কৃতি সে তার পিতা-পিতামহের কাছ থেকে পেয়েছে, যার কল্যাণে সে সভ্যজন বলে পৃথিবীতে স্বীকৃত হচ্ছে, যাকে সে পরিপুষ্ট করে পিতৃপুরুষের কাছ থেকে ঋণমুক্ত হতে চায়—সে তার মাতৃভাষা।

এই তার সময়। ভাষা আন্দোলনের বিক্ষোভ-উচ্ছ্বাসের দুর্দিনে গড়ার কাজ করা যায় না। সে যেন আতসবাজি। সেটা শেষ হলে যে অন্ধকার সেই অন্ধকার। তার পূর্বেই ওরই ক্ষুদ্র শিক্ষা দিয়ে গ্রামে গ্রামে সহস্র সহস্র প্রদীপ জ্বালিয়ে নিতে হয়।

* * *

এই তার সময়। রাজদণ্ডের ভয় নেই, রাজনৈতিক স্বার্থপ্রণোদিত কারসাজি নেই—শান্ত সমাহিত চিত্তে চিন্তা করতে হবে, পরিকল্পনা করতে হবে, অর্থ সঞ্চয় করতে হবে কি প্রকারে মাতৃভাষার গৌরব সম্বন্ধে সর্ব কাছাড়বাসীকে পরিপূর্ণ সচেতন করা যায়।

সেই চৈতন্যের উপরই মাতৃভাষার দৃঢ়ভূমি নির্মিত হবে।

তাই যখন আবার বিপদ আসবে তখন উন্মাদের মত দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করতে হবে না, ভ্যানে করে গ্রামে গ্রামে মাইকে চিৎকার করতে হবে না। গ্রামের লোক নিজের থেকেই সাড়া দেবে। শহরে সীমাবদ্ধ যে-কোনো

আন্দোলনই সহজে দমন করা যায়। কিন্তু সে যদি গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে তবে তাকে দমন করা অসম্ভব।

এই তার সময়। চিন্তা করুন, গ্রামে গ্রামে কি প্রকারে সে চৈতন্য উদ্দীপ্ত করতে পারি।

কিন্তু সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

এ আন্দোলন শান্তিময়, গঠনমূলক। এতে কোনো প্রকারের রাজনৈতিক স্বার্থ নেই। এবং সবচেয়ে শেষের বড় কথা—গঠন-কর্ম অগ্রসর হবে অহমিয়া ভ্রাতা, তথা কাছাড়ের কোনো সম্প্রদায় বা কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি বৈরীভাব না রেখে॥[৩]

নেতাজী

আজ—এবং নেতাজী।

এ পৃথিবীতে ভারতের মত অতখানি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র আর নেই। এবং সে-জন্য যে আমরা ক্যাপিটালিস্ট কম্যুনিস্ট উভয় পক্ষেরই বিরাগভাজন হয়েছি তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। সামাজিক জীবন লক্ষ্য করলেই এ তত্ত্বটা পরিষ্কার হয়ে যায়। যে-মানুষ দলাদলির মাঝখানে যেতে চায় না—তা সে স্বভাবে শান্তিপ্রিয় বলেই হোক্, আর দুই দলের গোঁড়ামিই তার কাছে আপত্তি-কর বলে মনে হয় বলেই হোক—সে উভয় দলেরই গালাগালি খায়।

তাই পাঁড় কম্যুনিস্টরা আমাদের টিটকারি দিয়ে বলছে, 'যাও, করো গে পীরিত ক্যাপিটালিস্টদের সঙ্গে; এখন বোঝো ঠ্যালা।' আর পাঁড় ক্যাপিটালিস্টরা বলছে ঠিক এই একই কথা। আমরা নাকি কম্যুনিস্টদের গলায় পীরিতির মালা পরাতে গিয়ে পেয়েছি লাঞ্ছনা।

পুরোপাকা সুস্থমস্তিষ্ক নিরপেক্ষ জন পাই কোথা যে তার মতটা জেনে নিয়ে আপন চিন্তা-ধারা আপন আচরণের বাছ-বিচার করি, জমা-খরচ নিই।

তবে পৃথিবীর লোক সচরাচর বলে থাকে সুইজারল্যাণ্ড নাকি বড় নিরপেক্ষ দেশ। আমার মনে হয়, লোকে তাকে যতটা নিরপেক্ষ মনে করে ঠিক ততটা সে নয়। তবু সবাই যখন এ-কথা বলছেন তখন সুইসদের মধ্যে যাঁরা সচরাচর লিব্‌রেল উদারপ্রকৃতি-সম্পন্ন বলে গণ্য (সব সুইসই যে সমান নিরপেক্ষ এ কথা

৩ অমিতাভ চৌধুরী, মুখের ভাষা বুকের রুধির।

সত্য হতে পারে না) তাঁদের মতটা শোনা যাক।

এঁরা প্রথমেই বলেন, চীন যে ভারত আক্রমণ করেছে এটা তার লাওস, ভিয়েটনাম বা কোরিয়াতে লড়াইয়ের মত নয়। ওসব জায়গায় সে লড়ে কম্যুনিজ্‌ম ধর্মকে 'কাফের' ক্যাপিটালিস্ট-ইম্‌পিরিয়ালিস্টদের অযথা আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য (ভারতবর্ষ আক্রমণে সে উদ্দেশ্য থাকতে পারে না, কারণ এ-কথা কেউ বলতে পারবে না যে কম্যুনিজ্‌ম্‌-ধর্মবিশ্বাসী কম্যুনিস্টদের আমরা নির্যাতন করে করে নিঃশেষ করে আনছিলুম, বরঞ্চ বলবো ওদের প্রতি আমাদের সহিষ্ণুতা ধৈর্যের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে বলে ঘরে বাইরে অনেকেই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন), এ-স্থলে চীন ভারত আক্রমণ করেছে নিছক রাজ্যজয়ার্থে।

আমরাও বলি তাই, যদিও অন্য একাধিক কারণ থাকতে পারে।

এর পর সুইস লেখক বলেছেন, এই আক্রমণের প্রতিক্রিয়া হয়েছে কি ?

(১) ভারতবাসীর স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়-ঐক্য রুদ্র জাগ্রত রূপ ধারণ করেছে এবং

(২) যে কম্যুনিজ্‌মের প্রতি এতদিন সে উদাসীন এবং সহিষ্ণু ছিল তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছে।

(৩) বিশ্বজন চীনকেই আক্রমণকারী পররাজ্য লোভী ইম্‌পিরিয়ালিস্ট বলেই ধরে নিয়েছে, কারণ তাঁরা নিরপেক্ষ জাতিদের মধ্যে ভারতকেই সর্বাগ্রগণ্য বলে শ্রদ্ধা করতেন ও ভারত যে তার দীনদুঃখীর ক্লেশ মোচনের জন্যই সর্বশক্তি নিয়োগ করছে সে সত্যও তাঁরা জানতেন (অর্থাৎ চীন যেমন অস্ত্র নির্মাণে আপন শক্তির অপচয় করছিল তা না করে)।

(৪) ভারতীয় কম্যুনিস্টরা পড়েছেন মহাবিপদে (আমার গাঁইয়া ভাষায় ফাটা বাঁশের মধ্যিখানে) ; হয় তাদের প্রাণের পুত্তলি চৈনিক 'অগ্রগতির' সঙ্গে যোগ দিয়ে, সর্বভারতীয়ের সম্মুখে নিজেদের দেশদ্রোহী ভ্রাতৃহন্তা রূপে সপ্রকাশ করে' পরিশেষে রাজনৈতিক আত্মহত্যা বরণ করতে হবে, কিংবা চীনের বিপক্ষে, এমন কি শেষমেষ চীনের কম্যুনিস্ট সৎভাই বিশ্বপ্রলেতারিয়ার গুলিস্তান পরীস্তান রুশ—অবশ্য সৎভাই কারণ সে ছোটভাই চীনকে সাহায্য করতে আদৌ উৎসাহ দেখাচ্ছে না—এমন কি রুশেরও বিপক্ষে দাঁড়াতে হবে।

(৫) শ্রীযুত খ্রুশ্চফকে হয় বিশ্বজনের সম্মুখে স্বধর্মানুরাগী পীতভ্রাতা চীনের বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গ নিতে হবে, কিংবা চীনের পক্ষ নিয়ে ভারত তথা এশো-আফ্রিকার নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির মৈত্রী থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

(৬) ভারতকে এখন পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রসমূহের কাছ থেকে প্রচুর এবং প্রচুরতর

অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে। ফলে পশ্চিমের সঙ্গে মৈত্রী বাড়বে, কম্যুনিস্টদের প্রতি বৈরীভাব বৃদ্ধি পাবে। ধীরে ধীরে তার নিরপেক্ষতা সম্পূর্ণ লোপ পাবে।

পাঠক ভাববেন না, আমি সুইসের সঙ্গে একমত। আমিও ভাবছি না যে আপনি সুইসের সঙ্গে দ্বিমত। তবে একটা কথা আমরা উভয়েই মেনে নেব, নিরপেক্ষতা সর্বকালীন সর্বজনীন সার্বভৌম ধর্ম নয়। যদি সত্যই একদিন আমাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়, কোনো বিশেষ নিরীহ দেশ অকারণে বলদৃপ্ত স্বাধিকার-প্রমত্ত রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে তবে আমরা নিশ্চয়ই নিরপেক্ষতা বর্জন করে আক্রান্ত রাষ্ট্রের পক্ষ নেব। মিশর আক্রান্ত হলে পর কমনওয়েলথের সম্মানিত সদস্য হওয়া সত্ত্বেও আমরা মিশরের পক্ষ নিয়েছিলাম। শুধু তাই নয়, নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য আজ আমরা যে আফ্রিকায় ভারতীয় সৈন্য পাঠাচ্ছি ঠিক সেই রকম আর্তজনকে রক্ষার জন্য নিরপেক্ষতা বর্জন করে ঠিক সেই রকমই সৈন্য পাঠাবো। কারণ আমরা বিশ্বাস করি, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়। তু হিটলার বিশ্বাস করেন, যেখানে জয় সেখানেই ধর্ম।

কিন্তু উপরের ছয় নম্বর বক্তব্যে ফিরে গিয়ে বলি, আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস আমাদের নিরপেক্ষতা বর্জন অবশ্যম্ভাবী নয়। ক্ষণেকের প্রয়োজনে যদি বা আমরা তৃতীয় পক্ষের সাহায্য নিতে বাধ্য হই, তার অর্থ এই নয় যে, আমরা চিরকালই তৃতীয় পক্ষের কেনা গোলাম হয়ে থাকবো। তার অর্থ এও নয়, আমরা নেমকহারাম। এবং যাতে করে তৃতীয় পক্ষের বা বিশ্বজনের এ-অন্যায় সন্দেহ না হয়, তাই সাহায্য নেবার পূর্বেই, আমাদের নীতি ও উদ্দেশ্য সর্বজনকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে হবে।

এই দুঃখের দিনে নেতাজীর কথা মনে পড়ল।

দশ-বারো বৎসর পূর্বে তাঁর সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলি, "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি তিনজন নেতা স্বেচ্ছায় নির্বাসন বরণ করে দেশোদ্ধারের জন্য মার্কিন-ইংরেজের শত্রুপক্ষকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রথম জেরুজালেমের গ্র্যাণ্ড মুফতী এবং দ্বিতীয় ইরাকের আবদুর রশীদ। এঁদের দুজনাই আপন দেশের একচ্ছত্র নেতা ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি আমাদের নেতাজী। তিনি ভারতের সর্বপ্রধান নেতা ছিলেন না।

"তিনজনই কপর্দকহীন, তিনজনই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন আপন আপন যশ ও চরিত্রবল। প্রথম দুজনার স্বজাতি ছিল উত্তর আফ্রিকায়, অথচ শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এঁদের কেউই কোনো সৈন্যবাহিনী গঠন করে তুনিসিয়া আলজারিয়ায় লড়তে পারলেন না; শুধু তাই নয়, জর্মন রমেল যখন উত্তর আফ্রিকায় বিজয়

অভিযানে বেরুলেন তখন এঁদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাবারও প্রয়োজন অনুভব করলেন না। এঁদের কেউই জর্মন সরকারকে আপন ব্যক্তিত্ব দিয়ে অভিভূত করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁদের গতি হল আর পাঁচজনের মত ইতালি থেকে বেতারে আরবীতে বক্তৃতা দিয়ে 'প্রোপাগাণ্ডা' করার।

"অথচ, পশ্য, পশ্য সুভাষচন্দ্র কী অলৌকিক কর্ম সমাধান করলেন! স্বাধীন রাষ্ট্র নির্মাণ করে, 'ইংরেজের গর্ব ভারতীয় সৈন্যদের' এক করে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করলেন। বর্মা-মালয়ের হাজার হাজার ভারতীয় সর্বস্ব তাঁর হাতে তুলে দিল, স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ দেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

"আমরা জানি, জাপান চেয়েছিল, সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সৈন্যগণ যেন জাপানী ঝাণ্ডার নিচে দাঁড়িয়ে লড়েন (মুফতী এবং আবদুর রশীদ জর্মনিকে সে সুযোগ দিতেও বাধ্য করাতে পারেননি)। সুভাষচন্দ্র কবুল জবাব দিয়ে বলেছিলেন, "আমি আজাদ হিন্দ ও তার ফৌজের নেতা। আমার রাষ্ট্র নির্বাসনে বটে, কিন্তু সে-রাষ্ট্র স্বাধীন এবং সার্বভৌম। যদি চাও তবে সে-রাষ্ট্রকে স্বীকার করার গৌরব তোমরা অর্জন করতে পারো। যদি ইচ্ছা হয় তবে অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্থ দিতে পারো—এক স্বাধীন রাষ্ট্র যে রকম অন্য স্বাধীন রাষ্ট্রকে মিত্রভাবে ধার দেয়, কিন্তু আমি কোনো ভিক্ষা চাই না এবং আমার সৈন্যগণ 'আজাদ হিন্দ' ভিন্ন অন্য কোনো রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে যুদ্ধ করবে না।"

আজ আমরা স্বাধীন। পৃথিবীতে আমাদের গৌরব আজ অনেক বেশী। নেতাজী বিনাশর্তে সেদিন যে শক্তি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, আজ কি আমরা তা পারবো না? না পারলে বুঝতে হবে আমাদের রাজনীতি দেউলিয়া॥

মস্কো-যুদ্ধ ও হিটলারের পরাজয়

লজ্জায় জর্মন জাঁদরেলরা হিটলারকে মুখ দেখাতে পারতেন না। রুশ-যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বার বার সপ্রমাণ করে ছেড়েছিলেন যে, জাঁদরেলরা ভুল করছেন—সত্যপন্থা জানেন হিটলার।

ভের্সাইয়ের চুক্তিতে পরিষ্কার শর্ত ছিল জর্মন রাইনল্যাণ্ডে সৈন্য সমাবেশ করতে পারবে না। হিটলার যখন করতে চাইলেন তখন জেনারেলরা তারস্বরে

প্রতিবাদ করে বললেন, 'যদি তখন ফ্রান্স আমাদের আক্রমণ করে তবে…?' হিটলার দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'করবে না।' হিটলারের কথাই ফলল। অবশ্য হিটলার পরে একাধিকবার স্বীকার করেছেন, তখন ফ্রান্স আক্রমণ করলে জর্মনি নির্ঘাত হেরে যেত। তারপর হিটলার পর পর অস্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া গ্রাস করলেন—জেনারেলদের আপত্তি সত্ত্বেও—ফরাসী ইংরেজ রা-টি পর্যন্ত কাড়লে না। বার বার তিনবার লজ্জা পাওয়ার পরও পোলাণ্ড আক্রমণের পূর্বে জেনারেলরা ফের গড়িমসি করেছিলেন, এমন কি ফ্রান্স আক্রমণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও তাঁরা ঐ 'জুয়ো খেলতে' চাননি। কিন্তু বার বার হিটলার প্রমাণ করলেন, জেনারেলদের আর যা থাকে থাক, সমরনৈতিক দূরদৃষ্টি তাঁদের নেই—ভবিষ্যদ্বাণী করা তো দূরের কথা।

এতবার লজ্জা পাওয়ার পর তাঁরা আর কোন্ মুখ নিয়ে আপত্তি করতেন—হিটলার যখন রুশ আক্রমণ করবার প্রস্তাব তাঁদের সামনে পাড়লেন? এবং বহু বিনিদ্র যামিনী যাপন করার পর যে হিটলার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন সে কথা তাঁরা ভালো করেই জানতেন। বক্ষ্যমাণ 'টেস্টামেণ্টে'ই আছে,

'এ যুদ্ধে আমাকে যত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়েছে তার মধ্যে কঠিনতম সিদ্ধান্ত রুশ আক্রমণ। আমি বরাবর বলে এসেছি, সর্বস্ব পণ করেও যেন আমরা দুই ফ্রণ্টে লড়াই করাটা ঠেকিয়ে রাখি, এবং আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, আমি নেপোলিয়ন এবং তাঁর রুশ-অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আপন মনে বহুদিন ধরে বিস্তর তোলাপাড়া করেছি।'

এ-সব তত্ত্ব জানা থাকা সত্ত্বেও জেনারেলরা তো মানুষই বটেন। আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের আকছারই যে আচরণ হয় তাঁদেরও তাই হয়েছিল। অর্থাৎ জর্মনি যখন পোলাণ্ড, গ্রীস, ফ্রান্স একটার পর একটা লড়াই জিতে চললো তখন জাঁদরেলরা নিজেদের পিঠ নিজেরাই চাপড়ে বললেন, 'আমরা জিতেছি, আমরা লড়াই জিতেছি।' হিটলারকে স্মরণে আনবার প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করলেন না।[১] কিন্তু হিটলার রুশযুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মহত্যা করলে পর এই

১ একমাত্র জঙ্গীলাট কাইটেল করেছিলেন। ফ্রান্সের পরাজয়ের খবর পৌঁছলে তিনি উল্লাসে বে-এক্তেয়ার হয়ে হিটলারকে উদ্দেশ করে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলেছিলেন, 'আপনি সর্বকালের সর্ব সেনাপতির প্রধানতম'। Groesste Feldherr alle Zeiten। ঈষৎ অবান্তর হলেও এস্থলে বলি, হিটলার যখন রুশে পরাজয়ের পর পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছেন তখন জর্মন কাষ্ঠরসিকরা

জাঁদরেলরাই মোটা মোটা কেতাব লিখলেন, 'হিটলার অগা, হিটলার বুদ্ধু—তারই দুর্বুদ্ধিতে আমরা লড়াই হারলুম।' বাঙলা প্রবাদে বলে, 'খেলেন দই রমাকান্ত, বিকারের বেলা গোবর্দ্ধন'। ফ্রান্স-জয়ের দই খেলেন জাঁদরেলরা, রুশ-পরাজয়ের বিকার হল হিটলারের। অবশ্য তাঁর পক্ষে এই সান্ত্বনা যে, তিনি এসব বই দেখে যাননি।

অবশ্য তিনিও কম না। জাঁদরেলরা যা করেছেন, তিনিও তাই করে গেছেন। পোলাণ্ড ফ্রান্স জয়ের গর্ব তিনি করেছেন পুরো ১০০ নঃ পঃ, কিন্তু রুশ-অভিযান-নিষ্ফলতার জন্য দায়ী করেছেন তাঁর জাঁদরেলদের ন'সিকে। তিনি আত্মহত্যা করবার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে যে উইল লিখে যান তাতে তিনি লিখেছেন, 'বিমানবাহিনী লড়েছে ভালো, নৌবহরও কিছু কম নয়, স্থল-সৈনিকরাও লড়েছে উত্তম, কিন্তু সর্বনাশ করেছে ঐ জাঁদরেলরা।' অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'তারা মূর্খ, তারা প্রগতিশীল নয়, যুদ্ধের সময় তাদের চিন্তা তাদের কর্মধারা দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়, ১৯৪১-৪৫ সালে তারা যে কায়দায় লড়ছে সেটা যেন ১৯১৪-১৮-এর যুদ্ধ! ব্লিৎস ক্রীগ—বিদ্যুৎ-গতি-যুদ্ধ—এ যে কি জিনিস তারা আদপেই বুঝতে না পেরে পদে পদে আমার আদেশ অমান্য করেছে।'[১]

অর্থাৎ এবার দই খাচ্ছেন হিটলার, বিকারের বেলা জাঁদরেলরা। ফ্রান্স, পোলাণ্ড জয় করেছিলেন তিনি, রুশ-যুদ্ধে হারলো জর্মন জাঁদরেলরা!

কিন্তু এহ বাহ্য। রুশ-যুদ্ধে জর্মনির হার হয়েছিল অন্য কারণে।

বহু রণপণ্ডিত এ-কথা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, সে পরাজয়ের জন্য প্রধানত দায়ী শ্রীমান মুসোলীনী! হিটলার বলেছেন (১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫),

'ইটালি যুদ্ধে প্রবেশ করা মাত্র আমাদের শত্রুদের এই প্রথম কয়েকটি সংগ্রাম

Groesste-এর Gro, Feldherr-এর F, aller-এর A এবং Zeiten-এর Z নিয়ে সংক্ষিপ্ত করে Grofatz নির্মাণ করেন। এখানে Gro মানে বিরাট এবং fatz শব্দের অর্থ—গ্রাম্য ভাষায় বাতকর্ম। আমি বাংলায় ভদ্রশব্দটি প্রয়োগ করলুম। বাঙলা আটপৌরে শব্দটির সঙ্গে জর্মন শব্দটির উচ্চারণের মিল এস্থলে লক্ষণীয়।

২ যেমন মনে করুন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কাইজার ছিল, শত্রু পরাজিত হলেও এক দিনের ভিতর কুড়ি মাইলের বেশী এগোবে না, পাছে তোমার লাইন অব কম্যুনিকেশন ছিন্ন হয়ে যায়। ব্লিৎসক্রীগে পঞ্চাশ মাইলও নস্যি।

জয় সম্ভব হল (এস্থলে হিটলার ইংরেজ কর্তৃক উত্তর আফ্রিকা জয়ের কথা বলছেন) এবং তারই ফলে চার্চিলের পক্ষে সম্ভব হল তার দেশবাসী তথা পৃথিবীর ইংরেজ-প্রেমীদের মনে সাহস এবং ভরসা সঞ্চার করা। ওদিকে মুস্‌সোলীনী আবিসিনিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায় হেরে যাওয়ার পরও গোঁয়ারের মত হঠাৎ খামোখা আক্রমণ করে বসল গ্রীসকে—আমাদের কাছ থেকে কোনো পরামর্শ না চেয়ে, এমন কি আমাদের সে সম্বন্ধে কোনো খবর না দিয়ে।[৩] খেল বেধড়ক মার ; ফলে বল্কানের রাজ্যগুলো আমাদের অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করলো। বাধ্য হয়ে, আমাদের তাবৎ প্ল্যান ভণ্ডুল করে নামতে হল বল্কানে (এবং গ্রীসে) এবং তাতে করে আমাদের রুশ অভিযানের তারিখ মারাত্মক রকম পিছিয়ে (কাটাস্‌ট্রফিক্ ডিলে) দিতে হল। এবং তারই ফলে আবার বাধ্য হয়ে আমাদের সৈন্যবাহিনীর কতকগুলো অত্যুত্তম ডিভিশন পাঠাতে হল সেখানে। এবং সর্বশেষ নেট্ ফল হল, বাধ্য হয়ে আমাদের বহুসংখ্যক সৈন্যকে খোদার-খামোখা বল্কানের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মোতায়েন করে রাখতে হল। (হিটলার বলতে চান, তা না হলে এ সৈন্যদের রুশ অভিযানে পাঠানো যেত। পক্ষান্তরে তখন তাদের সরালে ইংরেজ ফের গ্রীসে আপন সৈন্য নামাতো, এবং মুস্‌সোলীনী একা যে তাদের ঠেকাতে পারতেন না, সে তো জানা কথা)।

হায় ইটালি যদি এ যুদ্ধে না নামত! তারা কোনো পক্ষে যদি যোগ না দিত!

এ যুদ্ধ একা যদি জর্মনিই লড়ত—এ যদি অ্যাকসিসের যুদ্ধ না হত—তবে আমি ১৫ই মে, ১৯৪১-এ-ই রাশা আক্রমণ করতে পারতুম। জর্মন সৈন্য ইতিপূর্বে কোথাও পরাজিত হয়নি বলে আমরা শীত আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই (১৯৪১-৪২-এর শীত) যুদ্ধ খতম করে দিতে পারতুম।' (ইটালির গ্রীস আক্রমণের ফলে ও তাকে সাহায্য করতে গিয়ে সময় নষ্ট হওয়াতে, হিটলার রাশা আক্রমণ করতে সমর্থ হলেন প্রায় এক মাস পরে। ফলে তিনি যখন মস্কোর কাছে এসে পৌঁছলেন তখন হঠাৎ প্রচণ্ড শীত আর বরফপাত আরম্ভ হল—এ রকম ধারা শীত আর বরফ রাশাতেও বহুকাল ধরে পড়েনি—যুদ্ধের তাবৎ যন্ত্রপাতির তেল চর্বি জমে গেল, শীতের পূর্বেই জর্মন সৈন্য মস্কো দখল করে সেখানে শীতবস্ত্র লুট করতে পারবে বলে তারও কোনো ব্যবস্থা হিটলার করেননি, বহু হাজার সৈন্য শুধু শীতের

৩ মুস্‌সোলীনী বলেছেন, 'হিটলার প্রতিটি লড়াই লড়েছে আমাকে নোটিশ না দিয়ে—আমিই বা কেন আগেভাগে দিতে যাব?'

অত্যাচারেই জমে গিয়ে মারা গেল। বলা যেতে পারে, এই শীতেই হিটলারের পরাজয় আরম্ভ হল—যদিও সেটা দৃশ্যমান হল তার পরের শীতে স্টালিনগ্রাডে।)

হিটলার হা-হুতাশ করে বলেছেন, 'হায়, তাই সব-কিছু সম্পূর্ণ অন্য রূপ নিল!'

কিন্তু প্রশ্ন, মস্কো দখল করতে পারলেই কি হিটলার শেষ পর্যন্ত জয়ী হতেন? নেপোলিয়ন তো মস্কো জয় করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তিনি রুশ জয় করতে পারেননি।

॥ ২ ॥

গত প্রবন্ধে মস্কো যুদ্ধের বর্ণনা লেখার কালি শুকোতে না শুকোতে খাস মস্কো থেকে একটি চমকপ্রদ খবর এসেছে। মস্কো যুদ্ধের বিংশ বাৎসরিক স্মরণ দিবসে গত ৫ই ডিসেম্বর (১৯২১ খৃ) মস্কো শহরে মার্শাল রকসফ্‌স্কি তাস এজেন্সিকে বলেন, দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময় জর্মনরা স্থির করেছিল, মস্কোকে জলের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে সেটাকে সমুদ্রের মত করে ফেলবে। পরে যখন দেখা গেল টেকনিকাল কারণে সেটা সম্ভবপর নয় তখন তারা বোমা ফেলে সেটা ধ্বংস করার চেষ্টা দিল।

আমার মনে হয়, টেকনিকাল কারণে সম্ভবপর হলেও কৃত্রিম বন্যায় মস্কো ভাসিয়ে দেবার প্রস্তাবে হিটলার স্বয়ং রাজী হতেন না। তাঁর প্ল্যান ছিল, জর্মন সৈন্য মস্কো লুট করে গরম জামা-কাপড় এবং কিছু কিছু খোরাক পাবে—কিন্তু প্রধানত গরম জামা-কাপড় ও শীতের আশ্রয়ই ছিল তাঁর আসল লক্ষ্য, কারণ যুদ্ধ শীতের পূর্বেই শেষ হয়ে যাবে মনে করে হিটলার তাঁর সৈন্যবাহিনীর জন্য সে-ব্যবস্থা করেননি। (এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত, জর্মনিতে কোনো কালেই উলের প্রাচুর্য ছিল না—জর্মনি চিরকালই তার জন্য নির্ভর করেছে প্রধানত স্কটল্যাণ্ডের উপর এবং মস্কোর দোরে যখন জর্মনরা আটকা পড়ে গেল তখন হিটলারকে বাধ্য হয়ে জর্মনির জনসাধারণের কাছে শীতবস্ত্রের জন্য ঢালাও আবেদন জানাতে হল)। কাজেই মস্কো শহরকে সমুদ্রে পরিণত করলে তাঁর কোনো লাভই হত না। এবং মনে পড়ছে, নেপোলিয়নের বেলাতে রুশরা নিজেই কাঠের তৈরী মস্কো শহর পুড়িয়ে খাক করে দেওয়ার ফলে তিনি মস্কোর শ্মশানভূমিতে তাঁর সৈন্যের জন্য এক কণা ক্ষুদ, ঘোড়ার জন্য এক রত্তি দানা পাননি। এবারে রুশরা সেটা চাইলেও করতে পারতো না, কারণ ইতিমধ্যে তাবৎ মস্কো শহর কনক্রিট আর লোহাতে তার বাড়িঘর বানিয়ে বসে আছে। সেটাকে পোড়ানো অসম্ভব।

কাজেই মস্কো জয় করে নেপোলিয়ন লাভবান হননি, কিন্তু হিটলার হতেন।

মার্শাল রকসফ্‌স্কি আরো বলেছেন, মস্কোবাসী এবং সেখানকার রুশ সৈন্যদল জর্মনদের কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করা সত্ত্বেও তারা সেটা গ্রহণ করেনি। এটা সত্যই অত্যন্ত চমকপ্রদ খবর। এর একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে, কোনো নগর আত্মসমর্পণ করলে সেটাকে বে-এক্তেয়ার লুটতরাজ করা যায় না।[১]

অবশ্য যে সব ভুলের ফলে হিটলার মস্কো দখল করতে পারলেন না, সেগুলো না করে মস্কো দখল করতে পারলে তিনি যে তারপর অন্য ভুল করে যুদ্ধ হারতেন না, সে কথা বুক ঠুকে বলবে কে?

* * *

সমস্ত জর্মনি যখন রুশ, ইংরেজ, মার্কিন, ফরাসী সৈন্য দ্বারা অধিকৃত হয়ে গিয়েছে, রুশবাহিনী প্রায় তাবৎ বার্লিন দখল করে হিটলারের বুংকারের থেকে দু' পাঁচ শ' গজ দূরে, বুংকার সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন, বার্লিনের বাইরে তাঁর সৈন্যদল ও সেনাপতিরা আত্মসমর্পণে ব্যস্ত তখনো হিটলার কিসের আশায় পরাজয় স্বীকার করছিলেন না? আত্মহত্যার ঠিক তিন মাস পূর্বে হিটলার তাঁর আদর্শ মানব ফ্রেড্‌রিককে স্মরণ করে বলেছেন,

'না। একেবারে আর কোনো আশা নেই, এরকম পরিস্থিতি কখনো আসে না। জর্মনির ইতিহাসে আকস্মিক কতবার তার সৌভাগ্যের সূচনা হয়েছে সেইটে শুধু একবার স্মরণ করো। সপ্তবর্ষীয় যুদ্ধে ফ্রেড্‌রিক তাঁর নৈরাশ্য এবং দুরবস্থার এমনই চরমে পৌঁছেছিলেন যে, ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের শীতকালে তিনি মনস্থির করেন যে, বিশেষ একটি দিনের ভিতর তাঁর সৌভাগ্যের সূত্রপাত না হলে তিনি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবেন। ঐ স্থির করা বিশেষ দিনের মাত্র কয়েক দিন পূর্বে জারিনা হঠাৎ মারা গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন দৈবযোগে সমস্ত পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। মহান পুরুষ ফ্রেড্‌রিকের মত আমরাও কয়েকটি সমবেত শক্তির (কোয়ালিশনের) বিরুদ্ধে লড়ছি, এবং মনে রেখো, কোনো কোয়ালিশনই চিরন্তনী সত্তা ধরে না। এর অস্তিত্ব শুধু গুটি কয়েক লোকের

১ এর সঙ্গে তুলনীয় মার্কিন কর্তৃক হিরোশিমায় অ্যাটম বম প্রয়োগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জর্মনির পরাজয়ের পর জাপান নিরপেক্ষ সুইডেনের মারফতে আমেরিকার কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠায়। মার্কিন সেটা গ্রহণ করলে হিরোশিমায় অ্যাটম বম ফাটিয়ে তার ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত। তাই করেনি। করলো এক্সপেরিমেন্টটা দেখে নিয়ে।

ইচ্ছার উপর। আজ যদি হঠাৎ চার্চিল অবলুপ্ত হয়ে যায়, তা হলে তড়িৎশিখার ন্যায় এক মুহূর্তেই সমস্ত অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাবে। ব্রিটেনের খানদানী মুরুব্বীরা সেই মুহূর্তেই দেখতে পাবে তারা কোনো অতল গহ্বরের সামনে এসে পড়েছে—এবং চৈতন্যোদয় হবে তখন।'

হিটলার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা করেছিলেন মার্কিন এবং ইংরেজ একদিন না একদিন অতি অবশ্য বুঝতে পারবে, ওদের শত্রু জর্মন নয়, ওদের আসল শত্রু রুশ। এবং সেই হৃদয়ঙ্গম করা মাত্রই তারা জর্মনির সঙ্গে আলাদা সন্ধি করে, সবাই এক জোট হয়ে লড়াই দেবে রুশের বিরুদ্ধে। হিটলার আশা করেছিলেন, যেদিন মার্কিনিংরেজ জর্মনির কিয়দংশ দখল করার পর রুশের মুখোমুখি হবে সেইদিনই লেগে যাবে ঝগড়া। মার্কিনিংরেজ স্পষ্ট বুঝতে পারবে রুশ কী চীজ এবং সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে সন্ধি প্রস্তাব পাঠাবে। কিন্তু ঠিক সেইটেই হল না। বার্লিনকে বাইপাস করে রুশ এবং মার্কিনিংরেজ যখন মুখোমুখি হল তখন তারা সুবোধ বালকের ন্যায় আপন গোঠে জমিয়ে বসে গেল।

এবং অদৃষ্ট হিটলারের দিকে শেষ মুহূর্তে কী নিদারুণ মুখভেংচিই না কেটে গেলেন।

হিটলারের দুর্দশা যখন চরমে, তিনি যখন দিবারাত্রি আকস্মিক ভাগ্যপরিবর্তনের প্রত্যাশায় প্রহর গুনছেন, গ্যোবেল্‌স্‌ প্রভুর হৃদয়ে সাহস সঞ্চারের জন্য কার্লাইলের লিখিত 'ফ্রেডরিক দি গ্রেটের ইতিহাস' মাঝে মাঝে পড়ে শুনিয়ে যান, এমন সময় উত্তেজনায় বিবশ গ্যোবেল্‌স্‌ প্রভুকে ফোন করলেন, 'মাইন ফ্যুরার, আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই। নিয়তি আপনার পরম শত্রুকে বিনাশ করেছেন। জারিনা মারা গেছেন।'

এস্থলে জারিনা অবশ্য রোজোভেল্ট: তিনি মারা যান ১২ই এপ্রিল ১৯৪৫।

কিন্তু হায়, চার্চিল নয়, অদৃশ্য হলেন রোজোভেল্ট! তবু মন্দের ভালো। কিন্তু তার চেয়েও নিদারুণ—হায়, হায়—রোজোভেল্টের মৃত্যু সত্ত্বেও মার্কিন তার সমরনীতি বদলালো না। হিটলার প্রতিটি মুহূর্ত গুনলেন অধীর প্রত্যাশায়—ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য। আত্মহত্যা করলেন তার আঠারো দিন পরে। ফ্রেডরিককে করতে হয়নি।

* * *

এইবারে তাঁর শেষ ভবিষ্যদ্বাণী:

'জর্মনি হেরে গেলে, যতদিন না এশিয়া আফ্রিকা এবং সম্ভবত দক্ষিণ

আমেরিকার ন্যাশনালিজমগুলো জাগ্রত হয়, ততদিন পৃথিবীতে থাকবে মাত্র দুটি শক্তি যারা একে অন্যকে মোকাবেলা করতে পারে—মার্কিন এবং রুশ। ভূগোল এবং ইতিহাসের আইন এদের বাধ্য করবে একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে—সশস্ত্র সংগ্রাম কিংবা অর্থনীতি এবং আদর্শবাদের (ইডিয়লজিকাল) সংগ্রাম। এবং সেই ইতিহাস ভূগোলের আইনেই উভয় পক্ষই হবে ইয়োরোপের শত্রু। এবং এ বিষয়েও কণামাত্র সন্দেহ নেই যে, শীঘ্রই হোক আর দেরিতেই হোক, উভয় পক্ষকেই ইয়োরোপের একমাত্র বিদ্যমান শক্তিশালী জর্মন জাতির বন্ধুত্বের জন্য হাত পাততে হবে।'

এর টীকা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের তোড়জোড় যে জর্মনিতেই হচ্ছে সে-কথা কে না জানে? আর আডেনাওয়ারের কণ্ঠস্বর যে ক্রমেই উঁচু পর্দায় উঠছে সেও তো শুনতে পারছি! এবং রুশ যে পূর্বজর্মনির মারফতে পশ্চিম জর্মনির সঙ্গে আলাদা সন্ধি করতে উদ্‌গ্রীব, সেও তো জানা কথা॥

কুট্টি

পূব-বাঙলার বিস্তর নরনারী চিরকালই কলকাতায় ছিলেন; কিন্তু এবারে কলকাতায় এসে দেখি তাদের সংখ্যা একলপতে গুয়া গাছের ডগায় উঠে গেছে। কিছুদিন পূর্বেও পূব-বাঙলার উপভাষা শুধু দক্ষিণ কলকাতাতেই শোনা যেত, এখন দেখি তামাম কলকাতাময় বাঙাল ভাষার (আমি কোনো কটু অর্থে শব্দটি ব্যবহার করছি নে—শব্দটি সংক্ষিপ্ত এবং মধুর) ছয়লাপ।

বাঙাল ভাষা মিষ্ট এবং তার এমন সব গুণ আছে যার পুরো ফায়দা এখনো কোনো লেখক ওঠাননি। পূব-বাঙলার লেখকেরা ভাবেন 'করে' শব্দ 'কইরা' এবং অন্যান্য ক্রিয়াকে সম্প্রসারিত করলেই বুঝি বাঙাল ভাষার প্রতি সুবিচার হয়ে গেল। বাঙাল ভাষার আসল জোর তার নিজস্ব বাক্যভঙ্গিতে বা 'ইডিয়মে' —অবশ্য সেগুলো ভেবে-চিন্তে ব্যবহার করতে হয়, যাতে করে সে ইডিয়ম পশ্চিম-বঙ্গ তথা পূব-বাঙলার সাধারণ পাঠক পড়ে বুঝতে পারে। যেমন মনে করুন, বড়লোকের সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়ে যদি গরীব মার খায় তবে সিলেট অঞ্চলে বলে, 'হাতীর লগে পাতি খেলতায় গেছলায় কেনে?' অর্থাৎ 'হাতীর সঙ্গে পাতি খেলতে গিয়েছিলে কেন?' কিন্তু পাতি খেলা যে polo খেলা সেকথা বাঙলা দেশের কম লোকই জানেন; (চলন্তিকা এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহনে শব্দটি নেই) কাজেই এ ইডিয়ম ব্যবহার করলে রস ঠিক ওৎরাবে না। আবার—

দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা
দিঘল ঘোমটা নারী
পানার তলার শীতল জল
তিন-ই মন্দকারী।

'কামুফ্লাজ' বোঝাবার উত্তম ইডিয়ম। পূব, পশ্চিম কোনো বাংলার লোকের বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না।

ইডিয়ম, প্রবাদ, নিজস্ব শব্দ ছাড়া বাঙাল সভ্যতায় আরেকটি মহদ্‌গুণ আছে এবং এ গুণটি ঢাকা শহরের 'কুট্টি' সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ—যদিও তার রস তাবৎ পূব-বাঙলা এবং পশ্চিম বাংলারও কেউ কেউ চেখেছেন। কুট্টির রসপটুতা বা wit সম্পূর্ণ শহুরে বা 'নাগরিক'—এস্থলে আমি নাগরিক শব্দটি প্রাচীন সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করলুম অর্থাৎ চটুল, শৌখীন, হয়ত বা কিঞ্চিৎ ডেকাডেন্ট।

কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, আগ্রা বহু শহরে আমি বহু বৎসর কাটিয়েছি এবং স্বীকার করি লক্ষ্ণৌ, দিল্লীতে (ভারত বিভাগের পূর্বে) গাড়োয়ান সম্প্রদায় বেশ সুরসিক কিন্তু এদের সবাইকে হার মানতে হয় ঢাকার কুট্টির কাছে। তার উইট, তার রিপার্টি (মুখে মুখে উত্তর দিয়ে বিপক্ষকে বাক্‌শূন্য করা, ফার্সী এবং উর্দুতে যাকে বলে 'হাজির জবাব') এমনই তীক্ষ্ণ এবং ক্ষুরস্য ধারার ন্যায় নির্মম যে আমার সলা যদি নেন তবে বলবো, কুট্টির সঙ্গে ফস্ করে মস্করা না করতে যাওয়াই বিবেচকের কর্ম। খুলে কই।

প্রথম তাহলে একটি সর্বজনপরিচিত রসিকতা দিয়েই আরম্ভ করি। শাস্ত্রও বলেন, অরুন্ধতী-ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়, অর্থাৎ পাঠকের চেনা জিনিস থেকে ধীরে ধীরে অচেনা জিনিসে গেলেই পাঠক অনায়াসে নূতন বস্তুটি চিনতে পারে—ইংরিজীতে এই পন্থাকেই 'ফ্রম স্কুল রুম টু দি ওয়ার্লড ওয়াইড' বলে।

আমি কুট্টি ভাষা বুঝি কিন্তু বলতে পারি নে। তাই পশ্চিম বাঙলার ভাষাতেই নিবেদন করি।

যাত্রী : রমনা যেতে কত নেবে ?

কুট্টি গাড়োয়ান : এমনিতে দেড় টাকা ; কিন্তু কর্তার জন্য এক টাকাতেই হবে।

যাত্রী : বলো কি হে ? ছ আনায় হবে না ?

গাড়োয়ান : আস্তে কন কর্তা, ঘোড়ায় শুনলে হাসবে।

এর যুৎসই উত্তর আমি এখনো খুঁজে পাইনি।

মোটেই ভাববেন না যে এ জাতীয় রসিকতা মান্ধাতার আমলে একসঙ্গে নির্মিত হয়েছিল এবং আজও কুট্টিরা সেগুলো ভাঙিয়ে খাচ্ছে।

'ঘোড়ার হাসি'র মত কতকগুলো গল্প অবশ্য কালাতীত, অজরামর। কিন্তু কুট্টিরা হামেশাই চেষ্টা করে নূতন নূতন পরিবেশে নূতন নূতন রসিকতা তৈরী করার।

প্রথম যখন ঢাকাতে ঘোড়দৌড় চালু হল তখন একটি কুট্টি গিয়ে যে ঘোড়াটাকে ব্যাক করল সেটা এল সর্বশেষে। বাবু বললেন, 'এ কি ঘোড়াকে ব্যাক করলে হে? সক্কলের শেষে এল?

কুট্টি হেসে বললে, 'কন কি কর্তা, দেখলেন না, ঘোড়া তো নয়, বাঘের বাচ্চা; বেবাকগুলোকে খেদিয়ে নিয়ে গেল।'

আমি যদি নীতি-কবি ঈসপ কিংবা সাদী হতুম, তবে নিশ্চয়ই এর থেকে 'মরাল' ড্র করে বলতুম, একেই বলে 'রিয়েল, হেলথি অপটিমিজ্‌ম্'।

কিংবা আরেকটি গল্প নিন, এটা একেবারে নিতান্ত এ যুগের।

পাকিস্তান হওয়ার পর বিদেশীদের পাল্লায় পড়ে ঢাকার লোকও মর্নিং স্যুট, ডিনার জ্যাকেট পরতে শিখেছেন। হাঙ্গামা বাঁচাবার জন্য এক ভদ্রলোক গেছেন একটি কালো লঙ কোট বা প্রিন্স কোট বানাতে। ভদ্রলোকের রঙ মিশ্‌ কালো, তদুপরি তিনি হাড়-কিপ্‌টে। কালো বনাত দেখলেন, সার্জ দেখলেন, আশপাশ দেখলেন, কোনো কাপড়ই তাঁর পছন্দ হয় না অর্থাৎ দাম পছন্দ হয় না। যে-কুট্টি কোচম্যান সঙ্গে ছিল সে শেষটায় বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোককে সদুপদেশ দিল, 'কর্তা, আপনি কালো কোটের জন্য খামকা পয়সা খরচ করতে যাবেন কেন? খোলা গায়ে বুকের ওপর ছ'টা বোতাম, আর দু হাতে কব্জীর কাছে তিনটে তিনটে করে ছ'টা বোতাম লাগিয়ে নিন। খাসা প্রিন্সকোট হয়ে যাবে।'

তিন বৎসর পূর্বেও কলকাতায় মেলা অনুসন্ধান না করে বাখরখানী (বাকির-খানী) রুটি পাওয়া যেত না; আজ এই আমির আলী এভিন্যুতেই অন্ততঃ আধা ডজন দোকানের সাইন বোর্ডে 'বাখরখানী,' লেখা রয়েছে। তাই বিবেচনা করি, কুট্টির সব গল্পই ক্রমে ক্রমে বাখরখানীর মতই পশ্চিম বাঙলায় ছড়িয়ে পড়বে এবং তার নূতনত্বে মুগ্ধ হয়ে কোনো কৃতী লেখক সেগুলোকে আপন লেখাতে মিলিয়ে নিয়ে সাহিত্যের পর্যায়ে তুলে দেবেন—পরশুরাম যে রকম পশ্চিম বাঙলার নানা হাল্কা রসিকতা ব্যবহার করে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, হুতোম একদা কলকাতার নিতান্ত কক্‌নিকে সাহিত্যের সিংহাসনে বসাতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এটা হল জমার দিকে কিন্তু খরচের দিকে একটা বড় লোকসান আমার কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে, নিবেদন করি।

ভদ্র এবং শিক্ষিত লোকেরই স্বভাব অপরিচিত, অর্ধপরিচিত কিংবা বিদেশীর সামনে এমন ভাষা ব্যবহার না করা, যে ভাষা অন্যপক্ষ বা বিদেশী অনায়াসে বুঝতে না পারে। তাই খাস কলকাতার শিক্ষিত লোক পূব-বাঙালীর সঙ্গে কথা বলবার সময় খাস কলকাত্তাই শব্দ, মোটামুটি ভাবে যেগুলোকে ঘরোয়া অথবা 'স্ল্যাঙ্' বলা যেতে পারে, ব্যবহার করেন না। তাই এন্তার, ইলাহি, বেলেল্লা-বেহেড, দোগেড়ের চ্যাং এসব শব্দ এবং বাক্য কলকাতার ভদ্রলোক পূব-বাঙালীর সামনে সচরাচর ব্যবহার করেন না। অবশ্য বক্তা যদি সুরসিক হন এবং আসরে মাত্র একটি কিংবা দুটি ভিন্ন প্রদেশের লোক থাকেন তবে তিনি অনেক সময় আপন অজানাতেই অনেক ঝাঁঝ-ওলা ঘরোয়া শব্দ ব্যবহার করে ফেলেন।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে শ্যামবাজারের ভদ্র আড্ডাতে পূব-বাঙালীর সংখ্যা থাকতো অতিশয় নগণ্য। তাই শ্যামবাজারী গল্প ছোটালে এমন সব ঘরোয়া শব্দ, বাক্য, প্রবাদ ব্যবহার করতেন এবং নয়া নয়া বাক্যভঙ্গী বানাতেন যে রসিকজন মাত্র বাহবা শাবাশ না বলে থাকতে পারত না।

আজ পূব-বাঙলার বহু লোক কলকাতার আসর সরগরম করে বসেছেন বলে খাঁটি কলকাত্তাই আপন ভাষা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হয়ে গিয়েছেন এবং ঘরোয়া শব্দবিন্যাস ব্যবহার ক্রমেই কমিয়ে দিচ্ছেন। হয়তো এরা বাড়িতে এসব শব্দ এখনো ব্যবহার করেন ; কিন্তু আড্ডা তো বাড়ির লোকের সঙ্গে জমজমাট হয় না —আড্ডা জমে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে এবং সেই আড্ডাতে পূব-বাঙলার সদস্য সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে বলে খাস কলকাত্তাই আপন ঘরোয়া শব্দগুলি ব্যবহার না করে করে ক্রমেই এগুলো ভুলে যাচ্ছেন। কোথায় না এসব শব্দ আস্তে আস্তে ভদ্রভাষায় স্থান পেয়ে শেষটায় অভিধানে উঠবে, উল্টে এগুলো কলকাতা থেকে অন্তর্ধান করে যাবে।

আরেক শ্রেণীর খানদানী কলকাত্তাই চমৎকার বাঙলা বলতেন। এঁরা ছেলেবেলায় সায়েবী ইস্কুলে পড়েছিলেন বলে বাঙলা জানতেন অত্যন্ত কম এবং বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধ ছিল ভাশুর-ভাদ্রবধূর। তাই এঁরা বলতেন ঠাকুরমা দিদিমার কাছে শেখা বাঙলা এবং সে বাঙলা যে কত মধুর এবং ঝলমলে ছিল তা শুধু তাঁরাই বলতে পারবেন যাঁরা সে বাঙলা শুনেছেন। ক্রীক রোর মন্মথ দত্ত ছিলেন সোনার বেনে, আমার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু, কলকাতার অতি খানদানী ঘরে জন্ম। মন্মথদা যে বাঙলা বলতেন তার ওপর বাঙলা সাহিত্যের

বা পূব-বাঙলার কথ্য ভাষার কোন ছাপ কখনো পড়েনি। তিনি যখনই কথা বলতে আরম্ভ করতেন আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতাম আর মন্মথদা উৎসাহ পেয়ে রেকাবের পর রেকাব চড়ে চড়ে একদম আসমানে উঠে যেতেন। কেউ অন্য-মনস্ক হলে বলতেন, 'ও পরাণ, ঘুমুলে?' মন্মথদার কাছ থেকে এ অধম এন্তার বাঙলা শব্দ শিখেছে।

আরেকজনকে অনেক বাঙালী চেনেন। এঁর নাম গাঙ্গুলী মশাই—ইনি ছিলেন শান্তিনিকেতন অতিথিশালার ম্যানেজার। ইনি পিরিলি ঘরের ছেলে এবং গল্প বলার অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা এঁর ছিল। বহু-ভাষাবিদ্ পণ্ডিত হরিনাথ দে, সুসাহিত্যিক সুরেশ সমাজপতি ছিলেন এঁর বাল্যবন্ধু এবং শুনেছি এঁরা এঁর গল্প মুগ্ধ হয়ে শুনতেন।

কলের একদিক দিয়ে গরু ঢোকানো হচ্ছে, অন্যদিক দিয়ে জলতরঙ্গের মতো ঢেউয়ে ঢেউয়ে মিলিটারী বুট বেরিয়ে আসছে, টারালাপ টারালাপ করে, গাঙ্গুলী মশাই আর অন্যান্য ক্যাডেটরা বসে আছেন পা লম্বা করে, আর জুতোগুলো ফটাফট ফটাফট করে ফিট হয়ে যাচ্ছে—এ গল্প শুনে শান্তিনিকেতনের কোন্ ছেলে হেসে কুটিকুটি হয়নি?

হায়, এ শ্রেণীর লোক এখন আর দেখতে পাই নে। তবু এখনো আমার শেষ ভরসা শ্যামবাজারের ওপর।

শ্রদ্ধেয় বসু মহাশয়ের উপাদেয় 'স্মৃতিমন্থন' আমারও স্মৃতির ভিজে গামছাটি নিংড়ে বেশ কয়েক ফোঁটা চোখের জল বের করলো।

আমিও এ বাবদে একদা একটি প্রবন্ধ লিখি। আশ্চর্য! ছাপাও হয়েছিল। এবং চাটগাঁয়ে প্রকাশিত একটি মাসিকে সেটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। আবার কোনো পুস্তকে সেটি স্থান পেয়েছ কিনা, মনে পড়ছে না।

আমার মনে হয়, কুট্টি সম্প্রদায় (ঢাকার গাড়োয়ান শ্রেণী) একদা মোগল সৈন্যবাহিনীর ঘোড়-সওয়ার সেপাই ছিল। যার ফলে তারা 'কুঠি' বাড়ির ব্যারাকে থাকতো। এবং তাই পরে এদের নাম কুট্টি হয়। পরবর্তী কালে ইংরেজ বাহিনীতে এদের স্থান হয়নি বলে, কিংবা মোগলের নেমকহারামী করতে চায়নি বলে এরা ঘোড়ার গাড়ি চালাতে শুরু করে। কারণ ঘোড়া তাদের নিজেরই ছিল, এবং ঘোড়ার খবরদারী করতে তারা জানতো। বরোদা রাজ্যেও আমি শুনতে পাই, সেখানকার কোচম্যানরাও নাকি পূর্বে মারাঠা সৈন্যবাহিনীতে ক্যাভলরি অঙ্গে কাজ করতো। ঢাকার কুট্টিরা এককালে উর্দু বলতো, পরে

ঢাকা শহরের চলতি বাঙলার সঙ্গে মিশে 'কুট্টি ভাষা'র সৃষ্টি হয়। তাই তারা এখনো 'লেকিন, মগর' এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করে থাকে। তবে পূব-বাঙলার মৌলবী সায়েবরাও 'লেকিন, মগর' ছাড়া আরও বহু বহু আরবী ফার্সী শব্দ 'বাঙাল' কথা বলার সময় ব্যবহার করে থাকেন—ঐ অঞ্চলে হিন্দু পণ্ডিতরাও যে রকম গলায় ঘা হলে বলেন, 'কণ্ঠদেশে ক্ষত অইছে'। তাই শুনে মেডিকেল কলেজের গোরা ডাক্তার নাকি বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'চীন দেশ হ্যায়, জাপান ভী দেশ হ্যায়, ফির কণ্ঠদেশ কোন্ দেশ হ্যায় ?'

বছর পঞ্চাশেক পূর্বে ঢাকার এই 'কুট্টি' ভাষা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বেরোয়। তাতে ঐ আমলের কুট্টি ভাষার উদাহরণ স্বরূপ বলা হয় :

'করিম বক্‌স্‌কা মা নে আর রহিম বক্‌স্‌কা জরুনে এয়সা লাগিস্ লাগিস্তা কে এ ভি উস্‌কা বালমে ধরি টানিস্তা, উ ভী ইস্‌কা বাল্‌মে ধরি টানিস্তা।'

অর্থাৎ 'করিম বখ্‌শের মা আর রহিম বখ্‌শের স্ত্রীতে এমন লাগাই লাগলো (কোঁদল) যে এ ওর চুল ধরে টানে, ও এর চুল ধরে টানে।'

(কুট্টি ভাষার উদ্ধৃতিতে কোন ভুল থাকলে যেন কুট্টিভাষাভাষী আমার উপর বিরক্ত না হন—কারণ কুট্টি গাড়োয়ান ছাড়া অন্য অনেক লোক এ-ভাষা বলে থাকেন এবং বাঙলা সাহিত্যের চর্চাতে আনন্দ পান। পূর্বে এঁরা সকলেই উর্দু সাহিত্যপ্রেমিক ছিলেন। শুনতে পাই এঁদের কেউ কেউ নাকি ভাষা আন্দোলনে বাঙলা ভাষার পক্ষ নেন।)

* * *

'হাওয়া গাড়ি চইলা গেল গো
(আমার) বন্ধু আইল না।'

গানটি পূব-বাঙলায় রূপকার্থেও নেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ যে হাসন রাজার—

মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন
কানেতে করিল পয়দা মুসলমানী দীন (ধর্ম)॥
নাকে পয়দা করিয়াছে খুশবয় বদ্‌বয় (সুগন্ধ, দুর্গন্ধ)
আমা হইতে সব উৎপত্তি হাসন রাজায় কয়॥

এ ছত্রগুলি ব্যবহার করেন, সেই হাসন রাজারই একটি গান আছে, 'হাওয়ার গাড়ি ধু ধা করে চলেছে (নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের হাওয়ায় যে গাড়ি চলে অর্থাৎ শরীর) তার ভিতর সায়েব সোয়ারি (পরমাত্মা, আল্লা) বসে আছেন। হাসন রাজা (অর্থাৎ ব্যষ্টি পুরুষ) সেই সায়েবকে সেলাম করাতে (মর্মে মর্মে তাঁকে ভক্তিভরে অনুভব করাতে) তিনি হাসনকে আদর করে পাশে বসালেন।'

পুরো গানটি আমার স্মরণে নেই ; তবে শেষের দু'ছত্র আছে—

'হাসন রাজা, নাচতে আছে, 'আল্লা আল্লা' ধরি।
পবনের গাড়ি চলতে আছে ধু ধু ধা ধা করি' ॥

এখানে পবনের গাড়ি, হাওয়া গাড়ি, শ্রদ্ধেয় বসু মশায়েরও হাওয়া গাড়ি মোটামুটি একই। তাই অর্থ দাঁড়ায়, 'পবনের গাড়ি' অর্থাৎ 'আমার প্রাণবায়ু' চলে গেল, তবু আমার বন্ধু এল না। বলা বাহুল্য পূব-বাঙলার ভাটিয়ালী গীত রচয়িতা এবং পশ্চিম বাঙলার বাউল উভয়ই কিছুদিন আগে পর্যন্তও অত্যন্ত সজীব, প্রাণবন্ত স্রষ্টা ছিলেন বলে নূতন নূতন জিনিস আমদানি হলেও তাকে সিম্‌বল্‌, রূপক রূপে, এলেগরি করে মরমিয়া (মিস্টিক) গান রচনা করতেন। যেমন রেলগাড়ির ঘণ্টা বেজেছে (আসন্ন মৃত্যুর ধ্বনি বেজেছে), আমি যাত্রী ঘুমে অচৈতন্য (তমোগুণে আচ্ছন্ন) ইত্যাদি। বিজলি বাতি নিয়ে একটি গান আমার আবছা আবছা মনে পড়ছে। হাওয়া গাড়ি প্রবর্তিত হলে এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঐ 'মোতীফ' নিয়ে একাধিক গীত রচিত হয়।

* * *

প্রধানতঃ রিকশার চাপে কুট্টি গাড়োয়ান সম্প্রদায় ঢাকার রাস্তা থেকে প্রায় অন্তর্ধান করেছে। কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত এরা নূতন নূতন অবস্থায় নূতন নূতন রসিকতা তৈরি করে গিয়েছে—অনেকেরই ভুল বিশ্বাস, এদের রসিকতার একটি প্রাচীন ভাণ্ডার ছিল এবং তারা শুধু সেগুলো ভাঙিয়েই খায়, আমি যে শেষ রসিকতাটি শুনেছি, সেটি ১৯৪৭।৪৮ সালে নির্মিত।

আমি ১৯৪৮ সালে ঢাকার এক আত্মীয়কে শুধোই, 'মুসলিম লীগ কী রকম রাজত্ব চালাচ্ছেন ?'

তিনি বললেন, 'সে সম্বন্ধে একটি কুট্টি রসিকতা বাজারে চালু হয়েছে। অত্যন্ত ক্যারাক্‌টিরিসটিক্‌—অর্থাৎ লীগের ক্যারাক্‌টার প্রকাশ করে। যদিও গল্পটি একটু 'রিস্‌কে'—অর্থাৎ গলা খাঁকরি দিয়ে বলতে হয়।'

মুসলীম লীগ শাসনভার হাতে নিয়ে এক কুট্টি গাড়োয়ানকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিলেন, সে যেন তার জাতভাইদের মধ্যে তাঁদের জন্য প্রচারকার্য বা প্রোপাগাণ্ডা করে। সে তাদের ডেকে বক্তৃতা আরম্ভ করলে, 'ভাই সকল, শোনো (আমি এস্থলে কুট্টি ভাষার পরিবর্তে 'সাধুই' ব্যবহার করছি—লেখক)। আমাদের রাষ্ট্র আমাদের মায়ের মত! মাকে যদি খাওয়াও পরাও তবে মায়ের দুধ তুমি-ই পাবে। খাজনাটা ট্যাক্সোটা ঠিকমত দাও ; মায়ের দুধ তুমিই পাবে।' তখন এক ব্যাক্‌বেঞ্চার (হেক্‌লার) বলে উঠলো, কইছো ঠিকই, লেকিন বাবা হালারা

যে খাইয়া ফুরাইয়া দিল।' অর্থাৎ মিনিস্টার, পলিটিশিয়ানের দলই সব লুটে নিচ্ছে।...মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ কারো প্রতিই আমাদের কোনো বৈরী ভাব নেই, তবে মনে হয়, গল্পটি বহু দেশ প্রদেশের শাসনকর্তাদের সম্বন্ধে খাটে।

* * *

এই কুট্টি গাড়োয়ানদের সম্বন্ধে শেষ একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি।

পার্টিশনের, পূর্বে ও পরে, কি হিন্দু, কি মুসলমান সর্ব পিতামাতা নির্ভয়ে তাঁদের কন্যাদের কুট্টির গাড়িতে তুলে দিতেন। ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, ভূমিকম্প হোক এরা ঠিক সময়ে মেয়েদের ফের ইস্কুল কলেজ থেকে ফিরিয়ে আনতো। হঠাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগে গেলেও এবং শুনেছি, কোনো কোনো স্থানে দাঙ্গার ফলে বাপ মা উধাও জানতে পেরে ভালো জায়গায় তাদের পৌঁছে দিয়েছে। কুট্টিরা এ জিম্মাদারীতে কখনো গাফিলি করেছে বলে শোনা যায়নি। এরা সত্যই শিভাল্‌রাস।

আর ঐ শিভাল্‌রাস কথাটা এসেছে ফরাসী 'শেভালিয়ের' থেকে। 'শেভাল' মানে ঘোড়া।

শেভালিয়ের অর্থাৎ ঘোড়সওয়ার। একদা খানদানী ফরাসীদের ছেলেরা এই ক্যাভালরি বা অশ্ববাহিনীর সদস্য ছিল। তাই বলছিলুম, কুট্টিরা আসলে মোগল বাহিনীর ঘোড়সওয়ার ছিল।

দরখাস্ত

এই মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ঘটনাটি ঘটেছে। আমার এক বন্ধুপুত্র ঝাড়া তেরোটি বচ্ছর কাজ করার পর মিন্ নোটিশে চাকরি হারাল। টাইপ করা একখানা কাগজ হাতে তুলে দিল, তার সারমর্ম—তোমাকে দিয়ে আমাদের আর কোনো প্রয়োজন নেই, কেটে পড়ো।

চোদ্দ বছর পর চাকরি গেলে খুব আশ্চর্য হতুম না। কারণ আজকাল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর অর্থ চৌদ্দ বছর। তারপর মুক্তি। ঠিক সেইরকম আমার এক ফরাসী-বন্ধু তাঁর সিলভার ওয়েডিঙের পরবে আমায় শুধোলেন, আমাদের দেশে, জেলে ম্যাক্সিমাম ক'বছর পুরে রাখে? আমি ঐ উত্তর দিলে তিনি বললেন, 'তবে আমাকে ছেড়ে দিচ্ছে না কেন?'

আমি শুধালুম, 'কিসের থেকে?'

কড়ে আঙুল দিয়ে সন্তর্পণে বউকে দেখিয়ে বললেন, 'ঐ যে, ওর সঙ্গে

পঁচিশটি বৎসর বন্দী হয়ে কাটালুম। এখনো কি মুক্তি পাবো না?'

উল্টোটাও শুনেছি। এক ইংরেজকে শুধিয়েছিলুম—নিজে বিয়ে করতে যাবার ঠিক আগের দিন—ওদের বিবাহিত জীবনের কাহিনী শোনাতে। বললেন, 'বিয়ের চোদ্দ বছর পর একদিন বউকে একটুখানি সামান্য কড়া কথা বলতেই সে ডান ভুরুটি একটু উপরের দিকে তুলে শুধলো, "ডার্লিং! তবে কি আমাদের হানি-মুন শেষ হয়ে গেল?" ইংরেজ একটু থেমে বললেন, 'ঐ আমার আক্কেল হয়ে গেল। এরপর আর কক্‌খনো রা-টি পর্যন্ত কাড়িনি।' তারই কিছুদিন পর তাঁর যমজ সন্তান হলে পর আমি তাঁকে বলেছিলুম, 'চীনা ভাষায় প্রবাদ আছে "যে লোক মোমবাতির খর্চা বাঁচাবার জন্য সন্ধ্যার সময়েই শুয়ে পড়ে তারই যমজ সন্তান হয়"। ইংরেজ সেয়ানা; সঙ্গে সঙ্গে সকলকে একটা রাউণ্ড খাইয়ে দিলে।

এ বাবদে আমাকে লাখ কথার সেরা কথা শুনিয়েছেন আমাদের রাষ্ট্রপতি—তখন অবশ্য তিনি কাশীতে সাদামাটা অধ্যাপক—জুলুদের অভিধানে নাকি স্বামীর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, 'এক প্রকার জংলী পশু যাকে স্ত্রী পোষ মানায়।'

এবং দুই এক্সট্রিম সদাই মিলে যায় বলে অভিজাত চীনাদের অভিধানে লেখকের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, 'এক প্রকারের বন্যজন্তু যাকে সম্পাদক পোষ মানায়।'

গেল চোদ্দটি বছর ধরে বঙ্গদেশের সম্পাদক তথা প্রকাশককুল আমাকে পোষ মানাবার চেষ্টা করেছেন। আমি মেনে নিয়েছি। কিন্তু এখন তাঁরা আর আমাকে ছাড়তে চায় না। উত্তম শায়েস্তাপ্রাপ্ত কয়েদীকে জেলার ছাড়তে চায় না। বাড়ির এডা-সেডা করে দেয়—অথচ তাকে মাইনে দিতে হয় না।

আমি কিন্তু মহারাণীর কাছে আপীল করেছি—'চোদ্দ বছর পূর্বে ঠিক ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে আমার প্রথম বই বেরোয়। আজ ১৯৬৪, আমার ছুটি মঞ্জুর হোক।'

কুকর্ম করে মানুষ জেলে যায়। আমিও কুমতলব নিয়ে লেখক হয়েছিলুম।

সাধারণের বিশ্বাস, লেখকের কর্তব্য পাঠককে পরিচিত করে দেবে বৃহত্তর চিন্তা-জগতের সঙ্গে, তাকে উদ্বুদ্ধ করবে মহান আদর্শের পানে, প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক জেরোম কে জেরোমের ভাষায়, তাকে 'এলিভেট' করবে। এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলেছেন, 'মাই বুক উইল নট এলিভেট ঈভন্ এ কাউ!'

লেখকের কর্তব্য যদি পাঠককে মহত্তর করে তোলাই হয়, তবে নিঃসন্দেহে কুমতলব নিয়েই আমি সাহিত্যে প্রবেশ করেছিলুম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, অর্থ-লাভ।

মহাকবি হাইনে একাধিকবার বলেছেন—তাই তাঁকে একাধিকবার উদ্ধৃত করতে আপত্তি নেই—'কে বলে আমি টাকার মূল্য বুঝি নে? যখনই ফুরিয়ে গিয়েছে তখনই বুঝেছি।' আমার বেলা তার চেয়েও সরেস। আমার হাতে অর্থ কখনোই আসেনি। কাজেই মূল্য বোঝা-না-বোঝার কোনো প্রশ্নই ওঠে নি। আমি চিরটা কাল 'খেয়েছি লঙ্গরখানায়, ঘুমিয়েছি মস্‌জিদে'; কাজেই বছরটা আঠারো মাসে যাচ্ছিল।

এমন সময় লঙ্গরখানা বন্ধ হয়ে গেল। আমাকে যিনি পুষতেন তিনি আল্লার ডাক শুনে ওপারে চলে গেলেন। বেহশ্‌তে গিয়েছেন নিশ্চয়ই; কারণ আমাকে নাহক পোষা ছাড়া অন্য কোনো অপকর্ম (গুনাহ্‌) তিনি করেননি।

মাত্র কিছুদিন পূর্বে লণ্ডনের ঈভানং স্ট্যাণ্ডার্ডে বেরিয়েছে, ক্লেমিঙের মৃত্যুর পর তাঁর একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে যাতে আছে 'আন্‌অ্যাশেমডলি আই অ্যাডমিট—আই রাইট ফর্‌ ম্যান।'

এরপর যে-সব পূর্বসূরিগণ নিছক অর্থের জন্যই লিখনবৃত্তি গ্রহণ করেন তাঁদের নাম করতে গিয়ে বাল্‌জাক্‌, ডিকেন্স, স্কট্‌, ট্রলোপের নাম করেছেন।

এই প্রবন্ধটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন মিঃ কাউলি। তিনি তারপর আপন মন্তব্য জুড়েছেন, 'কিন্তু এখানেই থেমে যাওয়া কেন?' বস্‌ওয়েলের লেখা যাঁরা স্মরণে রাখেন তাঁরাই মনে করতে পারবেন, ডঃ জনসনও এ-বাবদে কুহকাচ্ছন্ন ছিলেন না, 'নিতান্ত গাড়োল (blockhead) ভিন্ন অন্য কেউ অর্থ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে লেখে না'—এই ছিল সেই মহাপুরুষের সুচিন্তিত অভিমত।

অবশ্য তার চেয়েও বড় গাড়োল, যে টাকার জন্য লিখেও টাকা কামাতে পারলো না।

আমি ডঃ জনসনের পদধূলি হওয়ার মতও স্পর্ধা ধরি নে; অতএব তাঁর মত কটুভাষা ব্যবহার না করে, অর্থাৎ কে কোন্‌ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখে, সেই অনুযায়ী কে পাঁঠা, কে গোলাপফুল সে আলোচনা না করে শুধু বলবো আমি স্বয়ং লিখেছি, নিছক টাকার জন্য।

আমার বয়েস যখন উনিশটাক তখন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ আমাকে একদিন বললেন, 'এবার থেকে তুই লেখা ছাপাতে আরম্ভ কর্‌। আর দেখ্‌, লেখাগুলো আমাকে দিয়ে যাস। আমি ব্যবস্থা করবো।'

আমার অর্থাভাব তিনি জানতেন; তদুপরি আমার হাত দিয়ে কেউ যেন তামাক না খায়, অর্থাৎ আমাকে exploit না করে। তিনি একদা উত্তমরূপেই জমিদারী চালিয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু কষ্টেশ্রেষ্ঠে দিন চলে যাচ্ছিল তাই

বাগ্দেবীকে বানরীর মত ঘাগরা পরিয়ে ঘরে ঘরে নাচতে হল না (এটি বিদ্যাসাগর মশাই দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, অস্য দগ্ধ উদরস্যার্থে কিং কিং ন ক্রিয়তে ময়া। বানরীমিব বাগ্দেবীং নর্তয়ামি গৃহে গৃহে ॥)

আমি শান্তিনিকেতন ছাড়ি ১৯২৬-এ। ১৯৩৮-এ গুরুদেবকে প্রণাম করতে এলে তিনি জানতে চাইলেন, আমি কোনো লেখা ছাপাচ্ছি না কেন? উত্তরে কি বলেছিলুম সেটা আর এখানে বলে কাজ নেই।

কায়ক্লেশে চলে গেল ১৯৪৯ পর্যন্ত। লঙ্গরখানা (অর্থাৎ ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্ট-মস্‌জিদে) বন্ধ হয়ে গেল তখন; যেটা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

সর্বশ্রেষ্ঠ না হলেও পৃথিবীতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অপ্‌রা কম্পজিস্ট রস্‌সীনি বলতেন, 'আমি ছেলেবেলা থেকেই জানতুম, অর্থের প্রয়োজন আছে। কিন্তু দেখলুম, এক অপ্‌রা কম্পোজ করা ভিন্ন অন্য কোনো এলেম্ আমার পেটে নেই। সেই করে টাকা হয়েছে যথেষ্ট। এখন আর কম্পোজ করবো কোন্ দুঃখে!' খ্যাতির মধ্যগগনে, যৌবনে, তিনি এই আপ্তবাক্যটি ছাড়েন। তারপর তিনি বোধ হয় আরো দুটি অপ্‌রা তৈরি করেন—একবার নিতান্ত বাধ্য হয়ে, প্রায় প্রাণ বাঁচানোর জন্য, ও আরেকবার একজনকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য।

রস্‌সীনির তুলনায় আমি কীটস্য কীট। কিন্তু আমি দেখলুম, ঐ এক বই লেখা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে পয়সা কামাবার মত বিদ্যে আমার ব্রেন-বাক্সে নেই। আশ্চর্য, তারপর একটা চাকরি পেয়ে গেলুম। কাজেই লেখা বন্ধ করে দিলুম। চাকরি ইস্তফা দিলুম। ফের কলম ধরতে হল। ফের চাকরি। ফের কলম। ফের চাকরি, ফের—ইত্যাদি।

আমার লেখা অল্প লোকেই পড়েন, আমার জীবন এমন কিছু একটা নয় যা নিয়ে লোকের কৌতূহল থাকতে পারে। তবু যাঁরা নিতান্তই 'নোজী' (পীপিং টম্—নোজী পার্কার) তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন, যখন আমার চাকরি থাকে, তখন আমি লিখি না।

একবার ফ্রান্সে ঢোকবার ফর্মে প্রশ্ন ছিল—'তোমার জীবিকা নির্বাহের উপায় কি?'

উত্তরে লিখেছিলুম, 'কিছুদিন অন্তর অন্তর চাকরি রিজাইন দেওয়া (রিজাইনিং জব্ ফ্রম্ টাইম টু টাইম্)।'

ফরাসী শুধোলে, 'তাহলে চলে কি করে?'

বললুম, 'তুমি রেজিগনেশনগুলো দেখছো; আমি জব্‌গুলো দেখছি।'

পেটের দায়ে লিখেছি, মশাই, পেটের দায়ে। বাংলা কথা স্বেচ্ছায় না

লেখার কারণ—

(১) আমার লিখতে ভাল লাগে না। আমি লিখে আনন্দ পাই নে।

(২) এমন কোনো গভীর, গূঢ় সত্য জানি নে যা না বললে বঙ্গভূমি কোনো এক মহাবৈভব থেকে বঞ্চিত হবেন।

(৩) আমি সোসাল রিফর্মার বা প্রফেট নই যে দেশের উন্নতির জন্য বই লিখব।

(৪) খ্যাতিতে আমার লোভ নেই। যেটুকু হয়েছে, সেইটেই প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছে। নাহক্ লোকে চিঠি লিখে জানতে চায়, আমি বিয়ে করেছি কি না, করে থাকলে সেটা প্রেমে পড়ে না কোল্ড ব্লাডেড, যে রকম কোল্ড ব্লাডেড খুন হয়—অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন ঠিক করে দিয়েছিলেন কি না?—শব্‌নমের সঙ্গে আমার আবার দেখা হল কি না, 'চাচা'টি কে, আমি আমার বউকে ডরাই কি না—ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং কেউ কেউ আসেন আমাকে দেখতে। এখানকার বাঘ সিঙ্গি নন্দলাল, সুধীরঞ্জনকে দেখার পর আমার মত খাটাশ্‌টাকেও একনজর দেখে নিতে চান। কারণ কলকাতায় ফেরার ট্রেন সেই বিকেল পাঁচটায়; ইতিমধ্যে আর কি করা যায়। এবং এসে রীতিমত হতাশ হন। ভেবেছিলেন দেখবেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মত সুপুরুষ সৌম্যদর্শন নাতিবৃদ্ধ এক ভদ্রজন লীলাকমল হাতে নিয়ে সুদূর মেঘের পানে তাকিয়ে আছেন; দেখেন বাঁধিপোতার গামছা পরা, উত্তমার্ধ অনাবৃত, বক্ষে ভাল্লুকের মত লোম, মাথা-জোড়া-টাক—ঘনকৃষ্ণ ছ্যাবড়া ছ্যাবড়া রঙ, সাতদিন খেউরি হয়ে নি বলে মুখটি কদমফুল,—হাতলভাঙা পেয়ালায় করে চা খাচ্ছে আর বিড়ি ফুঁকছে!

আমি রীতিমত নোটিশ দিয়ে লেখা বন্ধ করেছি। গত বৎসর মে মাসে আমি 'দেশ' পত্রিকা মারফৎ সেটা জানিয়ে দিয়েছিলুম। কেউ কেউ আপত্তি জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন—তাঁদের স্নেহ পেয়ে ধন্য হয়েছি। তারপরও দু-একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। দাদন শোধের জন্য।

আর কখনো লিখব না, একথা বলছি নে। চাকরি গেলেই লিখব। খেতে পরতে তো হবে।

উইট্‌নি বললে, 'ডান দিকে—ঠিক কোথায় জানি নে—বেশ বড় একটা দ্বীপ রয়েছে। সে একটা রহস্য—'

রেন্‌সফর্ড শুধালে, 'নাম কি দ্বীপটার ?'

'পুরানো দিনের ম্যাপে নাম রয়েছে "জাহাজ-ফাঁদ দ্বীপ"। নামটার থেকেই অর্থ কিছুটা আমেজ করা যায়, নয় কি ? মাঝি-মাল্লাদের ভিতর দ্বীপটার প্রতি কেমন যেন একটা অদ্ভুত ভয়। কি জানি কেন। কিছু একটা কুসংস্কার বোধ হয়—'

ইয়ট জাতের ছোট্ট জাহাজখানির চতুর্দিকে গরম দেশের গাঢ়, ভেজা ভেজা অন্ধকার যেন চেপে ধরেছে। তারই ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চালাবার নিষ্ফল চেষ্টা করে রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'ওটাকে দেখতে পাচ্ছি নে তো।'

উইট্‌নি হেসে বললেন, 'তোমার দৃষ্টিশক্তি খুবই প্রখর সে আমি জানি। চারশ গজ দূর থেকে মূস-মোষের মত শিকারকে ঝোপের ভিতর দেখে ফেলতে আমি তোমাকে দেখেছি কিন্তু ক্যারেবিয়ান সমুদ্রের অন্ধকার রাত্রে চার পাঁচ মাইল দূর পর্যন্ত দেখা তোমারও কর্ম নয়।'

রেন্‌স্‌ফর্ড সম্মতি জানিয়ে বললে, 'চার গজও না। আখ্‌—অন্ধকারটা যেন কালো মখমল।'

উইট্‌নি যেন আশ্বাস দিয়ে বললে, 'রিয়ো পৌঁছলে বিস্তর আলোর মেলা পাবে, ভয় কি! কয়েক দিনের ভিতরেই সেখানে পৌঁছে যাচ্ছি। জাগুয়ায় শিকারের বন্দুকগুলো পর্দোর কাছ থেকে পৌঁছে গেলেই হয়। আমাজন অঞ্চলে উত্তম শিকার পাবো বলে আশা করছি। শিকারের মত আর কোনো খেলই হয় না।'

'পৃথিবীর সব চেয়ে সেরা খেল।' সম্মতি জানালে রেন্‌স্‌ফর্ড।

কিঞ্চিৎ সংশোধন করে উইট্‌নি বললে, 'শিকারীর পক্ষে—জাগুয়ারের পক্ষে নয়।'

'আবোল-তাবোল বকো না, উইট্‌নি। তুমি বড় বড় জানোয়ারের শিকারী—তুমি দার্শনিক নও। জাগুয়ার কি অনুভব করে, না করে—তাতে কার কি যায় আসে ?'

'হয়তো জাগুয়ারের যায় আসে '

'ছোঃ! তারা আবার ভাবতে পারে নাকি ?'

'তা সে যাই হোক, আমার কিন্তু মনে হয়, তারা অন্তত একটা জিনিস বোঝে—ভয়। যন্ত্রণার ভয় আর মৃত্যুভয়।'

'গাঁজা!'—হেসে উঠলো রেন্‌স্‌ফর্ড। 'গরমে তোমার মগজ গলে যাচ্ছে—বুঝলে উইট্‌নি? বাস্তববাদী হতে শেখো। পৃথিবীতে দুটি শ্রেণী আছে। শিকারী আর শিকার। কপাল ভালো যে তুমি আমি শিকারী। আচ্ছা, আমরা কি ঐ দ্বীপটা পেরিয়ে এসেছি?'

'অন্ধকারে বলতে পারবো না। আশা তো করছি তা-ই।'

'কেন?'

'জায়গাটার নাম আছে—বদনাম।'

'নরখাদক আছে ওখানে?'

'তার সম্ভাবনা অল্পই। এমন লক্ষ্মীছাড়া জায়গাতে ওরাও থাকতে যাবে না। কিন্তু বদনামটা খালাসী-মাঝিদের মধ্যে যে করেই হোক রটে গেছে। লক্ষ্য করোনি আজ ওরা কি রকম যেন এক অজানা আতঙ্কে সন্ত্রস্ত ছিল?'

'তোমার বলাতে এখন মনে হচ্ছে, কেমন যেন তাদের ধরনধারণ আজ অন্য রকমের ছিল। কাপ্তান নীলসেন পর্যন্ত—'

'হ্যাঁ, এমন কি ঐ যে তাগড়া কলিজার বুড়ো সুইড্‌ নীলসেন—খুদ শয়তানের কাছে গিয়ে যে নির্ভয়ে দেশলাইটি চাইতে পারে, মাছের মত অসাড় তার নীল চোখেও আজ এমন ভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করলুম যেটা পূর্বে কখনো দেখিনি। যেটুকু বললে তার মোদ্দা, "খালাসী-লস্করদের ভিতর এ জায়গাটার ভারী দুর্নাম"। তার পর অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে আমাকে শুধোলে "কেন, আপনি কিছু টের পাচ্ছেন না?" যেন আমাদের চতুর্দিকের আকাশ-বাতাস বিষে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। দেখো, ঐ নিয়ে কিন্তু হেসে উঠো না, যদি বলি আমারও সর্বাঙ্গ যেন হঠাৎ হিম হয়ে গেল। ঐ সময়ে কোনো বাতাস বইছিল না। ফলে সমুদ্র জানলার শাসির মত পালিশ দেখাচ্ছিল। আমরা তখন ঐ দ্বীপটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। আমার মনে হচ্ছিল আমার বুকটা যেন শীতে জমে হিম হয়ে যাচ্ছিল—হঠাৎ যেন এক অজানা ত্রাসে।'

রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'নির্ভেজাল আকাশ-কুসুম! একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন নাবিক সমস্ত জাহাজের নাবিকদের মাঝে ভয় ছড়িয়ে দিতে পারে।'

'তাই হয়তো হবে। কিন্তু জানো, আমার মনে হয়, নাবিকদের যেন একটা আলাদা ইন্দ্রিয় আছে যেটা বিপদ ঘনিয়ে এলে তাদের জানিয়ে দেয়। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, অমঙ্গল যেন একটা বাস্তব পদার্থ—ধ্বনি বা আলোর থেকে

যে রকম তরঙ্গ বেরোয়, অমঙ্গলের শরীর থেকেও ঠিক তেমনি। সে ভাষায় বলতে গেলে বলবো, অমঙ্গলের পাপভূমি যেন বেতারে অমঙ্গল ছড়ায়। তা সে যা-ই হোক, এ এলাকাটা ছাড়িয়ে যেতে পারছি বলে আমি খুশী। যাক্ গে, আমি এখন শুতে চললুম, রেন্‌স্‌ফর্ড।'

রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'আমার এখনো ঘুম পায়নি। পিছনের ডেকে বসে আমি আরেকটা পাইপ টেনে নিই।'

'তা হলে গুড নাইট্, রেন্‌স্‌ফর্ড। কাল ব্রেকফাস্টে দেখা হবে।'

'ঠিক আছে! গুড নাইট্, উইট্‌নি।'

রাত্রি নিস্তব্ধ নীরব। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে যে ইঞ্জিন ইয়টটিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল শুধু তারই চাপা শব্দ শোনা যাচ্ছিল আর তার সঙ্গে প্রপেলারের মার খেয়ে জলের শব্দ!

ডেক্-চেয়ারে হেলান দিয়ে অলসরভসে রেন্‌স্‌ফর্ড তার শখের ব্রায়ার পাইপে টান দিচ্ছিল। রাত্রি যেন ঘুমের ঢুলুঢুলু ভাব তার শরীরে আবেশ লাগাচ্ছিল। আপন মনে চিন্তা করলে, 'রাতটা এমনই অন্ধকার যে মনে হয় চোখের পাতা বন্ধ না করেই ঘুমুতে পারবো; রাতটিই হবে আমার চোখের পাতা—'

হঠাৎ একটা আওয়াজ এসে তাকে চমকে দিল। ডান দিক থেকে শব্দটা এসেছিল। এসব ব্যাপারে সে সজাগ, সব কিছু ঠিক ঠিক জানে। তার কান ভুল করতে পারে না। আবার সে সেই শব্দটা শুনতে পেল, তার পর আবার। ঐ দূরের অন্ধকারে কে যেন তিনবার গুলি ছুঁড়েছে।

কি রহস্য বুঝতে না পেরে রেন্‌স্‌ফর্ড লাফ দিয়ে উঠে ঝটিতি রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল। যেদিক থেকে শব্দটা এসেছে সেই দিকে যেন চোখ ঠেলে দিল; কিন্তু এ যেন কম্বলের ভিতর দিয়ে দেখবার নিষ্ফল প্রচেষ্টা। আরেকটু উঁচু থেকে দেখবার জন্য সে রেলিঙের একটা রডে লাফ দিয়ে উঠে তার উপর দাঁড়ালো। তারই ফলে একটা দড়িতে লেগে তার পাইপটা মুখ থেকে ঠিকরে পড়ে যেতে সেটাকে ধরবার জন্য সে ঝটিতি সামনের দিকে ঝুঁকতেই তার গলা থেকে কর্কশ আর্তনাদ বেরুলো—কারণ সে তখন বুঝে গিয়েছে যে বড্ড বেশী এগিয়ে যাওয়ার ফলে সে ব্যালান্স হারিয়ে ফেলেছে। তার সে আর্তনাদ টুঁটি চেপে ধরে বন্ধ করে দিলে ক্যারেবিয়ান সমুদ্রের কুসুম কুসুম গরম জল। তার মাথা পর্যন্ত তখন সে-জলে ডুবে গিয়েছে।

যেন ধস্তাধস্তি করে সে জলের উপরে উঠে চিৎকার দেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু ইয়টের দ্রুতগতির মারে ছুটে আসা জল যেন কষালে তার গালে চড় আর নোনা

জল তার খোলা মুখের ভিতরে ঢুকে যেন তার টুঁটি চেপে ধরে বন্ধ করে দিল। দু বাহু বাড়িয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে সে মরীয়া হয়ে ক্রমশ অদৃশ্যমান ইয়টের দিকে সাঁতার কাটতে লাগলো, কিন্তু পঞ্চাশ ফুট চলার পূর্বেই সে আর সে-চেষ্টা দিল না। ততক্ষণে তার মাথা কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে ; জীবনে এই তার সর্ব-প্রথম কঠিন সঙ্কট নয়। জাহাজের কেউ তার চিৎকার শুনতে পাবে সে সম্ভাবনা অবশ্য একটুখানি ছিল, কিন্তু সে সম্ভাবনা ক্ষীণ এবং ইয়ট যতই দ্রুতগতিতে এগুতে লাগলো সে-সম্ভাবনা ততই ক্ষীণতর হতে লাগলো। যেন পালোয়ানের মত শক্তি প্রয়োগ করে সে নিজেকে তার জামাকাপড় থেকে মুক্ত করে সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করতে লাগলো। কিন্তু ইয়টের আলো ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগলো, যেন দূরের ক্রমশ অদৃশ্যমান জোনাকি পোকা। সর্বশেষে ইয়টের আলোকগুলোকে অন্ধকার যেন শুষে নিল।

ইয়টের ডেকে বসে রেন্‌স্‌ফর্ড যে গুলি ছোঁড়ার শব্দ শুনতে পেয়েছিল সেগুলো তার স্মরণে এল। সেগুলো এসেছিল ডান দিক থেকে। চরম অধ্যবসায়ের সঙ্গে সে সেদিকে সাঁতার কাটতে লাগলো—ধীরে ধীরে শরীরের শক্তি বাঁচিয়ে সে ভেবেচিন্তে হাত দুখানা ব্যবহার করছিল। ক'বার সে হাত ছুঁড়ছে সেটা সে গুনতে আরম্ভ করলো : সম্ভবত সে আরো শ খানেক বার হাত ফেলতে টানতে পারবে, এমন সময়—

রেন্‌স্‌ফর্ড একটা শব্দ শুনতে পেল। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে উচ্চকণ্ঠে পরিত্রাহি চিৎকারের শব্দ। কঠোরতম যন্ত্রণা ও ভীতির চিৎকার।

কোন্ প্রাণী এ আর্তরব ছাড়লো সে সেটাকে চিনতে পারলো না—চেষ্টাও করলো না। নবোদ্যমে সে সেই চিৎকারের দিকে সাঁতার কেটে এগুতে লাগলো। সেটা সে আবার শুনতে পেল। এবারে সেটা অন্য একটা ছোট্ট, হঠাৎ বেজে-ওঠা শব্দে অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

সাঁতার কাটতে কাটতে মৃদুকণ্ঠে রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'পিস্তলের শব্দ।'

আরো দশ মিনিট অধ্যবসায়ের সঙ্গে সাঁতার কাটার পর রেন্‌স্‌ফর্ডের কানে আরেকটা ধ্বনি এল—জীবনে সে এরকম মধুর ধ্বনি আর কখনো শোনেনি—পাহাড়ী বেলাভূমির উপর ঢেউয়ের আছড়ে পড়ার মূর্ছনা এবং গুমরানো। পাড়ের পাথরগুলো দেখার পূর্বেই প্রায় সে সেখানে পৌঁছে গিয়েছে ; রাত্রি অতখানি শান্ত না হলে ঢেউগুলো তাকে আছাড় মেরে টুকরো টুকরো করে দিত। অবশিষ্ট শক্তিটুকু দিয়ে সে কোনো গতিকে ঢেউয়ের দ' থেকে নিজেকে টেনে তুললো। এবড়ো-খেবড়ো পাথরের পাড় বেরিয়ে এসেছে নিরেট অন্ধকার

থেকে। দুহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে সে উপরের দিকে চড়তে আরম্ভ করলো। হাত তার ছড়ে গিয়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতে সে উপরের সমভূমিতে এসে পৌছল। গভীর জঙ্গল সেই পাথুরে পাড়ের শেষ সীমা অবধি পৌছেছে। এই জঙ্গল আর ঝোপঝাড়ের ভিতর তার জন্য অন্য কোনো বিপদ আছে কি না, সে চিন্তা রেন্‌স্‌ফর্ডের মনে অন্তত তখন উদয় হল না। তার মনে তখন শুধু ঐটুকু যে, সে তার শত্রু সমুদ্রের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে আর তার সর্বাঙ্গে অসীম ক্লান্তি। জঙ্গলের প্রান্তে সে প্রায় আছাড় খেয়ে পড়ে তার জীবনের গভীরতম নিদ্রায় ডুবে গেল।

যখন তার ঘুম ভাঙলো তখন সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখে অপরাহ্ণ শেষ হয় হয়। নিদ্রা তাকে নবীন জীবন রস দিয়েছে আর তীক্ষ্ণ ক্ষুধায় পেট কামড়াতে আরম্ভ করেছে। প্রায় আনন্দের সঙ্গেই সে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলো।

রেন্‌স্‌ফর্ড চিন্তা করলো, 'যেখানে পিস্তলের শব্দ হয় সেখানে মানুষ আছে। আর যেখানে মানুষ আছে সেখানে খাদ্যও আছে।' কিন্তু প্রশ্ন, কি রকমের মানুষ এরকম ভীষণ জায়গায় থাকে—এ চিন্তাও তার মনে উদয় হল। কারণ চোখের সামনেই একটানা আঁকাবাঁকা শাখা, এবড়ো খেবড়ো জড়ানো গুল্মলতা—একেবারে পাড় পর্যন্ত।

ঠাসবুনোটের লতাপাতা আর গাছের ভিতর দিয়ে সে সামান্যতম পায়ে চলার চিহ্ন বা পথও সে দেখতে পেল না। তার চেয়ে একেবারে পাড়ের উপর দিয়ে সমুদ্রের কাছে কাছে এগিয়ে যাওয়াই সহজ। হোঁচট খেয়ে খেয়ে সে এগুতে লাগলো। যেখানে সে প্রথম পাড়ে নেমেছিল তার অদূরেই সে দাঁড়ালো।

নিচের ঝোপে কোনো আহত প্রাণী—চিহ্ন থেকে মনে হল বড় আকারেরই—আছাড়ি-বিছাড়ি খেয়েছে। জঙ্গলের লতাপাতা ছিঁড়ে গিয়েছে আর শ্যাওলা থেঁতলে গিয়েছে। একটা জায়গা রক্তরাঙা। একটু দূরেই কি একটা চকচকে জিনিস তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তুলে দেখলে কার্তুজের খোল।

রেন্‌স্‌ফর্ড আপন মনে বললে, বাইশ নম্বরের। কি রকম অদ্ভুত ঠেকছে। আর ঐ শিকারটা বেশ বড় ছিল বলেই তো মনে হচ্ছে। খুবই ঠাণ্ডা মাথার শিকারী ছিল বলতে হবে যে তার সঙ্গে ঐ ছোট্ট হাতিয়ার নিয়ে মোকাবেলা করলো। আর এটাও তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে জন্তুটা বেশ লড়াইও দিয়েছিল। মনে হচ্ছে, প্রথম যে তিনটে শব্দ শুনতে পেয়েছিলুম তখন শিকারী তাকে দেখতে পেয়ে তিনটে গুলি ছুঁড়ে তাকে জখম করেছিল। তার পর তার পালিয়ে যাবার চিহ্ন ধরে ধরে এখানে এসে তাকে খতম করেছে। শেষ আওয়াজ

যেটা শুনতে পেয়েছিলুম সেটা সে-ই।

রেন্‌স্‌ফর্ড জমিটা খুব ভাল করে পরীক্ষা করে যা দেখতে পাবার আশা করেছিল তাই পেল—শিকারীর জুতোর চিহ্ন। সে যেদিকে এগিয়ে যাচ্ছিল জুতোর চিহ্ন সেই দিকেই গিয়েছে। উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় সে এগিয়ে চললো। কখনো বা পচা গাছের গুঁড়ি বা আধখসা পাথরে সে পিছলে যাচ্ছিল, কিন্তু অগ্রসর হচ্ছিল ঠিকই। দ্বীপের উপর তখন রাত্রির অন্ধকার আস্তে আস্তে নেমে আসছে।

রেন্‌স্‌ফর্ড যখন প্রথম আলোকগুলো দেখতে পেল তখন ঠাণ্ডা অন্ধকার সমুদ্র আর জঙ্গলটাকে কালোয় কালোময় করে দিচ্ছিল। বেলাভূমির একটা বেঁকে-যাওয়া জায়গায় মোড় নিতে সে সেগুলো দেখতে পেল এবং প্রথমটায় তার মনে হয়েছিল সে কোনো গ্রামের কাছে এসেছে—কারণ আলো দেখতে পেয়েছিল অনেকগুলো। কিন্তু ধাক্কা দিতে দিতে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখে বিস্মিত হল যে সব কটা আলো আসছে একই বিরাট বাড়ি থেকে—প্রকাণ্ড উঁচু বাড়ি, তার ছুঁচলো মিনারের মত টাওয়ার উপরের অন্ধকারের দিকে ঠেলে ধরেছে। বিরাট দুর্গের মত রাজপ্রাসাদের (শাটোর) আকার প্রচ্ছায়া তার চোখে ধরা পড়ল এবং দেখল শাটোটি একটি উঁচু জায়গার উপর নির্মিত। তার তিন দিকে খাড়া পাহাড়ের পাঁচিল সমুদ্র পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। সেখানে কালো ছায়াতে ক্ষুধার্ত সমুদ্র যেন দেওয়ালগুলো ঠোঁট দিয়ে চাটছে।

'মরীচিকাই হবে'—ভাবলে রেন্‌স্‌ফর্ড। কিন্তু যখন সে বাড়িটার ফলকওলা গেটটা খুললো তখন বুঝলো যে সেটা মোটেই মরীচিকা নয়। পাথরের সিঁড়িগুলোও যথেষ্ট বাস্তব; পুরু ভারী পাল্লার দরজাও যথেষ্ট বাস্তব—তার গায়ে রয়েছে দৈত্যমুখাকৃতি কড়া—কিন্তু তবু কেমন যেন সমস্ত জায়গাটার চতুর্দিকে অবাস্তবতার বাতাবরণ।

দরজার কড়া উপরের দিকে তুলে ঘা মারতে গেলে সেটা চড় চড় করলো; রেন্‌স্‌ফর্ডের মনে হল ওটা যেন কখনো ব্যবহার করা হয়নি। কড়াটা ছেড়ে দিতেই সেটা এমনই সুগুরুগম্ভীর নিনাদ ছাড়লো যে রেন্‌স্‌ফর্ড নিজেই চমকে উঠলো। তার মনে হল ভিতরে যেন কার পায়ের শব্দ শুনতে পেল—দরজা কিন্তু খুললো না। সে তখন আবার কড়া তুলে ছেড়ে দিল। তখন এমনই হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল যে তার মনে হল যে দরজাটা যেন স্প্রিং দিয়ে তৈরী। ঘরের ভিতর থেকে সোনালী অত্যুজ্জ্বল আলোর বন্যাধারা তার চোখ যেন ধাঁধিয়ে দিল। তার ভিতর দিয়ে রেন্‌স্‌ফর্ড সর্বপ্রথম যা দেখতে পেল সেটা তার

জীবনের এ পর্যন্ত দেখার মধ্যে সর্ববৃহৎ মনুষ্য কলেবর—বিরাট দৈত্যের মত আকার-প্রকার, নিরেট দড় মালে তৈরী, আর কোমর অবধি নেমে এসেছে কালো দাড়ি। তার হাতে লম্বা নালওলা রিভলভার আর সেটা সে নিশান করেছে সোজা রেন্‌স্‌ফর্ডের বুকের দিকে।

সেই দাড়ির জঙ্গলের ভিতর থেকে দুটি ছোট্ট চোখ রেন্‌স্‌ফর্ডের দিকে তাকিয়ে আছে।

'ভয় পেয়ো না'—বলে রেন্‌স্‌ফর্ড স্মিত হাস্য করলে; তার মনে আশা ছিল যে ঐ স্মিতহাস্য লোকটার মনের সন্দেহ দূর করে দেবে। 'আমি ডাকাত নই। একটা ইয়ট থেকে সমুদ্রে পড়ে গিয়েছিলুম, আমার নাম সেঙ্গার রেন্‌স্‌ফর্ড—নিউ ইয়র্কের।'

কিন্তু লোকটার ভীতি-উৎপাদক দৃষ্টির কোনো পরিবর্তন হল না। রিভলভারটা নড়ন-চড়ন না করে ঠিক তেমনি তার বুকের দিকে নিশান করে রইল, যেন দৈত্যটা পাথরে তৈরী। রেন্‌স্‌ফর্ডের কথাগুলো যে সে বুঝতে পেরেছে তারও কোনো চিহ্ন দেখা গেল না—এমন কি সে আদপেই শুনতে পেয়েছে কি না তা-ই বোঝা গেল না। লোকটার পরনে কালো উর্দি—তার শেষ প্রান্তে বাদামী রঙের আস্ত্রাখান লোমের ঝালর।

রেন্‌স্‌ফর্ড আবার শুরু করলে, 'আমি নিউ ইয়র্কের সেঙ্গার রেন্‌স্‌ফর্ড। আমি একটা ইয়ট থেকে পড়ে গিয়েছিলুম। আমার ক্ষিধে পেয়েছে।'

লোকটা উত্তরে শুধু বুড়ো আঙুল দিয়ে রিভলভারের ঘোড়াটা তুললো। তার পর রেন্‌স্‌ফর্ড দেখলো যে, লোকটার খালি হাতখানা মিলিটারি সেলাম দেবার কায়দায় কপাল ছুঁলো, এক জুতো দিয়ে অন্য জুতো ক্লিক করে এটেনশনে দাঁড়ালো। আরেক জন লোক চওড়া মার্বেলের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিলেন। ইভনিং ড্রেস পরা একদম খাড়া, পাতলা ধরনের লোক।

'বিখ্যাত শিকারী সেঙ্গার রেন্‌স্‌ফর্ডকে আমার বাড়িতে শুভাগমন জানাতে পেরে আমি আনন্দ ও গর্ব অনুভব করছি।' চোস্ত খানদানী গলায় লোকটি কথাগুলি বললেন। তাতে বিদেশী উচ্চারণের সামান্য আমেজ ছিল বলে কথাগুলো যেন আরো সুস্পষ্ট, সুচিন্তিত বলে মনে হল।

আপনা-আপনি যেন রেন্‌স্‌ফর্ড তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলে।

লোকটি বুঝিয়ে বললেন, 'তিব্বতে বরফের চিতে বাঘ শিকার সম্বন্ধে আমি আপনার বই পড়েছি, বুঝলেন তো। আমার নাম জেনারেল জারফ।'

রেন্‌স্‌ফর্ডের প্রথম ধারণাই হল যে লোকটি অসাধারণ সুপুরুষ। দ্বিতীয়

হল যে জেনারেলের চেহারায় যেন এক অপূর্ব অনন্যতা, প্রায় বলা যেতে পারে বিচিত্র ধরন রয়েছে। লোকটি প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে গেছেন, কারণ তাঁর চুল ধবধবে সাদা কিন্তু তাঁর ঘন ভুরু, আর মিলিটারি কায়দায় উপরের দিকে তোল ছুঁচলো গোঁফ মিশমিশে কালো—যেন ঠিক সেই অন্ধকারের কালো যার ভিতর থেকে রেন্‌স্‌ফড এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে। তাঁর চোখ দুটোও মিশমিশে কালো আর অত্যন্ত উজ্জ্বল। গালের হাড় দুটো তাঁর উঁচু, নাকটি টিকল আর মুখ শীর্ণ ধরনের ঈষৎ বাদামী,—এ ধরনের চেহারা হুকুম দিতে অভ্যস্ত—খানদানী লোকের চেহারা। জেনারেল সেই উর্দি-পরা দৈত্যটার দিকে তাকিয়ে ইশারা করাতে সে তার পিস্তল নামিয়ে নিয়ে তাঁকে সেলুট করে চলে গেল।

জেনারেল বললেন, 'ইভানের গায়ে অসুরের মত অবিশ্বাস্য শক্তি, কিন্তু বেচারীর কপাল মন্দ—সে বোবা আর কালা। সরল প্রকৃতির লোক, কিন্তু সত্যি বলতে কি তার জাতের আর পাঁচ জনের মত একটুখানি বর্বর।'

'লোকটা কি রাশান?'

জেনারেল স্মিত হাস্য করাতে তাঁর লাল ঠোঁট আর ছুঁচলো দাঁত দেখা দিল। বললেন, 'কসাক। আমিও।' তার পর বললেন, 'চলুন, এখানে আর কথাবার্তা নয়। আমরা পরে সেটা করতে পারবো। আপনার এখন প্রয়োজন জামাকাপড়, আহারাদি এবং বিশ্রাম। সব পেয়ে যাবেন। এ জায়গাটি পরিপূর্ণ শান্তিময়।'

ইভান আবার দেখা দিল। জেনারেল তাঁর সঙ্গে কথা কইলেন, সুদ্ধমাত্র ঠোঁট নেড়ে, কোন শব্দ উচ্চারণ না করে।

জেনারেল বললেন, 'আপনি দয়া করে ইভানের সঙ্গে যান। আপনি যখন এলেন তখন আমি সবে মাত্র ডিনারে বসেছিলুম। এখন আপনার জন্য অপেক্ষা করবো। আমার জামাকাপড় আপনার গায়ে ফিট করবে মনে হচ্ছে।'

বরগাওলা বিরাট এক বেডরুম, টোপরওলা যে বিছানা তাতে ছ'জন লোক শুতে পারে—সেখানে গিয়ে পৌঁছল রেন্‌স্‌ফর্ড নীরব দৈত্যের পিছনে পিছনে। ইভান একটি ইভনিং ড্রেস বের করে দিলে। পরার সময় রেন্‌স্‌ফর্ড লক্ষ্য করলো স্যুটে লণ্ডনের যে দর্জির নাম সেলাই করা রয়েছে তারা সাধারণত ডিউকের নিচের পদবীর কারো জন্য স্যুট সেলাই করে না।

যে ডাইনিং রুমে ইভান তাকে নিয়ে গেল সেটাও বহু দিক দিয়ে লক্ষণীয়। ঘরটায় যেন ছিল মধ্যযুগীয় আড়ম্বর। দেয়ালে ওক কাঠের আস্তর, উঁচু ছাদ, বিরাট খাবার টেবিলে দু'কুড়ি লোক খেতে পারে—এসব সামন্তযুগের কোনো

ব্যারনের হল্‌ঘরের মত দেখাচ্ছিল। দেয়ালে লাগানো ছিল নানা প্রকারের পশুর মাথা—সিংহ, বাঘ, হাতী, ভালুক। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর এবং বৃহৎ নমুনা রেন্‌স্‌ফর্ড ইতিপূর্বে আর কখনো দেখেনি। সেই বিরাট টেবিলে জেনারেল একা বসে।

জেনারেল যেন প্রস্তাব করলেন, 'একটা ককটেল খাবেন তো, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড?' ককটেলটি আশ্চর্য রকমের ভালো এবং রেন্‌স্‌ফর্ড আরো লক্ষ্য করলো যে টেবিলের সাজসরঞ্জামও সর্বোত্তম পর্যায়ের—টেবিলক্লথ, ন্যাপকিন, স্ফটিকের পাত্রাদি, রূপো এবং চীনেমাটির বাসনকোসন—সব কিছুই।

তাঁরা ঘন মশলাওলা সরে মাখানো বর্শ্‌ সুপ খাচ্ছিলেন। এ সুপটি রাশান-দের বড় প্রিয়। যেন আধো মাফ চাওয়ার ভঙ্গীতে জেনারেল জারফ বললেন, 'সভ্যতা যে-সব সুখ-সুবিধা দেয় আমরা এখানে সেগুলো রক্ষা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা দি। ত্রুটিবিচ্যুতি হলে মাফ করবেন। জনগণের গমনাগমনের বাঁধা রাস্তা থেকে আমরা যথেষ্ট দূরে—বুঝলেন তো? আপনার কি মনে হয় অনেক দূরের সমুদ্রপথ পেরিয়ে এসেছে বলে শ্যাম্পেনের স্বাদ খারাপ হয়ে গিয়েছে?'

রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'একদম না।' তার মনে হল জেনারেলটি অতিশয় অমায়িক ও যত্নশীল অতিথিসেবক—সত্যিকার বিশ্বনাগরিক। শুধু জেনারেলের একটি ক্ষুদ্র বৈশিষ্ট্য রেন্‌স্‌ফর্ডের মনে অস্বস্তির সঞ্চার করছিল। যখনই প্লেট থেকে মুখ তুলে সে তাঁর দিকে তাকিয়েছে তখনই দেখেছে তিনি যেন তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন, সূক্ষ্মতম ভাবে যাচাই করে নিচ্ছেন।

জেনারেল জারফ বললেন, 'আপনি হয়তো আশ্চর্য হয়েছেন আমি আপনার নাম চিনলুম কি করে। বুঝেছেন কিনা, ইংরিজি, ফরাসী এবং জর্মন ভাষায় যেসব শিকারের বই বেরোয় আমি তার সব কটাই পড়ি। আমার জীবনের ব্যসন মাত্র একটি, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড—শিকার।'

সুপক্ক ফিলে মিগ্নো খেতে খেতে রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'আপনার শিকারের মাথাগুলো চমৎকার। ঐ যে কেপ মহিষের মাথা—এত বড় মাথা আমি কখনো দেখিনি।'

'ও। ঐ ব্যাটা! পুরোদস্তুর দানব ছিল সে।'

'আপনার দিকে তেড়ে এসেছিল নাকি?'

'একটা গাছের উপর আমাকে ছুঁড়ে ফেলেছিল। আমার খুলিতে ফ্র্যাক্‌চার হয়। শেষ পর্যন্ত কিন্তু আমি ব্যাটাকে ঘায়েল করি।'

রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'আমার সব সময়ই মনে হয়েছে যে বড় শিকারের ভিতর কেপের মোষই সব চেয়ে বিপজ্জনক শিকার।'

এক লহমার তরে জেনারেল কোন উত্তর দিলেন না—তাঁর লাল ঠোঁট দিয়ে তিনি সেই বিচিত্র স্মিত হাস্য হেসে যেতে লাগলেন। তার পর ধীরে ধীরে বললেন, 'না, আপনি ভুল করেছেন, স্যর! কেপ মহিষ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক শিকার নয়।' তিনি মদের গেলাসে একটি ছোট্ট চুমুক দিলেন, 'এই দ্বীপে আমার খাস মৃগয়া ভূমিতে আমি তার চেয়েও বিপজ্জনক শিকার করে থাকি।'

রেন্‌স্‌ফর্ড বিস্ময় প্রকাশ করে শুধোলে, 'এই দ্বীপে বড় শিকার আছে নাকি?'

জেনারেল মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, 'সব চেয়ে বড়।'

'সত্যি?'

'ও! প্রকৃতিদত্ত নয়—নিশ্চয়ই। আমাকে স্টক্ করতে হয়।'

'আপনি কি আমদানি করেছেন, জেনারেল? বাঘ?'

জেনারেল স্মিত হাস্য করে বললেন, 'না। বাঘ শিকারে আমার আর কোনো চিত্তাকর্ষণ নেই—কয়েক বছর হয়ে গেল বাঘের মুরোদ কতখানি তার শেষ পর্যন্ত আমার দেখা হয়ে গিয়েছে। বাঘ আর আমাকে উত্তেজনা দিতে পারে না—কোনো সত্যকার বিপদে ফেলতে পারে না। আমি জীবন ধারণ করি বিপদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড।'

জেনারেল তাঁর পকেট থেকে একটি সোনার সিগারেট-কেস বের করে তার অতিথিকে রুপালি টিপওলা একটি লম্বা কালো সিগারেট দিলেন; সুগন্ধি সিগারেট, —ধূপের মত সৌরভ ছাড়ে।

জেনারেল বললেন, 'আমরা অত্যুত্তম শিকার করবো—আপনাতে আমাতে। আপনার সঙ্গ পেলে আমি বড়ই আনন্দ লাভ করবো।'

'কিন্তু কি ধরনের শিকার—'

'বলছি আপনাকে। আপনার খুব মজা লাগবে—আমি জানি। সবিনয়ে বলছি, আমি একটি নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি করেছি। আপনাকে আরেক গেলাস পোর্টওয়াইন দেব কি?'

'ধন্যবাদ, জেনারেল।'

জেনারেল দুটি গেলাস পূর্ণ করে বললেন, 'ভগবান কোনো কোনো লোককে কবি বানান। কাউকে তিনি রাজা বানান, কাউকে ভিখিরি। আমাকে তিনি

বানিয়েছেন শিকারী। আমার পিতা বলতেন, আমার হাতখানি বন্দুকের ঘোড়ার জন্য নির্মিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন খুবই ধনী ; ক্রিমিয়াতে তাঁর আড়াই লক্ষ একর জমি ছিল এবং শিকারে ছিল তাঁর চরম উৎসাহ। আমার বয়স যখন মাত্র পাঁচ তখন তিনি আমাকে ছোট্ট একটি বন্দুক দেন—বিশেষ অর্ডার দিয়ে সেটি মস্কোতে তৈরী করা হয়েছিল—চড়ুই শিকার করার জন্যে। আমি যখন ঐটে দিয়ে তাঁর কতকগুলো জাত টাকি মুর্গী মেরে ফেলি তিনি তখন আমাকে কোনো সাজা দেননি ; আমার তাগের তিনি প্রশংসা করলেন। দশ বছর বয়সে ককেসাসে আমি আমার প্রথম ভালুক মারি। আমার সমস্ত জীবন একটানা একটা শিকার। আমি ফৌজে যোগ দি—খানদানী ঘরের ছেলে মাত্রের কাছ থেকেই সে যুগে এই প্রত্যাশা করা হত—এবং কিছুকালের জন্য আমি একটা ঘোড়-সওয়ার কসাক ডিভিশনের কমাণ্ডারও হয়েছিলুম কিন্তু আমার সত্যকার আকর্ষণ সর্বসময়ই ছিল শিকার। সর্বদেশে আমি সর্বপ্রকারের জন্তু শিকার করেছি। আমি ক'টা জন্তু মেরেছি সেটা আপনাকে গুনে বলা আমার পক্ষে অসম্ভব।

'রাশা যখন তছনছ হয়ে গেল তখন আমি দেশ ছাড়লুম। কারণ জারের একজন অফিসারের পক্ষে তখন সেখানে থাকা অবিবেচনার কাজ হত। অনেক খানদানী রাশান সর্বস্ব হারালেন। আমি কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে প্রচুর মার্কিন শেয়ার কিনে রেখেছিলুম। তাই আমাকে কখনো মণ্টেকার্লোতে চায়ের দোকান করতে হবে না; বা প্যারিসে ট্যাক্সি ড্রাইভার হতে হবে না। অবশ্য আমি শিকার চালিয়ে যেতে লাগলুম। আপনাদের রকি অঞ্চলে গ্রিজলি, গঙ্গায় কুমীর, পূর্ব আফ্রিকায় গণ্ডার। আফ্রিকাতেই ঐ কেপ মহিষ আমাকে জখম করে ছ'-মাস শয্যাশায়ী করে রাখে। সেরে ওঠা মাত্রই আমি আমাজনে জাগুয়ার শিকার করতে বেরলুম, কারণ আমি শুনেছিলুম যে তারা অসাধারণ ধূর্ত হয়।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে কসাক বললেন, 'মোটেই না। বুদ্ধি সজাগ রাখলে আর জোরদার রাইফেল থাকলে তারা কোনো শিকারীর সঙ্গেই পাল্লা দিতে পারে না। আমি মর্মান্তিক নিরাশ হলুম। এক রাত্রে আমি তাঁবুতে শুয়ে অসহ্য মাথাব্যথায় কষ্ট পাচ্ছি এমন সময় একটা ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তা আমার মাথায় ঢুকলো। শিকার আমার কাছে একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে। এবং মনে রাখবেন শিকারই ছিল আমার জীবন। শুনেছি, মার্কিন দেশে ব্যবসায়ীরা আপন ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে প্রায়ই যেন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েন, কারণ ঐ ব্যবসায়ই ছিল ওদের জীবন।'

রেনস্‌ফর্ড বললে, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

জেনারেল স্মিতহাস্য করলেন। 'আমার কিন্তু ভেঙে পড়ার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। আমাকে তা হলে কিছু একটা করতে হয়। দেখুন, আমার হল গিয়ে বিশ্লেষণকারী মন, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড। নিঃসন্দেহ সেই কারণেই আমি শিকারের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যায় এত আনন্দ পাই।'

রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'এতে কোনো সন্দেহই নেই, জেনারেল জারফ।'

'তাই আমি নিজেকে শুধালুম, শিকার আমাকে এখন সম্মোহিত করে না কেন? আপনি আমার চেয়ে অনেক ছোট, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড, এবং আমি যতখানি শিকার করেছি আপনি ততখানি করেননি কিন্তু তবু আপনি হয়তো উত্তরটা অনুমান করতে পারবেন।'

'সেটা কি?'

'সোজাসুজি এই; শিকার তখন আমার কাছে আর "হয় হারি নয় জিতি" ধরনের বিষয় নয়। আমি প্রতিবারেই আমার শিকারকে খতম করছি। সব সময়। প্রতি বারেই। সমস্ত ব্যাপারটা তখন আমার কাছে অত্যন্ত সরল হয়ে গিয়েছে। আর পরিপূর্ণতার মত একঘেয়েমি আর কিছুতেই নেই।'

জেনারেল আরেকটা সিগারেট ধরালেন।

'কোনো শিকারেরই আর তখন আমাকে এড়াতে পারবার সৌভাগ্য হত না। আমি দেমাক করছি না। এ যেন একেবারে অঙ্কশাস্ত্রের নিশ্চয়তা। পশুটার কি আছে?—তার পা আর সহজাত প্রবৃত্তি। অন্ধ প্রবৃত্তি তো বুদ্ধির সঙ্গে মোকাবেলা করতে পারে না। এ চিন্তা যখন আমার মনে উদয় হল সে সময়টা আমার পক্ষে বিষাদময়, আপনাকে সত্যি বলছি।'

রেন্‌স্‌ফর্ড টেবিলের উপর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে গোগ্রাসে তাঁর কথা গিলছে।

জেনারেল বলে যেতে লাগলেন, 'আমাকে কি করতে হবে, সেটা যেন একটা অনুপ্রেরণার মত আমার কাছে এল।'

'এবং সেটা কি?'

জেনারেল আত্মপ্রসাদের স্মিত হাস্য করলেন। মানুষ কোনো প্রতিবন্ধকের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সেটাকে অতিক্রম করতে পারলে যে মৃদু হাসি হাসে। বললেন, 'শিকার করার জন্য আমাকে নূতন পশু আবিষ্কার করতে হল।'

'নূতন পশু? আপনি ঠাট্টা করছেন।'

জেনারেল বললেন, 'মোটেই না। আমি শিকারের ব্যাপার নিয়ে কখনো মস্করা করি নে। আমার প্রয়োজন ছিল একটা নূতন পশুর। পেলুমও একটা

তাই আমি এই দ্বীপটা কিনলুম, বাড়িটা তৈরী করলুম এবং এখানে আমি আমার শিকার করি। আমার কাজের জন্য এই দ্বীপটি একেবারে সর্বাঙ্গসুন্দর—জঙ্গল আছে, তার ভিতর পায়ে চলা-ফেরার রীতিমত গোলকধাঁধা রয়েছে, পাহাড় আছে, জলাভূমি—'

'কিন্তু সেই পশুটা, জেনারেল জারফ ?'

জেনারেল বললেন, 'ও! এই দ্বীপ আমাকে পৃথিবীর সব চেয়ে উত্তেজনা-দায়ক শিকার করতে দিয়েছে। অন্য যে কোনো শিকারের সঙ্গে এর তুলনা এক লহমার তরেও হয় না। আমি প্রতিদিন শিকার করি এবং একঘেয়েমি আমার কাছেই আসতে পারে না কারণ আমার শিকার এমনই ধরনের যে তার সঙ্গে আমার বুদ্ধির লড়াই চালাতে পারি।'

রেন্‌স্‌ফর্ডের মুখে হতভম্ব ভাব।

'আমি চেয়েছিলুম শিকারের জন্য একটা আদর্শ পশু। তাই আমি নিজেকে শুধালুম, "আদর্শ শিকারের কোন্ কোন্ গুণ থাকে ?" তার উত্তর স্বভাবতই ; "তার সাহস, চাতুর্য, এবং সর্বোপরি সে যেন বিচারশক্তি প্রয়োগ করতে পারে"।'

রেন্‌স্‌ফর্ড আপত্তি জানালে, 'কিন্তু কোনো পশুরই তো বিচারশক্তি নেই।'

জেনারেল বললেন, 'মাই ডিয়ার দোস্ত, একটা পশুর আছে।'

'কিন্তু আপনি তো সত্যই সেটা বলতে—' রেন্‌স্‌ফর্ডের দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

'না কেন ?'

'আমি বিশ্বাস করতে পারি নে যে আপনি যথার্থ কথা বলছেন, জেনারেল জারফ। একটা বীভৎস রসিকতা।'

'আমি যথার্থ কথা বলবো না কেন ? আমি শিকারের কথা বলছি।'

'শিকার ? ভগবান সাক্ষী, আপনি যা বলছেন সে তো খুন !'

জেনারেল পরিপূর্ণ খুশ মেজাজে হেসে উঠলেন। রেন্‌স্‌ফর্ডের দিকে তিনি মজার সঙ্গে তাকালেন। বললেন, 'আমি কিছুতেই বিশ্বাস করবো না যে আপনার মত সভ্য ও আধুনিক যুবা—আপনাকে দেখলে সেই তো মনে হয়—মানুষের প্রাণ সম্বন্ধে রোমান্টিক ধারণা পোষণ করবে। নিশ্চয়ই যুদ্ধে আপনার অভিজ্ঞতা—'

রেন্‌স্‌ফর্ড কঠিন কণ্ঠে বললো, 'নৃশংস খুন ক্ষমা করতে দেয় না।'

উচ্চহাস্যে জেনারেল দুলতে লাগলেন। বললেন, 'কী অসাধারণ মজার মানুষ আপনি ! আজকের দিনে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে—এমন কি আমেরিকাতেও

—এ ধরনের হাবাগোবা সরলবিশ্বাসী—আর যদি অনুমতি দেন তবে বলি—মধ্য ভিক্টোরীয় ধারণার মানুষ পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, তবে কিনা, কোনো সন্দেহ নেই আপনার পূর্বপুরুষ গোঁড়া শুদ্ধাচারী (প্যুরিটান) ছিলেন। কত না আমেরিকাবাসীর পিতৃপুরুষ এই সম্প্রদায়ের। আমি বাজী ধরছি, আমার সঙ্গে শিকারে বেরুলে এসব ধারণা আপনি ভুলে যাবেন। আপনার অদৃষ্টে খাঁটি নূতন রোমাঞ্চকর উত্তেজনা সঞ্চিত রয়েছে।'

'অনেক ধন্যবাদ। আমি শিকারী ; খুনী নই।'

বিচলিত না হয়ে জেনারেল বললেন, 'হায়, আবার সেই অপ্রিয় শব্দ! কিন্তু আমার বিশ্বাস আমি আপনার কাছে প্রমাণ করতে পারবো, আপনার নৈতিক দ্বিধা ভিত্তিহীন।'

'সত্যি?'

'জীবন জিনিসটাই শক্তিমানের জন্য, বেঁচে থাকবে শক্তিমান, এবং প্রয়োজন হলে সে জীবন নিতেও পারে। দুর্বলদের এই পৃথিবীতে রাখা হয়েছে শক্তিমানকে আনন্দ দেবার জন্য। আমি শক্তিমান। আমি আমার বিধিদত্ত উপহার কাজে খাটাবো না কেন? আমি যদি শিকার করতে চাই তবে করবো না কেন? তাই আমি দুনিয়ার যত আবর্জনাকে শিকার করি—রদ্দি জাহাজের খালাসী, মাঝিমাল্লা, কৃষ্ণাঙ্গ, চীনা, শ্বেতাঙ্গ, দুআঁসলা—একটি অবিমিশ্র রক্তের ঘোড়া বা কুকুর এদের কুড়িটার চেয়ে মূল্যবান।'

রেন্‌স্‌ফর্ড গরম হয়ে বললে, 'কিন্তু তারা মানুষ।'

জেনারেল বললেন, 'হুবহু খাঁটি কথা। সেই কারণেই আমি ওদের ব্যবহার করি। আমি তাতে আনন্দ পাই। তারা বিচারশক্তি প্রয়োগ করতে পারে, অবশ্য যার ঘটে যেমন বুদ্ধি সেইটুকু দিয়ে। তাই তারা বিপজ্জনক।'

'কিন্তু শিকারের জন্য মানুষ যোগাড় করেন কি প্রকারে?' রেন্‌স্‌ফর্ড শুধালে।

ক্ষণতরে জেনারেলের বাঁ চোখের পাতাটি নড়ে গিয়ে যেন কটাক্ষ মারলো। উত্তর দিলেন, 'এ দ্বীপের নাম "জাহাজ-ফাঁদ দ্বীপ"। কখনো কখনো ঝঞ্ঝামথিত ক্রুদ্ধ সমুদ্রদেব আমার কাছে ওদের পাঠিয়ে দেন। যখন ভাগ্যদেবী অপ্রসন্না, তখন আমি তাঁকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করি। আমার সঙ্গে জানলার কাছে আসুন।'

রেন্‌স্‌ফর্ড জানলার কাছে এসে বাইরের সমুদ্রের দিকে তাকালো।

জেনারেল বলে উঠলেন, 'লক্ষ্য করুন! ঐ ওখানে বাইরে!' রেন্‌স্‌ফর্ড

শুধু নিশির অন্ধকার দেখতে পেল। তারপর যেই জেনারেল একটি বোতাম টিপলেন অমনি দূর সমুদ্রে একাধিক আলোর ছটা দেখতে পেল।

জেনারেল পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, 'ঐ আলোকগুলোর অর্থ, ওখানে চ্যানেল পথ আছে—যেখানে সে জাতীয় কিছুই নেই। বিরাট বিরাট পাথর তাদের ক্ষুরের মত ধারালো পাশ নিয়ে হাঁ করে ঘাপটি মেরে বসেছে সমুদ্র-দৈত্যের মত। তারা অতি অক্লেশে একখানা জাহাজ গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিতে পারে—এই যে রকম আমি অক্লেশে এই বাদামটা গুঁড়িয়ে দিচ্ছি।' তিনি শক্ত কাঠের মেঝের উপর একটি বাদাম ফেলে দিয়ে জুতোর হিল দিয়ে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিলেন। যেন কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নিতান্ত কথায় কথায় বললেন, 'আমার ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা আছে। আমরা এখানে সভ্য থাকবার চেষ্টা করি।'

'সভ্য? আর আপনি গুলি করে মানুষ খুন করেন?'

জেনারেলের কালো চোখে ক্রোধের সামান্য রেশ দেখা দিল। কিন্তু সেটা এক সেকেণ্ডের তরে। অতি অমায়িক কণ্ঠে বললেন, 'হায় কপাল! কী অদ্ভুত নীতিবাগীশ তরুণই না আপনি। আমি আপনাকে প্রত্যয় দিচ্ছি আপনি যা বলতে চাইছেন আমি সে রকম কিছুই করি না। সেটা হবে বর্বরতা। আমি আমার অতিথিদের চরম খাতির যত্ন করে থাকি। তারা প্রচুর খাদ্য পায়, প্রয়োজনীয় কায়িক পরিশ্রম করে শরীর সুস্থ সবল রাখতে পায়। তাদের স্বাস্থ্য চমৎকার হয়ে ওঠে। কাল আপনি নিজেই দেখতে পাবেন।'

'মানে?'

মুচকি হেসে জেনারেল বললেন, 'কাল আমরা আমার ট্রেনিং স্কুল দেখতে যাবো। ইস্কুলটা মাটির নীচের সেলারে। উপস্থিত সেখানে আমার প্রায় ডজন খানেক ছাত্র আছে। তারা এসেছে হিস্‌পানি বোট "সানলুকার" থেকে—জাহাজখানার দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটা ঐ হোথায় পাথরগুলোর সঙ্গে ধাক্কা খায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সব কটাই অতিশয় নিরেস, বাজে-মার্কা—ডেকের উপর চলা-ফেরাতে যতখানি অভ্যস্ত জঙ্গলে ততখানি নয়।'

তিনি হাত তুলতেই ইভান—সে-ই ওয়েটারের কাজ করছিল—গাঢ় টাকিশ কফি নিয়ে এল। রেন্‌স্‌ফর্ড অতি কষ্টে নিজেকে কথা বলা থেকে ঠেকিয়ে রাখছিল।

ঢাক ঢাক গুড় গুড় না করে খোলাখুলি ভাবে জেনারেল বলে যেতে লাগলেন, 'বুঝতে পারছেন তো এটা হচ্ছে শিকারের ব্যাপার। আমি এদের একজনকে

আমার সঙ্গে শিকারে যেতে প্রস্তাব করি। আমি তাকে যথেষ্ট খাদ্য আর উৎকৃষ্ট একখানা শিকারের ছোরা দিয়ে আমার তিন ঘণ্টা আগে বেরুতে দিই। পরে বেরুই আমি, সবচেয়ে ছোট ক্যালিবারের আর সবচেয়ে কম পাল্লার মাত্র একটি পিস্তল নিয়ে। পুরো তিন দিন যদি সে আমাকে এড়িয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে তবে সে জিতলো। আর আমি যদি তাকে খুঁজে পাই—'জেনারেল মুচকি হেসে বললেন, 'তবে সে হারলো।'

'সে যদি শিকার হতে রাজী না হয়?'

'ও! সেটা বাছাই করা নিশ্চয়ই আমি তার হাতে ছেড়ে দি। সে যদি না খেলতে চায় তবে খেলবে না। সে যদি শিকারে যেতে রাজী না হয় তবে আমি তাকে ইভানের হাতে সমর্পণ করি। ইভান একদা মহামান্য শ্বেত জারের সরকারি চাবুকদারের সম্মানিত চাকরি করেছে। এবং খেলাধুলা, শিকার বাবদে সে আপন নিজস্ব ধারণা পোষণ করে। কোনো ব্যত্যয় হয় না, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড, কোনো ব্যত্যয় হয় না। তারা সব্বাই আমার সঙ্গে শিকার করাটাই পছন্দ করে নেয়।'

'আর যদি তারা জিতে যায়?'

জেনারেলের মৃদু হাস্য আরো বিস্তৃত হল। বললেন, 'আজ পর্যন্ত আমি হারিনি।'

সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি যোগ করলেন, 'আপনি ভাববেন না, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড, আমি দেমাক করছি। বস্তুত এদের বেশীর ভাগই অতিশয় সরল সমস্যা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। মাঝে মাঝে দু-একটা দুঁদে দেখা দেয় বটে। একজন প্রায় জিতে গিয়েছিল। শেষটায় কুকুরগুলোকে ব্যবহার করতে হয়েছিল আমাকে।'

'কুকুর?'

'এদিকে আসুন; আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

জেনারেল রেন্‌স্‌ফর্ডকে একটা জানলার কাছে নিয়ে গেলেন। জানলার আলোগুলো নিচের আঙিনায় আলো-ছায়ার হিজিবিজি প্যাটার্ন তৈরী করছিল। রেন্‌স্‌ফর্ড সেখানে ডজন খানেক বিরাট আকারের কালো প্রাণীকে নড়াচড়া করতে দেখলো। তারা তার দিকে মুখ তুলতেই তাদের চোখে সবুজ রঙের ঝিলিমিলি খেলে গেল।

জেনারেল মন্তব্য করলেন, 'আমার মতে উত্তম শ্রেণীর। প্রতি রাত্রে সাতটার সময় এদের ছেড়ে দেওয়া হয়। কেউ যদি আমার বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করে

কিংবা বেরিয়ে যাবার—তবে তার পক্ষে সেটা শোচনীয় হতে পারে।' জেনারেল গুন গুন করে ফলি বের্জেরের একটি গানের কলি ধরলেন।

জেনারেল বললেন, 'এখন আমি যে নূতন মাথাগুলো জমিয়েছি সেগুলো আপনাকে দেখাতে চাই। আমার সঙ্গে লাইব্রেরিতে আসবেন কি?'

রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'আমি আশা করছি, আজকে রাত্রের মত আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। আমার শরীরটা আদপেই ভালো যাচ্ছে না।'

জেনারেল উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বললেন, 'আহা, তাই নাকি! কিন্তু সেইটেই তো স্বাভাবিক—এতখানি দীর্ঘ সাঁতার কাটার পর। আপনার প্রয়োজন রাত্রি-ভর শান্তিতে সুনিদ্রা। কাল তাহলে আপনার মনে হবে, আপনি যেন নতুন মানুষ হয়ে গিয়েছেন—আমি বাজী ধরছি। তখন আমরা শিকারে বেরুবো—কি বলেন? কালকে শিকার উত্তম হবে বলেই আমি আশা করছি—'

রেন্‌স্‌ফর্ড তখন তাড়াতাড়ি সে-ঘর ছেড়ে বেরুচ্ছে।

জেনারেল পিছন থেকে গলা তুলে বললেন, 'আজ যে আপনি আমার সঙ্গে শিকারে বেরুতে পারছেন না তার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। আজ ভালো শিকারের আশা আছে—বড় সাইজের, তাগড়া নীগ্রো। দেখে তো মনে হচ্ছে অন্ধিসন্ধি জানে—আচ্ছা, গুড নাইট, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড! আশা করি রাত্রিটা পুরো বিশ্রাম পাবেন।'

বিছানাটা ছিল খুব ভাল, বিছানায় পরার পাজামা কুর্তা সব চেয়ে নরম রেশমের তৈরী, তার সর্ব পেশী-স্নায়ুতে ক্লান্তি, কিন্তু তবুও নিদ্রার ওষুধ দিয়ে সে তার মগজটাকে শান্ত করতে পারলো না—পড়ে রইল দুটো খোলা চোখ মেলে। একবার তার মনে হল, তার ঘরের সামনের করিডরে কার যেন চুপিসাড়ে চলার শব্দ শুনতে পেল। সে দরজাটা খোলার চেষ্টা করলো; খুললো না। জানলার কাছে গিয়ে সে বাইরের দিকে তাকালো। তার ঘরটা ছিল উঁচু টাওয়ারগুলোর একটাতে। বাড়ির আলো তখন নিভে গিয়েছে। নীরব, অন্ধকার। শুধু আকাশে এক ফালি পাণ্ডুর চাঁদ; তারই ফ্যাকাশে আলোতে সে আঙিনায় আবছায়া দেখতে পাচ্ছিল। কতকগুলো নিস্তব্ধ কালো আকারের কি যেন সেখানে আনাগোনা করে আলো-ছায়ার আলপনা কাটছিল; কুকুরগুলো জানলাতে তার শব্দ শুনতে পেয়ে কিসের যেন প্রতীক্ষায় তাদের সবুজ চোখ তুলে তাকালো। রেন্‌স্‌ফর্ড বিছানায় ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ার জন্য সে বহু পদ্ধতিতে চেষ্টা করলো। তার পর যখন কিছুটা ফল পেয়ে, পাতলা ঘুমে ঝিমিয়ে পড়েছে—ঠিক ভোরের দিকে তখন অতি দূর জঙ্গলের ভিতর সে পিস্তল

ছোঁড়ার ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেল।

দুপুরের খাওয়ার পূর্বে জেনারেল জারফ দেখা দিলেন না। লাঞ্চে যখন এলেন তখন তাঁর পরনে গ্রামাঞ্চলের জমিদারের নিখুঁত টুইডের স্যুট। তিনি রেন্‌স্‌ফর্ডের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেনারেল বললেন, 'আর আমার কথা যদি তোলেন, তবে বলি আমার ঠিক ভালো যাচ্ছে না। আমার মনে দুশ্চিন্তা, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড। কাল রাত্রে আমি আমার পুরোনো ব্যারামের চিহ্ন অনুভব করলুম।'

রেন্‌স্‌ফর্ডের চাউনিতে প্রশ্ন দেখে জেনারেল বললেন, 'একঘেয়েমি। বৈচিত্র্যহীনতার অরুচি।'

আপন প্লেটে আবার খানিকটা ক্রেপ স্যুজেৎ তুলে নিয়ে জেনারেল বুঝিয়ে বললেন, 'কাল রাত্রে ভালো শিকার হয়নি। লোকটার মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল। সে এমন সোজাসুজি চলে গিয়েছিল যে তাতে করে কোনো সমস্যারই উদ্ভব হল না। খালাসীগুলোকে নিয়ে এই হল মুশকিল। একে তো আকাট, তায় আবার বনের ভিতর চলাফেরার কৌশল জানে না। নিরেট বোকার মত এমন সব করে যা দেখা মাত্রই স্পষ্ট বোঝা যায়। ভারি বিরক্তিজনক। আরেক গেলাস শাবলি চলবে কি মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড?'

রেন্‌স্‌ফর্ড দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'জেনারেল, আমি এখ্‌খুনি এই দ্বীপ ত্যাগ করতে চাই।'

জেনারেল তাঁর দুই ঝোপ-ভুরু উপরের দিকে তুললেন; মনে হল তিনি যেন আঘাত পেয়েছেন। আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'সে কি দোস্ত! আপনি তো সবে এসেছেন। শিকারও তো করেননি—'

রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'আমি আজই যেতে চাই।' তার পর দেখে, জেনারেলের কালো চোখ দুটো তার দিকে মড়ার চোখের মত একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকে যেন যাচাই করে নিচ্ছে। হঠাৎ জেনারেল জারফের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বোতল থেকে প্রাচীন দিনের শাবলি ঢাললেন রেন্‌স্‌ফর্ডের গেলাসে। বললেন, 'আজ রাত্রে আমরা শিকারে বেরুবো—আপনাতে আমাতে।'

রেন্‌স্‌ফর্ড ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে বললে, 'না জেনারেল, আমি শিকারে যাবো না।'

জেনারেল ঘাড় দুটো তুলে নামিয়ে অসহায় ভাব দেখালেন। বাগানের কাঁচের ঘরে বিশেষ করে ফলানো একটি আঙুর মোলায়েমসে খেতে খেতে

বললেন, 'আপনার অভিরুচি, দোস্ত! কি করবেন, না করবেন সেটা সম্পূর্ণ আপনার হাতে। তবে যদি অনুমতি দেন তবে বলবো, শিকার-খেলা সম্বন্ধে ইভানের ধারণার চেয়ে আমার ধারণা আপনার অধিকতর মনঃপূত হবে।'

যে কোণে ইভান দাঁড়িয়ে ছিল সেদিকে তাকিয়ে জেনারেল মাথা নাড়লেন। দৈত্যটা সেখানে তার পিপের মত পুরু বুকের উপর দু' বাহু চেপে ভ্রূকুটি-কুটিল নয়নে তাকাচ্ছিল।

রেন্‌স্‌ফর্ড আর্তকণ্ঠে বললো, 'আপনি কি সত্যি বলতে চান—'

জেনারেল বললেন, 'প্যারা দোস্ত! আমি কি আপনাকে বলিনি, শিকার সম্বন্ধে আমি যা-ই বলি না কেন, সেটা সত্য সত্য বলি। কিন্তু এটা আমার খাঁটি অনুপ্রেরণা। আসুন, আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্দেশে আমি পান করি।'

জেনারেল তাঁর গেলাস উঁচু করে তুলে ধরলেন; কিন্তু রেন্‌স্‌ফর্ড তাঁর দিকে শুধু স্থির নয়নে তাকিয়ে রইল।

সোৎসাহে জেনারেল বললেন, 'আপনি দেখবেন এ শিকার শিকারের মত শিকার। আপনার বুদ্ধি আমার বুদ্ধির বিপক্ষে। আপনার শক্তি, আপনার লড়ে যাওয়ার ক্ষমতা—আমার বিরুদ্ধে। মুক্তাকাশের নিচে দাবা খেলা! এবং যে বাজী ধরা হবে তার মূল্যও কিছু কম নয়—কি বলেন?'

'আর যদি আমি জিতি—', রেন্‌স্‌ফর্ডের গলা থেকে শব্দগুলো যেন ধাক্কা দিয়ে দিয়ে বেরুল।

জেনারেল জারফ বললেন, 'তৃতীয় দিনের মধ্যরাত্রি অবধি যদি আমি আপনাকে খুঁজে না পাই তবে আমি সানন্দে আপন পরাজয় স্বীকার করে নেব। আমার নৌকা আপনাকে পার্শ্ববর্তী দেশের কোন শহরের কাছে ছেড়ে আসবে।'

জেনারেল যেন রেন্‌স্‌ফর্ডের চিন্তা পড়ে ফেলে বললেন, 'ও। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। ভদ্রলোক এবং শিকারী হিসেবে আমি আপনাকে প্রত্যয় দিচ্ছি। অবশ্য আপনাকেও তার বদলে কথা দিতে হবে যে এখানে আপনার আগমন সম্বন্ধে কিছু বলবেন না।'

রেন্‌স্‌ফর্ড বললেন, 'আমি আদপেই এরকম কোনো কথা দেব না।'

জেনারেল বললেন, 'ও! তাহলে—কিন্তু এখন কেন সে আলোচনা? তিন দিন পরে দুজনাতে এক বোতল ভ্যভ্‌ক্লিকো খেতে খেতে সে আলোচনা করা যাবে, অবশ্য যদি—'

জেনারেল মদে চুমুক দিলেন।

কারবারী লোকের ব্যস্ততা তাঁকে সজীব করে তুললো। রেন্‌স্‌ফর্ডকে বললেন, 'ইভান আপনাকে শিকারের কোটপাতলুন, আহারাদি ও একখানা ছোরা দেবে। আমাকে যদি অনুমতি দেন তবে বলি, আপনি নরম চামড়ার তালিওলা জুতোই পরবেন। ওতে করে চলার পথে দাগ পড়ে কম। এবং পরামর্শ দি, দ্বীপের দক্ষিণপূব কোণের বিস্তীর্ণ জলাভূমিটা মাড়াবেন না। আমরা ওটাকে "মরণ-জলা" নাম দিয়েছি। ওখানে চোরাবালি আছে। এক আহাম্মুক ঐ দিক দিয়ে চেষ্টা দিয়েছিল। শোকের বিষয় যে, ল্যাজ্‌রাস্‌ তার পিছনে পিছনে যায়। আপনি আমার বেদনাটা কল্পনা করে নিতে পারবেন, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড। আমি ল্যাজ্‌রাস্‌কে ভালোবাসতুম; আমার দলের ঐটেই ছিল সবচেয়ে সরেস ডালকুত্তা। তাহলে, এখন আপনার কাছে আমি ক্ষমা ভিক্ষা করছি। দুপুরে আহার করার পর আমি একটু গড়িয়ে নিই। আপনি কিন্তু নিদ্রার ফুরসৎ পাবেন না। নিশ্চয়ই আপনি রওয়ানা হতে চাইবেন। গোধূলি বেলার পূর্বে আমি আপনার পেছনে বেরুবো না। রাত্রিবেলার শিকারে উত্তেজনা অনেক বেশী, দিনের চেয়ে—কি বলেন? আচ্ছা তবে দেখা হবে, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড, ও রিভোয়া।'

নিচু হয়ে নম্র অভিবাদন জানিয়ে জেনারেল ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ইভান অন্য দরজা দিয়ে ঘরে এল। তার এক বগলে শিকারের খাকি পোশাক, খাবারের হ্যাভারস্যাক্‌, চামড়ার খাপের ভিতর লম্বা ফলাওলা শিকারের ছোরা। তার ডান হাত রক্তরঙের কোমরবন্ধের ভিতরে গোঁজা রিভলভারের তোলা ঘোড়ার উপর।

দু'ঘণ্টা ধরে রেন্‌স্‌ফর্ড ঝোপজঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেন লড়াই ক'রে চলেছে আর দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করেছে, 'আমি মাথা গরম হতে দেব না, আমার মাথা গরম হলে চলবে না।'

শাটোর গেট্‌ যখন তার পিছনে কড়াক্‌ করে বন্ধ হয়ে যায় তখন তার মাথা খুব পরিষ্কার ছিল না। প্রথমটায় তার সর্বপ্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়েছিল তার আর জেনারেল জারফের মাঝখানে যতখানি সম্ভব দূরত্ব সৃষ্টি করতে, আর ঐ উদ্দেশ্য মনে রেখে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সামনের দিকে। যেন এক করাল বিভীষিকা ঘোড়-সওয়ারের জুতোর কাঁটার মত খোঁচা মেরে মেরে তাকে সম্মুখপানে খেদিয়ে নিয়ে চলেছিল। কিন্তু এতক্ষণে সে অনেকখানি আত্মকর্তৃত্ব ফিরে পেয়েছে; সে দাঁড়িয়ে গিয়ে তার নিজের পরিস্থিতিটা বিচার-বিবেচনা করতে লাগলো।

সোজা, শুধু সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে কোনো লাভ নেই—কারণ তাতে করে সে সমুদ্রের কাছে গিয়ে মুখোমুখি হবে। সে যেন চতুর্দিকে সমুদ্রের ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবির মাঝখানে ; সে যা-ই করুক না কেন, এই ফ্রেমের ভিতরই তাকে সেটা করতে হবে।

রেন্‌স্‌ফর্ড বিড়বিড় করে বললে, 'দেখি, আমার চলার পথ সে খুঁজে বের করতে পারে কিনা।' এতক্ষণ সে জঙ্গলের কাঁচা পায়ে-চলার-পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল, সেটা ছেড়ে এখন নামলো দিকদিশেহীন ঘন জঙ্গলের ভিতর। সে অনেকগুলো জটিল ঘোর-প্যাঁচ খেয়ে তার উপর দিয়ে বার বার এলোপাতাড়ি আসা যাওয়া করতে করতে শেয়াল-শিকারের সমস্ত কলকৌশল, আর শেয়ালের এড়িয়ে যাবার তাবৎ ধূর্ত সধন্ধ-সুড়ুক স্মরণে আনতে লাগলো। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন নামলো তখন সে গভীর জঙ্গলে ভরা একটা টিলার প্রান্তে এসে পৌঁচেছে। পা দুটো শ্রমক্লান্ত, হাত আর মুখ জঙ্গলের শাখা-প্রশাখার আঁচড়ে ভর্তি। সে বেশ বুঝতে পারলো, এখন তার গায়ে শক্তি থাকলেও এই অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে চলাটা হবে বদ্ধ পাগলামি। এখন তার বিশ্রাম নেওয়ার একান্ত প্রয়োজন। মনে মনে ভাবলো, 'এতক্ষণ আমি শেয়ালের যা করার তাই করেছি, এখন বেড়ালের খেলা খেলতে হবে।' কাছেই ছিল একটা বিরাট গাছ—মোটা গুঁড়ি আর বিস্তৃত কাণ্ড নিয়ে। অতি সাবধানে সামান্যতম চিহ্ন না রেখে সে গাছ বেয়ে উঠে যেখানে একটা মোটা শাখা গুঁড়ি থেকে বেরিয়েছে সেখানে চওড়া শাখাটার উপর গা এলিয়ে দিয়ে যতখানি পারা যায় বিশ্রামের ব্যবস্থা করলো। এই বিশ্রান্তি তার বুকে যেন এক নূতন আত্মবিশ্বাস এনে দিল ; এমন কি সে অনেকখানি নিরাপত্তাও অনুভব করতে লাগলো। মনে মনে নিজেকে বললে, জেনারেল জারফ যত বড় উৎসাহী শিকারীই হোন না কেন এখানে তিনি তাঁকে খুঁজে পাবেন না। সে যে গোলকধাঁধার প্যাঁচ পিছনে রেখে এসেছে তার জট ছাড়িয়ে অন্ধকারে এই জঙ্গলের ভিতর একমাত্র শয়তানই এগুতে পারবে। কিন্তু হয়তো জেনারেল একটা শয়তানই—

আহত সর্প যে রকম ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়, এই উদ্বেগময়ী রজনীও সেই রকম কাটতে লাগলো, এবং জঙ্গলে মৃতা ধরণীর নৈস্তব্ধ্য বিরাজ করা সত্ত্বেও রেন্‌স্‌ফর্ডের চোখের পাতায় ঘুম নামলো না। ভোরের দিকে যখন আকাশ ঘোলাটে পাণ্ডুটে রঙ মাখছিল তখন চমকে-ওঠা একটা পাখীর চিৎকার রেন্‌স্‌ফর্ডের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করলো। কি যেন একটা আসছে ঝাড়-ঝোপের ভিতর দিয়ে—ধীরে, সাবধানে—সেই এলোপাতাড়ি গোলকধাঁধা বেয়ে,

ঠিক যেভাবে রেন্‌স্‌ফর্ড এসেছিল। ডালের উপর চ্যাপ্টা হয়ে শুয়ে পড়ে সে পাতায় বোনা প্রায় কার্পেটের মত পুরু আড়াল থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যে বস্তু আসছিল সে মানুষ।

জেনারেল জারফ! সর্ব চৈতন্য কেন্দ্রীভূত করে, গভীরতম মনোযোগের সঙ্গে তিনি এগিয়ে আসছিলেন। প্রায় ঠিক গাছটার সামনে তিনি দাঁড়ালেন, তার পর মাটিতে হাঁটু গেড়ে জমিটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। কিছুমাত্র চিন্তা না করে রেন্‌স্‌ফর্ডের প্রথম রোখ চেপেছিল নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে লক্ষ্য করলো জেনারেলের ডান হাতে ধাতুর তৈরী কি একটা বস্তু—ছোট্ট একটি অটোম্যাটিক পিস্তল।

শিকারী কয়েকবার মাথা নাড়লেন, যেন তিনি ধন্ধে পড়েছেন। তার পর সটান খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে কেস্‌ থেকে তাঁর কালো একটা সিগারেট বের করলেন; তার তীব্র সুগন্ধ ভেসে উঠে রেন্‌স্‌ফর্ডের নাকে পৌঁছল।

রেন্‌স্‌ফর্ড দম বন্ধ করে রইল!

জেনারেলের চোখ তখন মাটি ছেড়ে, ইঞ্চি ইঞ্চি করে গাছের গুঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠছে। রেন্‌স্‌ফর্ড বরফের মত জমে গিয়েছে, তার সব কটা মাংসপেশী লাফিয়ে পড়ার জন্য টনটন করছে। কিন্তু যে ডালটার উপর রেন্‌স্‌ফর্ড শুয়েছিল ঠিক সেখানে পৌঁছবার পূর্বে শিকারীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেমে গেল। তার রোদে পোড়া মুখে দেখা দিল স্মিত হাস্য। যেন অতিশয় সুচিন্তিতভাবে তিনি ধুঁয়োর একটি রিং উপরের দিকে উড়িয়ে দিলেন; তারপর গাছটার দিকে পিছন ফিরে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে যে পথ দিয়ে এসেছিলেন সেই পথেই ফিরে চললেন। ঘাস-পাতার উপর তাঁর শিকারের বুটের খস্‌খস্‌ শব্দ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগলো।

ফুসফুসের ভিতরে রেন্‌স্‌ফর্ডের বন্ধ প্রশ্বাস উগ্র বিস্ফোরণের মত ফেটে বেরুলো। তার মনে প্রথম যে চিন্তার উদয় হল সেটা তাকে ক্লিষ্ট, অবশ করে দিল। শিকার যেটুকু সামান্যতম চিহ্ন রেখে যেতে বাধ্য হয় জেনারেল সেই খেই ধরে রাতের অন্ধকারে বনের ভিতর এগুতে জানেন; তিনি ভূতুড়ে শক্তি ধরেন। সামান্যতম দৈববশে কসাক তাঁর শিকার এবার দেখতে অক্ষম হয়েছেন।

রেন্‌স্‌ফর্ডের দ্বিতীয় চিন্তা বীভৎসতর রূপে উদয় হল। সে কুচিন্তা তার সর্বসত্তার ভিতর মরণের হিমের কাঁপন তুলে দিল। জেনারেল মৃদু হাস্য করলেন কেন? তিনি ফিরে চলে গেলেন কেন?

তার সুস্থ বিচার-বুদ্ধি তাকে যে কথা বলছিল রেন্‌স্‌ফর্ড সে-সত্য বিশ্বাস করতে চাইল না—অথচ ঠিক সেই সময় প্রভাত-সূর্য যে রকম কুয়াশা ভেদ করে

বেরিয়ে এসেছিল সে সত্য ঠিক ঐ রকমই প্রত্যক্ষ। জেনারেল তাঁর সঙ্গে শিকার খেলা খেলছেন! আরেক দিনের শিকার খেলার জন্য জেনারেল তাঁকে বাঁচিয়ে রাখছেন! কসাকই বেরাল; সে ইঁদুর। মৃত্যুর আতঙ্ক তার পরিপূর্ণ অর্থ নিয়ে এই প্রথম রেন্‌স্‌ফর্ডের কাছে আত্মপ্রকাশ করলো।

'আমি আত্মকর্তৃত্ব হারাবো না, কিছুতেই না।'

সে গাছ থেকে পিছলে নেমে আবার ঘন বনের ভিতর ঢুকলো। তার মুখ তখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় কঠিন এবং সে তার মস্তিষ্কযন্ত্র সবলে পূর্ণোদ্যমে কাজে লাগিয়ে দিল। প্রায় তিন শ গজ দূরে সে বিরাট একটা মরাগাছের গুঁড়ির সামনে দাঁড়াল। সেটা বিপজ্জনক ভাবে পড়ো-পড়ো হয়ে একটা ছোট জ্যান্ত গাছের উপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। রেন্‌স্‌ফর্ড তার খাবারের ব্যাগ মাটিতে ফেলে দিয়ে খাপ থেকে শিকারের ছোরা বের করে পূর্ণোদ্যমে কাজে লেগে গেল।

অনেকক্ষণ পরে কর্ম সমাপ্ত হল। শ'ফুট খানেক দূরে একটা শুকনো কাঠের গুঁড়ি পড়ে ছিল। রেন্‌স্‌ফর্ড তার আড়ালে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। তাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। বেরালটা ঐ তো আবার আসছে, ইঁদুরের সঙ্গে খেলবে বলে!

ডালকুত্তার মত দ্বিধাহীন প্রত্যয় নিয়ে জেনারেল জারফ আসছেন রেন্‌স্‌ফর্ডের খেই ধরে ধরে। তাঁর সদাসন্ধানী কালো চোখকে কিছুই এড়িয়ে যেতে পারে না—একটি মাত্র থেঁতলে যাওয়া ঘাসের পাতা না, বেঁকে যাওয়া ছোট্ট ডালের টুকরোটি না, শ্যাওলার উপর ক্ষীণতম চিহ্নটি না—হোক না সে যতই ক্ষীণ। সন্ধান খুঁজে খুঁজে এগুতে গিয়ে জেনারেল এতই নিমগ্ন ছিলেন যে রেন্‌স্‌ফর্ড তাঁর জন্য যে জিনিসটি তৈরী করেছিল সেটা না দেখার পূর্বেই তার উপরে এসে পড়লেন। তাঁর পা পড়লো সামনে-এগিয়ে-পড়া একটা ঝোপের উপর—এইটেই রেন্‌স্‌ফর্ডের পাতা ফাঁদের হ্যাণ্ডিল। কিন্তু তাঁর পা ঐটে ছোঁয়া মাত্রই জেনারেলের চৈতন্যে বিপদের পূর্বাভাস চমক মারলো—সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্র বানরের মত তিনি তড়িৎ বেগে পিছনের দিকে লাফ দিলেন। কিন্তু যতখানি ক্ষিপ্র হওয়ার প্রয়োজন ছিল ঠিক ততখানি হননি; কাটা জ্যান্ত গাছের উপর সন্তর্পণে রাখা মরা গাছটা মড়মড়িয়ে পড়ার সময় জেনারেলের ঘাড়ের উপর মারলো ট্যারচা ঘা। জেনারেলের ক্ষিপ্র বিদ্যুৎগতি না থাকলে তিনি গাছের তলায় নিঃসন্দেহে গুঁড়িয়ে যেতেন। টাল খেয়ে তিনি টলতে লাগলেন বটে কিন্তু মাটিতে পড়লেন না; এবং পিস্তলটিও হস্তচ্যুত হল না। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জখমী ঘাড়টাতে হাত ঘষতে লাগলেন। রেন্‌স্‌ফর্ডের বুকটাকে সেই

ভীতি আবার পাকড়ে ধরেছে ; সে শুনতে পেল জেনারেলের ব্যঙ্গ-হাস্য জঙ্গলের ভিতর খলখলিয়ে উঠছে।

তিনি যেন ডেকে বললেন, 'রেন্‌স্‌ফর্ড, আপনি যদি আমার কণ্ঠস্বরের পাল্লার ভিতরে থাকেন—এবং আমার বিশ্বাস আছেন, তবে আপনাকে আমার অভিনন্দন জানাই। মালয় দেশের মানুষ ধরার ফাঁদ খুব বেশী লোক বানাতে জানে না। কিন্তু আমার কপাল ভালো যে আমিও মালাক্কাতে শিকার করেছি। আপনি সত্যি এখন আমার কাছে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠছেন। আমি এখন আমার জখমটাকে পট্টি বাঁধতে চললুম ; জখমটা সামান্যই। কিন্তু আমি ফিরে আসছি। আমি ফিরে আসছি।'

জেনারেল যখন তাঁর ছড়ে-যাওয়া ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে চলে গেলেন তখন রেন্‌স্‌ফর্ড আবার আরম্ভ করলো তার পলায়ন। এবারে সত্যকার পলায়ন—আশাহীন, জীবনমরণের পলায়ন, এবং সে পলায়ন চললো কয়েক ঘণ্টা ধরে। গোধূলির আলো নেমে এল, তার পর অন্ধকার হল, তবু তার অগ্রগতি বন্ধ হল না। পায়ের নিচের মাটি তখন নরম হতে আরম্ভ করেছে, গুল্মলতা ঘনতর নিবিড়তর হতে লাগলো, পোকাগুলোও ভীষণভাবে তাকে কামড়াতে আরম্ভ করেছে। তার পর আরেকটু এগুতেই তার পা জলা মাটিতে ঢুকে বসে গেল। সে তার পা-টা মুচড়ে টেনে বের করবার চেষ্টা করলো কিন্তু সেই চোরা-কাদা বিরাট জোঁকের মত তার পা পাশবিক শক্তির সঙ্গে শুষতে লাগলো। প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করে রেন্‌স্‌ফর্ড তার পা-খানা মুক্ত করলো। সে তখন বুঝতে পেরেছে, কোথায় এসে পৌঁচেছে! এ সেই 'মরণ-জলা' তার চোরাবালি নিয়ে।

তার হাত দুটি তখন মুষ্টিবদ্ধ। যেন তার বিচারবুদ্ধির সুস্থ স্নায়ুবল ধরা-ছোঁয়ার জিনিস এবং সেইটাকে অন্ধকারে কে যেন তার কব্জা থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঐ থলথলে মাটি তার মনে এক নূতন কৌশল এনে দিল। চোরাবালি থেকে ডজনখানেক ফুট পিছিয়ে গিয়ে যেন কোনো আদিম অন্ধকার যুগের মৃত্তিকা খননদক্ষ বিরাট বীভারের মত সে মাটি খুঁড়তে লাগলো।

ফ্রান্সে যুদ্ধের সময় মাটি খুঁড়ে রেন্‌স্‌ফর্ড ট্রেঞ্চের ভিতর আশ্রয় নিয়েছে—তখন এক সেকেণ্ডের বিলম্ব হওয়ার অর্থ ছিল মৃত্যু। তখনকার মৃত্তিকাখনন এর তুলনায় তার কাছে গদাইলস্করী চালের খেলাধুলো বলে মনে হল। গর্তটা গভীর হতে গভীরতর হতে লাগলো ; যখন সেটা তার ঘাড়ের চেয়েও গভীর হল তখন সেটার থেকে বেয়ে উঠে কতকগুলো শক্ত গাছের চারা কেটে ডগাগুলো

সূচাগ্র তীক্ষ্ণ করে বানালো বর্শার মত করে। ডগাগুলো উপরমুখো করে সেগুলো সে পুঁতে দিল গর্তের তলাতে। আগাছা আর ছোট ছোট ডাল নিয়ে দ্রুত হস্তে একটা এবড়ো-খেবড়ো কার্পেটের মত করে বুনলো এবং সেটা গর্তের উপর পেতে মুখটা বন্ধ করে দিল। ঘামে জবজবে ভেজা ক্লান্তিতে অবসন্ন শরীর নিয়ে সে গুঁড়ি মেরে বসলো একটা বাজে পোড়া গাছের গুঁড়ির পিছনে।

সে বুঝতে পেরেছে তার তাড়নাকারী আসছে ; নরম মাটির উপর পায়ের থপ থপ শব্দ সে শুনতে পেয়েছে এবং রাত্রের মৃদু বাতাস জেনারেলের সিগারেট-সৌরভ তার কাছে নিয়ে এসেছে। তার মনে হল যেন জেনারেল অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছেন ; আগের মত এক ফুট এক ফুট করে সমঝে-বুঝে আসছেন না। যেখানে গুঁড়ি মেরে রেন্‌স্‌ফর্ড বসে ছিল সেখান থেকে সে জেনারেল বা গর্তটা কোন কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। প্রত্যেকটি মিনিট যেন তার কাছে এক একটা বছরের আয়ুষ্কাল বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল। তার পর, হঠাৎ সে উল্লাসভরে সানন্দে চিৎকার করতে যাচ্ছিল—কারণ সে শুনতে পেয়েছে মড়মড় করে গর্তের ঢাকনা ভেঙে নিচে পড়ে গিয়েছে ; ধারালো কাঠের ডগাতে পড়ে কে যেন বেদনার তীক্ষ্ণ আর্তরব ছেড়েছে। তার লুকানো জায়গা থেকে সে লাফ দিয়ে উঠেছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে যেন মুষড়ে গিয়ে পিছু হটলো। গর্ত থেকে তিন ফুট দূরে একজন মানুষ ইলেকট্রিক টর্চ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জেনারেলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'শাবাশ রেন্‌স্‌ফর্ড, তোমার বর্মা-পদ্ধতিতে তৈরী গর্তটা আমার সবচেয়ে সেরা কুকুরদের একটাকে গ্রাস করেছে। আবার তুমি জিতলে। এবারে দেখবো মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড, তুমি আমার পুরো পাল কুকুরের বিরুদ্ধে কি করতে পার। আমি এখন বাড়ি চললুম একটু বিশ্রাম করতে। ভারি আমোদে কাটলো সন্ধ্যাটা —তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।'

জলাভূমির কাছে শুয়ে রাত কাটানোর পর ভোরবেলা তার ঘুম ভাঙল এমন একটা শব্দ শুনে যেটা তাকে বুঝিয়ে দিল যে ভয় বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে এখনো তার নূতন-কিছু শেখবার আছে। শব্দটা আসছিল দূর থেকে—ক্ষীণ, এবং ভাসা ভাসা। এক পাল কুকুরের চিৎকার।

রেন্‌স্‌ফর্ড জানতো, সে দুটোর একটা করতে পারে। যেখানে আছে সেখানেই থেকে অপেক্ষা করা। সেটা আত্মহত্যার সামিল। কিংবা সে ছুট লাগাতে পারে। সেটা হবে অবধারিতকে মুলতুবী করা। এক মুহূর্তের তরে সে দাঁড়িয়ে চিন্তা করলো। তার মাথায় যা এল সেটা সফল হওয়ার সম্ভাবনা অতিশয় ক্ষীণ। কোমরের বেল্ট শক্ত করে নিয়ে সে জলাভূমি ত্যাগ করলো।

কুকুরগুলোর চিৎকার আরো কাছে আসছে, তারপর আরো কাছে, তার চেয়েও আরো কাছে। পাহাড়ের খাড়াইয়ের উপরে একটা গাছে চড়ে রেন্‌স্‌ফর্ড দেখতে পেল, একটি জলধারার পোয়াটাক মাইল দূরে একটা ঝোপ নড়ছে। চোখ যতদূর সম্ভব পারে টাটিয়ে দেখতে পেল জেনারেলের একহারা শরীর আর তার সামনে আরেকজনের বিশাল স্কন্ধ জঙ্গলের উঁচু বোনো ঘাস ঠেলে ঠেলে এগুচ্ছে। এ সেই নরদানব ইভান। তাকে যেন কোন্ অদৃশ্য শক্তি টেনে টেনে এগিয়ে নিয়ে চলেছে; রেন্‌স্‌ফর্ডের বুঝতে কোনো অসুবিধা হল না সে কুকুর-গুলোর চেন হাতে ধরে রেখেছে।

যে কোনো মুহূর্তে তারা তার ঘাড়ে এসে পড়বে। তার মগজ তখন ক্ষিপ্র-বেগে চিন্তা করছে। ইউগাণ্ডায় শেখা গ্রামবাসীদের একটা ফন্দি তার মনে এল। গাছ থেকে নেমে সে একটা লিকলিকে চারাগাছের সঙ্গে তার শিকারের ছোরাটার ডগা নিচের দিকে মুখ করে বাঁধলে সে যে-পথ দিয়ে এসেছে তার ঠিক উপরে; সর্বশেষে চারাগাছটাকে লতা দিয়ে ধনুর মত বাঁকিয়ে পিছন দিকে বাঁধলো। তার পর সে দিল প্রাণপণ ছুট। কুকুরগুলো ইতিমধ্যে আবার তার গন্ধ পেয়ে চিৎকার করে উঠেছে তীব্রতর স্বরে। এইবারে রেন্‌স্‌ফর্ড হৃদয়ঙ্গম করলো, কোণ-ঠাসা শিকারের বুকে কোন অনুভূতি জাগে।

দম নেবার জন্য তাকে থামতে হল। হঠাৎ কুকুরগুলোর চিৎকার থেমে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে রেন্‌স্‌ফর্ডের হৃদ্‌স্পন্দনও যেন থেমে গেল। তাহলে তারা নিশ্চয়ই ছোরা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে।

রেন্‌স্‌ফর্ড উত্তেজনার চোটে চড়চড় করে একটা গাছে উঠে পিছনপানে তাকালো। তার তাড়নাকারীরা তখন দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু গাছে চড়ার সময় রেন্‌স্‌ফর্ড তার হৃদয়ে যে আশা পুষেছিল সেটা লোপ পেল; সে দেখতে পেল শুকনো উপত্যকার উপর জেনারেল জারফ আপন পায়ের উপরই দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু ইভান নয়। জ্যা মুক্ত চারাগাছের আঘাতে ছোরাটা সম্পূর্ণ নিষ্ফলকাম হয়নি।

রেন্‌স্‌ফর্ড হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়তে না পড়তে কুকুরগুলো আবার চিৎকার করে উঠলো।

আবার দৌড়তে আরম্ভ করে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলছে, 'মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, হবে, হবে।' একদম সামনে, গাছগুলোর ফাঁকে দেখা দিয়েছে এক ফালি নীলরঙের ফাঁকা। রেন্‌স্‌ফর্ড প্রাণপণ ছুটলো সেদিক পানে। পৌঁছল সেখানে। সেটা সমুদ্রের পাড়। সমুদ্র সেখানে খানিকটে ঢুকে গিয়ে ছোট্ট

উপসাগরের মত আকার ধরেছে। রেন্‌স্‌ফর্ড তারই ওপারে দেখতে পেলো বিষণ্ণ পাঁশুটে পাথরের তৈরী জেনারেলের শাটো। রেন্‌স্‌ফর্ডের পায়ের বিশ ফুট নিচে সমুদ্র গজরাচ্ছে আর ফোঁস ফোঁস করছে। রেন্‌স্‌ফর্ড দোটানায়। শুনতে পেল কুকুরগুলোর চিৎকার। লাফ দিয়ে পড়ল দূরে, সমুদ্রে।

জেনারেল আর তাঁর কুকুরের পাল সে জায়গায় পৌঁছলে পর তিনি সেখানে থামলেন। কয়েক মিনিটের তরে তিনি তাকিয়ে রইলেন নীলসবুজ বিস্তীর্ণ জলরাশির দিকে। ঘাড়ের ঝাঁকুনি দিয়ে 'যাকগে' ভাব প্রকাশ করলেন। তার পর মাটিতে বসে রূপোর ফ্লাস্ক থেকে ব্রাণ্ডি খেয়ে সুগন্ধি সিগারেট ধরিয়ে 'মাদাম বাটারফ্লাই' গীতিনাট্য থেকে খানিকটা গান গুনগুন করে গাইলেন।

সে রাত্রে তাঁর কাঠের আস্তরওলা বিরাট ডাইনিং হলে জেনারেল জারফ অত্যুৎকৃষ্ট ডিনার খেলেন। সঙ্গে পান করলেন এক বোতল পল রজের আর আধ বোতল শ্যাঁবেরত্যাঁ। দুটি যৎসামান্য বিরক্তিকর ঘটনা তাঁকে পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগে বাধা দিল মাত্র। তার একটা, ইভানের স্থলে অন্য লোক পাওয়া কঠিন হবে এবং অন্যটা, তাঁর শিকার হাতছাড়া হয়ে গেল বলে—স্পষ্টই দেখা গেল যে মার্কিনটা আইন মাফিক শিকারের খেলাটা খেলল না। ডিনারের পর লিক্যোরে চুমুক দিতে দিতে অন্তত জেনারেলের তাই মনে হল। আরাম পাবার জন্য তাই তিনি তাঁর লাইব্রেরিতে মার্কুস্‌ আউরেলিয়ুসের রচনা পড়লেন। দশটার সময় তিনি শোবার ঘরে ঢুকলেন। দোরে চাবি দিতে দিতে তিনি আপন মনে বললেন, আজকের ক্লান্তিটা তাঁর বড় আরামের ক্লান্তি। সামান্য একটু চাঁদের আলো আসছিল বলে তিনি বাতি সুইচ্‌ করার পূর্বে জানলার কাছে গিয়ে নিচে আঙিনার দিকে তাকালেন। বিরাট কুত্তাগুলোকে দেখে তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'আসছে বারে তোমাদের কপাল ভালো হবে, আশা করছি।' তার পর তিনি আলো সুইচ্‌ করলেন।

খাটের পর্দার আড়ালে যে লোকটা লুকিয়ে ছিল সে সেখানে দাঁড়িয়ে।

জেনারেল চেঁচিয়ে বললেন, 'রেন্‌স্‌ফর্ড! ভগবানের দোহাই, তুমি এখানে এলে কি করে?'

রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'সাঁতরে। আমি দেখলুম, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে না এসে এ ভাবেই তাড়াতাড়ি হয়।'

জেনারেল ঢোক গিললেন, তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই। আপনি শিকারে জিতেছেন।'

রেন্‌স্‌ফর্ড স্মিতহাস্য হাসলো না। নিচু স্বরে হিসহিসিয়ে সে বললে, 'আমি এখনো কোণ-ঠাসা শিকারের পশু। তৈরী হোন, জেনারেল জারফ!'

জেনারেল যে ভাবে নিচু হয়ে বাও করলেন সেটা তাঁর গভীরতম বাওয়ের একটি। বললেন, 'তাই নাকি? চমৎকার! আমাদের একজনকে কুত্তাগুলোর খানা হতে হবে। অন্যজন ঘুমুবে এই অতি উৎকৃষ্ট শয্যায়। এসো রেন্‌স্‌ফর্ড, হুঁশিয়ার...'

রেন্‌স্‌ফর্ড সিদ্ধান্ত করলো, এর চেয়ে ভাল বিছানায় সে কখনো ঘুমোয় নি॥*

অপর্ণার পারণা বা স্যালাড

বাসনা ছিল দু-একটি গাল-গল্প বলার পর যখন আসর খানিকটা ওম পেয়েছে তখন এই লেখাটিতে হাত দেব কিন্তু হিসেব করে দেখি সে আর হয় না। স্যালাড পাতা বাজারে ফুরিয়ে যাওয়ার পর এ লেখা বেরলে কে আর সেটি ন'মাস বাঁচিয়ে রাখবে? এমন কি মনে হচ্ছে এমনিতেই বোধহয় কিঞ্চিৎ দেরি হয়ে গেল। অবশ্য কলকাতা এবং হিলস্টেশনে যাঁরা থাকেন তাঁদের কথা আলাদা।

স্যালাড শব্দের মূল অর্থ 'নোনতা' কিন্তু এখন শব্দটি অন্য নানা অর্থে ব্যবহার হয়। প্রধানত কাঁচা পাতা খাওয়ার অর্থে। তাই আমি যখন কোনো ইয়োরোপীয়কে পান দি, তখন বলি, 'হ্যাভ্‌ সাম নেটিভ স্যালাড।'—অবশ্য তারা পান বলতে সেটাকে স্যালাডের ভিতর ধরেনি।

স্যালাড বললে দেশে-বিদেশে প্রধানত লেটিস (ইংরেজিতে বানান lettuce কিন্তু উচ্চারণ লেটিস) স্যালাডই বোঝায়। তার নানা জাত-বর্ণ আছে কিন্তু এদেশে প্রধানত হেড্‌ এবং লীফ্‌ এই ধরনেরই রেওয়াজ বেশী। হেড্‌ অর্থাৎ মাথা—এ লেটিস দেখতে অনেকটা বাঁধাকপির মত। আর লীফ্‌ স্যালাডে থাকে শুধু পাতা। দুটোরই বাইরের দিকের পাতাগুলো পুরু এবং তেতো বলে সেগুলো ছিঁড়ে ফেলে ভেতরের নরম-বস্তু কাজে লাগাতে হয়। আর যদি আপন বাগানে লীফ্‌ ফলিয়ে থাকেন তবে সূর্য ওঠবার সময়—আগে হলে আরো ভাল—প্রয়োজন মত যে কটি পাতা দরকার সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন লেটিসের ভিতরকার দিক থেকে ছিঁড়ে তুলে নেবেন (ভিন্ন ভিন্ন লেটিসে সে-সব জায়গায় আবার নূতন কচি পাতা

* বিদেশী গল্পের অনুবাদ

গজাবে, বাইরের দিকে যে পাতাগুলো ছেঁড়েননি সেগুলোর নিরাপদ আশ্রয়ে)। কেউ কেউ বলেন স্যালাড তৈরী করা পর্যন্ত পাতাগুলো ভিজিয়ে রাখতে, আমি বলি ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে জড়িয়ে রাখতে।

অমলেট, মাছভাজা যেমন বেশী আগে তৈরী করে রাখা হয় না, স্যালাডও তেমনি খেতে বসার যত অল্পক্ষণ আগে করা যায় ততই ভালো; না হলে পাতাগুলো নেতিয়ে একাকার হয়ে যায়।

সবচেয়ে ঘরোয়া আটপৌরে স্যালাড কি করে বানাতে হয় তারই বর্ণনা দিচ্ছি। এটা বানাতে যে-সব মাল-মসলা লাগে সেগুলো আপনার ভাঁড়ারে আর সব্জীর ঝুড়িতেই আছে—আপনাকে শুধু কিছু লেটিস পাতা কিনে আনতে হবে। আপনার যদি স্যালাড সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞানগম্যি থাকে তবে আপনি এখানেই তীব্র কণ্ঠে আপত্তি জানিয়ে বলবেন, 'কিন্তু অলিভ ওয়েল?—সে তো আমাদের ভাঁড়ারে থাকে না!' দাঁড়ান বলছি, ওটা বড্ড আক্রা জিনিস—এমন কি খাজা ভেজালটাও কম আক্রা নয়। সেকথা পরে আসছে।

বাজার কিংবা বাগান থেকে লেটিস পাতা এনে তার বাইরের পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলে দেবেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, বাইরের কটা পাতা? যত বেশী ফেলবেন, ভেতরের কচি পাতার গুণে স্যালাড তত সুস্বাদু হবে, কিন্তু তা হলে তো পরিমাণ এত কমে যাবে যে খরচায় পোষাবে না। অতএব আপনাকেই চিন্তা করে স্থির করতে হবে, বাইরের কটা পাতা ফেলে দেবেন। এ ব্যাপারে পাকা গিন্নীর মত বড্ড বেশী কঞ্জুসি করবেন না, কারণ লেটিস অতিশয় সস্তা জিনিস।

ভিতরের যে পাতাগুলো বাছাই করে নিলেন সেগুলো অতি সযত্নে ধুয়ে নেবেন। ধোয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ওগুলো থেকে ধুলোবালি ছাড়ানো—আর কিছু নয়। তার পর পাতাগুলো হাত দিয়ে টুকরো টুকরো ছিঁড়ে নেবেন, এই মনে করুন টুকরোগুলো যেন তিন ইঞ্চির মত লম্বা হয়। কিন্তু সাবধান! বঁটি দিয়ে কাটবেন না। যে-জিনিস কাঁচা খাওয়া হয় সেগুলো লোহা দিয়ে কাটা উচিত নয়—এ তো জানা কথা। স্টেনলেস স্টিলের ছুরি অবশ্য ব্যবহার করতে পারেন—অথবা যাকে বলা হয় ফ্রুট নাইফ বা ফল কাটার ছুরি। কিংবা ঝিনুক, কিংবা বাঁশের ছিলকে দিয়ে। কাঁচা আম মা-মাসীরা যে পদ্ধতিতে কাটেন—বাংলা কথা। কিন্তু লেটিসের পাতা ছিঁড়বেন হাত দিয়েই। এগুলো দরকার হবে পরের জিনিসগুলো কাটবার জন্য।

এইবারে ছেঁড়া পাতাগুলো চিনেমাটির কিংবা শুধু মাটির চ্যাপ্টা থালাতে রাখুন। কাঁসা বা পেতল সম্পূর্ণ বর্জনীয়। কারণ এতে নেবুর রস আসবে।

সবচেয়ে ভালো হয়, ময়দা ছাকার ছাঁকনির উপর রাখলে। তাহলে পাতার গায়ের জল ঝরে পড়ে পাতাগুলো ফের শুকনো হয়ে যায়।

তার পর মোটা সাদা পেঁয়াজ চাকতি চাকতি করে কাটুন। টমাটো, শসাও চাকতি চাকতি করুন। ছোট ছোট নরম লাল মূলো কিংবা খুব নরম সাধারণ মূলোও চাকতি চাকতি করে দিতে পারেন। কাঁচা লঙ্কাও কুচি কুচি করে দেবেন, যদি বাড়ির লোক কাঁচালঙ্কার ঝাল পছন্দ করেন।

এইবারে সব-কিছু—অর্থাৎ লেটিসের ছেঁড়া পাতা ও এগুলো—একসঙ্গে রাখুন। তার উপর সরষের তেল ঢালুন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সরষের তেল, যে তেল দিয়ে আমরা তেল-মুড়ি খাই। আপনি বলবেন, 'অলিভ তেলের কি হল?' উত্তরে নিবেদন, স্যালাড বানাবার সময় মার্কিন-ইয়োরোপীয় বিশেষ করে ফরাসীরা মাস্টার্ড পাউডার অর্থাৎ সর্ষেগুঁড়ো অলিভওয়েলের সঙ্গে মিশিয়ে নেয়, কিংবা আগেভাগে সর্ষেগুঁড়ো জলের সঙ্গে খুব পাতলা করে মিশিয়ে তার সঙ্গে লেটিস পাতা মাখিয়ে নেয়। অলিভ ওয়েলের আপন গন্ধ ও স্বাদ খুব কম। তার সঙ্গে সর্ষেগুঁড়ো মেশালে ফলে তো সর্ষের তেলই দাঁড়ালো—অবশ্য আমাদের সর্ষের তেলের ঝাঁজ এবং ধক তাতে থাকবে না। অবাঙালী সর্ষের তেলের ঝাঁজ সইতে পারে না বলেই 'অলিভ ওয়েল' করে। আমরা যখন ঐটেই পছন্দ করি তবে সর্ষে তেল দিয়ে স্যালাড বানাবো না কেন? আমি নিজে তো পুরনো আচারের মজা সর্ষের তেলই ব্যবহার করি।

সর্ষের তেলে সব কিছু আলতো আলতো করে মাখিয়ে নেওয়ার পর তার উপরে ঢালবেন পাতি বা কাগজী নেবুর রস। নুন। সব কিছু ফের আলতো আলতো করে মাখুন। ব্যস্—স্যালাড তৈরী।

নেবুর রসের বদলে অনেকেই ভিনিগার বা সিরকা দেয়। তার কারণ ইয়োরোপে ঐ ভিনিগার ছাড়া অন্য কোনো টক বস্তু নেই। নেবুর রসের বদলে যদি ভিনিগার ব্যবহার করেন তবে সেটা জল দিয়ে ডাইলুট অর্থাৎ কম-তেজ করে নেবেন।

প্রশ্নটা, কতখানি লেটিসের সঙ্গে কতখানি পেঁয়াজ, টমাটো, শসা, তেল, নেবুর রস দেব? এর উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে মনে রাখা উচিত, লেটিস পাতাই হবে প্রধান জিনিস, সেই যেন বাকি সব জিনিসের উপর প্রাধান্য করে। পাতাগুলো তেলতেলে হওয়ার মত তেলে মাখানো হবে, কিন্তু জবজবে যেন না হয়। নেবুর রস তেলের এক সিকি ভাগের মত। বেশী টকটক যেন মনে না হয়। এবং খাবার সময় লেটিস পাতা যেন আর পাঁচটা জিনিসের চাপে আপন

স্বাদ না হারায়।

এ স্যালাড অন্য পাঁচটা জিনিসের সঙ্গে খেতে হয়। অর্থাৎ ডাল-ভাত, ভাত-ঝোল, ভাত-মাংস, এক গ্রাস মুখে দেবার পর খানিকটা স্যালাড মুখে নিয়ে একসঙ্গে চিবোবেন। স্বাধীন পদ হিসাবে যে স্যালাড খাওয়া হয় সেটাতে মাছ, মাংস কিংবা ডিম থাকে, এবং মায়োনেজ দিয়েই তৈরী করা হয়। (ডিমের হলদে ভাগের সঙ্গে তেল সিরকা দিয়ে মেখে মেখে সেটা তৈরী করতে হয়; বড্ড খুঁটিনাটি বলে বাজারে তৈরী মায়োনেজ বোতলে পাওয়া যায়, টমাটো সসেরই মত, যদিও ইটালিয়ানরা প্রতিদিন তাজা টমাটো সস বাড়িতেই বানায়, আমরা যে রকম বাজারের কারি পাউডার না কিনে নিজেরাই হরেক জিনিস বেটে-গুলে রান্নায় ব্যবহার করি।) সে-সব স্বাধীন পদের স্যালাড বানাতে এটা ওটা সেটা এবং সময়ও লাগে বেশী—তদুপরি সবচেয়ে বড় কথা, বাঙালী রান্নার আর তিনটে পদের সঙ্গে ওটা ঠিক খাপ খায় না।

অনেকে আবার তেল-নেবুর রস ব্যবহার না করে লেটিসপাতা-টমাটো-প্যাজ সব-কিছু টক দইয়ে মেখে নেন, উপরে গোলমরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে দেন। আমার তো ভালোই লাগে।

কাবুলীরা ব্যত্যয়। তারা শুধু লেটিস পাতা এক ঠোঙ্গা মধুতে গুত্তা মেরে খেয়ে চলে রাস্তায় যেতে যেতে।

আমাদের দেশে শীতকালেও রোদ কড়া বলে লেটিস ভালো হয় না। তাই এ-দেশে লেটিস ফলাতে জানেন অল্প লোকই। লেটিস ক্ষেত যেন দিনে অল্পক্ষণের জন্য পূবের রোদ পায়, সার যেন বেশী না দেওয়া হয়, এবং জল সেচের পরিমাণও নির্ণয় কঠিন। মোট কথা, লেটিস যেন বড্ড বেশী প্রাণবন্ত না হয়। তাকে যেন খানিকটে জীবন্মৃত রাখা হয়। লেটিস পাতা পান ও তামাক পাতার মতই বড় ডেলিকেট লাজুক কোমল-প্রাণ। তাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, বরজের মত কোনো একটা ব্যবস্থা করে লেটিস ফলিয়ে দেখলে হয়।

এখন সর্বশেষ প্রশ্ন, আমি স্যালাড নিয়ে অত পাঁচ কাহন লিখছি কেন?

প্রথম: স্যালাড জিনিসটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। যে-কোনো ডাক্তারকে শুধোতে পারেন।

দ্বিতীয়: বাঙালী গরীব জাত। লেটিস সস্তা এবং স্যালাড বানাতে আর যে-সব জিনিস লাগে সেগুলো বাঙালীর ঘরে ঘরে কিছু-না-কিছু থাকে। প্রত্যেককে এক বাটি স্যালাড দিতে খর্চা তেমন কিছুই নয়। ডাল ভাত মাছ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি গ্রাস কিংবা দ্বিতীয় তৃতীয় গ্রাসে কিছুটা স্যালাড খেলে

ঐ দিয়ে পেটের কিছুটা ভরে। একটা হাফ-পদও হল। পরে যদি স্যালাডে আপনার রুচি জন্মে যায় তবে আপনি তার পরিমাণ বাড়িয়ে পেটের আরো বেশী ভরাতে পারবেন।

তৃতীয়: স্যালাড এক্সপেরিমেন্ট করে করে অনেক কিছু দিয়ে তার পরিমাণ বাড়ানো যায়। আলুসেদ্ধ চাকতি চাকতি করে (এমন কি আগের রাতের বাসি ঝোলের আলুগুলো তুলে নিয়ে, ধুয়ে, চাকতি চাকতি করে), মটরশুঁটি সেদ্ধ করে, গাজর বীট ইত্যাদি ইত্যাদি সবকিছুই তাতে দেওয়া যায়। এমন কি ঠাণ্ডা হাফবয়েলড ডিমও চাকতি চাকতি করে দেওয়া যায়—তবে ওটা স্যালাড তৈরী হয়ে যাবার পর সর্বশেষে; নইলে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে, অতি আলতো আলতো ভাবে মাখাবার সময়ও। অর্থাৎ বাড়ির কোনো কিছু খামকা বরবাদ হয় না। এমন কি আগের রাতের মাছ মাংস দিয়েও স্যালাড করা যায়—তবে সে অন্য মহাভারত, পদ্ধতি আলাদা।

সর্বশেষে পাঠক, এবং বিশেষ করে পাঠিকাকে সাবধান করে দিচ্ছি, স্যালাড এমন কিছু ভয়ঙ্কর সুখাদ্য নয়, (দেখতেই পাচ্ছেন, যে-সব মাল দিয়ে স্যালাড তৈরী হয় সেগুলো এমন কিছু মারাত্মক মূল্যবান সুখাদ্য নয়) যে আপনি হন্তদন্ত হয়ে স্যালাড তৈরী করে খেয়ে বলবেন, 'ও হরি! এই মালের জন্য আলী সাহেব এতখানি বকর বকর করলো।'

মনে পড়লো, এক মহিলাকে আমি কথায় কথায় এক বিশেষ ব্র্যাণ্ডের সাবান ব্যবহার করতে পরামর্শ দিয়েছিলুম। দিন সাতেক পরে তাঁর সঙ্গে রাস্তায় দেখা। নাক সিঁটকে বললেন, 'তা আর এমন কি সাবান!' আমি বললুম, 'ম্যাডাম, আপনি কি আশা করেছিলেন যে ঐ সাবান ব্যবহার করার সাত দিনের মধ্যেই আপনার কর্তা আপনাকে নূতন গয়না গড়িয়ে দেবেন!'—১৪ ক্যারেটের আগের কথা বলছি।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মিদ্বয়

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনার উপর দেশী বিদেশী কোন্ কোন্ মহাজন তথা কীর্তিমান লেখক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, সে-বিষয় নিয়ে বাঙলাসাহিত্যে বহু বৎসর ধরে আলোচনা গবেষণা হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এমনও একাধিক সজ্জন আছেন যাঁদের সন্ধান রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে অতি সহজে পাওয়া যাবে না, যদিও এঁদের প্রভাব থাক আর না-ই থাক, এঁদের

সাহচর্যে যে রবীন্দ্রনাথ উপকৃত হয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

যে-একটি বিষয়ে অনুমতি পেলে আমি প্রথমেই বলতে চাই সেটি এই—দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরে ছাত্রাবস্থায় আমি রবীন্দ্রনাথকে ক্লাস নিতে দেখেছি, সভাস্থলে সভাপতিরূপে, আপন প্রবন্ধ, ছোট গল্প, কবিতা, নাট্যের পাঠকরূপে এবং অন্যান্য নানারূপে তাঁকে দেখেছি। আমার মনের উপর সবচেয়ে বেশী দাগ কেটেছে, গুণীজ্ঞানীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথন, কখনো কখনো সূর্যাস্ত থেকে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তর্ক, ভাবের আদান-প্রদান, আলোচনা। কিন্তু, এই সমস্ত আলোচনায় তাঁকে তাঁর সৃজনী সাহিত্যের (ক্রিয়েটিভ লিটরেচারের) আঙ্গিকের (টেকনিকাল দিকের) আলোচনা করতে শুনিনি। যেমন 'বেলা'-র সঙ্গে 'খেলা' মিলের চেয়ে 'পূর্ণিমা সন্ধ্যায়'-এর সঙ্গে 'উদাসী মন ধায়' অনেক ভালো মিল, কিংবা তার চেয়ে অনেক বড় সাধারণতত্ত্ব—লিরিকে কি গুণ থাকলে কবি এমনই শব্দের সঙ্গে শব্দ বসাতে পারেন যার ফলে পাঠক শব্দ অর্থ ধ্বনি সব-কিছু পেরিয়ে অপূর্ব নবীন লোকে উপনীত হয়। তাঁর বহু বহু গান শুনে মনে হয়, এই যে অভূতপূর্ব শব্দ সম্মেলন, যার একটি মাত্র শব্দ পরিবর্তন করে অন্য শব্দ প্রয়োগ সম্পূর্ণ অসম্ভব—আর্টে এই পরিপূর্ণ সিদ্ধহস্তের কৃতিত্ব আসে কি প্রকারে? তিনি কোন্ পদ্ধতিতে এখানে এসে পৌঁছলেন? কিংবা কোনো সুচিন্তিত পূর্ব-পরিকল্পিত পদ্ধতি যদি না থাকে তবে অন্তত সে পরিপূর্ণতায় পৌঁছবার পক্ষে নূতন নূতন বাঁকে বাঁকে তিনি কি দেখলেন, কি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন?

বিষয়টি আমি খুব পরিষ্কার করে পেশ করতে পারলুম না, কিন্তু আমার মনে ভরসা আছে, যাঁরা শুধু পাঠক নন, কবিতা বা গল্প সৃষ্টি করেন, তাঁরা আমার বক্তব্যটি অনুমানে অনুভব করে নিয়েছেন।

অবশ্য শুনেছি, পরবর্তী যুগে কবি যখন তথাকথিত 'আধুনিক' কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গল্প-কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন তখন নাকি তিনি ঐ নিয়ে বিস্তর আলোচনা তর্ক-বিতর্ক করেন। তার বোধহয় অন্যতম কারণ, 'আধুনিক' কবিতার বহুলাংশ বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করে বলে তাই নিয়ে আলোচনা করা সহজ; পক্ষান্তরে আমি পূর্বে যে বিষয়ের উল্লেখ করেছি সেটা প্রধানত বুদ্ধির ধরাছোঁয়ার বাইরে।

এমন কি সঙ্গীতের রাগ-রাগিণী, ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গীতের ভিন্ন ভিন্ন প্রসাদগুণ এবং ঐ সম্পর্কে অন্যান্য নানা বিষয় তাঁকে আলোচনা করতে শুনেছি কিন্তু তিনি স্বয়ং যে তাঁর গানে শব্দ ও সুরের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যে পৌঁছলেন সেটা কি পদ্ধতিতে হল, তার ক্রমবিকাশের সময় কোন্ কোন্ দ্বন্দ্ব কিংবা সমস্যার সম্মুখীন হতে

হয়েছিল সে সম্বন্ধে বিশেষ কোনো আলোচনা করতে শুনিনি। আমি যে পাঁচ বৎসর এখানে ছিলুম, তখন তাঁকে বহু-বহুবার সঙ্গীতরাজ দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, খোশগল্প করতে শুনেছি, কিন্তু, যেমন মনে করুন, তাঁর প্রথম বয়সের অপেক্ষাকৃত কাঁচা কথাসুরের সম্মিলিত গান থেকে তিনি কি করে নিটোল গানের পরিপূর্ণতায় পৌঁছলেন সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করতে শুনি নি। স্বর্গত ধূর্জটিপ্রসাদ এবং শ্রীযুত দিলীপ রায়ের সঙ্গে তিনি সঙ্গীত নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন—এবং এখানকার শিক্ষক শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রীর সঙ্গে তো অহরহই হত—কিন্তু আমি এস্থলে যে বিষয়টির অবতারণা করেছি সেটি হত বলে জানি নে।

এবং এস্থলে আমার যদি ভুলও হয় তাতেও আমার মূল বক্তব্যের কোনো প্রকার ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। আমার মূল বক্তব্য: চিন্তার জগতে রবীন্দ্রনাথ কাদের সঙ্গে বিচরণ করতেন।

রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ পিতার মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পর (১৯০৫।৬) শান্তিনিকেতনে এসে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন পর্যন্ত স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনা করার পর থেকে রবীন্দ্রনাথ এখানেই মোটামুটি পাকাপাকিভাবে বাস করেন। সে-যুগে তাঁদের ভিতর কতখানি যোগাযোগ ছিল বলতে পারি না, কিন্তু ১৯২১ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত—অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর দুজনাতে একসঙ্গে বসে দীর্ঘ আলোচনা করতে কখনো দেখিনি। অথচ এ সত্য আমরা খুব ভালো করেই জানি, দ্বিজেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য, চরিত্রবল তথা বহুমুখী প্রতিভার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অতি অবিচল শ্রদ্ধা ছিল এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতাও রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভাকে অতিশয় সম্মানের চোখে দেখতেন। শুধু তাই নয়, আমি আশ্রমে কিংবদন্তী শুনেছি, দ্বিজেন্দ্রনাথ নাকি একদা এক আশ্রমাচার্যকে বলেন, 'আমাদের সকলেরই পা পিছলেছে, কিন্তু রবির কখনো পা পিছলায়নি।' অবশ্য স্মরণ রাখা উচিত, রবীন্দ্রনাথ প্রতি উৎসব দিনে, কিংবা বিদেশ থেকে আশ্রমে ফিরলে সেখানে প্রবেশ করা মাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রণাম করতে আসতেন। সামান্য যে দু-একটি কথাবার্তা হত তা অতিশয় আন্তরিকতার সঙ্গে। তা ছাড়া দ্বিজেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে ছোট্ট একটি কবিতা কিংবা অন্য ঐ ধরণের কোনো-কিছু একটা লিখে কবিকে পাঠিয়ে মতামত জানতে চাইতেন। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ভিন্ন অন্য কিছু রবীন্দ্রনাথকে প্রকাশ করতে শুনিনি।

রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হৃদ্যতা ছিল এ-কথা

সকলেই জানেন। এঁরা দুজনাই জীবনের শেষের ভাগ শান্তিনিকেতনের স্থায়ী বাসিন্দারূপে ছিলেন। তা ছাড়া লেভি, ভিনটারনিৎস, তুচ্চি, ফরমীকি, স্টেন-কোনো, মর্গ্যানস্টিয়ের্নে, কলিন্‌স্‌ বগদানফ[১] প্রভৃতির সঙ্গে তিনি ভারতীয় তথা পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে বহু ঘণ্টা, বহুদিনব্যাপী প্রচুর আলোচনা করেছেন, কখনো বা সভাস্থলে (প্রধানত 'বিশ্বভারতী সাহিত্যসভায়') কখনও স্বগৃহের বারান্দায়। আর্ট কি, রস ও অলঙ্কার নিয়ে তিনি সর্বাধিক আলোচনা করেছেন শ্রীমতী স্টেলা ক্রামরিশের সঙ্গে। নন্দলাল স্বল্পভাষী গুণী—বরঞ্চ অসিতকুমারের সঙ্গে ঐ নিয়ে তাঁর মুখর আলোচনা হত বেশী। অবশ্য এ-কথাও স্মরণ রাখা উচিত, আর্ট বলতে রবীন্দ্রনাথ কি বোঝেন নন্দলালই সেটি শুনেছেন বহু বৎসর ধরে এবং সবচেয়ে বেশী। এবং বৃদ্ধ বয়সে রবীন্দ্রনাথ যখন ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন তখন তাঁকে উৎসাহিত করেছেন নন্দলালই। নন্দলালই তাঁকে একাডেমিক আর্টের মরুপথে তাঁর ধারা হারাতে দেননি।

কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় সভ্যতা—ধর্মদর্শন কাব্য অলঙ্কার এ নিয়ে তিনি সবচেয়ে বেশী আলোচনা করেছেন দুটি পণ্ডিতের সঙ্গে: স্বর্গত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ক্ষিতিমোহন সেন। আলোচনা বললে অত্যন্ত কমই বলা হল। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার জগতে ঐতিহ্যগত ভারতীয় সংস্কৃতি কতখানি বিরাট জায়গা জুড়ে রেখেছিল সে-কথা আমরা সবাই জানি। বিধুশেখরের ছিল ঐ একমাত্র জগৎ। ক্ষিতিমোহন সেন সে-জগতে বাস করলেও দেশের গণধর্মের উৎপত্তি বিকাশের সত্য নির্ণয়ে তাঁর ছিল প্রবল অনুরাগ। এই তিনজনের জীবন এবং রচনাতে বার বার মনে হয়—এঁরা যেন অভিন্ন। অথচ যেন ত্রিমূর্তির তিনটি মুখ দেখছি। যেন বেদের উৎস থেকে তিনটি ধারা বেরিয়ে এসেছে অথচ তিনটি ধারাই আপন আপন পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভূগর্ভেও যেন একে অন্যের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করেছে। এস্থলে আমি অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি যে, বিষয়টি আমার পক্ষে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা কঠিন, কারণ এঁদের আলোচনা আমি শুনেছি অপরিণত বয়সে ও পরবর্তীকালে, এবং

---

১ এঁদের ছাড়া আরো বহু পণ্ডিতের নাম করতে হয়। তাঁদেরই একজন কোষকার স্বর্গত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি যৌবনকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শান্তিনিকেতনেই বসবাস করেন। অন্যজন ভগবদ্‌কৃপায় এখনো আমাদের মাঝখানে আছেন। গোস্বামীরাজ নিত্যানন্দবিনোদ। ইনি ১৯২০।২১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিস্তর শাস্ত্রালোচনা করেন।

আজও আমার সংহিতাজ্ঞান এতই যৎসামান্য যে, ত্রিমূর্তির এই লীলাখেলা আমি প্রধানত অনুভূতি দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করেছি, বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা বিশ্লেষণ—গবেষণা দ্বারা নয়। এস্থলে 'ত্রিধারা' 'ত্রিমূর্তি' বলার সময় আমি স্মরণে রেখেছি যে অনেকেই (যেমন 'ত্রিবেদী') চতুর্থ বেদ স্বীকার করেন না।

বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহন বাল্যবন্ধু, হয়তো বা সতীর্থ ছিলেন। উভয়েই কাশীতে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষালাভ ও সংস্কৃত চর্চা করেন। উভয়েই শাস্ত্রী।

বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহন উভয়েই অত্যুত্তম সংস্কৃত এবং পালি জানতেন।

এ স্থলে পালি ভাষার কথা বিশেষ করে উল্লেখ করতে হল। কারণ বৌদ্ধধর্ম তথা পালি ভাষার প্রতি সাধারণ সংস্কৃত পণ্ডিতের অনুরাগ থাকে না। পণ্ডিত-জনোচিত বিশেষজ্ঞ না হয়েও রবীন্দ্রনাথ এ দুটি ভাষাই জানতেন। পরবর্তী যুগে সংহিতা পাঠের সুবিধার জন্য বিধুশেখর জেন্দ-আবেস্তার ভাষা শেখেন।[২] ক্ষিতিমোহন গণধর্মের সন্ধানে হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠী প্রভৃতি অর্বাচীন ভাষা-গুলির প্রতি মনোনিবেশ করেন। বেদ উপনিষদে তিনজনারই অবাধগতি।

কিন্তু সংহিতাই বিধুশেখরের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, বিশেষ করে ঋগ্বেদ। রবীন্দ্র-নাথ তার অনুপ্রেরণা পেতেন উপনিষদ থেকে। এবং ক্ষিতিমোহনের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণ ছিল ভারতীয় গণধর্ম তথা ক্রিয়াকাণ্ডের সর্বপ্রাচীন ভাণ্ডার অথর্ববেদের প্রতি। আমি একাধিক পণ্ডিতের মুখে শুনেছি, ক্ষিতিমোহন যতখানি শ্রদ্ধাসহ, মনোযোগ সহকারে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অথর্ববেদ অধ্যয়ন করেছিলেন ততখানি এ-যুগে অন্য কোনো পণ্ডিতই করেননি। সংহিতায় সুপণ্ডিত বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ল্যুডার্সকে বলতে শুনেছি, অথর্ববেদ বড়ই অবহেলিত। তাঁর বিশ্বাস ছিল, পরবর্তী যুগের বহু রহস্যের সমাধান অথর্ববেদে আছে। অরবিন্দও নাকি এই মত পোষণ করতেন।

বিধুশেখর যখন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে যোগদান করেন তখন তিনি এই দৃঢ়বিশ্বাস নিয়েই আসেন যে, তিনি বৈদিক যুগের আশ্রমেই প্রবেশ করেছেন। এখানে বেদমন্ত্র পাঠ হয়, ব্রাহ্মণ সন্তান মাত্রই যজ্ঞোপবীতধারী, আমিষ পাদুকা আশ্রমে নিষিদ্ধ, ব্রহ্মচর্যের বহু ব্রত এখানে পালিত হয়, এবং গুরুশিষ্যের সম্পর্ক অতি

২ বিধুশেখরের পালি ও আবেস্তাচর্চা, ক্ষিতিমোহনের পালিচর্চায় রবীন্দ্র-নাথই প্রধান উৎসাহদাতা। হয়তো বা ভুল বলা হবে না, রবীন্দ্রনাথের আদেশেই বিধুশেখর আবেস্তাচর্চা আরম্ভ করেন।

এঁদের কাশীর সতীর্থ ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালও প্রথম দিকে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ছিলেন।—প্রকাশক।

প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যানুযায়ী। পাঠক এ যুগের ইতিহাস প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-জীবনীতে পাবেন।

বিধুশেখরের মত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এ-যুগে অল্পই জন্মেছেন। শুধু স্বপাকে ভক্ষণ, সন্ধ্যা আহ্নিক পালন তথা সশ্রদ্ধ বেদাধ্যয়নের কথা নয়—বাহ্যিক শুচি অশুচিতে পার্থক্যও তিনি করতেন অনায়াসে অবহেলে, কিন্তু তাঁর সর্বপ্রধান প্রচেষ্টা ছিল অন্তর্জগৎকে পরিপূর্ণ শুচিশুদ্ধ পবিত্র করার। তাঁর আদর্শ ছিল তাঁর কল্পনার ব্রহ্মচর্যাশ্রম এবং তাঁর কল্পনার আচার্য—অনাসক্ত পূত পবিত্র।

ক্ষিতিমোহনও নিষ্ঠাবান বৈদ্য-সন্তান। কিন্তু তাঁর সামাজিক আচার ব্যবহার ছিল অনেকটা বিবেকানন্দের মত।

আশ্রমে যতদিন বারো বৎসরের বেশী বয়স্ক ছাত্র নেওয়া হত না ততদিন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের রীতিনীতি পালন করা কঠিন হলেও অসম্ভব ছিল না। ইতিমধ্যে মহাত্মা গাঁধী কিছুদিনের জন্য আশ্রম পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করে দেখিয়ে দিলেন, এতদিন আশ্রমবাসীরা যে জীবন কৃচ্ছ্রসাধনময় ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করছিলেন সেটা বাস্তবিক বিলাস পরিপূর্ণ। আশ্রমের মেথর চাকর বিদায় দিয়ে তিনি এখানে যে বিপ্লবের সূত্রপাত করলেন সেটা এখানকার অনেক গুরুর পক্ষে অসহনীয় হয়ে দাঁড়াল। ফলে গাঁধী সাবরমতী চলে গেলেন। আশ্রমও ধীরে ধীরে তার রূপ পরিবর্তন করতে লাগল।

বিধুশেখর তবু তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমাদর্শে আকণ্ঠ আলিঙ্গনাবদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'হ্যারিকেন লণ্ঠন যখন আশ্রম ব্যবহার করছে, বিজলিই বা করবে না কেন?'

বিধুশেখর বললেন, 'রেড়ির তেলে আমি সানন্দে ফিরে যাব। হ্যারিকেন আর রেড়ির তেল প্রায় একই—বিজলির তুলনায়। বিজলি আনবে বিলাস। তার সর্বনাশের সর্বশেষ সোপান আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

পাঠক ক্ষণতরে ভাববেন না, বিধুশেখর সঙ্কীর্ণচেতা কূপমণ্ডুক ছিলেন। তাঁর প্রতি এর চেয়ে নির্মম অবিচার আর কিছুই হতে পারে না। ব্যক্তিগত জীবনে খৃষ্টান পাদ্রী এণ্ড্রুজ যাঁর অন্তরঙ্গ সখা, ব্রহ্মমন্দিরের আচার্যের আসনে বসে যিনি মুগ্ধ কণ্ঠে 'যবন' ইমাম গজ্জালীর 'কিমিয়া সাদৎ' (সৌভাগ্য-স্পর্শমণি) আবৃত্তি করে ব্রহ্মলাভের পন্থা-বর্ণনা করছেন, যিনি মৌলানা শওকৎ আলীকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে আশ্রম ভোজনাগারে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি যদি সঙ্কীর্ণচেতা হন তবে প্রার্থনা করি সর্বভারতবাসী যেন এ রকম সঙ্কীর্ণচেতা হয়।

বিধুশেখর না থাকলে যে রবীন্দ্রনাথ রাতারাতি ব্রহ্মবিদ্যালয়কে অক্সফর্ডে

পরিণত করতেন তা নয়। বিধুশেখর ছিলেন প্রাচীন ভারতের মূর্তমান প্রতীক। তাঁর সন্তুষ্টি থাকলে রবীন্দ্রনাথ আপন কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন হতে পারতেন। এবং যখনই তিনি বিধুশেখরকে—তা সে যত অল্পই হোক না কেন—আপন মতে টেনে আনতে পারতেন তখনই তাঁর মনে হত তিনি যেন ঐতিহ্যবদ্ধ ভারতকে, তার ধর্ম থেকে তাকে বিচ্যুত না করে, বর্তমান প্রাচীন সংসারের বিশ্ব-নাগরিকরূপে তার প্রাপ্য আসন নির্দিষ্ট করে দিতে পেরেছেন।

এই বিশ্বনাগরিক হওয়ার জন্য বিশ্বভারতীর সৃষ্টি।

পূর্বেই বলেছি, আশ্রম যতদিন বারো বৎসরের বেশী বয়স্ক ছাত্র নিত না ততদিন ব্রহ্মচর্যাদর্শ সম্মুখে রাখা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু ব্রহ্মচর্যাশ্রম যখন বিশ্ব-ভারতীতে রূপান্তরিত হল (ইস্কুলের সঙ্গে কলেজও যুক্ত হল) তখন পূর্ণবয়স্ক কিশোর ও যুবাকেও গ্রহণ করতে হয়। এই বিশ্বভারতী নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের প্রধান উৎসাহদাতা ও সচিব ছিলেন বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহন (সঙ্গীতে দিনেন্দ্রনাথ, চিত্রে নন্দলাল)। রবীন্দ্রনাথ যখন বললেন, 'এই শান্তিনিকেতনে প্রাচ্য প্রতীচ্যের গুণীজ্ঞানীরা একত্র হবেন' সঙ্গে সঙ্গে বিধুশেখর সংস্কৃত থেকে উদ্ধার করে দিলেন, 'যত্র বিশ্ব ভবত্যেকনীড়ম্'।

বিধুশেখরের আনন্দের সীমা নেই। এতদিন আশ্রম বালক তাঁর কাছ থেকে সন্ধি-সমাস পূর্ণরূপে আয়ত্ত করার পূর্বেই 'অর্ধস্নাতক' অবস্থায় আশ্রম ত্যাগ করতো, এখন ভারতের সর্ব খণ্ড থেকে আসতে লাগল প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রছাত্রী। এরা লুপ্তপ্রায় যাস্কের 'নিরুক্ত' অধ্যয়নে উদ্‌গ্রীব, বিধুশেখরেরই সম্পাদিত ও অনূদিত পালি গ্রন্থ 'মিলিন্দা পঞ্হো' থেকে তাঁকে বহুতর 'পঞ্হো' (প্রশ্ন) শুধায়। বিধুশেখরের আনন্দ উচ্ছলিত হয়ে উপচে পড়ছে। এইবারে সত্য জ্ঞানচর্চা হবে। এইবারে তিনি তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে দিতে পারবেন।

কিন্তু হায়, এই সব ছাত্রছাত্রীর অনেকেই তো ব্রহ্মচর্যে বিশ্বাস করে না। এমন কি এদের ভিতর 'নাস্তিক' 'চার্বাকপন্থী'ও একাধিক ছিল। খৃষ্টান মুসলমানও ছিল। এদের কেউ কেউ সমবেত উপাসনায় বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে অনিচ্ছুক। খৃষ্টান ছেলেটির আপত্তি ছিল না কিন্তু সেই 'চার্বাকপন্থী' তাকে বোঝালে খৃষ্টানের সর্বপ্রার্থনা যীশুর মারফৎ পাঠাতে হয়, বেদমন্ত্রে তা হয় না ; এবং মুসলমানকে আল্লা রসুলের দোহাই দিলে। খৃষ্টান ধাঁধায় পড়লো, মুসলমান বললে, পাঁচ বেকৎকে সাত বেকৎ করতে তার আপত্তি নেই, কিন্তু বেদমন্ত্রদ্বারা উপাসনা করছে এ-খবর পেলে তার পিতা অসন্তুষ্ট হবেন।

নাচার অধ্যক্ষ বিধুশেখর সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলেন পাদ্রী এণ্ড্রুজের হাতে।

এণ্ড্রুজ আবেগ-ভরা কণ্ঠে বিশ্বমানবিকতার শপথ নিয়ে বেদমন্ত্রের সর্বজনীনতা ব্যাখ্যা করলেন। আস্তিক নাস্তিক সকলেই সসম্ভ্রম নতমস্তকে তাঁর বক্তব্য শুনলো। কিন্তু সংশয়বাদী তথা নাস্তিকদের মত-পরিবর্তন হল না।

রবীন্দ্রনাথ ছাত্রছাত্রীদের সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে বাধ্য করলেন না।

ক্ষিতিমোহন সমাজে সংস্কারমুক্ত ছিলেন বলে কেউ যেন মনে না করেন—তিনি শুচি অশুচির পার্থক্য করতেন না। কিন্তু তাঁর কষ্টিপাথর মনু এমন কি ঋগ্বেদ থেকেও তিনি আহরণ করেননি। বেদ থেকে নিশ্চয়ই, কিন্তু সেটি আয়ুর্বেদ। একে তিনি বৈদ্যকুলোদ্ভব, তদুপরি তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন ; আহারবিহার তিনি তাই আয়ুর্বেদসম্মত পদ্ধতিতেই করতেন।

প্রাচীন অর্বাচীন নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। উপনিষদের বাণীর সন্ধান তিনি অহরহ পাচ্ছেন আউল-বাউলে। আবার আউল-বাউলের আচার-আচরণ তিনি পাচ্ছেন অথর্ববেদে। তাঁর সম্মুখে বহু পন্থা, তিনি সব ক'টিতেই বিশ্বাস করেন।

তিনি ছিলেন বিধুশেখর ও রবীন্দ্রনাথের মাঝখানে সেতুস্বরূপ—এণ্ড্রুজ যে রকম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গাঁধীর মাঝখানে। তিনি এ যুগে সনাতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের 'অসম্ভব' আদর্শে বিশ্বাস করতেন না, আবার সখা বিধুশেখরের নিষ্ঠায় শ্রদ্ধাবান ছিলেন বলে তাঁকে সমর্থন করতে পারলে আনন্দিত হতেন। বিশ্বভারতীর আদর্শ, তার ধ্যানলোকের ঐতিহ্যের সন্ধানে বিধুশেখর শরণ নিতেন ঋগ্বেদের, আশ্রমের পাল-পার্বণের জন্য মন্ত্রসন্ধানে ক্ষিতিমোহন যেতেন অথর্ববেদে।

আজ বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থদানের উপর নির্ভর করে, কিন্তু তার মূল্য যতই হোক না কেন, বিধুশেখর ক্ষিতিমোহন যে মূলধন তাঁদের গুরুদেবের পদপ্রান্তে রেখেছিলেন তার উপর নির্ভর করে চিন্ময় মৃন্ময়—ধ্যানে এবং কর্মকাণ্ডে—অদ্যকার ব্রহ্মচর্যাশ্রম-বিশ্বভারতী। অদ্য বাব্দশতান্তে সে যতই পরিবর্তিত হোক না কেন, এঁদের কাছে বিশ্বভারতী চিরঋণী।

রাষ্ট্রভাষা

॥ ১ ॥

ভারতবর্ষের সবাই যদি এক ভাষায় কথা বলত তাহলে সব দিক দিয়ে আমাদের যে কত সুবিধে হত সে-কথা ফলিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। শুধু যে কাজ-কারবারের মেলা বখেড়ার ফৈসালা হয়ে যেত তাই নয়, একই ভাষার ভিত্তিতে আমরা অনায়াসে নবীন ভারতীয় সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্যের ইমারৎ গড়ে তুলতে পারতুম। মালমসলা আমাদের বিস্তর রয়েছে তাই সে ইমারৎ বাইরের পাঁচটা দেশের শাবাশীও পেত।

এ তত্ত্বটা নূতন নয়। কিন্তু একই ভাষার ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক ইমারৎ গড়ে তুলতে গেলেই এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে করজোড়ে স্বীকার করছি আমার জীবনে আমি যত দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছি তার মধ্যে এটাই আমাকে সবচেয়ে বেশী কাবু করেছে—এ দ্বন্দ্বের সমাধান আমি কিছুতেই করে উঠতে পারিনি। বিচক্ষণ পাঠক যদি দয়া করে এ-অধমকে সাহায্য করেন।

বৈদিক সভ্যতাসংস্কৃতি একটিমাত্র ভাষার উপরই খাড়া ছিল সেকথা আমরা জানি তার কারণ সে যুগে আমরা ভারতবর্ষে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়েননি এবং দ্বিতীয়তর অনার্যদের সঙ্গে তাঁদের ব্যাপক যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি বলে সে ভাষাতে পরিবর্তন পরিবর্ধন অতি অল্পই হয়েছিল।

প্রভু বুদ্ধের যুগ আসতে না আসতেই দেখি, সে-ভাষা আর আপামর জন-সাধারণ বুঝতে পারছে না। যতদূর জানা আছে, প্রভু বুদ্ধ তাঁর নবীন ধর্ম প্রচারের জন্য বৈদিক ভাষা কিংবা সে ভাষার তৎকালীন প্রচলিত রূপের শরণ নেননি। তিনি তৎকালীন সর্বজনবোধ্য ভাষার স্মরণ নিয়েছিলেন—সে ভাষাকে প্রাকৃত বলা যেতে পারে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম কিংবা ব্রাহ্মণ্য ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তিনি যে বিহারে প্রচলিত তৎকালীন সর্বজনবোধ্য ভাষার স্মরণ নিয়েছিলেন তা নয়, কারণ সকলেই জানেন বুদ্ধদেব 'ব্রাহ্মণ-শ্রমণ' এই সমাস বার বার ব্যবহার করেছেন, উভয়কে সমান সম্মান দেখাবার জন্য। জনপদ ভাষা যে তিনি ব্যবহার করেছিলেন তার একমাত্র কারণ বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের অন্যতম সর্বপ্রথম গণ-আন্দোলন এবং গণ-ভাষার প্রয়োগ ব্যতীত গণ-আন্দোলন সফল হতে পারে না।

এস্থলে লক্ষ্য করবার বিষয় বিহারের আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহার করাতে বুদ্ধদেব সর্বভারতের পণ্ডিতজনবোধ্য ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তিনি তাতে বিচলিত হননি।

ঠিক একই কারণে মহাবীর জিনও আঞ্চলিক উপভাষার শরণ নিয়ে অর্ধ মাগধীতে আপন বাণী প্রচার করেন। শাস্ত্রীয় মতবাদ এবং জীবহত্যা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ মতানৈক্য বাদ দিলে বৌদ্ধ ও জৈন গণ-আন্দোলন একই রূপ একই গতি ধারণ করেছিল।

অশোকস্তম্ভে উৎকীর্ণ ভাষাও সংস্কৃত নয়।

তারপরের বড় আন্দোলন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব আনয়ন করেন। তিনিও প্রধানত সর্বজনবোধ্য বাঙলার শরণ নিয়েছিলেন—যদিও তাঁর সংস্কৃতজ্ঞান সে যুগের কোনো পণ্ডিতের চেয়ে কম ছিল না। পশ্চিম ও উত্তর ভারতেও তুকারাম মারাঠী ব্যবহার করেন। কবীর দাদু প্রভৃতি সাধকেরা হিন্দী ব্যবহার করেন। কবীর বললেন, "সংস্কৃত কূপজল," সে জল কূয়ো থেকে বের করে আনতে হলে ব্যাকরণ অলঙ্কারের লম্বা দড়ির প্রয়োজন কিন্তু "ভাষা" (অর্থাৎ সর্বজনবোধ্য প্রচলিত ভাষা) "বহতা নীর"—সে জল বয়ে যাচ্ছে, যখন তখন ঝাঁপ দিয়ে শরীর শান্ত করা যায়। আর তুকারাম বললেন, "সংস্কৃত যদি দেবভাষা হয় তবে মারাঠী কি চোরের ভাষা?"

তার পরের গণ-আন্দোলন মহাত্মা গান্ধী আরম্ভ করেন। তিনি যদিও জনগণের ভাষা হিন্দীর শরণ নিয়েছিলেন তবু লক্ষ্য করার বিষয় যে, অসহযোগ আন্দোলন বাঙলা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, কেরালায় হিন্দী কিংবা ইংরিজির মাধ্যমে আপামর জনসাধারণে প্রসারলাভ করেনি; জনগণ যে সাড়া দিল সে বাঙলা, তামিল, তেলুগু, মালয়ালাম ভাষার মাধ্যমে—অসহযোগ আন্দোলন প্রচার করার ফলে। বারদলই সত্যাগ্রহের প্রধান বক্তা ছিলেন বল্লভভাই পটেল। তিনি যে অদ্ভুত তেজস্বিনী গুজরাতি ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন সে ভাষা অনায়াসে সাহিত্যের পর্যায়ে ওঠে। বল্লভভাইয়ের গুজরাতির সঙ্গে তাঁর হিন্দীর কোনো তুলনাই হয় না।

এতক্ষণ ধরে যে ঐতিহ্যের বর্ণনা দিতুম সে শুধু ভারতের সীমাবদ্ধ নয়। প্রভু খৃষ্ট সাধু এবং পণ্ডিতী ভাষা হীব্রুতে তাঁর ধর্ম প্রচার করেননি। তাঁর প্রথম ও প্রধান শিষ্যদের বেশীর ভাগই ছিলেন অতি সাধারণ জেলে। তাঁর প্রচারকার্য এঁদের নিয়েই আরম্ভ হয় বলে তিনি তাঁর বাণী প্রচার করেছিলেন গ্যালিলি-নাজারেৎ অঞ্চলবোধ্য আরামেইক উপভাষায়। মহাপুরুষ মহম্মদও যখন আরবীর

মাধ্যমে আল্লার আদেশ প্রচার করলেন তখন আরবী ভাষা ছিল পৌত্তলিকদের 'না-পাক' ভাষা, এবং সে ভাষায় ধর্ম প্রচারের কোনো ঐতিহ্য ছিল না। ইসলামের ইতিহাসে লেখা আছে মহাপুরুষ মুহম্মদের ঈষৎ পূর্বে এবং তাঁর সমবর্তীকালে মক্কাবাসীদের যাঁরা সত্য পথের অনুসন্ধান করতেন তাঁরা হীব্রু শিখে সে ভাষায় ধর্মগ্রন্থ পড়তেন। তাই যখন মহাপুরুষ হীব্রুর শরণাপন্ন না হয়ে আরবীর মাধ্যমে ধর্মপ্রচার করলেন তখন সবাই তাজ্জব মেনে গেল। তার উত্তরে আল্লাই কুরান শরীফে বলেছেন, তাঁর প্রেরিত পুরুষ যদি আরব হয় তবে প্রচারের ভাষা আরবী হবে না তো কি হবে? আর আরবী না হলে সবাই বলত, "আমরা তো এসব বুঝতে পারছি নে"।

লুথারও পোপের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন জর্মনের পক্ষ নিয়ে—পণ্ডিতী লাতিন তিনি এই বলেই অস্বীকার করেছিলেন যে সে-ভাষার সঙ্গে আপামর জনসাধারণের কোনো যোগসূত্র ছিল না।

মোদ্দা কথা এই, এ পৃথিবীতে যত সব বিরাট আন্দোলন হয়ে গিয়েছে—তা সে নিছক ধর্মান্দোলনই হোক আর ধর্মের মুখোশ পরে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আন্দোলনই হোক—তার সব কটাই গণ-আন্দোলন এবং গণ-আন্দোলন সর্বদাই আঞ্চলিক গণভাষার মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করেছে।*

॥ ২ ॥

রাষ্ট্রভাষার যে প্রয়োজন আছে সে সত্য তর্কাতীত, কিন্তু প্রশ্ন সে ভাষা গণ-আন্দোলন উদ্বুদ্ধ করতে পারবে কি না? যাঁরা মনে করেন, স্বরাজ লাভ হয়ে গিয়েছে এখন আর গণ-আন্দোলনের কোনো প্রয়োজন নেই তাঁরা হয় মারাত্মক ভুল করছেন নয় ভাবছেন দেশের জনগণ তাঁদের জন্য পায়ের ঘাম মাথায় ফেলে খাটবে আর তাঁরা শহরে শহরে দিব্য খাবেন দাবেন আর কেউ কোনো প্রকারের তেরীমেরী করলে ডাণ্ডা উঁচিয়ে ভয় দেখাবেন এবং তাইতেই সব কুছ বিলকুল ঠাণ্ডা হয়ে থাকবে।

সেটি হচ্ছে না, সেটি হবার জো নেই। যে জনসাধারণকে একদা স্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন করে স্বরাজের জন্য লড়ানো হল তাদের এখন ডেকে আনতে হবে রাষ্ট্রনির্মাণ কর্মে। তারা যদি ভারতীয় রাষ্ট্রকে আপন রাষ্ট্র বলে চিনতে না পারে,

* রাষ্ট্রভাষার সপক্ষে বিপক্ষে যে ক'টি যুক্তি আছে, সব কটিরই আলোচনা করা এ প্রবন্ধমালার উদ্দেশ্য—লেখক।

সে রাষ্ট্রের প্রতি যদি তাদের আত্মীয়তাবোধ না জন্মে তবে নানাপ্রকারের বিপদের সম্মুখীন হতে হবে—তার ফিরিস্তি দেবার প্রয়োজন নেই। পাড়ার কম্যুনিস্টকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন—সে সব বাৎলে দেবে।

এখন প্রশ্ন, কোন ভাষার মাধ্যমে আমরা জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত হব? বেশির ভাগ লোকই স্বীকার করে নিয়েছেন পাঠশালাতে মাত্র একটি ভাষা শেখানো হবে—অর্থাৎ হিন্দী যে সব অঞ্চলের আপন ভাষা সেগুলো বাদ দিয়ে আর সর্বত্র মাত্র প্রাদেশিক ভাষাটিই শেখানো হবে। অর্থাৎ বাঙলা, উড়িষ্যা, অন্ধ্র অঞ্চলের পাঠশালাগুলোতে ছেলেমেয়েরা সুদ্ধ আপন আপন মাতৃভাষা শিখবে। ভারতবর্ষ থেকে নিরক্ষরতা কবে দূর হবে জানি নে, তবে আশা করি সকলেই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, নিরক্ষরতা দূর হওয়ার বহু বৎসর পর পর্যন্ত এ দেশের শতকরা ৭০টি ছেলেমেয়ে পাঠশালাতেই লেখাপড়া শেষ করবে—এবং শিখবে শুধু মাতৃভাষা।

বাদবাকীরা হিন্দী শিখবেন—সে হিন্দী জ্ঞান কতটা হবে তার আলোচনা পরে হবে—এবং ক্রমে ক্রমে অতি অল্প সংখ্যক লোকই ইংরিজি শিখবেন, আজকের দিনে চীন কিংবা মিশরের লোক যে অনুপাতে ইংরিজি শেখে।

রাষ্ট্রভাষা সর্বভারতে চালু করনেওয়ালারা বলেন, আজ ইংরিজি ভাষা যে রকম ব্যবহৃত হচ্ছে একদিন হিন্দী তার আসনটি নিয়ে নেবে অর্থাৎ যাবতীয় রাজকার্য, মামলা-মোকদ্দমার তর্কাতর্কি, রায়, আপিল, বড় বড় ব্যবসা বাণিজ্য, পার্লিমেণ্টে বক্তৃতা ঝাড়া ইত্যাদি তাবৎ কর্ম হিন্দীতে হবে। কলকাতা তথা অন্ধ্র, তামিলনাড়ু বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দীর মাধ্যমে জ্ঞানদান হবে কি না সে সম্বন্ধে অনেকেরই মনে ধোঁকা রয়ে গিয়েছে তবে কট্টর রাষ্ট্রভাষীদের বাসনা যে তাই সে সম্বন্ধে খুব বেশি সন্দেহ নেই।

তাহলে অনায়াসে ধরে নিতে পারি ইংরেজ আমলে যে রকম আমাদের বেশীর ভাগ ভালো লেখকেরা সভ্যতা সংস্কৃতি সম্বন্ধে ইংরিজিতে বই লিখতেন (রাধাকৃষ্ণনের ইণ্ডিয়ান ফিলসফি থেকে পণ্ডিতজীর ডিস্‌কভারি অব্‌ ইণ্ডিয়া ইস্তেক) ঠিক তেমন আমাদের ভবিষ্যতের শক্তিশালী লেখকেরা তাঁদের প্রচেষ্টা নিয়োগ করবেন হিন্দীর মাধ্যমে এবং যে সৎসাহিত্য—গল্প উপন্যাস কবিতাই সাহিত্যের একমাত্র কিংবা প্রধান সৃষ্টি নয়—হিন্দীতে গড়ে উঠবে সেটা, বাঙলা, তামিল, গুজরাতি সাহিত্য-সৃষ্টি-প্রচেষ্টার খেসারতি দিয়ে। এতদিন যে ভারতীয় ভাষাগুলিতে নানামুখী সৃষ্টিকার্য প্রসার এবং প্রচার লাভ করতে পারছিল না তার জন্য আমরা প্রাণভরে ইংরিজির জগদ্দল পাথরকে গালমন্দ করেছি এখন হিন্দীর চাপে

সেই একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, কিন্তু হয়ত গালমন্দ করার অধিকার থাকবে না। পূর্ববঙ্গে যখন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে চালু করবার চেষ্টা হয়েছিল তখন আমি অন্যান্য যুক্তির ভিতর এইটিও পেশ করে তীব্রকণ্ঠে আপত্তি জানিয়েছিলুম এবং বহু পূর্ববঙ্গবাসী আমার যুক্তিতে সায় দিয়েছিলেন।

আমাদের প্রাদেশিক সাহিত্যের যে ক্ষতি হবে সে কথা এখন থাক। উপস্থিত মোদ্দা কথা হচ্ছে এই, ভারতীয় নবীন রাষ্ট্রনির্মাণ সম্বন্ধে গবেষণা, আলোচনা, তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ যেসব গ্রামভারী কেতাব, ব্লু বুক, দলিল-দস্তাবেজ, উৎসাহোদ্দীপক ওজস্বিনী এবং গম্ভীর পুস্তক রচিত হবে সেগুলো হবে হিন্দীতে এবং দেশের শত-করা সত্তরজন লোক গ্রামে বসে সেগুলো পড়তে পারবে না।

একদা এই সত্তরজন লোকের প্রয়োজন হয়েছিল ইংরেজকে তাড়াবার জন্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র এই সত্তরজনকে বাদ দিয়ে নির্মাণ করা যাবে না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাবৎ কেতাব বাঙলাতে লিখলেই কি এরা সেগুলো পড়ে বুঝতে পারবে? সে সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে। আমার বিশ্বাস দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় সব সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া ছাপের উপর নির্ভর করে না। এমন সব ইংরিজি অনভিজ্ঞ, অর্থাৎ সুদ্ধ বাঙলা-ভাষী পাঠশালার পণ্ডিত আছেন, যাঁরা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন আছেন বলে এবং বাংলা দৈনিকের মারফতে অতি অল্প যে রাষ্ট্রসংবাদ পান তারই জোরে গ্রাজুয়েটকে তর্কে ঘায়েল করতে পারেন। অনেক এম. এ. পাস লোক বই জমায় না—জমালে জমায় চেক বুক—আর অনেক পাঠশালার পণ্ডিত গোগ্রাসে যে কেতাব পান তাই গেলেন। পুনরায় নিবেদন করি, জ্ঞানতৃষা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির উপর নির্ভর করে না।

তাই দেখতে হবে আমাদের রাষ্ট্রনির্মাণ প্রচেষ্টার সর্বসংবাদ যেন এমন ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় যে ভাষা মানুষের মাতৃভাষা। ইংরেজ আমলে ইংরিজি জাননেওয়ালা ও না-জাননেওয়ালার মধ্যে যে ন্যক্কারজনক কৌলীন্যের পার্থক্য ছিল সেটা যেন আমরা জেনেশুনে আবার প্রবর্তন না করি।

॥ ৩ ॥

সুশীল পাঠক, মাঝে মাঝে ধোঁকা লাগে, রাষ্ট্রভাষা নিয়ে এই যে আমি হপ্তার পর হপ্তা দাপাদাপি করছি তাতে তুমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠছ না তো? আমি তো হয়ে গিয়েছি কিন্তু বিষয়টি বড্ডই গুরুত্বব্যঞ্জক এবং আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষের শুধু রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ এর উপর নির্ভর করছে না, আমাদের অতীত

ঐতিহ্য, আমাদের ভবিষ্যৎ বৈদগ্ধ্য সংস্কৃতি সব কিছুই এর উপর নির্ভর করছে। একবার যদি ভুল রাস্তা ধরি তবে আমড়াতলার মোড়ে ফিরে আসতেই আমাদের লেগে যাবে বহু যুগ এবং তখন আবার নূতন করে সব কিছু ঢেলে সাজাতে গিয়ে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। আজকের দিনে পৃথিবীতে কেউ বসে নেই—তখন দেখতে পাবেন, আর সবাই এগিয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ রাজনীতিতে আপনি অমুক দেশের ধামাধরা হয়ে আছেন, অর্থনীতিতে আপনি আর এক মুল্লুকের কাছে সর্বস্ব বিকিয়ে দিয়েছেন এবং কৃষ্টি সংস্কৃতিতে নিরেট হটেন্‌টট বনে গিয়েছেন।

কেন্দ্রের ভাষা যে হিন্দী হবে সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কেন্দ্রীয় পরিষদের ভাষা হবে কি? অর্থাৎ প্রশ্ন, পার্লিমেণ্টে সদস্যেরা বক্তৃতা দেবেন কোন্ ভাষায়?

হিন্দীওলারা হিন্দীতে দেবেন—বাঙলা কথা। কিন্তু তামিল-ভাষীরা দেবেন কোন্ ভাষায়?

এতদিন একদিক দিয়ে আমাদের কোন বিশেষ হাঙ্গামা ছিল না। সব প্রদেশের সদস্যরা ইংরিজিতে বক্তৃতা দিতেন—অথচ কারোরই মাতৃভাষা ইংরিজি ছিল না বলে অহেতুক সুবিধা কেউই পেত না। এবং যে সুবিধাটা পেত ইংরেজ রাজসম্প্রদায় এবং তারা যে সে সুযোগটা ন'সিকে কাজে লাগাত সেকথাও সবাই জানেন।

এখন অবস্থাটা হবে কি? কেঁদে-ককিয়ে যেটুকু হিন্দী শিখব তার জোরে কি পার্লিমেণ্টে বক্তৃতা ঝাড়া যায়? পূর্বেই নিবেদন করেছি, হিন্দীকে যদি তিরু অনন্তপুরম (ত্রিভান্দরম) কিংবা বিশাখাপট্টনম (ভাইজাগ্) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম করা হয় (কলকাতা কিছুতেই মানবে না, সে আপনি আমি বিলক্ষণ জানি) তবে তাদের আখেরটি ঝরঝরে হয়ে যাবে। অতএব অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, কেরালার লোক দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে যেটুকু হিন্দী শিখবে—(সবাই শিখবে তাও নয়, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার নাও শিখতে পারে)—তা দিয়ে কি সে হিন্দী-ভাষীদের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ চালাতে পারবে?

দু দণ্ড রসালাপ সব ভাষাতেই করা যায়। 'আমি তোমায় ভালবাসি', 'জ্যা ত্যেম্', 'ইয লীবে ডীয'—আহা এসব কথা দেখতে না দেখতেই শিখে ফেলা যায়। মদন যেস্থলে গুরু, সখা কন্দর্পও হয়ত মজুত, কালটি মধুমাস, উর্বশী দু চক্কর নাচভী দেখিয়ে দিচ্ছেন, তার মধ্যিখানে সবাই এক লহমায় হরিনাথ দে হয়ে যান। কিংবা বলতে পারেন, সেখানে ভাষার দরকারই বা কি—কোন্ প্রয়োজন মধুর ভাষণের?

কিন্তু পার্লামেণ্টে তো মানুষ রসালাপ করতে যায় না। সেখানে লাগে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত, চিন্তাধারা চিন্তাধারায় টক্কর লেগে 'উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি', বজেটকে বাক্যবাণে জর্জরিত করতে হয় যেখানে—সেখানে 'করেঙ্গা, খায়েঙ্গা' হিন্দী দিয়ে কাজ চলে না। আমাদের বাঙাল দেশে বলে 'ছাগল দিয়ে হাল চালাবার চেষ্টা করো না।'

বিচক্ষণ পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, ঘড়েল প্যাসেঞ্জার কক্‌খনো, অর্থাৎ 'কাইট্যা ফালাইলে'ও বেহারী মুটের সঙ্গে ভাড়া নিয়ে তর্ক করার সময় হিন্দী বলে না। কারণ সে একখানা বলতে না বলতে মুটে ঝেড়ে দেবে পাঁচখানা পুরো পাঁচালী এবং লক্ষ্য করেছ, মুটেও ততোধিক ঘড়েল—দিব্য বাঙলা জানে, কিন্তু মেশিন গান চালাচ্ছে তার বিহারী হিন্দী 'করত, খাওত,' আর 'ভজলু কী বহিনিয়া ভগলু কী বেটিয়া'র ভাষা দিয়ে।

অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শেখা ভাষা দিয়ে কোনো মরণ-বাঁচনের ব্যাপারে তর্কাতর্কি করা যায় না। সে ভাষা দিয়ে বই পড়ে জ্ঞান আহরণ করা যায়—ব্যস্।

আরেকটা উদাহরণ দি। ইংলণ্ড যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি পৌণ্ড খর্চা করেছে ইংরেজ ছোকরাদের ফরাসী শেখাবার জন্য—দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে। অথচ দশ হাজার ইংরেজ যদি প্যারিস বেড়াতে আসে তবে দশটা ইংরেজও ফরাসী বলতে পারে না।

সে এক হৃদয়-বিদারক দৃশ্য। বাপ, মা, ম্যাট্রিক-পাস ব্যাটা নাবলেন ক্যালে বন্দরে। ইস্টিমারে ইংরিজি চলে, কোনো অসুবিধা হয়নি। ক্যালেতেও হবে না, বাপ-মায়ের দৃঢ় বিশ্বাস, কারণ ছেলে ম্যাট্রিকে ফরাসীতে গোল্ড মেডেল পেয়েছে। বাপ প্রতাপ রায়ের মত ছেলে বরজলালকে হেসে বললেন, 'জিজ্ঞেস কর তো বাবাজী, পোর্টারটাকে—প্যারিসের ট্রেন কটায় ছাড়বে?'

ছেলে প্রমাদ গুনছে। বরজলালেরই মত আপন ফরাসী ভাষার গুরুকে স্মরণ করে ক্ষীণ কণ্ঠে যখন পোর্টারকে বিদঘুটে উচ্চারণে জিজ্ঞেস করল, 'আকেল আর পার লা এ্যাঁ পুর পারি?' তখন পোর্টার মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে হাঁ করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, তারপর মিনিট তিনেক ঘাড় চুলকে চুলকে ভেবে নিলে। হঠাৎ মুখে হাসি ফুটল। চিৎকার করে আরেকটা পোর্টারকে ডাক দিয়ে বললে, 'এ, জ্যাঁ ভিয়ানিসি, ওয়ালা আঁ মসিয়ো কি পার্ল লাংলে।' 'এই জন, এদিকে আয়, এক ভদ্রলোক ইংরিজি বলছেন। বুঝতে নারনু।'

হায়, কিন্তু বেচারা ফাঁকি দিয়ে গোল্ড মেডেল মারেনি। ফরাসী ব্যাকরণ

তার কণ্ঠস্থ, পাস্ট কণ্ডিশনাল, ফ্যুচার সবজনকটিত তার নখাগ্রদর্পণে—কিন্তু ফরাসী জাতটাই নচ্ছার, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিদেশীর মুখে ভুল উচ্চারণে আপন ভাষার শব্দরূপ ধাতুরূপ শুনতে কিছুতেই রাজী হয় না!

* * *

কিন্তু পাঠক নিরাশ হবেন না। পার্লিমেণ্টে বক্তৃতার ভাষা-সমস্যা সমাধান করা যায়। পরে নিবেদন করব।

॥ ৪ ॥

ভারতের ভবিষ্যৎ বৈদগ্ধ্য সংস্কৃতি কি রূপ নেবে, সে সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হলেই দেখতে পাই অনেকেই মনে মনে আশা পোষণ করছেন, সে বৈদগ্ধ্য যেন ঐক্যসূত্রে তাবৎ প্রদেশগুলোকে সম্মিলিত করে নব নব বিকাশের দিকে ধাবিত হয়। এ অতি উত্তম প্রস্তাব এবং এতে কারো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। যখন ভাবি, এই ভারতবর্ষেই একদা একই সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে কাবুল থেকে কামরূপ, হরিদ্বার থেকে কন্যাকুমারী সর্ব কলাপ্রচেষ্টা সর্ব জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা হয়েছে, তখনই ঐক্যাভিলাষী হৃদয় উল্লসিত হয়ে ওঠে, আর তার পুনরাবৃত্তি দেখাতে চায়।

সংস্কৃতকে ব্যাপকভাবে পুনরায় সেরকম ধারায় চালু করার আশা আর কেউ করেন না। এখন প্রশ্ন, হিন্দীর মাধ্যমে সেটা সম্ভবপর কি না?

এই মনে করুন 'রামের সুমতি' কিংবা 'বিন্দুর ছেলে'। ধরে নিন অতি উত্তম অনুবাদক বই দুখানা হিন্দীতে অনুবাদ করলেন। আপনি উত্তম না হোক মধ্যম ধরনের হিন্দী জানেন, অর্থাৎ হিন্দী পুস্তক মাত্রই দিব্য গড় গড় করে পড়ে যেতে পারেন। এখন প্রশ্ন, আপনি কি সে সুখটা পাবেন যে সুখ ঐ দুখানা বাঙলা বই বাঙলাতে পড়ে পান? ('গোরা'র ইংরিজি তর্জমা পড়েছেন? তাতে তো কোনো সুখই পাওয়া যায় না—কারণ ইংরিজি অতি-দূরের ভাষা) কেন পান না? তার প্রধান কারণ বিন্দু কি ভাষায়, কি ভঙ্গিতে কথা বলে, তার সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনে আপনার পরিচয় আছে; যখন দেখবেন তার সঙ্গে কিছুই মিলছে না, সবই কৃত্রিম বোধ হচ্ছে, তখন আপনার কাব্যরসাস্বাদনের সব বাসনা চিরতরে না হোক, তখনকার মত লোপ পাবে। সংস্কৃতে যাঁরা নাটক লিখে গিয়েছেন, তাঁরা এ তত্ত্বটি বিলক্ষণ জানতেন, তাই অন্ততঃ মেয়েদের দিয়ে সংস্কৃত বলাননি, বলিয়েছেন প্রাকৃত। নৃপ ব্রাহ্মণ সংস্কৃত বলেছেন, কারণ তাঁরা সংস্কৃত বলতে পারতেন, কিন্তু গোরা, বিনয়, অমিট রে কেউই দৈনন্দিন জীবনে হিন্দী

বলেন না, কখনো বলবেন বলে মনে হয় না। কাজেই হিন্দী দিয়ে এদের চরিত্র বিকাশ করে বাঙালীকে সুখ দেওয়া যাবে না। যাঁদের মাতৃভাষা বাঙলা নয়, তাঁদের কথা আলাদা—তাঁরা অবশ্য অনেকখানি রস পাবেন—যদিও স্বামী বিবেকানন্দ বলে গিয়েছেন, অনুবাদ সাহিত্য মাত্রই কাশ্মীরী শালের উল্টো দিকের মত, মূল নক্সাটি বোঝা যায় মাত্র, আর সব রসের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।*

উপরিস্থ তত্ত্ব-কথাটি সকলের কাছে এতই সুপরিচিত যে, আমার পুনরাবৃত্তিতে অনেকেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠবেন, কিন্তু এইটির উপর নির্ভর করে আমি যে বক্তব্য পেশ করবো, সেটা যদি সকলে গ্রহণ করেন কিংবা অন্ততপক্ষে সেটি বিবেচনাধীন করেন, তবে আমি শ্রম সফল বলে মানব।

শুধু ভাষা এবং সাহিত্য নয়, অন্যান্য প্রচেষ্টাও স্বভাবতই প্রাদেশিক রঙ নেয়। অজন্তা ও মোগল-শৈলীর নবজীবন লাভ হয় বাঙলাদেশে, তাই সে সম্বন্ধে যত আলোচনা গবেষণা হয়েছে তার অধিকাংশই বাঙলাতে। অর্থাৎ প্রাদেশিক ভাষাকে একবার সার্বভৌম অধিকার দিলে যে বৈদগ্ধ্য গড়ে উঠে, সেটা প্রাদেশিক।

এইখানে লেগে গেল দ্বন্দ্ব। আমরা এ প্রবন্ধ প্রারম্ভ করেছি প্রতিজ্ঞা নিয়ে, ভারতীয় বৈদগ্ধ্য যেন ঐক্যসূত্রে তাবৎ প্রদেশগুলিকে সম্মিলিত করে নব নব বিকাশের দিকে ধাবিত হয়। তাহলে মুক্তি কোন্ পন্থায়—প্রাদেশিক ভাষাকে সংস্কৃতি জগতের চক্রবর্তীরূপে স্বীকার করে প্রাদেশিক সংস্কৃতি গড়ব, না বাঙলা বর্জন করে হিন্দীর মাধ্যমে ভারতীয় ঐক্যবদ্ধ সংস্কৃতির সন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত করব?

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ প্রাদেশিক ভাষাকে বর্জন করে নয়, তার সম্যক উন্নতি সাধন করে, এবং আমার আরো বিশ্বাস প্রাদেশিক সংস্কৃতি নির্মাণ করলে বৃহত্তর ভারতীয় ঐক্য ক্ষুণ্ণ হবে না।

কারণ ভারতীয় ঐক্য (ইউনিটি) ও ভারতীয় সমতা (ইউনিফর্মিটি) এক বস্তু নয়। আজ যদি পাঞ্জাব থেকে আসাম অবধি সবাই ভাত খেতে আরম্ভ করে, তবে বিদেশ থেকে শস্য কেনার সময় আমাদের বহুৎ বখেড়া আসান হয়ে যাবে, আজ যদি তাবৎ ভারতীয়ের উচ্চতা ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি হয়ে যায়, তবে সৈন্যদের ইউনিফর্ম বানাবার কত না সুবিধা হয়! তবু কেউ বলবেন না, সবাইকে

---

* সত্যই স্বামীজী বলেছেন কি না, হলপ করে বলতে পারব না; এক গুণীর মুখে শোনা।

জোর করে ভাত খাওয়াও, কিংবা ঢ্যাঙাদের শরীর থেকে দু ইঞ্চি কেটে ফেলো। এ ইউনিটি নয়, ইউনিফর্‌মিটি।

যাঁরা মেরে-পিটে ভারতীয় সমতা চাইছেন, তাঁরা যে জেনে-শুনে ভুল করেছেন তা নাও হতে পারে। আমার বিশ্বাস, তাঁরা ইউনিটি চাইছেন সত্য, কিন্তু ইউনিটি এবং ইউনিফর্‌মিটিতে গোল পাকিয়ে ফেলেছেন। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, প্রত্যেক ভারতীয় প্রদেশ যদি আপন প্রাদেশিক সংস্কৃতি সভ্যতা আপন শক্তি ও প্রতিভা দিয়ে গড়ে তোলে, তবে সেই সম্মিলিত সংস্কৃতিই হবে সত্যকার ভারতীয় সংস্কৃতি।

গুরু রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে নিবেদন করি, তিনি বলেছিলেন, একতারা বাজানো সহজ, বীণা বাজানো কঠিন ; কিন্তু সেটা বাজাতে পারলে তার থেকে যে harmony বা বহুধ্বনি আপন আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ঐক্যের যে-সঙ্গীত নির্মাণ করে তোলে, তার সঙ্গে একতারার ইউনিফর্‌মিটির কোনো তুলনা হয় না।

বহু প্রদেশের নানাবিধ সঙ্গীত জেগে উঠে যে harmonyর সৃষ্টি হবে, সে-ই সত্যকার ভারতীয় ঐক্য-সঙ্গীত। তবেই 'জনগণ ঐক্যবিধায়ক' বলা সফল হবে।

॥ ৫ ॥

হিন্দীর প্রসার এবং প্রচার অতীব প্রয়োজনীয়, সেকথা আমরা সকলেই স্বীকার করি—কিন্তু সে প্রসার যেন প্রাদেশিক এবং আঞ্চলিক ভাষা এবং সাহিত্যকে গলা টিপে না মেরে ফেলে। হুঁশিয়ার হয়ে সে প্রসার কর্ম সমাধান করলে কারোরই কোন আপত্তি থাকবে না। কি প্রকারে সেটা করা যেতে পারে, সে নিবেদন করার পূর্বে হিন্দীর বিরুদ্ধে যে কয়টি আপত্তি বাঙলা দেশের কাগজে ইদানীং উঠেছে, তারই দু-একটি নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন।

হিন্দীর বিরুদ্ধে প্রধান এবং প্রথম আপত্তি, হিন্দীর লিঙ্গ বিভাগটা বড্ডই বদখদ। বাঙালী ভাবে, 'ছেলেটা যাচ্ছে,' 'মেয়েটা যাচ্ছে' বললে যখন দিব্য অর্থ বুঝতে পারি তখন 'লড়কা জাতা হৈ,' 'লড়কী জাতী হৈ' বলে মানুষকে বিরক্ত করা ছাড়া অন্য কোন লাভ হয় না। এস্থলে বক্তব্য, 'অর্থ বুঝতে পারার' মান নিয়েই ভাষা সৃষ্টি হয় না। তাই যদি হত তবে বাঙলায় বলি না কেন, 'আমি গেলুম', তুমি গেলুম' 'সে গেলুম' ? ইংরেজ তো খাসা এক 'ওয়েন্ট' দিয়েই বলে যায়,

'আই ওয়েন্ট', 'ইউ ওয়েন্ট', 'হি ওয়েন্ট'—অর্থ জলের মত পরিষ্কার, বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না।

অর্থাৎ প্রত্যেক ভাষারই আপন আপন বৈশিষ্ট্য থাকে এবং তা নিয়ে গোসা করলে চলে না। এখন প্রশ্ন, হিন্দী যে লিঙ্গভেদ করে সেটা কি নিছক তারই 'পাগলামি', না অন্যান্য ভাষাও করে? বাঙলা এককালে কিছুটা করত, সে কথা সকলেই জানেন, এবং এখনও কিছুটা করে। 'সুন্দর রমণী' বলতে এখনো বাধো বাধো ঠেকে, এবং কোন রমণীকে যদি বলি, 'ওগো সুন্দর, গঙ্গাস্নানে চললে নাকি'—তবে এখনো সেটা ভুল, 'সুন্দরী' বলতে হয়।

সংস্কৃতে যে লিঙ্গভেদ আছে এবং সে লিঙ্গভেদ যে সরল নয়, সে কথাও সকলেই জানেন। প্রাণহীন বস্তু মাত্রই যে ক্লীব হয় তাও তো নয়। বহু নদনদী এ জীবনে দেখেছি কিন্তু কোন্‌টারই নাম পুংলিঙ্গ আর কোন্‌টারই বা স্ত্রীলিঙ্গ—ক্লীবের তো কথাই উঠে না—সে তত্ত্বটি জলধারা দেখে ঠাহর করতে পারিনি। দিক্‌-সুন্দরীর (ডিক্‌শনারীর) শরণাপন্ন হলে পর তিনি দিশেহারাকে দিক বাতলে দেন।

উত্তরে হয়ত বলবেন, সংস্কৃতের উদাহরণ এখন আর চলবে না। চালু ভাষা থেকে নজীর পেশ করো।

এই মুশকিলে পড়ে গেলেন। ফরাসী, জর্মন, রুশ, ইতালী, ওলন্দাজ, আরবী, গুজরাতী, মারাঠী এ-সব ভাষাতেই লিঙ্গভেদ আছে—এবং আরো বহু ভাষায় আছে বলে শুনেছি—, সত্য বলতে কি লিঙ্গভেদ নেই এরকম ভাষাই বিরল। আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞান বলে, বড় ভাষার ভিতরে তিনটি মাত্র ভাষাতে লিঙ্গবিচার নেই—ইংরেজী, ফার্সী এবং বাঙলা। এ তিনটি ভাষা যতখানি ছাত্রত্রাস ব্যাকরণ বর্জন করতে পেরেছে অন্য ভাষাগুলো সে রকম পারেনি।

জর্মনের লিঙ্গ সবচেয়ে বেতালা বেহিসাব। 'ছুরি' 'কাঁটা' এবং 'চামচ' তিনটি শব্দই আমাদের কাণ্ডজ্ঞান অনুযায়ী ক্লীব হওয়া উচিত অথচ জর্মন ভাষাতে 'ছুরি' ক্লীব, 'কাঁটা' স্ত্রীলিঙ্গ এবং 'চামচ' পুংলিঙ্গ। দোর্দণ্ডপ্রতাপ 'সূর্য' স্ত্রীলিঙ্গ, শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীর 'চন্দ্রমা' পুংলিঙ্গ এবং 'নারী' ('ডাস ভাইব', 'ভাইব'—'ওয়াইফ') ক্লীব লিঙ্গ! শুধু তাই নয়, সূর্যের চেয়েও দোর্দণ্ডপ্রতাপ জর্মন পুলিস বাহিনী ('ডী পোলিৎসাই') স্ত্রীলিঙ্গ!

পুনরপি পশ্য, পশ্য, ফরাসী এবং হিন্দীতে 'দাড়ি' স্ত্রীলিঙ্গ।

তবে কি দাড়ির জৌলুসের মালিক এককালে রমণীরা ছিলেন? পুরুষেরা পরবর্তী যুগে জোর করে কেড়ে নিয়েছেন? কিন্তু ভুলবেন না, গোঁফ হামেশাই দাড়ির উপরে!

তবে বলুন তো, ভদ্র, হিন্দীকে দোষ দিয়ে লাভ কি? বরঞ্চ হিন্দী জর্মনের তুলনায় ভদ্রতর। জর্মনে তিনটি লিঙ্গ; 'লাগলে তাগ, না লাগলে তুক্কা' করে যদি লিঙ্গবিচার করেন তবে শুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা মাত্র শতকরা ৩৩·৩ ভাগ; হিন্দীতে ৫০ ভাগ, কারণ হিন্দীতে মাত্র দুটি লিঙ্গ।

যাঁরা হিন্দী জানেন তাঁরা হিন্দীর বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি উত্থাপন করেছেন। হিন্দীতে বলি, 'মৈঁ রোটী খাতা হুঁ' 'আমি রুটি খাই', কিন্তু অতীত-কাল নিলে বলতে হয় 'মৈঁ নে রোটী খাঈ' 'আমি রুটি খেয়েছি'। অর্থাৎ অতীত-কালে 'আমি' আর কর্তা থাকলুম না, কর্তা হয়ে গেলেন 'রুটি' এবং সেই অনুযায়ী ক্রিয়াপদ স্ত্রীলিঙ্গ হয়ে গেল, কারণ 'রোটী' হিন্দীতে স্ত্রীলিঙ্গ ('পানী', 'ঘি', 'দহী', 'মোতী'র মত মাত্র কয়েকটি ই-কারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ; তাই পুংভূষণ 'দাড়ি' বেচারী স্ত্রীলিঙ্গ হয়ে গিয়েছে)। তার মানে 'আমা-দ্বারা রুটি খাওয়া হল' বললে অনেকটা হিন্দীর ওজনে বলা হল। কিংবা 'পাগলে কি না বলে!' সংস্কৃতে এরকম জিনিস আছে একথা সকলেই জানেন।

কিন্তু এসব সমস্যা অপেক্ষাকৃত সরল। একবার কোন্ শব্দ কোন্ লিঙ্গ জানা হয়ে গেলে বাদবাকি জট তিন লহমায় ছাড়িয়ে নেওয়া যায়।

লিঙ্গ নিয়ে আপত্তি উত্থাপন করে কোন লাভ নেই। আমরা যদি হিন্দী-ভাষীকে বলি লিঙ্গ তুলে 'লড়কা জাতা', 'লড়কী জাতা' বলা আরম্ভ করে দাও, তবে ইংরেজ বাঙালীকে বলবে, 'আমি গেলুম', 'তুমি গেলুম', 'সে গেলুম', বলতে আরম্ভ করো। তাই ইংরেজ ফরাসী শেখার সময় ফরাসীর লিঙ্গবিচার নিয়ে আপত্তি তোলে না। চাঁদপানা মুখ করে, মুখস্থ করে 'শব্দের অন্তে বি, সি, ডি, জি, এল, পি, কিউ, জেড থাকলে শব্দ পুংলিঙ্গ হয়', অবশ্য বিস্তর ব্যত্যয় আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ফরাসীতে হিন্দীর মত মাত্র দুটি লিঙ্গ—কিন্তু আমার মনে হয়, ফরাসীতে লিঙ্গবিচার হিন্দীর চেয়ে শক্ত।

এটা অবশ্য অসম্ভব নয় যে, হিন্দী বহু প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ার পর প্রাদেশিক অজ্ঞতাবশতঃ লিঙ্গে ভুল হতে আরম্ভ হবে এবং তারই ফলে হয়ত একদিন হিন্দী থেকে লিঙ্গ লোপ পেয়ে যাবে। তবে তার ফললাভ আমরা করতে পারবো না সে-কথা সুনিশ্চিত।

॥ ৬ ॥

হিন্দী-বিরোধী সম্প্রদায় বলেন, হিন্দীতে এমন কি সাহিত্য আছে, বাপু, যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হিন্দী শিখতে যাব? উত্তরে হিন্দীর দল বলেন, তাবৎ ভারত যদি হিন্দী গ্রহণ করে সে-ভাষাতে সাহিত্য সৃষ্টি আরম্ভ করে তবে দেখতে না দেখতেই হিন্দী ইংরিজি ফরাসীর সঙ্গে পাল্লা দিতে আরম্ভ করবে।

এ উত্তরটা ইতিহাসের ধোপে টেকে না। সকলেই জানেন, এককালে লাতিন সব ইউরোপের 'রাষ্ট্রভাষা' ছিল কিন্তু তৎসত্ত্বেও লাতিন ভাষা গ্রীক কিংবা সংস্কৃতের মত উচ্চাঙ্গ সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। তারপর ফরাসী ভাষা লাতিনের আসনটি কেড়ে নিল। কিন্তু ফরাসী সাহিত্য যে বিত্তবান হল সেটা ইংরেজ, জর্মন, ইতালিয়দের ফরাসী সাহিত্য-চর্চা করার ফলে নয়—ফরাসীর ব্যাপক সাহিত্য গড়ে উঠেছে ফরাসী যাঁদের মাতৃভাষা একমাত্র তাঁদেরই প্রচেষ্টার ফলে। ঠিক সেই কারণেই প্রশ্ন, ক'টা বিদেশী ইংরিজিতে লিখে নাম করতে পেরেছে কিংবা কজন ইংরেজ ফরাসী জর্মনে লিখে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছে? ইংরিজিতে ফিরে যাই; ফরাসীর পর এই যে ইংরিজি ভুবন জুড়ে রাজত্ব করল সে ভাষাতেই বা ক'টি বিদেশী নাম করতে পেরেছেন? এমন কি, কজন অস্ট্রেলিয়া কিংবা কানাডাবাসী ইংরিজি সাহিত্যে উচ্চাঙ্গের রচনা লিখতে সক্ষম হয়েছেন? এ জিনিসটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। তবে কি ভাষাকে টবে পুঁতে বিদেশে পাঠালে সেখানে সে বেঁচে থাকতে সক্ষম হলেও ফল দিতে পারে না? আমেরিকার মত বিরাট দেশে তো আরো বেশী লেখকের জন্ম নেবার কথা ছিল—একদম পয়লা নম্বরের লেখক সে মহাদেশে জন্মেছেন কজন? অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আমেরিকাবাসীর মাতৃভাষা ইংরিজি—তারাই যদি এ বাবদে কাহিল তবে যাঁদের মাতৃভাষা ইংরিজি নয় তাঁরাই বা কোন্ গন্ধমাদন উত্তোলন করতে পারবেন?

অথচ দেখুন, লাতিন ফরাসীর একচ্ছত্রাধিপত্য যেমন যেমন লোপ পেল সঙ্গে সঙ্গে জর্মন, ইংরিজি, ইতালি, রুশ, সুইডিশ, ওলন্দাজ সাহিত্য কী অল্প সময়ে কত না কত অদ্ভুত উন্নতি সাধন করতে পেরেছে। তাই আজ আধমরা লাতিনের জায়গায় জেগে উঠেছে বহুতর ভাষা গরুড়ের ক্ষুধা নিয়ে। তাই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি বহু ভাষার শিখরতোরণ, মিনার-গম্বুজ দিয়ে গড়া 'ইউরোপীয় সাহিত্য' নামক এক গগনচুম্বী তাজমহল!

ইংরেজ ফরাসী ভাষায় লেখে না, ফরাসী জর্মনে লেখে না, রুশ দিনেমার

ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করতে যায় না, তথাপি এদের ভিতর আন্তরিক সহযোগিতার অন্ত নেই। আজ ফরাসী দেশে যে গঁকুর পুরস্কার পায় কালই তার বই ইংরিজিতে তর্জমা হয়ে যায়—অধিকাংশ স্থলে প্রাইজ পাওয়ার বহু পূর্বেই তর্জমা হয়ে গিয়েছে। আর নোবল পেলে তো কথাই নেই—হুস হুস করে ডজনখানেক ভাষায় খান বিয়াল্লিশ তর্জমা বাজার গরম করে তোলে।

ইংরেজ গেছে, আপদ গেছে। এখন আমি স্বপ্ন দেখি—সুশীল পাঠক তুমিও যোগ দাও—ভারতবর্ষের নানা ভাষায় যেন উত্তম উত্তম সাহিত্য সৃষ্টি হয় এবং এক সাহিত্যের ভালো লেখা যেন অন্য সব সাহিত্যে অনুবাদ করা হয়। ইংরেজের মতলব ছিল প্রদেশে প্রদেশে যেন ভাবের আদান-প্রদান না হয়। তৎসত্ত্বেও আমরা ইংরিজির মাধ্যমে একে অন্যকে কিছুটা চিনতে পেরেছি কিন্তু বহুস্থানেই অনেকখানি ভুল চেনাশোনা হয়েছে। এবারে সৎসাহিত্যের ভিতর দিয়ে আসল সদালাপ আরম্ভ হবে—আমরা এই স্বপ্ন দেখি।

বাঙলা বই হিন্দীতে অনুবাদ হবে, তারপর হিন্দী থেকে তামিলে—এ ব্যবস্থা আমার মনঃপূত হয় না। জ্যামিতি নাকি সপ্রমাণ করতে পারে, ত্রিভুজের যে কোনো এক বাহু যে কোনো দুই বাহুর চেয়ে হ্রস্বতর।

সোজাসুজি পরিচয় সবচেয়ে ভালো পরিচয়। একটি সামান্য উদাহরণ দিই। একখানি পুস্তকের প্রতি আমার ভক্তিশ্রদ্ধার অন্ত নেই—এ সম্বন্ধে পূর্বেও ইঙ্গিত করেছি—বইখানি স্বর্গীয় লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলকের 'গীতারহস্য'।

লোকমান্য গীতার এই নবীন ভাষ্য মারাঠীতে লিখেছিলেন এবং তার এক অতি জঘন্য ইংরিজি অনুবাদ আছে—একদম অখাদ্য অপাঠ্য। কিন্তু বৃদ্ধ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যৌবনে-শেখা, মরচে-ধরা, জাম-পড়া তাঁর মারাঠীজ্ঞানকে ঝালিয়ে নিয়ে বাঙলায় যে অনুবাদখানি করেছেন তার প্রশংসা করতে গিয়ে আমার অক্ষম লেখনী বার বার তার দুর্বলতা নিয়ে লজ্জিত হয়। এ তো অনুবাদ নয়, এ যেন বাঙালী টিলক বাঙলায় লিখেছেন। মারাঠীর সঙ্গে মিলিয়ে এ অধম সে পুস্তক বহুবার অধ্যয়ন করেছে, প্রতিবার মনে মনে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে, বন্ধুবান্ধবকে সে কেতাব-ই-কুৎব্-মিনার পড়তে অনুরোধ করেছে, এবং 'সত্যপীর' ছদ্মনামে সে গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের জন্য 'আনন্দবাজারে' বিস্তর কান্নাকাটি করেছে।

এই বই পড়লে 'গীতা' নূতন করে চেনা যায় সে কথা অতি সত্য; কিন্তু উপস্থিত আমার নিবেদন, এ গ্রন্থ পড়লে মহারাষ্ট্র দেশকেও চেনা যায়। সংস্কৃত আজ সর্বত্রই মুমূর্ষু, কিন্তু কতখানি সংস্কৃত-চর্চা থাকলে পর এরকম গ্রন্থ বেরুতে

পারে সেটা এ বই পড়লে মহারাষ্ট্রের সেই ক্ষুদ্র পল্লী চোখের সামনে ভেসে ওঠে যেখানে বালক বালগঙ্গাধর সংস্কৃত-চর্চার মাঝখানে মানুষ হলেন। আমার গর্ব, আমি সে গ্রামে গিয়েছি, সে তীর্থ দেখেছি ॥*

বন্ধ-বাতায়নে

॥ ১ ॥

ইংরেজকে যত দোষই দিই না কেন, ইংরিজি সভ্যতার যত নিন্দাই করি না কেন, ইংরেজ যে একটা মহৎ কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একদিক দিয়ে বহু জাত-বেজাত ইংলণ্ড দখল করেছে, অন্যদিক দিয়ে ইংরেজ বিশ্বভুবনময় ছড়িয়ে পড়েছে, এবং তার ফলে ইংলণ্ডে যে কত প্রকারের ভাব-ধারা এসে সম্মিলিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

এই নানা ঘাত-প্রতিঘাতী পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারা, রসবোধ পদ্ধতি, আদর্শানুসন্ধান যখন পৃথক ভাবে যাচাই করি তখন বিস্ময়ের আর অন্ত থাকে না যে ইংরেজ কি করে সব কটাকে এক করে বহুর ভিতর দিয়ে ঐক্যের সন্ধান পেল।

কাব্যকলায় ইংরেজের যে খুব বেশী মৌলিকতা গুণ আছে তা নয়—ইয়োরোপীয় সঙ্গীত, স্থাপত্য, চিত্রকলায় ইংরেজের দান অতি অল্পই—কিন্তু মনের সব কটি জানলা ইংরেজ সব সময়ই খোলা রেখেছে বলে বহু ভ্রমর তার ঘরে এসে নানা গুঞ্জন গান তুলেছে, নানা ফুলের সুবাস তার বৈদগ্ধ্যকে সুবাসিত করে তুলেছে। সে বৈদগ্ধ্যের প্রকাশও তাই সুভাষিত।

অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, এই নানা বস্তু অন্তরে গ্রহণ করার ক্ষমতার পিছনে রয়েছে সহিষ্ণুতা। এ গুণটি বড় মহৎ, এবং জর্মন জাতির এ গুণটি নেই বলেই তারা বহু প্রতিভাবান কবি, গায়ক, দার্শনিক পেয়েও কখনোই ইয়োরোপে একচ্ছত্রাধিপত্য করতে পারেনি।

* এ-প্রবন্ধ আমি বহু বৎসর পূর্বে, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে লিখি, কিন্তু তখনো রাষ্ট্র-ভাষা সমস্যা তার রুদ্রতম রূপ ধারণ করেনি বলে—আমি জানতুম একদিন নেবেই নেবে, তাই আগেভাগেই সাবধানবাণী শোনাতে চেয়েছিলুম—(দক্ষিণ ভারতে হিন্দীর বিরুদ্ধে যে-সংগ্রাম প্রয়োজনাতীত তাণ্ডব রূপ ধারণ করে—সে তো তার বহু পরের ঘটনা!) আমার প্রিয় পাঠকবর্গ সমস্যাটির গুরুত্ব অনুভব করতে পারেননি। ফলে, উৎসাহাভাবে, আমি প্রবন্ধটিকে পরিপূর্ণ রূপ দিতে পারিনি।

ইংরেজ রাজত্বের সময় আমাদের প্রধান কর্ম ছিল ইংরেজকে খেদানোর কল-কৌশল বের করা।—আমরা সহিষ্ণু এবং উদার কিনা, ছুঁৎবাইগ্রস্ত এবং কূপমণ্ডুক—এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার ফুরসৎ এবং প্রয়োজন আমাদের তখন ছিল না।

এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার সময় আজ এসেছে।

আমাদের বৈদেশিক রাজনীতি সম্পূর্ণ নির্ভর করবে আমাদের চরিত্রের উপর।

আমরা যদি হাম-বড়াই প্রমত্ত হয়ে দেশবিদেশে সর্বত্র এরকম ধারা ভাবখানা দেখাই যে কারো কাছে আমাদের কিছু শেখবার নেই, আমাদের পুরাণাদি অনুসন্ধান করলে এটম বম্ বানানোর কৌশল খুঁজে পাওয়া যায়, আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধির সামনে যে লোক মাথা না নোওয়ায় সে আকাট মূর্খ, আমরা যদি দেশ-বিদেশে আপন সামাজিক জীবনে পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ করে, নিমন্ত্রণ রেখে হৃদ্যতাযোগে সকলের সঙ্গে এক না হতে পারি তবে আমরা বৈদেশিক রাজনীতিতে মার খাব—বেধড়ক মার খাব, সে বিষয়ে আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই।

যুদ্ধের সময় কত মার্কিন, ফরাসী, চেক্, বেলজিয়াম আমার কাছে ফরিয়াদ করেছে, বাঙালীদের সঙ্গে মেশবার সুযোগ তারা পেল না। এক মার্কিন আমাদের একখানা বাজে ইংরেজী কাগজের রবিবাসরীয় পড়ে মুগ্ধ হয়ে বলল, "তোমরা যদি এ-রকম ইংরেজী লিখতে পারো তবে বাঙলাতে তোমাদের চিন্তাধারা কত না অদ্ভুত খোলতাই হয় তার সন্ধান পাব কি প্রকারে? বাঙলা শেখবার মত দীর্ঘকাল তো আর এদেশে থাকবো না, তাই অন্ততঃ দু-চারজন গুণীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও, দু-দণ্ড রসালাপ আর তত্ত্বালোচনা করে লড়াই-য়ের খুনকতলের কথাটা যাতে করে ভুলে যেতে পারি।"

আলাপ করিয়ে দিলুম কিন্তু জমলো না।

আমার বাঙালী বন্ধুরা যে জাত মানেন তা নয়, কিংবা মার্কিন ভদ্রলোকটি যে আমাদের ঠাকুরঘরে বসে গোমাংস খেতে চেয়েছিলেন তাও নয়, বেদনাটা বাজলো অন্য জায়গায়।

আলাপ-পরিচয়ের দু'দিন বাদেই ধরা পড়ে, আমাদের মনের জানালাগুলো সব বন্ধ। আমরা করি সাহিত্যচর্চা ও কিঞ্চিৎ রাজনীতি। নিতান্ত যাঁরা অর্থ-শাস্ত্র পড়েছেন, তাঁদের বাদ দিলে আমাদের রাজনীতিচর্চাও নিতান্ত একপেশে; আর আমাদের নিজেদের দর্শন, সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য, নৃত্য সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান অত্যল্প। ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খানিকটে আছে বটে কিন্তু ইয়োরোপীয় বৈদগ্ধ্যের আর পাঁচটা সম্পদ সম্বন্ধে আমরা অচেতন।

তাই গালগল্প ভালো করে জমে না। যে আমেরিকান পঁচিশপদী খানা খায় তাকে দু'বেলা ডালভাত দিলে চলবে কেন? রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধী, গান্ধী আর রবীন্দ্রনাথ করে তো আর দিনের পর দিন কাটানো যায় না।

এর চেয়ে আশ্চর্যের জিনিস আর কিছুই হতে পারে না। কারণ এখনো আমাদের যেটুকু বৈদগ্ধ্য আছে, যে-সম্পদ সম্বন্ধে আমাদের বেশীর ভাগ লোকই অচেতন, সেটুকু গড়ে উঠেছে এককালে আমাদের মনের সব কটি জানলা খোলা ছিল বলে।

শুধু তাজমহল নয়, সমস্ত মোগল-পাঠান স্থাপত্য—জামি মসজিদ, আগ্রা দুর্গ, হুমায়ুনের কবর, সিক্রি এবং তার পূর্বেকার হৌজখাস, কুৎবমিনার সব কিছু গড়ে উঠলো ভারতবাসীর মনের জানলা খোলা ছিল বলে; দিল্লী আগ্রার বাইরে যে-সব স্থাপত্যশৈলী রয়েছে, যেমন ধরুন আহমদাবাদ বাঙলা দেশ কিংবা বিজাপুরে সেগুলোও তাদের পরিপূর্ণতা পেয়েছে, এককালে আমাদের মনের দরজা খোলা ছিল বলে; খানসাহেব আব্দুল করীম খান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যে চরমে পৌঁছতে পেরেছিলেন তার সোপান নির্মিত হয়েছে ভারতীয় পূর্বাচার্যগণের ঔদার্যগুণে।

এই বাঙলা ভাষা আর সাহিত্যই নিন। বৌদ্ধচর্যাপদে তার জন্ম, তার গায়ে বৈষ্ণব পদাবলীর নামাবলী, 'মঙ্গল'-মুকুট তার শিরে, আরবী-ফারসী শব্দের খানা খেয়েছে সে বিস্তর আর তার কথার ফাঁকে ফাঁকে যে ইংরিজি বোল ফুটে ওঠে তার জ্বালায় তো মাঝে মাঝে প্রাণ অস্থির হয়ে ওঠে।

আর কিছু না হোক আরবী-ফারসীর যে দুটো জানলা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি—যেগুলো সামান্য ফাঁক করে দিয়েই কবি নজরুল ইসলাম আমাদের গায়ে তাজা হাওয়া লাগিয়ে দিলেন—সেগুলোই যদি আমরা পুনরায় খুলে ধরি তা হলে আফগানিস্থান, ইরান, ইরাক, সীরিয়া, লেবানন, প্যালেস্টাইন, মিশর, লীবিয়া, মরক্কো, আলজেরিয়ার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সহজ হয়ে যাবে। আফগানিস্থান ও ইরানে ফার্সী প্রচলিত আর বাদবাকি দেশ আরবী।

স্বার্থের সন্ধানে একদিন আমরা তাদের কাছে যাবো, তারাও আমাদের অনুসন্ধান করবে। তখন যদি তারা আমাদের যতটা চেনে তার চেয়ে তাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বেশী হয় তবে আমরাই জিতব।

আর পূবের জানলাও তো খুলে ফেলা সহজ। বৌদ্ধধর্মের ত্রিপিটক তো ভারতের পিটকেই বন্ধ আছে। ত্রিশরণ ত্রিরত্নের রত্নাকর তো আমরাই।

॥ ২ ॥

পশ্চিমের জানলা খুললে দেখতে পাই, পাকিস্তান ছাড়িয়ে আফগানিস্থান, ইরান, আরব দেশের পর ভূমধ্যসাগর, অর্থাৎ ভারত এবং ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী ভূমি মুসলিম। তাই স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, এই বিশাল ভূখণ্ড যদি ধর্মের উদ্দীপনায় ঐক্যলাভ করতে পারে তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতি-পঞ্চায়েতে এদের উচ্চকণ্ঠ কি মার্কিন, কি রুশ কেউই অবহেলা করতে পারবে না।

তার পূর্বে প্রশ্ন, বহুশত বৎসর ধরে এ-ভূখণ্ডে কোনো প্রকারের স্বাধীন ঐক্য যখন নেই তখন আজ হঠাৎ কি প্রকারে এদের ভিতর একতা গড়ে তোলা সম্ভব? উত্তরে শুধু এইটুকু বলা চলে যে এ-ভূখণ্ডে ইতিপূর্বে আর কখনো এমন কট্টর জীবনমরণ সমস্যা উপস্থিত হয়নি। তাই আজ যদি প্রাণের দায়ে এরা এক হয়ে যায়!

ঐক্যের পথে অন্তরায় কি?

প্রথম অন্তরায় ধর্মই। ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে যেমন বর্মা চীন এবং অন্যদিকে মুসলিম ভূমি, ঠিক তেমনি শীয়া ইরানের একদিকে সুন্নী আফগানিস্থান পাকিস্তান এবং ভারতীয় মুসলমান, অন্যদিকেও সুন্নী আরবিস্থান। শীয়া ইরানের সঙ্গে সুন্নী আফগানিস্থানের মনের মিল কখনো ছিল না, এখনো নেই। একটা উদাহরণ দিলেই আমার বক্তব্যটা খোলসা হবে; আফগান বিদগ্ধজনের শিক্ষাদীক্ষা এবং রাষ্ট্রভাষা ফার্সী, আর ইরানের ভাষা তো ফার্সী বটেই, তৎসত্ত্বেও কাবুলের লোক কস্মিনকালেও ইরানে লেখা-পড়া শেখবার জন্য যায়নি এবং তার চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় যে তারা লেখা-পড়া এবং ধর্ম-চর্চার জন্য আসতো ভারতবর্ষে, এখনো আসে, যদ্যপি সকলেই জানে যে, ভারতবর্ষের কোনো প্রদেশের লোকই ফার্সীতে কথা বলে না। ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বেও তাই ছিল—আফগানিস্থান এককালে বৌদ্ধ ছিল, তার পূর্বে সে হিন্দু ছিল, কিন্তু ইরানী জরথুস্ত্র ধর্ম সে কখনো ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেনি।

ইরান আফগানিস্থানে তাই অহরহ মনোমালিন্য। আফগানিস্থান ও ইরান সীমান্ত নিয়ে দু'দিন বাদে বাদে ঝগড়া লাগে ও আজ পর্যন্ত সে-সব ঝগড়া-কাজিয়া ফৈসালা করার জন্য কত যে কমিশন বসেছে তার ইয়ত্তা নেই। আফগানিস্থানের পশ্চিমতম হিরাত ও ইরানের পূর্বতম শহর মেশেদে প্রায়ই শীয়া-সুন্নীতে হাতাহাতি মারামারি হয়। আফগান ইরানেতে বিয়ে শাদী হয় না, কাবুলরাজ কখনো তেহরান যান না, ইরান অধিপতিও কখনো কাবুলমুখো হন

না। ব্যত্যয় আমানউল্লা খান এবং তাঁর ইরান গমনের সংবাদ পেয়ে আফগানরা কিছুমাত্র উল্লসিত হয়নি।

ওদিকে যেমন ইরানের সঙ্গে আফগানিস্থানের মনের মিল নেই, এদিকে তেমনি আফগান পাকিস্তানীতে মন-কষাকষি চলছে। সিন্ধুর পশ্চিম পার থেকে আসল পাঠানভূমি আরম্ভ হয়, এবং পূর্ব আফগানিস্থানের উপজাতি সম্প্রদায়ও পাঠান। তাই আফগান সরকারের দাবী, পাকিস্তানের পাঠান হিস্যাটা যেন তার জমিদারীতে ফেরত দেওয়া হয়। এ দাবীটা আফগানিস্থান ইংরেজ আমলে মনে মনে পোষণ করত, কিন্তু ইংরেজের ডাণ্ডার ভয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য করত না।

এই তো গেল পাকিস্তান, আফগানিস্থান, ইরানের মধ্যে হার্দিক সম্পর্ক বা আঁতাঁৎ কর্দিয়ালের কেচ্ছা!

ওদিকে আবার ইরান আরবে দোস্তী হয় না। প্রথমতঃ ধর্মের বাধা ইরান শীয়া, আরব সুন্নী; দ্বিতীয়তঃ ইরানীরা আর্য, আরবরা সেমিতি, তৃতীয়তঃ ইরানের ভাষা ফার্সী, আরবের ভাষা আরবী।

কিন্তু তার চেয়েও গুরুতর বাধা হয়েছে এই যে, খুদ আরব ভূখণ্ড ঐক্যসূত্রে গাঁথা নয়। খুদ আরবভূমি যদি এক হয়ে ইরানের উপর তার বিরাট চাপ ফেলতে পারত তবে হয়ত ইরান প্রাণের দায়ে ভালো হোক মন্দ হোক কোনো প্রকারের একটা দোস্তী করে ফেলত (তা সে-'আঁতাঁৎ', 'হার্দিক, হার্টি' অর্থাৎ 'কর্দিয়াল' হল আর নাই হল) কিন্তু তাবৎ আরব ভূখণ্ডকে এক করবার মত তাগদ আজ কারো ভিতরেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

আরবভূমি আজ ইরাক, সীরিয়া, লেবানন, ট্রান্স্-জর্ডান, সউদী আরব, প্যালেস্টাইন ও ইয়েমেন এই সাত রাষ্ট্রে বিভক্ত। তাছাড়া, কুয়েৎ, হাদ্রামুত, অধুনা 'নিমিত' আদন ইত্যাদি ক-গণ্ডা উপরাষ্ট্র আছে সে তো অশুমার! এদের সকলেরই ভাষা ও ধর্ম এক ও তৎসত্ত্বেও এদের ভিতর মনের মিল নেই। এবং সে ঐক্যের অভাব এই সেদিন মর্মন্তুদরূপে সপ্রমাণ হয়ে গেল—যেদিন কথা নেই বার্তা নেই আড়াই গণ্ডাই ইহুদী হঠাৎ উড়ে এসে আরবীস্থানের বুকের উপর প্যালেস্টাইনে জুড়ে বসল। যে আরব হাজারো বৎসর ধরে প্যালেস্টাইনের পাথর নিংড়ে সরস জাফা কমলালেবু বানিয়ে নিজে খেত, দুনিয়াকে খাওয়াত, সেই আরবের ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করল আড়াই গণ্ডা 'রণভীরু' ইহুদী! আরব রাষ্ট্রেরা আপন গৃহকলহ নিয়ে মশগুল—ওদিকে প্যালেস্টাইন পয়মাল হয়ে গেল।

লেবাননকে বাদ দিয়ে আরব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্—কারণ লেবানন রাষ্ট্রে মুসলিম-আরবের চেয়ে খৃষ্টান-আরবের সংখ্যা একটুখানি বেশী; লেবাননের

খৃষ্টান আরবেরা ইহুদীদের সঙ্গে দোস্তী করতে চায় না একথা খাঁটি এবং তারা হয়ত বৃহত্তর আরবভূমির পঞ্চায়েতে হাজিরা দিতে রাজি নাও হতে পারে। কিন্তু তাতে কিছুমাত্র এসে যায় না, কারণ লেবানন অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ রাষ্ট্র।

আসল লড়াই দুই পালোয়ানে। তাঁদের একজন আমীর আব্দুল্লা, ট্র্যান্স-জর্ডনের রাজা, অন্যজন মক্কা-মদীনা, জিন্দা-নেজদের রাজা ইবনে সউদ। আব্দুল্লার বংশই ইরাকে রাজত্ব করেন, কাজেই এ দু'রাষ্ট্রে মিতালি পাক্কা, কিন্তু ইবনে সউদ একাই একশ। কারণ রাজা বলতে আমরা যা বুঝি সে হিসেবে আজকের দুনিয়ায় একমাত্র তিনিই খাঁটি রাজা। আব্দুল্লার পিছনে রয়েছে ইংরেজের অর্থবল, বাহুর দম্ভ; কিন্তু ইবনে সউদ কারো তোয়াক্কা করে আপন রাজ্য চালান না। মার্কিনকে তেল বেচে তিনি এযাবৎ কয়েকশ মিলিয়ন ডলার পেয়েছেন বটে, তবু মার্কিন তাঁর রাজত্বে কোনো প্রকারের নাম-প্রভুত্ব কায়েম করতে পারেনি। আর সবচেয়ে বড় কথা, তিনি মক্কার কাবা শরীফের তদারকদার—বিশ্ব মুসলিম, সেই খাতিরে তাঁকে কিছুটা মানেও বটে।

যেন ঘোঁটালাটা যথেষ্ট প্যাঁচালো নয় তাই মিশরকেও এই সম্পর্কে স্মরণ করতে হয়। কারণ মিশরবাসীর শতকরা নব্বুই জন আরবীতে কথা বলে, ধর্ম তাদের ইসলাম ও তাদের বেশীর ভাগের রক্তও আরব-রক্ত। এবং তার চেয়েও বড় কথা, ইসলাম এবং মুসলিম ঐতিহ্যের সবচেয়ে বড় অছি কাইরোর সহস্রাধিক বৎসরের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় অল-অজহর। আরব, আফগানিস্থান, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, ভারতবর্ষ, চীন, মালয়, জাভা এক কথায় তাবৎ দুনিয়ার কুল্লে ধর্মপ্রাণ মুসলিমের আন্তরিক কামনা অজহরে ধর্মশিক্ষা লাভ করবার।

তদুপরি মিশর প্রগতিশীল এবং বিত্তশালী রাষ্ট্রও বটে।

কিন্তু মিশরের উপরে রয়েছে ইংরেজের সরদার।

সেই হল আরেক বখেড়া। আরবদের ভিতর ঝগড়া-কাজিয়া তো রয়েছেই, তার উপর আবার আরব হাঁড়ির ভিতর গর্দান ঢুকিয়ে বসে আছেন ইংরেজ এবং স্বয়ং মার্কিন চতুর্দিকে ছোঁক-ছোঁক করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, হাঁড়ির কিছুটা স্নেহ-জাতীয় পদার্থ ইতিমধ্যেই তাঁর লাঙ্গুলকে কিঞ্চিৎ চেকনাই এনে দিয়েছে—সেকথা পূর্বেই নিবেদন করেছি।

তাই সব কিছু ছয়লাপ করে দেয় তেলের বন্যা। ইরান ইরাকের তেল ইংরেজের, আর সউদী আরবের তেল মার্কিনের। পাঠক বলবেন, তাহলেই হল, ব্রাদারলি ডিভিশন, কিন্তু সুশীল পাঠক, আপনি উপনিষদ পড়েননি তাই এ-রকম ধারা বললেন। ভূমৈব সুখম—অল্পে সুখ নেই। মার্কিন চায় তৈলযজ্ঞের

একক পুরোহিত হতে, আর ইংরেজ চায় মার্কিনকে দরিয়ার সে-পারে খেদাতে।

কি দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম আর কোথায় এসে পড়েছি। কোথায় আফগানিস্থানের প্রস্তরময় শৈলশিখর আর কোথায় স্নেহভরে ডগমগ আরবের পাতাল-তল। এ সবকিছুর হিসেবনিকেশ করে পররাষ্ট্র নীতির হদিস বানানো তো সোজা কর্ম নয়।

আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা এ-দেশের বিস্তর লোক আরবী এবং ফার্সী উভয় ভাষাই জানেন। ইচ্ছে করলে এঁদের সম্বন্ধে আমরা নিজের মুখেই ঝাল খেতে পারি।

তাই বলি খোলো খোলো জানলা খোলো ॥*

এ্যারোপ্লেন

॥ ১ ॥

পঁচিশ বৎসর পূর্বে প্রথম এ্যারোপ্লেন চড়েছিলুম। ‡ দশ টাকা দিয়ে কলকাতা শহরের উপর পাঁচ মিনিটের জন্য খুশ সোওয়ারী বা 'জয়-রাইড' নয়, রীতিমত দু'শ মাইল রাস্তা—পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে নদী-নালা পেরিয়ে এক শহর থেকে অন্য শহর যেতে হয়েছিল। তখনকার দিনে এদেশে প্যাসেঞ্জার সার্ভিস ছিল না, কাজেই আমার অভিজ্ঞতাটা গড়পড়তা ভারতীয়দের পক্ষে একরকম অভূতপূর্বই হয়েছিল বলতে হবে।

তারপর ১৯৪৮ থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বহু জায়গায় প্লেনে গিয়েছি এবং যাচ্ছি। একদিন হয়তো পুষ্পক-রথে করেই স্বর্গে যাব, অর্থাৎ প্লেন-ক্র্যাশে অক্কালাভ করবো—তাতে আমি আশ্চর্য হব না, কারণ এ তো জানা কথা, 'ডান-পিটের মরণ গাছের আগায়।' সে-কথা থাক্।

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে প্রতিবারেই লক্ষ্য করি, পঁচিশ বৎসর পূর্বে প্লেনে যে সুখ-সুবিধে ছিল আজও প্রায় তাই। ভুল বলা হল, 'সুখ-সুবিধে' না বলে 'অসুখ-

* এ প্রবন্ধটি লিখি ১৩৫৬ (১৯৪৯ খৃঃ) সালে—(অর্থাৎ দেশে-বিদেশে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময়)। ইতিমধ্যে আরব ভূখণ্ডে রাজার বদলে কোনো কোনো জায়গায় ডিকটেটর হয়েছেন, মিশর থেকে ইংরেজ অনেক দূরে হটে গিয়েছে। নইলে এ প্রবন্ধের মূল দর্শন তখন যা ছিল, আজও তাই। আমি তাই প্রবন্ধের কোনো পরিবর্তন করিনি।

‡ রচনাটি লেখা হয় ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে।

অসুবিধে' বলাই উচিত ছিল কারণ প্লেনে সফর করার মত পীড়াদায়ক এবং বর্বরতর পদ্ধতি মানুষ আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেনি। আমার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যে সব হতভাগ্য প্লেনে চড়েন তাঁরা ওকীব-হাল, তাঁদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। উপস্থিত তাই তাঁদেরই উদ্দেশে নিবেদন, প্লেনে চড়ার সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য যাঁদের এযাবৎ হয়নি।

রেলে কোথাও যেতে হলে আপনি চলে যান সোজা হাওড়া। সেখানে টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসেন—ব্যস হয়ে গেল। অবশ্য আপনি যদি বার্থ রিজার্ভ করতে চান তবে অন্য কথা, কিন্তু তবু এ-কথা বলবো, হঠাৎ খেয়াল হলে আপনি শেষ মুহূর্তেও হাওড়া গিয়ে টিকিট এবং বার্থের জন্য একটা চেষ্টা দিতে পারেন এবং শেষ পর্যন্ত কোনোগতিকে একটা বার্থ কিংবা নিদেনপক্ষে একটা সীট জুটে যায়ই।

প্লেনে সেটি হবার যো নেই। আপনাকে তিন দিন, পাঁচ দিন, কিংবা সাত দিন পূর্বে যেতে হবে 'এ্যার আপিসে'। এক হাওড়া স্টেশন থেকে আপনি বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, গৌহাটি—এমন কি ব্যাণ্ডেল-হুগলী হয়ে পাকিস্তান পর্যন্ত যেতে পারেন কিন্তু একই 'এ্যার আপিস' আপনাকে সব জায়গার টিকিট দেয় না—কেউ দেবে ঢাকা আর আসাম, কেউ দেবে মাদ্রাজ অঞ্চল, কেউ দেবে দিল্লীর।

এবং এ-সব এ্যার আপিস ছড়ানো রয়েছে বিরাট কলকাতার নানা কোণে, নানা গহ্বরে। এবং বেশির ভাগই ট্রামলাইন, বাসলাইনের উপরে নয়। হাওড়া যান ট্রামে, দিব্য মা গঙ্গার হাওয়া খেয়ে, এ্যার আপিসে যেতে হলে প্রথমেই ট্যাক্সির ধাক্কা।

এ্যার আপিসে ঢুকেই আপনার মনে হবে ভুল করে বুঝি জঙ্গী দফতরে এসে পড়েছেন। পাইলট, রেডিয়ো অফিসার তো উর্দী পরে আছেনই—এমন কি টিকিটবাবু পর্যন্ত শার্টের ঘাড়ে লাগিয়েছেন নীল-সোনালির ব্যাজ-বিল্লা-রিবন-পট্টি—যা খুশী বলতে পারেন। রেলের মাস্টারবাবু, গার্ড সাহেবরা উর্দী পরেন কিন্তু সে উর্দী জঙ্গী কিংবা লস্করী উর্দী থেকে স্বতন্ত্র—এ্যার আপিসে কিন্তু এমনই উর্দী পরা হয়—খুব সম্ভব ইচ্ছে করেই—যে আমার মত কুনো বাঙালী সেটাকে মিলিটারী কিংবা নেভির য়ুনিফর্মের সঙ্গে গুবলেট পাকিয়ে আপন অজানাতে দুম্ করে একটা সলুট মেরে ফেলে।

তারপর সেই উর্দী পরা ভদ্রলোকটি আপনার সঙ্গে কথা কইবেন ইংরিজিতে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, আপনি ধুতি-কুর্তা-পরা নিরীহ বাঙালী তবু ইংরিজি বলা চাই। আপনি না হয় সামলে নিলেন—বি. এ., এম. এ. পাস করেছেন—কিন্তু

আমি মশাই, পড়ি মহা বিপদে। তিনি আমার ইংরিজি বোঝেন না, আমি তাঁর ইংরিজি বুঝতে পারি নে—কী জ্বালা! এখন অবশ্য অনেক পোড় খাওয়ার পর শিখে গিয়েছি যে জোর করে বাঙলা চালানোই প্রশস্ততম পন্থা। অন্ততঃ তিনি আমার বক্তব্যটা বুঝতে পারেন।

তখ্‌খুনি যদি রোক্কা টাকা ঢেলে দিয়ে টিকিট কাটেন তবে তো ল্যাঠা চুকে গেল কিন্তু যদি শুধু 'বুক' করান তবে আপনাকে আবার আসতে হবে টাকা দিতে। নগদা টাকা ঢেলে দেওয়াতে অসুবিধে এই যে পরে যদি মন বদলান তবে রিফাণ্ড পেতে অনেক হ্যাঁপা পোয়াতে হয়। সে না হয় হল, রেলের বেলাও হয়।

কিন্তু প্লেনের বেলা আরেকটা বিদকুটে নিয়ম আছে। মনে করুন আপনি ঠিক সময় দমদমা উপস্থিত না হতে পারায় প্লেন মিস করলেন। রেলের বেলা আপনি তখুনি টিকিট ফেরত দিলে শতকরা দশ টাকা কিংবা তারো কম কম-বেশী খেসারতির আক্কেলসেলামি দিয়ে ভাড়ার পয়সা ফেরত পাবেন। প্লেনের বেলা সে-টি হচ্ছে না। অথচ আপনি পাকা খবর পেলেন, প্লেনে আপনার সীট ফাঁকা যায়নি, আরেক বিপদগ্রস্ত ভদ্রলোক পুরো ভাড়া দিয়ে আপনার সীটে করে ট্রাভেল করেছেন, এ্যার কোম্পানীও স্বীকার করলো কিন্তু তবু আপনি একটি কড়িও ফেরত পাবেন না। এ্যার কোম্পানীর ডবল লাভ! এ-নিয়ে দেওয়ানী মোকদ্দমা লাগালে কি হবে বলতে পারি নে, কারণ আমি আদালতকে ডরাই এ্যার কোম্পানীর চেয়ে একটুখানি বেশী।

টিকিট কেটে তো বাড়ি ফিরলেন। তারপর সেই মহামূল্যবান 'মূল্যপত্রিকা'-খানি পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে প্লেন দমদমা থেকে ছাড়বে দশটার সময়, আপনাকে কিন্তু এ্যার আপিসে হাজিরা দিতে হবে আটটার সময়! বলে কি? নিতান্ত থাড্ডো কেলাসে যেতে হলেও তো আমরা এক ঘণ্টার পূর্বে হাওড়া যাই নে—কাছাকাছির সফর হলে তো আধঘণ্টা পূর্বে গেলেই যথেষ্ট আর যদি ফার্স্ট কিংবা সেকেণ্ডের (প্লেনে আপনি ভাড়া দিচ্ছেন ফার্স্টের চেয়েও বেশী —অনেক সময় ফার্স্টের দেড়া!) বার্থ রিজার্ভ থাকে তবে তো আধ মিনিট পূর্বে পৌঁছলেই হয়। আপনি হয়ত প্লেনে থাকবেন পৌনে দু'ঘণ্টা, অথচ আপনাকে এ্যার আপিসে যেতে হচ্ছে পাকি দু'ঘণ্টা পূর্বে (মোকামে পৌঁছে সেখানে আরো কত সময় যাবে সে-কথা পরে হবে)।

এইবার মাল নিয়ে শিরঃশীড়া। আপনি চুয়াল্লিশ (কিংবা বিয়াল্লিশ) পৌণ্ড লগেজ ফ্রী পাবেন। অতএব,

'সোনা-মুগ সরু চাল সুপারি ও পান,
ও হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই-চারিখান
গুড়ের পাটালি ; কিছু ঝুনা নারিকেল,
দুই ভাণ্ড ভালো রাই-সরিষার তেল
আমসত্ত্ব আমচুর—'

ইত্যাদি মাথায় থাকুন, বিছানাটি যে নিয়ে যাবেন তারো উপায় নেই। অথচ আপনি গৌহাটি নেমে হয়ত ট্রেনে যাবেন লামডিং, সেখানে উঠবেন ডাক বাঙলোয়। বিছানা—বিশেষ করে মশারি—বিন কি করে গোঁয়াবেন দিন-রাতিয়া ?

বিছানাটা নিলেন কি ? না। তার ভেতরে যে ভারী জিনিস কিছু কিছু লুকোবেন ভেবেছিলেন সেটিও তা হলে হল না। অবশ্য লুকিয়ে কোনো লাভ হত না কারণ জিনিসটিকে ওজন তো করা হতই—মালে আপনি ফাঁকি দিতে পারতেন না।

এ্যার ট্রাভেল করবেন—মাত্র বিয়ালিশ পৌণ্ড ফ্রী লগেজ—অতএব আপনি নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের মত একটি পিচবোর্ডে কিংবা ফাইবারের সুটকেসে মালপত্র পুরে—সেটার অবস্থা কি হবে মোকামে পৌঁছলে পর বলবো—রওয়ানা দিলেন এ্যার আপিসের দিকে, ছাতা-বরসাতি এটাচি হাতে, তার জন্য ফালতো ভাড়া দিতে হবে না (থ্যাঙ্ক ইউ !)। ট্যাক্সি যখন নিতেই হবে তখন সঙ্গে চললেন দু' একজন বন্ধু-বান্ধব। যদিস্যাৎ দৈবাৎ প্লেন মিস্ করেন তবে একটি কড়িও ফেরত পাবেন না বলে দু-দশ মিনিট আগেই রওয়ানা দিলেন এবং এ্যার আপিসে পৌঁছলেন পাকি সোয়া দু ঘণ্টা পূর্বে—আমার জাত-ভাই বাঙালরা যে রকম ইস্টিশানে গাড়ি ছাড়ার তিন ঘণ্টা পূর্বে যায়।

এ্যার আপিসের লোক হন্তদন্ত হয়ে ট্যাক্সি থেকে আপনার মাল নামাবে। সে লোকটা কুলি-চাপরাসীর সমন্বয়—তা হোক্ গে, কিন্তু তার বাই সে 'হিন্দীতে'—রাষ্ট্রভাষাতে—অর্থাৎ তার অউন, অরিজিন্যাল হিন্দীতে কথা বলবেই—যে রকম তার বসের ইংরেজি বলার বাই, অথচ উভয় পক্ষই বাঙালী। আমাদের বঙ্কিম, আমাদের রবীন্দ্রনাথ বলতে আমরা অজ্ঞান, কিন্তু এই বাঙলা দেশের মহানগরী রামমোহন রবীন্দ্রনাথের লীলাভূমিতেই আপিস-আদালতে, রাস্তা-ঘাট 'আ মরি বাংলা ভাষার' কী কদর, কী সোহাগ !

॥ ২ ॥

কলকাতা বাঙালীর শহর। বাঙালী বলতে আপনি আমি মধ্যবিত্ত বাঙালীই বুঝি তাই আমাদের এ্যার আপিসগুলোর অবস্থা মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের মত। অর্থাৎ মাসের পয়লা তিন দিন ইলিশ মুর্গী তারপর আলুভাতে আর মসুর ডাল।

ঢাক-ঢোল শাঁক-করতাল বাজিয়ে যখন প্রথম আমাদের এ্যার আপিসগুলো খোলা হয় তখন সেগুলো বানানো হয়েছিল একদম সায়েবি কায়দায়। বড় বড় কৌচ, বিরাট বিরাট সোফা, এন্তার ফ্যান, হ্যাট-স্ট্যাণ্ড, গ্লাস-টপ টেবিল, তার উপরে থাকতো মাসিক, দৈনিক, এ্যাশট্রে আরো কত কি। সাহস হত না বসতে, পাছে জামাকাপড়ের ঘষায় সোফার চামড়া নোংরা হয়ে যায়—চাপরাসীগুলোর উর্দীই তো আমার পোশাকের চেয়ে ঢের বেশী দুরস্ত, ছিমছাম।

আর আজ? চেয়ারগুলোর উপর যা ময়লা জমেছে তাতে বসতে ঘেন্না করে। ফ্যানগুলো ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে ছুটির আবেদন জানাচ্ছে, দেওয়ালে চুনকাম করা হয়নি সেই অন্নপ্রাশনের দিন থেকে—সমস্তটা নোংরা, এলোপাতাড়ি আর আবহাওয়াটা ইংরিজিতে যাকে বলে ড্রেয়ারি, ডিসমল্।

একটা এ্যার আপিসে দেখেছি—ভিতরে যাবার দরজায় যেখানে হাত দিয়ে ধাক্কা দিতে হয় সেখানে যা ময়লা জমেছে তার তুলনায় রান্নাঘরের তেলচিটে কালি-মাখা দরজাও পরিষ্কার। আপনি সহজে বিশ্বাস করবেন না, আসুন একদিন আমার সঙ্গে, আপনাকে দেখিয়ে দেব।

এইবারে একটু আনন্দের সন্ধান পাবেন। দশাশয়ী লাশদের যখন ওজন করা হবে তখন আড়নয়নে ওজনের কাঁটাটার দিকে নজর রাখবেন। ১৬০ থেকে তামাসা আরম্ভ হয়, তারপর ডবল সেঞ্চুরি পেরিয়ে কেউ কেউ মুশতাক আলীর মত ট্রিপলের কাছাকাছি পৌঁছে যান। আমার বন্ধু '—' মুখুয্যে যখন একবার ওজন নিতে উঠেছিল তখন কাঁটাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে শেষটায় থপ করে শূন্যেতে এসে ভিরমি গিয়েছিল। মুখুয্যে আমাকে হেসে বলেছিল, 'কিন্তু ভাড়া তুমি যা দাও আমিও তাই।'

কী অন্যায়!

তারপর আবার সেই একটানা একঘেয়ে অপেক্ষা।

তিন কোয়ার্টার পরে খবর আসবে—মালপত্র সব বাসে তোলা হয়ে গিয়েছে। আপনারা গা-তুলুন।

রবিঠাকুর কি একটা গান রচেছেন না ?

আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে
তোমার সুরের সুরে সুর মেলাতে—

এ্যার কোম্পানীর বাসগুলো কিন্তু আপিসগুলোর সঙ্গে দিব্য সুর মিলিয়ে বসে আছে। লড়াইয়ের বাজারে যখন বিলেত থেকে নূতন মোটর আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন কচু-বন থেকে কুড়িয়ে-আনা যে সব বাস গ্রামাঞ্চলে চড়েছিলুম আমাদের এ্যার কোম্পানীর বাস প্রায় সেই রকম। ওদেরই আপিসের মত নোংরা, নড়বড়ে আর সীটগুলোর স্প্রিং অনেকটা আরবিস্থানের উটের পিঠের মত। 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়ীন' হওয়ার শখ যদি আপনার হয়, আরব দেশ না গিয়ে, তবে এই বাসের যে কোনো একটা দু'দণ্ডের তরে চড়ে নিন। আপনার মনে আর কোন খেদ থাকবে না।

মধ্য কলকাতা থেকে দমদম ক'মাইল রাস্তা সে খবর বের করা বোধ হয় খুব কঠিন নয় ; কিন্তু সেই বাসে চড়ে আপনার মনে হবে :—

'যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ।'

মোটর, ট্যাক্সি, স্টেট বাস, বেসরকারী বাস এমন কি দু-চারখানা সাইকেল-রিক্সাও আপনাকে পেরিয়ে চলে যাবে। ত্রিশ না চল্লিশ জন যাত্রীকে এক খেপে দমদম নিয়ে যাবার জন্য তৈরী এই ঢাউস বাস—প্রতি পদে সে জাম্ হয়ে যায়, ড্রাইভার করবে কি, আপনিই বা বলবেন কি ?

দিল্লী থেকে কলকাতা আসবার সময় একবার দেখেছিলুম, যে যাত্রী প্লেনের দোলাতে কাতর হয়নি সে এই বাসের ঝাঁকুনিতে বমি করেছিল।

দমদমা পৌঁছলেন। এবারে প্লেন না-ছাড়া পর্যন্ত একটানা প্রতীক্ষা। সেও প্রায় তিন কোয়ার্টারের ধাক্কা।

তবে সময়টা অত মন্দ কাটবে না। জায়গাটা সাফ-সুতরো, বইয়ের স্টল আছে, দমদম আন্তর্জাতিক এ্যার-পোর্ট বলে জাত-বেজাতের লোক ঘোরাঘুরি করছে, ফুটফুটে ফরাসী মেম থেকে কালো-বোরকায় সর্বাঙ্গ ঢাকা পর্দা-নশিনী হজযাত্রিণী সব কিছুই চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবে।

তবে এ-কথাও ঠিক হাওড়ার প্ল্যাটফর্মের তুলনায় এখানে উত্তেজনা এবং চাঞ্চল্য কম। প্লেনে যখন মাল আর আপনার জায়গা হবেই তখন আর হুতো-হুতি গুঁতোগুঁতি করার কি প্রয়োজন ?

তবু ভারতবর্ষ তাজ্জব দেশ। দিনকয়েক পূর্বে দমদম এ্যার-পোর্ট রেস্তোরাঁয় ঢুকে এক গেলাস জল চাইলুম। দেখি জলের রঙ ফিকে হলদে। শুধালুম, শরবত

কি ফ্রী বিলোনো হচ্ছে? বয় বললে, জলের টাঁকি সাফ করা হয়েছে তাই জল ঘোলা এবং মৃদুস্বরে উপদেশ দিলে ও-জল না-খাওয়াই ভালো।

শুনেছি, ইয়োরোপের কোনো কোনো দেশে নরনারী এমন কি বাচ্চা-কাচ্চারাও নাকি জল খায় না। দমদমাতে যদি কিছুদিন ধরে নিত্যি নিত্যি টাঁকি সাফ করা হয় তবে আমরা সবাই সায়েব হয়ে যাবো। শুধু কি তাই, জলের জন্য উদ্বাস্তুরা উদ্ব্যস্ত করে তুলবে না কলকাতা কর্পোরেশনকে। আমরা সবাই তখন রুটির বদলে কেক খাবো। সে কথা থাক্!

কিন্তু দমদম এ্যার-পোর্টের সত্যিকার জৌলুস খোলে যেদিন ভোরে কুয়াশা জমে। কাণ্ডটা আমি এই শীতেই দুবার দেখেছি।

ভোর থেকে যে সব প্লেনের দমদম ছাড়ার কথা ছিল তার একটাও ছাড়তে পারেনি। তার প্যাসেঞ্জার সব বসে আছে এ্যার-পোর্টে। আরো যাত্রী আসছে দলে দলে, তাদেরও প্লেন ছাড়তে পারছে না। করে করে প্রায় দশটা বেজে গেল। একদিক থেকে যাত্রীরা চলে যাচ্ছে, অন্যদিক থেকে আসছে, এই স্রোত বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তখন দমদমাতে যে যাত্রীর বন্যা জাগে, তাদের উৎকণ্ঠা, আহারাদির সন্ধান, খবরের জন্য এ্যার কোম্পানীর কর্মচারীদের বার বার একই প্রশ্ন শোধানো, 'ড্যাম ক্যালকাটা ওয়েদার' ইত্যাদি কটুবাক্য, নানারকমের গুজোব—কোথায় নাকি কোন্ প্লেন ক্র্যাশ করেছে, কেউ জানে না—যে সব বন্ধুরা 'সী অফ্' করতে এসেছিলেন তাঁদের আপিসের সময় হয়ে গেল অথচ চলে গেলে খারাপ দেখাবে বলে কষ্টে আত্মসম্বরণ, প্লেন 'টেক অফ্' করতে পারছে না ওদিকে ব্রেকফাস্টের সময় হয়ে গিয়েছে বলে যাত্রীদের ফ্রী খাওয়ানো হচ্ছে, কঞ্জুস কোম্পানীগুলো গড়িমসি করছে বলে তাদের যাত্রীদের অভিসম্পাত—আরো কত কি?

লাউড স্পীকার ভোর ছটা থেকে রা কাড়েনি। খবর দেবেই বা কি?

দমদমা নর্থ-পোল হলে কি হত জানি নে—শেষটায় কুয়াশা কাটলো। হঠাৎ শুনি লাউড স্পীকারটা কুয়াশায়-জমা গলায় কাশি বার কয়েক সাফ করে জানালে, 'অমুক জায়গার প্যাসেঞ্জাররা অমুক প্লেনে (ডি বি জি, হি বি জি, হিজিবিজি কি নম্বর বললে বোঝা গেল না) করে রওয়ানা দিন।'

আমি না হয় ইংরিজি বুঝি নে, আমার কথা বাদ দিন, কিন্তু লক্ষ্য করলুম, আরও অনেকে বুঝতে পারেননি। গোবেচারীরা ফ্যাল ফ্যাল করে ডাইনে-বাঁয়ে তাকালে, অপেক্ষাকৃত চালাকেরা এ্যার আপিসে খবর নিলে, শেষটায় যে-প্লেন ছাড়বে তার কোম্পানীর লোক আমাদের ডেকে-ডুকে জড়ো করে প্লেনের দিকে

রওয়ানা করে দিলে—পাণ্ডারা যে-রকম গাঁইয়া তীর্থযাত্রীদের ধাক্কাধাক্কি দিয়ে ঠিক গাড়িতে তুলে দেয়।

আমার সঙ্গে পাশাপাশি হয়ে যাচ্ছিলেন এক মারোয়াড়ী ভদ্রলোক। আমাকে বললেন, 'আজকাল তো অনেক ইংরেজী না-জাননেওয়ালা যাত্রী-ভী প্লেন চঢ়ছে—তব্ বাঙালী জবান মে প্লেনকা খবর বলে না কাহে?'

ঐ বুঝলেই তো পাগল সারে।

॥ ৩ ॥

দেবরাজকে সাহায্য করে রাজা দুষ্মন্ত যখন পুষ্পক রথে চড়ে পৃথিবীতে ফিরছিলেন, তখন যেমন যেমন তিনি পৃথিবীর নিকটবর্তী হতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়-পর্বত, গৃহ-অট্টালিকা অতিশয় দ্রুতগতিতে তাঁর চক্ষের সম্মুখে বৃহৎ আকার ধারণ করতে লাগল। যতদূর মনে পড়ছে, রাজা দুষ্মন্ত তখন তাই নিয়ে রথীর কাছে আপন বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

পুণার জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তারই উল্লেখ করে আমার কাছে সপ্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে, দুষ্মন্তের যুগ পর্যন্ত ভারতীয়েরা নিশ্চয়ই খপোত নির্মাণ করতে পারতেন, না হলে রাজা ক্রমাসন্ন পৃথিবীর এহেন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিলেন কি প্রকারে?

তার বহু বৎসর পরে একদা রমন মহর্ষি কোনো একটি ঘটনা বিশদভাবে পরিস্ফুট করার জন্য তুলনা দিয়ে বলেন, উপরের থেকে নিচের দিকে দ্রুতগতিতে আসার সময় পৃথিবীর ছোট ছোট জিনিস যে রকম হঠাৎ বৃহৎ অবয়ব নিতে আরম্ভ করে, ঠিক সেই রকম ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহর্ষির এক প্রাচীন ভক্ত আমার কাছে বসে ছিলেন। আমাকে কানে কানে বললেন, 'এখন তো তোমার বিশ্বাস হল যে, মহর্ষি যোগবলে উড্ডীয়মান হতে পারেন।' আমাকে এ-কথাটি তাঁর বিশেষভাবে বলার কারণ এই যে, আমি একদিন অলৌকিক ঘটনার আলোচনা প্রসঙ্গে একটি ফার্সী প্রবাদবাক্যের উল্লেখ করে বলেছিলুম,

'পীরুহা নমীপরন্দ,
শাগিরদার উস্তারা মীপরানন্দ্।'

অর্থাৎ 'পীর (মুরশাদ) ওড়েন না, তাঁদের চেলারা ওঁদের ওড়ান (cause them fly)'।

তার কিছুদিন পরে আমি রমন মহর্ষির পীঠস্থল তীরু-আন্নামলাই

(শ্রীআন্নামলাই) গ্রামের নিকটবর্তী অরুণাচল পর্বত আরোহণ করি। মহর্ষি এই পর্বতে প্রায় চল্লিশ বৎসর নির্জনে সাধনা করার পর তীরু-আন্নামলাই গ্রামে অবতরণ করেন—সাধনার ভাষায় অবতীর্ণ হন।

পাহাড়ের উপর থেকে রমনাশ্রম, দ্রৌপদী-মন্দির সব কিছুই খুব ছোট দেখাচ্ছিল। তারপর নামবার সময় পাহাড়ের সানুদেশে এক জায়গায় খুব সোজা এবং বেশ ঢালু পথ পাওয়ায় আমি ছুটে সেই পথ দিয়ে নামতে আরম্ভ করলুম এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলুম, আশ্রম, দ্রৌপদী-মন্দির কি রকম অদ্ভুত দ্রুত-গতিতে বৃহৎ আকার ধারণ করতে লাগলো।

আমার এ অভিজ্ঞতা থেকে এটা কিছু সপ্রমাণ হয় না যে, পুষ্পক রথ কল্পনার সৃষ্টি কিংবা রমন মহর্ষি যোগবলে আকাশে উড্ডীয়মান হননি, কিন্তু আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে দ্রুতগতিতে অবতরণ করার সময় ভূপৃষ্ঠ কিরূপ বৃহৎ আকার ধারণ করতে থাকে।

কিন্তু এর উল্টোটা করা কঠিন –কঠিন কেন, অসম্ভব। অর্থাৎ দ্রুতগতিতে উপরের দিকে যাচ্ছি আর দেখছি পৃথিবীর তাবৎ বস্তু ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে—এ-জিনিস অসম্ভব, কারণ দৌড় মেরে উপরের দিকে যাওয়া যায় না।

সেটা সম্ভব হয় এ্যারোপ্লেন চড়ে।

মাটির উপর দিয়ে প্লেন চলছিল মারাত্মক বেগে, সেটা ঠাহর হচ্ছিল এ্যার-ড্রোমের দ্রুত পলায়মান বাড়িঘর, হাঙ্গার, ল্যাম্পপোস্ট থেকে ; কিন্তু যেই প্লেন শ-পাঁচেক ফুট উপরে উঠে গেল, তখন মনে হল আর যেন তেমন জোর গতিতে সামনের দিকে যাচ্ছি নে।

উপরের থেকে নিচের দিকে তাকাচ্ছি বলে খাড়া নারকোল গাছ, টেলিগ্রাফের খুঁটি, তিনতলা বাড়ি ছোট তো দেখাচ্ছিলই, কিন্তু সবকিছু যে কতখানি ছোট হয়ে গিয়েছে, সেটা মালুম হল, পুকুর, ধানক্ষেত আর রেল লাইন দেখে। ঠিক পাখির মত প্লেনও এক একবার গা-ঝাড়া দিয়ে দিয়ে এক এক ধাক্কায় উঠে যাচ্ছিল বলে নিচের জিনিস ছোট হয়ে যাচ্ছিল এক এক ঝটকায়।

জয় মা গঙ্গা ! অপরাধ নিও না মা, তোমাকে পবননন্দনপদ্ধতিতে ডিঙিয়ে যাচ্ছি বলে। কিন্তু মা, তুমি যে সত্যি মা, সেটা তো এই আজ বুঝলুম তোমার উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময়। তোমার বুকের উপর কৃষ্ণাম্বরী শাড়ি, আর তার উপর শুয়ে আছে অগুণতি ক্ষুদে ক্ষুদে মানওয়ারি জাহাজ, মহাজনী নৌকা—আর পানসিডিঙির তো লেখা-জোখা নেই। এত দিন এদের পাড় থেকে অন্য

পরিপ্রেক্ষিতে দেখেছি বলে হামেশাই মনে হয়েছে, জাহাজ নৌকা এরা তেমন কিছু ছোট নয়, আর তুমিও তেমন কিছু বিরাট নও, কিন্তু 'আজ কি এ দেখি, দেখি, দেখি, আজ কি দেখি ?—' এই যে ছোট ছোট আণ্ডা-বাচ্চারা তোমার বুকের উপর নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে আছে, তারা তোমার বুকের তুলনায় কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য ! এদের মত হাজার হাজার সন্তান-সন্ততিকে তুমি অনায়াসে তোমার বুকের আঁচলে আশ্রয় দিতে পারো।

প্লেন একটুখানি মোড় নিতেই হঠাৎ সর্বব্রহ্মাণ্ডের সূর্যরশ্মি এসে পড়লো মা গঙ্গার উপর। সঙ্গে সঙ্গে যেন এ-পার ও-পার জুড়ে আগুন জ্বলে উঠলো, কিন্তু এ-আগুন যেন শুভ্র মল্লিকার পাপড়ি দিয়ে ইস্পাত বানিয়ে। সেদিকে চোখ ফিরে তাকাই তার কি সাধ্য ? মনে হল স্বয়ং সূর্যদেবের—রুদ্রের—মুখের দিকে তাকাচ্ছি ; তিনি যেন শুধু স্বচ্ছ রজত-যবনিকা দিয়ে বদন আচ্ছাদন করে দিয়েছেন। এ কী মহিমা, এ কী দৃশ্য ? কিন্তু এ আমি সইব কি করে ? তোমার দক্ষিণ মুখ দেখাও, রুদ্র। হে পূষন, আমি উপনিষদের জ্যোতির্দ্রষ্টা ঋষি নই, যে বলবো,

'হে পূষন, সংহরণ
করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো
তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে-পুরুষ
তোমার আমার মাঝে এক।'

আমি বলি, তব রশ্মিজাল তুমি সংহরণ করো, তুমি আমাকে দেখা দাও, তোমার মধুর রূপে, তোমার রুদ্র রূপে নয়। তোমার বদন-যবনিকা ঘনতর করে দাও।

তাই হল—হয়ত প্লেন তাঁরই আদেশে পরিপ্রেক্ষিত বদলিয়েছে—এবার দেখি গঙ্গাবক্ষে স্নিগ্ধ রজত-আচ্ছাদন আর তার উপর লক্ষ কোটি অলস সুরসুন্দরী সব শুধু মাত্র তাঁদের নূপুর দৃশ্যমান করে নৃত্য আরম্ভ করেছেন। কিন্তু এ নৃত্য দেখবার অধিকার আমার আছে কি ? রুদ্র না হয় অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর চেলা নন্দীভৃঙ্গীরা তো রয়েছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাদের সমঝে চলতেন, যদিও ওদিকে পূষনের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল—তাই বলেছেন,

'ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত-আঁখি !'

অস্ট্রিচ পাখি যে রকম ভয় পেলে বালুতে মাথা গুঁজে ভাবে, কেউ তাকে

দেখতে পাচ্ছে না, আমিও ঠিক তেমনি পকেট থেকে কালো চশমা বের করে পরলুম—এইবারে নূপুর-নৃত্য দেখতে আর কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

শুনি, 'স্যর, স্যর!' এ কী জ্বালা! চেয়ে দেখি প্লেনের স্টুয়ার্ড ট্রে'তে করে সামনে লজেঞ্জুস ধরেছে। বিশ্বাস করবেন না, সত্যি ল্যাবেঞ্চুস্! লাল, পিলা, ধলা, হরেক রঙের। লোকটা মস্করা করছে নাকি—আমি ছোঁড়ার বাপের বয়সী—আমাকে দেখাচ্ছে লজেঞ্জুস! তারপর কি ঝুমঝুমি দিয়ে বলবে, 'বাপধন এইটে দোলাও দিকিনি, ডাইনে বাঁয়ে, ডাইনে—আর—বাঁয়ে!'

এদিকে রসভঙ্গ করলো, ওদিকে দেখাচ্ছে লজেঞ্জুসের রস। আমি মহা বিরক্তির সঙ্গে বললুম, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

লোকটা আচ্ছা গবেট তো! শুধালে, 'থ্যাঙ্ক ইউ, ইয়েস; অর থ্যাঙ্ক ইউ, নো।' মনে মনে বললুম, 'তোমার মাথায় গোবর।' বাইরে বললুম, 'নো।' কিন্তু এবারে আর 'থ্যাঙ্ক ইউ' বললুম না।

কিন্তু বিশ্বাস করবেন না, মশাইরা, বেশির ভাগ ধেড়েরাই লজেঞ্জুস নিলে এবং চুষলে।

তবে কি হাওয়ায় চড়ে এদের গলা শুকিয়ে গিয়েছে, আর ঐ বাচ্চাদের মাল নিয়ে গলা ভেজাচ্ছে? আল্লায় মালুম।

ওমা ততক্ষণে দেখি সামনে আবার গঙ্গা। কাটোয়ার বাঁক।

প্লেন আবার গঙ্গা ডিঙলো। ওকে তো আর খেয়ার পয়সা দিতে হয় না। কে বলেছে,

'ভাগ্যিস আছিল নদী জগৎ-সংসারে
তাই লোকে কড়ি দিয়ে যেতে পারে ও-পারে'॥

চরিত্র-বিচার

অঙ্কশাস্ত্রে প্রশ্ন ওঠে না, এ বাবদে আপনার কিংবা আমার অভিজ্ঞতা কি? রস নির্মাণে ঠিক তার উল্টো। সেখানে লেখক আপন অভিজ্ঞতা থেকে চরিত্র নির্মাণ করেন আর পাঠক আপন অভিজ্ঞতা দিয়ে সেটাকে অল্পবিস্তর যাচাই করে নেয়। কিন্তু যখন কোনো জাতির চরিত্র নিয়ে আলোচনা হয় তখন সেটাকে একদিক দিয়ে যেমন অঙ্কশাস্ত্রের মত—নৈর্ব্যক্তিক করা যায় না, ঠিক তেমনি সেটাকে সম্পূর্ণ নিজের অভিজ্ঞতার উপরও ছেড়ে দেওয়া যায় না। এবং তখন আবার এ প্রশ্নও ওঠে, যে-সব লোক এ আলোচনায় যোগ দিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতা

এ বাবদে কতখানি।

আমার অতি সামান্য আছে। তাই এই ভূমিকা দিয়ে আরম্ভ করতে হল। এবং অনুরোধ, নিজের অভিজ্ঞতার দোহাই যদি মাত্রা পেরিয়ে যায় তবে যেন পাঠক অপরাধ না নেন। সেটা সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়। 'বাঙালী চরিত্র' সম্বন্ধে যদি প্রামাণিক পুঁথিপ্রবন্ধ থাকতো তবে তারই উপর নির্ভর করে আলোচনা অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারতো। তা নেই। বস্তুতঃ আমাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় অন্য প্রদেশের লোক দ্বারা বাঙালী সম্বন্ধে অকৃপণ, অকরুণ নিন্দাবাদ থেকে। যথা 'বাঙালী বড় দম্ভী', 'বাঙালী অন্য প্রদেশের সঙ্গে মিশতে চায় না',—সহৃদয় মন্তব্য যে একেবারেই শুনতে পাওয়া যায় না, তা নয়—যেমন শুনবেন, 'বাঙালী মেয়ে ভালো চুল বাঁধতে জানে', কিংবা 'ব্যবসাতে বাঙালীকে ঘায়েল করা (অর্থাৎ ঠকানো) অতি সরল।'

আমি ভারতবর্ষের সব প্রদেশেই বাস করেছি। দিল্লীতেও প্রায় চার বৎসর ছিলুম। চোখ কান খোলা খাড়া না রাখলেও সেখানে আপনাকে অনেক খবর অনেক গুজোব শুনতে হয়।

বাঙালীর প্রতি আপনার যদি কোনো দরদ থাকে তবে কিছুদিনের মধ্যেই আপনি কতকগুলো জিনিস স্পষ্ট বুঝে যাবেন।

(১) সিন্ধী পাঞ্জাবী দেশহারা হয়ে দিশেহারা হয়নি। সিন্ধীরা বোম্বাই অঞ্চলে, পাঞ্জাবীরা দিল্লী অঞ্চলে আপন ব্যবসা-বাণিজ্য দিব্য গোছগাছ ছিমছাম করে নিয়েছে। বরঞ্চ, অনেক স্থলে এদের সুবিধেই হয়েছে বেশী। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। দিল্লীর কনট সার্কাস থেকে মুসলমান হোটেলওয়ালারা চলে যাওয়াতে সেখানে পাঞ্জাবীরা গাদা গাদা রেস্তোরাঁ খুলেছে। (ফলে খাস দিল্লীর মোগলাই রান্না সেখান থেকে লোপ পেয়েছে—এখন যা পাবেন সে বস্তু পাঞ্জাবী রান্না, লাহোর অঞ্চলের। দিল্লীর রান্নার কাছে সে রান্না অজ পাড়াগেঁয়ে।) এই পাঞ্জাবীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার অন্ত নেই। এদের কেউ কেউ পারমিট গিরমিট ব্যাপারে আমার কাছে দৈবেসৈবে সাহায্য নিতে এসেছে—কিন্তু কখনো হাত পাতেনি। এরা যা খাটছে এবং খেটেছে তা দেখে আমি সর্বান্তঃকরণে এদের কল্যাণ এবং শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছি।

তাই অতিশয় সভয়ে শুধাই, পূব বাঙলার লোক পশ্চিম বাঙলায় এসে অনেক করেছে কিন্তু পাঞ্জাবী সিন্ধীরা যতখানি পেরেছে ততখানি কি তাদের দ্বারা হয়েছে? এ বড় বে-দরদ এবং বেয়াদব প্রশ্ন। পূর্ববঙ্গবাসীরা এ প্রশ্নে আমার উপর চটে গিয়ে অনেক কড়া কড়া উত্তর শুনিয়ে দেবেন। আমি নতশিরে সব

উত্তর মেনে নিচ্ছি। এবং এস্থলে আগেভাগেই বলে রাখছি, আমি তাদের উকিল হয়েই এ-আলোচনা আরম্ভ করেছি, তাদেরই সাফাই গাইবার জন্য। একটু ধৈর্য ধরুন।

(২) চাকরি যেখানে ব্যক্তিবিশেষ কিংবা ব্যবসা-বিশেষের চাকরি সেখানে সে চাকুরির মূল্য চাকুরের পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু দেশের দশের পক্ষে তা যৎসামান্য। কিন্তু চাকরি যখন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে হয়, তখন তার গুরুত্ব অসাধারণ। সকলেই জানেন, দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মুখে অনেকগুলো বিরাট বিরাট পরিকল্পনা রয়েছে। এ-সব পরিকল্পনা ফলবতী করার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত বর্তায়, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের উপর।

তাই প্রশ্ন, এই সব চাকরি পাচ্ছে ক'জন বাঙালী? পূর্বের তুলনায় এদের উপস্থিত রেশিয়ো কি? পূর্বের তুলনা বাদ দিলেও, প্রাদেশিক জন-সংখ্যার হিসেবে তারা তাদের ন্যায্য হক্কগত রেশিয়ো পাচ্ছে কি?

দিল্লীবাসী বাঙালীমাত্রই একবাক্যে তারস্বরে বলবে, 'না, না, না।' পরশ্রী-কাতর অবাঙালীও সে-ঐক্যতানে যোগ দেয়। মনে মনে হয়তো বলে 'ভালোই হয়েছে'।—তা সে কথা থাক্।

কেন পায়নি তার জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষ দেব না। দোষ বাঙালীর। কেন পারলে না, সেই সাফাই গাইবার জন্যই এ-আলোচনা। আরো একটু ধৈর্য ধরুন।

(৩) অথচ দ্রষ্টব্য, দিল্লীর সাংস্কৃতিক মজলিসে বাঙালী এখনো তার আসন বজায় রাখতে পেরেছে। এই কিছুদিন পূর্বেই শম্ভু মিত্র দিল্লীতে যা ভেল্কীবাজি দেখালেন সে কেরামতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। অল্পের ভিতর লিট্‌ল্ থিয়েটার চালায় চাটুয্যে। দিল্লীতে যাবতীয় চিত্র-ভাস্কর্য প্রদর্শনী হয় বাঙালী উকিলবাবুর তাঁবেতে। গাওনাবাজনাতে বাঙাল আলাউদ্দীন সায়েব—রবিশঙ্করের কথা নাই বা তুললুম, কারণ তিনি সরকারী নোকরি করেন। শিক্ষাদীক্ষায় মৌলানা আজাদ সায়েব। সাহিত্যে হুমায়ুন কবির।

ইতিমধ্যে সত্যজিৎ রায়ের তোলা 'পথের পাঁচালী' দিল্লী ছাড়িয়েও কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে চলে গিয়েছে। নভেম্বরে বুদ্ধ-জয়ন্তী হওয়ার পূর্বেই হাঁকডাক পড়ে গিয়েছে, 'কে করে তবে "নটীর পূজা", কাকে ডাকা যায় "চণ্ডালিকা"র জন্য?'

অর্থাৎ বাঙালীর রসবোধ আছে, অর্থাৎ সে স্পর্শকাতর। তাই সে সেন্‌সিটিভ এবং অভিমানী।

আলিপুর বোমা মামলার সময় শমসুল হক্ (কিংবা ইসলাম) নামক একজন

ইন্‌স্‌পেক্‌টর আসামীদের সঙ্গে পীরিত জমিয়ে ভিতরের কথা বের করে ফাঁস করে দেয়। বোমারুরা তাই তার উল্লেখ করে বলতো, 'হে শমসুল, তুমিই আমাদের শ্যাম, আর তুমিই আমাদের শূল।'

স্পর্শকাতরতাই বাঙালীর শ্যাম এবং ঐ স্পর্শকাতরতাই তার শূল। শুদ্ধমাত্র কিছু না দিয়ে স্টেজ সাজিয়ে নিয়ে দশটা বাঙালী তিন দিনের ভিতর যে রকম একটা নাট্য খাড়া করে দিতে পারে অন্য প্রদেশেব লোক সে রকম পারে না। আবার যেখানে পাঁচটা সিন্ধী পারমিটের জন্য বড় সায়েবের দরজায় পঞ্চান্ন দিন ধন্না দেবে সেখানে বাঙালীর নাভিশ্বাস ওঠে পাঁচ মিনিটেই। সংসারে করে খেতে হলে ড্রিল ডিসিপ্লিনের দরকার। আর ওসব জিনিস পারে বুদ্ধিসুদ্ধিতে যারা কিঞ্চিৎ ভোঁতা, অনুভব-অনুভূতির বেলায় একটুখানি গণ্ডারের চামড়াধারী।

স্পর্শকাতরতা এবং ডিসিপ্লিন এ-দুটোর সমন্বয় হয় না? বোধ হয় না। লাতিন জাতটা স্পর্শকাতর; তাদের ভিতর ডিসিপ্লিনও কম। ইংরেজ সাহিত্য ছাড়া প্রায় আর সব রসের ক্ষেত্রে ভোঁতা—তাই তার ডিসিপ্লিনও ভালো।

এ আইনের ব্যত্যয় জর্মনিতে। চরম স্পর্শকাতর জাত মোক্ষম ডিসিপ্লিন মেনে নিলে কি মারাত্মক অবস্থা হতে পারে হিটলার তার সর্বোত্তম উদাহরণ। হালের জর্মনরা তাই বলে, 'অতখানি ডিসিপ্লিন ভালো নয়।' কিন্তু এ-কথা কাউকে বলতে শুনিনি, 'অতখানি স্পর্শকাতরতা ভালো নয়।'

কোন জিনিসেরই বাড়াবাড়ি ভালো নয়, সে তো আমরা জানি, কিন্তু আসল প্রশ্ন, লাইন টানবো কোথায়? জাতীয় জীবনে স্পর্শকাতরতা থাকবে কতখানি আর ডিসিপ্লিন কতখানি? কিংবা শুধাই, উপস্থিত যে মেকদার বা প্রোপর্শন আছে সেটাতে বাড়াই কোন্ বস্তু—স্পর্শকাতরতা না ডিসিপ্লিন?

গুণীরা বিচার করে দেখবেন॥

দিল্লী,

১৩৬৩।

গান্ধীজীর দেশে ফেরা

১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইতালি থেকে জাহাজে ফিরছিলুম; ঝক্‌ঝকে চকচকে নূতন জাহাজ, তিলটি পড়লে কুড়িয়ে তোলা যায়। যাত্রী-পালের সুখ-সুবিধার তদারক করনেওয়ালা স্টুয়ার্ডের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। তাকে বললুম, "এরকম সাফ্‌সফা জাহাজ কখনো দেখিনি।"

সে বিশেষ উৎসাহ না দেখিয়ে বললে, "হবে না। নূতন জাহাজ! তার উপর এই কিছুদিন আগে তোমাদের মহাত্মা গাঁধী এই জাহাজে দেশে ফেরেন।"

আমার অদ্ভুত লাগল। মহাত্মাজী শরীর খুব পরিষ্কার রাখেন জানি, কাপড়-চোপড়, বাড়ি-ঘর-দোরও, কিন্তু এত বড় জাহাজখানাও কি তিনি মেজে ঘষে— ? বললুম, "সে কি কথা ?"

স্টুয়ার্ড বললে—"মশায়, সে এক মস্ত ইতিহাস। এ যাত্রায় খুব বেঁচে গেছি। ইংরেজ যদি ঘন ঘন গোলটেবিল বৈঠক বসায়, আর তোমাদের ঐ গাঁধী যদি নিত্যি নিত্যি এই জাহাজে যাওয়া আসা আরম্ভ করেন, তবে আর বেশী দিন বাঁচতে হবে না।"

আমি বললুম—"তোমার কথাগুলো নতুন ঠেকছে। গান্ধীজী তো কাউকে কখনো জ্বালাতন করেন না।"

স্টুয়ার্ড বললে—"আজব কথা কইছেন স্যার; কে বললে গাঁধী জ্বালাতন করেন ? কোথায় তিনি, আর কোথায় আমি। ব্যাপারটা তাহলে শুনুন—

ইতালির বন্দরে জাহাজ বাঁধা। দিব্যি খাচ্ছি-দাচ্ছি-ঘুমোচ্ছি, কাজকর্ম চুকে গেছে, এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই, শুনতে পেলুম কাপ্তেন সাহেব পাগল হয়ে গেছেন। ছুটে গেলুম খবর নিতে। গিয়ে দেখি তিনি দু হাত দিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছেন আর সাতান্নবার করে একই টেলিগ্রাম পড়ছেন। খবর সবাই জেনে গেছে ততক্ষণে। ইল্‌ দুচে (অর্থাৎ মুস্‌সোলীনি) তার করেছেন, মহাত্মা গাঁধী এই জাহাজে করে দেশে ফিরছেন। বন্দোবস্তের যেন কোনো ত্রুটি না হয়।

তারপর যা কাণ্ড শুরু হল, সে ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়। গোটা জাহাজ-খানাকে চেপে ধরে ঝাড়ামোছা, ধোওয়া-মাজা, মালিশ-পালিশ যা আরম্ভ হল, তা দেখে মনে হল ক্ষয়ে গিয়ে জাহাজখানা কপ্‌পুর হয়ে উবে যাবে। কাপ্তেনের খাওয়া নেই, নাওয়া নেই। যেখানে যাও, সেখানেই তিনি তদারক করছেন। দেখছেন, শুনছেন, শুঁকছেন, চাখছেন, আর সবাইকে কানে কানে বলছেন, 'গোপনীয় খবর, নিতান্ত তোমাকেই আপনজন জেনে বলছি, মহাত্মা গাঁধী

আমাদের জাহাজে করে দেশে ফিরছেন।' এই যে আমি, নগণ্য স্টুয়ার্ড, আমাকেও নিদেনপক্ষে বাহান্নবার বলেছেন ঐ খবরটা যদিও ততদিন সব খবরের কাগজে বেরিয়ে গেছে গাঁধীজী এই জাহাজে যাচ্ছেন ; কিন্তু কাপ্তেনের কি আর খবরের কাগজ পড়ার ফুরসত আছে ?

আমাদের ফার্স্ট ক্লাসের শৌখিন কেবিন-(কাবিন্ দ্য ল্যুক্স) গুলো দেখেছেন ? সেগুলো ভাড়া নেবার মত যখের ধন আছে শুধু রাজা-মহারাজাদের আর মার্কিন কারবারীদের। সেবারে যারা ভাড়া নিয়েছিল তাদের তার করে দেওয়া হল, 'তোমাদের যাওয়া হবে না, গাঁধীজী যাচ্ছেন। আধেকখানা জাহাজ গাঁধীজীর জন্য রিজার্ভ—পল্টনের একটা দল যাবার মত জায়গা তাতে আছে।

শৌখিন কেবিনের আসবাবপত্র দেখেছেন কখনো ? সোনার গিল্টি রুপোর পাতে মোড়া সব। দেয়ালে দামী সিল্ক, মেঝেতে ঘন সবুজ রঙের রবর আর ইরানি গালচে—ছ ইঞ্চি পুরু—পা দিলে পা বসে যায়। সেগুলো পর্যন্ত সরিয়ে ফেলা হল। ইল্ দুচে বিশেষ করে পালাদ্সো ভেনেদ্সিয়া (অর্থাৎ ভেনিসীয়-রাজপ্রাসাদ) থেকে চেয়ার-টেবিল, খাটপালঙ্ক পাঠিয়েছেন। আর সে খাট, মশয়, এমন তার সাইজ, ফুটবলের বি টীমের খেলা তার উপরে চলে। কেবিনের ছোট দরজা দিয়ে ঢোকে কি করে ! আন্ মিস্ত্রী, ডাক্ কারিগর, খোল্ কবজা, ঢোকা খাট। হৈ হৈ ব্যাপার—মার-মার কাণ্ড। খাবারদাবার আর বাদবাকী যা সব মালমশলা যোগাড় হল, সে না হয় আরেক হপ্তা ধরে শুনবেন।

সব তৈরী। ফিট্‌ফাট্। ওই যে বললেন, তিলটি পড়লে কুড়িয়ে তোলা যায়, ছুঁচটি পড়লে মনে হয় হাতী শুয়ে আছে।

গাঁধীজী যেদিন আসবেন সেদিন কাগ্‌কোকিল ডাকার আগে থেকেই কাপ্তেন সিঁড়ির কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে, পিছনে সেকেণ্ড অফিসার, তার পিছনে আর সব বড়কর্তারা, তার পিছনে বড় স্টুয়ার্ড, তার পিছনে লাইব্রেরিয়ান, তার পিছনে শেফ্ দ্য কুইজিন (পাচকদের সর্দার), তার পিছনে ব্যাণ্ড বাদ্যির বড়কর্তা, তার পিছনে—এক কথায় শুনে নিন, গোটা জাহাজের বেবাক কর্মচারী। আমি যে নগণ্য স্টুয়ার্ড, আমার উপর কড়া হুকুম, নট-নড়ন-চড়ন-নট-কিচ্ছু। বড় স্টুয়ার্ডের কাছে যেন চব্বিশ ঘণ্টা থাকি। আমার দোষ ? দু-চারটে হিন্দী কথা বলতে পারি। যদি গাঁধীজী হিন্দী বলেন, আমাকে তর্জমা করতে হবে। আমি তো বলির পাঁঠার মত কাঁপছি।

গাঁধীজী এলেন। মুখে হাসি, চোখে হাসি। 'এদিকে স্যর, এদিকে স্যর' বলে কাপ্তেন নিয়ে চললেন গাঁধীজীকে তাঁর ঘর—কেবিন দেখাতে। পিছনে

আমরা সবাই মিছিল করে চলেছি। কেবিন দেখানো হল,—এটা আপনার বসবার ঘর, এটা আপনার সঙ্গে যাঁরা দেখা করতে আসবেন তাঁদের অপেক্ষা করার ঘর, এটা আপনার পড়ার, চিঠিপত্র লেখার ঘর, এটা আপনার উপাসনার ঘর, এটা আপনার খাবার ঘর যদি বড় খাস কামরায় যেতে না চান, এটা আপনার শোবার ঘর, এটা আপনার কাপড় ছাড়ার ঘর, এটা আপনার গোসল-খানা, এটা চাকরবাকরদের ঘর। আর এ অধম তো আছেই—আপনি আমার অতিথি নন, আপনি রাজা ইমানুয়েল ও ইল্ দুচের অতিথি। অধম, রাজা আর দুচের সেবক।'

গাঁধীজী তো অনেকক্ষণ ধরে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর বললেন, 'কাপ্তেন সায়েব, আপনার জাহাজখানা ভারী সুন্দর। কেবিনগুলো তো দেখলুম ; বাকী গোটা জাহাজটা দেখারও আমার বাসনা হয়েছে। তাতে কোন আপত্তি—?'

কাপ্তেন সায়েব তো আহ্লাদে আটখানা, গলে জল। গাঁধীজীর মত লোক যে তাঁর জাহাজ দেখতে চাইবেন এ তিনি আশাই করতে পারেননি। 'চলুন, চলুন' বলে তো সব দেখাতে শুরু করলেন। গাঁধীজী এটা দেখলেন, ওটা দেখলেন, সব কিছু দেখলেন। ভারী খুশী। তারপর গেলেন এঞ্জিন-ঘরে। জানেন তো সেখানে কি অসহ্য গরম। যে-বেচারীরা সেখানে খাটে তাদের ঘেমে ঘেমে যে কি অবস্থা হয় কল্পনা করতে পারবেন না। আপনি গেছেন কখনো ?"

আমি বললুম, "না।"

"গাঁধীজী তাদের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কাপ্তেনের মুখেও হাসি নেই। আমাদের কাপ্তেনটির বড নরম হৃদয় ; বুঝতে পারলেন গাঁধীজীর কোথায় বেজেছে।

খানিকক্ষণ পরে গাঁধীজী নিজেই বললেন, 'চলুন কাপ্তেন।' তখন তিনি তাঁকে বাকী সব দেখালেন। সব শেষে নিয়ে গেলেন খোলা ডেকের ওপর। সেখানে কাঠফাটা রদ্দুর। কাপ্তেন বললেন, 'এখানে বেশীক্ষণ দাঁড়াবেন না, স্যার। সর্দিগর্মি হতে পারে।'

গাঁধীজী বললেন, 'কাপ্তেন সায়েব, এ জায়গাটি আমার বড় পছন্দ হয়েছে। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে এখানে একটা তাঁবু খাটিয়ে দিন, আমি তাতেই থাকব।' কাপ্তেনের চক্ষু স্থির! অনেক বোঝালেন, পড়ালেন। গাঁধীজী শুধু বলেন, 'অবিশ্যি আ-প-না-র যদি কোন আপত্তি না থাকে।' কাপ্তেন কি করেন। তাঁবু এল, খাটানো হল। গাঁধী সেই খোলা ছাদের তাঁবুতে ঝাড়া বারোটা দিন কাটালেন।

কাপ্তেন শয্যাগ্রহণ করলেন। জাহাজের ডাক্তারকে ডেকে বললেন, "তোমার হাতে আমার প্রাণ। গাঁধীজীকে কোনো রকমে জ্যান্ত অবস্থায় বোম্বাই পৌঁছিয়ে দাও। তোমাকে তিন ডবল প্রমোশন দেব।"

আমি অবাক হয়ে শুধালুম,—"সব বন্দোবস্ত ?"

স্টুয়ার্ড হাতের তেলো উঁচিয়ে বললো, "পড়ে রইল। গাঁধীজী খেলেন তো বকরীর দুধ আর পেঁয়াজের শুরুয়া। কোথায় বড় বাবুর্চি, আর কোথায় গাওনা-বাজনা। সব ভণ্ডুল। শুধু রোজ সকালবেলা একবার নেবে আসতেন আর জাহাজের সবচেয়ে বড় ঘরে উপাসনা করতেন। তখন সেখানে সকলের অবাধ গতি—কেবিন-বয় পর্যন্ত।

কাপ্তেনের সব দুঃখ জল হয়ে গেল বোম্বাই পৌঁছে। গাঁধীজী তাঁকে সই করা একখানা ফোটো দিলেন। তখন আর কাপ্তেনকে পায় কে ? আপনার সঙ্গে তাঁর বুঝি আলাপ হয়নি ? পরিচয় হওয়ার আড়াই সেকেণ্ডের ভিতর আপনাকে যদি সেই ছবি উনি না দেখান তবে আমি এখান থেকে ইতালি অবধি নাকে খৎ দিতে রাজী আছি। হিসেব করে দেখা গেছে ইতালির শতকরা ৮৪.২৭১৯ জন লোক সে ছবি দেখেছে।"

স্টুয়ার্ড কতটা লবণ লঙ্কা গল্পে লাগিয়েছিল জানি নে ; তবে এই কথাগুলো ঠিক যে—গান্ধীজী ঐ জাহাজেই দেশে ফিরেছিলেন—পালাদ্‌সো ভেনেদ্‌সিয়া থেকে আমবাব এসেছিল, গান্ধীজী এঞ্জিনরুমে গিয়েছিলেন, জাহাজের দিনগুলো কাটিয়েছিলেন তাঁবুতে, আর নীচে নাবতেন উপাসনার সময়ে। অন্য লোকের মুখেও শুনেছি ॥

তপঃ-শান্ত

শাস্ত্র তো মানি না আজ। হে তরুণ, তব পদাঘাত
দেশের তন্দ্রারে দিল কী রূঢ় চেতনা! ঝঞ্ঝাবাত
ঘূর্ণবায়ু দিগ্বিদিক আন্দোলিয়া কী মহাপ্রলয়
নটেশ তাণ্ডব-নৃত্য। হে তরুণ! জয়, জয়, জয়
জয় তব ; অর্থহীন মূল্যহীন কে বৃথা শুধায়
কোথায় তোমার লক্ষ্য! বন্যা যবে বাঁধ ভেঙে যায়
মিথ্যা প্রশ্ন কোথা তার গতি। হে তরুণ, হে প্লাবন
নহ তো তটিনী। দু'কূলের শাস্ত্র মিথ্যা। চিরন্তন,

মৃত্যুঞ্জয়, হে নবীন, তোমার ধমনী রক্তবীণ,
অন্তহীন। পঞ্চনদে তার শাখা—সে তো নহে ক্ষীণ
সে তো নহে ধর্মে বর্ণে অবরুদ্ধ।

পঞ্চনদবাসী
কিবা হিন্দু কি মুস্‌লিম্ শিখ আর যত শ্বেতত্রাসী
লালকেল্লা অধিবাসী—পাইল তোমার বক্ষে স্থান ;
কে বলে বাঙালী তুমি ? তব রক্তপাতে অভিযান
দেশের বিশ্বের অনন্ত মঙ্গল লাগি। হে অভয়,
জয় তব জয়।

প্রদোষের অন্ধকারে
নির্জীব নিদ্রায় ছিনু রুদ্ধ ; নৈরাশ্যের কারাগারে
অবিশ্বাসে নিমজ্জিত। হেনকালে শুনি বজ্রশঙ্খ
হে পার্থ-সারথি লক্ষ। লৌহের কীলক পেতে অঙ্ক,
বক্ষ, ভাল, কী আদরে নিলে বরি মৃত্যু তুচ্ছ করি।
জীর্ণ এ জীবন মম পুণ্য হল বারে বারে স্মরি।

ক্ষান্ত রণ ?
নহে নহে। শিবের তাণ্ডব অন্তহীন অনুক্ষণ,
কখনো বাহিরে কভু অন্তর্মুখী। এবে শান্ত শিব
লহ সংহরিয়া নিগূঢ় ধ্যানেতে, জ্বালো অন্তর্দীপ
জ্যোতির্ময়, গহন সাধন মাঝে হও নিমজ্জিত
যে-শক্তি সঞ্চয় হল চক্রাকারে করুক প্লাবিত
বৃদ্ধি পেয়ে, গতিবেগে, পর্বত কন্দরে নদী যথা
অবরুদ্ধ, কিন্তু বহির্মুখী।

তার পর এক দিন বাহিরিবে তপঃ সাঙ্গ হলে
শৃঙ্খল হবে মুক্ত—এ প্রলয় অভিজ্ঞতা বলে
হবে না তো উচ্ছৃঙ্খল ; অচঞ্চল দৃঢ় পদক্ষেপে
সমাহিত, রিপু শান্ত, স্বর্গ মর্ত্য ত্রিভুবন ব্যেপে

চলিবে হে ত্রিবিক্রম। পরিবে দুর্জয় বরমালা
পূত শান্ত স্নিগ্ধ পুণ্য সর্ব-বিশ্ব-প্রেম গন্ধ ঢালা ॥*

২৫।১১।১৯৪৫

মৃত্যু

বুড়ো হওয়াতে নাকি কোনো সুখ নেই।

আমি কিন্তু দেখলুম, একটা মস্ত সুবিধা তাতে আছে। কোনো কিছু একটা অপ্রিয় ঘটনা ঘটলে—যেমন ধরুন প্রিয়-বিয়োগ—মনকে এই বলে চমৎকার সান্ত্বনা দেওয়া যায়—'যাক্! এটার তিক্ত স্মৃতি আর বেশীদিন বয়ে বেড়াতে হবে না। মৃত্যু তো আসন্ন।' যৌবনে দাগা খেলে তার বেদনার স্মৃতি বয়ে বেড়াতে হয় সমস্ত জীবন ধরে। কিংবা, এই যে বললুম, প্রিয়-বিয়োগ—আমার যখন বয়স বছর চৌদ্দটাক তখন আমার ছোট ভাই দু'বছর বয়সে ওপারে চলে যায়। কালাজ্বরে। তার ছ'মাস পরে ব্রহ্মচারীর ইন্‌জেক্‌শন বেরোয়। তারপর যখন গণ্ডায় গণ্ডায় লোক তারই কল্যাণে কালাজ্বরের যমদূতগুলোকে ঠাস ঠাস করে দু'গালে চড় কষিয়ে ড্যাং ড্যাং করে শহরময় চষে বেড়াতে লাগলো তখন আমার শোক যেন আরো উথলে উঠলো। বার বার মনে পড়তে লাগলো, ঐ চৌদ্দ বছর বয়সেই আমি তার জন্য কত না ডাক্তার, কবরেজ, বদ্যি, হেকিমের বাড়ি ধন্না দিয়েছিলুম। ইস্কুল থেকে ফিরেই ছুটে যেতুম মায়ের কাছে; শুধাতুম, 'আজ জ্বর এসেছিল?' মা মুখটি মলিন করে ঘাড় ফিরিয়ে নিতেন। একটু পরে বলতেন, 'আজ আরো বেশী।'

আমি চুপ করে বারান্দায় ভাবতে বসতুম—'নাঃ, এ-কবরেজটা কোনো কর্মের

---

* দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জয়লাভের পর ইংরেজ সরকার যখন আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সেনানীদের লালকেল্লায় বিচার শুরু করে, তখন তার প্রতিবাদে দেশব্যাপী প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। শাহনওয়াজ-ধীলন-ভোঁসলে দিবসে বাংলার তরুণ সমাজ কলকাতায় সেদিন যে সম্পূর্ণ অহিংস প্রতিবাদ আন্দোলনের পরাকাষ্ঠা দেখান তার তুলনা বিরল। অথচ সেই অহিংস আন্দোলনকারীদের ওপর ইংরেজ পুলিস গুলি চালাতে দ্বিধা করেনি। এই গুলিবর্ষণের ফলে রামেশ্বর নামে একটি তরুণ ছাত্র নিহত হন। সেদিনের ঘটনার পটভূমিকায় এই কবিতা লিখিত হয়।

নয়। কিন্তু শহরের এই তো নাম-করা শেষ কবরেজ। তবে দেখি হেকিম সায়েবকে দিয়ে কিছু হয় কিনা—'

আপনারা হয়তো ভাবছেন, 'চৌদ্দ বছরের ছেলে করবে এ-সব ডিসিশন! বাড়ির কর্তারা করছিলেন কি?'

আসলে আমি বুঝতে পারতুম না, কর্তারা, দাদারা এমন কি মা পর্যন্ত অনেক আগেই বুঝে গিয়েছিলেন, আমার ভাইটি বাঁচবে না। তাঁরা আমাকে সে খবরটি দিতে চাননি। আমার জন্মের পূর্বে আমার এক দাদা আর দিদিও ঐ ব্যামোতে যায়।

ডাক্তার-কবরেজরাও আমার দিকে এমন ভাবে তাকাতেন যে তার অর্থটা আজ আমার কাছে পরিষ্কার—তখন বুঝতে পারিনি। তবু তাঁদের এই চৌদ্দ বছরের ছেলেটির প্রতি দরদ ছিল বলে আসতেন, নাড়ী টিপতেন, ওষুধ দিতেন।

ঐ দুই বছরের ভাইটি কিন্তু আমাকে চিনতো সবচেয়ে বেশী—কি করে বলতে পারবো না। আমাকে দেখা মাত্রই তার রোগজীর্ণ শুকনো মুখে ফুটে উঠতো ম্লান হাসি।

সে হাসি একদিন আর রইল না। আমাকে সে ডরাতে আরম্ভ করলো। আমাকে দেখলেই মাকে সে আঁকড়ে ধরে রইত। আমার কোলে আসতে চাইতো না। আমার দোষ, আমি কবরেজের আদেশমত তার নাক টিপে, তাকে জোর করে তেতো ওষুধ খাইয়েছিলুম।

ঐ ভয় নিয়েই সে ওপারে চলে যায়।

তার সেই ভীত মুখের ছবি আমি বয়ে বেড়াচ্ছি, বাকি জীবন ধরে।

* * *

ঠিক এক বছর পূর্বে আমার এক প্রিয়-বিয়োগ হয়। এবারেরটা নিদারুণতর। কিন্তু ঐ যে বললুম, এটা আর বেশীদিন ধরে বয়ে বেড়াতে হবে না।

কিন্তু প্রশ্ন, আমি এসব করুণ কথা পাড়ছি কেন? বিশ্বসংসার না জানুক, আমার যে ক'টি পাঠক-পাঠিকা আছেন তাঁরা জানেন আমি হাসাতে ভালো-বাসি। কিন্তু 'উল্টোরথে'র পাঠক-পাঠিকারা নিত্য নিত্যি সিনেমা দেখতে যান —সেখানে করুণ দৃশ্যের পর করুণ দৃশ্য দেখে ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলেন। ভগ্নহৃদয় নায়ক কি রকম খোঁড়াতে খোঁড়াতে দূর দিগন্তে বিলীন হয়ে যান, আর সুস্থহৃদয় নায়িকা কি রকম ড্যাং ড্যাং করে বিজয়ী সপত্নের সঙ্গে ক্যাডিলাক গাড়ি চড়ে হানিমুন করতে মন্টিকার্লো পানে রওয়ানা হন। আমার করুণ-কাহিনী তো তাঁদের কাছে ডাল-ভাত।

তবু আমি ব্যক্তিগত জীবন দিয়ে এ রচনা আরম্ভ করেছি মহত্তর আদর্শ নিয়ে।

আমাদের সবচেয়ে বড় কবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি আর পাঁচটা রসের সঙ্গে হাস্যরসও আমাদের সামনে পরিবেশন করেছেন, অথচ কেউ কি কখনো চিন্তা করে, তাঁর জীবনটা কি রকম বিষাদবহুল ঘটনায় পরিপূর্ণ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস অন্য যে-কোন সাধারণজন এরকম আঘাতের পর আঘাত পেলে কিছুতেই আর সুস্থ জীবনযাপন করতে পারতো না। অথচ রবীন্দ্রনাথকে দেখলে বোঝা যেত না, কতখানি শোক তিনি বুকের ভিতর বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। তিনি ভেঙে তো পড়েনইনি, এমন কি তীব্র শোকাবেগে কখনো কোনো অধর্মাচরণও করেননি —অর্থাৎ কাব্য সাহিত্য সৃষ্টি, যা তাঁর 'ধর্ম' সেটি থেকে বিচ্যুত হননি। তাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁর ঋষিতুল্য সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলেন, 'আমাদের সকলেরই পা পিছলিয়েছে—রবির কিন্তু কখনো পা পিছলোয়নি'।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর মায়ের আদর পাননি। কিন্তু তাঁর বয়স যখন ৭।৮ তখন তাঁর দাদা বিয়ে করে আনলেন কাদম্বরী দেবীকে। বয়সে দুজনাই প্রায় সমান। কিন্তু মেয়েদের মাতৃত্ব-বোধটি অল্প বয়সেই হয়ে যায় বলে তিনি তাঁর মায়ের অভাব পূর্ণ করে দেন। এই সমবয়সী দেবরটিকে তিনি দিয়েছিলেন সর্বপ্রকারের স্নেহ ভালোবাসা। প্রভাত মুখোর রবীন্দ্রজীবনীতে তার সবিস্তার পরিচয় পাঠক পাবেন।

এই প্রাণাধিকা বৌদিটি আত্মহত্যা করেন রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন বাইশ। কী গভীর শোক তিনি পেয়েছিলেন তা তাঁর কাব্যে বার বার প্রকাশ পেয়েছে। অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তীর ভ্রাতা আত্মহত্যা করলে পর বৃদ্ধ কবি তাঁকে তখন সান্ত্বনা দিয়ে একখানি চিঠি লেখেন। সেটিও রবীন্দ্র-জীবনীতে উদ্ধৃত হয়েছে। পাঠক পড়ে দেখবেন। কী আশ্চর্য চরিত্রবল থাকলে মানুষ এমনতরো গভীর শোককে আপন ধ্যানলোকে শান্ত সমাহিত করে পরে রসরূপে, কাব্যরূপে নানা ছন্দে নানা গানে প্রকাশ করতে পারে,—পাঠক, শ্রোতার হৃদয় অনির্বচনীয় দুঃখে-সুখে মেশানো মাধুর্যে ভরে দিতে পারে। কবির ক্ষয়ক্ষতি বাঙলা কাব্যের অজরামর সম্পদে পরিবর্তিত হল। এঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গত হলেন, পিতা গত হলেন—এগুলো শুধু বলার জন্যে বললুম, হিসেব নিচ্ছি না।

তারপর পুরো কুড়ি বছর কাটেনি—আরম্ভ হল একটার পর একটা শোকের পালা।

প্রথমে গেলেন স্ত্রী[১]। তাঁর বয়স তখন ত্রিশ পূর্ণ হয়নি। (বড় মেয়ে মাধুরীলতার বিয়ের কয়েক মাস পরেই।) তিন কন্যা আর দুই পুত্র রেখে। সর্বজ্যেষ্ঠর বয়স পনেরো, সর্বকনিষ্ঠের সাত। মাধুরীলতা ছাড়া আর সব কটি ছেলে-মেয়ে মানুষ করার ভার রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ল। রবীন্দ্রনাথের শিষ্য অজিত চক্রবর্তীর ('কাব্যপরিক্রমা'র লেখক) মাতা কবিজায়ার মৃত্যুর কুড়ি বৎসর পর আমাকে বলেন, মৃণালিনী দেবী তাঁর রোগশয্যায় এবং অসুস্থাবস্থায় তাঁর স্বামীর কাছ থেকে যে সেবা পেয়েছিলেন তেমনটি কোনো রমণী কোনো কালে তার স্বামীর কাছ থেকে পেয়েছে বলে তিনি জানেন না। তিনি বলেন, স্ত্রীর মানা অনুরোধ না শুনে তিনি নাকি রাত্রির পর রাত্রি তাঁকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করেছেন।

রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরাই জানেন, স্পর্শকাতর কবিকে এই মৃত্যু কী নিদারুণ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তাঁকে জীবনের রহস্য শেখায়। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৪০।৪১—দেখাতো ৩০।৩১। অটুট স্বাস্থ্য। কিন্তু তিনি পুনরায় দারগ্রহণ করেননি।

এর কয়েক মাস পরেই দ্বিতীয় মেয়ে রেণুকা বারো বছর বয়সেই পড়ল শক্ত অসুখে। যখন ধরা পড়লো ক্ষয় রোগ, তখন কবি তাকে বাঁচাবার জন্য যে কী আপ্রাণ পরিশ্রম আর চেষ্টা দিয়েছিলেন তার বর্ণনা দেওয়া আমার শক্তির বাইরে। কিছুটা বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দিয়েছেন—তখনো তিনি জানতেন না, মেয়েটি কিছুদিন পরেই তাঁকে ছেড়ে যাবে। অসুস্থ অবস্থায়ও এই মেয়েটির প্রাণ ছিল আনন্দরসে চঞ্চল। পিতা-কন্যায় গাড়িতে করে স্বাস্থ্যকর জায়গায় যাবার সময় যে মধুর সময় যাপন করেন তার কিছুটা আভাস পাঠক পাবেন 'পলাতকা'র 'ফাঁকি' কবিতাতে।

(বছর দেড়েক চিকিৎসাতে করলে যখন অস্থি জর জর
তখন বললে 'হাওয়া বদল করো'।

পাঠক, এই 'তখন' শব্দটির দিকে লক্ষ্য রাখবেন। রোগের প্রথম অবস্থায় নয়—যখন মৃত্যু আসন্ন। এ নিদারুণ অভিজ্ঞতা ক্ষয়-রুগীর অনেক আত্মীয়-স্বজনের হয়েছে।)

১ ইনি কি রোগে গত হন জানা যায়নি। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, 'উদরের পীড়া, খুব সম্ভব এপেণ্ডিসাইটিস।' আমি বাল্যকালে গুরুজনদের মুখে শুনেছি সূতিকা।

দু বছরের ভিতরই দুইটি অকালমৃত্যু—অর্থহীন, সামঞ্জস্যহীন, যেন মানুষকে নিছক পীড়া দেবার জন্য ভগবান তাকে পীড়া দিচ্ছেন। তারপর চার বছর যেতে না যেতেই সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ তেরো বছর বয়সে এক বন্ধুর সঙ্গে ছুটিতে বেড়াতে যায় মুঙ্গেরে। 'সেইখানে শমীন্দ্রের কলেরা হয়; কবি টেলিগ্রাফ পাইয়া কলিকাতা হইতে মুঙ্গের চলিয়া গেলেন।' রবীন্দ্রনাথই এই সময়ের এক চিঠিতে লিখছেন, 'যে সংবাদ শুনিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে। ভোলা মুঙ্গেরে তাহার মামার বাড়িতে গিয়াছিল, শমীও আগ্রহ করিয়া সেখানে বেড়াইতে গেল, তাহার পরে আর ফিরিল না।'

অনেকের মুখেই শুনেছি, শমীন্দ্র তার পিতার সবচেয়ে আদরের সন্তান ছিলেন। প্রভাত মুখোপাধ্যায় বলেন, সে 'আকৃতিতে প্রকৃতিতে পিতার অনুরূপ ছিল।

ঠিক পাঁচ বৎসর পূর্বে ঐ দিনে কলিকাতায় শমীন্দ্রের মায়ের মৃত্যু হয়।'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়।

কয়েক বৎসর পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই পুত্রের স্মরণে যে কবিতা লেখেন তাতে আছে,

'বিজু যখন চলে গেল মরণপারের দেশে
বাপের বাহু-বাঁধন কেটে।
মনে হল, আমার ঘরের সকাল যেন মরেছে বুক ফেটে।'

আবার অকালমৃত্যু! শুধু ভগবান জানে তাঁর ভূমণ্ডল ব্যবস্থায়, ত্রিলোক-নিয়ন্ত্রণে 'ইন হিজ স্কীম অব্ থিংস'—এর কি প্রয়োজন?'[২] শমী আমাদের পুত্র নয়, কিন্তু এ কবিতাটি পড়ে কার না 'বুক ফাটে'? এ কবিতাটি আমি জীবনে মাত্র একবার পড়েছি। দ্বিতীয়বার পড়তে পারিনি।

এর পর দশ বছর কাটেনি। সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তান, বড় মেয়ে মাধুরীলতার হল ক্ষয়রোগ। প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, আমিও শুনেছি, মাধুরীর স্বামীর সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির সদ্ভাব ছিল না (যদিও তাঁর পিতার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল বলেই এ বিয়ে হয়। কবি বিহারী চক্রবর্তী ছিলেন কাদম্বরী

---

২ রবীন্দ্রনাথও পুত্রহারা-মাতা তাঁর কন্যার দিকে তাকিয়ে শুধিয়েছেন, 'তুমি স্থির সীমাহীন নৈরাশ্যের তীরে / নির্বাক অপার নির্বাসনে।/ অশ্রুহীন তোমার নয়নে / অবিরাম প্রশ্ন জাগে যেন—/ কেন, ওগো কেন!'/—দুর্ভাগিনী, বীথিকা, পৃঃ ৩০৯।

দেবীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় কবি)। রবীন্দ্রনাথ দুপুরবেলা মেয়েকে দেখতে যেতেন বন্ধ গাড়িতে করে। জামাই তখন আদালতে। সমস্ত দুপুর মেয়েকে গল্প শোনাতেন। হয়তো বা কবিতা পড়তেন। বোধহয় তারই দু'একটি 'পলাতকা' (নামকরণ অবশ্য পরে হয়) বইয়ে স্থান পেয়েছে।

একদিন দুপুরে বাড়ির সামনে পৌঁছতেই বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন। কবি কোচম্যানকে গাড়ি ঘোরাতে হুকুম দিলেন। বাড়িতে প্রবেশ করলেন না। আমি শুনেছি, এই মেয়ে নাকি বড় উৎসুক আগ্রহে পিতার লেখার জন্য প্রতীক্ষা করতেন। ভাগলপুরে, কলকাতায়।

বহু বহু বৎসর পর এঁর সখী ঔপন্যাসিকা অনুরূপা দেবী লেখেন, (উভয়ের শ্বশুরবাড়ি ভাগলপুর—বোধহয় সেইসূত্রে পরিচয় ও সখ্য) মেয়ের স্মরণে কবির চোখ দিয়ে দুই ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। বোধহয় 'পলাতকা'র 'মুক্তি' কবিতায় এ মেয়ের কিছুটা বর্ণনা পাওয়া যায়।

* * *

পূর্বেই বলেছি, মাধুরীলতার রোগশয্যায় কবি তাঁকে গল্প বলতেন। এবং শেষের দিকে বোধহয় বেদনার সঙ্গে অনুভব করেছিলেন যে এ মেয়েও বাঁচবে না। তখন তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন, তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, এঁরা সব তাঁর মায়ার বন্ধন কেটে সময় হবার বহু পূর্বেই পালিয়ে যাচ্ছেন—এঁরা সব 'পলাতকা'। তাই মাধুরীলতার মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই বেরল 'পলাতকা'। এ বইয়ের উপর মাধুরী, রেণুকা, শমী তিনজনের ছাপ স্পষ্ট রয়েছে। আরো হয়তো কয়েক জনের ছাপ রয়েছে, কিন্তু তাঁরা হয়তো তাঁর পরিবারের কেউ নয়, তাই তাঁদের ঠিক চেনা যায় না।

'পলাতকা'র সর্বশেষের কবিতাটিতে আছে,—কবিতাটির নাম 'শেষ প্রতিষ্ঠা'—

'এই কথা সদা শুনি, "গেছে চলে, গেছে চলে"
তবু রাখি বলে
বোলো না 'সে নাই'।

* * *

আমি চাই সেইখানে মিলাইতে প্রাণ
যে সমুদ্রে "আছে" "নাই" পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান।'

এই কবিতাটি কবির সর্ব পলাতকার উদ্দেশে লেখা। কিন্তু প্রশ্ন, 'আছে' ও 'নাই' দুটোই একসঙ্গে অস্তিত্ব রাখে কি প্রকারে? কবি এর উত্তর দিলেন—অবশ্য সে উত্তরে সবাই সন্তুষ্ট হবেন কিনা জানি নে—তাঁর জীবনের শেষ শোকের সময়।

'পলাতকা'র সব কটি পালিয়ে যাবার পর কবির রইলেন, পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও

কন্যা মীরা। এই মীরাদির একটি পুত্র ও কন্যা। এ নাতিটিকে রবীন্দ্রনাথ যে কী রকম গভীর ভালবাসা দিয়ে ডুবিয়ে রেখেছিলেন সে কথা ঐ সময়ে আশ্রম-বাসী সবাই জানে। একটু ব্যক্তিগত কথা বলি—নীতু যদিও আমার চেয়ে বছর নয়েকের ছোট ছিল তবু হস্টেলে সে প্রায়ই আমার ঘরে আসতো। ভারী প্রিয়-দর্শন ছিল সে। মাঝে মাঝে ফিনফিনে ধুতি-কুর্তা পরে এলে মানাতো চমৎকার —আমরা শুধাতুম, কে সাজিয়ে দিল রে ?

সে উত্তর না দিয়ে শুধু মিট্ মিট্ করে হাসতো। চট্টগ্রামের জিতেন হোড় বলতো, 'নিশ্চয়ই দাদামশাই'। আমি বলতুম, 'মা'। (আশা করি, এ লেখাটি মীরাদি বা তাঁর মেয়ে 'বুড়ী'র চোখে পড়বে না—তাঁদের শোক জাগাতে আমার কতখানি অনিচ্ছা সে কথা অন্তর্যামী জানেন।) সেই নীতু গেল ইয়োরোপে। ক্ষয়রোগে মারা গেল ১৯।২০ বছর বয়সে। এই শেষ শোকের বর্ণনা দিতে কারোই ইচ্ছা হবে না। কবির বয়স তখন ৭১। একে নিজের শোক, তার উপর কন্যা —পুত্রহারা মাতার শোক।

শুধু একটি সামান্য ঘটনার উল্লেখ করি—শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবিশের 'বাইশে শ্রাবণ' থেকে নেওয়া।

রবীন্দ্রনাথ তখন থাকতেন বরানগরে মহলানবিশদের সঙ্গে। বন্ধু এণ্ডরুজ সায়েবের কাছ থেকে চিঠি পেলেন, নীতুর শরীর আগের চেয়ে একটু ভালো।

'পরদিন সকালবেলা খবরের কাগজে রয়টারের টেলিগ্রামে দেখলাম, ছ'দিন (দু'দিন ?) আগে ৭ই আগস্ট জার্মানীতে নীতুর মৃত্যু হয়েছে।'

এ খবরটা রবীন্দ্রনাথের কাছে ভাঙা যায় কি প্রকারে ?

'শেষে স্থির হল খড়দায় রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীকে টেলিফোন করে আনিয়ে আমরা চারজনে একসঙ্গে কবির কাছে গেলে কথাটা বলা হবে। প্রতিমাদিরা এলে সবাই মিলে কবির ঘরে গিয়ে বসা হল। রথীন্দ্র-নাথকে কবি প্রশ্ন করলেন, "নীতুর খবর পেয়েছিস, সে এখন ভাল আছে, না ?" রথীবাবু বললেন, "না, খবর ভালো না।" কবি প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। বললেন, "ভালো ? কাল এণ্ডরুজও আমাকে লিখেছেন যে নীতু অনেকটা ভাল আছে। হয়তো কিছুদিন পরেই ওকে দেশে নিয়ে আসতে পারা যাবে।"[৩] রথীবাবু এবারে চেষ্টা করে গলা চড়িয়ে বললেন,

৩ এর আগের দিন রথীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত মহলানবিশকেও বলেন, 'কাল এণ্ডরুজের চিঠি পেয়ে অবধি নীতুর জন্য মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে আছে, যদিও তিনি

"না, খবর ভাল নয়। আজকের কাগজে বেরিয়েছে।" কবি শুনেই একেবারে স্তব্ধ, রথীবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। একটু পরেই শান্তভাবে সহজ গলায় বললেন, "বৌমা আজই শান্তিনিকেতন চলে যান, সেখানে বুড়ি একা রয়েছে। আমি আজ না গিয়ে কাল যাবো, তুই আমার সঙ্গে যাস"।'

নীতুর মা জর্মনি গিয়েছিলেন পুত্রের অসুস্থতার খবর পেয়ে। তিনি যেদিন বোম্বাই পৌঁছবেন, তার কয়েকদিন আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বোম্বাইয়ের ঠিকানায় চিঠি লেখেন। তাতে সেই 'আছে' ও 'নাই'-য়ের উত্তর আছে। তাতে এক জায়গায় তিনি লেখেন, 'যে রাত্রে শমী গিয়েছিল,[৪] সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক, আমার শোক তাকে একটুও পিছনে যেন না টানে। তেমনি নীতুর চলে যাওয়ার কথা যখন শুনলুম তখন অনেকদিন ধরে বার বার করে বলেছি, আর তো আমার কোনো কর্তব্য নেই, কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি, সেখানে তার কল্যাণ হোক্। সেখানে আমাদের সেবা পৌঁছয় না, কিন্তু ভালবাসা হয়তো বা পৌঁছয়—নইলে ভালোবাসা এখনও টিকে থাকে কেন?'

এই সেই মূল কথা। সে নেই কিন্তু আমার ভালোবাসার মধ্যে সে 'আছে'। বার বার নমস্কার করি গুরুকে, গুরুদেবকে। বার বার দুরদৃষ্টের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে তিনি কাতর হয়েছেন, কিন্তু কখনও পরাজয় স্বীকার করেননি।

এবং পাঠক-পাঠিকাদের উপদেশ দি, প্রিয়-বিয়োগ—এমন কি প্রিয়বিচ্ছেদ—হলে তাঁরা যেন উপরে বর্ণিত এই চিঠিখানা পড়েন। এ চিঠি মুক্তপুরুষের লেখা চিঠি নয়। কারণ গীতায় আছে মুক্তপুরুষ 'দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন'। রবীন্দ্রনাথ দুঃখে আমাদের মতই কাতর হতেন—হয়তো বা আরো বেশী, কারণ তাঁর দিলের দরদ, হৃদয়ের স্পর্শকাতরতা ছিল আমাদের চেয়ে লক্ষগুণ বেশী—কিন্তু তিনি পরাজয় মানতেন না। আমরা পরাজয় মেনে নিই। এ-চিঠি যদি একজনকেও

লিখেছেন, ও এখন একটু ভালোর দিকে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। সাহেব লিখেছেন, নীতুকে হয়তো শীগ্‌গিরই দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। তা হলে ভাবছি তাকে একটা কোনো ভালো জায়গায় অনেকদিন ধরে রেখে দেবো। ভাওয়ালি কি কোনো পাহাড়ে বেশ কিছুদিন থাকলেই সেরে উঠবে।' পৃঃ ২৮।

৪ এর মৃত্যুর কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এবং আরো বলেছি মাতা ও পুত্র যান একই দিনে, এবং আশ্চর্য, দাদামশাই ও নাতি যান একই দিনে। (২২ শ্রাবণ)।

পরাজয়-স্বীকৃতি থেকে নিষ্কৃতি দেয় তবে অন্যলোকে রবীন্দ্রনাথ তৃপ্ত হবেন।

সহৃদয় পাঠক, তুমি সিনেমা দেখতে যাও। সেখানে যদি কোনো ছবিতে তোমার হীরোর জীবনে পর পর এতগুলো শোকাবহ ঘটনা ঘটতো তবে তুমি বলতে, 'এ যে বড্ড বাড়াবাড়ি। এ যে অত্যন্ত অবাস্তব, আন্‌রিয়ালিস্টিক।'

তাই বটে। যা জীবনে বাস্তব তা হয়ে যায় সিনেমায় অবাস্তব! আশ্চর্য! আমার কাছে আবার সিনেমাটা অত্যন্ত অবাস্তব ঠেকে।

তাই সিনেমাওয়ালাদের কাছেই রবীন্দ্র-জীবনের সবচেয়ে নিষ্ঠুর অধ্যায় তুলে ধরলুম। নইলে 'রবীন্দ্রনাথের শোক ও কাব্যে তার প্রতিচ্ছবি' এ জাতীয় ডক্টরেট থিসিস লেখবার বয়স আমার গেছে। আর তাই এ 'রম্যরচনাটি' আরম্ভ করেছি আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে। কারণ আমার জীবন আর তোমাদের পাঁচজনের জীবনের লেশমাত্র পার্থক্য নেই। তফাৎ যদি থাকে, তবে শুধু এইটুকু যে, তোমরা মনোবেদনা গুছিয়ে বলতে পার না ব'লে গুমরে গুমরে মরো বেশী। কিন্তু তোমাদের এই বলে সান্ত্বনা জানাই, যতদিন তোমার প্রিয়জন তোমার প্রতি সহৃদয় ততদিন তোমার না বলা সত্ত্বেও সে তোমার হৃদয়ের সব কথাই বোঝে। আর যেদিন তার হৃদয় বিমুখ হয়ে যায়, সেদিন যতই গুছিয়ে বলো না কেন, সে শুনবে না। কাজেই না-বলতে পারাটা তোমাকে গুছিয়ে-বলতে-পারার বিড়ম্বনা থেকে অন্তত বাঁচাবে॥

কত না অশ্রুজল

উৎসর্গ

স্নেহভাজন শ্রীমান ফণী দেব ও আমাদের উভয়ের সখা
শ্রীমান সাগরময় ঘোষের করকমলে—

এই পুস্তকের সব লেখাই "দেশ" পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে বেরোয়। সে-সময় আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে অগণিত চিঠি আমার কাছে আসে। তাদের অনেকগুলো "কত না অশ্রুজলে" ভরা ছিল। একাধিক মাতা, ভগ্নী আমাকে পুত্রের, ভ্রাতার শেষ পত্র পাঠান। বস্তুতঃ যখন "দেশ" পত্রিকায় অধমের "দেশে-বিদেশে" প্রকাশিত হয় তখনো এত পত্র আমি পাইনি।

সে-সব রচনা আমার বান্ধবী অখণ্ড-সৌভাগ্যবতী কল্যাণীয়া শ্রীমতী নিরুপমা ও তাঁর সিঁথির সিঁদুর শ্রীমান্ পশুপতি অশেষ ক্লেশ স্বীকার ক'রে সঞ্চয় করে, কেটে-ছেঁটে পুস্তকরূপে প্রকাশ করলেন। ওঁদের প্রতি আমি কি সাধুবাদ জানাবো! প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন দীর্ঘজীবী হয়ে উত্তমোত্তম লেখকের সম্পাদনা করেন।

পরিশেষে শ্রীমান্ ব্রজকিশোরের কল্যাণ কামনা করি। শঙ্কর তাকে জয়যুক্ত করুন।

সৈয়দ মুজতবা আলী

কত না অশ্রুজল

॥ ১ ॥

একখানা অপূর্ব সংকলনগ্রন্থ অধীনের হাতে এসে পৌঁচেছে। পুনরায়, বারংবার বলছি অপূর্ব, অপূর্ব! এ-বইখানিতে আছে, মানুষের আপন মনের আপন হৃদয়ের গভীরতম আত্মপ্রকাশ। কারণ মৃত্যুর সম্মুখীন মানুষ অতি অল্প অবস্থাতেই মিথ্যা কয় বা সত্য গোপন করে। এবং একটি দেশের একজন মানুষের সুখদুঃখের কাহিনী নয়; বহু দেশের বহুজনের। ফ্রান্স, জর্মনি, ভারতবর্ষ, বেলজিয়াম, হলাণ্ড, রাশিয়া, আমেরিকা, ফিনল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, চীন, জাপান, কানাডা ইত্যাদি ইত্যাদি—বস্তুত হেন দেশ প্রায় নেই যার বহু লোকের বহু কণ্ঠস্বর এই গ্রন্থে নেই।

যুদ্ধের সময় সৈন্য তো জানে না কোন্ মুহূর্তে তার মৃত্যু আসবে। সে যখন ঐ সময় ট্রেন্‌চে বসে আপন মা, বউ, প্রিয়া বা বোনকে চিঠি বা তাঁদের জন্যে ডাইরি লেখে তখনও সে মিথ্যা কথা বলছে, এ সন্দেহ করার মত সিনিক বা ব্যঙ্গপ্রবণ অবিশ্বাসী আমি নই।

এ বইয়ে আছে গত বিশ্বযুদ্ধে যারা জড়িয়ে পড়েছিল, অর্থাৎ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় সৈনিকরূপে একে অন্যকে নিধন করতে হয়েছিল, তাদের শেষ চিঠি, ডাইরির শেষ পাতা। এ বিশ্বযুদ্ধ থেকে অল্প দেশই রেহাই পেয়েছিল সে কথা আমরা জানি। শান্তিকামী ভারত, এমন কি যুদ্ধে যোগদান না করেও নিরীহ এস্‌কিমোও এর থেকে নিষ্কৃতি পায়নি।

এবং শুধু তাদেরই লেখা নেওয়া হয়েছে যারা এ-যুদ্ধে নিহত হয় বা যুদ্ধে মারাত্মকরূপে আহত হওয়ার ফলে যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরেই মারা যায় কিংবা যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহুদূরে শান্তিপূর্ণ দেশে বাস করার সময় যুদ্ধের বীভৎসতা, আত্মজন বিয়োগের শোকে কাতর হয়ে আত্মহত্যা করে।

কিন্তু এত দীর্ঘ অবতরণিকা করার কণামাত্র প্রয়োজন নেই। দু'একটি চিঠির অনুবাদ পড়ে সহৃদয় পাঠক বুঝে যাবেন, এ-অবতরণিকা কতখানি বেকার।

গত যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হলে পর জর্মন সৈন্যরা সেখানে কায়েম হয়ে দেশটাকে 'অকুপাই' করে। সঙ্গে সঙ্গে বহু ছেলেমেয়ে, তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা গড়ে

তোলে 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড মুভমেণ্ট'। তারা মোকা পেলে জর্মন সৈন্যকে গুলি করে মারে, রেল লাইন, তাদের বন্দুক-কামানের কারখানা ডাইনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয় এবং আরো কত কী! এ প্রতিষ্ঠানটি আমাদের আপন দেশেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ অজানা নয়।

এই আন্দোলনে যোগদান করার ফলে একটি ষোল বছরের ফরাসী বালক জর্মনদের হাতে ধরা পড়ে এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। মৃত্যুর কয়েক মিনিট পূর্বে সে তার জনকজননীকে একখানি চিঠি লেখে। এবারে আমি সেটি অনুবাদ করে দিচ্ছি:

"...আমার প্রতি যাঁরা সহানুভূতিশীল, বিশেষ করে আমার আত্মীয় ও বন্ধুদের আমার ধন্যবাদ জানিয়ো; তাদের বলো যে (মাতৃভূমি) ফ্রান্সের প্রতি আমার অনন্ত বিশ্বাস। আমার হয়ে ঠাকুর্দা, ঠাকুমা, কাকারা, মাসীরা ও ওদের মেয়ে—আমার বোনেদের—প্রগাঢ় আলিঙ্গন করো। আমার পাদ্রিসাহেবকে বলো আমি বিশেষ করে তাঁকে ও তাঁর আত্মজনকে স্মরণে রেখেছি; আমি মসেন্নোর (প্রধান পাদ্রি)-কে ধন্যবাদ জানাই। তিনি আমাকে যে-ভাবে গৌরবান্বিত করেছেন, আশা করি, আমি যে তার উপযুক্ত পাত্র সেটা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি। মৃত্যুর সময় আমি আমার স্কুলের বন্ধুদেরও আদর-সম্ভাষণ জানাই। আমার ক্ষুদ্র পুস্তক সঞ্চয়ন (লাইব্রেরিটি) পিয়েরকে,[১] আমার ইস্কুলের বই বাবাকে, আমার অন্যান্য সঞ্চয়ন আমার সব চেয়ে প্রিয় আমার মাকে দিয়ে গেলুম। আমার বাসনার ধন স্বাধীন ফরাসীভূমি এবং সুখী ফ্রান্সবাসী দম্ভী ফ্রান্স, পৃথিবীর সর্বাগ্রণী নেশন ফ্রান্স আমার কাম্য নয়; বরঞ্চ কর্মনিষ্ঠ ফ্রান্স,[২]—কর্মনিষ্ঠ এবং আত্মমর্যাদাশীল ফ্রান্স। আমি প্রার্থনা করি ফ্রান্সবাসী যেন সুখী

একাধিক পাঠক অনুযোগ করেছেন, অধমের রচনা ইদানীং বড্ডই টীকা কণ্টকাকীর্ণ। আমার নিবেদন, টীকা না পড়লে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। যাঁরা নিতান্ত একটু-আধটু আশকথা-পাশকথা জানতে চান কিংবা এই আক্রাগণ্ডার বাজারে 'বই' কিনেছেন বলে প্রতিটি পিঁপড়ে নিঙড়িয়ে নিঙড়িয়ে গুড় বের করতে চান—এ টীকা শুধু তাঁদের জন্য।

১ পিয়ের খুব সম্ভব পত্রলেখক আঁরির (Henri = Henry) ছোট ভাই। তাই পিয়েরকে তার ছোটখাটো পুস্তক সঞ্চয়ন দিয়ে যাচ্ছে।

২ ফ্রান্সে যুদ্ধ হবার পর অনেকেই বিশ্বাস করতো, ফরাসীদের আলসেমিই তাদের ঐ পরাজয়ের কারণ।

হয়—সেইটেই সব চেয়ে বড় সত্য। তারা যেন শেখে জীবনে শিবম্‌কে আলিঙ্গন করতে।[৩]

আমার জন্য তোমরা কোনো চিন্তা করো না; জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আমার সাহস ও সহজ রসবোধ (গুড হিউমার) বজায় রেখে যাবো; আমি যাবার সময় সেই 'সাঁব্‌র্‌-এ-ম্যজ্‌'[৪] গানটি গেয়ে যাব, যেটি তুমি, আমার আদরের মা আমাকে শিখিয়েছিলে।

পিয়েরকে[৫] শাসনে রেখো কিন্তু স্নেহের সঙ্গে। আর লেখাপড়ার কাজ চেক্‌ আপ্‌ করে নিয়ো এবং সে যেন ঠিকমতো খাটে[৬] তার উপর জোর দিয়ো। তাকে আলস্য-অবহেলা করতে দিয়ো না। আমি যেন তার শ্লাঘার পাত্র হই। সেপাইরা আসছে আমাকে নিয়ে যেতে। আমার হাতের লেখা হয়তো অল্প একটু কাঁপা-কাঁপা হয়ে গেল; তার কারণ পেনসিলটি বড্ড ছোট্ট; মৃত্যুভয় আমার আদৌ নেই; আমার আত্মা অত্যন্ত শান্ত।

বাবা, আমি তোমাকে অতিশয় অনুরোধ জানাই, প্রার্থনা করো। শুধু এই কথাটুকু বিবেচনা করো, এই যে আমি এখানে মরতে যাচ্ছি, সেটি আমাদের সকলের জন্য। এর চেয়ে শ্লাঘনীয় আমার কী মৃত্যু হতে পারতো? আমি স্বেচ্ছায় পিতৃভূমির জন্য মৃত্যুবরণ করছি; স্বর্গভূমিতে আমাদের চারজনাতে[৭] ফের দেখা হবে। প্রতিহিংসাকামীদের মৃত্যুর পরও তাদের অনুগামী পাবে। বিদায় বিদায়! মৃত্যু আমাকে ডাকছে। আমার চোখে ফেটা বেঁধে আমাকে গুলি করবে সে আমি চাই নে, আমাকে হাতে-পায়ে বাঁধতেও হবে না। আমি তোমাদের সবাইকে আলিঙ্গন করি। তৎসত্ত্বেও কিন্তু বলি, বাধ্য হয়ে মরাটা

৩ 'শিবম্‌কে আলিঙ্গন'—এটা মনে হচ্ছে, জর্মন কবি গ্যোটে থেকে উদ্ধৃত। পত্রলেখক আঁরি জর্মনদের হাতে নিহত হচ্ছে, অথচ সে বিশ্বপ্রেমিক বলে বিশ্বকবি—জর্মন-গ্যোটেকে উদ্ধৃত করছে।

৪ সাঁব্‌র্‌ এবং ম্যজ ফ্রান্সের দুই নদী। আমাদের যে-রকম গঙ্গা-যমুনা। 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা' তুলনীয়।

৫ এক নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

৬ দুই নম্বর ও পাঁচ নম্বর দ্রষ্টব্য।

৭ স্বর্গে বাপ, মা, পিয়ের ও সে নিজে এই চারজন সম্মিলিত হবে আশা করছে।

কঠিন কাজ। সহস্র চুম্ব।

ফ্রান্স—জিন্দাবাদ!

ষোড়শ বৎসরে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত

এচ্ ফেরুতে

হাতের লেখা আর ভুলচুকের জন্য মাফ চাইছি; আবার পড়ার সময় নেই।

পত্র-প্রেরক: আঁরি ফেরুতে, স্বর্গলোক, কেয়ার অব ভগবান।[৮]

॥ ২ ॥

এবারে একজন জাপানীর চিঠি তুলে দিচ্ছি:

জিরুকু ইওয়াগায়া (Jiroku Iwagaya), শিক্ষক,

জন্ম ১৯২৩ সালে। ১৯৪৪ সালে ফিলিপাইন যাবার সময় যুদ্ধজাহাজ-ডুবিতে সলিলসমাধি।

শিজুয়োকা, ১২ জুন ১৯৪৩

বুগাঁভিস[১] দ্বীপের কাছে যে নৌযুদ্ধ হয়ে গেল তার খবর আজ কাগজে বেরিয়েছে। প্রকাশ, একখানা বিরাট সৈন্যবাহী জাহাজ গুরুতরভাবে জখম হয়েছে ও একখানা জঙ্গী জাহাজ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে। এভাবে মানুষ কেন সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়ে অতলে লীন হবে? জাপানীরা মারা গেলে শুধু জাপানীরাই, বিদেশীরা মারা গেলে শুধু বিদেশীরাই অশ্রুবর্ষণ করে কেন? মানুষ শুধুমাত্র মানুষ হিসেবে সম্মিলিত হয়ে অশ্রুবর্ষণ করে না কেন, আনন্দের সময়

৮ কনটিনেণ্টে পত্রলেখককে তার ঠিকানা দিতে হয় (যেমন আমাদের ইনল্যাণ্ড-লেটার)। তাই আঁরি তার ঠিকানা দিয়েছে। এর থেকেই পাঠক বুঝতে পারবেন, সে যে গর্ব করেছে জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি (তার) হিউমার বজায় রেখে যাবে, সেটা কিছুমাত্র মিথ্যা দম্ভ নয়। কারণ এই কটি শব্দই ইহ-জীবনে তার শেষ বাক্য।

যে-বই থেকে এই পত্রটি অনুবাদ করেছি তার নাম-ঠিকানা:

Die Stimme des Menschen Briefe und Aufzeichnungen aus der ganzen Welt। 1939-1945 Gesam melt und herausgegeben von Hans Walter Baenl Piper Verlag, 1961, Muenchen.

১ সলমন দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তম দ্বীপ—অস্ট্রেলিয়ার অধীনে।

সম্মিলিতভাবে আনন্দ প্রকাশ করে না কেন? এ তত্ত্বটি যে-কোনো শান্তিকামী জনের চিত্ত আলোড়িত করবে। যেহেতু একটা বিদেশী মরেছে অতএব জাপানীরা বেশ পরিতৃপ্ত। এটা আমার কাছে চিরকাল অবোধ্য থেকে যাবে। তিন দিন চার দিন ধরে একটা লোক সমুদ্রে সাঁতার কাটতে কাটতে শেষটায় অবসন্ন হয়ে জলে ডুবে গেল এটা কী নিদারুণ! মৃত্যুর সঙ্গে আমার যদি সমুদ্রে কখনো দেখা হয় তবে কি আমি তাকে সজ্ঞানে চিনতে পারবো?

৩ মার্চ ১৯৪৪

বিদায় নেবার পূর্বে আমি ক্লাসের ছেলেদের দিয়ে 'তাজিমামরি'[২] গানটি গাওয়ালুম। আমি জানি না কেন, এটি শুনে আমার বড় আনন্দ হল। এ গানটি আমি কখনই ভুলবো না; এটি আমাকে সব সময়ই স্মরণ করিয়ে দেবে যে আমি শিক্ষক ছিলুম।

মার্চ ১৯৪৪

আমি যুদ্ধে চললুম, কিন্তু আমি যুদ্ধ চাইনি। হয়তো আমার এ কথাটা কেউই বুঝবে না। কিন্তু কোনো মানুষকে হত্যা করার জন্য আমি কোনো তাগিদ অনুভব করি না। আমার মনে হয়, আমাকে যেন একটা দ' টেনে নিয়ে ডুবিয়ে দিচ্ছে।

একাধিক জাতের বিশ্বাস এবং তারা যুদ্ধের সময় প্রোপাগাণ্ডা করে যে, জাপানীমাত্রই যুদ্ধের জন্য হামেহাল মারমুখো। এ চিঠি পড়ে পাঠক বুঝতে পারবেন, কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। এ-ধরনের আরো চিঠি আছে। স্থানাভাবে তার অল্পাংশও তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। আমার উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ভিন্ন টাইপের চিঠি অনুবাদ মারফত বহুবিধ মানবের চিন্তাধারা, হৃদয়ানুভূতি—এবং তৎসত্ত্বেও সেগুলি সর্বজনীন—এগুলির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

যুগোস্লাভিয়ার জনৈক নাম-না-জানা সৈনিক,

অজাত শিশুর প্রতি পত্র,

[যুদ্ধের সময়ে]

হে আমার সন্তান, এখনো তুমি অন্ধকারে ঘুমুচ্ছো এবং ভূমিষ্ঠ হবার জন্য

---

২ 'তাজিমামরি' গীতটি আমি যোগাড় করতে পারিনি। কোনো গুণিন পাঠক যদি সেটি সংগ্রহ করে অনুবাদসহ প্রকাশক মহাশয়কে পাঠান তবে লেখক তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

শক্তি সঞ্চয় করছো; আমি তোমার সর্বমঙ্গল কামনা করি। তুমি এখনো তোমার প্রকৃত রূপ (Gestalt) পাওনি; তুমি এখনো শ্বাসগ্রহণ করছো না; তুমি এখনো অন্ধ। তবু, যখন তোমার সে লগ্ন আসবে, তোমার এবং তোমার মাতার সে-লগ্ন আসবে (তোমার সে মাতাকে আমি সর্বহৃদয় দিয়ে ভালোবাসি) তখন তুমি বাতাস এবং আলো পাবার জন্য সংগ্রাম করার মতো শক্তিও পাবে। আলোকের জন্য অক্লান্ত সংগ্রাম করার অধিকার তোমার ন্যায্য প্রাপ্য। সেই কারণেই তুমি নারীদেহ থেকে শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করবে, অবশ্যই তুমি প্রকৃত কারণ না জেনেই জন্মগ্রহণ করবে।

বেঁচে থাকতে যে আনন্দ আছে সেটাকে তুমি রক্ষা করো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুভয় ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিও। এই যে জীবন—এটাকে ভালোবাসা উচিত, নইলে এটা বৃথাই নষ্ট হয়, কিন্তু এটাকে মাত্রাধিক ভালোবাসা উচিত নয়।

নূতন নূতন জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য হৃদয় সর্বদা উন্মুক্ত রেখো; মিথ্যাকে ঘৃণা করার জন্য হৃদয় প্রস্তুত রেখো; অশিবকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বর্জন করার মতো শক্তি সর্বথা হৃদয়ে ধারণ করো। আমি জানি, আমাকে এখন মরতে হবে, এবং তোমাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে এবং আমার যত সব ভুলত্রুটির জঞ্জালের উপর তোমাকে দাঁড়াতে হবে। আমাকে ক্ষমা করো। আমি নিজের কাছে নিজে লজ্জিত যে তোমাকে এই অরাজক আরামহীন সংসারের পিছনে রেখে চলে যাচ্ছি। কিন্তু এ-ছাড়া তো কোনো গতি নেই। আমি কল্পনায় তোমার কপালে চুম্বন রাখছি —শেষবারের মতো তোমাকে আশীর্বাদ জানাবার জন্য। গুড্‌নাইট, বাছা আমার —গুড্ মরনিং এবং শুভ প্রভাতে তুমি জাগ্রত হও।

মিসাক মানুচিয়ান, তুরস্ক।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে আদি-ইয়মনে (তুর্কী—আরমেনিয়ায়) জন্ম; ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪-এ প্যারিসে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ [প্যারিস]

[আমার মৃত্যুর পর] যাঁরা বেঁচে থাকবেন তাঁরাই ধন্য, কারণ তাঁরা মধুর স্বাধীনতা উপভোগ করবেন। আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই যে ফরাসী জাতি এবং অন্যান্য স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগ্রামী আমাদের স্মৃতিকে যথোপযুক্ত সম্মান দেবে। মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমি পরিষ্কার ভাষায় বলছি, আমি জর্মন জাতের প্রতি কোনো ঘৃণা অনুভব করি না…প্রত্যেক মানুষ তার কর্মফল অনুযায়ী তিরস্কার পাবে। জর্মন ও অন্যান্য জাত যুদ্ধশেষে শান্তিতে, ভ্রাতৃভাবে জীবনধারণ করবে; এ-যুদ্ধ শেষ হতে আর বিলম্ব নেই। বিশ্বজন সুখী হোক।

গভীর বেদনা অনুভব করি আমি যে, আমি তোমাকে সুখী করতে পারিনি। আমি চেয়েছিলুম, তুমি আমাকে একটি সন্তান দেবে, এবং তুমিও সব সময় তাই চেয়েছিলে। তোমার প্রতি তাই আমার অনুরোধ, আমার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য যুদ্ধের পর তুমি অতি অবশ্য পুনরায় পরিণয় করে সন্তান লাভ করবে।

আজ রোদ উঠেছে। এ রকম দৃশ্য আর সুন্দর প্রকৃতির পানে তাকিয়ে আমি তোমাকে নিত্যদিন কতই না ভালোবেসেছি। তাই বিদায় বিদায়! বিদায় নিচ্ছি এ জীবনের কাছ থেকে, তোমাদের সকলের কাছ থেকে, আমার প্রিয়াপেক্ষা প্রিয়তমা পত্নীর থেকে, এবং আমার ভালোবাসার বন্ধুজনের কাছ থেকে। আমি তোমাকে নিবিড় আলিঙ্গন করছি, তোমার ছোট বোনকেও এবং দূরের এবং নিকটের পরিচিত সর্ব বন্ধুজনকে।

॥ ৩ ॥

এ-কথা অনেকের কাছেই অবিদিত নয় যে, প্রাচ্যে মাতার প্রতি বয়স্ক পুত্রের যতখানি টান থাকে, পশ্চিমে—বিশেষ করে ফ্রান্স জর্মনি ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে—পুত্রের টান তার চেয়ে অনেক কম। এসব দেশের কবিরা মাতার উদ্দেশে কবিতা রচেছেন অত্যল্পই। তার একটা কারণ বোধহয় এরা বিয়ে করে মা'র সঙ্গে বাস করে না—বউ নিয়ে আলাদা সংসার পাতে। আমাদের বড় এবং মাঝারি শহরেও এ রীতি কিছুটা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

তা সে যাই হোক, যুদ্ধের সময় অনেক সৈন্যই মাতাকে বার বার স্মরণ করে। হৃদয় খুলে তার সব কথা জানায়। তাই যুদ্ধের সময় ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে লেখা চিঠিতে পাঠক মানব-হৃদয়ের নূতন নূতন মর্মস্পর্শী পরিচয় পাবেন।

যুদ্ধ তার রুদ্রতম নিকটতম বদন দেখায় সিভিল উয়োর বা ভ্রাতৃযুদ্ধের সময় এবং আশ্চর্য সে সময় মানুষের করুণাধারাও যে কী রকম উছলে পড়ে সেটা বহু চিঠিতে বহুভাবে প্রকাশ পায়।

গত বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে ইতালিতে ভ্রাতৃযুদ্ধ চলেছে। এ চিঠিটি সে সময়কার।

রবের্তো নান্নি : ইতালি, বল্না স্কুলের ছাত্র।

জন্ম ১৯২৮। প্যারাশুট থেকে ভূপৃষ্ঠে সংঘর্ষে ২৮ মার্চ ১৯৪৫[১] সালে নিহত।

২১ জানুয়ারি, ১৯৪৫

(মাতাকে লিখিত)

আজ এই প্রথম য়ুনিফর্ম পরে গির্জের উপাসনায় আমি যোগ দিয়েছিলুম।[২] আর বিশ্বাস করো মা আমার হৃদয় কী অনুভূতিতেই না ভরে উঠেছিল। ছেলেবেলায় তুমি যে আমাকে সঙ্গে করে গির্জেয় নিয়ে যেতে সে-সময়কার কথা ভাবছিলুম। আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যত দিন যায় মানুষের বয়স বাড়ে বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ের গভীরে সে ছেলেমানুষই থেকে যায়। আমরা সমবেত কণ্ঠে 'অসংখ্য জনের প্রার্থনা গীতি' গাইবার সময় যখন পুণ্যময়ী 'মাতা'র নাম এল তখন শুধু যে আমারই দু'চোখ জলে ভিজে গেল তাই নয় আমার বন্ধুদেরও তাই হল। তোমার কাছ থেকে চিঠি পাবার যে সুযোগ সুবিধা ও আনন্দ পাবার অধিকার আমার আছে তার মূল্য আমি তখন বুঝতে পারলুম কারণ আমার বহু সাথীর পরিবারবর্গ শত্রু-অধিকৃত এলাকায় আছে বলে তারা কোনো চিঠি পায় না।

আমার বিশ্বাস যে-নাম মানুষ বিপদের মুখোমুখি হলে সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ডেকে ওঠে সে-নাম "মা"।

শত্রুপক্ষের যাকে আমি দু'বাহুতে করে ফার্স্ট এডের ঘাঁটিতে নিয়ে যাচ্ছিলুম সে চেঁচিয়ে ডেকেছিল "মা"। যেতে যেতে তার মনের মধ্যে শুধু ছিল একটি মাত্র চিন্তা : তার মা। কাতর হয়ে আমাকে শুধোচ্ছিল, আমরা তার মাকে কিছু করিনি তো? আমি যতই 'না' বলছিলুম সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। আমাকে মিনতি জানাচ্ছিল আমি যেন সদা আমার মাকে অবশ্য স্মরণে রাখি, তোমার সম্বন্ধে খবর জানতে অনুরোধ করছিল, জিজ্ঞেস করছিল আমি তোমার কাছ থেকে চিঠি পাই কিনা, তোমার কোনো ফোটো আমার কাছে আছে

---

১ এর ঠিক এক মাস পরে ইতালিতে যুদ্ধের অবসান হয়। তাই ভাবলে দুঃখ হয় যে সতেরো বছরের ছেলেটির মা যখনই এ কথাটি ভাববে তখনই তার শোক কত না গভীর হবে।

২ জর্মন ইতালির ফ্যাসি সম্প্রদায় সৈন্যদের উর্দি পরে গির্জে যাওয়াটা পছন্দ করতো না। তারা গির্জেকে রাষ্ট্রের শত্রুভাবে দেখতো এবং উর্দি না পরে গির্জে যাওয়াটাও অতি কষ্টে বরদাস্ত করতো।

কিনা, কারণ তার আপন মায়ের কোনো ছবি তার কাছে ছিল না এবং তাই তোমার ফোটোতে সে তার আপন মায়ের ছবিও দেখতে চেয়েছিল।

৮ই সেপ্টেম্বর[৩] নিয়ে যারা অবহেলার সঙ্গে আলোচনা করে—কণামাত্র জানে না ঐ দিন আমাদের পিতৃভূমির জন্য কী দুর্ভাগ্য আর পরিপূর্ণ বিনাশ নিয়ে এসেছে—তারা যদি আমি যা এইমাত্র বর্ণনা করলুম সে দৃশ্যের সম্মুখে থাকত! কারণ, বুঝলে মা, যে লোকটাকে আমি গুলি করে আহত করতে বাধ্য হয়েছিলুম, যাতে করে সে আমার উপর আগেই গুলি না করতে পারে; সে আর আমি তো একই ভাষাতে কথা বলি, এবং "মা" বলে সে ডেকে উঠেছিল, এই এখন আমি তোমাকে যে নাম ধরে ডাকছি…

এবারে একটি কবিতার গদ্যানুবাদ।

আমির হামজা: মালয়, রাজপরিবারজাত কবি।

জন্ম ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১১, সুমাত্রায়। যুদ্ধাবসানের অরাজকতার সময় ১৯৪৬ সালে সুমাত্রায় নিহত।

(প্রিয়মিলন তৃষ্ণা)

কী মধুর! হে সমারোহময় মেঘরাশির শোভাযাত্রা
তুমি ঢেকে নিয়েছো সুনীল আকাশের নীলাঞ্জন।
দাঁড়াও ক্ষণেক তরে এই কুটিরের 'পরে
দূরের প্রবাসী তিয়াসী এক পথিকের কুটিরের 'পরে—
এক লহমার তরে, এক পলকের তরে—
আমি তোমাকে শুধু শুধোতে চাই,
তোমাকে হে মেঘ তোমাকে শুধোতে চাই
তুমি কোন্ দিকে যাবে মনস্থির করেছ?
কোন্ দেশে গিয়ে তুমি দাঁড়াবে?
হে মেঘ, আমার প্রিয়ার কাছে নিয়ে যাও আমার বিরহ ব্যথা
তাকে কানে কানে বলো আমার বিরহ বেদনা
তার তরুণ সোনালী হাঁটু দুটিকে তুমি আলিঙ্গন ক'রো,
যেন আমি নিজে সে দুটিকে আলিঙ্গন করছি।

এ কবিতা তো আমাদের বহুদিনকার চেনা কবিতা!!

৩ ঐ দিনই প্রথম খবর প্রকাশ পায়, ইতালির রাজা তাঁর মিত্রশক্তি

॥ ৪ ॥

ইভান ভ্লাদ্‌কফ: বুলগারিয়া।

জন্ম দ্রিয়ানভো-তে ১লা জানুয়ারি ১৯১৫।

মৃত্যু ২২ নভেম্বর ১৯৪৩, বুলগারিয়ার পুলিস কর্তৃক নিহত।

২১ নভেম্বর ১৯৪৩

যে একটি মাত্র বাসনা আমার আছে সেটি বেঁচে থাকার। তোমার শ্বাস চেপে ধরে বন্ধ করে দিল, তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, ধীরে ধীরে তোমার চৈতন্য লোপ পেল; গারদের কুটুরি আরো ছোট হয়ে গেল, এ-কুটুরিতে কখনো বাতাস ঢোকে না। তৎসত্ত্বেও বেঁচে থাকবার জন্য কী অদম্য স্পৃহা!

আর আমার ছোট ছেলেটি! এখন থেকেই সে আমার অভাব অনুভব করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। যে কথাগুলো সে আমায় বলেছিল সেগুলো এখনো আমার মনকে চঞ্চল করে তোলে: বাবা, তুমি যখন ফিরে আসবে তখন আমার জন্য একটা ট্রাম-লাইন কিনে দেবে আর ছোট একটি গাড়ি, আর এক জোড়া জুতো!

আমার পুত্র আমার অনুপস্থিতি অনুভব করে। আমার আদরসোহাগ সে কামনা করে, আমার কথা ভেবে সে ব্যাকুল হয়। আমি যখন তাকে বললুম, এরা আমাকে তোর কাছে যেতে দেয় না, তখন সে আমাকে বলল, 'তুমি যে আমার কাছে আসতে চাও না, তার মানে তুমি আমাকে ভালোবাসো না—না বাবা?' শিশুসন্তানের এ কী সরল ভালোবাসা, তার আত্মাটি কত না বিরাট ভালোবাসা ধরতে জানে!

কিন্তু এই এঁরা যাঁরা আমাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন এঁদের কি তবে শিশুসন্তান নেই? এঁরা কি নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন না, অন্যের প্রতি কি এঁদের কোনো সমবেদনা নেই? অতি অবশ্যই সর্বদাই এঁরা কোনো কিছু দিয়ে নিজের মনকে বোঝাতে জানেন। যখন তাঁদের উচিত আমাদের মৃত্যুর চরম দণ্ডাদেশ না দিয়ে লঘুতর দণ্ড দেওয়া—অন্য সর্ব কারণ বাদ দিয়ে হোক না সে শুধু আমাদের শিশুসন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে—তখন তাঁরা বলেন, শাসন-

জর্মনিকে ত্যাগ করে মার্কিন-ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করে ফেলেছেন, ফলে দেশে ভ্রাতৃযুদ্ধ আরম্ভ হয়। যে সৈন্য আহত হয় সে ছিল পার্টিজান দলের। (বর্তমান লেখকের ভেন্দেত্তা দ্রষ্টব্য)।

দণ্ডের আইন সে অনুমতি দেয় না। এ কী মূর্খতা! কিন্তু বোধ হয় এঁরা আপন শিশুসন্তানের প্রতি আমাদের মতো এ গভীর ভালোবাসা পোষণ করেননি। কারণ তাই যদি হত তবে তাঁদের আচরণ অন্য রকমের হত। আমার এখনো স্মরণে আসছে জেনারেল কচো স্টয়ানফের কথা—আমাকে কি বলেছিলেন: "বিচারকেরা সন্তানদের কথা স্মরণ রাখেন।" কিন্তু আমি এখনো বুঝতে পারছি নে, হয়তো কখনোই বুঝতে পারবো না, তাই যদি হবে, সন্তানদের কথা যদি তাঁরা স্মরণেই রাখেন তবে এ রকম দণ্ডাদেশ দেন কি প্রকারে?

'রাষ্ট্র শক্তিমান এবং রাষ্ট্র কাউকে পরোয়া করে না (ডিফাই)।' কিন্তু তাই যদি হবে তবে এরা আমাকে গুলি করে মারছে কেন?

২১ নভেম্বর ১৯৪৩

পুত্রকে—

আমি জানি পিতৃহীন হয়ে তোমার জীবনধারণ কঠিন হবে এবং তোমাকে অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা সইতে হবে। কিন্তু যে-সমাজতন্ত্রের জন্যে আমি এ-জীবন আহুতি দিচ্ছি সে ব্যবস্থা আসবে[১] এবং তোমাদের জীবনযাপনের জন্য মহত্তর পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

তুমিও সংগ্রামী হও এবং ন্যায়ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও। তোমার মাকে ভালোবাসবে, হে প্রিয়পুত্র! জীবনের বিপদ-আপদে তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন।

বুলগারিয়ার রাজনৈতিক পটভূমি বড়ই জটিল। পাঁচশত বৎসর তুর্কদের কবলে পরাধীনতার পর বুলগারিয়া ১৮৭২-এ রুশদের সাহায্যে স্বাধীনতা পায়, কিন্তু গৃহ-যুদ্ধ লেগেই থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভে বুলগারিয়ার জনসাধারণ ছিল রুশ-মিত্র, পক্ষান্তরে রাজা বরিস ও তাঁর ফৌজী অফিসাররা ছিলেন হিটলার-প্রেমী। কারণ এই রাজ্যবিস্তার-লোভী দলকে হিটলার অনেক লোভ দেখিয়ে হাত করেন এবং প্রকৃত-

১ কিন্তু পত্রলেখকের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। এর ঠিক এক বৎসর পর বিজয়ী রুশ সেনা নাৎসিদের বিতাড়িত করে বুলগারিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে। ঐ সময় বিস্তর নাৎসিমিত্র নবীন রাষ্ট্র কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। আশা করি, পত্রলেখক যে কামনা করেছিলেন এবারে সেটা পূর্ণ হয়েছিল অর্থাৎ নবীন রাষ্ট্র পত্রলেখকবৈরী-নাৎসিমিত্রদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার পূর্বে তাদের শিশু-সন্তানদের কথা ভেবেছিল।

পক্ষে সেখানে তাঁরই চেলাচামুণ্ডারা বুলগার অফিসারদের সাহায্যে নৃশংসভাবে রাজত্ব চালাতো। পত্রলেখক স্পষ্টত নাৎসিবৈরী জনসাধারণের অন্যতম ও নাৎসি-দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য মৃত্যুবরণ করেন।

জনৈক জর্মন সৈন্যদ্বারা লিখিত :

হেরবের্ট্ ডুকস্টাইন : জর্মনি।

জন্ম ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯০৯ মাগডেবুর্গ্।

মৃত্যু ২ জুন, ১৯৪৪, যোআন্নিনা, গ্রীস-এ যুদ্ধে নিহত।

গ্রীষ্ম ৯৪৪

ডিটমার বা মণিকা—আমার অজাত সন্তান!

যাত্রা এখনো আরম্ভ হয়নি—তোমার যাত্রা আমার যাত্রা কারোরই না। সেই বিরাট ঘটনার প্রাক্কালে আমরা উভয়েই প্রতীক্ষমাণ, তুমি তোমার—তোমার জন্মগ্রহণ করার, আর আমি আমার—যুদ্ধ এবং কাল-ঘূর্ণাবর্ত আমাকে যেখানে টেনে নিয়ে যাবে। সেই হেতু এ-পত্র প্রধানত তোমার মায়ের উদ্দেশে লেখা—যে মাতা তাঁর আপন দেহ দিয়ে তোমার আমার মধ্যে সংযোগ স্থাপনা করেছেন। আমি তোমাকে ভালোবাসি—যতদিন তোমার হৃৎপিণ্ড-স্পন্দন তোমাকে নিয়তি-নির্দিষ্ট যে-পথে যেতে হবে সে-পথ দেখিয়ে দিয়ে যায়।

আমার হৃদয় সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে, যতখানি শক্তি সে ধরে—কিন্তু হায়, সে-শক্তি বুঝিবা তার নেই যে তোমার বিরাট অভিযানের প্রথম পদক্ষেপগুলো দেখা যাবে—শুভেচ্ছা জানায় তোমার মাতাকে ইহসংসারে তোমার সর্বশ্রেয়া যিনি এবং তোমাকে—

—এখনো যার সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়নি, তোমার পিতা।

হ্স্যু হ্সিআও-হ্সিএ্যান, চীন।

১৯১৩-এ যুদ্ধে নিহত।

(একটি ক্ষুদ্র কবিতা)

সংঘ-প্রাচীরের পিছনে
আমাদের বন্ধুত্ব হল নিবিড়তর।
আমরা বিরাট বিরাট যত সব প্ল্যান করলুম
আমাদের আদর্শ আকাঙ্ক্ষা ছিল সুদূরব্যাপী…

কিন্তু বিদায়ের সময় শুধু নাড়লাম মাথা—
একটি মাত্র কথা না বলে—একে অন্যের দিকে।
কেন না সেনাবাহিনী তখন এসে দাঁড়িয়েছে
প্রাচীর দুর্গতোরণের সম্মুখে ॥

॥ ৫ ॥

যুদ্ধের সময় মাতারাই যে তাদের সন্তান হারিয়েছে তাই নয়, শিশুও মাকে হারিয়েছে—বিশেষ করে গত যুদ্ধের সময়। তাই এ-যুদ্ধে মাকে লেখা মেয়ের চিঠিও আছে।

হিটলার গদীতে বসার আগে থেকেই তাঁর শত্রু কম্যুনিস্ট ও সোস্যালিস্টরা তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে এবং গোপনে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যাঁরা ধরা পড়েন তাঁদের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে বিচারের নামে পরিহাস করা হত বটে, কিন্তু অধিকাংশকেই বিনা-বিচারে কন্‌সানট্রেশন ক্যাম্‌পে বন্ধ করে তাদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হত।

যুদ্ধ না লাগলে হয়তো হিটলার হিমলার এদের অনেককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করতেন না। কিন্তু হিটলার রুশ-রণাঙ্গনে যতই হারতে লাগলেন ততই তাঁর নিষ্ঠুরতা জিঘাংসা উত্তেজিত হতে লাগল—এই বিদ্রোহী পক্ষের প্রতি। হিটলার তখন স্ত্রী-পুরুষে আর কোনো পার্থক্য রাখলেন না। এমন কি নবজাত শিশুর মাতাও তাঁর বর্বরতা থেকে নিষ্কৃতি পেল না।

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী হান্‌স্ কপ্‌পিসহ স্ত্রী হিল্‌ডে কপ্‌পি গ্রেপ্তার হন। এঁরা দুজনেই হিটলারের বিরুদ্ধে সক্রিয় সোস্যালিস্ট ছিলেন। কারাগারে হিল্‌ডে একটি শিশুপুত্রের জন্ম দেন। পিতার নামেই এই শিশুর নামকরণ করা হয় 'হান্‌স্'—এ রেওয়াজ পৃথিবীর বহু দেশে আছে। 'ছোট' হান্‌সের ভূমিষ্ঠ হওয়ার এক মাস পর পিতা 'বড়' হান্‌স্‌কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, এবং মাতা হিল্‌ডেকে আট মাস পরে ১৯৪৩ সালের ৫ই আগস্ট। তখন তাঁর বয়স ৩৪।

মাতাকে লেখা কন্যার পত্র

আমার মা, গভীরতম ভালোবাসার মা-মণি,

সময় প্রায় এসে গিয়েছে যখন আমাদের একে অন্যের কাছ থেকে চিরতরে বিদায় নিতে হবে। এর ভিতর কঠিনতম ছিল আমার ছোট হান্‌সের কাছ থেকে চিরবিদায় নেওয়া—সেটা হয়ে গিয়েছে। সে আমাকে কী আনন্দই না

দিয়েছে! আমি জানি, সে তোমার স্নেহনিষ্ঠ মাতৃহস্তে অতি উত্তম রক্ষণাবেক্ষণ পাবে এবং আমার তরে মা মণি—প্রতিজ্ঞা করো—তুমি সাহসে বুক বাঁধবে। আমি জানি, তোমার বুকে বাজছে, এই বুঝি তোমার হৃদয় ভেঙে পড়বে, কিন্তু তুমি নিজেকে শক্ত করে নিজের হাতে চেপে ধরো—খুব শক্ত করে। তুমি ঠিক পারবে—তুমি তো কঠিনতম বাধাবিঘ্নের সামনে সর্বদাই জয়ী হয়েছ—এবারেও পারবে না মা? তোমার কথা যতই ভাবি, তোমাকে যে নির্মম বেদনা আমি দিতে যাচ্ছি সেই কথা—এটাই আমার কাছে সব কিছুর চাইতে অসহনীয়—এই ভাবনা যে, জীবনের যে-বয়সে আমাকে দিয়ে তোমার সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন তখনই আমায় ছেড়ে যেতে হচ্ছে তোমাকে। তুমি কি কখনো—কোনো দিন—আমাকে ক্ষমা করতে পারবে? তুমি তো জানো মা, আমার যখন বয়স কম ছিল—অনেক রাত্রে ঘুম আসতো না—তখন যে-চিন্তা আমার মনকে সজীব করে তুলতো সেটা—আমি যেন তোমার আগে ও-পারে যেতে পাই। এবং তার পরবর্তীকালে আমার মাত্র একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল; সে আকাঙ্ক্ষা দিবারাত্র, জানা-অজানায় আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতো—এ সংসারে একটি সন্তান না এনে কিছুতেই আমি মরবো না। তা হলে দেখো মা, আমার এই দুই মহান কামনা এবং তাই দিয়ে আমার জীবন পরিপূর্ণ সফলতা পেয়েছে। এখন আমি যাচ্ছি আমার বড় হান্‌সের মিলনে। ছোট হান্‌স্—আমি আশা ধরি—আমাদের দু'জনার ভিতর যা ছিল ভালো, সেইটে পেয়েছে। এবং যখনই তুমি তাকে তোমার বুকে চেপে ধরবে, তোমার এই শিশুটি সর্বদাই তোমাকে সঙ্গ দেবে—আমার চেয়ে বেশী, আমি তো আর কখনো তোমার অত কাছে আসতে পারবো না। ছোট হান্‌স্—আমার আশা—যেন সুদৃঢ় শক্তিশালী হয়, সে যেন মুক্তহৃদয় হয়, দরদী সেবাশীল হৃদয় ধরে এবং তার বাপের অকলঙ্ক ভদ্রচরিত্র পায়। আমরা একে অন্যকে নিবিড়, বড় নিবিড়ভাবে ভালোবেসেছিলুম। প্রেমই আমাদের সর্বকর্ম নিয়ন্ত্রিত করেছিল।

শক্তি দিয়ে যুঝে যেবা দেহ করে দান,
প্রভু রাখে তার তরে মহান নির্বাণ॥

মা আমার, আমার অদ্বিতীয়া কল্যাণী মা, আর আমার ছোট হান্‌স্—আমার সর্ব ভালোবাসা সর্বকাল তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে; সাহস ধরো—আমি যে রকম সাহস রাখবো বলে দৃঢ়প্রত্যয়।

নিত্যকালের
তোমার মেয়ে হিল্‌ডে

মাতাকে নিহত করে যারা শিশুকে মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত করে তাদের কি নাম দিয়ে ডাকি? হিটলার সর্বদাই ইহুদি বেদের পরিচয় দিতেন তাদের Untermensch = Undermen নাম দিয়ে অর্থাৎ মানুষ যে স্তরে আছে ইহুদি বেদে তাদের নিচের স্তরে। তাই তাদের গ্যাসচেম্বারে পুরে মারা হয়। অথচ আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তার থেকে বলতে পারি, এই দুই জাতই মাতা মাত্রকেই অবর্ণনীয় অসাধারণ প্রীতিস্নেহের চোখে দেখে। এইবারে পাঠক চিন্তা করুন Untermensch পদবী ধরার হক্ক সবচেয়ে বেশী কার?

মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিই যে হিল্‌ডের যে দুটি চরম কামনা ছিল সে-দুটি পূর্ণ।

আর সান্ত্বনা দিই যে তাকে দীর্ঘকাল বৈধব্যশোক সইতে হয়নি। কিন্তু প্রশ্ন ঐ কটি মাসই তার কি করে কেটেছিল? আর ঐ কটি মাসেই তার পিতা বড় হান্‌স্ কী গর্ব, কী বেদনাই না অনুভব করেছিল!

আর সান্ত্বনা দিই এই ভেবে যে মাত্র ন'মাসের শিশু মাতৃবিচ্ছেদের শোক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। কিন্তু প্রশ্ন, সে যে মাতৃদুগ্ধ না খেয়ে অন্য দুগ্ধ খাচ্ছে সেটা কি সে ইন্‌স্‌টিন্‌ক্ট দিয়ে (অনুভূতি-জাত সরাসরি জ্ঞান) বুঝতে পেরেছিল?

মনকে যতই চোখের ঠার মারি না কেন, যতই সান্ত্বনা খুঁজি না কেন এ-চিঠি গিলতে গিয়ে আমাদের সর্ব বুদ্ধি বিবেচনা সর্ব অনুভূতি চেতনা অসাড় হয়ে যায়।

এই পুণ্যশ্লোকা প্রাতঃস্মরণীয় কন্যা মৈত্রেয়ীর অনুজা। তিনি অমৃতের সন্ধানে ইহবৈভব ত্যাগ করেছিলেন (যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহমং তেন কুর্যাম্)। ইনি মাতা ত্যাগ পুত্র ত্যাগ করলেন সত্যশিবের সন্ধানে।

এই অতিশয় অসাধারণ পত্রের পর অন্যের পত্র কি পাঠকের মনে সাড়া জাগাবে? কি আমি তো কোনো ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি করার জন্য চিঠিগুলি বাছাই করে করে ফুলের তোড়া সাজাচ্ছি না। যেমন যেমন পড়ে যাচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে যেগুলো আমার হৃদয় স্পর্শ করছে সেগুলো অনুবাদ করে দিচ্ছি এবং আমি বাঙালী বলে আশা করছি বাঙালী হৃদয়ও এগুলো গ্রহণ করবে।

তাই চীন দেশের একটি কবিতা।

বাচ্চাটির বয়স যখন পাঁচ তখন তার বাপ যুদ্ধে মারা যায়। এবং তাকেও কৈশোরে পৌঁছতে না পৌঁছতেই যুদ্ধে যেতে হল। কবিতাটি ঈষৎ মডার্ন স্টাইলে ক্লাশ-ব্যাক করে রচিত। মডার্নদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না; ভূমিকা

হিসেবে উপরের দুটি ছত্র লিখতে বাধ্য হলুম প্রাচীনপন্থী পাঠকদের জন্য।

য়েন য়ুই : চীন।

যুদ্ধের সময় ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে আহত, তারই ফলে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু।

(সমরাঙ্গনের পুরোভূমিতে তরুণ)

এ তো এক ফোঁটা ছেলেমাত্র—আর এরি মধ্যে যুদ্ধ।
হিম্মতে সে ভরপুর তবু হৃদয় থেকে যেন রক্ত ঝরছে।
তার বয়স তখন মাত্র পাঁচটি হেমন্ত – যখন বাপ যুদ্ধে মারা গেল।
বাড়ি দৈন্যে ঢাকা পড়লো, খাদ্য বস্ত্র খেলনা নেই।

ছেলেটির বয়স ক্রমে চোদ্দ হল, তাকেও যুদ্ধে নিয়ে গেল।
দুঃখ বেদনায় মাতৃহৃদয় খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল।
সমস্ত গ্রীষ্মকাল জুড়ে চললো রক্তপাত আর বহ্নি-দাহনের তাণ্ডব,
ছেলের সংবাদ—সে কোন সুদূরে মরে গেছে না জয়ী হবে ?

তখন—বিদায় নেবার সময় হায় রে নিষ্ঠুর নিয়তি—
ছেলেটি জামাকাপড় পরেছিল বাচ্চাদের মতন তখনো।
তারপর সে বাড়ি ফিরলো—বাপেরই মতো হয়েছে লম্বা
মায়ের চোখের দিকে তাকালো, মায়ের কোলে লুটিয়ে পড়লো।

চোখের জল ঝরে পড়ে মায়ের কাপড় দিলে ভিজিয়ে
অতীত কি কেউ কখনো ভুলতে পারে ?
বাপ যা চেয়েছিল ছেলেকে সেটা এগিয়ে নিয়ে যেতে হল
আবার মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে হল— একটি কথাও বলে নি সে ॥

॥ ৬ ॥

জাঁদরেল থেকে জোয়ান—তা তিনি জর্মন হন বা ফিনই—বস্তুত যারাই রুশদের বিরুদ্ধে লড়েছে তারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছে কষ্টসহিষ্ণুতা আর দার্ঢ্যে রুশ সৈন্যের জুড়ি নেই। যে অবস্থায় অন্য যে-কোনো দেশের সৈন্য ভেঙে পড়বে —বোধ হয় একমাত্র জাপানী ছাড়া—সেখানে রুশ জোয়ান খানিকক্ষণ ঘাড় চুল-কোবে—কোনো কিছু ঠিক ঠিক ঠাহর করতে তার বেশ একটু সময় লাগে—

তারপর এক হাতের তেলোতে আর এক হাত দিয়ে যেন অদৃশ্য ধুলো ঝাড়ছে ঐ 'মুদ্রাটি' এঁকে বলবে 'নিচ্চিভো'। 'ইট ইজ নাথিং', 'ডাজ্‌নট ম্যাটার'-এর দূরের অনুবাদ। 'কুছ পরোয়া নহী' 'কৈ বাত নহী' তবু অনেক কাছের অনুবাদ।

কিন্তু দার্চ্য—ঐটেই আসল কথা। কিন্তু ঐটেই কি শেষ কথা?

(কবিতা)

সেমেন গোদসেন্‌কো : সোভিয়েত ইউনিয়ন।

জন্ম ১৯২২। মে ১৯৪২এর যুদ্ধে আহত হওয়ার ফলে ১৯৫৩ সালে মৃত্যু।

কুড়িটি বচ্ছর আমাদের বয়স হল,
তারপর এই যুদ্ধের বৎসরে,
সর্বপ্রথম আমরা দেখলুম রক্ত, দেখলুম মৃত্যু—
সরল, সোজাসুজি, মানুষ যে রকম স্বপ্ন দেখে অক্লেশে।
আমার স্মৃতিপট থেকে কিছুই মুছে যাবে না;
যুদ্ধে প্রথম মৃত জনের সঙ্গে দেখা,
বরফের উপর প্রথম রাত্রি যাপন, শীতে জমে গিয়ে
একে অন্যকে পিঠ দিয়ে ঘুমুলুম।
আমি আমার পুত্রকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব মৈত্রীর দিকে—
তাকে যেন কক্‌খনো যুদ্ধ না করতে হয়—
সে যেন আমাদের মতো কাঁধে কাঁধ ছুঁইয়ে
মিত্রগণের সঙ্গে ধরণীর বুকে পা ফেলে চলে।
সে যেন শেখে : ন্যায্যভাবে
রুটির শেষ টুকরো ভাগাভাগি করতে।
...মস্‌কোর হেমন্ত, স্মলেনস্‌কের শীত ঋতু,
আমাদের অনেকেই মারা গিয়েছে।
কিন্তু সৈন্যবাহিনীর ঝঞ্ঝা, বসন্তের ঝঞ্ঝা
পরিপূর্ণ করে দিয়েছে এই নব ফাল্গুন।
বিরাট যুদ্ধ এই করে
মানুষের বুকের পাটা ভরে দেয় সাহস দিয়ে।
মুষ্টি হয় দৃঢ়তর, বাক্য হয় গুরু-ভার।
এবং বহু কিছু তখন হয়ে যায় পরিষ্কার।
...কিন্তু এখনো তুমি বুঝতে পারো নি—
এই সব অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আমি হয়েছি আগের চেয়ে কোমলতর।

অর্থাৎ বাইরের কার্যকলাপে, সংগ্রামে শান্তিতে রুশজন যতই দার্ঢ্য ধরুক না কেন অন্তরে সে পুষে রাখে কোমলতা, করুণা, মৈত্রী। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই বিশ্বাস ধরি।

আধুনিক রুশ সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি অল্প। কাজেই বলতে পারবো না, কবি গোদসেন্‌কো রুশ দেশে কতখানি খ্যাতিপ্রতিপত্তি ধরেন। তবে তাঁর আর একটি কবিতা আমার বড় ভালো লেগেছে।

বাইরে যতই বড়ফট্টাই করুক না কেন, হিটলারের অনেক চেলাই যে ভিতরে ভিতরে গড্‌ড্যাম্‌ কাপুরুষ ছিল সেইটে কবি প্রকাশ করেছেন অতি অল্পতেই। ভল্‌গা-অঞ্চলের স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ তখন (ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩) শেষ হয়ে গিয়েছে। বিশ্বজন, এমন কি জর্মন জাঁদরেলরাও তখন জেনে গিয়েছেন যে জর্মনির জয়াশা আর নেই। জয়াশা ত্যাগ করে মুণ্ডহীন দেহে যত্রতত্র বিচরণ করাটা তখন স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো ছিল না। কবিতাটি স্তালিনগ্রাদে লেখা।

স্তালিনগ্রাদ, মে—নভেম্বর, ১৯৪৩

ফেব্রুয়ারি শেষ হল।
নীলাকাশ
দেওয়ালের ফুটোগুলোর ভিতর দিয়ে
যেন চিৎকার করছে।
প্রতি চৌরাস্তায় তীরের চিহ্ন—
জর্মন সৈন্যদের পথনির্দেশ করছে
কোথায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে।
এ তো ইতিহাস।
এ তো স্মরণের কাহিনী।
সংগ্রামের চিৎকার ভল্‌গা-অঞ্চল থেকে সরে গিয়েছে।
এখন, কিভাবে ইস্কুলগুলো ফের বানাতে হবে
তাই নিয়ে দিবারাত্তির মহকুমা-শহরে গভীর আলোচনা হচ্ছে
বাচ্চারা নিয়ে এল অতিশয় সযত্নে
একখানা বেঞ্চি—কোনো জখম-চোট লাগে নি
যেন কাঁচের তৈরি পলকা মাল,—মাটির নিচের ঘর থেকে।

…সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল
—হঠাৎ-আলোতে-অন্ধপ্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল
এক জর্মন সৈন্য।
ওঃ! কী কাঁপতে কাঁপতে সে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল।
তার ওভারকোট ছেঁড়া, টেনা টেনা—পা দুটো নড়বড়ে।
ঐ শেষ জর্মন সৈন্য স্তালিনগ্রাদে।
একদা বার্লিনে সে যে হামাগুড়ি দিতো হুবহু সেইভাবে।

(নাৎসি-প্রধানদের সম্মুখে—অনুবাদক)

এভাল্ট্ ফন্ ক্লাইস্ট-শ্নেনৎসিন।
জন্ম ২২ মার্চ ১৮৮৯।
ফাঁসিতে মৃত্যু ১৫ এপ্রিল ১৯৪৫।

জনৈক ধর্মভীরু নিষ্ঠাবান ক্যাথলিক ক্রিশ্চানের পত্রাংশ। ইনি হিটলারের আদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন :

'ভগবানের দিকে যে জাত যতখানি নিয়োজিত করেছে, সেই দিয়ে তার মূল্য বিচার করতে হয়। একটা অ-ক্রিশ্চান জাতও ক্রিশ্চানদের তুলনায় (যেমন আমরা—অনুবাদক) ভগবানের অনেক নিকটতর হতে পারে। আজকের দিনের ক্রিশ্চানরা ভগবানের কাছ থেকে অনেক দূরে।'

॥ ৭ ॥

কনসানট্রেশন ক্যাম্পের (ক. ক) কেলেঙ্কারি কেচ্ছা এতদিনে হটেনটটরাও শুনে গিয়ে থাকবে কিন্তু তার 'গৌরবময়' যুগে সে তার কীর্তিকলাপ এতই ঢেকে চেপে সারতে পেরেছিল যে সাধারণ নিরীহ জর্মন ক-ক'র ভিতরে কি হয় না-হয় সে সম্বন্ধে নানা রকম গুজব শুনতে পেতো বটে, পাকা খবর পাবার কোনো উপায় ছিল না। তদুপরি সুবুদ্ধিমান জর্মন মাত্রই জানতো, এ-বাবদে অত্যধিক কৌতূহল প্রকাশ করা আপন স্বাস্থ্যের জন্য প্রকৃষ্টতম পন্থা নয়। যেমন ১৯৪৫-এ যখন যুদ্ধ জয়ের কোনো আশাই ছিল না তখন হিটলার-হিমলার আইন জারী করেন যে, কেউ যদি বলে যে এ-যুদ্ধে জর্মনির জয়াশা নেই তার মুণ্ডচ্ছেদ করা হবে ; ঐ সময় এক জর্মন তার বউকে গোপনে বলে, 'যুদ্ধে জয়লাভ করার ভরসাটা বরঞ্চ ভালো।

মুণ্ডহীন ধড় নিয়ে হেথাহোথা ছুটোছুটি করাটা স্বাস্থ্যের পক্ষে আদপেই ভালো নয়।'

গল্পটি সেই সময়কার।

ট্যুনিস আর শ্যেল দুই নিরীহ, সদাশান্ত জর্মন। দু'জনাতে দোস্তী। পথিমধ্যে দেখা। ট্যুনিস শুধোলে, 'হ্যাঁ রে শ্যেল, এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি বল তো!'

'হুঁ : : !'

'সে কি রে? কথা কইছিস না কেন? আমি তো শুনলুম, তোকে কনসান-ট্রেশন ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ঐ জায়গাটা সম্বন্ধে তো নানান কথা শুনি! কি রকম ছিলি সেখানে?'

শ্যেল বললে, 'ফার্স্ট ক্লাস। উত্তম আহারাদি। পরিপাটি ব্যবস্থা। সকালে বেড্-টী। জামবাটি ভর্তি চা। একটি আপেল, দু'খানা খাস্তা বিস্কুট। তারপর আটটা-ন'টায় ব্রেকফাস্ট। ডাবরভরা সর-দুধ, কর্‌নফ্লেক, চাকতি চাকতি কলা, উত্তম মধু। সঙ্গে তো টোস্ট, মাখন, চীজ আছেই। তারপর দু'খানা অ্যাব্‌বড়া আস্ত মাছ ভাজা—ফ্রেশ মাখমে। তারপর দুটো ফুল-সাইজ পোচ, ডিম ভাজা বা মমলেট—যা তোর প্রাণ চায় - বেকন সহ, কিংবা হ্যামও নিতে পারিস। তারপর—'

ট্যুনিস সন্দিগ্ধ নয়নে তাকিয়ে বললে, 'সে কি রে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ন'সিকে খাঁটি কথা কইছি। ক-ক'র বাইরে বসে তোরা তো নিত্যি নিত্যি খাচ্ছিস lunch-এর নামে লাঞ্ছনা, supper-এর নামে suffer। আমরা খাচ্ছিলুম…' পুনরায় সসিজ, কটলেট, এস্‌পেরেগাস, চিকেন্ রোসটের সবিস্তর বর্ণনা।

ট্যুনিস বললে, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি নে। হালে ম্যুলারের সঙ্গে দেখা। সেও মাস ছয় ক-ক'তে কাটিয়ে এসেছে। সে তো বললে সম্পূর্ণ ভিন্ন কাহিনী। সে বললে—'

বাধা দিয়ে বাঁকা হাসি হেসে শ্যেল বললে, 'বলতে হবে না, সে আমি জানি। তাই তো বাবুকে ফের ওখানে ধরে নিয়ে গিয়েছে।'

শ্যেল আর ওখানে ফিরে যেতে চায় না। তাই ইংরিজিতে যাকে বলে সে তার বর্ণনা-টোস্টে প্রেমসে লাগাচ্ছে প্রয়োজনাতিরিক্ত গাদা গাদা মাখন।

কিন্তু শ্যেল-বর্ণিত ঘটনা সত্য সত্যই ঘটেছিল ক-ক'তে তবে ভিন্ন ভাবে। যাকে বলে—

উল্টো বুঝলি রাম, ওরে উল্টো বুঝলি রাম।
কালে করলি ঘোড়া, আর কার মুখে লাগাম॥

১৯৪৫-এর মে মাসে যুদ্ধশেষে বিজয়ী রুশ সেনা যেমন যেমন জর্মনির অন্তর্দেশে ঢুকলো, সঙ্গে সঙ্গে ক-ক'র বন্দীদের খালাস ক'রে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করলো—কারণ এই বন্দীরা ছিল হিটলারবৈরী, জার্মানের দুশমন।

ঐ সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে চিঠি লিখছে এক চেকোস্লোভাক বন্দী। চিঠিখানি দীর্ঘ। আমি কাটছাঁট করে অনুবাদ দিচ্ছি:

য়ারোস্লাভ য়ান পাউলিক; চেকোস্লোভাকিয়া।
জন্ম ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৫।
মৃত্যু ১৩ মে ১৯৪৫।

উত্তর জর্মনি, মে ১৯৪৫

ওলাফ ঝড়ের বেগে, যেন হোঁচট খেয়ে ঢুকলো আমার গারদে। রুপোলী চুলে মাথাভরা ওলাফ। খোঁড়া-পা ওলাফ, তার ক্রাচ ছুটিয়ে নিয়ে। তার সেই মধুর হাসি হেসে সে আমায় আলিঙ্গন করলে।

মুক্তি মুক্তি মুক্তি।

স্বাধীনতা স্বাধীনতা।

আমরা সবাই এখন মুক্ত, স্বাধীন। এমন কি ডাকাত, খুনীরাও মুক্তি পেয়েছে। সবাই মিলে লেগে গেল আশপাশে ডাকাতি লুটতরাজ করতে। আমি কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারলুম না। ঐ যে পেটুক ম্যুলার বলে, আমি ওসব ব্যাপারে একটা আস্ত বুদ্ধু। তদুপরি আমি ভুগে ভুগে অত্যন্ত দুর্বল; রোগে কাতর, সর্ব নড়নচড়নে অথর্ব। আর এই হট্টগোলের মাঝখানে এই প্রথম অনুভব করছি সেটা কতখানি। এদিকে আসছে বাসন বাসন ভর্তি আলু, রুটি, চিনি। অমুক (পত্রলেখক ইচ্ছে করেই নামটা ফাঁস করেন নি—অনুবাদক) একটা খাসা, বেড়ে সুটকেস লুট করেছে—ভেতরে আছে, শার্ট-কলার-গেঞ্জি-রুমাল এবং চিনি, কোকো, সিগার, মাখন, এক বোতল 'হৃদয়ভেদী' ব্র্যাণ্ডি, হেনেসি ব্র্যাণ্ডির চেয়েও উৎকৃষ্ট। তার সোওয়াদটা আমার জিভে এখনো লেগে আছে।

ওদিকে আঙিনার উপর ডাঁই ডাঁই আলু। তন্দুরের ভিতর গাদা গাদা পাঁউরুটি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে, তৈরি হয়ে উড়ে উড়ে বাইরে চলে আসছে। পেপে আমাকে একটা ছেঁড়া স্বেটার, একটা ছোরা আর এক জোড়া জুতো

দিয়েছে (ক-ক'র বন্দীরা দুরন্ত শীতে খড়, ন্যাকড়া দিয়ে পা বাঁধতো—অনুবাদক)। সত্যিকার জুতো! যতই চেয়ে দেখি প্রাণটা কী যে আনন্দে ভরে আসে!

রুশ সৈন্যবাহিনীর ট্যাঙ্ক, মোটরগাড়ি, বাইসিকল আমাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। 'নমস্কার, নমস্কার! কি রকম আছেন?' (জ্‌দ্রাসভুইয়েতে, কাক্ পজিভাইয়িতে?) বলছে তারা। তারা তাদের গাড়ি থেকে আমাদের দিকে ছুঁড়ে ফেলছে সিগরেট, রুপোলী-মোড়কে প্যাঁচানো ৫০ গ্রামের তামাক, মিষ্টি, মাখন-চর্বি, টিনের যাবতীয় খাদ্য, প্যাঁজ, টুথ-পেস্ট, দুধের গুঁড়ো, সিরাপ।

সকালবেলা খেলুম; আণ্ডাবেকন, জামবাটি ভর্তি পরিজ, সঙ্গে বিস্তর মার্মালেড, রুটি মাখন প্যাঁজ, সত্যিকার কফি, চিনিসহ।

(দ্বিতীয় চিঠি)

হয়েছে। আমার একটি অনবদ্য, পুরো পাকা আমাশা হয়েছে। ফরাসী পাচকরা কালকের দিনে যা রেঁধেছিল (ঐ সময়ে একাধিক ফরাসী পাচকও ক-ক'তে বন্দী ছিল ও দ্রব্যাদি তথা মালমসলা পেয়ে বহুদিন পর মুখরোচক জিনিস তৈরি করছিল—অনুবাদক)—কলিজা-ভাজা তার সঙ্গে সরে-দুধে মাখানো আলুভাতে, তাবত বস্তু প্যাঁজ-ফোঁড়নে, ওঃ সে কী সুন্দর, কী মধুর!

এখন আমাকে কি করতে হচ্ছে, ঐ সবের সামনে দাঁড়িয়ে?

দুধ আর আঙুর রস! ঐ আমার পথ্যি।

দুপুরের খাবার সময় হয়ে এসেছে।

হায় আমার খিদে নেই, রুচি নেই।

আমার প্রিয়া, আমার ছোট্ট বউটি এখন কি করছে, কি ভাবছে?

কাল তাকে পাবার জন্য আমার বুক যা আকুলি-বিকুলি করছিল।

মনে হচ্ছে, এইবারেই নাক-বরাবর ওরই দিকে ছুটে যাবো।

হায়, যুদ্ধশেষের পাঁচদিন পরই হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

॥ ৮ ॥

ভিন্ন ভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বহু চুটকিলা প্রচলিত আছে।

জর্মনির দুই নম্বরের মোড়ল হারমান গ্যোরিঙ যখন বন্দী অবস্থায় ন্যুরন্‌বের্গ মোকদ্দমায় আসামী তখন জেলের গারদে যে সব মার্কিন মনস্তাত্ত্বিক তাঁকে পর্যবেক্ষণ করতে আসতেন তাঁদের সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ করে নিতেন। এক মোকায় তিনি বলেন,

'তোমরা মার্কিন। ইয়োরোপীয় জাতগুলোর বৈশিষ্ট্য বুঝবে কি প্রকারে? শোনো:

একজন ইংরেজ—শিকারী (স্পোর্টস্‌ম্যান)

দুজন ইংরেজ—একটা ক্লাব স্থাপনা,

তিনজন ইংরেজ—হার ম্যাজেস্‌টি কুইনের জন্য একটা কলোনি জয়।' তারপর হেসে বলতেন,

'একজন ইতালীয়—গাইয়ে,

দুজন ইতালীয়—ডুয়েট গাইয়ে,

তিনজন ইতালীয়—যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন!' হাঃ হাঃ হাঃ।

'এবারে শুনুন,

একজন জর্মন—পণ্ডিত,

দুজন জর্মন—একটি নূতন পলিটিকাল পার্টি স্থাপনা (এ-বাবদে অবশ্য আমরা, বাঙালীরা এখন হেসে খেলে জর্মনদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি)।

তিনজন জর্মন? হাঃ হাঃ—বিশ্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা!' তারপর ফিসফিস করে বলতেন, 'আর জাপানীরা?

একজন জাপানী—রহস্যময়!

দুজন জাপানী—সেও রহস্যময়!

তিনজন জাপানী?' এখানে এসে গোয়েরিঙ 'রহস্য'পূর্ণ দৃষ্টিতে শ্রোতাদের দিকে তাকাতেন, তারপর বলতেন,

'তিনজন জাপানী—সেও রহস্যময়।' বলেই ঠা ঠা করে উচ্চহাস্য করতেন—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাল্লুকী থাবা দুটো দিয়ে তাঁর বিশাল উরুতে থাবড়াতেন—যে উরুর একটা দিয়ে অক্লেশে যে-কোনো বঙ্গসন্তানের দুটো কোমর হোতে পারে।

আমার এবং আমার বন্ধুজনেরও ঐ ধারণা। যেন অনুভূতির কোনো বালাই-ই জাপানীদের আদৌ নেই। কিন্তু পরের পৃষ্ঠার চিঠিটি পড়ুন:

গরু কিকিয়ু

জন্ম : ১৯১০

মৃত্যু : ফিলিপিনের যুদ্ধে, ২০ আগস্ট, ১৯৫৪

স্ত্রী য়াকোকে লেখা :

মানচুরিয়া

বেশীদিন তো হয়নি তোমার সঙ্গে ছিলুম অথচ ইতিমধ্যেই তোমার সঙ্গ পাবার জন্য আবার আমার কী দুরন্ত আকুলি-বিকুলি। আমরা এক সঙ্গে কাটিয়েছি অল্পকালই, তবু তোমার সে-সময়কার চলাফেরা ওঠাবসার কত না ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠছে। আর সব চেয়ে জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠো তুমি, যেখানে তুমি কোমল, মৃদু। আমাদের উভয়ের শিশুসন্তানটি জন্ম দেবার পর থেকে তুমি আরো সুন্দর হয়ে উঠেছো। তোমার সৌন্দর্যে যেটুকু শুষ্কতা ছিল সেটা রসঘন হয়ে গিয়েছে, তুমি পেয়ে গেলে এক নবীন পবিত্র সৌন্দর্য—মাতৃত্বের সৌন্দর্য। আমার স্মরণে আছে সেদিনকার ছবি, যেদিন আমি টোকিও ছেড়ে চলে এলুম —সামান্য একটু প্রসাধন করে তুমি তখন বসে আছো খাটের উপর।

তখন কী সরল হাসিটি তোমার! অথচ যখন তুমি আমার কল্যাণ কামনা করে বিদায় নিতে এলে আমাদের আঙ্গিনায়, তখন, এই বুঝি, এই বুঝি তুমি কান্নায় ভেঙে পড়বে। নিতান্ত সেই নীরবতা ভাঙবার জন্য আমি তোমাকে বললুম, 'সাবধানে থেকো।' তারপর আমি ইজুমি আর প্রতিবেশীদের সঙ্গে রাস্তায় নেমে পড়লুম। আমি তখন মনে মনে আমাদের বাড়ির দিকে পিঠ ফিরিয়ে নিয়েছি। আমার ভাবনাচিন্তা তখন যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। আমি হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করছিলুম, আমার মাতৃভূমির সব-কিছু যেন সেই সময়েই অন্তর্হিত হল। আমার এই অনুভূতিটি তোমার পক্ষে বোঝাটা হয়তো কঠিন হবে কিন্তু তুমি আমার হয়ে একবার আমার এই অবস্থাটি কল্পনায় বুঝতে চেষ্টা করো। আকার মনে হয়েছিল, ঐ বিদায় মুহূর্তে যেন আমার দেহ উর্ধ্বপানে ধেয়ে গিয়ে অনন্তে চলে গেল।

কিন্তু এখন? আজ রবিবারের এই সকালে আমার সর্ব দেহমন ধেয়ে চলেছে তোমা পানে।

বুঝিয়ে বলি; আমার হৃদয় কামনা করছে, তোমার অক্ষিপল্লব মৃদু মৃদু স্পর্শ করতে, তোমাকে শান্ত আলিঙ্গনে ভরে নিতে। তুমি যখন স্মিতহাস্য করো তখন তুমি বড় সুন্দর এবং সবচেয়ে সুন্দর তোমার দন্তপঙ্‌ক্তি। হ্যাঁ, তোমার বর্ণ উজ্জ্বল শুভ্র নয়, কিন্তু মানতেই হবে, সে বর্ণ পরিপক্ক গোধূম বর্ণ—তোমার চর্ম

সম্পূর্ণ অকুঞ্চিত—কোমল। তোমার বক্ষ পূর্ণস্তন—মাতৃত্বের স্ফীতবক্ষ। এবং বর্ণ সেখানে প্রায় স্বচ্ছ শুভ্র। আমি তোমার বুকের উপর শিশুটির মতো ঘুমিয়ে পড়তে চাই। বহুবার কামনা করেছি, তোমার সুডৌল গোল বাহুতে মাথা রেখে আরাম লাভ করতে। তোমার সুন্দর সুবিন্যস্ত ওষ্ঠাধরে চুম্বন দিতে দিতে আমি মৃদু হাস্য করি আর তুমি প্রত্যুত্তরে মোহনীয়া মৃদুহাস্য দিয়ে আমাকে জাদু করছো। এরকম ধারা যত আমার কামনা এগিয়ে যায় ততই তোমাকে কাছে পাবার বাসনা দুর্বার হয়ে ওঠে। না—এরকম ধরনে আমি আর লিখতে পারবো না। এ লাইনটি পড়ে তুমি হয়তো হেসে উঠবে, কারণ এটা আমার স্বভাবের বিপরীত। কিংবা হয়তো তুমি আশ্চর্য হচ্ছো, তোমার কাছে আমার মূল্য বেড়ে যাচ্ছে—নয় কি? কিংবা হয়তো ভাবছো, আমি শিশু—'বুড়ো খোকা' এবং তাই আমাকে সোহাগ করতে চাইছো—না?

এ-সব নির্মল স্মৃতি আমার চোখের সামনে বার বার ভেসে ওঠে আর সে-সময়কার কথা বার বার মনে পড়ে।

তোমার পূর্ণ বক্ষ আমার চোখের সামনে মায়াময় কায়া ধরে ফুটে ওঠে। আমার ইচ্ছে যায় যে নিটোল বক্ষে হাত বুলোই—ধীরে অতি ধীরে—তোমার মধুর নাসিকা, তোমার মুখ চুম্বনে চুম্বনে ভরে দিই। তুমি তখন মধুর হাসি হেসে উঠবে, আমাকে আদর সোহাগ করবে। বলো দেখি, অন্য কোথা; কোথায় আছে এই বিশ্বভুবনে, এরকম হৃদয়কাড়া সৌন্দর্য?

সুস্থ শরীর-মনে থেকো। তোমার চিত্তটিকে সৌন্দর্যময়, প্রেমময় করে রেখো। এরকম যে-মা তার কাছে আমি ফিরে আসছি শিগগিরই।

আমাকে আলিঙ্গন করো, তোমার পূর্ণ বক্ষ, উষ্ণ স্তন দিয়ে।

একটুখানি ধৈর্য ধরে থাকো—বাস, ঐটুকু শুধু।

হায়! বহু যুগ পূর্বে শ্রীরাধার সখী তাঁকে বলেছিলেন, 'ধৈর্যং কুরু, ধৈর্যং কুরু গচ্ছং মম মথুরাবে' কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ফিরে আসেননি।

পূর্বে নিবেদন করেছি জাপানীরা রহস্যময়। কিন্তু এ চিঠি তো আদৌ রহস্যময় নয়। এ তো সেই রামগিরির বিরহী যক্ষ, মালয়ের কবি আমির হামজার মতো উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলছে!

আর এ-পত্রে প্রেম ও কামের কী অনবদ্য সমন্বয়।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মে ফ্রান্সে সৈন্য অবতরণ করে জর্মনি জয়ের জন্য ইংলণ্ড

তার তাবৎ কমনওয়েলথের এবং অন্যান্য সৈন্য সেখানে জমায়েৎ করেছিল। তারা এসেছে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আরো মেলা দেশ, এবং প্রধানত, সবচেয়ে বেশী আমেরিকা থেকে।

ঐ সময়ে জনৈক ক্যানাডাবাসীর পত্র—তার বউকে।

ডনাল্‌ড্‌ আলবেরট ডানকান, কানাডা।

১৯৪৪ সালে, জুলাই মাসের শেষের দিকে, ফ্রান্সে সৈন্যাবতরণের সময় নিহত।

ইংল্যাণ্ড ১৪ মে, ১৯৪৪

...ইংল্যাণ্ড এখন আর ইংরেজের (জমিদারী) নয়। এ-দেশটা এখন সম্পূর্ণ দখল করেছে মার্কিনরা। একই সঙ্গে চার-চারটে বেস্‌ বল খেলার মাঠ তৈরি হয়েছে হাইড পার্কে। ইংরেজরা অবশ্যই অনেকখানি সহিষ্ণু, কিন্তু একথা নিশ্চিত মনে বলা যেতে পারে, তারা মার্কিনদের সঙ্গে গভীর পীরিতি-সায়রে নিমজ্জমান হয়নি! মার্কিনদের কাঁড়ি কাঁড়ি কড়ি! তদুপরি কেড়ে নিয়েছে ছুঁড়ীদের, বাসা বেঁধেছে সেরা সেরা হোটেলে। (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে ইংরেজও কড়ির তাগদে প্যারিসে তাই করেছিল। এই কলকাতাতেই আমরা মার্কিনদের সে রোওয়াব দেখেছি!) কিন্তু ইংরেজ করবে কি? ফ্রান্সে নেমে জর্মনিকে পরাজিত করতে হলে যে ইয়াংকিদের প্রয়োজন।

ইংল্যাণ্ড, ২৪ জুন, ১৯৪৪

...এসব তো হল, ওলো, প্রাচীন প্রিয়া (ওল্ড গারল)! বাচ্চাদের আমার হয়ে আদর দিয়ে বলো, আমি ইউরোপ থেকে ওদের জন্য সুন্দর টুকিটাকি নিয়ে ফিরে আসবো—যখন নিষ্প্রদীপ বিশ্ব আবার আলোকোজ্জ্বল হবে।

ফেরেনি। এক মাস পরে রণাঙ্গনে তার মৃত্যু।

॥ ৯ ॥

আডাম ফন্‌ ট্রটৎস্থ (Zu) জল্‌ৎস্থ, জর্মন।

জন্ম: ১৯০৯

মৃত্যু: ২৬ আগস্ট, ১৯৪৪

হিটলারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য বার্লিনের প্লোৎসেন্‌জে কারাগারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।

ইহলোক থেকে মাতার কাছে বিদায় জানিয়ে মৃত্যুর ক্ষণকাল পূর্বে লেখা শেষ পত্র।

বার্লিন-প্লোৎসেনজে ২৬ আগস্ট, ১৯৪৪

সবচেয়ে আদরের মা!

তবু ভালো, তোমাকে সামান্য কয়টি ক্ষুদ্র ছত্র লেখার সুযোগ শেষটায় আমি পেয়েছি—তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ; তুমি সব সময়ই আমার কাছে ছিলে, এবং এখনও আছ—আরও নিবিড় হয়ে কাছে আছ। তুমি আমি যে অনন্ত অনন্ত-কালীন যোগসূত্রে বাঁধা, আমি সেটি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে জোর আঁকড়ে ধরে আছি। এ কয়েক সপ্তাহ ধরে ঈশ্বর আমাকে তাঁর দাক্ষিণ্য দিয়ে ভরে রেখেছেন এবং সব—প্রায় সব কিছুর জন্য—আমাকে আনন্দময় সরল-স্বচ্ছ শক্তি দিয়েছেন। এবং তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন এ-জীবনে আমি কিভাবে, কোন্ কোন্ বিষয়ে কৃতকার্য হতে সক্ষম হই নি। কিন্তু এ-সবের চেয়েও সবচেয়ে বড় কথা: এই যে তোমাকে কঠিন শোক পেতে হবে, তার জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি, এবং বৃদ্ধ বয়সে তুমি যে আমার উপর নির্ভর করতে, সেই নির্ভর থেকে তোমাকে বঞ্চিত করার জন্য আমি ক্ষমা ভিক্ষা করছি।

তোমায় আমায় আবার মিলন হওয়ার পূর্বে একটি শেষ চুম্বন—কৃতজ্ঞতা আর স্নেহে ভরা।

তোমার পুত্র তোমাকে যে বড্ড ভালোবাসে।

—আডাম

"তোমার পূত আত্মায়, হে প্রভু আমি নিজেকে সমর্পণ করি…"

ইহলোক থেকে পত্নীর কাছে বিদায় জানিয়ে মৃত্যুর ক্ষণকাল পূর্বে লেখা শেষ পত্র।

বার্লিন-প্লোৎসেনজে, ২৬ আগস্ট ১৯৪৪

প্রিয়া কণিকা ক্লারিটা,

দুঃখের বিষয়, সম্ভবত এই আমার শেষ চিঠি। আশা করি ইতিপূর্বে লেখা আমার দীর্ঘতর পত্রগুলো তোমার কাছে পৌঁচেছে।

আর কিছু বলার পূর্বে এবং সর্বোপরি আমি যা বলতে চাই: নিতান্ত অবাঞ্ছিত-ভাবে তোমাকে যে গভীর শোক দিতে হল, তার জন্য আমি মাফ চাইছি।

আমি প্রত্যয় দিচ্ছি, আমি চিন্ময়রূপে পূর্বেরই মতো তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবো, এবং দৃঢ়তম প্রত্যয় ও বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করছি।

আকাশ আজ নির্মল, ঘন নীল (পীকক্ ব্লু) এবং গাছে গাছে মর্মরধ্বনি। আমাদের আদর-সোহাগের মিষ্টি মিষ্টি কথা বাচ্চা দুটোকে শিখিয়ো, তারা যেন

পরমেশ্বরের এ-প্রতীকগুলো বুঝতে পারে এবং তাদেরও গভীরে যে-প্রতীকগুলো আছে, সেগুলোও চিনতে শেখে।—কৃতজ্ঞতা সহ, কিন্তু গ্রহণ করার সময় যেন থাকে সক্রিয় বীর্যবান সাহস।

আমি তোমাকে বড় ভালোবাসি।

তার পরও অনেক অনেক কিছু বলার রইল। কিন্তু তার জন্য আর সময় নেই।

ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন (আমাদের 'ঈশ্বর রক্ষতু'—অনুবাদক) আমি জানি, তুমি কক্ষনো পরাজয় স্বীকার করবে না। আম জানি, তুমি জীবন-সংগ্রামে ক্রমাগত এগিয়ে যাবে, এবং যদিও সে-সংগ্রামে তোমার মনে হয় তুমি একা, তবু জেনো, আমার অদেহী স্বরূপ অহরহ তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। আমি প্রার্থনা করছি, তুমি যেন শক্তিলাভ করো, তুমিও আমার জন্য সেই প্রার্থনা করো। এই শেষের ক'দিনে পুরগাতোরিয়ো এবং মেরি স্টুয়ার্ট পড়বার সুযোগ আমার হয়েছিল।...এ-ছাড়া পড়বার মতো এ ধরনের বিশেষ কিছু আমার ছিল না—কিন্তু মনের ভিতর অনেক-কিছু উল্টে-পাল্টে দেখেছি এবং শান্তচিত্তে সেগুলো পরিষ্কার করে বুঝে নিয়েছি। তাই বলছি, আমার জন্য অত্যধিক শোক করো না—কারণ তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারবে, সব কিছুই অত্যন্ত সরল, পরিষ্কার, যদিও সেগুলো গভীর বেদনাদায়ক।

আমার জানতে বড় ইচ্ছে করে, এই যা সব ঘটলো, তার ফলে তোমাদের জীবনযাত্রায় কোনো পরিবর্তন হল কি না? তুমি কি রাইনবেক্ যাবে, না যেখানে আছ, সেখানেই থাকবে? অবশ্যই তাঁরা সকলে তোমাকে অত্যন্ত আদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন—আমার প্রিয়া, ছোট্ট বউটি আমার! আমার পূর্বের পত্রগুলোতে তোমাকে বলেছিলুম আমার যে বহু বন্ধুবান্ধব আছেন তাঁদের শুভেচ্ছা জানাতে—এটা আমার অন্তরতম কামনা। তুমি ওদের সকলের সঙ্গে সুপরিচিত; তাই আমার সাহায্য ছাড়াও তুমি আমার শুভেচ্ছা ঠিকমতো তাঁদের জানাতে পারবে।

আমি সর্ব হৃদয় দিয়ে তোমাকে আলিঙ্গন করছি, অনুভব করছি তুমি আমার সঙ্গে আছ।

ভগবান তোমাকে ও বাচ্চাদের আশীর্বাদ করুন।

তোমার প্রতি অবিচল প্রেমনিষ্ঠ,

—আডাম

এ চিঠি দুটি অন্যান্য চিঠির তুলনায় অসাধারণ বলে নাও মনে হতে পারে।

কিন্তু আডাম ছিলেন অতিশয় অসাধারণ পুরুষ। অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন তিনি ছেলেবেলা থেকেই এবং হিটলার তাঁর অভিযান আরম্ভ করার সময় থেকেই তিনি বুঝে যান, এই সব নীতি-বিবর্জিত অখ্রীষ্টান আন্দোলন জর্মনি তথা তাবৎ ইয়োরোপকে মহতী বিনষ্টির পথে নিয়ে যাবে। আপন দেশে লেখাপড়া করার পর তিনি অক্সফোর্ডে রোড্‌স্ স্কলাররূপে বেলিয়েল কলেজে খ্যাতিলাভ করেন। খোলাদিল সাদা মনের মানুষ ছিলেন বলে সে-সময় তিনি একাধিক ভারতীয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেন। যুদ্ধের পর যখন তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখা হচ্ছিল তখন তাঁর অক্সফোর্ডের বন্ধু শ্রীযুত হুমায়ুন কবীরকেও মাল-মসলা দিয়ে সাহায্য করতে অনুরোধ করা হয়।

হিটলারকে সরাবার জন্য গ্রাফ ফন্ স্টাউনফেনবের্গ তাঁর পায়ের কাছে, টেবিলের তলায়, পোর্টফোলিওর ভিতর একটি মারাত্মক টাইম বম্ রেখে বাইরে চলে যান। কিন্তু কিম্বৎ হিটলারকে বাঁচিয়ে দিল। যদ্যপি সেই কনফারেন্স-রুমের একাধিক লোক সঙ্গে সঙ্গে নিহত হন, হিটলারের বিশেষ কিছুই হল না।

ক্রোধোন্মত্ত হিটলার এই চক্রান্তকারীদের উপর দাদ নেবার জন্য দোষী নির্দোষী প্রায় পাঁচ হাজার জনকে ফাঁসি দেন। আডাম ছিলেন স্টাউফেনবের্গের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং তাঁকে এই কর্মে সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছিলেন। তাঁরও ফাঁসি হয়।

অসাধারণ দৃঢ়-চরিত্র ধরতেন বলেই আডাম তাঁর মা বউকে শেষ চিঠি লেখার সময় সজ্ঞানে যতখানি পারেন অনুভূতি চেপে রেখেছিলেন—পাছে ওঁদের মনে আরো না লাগে। অথচ তিনি লিখতে পারতেন বড় সুন্দর মরমিয়া জর্মন।

ঐ সময়ের অল্প পূর্বে একদল ছাত্র ম্যুনিকে প্রথমত গোপনে, পরে অর্ধপ্রকাশ্যে হিটলারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালায়। তারই একজন ধরা পড়ে ফাঁসি যাওয়ার পূর্বে তার মাকে লেখে—

'মা মণি,

তুমি আমাকে জন্ম দিয়েছিলে, আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি যখন আদ্যন্ত চিন্তা করে দেখি তখন মনে হয় আমার সমস্ত জীবন একই রাস্তা ধরে চলেছিল যার অন্তে আছেন—স্বয়ং ভগবান। এখন কিন্তু শোক করো না, যে, রাস্তার শেষাংশটুকু আমাকে এক লম্ফে পেরুতে হল। শিগ্‌গিরই আমি এ জীবনে তোমার যত না কাছে ছিলুম, তার চেয়ে অনেক বেশী কাছে চলে আসব।

ইতিমধ্যে তোমাদের সকলের জন্য একটি রাজকীয় অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করছি!'

মৃত্যুর প্রাক্কালেও এ-রকম চিঠি! এতখানি রসবোধ! ফাঁসিতে 'লম্ফ' দিতে হয় বই কি, আর স্বর্গপুরীতে মায়ের জন্য রাজসিক অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করবে সে।

॥ ১০ ॥

শিশুকন্যাকে লেখা মায়ের চিঠি।

রোজে (গোলাপ) শ্লোএজিন্‌গারের জন্ম ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। নাৎসীবিরোধী আন্দোলন চালানোর সময় ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ তিনি বন্দী হন এবং ৫ই আগস্ট ১৯৪৩-এ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁর স্বামী বোডো শ্লোএজিন্‌গার ছিলেন জর্মন মিলিটারি পুলিসে দোভাষী। তাঁর স্ত্রীর প্রাণদণ্ড হয়েছে, এ খবর পেয়ে তিনি পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করেন।

"আমার সোহাগের ক্ষুদে, দড়[১] মারিয়াননে

অনুমান করতে পারছি নে তুমি কবে এ চিঠি পড়তে পারবে। তাই এটি তোমার ঠাকুরমা বা বাবার কাছে রেখে যাচ্ছি, যাতে করে তুমি বড় হয়ে এটি পড়তে পারো। এখন তোমার কাছ থেকে আমাকে বিদায় নিতে হবে, কারণ খুব সম্ভব আমরা একে-অন্যকে আর দেখতে পাবো না।

তা সে যাই হোক না কেন, তুমি যেন স্বাস্থ্যবতী, সুখী এবং সবলা হয়ে বড় হয়ে ওঠো। আমি আশা করছি, পৃথিবী তার যে-সব সুন্দরতম জিনিস দিতে পারে সেগুলো তুমি উপভোগ করবে—আমি যে রকম উপভোগ করেছি—এবং তোমাকে যেন সে-সব দুঃখ-বেদনার ভিতর দিয়ে না যেতে হয়—যেগুলোর ভিতর দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা: তোমাকে কর্মদক্ষ ও অধ্যবসায়ী হতে হবে। এ দু'টি থাকলে বাকী সব আনন্দ-সুখ আপনার থেকেই আসে।

১ মূলে আছে ক্লাইন গ্রোস (ইংরিজীতে হবে লিট্‌ল্ বিগ) স্পষ্টত পরস্পর-বিরোধী। তবে জর্মনরা আদর করার সময় অনেক ক্ষেত্রে এরকমধারা বলে। কিংবা হয়তো মেয়েটি বয়সে শিশু হলেও গঠনে দার্ঢ্য ধরতো, যার থেকে মা অনুমান করে যে, কালে সে তন্বঙ্গী না হয়ে পূর্ণাঙ্গী হবে।

তোমার স্নেহ-ভালোবাসা মুক্ত হস্তে বিলিয়ে দিয়ো না। এ সংসারে তোমার বাবার মতো কম লোকই আছে যারা তাঁর মতো সৎ এবং প্রেমে নির্মল। তাই সমস্ত প্রেম উজাড় করে দেবার আগে একটু ধৈর্য ধরতে শেখো। তা হলে প্রেমে ধোঁকা খাওয়ার যন্ত্রণা থেকে তুমি বেঁচে যাবে। কিন্তু এমন একজন যেদিন আসবে, যে তোমাকে এতই গভীর ভালোবাসে যে, তোমার সর্ব যন্ত্রণা সেও সঙ্গে সঙ্গে সইবে—এবং যার জন্য তুমিও সইতে প্রস্তুত—এ-রকম পুরুষকে তুমি তোমার প্রেম নিবেদন করতে পারো। আমি প্রত্যয় দিচ্ছি, তাকে পেয়ে তার সঙ্গে যে আনন্দ তৃপ্তি তুমি উপভোগ করবে তার থেকে তুমি বুঝতে পারবে, তার প্রতীক্ষায় তুমি যে ধৈর্য ধরেছিলে, সেটা নিষ্ফল হয়নি।

তোমার জন্যে আমি বহু বৎসরের আনন্দ প্রার্থনা করছি ; আমার কপাল মন্দ, আমি পেয়েছি অল্প কয়েক বৎসরই। এবং তোমাকে সন্তানের জন্ম দিয়ে মা হতে হবে : যখন তোমার নবজাত শিশুটিকে তোমার বুকের ওপর রাখবে তখন হয়ত আমার কথা তোমার স্মরণে আসবে। তোমাকে যখন আমি প্রথম বারের মতো দু' বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলুম সেটি আমার জীবনের চরম মুহূর্ত—তুমি তখন মাত্র একটি গোলাপী পুঁটুলি।

তার পরে স্মরণে আন, আমরা রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে জীবনের কত না গভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি—আমি চেষ্টা করছিলুম তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে। আবার স্মরণে আন, আমরা যে সমুদ্রপারে তিন হপ্তা কাটিয়েছিলুম—তিন মধুর সপ্তাহ। সেখানকার সূর্যোদয় এবং তোমাতে আমাতে খালি পায়ে বেলাভূমি বেয়ে বেয়ে বানসিন থেকে উকেরিৎস্ গিয়েছিলুম ; তারপর জলে রবারের দোলনাতে তোমাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিলুম ; তারপর আমরা দুজনাতে এক সঙ্গে বই পড়তুম। বাছা, তোমাতে আমাতে কতই না সৌন্দর্য উপভোগ করেছি এবং এগুলো তোমাকে নতুন করে উপভোগ করতে হবে, এবং তারও বাড়া অনেক কিছু বেশী।

হ্যাঁ, তোমাকে আরও একটি কথা বলতে চাই, মৃত্যুবরণ করার সময় আমাদের মনে বড় বেদনা লাগে যে আমাদের প্রিয়জনকে অনেক অপ্রিয় কথা বলেছি ; আমরা যদি দীর্ঘতর দিন বেঁচে থাকতে পারতুম তা হলে আমরা সেটা স্মরণে এনে নিজেদের অনেক বেশী সংযত করতে পারতুম। হয়ত আমার এ কথাটি তুমি স্মরণে রাখবে তাতে করে তোমার জীবন—এবং সর্বশেষে তোমার মৃত্যু—তুমি নিজের জন্যে এবং অন্যদের জন্যেও সহজতর করে তুলতে পারবে।

এবং যতবার পার সুখী হও আনন্দে থাক—প্রত্যেকটি দিন মহামূল্যবান!

যে প্রতিটি মুহূর্ত আমরা [redacted] কাটাই তার জন্য হাহাকার!

আমার স্নেহ তোমার সমস্ত জীবনভর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে—আমি তোমাকে চুমু খাচ্ছি—এবং যারা সব্বাই তোমাকে ভালোবাসে। বিদায়! বিদায়!! ও আমার সোহাগের ধন—জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমারই কথা আমার গভীরতম স্নেহের সঙ্গে হৃদয়ে রেখে,

তোমার মা

॥ ১১ ॥

য়োরমা হাইসকানেন, ফিন্‌ল্যাণ্ড

জন্ম: ৩১ জুলাই ১৯১৪

মৃত্যু: জুন ১৯৪১

সোভিয়েৎ-ফিন্ সংগ্রামে সীমান্তে নিহত সৈনিকের রোজ-নামচা থেকে উদ্ধৃত।

ডিসেম্বর ১৯৩৯ (ফিনিশ সীমান্তে) যুদ্ধের প্রথম দিনই আমি সুভিলাহতির গির্জা-চুড়োয় উঠলুম; সেখান থেকে আবার পর্যবেক্ষণ করবো সীমান্তে যেখানে সংগ্রাম চলচে…এখান থেকে স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে গোলাগুলির শব্দ; অকস্মাৎ একটা চিন্তা আমাকে যেন ঝাঁকুনি দিল: ঐ যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে সেখানে যে-কোনো মুহূর্তে আমাদেরই একজন নিহত হতে পারে। তখন লক্ষ্য করলুম গির্জা-চুড়োতে আমি একা নই।

প্রতিরক্ষার জন্য রাখা একটা বালুর বস্তায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি নাবালক বাচ্চা—বয়স এই এগারো-বারো। পরনে চামড়ার কোট, হাতে একটা দুরবীন। ঐটে দিয়ে সে দক্ষিণ পানে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল—সেখান থেকে যুদ্ধের ক্ষীণ কোলাহল-ধ্বনি আসছিল। আমি তো অবাক—এ রকম অকুস্থলে তো ওর মতো ছোট্ট একটা বাচ্চার থাকার কথা নয়। বনের গাছগুলো ছাড়িয়ে উর্ধ্বে উঠেছে এই গির্জা-চুড়ো; যে-কোনো মুহূর্তে শত্রুপক্ষের কামানের গোলা এটাকে হানতে পারে।

'এখানে তুমি কি করচো?'

বড় সুন্দর তাজা গলায় উত্তর এল: 'কেন? আমাকে তো জঙ্গী হাওয়াই জাহাজের গতিবিধি পাহারা দেবার জন্য এখানে পাঠানো হয়েছে।'

'তোমার বাড়ি কোথায় ?'

শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, 'হাউটাভারা-য়।'

আমি তাড়াতাড়ি শুধোলুম, 'তোমার বাপ মা··· ?'

অতি স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিল, যেন এ নিয়ে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না —'বাড়িতে বই কি !'

বাচ্চাটি আমার দিকে লুকিয়ে লুকিয়ে তাকালে—দূরবীন দিয়ে তদারকী কর্ম সে তখনকার মতো ক্ষান্ত দিয়েছে।

আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। আমি আর কোনো প্রশ্ন শুধোতে পারছি নে। বাচ্চাটি কি জানে তার বসতগ্রাম হাউটাভারা শব্দার্থে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে ? ঐ তো সীমান্তের শেষ গ্রাম। এটাতে কোনো সেনা-সেনানী নেই। কিন্তু ওরই উপর সকাল থেকে শত্রুপক্ষ সব কামান এক জোট করে গোলা হেনেছে। এ-গ্রাম তো সম্পূর্ণ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সেখানেই তো তার বাড়ি—সে বাড়ি কি আর আছে ? তার বাপ-মা পরিবারের আর পাঁচজন ? তাদের সঙ্গে এর কি আর কখনো দেখা হবে ?

কিন্তু সে কি জানে এ সব ? না, না, আমি এ-প্রশ্ন ওকে শুধোতে পারবো না।

ইতিমধ্যে যুদ্ধের আগুন আরো জোরে জলে উঠেছে।

'তুই কি এখানেই থাকবি না অন্য কোথাও যেতে চাস ?'

'কেন ? এখানেই তো আমার থাকবার কথা—নয় কি ? তবে আমাকে দিয়ে আর কোনো দরকার নেই ?' (অর্থাৎ সে চলে যেতে চায়নি—অনুবাদক)

বহুকাল ধরে তার এই শেষ কথাগুলো আমার কানে বেজে যেতে লাগলো— বহুকাল ধরে, তার কাছ থেকে, সেখানে থেকে বিদায় নেবার পরও।

জানেন শুধু ভগবান, এই পিতৃমাতৃহীন গৃহহীন শিশু যুদ্ধের তাড়নায় কোথায় ঘুরে মরেছিল—ফিনল্যাণ্ডের ডিসেম্বরের দারুণ শীতে—প্রভুই জানেন, সে অন্তত আশ্রয়টুকু পেয়েছিল কি না।

জেল থেকে বোনেদের প্রতি লেখা বোনের শেষ পত্র—কবিতায়।

···আটদিন ধরে আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ
আমার এ অবস্থা কি কখনো ভুলতে পারবো ?

শেকলগুলো আমাকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিচ্ছে।

আমাকে নির্জন কারাগারে দণ্ডিত করা হয়েছে। হে প্রভু, তুমি আমাকে ত্যাগ করছো কেন ?…(খ্রীষ্ট নাকি ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় এই হাহাকারই করেছিলেন —অনুবাদক)

আমার বোনেরা—মিমি, মিনা—তোমরা কি এখনো তোমাদের বোন লোরেনস্‌কে স্মরণে আনো,

সে তোমাদের ভালোবাসে।

দুঃখবেদনা আমাদের সম্মিলিত করে একই পথে চালাবে,

এই তো ছিল আমাদের শপথ এবং একই অনুভূতি আমরা ভাগাভাগি করে নেব।

আমাকে তারা শিকল দিয়ে বেঁধেছে, কিন্তু আমার হৃদয়টাকে নয়।

আমি আশা রাখি, আমি বিশ্বাস রাখি, আলোকে আলোকে আলোকিত সূর্যরশ্মিময় ভবিষ্যৎ।

কাল যদি আমার মৃত্যু হয় !

তবে কীই বা হবে ?

শুধু আমি মুক্তি পাবো আমার পায়ের শৃঙ্খল থেকে !

এই মেয়েটির নাম লোরেনস্‌—বোনেদের নাম মিমি মিনা। কিন্তু পারিবারিক নাম চিঠিতে নেই বলে এঁদের কাউকেই সনাক্ত করা যায়নি। যেটুকু জানা গিয়েছে তা এই :

ফ্রান্স জয় করার পর জর্মনি তার বৃহদংশে আপন রাজত্ব চালায়। তখন সে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যে আণ্ডারগ্রাউণ্ড সংগ্রাম চলে মাদমোয়াজেল লোরেনস্‌ তারই একজন।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অবশ্য মৃত্যু আসন্ন জেনে এই তার শেষ পত্র।

॥ ১২ ॥

রণদামামা বাজিয়ে সগর্বে যখন ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করলেন তখন তিনি বার্লিনের প্রধানতম রাজপথের দিকে তাকিয়ে ক্ষুব্ধ ও নিরাশ হলেন। তাঁর মনে পড়ল ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-সূচনার কথা। তখন কী

উৎসাহ-উত্তেজনার সঙ্গে কাইজারের সেই 'যুদ্ধং দেহি' আহ্বানে জর্মনির জনগণ সাড়া দিয়েছিল।[১] তারা যে এবারে—তাঁর এবং গ্যোবেল্‌স-এর কর্ণপটহবিদারক শত প্রোপাগাণ্ডা সত্ত্বেও—এরকম জড়ভরতের মতো চোখেমুখে নির্বিকার ঔদাসীন্য মেখে পোলাণ্ডগামী যুযুধানদের দিকে শুধুমাত্র তাকিয়েই থাকবে—ঘন ঘন সাধুবাদ, করতালি, স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম-সঙ্গীত, প্রজ্বলিত মশালসহ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে 'কদম কদম বাড়িয়ে' তাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানানো, সৈন্যদের ধরে ধরে পথমধ্যে তরুণী যুবতীদের যদৃচ্ছা চুম্বনালিঙ্গন—কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, সব ঝুট সব ঝুট—; হিটলার ও ইয়ার গ্যোবেল্‌স তো রীতিমতো মুষড়ে পড়েছিলেন।

আসলে জনগণ সংগ্রাম চায়নি; তারা চেয়েছিল শান্তি। বিশেষ করে হিটলার তাঁর বুদ্ধিমত্তা, কর্মদক্ষতা, দূরদৃষ্টি-প্রসাদাৎ, বছর তিনেক পূর্বে দেশকে যে আর্থিক সাচ্ছল্য এনে দিয়েছিলেন তারা চেয়েছিল নির্বিঘ্নে শান্তিতে সেটি দীর্ঘকালব্যাপী উপভোগ করতে। আর ভবিষ্যতে সুখভোগের জন্য হিটলার যে সব গণ্ডায় গণ্ডায় অঙ্গীকার করে বসে আছেন, সেগুলোর তো কথাই নেই। তার অন্যতম: বছর তিনেকের মধ্যেই তিনি জর্মনির চাষী মজুর প্রত্যেক পরিবারকে এক-একখানি সরেস 'ফল্কস্‌ভাগেন' (Volkswagen = folk-car = জনগণরথ) দেবেন—বস্তুত তখন থেকেই অনেকে আগাম কিস্তি-আমানত দিতে শুরু করেছে। মোটরগাড়ি তা হলে শিকেয় উঠলো!

বললে প্রত্যয় যাবে না, সুশীল পাঠক, এই যে জর্মনির প্রাশান অফিসার-গোষ্ঠীকে বহু বহু যুগ ধরে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রণবিশারদ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, তাদেরও অধিকাংশই এ সংগ্রাম চাননি। এঁদের একাধিক জন সংগ্রাম আসন্ন জেনে, এরই এক বৎসর পূর্বে, হিটলারের সম্মুখে তীব্র প্রতিবাদ তুলে নিরাশ হয়ে আপন আপন পদে ইস্তফা দেন। আর অর্থনৈতিকদের তো কথাই নেই। শাখ্‌ট্‌-এর মতো 'অর্থনৈতিক জাদুকর'ও যখন দেখলেন হিটলার তাঁর সাবধান-বাণী শুনলেন না তখন তিনিও অবসর গ্রহণ করলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল হিটলার ক্ষুদ্র রাজ্য পোলাণ্ডকে আক্রমণ করে যদি আশা করেন যুদ্ধ সেই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকবে তবে সেটা মারাত্মক ভ্রমাত্মক দুরাশা। সেই খণ্ড-যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত

১ হিটলার স্বয়ং সেই জনতায় ছিলেন। অধুনা এই মহানগরীতে প্রদর্শিত একটি 'হিটলার-ছবি'তে সেটি দেখানো হয়েছে। আসলে যে ফোটো থেকে এ অংশ তোলা হয়েছে সেটি পাঠক পাবেন, ফটোগ্রাফার হফমান রচিত 'হিটলার উয়োজ মাই ফ্রেণ্ড' পুস্তকে।

হবেই হবে। এবং সেই সুদূরপ্রসারী দীর্ঘকালব্যাপী বিশ্বসংগ্রাম চালাবার মতো কাঁচা মাল-মেটিরিয়েল জর্মনির নেই। (এবং শেষটায় প্রধানত এই কারণেই হিটলারের পতন হয়, এবং তিনি ক্রোধোন্মত্ত স্যামসনের ন্যায় সমস্ত 'গাজা'—এস্থলে তাবৎ ইয়োরোপ—তাঁর বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে রসাতলে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।)

শুনেছি, যেখানে হোক, যে-কোনো প্রকারেই হোক একটা লড়াই বাধিয়ে দেবার জন্য হামেহাল তেরিয়া হয়ে থাকে একটি গোদা দল—অস্ত্রশস্ত্র-নির্মাণকারী বিরাট বিরাট কারখানার মালিকগণ। শুনেছি এরা নাকি গ্যাটের কড়ি খরচা করে অনুন্নত দেশে সিভিল উয়োর লাগিয়ে দিয়ে পরে হরষিত হৃদয়ে উভয় পক্ষ-কেই বন্দুক কামান বোমা বিক্রি করে খরচার হাজার গুণ মুনাফা তুলে নেয়। (শকুনির যদি এ প্রকারের 'সুবুদ্ধি' থাকতো তবে সে নিশ্চয়ই গো-কুলে মড়ক লাগাত।)

এ স্থলে কিন্তু শুনেছি, সমরাস্ত্র-নির্মাণকারী জর্মনরাও হিটলারের যুদ্ধ কামনা করেননি। এঁদের অধিকাংশই জানতেন, এ যুদ্ধে জয়াশা নেই। ফলে মুনাফা তো যাবেই যাবে, তদুপরি শত্রুপক্ষ দেশ দখল করে এস্তেক কারখানাগুলোর সমূচা যন্ত্রপাতি—লক্ স্টক্ ব্যারেল—আপন আপন দেশে চালান দেবে।

তাঁরা অবশ্য তখন জানতেন না, ধন তো যাবেই, প্রাণ নিয়েও টানাটানি লাগবে।

এবং তাও হয়েছিল—ইতিপূর্বে যা কখনো হয়নি—যুদ্ধ শেষে মিত্রপক্ষ এইসব ডাঙর ডাঙর অস্ত্রপতিদের বিরুদ্ধে জোর মকদ্দমা চালায়; রিবেনট্রপ, কাইটেল ইত্যাদিকে ফাঁসি দেবার পর। জেল তো এঁদের অনেকেরই হয়েছিল—ফাঁসি হয়েছিল কি না, আমার মনে নেই। (অবশ্য শুনেছি, এখন ফের তাঁরা, অথবা তাঁদের বংশধররা—বন্দুক কামান তৈরি করে খনে বেচেন মিশরকে খনে ইজরাএলকে!)

এবং পাঠক আরও প্রত্যয় যাবেন না, হিটলারের আপন খাস চেলা-চামুণ্ডা-দের অনেকেই এ-যুদ্ধ চাননি!—মায় তাঁর দু'নম্বরী ইয়ার বিমান-বহরাধিপতি গ্যোরিং। এঁরা মোকা পেয়ে কলাকৌশলে তখন এতই ধনদৌলত জমিয়েছেন যে বার্লিনের কুট্টি সম্প্রদায় এঁদের চপ-বেচপের চাউস চাউস মেরৎসেডেজ মোটর দেখতে পেলে কখনো চেঁচিয়ে, কখনো আপসে মৃদুস্বরে বলতো 'মহারাট্শা!'—মহারাজা শব্দের জর্মন উচ্চারণ। গ্যোবেল্স তো একবার উচ্চ কণ্ঠেই বললেন, 'এদের যদি এখন "জ্যুস্ প্রিমে নক্টিস্" দেওয়া হয় তবেই এরা সর্বার্থে মধ্যযুগের

। ১৩ ।

ব্যক্তিগত কথা বলতে আমার বাধে। কিন্তু প্রাগুক্ত মহিলা তাঁর শোক সংবরণ করে তাঁর সম-দুখে-দুখী হৃদয়ের প্রকাশ দেওয়াতে আমিও কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করে আপন অভিজ্ঞতা নিবেদন করি।

আমি বার্লিন যাই ১৯২৯-এ। হিটলার তখন ম্যুনিকের স্থানীয় উষ্ণমস্তিষ্ক রাজনৈতিক পাণ্ডা মাত্র। ১৯৩০-এ আমি রাইনল্যাণ্ডের বন বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসি। সেখানে হিটলারের কোনো প্রতিপত্তি ছিল না বললেই চলে।

বন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার গভীর অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব হয় আমার এক সতীর্থ পাউল (Paul) হরস্টারের সঙ্গে। সে পড়তো আইন শাস্ত্র এবং সঙ্গে সঙ্গে তুর্কী ও আরবী—ইচ্ছা ছিল ডক্টরেট নেবার পর ফরেন আপিসে ঢুকবে। আমারও অপ্-শনাল ছিল আরবী। সেই সূত্রে উভয়ের পরিচয় ও অত্যল্পকালের মধ্যেই গভীর সখ্য…। পাউলের বাপ-মা বাস করতেন নিকটবর্তী ড্যুস্‌ল্‌ডর্ফ শহরে। এক উইক-এণ্ডে সে আমায় নিয়ে গেল তাদের বাড়িতে। মা কখনো ইণ্ডিয়ান দেখেন নি। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মন স্থির করতে পারছেন না, আমার জন্য কোন্ কোন্ বস্তু রান্না করবেন। আমরা সবাই রান্নাঘরে বসে—কোন্ একটা কথাচ্ছলে পাউল বললে যে আমার মা সুদূর ভারতে প্রতিদিন আমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করছে। শোনা মাত্র পাউলের মা তাঁর দু'হাত দিয়ে চোখ মুখ ঢেকে দ্রুতপদে চলে গেলেন পাশের ঘরে।

অনেকক্ষণ পর ফিরে এসে ফের রান্নায় মন দিলেন।

সন্ধ্যেবেলা ড্রইংরুমে কফি আর গৃহনির্মিত অতুলনীয় ক্রীমবান্ (পাটিসাপটার অতি দূর সম্পর্কের ভাই) খাচ্ছি এমন সময় একটি অতিশয় সুপুরুষ যুবক এসে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে একটি সুন্দরী। কিন্তু এ-যুবক যত্রতত্র সর্বত্র যে রকম পুরুষ-নারী উভয়ের বিমোহিত দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, সঙ্গের যুবতীটি ততখানি না। পর-স্পরের পরিচয়াদির লৌকিকতা অবহেলে, সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সোজাসুজি আমার কাছে এসে হ্যাণ্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে বললে, 'আমি আপনাকে চিনি; পাউলের বন্ধু। আর আমি ঐ রাসকেলটার দাদা কার্ল। এবং এই রমণীটি আমার শিরঃপীড়া, অর্থাৎ আমার ভামিনী।'

আমি ঘন ঘন হাত ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললুম, 'আমার কাছে শিরঃপীড়ার

অত্যুত্তম ভারতীয় হেকিমী দাওয়াই আছে। দেব আপনাকে? কিন্তু ডাক্তারের ফীজ দিতে হবে। শিরঃপীড়াটি দূরীভূত হলে সেটি—অপরাধ নেবেন না, স্যর—সেটি কি আমি পেতে পারি?'

কার্ল তো তার পাঁজরের দু-পাশ দু-হাত দিয়ে চেপে ধরে, কোমরে দু'ভাঁজ হয়ে দুলে দুলে গমগম করে হাসে আর বার বার বললে, 'আমার তো ধারণা ছিল, পুরবীয়ারা (প্রাচ্য দেশীরা) রসিকতা করতে জানে না। সর্বক্ষণ মোক্ষ, নির্বাণ, স্যাল্‌ভেশনের চিন্তায় মশগুল!—তা, ব্রাদার, কিছু মনে করো না। আমার 'শিরঃপীড়া'র একটি কনিষ্ঠা ভগিনী আছেন—এক্কেবারে কামানের গোলা। গেল বছরে মিস্ রাইনল্যাণ্ড হয়েছেন। নেবে সেটি?'

ইতিমধ্যে লক্ষ্য করলুম কার্লের বউ লজ্জায় একেবারে পাকা টমাটো।

ঝপ করে একটা সোফাতে বসে বললে, 'কিন্তু তোমাতে আমাতে আর "আপনি" চলবে না। বুঝলে? তারপর, হ্যাঁ, কি যেন বলতে এসেছিলুম। আজ সন্ধ্যায় আমার ফ্ল্যাটে পার্টি। পাউল তোমাকে নিয়ে আসবে। ঠিক আছে তো!'

আমি বললুম, 'অতি অবশ্যই। প্লেজার অনার! কিন্তু সেই যে আরেকটি শিরঃপীড়ার কথা বলছিলেন, তিনিও আসবেন কি?'

তারপর আর কার্লকে পায় কে? তার হাসি আর কিছুতেই থামতে চায় না।

শেষটায় কার্ল তার বউকে আমার পাশে বসিয়ে দিয়ে বললে, 'মায়ের সঙ্গে দুটি কথা কয়ে নি।' তারপর বউকে ফিসফিস করে শুধোলে, 'ওকে তো ডাকা হয়নি। লাস্ট মোমেণ্টে আসতে পারবে কি? তুমি দেখো তো।'

উত্তরের প্রতীক্ষা না করে সোজা গিয়ে মায়ের কোলে দুম্ করে বসে পড়ল—ট্যারচা হয়ে। বাঁ হাত দিয়ে মায়ের বাঁ বাহু চেপে ধরে, ডান হাত দিয়ে মায়ের ঘাড় পেঁচিয়ে নিয়ে মায়ের গালে ঘন ঘন চুম্বন।

স্পষ্ট শুনতে পেলুম, মা বলছেন, 'ওরে গরিল্লা, ওঠ, ওঠ, আমার লাগছে!'

আমি জানতুম, তখন সে-ঘরে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় জন আমি—যদ্যপি আমি কোনো পীর প্যাকম্বর্ নই—নিতান্ত বিদেশী এবং তারো বাড়া ভারতীয় বলে। তাই আমি অক্লেশে বুঝতে পারলাম, কার্ল আমাকে ছেড়ে তার মায়ের কাছে চলে গেল কেন। সামান্য ড্রইংরুমে 'কে কার পাশে বসে, তাতে কিবা যায় আসে!' কিন্তু সে তার মা'কে বোঝাতে চেয়েছিল, যে-ই আসুক যে-ই থাক, তার কাছে তার মা-ই সবচেয়ে আকর্ষণীয়।

কার্লের বউ ক্লারা আমাকে বললে, 'আমার বোন নিশ্চয়ই আসবে। তার অন্য

এনগেজমেণ্ট থাক আর না-ই থাক।'

আমি বললুম, 'তার অন্য এনগেজমেণ্ট হয়তো তার লাভার, তার ইয়ংম্যানের সঙ্গে। তাকে নিরাশ করাটা কি উচিত হবে, এই আনন্দের দিনে ? তাকেও ডাকুন না—অবশ্য যদি আপনাদের অন্য কোনো অসুবিধা না থাকে।'

ক্লারা আমার দিকে বিস্মিত নয়নে তাকালে।

আমি বুঝতে পেরেছি।

আমি শান্ত কণ্ঠে বললুম, 'আপনি ঘাবড়াচ্ছেন যে আমাতে আর আপনার বোনের লাভারেতে খুনোখুনি হবে—না ? নিশ্চিন্ত থাকুন, কিচ্ছুটি হবে না। সে কি আপনার বোনকে বিয়ে করার প্রস্তাব পেড়েছিল ?'

'এ যাবৎ করেনি। কেমন যেন গড়িমসি করছে ?'

দৃঢ় কণ্ঠে আমি বললুম, 'আজ রাত্রেই সে প্রস্তাব পাড়বে।'

'? ? ?'

'আমি আপনার বোনের সঙ্গে একটুখানি ভাবসাব করতেই সে রেগে, চটে, হিংসায় জর্জর হয়ে, আমাকে ঢিড দেবার জন্য আজ রাতদুপুরেই সে প্রস্তাব পাড়বে। হল ?'

সে সন্ধ্যায় কার্লের বাড়িতে জব্বর পার্টি হল। আমার তিনটি জিনিস মনে আছে।

কার্ল যখন আমাদের নাচের জন্য পিয়ানো বাজাচ্ছিল তখন আমার নজর গেল তার হাত দু'খানির দিকে। সেই হাতের আঙুলগুলি তন্বঙ্গী দীর্ঘ, অথচ সেগুলির তুলনায় বাকি হাত আরো ছোটো। এতে যেন কোনো প্রোপরশন নেই। কিন্তু কী সুন্দর! এ-রকম হাতের বর্ণনা দেবার শক্তি আমার নেই। বার বার আমার চোখের সামনে ফুটে উঠলো আমার মায়ের হাত দুটি।

গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়েছি।

এমন সময় কে যেন আমার খাটের বাজুতে এসে বসলো। আধো ঘুমে শুধালুম, 'কে ?'

'আমি পাউলের মা। আমি শুধু বলতে এসেছিলুম, এই যে আমার পাউল, সে সপ্তাহের ছ'দিন থাকে বন শহরে, প্রতি শনিবার ছুটে আসে আমার কাছে। আর বন তো এখান থেকে দূরে নয়। ডাকগাড়িতে আধ ঘণ্টার পথ মাত্র। তবু আমি এই ছ'দিন কী ছটফটই না করি।

'আর তোমার মা ? তিনি থাকেন কত সমুদ্রের ওপারে।

'তাঁর দিন কাটে কি করে ?

'তুমি খুব তাড়াতাড়ি পাস দিয়ে বাড়ি চলে যাও।'

তারপর আমার কপালে চুমো দিলেন। আমার মনে হল, এ তো আমারই মায়ের চুমো।

॥ ১৪ ॥

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে অকস্মাৎ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে হিটলারের দল জর্মন পার্লিমেনটে এত অধিক সংখ্যক আসন পেয়ে গেল যে তার গুরুত্ব জর্মনির বাইরে তো বটেই, ভিতরে অল্প লোকই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিল। কম্যুনিস্টরা ঠিক-ঠিকই বুঝেছিলেন কিন্তু স্তালিন তখন আপন ঘর সামলাতে ব্যস্ত এবং বিশ্বভুবনজোড়া প্রলেতারিয়া রাজ্য স্থাপনের সদিচ্ছা তিনি তখন প্রায় ত্যাগ করেছেন। জর্মন কম্যুনিস্টরা বাতুশকা স্তালিনের কাছ থেকে সাহায্য পেল অত্যল্পই।

পাঠক হয়তো আশ্চর্য হবেন যে, আমার সতীর্থ পাউল হর্‌স্টারের অগ্রজ কার্ল কিন্তু ঠিক-ঠিক বুঝে গিয়েছিল, দেয়ালে কি লিখন লেখা হয়ে গেল—

'আকাশে বিদ্যুৎবহ্নি কোন্ অভিশাপ গেল লিখি।'

১৯৩২-এর বড়দিনের পরবে গেলুম ড্যুস্‌ল্‌ডর্ফ।

রান্নাঘরে বসে কার্ল-পাউলের মা'র সঙ্গে রসালাপ করছি।

এমন সময় কার্ল এসে ঘরে ঢুকল। প্রথম মাকে গণ্ডা দুই চুমো খেয়ে আমাকে দিলে গণ্ডা খানেক। কুশলাদির লৌকিকতা বর্জন করে সরাসরি শুধালো—

'হেই, ভাইয়া, জর্মন পলিটিক্স কিছুটা রপ্ত করতে পেরেছিস ?—এক বছর তো হয়ে গেল এই লক্ষ্মীছাড়া দেশে এসেছিস !'

আমি উষ্মা প্রকাশ করে বললুম, 'পফুই (অর্থাৎ ছিঃ !), এমন কথা বলতে নেই। মুখে ঘা ('কুষ্ঠ' ঘা-টা আর বললুম না) হবে। জর্মনি কাণ্ট-গ্যোটে, বেটোফেন-ড্যুরারের দেশ। কিন্তু, বাওয়া, তোমাদের পলিটিক্সের জট ছাড়ানো আমাদের গান্ধীরও কম্ম নয়। হালে একখানা চটি বই কিনেছি। জর্মনির ছাব্বিশ না আঠাশখানা পার্টির (বাপ্‌স !) ঠিকুজি-কুলজি দপে দপে তাতে বয়ান আছে। পড়েছিলুম কবে ! এখনো মাথাটা তাজ্জিম-মাজ্জিম করছে।'

পরম অবহেলা ভরে বললো, 'ছোঃ ! তোদের না থ্রী হান্‌ড্রেড মিলিয়ান গডেসেস্ আছে ! হিসেব রাখিস কি করে ? তোদের আবার 'লাকি' দেশ—কার্ড ইনডেক্‌সিঙের গব্বযন্ত্রনা সেখানে এখনো পৌঁছয়নি। তা সে-সব কথা

যাক্। ইতিমধ্যে তোকে একটি মহামূল্যবান সদুপদেশ দিচ্ছি—তোর সেই রাম-আহাম্মুখীর সাক্ষাৎ ডক্টরেট্-সার্টিফিকেট ঐ পার্টি পঞ্জীটি সিকি দরে বিক্রি করে দে—তোর চেয়েও প্রাইজ-ইম্বেসাইল এ-দেশে রাইন নদের সামোন মাছের মতো আবজাব করছে। নইলে শিকের হাঁড়িতে (ওদের ভাষায় মাটির নিচের সেলারের কয়লা গুদোমে) তুলে রেখে দে। দরকার মাফিক ওরই পাতা ছিঁড়ে ঘরের স্টোভে আগুন ধরাবি। কিন্তু সে-কথাও থাক। আসল তত্ত্ব কথাটা শোন্।'

তারপর সত্যি অত্যন্ত সিরিয়স মুখে বলল—কার্লকে এই প্রথম আমি গম্ভীর হতে দেখলুম—'বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। জানিস, হিটলার রাইখস্টাগে অনেকগুলো সীট পেয়ে গিয়েছে ?'

আমি হেসে উঠলুম। এ-যেন পর্বতের মূষিকপ্রসব!

ইতিমধ্যে পাউল রান্নাঘরে ঢুকে মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিল। লক্ষ্য করলুম, আমার হাসির সঙ্গে হামদরদী দেখিয়ে দোহারের মতো স্মিত হাস্য সে করলো না—যা সে আকছারই করে থাকে। মায়ের মুখে কোনো ভাবের খেলা নেই।

কার্ল কোনো দিকে খেয়াল না করে আমাকে সরাসরি শুধোলে, 'তুই হিটলারের "মাইন কাম্পফ্" (বাঙলাতে মোটামুটি আমার সংগ্রাম) পড়েছিস ?'

আমি হাত জোড় করে বললুম, 'রক্ষে দাও বাবা! ও-বই আদ্যন্ত পড়া আমার কর্ম নয়। একে তো তোমাদের এই জর্মন ভাষাটি এমনই প্যাঁচানো-জড়ানো, ইংরেজিতে যাকে বলে ইন্‌ভল্‌ভ্‌ড, এবং নিদেন বিশ-ত্রিশটি লাইনের ন্যাজ না খেলিয়ে তোমাদের একটা সেন্‌টেন্স সম্পূর্ণ হয় না, তদুপরি তোমাদের ঐ হিটলার বাবু যেন মাথায় গামছা বেঁধে বেল্ট টাইট করে, মোজা উপর বাগে টেনে নিয়ে, গণ্ডারের চর্বির টনিক খেয়ে উঠে পড়ে লেগে গেছেন, সরল জিনিস কি কৌশলে দুরূহ করা যায়—অবশ্য আমার জর্মন জ্ঞান যা, সেটা তো "নাথিং টু রাইট হোম এবাউট"! তবে, হ্যাঁ, বিস্তর হোঁচট খেয়ে চোট-জখম-হজম করে খাবলা মেরে মেরে মোদ্দা কথা কটি ধরে নিয়েছি।'

কার্ল "মাইন কাম্পফ্"-এর ভাষা বাবদ সায় দিয়ে বলল, 'তোর জর্মন ভাষা-জ্ঞানের কথা উঠছে না। ঐ আকাট ব্যাটা হিটলার তো আসলে কথা কয় পশ্চিম-অস্ট্রিয়ার অতিশয় চোতা জর্মন ডাইলেক্টে। তদুপরি তার গায়ে রয়েছে চেক রক্ত, কেউ বা বলে দু-চার ফোঁটা ভ্যাগাবণ্ড জিপসি "নাপাক" খুনও তাতে মেশানো রয়েছে। এ রকম দু'আশলা, সাড়ে তিন আশলা লোক, তদুপরি "উনিশটি বার ম্যাট্রিকে সে ঘায়েল হয়ে থামলো শেষে"—সে আবার লিখবে জর্মন! তা তার

লেখার ধরন যত না মারাত্মক, তার চেয়ে তার প্রোগ্রামটা ঢের ঢের বেশী মারাত্মক। ইহুদি জাতটাকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে, ফ্রান্স দেশটাকে গুঁড়িয়ে দিতে হবে এবং সর্বশেষে রাশার বৃহদংশ দখল করে সেখানকার চাষাভূষোদের রীতি-মতো গোলাম বানিয়ে, যাকে বলে স্লেভ লেবার, জর্মনদের জন্য ফোকটে দেদার দেদার রুটি মাখন আণ্ডা বেকন লুট করতে হবে। সেও না হয় বুঝি, এই বিরাট দুনিয়ায় কত না তরো-বেতরো গুণ্ডা-গ্যাংগস্টার হয়—অতি অবশ্য আমার ধর্ম-বুদ্ধি এতে একদম সায় দেয় না, কিন্তু যে করাল বিভীষিকা আমি চোখের সামনে দেখছি সেটা এই যে, হিটলারের এই শয়তানী স্বপ্ন সফল তো হবেই না, মাঝখান থেকে লক্ষ লক্ষ জর্মন যুদ্ধে মারা যাবে, তাবৎ জর্মন দেশটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে এই যে—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'ব্রাদার কার্ল, এসবের অধিকাংশ ভোট পাবার জন্য পোলিটিক্যাল প্রোপাগ্যাণ্ডা। আমাদের রাজা ইংরেজ বলে, তাদের খেদমৎ করলে খুব শীগগিরই আমরা সবাই রাজা হয়ে যাবো, কংগ্রেস বলে, ইংরেজকে তাড়িয়ে দিলে আমরা রাজা না, মহারাজা হয়ে যাবো। আমি অবশ্য জিনিসটা বড্ড ক্রুড ভাষায় বলছি। কম্যুনিস্টরা বলে—'

হঠাৎ লক্ষ্য করলুম, কার্লের মুখের উপর দিয়ে যেন একটা উড়ো মেঘের ছায়া পড়ে মিলিয়ে গেল। আমি শুধালুম, 'কার্ল, তুমি কি কম্যুনিস্ট?'

'এককালে ছিলুম। বছর দুই হল পার্টি মেম্বারশিপ রিজাইন দিয়েছি। ঐ সময় থেকে চাঁদাও আর দিইনি।'

'কেন?'

'সে কথা আরেক দিন হবে।'

গোটা ১৯৩১টা আসন্ন পরীক্ষা নিয়ে আমি এমনই ব্যস্ত ছিলুম যে, ড্যুস্‌ল্‌-ডর্ফ যেতে পারিনি। এমন কি ১৯৩১-এর বড়দিনটাতেও ফুরসত করে উঠতে পারলুম না।

১৯৩২ পরীক্ষা পাস করে জর্মনি ত্যাগ করার পূর্বে একদিনের তরে ড্যুস্‌ল্‌-ডর্ফ গেলুম হরস্টার পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য। আমার কপাল মন্দ, কার্ল শহরে ছিল না। বড় বিষণ্ণ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে, বন হয়ে ইতালিতে এসে জাহাজ ধরলুম।

১৯৩২ কেটে গেল। পাউলের চিঠিপত্র পাই।

১৯৩৩-এর জানুয়ারি মাসে হিটলার জর্মনির চ্যান্সেলর বা কর্ণধার হলেন।

তার দু'মাস পরে পাউলের একখানা অতি ক্ষুদ্র চিঠি পড়ে আমি স্তম্ভিত। কার্লকে জর্মনির 'গোপন পুলিস' অ্যারেস্ট করে নিয়ে গিয়ে নির্জন কারাবাসে রেখেছে। বেল পাওয়ার কোনোই আশা নেই। তার বিরুদ্ধে গোপন বা প্রকাশ্য কোনো আদালতে যে মকদ্দমা উঠবে তার সম্ভাবনাও অতিশয় ক্ষীণ।

॥ ১৫ ॥

১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফেরার পর ৩৩-এর সম্পূর্ণ বছরটি কাটাই দেশের ছোট শহরে মায়ের সঙ্গে। সুদীর্ঘ, প্রায় তিন বৎসরের পর ফের মায়ের কাছে ফিরে এসেছি। এর পূর্বেও, অর্থাৎ ১৯২১ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত আমি মায়ের কাছে এসেছি পূজো আর গরমের ছুটিতে, মাত্র কয়েকদিনের, কয়েক সপ্তাহের জন্য। আমি পেয়েছি মায়ের সঙ্গ-সুখ, মাও পেয়েছে আমার সঙ্গ-সুখ—ফের আমাকে দেশ ছাড়তে হবে, সেই আসন্ন বিচ্ছেদের তীক্ষ্ণ তলওয়ার সূক্ষ্ম একটি চুলে ঝুলছে অবশ্য অহরহ মায়ের মাথার ওপর। কে বেশী আনন্দ পেয়েছিল সেটির মীমাংসা আমি নিজে করবার হক্ক ধরি নে। আমার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যে-সব মাতা ও সন্তান আছেন তাঁদের হাতেই শেষ রায়ের জিম্মেদারী ছেড়ে দিলুম। আর যে-সব সন্তানের মা তাদের অল্প বয়সে স্বর্গলোকে চলে গেছেন সে-সব দুঃখীদের কথা আমি মোটেই ভাবতে চাই নে।

আমি জানি, আমার যে-সব পাঠিকা মা, তাঁরা আমাকে একটা মূর্খ ধরে নিয়ে (এবং আমি সে 'ধরে-নেওয়াটা'-র বিরুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ আপত্তি মুহূর্তেক তরে তুলবো না, কারণ আমার পিঠপিঠ দাদা এখনো আমাকে নিত্যনিয়ত অকাট্য যুক্তিপ্রমাণসহ 'পদ্মভূষণে'র পরিবর্তে 'গণ্ডমূর্খ' 'অলিম্পিক ইডিয়েট' খেতাব দেয়) বলবেন, 'অতি অবশ্যই মাতা পুত্রের সঙ্গ-সুখ পুত্রের তুলনায় বহু গুণে, বহু উৎকর্ষে, বহুতর আনন্দ-ঘন চরমা তৃপ্তি পরমারাম পায়। শুধু তাই নয়, পুত্রের জন্যও সে সঙ্গে সঙ্গে এক মহামিলনের মহানন্দময় মহোৎসবের সৃষ্টি করে—কারণ মা তার স্বভাবজনিত নিঃস্বার্থপরায়ণতায় চায়, সন্তানও যেন তারই মতো—এমন কি তারও বেশী পরিপূর্ণানন্দ লাভ করে। কিন্তু সন্তান কি সেটা পারে? পুত্র যুবা। সে চায়, মায়ের ভালোবাসার বাইরেও অনেক-কিছু—খ্যাতি, প্রতিপত্তি, অর্থবৈভব; তদুপরি সে কামনা করে অন্য রমণীর যৌবন-মদিরাভরা প্রণয়—এও কি তখন সম্ভবে, যে, সে তখন শিশুকালে যে-রকম একাগ্রচিত্তে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে মাতৃস্তন শোষণ করেছিল আজও সেই রকম তার মাতৃস্নেহসিক্ত সঙ্গসুজাত

আনন্দযজ্ঞ থেকে সেই প্রকারেই একাগ্রচিত্তে বাহ্যজ্ঞানশূন্য প্রতিটি মধুকণার সৌরভঘন আনন্দরস নিঃশেষে শোষণ করবে? সেই শিশু জন্মলাভের পরই মায়ের বামস্তন ওষ্ঠাধর দ্বারা অবিরত নিষ্পিষ্ট করে যেন মাতৃদেহের শেষ রক্তবিন্দু লুণ্ঠন করে নিয়েছে, তার বামহস্ত মাতার দক্ষিণ স্তনের উপর রেখে সেই ক্ষুদ্র হস্তাঙ্গুলির কোমল পরশ ছুঁইয়ে আরো দুগ্ধ আরো অমৃতের আহ্বান জানাচ্ছে।

ইতিমধ্যে মধ্যে মধ্যে তার অতি হ্রস্ব, অতিশয় স্ফীত বাম পদ দিয়ে মাতার দেহে মধুর মধুর পদাঘাত করছে।

সুশীল পাঠক! তুমি হয়তো ভাবছো, আমি যশোদানন্দন শ্রীশ্রীবালকৃষ্ণের কাব্যচ্ছন্দে বাঁধা মাতৃদুগ্ধ পান এতশত যুগ পরে কেন গদ্যময় নিরস ভাষায় পুনরায় পরিবেশন করছি! (কিন্তু আমি জানি, প্রকৃত বৈষ্ণব জন বিশেষ করে আমার মুরব্বী শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ, আমার এ অনধিকার চর্চা অবহেলে এবং সস্নেহে ক্ষমা করবেন।) নিবেদন, আমার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।

এই যে আমি আমার মাকে অনেকখানি হতাশ-নিরাশ করলুম (অবশ্য সব মা-ই সেটা মাফ করে দেয়), তার তুলনায় আমার মা কি করলে?

আমার বয়স যখন চৌত্রিশ তখন আমার মা ১৯৩৮ সালে আমাকে ছেড়ে ওপারে চলে গেল। সেই বিচ্ছেদের পর আমি আরও চৌত্রিশ বৎসর ধরে এ-সংসারে সেই মায়ের বিরহযন্ত্রণা কতখানি নিতে পারি, তারই চেষ্টা করছি।

এইবারে আমি পূর্বোল্লিখিত উদ্দেশ্য খুলে বলছি—

যে-মা আমার ছ' মাস এক বৎসর এবং সর্বাধিক, পৌনে তিন বৎসরের বিচ্ছেদ সইতে পারতো না বলে দিনে দিনে ফরিয়াদ করতো, সে-ই মা-ই আমার জন্য রেখে গেল চৌত্রিশ বৎসরের বিচ্ছেদ-বেদনা।

করজোড়ে স্বীকার করছি আমার মা আমাকে যতখানি ভালোবেসেছিল তার তুলনায় আমার ভালোবাসা নগণ্য। কিন্তু মাকে দিয়েছিলুম মাত্র পৌনে তিন বৎসরের বেদনা। তার বদলে মা আমাকে দিলে চৌত্রিশ বৎসরের বিরহ। আমি কোনো ফরিয়াদ, কোনো নালিশ করছি নে। আল্লা আমার মায়ের পূতাত্মা তাঁর পদপ্রান্তে নিয়ে মাকে তাঁর বহু দুঃখ বহু বিরহযন্ত্রণা থেকে শাশ্বত নিষ্কৃতি দিয়ে তাঁকে সর্বানন্দাতীত চরমানন্দ দিয়েছেন।

স্পর্শকাতরতাহীন পাঠক শুধোবেন, কার্লের কথা কও। তোমার মায়ের কথা এস্থলে টেনে আনছো কেন?

কার্লকে জেলে নিয়ে যায় ১৯৩৩-এর বসন্তে। তারপর এল ইস্টারের পরব।

ঐ সময় আমি পাউলের সঙ্গে প্রতি বছর ড্যুস্‌ল্‌ডর্ফ গিয়ে সপরিবারে কার্ল এবং পাউল পরিবারের সঙ্গে পরব পালন করতুম। ঐ সময়ে প্রভু যীশু ক্রুশবিদ্ধ হন এবং সপ্তাহান্তে তিনি পুনরুত্থান করেন।

১৯৩২-এর এই পরবের সময় আমি দেশে। কার্ল পাউল আমাকে রঙিন কার্ড পাঠায়; সঙ্গে দীর্ঘ আবোল-তাবোল-ভরা নানা প্রকারের কেচ্ছা-কাহিনী।

১৯৩৩, কার্ল জেলে। কিন্তু মানুষ কি অসম্ভবের আশা ত্যাগ করতে পারে? আমার ছিল দুরাশা, হয়তো হিটলার-রাজ এই সময়ে একটা মহানুভব ব্যত্যয় করে কার্লকে চিঠি লিখতে দেবে।

না। এমন কি পাউলও চিঠি লেখেনি। শুধু কার্ল পাউলের পিতা আমাকে একটি পিকচার কার্ড পাঠিয়েছে। তার উপরে বৃদ্ধ পিতার কম্পিত হস্তে, কোনো-গতিকে লেখা আমার প্রতি আশীর্বচন।

ইতিমধ্যে প্রতি সপ্তাহে প্রতি চিঠিতে বার বার পাউলকে শুধোই (তখন অ্যারমেল হয়নি), 'কার্লের খবর কি? কার্লের খবর জানাও।'

পাউল উত্তরে আমার মূল প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। তার বাপ মা, কার্লের বউ বাচ্চা সম্বন্ধে অনেক-কিছু লেখে।

তার পর একটা চিঠিতে লিখলো, 'ড্যুস্‌ল্‌ডর্ফের জেলে সুপারিনটেনডেণ্ট আমাকে এক পাশে টেনে নিয়ে নিভৃতে বলেছে, আমি যেন আমার দাদার অত-খানি তত্ত্বতাবাশ না করি। নইলে আমাকেও তারা জেলে পুরতে বাধ্য হবে। আমি তাকে দেখতে যাচ্ছি।'

তখনো নাৎসি পার্টি পরবর্তী যুগের চরমতম পৈশাচিক বর্বরতায় পৌঁছয়নি। তাই জেলের কর্তা পাউলকে এই সহানুভূতির উপদেশ দিয়েছিল।

এ-চিঠি পেয়ে আমি দুর্ভাবনা দুর্ভাবনায় কাতর হয়ে পড়লুম।

তারপর দু'মাস ধরে, পূর্ণ দু'মাস ধরে পাউল সম্পূর্ণ নীরব। আমার তখন কি অবস্থা সেটা বোঝাই কি প্রকারে?

আমার মা আমার মনমরা ভাব বেশ লক্ষ্য করেছে। একদিন শুধোলে, 'হ্যাঁরে তোর কি হয়েছে! বিদিশি চিঠি পেলেই তুই শুয়ে পড়িস কেন?'

আমি সব কথা খুলে বললুম।

কার্লের মাও মা, আমার মাও মা।

আমার মা বললে, সে কার্লের জন্যে দোওয়া মেঙে তার জন্য নফল নমাজ পড়বে।

ততদিনে বড়দিন এসে গেছে। বড়দিন শেষ হল।

কিন্তু পাউল কিংবা তার বাপ মা কারো কোনো চিঠি নেই।

ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে পাউলের চিঠি এল।

সংক্ষেপে লিখেছে :

'ক্রিসমাসের সন্ধ্যায় দাদা আত্মহত্যা করেছে। কোনো এক সদাশয় জেল-গার্ড দাদাকে এক প্যাকেট সিগারেট দেয়—গোপনে। দেশলাই পুড়িয়ে পুড়িয়ে সিগারেটের খোলে সে লিখে গিয়েছে, "মাকে সান্ত্বনা দিয়ো।" গার্ডটিই আমাকে সেটা পৌঁছিয়ে দেয়।'

চিঠি যখন পড়ছি আমার মা তখন সম্মুখে ছিল। শুধোল, 'হ্যাঁরে কি খবর পেলি? তোর বন্ধু ভালো আছে তো?'

আমি সত্য গোপন করিনি।

মা দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নেমাজের ঘরের দিকে চলে গেল।

॥ ১৬ ॥

কার্ল-এর কথা শেষ হয়েছে। তথাপি বিবেচনা করি কোনো কোনো সহানুভূতি-শীল তথা কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকা জানতে চাইবেন যে কি-সব দুর্দৈব কোন্ সব নিপীড়নের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে একদিন কারাগারের পাষাণপ্রাচীর ভেদ করে কার্লের কাছে দিব্য-জ্যোতি উদ্ভাসিত হল যে এ-জীবন নিরর্থক ; কিংবা হয়তো কোনো কোনো মনস্তত্ত্ববিদ্ বিজ্ঞানসম্মত মীমাংসা প্রকাশ করে বললেন, কার্ল অংশতঃ মতিচ্ছন্ন অবস্থায় স্বেচ্ছায় এ-সংসার থেকে বিদায় নেয়—কার্ল সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় কি কখনো তার সে মায়ের কাছে থেকে চিরবিদায় নিতে পারতো, যে-মাকে সে এতখানি প্রাণঢালা সোহাগ করতো, তার জায়া তার শিশু-কন্যাকে সে প্রাণাধিক ভালোবাসত? কবি বলেছেন—

'কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়?'

এরই কাছাকাছি একটি অনুভূতি প্রকাশ করেছেন, কার্লেরই সমগোত্রীয় হিটলারবিরোধী এক শহীদ। ইনি জর্মনিতে কার্লের মতো অজানা অচেনা জন নন। উলরিব ফন্ হাসেল ছিলেন ইতালিতে জর্মন রাজ্যের মহামান্য রাষ্ট্রদূত। বিদগ্ধ পণ্ডিতরূপে তিনি ইংলণ্ড থেকে বুলগেরিয়া, রুমানিয়া পর্যন্ত সুপরিচিত ছিলেন এবং বহুদেশে বহু পণ্ডিতমণ্ডলীর আমন্ত্রণে বহু জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন। হিটলারের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হওয়া মাত্রই তিনি সেই সম্মানিত রাষ্ট্র-দূতের পদত্যাগ করেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে হিটলারকে নিধন করার যে ষড়যন্ত্র নিষ্ফল

হয় তারই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার দরুন সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। অর্থাৎ কার্লের আত্মহত্যার এগারো বৎসর পর।

ফন্ হাসেল কিন্তু এক হিসাবে কার্লের চেয়ে সৌভাগ্যবান ছিলেন। নির্জন কারাগারে তিনি কাগজ-কলম পেয়েছিলেন বলে তিনি তাঁর 'আত্মচিন্তা'র কিছুটা লিখে যাবার সুযোগ পান।

সেই 'আত্মচিন্তা' পাণ্ডুলিপির মার্জিনে আসন্ন মৃত্যু অনিবার্য জেনে তিনি মাত্র তিনটি ছন্দে গাঁথা ছত্রে মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর আশাভরা অনুভূতি প্রকাশ করেন :

'তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারো মৃত্যুদ্বার দিয়ে
আমরা তখন যেন স্বপ্ন-সম্মোহিত
এবং অকস্মাৎ আমাদের করে দিলে মুক্ত।'[১]

সেই রবীন্দ্রনাথের 'এই দুয়ারটুকু'। এটি 'পার হতে' কার্ল, ফন্ হাসেল কারো কোনো সংশয় ছিল না।

১৯৩৩-এর বড়দিনে কার্ল ওপারে চলে যায়।

১৯৬৪-এর গ্রীষ্মে আমি অপ্রত্যাশিতভাবে ফের জর্মনি যাই।

বন শহরের আমার এক প্রাক্তন অধ্যাপকের সঙ্গে বাস করছি। পাউলকে চিঠি লিখলুম। সে জানালে, ইতিমধ্যে তার মা কার্লের সান্নিধ্যে চলে গিয়েছেন। তার বাপ পেনশন পেয়েছেন। পাউল লিখেছে, 'না পেলেই ভালো হত; বুড়ো একটা কিছু নিয়ে থাকতে পারতো। এখন সে তার জাগ্রতাবস্থার অধিকাংশ সময় কাটায় রান্নাঘরের সেই ভাঙা কৌচটার উপর যেখানে বসে বসে মাকে সঙ্গ দিত; পূর্বেরই মতো—কিন্তু এখন একা একা, এবং প্রায় সমস্ত দিনরাত্রি—আগে অন্ততঃ ন'ঘণ্টাটাক আপিসে কাজকর্ম করতো। আর সমস্তক্ষণ আগেরই মতো সিগার ফোঁকে। তবে, আগে ফুঁকতো তামাম দিনে গোটা ছয় মোলায়েম সিগার; এখন গোটা আঠারো এবং এ-দেশের সবচেয়ে কড়া সিগার। আমি অনুরোধ করাতে মাসি এসেছে। মাসি মায়েরই মতো ভালো রাঁধতে পারে। আগে বাবাই সে-কথা বার বার স্বীকার করেছে। এখন শুধু খুঁত-খুঁত করে।' লক্ষ্য করলুম, পূর্বের প্রথামতো পাউল যথারীতি আমাকে ড্যুসলডর্ফ যাবার নিমন্ত্রণ জানায়নি।

১ অধুনা অনেকেই জর্মন শিখছেন, তাই মূল পাঠ তুলে দিলুম ;—
"Du kannst uns durch des Todes Nueren
Trtaumend fuehren
Und machest uns Uns auf einmal frel."

বেদনা পাওয়ার কথা ছিল ; আমি পেলুম শান্তি স্বস্তি।

পাউল বন-শহরে এসে আমাদের ছাত্রাবস্থার পাব-এ রাঁদেভু স্থির করল।

কুশল আলিঙ্গনাদির পর পূর্বের প্রথামতো সে আধ লিটার বিয়ার অর্ডার দিয়ে গেলাসটার দিকে অনেকক্ষণ ধরে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। শেষটায় একচুমুকে আধ গেলাস শেষ করে বললে, 'কাঁই বা তোকে বলি, যা তুই শুনতে চাস।' কার্ল ধরা পড়ার এক মাস পর এল ঈস্টার পরব। কর্মে তার বিশেষ মতিগতি ছিল না কিন্তু ধর্মের পরব, লৌকিকতা নিয়ে সে হই-হুল্লোড় করতে বড় ভালবাসতো। নানা রঙের কাগজে ডিম মুড়ে সেগুলোকে চিত্র-বিচিত্র করা থেকে শুরু করে, নিতান্ত বাচ্চাদের মতো সেগুলোকে কল্পনাতীত অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় লুকনো, তারপর আমাদের সব্বাইকে নিয়ে বিকট চিৎকার লাফালাফি দাপাদাপি করে সেগুলো খোঁজা, তার বউ যেগুলো লুকিয়েছিল সেগুলো খুঁজে পাওয়াতে রেড্-ইণ্ডিয়ান স্টাইলে তার তাণ্ডব নৃত্য, তার উৎকট উদ্দাম জয়োল্লাস —এসব কথা সে নিশ্চয়ই জেলে বসে বসে ভেবেছিল।

আমার চোখে জল এল। বললুম, 'পাউল, তোর মনে আছে '৩২-এর পরবে কার্ল তোর মারফত আমাকে এক ডজন রঙিন ডিম পাঠিয়েছিল ?'

পাউল মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে বললে, 'তুই তো সর্ব ধর্ম নিয়ে নাড়াচাড়া করিস তোর অজানা নয়, অনেক ক্যাথলিক ঈস্টারকে বড়দিনের চেয়ে বেশী সম্মান দেয়। ঐ সময় প্রভু যীশু মৃত্যুবরণ করার সময়েও তাঁর নিপীড়নকারীদের ক্ষমা করে যান। এই ঈস্টার সপ্তাহটি ক্ষমা, দয়া, মৈত্রীর সপ্তাহ। আমার সর্ব নৈরাশ্য তখন দুরাশা দিয়ে চেপে ধরে ঈস্টার ফ্রাইডে থেকে ঈস্টার মানডে অবধি চার দিন রোজ গিয়েছি জেলখানায়, যদি এই ক্ষমাদয়ার সপ্তাহে ওরা একটু নরম হয়। মাকে না জানিয়ে।' পাউল থামলো।

আমি বললুম, 'বুঝেছি, তুই বলে যা। আমি দেশে থাকতে সব শুনতে চেয়েছিলুম। এখন আর না। তুই সংক্ষেপে সার।'

পাউল বললে, 'তার দু'মাস পরে এল তার মেয়ের নামকরণ দিবস।[১]

কার্ল ঐদিনই করতো তার বাড়ির সবচেয়ে জব্বর পরব। মেয়েকে সাজাতো

১ ক্যাথলিকরা জন্মদিন পালন করে না। ঠাট্টা করে বলে, শ্যাল কুকুরেরও তো জন্মদিন আছে। তারা পালন করে যে সন্তের নামে বাচ্চার নাম দেওয়া হয়েছে (যেমন পাউল, মারিয়া=মেরি, ইত্যাদি) তাঁর সেণ্ট পদবি প্রাপ্তির দিন। এটাকে বলে, নামেন্সটাথ্।

শুভ্রাতিশুভ্র সাদা রেশমী জামা-কাপড়ে আর হল্যাণ্ড থেকে কেনা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লেস্ ঝালরে।

কার্ল জেলে। হয়তো ভাবছে মা কি করে বাচ্চাটিকে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে আজ সে রকম পরব হচ্ছে না কেন?

তার পর এল কার্লের বাৎসরিক বিবাহোৎসব।

এ সব কটা পরব পড়ে এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাসে। শুধু তার বউ আর আমাদের মা'র নামকরণ দিবস পড়ে জানুয়ারি থেকে মার্চে।

এ সব কটা দিনে কার্ল কারাগারে কী বেদনা অনুভব করেছিল তার খানিকটা কল্পনা আমি করতে পারি। আর সেই দরদী গার্ড আমাকে তার শেষ মেসেজ দিয়েছিল সে আমাকে কিছুটা বলেছিল। কার্ল নাকি তাকে তার পরিবারের প্রতি পর্বদিন ওকে ঐ সম্বন্ধে একটু-আধটু বলতো।

তার পর বড়দিন এল। সে আর যে সইতে পারলো না। সে কথা তোকে তো চিঠিতে লিখেছিলুম।'

তার দু'একদিন পর আমি একটু সুযোগ পেয়ে পাউলকে শুধালুম, 'আচ্ছা পাউল, কার্ল তো হিটলার জর্মনির সর্বেশ্বর হওয়ার দু'বৎসর পূর্বে পার্টি ছেড়ে দেয়. চাঁদা বন্ধ করে! তবে ওকে ধরলো কেন?'

পাউল ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে বললে, 'কিন্তু পার্টি কি ছাড়ে (আমাদের ভাষায় কমলী নহী ছোড়তী)? কার্ল ছিল পার্টির সব চেয়ে সেরা যুক্তিতর্কসিদ্ধ মেম্বার এবং উত্তম বক্তা। হিটলার ফ্যুরার হওয়ার পর যে-সব মাতব্বর কম্যুনিস্ট-দের গ্রেফতার করা হয় তাঁদের প্রায় সকলেরই নোটবুকে কার্লের নাম ঠিকানা পাওয়া গেল। আমি ওদের দোষ দিই নে; কিন্তু নাৎসিরা স্বভাবতই ধরে নিল এ-রকম একজন সর্ব-কম্যুনিস্ট-মান্য লোককে বন্ধ করে রাখাই সেফার।'

পাঠক হয় তো শুধোবেন 'কত না অশ্রুজল'-এ আমি কার্লের শেষ চিঠিকে যথাযথ মূল্য দিয়ে গোড়ার দিকেই ছাপালুম না কেন? কিন্তু যেখানে আমি অত্যুৎকৃষ্ট শেষ বিদায়ের চিঠিগুলো অনুবাদ করছি, সেখানে মাকে সান্ত্বনা জানিয়ে তিনটি মাত্র শব্দ, সেগুলোর কী অধিকার ওদের সঙ্গে সমাসনে বসার?

অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, নাৎসি পার্টির কি কোনো গুণ ছিল না, তারা কি সুদ্ধুমাত্র পাপাচারই করেছে? এর উত্তরে একটি ক্ল্যাসিক্যাল নীতিবাক্য সম্বলিত ছোট্ট কাহিনী মনে আসে। এক দরিদ্র গ্রাম্য পাদ্রী গিয়েছেন শহরে—বিশপের সঙ্গে দেখা করতে, সকালবেলা বিশপ তাঁর চেহারা দেখেই বুঝে গেলেন, বেচারির পেটে তখনো কিছু পড়েনি। বাটলারকে হুকুম দিলে সে রুটি মাখন আর একটি ডিম-সেদ্ধ নিয়ে এল। পাদ্রী মৃদু আপত্তি জানিয়ে খেতে আরম্ভ করলে হঠাৎ বিশপের নাকে গেল পচা ডিমের গন্ধ। চশমার উপর দিকে অর্ধোন্মুক্ত পচা ডিম ও পাদ্রীর দিকে যুগপৎ তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আই অ্যাম অ্যাফ্রেড, আপনাকে একটা পচা ডিম দিয়েছে!' পাদ্রী সাহেব তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে বললেন, 'না হুজুর না, ইট্ ইজ অলরাইট—' তারপর একটু থেমে বললেন, '—অ্যাট প্লেসেস্'—অর্থাৎ কোনো কোনো জায়গায়।

তাই 'পাদ্রী সাহেবের ডিম' বলতে বোঝায়, পৃথিবীতে কি এমন কোনো পচা ডিম পাওয়া যাবে, যার সর্বশেষ অণুটুকুও পচে গিয়েছে? তেমন করে খুঁজলে অন্তত দু-একটি পরমাণু পাওয়া যাবে, যেগুলো সম্পূর্ণ পচে যায়নি।

নির্গলিতার্থ: ইহভুবনে এমন কোনো ব্যক্তি, বস্তু, প্রতিষ্ঠান পাওয়া যাবে না যার ভিতর 'নেই কোনো গুণ, শুধু কপালে আগুন'।

বস্তুত হিটলার তথা নাৎসি পার্টির অনেক গুণই ছিল, এবং আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, গত বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত শ্মশান-মশানে পরিণত জর্মনি যে বছর পাঁচেকের ভিতর আপন পায়ে দাঁড়াতে পারলো, তার জন্য কিছুটা ধন্যবাদ পাবেন হিটলার ও তাঁর নাৎসি পার্টি। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কঠোর তপস্যা দ্বারা কি প্রকারে একটা দেউলে দেশকে (১৯৩৩-এর জর্মনি) মাত্র পাঁচটি বৎসরের ভিতর পরিপূর্ণ শক্তিমান বিত্তবান করা যায় (১৯৩৮-এর জর্মনি) সেই ভানুমতীর খেল দেখিয়েছিলেন স্বয়ং হিটলার। সেই সঙ্ঘবদ্ধ তপস্যালব্ধ চরিত্রবল বহুলাংশে প্রয়োগ করে যুদ্ধশেষের বিধ্বংসিত-জর্মনি পুনরায় শ্রী-সমৃদ্ধি লাভ করে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ভুললে চলবে না, নাৎসিরা পঞ্চাশ লক্ষ ইহুদীকে নিহত করে।

আবার তারপর এটা ভুলে গেলে আরও একটা মারাত্মক ভ্রম করা হবে যে, হিটলারের দৃষ্টান্ত থেকে বিশ্বমানবের মোক্ষম শিক্ষালাভ হয়ে গিয়েছে এবং ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি হবে না। বস্তুত ন্যুরন্‌বের্গের মোকদ্দমার সময় যে-সেরা

মার্কিন মনঃসমীক্ষণবিদ্, ডাক্তার কেলি প্রধান প্রধান আসামী গ্যোরিঙ, রিবেনট্রপ, কাইটেল ইত্যাদির মনঃসমীক্ষণ (সাইকো-অ্যানালেসিস) দীর্ঘকাল ধরে করেন, হিটলার সম্বন্ধে নানা দ্ব্যর্থহীন তত্ত্ব ও তথ্য এঁদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন (আসামীদের সকলেই হিটলারকে বহু বৎসর ধরে অব্যবহিত অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন) এই ডাক্তার কেলি আপন 'সোনার দেশ', ইহলোকে 'গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভূ' মার্কিন মুল্লুকে ফিরে গিয়ে প্রামাণিক পুস্তক মারফত বলেন, এই মার্কিন মুল্লুকেই যে-কোনো দিন এক নয়া-হিটলার নয়া-তাণ্ডব নৃত্য নাচাতে পারে, নাচতে পারে।

কেলি তাঁর পুস্তক প্রকাশ করেন সম্ভবত ১৯৪৭-৪৮-এ। তারপর দীর্ঘ একুশ বৎসর পরে, খবরের কাগজে পড়লুম, এক গণ্যমান্য মার্কিন অধ্যাপক অস্ট্রেলিয়াতে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, (কাটিং রাখিনি, মোদ্দাটা সাদামাটা ভাষায় বলছি) এখনো বিস্তর হিটলার রয়েছে ; তারা সুযোগ পেলেই আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।

এই মোক্ষম হক্ক বাক্যটি আমরা যেন কখনো না ভুলি।

অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, হিটলার কি শুধু ইহুদী এবং তাঁর জর্মন-বৈরীদেরই (যেমন আমার সখা কার্ল, তথা কবীর-সখা ট্রটৎস্কু জল্‌ৎস্) নির্যাতন করেছেন ? দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে, শুধু তাই নয়। পোলিশ, চেকস্লোভাক-বুদ্ধিজীবী, যুদ্ধে বন্দী রাশান অফিসার আরও বহুবিধ লোক তাঁর দীর্ঘ হস্ত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। এমন কি, কয়েক হাজার নিতান্ত নিরীহ বেদের পালও কনসানট্রেশন ক্যাম্পে, গ্যাস-চেম্বারে প্রাণ দেয় ; কি এক অজ্ঞাত অখ্যাত ককেশাস না কোন্ এক অঞ্চলে ধৃত এক অতিশয় ক্ষুদ্র উপজাতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তারা স্লাভ না 'আর্য' ? জর্মন তথা বিশ্বের সর্ব বিশ্বকোষ এদের সম্বন্ধে কোনো খবর দেয় না। শেষটায় হিটলারের খাস-প্যারা হিমলার-চিত্রগুপ্ত—যিনি কনসানট্রেশন-নরকের কার্ড ইনডেক্‌সিং-এর চীফ সেক্রেটারি—তিনি রায় দিলেন, আল্লায় মালুম কোন্ দলিলদস্তাবেজ 'বিদ্যাবুদ্ধি'র উপর নির্ভর করে—যে, এরা স্লাভ, অর্থাৎ নাৎসি-'ধর্মানুযায়ী', বেকসুর বধ্য। ওরা মরে। যুদ্ধশেষে তাবৎ খবর পাওয়ার পর বিশ্বপণ্ডিতরা নাকি ফতোয়া দিয়েছেন এরা আর্যদেরই কোন্ এক নাম-না-জানা উপজাতি। এবং কেউ কেউ বলেন, এই উপজাতি সমূলে নির্বংশ হয়েছে, কেউ কেউ বলেন, না, দু-একটা উটকো হেথা-হোথা বেঁচে আছে এবং বংশরক্ষার জন্য বধু খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি সঠিক জানি নে।

কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইহুদীরাই—সুদ্ধমাত্র ইহুদী পরিবারে

জন্ম নেবার 'অপরাধ'-এর ফলেই—প্রাণ দিয়ে খেসারত দেয় সর্বাধিক।

এ বাবদে অন্যতম উৎকৃষ্ট দলিল সৌভাগ্যক্রমে বাংলা ভাষাতেই উৎকৃষ্টরূপে অনূদিত হয়েছে। একটি তেরো-চৌদ্দ বছরের ইহুদী মেয়ের ডাইরি বা রোজ-নামচা। যুদ্ধের সময় লেখা। বাংলাতে বইখানির নাম 'আন্ ফ্রাঙ্কের ডায়ারী', অনুবাদক শ্রীঅরুণকুমার সরকার ও শ্রীঅংশুকুমার চট্টোপাধ্যায়। আমি মেয়েটির রোজনামচা থেকে কিছুটা তুলে দিচ্ছি; পরে সুযোগ পেলে সবিস্তার আলোচনা হবে। ডাইরিকে উদ্দেশ করে মেয়েটি লিখছে—

'শুক্রবার, ৯ই অক্টোবর, ১৯৪২

আজ তোমাকে কেবল খারাপ খবর শোনাবো। আমাদের ইহুদী বন্ধুদের দলে দলে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এইসব হতভাগ্য ইহুদীদের সাথে গেস্টাপো পুলিস যে কি নির্দয় ব্যবহার করছে, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। এদের গরু-ছাগলের গাড়িতে বোঝাই করে ড্রেণ্টের (Drente) ওয়েস্টারবর্ক (Wester-bark) বন্দিশালায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওয়েস্টারবর্কের নাম শুনলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। একশো লোকের জন্য মাত্র একটি হাত-মুখ ধোবার কল। পায়খানা নেই বললেই চলে। স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুদের একই জায়গায় শোবার ব্যবস্থা। এর ফলে, ব্যাপকভাবে নরনারীর চরিত্রস্খলন হচ্ছে। বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক, এমন কি অল্পবয়সী মেয়েরাও গর্ভবতী হয়ে পড়ছে।

বন্দিশালা থেকে পালানো অসম্ভব। বন্দিশালার অধিবাসীর মার্কা হিসাবে এদের সকলের মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হয়েছে। খাস হল্যাণ্ডেই যখন এই অবস্থা তখন দূরদেশে স্থানান্তরিত করে এদের উপর যে কি অমানুষিক অত্যাচার করা হচ্ছে, তা সহজেই কল্পনা করা যায়। আমাদের বিশ্বাস যে, তাদের অধিকাংশকে হত্যা করা হচ্ছে। ব্রিটিশ রেডিও থেকে বলা হচ্ছে যে, তাদের গ্যাস দিয়ে মারা হচ্ছে।

বোধ করি, এইটিই হত্যা করার সব-চেয়ে সহজ পন্থা। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি। মিয়েপের মুখে এইসব ভয়ঙ্কর গল্প শোনবার সময়, আমার রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছিল, অথচ না শুনেও পারছিলাম না।

সম্প্রতি একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তার বাড়ির দরজার সামনে বসে ছিল। হঠাৎ পুলিসের গাড়ি তার বাড়ির সামনে এসে থামল, আর গাড়ি থেকে গেস্টাপো পুলিস নেমে তাকে হুকুম করল, 'গাড়িতে উঠে এসো'। পঙ্গু হতভাগিনী চলতে পারে না, কোনো রকমে হামাগুড়ি দিয়ে গাড়িতে উঠতে গিয়ে চাকার তলায় পড়ে গেল। জর্মনরা তার উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে তাকে পিষে মেরে ফেলল।

জর্মনদের আর একরকম অত্যাচারের নাম হল প্রতিশোধমূলক হত্যা। ব্যাপারটা এই রকম—নিরীহ নাগরিকদের জামিনস্বরূপ জেলে পুরে রাখা হয়। যখনই হল্যাণ্ডের কোথাও জর্মনদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়, তখনই তার প্রতিশোধস্বরূপ, নির্দিষ্ট সংখ্যক লোককে জেল থেকে টেনে বের করে গুলি করা হয়। তারপর তাদের মৃত্যু-সংবাদ কাগজে ছাপানো হয়। এই হল হিটলারতন্ত্রের আসল রূপ। এরা আবার নিজেদের আর্য বলে গর্ব করে।

তোমারই আন'

ভরা ডুবি (আন ফ্রাঙ্ক)

আজকালের মধ্যেই তো ৬ই জুন। শুধু ইয়োরোপের না, বিশ্বের ইতিহাসেও এটি একটি অবিস্মরণীয় দিন। আজ থেকে পঁচিশ বৎসর পূর্বে ঐ দিন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সৈন্যে জাহাজ ভর্তি করে ফ্রান্সের নরমাঁদি উপকূলে মার্কিন-ইংরেজ অবতরণ করে। এরকম বিরাট নৌবহর নিয়ে এ-আকারের একটা অভিযান পৃথিবীর ইতিহাসে ইতিপূর্বে হয়েছে বলে আমার জানা নেই। সারা বিশ্বে এটা 'ডী ডে' নামে পরিচিত এবং সুদ্ধমাত্র কূলে অবতরণের ঐ একটি দিবস নিয়েই এত কেতাব লেখা হয়েছে যে একটা মানুষ দশ বছরেও সেগুলো পড়ে শেষ করতে পারবে না। এবং নূতন নূতন বই লেখা হচ্ছে। এর বুঝি শেষ নেই। তাই বোধ হয় এটাকে 'দীর্ঘতম দিবসও' বলা হয়, যদ্যপি জ্যোতিষ অনুযায়ী এটি দীর্ঘতম দিবস নয়।

ফিল্মও হয়েছে। তারই বদৌলত যাঁদের যুদ্ধ বাবদে কৌতূহল সীমাবদ্ধ তাঁরাও অনেকখানি ওয়াকিফ-হাল হয়ে গিয়েছেন। যদ্যপি ফিল্মটি বড্ডই একপেশে ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু সুশীল পাঠক তোমাকে অভয় দিচ্ছি, আমি এ কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করবো না—যে-সব মহারথীরা এ-বিষয়ে বিরাট বিরাট ভলুম ভলুম কেতাব লিখেছেন পার্কার শীফার মঁ ব্লাঁ ফাউনটেন পেন দিয়ে তার সঙ্গে পাল্লা দেবে আমার ভোঁতা কঞ্চির কলম!

আমার বর্তমান উদ্দেশ্য ভিন্ন।

ঐ ১৯৪৪ সালের মার্কিনিংরেজ অভিযানের প্রায় দেড়-দুই বৎসর পূর্বের থেকেই সারা ইয়োরোপময়—এমন কি প্রাচ্যেও—জল্পনা-কল্পনা হচ্ছিল ওরা জর্মনিকে হুড়ো দেবার জন্য ইংলিশ চ্যানেল ক্রস করে জর্মন নিমিত আটলানটিক উয়োলে হানা দেবে কবে, কোন্ জায়গায়? এই জল্পনা-কল্পনা সর্বাপেক্ষা

উৎকণ্ঠ আকণ্ঠ আগ্রহে, আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান ইয়োরোপের সর্বত্র লুক্কায়িত কিংবা কনসানট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী ইহুদীরাই ছিল প্রধানতম।

আন্ ফ্রাঙ্ক তার ডাইরিতে মার্চ মাসে অর্থাৎ 'ডী ডে'র তিন মাস পূর্বে লিখছে: 'সেটা ছিল রবিবার, রাত্রি ন'টা। উইনস্টন চার্চিল সেদিন বেতার বক্তৃতা দিয়েছিলেন—সে বক্তৃতার মধ্যে সত্যিকারের আশার আলো দেখতে পেয়েছিলাম। তার মধ্যে মিথ্যা বাগাড়ম্বর ছিল না—ছিল হিটলার-নিপীড়িত অগণিত নরনারীর প্রতি আশ্বাসের বাণী। সেই সময়টা মনে হয়েছিল যে আমাদের এই গোপন-আবাসে আমরা অসহায় ও নিঃসঙ্গ নই। এক বিশাল দুনিয়া জুড়ে আমাদের উদ্ধার করবার জন্য তোড়জোড় চলছে।'

কিন্তু আন্ সরলা হলেও এ-বাবদে রীতিমতো বুদ্ধিমতী। ঐ গোপন আবাসে যে আটটি প্রাণী প্রতিদিন জল্পনা-কল্পনা করছে তার নীর সরিয়ে ক্ষীরটুকু সযত্নে সংগ্রহ করে তার ডাইরিতে লিখে রাখছে, এদের ভিতর বয়সে যে সবচেয়ে ছোট, সেই আন্। আর খাসা রসিয়ে রসিয়ে—

একজন হয়তো বললে, কয়েকদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হবে, সঙ্গে সঙ্গে অপর জন সবজান্তার মতো বলল, তা কি হবে? ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে আক্রমণ করা কি এতই সোজা! আবার একজন বললে, 'একবার ফ্রান্সে নামতে পারলে, এক মাসের মধ্যে বার্লিন পৌঁছে যাবে।' আর একজন রণবিশারদ্ বলে উঠলেন, 'এক বৎসরের কম কিছুতেই বার্লিন পৌঁছতে পারবে না।' আন্ এর অভিমত দিয়ে এ-অনুচ্ছেদ শেষ করেছে। এবং এর কথা আখেরে ফলেছিল। 'ডী ডে' হয় ৬ই জুন; তার এগারো মাস পরে ৮ই মে জর্মনি বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করে। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন, ইংরিজিতে নাকি সিক্‌সেস্ অ্যাণ্ড সেভেনস, ফার্সীতে শশ্ (ষষ্ঠ) ও পন্‌জ (পঞ্চ) বলে—অবশ্য অল্প ভিন্নার্থে। মোদ্দা: এগারো মাস যা, বারো মাস তা।

কিন্তু এইমাত্র বলেছি, আন্ সুচতুরা বালা।

কারণ যদ্যপি সে বলেছে, 'এক বিশাল দুনিয়া জুড়ে আমাদের উদ্ধার করবার জন্য তোড়জোড় চলেছে', তথাপি সে অন্তরে অন্তরে জানে মার্কিনিংরেজ বাবুরা নিছক খয়রাতি কর্ম করার জন্য, দু-হাতে চ্যারিটেবল হসপিটাল ছড়াতে ছড়াতে 'ডী ডে'-তে ফ্রান্সে নামবেন না। তাই ঐ দিবসের এক মাস পূর্বে লিখছে, 'আমাদের এখানে সকলেই এখন আশা করছে যে মিত্রপক্ষের (অর্থাৎ মার্কিনিং-রেজ) অভিযান খুব তাড়াতাড়ি আরম্ভ হবে; কারণ রাশিয়া সমস্ত ইউরোপ দখল করে নেবে, এ তারা কিছুতেই হতে দেবে না।'

অতিশয় হক্ কথা। আন্ ঐ বয়সেই বাবুদের 'সচ্চরিত্রে'র কিছুটা চিনে গিয়েছে, নিছক ঈশ্বরপ্রসাদাৎ! আমরা ইংরেজকে বিলক্ষণ চিনি, চোখের জলে নাকের জলে হাড়ে হাড়ে।

কিন্তু মুক্তি পাবার আশা উৎকণ্ঠা উত্তেজনার মাঝখানেও দেখুন, এই কুমারীটি কি রকম শান্তভাবে উভয় পক্ষের দায়িত্ব ওজন করে দেখছে। 'ডী ডে'র ঠিক এক পক্ষ পূর্বে সে লিখছে: '...আশা এবং উৎকণ্ঠা চরমে পৌঁছে গেছে। কেন এখনো আক্রমণ হচ্ছে না, ইংরেজরা কেন এত দেরি করছে, তারা কি কেবল তাদের নিজের দেশের জন্য লড়ছে, হল্যাণ্ডের প্রতি কি তাদের কোনো দায়িত্ব নেই? কিন্তু ইংরেজদের আমাদের প্রতি কীই বা দায়িত্ব আছে? আমরা আমাদের নিজেদের মুক্তির জন্য কতটুকু চেষ্টা করেছি? জর্মন অধিকৃত দেশগুলোর মধ্যে কবার কটা বিদ্রোহ হয়েছে? নিজের মুক্তি নিজেরই অর্জন করতে হয়—অন্য দেশের কি মাথাব্যথা পড়েছে যে কেবলমাত্র আমাদের উদ্ধার করবার জন্যে সৈন্যসামন্ত পাঠাবে? আক্রমণ একদিন হবেই, কিন্তু তা আমরা চাইছি বলে নয়, ইংরেজ এবং আমেরিকার নিজেদের স্বার্থে।'

এই চরম দ্বন্দ্বের মাঝখানে মেয়েটির ভগবানে বিশ্বাস, অন্তিমে সত্যের সর্বজয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ প্রত্যয় এবং সর্বোপরি তমসাচ্ছন্ন পাশ্চাত্ত্যে নবীন উষার উদয়, নবীন জীবনের অভ্যুদয় সম্বন্ধে এ বালাটির পরিপূর্ণ আশাবাদ—তার পরিচয় আমার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে কিছুতেই প্রকাশ পাবে না।

তবু মাঝে মাঝে মেয়েটি কিন্তু ভেঙে পড়তো।

একদিন লিখছে, 'প্রিয় কিটি, এক নিদারুণ হতাশা এবং অবসাদ আমায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এখন মনে হচ্ছে যে এ যুদ্ধ বুঝি আর কখনও শেষ হবে না। যুদ্ধ মিটে যাওয়া যেন বহু দূরের রূপকথার রাজ্যের ব্যাপার বলে এখন মনে হচ্ছে।' তার দেড় মাস পরে বলছে, 'আবার আমার অবস্থা ভেঙে পড়বার মতো হয়েছে। এই গোপন আবাসে এখন সবই বিষাদময়।...হয় মুক্তি, নয় মৃত্যু—দুটোর যে-কোনো একটা তাড়াতাড়ি ঘটুক। ভগবান এই আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠা থেকে আমাদের রেহাই দাও।

তোমারই আন্'

কিন্তু এর মাত্র এগার দিন পরেই—

কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ—
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ॥

'মঙ্গলবার, ৬ই জুন, ১৯৪৪ (অর্থাৎ ডী ডে—লেখক)

প্রিয় কিটি,

আজ একটি অবিস্মরণীয় দিন। অবশেষে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হল। ফরাসী উপকূলের বিভিন্ন জায়গায় মিত্রপক্ষের সৈন্যদল অবতরণ করছে।...

জর্মনির খবরেও স্বীকার করা হয়েছে যে ফরাসী উপকূলে ব্রিটিশ প্যারাশুট বাহিনী অবতরণ করেছে।...

আমাদের গোপন আবাস চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সেই বহু প্রতীক্ষিত মুক্তি যা এতদিন আমাদের কাছে ছিল সুদূর স্বপ্নরাজ্যের কাহিনীর মতো, তা কি সত্যিই আমাদের কাছে এল? সত্যিই কি ১৯৪৪ সালের মধ্যে বিজয়লাভ করব?

হতাশার অন্ধকার ছিন্ন করে আবার আশার আলোক জেগেছে।'

কিন্তু পাঠক, এর পর দিনের পর দিন, মিত্রশক্তি যেমন যেমন ফ্রান্স জয় করে এগিয়ে আসতে লাগলো, আর আন্ সোল্লাসে তার ডাইরিতে সেগুলো লিপিবদ্ধ করলো তার উদ্ধৃতি আমি দেব না। আপনারা ডাইরিখানা পড়ে দেখবেন। সে প্রতিদিন আশা করছে মিত্রশক্তি হল্যাণ্ড জয় করে তাদের মুক্তিদান করবে। এবং এইটুকু বলবো, এ-যুদ্ধের শেষাঙ্ক সম্বন্ধে যে-সব বই লেখা হয়েছে তার মধ্যে আন্ ফ্রাঙ্কের ডাইরি সর্বপ্রথম সর্বপ্রধান পর্যায়ে পড়ে।

কিন্তু হায়! হায়!' শেষরক্ষা হল না।

২১ জুলাই আন্ বেতারে শুনলো, হিটলারকে হত্যা করবার চেষ্টা করা হয়েছিল, আর হিটলার হন্যে হয়ে দোষী-নির্দোষী হাজার হাজার জর্মনকে ফাঁসী দিচ্ছেন। আন লিখছে, 'এই রকম করে হতভাগারা যদি নিজেরা মারামারি করে মরে, তাহলে ইংরেজ-আমেরিকা আর রুশদের কাজটা খুব সহজ হয়ে যায়। আমাকে কি বড় খুশী মনে হচ্ছে? সত্যি, আমি যে আনন্দ চেপে রাখতে পারছি না। কেবলই মনে হচ্ছে এই অক্টোবর মাসেই আবার আমার পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে।

একে তুমি আকাশ-কুসুম কল্পনা বলছ? বার্লিনের দিকে ধাবমান সৈন্যদের পদধ্বনি বলছে, না এ আকাশ-কুসুম নয়। এ সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।'

কিন্তু হায়, পাড়ে এসে ভরাডুবি হল। এর কয়েকদিন পরেই জর্মন পুলিস আন্‌দের গুপ্তাবাস আবিষ্কার করে সবাইকে গ্রেপ্তার করে কনসানট্রেশন ক্যাম্পে পাঠাল। তারপর কি হয়েছিল সেটা, কঠোর পাঠক, দয়া করে আমাকে পুনরাবৃত্তি করার হুকুম দিয়ো না।

আন্ ফ্রাঙ্ক সম্বন্ধে আমার হয়তো আরো অধিক-কিছু লেখাটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। কারণ ইতিমধ্যেই হাতে-কলমে সপ্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে, একাধিক দরদী পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আন্-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ বাবদে আমার মতো নগণ্য লেখক একজন প্রখ্যাত বাঙালী লেখকের সহৃদয় একখানি চিঠি পেয়েছে। তিনি লিখেছেন :

সম্প্রতি এর্নাকুলাম থেকে একটি মহিলা (ইনি আমার '—'এর মালায়ালাম অনুবাদ প্রকাশ করেছেন) জানতে চেয়েছেন—আন্ ফ্রাঙ্কের লেখা The Diary of a Young Girl বইখানার বাংলা অনুবাদ কে করেছেন, তাঁর ঠিকানা কি এবং প্রকাশক কারা। এখানে বসে কি করে খবরটা সংগ্রহ করা যায় যখন ভাবছি, 'দেশ' পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় আপনার 'পঞ্চতন্ত্রে' এ বিষয়ে অনুবাদকের নাম পেয়ে গেলাম। এঁদের ঠিকানা কি আপনি জানেন ?—ইত্যাদি।

আন্ সম্বন্ধে যখন সেই সুদূর কেরালায়ও এতখানি কৌতূহল রয়েছে তখন আমার পক্ষে হয়তো এ-নিয়ে আর অত্যধিক বাগ্‌বিন্যাস করা উচিত হবে না। কিন্তু মাঝে মাঝে কোনো কোনো কাঁচা লেখক একটি বিষয়েই এমনি মজে যান যে সে দ' থেকে আর সহজে বেরুতে পারেন না। আমার হয়েছে তাই। কিংবা বলতে পারেন, 'একে তো ছিল নাচপাগলী বুড়ী, তার উপর পেল মৃদঙ্গের তাল।' কিংবা তারো বাড়া :

কী কল পাতাইছো তুমি
বিনা বাইদ্দে (বাদ্যে) নাচি আমি !!

অতএব বহুদাস্তশীল পাঠকের সামনে আন্-এর আরো একটু সামান্য পরিচয় নিবেদন করি।

আন্-এর রসিকতাবোধ ছিল অসাধারণ। তার তেরো বৎসর বয়সে ক্লাস টিচার আদেশ দিয়েছেন 'বাচালতা' সম্বন্ধে রচনা লিখতে। আন্-এর 'বাচালতা'র শাস্তিস্বরূপ !

'ফাউন্টেন পেনের ডগা কামড়াতে কামড়াতে ভাবতে লাগলাম—কি লেখা যায় ? হঠাৎ আমার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, বরাদ্দ তিন পাতা লিখে ফেলে আমি নিশ্চিন্ত বোধ করলুম। আমার যুক্তি হল, বক বক করা নারীজাতির বৈশিষ্ট্য। যদিও বাচালতাকে সংযত করার চেষ্টা করা উচিত, তবুও এই দোষ থেকে আমার একেবারে মুক্ত হওয়া উচিত হবে না, কারণ আমার মা, আমারই মতো এবং সময় সময় আমার চেয়েও বেশী কথা বলেন। সুতরাং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত স্বভাব-

ধর্ম কি করে ত্যাগ করতে পারি ? আমার যুক্তি শুনে মিঃ কেপ্টরকে (শিক্ষককে) হাসতে হল।'

আমরাও হাসছি। কিন্তু আন্-এর শেষ দুর্গতির কথা স্মরণে আছে বলে চোখের জলের ফাঁকে ফাঁকে। সেই প্রাচীন দিনের এক হতভাগ্যের গান,

'I am dancing with tears in my eyes'.

সবেমাত্র চৌদ্দ বছর পূর্ণ হওয়ার সময় আন্ তাদেরই সঙ্গে লুক্কায়িত একটি ইহুদি ছোকরার প্রেমে পড়ে। তখন লিখছে—আমি কেটে-ছেঁটে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করছি।

'রবিবার ১৬ই এপ্রিল, ১৯৪৪

প্রিয় কিটি,

কালকের দিনটা আমার জীবনে এক স্মরণীয় দিন। প্রথম চুম্বন। প্রত্যেক মেয়ের জীবনেই এক স্মরণীয় ঘটনা এবং সেই জন্যেই কালকের দিনটা আমার চিরকাল মনে থাকবে। কাল সন্ধ্যাবেলা পিটারের ঘরে আমরা দু'জনা চৌকির ওপর বসে ছিলাম। খানিকক্ষণ পরে ও আমার কাঁধের উপর হাত রাখল। আমিও ওর কোমর জড়িয়ে ধরলাম। ও তখন আমাকে আরো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল। এর আগেও আমরা অনেকবার এই রকম পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বসেছি, কিন্তু এবার আমাদের সান্নিধ্য অনেক নিবিড় ও উষ্ণ। আমার বুকের ভিতর ঢিপঢিপ করছিল।...ঐ সময় আমার যে কি আনন্দ হচ্ছিল, তা লিখে বোঝাতে পারব না...তার পরের মুহূর্তগুলো আমার ঠিক মনে নেই। নিচের দিকে যাবার জন্য যখন পা বাড়িয়েছি, ও তখন হঠাৎ আমায় চেপে ধরে আমার কপালে, গালে, গলায় এবং বুকে বার বার চুমু খেতে লাগল। আমি কোনো রকমে ওর হাত ছাড়িয়ে ছুটে নিচে পালিয়ে এলাম।

আজকের আবার ঐ মুহূর্তগুলির জন্য প্রতীক্ষা করছি।

তোমারই আন্।'

ছেলেটির বয়স তখন মাত্র সাড়ে সতেরো। মনে হচ্ছে, এটি নিষ্পাপ কিশোর-কিশোরীর প্রথম প্রণয়।

এর পূর্বে আন্ অতিশয় সরলতার সঙ্গে বর্ণনা করেছে তার 'দেহের বহির্ভাগে বিস্ময়কর যা ঘটেছে', কিন্তু বলছে : 'দেহের অভ্যন্তরে যা ঘটেছে তা আরো রহস্যঘন বিস্ময়। ইতিমধ্যে আমি তিন বার ঋতুমতী হয়েছি।...এখন আমার মনের মধ্যে অদ্ভুত সব কামনা জাগছে। কোনো কোনো দিন রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে নিজের স্তন দুটোকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে আমার ভীষণ ইচ্ছে হয়। এ

বক্ষের ছন্দোময় স্পন্দন শোনবার জন্য আমি কান পেতে থাকি।...'

এ স্থলে উদ্ধৃতিটি অসম্পূর্ণ রেখে বলি, ধন্য ধন্য কবীন্দ্র রবীন্দ্র। তিনি কী করে জানলেন বালিকা যখন কিশোরী হয় তখন তার দেহানুভূতি হৃদয়ানুভূতি!

ওগো তুমি পঞ্চদশী,
পৌঁছিলে পূর্ণিমাতে।
মৃদুস্মিত স্বপ্নের আভাস তব বিহ্বল রাতে॥
ক্বচিৎ জাগরিত বিহঙ্গকাকলী
তব নবযৌবনে উঠিছে আকুলি ক্ষণে ক্ষণে।
প্রথম আষাঢ়ের কেতকীসৌরভ তব নিদ্রাতে॥
যেন অরণ্যমর্মর
গুঞ্জরি উঠে তব বক্ষে থরথর।
অকারণ বেদনার ছায়া ঘনায় মনের দিগন্তে,
ছলো ছলো জল এনে দেয় তব নয়নপাতে॥'

এই যে "যেন অরণ্যমর্মর / গুঞ্জরি উঠে তব বক্ষে থরথর" ঠিক সেই অনুভূতিই তো আন্ প্রকাশ করছে যখন সে বলছে 'এ-বক্ষের ছন্দোময় স্পন্দন শোনবার জন্য আমি কান পেতে থাকি।'

ততোধিক আশ্চর্য, ঠিক ঐ সময়েই প্রেমবোধের সঙ্গে সঙ্গে তার ধর্মবোধও জাগ্রত হয়েছে। তার দয়িত পিটারের কথা ভাবতে ভাবতে বলছে,

'এর উপর আরো বিপদ, ও ধর্ম ও ভগবান মানে। ধর্ম মানুষের এক বিরাট অবলম্বন—স্বর্গীয় বিধানের উপর ক'জন লোক পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারে?

(রবীন্দ্রনাথের 'আমার গুরুর আসন কাছে / সুবোধ ছেলে ক'জন আছে?' —লেখক) কিন্তু যারা পারে, তারা সত্যিই সুখী। আর নিজের বিবেক যখন ধর্মের বিধানের সঙ্গে যোগ খেয়ে যায় তখন যে শক্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়, তার তুলনা নেই!'

এ-অধম স্তম্ভিত। 'ধর্মের বিধানে'র সঙ্গে যে প্রায়ই বিবেকের দ্বন্দ্ব লাগে সেটা সে ঐ অতি অল্প বয়সে হৃদয়ঙ্গম করলো কী করে!

বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে ইয়োরোপীয় ইহুদিদের অন্যতম কেন্দ্রভূমি ছিল রাইন নদীর পারের ফ্রাঙ্কফুর্ট শহর। এরই এক পরিবারে আন্ ফ্রাঙ্কের জন্ম ১২ই জুন, ১৯২৯-এ[১]। ১৯৩৩-এ হিটলার গদিনশীন হলে পর আন্-এর পিতা

১ আন্ তিন-তিনবার তাঁর ডাইরিতে লিখেছেন তাঁর জন্মদিন ১২ জুন।

সপরিবার হল্যাণ্ডের আম্‌স্‌টের্ডাম চলে যান। (আইনস্টাইনও ঐ বৎসরে আমেরিকা যান)।

স্বয়ং আন্‌ লিখছেন (তখন তাঁর বয়স তেরো): 'আমাদের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, যাঁরা জর্মনিতে রয়ে গেলেন তাঁরা নাৎসিদের হাতে নানাভাবে লাঞ্ছিত হতে লাগলেন। তখন আমার দু'-মামা আমেরিকায় পালিয়ে গেলেন। তাঁদের জন্য আমরা সর্বদাই উদ্বিগ্ন থাকতাম। ১৯৩৮ সালে যখন ইহুদিদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা লাগানো শুরু হল, তখন আমার বুড়ী দিদিমা আমাদের কাছে চলে এলেন। তাঁর বয়স তখন ৭৩।'

১৯৪০-এর মে মাস থেকে আরম্ভ হল হল্যাণ্ডবাসী তাবৎ ইহুদিদের বিপর্যয়। হিটলার হল্যাণ্ড দখল করে এমন সব আইন পাস করলেন যাতে করে ইহুদিদের জীবন বিভীষিকাময় হয়ে উঠলো।

হিটলার হল্যাণ্ড বিজয়ের দুই বৎসর পরও আন্‌ লিখছেন:

'হাজার রকম বিধিনিষেধের মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবন কাটতে লাগল। আমাদের স্বাধীনতা বলতে কিছুই রইল না। তবুও তখন অবস্থাটা একেবারে অসহ্য হয়নি।'

বেচারী আন্‌—আন্‌ কেন, কজন ঐ ১৯৪২-এ জানতো যে হিটলার ১৯৩৯ সালেই মনস্থির করে গোপনে হুকুম দিয়েছেন, নির্যাতন উৎপীড়ন দিয়ে আরম্ভ করে শেষটায় ইহুদিদের সবংশে ও সমূলে নিধন করতে হবে। বিশেষ করে হল্যাণ্ড দেশটিতে যেন একটি ইহুদিও জীবন্ত না থাকে।

কিন্তু আন্‌-এর পিতা বুঝতে পেরেছিলেন যে দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে। ৫ই জুলাই ১৯৪২ সালে আন্‌ লিখেছেন,

'একদিন বাবার সঙ্গে পার্কে বেড়াচ্ছিলাম, বাবা হঠাৎ আমাকে বললেন "শোন আন্‌, এখন যত পারো আনন্দ করে নাও, কেন না খুব তাড়াতাড়ি আমাদের এখান থেকে চলে গিয়ে কোনো নতুন জায়গায় লুকোতে হবে।" আমি অবাক হয়ে বললাম, "কেন বাবা, এখান থেকে কোথায় যাব? লুকোতেই বা হবে কেন?" তিনি বললেন, "জর্মনরা এসে আমাদের ধরবার আগেই আমরা

অথচ প্রামাণিক জর্মন্‌ বিশ্বকোষ ড্যার গ্রসে ব্রহহাউস (১৯৫৮, অ্যারগান্‌ৎ-স্যুংসবান্‌ট, পৃ ১৫৭) লিখছেন ১৪ই জুন। জর্মন-প্রবাসী কোনো বঙ্গসন্তান যদি অনুসন্ধান করে পাকা খবর জানান তবে উপকৃত হই। তবে কি ইহুদি ক্যালেন্‌ডারের সঙ্গে চালু ক্যালেন্‌ডারের কোনো ফেরফার আছে?

লুকিয়ে পড়ব।" ব্যাপারটা তখনও ভাল করে বুঝতে পারলাম না, কিন্তু একটা অস্পষ্ট বিষাদে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল।'

এর পাঁচ-সাত দিন পরই ফ্রাঙ্ক পরিবারকে তাঁদের বাসস্থান ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে শহরের অন্যপ্রান্তে চারতলার পিছনের দিকে গুটিকয়েক কুঠুরিতে গোপন আশ্রয় নিতে হল। এদের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি ইহুদি পরিবারও আশ্রয় নেয়। সবসুদ্ধ আটটি প্রাণী। প্রায় দুই বৎসর এখানে লুকিয়ে থাকার পর এদের সকলেই ধরা পড়ে। এর পরের কাহিনী অত্যন্ত মর্মন্তুদ।

এই দুই বৎসর ধরে আন্ তাঁর ডাইরিটি লিখে যান। যখন ডাইরিটিতে লিখতে আরম্ভ করেন তখন তাঁর বয়স তেরো, যখন ধরা পড়েন তখন তাঁর বয়স পনরো বৎসর। ষোল পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই আন্ জর্মন কনসানট্রেশন ক্যাম্পে টাইফাস জ্বরে অসহ্য যন্ত্রণা ভুগে মারা যান। তাঁর আঠেরো বছরের দিদি মারগট (মারগারেট)-এরও টাইফাস হয়েছিল এবং ক্যাম্পের একই কামরায় রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে উপরের বাঙ্ক থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান। ঐ একই সময়ে এঁদের মা-ও ক্যাম্পে যারা যান। তখন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশের মতো। পরিবারের মাত্র একজন, পিতা অটো দৈববলে অবলীলাক্রমে বেঁচে যান।

এই ডাইরিখানার বৈশিষ্ট্য কি ?

যুদ্ধশেষে, মোটামুটি ১৯৪৯ সালে ডাইরিখানা ডাচ ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৫০ সালে বইখানি জর্মনে অনূদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইয়োরোপ আমেরিকাতে প্রচুরতম খ্যাতিলাভ করে। কয়েক বছরের ভিতরই বইখানা ন্যূনাধিক ত্রিশ-চল্লিশটি ভাষায় অনূদিত হয়। অনবদ্য বাংলা অনুবাদ করেছেন শ্রীঅরুণ সরকার ও শ্রীঅংশুকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ইতিমধ্যে ডাইরিটি অবলম্বন করে যে নাটকটি রচিত হয়—সেই জর্মন বিশ্ব-কোষের ভাষায়—বিশ্বের সর্বমঞ্চে অভিনীত হয়েছে (য়্যাবার ডী বুনেন ড্যার ভেল্ট্)। ফিল্ম জগতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কম, তবে শুনেছি এর ফিল্ম নাকি এদেশেও এসেছিল।

ভাবতে আশ্চর্য বোধ হয়, চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ের লেখা একটি রোজনামচা কী করে এতখানি খ্যাতি অর্জন করলো। এ যেন সেই 'বালকবীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়, এ কী গো বিস্ময় !'

বইখানা যতবার পড়ি ততবার মনে হয় এর পাতার পর পাতা তুলে দিয়ে 'কত না অশ্রুজল' পর্যায়ের সমাপ্তি টানি। কিন্তু স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে সেটা

সম্ভবপর নয়। তবে আন্-এর কিছুটা ব্যক্তিগত পরিচয় দেবার জন্য অত্যল্প তুলে দিচ্ছি। কিন্তু তার পূর্বে তুলে দি আন্ কিভাবে রোজনামচা লেখা শুরু করেন।

শনিবার, ২০ জুন ১৯৪২ (জর্মনি কর্তৃক হল্যাণ্ড দখলের দুই বৎসর পরে—লেখক)

'আমার ডায়েরি লেখার খেয়াল একটু অদ্ভুত। আমার বয়সী কোনো মেয়ে ডাইরি লেখে বলে তো আমি শুনিনি। আর তেরো বছরের মেয়ের মনের কথা জানবার কারই বা মাথাব্যথা পড়েছে? কিন্তু তবুও আমি লিখছি। আমার মনের গহনে যে সব ভাব রয়েছে, সেগুলোকে আমি প্রকাশ করতে চাই।

একটি প্রবাদ আছে: "মানুষের থেকে কাগজ অনেক বেশী সহিষ্ণু"। একদিন নিরানন্দ আলস্যের মধ্যে গালে হাত দিয়ে যখন ভাবছিলাম, কি করে সময় কাটানো যায়, সেই সময় এই কথাটা আমার মনে এল।

এখন আমার সত্যিকারের বন্ধু কেউ নেই।'

এরপর আন্ বলছেন তাঁর বাপ, মা, বোন এবং প্রায় ত্রিশজন বন্ধু আছেন। এবং আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ইহুদিরা আসলে প্রাচ্যদেশীয় বলে আমাদেরই মতো 'গুষ্টিসুখ' অনুভব করতে খুবই ভালোবাসে।

তবু আন্ বলেছেন, 'কিন্তু তবু আমি নিঃসঙ্গ। সুতরাং এই নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যে আমি এই ডাইরি লিখছি; কিন্তু এই ডাইরি আমি চিঠির আকারে লিখব। আমি এক কাল্পনিক বন্ধু ঠিক করেছি—তার নাম কিটি (ইংরেজিতেও কিটি, ক্যাৎরীন—লেখক), আমার এই ডায়েরি কিটিকে লেখা চিঠির আকারে লিপিবদ্ধ হবে।'

পাঠকের মনে এস্থলে প্রশ্ন উঠতে পারে, আন্ কি জানতেন তাঁর এ-রোজনামচা একদিন প্রকাশিত হবে?

আন্‌কেই বলতে দিন:

'বুধবার ২৯শে মার্চ, ১৯৪৪

প্রিয় কিটি,

বলকেস্টাইন নামে একজন মন্ত্রী লণ্ডন থেকে একদিন বেতার-বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল—হল্যাণ্ডের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বললেন—জর্মন অধিকৃত অঞ্চলের লোকেদের ডায়েরি যোগাড় করতে হবে; তা যদি হয়, তা হলে আমার এই ডায়েরির খুব কদর হবে। ভাবতে কী মজাই না লাগছে! বাস্তবিক দশ বছরে পরে আমার এই ডায়েরি যদি লোক পড়ে (প্রকৃত প্রস্তাবে দশ নয় পাঁচ বছর পরেই বিশ্বজন এই

বইখানিকে হৃদয়ে টেনে নিয়ে তার প্রভূততম 'কদর' দিয়েছে—লেখক) তা হলে আমরা এখানে কি অবস্থায় কাটিয়েছি, তা জেনে তারা অবাক হবে।'

এর দেড় মাস পর আন্ আবার কিটিকে জানাচ্ছেন :

'কিন্তু জীবনের চরম লক্ষ্য সাংবাদিক ও বড় লেখিকা হওয়া—সে কথা মুহূর্তের জন্যেও ভুলি না। আমার এই অলীক আশা কোনোদিন সফল হবে কিনা, তা ভবিষ্যৎই জানে। কিন্তু আমার ডায়েরি যুদ্ধ শেষ হলে আমি ছাপিয়ে বার করব—এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত।

তোমারই অ্যান্'

বস্তুত লেখিকা হতে হলে যে কটি গুণের প্রয়োজন আন্-এর সব কটিই ছিল, কিন্তু বিধাতা তাঁর জন্য রেখেছিলেন অকালমৃত্যু।

জানি না, আমার দরদী পাঠক এর থেকে কোনো সান্ত্বনা পাবেন কিনা। যে আন্-এর মৃত্যুর জন্য হিটলার হিমলার দায়ী, তাদের দুজনকেই আত্মহত্যা করতে হয় আন্-এর মৃত্যুর দু'মাসের মধ্যে।

যে নাৎসি নেতা সাইস-ইন্‌কুভারট ফ্রাঙ্ক পরিবার গ্রেফতার হওয়ার সময় হল্যাণ্ডের শাসনকর্তা ছিলেন তিনি প্রধানত হল্যাণ্ডে কৃত তাঁর কুকীর্তির জন্য ন্যুরন্‌বের্গ মোকদ্দমার বিচারের পর—আন্-এর মৃত্যুর দেড় বৎসর পর—ঝোলেন ফাঁসি কাঠে। গেস্তাপো নেতা কালটেন ব্রুনারও ঐদিন একই পন্থায় ও-পারে যান এবং তাঁর সহকর্মী আইকমানকে ফাঁসি দেয় ইহুদিরা কয়েক বৎসর পরে—ইজরায়েলে।

ধন্য অবাঙালী !

ভিন্ন ভিন্ন জাত সম্বন্ধে পৃথিবীর লোক কতকগুলো ধারণা করে বসে আছে। যেমন স্কচ্ কিপ্টে, ফরাসী দুশ্চরিত্র, জর্মন ভোঁতা, ইংরেজ অবিশ্বাসী, এমন কি প্রখ্যাত ফরাসী সাংবাদিকা মাদাম তাবুই-এর একখানা বই আছে যার শিরোনামা 'লা পেরফিড আলবিয়েঁ' (বিশ্বাসঘাতক ইংরেজ) দিয়ে আরম্ভ। (অবশ্য তিনি তাঁর পুস্তকে প্রমাণ করার চেষ্টা দিয়েছেন যে এ 'কুসংস্কারে'র জন্য ইংরেজ সম্পূর্ণ দায়ী নয়, ফরাসীও অনেকখানি)।

এরকম ঢালাও 'জাতিবিচার' থেকে ঐ যে ধারকর্জ দেনেওলা আমাদের নিরীহ কলকাত্তাই পাঠানও (চলতি ভাষায় কাবুলীওয়ালা) মুক্ত নয়। আমাদের

পার্ক সার্কাসের বাড়িতে আসতো দুই ঈদের দিনে এক পাঠান। একবার কথায় কথায় বললে, 'আপকা কলকাত্তা শহরমে বহুৎ আচ্ছা আলু' চান্না হোতা হৈ।' আমরা তো অবাক—কলকাতা শহরের রাস্তার উপর যত লক্ষ লক্ষ গভীর গর্ত থাক না কেন কোনোটাতেই তো আজ অবধি আলু বা চানা ফলতে দেখিনি—সরকারের 'অধিক ফসল ফলাও' কান ঝালাপালা-করা প্রপাগাণ্ডা সত্ত্বেও! পাঠান ফের বললে, 'ঘর ঘর মেঁ।' আমরা তো আরো সাত হাত পানীমেঁ। শেষটায় বোঝা গেল পাঠান 'আলু চান্না' বলতে 'আলোচনা' বোঝাতে চেয়েছিল।

পাঠানের এই ঢালাও জাতিবিচার কিন্তু এ-স্থলে ভুল নয়। রকবাজি আড্ডা-বাজিতে কলকাত্তাইয়া এখনো অলিম্পিকের গোল্ড মেডেল ধারণ করে। এই যে হালে আমরা নিউজীল্যাণ্ডের সঙ্গে ক্রিকেট "খেললুম" ঠিক তার উল্টোটি। ক্রিকেটের সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলতে হলে আমাদের রক-আড্ডাবাজির টিমে আছেন চারটে রণজী, তিনটে ব্রাডম্যান, দুটো লারউড, একটা নিসার আর গুগ্‌লির জন্য ঐ একটা বসান্‌কে। তা সে-কথা থাক। পাঠান বাস করে খাঁটি বাঙালী পাড়ায়—সাম্‌বাজারে। রাস্তার পর রাস্তা পেরুতে পেরুতে সুবোশাম নিত্যি নিত্যি দু-পাশে দেখে রকের পর রক—মহাসভা, কানে যায় আলু চান্না।

কিন্তু পাঠানের দ্বিতীয় জাতবিচারটা একদম ভুল বেরুলো। বললে, 'কলকত্তেমে বহুৎ অচ্ছী ফার্সী বোলী জাতী—হর্ রাস্তে পর।' বলে কী? আলু আর চানা তবু না হয় বুঝি; হয়তো বা পাঠান কলকাতার মুদীর দোকানে ঐ দুই বস্তু অত্যুত্তম সরেস জাতের পেয়েছিল। কিন্তু কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় "অচ্ছী ফার্সী" বলা হয় এটা কেমনতর? পাঠান বোঝালে, দিনে অন্তত একশ' বার সে শুনতে পায় বহু কণ্ঠে, কিন্তু সর্বদাই অনবদ্য ফার্সী উচ্চারণে "ব্‌-তালাশে বক্রী"। এ-স্থলে বাঙালী পাঠককে বোঝাই "ব্‌" = with এবং for (যেমন ব্‌ কলমে-বকলমে শেখ ফিরোজ, বা ব্‌হাল = বহাল তবিয়ৎ, ব্‌মল = বমাল গ্রেফতার) "তালাশ" = তল্লাসী; এবং "বক্রী" = ছাগল। অর্থাৎ কোনো লোক বক্রীর তল্লাসীতে (for বক্রী) বেরিয়েছে।

এ কি কথা! আমরা তো কখনো শুনিনি।

এমন সময় বাইরে ফেরিওয়ালার হাঁক শোনা গেল। পাঠান লম্ফ দিয়ে সোল্লাসে বললে, ঐ তো বলছে ব্‌-তালাশে বক্রী।"

ওমা! ইয়াল্লা! ও হরি! ফেরিওলা চেঁচাচ্ছে "বোতল আছে বিক্রি!"

তাই বলছিলুম, এস্থলে পাঠানের জাতবিচারে ভুল হয়ে গেল।

এগুলোর নিষ্পত্তি তো সহজেই হয়ে গেল কিন্তু অন্যগুলোর বেলা? যেমন মনে করুন, লোকে বলে ফ্রান্সের লোক অসচ্চরিত্র। এবং সেই সূত্রে বহু বহু চুটকিলা প্রচলিত আছে। তারই একটি:

এক ফরাসী নিমন্ত্রিত হয়েছে এক মার্কিন পরিবারে। বিস্তর হইহুল্লোড়। ফরাসী সঠিক বুঝতে পারেনি পরবটা কিসের। পাশে বসেছিল এক মার্কিন। তাকে কানে কানে শুধোলো, 'ব্যাপারটা কি?' মার্কিন বুঝিয়ে বললে, 'ঐ যে দেখতে পাচ্ছেন বুড়ো-বুড়ী—এঁরা পঞ্চাশ বৎসর সুখে সহবাস করার পর আজ তাঁদের "বিবাহের সুবর্ণজয়ন্তী" পালন করছেন।' ফরাসী বললে, 'অ বুঝেছি। এঁরা পঞ্চাশ বছর সহবাস করার পর এই এখন বিয়ে করতে যাচ্ছেন।' তারপর খানেকক্ষণ ঘাড় চুলকে বললো, 'তা—তা ঐ নিয়ে এত তুলকালাম কাণ্ড কেন? আমরা তো আকছারই করে থাকি।'

পাঠানের গল্প যে-রকম "জাতিবিচারে"র ব্যাপারে পরখ করা গেল, এখানে তো তা করা যাচ্ছে না। তবে কি সত্যিই হুদো হুদো ফরাসী ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর সহবাস করার পর বিয়ে করে? প্রধানত জারজ সন্তানদের আইনত সন্তানরূপে স্বীকৃতি দেবার জন্যে?

কিন্তু এ-বিষয়ে ফরাসীদের নিয়েই এ-গল্পটা তৈরী হল কেন?

আমরা একটি সত্য ঘটনা জানি, এবং সেটা অস্ট্রিয়া দেশের ব্যাপার।

জনৈক অস্ট্রিয়ার লোক, যোহান গেওর্গ হিটলার যখন একটি 'কুমারী'কে বিয়ে করলেন, তখন সেই 'কুমারী'র একটি পাঁচ বছর বয়সের ছেলে ছিল। বিয়ের পাঁচ বছর পর ঐ মহিলার মৃত্যু হয়। সঙ্গে সঙ্গে যোহান হিটলার অস্ট্রিয়া থেকে অন্তর্ধান করলেন। তার সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পর তিনি আবার ফিরে এলেন মাতৃভূমিতে এবং একজন উকিল ও দু'জন সাক্ষীর সামনে শপথ নিয়ে বললেন, তাঁর বিয়ের পাঁচ বছর পূর্বে ঐ যে সন্তান জন্মেছিল সে তাঁরই ঔরসের সন্তান।

এই লোকটিই জর্মনীর ফুরার আডলফ হিটলারের পিতা।*

এতক্ষণ ধরে আমি শুধু পটভূমি নির্মাণ করেছিলুম। এইবারে দেখি, সেয়ানা পাঠক, তোমার পেটে এলেম কতখানি।

মার্কিনরা চাঁদে গেছে শুনে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের আত্মসম্মানবোধ

*W. Shirer; Aufsteg unid Fall in S. W. পৃষ্ঠা ৭।

হুঙ্কার দিয়ে বললে, 'ভারতীয়েরাও যাবে।' কিন্তু শ্রীযুত সত্যেন বসু এ-বাবদে উদাসীন। তাই কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুলো, 'চাঁদে যাঁরা যেতে চান তাঁরা আবেদন করুন।' বিস্তর দরখাস্ত এল। শেষ পর্যন্ত মাত্র তিনজনকে ইণ্টারভ্যুর জন্য ডাকা হল, একজন বাঙালী, বাকি দু'জন ভিন্ন প্রদেশের।

যে-কর্তা ইণ্টারভ্যু নিচ্ছিলেন তিনি প্রথম ডেকে পাঠালেন বাঙালীকে। শুধোলেন, 'চাঁদে যাওয়ার জন্য কত টাকা চান?'

'পাঁচ লাখ।'

'অত কেন?'

'এজ্ঞে, বুড়ো মা বাপ রয়েছেন। বোনটির বিয়ে দিতে হবে। দু'টো ছোট ভাই ইস্কুলে যায়। বিধবা পিসিও রয়েছেন। চাঁদ থেকে ফিরে না আসতে পারলে ঐ টাকাতেই তাদের চলে যাবে।'

কর্তা: 'আচ্ছা, পরে জানাবো।'

তার পর ডাকা হল দ্বিতীয় জনকে। সে-প্রদেশের লোক একটু ফুর্তিফার্তি করতে ভালোবাসে। বললে, 'দশ লাখ।'

কর্তা: 'অত কেন?'

'হানজী পাঁচ লাখ দিয়ে মদ্যপানাদি, কাবারে গমন, হেঁ হেঁ—রমণীসঙ্গ ইত্যাদি ইত্যাদি। ফিরে তো নাও আসতে পারি; তাই সর্বশেষ শখটখ। বাকি পাঁচ লাখ রেখে যাবো বুড়ো মা, বাপ, অবিবাহিত, ভগ্নী, দুই ভাই, বিধবা পিসির জন্য!'

কর্তা: 'আচ্ছা, পরে জানাবো।'

এরপর এলেন তৃতীয় এক প্রদেশের লোক। ইনি চাইলেন পনেরো লাখ।

কর্তা তাজ্জব মেনে বললেন, 'অত বেশী কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি ডাইনে-বাঁয়ে দরজার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে ফিসফিস করে বললে—

"বাবুজী, পনেরো লাখের পাঁচ লাখ তো তোমার। পাঁচ লাখ আমার। আর বাকি পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে ঐ ব্যাটা বাঙালীকে চাঁদে পাঠিয়ে দেব।"

এই বারে পাঠক, বের করো তো, দোসরা আর তেসরা ওমেদার কোন্ কোন্ প্রদেশের লোক? কিন্তু সাবধান! "প্রকাশককে" এ-বাবদে চিঠি দেবে না। তিনি ছাপাবেন না। আমাকেও লিখবে না। আম্মো উত্তর দেব না।

নট গিলটি

সর্বপ্রথম যেদিন আমার লেখা ছাপাতে বেরুলো তার কয়েক দিন পরই 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা'র সম্পাদক মহাশয় আমাকে একখানি চিঠি রিডাইরেক্ট করে পাঠালেন। চিঠিখানা আমার উদ্দেশে লেখা। পত্রলেখক আমার ঠিকানা জানেন না বলে সেটি সম্পাদকের C/o করে লিখেছেন। এইটেই বিচক্ষণের লক্ষণ। এবং বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা-সঞ্চিত আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিবলে, যে-সব স্পর্শকাতর পাঠকপাঠিকা কারো কোনো লেখা পড়ে মুগ্ধ হন, বিরক্ত হন বা বিচলিত হন তাঁরা যেন তাঁদের মানসিক, হার্দিক প্রতিক্রিয়া সম্পাদকের মারফতে লেখকের কাছে পাঠান। এবারে বাকিটা বলছি।

প্রথম গোটা পাঁচেক চিঠি তো আমাকে অভিনন্দন জানালে। তার ধরন অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন। কোনো কোনো পত্রলেখক আমাকে সবিনয়, সসম্মান, সশ্রদ্ধ আনন্দাভিবাদন জানালে, আর কোনো কোনো লেখক আমার পিঠ চাপড়ে মুরুব্বীয়ানা মোগলাই কণ্ঠে বললেন, 'বেশ লিখেছিস ছোঁড়া, খাসা লিখেছিস। লেগে থাক্। আখেরে টু পাইস্ কামাতেও পারবি।'

দ্বিতীয় পক্ষের মুরুব্বীয়ানা আমাকে ঈষৎ বিরক্ত করেছিল, সে-কথা আমি অস্বীকার করবো না। কিন্তু সেটা ক্ষণতরে। কারণ, আমি কাগজে লেখা আরম্ভ করি, বিয়াল্লিশ বছর বয়সে। ততদিনে বাস্তব জীবনে নানা প্রকারের চড়-চাপাটি খেয়ে খেয়ে আমার দেহে তখন দিব্য একখানা গণ্ডারের চামড়া তৈরি হয়ে গিয়েছে। বিস্তর মুরুব্বী এতদিন ধরে, আমার কর্মজীবনে আমার পিঠ চাপড়ে আমাকে এন্তের সদুপদেশ দিয়েছেন। কই? আমি তো তখন চটিনি। অবশ্য এনারা উপদেশ দিয়েছিলেন বাচনিক; উপস্থিত যে-সব ঐ-জাতীয় মুরুব্বীয়ানার চিঠি আসছে সেগুলো 'লেখনিক'।

তাতে কীই বা যায় আসে!

কিন্তু আমার মনে তখন প্রশ্ন জাগলো, এ-সব তাবৎ ব্যক্তিগত চিঠির প্রত্যেকটির উত্তর আমাকে স্বহস্তে লিখতে হবে কি না?

তা হলেই তো হয়েছে! কতখানি সময়, শক্তিক্ষয়, ডাকটিকিটের ব্যয়, কে জানে?

আমার টাইপরাইটার আছে। আমি অবশ্যই আধ ঘণ্টার ভিতর খান তিরিশেক কার্বন কপি তৈরি করতে পারি। তার বক্তব্য হবে 'Many

thanks for your good wishes.'

উঁহু। হল না।

যাঁরা চিঠি লিখেছেন তাঁরা সাহিত্যরসিক-রসিকা। তাঁরা চান, সাহিত্যিক উত্তর। লন্‌ড্রির চিঠিতে প্রশ্ন, 'আপনার অত অত নম্বরের জামাকাপড় ছাড়াচ্ছেন না কেন?' আপনি তখন ঐ গদ্যময় বেরসিক ভাষায়ই উত্তর দেবেন। কিন্তু এনারা তো সাহিত্যিক উত্তর চান।

ইতিমধ্যে আরেকখানি মোলায়েম চিঠি। তার বক্তব্য, মোটামুটি যা মনে আসছে, কারণ চিঠিখানা আমার বউ পুড়িয়ে ফেলেছেন:

'মহাশয়, আমার মনের গভীরতম কথাটি আপনি কী মরমিয়া ভাষায়ই না প্রকাশ করেছেন!' ইত্যাদি ইত্যাদি প্রায় তিন পাতা জুড়ে। পড়ে আমিও রোমাঞ্চিত হলুম। লেখিকাকে মনে মনে সুক্‌রিয়া জানালুম।

কিন্তু ইয়াল্লা! আমি খেজুর গাছের শেষ আড়াই হাতের দিকে আদৌ খেয়াল করিনি। কিংবা বলতে পারেন, বন থেকে বেরুবার পূর্বেই হর্ষধ্বনি করে বসে আছি।

চিঠির সর্বশেষে আছে, 'আমি পঞ্চদশী। এ-চিঠির উত্তর আপনাকে স্বহস্তে দিতেই হবে!' এবং তার পরেই, সর্বশেষে মোক্ষম কথা: "এখন থেকে আমি পিওনের পদধ্বনি প্রতীক্ষায় প্রহর গুনব।'

সর্বনাশ, এ-স্থলে আপনি কি করবেন? আরবী ভাষায় প্রবাদ আছে: 'অল-ইন্‌তিজারু আশাদ্দু মিনাল্ মউৎ।' অর্থাৎ 'প্রতীক্ষা করাটা (ইন্‌তিজার) মৃত্যু চেয়েও কঠোরতর।

অনেক ভেবেচিন্তে একটি হ্রস্ব চিঠি লিখে পত্রলেখিকাকে ধন্যবাদ জানালুম এবং সর্বশেষে একটা অতি সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিলুম যে, আমার বয়স বাড়তির দিকে, শক্তি কমতির দিকে, অতএব চিঠিচাপাটি লেখা বাবদে আমাকে যেন একটু সদয় নিষ্কৃতি দেওয়া হয়—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর কি হল? আমি আশা করেছিলুম, এখানেই শেষ। মূর্খ আমি, জানতুম না, এইখানেই আরম্ভ।

দিন পনেরো পর ঐ 'পঞ্চদশী'র পাড়া থেকে এল আরো পাঁচখানা চিঠি! সব ক'টা চিঠি যে একই পাড়া থেকে, সেটা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আমাকে ব্যোমকেশ-হোম্‌স্ হতে হয়নি। মসজিদবাড়ি পাড়া, কলকাতা-৬ আমার বিলক্ষণ চেনা।

স্পষ্ট বোঝা গেল, পঞ্চদশীটি আমার চিঠিখানা তাঁর পাড়ার তাবৎ বান্ধবীকে দেখিয়েছেন।

এ-স্থলে পাঠকদের কাছে আমার একটি অতিশয় ক্ষুদ্র আরজী আছে। এবং সেটি যদি তাঁরা মঞ্জুর না করেন তবে আমি সত্য সত্যই মর্মাহত হব। এটা কথার কথা নয়, হৃদয়ের কথা। আমি জানি, আমি মোকা-বেমোকায় ঠাট্টা-মস্করা করি, কিন্তু আমার এ-আরজী মোটেই মস্করা-রসিকতা নয়—সিরিয়াস। আমার নিবেদন :

এই যে এতক্ষণ ধরে আমি আমাকে লেখা চিঠিপত্র নিয়ে যে আলোচনা করেছি সেটা আমার মূল্য বাড়াবার জন্য নয়।

আমি আল্লা মানি। আল্লার কসম খেয়ে এ-কথা বলছি।

আপনারা তারাশঙ্করাদি প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের শুধোন—মিথ্যা বিনয় নয়, আমি তো ওঁদের অনেক পিছনে—তাঁরা কত না কত রঙের কত ঢঙের, কত না কল্পনাতীত জায়গা থেকে, কত না অবিশ্বাস্য ধরনের চিঠি পান।

ওঁরা যত চিঠি পান, তার শতাংশের একাংশও আমি পাই না।

এখানে এসে আমাকে আরেকটি কথা বেশ জোর গলায় বলতে হবে।

অদ্যাবধি কী দেশে, কী বিদেশে আমি একটি লেখকও পাইনি যিনি অপরিচিত পাঠকের স্বতঃপ্রবৃত্ত পত্র পেয়ে আনন্দিত হন না। এমন কি কড়া চিঠি পেয়েও লেখকরা খুব একটা বিমুখ হন না। তবে এ ধরনের চিঠি আসে কমই। কারণ স্বয়ং কবিগুরু বলেছেন,

"আমার মতে জগৎটাতে
ভালোটারই প্রাধান্য,—
মন্দ যদি তিন-চল্লিশ
ভালোর সংখ্যা সাতান্ন।"

তবে লেখককুল 'তিন-চল্লিশ'-খানা 'মন্দ' চিঠি পান না, পান তার চেয়ে ঢের ঢের কম। তবে অন্য 'মন্দ' চিঠিগুলো যায় কোথায়? সেগুলো যায় সোজা সম্পাদক মহাশয়ের নামে। সেগুলোতে থাকে নানা প্রকারের প্রতিবাদ, মন্দ-মধুর সমালোচনা বা তীব্র কঠোর মন্তব্য। সম্পাদক আপন দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন বলে কোনোটা ছাপান, কোনোটা ছাপান না।

এই ব্যবস্থাই উত্তম। বুঝিয়ে বলি :

আপনি আমাকে সরাসুরি চিঠি লিখলেন (সম্পাদক মহাশয়কে না), 'মহাশয়, আপনার শহ্‌র্‌-ইয়ার নিতান্তই কাল্পনিক রচনা। এ-রকম মুসলমান মেয়ে বাঙলা-দেশে সম্পূর্ণ অসম্ভব।' তারপর আপনি সুচারুরূপে আপন অভিজ্ঞতাপ্রসূত সম্পদ যুক্তিযুক্তভাবে প্রকাশ করলেন।

এ-স্থলে আমি করি কি ?

আপনি এ-স্থলে বলেছেন, 'তুমি, আলী, অপরাধী !'

এ-স্থলে চিন্তা করুন তো, কোন্ অপরাধী সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, আমি অপরাধী, স্যর !—গিল্‌টি, মিলাট্ (মাই লর্ড) !'

ব্যাপার যদি এতই সরল হবে তবে তো আদালতের শতকরা নব্বুইটি মোকদ্দমা সঙ্গে সঙ্গে ফৈসালা হয়ে যেত।

কিন্তু আমি "নট্ গিলটি" বললেই তো অনুযোগকারী পত্রলেখক (প্রসিকিউশন, ফরিয়াদী) সঙ্গে সঙ্গে সেটা মেনে নেবেন না।

তাই পুনরায় প্রশ্ন, এ-স্থলে আমি করি কি ?

এইবারে আমি আমার মোদ্দা কথাতে এসে গিয়েছি।

পত্রলেখক যদি তাঁর অনুযোগ আমাকে সরাসরি না লিখে সম্পাদক মশাইকে জানাতেন, তবে আমি বেঁচে যেতুম। সম্পাদক মশাই না ছাপালে তো ল্যাঠাই চুকে যেত। অর্থাৎ মোকদ্দমা আদৌ আদালতে উঠলো না।

কিন্তু তিনি ছাপালেও আমি খুশী। কারণ, তখন যাঁরা এ-বাবদে ভিন্ন মত পোষণ করেন তাঁরা আমার পক্ষ নিয়ে সাক্ষ্য দেবেন। ভূরি ভূরি প্রমাণ পেশ করবেন যে, শহ্‌র্-ইয়ার আদৌ কাল্পনিক নয়।

আমার মনে হয়, এই পন্থাই (প্রসিডিয়র) সর্বোত্তম।

এ-বাবদ ভবিষ্যতেও লেখার আশা পোষণ করি।

ইতিমধ্যে, দোহাই পাঠক, তুমি আদৌ ভেবো না, আমি সরাসরি চিঠি পেতে আদপেই পছন্দ করি না। খুব পছন্দ করি, বিলক্ষণ পছন্দ করি।

কিন্তু সেগুলোর উত্তর দেওয়াটা যে বড়—॥

ব্রেন-ড্রেন

যাঁরা এদেশে গবেষণা করার সুযোগ পান না, তাঁদের অনেকেই ইংলণ্ডে চলে যান। আবার বিলিতি খবরের কাগজে প্রায়ই দেখতে পাবেন, সেখানেও ওই একই ব্যাপার ; মেধাবী বৈজ্ঞানিক তার জুতো থেকে ইংলণ্ডের ধুলো ঝেড়ে ফেলে মার্কিন মুল্লুকে চলে যায়। সেখানে বেশী মাইনে তো পাবেই, এবং তার চেয়েও বড় কথা, সেখানে গবেষণা করার জন্য পাবে আশাতিরিক্ত অর্থানুকূল্য। অধুনা

'গৌরীসেন' মার্কিন সিটিজেন্‌শিপ গ্রহণ করে সেখানেই ডলার ঢালেন।...জর্মন কাগজেও মাঝে মাঝে দেখতে পাই, ওদের তরুণ বৈজ্ঞানিকদেরও কিছু কিছু মার্কিন-মক্কায় চলে যাচ্ছে।

থাকি মফস্বলে। কলকাতায় পৌঁছলুম ল্যাটে। তবু দেখি, পাড়ায় ঝাণ্ডুতম রক খুরানা সায়েবের মার্কিন নাগরিকতা গ্রহণ নিয়ে সরগরম, মালুম হল, মতভেদ ক্ষুরস্য ধারার ন্যায় সুতীক্ষ্ণ। রকের খলিফে-বেঞ্চ বলছেন, যে-যেখানে কাজের সুযোগ পাবে, সে সেখানে যাবে—বাংলা কথা। পক্ষান্তরে তালেবর-বেঞ্চ যুক্তিতর্ক সহ সপ্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, 'খুরানা মহাশয়ের উচিত ছিল দেশে থেকে দেশের সেবা করা। এবং উচিত-অনুচিতের কথাই যখন উঠলো তখন বলতে হবে এদেশের কর্তৃপক্ষই পয়লা নম্বরের আসামী। নিজেরা তো কিছু করবেনই না, যারা করতে চায় তাদেরও কিছু করতে দেবেন না। একেবারে ডগ অ্যানড দি ম্যানেজার—'

তালেবর পক্ষেরই এক ব্যাক-বেঞ্চার ক্ষীণকণ্ঠে শুধোলো, প্রবাদটা কি 'ডগ অ্যানড দি মেইনজার—' নয়?

'আলবৎ নয়। এখন এঁরা সব ম্যানেজার!'

এরপর কর্তাদের নিয়ে আরম্ভ হল কটুকাটব্য। আমি প্রাচীন যুগের লোক—ডাইনে বাঁয়ে চট করে একবার তাকিয়ে নিলুম। টেগার্ট সায়েবের প্রেতাত্মা আবার কোথাও পঞ্চভূত ধারণ করেননি তো!

খলিফে পক্ষের এক চাঁই মাথা দুলোতে দুলোতে বললেন, 'সেই কথাই তো হচ্ছে। কাজ করতেও দেবে না। তবে শোনো, আমাদেরই এক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নীতি—যদিও সেটা তারা স্পষ্ট ভাষায় বলেন না—ভিন্ন রাষ্ট্রের কাউকে আপন রাষ্ট্রে চাকরি দেবেন না। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো এক সাবজেক্টে ঝাড়া বিশটি বছর ধরে কেউ মাস্টার্স ডিগ্রীতে ফার্স্ট ক্লাস পায়নি। বুড়ো-হাবড়া অধ্যাপকরা রিটায়ার করতে চান না। ওদিকে পোস্ট গ্রাজুয়েটে কাউকে লেকচারার তক নেবেন না—যদি ফার্স্ট ক্লাসের 'হরিন্নাম' তার সর্বাঙ্গে ছাপা না থাকে। এদিকে চন্দনের বাটিটি বিশটি বচ্ছর ধরে তাঁরা ঝুলিতে লুকিয়ে রেখেছেন সযত্নে। শুধোলে অবশ্য বলেন, 'ঘোর কলিকাল মোশয়, ঘোর কলি-কাল। পাষণ্ড, পাষণ্ড, পাষণ্ডের পাল। অধ্যয়নে কি এঁদের কোনো প্রকারের আসক্তি আছে? পড়েননি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থানের প্রতিবেদন?—স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে "ছাত্রসমাজে, বিশেষ করে ছাত্রসমাজে, মদ্যাদি সেবন দ্রুতগতিতে শনৈঃ শনৈঃ বর্ধমান!"—এদের গায়ে কাটবো হরিন্নামের ছাপ! মাথা খারাপ!'

খলিফে পক্ষের আরেক 'খাজা' বললেন, 'বিলক্ষণ! ভাল্লুকের সব্বাঙ্গে লোম। এম-এর তেড়ি কাটবে কোথা?'

প্রথম চাঁই সোল্লাসে বললেন, 'বিলকুল! যে দেশের মেস্টার পুত্রবৎ ছাত্রকে স্নাতকোত্তর করতে চায় না, সে দেবে তাকে রিসার্চ করতে! ঐ আনন্দেই থাকো।'

খলিফের খাজা বললেন, 'যথা, পিতার প্রেতাত্মা দাবড়ে বেড়াবেন বিশ্বময়, কিন্তু পুত্রকে দেবেন না—এস্তেক পিণ্ড-দাদনখানে—পিণ্ড দিয়ে অশৌচ সমাপ্তি করতে।'

তালেবর বেঞ্চ ঢিড্ খেয়ে যাবার খাবি খাচ্ছে দেখে তাদের এক ঝানু তখন 'ফীলিঙে'র শরণাপন্ন হলেন।

এস্থলে আমাকে একটু বুঝিয়ে বলতে হয়। দরদ, সহানুভূতি, সমবেদনা, সহব্যথা, হৃদয়বেদনা এ-শব্দগুলো বড্ডই মোলায়েম মরমিয়া। অপিচ 'ফীলিঙ' কথাটার 'ফ' হরফে কট্টর জোর দিয়ে (অবশ্যই ইংরাজী 'F'-এর মতো উচ্চারণ না করে) শব্দটা বললে তবেই না গভীর ভাবানুভূতির খানিকটে প্রকাশ পায়![১]

সেই 'ফ' উচ্চারণ করে ঝানু-তালেবর ভাবাবেগে বললেন, 'pfi-লিঙ নেই, pfi-লিঙ নেই, সব ফলানা ফলানা খুরানাদের কারোরই ফীলিঙ নেই দেশের প্রতি। দেশে বসে কি রিসার্চ করা যায়—'

কথা শেষ না হতেই খলিফে পক্ষের আরেক গুণীন্ মিনমিনিয়ে বললেন, 'নৌকোতে বসে কি গুণ টানা যায় না!'

ওই পক্ষের আরেক জাঁহাবাজ বললেন, 'কিংবা মাতৃগর্ভে শুয়ে শুয়ে দেশভ্রমণ!'

এইবারে রকের বারোয়ারি 'মামা' মুখ খুললেন। ইনি আমাদের রকের প্রেসিডেন্ট! এঁরই রকে আমরা দু-দণ্ড রসালাপ করি। কিন্তু ইনি থাকেন প্রাচীন দিনের একটি সোফাতে শুয়ে ঘরের ভিতরে। অনেকটা কবিগুরুর 'রাজা' নাটকের রাজার মতো। অবরে-সবরে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু' একটি লবজো ছাড়েন।

বললেন, 'সে রকম নিষ্ঠা থাকলে কি দেশে থেকেই রিসার্চ করা যায় না? সেইটেই হচ্ছে মোদ্দা কথা।[২]

১ অর্থাৎ 'প্রফুল্ল' শব্দ আমরা যে-ভাবে উচ্চারণ করি সে-ভাবে নয় মারওয়াড়িরা যে-তাবে 'পর-ফু (pf)-ল্ল' উচ্চারণ করেন তারই 'ফ'।

বিজ্ঞানের বেলা অর্থাৎ এপ্লায়েড সায়েন্সের বেলা, আজকাল বিস্তর যন্ত্রপাতি, মালমসলার প্রয়োজন। তার জন্য প্রচুর আয়োজন; প্রচুরতর অর্থ না থাকলে এসব হয় না। অবশ্য, এ-কথাও সত্য জগদীশচন্দ্র বসু, মার্কনি এবং আরো মেলা লোক এসব না থাকা সত্ত্বেও এস্তের কেরামতি দেখিয়ে গেছেন। কিন্তু সেসব দিন হয়তো গেছে। আজকের দিনে স্বয়ং লেওনারদো দা ভিন্‌চিও সরকারী গৌরীসেনের সাহায্য ছাড়া এটম্ বম্ বানাতে পারবেন বলে মনে হয় না।

কিন্তু পিওর সায়েন্স? পিওর ফিজিক্স, ম্যাথ্‌মিটিক্স,—আরো বিস্তর বিষয়-বস্তু আছে যার জন্যে কোনোই যন্ত্রপাতি টাকা-পয়সার প্রয়োজন হয় না—সে-গুলোর বেলা কি? তা হলে শোন, একটা গল্প বলি, সত্যি-মিথ্যে জানি নে, বাবা! একদা কালিফর্‌নিয়ায় এক বিরাট ইন্‌স্টিটুটে বিরাটতর টেলিস্কোপ লাগানো উপলক্ষে মাদাম আইনস্টাইনকে নিমন্ত্রণ করা হয়। সরলা মাদাম সেই দানবপ্রমাণ যন্ত্রটা দেখে তো একেবারে স্তম্ভিত।

'যেহোভার দোহাই!' প্রায় চীৎকার করে উঠলেন মাদাম: 'এ যন্তরটা লাগে কোন্ কাজে?'

বড় কর্তা হাত কচলাতে কচলাতে খুশিতে ফাটোফাটো হয়ে বললেন, 'মাদাম, এই যে বিরাট ব্রহ্মাণ্ড তার পরিপূর্ণ স্বরূপ (Gestalt) হৃদয়ঙ্গম করার জন্য এটি অপরিহার্য। এ বাবদে আপনার স্বামী, আমাদের গুরুর অবদানও তো হেঁ, হেঁ—।'

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে মাদাম বললেন, 'সে কি! আমার কর্তা তো ওয়েস্ট পেপার বাসকেট থেকে একটা পুরোনো খাম তুলে নিয়ে তার উল্টো পিঠে এসব করে থাকেন।'

'তবেই দেখো, হয়ও অনেক কিছুই যন্ত্রপাতি ছাড়াও।'

কিন্তু এসব বাদ দাও এবং চিন্তা করো, দর্শন, ন্যায়, ইতিহাস, প্রাচ্যতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, অলঙ্কার, শব্দতত্ত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি এস্তের এস্তের সবজেক্ট রয়েছে যার জন্য কোনো ক্ষুদে গৌরীসেনেরও প্রয়োজন হয় না।

মামা দম নিয়ে বললেন, 'এবারে বাবারা বলো, তোমরা তো অনেক সবজেক্টে অনেক পাস দিয়েছ; গত তিরিশ বছরে এই পুণ্য বঙ্গভূমিতে কোন্ কোন্ মহাপ্রভুর দর্শন ইত্যাদি সবজেক্ট গবেষণার বিশল্যকরণী সমেত গন্ধমাদন উত্তোলন করে ভুবন "ভির্খাতো" হয়েছেন? বাঙলাদেশের কথা বিশেষ করে বলুন, কারণ একদা এদেশ হিন্দুস্থানের লীডার ছিল।'

মামার চোখে-মুখে ব্যঙ্গভরা বেদনা।

এইবারে আমি মুখ খোলার একটু মোকা পেয়ে বললুম, 'তা মামু-সায়েব—রিসার্চের জন্য কড়ি লাগুক আর নাই লাগুক, যে লোকটা রিসার্চ করবে তার পেটে, তার সমাজের আর পাঁচজনের পেটে যদি দুমুঠো অন্ন না থাকে তবে কি রিসার্চ হয়? আজ এই কলকাতা শহরে আর সকলের পেটেই অন্ন আছে—নেই শুধু বাঙালীর।

মামা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, যেন আপন মনে বিড়বিড় করে—'১৮২০ থেকে ১৯২০। ঐ সময়টায় কলকাতায় বাঙালী সচ্ছল ছিল। যা-কিছু করেছে ঐ সময়েই করেছে। আজকের দিনে দু-পাঁচটা প্রফেসরের দু-মুঠো অন্ন জোটে, এ-কথা সত্যি। কিন্তু তার আর পাঁচটা ভাইবেরাদর, মোদ্দা কথা তার গোটা সমাজ (Gestalt) যদি নিরন্ন হয় তবে এই দু-পাঁচটা প্রফেসরও কোনো কিছু দেখাবার মতো করে উঠতে পারে না। সী-লেভেল থেকে আচমকা এভারেস্ট মাথা উঁচু করে খাড়া হয় না; তবে লেভেল অর্থাৎ তার সমাজ অনেকখানি উঁচু না হলে সে আকাশচুম্বী হবে কী করে?'

আস্তে আস্তে মামা চোখ খুললেন। কড়া গলায় বললেন, '১৮২০ থেকে ১৯০০ কিংবা ১৯২০ পর্যন্ত কলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য—আর ঐটেই তো সমাজের সচ্ছলতা আনে—কাদের হাত থেকে কাদের হাতে গেল সেইটে একটু খুঁজে দেখ তো।' হেসে বললেন, 'ঐ নিয়ে একটা রিসার্চ কর না।'

বনে ভূত না মনে ভূত

আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, দেশ-বিদেশে তো অনেক ঘুরলেন, বয়সও হয়েছে, অতিপ্রাকৃত অলৌকিক কিছু দেখেছেন কি? সোজা বাংলায় ভূত, প্রেত, মামদো (মানুষ মরে ভূত হয় এটা ইসলাম অস্বীকার করে কিন্তু কোনো কোনো হিন্দুর বিশ্বাস "অয়, অয় Zানতি পারো না। মুহম্মদী মানুষ—অর্থাৎ মুসলমান—মরে গিয়ে মামদো হয়—মুহম্মদী শব্দ গ্রাম্য বাংলায় হয়ে গিয়েছে "মামদো"। এস্থলে Zানতি কথাটা ঠিক ঠিক ব্যবহৃত হয়েছে—কারণ মামদো বলুন, ভূত বলুন, এনাদের তো চট করে চোখে দেখা যায় না—অতএব এনারা আছেন, ওনারাও আছেন, শুধু আমরা Zানতি পারি না) এবং অন্যান্য বিভিন্ন জাতবেজাতের ভূতের কোনো একটা আমি দেখেছি কি না?

জর্মন ভাষার দুটি শব্দ বাংলায় বেশ চালু হয়ে গিয়েছে। একটা "কিণ্ডার-গার্টেন" আরেকটা—যদিও অতখানি চালু না—"রিণ্ডারপেস্ট", পশুচিকিৎসক মাত্রই চেনেন। আরেকটি শব্দ প্রচলিত হওয়ার বড়ই প্রয়োজন—"পল্‌টারগাইস্ট"। ভূতুড়ে বাড়িতে যে দমাদ্দম ইঁটপাটকেল এবং মাঝে-মধ্যে কচুপাতায় মোড়া নোংরা বস্তুও বর্ষিত হয় সেটি করেন পল্‌টারগাইস্ট। "পল্‌টারন্" ক্রিয়ার অর্থ দুদ্দাড় দুমদাম শব্দ করা আর গাইস্ট = ইংরিজি গোস্ট (ghost)।

এর থেকে আরেকটা তত্ত্ব সুস্পষ্ট হয়। ভূত-প্রেত সম্বন্ধে দেশ-বিদেশের যেখান থেকেই হোক না কেন, কোনো গুজব, জনরব—একুনে গুজোরব—পৌঁছনো মাত্রই সরল মানুষ সঙ্গে সঙ্গে সেটা বিশ্বাস করে ফেলে এবং সেই নয়া ভূতকে অবিচারে জাতে তুলে নেয়। ইংরেজের মতো অবিশ্বাসী (অনবিলীভিং টমাস) জাতও তাই তার দুশমন জর্মন জাতের পল্‌টারগাইস্টকে আলিঙ্গন করে আপন ভাষায় স্থান দিয়েছে। বিশ্বাস না হয়, যে কোনো ইংরিজি দিকসুন্দরীর (যে সুন্দরী নারী দিক দেখিয়ে দেন, অর্থাৎ ডিক্‌শনারী) আশ্রয় গ্রহণ করে সন্দেহ ভঞ্জন করুন। প্রেতসিদ্ধ কোনো কোনো গুণিন নাকি ভূতপ্রেতকে দিয়ে অনেক কিছু কাজকর্ম করিয়ে নেন। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন তাঁর নক্‌শাতে এঁদের সম্বন্ধে সবিস্তার তাজ্জব বয়ান দিয়েছেন। কোনো কোনো পীর সাহেবও নাকি এখনো এই অলৌকিক তিলিসমাৎ দেখাতে পারেন। শীতকালে বোম্বাই আম, যে-কোনো কালে কাবুলী মেওয়া পয়দা করতে পারেন।

দুঃখের বিষয় মহাকবি গ্যোটের সেই সুন্দর কবিতাটি আমি ভুলে গিয়েছি। যদ্দূর মনে পড়ছে তাতে এক চেলা পরিপূর্ণ ভূতসিদ্ধ হওয়ার পূর্বেই উচাটন মন্ত্রে ভূতকে আবাহন জানায়। তারপর কি একটা হুকুম করে—খুব সম্ভব জল আনতে—তারপর ভূত জল আনছে তো আনছেই, জলে জলে ছয়লাপ। ওদিকে বিপদ হয়েছে কি, চেলা কিন্তু গুরুর কাছ থেকে শেষ উচাটন মন্ত্রটি যেটি দিয়ে ভূতকে ঠেকাবে, সেটি শেখার পূর্বেই চলে এসেছে। এখন বন্যার জলে ডুবে মরে আর কি !···শেষটায় কাতরকণ্ঠে সে গুরুকে স্মরণ করলো। গুরু এসে এই ভূতকে অন্য হুকুম দিলেন, 'আমি এসব চ্যাংড়াদের গুরু। প্রথমে আমার মোক্ষম হুকুম শোনো। তারপর অন্য কাজ।' এই বলে তিনি ভূতকে অন্য হুকুম দিয়ে বন্যা বন্ধ করলেন।

কিন্তু এ-বাবদে আমাদের দেশে প্রচলিত গল্পটি এর চেয়ে ঢের ঢের ভালো।

সে-গল্পের গোড়াপত্তন ঐ একই। আমাদের গল্পেও গুরুর কাছ থেকে

সম্পূর্ণ বিদ্যা আয়ত্ত করার পূর্বেই চেলা তার ভূতকে আবাহন করেছে। ভূতের সঙ্গে তার কিন্তু একটা শর্ত ছিল। ভূতকে সর্বক্ষণ কোনো-কিছু একটা কাজ দিতে হবে। সে বেকার থাকতে পারে না। কাজ না দিতে পারলে সে ওর ঘাড়টি মটকে দেবে।

অস্মদ্দেশীয় কাহিনীতে চেলা ভূতকে ডেকে বললে, 'আমার জন্য একটা রাজ-প্রাসাদ তৈরি করে দাও।' দু-মিনিট যেতে না যেতেই রাজপ্রাসাদ চোখের সামনে তৈরি। ভূত বললে, 'তার পরের হুকুম?' চেলা তো তাজ্জব। তাড়াতাড়ি বললে, 'গোটা দশেক সুন্দরী রমণী।' ভূত কটমটিয়ে তাকিয়ে বললে, 'সে তো প্রাসাদে অলরেডি রয়েছে। বুদ্ধু! হেরেম ভিন্ন প্রাসাদ হয় নাকি?' চেলা বললে, 'তা হলে প্রাসাদের সামনে একটা হ্রদ তৈরি করে দাও।' এক মিনিটে তৈরি। ভূত শুধোলে, 'তার পরের কাজ?' চেলা তখন আরো মেলাই অর্ডার দিলে। সেগুলোও ঝটপট হয়ে গেল। আর প্রতিবারেই ভূত তার কাছে এসে কটমটিয়ে তাকায়। ভাবখানা সুস্পষ্ট। কাজ না দিতে পারলে শর্তানুযায়ী তোমার ঘাড়টা মটাস করে ভাঙব। চেলা তখন পড়েছে মহাসঙ্কটে। নূতন অর্ডার আর খুঁজে পায় না। কবি গ্যোটের চেলার মতোই সে ভূত বিদায় দিতে জানে না। তখন হন্নে হয়ে, না পেরে, কবি গ্যোটেরই চেলার মতো সে তার গুরুকে স্মরণ করলে।

এইখানেই আমাদের কাহিনী গ্যোটের কাহিনীর চেয়ে ঢের সরেস।

আমাদের গুরু তাঁর প্রাচীনতার, ফার্স্ট প্রেফারেন্সের দোহাই পাড়লেন না। চেলাকে বললেন, 'ভূতকে হুকুম দাও একটা বাঁশ পুঁততে।' সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল। গুরু চেলাকে বললেন, 'এবারে ভূতকে হুকুম দাও, সে যেন ঐ বাঁশ বেয়ে উপরে ওঠে। এবং উপরে ওঠা মাত্রই যেন নিচে বেয়ে নামে। ফের উপর। ফের নিচে। ফের উপর। ফের নিচ।'

গুরু চেলাকে কানে কানে বললেন, 'ঐ করুক, ব্যাটা অন্তত কাল অবধি। অবশ্য যখন তোমার অন্য-কিছুর প্রয়োজন হয় তখন তাকে ওঠানামা ক্ষণতরে ক্ষান্ত দিয়ে সে-কাজ করতে বলবে। তারপর ফের হুকুম দেবে, ওঠো নামো, ওঠো নামো।'

কিন্তু এহ বাহ্য।

এ-গল্পের একটা গভীর অর্থ আছে।

মানুষের মন ঐ ভূতের মতো। তাকে সর্বক্ষণ কোনো কর্মে নিয়োজিত না করতে পারলে সে তোমার ঘাড় মটকাবে। ইংরাজিতে তাই প্রবাদ "অলস

মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।" অতএব যখন যা দরকার মনকে দিয়ে তাই করিয়ে নিয়ে ফের তাকে একটা বাঁশে ওঠানামার মতো মেকানিকাল কাজে লাগিয়ে দিতে হয়। মানুষ সর্বক্ষণ মনের জন্য নূতন নূতন কাজ সৃষ্টি করতে পারে না।

এইবারে, সর্বশেষে, আমি শান্তনু পাঠকের হাতে খাবো কিল।

মহাত্মাজী চরকা কাটতেন।

রবীন্দ্রনাথ আপন লেখার কপি করতেন। গোরার মতো বিরাট গ্রন্থ তিনি তিন-তিনবার কপি করেছেন। যদিও ঐ মেকানিকাল কর্ম করার জন্য আশ্রমে লোকাভাব ছিল না।

আইনস্টাইন ব্যালা বাজাতেন।

স্পাই

আশ্চর্য!

মানুষ কত সহজে বিশ্বকুখ্যাত লোককে ভুলে যায়—বিশ্ববিখ্যাত লোককে ভোলাটা মানুষের পক্ষে অবশ্যই স্বাভাবিক।

মাতা হারিকে সচরাচর পৃথিবীর লোকে পয়লা নম্বরী স্পাই খেতাব দিয়েছে কিন্তু অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, সে-খ্যাতির চৌদ্দ আনা পরিমাণ গুজোব আর কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করছে। বাকি দু-আনাও বিশ্বাসযোগ্য কিনা বলা সুকঠিন।

কিন্তু গত বিশ্বযুদ্ধের স্পাইদের রাজার রাজা রিষার্ট জর্‌গে সম্বন্ধে অনেক কিছু পাকা খবর জানা গিয়েছে। অবশ্য এ-সত্য প্রতিভাসিত যে, যে-কোনো স্পাই সম্বন্ধে সব খবর কোনোদিনই পাওয়া যায় না। স্পাই ধরা পড়ার পর তার সম্বন্ধে সব খবর যদি খুঁড়ে বের করা যায় তবে সে ওঁচা স্পাই।

কিন্তু তার পূর্বে আরেকটি কথা বলে নেই। গুপ্তচরবৃত্তি বা এসপিয়োনাজের প্রথম অলিখিত আইন, গুপ্তচর যদি বিদেশে ধরা পড়ে তবে যে-দেশের হয়ে সে কাজ করছিল সে-দেশ কিছুতেই স্বীকার করে না যে ঐ-লোক তাদের গুপ্তচর। তার কারণ, আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে এক দেশ অন্য দেশে সরকারীভাবে গুপ্তচর রাখতে পারে না—অথচ আশ্চর্য, প্রায় সব-দেশই সেটা করে থাকে।

পৃথিবীর ইতিহাসে জর্‌গে একমাত্র ব্যত্যয়। রুশের হয়ে ইনি জাপানে

সুদীর্ঘ দশ বৎসর কৃতিত্বের সঙ্গে স্পাইগিরি করে ১৯৪১-এ ধরা পড়েন এবং ১৯৪৪-এ তাঁর ফাঁসি হয়। যুদ্ধশেষে যখন তাঁর কর্মকীর্তির অনেকখানি প্রকাশ পেল তখন তাবৎ ইয়োরোপে হইচই পড়ে গেল এবং বহু ভাষায় তাঁর সম্বন্ধে বিস্তর সিরিয়াল রগরগে কেতাব, সিনেমা, নাট্য ইত্যাদি তাবৎ পূর্ব-পশ্চিমকে রোমাঞ্চিত করে তুললো। বিশেষ করে জাপানকে। কারণ এইমাত্র বলেছি তার শেষ কর্মভূমি ছিল জাপান।

এবং এই ডামাডোলের মধ্যিখানে কোথায় না রুশ তার গোরস্তানের নৈস্তব্ধ্য বজায় রেখে "নিস্তব্ধতা হিরণ্ময়"—সাইলেন্স্ ইজ গোল্ডেন—নীতি পুনরায় সপ্রমাণ করবে, উল্টে পৃথিবীর সর্ব রাজনৈতিক-ঐতিহ্য ধূলিসাৎ করে সগর্বে সদম্ভে সরকারীভাবে স্পাই জর্‌গের স্মৃতির উদ্দেশে বলশেভিক রুশ দেশের সর্বাধিপতি সর্বোচ্চ সম্মান মেডেল ইত্যাদি অর্পণ করলেন—এ-মেডেল রুশ দেশের যুদ্ধকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ বীরদেরই দেওয়া হয় মাত্র। যতদূর মনে পড়ছে তার ছবিসহ স্ট্যাম্পও বেরিয়েছিল।[১] কিন্তু হায়, সে মেডেল গ্রহণ করার জন্য জর্‌গের দারাপুত্র পরিবার কেউ ছিল না। তাঁর স্ত্রীকে তিনি বহু পূর্বেই তালাক দিয়েছিলেন—তাঁর গুপ্তচরবৃত্তিতে সম্পূর্ণ একনিষ্ঠ আত্মনিয়োগ করার জন্য। অনেকটা হিটলারের মতো। তিনিও ঐ একই কারণে আদৌ বিয়ে করেননি—করলেন, যখন তাঁর রাজনৈতিক নাট্যমঞ্চের বৃহৎ কৃষ্ণ যবনিকা নটগুরু মহাকাল কামান গর্জনের অট্ট করতালির মাঝখানে নামিয়ে দিলেন, এবং সে-বিবাহ সেই কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরালে। আত্মহত্যার পিস্তল ধ্বনি সে-বিবাহের আতশবাজীর বোমা। স্ত্রীও নাট্যমঞ্চের জুলিয়েতের মতো বিষপান করলেন।...মার্কিন খবরের কাগজের নেকড়েরা এড়ি (পূর্ব বাঙলার মুসলমানী ভাষায় তালাকপ্রাপ্তা রমণীকে এড়ি—ডিভোর্সে—এবং বিধবাকে রাড়ি বলে) জর্‌গেকে খুঁজে বের করলো। রমণী স্বল্প- তথা সত্য-ভাষিণী। তাঁর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, ন'সিকে খাঁটি স্পাইদের মতো জর্‌গে তাঁর স্ত্রীকে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে দেননি তিনি কি নিয়ে দিবারাত্র লিপ্ত থাকেন।

জর্‌গের জীবন এমনই বৈচিত্র্যময় এবং ঘটনাবহুল যে সুদ্ধমাত্র তার সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি দিতে গেলেই একখানা মিনি সাইজের মহাভারত লিখতে হয়।...আমি গুপ্তচর জর্‌গেকে নিয়ে "গুপ্ত" পদ্ধতিতে দিব্য একখানা রগরগে সিরিয়াল লিখতে পারি—যত কাঁচা ভাষা ততোধিক বেঢপ শৈলীতে লিখলেও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য-

১ কোনো ফিলাটেলিস্ট পাকা খবর জানালে বাধিত হব

বশত সেটা উৎরে যাবে নিশ্চয়ই। কিন্তু বয়স হয়েছে। আমার জীবনদুর্গে প্রাচীরের বাইরে, গভীর রাত্রে যমদূতের পদধ্বনি প্রায়ই শুনতে পাই। মাঝে মাঝে—এদানীং ক্রমেই টেম্পো বেড়ে যাচ্ছে—প্রাচীরের উপর সাহেবী কায়দায় নক্‌ও করে। এহেন অবস্থায় সিরিয়াল অসম্পূর্ণ রেখে উল্টোরথহীন রথযাত্রায় বেরুতে চাই নে—মমেকসদয় সম্পাদকমণ্ডলীকে ক্ষিপ্ত পাঠক সম্প্রদায়ের অভি-সম্পাতকুণ্ডে নিমজ্জিত করে। কাজেই সম্ভাব্য ক্ষিপ্ত পাঠকমণ্ডলীর জন্য সংক্ষিপ্ত পাঠ দিচ্ছি—সাতিশয় সংক্ষিপ্ত।[১]

দুই কারণে সোভিয়েত দেশ জর্‌গের কাছে চিরঋণী। অবশ্য রুশের আরো বহু সেবা তিনি করেছেন।

প্রথম : হিটলার রুশদের আক্রমণ করার বেশ কয়েক মাস অর্থাৎ পর্যাপ্তকাল পূর্বে জর্‌গে জাপান থেকে গোপন বেতারযোগে (বেতার যন্ত্রটি চালাতেন তাঁর এক সহ-স্পাই) স্তালিনকে খবর পাঠান, হিটলার চুক্তিভঙ্গ করে রুশ আক্রমণ করবে। শুধু তাই নয়, কোন্ মাসে, কোন্ সপ্তাহে সে খবরও পাকাপাকিভাবে জানান। আশ্চর্য, যখন খুদ জর্মনির মাত্র গুটিকয়েক ডাঙর ডাঙর জাঁদরেল জানতেন যে হিটলার রুশ আক্রমণ করার জন্য সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করছেন এবং তাঁরাও জানতেন না, কবে কোন্ মাসে হিটলার সে হামলা শুরু করবেন, তখন জর্মনি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের জাপানে বসে জর্‌গে এই পাকা খবরটি পেলেন কি করে? মনে রাখা উচিত, ১৯৩৯-এ যুদ্ধারম্ভের পর থেকে জাপান এবং জর্মনির মধ্যে কোনো যাতায়াত পথ ছিল না। (সুভাষচন্দ্র যে কতখানি বিপদের ঝুঁকি মাথায় তুলে জর্মনি থেকে জাপান পাড়ি দিয়েছিলেন সে-কথা সবাই জানেন।) সুইজারল্যাণ্ড থেকে গোপন বেতারেও—যেমন মনে করুন—খবরটা প্রথম জর্মনি থেকে নিরপেক্ষ সুইজারল্যাণ্ডে গুপ্তচর মারফৎ গেল—সেটা পাঠানো প্রায় অসম্ভব ছিল। ওরকম বেআইনী জোরদার বেতার ট্রান্সমিটার সুইস সরকার ধরে ফেলতই ফেলত। এস্থলে আরো বলি, হিটলার তাঁর যুদ্ধের প্ল্যান তাঁর দূর-মিত্র জাপানকে তো বলতেনই না, তাঁর অতিশয় নিকট-মিত্র—ভৌগোলিক ও

১ শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী-লেখকের উপকারার্থে মসলা নিবেদন। একখানা বৃহৎ ব্যাকরণ রচনা করার কয়েক বৎসর পর তিনি তারই একখানি 'সংক্ষিপ্ত' সংস্করণ প্রকাশ করেন। আমার সঙ্গে দেখা হলে পর দুষ্টু হাসি হেসে বললেন, "এটা হল 'সংক্ষিপ্ত' ব্যাকরণ ; আগেরটা ছিল 'ক্ষিপ্ত' ব্যাকরণ।"

হার্দিক উভয়ার্থে—মুসসোলিনীকেও আগেভাগে জানাতেন না। এবং জাপানে অবস্থিত জর্মন রাজ-দূতাবাসও আর-পঞ্চাশটা দেশে অবস্থিত জর্মন রাজ-দূতাবাসের মতোই যে এ-ব্যাপারের কিছুই জানতো না সে তো বহুবার বহু ক্ষেত্রে সপ্রমাণ হয়ে গেছে। হিটলার যে তাঁর ফরেন আপিস এবং তাঁর রাজদূতদের অবিশ্বাস করতেন তাই নয়, এদের রীতিমত ঘৃণা করতেন। এবং এ তত্ত্বটি হিটলার কোনোদিন গোপন রাখার কণামাত্র প্রয়োজনও বোধ করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন একমাত্র তাঁর আপন খাস প্যারা ফরেন মিনিস্টার রিবেনট্রপকে। ইনি জাতে শুঁড়ি। কূটনীতিতে তাঁর কোনো শিক্ষাদীক্ষা বা অভিজ্ঞতা ছিল না। তৎসত্ত্বেও হিটলার গদীনশীন হওয়ার সামান্য কয়েক বৎসর পর তাঁর পার্টি, ফরেন আপিস, এমন কি তাঁর দক্ষিণ হস্ত গ্যোরিঙ, বাম হস্ত গ্যোবেলস সকলের তীব্র প্রতিবাদ উপেক্ষা করে রিবেনট্রপকে দুম করে বসিয়ে দিলেন ফরেন আপিসের মাথার উপর মহামান্য পররাষ্ট্র সচিবরূপে।

জর্‌গের দ্বিতীয় অবদান : যে-রাত্রে জাপানী মন্ত্রিসভা এক অতিশয় গোপন বৈঠকে স্থির করলেন—হিটলার রুশ আক্রমণ করার পর জাপানকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান, তারা যেন রুশের পূর্বসীমান্ত আক্রমণ করে—যে তাঁরা কোনো অবস্থাতেই রুশ দেশ আক্রমণ করবেন না, তার পরদিন ভোর বেলা জর্‌গে সেই সাতিশয় গুরুত্বপূর্ণ গোপনতম সিদ্ধান্তটির খবর পেয়ে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে স্তালিনকে পূর্ব পদ্ধতিতে সংবাদটি জানান। স্তালিনের বুকের উপর থেকে জগদ্দল "জগরনট" নেমে গেল। জাপানী আক্রমণের ভয়ে পূর্ব সীমান্তে তাঁর যে-সেনাবাহিনী মোতায়েন ছিল সেটাকে তদ্দণ্ডেই পশ্চিম সীমান্তে এনে হানলেন হিটলারের উপর মোক্ষম হামলা। দুই সীমান্তে একই সঙ্গে কে লড়তে চায়? ঐ করে সর্বনাশ হল কাইজারের। হিটলারেরও আখেরে সেই গতিই হয়েছিল। রুশ বেঁচে গেল।

পত্রান্তরে বেরিয়েছে : গত ৬ই নভেম্বর পূর্ব জর্মনির পূর্ব বার্লিনের একটি রাস্তার উপর প্রাক্তন রুশ স্পাইদের একটি সম্মিলিত অনুষ্ঠান হয়—প্রকাশ্যে। রয়টার বিস্ময় প্রকাশ করেছেন : স্পাইদের সম্মেলন—তাও প্রকাশ্যে।

এঁরা সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের গুরুর গুরু জর্‌গের স্মরণে।

পঁচিশ বৎসর পূর্বে বিশ্ব কম্যুনিজমের জন্য টোকিয়োতে প্রাণ দেন।

যে রাস্তাতে তাঁরা সমবেত হন সেখানে সেনাবাহিনীর ব্রাস্‌ব্যাণ্ডের সঙ্গীত সহ রাস্তাটির নূতন নামকরণ হয়।

"রিষার্ট জর্‌গে স্ট্রাসে"।

রিষার্ট জর্গে খাঁটি জর্মন নাম। রিষার্টের পিতা ছিলেন খাঁটি জর্মন, মা রুশ। জর্গের জন্ম রুশদেশে। জাপানে থাকাকালীন জর্গে সর্বজনসমক্ষে বলতে কসুর করতেন না যে রুশের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আছে। তৎসত্ত্বে কেউ কখনো সন্দেহ করেননি যে তিনি রুশের স্পাই, অতখানি কি করে হয়। ওদিকে তাঁর মূল কর্ম ছিল জাপান সম্বন্ধে স্তালিনকে খবর দেওয়া এবং দ্বিতীয় সেই সুদূর জাপান থেকে জর্মনির আভ্যন্তরীণ গুপ্ত খবরও সংগ্রহ করে তাঁকে জানানো—কি করে তিনি সংগ্রহ করতেন সেটা প্লাঁশাটে (প্ল্যানচেটে) শার্লক হোমসকে আবাহন জানালে হয়তো জানা যেতে পারে। জর্গে ধরা পড়ার পর জাপানে প্রবাসী জর্মন-অজর্মন সবাই এক বাক্যে বলেছেন, জর্গে কস্মিন-কালেও তাদের কাছ থেকে জর্মনি সম্বন্ধে কোনো খবরাখবর পাম্প তো করতেনই না, উল্টে নয়া নয়া খবর দিয়ে তাদের পিলে চমকে দিতেন ; পরে সেগুলো কনফারমড হত।

জর্গের চেহারাটি ছিল সুন্দর এবং পুরুষত্বব্যঞ্জক। দীর্ঘ বলীয়ান দেহ। নাক চোখ ঠোঁট যেন পাথরে খোদাই অতি তীক্ষ্ণ। তাঁকে দেখে মনে হত যেন চ্যাম্পিয়ন বক্সার বিরাট কোনো মেলাতে চ্যালেঞ্জ করে বেড়াচ্ছেন, কেউ তাঁর সঙ্গে লড়তে রাজী আছে কি না—

বলেছেন এরিষ কর্ট্, জাপানে অবস্থিত জর্মন রাজ-দূতাবাসের দুই নম্বরের কর্মচারী। অবশ্য টোকিয়োতে তিনি সবাইকে চ্যালেঞ্জ করতেন তর্কযুদ্ধে এবং জিততেন হামেশাই। কারণ তাঁর তূণীর ভর্তি থাকতো তথ্যের লেটেস্ট ইন-টেলিজেন্সের শরগুচ্ছে। অর্থাৎ নেকেড্ ফ্যাক্টস।

সেই যে গল্প আছে, গ্রামাঞ্চলের দুই ইরাকী জমিদার মোকদ্দমা লড়তে লড়তে আপিল করেছেন বাগদাদের শেষ আদালতে অর্থাৎ স্বয়ং খলীফা হারুন-উর-রশীদ এর শেষ ফাইনাল বিচার করবেন। এক জমিদার বাগদাদে এসে উঠলেন তাঁর সখা বাদশার প্রধানমন্ত্রীর প্রাসাদে। প্রতিবাদী উঠলেন তাঁর বাল্যের বান্ধবী বাদশার খাস প্যারা রক্ষিতার বাড়িতে। বাদী মোকদ্দমা হেরে গ্রামে ফিরলে পর সবাই বিস্ময় মেনে শুধোলে, 'প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে উঠেও আপনি মোকদ্দমার সুরাহা করতে পারলেন না ?' তিনি বিজ্ঞজনোচিত কণ্ঠে বললেন, 'তাঁরা যে উঠে-ছিলেন রাজরক্ষিতার বাড়িতে। আমার কোনো যুক্তি কোনো নজীর দাঁড়াতে পারে "উলঙ্গ" যুক্তির বিরুদ্ধে, এগেনস্ট নেকেড আরগুমেন্ট !'

জর্গের বেশভূষা ছিল অপরিপাটি ; তিনি বাস করতেন টোকিওর সবচেয়ে

খাঁটির খাঁটি ঘিঞ্জি জাপানী মহল্লায় এবং বাড়িটা চোখে পড়ার মতো নোংরা। কিন্তু জাপানীদের আকর্ষণ করার মতো কেমন যেন একটা চুম্বকের শক্তি তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হত। তারা তাঁকে পূজো করতো বললে কমই বলা হয় ওদিকে তাঁর চালচলন ছিল ভ্যাগাবণ্ড, বেদে বা বোহেমিয়ান ধরনের। রমণী-বাজী করতেন প্রচুর এবং মদ্যপান করতেন বেহদ্দ। তিনটে বোতল হুইস্কি ঘণ্টা কয়েকের ভিতর সাবড়ে দিতেন তিনি অক্লেশে—চোখের পাতাটি না কাঁপিয়ে এবং তাঁর চোখের সেই তীক্ষ্ণ জ্যোতিটির উপর সামান্যতম ঘোলাটে পোঁছ পড়তো না।

অর্থাভাব তাঁর লেগেই থাকতো। ধরা পড়ার পর অনুসন্ধান করে জানা যায়, তাঁর আমদানি যে কোনো মাঝারি রাজ-দূতাবাসের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের মতো অতি সাধারণ। পরিষ্কার বোঝা যায়, তিনি কখনো তাঁর স্পাইবৃত্তি এক্স-প্লয়েট করেননি। তিনি স্পাই হয়েছিলেন কম্যুনিজমের প্রতি তাঁর আন্তরিক আদর্শবাদে প্রবুদ্ধ হয়ে।

জব্‌গে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন রুশ এবং জর্মনি উভয় দেশে। তাঁর স্বর্গত ঠাকুর্দা ছিলেন কার্ল মার্কসের সেক্রেটারি। শিক্ষা সমাপনান্তে, প্রথম যৌবনে, এ শতকের দ্বিতীয় দশকে তিনি পশ্চিম জর্মনিতে একটি কম্যুনিস্ট পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। অতঃপর তাঁকে তৃতীয় ইণ্টারনেশনালের বৈদেশিক গুপ্তচর বিভাগে কর্ম দিয়ে স্কানডিনেভিয়া ও পরে তুর্কীতে গুপ্তচরবৃত্তি করতে পাঠানো হয়। তুর্কীরা এসব বাবদে অসাধারণ চালাক। গন্ধ পেয়ে যায় অচিরায়। জব্‌গে কিয়ৎকাল জেল খাটলেন—তাঁর গুপ্তচরবৃত্তিতে এই একটি মাত্র কলঙ্ক; সর্বসাধারণ অবশ্য যুদ্ধশেষের অনেক পরে এসব জানতে পায়। ১৯৩০ সালে রুশ সরকারের আদেশে তাঁকে পাঠানো হয় সাংহাইয়ে। এখান থেকে আরম্ভ হয় তাঁর কৃতিত্বময় জীবন। ...জব্‌গেকে যে জাপানী কোর্ট মারশালের সামনে দাঁড়াতে হয় সে মোকদ্দমার নথিপত্র মার্কিনরা জাপান অধিকার করার পর হস্তগত করে। তার থেকে জানা যায়, জব্‌গে সাংহাইয়ে যেসব দেশী-বিদেশী কম্যুনিস্টদের সংস্পর্শে আসেন তাঁদের অন্যতম হজুমি ওসাকি নামের জনৈক জাপানী। এর পর এঁরা মস্কোর আদেশে টোকিও চলে আসেন।

প্রকাশ্যে তাঁর পেশা ছিল নাৎসি-নির্দেশচালিত (অবশ্য তখন তাবৎ জর্মন প্রেসই গ্যোবেলসের কব্জাতে) ফ্রাঙ্কফুর্টের আলগে-মাইনে ৎসাইটুঙের সংবাদদাতারূপে। তবে তাঁর অনেক প্রবন্ধই ছাপাবার মতো সাহস সম্পাদক-মণ্ডলীর ছিল না। তাঁরা সেগুলো না ছেপে চেপে যেতেন। সহকর্মীরূপে তাঁকে ক্লাউজেন নামক আরেক জর্মন গুপ্তচর দেওয়া হয়েছিল। প্রকাশ্যে

তাঁর ব্যবসা ছিল মোটর মেরামতি। ওদিকে ছিলেন সেরার সেরা রেডিয়োর ওস্তাদ। অবশ্য জাপান থেকে রুশের পূর্বতম সীমান্তে রেডিয়োবার্তা পাঠাতে জোরদার ট্রান্সমিটারের দরকার হয় না—ধরা পড়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। ক্লাউজেনও ধরা পড়েছিল কিন্তু তাঁকে জাপানীরা ফাঁসি দেয়নি; যুদ্ধশেষে রুশ দেশে ফিরে যাবার অনুমতি দেয়।

জর্‌গে যখন ধরা পড়লেন এবং সামান্যমাত্র অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়েছে তিনি বাঘা স্পাই, তখনই জাপান মন্ত্রিমণ্ডলী বিস্ময়ে হতবাক্। এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য! এইমাত্র যে জাপানী হজুমি ওসাকির নাম বললুম সে লোকটি কি করে হয়ে গিয়েছিলেন প্রিন্স কনোয়ের সাতিশয় বিশ্বাসভাজন সহকর্মী। এই কনোয়েটি যে-সে ব্যক্তি নন। একে তো জাপানের তিন-চারটি খানদানীতম ঘরের একটির প্রিন্স ডিউক, তদুপরি তিনি তিন-তিনবার জাপানের প্রধানমন্ত্রীত্ব করেছেন—এঁর আদেশেই জাপান ত্রিশক্তি চুক্তিতে যোগ দেয়, হিটলার ও মুসসোলিনীর সঙ্গে এবং এঁরই রাজত্বকালে পাকা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে—যদিও ঘোষণা করা হয় তাঁর পদত্যাগের পরে। এবারে পাঠক তারিখগুলো লক্ষ্য করবেন। ১৯৪০-এর জুলাই থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪১ পর্যন্ত (ক্যাবিনেট পুনর্গঠনের জন্য মাত্র দুটি দিন বাদ দিয়ে) কনোয়ে ছিলেন জাপানের সর্বময় কর্তা এবং হজুমি ওসাকি ছিলেন তাঁর পরম বিশ্বাসী অন্তরঙ্গজন। বলা বাহুল্য গোপন মন্ত্রণাসভার আলোচনা-সিদ্ধান্ত ওসাকি কনোয়ের কাছে পেয়ে কমরেড জর্‌গেকে গরম-গরম সরবরাহ করতেন এবং এই চোদ্দ মাসেই জাপানের এ যুগের ইতিহাসে সবচেয়ে মোক্ষম-মোক্ষম মরণ-বাঁচন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় (হিটলারের সঙ্গে দোস্তী, মার্কিনের সঙ্গে লড়াই)। একেবারে গাঁজাখুরি অবিশ্বাস্য ঠেকে যে, হিটলার-সখা কনোয়ের পরম বিশ্বাসী সহচর ছিলেন হিটলারবৈরী রুশের গুপ্তচর এবং তিনি জাপানের গোপনতম সিদ্ধান্ত স্তালিনকে পাঠাচ্ছেন হিটলারের বিনাশসাধনের জন্য। এবং হিটলার বিনষ্ট হলে যে আপন মাতৃভূমি জাপানেরও পরাজয় অবশ্যম্ভাবী সে তত্ত্বটি বোঝায় মতো এলেম নিশ্চয়ই এই ঝানু গুপ্তচরের পেটে ছিল। তিনি নাকি গুপ্তচরবৃত্তিতে তালিম পেয়েছিলেন জর্‌গের কাছ থেকে। জর্‌গে যে স্পাইদের গুরুর গুরু সে কথা তো পূর্বেই বলেছি।

১৭ অক্টোবর ১৯৪১-এ জর্‌গে গ্রেফতার হন। ঠিক তার ৩২ দিন পূর্বে কনোয়ে মন্ত্রীত্ব পদে ইস্তফা দেন। এ দুটোতে কোনো যোগসূত্র আছে কি না—আমার কাগজপত্র কেতাবাদি সে সম্বন্ধে নীরব। আমার মনে হয় পুলিস কোনো

গুপ্তচর সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া মাত্রই তাকে গ্রেপ্তার করে না। বেশ কিছু দিন তাকে অবাধে চলা-ফেরা করতে দেয়। তার সহকর্মী চরদের চিনে নেয়। তার পর এক "শুভ প্রভাতে" বিরাট খেয়াজাল ফেলে সব ক'টা মাছ ধরে। ইতিমধ্যে কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান কনোয়েকে অবশ্যই জানানো হয়েছে যে, তাঁর বিশ্বাসী ওসাকিই অশেষ পাপের পাপী পঞ্চম পাতকী / তার চেয়ে বেশী পাপী বিশ্বাসঘাতকী।

এত বড় কেলেঙ্কারির পর প্রধানমন্ত্রী থাকা যায় না। কনোয়ের রাজনৈতিক জীবন এখানেই চিরতরে খতম। ১৯৪৫-এ তিনি আত্মহত্যা করেন। কনোয়ে ছাড়া আরও বেশ কয়েকটি খানদানী উচ্চকর্মচারীকে, জর্‌গের নির্দেশে ওসাকি পারদর্শিতার সঙ্গে দিনের পর দিন পাম্প করেছিলেন।

সামসনের মতো জর্‌গে পুরো এমারৎ ধূলিসাৎ না করতে পারলেও জাপান রাষ্ট্রের ভিতে যে ফাটল ফাটিয়ে যান সেটা কখনো মেরামত হয়নি।

আধুনিকের আত্মহত্যা

১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ১৯১৪-১৮র বিশ্বযুদ্ধে যত যুবক ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ, খ্রীষ্টধর্মের ব্যর্থতা এবং স্ব স্ব আদর্শবাদ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাওয়া নিয়ে চিন্তা করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, কেন জানি নে, তার দশমাংশও করেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ যখন ইয়োরোপের ভিন্ন ভিন্ন নগর, এমন কি গ্রামাঞ্চলেও ভারতের শাশ্বত বাণী প্রচার করে বক্তৃতা দেন তখন বিশেষ করে মুগ্ধ হন তাঁরাই, যাঁরা একদা খ্রীষ্টধর্মে গভীর বিশ্বাস ধরতেন কিন্তু যুদ্ধের কল্পনাতীত বর্বরতা দেখে সে ধর্মের কার্যকারিতা অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম ইয়োরোপের খ্রীষ্টানগণকে ভদ্র মানুষে পরিবর্তিত করতে পারবে কি না, সে-বিষয়ে অত্যন্ত সন্দিহান হয়ে গিয়েছিলেন। অনেকেই নৈরাশ্যবশত সাতিশয় বিরক্তিসহ চার্চে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এমন কি তাঁদের ঈশ্বর-বিশ্বাসের দৃঢ়ভূমি পর্যন্ত যেন তাঁদের পায়ের তলা থেকে ক্রমেই শিথিল হয়ে সরে যাচ্ছিল। শুধু যুবক সম্প্রদায়ই নয়, অপেক্ষাকৃত বয়স্ক গুণীজ্ঞানী পণ্ডিতরা পর্যন্ত ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন—ভিক্টোরীয় যুগে তাঁদের যে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মনুষ্য-জাতি, বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গগণ সভ্য থেকে সভ্যতার পর্যায়ে উঠছে এবং ফলে একদিন আর এ-সংসারে দুঃখদৈন্য অনাচার-উৎপীড়ন থাকবে না সেটি লোপ পেল। বিশেষ করে যাঁরা ইতিহাসের দর্শন নিয়ে হেগেলের যুগ থেকে প্রশ্ন

করছেন যে, ইতিহাসে আমরা শুধু অসংলগ্ন, চৈতন্যহীন মূঢ় কতকগুলো ঘটনা-সমষ্টি পাই, না এর পিছনে কোনো সচেতন সত্তা ঘটনাপরম্পরাগত ক্রমবিকাশের মাধ্যমে শুধু যে মানুষকে উন্নততর এবং সভ্যতর পন্থায় নিয়ে যাচ্ছে তাই নয়, নিজেকেও সপ্রকাশ করছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অনেকেই দ্বিতীয় সমাধানটি অগ্রাহ্য করলেন, এবং অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস-দর্শনের সুপণ্ডিত অসভাল্ট স্পেঙলার তাই লিখলেন, 'য়ুরোপের সূর্যাস্ত' (ড্যার উন্টেরগাঙ ডেস্ আবেন্ট-লাণ্ডের)। বইখানার খ্যাতি সে যুগে পঞ্চমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু আমি যুবকদের কথা বলছিলুম। তাদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের বাণীর মাধ্যমে অনুভব করলো যে প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস না করেও শাশ্বত সত্য ধর্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরবিশ্বাসের উচ্চতম পর্যায়ে ওঠা যায়, এঁদের একাধিক জন তখন প্রাচ্যভূমিতে এসে স্থায়ী বসবাস নির্মাণ করতে উদ্‌গ্রীব হন।

এঁদেরই একজন মসিয়ো ফের্না বেনওয়া। রবীন্দ্রনাথ যে ক'জন ইয়োরোপীয়কে বিশ্বভারতীতে—কয়েকজনকে অন্তত সাময়িকভাবে—শিক্ষাদানের জন্য আহ্বান করেছিলেন তাঁদের সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন : যেমন লেভি, ভিন্‌টারনিৎস, তুচ্চি ইত্যাদি। খাঁটি সাহিত্যিক ছিলেন একমাত্র অধ্যাপক বেনওয়া এবং তিনি ফ্রান্সেও সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর প্রকৃত পরিচয় আমরা পাই, যখন মনীষী রমাঁ রলাঁ তাঁর জীবনের ষষ্টিতম বৎসরে পদার্পণ করার শুভলগ্নে বিশ্ববাসী গুণীজ্ঞানীগণ একখানা পুস্তক তাঁকে উৎসর্গ করেন। বইখানার নাম তাঁরা দেন লাতিনে 'লীবার আমিকরুম্'—অর্থাৎ 'সখাগণপ্রদত্ত (উৎসর্গিত) পুস্তক।' এদেশ থেকে লেখেন মহাত্মা গান্ধী, জগদীশচন্দ্র বসু ইত্যাদি। পৃথিবীর প্রায় সর্ব সভ্যদেশ থেকে কেউ না কেউ ঐ শুভলগ্নে রলাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন। আমার এখনো মনে আছে এক আরব রলাঁকে উদ্দেশ করে লিখেছিলেন, 'তুমি লৌহসম্মার্জনী দ্বারা ইয়োরোপের কুসংস্কারজঞ্জাল দূর করেছ।' বলা বাহুল্য ঐ লেখনী সঞ্চয়নে আপন রচনা দিয়ে শ্লাঘাপ্রাপ্তির জন্য যখন সর্ব বিশ্বের সহস্র সহস্র গুণীজ্ঞানী উদ্‌গ্রীব, তখন প্যারিস থেকে সসম্মানে আমন্ত্রণ জানানো হল অধ্যাপক বেনওয়াকে, তাঁর রচনার জন্য। তিনি তাঁর স্বাভাবিক বিনয়বশতঃ আশ্রমের কাউকে কিছু বলেননি, কিন্তু ঐ 'লীবার আমিকরুম্' যখন আমাদের লাইব্রেরিতে পৌঁছল তখন আমরা সেটিতে আমাদেরই অধ্যাপকের রচনা দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হই। তিনিও আবার তাঁর প্রবন্ধে কোনো গুরুগম্ভীর বিষয়ের অবতারণা করেননি—আমরা ঠিক সেই সময়ে তাঁর ক্লাসে রলাঁর এক স্বল্পখ্যাত পুস্তিকা 'পিয়ের এ ল্যুস'—

'পীটার ও লুসি' পড়ছিলুম। চটি বই। বিরাট জঁ্যা ক্রিস্তফ লেখার পর রলাঁ দুই তরুণ-তরুণীর একটি বিশুদ্ধ প্রেমের কাহিনী লিখে জঁ্যা ক্রিস্তফের মতো বিরাট পুস্তকের কঠিন কঠিন সমস্যা, ইয়োরোপীয় সভ্যতা নিয়ে আলোড়ন-বিলোড়ন থেকে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিলেন। বেনওয়া তাঁর প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'শান্তিনিকেতনে পিয়ের এ ল্যুস'—যতদূর মনে পড়ছে, এই শিরোনামা দিয়ে, এবং 'পিয়ের এ ল্যুস' পড়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীর মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তার সবিস্তার বর্ণনা দেন। রলাঁকে উৎসর্গিত 'লীবার আমিকরুম্' পুস্তকের কোনো কোনো অংশ সে সময়ে কালিদাস নাগ অনুবাদ করে এদেশে প্রকাশ করেন।

অধ্যাপক বেনওয়ার গত হওয়ার দিবস বিস্ময়সূচক। যে গুরুর কাছ থেকে তিনি অকৃপণ স্নেহ ও সম্মান পেয়েছিলেন তাঁরই জন্মশতবার্ষিকীর দিনে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

এস্থলে আমি অধ্যাপক বেনওয়ার জীবনী লিখতে যাচ্ছি নে। বস্তুত ১৯২১ থেকে এবং সঠিক বলতে গেলে যবে থেকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন সেই সময় থেকে ১৯৪১ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত যে সব গুণীজ্ঞানীরা এখানে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করেছিলেন তাঁদের পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখার ভার আমার স্কন্ধে নয়। কার, সেটা বলা বাহুল্য। বছর দশেক পূর্বে লাইপৎসিক্ বিশ্ব-বিদ্যালয় রবীন্দ্রভবনকে লেখে, তাঁরা তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের জীবনী প্রকাশ করছেন, জনৈক মার্ক কলিন্স সম্বন্ধে শান্তিনিকেতনের কেউ কিছু জানে কিনা? (কলিন্স এখানে অধ্যাপনা করেছিলেন।) অন্যরা তাদের ছাত্রদের সম্বন্ধে লেখে আর আমরা আমাদের অধ্যাপকদের—'বৃথা বাক্য থাক'! (স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলেছেন)[১]

সেই বেনওয়া সাহেব কয়েকদিন ফরাসী ক্লাস নেওয়ার পর বললেন, 'তোমরা যে মলিয়ের, ফ্লবের, য়্যুগো (Hugo), জিদ, ফ্রাঁস পড়তে চাও সে তো খুব ভালো কথা। কারণ আজকালকার ইয়োরোপীয় ছাত্রছাত্রীদের এসব লেখকের বই পড়ানো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা লাতিন গ্রীক তো শিখতেই চায় না,

১ এইসব অধ্যাপকদের সম্বন্ধে যেটুকু সামান্য বিবরণ পাঠক পাবেন সেটুকু শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনীতে। কিন্তু তাঁর মূল বক্তব্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ছিল বলে, বাধ্য হয়ে অধ্যাপকদের সম্বন্ধে বিবরণ দিয়েছেন সংক্ষিপ্তরূপে।

তার অনুবাদেও বিরাগ, এমন কি, এই একটু আগে যাঁদের নাম করলুম, তাঁদের লেখার প্রতিও কোনো উৎসাহ নেই, তাদের কারণ তাঁরা লেখেন ক্লাসিকাল পদ্ধতিতে। তার অন্যতম মূল সূত্র, 'যে জিনিস স্বচ্ছ (ক্লিয়ার, পরিষ্কার যার অর্থ অতি সহজেই বোঝা যায়) নয়, সে জিনিস ফরাসী নয়' (স্ কি নে পা ক্ল্যার নে পা ফ্রাঁসে!) আর এ যুগের পাঠকরা চায় আধা-আলো-অন্ধকার। তাদের বক্তব্য, 'তোমরা জীবনটাকে যতখানি সহজ সরল স্বচ্ছ ধরে নিয়েছো এবং ফলে স্বচ্ছ সরল পদ্ধতিতে প্রকাশ করো জীবনটাকে—বাস্তবে সে তা নয়, জীবন ওরকম হয় না। সর্ব মানবজীবনেই আছে আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব—তাই তার প্রকাশও পরিষ্কার হয়ে ধরা দেবে না। আমরা আজ যা লিখছি সেটা পুরনো স্টাইলকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছে, এবং তোমরা যারা প্রাচীন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত—তারা তো এটাকে দুর্বোধ্য, অবোধ্য এমন কি অর্থহীন প্রলাপ বললেও বলতে পারো, কিন্তু আমরা তার কোনোই পরোয়া করি নে। আমরা আমাদের "অপক্ষে" এগিয়ে যাবো, এবং এই করেই নূতন পথ বানাবো।'

এতদিন পরে কি আর সব কথা মনে থাকে! এটা হচ্ছে ১৯২১।২২।২৩-এর কাহিনী। তখনো এদেশে মডার্ন কবিতা জন্ম নেয়নি, (পরবর্তী যুগে যখন নিল, তখন হিসেব নিয়ে দেখা গেল, এসব মডার্ন কবিতাতে যে শব্দটি বার বার, এমন কি বলা যায় সর্বাধিক বার আসে সেটি 'ধূসর'। তখন মনে পড়লো, ফ্রান্সের মডার্নদের সম্বন্ধে অধ্যাপক বেনওয়ার প্রাচীন দিনের বিবৃতি—সেখানে মূল কথা ছিল 'অস্পষ্ট' 'দ্বন্দ্বমুখর' এবং সর্বোপরি 'আধা-আলো-অন্ধকার'। সেই বস্তুই এদেশে এসে পরেছে 'ধূসর' আলখাল্লা! তা হবেই বা না কেন? এ দেশটা তো বৈরাগ্যের গেরুয়া বসনধারী, আর গেরুয়া যা ধূসরও তা!) তবে মোটামুটি যা বলেছিলেন, সেটা মনে আছে—এবং চোখের জলে নাকের জলে মনে আছে!

কারণ সর্বশেষে সাহেব বললেন, 'অতএব এই নূতন ফ্রান্সকেও তোমাদের চেনা উচিত; বিশেষ করে তার কাব্যপ্রচেষ্টাকে।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফ্রান্স থেকে আনালেন—তখনকার দিনে জাহাজ-রেলে প্রায় ছ সপ্তাহ লাগতো—বেশ মোটা মোটা দু-ভলুমে সম্পূর্ণ মডার্ন কবিতার চয়নিকা। শিরোনাম, 'পোয়েৎ দ' জুরদ্যুই', 'পোয়েটস্ অব্ টুডে';—'হালের কবি', 'আজকের কবি' যেটা আপনার প্যারা লাগে বাংলাতে সেইটেই বেছে নিন।

বলছিলুম না, 'চোখের জলে নাকের জলে'? পড়েই যাচ্ছি, পড়েই যাচ্ছি, কোনো হদিস আর পাই নে। ক্লাসের পড়া তৈরি করতে আগে আমার লাগতো

তিন পো ঘণ্টাটাক, এখন দু-ঘণ্টা তিন-ঘণ্টা অভিধান ঘেঁটেও কোনো হদিস পাই নে। একটা তুলনা দিয়ে জিনিসটা পরিষ্কার করি। আপনি কোনো বিষয়বস্তু পড়ছেন যেটা সরল, এবং লেখকের উদ্দেশ্যও সরল। সেখানে মনে করুন হঠাৎ এল একটা শব্দ যার অর্থ আপনি জানেন না, যেমন ধরুন 'কর'। অভিধান খুলে মানে পেলেন 'করা ধাতুর রূপ বিশেষ', 'খাজনা' 'হাত' 'কিরণ' 'হাতির শুঁড়' 'হিন্দুর উপাধি বিশেষ'। এতক্ষণ ধরে লেখকের সব কথাই আপনার কাছে পরিষ্কার ছিল বলে, পূর্বাপর প্রসঙ্গ বিবেচনা করে আপনি চট্ করে বুঝে গেলেন কোন্ অর্থটা লাগবে, লেগেও গেল ক্লিক্ করে। তাই বোধ হয় অভিধানকে কুঞ্চিকাও বলা হয়। সেখানে আপনি পাবেন চাবি—এটা প্রয়োগ করে আপনি যে অচেনা শব্দরূপ তালা খুলতে চান, সেটি খুলতে পারেন। এর পরে তুলনাটা হয়তো টায়-টায় মিলবে না, কিন্তু আমার বক্তব্য কিঞ্চিৎ খোলসা করবে। আপনার নিজের যে তালা আপনি নিত্যি নিত্যি খোলেন তার চাবি যদি হারিয়ে যায়, আর কেউ এসে এক গুচ্ছ জাত-বেজাতের চাবি দেয়, তাহলে কোন্ চাবিটি দিয়ে আপনার তালাটি খোলা যাবে সেটা চট করে বেছে নেবেন—জোর, নিতান্ত একাকার হলে, দু-তিনটে ট্রায়েল নিয়েই কর্মসিদ্ধি।

আর এখানে, অর্থাৎ এই মডার্ন কবিতা নিয়ে হালটা কি? যেন তালাটিই দেখতে পাচ্ছি নে ভালো করে,—আদৌ আছে কি না সো ভী কসম খেয়ে বলতে পারবো না, অর্থাৎ বিসমিল্লাতেই গয়লৎ (গলৎ)—কেমন যেন আবছা-আবছা গোছ, ঐ যে সায়েব অধ্যাপক স্বয়ং বলেছিলেন কেমন যেন আধা-আলো-অন্ধকার, ফরাসীতে বলে 'ক্রেপ্যুস্কুল' (ইংরেজিতে বিশেষ্যটা চলে না বটে, কিন্তু বিশেষণটা—crepuscular—মাঝে মাঝে পাওয়া যায়) এদেশের পরবর্তী যুগের 'ধূসর'! এদিকে তালাটাই দেখতে পাচ্ছি নে ভালো করে, ওদিকে অভিধান আমার হাতে তুলে দিলেন চারটে চাবি—এখন লাগাই কোন্টা? এমন কি 'রাজাকে হাতির শুঁড় (কর) দিলুম' অর্থও যদি 'রাজাকে খাজনা (কর) দিলুম' -এর বদলে বেরোয় তাতেও আমি খুশী! কথায় বলে 'হাতের একটা পাখি কানা মামার চেয়ে ভালো'—ঐক্ যা, দুটো প্রবাদে গোবলেট করে ফেললুম নাকি? তা সঙ্গগুণে সবই হয়। অর্থাৎ সে যুগের ফরাসী মডার্ন কবিতা শব্দ, অর্থ, অনুপ্রাস, এমন কি বানান নিয়েও, এক্ষুনি আমি যা গোবলেট পাকালুম, তার চেয়ে কোটি গুণে (ইনফিনিটি সিম্বলটি দিতে চেয়েছিলুম, কিন্তু সেটি বোধ হয় ছাপাখানায় নেই) ওস্তাদ ছিল—গোবলেট পাকাতে!

বেশ কয়েকদিন গলদঘর্ম পরিশ্রম করার পর আমি স্থিরনিশ্চয় হলুম, আমার

মনে সন্দেহের অবকাশ মাত্র রইল না, এ বস্তু কাব্য নয়, এটা নিশ্চয়ই দর্শন। কারণ দর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে দার্শনিকশ্রেষ্ঠ শোপেনহাওয়ার বলেছেন (আমি অনুবাদের খাতিরে একটুখানি কনসুরা লাগাচ্ছি) :

দর্শন হল গিয়ে, 'অমানিশার অন্ধকার অঙ্গনে অন্ধের অনুপস্থিত অসিত অশ্ব অণ্ডের অনুসন্ধান।'

কিন্তু এ তত্ত্বে পৌঁছনোর পরও আমি অত সহজে হাল ছাড়িনি—তার জন্য বয়সটাই দায়ী ; ওটা জেদীর বয়স।

কারণ আমার মনে পড়লো, ছেলেবেলায় কাকার কাছে শোনা একটি তত্ত্বোপদেশমূলক কাহিনী। এক রাজার ছিল একটি অতি বিরল মহামূল্যবান সাদা হাতি। সে দিন দিন কেন শুকিয়ে যাচ্ছে তার অনুসন্ধান করার ফলে পড়লো যে, তার মাহুত শত সাবধান বাণী সত্ত্বেও অতি সঙ্গোপনে হাতির দানা চুরি করছে। রাজা ভয়ঙ্কর চটে গিয়ে তার প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন। মাহুত যখন দেখল এ-হুকুম কিছুতেই রদ হবে না, রাজার সামনে নিবেদন করলে, তাকে যদি এক বছরের সময় দেওয়া হয় তবে, একমাত্র তারই জানা গোপন কৌশল প্রয়োগ করে ঐ সাদা হাতিটাকে দিয়ে মানুষের মতো কথা বলাতে পারবে। রাজা সম্মত হলেন। মাহুতের অন্তরঙ্গ বন্ধুরা যখন তাকে শুধালো হাতিকে দিয়ে সে কথা বলাবে কি করে, তখন সে বললে, 'ভাইরা সব, এক বছরের ভিতর কত কিছুই না ঘটতে পারে। এক বছরের ভিতর রাজা মারা যেতে পারেন, কিংবা হাতি মারা যেতে পারে, কিংবা আমি মারা যেতে পারি—এবং কে জানে, কিংবা হয়তো হাতিটা শেষমেষ কথাই বলে ফেলতে পারে!'

আমিও সেই আশাতেই রইলুম, কে জানে এ সব কবিতার মানে একদিন হয়তো বেরিয়ে গেলে যেতেও পারে। যদিও অকপট চিত্তে স্বীকার করছি, আমার তখন মনে হয়েছিল, এবং আজও মনে হয়, আচম্বিতে হাতির মানুষের মতো কথা বলতে পারাটার সম্ভাবনা এসব কবিতার অর্থ বোঝার সম্ভাবনার চেয়ে ঢের ঢের বেশী।

সত্যের অপলাপ হবে বলে স্বীকার করছি, সাহেব আমাদের বলেও ছিলেন, প্রাচীন যুগের ল্য কঁৎ দ্য লিল্ বা য়্যুগোর কবিতার অর্থ যে-রকম বর্ণে বর্ণে বোঝা যায়, এসব 'পোয়েৎ দ' জুরদ্যুই'—'হালের কবি'দের কাছে থেকে সেটা যেন প্রত্যাশা না করি—এর নাকি অনেকখানি সরাসরি, সোজাসুজি অনুভূতির যোগে চিত্তে গ্রহণ করতে হয়। কি প্রকারে সে 'যোগ' করতে হয় সেটা অধ্যাপককে শুধিয়ে তাঁকে বৃথা হয়রান করতে চাইনি—কারণ যেখানে অনুভূতির কারবার

সেখানে সে রসে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়া তো আর সিলজিজ্‌ম্‌ দিয়ে বাৎলানো যায় না। যেমন মাকে কি করে ভালোবাসতে হয় এটা তো আর কাউকে ইন্সট্রাকশন দিয়ে শেখানো যায় না—যেরকম বিস্কুটের টিনের উপরে ছাপা নির্দেশানুযায়ী-প্রক্রিয়ায় টিনটি পরিপাটিরূপে খোলা যায়।

পাঠক শুধোবেন, 'তা হলে ক্লাসে কি অধ্যাপক সেগুলো বুঝিয়ে দিতেন না? এবারে ফেললেন মুশকিলে। সায়েব মোটামুটি একটা ইংরিজি অনুবাদ খাড়া করে দিতেন—কারণ ইংরিজি ও ফরাসীর শব্দসম্পদ—বিশেষ করে চিন্তা ও অনুভূতি সংশ্লিষ্ট বিমূর্ত শব্দ একই ভাণ্ডার থেকে নেওয়া হয় বলে বহু কবিতার শতকরা ষাটটি শব্দ দুই ভাষাতেই এক। অনুবাদ করা কঠিন নয়। কিন্তু তাই বলেই কি জিনিসটা সরল হয়ে যাবে? মডার্ন বাংলা কবিতার শব্দগুলো তো আপনি চেনেন, তাই বলে কি অর্থ বোধগম্য হয়? তার উপর সর্বক্ষণ ভয়, এখনো তো মামুলী ফরাসীটাই ঠিকমতো রপ্ত হয়নি, হয়তো গাড়োলের মতো এমন প্রশ্ন শুধিয়ে বসবো যেটা বাঙলায় প্রকাশ করতে হলে বলি, 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পড়ে—ইত্যাদি।'

তবে দুটো জিনিস লক্ষ্য করলুম। 'শোল্‌ডার শ্রাগ্‌' করা বা কাঁধ উঠিয়ে নামিয়ে নিজের অসহায়তা প্রকাশ করার অভ্যাস সর্ব ইয়োরোপীয়েরই আছে, কিন্তু এর সব চাইতে বেশী কনজাম্‌শন্‌ ফ্রান্সে—শ্যাম্পেন বা ব্র্যাণ্ডির চেয়েও ঢের ঢের বেশী; এ সব কবিতা 'বোঝাবার' সময় বেনওয়া সাহেব যা 'শোল্‌ডার শ্রাগ্‌' করলেন তার থেকে আমার মনে হল, যে আগামী দশ বৎসরের রেশন তিনি ঐ 'হালের কবি'দের পাল্লায় পড়ে তিন মাসেই খতম করে দিচ্ছেন। এবং ঐ শ্রাগ্‌ করার সঙ্গে সঙ্গে হাতের তেলো দুটো এমনভাবে চিত করতেন যে আমরা স্পষ্ট বুঝতুম, ইংরেজিতে যাকে বলে, ঘোড়াকে জলের যথেষ্ট কাছে আনা হয়েছে, এখন সে যদি না খায়—

দ্বিতীয়ত, সনাতন লেখকদের বেলা তিনি মাঝে মাঝে আমাদের অনুবাদ করতে বলতেন। কিন্তু এই মডার্ন কবিদের হাতে নিরীহ বঙ্গসন্তানদের বে-পনাহ্‌ অর্থাৎ একান্ত অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিতে তিনি সাহস পেতেন না। নরখাদক না হলেও, যারা তাঁদের কবিতা বোঝবার চেষ্টা করে, তাদের মগজ যে কিরকম কুরে কুরে খেতে পারেন, সে তত্ত্বটি সায়েবের অজানা ছিল না। এবং ঐ সময়ে শান্তিনিকেতনের একটি ছেলে পাগল হয়ে গেলে যে গুজোব রটেছিল, তার বিরুদ্ধে তারস্বরে প্রতিবাদ জানিয়ে আমি আজ বলছি, 'সর্বৈব মিথ্যা; সে ছোকরা একদা ফরাসী ক্লাসে আসতো বটে, কিন্তু ঐ সব 'পোয়েৎ দ' জুরদ্যুই'দের প্রথম

দর্শন পাওয়া মাত্রই সে 'বাপ্পো বাপ্পো' রব ছেড়ে অধ্যাপক মিশ্রজীর পাণিনি ক্লাসে চলে যায়—যে ক্লাসটাকে আমরা বাঘের চেয়েও বেশী ডরাতাম—এবং পরে মুক্তকণ্ঠে বলে, এসব হালের ফরাসিস 'কবি'দের মাল বোঝার চেয়ে পাণিনির সূত্র বোঝা ও কণ্ঠস্থ করা ঢের ঢের সহজ।'

একে মডার্ন, তায় ফরাসিস, তদুপরি কোনো কোনো 'কবি' খাস প্যারিসিয়ান—উপস্থিত আবার বাঙলাদেশে একটা বিশেষ 'রস' বা ঐ ধরনের 'একটা-কিছু নিয়ে' জোর আন্দোলন চলছে—কাজেই পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগা অসম্ভব নয়, এসব কবিরা কাব্যে শ্লীলতা অশ্লীলতার মধ্যে কোনো পার্থক্য স্বীকার করতেন কি না? আমার তো শেষ ভরসা ছিল ঐটেই। এত যে মেহন্নৎ করছি, তার ফলে আখেরে যদি এমন কিছু জুটে যায় যার প্রসাদাৎ সংস্কৃত-পড়নেওলাদের ঢিঢ দিতে পারি। 'ধ্যত্তর তোর "চৌরপঞ্চাশিকা" আর "কুট্টনীমতম্"! আসল মাল এ্যাদ্দিনে, বাবা, এদেশে এসে পৌঁছেছে, নাক বরাবর প্যারিস থেকে। আয়, শুনে যা।' কারণ এদের কেউ কেউ অল্পবিস্তর মপাসাঁ পড়েছে, অবশ্য ইংরিজি অনুবাদে,[২] তাই (ঐ বয়সে) আমার সরস আহ্বান শুনে যে আমার সামনে করজোড়ে আসন নিত সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু হায়, অধ্যাপক বেনওয়া স্বয়ং বহু বৎসর প্যারিসে কাটিয়েছিলেন বলে এ-বিষয়ে সাবধান হতে জানতেন। ক্লাসে দুটি মেয়ে ছিল বলে তিনি প্রথম দিনই বলে দিয়েছিলেন, কোন্ কোন্ কবিতা ক্লাসে পড়ানো হবে।

আমার নিজের কেমন জানি একটা অন্ধ বিশ্বাস সে সময় জন্মেছিল যে অধ্যাপক বেনওয়া স্বয়ং এই নূতন 'একোল' 'স্কুল' বা 'রীতিটা' পছন্দ করতেন না, বিশেষ রসও পেতেন না। তিনি আমাদের সঙ্গে মডার্ন ফ্রান্সের নবীন কাব্য-আন্দোলনের পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন মাত্র—অনেকটা যেন কর্তব্য পালনের জন্য।

তবু এই সুবাদে একটি তত্ত্বকথা বলে রাখা ভালো। এসব মডার্ন কবিদের সাধনা ছিল সত্যই বিস্ময়জনক। কারো কারো ছন্দহীন, লয়বিহীন, মিলবর্জিত—বস্তুত সর্ব অলঙ্কারশূন্য—এলোপাতাড়ি আবোল-তাবোল শব্দসমষ্টি দেখে যখন

২ সব জিনিস মূল ভাষাতে পড়তে হবে এ উন্নাসিকতার কোনো অর্থ হয় না। আমার আপন অভিজ্ঞতা বলে, বহুক্ষেত্রে অনুবাদ মূলের চেয়ে ঢের সরেস হয়েছে। তারি একাধিক কারণ আছে, কিন্তু সে-আলোচনা এস্থানে অবান্তর এবং সংক্ষেপে সারবার উপায় নেই।

আমরা উদ্‌ভ্রান্ত তখন বেনওয়া সায়েব অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কাব্য থেকে পড়ে শোনাতেন এঁদেরই আগেকার দিনের, প্রাচীন পদ্ধতিতে রচিত কবিতা—মডার্ন আন্দোলনে যোগ দেবার পূর্বে রচিত।

এবং সেগুলো শুনে, পরে পড়ে স্তম্ভিত হয়েছি। অনবদ্য এক-একটি কবিতা! কতখানি পরিশ্রম, কতখানি সাধনার প্রয়োজন এ রকম অত্যুত্তম কবিতা রচনা করতে! অর্থাৎ, এঁরা 'ব্লাফ্‌-মাস্টার' নন। প্রাচীন পদ্ধতিতে কবিতা রচনা করার টেকনীক্‌, স্কিল, কৌশল সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করার পর এঁরা যে-কোনো কারণেই হোক—খুব সম্ভব নিজের সৃষ্টিতে ঈপ্সিত পরিতৃপ্তি না পেয়ে—ধরেছেন অন্য টেকনীক্‌, বা বলা যেতে পারে, চেষ্টা করছেন নূতন এক টেকনীক্‌ আবিষ্কার করার। সেজানের ছবি দেখে অজ্ঞজন মনে করে, এরকম 'এলোপাতাড়ি তুলির বাড়ি ধাপ্পুস-ধুপ্পুস মারা' তো যে-কোনো পাঁচ বছরের বাচ্চাও দেখিয়ে দিতে পারে, কিন্তু সেজান যখন প্রাচীন 'একাডেমিক' টেকনীকে আঁকতেন তখনকার ছবি দেখলে চক্ষুস্থির হয়ে যায়। তখনকার দিনের 'একাডেমিক' যে কোনো চিত্রকরের সঙ্গে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারতেন, কারণ একে তো ছিল তাঁর বিধিদত্ত অসাধারণ সৌন্দর্যবোধ ও স্পর্শকাতরতা, তদুপরি তাঁর আঙুলগুলি যেন শুধু ছবি আঁকার জন্যই বিধাতা নির্মাণ করেছিলেন, এবং সর্বোপরি তাঁর বহু বৎসরব্যাপী অক্লান্ত সাধনা, ঐ প্রাচীন একাডেমিক টেকনীক্‌ সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার জন্য। এ দেশে তাই যখন দেখি, মাত্র দু'টি বছর রেওয়াজ—কবিতা, গান, নাচ যাই হোক না কেন—করেছে কি না, তার আগেই সে লেগে যায় 'কম্পোজ' করতে, এবং অন্যকে বিজ্ঞভাবে 'নবীন পন্থা' বাৎলাতে, তখন —থাক্‌ গে।

ইতিমধ্যে আবার জর্মন ভাষার অধ্যাপক ছুটিতে চলে যাওয়ার দরুন বেনওয়া সায়েবের ঘাড়েই পড়লো জর্মন শেখাবার ভার, এবং তিনিও ফরাসী মডার্ন কবিদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পড়াতে আরম্ভ করলেন জর্মন মডার্ন কবিদের মডার্নতম রাইনের মারিয়া রিল্‌কে! সে আরেক নিদারুণ অভিজ্ঞতা, সুকুমার রায়ের ভাষায় 'ভুক্তভোগী জানে তাহা, অপরে বুঝিবে কিসে?'—সে-কাহিনী আরেক দিনের জন্য মুলতবী রইল। শুধু এইটুকু নিবেদন, চেষ্টা দিয়েছিলুম, স্যর, সেই সতরো-আঠেরো বছর বয়সেই চেষ্টা দিয়েছিলুম এই গবিতা নামক জিনিসটির রসাস্বাদন করার। আর যে দোষ দেবেন দিন, শুধু এইটুকু বলবেন না যে, বুড়ো-হাবড়া হয়ে যাবার পর মডার্ন কবিতার প্রেম কামনা করে হতাশ-প্রেমিকরূপে পরিবর্তিত হয়েছি।

তারপর এল সেই শুভলগ্ন যেদিন মডার্ন কবিতার সঙ্গে আমাদের তালাকটি বেনওয়া সাহেব মঞ্জুর করলেন। আমরা সোল্লাসে ফিরে গেলুম দোদে, ফ্লবেরের কাছে। শুনেছি, স্পেনের লোক নাকি বছরের প্রথম দিন এক গেলাস জল নিয়ে তাতে কড়ে আঙুলের ডগাটি ডুবিয়ে সেই আঙুল জিভে লাগিয়ে অতি সন্তর্পণে সভয়ে চাটার পর আঁতকে উঠে বলে, 'ঐ সেই প্রাচীন দিনের পুরনো বিস্বাদ বস্তু; চ, ভাই, ফিরে যাই আমাদের মদের গেলাসেই! কেন যে পাদ্রী সায়েব মদ কমাতে আর বেশী জল খেতে বলেন বোঝা ভার।' আমরাও স্পানিয়ার্ডদের মতো ফিরে গেলুম আমাদের ক্লাসিক্স-মদ্যে।

আমাদের মুখের ভাব দেখে বেনওয়া সায়েব হেসে বললেন, 'তবু তো আমরা আছি ভালো, কারণ আমরা চর্চা করি সাহিত্যের। সেখানে উৎকৃষ্টে-নিকৃষ্টে পার্থক্য করা তেমন কিছু অসম্ভব কঠিন নয়! সেখানে রুচিবোধের অনেকখানি স্থিরতা আছে। কিন্তু হত যদি আমাদের বিষয়বস্তু চিত্র? তাহলে খানিকটে আভাস পেতে সে-ক্ষেত্রে রুচির কী আকাশ-পাতাল পরিবর্তন হয় রাতারাতি। আজ যাঁর ছবি খোলা নিলামে বিক্রি হল লক্ষ ডলারে, বছর ঘুরতে না ঘুরতে সেই ছবিই বিক্রি হল হাজার ডলারে। আজ যাঁকে বলা হচ্ছে 'গ্রাঁ মেৎর্' গ্র্যাণ্ড মাস্টার বা মেস্‌ৎরো (ওস্তাদের ওস্তাদ) তিন বছর যেতে না যেতে তাঁর ছবি হয়ে গেলো বিল্‌জ্, পিফ্‌ল্ (রদ্দী, চোতা)!—আর এ সব ছবিই কিন্তু একাডেমিক স্টাইলে আঁকা; কোনো নূতন এক্সপেরিমেণ্টের কথা উঠছে না।

তবেই ধারণা করতে পারবে 'মডার্ন পেণ্টিং' নিয়ে কী অসম্ভব রুচি পরিবর্তন, রীতিমত খুনোখুনি মারামারি। আর সে ছবিগুলোতে আছে কি? ধোঁয়াটে, তামাটে, বিৎকুটে কি যেন কি,—জানেন শুধু আর্টিস্টই, বা হয়তো তাঁর অন্তরঙ্গ সখামণ্ডলী, এতে আছে কি, আর্টিস্টের উদ্দেশ্য কি—নিচে লেখা 'বসন্ত'। আর, এজ্ ফার্ এজ্ আই এম্ কনসার্নড্ সেখানে 'বসন্ত' না লিখে অভিধানের ভিতরের বা বাইরের যে-কোনো শব্দ লিখলেও আমার তাতে সুবিধা অসুবিধা কিছুই হয় না। অধিকাংশ আর্টিস্টই আবার তাঁদের ছবির কোনো নামই দেন না। বলেন, তাঁরা নাকি ডিক্সনারি ইলাস্‌ট্রেট করার জন্য ছবি আঁকেন না।'

বেনওয়া সাহেব সেদিন আরো অনেক খাঁটি তত্ত্বকথা বলেছিলেন। কারণ খাস ফরাসিসের মতো তাঁর কৌতূহল ও উৎসাহ ছিল—কাব্য, সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য ইত্যাদি নানা রসের নানা প্রকাশে, নানা বিকাশে। সর্বশেষ তিনি ইম্‌প্রেশনিজ্‌ম্, সুররিয়ালিজ্‌ম, ক্যুবিজ্‌ম, দাদাইজ্‌ম ইত্যাদি বহুবিধ 'ইজ্‌ম'-এর ইতিহাস শোনানোর পর শেষ করলেন 'বানরালে'র কীর্তিকাহিনী শুনিয়ে।

কাহিনীটি আমার চোখের সামনে আজো জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় 'নাটকে'র যিনি 'হীরো' তাঁর নামটি ভুলে গিয়েছি। বানরালে-বানরালে গোছ কি যেন এক বিজাতীয় নাম,—এ নামটা অনায়াসে আমারও হতে পারতো,—তবে এটুকু মনে আছে যে নামের মধ্যিখানে 'আন্' কথাটি ছিল। অবশ্য এ নাট্যের আদ্যন্ত আজো অতি সহজেই আবিষ্কার করা সম্ভবে, সামান্য কয়েক মাস কলকাতা-দিল্লী-বোম্বাই (এ ব্যাপারে বোম্বাই কোন্ পুণ্যবলে তীর্থভূমিতে পরিণত হলেন সে রহস্য পূতভূমির পাণ্ডারাও জানেন না) মাকু মারার পর নিরাশ হয়ে, শেষটায় ভিটেমাটি বেচে, কালোবাজারে ফরেন এক্সচেঞ্জ কিনে যদি প্যারিস চলে যান (ভুলবেন না, ফেরার সময় মঁ পল্যিয়ে থেকে একটা ডিলিট নিয়ে আসবেন; এদেশে কাজে লাগবে। প্ল্যাটফর্মেই বোধ হয় সনদ বিক্রি হয়, নইলে হয়তো দু-একদিন বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় বাস করে, রেডিমেড্ থীসিস কিনে সেটা পেশ করা মাত্রই সনদটা পেয়ে যাবেন সঙ্গে সঙ্গে···ডট করা লাইনের সঠিক জায়গায় নাম সই করতে কিংবা টিপসই দিতে যেন ত্রুটি না হয়···) তবে অদ্যকার বঙ্গসন্তান মাত্রই আনন্দিত হবে যে, কালোবাজার সেখানে নেই—(সব খোলাখুলি, সামনাসামনি)।

প্যারিসের লোক সে কাহিনী এখনো ভোলেনি। আপনাকে নূতন করে বলার সুযোগ পেয়ে বড্ডই উৎসাহের সঙ্গে সেটি কীর্তন করবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন মডার্ন আর্ট প্যারিসের অন্য সব প্রাচীন অর্বাচীন কলাসৃষ্টিকে ঝেঁটিয়ে মহানগরী থেকে বের করে দিয়েছে তখন হঠাৎ একদিন উদয় হলেন গট্‌গট্ করে, সূর্যোদয়ের গৌরব নিয়ে এই চিত্রকর—চিত্রকর বললে অত্যল্পই বলা হয়—যেন স্বয়ং বিশ্বকর্মা। এতদিন নাকি নির্জনে চিত্রসাধনায় নিযুক্ত ছিলেন বলে কোনো প্রদর্শনীতে ছবি পাঠাননি। কিন্তু এইবারে তাঁর সময় হয়েছে। কারণ মডার্ন আর্ট তার নূতন পথ খুঁজে পেয়েছে, তার চরম সিদ্ধিতে পৌঁছে গেছে এঁরই চিত্রকলায়।

একই সঙ্গে প্যারিসের তিনখানা প্রখ্যাততম পত্রিকা মারফত—শুধু কলাবিভাগের নয়, অসাধারণ জ্ঞাতব্য সংবাদ রূপে কাগজের উত্তমাঙ্গেও প্রকাশিত—প্যারিসবাসী এবং দু-তিন দিনের ভিতর তাবৎ ফরাসিস জাতি এই নব অরুণোদয়ের সংবাদ পেয়ে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হল। ক্রমে ক্রমে সর্ব আর্টজর্নলে, বিশেষ করে সেই সব আলট্রা-মডার্ন-আর্টজর্নলে, যেগুলো খবরটা সর্বপ্রথমে পরিবেশন করতে পারেনি বলে ঈষৎ বিব্রত বোধ করছিল, সর্বত্রই এই নবীন আর্টিস্ট সম্বন্ধে কলামের পর কলাম, পাতার পর পাতা জুড়ে নানা

প্রকারের বিশ্লেষণ তথা তাঁর প্রথম চিত্রের জন্ম থেকে শেষ চিত্র অবধি তার ক্রমবিকাশের সুনিপুণ ইতিহাস সবিস্তার বর্ণিত হল। শেষটায় কিন্তু এঁকে লুফে নিলেন আলট্রা-মডার্ন আর্টের ক্রিটিকদের চাঁইরাই। এঁরা একাডেমিক আর্টের জন্মশত্রু, কসম্-খাওয়া-খুনী-দুশ্‌মন। অন্যপক্ষে প্রথমটায় কিঞ্চিৎ গাঁইগুঁই না-রাম-না-গঙ্গা ধরনের দু-একটা মন্তব্য করার পর আলট্রা-মডার্নদের হাতে ঘোল খেয়ে চুপসে রঙ্গভূমি—বা জঙ্গভূমি, যাই বলুন,—পরিত্যাগ করলেন। ওদিকে সেই চিত্রকরের ছবি দেখবার জন্য যা ভিড়, সেটা সামলাতে গিয়ে প্যারিস পুলিসের মতো সহিষ্ণু প্রতিষ্ঠানও হিমসিম খেয়ে গেল। ওঁর ছবি না দেখা থাকলে তো প্যারিসের শিক্ (chic) সমাজে মুখ দেখানো যায় না, ওঁর সম্বন্ধে বিজ্ঞভাবে কথা বলাটাই তখন দুনিয়ে ক্রী—dernier cri—শব্দে শব্দে অনুবাদ করলে 'শেষ চিৎকার' কিন্তু তার থেকে আসল অর্থ ওৎরায় না, বরঞ্চ 'আখেরী কালাম্' বললে ওরই গা ঘেঁষে যায়। আর্টের ব্যাপারে ফরাসী হনুকরণ (to ape)-কারী ইংরেজ ও ঐ দুনিয়ে ক্রী-ই আপন ভাষাতে ব্যবহার করে, অর্থ uttermost refinement– ও রকম দুটো শব্দ কিছুতেই অনুবাদ করা যায় না বলে।

এমন সময় সিন্দবাদের সেই সুদর্শন, নিটোল, নিখুঁত সী-মোরগের আণ্ডাটি গেল ফেটে, কিংবা কেউ দিলে ফাটিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে বেরুলো উৎকট পচা দুর্গন্ধ। প্যারিসে তিষ্ঠনো কি সোজা ব্যাপার?

সেই যে বলেছিলুম 'একই সঙ্গে প্যারিসের তিনখানা প্রখ্যাততম পত্রিকা মারফত' এই নবীন রবির প্রথম সংবাদ বেরোয়, এবং পরে সকলের অলক্ষ্যে এঁরা কেটে পড়েন—সেই তিন 'সংবাদদাতা' বা জালিয়াৎ আণ্ডাটি ফাটালেন—সর্বজনসমক্ষে ফোটোগ্রাফ সহ।

আসলে বানরালে নামে কোনো আর্টিস্টই নেই। এই তিন মিত্র একটা গাধাকে শক্ত করে বেঁধে নেন একটা খুঁটিতে। লম্বা ন্যাজে মাখিয়ে দেন সযত্নে, আর্টিস্টরা—বরঞ্চ বলা উচিত আলট্রামডার্ন আর্টিস্টরা—যে রঙ, অয়েল কালার ব্যবহার করতে পছন্দ করেন, সেই সব রঙ। তার ন্যাজের কাছে, পিছনে, আর্টিস্টদের তেপায়া স্ট্যাণ্ড বা ইজ্‌লের উপর ক্যানভাস। তার পর সেই গাধাটাকে দে, বেধড়ক মার! সে বেচারী পিছনের ঠ্যাং দুটো তুলে যত লাফায়, ততই তার নানা-রঙে-রাঙা ন্যাজ থাবড়া মারে ক্যানভাসের উপর। সঙ্গে সঙ্গে আঁকা হয়ে যায় মোস্ট আলট্রামডার্ন 'ছবি'! ভিন্ন ভিন্ন সাইজের ভিন্ন ভিন্ন ক্যানভাস নিয়ে, গাধার ন্যাজ কখনো বিনুনির মতো ভাগ করে, কখনো গোচ্ছা

গোচ্ছা করে বেঁধে—যার যথা অভিরুচি—রঙের ভিন্ন ভিন্ন সংমিশ্রণ করে 'আঁকা' হল 'ছবি'র পর 'ছবি'। এবং পাছে লোকে অবিশ্বাস করে তাই 'ছবি'র প্রতি স্টেজে তার ফোটো, গাধার লম্ফঝম্পের ফোটো, গর্দভের পুচ্ছাংশসহ চিত্রাংশের ফোটো—এক কথায় শব্দার্থে ডকুমেণ্টারি ফোটোগ্রাফ তোলা হয়েছে অপর্যাপ্ত।

তিন জালিয়াত—বলা বাহুল্য, এঁরা তৎকালীন তথাকথিত মডার্ন আর্টিস্টদের গোঠ বেঁধে, দল পাকিয়ে চিৎকার ও একাডেমিক আর্টের উদ্দেশে তাদের অশ্রাব্য কটুবাক্য শুনতে শুনতে হন্যে হয়ে গিয়ে শেষটায় উপযুক্ত 'সৎকার'টি করেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে আবার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দিলেন 'বানরালে' নামটার মধ্যখানে ane—ফরাসীতে যার অর্থ গর্দভ—শব্দটি গোপনে গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছে। অর্থাৎ গাধাটিই এসব ছবির প্রকৃত আর্টিস্ট।

তস্য বিগলিতার্থ, মোস্ট-আলট্রা-মডার্ন-আর্টিস্ট তথা তাঁদের মুখপাত্র আর্ট-ক্রিটিকরা এ্যাদ্দিন ধরে যাকে তাঁদের শিরোমণি করে, তাঁদের হীরো বানিয়ে বিনা বাদ্যে নেচেছেন ('কি কল পাতাইছো তুমি! বিনা বাইদ্যে নাচি আমি॥'—লেখকের মাতৃভূমির প্রবাদ) তিনি একটি গর্দভ!

এ-জাতীয় ঘটনা আরো ঘটেছে। তার ফিরিস্তি দিতে যাবে কে? আর উপরের উল্লিখিত ঘটনাটির পিছনে রয়েছে নষ্টামী। কিন্তু যেখানে কোনো প্রকারের কুমতলব নেই, সেখানেও যে এ রকমের দুর্ঘটনা ঘটে থাকে সেটা বছর পাঁচেক পূর্বে সপ্রমাণ করে সুইডেনের মতো ঠাণ্ডা দেশ।

সুইডেনের অন্যতম প্রখ্যাত অতি আধুনিক চিত্রকর ফালস্ট্রোম ছবি আঁকার সময় একখানা ম্যাসোনাইটের টুকরোয় মাঝে মাঝে তুলি পুঁছে নিতেন। কাজেই সেটাতে হরেক রকম রঙ লেগে থাকার কথা। ঐ সময় সুইডেনের ললিতকলা আকাদেমী এক বিরাট মহতী চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন—'স্বতঃস্ফূর্ত কলা (Spontaneous art বা স্পণ্টানিস্‌মুস্ এর নাম এবং এটাকেই তখন সর্বাধুনিক কলাপদ্ধতি বলা হত) ও তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ' এই নাম দিয়ে সেই চিত্রপ্রদর্শনীতে থাকবে সুইডেন তথা অন্যান্য দেশের স্পণ্টানিস্‌মুস্ কলার উত্তম উত্তম নিদর্শন। এখন হয়েছে কি, চিত্রকর ফালস্ট্রোম তাঁর অন্য ছবি যাতে ডাকে যাবার সময় জখম না হয় সেই উদ্দেশ্যে পূর্বোল্লিখিত তুলি পোঁছার রঙবেরঙের ম্যাসোনাইটের টুকরোখানা তাঁর অন্য দুখানা ছবির উপর রেখে প্যাক করে প্রদর্শনীতে পাঠিয়ে দেন—এস্থলে বলা উচিত ফালস্ট্রোম ছবি ক্যানভাসের উপর না এঁকে আঁকতেন ম্যাসোনাইটের উপর। আকাদেমীর বড় কর্তারা ভাবলেন এটাও মহৎ আর্টিস্টের

এক নবীন কলানিদর্শন, এবং পরম শ্রদ্ধাভরে সেই তুলি পোঁছার টুকরোটির নিচে আর্টিস্টের স্বনামধন্য নাম লিখে ঝুলিয়ে দিলেন তাঁর অন্য ছবির পাশে।

কেলেঙ্কারিটা কি করে বেরিয়ে পড়ে সে অন্য কাহিনী, কিন্তু যখন পড়ল তখন উঠলো কাগজে কাগজে হৈহৈ রব। শেষটায় খুদ আকাদেমির প্রেসিডেন্ট খুদাতাল্লার হাতে সব-কিছু ছেড়ে দিয়ে বলেই ফেললেন, 'কি করি মশাইরা, বলুন। কে জানত শেষটায় এ-রকম-ধারা হবে? আজকাল নিত্যি নিত্যি এত সব নয়া নয়া এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে যে, কোন্‌টা যে এক্সপেরিমেন্ট আর কোন্‌টা যে এ্যাক্সিডেন্ট কি করে ঠাওরাই? আমরা ভেবেছি গুণী ফালস্ট্র্যাম আর্টের ক্ষেত্রে একটা অভিনব নবীন পন্থা আবিষ্কার করতে পেরেছেন এবং সেই ভেবে ঐ ছবিটাও প্রদর্শনীর অন্যান্য ছবির সঙ্গে টাঙিয়ে দিয়েছি—'

'রাস্তার লোক' সব শুনে বললে, 'এতদিন যা শুধু সরস্বতীর বরপুত্ররাই বহু সাধনার পর, বহু তপস্যার ফলে সৃষ্টি করতে পারতেন, এখন দেখছি এ্যাক্সিডেন্টও (আকস্মিক যোগাযোগ) সেটা করতে পারে!'

এর বহু পূর্বেই সংস্কৃতেও নাকি বলা হয়ে গিয়েছে, কোটি কোটি বৎসর ধরে উইপোকা কাঠ খেয়ে খেয়ে হিজিবিজি যে নক্সা কাটছে, তার ভিতর হয়তো একদিন পূর্ণ প্রণব মন্ত্রটিই খোদাই হয়ে বেরিয়ে আসবে।

পাঠক আদৌ ভাববেন না, আমি মডার্ন কবিতা বা আর্টের দুশ্‌মন্‌। এর চেয়ে সত্যের অপলাপ ও অন্যায় অবিচার আমার প্রতি আর কিছুই হতে পারে না। বস্তুত আমি মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি, প্রকৃত শিল্পী প্রতিদিন সেই চেষ্টাতেই থাকবে, কি করে নূতন ভঙ্গীতে নবীন পদ্ধতিতে তার মহত্তম চিন্তা নিবিড়তম অভিজ্ঞতা মধুরতম ভাষায় প্রকাশ করতে পারে। নইলে তো আমরা প্রলয় পর্যন্ত 'পাখীসবে'র সঙ্গে সেই একই 'রব' গেয়েও কূল পাবো না।

কিন্তু গেল ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আমি বড় দুশ্চিন্তায় পড়েছি। পাব্‌লো পিকাস্‌সোর নাম শুনলে আজকের দিনে শতকরা নিরানব্বই জন—কি প্রাচীন কি অর্বাচীন সবাই—অজ্ঞান। সেই পিকাস্‌সো গেল ফেব্রুয়ারি মাসের কাছাকাছি একটি বিবৃতি দেন। বোম্বায়ের Alvi Book Bulletin-এর ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় সেটি বেরিয়েছে। উপস্থিত আমি কোনো মন্তব্য করছি না। শুধু সেটি তুলে দিচ্ছি। বাংলায় অনুবাদও করবো না, কারণ যাঁরা ইংরিজি জানেন না তাঁরা অযথা সন্তাপ থেকে বেঁচে যাবেন, আর যাঁরা জানেন, তাঁদের জন্য অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন। আসল প্রধান কারণ অবশ্য, এটির সুষ্ঠু অনুবাদ আমার শক্তির বাইরে।

তবে উভয় পক্ষকে অসন্তুষ্ট করার জন্য মোটামুটি একটি ব্যাখ্যা দেব।

'Pablo Picasso, 83 years old Spanish-born father-figure of the modernist cult in art, has now made a sensational "confession" that he was simply amusing himself at the expense of his intellectual admirers with his bizarre creations.' Says he :

'The people no longer seek consolation and inspiration in art. But the refined people, the rich, the idle, seek the new, the extraordinary, the original, the extravagant, the scandalous. And myself, since the epoch of Cubism, have contended these people with all the bizarre things that have come into my head. And the less they understood it the more they admired it.

By amusing myself with all these games, all this nonsense, all these picture puzzles and arabesques, I became famous, and very rapidly. And celebrity, for a painter, means sales, profits, a fortune. Today, as you know, I am famous and very rich.

But when I am alone with myself I have not the courage to consider myself as an artist in the great sense of the word, as in the days of Giotto, Titian, Rembrandt, and Goya. I am only a public entertainer who has understood his time.'

পিকাস্‌সোর উক্তির বিগলিতার্থ—আজকের দিনের মানুষ কলাসৃষ্টির দ্বারস্থ হয় না সান্ত্বনা বা অনুপ্রেরণার জন্য ; আজকের দিনের নিষ্কর্মা, তথাকথিত বিদগ্ধ ধনীরা চায়, নূতন, মৌলিক, অসাধারণ, বাড়াবাড়ির চরম, কেলেঙ্কারির কলা আর তিনি সেই ক্যুবিজেম্‌-এর[৩] আমল থেকে তাঁর মাথায় যত সব আবোল-তাবোল হযবরল (bizarre)[৪] এসেছে, সেগুলো দিয়ে ঐ সব ধনীদের

৩ এদেশে গগনেন্দ্রনাথ সত্যই ছবি এঁকেছিলেন ঐ ক্যুবিজম্‌ পদ্ধতিতে।

৪ মডার্ন মাথামুণ্ডুহীন ছবির জন্যই যেন এই মোক্ষম bizarre শব্দটি

সন্তুষ্ট করেছেন। এবং তাঁর ঐ সব 'বিজার' ছবি তারা যত কম বুঝতে পেরেছে, সেই অনুপাতে মুগ্ধ প্রশংসা করেছে ততই উচ্চমাত্রায়। আর তিনিও ফুর্তি পেলেন ঐ ধরনের, ওদেরই প্রার্থিত খেলা খেলতে,—আঁকলেন অর্থহীন যা-তা (নন্‌সেন্স), ছবির ধাঁধা, জ্যামিতিক ডিজাইন এবং তারই ফলে হয়ে গেলেন বিখ্যাত। আর আর্টিস্টের পক্ষে বিখ্যাত হওয়ার অর্থই, প্রচুর ছবি বিক্রির ফলে প্রচুরতর অর্থলাভ। এবং সবাই এখন জানেন, পিকাস্‌সো বলছেন, তিনি এখন বিখ্যাত এবং খুবই সম্পদশালী।

কিন্তু তার পরই বলছেন, কিন্তু তিনি যখন একা বসে আত্মচিন্তা করেন, তখন আর তাঁর সাহস হয় না, নিজেকে সেই মহান অর্থে শিল্পী আখ্যা দিতে, যে অর্থে শিল্পী বোঝাতো জিত্তো, তিৎসিয়ান, রেমব্রাণ্ট, গোইয়া-র যুগে। তিনি শুধু দিয়েছেন সবাইকে ফুর্তি (পাব্‌লিক্ এণ্টারটেনার—তার রূঢ়তম অর্থ 'ভাঁড়', 'সার্কেসের ক্লাউন', 'সং') কারণ তিনি 'যেমন কলি, তেমন চলি' তত্ত্বটি বুঝতেন।

নির্মিত হয়েছিল। ইংরেজ আভিধানিক এর প্রকৃত অর্থ বোঝাতে গিয়ে যেন দিশা না পেয়ে অনেকগুলো কাছে পিঠের শব্দ ও তাদের সমন্বয় করেছেন: eccentric, fantastic, grotesque, mixed in style, half barbaric. কিন্তু এদেশের সুকুমার রায় 'বিজার' শব্দটির প্রকৃত অর্থ একটি কবিতার মারফতে যা বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছেন সেটি বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়। আমি কয়েক ছত্র তুলে দিচ্ছি:

'কেউ কি জানে সদাই কেন বোম্বাগড়ের রাজা
ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত্ব ভাজা?
রানীর মাথায় অষ্টপ্রহর কেন বালিশ বাঁধা?
পাঁউরুটিতে পেরেক ঠোকে কেন রানীর দাদা?
কেন সেথায় সর্দি হলে ডিগ্‌বাজি খায় লোকে?
জোছনা রাতে সবাই কেন আলতা মাখায় চোখে?
ওস্তাদেরা লেপমুড়ি দেয় কেন মাথায় ঘাড়ে?
টাকের 'পরে পণ্ডিতেরা ডাকের টিকিট মারে?
সভায় কেন চেঁচায় রাজা "হুক্কা হুয়া" ব'লে?
মন্ত্রী কেন কল্‌সী বাজায় ব'সে রাজার কোলে?
সিংহাসনে ঝোলায় কেন ভাঙা বোতল শিশি?
কুমড়ো নিয়ে ক্রিকেট খেলে কেন রাজার পিসি?' ইত্যাদি।

এই বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর পিকাস্‌সোর 'কর্তাভজা' সম্প্রদায়ে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হয়, সেটা আমার চোখে পড়েনি। তবে আমার কাছে পূর্বের অবোধ্য একটি সমস্যা সরল হয়ে গেল।

পিকাস্‌সো বৃদ্ধবয়সে এক তরুণীকে বিয়ে করেন। কয়েক বছর পর তরুণী তাঁকে ত্যাগ করে তালাক নেন (কিংবা হয়তো পিকাস্‌সোই এমন পরিস্থিতি নির্মাণ করেন যে তালাক ভিন্ন অন্য গতি ছিল না—কারণ তিনি 'গ্রেট্ আর্টিস্ট' হন আর নাই হন এ তত্ত্বটি কিন্তু অনস্বীকার্য, 'গ্রেট আর্টিস্ট'দের যে-খামখেয়ালির বাতিক থাকে, মাথায় যে-ছিট থাকে সেটা তিনি পেয়েছেন ন'সিকে!) এবং পিকাস্‌সোর সঙ্গে তাঁর দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। পিকাস্‌সো নাকি সেটা ঠেকাবার চেষ্টা করে বিফল হন। সেই জীবনীটি যখন ধারাবাহিকভাবে কন্টিনেন্টের একটি সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয় তখন তার প্রায় সব কটা কিস্তিই আমি পড়ি, এবং আমার মনে সব চেয়ে বেশী বিস্ময় সৃষ্টি করলো —আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম বললেও অত্যুক্তি হয় না—যে, সে পুস্তিকায় পিকাস্‌সো তাঁর তরুণী স্ত্রীকে আর্ট বলতে কি বোঝায় এবং ঐ বিষয় নিয়ে যে সব আলোচনা তাঁর সঙ্গে করেন সেগুলো সব প্রাচীন যুগের কথা; অর্থাৎ সেই মাইকেল এঞ্জেলোর আমল থেকে প্রায় একশ' বৎসর পূর্ব পর্যন্ত আলঙ্কারিক, কলারসিকরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আর্টের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, আর্ট-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে যে-সব অভিমত প্রকাশ করেছেন, পিকাস্‌সো মোটামুটি তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র!

আমি তখন চিন্তা করে বিহ্বল হয়েছি, এই যদি আর্ট সম্বন্ধে পিকাস্‌সোর ধারণা হয় তবে তাঁর আঁকা ছবির সঙ্গে এ ধারণার কোনো সামঞ্জস্যই তো খুঁজে পাচ্ছি নে! একদিকে লোকটি আর্ট সম্বন্ধে ক্ল্যাসিক্যাল, একাডেমিক ধারণা পোষণ করেন, আর অন্যদিকে তিনি এঁকে যাচ্ছেন—তাঁর ভাষাতেই বলি— 'বিজার' 'গ্রোটেস্ক' যত সব মাল!

এ যেন, আপনি নামতা শিখেছেন ঠিকই, কিন্তু অঙ্ক কষার বেলা করছেন ৩×৪=৮২, ৭+৫=২!

পিকাস্‌সোর এই বিবৃতিটি পড়ে আমার মনের ধন্দ গেল। তাঁর আদর্শ ছিলেন জিত্তো রেমব্রাণ্টই, কিন্তু তিনি জানতেন প্রথমত, ওঁদের স্তরে আদৌ পৌঁছতে পারবেন কি না, দ্বিতীয়ত, পৌঁছতে পারলেও বাজারে সেই 'প্রাচীন ঢঙে'র ছবির চাহিদা আজ আর আদপেই নেই, তৃতীয়ত, তাঁরও খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্য অর্থের প্রয়োজন এবং সর্বশেষে, সেই অর্থের জন্যই যখন

ছবি আঁকবো আপন আদর্শ বেহায়া বিসর্জন দিয়ে—তবে সেইটাই করি পূর্ণমাত্রায় ইংরিজিতে যাকে বলে 'উইথ্ এ ভেন্‌জেন্‌স', উর্দুতে বলে, 'পক্‌ড়ে তলওয়ার দামন্‌কে সম্ভালে কোই ?'—তলওয়ার যখন ধরেইছি তখন রক্তের ছিঁটে পড়বে বলে কুর্তার দামন (প্রান্ত, অঞ্চল) অন্য হাত দিয়ে সামলানোটা বিলকুল বেকার।

অবশ্য এসব তর্কবিতর্কের অর্থ হয়, যদি আমরা নিঃসন্দেহে ধরে নিই যে পিকাস্‌সো এ-বিবৃতিতে প্রাণের কথা খোলাখুলিই বলেছেন, সজ্ঞানে সত্যভাষণই করেছেন। নইলে কাল যদি আরো পয়সা কামানোর জন্য, বা বিনা কারণেই আরেকটা নয়া ফয়তা ঝেড়ে বলেন, 'না না, ওটা আমার সত্য বিবৃতি নয়। আমি শুধু রগড় দেখবার জন্য এই মস্করাটা করেছিলুম—আমার অন্ধ স্তাবক, এবং ঐ সব মূর্খ ধনীরা যারা নৃত্য করতে করতে আমার ছবি কিনেছে হুজুগে মেতে, ন্যায্য মূল্যের শতগুণ বেশী টাকা ঢেলে, তারা তখন কি বলে ?—সোজা ইংরিজিতে 'আই উয়োজ পুলিং দেয়ার লেগ্!'—তখন আজ যে-সব প্রাচীনপন্থীরা এই হাটের মধ্যিখানে হাঁড়ি ভাঙাটা দেখে উল্লাসে চিৎকার করে উঠেছেন, তাঁরা লুকোবেন কোন্ ইঁদুরের গর্তে!

অবশ্য শেষ পর্যন্ত কর্তাভজাদের কোনো দুশ্চিন্তা নেই। তাঁরা বলবেন, 'আজ যদি শেক্সপীয়রের স্বহস্তে লিখিত একখানা গোপন ডাইরি বেরোয় যাতে তিনি লিখেছেন, "আমি হতে চেয়েছিলুম হোমার, ভার্জিলের মতো কবি, কিন্তু যখন দেখলুম এযুগে সে সব কবিদের চাহিদা নেই তখন হয়ে গেলুম, পাব্‌লিক এণ্টার-টেনার—ভাঁড়" তা হলেই কি আমরা সেটা মেনে নেব, আর বলবো, শেক্সপীয়র গ্রেট পোয়েট নন!'

মুসলমানদের ভিতর একাধিক সম্প্রদায়ের লোক বিশ্বাস করেন, তাঁদের সপ্তম ইমাম (পৃথিবীতে আল্লার প্রতিভূ) অদৃশ্য হয়ে যান, তিনি সত্যি সত্যি মারা যাননি,—সময় হলেই তিনি অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে মাহ্‌দী (কল্কি) রূপে আত্মপ্রকাশ করবেন। অন্য সম্প্রদায় বলেন, 'সপ্তম ইমাম না, অদৃশ্য হন দ্বাদশ ইমাম, তিনিই মাহ্‌দীরূপে ইত্যাদি।' তৃতীয় সম্প্রদায় বলেন, 'দ্বাদশ না, চতু-র্বিংশতি ইত্যাদি।'

এঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে স্পেনের আন্দালুশ প্রদেশের মৌলানা ইব্‌ন হাজম যেন এঁদের বাবদে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে মাথা থাবড়াতে থাবড়াতে বলছেন, 'অলৌকিক এদের অন্ধবিশ্বাসের পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত হয়ে থাকবার ক্ষমতা! কারো ইমাম অদৃশ্য হয়েছেন অষ্টম শতাব্দীতে, কারো নবম, কারো বা দশমে। যে জিনিস হারিয়ে গেছে (অদৃশ্য হয়েছে) দু'শ তিনশ চারশ বছর

আগে, এরা এখনো সেটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কেউ বা আবার বলে, অদৃশ্য ইমাম আছেন একটা মেঘের আড়ালে! আহা, যদি জানতুম কোন্ মেঘটা! চীৎকারে চীৎকারে তাঁকে অতিষ্ঠ করে বলতুম, "সশরীরে নেমে এসে কুল্লে বখেড়ার ফৈসালা করে দাও না, বাবা!" তাজ্জব, তাজ্জব!'

পিকাস্সোর আগের বিবৃতি যদি সত্য হয় তবে আমাদের বলতে হবে, ভক্তজনের যে উপাস্য পিকাস্সো তিনি আত্মহত্যা করলেন। আর ভক্তজন বলবেন, তিনি মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছেন।

আর যে-সব সরলজন বিশ্বাস করে ঐ সব 'বিজারের' বাজার বিলকুল ঝুটা, মস্করা করে ছবির ধাঁধা বানিয়ে আর আরাবেস্ক এঁকে প্রকৃত কলাসৃষ্টি হয় না, তার জন্য প্রচুর অক্লান্ত তপস্যার প্রয়োজন তাদের জন্য নিম্নের উদ্ধৃতিটি তুলে দিলুম; কিছুতেই লোভ সামলাতে পারলুম না,—আমার চোখে পড়েছে এই আজ: কিছুদিন আগে কোনো একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আলাউদ্দিন সাহেব এবং গোলাম আলি সাহেবকে সংবর্ধনা জানানো হয়। অভিনন্দনের উত্তরে আলাউদ্দিন সাহেব বললেন—"নব্বই বছর ধরে সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর দর্শনের আশায় সাধনা করে আসছি। একটি মাত্র আশায় দিনের পর দিন সাধনা করে আসছি—একদিন-না-একদিন তিনি প্রসন্ন হয়ে আমাকে অমরাবতীর-সঙ্গীত মন্দিরে ঢোকবার অনুমতি দেবেন। আজও আমার সাধনার শেষ নেই। এতদিন সাধনার ফলে দূর থেকে শুধু মন্দিরের আবছায়া ছায়াটা যেন একটু একটু নজরে আসছে।"

এর পর গোলাম আলি সাহেব অভিনন্দনের উত্তরে বললেন—"আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব মহাভাগ্যবান ব্যক্তি। দেবী সরস্বতী তাঁর সাধনায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে মন্দিরের ছায়া দেখিয়েছেন। কিন্তু আমি হতভাগ্য এতদিন সাধনা করার পরেও সঙ্গীত-মন্দিরের ছায়া দেখতে পাওয়া দূরে থাক—উপরে ওঠবার সিঁড়িটুকুও এখনো শেষ করতে পারিনি। জানি না কত সহস্র বছর আরো কঠিন কঠোর সাধনায় দেবী প্রসন্ন হবেন।"

দর্পণ

বছর পনেরো পূর্বে সেই সোনার বাঙলা মেতে উঠেছিল রম্যরচনা মারফত রম্যসাহিত্য সৃষ্টি করতে। তারপর সে হুজুগ কেটে যায়—তার কারণ বর্ণন উপস্থিত মুলতুবী রাখলুম। বছর পাঁচ-সাত পূর্বে দেখলুম, কেষ্টবিষ্টু তো বটেনই, পাঁচু-পেঁচি তক্ ছেড়ে কথা কইছেন না—সবাই লেগে গেছেন, আত্মজীবনী প্রকাশ করতে। সে-মোকায় আমারও মনে বাসনা যায় একখানি সরেস আত্মজীবনী ছেড়ে আর পাঁচজনকে ঘায়েল করে দি, কিন্তু বিধি বাম। ইংরিজিতে প্রবাদ আছে 'ম্যান প্রোপোজেস, গড্ ডিস্পোজেস'—মানুষ প্রস্তাব পাড়ে (কোন কিছুর কামনা করে) আর ভগবান সমাধান করেন, তাঁর ইচ্ছে মতো। এটা ইংরেজ আমাদের শিখিয়েছে আর পাঁচটা ভুল জিনিস শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে। আপনারা সরল চিত্ত ধরেন, আর ভাবেন, ইংরেজ আমাদের ইংরিজি শিখিয়েছে। বিলকুল ভুল। ইংরেজ নিজে শেখে 'কিংস্ ঈংলিশ', তার অর্থ, তাদের রাজা—উপস্থিত রানী—যে ইংরিজি ব্যবহার করেন। আর আমাদের শিখিয়েছে 'ব্যাবু ইংলিশ' বা 'বাবু ইংলিশ'! আসলে প্রবাদটা 'ম্যান প্রোপোজেস, উম্যান ডিজপোজেস' অর্থাৎ পুরুষ প্রস্তাব করে, স্ত্রীলোক ফৈসালা করে। প্রবাদে ভেজাল কর্ম কিছু নূতন নয়; স্মরণ করুন বেদনিষ্ঠ সদাচারী ব্রাহ্মণসন্তান দ্রোণাচার্য তাঁর শিশুতনয়কে দুধের পরিবর্তে কি দিয়েছিলেন! কিংবা সদাশয় সরকার—থাক গে আবার শ্বশুরবাড়ি যেতে চাই নে।

শ্বশুরবাড়ি যেতে চাই নে! হেন বাঙালী আছে কি যে শ্বশুরবাড়ি যেতে চায় না? অসার খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরম্—দেবভাষায় আপ্তবাক্য। ঐ তো করলেন ব্যাকরণে ভুল!

আত্মজীবনী লিখি-লিখছি লিখি-লিখছি করছি এমন সময় এক রমণীর পাল্লায় পড়ে আমাকে কয়েক বছর জেলে কাটাতে হয়।

শুনেছি, জরাসন্ধ নাকি চৌদ্দ বছর আলীপুর জেলে কাটান। তার কয়েক বৎসর পর একদা বাস-এ করে ঐ জেলের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁর বালকপুত্র চিৎকার করে সোল্লাসে তাঁকে শুধোয়, 'বাবা, ঐখেনে তুমি চোদ্দ বছর ছিলে? না?'

বাস-সুদ্ধ লোক তাঁর পানে কটমটিয়ে তাকায়। যদ্যপি গাঁটকাটার চোদ্দ বছর জেল হয় না, তবু সবাই অচেতন মনে আপন আপন পকেটে হাত দিয়ে

মনিব্যাগ পাকড়ে ধরে। তা ধরুক। কিন্তু বেচারী জরাসন্ধ বাস-সুদ্ধ লোককে বোঝান কি প্রকারে যে, তিনি জেলে চোদ্দ বছর সুপারিনটেন্‌ডেনটের কর্ম করেছেন। বুঝুন ঠ্যালাটা! তাই তো ঋষি বলেছেন, 'দারা পুত্র পরিবার কে তোমার তুমি কার?' পুত্র না হয়ে আর কেউ হলে শান্তস্বভাব তিতিক্ষু 'জরাসন্ধ' বসিয়ে দিতেন নাকে মোক্ষম এক ঘুঁষি!

না। আমি জেলে যাই, আইনত, খাস জজসাহেবের হুকুমে। সে কথা যথাসময়ে হবে।

জেলে একজন আরবের সঙ্গে আলাপ হয়—আমি পোরট্ সঈদের একটা গোপন নাইট-ক্লাবে চাকরি করার সময় কিছুটা আরবি শিখে যাই, ঐ ভাষায় কটুকাটব্য করতে ততোধিক।

আরবটি বেশ লেখাপড়ি করেছে। তবু যে কেন জেলে এল তার কারণ একটি সরেস্ ফার্সী কবিতাতে আছে।

এক বৃদ্ধ বাজীকর তার ছেলেকে বলছে, 'ছাখ ব্যাটা, এই বয়সেই তুই আমার মতো হুনুরীর কাছে সব এলেম রপ্ত করে নে। কি করে পাঁচটা বল নিয়ে লুফোলুফি করতে হয়, টুপির ভিতর থেকে জ্যান্ত খরগোশ বের করতে হয়, হাত-পা-বেঁধে বাক্সে ভরে সমুদ্রে ফেলে দিলে বেরিয়ে আসতে হয়।

শুনবি না বুড়ো বাপের কথা? তা হলে আল্লার কসম, খুদার কিরে কেটে বলছি, তোকে পাঠাবো প্লাটশালে, তার পর ইস্কুলে, তারপর কলেজে। এম-এ, পি-এইচ-ডি করে বেরনোর পর যখন দোরে দোরে ভিক্ষে মাগবি, লাথি-ঝ্যাঁটা খাবি তখন বুঝবি রে, ব্যাটা, তখন বুঝবি, বুড়ো বাপ হক্ক কথা বলেছিল কি, না।'

আরবের বেলাও বোধ হয় তাই হয়েছিল। কলেজের বিদ্যেতে যখন পেট ভরলো না তখন শিখতে গেল বড় বিদ্যে—ল্যাটে গেল, ল্যাটে গেল! বুড়ো বয়সে বিয়ে করা আর বড় বিদ্যে শিখতে যাওয়া একই আহাম্মুখী!

পীরসাহেব সেজে আরবিস্থান থেকে সোনা পাচার করতে গিয়ে শ্রীঘর।

সে কথা থাক। তার কাছে কিন্তু একখানা বই ছিল। সেটি পবিত্র কুরান-শরীফ বলাতে জেল-কর্তৃপক্ষ সেটিকে তার কাছে হামেহাল রাখবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

অতখানি আরবী বিদ্যে আমার নেই যে, স্বচ্ছন্দে কেতাবখানা পড়ি। তাই আরব বাবাজীই আমাকে পড়ে শোনাতো। লেখকের নামটা আমার এখনো মনে আছে। এরকম দেড়-গজী নাম ইহসংসারে বিরল বলে সেইটে বহু তকলীফ

বরদাস্ত করে মুখস্থ করে নিয়েছিলুম: আবু উস্‌মান্ আম্‌র ইব্‌ন্ বহ্‌র্ উল্ জাহিজ্—ধানাই-পানাই বাদ দিলে তার বিগলিতার্থ দাঁড়ায় 'প্রলম্বিত চক্ষুপল্লব বিশিষ্ট'। এই জাহিজ লিখেছিলেন তাঁর আত্মজীবনী।

এ-দেশে যে আরব্যরজনী খুবই প্রচলিত সে-তথ্য আরব জানতো না। আমি সে আরব্যরজনীর কথা বলছি নে যেটি আপনারা কলেজ স্ট্রীটে পান—কেটেছেঁটে সেটিকে করা হয়েছে গঙ্গাজলে ধোওয়া তুলসী পাতাটির মতো পূতপবিত্র। আমি বটতলা সংস্করণের কথা বলছি। অশ্লীলতায় মূল আরব্যরজনী—ঐ যে কি বলে, লেডি চ্যাটারলি না কি—তেনাকে ঢিড-দুয়ো দিতে পারে, হেসে-খেলে। পারলে সত্য গোপন করতুম, কিন্তু সুচতুর পাঠক বহু পূর্বেই ধরে ফেলেছেন ঐ কারণেই বইখানা আমাকে ছেলেবেলায়ই আকৃষ্ট করেছিল। আহা, ঐ যে নিগ্রো ছোকরা গোলাম আর সুন্দরী প্রভুকন্যার কেচ্ছা—না, থাক্ আবার আলীপুর যেতে চাই নে।

আরব বলছিল, জাহিজ্ নাকি আরব্যরজনীর খলীফা হারুন-অর্-রশীদের নাতি না কে যেন, সেই খলীফার উজীরের নেক্-নজরের আস্কারা পেয়ে আপন বউকে পর্যন্ত ডরাতেন না। ব্যস্, ঐ এক কথাই কাফী। কথায় বলে, বাঘের এক বাচ্চাই ব্যস্।

আত্মজীবনী আরম্ভ করার গোড়াতেই মনে পড়ল, জাহিজ্ যে অবতরণিকা দিয়ে তাঁর জীবনী আরম্ভ করেছেন সেইটে দিয়ে আমিও আরম্ভ করলে আমারও যাত্রা হবে নিরাপদ—

'যেমতি মূষিক ভ্রমে সাগরে বন্দরে
নৃপতরী আরোহিয়া—'

এমন সময় খটকা লাগল। জাহিজের কিঞ্চিৎ পরিচয় তো দিতে হয়। নিদেন তাঁর জন্মকাল লীলাভূমি তো বাৎলাতে হয়।

অধমের বাসভবনে যাঁরাই পায়ের ধূলি দিয়েছেন, তাঁরাই জানেন সেখানে আর যা থাক, না-থাক, বই সেখানে একখানাও নেই। শুনেছি এক 'বিদ্যেসাগর' নেটিভ মহারাজা ভাইসরয়ের সামনে আপন কিম্মৎ বাড়াবার জন্য একটি কলেজ খোলেন। প্রিন্সিপল নিযুক্ত হয়ে দেখেন, কলেজ লাইব্রেরি নামক কোনো কিছু সেখানে নেই। তিনি টাকা চাইতেই মহারাজা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'নিকালো হারামীকো অভী স্টেটসে। লেখাপড়া শিখে আসেনি; এখন বুঝি বই পড়ে কলেজে পড়াবে! আমাকে কি উল্লু পেয়েছে নাকি?'

এর থেকে আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েছে।

অবশ্য নতমস্তকে বারংবার স্বীকার করবো, একখানা বইয়ের সন্ধানে আমি সংবরণের মতো পত্নীবর কামনা করে—

—তপতীর আশে
প্রখর সূর্যের পানে তাকায়ে আকাশে
অনাহারে কঠোর সাধনা কত—

করেছি। কি সে বই? ধর্মগ্রন্থ, আয়ুর্বেদ, কামশাস্ত্র—?

এসব কিছু না। একখানা চেক্ বই। সে দুঃখের কথা আর তুলবো না।

কিন্তু পুলিসের হুলিয়ার হুড়ো খেয়ে উপস্থিত যেখানে গা-ঢাকা দিয়ে আছি সেই এলাকায় এক অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি বাস করেন। তদুপরি তিনি অতিশয় অমায়িক। আমি তাঁর কাছে নিবেদন করলুম, 'স্যর, জাহিজ্ নামক আরবী লেখক কবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?'

চট করে একখানা বই টেনে নিলেন। ঠিক ঐ ঢপের আরো খান পঁচিশেক ভলুম শেলফে বিরাজ করছিল। বই থেকে পড়ে বললেন, 'মৃত্যু হয় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে—'

আমার কেমন যেন ধোঁকা লাগলো। বললুম, '১৮৬৯? হারুন-রশীদের নাতির আমলের লোক তিনি—এই কথাই তো শুনেছি।'

'ঠিকই তো! দেখি, হারুনের নাতি'—বলে আরেক ভলুম পাড়লেন—'হ্যাঁ, অল-ওয়াসিক—৮৪২ থেকে ৮৪৭।' একটু চিন্তা করে বললেন, 'অহ্ হো, বুঝিছি। ১৮৬৯-এর প্রথম ১টা বাদ দিতে হবে! ওয়াসিকের মৃত্যুর পর আরো বাইশ বছর বেঁচেছিলেন আর কি।' তা থাকুন আর নাই থাকুন। মোদ্দা কথা, কিন্তু ইনি নবম শতাব্দীর লোক, আর এই পণ্ডিতদের বেদ বলো, কুরান বলো, পরম পূজনীয় এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা বেচারীকে টেনে নিয়ে এলেন উনবিংশ শতাব্দীতে! তোবা! তোবা!! নির্জলা পূর্ণ এক হাজার বছরের ডিফ্রেনস্।

যে রকম সরলভাবে তিনি আমাকে স্ক্যাণ্ডালটা বুঝিয়ে বললেন যে মনে হয়, কলকাতার ডিটেকটিভ পর্যন্ত সেখানে থাকলে বুঝে যেত।

জাহিজ্ অবতরণিকায় বলেছেন, 'চতুর্দিকে আমার দুশমন আর দুশমন—দুশমনে দুশমনে আবজাব করছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আমার মুরুব্বী; কেউ ডরের মারে আমার রাজহাঁসটাকে পর্যন্ত বু করতে সাহস পায় না। কিন্তু আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, আমার দেহাস্থি গোরস্তানে প্রোথিত আমার পুণ্যশ্লোক পিতৃপুরুষগণের জীর্ণাস্থির সঙ্গে শুভযোগে সম্মিলিত হওয়ার পূর্বেই (মেহেরবান

খুদা সে শুভমিলন আসন্ন করুন !) আমার দুশমন-গুষ্টি অশেষ তৎপরতার সঙ্গে লিপ্ত হয়ে যাবে আমি এবং আমার উর্ধ্বতন তথা অধস্তন চতুর্দশ পুরুষের পূতিগন্ধময় নিন্দাবাদ করতে—এবং তার শতকরা ন'সিকে কপোলকল্পিত, আকাশ-পুরীষ-চয়িত বেহদ্দ গুলগঞ্জিকার ঝুটমুট।

যেমন, আমি জানি, আর পাঁচটা নিন্দাবাদের মাঝখানে, অতি কুচতুরতা সহ তারা কীর্তন করবে—আমি নাকি অতিশয় প্রিয়দর্শন সুপুরুষ ছিলুম, সাক্ষাৎ ইউ-সুফ-পারা হেন দেবদুর্লভ চেহারা নাকি কামনা করেন স্বয়ং বেহেস্তের ফেরেস্তারা।

ক্রোধান্ধ হয়ে জাহিজ্ এ স্থলে হুঙ্কার ছাড়ছেন, 'মিথ্যা, মিথ্যা, সর্বৈব মিথ্যা। আমার প্রতি অন্যায় অবিচার! আমি অভিসম্পাত দিচ্ছি, যে এ-অপবাদ রটাবে তার পিতা নির্বংশ হবে। আমি আদৌ সুশ্রী নই। বস্তুত টেকো মর্কটটার চেহারা পেলে আমি বর্তে যাই। আমার মুখমণ্ডল নামক বদ্‌নাবদন চেহারার বিভীষিকা দেখে অসংখ্য শিশু ভিরমি গেছে। আমার—'

সরল পাঠক! অধম অবগত আছে তুমি জাহিজের এই আত্মকথন শুনে ধন্ধে পড়ে গ্রীবা কণ্ডুয়নে লিপ্ত হয়েছ! তোমার মনে হচ্ছে, 'এ তো বিচিত্র ব্যাপার! কেউ যদি জাহিজ্‌কে প্রিয়দর্শন বলে মন্তব্য করে তবে সেটা নিন্দা হতে যাবে কেন, আর যে মন্তব্যটা করেছে সে-ই বা দুশমন হতে যাবে কেন? আর জাহিজ্ যদি কুৎসিতই হন তাতেই বা কি? তাঁর গোর হয়ে যাওয়ার পর কে আর মিলিয়ে দেখতে পারবে তিনি সুরূপ না কদ্রূপ ছিলেন। কথায় বলে, "মড়ার উপর এক মণও মাটি শ' মণও মাটি।" তবে কি জাহিজ্ নিরতিশয় সত্যনিষ্ঠ ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে কেউ মিথ্যে বলুক, এটা তিনি সইতে পারতেন না?—তা ও সে মিথ্যে প্রিয়ই হোক্, আর অপ্রিয়ই হোক্।

এসবের উত্তর আমি দেব কি প্রকারে? বেলা গড়িয়ে গেল, আর তুমি এখনো বুঝতে পারোনি, আমার পেটে সে-এলেম নেই! বিশেষত আমার সেই মুরুব্বী পণ্ডিত—যিনি দশটি ভাষায় ত্রিশ-ভলুমী সাইক্লোপীডিয়া নিয়ে কারবার করেন এবং যাঁর বাড়তিপড়তি মাল ভাঙিয়ে আমি হাঁড়ি চড়াই, তিনি গায়েব। তবে শেষ দেখার সময় মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে আমাকে বলেন, 'রেনেসাঁসের পূর্বেই এই লোকটা লিখল আত্মজীবনী! আশ্চর্য আশ্চর্য! রেনেসাঁসের পূর্বে তো শুধু রাজরাজড়া আর ডাঙর ডাঙর সাধুসন্ত। সাধারণ মানুষেরও যে একটা ব্যক্তিগত অস্তিত্ব আছে সেটা আবিষ্কৃত হল রেনেসাঁসের সময়। সাধারণ লোকের আত্মজীবনী তো প্রথম লেখেন আবেলরাড দ্বাদশ শতাব্দীতে, তার পর দান্‌তে 'নবজীবন' (ভিটা নুওভা) লেখেন ত্রয়োদশ

শতাব্দীর শেষে। আর তোমার ঐ জাহিজ্ না কে লিখে ফেললে নবম শতাব্দীতে? বড়ই বিস্ময়জনক, প্রায় অবিশ্বাস্য!'

সরল পাঠক, তোমার কুটিল প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারলাম না। তবে একটা ভরসা তোমাকে দিতে পারি। ইংরিজিতে প্রবাদ আছে—এক্সট্রিম্‌স মীট—দুই অন্তিম প্রান্ত একত্র হয়ে যায়। যেমন দেখতে পাবে গ্রাম্য গাড়ল (ভিলেজ ইডিয়ট) দাওয়ায় বসে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দেয় একটা শুকনো খুঁটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে, আর যোগীশ্রেষ্ঠও তাবৎ দিবসটা কাটিয়ে দেন একাসনে বসে বসে। উভয়েই কর্মস্পৃহা জয় করতে সক্ষম হয়েছেন। বিদ্যা-বুদ্ধিতে আমি এক প্রান্তে, জাহিজ্ অন্য প্রান্তে—উভয়ের সম্মিলন অবশ্যম্ভাবী।

অতএব আমার আত্মজীবনী যদি অবহিত চিত্তে পাঠ করো তবে হয়তো তোমার প্রশ্নগুলোর কিছুটা সদুত্তর পেয়ে যাবে।

জাহিজ্ তাঁর কেতাব আরম্ভ করেছেন এই বলে যে তাঁর দুশমনের অভাব নেই। এইখানেই তাঁর সঙ্গে আমার হুবহু মিল। বাকিটা সবিস্তার নিবেদন করি।

আত্মজীবনী-লেখক মাত্রই আপন বাল্যকাল নিয়ে রচনা আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথও এই পন্থা অবলম্বন করেছেন। এবং সেই সুবাদে সকলেই আপন আপন বংশ-পরিচয় দেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যতটা পারেন, পরিবারের মান-ইজ্জৎ বাড়িয়েই বলেন। এ নিয়ে বাক্যব্যয় সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। স্বদেশ, স্বজাতি, মাতৃভাষা নিয়ে অযথা অহেতুক বড়াই করে না, এমন মানুষ বিরল।

আমাকে কিন্তু ক্ষমা করতে হবে। তার কারণ এ নয় যে, আমি হীন পরিবারের লোক। সত্য কারণটা পাঠক একটু ধৈর্য ধরলেই বুঝতে পারবেন।

বস্তুত, পরিবার আমাদের খানদানী। আমাদের পূর্বপুরুষ শাহ আহমদের (শাহ এ স্থলে বাদশা নয়—'সৈয়দ'কে মধ্যযুগে 'শাহ' বলা হত) দরগা এখনো তরপ পরগনাতে আমাদের ভদ্রাসনে বিরাজিত—সেখানে প্রতি বৎসর উর্স্ হয়। তারই অল্প দূরে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মাতুলালয়—মাতা শচী দেবীর জন্ম সেখানেই। আমাদের বংশ 'পীরের বংশ'—এঁরা কিন্তু যজমানগৃহে অন্ন পর্যন্ত গ্রহণ করতেন না। আমার পিতামহ, মাতামহ, আমার অগ্রজদ্বয় সুপণ্ডিত। আমার অগ্রজ প্রায় কুড়ি বৎসর পরিশ্রম করে সম্প্রতি 'চর্যাপদে'র একখানি নূতন টীকা রচনা করেছেন। আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর ফকীরী, মারিফতী গীত ঢাকা বেতারে শুনতে পাবেন।

কিন্তু থাক, আর না। এ বিষয়টাই আমার কাছে মর্মান্তিক পীড়াদায়ক।

কুলমর্যাদার প্রস্তাব উঠলেই আমার পিতা বলতেন, 'বাপ-ঠাকুর্দার শুকনো হাড় চিবিয়ে কি আর পেট ভরবে?' আমিও চিবোইনি। চিবোনো দূরে থাক, আমাদের পিতৃপুরুষ যে গোরস্তানে শুয়ে আছেন তার পাশ দিয়ে যেতে হলে আমি মাথা হেঁট করি।

আমি এই গোষ্ঠীর একমাত্র ব্ল্যাকশীপ—কালা ম্যাড়া।

শব্দার্থে আমার বর্ণ ঘোরতর কৃষ্ণ তো বটেই—বাকি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা আর দেব না। তবে এইটুকুন বলতে পারি পরবর্তীকালে 'উচ্চ-শিক্ষা'র অজুহাত দেখিয়ে জন্মদাতা ও শিক্ষাদাতা দুই গুরুর কিল কানমলা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যখন শান্তিনিকেতনে আশ্রয় নিই তখন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর শ্রীযুত রামকিঙ্কর বায়েজ আমাকে দেখা মাত্রই সোল্লাসে চিৎকার করে ওঠেন, 'হুর্‌রে হুর্‌রে। কেল্লা মার দিয়া। কিষ্কিন্ধ্যার মহারাজ সুগ্রীবের বংশধর শ্রীযুত আহ্লাদী কুঞ্চিতপদম্ আমাকে বায়না দিয়েছেন শয়তানের একটি মূর্তি গড়ে দেবার জন্য। মানসসরোবর থেকে কন্যাকুমারী, হিংলাজ থেকে পরশুরাম কুণ্ড অবধি খুঁজে খুঁজে হায়রান—মডেল আর পাই নে। গুরুদেবের কৃপায় আজ তুই হেথায় এসে গেছিস। আয় ভাই আয়। চ' কলাভবনে।'

ইহুদিদের সদাপ্রভু য়াহভের বেহেশতে শয়তানের প্রবেশ নিষেধ। সেখান থেকে যদি শয়তানের মূর্তি গড়ার ফরমায়েশ আসতো সেটাও না হয় বুঝতুম কিন্তু কিষ্কিন্ধ্যা থেকে! সেখানকার মেয়েমদ্দা দুই-ই বুঝি দারুণ খাপসুরৎ হয়!

পরবর্তীকালে কিষ্কিন্ধ্যা গিয়েছিলুম। দ্রাবিড় অঞ্চলে প্রবাদ আছে, রমণীরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে—'কামের প্রলোভন থেকে আমাদের রক্ষা করো।' তাদের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করে ভগবান কিষ্কিন্ধ্যার পুরুষ সৃষ্টি করেন।

কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে দেখি, দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার। আসছে রবিবারে যমের পূজা উপলক্ষে অলিম্পিকের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানীয় টাউন হলে একটি টুর্নামেন্ট হবে। যে সব চেয়ে বেশী বিকট মুখ-ভেংচি কাটতে পারবে সে পাবে হাজার টাকার পুরস্কার।

আমি কম্পীট করিনি। নিরীহ দর্শক হিসাবে ছিলুম মাত্র। অবশ্য বিকট বিকট গরিল্লাপারা নরদানবরাই ঐ ভেংচি প্রদর্শনীতে হিস্যে নিয়েছিলেন—কার্তিক যতই ভেংচি কাটুন না কেন তাঁকে তো আর মর্কটের মতো দেখাবে না!

সে কী ভেংচির বহর! এক-একটা দেখি আর আমার পেটের ভাত চাল হয়ে যায়। আর সে কী দুর্দান্ত নেক্-টু-নেক্ রেস! কোথায় লাগে তার কাছে নিক্‌সন-হামফ্রের ঘোড়দৌড়!

পালা সাঙ্গ হল। হঠাৎ দেখি তিনজন জজই মল্লদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দর্শকদের গ্যালারি পানে এগিয়ে আসছেন। তার পর ওমা, দেখি, ঠিক আমারই সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমার গলায় জবাফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'যদ্যপি আপনি এই কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করেননি তবু আপনাকে প্রথম স্থান না দিলে অবিচার হবে। ভেংচি না কেটেও আপনার মুখে বিধিদত্ত যে ভেংচি সদাই বিরাজ করছে সেটা অনবদ্য, দেব—না, না—যমদুর্লভ। তবে আপনি এই কম্পিটিশনে পার্ট নেননি বলে আইনত টাকাটা দেওয়া যায় না—সেটা যমপূজায় ব্যয় হবে। হেঁ হেঁ, হেঁ হেঁ—পত্রপুষ্পাদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণে পৌঁছায়, বিকটের পূজো মাত্রই আপনাকে পৌঁছবে।' এ বাবদে শেষ কথা। আমি আজও কেন আই-বুড়ো আছি, সেটা বুঝতে কারোরই অসুবিধা হবে না।

পাঠক! এ লেখন প্রধানত তোমার অখণ্ড-সৌভাগ্যবান বংশধরদের জন্য। তারা যদি প্রত্যয় না যায় তবে যেন একবার কলাভবনে সন্ধান নেয়। ঐ মূর্তির একটি ফোটো তুলে রেখেছিলেন—আশ্চর্য, লেন্সটা কেন চৌচির হল না—ভবিষ্যৎদ্রষ্টা রামকিঙ্কর। ছবিটা তিনি দেখালেও দেখাতে পারেন। তবে তারা যেন গ্যাসমাস্ক তথা ধুঁয়ো মাখানো কাঁচ সঙ্গে নিয়ে যায়। মূর্তিটা গায়েব হয়েছে। গুজোরব শিল্পী রর্দার প্রেতাত্মা সেটি সরিয়েছে।

কিন্তু এহ বাহ্য।

পাড়ার ভটচার্য মহাশয়ের কাছে শুনেছি, বিয়ের সময় বনে নাকি বরের রূপ কামনা করে (আমার রূপের বর্ণনা দিলুম), বন্ধুবান্ধব বরের উত্তম কুল কামনা করে (সেটাও হল), পিতা সুশিক্ষিত বর চায়—এইবারে আমরা এলুম ইংরিজিতে যাকে বলে 'থিক্ অব দি ব্যাটল্' বা রণাঙ্গনের কেন্দ্রভূমিতে।

ডাক্তার অবশ্য পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'স্লো বাট স্টেডি উইন্‌স দি রেস'—বিলম্বিত চালেই চলুক না, সেই চাল যদি সদা বজায় রাখে তবে সে জিতবে। অর্থাৎ হোক না গর্দভ, সে যদি গর্দভী চাল বজায় রেখে চলে তবে আখেরে ডার্‌বি ঘোড়ার রেস জিতবে।

জীবনের অষ্টম বর্ষাবধি আমি শুধু একটানা 'ভাত খাবো, ভাত খাবো' বলেছি। একদম স্টেডি সুরে। ডাক্তারের স্তোকবাক্যে আত্মজন পরিতৃপ্ত না হয়ে মেনে নিলেন যে আমি স্লোউইটেড জড়ভরত। অষ্টম বর্ষে (চাণক্যকে ঢিঢ দিয়ে পঞ্চমে নয়) আমাকে পাঠানো হল পাঠশালে।

হাতেখড়ির প্রথম দিবসান্তে গুরুমশাই যে-শ্লোকটি আবৃত্তি করেন সেটি

মমাগ্রজ লিখে নেন :—

কাকঃ কৃষ্ণঃ পিকঃ কৃষ্ণঃ কো ভেদঃ পিককাকয়োঃ।
বসন্তসময়ে প্রাপ্তে কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ॥

কাক কোকিল দুইই কালো, কিন্তু মাইকেল মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলেন 'পিকবর রব নব পল্লব মাঝারে', আর আমার কণ্ঠস্বর শুনেই গুরু বুঝে গেলেন এটা একেবারে জাত দাঁড়কাকের। সবিস্ময়ে দাদাকে শুধোলেন, 'এটা তোর ভাই ?'

তারপর তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'কস্মিনকালেও শুনিনি, কাক কোকিলের বাসায় ডিম পাড়লো। এইবারে একটা ব্যত্যয় দেখলুম—হরি হে, তুমিই সত্য।'

এস্থলে তড়িঘড়ি আমি একটি সম্ভাব্য 'ভ্রম সংশোধন' করে রাখি। আমার দাদারা ফর্সা। আর আমি বিটকেল কৃষ্ণবর্ণ। অথচ আমরা একই বর্ণের, অর্থাৎ একই কুলের, অন্তত এই আমার বিশ্বাস ছিল বহুদিন ধরে।

কাকের সঙ্গে আমার আরো একটা জবরদস্ত দোস্তী দেখা গেল অচিরাৎ। আমি নিরবচ্ছিন্ন সেল্‌ফ পর্ট্রেট আঁকলুম ঝাড়া তিনটি বছর ধরে। অর্থাৎ পাততাড়িতে বছরের পর বছর কাগের ছা বগের ছা লিখে গেলুম।

আমার বিস্ময় লাগে, শিক্ষামন্ত্রী ত্রিগুণা সেনের জন্মনগরী করিমগঞ্জ আমারও তদ্বৎ। তাঁর আমার জন্ম একই বৎসরে। আজ তিনি তাবৎ দেশের শিক্ষাদীক্ষা তরণীর কর্ণধার, আর আমি সুর করে একটানা গেয়ে যাচ্ছি—'এক বাঁও মেলে না, দু বাঁও মেলে না—'

আমি যে শিক্ষা-দীক্ষায় নিরঙ্কুশ 'ডডনং' হয়ে রইলুম তার জন্য কবিগুরু গুরুদেবও খানিকটা দায়ী। অবশ্য তাঁর প্রতি আমার ভক্তি আমৃত্যু অচলা থাকবে। কারণ—

যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি-বাড়ি যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥

কবিগুরু বাঙালী তথা ভারতবাসীর সম্মুখে উত্তম উত্তম আদর্শ রেখে গেছেন, কিন্তু যে-আদর্শ 'এলেন আমার দ্বারে/ডাক দিলেন অন্ধকারে' এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুল্লেখার মতো আমার চিত্তাকাশ উদ্ভাসিত করে দিল সেটি এই :

'নেই বা হলেম যেমন তোমার
অম্বিকে গোসাঁই।
আমি তো, মা, চাইনে হতে
পণ্ডিতমশাই।

নাই যদি হই ভালো ছেলে,
কেবল যদি বেড়াই খেলে,
তুঁতের ডালে খুঁজে বেড়াই
গুটিপোকার গুটি,
মুর্খু হয়ে রইব তবে ?
আমার তাতে কীই বা হবে,
মুর্খু যারা তাদেরি তো
সমস্তখন ছুটি।'

পুনরায় :—

'যখন গিয়ে পাঠশালাতে
দাগা বুলোই খাতার পাতে,
গুরুমশাই দুপুরবেলায়
বসে বসে ঢোলে,
হাঁকিয়ে গাড়ি কোন্ গাড়োয়ান
মাঠের পথে যায় গেয়ে গান
শুনে আমি পণ করি যে
মুর্খু হব বলে।'

আমাকে অবশ্য কোনো উচাটন মন্ত্রোচ্চারণ করে কোনো প্রকারেই পণ করতে হয়নি। সর্বেশ্বর প্রসাদাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়ার লগ্ন থেকেই আমি কর্মমুক্ত। গোড়ায় ভেবেছিলুম, এটা বুঝি জড়ত্বের লক্ষণ। পরে শুনি দক্ষিণ ভারতের মহর্ষি ছন্দে গেঁথে বলেছেন, 'কর্ম কিং পরং। কর্ম তজ্জড়ম্॥' 'কর্ম তো স্বতন্ত্র নয়, কর্ম সে তো জড়!' তবে আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কর্মাতে কর্মাতে অম্বিকে গোসাঁই হয়ে গিয়ে কোন্ তুর্কীস্থানের বাখারার আজব মেওয়া আলু-বুখারা লাভ হবে ?

অবশ্য নতমস্তকে স্বীকার করবো, আমি পাঠশালা পাস করেছিলুম।

শুনেছি, নাৎসি যুগে এমনও চৌকশ স্পাই ছিল যে বিশ গজ দূরের থেকে শুধুমাত্র ঠোঁট নাড়া দেখে দুজনের ফিসফিসিনিতে কি কথাবার্তা হচ্ছে আদ্যন্ত বুঝে যেত এবং পকেটে হাত গুঁজে প্যাডের উপর সেটা আগাপাস্তলা শর্টহ্যাণ্ডে তুলে নিতে পারতো। আমি কিন্তু সে লাইনে কাজ করিনি। শ্যেনের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকলে আমরা সে ব্যক্তিকে বলি 'সেয়ানা'। আমি সেই দৃষ্টিশক্তির আনুকূল্যে দশ হাত দূরের ব্রিলিয়ান্ট বয়ের খাতা থেকে টুকলি করে তর্ তর্

করে পেরিয়ে গেলুম পাঠশালার ভব-নদী।

বুদ্ধিমান জন আপন বুদ্ধির জোরে তরে যায় বলে ভাগ্যবিধাতা মূর্খকে সাহায্য করেন, নইলে তিনিও বিলকুল বেকার হয়ে পড়বেন যে! মৌলা আলীকে শিরনি চড়াবে কে, কালীঘাটে মানত মানবে কোন্ মূর্খ—আর বুদ্ধিমান যে করে না, সে তো জানা কথা।

পাঠশালা পাস করার পর করলুম জীবনের চরম মূর্খমো! কলকাতার 'বেম্মো'-সমাজের বাবু-বিবিরা সে-যুগে পাড়াগাঁয়ে আসতেন আমাদের পেট্রনাইজ করার জন্য। তাঁদের চোখে কত না ঢঙ-বেঢঙের রঙ-বেরঙের চশমা। আমারও শখ গেল অপ-টু-ডেট হওয়ার। ভান করতে লাগলুম আমি ব্ল্যাক বোর্ড দেখতে পাই নে। ডাক্তারকে পর্যন্ত ঘায়েল করলুম—কিংবা সে ছিল ঝটপট দু'পয়সা কামাবার তালে।

সেই বেকার চশমা ব্যবহার করে গেল আমার শ্যেনদৃষ্টি। ফল ওৎরালো বিষময়। একই ইস্টিশানে—যেমন আগ্রা সিটি, আগ্রা ফোর্ট, আগ্রা জংশন—গাড়ি দাঁড়াতে লাগল তিন তিন বার করে। শ্যেন দৃষ্টি গেছে, টুকলি করতে পারিনি—একই ক্লাসে কাটাই তিন-তিনটি বছর করে।

ইতিমধ্যে কিন্তু আমি দিব্য অকালপক্ক 'জ্যেষ্ঠতাতত্ব' লাভ করেছি—তারই একটি উদাহরণ দি। ফেল মেরে দু'কান কাটার মতো শহরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি এমন সময় এক গুরুজন, মরালিটি প্রচারে নিরেট পাদরী সাহেব, আমাকে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'ফেল মেরেছিস? লজ্জাশরম নেই? তোর দাদারা, তোদের বংশ—'

একগাল হেসে বললুম, 'কি যে বলেন, স্যার! এ্যাসন ফাস্ট ক্লাস অ্যানসার লিখেছিলুম যে এগজামিনার মুগ্ধ হয়ে খাতায় লিখলে "এনকোর এনকোর!" তাইতেই তো ফের পরীক্ষা দিচ্ছি!'

সম্পর্কে তিনি আমার জ্যাঠা। কিন্তু আমার পক্ক-নিতম্ব 'জ্যাঠামো' শুনে তিনি থ মেরে গেলেন—আমাদের স্টেট বাস যেরকম আকছারই যত্রতত্র থ মারে—বুঝে গেলেন এ-পেল্লাদকে ঘায়েল করার মতো পাষাণে, সমুদ্রে নিক্ষেপ পদ্ধতি তাঁর শস্ত্রাগারে নেই। গত যুদ্ধের ফ্লেম থ্রোয়ারের মতো একবার আমার দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'এ ছেলে বাঁচলে হয়!'

গুরুজনের আশীর্বাদ কখনো নিষ্ফল হয়! দিব্যপুরুষ্টু পাঁঠাটার মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছি।

মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গেল। হঠাৎ উপলব্ধি করলুম বয়স ষোল। ওদিকে

ক্লাস ফাইভের যোগাসন আর পরিবর্তিত হচ্ছে না। দুনিয়ার যত ডানপিটেমি নষ্টামির মামদো উপযুক্ত পীঠস্থান পেয়ে আমার স্কন্ধে কায়েমী আসন গেড়েছে। আমার তথাকথিত অপকর্মের বয়ান আমি দফে-দফে দেব না! তবে এইটুকু বলতে পারি, পরীক্ষার হলে বেঞ্চি-ডেসকো ভাঙা, ট্রামবাস পোড়ানোর কথা শুনলে আমার ঠা ঠা করে উচ্চহাস্য হাসতে ইচ্ছে যায়। আরেকটি কথা বলতে পারি, আজ যে শ্রীহট্ট বার-এর আসামী পক্ষের উকিলরূপে সর্ববিখ্যাত মৌলভী সইফুল আলম খান—তিনি বাল্য বয়সেই কোথায় পেলেন তাঁর প্রথম তালিম? আমার 'অপকর্ম' পদ্ধতি (মডুস অপারেনডি) অপকর্ম গোপন করার কায়দা যে নব-নব রূপে দেখা দিত সেগুলো কি তিনি আমার সহপাঠী 'কনফিডেন্ট' রূপে আগাপাস্তলা নিরীক্ষণ করে তারই ফলস্বরূপ আজ উকিল সভায় স্বর্ণাসনে বসেননি!

তবু যদি পেত্যয় না যান তবে তৎকালীন আসামের আই. জি. অসরপ্রাপ্ত শ্রীযুত—দত্তকে শুধোবেন। স্পুটনিক আর কতখানি উঁচুতে গিয়েছিল? তাঁর দফতরে মৎ-বাবৎ যে ফাইল উঁচু হয়েছিল তার সঙ্গে সে পাল্লা দিতে পারে? এবং সানন্দে আপনাদের জানাচ্ছি প্রত্যেকটি ফাইলের উপর মোটা লাল উড-পেন্সিলে লেখা 'প্রমাণাভাব প্রমাণাভাব।' বেনিফিট অব্ ডাউট নামক প্রতিষ্ঠানটি যে মহাজন আবিষ্কার করেছিলেন তাঁকে বার বার নমস্কার।

কিন্তু দুস্তর সন্তাপের বিষয়, ইহসংসারের হেডমাস্টারকুল এই প্রতিষ্ঠানটিকে যথোচিত সম্মান শ্রদ্ধা করেন না। সে সৎসাহস তাঁদের নেই। থাকলে আমার সোনার মাতৃভূমি শিক্ষাদীক্ষায় আজ এতখানি পশ্চাৎপদ কেন? আমার নাম দু-দু'বার 'ব্ল্যাক বুক'-এ উঠলো পর্যাপ্ত প্রমাণাভাব সত্ত্বেও। হেডমাস্টার নাকি মরালি সারটন হয়ে—যে-কোনো চার-আনী বটতলার মোকতারও বলবে, এটা ঘোর 'ইলিগালি অনসারটন'—আমার নাম কালো কেতাবে তুলেছেন। আরেকটা ঘটনা নাকি তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। এটা যে কি রকম সংবিধান-বিরোধী 'উল্‌টরা ভিরেস' (গাড়ল ইংরেজের উচ্চারণে 'আল্‌টরা ভাইয়ারীজ')—বেআইনী স্বেচ্ছাচারিতা, সেটা বুঝিয়ে বলতে হবে না: হেডমাস্টার তো সেখানে সাক্ষী, তিনি সেখানে বিচারক হন কোন্ আইনে? এ স্বতঃসিদ্ধটা তো স্কুল-বয়ও জানে। জানেন না শুধু হেডমাস্টার? তাই বিবেচনা করি, যে স্কুল-বয় এ তত্ত্বটা জানে না সে-ই আখেরে হেডমাস্টার হয়।

তৃতীয়বার কোনো অপকর্ম করলে 'কালো কেতাবে' নাম ওঠে না। তাকে গলাধাক্কা দিয়ে স্বর্মা নদীর কালো (চোখের স্বর্মা-কালো) জলে ভাসিয়ে দেওয়া

হয়। সোজা বাংলায় তাকে রাস্টিকেট করে দেওয়া হয়। তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। যদি সেটা শব্দার্থে নেওয়া হয়। রাস্টিকেট শব্দের প্রকৃত অর্থ, গ্রামের ছেলে শহরের স্কুলে এসে গ্রাম্য অভদ্র আচরণ করেছিল বলে তাকে ফের গ্রামে পাঠানো হল, তাকে 'রাস্টিকিট' করে দেওয়া হল, তাকে কাণ্ট্রিফাই করে দেওয়া হল। আমি চাঁদপানা মুখ করে সুর্মার ওপারে গ্রামে বাস করে ইস্কুলে আসতে রাজী আছি। বিস্তর ছেলে ওপার থেকে খেয়া পেরিয়ে সরকারী ইস্কুলে পড়তে আসে। আমাদের পাদ্রী সাহেবের কাছে শোনা, লাতিন 'রুস্তিকারে' ('গ্রামে বাস করা' ; শব্দ থেকে 'রাস্টিকেট' কথাটা এসেছে। কিন্তু এসব গুণগর্ভ সুভাষিত শুনে হেডমাস্টার যে আসন ছেড়ে আমি-সত্যকামকে গৌতম ঋষির মতো আলিঙ্গন করবেন এমত আশা তিন লিটার ভাঙ পেটে নামিয়েও করা যায় না। 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'। এস্থলে ধার্মিকও শুনতে চায় না ধর্মের কাহিনী—নইলে পৃথিবীতে এত গণ্ডায় গণ্ডায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম কেন? ভটচায যান মসজিদে ধর্মকাহিনী শুনতে এবং বিপরীতটা? হুঁঃ!

সে সব দিনে—না, রাতের আকাশে উত্তমকুমারাদি তারকা আকাশে দীপ্যমান হন নি। আমার পরবর্তী যুগের সখা দেবকী পাহাড়ীও তখন অসংখ্য বিমল উজল রতনরাজির মতো খনির তিমির গর্ভে। নইলে গাগারিন্ বেগে চলে যেতুম মোহময়ী মুম্বই বা টলিউডে—হেসেখেলে পেয়ে যেতুম যম বা শয়তানের মেন্ রোল।

ভাঙের কথা এইমাত্র বলেছি: তখন স্থির করলুম স্কুলের দরওয়ানজী হনুমান পূজন তেওয়ারী—যিনি কিনা পালপরবে ঐ বস্তু সেবন করেন এবং সেই সুবাদে আমাকে তথা ফ্রেণ্ড স্বদেশ চক্রবর্তীকে ঐ বিদ্যায় হাতেখড়ি দেন—তেনাকে ভাঙ খাইয়ে বেহুঁস করে হেডমাস্টারের ঘরে লাগাবো আগুন। গায়ে আগুন লেগে গেঞ্জিটা পুড়ে গেল আর পাঞ্জাবিটা পুড়লো না—এ কখনো হয়! ব্ল্যাক বুক তার মিথ্যা সাক্ষ্য সহ পুড়ে ছাই হবে। সেই ছাই দিয়ে পরবো বিজয়-টিকা! ওয়াহ্, ওয়াহ্!

'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে—'

কিচ্ছুটি করতে হল না। অতি ভৈরব হরষে ঐ সময়ে এলো অসহযোগ আন্দোলন।

আমারে আর পায় কেডা?

ঘটনাটা সাঁচ্চা না গুল, হলফ করে বলতে পারবো না, কিন্তু তাতে কণামাত্র যায় আসে না। রসের বিচারে সত্য না অসত্য, ভাল না মন্দ, প্রাকৃত না অপ্রাকৃত, এসব মাপকাঠি, কষ্টিপাথর সম্পূর্ণ অবান্তর। ডানাওলা অশ্ব অর্থাৎ পক্ষিরাজ ঘোড়া কখনো হয়?…রাক্ষসীই হয় না, তার উপর তার প্রাণ নাকি কোন্ এক সাত সাগরের অতল তলে কৌটোর ভিতর রয়েছে—ভোমরা রূপে। সেই ভোমরাকে চেপটে থেঁতলে না মারা পর্যন্ত ঐ রাক্ষসীর উপর যতই খঞ্জর-খাণ্ডার, বন্দুক-কামান চালাও না কেন সে মরবে না। এইসব অবাস্তব ব্যাপার নিয়ে যখন ঠাকুমা রূপকথা বলেন তখন কি সর্বাঙ্গে শিহরণ কম্পন রোমাঞ্চন হয় না? মধ্যরজনী অবধি ঠাকুমাকে জাবড়ে ধরে বিনিদ্রাবস্থায় কাটে না?

হালে জনৈক পাঠক আমায় জানিয়েছেন, আমার সদ্য প্রকাশিত উপন্যাসের শহ্‌র্-ইয়ার নামক রমণী বঙ্গদেশের মুসলিম সমাজে কখনই থাকতে পারে না। এ চরিত্রটি সম্পূর্ণ অবাস্তব। প্রত্যুত্তরে আমার বক্তব্য অবাস্তব হলেই যে রসের পর্যায়ে পৌছয় না, এ হুকুম দিয়েছেন কোন্ রসরাজ? তাহলে পূর্বোক্ত পক্ষিরাজের বাচ্চা ঘোড়া, রাক্ষসীর কৌটোতে রাখা ভোমরা প্রাণ এসব কোনো প্রকারেরই রসসৃষ্টি করতে পারে না। ঐ অকরুণ পাঠক যদি বলতেন, "শহ্‌র্-ইয়ার বাস্তব হোক, অবাস্তব হোক, এটা রসের পর্যায়ে পৌছয় নি," তাহলে আমি চাঁদপানা মুখ করে সেটা সয়ে নিতুম। কারণ এটা রুচির কথা, রসবোধের কথা। আমার আরও পাঁচজন পাঠক-পাঠিকা রয়েছেন। তাঁরা হয়তো বলবেন, "না; শহ্‌র্-ইয়ার রসসৃষ্টি করেছে।" অতএব এ লড়াই করবেন আমার পাঠকমণ্ডলী। আমি শুক্তি বা ঝিনুক। আমার পেটে জন্মেছে শহ্‌র্-ইয়ার মুক্তো। জহুরীরা এর মূল্য বিচার করবেন। ঐ অকরুণ পাঠকের মতো কেউ বলবেন, "এটার মূল্য একটা কানাকড়িও নয়।" আবার কেউ কেউ হয়তো বলবেন, "না হে না, অত হেনস্তা করো না। মুক্তোটা তো নিতান্ত হাবিজাবি বলে মনে হচ্ছে না।"

এই মতভেদের মাঝখানে দুই পক্ষের কেউই তখন বলবেন না, "ঐ ঝিনুকটাকে ডাকো না কেন? সেই-ই তো এটার জন্ম দিয়েছে। সে-ই বলুক, এটার দাম কত?"

বিচক্ষণ পাঠক, চিন্তা করো, সেই ঝিনুক, যে ইতিমধ্যে মরে দু'ফাঁক হয়ে গিয়েছে, তাকে কোন্ মূর্খ নিয়ে আসবে নিউ মার্কেটের জউরী বাজারে, কিংবা আমস্টারডামের মণিমুক্তোর মক্কা মদীনায় ? সে এসে ফাইনাল ফৈসালা করবে, মুক্তোটির মূল্য কি হবে! তাজ্জব কী বাৎ!!

সহজতর উদাহরণ দিতে গেলে বলতে হয়, নেপোলিয়নকে যিনি জন্ম দিয়েছিলেন তাঁর সে-জননীই কি নেপোলিয়নের সর্বোত্তম জীবনী লেখবার হক ধারণ করেন ?

কিন্তু এসব কচকচানি থাক্। যে কাহিনীটি বলতে যাচ্ছিলুম সেইটে নিবেদন করি।

ইয়োরোপের কোনো এক বিখ্যাত নগরে মোকদ্দমা উঠেছে এক চিত্রকরের বিরুদ্ধে। তিনি একটা এক্‌জিবিশনে একাধিক ছবির মধ্যে দিয়েছেন সম্পূর্ণ নগ্না এক যুবতীর চিত্র। পুলিস মোকদ্দমা করেছে, নগ্না রমণীর চিত্র অশ্লীল, ভাল্‌গার্, অব্‌সীন, পর্নগ্রাফিক। এ ধরনের ছবি সর্বজনসমক্ষে প্রদর্শন করা বে-আইনী, ক্রিমিনাল অফেন্স।

আদালতের এজলাসে বসেছেন গণ্যমান্য বৃদ্ধ জজসাহেব, এবং জুরি হিসেবে ছ'জন সম্মানিত নাগরিক।

এক কোণে সেই নগ্না নারীর লাইফ সাইজ তৈলচিত্র। তাবৎ আদালত সেটি দেখতে পাচ্ছে। দুই পক্ষের উকিলদের তর্ক-বিতর্কের মাঝখানে হঠাৎ জজ-সাহেব চিত্রকরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি বলছেন, এ ছবিটা অশ্লীল নয়। আচ্ছা, তাহলে অশ্লীল ছবি কাকে বলে সেটা কি এই আদালত তথা জুরি মহোদয়গণকে বুঝিয়ে বলতে পারেন ?"

চিত্রকর ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই পারি, হুজুর। তবে অনুগ্রহ করে আমাকে মিনিট দশেক সময় দিলে বাধিত হব।"

জজ-সাহেব বললেন, "তথাস্তু!"

চিত্রকর তাঁর উকিলের কানে কানে ফিসফিস করে কি বললেন সেটা বাদ-বাকী আদালত শুনতে পেল না।

সাত আট মিনিট যেতে না যেতেই উকিলের এক ছোকরা কর্মচারী চিত্রকরের হাতে ছবি আঁকার একটা রঙের বাক্স তুলে দিল। চিত্রকর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নগ্না রমণীর ছবির সামনে গিয়ে রঙতুলি দিয়ে এঁকে দিলেন নগ্নার একটি পায়ে সিল্কের একটি মোজা।

জজের দিকে তাকিয়ে বলেন, "হুজুর, এ ছবিটা এখন হয়ে গেল অশ্লীল!"

তাবৎ আদালত থ। জজ বললেন, "সেটা কি প্রকারে হল? আপনি তো বরঞ্চ মোজাটি পরিয়ে দিয়ে নগ্নার দেহ কথঞ্চিৎ আবৃত করলেন?"

চিত্রকর সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "এই কথঞ্চিৎ আবৃত করাতেই দেওয়া হল অশ্লীলতার ইঙ্গিত। এতক্ষণ মেয়েটি ছিল তার স্বাভাবিক, নৈসর্গিক, নেচারেল নগ্নতা নিয়ে—যে নগ্নতা দিয়ে সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেক নরনারী পশুপক্ষীকে ইহ-সংসারে প্রেরণ করেন। এবারে একটি মোজা পরে মেয়েটা আবরণ দিয়ে অশ্লীল সাজেশন্ দিল তার আবরণহীনতার প্রতি। এখন যদি কেউ এ ছবিটা দেখে মনে করে, কোনো গণিকা তার গ্রাহকের লম্পট কর্ম-প্রবৃত্তি উত্তেজিত করার জন্য একটিমাত্র মোজা পরেছে তবে আমি দর্শককে কণামাত্র দোষ দেব না।"

চিত্রকরের বিবৃতিতে সম্মানিত জজ তথা জুরি-মহোদয়গণ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন কি না, সে কথা আমার মনে নেই, তবে আমার উনিশ বৎসর বয়সে—যে-সময় কিশোর মাত্রেরই হৃদয়ানুভূতি নারী-রহস্য সম্বন্ধে কৌতূহল, কবিগুরু যা অপূর্ব ব্যঞ্জনা দিয়ে প্রকাশ করেছেন:

"বালকের প্রাণে
প্রথম সে নারীমন্ত্র আগমনী গানে
ছন্দের লাগালো দোল
আধো-জাগা কল্পনার শিহরদোলায়,
আঁধার আলোর দ্বন্দ্বে
সে প্রদোষে মনেরে ভোলায়,
সত্য অসত্যের মাঝে
লোপ করি সীমা
দেখা দেয় ছায়ার প্রতিমা।"

সে বয়সে পূর্বোক্ত চিত্রকর-কাহিনী আমার মনে গভীর দাগ কেটেছিল। তার সাত বৎসর পর কিম্বৎ আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন প্যারিসে। কারো দোষ নেই, আমি স্বেচ্ছায় গেলুম, এ জীবনের প্রথম 'ক্যাবারে' দেখতে।

বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, আমার সর্বপ্রথমই মনে হয়েছিল, এ কিশোরী যুবতীরা কি অনবদ্য সুন্দর স্বাস্থ্যই না ধরে! সুডৌল পরিপূর্ণ স্তনদ্বয়, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে না-মোটা-না-সরু যুগল বাহু, নাতিক্ষীণ কটিচক্র, পুষ্টনধর উরুযুগ এবং দেহের উত্তরার্ধের কুচদ্বয়ের সঙ্গে পরিমাণ রেখে তরঙ্গিত নিতম্বদ্বয়। আমি দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরে স্বাস্থ্যবতী সাঁওতাল রমণী এবং অন্তত একটি মাস

রাজপুতানী দেখেছি। এদের সঙ্গে আমি প্যারিসের 'ক্যাবারিনী'দের সৌন্দর্যের তুলনা করছি নে। আমি করছি স্বাস্থ্যের। সেখানে প্যারিসিনীরা বিজয়িনী। ...এবং আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলুম। প্যারিসিনীরা যখন নাচছিল তখন তাদের নাভিকুণ্ডলীর চতুর্দিকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসপেশী নাভিকে কেন্দ্র করে চক্রাকারে ঘুরে যাচ্ছিল। নদীতে যে রকম অতি ক্ষুদ্র দ'য়ের চতুর্দিকে স্রোতের চাপে ঘূর্ণায়মান আবর্ত সৃষ্ট হয়। ঠিক এই অদ্ভুত সৌন্দর্যটি আমি ইতিপূর্বে দেখেছিলুম একমাত্র রাজপুতানায়। সেখানকার কুমারীরা মাথার উপর দুটো তিনটে জলে-ভর্তি ঘড়া-কলসী চাপিয়ে বাড়ি ফেরে। ওরা তো তখন হাঁটে না। যেন নাচতে নাচতে এগিয়ে যায়। তাই ওদের নাভিকুণ্ডলীর চতুর্দিকে প্যারিসিয়ান নর্তকীদের মতো সৃষ্ট হয় সেই দ', সেই আবর্ত। অপূর্ব সে দৃশ্য!

নমস্য চিত্রকর নন্দলাল, এই সচল ডাইনামিক চক্রাবর্তন তুলে নিয়েছেন এক অচল স্টাটিক ছবিতে। সেখানে সেই রাজপুতানীর নাভিকুণ্ডলীর দিকে খানিকক্ষণ তাকালেই চোখে ধাঁধা লাগে; মনে হয় নাভির চতুর্দিকে যেন চর্কিবাজী ঘুরেই যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে।...এই হল সার্থক শিল্পীর কলাদক্ষতা। সচলকে অচলতা দিয়ে, অচলকে সচলতা দিয়ে মূর্তমান করতে পারেন।

কিন্তু এ-বর্ণনা আর বাড়াবো না। আমার বক্তব্য বোঝাবার জন্য নিতান্ত যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুই নিবেদন করি।

ক্যাবারিনীদের পরনে ছিল উত্তমার্ধে অতি সূক্ষ্ম, প্রায় স্বচ্ছ, শরীরের মাংসের সঙ্গে রঙ-মিলিয়ে চীনাংশুকের গোলাপী ব্রাসিয়ের। অধমার্ধে ছিল কটিসূত্র —সোজা বাংলায় যাকে বলে ঘুনসি। সেই ঘুনসি থেকে নেবে গিয়েছে চার আঙুল চওড়া, ঠিক আমাদের পালোয়ানদের নেঙট, অবশ্য সাইজে তিনগুণের একগুণ, আকারে ত্রিকোণ, এবং সেটি ঘুরে গিয়ে পিছনের কটিমধ্যে যেখানে ঘুনসির সঙ্গে গিঁঠ খেয়েছে সেখানে সে ঠিক ঘুনসিরই মতো একটি সূক্ষ্ম সূত্ররূপ ধারণ করেছে।

নৃত্যের সর্বশেষ দৃশ্যে ক্যাবারিনীরা তাঁদের ব্রাসিয়ের খুলে খুলে স্টেজের চতুর্দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ছড়াতে আরম্ভ করলেন।

এস্থলে এসে পাঠক আমাকে লম্পট ভাবুন আর যাই ভাবুন, হক্ কথা বলতে গাফিলী করবো না। যা থাকে কুল-কপালে!

এরপর আমি ভেবেছিলুম নর্তকীরা তাদের অধমার্ধের অঙ্গবাসও খুলে ফেলবেন। তা যখন হল না, তখন আমি আমার সঙ্গীকে শুধিয়ে জানতে পারলুম,

আইনানুযায়ী স্টেজে সম্পূর্ণ নগ্ন হওয়া নিষিদ্ধ। অবশ্য বে-আইনীভাবে গোপনে সম্পূর্ণ নগ্ননৃত্যের ব্যবস্থার অভাবও প্যারিসে নেই।

এরা যখন নাভির নিচের কাপড়টুকু খুললো না তখনই আমার মনে হল—এবারে পাঠক নিশ্চয়ই বিস্মিত হবেন—এ নৃত্য এবারে হয়ে গেল অশ্লীল। আমার মনে হল, সেই যে চিত্রকরের আঁকা একটি মাত্র মোজা অশ্লীলতম ইঙ্গিত দিচ্ছিল, এখানেও হুবহু তাই, বরং বলবো অশ্লীলতর, অশ্লীলতম। এরা যদি একেবারে নগ্ন হয়ে যেত তবে এরা সেই চিত্রকরের নগ্ন রমণীর মতো (একটি মোজা পরানোর পূর্বে) হয়ে যেত সরল স্বাভাবিক নৈসর্গিক নেচারেল। এদের সেই এক চিলতে দক্ষিণার্ধবাস তখন দিতে লাগলো অশ্লীলতম ইঙ্গিত—চিত্রকরের মোজাটির ইঙ্গিত তার তুলনায় কিছু না।

তখন হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এক নেটিভ স্টেটের জনৈক মহারাজা ভাস্কর্য-শিল্পের প্রকৃত সমঝদার ছিলেন। তিনি ইয়োরোপ থেকে অনেকগুলো প্রথম শ্রেণীর মূর্তির প্লাস্টার-কাস্ট নিয়ে এসে তাঁর জাদুঘরটি সত্যকার দ্রষ্টব্য প্রতিষ্ঠান করে তুলেছিলেন। কিছু কিছু মূর্তি ছিল সম্পূর্ণ নগ্ন—পুরুষ রমণী দুই-ই। একদিন মহারানী গিয়েছেন সেই জাদুঘর দেখতে। তিনি তো শকড্। হুকুম দিলেন নগ্ন মূর্তিগুলোর কোমরে গামছা বেঁধে দিতে! পাঠক ভাবুন, রোমান মূর্তির কোমরে (বাঁধিপোতার ?) গামছা! সে কী বেঢপ দেখতে! কিন্তু এহ বাহ্য।... অজ পাড়াগাঁয়ে লোক, সে-শহরে এলে চিড়িয়াখানা এবং এই জাদুঘরটিও দেখতে আসতো। এক ছুটির দিনে আমি জাদুঘরের এটা সেটা দেখছি,—এমন সময় একটি গামছা-পরা মূর্তির সম্মুখে তিনজন গামড়িয়া—চাষাই হবে—আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। আমি গুড়িগুড়ি তাদের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালুম এবং নিম্নোক্ত সরেস কথোপকথন শুনতে পেলুম।

প্রথম চাষা : "মূর্তিটার কোমরে গামছা কেন ?" (আমি বুঝলুম, ঐ অঞ্চলের একাধিক মন্দিরে নগ্নমূর্তি দেখেছে বলে এ-প্রশ্নটা তুলেছে)।

দ্বিতীয় চাষা : "শুনেছি, মহারানী নাকি ন্যাংটো মূর্তি আদপেই বরদাস্ত করতে পারেন না। তাঁরই হুকুমে গামছা পরানো হয়েছে।"

পূর্ণ এক মিনিটের নীরবতা। তারপর—

তৃতীয় চাষা : (ফিসফিস করে) "মহারানীর পাপ মন।"

আমার এই অভিজ্ঞতা সমর্থন করেন, ঐ জাদুঘরের ধুরন্ধর পণ্ডিত জর্মন উচ্চতম কর্তা। জাদুঘরে গাঁইয়াদের ভিড় লাগলেই তিনি তাঁর একাধিক কর্মচারীকে নিযুক্ত করতেন ওদের পিছনে গা-ঢাকা দিয়ে ছবিমূর্তি সম্বন্ধে ওদের

টীকাটিপ্পনী শুনে তাঁকে রিপোর্ট দিতে।...এ-দেশ ছাড়ার সময় তিনি আমাকে বলেন, "শহুরেদের তুলনায় এ দেশের জনপদবাসীদের সরল স্পর্শকাতরতা অনেক বেশী। এরা যেমন কালীঘাটের পট দেখে আনন্দ পায়, ঠিক তেমনি ইউরোপীয় মডার্ন ছবি দেখেও সুখ পায়। এবং বললে বিশ্বাস করবেন না, গগন ঠাকুরের কিউবিস্ট ছবিও এদেরকে হকচকিয়ে দিতে পারে না। তবে এগুলো সম্বন্ধে মতামত দেবার পূর্বে—এবং আকছারই লোহার উপর হাতুড়িটি মারে মোক্ষম—অনেকখানি চিন্তা করে তবে বলে। আরো একটা মোস্ট ইনট্রিসটিং এবং ক্যারাকটেরিস্টিক ফ্যাক্ট—এরা থ্রী-ডাইমেনশনাল, রিয়ালিস্টিক, রঙীন ফোটো-গ্রাফের মতো ছবি বাবদে উদাসীন (যেগুলো শহুরেরা পছন্দ করেন)। এই হল আমার কর্মচারীদের রিপোর্ট।" অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। কারণ, হা হতোস্মি, এই কর্মচারীরা অন্যান্য শহুরেদের মতো পছন্দ করে রঙিন ফোটো-গ্রাফের মতো ছবি।

আমি শুধালুম, "নিউড?"

হার ডিরেক্টর তাজ্জব মেনে বললেন, "নিউড? এসব গ্রাম্য লোক সুস্থ স্বাভাবিক যৌনজীবন যাপন করে। উত্তম বলদের সঙ্গে জাত গাভীর সম্বন্ধ করায়। পথেঘাটে কুকুর-বেড়ালের সম্পর্ক দেখে ছেলেবেলা থেকেই। এদের ভিতরে তো কোনো ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। এরা তো শহুরেদের মতো সেক্স্‌স্টার্ভড্‌ বা পার্ভার্স নয়। এরা ন্যুড দেখে সরলচিত্তে, রস পায় অনাবিল হৃদয়ে।

কি বলতে গিয়ে কি বলে বলে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে চলে এলুম! কিন্তু বিচক্ষণ গ্রাম্য পাঠক অনায়াসে বুঝতে পারবেন আমার এসব আশকথা-পাশকথা আমার মূল বক্তব্যের জন্য সখ্‌ৎ বুনিয়াদ নির্মাণ করছে।

তা হলে ফিরে যাই ফের সেই ক্যাবারেতে; বরঞ্চ বলি, ততক্ষণে আমি সখাসহ নৃত্যশালা ত্যাগ করে রাস্তায় নেমে পড়েছি। আমি প্যুরিটান নই, নটবরও নই। তাই এ-সব অশ্লীল ইঙ্গিত আমার ভালো লাগে না। ঐ জর্মন পণ্ডিতের ভাষায় বলতে গেলে আমি গ্রামাঞ্চলের সাধারণ স্বাভাবিক জনপদপ্রাণী। তদুপরি আমি বুদ্ধু। আমি চট্‌ করে উত্তেজিত হই নে, ঝপ্‌ করে মাটির সঙ্গে মিলিয়েও যাই নে।

রাস্তায় নামার পর সখা বললে, "তা হলে চলো, পুরোপাক্কা উলঙ্গ নৃত্যে।"

আমি আঁৎকে উঠে বললুম, "সর্বনাশ! সে-জায়গার টিকিটের মূল্য তো বিলেতের পঞ্চম জর্জের মুকুটের কুহ্‌-ই-নূরের চেয়ে খুব কিছু একটা কম হবে না। আমার পকেটে সে-রেস্ত নেই।"

সখা জানতেন আমি বুদ্ধু। তাই শান্তকণ্ঠে বললেন, "একদম নগ্ননৃত্যের আসরে টিকিটের দাম ঢের ঢের কম। ওগুলো বিলকুল পপুলার নয়।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলুম, যেটি এ-লেখনে আমার একমাত্র বক্তব্য।

সম্পূর্ণ নগ্ননৃত্য তা অত্যন্ত স্বাভাবিক, নৈসর্গিক নেচারেল জিনিস। সেটা দেখতে যাবে কে? প্যারিসে বেড়াতে আসে সাধারণতঃ বিদেশীরা। তাদের অনেকেই মরবিড, নপুংসক পার্ভার্স্। তারা, এবং অল্পাধিক ফরাসীরা যায় ঐ সব অশ্লীল ইঙ্গিতপূর্ণ নৃত্যে। তারা তো নেচারেল নগ্ননৃত্য দেখতে চায় না। এইটেই আমার মূল বক্তব্য।

সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি খোস্‌লা অতিষ্ঠ হয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। সে-বিবৃতিতে তিনি একটা অশ্লীল ফিল্মের সাতিশয় ভর্ৎসনাপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন। যুবক নায়ক যুবতী নায়িকা একটা টিলার সানুদেশে একে অন্যের অতিশয় পাশাপাশি লম্বমান হয়ে গড়-গড়িয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছেন এবং একে অন্যের প্রতি কুৎসিততম জঘন্যতম যৌনইঙ্গিত দিচ্ছেন। এটা কেন হল, তার বিশ্লেষণ শ্রীযুত খোস্‌লা করেন নি। বোধহয় প্রয়োজন বোধ করেননি।

পাঠকদের সহৃদয় অনুমতি নিয়ে আমি তার বিশ্লেষণ করি।

যেহেতু এ-দেশের ফিল্মে চুম্বন, আলিঙ্গন, নগ্নতা দেখানো বে-আইনী তাই ফিল্ম-নির্মাতা রগরগে ছবি বানিয়েছেন যৌন-সম্পর্কের প্রতি অশ্লীল ইঙ্গিতের আশ্রয় নিয়ে—

হুবহু যে-রকম নগ্নাকে মোজা পরিয়ে, ক্যাবারে নৃত্যের শেষ কটিবস্ত্র উন্মোচন না করে।

আমার মনে প্রশ্ন জাগে, চুম্বন নগ্নতার বাধা-নিষেধ যদি আজ তুলে দেওয়া হয় আর্টের খাতিরে (অবশ্যই সেটা কঠিন প্রশ্ন, ফিল্মে আর্ট বলতে আমরা কি বুঝি, এ নিয়ে সুযোগ পেলে পরবর্তীকালে আলোচনা করবো), তবে কি আমাদের ফিল্ম-নির্মাতারা সঙ্গে সঙ্গে উদোম নৃত্য আরম্ভ করে তাঁদের ফিল্ম চুম্বনে নগ্নতায় ভরপুর, টৈটম্বর করে দেবেন?

হয়তো গোড়ার দিকে কিছুটা বাড়াবাড়ি হবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাঁরা শীগগিরই বুঝে যাবেন যে সাধারণ দর্শক তিন মিনিটব্যাপী চুম্বন, পাঁচ মিনিটব্যাপী নগ্নতা প্রদর্শন দেখবার জন্য অত্যধিক ব্যাকুল নয়। ঠিক যে-রকম পূর্বেই নিবেদন করেছি, প্যারিসের পরিপূর্ণ নগ্ননৃত্য দেখবার জন্য মানুষ হৈ-হুল্লোড় লাগায় না।

আইন দরকার, ব্যান্-এরও আয়োজন আছে।

কিন্তু মনে রাখা উচিত, কোনো কোনো দেশে মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়ার পরও সে-সব দেশের খুনের সংখ্যা বেড়ে যায়নি।

হালে ডেনমার্কে সর্বপ্রকার অশ্লীল 'সাহিত্যে'র উপরকার ব্যান্ তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে কোথায় না অশ্লীল সাহিত্যের বিক্রি হুশ হুশ করে বেড়ে যাবে, রাম—ব্যাপারটা উল্টো বুঝেছেন। অশ্লীল মালের পাবলিশাররা মাথায় হাত দিয়ে ফুটপাতে বসে গেছেন। তাঁদের বিক্রি শতকরা ৭০ ভাগ কমে গেছে। কারণ মানুষের লোভ নিষিদ্ধ ফলের প্রতি। ইংরিজিতে প্রবাদ: A stolen kiss is sweeter than any other.

এ বাবদে শেষ আপ্তবাক্য বলেছেন একটি সুরসিকা ফরাসী মহিলা। আমেরিকায় তখন লরেন্স মহাশয়ের লেডি চ্যাটারলি পুস্তক অশ্লীল কি না, সেই নিয়ে মোকদ্দমা চলছে। লেডি চ্যাটারলি পক্ষের উকিল ("লেডি চ্যাটারলির লাভার' না, "লেডি চ্যাটারলির লয়ার") হুতাশনসদৃশ প্রজ্বলিত ভাষায় তাঁর বক্তৃতা শেষ করে অনুপ্রেরণিত কণ্ঠে বললেন, "লেখকরাজ লরেন্স এই পুস্তক দ্বারা যৌন সম্পর্ককে অকল্পনীয় স্বর্গীয় স্তরে (স্পিরিচুয়াল লেভেলে) তুলে ধরেছেন।"

এই বিবৃতিটি পড়ে সেই ফরাসী মহিলাটি একটু দুষ্টু হাসি হেসে বললেন, "সর্বনাশ! এখন তা হলে যৌন-সম্পর্কের অর্ধেক আনন্দই মাঠে মারা গেল। আতি তো এ্যাদ্দিন জানতুম, এটা পাপাচার!"

মরহুম অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল হাই
(আল্লার পদপ্রান্তে)

এ লেখাটি আমাকে লিখতে হবে, এবং আজই লিখতে হবে। অথচ অন্তর্যামী জানেন, এটি লিখতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে আমার অক্ষম লেখনী কতখানি পর্যুদস্ত হচ্ছে। ভাবাবেগে আমি এমনই মতিচ্ছন্ন যে অনেক কিছু একসঙ্গে বলতে চাই, এবং শেষ পর্যন্ত কিছুই বলতে পারি না।

সরল পাঠক ভাবে, সাহিত্যিকের ভাবনা কি? ভাষা তার আয়ত্তে, বেদনা হোক, আনন্দ হোক সে-সব কিছুই সহজ সরলতার সঙ্গে প্রকাশ করতে পারে। কথাটা ভুল নয়। কিন্তু এ-বিষয়ে মাত্র একটি ব্যত্যয় আছে।

উপস্থিত আমার কথা ভুলে যান। সার্থক সাহিত্যিকদের কথাই বলবো।

তাঁরা কল্পনারাজ্যে বিচরণ করে যুবক-যুবতীর মধ্যে বিরহ ঘটান, বিধবার একমাত্র শিশুপুত্রের মৃত্যু ঘটান এবং এগুলোর চেয়েও নিদারুণতর ট্র্যাজেডি নির্মাণ করেন। তারপর অতিশয় সহানুভূতিপূর্ণ স্পর্শকাতর হৃদয় দিয়ে বিরহ-কাতরা যুবতীকে, পুত্রহীনা বিধবাকে কখনো যুক্তি, কখনো অনুভূতির মারফতে সান্ত্বনা জানান।

এসব কল্পনারাজ্যের কথা।

কিন্তু যখন সার্থক সাহিত্যিকের আপন জীবনে নিদারুণ শোক আসে তখন তিনি কি করেন? তখন তাঁর অবস্থা হয় সত্যই শোচনীয়। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দিই। আমার চেয়ে অন্তত কুড়ি বছরের বড় জনৈক যশস্বী লেখক একদিন ঢুকলেন আমার ঘরে কাঁদতে কাঁদতে। আমি কোনো কিছু বলার পূর্বেই তিনি বললেন, "ভাই আমার ছোট মেয়ে মাধবী কাল বিধবা হয়েছে। লক্ষ্ণৌ থেকে টেলিগ্রাম এসেছে। তুমি ভাই, আমার হয়ে একটা চিঠি লিখে দাও। আমি কি লিখব কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি নে।"

সেইদিনই আমি প্রথম বুঝতে পারলুম, ব্যক্তিগত বেদনায় সাহিত্যিক কী নিদারুণ অসহায়। অপরের বেদনা সে দূর থেকে দেখে কিছুদিন ধরে সেটাকে মনের ভিতর খিতোয় এবং বেশ কিছুদিন পর সেটাকে সাহিত্য রূপে প্রকাশ করে। কিন্তু নিজের বেলায়? হায়, সে অসহায়। এবং সাধারণ "অসাহিত্যিক"-জনের চেয়েও সে নিরুপায়। সাধারণ "অসাহিত্যিক"-জন তখন বিধবা কন্যাকে সাদা-মাটা চিঠি লিখে সান্ত্বনা জানায়। মেয়েও সে চিঠি বুকে চেপে কাঁদে, সান্ত্বনা পায়।

কিন্তু সার্থক সাহিত্যিক? সে তো অনেক বেশী স্পর্শকাতর। এ রকম সাদা-মাটা চিঠি সে তো লিখতে পারে না। তার তো সে অভ্যাস নেই।

সার্থক যশস্বী সাহিত্য-নির্মাতার যদি এই বিপাক হয়, তবে আমার মতো অতিশয় সাধারণ লেখকের কথা চিন্তা করুন।

আমি যে কি মতিচ্ছন্ন সেটি রচনারম্ভেই নিবেদন করেছি।

ভোরবেলা আমার এক চেলা ঘরে ঢুকলো, 'আনন্দবাজার' হাতে নিয়ে প্রায়ই আসে। আপন মনে খবরের কাগজ পড়ে।

আজ শুধলো, 'আপনি তো বাঙাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ এবং পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলনে জোর লড়নেওলা অধ্যাপক আব্দুল হাইকে আপনি চিনতেন?'

আমি বললুম, চিনতুম মানে? এখনো চিনি। আমার চেয়ে বছর পনরো ছোট। তাহলে কি হয়! লোকটা অসাধারণ পণ্ডিত, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার

সাহিত্যরসে কী সুন্দর স্পর্শকাতরতা। তদুপরি, তুমি যা বললে, ভাষা আন্দোলনে জোর লড়নেওলা, আমার বন্ধু—'

চেলা আমাকে আনন্দবাজার এগিয়ে-দিলে। তাতে দেখি আব্দুল হাইয়ের ছবি এবং নিচে লেখা :

"ঢাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে ডক্টর হাই-এর মৃত্যু।"

ভাষা ও ধ্বনিবিদ্ বলতে শেষ পর্যন্ত বিধাতার কৃপায় বেঁচে রইলেন পণ্ডিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মৌলানা মহম্মদ শহীদুল্লাহ। এঁরা উভয়েই পশ্চিম বাংলার কৃতী সন্তান।

দেশ বিভাগের ফলে একজন রইলেন কলকাতায়, অন্যজন ঢাকায়। যেন গঙ্গার এক ভাগ জল এল ভাগীরথী দিয়ে, অন্য হিস্যার পানি চলে গেল পদ্মা দিয়ে পাকিস্তানে। তার পর এই বাইশ বৎসর ধরে বিস্তর পানি জল[১] দু'ধারা দিয়ে বয়ে গেল।

ইতিমধ্যে শ্রীযুত চাটুয্যের উপর নানাবিধ দায়িত্বপূর্ণ কাজের চাপ পড়লো। বয়সও হয়েছে। কাজেই তাঁর প্রাণের যে কামনা—ভাষাতত্ত্বের চর্চা—তার জন্য হাতে সময় থাকে অল্পই। তবে বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি, শব্দতত্ত্বে জ্ঞানার্থীজনকে তিনি সদাসর্বদা পথনির্দেশ করে দেন। ভরতনাট্যেও বলে, একটা বিশেষ বয়সের পর তুমি আর নৃত্যগীত করবে না, তোমার শিষ্যশিষ্যাদের দেহ দিয়ে তোমার নৃত্যকলা দেখাবে।

ওদিকে, ওপারে ঘটলো আরো মর্মন্তুদ ঘটনা। মৌলানা শহীদুল্লাহ পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে বৎসর দুই পূর্বে আচম্বিতে শয্যা নিলেন[২]—বহু কাজ অসম্পূর্ণ রেখে। গত বৎসর যখন তাঁকে ঢাকা হাসপাতালে সেলাম দিতে যাই তখন তিনি আমাকে চিনতে পারলেন, অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে—যদ্যপি

১ জলপানি বললুম না, তার অর্থ ভিন্ন। বস্তুত আমি 'পানি' শব্দের দুশমন নই। অতি অবশ্যই আমি 'জল-পাঁড়ে' নামক কাল্পনিক সমাস ব্যবহার করবো না। পক্ষান্তরে জমজমের জল না বলে জমজমের পানি বলাই ভালো। 'গঙ্গা পানি' কানে খারাপ শোনায়। কিন্তু সেও না হয় সয়ে নিলুম। মুশকিল হবে 'জলপানি' নিয়ে। কেউ 'জলপানি' পেলে সে কি 'পানি-পানি' পায়? যদিও সে খুশীতে পানি পানি হতে পারে, তার জান ত-র্-র্-র্ হতে পারে।

২ তবে ইনি এখনো সম্পূর্ণ অচল নন। এবং তাঁর গুণগ্রাহী তথা শিষ্যজনকে

আমাদের পরিচয় গত অর্ধ শতাব্দী ধরে।

উভয় বাংলাতে আমরা সকলেই আশা করেছিলুম, আব্দুল হাই একদিন শহীদুল্লাহর আসন গ্রহণ করবেন। আমি কোন সরকারী, বেসরকারী উচ্চপদের কথা ভাবছি নে। আমার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল একদিন তাঁর গবেষণা আরো বিস্তৃত সুপরিচিত হবে, তাঁর পথনির্দেশ গৌড়জনকে গন্তব্য স্থলে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে।

কিম্মৎ, কিম্মৎ—সবই কিম্মৎ! একটি সামান্য উদাহরণ দি:

'হাই' শব্দের অর্থ জীবন্ত প্রাণবন্ত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'জাগ্রত ভগবান'। আব্দুল হাই শব্দদ্বয়ের অর্থ তাই 'জাগ্রত (জীবন্ত) ভগবানের (অনুগত) দাস।'

যিনি তার নামকরণ করেছিলেন তিনি নিশ্চয়ই আশা পোষণ করেছিলেন এ-শিশু যেন অতি, অতিশয় দীর্ঘজীবী হয়।

সে চলে গেল পঞ্চাশে। যাঁরা তাঁকে চিনতেন না, তাঁরা হয়তো ভাবলেন, পঞ্চাশ তো খুব অল্প বয়স নয়। কিন্তু আমার মতো তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ পরিচয়ে চেনবার সৌভাগ্য যাঁদেরই হয়েছিল তাঁরাই শুধু জানেন পঞ্চাশেও এই লোকটি ছিলেন কি অসাধারণ প্রাণবন্ত ('হাই',) বিদ্যাচর্চা রসগ্রহণে সদাজাগ্রত এমন কি মূর্তমান 'চাঞ্চল্য' বললেও অত্যুক্তি হয় না—অবশ্য সদর্থে। এঁরা সকলেই এক বাক্যে বলবেন, আব্দুল হাইয়ের মৃত্যুর মতো অকালমৃত্যু—এ শোক বিধাতা যেন দয়া করে আমাদের অত্যধিক না দেন।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অকাল মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ গভীর শোক প্রকাশ করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যজীবনে যখন এক নবীন ভুবনে প্রবেশ করেছিলেন তখন তাঁর মৃত্যু হয়। আব্দুল হাই যখন জ্ঞানান্বেষণে এক নূতন জগতের সম্মুখীন তখন তাঁর মৃত্যু হল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের গুরু। আজ শুধু আব্দুল হাইয়ের গুরুই তাঁর সম্বন্ধে সার্থক সর্বাঙ্গসুন্দর প্রশস্তি রচনা করতে পারবেন।

তাঁর শিষ্যসম্প্রদায়, আমি, আমরা শুধু আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে পারি।

আব্দুল হাইয়ের চরিত্রের একটিমাত্র বৈশিষ্ট্য আমি এ-স্থলে নিবেদন করি।

সানন্দে জানাই তাঁর তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছেন একটি তরুণ ডাক্তার—চট্টগ্রামের চিরঞ্জীব বড়ুয়া। মানুষ বুঝি পিতাকেও অতখানি সেবা করে না।

তার সঙ্গে পাণ্ডিত্যের বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই বলে হয়তো আব্দুল হাইয়ের চরিত্রের এ মহান্ দিকটি অধিকাংশের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না। অতি সংক্ষেপে নিবেদন করি।

এ-বঙ্গে আমার চেয়েও বেশী যদি আজ কেউ প্রিয়বিয়োগ-কাতর হয়ে থাকেন তবে তিনি—যদিও আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না, তবু তাঁর অবস্থার কিছুটা অনুমান করতে পারি—ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র পাল, এম-এ (ট্রিপল) ডি-লিট (ক্যাল), রিপন, হুগলী মহসিন, কৃষ্ণনগর কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। তিনি পূর্ববঙ্গের লোক, কিন্তু বহুকাল ধরে এদেশবাসী।

অধুনা তাঁর একখানি অভিধান—'বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ'—ডক্টর আব্দুল হাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রকাশ করেন। পূর্বতন 'পঞ্চতন্ত্র'-এ আমি এ-গ্রন্থের উল্লেখ করেছি। কিন্তু আমার কথা থাক। এ অভিধান প্রকাশ করার সময় আব্দুল হাই একটি ক্ষুদ্র 'ভূমিকা' লেখেন। তার থেকে আমি কয়েকটি ছত্র তুলে দিচ্ছি।

হাই সাহেব ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখছেন: 'কয়েক বছর পূর্বে ডক্টর সুকুমার সেন সাহিত্য পত্রিকায় (এ পত্রিকাটি অধ্যক্ষ আব্দুল হাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমৃত্যু সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছেন) প্রকাশের জন্য ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র পালের "বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন" নামে একটি প্রবন্ধ আমাকে পাঠিয়ে দেন। ডক্টর পালের এ প্রবন্ধটি আমি ১৯৬৮ সালের শীত সংখ্যা সাহিত্য পত্রিকায় সানন্দে প্রকাশ করি এবং যতদূর সম্ভব বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে অভিধান আকারে এ-কাজটি সম্পন্ন করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানাই।

ডক্টর পাল পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা পূর্ব পাকিস্তানে। এ কারণে পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর কর্মক্ষেত্র হওয়া উচিত ছিল কিন্তু অদৃষ্টচক্রে তিনি সীমান্তপারে বসবাস করছেন।[৩] তাহলেও তিনি মুসলিম জীবন ও সংস্কৃতিমূলক সাধনাতেই নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। মধ্যযুগ থেকে এ-কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার দেখিয়ে এ-বিরাট সংকলন গ্রন্থটি প্রণয়ন করে ডক্টর পাল বাংলা ভাষা-ভাষী সকলকে এবং বিশেষভাবে বাঙালী মুসলমান

৩ আব্দুল হাই মুর্শিদাবাদের লোক। 'অদৃষ্টচক্রে' তাঁকেও 'সীমান্তপারে' বসবাস করতে হল। তাই সমদুঃখীজনব্যথিতবেদন অনুভব করার মতো অভিজ্ঞতা ও স্পর্শকাতরতা ছিল। তাঁর আপন দুঃখ তিনি ডক্টর পালের মারফৎ প্রকাশ করেছেন।

সমাজকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে প্রথমে 'সাহিত্য পত্রিকায়' ও পরে পুস্তকাকারে তাঁর এ মূল্যবান গবেষণামূলক সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশ করে বাঙালী সুধী সমাজের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি আজ সত্যিই আনন্দিত।

মুহম্মদ আব্দুল হাই
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ

আমি শুধু এইটুকুই নিবেদন করতে পেরেছিলুম, পণ্ডিত আব্দুল হাই নিজে, তো জ্ঞানচর্চা করেছেনই, কিন্তু তার চেয়েও ঢের ঢের বেশী উৎসাহ দিয়েছেন অন্যজনকে—শুধু পূর্ববঙ্গে নয়, এ বঙ্গেও।

আর, আজ যে সব যুবক জ্ঞানচর্চা গবেষণা করতে গিয়ে নানাবিধ অন্যায় অসত্য, মনুষ্যকৃত স্বার্থপ্রণোদিত নীচ-হীন প্রতিবন্ধকের সম্মুখে পদে পদে বিড়ম্বিত হচ্ছে তারা অন্তত এই ব্যত্যয়টি, উৎসাহদাতা আব্দুল হাইয়ের এই চরিত্রমূল্যটি মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করবে। আমেন।

সিংহ-মূষিক কাহিনী

চল্লিশ বৎসর বয়সের ঘাটের থেকে যৌবনতরী বিদায় দেওয়ার পরও কখনো আশা করতে পারিনি, স্বপ্নেও সে আকাশ-কুসুম চয়ন করতে পারিনি যে এ-অধমের জীবদ্দশাতেই স্বরাজ আসবে, স্বাধীন জীবন কাকে বলে তা এই চর্মচোখেই দেখে যেতে পারবো।

কিন্তু প্রভু যখন দেন, তিনি তখন চাল-ছাত চৌচির করে ঐশ্বর্য-বৈভব (নিয়ামৎ গণীমৎ) ঢেলে দেন। হঠাৎ একদিন হুড়মুড়িয়ে স্বরাজ এসে উপস্থিত—বন্যার প্লাবনের মতো। ফলে আমরা সবাই যে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে ভেসে গেলুম এবং এখনো এমনই যাচ্ছি যে তার দিক্‌চক্রবালও দেখতে পাচ্ছি নে। আমি ইচ্ছে করেই এই অতিশয় প্রাচীন, সাদামাটা তুলনাটি পেশ করলুম, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তুলনা তিন ঠ্যাঙের উপর ভর করে দাঁড়ায়, কিন্তু এ-স্থলে তুল্য ও তুলনীয় এমনই টায়-টায় মিলে গেছে—স্বরাজ এবং বন্যা, যে এটি সত্যি চার ঠ্যাঙের উপর দাঁড়িয়েছে। তুলনাটি যে কী রকম মোক্ষম ড্রেন পাইপ পাতলুনের

মতো টাইটফিট তার আরেকটি নিদর্শন দি। এই প্রলয়জলধিতে যে সব কর্তা-ব্যক্তিরা নৌকো ভেলা পেয়ে গেলেন তাঁরা বানে ভেসে-যাওয়া বেওয়ারিশ মাল (সেশের সম্পদ, "কোম্পানি কা মাল", যদি বেওয়ারিশ না হয় তবে বেওয়ারিশ আর কারে কয়!) আঁকশি দিয়ে ধরে ধরে আপন আপন ভল্টে বোঝাই করলেন। এখানে আরো একটা মিল রয়েছে—অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, গুটি কয়েক অ্যাঙ্‌রি ইয়ং টার্ক এর "অবিমৃষ্যকারিতা"র ফলে ব্যাঙ্ক-ভল্ট বাবদে এমন সব ব্যবস্থা নেওয়া হল যে সেগুলো সেই বানের জলে উৎক্ষিপ্ত-প্রক্ষিপ্ত হয়ে ভেসে ভেসে চলেছে। কোন্ কূলে ভিড়বে—আমরা তো অনুমান করতে পারছি নে। তবে মাভৈঃ! এসব ঘড়েল কুমীরগুষ্টি যখন জলের অতল থেকে নির্বিচারে অবলা কুমারী থেকে গোবর-গামার ঠ্যাং কামড়ে ধনে বহ্বান্ন ভক্ষণ করতে পারেন, তখন এই সব বেওয়ারিশ প্রাণহীন ভল্ট কামড়ে ধরে সেগুলোকে নদীর অর্ধনিমজ্জিত গহ্বরে নিয়ে যাওয়া তো এঁদের কাছে শনির অপরাহ্নের পিকনিকের মতো নির্দোষ সহজ সরল, কিংবা বলতে পারেন অত্যাবশ্যকীয় 'রাজকার্যে'র অনুরোধে হাওয়াই দ্বীপে বসন্ত যাপন অথবা শীতে মস্তে কার্লো ভ্রমণ।

সন্দেহপিচেশ পাঠক হয়তো ভাবছো, আমি নিজে সেই হালুয়ার কোনো হিস্যে পাইনি বলে বন্ধ্যা রমণীর ন্যায় শতপুত্রবতীদের অভিসম্পাত দিচ্ছি। মোটেই না। আমার কপালেও ছিটেফোঁটা জুটেছে! ইরানের প্রখ্যাত কবি মৌলানা শেখ সাদী বলেছেন, 'ইহ-সংসারে মহাজন ব্যক্তি মাত্রই (সাদী গুণীজ্ঞানী অর্থে বলেছেন এস্থলে কিন্তু আপনাকে যখ সম্প্রদায়ের বেনেদের কথা ভাবতে হবে) যেন আতরের ব্যবসা করেন। তোমাকে মিন-পয়সায় আতর না দিলেও তাবৎ আতরের বাক্স ডবল তালা মেরে বন্ধ রাখলেও বাড়িময় যে আতরের খুশবাই ম-ম করছে এবং তোমার নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবেশ করছে, সেটা ঠেকাবেন কি প্রকারে?' এস্থলেও তাই। এ মহাজনরা যদ্যপি বাইশ বৎসর ধনদৌলত ভরা গোটা আষ্টেক লোহার সিন্দুকের উপর ডবল ডানলোপিলোতে বিনিদ্র যামিনী যাপন করেছেন তথাপি এগুলো বাধ্য হয়ে মাঝে মাঝে এঁদের খুলতে হয় তখন পাকা বেল ফেটে গিয়ে যে কাককুল প্রবাদানুযায়ী এ রস থেকে বঞ্চিত তারাও তার হিস্যে পেয়ে যায়।

এই ধরুন কিছুদিন আগেকার কথা। এক টাকার-কুমীরের উচ্চাশা হয়েছে তিনি সমাজেও যেন গণ্যমান্যব্যক্তিরূপে উচ্চাসন লাভ করেন। হঠাৎ একদিন আমার কুটিরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো এক বিরাট মোটরগাড়ি। তার

দৈর্ঘ্য এমনই যে সেটার ন্যাজামুড়ো করতে হলে হঠাৎ পিছনের লাগেজ কেরিয়ার থেকে সম্মুখের বনেটের নাক অবধি—সেখানে পদাধিকারলব্ধ পতাকা পৎ পৎ করে, এঁর গাড়িতে অবশ্য পতাকা ছিল না—যেতে হলে আরেকটা মোটরগাড়ি ভাড়া করতে হয়! তা সে যাই হোক, যাই থাক, যেই যক্ষ (অবশ্য ইনি কালিদাসের একদারনিষ্ঠ বিরহী যক্ষ নন—এঁর নাকি ভূমিতে আনন্দ; থাক "শঙ্করে"র চৌরঙ্গী পশ্য) এসে এই অধমকে আলিঙ্গন করে একখানা চেয়ারে আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন।

নিম্নলিখিত রসালাপ হল:

যক্ষ॥ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হওয়াতে বড়ই আনন্দিত হলুম। আমি বহুকাল ধরে আপনার একনিষ্ঠ পাঠক। আপনার "অগ্নিবীণা" আপনার "বিদ্রোহী" উপন্যাস আমি পড়েছি, কতবার পড়েছি বলে শেষ করতে পারবো না। ওঃ! কী করুণ, কী মধুর!

হরি হে, তুমিই সত্য।

আমি॥ (মনে মনে) সর্বনাশ! ইনি আমাকে কবিবর নজরুল ইসলামের সঙ্গে গোবলেট করে ফেলেছেন! যে ভুল পাঠশালার ছোকরাও যদি করে তবে সে খাবে ইস্কুলের বাদবাকি পড়ুয়াদের কাছে বেধড়ক প্যাঁদানি। তদুপরি যক্ষবর বলছেন, "বিদ্রোহী" কবিতাটি নাকি উপন্যাস এবং সেটি নাকি বড়ই করুণ আর মধুর! এস্থলে আমি করি কী! যে ব্যক্তি গাধাকে (এস্থলে আমি) দেখে বলে এটা রেসের ঘোড়া (এস্থলে কাজী কবি—কবি-পরিবার যেন অপরাধ না নেন, আমি নিছক রূপকার্থে নিবেদন করছি) সে ব্যক্তি গাধাকে তো চেনেই না, ঘোড়াকেও চেনে না। ইতিমধ্যে পুনরপি,

যক্ষ॥ (স্মিতহাস্য করে) আপনার বড় ভাই সৈয়দ মুস্তাফা শিরাজ—ঐ যিনি তালতলার খ্যাতনামা পুস্তক প্রকাশক—তিনিও আমার ছোট ভাইয়ের কাছে প্রায়ই আসেন। বড় অমায়িক বৃদ্ধ। শুনেছি আমাদের বাড়ির পাশেই তাঁর বিরাট তেতলা বাড়ি।

হরি হে, তুমিই সত্য! তুমিই সত্য!

আমি॥ (মনে মনে) এই আমার জীবনে সর্বপ্রথম আমার পিরামিড-দৃঢ় হরিভক্তিতে চিড় ধরলো। হরি যদি সত্যই হবেন তবে তাঁকে সাক্ষী রেখে এই লোকটা মিথ্যার জাহাজ বোঝাই করে যাচ্ছে আর তিনি টুঁ ফুঁ করছেন না, এটা কি প্রকারে হয়? ওদিকে শিরাজ মিঞা খাঁটি বিদগ্ধ রাঢ়ের ঘটি, আর আমি সিলট্যা খাজা বাঙাল। ওঁর সঙ্গে আমার কোনো আত্মীয়তা নেই—থাকলে

নিশ্চয়ই শ্লাঘা অনুভব করতুম। অবশ্য আমরা সবাই আদমের সন্তান; সে হিসেবে তিনি আমার আত্মীয়। তদুপরি বেচারী পুস্তক প্রকাশক নয়, ঢাউস বাড়িও তাঁর নেই, যদ্দূর জানি আমারই মতো দিন-আনি-দিন-খাই চাকরিতে পুরো-পাক্কা-পার্মানেন্ট। এবং বাচ্চা শিরাজ—যে আমার পুত্রের বয়সী—সে নাকি আমার অগ্রজ এবং বৃদ্ধ! বৃদ্ধ! বুঝুন ঠ্যালা। আশা করি এ লেখন বাবাজীর গোচর হলে তিনিও সব্যসাচীর ন্যায় আমাকে মাফ করে দেবেন। ইতিমধ্যে পুনরপি,

যক্ষ ॥ (তাঁর দেওয়া "বিবিধ-ভারতী"র মতো বিবিধ সংবাদ যে আমাকে একদম হতবাক করে দিয়েছে সেইটে উপলব্ধি করে, পরম পরিতোষ সহকারে) আচ্ছা, আপনি কি শান্তিনিকেতনে লেখাপড়া করেছিলেন?

আমি ॥ (মনে মনে, যাক্ মিথ্যের জাহাজ সত্যের চড়াতে এসে কিছুটা ঠেকেছে) আজ্ঞে হাঁ। তবে বিশেষ ফলোদয় হয়নি সে তো দেখতেই পাচ্ছেন।

—আহা কি যে বলেন! আচ্ছা, আপনার হাতের লেখা নাকি রবিঠাকুরের মতো?

—অনুকরণ করেছিলুম। সে সুন্দর লেখার কাছে আমার লেখা কি কস্মিন-কালেও পৌঁছতে পারে?

—আচ্ছা, কিন্তু আপনি নাকি হুবহু তাঁর নাম সই করতে পারেন? একবার নাকি তাঁর নাম সই করে ভুয়ো নোটিশ মারফৎ আশ্রমকে একদিনের ছুটি দেন! পরে নাকি আপনি নিজেই সেটা ফাঁস করে দেন?

আমি "কীর্তিটি" অস্বীকার করলুম না। কিন্তু যক্ষরাজ কোন্ দিকে নল চালাচ্ছেন সেঁটে বসে, তখনও বুঝিনি! জানলা দরজার দিকে ঘুরে এবারে চেয়ার ছেড়ে তক্তপোশে আমার গা সেঁটে বসে, জানলা দরজার দিকে ঘোর সন্দিগ্ধ নয়নে তাকিয়ে ফিসফিস করে আমার কানে কানে বললেন, বাবু, তোমার হাল তো দেখতে পাচ্ছি। তোমার দু'-পয়সা হবে: আমারও ফায়দা হবে। কিন্তু কাককোকিল পোকাপরিন্দায়ও যেন জানতে না পায়।

আমার প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের একখানা সার্টিফিকেট। আমি যে তাঁর জীবিতাবস্থায় গোপনে গোপনে দেশসেবা, পলিটিক্যাল কাজ এবং বিশ্বভারতীকে সাহায্য করছিলুম সেই মর্মে একখানা চিঠি। শেষ বয়েসে তাঁর প্রায় সব চিঠিই ইংরিজিতে টাইপ হত, তিনি শুধুমাত্র সই করে দিতেন।

আপনাকে কিচ্ছুটি করতে হবে না। আমি সেই জরাজীর্ণ টাইপরাইটার মেলা জাহের সঙ্গে নিলামে কিনেছি, অবশ্যই দালাল মারফৎ। আমার কপাল

ভালো। ঐ সব হাবিজাবির ভিতর তাঁর প্রাচীন দিনের একগুচ্ছা লেটারহেড সমেত হলদে ফ্যাকাশে নোটপেপারও পেয়ে গিয়েছি। টাইপরাইটারটা সযত্নে মেরামত করেছি। এখন এটা ঠিক ১৯৩৮।৩৯।৪১-এর মতোই ছাপা ফোটায়। আমি পাকা লোককে দিয়ে সার্টিফিকেটের মুশাবিদা করাবো, টাইপ করাবো। তারপর কবির দস্তখৎটি হয়ে গেলে দলিলটি রেখে দেব আঁকাড়া চালের বস্তার ভিতর। ব্যস! আর দেখতে হবে না। টাইপের কালি, দস্তখতের কালি সব ম্যাটমেটে মেরে গিয়ে ১৯৪১ সনের চেহারা নিয়ে বেরুবে সেই খানদানী চেহারা নিয়ে।

এই চূড়ান্তে পৌঁছে যক্ষ হঠাৎ থেমে গিয়ে আমার দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে রইলেন।

সাংসারিক বুদ্ধি আমার ঘটে আছে, এহেন অপবাদ যে-সব পাওনাদারদের আমি নিত্যি নিত্যি ফাঁকি দিয়ে অদ্যাবধি বেঁচেবর্তে আছি তাঁরাও বলবেন না। তৎসত্ত্বে এ-নাটকের শেষাঙ্কে আমি যেন অকস্মাৎ অর্জুনের দিব্যদৃষ্টি প্রসাদাৎ কৃষ্ণাবতারের বিশ্বরূপ দেখতে পেলুম।

"সংক্ষেপে বলিতে গেলে হিং টিং ছট!" অর্থাৎ পূর্বোক্ত দলিলে আমাকে জাল করতে হবে কবির সিগনেচর, স্বাক্ষর, দস্তখৎ। দস্ত্ কথা শব্দটির অর্থ হাত (যার থেকে দস্তানা এসেছে); আমাকে দস্তখৎ করতে হবে না, করতে হবে দস্তক্ষত—অর্থাৎ জাল করে হাতে ক্ষত আনতে হবে।

আমার মুখে কোনো কথা যোগালো না।

যক্ষ বললেন, আপনার দক্ষিণা কি পরিমাণ হবে?

আমার মাথায় তখন নলরাজদেহনির্গত কলি ঢুকেছে, অর্থাৎ দুষ্টবুদ্ধি চেপেছে। দেখিই না, শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায়।

ব্রীড়াময়ী কুমারীর মতো—কিংবা ধোওয়া তুলসী পাতাটির মতোও বলতে পারেন—ক্ষিতিতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিবেদন করলুম, আপনি বলুন।

সঙ্গে সঙ্গে না তাকিয়েই অনুভব করলুম যক্ষের সর্বাঙ্গে শিহরণ রোমাঞ্চন উত্তাল তরঙ্গ তুলেছে। এত সহজে যে নিরীহ একটা লেখক এহেন ফেরেব্বাজীতে রাজী হবে, এ-দুরাশা তিনি আদপেই করেননি। ভেবেছিলেন আমাকে বহুৎ ভলাইমলাই করতে হবে। সোল্লাসে বললেন পাঁচশ।

আমি তুলসীপাতার কোমল রূপটি সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করে সুতীক্ষ্ণ তালপাতার আকার ধারণ করে বললুম, আপনি কি ছাগীর দরে হাতি কিনতে চান? তার চাইতে যান না যে-কোনো আদালতের সামনে বটতলায়। পাকা জালিয়াত

পাঁচটি টাকায় ঐ কর্মটি করে দেবে!

আমার চাই পাঁচ হাজার।

আমি বেশ বুঝে গিয়েছিলুম, যক্ষ প্রফেশনাল জালিয়াতের কাছে যেতে চান না। সেটা মোস্ট ডেনজরস্।

ইতিমধ্যে এই প্রথম তাঁর পরিপূর্ণ সপ্রতিভ ভাব কেটে গিয়ে তিনি হয়ে গেছেন স্তম্ভিত হতভম্ব। কিছুক্ষণ পরে রাম ইডিয়টের মতো বিড়বিড় করে বললেন, পাঁচ হাজার?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললুম, বড়বাজারের নাপিতকে দিয়ে আপনার কান সাফ করাতে হবে না। ঠিকই শুনেছেন।

অতঃপর গৃহমধ্যে সূচীভেদ্য নৈস্তব্ধ্য।

খানিকক্ষণ পর আমিই বললুম, আপনি বাড়ি গিয়ে চিন্তা করুন, স্লীপ ওভার ইট। আমিও তাই করবো।

আমি জানতুম, এ সব ঘড়েলদের সবচেয়ে বড় গুণ এদের ধৈর্য। তাই এই ধৈর্য কাজে লাগাবার ফুরসত-মোকা পেলেই এরা সোল্লাসে রাজী হয়। ধৈর্য দ্বারা ঘষতে ঘষতে এরা অন্যপক্ষের প্রস্তরও ক্ষয় করতে পারে।

আর আমারও তো কোনো স্টক নেই। এদের ধৈর্য যদি অফুরন্ত হয়, তবে আমার ধৈর্য অনন্ত। দেখাই যাক না, শ্রাদ্ধ কদ্দূর গড়ায়!

তাই গোড়াতেই বলছিলুম আমাদের মত নগণ্যগণও এ-সব ছিটেফোঁটার সুযোগ পায়, কিন্তু হায়, যার অদৃষ্টে অর্থ নেই তার কপালে স্বয়ং মা-লক্ষ্মী ঠাকুরানীও ফোঁটা আঁকতে এলে সে মূর্খ তখন যায় নদীতীরে, কপাল ধুতে! ফিরে এসে দেখে, লক্ষ্মী অন্তর্ধান করেছেন। তাই তাঁর নাম চপলা!

রাবাৎ—ইনসল্ট

প্রখ্যাত লেখক রেমার্ক-এর উপন্যাস "পশ্চিম রণাঙ্গন নিশ্চুপ (অল কোআএট্)"-এর এক জায়গায় আলোচনা হচ্ছে কয়েকজন নিতান্ত সাধারণ সেপাইয়ের মধ্যে। ক্ষীণ স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে প্রতিবেদন নিবেদন করছি। একজন সেপাই শুধোলে, "লড়াই লাগে কেন?" আরেকজন বললে, "দূর বোকা! এক দেশ আরেক দেশকে অপমান করে। তখন লাগে লড়াই।" প্রথম সেপাই তখন বললে, "কিন্তু আমি তো মোটেই অপমানিত বোধ করছি নে। যারা করছে তারা

প্রাণভরে লড়ুক। আমাকে আমার বাড়ি, ক্ষেতখামারে ফিরে যেতে দেয় না কেন?"

রাবাৎ সম্মেলনে নাকি ভারতবর্ষ ইন্‌সল্টেড হয়েছেন। কই, আমি তো মোটেই অপমানিত বোধ করছি নে। তদুপরি আরেকটা তত্ত্ব এ-স্থলে আমার স্মরণে আসে। আমার বাল্যবয়সে আমার এক গুরুজনের সামনে বাইরের এক ব্যক্তি আমাকে অযথা কড়া কড়া কথা শোনায়। আমি তখন চটে গিয়ে বলি, 'আমাকে অপমান করছেন কেন?' সে ব্যক্তি কোনো উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। আমার সেই মুরুব্বী তখন বললেন, "ঐ তো করলে ব্যাকরণে—প্রোতোকলে—ভুল। তুমি স্বীকার করে নিলে তুমি অপমানিত হয়েছ। তারপর যে অপমান করেছে সে মাফ না চেয়ে চলে গেল। তুমি রয়ে গেলে অপমানিত। সুতরাং কক্‌খনো নিজের মুখে মেনে নিতে নেই, 'আমি অপমানিত হয়েছি।' নিতান্তই যদি তখন তোমাকে কিছু বলতে হয়, তবে বলবে, 'আপনি এরকম অভদ্র আচরণ করছেন কেন?' দোষটা চাপাবে তার ঘাড়ে। এবং আরো নিতান্তই যদি অপমান বোধ করে থাকো তবে সেটা জোর গলায় স্বীকার না করে, চুপসে সেটা হজম করে নেবে এবং তক্কে তক্কে থাকবে কখন ব্যাটার উপর মোক্ষম দাদ তুলতে পারবে—যদ্যপি আল্লাতালার আদেশ সব্‌র্ (সহিষ্ণুতাসহ ক্ষমা—যার থেকে বাংলার "সবুর" কথাটা এসেছে।) রাবাতের ব্যাপারটা আগাপাস্তলা "মুসলমানী" ছিল বলে মুসলমানী শাস্ত্রের নজির দিলুম।

এর উপর আরেকটা কথা আছে। অপমান করতে পারে কে, কাকে? আমি গেলুম আপনার বাড়িতে। আপনার চাকর আমাকে খামোখা কতকগুলো কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিলে—বৈঠকখানায় ঢুকতেই দিলে না। এ-স্থলে সে আমাকে অপমান করেনি, করেছে রূঢ় ব্যবহার—আমাকে অপমান করার মত সামাজিক আসন তার কোথায়? আবার দেখুন, অন্য আরেকদিন আপনার ঠাকুরদা বসে ছিলেন বারান্দায়। আমাকে দেখেই খাপ্পা হয়ে আমাকে নাহক বকতে শুরু করলেন। সে-স্থলেও আমি অপমানিত নই। কারণ আমি আপনার বন্ধু। আপনার পিতামহের বিলক্ষণ হক আছে আমাকে কড়া কথা বলার।...অপমান হয় সমপর্যায়ে। যেমন মনে করুন, সন্তোষ ঘোষ। তিনি লেখক, আমিও লেখক। তিনি আমাকে অপমান করতে পারেন, আমিও তাঁকে অপমান করতে পারি। আরেকটি নজির দিই। যদ্যপি আইনে বারণ তথাপি ইতালি প্রভৃতি কোনো কোনো দেশে ডুয়েল লড়ার প্রথা প্রচলিত আছে।

কিন্তু সেখানেও যদি আপনার ভৃত্য ইতালির প্রধানমন্ত্রীকে ডুয়েলে চ্যালেন্‌জ্‌ করে, সে-খবর জানিয়ে দুজন প্রতিভূ চাকরের প্রতিভূদের সঙ্গে দু-মিনিট আলোচনা করেই, একবাক্যে চারজনাই রায় দেবেন, "এ ডুয়েল হতে পারে না। দু'জনার পদমর্যাদা এক নয়। চাকরটা শুধু তার পদমর্যাদা বাড়াবার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে চ্যালেন্‌জ্‌ করেছে।"

মরক্কো দেশ কোথায়, মশাই? শুনেছি সেখান থেকে মরক্কো লেদার নামক পুরু চামড়া রপ্তানি হয়। পুরু চামড়া নিশ্চয়ই। নইলে সেখানকার লোক এই সুদূর ভারতবর্ষের লোককে নিমন্ত্রণ করে—তাদের অর্বাচীন ইতিহাসে (প্রাচীন ইতিহাস এদের নেই) এই বোধ হয় তারা কাউকে কখনো নিমন্ত্রণ করলো—এ রকম পুরু চামড়ার আচরণ করবে কেন? তদুপরি শুনেছি, মরক্কো দেশকে নাকি এখনো বহু বাবতে ফ্রান্স এবং স্পেনের কথামতো চলতে হয়, এবং সর্বশেষে শুনেছি, স্পেন ও ফ্রান্সের ঝগড়ার সুযোগ নিয়েই এ-দেশের যেটুকু "স্বাধীনতা" আছে সেটুকু বেঁচেবর্তে আছে। আমার কেমন যেন সন্দেহ জাগে, মুসলিম রাষ্ট্রদের নিমন্ত্রণ করে এরা যেন সেই ইতালীয় ডুয়েলকামীর মতো পদমর্যাদা বাড়াতে চেয়েছিল। আমার তো মনে হয় না, আক্‌সা মসজিদের আগুন মরক্কোর বুকে কোনো আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

কোথায় মরক্কো, কোথায় ভারত? পদমর্যাদায় কোথায় ভারত আর কোথায় সেই ধেড়ধেড়ে গোবিন্দপুর টা-পেনি হে-পেনি মরক্কো! সে আমাদের ইনসল্ট করবে কী করে!

ফখরুদ্দীন সায়েব, দীনেশবাবু, আমাদের ফরেন আপিস যা করলেন সেটা নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। আমার দুঃখ, খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখে চিঠিপত্র ছাপিয়ে এ-দেশের মুসলমানরা এঁদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন না কেন? বলেন না কেন যে, এঁদেরই হয়ে একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ভারত সরকার ঐ একটা থার্ড ক্লাস দেশে গিয়েছিল।

যদ্যপি-বা স্বীকার করি—আমি করি না—যে ভারত রাবাতে ইনসল্টেড হয়েছে—তথাপি বলবো, মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অপমানিত হওয়াতে লজ্জার কিছু নেই। ক্ষুদ্র স্বার্থপর উদ্দেশ্য নিয়ে জয়ী হলেও উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করার কিছু নেই।

অল-মসজিদ্-উল-আক্সা

আজকের দিনে বিশ্ব মুসলিম প্রধানত তিনটি তীর্থ দর্শনে যান। মক্কায় আল্লার ঘর কা'বাতে, মদীনায় পয়গম্বরের কবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে এবং তৃতীয় জেরুজালেমে—যেখানে ইহুদি, খ্রীষ্ট ও ইসলাম তিন ধর্মের সমন্বয় হয়।

প্রকৃত শাস্ত্র বিধান অনুযায়ী কিন্তু বিশ্ব মুসলিমকে যে-তিনটি পুণ্যভূমি স্বীকার করতে হয় তার একটি মক্কার কা'বা এবং তারপর যে পুণ্যস্থানের উল্লেখ করা হয়েছে তার দুইটিই জেরুজালেমে। এর প্রথমটি একাধিক নামে পরিচিত। ইংরিজিতে একে ডোম্ অব দি রক্ (রক = প্রস্তরের উপর নির্মিত ডোম্ = গুম্বুজ), ঐতিহাসিক ভ্রান্তিবশতঃ ওমর মস্ক্ও বলা হয়; আরবীতে এটিকে কুব্বতুস্—সখরা (কুব্বৎ = ডোম; সখ্রা = প্রস্তর বলা হয়)। এটিকে ইহুদি, খ্রীস্টান, মুসলমান সকলেই সম্মান প্রদর্শন করে। কারণ এই তিন ধর্মেরই সম্মানিত রাজা সুলেমানের প্রসিদ্ধ মন্দির একদা এস্থলেই দণ্ডায়মান ছিল। এই সলমনের টেম্পল্ একাধিক বার বিনষ্ট হয় এবং সর্বশেষে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় ৭০ খ্রীস্টাব্দে রোমানদের দ্বারা। ভগ্নস্তূপের উপর তাবৎ শহরের ময়লা স্তূপীকৃত হতে থাকে প্রায় সাড়ে পাঁচ শ' বৎসর ধরে। ৬৩৪ খ্রীস্টাব্দে মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হজরৎ ওমর খ্রীস্টানদের হাত থেকে জেরুজালেম অধিকার করে জঞ্জাল সরিয়ে একটি ক্ষুদ্র মসজিদ নির্মাণ করেন এবং এর পঞ্চাশ বৎসর পর আমাদের শাহ্-জাহানের মতো বিত্তশালী ও স্থাপত্যে সুরুচিসম্পন্ন খলিফা আব্দুল মালিক সেখানে যে পৃথিবীর অন্যতম অনবদ্য ইমারৎ নির্মাণ করেন সেইটিই ১২০০ বৎসর ধরে সেখানে অটুট অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে বিশ্বজনের সৌন্দর্যস্তুতি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করছে। আমি যতদিন জেরুজালেমে ছিলুম তার প্রায় প্রতিদিন একবার না একবার একা একা ঘুরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর বিরাট আরকিটেক্টনিকাল বৈভব থেকে ক্ষুদ্রতম অলংকরণ দেখে মুগ্ধ হতুম।

(১) কা'বা, (২) উপরে উল্লিখিত এই মসজিদ—তারপরই আসে (৩) মস্জিদ-উল্-আক্সা, সংক্ষেপে আক্সা মসজিদ। এই আক্সার উল্লেখ কুরান শরীফে আছে (সুরা ১৭ : ১)।

এ স্থলে কিঞ্চিৎ ইতিহাসের প্রয়োজন।

আরব ও ইহুদি একই সেমিতি বংশ (রেস) জাত, একই রক্ত ধারণ করে। আরবী ও হীব্রু (ইহুদিদের এই ভাষাতেই তাদের বাইবেল রচিত) ভাষা দুই

ভগ্নী, অর্থাৎ কগ্‌নেট্‌। এবং সব চেয়ে বড় কথা বাইবেলে বর্ণিত ইহুদী প্রফেটগণ যথা, আব্রাহম, দায়ুদ, সুলেমান ইত্যাদি কুরান শরীফেও স্বীকৃতিলাভ করেছেন। হজরৎ নবী তাই যখন ইসলাম প্রচার করেন তখন তিনি ইহুদি আরবের কেন্দ্রভূমি জেরুজালেমের দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে আরম্ভ করেন। কিন্তু হজরতের মদীনা শহরের বসতি স্থাপনা করার দুই বৎসর পর আল্লার আদেশে মক্কার দিকে মুখ করে নামাজ পড়েন—এবং আজও সেই রীতি প্রচলিত আছে। এরই ফলে জেরুজালেমের সলমন-মন্দিরভূমি মুসলিম জগতে দ্বিতীয় স্থান পেল বটে তবু কোনো কোনো জাত্যভিমানী আরব সেটিকে বহু শতাব্দী ধরে প্রথম স্থানেই রেখেছিলেন—বিশেষত উম্মই (ওমাইয়াড্‌) খলিফারা। অদ্যকার দিনে কিন্তু মুসলিম জহান প্রথম স্থান দেয় মক্কার কা'বা শরীফকে এবং দ্বিতীয় স্থান জেরুজালেমের সলমন মন্দিরকে—যার উপর প্রতিষ্ঠিত আব্দুল মালিক নির্মিত এমারতের বয়ান এইমাত্র দিয়েছি এবং এর পরেই বলেছি, তৃতীয় পুণ্যক্ষেত্র—মসজিদ্‌-উল্‌-আক্‌সা।

কিন্তু তৃতীয় হলে কি হয়, এই আক্‌সার সঙ্গে বিজড়িত আছে বিশ্ব মুসলিমের রোমহর্ষক উত্তেজনাদায়ী ঐতিহ্য, পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার সম্মিলিত হবার অবিস্মরণীয় অভিযান এবং তার চরম ফলপ্রাপ্তি—নজাৎ, মোক্ষ, মহা পরিনির্বাণ, যা-খুশী বলতে পারেন।

কুরান শরীফে এ-অভিযানের যে-বয়ান লেখা আছে, হদীসে তার যে টীকা-টিপ্পনী আছে (কুরান হিন্দুদের বেদস্থানীয় শ্রুতি; হদীসকে স্মৃতিশাস্ত্রের সঙ্গে সচরাচর তুলনা করা হয়, আশা করি কোনো মুসলমান এ-তুলনার জন্য অপরাধ নেবেন না)। বস্তুত ইয়োরোপীয় কাব্যের ইতিহাসে ইসলামের এই অনুচ্ছেদটি তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। দান্তের মহাকাব্য "ডিভাইন কমেডি" এর কাছে ঋণী—অপর্যাপ্ত ইয়োরোপীয় আরবী তথা ইতালিয়ান ভাষা-সাহিত্যের গুণীজ্ঞানী আলঙ্কারিক পণ্ডিত এই মত পোষণ করেন।

কুরানে আছে, পয়গম্বর সাহেব মক্কাতে ইসলাম প্রচার আরম্ভ করার কিছু কালের মধ্যেই স্বয়ং আল্লাতালা তাঁকে পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং পরম সত্যধর্মের নিগূঢ়তম তত্ত্বে দীক্ষিত করার জন্য তাঁর প্রধান ফেরেশতা ("দেবদূত" ইংরিজিতে "আর্কেঞ্জেল" জিব্‌ রাঈল = গেব্রিয়েলকে) পাঠান মুহম্মদকে (দঃ) তাঁর সমীপে

নিয়ে আসতে।[১] কুরান শরীফে স্পষ্টাক্ষরে বলা হয়েছে,

"সেই (ব্যক্তিই) ধন্য যিনি এক রাত্রেই তাঁর অনুচরসহ মসজিদ্-উল্-হারাম্ (অর্থাৎ মক্কার কা'বা) থেকে একই রাত্রে মসজিদ-উল্-আক্সা (জেরুজালেম) পর্যন্ত ভ্রমণ করেন, যার চতুর্দিক আমরা পূত করেছি। এবং যাতে করে আমরা তাঁকে আমাদের চিহ্ন দেখাতে পারি।" (কুরান শরীফ; সূরা ১৭ : ১)

অন্বয় এবং টীকা : "সেই ব্যক্তি" হজরৎ। "একই রাত্রে"—তখনকার দিনে যানবাহন যা ছিল তাতে করে মক্কা থেকে জেরুজালেম পৌঁছতে অন্তত (উটে চড়েও) পনেরো দিন লাগার কথা। এটা আমার অনুমান মাত্র। কম তো হতে পারে না; বেশীই হবে।

"আমাদের চিহ্ন দেখাতে পারি"—অর্থাৎ আল্লাতালা স্বয়ং তাঁকে সত্যধর্মের গভীর তত্ত্বে দীক্ষিত করবেন—পূর্বোক্ত নজাৎ মোক্ষ ইত্যাদি।

এস্থলে প্রশ্ন মসজিদ-উল্-আক্সা কোন্ স্থলে অধিষ্ঠিত? মুসলিম অমুসলিম (অমুসলিম এই কারণে বলছি, প্রচলিতার্থে অহিন্দু মাক্সমুলার যে-রকম বেদ নিয়ে গবেষণা করেছেন, ঠিক সেই জিনিসই করেছেন একাধিক ইয়োরোপীয় অমুসলিম পণ্ডিত কুরান হদীস নিয়ে) সকলেই তার অধিষ্ঠান জেরুজালেমে ছিল বলে স্থির-নিশ্চয়—তাই আমি অনুবাদ এবং টীকাতে একই রাত্রে মক্কা থেকে জেরুজালেম ভ্রমণের কথা বলেছি।

পণ্ডিতদের বক্তব্য, মক্কা শরীফের বাইরে এমন এক জায়গা যেটি আল্লা স্বয়ং পূতপবিত্র করেছেন সে-শুধু জেরুজালেমই হতে পারে। কারণ ইসলামের প্রথম অভ্যুদয়ের সময়ই হজরৎ নবী ঐ দিকে মুখ করে নামাজ পড়েছিলেন। অতএব সেই জেরুজালেমের সলমনের মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত ভূমিতেই আছে মসজিদ-উল্-আক্সা।

পূর্বেই বলেছি খলিফা ওমর সলমন মন্দিরের সেই ভগ্নস্তূপ পরিষ্কার করে নির্মাণ করেন একটি মসজিদ এবং পরবর্তীকালে আব্দুল মালিক নির্মাণ করেন ডোম অব দি রক্ এবং তারই অতি কাছে আরেকটি বৃহত্তর বিরাট মসজিদ-উল্-আক্সা।

ডোম অব্ দি রক্ একটা পাথরের চতুর্দিকে গড়া হয়েছিল বলে স্থপতি সেটাকে হাজার হাজার নমাজার্থী মুসলমানের জন্য বিরাট কলেবর দিতে পারেন

১ কুরান শরীফে জিব্রাঈলের উল্লেখ নেই। একাধিক হদীসে সবিস্তর আছে।

নি। তাই তিনি সেটিকে করেছিলেন সুন্দর, মধুর। অবশ্য মসজিদের চতুর্দিকে দিয়েছিলেন প্রশস্ততম অঙ্গন (এদেশের মন্দিরে সঙ্কীর্ণ গর্ভ-গৃহের চতুর্দিকে যে-রকম বিস্তীর্ণ অঙ্গন রাখা হয়), কিন্তু গ্রীষ্মকালে, জেরুজালেমের দ্বিপ্রহর রৌদ্রে সেখানকার অনাচ্ছাদিত মুক্তাঙ্গনে—যেখানে মস্তকোপরি সূর্যের প্রতাপের চেয়ে পদতলের পাষাণ ঢের বেশী পীড়াদায়ক—সেখানে জুম্মা নামাজ পড়া অহেতুক পীড়াদায়ক হবে বলে তিনি নির্মাণ করেছিলেন, তাঁর প্রাণ যা চায় সেই পরিমাণে বিস্তৃত, মসজিদ্-উল্-আক্সা।

কিন্তু এহ বাহ্য।

আসলে বিশ্ব মুসলিমের কাছে মসজিদ্-উল্-আক্সা তাবৎ পুণ্যভূমির মধ্যে সব চেয়ে রোমাঞ্চকর।

কুরান হদীসের সঙ্গে যে মুসলিমের সামান্যতম পরিচয় আছে, সে-ই আপন মনে কল্পনা করে, সেই সুদূর মক্কা থেকে আল্লা তাঁর প্রিয় নবীকে রাতারাতি নিয়ে এলেন মুস্‌জিদ্-উল্ আক্সাতে (শব্দার্থে মক্কা থেকে "সবচেয়ে দূরে পুণ্যক্ষেত্রে"), সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল, 'বুর্‌য়াক্' নামক পক্ষিরাজ অশ্ব এবং তার মুখ মানবীর ন্যায়—সেই অশ্বে সোয়ার হয়ে নবীজী পৌঁছলেন বেহেশ্‌তের দ্বার-প্রান্তে।

এই নিয়ে সে মনে মনে কত না কল্পনার জাল বোনে! স্বয়ং আল্লার সঙ্গে সশরীরে সাক্ষাৎ!

অবশ্য এ-কথাও সত্য যে বহু মুসলিম দার্শনিক সুফী (রহস্যবাদী ভক্ত = মিস্টিক) এ প্রশ্ন বার বার শুধিয়েছেন, এই যে হজরতের স্বর্গারোহণ এটা কি বাস্তব না স্বপ্ন; তিনি কি সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন, না তাঁর আত্মা মাত্রই আল্লার সম্মুখীন হয়েছিলেন? কিন্তু মোলাকাত যে হয়েছিল সে-সম্বন্ধে সবাই নিঃসন্দেহ।

যাই হোক্, যা-ই থাক্,—এই মস্‌জিদ-উল্-আক্সা থেকেই, আল্লাতালা হজরৎকে দিয়ে স্থাপনা করলেন মর্ত্যভূমি ও স্বর্গভূমিতে যোগ-সেতু।

সেই সেতুর পার্থিব প্রান্ত পুড়িয়ে দিয়ে সে-সেতু বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা অজ্ঞ বিজ্ঞ যে-কোনো মুসলমানকেই বিচলিত করার কথা।

ন্যাকামো

প্রতি বৎসর আনুষ্ঠানিকভাবে সাড়ম্বর প্রাথমিক শিক্ষা, পাঠশালার মাস্টার-মশাইদের 'দুরাবস্থা', দেশ থেকে কেন নিরক্ষরতা দূর হচ্ছে না এই নিয়ে বিরাট বিরাট মীটিং হয়, বিস্তর চেল্লাচেল্লি হয়, ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলা হয়। তারপর সারা বৎসর নিশ্চুপ।

এ-যেন কঞ্জুস শ্বশুরের জামাইষষ্ঠী করার মতো। নিতান্ত না করলেই নয় বলে। তারপর পরিপূর্ণ একটি বৎসর কিপ্টে শ্বশুর নিশ্চিন্দি।

উঁহু! তুলনাটা টায়-টায় মিললো না। শ্বশুর যতই হাড়ে টক শাইলক হোক না কেন, এবং জামাই যতই হতভাগ্য দুঃখী হোক না কেন, সে বেচারী অন্তত একবেলার মতো পেট ভরে খেতে পায় এবং শুনেছি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একখানা কাপড়ও পায়। আমি সঠিক বলতে পারবো না কারণ আমি মুসলমানী বিয়ে করেছি। যদ্যপি সম্পর্কে তার এক বারেন্দ্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই কলকাতা শহরেই পুরুষ্টু পাঁঠাটার মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঝাঁ-চকচকে একাধিক মোটর দাবড়ে বেড়ায় তবু শালা···আমি অশ্রাব্য অছাপা গালিগালাজ করছি নে[১]—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন ব্যাটা সম্পর্কে আমার বড়কুটুম (শ্যালক)—আমাকে জামাই-ষষ্ঠীর দিনে স্মরণ করে না। কারণ তার পিতা—আমার ঈশ্বর শ্বশুর মহাশয় তাঁর সাধনোচিত ধামে চলে যাওয়ার পর এই শ্যালকটি তার পিতার তাবৎ সব গ্রহণ করেছেন নৃত্য করতে করতে। (সত্যের খাতিরে অনিচ্ছায় বলছি দাতাকর্ণ

১ আমার প্রতি অকারণ সহৃদয় পাঠক, যাঁরা আশকথা-পাশকথা শুনতে ভালোবাসেন, তাঁদের কাছে অবান্তর একটি ঘটনার উল্লেখ। আমার বৃদ্ধ পিতা তখন ছোট একটি মহকুমার অনারারি হাকিম। একদিন আদালত থেকে ফিরে আমায় বললেন, "সিতু, আজ আদালতে কি হয়েছিল, জানিস? এক মূর্খ আরেক গাধার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা এনেছে, ঐ দোসরাটা নাকি তাকে সদর রাস্তায় 'শালা' বলে গালাগালি দিয়েছে (এতদিন পরে আমার মনে নেই সেটা এবুজিভ ল্যানগুইজ না ডিফেমেশন-ছিল—লেখক)।" তারপর বাবা বললেন, "আসামী পক্ষের মোক্তারের বক্তব্য, যাকে সে 'শালা' বলেছে সে সম্পর্কে সত্যিই তার শালা; অতএব কোনো অপরাধ হয়নি। বিপক্ষ কিন্তু বলছে, রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আসামী যখন শালা বলেছে তখন মধুভরা সোহাগ-পোরা সে শালা বলেনি; বলেছে

শ্বশুরমশাই বিশেষ কিছু রেখে যাননি, এবং সামান্য যেটুকু ভদ্রাসন রঙপুরে রেখে গিয়েছিলেন সেটুকুও পার্টিশনের ফলে শ্যালকের হস্তচ্যুত হয়। বেশ হয়েছে খুব হয়েছে !!) কিন্তু পিতৃদেবের দায়দায়িত্ব বেবাক এড়িয়ে গেছে। তাই সে জামাইষষ্ঠীর একমাস আগের থেকে এড়িয়ে চলে। হিন্দু কায়দাকানুন আমি জানি নে, কিন্তু আমি যে অঞ্চলের মুসলমান সেখানে রীতি, শ্বশুর গত হওয়ার পরেই তাঁর পুত্র জামাইয়ের শ্বশুর হয়ে যান। হয়তো হিন্দুদের ভিতর এ-রেওয়াজ নেই। আমি জানবো কি করে ? কিন্তু আমাদের এই হিন্দু-মুসলমান, ভারতীয় ঐক্যবিধান নিয়ে যখন সব্বাই মাথা ঘামাচ্ছেন তখন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ লেনদেন গিভ্-অ্যাণ্ড-টেক করা উচিত নয় ?

এই দেখুন না, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সময় আমার দু-তিনটি হিন্দু বোন আমাকে নেমন্তন্ন জানায়—নেমন্তন্ন কথাটা বোধ হয় ঠিক নয়। আমাকে তখন তারা ডাক দেয়—হক্ হিসেবে, অ্যাজ এ ম্যাটার অব্ রাইট। আমি তখন বিশ-পঁচিশ টাকার শাড়ি নিয়ে যাই।

কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, প্রিন্স অব্ ওয়েলস, ফিরোজ মিঞা বড্ডই ঘোর আত্মাভিমানী। সে নিমন্ত্রণ পায় তার তিন-চার হিন্দু বোনদের কাছ থেকে। আমি বিলক্ষণ বুঝি সেই সরলা হিন্দু কুমারীরা মনে মনে ভাবে, সব হিন্দু ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার পরব করছে আর এই ছোট ভাইটি একা একা দিন গোঁয়াবে ? তদুপরি একথাও তো সত্য, এই কুমারীদের কোনো কোনো হিন্দু ভাই মুসলমান ফিরোজের চেয়ে কোনো গুণে শ্রেষ্ঠতর নয়। আমার মনে পড়লো, ঐ ফিরোজই তার কোনো এক দিদির জন্মদিনে তার প্রিয় ফুল কেয়া আনতে গিয়ে শান্তিনিকেতনের দক্ষিণ দিকে গোয়ালপাড়ার কেয়াবনের মধ্যিখানে গোখরো সাপের ছোবল খেতে খেতে বেঁচে যায়।

অপমান করার জন্য।" ইতিমধ্যে বাবার মগরিবের (সন্ধ্যার নামাজের) অন্য অজুর জল এসে গিয়েছে। আমি তাই তাড়াতাড়ি শুধোলুম, "আপনি কি রায় দিলেন ?" বাবা বললেন, "দুই পক্ষকে আদালত থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলুম। বললুম, "মস্করা করার জায়গা পাও নি !"...আমার মনে এখন সন্দেহ জাগে, বাবার এই হুকুম ঠিক আইনসম্মত হয়েছিল কি না। তবে এ কথা জানি, দুই পক্ষই কোনো প্রতিবাদ না জানিয়ে স্যুস্‌সুড় করে বেরিয়ে গিয়েছিল। কারণ বাবা ছিলেন রাশভারী, আচারনিষ্ঠ বৃদ্ধ। আসামী ফরিয়াদী মোক্তার সবাইকে দেখেছেন উলঙ্গাবস্থায় আমাদের বাড়ির আঙ্গিনায় খেলাধুলো করতে।

অতএব বাবু ফিরোজ আমাকে বললেন, "আব্বু, আমি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় যাচ্ছি। কিন্তু তার পূর্বে দিদিদের জন্য কিছু শাড়ি কিনতে হবে। আমি দালাল কোম্পানিতে যাচ্ছি।"

সর্বনাশ! দালাল কোম্পানী অকাতরে সব দেবে। অবশ্য, বাচ্চা ফিরোজ কেন, ওরা কাউকেই ঠকায় না। তবে কেনা আমি ওদেরকে একবার ঠকিয়েছি।

কত টাকার বিল এনেছিল জানেন? ১৮০ টাকা!

পাঠক হয়তো ভাবছেন, আমি কি নিয়ে আরম্ভ করেছিলুম, আর কোথায় এসে পৌঁছলুম। বুঝিয়ে বলি। এ-লেখাটি যখন আরম্ভ করি তখন ভীষণ রৌদ্র, দারুণ গরম। তারই সঙ্গে তাল রেখে আমি রুদ্র তথা ব্যঙ্গরসের অবতারণা করি। কিন্তু দু'লহমা লেখার পূর্বেই হঠাৎ অন্ধকার করে নামলো ঝমাঝম বৃষ্টি। তারপর মোলায়েম রিমঝিম। তারপর ইলশেগুঁড়ি। সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ররসের অন্তর্ধান। বাসনা হলো আপনাদের সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ করি, একটুখানি জমজমাট আড্ডা জমাই।

ইতিমধ্যে আবার চচ্চড়ে রোদ উঠেছে। ফিরে যাই সেই রুদ্ররসে।

আমাকে যদি কেউ শুধোয়, আমি কোন্ জিনিসে সবচেয়ে গুরুত্ব আরোপ করি তবে নির্ভয়ে বলবো, শিক্ষা।

কোন্ শিক্ষা?

প্রাইমারি স্কুল, অর্থাৎ পাঠশালা।

তারপর?

হাইস্কুল। তারপর? কলেজ, বি. এ. এম. এ.। তারপর? পি. এচ. ডি.। আমার মনে সবচেয়ে বিরক্তির সঞ্চার হয়, যখন ডক্টরেট করার জন্য কেউ আমার কাছে এসে সাহায্য চায়।

পাঠক অপরাধ নেবেন না যদি এ-স্থলে আমি কিঞ্চিৎ আত্মজীবন প্রকাশ করি।

বঙ্গসাহিত্যে আমার যেটুকু সামান্য লাস্ট বেঞ্চের আসন জুটেছে (অর্থাৎ আমার প্রথম পুস্তক "দেশে বিদেশে" প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে) আমি একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি, মরহুম হুমায়ুন কবীর সাহেবের "চতুরঙ্গে" ১৯৪৮ সালে। প্রবন্ধটির নাম "পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা"। আমি প্রমাণ করতে চেয়েছিলুম, যে যাই বলুক না কেন, আখেরে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলাই হবে। কিন্তু এহ

বাহ্য। আমি তখন প্রাইমারি এডুকেশনের উপর সবচেয়ে বেশী জোর দিয়ে বলি :

'আমাদের পাঠশালার পণ্ডিতমশাইদের কিছু কিছু জমিজমা মাঝে-মধ্যে থাকে, কিন্তু সে অতি সামান্য, নগণ্য। কেউ কেউ হালও ধরে থাকেন। এবং তৎসত্ত্বেও তাঁরা যে কী নিদারুণ দারিদ্র্যের ভিতর দিয়ে জীবনযাপন করেন সে নির্মম কাহিনী বর্ণনা করার মত ভাষা ও শৈলী আমার নেই। লেখাপড়া শিখেছেন বলে এবং অনেক স্থলেই উত্তম বিদ্যার্জন করেছেন, যেটা আমরা শহরে বসে সঠিক বুঝি নে—গ্রামের আর পাঁচজনের তুলনায় এঁদের সূক্ষ্মানুভূতি, স্পর্শকাতরতা এবং আত্মসম্মানজ্ঞান হয় অনেক বেশী। মহাজনের রূঢ় বাক্য, জমিদার জোতদারের রক্তচক্ষু এঁদের হৃদয়মনে আঘাত দেয় ঢের ঢের বেশী। এবং উচ্চশিক্ষা কি বস্তু তার সন্ধান তাঁরা কিছুটা রাখেন বলে মেধাবী পুত্রকে অর্থাভাবে উচ্চশিক্ষা না দিতে পারাটা এঁদের জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ট্রাজেডি। "ইত্তিহাদ" "আজাদ" (পশ্চিমবঙ্গের বেলায় বলবো, "আনন্দবাজার" "দেশ"—এটা এখানে জুড়ে দিচ্ছি—লেখক) মাঝে মাঝে এঁদের হস্তগত হয় বলে এঁরা জানেন যে যক্ষ্মারোগী স্বাস্থ্যনিবাসে বহু ক্ষেত্রে নিরাময় হয়, হয়তো তার সবিস্তর আশাবাদী বর্ণনাও কোনো রবিবাসরীয়তে তাঁরা পড়েছেন এবং তারপর অন্নাভাবে চিকিৎসাভাবে পুত্র অথবা কন্যা যখন যক্ষ্মারোগে চোখের সামনে তিলে তিলে মরে তখন তাঁরা কি করেন, কি ভাবেন, আমার জানা নেই। বাইবেলি ভাষায় বলতে ইচ্ছা যায়, 'ধন্য যাহারা অজ্ঞ, কারণ তাহাদের দুঃখ কম'। পাঠশালার গুরু-মশাইয়ের তুলনায় গাঁয়ের আর পাঁচজন যখন জানে না, স্বাস্থ্যনিবাস (সেনেটরিয়াম) সাপ না ব্যাঙ না কি, তখন তারা যক্ষ্মারোগকে কিস্মতের গর্দিশ ব'লে মেনে নিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারে। হতভাগা পণ্ডিত পারে না।'

কিন্তু প্রশ্ন, প্রবন্ধের গোড়াতেই জামাইষষ্ঠীর কথা তুলেছিলুম কেন?

শুনেছি, সঠিক বলতে পারবো না, গাঁয়ের পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করে বছরে এক-দিন শহরে এনে ঐ যে বিরাট বিরাট সভা করা হয়, ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলা হয় তখন জামাইষষ্ঠীর দিনের মতো তাদেরকে এক পেট খেতেও দেওয়া হয় না।

এবং তৎপর ৩৬৪ দিনের গোরস্তানের নীরবতা।

এই শেষ নয়। দাঁড়ান না। সুযোগ পেলে আরেকদিন আরেক হাত আমি নেবই নেব!

স্বামী বিবেকানন্দকে গুরু মেনে, সাক্ষী মেনে।

বিশ্বভারতী প্রাগ্

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বভারতীর জন্য এদেশে বিশ্ববিখ্যাত একাধিক পণ্ডিত আনিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতনামা ছিলেন অধ্যাপক মরিৎস্ ভিন্‌টার্‌নিৎস। এঁকে এদেশের অনেক সংস্কৃতপণ্ডিত চিনতে পারবেন। ১৯০৯ থেকে ১৯২২ জুড়ে জর্মন ভাষায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস'। এরই ইংরাজী অনুবাদ বেরয় এদেশে ১৯২৭ থেকে ১৯৩২। এছাড়া আছে, 'গৃহ্যসূত্র' 'প্রাচীন ভারতে বিবাহ অনুষ্ঠান' 'ভারতীয় ধর্মে রমণী' ইত্যাদি তাঁর প্রচুর গ্রন্থরাজি।

এ সব ক'টি বই-ই পণ্ডিতদের জন্য।

কিন্তু তিনি আমাদের মতো সাধারণজনদের একখানি পুস্তিকা লিখে গিয়েছেন —কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে। এ-পুস্তিকা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে, অন্য অবকাশে, আমি দু-একটি কথা বলেছি। এ-স্থলে পুনরায় বলি, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যত লেখা বেরিয়েছে তার ভিতরে আমি এটিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি। তার প্রধান কারণ অধ্যাপকের সমস্ত জীবন কাটে বেদ, উপনিষদ, সংস্কৃত কাব্য নিয়ে। এদেরই ভিতর দিয়ে যে ঐতিহ্য ভারতবর্ষে চলে আসছে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কতখানি সংযুক্ত, কতখানি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তাঁর ধর্মমত কিভাবে গড়ে উঠেছিল এ সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী বলার অধিকার ছিল অধ্যাপক ভিন্‌টার্‌নিৎসেরই। তিনি বাংলা ভাষা জানতেন।

বইখানি অতিশয় সরল জর্মন ভাষায় রচিত। ইংরাজী বা বাংলায় এর অনুবাদ হয়েছে বলে শুনিনি। হওয়া উচিত। বইখানির এক খণ্ড শান্তি-নিকেতনের রবীন্দ্র-ভবনে আছে।

চেকোস্লোভাকিয়ার জনসাধারণ অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিয় জর্মন এবং পরবর্তী যুগে খাস জর্মনির জর্মনগণ দ্বারা নিপীড়িত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের কৃষ্টি সভ্যতার অনেক-খানি জর্মন সভ্যতার কাছে ঋণী। তাছাড়া অনেক জর্মনও চেকোস্লোভাকিয়ায় বাস করতো।

অধ্যাপক ভিন্‌টার্‌নিৎস চেক নন। তিনি জন্মেছিলেন দক্ষিণ অস্ট্রিয়ায় ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি যখন টুকরো টুকরো হয়ে যায় তখন তাঁর জন্মভূমি পড়ে নবনির্মিত রাষ্ট্র চেকোস্লোভাকিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশে, অবশ্য অস্ট্রিয়াই (হিটলারেরও জন্ম এই অঞ্চলে এবং তাঁর ধমনীতে নাকি কিঞ্চিৎ চেক

রক্তও ছিল ; মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন, চেকদের যে তিনি সর্বনাশ করতে চেয়েছিলেন তার কারণ, ওই করে তিনি তাঁর চেক রক্ত অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন) কিন্তু, সেইটে আসল কথা নয়। তিনি ভালোবাসতেন প্রাগ শহরকে। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে সেখানে তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১৮/১৯ খ্রীস্টাব্দে চেকোস্লোভাকিয়া জন্মগ্রহণ করে মাতৃ-উদর থেকে যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তখন তিনি ইচ্ছে করলেই ভিয়েনা (এইমাত্র বলেছি, তাঁর মাতৃভূমি পড়েছিল অস্ট্রিয়ায় এবং অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা তখন প্রাগ ইত্যাদি শহর থেকে তার আপনজনকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে) বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যেতে পারতেন কিন্তু তিনি যাননি।

অধ্যাপক ভিন্‌টার্‌নিৎস ১৯০২ খ্রীস্টাব্দ থেকে বরাবর ১৯৩৭—তাঁর পরলোকগমন অবধি প্রাগেই থেকে যান।

তিনি ছিলেন জাতে, ধর্মে ইহুদি।[১] ইহুদিরা কোনো জায়গায় পত্তন জমালে সেখানে যে সব ইহুদি পরিবার আছে তাদের সঙ্গে মিলেমিশে এমনই এক হয়ে যায় যে পরে ভিন্ন জায়গায় উৎকৃষ্ট সুযোগ-সুবিধা পেলেও এদের ত্যাগ করাটা নিমকহারামী বলে মনে করে। ওই একই কারণে ইজরায়েলের শত ক্রন্দনরোদন সত্ত্বেও আমেরিকার লক্ষ লক্ষ ইহুদি পরিবার-সমাজ-দেশ ছেড়ে ওই দেশে যেতে চায় না।[২]

প্রাগ শহর বড় বিচিত্র শহর। সেখানে চেক আছে, জর্মন আছে, ইহুদি আছে, আরো কত জাত-বেজাতের লোক আছে—এবং বড় মিলেমিশে থাকে।

আর, পূর্বেই বলেছি, শহরটি বাস্তবিকই বড় সুন্দর।

মধ্যিখান দিয়ে মলডাও নদী চলে গিয়েছে। ঠিক যে-রকম ভিয়েনার মাঝখান দিয়ে ড্যানুয়ুব, প্যারিসের মধ্যিখান দিয়ে শেন, বুডাপেস্ট-এর মাঝখান দিয়ে ড্যানুয়ুব।

---

১ আমি শুনেছি তিনি যখন শান্তিনিকেতনে ভিজিটিং প্রফেসাররূপে ছিলেন তখন কলকাতার ইহুদি সম্প্রদায়ের নিমন্ত্রণে সেখানকার ইহুদি ধর্মমন্দিরে তাঁদের বাৎসরিক পূজায় উপস্থিত থাকেন।

২ অন্য কারণও হয়তো আছে। ১৯৩৫ সালে যখন আমি প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের কেন্দ্রভূমি তেল্‌-আভিভ শহরে যাই তখন এক ইহুদি আমাকে বলেন—মস্করা করে, না কি, বলা কঠিন—'কাকে কাকের মাংস খায় না। সব ইহুদি, সব কাক, এক জায়গায় জড়ো হলে তো উপবাসে মরতে হবে। দুনিয়ার কুল্লে জাত স্বজাতের সঙ্গে থাকতে চায়। আমরা ব্যত্যয়।'

অধ্যাপক ভিন্‌টার্‌নিৎসকে নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাবো।

হোটেলওলাকে শুধোলুম, হোথায় কোন্ ট্রামে বা বাস-এ যেতে হয়।

সেদিন কি একটা পরব ছিল। ভিড়ে ভিড়ে হুর্জ্জুম।

অতএব বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চয়ই বন্ধ। কিন্তু একটা স্কেলিটেন স্টাফ থাকবে তো! তারা নিশ্চয়ই অধ্যাপকের বাড়ির ঠিকানা দিতে পারবে।

ইতিমধ্যে এই হুজ্জুম না কাটা পর্যন্ত ট্রাম-বাস তো চলবে না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডান হাত দিয়ে ঘাড়ের বাঁ দিকটা চুলকোচ্ছি, এমন সময়ে এক অপরূপ সুন্দরী এসে আমাকে শুধোলে, 'আপনার কি কোনো সাহায্যের প্রয়োজন?'

এ শুধু প্রাগেই সম্ভবে!

অন্য দেশের মেয়েরা পুরুষকে মদত দেবার জন্য এরকম এগিয়ে আসে না।

ত্রিমূর্তি

প্রখ্যাত রুশ ঐতিহাসিক মিখাইল্ গুস্ একটি বড় খাঁটি তত্ত্বকথা বলেছেন: "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলীর কথা আজ আমরা স্মরণ করি এজন্য যে, যাতে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য আমরা তা থেকে শিক্ষা নিতে পারি। এরকম একটা শিক্ষা হল যে, আমাদের যুগে বিশ্ব আধিপত্য বিস্তারের যে কোনো রকম দাবি এক সামগ্রিক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। হিটলারের পদানুসরণ যারা করতে চায়, তাদের সকলের প্রতি এ হল এক গুরুতর হুঁশিয়ারি।"[১]

কমরেড পণ্ডিত গুসের কথার পিঠ-পিঠ আমি কোনো মন্তব্য করার দম্ভ ধরি নে। আমি অন্য এক মনস্তত্ত্ববিদের একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি মাত্র। দ্বিতীয়

১ ভারতে অবস্থিত বিদেশী একাধিক দূতাবাস একাধিক ভাষায় বিস্তর প্রোপাগাণ্ডা লেখন প্রকাশ করেন, আমার মতো স্বল্পজ্ঞাত লোকও খান-দশেক পায়। এগুলো পড়তে হলে অনেকখানি ধৈর্যের প্রয়োজন কারণ এদের অধিকাংশই বড় একঘেয়ে।...এরই মধ্যে হঠাৎ একখানি উত্তম চটি পুস্তিকা আমার হৃদয়মনকে বড়ই আলোড়িত করেছে। "সোভিয়েত সমীক্ষা" ৯. ৯. ৬৯ সংখ্যা, সম্পাদক কোলোকোলো, যুগ্ম-সম্পাদক প্রদ্যোৎ গুহ, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কলিকাতাস্থিত দূতস্থানে প্রকাশিত।

বিশ্বযুদ্ধের শেষে ন্যুরনবের্গ শহরে যখন গ্যোরিঙ, হেস্, কাইটেল প্রভৃতি জনা বিশেকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলছিল তখন প্রখ্যাত মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার কেলি দিনের পর দিন হাজতে এদের মনঃসমীক্ষণ করার পর দেশে ফিরে গিয়ে বলেন, "হিটলারের মতো ডিক্টেটর এবং নাৎসি পার্টির মতো পার্টি পৃথিবীর যে কোনো দেশে যে কোনো সময়ে পুনরায় দেখা দিতে পারে।" তাই আমার মনে ভয় লাগে, কমরেড গুসের "গুরুতর হুঁশিয়ারি" সত্ত্বেও এ-গর্দিশ পুনরায় যে-কোনো দিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। তবু যদি রুশ তভারিশ্ গুস্এর এ-হুঁশিয়ারি (অস্তরজ্নো!) মেনে নেন তবে ক্রমে ক্রমে চীন এমন কি মার্কিনও হয়তো রুশের সৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন—এ রকম একটা আশা করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইয়োরোপের পঞ্চপ্রধান ছিলেন, হিটলার স্তালিন মুস্সোলীনি রোজোভেল্ট্ এবং চার্চিল। এদের প্রথম তিনজন ছিলেন কট্টর ডিক্টেটর; বাকি দুজন গণতন্ত্রের প্রতিভূ। প্রথম তিনজন রণাঙ্গনে নামেননি বটে, কিন্তু তাবৎ যুদ্ধের নীতি পদ্ধতি ইত্যাদি (স্ট্রাটেজি; মাঝে-মধ্যে ট্যাক্টিক পর্যন্ত)[২] সম্বন্ধে তাঁরা পরিষ্কার, কঠিন নির্দেশ দিতেন রণাঙ্গনে অবতীর্ণ জঙ্গীলাটদের।

এই সংখ্যায় আছে দুটি সুলিখিত রচনা: (১) মিখাইল গুস কর্তৃক "ইতিহাসের শিক্ষা" এবং (২) সোভিয়েট ইউনিয়নের জনৈক মার্শাল কর্তৃক "সোভিয়েত সৈন্যের উদ্দেশে" (মার্শাল জুকভের গ্রন্থ "স্মৃতিচারণ ও প্রতিচিন্তার" সমালোচনা)। বলা বাহুল্য আমি যে সব সময় এঁদের সঙ্গে একমত হতে পেরেছি তা নয়। সান্ত্বনা নিই এই ভেবে যে দেশে-বিদেশের একাধিক কমরেডও হয়তো কোনো কোনো স্থলে ভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন। বাংলা অনুবাদ কে বা কারা করেছেন তাঁদের নাম নেই। অনুবাদ স্থলে স্থলে ঈষৎ আড়ষ্ট হলেও অতিশয় বিদগ্ধ উচ্চাঙ্গের।

২ মাত্র কয়েকদিন পূর্বে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড (৩ অক্টোবর '৬৯)-এ জেনারেল শ্রীযুক্ত চৌধুরীর "ডিফেন্স স্ট্রাটেজি" শিরোনামায় লিখিত একটি অতুলনীয় অনবদ্য রচনা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, এটির বাংলা অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। অনেকে হয়ত বলবেন, সাধারণজন, (সিভিলিয়ানরা) যতই সংগ্রামশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হবে ততই সে মারমুখো হয়ে পদে পদে লড়াই করতে চাইবে—জিঙ্গোইস্ট বনে যাবে। আমি ভিন্ন মত পোষণ করি। আমার বিশ্বাস রাজনীতি কোথায় সমরনীতিতে পরিণত হয়, এ জ্ঞান সাধারণজনের যতই বাড়বে ততই যুদ্ধ সম্বন্ধে তার দায়িত্ব-

রোজোভেল্ট চার্চিল সেরকম করেননি। এঁরা তাঁদের জঙ্গীলাটদের যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য এবং নীতি সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে বাদবাকী সব কিছু ওদেরই হাতে ছেড়ে দিতেন। তবে বলা হয়, রণাঙ্গনে যুদ্ধে লিপ্ত জঙ্গীলাটদের রুটিন কর্মে নাক গলাতেন (ইনটারফিয়ার করতেন) ডিক্টেটরদের ভিতর হিটলার প্রচুরতম ও গণতন্ত্রের প্রতিভূ চার্চিল অনেকখানি।

এই পঞ্চপ্রধানের যে তিন জঙ্গীলাট খ্যাতি অর্জন করলেন তাঁরা মার্কিন আইজেনহাওয়ার, ইংরেজ মণ্টগামেরি। ডিক্টেটররা সর্বদাই সর্বকৃতিত্ব সম্পূর্ণ পেতে চান বলে তাঁদের সৈন্যবাহিনীর কোনো সর্বময় কর্তা নিযুক্ত করতে চাইতেন না। তৎসত্ত্বেও ডিক্টেটরের অধীনে থেকেও যিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন তিনি রুশের জঙ্গীলাট মার্শাল গ্রিগরি জুকফ্।

এই তিন জঙ্গীলাট সম্মুখ সংগ্রামে নেমেছিলেন। এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার কিয়ৎকাল পরেই মার্কিন আইজেনহাওয়ার ও ইংরেজ মণ্টগামেরি যুদ্ধক্ষেত্রে আপন আপন অভিজ্ঞতা সবিস্তর বর্ণনা করে গ্রন্থ লেখেন। তৃতীয় বীর জুকফ্ এ তাবৎ কিছুই লেখেননি।[৩] (হয়তো স্তালিন চাননি যে জুকফ্ কোনো কিছু লেখেন যাতে করে তাঁর কৃতিত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। আমার মনে হয় সেখানে তিনি করেছিলেন ভুল। সেকথা পরে হবে।)

এই তিনজনই হিটলারের সৈন্যবাহিনীকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাজিত করেন। এবং একাধিক মার্কিন, ইংরেজ (ফরাসীও) যদ্যপি স্বীকার করতে রাজী হন না, আমার নিজের বিশ্বাস হিটলারকে পরাজিত করার প্রধান কৃতিত্ব রুশ জনগণ, স্তালিন ও মার্শাল জুকফের। সুতরাং গত বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গন-ইতিহাস—জুকফের বিবরণীহীন ইতিহাস—যেন হামলেটকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটক!

বোধও বাড়বে। ঐতিহাসিক মাত্রই জানেন, এ দুনিয়ায় কত শত বার সিভিলিয়ান পলিটিশিয়ানরা লড়াই করার জন্য যখন হন্যে হয়ে উঠেছে, তখন সেনাবাহিনীর জঙ্গীলাট জাঁদরেলরা (প্রফেশনাল সোলজাররা) তাদেরকে ঠেকিয়ে সংগ্রাম ঘোষণা করতে দেয়নি এবং পরে দেখা গেল ঐ করে জঙ্গীলাট জাঁদরেল দেশকে সর্বনাশ থেকে বাঁচিয়েছেন। অথচ সাধারণজন ভাবে, এরা কথায় কথায় লড়াই শুরু করে দিয়ে পদোন্নতি, মেডেলের জন্য মুখিয়ে আছেন।

৩ কয়েকজন জর্মন জেনরেল লিখেছেন বটে, কিন্তু এঁদের কেউই সব রণাঙ্গনের পূর্ণাধিকার কখনো পাননি। আর ইতালিয়ান "জাঁদরেল"দের সম্বন্ধে "নীরবতা হিরণ্ময়"।

স্তালিনের মৃত্যুর পর জুকফ অবশ্যই তাঁর গ্রন্থ লিখতে পারতেন। কিন্তু তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে স্তালিনের চরিত্রের উপর কলঙ্ক-লেপন। রুশের বড় কর্তারা তখন যে-প্রোপাগাণ্ডা আরম্ভ করলেন তার মূল বক্তব্য, "স্তালিন ছিল সংগ্রাম-নীতিতে একটা আস্ত বুদ্ধু। তার ভ্রান্ত নির্দেশের ফলেই লক্ষ লক্ষ রুশ সে যুদ্ধে মারা যায়। নইলে যুদ্ধ অনেক পূর্বেই খতম হয়ে যেত।"

যুদ্ধের পর স্তালিন যদিও জুকফকে নানাপ্রকার নিপীড়ন করেন তবু তিনি এই প্রোপাগাণ্ডাতে সায় দিতে পারেননি। স্তালিনকে তিনি তাঁর ন্যায্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করতে চাননি। তাই সে সময়েও তিনি কোনো কিছু লিখলেন না।

এরপর স্তালিন-স্মৃতিবিরোধীরাও গদিচ্যুত হলেন।

ধীরে ধীরে স্তালিন সম্বন্ধে রাশার জনসাধারণেরও ধারণা বদলাতে লাগলো।

তাই যুদ্ধের চব্বিশ বৎসর পর জুকফ তাঁর "স্মৃতিচারণ ও প্রতিচিন্তা" প্রকাশ করেছেন ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে। (এক নম্বর ফুটনোট দ্রষ্টব্য)

যুদ্ধশেষের এই সুদীর্ঘ চব্বিশ বৎসর পর আইজেনহাওয়ার, মণ্টগামেরি ও জুকফ এই ত্রিমূর্তির কল্যাণে এখন যুদ্ধক্ষেত্রে হাতেকলমে এঁরা কোন্ কোন্ রণনীতি রণকৌশল অবলম্বন করে অবশেষে জয়লাভ করলেন তার পূর্ণতর ইতিহাস লেখা সম্ভবপর হবে—কোনো যুদ্ধেরই পূর্ণতম ইতিহাস এ পর্যন্ত লেখা হয়নি, এ-বেলাও হবে না।

জুকফের মূল গ্রন্থ বা তার পূর্ণ অনুবাদ আমার হাতে কখনো পৌঁছবে না। ইতিমধ্যে রুশ মার্শাল ভাসিলেফস্কি ঐ গ্রন্থের যে পরিচিতি অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত সারাংশ দিয়েছেন একমাত্র তারই উপর নির্ভর করে—কথায় বলে অভাবে পড়লে স্বয়ং শয়তানও মাছি ধরে ধরে খায়—ঘরমুখো বাঙালীকে রণমুখো সেপাইয়ের অভিজ্ঞতা শোনাবার চেষ্টা দেব। একেবারে নিষ্ফল হব না। কারণ "রণমুখো" না হলেও বাঙালী যে ইতিমধ্যে বেশ "মারমুখো" হয়ে উঠেছে সে-তত্ত্ব কি কলকাতা কি মফঃস্বল সর্বত্রই স্বপ্রকাশ। শুনতে পাই এরপর তারা নাকি "রণমুখো" হয়ে লড়াই লড়ে এদেশে "প্রলেতারিয়া রাষ্ট্র" প্রবর্তন করবে। কিন্তু সেটা আ লা রুস্ (রুশ পদ্ধতিতে রান্না স্যালাড) না, আ লা শীন (চীন পদ্ধতিতে রান্না ফ্রাইড রাইস) হবে সেটি নিয়ে মতভেদ আছে।

রুশ রাজনীতি তথা চীন রাজনীতি সম্বন্ধে আমার কোনোই জ্ঞানগম্যি নেই।

কিন্তু বিস্তর রসানুভূতি আছে উভয়ের সরেস খাদ্যাদি সম্বন্ধে।

তাই ভালোবাসি রাশান স্যালাড, রাশান কাভিয়ার, রাশান বর্শস্যুপ, রাশান পানীয় (আমি কড়া ভোদকা সইতে পারি নে ; পছন্দ করি—এবং স্তালিনও ঐ খেতেন—উত্তম ওয়াইন, তা সে স্তালিনের জন্মভূমি জর্জিয়ারই হোক বা ককেশাসেরই হোক)।

সঙ্গে সঙ্গে পছন্দ করি চীনা ফ্রাইড রাইস (চীনা হোটেল-বয় বলে "ফ্রাইড লাইস" অর্থাৎ ভাজা উকুন), স্প্রিং চিকিন, ব্যাঙের ছাতার অমলেট ইত্যাদি।

কলকাতার রুশপন্থী কম্যুনিস্টরা একটা মারাত্মক ভুল করছেন। ওঁদের উচিত এ-শহরে অন্তত দু গণ্ডা রাশান রেস্তোরাঁ বসানো।

কারণ "Love does not go through heart, but through stomach"—"প্রেম হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় না, সঞ্চারিত হয় উদরে"—আপ্তবাক্যটি বলেছেন একটি ফরাসিনী সুরসিকা নাগরিক ॥

রহস্য লহরী

২২ সেপ্টেম্বরের 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' কাগজের "ক্যালকাটা নোটবুক"-এ দীনেন্দ্রকুমার রায় সম্বন্ধে ঐ "নোটবুকে"র বিদগ্ধ লেখকের করুণ-মধুর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অনুচ্ছেদটি পড়ে আমি সত্যই ঈষৎ লজ্জায় মাথা নিচু করলুম। "ঈষৎ" বললুম এই কারণে যে, আমিও স্থির করেছিলাম যে আগস্ট-সেপ্টেম্বর (দীনেন্দ্রকুমারের জন্ম ২০ আগস্ট ১৮৬৯) তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে আমিও তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আমার নগণ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবো। তারপর বার্ধক্যে যা হয়, বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের জন্মদিন যখন সে ভুলে যায় তখন তরুণ অকরুণ পাঠক তার ক্ষীণ স্মৃতিশক্তির দিকে কটাক্ষ করে তাকে বিড়ম্বিত করবেন না এই তার ক্ষীণতর আশা।

তরুণ পাঠক যদি ২২ সেপ্টেম্বরের ঐ হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডটি যোগাড় করতে পারেন তবে তিনি যেন সেই অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ করে তাঁর ঠাকুমা-দিদিমাকে শোনান। আমি কথা দিচ্ছি, তাঁদের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠবে, ক্ষণতরে তাঁরা আবার কিশোরী হয়ে যাবেন, দু-ফোঁটা চোখের জলও ফেলতে পারেন। কারণ পুনরায় বলছি, অনুচ্ছেদটি—এ লেখকের চৌদ্দ আনা লেখাতে যা হয় তাই হয়েছে—বড়ই সুন্দর হয়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি যোগ করছি, আমি লেখক হিসেবে ওঁকে দম্ভপূর্ণ সার্টিফিকেট দিচ্ছি নে—সামান্য পাঠক হিসেবে আমার দিলভরা তারীফ জানাচ্ছি। সে হক সকল পাঠকেরই আছে।

আর লেখক হিসেবে বললেই বা কী! কাগে কাগের মাংস খায় না, এ প্রবাদ জানি। কিন্তু কাগে কাগের মাংস প্রশংসা করে না একথা কখনো শুনিনি।

গুরুজনদের মুখে যা শুনেছি (বিশেষত মমাগ্রজের বাচনিক—কারণ তিনি কুষ্টিয়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন) সে-সব তত্ত্ব ক্ষীণ স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে বলেছি। ভুল হয়ে যেতে পারে।

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের জন্ম কুষ্টিয়ার কাছেই। সেই জায়গাতেই বা তার অতিশয় কাছে জন্ম নেন বা বিরাজ করেন, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র, সাহিত্যিক জলধর সেন (যাঁকে শরৎচন্দ্র বড়দা বলে সম্বোধন করে সম্মান দেখাতেন) এবং এ-যুগের প্রথম মুসলমান লেখক মুশর্‌রফ হোসেন। তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "বিষাদসিন্ধু" এখনো মুসলমানদের—এবং অনেক হিন্দুদের কাছে সুপরিচিত।

তদুপরি ছিলেন কাঙাল হরিনাথ। এঁর শ্যামাসঙ্গীত আমি শুনি বাল্যবয়সে, পদকীর্তন শোনার সময়ে—প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনার বহু পূর্বে। হায়, সে গানের কথাগুলো আমার ঠিক ঠিক মনে নেই। তার বক্তব্য ছিল, "কাঙাল (অর্থাৎ হরিনাথ) যদি ছেলের মত ছেলে হত তবে তুমি জানতে। কাঙাল জোর করে কোল কেড়ে নিত, তুমি পারতে না মা ছাড়তে।" গ্রামোফোন কোম্পানির সে রেকর্ড বোধ হয় এখন আর নেই।

এবং এই অঞ্চলেরই মহাত্মা—লালন ফকীর। তাঁর পরিচয় দেবার মতো প্রগল্‌ভতা আমার নেই।

ঐ সময়ে গোপনে গোপনে কেমন যেন একটা দ্বন্দ্ব ছিল নদীয়া জেলায় এবং কলকাতাতে। নদীয়ার লোক তো বলতোই, এখনো বলে, তাদের বাংলা ভাষা সবচেয়ে শুদ্ধ ও মধুর। ওদিকে রাঢ়ের ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্কিম প্রভৃতি তখন কলকাতাকে কেন্দ্র করে, তাঁরা যে-ভাষা জানেন, বলেন, সেই ভাষাকেই বাংলা সাহিত্যের বাহনরূপে প্রবর্তিত করেছেন। তাই এখনো নদীয়া তথা পূর্ববঙ্গের বহু গুণী খেদ করেন যে, মীর মুশর্‌রফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু' যখন প্রকাশিত হল, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বঙ্গদর্শনে পুস্তকটির পরিপূর্ণ সম্মান দেখাননি।

ঐ সময়ে, অর্থাৎ গত শতাব্দীর শেষের দিকে, এ শতাব্দীর গোড়াতে দীনেন্দ্রকুমার তাঁর সামান্য কয়েকটি পল্লীচিত্র ("নোটবুকে"র ভাষায় he wrote sketches of village life in a reminiscent mood…. Generally he starts with a festival and goes on to describe its impact

on the different sections of the village population. His pleasant vignettes—পল্লীচিত্রের জন্য এই "ভিন্নেৎ" শব্দটি একদম mot juste—born out of acute personal observation, present a microscopic picture of life.) "ভারতী" পত্রিকাকে পাঠান। তখন সম্পাদিকা ছিলেন খুব সম্ভব সরলা দেবী কিংবা তাঁর মাতা স্বর্ণকুমারী দেবী। এই ভিন্নেৎগুলো সম্পাদিকা সানন্দে লুফে নেন এবং বহু বহু গুণী এগুলোর সর্বোত্তম প্রশংসা করেন। এ যেন হঠাৎ এক ঝলক গাঁয়ের মিঠে মেঠো হাওয়া নগরে ঢুকে শহরের নিরুদ্ধ-নিশ্বাস বাতাসকে মোলায়েম করে দিল। এই চিত্রগুলো ঐ সময়ে পুস্তকাকারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

এর পরের ইতিহাস আমি সঠিক কালানুক্রমিক বলতে পারবো না। যতদূর মনে আছে তাই নিবেদন করি।

ঐ সময়ে শ্রীঅরবিন্দ বরোদার চাকরি নিয়ে বাঙলাদেশে লিখে পাঠান, তাঁকে বাংলা শেখাবার জন্য যেন একজন উপযুক্ত শিক্ষক পাঠানো হয়। শেষ পর্যন্ত যে দীনেন্দ্রকুমারকেই পাঠানো হয় এর থেকেই আজকের দিনের পাঠক বুঝে যাবেন, সেদিন বাংলা সাহিত্যে তাঁর আসন কতখানি উচ্চ ছিল। এবং হয়তো যাঁরা তাঁকে মনোনীত করেন তাঁরা চেয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দের উচ্চারণটিও যেন খাঁটি ন'দের মিষ্টি উচ্চারণ হয়।[১]

কিন্তু দীনেন্দ্রকুমার বরোদায় খুব বেশীকাল থাকেননি।

১ "বরোদাতে বাঙালী" নাম দিয়ে একটি গ্রন্থ লেখা যায়। ঔপন্যাসিক, বেদজ্ঞ সুপণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীঅরবিন্দ থেকে আরম্ভ করে সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের নাতি সুপ্রকাশ গাঙ্গুলী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুত্র বিনয়তোষ ভট্টাচার্য এবং আরো উত্তম উত্তম বাঙালীকে বরোদার মহারাজা সয়াজী রাও কর্ম দেন।...এস্থলে একটি ব্যক্তিগত নিবেদন আমার আছে। আমার প্রতি দরদী পাঠক ভিন্ন অন্যেরা যেন বাকিটুকু না পড়েন। ১৯৩৪-এ আমি যখন কাইরোতে শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি তখন ঐ সয়াজী রাও আমাকে 'পাকড়্‌কে' বরোদায় নিয়ে এসে একটি অত্যুত্তম কর্ম দেন। মহারাজা একদিন আমাকে রমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীঅরবিন্দের অনেক কাহিনী বলার পর আমি দুঃখ করে বলেছিলুম—"Your Highness! I am your latest and worst choice." মহারাজ তখন গুন গুন করে সেকালের একটি song-hit গান "you are not my first love, but you could be my last love!...এর

কারণ ইতিমধ্যে বরোদার মহারাজা, শ্রীঅরবিন্দ, অন্যতম বরোদাপ্রধান খাসে রাও যাদব এবং (বোধ হয়) দেশপাণ্ডের মধ্যে কি-সব গুপ্ত মন্ত্রণা হয়, সে-সম্বন্ধে আমি সঠিক জানি নে। ফলে শ্রীঅরবিন্দ বরোদা ত্যাগ করে কলকাতায় এসে বিপ্লবী আন্দোলন আরম্ভ করেন। কিন্তু এ ভিন্ন কাহিনী।

দীনেন্দ্রকুমার বাঙলায় ফিরে এলেন।

এর পর তাঁর জীবন-কাহিনী আমার কাছে আরো অস্পষ্ট।

তবে আমার মনে সন্দেহ হয়, এ-কালেও যখন বাঙালী সাহিত্যস্রষ্টা শুধুমাত্র সাহিত্য সৃষ্টি করে দগ্ধ-উদর-জ্বালা শান্ত করতে পারেনা[২], তা হলে ভদ্রলোক বোধহয় খুবই অর্থকষ্টে ছিলেন। তখন ১৯১৫, এ-রকম সময় দীনেন্দ্রকুমার গত্যন্তর না দেখে ডিটেক্টিভ স্টোরি ইংরেজী থেকে অনুবাদ করতে আরম্ভ করলেন। তারই নাম "রহস্য লহরী"। সঠিক অনুবাদ বললে বোধ হয় একটু ভুল হয়। যেখানেই সুযোগ পেতেন, সেখানেই কিঞ্চিৎ বঙ্গোপযোগী বাঙালী ধরনধারণ ঢুকিয়ে দিতেন।

এই "রহস্য লহরী" এ-দেশে তখন যে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল, তার বয়ান আজ দেবে কে? সাধুবাদ সহ বলি, "নোটবুক" তার যথাসাধ্য চেষ্টা দিয়েছেন।

কিছুদিন পরেই মহারাজ গত হন। এ-বাবদে শেষ কথা, ঐ সর্বগুণে গুণী মহারাজ ভারতের নানা জাতের ভিতর সব চেয়ে ভালোবাসতেন বাঙালীকে।

২ নবীনরা হয়তো জানেন না এ বিষয়ে ইতিপূর্বে কি কি মনোবেদনা বাংলা এবং সংস্কৃতে প্রকাশিত হয়েছিল। অর্থকষ্টে যখন মাইকেল মারা যান তখন হেমচন্দ্র লেখেন :

"হায় মা ভারতী,
চিরদিন তোর কেন এ-কুখ্যাতি ভবে,
যে-জন সেবিবে ও-রাঙা চরণ সেই সে দরিদ্র হবে।"

এবং বিদ্যাসাগর মশাই সংস্কৃতে বলেছেন,

"অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কিং কিং ন ক্রিয়তে ময়া।
বানরীমিব বাগ্‌দেবীং নর্তয়ামি গৃহে গৃহে॥"

অধমের তার অক্ষম অনুবাদ :

"ওরে পোড়া পেট, কত না কিছুই করি আমি তোর তরে।
[illegible] মত সরস্বতীরে নাচাচ্ছি ঘরে ঘরে।"

কিন্তু এই উন্মাদনার প্রধান কারণ কি ?

আমি দৃঢ়প্রত্যয়, সত্যনিশ্চয় যে-ভাষাতে দীনেন্দ্রকুমার তাঁর "রহস্য লহরী" লিখলেন, ও-রকম ঝরঝরে, ছিমছাম সরল স্বচ্ছ শীতের নদীস্রোতের মতো শান্ত প্রবহমাণ বাংলা ভাষা এই দেড়শো বছরের ভিতর অতি অল্প লোকই লিখেছেন।

তা না হলে বলুন তো, বারো বছরের বাঙাল বালক তার সম্পূর্ণ অজানা অচেনা বিলাতের গল্প পড়ে অর্ধযামিনী অবধি বিনিদ্র অবস্থায় শিহরিত, কম্পিত, রোমাঞ্চিত হয়ে রইল কেন ?

ভাষা, ভাষা, ভাষা ! ভাষা বহু তিলিসমাৎ, বহু মিরাকল, বহু অলৌকিক কর্ম করতে পারে।

দ্বন্দ্ব-পুরাণ

মহাপুরুষদের জীবনধারণ প্রণালী, তাঁদের কর্মকীর্তি এমন কি দৈবেসৈবে তাঁদের খামখেয়ালীর আচরণ দেখে তাঁদের শিষ্য-সহচর তথা সমকালীন সাধারণ জন আপন আপন গতানুগতিক ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না, কী করে একটা মানুষের পক্ষে এ-রকম কীর্তিকলাপ আদৌ সম্ভবে। এ-প্রহেলিকার সমাধান না করতে পেরে শেষটায় বলে, "ওঃ ! বুঝেছি। এঁরা অলৌকিক ঐশী শক্তি ধারণ করেন।" তখন আরম্ভ হয় এঁদের সম্বন্ধে কিংবদন্তী বা লেজেণ্ড নির্মাণ। কোন্ পীর ধুলিমুষ্টি স্বর্ণমুষ্টিতে পরিবর্তিত করতে পারতেন, কোন্ গুরু চেলাদের আবদার-খাঁইয়ে অতিষ্ঠ হয়ে রাগের বশে এক কুষ্ঠরোগীকে পদাঘাত করা মাত্রই, তন্মুহূর্তেই, সে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে যায়—হরি হে তুমিই সত্য।

ফার্সী ভাষাতে তাই প্রবাদ আছে, "পীরেরা ওড়েন না, তাদের চেলারা ওঁদের ওড়ান" "পীরহা নমীপরন্দ, শাগির্দান উন্‌হারা মী পরানন্দ্"—অর্থাৎ "আমাদের পীর উড়তে পারেন। তবে কিনা সে অলৌকিক দৃশ্য সবাই দেখতে পায় না।"

অদ্যাপিও সেই লীলা খেলে গোরা রায়।
মধ্যে মধ্যে ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

এস্থলে লক্ষণীয় আপনার আমার মতো পাঁচু ভূতোকে নিয়ে কেউ ক্ষুদ্রস্য ক্ষুদ্র লেজেণ্ডও নির্মাণ করে না। করবার কোন প্রয়োজন বোধ করে না।

তাই আশ্চর্য হলুম একটা ব্যাপার দেখে। কিছু দিন পূর্বে এই গৌড়ভূমির এক মহাপুরুষকে নিয়ে জনৈক সুপণ্ডিত গভীর গবেষণামূলক একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্য—থিসিস—ঐ মহাপুরুষকে নিয়ে যে-সব অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে সেগুলো নিছক রূপকথা, সোজা বাংলায় গাঁজা-গুল; আসলে উনি ছিলেন অত্যন্ত সাদামাটা সাধারণ জনের একজন।

এ থিসিস ধোপে কতখানি টেকে কি না টেঁকে সেটা আমি বলতে পারব না —আমার পশ্চাদ্দেশে লোহার শিকলি দিয়ে টাইম বম বেঁধে দিলেও প্রাণ বাঁচাবার জন্যও না (যদ্যপি পয়গম্বর সাহেব বলেছেন, "জান্ বাঁচানো ফর্জ।" নামাজ রোজার মতোই ফর্জ—অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য কর্ম, না করলে সখ্‌ৎ গুনাহ বা কঠিন পাপ হয়)!

তাই আমি ঐ লেখককে (তিনি যে সত্যই সুপণ্ডিত সে-বিষয়ে আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই, কারণ আমি তাঁর একাধিক গভীর গবেষণাময় সুচিন্তিত পুস্তক পড়েছি) মাত্র একটি প্রশ্ন শুধোতে চাই। সেই আলোচ্য মহাপুরুষ যদি আসলে অতই সাদামাটা সাধারণ জন হন তবে তাঁর সম্বন্ধে অত লেজেণ্ড, অত অলৌকিক কাহিনী নির্মাণ করবার দায় পড়েছিল কোন্ গণ্ডমূর্খ-মণ্ডলীর উপর! লেজেণ্ডগুলো সত্য না মিথ্যা সে বিচারের গুরুভার বিধাতা এ হীনপ্রাণের স্কন্ধে রাখেননি। আমি শুধু জানি, সাধারণ জনকে দিয়ে মানুষ অলৌকিক কর্ম করায় না; যদি বা অতি, অতিশয় দৈবেসৈবে, দু-একজনকে নিয়ে লেজেণ্ড তৈরি করে, তবে প্রথম পরশুরামের "বিরিঞ্চি" স্মরণে এনে তারপর কাশীরামদাসের শরণ নিতে হয়;

কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে।
কতক্ষণ থাকে শিলা শূন্যেতে মারিলে॥

তাবৎ লেজেণ্ডই যে নৈসর্গিক নিয়মভঙ্গকারী অলৌকিক কর্ম, মিরাকল হবে, এমন কোনো খুদার কসম বা কালীর কিরে নেই। সাদামাটা, হার্মলেস লেজেণ্ড আজকের দিনেও নির্মিত হয়। পাঠক হয়তো প্রত্যয় যাবেন না, কিন্তু হয়, হয় এই বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ সপ্তম দশকে—অন্তত নব লেজেণ্ডের ফাউণ্ডেশন স্টোন পোঁতা হয়।

ঐ তো সেদিন পত্রান্তরে পড়লুম, জনৈক লেখক লিখেছেন, "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ চা পান করতেন না।" আমি তো বিস্ময়ে স্তম্ভিত। আমি তাঁকে বহু বহুবার চা খেতে দেখেছি, এ-দেশী চা, যাকে সচরাচর ব্ল্যাক টী বলা হয়, উত্তম গোত্রবর্ণের অর্থাৎ, উজ্জ্বল সোনালি রঙের চা হলে তারিফ করতে শুনেছি।

একবার চীন দেশ থেকে গ্রীন টী (যদিও গরম জলে ঢালার পর রঙ এর হয়ে যায় ফিকে লেমন ইয়োলো) আসে গুরুদেবের কাছে। সে-চায়ের শেষ পাতাটুকু পর্যন্ত তাঁকে সদ্ব্যবহার করতে দেখেছি।

তা হলে এ-লেজেণ্ডের মূল উৎস কোথায়? এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চা-বাগানের কুলীদের উপর বর্বর ইংরেজ ম্যানেজার (আই. সি. এস.-দের তাচ্ছিল্য-ব্যঞ্জক ভাষায় বক্স-ওয়ালা—কারণ তারা চায়ের বাক্স নিয়ে কারবার করে) কী পৈশাচিক অত্যাচার করত সে-সংবাদ বাঙালী জনসাধারণের কানে এসে পৌঁছয়। তখন চায়ের নামকরণ হয় "কুলীর রক্ত" এবং অনেকেই এই "কুলীর রক্ত" চায়ের পাতা বাড়ি থেকে চিরতরে নির্বাসনে পাঠান, কাউকে চা পান করতে দেখলে ঘৃণামিশ্রিত উচ্চকণ্ঠে সর্বজনসমক্ষে বলতেন, "লজ্জা করে না মশাই, কুলীর রক্ত পান করতে!" রবীন্দ্রনাথ এ-আন্দোলনের খবর রাখতেন; বিশেষ করে যখন স্মরণে আনি, যে-স্বর্গত শশীন্দ্র সিংহ তাঁর সাপ্তাহিক ইংরেজী খবরের কাগজে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে অকুতোভয়ে চা-বাগানের "টমকাকার কুটির" লিখে লিখে বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সুপরিচিত ছিলেন। অতএব আজ যিনি এক লেজেণ্ডের প্রথম চিড়িয়া ওড়ালেন যে রবীন্দ্রনাথ চা খেতেন না, তিনি হয়তো ধরে নিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় তখন আর পাঁচ জন সহানুভূতিশীল বাঙালীর মতো চা বয়কট করেছিলেন এবং জীবনে আর কখনো চা খাননি। বয়কট হয়তো তিনি করেছিলেন—কিন্তু নিশ্চয়ই সেটা কিয়ৎকাল (এবং স্মরণে রাখা উচিত সে-যুগে চায়ের এত ছড়াছড়ি ছিল না—বোধ হয় মোটামুটি গত শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ স্টীমার প্যাসেনজারদের মুফতে চা পান করান হত), কারণ পূর্বেই নিবেদন করেছি ১৯২১ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত আমি তাঁকে বহুবার চা পান করতে দেখেছি।[১] তবে চায়ের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনো আসক্তি ছিল না।

১ ১৯২১-২২ রবীন্দ্রনাথ বাস করতেন দেহলী বাড়ির উপরের তলায়, নিচের তলায় সস্ত্রীক দিনেন্দ্রনাথ। তার সঙ্গে একেবারে লাগোয়া নূতন বাড়ি হসটেল ঘর। সেখানে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ, বিনোদবিহারী ইত্যাদিরা বাস করতেন। শেষ কামরায় স্বর্গত অনাথনাথ বসু এবং আপনাদের স্নেহধন্য এ-অধম। সর্বশেষ কামরা রবীন্দ্রনাথের পেন্‌ট্রি রূপে ব্যবহৃত হত। অর্থাৎ প্রতিমা দেবী, মীরা দেবী, কমলাদি (দিনুবাবুর স্ত্রী) রবীন্দ্রনাথের যে দৈনন্দিন আহার্য পানীয় পাঠাতেন সেগুলো প্রথম এ পেন্‌ট্রিতে জড়ো করে (চাকরের নাম ছিল সাধু;

প্রায়ই চা ছেড়ে দিয়ে কিছুকালের জন্য অন্য কোনো পানীয়তে চলে যেতেন। গরমের দিন বিকালে চা বড় খেতেন না—বদলে খেতেন বেলের, তরমুজের শরবত (নিম পাতার "শরবতের" কথা সকলেই জানেন)। সকাল বিকেল ছাড়া অবেলায় টিপিকাল বাঙালীর মতো তাঁকে আমি কখনো বেমক্কা চা খেতে দেখিনি। এবং

বর্ণনাটা ক্ষান্ত করি, অনেকগুলো কাজ বাকি,
আছে চায়ের নেমন্তন্ন, এখনো তার সাজ বাকি।[২]

স্মরণে আনুন। অবশ্য চায়ের নেমন্তন্নে চা খেতেই হবে এমন আইন হিটলারও করেননি—যদ্যপি তিনি দিনে রাতে এণ্ডলেস (অসংখ্য, অন্তহীন) কাপ্‌স্ অব টী পান করতেন—অতিশয় হাল্কা, মিন-দুধ।

বস্তুত কী চা, কী মাছ-মাংস কোনো জিনিসেই রবীন্দ্রনাথের আসক্তি ছিল না—যা-সামান্য ছিল সেটা মিষ্ট মিষ্টান্নের প্রতি। টোস্টের উপর প্রায় কোয়ার্টার ইঞ্চি মধুর পলস্তরা পেতে জীবনের প্রায় শেষ বৎসর অবধি তিনি পরম পরিতৃপ্তি সহকারে ঐ বস্তু খেয়েছেন।[৩] মিষ্টান্ন তো বটেই—বিশেষ করে নলেন

বনমালী পরে আসে) রবীন্দ্রনাথকে সার্ভ করা হত। ঐ ঘর পেরুবার সময় সব সময়ই চোখে পড়ত আহারাদি কি কি। আমার জানার কথা।

২ এই কবিতাটি নিয়ে আমার মনে ধন্দ আছে। এ দু-লাইন থেকে বোঝা যায় কবি ব্যস্ত, চায়ের নেমন্তন্নের জন্য এখনো সাজ করা হয়নি ; অথচ তার ঠিক ষোল লাইন পরেই বলেছেন, বিশেষ কারণে তিনি যে বৃদ্ধ নন সেটা তিনি বুঝতে পেরেছেন। (তখন তাঁর বয়েস ৬২) এবং বলেছেন,

"এই ভাবনায় সেই হতে মন এমনিতরো খুশ আছে,
ডাকছে ভোলা "খাবার এল" আমার কি তার হুঁশ আছে ?"

এখন প্রশ্ন, কবি এই বললেন তিনি চায়ের নিমন্ত্রণে যাচ্ছেন এবং তার পরই নাকি ভোলা খাবার নিয়ে এসেছে! তবে কি লখনৌওলাদের মতো বাড়ি থেকে উত্তম রূপে খেয়ে নিয়ে দাওয়াতে যেতেন যাতে করে সেখানে খানদানী কায়দায় কম-সে-কম খাবেন। কিংবা ফরেসডাঙার এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মতো—যেখানে নিমন্ত্রিত মাত্র ভোজ্যবস্তুর প্রতি নজর বুলিয়ে জলস্পর্শ না করে বাড়ি ফিরে যান। বিশ্বাস না হয়, অবধূত রচিত "নীলকণ্ঠ হিমালয়ে" মল্লিখিত মুখবন্ধে এ-বাবদে সবিস্তর বর্ণনা পড়ুন।

৩ সিলেট ও খাসিয়া সীমান্তে এক রকম অতুলনীয় মধু পাওয়া যায়।

গুড়ের সন্দেশ। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের মতো ভোজনবিলাসী আমি কমই দেখেছি। এবং প্রকৃত ভোজনবিলাসীর মতো পদের আধিক্য ও বৈচিত্র্য থাকলেও পরিমাণে খেতেন কম—তাঁর সেই পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও তার সঙ্গে মানানসই দোহারা দেহ দিয়ে—প্রয়োজনের চেয়ে ঢের কম। ফরাসিতে বলতে গেলে তিনি ছিলেন গুর্‌মে (ভোজনবিলাসী, খুশখানেওলা); গুরমাঁ (পেটুক) বদনাম তাঁকে পওহারী বাবা (এই সাধুজী নাকি শুধুমাত্র পও=বাতাস খেয়ে প্রাণধারণ করতেন) পর্যন্ত দেবেন না।

লেজেণ্ড সম্বন্ধে এইবারে শেষ কথাটি বলে মূল বক্তব্যে যাব।

লেজেণ্ডের একটা বিশেষ সুস্পষ্ট লক্ষণ এই; দার্শনিক বৈজ্ঞানিক গুণীজ্ঞানীরা যতই কট্টর কট্টর অকাট্য যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করুন না কেন যে বিশেষ কোনো একটা লেজেণ্ড সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, তবুও তারা সে লেজেণ্ড আঁকড়ে ধরে থাকে। এখনো বিস্তর লোক বিশ্বাস করে পৃথিবীটা চেপ্টা; শ্মশানে ভূতপ্রেত, গোরস্তানে মামদো আছে; ইংরেজ বিশ্বাস করে সে পৃথিবীর—সরি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বোৎকৃষ্ট নেশন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ-স্থলে আরো বলে নিই; মহাপুরুষদের যারা বিরুদ্ধাচরণ করে তারাও তাদের সম্বন্ধে বিপরীত লেজেণ্ড তৈরি করে। যেমন খ্রীস্টবৈরী ইহুদিরা বলেছে প্রভু খ্রীস্ট ছিলেন মাতাল, তিনি শুঁড়িদের (পাব্‌লিকান্‌স) ইতরজনের সাহচর্যে উল্লাস বোধ করতেন, এবং নর্তকী বেশ্যাদের সেবা গ্রহণ করতে কুণ্ঠা বোধ করতেন না (মেরি ম্যাগডলীন)।

বাঙলাদেশে একটা দল আছে। সেটা কভু বা বর্ষার প্লাবনে দুর্বার গতিতে বন্যা জাগিয়ে জনপদভূমির সর্বনাশ করে যায় আর কভু বা, বৎসরের পর বৎসর ফল্গুধারা পারা অন্তঃসলিলা থাকে। এ-দল পর পর রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র এবং সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধাচরণ করে উপস্থিত ফল্গু-পন্থানুযায়ী অন্তঃসলিলা। মোকা পেলে বুজ্‌বুজ্‌ করে বেরুতে চায়। এদের জন্ম নেবার

এ-মধু মৌমাছিরা সুদ্ধমাত্র কমলালেবুর ফুল থেকে সংগ্রহ করে (সিলেটি কমলালেবুও পৃথিবীতে সবচেয়ে মিষ্ট এবং সবচেয়ে সুগন্ধী, যদিও জাফার নেবুর চেয়ে সাইজে ছোট)। ছুটিতে দেশে যাবার সময় গুরুদেব আমাকে বললেন, "পারিস যদি আমার জন্য কিছু কমলামধু নিয়ে আসিস।" আমি খুশি হয়ে বললুম, "নিশ্চয়ই আনব কিন্তু কাশ্মীরের পদ্মমধু কি এর চেয়ে আরো ভালো নয়?" গুরুদেব স্মিত হাস্য করলেন। ভাবখানা "কিসে আর কিসে।"

কারণ সম্বন্ধে এ-স্থলে আলোচনা করব না।

রবীন্দ্রনাথ চা খেতেন না, এটা নিরীহ, হার্মলেস লেজেণ্ড। কিন্তু এই দল প্রচার করে যে রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ক অক্ষরও জানতেন না, তিনি ছিলেন সুরকানা, মামুলী রাগরাগিণী তিনি ঘুলিয়ে ফেলতেন এবং বিলিতি গাওনা-বাজনার প্রতি তাঁর ছিল অন্ধ ভক্তি। তাই গোড়ার দিকে তাঁর গানের কথাতে সুর দিতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং পরবর্তীকালে তাবৎ রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর দিয়েছেন দিনেন্দ্রনাথ !!! এস্থলে পুনরায় বলতে হয়, হরি হে তুমিই সত্য।

দ্বিতীয় লেজেণ্ড : আমাদের জাতীয় সঙ্গীত জনগণমন রবিঠাকুর রচনা করেন রাজা পঞ্চম জর্জের উদ্দেশে। এদের "যুক্তি" এই প্রকার :—

(১) জনগণমন-অধিনায়ক ভারতভাগ্যবিধাতা একজন রাজা (কারণ রাজাই তো জনগণের ভাগ্যনির্ণয় করেন)।

(২) পঞ্চম জর্জ রাজা।

অতএব জনগণমন-অধিনায়ক ভারতভাগ্যবিধাতা স্বয়ং পঞ্চম জর্জ।

কুয়োট এরাট ডেমনস্ট্রাণ্ডুম (Q. E. D.)। আমেন আমেন। সুশীল পাঠক, অবধারিত হোন, যে দল এ-লেজেণ্ডের বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিল তারা সেটা সত্য জানা সত্ত্বেও সজ্ঞানেই করেছিল। এরা জ্ঞানপাপী। এবং এরা বিলক্ষণ অবগত ছিল, সমসাময়িক বিশ্বাসভাজন শ্রদ্ধেয় গুণীজ্ঞানীরা এই কিম্ভূত-কিমাকার থিয়োরীকে দলিলদস্তাবেজ, প্রমাণপত্র, সাক্ষীসাবুদ, যুক্তিতর্ক দ্বারা নস্যাৎ ধুলিসাৎ তো করবেনই, তদুপরি করলারি বা ফাউ হিসেবে আরো প্রমাণ করে দেবেন, এই বিষবৃক্ষ-রোপণকারীরা হস্তীমূর্খ রামপণ্টক (কণ্টক থেকে কাঁটা, পণ্টক থেকে পাঁঠা—জ্ঞানবৃদ্ধ রসসিদ্ধ সুনীতি উবাচ)। কিন্তু এ-দলের চর্ম কাজিরাঙার গণ্ডারবিনিন্দিত বর্মসম স্থূল। তাই আমার যখন একদা চর্মরোগ হয় তখন আমার সখা ও শিষ্য চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞ ডঃ—লি আমাকে সলা দেন, "আপনি পরনিন্দা আরম্ভ করুন। চামড়াটি গণ্ডারের মতো হয়ে যাবে। গণ্ডারের চর্মরোগ হয় না।"

তাই যখন অধুনা খবরের কাগজে দেখতে পাই শ্রীযুক্তা ইন্দিরাকে "জনগণমন অধিনায়িকা" রূপে উল্লেখ করা হয়েছে তখন আমি রীতিমতো শঙ্কিত হই। আজ ইন্দিরা, কাল জ্যোতিবাবু, পরশু আপনার মতো নিরীহ পাঠককে হয়তো "জনগণমন-অধিনায়ক" বলে বসবে, অর্থাৎ পরমেশ্বরের পর্যায়ে তুলে দেবে। কিন্তু এ পয়েণ্টটি থাক।

কিন্তু প্রশ্ন এই জাতীয় সঙ্গীতটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে পঞ্চম জর্জকে

শোনালে কি হিজ ম্যাজেস্টি আপ্যায়িত হতেন? মোটেই না।

আইস পাঠক! গানটি বিশ্লেষণ করহ।

"ভারতভাগ্যবিধাতা" যে তিনি, সে-কথা শুনে রাজা নিশ্চয়ই মনে মনে শুকনো হাসি হাসতেন। তিনি বিলক্ষণ জানেন, তিনি তাঁর মাতৃভূমি ইংলণ্ডেরও ভাগ্যবিধাতা নন। তাঁর আপন ভাগ্যই নির্ণয় করেন তাঁর (হাঁ "তাঁরই"—মস্করা আর কারে কয়?) প্রধানমন্ত্রী পার্লামেণ্টের চূড়োয় বসে। তিনি অবশ্য তখন জানতেন না যে তাঁর যুবরাজ রাজা হবার পর যখন এক এড়িকে (লগ্নচ্ছিন্ন = ডিভোর্সড্ = তালাকপ্রাপ্তা) বিয়ে করতে চাইবেন তখন তাঁর (!) প্রধান-মন্ত্রী তাঁকে কানটি ধরে দেশ থেকে বের করে দেবেন। এবং তাঁর নাতনী যখন রানী হবেন তখন তাঁর স্বামী রানা ("রাজা"র স্ত্রীলিঙ্গ "রানী" কিন্তু রানীর স্বামী যদি রাজা না হন তবে "রানী" শব্দ থেকে পুংলিঙ্গ নির্মাণ করে "রানা" শব্দ ব্যবহার করা হয়। তাই রানী এলিজাবেথের স্বামী রাজা নন, তিনি রানা) ডূক অব্ এড্‌ন্‌বরা ভিখিরির টোল-খাওয়া মাখমের টিন হাতে করে পার্লামেণ্ট বাড়ির সামনে এসে হাঁকবেন "দুটো চাল পাই মা", আর গেরস্ত গিন্নী প্রধানমন্ত্রী বাড়ির দরজা এক বুড়ো আঙুল ফাঁক করে (অবশ্য অষ্টরম্ভা দেখিয়ে) বিরক্ত কণ্ঠে বলবেন "ঘরে চাল বাড়ন্ত"। প্রধানমন্ত্রী মুসলমান হলে বলবেন, "ফিরি মাঙো"—অর্থাৎ "অন্য বাড়ি যাও"।

এর পর যখন অনুবাদক চারণ বলবে, "হুজুরকে 'জনগণ ঐক্যবিধায়ক' বলা হয়েছে" তখন তিনি বহুযুগসঞ্চিত রাজগৌরব প্রসাদাৎ তাঁর ঠা ঠা করে অট্টহাস্য করার অদমনীয় উচ্ছৃঙ্খলাচরণ দমন করে মনে মনে মৃদু হাস্য করে বলবেন, "বটো! আমাদের নীতি আমাদের ধর্ম 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' 'দ্বিধা করে সিধা রাখো'। আর এ প্রাইজ ইডিয়ট বলে কি? আমি নাকি 'ঐক্যবিধায়ক'। হোলি জীজস!"

এর পর চারণ কাঁচুমাচু হয়ে বলবে, "হুজুর মধ্যিখানের প্যারা খুঁজে পাচ্ছি নে। দুসরা কপি এখ্‌খনি এল বলে। ইতিমধ্যে শেষ প্যারাটি অনুবাদ করি।" রাজা আন্‌মনে শুনতে শুনতে হঠাৎ খাড়া হয়ে বসবেন। "কি বললে? 'পূর্ব গিরিতে রবি উদিল'? রবি তো রবীনডর ন্যাট ট্যাগোর—ন্যাট নেটিভ?"

চারণ সভয়ে বলবে, "এজ্ঞে হ্যাঁ।" কারণ একথা তো বিলকুল খাঁটি যে রবি কবি পূর্বদেশে, প্রাচ্যে জন্মেছেন, "পূর্ব উদয়গিরিভালে" তিনি রাজটীকা।

রাজা জর্জ তো রেগে টঙ। "কী, কী-আস্পদ্দা। কাউকে যদি পূর্বদেশে, ভারতে উদয় হতেই হয় তবে সে হব আমি।" তারপর গরগর করে বলবেন,

ভাইসরয়টাকে বলো গে, পুবের মণিপুর পাহাড়ের উপর সিংহাসন যেন পাতা হয়। আমি যেখানে উদিত হব। আশ্চর্য, এত বড় একটা ফন্‌কৃশন ডংকিগুলো বেবাক ভুলে গেছে। চীফ অব্‌ প্রটোকল মাস্টার অব্‌ সেরিমনিজকে এক্ষুনি ডিসমিস করো।"

ইতিমধ্যে মিসিং দুই প্যারা এসে গেছে। অনুবাদক তো ভয়ে কাঁপছে। অনুবাদ করে কি প্রকারে? শেষটায় "ভয়ে না নির্ভয়ে" ইত্যাদি ফরমূলা কেতাদুরস্ত করে বললে, "হুজুর, কবি বলছে, আপনি 'চিরসারথি', আপনি শাঁখ বাজাচ্ছেন (হে চিরসারথি তব···শঙ্খধ্বনি বাজে)।"

রাজা তো রেগে টঙ। ক্রোধে জিঘাংসায় বেপথুমান হয়ে হুঙ্কারিলেন, "কি এত বড় বেআদবী, বেইজ্জতী বেত্তমিজী! এ তো 'লায়েসা মাজেস্টাস' (laesa majestas)। হিজ ম্যাজেস্টিকে অপমান। অবশ্য নেটিভটা লাতিন লায়েসা মাজেস্টাস জানে না। কিন্তু এটাও কি জানে না, এর চেয়ে শতাংশের একাংশ অপরাধ করেও, কোনো কোনো স্থলে না করেও ব্রিটিশ রাজে লক্ষ লক্ষ লোক ফাঁসি গেছে।

অসহ্য অসহ্য। আমাকে বলছে সারথি। মোটর ড্রাইভার। আমার বাবা এডওয়ার্ড যখন ইহজগতের স্বপ্নাতীত অকল্পনীয় সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বপ্রথম ডেমলার গাড়ি নিয়ে তাঁর কাজিন কাইজারকে বার্লিনে দেখতে যান তখন কাইজার বিস্ময়ে অভিভূত ছোট বাচ্চাটার মতো নাগাড়ে সাড়ে তেরো ঘণ্টা গাড়িটার পালিশের উপর হাত বুলিয়েছিলেন। বাবা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন একটা গাড়ির জন্য বারোটা ড্রাইভার। আর আজ আমাকে—রাজাকে—বলছে আমি মোটর ড্রাইভার, শোফার। আমার আস্তাবলে ক'শ ড্রাইভার আছে তার খবর আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি পর্যন্ত জানে না। আর আমি নাকি—ওঃ!"

তারপর বিড়বিড় করে যেন আপন মনে বললেন, "আর বলছে কি, আমি নাকি 'চিরসারথি'। আমি চিরকাল ড্রাইভার থাকব। পার্মেনেণ্ট পোস্ট। আমার প্রমোশন তক হবে না। আমি এমনই নিষ্কর্মা চোতা রদ্দী ড্রাইভার! হোলি মৈরি—হ্যা নেটিভরা মাইরি বলে বটে—আমি যদি এ লোকটাকে আমার রোলসের চাকায় বেঁধে—না, আগে তো বলডুইনের এজাজৎ চাই। ড্যাম বলডুইন! আর আমি শাঁখ বাজাই। পণ্টনের বিউগলে ফুঁ দি। ছি ছি।"

চারণ আবার "সভয় নির্ভয়" করে নিয়ে বললে, "হুজুরকে বলেছে স্নেহময়ী মাতা।"

এবারে রাজা লম্ফ দিয়ে সিংহাসন ত্যাগ করলেন। অবশ্য অন্য কারণও ছিল।

সিংহাসনে কোচের মতো স্প্রিং থাকে না। থাকে পাতলা একখানি কুশন। কংগ্রেসের সম্মানিত সিডিশাস মেম্বার ভারতীয় ছারপোকার পাল সেখানে বাসা বেঁধে হুজুরের কোমলাঙ্গে তখন ব্যাংকুয়েট পরবের মাঝখানে।

কম্পিত কণ্ঠে রাজা বললেন, "আমি এখ্খুনি ফিরে যাচ্ছি দেশে। সব সইতে পারি। কিন্তু আমি মা, আমি স্ত্রীলোক! বুঝেছি লোকটার ইনসলেন্স। বলতে চায়, কূটনৈতিক কারণে, রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য—raison d' etat—আমি মাগী হওয়া সত্ত্বেও মেকডনাল্ড বলডুইন আমাকে মদ্দার বেশে সাজিয়েছে। আমি আসলে মেনি, ওরা আমাকে পরিয়েছে হুলোর ছদ্মবেশ।"

কাঁপতে কাঁপতে রাজা কার্পেটে বসে পড়লেন। প্রায় কান্নার সুরে বললেন, "সেদিন শিকারের সময় এক নেটিভ শিকারী বলেছিল, এক আসামী নাকি দারোগাকে বলেছিল, 'হুজুর, আমার মা বাপ।' দারোগা নাকি বলেছিল, 'বাপ হতে পারি, কিন্তু আমাকে মা বলছিস কেন? আমি কি স্যারি (শাড়ি) পরি।' শিকারী আমাকে বলেছিল, 'হুজুর, আসামী যদি শুধু বাপ বলত তবে দারোগা ছেড়ে দিত। মা বলেছিল বলে সেশনে সোপর্দ করলে। ফাঁসি হল।'... দারোগাকে মেনি বলাতে সামান্য দারোগা ফাঁসিকাঠে চড়ালে। আর আমি ইংলণ্ডেশ্বর, অ্যাণ্ড অব্ দি ডমিনিয়নস বিওণ্ড দী সীজ, ডিফেণ্ডার অব ফেথ, এম্পারার অব ইণ্ডিয়া। আর এই শেষেরটা কী কাষ্ঠরসিকতা! আমি কি বকিংহম পেলেসে নিভৃতে পেটিকোট পরি, ঠোঁটে নখে আলতা মাখি। ওঃ! অসহ্য অসহ্য!"

তারপর রাজা কোর্ট-গেজেট প্রকাশ করলেন, ঐ নেটিভ টেগোরের গান আমার উদ্দেশে লেখা নয়।

তথাপি এ-লেখেও মরে না।

কিন্তু এ-কাহিনী এখানে বন্ধ করি। হালে বঙ্কিমচন্দ্রের রামায়ণ-সম্বন্ধে একটি রচনা হিন্দীতে অনুবাদিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে দিল্লীর আদালতে ডবল ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু হয়েছে। বঙ্কিমবাবু নাকি বিস্তর ছুটোছুটি করেও একটা বটতলার চার-আনী মোক্তারও পাচ্ছেন না—অথচ একদা তিনি স্বয়ং দুঁদে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাবৎ ছাতুখোর খোট্টা চুরনবেচনে-ওলাকে বংশধর লালাজী ব্যারিস্টার দারুণ চটিতং।...পাঠক, তিষ্ঠ ক্ষণকাল—টেলিফোন বাজছে।

হ্যাঁ, যা ভেবেছিলুম তাই। এক হিন্দীপ্রেমী সোল্লাসে জানালেন, আজ সকালে বঙ্কিমবাবুর ফাঁসি হয়ে গিয়েছে।

আমার এ-লেখন হিন্দীতে অনূদিত হলে আমার নির্ঘাত ছ' মাসের ফাঁসি।

মে মাসের ২৯ তারিখ ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে মহাত্মা গাঁধী শান্তিনিকেতন আশ্রমে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। বলা বাহুল্য এই তাঁদের প্রথম পরিচয় নয়। গাঁধীজী যখন দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করে ভারতে আসেন তখন তিনি প্রায় চার মাস শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় পরিচালনা করেন। ঐ সময়ে ৬ই মার্চ ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ হয়।[৩] এর পর ১৯২১-এর পূর্বে উভয়ের আর কোনো মোলাকাত হয়েছিল কি না জানি নে তবে ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১-এ গাঁধীজী জোড়াসাঁকোর "বিচিত্রা" ভবনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রায় চার ঘণ্টা ধরে আলাপ-আলোচনা করেন। গাঁধীজীর উদ্দেশ্য ছিল সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ যে বিরুদ্ধমত প্রকাশ করেছিলেন সেটা বন্ধ করা এবং কবি যেন সত্যাগ্রহকে অন্তত তাঁর আশীর্বাদটুকু জানান।[৪] বলা বাহুল্য, গাঁধীজী অকৃতকার্য হন। এই আলোচনা হয়েছিল রুদ্ধদ্বারে। কবি ও গাঁধীজী ছাড়া এ-আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন মাত্র আর একজন—দীনবন্ধু এনড্রুজ। বস্তুত তিনিই এ-দুজনকে একত্র করেছিলেন; তাঁর আশা ছিল,

---

৩ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে (পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৩৫৫) লিখেছেন: "দুই মহাপুরুষের প্রথম সাক্ষাৎকার হইল (৬ই মার্চ ১৯১৮)।" পৃঃ ৩৭৭। এটা বোধহয় ছাপার ভুল। হবে ১৯১৫।

৪ রবীন্দ্রনাথের সর্বাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ (একুশ বছরের বড়) কিন্তু গোড়ার থেকেই সত্যাগ্রহ আন্দোলন সমর্থন করে গাঁধীকে পত্র লেখেন। গান্ধীজীর ভক্তেরা, আশা করি অপরাধ নেবেন না, যদি বলি, হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থরাজির সঙ্গে গান্ধীজীর খুব নিবিড় পরিচয় ছিল না। ওদিকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বশাস্ত্র তথা সর্বদর্শন বিশারদ। তাই গান্ধীজী খুব একটা বল পেয়েছিলেন যে তাঁর আন্দোলন শাস্ত্রসম্মত এবং হিন্দু-ঐতিহ্যপন্থী। দ্বিজেন্দ্রনাথকে গাঁধী ডাকতেন "বড়দাদা" বলে। ১৬ই জুলাই (অর্থাৎ গাঁধী ভেটের প্রায় মাস দেড়েক পূর্বে ১৯২১-এ) রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোমেরিকা ভ্রমণের পর আশ্রমে ঢুকেই দ্বিজেন্দ্রনাথকে প্রণাম করতে যান। কুশলাদি জিজ্ঞেস করার পর তিনি একাধিকবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করবার চেষ্টা দেন—কারণ তিনি জানতেন, রবীন্দ্রনাথ এ-আন্দোলনের বিরোধী কিন্তু অতিশয় নম্রতার সঙ্গে এবং দৃঢ়ভাবে রবীন্দ্রনাথ সে আলোচনার গোড়াপত্তন করতে দিলেন না। অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলুম।

সামনাসামনি আলাপচারি হলে হয়তো দুজনের মতের মিল হয়ে যেতে পারে। ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য তিনি এই দুই প্রখ্যাত ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন।[৫]

এ মোলাকাৎ সম্বন্ধে একটি হাফ-লেজেণ্ড আছে। তবে সেটা অবনীন্দ্রনাথকে দিয়ে। তিনি বললেন, "এত বড় জব্বর একটা পেল্লাই ব্যাপার এলাহি কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে আর আমরা দেখতে পাব না, শুনতে পাব না? আচ্ছা দেখি।" অর্থাৎ শব্দার্থেই তিনি দেখে নিলেন কীহোল দিয়ে, কি ভাবে দুই জাঁদরেল ও তাঁদের মধ্যিখানের সেতুবন্ধ এনড্রুজ আসন গ্রহণ করেছেন। বিচিত্রা বাড়িতে বিলিতি কেতায় কীহোল আছে কি না জানি নে; তবে হয়তো তিনজনের আসন নেওয়ার পর বাইরের থেকে দরজায় খিল দেওয়ার পূর্বে তিনি এক ঝলক দেখে নিয়েছিলেন। আপন বাড়িতে ফিরেই তিনি এঁকে ফেললেন একখানা বেশ বড় সাইজের গ্রুপ ছবি। মুখোমুখি হয়ে বসেছেন দু'জনা দু-প্রান্তে। তাঁদের বসার ধরন টিপিকাল—ঠিক এই ধরনেই তাঁরা আকছারই বসতেন। আর গাঁধীর পিছনে একপাশে বসেছেন এনড্রুজ। এর তিন মাসপরে বাৎসরিক কলাপ্রদর্শনীতে অবনবাবু ছবিখানি এক্সিবিট করলেন। দাম দেখে তো বিশ্বজনের চক্ষুস্থির। সেই আমলে—আবার বলছি সেই আমলে—পনেরো হাজার টাকা! কে একজন বললে, "দামটা বড্ড বেশী হয়ে গেল না?" অবনবাবু শেয়ানা বেনের মতো হেসে বললেন, "বা রে! আমি তো সস্তায় ছাড়ছি। এদের প্রত্যেকের দাম পাঁচ পাঁচ হাজারের চেয়ে ঢের ঢের বেশী নয় কি?" এ-ছবি যখন কেউ কিনলো না, তখন অবনবাবু বললেন, "এটা কাকে দেওয়া যায়? রবিকাকা হেথায়, গাঁধী হোথায়। তবে কিনা এনড্রুজের নিবাস বলতে যদি কিছু থাকে তবে সেটা তো রবিকাকার ছায়াতেই। দু'জন যখন শান্তিনিকেতনে তখন এটা যাক ওখানকার কলাভবনে।" এ-ছবি অনেকেই নিশ্চয়ই কলাভবনে দেখেছেন—তবে দীর্ঘ ৪৮ বৎসর পর রঙ বড্ড ফিকে হয়ে গিয়েছে।

---

৫ এ-আলোচনার বিবরণী কখনো প্রকাশিত হয়নি। তবে এনড্রুজ সাহেব আশ্রমে ফিরে ঘরোয়া বৈঠকে আমাদের একটা প্রতিবেদন দেন কিন্তু আমাদের নোট নিতে মানা করেন। আমি ঘরে ফিরে যতখানি মনে ছিল গরমাগরম লিখে ফেলি। সে পাণ্ডুলিপি কাবুলে বিদ্রোহের সময় হারিয়ে যায়। তাতে করে বিশেষ ক্ষতি হয়নি। এ-আলোচনার সারাংশ না হোক বিষয়বস্তু পাঠক প্রাগুক্ত পুস্তকের ৮২-৮৩ পৃষ্ঠায় পাবেন।

১৯২৫-এর ২৯ মে গাঁধীজী আবার রবীন্দ্রনাথকে স্বপক্ষে টানবার জন্য শান্তিনিকেতন আসেন এবং দু'দিন সেখানে থাকেন। ইতিমধ্যে "শান্তিনিকেতনেই ৯০ খানা চরকা ও তকলি চলিতেছে—বিধুশেখর, নন্দলাল প্রভৃতি সকলেই চরকা কাটিতেছেন।" আবহাওয়া তাহলে অনুকূল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন: "তিনি (গাঁধী) শান্তিনিকেতনে আসিতেন, রবীন্দ্রনাথের সহিত চরকা সম্বন্ধে আলোচনাই প্রধান উদ্দেশ্য। গাঁধীজী জানিতেন কবি তাঁহার সহিত চরকা সম্বন্ধে একমত নহেন, তবুও বোধহয় বিশ্বাস ছিল যে নিজের ঐকান্তিকতার বলে তিনি কবিকে তাঁহার পথে আনিতে পারিবেন। দুই দিন তাঁহাদের দীর্ঘ আলোচনা চলে, বলা বাহুল্য কেহ কাহাকেও নিজ মতে আনিতে পারেন নাই। তৎসত্ত্বেও এখানে বলিয়া রাখি, উভয়ের প্রীতি পূর্ববৎই অক্ষুন্ন রহিল।"*

২৯-এ মে গ্রীষ্মাবকাশের মাঝখানে পড়ে। আমি তখন দেশে, সিলেটে।

ফিরে এসে কি আলোচনা হয়েছিল সে-সম্বন্ধে নানা মুনির নানা কীর্তন শুনলুম। কিন্তু সে-সব রসকষহীন আলোচনা নিয়ে লেজেণ্ডের গোড়াপত্তন হয় না। আমি বলতে চাই অন্য জিনিস।

ফিরে এসেই গেলুম আমার মুরুব্বী গাঙ্গুলীমশাইকে আদাব-তসলিমাৎ জানাতে। শুনেছি, ইনি রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় বৌদির (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রীর) আত্মীয় ছিলেন। গাঙ্গুলীমশাই ছিলেন শান্তিনিকেতন গেস্ট হাউসের ম্যানেজার। সে আমলে শান্তিনিকেতন মন্দিরের কাছে যে পাকা দোতলা বাড়ি (এইটেই আশ্রমে মহর্ষি-নির্মিত প্রথম বাড়ি এবং বর্তমান বোধহয় বিশ্বভারতীর দর্শন বিভাগের আস্তানা) সেইটেই ছিল গেস্ট হাউস। তারই নিচের তলায় একটি ছোট্ট কামরায় মিলিটারী বুট তথা হাফ মিলিটারী য়ুনিফর্ম পরিহিত, হীতলাল প্রভৃতি "দাসবংশ" কর্তৃক সমাদৃত হয়ে সাতিশয় ফিটফাট রূপে বিরাজ করতেন মহাপ্রতাপান্বিত মহারাজ প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায় বা "গাঙ্গুলীমশাই"। বিরাজ করতেন বললে বড্ডই অল্পোক্তি করা হয়—রামায়ণী ভাষায় বলতে গেলে শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় গাঙ্গুলীমশাই ম্যানেজার পদে "প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহতভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্বিশেষে" অতিথিশালায় পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ তথা অষ্টকুলাচল সপ্তসমুদ্র থেকে রবিমন্ত্রিত "দেশ দেশ নন্দিত করি" ভেরীর আহ্বানে সমাগত হিন্দু বৌদ্ধ জৈন পারসিক মুসলমান খ্রীস্টানী অতিথি

* প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড: পৃঃ ১৬৪

সজ্জনকে যেন "প্রজাপালন করিতেন"। তাঁর দাপট তাঁর রওয়াবের সামনে দাঁড়াতে পারেন এমন লোক আশ্রমে সে-আমলে ছিলেন কমই। লোকে বলে, তিনি যখন গেস্ট হাউসে বসে "হীতলাল!" বলে হুঙ্কার ছাড়তেন তখন এক ফার্লঙ দূরের রতন কুটিতে প্রফেসর মার্ক কলিন্সের ছোকরা চাকর পঞ্চা আঁৎকে উঠত—তার পিলে চমকে উঠে এপেনডিক্সের সঙ্গে স্ট্র্যাঙ্গুলেটেড হয়ে যেত।

গাঙ্গুলীমশাই ম্যাট্রিক অবধি উঠতে পেরেছিলেন কি না সেকথা বলতে পারি না। তাই পাঠক পেত্যয় যাবেন না যে এঁর আবাল্য অতিশয় অন্তরঙ্গ সখা ছিলেন বহুভাষাবিদ্ হরিনাথ দে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবীর পুত্র ব্যঙ্গসুনিপুণ অভূতপূর্ব সাহিত্য-সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সম্পাদক-মণ্ডলীর মুকুটমণি পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেক ইনটেলেকচুয়েল বা বুদ্ধিজীবী।

গাঙ্গুলীমশাইয়ের মতো সর্বাঙ্গসুন্দর, নিটোল পারফেক্ট "রাকোঁতর" স্টোরি-টেলার মজলিসতোড কেচ্ছাবলনেওলা এ-পৃথিবীতে আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি। রাকোঁতর হিসাবে ওসকার ওয়াইল্ড ছিলেন এ-কলার সম্রাট। সে-বাবদে যা-কিছু লেখা হয়েছে বিশেষ করে গীতাঞ্জলির ফরাসী অনুবাদক, ১৯৪৮-এ নোবেল প্রাইজ বিভূষিত আঁদ্রে জিদ (এই হালে, ২২শে নভেম্বর ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী মহাড়ম্বরে ইয়োরোপে উদ্‌যাপিত হল, কিন্তু হায়, মৌলিক রচনার যে প্রখ্যাত লেখক আপন সৃজনকর্ম স্থগিত রেখে গীতাঞ্জলির অনুবাদ করলেন—তিনি অন্য কোনো মহান লেখকের রচনা অনুবাদ করে তাঁকে এভাবে সম্মানিত করেছেন বলে শুনিনি—যে আঁদ্রে জিদ ইয়োরোপে অজ্ঞাত বাঙালী নামক জাতের শ্রেষ্ঠ ধন ইয়োরোপের বিদগ্ধতম জাতের প্যারিস সমাজে প্রচার করলেন, তাঁকে এই উপলক্ষে কোনো বাঙালী স্মরণ করেছে বলে কানে আসেনি) তাঁর অন্তরঙ্গ সখা ওয়াইল্ড সম্বন্ধে যা লিখেছেন সে-সব পড়ার পর রাকোঁতর হিসেবে গাঙ্গুলীমশাইয়ের প্রতি আমার ভক্তি বেড়েছে বই কমেনি। বস্তুত আ লা রীডারস্ ডাইজেস্ট্ বলতে হলে ইনিই আমার মোস্ট্ অনফরগেটবল্ ক্যারেকটার। এঁর কাছ থেকে আমি সবচেয়ে বেশী বাংলা ভাষার চালু ইডিয়ম, প্রবাদ এবং কলকাতার কক্‌নি শব্দ শিখেছি। আমার মতো তাঁর অন্য এক সমঝদার—সাপুড়ে সম্মোহিত সর্পের মতো মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতা—ছিলেন 'আনন্দবাজার' গ্রুপের শ্রীযুত কানাইলাল সরকার। আমার কথা পেত্যয় না গেলে ওঁয়াকে শুধোবেন।

বলা বাহুল্য, বিলকুল বেফায়দা বেকার, আমি গাঙ্গুলীমশাইয়ের সে-বয়ানের বন্যা, টৈটম্বুর রসের ছিঁটেফোঁটাও এই হিম-শীতল, রসকষহীন সিসের ছাপা হরফে

প্রকাশ করতে পারব না। একমাত্র লোক যিনি পারতেন তিনি আমার রসের দুনিয়া-আখেরের পীরমুর্শীদ "পরশুরাম" রাজশেখর বসু।

আমি তাঁকে মায়ের দেওয়া এক বোতল অত্যুৎকৃষ্ট সিলেটি আনারসের মোরব্বা দিলে পর তিনি আমার ললাটে চুম্বন দিলেন, মস্তকাঘ্রাণ করলেন। বেলা তখন একটা। তিনি আহারাদি সমাপন করে খাটে শুয়ে আলবোলায় ফুরুৎ ফুরুৎ মন্দমধুর টান দিচ্ছিলেন। আমাকে আদর করার পর ফের লম্বা হয়ে শুয়ে নলটি তুলে নিলেন। চোখ দুটি বন্ধ করে, কবির ভাষায় "আকাশ পানে হানি যুগল ভুরু" বললেন, "গেরো হে গেরো। এমন গেরো আমার পঞ্চাশ বচ্ছরের আয়ুতে কখনো আসেনি। পুলিসের সঙ্গে মারপিট করে অসহ্য মশার কামড়ের মধ্যিখানে তেরাত্তির হাজতে কাটিয়েছি, চন্নগর মাহেশের ফেস্তাতে যাবার পথে মাঝগঙ্গায় নৌকোডুবিতে হাবুডুবু খেয়েছি - জলে পড়লে আমি আবার নিরেট পাথরবাটি—থিয়েডারের এক হাফ-গেরস্ত মাগী আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল" ইত্যাকার বহুবিধ যাবতীয় ফাঁড়া-মুশকিল গেরো-গদীশ বয়ান করার পর বললেন, "ওসব লস্তি হে লস্তি। ওঃ! এ-গেরো যা গেল।"

আমি বললুম, "এ-আশ্রম তো শান্তির নিকেতন। এখানে আবার গেরো?"

গাঙ্গুলীমশাই নল ফেলে দিয়ে যুক্তকরে, মহর্ষির উদ্দেশে প্রণাম করে বললেন, "তিনি পিরিলী[৬] বংশের প্রদীপ, আর সেই পিরিলী বংশের এ-অধম পিলসুজ-দেলকোর ছায়া। পাপ মুখে কি করে বলি, এখানেও মাঝে মাঝে অশান্তির উপদ্রব দেখা দেয়। কিন্তু বাবা, আমা হেন সামান্য প্রাণীকে বলির পাঁঠার মতো বেছে নেওয়া কেন?"

আমি হুঁকোর নলটা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বললুম, "হুঁকোটা ল্যান, খুলে কন।"

গাঙ্গুলীমশাই বললেন, "গাঁধী হে, গাঁধী! তোমরা মাকে মহাৎমা ঠহাৎমা বলো।" তারপর ফের যুক্তকরে বললেন, "তারা ব্রহ্মময়ী মা, বজ্রযোগিনী মা,

৬ পিরিলী খেতাবটি নাকি মুসলমান বাদশা ঠাকুর গোষ্ঠী এবং তাঁদের আত্মীয়দের দেন। কথাটা "পীর" এবং "আলী" শব্দের অশুদ্ধ সন্ধি। আমি যখন শান্তিনিকেতনে ছিলুম তখন গুরুদেবের এক পিরিলী আত্মীয় ছোকরা আমাকে বলে, "ভাই তোর নাম মুজতবা আলী, আর আমার বংশের নাম পীর আলী। দুজনারই পদবী আলী। আর ঐ সিলেটী রাকেশ বলছিল তুই নাকি পীর বংশের ছেলেও বটিস। তবেই ত্যাখ, তুই আমার কাছের কুটুম।"

রক্ষে দাও মা এসব মহাৎমাদের লেক লজর থাকে।"

আমি তাজ্জব মেনে বললুম, "গান্ধীজী তো অতিশয় নিরীহ, নিরুপদ্রবী, ভালো মানুষ। তিনি আপনার গেরো হতে যাবেন কেন?"

গাঙ্গুলীমশাই বললেন, "ঐ বুঝলেই তো পাগল সারে। তোমাকে তা হলে ভালো করে বুঝিয়ে বলি।

জানো তো বাপু, দেশ-বিদেশের হোমরা-চোমরা এখানে এলে আকছারই ওঠেন উত্তরায়ণে; বাস করেন হয় গুর্দেবের (প্রাচীন-পন্থীরা "গুরুদেব" না বলে বলতেন "গুর্দেব") পাশে, নয় রথীবাবুর ওখানে। আমি তো নিশ্চিন্দি মনে দিব্য গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর উত্তরায়ণের নায়েব গোমস্তা চাকরবাকরদের দেখলেই মনে মনে ফিক্‌ফিক্ করে হেসে ভাবি, সব ব্যাটা বলির পাঁঠা। গাঁধী মাছ মাংস খান না বটে, কিন্তু মা কালীকেই কি তাঁর উদ্দেশে বলি দেওয়া পাঁঠা কেউ কখনো খেতে দেখেছ? গাঁধী খাবেন না, সত্যি কথা, কিন্তু তাই বলে চাকর নফরের বলি নির্ঘাত। তখন কেমন জানি, কিংবা জানি নে, একটা অহেতুক অজানা শঙ্কা আমার ব্রেন-বক্সের ব্রহ্মতালুতে ঢুকে সর্বাঙ্গ শিরশিরিয়ে পায়ের চেটো দিয়ে বেরিয়ে গেল, তোমারই মুখে শোনা,

পাঁঠার বলি দেখে পাঁঠী নাচে।

(পাঁঠা বলে) 'ও পাঁঠী তোমার লাগি বীবীর শীরনী আছে॥'

আমি তখন পাঁঠীর মতো আপন মনে ফিক্‌ফিক্ হাসছি, বিলকুল খেয়াল নেই যে পীর বীবীর দর্গাতে পাঁঠা বলি হয় না, বলি হয় পাঁঠী, শীরনী চড়াবার জন্যে। সাদামাটা রাঢ়ীতে বলে, 'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে, সবার একদিন আছে শেষে।'[৭] উত্তমরূপে প্রবাদটি হৃদয়ঙ্গম করার পূর্বেই ছ্যাখ-তো-না-ছ্যাখ সঙ্গে সঙ্গে এত্তেলাফরমান উপস্থিত। আমি কি তখন আর জানতুম যে এই ফরমান-পুষ্পগুচ্ছের ভিতর লুকিয়ে আছে গোখরোর বাচ্চা। আমি তো নাপাতে নাপাতে উত্তরায়ণ পৌঁছলুম। পকেট থেকে ডাস্টার বের করে বুটজোড়া পরিষ্কার করে খোলা দরজায় হাফ মিলিটারি মোলায়েম টোকা দিয়ে গুর্দেবের ঘরে ঢুকলুম।

গুর্দেব লেখা বন্ধ করে আমার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বললেন, 'বসো

৭ শ্রদ্ধেয় সুশীলকুমার দে'র অত্যুত্তম "বাংলা প্রবাদ" গ্রন্থে আছে (নং ৪৯৯৯) "পাঁঠায় কাটে, পাঁঠী নাচে, পাঁঠা বলে মগধেশ্বরী আছে।" সুশীলবাবু এর টীকা লিখতে গিয়ে জে. ডি. এনডারসেন-এর উপর বরাত দিয়ে বলছেন, মগধেশ্বরীর পুজোতে চট্টগ্রামে পাঁঠী বলি দেওয়া হয়।

গাঙ্গুলী।' আমি সিভিলিয়ান কায়দায় তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মিলিটারি কেতায় দাঁড়িয়েই রইলুম।

গুর্দেব অত্যন্ত প্রসন্ন বদনে আমাকে বললেন, 'যবে থেকে তুমি এখানে এসেছ, বুঝলে গাঙ্গুলী, আমার ঘাড় থেকে অন্তত একটা বোঝা নেমে গেছে, ভিজটারদের আরাম-আয়েসের জন্যে আমাকে আর মাথা ঘামাতে হয় না। তুমি একাই একশ; সব সামলাতে পারো। আমি তো মনস্থির করে বসেছিলুম গান্ধীজীকে এই উত্তরায়ণেই গেস্ট-রুমে তুলব। কিন্তু আজ এইমাত্র তাঁর কাছ থেকে চিঠি পেলুম, তিনি দুটি দিন এখানে নির্জনে শান্তিতে বাস করতে চান। তুমি তো জানো, আমার এখানে উদয়াস্ত ভিজটারের ভিড় লেগেই আছে। তাদের আনাগোনা, বারান্দায় চলাফেরা, আঙ্গিনায় হাঁকডাক গাঁধীর শান্তিভঙ্গ করবে। তাই স্থির করেছি, তোমার গেস্ট হাউসের দোতলাই তাঁর জন্য সবচেয়ে ভালো আবাস হবে; আর তুমি যা-তা ভিজটারকে ঠেকাতে যে কতখানি ওস্তাদ সে আমি ভালো করেই জানি। তোমার হাতে গাঁধীকে সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলুম।' "

গাঙ্গুলীমশাই সেই ফাঁসির হুকুমের স্মরণে একটুখানি কেঁপে উঠে কাঁপা গলায় বললেন, "বাব্বা! আমি আমার ঐ গেস্ট হাউস আস্তাবলে গাঁধীকে রাখব কি করে? একটা শোবার ঘরে আছে দু'খানা স্প্রিঙের খাট। সে এমনই স্প্রিং যে তার উপর রামমূর্তি সার্কাসের ফেদার-ওয়েট বামনাবতার শুলেও সে-স্প্রিং ক্যাঁচর-ম্যাঁচর করে মেঝের সঙ্গে মিশে যায়। আমাদের পাড়াতে এক পাদ্রী সাহেব লেকচার দিতে গিয়ে বলেন, "প্রফেট নোআর আমলে সর্ববিশ্বব্যাপী এক বিরাট বন্যা হয়। ঈশ্বরসৃষ্ট তাবৎ প্রাণী, বৃক্ষ, তৈজস-পত্রাদি যাতে সেই বন্যায় লোপ না পায় তাই তিনি নোআকে আদেশ দেন, তিনি যেন একটা বিরাট নৌকা গড়ে তার উপর প্রত্যেক প্রাণী, প্রত্যেক বীজ, এমন কি প্রত্যেক আসবাবপত্র জোড়ায় জোড়ায় হেপাজতীর সঙ্গে তুলে রাখেন।" গুরুগম্ভীর হয়ে এতখানি শাস্ত্রালোচনা করার পর গাঙ্গুলীমশাই ঈষৎ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। জিরিয়ে নিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "আমার মনে রত্তিভর সন্দ নেই যে আমার গেস্ট হাউসের উপরের তলায় যে দুটি খাট আছে সেগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশ্বময় ঘোরাঘুরি করে শেষটায় আশ্রয় পেল দেবেন্দ্রনাথের চরণপ্রান্তে। আফটার অল্ তিনি তো প্রফেট —নোআরই মতোন গত শতাব্দীর প্রফেট।"

এস্থলে বলে রাখা প্রয়োজন, গাঙ্গুলীমশাই ছেলেবেলা থেকেই সে-যুগের বিলিতি—এদেশে একদম বেখাপ্পা—ডবল খাট, ড্রেসিং টেবিল, এস্‌ক্রিতোয়ার,

বিদে, চায়না ইত্যাদিতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনিই আমাকে একদিন বলেছিলেন যে তাঁর ধনী ঠাকুদ্দা তাঁর ভিলাটি সাজিয়েছিলেন ন'সিকে বিলিতি কায়দায়—একমাত্র ডাব্‌ল সী টা ছিল ব্যত্যয়, নেটীভ স্টাইলে গোড়ালির উপর বসে কর্মটি সমাধান করতে হত। তা সে যাই হোক, গাঁধীজীর অভ্যর্থনার জন্য যেটুকু মিনিমামেস্ট দরকার সে তিনি পাবেন কোথায়, গাঙ্গুলীমশায়ের ভাষায় "আফটার অল লোকটা তো বিলেতে ব্যারিস্টারি পাস করেছে।"

গাঙ্গুলীমশাই বলে যেতে লাগলেন, "গুর্দেব বোধ হয় আমার হতভম্ব ভাব দেখে ভরসা দেবার জন্য বললেন, 'তোমার যা যা দরকার আমার এখান থেকে, রথী আর বউমার বাড়ি থেকে নিয়ে যেয়ো।' আঃ! কথাটি শুনে পেরানটি জুড়িয়ে গেল। ওঁয়ার আছেটা কি? এ-রকম কম আসবাবপত্র নিয়ে তাঁর ক্রিচারস কম্ফর্ট পোষায় কি করে জানেন ব্রহ্মময়ী।[৮] অবশ্য রথীবাবুর বাড়িতে এটা-সেটা আছে, কিন্তু একটা ভদ্রলোকের বাড়ি তো আর লাজারসের গুদোম ঘর নয় যে প্রত্যেক আইটেম্ দু'তিন দফে করে থাকবে। ও বাড়ি থেকে আমার যা দরকার—খাট সোফা কোচ, নূতন পর্দা, লেখা-পড়ার জন্য উত্তম টেবিল-চেয়ার, একটা পেনট্রির আসবাবপত্র যেখানে খাবার জড়ো করা হবে, ডাইনিং রুমের জন্য একটা সাইডবর্ড যেখানে পেনট্রি থেকে আসা খাবারের ডিশ ডিনার টেবিলে সার্ভ করার পূর্বে রাখা হয়, হল-মার্কওলা উত্তম রুপোর ছুরি-কাঁটা—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "অবাক করলেন, গাঙ্গুলীমশাই! আপনি আমাকে সেই বুদ্দু স্নব ইংরেজের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। ফরাসী ভাষা জানে না; প্যারিসের রেস্তোরাঁয় তাই আঙুল দিয়ে মেনুতে দেখিয়ে দিলে প্রথম পদ। এল স্যুপ। এবার স্নব আঙুল দিলে মেনুর মধ্যিখানে। ভাবলে, মাছ-মাংস ঐ

৮ কথাটা খুবই সত্য। প্রাগুক্ত দেহলী বাড়িতে যখন কবি থাকতেন তখন দেখেছি তাঁর ছিল (১) দু'খানা তক্তপোশ জুড়ে একটি ফরাস—তার গদি কোয়ার্টার ইঞ্চি পুরু হয় কি না হয় (২) মেসে পড়াশোনার জন্য যে-রকম মিনিয়েচার টেবিল দেয় তারই এক প্রস্থ ও একখানা চেয়ার (৩) সামনের ন্যাড়া ছাতের উপর দু'-একখানা বেতের কুশনহীন চেয়ার এবং (৪) বোধ হয় উপাসনা করার জন্য একখানা হেল্যানো-হাতাহীন জলচৌকির মতো কাষ্ঠাসন। গোসল-খানায় কি কি মহামূল্যবান জিনিস ছিল দেখিনি, তবে এমনই একটা সঙ্কীর্ণ করিডরের মতো ফালি জায়গায় সেটা ছিল যে সেখানে নূরজাহানের হাম্মাম থাকার কথা নয়।

ধরনের কিছু একটা সলিড্ সাব্স্টেনশাল আসবে—ফরাসীতে যাকে বলে "পিয়েস দ্য রেজিস্তাঁস" অর্থাৎ যে বস্তু (পীস) আপনার ক্ষুধাকে মোক্ষম রেজিসটেন্স দেবে। ও হরি! ফের এল সুপ। খানাপীনা বাবদে হটেনটট গোত্রের ইংরেজ জানবে কি করে বিদগ্ধ ফরাসী জাত মেনুতে নিদেন ত্রিশ রকমের সুপ রাখে (হটেনটট গোরা বলে, উয়ি ঈট টু লিভ, আর বিদগ্ধ ফরাসী বলে, উয়ি লিভ টু ঈট)। এদিকে ইংরেজের রেস্ত ফুরিয়ে এসেছে। পুডিং মুডিং-এর আশায় দেখালে সর্বশেষ আইটেম। এল টুথ পেক—খড়কে। বুঝুন ঠ্যালা। তরলতম দু-কিস্তি সুপ খেয়ে, 'পান করে' বললে সঠিকতর হয়, খড়কে দিয়ে দাঁত খোঁটা! আপনি যে ইংরেজটাকেও হার মানাতে চললেন। করমচান্দের সুযোগ্য সন্তান মোহনদাস গাঁধী তো শুনি খান—বা পান করেন—প্যাজের শুরুয়া বা সুপ, সেও অতি হাল্কা আর বকরীর দুধ। ঐ দুই তরল দ্রব্য মুখে পৌঁছে দেবার জন্য আপনি ওঁকে হাতে তুলে দেবেন হামিলটন কোম্পানির হল-মার্কওলা রুপোর ছুরি আর কাঁটা! ভাগ্যিস আপনি চীনের ইম্পিরিয়াল পেলেস থেকে হীরে পান্না বসানো চপ স্টিক রেকুইজেশন করেননি।"

গাঙ্গুলীমশাই ঠোঁটের এক কোণ দিয়ে কিস্তিতে কিস্তিতে ধুঁয়ো ছাড়তে ছাড়তে বললেন, "তোমার যেমন আক্কেল। যে-ভিখিরি কুকুরের সঙ্গে মারামারি করতে করতে ডাস্ট-বিন থেকে খুঁজে খুঁজে খুঁটে খুঁটে অখাদ্য খায়, তাকে খেতে ডাকলে কি রাস্তা থেকে বাড়িতে একটা ডাস্ট-বিন তুলে এনে সেই ময়লার ভিতর সেই অখাদ্যই রাখো নাকি যেটা সে নিত্যি নিত্যি খায়? আর দু-তিনটে ঘেয়ো কুকুর লড়াই করার জন্য?

আরে বাপু, যার যা বেস্ট, মেহমানকে সেইটে দিতে হয়। আমি তাই দিন তিনেক উদয়াস্ত খেটে উপরের তলার তিনখানা ঘর সাজালুম। খুব যে মন্দ হল তা বলব না। অবশ্য দুর্গা নাম জপ এক সেকেণ্ডের তরেও কামাই দিইনি।

মহারাজ আসবার আগের দিন বেলা প্রায় দশটার সময়—গমি তখন নিদেন ১১২ ডিগ্রী—দেখি, কে যেন মিন ছাতায় রোদ্দুর ভেঙে ভেঙে আসছে। কে? চোখ কচলে দেখি—সর্বনাশ—জাব্বাজোব্বা পরা গুর্দেব। প্রথমটায় ভেবেছিলুম মহর্ষিদেবের ছায়া-শরীর। জানো বোধহয়, অনেকেই জ্যোৎস্না রাতে দেখেছে, সাদা আলখাল্লা পরা তাঁর ছায়াকায়া মন্দির থেকে বেরিয়ে তাঁর মর্তের বাসভবন এই গেস্ট হাউসের দিকে আসছেন। এবারে বুঝি ঠা ঠা রোদ্দুরে। তবে ভরসা এই কাছে গেলেই উপে যাবেন।"

আমি বললুম, "যত সব গাঁজা। মহর্ষিদেব এ-মন্দির কখনো দেখেননি।

শুনেছি, মহর্ষির আদেশে হাভেল সাহেব না কে যেন আর অবন ঠাকুরে মিলে এটার প্ল্যান করেন। এটার প্রতি পরলোকে গিয়েও তাঁর মোহ থাকবে কেন?"

গাঙ্গুলীমশাই বললেন, "আমি তো পড়িমরি হয়ে ছুটলুম গুর্দেবের দিকে, রঙ-চটা বাঁশের ছাতাখানা নিয়ে। তিনি ছাতাখানা উপেক্ষা করে মৃদু হেসে বললেন, 'দেখি গাঙ্গুলী, অতিথি সৎকারের কি ব্যবস্থা করেছ'।"

গাঙ্গুলী মহাশয়ের সর্বাঙ্গে সভয় কম্পনের শিহরণ খেলে গেল—গুরুদেবের ঐ অত্যন্ত হার্মলেস ইচ্ছা প্রকাশের স্মরণে। বললেন, "সবাই আমাকে ভরসা দিয়েছিল, গাঁধী কিছুতেই গুর্দেবকে এ-বাড়িতে তকলীফ বরদাস্ত করে আসতে দেবেন না। তিনি যাবেন স্বয়ং—যতবার প্রয়োজন হয়—উত্তরায়ণে, যাত্রী যে-রকম ভক্তিভরে তীর্থস্থলে যায়। কাজেই গুর্দেব আমার জোড়াতালির ঘর-সাজানো দেখতে পাবেন না। এখন উপায়?—এক ঝটকায় মা কালীর ঘুষ ডবল করে দিলুম—দুটোর বদলে চারটে মোষ।

হায়, হায়, হায়। গেরো, গেরো, গেরো। গুর্দেব ঘরে ঢুকেই বললেন, 'এসব করেছ কি হে! সব যে বিলিতি মাল। ব্রাস রডওলা স্প্রিং খাট! সর্বনাশ। বের কর, বের কর টেনে। এখ্খুনি। আর লোক পাঠাও, দেরি করো না—অমুকের বাড়িতে। বিয়ের সময়ে সে পেয়েছিল চীনে মিস্ত্রীর হাতে খোদাই করা করা একখানা জবরদস্ত কাঠের পালঙ্ক। আনাও সেটা। আর এসব যে এক্কেবারে বিলিতি বেড্‌শীট, বালিশের ওয়াড়। তুমিই যাও, গাঙ্গুলী, হ্যাঁ তুমিই যাও, বৌমার কাছে। তাঁর গুদোমঘরে আমার একটা মস্ত বড় সিন্দুক আছে। তার ভিতর খদ্দরের সব জিনিস পাবে। আমি যখন গেলবার আহমদাবাদ গিয়েছিলুম তখন সবাই আমাকে চেপে ধরল খদ্দর পরার জন্য। আমি বললুম অত মোটা কাপড় আমার সয় না। তারা যেন চ্যালেন্‌জ্‌টা তুলে নিলে। ধুতি, পাঞ্জাবির অতি মিহিন কাপড় থেকে আরম্ভ করে বিছানার চাদর, ওয়াড়—এমন কি খদ্দরের মশারি। না হে না, তুমি ভাবছ ওর ভিতর মানুষ দমবন্ধ হয়ে মারা যাবে। মোটেই না। এমনই মিহিন যেন মসলিন। ভিতরে যে শুয়ে আছে তার দিকে বাইরের থেকে তাকালে মনে হয় মাঝখানে কোনো মশারি নেই।'

হঠাৎ কার্পেটের দিকে নজর যেতে ফের হুকুম, 'ফেলে দাও এটাও।' তারপর কি যেন ভাবতে গিয়ে উপরের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল বিজলি বাতির বাল্‌ব। চিন্তিতভাবে যেন আপন মনে বল্লেন, 'এটাকে নিয়ে কি করা যায়?' আমাকে বললেন, 'হ্যাঁ, বউমার ওখানে যাবার সময় নন্দলাল আর

ক্ষিতিমোহনবাবুর স্ত্রীকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ো।' আমি সর্ব আদেশ তামিল করার সময় ভাবলুম, হনুমানজীকে কে বলে সরল? তিনি তাঁর মুনিবটিকে হাড়ে হাড়ে চিনতেন। এখন বলছেন, 'লে আও বিশল্যকরণী'। আনা মাত্রই হয়তো ফের হুকুম—'ঐ য্-যা। বিবজ্রতারিণীর কথা বেবাক ভুলে গিয়েছিলুম। যাও তো বৎস পবননন্দন হনুমান পবনগতিতে। নিয়ে এসো ঐ বস্তুটি।' তখন ঘষ্টাতে ঘষ্টাতে যাও ফের ঐ মোকামে। ক'বার যেতে আসতে হবে সে কি স্বয়ং প্রভু রামচন্দ্রই জানেন? অতএব নিয়ে চল সমূচা গন্ধমাদনটাকে। আর এ-স্থলে স্মরণ কর, আমাদের গুর্দেবের বাবামশাই কি করতেন? ঘড়ি ঘড়ি মত বদলাতেন বলে তাঁর খাস সহচর দু'দিন অন্তর অন্তর বিদেশ থেকে টেলি পাঠাতেন, 'বাবু চেন্‌জেস্ হিজ মাইণ্ড।' পুত্রে যে সেটা অর্সায়নি কি করে জানব? আমি নিয়ে চললুম গন্ধমাদন প্রমাণ সেই বিরাট সিন্দুকটাকে। আমার অবশ্য সুবিধে, আমাকে তো ওটা বইতে হবে না। বইবে ব্যাটা হীতলাল, কালো, ভোলা, বঙ্কা গয়রহ।

গেস্ট হাউসে পৌঁছে দেখি, চীনা পালঙ্ক তখনো আসেনি। খবর পেলুম সক্কলের পয়লা এসে পৌঁচেছেন ঠানদি (৺ক্ষিতিমোহনবাবুর স্ত্রী)। সেটা অতিশয় স্বাভাবিক। তাঁর নাম কিরণ। তাঁর টাট্টু ঘোড়ার মতো চলন দেখে ক্ষিতিবাবুই একদিন বলেছিলেন, 'সার্থক নাম কিরণ! কী-run দেখেছ?'

উপরে গিয়ে দেখি তুলকালাম কাণ্ড। ঠানদি এবং জনা তিন-চার এক্সপার্ট মহিলা লেগে গেছেন ঠিক সেনট্রাল বাতিটার নিচে দুনিয়ার যত কঠিন কারুকার্য ভরা বিরাট গোল একটা আল্পনা আঁকতে। গুর্দেব এক কোণে চুপ করে বসে বসে সব দেখছেন। এমন সময় নন্দলাল এলেন। গুর্দেব তাঁকে বললেন, 'এক কাজ কর তো নন্দলাল। ঐ বাল্‌বটাকে আড়াল করতে হবে। তুমি এটার নিচে একটা পেতলের চেপ্টা ফ্লাওয়ার ভাজ্ ছাত থেকে সরু সরু চেন দিয়ে ঝুলিয়ে দাও তো। ঠিক মানানসই সাইজ ও শেপের ও-রকম একটা ভাজ্ বৌমার আছে। আর ভাজ্ ভর্তি করে দাও পদ্মফুল দিয়ে, কুঁড়িগুলো যেন গোল হয়ে বাইরের দিকে মাথা ঝুলিয়ে দেয়। বিজলির আলো আসবে পদ্ম পাপড়ির ফাঁকে ফাঁকে। কি বললে? পদ্ম নাও পাওয়া যেতে পারে! নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। একটু দূরে লোক পাঠালেই হবে। নইলে মানানসই অন্য ফুল।' নন্দলাল মাথা নেড়ে জানালেন হয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে সেই মানওয়ারি জাহাজ সাইজের পালঙ্ক এল।

আমি এ-কাপড়, ও-শীট দেখাই। তিনি নামঞ্জুর করেন। শেষটায় না

পেরে বললুম, 'সিন্দুকটা নিচে রয়েছে। উপরে নিয়ে আসব কি?' এক ঝলক হেসে বললেন, 'না, আমি নিচে যাচ্ছি।' সেখানে চেয়ারে বসে শেষ রুমাল অবধি নেড়ে-চেড়ে পরখ করলেন, বাছাই করলেন। তারপর ফের উপরে এসে চেয়ারে বসে বিছানা তৈরী করা বাবদে পই পই করে বাৎলালেন, কোন শীটটা উপরে যাবে, কোন্‌টা নিচে ইত্যাদি ইত্যাদি। আরো মেলা মেলা বায়নাক্কা ঝামেলা। জলের কুঁজোটা কোথায় থাকবে, নাইট-টেবিলের পাশে ছোট্ট শেলফে কি কি বই থাকবে—সে সব কথা বলতে গেলে বাকি দিনটা, চাই কি রাতটাও কাবার হয়ে যেতে পারে। সংক্ষেপে সারি। হঠাৎ বললেন, 'চল গাঙ্গুলী, স্নানের ঘর দেখে আসি।' ঢুকেই বললেন, 'এ কী কাণ্ড! সরাও এখখুনি ঐ জিনক্ টাব্‌টা। নিয়ে এস আমার স্নানের ঘর থেকে পেতলের বড় গামলাটা। আর ওখানেই একটা বোয়ামে আছে বেসন। নিয়ে এসো একটা রুপোর কৌটোতে করে। সাবানটা সরাও।' আমি বললুম, 'ওটা গডরেজের ভেজিটেবল সোপ।' 'তা হোক। ফেলে দাও ওটা। আর ঐ টার্কিশ টাওয়েলটাও সরাও। সিন্দুক থেকে নিয়ে এস খদ্দরের তোয়ালে, আর একখানা সব চেয়ে সরেস গামছা। নিমের দাঁতন কই?' আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'ওঁর তো দাঁত নেই, আর্টিফিসিয়াল আছে কি না জানি নে।' 'তা হোক, নিয়ে এস দাঁতন। আর ক্ষিতিমোহনবাবুর স্ত্রীকে বলো, আজই যেন সুপুরি পুড়িয়ে—বাকি সব তিনি জানেন—টুথ পাউডার বানিয়ে পাঠিয়ে দিতে।' বুঝলুম, কোনো নবীন দশনসংস্কারচূর্ণ—ক্ষিতিমোহনের স্ত্রী বদ্যি-গিন্নী তো।

করে করে সব কটা ঘর তৈরি হল। সেই ১১৪ গরমে আর ক্লান্তিতে আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। বৃদ্ধ প্রভু কিন্তু খুট খুট করে দিব্য এ-ঘর ও-ঘর করছেন।'

দম নিয়ে গাঙ্গলীমশাই বিরাট এক তাওয়া সাজাতে সাজাতে বললেন, 'তোমার প্রাণ যা চায় সেই দিব্যি, কসম, কিরে আমাকে কাটতে বললে আমি এখখুনি সেইটে কেটে বলব আমার দৃঢ়তম বিশ্বাস কোনো বধু তার বরের জন্য, কোনো প্রেমিক তার প্রিয়ার জন্য কস্মিনকালেও এ-রকম বাসরঘর মিলনশয্যা তৈরি করেনি। আর গুর্দেবও এ-কর্ম পূর্বে কখনো করেননি সে-বিষয়ে আমি আদালতে তিন সত্যির দোহাই দিয়ে কসম খেতে রাজি আছি।

আরেকটা কথা শোন, সৈয়দ। গুর্দেবের মতো স্পর্শকাতর, সুন্দরের পূজারী যখন সব হৃদয় ঢেলে দিয়ে কোনো কিছু সুন্দর করে গড়ে তুলতে চান—এই যেমন এ-বাড়িটাকে তার চরম সুন্দর রূপ দেওয়া—তখন তাঁর হাজার মাইল কাছেও

আসতে পারে কোন্ প্রফেশনাল ডেকোরেটরের গোসাঁই!

আর সমস্ত জিনিসটা ছিল অত্যন্ত সিম্‌পল অথচ প্রত্যেকটি জিনিস থেকে উথলে উঠছিল সৌন্দর্য।"

আমি শুধালুম, "তারপর?"

গাঙ্গুলীমশাই শান্তকণ্ঠে বললেন, "এখানেই কাহিনীটি শেষ করতে পারলে ভালো হত। কিন্তু তুমি যখন আদ্যন্ত শুনতে চাও তবে কি আর করি? বলি।

গাঁধীজীকে উপরের তলায় নিয়ে গেলেন স্বয়ং গুর্দেব। আমি তাঁর ধরা-ছোঁওয়ার ভিতরে,—যদি বা কোনো কিছুর দরকার হয়। তাই সব দেখেছিলুম, সব শুনেছিলুম। দুই হিমালয়ের সাক্ষাৎ, উভয়ের মধ্যে গভীরতম প্রীতি—এমন কি সংঘাত। সেই মোকা ছাড়ব আমি! হেঁঃ!

বেশ পরিষ্কার স্পষ্ট লক্ষ্য করলুম, গাঁধী যেন দু'চারটে জিনিস দেখলেন, কিন্তু কোনো কিছুই লক্ষ্য করলেন না। আল্পনা, মাথার উপরে ফুলের ডালি, তাজমহলের মতো খাটবিছানা, বেডকাভারের ঠিক মাঝখানে বাতিকে কাজ করা নিটোল গোল মেডালিয়নের ভিতর সেই অজন্তার ছবি, যেখানে একটি তরুণী দু'ভাঁজ হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রভু বুদ্ধের পদতলে পদ্মফুলের অঞ্জলি দিচ্ছে।

কোনো-কিছুই যেন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারল না।

তারপর তিনি আস্তে আস্তে উত্তরের খোলা জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দৃষ্টি যেন মন্দির পেরিয়ে টাটা বিলডিং ছাড়িয়ে কোন্ সুদূরে চলে গেছে। হঠাৎ গুর্দেবের দিকে ফিরে বললেন, 'এরই কাছে ছাতে যাবার সিঁড়ি আছে না? চলুন।' ছাতে গিয়ে দু'জনাতে অল্প একটু পাইচারি করার পর গাঁধী একগাল হেসে বললেন, 'আমি এই ছাতেই বাসা বাঁধব। ভারী চমৎকার!"

আমি অবাক হয়ে বললুম, "তার মানে?"

"মানে আর কি? পড়ে রইল সব নিচে। আমি তাঁকে ককখনো ঐ বেড-রুমের একটিমাত্র জিনিসও ব্যবহার করতে দেখিনি। অবশ্য এ কথা ঠিক, যে দুটি দিন এখানে ছিলেন তার অধিকাংশ সময়ই কাটিয়েছেন উত্তরায়ণে, গুর্দেবের সঙ্গে আর বড়বাবুর (দ্বিজেন্দ্রনাথের) সান্নিধ্যে। বড়বাবুর কাছ থেকে বুড়ো ফির-ছিলেন হাসিখুশি ভরা ডগমগ মুখে, আর গুর্দেবের কাছ থেকে চিন্তাকুল বদনে। রাত্রি কাটাতেন ছাতে।" গাঙ্গুলীমশাই থামলেন।

অনেকক্ষণ গভীর চিন্তা করার পর বললেন, "আমি পলিটিক্স এক বর্ণও

বুঝি নে। গাঁধীর লেখা এক ছত্রও পড়িনি আর গুর্দেবের সামান্য যে-টুকু পড়েছি সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। আমার মতামতের কোনো মূল্য নেই। তবু বলি, এবারও গাঁধী-গুর্দেবে মনের মিল হল না। কিন্তু আমার মনে হয় এবারেই ছিল বেস্ট চান্‌স্। আমার মনে হয়, গাঁধী যদি ঐ আল্পনা, পদ্মফুলের আলো এবং গুর্দেবের আরো পাঁচটা সযত্নে সাজানো নেড়ে-চেড়ে দেখতেন, একটুখানি কদর দেখাতেন তাহলে গুর্দেবের দিলটা একটু মোলায়েম হত। লোকে বলে গাঁধী সত্যের পূজারী আর গুর্দেব নাকি সুন্দরের পূজারী! কিন্তু গুর্দেব যে সত্যেরও পূজারী সেও তো জানা কথা। গাঁধীও নিশ্চয়ই সুন্দর জিনিস ভালোবাসেন—কে বাসে না, কও! কিন্তু তার কোনো লক্ষণ আমার পাপ চোখে পড়েনি। তাই আমার মনে হয় গাঁধী যদি তাঁর জন্য সাজানো ঘরটাকে একটু পূজো করতেন—মানে একটু আদর করতেন—তা হলে গুর্দেব ভাবতেন, 'এ-লোকটা ভিতরে ভিতরে সুন্দরেরও পূজা করে। আমার বংশের না হোক আমার গোত্রেরই লোক।' তাই হয় তো একটা সমঝাওতা হয়ে যেত।

আবার দেখ, গাঁধীজী তাঁর সত্য-উপলব্ধির প্রতীক চরকা সবাইকে বিলোচ্ছেন। আমরা হাত পেতে নিচ্ছি কিন্তু আমরা কোনো প্রতিদান দিচ্ছি নে —কারণ আমাদের মতো সাধারণ লোকের কীই বা আছে যে তাঁকে দেব? কিন্তু গুর্দেবের বেলা তো সে-কথা নয়। তিনি সুন্দরের পূজা করে অনেক-কিছু পেয়েছেন। কই, গাঁধী তো তাঁর কাছ থেকে নিলেন না! এমন কি এই যে সামান্য সাজানো কামরা কটি—তার ফুল, কিছু আল্পনা কোনো-কিছুই লক্ষ্য করলেন না—গ্রহণ করলেন না।

তাই বলি, সৈয়দ, সংসারটা চলে গিভ অ্যান্‌ড্ টেকের উপর।"

উপসংহারে নিবেদন, বলা বাহুল্য, গুরুদেবকে দিয়ে যে আমি উত্তম পুরুষে কথা বলিয়েছি তার অধিকাংশই আমার কল্পনাপ্রসূত। কারণ যদিও গাঙ্গুলীমশাই গুরুদেবের কথাবার্তার চোদ্দ আনা আমাকে সে-সময়ে ঠিক ঠিকই বলেছিলেন তবু ভুললে চলবে না, পূর্বেই নিবেদন করেছি, গাঙ্গুলীমশাই ছিলেন পয়লা নম্বরী কীর্তনিয়া—রাকোঁতর। নিশ্চয়ই তাঁর বর্ণনায় বেশ খানিকটে রঙচঙ চড়িয়ে ছিলেন—ইচ্ছা-অনিচ্ছায়।

তদুপরি তিনি আমাকে কাহিনীটি বলেন, ১৯২৫-এ। আর আমি এ-কাহিনী লিখছি ১৯৬৯-এ!! কিন্তু মূল ঘটনাগুলো যে সত্য তার গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি (কারণ এ-ঘটনা পরে আরেকবার ঘটে—তবে সেখানে পাত্র গাঁধী ও মুসসোলিনির

প্রতিভূ এক জাহাজ-কাপ্তান)।

অবশ্য আমি দুই লাইনেই এ-কাহিনী শেষ করতে পারতুম। যথা :

"গুরুদেব অতিশয় সযত্নে ঘর সাজালেন। তার সৌন্দর্য গাঁধীজীর চোখে পড়ল না।" কিন্তু তাহলে তো লেজেণ্ডের গোড়াপত্তন হয় না—"রবিপুরাণ" দ্বন্দ্বকাহিনী নির্মিত হয় না।

আরেকটি কথা বলার খুব যে একটা প্রয়োজন আছে তা নয়। তবু বলি। সুচতুর পাঠক অতি অবশ্যই বুঝে গিয়েছেন, গুরুদেবের মুখে আমি যে ভাষা বসিয়েছি, অতি অবশ্যই গুরুদেব ও-রকম কাঁচা বাংলা বলতেন না। এবং সহৃদয় পাঠক বুঝে গিয়েছেন বলেই আমাকে মাফও করে দিয়েছেন। প্রবাদ আছে—"টু আন্‌ডারস্টেণ্ড ইজ টু ফরগিভ্"।

এবং গাঙ্গুলীমশাইয়ের ভাষারও জেল্লাই জৌলুস জ্যান্ত জিন্দা করতে পারিনি আমি—দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছর পর।

সর্বশেষে বক্তব্য এটা লেজেণ্ড, রূপকথা, পুরাণ। ইতিহাস নয়।

"দ্বন্দ্বপুরাণ" উপরেই শেষ হল। কিন্তু গাঁধী-পুরাণের অন্য এক কাহিনীর ইঙ্গিত আমি এই মাত্র দিয়েছি। সেটি বলিনি। সেও মজাদার।

দ্বন্দ্বপুরাণের ছ'বছর পরের ঘটনা। ১৯৩১, রাউণ্ড-টেবিল সেরে গাঁধীজী দেশে ফেরার জন্য বেছে নিলেন একখানা ইতালীয় জাহাজ। ইল্ দুচে বেনিতো মুসসোলিনি তো ড্যাম্ গ্ল্যাড্। (ওদিকে জর্মন জাত বড় নিরাশ হয়েছিল। গাঁধী বলেছিলেন, রাউণ্ড-টেবিলে তিনি যদি সফলতা লাভ করেন তবে ইয়োরোপে যে একটি মাত্র জায়গা দেখার তাঁর ঐকান্তিক কামনা আছে সেটিকে তিনি তীর্থযাত্রীরূপে শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশে ফিরবেন—ভাইমার, কবি গ্যোটের লীলাভূমি ও সমাধিস্থল। কিন্তু গোলটেবিলে নিষ্ফল হলেন বলে সোজা দেশে ফেরেন।) মুসসোলিনি খবর পাওয়া মাত্র বললেন, "যে জাহাজে গাঁধী যাবেন সেটা অত্যুত্তম, কিন্তু তার সেরার সেরা 'কাবিনা লুস্‌সোরীয়োজা' (সাধু সাবধান!—ইতালীয় ভাষার সঙ্গে আমার অতি সামান্য নমস্কার-প্রতিনমস্কারের পরিচয়—ভুল হতে পারে। অর্থ হচ্ছে কাবিন দ্য ল্যুক্স্, লাকশারি কেবিন, সব চেয়ে আক্রা ভাড়ার বিলাস কেবিন) নিশ্চয়ই রাজা মহারাজা ফিল্মস্টারের পক্ষে যথেষ্টরও বেশী, কিন্তু গাঁধী?" এখানে এসে তিনি যে অলঙ্কার ব্যবহার করলেন তার ইংরেজি আছে—"গাঁধী? হি ইজ নট এভরিবডিজ কাপ অব্ টী"—বাংলাতে মেরেকেটে বলা যেতে পারে, "ভিন্ন গোয়ালের একক গোমাতা, মা-

ভগবতী" কিংবা আমরা যে-রকম বলি "কানু ছাড়া গীত নেই", তার সঙ্গে মিলিয়ে "গাঁধী ছাড়া নর নেই।" আরবরা বলে, "গাঁধী মহারাজের কাহিনী সব কাহিনীর মহারাজা।" তার পর হুকুম দিলেন, "গাঁধীকে সবসে বঢ়িয়া কেবিন দাও—একটা না, সুইট অব কেবিন্‌স্‌। বেডরুম, ড্রইংরুম, এণ্টিরুম (ভিজিটারদের জন্য প্রতীক্ষা-গৃহ), আপন খাস ডাইনিং রুম ইত্যাদি ইত্যাদি। লক্ষপতিদের বুকিং কেনসেল করে। আর তোমাদের দ্য ল্যুক্‌স্‌ কেবিনের সোফা কোচ বিছানা বাথরুম লক্ষপতিদের জন্য গুড ইনাফ, মলটো বুয়োনো (ভেরি গুড্‌) কিন্তু গাঁধীর জন্য নয়। পালাদসো ভেনেদসিয়া (ভেনিস পেলেস—ইটালীর প্রায় সর্বোত্তম প্রাসাদ) থেকে তাবৎ ফার্নিচার পাঠাও।" সর্বশেষে বললেন, "ঔর অচ্ছী অচ্ছী তাগড়ী বকরী, দুধকে লীয়ে।" এই ফার্নিচার পাঠানোর পিছনে হয়তো বা কিঞ্চিৎ ইতিহাস আছে। এখানে আবার গুরুদেব প্রধান পাত্র।

যাঁরা কবিগুরুর মৃত্যুর পর তাঁর বধূমাতা স্বর্গীয় প্রতিমা দেবীর "নির্বাণ" পুস্তিকা পড়েছেন, তাঁরাই জানেন, অসুস্থাবস্থায় তিনি কিছুদিন কাটান তাঁর এক প্রিয়া শিষ্যার বাড়িতে, দক্ষিণ আমেরিকার আরজেনটিনায়। এঁর নাম ভিকতরিয়া (অর্থাৎ "বিজয়া" এবং কবি দেশে ফিরে এঁকেই তাঁর পরের গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন। কবির সঙ্গে তোলা এঁর ছবি পাঠক পাবেন "পূরবী" কাব্যে, বিশ্বভারতী সংস্করণ "রবীন্দ্ররচনাবলী" চতুর্দশ খণ্ড, ১০৫ পৃষ্ঠার মুখোমুখি। এঁকে উদ্দেশ করে কবি একগুচ্ছ কবিতা লিখেছেন। "পূরবী"তে "বিদেশী ফুল" "অতিথি" ও অন্যান্য কবিতা দ্রষ্টব্য) ও-কাম্পো। কবি দেশে ফেরেন ইটালিয়ান "জুলিয়ো চেজারে" (জুলিয়াস সীজারের ইতালীয় উচ্চারণ) জাহাজে করে। জাহাজে বিদায় দিতে এসে ভিকতরিয়া দেখেন (পূরবীর "বদল" ও গীতবিতানের "তার হাতে ছিল" গান দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য) যে, যদিও কবিকে সর্বোত্তম দ্য ল্যুক্‌স্‌ কেবিন দেওয়া হয়েছে তবু সদ্য রোগমুক্ত জনের জন্য হেলান দিয়ে বসার আরাম-কেদারা সেখানে নেই। তিনি তদ্দণ্ডেই লোক পাঠালেন বাড়িতে; সে আরাম কেদারায় অসুস্থ কবি বসতে ভালোবাসতেন সেইটে নিয়ে আসতে। বিরাট সে কেদারা, তাই কেবিনের ছোট দরজা দিয়ে ঢোকে না। ভিকতরিয়া ডেকে পাঠালেন জাহাজের কাপ্তানকে। বিরাট জাহাজের কাপতেন হেজিপেজি লোক নয়—তাকে "ডেকে পাঠানো" যে সে লোকের কর্ম নয়। তাই এস্থলে বলে রাখা ভালো, তাঁর অর্থসম্পত্তি ছিল প্রচুরতম এবং তাবৎ আর্জেনটাইনের রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর তাঁর প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারিত। তিনি সুসাহিত্যিকা, প্রভাবশালী মাসিকের সম্পাদিকা এবং পরবর্তীকালে তিনি ইউনাইটেড নেশনসের

একাধিক বিভাগে তাঁর দেশের প্রতিভূ হয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। "টাইম" সাপ্তাহিকে আমি সে-বিবরণী পড়েছি ও তাঁর ছবি সেখানে দেখতে পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিক উৎসবে আরজেনটাইন-ডাকবিভাগ কবির ছবিসহ বিশেষ স্ট্যাম্প প্রকাশ করে ভিকতরিয়ারই জোরদার প্রস্তাবে। এবং তিনি নির্দেশ দেন, ডাকবিভাগ যেন কবির কোন্ ছবি ছাপা হবে তাই নিয়ে মাথা না ঘামায়। ভারত যে-ছবি ছাপাবে সেটা তিনি কবিপুত্রের কাছ থেকে আনিয়ে ডাকবিভাগকে দেবেন। ডাকবিভাগ মাতার সুপুত্রের মতো তাবৎ নির্দেশ মেনে নেয়। ঐ স্ট্যাম্প খামে সেঁটে ভিকতরিয়া কবিপুত্রকে একখানা চিঠি লেখেন; আমি সেটি দেখেছি। যা বলছিলুম: কাপতানকে ভিকতরিয়া হুকুম দিলে কেবিনের দরজা কেটে কেদারা ঢোকাও।* বলে কি? ত্য ল্যাক্স কেবিনের দেয়াল বরাত দিয়ে কেটে তার অঙ্গহানি করা! কাপতান গাঁইগুঁই করছে দেখে জাতে দজ্জাল সেই স্পেনিশ রমণী আরম্ভ করলেন ভৎর্সনা, অভিসম্পাত, কাপতানের আসন্ন পতনের ভবিষ্যদ্বাণী—মুষলধারার বাক্যবাণে তাকে জর্জরিত করতে। এ-ঘটনা স্বয়ং কবি কনফার্ম করেছেন। তিনি পুরো ঘটনাটির বর্ণনা দিতে গিয়ে এস্থলে বলেন, "আমি স্পেনিশ ভাষা জানি নে। কিন্তু ভিকতরিয়ার সেই জ্বালাময়ী ভাষার কটুবাক্যের রসগ্রহণে আমার কণামাত্র অসুবিধা হয়নি।"

কাপতান পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচায়। বংশরক্ষার জন্য সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের মিস্ত্রিকে পাঠিয়ে দেয়।

হয়তো এ-ঘটনা মুসসোলিনির কানে পৌছয়। হয়তো তাই এ-ঘটনার ছ' বছর পর গাঁধীজী যখন তাঁর জাহাজে চড়লেন তখন তিনি পালাদসো ভেনেদসিয়া থেকে সেরা সেরা আসবাবপত্র পাঠান।

যে-জাহাজ করে গাঁধী দেশে ফেরেন তার এক ইতালীয় স্টুয়ার্ড আমাকে এ-কাহিনীটি বলে। আমি তার সবিস্তর বর্ণনা আমার "বড়বাবু" গ্রন্থে "গান্ধীজীর দেশে ফেরা" নাম দিয়ে লিখেছি। এস্থলে সংক্ষেপে সারি।

গাঁধীজী জাহাজে উঠলেন। ভয়ে আধমরা (কারণ নির্মম ডিক্টেটর

---

* এ-কেদারার শেষ ইতিহাস পাঠক পাবেন, কবির সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ "শেষলেখা"তে। এ ঘটনার দীর্ঘ ষোল বৎসর পরে, কবি তাঁর মৃত্যুর পাঁচ মাস পূর্বে রোগশয্যায় সেই কেদারখানা খুঁজে নিয়ে (ছাপাতে আছে "খুঁজে দেব"—হবে "খুঁজে নেব") তার উদ্দেশে একটি মধুর কবিতা লেখেন। "শেষলেখা" কাব্যের ৫নং কবিতা পশ্য।

মুসসোলিনির কানে যদি খবর পৌঁছয়—গুজোব হোক আর না-ই হোক, লেজেণ্ড হোক আর সত্য ইতিহাসই হোক—যে গাঁধীর পরিচর্যায় ত্রুটি-জখম ছিল তা হলে বারোটা রাইফেলের গুলি খেয়ে তাঁকে যে ওপারে যেতে হবে সে-বিষয়ে তিনি স্থির নিশ্চয়) তথাপি সগর্বে সদম্ভে গাঁধীজীকে দেখালেন তাঁর জন্য স্পেশালি রিজার্ভড্ প্রাসাদসজ্জায় গৌরবদীপ্ত আরাম-আয়েসের ইন্দ্রপুরী সদৃশ কেবিনগুলো। গাঁধীজীর অনুরোধে তারপর তিনি তাঁকে দেখালেন বাদবাকী তাবৎ জাহাজ।

সর্বশেষে গাঁধী শুধোলেন, সব চেয়ে উপরের খোলা ডেক-এ (ছাতে) যাওয়া যায় কি না ?

কাপ্তান সানন্দে তাঁকে সেখানে নিয়ে গেলেন। উন্মুক্ত আকাশের নিচে বিরাট বিস্তীর্ণ ডেক।

গাঁধী বললেন, "আমি এখানে তাঁবু খাটিয়ে বাস করব।"

কাপ্তান বদ্ধ পাগলের মতো হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে গোঙরাতে গোঙরাতে বলল, "অসম্ভব, অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই ভূমধ্যসাগরে রাত্রে তাপমাত্রা নামবে শূন্যে। সুয়েজ খাল আর লোহিত সাগরে দুপুরের গরমী উঠবে ১১৪ তক্। এমন কর্ম থেকে আপনাকে ঈশ্বর রক্ষতু।"

গাঁধী ঝাড়া তেরোটি দিনরাত্রি কাটিয়েছিলেন উপরে। প্রতি সকালে মাত্র একবার নেমে আসতেন নিচে। প্রার্থনা করতে। সর্বশ্রেণীর প্যাসেনজার নিমন্ত্রিত হতেন। শুনেছি খালাসীরাও বাদ যায়নি।

কিন্তু গাঁধীজীর এই দুই প্রত্যাখ্যানের ভিতর অতলস্পর্শী পাতাল এবং গগন-চুম্বী আকাশের পার্থক্য রয়েছে।

মুসসোলিনির ভেট ছিল আরাম-আয়েস [illegible] ঐশ্বর্য। গাঁধী যে সেগুলো সবিনয় প্রত্যাখ্যান করবেন সেটা কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু রবি কবি গাঁধীর সামনে ধরেছিলেন সরল, অনাড়ম্বর সৌন্দর্য। কবিরই ভাষায় বলি,

"দুয়ারে এঁকেছি
রক্তরেখায়
পদ্ম-আসন,
সে তোমারে কিছু বলে ?"

হায়, বলেনি।

মাভৈঃ!

বাঙালী সব দিক দিয়েই পিছিয়ে যাচ্ছে, এ রকম একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। কথাটা ঠিক কিনা, হলপ খেয়ে বলা কঠিন, কারণ দেশ-বিভাগের ফলে তার যে খানিকটে শক্তিক্ষয় হয়েছে সে বিষয়ে তো কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। পার্লামেণ্টে যদি আপনার সদস্য সংখ্যা কমে যায় তবে সব-কিছুই কাটতে হয় ধার দিয়ে—ভার দিয়ে কাটার সুযোগ আর মোটেই জোটে না।

দিল্লীতে থাকাকালীন আমি একটি বিষয় নিয়ে কিঞ্চিৎ চিন্তা করেছিলুম। কেন্দ্রে অর্থাৎ ইউ পি এস সি-তে বাঙালী যথেষ্ট চাকরি পাচ্ছে কি না? ঐ অনুষ্ঠানের সদস্য না হয়েও যাঁরা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁদের বিশ্বাস, বাঙালীর এতে যতখানি কৃতকার্য হওয়া উচিত ততখানি সে হচ্ছে না। একদা বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমাকেও সেখানে ডাকা হয়েছিল; আমি তখন চোখকান খোলা এবং খাড়া রেখে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করেছিলুম।

দিল্লীতে এখন যাঁরা বসবাস করেন তাঁরা বিলিতি কিংবা বিলিতি-ঘেঁষা পোশাক পরেন, ছুরিকাঁটা দিয়ে খাওয়া প্রচুর বাড়িতে চালু হয়েছে, ইংরিজি আদব-কায়দা, বিশেষ করে ইংরিজি এটিকেট এঁদের কাছে আর সম্পূর্ণ অজানা নয়।

ইউ পি এস সি-র তাবৎ মেম্বারই সায়েবীয়ানা পছন্দ করেন, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু যেখানে যে-আবহাওয়া বিদ্যমান, মানুষ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তার থেকেই প্রাণবায়ু গ্রহণ করে। তাই যদি বাঙালী ছেলের পোশাক ছিমছাম না হয়, চেয়ার টেনে বসার সময় সে যদি শব্দ করে, মোকামাফিক পার্ডন, থ্যাঙ্ক্যু না বলতে পারে এবং সর্বক্ষণ ঘন ঘন পা দোলায় তবে সদস্যরা আপন অজান্তেই যে তার প্রতি কিঞ্চিৎ বিমুখ হয়ে ওঠেন সেটা কিছু আশ্চর্যজনক বস্তু নয়।

কিন্তু আসল বিপদ অন্যত্র। বাঙালী উমেদার ইংরিজিতে ভাব প্রকাশ করতে পারে না। পাঞ্জাবী, হিন্দীভাষী কিংবা মারাঠী যে ইংরিজি বলে সেটা কিছু 'আ-মরি' 'আ-মরি' করবার মতো নয়,—বিশেষত পাঞ্জাবী, হিন্দীভাষী ও সিন্ধীদের ইংরিজিজ্ঞান 'শিলিং-শকার' ও 'পেনি-হরার' থেকেই আহরিত। তা হোক কিন্তু ঐসব বুঝে না-বুঝেই যারা বেশী পড়ে তাদের কথা বলার অভ্যাস হয়ে যায় বেশী, অন্তত 'থ্যাঙ্ক্যু', 'পার্ডন', 'আই এম এফ্রেড' তারা তাগমাফিক লাগিয়ে দিতে কসুর করে না।

এ স্থলে ইতিহাসের দিকে এক নজর তাকাতে হয়।

মুসলমান আগমনের পর থেকে ১৮৪০-৪২ পর্যন্ত বাঙলাদেশের ব্রাহ্মণ তথা বৈদ্য সম্প্রদায়ের বিস্তর লোক সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেন এবং মুসলমান ও কায়স্থরা ফার্সী (এবং কিঞ্চিৎ আরবীর) চর্চা করেন। এদেশের বড় বড় সরকারি চাকরি, যেমন সরকার (চীফ সেক্রেটারী), কানুনগো (লিগেল রিমেম্‌ব্রেন্‌সার), বখ্‌শী (একাউণ্টেণ্ট জেনারেল—পে মাস্টার) অর্থাৎ এডমিনিস্ট্রেটিভ তাবৎ ডাঙর ডাঙর নোকরিই করেন কায়স্থরা। ইংরেজের আদেশে এঁরাই কলকাতাতে প্রথম ইংরিজি শিখতে আরম্ভ করেন। বস্তুত ফার্সী তাঁদের মাতৃভাষা ছিল না বলে তাঁরা সেটা অনায়াসে ত্যাগ করে ইংরিজি আরম্ভ করে দিয়েছিলেন—এবং ফলে হাইকোর্টটি তাঁদের হাতে চলে যায়। ব্রাহ্মণরা আসেন পরে; তাই তাঁরা পেলেন বিশ্ববিদ্যালয়। মুসলমান আসেন সর্বশেষে, তাঁদের কপালে কিছুই জোটেনি।

তা সে যাই হোক্, আমরা বাঙালী প্রথমেই সাততাড়াতাড়ি ইংরিজি শিখেছিলুম বলে বেহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এস্তক সিন্ধুদেশ পর্যন্ত আমরা ছড়িয়ে পড়ি।

এর পর অন্যান্য প্রদেশেও বিস্তর লোক ইংরিজি শিখতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমে ক্রমে আমাদের চাহিদা ও কদর কমতে লাগল, এসব কথা সকলেই জানেন, কিন্তু এর সঙ্গে আরেকটি তত্ত্ব বিশেষভাবে বিজড়িত এবং সেই তত্ত্বটির প্রতি আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

যে দুটি জাতীয় সঙ্গীত ভারতের সর্বত্র সম্মানিত সে দুটিই বাঙলাদেশেই রচিত হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম সর্বপ্রথম আরম্ভ হয় বাঙলাদেশেই। এটা কিছু আকস্মিক যোগাযোগ নয়। এর কারণ বাঙালী আপন দেশ ভালোবাসে এবং সে বিদ্রোহী।[১] দেশকে ভালোবাসলে মানুষ তার ভাষাকেও ভালোবাসতে শেখে।

আশ্চর্য, ইংরিজি ভালো করে আসন জমাবার পূর্বেই বাঙলাদেশে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। (ঠিক সেই রকম ফার্সী যখন একদা আসন জমাতে যায়

১ 'বিদ্রোহী' আমি কথার কথারূপে বলছি না। বস্তুত বাঙালী যে বিদ্রোহী তার ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি। (ক) দোয়াবের ব্রাহ্মণ্যধর্ম তাকে অভিভূত করতে পারেনি, ফলে সে সংস্কৃত উচ্চারণ গ্রহণ করেনি, (খ) বৌদ্ধ-জৈনের নিরামিষ সে গ্রহণ করেনি, (গ) মুসলমান আমলে বাঙলাদেশই সব চেয়ে বেশী লড়াই দিয়েছে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ইত্যাদি বিস্তর বিষয়বস্তু নিয়ে সে ইতিহাস লিখতে হবে।

তখন কবি সৈয়দ সুলতান আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন,

আল্লায় বলিছে "মুই যে-দেশে যে-ভাষ,
সে-দেশে সে-ভাষে করলুম রসুল প্রকাশ।"
"যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন।
সেই ভাষা তাহার অমূল্য সেই ধন॥")

এবং আরো আশ্চর্যের বিষয়, সে বিদ্রোহের কাণ্ডারী ছিলেন সে যুগের সব-চেয়ে বড় ইংরিজ (ফরাসী, লাতিন, গ্রীক) ভাষার সুপণ্ডিত মাইকেল। কাজেই যদিও সে উইলসেন, কেশবসেন ও ইস্টিসেন এই তিন সেনের কাছে জাত দিয়ে ছুরি কাঁটা ধরতে শিখল (আজ যা দিল্লিতে বড়ই কদর পাচ্ছে) তবু সঙ্গে সঙ্গে ওর বিনাশের চারাকে জল দিয়ে বাঁচাতে আরম্ভ করলো। এটাকে বাঙালীর স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। এসময় সে গাছেরও খেয়েছে, তলারও কুড়িয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই চোখে পড়ল, বাঙালী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরিজি বইয়ের আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যে রকম কাতর হয়ে পড়েছিল এবার সে সে-রকম হাঁসফাঁস করলো না। স্বরাজ লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, বাঙালী ইংরিজি ভাষা, আচার-ব্যবহার, কায়দা-কেতা থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে এবং ফলে দিল্লীতে আর কল্কে, সরি, সেভিয়েট—পায় না।

তর্ক করে, দলীল-দস্তাবেজ দিয়ে সপ্রমাণ করতে হলে ভূরি ভূরি লিখতে হবে। তা না হয় লিখলুম, কিন্তু পড়বে কে? তাই সংক্ষেপে বলি।

পৃথিবীর সভ্যাসভ্য কোনো দেশই বিদেশী ভাষা দিয়ে বেশী দিন কারবার চালায় না। আজকের দিনে তো নয়ই। ফার্সী এদেশে ছ'শ বছর ধরে রাষ্ট্রভাষা ছিল—আমরা একে চিরন্তনী ভাষা বলে গ্রহণ করিনি।

তাই হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠীওলারাও একদিন ইংরেজি বর্জন করে আপন আপন মাতৃভাষায় কাজ-কারবার করতে গিয়ে দেখবেন, আমরা বাঙালীরা অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছি, মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গিয়েছে—কারণ আমরা অনেক পূর্বে আরম্ভ করেছিলুম। তখন যখন কেন্দ্রে আপন আপন মাতৃভাষায় পরীক্ষা দিতে হবে তখন আবার আমরা সেই যুগে ফিরে যাব, যখন একমাত্র বাঙালীই ইংরিজি জানত। হিন্দী কখনো ব্যাপকভাবে বাধ্যতামূলক হবে না, আর হলেও বাঙালীকে যেমন মাতৃভাষার উপর হিন্দীতে পরীক্ষা দিতে হবে, হিন্দীওলাকে হিন্দী ভিন্ন অন্য একটি ভাষায় পরীক্ষা দিতে হবে। অমাতৃভাষা অমাতৃভাষায় কাটাকুটি গিয়ে রইবে বাঙলা বনাম হিন্দী। তাই অবস্থা একই দাঁড়াবে—আমরা এগিয়ে যাব।

তাই মাভৈঃ!

হিটলারের শেষ প্রেম

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ১লা মে রাত দশটার সময় হামবুর্গ বেতার কেন্দ্র তার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রোগ্রাম হঠাৎ বন্ধ করে দিয়ে ঘোষণা করলো—

"আমাদের ফ্যুরার আডলফ হিটলার বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণ করেছেন।"

যে-সময়ে এ নিদারুণ ঘোষণাটি করা হয়, তখন প্রোগ্রামমাফিক কথা ছিল, "ইঁদুর ধ্বংস করার উপায়।" এই নিয়ে হিটলার-বৈরীরা এখনো ঠাট্টা-মস্করা করেন।

যে সব জর্মন বেতার-ঘোষণাটি শুনেছিল, তাদের অনেকেই যে বিরাট শক্ পেয়েছিল, সে-নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এদের অনেকেই সরলচিত্তে বিশ্বাস করতো, আশা রাখতো—যে-হিটলার ক্রমাগত পঁচিশ বৎসর বহু উৎকৃষ্ট সংকটে যেন ভাগ্যবিধাতার অদৃশ্য অঙ্গুলি সংকেতে, অবলীলাক্রমে বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান করে সে-সব সংকট উত্তীর্ণ হয়েছেন এবারেও তিনি আবার শেষ মোক্ষম ভেল্কিবাজি দেখিয়ে তাবৎ মুশকিল আসান করে দেবেন। তার অর্থ; যে-সব রুশ সৈন্য বার্লিন অবরোধ করেছে তারা স্বয়ং হিটলারচালিত আক্রমণে খাবে প্রচণ্ডতম মার, ছুটবে মুক্তকচ্ছ হয়ে মস্কো বাগে। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন ইংরেজ সৈন্যও পড়ি-মরি হয়ে ফিরে যাবে আপন আপন দেশে। রাহুমুক্ত ফ্যুরার —পথপ্রদর্শক সর্বোচ্চ নেতা পুনরায় ইয়োরোপময় দাবড়ে বেড়াবেন।

এরা যে মোক্ষম শক্ পেয়েছিল সে তো বোঝা গেল। কিন্তু তার চেয়েও মোক্ষমতর শক্ পেল কয়েকদিন পর যখন বেতার ঘোষণা করলো, হিটলার আত্মহত্যা করার পনেরো ঘণ্টা পূর্বে এফা ব্রাউন নামক একটি কুমারীকে বিয়ে করেন। কারণ, জর্মনির দশ লক্ষের ভিতর মাত্র একজন হয়তো জানতো যে, হিটলারের একটি প্রণয়িনী আছেন এবং তাঁর সঙ্গে তিনি স্বামী-স্ত্রীরূপে বছর বারো-তেরো ধরে জীবনযাপন করছেন। নিতান্ত অন্তরঙ্গ যে কয়েকজন এই "গুপ্তি প্রেমে"র খবর জানতেন, তাঁরা এ-বাবদে ঠোঁট সেলাই করে কানে ক্লরফর্ম ঢেলে পুরো পাক্কা নিশ্চুপ থাকতেন। কারণ হিটলারের কড়া আদেশ ছিল, তাঁর এই গুপ্তিপ্রেম সম্বন্ধে যে-কেউ খবর দেবে বা গুজব রটাবে, তিনি তার সর্বনাশ করবেন। তার কারণও সরল। তাঁর প্রপাগাণ্ডা মিনিস্টার গ্যোবেল্স্ দিনে দিনে বেতারে খবরের কাগজের মারফতে হিটলারের যে মূর্তি গড়ে তুলেছিলেন (আজকের দিনের ইংরেজিতে "তাঁর যে 'ইমেজ' নির্মাণ করেছিলেন") সেটি

সংক্ষেপে এই : হিটলার আজীবন ব্রহ্মচারী, তাঁর ধ্যানধারণাসাধনা সর্বশক্তি তিনি নিয়োগ করেন একমাত্র জর্মনির মঙ্গলসাধনে। হিটলার স্বয়ং অন্তরঙ্গ জনকে একাধিকবার বলেছেন, "জর্মনিই আমার বঁধু" (বাগদত্তা দয়িতা)। এমন কি তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরও তত্ত্বতাবাশ করেন না। এটা সত্য, এ নিয়ে কোন ঢাক ঢাক গুড় গুড় ছিল না। গোড়ার দিকে তিনি তাঁর বিধবা একমাত্র সৎদিদিকে মিউনিকের নিকটবর্তী তাঁর বের্ষ্‌টেশগার্ডেনের বাড়ি বের্গহফে গৃহকর্ত্রী রূপে রাখেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে সে-বাড়িতে এসে পৌঁছলেন এফা ব্রাউন। যা আকছারই হয়—ননদিনী ঠাকুরঝির সঙ্গে লাগল কোঁদল। হিটলারের অন্যতম বন্ধু বলেন এ স্থলে আরো আকছারই যা হয় তাই হল। পুরুষমানুষ, তায় হিটলারের মতো কর্মব্যস্ত পুরুষ, এ-সব মেয়েলী কোঁদলে কিছুতেই প্রবেশ করে একটা ফৈসালা করে দিতে সম্পূর্ণ নারাজ। তিনি চুপ করে বসে "যাত্রাগান দেখলেন"—অবশ্য অতিশয় বিরক্তিভরে। শেষটায় দিদিই হার মানলেন। হিটলার-ভবন ত্যাগ করে মিউনিকে আপন একটি ছোট্ট বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। হিটলার এর পর তাঁকে আর কখনো তাঁর নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেননি। তার কিছুদিন পর সৎদিদি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। হিটলার এটাতে ভয়ঙ্কর চটে যান। কেন, তা জানা যায়নি। বিবাহ-উৎসবে উপস্থিত তো হলেনই না, সামান্য একটি প্রেজেন্টও পাঠালেন না। উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র চিরতরে সম্পূর্ণ ছিন্ন হল।

হিটলারের আপন মায়ের পেটের একটি সুন্দরী বোনও ছিল। তাঁকেও তিনি একবার তাঁর বাড়ি বের্গহফে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু তিনি ঐ বাড়ির আরাম-আয়েসে এতই সুখ পেলেন যে, কাটালেন মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘকাল। হিটলার বিরক্ত হলেন এবং শেষ পর্যন্ত বোনের বিদায় নেওয়ার পর তাঁকে আর কখনো নিমন্ত্রণ জানাননি। এ-ননদীর সঙ্গে এফা ব্রাউনের কলহ হয়েছিল কি না সে-বিষয়ে ঐতিহাসিকরা নীরব। ভাইবোন বলতে ইনিই হিটলারের একমাত্র মায়ের পেটের বোন। তাঁর বিখ্যাত ভ্রাতা আডলফ হিটলারের মৃত্যুর পরও অবহেলিত এই বোন কয়েক বৎসর বেঁচে ছিলেন।

এই আপন বোন ও পূর্বে বর্ণিত সেই সৎদিদি ছাড়া হিটলারের ছিলেন একটি বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ঐ সৎদিদির বড় ভাই। নানা দেশে বহু কর্মকীর্তি করার পর ইনি এলেন বার্লিনে—তাঁর সৎভাই জর্মনির কর্ণধার হয়েছেন খবর শুনে। নাৎসি পার্টির দু-একজনকে চিনতেন বলে তাঁদের কৃপায় পারমিট যোগাড় করে খুললেন বার্লিনের উপকণ্ঠে একটা মদের দোকান—বার্। পার্টি-মেম্বাররা

সেখানে যেতেন তো বটেই, তদুপরি বিশেষ করে সেখানে হুল্লোড় লাগাতেন দুনিয়ার যত খবরের কাগজের রিপোর্টার। ওনাদের মতলব, হিটলারের বাল্যজীবন সম্বন্ধে তস্য অগ্রজ ভ্রাতার কাছ থেকে গোপন তথ্য, রসালো চুট্‌কিলা সংগ্রহ করে আপন আপন কাগজে টকঝাল পরিবেশন করা।

কিন্তু ব্রাদার আলওয়া হিটলার ছিলেন ঝাণ্ডু শুঁড়ি। পাছে তাঁর কোনো বেফাঁস কথা কনিষ্ঠ ফ্যুরার আডলফের কানে পৌঁছে যায় এবং তিনি চটেমটে তাঁর মদের দোকানের পারমিটটি নাকচ করে দেন সেই ভয়ে তিনি ফ্যুরার সম্বন্ধে একটি মাত্র কথা বলতে রাজি হতেন না। অনুজ যে কারণে-অকারণে ফায়ার হয়ে যান সেটা বড় বেরাদার বিলক্ষণ জানতেন।...হিটলারও তাঁর সম্বন্ধে কখনো কোনো কৌতূহল দেখাননি।

পূর্বেই বলেছি, হিটলারের দাদা দিদি বোনের সঙ্গে তাঁর যে কোনো প্রকারের সম্পর্ক ছিল না, সেটা দিদি বোনের পাড়াপ্রতিবেশী সখাসখী সবাই জানতেন। তাঁরাও সেটা আর পাঁচজনকে বলতেন। "আহা! ফ্যুরার জর্মনির ভবিষ্যৎ নিয়ে এমনই আকণ্ঠ নিমগ্ন যে তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন সম্বন্ধেও অচেতন।" ক্রমে ক্রমে, গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে "মৈত্র মহাশয় যাবে সাগর-সঙ্গমে", এ-স্থলে জর্মনিরও নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে সংবাদটি রটে গেল, আবাল্য ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় প্রভু হিটলার তাঁর সর্ব আত্মজনকে বিসর্জন দিয়ে একমাত্র জর্মনির জন্য আত্ম-বিসর্জন দিচ্ছেন।

প্রপাগণ্ডা মন্ত্রী গ্যোবেল্‌স্ ঠিক এইটেই চাইছিলেন। তিনি সেই গুজবের দাবাগ্নিতে দিলেন ঘন ঘন কুলোর বাতাস। দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ুক এ 'সত্য তত্ত্ব'। বিশ্বজন আগের থেকেই জানতো, হিটলারের জীবনধারণ পদ্ধতি ছিল চার্চিল এবং স্তালিন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। চার্চিলের মুখে জাগ্রতাবস্থায় সর্বক্ষণ অ্যাম্মোটা সিগার এবং বেলা-অবেলায় এক পেট খাঁটি স্কচ হুইস্কি। স্তালিনের ঠোঁটেও তদ্বৎ—তবে সিগারের বদলে খাঁটি রাশান পাপিরসি (সিগারেট) এবং স্কচের বদলে তিনি অষ্টপ্রহর পান করতেন, হুইস্কির চেয়েও কড়া মাল ভোদকা শরাব। দুজনাই সর্ববিধ গোস্ত গব গব করে গিলতেন। পক্ষান্তরে হিটলার ধূম্র এবং মদ্যপান করতেন না এবং তিনি ছিলেন ভেজিটারিয়ান। কাজেই তাঁকে জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারীরূপে বিশ্বজনের সম্মুখে তুলে ধরতে ডঃ গ্যোবেল্‌সের কল্পনার আশ্রয় অত্যধিক নিতে হয়নি।

হিটলারের মৃত্যুসংবাদ জর্মন জনগণকে যে শক্ দিয়েছিল, তারপর তারা যে মোক্ষমতর শক পেল তার সঙ্গে এটার কোনো তুলনাই হয় না।

যুদ্ধ-শেষে কয়েক দিন পর (মে ১৯৪৫) যে-রুশ সেনাপতি জুকফ বার্লিন অধিকার করেন তিনি প্রচার করলেন, আত্মহত্যা করবার পূর্বে হিটলার তাঁর এক রক্ষিতাকে বিয়ে করেন।

সর্বনাশ! বলে কি! সেই জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী যিনি

"দারাপুত্র পরিবার
কে তোমার তুমি কার?"

কিংবা "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" ধ্যানমন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করে সুদীর্ঘ পঞ্চবিংশ বৎসর জর্মনির জন্য বিনিদ্র ত্রিযামা যামিনী যাপন করলেন তিনি কি না শেষ মুহূর্তে ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্যবশতঃ "ধর্মচ্যুত" হয়ে বিবাহ করলেন একটা "রক্ষিতাকে"! এ যে মস্তকে সর্পদংশন।

আজ যদি শুনতে পাই (এবং এটা অসম্ভব তথা আমি মাপ চেয়ে নিয়ে বলছি) যে-ডিউক অব উইনজার তাঁর দয়িতার সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলনার্থে অবহেলে ইংলণ্ডের সিংহাসন ত্যাগ করেন, তিনি তাঁর সেই বিবাহিতা পত্নীকে ত্যাগ করে প্যারিসের কোনো গণিকালয়ে আশ্রয় নিয়েছেন তবে কি সেটা পয়লা ধাক্কাতেই বিশ্বাস করবো?

জর্মনির জনসাধারণ প্রথমটায় এ সংবাদ বিশ্বাস করতে চায়নি।

কিন্তু ব্যাপারটা তখন দাঁড়িয়েছে এই: যতক্ষণ ম্যাজিশিয়ান তার ভানুমতী খেল দেখায় ততক্ষণ দর্শক বেবাক নির্বাক হয়ে তাই দেখে, কিন্তু যে-মুহূর্তে বাজিকর "গুড নাইট" বলে অন্তর্ধান করে তন্মুহূর্তেই আরম্ভ হয় বিপুল কলরব। কী করে এটা সম্ভব হল, কী করে ওটা সম্ভব হল?—তাই নিয়ে তুমুল বাকবিতণ্ডা! এবং দু'একটি লোক যারা ম্যাজিকের সঙ্গে কিছু কিছু পরিচিত তারা অল্পবিস্তর পাকা সমাধানও তখন দেয়।

এস্থলেও তাই হল। হিটলার ম্যাজিশিয়ান যখন তাঁর শেষ খেল দেখিয়ে ইহলোক থেকে অন্তর্ধান করলেন তখন আরম্ভ হল তুমুলতর অট্টরোল। এবং এস্থলেও যাঁরা হিটলারের অন্তরঙ্গজন—হিটলারী ম্যাজিকের অর্থাৎ এফা ব্রাউনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জানতেন—তাঁরা এ-বাবদে ঈষৎ ছিটেফোঁটা ছাড়তে আরম্ভ করলেন। এঁদের কাহিনী অবিশ্বাস করার উপায় ছিল না।

ইতিমধ্যে হিটলারের খাস চিকিৎসক ডাক্তার মরেল ধরা পড়েছেন। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা বলেন সেটা আমাদের ভাষায় বলতে গেলে, "হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—এফা ব্রাউন আর হিটলার একসঙ্গে বাস করতেন বই কি—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—এবং কিছু-একটা হত হয়তো—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ।"

এ সময়ে হিটলারের উইল দলিলটি আবিষ্কৃত হয়। এটি তিনি তাঁর বিবাহের পরমুহূর্তেই ডিকটেট করে টাইপ করান এবং আপন স্বাক্ষর দেন। তাতে অন্যান্য বক্তব্যের ভিতর আছে :

"যদ্যপি আমার সংগ্রামের সময় বিবাহ এবং তজ্জনিত দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো আস্থা আমার ছিল না, তথাপি এখন, আমার মৃত্যুর পূর্বে আমি মনস্থির করে একটি রমণীকে বিবাহ করছি। আমাদের ভিতর ছিল বহু বৎসরের বন্ধুত্ব (ফ্রেণ্ডশিপ = জর্মনে ফ্রয়েণ্টশফট) এবং বার্লিন যখন চতুর্দিক থেকে শত্রুসৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত তখন তিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় আমার অদৃষ্টের অংশীদার হবার জন্য এখানে এসেছেন। তিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় আমার স্ত্রীরূপে আমার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবেন। আমি জনসেবায় নিয়োজিত ছিলুম বলে যে ক্ষতি হয়েছিল (অর্থাৎ একে অন্যের সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলুম—অনুবাদক) তার ক্ষতিপূরণ এর দ্বারা হবে।"[১]

এই এফা ব্রাউন রমণীটি কে ?

আমি ইতিপূর্বে 'হিটলারের শেষ দশ দিবস' তথা 'হিটলারের প্রেম' সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখার সময় উল্লেখ করি যে আমার জানামতে হিটলার তাঁর জীবনে সবসুদ্ধ ½ + ১ + ½ = দুইবার ভালোবেসেছিলেন। প্রথম হাফ প্রেমকে ইংরাজিতে 'কাফ্ লভ্' বলে। বাছুরের মতো ড্যাবডেবে চোখে দয়িতার দিকে তাকানো আর 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র মতো গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলা—বাঙাল দেশে যাকে বলে ঝুরে মরা। কারণ হিটলার তাঁর হৃদয়েশ্বরীর সঙ্গে কখনো সাহসভরে আলাপচারী তো করেনইনি, এমন কি চিঠিপত্রও লেখেননি। হিটলার তখন, ইংরিজিতে যাকে বলে 'টীন এজার'। এ-প্রেমটাকে সত্যকার রোমান্টিক প্লাতনিক প্রেম বলা যেতে পারে।

এর প্রায় বাইশ বৎসর পরে, যৌবনে, হিটলার পুরো-পাকা ভালোবেসেছিলেন গেলী রাউবাল নামক এক কিশোরীকে। এটিকে আমি পুরো এক নম্বর দিয়ে পূর্বোল্লিখিত "হিটলারের প্রেম" প্রবন্ধ রচনা করি। এটি স্থান পেয়েছে মল্লিখিত 'রাজা উজির' পুস্তকে। এ-অধম পারতপক্ষে কাউকে কখনো আমার

১ বৈদিক যুগে আমাদের ভিতর সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল কি না, তার সমাধান এখনো হয়নি। এস্থলে লক্ষণীয়, হিটলার নিজেকে আর্য বলে শ্লাঘা অনুভব করতেন। তাই হয়ত প্রথমে কিছুটা আপত্তি জানানোর পর এই সতীদাহে সম্মত হন। পাঠক এ-নিয়ে চিন্তা করতে পারেন।

নিজের লেখা পড়ার সলা-উপদেশ দেয় না, তবে যাঁরা রগরগে রোমান্টিক প্রেমের গল্প ছাড়া অন্য রচনা পড়তে পারেন না, তাঁরা এটি পড়ে দেখতে পারেন।

এই কিশোরী আত্মহত্যা করেন। হিটলারও হয়ত সেই শোকে আত্মহত্যা করতেন যদি না তাঁর কতিপয় অন্তরঙ্গ বন্ধু—তাঁর ফোটোগ্রাফার বন্ধু, হফ্‌মান প্রধানত—যদি তাঁকে শব্দার্থে তিন দিন তিন রাত্রি চোখে চোখে রাখতেন।

এই দুটি—½ + ১ প্রেম হয়ে যাওয়ার পর হিটলার আরেক ½ প্রেমে পড়েন—জীবনের শেষ বারের মতো। এফা ব্রাউনের সঙ্গে। এটাকে আমি হাফ প্রেম বলছি এই কারণে যে, আজ পর্যন্ত উভয়ের কোনো অন্তরঙ্গজনই এঁদের ভিতর সঠিক কি সম্পর্ক ছিল সেটা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলতে পারেননি। এফা ছিলেন অতিশয় নীতিনিষ্ঠ মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের কুমারী। হিটলার ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের প্রতি তিনি কদাচ আকৃষ্ট হননি। যে-রমণী তার দয়িতের সঙ্গে সহমরণ বরণ করার জন্য স্বেচ্ছায় শত্রুবেষ্টিত পুরীতে প্রবেশ করে, তাকে "রক্ষিতা" আখ্যা দিলে নিশ্চয়ই তার প্রতি অবিচার করা হয়।

পক্ষান্তরে এ-তত্ত্বটিও নিষ্ঠুর সত্য যে হিটলার সুদীর্ঘ বারো বৎসর ধরে এফাকে বিয়ে করতে রাজী হননি। তিনি অবশ্য তার জন্য একাধিক যুক্তি দেখিয়েছেন। সেগুলো বিশ্বাস করা-না-করা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও রুচির উপর নির্ভর করে। আমার মনে হয় তার সব কটা ভুয়ো নয়। এবং হিটলার সর্বদাই এ-জাতীয় আলোচনার সর্বশেষে মধুরেণ সমাপয়েৎ করে বলতেন, "জর্মনি ইজ মাই ব্রাইড" = জর্মনি আমার (জীবনমরণের) বধূ। এরই ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন, তাঁর শেষ উইল-এ।

অতএব এফা না ছিলেন হিটলারের রক্ষিতা, না ছিলেন তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী। সর্ব ঐতিহাসিক তাই বলেছেন, 'এ মোস্ট আনডিফাইণ্ড স্টেট'—অর্থাৎ এঁদের ভিতর ছিল এমন এক সম্বন্ধ যেটা কোনো সংজ্ঞার চৌহদ্দীতে পড়ে না।

হিটলারের সঙ্গে এফার প্রথম পরিচয় হয় ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে। বাঘা ঐতিহাসিক (যদ্যপি আমার বিচারে তিনি ট্রেভার রোপার, বুলক, নামিরের ইত্যাদির কাছেই আসতে পারেন না) শয়রার—যাঁর নাৎসিদের সম্বন্ধে বিরাট ইতিহাসের উপর নির্ভর করে নির্মিত একটা অতিশয় রসকষহীন ফিল্ম ১৯৬৯-এর গোড়ার দিকে কলকাতা তক পৌঁচেছিল—ইনি বলছেন, যে গেলী রাউবালের সঙ্গে হিটলারের প্রণয় হয় তাঁর আত্মহত্যার এক বা দুই বৎসর পর হিটলারের সঙ্গে এফা ব্রাউনের পরিচয় হয়। এ তথ্যটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য নয়। কারণ একাধিক ঐতিহাসিক বলেন আত্মহত্যা করার কয়েক দিন পূর্বে গেলী তার মামা (সম্পর্কে) হিটলারের

স্যুট সাফসুৎরো করার সময় পকেটে হিটলারকে লিখিত এফা ব্রাউনের একখানা 'প্রেমপত্র' পেয়ে যায়। গেলী আত্মহত্যা করার পর তার মা বলেন, এই চিঠিই গেলীকে আত্মহত্যার দিকে শেষ ঠেলা দেয়,—অবশ্য এ-কথা কারুর কাছেই অবিদিত ছিল না গেলীর মা এফাকে এমনই উৎকট ঘৃণা করতেন যে পারলে তার চোখ দুটো ছোবল মেরে তুলে নিয়ে, রোস্ট করে তাঁর প্যারা কুকুরকে খেতে দিতেন।

গেলী হয়ত চিঠিখানা পেয়েছিল কিন্তু সে-চিঠি যে তার হৃদয়ে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল সে-বিশ্বাস আমার হয় না। কারণ গেলীকে যিনি সবচেয়ে বেশী চিনতেন সেই হফ্‌মান বলেছেন, গেলী ভালবাসত ভিয়েনাবাসী এক কলেজের ছোকরাকে, সে প্রকৃতপক্ষে কখনো তার মামার প্রেম নিবেদনের প্রতিদান দেয়নি। তদুপরি আরেকটি কথা আছে, হিটলার তখন গেলীর প্রেমে অর্ধোন্মাদ। এফার সঙ্গে এমনি গতানুগতিক আলাপ হয়েছে। সে মজে গিয়ে হিটলারকে প্রেমপত্র লিখেছে—তরুণীরা আকছারই এ-রকম করে থাকে—এবং হিটলার এ-ধরনের চিঠি পেতেন গণ্ডায় গণ্ডায় এবং নিশ্চয়ই এফার এ-চিঠি সিরিয়াসলি নেননি।

হিটলারের সঙ্গে এফার প্রথম পরিচয় হল হিটলার-সখা ফোটোগ্রাফার হফ্‌মানের স্টুডিয়োতে। মধ্যবিত্ত সমাজের কুমারী কন্যা যতখানি লেখাপড়া করে সেইটে সেরে তিনি হফ্‌মানের স্টুডিয়োতে অ্যাসিসটেণ্টের কর্ম নেন। তাঁর কাজ ছিল, খদ্দেরদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা এবং ডার্করুমে কিছুটা সাহায্য করা। সেই সূত্রে হফ্‌মান নিতান্ত প্রফেশনালি হিটলারের সঙ্গে এফার আলাপ করিয়ে দেন।

হিটলারের কৈশোর ও প্রথম যৌবন কাটে ভিয়েনা নগরে। সে-নগরের নাগরিকরা ডানসিং, ফ্লার্টিং, প্রণয়-মিলন, পরকীয়া শিভালরিতে অনায়াসে প্যারিসের সঙ্গে পাল্লা দেয়। হিটলারও রমণীসঙ্গ খুবই পছন্দ করতেন। জর্মনির সর্বময় কর্তা হওয়ার পর তিনি তাঁর অন্তরঙ্গজনকে একাধিকবার গল্পচ্ছলে বলেছেন, "এসব বড় বড় হোটেলের গাড়োলরা যে পুরুষ ওয়েটার রাখে, তার মত ইডিয়টিক আর কী হতে পারে! এটা তো জলের মত স্বচ্ছ যে সুন্দরী যুবতী ওয়েট্রেস রাখলে ঢের ঢের বেশী খদ্দের জুটবে। আমার জীবনে ট্র্যাজেডি যে রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে যখন আমি কোন স্টেট-ব্যাঙ্কুয়েটে বসি, আমাকে বাধ্য হয়ে ডাইনে এবং বাঁয়ে বসাতে হয় এই বুড়ী-হাবড়ীকে। কারণ তাঁদের স্বামীরা দুই বুড়ো-হাবড়া রাষ্ট্রমন্ত্রী বা ভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি।...ওঃ, সে কি গব্বযন্ত্রণা।

খুশ-এখতেয়ার থাকলে তার বদলে আমি যে-কোন অবস্থায় ছোট্ট একটি নাম-না-জানা রেস্তোরাঁয় একটি ডবকী ওয়েট্রেসের সঙ্গে (মেয়েদের বেতন কম বলে কন্টিনেন্টে ছোট রেস্তোরাঁই শুধু ওয়েট্রেস রাখে) দু'দণ্ড রসালাপ করতে করতে না হয় সামান্য ডাল-ভাতই (ওদেশের ভাষায় দুই পদী খানা) খাবো—জাহান্নামে যাক স্টেট ব্যাঙ্কুয়েটের বাহান্ন পদী কোর্মা-কালিয়া, বিরয়ানি-তন্দুরী (ওদের ভাষায় শ্যাম্পেন কাভিয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি)।"

তাই হিটলারের অ্যারোপ্লেনে রাখা হত খাবস্থুরৎ হুরী, স্টুয়ার্ডেস। কিন্তু এ-কথা সবাই বলেছেন, হিটলার উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের লোক ছিলেন না।

এস্থলে নাগর পাঠককে সবিনয় নিবেদন করি, এফা ব্রাউন ছিলেন সত্য সত্যই চিত্তহারিণী অসাধারণ সুন্দরী। কিশোরী-যুবতীর সেই মধুর সঙ্গমস্থলে। কিন্তু এ-বেসরিক লেখক নারী-সৌন্দর্য বর্ণনে এযাবৎ বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি বলে নাগর রসিক পাঠককে এস্থলে সে-রস থেকে সে বঞ্চিত করতে বাধ্য হল।

এফা সুন্দরী তো ছিলেনই তদুপরি স্টুডিয়াতে যে-সব খানদানী বিত্তশালিনী তরুণী যুবতী ছবি তোলাতে আসতেন, এফা তাদের আচার-আচরণ থেকে অনেক-কিছু শিখে নিয়েছিলেন। বিশেষ করে তাদের বেশভূষা এবং অলঙ্কারাদি।... পরবর্তীকালে যখন তাঁর অর্থের কোনই অভাব ছিল না তখনো তাঁর বেশভূষাতে রুচিহীন আড়ম্বরাতিশয্য প্রকাশ পায়নি। তাঁর অর্থবৈভব শুধু একটি অলঙ্কারে প্রকাশ পেত। তাঁর বাঁ হাতে বাঁধা থাকত মহার্ঘ্য বিরল হীরেতে বসানো একটি ছোট্ট রিস্টওয়াচ। জর্মনির মত দেশের ফ্যুরার যদি প্রিয়াকে তাঁকে জন্মদিনে একটি হাতঘড়ি উপহার দেন, তবে সেটি কি প্রকারের হবে, সেটা কল্পনা করার ভার আমি বিত্তশালী পাঠকদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি।

গোড়ার দিকে হিটলার এফাকে খুব বেশী একটা লক্ষ্য করেননি।

এদিকে গেলীর মৃত্যুর পর হিটলারের জীবন বড়ই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল।

সখা হফ্‌মান তখন তাঁর চিত্তবিনোদনের জন্য সুযোগ পেলে হিটলারের প্রিয় অবসর যাপন পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। হিটলারকে নিয়ে যেতেন মিউনিকের আশপাশের হ্রদবনানীতে পিকনিকে। সঙ্গে থাকতেন হফ্‌মানের স্ত্রী, ফোটো স্টুডিয়োর দু-একজন কর্মচারী এবং এফা ব্রাউন।

ক্রমে ক্রমে হিটলার শ্রীমতী এফা ব্রাউনের প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলেন।

এর পর দেখা গেল, হফ্‌মান যদি পক্ষাধিককাল কোন পিকনিকের ব্যবস্থা না করতেন তবে স্বয়ং হিটলার তাঁর ফ্ল্যাটে উপস্থিত হয়ে বলতেন, "হেঁ হেঁ এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, তাই আপনার এখানে ঢুঁ মারলুম।" তারপর কিঞ্চিৎ ইতিউতি

করে বলতেন, "যা ভাবছিলুম···একটা পিকনিকের ব্যবস্থা করলে হয়, আপনারা তো আছেনই, আর হেঁ হেঁ ঐ ফ্রলাইন ব্রাউনকে সঙ্গে নিয়ে এলেও মন্দ হয় না,—কি বলেন ?"

তখনো হিটলার এফার প্রেমে নিমজ্জিত হননি—এবং কখনও হয়েছিলেন কি না, সে-বাবদে আমার মনে গভীর সন্দেহ আছে। পরবর্তী কাহিনী পড়ে সুচতুর—অন্তত আমার চেয়ে চতুর—পাঠক-পাঠিকা প্রেম বাবদে আপন আপন অভিজ্ঞতা-প্রসূত কূটবুদ্ধি দ্বারা আপন আপন সুচিন্তিত এবং/কিংবা সহৃদয় অভিমত নির্মাণ করে নিতে পারবেন।

ইতিমধ্যে কিন্তু শ্রীমতী এফা হিটলার প্রেমের অতলান্ত সমুদ্রের গভীর থেকে গভীরতরে বিলীন হচ্ছেন। আর হবেনই না কেন ? যদ্যপি হিটলার তখনো রাষ্ট্রনেতা হননি, তথাপি তাবৎ জর্মনির সবাই তখন জানত, রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গ যে-কোনো দিন তাঁকে ডেকে বলবেন প্রধানমন্ত্রীরূপে দেশের শাসনভার গ্রহণ করতে। তদুপরি, পূর্বেই বলেছি, হিটলার ছিলেন রমণীচিত্তহরণের যাবতীয় কলাকৌশলে রপ্ত।···এবং সর্বোপরি তিনি প্রায়ই অবরেসবরে এফাকে দিতেন ছোটখাটো প্রেজেণ্ট। বিত্তশালীজন তার দয়িতাকে যে-রকম দামী দামী ফার কোট, মোটর গাড়ি দেয়, সে রকম আদৌ ছিল না—তিনি দিতেন চকলেট, ফুল বা ভ্যানিটি কেস (আমাগো রাষ্ট্রভাষায় যারে কয় "ফুটানি কী ডিবিয়া")।

সব ঐতিহাসিক বলেছেন, এফা ছিলেন "রাদার এম্‌টি-হেডেড" অর্থাৎ সরলা বুদ্ধিহীনা। কিন্তু তাতে কি এসে যায় ? অস্মদ্দেশীয় এক বৃদ্ধ চাটুয্যে "মহারাজ"কে জনৈক অর্বাচীন শুধিয়েছিল প্রেমের খবর তিনি রাখেন কি, তিনি বৃদ্ধ, তাঁর ক'টা দাঁত আর এখনো বাকি আছে ? গোস্‌সাভরে তিনি যা বলেন তার মোদ্দা—"ওরে মূর্খ, প্রেম কি চিবিয়ে খাবার জিনিস যে দাঁতের খবর নিচ্ছিস ? প্রেম হয় হৃদয়ে।" বিলকুল হক কথা। এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলতে পারতেন, প্রেম নামক আদিরসটি মস্তিষ্ক থেকে সঞ্চারিত হয় না।

তাই এফা ঐ সব চকলেটাদি সওগাৎ বান্ধবী, সহকর্মীদের ফলাও করে দেখাত, পিকনিকের বর্ণনা ফলাওতর করে সবিস্তর বাখানিত এবং ভাবখানা এমন করত যে, হিটলার তার প্রেমে রীতিমত ডগোমগোজরোজরোমরোমরো।

এস্থলে ইয়োরোপীয় সরলা কুমারীরা যা সর্বত্রই করে থাকে (এবং অধুনা কলকাতা-ঢাকাতে তাই হচ্ছে) এফা তাই করলেন। নির্জনে একে অন্যে যখন হুঁহুঁ হুঁহুঁ, কুঁহুঁ কুঁহুঁ তখন আশ-কথা পাশ-কথার মাঝখান দিয়ে—যেন টেবিলের

ফুলদানির দেখা-না-দেখার ফুলের মাঝখান দিয়ে জর্মনে একে বলে 'থ্রু দ্য ফ্লাওয়ারস' —বিবাহ নামক সেই প্রাচীন সনাতন প্রতিষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা দিলেন। নিশ্চয়ই একাধিকবার।

পূর্বেই বলেছি, হিটলার কিন্তু পৈতে ছুঁয়ে কসম খেয়ে বসে আছেন, বিবাহ-বন্ধন নামক উদ্বন্ধনে তিনি—কাট্যাফালাইয়েও—দোদুল্যমান হতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। এবং ঝাণ্ডু ডিপ্লোমেট এই অস্বস্তিকর বাক্যালাপ কি করে এড়াতে হয়, সেটা খুব ভাল করেই জানতেন।

এটা বুঝতে সরলা, নীতিশীল পরিবারে পালিতা এফার একটু সময় লেগেছিল। ইতিমধ্যে তাঁর রক্ষণশীল পিতামাতা এফার সঙ্গে হিটলারের 'ঢলাঢলি'র খবর পেয়ে গিয়েছেন। তাঁর মেয়েকে বুঝিয়ে দিলেন হয় হিটলার তোমাকে বিয়ে করুক, নয় তুমি তার সঙ্গ ত্যাগ কর।

পিতামাতার প্রতি বিনম্রা এই কুমারী তখন কি করে?

হঠাৎ ঐ সময়ে একদিন হফ্‌মান সখা হিটলারকে টেলিফোন করলেন, "যদ্দূর সম্ভব তাড়াতাড়ি আমার বাড়ি চলে আসুন।"

হিটলার: "কেন, কি হয়েছে?"

হফ্‌মান: "আসুন না; সব কথা এখানে হবে।" হফ্‌মান এবং হিটলার দুজনেই জানতেন তাঁদের টেলিফোনের কথাবার্তা পুলিস ট্যাপ্ করে।

হিটলার কয়েক মিনিটের মধ্যেই হফ্‌মানের ফ্লাটে পৌঁছলেন। শুধোলেন, "কি হয়েছে? ব্যাপার কি?"

হফ্‌মান: "বড় সিরিয়াস। একা পিস্তল দিয়ে বুকে গুলি মেরে আত্মহত্যা করার চেষ্টা নেয়। তাকে অচৈতন্য অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়—"

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় হিটলার বাধা দিয়ে বললেন, "কিন্তু জানাজানি হয়নি তো—তাহলেই তো সর্বনাশ!"

এস্থলে লক্ষণীয় যে হিটলার দুঃসংবাদ পাওয়া মাত্রই সর্বপ্রথম নিজের স্বার্থের কথাই ভেবেছেন। তাঁর পার্টি এবং বিশেষ করে গ্যোবেল্‌স্ সাধারণ্যে তাঁর যে "ইমেজ" গড়ে তুলছিলেন, সেটা জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারীর। এখন যদি তাঁর দুশমন কম্যুনিস্টরা জেনে যায় যে, তিনি গোপনে একটা মেয়ের সঙ্গে ঢলাঢলি করতেন এবং সেই সরলা কুমারী যখন যুক্তিসঙ্গত নীতিসম্মত পদ্ধতিতে হিটলারকে সেই ভাব-ভালোবাসার অন্তে যে প্রতিষ্ঠান থাকে, অর্থাৎ বিবাহ, সেটা প্রস্তাব করে তখন তিনি ধড়িবাজ, কাপুরুষ, বেইমানের মতো মেয়েটাকে ধাপ্পা মারেন, এবং ফলে ভগ্নহৃদয়া কুমারী আত্মহত্যার চেষ্টা করে, তবেই তো চিত্তির! যে নাৎসি

পার্টির নেতা এ-রকম একটা পিশেচ সে পার্টির কী মূল্য? এই বেইমান পার্টিতে আস্থা রাখবে কোন্ ভদ্র ইমানদার জর্মন? এবং ভুললে চলবে না, মাত্র বছর দুই পূর্বে গেলী রাউবালও আত্মহত্যা করে—যদিও সে সময় কম্যুনিস্টরা সেই সুবর্ণ-সুযোগের সিকি পরিমাণ ফায়দাও ওঠাতে পারেনি, অর্থাৎ একসপ্লয়েট করতে পারেনি।

কিন্তু মাভৈঃ! কন্দর্প নির্মিত এ-সব সংকটে প্রায়শ তিনি বিধাতার ন্যায়-নীতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে প্রেমিক-প্রেমিকার তাবৎ মুশকিল আসান করে দেন।

হফ্‌মান সঙ্গে সঙ্গে হিটলার তথা নাৎসি পার্টির জীবনমরণ সমস্যা সমাধান করে বললেন, "নিশ্চিন্ত থাকুন। জানাজানি হয়নি। কারণ এফাকে অচৈতন্য অবস্থায় যে সার্জনের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তিনি আমার নিকট-আত্মীয়। তাকে এমনভাবে কড়া পাহারায় রেখেছেন যে, পুলিস পর্যন্ত সেখানে পৌঁছতে পারেনি। তিনি স্বয়ং আমাকে খবরটা জানিয়েছেন।"

তখন, এই প্রথম হিটলার প্রেয়সীর অবস্থা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। না—ফাঁড়া কেটে গিয়েছে, তবে এফা রক্তক্ষরণহেতু বড্ডই দুর্বল।

শুধু এফার ফাঁড়া কেটে গেল তাই নয়, স্বয়ং হিটলার এবং নাৎসি পার্টিরও ফাঁড়া কেটে গেল। অবশ্য কিছুটা কানাঘুষো হয়েছিল, কিন্তু জানাজানি হয়নি।

ব্যক্তিগত সম্পর্কে হিটলার যে খুব একটা নেমকহারাম ছিলেন তা নয়। এই আত্মহত্যার প্রচেষ্টা থেকে হিটলার বুঝে গেলেন এফার প্রেম কতখানি গভীর—বল্লভার ব্রেন-বাক্সে কিছু থাক আর নাই থাক, তার গলা থেকে নাভিকুণ্ডলী অবধি জুড়ে বসে আছে একটা বিরাট হৃদয়—সেখানে না আছে ফুসফুস না আছে লিভার স্প্লীন কিডনি না আছে অন্য কোনো যন্ত্রপাতি।

এ-হেন হৃদয়কে তো অবহেলা করা যায় না।

এতদিন হিটলার যে-প্রেম করতেন এফার সঙ্গে সেটার পদ্ধতি ছিল মোটামুটি জর্মন কলেজ-স্টুডেন্টরা তাদের বান্ধবীর (ফ্রয়েণ্ডিন=গার্ল ফ্রেণ্ডের) সঙ্গে যে ভাবে করে থাকে। অর্থাৎ সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর এফা তাঁর নাইট গাউন ইত্যাদি রাত্রের পোশাক একটি অতি ছোট্ট স্যুটকেসে পুরে চুপিসাড়ে ঢুকতেন হিটলারের ফ্ল্যাট বাড়িতে। বাড়ির পাঁচজন জেগে ওঠার পূর্বেই, ভোরবেলা, ফের চুপিসাড়ে চলে যেতেন আপন ফ্ল্যাটে।

এবারে হিটলার করলেন ভিন্ন ব্যবস্থা। ততদিনে তিনি রীতিমত বিত্তশালী হয়ে গিয়েছেন। হিটলারের আপন কর্মস্থল ম্যুনিক শহরে তিনি এফার জন্য

ছোট্ট একটি ভিলা, মোটর কিনে দিলেন এবং মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিলেন।

অর্থাৎ তিনি হিটলারের একমাত্র রক্ষিতা হিসাবে হিটলারমণ্ডলীতে আসন পেলেন। এস্থলে "রক্ষিতা" বলাটা হয়ত ঠিক হল না। কারণ ইয়োরোপের প্রায়ই অনেকে কয়েক বৎসর পরে এই রক্ষিতাকে বিয়ে করে তাকে সমাজে তুলে নেন। এবং সমাজপতিরাও বধূর অতীত সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তোলেন না। আরেকটি দৃষ্টান্ত দিই: এদেশে যদি বিয়ের তিন চার মাস পর কোনো রমণী বাচ্চা প্রসব করে, তবে হইচই পড়ে যায়। ইয়োরোপে আদৌ না। আমার যতদূর জানা গির্জা পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন না তুলে বাচ্চাটাকে ব্যাপ্টিস্ট করে তাকে ধর্মতঃ সমাজে তুলে নেয়।

অবশ্য হিটলার সমস্ত ব্যবস্থাটা করলেন অতিশয় গোপনে। পূর্বেই বলেছি, তাঁর এবং এফার চাকর মেড্ তথা অতিশয় অন্তরঙ্গজন হাড়ে-মাসে জানতেন যে তাঁরা যদি এই প্রণয়লীলা নিয়ে সামান্যতম আলোচনা করেন—বাইরের লোককে খবরটা জানাবার তো কথাই ওঠে না—তাহলে তিনি পার্টির জব্বর পাণ্ডাই হন আর জমাদারণীই হোক, তাঁরা যে তদ্দণ্ডেই পদচ্যুত বহিষ্কৃত হবেন তাই নয়, কপালে গুম-খুনও অনিবার্য। কারণ হিটলার বহু বিষয়ে নির্মম। দেশের কর্ণধার হওয়ার পূর্বে এবং পরেও হিটলার হিমলার বিস্তর গুম-খুন করিয়েছেন।

ওদিকে এফার যে ধার্মিক চরিত্রশীল জনক-জননী হিটলারের সঙ্গে তাঁদের কুমারী কন্যার অন্তরঙ্গতার কঠোর কঠিনতম প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, তাঁরাও এ-ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে নিলেন। এটাকে প্রতিরোধ করলে একগুঁয়ে মেয়ে যদি আবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে, এবং যদি সফল হয়ে যায়!

আমার দুঃখ শুদ্ধ-পাঠটি আমার মনে নেই: মোটামুটি যে মেয়ে—

"মরণেরে করিয়াছে জীবনের প্রিয়।
কারো কোনো উপদেশ কান দিবে কি ও?"

এফার নিতান্ত ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গজন ছাড়া আর সবাই বিশ্বাস করতো, এফা ফোটোগ্রাফ দোকানে কাজ করেন। তিনি হফ্মানের স্টুডিয়োতে প্রতিদিন হাজিরা দিতেন।

এর কিছুদিন পরে ১৯৩৩-এর ৩০-এ জানুয়ারি হিটলার হয়ে গেলেন জর্মনির কর্ণধার—প্রধানমন্ত্রী চ্যানসেলার। তাঁকে তখন স্থায়ীভাবে বাস করতে হল বার্লিনে—ম্যুনিক পরিত্যাগ করে। এখন তিনি এফাকে নিয়ে পড়লেন বিপদে।

এতদিন শুধু কম্যুনিস্টরাই তাদের আধা-পাকা গোয়েন্দাগিরি করেছে হিটলারের। এবারে জুটলো তাবৎ মার্কিন খবরের কাগজের দুঁদে দুঁদে রিপোর্টার—পূর্বোক্ত "ঐতিহাসিক" শায়রারও তাদেরই একজন। এদের চোখ দু-নলা বন্দুকের মতো গভীর অন্ধকারেও এক্স-রে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে জানে শিকারের দিকে। এবং কারো যে কোনো ব্যক্তিগত জীবনের প্রাইভেসি থাকতে পারে সেটা তাদের শাস্ত্রে —আদৌ যদি তাদের কোনো শাস্ত্র থাকে—লেখে না। পাঠক শুধু স্মরণে আনুন ইংলণ্ডের রাজা যখন মিসেস সিমসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছেন তখন সে "কেচ্ছা"কে তারা কী কেলেঙ্কারির রূপ দিয়ে দিনে দিনে রসিয়ে রসিয়ে মার্কিন কাগজে প্রকাশ করেছে! তার তুলনায় হিটলার কোন্ ছার। ব্যাটা আপস্টার্ট যুদ্ধের সময় ছিল নগণ্য করপরেল—তার আবার প্রাইভেট লাইফ! সেটাকেও আবার রেহাই দিতে হবে! ছোঃ!

কাজেই এফাকে বার্লিনে আনা অসম্ভব।

ফলস্বরূপ ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫-এ হিটলারের আত্মহত্যা করা পর্যন্ত সুদীর্ঘ বারোটি বৎসর—কবির ভাষায় নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ বৎসর—এফা পেলেন আগের তুলনায় অল্পই, এবং ক্রমশঃ হ্রাসমান। তাই সহমরণের বহু আগের থেকেই এফা একাধিক বন্ধুবান্ধবীকে বিষণ্ণকণ্ঠে বলেছেন, "১৯৩৩-এর জানুয়ারি (অর্থাৎ হিটলার যেদিন চ্যানসেলর হন) আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা নির্মম দিবস (ট্র্যাজিক ডে, 'ট্রাগিশা টাখ')।"

যেদিন মিত্রপক্ষ ফ্রান্সে অবতরণ করে কালক্রমে জর্মনি জয় করে সেটাকে বলা হয় ডী-ডে (D-Day)। সেটা ৬ই জুন ১৯৪৪। ১৯৩৩-এর ৩০ জানুয়ারিতেই কিন্তু আরম্ভ হয় অভাগিনী এফার ডী-ডে। কিন্তু এসব কথা পরে হবে।

বার্লিনে কর্মব্যস্ত হিটলার ম্যুনিকে আসার সুযোগ পেতেন কমই। কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ম্যুনিকে ট্রাঙ্ককল করে তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ধরে আলাপ করে নিতেন। এবং টেলিফোন লাইনটি এমনভাবে নির্মিত ছিল যে, এফা হিটলার কনেকশন হয়ে যাওয়া মাত্রই দুই প্রান্তের টেলিফোন অপরাটেররা কিছুই শুনতে পেত না।...এবং যে স্থলে ট্রাঙ্ককলের অষ্টপ্রহর ব্যাপী এহেন সুবিধা সেখানে চিঠিচাপাটির বিশেষ প্রশ্ন ওঠে না—ওদিকে আবার চিঠিপত্র লেখার ব্যাপারে হিটলার ছিলেন হাড় আলসে। (জর্মনে "স্টিওঙ্কেতের শ্রাইবফাউল"দু=গন্ধময় লেখন-আলসে)। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যখন আক্ষরিক অর্থে হিটলারের দম ফেলার ফুরসৎ নেই, ক্রমাগত একটার পর আরেকটা মিলিটারি কনফারেন্স হচ্ছে—

তখন তিনি তাঁর অন্তরঙ্গতম ভ্যালে লিঙেকে বলতেন, "হে লিঙে, তুমি ঝপ করে এফাকে দুটি লাইন লিখে দাও না।" তখন প্রায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় হিটলারের কোনো-না-কোনো কর্মচারী প্লেনে করে ম্যুনিক যাচ্ছে। ঘণ্টা তিনেকের ভিতর চিঠি এফার হস্তগত হত।

ভ্যালে বলতে ভৃত্যও বোঝায়। কাজেই পাঠক নিশ্চয়ই মর্মাহত হয়ে শুধাবেন, "কী! চাকরকে দিয়ে প্রিয়ার উদ্দেশে চিঠি লেখানো! সখ্‌ৎ বেআদবী তো বটেই—তার চেয়ে বটতলার 'সচিত্র প্রেমপত্র' থেকে দু-পাতা কেটে নিয়ে খামে পাঠিয়ে দেওয়া ঢের ঢের বেশী শৃঙ্গাররসসম্মত!" কিন্তু পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিই—হিটলার, এফা ও ভ্যালে লিঙে তিনজনই ছিলেন নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। এমন কি লিঙের সামাজিক (রাজনীতির কথা হচ্ছে না) প্রতিষ্ঠা ছিল হিটলারের চেয়ে উচ্চতর পর্যায়ের। তদুপরি, হিটলারের হাজার হাজার খাস সেনানীর (এস-এ) মাঝখান থেকে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর লিঙেকে বেছে নেওয়া হয়েছিল এবং সেনাবাহিনীতে তিনি ছিলেন প্রায় কর্নেলের কাছাকাছি। এবং সর্বশেষ বক্তব্য, হিটলার ম্যুনিকে এলেও তাঁর অধিকাংশ সময় কাটতো রাষ্ট্রকার্যে। সে-সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা এফাতে লিঙেতে সময় কাটাতেন গালগল্প করে। এফা জানতেন, পুরুষদের ভিতর লিঙেই দশ-বারো বছর ধরে হিটলারের সবচেয়ে নিকটবর্তী এবং হিটলারও তাঁর সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতেন। এফা মেয়েদের ভিতর সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তিনী। অতএব দুজনার ভিতর একটা অন্তরঙ্গতা জমে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। আমার মনে হয়, এফা এই লিঙেকে তাঁর হৃদয়বেদনা যতখানি খুলে বলেছেন, অন্য আর কাউকে অতখানি বলেননি।[২]

অন্যত্র সবিস্তর লিখেছি, হিটলারের মৃত্যুর পর লিঙে রুশহস্তে বন্দী হন এবং দীর্ঘ দশ বৎসর রুশ-কারাগারের দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করার পর জর্মনিতে ফিরে এসে হিটলার সম্বন্ধে একখানি চটি বই লেখেন। এফা সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠক এই

২ এফার সঙ্গে লিঙের আরেকটা মিল আছে। বার্লিন যখন প্রায় চতুর্দিক থেকে বেষ্টিত, শেষ পরাজয় সুনিশ্চিত, কিন্তু পালাবার পথ তখনো ছিল, সে-সময় হিটলার লিঙেকে ডেকে বলেন, "তুমি আপন বাড়ি চলে যাও।" লিঙে অসম্মতি জানান এবং সংক্ষেপে যা বলেন তার মোদ্দা: যাঁকে আমি এত বৎসর ধরে সেবা করেছি তাঁকে তাঁর শেষ মুহূর্তে আমি ত্যাগ করতে পারবো না। এবং সবাই জানেন, এফাও হিটলারের কড়া আদেশ সত্ত্বেও তাঁকে ত্যাগ করেননি।

পুস্তিকায়ই তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী এবং সবচেয়ে বিশ্বাস্য খবর পাবেন। হিটলার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিবিন্দু থেকে, কিন্তু এফা সম্বন্ধে লিখেছেন বড়ই দরদ-ভরা ভাষায়। তিনি ইচ্ছে করলেই হিটলার এফার সম্পর্ক সম্বন্ধে রগরগে মার্কিনী ভাষায় "কেলেঙ্কারি কেচ্ছা" লিখতে পারতেন—কোনো সন্দেহ নেই তিনি রুশ দেশ থেকে পশ্চিম জর্মনিতে ফেরা মাত্রই মার্কিন রিপোর্টাররা তাঁকে চেপে ধরে, অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে হিটলার এফার নব "বিদ্যাসুন্দরে"র জন্য আপ্রাণ পাম্প করেছিল কিন্তু সে-সময় বিশেষ কিছু তো বলেনই নি, পরেও পুস্তিকা রচনাকালে লিখেছেন যেটুকু নিতান্তই না লিখলে সত্য গোপন করে এফার প্রতি অবিচার করা হয়। এই অন্তর্নিহিত শালীনতাবোধ ছিল বলেই হিটলার ও এফা উভয়েই তাঁকে বন্ধুর চোখে দেখতেন। এটা এমন কিছু সৃষ্টিছাড়া আজগুবী ব্যাপার নয়। এ দেশের পাঠান দাসবংশের ইতিহাস যাঁরা মন দিয়ে পড়েছেন, তাঁরাই এর সত্যতার নজীর সে-ইতিহাসে পাবেন। এবং লিঙে তো কিছু ক্রীতদাস নন !!

তাই এফাতে লিঙেতে এমনিতেই চিঠিপত্র চলতো। হিটলার সেটা জানতেন। তাই তিনি যে কাজকর্মে আকণ্ঠ নিমগ্ন, তিনি যে ফোন করার জন্য মন্ত্রণাকক্ষ ত্যাগ করে পাঁচ মিনিটের তরেও আপন খাস কামরায় যেতে পারছেন না, এটা তাঁর গাফিলতি নয়, বস্তুত তাঁর এই অপারগতা সম্বন্ধে তিনি নিজেকে দোষী মনে করেন—এসব কথা লিঙেকে গুছিয়ে লিখতে বলতেন।

হিটলার যে এফাকে কখনো বার্লিনে আসতে দিতেন না তা নয়। অবশ্য অতিশয় কালেকস্মিনে। জব্বর পার্টি-পরবের স্টেট ব্যাঙ্কুয়েট না থাকলে অন্তরঙ্গজন তথা এফার সঙ্গে তিনি ডিনার-লাঞ্চে বসতেন। এফাকে তাঁর বাঁ-দিকের চেয়ারে বসাতেন। এফা ঠিকমতো খাচ্ছেন কি না, তাঁর পছন্দসই খানা তৈরি হয়েছে কি না তাই নিয়ে পুতু-পুতু করতেন এবং সবাই বুঝতে পারতো তিনি এফাকে সর্বাপেক্ষা বেশী সম্মান দেখাচ্ছেন। কিন্তু যেদিন স্টেট ব্যাঙ্কুয়েট বা বাইরের লোক খানা খেতে আসতো, সেদিন এফাকে উপরের তলায় হিটলারের চারজন মহিলা সেক্রেটারি ও তাঁর খাদ্যরন্ধনের অধিকর্ত্রীর[৩] সঙ্গে খানা খেতে হত। অবশ্য এ ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হল, যখন হিটলারের দফতরের এক উচ্চ

৩ ইংরেজের স্বারির "বামনাই"য়ের দুটি চূড়ান্ত বেশরম, বেহায়া উদাহরণ পাঠক এ-স্থলে পাবেন। হিটলার নিরামিষাশী ছিলেন ও তদুপরি তাঁকে বিশেষ বিশেষ খাদ্য খেতে হত ; অর্থাৎ তিনি ডায়েট খেতেন। সে-সব বিষয়ে রান্না বড়

অফিসার, ফেগেলাইন বিয়ে করলেন এফার এক বোনকে। তখন হিটলার-সমাজের একটুখানি বৃহত্তর চক্রে এফাকে পরিচয় দেওয়া হত, সম্মানিত অফিসার ফেগেলাইনের শ্যালিকারূপে! মায়ের ছেলে নয়, শাশুড়ীর মেয়ের বর!

বিরাট বিরাট লক্ষজন পরিপূর্ণ সভাতে, যেখানে হিটলার ওজস্বিনী বজ্রভাষিণী থাণ্ডারী লেকচার ঝাড়বেন, সেখানেও তাঁকে বিশেষ আসন দেওয়া হত না। তাঁর এবং হিটলারের আর পাঁচজন কর্মচারীর সঙ্গে তিনি সবার সঙ্গে মিশে গিয়ে দয়িতের জনগণমনচিত্তহারিণী বক্তৃতা শুনতেন।

হায়! একে কি বলবো—"বড় দুঃখে সুখ" বা "বড় সুখে দুঃখ"? আমি এ-বাবদে মূর্খ—আবার বিদগ্ধ, সম্মানিত সখা "শিব্রাম" এ রকম একটা মোকা পেলে ঝপ্ করে একটা অকল্পনীয় পান করে খপ্ করে একটা আরো অচিন্তনীয় সুমধুর সুভাষিত ম্যাক্সিম বানিয়ে ফেলতেন পুরো দেড় গণ্ডা শব্দ ব্যবহার না করেই। এই একটা ব্যাপারে লোকটা মকৃথী-চোস্ কঞ্জুস। অভিধানের শব্দ-ভাণ্ডার যেন ব্যাঙ্কের ভল্টে লুকানো চিত্র-তারকাদের—সক্কলের না কারো-

---

বড় হোটেলের "শেফ"-রাও রাঁধতে জানে না। তাই ডাক্তারদের আদেশে তাঁকে নিযুক্ত করতে হয় একটি অতিশয় উচ্চশিক্ষিতা মহিলাকে। ইনি সর্বোচ্চ সম্মানসহ এম. ডি. পাস করার পর বিশেষভাবে স্পেশালাইজ করেন কিভাবে বিশেষ বিশেষ খাদ্য দিয়ে রুগীকে সারানো যায়। (আমাদের কবিরাজ ঠাকুমা-দিদিমারা যা করে থাকেন) এবং যারা শীতের দেশে নিরামিষাশী তাদের খাদ্য কিভাবে তৈরি করতে হয়—যাতে করে মাছ-মাংসের অভাব পরিপূরণ করা যায়। ইংরেজ এই সম্ভ্রান্ত মহিলাকে বার বার "কুক", "পাচিকা", "রাঁধুনী বামনী", "বাবুর্চী" বলে তাচ্ছিল্যভরে উল্লেখ করে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছে। তিনি প্রায়ই এঁর সঙ্গে ডিনার খেতেন। ভাবটা এই, ছোট জাতের হিটলার—আর "রাঁধুনী", "বাবুর্চী" ছাড়া কার সঙ্গে হৃদ্যতা করবে! এবং সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ ইংরেজের স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যায় এবং মহিলার পাণ্ডিত্যের কথা বলতে বেবাক ভুলে যায়। এবং ভুলে যায় বলতে, মহিলাতে হিটলারেতে খেতে খেতে "মোচার ঘণ্টে কতখানি গুড় দিতে হয়" সে নিয়ে আলোচনা হত না। আলোচনা হত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান নিয়ে। ...এবং পূর্বেই বলেছি, লিঙের শিক্ষাদীক্ষা পদমর্যাদা "ভুলে গিয়ে" ঠিক এই উদ্দেশ্য নিয়ে "ভ্যালে চাকর" নামে তাকে হীন করার চেষ্টা করেছে।...হিটলারের আদেশ সত্ত্বেও তিনি লিঙেরই মতো হিটলারকে ত্যাগ করতে সম্মত হননি। আমার যতদূর জানা, তিনি বার্লিনে নিহত হন। প্রভুভক্তির ফলস্বরূপ।

কারোর—ইনক্যাম-ট্যাক্স অফিসারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শক সম্পদ।

আমি কিন্তু দেখছি, এর ট্র্যাজিক দিকটা। পিতামহ ভীষ্মের পরই যে-বীরকে এ-ভারত সর্বসম্মত স্বীকৃতি দিয়েছে তিনি একচক্রা ভদ্রোত্তম কমাণ্ডর-ইন-চীফ্ ফীল্ড-মার্শাল কর্ণ। তিনি যখন কুরুপ্রাঙ্গণে শৌর্যবীর্য দেখাচ্ছেন, তখন মাতা কুন্তী তাঁর প্রতি-সাফল্যে কি তাঁর মাতৃগর্ব, মাতৃশ্লাঘা প্রকাশ করতে পেরেছিলেন? শাস্ত্রোদ্ধৃতি দিতে পারবো না, তবে বাল্যবয়সের আমার সংস্কৃত শিক্ষার প্রথম গুরু আমাকে সঙ্গোপনে কেমন যেন ভয়ে ভয়ে বলেছিলেন, মাতা কুন্তীর সর্বাপেক্ষা প্রিয়সন্তান ছিলেন কর্ণ।

এফা ব্রাউনের ঐ একই ট্রাজেডি। সবজনসমক্ষে তিনিও গাইতে পারেন না—"বঁধু তুহাঁরি গরবে গরবিনী হম, রূপসী তুহাঁরি রূপে।"

অভিমানিনী পাঠিকা, তুমি হয়তো শুধোবে, এ-হেন ভণ্ডামীর অপমানজনক পরিস্থিতি এফা মেনে নিলেন কেন? এর উত্তরে আমার নিজের কোনো মন্তব্য না দিয়ে শুধু নিবেদন:

"চন্দ্রাবলী কুঞ্জে গিয়ে
সারা নিশি কাটাইয়ে
প্রভাতে এসেছ, শ্যাম,
দিতে মনোবেদনা॥"

হিটলার

উৎসর্গ

প্রহর শেষে আলোয় রাঙা
সেদিন মধুমাস,
পূরবী গেয়ে ভোলালি তোরা,
চাইনে তো বিভাস !

বাণীর একনিষ্ঠা সাধিকা
অখণ্ডসৌভাগ্যবতী বধূ
কল্যাণীয়া
শ্রীমতী অর্চ্চনা
তথা
পুত্রপ্রতিম অপিচ দিলের দোস্ত
নূর-ই-চশ্‌ম
শ্রীমান দ্বারিক মিত্রের
চতুর্ভদ্র করকমলে

রথযাত্রা, ১৩৪৭
কলকাতা।

আনকূল্‌
সৈয়দ মুজতবা আলী

হিটলারের শেষ দশ দিবস

ঠিক কুড়ি বৎসর আগে, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল বেলা সাড়ে তিনটের অল্প পূর্বে হিটলার তাঁর অ্যার-রেড্ শেল্টার (বুঙ্কার—মাটির গভীরে কন্‌ক্রিটের পঞ্চাশ ফুট ছাতের নিচের আশ্রয়স্থল—কামানের বা প্লেন থেকে ফেলা গোলা বুঙ্কারের গর্ভ পর্যন্ত কিছুতেই পৌছতে পারে না) থেকে বেরিয়ে করিডরে এলেন। সঙ্গে তাঁর নব-পরিণীতা বধূ এফা, প্রায় পনেরো বৎসরের 'বন্ধুত্বে'র (হিটলারের শেষ উইলে তিনি এই শব্দটিই ব্যবহার করেছেন—বস্তুত নিতান্ত অন্তরঙ্গ কয়েক-জন অনুচর ভিন্ন দেশের-দশের লোক জানত না যে হিটলার ও এফার মধ্যে সম্পর্ক ছিল স্বামী-স্ত্রীর) পর তিনি প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা পূর্বে এঁকে বিয়ে করেছেন। করিডরে গ্যোবেল্‌স্, বরমান প্রভৃতি প্রায় পনেরোজন তাঁর নিকটতম মন্ত্রী, সেক্রেটারি, সেনাপতি, স্টেনো, খাস অনুচর-চাকর সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। হিটলার ও এফা নীরবে একে একে সকলের সঙ্গে করমর্দন করলেন। তারপর নিতান্ত যে ক'জনের প্রয়োজন তাঁরা করিডরে রইলেন—বাদ-বাকিদের বিদায় দেওয়া হল। হিটলার ও এফা খাস কামরায় ঢুকলেন। অনুচররা বাইরে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে একটিমাত্র পিস্তল ছোঁড়ার শব্দ শোনা গেল। অনুচররা আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন—তাঁরা ভেবেছিলেন দুটো শব্দ হবে। সেটা যখন শোনা গেল না তখন তাঁরা কামরার ভিতরে ঢুকলেন। সেখানে দেখতে পেলেন, তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে বসে আছেন, কিংবা পড়ে আছেনও বলা যেতে পারে। তাঁর খুলি, মুখ এবং যে সোফাটিতে তিনি বসেছিলেন সব রক্তাক্ত। কেউ কেউ বলেন, তিনি মুখের ভিতর পিস্তল পুরে আত্মহত্যা করেছেন, কেউ কেউ বলেন, কপালের ভিতর দিয়ে গুলি চালিয়ে। তার কাঁধে এফার মাথা হেলে পড়েছে। এফার কাছেও মাটিতে একটি ছোট পিস্তল। কিন্তু তিনি সেটা ব্যবহার করেননি। বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

তারপর কুড়িটি বৎসর কেটে গেলে পর ইয়োরোপের অনেক ভাষাতেই সেদিনের স্মরণে ও তার সপ্তাহ খানেক পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার উপলক্ষে বহু প্রবন্ধ বেরিয়েছে।

আমার কাছে আসে প্রধানত জর্মনি, অস্ট্রিয়া ও সুইটজারল্যাণ্ড থেকে প্রকাশিত জর্মন ভাষায় লিখিত সাপ্তাহিক। এগুলোর আসতে প্রায় দু' মাস সময় লাগে। অ্যার-মেল হওয়ার ফলে বুকপোস্ট, ছাপা-মাল যে কী জঘন্য শম্বুক

গতিতে আসে সে-কথা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন।

হিটলারের মৃত্যুর পর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ অন্তর্ধান করেন। কেউ কেউ ধরা পড়েন রাশানদের হাতে। তার মধ্যে হিটলারের খাস চাকর (ভ্যালে) লিঙেও ছিলেন। কেউ কেউ লুকিয়ে থাকেন মার্কিন-ইংরেজ-ফরাসী অধিকৃত এলাকায়। এঁরাও ধরা পড়েন, প্রধানত মার্কিনদের দ্বারা। আর কারো কারো কোনো সন্ধানই পাওয়া যায়নি। যেমন বরমান ইত্যাদি কয়েকজন। এঁদের কে কে পালাবার সময় হত হন বা পালাতে সক্ষম হন জানা যায়নি।

গোড়ায়, অর্থাৎ হিটলারের মৃত্যুর কয়েকদিন পর রুশ জঙ্গীলাট জুকফ প্রচার করেন যে, হিটলার এফা ব্রাউনকে বিয়ে করার পর আত্মহত্যা করেন। ওদিকে মস্কোতে বসে স্তালিন বলেন, হিটলার মরেননি, তিনি ডিক্‌টেটর ফ্রাঙ্কোর আশ্রয়ে স্পেনে আছেন (স্তালিনের মতলব ছিল এই অছিলায় ইয়োরোপের শেষ ফ্যাশী ডিক্‌টেটর ফ্রাঙ্কোকে খতম করা)। এমন কি কোনো কোনো উচ্চস্থলে একথাও বলা হল যে, ইংরেজ (!) তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে। ইংরেজকে তখন বাধ্য হয়ে পাকাপাকি তদন্ত করতে হয় যে হিটলার সত্যই বুঙ্কার থেকে পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন কি না, কিংবা তিনি মারা গিয়েছেন কি না। এ কাজের ভার দেওয়া হয় ইতিহাসের অধ্যাপক, যুদ্ধকালীন গুপ্তচর বিভাগের উচ্চ কর্মচারী ট্রেভার রোপারকে।

তিনি তাঁদেরই সন্ধানে বেরুলেন যাঁরা হিটলারের সঙ্গে বুঙ্কারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন। এঁদের কয়েকজন হিটলারের মৃত্যু, দাহ, অস্থি-সমাধি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বর্ণনা করেন। কিন্তু বুঙ্কার ও তৎসংলগ্ন ভূমি তখন রাশানদের অধিকারে (পূর্ব বার্লিনে); তারা সেখানে অধ্যাপককে কোনো অনুসন্ধান করতে দিল না। হিটলারের যে সব সাঙ্গোপাঙ্গ রাশানদের হাতে ধরা পড়েন তাঁরা যে সব জবান-বন্দি দেন সেগুলোও অধ্যাপককে জানানো হল না।

হিটলারের মৃত্যুর সাত মাস পরে ট্রেভার রোপার তাঁর রিপোর্ট সরকারের হাতে দেন ও সেটি প্রকাশিত হয়। এর পর আরো তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয় বটে, কিন্তু অধ্যাপক তাঁর ময়না-তদন্তে যে বর্ণনাটি দেন তার বিশেষ কোনো রদ্‌-বদল করার প্রয়োজন হয়নি। এসব মিলিয়ে ট্রেভার রোপার সর্বসাধারণের জন্য একখানি পুস্তিকা রচনা করে ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত করেন। তার নাম 'লাস্ট্‌ ডেজ্‌ অব হিটলার।'

এ পুস্তিকা ইয়োরোপের প্রায় সর্ব ভাষাতেই অনূদিত হয়, এবং তার যুক্তিতর্ক এমনই অকাট্য যে জনসাধারণ হিটলারের মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়। ওদিকে

সরকারী রাশান মত—হিটলার মারা যাননি।—তাই লৌহ-যবনিকার অন্তরালে বইখানি নিষিদ্ধ বলে আইনজারী করা হল।

কিন্তু শেষটায় রাশানদেরও স্বীকার করতে হল যে হিটলার জীবিত নেই। কাশীরাম দাস পূর্বেই বলে গেছেন :—

কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে
কতক্ষণ থাকে শিলা শূন্যেতে মারিলে।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে স্তালিনকে প্রায় সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সৃষ্টিকর্তার আসনে তুলে 'দি ফল্ অব বার্লিন' ফিল্ম্ রাশাতে তৈরী হল। এ ছবি এদেশেও এসেছিল। এতে হিটলারের মৃত্যু যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে সেটা মোটামুটি ট্রেভার রোপারের বর্ণনাই। মাত্র একটি বিষয়ে তফাত। ছবিতে দেখানো হয়েছে হিটলার বিষ খেয়ে মরলেন—অথচ হিটলার যে পিস্তল ব্যবহার করেছিলেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই পরিবর্তনের কারণ কি তাই নিয়ে অধ্যাপক তাঁর পুস্তকের পরবর্তী সংস্করণে সবিস্তর আলোচনা করেছেন—এ স্থলে সেটা নিষ্প্রয়োজন। অধিকাংশ পণ্ডিতের বিশ্বাস, to make assurance doubly sure হিটলার বিষের পিলে কামড় ও পিস্তলের গুলি ছোঁড়েন একই সঙ্গে।

রুশদেশে দশ বছর জেল খাটার পর ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে হিটলারের কয়েকজন পার্শ্বচর মুক্তি পান। তার ভিতর একজন হিটলারের ভ্যালে লিঙে। ইনি বেরিয়ে এসেই দীর্ঘ একটি বিবৃতি দেন। এদেশের অমৃতবাজার পত্রিকায়ও সেটি ধারাবাহিক বেরয়। অন্যজন হিটলারের এ্যাড্জুটাণ্ট গ্যুন্শে। ইনি ও লিঙে যে সব বিবৃতি দিলেন, সেগুলোর সঙ্গে অধ্যাপকের বইয়ে গরমিল অতি কম, এবং তাও খুঁটিনাটি নিয়ে।

অধ্যাপকের 'লাস্ট্ ডেজ্ অব হিটলার' বেরনোর পর ঐ বিষয় নিয়ে প্রচুর লেখা হয়েছে, কিন্তু মোটামুটি সকলেই অধ্যাপকের উপর নির্ভর করেছেন।

* * *

আমি প্রথম জর্মনি যাই ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে। হিটলার তখনো গোটা জর্মনিতে সুপরিচিত হননি। তাঁর কর্মস্থল ও খ্যাতি প্রধানত ছিল ম্যুনিক অঞ্চলে। তারপর আমার চোখের সামনেই তিনি রাইষ্টাগে (জর্মন পার্লিমেণ্টে) তাঁর দলের ক্ষমতা অপ্রত্যাশিত ভাবে বাড়ালেন। ১৯৩২-এ আমি দেশে ফিরে এলুম। ৩৩-এ হিটলার জর্মনির চ্যান্সেলর—প্রধানমন্ত্রী, প্রধান কর্মকর্তা হলেন। ১৯৩৪-এ আমি আবার প্রায় এক বছর জর্মনিতে ছিলুম। তখন হিটলার কিভাবে রাজ্যশাসন করেন সেটি পুরোপুরি দেখলুম। ১৯৩৮-এ আমি আবার জর্মনিতে চার

মাস কাটালুম। চেম্বারলেন তখন হিটলারের কাছে যাবার জন্য তোড়জোড় করছেন। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করলেন—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগলো। বিশ্বযুদ্ধের পর আমি হিটলার ও তাঁর রাজ্যশাসন (থার্ড রাইখ একেই বলা হয়, এবং হিটলার সদম্ভে ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন, তৃতীয় রাইখ, এক হাজার বছর স্থায়ী হবে—কিন্তু তার আয়ুষ্কাল হল মাত্র বারো বছর তিন মাস!) সম্বন্ধে শত শত বই কিনি। জর্মন, মার্কিন, ফরাসী, ইংরেজ ইত্যাদির লেখা। এদের সকলেই হয় হিটলারের পক্ষে না হয় বিপক্ষে ছিলেন। আমাকে নিরপেক্ষ বলা যেতে পারে। যুদ্ধের পরও আমি দু'বার জর্মনি ঘুরে আসি।

এস্থলে হিটলারের পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখার দম্ভ আমার নেই। উপরের কয়েক ছত্র থেকে পাঠক শুধু যেন বুঝতে পারেন আমার মিত্রেরা কেন আমাকে হিটলার সম্বন্ধে প্রামাণিক পুস্তক লিখতে বলেন। আমারও সেই বাসনা ছিল, কিন্তু এখন দেখছি সেটা আর হয়ে উঠবে না। তাই যেটুকু পারি সেইটুকু এইবেলা লিখে নিই।

অনেক সময় পাঠকের ধৈর্য কম থাকে বলে তিনি উপন্যাসের শেষ অধ্যায়টি পড়ে নেন। আমি শেষ অধ্যায়ই সর্বপ্রথম লিখ্‌ব। পটভূমি—অর্থাৎ প্রথম বাইশ বা বত্রিশ অধ্যায়—নির্মাণ করবো কয়েকটি ছত্রে।

১৯৩৩-এ হিটলার চ্যান্‌সেলর হলেন। ১৯৩৪-এ জর্মনির প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গ মারা গেলে তিনি সে আসনটিও দখল করে দেশের 'ফ্যুরার' বা একচ্ছত্রাধিপতি 'নেতা' হন। পার্লিমেন্টের আর কোনো স্বাধীনতা রইল না। ১৯৩৮-এ হিটলার স্বাধীন অস্ট্রিয়া রাজ্য (তাঁর আপন জন্মভূমি ঐ দেশেই) দখল করে 'বৃহত্তর রাইখে'র অংশ করে নিলেন। ঐ বছরের সেপ্টেম্বরেই তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার জর্মন-ভাষাভাষী অঞ্চল গ্রাস করতে চাইলে, শান্তিভঙ্গের ভয়ে ভীত ইংলণ্ডের চেম্বারলেন ও ফ্রান্সের দালাদিয়ে সে অঞ্চলটুকু তাঁকে লিখিত-পঠিত ভাবে দান করলেন। কয়েক মাস পর হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার যে অঞ্চল তিনি স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন সেইটুকুও কাউকে কিছু না বলে-কয়ে গ্রাস করলেন। তখন চেম্বারলেনের কানে জল গেল—সেও পূর্ণমাত্রায় নয়। ১৯৩৯-এ হিটলার পোলাণ্ডের ভিতর দিয়ে জর্মন পূর্ব প্রাশা সংযুক্ত করার মানসে পোলাণ্ড রাজ্যের কাছে করিডর এবং অন্যান্য এটা-সেটা

দাবী করলেন। ইংলণ্ড আবার মধ্যস্থ হতে চাইল, কিন্তু হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করলেন। ইতিপূর্বেই জর্মন তথা বিশ্ববাসীকে সচকিত শঙ্কিত করে তিনি তাঁর জাতশত্রু স্তালিনের সঙ্গে চুক্তি করে পোলাণ্ড ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তখন উত্তেজিত জনমতের চাপে পড়ে হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো কিন্তু পোলাণ্ডকে কোনো সাহায্য পাঠাতে পারার পূর্বেই পোলাণ্ড হেরে গেল।

তার এক বৎসর পর ১৯৪০-এর গ্রীষ্মকালে হিটলার ফ্রান্স আক্রমণ করে অত্যল্প সময়েই তাকে পরাজিত করলেন। ফ্রান্সে আগত ইংরেজ বাহিনী প্রাণ নিয়ে কোনো গতিকে স্বদেশে ফিরে গেল। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র সাজসরঞ্জাম সব-কিছু ডানকার্ক বন্দরে ফেলে যেতে হল।

হিটলার ইংরেজকে বললেন, 'আর কেন? সন্ধি করো!' ইংরেজ বললে, 'না, তোমাকে খতম করবো।'

হিটলার তখন বিরাট নৌবহর নিয়ে ইংলণ্ড আক্রমণের তোড়জোড় করলেন, কিন্তু শেষটায় দেখা গেল অভিযান নিষ্ফল হলেও হতে পারে। হিটলার সে চিন্তা বর্জন করলেন।

তাঁর চিরকালের বাসনা ছিল রুশ জয় করে বিজিত অংশে জর্মন চাষী মজুর বসিয়ে কলনি নির্মাণ করা।[১] ১৯৪১-এর গ্রীষ্মে তিনি রাশা আক্রমণ করলেন ও রুশ সৈন্য পরাজয়ের পর পরাজয় স্বীকার করে পিছু হটতে লাগলো। হিটলার-বাহিনী মস্কোর দোরের গোড়ায় পৌছল। কিন্তু হিটলারের কপাল মন্দ। অসময়ে নেমে এল প্রচণ্ড শীত, বরফ আর বৃষ্টি। পরের বৎসর হিটলার-সৈন্য অভিযান করলো ককেশাসের তেল দখল করতে। সেখানে স্তালিনগ্রাদে জর্মনরা খেল তাদের প্রথম মোক্ষম মার। ওদিকে হিটলারের মিত্র জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করার ফলে আমেরিকাও যুদ্ধে নামল। মার্কিনদের এক দল গেল জাপানকে হারাতে; অন্য দল ইংরেজ সহ উত্তর আফ্রিকায়। সেখানে রমেল প্রায় মিশর আক্রমণ করে সুয়েজ দখল করতে যাচ্ছিলেন। মার্কিন-ইংরেজ সম্পূর্ণ উত্তর আফ্রিকা দখল করে নামলো জর্মনমিত্র মুসোলীনির মুল্লুক ইতালিতে।

---

১ জর্মন রাষ্ট্রের নেতা (ফ্যুরার) হওয়ার বহু পূর্বে তাঁর একমাত্র বই হিটলার লেখেন 'মাইন কাম্প্‌ফ্‌' নাম দিয়ে। এ পুস্তকের অন্যতম মূল বক্তব্য: সমুদ্রপারে কলনি নির্মাণের যুগ গেছে (এটা সত্য, এতদিনে সপ্রমাণ হয়েছে); জর্মনিকে রুশদেশ জয় করে সেখানে কলনি স্থাপনা করতে হবে।

ওদিকে ১৯৪৪-এ রুশ বিপুল বিক্রমে জর্মনদের আক্রমণ করে বিজিত রাশা থেকে তাদের খেদিয়ে দিয়ে পৌঁছে গেল পোলাণ্ডে—তারপর জর্মন সীমান্তে। এদিকে ১৯৪৪-এর গ্রীষ্মকালে হাজার হাজার জাহাজ নিয়ে মার্কিন-ইংরেজ নামল পশ্চিম ফ্রান্সের নরমাণ্ডি উপকূলে (হিটলার যে নৌ-অভিযান করতে সাহস পান নি এরা সেটাই উল্টোদিক থেকে করলে)। হিটলার সমুদ্র উপকূলে প্রচুর রক্ষণ ব্যবস্থা করেছিলেন—সেনাপতিদের মধ্যে রমেলও ছিলেন—কিন্তু দুশমনকে ঠেকাতে পারলেন না। তারা ফ্রান্স জয় করে ১৯৪৫-এর শীতকালে জর্মনি ঢুকে, রাইন নদ অতিক্রম করে বার্লিনের কিছু দূরে এসে দাঁড়িয়ে রইল। কারণ স্তালিনের সঙ্গে মার্কিন-ইংরেজের চুক্তি ছিল, রুশরা প্রথম বার্লিন প্রবেশ করবে। রুশরা বার্লিনের পূর্ব সীমান্তে পৌঁছে গিয়েছে। এবারে তারা বার্লিন আক্রমণ করবে। এটা এপ্রিলের মাঝামাঝি—১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ। আর কয়েক দিন পরেই হিটলারের জন্মদিন—২০ এপ্রিল।

২০ এপ্রিল। আজ ফ্যুরারের জন্মদিন। তিনি কি জানতেন, দশ দিন পর তাঁকে নিজের হাতে নিজের জীবন নিতে হবে? না; কারণ ২৯ এপ্রিল রাত্রেও তিনি জেনারেল ভেংকের খবর নিচ্ছেন; তিনি কবে পর্যন্ত চতুর্দিকে সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ বার্লিন থেকে তাঁকে উদ্ধার করবেন। আবার ২০ এপ্রিলে ফিরে যাই।

হিটলারের আমীর-ওমরাহ, সেনাপতি-জাঁদরেল, সাঙ্গোপাঙ্গ সেদিন সবাই জন্মদিন উপলক্ষে বুঙ্কারে উপস্থিত হয়েছেন। এদের প্রায় সকলেই মনে মনে জানতেন, ফ্যুরারের সঙ্গে এই তাঁদের শেষ দেখা, কারণ রাশানরা তখন বার্লিনের প্রায় চতুর্দিকে বৃত্তাকারে ব্যূহ নির্মাণ করে ফেলেছে। যে প্রভুকে তাঁরা কেউ ১২ বছর, কেউ ২০ বছর ধরে সেবা করেছেন এবং হিটলার চ্যান্সেলর হওয়ার পর ধনজন-খ্যাতি-খেতাব সব-কিছুই তাঁর অকৃপণ হস্ত থেকে পেয়েছেন—তাঁকে তখন ত্যাগ করতে তাঁদের আর তর সইছে না। কারণ রাশান-ব্যূহ পরিপূর্ণ চক্রাকার ধারণ করার পর তাঁরা আর বেরুতে পারবেন না। তদুপরি বার্লিনের আরো দক্ষিণে রুশ-সেনাবাহিনীর আরেক বৃহৎ অংশ রাষ্ট্রের প্রায় মাঝখানে এসেছে; মার্কিন-ইংরেজ পশ্চিম থেকে পূর্ব পানে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। দুই সৈন্যদল হাত মেলালে পর রাইষ দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যাবে। ২০ এপ্রিলে তারা তখনো হাত মেলায়নি—দক্ষিণ জর্মনি পৌঁছবার জন্য তখনো একটি করিডর খোলা। বেশীর ভাগই দক্ষিণ জর্মনি যেতে চান। সেখানেই নাৎসি আন্দোলনের জন্মভূমি ম্যুনিক শহর; তার কাছেই হিটলারের আবাসভূমি বের্গহফ—বের্‌ষ্‌টেশ-

গাডেন্ অঞ্চলে, আল্পসের উপরে। সকলেরই বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত হিটলার ঐ পর্বতসঙ্কুল গিরি-উপত্যকার গোলকধাঁধাতে এসে তারই সাহায্যে অনির্দিষ্ট কালের জন্য দুশমনের সঙ্গে লড়ে যাবেন—

কারণ হিটলার একাদিক্রমে বার বার তাঁর সহচরদের বলেছেন : 'আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, এই যে রুশ, মার্কিন, ইংরেজ মৈত্রী এটা কিছুতেই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। এদের আদর্শ স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন। দুই সৈন্যদল মুখোমুখি হতেই এই কোয়ালিশন (মৈত্রী) ভেঙে পড়বে। ফ্রেডরিক দ্য গ্রেটের বিরুদ্ধে ঠিক এই রকমই কোয়ালিশন হয়েছিল। তিনিও নিরুপায় হয়ে যখন আত্মহত্যার চিন্তা করছেন, ঠিক সেই সময় কোয়ালিশনের অন্যতম প্রধান নেত্রী রাশার মহারাণী মারা গেলেন। রাশানরা বাড়ি ফিরে গেল ; সঙ্গে সঙ্গে কোয়ালিশন খানখান হয়ে গেল। জর্মনি লুপ্তগৌরব ফিরে পেল এবং উচ্চতর শিখরে আরোহণ করল।'

বুঙ্কারের খাস কামরায় নৌসেনাপতি ড্যোনিৎস, জেনারেল কাইটেল, জেনারেল ইয়োডলের কাছ থেকে হিটলার একজন একজন করে জন্মদিনের অভিনন্দন গ্রহণ করলেন। বাদবাকিরা—গ্যোরিঙ, রিবেনট্রপ্, হিমলার (হিটলার এঁরই মারফৎ আইষমানকে ইহুদি-হননে নিযুক্ত করেন), গ্যোবেল্স্, বরমান ইত্যাদির সঙ্গে করমর্দন করলেন। তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে আত্মবিশ্বাস। তিনি দৃঢ়নিশ্চয়, বার্লিন মহানগরের সামনে রাশানরা পাবে তাদের চূড়ান্ত পরাজয়। ভাগ্যবিধাতাই শুধু জানেন, এই সব অপদার্থ চাটুকারদের ক'জন হিটলারের এই অন্ধবিশ্বাসে অংশীদার ছিলেন। কারণ এঁরা সবাই জানতেন, প্রায় সপ্তাহ খানেক পূর্বে রাশার জারিনার (মহারাণীর) মত প্রেসিডেন্ট রোজভেল্ট মারা গিয়েছেন, কিন্তু মার্কিন সৈন্যদল স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেনি।

হিটলার আগের থেকেই জর্মনিকে উত্তর দক্ষিণ দু'ভাগে বিভক্ত করে রেখেছিলেন। এখন আদেশ দিলেন, বার্লিনে যাঁদের নিতান্তই কোনো প্রয়োজন নেই তারা হয় উত্তর নয় দক্ষিণ পানে চলে যাবেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আমীর-ওমরাহ দক্ষিণ বাগে চললেন—বিরাট বিরাট লরীতে করে দফতরের কাগজপত্র বোঝাই করে, এবং তার চেয়েও বড় কথা—আপন আপন ধন-দৌলত বোঝাই করে। পড়ে রইল বার্লিনের অসহায় লক্ষ লক্ষ নরনারী। আর রইলেন খাঁটি প্রভুভক্ত গ্যোবেল্স্, ক্ষমতালোভী সেক্রেটারী বরমান—হিটলারের 'গরবে তিনি গরবিনী' ; দূরে চলে গেলে সে শক্তি পাবেন কোথা থেকে ? বাদবাকিদের অধিকাংশের সঙ্গে হিটলারের আর দেখা হয়নি। তাঁর দুই প্রধান সেনাপতি

কাইটেল আর ইয়োডল গেলেন বার্লিনের উপকণ্ঠে, সেনাবাহিনীর হেড কোয়ার্টার্সে; নৌসেনাপতি চলে গেলেন উত্তর-পশ্চিম সমুদ্র-পারে, তাঁর হেড কোয়ার্টার্সে।

সবাই করজোড়ে হিটলারকে নিবেদন করলেন, আর কয়েকদিনের মধ্যেই রুশ সৈন্য বার্লিনের চতুর্দিকে ব্যূহ স্থাপন করে ফেলবে। ফ্যুরার তাহলে আর দক্ষিণে যেতে পারবেন না। যুদ্ধচালনার হুকুম-নির্দেশ তাহলে দেবে কে? হিটলার কিন্তু কিছুতেই মনস্থির করতে পারছেন না। অবশ্য এ-কথা সবাই জানতেন, একবার মনস্থির করার পর হিটলার অচল অটল হয়ে রইতেন।

তারপর হিটলার হুকুম দিলেন, বার্লিনে ও বার্লিনের চতুর্দিকে যে সব সৈন্য রয়েছে তারা যেন সবাই একত্র হয়ে এক জোটে সব ট্যাঙ্ক সব জঙ্গীবিমান নিয়ে বার্লিনের দক্ষিণভাগে রুশসৈন্যদের আক্রমণ করে। হিটলার হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'কোন সেনাধ্যক্ষ যদি তার সৈন্যকে সম্মুখযুদ্ধে না পাঠায় তবে পাঁচ ঘণ্টার বেশী সে বাঁচবে না।' জঙ্গীবিমানের সেনাপতি কলারকে বললেন, 'তোমার মাথার দিব্যি, কোন সৈন্য যদি রণাঙ্গনে না যায়…।' এস্থলে 'মাথার দিব্যি' অর্থ হিটলার তার মুণ্ডুটির ভিতর দিয়ে পিস্তলের গুলি চালাবার হুকুম দেবেন।

কিন্তু হায়, বাস্তব জগতের সঙ্গে হিটলারের হুকুমের কোনো সাদৃশ্য তখন আর ছিল না। মাসের পর মাস ধরে তাঁর আমীর-ওমরাহ তাঁর কাছে সত্য গোপন করে চলেছেন। যাঁরা সত্য গোপন করেননি, তাঁদের মধ্যে যাঁরা অশেষ ভাগ্যবান, তাঁরা সুদ্ধু অপমানিত লাঞ্ছিত হয়ে বরখাস্ত হয়েছেন, অন্যরা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, কারাগারে ফাঁসি যাচ্ছেন বা হিটলারের খাসসেনানীর চাবুকে চাবুকে জর্জরিত হচ্ছেন। সত্য গোপন করে হিটলারকে বলা হয়নি, ব্যাটালিয়ানের পর ব্যাটালিয়ান যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে—যেখানে হিটলার ভেবেছেন পুরো ডিভিশন রয়েছে, সেখানে তার এক-দশমাংশ আছে কি না সন্দেহ, তিনজন সেপাইয়ে মিলে রয়েছে একটা বন্দুক, টোটার সংখ্যা এতই সীমাবদ্ধ যে শত্রু দশবার গুলি ছুঁড়লে এরা একবার;—হিটলার জানতেন যে জঙ্গীবিমানের পেট্রল কমে আসছে, কিন্তু তারই অভাবে যে শত শত অ্যারোপ্লেন মাটিতেই শত্রুর বোমারু দ্বারা বিনষ্ট হচ্ছে তার পুরো খবর তাঁকে দেওয়া হয়নি।

বুঙ্কারের কনফারেন্স্ রুমের টেবিলের উপর বিরাট জঙ্গী ম্যাপ খুলে হিটলার তাঁর কাল্পনিক সৈন্যবাহিনী, ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি লাল নীল রঙীন বোতামের প্রতীক দিয়ে সাজাচ্ছেন আর কোন্ জায়গা থেকে কোন্ সৈন্যদল কোথায় কার

সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে কোন্ জায়গায় আক্রমণ করবে তার হুকুম দিচ্ছেন। এসব সেনাপতিদের, এমন কি কোনো কোনো স্থলে কর্নেলদের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করার কথা—এ সমস্ত তিনি তুলে নিয়েছেন আপন স্কন্ধে। হুকুম দিচ্ছেন মাটির নিচের বুঙ্কারে বসে। যুদ্ধের শেষের দিকে মার্কিন-ইংরেজ বোমারু, জঙ্গীবিমান জর্মনির আকাশে একচ্ছত্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং দিন নেই, রাত্রি নেই বেধড়ক বোমা ফেলে ফেলে বার্লিন শহরটাকে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। হিটলার একদিনের তরে, একঘণ্টার তরেও সরজমিনে অবস্থা তদন্ত করতে বেরননি। পাছে 'বাস্তবতা' তাঁর 'অনুপ্রেরণাকে ব্যাহত করে'। পক্ষান্তরে যুদ্ধের গোড়ার দিকে জর্মন বোমারু যখন লণ্ডন লণ্ডভণ্ড করছিল তখন প্রায়ই দেখা যেত, বিরাট সিগার মুখে চার্চিল সে-সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর জনসাধারণকে দুঃখের দিনে উৎসাহ দিচ্ছেন—আর তারাও বলছে, 'আসুক না তারা। আমরাও আছি—গুড ওল্ড উইনি'।[২]

বুঙ্কারে হিটলারের জীবনের শেষ ক'দিন সম্বন্ধে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে সময় ও তারিখে ভুল করেছেন। কারণটি অতিশয় সরল। দিনের পর দিন এঁরা বিজলি বাতিতে কাজ করেছেন—মাটির পঞ্চাশ ফুট নিচে। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত কিছুই দেখতে পাননি। তারিখ ঠিক থাকবে কি করে? মাঝে মাঝে তাঁরা প্রায় ভিরমি যেতেন। বাইরের বিশুদ্ধ বাতাস কলের সাহায্যে বুঙ্কারে ঠেলে দেওয়া হত। কিন্তু বোমাবর্ষণের ফলে বাইরের আকাশে মাঝে মাঝে এত ধুলোবালি জমে যেত যে কল সেগুলোও বুঙ্কারের ভিতর পাঠাতো। তখন বাধ্য হয়ে কিছুক্ষণের জন্য কল বন্ধ করে দিতে হত। ফলে অক্সিজেনের অভাবে সবাই নিরুদ্ধনিশ্বাস। বুঙ্কারের ভিতরকার অনৈসর্গিক দূষিত বাতাবরণের—দৈহিক ও মানসিক উভয়ই—সর্বোত্তম বর্ণনা দিয়েছেন হ্যার বল্ট্, একখানা চটি বইয়ে। ট্রেভার তাঁর উপর অনেকখানি নির্ভর করেছেন। অমূল্য চটি বইখানার অনুবাদ নিশ্চয়ই হয়েছে কিন্তু সেটি আমার চোখে পড়েনি—আমি উপকৃত হয়েছি বলে পাঠককে পড়তে বলছি। শুনেছি, বইখানা নাকি দক্ষিণ আমেরিকায় আইখমানের লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়, এবং ক্রোধোন্মত্ত আইখমান নাকি মার্জিনে লিখেছেন—'ব্যাটাকে যদি একবার পেতুম'![৩]

পূর্বোল্লিখিত আক্রমণের যে আদেশ হিটলার তাঁর জন্মদিনের পরের দিন, ২১

---

২ উইনি, উইনস্টন চার্চিল।

৩ বল্ট—ডি লেৎস্তেন টাগে ড্যার রাইখস্কান্ৎসেলাই।

এপ্রিল দিলেন তার সেনাপতি নিযুক্ত হলেন স্টাইনার।

পরের দিন সকালবেলা (হিটলার শুতে যেতেন ভোরের দিকে আর উঠতেন দুপুরের দিকে—শেষের দিকে দুর্ভাবনা আর ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুন শুতে যেতেন আরো দেরিতে, উঠতেনও তাড়াতাড়ি, তিন ঘণ্টারও বেশী ঘুম হত না) থেকে হিটলার স্বয়ং এবং তাঁর হুকুমে অন্যান্যরা চতুর্দিকে ফোন করতে লাগলেন, স্টাইনারের আক্রমণ কতদূর এগিয়েছে ? কেউই কোনো পাকা খবর দিতে পারে না। যেটুকু আসছে তাও পরস্পরবিরোধী ; একবার স্বয়ং হিমলার বললেন—তিনি অবশ্য অকুস্থল থেকে দূরে—আক্রমণ চলছে ; তার পরমুহূর্তেই অন্য সূত্র থেকে খবর এল আক্রমণ আদপেই আরম্ভ হয়নি। এমন কি স্টাইনার স্বয়ং যে কোথায় তাও কেউ সঠিক বলতে পারে না। যে জেনারেল কলারের মুণ্ডুর ভিতর দিয়ে গরম বুলেট চালিয়ে দেবার ভয় দেখানো হয়েছিল তিনি তাঁর রোজনামচায় সেই ধুন্ধুমারের বর্ণনা লিখেছেন—এবং সেটি প্রকাশিত হয়েছে।

বিকেল তিনটে পর্যন্ত কোন খবর নেই। তারপর নিত্যিকার প্রথামত মন্ত্রণা-সভা বসল। উপস্থিত ছিলেন ফ্যুরার, দুই জেনারেল কাইটেল (হিটলারের পরেই তিনি) ও তার পরের জন ইয়োডল ; এবং আরো দুই সেনাপতি বুর্গডফ (পাঁড়মাতাল) ও ক্রেব্‌স্—শেষের দুজন সদাসর্বদা হিটলারের পাশের বুঙ্কারে বাস করতেন ও বলতে গেলে হিটলারের লিয়েজোঁ আপিসার ছিলেন এবং হিটলারের সেক্রেটারি বরমান।[৪]

সেই ঐতিহাসিক মন্ত্রণাসভায় হিটলার-রাইখের শেষ হাঁড়ি ফাটলো।

স্টাইনার আক্রমণ আদৌ ঘটেনি। একখানি বোমারু বা জঙ্গীবিমানও আকাশে ওঠেনি। হিটলারের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্ল্যান, মুণ্ডু দিয়ে বুলেট চালানোর বিভীষিকা প্রদর্শন—সব ভণ্ডুল, সব নস্যাৎ।

তাঁর জীবনে এই প্রথমবারের মত হিটলার পরাজয় স্বীকার করলেন।

৩ বল্‌ট্—পূর্বোক্ত।

৪ ডাঙর ডাঙর নাৎসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধশেষে মিত্রপক্ষ ন্যুরন্‌বের্গে 'মকদ্দমা' করেন। কাইটেল, ইয়োডলের ফাঁসি হয়। বুর্গডর্ফ, ক্রেব্‌সের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি ; তবে প্রায় সবাই নিঃসন্দেহ, রাশানরা যখন ২ মে তারিখে বুঙ্কার আক্রমণ করে তখন এঁরা আত্মহত্যা করেন। তার পূর্বে ক্রেব্‌স্ সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে (১ মে) রাশান প্রধান সেনাপতির কাছে যান, কিন্তু রাশানরা শর্ত মানলো না বলে প্রস্তাব ভেস্তে যায়। বরমান নিখোঁজ।

হিটলারের মেজাজটি ছিল আগুনে গড়া। দুঃসংবাদ পেলেই তিনি চিৎকার করে উঠতেন কর্কশ কণ্ঠে, চিৎকারে চিৎকারে তাঁর গলা ফেটে যেত, পাইচারি না—ঘরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সবেগে ছুটোছুটি আরম্ভ করতেন, মুখ দিয়ে ফেনা বেরুতে আরম্ভ করত, এবং চোখ দুটো যেন কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইত। প্রধান প্রধান সেনাপতিদের মুখের সামনে ঘুষি বাগিয়ে 'কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতক' পর্যন্ত বলতে কসুর করতেন না। বেদরদীরা বলে, তিনি শেষ পর্যন্ত মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে দিতে কার্পেট চিবুতে আরম্ভ করতেন—তাই তারা তাঁর নামকরণ করে 'কার্পেটভুক'। তবে সত্যের খাতিরে বলা ভাল, হিটলারের শত্রু-মিত্র কোনো ঐতিহাসিকই এটা বিশ্বাস করেননি।

এবারে শুধু যে তাই হল তা নয়, এবারে চিৎকার, হুঙ্কার, বেপথুর পর তিনি নির্জীবের মত চেয়ারে বসে স্বীকার করলেন, এই শেষ। রুশের তুলনায় জর্মন জাতি হীনবল, নির্বীয, অপদার্থ বলে সপ্রমাণিত হয়েছে, তাঁর মত লোককে তাদের ফুরারররূপে পাবার গৌরব ও সামর্থ্য তারা ধরে না। তাঁর মনে আর কোনো দ্বিধা নেই, তিনি দক্ষিণ জর্মনি গিয়ে আল্প্‌সের গিরি-উপত্যকা গুহা-গহ্বরে যুদ্ধ চালাবেন না—তৃতীয় রাষ্ট্র বন্ধ্যা সপ্রমাণ হয়ে গিয়েছে। তিনি বার্লিনেই থাকবেন। সম্মুখযুদ্ধ করার মত শারীরিক শক্তি তাঁর আর নেই বলে রুশরা বার্লিন প্রবেশ করলে তিনি বার্লিনের রাস্তায় বীরের মত যুদ্ধ করে প্রাণ দিতে পারবেন না। তিনি তখন আত্মহত্যা করবেন।

একথা সত্য, হিটলারের শরীরে তখন আর কিছু নেই।

হিটলারের অন্যতম বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হাসেলবাখ বলেন, '১৯৪০ পর্যন্ত হিটলারকে তাঁর বয়সের তুলনায় (তখন তিনি ৫০) অনেক কম দেখাত। ঐ সময় থেকে তিনি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বুড়োতে লাগলেন। ১৯৪০ থেকে '৪৩ পর্যন্ত তাঁর যা সত্যকার বয়স তাই দেখাতো। ১৯৪৩-এর (স্তালিনগ্রাদের পরাজয়ের) পর তিনি বুড়ো হয়ে গেলেন।' শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বাস্থ্য যে একেবারে ভেঙে পড়ে তার জন্য অংশত তাঁর হাতুড়ে ডাক্তার মরেলই দায়ী—হিটলারকে যে সব গণ্যমান্য চিকিৎসক পরীক্ষা করেছেন, কিংবা সাময়িকভাবে চিকিৎসা করেছেন তাঁরা সকলে একবাক্যে এ সত্যটি বলে গেছেন। হিটলার কার্যক্ষম থাকবার জন্যে—সামান্যতম সর্দিকাশিতে পর্যন্ত তিনি ভয় পেতেন, এবং আসার লক্ষণ দেখতে পেলেই অবিচারে ইনজেকশন নিতেন—মরেলের কাছ থেকে উত্তেজনাদায়ক ওষুধ চাইতেন। মরেলও অবিচারে এমন সব ওষুধ আর ইনজেকশন দিতেন যেগুলো দিত সাময়িক উত্তেজনা কিন্তু আখেরে করত স্বাস্থ্যের অশেষ ক্ষতি। বৃদ্ধ

সাময়িকভাবে থাকাকালীন অন্য এক ডাক্তার দৈবযোগে হিটলারের চাকর লিঙের ড্রয়ারে এসব ওষুধ প্রচুর পরিমাণে পান ও বিশ্লেষণ করে দেখেন যে ওগুলোতে মারাত্মক বিষ রয়েছে, যেগুলো অতি অল্প ডোজে কঠিন ব্যামোতে দেওয়া হয়। অথচ মরেল ওগুলো লিঙেকে দিয়ে রেখেছিলেন, হুজুর যাতে যখন খুশী, যত খুশী ঐসব ট্যাবলেট খেতে পারেন।[৫]

আর ইনজেকশনের তো কথাই নেই : লেকচার দিতে হলে পূর্বে ইনজেকশন, পরে ইনজেকশন। প্রকৃতি অসুস্থ মানুষকে সুস্থ হতে সাহায্য করে ; মরেল বা হিটলার সে সাহায্য নিতে চাইতেন না। ফলে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'ও শেষ বয়সে নির্মমভাবে তার প্রাপ্য নেয়।

ডাক্তাররা যখন হিটলারকে এ তথ্যটি বললেন, তখন তিনি রেগে টং। মরেলের উপর না, ডাক্তারদের উপর।

হিটলার তাদের অকথ্য অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। তাঁর বক্তব্য, মরেলের কড়ে আঙুলে যত এলেম, এঁদের গুষ্টির সব ক'টার মগজেও তা নেই।

ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫ সালে বল্‌ট্‌ মিলিটারি রিপোর্ট দিতে গিয়ে তাঁকে জীবনের প্রথমবারের মত কাছের থেকে দেখেন। 'হিটলার অনেকখানি কুঁজো হয়ে, বাঁ পা হেঁচড়ে টেনে আনতে আনতে আমার দিকে এগিয়ে এসে করমর্দন করতে হাত বাড়িয়ে দিলেন। মর্দনের সময় নির্জীব হাত কোনো চাপ দিল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন—তাঁর চোখে এক অবর্ণনীয় কাঁপা-কাঁপা জ্যোতি[৬] সম্পূর্ণ অনৈসর্গিক এবং ভীতিজনক। তাঁর বাঁ হাত নিস্তেজ হয়ে ঝুলে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে। তাঁর মাথাও অল্প অল্প দুলছে। তাঁর মুখ ও বিশেষ করে চোখের চতুর্দিকে দেখলে মনে হয় যেন এগুলোর সব শেষ হয়ে গেছে। সবসুদ্ধ মিলিয়ে মনে হয়, লোকটি অতিশয় বৃদ্ধ।'[৭]...অন্যরা বলেছেন, নানা রকমের বিষাক্ত ওষুধ খেয়ে খেয়ে তাঁর চামড়ার রঙ বিবর্ণ পাঁশুটে হয়ে গিয়েছিল। তাঁর বাঁ-হাত এত বেশী কাঁপতো যে চেয়ারের হাতা বা টেবিল তিনি সে হাত দিয়ে

---

৫ চিকিৎসকদের কৌতূহল হতে পারে ওষুধটা কি? এর নাম Dr. Koester's Antigaspills. এর প্রেসক্রিপশন : Extr. Nux. Vom ; tr. Bellad. a. a. 0. 5 ; extr. Gent 1. 0. বলা বাহুল্য, এসব ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমি যদ্দৃষ্টং নকল দিলুম।

৬ অনেকে সন্দেহ করেছেন, এই জ্যোতি উত্তেজক ওষুধবশতঃ। বল্‌ট্‌, ট্রেভার রোপার, আসমান দ্রষ্টব্য।

চেপে ধরতেন ; দাঁড়ানো অবস্থায় দুহাত পিছনে নিয়ে গিয়ে ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত চেপে ধরে রাখতেন।...বল্ট্ হিটলারের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্বে আবার তাঁর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তিনি আরো কুঁজো হয়ে গিয়েছেন, আরো পা টেনে টেনে আস্তে আস্তে এগোন। সমস্ত চেহারাটা মৃত। সবসুদ্ধ শীর্ণ-জীর্ণ বিকৃত-মস্তিষ্ক অতি বৃদ্ধের মূর্তি। চোখেও সেই অস্বাভাবিক জ্যোতি আর নেই।

হিটলার যখন দৃঢ়কণ্ঠে বার্লিনেই মৃত্যুবরণের শপথ গ্রহণ করলেন তখন সকলেই একবাক্যে আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'নিরাশ হবার মত কিছুই নেই। দক্ষিণ জর্মনি ও উত্তর ইতালিতে, বোহেমিয়া অঞ্চলে ও অন্যত্র এখনো অনেক অক্ষত সৈন্যবাহিনী রয়েছে। হিটলার যদি দক্ষিণ জর্মনির গিরি-উপত্যকায় তাদের জড়ো করেন তবে আরো অনেক দিন ধরে যুদ্ধ চালিয়ে ভাগ্য পরিবর্তন করা যাবে।'

হিটলার অচল অটল। তাঁর হুকুমে পরের দিন বার্লিন বেতার প্রচার করলো, হিটলার ও গ্যোবেল্স্ ও পার্টির কর্মকর্তাগণ বার্লিন ত্যাগ করবেন না, ফ্যুরার স্বয়ং বার্লিন রক্ষা করবেন। তার পরের কথাগুলো বোধহয় গ্যোবেল্সের জোড়া প্রপাগাণ্ডা-বাণী 'বার্লিন ও প্রাগ চিরকাল জর্মন শহর হয়ে রইবে।' কাইটেল, ইয়োডল বরমানকে ডেকে বললেন, 'আমি বার্লিন ত্যাগ করবো না।' জেনারেলদ্বয় প্রতিবাদ করে বললেন, 'তাহলে দক্ষিণ জর্মনির জমায়েত সৈন্যচালনা করবে কে?' হিটলার বললেন, 'সৈন্যচালনার কীই বা আছে, লড়াইয়ের কীই বা বাকি? এখন সন্ধিসুলেহ করো গে। সে কাজ গ্যোরিঙই আমার চেয়ে ঢের ভালো পারবে।'

গ্যোরিঙের এই উল্লেখ পরবর্তী অনেক ঘটনার জন্য দায়ী।

২৩ এপ্রিল দুপুরবেলা দক্ষিণ জর্মনিতে গ্যোরিঙের কাছে এই কথোপকথনের খবর পৌঁছল। তিনি যে খুশী হলেন সেটা কারো বুঝতে অসুবিধা হল না। তবু সাবধানের মার নেই বলে হিটলারের আইন-উপদেষ্টাকে ডেকে পাঠিয়ে ১৯৪১ সালের হিটলার-দত্ত সেই পুরনো প্রত্যাদেশের দলিল বের করলেন—যেটাতে হিটলার তাঁকে তাঁর ডেপুটি রূপে নিয়োগ করেছিলেন। এখন যদি রিপোর্ট সত্য হয় যে হিটলার আর কোনো হুকুম দিচ্ছেন না, এবং সন্ধিসুলেহ করার জন্য তাঁকেই স্মরণ করে থাকেন তবে তাঁকে কিছু একটা করতে হয়। পারিষদদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ করার পর তিনি হিটলারকে তার পাঠালেন, আপনি যখন বার্লিনে শেষ পর্যন্ত থাকবেন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন—তবে কি আপনি ১৯৪১ এর প্রত্যাদেশ মোতাবেক রাজী আছেন যে আমি তাবৎ রাইষের নেতৃত্ব গ্রহণ

করি ? আজ রাত্রে দশটার ভিতর কোনো উত্তর না পেলে বুঝবো, আপন কর্ম স্বাধীনতা থেকে আপনি বঞ্চিত হয়েছেন এবং তদনুযায়ী দেশের দশের মঙ্গলের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করবো। আপনি জানেন, আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বময় এই মুহূর্তে আপনার জন্য আমার হৃদয়ে কী অনুভূতি হচ্ছে! ভগবান আপনাকে—' ইত্যাদি ইত্যাদি (তারপর আশীর্বচন, মঙ্গল কামনা, অন্যান্য দরদী বাৎ)।

অত্যন্ত আইনসঙ্গত সহৃদয় চিঠি। কিন্তু গ্যোরিঙের জাতশত্রু জানেন দুশমন সেক্রেটারি বরমান বছরের পর বছর ধরে এই মহাশুভ লগনের জন্য প্রহর গুনছিলেন। দিনভর হিটলার শুধু 'নেমকহারাম, মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক সব—দলকে দল' এই সব বুলি আওড়েছেন ; যখন তিনি উত্তেজনার চরমে হাঁপাচ্ছেন তখন বরমান গুড়িগুড়ি টেলিগ্রামখানা এগিয়ে দেবার সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে এটাও যে আরেকটা বিশ্বাসঘাতকতা, হিটলার উৎকট সঙ্কটে অসহায় জেনে এ শুধু গ্যোরিঙের নিছক শক্তি কেড়ে নেওয়ার নীচ হীন ষড়যন্ত্র এবং এটা তারই নির্লজ্জ আলটিমেটাম (ভীতিপ্রদর্শনের সঙ্গে ম্যাদ)—এ কথাটিও বললেন।

হিটলার তখন চতুর্দিকে দেখছেন বিশ্বাসঘাতকতা ; এটা তারই আরেক নেমকহারাম নিদর্শন—এই অর্থেই সেটা গ্রহণ করলেন। তীব্র কর্কশ কণ্ঠে গ্যোরিঙকে দিলেন অশ্রাব্য গালাগাল। বেবাক ভুলে গেলেন, তাঁরই মুখে বেরিয়েছিল গ্যোরিঙ সম্বন্ধে প্রস্তাব, কিন্তু বরমান যখন গ্যোরিঙের প্রাণদণ্ডাদেশ চাইলেন তখন তিনি পার্টি এবং ফ্যুরারের প্রতি গ্যোরিঙের পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ও সেবা ভুলতে না পেরে আদেশ দিলেন, তাঁকে তাঁর সর্ব পদ সর্ব ক্ষমতা থেকে পদচ্যুত করা হল, এবং আদেশ দেওয়া হল হিটলারের পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন না। এবং তাঁকে গ্রেফতার করে বন্দী করে রাখার হুকুম দেওয়া হল।

ইতিমধ্যে হিটলার গ্যোবেল্‌স্ দম্পতিকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তাঁরা যেন তাঁদের বাসস্থান ত্যাগ করে তাঁদের ছ'টি বাচ্চাসহ তাঁর পাশের বুঙ্কারে বাসা বাঁধেন। সুবুদ্ধিমান হাতুড়ে ডাক্তার মরেল ইতিপূর্বেই চোখের জল ফেলতে ফেলতে (কেউ কেউ বলেন চোখের জল ফেলে অনুনয় করে, অন্যেরা বলেন কুমীরের ভণ্ডাশ্রু) হিটলারের কাছ থেকে বিদায় ভিক্ষা করে দূর দক্ষিণে কেটে পড়েছেন (হিটলার যেন ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, 'যে পথে যাচ্ছি সেখানে যাবার জন্যে আপনাকে আমার আর প্রয়োজন নেই')। তাঁর কামরা ছিল বুঙ্কারে হিটলারের মুখোমুখি—গ্যোবেল্‌স্ সে ঘরটাও পেলেন। গ্যোবেল্‌স্ দম্পতি ও হিটলার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে বসলেন। গ্যোবেল্‌স্ বললেন তিনিও

আত্মহত্যা করবেন, এবং হিটলারের আপত্তি সত্ত্বেও ফ্রাউ গ্যোবেল্‌স্‌ বললেন, তিনিও সেই পথ ধরবেন এবং বাচ্চা ছ'টিকে বিষ খাইয়ে মারবেন।

এটা এমনি বীভৎস কাণ্ড যে কোনো ঐতিহাসিকই এ নিয়ে মন্তব্য করেননি। এর পর হিটলার তাঁর কাগজপত্র থেকে নিজে বাছাই করে কতকগুলো পোড়াবার আদেশ দিলেন।

সমস্ত দিন ধরে দক্ষিণ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ, উত্তর থেকে নৌসেনাপতি ড্যোনিৎস ও হিমলার এবং আরো একাধিক আর্মীর হিটলারকে বার্লিন ত্যাগ করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন, কিন্তু হিটলার অটল অচল। ২৩ তারিখে তিনি জেনারেল কাইটেলকে পশ্চিম রণাঙ্গনে পাঠিয়েছেন জেনারেল ভেংকের কাছে—তিনি তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে বার্লিন উদ্ধার করবেন। ইতিমধ্যে রাশানরা বার্লিন মাঝখানে রেখে সাঁড়াশী ব্যূহ নির্মাণের জন্য বার্লিন ছাড়িয়ে পশ্চিম দিকে পঞ্চাশ মাইল এগিয়ে গিয়েছে। ভেংককে এদের সঙ্গে লড়াই করে করে তবে বার্লিন পৌঁছতে হবে। হিটলার ঘড়ি ঘড়ি শুধোচ্ছেন, ভেংকের খবর কি, তিনি কতদূর এগিয়েছেন! সমস্ত বুঙ্কারবাসীর ঐ এক শেষ ভরসা। কিন্তু তাঁর কোনো খবর নেই।

২৫ তারিখে রুশসৈন্য সমস্ত বার্লিন চক্রব্যূহে ঘিরে ফেলল। এর পর আর দশ-বিশজন লোক যে একসঙ্গে বার্লিন থেকে বেরুবে তার উপায় আর রইল না। তবে একজন দুজন গলিঘুঁচি দিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে রাতের অন্ধকারে হয়তো বেরুতে পারে। এ অবস্থায় হিটলারকে বার্লিন ত্যাগ করার জন্য আর অনুরোধ করা যায় না।

কিন্তু বুঙ্কারে দিনে দু'বার কখনো বা তিনবার হিটলার তাঁর মন্ত্রণাসভায় নেতৃত্ব করে যেতে লাগলেন। সেখানে শুধু ঐ খবরই পাওয়া যেত, রুশরা বার্লিনের কোন্‌ দিকে কতখানি ভিতরে ঢুকে পড়েছে। রাস্তায় রাস্তায় বৃদ্ধ আর বারো থেকে ষোল বছরের ছেলেরা যতখানি পারে লড়াই দিচ্ছে। যে কোনো সেনানীর পক্ষেই কোনো শহরের অন্তর্ভাগ দখল করা সহজ নয়। রুশরা এগুচ্ছে ধীরে ধীরে, অতি সাবধানে। ইতিমধ্যে পূর্ব থেকে এসে রুশসৈন্য ও পশ্চিম থেকে এসে মার্কিন সৈন্য মধ্য-জর্মনিতে হাত মিলিয়েছে—জর্মনি এখন দুখণ্ডে বিভক্ত। উত্তর থেকে—বার্লিন থেকে এখন আর আলপ্‌সের গিরি-উপত্যকায় গিয়ে যুদ্ধ প্রলম্বিত করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

দুই সেনাবাহিনীর এই হাত মেলানোর খবর হিটলার পেলেন মন্ত্রণাসভায় বসে। সংবাদদাতা বললেন, 'দুদলে কথা-কাটাকাটি হয়েছে।' ফ্যুরারের

পাংশু মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, চোখের জ্যোতি যেন হঠাৎ ফিরে এল। সোল্লাসে বললেন, 'আমি কি তখনই বলিনি? এইবারে শুরু হবে।' কিন্তু হায়, পরের দিনই খবর এল, দু'দল শান্তভাবে আপন আপন থানা গেড়ে নির্বিরোধে খবর পরামর্শ লেন-দেন করছে।

বার্লিনের অবস্থা অবর্ণনীয়। অষ্টপ্রহর উপর থেকে বোমাবর্ষণ এবং তার সঙ্গে এসে জুটেছে শহরের উপকণ্ঠে বিরাট বিরাট কামান। বোমা ফেলছে বুঙ্কারের উপর। স্তালিনগ্রাদে যে সব জর্মন ধরা পড়েছিল তাদের অনেকে মিলে হিটলার-বিরোধী এক 'স্বাধীন-জর্মনি' দল গড়ে। এরাই আজ রুশদের বার্লিনের রাস্তাঘাট, বাড়ি-ঘর চিনিয়ে দিচ্ছে। তাই তাগেও ভুল হচ্ছে না। বুঙ্কারে ফাটল ধরেছে। শহরের কোনো জায়গায় যদি অগ্নিপ্রজ্বালক বোমায় আগুন ধরলো তবে সে আগুন জলের অভাবে নেভানো যায় না বলে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং যতক্ষণ না পূর্বের থেকে পুড়ে গিয়ে ফাঁকা জায়গায় পৌঁছয় ততক্ষণ সে ব্লকের পর ব্লক, রাস্তার পর রাস্তা পুড়িয়ে চলে। ভূগর্ভস্থ সেলারে সেলারে লক্ষ লক্ষ আহত সৈনিক গোঙরাচ্ছে, শিশুরা কাঁদছে। ক্ষুধার চেয়ে তৃষ্ণা বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বোমা পড়ে কোনো কোনো জায়গায় জলের পাইপ ফেটে পূর্বে যে জল জমেছিল মেয়েরা সেই ঘোলাটে জল বালতিতে করে নিয়ে যাচ্ছে।

খবর এল রাস্তায় রাস্তায় লড়ে লড়ে রুশসৈন্যরা তো এগুচ্ছেই, সঙ্গে সঙ্গে তারা ভূগর্ভস্থ রেলপথের (আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলওয়ে) টানেল দিয়ে এগিয়ে আসছে। হিটলার হুকুম দিলেন স্প্রে নদীর (কানাল বা বড় খালও বলা হয়) জল বন্ধ করার গেট খুলে দিতে। সে জল রুশদের ডুবিয়ে মারবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মরবে হাজার হাজার আহত জর্মন সৈনিক—যারা মাটির নিচের স্টেশন-প্লাটফর্মে শুয়ে শুয়ে অচিকিৎসায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। এদের জীবন-মরণে হিটলারের ভ্রূক্ষেপ নেই। বল্‌ট্‌ বলেছেন, সমস্ত যুদ্ধে এ রকম হৃদয়হীন আদেশ তিনি শোনেননি। (এ আদেশ পালিত হয়েছিল কি না আমি জানি নে)।

এর চেয়েও নিষ্ঠুর আদেশ হিটলার বরমানকে পূর্বেই দিয়ে বসে আছেন। যে শহরের সামনে শত্রুসৈন্য দেখা দেবে তার তাবৎ কারখানা, ওয়াটার-ওয়ার্কস, বিজলি, নদীর উপর সেতু সব যেন উড়িয়ে দেওয়া হয়। সরবরাহ মন্ত্রী স্পের আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'যুদ্ধের পরে জর্মনরা তবে গড়বে কি, বাঁচবে কি দিয়ে?' হিটলার বললেন, 'এ যুদ্ধে সপ্রমাণ হয়েছে জর্মন জাত রুশের তুলনায় অপদার্থ; এদের পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়।' স্পের কিন্তু গোপনে এ-আদেশ বানচাল করে দেন।

নিষ্ঠুরতম আদেশ দেন হিটলার বরমানকে জর্মন জাতকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করার।

উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম থেকে আবালবৃদ্ধ নরনারীকে খেদিয়ে, সঙ্গীনের ঘায়ে, গুলি চালিয়ে জড়ো করা হোক মধ্য-জর্মনির এক মধ্য-অঞ্চলে। পথে বা সেখানে আহারাদির কোনো ব্যবস্থা থাকবে না। সেখানে ও পথে আসতে আসতে তারা সবাই মরবে। এ-আদেশ পালিত হয়নি। সেনাবাহিনীতে হুকুম দেবার মত যথেষ্ট অফিসার ছিলেন না বলে, না অন্য কারণে কেউ স্পষ্টাস্পষ্টি উল্লেখ করেননি। তবে একাধিক ঐতিহাসিক বলেছেন, বাইবেল-বর্ণিত স্যামসন ('স্যামসন ও ড্যালাইলা' ছবি এদেশেও আসে) যে রকম মৃত্যুবরণ করার সময় তাঁর শত্রুদের মন্দির টেনে ভেঙে ফেলে তাদেরও মৃত্যু ঘটান, হিটলারও তেমনি ওপারে যাবার সময় কুল্লে জাতটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

বার্লিনবাসীরা প্যারিজিয়ানদের মত কখনো নিজেদের মধ্যে সিভিল ওয়ার লড়েনি বলে কখনো রাস্তায় রাস্তায় পিপে, পাথর, আসবাবপত্র, ভাঙা গাড়ি, মোটর দিয়ে ঘাঁটি বা ব্যারিকেড বানাতে শেখেনি। যেগুলো বানিয়েছিল সেগুলো এতই আনাড়ি হাতে তৈরি কাঁচা যে তার বর্ণনা দিয়েছেন সুইডেন রাজ-পরিবারের কাউন্ট ফলকে বেরনাডট্টে। ইনি ব্যারিকেড বানাবার সময় বার্লিনে আসেন সুইডিশ রেড্ ক্রসের প্রতিভূ হিসাবে, তাঁর দেশবাসী বন্দীদের জন্য মুক্তির আবেদন করতে।[৮] ঐ ব্যারিকেডগুলো নিয়ে খাস বার্লিন কর্কনিরা (ঢাকার কুট্টিদের মত) একে অন্যের সঙ্গে মন্তব্য বিনিময় করছিল। একজন বললে, 'এগুলো ভাঙতে রুশদের এক ঘণ্টা দু' মিনিট লাগবে।' 'কি রকম?' 'পাকা একঘণ্টা তাদের লাগবে হাসি থামাতে। আর দু' মিনিট লাগবে সেগুলো ভাঙতে।'

ভিন্ন ভিন্ন বুঙ্কারে প্রায় ছ-সাতশ' হিটলার-দেহরক্ষী দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, বেঞ্চিতে মাটিতে ঘুমিয়ে অথবা সংখ্যাতীত টিনে রক্ষিত হ্যাম, বেকন, সসেজ ('রুটির উপর এত পুরু মাখন যে বলদ ঠোক্কর খেয়ে পড়ে যাবে') মুর্গী-

৮ ঐ সময়েই হিমলার প্রভু হিটলারকে না জানিয়ে আত্মসমর্পণ ও যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন। পরে তাঁরই মাধ্যমে মিত্র-পক্ষের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠান। এসব আলোচনা ও জর্মন রাষ্ট্রের শেষ ক' মাস সম্বন্ধে তিনি যুদ্ধের পর একখানি মনোরম বই লেখেন—ইংরিজি অনুবাদের নাম The curtaln falls. পরম পরিতাপের বিষয় এই সহৃদয়, বিশ্বনাগরিক কয়েক বৎসর পর প্যালেস্টাইনে ইহুদী আরবের সমঝাওতা করতে গেলে সেখানে ইহুদী আততায়ীর গুলিতে মারা যান।

রোস্ট আর বোতল বোতল ফ্রান্স থেকে লুট-করে-আনা, জর্মনির আপন উৎকৃষ্ট ওয়াইন, শ্যাম্পেন খাচ্ছে। এরা জর্মনির ঐতিহ্যগত সেনাবাহিনীর লোক নয়—তারা লড়ছে আপ্রাণ—এরা হিটলার হিমলারের আপন হাতে তৈরী এস এস, যুদ্ধে নামবার বিশেষ আগ্রহ এদের নেই। এদের দেখে বল্‌ট্‌ মনে মনে ভাবছেন, 'এরা এখানে কেন? ফ্যুরার তথা জর্মনির শত্রু বুঙ্কারের ভিতরে না বাইরে, যেখানে লড়াই হচ্ছে?' কিন্তু রান্নাঘরের খাস বার্লিনের কক্‌নি (কুট্টি) মেয়েরা স্পষ্টভাষী। হঠাৎ কয়েকজন চিৎকার করে এদের বললে, 'হেই, হতভাগা নিষ্কর্মার দল! তোরা যদি এখখুনি বাইরে গিয়ে যুদ্ধে না নামিস তবে তোদের পরিয়ে দেব আমাদের গা থেকে মেয়েছেলেদের রান্নার সময়কার পোশাক। আর আমরা যাবো লড়তে। বারো-চোদ্দ বছরের ছেলেরা প্রাণ দিচ্ছে লড়তে লড়তে, রাস্তায়—আর হামদো হামদো তাগড়ারা বসে আছে এখানে!'

হিটলার তাকিয়ে আছেন ভেংকের আশায়।

বুঙ্কারের এই পাগলদের দুরাশার ভিতর একটি লোকের মাথা পরিষ্কার ছিল—ইনি হিমলারের প্রতিনিধি—ফেগেলাইন। কিন্তু তিনি জানতেন না, যেখানে সবাই পাগল সেখানে সুস্থ-মস্তিষ্ক হওয়া পাগলামি। ইনি মোকা বুঝে এফার (যাকে দু'দিন পরে হিটলার বিয়ে করেন) বোনকে বিয়ে করে যেন হিটলার-পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছিলেন—আসলে সবাই একমত, লোকটা অপদার্থ। গোড়াতে ছিল রেস্‌-কোর্সের জকি। আঙুল ফুলে কলাগাছ, দম্ভভরে যাকে-তাকে অপমান করতো—ওদিকে বরমান, বুর্গডর্ফ, ক্রেব্‌স্‌ তার এক গেলাসের ইয়ার। হিটলার-পরিবারের সম্মানিত সদস্য হয়েও পারিবারিক আত্মহত্যা করে পারিবারিক চিতানলে হিটলার-এফার সঙ্গে ভস্মীভূত হয়ে বৃহত্তর গৌরব সে কামনা করেনি।' সোনা-জওহর নিয়ে পালাবার সময় সে ধরা পড়লো—এই সঙ্কটের সময়ও যে হিটলার সব দিকে নজর রাখতেন সেটা সপ্রমাণ হল যখন তিনিই প্রথম লক্ষ্য করলেন, ফেগেলাইন নেই। ধরার পর হিটলারের আদেশে তার য়ুনিফর্ম, মেডেলাদি কেড়ে নিয়ে, পদচ্যুত করে তাকে বন্দী করে রাখা হল।

২৭ এপ্রিল দিনের শেষে রাত্রে রাশানরা যেন দৈবক্ষমতায় দিব্যদৃষ্টি পেয়ে অব্যর্থ লক্ষ্যে হিটলারের বুঙ্কারের আশেপাশে, উপরে বোমার পর বোমা ফেলতে লাগল। বুঙ্কার-বাসীরা জড়সড় হয়ে শুনতে পাচ্ছে যেন প্রত্যেকটি কামানের বিরাট গোলা তাদেরই মাথার উপর ফাটছে। কারো মনে আর সন্দেহ রইল না, এবার যে কোনো মুহূর্তে রুশেরা সরাসরি বুঙ্কার আক্রমণ করবে।

সে রাত্রে হিটলার তাঁর অন্তরঙ্গজনকে নিয়ে মজলিসে বসলেন। স্থির হল,

প্রথম রুশসৈন্য দেখা দিতেই পাইকারি হারে সবাই আত্মহত্যা করবেন। তারপর সবাই পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করলেন, কি প্রকারে মৃতদেহগুলোও সনাক্তের বাইরে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করা যায়। তারপর একে একে প্রত্যেকে ছোট্ট ছোট্ট বক্তৃতা দিয়ে হিটলার ও জর্মনির প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন বলে শপথ নিলেন।

ব্লাফ্! ব্লাফ্! ব্লাফ্! সবসুদ্ধ দুই কিংবা তিনজন প্রতিজ্ঞা পালন করেন। আর সবচেয়ে হাস্যকর—হিটলারের মৃত্যুর ঘণ্টা তিনেক পরেই আমিরদের পয়লা নম্বরী বরমান চার নম্বরী ক্রেব্‌স্‌কে পাঠালেন রুশদের কাছে সন্ধি-স্থাপনার্থে। সেটা বানচাল হয়ে গেলে দু'জন ছাড়া সবাই চেষ্টা করলেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে, বরমান একটা ট্যাঙ্কে চড়ে—এটার ব্যবস্থা তিনি শপথ নেবার পূর্বেই করেছিলেন নিশ্চয়—রুশ-ব্যূহ এড়িয়ে, তখনো অপরাজিত উত্তর জর্মনিতে ডোনিৎসের (হিটলার মৃত্যুর পূর্বে একেই রাষ্ট্রের প্রধান রূপে নির্বাচিত করে যান) সঙ্গে যোগ দিতে। যাঁরা অক্ষম হয়ে মার্কিনদের হাতে বন্দী হলেন তাঁরা তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করলেন মার্কিনদের সুমুখে, কে হিটলারকে কত বেশী ঘৃণা করতেন সেইটে সাড়ম্বরে বোঝাতে।

হিটলার তখনো আশা ছাড়েননি। কখনো সামনে ম্যাপ খুলে কম্পিত হস্তে রুশসৈন্য, ভেংকের সৈন্য, নবম বাহিনীর সৈন্য রঙিন বোতাম দিয়ে প্রতীক করে যুদ্ধের ব্যূহ নির্মাণ করছেন আক্রমণের পথ স্থির করছেন; কখনো বা চিৎকার করে মিলিটারী হুকুম দিচ্ছেন—যেন তিনি নিজে রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করছেন। কখনো ঘর্মাক্ত হস্তে ম্যাপ নিয়ে দ্রুতপদে পাইচারি করছেন—ভেজা হাতের স্পর্শে ম্যাপখানা দ্রুত পচে যাচ্ছে—আর যাকে পান তাকেই সেই ম্যাপ দেখান, কি ভাবে, কোন্ পথে, সমরনীতির কোন কূটচালে শত্রুপক্ষকে নির্মম ঘায়েল করে, যেন এক অলৌকিক বিস্ময়ে ভেংক এসে সবাইকে এই সংকট থেকে মুক্ত স্বাধীন করবেন।

এঁদের অনেকেই ততদিনে জেনে গিয়েছেন, ভেংকের সেনাবাহিনী বলে আর কিছু নেই। যে ক'জন তখনো বেঁচে ছিল তাঁদের তিনি অনুমতি দিয়েছেন, পশ্চিম দিকে পালিয়ে গিয়ে মার্কিনদের হাতে আত্মসমর্পণ করতে—রুশদের চেয়ে মার্কিনরাই ভালো, এই তখন আপামর জনসাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু ভেংকের সত্য বিবরণ হিটলারকে বলে কে? বলে লাভ? কাইটেল, ইয়োডল সব জেনে শুনে হিটলারের আর্তনাদী টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রামের কোনো উত্তর দিচ্ছেন না—(নামে মাত্র) আর্মি হেড-কোয়ার্টার্স থেকে। কী উত্তর দেবেন এঁরা?

লিঙে এ সময়ে হিটলারের আচরণ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তিনি কামরার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দ্রুতগতিতে পাইচারি করছেন, কখনো বা ধীরে ধীরে। মাঝে মাঝে দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে বদ্ধমুষ্টি দিয়ে দেয়ালে করাঘাত করছেন।' কেন? তাঁর কাছে ঘরের চারখানা দেয়াল কি কারাগারের চারখানা প্রাচীরে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে?

আর পাইচারি? এটা তাঁর প্রাচীন দিনের অভ্যাস। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেন? দিনের পর দিন। হিটলারের একমাত্র বন্ধু ফোটোগ্রফার হফ্‌মান লিখেছেন, 'হিটলারের প্রথমা প্রেয়সী (সকলেরই মতে এইটেই ছিল তাঁর প্রথম এবং শেষ-গ্রেট্ লাভ—এফার প্রতি তাঁর প্রেম ছিল অন্য ধরনের) যখন আত্মহত্যা করে মারা যান, তখন তিনি নিচের তলা থেকে হিটলারের পদধ্বনি শুনতে পান তিন দিন তিন রাত ধরে—মাঝে মাঝে ক্ষান্ত দিয়ে। এই তিন দিন তিন রাত তিনি জলস্পর্শ করেননি। প্রণয়িনীর গোর হয়ে গিয়েছে খবর পেয়ে হিটলার পাইচারি বন্ধ করে সোজা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গিয়ে পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন।'[৯]

আর কখনো কখনো টেবিলের উপর কনুই রেখে অনেকক্ষণ ধরে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন সমুখপানে।

ভেংকের জন্য প্রতীক্ষা, তাঁর উত্তেজনা ও জালবদ্ধ পশুর মত ছটফটানি তার চরমে পৌঁছল ২৮ এপ্রিল। রাশানরা তখন বার্লিন নগরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে লড়াই করে করে হিটলারের বাসভবনের দিকে এগিয়ে আসছে। বার্লিনের কমাণ্ডাণ্ট হিটলারকে বলে গেছেন, দু দিন, জোর তিন দিনের ভিতর রুশরা বুঙ্কারে এসে পৌঁছবে। কিন্তু ভেংক কোথায়? কি ঘটে থাকতে পারে?

নিশ্চয়ই আবার বিশ্বাসঘাতকতা! বার্লিন জয় করার মত শক্তির শতাংশের একাংশও যে ভেংকের নেই সে-কথা কে বিশ্বাস করে? ২৮শে সন্ধ্যায় বরমান সেই সুদূর দক্ষিণ জর্মনির ম্যুনিকে তাঁর মিত্র এডমিরাল পুট্‌কামারকে টেলিগ্রাম করলেন, 'সৈন্যদের আদেশ ও অনুরোধ করে যে সব কর্তৃপক্ষ তাদের এখানে আমাদের উদ্ধার করার জন্য পাঠাতে পারতেন, তাঁরা সেটা না করে নীরব। বিশ্বাসঘাতকতা বিশ্বস্ততার স্থান অধিকার করেছে। আমরা এখানেই থাকবো। ফ্যুরার-ভবন খণ্ড-বিখণ্ড।'

এক ঘণ্টা পর, বহু প্রতীক্ষার পর বাইরের জগৎ থেকে পাকা খবর এল। হিটলারকে কিছুমাত্র আভাস না দিয়ে হাইনরিষ হিমলার—গ্যোরিঙের পদচ্যুতির

৯ হাইনরিষ হফ্‌মান, হিটলার উয়োজ মাই ফ্রেণ্ড

পর এখন যিনি জর্মনির দ্বিতীয় ব্যক্তি—মিত্রশক্তির কাছে সন্ধির প্রস্তাব করেছেন, পূর্বোল্লিখিত রেড্‌ক্রশের নেতা সুইড্‌ কাউণ্ট বের্নাডট্টের মাধ্যমে। প্রস্তাবটি গোপনেই করা হয়েছিল কিন্তু কি করে কে জানে সেটা গুপ্তপথে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কোন এক বেতার-কেন্দ্র সেটা প্রচার করেছে। হিটলারের বার্তা সরবরাহ বিভাগের কর্মচারী বেতারে সেটা শুনে ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে স্বয়ং এসেছেন হিটলারকে মুখোমুখি খবরটা দিতে।

কামানের গোলা, বোমারুর বোমা তখন ডাল-ভাত। কাজেই ঘরের ভিতর বোমা ফাটলেও হিটলার অতখানি বিচলিত হতেন না। 'সেই বিশ্বাসী হাইনরিষ, যে কি না তার খাস সৈন্যদলের বেল্টে খোদাবার আদেশ দিয়েছিল—TREUE—বিশ্বস্ততা, প্রভুভক্তি, নেমকহালালী!—সে কুকুর এখন ঠাকুরের আসনে বসতে চায়, তাঁর প্রতি নেমকহারামী করে?' এই একমাত্র নাৎসি নেতা যাঁর প্রভুতে অবিচল ভক্তি সম্বন্ধে কারো মনে কখনো সন্দেহ হয়নি। আর এ-কথা সকলেই জানতেন, যুদ্ধারম্ভের প্রথম দিনই হিটলার মার্শাল ল প্রচার করেছিলেন, 'তাঁর কোনো কর্মচারী—তা তিনি যত উচ্চপদেরই হোন না কেন—যদি কোনো সন্ধির আলোচনা করেন তবে তাঁর প্রাণদণ্ড হবে—এ বাবদে কোনো করুণা দেখানো হবে না।'

হিটলারের মুখ থেকে নাকি সবশেষ রক্তবিন্দু অন্তর্ধান করেছিল।

স্টাইনারের আক্রমণ কেন হয়ে ওঠেনি, ভেংক কেন আসছে না—এসব সমস্যা হিটলারের কাছে সরল হয়ে গেল। নিশ্চয়ই পিছনে রয়েছে হিমলারের বিশ্বাস-ঘাতকতা। অবশ্য ঐতিহাসিক মাত্রই জানেন এ সন্দেহ সত্য নয়। হিমলার শেষ মুহূর্তে সন্ধির প্রস্তাব এনে শুধু আপন প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করছিলেন—অন্য বহু বহু নাৎসি নেতার মত। তাঁরা গোপনে সুইস ও দক্ষিণ আমেরিকার জর্মন-বহুল নাৎসিদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন একাধিক রাষ্ট্রে বিস্তর অর্থ জমা রেখেছিলেন ও জাল নামে পাশপোর্টও তৈরী করিয়ে নিয়েছিলেন। হিমলারকে জনসাধারণ ভালো করেই চিনতো; তাঁর পক্ষে এ পন্থা সম্ভবপর ছিল না।[১০]

---

১০ আখেরে তিনি সেই চেষ্টাই করেছিলেন। ছদ্মবেশে মিত্রশক্তির ঘাঁটি পেরবার সময় তিনি বন্দী হন। দেহতল্লাসির সময় মুখে কিছু আছে কি না দেখবার জন্য তাঁকে মুখ খুলতে বললে তখন তিনি বুঝলেন এই তাঁর শেষ সুযোগ। ডাক্তার মুখে হাত ঢোকাবার পূর্বেই তিনি দাঁত ও মাড়ির মধ্যে লুকানো ক্যাপসুলে কামড় দিলেন। আবরণ ভেঙে বিষ বেরিয়ে এল; কয়েক মিনিটের

হিমলারের 'বিশ্বাসঘাতকতা'র পর হিটলারের সর্বশেষ কর্ম সম্বন্ধে মনস্থির করতে আর কোন প্রতিবন্ধক রইল না। প্রথমেই হিমলারের বিশ্বাসী নায়েব, প্রতিভু, লিয়েজোঁ অফিসার ফেগেলাইনকে বন্দিশালা থেকে বের করে নিয়ে এসে সওয়াল করা হল। এই সব বিশ্বাসঘাতকতার সম্বন্ধে তিনি কতখানি ওকীব-হাল ছিলেন? ফেগেলাইন কি উত্তর দিয়েছিলেন তা আর জানবার উপায় নেই। প্রশ্নকর্তারা মৃত নয় নিরুদ্দেশ। হিটলারের যুক্তি, ফেগেলাইন যদি না জানবে তবে পালাবার চেষ্টা করলো কেন? বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কি? হুকুম দিলেন, বুঙ্কারের বাইরের বাগানে তাকে গুলি করে মেরে ফেলতে। বল্‌ট্‌ তাঁর বইয়ে বলেছেন, 'এফা তাঁর ভগ্নিপতিকে বাঁচাবার কোনো চেষ্টা করেছিলেন কি না আমরা তার কোনো খবর পেলুম না, হয়তো স্বামীর উপর তাঁর কোনো প্রভাবই ছিল না, কিংবা হয়তো তিনি তাঁর স্বামীর মতই ধর্মান্ধের মত বিশ্বাস করতেন, বিশ্বাসঘাতকের প্রাপ্য মৃত্যুদণ্ড—তা সে যে-ই হোন।' আমাদের মনে হয় দুটোই। ঐ সময় শ্রীমতী হানা রাইট্‌শ বুঙ্কারে ছিলেন। ইনি বিশ্বের অন্যতম নামজাদা পাইলট (পরবর্তীকালে পণ্ডিতজীর সঙ্গে এঁর হৃদ্যতা হয় এবং তাঁর অতিথি হয়ে কিছুদিন দিল্লীতে ছিলেন)। ইনি বলছেন, এফা নাকি ঐ সময় বেদনাভরে এক হাত দিয়ে আরেক হতে মোচড়াতে মোচড়াতে যাকে পেতেন তাকেই বলতেন, 'হায় বেচারা, বেচারা আডল্‌ফ্‌! সবাই তাঁকে ত্যাগ করেছে, সবাই তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। দশ হাজার লোক মরুক ক্ষতি নেই, কিন্তু জর্মনি যেন আডল্‌ফ্‌কে না হারায়!'

রুশরা বুঙ্কার থেকে আর মাত্র হাজার গজ দূরে।

২৮।২৯ এপ্রিলের রাত। ফেগেলাইনের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে হিটলার অন্যান্য কর্তব্যের দিকে মন দিলেন। যে রমণী তাঁকে ১৪।১৫ বৎসর ধরে ভালোবেসেছেন, ভালোবাসার প্রথম দিকে একবার নিরাশ হয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টাতে গুরুতর-রূপে জখম হন, হিটলার যাঁকে বিশ্বাস করতেন সব চেয়ে বেশী (হিটলারও বলতেন, তিনি দুজনকে অবিচারে বিশ্বাস করেন। এফা ও তাঁর আলসেশিয়ান ব্লণ্ডীকে), সঙ্কট ঘনিয়ে এলে তাঁর নিরাপত্তার জন্য হিটলার বার বার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যিনি তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে রাজী হননি, এবং যিনি দৃঢ়কণ্ঠে একাধিক-

ভিতরই ভবলীলা সম্বরণ করলেন। গ্যোরিঙও এই পদ্ধতিতেই জেলের ভিতর আত্মহত্যা করেন। তাঁর দেহ ও মুখ বহুবার সার্চ করা হয়, কিন্তু তিনি যে কোথায় ক্যাপসুলটি দিনের পর দিন লুকিয়ে রেখেছিলেন সেটা আজও রহস্য।

জনকে একাধিকবার বলেছেন, 'আডল্‌ফ্‌ আর আমার জীবনমরণ একসূত্রে গাঁথা', সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে যাঁকে হিটলার অল্প লোকের সামনেই বেরুতে দিতেন, কোথাও যেতে হলে ভিন্ন ভিন্ন মোটরে যেতেন, সভাস্থলে এফা দর্শকদের সঙ্গে বসে হিটলারের বক্তৃতা শুনতেন—সেই এফা এত বৎসর পর তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার এবং আসন পেলেন। সে রাত্রে হিটলার তাঁকে বিয়ে করলেন।

কিন্তু দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা ডিকটেটরদের প্রিয়া, রক্ষিতা, উপপত্নী, পত্নীরা যে রকম রোমান্টিকভাবে তাঁদের বল্লভদের জীবন প্রভাবান্বিত করেন, পর্দার সামনে কিংবা আড়ালে বহুলোকের জীবনমরণ নিয়ে খেলা করেন—চক্রান্ত, বিষপ্রয়োগ অনেক কিছু করে থাকেন,—এফার সেদিকে কোনোই আকর্ষণ ছিল না। কর্মব্যস্ত হিটলার তাঁর সঙ্গে দেখা করার সময় পেতেন কমই। বিশেষ করে যুদ্ধের পাঁচ বৎসর তিনি ভিন্ন ভিন্ন আর্মি হেড কোয়ার্টার্সের সন্নিধানে থাকতে বাধ্য হতেন বলে প্রোষিতভর্তৃকা এফা দূর আল্‌প্‌সের উপর হিটলারের নির্জন নিরানন্দ বের্গহফ ভবনে একা একা দিনের পর দিন তাঁর জন্যে প্রতীক্ষা করতেন। চাকর-বাকররা বলত এ যেন 'সোনার খাঁচার বন্ধ পাখী'। তারপর হঠাৎ একদিন বল্লভ এসে উপস্থিত হতেন অতিশয় অন্তরঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। বাড়ি গমগম করে উঠতো। ডিনার, তারপর ফিল্ম, তারপর সঙ্গীত, রাত দুটোয় শেষ পার্টি—হিটলার টিটোটেলার, খেতেন হাল্কা চা, কাপের পর কাপ, অন্য সবাই শ্যাম্পেন। হিটলার ঘুম থেকে উঠতেন দেরিতে। খেয়ে জিরিয়ে এফা, ব্রাণ্ডী, অনুচরদের নিয়ে নির্জন পথে বেড়াতে বেরুতেন। পথের শেষপ্রান্তে একটি বিশ্রামাগার। সেখানে চা, কেক্‌, ক্রীম-বান খাওয়া হত। হিটলার প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়তেন। সবাই ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলতো। প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হলে সবাই বাড়ি ফিরতেন। কিন্তু বৃহত্তর সমাজে তাঁর স্থান ছিল না। হিটলারের মৃত্যুর পূর্বে ১০ লক্ষের ভিতর একজনও জানতো না, হিটলারের কোনো বান্ধবী আছেন।[১১]

---

১১ এফা ব্রাউন (হিটলার) সম্বন্ধে কৌতূহলীজন সর্বোত্তম খবর পাবেন পূর্বোল্লিখিত হফ্‌মানের বইয়ে। এঁর ফোটো-ল্যাবরেটরিতেই এফা কাজ করার সময় হিটলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে হফ্‌মান তাঁর সঙ্গে এঁর আলাপ করিয়ে দেন। হিটলারের ভ্যালে লিঙে উভয়েরই কামরা-বিছানা সাফসুৎরো করতেন, এবং একদিন দৈবাৎ তিনি দুজনাকে এমন অবস্থায় পান যে, লিঙের চাকরি যাবার যোগাড় হয়েছিল। লিঙেই এঁদের অন্তরঙ্গতার বিস্তরতম খবর দিয়েছেন। এফাও লিঙেকে খুব বিশ্বাস করতেন ও তাঁর মনের কথা খুলে বলতেন। আসন্ন

জনকে একাধিকবার বলেছেন, 'আডল্‌ফ্‌ আর আমার জীবনমরণ একসূত্রে গাঁথা', সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে যাঁকে হিটলার অল্প লোকের সামনেই বেরুতে দিতেন, কোথাও যেতে হলে ভিন্ন ভিন্ন মোটরে যেতেন, সভাস্থলে এফা দর্শকদের সঙ্গে বসে হিটলারের বক্তৃতা শুনতেন—সেই এফা এত বৎসর পর তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার এবং আসন পেলেন। সে রাত্রে হিটলার তাঁকে বিয়ে করলেন।

কিন্তু দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা ডিকটেটরদের প্রিয়া, রক্ষিতা, উপপত্নী, পত্নীরা যে রকম রোমান্টিকভাবে তাঁদের বল্লভদের জীবন প্রভাবান্বিত করেন, পর্দার সামনে কিংবা আড়ালে বহুলোকের জীবনমরণ নিয়ে খেলা করেন—চক্রান্ত, বিষপ্রয়োগ অনেক কিছু করে থাকেন,—এফার সেদিকে কোনোই আকর্ষণ ছিল না। কর্মব্যস্ত হিটলার তাঁর সঙ্গে দেখা করার সময় পেতেন কমই। বিশেষ করে যুদ্ধের পাঁচ বৎসর তিনি ভিন্ন ভিন্ন আর্মি হেড কোয়ার্টার্সের সন্নিধানে থাকতে বাধ্য হতেন বলে প্রোষিতভর্তৃকা এফা দূর আল্‌প্‌সের উপর হিটলারের নির্জন নিরানন্দ বের্গহফ ভবনে একা একা দিনের পর দিন তাঁর জন্যে প্রতীক্ষা করতেন। চাকর-বাকররা বলত এ যেন 'সোনার খাঁচার বন্ধ পাখী'। তারপর হঠাৎ একদিন বল্লভ এসে উপস্থিত হতেন অতিশয় অন্তরঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। বাড়ি গমগম করে উঠতো। ডিনার, তারপর ফিল্ম, তারপর সঙ্গীত, রাত দুটোয় শেষ পার্টি—হিটলার টিটোটেলার, খেতেন হাল্কা চা, কাপের পর কাপ, অন্য সবাই শ্যাম্পেন। হিটলার ঘুম থেকে উঠতেন দেরিতে। খেয়ে জিরিয়ে এফা, ব্রাণ্ডী, অনুচরদের নিয়ে নির্জন পথে বেড়াতে বেরুতেন। পথের শেষপ্রান্তে একটি বিশ্রামাগার। সেখানে চা, কেক্‌, ক্রীম-বান খাওয়া হত। হিটলার প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়তেন। সবাই ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলতো। প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হলে সবাই বাড়ি ফিরতেন। কিন্তু বৃহত্তর সমাজে তাঁর স্থান ছিল না। হিটলারের মৃত্যুর পূর্বে ১০ লক্ষের ভিতর একজনও জানতো না, হিটলারের কোনো বান্ধবী আছেন।[১১]

---

১১ এফা ব্রাউন (হিটলার) সম্বন্ধে কৌতূহলীজন সর্বোত্তম খবর পাবেন পূর্বোল্লিখিত হফ্‌মানের বইয়ে। এঁর ফোটো-ল্যাবরেটরিতেই এফা কাজ করার সময় হিটলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে হফ্‌মান তাঁর সঙ্গে এঁর আলাপ করিয়ে দেন। হিটলারের ভ্যালে লিঙে উভয়েরই কামরা-বিছানা সাফসুৎরো করতেন, এবং একদিন দৈবাৎ তিনি দুজনাকে এমন অবস্থায় পান যে, লিঙের চাকরি যাবার যোগাড় হয়েছিল। লিঙেই এঁদের অন্তরঙ্গতার বিস্তরতম খবর দিয়েছেন। এফাও লিঙেকে খুব বিশ্বাস করতেন ও তাঁর মনের কথা খুলে বলতেন। আসন্ন

এই দুদিনে বিয়ের রেজেস্ট্রি অফিসার যোগাড় করা সহজ হয়নি। শেষটায় একজন এলেন যাঁকে বুঙ্কারের কেউই চেনে না। গ্যোবেল্‌স্ এঁকে যোগাড় করে এনেছেন; লিঙের মতে ইনিই নাকি একদা গ্যোবেল্‌সের বিয়ে সম্পন্ন করেন। এমার্জেন্সি বা বিন্‌নোটিসের বিয়ে বলে বহ্বাড়ম্বর আর বাহ্যাড়ম্বর বাদ দেওয়া হল। দুই পক্ষ মৌখিক—সাধারণতঃ হিটলার-জর্মনিতে সার্টিফিকেট দরকার হত—শপথ দিলেন, উভয়েই অবিমিশ্র 'আর্যরক্ত' ধরেন, ও তাঁদের বংশগত কোনো ব্যাধি নেই। তারপর উভয়ে রেজিস্ট্রিতে সই করলেন। কনে নাম সই করার সময় 'এফা' লিখে 'ব্রাউন' লেখবার জন্যে 'বি' হরফ লিখে ফেলেছিলেন; তাঁকে ঠেকানো হলো, তিনি 'বি' কেটে 'হিটলার' ও 'ব্রাউন নামে জন্ম' (nee) লিখলেন। গ্যোবেল্‌স্ ও বরমান সাক্ষী হলেন।[১২] রাত তখন একটা বেজে গিয়েছে। ২৯ এপ্রিল শুরু হয়েছে।

বিয়ের পর হিটলারের ঘরে পার্টি বসলো। শ্যাম্পেন এল। বহু বৎসর পূর্বে গ্যোবেল্‌স্ যখন বিয়ে করেন তখন হিটলার সে বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। গ্যোবেল্‌স্ দম্পতি ও হিটলার সেই অবিমিশ্র আনন্দের দিনের সঙ্গে অদ্যকার আনন্দের উপর করাল ছায়ার তুলনা করে সে সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন। জর্মন ভাষায় একটি সংহিটে আছে, 'চোখের জল নিয়ে আমি নাচছি'—এ যেন তাই। হিটলার আবার তাঁর আত্মহত্যার কথা তুললেন। বললেন, তাঁর জীবনাদর্শ (ভেল্টআনশাউউঙ) নাৎসিবাদ খতম হয়ে গেল; এর পুনর্জন্ম আর কখনো হবে না। তাঁর সর্বোত্তম বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে প্রবঞ্চনা আর বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। মৃত্যুর ভিতর দিয়েই তিনি এসব থেকে নিষ্কৃতির আরাম পাবেন।

পার্টি চালু রেখে তিনি পাশের ঘরে তাঁর স্টেনো-সেক্রেটারি ফ্রাউ য়ুঙেকে নিয়ে তাঁর দুখানা উইল মুখে মুখে বলে যেতে লাগলেন। প্রথম উইলখানা রাজনৈতিক, দ্বিতীয়খানা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে। পাঠক

মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে তিনি লিঙের কাছে যে সব করুণ কথা বলেন সেগুলোও পড়ার যোগ্য।...হিটলারের চিকিৎসক মরেলও এফা সম্বন্ধে তাঁর জবানবন্দিতে কিছু কিছু বলেছেন।

১২ কয়েক মাস পূর্বে; অর্থাৎ এ-বিয়ের কুড়ি বৎসর পর রুশদের প্রধান সেনাপতি—যিনি বার্লিন জয় করেন—ঘোষণা করেন যে তাঁর মূল্যবান সম্পত্তির মধ্যে আছে এই দলিলখানা। রুশরাই সর্বপ্রথম বুঙ্কার দখল করেছিল বলে বিয়ের রেজিস্টারখানা তারাই হস্তগত করে।

হিটলার সম্বন্ধে যে কোনো বইয়ে এ দুখানার কপি পাবেন। আমি সংক্ষেপে সারি। সর্বপ্রথমেই তিনি আরম্ভ করেছেন এই বলে যে, 'একথা মিথ্যা যে আমি বা জর্মনির আর কেউ এ যুদ্ধ চেয়েছিল। এটা ইহুদি এবং যারা তাদের জন্য কাজ করে তাদের কীর্তি···এখন আমার সৈন্যবল আর নেই বলে রাষ্ট্রপতি ভবন আক্রান্ত হলে আমি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করবো। আমি শত্রুর হাতে ধরা দেব না —ইহুদিরা যাতে করে আমাকে নিয়ে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত জনতার জন্য একটা নয়া তামাশা সৃষ্টি না করতে পারে।···তারপর তিনি গ্যোরিঙ ও হিমলারকে নাৎসি পার্টি থেকে ও সর্ব আসন থেকে বিচ্যুত করে বললেন, 'এঁরা যে শক্তিলোভে শত্রুর সঙ্গে গোপন সন্ধি-প্রস্তাব করে শুধু আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তাই নয়, জর্মনি ও তার নাগরিকদের মুখে অমোচনীয় কলঙ্ককালিমা মাখিয়েছেন।' হিটলারের মূলমন্ত্র ছিল 'যুদ্ধের সাধন কিংবা জীবনপাতন'— সন্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করাই বেইজ্জতির চূড়ান্ত। সর্বশেষে তিনি জর্মনদের কঠোরতম নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের রক্তে যেন সংমিশ্রণ না হয় তার জন্যে, এবং বিশ্বে বিষসঞ্চারণকারী আন্তর্জাতিক ইহুদিদের নির্দয়ভাবে প্রতিরোধ করার জন্য দিব্য দিলেন।···এই উইলেই তিনি এডমিরাল ড্যোনিৎসকে দেশের নেতৃত্ব দিলেন, এবং তাঁর জন্যে মন্ত্রিসভা নির্বাচন করে গেলেন।[১৩]

তাঁর ব্যক্তিগত হ্রস্ব উইলে তিনি এফাকে বিবাহ করার পটভূমি ও কারণ দর্শালেন। তারপর বললেন, 'তিনি স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করছেন।' তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি নাৎসি পার্টিকে দান করলেন, পার্টির অস্তিত্ব লোপ পেলে জর্মন রাষ্ট্রকে, এবং সেও যদি লোপ পায় তাহলে সে বিষয়ে তাঁর আর কোনো নির্দেশ নেই। তাঁর বিরাট চিত্রসঞ্চয় তিনি তাঁর জন্মভূমির লিন্‌ৎস্‌ শহরের যাদুঘর নির্মাণের জন্য দিলেন। দরকার হলে তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর আত্মজন, তাঁর সহকর্মী সেক্রেটারি ইত্যাদি যেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মত জীবনযাত্রা করতে পারেন, তার আর্থিক ব্যবস্থাও তিনি উইলে রাখলেন।···উইল লেখা শেষ হলে ভোর চারটায় তিনি শুতে গেলেন। হায় রে বাসরশয্যা!

গ্যোবেল্‌স্‌ও তাঁর উইল লিখলেন। তাঁর প্রধান বক্তব্য: ফ্যুরার আমাকে আদেশ দিয়েছেন, নূতন মন্ত্রিসভায় অংশ নিতে, কিন্তু জীবনে এই প্রথমবার (এবং ইচ্ছে করলে তিনি 'শেষবারের' মতোও লিখতে পারতেন; কেন করলেন না, বোঝা ভার) আমি ফ্যুরারের আদেশ সরাসরি লঙ্ঘন করছি।

১৩ ড্যোনিৎস এঁদের অধিকাংশকেই গ্রহণ করেননি

আমি, আমার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণসহ ফ্যুরারের পার্শ্বেই জীবন শেষ করবো। এরপর আছে 'সর্বব্যাপী বিশ্বাসঘাতকতা' ইত্যাদি ইত্যাদির কথা।

সেই দিন ২৯শে এপ্রিল। দুপুরের দিকে চারজন বিশ্বস্ত লোক মারফৎ তিনখানা উইল তিন ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পাঠাবার ব্যবস্থা করা হল। যে করেই হোক তারা যেন রুশব্যূহ ভেদ করে, কিংবা ব্যূহে কোনো ছিদ্র থাকলে তাই দিলে ড্যোনিৎসের কাছে পৌছয়, নইলে ব্রিটিশ বা মার্কিন অধিকৃত অঞ্চলে।

দুপুরবেলা মন্ত্রণাসভা বসলো। সেখানে প্রধান খবর, রাশানরা এগিয়ে এসেছে এবং ভেংকের কোনোই খবর নেই। তিনজন অফিসার—এঁদের মধ্যে ছিলেন আমাদের পূর্বোল্লিখিত বল্‌ট্‌—বললেন, তাঁরা ভেংকের সন্ধানে ও তাঁকে বার্লিন পানে ধাওয়া করবার জন্য ফ্যুরারের আদেশ পৌছে দিতে প্রস্তুত আছেন। হিটলার অনুমতি দিলেন। রাত্রের মন্ত্রণাসভার পর আরেকজন চলে যাবার অনুমতি পেলেন।

রাত্রের মন্ত্রণাসভায় বার্লিনের কমাণ্ডাণ্ট জানালেন, রাশানরা চতুর্দিক থেকেই শহরের ভিতরে এগিয়ে এসেছে। ১লা মে তারা বুঙ্কার (এবং রাষ্ট্রভবনে) পৌছে যাবে। বার্লিনের ভিতর যে সব জর্মন সৈন্যদল আটকা পড়েছে তারা এই বেলা যদি রুশব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে না যায়, তবে আর কখনো পারবে না। হিটলার বললেন, দু'একজনের পক্ষে কোনোগতিকে বেরোনো সম্ভব হলেও হতে পারে কিন্তু এই সব রণক্লান্ত ভাঙাচোরা হাতিয়ারে সজ্জিত—তারও আবার গুলি-বারুদের অভাব—সৈন্যরা দল বেঁধে, তা সে যতই ছোট দল হোক না কেন, কখনই বেরুতে পারবে না। ব্যস্‌, হয়ে গেল ; হিটলারের অভিমতই সর্বশেষ অভিমত। সৈন্যদের কপালে নিরর্থক মৃত্যুর লাঞ্ছন অঙ্কিত হয়ে গেল।

এই সময়ে হিটলার তাঁর সর্বশেষ টেলিগ্রাম পাঠান—জেনারেল ইয়োডল্‌কে। আশ্চর্যের বিষয়, ট্রেভার রোপারের মত অতুলনীয় ঐতিহাসিক এই শেষ টেলিগ্রামের উল্লেখ করেননি। বল্‌ট্‌ তো তার আগেই বুঙ্কার ত্যাগ করেছেন—তাঁর কথা ওঠে না। হিটলারের কোনো প্রামাণিক জীবনীতেও আমি এর উল্লেখ পাইনি। শুধু আস্‌মান্‌ ও অন্য এক নৌ-সেনাপতি এর উল্লেখ করেছেন ; আস্‌মান্‌ তাঁর ইতিহাসে টেলিগ্রামখানার ফটোও দিয়েছেন। তাতে হিটলারের সেই আর্তকণ্ঠে প্রশ্ন, 'ভেংক কোথায়, নবম বাহিনীর পুরোভাগ কোন্‌ কোন্‌ স্থলে পৌচেছে, ইত্যাদি ; আমি এই মুহূর্তেই উত্তর চাই।'

সেইদিনই খবর পৌছল, হিটলার-সখা ডিকটেটর মুস্‌সোলিনীকে মিলানের বিদ্রোহী দল তাঁকে তাঁর উপপত্নীর সঙ্গে ইতালী ছেড়ে সুইটজারল্যাণ্ডে পলায়নের

সময় ধরে দুজনকে খতম করে শহরের মাঝখানের বাজারে পায়ে পায়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছে—যাতে করে উত্তেজিত প্রতিহিংসোন্মত্ত জনগণ দুজনাকে পেটাতে ও পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ক্ষত-বিক্ষত করতে পারে। এ সংবাদ হিটলারের মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল জানা যায়নি। তবে বহু ডিকটেটরদের শেষ পরিণতি হিটলারের কাছে কোনো নতুন খবর নয়। তাই উইল লেখার সময় ও তার পূর্বেও হিটলার আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর ও একার দেহ যেন পুড়িয়ে এমনভাবে ভস্ম করে দেওয়া হয় যে ইহুদিরা পাগলা জনতাকে তামাশা দেখাবার জন্য কোনো কিছু না পায়। বুঙ্কারের একাধিক বাসিন্দা হুবহু একই ভাষায় এই মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

২৯ তারিখ অপরাহ্ণে হিটলারের আদেশে তাঁর প্যারা অ্যালসেশিয়ান কুকুর ব্লণ্ডীকে গুলি করে মারা হল। সেইদিনই তিনি তাঁর দুই মহিলা সেক্রেটারিকে চরম সঙ্কটে ব্যবহারের জন্য বিষের ক্যাপসুল দিতে দিতে দুঃখ করে বললেন যে, শেষ বিদায়কালে তিনি এর চাইতে ভালো কোনো উপহার দিতে পারলেন না।

সেই রাত্রে হিটলার ভিন্ন ভিন্ন বুঙ্কারবাসীদের খবর পাঠালেন, তিনি মহিলাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চান, – তাঁরা যেন অপেক্ষা করেন। রাত আড়াইটার সময় (৩০ এপ্রিল আরম্ভ হয়ে গিয়েছে) প্রায় কুড়ি জন অফিসার ও মহিলা সারি বেঁধে করিডরে দাঁড়ালেন। বরমান সহ হিটলার বেরিয়ে এসে তাঁদের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেন এবং মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করলেন। হিটলারের চোখের উপর যেন ক্ষীণ বাষ্পের হালকা পরশ লেগে আছে। এ বিষয় এবং তাঁর মৃত্যু, শবদাহ ইত্যাদি অনেকেই সবিস্তর লিখেছেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হিটলারের ড্রাইভার কেম্পকার 'আমি হিটলারকে পুড়িয়েছিলুম' এবং লিঙের কাহিনী। হিটলারের অন্যতম মহিলা সেক্রেটারি ছদ্মনামে 'হিটলার প্রিভাট' অর্থাৎ হিটলারের প্রাইভেট জীবন নিয়ে বই লেখেন। সর্বশেষে হিটলারের নরদানব অ্যাডজুটাণ্ট গ্যুন্‌শের বিবৃতি—রুশ কারাগারে দশ বছর কাটানোর পর জর্মনি ফিরে এসে তিনি বিবৃতি দেন। কিন্তু ট্রেভার রোপার সকলের জবানবন্দি ও বিবৃতি যাচাই করে লিখেছেন বলে তাঁকে অনুসরণ করাই প্রশস্ত। এস্থলে বলে রাখা ভালো হিটলার সপ্তাহখানেক পূর্বে তাঁর চারজন মহিলা সেক্রেটারিকেই বুঙ্কার ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় চলে যাবার প্রস্তাব করেন। দুজন চলে যান, দুজন থাকেন। নিরামিষাশী হিটলারের জন্য রান্না করতেন ফ্রলাইন মান্‌ৎস্নিয়ালী। তিনিও থেকে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি। লিঙেকেও যাওয়া না-যাওয়া তাঁর ইচ্ছার উপর ছেড়ে

দিয়েছিলেন—তিনি যাননি। ফলে রাশাতে দশ বৎসর কারাভোগ করতে হয়েছিল।

অবধারিত আশু বিপদের সামনে মানুষ সব সময় ভেঙে পড়ে না। জাপানী যখন সিঙ্গাপুর দখল করে তখন সব-কিছু জেনেশুনেই সিঙ্গাপুর-বাসিন্দারা বিশেষ করে ইংরেজগুষ্টি নৃত্য-মদে মত্ত ছিলেন। এস্থলেও তাই হল। হিটলারের বিদায় নেওয়ার পরই সবাই বুঝে গেল, এই শেষ, আর আশানিরাশার কিছু নেই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বুঙ্কারে (হিটলারেরটা প্রথম) তখন আরম্ভ হল জালা জালা অত্যুৎকৃষ্ট মদ্যপান ও গ্রামোফোন যোগে নৃত্য। 'হেসে নাও দু'দিন বই তো নয়'—এস্থলে 'দু'দিন' শব্দার্থে। ঠিক দু'দিন বাদেই রুশরা বুঙ্কার দখল করে।

৩০ এপ্রিল—শেষ দিন

সকালবেলা জেনারেলরা বার্লিনের ভিন্ন ভিন্ন অংশের খবর নিয়ে মন্ত্রণাসভায় এলেন। অবস্থা আগের চেয়ে সামান্য একটু ভালো, কিন্তু হরেদরে সেই পুরনো কাহিনী—জর্মনরা যদি অসীম বিক্রমে কোনো এক অংশে একটুখানি এগোয় তবে রুশরা আর পাঁচটা দুর্বল জায়গায় তারও বেশী এগিয়ে আসে।

হিটলার আগের রাত্রে যে শেষ টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন তার উত্তর আসেনি, আর বরমান হিটলারের অনুমতিতে বিনানুমতিতে গণ্ডায় গণ্ডায় যে-সব টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন তারও কোনো উত্তর নেই।

দুপুরবেলার মন্ত্রণাসভা হিটলারের জীবনের শেষ সভা। এবং সে-সভায় যে খবর সব এলো সে-রকম দুঃসংবাদ তিনি জীবনে আর কখনো শোনেননি (এবং শুনতেও হবে না)। রাষ্ট্রভবন থেকে উত্তরে বেরবার পথে স্প্রে খাল। তার ভাইডেনডামার ব্রিজের কাছে রুশরা এসে গেছে (এই পোলের উপর দিয়েই বরমান এবং কয়েকজন পরের দিন বার্লিন থেকে বেরুনোর চেষ্টা করেছিলেন) —অর্থাৎ উত্তরের পথও বন্ধ হল। এবং রাষ্ট্রভবনের এক কোণ যে ফস্ স্ট্রীটে এসে ঠেকেছে তার অন্য প্রান্তের টানেলের কিছুটা রুশরা দখল করে ফেলেছে। নির্লিপ্ত নিরাসক্ত চিত্তে হিটলার সঞ্জয়-বার্তা শুনে গেলেন।

দুটোর সময় হিটলার লাঞ্চ খেতে বসলেন। এফা আসেননি।

তিনি যে মানসিক চঞ্চলতা ও উত্তেজনায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন সে-কথা লিঙে বলেছেন। ট্রেভার রোপার ঐতিহাসিক। মানুষের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ নিয়ে তাঁর কারবার কম—বিশেষ করে এফা যখন ইতিহাসে কোনো অংশ নেননি, তখন তিনি যে তাঁকে কিঞ্চিৎ অবহেলা করবেন সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু লিঙে

ভ্যালে। তিনি তাঁর বিবৃতিতে যে এফার জন্য একটু বেশী স্থান দিয়েছেন সেটা কিছু বিস্ময়জনক নয়। লিঙে বলেছেন, ঐ শেষের দিনেও তিনি লিঙেকে অনুরোধ করেন, হিটলারকে বুঙ্কার ত্যাগ করার জন্য চেষ্টা দিতে। এস্থলে অন্য আরেকটি ব্যাপারে ট্রেভার রোপারের সঙ্গে লিঙের কাহিনী মেলে না। ট্রেভার রোপারের মতে গ্যোবেল্‌স্‌ আগাগোড়া হিটলারকে বার্লিন ত্যাগ না করতেই উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু লিঙের বিবরণী থেকে জানা যায়, গোড়ার দিকে না হোক অন্তত শেষের দিকে তিনি পর্যন্ত লিঙেকে এফারই মত অনুরোধ জানান, লিঙে যেন হিটলারকে বার্লিন ত্যাগ করার কথা বোঝান। লিঙে নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, তিনি ফ্যুরারের মন্ত্রী ও নিত্যালাপী হয়েও যে কর্ম সমাধান করতে পারেননি, সামান্য লিঙে সেটা করবেন কি প্রকারে?

লাঞ্চের পর হিটলার যখন বিশ্রাম করছেন তখন ফ্রাউ (মিসেস) গ্যোবেল্‌স্‌ লিঙের হাতে একখানা চিরকুট দেন হিটলারের জন্য। শেষবারের মত একবার দেখা করে যেতে। হিটলার প্রথমটায় ভ্রূ-কুঞ্চিত করে পরে সেদিক পানে চললেন। সিঁড়িতে গ্যোবেল্‌সের সঙ্গে দেখা। তিনি হিটলারকে মত পরিবর্তন করতে বললেন। হিটলার অনিচ্ছা জানিয়ে আপন বুঙ্কারে ফিরে এলেন।

এ ঘটনার উল্লেখ আর কেউ করেননি, কারণ লিঙে ভিন্ন আর সবাই ওপারে। ইতিমধ্যে হিটলারের অন্তরতম অন্তরঙ্গ জনা পনেরো বুঙ্কারের করিডরে দাঁড়িয়ে আছেন। হিটলার ও ফ্রাউ হিটলার (এফা) তাঁদের সঙ্গে নীরবে একে একে করমর্দন করলেন। এই শেষ বিদায়। ফ্রাউ গ্যোবেল্‌স্‌ উপস্থিত ছিলেন না। সন্তান ক'টির আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে তিনি ভেঙে পড়েছিলেন।

বুঙ্কারে সৈন্যসামন্ত এবং তজ্জনিত রূঢ় কঠোর বাতাবরণের ভিতর এসব সুন্দর মধুর বচ্চোদের দেখাতো যেন অন্য কোনো জগতের; কোন বেহেশ্‌তের ফিরিশতা দেবদূতের মত। তারা এঘর থেকে ওঘরে ছুটোছুটি করতো। এক বুঙ্কার থেকে অন্য বুঙ্কার যেতে হলে যেখানে দেশের প্রধান সেনাপতি কাইটেলকেও পাস দেখাতে হত সেখানেও তাদের অবাধ গতি। যে কদিন পাইলট নারী হানা রাইট্‌শ্‌ বুঙ্কারে ছিলেন তারা তাঁর কাছ থেকে কোরাস্‌ গান শিখেছে। তাদের কি ভয়? ঐ তো কাকা আডল্‌ফ্‌ রয়েছেন। তিনি ঈশ্বরের মত (ঈশ্বর জাতীয় 'কুসংস্কার' গ্যোবেল্‌স্‌ দম্পতি হয়ত বাচ্চাদের জন্য ব্যান করে দিয়েছিলেন! সর্বশক্তিমান; এই তো তারা জন্মের প্রথম দিন থেকে জানে। কাকা হিটলারের অনুকরণে তাদের প্রত্যেকের নাম 'এচ' অক্ষর দিয়ে আরম্ভ।

শেষ বিদায় নেবার পর একমাত্র তাঁরাই করিডরে রইলেন যাঁরা হিটলারের

শেষ-কৃত্য সমাধান করবেন, অন্যদের বিদায় দেওয়া হল।

হিটলার ও এফা তারপর তাঁদের খাস কামরাতে ঢুকে দরজা বন্ধ করতেই,—লিঙে তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন—তিনি হঠাৎ কি এক অজানা ভয়ে করিডর দিয়ে ছুটে পালালেন। অল্পক্ষণের ভিতরই কিন্তু তাঁর মাথা ঠাণ্ডা হল। তিনি ধীর পদক্ষেপে ফিরে এলেন।

এর পরের ঘটনা দিয়ে, আমরা এ-প্রবন্ধ আরম্ভ করেছি। মাত্র একটি গুলি ছোঁড়ার শব্দ শোনা গেল, এবং লিঙে বলছেন পোড়া বারুদের কটু গন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে ভেসে এল।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে লিঙে, গ্যান্‌শে, বরমান, গ্যোবেল্‌স্ ইত্যাদি ঘরে ঢুকলেন এবং যা দেখতে পেলেন তা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

মৃতদেহ দুটি পোড়াবার জন্য দশ লিটার পেট্রল আনতে সেদিন সকালেই হিটলার তাঁর অ্যাডজুটাণ্ট গ্যান্‌শেকে আদেশ দিয়েছিলেন। গ্যান্‌শে হিটলারের ড্রাইভার কেম্পকাকে সে আদেশ জানালে তিনি বলেন, অতখানি পেট্রল যোগাড় করা সম্ভব হবে না (রুমানিয়া রাশান হাতে চলে যাওয়ার পর বার্লিন আর কোন পেট্রল পায়নি)। অবশেষে পেতে হবেই হবে আদেশ এলে কেম্পকা অতি কষ্টে ১৮০ লিটার পেট্রল টিনে করে বুঙ্কারের বাইরের বাগানে পাঠিয়েছিলেন। শেষ রেস্ত খতম না হওয়া পর্যন্ত হিটলার যে জুয়োখেলা বন্ধ করেননি, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সকাল থেকেই অন্যান্য বুঙ্কার থেকে হিটলার-বুঙ্কারে আসার সব ক'টা পথ তালা মেরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল—যাতে করে অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং প্রয়োজনীয় জন ভিন্ন অন্য কেউ ঘুণাক্ষরেও কিছু টের না পায়।

হিটলারের আপন সৈন্যবাহিনী এস. এস. সৈন্য ও লিঙে হিটলারের দেহ কম্বলে জড়িয়ে নিলেন—রক্তমাখা মাথা মুখ ঢাকবার জন্য। পরিচিত কালো পাতলুন পরা পা দুখানা দেখে করিডরে আর সবাই অনায়াসে ইনি যে হিটলার সেকথা বুঝতে পারলেন। চার দফে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে এরা পঞ্চাশ ফুট উপরে খোলা বাগানে বেরুলেন। ইতিমধ্যে বরমান এফার দেহ তুলে নিলেন। তিনি বিষ খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলে তাঁর দেহে কোনো রক্তের দাগ ছিল না, এবং দেহটিকে ঢাকবার প্রয়োজন হয়নি। বাগানে এনে তাঁর দেহ হিটলারের দেহের পাশে শোয়ানো হল।

কিন্তু ইতিমধ্যে একটি 'দুর্ঘটনা' ঘটে গেল। ম্যাটির উপরে বুঙ্কারের যে প্রহরা মিনার ছিল সেখান থেকে প্রহরারত মান্‌স্‌ফেল্ট নিচে সন্দেহজনক দ্রুত চলাফেরা;

এই দুদিনে বিয়ের রেজেস্ট্রি অফিসার যোগাড় করা সহজ হয়নি। শেষটায় একজন এলেন যাঁকে বুঙ্কারের কেউই চেনে না। গ্যোবেল্‌স্ এঁকে যোগাড় করে এনেছেন; লিঙের মতে ইনিই নাকি একদা গ্যোবেল্‌সের বিয়ে সম্পন্ন করেন। এমার্জেন্সি বা বিন্‌নোটিসের বিয়ে বলে বহ্বাড়ম্বর আর বাহ্যাড়ম্বর বাদ দেওয়া হল। দুই পক্ষ মৌখিক—সাধারণতঃ হিটলার-জর্মনিতে সার্টিফিকেট দরকার হত—শপথ দিলেন, উভয়েই অবিমিশ্র 'আর্যরক্ত' ধরেন, ও তাঁদের বংশগত কোনো ব্যাধি নেই। তারপর উভয়ে রেজিস্ট্রিতে সই করলেন। কনে নাম সই করার সময় 'এফা' লিখে 'ব্রাউন' লেখবার জন্যে 'বি' হরফ লিখে ফেলেছিলেন; তাঁকে ঠেকানো হলো, তিনি 'বি' কেটে 'হিটলার' ও 'ব্রাউন নামে জন্ম' (nee) লিখলেন। গ্যোবেল্‌স্ ও বরমান সাক্ষী হলেন।[১২] রাত তখন একটা বেজে গিয়েছে। ২৯ এপ্রিল শুরু হয়েছে।

বিয়ের পর হিটলারের ঘরে পার্টি বসলো। শ্যাম্পেন এল। বহু বৎসর পূর্বে গ্যোবেল্‌স্ যখন বিয়ে করেন তখন হিটলার সে বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। গ্যোবেল্‌স্ দম্পতি ও হিটলার সেই অবিমিশ্র আনন্দের দিনের সঙ্গে অদ্যকার আনন্দের উপর করাল ছায়ার তুলনা করে সে সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন। জর্মন ভাষায় একটি সংহিটে আছে, 'চোখের জল নিয়ে আমি নাচছি'—এ যেন তাই। হিটলার আবার তাঁর আত্মহত্যার কথা তুললেন। বললেন, তাঁর জীবনাদর্শ (ভেল্টআনশাউউঙ) নাৎসিবাদ খতম হয়ে গেল; এর পুনর্জন্ম আর কখনো হবে না। তাঁর সর্বোত্তম বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে প্রবঞ্চনা আর বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। মৃত্যুর ভিতর দিয়েই তিনি এসব থেকে নিষ্কৃতির আরাম পাবেন।

পার্টি চালু রেখে তিনি পাশের ঘরে তাঁর স্টেনো-সেক্রেটারি ফ্রাউ য়ুঙেকে নিয়ে তাঁর দুখানা উইল মুখে মুখে বলে যেতে লাগলেন। প্রথম উইলখানা রাজনৈতিক, দ্বিতীয়খানা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে। পাঠক

মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে তিনি লিঙের কাছে যে সব করুণ কথা বলেন সেগুলোও পড়ার যোগ্য।...হিটলারের চিকিৎসক মরেলও এফা সম্বন্ধে তাঁর জবানবন্দিতে কিছু কিছু বলেছেন।

১২ কয়েক মাস পূর্বে; অর্থাৎ এ-বিয়ের কুড়ি বৎসর পর রুশদের প্রধান সেনাপতি—যিনি বার্লিন জয় করেন—ঘোষণা করেন যে তাঁর মূল্যবান সম্পত্তির মধ্যে আছে এই দলিলখানা। রুশরাই সর্বপ্রথম বুঙ্কার দখল করেছিল বলে বিয়ের রেজিস্টারখানা তারাই হস্তগত করে।

হিটলার সম্বন্ধে যে কোনো বইয়ে এ দুখানার কপি পাবেন। আমি সংক্ষেপে সারি। সর্বপ্রথমেই তিনি আরম্ভ করেছেন এই বলে যে, 'একথা মিথ্যা যে আমি বা জর্মনির আর কেউ এ যুদ্ধ চেয়েছিল। এটা ইহুদি এবং যারা তাদের জন্য কাজ করে তাদের কীর্তি···এখন আমার সৈন্যবল আর নেই বলে রাষ্ট্রপতি ভবন আক্রান্ত হলে আমি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করবো। আমি শত্রুর হাতে ধরা দেব না —ইহুদিরা যাতে করে আমাকে নিয়ে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত জনতার জন্য একটা নয়া তামাশা সৃষ্টি না করতে পারে।···তারপর তিনি গ্যোরিঙ ও হিমলারকে নাৎসি পার্টি থেকে ও সর্ব আসন থেকে বিচ্যুত করে বললেন, 'এঁরা যে শক্তিলোভে শত্রুর সঙ্গে গোপন সন্ধি-প্রস্তাব করে শুধু আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তাই নয়, জর্মনি ও তার নাগরিকদের মুখে অমোচনীয় কলঙ্ককালিমা মাখিয়েছেন।' হিটলারের মূলমন্ত্র ছিল 'যুদ্ধের সাধন কিংবা জীবনপাতন'— সন্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করাই বেইজ্জতির চূড়ান্ত। সর্বশেষে তিনি জর্মনদের কঠোরতম নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের রক্তে যেন সংমিশ্রণ না হয় তার জন্যে, এবং বিশ্বে বিষসঞ্চারণকারী আন্তর্জাতিক ইহুদিদের নির্দয়ভাবে প্রতিরোধ করার জন্য দিব্য দিলেন।···এই উইলেই তিনি এডমিরাল ড্যোনিৎসকে দেশের নেতৃত্ব দিলেন, এবং তাঁর জন্যে মন্ত্রিসভা নির্বাচন করে গেলেন।[১৩]

তাঁর ব্যক্তিগত হ্রস্ব উইলে তিনি এফাকে বিবাহ করার পটভূমি ও কারণ দর্শালেন। তারপর বললেন, 'তিনি স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করছেন।' তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি নাৎসি পার্টিকে দান করলেন, পার্টির অস্তিত্ব লোপ পেলে জর্মন রাষ্ট্রকে, এবং সেও যদি লোপ পায় তাহলে সে বিষয়ে তাঁর আর কোনো নির্দেশ নেই। তাঁর বিরাট চিত্রসঞ্চয় তিনি তাঁর জন্মভূমির লিন্‌ৎস্‌ শহরের যাদুঘর নির্মাণের জন্য দিলেন। দরকার হলে তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর আত্মজন, তাঁর সহকর্মী সেক্রেটারি ইত্যাদি যেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মত জীবনযাত্রা করতে পারেন, তার আর্থিক ব্যবস্থাও তিনি উইলে রাখলেন।···উইল লেখা শেষ হলে ভোর চারটায় তিনি শুতে গেলেন। হায় রে বাসরশয্যা!

গ্যোবেল্‌স্‌ও তাঁর উইল লিখলেন। তাঁর প্রধান বক্তব্য: ফ্যুরার আমাকে আদেশ দিয়েছেন, নূতন মন্ত্রিসভায় অংশ নিতে, কিন্তু জীবনে এই প্রথমবার (এবং ইচ্ছে করলে তিনি 'শেষবারের' মতোও লিখতে পারতেন; কেন করলেন না, বোঝা ভার) আমি ফ্যুরারের আদেশ সরাসরি লঙ্ঘন করছি।

১৩ ড্যোনিৎস এঁদের অধিকাংশকেই গ্রহণ করেননি

দরজা খোলা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেল। প্রহরীর কর্তব্য অনুযায়ী অনুসন্ধান করতে নীচে এসে বুঙ্কারের সামনে সে খেল ধাক্কা শবযাত্রার সঙ্গে। এফাকে সে পরিষ্কার চিনতে পারলো এবং কম্বলে ঢাকা শরীর থেকে কালো পাতলুন পরা দুখানা পা ঝুলছে দেখতে পেল। সঙ্গে বরমান, জেনারেল বুর্গডর্ফ (পূর্বের সেই পাঁড়-মাতাল), দানব সাইজের অ্যাডজুটাণ্ট গ্যুন্‌শে, ভ্যালে লিঙে। গ্যুন্‌শে হুঙ্কার দিয়ে মান্‌স্‌ফেল্টকে সরে যেতে বললো। আদর্শনীয় চিত্তাকর্ষক ব্যাপার দেখা হয়ে গেল মান্‌স্‌ফেল্টের।

বরমান সম্প্রদায় সব আটঘাট বেঁধে ভেবেছিলেন 'সাবধানের মার নেই'।

সপ্রমাণ হল 'মারেরও সাবধান নেই'!

অনুষ্ঠান আবার চললো।

বুঙ্কারের দরজার উপর পর্চ ছিল। দরজা থেকে কয়েক হাত দূরে দুটি লাশ মাটিতে শুইয়ে তার উপর পেট্রল ঢালা হল। এমন সময় রাশান কামানের বোমা এসে পড়তে লাগল বলে শবযাত্রীরা পর্চের তলায় আশ্রয় নিলেন। ট্রেভার রোপারের মত গ্যুন্‌শে একখানা ন্যাকড়াতে পেট্রল ভিজিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে সেটা লাশদের উপর ছুঁড়ে ফেললেন। লিঙে বললেন, তিনি খবরের কাগজে আগুন ধরিয়ে ছুঁড়ে মারেন। সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে উঠে লাশ দুটো ঢেকে ফেললো। পর্চে দাঁড়িয়ে শবযাত্রীদল হিটলারকে শেষ মিলিটারি সেল্যুট দিলেন। তারপর তাঁরা বুঙ্কারের ভিতরে ফিরে গেলেন।

কারনাও নামক আরেকজন সাধারণ প্রহরীরও এসব গোপন অনুষ্ঠান দেখবার কথা নয়। বুঙ্কারের ভিতরকার দরজা তালাবন্ধ দেখে সেও বাগানের দিক দিয়ে ঘুরে আসবার চেষ্টা করে মোড় নিতেই আশ্চর্য হল। হঠাৎ সামনে দেখে দুটি মৃতদেহ পাশাপাশি শুয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো ধপ করে জ্বলে উঠলো—বুঙ্কার মিনারের পর্চা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল বলে সে দেখতে পায়নি. ওখান থেকেই জ্বলন্ত ন্যাকড়া, কাগজ ছুঁড়ে লাশে আগুন ধরানো হয়েছে। খানিক পর আগুন একটু কমে যেতে সে পরিষ্কার চিনতে পারলো ভগ্ন-মুণ্ড হিটলারের দেহ। প্রহরী কার্‌নাও কিন্তু সেখানে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলো না। পরে সে বলে, 'বীভৎসতম দৃশ্য'। গ্যুন্‌শের মত বিরাট-দেহ দানব তাবৎ জর্মনিতেই কম ছিল। অল্পেতে বিচলিত হবার পাত্র নয়। সে পর্যন্ত বলে, 'হিটলারের দেহ-দাহ-দর্শন আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা'।

প্রহরা পুলিসের এক তৃতীয় ব্যক্তি এই ঐতিহাসিক দৃশ্য দেখবার জন্য বুঙ্কারের পর্চে গিয়ে দাঁড়ান কিন্তু মনুষ্যদেহ-বসা পোড়ার দারুণ উৎকট দুর্গন্ধ তাঁকে

সেখান থেকে পালাতে বাধ্য করে।

মিনারের ঘুলঘুলি দিয়ে মান্‌স্‌ফেল্ট ও কার্‌নাও দেখতে পান, কিছুক্ষণ পরে পরে এস. এস-এর লোক বুঙ্কার থেকে বেরিয়ে 'চিতা'তে আরো পেট্রল ঢেলে দিচ্ছে। তারপর দুজনাতে নিচে নেমে এসে দেখেন, লাশগুলোর পায়ের দিকটা পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে এবং হিটলারের হাঁটুর হাড় দেখা যাচ্ছে। এক ঘণ্টা পর তাঁরা ফের এসে দেখেন আগুন তখনো জ্বলছে, কিন্তু তেজ কম।

হিটলার আত্মহত্যা করেন অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটেয়—লিঙের হিসেবে তিনটে পঞ্চাশে। খুব সম্ভব বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছ'টা অবধি পেট্রল ঢালা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেট্রল ফুরিয়ে যাবার পরও দেখা যায়, দেহ দুটো পুড়ে ছাই হওয়া দূরে থাক্, মাসচাম পুড়ে গিয়ে কালো হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও হিটলারকে যাঁরা কাছের থেকে দেখেছেন তাঁরা তখনো তাঁকে চিনতে পারবেন।

শবদাহকারীগণ পড়লেন বিপদে। হিটলার এ পরিস্থিতির সম্ভাবনা মনশ্চক্ষে দেখেননি এবং সে অনুযায়ী কোনো নির্দেশও দিয়ে যাননি। লিঙে তাঁর বিবৃতিতে হক্ কথা বলেছেন: পেট্রল দিয়ে মানব-দেহ পোড়ানো তো সহজ কর্ম নয়, হিটলার কেরোসিনের ব্যবস্থা করে গেলেন না কেন? লাশ পোড়ানোর অভিজ্ঞতা ভারতের বাইরে কম লোকেরই আছে। এটা যে কত কঠিন কর্ম সেটা যে সব নাৎসি গ্যাস-চেম্বারের লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরে পরে বিরাট বিরাট চুল্লিতে এদের লাশ পোড়ান, তাঁরা, ন্যুরন্‌বের্গের মোকদ্দমায় জবানবন্দির সময় এ-কথার উল্লেখ করেছেন। এঁদের কর্তা বলেন, 'হাজারখানেক মানুষ গ্যাস দিয়ে মারতে আমাদের বারো মিনিটেরও বেশী সময় লাগতো না, কিন্তু সেগুলো পুড়িয়ে ভস্মীভূত করা ছিল অতিশয় কঠিন ব্যাপার। আমাদের চুল্লীগুলো দিনের পর দিন চব্বিশ ঘণ্টা চালু রেখেও এদের নিশ্চিহ্ন করতে পারতুম না। বিস্তর হাড় চুল্লির তলায় পড়ে থাকতো।' অন্য এক সাক্ষী বলেন, 'সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ছিল চুল্লীর ধুঁয়ো। মানুষের পুড়ে-যাওয়া ছাই চিমনি দিয়ে বেরিয়ে বাতাসে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে আমাদের নাকে-কানে পোশাকে-আশাকে সর্বত্র ঢুকে পড়তো। পাশের এবং দূরের গাঁয়ের লোকগুলো পর্যন্ত বুঝে যায় যে আমরা কোন্ ব্যবসাতে লিপ্ত আছি।'

হিটলারের অনুচরবর্গ ভাবলেন, তাঁর প্রধান বাসনা ছিল তাঁর দেহ যেন শত্রুহস্তে বর্বর তামাশার বস্তু না হয়; অতএব তাঁকে যদি খুব গোপনে গোর দেওয়া হয়, তবে 'ইহুদি' ও রুশরা তাঁর অর্ধদগ্ধ দেহ খুঁজে পাবে না। সন্ধ্যা মিলিয়ে যাওয়ার পর পুলিসকর্তা রাটেনহুবার গার্ডদের বুঙ্কারে ঢুকে সেখানকার

সার্জেন্টকে বললে, হিটলার দম্পতির লাশ গোর দেবার জন্য তিনজন বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন। তাঁদের নিয়ে যেন তিনি আসেন। এঁদের শপথ করানো হল, তাঁরা সব-কিছু গোপন রাখবেন। নইলে তাঁদের গুলি করে মারা হবে।

এঁদের একজনের নাম মেঙের্‌স্‌হাউজ্‌ন্‌ ও অন্যজন গ্লান্‌ৎসার। দ্বিতীয়জন বার্লিনের রাস্তার যুদ্ধে মারা যান, এবং প্রথমজন রুশহস্তে বন্দী হয়ে রুশদেশে দশ বছর কাটিয়ে পশ্চিম জর্মনিতে ফিরে আসেন। তিনি বলেন, হিটলারের শরীর সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়া দূরে থাক, তাঁকে তখনো চেনা যাচ্ছিল।

বাগানে চিতার কাছে বোমা পড়ে একটা গর্ত হয়েছিল। মেঙের্‌স্‌হাউজ্‌ন্‌ ও গ্লান্‌ৎসার সেটাকে একটা ডবল গোরের সাইজে তিন ফুট গভীর করে খুঁড়লেন। তলায় তক্তা পেতে তার উপর লাশ দুটি রেখে উপরে মাটি চাপা দেওয়া হল।

লিঙে ও রাটেরহুবার রুশদেশে দশ বৎসর বন্দীদশায় কাটিয়ে ফিরে এসে বলেন, তাঁরা ঠিক গোরের সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন না বটে তবে বাগানের একটা বোমাতে বানানো গর্তে যে উভয়ের কবর দেওয়া হয় সেটা সত্য। রাটেনহুবার তার সঙ্গে যোগ দিয়ে বলেন, শেষ মিলিটারি সম্মান দেবার জন্য তাঁর কাছে একখানা স্বস্তিক (হাকেন্‌ক্রয়েৎস—হুক্‌ট ক্রস) পতাকা চাওয়া হয়, কিন্তু তিনি যোগাড় করতে পারেননি।

মধ্যরাত্রে প্রহরী মান্‌স্‌ফেল্ট আবার প্রহরায় ফিরে এসে আবার মিনারে চড়ল। রাশান বোমা তখনো চতুর্দিকে পড়ছিল ও বিমানবাহিনী আকাশে হাউই ফাটাচ্ছিল। তারই আলোকে সে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল, লাশ দুটো নেই, এবং বোমাতে খোঁড়া এবড়ো-খেবড়ো গর্তটা পরিপাটি লম্বমান চতুষ্কোণ গোরের আকারে নির্মিত হয়েছে। তার মনে কোনো সন্দেহ রইল না, এটা মানুষের হাতের দক্ষ কাজ; আকাশ বা কামান থেকে বোমা পড়ার ফলে এ রকম সুবিন্যস্ত নমুনা তৈরী হতে পারে না।

ওদিকে তার সহকর্মী কার্‌নাও রাষ্ট্রভবনের কাছে সঙ্গীদের নিয়ে প্রহরার রোঁদে বেরিয়েছিল। এদের একজন তাকে বললে, 'ভাবতে দুঃখ হয়, অফিসার-দের একজনও ফ্যুরারের দেহ কোথায় রইল না-রইল সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমি তাঁর দেহ কোথায় আছে জানি বলে গর্ব অনুভব করি।' (লোকটি হয় মেঙের্‌স্‌হাউজ্‌ন্‌, নয় গ্লান্‌ৎসার)।

কিন্তু যে-ই হোক লোকটির প্রথম বাক্যটি ন'সিকে খাঁটি। হিটলারের মৃত্যুর পর থেকে বাকি সব ব্যবস্থা অত্যন্ত অবহেলা ও দরদহীনভাবে করা হয়। এমনিতে জর্মনরা অত্যন্ত পাকা কাজ করতে অভ্যস্ত। তাহলে এমনটা হল কেন? খুব

সম্ভবত লোকে যে বলে হিটলার তার সাঙ্গোপাঙ্গকে (এমন কি বহু বিদেশীকেও) মন্ত্রমুগ্ধ, প্রায় মেস্‌মেরাইজ করে রাখতেন সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। সেই ভানুমতীর ভোজবাজির সঙ্গে সঙ্গে যখন ম্যাজিসিয়ান হিটলার-ভানুমতীও অন্তর্ধান করলেন তখন তারা হঠাৎ সচেতন হল, তাদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে। অন্ধ হোক সত্য বিশ্বাস হোক এতদিন 'গুরুর উপর তারা তাদের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখন ? 'ঈচ্ ফর হিমসেলফ্ এ্যাণ্ড ডেভিল টেক দি হাইণ্ডমোস্ট'—'চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা, আর শয়তান নিক যেটা সক্কলের পিছনে, যেটা অগা কাঁচা'। বরমান অবশ্য তখন নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, কিন্তু বুঙ্কারের অন্যতম অধিবাসী—সে বেচারী লাটবেলাট কিছুই না, এমন কি সামান্য 'আগডোম বাঘডোমের' ডোম সেপাইও নয়, সে নগণ্য দরজী, য়ুনিফর্ম বানায়, 'রিপুকম্ম' করে—সে বলে, 'নেতৃত্ব কখ্‌খনো এক কানাকড়িরও ছিল না, লোকগুলো হেথাহোথা ছুটোছুটি করছিল মুণ্ডুকাটা মুর্গীর মত।' কিন্তু সেটা তার পরের অধ্যায়ের কাহিনী—সেটা আমি লিখতে যাচ্ছি নে।

আমি শুধু হিটলারের গোর দেওয়ার পরের একটি ঘটনা উল্লেখ করবো। আনাড়ি হাতে হিটলার-এফার শবদেহ পোড়ানোর অপটু প্রচেষ্টা যথেষ্ট বীভৎস, এটা বীভৎস ও নিষ্ঠুর।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সেই রাত্রেই বুঙ্কারবাসীর পক্ষ থেকে রুশদের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব নিষ্ফল হয়। শেষ নিষ্ফলতার খবর আসে পরদিন, ১ মে, দুপুরের দিকে।

এবং পূর্বেই বলেছি, গ্যোবেল্‌স্ স্থির করেন যে তিনি সপরিবার আত্মহত্যা করবেন। এখন সে সময় এসেছে। তিনি সকলের সঙ্গ ত্যাগ করে সপরিবার আপন বুঙ্কারে চলে গেলেন। কোনো কোনো বন্ধু সেখানে তাঁর কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে নিলেন।

লিঙে বলেন—ট্রেভার রোপার এ-বাবদে স্বল্পভাষী—গ্যোবেল্‌স্ হিটলারের সার্জন ডাক্তার স্টুম্‌প্‌ফ্‌ফেগারকে ডেকে পাঠালেন। তিনি ভিতরে ঢুকতেই গ্যোবেল্‌স্ দম্পতি বেরিয়ে এলেন। ভিতরে কি হল কেউ সঠিক জানে না।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার সিঁড়ির কাছে বেরিয়ে এসে ফ্রাউ গ্যোবেল্‌সের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়লেন—অর্থ, 'হয়ে গেছে'। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রাউ গ্যোবেল্‌স্ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

ভিতরে কি হয়েছিল, কেউ জানে না, জানবেও না। কারণ ডাক্তার ও গ্যোবেল্‌স্ পরিবারের কেউই বেঁচে নেই। জনশ্রুতি, ডাক্তার যখন ঘরে

ঢুকলেন তখন বাচ্চারা কফি খাচ্ছে। তাদের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল; তিনি বললেন, 'কফি খাওয়া শেষ হলেই তোমাদের সবাইকে নানা রঙের লজেঞ্চুস দেব। নূতন ধরনের লজেঞ্চুস।' বাচ্চারা সাত-তাড়াতাড়ি তাদের কফি, কোকো, দুধ শেষ করলো। তিনি বিষে-ভরা লজেঞ্চুস দিলেন। নিজে অন্য ধরনের একটা নিলেন। সব্বাইকে একসঙ্গে মুখে পুরতে হবে। ব্যাস হয়ে গেল।...অন্যেরা বলেন, ইনজেকশন দেন, এবং সবচেয়ে বড় মেয়েটি নাকি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নেবে না বলে ধস্তাধস্তি করেছিল। এসব জনশ্রুতির মূলে কি ছিল? যে পাষণ্ড এরকম হীন কাজ করতে পারে সে হয়তো বুঙ্কারে তার পরিচিতদের ভিন্ন জনকে ভিন্ন কথা বলেছিল। যে এসব করতে পারে তার পক্ষে বলাটা আর এমন কি কঠিন কর্ম? কিংবা হয়তো তাঁর এসিসটেণ্ট ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছিল এবং জনশ্রুতিগুলোর মধ্যে একটা হয়তো তার।

এবং আরেকটা কথা বুঙ্কারের প্রায় সবাই জানতেন। একাধিক রমণী গ্যোবেল্‌স্‌দের সব ক'টি সন্তান একসঙ্গে বা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে, ছদ্মনামে বা আপন নামে পালাতে প্রস্তুত ছিলেন। বল্‌ট্‌ বলেছেন, 'গ্যোবেল্‌স্‌ শেষটায় তাঁর আপন প্রোপাগাণ্ডার ফাঁদে বন্দী। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন, বার্লিন অজেয়। তারপর শেষ মুহূর্তে যখন বার্লিনে হাজার হাজার অসহায় শিশু রোগে ক্ষুধায় মরছে, তখন তিনি—প্রোপাগাণ্ডা মন্ত্রী—আপন সন্তানদের নিরাপদ স্থলে পাঠান কি করে?' আমি বলি, পাঠালে কি হত? দু-চারটা লোক ঠাণ্ডা ব্যঙ্গ করতো। কিন্তু ছ-ছটি নিষ্পাপ শিশুর জীবন বড়, না দুটো হৃদয়হীনের তিনটে মস্করা!

পূর্বেই বলেছি, শিশুগুলোর সব কটারই নাম ছিল হিটলারের আদ্যক্ষর 'এচ' দিয়ে। তারা তাঁর সঙ্গেই গেল।

বেঁচে গেল শুধু একজন। গ্যোবেল্‌সের স্ত্রী তাঁর প্রথম স্বামীর সঙ্গে লগ্নচ্ছেদ (ডিভোর্স) করে গ্যোবেল্‌স্‌কে বিয়ে করেন। সে-পক্ষের একটি সন্তান ছিল। নাম কোয়াণ্ট্‌। গ্যোবেল্‌স্‌ তাকে খুব স্নেহ করতেন। সে তখন বার্লিন থেকে দূরে। গ্যোবেল্‌স্‌ তার জন্য একখানি সুন্দর চিঠি রেখে যান।

অতঃপর গ্যোবেল্‌স্‌ তাঁর অ্যাডজুটাণ্ট শ্যাগেরমানকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'এটাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিশ্বাসঘাতকতা; সব কটা জেনারেল ফ্যুরারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমাদের সব-কিছু লোপ হয়ে গেল। আমি সপরিবার আত্মহত্যা করবো। তুমি আমার দেহ পোড়াবার ভার নিতে পারো?" শ্যাগেরমান স্বীকৃত হলেন ও পেট্রলের জন্য লোক পাঠালেন কিন্তু অল্প

পরিমাণেই পাওয়া গেল। প্রায় সাড়ে আটটার সময় গ্যোবেল্‌স্‌ তাঁর স্ত্রীসহ বুঙ্কারের করিডর দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে চললেন। পথে শ্যুগেরমান ও ড্রাইভারকে পেট্রলসহ দেখতে পেলেন কিন্তু কোনো কথা বললেন না। বাগানে বেরিয়ে তিনি তাঁর অর্ডারলিকে আদেশ দিয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনা তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন। অর্ডারলি দুজনার ঘাড়ের উপর দুটি গুলি মারলো। শ্যুগেরমাদ শব্দ শোনার পর উপরে বাগানে গিয়ে মাটির উপর দুই মৃতদেহ পেলেন। পূর্বাদেশ অনুযায়ী তাঁরে চার টিন পেট্রল—আঠেরো গ্যালন—তাঁদের উপর ঢেলে চলে গেলেন। ঐটুকু পেট্রলে তাঁদের শরীরের চামড়া আর পোশাক পুড়েছিল মাত্র। মৃতদেহগুলো বিনষ্ট করার বা গোর দেবার কোন চেষ্টাই করা হয়নি। রাশানরা পরের দিন সেগুলো বুঙ্কার আক্রমণ করার সময় পায় ও তাঁদের সনাক্ত করতে কোনো অসুবিধা হয়নি। গ্যোবেল্‌সের ঝলসে যাওয়া শরীরের ফোটো-গ্রাফ কাগজে বেরয়। ভাঙা গাল চওড়া কপাল—চিনতে আমার পর্যন্ত কোনো অসুবিধা হয়নি।

উত্তর হিটলার

হিটলারের মনস্কামনা পূর্ণ হয়নি, আবার অন্য অর্থে হয়েও ছিল।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই সর্ব পবিত্র শপথ ভঙ্গ করে একাধিক ব্যক্তি বন্দী-দশায় রাশানদের কাছে হিটলারের শবদাহ ও কবরের গুপ্তভূমির খবর দিয়ে দেন। তারা হিটলার ও এফার মৃতদেহ খুঁড়ে বের করে ও মেঙেরুস্‌হাউজ্‌ন্‌ প্রভৃতিকে দিয়ে সন্দেহাতীতরূপে সনাক্ত করায়।[১৪]

কিন্তু রাশানরা বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ। ইতিহাস তাদের ভালো করেই পড়া। আছে। তারা জানে, এ-যুগে যাকে অপমান করে আগুনে পুড়িয়ে বা পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারা হয়, পরের যুগের লোক তাকেই শহীদরূপে পুজো করে—তার নির্যাতন-ভূমি তীর্থভূমিতে পরিণত হয়।

একজন বিচক্ষণ রুশ জনৈক বন্দী হিটলার-পার্শ্বচরকে বলেন, 'হিটলারের দেহ আমাদের কাছে গোপনে লুকোনো আছে, ভালেই আছে ; তোমরা জর্মনরা শহীদ পূজারী।'

তাই রুশরা হিটলারের দেহ জনগণের তামাশার জন্য বাজারে লটকায়নি। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে হিটলারের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে !!

১৪ সে আরেক দীর্ঘ কাহিনী এবং তার সঙ্গে যায় বুঙ্কার থেকে বরমান, লিঙে ইত্যাদির পলায়নের চেষ্টা। কিন্তু সেটা বর্তমান কাহিনীর অংশ নয়।

গ্রন্থপরিচয়

১

'বড়বাবু' মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে ফাল্গুন ১৩৪২-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। বইয়ের আকার ডবল মিডিয়ম ষোড়শাংশিত পাইকা টাইপে ছাপা, পৃষ্ঠা ২০৭। বইটির প্রচ্ছদপট আঁকেন বিখ্যাত শিল্পী শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচিত মহলে 'বড়বাবু' নামেই সমধিক অভিহিত হতেন। এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ। দ্বিজেন্দ্রনাথের ব্যক্তিচরিত্র সম্বন্ধে এরকম উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সম্ভবত আর কেউ লেখেন নি। প্রবন্ধটির নাম 'বড়বাবু'। প্রথম প্রবন্ধের নামেই গ্রন্থের নামকরণ। এই গ্রন্থে চরিত্র-প্রসঙ্গ জাতীয় আরও গুটি কয়েক প্রবন্ধ আছে, যেমন—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নেতাজী, সরলাবালা, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মিদ্বয়। ব্যক্তিচরিত্র-প্রসঙ্গ এবং সরস ও চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ ছাড়া 'সর্বাপেক্ষা সঙ্কটময় শিকার' নামের একটি রোমহর্ষক কাহিনী গ্রন্থটির অন্যতম আকর্ষণ। কাহিনীটি বিদেশী গল্পের অনুবাদ হলেও লেখকের সাবলীল রচনার গুণে কোথাও অনুবাদ বলে মনে হয় না। দুর্নিবার কৌতূহল পাঠককে গল্পের শেষ পর্যন্ত রুদ্ধশ্বাসে টেনে নিয়ে যায়। এই বইয়ের সব রচনাই দেশ, কথাসাহিত্য ও উল্টোরথ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

২

'কত না অশ্রুজল' বইটির প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১৩৪২। প্রকাশক—বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১ বি মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯। বইয়ের আকার ডবল মিডিয়ম ষোড়শাংশিত, পাইকা টাইপে ছাপা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭২। "কত না না অশ্রুজল" প্রবন্ধটি বইয়ের প্রথম রচনা। গ্রন্থের এক-চতুর্থাংশ ব্যাপী এই রচনার নামেই বইটির নামকরণ। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধরত নিহত আহত সৈনিকদের পত্রাবলী এই প্রবন্ধের বিষয়। বইয়ের অন্যান্য রচনার অধিকাংশই হিটলার ও নাৎসী-জার্মানী সম্পর্কিত ঘটনাবলী বিষয়ক। উপরোক্ত রচনাগুলি ছাড়া গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত 'দ্বন্দ্ব-পুরাণ' অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। এই বইয়ের অধিকাংশ লেখাই দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

'হিটলার' বইটিতে সৈয়দ মুজতবা আলীর হিটলার ও নাৎসী জার্মানী সম্পর্কিত সব লেখা একত্রিত করার চেষ্টা হয়েছে। চেষ্টা করা হয় বলার কারণ—এমন আরও পূর্ব-প্রকাশিত কিছু লেখা রয়ে গেছে যা এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। এই বইটি আষাঢ় ১৩৭৭-এ বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১ বি মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। আকার ডবল মিডিয়ম ষোড়শাংশিত, পাইকা টাইপ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৪। হিটলারের শেষ দশ দিবস ছাড়া অন্য রচনাগুলি (হিটলারের প্রেম, মস্কোযুদ্ধ ও হিটলারের পরাজয়, লক্ষ মার্কের বরমান, কনরাট্ আডেনাওয়ার, রাজহংসের মরণগীতি, আবার আবার সেই কামানগর্জন, হিটলার) 'টুনিমেম' 'রাজাউজীর' ও 'বড়বাবু'তে পূর্বেই মুদ্রিত হয়েছে ও রচনাবলীর পূর্ববর্তী অংশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেই কারণে 'হিটলার' অংশে ঐ রচনাগুলি অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

নকুল চট্টোপাধ্যায়

— চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত —

শৈলজানন্দ রচনাবলী

পঞ্চম খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬০

সম্পাদক

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সুমথনাথ ঘোষ

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা

চুনী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ

সিল্ক-স্ক্রীন ও

চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা ৯ হইতে পি. কে. পাল কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা	সৈয়দ আলী আহ্‌সান	৵০
অবিশ্বাস্য	...	১
শব্‌নম	...	১০৯
প্রেম	...	২৭১
দু-হারা		
দু-হারা	...	৩৪৫
প্রেমের প্রথম ভাগ	...	৩৮১
মধ্যপন্থা ওরফে মধ্যপন্থা	...	৩৯০
শ্রীচরণেষু	...	৪০০
পুচ্ছ (প্র)দর্শন	...	৪০৭
নটরাজনের একলব্যত্ব	...	৪১৯
বুড়ো-বুড়ী	...	৪৩৬
কোষ্ঠী-বিচার	...	৪৪৪
একটি অনমিত নাম :		
বনবিহারী মুখোপাধ্যায়	...	৪৪৭
অদৃষ্টের রঙ্গরস	...	৪৬৪
দ্বিজ	...	৪৮০
গ্রন্থ-পরিচয়	...	৪৮৭

ভূমিকা

একজন লেখক তাঁর উপলব্ধির প্রতিরূপ আবিষ্কার করেন শব্দে। অথবা আবিষ্কার না বলে বলা যায়, তিনি স্বতঃসিদ্ধান্তে একটি বক্তব্যে উপনীত হন। আমরা অনেক সময় সকালবেলায় জানালা খুলে আকাশের দিকে তাকাই, তখন হয়তো কুয়াশার অস্পষ্টতায় পাখী দেখি, মেঘ দেখি, এলোমেলো গাছের পাতা অথবা কাগজের টুকরো উড়ে যেতে দেখি, হয়তো গানের শব্দ কানে আসে, হয়তো অনেক পুরোনো ঘটনা সহসা মনে সাড়া তোলে। আমি যদি বুদ্ধিমান হই, তাহলে আমি তখন সমস্ত ঘটনার বিমিশ্রণে একটি কুশলী ভাষণ উপস্থিত করবো যার মধ্যে আমার চিন্তা ও অহমিকার পরিচয় থাকবে এবং অধীত বিদ্যার তাৎপর্য আবিষ্কৃত হবে। একটি উপলব্ধির পরিপূর্ণতায় এভাবেই লেখকের প্রথম পদক্ষেপ ঘটে। এ পরিপূর্ণতার পথে অন্তরঙ্গ ধ্যান এবং চিন্তায় শব্দগুলো আবেগ ও বিশ্বাসের উষ্ণতায় হৃদয়কে উন্মোচিত করে। সমস্ত ঘটনা এবং চিন্তা তখন শব্দ হিসেবে উদয় হয়।

শব্দ হচ্ছে দাবাখেলার গুটি। একটি বিশেষ মুহূর্তে জাতির সাহিত্যে যতগুলো শব্দ আছে তা নিয়েই তার বহু বিচিত্র কথার খেলা। আবার কখনও কখনও শব্দ যোগ করি, কখনও পুরাতন শব্দকে অস্বীকার করি এবং এভাবে আয়ত্তাগত শব্দের সামগ্রীকে অনবরত নব নব বিন্যাসে নতুন নতুন উপলব্ধির স্মারক করে তুলি।

সমাজ হচ্ছে শব্দবৈচিত্র্যের লীলাভূমি। মানুষের অনবরত সংলাপ, জিজ্ঞাসা, ইচ্ছা, অহমিকা, বেদনা, প্রতিদিন উচ্চারিত ধ্বনিকে ইঙ্গিতবহ করছে। আমরা যদি কখনও আমাদের কর্মে ও ইচ্ছায় সমাজ-বিমুখ হই, তাহলেও সমাজ আমাদের অনুসরণ করবে ভাষা হয়ে, কখনও জাগরণে, কখনও স্বপ্নে। শব্দ চিরকাল সমাজ ও সভ্যতার স্মৃতিকে ধারণ করে আছে, শব্দ হচ্ছে একটি জাতির ইতিহাস ও বিবেকের সাড়া। যিনি চিরকাল আকাশে স্বপ্ন ছড়াতে চান, তিনিও তাঁর শব্দকে মানবসমাজের চেতনার আড়ালে নিতে পারেন না। প্রতিদিনের গতি-বিধিতে যতটা অঞ্চল আমরা পরিক্রম করি, শব্দরূপে আমাদের ইচ্ছাগুলো তার চেয়েও অধিক অঞ্চল পরিক্রম করে, কিন্তু যেহেতু তা শব্দরূপে এবং যেহেতু শব্দসকল মুহূর্তেই সমাজের অনুভূতির উত্তাপ তাই আমাদের সকল ইচ্ছা, কল্পনা ও স্বপ্ন আমাদের সমাজ এবং সভ্যতার উৎপ্রেক্ষা মাত্র।

লেখায় প্রাথমিক পর্যায়ে যে সরলতা থাকে তা জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতার

অভাবের জন্য, কিন্তু সর্বশেষের সরলতা অভিজ্ঞতার প্রগাঢ়তার জন্য। আমরা প্রথমে ভাষাকে পাই, কিন্তু অবশেষে তাকে আবিষ্কার করি শাসনের মধ্যে এবং অস্তিত্বের বিচিত্র খেলায়। রুদ্ধবাক থেকে মুক্তবাক এবং অবশেষে সর্বসঞ্চয়ের অভিজ্ঞতায় স্বল্পবাক—যে কোনও প্রধান লেখকের লেখক-জীবনের ক্ষেত্রে এ উক্তি চরমভাবে সত্য। যাকে ইংরেজীতে বলে crystallization অর্থাৎ স্ফটিক-বন্ধন, আমাদের অভিজ্ঞতা যখন স্ফটিকের নিশ্চিত স্বচ্ছতায় পরিণত হবে, তখন অনেক কথা বলবার প্রয়োজন করবে না। অতি অল্প কথায় আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাকে বাঙ্ময় করবো। আমরা প্রতিদিন জীবনের অলিন্দে দাঁড়িয়ে অভিজ্ঞতার নিঃশ্বাস গ্রহণ করছি। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে জীবনের যে সঞ্চয়, অভিজ্ঞতার আহরণ নিয়ে একজন লেখকের জীবনে তা যেমন সত্য, অন্য কারোও জীবনে তেমন নয়।

পাঠকের বুদ্ধিকে দীপিত করা এবং আবেগকে পরিচ্ছন্ন করার দায়িত্ব লেখকের। শব্দের বিন্যাসের মধ্যে নতুন ধ্বনি-ব্যঞ্জনা দান করে, বক্তব্যকে একই সঙ্গে চিন্তা ও আবেগের মধ্যে শিহরিত করে পাঠকের আপন বোধের রাজ্যে লেখক তার সত্তাকে কম্পিত দেখবেন। প্রতিদিনের কথা একটি তীব্র স্বাভাবিকতায় অথচ এ-মুহূর্তের সীমাকে অতিক্রম করে একটি জীবনের স্মরণচিহ্ন হবে। জ্ঞানের পরিধি বর্তমানে অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা যা জানি তা আমাদের প্রতি-দিনের প্রয়োজনের অনেক বেশী অর্থাৎ যতটা আমাদের ব্যবহারে লাগবে তার চেয়ে অনেক বেশী। একজন লেখককে এ জানার অসম্ভব প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে বাস করতে হয়। পাঠক যেখানে বাস করেন ব্যবহারের এবং প্রয়োজনের পৃথিবীতে লেখক সেখানে বাস করেন জ্ঞানের ক্রমবৃদ্ধিমান ভবিষ্যতের অগাধ ঐশ্বর্যের মধ্যে। তাই পাঠককে লেখকের কাছে পৌঁছতে হয়। সৈয়দ মুজতবা আলী সম্পর্কে এ-কথা খুবই প্রযোজ্য।

সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে হলে আমাদের ভাষায় জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত শব্দের প্রতাপের কথা বলতে হয়। যেভাবে তিনি শব্দকে ব্যবহার করেছেন, শব্দকে তার বহুবিধ লৌকিক অঞ্চল থেকে মুক্ত করে সাহিত্যে প্রবাহিত করেছেন, মানুষের উচ্চারণগত বাণীভঙ্গীকে নির্মিত বাক্যের মধ্যে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন তার তুলনা হয় না। তিনি নিজেই নিজের তুলনা।

প্রতিদিনের জীবনে লঘুসম্পর্কের যে শিহরণ আছে, ক্ষণকালীন যে কৌতুক আছে, সময় অপহরণের জন্য কয়েকজন মানুষের মিলিত কণ্ঠস্বরের যে কল্লোল

আছে—মুজতবা আলীর বলার মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর কোনও রচনাতেই তিনি নিঃসঙ্গ নন। তিনি আসর জমিয়ে কথা বলতে ভালোবাসতেন, তাঁর লেখাতেও সেই আসরের আমেজ এসেছে। তাঁর শব্দের প্রবাহের মধ্যে তিনি শুধু একাকী উপস্থিত নন, আমরা অনুভব করি যে আসরের অন্যান্য লোকেরাও সেখানে উপস্থিত রয়েছে। অর্থাৎ তাঁর রচনায় ব্যবহৃত শব্দ এবং তাদের বিন্যাস এমন স্বভাবের যে উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন মানুষের কলরব সেখানে শোনা যায়। এই অসাধারণ দক্ষতার ফলেই মুজতবা আলী তাঁর রচনার মধ্যে একটি চতুর নাগরিক জীবনকে বাঙ্ময় করতে সক্ষম হয়েছেন। কেউ কেউ অনুযোগ করেন যে, মুজতবা আলী ইচ্ছা করলে তাঁর বিচিত্র জ্ঞানের নির্যাস নিয়ে জীবন সম্পর্কে গভীর উপলব্ধিগত কোন কিছু আমাদেরকে দিয়ে যেতে পারতেন। হয়তো বা পারতেন কিন্তু তা হলে আমরা সদাহাস্যময় মুজতবা আলীকে প্রাত্যহিক জীবনের লঘু স্পর্শের আনন্দ-কল্লোলের মধ্যে পেতাম না।

মুজতবা আলী অনেকদিন বিদেশে ছিলেন, বিশেষ করে জার্মানিতে। সেখানকার জীবনকে তিনি জেনেছিলেন, বিশেষ করে সেখানকার মানুষের সময়-ক্ষেপণের যে সমস্ত উপকরণ ছিল সেগুলো তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। আমরা সাধারণত যে জার্মানীকে জানি, শিলার গ্যয়টে অথবা হাইনের রচনায়, মুজতবা আলীর জার্মেনী সে জার্মেনী নয়, তাঁর জার্মেনী হচ্ছে প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডে প্রবাহিত নগর-জীবনের বিচিত্র মানুষের অবসর-মুহূর্তের জার্মেনী। এ জার্মেনীকে দেখা যায় বিভিন্ন শহরের বিয়ারের আড্ডায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ক্লাবের সভায়, যন্ত্রণার মধ্যেও রহস্যপ্রিয়তায়। বিদেশীরা সাধারণত এ জার্মেনীকে দেখে নি। মুজতবা আলীর সৌভাগ্য যে তিনি সে জার্মেনীকে দেখেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন রচনায় তাঁর নিজস্ব স্বভাবের শব্দের ব্যবহারের মধ্যে তাঁর দৃষ্টিপাতই আমরা আবিষ্কার করি। এত অন্তরঙ্গভাবে একটি জাতির পরিচয় উদ্ঘাটন করা সহজ ক্ষমতার পরিচায়ক নয়। মুজতবা আলীর রচনায় আমরা হিটলারের সমসাময়িক জার্মেনীকে পাচ্ছি, আবার হিটলারের পরবর্তী জার্মেনীকে দেখছি এবং একেবারে শেষে নতুন শোভায় সমৃদ্ধ নতুন জার্মেনীকে পাচ্ছি। এক কথায় বলতে গেলে তিনি জার্মেনীর আর্তনাদকে দেখেছেন, তার বেঁচে থাকার প্রয়াসকে দেখেছেন এবং তাকে একটি উজ্জ্বল সমৃদ্ধির মধ্যে দেখেছেন। কিন্তু কোথাও তিনি এ পরিচয়গুলো তথ্যভারাক্রান্ত গভীর অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকাশ করেন নি। জার্মেনীর বিচিত্র স্বভাবের মানুষের কল্লোলের মধ্যে তিনি জার্মেনীকে আবিষ্কার করেছেন।

ঠিক একইভাবে তিনি কলকাতাকে চিনেছিলেন এবং তার পরিচয় উদ্ঘাটন করেছিলেন। কলকাতার যে পরিচয় সাহিত্যে অথবা কাব্যে অথবা বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত মানুষের জীবনযাত্রায়, সে কলকাতাকে মুজতবা আলী তাঁর প্রয়োজনের সামগ্রী করেন নি। বর্তমানকালের অর্থনৈতিক অব্যবস্থায় যে মানুষ প্রতিদিন জীর্ণ হচ্ছে সে মানুষের পরিমণ্ডলের মধ্যে আনন্দের যে উপকরণ আছে সে আনন্দের উপকরণকে তিনি সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছেন। মুজতবা আলীর রচনায় সকল মানুষকে একই আসরে উপস্থিত হতে দেখি। পর্যাপ্ত রসিকতার মধ্যে, বিনয়ের লঘুস্পর্শে, চতুর সংলাপের মধ্যে যে সব মানুষকে আমরা দেখেছি তারা সর্বতোভাবে বর্তমান মুহূর্তের মানুষ। যদি সময়কে স্পষ্টভাবে অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ হিসেবে বিবেচনা করি তাহলে বলা যায় যে মুজতবা আলীর রচনায় আমরা ঠিক এই মুহূর্তের চলমান বর্তমানকে পাই। কতদিন এই বর্তমান থাকবে জানি না, কিন্তু যতদিন থাকবে ততদিন মুজতবা আলীর রচনাকে আমরা বর্তমান সময়ের অন্তঃসার হিসেবে গণ্য করব।

প্রত্যেক লেখকের রচনার প্রতিকৃতি তাঁর প্রতিফলিত মানসিকতার বাণীরূপ। কখনও শ্রদ্ধায়, কখনও অবজ্ঞায়, কখনও নিরাসক্তিতে আমরা যখন পৃথিবীর বিভিন্ন কর্ম ও সত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করি তখন আমাদের বর্ণনার শব্দসজ্জায় কখনও শ্রদ্ধা, কখনও অবজ্ঞা, কখনও নিরাসক্তি ধরা পড়ে। তথ্যের ব্যতিক্রমের সঙ্গে অনুভূতির ব্যতিক্রম যে সর্বত্র হবে তা বলা চলে না। তথ্যের সমৃদ্ধি তার স্থিরতায়, এবং অনুভূতির সমৃদ্ধি তার প্রবাহে। 'তিনি কবি', 'তিনি কবিতা লিখবার চেষ্টা করেন', 'তিনি কবিতা লেখেন'—এ তিনটি উক্তিতে একটি তথ্যই আছে যে, যে ব্যক্তি সম্বন্ধে বলা হচ্ছে তিনি কবি কিন্তু তিনটি উক্তি তিনটি বিভিন্ন মনোভাব ধারণ করছে। প্রথম উক্তিতে শ্রদ্ধা, দ্বিতীয় উক্তিতে অবজ্ঞা এবং তৃতীয় উক্তিতে নিরাসক্তি স্পষ্ট। স্টাইল বা বাগ্-ধারা এভাবেই লেখকের প্রতিফলিত মানসিকতা। লেখকের মানসিকতার পশ্চাতে সক্রিয়রূপে অথচ প্রায়শঃই অজ্ঞাতে বিদ্যমান তাঁর সমাজ, পরিবেশ এবং শিক্ষা। যে সমাজ ও পরিবেশ লেখককে লালন করেছে এবং যার প্রশ্রয়ে তিনি সমৃদ্ধ অথবা লাঞ্ছিত তাঁর মানসরূপ নির্মাণকার্যে সে সমাজ সর্বদাই প্রতিশ্রুত। যে পাঠক্রম এবং শিক্ষার ধারায় তিনি অগ্রসর হয়েছেন এবং এখনও হচ্ছেন সে শিক্ষা তাঁর বক্তব্যকে বুদ্ধিদীপ্ত অথবা নির্বিকার, চাতুর্যময় অথবা নিরাভরণ, দ্বিধাহীন অথবা শঙ্কিত, প্রশান্ত অথবা অশোভন করে।

গদ্য লেখার প্রকৃতি নির্ধারণ এ জন্যই দুরূহ কর্ম। আমরা সকলেই কথা বলি,

গদ্যে, আমাদের প্রতি মুহূর্তের পরিচয়ের ভাষা গদ্য, তাই বিভিন্ন প্রকারের গদ্য রচনার মধ্যে যে প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে তা আমাদের নির্ণয়ে আসে না। কবিতা সম্পর্কে গভীর অনুধাবন সহজে সম্ভবপর না হলেও যে কোনও লোক একথা বলতে পারেন যে কবিতার একটি বিশেষ গঠন-সৌষ্ঠব আছে, ছন্দ আছে, শব্দের পুনরাগম আছে। কবিতা সম্পর্কে এ কথাই সব কথা নয় এবং হয়তো বিশিষ্টার্থক কোনও কথাই নয়। কিন্তু বিশ্লেষণবিহীন হঠাৎ মন্তব্যের জন্য এ কথাই আপাততঃ চূড়ান্ত। গদ্য সম্পর্কে এভাবে হঠাৎ কোনও মন্তব্য করা চলে না। মুজতবা আলী প্রসঙ্গে এ কথা কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তাঁর স্বভাব, মানসিকতা, চিত্তগত প্রবণতা তাঁর শব্দের সম্ভারের মধ্যে বিচিত্র ভঙ্গীতে ধরা পড়েছে।

বাংলা শব্দ-ব্যবহারের বিচিত্র দ্যোতনায় মুজতবা আলী নিঃসন্দেহে এক অনন্য সমৃদ্ধমান ব্যক্তি।

বাংলা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সৈয়দ আলী আহ্‌সান

সৈ—৫ম

অবিশ্বাস্য

বাঙলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক

সুরসিক শ্রীপ্রমথনাথ বিশীকে—

মধুগঞ্জ মহকুমা শহর বলে তাকে অবহেলা করা যায় না।

মধুগঞ্জের ব্যবসা-বাণিজ্য নগণ্য; মধুগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে কুড়ি মাইল দূরে; মধুগঞ্জে জলের কল, ইলেকট্রিক নেই, তবু মানুষ মধুগঞ্জে বদলি হবার জন্য সরকারের কাছে ধন্যে দিত। কারণ এসব অসুবিধাগুলো যে রকম এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে শাপ, অন্যদিক দিয়ে আবার ঠিক সেইগুলোই বর। মাছের সের দু আনা, দুধের সের ছ পয়সা, ঘিয়ের সের বারো আনা এবং সেই অনুপাতে আণ্ডা মুরগী সবই সস্তা। আর সবচেয়ে বড় কথা, কাচ্চাবাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য মধুগঞ্জ পুববাঙলা-আসামের অক্সফোর্ড বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না; ওয়েলশ মিশনারীদের কৃপায় মধুগঞ্জে একটা হাইস্কুল আর দুটো প্রাইমারী স্কুল যে পদ্ধতিতে চলত তা দেখে বাইরের লোক মধুগঞ্জে এসে অবাক মানত। স্কুল-হস্টেলে সীটের জন্য পুববাঙলা-আসামে একমাত্র মধুগঞ্জেই আড়াই-গজ ওয়েটিং লিস্ট অফিসের দেওয়ালে টাঙানো থাকত। হস্টেলের খাই-খরচা মাসে সাড়ে চার টাকা, আর সীট-রেণ্ট চার আনা!

মধুগঞ্জের আরেকটি সদ্‌গুণের উল্লেখ করতে লেখকমাত্রই ঈষৎ কুণ্ঠিত হবেন। লেখকমাত্রই সাহিত্যিক, কাজেই মধুগঞ্জের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁদের হৃদয় আকৃষ্ট করবে এ তো জানা কথা। কিন্তু সাহিত্যিকেরা এ তত্ত্বও বিলক্ষণ জানেন যে, এ সংসারে আর পাঁচজন শহরের দোষগুণ নির্ণয় করার সময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য জিনিসটাকে জমা-খরচের কোনো খাতেই ফেলার কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না। কারণ এ তত্ত্ব তো অতিশয় সত্য যে, নিছক প্রকৃতির মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে কেউ চাকরিতে বদলি খোঁজে না, কিংবা ব্যবসা ফাঁদে না।

এ সত্য জানা সত্ত্বেও যে দু-একজন সাহিত্যিক বরযাত্রীরূপে কিংবা সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করতে এসেছেন তাঁরাই মধুগঞ্জের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গিয়েছেন। তাই দেখে খাস মধুগঞ্জীয় কাঁচা সাহিত্যিকেরাও মধুগঞ্জের আর পাঁচটা সুখ-সুবিধের সঙ্গে তার প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও প্রশস্তি গেয়েছেন।

পশ্চিম বাঙলা যেখানে সত্যই সুন্দর সেখানেই দেখি তার উঁচু-নিচু খোয়াইডাঙা আর দূরদূরান্তের নীলাভ পাহাড়। উঁচু-নিচুর ঢেউ-খেলানো মাঠের এখানে ওখানে কখনো বা দীর্ঘ তালগাছের সারি, আর কখনো বা একা দাঁড়িয়ে একটিমাত্র তালগাছ। এই তালগাছগুলো মানুষের মনে যে অন্তহীন দূরত্বের মায়া রচে দিতে পারে তা সমুদ্রও দিতে পারে না। সমুদ্রপাড়ে বসে

মনে হয়, এই আধমাইল দূরেই বুঝি সমুদ্র থেমে গিয়েছে—আকাশ নেমে গিয়ে নিরেট দেয়ালের মত হয়ে সমুদ্রের অগ্রগতি বন্ধ করে দিয়েছে।

পশ্চিম বাঙলার খোয়াইডাঙা তাই তার শালতাল দিয়ে, দূর না হয়েও যে দূরত্বের মরীচিকা সৃষ্টি করে, সে মায়াদিগন্ত মানুষের মনকে এক গভীর মুক্তির আনন্দে ভরে দেয়। জানি মন স্বাধীন; সে কল্পনার পক্ষিরাজ চড়ে এক মুহূর্তেই চন্দ্রসূর্য পেরিয়ে সৃষ্টির ওপারপানে ধাওয়া দিতে পারে, কিন্তু সে স্বপ্নপ্রয়াণে তো আমার রক্ত-মাংসের শরীরকে বাদ দিয়ে চলতে হয়—আমাকে দেখতে হয় সবকিছু চোখ বন্ধ করে। আর এখানে আমার দুটি মাত্র চোখই আমাকে এক নিমেষে নিয়ে যায় দূর হতে দূরে, যেখানকার শেষ নীল পাহাড় বলে, 'আরো আছে, আরো দূরের দূর আছে'; সে যেন ডাক দিয়ে বলে, 'তুমি মুক্ত মানুষ, তুমি ওখানে বসে আছ কী করতে—চলে এসো আমার দিকে।'

এ মুক্তি-ধারণা নিছক কবি-কল্পনা নয়। বহুবার দেখা গিয়েছে সন্ধ্যার সময় পশ্চিমপানে তাকাতে তাকাতে সাঁওতাল ছেলে হঠাৎ দাওয়া ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে রওয়ানা দিল। তারপর সে আর ফিরল না। মড়া পাওয়া গেল পরের দিন খোয়াইয়ের মাঝখানে—বাড়ি হতে অনেক দূরে; বুড়ো মাঝিরা বলে, ভূত তাকে ডেকেছিল, তারপর অন্ধকারে পথ হারিয়ে কী দেখেছে, কী ভয় পেয়ে মরেছে, কে জানে?

পুববাঙলার সৌন্দর্য দূরত্বে নয়, পুববাঙলার 'মাঠের শেষে মাঠ, মাঠের শেষে/সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে' নয়, সেখানে মাঠের শেষেই ঘন সবুজ গ্রাম আর গ্রামখানির উপর পাহারা দিচ্ছে সবুজের উপর সাদা ডোরা কেটে কেটে সুদীর্ঘ সুপারি গাছ। আর সে সবুজ কত না আভা, কত না আভাস ধরতে জানে। কচি ধানের কাঁচা-সবুজ, হলদে-সবুজ থেকে আরম্ভ করে আম, জাম, কাঁঠালের ঘন সবুজ, কৃষ্ণচূড়া-রাধাচূড়ার কালো সবুজ। পানার সবুজ, শ্যাওলার সবুজ, কচি বাঁশের সবুজ, ঘনবেতের সবুজ—আর ঝরে-পড়া সবুজ পাতার রস খেয়ে খেয়ে পুববাঙলার মা-টি হয়ে গেছেন গাঢ় সবুজ—কৃষ্ণশ্যাম। তাই তাঁর মেয়ের গায়ের রঙে কেমন যেন সবুজের আমেজ লেগে আছে। সে শ্যামশ্রী দেশ-বিদেশে আর কে পেয়েছে, আর কে দেখেছে?

কিন্তু মধুগঞ্জের সৌন্দর্য এও নয় ও-ও নয়। মধুগঞ্জ পুববাঙলার মত ফ্ল্যাট নয়, আবার পশ্চিমবাঙলার মত ঢেউ-খেলানোও নয়। ভগবান যেন মধুগঞ্জে

এক তিসরা খেলা খেলার জন্য নয়া এক ক্যানভাস নিয়ে বসে গেছেন। ক্যানভ্যাসখানা বিরাট আর তাতে আছে মোটামুটি তিনটি বড় রঙের পোঁচ—সামনের 'কাজলধারা' নদীর কাকচক্ষু কালো জল, নদী পেরিয়ে বিস্তীর্ণ সবুজ ধানক্ষেত, সর্বশেষে এক আকাশছোঁয়া বিরাট নিরেট নীল পাথরের খাড়া পাহাড়। এখানে পশ্চিম বাঙলার মত মাঠ ঢেউ খেলতে খেলতে পাহাড়ে বিলীন হয় নি—পাহাড় এখানে দাঁড়িয়ে আছে পালিশ সবুজ মাঠের শেষে সোজা খাড়া পাঁচিলের মত। তার গায়ে কিছু কিছু খাঁজ আছে কিন্তু এ খাঁজ আঁকড়ে ধরে ধরে উপরে চড়া অসম্ভব।

মধুগঞ্জের যেখানেই যাও না কেন উত্তরদিকে তাকালে দেখতে পাবে, কালো নদী, সবুজ মাঠ আর তার পর নীল পাহাড়। আর সেই পাহাড় বেয়ে নেমে এসেছে কত শত রুপালী ঝরনা। দূর থেকে মনে হয়, নীল ধাতুর উপর রুপোর বিদ্‌রী মিনার কাজ।

এ পাহাড় হাতছানি দিয়ে ডাকে না—এ পাহাড় বলে, যেখানে আছ সেইখানেই থাকো।

এরকম পাহাড় বিলেতে প্রচুর আছে, শুধু গায়ে নেই মিনার কাজ আর সামনে নেই সবুজ মাঠ, কাজলধারার কালো জল।

তাই আইরিশম্যান ডেভিড ও-রেলি মধুগঞ্জে অ্যাসিস্‌টেণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস হয়ে আসামাত্রই জায়গাটার প্রেমে পড়ে গেল।

॥ ২ ॥

প্রেমটা কিন্তু দু'তরফাই হল। ছোট্ট মহকুমার শহরটি ও-রেলিকে দেখে প্রথম দর্শনেই ভালবেসে ফেললে।

তার প্রধান কারণ বুঝতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না। ও-রেলি সত্যই সুপুরুষ। ইংরেজ বাঙালীর তুলনায় অনেক বেশী ঢ্যাঙা, তার উপর এদেশে বেশীদিন বাস করলে কেউ হয়ে যায় দারুণ মোটা, কেউ বড্ড লিকলিকে, কারো বা নাক হয়ে যায় টকটকে লাল, কারো দেখা দেয় সাদা চামড়ার তলায় বেগনি রঙের মোটা মোটা শিরা-উপশিরা। তার-ই মাঝখানে হঠাৎ যখন স্বাস্থ্যসবল আরেক ইংরেজ এসে দেখা দেয়—ইংরিজিতে যাকে বলে ফ্রেশ ফ্রম ক্রিসটিয়ান হোম্—তখন সে সুন্দর না হলেও তাকে প্রিয়দর্শন বলে মনে হয় ; রাজপুত্তুর না হলেও অন্তত কোটালপুত্তুরের খাতির পায়।

বয়স তার একুশ, জোর বাইশ। সায়েবদের ফরসা রঙ্ তো আছেই কিন্তু তার চুল খাঁটি বাঙালীর মতো মিশকালো আর তার সঙ্গে ঘননীল চোখ। এ জিনিসটি অসাধারণ; কারণ সায়েব-মেমদের চুল কালো হলে চোখও কালো, নিদেনপক্ষে বাদামী—আর চুল ব্লণ্ড্ হলে চোখ হয় নীল। আমাদের দেশেও যাদের রঙ ধবধবে ফরসা হয় তাদের চোখও সাধারণত একটুখানি কটা; তাই যখন তাদের চোখ মিশমিশে কালো হয় তখন যেন তাদের চেহারাতে একটা অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্য দেখা দেয়। কালো চুল আর নীল চোখও সেই আকর্ষণী শক্তি ধরে।

মধুগঞ্জ যদিও ছোট শহর তবু তার বিলিতি ক্লাব এ অঞ্চলে বিখ্যাত। শহর থেকে বিশ মাইল দূরে যে স্টেশন সে পথের দুদিকে পড়ে বিস্তর চা-বাগান আর রোজ সন্ধ্যায় সে সব বাগান থেকে হেটিয়ে আসত ক্লাবের দিকে সায়েব-মেম আর তাদের আণ্ডাবাচ্চারা।

ফুটফুটে ক্লাব-বাড়িটি। একদিকে লন টেনিসের কোর্ট আর ভিতরে বিলিয়ার্ড খেলার ব্যবস্থা—বিলিয়ার্ডের বল দেখে খানসামারা ক্লাবের নাম দিয়েছিল 'আণ্ডাঘর', আর সেই থেকে এ অঞ্চলে ঐ নামই চালু হয়ে যায়।

এ সম্পর্কে মুরুব্বী রায়বাহাদুর কাশীশ্বর চক্রবর্তীরও একটা 'অনবদ্য অবদান' আছে। ক্লাব তখন সবেমাত্র খুলেছে। সায়েব-মেমরা ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরে টুকটাক করে টেনিস খেলছেন—রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে রায়বাহাদুর ভীত নয়নে একটিবার সেদিকে তাকালেন। সে সন্ধ্যায় পাশার আড্ডায় রায়বাহাদুর গম্ভীর কণ্ঠে সবাইকে বললেন, 'দেখলে হে কাণ্ডখানা, সায়েবরা নিজেদের জন্য রেখেছে একখানা মোলায়েম খেলা; ধাক্কাধাক্কি মারামারি নেই—যে যার আপন কোটে দাঁড়িয়ে দিব্যি খেলে যাচ্ছে। আর তোমাদের মত কালো-আদমিদের জন্য ছেড়ে দিয়েছে একটা কালো ফুটবল। তার পিছনে লাগিয়ে দিয়েছে বাইশটা নেটিভকে—মরো গুঁতোগুঁতি করে, আপোসে মাথা ফাটাফাটি করে। আর দেখেছ, সাহেবদের যদি বা কেউ তোমাদের খেলায় আসে তবে সে মাঠের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে বাজায় গোরা রায়ের বাঁশি—তার গায়ে আঁচড়টি লাগবার জো নেই।'

পাশা খেলোয়াড়রা একবাক্যে স্বীকার করলেন, এত বড় একটা দার্শনিক তত্ত্বের আবিষ্কার একমাত্র রায়বাহাদুরেই সম্ভবে, তদুপরি তিনি ব্রাহ্মণ-সন্তানও তো বটেন!

সেই রায়বাহাদুরের সপ্তম দর্শনের বেলুনটি ফুটো করে চুপসে দিয়ে দেশে নাম

করে ফেললে বিদেশী ও-রেলি। চার্জ নেবার তিনদিন পরেই দেখা গেল, সে ইস্কুলের ছোঁড়াদের সঙ্গে ফুটবলে দমাদ্দম কিক লাগাচ্ছে; আর এদেশের ভিজে মাঠে খেলার অভ্যাস নেই বলে হাসিমুখে আছাড় খেল বার তিরিশেক।

রায়বাহাদুর বললেন, 'ব্যাটা বদ্ধ-পাগল নয়,—মুক্ত পাগল।'

পাশা খেলোয়াড়রা কান দিলেন না। পুলিসের বড় সাহেব ছোঁড়াদের নিয়ে ধেই ধেই করলে অভিভাবকদের আনন্দিত হওয়ারই কথা। কিন্তু এসব পরের কেচ্ছা।

ক্লাব জয় করেছিল ও-রেলি—প্রথম দিনই টেনিস খেলায় জিতে নয়—হেরে গিয়ে। মাদামপুর চা-বাগিচার বড সায়েব এ অঞ্চলের টেনিস চেম্পিয়ান। পয়লা সেট ও-রেলি জিতল; কারণ সে বিলেত থেকে সঙ্গে এনেছে টেনিস খেলার এক নূতন ঢঙ—মিডকোর্ট গেম আর বড় সাহেব খেলেন সেই বেজ লাইনে দাঁড়িয়ে আদ্যিকালের কুটুস-কাটুস। অথচ পরের দু সেটে ও-রেলি হেরে গেল—দাবার ভাষায় বলতে গেলে অবিশ্যি গজচক্র কিংবা অশ্বচক্র খেল না বটে, আনাড়ি দর্শকেরা ভাবলে বড় সায়েব প্রথম সেটে সুতো ছাড়ছিলেন; জউরীরা বিলক্ষণ টের পেয়ে গেল, ও-রেলি প্রথম দিনেই 'ওভার চালাক', 'বাউন্সার' হিসাবে বদনাম কিনতে চায়নি। মেমেরা তো অজ্ঞান—যদিও হারলে তবু কী খেলাটাই না দেখালে, 'মাস্ট বি দি হীট, ইউ নো ফ্রেশ ফ্রম হোম্' ইত্যাদি। বড সায়েবও খুশি। সবাইকে বলে বেড়ালেন, 'ছোকরা আমার চেয়ে ঢের ভালো খেলে, তবে কি না, বুঝলে তো, আমার বুড়ো হাড়, হেঁ হেঁ, অফ কোর্স!'

পরদিনই দেখা গেল, ও-রেলি বুড়ো পাদ্রী সায়েব রেভরেণ্ড চার্লস ফ্রেডারিক জোনস্‌কে পর্যন্ত বগলদাবা করে নিয়ে চলেছে 'আণ্ডা-ঘরের' দিকে। বুড়ো পাদ্রী অতিশয় নীতিবাগীশ লোক, অবরে-সবরে ক্লাবে এলে নির্দোষ বিলিয়ার্ডকে পর্যন্ত ব্যসনে শামিল করে দিয়ে এক কোণে বসে সেই অজ ওয়েলসের দেড় মাসের পুরনো খবরের কাগজ পড়তেন কিংবা বাচ্চাদের সঙ্গে কানামাছি খেলতেন। ও-রেলির পাল্লায় পড়ে ধর্মপ্রাণ পাদ্রীর পর্যন্ত 'চরিত্রদোষ' ঘটল। দেখা গেল, পাদ্রী এখন প্রায়ই ক্লাবে এসে ও-রেলির সঙ্গে এক প্রস্ত বিলিয়ার্ড খেলে সন্ধ্যের পর তাঁর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে শহরের বাইরে ও-রেলির বাঙলোর দিকে চলেছেন।

পাদ্রী যে ও-রেলির সঙ্গে জমে গেলেন তার অন্য কারণও আছে।

ও-রেলির থানার কাছেই পাদ্রীদের ইস্কুল। চাকরিতে ঢোকার দিন দশেক পরে ও-রেলি লক্ষ্য করল ইস্কুলে কতগুলো সায়েব-মেমের বাচ্চাও ঘোরাঘুরি

করছে, কিন্তু দূর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না আসলে এরা ঠিক কী ?

ইনস্‌পেক্‌টর সোমকে ডেকে পাঠিয়ে বললে, 'সোম ?'

'ইয়েস স্যর !'

'নো, আমাকে "স্যর" "স্যর" করো না।'

'নো, স্যর।'

'ফের "স্যর" ?'

'ইয়েস স্য—।'

বাচ্চাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে সায়েব শুধাল, 'এরা কারা ?'

সোম চুপ করে রইল।

ও-রেলি বলল, 'দেখো সোম, তুমি আমার সহকর্মী। তুমি যা জান আমাকে খোলাখুলি না বললে আমি এখানে কাজ করব কী করে, আর তুমিই বা আমার সাহায্য পাবে কী করে ?'

'আজ্ঞে, এরা ইয়োরেশিয়ন।'

'ভালো করে খুলে বলো।'

'এরা দোআঁশলা ; এদের অধিকাংশই চা-বাগান্ থেকে এসেছে। এদের বাপ—'

'থামলে কেন ?'

'চা-বাগানের সায়েব আর মা—এই, এই, যাদের বলে কুলী রমণী।'

ও-রেলি থ মেরে সব কিছু শুনল। তারপর অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে শুধাল, 'তা এদের সম্বন্ধে আমাকে কেউ কিছু বলেনি কেন, এমন কি পাদ্রী সায়েব পর্যন্ত না ?'

সোম বললে, 'এদের নিয়ে খাস ইংরেজদের লজ্জার অন্ত নেই, তাই, এরা তাদের ঘেন্না করে। পাদ্রী সায়ের ভালো মানুষ, তাই এ নিয়ে ওঁর দুঃখ হওয়ারই কথা। বোধহয়, আপনাকে ভালো করে না চিনে কোনো কিছু বলতে চাননি।'

সেদিনই থানা থেকে ফেরার সময় ও-রেলি সোজা পাদ্রীর টিলায় গেল। পাদ্রীকে সে কী বলেছিল জানা নেই। তবে পাদ্রী-টিলার ব্যাডমিণ্টন ক্লাবের প্রথম খাস ইংরেজ সদস্য ও-রেলি—অবশ্য পাদ্রী সায়েবদের বাদ দিয়ে—সে কথাটা ক্লাবের মিনিট বুকে সগর্বে সানন্দে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

খবর শুনে এস-ডি-ও প্লামার ও-রেলিকে বললেন, 'গো স্লো।'

ও-রেলি তর্ক জোড়েনি, তবে এ বিষয়ে তার মনের গতি কোন্ দিকে সেটাও জানিয়ে দিতে কসুর করেনি।

রায়বাহাদুর খবরটা শুনে বললেন, 'নাঃ, ছোঁড়াটাকে তো ভালো বলেই মনে হচ্ছে। তবে না আখেরে ডোবে। পাদ্রী-টিলার কোনো একটা ডপকা ছুঁড়িকে বিয়ে করলেই চিত্তির!'

আর ইস্কুলের ছোঁড়ারা তো ওর নাম দিয়ে ছড়া বানিয়েছিল,

'ও—রেলি, কোথায় গেলি?'

সাহেব মানে শুধিয়ে উত্তর শুনে ড্যাম্ গ্লাড্।

তারপর হাত-পা ছুঁড়ে আবৃত্তি করলে,

'O, Mary, go and call the cattle
Home,
Call the cattle home,
Across the sands of Dee,'

'আমাকে ঐ ক্যাট্‌ল্‌দের একটা মনে করেছ বুঝি? তাই সই, আমি না হয় তোমাদের দেবতা "হোলি কাও"ই হলুম।'

॥ ৩ ॥

এক বৎসর হয়ে গিয়েছে। ও-রেলিকে মধুগঞ্জ যে ক্রিকেট ম্যাচের মত লুফে নিয়েছিল সেই থেকে সে শহরের ছেলে-বুড়োর বুকে গোঁজা—ভারতীয় ক্রিকেটের ঐতিহ্যানুযায়ী তাকে 'ড্রপ' করা হয়নি।

ইতিমধ্যে ভর বর্ষায় মধুগঞ্জের জলে সাড়ম্বরে নৌকো-বাচ হয়ে গেল। বিলেত তার নৌকো-বাচ নিয়ে যতই বড়ফাট্টাই করুক না কেন, পুববাঙলার নৌকো-বাচের তুলনায় সে লাফালাফি বাচ্চাদের কাগজের নৌকো ভাসানোর মত। ও-রেলি উল্লাসে বে-এক্তেয়ার। নৌকো-বাচের আইনকানুন সোমের কাছ থেকে তিন মিনিটে রপ্ত করে বন্দুক কাঁধে করে উঠল মোটর বোটে। সোমকে বললে, 'তুমি এগিয়ে যাও আমার লঞ্চ নিয়ে ওদিকের শেষ সীমানায়, সেখানে যেন কোনো বদমাইশি না হয়। আমি এদিক সামলাব—এখানেই তো জেতার গোল!'

সোম বললে, 'সায়েব, নৌকো-বাচের "ফাউল" আর তারপর বৈঠে দিয়ে মাথা ফাটাফাটির ঠ্যালায় ফি বছর এ-দিনটায় ভাবি চাকরি রিজাইন দেব। আজ তুমি আমায় বাঁচালে।'

সায়েব বললে, 'তুমি কুছ্ পরোয়া কোরো না সোম, ফাউল বাঁচাতে গিয়ে

খুন-জখম আমিই করব। ইউ গো রাইট্ অ্যাহেড।'

তারপর ও-রেলি বন্দুক দেগে রেসের স্টার্ট দিলে, পিছনে পিছনে মোটর বোট, হেঁকে ফাউল সামলালে, উল্লাসে চিৎকার করে ঘন ঘন 'গ্র্যাণ্ড গ্র্যাণ্ড, ও হাউ গ্র্যাণ্ড' হুঙ্কার ছাড়লে, কমজোর নৌকোগুলোকে 'চীয়ার আপ্' করলে আর সর্বশেষে প্রাইজের পাঁঠা, কলসী সকলের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে করে স্বহস্তে বিতরণ করলে। মাথা-ফাটাফাটি যে হল না তার জন্য সোম আর বাইচওলাদের অভিনন্দন জানালে।

সর্বশেষে সোম খুশিতে ডগমগ হয়ে বিজয়ী নৌকোর গলুইয়ে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলে, 'আসছে বছর যে নৌকো জিতবে সে পাবে হুজুর ও-রেলির পিতার নামে দেওয়া "মাইকেল শীল্ড"। পুববাঙলায় নৌকো-বাচে এই প্রথম শীল্ড—কম কথা নয়, আপনারা ভেবে দেখুন। আর সে শীল্ড লম্বায় তিন হাত হবে, হুজুরের কাছ থেকে সেটা আমি জেনে নিয়েছি। তার মানে পূর্ব বাঙলার যে-কোন ফুটবল শীল্ড তার তুলনায় "ছোড্ড আড্ডা পোলাডা।" হুজুর শীল্ড কী ধরনের হবে সেটা আমায় বলতে বারণ করেছিলেন; আমি সে আদেশ অমান্য করেছি। কাল আমার চাকরি যাবে। তা যাক। এখন আপনারা বলুন:

থ্রী চিয়ারস্ ফর ও-রেলি,
হিপ্ হিপ্ হুররে।'

সে কী হুঙ্কারে হিপ্, হিপ্। গাঁয়ের লোক এ ধরনের স্থূল রসিকতা বোঝে। তার উপর তাদের আনন্দ, দু'দিনের চ্যাংড়া ফুটবল খেলার পাতলা দাপাদাপিকে তারা আজ হারিয়েছে। তাদের শীল্ড আসছে বছর থেকে সব ফুটবল শীল্ডের কান মলে দেবে।

ক্লাবের যে দু-একটি পাঁড় ইংরেজ কালা আদমিদের রেস দেখতে আসেননি তাঁরা পর্যন্ত হুঙ্কার শুনে আঙুল দিয়ে কান বন্ধ করে বলেছিলেন, 'ও-রেলি ইজ গন্ কমপ্লীটলি নেটিভ!'

অসম্ভব নয়। কিন্তু সেদিন শীল্ড-ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যদি ও-রেলি গা-ঢাকা না দিত তবে পঞ্চাশখানা গাঁয়ের লোক তাকে লিন্চ্ করত।

পাদ্রী-বাঙলোর নয়মি, রুথ, ইভা, মেরি সব ক'টা সোমত্থ মেয়ে জাত-বেজাত ভুলে পাইকেরী দরে পড়ল ও-রেলির প্রেমে। সে হ্যাপা সামলাতে না পেরে ও-রেলিকে বাধ্য হয়ে প্রকাশ করতে হল, তার বিয়ে দেশে ঠিক হয়ে আছে, ছুটি পেলেই বিয়ে করে বউ নিয়ে আসবে।

ও-রেলি বুদ্ধিমান ছেলে। বিয়ের খবরটা সে ভেঙেছিল সোমের কাছে।

সোম খবরটাকে বিয়ে-বাড়িতে ফাটাবার বোমার মতই হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ আদর করার পর সেটি ফাটিয়ে দিলে হাটের মধ্যিখানে, কিন্তু তার থেকে বেরল টিয়ার গ্যাস। সে গ্যাস পৌঁছে গেল পাদ্রী-বাঙলোয় পোপের মৃত্যুসংবাদ ছড়াবার চেয়েও তেজে—এবং চোখের জলের জোয়ার জাগাল নয়মি, রুথ, ইভার হৃদয় ছাপিয়ে।

হায়, এরা তো জানে না ও-রেলিকে আশা করা এদের পক্ষে বামন হয়ে চাঁদ ধরার আশা করার মত। কিংবা তাতেই বা কি? এবং এ উপমাটাও হয়ত তারা জানে যে সামান্য একটা খরগোশ যখন চাঁদের কোলে প্রতি সন্ধ্যের অশ্বিনী-ভরণীকে ঢিঢ দিয়ে বসতে পারে তখন এরাই বা এমন কি ফেলনা? বিশেষ করে নয়মি। ভারতীয় সৌন্দর্যের নুন-নেমক আর ইংরেজের নিটোল স্বাস্থ্য নিয়ে গড়া এই তরুণী; এর সঙ্গে ফ্লার্ট করার জন্য পঁচিশটে বাগানের ইংরেজ ছোঁড়ারা ছোঁকছোঁক ঘুরঘুর করে তার চতুর্দিকে, যদিও সকলেরই জানা—শেষ পর্যন্ত তারা বিয়ে করে নিয়ে আসবে বিলেত থেকে কতকগুলো খাটাশমুখো ওল্ড মেড।

এ তত্ত্বটাও ও-রেলির জানা ছিল বলে সে একদিন সোমকে দুঃখ করে বলেছিল, 'দেখো সোম, আর যে যা-খুশি ভাবুক তুমি কিন্তু ভেবো না যে, আমি পাদ্রী-টিলার মেয়েদের নিচু বলে ধরে নিয়েছি। আমার বিয়ে ঠিক না থাকলে আমি ওদেরই একজনকে বিয়ে করতুম। মেয়েগুলির বড় মিষ্টি স্বভাব।'

সোম কানে আঙুল দিয়ে বললে, 'ও কথা বোল না সায়েব। জাত মানতে হয়।'

ও-রেলি আশ্চর্য হয়ে বললে, 'ক্রিশ্চানের আবার জাত কি?'

সোম বললে, 'জাতের আবার ক্রিশ্চান কি?'

করে করে এক বছর কেটে গেল।

ও-রেলি ছুটি নিয়ে বিলেত থেকে বউ আনতে গেল।

॥ ৪ ॥

খাসপেয়ারা লোক যখন বিয়ে করে তখন তার একদল বন্ধু বউকে ভালোমন্দ বিচার না করে কাঁধে তুলে ধেই ধেই করে নাচে আবার আরেক দল তার দিকে তাকায় বড্ড বেশি আড়নয়নে। এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হল না। সোম-কোম্পানি দিনের পর দিন মেমসায়েবকে ফুল পাঠাল, মিষ্টি পাঠাল, মেমের জন্যে

শখ জেনে ছোঁড়ারা তাকে নিত্যি নিত্যি ডিঙি চড়াল, পাদ্রীর টিলায় ঘন ঘন চড়ুইভাতে নেমতন্ন করল, ক্লাবে আর বাগিচা-বাগিচায় বেনকুয়েট ডিনার হল; এ দলের খুশির অন্ত নেই।

অন্য দল বিস্তর যাচাই করার পর শুধু একটি কথা বললে, 'মেয়েটি ভালো, কিন্তু কেমন যেন মিশুক নয়।'

কিন্তু তাদের সর্দার রায়বাহাদুর চক্রবর্তীই তাদের কানা করে দিলেন আর-একটি মহামূল্যবান তত্ত্বকথা বলে—বললেন, 'নেটিভদের সঙ্গে ধেই ধেই করা উভয় পক্ষের পক্ষেই অমঙ্গল। ওরা রাজার জাত, রাজত্ব করবে: আমরা প্রজার জাত, হুজুরদের মেনে চলব। এর ভিতর আবার দোস্তি-ইয়ার্কি কী রে বাবা? তোমরা ভেবেছ লিবার্টি পেলে তোমাদের নূতন কর্তারা তোমাদের কোলে বসিয়ে মণ্ডামেঠাই খাওয়াবেন? দেখে নিয়ো, আজ আমি যা বললুম।'

তখনো স্বরাজের ছবি দিগদিগন্তেরও বহু পিছনে আণ্ডার ভিতরে বাচ্চার মত নিশ্চিন্দি মনে ঘুমুচ্ছেন। কাজেই রায়বাহাদুরের সঙ্গে এ বাবদে তর্ক করার উপায় ছিল না; এবং এ ধরনের মুরুব্বীও তখন সর্বত্রই বিস্তর, মজলিস গুলজার করে এই রায়ই ঝাড়তেন। রায়বাহাদুর আবার বললেন, 'নেটিভ সাহেব যেন তেলে-জলে। সাবধান!' কিন্তু মধুগঞ্জ এ সাবধানবাণীতে কোন প্রয়োজনই অনুভব করল না।

রায়বাহাদুর অবশ্য মেমসায়েবকে সেলাম দিতে প্রথম দিনই কুঠিতে গিয়েছিলেন। মেমসায়েব তাঁর গালকম্বল মান-মনোহর দাড়ি দেখে একেবারে স্ট্রাক্, থ! রায়বাহাদুর ভাল করেই জানতেন আজকের দিনের দাড়ি-গোঁফ-কামানো ছোঁড়ারা তাঁর দাড়িতে উকুন অথবা ছারপোকা আছে কি না তাই নিয়ে ফিসফাস গুজগাজ করে, কিন্তু অন্তরে তাঁর দৃঢ়তম বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর দাড়ি-গোঁফের কদর প্রকৃত রসিক-রসিকাদের কাছে কিছুমাত্র নগণ্য নয়।

আদালতে বিস্তর সায়েবকে তিনি বহুবার যে কাবু করেছেন তার দুটি কারণ:

প্রথম, তাঁর আইনজ্ঞান এবং দ্বিতীয় তাঁর মনস্তত্ত্ববোধ। সায়েবের সাদা মুখ লাল, নীল, বেগুনি রঙের ভোল বদলানোর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চটপট সমঝে যেতেন সাহেব চটেছেন, খুশি হয়েছেন, হকচকিয়ে গিয়েছেন কিংবা আইনের অথই দরিয়ায় হাবুডাবু খাচ্ছেন।

প্রথম দর্শনেই তিনি বুঝে গেলেন, মেমসায়েব তাঁকে নেকনজরে দেখেছেন। তারই পুরা ফায়দা উঠিয়ে তিনি তাঁকে মেলা অভিনন্দন আর অভ্যর্থনা জানালেন,

উনি যে তাঁর সেবার জন্য সব সময়ই তৈরী সে কথা বললেন, তাঁর স্বামী যে অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি সে কথাও উল্লেখ করলেন এবং বলতে বলতে উৎসাহের তোড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আদালত যে এ দেশে শুভাগমন করেছেন—' বলেই তাঁর মনে পড়ল, এ আদালত নয়। ঝুপ করে বসে পড়ে বললেন, 'সরি, ম্যাডাম, আই ফরগট !'

মেম তো হেসেই লাল। রায়বাহাদুর ঘেমে কালো। শেষটায় মেম বললেন, 'ইটস্ ও' রাইট, রে ব্যাডুর; থ্যাঙ্কয়্যু ভেরী মাচ্ ইনডীড্।'

রায়বাহাদুরের এ ভুল জীবনে এই প্রথম নয়। বুড়ো বয়সে সিনিয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের প্রথম পুত্রসন্তান হওয়াতে তিনি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে টিফিনের পূর্বে 'বারের' পক্ষ থেকে বলেছিলেন, 'আদালতের পুত্রসন্তান হওয়াতে আমরা সকলে বড়ই আনন্দিত হয়েছি।'

এ ভুলটাও তিনি গোপন রাখেননি। সেদিক দিয়ে তিনি সত্যই সরল প্রকৃতির লোক। মেমসায়েবের সঙ্গে তাঁর ভেট তিনি সবিস্তর বাখানিয়া বললেন, চাপরাসী ইস্তাজ আলীকে যে তিনি দু আনা বখশিশ দিয়েছেন সেটাও বলতে ভুললেন না।

সর্বশেষে খানিকক্ষণ কিন্তু কিন্তু করে বললেন, 'সায়েবের সঙ্গে তো আমার বিশেষ পরিচয় নেই, তবু কেমন যেন মনে হল একটু বদলে গিয়েছে। ঠিক বুঝতে পারলুম না।'

আড্ডা বললেন, 'আপনিও তাজ্জব বাত বললেন, রায়বাহাদুর। বিয়ে করে কোন্ মানুষ বদলায় না, বলুন দিকিনি ? অন্তত কিছু দিনের জন্য ?'

সোম উপস্থিত ছিল। কেউ কেউ লক্ষ্য করল সেও কোনো আপত্তি জানাল না।

রায়বাহাদুর বললেন, 'কী জানি ভাই, আমার অতশত স্মরণ নেই। বিয়ে করেছিলুম কবে, সেই ঠাকুদ্দার আমলে।'

জুনিয়ার তালেবুর রহমান বললে, 'সে কি, স্যার ! বিয়ের পূর্বের কেস-গুলোও তো আপনার খুঁটিনাটি সুদ্ধ মনে আছে !'

উকিল মেম্বাররা সায় দিলেন।

রায়বাহাদুর গুণী লোক। মুনিঋষিরা যে রকম এককালে একসুরে দৃষ্টি দিয়ে হাঁড়ির খবর জানতে পারতেন তিনিও হয়তো খানিকটা আসল খবর ধরতে পেরেছিলেন, তবে কি না ঋষিদের তিন হাজার বছরের পুরনো লেন্স্ অনাদর-অবহেলায় ক্ষয়ে ঘষে গিয়েছে বলে ছবিটা আবছা-আবছা হয়ে ফুটল।

ও-রেলি তাগড়া জোয়ান, তার উপর পার্টি-পরবে ভোর অবধি বেদম নাচতে পারে—একটা ডান্সও মিস্ না করে। তাই বিয়ের পর আড্ডা-ঘরের 'গ্যালা'-নাচে সবাই আশা করেছিল ও-রেলি হয় বউকে কোমরে ধরে লাফ দিয়ে টেবিলের উপর তুলে দিয়ে নাচতে শুরু করবে কিংবা হলের মধ্যিখানে বউকে দুই ঠেঙে তুলে ধরে পাঁই পাঁই করে তার চতুর্দিকে সার্কেসি ঢঙে চক্কর খাওয়াবে। অন্তত-পক্ষে টাঙ্গো নাচের সময় সে যে বউকে নিবিড় আলিঙ্গনে ধরে নিয়ে গভীর দোদুলদোলা জাগাবে সে আশা—এবং বুড়ী মেয়েরা সে আশঙ্কা—নিশ্চয়ই মনে মনে করেছিলেন; কারণ বউকে, তাও আবার আনকোরা বউকে নিয়ে নাচের সময় যে ঢলাঢলি করা যায় সেটা ইংরেজ সমাজে পরকীয়াতে চলে না। ফ্রান্সে চলে, তবে নাচের মজলিসে নয়।

ও-রেলি নেচেছিল এবং তার নাচে প্রাণও ছিল, কিন্তু আয়ারল্যাণ্ডে নব বর এ রকম নাচের সময় যে কুরুক্ষেত্র জাগিয়ে তোলে এখানে সেটা হল না। কেউ কেউ কিঞ্চিৎ নিরাশ হল বটে তবে ঝানুরা জানেন নব বর (অর্থাৎ নওশাহ্—নূতন রাজা) পয়লা রাতে কী রকম আচরণ করবে তার ভবিষ্যদ্বাণী কেউ কখনো করতে পারে না। মদ খেলে বাচাল হয়ে যায় চুপ আর বোবা হয় মুখর—আর বিয়ে করা তো সব নেশার চেয়ে মোক্ষম নেশা, খোঁয়ারি ভাঙাতে গিয়েই বাদ-বাকি জীবনটা কেটে যায়। কিন্তু তাই বলে যে সব সময় ঠিক উলটোটাই ফলবে তারও তো কোনো স্থিরতা নেই। আবহাওয়ার জ্যোতিষীরা বললেন, বৃষ্টি হবে অতএব আপনি ছাতা না নিয়ে বেরুলেন; ফলং? ভিজে কাঁই হয়ে বাড়ি ফিরলেন। ব্যত্যয়ও তো হয়।

কাজেই পালোয়ান এবং নাচিয়ে ও-রেলি আড্ডা-ঘরকে তার হক্কের পাকী সের থেকে এক ছটাক বঞ্চিত করাতে অল্প লোকই তাই নিয়ে মাথা চুলকোল।

গ্যালা নাচের পর পাদ্রী-বাঙলো দিলে পিকনিক। বাইরের বেশী লোককে নেমন্তন্ন করা হয়নি কিন্তু সোমের ডাক পড়েছিল কারণ পাদ্রীরা এ বাবদে বাঙালা সায়েব কারোরই মত এত মারাত্মক নাকতোলা নয়। পাদ্রী-টিলার পিছনে যে ছোট ছোট টিলা আর বনবাদাড়ের আরম্ভ তার শেষ হয় কুড়ি মাইল দূরে রেলস্টেশন পৌঁছে। এ বনে বুনো আম, কাঁঠাল, বৈঁইচি, কালোজাম, মিষ্টি মধুর সন্ধানে সকাল-সন্ধ্যে কাটিয়ে দেওয়া যায়। মৌসুমের সময় মাটিতে ফোটে অগুনতি লুট্‌কি ফুল আর গাছের গা-ঝুলে ফুলে ওঠে রঙ-বেরঙের অর্কিড ('বাঁদরের ন্যাজ')। এ জায়গাটায় পিকনিক করতে গেলে তাস-পাশা নিয়ে যেতে হয় না, গাছতলায় বসে দুটি খেয়ে শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে

হয় না,—এখানে একা একা কিংবা ছোট ছোট দল পাকিয়ে অনেক কিছুর অনুসন্ধানে বেরনো যায় আর লুকোচুরি খেলার অলিম্পিক যদি কোনোদিন তার সদর অপিস খুলতে চায় তবে গড়িমসি না করে এখানেই সোজা চলে আসবে।

পাদ্রী-টিলাতে আপোসে বিয়ে হলেই এখানে তার পরের দিন পিকনিক। পিকনিকওয়ালারা আবার বর-বধূকে নানা ছুতোয় একা একা এদিক-ওদিক গুম হয়ে যেতে দেয় এবং নিজেদের মধ্যে তাই নিয়ে চোখ-ঠারাঠারি করে।

বর-বধূ বিয়ের পর প্রথম কয়েক দিন একে অন্যকে চিনে নেয় ঘরের ভিতরে বাইরে, বারান্দায়, নদীর পারে চাঁদের আলোতে কিংবা সমাজে আর পাঁচজনের ভিতর। এখানে নিভৃতে বনের ভিতর একে অন্যকে চিনে নেওয়ার ভিতর আরেক অভিনব মাধুর্য আছে—ওদিকে বন্ধুবান্ধব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নও তারা নয়। ডাক দিলেই সাড়া মিলবে—ওরা তো এসেছে নব বরের নূতন শাহের খেদমত করার জন্যে।

খোয়াইডাঙ্গার দিগ্‌দিগন্ত-মুগ্ধ কবি, পদ্মার অবিচ্ছিন্ন অবিরল স্রোতের সঙ্গে যে কবি তাঁর জীবনধারার মিল দেখতে পেয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, গ্রহসূর্যে-তারায় বিশ্ব-স্রোত বিশ্ব-গতি হৃদয় দিয়ে আবিষ্কার করলেন, সে কবি পর্যন্ত আপন বঁধুয়ার যে ছবিটিকে বুকের ভিতর এঁকে নিতে চেয়েছিলেন সেটি পত্রপল্লবের অর্ধ-আচ্ছাদনে, বনানীর মাঝখানে;—

'পাতার আড়াল হতে বিকালের
আলোটুকু এসে
আরো কিছুক্ষণ ধরে ঝলুক তোমার
কালো কেশে॥
হাসিয়ো মধু উচ্চহাসে
অকারণ নির্মম উল্লাসে—
বনসরসীর তীরে ভীরু কাঠ-বিড়ালিরে
সহসা চকিত কোরো ত্রাসে।'

ও-রেলি বসে রইল বুড়ো পাদ্রী সায়েবের সঙ্গে বটগাছতলায়—পিকনিকের হেড অফিসে। অবশ্য বউ মেব্‌ল্‌ও তার গা ঘেঁষে।

বুড়ো পাদ্রী গল্প বলে যেতে লাগলেন,—চল্লিশ বছরের আগেকার কথা। এ-সব গল্প মধুগঞ্জ বহুবার শুনেছে, কিন্তু ও-রেলির কাছে নূতন।

'বুঝলে ডেভিড, তখন আমি ছোকরা পাদ্রী হয়ে এদেশে এসেছি। সোম

এ-সব জানে, তার বাপ তখন এখানে সাবরেজিস্ট্রার। আমাকে অনেক করে বোঝালে টিলাতে বাঙলো না বানিয়ে যেন নদীপাড়ে আসন পাতি। তখনকার দিনে দুপুরবেলায় এখানে বাঘ চরাচরি করত, আমার একটা বাছুর চিতে নিয়ে গেল আমার চোখের সামনে, ব্রেকফাস্টের সময়।'

ও-রেলি শুধালে, 'টিলার মোহটা কী? আপনি তো হরিণ কিংবা পাখী শিকারও করেন না।'

পাদ্রী বললেন, 'বাঘ আর ম্যালেরিয়ার ভিতর আমি বাঘই পছন্দ করি বেশী। টিলার উপর ম্যালেরিয়া হয় কম। বন্দুক দিয়ে বাঘ শিকার করা যায়, কিন্তু মশা মারা কঠিন। কী বলো সোম, তুমি তো রববার হলেই বন্দুক নিয়ে মত্ত। কতবার বলেছি সোম, রববার স্যাবাথ—শান্তির দিন। এ-দিনটায় রক্তারক্তি নাই করলে।'

সোম বললে, 'স্যার, তেত্রিশ কোটি দেবতা ছেড়ে একজন দেবতা পেয়ে আমার লাভ না ক্ষতি?' তারপর ও-রেলির দিকে তাকিয়ে শুধাল, 'আপনি-ই বলুন চীফ, তেত্রিশ কোটি টাকার মাইনে ছেড়ে দিয়ে এক টাকার চাকরি নেয় কোন্ লোক?'

পাদ্রী বললেন, 'ওর যে সব কটা মেকি।'

সোম বললেন, 'আমি পুলিসের লোক, স্যার, মেকি টাকা চিনতে না পারলে আমার সায়েবই কাল আমাকে ডিসমিস করবেন। মেকি খাঁটিতে তফাত আমি বেশ জানি। কিন্তু এদিককার তেত্রিশ কোটি আর ওদিককার একজন কেউ তো কখনো আমার থানায় এসে এজহার দেননি। বাজিয়ে দেখব কী করে? মাঝে মাঝে সন্দ হয়, সব কজনাই মেকি।'

পাদ্রী বললেন, 'মাই বয়! কী বলছ?'

পাদ্রীর বুড়ী বউ স্বামীকে বললেন, 'তোমাকে কতবার বলেছি, সোমের সঙ্গে কক্‌খনো ধর্ম নিয়ে আলোচনা করো না। ও যে শুধু হিন্দু তাই নয়—হিন্দুদের ভিতর অনেক সৎ লোক আছেন—ও একটা আস্ত ভণ্ড।'

তারপর ও-রেলিকে শুধালেন, 'সোম আমাদের টিলায় এত ঘন ঘন আসে কেন?'

ও-রেলি হেসে পালটে শুধালেন, 'কেন, আপনাদের ঝগড়া মেটাতে?'

বুড়ী রেগে বললেন, 'বিয়ে করেছ তো মাত্র সেদিন! ঝগড়ার তুমি কী জান হে, ছোকরা? সে কথা থাক, সোম আসে শুধুমাত্র মুর্গী খেতে, বাড়িতে পায় না বলে।'

সোম বললে, 'মাম্মি, আপনি যে ধরতে পেরেছেন, সে কথাটা এতদিন

বলেন নি কেন ?'

বুড়ী থ হয়ে বললেন, 'সে কী রে ! তোকে একশবার বলেছি, তোর বাপকে পর্যন্ত লুকিয়ে রাখি নি।'

সোম বললে, 'কই, আমার তো মনে পড়ছে না ? তা কাল থানাতে গিয়ে দেখব, কোনো পুরোনো নথিতে রিপোর্ট লেখা আছে কি না।'

বুড়ো পাদ্রী ও-রেলি আর মেব্‌লের চোখের উপর কয়েকবার স্নেহের চোখ বুলিয়ে বললেন, 'এই যে ডেভিড বললেন, সোম আসে আমাদের ঝগড়া মেটাতে, তা সে কিছু ভুল বলে নি। আজ যে রকম ডেভিড মেব্‌লকে নিয়ে এসেছে ঠিক তেমনি আমিও একদিন নিয়ে এসেছিলুম গ্রেসিকে। পনেরো বছর কেটে যাওয়ার পর একদিন আমাদের ভিতর সামান্য কথা-কাটাকাটি হওয়াতে হঠাৎ গ্রেসি বললে, "তবে কি আমাদের 'হনিমুন' আজ শেষ হল !" সেই সেদিনই আমি সামলে নিলুম। তারপর দেখো, কেটে গেছে আমাদের 'হনিমুনের' আরো পঁইত্রিশ বছর।'

সোম বললে, 'সে কথা মধুগঞ্জের কে না জানে বলুন ! কিন্তু আমার বেলায় উল্টো। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর মানে চৌদ্দ বছরের জেল। আমার বেলা তারও বেশী। বিয়ে করেছি চৌদ্দ বছর বয়সে, তারপর কেটে গেছে প্রায় আঠারো বৎসর। এখনো কেউ খালাস করবার কথাটি তোলে না।'

পাদ্রী সোমের পাগলামিতে কান না দিয়ে বললেন, 'ঠিক এই গাছতলাতেই বসেছিলুম গ্রেসিকে নিয়ে, বাঘ-ভালুকের ভয় না করে। পাশের ঝোপে কোকিল কুহু কুহু করছিল। আমাদের মনে কী আনন্দ, এমন সময় একটা হনুমান "হুম" "হুম" করে আমাদের সামনে এসে দাঁত-মুখ খিঁচোতে লাগল। গ্রেসি কখনো বাঁদর দেখে নি, প্রায় ভিরমি খেয়ে আমার কোলে মুখ গুঁজল।'

বুড়ি মেম লজ্জায় রাঙা হয়ে বললেন, 'ব্যস, ব্যস হয়েছে।' এর পরও ডেভিড মেব্‌ল্ উঠল না।

॥ ৫ ॥

দেখা যেত দুজনকে, রাস্তা থেকে, তাদের বাঙলোর বারান্দায় ছাতা-ল্যাম্পের নিচে আরাম-চেয়ারে বসে আছে। কখনো সায়েব মেমসায়েবের হাত-পাখাখানা এগিয়ে দিচ্ছে, কখনো মেমসায়েব ঘরের ভিতর গিয়ে দু'হাতে দুটো লাইমজুস নিয়ে আসছে। আর কখনো বা সিংহলী বাটলার জয়সূর্য বারান্দার এক-

প্রান্তে গ্রামোফোনে রেকর্ডের পর রেকর্ড বিলিতি বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই নির্জন বারান্দায় কিংবা টিলার বাগানের লিচুগাছতলায় দুজন পাশাপাশি বসে, সামনের কালাই পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে।

জ্যোৎস্না রাতে দুজনা ডিনারের পর বারান্দা থেকে নেমে লিচুবাগানের ভিতর দিয়ে নেমে আসত সদর রাস্তায়। সেখান থেকে চলে যেত নদীপারে। নদী-পার দিয়ে হেঁটে হেঁটে পৌছোত গিয়ে রামশ্রী গ্রামে, যেখানে ছোট্ট কিসাই নদী বড় নদী কাজলধারার সঙ্গে মিশেছে।

কিংবা তাদের মাথায় চাপত অদ্ভুত খেয়াল। কিসাই-কাজলের মোহনায় খেয়াঘাট; তারা সেই রাত দশটায় হাট-ফের্তাদের সঙ্গে বসত খেয়া-নৌকায় —বাতার উপর। তারপর দুপুররাত অবধি খেয়া-নৌকোয় বসে এপার-ওপার করে বাড়ির পথ ধরত চাঁদ যখন ডুবুডুবু।

মেম আসার পর সায়েব টূরে গেছে মাত্র একবার। মেমকে সঙ্গে নিয়েই গেল। ভাওয়ালি-নৌকোয় করে দু'দিনের রাস্তা। রোজ সন্ধ্যায় সায়েব-মেম ভাওয়ালির ছাদের উপর বসে বসে মাঝি-মাল্লার ভাটিয়ালি গান শোনে, আর কখনো বা জয়সূর্য ভগলা-মাঝির গান গ্রামোফোনে বাজায়। মাঝি-মাল্লারা সে গীত শুনে তাজ্জব মানে, আর মাঝে মাঝে তার নকল করতে গিয়ে মেম-সায়েবের কাছে ধমক খায়। মেম বলে ভাটিয়ালিই ভালো—মাঝিরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে;—তাদের গান সায়েবদের কলে বাজানো গাওনার চেয়ে ভালো, এও কি কখনো সম্ভবে! তবে কি না সায়েব-সুবোদের খেয়াল, আল্লায় মালুম, ওদের দিল, ওদের দরদ কখন কোন্ দিকে ধাওয়া করে। একদিন তো মেমসায়েব নায়ের মশলা-পেষা ছোকরাটার বাঁশের বাঁশি চেয়ে নিয়ে সাবান দিয়ে ধুয়ে-পুঁছে ভাটিয়ালির সুর অনেকক্ষণ ধরে বাজালে।

এবারে নৌকোর বারোয়ারী ডাবাহুকোতে এনরা গুড়ুক খেলেই হয়েছে আর কি!

মাঝি-মাল্লারা কিন্তু একটা বিষয়ে নিজেদের ভিতর বিস্তর আলোচনা করল। সায়েব-মেম এক অন্যের সঙ্গে অত কম কথা কয় কেন? ভাগ্যিস ওরা জানত না যে, বিয়ের আগে ও-রেলি সাহেবের বাচাল বলে একটুখানি বদনাম ছিল বটে।

ভাওয়ালির হালদার বুড়ো মাঝি তালেবুদ্দি বললে, 'খুদাতালা কত কেরামতিই দেখালে; গোরা হল রাজার জাত—আমাদের ডাঙর জমিদারের

গালে ঠাস ঠাস করে চড় মারলে উনি সেটা আল্লার মেহেরবানি সমঝে দিল-খুশ হয়ে হাবেলী চলে যান। আর সেই গোরা দেখো, মেমের রুমালখানা হাত থেকে পড়ে গেলে তখ্‌খুনি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে মেমকে এগিয়ে দেয়। আমি তো এ মামলা বিলকুল বুঝতে পারলাম না।'

শুকুরুল্লা বললে, 'কইছো ঠিকই কিন্তু আমাগো সায়েব তো কখনো কাউরে চড় মারে নি। বল্কে, আমার মনে লয়, সায়েবরা হামেশাই কথা কয় কম, কাম করে বিস্তর। দেখছো না, যারা হাম্বাই-তাম্বাই করে বেশী, তারাই কাম করে কম।'

মশলা-পেষা বললে, 'বউয়ের লগে যদি দুই-চারটা মিডা মিডা কথা না কইলা তয় বিয়া করলা ক্যান্।'

একই বিষয় নিয়ে আমাদের দেশে মাঝি-মাল্লা চাষা-ভূষো অনেকক্ষণ ধরে তর্ক-বিতর্ক করতে পারে না—অবশ্য পুববাঙলার পটভূমি নিয়ে লেখা নভেলে তারা 'গোরা' এবং 'বিনয়ের' মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা নব্যন্যায়ের তৈলাধার জ্বালিয়ে রাখতে পারে। তারা আপন আপন রায় জাহির করেই চুপ করে যায়। তর্ক করে যুক্তি দেখিয়ে একে অন্যের অভিমত বদলাবার চেষ্টা করে না। তাই বোধ করি ভদ্রসমাজে নিছক অবাস্তব তর্কাতর্কির ফলে যে রকম মনকষাকষি এবং মুখ-দেখাদেখি-বন্ধ হয়, চাষা-ভূষোদের ভিতর সেরকম হয় না।

তাই আলোচনার মোড় বদলে গিয়ে সভাস্থলে প্রশ্ন উত্থাপিত হল, 'সায়েব-মেমরা সাঁতার কাটতে ভালোবাসে, কিন্তু নদীর জল ঘোলা হলে গোসল করে না কেন?'

পুববাঙলার লোক জানে না, সায়েবদের কাছে সাঁতার কাটা হচ্ছে স্পোর্টস-বিশেষ—স্নানের খাতিরে তারা সাঁতার কাটতে নামে না। আমাদের কাছে স্নান যা, সাঁতার কাটাও তা।

টুর থেকে ফিরে এসে ও-রেলি পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে একা কলকাতায় চলে গেল। সোম কিন্তু সবাইকে বললে, 'হুজুর সরকারী কাজে কলকাতা গেছেন; জানেন তো, আজকাল যা স্বদেশী-ফদেশী আরম্ভ হয়েছে।'

রায়বাহাদুর বললেন, 'দুদিকেই বিপদ দেখতে পাচ্ছি। সায়েব যদি "স্বদেশীর" পিছনে লাগে, তবে তাদের দফা-রফা! নেটিভদের সঙ্গে দোস্তি জমিয়ে ও তাদের সব হাড়হদ্দ শিখে নিয়েছে, কড়ি চালালে আর কারো রক্ষে নাই। ওদিকে ছোকরা আবার আইরিশম্যান; ওর আপন দেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে

চলেছে জোর "স্বদেশী"। ও যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকে, তবে তার প্রমোশনেরও তেরোটা বেজে যাবে। চাই কি কমপল্‌সরি রেটায়ারমেণ্টও হতে পারে। থাক, ও-সব কথা কইতে নেই।'

জুনিয়ার তালেবুর রহমান বললে, 'নৌকো দিয়েছেন ভাসিয়ে মাঝগাঙে —আর তারপর করছেন নোঙরের খোঁজ। সোমের সামনে খুলে দিয়ে দিয়েছেন শুটকির হাঁড়ি, আর এখন বলছেন নাক বন্ধ করো!'

রায়বাহাদুর বললেন, 'বাবা, সুধাংশু—'

সোম জিভ কেটে দু'কানে হাত দিয়ে বললে, 'রাম, রাম!'

এবারে ও-রেলি যখন কলকাতা থেকে ফিরল, ওখন সকলেরই চোখে পড়ল তার মুখের উপর গাম্ভীর্যের ছাপ।

সায়েবরা কলকাতা থেকে ফিরলে, তা সে রাত বারোটাই হোক, তখ্‌খুনি যায় ক্লাবে, সবাইকে কলকাতার তাজা খবর বিলিয়ে দেবার জন্য—শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি এলে মেয়ে যে রকম ধুলো-পায় সইয়ের বাড়িতে ছুট লাগায়। ক্লাবের সবচেয়ে নীরস বেরসিকও তখন কয়েক দিন ধরে আরব্য উপন্যাসের শেহেরজাদীর কদর পায়।

ও-রেলি ক্লাবে গেল ফিরে আসার তিনদিন পরে।

বুড়ো পাদ্রীর চোখের জ্যোতি কম। তার উপর এতখানি সাংসারিক বুদ্ধি নেই যে, কারো চেহারা খারাপ দেখালে তদ্দণ্ডেই সে সম্বন্ধে প্রশ্ন শুধাতে নেই। ও-রেলিকে দেখামাত্রই শুধালেন, 'সে কি হে ডেভিড, তোমার চেহারা ও-রকম শুকিয়ে গেছে কেন?'

মাদামপুরের বুড়া-সায়েব ঝানু লোক। ও-রেলি আমতা আমতা করছে দেখে বললেন, 'অসুখ-বিসুখ করেছিল হয়তো। কলকাতা বড় নাস্‌টি প্লেস— ডিসেণ্ট্রি আর ডিসেণ্ট্রি! কেন যে মানুষ কলকাতা যায় বুঝতে পারি নে। আমি যখন প্রথম মাদামপুর আসি—'

বিষ্ণুছড়া বাগিচার মেম বললেন, 'তা মিস্টার ও-রেলি, কলকাতার নূতন খবর কী?'

মাদামপুরের বড় সায়েব তখনো আশা ছাড়েন নি; বললেন, 'কলকাতায় যেতে আঠারো দিন লাগত, আর—'

বিষ্ণুছড়া বাগিচার বড় মেমে আর মীরপুর বাগিচার ছোট মেমে যেন সাপে-নেউলে। একে অন্যের দেখা হলেই টুকাটুকি ঠোকাঠুকি। বললেন, 'মিস্টার ও-রেলি, কলকাতার সব খবরই নূতন। ফার্পোতে নেটিভরা ঢুকতে পারছে,

সে-ও নূতন খবর। ময়দানে ঘাস গজাচ্ছে, সে-ও নূতন খবর।'

বিষ্ণুছড়ার মেম ছোবল মারতেন, কিন্তু তাঁর সায়েব শান্তভাবে মেমের হাতের উপর হাত রেখে তাঁকে চেপে দিয়ে বললেন, 'তাজা-বাসি আমরাই যাচাই করে নেব ও-রেলি। ও-সব ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না।'

আগে হলে ও-রেলি এতক্ষণ সুবোধ ছেলের মত 'টু বী সীন, নট টু বী হার্ড' হয়ে বসে থাকতো না। ততক্ষণ হয়তো সপ্রমাণ করে দিত গড়ের মাঠে সত্যই কত রকম নূতন ঘাস গজাচ্ছে, তার রঙ গোলাপী, ফুল সবুজ আর সে ঘাস নেটিভ মাঠে পা ফেললেই গোখরোর মত ছোবল মারে—ডেঞ্জারেস পয়জন্—কিংবা হয়তো গম্ভীরস্বরে বয়ান করত, নেটিভরা এখনো ফার্পোতে ঢুকতে পায় নি; তবে কি না এ খবর কিছুটা সত্য, এখন ফার্পোর টেবিল-চেয়ার সরিয়ে সেখানে কার্পেটের উপর গোবর নিকনো লেপানো হয়েছে, আর তারই উপর সায়েবরা থালা পেতে হাপুর-হুপুর শব্দ করে খিচুড়ির সঙ্গে মালেগাটানি সুপ মাখিয়ে খাচ্ছেন।

অবশ্য ও-রেলি একেবারে চুপ করে বসে রইল না। কিন্তু খবর বিলোতে গিয়ে দেখল এবারে কলকাতায় সে তেমন কিছুই দেখে নি। গ্র্যাণ্ডে বসে লাঞ্চ খেয়েছে অথচ চারদিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে কিছুমাত্র লক্ষ্য করে নি। ক্যালকাটা ক্লাবের বারে বসে অনেকক্ষণ ধরে এটা-ওটা চুকচুক করেছে, কিন্তু এখন আর স্মরণ করতে পারল না পরিচিত কার কার সঙ্গে সেখানে দেখা হয়েছে।

বিষ্ণুছড়া বললেন, 'ও-রেলি গোপন সরকারী কাজে গিয়েছিলেন কলকাতায়, আর তার ফাঁকে করেছেন পার্টি-পরব। দুটোয় জট পাকিয়ে গিয়েছে বলে কী বলবেন, কী বলবেন না, ঠিক করতে পারছেন না।'

ও-রেলি বুঝলে, এটা সোমের কীর্তি।

প্রকাশ্যে বললে, 'ঠিক তা নয়, তবে এখন কলকাতার মৌসুমটা মন্দা যাচ্ছে। বেশীর ভাগই দার্জিলিং কিংবা শিলঙে। আমার পরিচিত অল্প লোকের সঙ্গেই সেখানে দেখা হল।'

মীরপুর বললেন, 'সে কি মিস্টার ও-রেলি? আপনি তো এক সেকেণ্ডে আলাপ জমিয়ে ফেলতে পারেন বদ্ধ কালা-বোবার সঙ্গে, আর আপনি করছেন পরিচয় অভাবের শোক!'

মনের ভিতর চমক খেয়ে ও-রেলি দেখলে, কথাটা একেবারে খাঁটি। এই তার জীবনে প্রথম যে সে কলকাতায় কোনো নূতন পরিচয় জানতে পারে নি। তবে কি সে জানাতে চায় নি? কেন, কী হয়েছে তার?

কিছু একটা বলতে হয়—যে লোক গল্পবাজ, সে কোনো কারণে চুপ মেরে গেলে সমাজে তার বড় দুরবস্থা—তাই আমতা আমতা করে বললে, 'না না, সে দিক দিয়ে আটকায় নি।' বলতে বলতে মনে পড়ে গেল, ক্রিকেটার হেণ্ডারসনের সঙ্গে হুয়াইটওয়ের দোকানে তার দেখা হয়েছিল। ও-রেলি বেঁচে গেল। শুধালে—

'ক্রিকেটার হেণ্ডারসনকে চেনেন?'

বিষ্ণুছড়ার মেম বললেন, 'আমার দূর সম্পর্কের বোন-পো হয়।'

মীরপুর মেম কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার পূর্বেই ও-রেলি ক্রিকেটের গল্প জুড়ে দিল। মীরপুর-বিষ্ণুছড়ার কথা-কাটাকাটিকে সে, স্বদেশী' বোমার চেয়েও বেশী ডরাত—বললে, 'একটা ভালো ইংলিশ ক্রিকেট টীম নিয়ে আসছে-শীতে ইণ্ডিয়া আসতে চায়। ছেলেটার তাই নিয়ে উৎসাহের অন্ত নেই। ভারতবর্ষের সব কটা "পিচ" সে তার আপন হাতের তেলোর চেয়েও ভালো করে চেনে। আমার তো মনে হল "পিচ"গুলোর ঘাস বকরির মত চিবিয়ে খেয়ে যাচাই করে নিয়েছে, কোন্‌টা বোলারের স্বর্গ আর কোন্‌টা ব্যাটসম্যানের—দরকার হলে 'কোয়ের ম্যাটিঙ'ও চিবুতে তৈরী।

"আমি বললুম, অতশত মাথা ঘামাচ্ছ কেন হেণ্ডারসন, এদেশের ক্রিকেট বড্ড কাঁচা, তোমরা অনায়াসেই জিতে যাবে।"

"হেণ্ডারসন বললে, তার কিচ্ছু ঠিক ঠিকানা নেই। বোম্বাইয়ের জ্যাম সায়েব —তোমরা নাকি নামটা অন্য ধরনে উচ্চারণ করো, তিনি 'জ্যাম' হোন আর জেলিই হোন, বিলেতে তিনি তাড় হাঁকড়ে সবাইকে ক-শো বার জেলি বানিয়ে দিয়েছেন, তার খবরও তো তোমার অজানা নেই। কে বলতে পারে বলো, কালই এদেশে আরো পাঁচটা জ্যাম বেরিয়ে যাবে না এবং হয়তো জ্যাম নয়, তার চেয়েও শক্ত মাল—'হার্ড নাট'।"

'আমি উত্তরে বললুম, অসম্ভব তো কিছুই নয়, তবে কি না কাল আমার ন্যাজ গজাতে পারে বলে আজ তো আমি তাই নিয়ে মাথা ঘামাই নে কিংবা ন্যাজ সাফসুতরো রাখার জন্য বরুশও কিনি নে!'

মাদামপুরের বুড়ো সায়েব লক্ষ্য করলেন, ক্রিকেটের গল্পে উত্তেজিত হয়ে ও-রেলি তার মন-মরা ভাবটা কাটিয়ে ফেলেছে। খুশি হয়ে উৎসাহ দিয়ে বললে, 'তা তুমি এখানে একটা ক্রিকেট টীম বানাও না কেন?'

ও-রেলি বললে, 'ভাবছি, শমশেরগঞ্জের জমিদারের কাছ থেকে কিছু টাকা বাগাব। সম্প্রতি লোকটা গুম-খুনে জড়িয়ে পড়েছিল—অথচ সোম পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে প্রমাণ খাড়া করতে পারলে না। আমি কিন্তু জমিদারকে ভাঁওতা

মারলুম, সব প্রমাণ তৈরী, এবারে বাছাধনকে ঝুলতে হবে। পায়ে জড়িয়ে ধরে আর কি, তখন ভবিষ্যতের জন্যে তার বুকে যমদূতের ভয় জাগিয়ে দিয়ে যেন নিছক মেহেরবানি করে তাকে ছেড়ে দিয়েছি। টাকা চাইলে এখন তার ঘাড় দেবে।'

সবাই কলরব তুলে নূতন করে আবার সেই গুম-খুনের পোস্টমর্টেমে লেগে গেলেন। ইংলণ্ডে হিজ ম্যাজেস্টির পরেই ক্রিকেট-আলোচনা আড্ডার রাজা কিন্তু পূববাঙলার গুম-খুন রাজারও রাজা, অর্থাৎ মন্ত্রী—অবশ্য দাবা খেলার—রাজার চেয়ে ঢের বেশি তাগদ ধরেন। কত রকম কথা-কাটাকাটিই না হল, বিষ্ণুছড়ার মেম বলছেন, জমিদারের হুকুমে বড় ভাইয়ের চোখের সামনে ছোট ভাইকে জ্যান্ত পোঁতা হয়েছিল, মীরপুরের মেম বললেন, গুলতান, লোকটার বড় ভাই-ই নেই আর সে খুন হয় নি আদপেই; মীরপুরের জমিদারের টাকা খেয়ে গুম হয়ে গিয়েছে শমশেরগঞ্জকে জড়াবার জন্য।

অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলেছিল। ইতিমধ্যে ও-রেলি কেটে পড়েছে।

মাদামপুরকে বাগানে ফেরার সময় বিড়বিড় করে বলতে শোনা গেল, 'ও-রেলিকে বোঝা ভার'।

॥ ৬ ॥

বরঞ্চ ইংরেজ সকালবেলার বেকন আণ্ডা বর্জন করে দেবে, বরঞ্চ ইংরেজ বড়দিনে গির্জে কট করতে পারে, এমন কি শাশুড়ীর জন্মদিনও ইংরেজের পক্ষে ভুলে যাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু ক্লাব-গমন বন্ধ করা ইংরেজের পক্ষে হৌস-অব-কমনস্ পুড়িয়ে দেবার সামিল—মুসলমানের কলমা ভুলে যাওয়া, হিন্দুর গো-মাংস ভক্ষণের তুলনায় চুলে চিমটি কাটার মত।

ডেভিড, মেব্‌ল্ তিন মাস ধরে ক্লাবে যায় নি!

যে মীরপুরের ছোট মেম ডুমুরের ফুল সাপের ঠ্যাঙ দেখেছেন বলে ক্লাবে দাবি করে থাকেন, তাঁকে পর্যন্ত স্বীকার করতে হল, মধুগঞ্জের তাবৎ খানসামা-বাটলার, মেথর-ঝাড়ুদারকে ফালতো চা বকশিশ দিয়েও তিনি কারণটা বের করতে পারেন নি।

এ-সব বাবদে সোজাসুজি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা ইংরেজের সর্বশাস্ত্রে বারণ। এক-মাত্র পাদ্রীদের কিছু হক্ক আছে। বুড়ো পাদ্রী সন্তর্পণে প্রশ্ন শুধিয়ে নিরাশ হলেন। বুড়ী মেম একবার ডেভিডের মফস্বল-বাসের সময় মেব্‌লের সঙ্গে তেরাত্তির কাটান। চতুর্দিকে কড়া নজর ফেলে, এমন কি শেষটায় জিজ্ঞেসবাদ

করেও কোনো খবর যোগাড় করতে পারলেন না।

বুড়ী বেদনা পেয়েছিলেন। তৃতীয় রাত্রিতে ছিল পূর্ণিমা। জানালা দিয়ে চোখে চাঁদের আলো পড়তে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। পাশের খাটের দিকে তাকিয়ে দেখেন মেব্‌ল্‌ নেই। পা টিপে টিপে বারান্দায় এসে দেখেন মেব্‌ল্‌ ডেকচেয়ারে সামনের দিকে ঝুঁকে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসে আছে—তার দীর্ঘ বাদামী চুল হাত-মুখ ছাপিয়ে ফেলেছে। বুড়ী মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, চুলে আঙুল চালাতে চালাতে হঠাৎ চুলের ডগাগুলো ভেজা ঠেকল।

প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে তিনি পাদ্রী-টিলার বহু তরুণী, বিস্তর যুবতীর অনেক বুকফাটা কান্না দেখেছেন, কোনো কোনো স্থলে সলা-পরামর্শ দিয়ে নানা দিকে নানা রকম কলকাঠি চালিয়ে এদের মুখে হাসি ফোটাতেও সক্ষম হয়েছেন, কিন্তু এ নারীর বেদনা কী হতে পারে, সে সমস্যার সন্ধানে কোন্‌ দিকে হাতড়াতে হবে তার সামান্যতম অনুমানও তিনি করতে পারলেন না।

বুড়ো পাদ্রী সব শুনে বললেন, 'এসো, দুজনাতে মিলে প্রার্থনা করি।'

সোম একদিন ও-রেলিকে প্রশ্ন শুধাল মাত্র দুটি শব্দ দিয়ে, 'এনি ট্রাবল ?'

উত্তরের জন্য মাত্র এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে সোম 'গুড বাই' বলে বারান্দা থেকে নেমে লিচুতলা দিয়ে গেট খুলে বড় রাস্তায় নেমে গেল।

ও-রেলি ভাবলে মাত্র দুটি কথা, 'এনি ট্রাবল !'

স্মরণই করতে পারল না, তার জীবনে কখনো কোনো শক্ত ট্রাবল এসেছিল, কি না যেটাকে সে কাত করতে পারে নি। সে তাগড়া জোয়ান, লেখাপড়ায় ব্রিলিয়াণ্ট না হলেও ভালো, গায়ের জোরে কমতি নেই, আর পাঁচটা ইংরেজের মত তিনটে কথা বলতে গেলে সাতবার হোঁচট খায় না—তার আবার ট্রাবল ! হ্যাঁ, একটা সামান্য ট্রাবলের কথা মনে পড়ছে বটে। এমনিতে তার মুখে শুধু খই ফোটে না, টোস্ট পর্যন্ত সেঁকা যায় তবে প্রেমের ব্যাপারে একটু মুখচোরা বলে মেব্‌ল্‌কে বিয়ের প্রস্তাব পাড়তে তার তিনটে রবির সন্ধ্যা লেগেছিল বটে, কিন্তু তারপরের অবস্থা দেখে সে থ—মেব্‌ল্‌ বাহান্ন রববারের আগের থেকেই নাকি তাকে বিয়ে করবে বলে মনস্থির করে ট্রসোর ডিজাইন বানাতে লেগে গিয়েছিল।

ইস্কুলের ব্লু, চাকরির জন্য পরীক্ষা, রাগবিতে একখানা পাঁজর গুঁড়িয়ে যাওয়া—এ-সব ও-রেলির কাছে কখনো ট্রাবল বলে মনে হয় নি। তার একমাত্র ভয় ছিল মেব্‌ল্‌ যদি তাকে গ্রহণ না করে। সেই মেব্‌ল্‌কে পেতে তার তিনটে রববার—অর্থাৎ একুশ দিনের দিবারাত্র দুশ্চিন্তা—লেগেছিল বটে কিন্তু

আজকের তুলনায় সে কত সহজ। সেদিন পথহারা ও-রেলির সামনে থেকে হঠাৎ যেন কুয়াশা কেটে যায় আর সুমুখে দেখে বসন্তের মধুরৌদ্রে, নীল আকাশের পটে আঁকা মেব্‌ল। 'উতলা পবন বেগে মেঘে মেঘে' যেন তার খোলা চুল উড়ে উড়ে চলেছে। হাতে তার একটি ছোট ফুল। তারই এক-একটা পাপড়ি ছিঁড়ছে আর বলছে 'হি লাভস্ মী', পরেরটায় বলছে 'হি লাভস্ মী নট্'—এই করে করে ভাগ্য-গণনা করছে। সর্বশেষের পাপড়িতে 'হি লাভস্ মী' না 'হি লাভস্ মী নট'-এ এই জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান মিলবে।

ও-রেলির মনে পড়ল, মেব্‌ল সেদিন তার কানের ডগায় চুমো খেয়ে বলেছিল, 'আমি সব সময়ই জানতুম, শেষ পাপড়ি 'হি লাভস্ মী'-তেই শেষ হবে। একদিন যখন হল না তখন রীতিমত হকচকিয়ে গেলুম। পরে দেখি একটা পাপড়ি আগের থেকেই ছিঁড়ে গিয়েছিল—টুকরোখানা তখনো বোঁটায় লেগে আছে।'

সে সব দিন চলে যাওয়ার পর আজ সোম জিজ্ঞেস করলে, 'এনি ট্রাবল্!'

তারপর আরো তিন মাস কেটে গিয়েছে। এ তিন মাসের ভিতর আরো পরিবর্তন ঘটেছে। ও-রেলিরা ক্লাব দূরে থাক কারো বাড়িতে পর্যন্ত যায় নি। তার থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল তারাও চায় না কেউ তাদের বাড়িতে আসুক। শেষ পর্যন্ত এক পাদ্রী মেম ছাড়া আর কেউ ও-রেলি টিলায় আসত না এবং তিনিও আসতেন যেন অতিশয় দায়ে পড়ে, অন্ধভাবে অন্ধকারে কোন এক ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আবছা বুঝতে পেরে মানুষ যেরকম আত্মজনের কাছে এসে দাঁড়ায়।

তারপর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের খরদাহের পর নামল বর্ষা। কলকাতার বদখদ দালান-কোঠার উপর বর্ষা যখন নামে তখন বড়বাজারের বেরসিক মারোয়াড়ী পর্যন্ত আকাশের দিকে দু-একবার না তাকিয়ে থাকতে পারে না, আর কলেজের মেয়েরা নাকি ছাদের উপর বৃষ্টির জলে ভেজবার অছিলা করে মেঘের জলের সঙ্গে চোখের জল মেলায়। আর তাতে আশ্চর্য হবারই বা কী আছে!. ছেলেরা তো কলেজ পাসের পর অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে প্রেম-বিয়ে-শাদি মন থেকে কুলোর বাতাস দিয়ে খেদিয়ে দেয়; মেয়েরাই শুধু অজানা ভবিষ্যৎকে অতখানি ডরায় না বলে বে-এক্তেয়ার প্রেমে পড়ে আর তারই প্রকাশ খুঁজতে গিয়ে রবিঠাকুরের গান আর কবিতা বাঁচিয়ে রাখে। তবে কি রবিঠাকুর এ তত্ত্বটা জানতেন, তাই ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের গান শিখিয়েছেন অনেক বেশী সযত্নে?

মধুগঞ্জে এ-সব বালাই নেই—মারোয়াড়ী নেই বললেও চলে, কলেজ নেই তাই কলেজের মেয়েও নেই। মধুগঞ্জী বালিকাদের বিয়ে হয়ে যায় চোদ্দ পেরতে না পেরতেই। এ বিষয়ে ওয়েলস পাদ্রী সাহেবও নেটিভ বনে গিয়েছেন, রুথ্-মেরীদের ষোলো পেরতে না পেরতেই বরের সন্ধানে লেগে যান। তাঁর যুক্তি—প্রাচ্যে মেয়েরা বিবাহযোগ্য হয়ে যায় অল্প বয়সেই, এদেশে বিলিতি কায়দা মেনে নিলে শুধু অনর্থেরই সৃষ্টি হয়।

বিবাহ মাত্রই প্রেমের গোরস্তান, কিন্তু শান্তির আস্তানা।

তাই এখানে কোনো তরুণী অকারণ বেদনায় কাতর হয়ে রবিঠাকুরের কবিতা-গান নিয়ে নাড়াচাড়া করে না। রবিঠাকুর তাই সেযুগে মধুগঞ্জে অচল।

ঠিক সেই কারণেই প্রকৃতির সৌন্দর্যবোধ মধুগঞ্জে মদনভস্মের মত শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। অর্থাৎ এখানকার লোক নববরষণে ময়ূরের মত পেখম তুলে নাচে না, আবার উত্তরের পাহাড় পেরিয়ে দলে দলে নবীন মেঘ এসে যখন শহরের বনের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে তখনও মানুষ সেখানে বর্ষার মধুর দিকটা সম্বন্ধে অচেতন হতে পারে না। আর হবেই বা কী করে? প্রথম যেদিন মধুগঞ্জে কদম ফুল ফোটে সেদিন তার গন্ধে সমস্ত শহর ম-ম করতে থাকে। সে গন্ধে নেশা আছে—রায়বাহাদুর চক্রবর্তীর মত রসকষহীন মানুষকেও দেখা যায় বেড়িয়ে বাড়ি ফেরার সময় একডাল কদম হাতে নিয়ে ফিরছেন।

কিন্তু পুববাঙলা আসামের সায়েবরা বর্ষাকালে প্রায় পাগল হয়ে যায়। বিশেষ করে যারা বাগানের ছোট ছোট টিলাতে নির্জনবাসে থাকতে বাধ্য হয়। পাঁচ মাইলের ভিতরে একটা ইংরেজ নেই যার সঙ্গে দুটি কথা বলতে পারে, দিনের পর দিন অনবরত বৃষ্টি, রাস্তাঘাট জলে-জোয়ারে ভেসে গিয়েছে, ক্লাবে যাবার কথাই ওঠে না। শেষ পর্যন্ত গ্রামোফোন বাজানো পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। হিসেব নিয়ে দেখা গিয়েছে বেশীর ভাগ সায়েবরাই এই সময় দিশী রমণী গ্রহণ করে। কেউ কেউ ম্যালেরিয়ায় তাদের শুশ্রূষা লাভ করে সেরে ওঠার পর, আর কেউ কেউ একটানা নির্জনবাসের ফলে হন্যে হয়ে গিয়ে।

ও-রেলির মাথার ইস্ক্রুপগুলো জোর টাইট করে বসানো। বর্ষা তাকে কাবু করতে পারে না। তার ওপর মেব্‌ল্ পাশের চেয়ারে বসে।

তবু বোঝা গেল, এ বর্ষা ও-রেলিকে পর্যন্ত অনেকখানি ঘায়েল করে দিয়েছে। ও-রেলি মুষড়ে পড়েছে।

॥ ৭ ॥

মাদামপুরের বড় সায়েব বললেন, 'এ কথাটা আমি কী করে বিশ্বাস করি বলো তো, পার্সি? মেব্‌ল মিশুকে হোক আর না-ই হোক, ওর মত ডিসেণ্ট গার্ল আমি জীবনে অল্পই দেখেছি। কলেজ পর্যন্ত পড়েছে, উত্তম রুচি। সে কী করে অতখানি স্টুপ করবে? তুমি ছাড়া অন্য কেউ এ কথাটা বললে তার সঙ্গে আমার হাতাহাতি হয়ে যেত।'

বিষ্ণুছড়ার সায়েবের বয়স যদিও কম তবু এ অঞ্চলে তার খ্যাতি-প্রতিপত্তি বিচক্ষণ লোক হিসাবে। আর পরচর্চা, গুজোব রটানো থেকে তিনি থাকেন সব সময়েই দূরে এবং আশ্চর্য, যারা এ-সব জিনিসে কান দেয় না, পাকা খবর তারাই পায় বেশী এবং আর সকলের আগে। বললেন, 'আমার কাছে এখনো সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তোমাকে তো বললুম, কিছুটা বিশ্বাস না করলে তোমার কাছে আমি কথাটা পাড়তুম না। অবশ্য একথাও আমি বলব, এ-সব জিনিস আমি শেষ পর্যন্ত অবিশ্বাস করারই চেষ্টা করি।'

'তোমার মেম, মীরপুরের মেম, এরা সব জানতে পেরেছে?'

'নিশ্চয়ই এখন পর্যন্ত না। শার্লট জানতে পারলে আমাকে রাত তিনটেয় খবরটা দিত এবং সঙ্গে সঙ্গে মীরপুর ছুটত এমিলিকে টেক্কা মারবার জন্য—অ্যাণ্ড ভাইস ভার্সা। তবে খুব বেশী দিন গোপন থাকবে না। সত্যই হোক আর মিথ্যেই হোক, যে-সব মেয়েরা মেব্‌লের রুচিশীল ব্যক্তিত্বের সামনে নিজেদের ছোট মনে করত তাদের জিভের লকলকানি খুব শিগগিরই আরম্ভ হয়ে যাবে।'

সন্ধ্যের পর টেনিস লনের এক কোণে বসে দুই সায়েব অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে ভাবলেন। মধুগঞ্জ অঞ্চলের ইংরেজ কলোনির আসল সর্দার এঁরাই। বিষয়টি তাঁরা আলোচনা করছিলেন সেই কর্তব্যবোধ থেকে—এ সম্বন্ধে তাঁরা কিছু করতে পারেন কি না।

শেষটায় মাদামপুর হুঙ্কার দিলেন, 'বয়, দো ব্রা পেগ্‌।'

খবর কিংবা গুজোব যা-ই হোক, ব্যাপারটা মারাত্মক—গড্‌ ড্যাম্‌ সিরিয়স—মেব্‌ল্‌ নাকি নেটিভ বাটলারটার প্রতি অনুরক্ত!

ঐ মিশকালো, অষ্টপ্রহর মদে-মাতাল-রাঙা-চোখওলা ভোঁতকা লোকটার প্রতি মেব্‌ল্‌ অনুরক্ত, একথা কে বিশ্বাস করবে? একমাত্র 'স্ত্রীচরিত্র দেবতারাও জানে না' তত্ত্ব মানলে সব কিছুই বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু এই সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য স্ত্রী-নিন্দার সামনে দাঁড়িয়ে বরঞ্চ জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে যায়, দেবতারা না হয় দেবীদের চরিত্র চিনতে পারেন নি, তাই বলে পুরুষকেও তার স্ত্রী-জাত সম্বন্ধে

এই অজ্ঞতা মেনে নিতে হবে এবং মেনে নিয়ে স্ত্রী-জাতকে অপমান এবং নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে লাঞ্ছনা করতে হবে ?

কিন্তু এ-সব তো পরের কথা। প্রথমেই যেটা মনে আসে সেইটেই মাদামপুরের বড় সায়েব বিষ্ণুছড়াকে বললেন, 'হাতা-হাতি হয়ে যেত।' তারপর হুড়হুড় করে মনে আসে একসঙ্গে দশটা প্রতিবাদ ; ও-রেলির মত সুপুরুষকে ছেড়ে ? এক বৎসর যেতে না যেতে ? ও-রেলির এতখানি আদর-যত্ন পেয়েও ? ও-রেলি কি তবে জানে না ?

ঠাণ্ডা-মাথা মাদামপুর বললেন, 'পার্সি, তবে কি তাই তারা পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিয়েছে ?'

বিষ্ণুছড়া একটুখানি ভেবে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু মেলামেশাটা বজায় রাখলেই তো মানুষের সন্দেহ হত কম।'

মাদামপুর দুই ঢোকে ডবল হুইস্কি খতম করে বললেন, 'মাই গড, নেটিভরা জানতে পারলে লজ্জার সীমা থাকবে না। ওঃ !'

'তা ঠিক, তবে কি না জিনিসটা যখন চা-বাগিচার ভিতরে আগেও হয়েছে তখন—'

মাদামপুর বাধা দিয়ে বললেন, 'সে হয় শহর থেকে দূরে, বনের ভিতর, টিলার উপরে।'

'সে কথা ঠিক কিন্তু পাদ্রী-টিলার বাচ্চারা কোথা থেকে আসে সে তত্ত্বও তো নেটিভদের অজানা নয়।'

মাদামপুর একটুখানি অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'সে তো সাধারণভাবে, যে রকম ধরো অনাথাশ্রম হয়। কিন্তু এখানে যে ব্যক্তিবিশেষ, সমাজ যাকে চেনে। তা আবার এ. এস. পি.র মেম ! মাই গড ! আমি ভাবতুম, পুরুষরা এ-সব ঢলা-ঢলিতে যতখানি নিচু হতে পারে, স্ত্রীলোকেরা ততখানি পারে না।'

দুজনেই উঠে দাঁড়ালেন। দেখা গেল বিষ্ণুছড়া আর মীরপুরের মেম আসছেন। সাপে-নেউলে গল্প করতে করতে আসছেন এ জিনিস প্রাণীজগতে কখনোই দেখা যায় না। দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন এক লেঙ্গোটার ইয়ার—উহুঁ, এক ফ্রকের সই। অথচ এঁরা আসছেন ইনি ওঁকে ছোবল মারতে মারতে, উনি এঁকে কামড় দিতে দিতে। চোখ লাল না করে, দাঁত না খিঁচিয়ে, ফণা না বাগিয়ে ঝগড়া করতে পারে একমাত্র মানুষই—অবশ্য স্ত্রীলোকেরাই পায় মাইকেল ও-রেলি শীল্ড—পুরুষের কপালে কনসোলেশন প্রাইজ।

গুজোবটা ছড়াতে কত দিন লেগেছিল বলা শক্ত। গুজোবের স্বভাব হচ্ছে যে,

প্রথম ধাক্কাতেই সে যদি কিছুটা সাহায্য না পায় তবে কেমন যেন দড়কচ্চা মেরে যায়। ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে মাদামপুর আর বিষ্ণুছড়া যদি সেটার টুঁটি চেপে না ধরতেন, তবে কী হত বলা যায় না; এস্থলে গুজোবটাকে ফের চাঙ্গা হয়ে ছড়িয়ে পড়তে বেশ একটুখানি সময় লেগেছিল।

মধুগঞ্জের 'আণ্ডা-ঘরে' গুজোব মাত্রেরই জন্ম-মৃত্যু জরা-যৌবনের বেশ একটা সুনির্দিষ্ট ঠিকুজি আছে। গুজোবের জননী যদি মীরপুরের ছোট মেম হন, তবে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। অবশ্য জানা কথা, বিষ্ণুছড়ার বড় মেম তখন আঁতুড়ঘরেই বাচ্চাটাকে নুন খাইয়ে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেন এবং আরো জানা কথা, বেশীর ভাগ স্থলেই বাচ্চা ঘোঁত-ঘোঁত করে নুনটা খেয়ে ফেলে দিব্য ট্যাঁ-ট্যাঁ করে দুধের জন্য আপন ক্ষুধা জানিয়ে দেয়। তার কারণ বিষ্ণুছড়ার বড় মেম পাঁঠা কাটতে চান তাঁর পদমর্যাদার ভার দিয়ে—তিনি বড় মেম, মীরপুর ছোট মেম—আর মীরপুর কাটে ধার দিয়ে। তার উপর ক্লাবে ছোট মেমদের সংখ্যা বেশী, কাজেই তারা সদলবল সায় দেয় মীরপুরের কথায় কথায়—হায়, কার্লমার্কস্ যদি আণ্ডা-ঘরে একটা ঢুঁ মেরে যেতেন, তবে তিনি 'পতি বুর্জুয়াজী' আর 'অৎ বুর্জুয়াজী'র আড়াআড়ি সম্বন্ধে কত তত্ত্বকথা না রপ্ত করে যেতে পারতেন!

আবার বিষ্ণুছড়া যদি কোনো গুজোবের 'গড্‌মাদার' হন তবে সে বেচারীকে ষষ্ঠী-পূজোর দিন পর্যন্ত বাঁচতে হয় না।

মেব্‌লের সৌভাগ্য বলতে হবে যে, তার সম্বন্ধে গুজোবটা বিষ্ণুছড়া ক্লাবে বাপ্তিস্ম করেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই মীরপুর বললেন, এ গুজোব তাঁর কানে এসেছে বহুদিন হল। তিনি এটা একদম বিশ্বেস করেন নি। ও-রেলি বিপ্লবীদের পিছনে লেগেছে বলে নেটিভরা হিংসেয় এইসব আজগুবী যাচ্ছেতাই কেচ্ছা রটাচ্ছে।

অনেকক্ষণ ধরে কথা-কাটাকাটি হয়েছিল। সে ময়না তদন্তে মেব্‌লের গোপনতম অন্তবস্ত্রের সাইজ, রঙ কিছুই বাদ পড়ল না। সেদিন কিন্তু আরেকটু হলে মীরপুরই লড়াইয়ে হেরে যেতেন, কারণ দেখা গেল মেব্‌লের সৌন্দর্যে হিংসুটে খাটাসমুখোগুলো পাইকারী হিসেবে জুটেছে বিষ্ণুছড়ার পিছনে। আরেকটু হলে মীরপুরকে রণে ভঙ্গ দিতে হত, কিন্তু অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তার ফিফ্‌থ কলাম জুটে গেল, বিষ্ণুছড়ার বড়সায়েবের সাহায্যে।

এ-সব কেলেঙ্কারি-কোঁদল মেমেরা করে সায়েবদের বাদ দিয়ে। আজকের আলোচনা কিন্তু এতই তপ্ত-গরম হয়ে উঠেছিল যে, বিষ্ণুছড়ার বড় সাহেব যে কখন এসে একপাশে দাঁড়িয়েছেন কেউ লক্ষ্য করে নি।

হঠাৎ একসময় তাঁর স্ত্রীর কথা কেটে দিয়ে বললেন, 'শার্লট, তুমি যে

কথা বলছ সেটা কি খুব রুচিসঙ্গত ?'

তারপর আর পাঁচজনের দিকে একটুখানি বাও করে, 'আপনারা আমাকে মাফ করবেন', বলে আস্তে আস্তে বাইরে চলে গেলেন।

সবাই থ। একে অন্যের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে। বরঞ্চ যদি বিষ্ণুছড়া তাঁর খাণ্ডার মেমের কথার প্রতিবাদ না করে কোট-পাতলুন ফেলে দিয়ে আণ্ডাখেলার টেবিলের উপর ধেই-ধেই করে নেচে নেচে ধর্মসঙ্গীত গাইতে আরম্ভ করতেন তবু আণ্ডা-ঘর এতখানি আশ্চর্য হত না, কারণ এ অঞ্চলে সবাই জানে, বিষ্ণুছড়া তাঁর মেমকে ডরান কুলীদের স্ট্রাইকের চেয়েও বেশী। তাঁর যে এতখানি দুঃসাহস হতে পারে সেকথা সম্পূর্ণ কল্পনাতীত। সবাই থ। না, থ নয়—একেবারে দ, ধ, দন্ত্য ন—বর্ণমালার শেষ হরফ পর্যন্ত।

সম্বিতে ফেরার পর মীরপুরের ছোট মেম ফিসফিস করে এস. ডি. ও'র মেমকে বললেন, 'নিশ্চয়ই এক জালা হুইস্কি খেয়েছে, বাঘের চর্বির সঙ্গে ককটেল বানিয়ে।'

এস. ডি. ও'র মেমের সুরসিকারূপে খ্যাতি ছিল। ক্লাব থেকে বেরতে বেরতে বললেন, 'হ্যাঁ, একটা ছবিতে দেখেছিলুম, হুইস্কির পিঁপে থেকে ছ্যাঁদা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা হুইস্কি চুইয়ে বেরচ্ছে। এক ইঁদুরছানা সেইটে চুকচুক করে চুষে হয়ে গিয়েছে বেহেড মাতাল। লাফ দিয়ে পিঁপের উপর উঠে আস্তিন গুটিয়ে চিৎকার করে বলছে, 'ঐ ড্যাম্ ক্যাট্‌টা গেল কোথায় ? নিয়ে এসো এইখেনে —আমি ব্যাটার সঙ্গে লড়ব।'

মীরপুর বললেন, 'ভালো গল্প ; টম্‌কে বললে হবে। আপিসের কাউকে ডিসমিস করতে হলে সে সেই সাতসকাল ছটার সময় হুইস্কি খেয়ে আপিস যায়।'

এস. ডি. ও-মেম বললেন, 'আজ রাত্রে বেচারা পার্সির ডিনার জুটবে না। ওকে "পট-লাকে" নেমন্তন্ন করলে হয় না ?' হঠাৎ কথা বন্ধ করে বললেন, 'ঐ দেখো, পার্সিকে ফেলে বেটি মোটর হাঁকিয়ে বাড়ি রওয়ানা হয়েছে। এই বয়সে পার্সি বেচারার কী করে টাক হল বুঝতে কষ্ট হয় না। তালুতে যে কুল্লে আড়াইখানা চুল আছে সেগুলোও আজ রাত্রে ছেঁড়া যাবে।'

মীরপুর ততক্ষণে আপন ভাবনায় ডুব দিয়েছেন। গুজোবটা তিনি বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু এই যে বিষ্ণুপুরের বড় সায়েব জিনিসটাকে এত সিরিয়সলি নিলে যে মেমকে পর্যন্ত ধমক দিলে—তবে কি ?—কে জানে ?

'গুড্ নাইট !'

'গুড্ নাইট !'

॥ ৮ ॥

কিষ্ণুছড়া আণ্ডা-ঘরে গুজোবটার উপর যে বম্-শেল ফাটিয়েছিলেন তার ধুঁয়ো কাটতে কাটতে কেটে গেল পুরো তিনটি মাস। তাঁর সাহসকে পুরস্কার দেবার জন্যই বোধ করি গুজোবটাকে মৃতের প্রতি সম্মান দেখানো হল—সায়েবের উপর চটে গিয়ে বিষ্ণুছড়ার মেমও হপ্তা-তিনেক ক্লাবে হাজিরা দেন নি—ও নিয়ে বহুদিন ক্লাবে আর কোনো আলোচনা হল না। আর যত বড় রগরগে খবর কিংবা পরনিন্দা, পরচর্চাই হোক—মানুষ এক জিনিস নিয়ে বেশীদিন লেগে থাকতে পারে না। পারলে কোনো ছেলেই পরীক্ষায় ফেল হত না, কোনো আবিষ্কারই অনাবিষ্কৃত হয়ে থাকত না। ইংরেজিতে এই মনোবৃত্তিরই নাম, 'গ্রাসহপার মাইণ্ড', প্রতি মুহূর্তে হেথায় লম্ফ, হোথায় ঝম্প। ইতিমধ্যে আবার লাকাউড়া বাগিচায় একটা খুন হয়ে গেল। কুলি-সর্দারের ডপকা বউ—'মিস্ লাকাউড়া' –ডিস্পেনসারির কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে ইয়ার্কি-ফাজলামো করছিল বলে সে তার গলাটি কেটে, গামছায় বেঁধে থানায় নিয়ে গিয়ে স্বহস্তে পেশ করেছে। পথে পড়ে চ্যাঙের খাল, তার সাঁকোতে এক-এক পয়সা করে 'পোল্' ট্যাক্স দিতে হয়। সর্দারকে বাধা দিতে সে বললে, সরকারী কাজে থানায় যাচ্ছে, তার ট্যাক্সো লাগবে না!

'কি সরকারী কাজ?'

সর্দার গামছা খুলে মুণ্ডুটা দেখালে। সবাই নাকি দেখামাত্র পরিত্রাহি চিৎকার করে চুঙ্গীঘরের দরজায় হুড়কো মেরে জানালা দিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'তুই শিগগির যা, তোর ট্যাক্সো লাগবে না, এ সত্যই বড্ড জরুরী সরকারী কাজ!'

সর্দার নাকি এদের ভয় দেখে একটুখানি তাজ্জব বেনে গিয়েছিল। ধীরে সুস্থে মুণ্ডুটা ফের গামছায় বেঁধে হেলেদুলে থানার দিকে রওনা দিয়েছিল।

ম্যাজিস্ট্রেট মরতুজা সায়েবের এজলাসে যখন সর্দার দাঁড়ালে তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই মেয়েটাকে খুন করতে গেলি কেন?'

সর্দার বললে, 'করব না? বেটি আমাকে বললে, "দেখ্ সর্দার, আমার উপর তুই যদি চটে গিয়ে থাকিস তবে আর কোনো মেয়েছেলেকে নে না, এই দুনিয়াতে আমিই তো একহ-ই-ঠো লড়কী নই! আর তোকে যদি আমার ভালো না লাগে তবে তুইও তো একহ-ই-ঠো মর্দ নস; তুই বেছে নে তোর-ঠো, আমি বেছে নিই হমার-ঠো।" ঐসী বেতমীজ? হারামজাদী আমার মুখের উপর এইরকম বেশরম বাত বললে। তাকে খুন করে আমি সরকারী কাম করেছি হুজুর। আমাকে এরা বেহক্ হাজতে পুরে রেখেছে, আপনিই বলুন হুজুর।'

ম্যাজিস্ট্রেট সর্দারকে দায়রায় সোপর্দ করার সময় সরকারী উকিলের দিকে

তাকিয়ে ইংরেজিতে বললেন, 'দেয়ার ইজ এ লট্ অব ট্রুথ ইন ওয়াট দি গার্ল সেড! ঐ খাঁটি কথাটি মেনে নিলে পৃথিবীতে খুনের সংখ্যা অনেক কমে যেত।'

এই নিয়ে ক্লাব মেতে রইল খুনের খবর পৌঁছনোর থেকে সর্দারকে চোদ্দ বছর জেল পর্যন্ত। তারপর এই লাকাউড়া বাগিচার ছোট সায়েব করলে আত্মহত্যা। কেন করল তার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। কেউ বললে, দেশে যে মেমসায়েবের সঙ্গে তার বিয়ের কথা পাকাপাকি ছিল সে নাকি আর কারো সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছে, কেউ বলে, সায়েব যে এদিকে এক কুলী-রমণীর কৃষ্ণালিঙ্গনে চব্বিশ ঘণ্টা চুর হয়ে থাকত সেই খবর শুনে সে রমণী অন্য পুরুষ খুঁজে নিয়েছে, কেউ বললে, তিনমাসব্যাপী ঝাড়া বাদলের ঠেলায় টিলার নির্জন বাসে খেপে খিয়ে মদ ধরে—তাও আবার কুলীদের ধান্যেশ্বরী—তারপর দিবা-রাত্তিরে সে মদের নেশায় ছ-ঠ্যাঙওলা বাঘের দিকে সে অনবরত গুলি ছুঁড়তে থাকে, শেষটায় বাঘ নাকি তার মাথার ভিতর ঢুকে যায়, চিৎকার করে সেই ফরিয়াদ জানাতে জানাতে একদিন সেই বাঘকে আপন কানের ভিতর দিয়ে পিস্তলের গুলি চালিয়ে খুন করে।

ততদিন ও-রেলিদের কথা প্রায় সবাই ভুলে গিয়েছে। ক্লাব যখন গুজোবের তাড়িতে মত্ত তখন ও-রেলিদের বংশধর জন্মের খবর পৌঁছল পানসে শরবতের মতো। কেউ সামান্য চাখলে, অর্থাৎ জিজ্ঞেস করলে, তাই নাকি, কবে হল? কেউ সামান্য ভুরু কোঁচকালে। মুরুব্বীরা বললেন, 'ভালোই হয়েছে, বাচ্চাই অনেক সময় বাপ-মায়ের মাঝে সেতু হয়ে দুজনাকে এক করে দেয়।'

শুধু বিষ্ণুছড়ার মেম বাঁকা হাসি হেসেছিলেন।

'সে হাসির অর্থ বলা শক্ত কারণ এটা ব্যক্ত'—দু জাহাজের মাঝখানে তক্তা পেতে যেমন এ-জাহাজে ও-জাহাজে জোড়া লাগানো যায়, ঠিক তেমনি ঐ তক্তা তুলে ধাক্কা মেরে দু-নৌকোর মাঝখানের দূরত্ব বাড়িয়েও দেওয়া যায়।

পয়লা বাচ্চার বাপ্তিস্ম করার সময় ক্যাথলিকরা ধুমধাড়াক্কা করে বাঙালী ঠাকুরদার পয়লা নাতির অন্নপ্রাশনের চেয়েও বেশী। মেব্‌ল্ কিন্তু সব-কিছু সারতে চেয়েছিল সাদামাটাভাবে। ও-রেলি দেখা গেল ঠাকুরদা-গোত্রের। সে চায় পালা-পরব করতে। ওদিকে পাদ্রী জোনস্ সাহেব প্রটেস্টানট্—তিনি ক্যাথলিকের বাচ্চাকে বাপ্তিস্ম করবেন কী করে? এ যেন পাঁড় বোষ্টমের ছেলেকে শাক্ত দিচ্ছে মন্ত্রদীক্ষা—শ্মশানে মড়ার উপর মুখোমুখি বসে মড়ার খুলিতে কারণ-ভর্তি-হাতে! ও-রেলি কিন্তু জোনস্‌কেই অনুরোধ করলে বাপ্তিস্মের তাবৎ ব্যবস্থা করতে।

গড্-ফাদার অর্থাৎ ধর্মপিতার অভাব মধুগঞ্জে হত না। মাদামপুরের বড় সায়েব, ডি. এম, যে-কেউ আনন্দের সঙ্গে রাজী হতেন, 'পুয়োর ডেভিল —বেচারা! একলা-একলি মনমরা হয়ে থাকে, ঐটুকুতে যদি সে খুশি হয় তবে হোয়াই নট্—নিশ্চয়ই—অফ কোর্স—অবশ্যি, অতি অবশ্যি।' কিন্তু ওদিকে দেখা গেল, ও-রেলি পাঁড় ক্যাথলিক। ক্যাথলিক বাচ্চার গড-ফাদার হবে প্রটেস্টানট্! মন্ত্র যে খুশি পড়াক, বাপ্তিস্ম যে খুশি করুক, সে তো পাঁচ মিনিটের ব্যাপার; কিন্তু ধর্মবাপ তামাম জীবনের। সেখানে প্রটেস্টানট্ হলে চলবে কেন? কলমা যে খুশি পড়াক, কিন্তু মুরশীদ ধরার সময় দেখে-বেছে নিতে হয়।

ও-রেলি পরিবার বাদ দিলে মধুগঞ্জে আছে মাত্র একজন ক্যাথলিক—বাটলার জয়সূর্য। ও-রেলিদের মতই একেবারে খাঁটি। ও-রেলি বললে, সেই হবে ধর্মবাপ। শুনে পাদ্রী সায়েব পর্যন্ত অনেক 'যদি' অনেক 'কিন্তু' অনেক 'ইউ নো হোয়াট আই মিন' অনেক 'বাট অফ কোর্স' বলে ইতি-উতি করে মৃদু আপত্তি জানিয়েছিলেন, এমন কি, কলকাতা থেকে তাঁর পরিচিত ভদ্র ক্যাথলিক আনাবার ব্যবস্থা করে দেবেন বলেছিলেন, কিন্তু ও-রেলি একদম নেই-আঁকড়া,—বলে ধর্মের চোখে সব ক্যাথলিকই বরাবর—পোপ যা, জয়সূর্যও তা।

ও-রেলির কথার কোনো জমা-খরচ পাওয়া গেল না। বাপ্তিস্মের বেলায় সে দিলদরিয়া—হেরেটিক প্রটেস্টানট্ই সই, অথচ ধর্মবাপের বেলা সে কট্টর —ক্যাথলিক না হলে জর্ডনের জল অশুদ্ধ হয়ে যাবে। তখন 'বিদেশী ঠাকুর ছেড়ে দেশের কুকুর'। ওদের ভাষায় বলতে হলে 'মাই রিলিজিয়ন রাইট অর রঙ্, মাই মাদার—ড্রাঙ্ক অর সোবার।'

হ্যাঁ, 'ড্রাঙ্ক অর সোবার' কথাটা ওঠাতে ভালই হল। জয়সূর্য পৃথিবীর আর পাঁচ লক্ষ বাটলারের মতো অধিকাংশ সময়ই থাকে ড্রাঙ্ক আর সোবারের মাঝখানে। আর মোকা পেলেই গুত্তা খেয়ে ড্রাঙ্কের দিকেই কাত। অবশ্য তাকে গড্-ফাদার হতে হবে শুনে তন্মুহূর্তেই বেচারার নেশা কেটে গিয়েছিল। গবেটের মত বিড়বিড় করে কী একটা বলতে গিয়ে খেল ও-রেলির ধমক আর কড়া তম্বি,—অন্তত পরবের দিনটায় যেন সে সাদা চোখে গির্জায় যায়।

সে এক বিচিত্র বাপ্তিস্ম। মেব্ল্ দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাতে অল্প অল্প কাঁপছে, ও-রেলি পাথরের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে, পাদ্রী সায়েব নার্ভাস আর জয়সূর্য তার বরাবরের গির্জের পোশাক পরে বিহ্বলের মত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। সবাই ভাবলে, ব্যাটা আজ টেনে এসেছে।

একমাত্র সোমই ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছুর তদারক করলে। পাদ্রী-টিলার

মেয়েদের বেশীর ভাগই জয়সূর্য জাতের—পরবের উৎকট দিকটা শুধু তাদেরই চোখে ধরা পড়ল না।

বাপ্তিস্মের পরই কিন্তু গির্জে থেকে বেরিয়ে জয়সূর্য না-পাত্তা। সন্ধ্যের সময় সোম তাকে খুঁজে বের করল উজান গাঙের ঘাটে বাঁধা এক নৌকোর ভিতর। দু'বোতল ধান্যেশ্বরী শেষ করে বুঁদ হয়ে বসে আছে।

সব খবরই আণ্ডা-ঘরে পৌঁছল।

বিষ্ণুছড়ার মেম বললেন, 'ডিসগ্রেসফুল!'

মাদামপুর তাঁর অন্তরঙ্গজনকে বললেন, 'থাক! এবার থেকে ওদের আর একদম ঘেঁটিও না। কাট দেম একদম ডেড। কী যে হল, কী যে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি নে।'

দিশী কথায় বলে, ঐ বুঝলেই তো পাগল সারে।

॥ ৯ ॥

মুসলমান শাস্ত্রে বর্ণনা আছে, লাশ গোর দিয়ে লোকজন চলে আসার পর গোরের ভিতর কী কাণ্ড-কারখানা হয়।

কুরানে স্পষ্ট বলা আছে, ইয়োম্-উল্-কিয়ামত—অর্থাৎ প্রলয়ের দিন সবাইকে আল্লাতালার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তিনি তখন সকলের বিচার করে ধার্মিককে পাঠাবেন স্বর্গে আর পাপীকে নরকে। এখন প্রশ্ন, কিয়ামত কবে হবে তার তো কোনো হদিস পাওয়া যায় না, এই মুহূর্তেই হতে পারে আবার এক কোটি বৎসর পরেও হতে পারে—ততদিন অবধি গোরের ভিতর মরাদের কী গতি হয়?

কুরান নয়—অন্য শাস্ত্রে বলেন,—গোর দিয়ে আত্মীয়স্বজন চল্লিশ পা চলে আসার পর দুই ফিরিস্তা—দেবদূত গোরের ভিতর ঢুকে তাকে জিজ্ঞেস করেন, তার ইমান (ধর্মমত) কী? সে যদি খাঁটি মুসলমান হয় তবে তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে, 'আল্লা এক, আর মুহম্মদ সাহেব তাঁর প্রেরিত পুরুষ।' ফিরিস্তারা উত্তর শুনে খুশি হয়ে বলেন, 'তোমার ইমান ঠিক, কিন্তু এখনো তো কিয়ামতের কিছু দেরি আছে। ততক্ষণ অবধি এই নাও এক গাছা তসবী, আল্লার নাম স্মরণ করো।' তারপর শাস্ত্র বলেন, লোকটি খুশি হয়ে তসবী হাতে নিতেই তার সুতোটি ছিঁড়ে গিয়ে তসবীর দানাগুলো কবরময় ছড়িয়ে পড়বে। সে তখন ব্যস্ত হয়ে দানাগুলো কুড়োতে না কুড়োতে দেখবে, কিয়ামতের শিঙে ফুঁকে

উঠেছে—ছুটে গিয়ে আল্লার সামনে দাঁড়াবে আর-সকলের সঙ্গে সারি বেঁধে।

আর যদি সে পাপাত্মা হয় তবে সে ইমান বলতে পারবে না। ফিরিস্তারা তখন তাকে ধনুরীরা যেমন তুলোর ভিতর যন্ত্র চালিয়ে দেয় ঠিক তেমনি তার সর্বসত্তা ছিন্নভিন্ন করে দেবেন—তুলোর মতো সে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডময় ছড়িয়ে পড়বে। আবার সব কটা টুকরো জুড়ে দিয়ে ফিরিস্তারা আবার ঐ প্রক্রিয়া চালাবেন। পাপীর মনে হবে, এ যন্ত্রণা যেন যুগ যুগ ধরে চলছে।

অথচ পুণ্যাত্মা হয়তো মরেছিল কিয়ামতের এক লক্ষ বৎসর পূর্বে; পাপাত্মা মরেছিল কিয়ামতের এক সেকেণ্ড আগে।

অর্থাৎ পুণ্যাত্মার বেলা আল্লা এক লক্ষ বৎসরকে তার চৈতন্যের ভিতর এক সেকেণ্ডে পরিণত করে দেবেন আর পাপাত্মার বেলা এক সেকেণ্ডকে লক্ষাধিক বৎসরে।

আজকের দিনের ভাষায় তুলনা দিতে বলা যেতে পারে পুণ্যাত্মার বেলা যেন তিন মিনিটের রেকর্ডের গতিবেগ বাড়িয়ে এক সেকেণ্ডে বাজিয়ে দেওয়া হল, পাপাত্মার বেলায় সেই রেকর্ডই বাজানো হল এক ঘণ্টা ধরে।

তাই বোধহয়, হিন্দু পুরাণেও আছে, নরের এক লক্ষ বৎসরে ব্রহ্মার এক মুহূর্ত।

কিন্তু এ কি শুধু মৃত্যুর পরই? জীবিত অবস্থায়ও তো ঐ-ই। মিলনের শত বৎসর মনে হয় এক মুহূর্ত, আর 'ক্ষণেক আড়ালে বারেক দাঁড়ালে' মনে হয় 'লাখ লাখ যুগ' ধরে সে যেন কোন্ সুদূরে অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে।

'মোতির মালা' গল্পে তাই দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের দুঃখ-দুর্দৈবের বর্ণনা মোপাসাঁ দিয়েছেন দশ ছত্রে আর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত খুনীর তিনদিন মেয়াদের বর্ণনা দিয়েছেন য়্যুগো পুরো একখানা কেতাব লিখে।

বাপ্তিস্ম-পরবের পর চার বৎসর কেটে গিয়েছে। এ চার বৎসর মেব্‌ল্ ডেভিডের কেটেছে তসবীর দানা কুড়োতে কুড়োতে না তুলো-ধুনো হয়ে হয়ে—তার খবর দেবে কে? কাজল-ধারা নদীর মত নিরবধি তাদের জীবনগতি সমুখ পানে ধেয়ে চলেছিল, না সামনের নীলপাথরী পাহাড়ের মত স্থাণু হয়ে পড়েছিল তাই বা বলবে কে? মধুগঞ্জ শুধু দেখল, যে বারান্দায় সায়েব আর মেম বসে থাকত, বাটলার রেকর্ডের পর রেকর্ড বদলে যেত সেখানে একটি চতুর্থ প্রাণী প্রথম দোলনায় শুয়ে তারপর পেরেম্বুলেটারে বসে এবং সর্বশেষে টলমল হয়ে হেঁটে হেঁটে বারান্দাটাকে চঞ্চল করে তুলল। যেখানে আর দুটি প্রাণী—জয়সূর্যকে ধরলে কখনো বা তিনটি—আপন আপন আসনে ধ্যানমগ্ন,

সেখানে এই নূতন প্রাণীটির আনাগোনার অন্ত নেই। কখনো সে মেব্‌লের কোলে মাথা গুঁজে দুটি খুদে হাত দিয়ে উরু জড়িয়ে ধরে, মেব্‌ল্‌ তার কালো চুলের ভিতর দিয়ে আঙুল চালিয়ে দেয়, কখনো সে ডেভিডের আস্তিন ধরে টানাটানি আরম্ভ করে, তখন সে তার দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আর কখনো বা জয়সূর্যের গলা জড়িয়ে ধরে তার-ই কাছ থেকে শেখা গান ধরত—

'ক্‌-ক্‌-ক্‌-কেটি, হুয়েন দি ম্‌-ম্‌-মুন শাইনস্‌—'

একমাত্র ওরই জীবনে এখনো তসবী, ধুনুরী কেউই আসে নি। 'সময়' কী বস্তু সে এখনো বোঝে নি—টেকোর ভয় নেই উকুনের।

বাচ্চা প্যাট্রিকের চতুর্থ জন্মদিনে ও-রেলিরা স্থির করলে, মেব্‌ল্‌ বাচ্চাকে নিয়ে বিলেত চলে যাবে, সেখানে বাসা বেঁধে তার পড়াশোনার ব্যবস্থা করবে। মধুগঞ্জের ইস্কুল দিশীর কাছে অক্সফোর্ড-সম হতে পারে, কিন্তু সায়েবের বাচ্চা যদি সেখানে ট্যাঁশ উচ্চারণ শেখে তবেই চিত্তির! বড় হয়ে সে বাপ মাকে প্রতি সন্ধ্যায় অভিসম্পাত না দিয়ে হুইস্কি-সোডা স্পর্শ করবে না, সে যে ইয়োরেশিয়ান নয়, সেকথা বোঝাতে গিয়ে গলদঘর্ম হতে হবে, বোঝাবার মোকা না পেলে সেই ঘর্মে ডুবে মরতে হবে।

টমাস কুক্‌, অ্যামেরিকান এক্সপ্রেস, আর দুনিয়ার যত জাহাজ কোম্পানির ছবির বিজ্ঞাপন, চটি বই, জাহাজের টাইম-টেবলে ও-রেলির বারান্দা ভরতি হয়ে গেল। হিন্দীতে বলে:

'বাঘ কা ভাই বাঘেরা
কুদে পাঁচ তো কুদে তেরা'

'বাঘ যদি দেয় পাঁচ লম্ফ, তবে তার ভাই বাঘেরা মারে তেরোটা।' বাঙলায় প্রবাদ 'ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে।' অর্থাৎ যাত্রী যদি কোম্পানিকে লেখে আমি লণ্ডন যাব, তবে তারা যে শুধু ঐ জাহাজেরই খবরওয়ালা চটি বইই পাঠায় তাই নয়, সঙ্গে পাঠায় আরেক হন্দর 'পথিক-দিক্‌-দর্শন'—তাতে আছে নরওয়ের ফিয়োর্ডে যেতে হলে কোন্‌ জামা-কাপড় অপরিহার্য, মধ্য আফ্রিকায় উট চড়তে হলে আগে-ভাগে ইনকোলেশন নিতে হয় কি না। ফলে সেই পর্বত-প্রমাণ কাগজপত্রের মাঝখানে বিলাতগামী জাহাজের বিশল্যকরণী খুঁজে বের করা হনুমানের—অর্থাৎ সাধারণ মানুষের কর্ম নয়। ও-রেলি সেই অষ্টাদশ পর্বে উদয়াস্ত ডুব মেরে পড়ে রইল।

সোম এসেছিল একদিন সরকারী কাজে। কাগজপত্রের ডাঁই দেখে

শুধালে, 'স্যার, গুষ্টিসুদ্ধ নর্থপোলে চললেন নাকি? এর চেয়ে অল্প দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে তো মঙ্গল কিংবা শনিতে ভ্রমণ করে আসা যায়।'

ও-রেলি এক তাড়া কাগজ সোমের দিকে ছুঁড়ে ফেলে বললে, 'মঙ্গল-শনির কথা বলতে পারি নে, কিন্তু নর্থপোলে যেতে হলে এ-সবের দরকার হয় না। সেখানে যাবার জন্যে কোনো স্টীমার-সার্ভিস নেই—আস্ত জাহাজ চার্টার করতে হয়। এখানে ঠিক তার উল্‌টো। কত সব অল্‌টারনেটিভ দেখো। বোম্বাই থেকে জাহাজ ধরবে, না কলম্ব থেকে কিংবা মাদ্রাজ থেকে? পি. এণ্ড. ও. নেবে, না মার্কিন জাহাজ, না জর্মন? ফরাসীও নিতে পারো—জাহাজগুলো বড্‌ড নোংরা, কিন্তু রান্না ভারী চমৎকার। তুমি কি একটা প্রবাদ বলো না, দি ডোম ইজ্‌ ব্লাইণ্ড ইন দি ব্যাম্বু-জাঙ্গল্‌? আমার হয়েছে তাই।'

বহুকাল পরে সায়েবের তাজা-দিল দেখে সোম খুশি হল। বললে, 'তাহলে সায়েব, অন্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ—ইট্‌ দি বো স্ট্রিং টুডে—অর্থাৎ সবচেয়ে সস্তা জাহাজ নিলেই হয়।'

ও-রেলি বললে, 'দেখো সোম, আমাকে আর ধাপ্পা দেবার চেষ্টা কোরো না। গোড়ার দিকে কিছু জানতুম না বলে তুমি তোমার আপন মাল গুড্‌ ওল্ড ইণ্ডিয়ান উইজডম্‌ বলে পাচার করেছ বিস্তর। এখন আর সেটি চলছে না। আমার পন্‌চা-টান্ট্রা, হিটোপ্‌ডেস পড়া হয়ে গিয়েছে। ধনুর ছিলে খেতে গিয়ে তোমার ঐ শেয়ালের কী হয়েছিল মনে আছে?'

সোম ইস্কুলের ছেলেদের ভঙ্গীতে তড়াক করে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'খুব মনে আছে, স্যর! ছিলে ছিঁড়ে গিয়েছিল। তা যাবে না? আপনারাই তো বলেন, "ডিম না ভেঙে মমলেট বানানো যায় না"।'

ও-রেলি বললে, 'ডিম দিয়ে মামলেড্‌ কী করে হয় হে? মামলেড্‌ তো হয় কমলালেবুর খোসা দিয়ে।'

'আজ্ঞে মামলেড্‌ নয়, মমলেট?'

'ও! অমলেট!'

'আজ্ঞে না। অমলেট হয় বিলেতে, বিলিতি ডিম দিয়ে। দিশী ডিমে হয় মমলেট। তা যখন মামলেড্‌ মমলেটের কথাই উঠল, ওসব তৈরি করেন মেয়েরা। জাহাজ বাছাইয়ের ভার মেমসাহেবের হাতে ছেড়ে দিলে হয় না?'

ও-রেলির মুখ কঠিন হল। সোমের দৃষ্টি এড়াল না।

সুরসিক যদি বদমেজাজী আর খামখেয়ালী হয়, তবে তাকে নিয়ে বড় বিপদ। যন্ত্র চট করে বেসুরো হয়ে যায় আর তার বিকৃত স্বর সব-কিছু বরবাদ করে দেয়।

ও-রেলির 'হুঁঃ' বীণাবাদ্যের মাঝখানে প্যাঁচার কণ্ঠের মত শোনাল।

সোম বুঝলে, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে ঢোঁড়া বেরিয়েছে। এইখানেই থামা উচিত, না হলে হয়তো কেউটে বেরুবে। কিন্তু হঠাৎ থেমে গিয়ে বিদায় নিলে সেটা হবে আরো বেতালা। একটুখানি ইতি-উতি করে শুধালে, 'আপনি পোর্টে ওদের সী অফ্ করতে যাচ্ছেন তো?'

ও-রেলি বললে, 'না।'

তারপর একটু ভেবে নিয়ে, জিজ্ঞেস না করা সত্ত্বেও বললে, 'বাটলার পৌঁছে দিয়ে সেখান থেকে সে দেশে যাবে। অনেককাল ছুটি নেয় নি বলছিল।'

কণ্ঠে কিন্তু বিরক্তির সুর।

সোম না হয়ে আর কোনো নেটিভ হলে ভাবত, এই সাদামুখগুলোর মতিগতি বোঝা ভার, কিন্তু সোম মেলা ইংরেজ চরিয়েছে। সে অত সহজ সমাধানে সন্তুষ্ট নয়। বড় ভারী মন নিয়ে সোম বাড়ি ফিরল। ও-রেলিকে সে সত্যই ভালোবেসে ফেলেছিল।

'সোনামুগ সরু চাল সুপারি ও পান
ও হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই-চারিখান
গুড়ের পাটালি; কিছু ঝুনা নারিকেল
দুই ভাণ্ড ভালো রাই-সরিষার তেল—'

এই সব পর্বতপ্রমাণ মালপত্র নিয়ে আমরা সফরে বেরই, আর সায়েবরা কিরকম মাত্র একটা সুটকেস হাতে নিয়েই গটমট করে গাড়িতে ওঠে, তাই দেখে বাঙালীর ভারি ঈর্ষা হয়। কিন্তু ঐ সুটকেসটির ভিতরকার মালপত্র তৈরি করতে গিয়ে সায়েবদেরও হিমসিম খেতে হয়। মোকামে পৌঁছনোর পর বাঙালী যদি দেখে ধুতির অনটন তাহলে সে কারো কাছ থেকে ও জিনিসটি ধার নিয়ে পরতে পায়—এমনকি কুর্তাতেও খুব বেশী আটকায় না—কিন্তু সায়েবরা কোট-পাতলুন ধার নিয়ে পরতে পারে না, ফিট হল কি না সেটা মারাত্মক প্রশ্ন।

মেব্‌লকে তাই বাচ্চার কাপড়-জামা তৈরি করতে বেশ বেগ পেতে হল। ভূমধ্যসাগর অবধি আবহাওয়া গরম, মধুগঞ্জের জামাকাপড়েই চলবে। কিন্তু তার পরের জন্য যে গরম জিনিসের প্রয়োজন, সে তো মধুগঞ্জে পাওয়া যায় না। তাই ফ্লানেল, সার্জ, টুইড আনাতে হল শিলঙ থেকে, আর আনাতে হল শহরের বুড়ো খলিফাকে। তাই নিয়ে পড়ে রইল মেব্‌ল্ দিনের পর দিন, আর ও-রেলি বাক্স-সুটকেস-হ্যাটকেসে সাঁটতে লাগল জাহাজের

লেবেল। যে বাক্স যাবে কেবিনে তার এক রঙ, যেটা যাবে স্টোররুমে তার অন্য রঙ এবং যেটা হাতে থাকবে তার জন্য কোনো লেবেলের প্রয়োজন নেই। এই রামধনুর রঙের প্যাঁচে ও-রেলি তো একবার মতিচ্ছন্ন হয়ে বাচ্চার পিঠে লেবেল লাগিয়েছিল আর কি!

বিদায়ের আগের সন্ধ্যায় জিনিসপত্র সব ফিটফাট ছিমছাম হল। পরদিন ভোর ছ'টায় ও-রেলি মোটর হাঁকিয়ে সবাইকে কুড়ি মাইল দূরে স্টেশনে পৌঁছিয়ে দেবে। চাকর-বাকরদের বললে তারা যেন বাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে, কারণ পরদিন ভোরেবেলা এসে মালপত্র ওঠাতে তাদের সাহায্যের প্রয়োজন। কম্পাউণ্ডে রইল শুধু বাটলার—অন্য চাকর-বাকরদের সেখানে রাত্রিবাসের কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

পরদিন ভোরের দিকে বৃষ্টি হল। চাকর-বাকরেরা কোনোগতিকে ছ'টায় বাঙলো পৌঁছে দেখে সবাই চলে গিয়েছে—গারাজ খালি, বাড়ি তালাবন্ধ। ও-রেলি সায়েবের সব-কুছ তড়িঘড়ি, ঝটপট, কাঁটায় কাঁটায়। চাকরেরা আন্দাজ করলে সামান্য পাঁচ মিনিট দেরিতে আসার জন্য তাদের একটুখানি বকুনি খেতে হবে।

সায়েব ফিরল বেশ বেলা গড়িয়ে যাবার পর। আরদালি আসমৎউল্লা সায়েবের জন্য দুখানা কাটলিস আর আলুসেদ্ধ করে রেখেছিল, কিন্তু সে কিছু না খেয়ে সোজা দোতলায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

সব-কিছু শুনে রায়বাহাদুর কাশীশ্বর চক্রবর্তী বললেন, 'আহা, বেচারা, এবারে একদম একা পড়ে গেল।'

তাঁর জুনিয়র তালেবুর রহমান বললেন, 'আমি ভাবছি অন্য কথা। বাচ্চাটা বিলেত গেল বাঘ হয়ে ফিরে আসবার জন্য। তখন লাগাবে নেটিভদের উপর জোর ডাণ্ডা। এ-মুল্লুকে থাকলে তাদের তরে দরদী হয়ে যেত, ছাতির খুন ঠাণ্ডা আর দিলেও মোলায়েম মেরে যেত।'

রায়বাহাদুর বললেন, 'সে কী কথা! ও-রেলির মত ভদ্রলোকের ছেলে কি কখনো বৈরীভাব নিতে পারে? কী বলো সোম?'

সোম বললে, 'আপনার ছেলের বিলেত যাওয়ার কী হল?'

রায়বাহাদুর বললেন, 'জানেন ব্রাহ্মণী?'

তালেবুর রহমান বললেন, 'সোম ভাবে সে একটা মস্ত ঘড়েল।'

ক্লাবে হল অন্য প্রতিক্রিয়া। প্রায় সবাই বললে, 'গেছে গেছে, আপদ গেছে। কেলেঙ্কারিটা তো চাপা পড়ল। এখন ক্লাবের ছেলে ও-রেলি ক্লাবে

ফিরে এলেই হয়।'

কিন্তু আরেকটি বৎসর কেটে গেল। ও-রেলি ক্লাবে এল না।

॥ ১০ ॥

বাড়ির সামনে জ্যোতিষ্মান এবং অন্ধকারে মানুষের তৃতীয় চক্ষুস্বরূপ ল্যাম্প-পোস্টটা সম্বন্ধেই যখন সে দুদিন বাদেই অচেতন হয়ে যায়, তখন অদৃশ্য ও-রেলিকে ক্লাব যে ভুলে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে! কিন্তু যেদিন খবর এল ও-রেলি মধুগঞ্জ থেকে বদলি হয়ে গিয়েছে, সেদিন ক্লাবে তার সম্বন্ধে আর-এক প্রস্ত আলোচনা করে নিলে।

মাদামপুর আর বিষ্ণুছড়াই প্রথম খবর পেলেন ডি. এম-এর কাছ থেকে।

মাদামপুর বললেন, 'ভালোই হল। যাচ্ছে কক্‌সবাজার না কোথায়, সেখানে কেলেঙ্কারিটা হয়তো পৌঁছয় নি এবং পৌঁছলেও সেটা বাসি হয়ে গিয়েছে। ওখানে গিয়ে হয়তো পুয়োর ডেভিল আবার নর্মাল লাইফে ফিরে আসতে পারবে। আমি সত্যি তাকে বড্‌ড মিস করতুম।'

বিষ্ণুছড়া চুপ করে রইলেন, ভালো মন্দ কিছু বললেন না।

মাদামপুর শুধালেন, 'কী হে, চুপ করে রইলে যে? হুইস্কি চড়েছে নাকি?'

বিষ্ণুছড়া বললেন, 'সাতটা ছোটায়? আই লাইক দ্যাট—আপনিও যেমন!' তারপর মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে খাড়া হয়ে বসে বললেন, 'আমি সে কথা ভাবছি নে। আমার কানে এসে সেদিন পৌঁছল, মেব্‌ল্‌রা নাকি আদপেই ইংলণ্ড পৌঁছয় নি।'

মাদামপুর বললেন, 'আমিও শুনেছি, কিন্তু তারা পৌঁছল কি না তার খবর দেবে কে? মেব্‌লের সঙ্গে ক্লাবের কারো তো এমন দহরম-মহরম ছিল না যে, বন্দর বন্দর থেকে পিকচার-পোস্ট-কার্ড পাঠাবে আর লণ্ডন পৌঁছে কেব্‌ল্‌। মোকামে পৌঁছে প্রতি মেলে স্কার্ফ, স্বয়েটার আর গরম মোজা, প্যোর স্কটিশ উলে তৈরী! হোম মেড!'

বিষ্ণুছড়া বুঝলেন, সায়েবের একটু চড়েছে—বয়স রয়েছে কি না, অল্পেই একটু কেমন যেন হয়ে যান—না হলে স্কার্ফ, স্বয়েটারের কথা বলবেন কেন? ও বস্তু মধুগঞ্জে পরবে কে? সাদা চোখে এ ভুলটা করতেন না, হয়তো বলতেন টিনের বেকন, সার্ডিন। চেপে গিয়ে বললেন, 'কলকাতার ও. শী-র সঙ্গে নর্থ ক্লাবে দেখা হয়েছিল, সে বললে, মেব্‌ল্‌ আর তার বাচ্চাকে সে মাস তিনেক আগে দেখেছে মসুরিতে, সঙ্গে ছিল ও-রেলি। তোমার মনে আছে কি না জানি নে,

ও-রেলি তখন ছুটি নিয়ে মসুরি গিয়েছিল।

এবারে মাদামপুর হা হা করে হেসে উঠলেন, 'কে বলেছে? ও. শী.? কটা মেব্‌ল্ আর কটা ডেভিড্ দেখেছিল জিজ্ঞেস করো নি? ও তো সকালে খায় কড়া হর্স-নেক, দুপুরে জিন, সন্ধ্যায় রম্ আর রাত্রে হুইস্কি। সন্ধ্যায় দেখে থাকলে নিশ্চয়ই দুটো, আর রাত্রে দেখে থাকলে চারটে ও-রেলি দেখেছে। কটা মসুরি দেখেছে সেকথা জিজ্ঞেস করেছিলে কি?'

বিষ্ণুছড়া বুঝলেন, এখন আর কথা-কাটাকাটি করে কোনো লাভ নেই। তাই বললেন, 'সোমও বলছিল মেব্‌ল্‌রা লণ্ডনে আছে।'

মাদামপুর আশ্চর্য হয়ে শুধালেন, 'সোম বললে? আশ্চর্য! ও তো কখনো কোনো খবর কাউকে দেয় না। মধুগঞ্জের বানান জিজ্ঞেস করলে ভাবখানা করে যেন সরকারী টপ সিক্রেট। আমি তাকে একদিন বলেছিলুম, "ফাইন ওয়েদার, সোম।" মুখখানা করলে যেন আলিপুরের আবহাওয়া দফতর থেকে রিপোর্ট না এলে সে ঐ একস্‌ট্রিমলি কনফিডিয়েনশেল খবর কনফার্ম করতে প্রস্তুত নয়। তাই বলছি সোম যখন বলেছে তখন ওটা বাইবেল-বাক্য।'

কিন্তু বিষ্ণুছড়ারই ভুল। হঠাৎ চেয়ারখানা তার কাছে টেনে এনে মাদামপুর একটুখানি সামনের দিকে ঝুঁকে নিচু স্বরে অত্যন্ত সাদা গলায় গম্ভীরভাবে বললেন, 'কোথায় আছে, কোথায় নেই, ওসব খোঁচাখুঁচি করতে গেলে আবার সেই ধামাচাপা ডার্টি লিনেন বেরিয়ে পড়বে। তাতে ইয়োরোপীয়ন কমিউনিটির কী লাভ? বরঞ্চ ক্ষতিরই সম্ভাবনা। নো নিউজই যদি হয়, তবে জান তো প্রবাদ, "নো নিউজ ইজ গুড নিউজ"।'

বিষ্ণুছড়া অভয় পেয়ে বললেন, 'বিশেষ করে সোমের কথাই পাকি খবর। কিন্তু ও-রেলিকে একটা বিদায়ভোজ দিতে হবে না! ক্লাবে আসুক আর না-ই আসুক, চাঁদা তো ঠিক ঠিক দিয়ে গিয়েছে, এমন কি টেনিসের একস্‌ট্রা ও চ্যারিটি-ফ্যারিটির পয়সাও কামাই দেয়নি।'

মাদারপুর বললেন, 'সাউণ্ড করে দেখতে পার। কিন্তু আসবে কি।'

এ সম্বন্ধে মাদামপুর এবং বিষ্ণুছড়ার মনে সন্দেহ জাগা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ও-রেলি আসতে রাজী হল। তবে ইঙ্গিত করলে যে, ডিনারের বদলে মামুলী টি-পার্টি হলেই ভালো হয়। ক্লাব রাজী হল।

ক্লাবের প্রায় সবাই সেদিন হাজিরা দিলেন। ও-রেলি সঙ্গে নিয়ে এল তার বদলী সমারসেট ভীনকে। চটপটে ছোকরা, সমস্তক্ষণ কথা কয় আর এক সিগরেট থেকে আরেক সিগরেট ধরিয়ে দেশলাইয়ের খর্চা বাঁচায়। ও-রেলি

ডীনকে ক্লাবের সঙ্গে সাড়ম্বর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললে, 'ইনি স্কটলাণ্ড ইয়ার্ড থেকে খাশ-তালিম নিয়ে তৈরি হয়ে এদেশে এসেছেন, মধুগঞ্জ এঁর সেবায় উপকৃত হবে।'

গুজোব রটাতে ফিসফাস-গুজগাজ করতে ইংরেজ এবং বাঙালীতে কোনো তফাৎ নেই, কিন্তু যাকে নিয়ে এ-সব করা হয়, তাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করাটা ইংরেজের অভ্যাস নয় এবং এটিকেটের খেলাফ। তাই মেব্‌ল্‌ সম্বন্ধে ও-রেলিকে মুখের উপর কেউ কোনো প্রশ্ন শুধালে না। একেবারে কোনো প্রকারের অনুসন্ধান না করাটা আবার মুরুব্বীদের পক্ষে ভালো দেখায় না। তাই বুড়ো মাদামপুর ও ডি. এম. শ্রেণীর দু-একজন ও-রেলির পরিবারের খবর নিলেন কোনো প্রকারের প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করে, অর্থাৎ শুদ্ধু আশা প্রকাশ করলেন, মেব্‌ল্‌রা বিলেতে ভালো আছে নিশ্চয়ই। ও-রেলি ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

মোটের উপর পার্টিতে কোনরকমের অস্বস্তি কিংবা আড়ষ্টতার ভাব দেখা গেল না। ও-রেলি ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে কথা কইলে। বাঙলাদেশে তখন স্বদেশী আন্দোলন প্রায় সব শহরেই ছোট-বড় দ'য়ের সৃষ্টি করেছে—কথাবার্তা হল সেই সম্বন্ধেই বেশী। ও-রেলি আইরিশম্যান, তাই সে বুঝিয়ে বললে, এ-সব আন্দোলন নির্মূল করা পুলিসের কর্ম নয়, বিলেতের পার্লামেণ্ট যদি সময়োপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, তবে সন্ত্রাসবাদ বাড়বে বৈ কমবে না। অবশ্য তার অর্থ এই নয়, পুলিশ হাত-পা গুটিয়ে বসে বসে বিড়ি ফুঁকবে—সে তার কর্তব্য করে যাবে, তবে তারও একটা সীমা আছে।

মাদামপুর এ বাবদে কট্টর। কিন্তু ও-রেলি তার বক্তব্য এমনভাবে গুছিয়ে বললে যে, তিনি পর্যন্ত বাগান ফেরার সময় বিষ্ণুছড়াকে বললেন, 'পিটি, ছোঁড়াটার পারিবারিক জীবন সুখের হল না। ওকে কিন্তু দোষ দিয়ে লাভ নেই। ছোঁড়ার মাথাটা ঘাড়ের সঙ্গে ঠিকমত স্ক্রু করাই আছে। আমি সত্যই প্রার্থনা করি, ও যেন জীবনে সুখী হয়।'

বিষ্ণুছড়াও সায় দিয়ে বললেন, 'হোয়াই নট্‌। ইট্‌ ইজ নেভার টু লেট্‌ টু বিগিন্‌ এগেন্‌।'

মীরপুরের মেম দরদী রমণী। তিনি ও-রেলিকে একবার এক লহমার তরে একলা পেয়ে তার ডান হাত চেপে বলেছিলেন, 'ও-রেলি, তুমি আমার ছেলের বয়সী তাই তোমাকে বলি, জীবনটা একেবারে হুবহু জিগশো ধাঁধার মতো—প্রথমবারেই সব কটা মেলাতে না পারলে নিরাশ হবার মতো কিছু নেই। তোমার উপর আমার আশীর্বাদ রইল।'

ও-রেলি স্পষ্টই বিচলিত হয়েছিল। আধো-আধো ধন্যবাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে কেটে পড়েছিল।

পার্টি শেষ হতেই ও-রেলি নিয়ে গেল ডীনকে তার বাঙলোয়। ডিনার খেয়ে ও-রেলি তার ডেরা তুলে মোটরে যাবে স্টেশন, আর ডীন খাটাবে তার বাঙলোতে আপন ডেরা। চাকরি-জগতে সরকারী বাসা সম্বন্ধে এ-ই হচ্ছে এদেশে আইন—অবশ্য সাদা কালিতে লেখা।

ডীন সবেমাত্র বিলেত থেকে এসেছে, তার উপর সে বকর-বকর করতে ভালোবাসে—এককালে ও-রেলিও গালগল্প জমাতে কিছুমাত্র কম ওস্তাদ ছিল না—কাজেই সে একটানা গল্প বলে যেতে লাগল। ও-রেলিরও ব্যবস্থাটা মনঃপূত হল, তাই যদি বা ডীন দু-একবার ভদ্রতার খাতিরে তাকে কথা বলাবার চেষ্টা করলে সে তাতে সাড়া না দিয়ে উলটে দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে ওকে আবার বকর-বকর করাতে তাতিয়ে দিলে।

ও-রেলির মালপত্র মোটরে তোলা হয়ে গিয়েছে—এখন তার ওঠবার সময় হল দেখে ডীন শুধালে, 'এখানে ভালো করে কাজ চালাবার জন্য আপনি কোন টিপ্‌স্ দেবেন কি? আমার তাতে উপকার হবে।'

ও-রেলি বললে, 'সে কথা যে আমি ভাবি নি তা নয় এবং দেবার মতো টিপ্‌স্ থাকলে আমি অনেক আগেই এ প্রস্তাব পাড়তুম—'

ডীন বললে, 'সরি, আমি বড্ড বেশি কথা বলি,—না?'

ও-রেলি বললে, 'নটেটোল। চুপ করে অন্যের কথা শুনলেই অপর পক্ষকে বেশি চেনা যায় তা নয়। অনেক সময় নিজে কথা বলে অন্যের উপর কী প্রতিক্রিয়া হয়—তার মাথা নাড়াতে, হাঁ না বলাতে, কোন্ প্রসঙ্গে সে ইন্‌টরেস্ট নিচ্ছে, কোন্‌টাতে নিচ্ছে না—তাই দিয়ে মানুষ চেনা যায় অনেক বেশি। তার উপর সমস্তক্ষণ কথা বললে অন্য পক্ষ কোনো প্রশ্ন শুধাবার সুযোগ পায় না—যে প্রস্তাব তোলার ইচ্ছে নেই, সেটা বেশ এড়িয়ে যাওয়া যায়। মধুগঞ্জ লোক্যাল-বোর্ড চেয়ারম্যান এ ব্যাপারে চ্যাম্পিয়ন। অপ্রিয় কথা ওঠবার সম্ভাবনা দেখলেই তিনি পাখি শিকার, ৯০ সালের ভূমিকম্প, আর গিরের ফিতে না ইঞ্চির ফিতে ভালো, এ-সব নিয়ে এমন গল্প জোতেন যে, তাঁর ঘর থেকে বেরনোই মুশকিল হয়ে ওঠে।

'সে কথা যাক, আমি মাত্র একটা টিপ্ দেব। আপনার আপিসের সোম—তার সঙ্গে তো আপনার আলাপ হয়েছে—বড় খাঁটি আর বুদ্ধিমান লোক। আপনি তো স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে অনেক নূতন পদ্ধতি শিখে এসেছেন, সেগুলোর

কটা এখানে কাজে খাটবে জানি নে, তবে একথা আপনাকে বলতে পারি সোম যেখানে ফেল মারে, সেখানে করার মতো বড় কিছু একটা থাকে না। অন্তত আমি কিছু পারি নি।'

ডীন একটুখানি অবিশ্বাসের সুরে বললে, 'দেখে তো কিন্তু বুদ্ধু বলে মনে হয়।'

ও-রেলি হেসে বললে, 'প্রিসাইসলি! ঐ তার একটা মস্ত রেস্ত। কিন্তু এদেশে অল্ দ্যাট্ স্টিন্‌কৃস ইজ নট্ রট্‌ন্ ফিশ্—"ঝলঝল করলেই সোনা নয়" হচ্ছে তার উল্টো প্রবাদ। বর্মাতে একরকম ফল আছে, তার গন্ধ পচা নর্দমার মতো, কিন্তু একবার সে ফল যে খেয়েছে, তার ঐ ফলের জন্য নেশা হয় আফিমের চেয়েও বেশী। সোম ঐ বর্মী-ফল।'

'তাহলে গুড-নাইট।'

'গুড-নাইট।'

॥ ১১ ॥

'খ্রীষ্টালয় থেকে সত্যাগত'—'ফ্রেশ ফ্রম ক্রিস্টিয়ান হোম'-ওলাদের এদেশে এসে বায়নাক্কার অন্ত থাকে না। এটা নেই, ওটা চাই, সেটা কোথায়—সুবো-শাম লেগেই আছে। তবু যত বড় উন্নাসিকই হোক না কেন, পুলিস সায়েবের বাঙলোটি কিছুমাত্র ফেলনা নয়।

ডিনার খেয়ে দুজনাই এসে বসেছিল চওড়া বারান্দায়। বস্তুত ঐ বারান্দা-টাই বাড়ির সবচেয়ে আরামের জায়গা। ও-রেলি চলে যাওয়ার পর ডীন বেয়ারাকে দিয়ে সিগারেটের তাজা টিন খুলিয়ে আরাম করে গা এলিয়ে বসল। লণ্ডন ছেড়েছে অবধি জাহাজে ট্রেনে সর্বত্র হৈ-হুল্লোড়ের ভিতর দিয়ে তার সময় কেটেছে, দু-দণ্ড নিজের মনে নূতন নূতন অভিজ্ঞতার জমা-খরচ মিলিয়ে নিতে পারে নি—অথচ গুণীরাই জানেন, যারা কথা কয় বিস্তর তারাই নির্জনতা খোঁজে শান্তজনের চেয়ে বেশী।

পেট্রোমাক্স জ্বলছে। তার আলো বারান্দার বাইরের অন্ধকার কিন্তু ফুটো করতে পারছে না। ওদিকে আবার বর্ষার গুমোট। আকাশ থমথম করছে। গাছগুলো অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে। সিগারেটের ধোঁয়া পর্যন্ত ডাইনে-বাঁয়ে, উপর-নিচে কোনো দিকে যেতে চায় না। এ অবস্থায় মুখের ধোঁয়া দিয়ে খাশা রিং বানানো যায়। মুখ থেকে বেরিয়েই রিংগুলো একটার

পিছনে আরেকটা সারি বেঁধে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন সিগারেট-খেকোরা আর সিগারেটের নেশা করে না—রিঙের নেশায় পিলপিল করে চক্করের পর চক্কর বের করতে থাকে।

ব্যাচেলাররা দেরিতে শুতে যায়, এ-কথা সবাই জানে, আর তামাকখোররা যায় আরো দেরিতে। 'আরেকটা খেয়েই উঠছি', 'আরেকটা খেয়েই উঠব' করে করে ঘুমে আর সিগারেটে যখন লড়াই বেশ জমে ওঠে তখন অনেক সময় রেফরি লড়াইয়ে ক্ষান্ত দিয়ে ঘুমের শরণ নেয়, সিগারেটও চটে গিয়ে কার্পেট পোড়ায়।

ডীনের চোখ ঘুমে জড়িয়ে এসেছে, ডান হাত চেয়ারের হাত থেকে খসে ঝুলে পড়ছে, ঢিলে আঙুল থেকে সিগারেটটা খসিখসি করছে, এমন সময়—

এমন সময় ডীন দেখে তিনটি প্রাণী—মূর্তি—কী বলি?—বেড-রুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচের তলায় নেমে গেল। সে বসে ছিল বারান্দার এক প্রান্তে, বেড-রুম অন্য প্রান্তে—সিঁড়ি তার-ই গা ঘেঁষে।

ডীনের চোখে কাঁচা ঘুমের ছানি। তার ভিতর দিয়ে সবকিছু যেন আব্‌ছা আব্‌ছা, যেন কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেখা দিল, কিংবা যেন সিনেমার পর্দাতে ঢিলে ফোকাসের ছবি।

তিনটি মূর্তির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার পূর্বেই তারা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গিয়েছে। ডীন শুধু দেখলে প্রথমটি দৈর্ঘ্যে মাঝারি, দ্বিতীয়টি ছোট এবং তৃতীয়টি বেশ লম্বা—ব্যস আর কিছু না।

সম্বিতে ফিরে ডীন ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নামল। চতুর্দিকে ঘোরঘুট্টি অন্ধকার, নিচের তলায় ছাতা-ল্যাম্প বেয়ারা অনেকক্ষণ হল নিবিয়ে দিয়েছে, উপরের তলার আলো সেখানে পৌঁছয় না। ডীন সদ্য বিলেত থেকে এসেছে—মফঃস্বলে টর্চের কী প্রয়োজন এখনো জানতে পারে নি। তার টর্চ নেই। ছুটে গেল গেটের কাছে; সেখানে রাস্তার ক্ষীণ আলোতে দেখলে, চতুর্দিকে জনমানবশূন্য।

সাপ, চোর, শেয়াল দেখলে আমরা চিৎকার করে চাকর-বাকরদের ডাকি, কারণ আপন দেহ রক্ষার জন্য এদের উপর আমরা নির্ভর করেছি যুগ-যুগ ধরে। বিলেতের লোক কাজকর্ম চালাচ্ছেন বিন্‌ চাকরে বহুকাল ধরে। তাই সম্বিতে ফিরেও ডীন চেঁচামেচি আরম্ভ করলে না। ধীরে ধীরে বারান্দায় ফিরে আবার চেয়ারে বসল।

আকাশ-কুসুম কেউ কখনো দেখে নি—সে সুদ্ধ কল্পনামাত্র; স্বপ্ন আমরা

দেখি, কিন্তু তার পিছনে কোনো বাস্তবতা নেই ; রজ্জু দেখে যখন সর্প ভ্রম হয় তখন সে সর্প বাস্তব নয় বটে, কিন্তু ভ্রম কেটে যাবার পরও রজ্জুটিকে ধরতে-ছুঁতে পাই। ডীন যা দেখল সেটা এর কোনো পর্যায়েই পড়ে না। তাহলে কি সে বাস্তব জিনিস প্রত্যেক্ষ করল ? তাই বা কী করে ? বেড-রুমে থাকার কথা নয় —ডিনার শেষ হওয়ার পর চাকররা চলে গিয়েছিল, ও-রেলি যাওয়ার পর উপরের তলায় তো সে একেবারে একা বসে ছিল। তবে কি ওরা মেথরের দরজা দিয়ে বাথ-রুম বেড-রুম হয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল ? ডীন চেক্-আপ করে দেখলে মেথরের দরজা ডবল বল্টে বন্ধ।

তবে কি মদ্যপান ? অসম্ভব। খেয়েছে মাত্র ছোট্ট দু পেগ—তাও ডিনারের আগে। দু পেগে বঙ্গ-সন্তানেরই চিত্ত-চাঞ্চল্য হয় না—ও দিয়ে তো ইংরেজ কপালে তিলক কাটে।

ছুটোছুটি আর উত্তেজনায় ডীনের ঘুম ততক্ষণে ক্ষীণ নয়—লীন হয়ে গিয়েছে। বিছানায় ছটফট করার চেয়ে বরঞ্চ চেয়ারে বসে প্রতীক্ষা করাই ভালো, যারা গেছে তারা ফিরে আসে কি না। পুলিসের লোক—প্রথম সম্বিতে ফেরা মাত্রই সে ঘড়ি দেখে নিয়েছিল। এরা বেরিয়েছিল ১২টা ৩০ এবং ৩৫-এর মাঝামাঝি। যদি তারা নিতান্তই ফেরে তবে তো ফিরবে ভোরের আলো ফোটবার আগেই। ডীন পিস্তলটা সুটকেস থেকে বের করে পেগ-টেবিলের উপর রেখে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে রইল।

ঘণ্টা চারেক সিগারেট পোড়ানোর পর লুপ্ত ঘুম ফিরে এল কিন্তু যাদের জন্য এত অপেক্ষা তারা আর এল না।

সকালবেলা বেয়ারা বেড-টী এনে দেখে সায়েব চেয়ারের উপরে বেঘোরে ঘুমে কাতর। শেষ সিগারেট হাত থেকে পড়ে গিয়ে পেগ-টেবিলের বার্নিশ পুড়িয়ে দিয়েছে।

আরো একটু ক্ষতি হল ডীনের। সেদিনই আণ্ডাঘরের বেয়ারামহলে রটে গেল, নূতন সায়েব বোতল-বাসী-পিয়সী। কেউ প্রশ্ন পর্যন্ত করল না, যে-বেয়ারা চা এনেছিল সে বোতল খালি পেয়েছিল না ভর্তি।

সকাল হতে না হতেই ভিজিটারদের ঠ্যালা। তাদের সঙ্গে লৌকিকতা করতে করতে ডীন ভাবছে আগের রাত্রের কথা। দিনের আলো প্রখর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডীনের কাছে রাত্রের প্রহেলিকা হাসির বিষয় হয়ে দাঁড়াল। স্বপ্নের ঘোরে কিংবা ঘুমের জড়তায় কী দেখতে কী দেখেছে তাই নিয়ে সে ছুটোছুটি

করলে—ইস্তেক পিস্তল বের করলে! কী আশ্চর্য! এদেশে একটানা বিশ বছর কাটানোর পর অসহ্য গরম আর সুদীর্ঘ বর্ষার ঠ্যালায় ইংরেজদের মাথায় ছিট জন্মায়—দেশে ফিরে গিয়ে তার ধকল কাটায় পুডিং দিয়ে খানা আরম্ভ করে আর স্যুপ দিয়ে শেষ করে। তাদেরই একজন, ডীনের এক মামাকে নিয়ে সে কতই না ঠাট্টা-মশকরা করেছে, আর বেচারী মামা কিছু না বলতে পেরে শুধু হম-হম করেছে। আর তার নিজের সেই অবস্থা এই প্রথম রাত্রেই। পিস্তল উঁচায় স্বপ্নের পেট ফুটো করতে? তার হল কী?

এমন সময় সোম এসে খবর দিলে, কাল রাত্রে তের-সতীতে জলে ডাকাতির খবর এসেছে। বোধ হয় গোটা তিনেক খুনও হয়েছে। সে অকুস্থানে যাচ্ছে।

ইংরেজের বাচ্চা নিজেকে এতক্ষণে সংযত করতে শিখেছে। কোনো চাঞ্চল্য না দেখিয়ে শুধালে রাত কটায় কাণ্ডটা ঘটেছে?

'কী জানি, ঠিক বলা যাচ্ছে না, দুপুর কিংবা শেষ রাতে।'

সোম চলে গেল।

'টু হেল'—অর্থাৎ চুলোয় যাগগে বলে ডীন মধুগঞ্জের ম্যাপ মেলে গেজেটিয়র খুলে পড়তে বসল।

কিন্তু 'চুলোয় যাগগে' বললেই যদি সব আপদ চুলোয় যেত তাহলে গোটা পৃথিবীটাকেই হামেহাল নরককুণ্ডের মতো জ্বালিয়ে রাখতে হত। সন্ধ্যে হতে না হতেই দিনের-বেলায়-হেসে-উড়িয়ে-দেওয়া আপদ ডীনের মনের ভিতর 'কিন্তু কিন্তু' করে ইতি-উতি করতে লাগল। ডিনারে বসে মনে হল কাল রাত্রের ঘটনা স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রমও নয়—ইংরিজিতে ভাবতে গেলে ইলুশন, ডিলুশন, হ্যালুসিনেশন কিছুই নয়। প্রেসটিডিজিটেশনও নয়—কারণ ঐ রাত সাড়ে চব্বিশটার সময় তাকে ম্যাজিক দেখিয়ে বোকা বানাতে যাবে কোন্ ভাঁড়?

বাগানের আম-জাম-লিচুর অন্ধকার ক্রমেই যেন বারান্দার দিকে গুড়িগুড়ি এগিয়ে আসছে। প্রতিপদ আকাশের মেঘময় অন্ধকারও নেবে আসছে নিচের দিকে, দুই অন্ধকারের ভিতর কী যেন গোপন যোগ-সাজস রয়েছে। সেই নিরেট জমে-ওঠা অন্ধকারের ভিতর দিয়ে গাছপালার মধ্যে সূক্ষ্ম—অতি সূক্ষ্ম—ছিদ্র করে কাজলধারার উপর দিয়ে বেয়ে যাওয়া নৌকার ক্ষীণ প্রদীপের আলোক মাঝে মাঝে এসে পৌঁছচ্ছে বাঙলোর দিকে। কিন্তু সে আলোক চোখে পড়ে ঐ দিকে অনেকক্ষণ ধরে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে। সে আলো তখন যেন চোখকে আরো কানা করে দেয়—চতুর্দিকের অন্ধকার যে কতখানি পুঞ্জীভূত নীরন্ধ্র তখনই ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

অন্ধকারে মানুষ যেমন নিজেকে সাহস দেবার জন্য শিস দেয়, পেট্রোমাক্সটাও ঠিক তেমনি মৃদু একটানা শাঁ—শব্দ করে যাচ্ছে আর ভয়ে মরছে হঠাৎ কখন অজানতে অন্ধকার তার লম্বা আঙুল দিয়ে বাতির চাবিতে দম দিয়ে তার দম বন্ধ করে দেবে।

ডীন চাকর-বাকরকে বিদায় দিয়ে পিস্তল কোলে নিয়ে বসেছে সিঁড়ির দিকে মুখ করে। টিপয়ের উপর রিস্টওয়াচ।

রাত ঘনিয়ে এল। আগের রাত্রে ভোরের দিকে চোখের দু পাতা জুড়েছিল মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য, দিন কেটেছে নানা কাজের ঠেলায়, এখন বারে বারে ঘুম পাচ্ছিল, কিন্তু আজ তো সর্বচৈতন্য কোলম্যান মাস্টার্ডের মতো তীক্ষ্ণ সজাগ রাখতে হবে। সে আজ আদৌ মদ খায় নি, জাস্ট টু বি অন ১০০% সেফ সাইড।

ঘড়িতে বারোটা বেজেছে। ডীন ভাবলে, এবারে আরো সজাগ হতে হবে। রুমালটা ভিজিয়ে এনে চোখে বোলাবার জন্য এদিক ওদিক জল খুঁজছে এমন সময় হঠাৎ দেখে সেই ত্রিমূর্তি বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। ডীন মন স্থির করে রেখেছিল দেখামাত্র পিস্তল হাতে ছুটে গিয়ে ওদের ঠ্যাকাবে কিন্তু কাজের বেলায় এক মুহূর্ত দেরি হয়ে গেল—ছুটে গিয়ে যখন নিচের বারান্দায় নামল তখন ত্রিমূর্তি বাগানের বড় জামগাছটার কাছে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। ঘড়িতে দেখে তখনো বারোটা—অর্থাৎ সকালে দম দেওয়া হয় নি।

এবারে ডীন ছুটোছুটি করলে না। 'মাই গড' বলে চাপরাসীর টুলে বসে পড়ল—ভীষণ বিপাকে না পড়লে ইংরেজ 'মাই গড' বলে না। অনেকক্ষণ পর সে বেড-রুমে ঢুকল। ক্লান্তিতে নিদ্রা-জাগরণে মেশা আসুপ্তির ভিতর দিয়ে কাটল।

সকালবেলা সোম এল। তিনটে নয়, দুটো খুন।

সেদিকে খেয়াল না করে ডীন শুধালেন, 'সোম, এ বাড়ি ভূতুড়ে?'

সোম বললে, 'জানি নে স্যর।'

'তুমি ভূত মান?'

'নো, স্যর।'

'তাহলে এ বাড়ি কিংবা যে কোনো বাড়ি ভূতুড়ে হয় কী করে?'

'জানি নে স্যর।'

ডীন বলতে যাচ্ছিল, 'তুমি একটা গবেট, আর তোমার প্যারা বস্ একটা আস্ত গাড়ল—না হলে তোমাকে শার্লক হোমসের মতো ঠাওরালে কেন?' ঠিকই

তো, বোকাকে বুদ্ধিমান মনে করা, এ যেন গাধা দেখে বলা এটা ঘোড়া। যে এ কথা বলে সে শুধু গাধা চেনে তা নয়, ঘোড়াও চেনে না।

তারপর ডীন আরও পাকাপাকি ভাবে আটঘাট বেঁধে ত্রিমূর্তির জন্য ত্রিরাত্রি অপেক্ষা করল, কিন্তু তাকে নিরাশ হতে হল।

সপ্তাহের শেষে আই. জি-কে রিপোর্ট লেখার সময় ডীন এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে লিখব-কি-লিখব-না করে করে কী করে যে লিখে ফেললে নিজেই বুঝতে পারলে না। ভাবলে ওটা কেটে ফেলি—সে বিলক্ষণ জানত, ইংরেজ এ সব কেচ্ছা নিয়ে নির্মম হাসাহাসি করে—কিন্তু তাহলে আবার নূতন করে রিপোর্ট লিখতে হয়, আর লেখালেখির ব্যাপারে পুলিস বাবাজীরা হামেশাই একটুখানি কাহিল।

যাগ কে বলে শেষটায় পয়লা পাঠই পাঠিয়ে দিলে।

তিন দিন বাদে উত্তর এল। তার শেষ ছত্র, 'ড্রিঙ্ক লেস স্পিরিট'।

ডীন খাপ্পা হয়ে বললে, 'ড্যাম দি স্পিরিট।'

॥ ১২ ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জয় করে ইংরেজ সগর্বে তার ইতিহাস রচনা করেছে। যুদ্ধে হেরে জর্মন তার সলজ্জ ইতিহাস লিখেছে। দুটোর কোনোটা থেকেই প্রকৃত সত্য জানবার উপায় নেই। তাই মনে হয়, ইংরেজের ইতিহাসটা যদি জর্মন লিখত এবং জর্মনেরটা ইংরেজ, তাহলেও হয়তো খানিকটে সত্যের কাছে যাবার উপায় থাকত। কিংবা যদি ভারতবাসী লিখত—কারণ সে যে এ বাবদে অনেকখানি নিরপেক্ষ সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

তাই চা-বাগানের আশেপাশের, বিশেষ করে মধুগঞ্জের লোক বিলক্ষণ জানে ইংরেজ তার শৌর্যবীর্য নিয়ে যতই লম্ফঝম্প করুক না কেন, চা-বাগিচার সায়েবদের ভিতর লেগে গিয়েছিল ধুন্ধুমার। তার ইতিহাস লেখা হয় নি, কোনো কালে হবেও না।

হাতিম-তাই না সিন্দবাদ কোন্ এক দেশে গিয়েছিলেন যেখানে মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মে বুড়ো হয়ে কিংবা অসুখ-বিসুখ করে মরে না। প্রতি সন্ধ্যেয় সবাই এক জায়গায় ম্লান মুখে বসে কিসের যেন অপেক্ষা করে, আর হঠাৎ এক গম্ভীর ডাক শুনে ওদের একজন লাফ দিয়ে উঠে দূর দিগন্তে পালিয়ে যায়, কেউ তার পিছু নেয় না, সে-ও আর কোনো দিন ফিরে আসে না।

চা-বাগিচার বড় মেজো ছোট বেবাক সায়েব রোজ সন্ধ্যেয় ক্লাবে বসে প্রতীক্ষা করেন, লড়াইয়ে যাবার জন্য বিলেত থেকে কোন দিন কার ডাক পড়ে। এবং কাজের বেলা দেখা গেল হাতিম-তাই-এর গল্পের লোকগুলোর মত এঁরা পত্রপাঠ বিলেতের দিকে ছুট দেন না—এঁদের অনেকেই আছেন ডাক এড়াবার তালে। সিভিল সার্জেন ইংরেজ, তার উপর কট্টর সাম্রাজ্যবাদী, সার্টিফিকেট পাওয়া অসম্ভব, কাজেই এদের উর্বর মস্তিষ্ক তখন লেগে যায় নূতন নূতন ফন্দিফিকিরের অনুসন্ধানে। এক ভীতু তো সাহস করে বাঁ হাতের কব্জীতে গুলি মেরে সেটাকে জখম করে লড়াই এড়ালে। মাদামপুর বিষ্ণুছড়া নিজেদের ভিতর লজ্জায় মাথা হেঁট করলেন।

তাঁরই মাঝখানে কে যেন খবর এনে দিল ও-রেলি লড়ায়ে যাবার জন্য নিজের থেকে প্রস্তাব পেড়েছিল, কিন্তু ভারত সরকার রংরুটের অসুবিধা হবে বলে তাকে যেতে দিল না, কারণ সে ইতিমধ্যেই জনপঞ্চাশেক বাঙালী ছোকরাকে রিক্রুট করেছে এবং তার ভিতর গোটাপাঁচেক টেরোরিস্টও আছে।

ও-রেলি সম্বন্ধে আর সব কথা ক্লাব এক মুহূর্তেই ভুলে গিয়ে এক বাক্যে বলে, শাবাশ।

পুলিসের ক্লাবে আই. জি. এসেছিলেন মধুগঞ্জে টুরে। ক্লাবে বসে ও-রেলির উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি শুনে নিজের ডিপার্টমেণ্টের প্রতি গর্ব অনুভব করলেন। তার সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলতে না বলতেই ক্লাবের নয়া-ঝুনা সব সদস্য দফে দফে তার গুণকীর্তন করলেন, এবং বিষ্ণুছড়ার ছোট মেমই বিগলিতাশ্রু হলেন সব চেয়ে বেশী।

ক্লাব ভাঙল অনেক রাত্রে, পরদিন কাইজারের খড়ের মূর্তি পোড়াবার সুব্যবস্থা করে। বেয়ারারা তাই নিয়ে নিজেদের ভিতর হাসাহাসি করলে। সায়েবদের বড়ফাট্টাই যে কী বেহদ বেশরম ফঙ্গাবেনে সে-কথা তারা লড়াই লাগাবার কয়েক মাস পরেই টের পেয়ে গিয়েছিল। ওদিকে আবার তাদের যে সব ভাই-বোনেরা সাত জন্মে কখনো লড়াই দেখে নি তারা যেতে আরম্ভ করল ইরাকে। তাই নিয়ে পূব বাঙলায় গান পর্যন্ত রচনা হয়ে গেল। সেপাই ফিরে এসেছে মেসপট থেকে দেশে ; বউ জিজ্ঞেস করছে,

মিয়া, গেছলায় যে বসরায়,
দেখছনি দালান ?
ছোট ছোট সেপাইগুলি লাল কুর্তি গায়
হাঁটু পানিৎ ল্যামা তারা

পিস্তত মারাৎ যায়—

মিয়া গেছলায় যে বসরায়, মিয়া গে— (সম)!

এ গীতে তবু বরঞ্চ গ্রাম্য মেয়ের সরলতা আর কল্পনাশক্তির খানিকটা বিকাশ পেয়েছে, কিন্তু সায়েবদের ছেলেমানুষি কত চরমে পৌঁছে গিয়েছে তার প্রমাণ বেয়ারাগুলো পেল যেদিন মধুগঞ্জের পাগলা চেঁচিয়ে গান ধরলে,

মরি, রাই, রাই, রাই,

জর্মনিরে ধরে এনে,

হার্মনি বাজাই !

এ গানের না আছে মাথা না আছে কাঁথা—পাগলা জগাইয়ের 'গানে' কখনো থাকতও না—অথচ সায়েবরা গান শুনে ভাবলেন জগাই জর্মনির কান খুব করে মলে দিচ্ছে। পাগলকে ডেকে এনে ক্লাবে তার 'নৃত্যসম্বলিত' গান শোনা হল, প্রচুর বকশিশ দেওয়া হল, এবং তাকে একটা মেডেল দেওয়া যায় কিনা সে সম্বন্ধে আলোচনা হল।

'বাঙাল' গাছে ফলে না, 'বাঙালে'র চাষ পুব-বাঙলার একচেটে নয়, তাই সায়েবদের 'বাঙালপনা' দেখে বাঙাল বেয়ারাগুলো হাসলে জোর একপেট আর পাগলা জগাইকে খেতাব দিলে 'জঙ্গীলাট'।

রাত্রে আই. জি'র নিমন্ত্রণ ছিল ডীনের বাংলোয়।

সুপ শেষ হতে না হতেই ডি. এম-এর বাংলো থেকে জরুরী খবর এল 'স্বদেশী'দের আড্ডায় বোমা ফেটে দুজন মারা গিয়েছে—ডীন যেন তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ডীন তাদের অভিসম্পাত দিতে দিতে খানা ছেড়ে উর্দি চড়ালে।

আই. জি. বাঙাল ভাষা বেশ শিখে গিয়েছিলেন। একা একা খানা খাওয়ার একঘেয়েমি কাটাবার জন্য বাটলারদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। এককালে বড়লোকদের যদি শখ হত ছোটলোকদের সঙ্গে গল্প করার তবে তাঁরা ডেকে পাঠাতেন চন্দ্রবৈদ্যকে—মুখ-চন্দ্রটিকে বিচক্ষণ বৈদ্যের মতো খাফসুরত করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে নাপিত হুজুরকে দুনিয়ার নানা খবর নানা গুজব শুনিয়ে ওকিবহাল করে তুলত। বিলেতে এখনো ও কর্মটি করে বাটলার এবং খানদানী সায়েবদের যাঁরাই দেশী ভাষা শিখতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরাই এ-দেশে সেই রেওয়াজটি চালু রেখেছেন।

সায়েবের মতির গতি ধরতে পেরে খয়রুল্লা আলোচনা আরম্ভ করলে জিনিস-পত্রের দাম বেড়ে যাওয়া নিয়ে—সায়েব সায় দিলেন; তারপর ভরসা দিলে

লড়াই শিগগিরই খতম হয়ে যাবে—সায়েব শুধু 'হুঁ' বললেন—খয়রুল্লা কথার মোড় ফিরিয়ে বললে, দিশী লোক বসরা থেকে বেশ দু পয়সা বাড়িতে পাঠাচ্ছে—সায়েব আনন্দ-প্রকাশ করলেন।

খানার শেষ পদ ছিল পনিরে রান্না আস্ত আণ্ডা। বহুকাল ধরে বিলেত থেকে পনির আসছে না বলে বড় সায়েব তাই নিয়ে প্রশংসা ও বিস্ময় প্রকাশ করলেন। খয়রুল্লা দেমাক করে জানালে এ পনির বিলেতি নয়, এ জিনিস তৈরি হয় মৈমনসিংহের অষ্টগ্রামে। বিদেশী পনির যখন এ-দেশে পাওয়া যেত সেই আমলেই ও-রেলি সায়েবের মেম দিশী পনিরের সন্ধান পেয়ে তাই দিয়ে এই নূতন সেভারি আবিষ্কার করেন। খয়রুল্লার মতে তাঁর মতো পাকা রাঁধুনি এ দেশে কখনো আসে নি। সে তখন জয়সূর্যের মেট—তার কাছ থেকে সে এ জিনিসটে বানাতে শিখেছে।

বড় সায়েব জানতেন মিসেস ও-রেলি বিলেতে। তবু কথার পিঠে কথা বলার জন্য আপন মনেই যেন শুধালেন, 'তা মেম সায়েব তো এখন বিলেতে?'

খয়রুল্লা একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, 'বোধ হয় তাই। তবে সঠিক কেউ বলতে পারে না। মীরপুর বাগিচার বেয়ারা বলছিল তিনি মসুরি না সিমলে কোথায় যেন।'

এবারে সায়েব একটুখানি আশ্চর্য হলেন। বললেন, 'সে কী হে? এই সামান্য খবরটাও সঠিক জান না?'

খয়রুল্লার দিলে চোট লাগল। পুলিস সায়েবের বেয়ারা হিসেবে জাত-ভাইদের ভিতর তার খুশ-নাম ছিল যে, সে দুনিয়ার সকলের নাড়ীনক্ষত্র জানে, তাকে কি না সায়েব পষ্ট ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন সে একটা আস্ত উজবুক, দুনিয়ার কোনো খবর রাখে না। তার চেয়ে যদি তিনি তাকে খবর দিতেন যে সে এদিকে, জানে না, ওদিকে কিন্তু তার বিবি বিধবা হয়ে গিয়েছেন, তা হলেও তার কলিজা এতখানি ঘায়েল হত না। তাই ইজ্জত বাঁচাবার জন্য বললে, 'সঠিক খবর তো দিতে পারেন শুধু ও-রেলি সায়েবই। তা তিনি তো কারো সঙ্গে কখনো কথা বলেন না, তাঁকে শুধাতে যাবে কে?'

বড় সায়েব খানদানী ঘরের ছেলে। সায়েব-মেমদের নিয়ে চাকর-নফরের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলতে চান না; আলোচনাটা ওদিকে মোড় নিচ্ছে দেখে বললেন, 'ঠিক বলেছ।'

খয়রুল্লাও পেটে আক্কেল ধরে। সায়েব যদি বা কথার মোড় ফেরালেন সে তাঁর সামনে খাড়া করে দিলে একখানা নিরেট পাঁচিল।

বললে, সে বহু মেহন্নত করে ক্লাব থেকে কিঞ্চিৎ উত্তম কফি যোগাড় করে এনেছে, পারকুলেটরে সেটা চড়িয়ে রেখেছে, সায়েব যদি একটু মর্জি করেন ?

ডিনার শেষ হলে পর খয়রুল্লা বললে, সে সায়েবকে সার্কিট হাউসে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য নিচের তলায় অপেক্ষা করবে। কফি-লিকার-সিগার তিনটিই উত্তম শ্রেণীর ছিল বলে সায়েব তদ্দণ্ডেই ডেরা ভাঙবার কোনো প্রয়োজন বোধ করলেন না। জানালেন, তিনি একাই সার্কিট হাউস যেতে পারবেন।

রাত একটার সময় ডীন ফিরে এল। বড় সায়েবকে নিতান্ত একা-একা ডিনার খেতে হল বলে আবার দুঃখ প্রকাশ করলে।

বড় সায়েব সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন, 'মিসেস ও-রেলি এখন কোথায় তুমি জান ?'

ডীন হেসে বললে, 'কেন ? আপনিও কিছু শুনেছেন নাকি ?'

'না, তো। আমি শুনেছি, তিনি বিলেত না মসুরিতে সে-কথা কেউ জানে না। আমার কাছে একটু আশ্চর্য ঠেকল।'

ডীন বললে, 'ঠেকারই কথা। কিন্তু এ নিয়ে কারো কোনো কৌতূহল নেই। এর পিছনে আবার একটুখানি কেলেঙ্কারি কেচ্ছা রয়েছে। মেব্‌ল্ এখান থেকে সরে পড়াতে কেচ্ছাটা প্রায় সবাই ভুলে গিয়েছে।'

তারপর ডীন ক্লাবে যা-কিছু শুনেছিল সে কথা তাঁকে সংক্ষেপে জানিয়ে বললে, 'পাছে আমি ব্যাপারটার গুরুত্ব না বুঝতে পেরে এলোপাতাড়ি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, তাই মাদামপুরের সায়েব—এ অঞ্চলে তিনিই মুরুব্বী—আমাকে এখানে আসার দিনই সমস্ত কথা খুলে বলে ইঙ্গিত করেন যে, এ ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া করে কোনো লাভ নেই, ক্ষতিরই সম্ভাবনা। আমিও তাঁকে বলেছি, ব্রাদার অফিসারের ফ্যামিলি অ্যাফেয়ারে আমি কনসার্নড্ নই।'

বড় সায়েব বললেন, 'ঠিক বলেছ !'

আরো পাঁচ রকমের কথা হল—বিশেষ করে লড়াই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা। দুজনেই ইয়র্কশায়ের লোক, কাজেই দুজনারই পরিচিত অনেক লোকের প্রমোশন, জখম, বাহাদুরি, মৃত্যু নিয়ে অনেক সুখ-দুঃখ প্রকাশ করা হল।

রাত প্রায় একটার সময় বড় সায়েব শেষ ফ্লেম দ্য মাৎ খেয়ে উঠলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ বললেন, 'কই হে, তোমার ত্রিমূর্তির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে না ?'

ডীন যেন শুনতে পায় নি এমনভাবে বললে, 'আপনি বাগদাদের কাজীর

গল্প জানেন ?'

বেমক্কা হঠাৎ কাজীর গল্প কেন উপস্থিত হল তার হদিস না পেয়ে বড় সায়েব বললেন, 'না তো।'

ডীন বললে, 'মুর্গী খেতে খেতে কাজী বাবুর্চীকে শুধালেন, মুর্গীর আরেকটা ঠ্যাং কোথায় ? বাবুর্চী বললে, মুর্গীটার ছিল মাত্র একটা ঠ্যাং। কাজী বললেন, একঠ্যাঙী মুর্গী কেউ কখনো দেখে নি। বাবুর্চী বললে, বিস্তর হয়, সে দেখিয়ে দেবে। তারপর শীতকালে একদিন আঙিনায় একটা মুর্গী এক ঠ্যাং পালকের ভিতর গুঁজে দাঁড়িয়ে ছিল—বাবুর্চী কাজীকে দেখিয়ে দিলে একঠ্যাঙী মুর্গী। কাজী দিলেন জোর হাততালি। মুর্গী দুসরা ঠ্যাং বের করে ছুটে পালাল। কাজী বললেন, ঐ তো দুসরা ঠ্যাং। বাবুর্চী বললে, সেদিনও খাওয়ার সময় তিনি হাততালি দিলে দুসরা ঠ্যাং বেরোত।'

বড় সায়েব বললেন, 'উত্তম গল্প কিন্তু—'

ডীন বললে, 'এতে আবার কিন্তু কী ? আপনি আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন কম হুইস্কি খেতে—ত্রিমূর্তি হুইস্কির চোখে দেখেছিলুম কি না ! আপনি যদি আচ্ছা করে আজ হুইস্কি খেতেন, তবে তার-ই 'হাততালিতে' ত্রিমূর্তি বেরিয়ে আসতো।'

অথচ সায়েব খেয়েছিল পাঁচটা 'ব্রা'—বড়া।

মনে মনে ভাবলেন, 'ছোকরা তুখোড়।' বাইরে হেসে বললেন, 'আচ্ছা, আসছে বারে না হয়, ম্যাকবেথের তিন ডাইনীর স্মরণে তিন বোতল খেয়ে ত্রিমূর্তিকে ইনভোক করা যাবে।'

ডীন বললে—'থাইস ওথ—তিন সত্যি।'

॥ ১৩ ॥

লড়াইয়ের জন্য টাকা তোলার মতলবে ইংরেজ নানা ফন্দি-ফিকির চালালে—তারই একটা 'আওয়ার ডে', পুব বাঙলার এই প্রথম ফ্ল্যাগ ডে। নেটিভরা বিদ্রূপ করে 'আওয়ার ডে'-কে নাম দিলে 'আওর দে' অর্থাৎ 'আরো দে'। ওদিকে ভারতবাসীদের কাছ থেকে এ দুঃসংবাদ আর লুকিয়ে রাখা যাচ্ছিল না যে, ইংরেজ ক্রমাগতই লড়াই হারছে। চতুর্দিকের অভাব অনটনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের গৌরবও কমে যাওয়াতে পুব বাঙলায় আরম্ভ হল বাজার লুট। ইংরেজ ভয় পেয়ে গেল যে, একবার যদি এ অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে, তবে সেটা ঠেকানো

সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

দেখা গেল, ও-রেলির এলাকায় কোনো বাজার লুট হয় নি। আই. জি. গেলেন ঐ এলাকা পরিদর্শন করতে আর ও-রেলির কাছ থেকে সলা-পরামর্শ নিতে।

ও-রেলির বাঙলোয় বসে আলাপচারি করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল দেখে সে সায়েবকে 'পট্‌লোক্' খেয়ে যেতে বললে।

খেতে বসে সুখ-দুঃখের আলাপ আরম্ভ হল। বড় সায়েবের পরিবারও বিলেতে, তাই নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার অবাধ নেই, তবে সান্ত্বনা এই যে, তাঁর স্ত্রী লড়াইয়ের কাজে যোগ দিয়েছেন আর বড় মেয়ে তো নার্স হয়ে ফ্রান্সে গিয়েছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সায়েব বললেন, 'লড়াইয়ে যে শুধু মানুষ জখম হয় আর মরে সেইটেই তো শেষ কথা নয়, কত পরিবার যে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় তার কি কোনো স্টাটিস্‌টিকস্ কেউ নেয়? তোমার বউ-বাচ্চা কী রকম আছে?'

'ভালোই।'

'চিঠিপত্র ঠিকমতো পাচ্ছ তো?'

'হুঁ।' তারপর বলল, 'ও-সব কথা বাদ দিন। আমি আমার মনকে আদপেই বিলেতমুখো হতে দিই নে। যতটা পারি কাজকর্মে ডুব মেরে থাকি।'

বড় সায়েব বললেন, 'সরি! কিছু মনে কোরো না, ও-রেলি। আমি পরের পারিবারিক সুখ-দুঃখের কথা সচরাচর জিজ্ঞেস করি নে; নিজের দুশ্চিন্তারই আমার অবসান নেই।'

ও-রেলি চুপ করে রইলো।

মাস দুই পর সায়েব ডীনকে চিঠি লিখলেন,

'প্রিয় ডীন,

আমি বড় সমস্যায় পড়ে তোমাকে চিঠি লিখছি। প্রায় দু'মাস হল আমি রাধাপুর মফঃস্বল যাই। সেখানকার অবস্থা খুব সন্তোষজনক সে খবর তুমি জান—তার জন্য ও-রেলিকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে হয়, সে কথাও তোমার অজানা নয়। দেশে যে সে শান্তিরক্ষা করতে পেরেছে, সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা নয়, আমি মুগ্ধ হয়েছি অন্য কারণে।

ভারতবর্ষে একদিন আমাদের প্রাধান্য আর থাকবে না, এ জিনিসটা আমার কল্পনার বাইরে নয়, কিন্তু আমরা জর্মনির কাছে পরাজিত হব এবং ফলে আমরা জর্মন হুনদের তাঁবুতে আসতে পারি, এ জিনিসটার কল্পনাও

আমি করতে পারি নে। এ-লড়াই জেতার জন্য ভারতে শান্তি গৌণ—মুখ্য, ভারতকে এই যুদ্ধে আমাদের হয়ে লড়ানো। ও-রেলি এ-কাজটি তার এলাকায় অবিশ্বাস্যরূপে সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে। তার কার্যপন্থা ও সরলতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

তাই আমাদের সকলের কর্তব্য তাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা।

গতবার যখন তার সঙ্গে দেখা হয়, তখন পরিবারের কথা উঠেছিল। আমার প্রশ্নের সামান্যতম উত্তর না দিয়ে সে আমার দিকে যে ভাবে তাকালে তাতে আমার মনে হল, এই বিষয় নিয়ে তার মনের কোণে এক গভীর বেদনা লুকনো আছে। আমার মনে হল, তার সম্বন্ধে আমরা যে-সব গুজব শুনেছি, সেগুলোর কিছুটা তার কানে পৌঁছেছে এবং গুজবের বিরুদ্ধে লড়াই অসম্ভব জেনে চুপ করে সব অপবাদ সয়ে নিয়েছে।

হয়তো এটা বিচক্ষণের কর্ম। কিন্তু আমার মনে হল, এ বিষয়ে আমাদেরও কর্তব্যবোধ থাকা দরকার। যে মানুষ তার সম্বন্ধে জঘন্য অপবাদ সহ্য করেও আপন দেশের জন্য অম্লানমুখে অবিশ্রাম খেটে যাচ্ছে—এবং খাটছে কাদের জন্য? যারা তার বিরুদ্ধে গুজব রটিয়েছে তাদেরই জন্য—তার মনের জ্বালা লাঘব করার জন্য যদি আমরা আমাদের কড়ে আঙুলটিও না তুলি, তবে আমরা যে নুন খেয়েছি তার উপযুক্ত নই। আর যদি আমাদের প্রফেশনের কথা তুলি তবে বলব, 'তুমি আমি পুলিস; অসৎকে সাজা দেওয়া যেমন আমাদের কর্তব্য, সজ্জনকে অন্যায় আক্রমণ থেকে রক্ষা করা আমাদের ততোধিক কর্তব্য,—ভারতীয় পুলিস এ কথা ভুলে গিয়েছে।

আমি তাই স্থির করলুম, ও-রেলিকে না জানিয়ে তার স্ত্রীর অনুসন্ধান করে সত্য খবর মধুগঞ্জের ইয়োরোপীয় সমাজকে গোচর করাব। এবং তারপরও কারো বিষ-জিভ যদি লকলকানি আরম্ভ করে, তবে রাস্কেলটাকে মধুগঞ্জের ক্লাবহাউসের সিঁড়িতে চাবকে দেব।

মেব্‌ল্‌ এবং তার বাচ্চা কোন মাসে বিলেত গিয়েছিল সে খবর বের করে আমি বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা, কলম্বো এমন কি চাটগাঁর বন্দরের সব প্যাসেঞ্জার লিস্ট তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করেও তাদের নাম পেলুম না।

ও-রেলিকে মসুরিতে নাকি মেব্‌ল্‌দের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল—সব কটা ইউরোপীয় হোটেলে অনুসন্ধান করেও ওদের নাম পাওয়া গেল না, অথচ ও-রেলির নাম সাভয় হোটেলের রেজিস্ট্রিতে রয়েছে।

ভারতবর্ষের হিল-স্টেশনে কোনো ইউরোপীয় রমণীর পক্ষে নাম ভাঁড়িয়ে

বেশী দিন কাটানো প্রায় অসম্ভব, ছদ্মনামে ছদ্ম পাসপোর্ট নিয়ে বিলেতে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

সব দিক যখন ব্ল্যাঙ্ক বেরল তখন আমি মেব্‌ল্‌দের বাটলারটার অনুসন্ধান করলুম সিংহলে তার গ্রামে। খবর এল সাত বৎসর ধরে সে গ্রামে ফেরে নি।

তাই আমি বড় সমস্যায় পড়েছি।

তুমি কি মধুগঞ্জে অত্যন্ত সাবধানে এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে কোন্ পথে এগোতে হবে, সে সম্বন্ধে কিছু হদিস দিতে পার?

মনে রেখো, আমি এ যাবৎ সব অনুসন্ধান করেছি অতিশয় গোপনে, এবং বেশির ভাগ নিজে নিজেই—পাছে ও-রেলি খবর পেয়ে মর্মাহত হয় যে, আমিও মধুগঞ্জের বক্সওয়ালাদের* মতো কুচুটে। তুমিও সাবধানে কাজ করবে। আমাদের উদ্দেশ্য ও-রেলিকে মিথ্যা অপবাদ থেকে মুক্ত করা। সে-কর্মে সফলতা নাও পেতে পারি, কিন্তু তাকে আরো দুঃখ দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত হবে।

শুভেচ্ছাসহ

ডাড্‌নি।'

ঠিক সাতদিন পর বড় সায়েব ডীনের কাছ থেকে একখানি ছোট চিঠি পেলেন।

'যতদূর সম্ভব শীঘ্র এখানে আসুন; সব আলোচনা মুখোমুখি হওয়ার প্রয়োজন।'

বড় সায়েব খবর দিয়ে মধুগঞ্জে পৌঁছলেন। মোটরেই জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপারটা কী?' ডীন উত্তর না দিয়ে শুধু ড্রাইভারের দিকে আঙুল দেখালে।

রাত্রে ডিনারের পর চাকরদের বিদায় দিয়ে ডীন বড় সায়েবকে তার স্টোর-রুমের তালা খুলে ভেতরে নিয়ে গেল।

সায়েব দেখলেন, টুকরো টুকরো হাড়ে জোড়া তিনটি কঙ্কাল। একটা বড়ো, একটা মাঝারি, আরেকটা ছোট্ট শিশুর।

তালা বন্ধ করে দুজনে ফিরে এলেন। বড সায়েব একটা নির্জলা বড় হুইস্কি খেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় পেলে?'

---

* টী-চেস্ট বা চায়ের বাক্স নিয়ে কারবার করে বলে চা-বাগিচার সায়েবদের অবজ্ঞার্থ অন্য ইংরেজ নাম দিয়েছে 'বক্সওয়ালা'। হিন্দী 'ওয়ালা' প্রত্যয় ব্যবহার করার অর্থ যে তারা 'হাফ-নেটিভ'।

'বাগানে লিচুগাছের তলা খুঁড়ে।'

'কী করে সন্দেহ হল?'

ডীন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'আপনার চিঠি থেকে আমি দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছই যে, মেব্‌ল্‌দের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই আমি অবিশ্বাস্য জিনিসে বিশ্বাস করে আপন অনুসন্ধান আরম্ভ করলুম—বরঞ্চ বলতে পারেন শেষ করলুম।

'এ বাঙলোয় প্রথম দু রাত্রে আমি যে ত্রিমূর্তি দেখেছিলুম, সেগুলো আমার মন থেকে কখনো মুছে যায় নি। যে গাছতলায় ছায়ামূর্তিগুলো হঠাৎ মিলিয়ে যায়, সে গাছটাকেও আমি স্পষ্ট মনে রেখেছিলুম। আপনার সব তল্লাসীই যখন নিষ্ফল হল, তখন আমি যে কাজ করলুম সেটা শুনলে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আমার গুরুরা হাসবেন। কিন্তু যে জিনিস আমি স্পষ্ট দেখেছি, যার সম্বন্ধে আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই, সে জিনিস স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কাছে—আপনার কাছে—যতই অবিশ্বাস্য হোক না কেন, আমার কাছে তা-ই বিশ্বাস্য, সে-ই আমার খেই।

'জায়গাটা খোঁড়ার আরেকটা কারণ: যদি কিছু না পাই, তবে আমি সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারব।'

বড় সায়েব দু হাতে মাথা চেপে ধরে রইলেন অনেকক্ষণ ধরে।

ডীন সায়েবকে আরেকটা পেগ দিলেন।

সায়েব শুধালেন, 'তোমার কী মনে হয়?'

ডীন কোনো উত্তর দিলে না, প্রশ্নটা যেন সে শুনতেই পায় নি।

এবারে সায়েব মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'এ কাজ যদি ও-রেলির হয়, তবে বলব, যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত কারণ না থাকলে তার দ্বারা এটা কখনো সম্ভবপর হত না।'

ডীনও উঠে দাঁড়াল। বললে, 'খোঁড়াখুঁড়ি করার আমার তৃতীয় কারণ সেইখানেই। আপনার শেষ সিদ্ধান্ত যদি ও-রেলির সপক্ষে যায়, তবে এই কঙ্কালগুলো নিয়ে আপনি যা ভালো মনে করেন তাই করতে পারবেন। এটা তো আপনার কেস।'

বড় সায়েব বললেন, 'মাই কেস! ও গড।'

বড় সায়েব পরদিন রাধাপুর গিয়ে সোজা উঠলেন ও-রেলির বাঙলোয়। কোনো ভূমিকা না দিয়েই বললেন, 'ও-রেলি, মধুগঞ্জে তোমার বাঙলোর বাগান খুঁড়ে তিনটি কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে। এ সম্বন্ধে তোমার কিছু বলবার আছে

কি ? কিন্তু তার পূর্বে তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি—তুমিও জান—'

সায়েব বাক্য শেষ করলেন।

ও-রেলি তখন একটু শুকনো হেসে বললে, 'আমাকে কিছু সাবধান করতে হবে না। এই নিন।' বলে সে কোটের ভিতর বুকের পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বের করে সায়েবের হাতে দিলে।

॥ ১৪ ॥

প্রিয় সোম,

এ চিঠিটা তোমাকে লিখছি ; এ চিঠিটা বিশ্বসংসারের যে কোনো লোককে লেখা যেত। তবু তোমাকেই কেন লিখছি তার কারণ তুমি আমাকে হৃদয় আর মন দিয়ে যে রকম বুঝতে চেষ্টা করেছ এ রকমটা আর কেউ কখনো করে নি—না এদেশে না আমার আপন দেশে—এক মেব্‌ল্‌ ছাড়া। 'হৃদয় আর মন' দিয়ে বলবার সময় আমি ইচ্ছে করেই 'হৃদয়' আগে ব্যবহার করেছি ; তার কারণ আমি আইরিশম্যান, আমি ইংরেজ নই। আমি আমার পাঁচটা জাতভাইয়ের মতো হৃদয় দিয়ে ভাবি, আর মন দিয়ে অনুভব করি। ইংরেজ তার মনকে হৃদয়ের আগে স্থান দেয়—এবং বহু ইংরেজের আদপেই হৃদয় আছে কি না তাই নিয়ে আমার মনে সন্দেহ আছে। কিন্তু থাক, এ-সব সস্তা পাইকারি হিসেবে কোনো জাত কিংবা দেশ সম্বন্ধে রায় প্রকাশ। শুধু শেষ একটা কথা বলি, বাঙালীর সঙ্গে এ বাবদে আইরিশম্যানের অনেকখানি মিল আছে। জানি নে, তোমার কাছে খবর পৌঁছেছে কি না, আলিপুরের মামলায় যারা হাজতে ছিল তাদের প্রতি দরদ দেখিয়ে এক আইরিশ ডাক্তারকে এদেশের ইংরেজ কর্তাদের কাছে হুমকি খেতে হয়েছে। এই আইরিশ ডাক্তারের সঙ্গে আমার এবং তোমার হৃদয়ের মিল রয়েছে। দেশে আমার জাতভাইরা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ছে স্বাধীনতার জন্য। তাদের জন্য আমার হৃদয়ে যথেষ্ট দরদ। ওদিকে ইংরেজ আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে সেটাকেও অস্বীকার করতে পারি নে। তোমার বেলাও তাই, অরবিন্দ-কোম্পানির প্রতি তোমার সহানুভূতি ; ওদিকে যে ইংরেজ রাজতন্ত্র এ দেশে প্রচলিত তার সদ্‌গুণগুলো তোমার চোখ এড়ায় না। আইরিশ ডাক্তার, তোমার এবং আমার, আমাদের সকলের ভিতর একই দ্বন্দ্ব।

সাধারণ লোক এ ক্ষেত্রে বলে, 'তাহলে চাকরি ছেড়ে দিলেই পার !'

এর সদুত্তর যখন আমি আপন মনে খুঁজছি তখন তোমার মুরুব্বী—যাকে

প্রথম দর্শনে মনে হয়, আস্ত একটা গড-ড্যাম ফুল—কাশীশ্বর চক্রবর্তীকে এক পুরস্কার-সভার বক্তৃতাতে অন্য কথাপ্রসঙ্গে বলতে শুনলুম, 'সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব সংসারে তো চিরকালই লেগে থাকবে; তাই কি আমরা সবাই সংসার ত্যাগ করে বনবাসে চলে যাই? আর যদি যাই-ও, তাতেই বা কী? সেখানে কি দ্বন্দ্ব নেই?'

কথায় কথায় কোথায় এসে পড়লুম! কিন্তু তোমার স্মরণ আছে, সোম, আমি যখন প্রথম এদেশে আসি তখন কী রকম মারাত্মক বাচাল ছিলুম। তুমিই নাকি মীরপুরকে একদিন বলেছিলে, 'সায়েব কথা কয় যেন ম্যাক্‌সিম্ গানের মতো—কট্ কট্ কট্ কট্ ট্-ট্-ট্!' ঠিকই বলেছিলে। এবং আমিও মন্তব্যটা শুনে সেটাকে সবিশেষ প্রতিপন্ন করার জন্য আরো শ তিনেক রৌণ্ড তদ্দণ্ডেই ছেড়েছিলুম।

সে বাচালতা একদিন আমার লোপ পায়। আজ আবার সেটা ফিরে এসেছে। দীর্ঘ সাত বছরের জমানো কথা আজ তোমাকে বলতে যাচ্ছি। যে কলম-ধরাকে আমি ভূতের মতো ডরাতুম, আজ আমাকে সেই কলম ধরেছে। আমার একমাত্র দুঃখ এ-চিঠি হয়তো কোনোদিন তোমার হাতে পৌঁছবে না। এটা হয়তো জবানবন্দী রূপে আদালতে পেশ করা হবে। যে অন্ন তোমাকে সাদরে আপন হাতে খাওয়াতে চেয়েছিলুম, সেটা পৌঁছবে তোমার কাছে, পাঁচশো জনের এঁটো হয়ে।

হ্যাঁ, আমার-ই কর্ম, আমিই করেছি। এর জন্য আর কেউ দায়ী নয়। আমি একাই দায়ী আমি জানি, একমাত্র তুমিই জানতে পেরেছিলে যে, আমি দায়ী। তুমি আমাকে ধরিয়ে দাও নি কেন তারও আন্দাজ আমি খানিকটা করতে পেরেছি। বিশ্বের আদালতে আমাকে খাড়া না করে তুমি আমাকে তোমার নিজের আদালতে খাড়া করে হয়তো যথেষ্ট প্রমাণ পাও নি, হয়তো তোমার প্রত্যয় হয়েছিল যে, এ অবস্থায় পড়লে তুমিও ঠিক এই রকম ধারাই করতে, হয়তো ভেবেছিলে আমি তোমার ওপরওলা,—ওপরওলার অপরাধের বিচার করবেন তাঁর ওপরওলা, গুরুর বিচার করবেন ভগবান, চেলার তাতে কিসের জিম্মেদারি! এ নিয়ে আমার কোনো কৌতূহল নেই। জজ যখন আসামীকে খালাস দেয় তখন জজ কেন তাকে ছেড়ে দিলে তাই নিয়ে মাথা ঘামায় কোন্ আসামী?

তুমি যে আমাকে হৃদয় দিয়ে খানিকটে বুঝতে পেরেছিলে সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, তুমি যেন অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে গুপ্তধনের কাছে

পৌঁছে গিয়েছিলে, এইবারে আমি তোমাকে হাত ধরে বাকি পথটুকু নিয়ে যাব। কিন্তু যদি গুপ্তধনের কলসী তখন ফাঁকা বেরোয়, কিংবা যদি তার থেকে বেরোয় কেউটে…? তখন তুমি আমাকে দোষ দিয়ো না। আর তুমি যদি তখন তোমার রায় বদলাও তবে আমিও তোমাকে দোষ দেব না।

তাহলে গোড়া থেকেই আরম্ভ করি।

একদিন কথায় কথায় আমি তোমাকে আমার বাপ-মা সম্বন্ধে কী যেন সামান্য কিছু একটা বলি। তুমি সুযোগ পেয়ে এমন একটা প্রশ্ন শুধালে যার থেকে আমি আবছা-আবছা বুঝতে পারলুম, তুমি জানতে চাও আমি আমার রক্তে এমন কোনো দ্বন্দ্ব নিয়ে জন্মেছি কি না যার তাড়নায় আত্মবিস্মৃত হয়ে আমি অপরাধের পন্থা বরণ করলুম, এখানে বলে রাখি, সে স্থলে তুমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলে আমিও ঠিক সেই প্রশ্নই জিজ্ঞেস করতুম। কারণ অপরাধী নিয়ে আমাদের কারবার। হয় তাদের গায়ে বদ-খুন,—না হয় তারা বড় হয়েছে বদ আবহাওয়ার ভিতরে। আজ আমার আর স্পষ্ট মনে নেই তবে এটুকু এখনো স্মরণে আছে যে, তুমি কিন্তু প্রশ্নটি করেছিলে এমনি সুচতুরভাবে যে, আমি কোনো অফেন্‌স্ নিই নি।

তাই বলে রাখি, আমি আমার বাবার যেটুকু দেখেছি তার থেকে এমন কিছুই মনে পড়ছে না যা দিয়ে আমার চরিত্র বিশ্লেষণ করা যায়। তিনি ছিলেন খাঁটি আইরিশম্যান, অর্থাৎ দু মুঠো অন্ন আর তিন পাত্তর মদের পয়সা হয়ে গেলেই কাজে ক্ষান্ত দিয়ে সোজা চলে যেতেন পাড়ার মদের দোকানে—তারপর তাঁকে আর এক মিনিটের তরে কাজ করানো যেত না। তুমি আয়ারল্যাণ্ডের মদের দোকান কখনো দেখ নি, তাই তুলনা দিয়ে বলছি সে হল কাশীশ্বর চক্রবর্তীর বৈঠকখানার মতো। সেখানে কুঁড়েমি আর গালগল্প ছাড়া অন্য কোনো জিনিস হয় না—মদ সেখানে আনুষঙ্গিক মাত্র। মেয়েদের সামনে এ সব জিনিস ভালো করে জমে না বলে মেয়েরা 'পাবে' যায় না, চক্রবর্তীর বৈঠকখানায়ও তাদের প্রবেশ নিষেধ।

আমার বাবা ছিলেন গল্প বলায় ওস্তাদ, তাই তিনি ছিলেন 'পাবের' প্রাণ—চক্রবর্তীর বৈঠকখানায় শুনেছি সেই ব্যবস্থা।

তাঁর কোনো প্রকারের চরিত্র-দোষ ছিল না, তাঁকে কোনো প্রকারের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করতে আমি কখনো দেখি নি। অথচ তিনি আমাকে জীবনে একটিমাত্র উপদেশ লক্ষাধিকবার দিয়েছেন, সেটি—'ডেভিড, যা খুশি তাই করবি, কারো পরোয়া করিস নি।' কেন তিনি এ উপদেশ দিতেন জানি নে, এর ভিতর

কোনো দ্বন্দ্ব আছে কি না সে তুমি ভেবে দেখো। মা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু, তিনি মৃদু আপত্তি জানাতেন। বাবা তখন অন্য কথা পাড়তেন, কিন্তু যেদিনই ঝড় দুর্যোগে 'পাবে' যেতে পারতেন না, সেদিনই আমাকে মজাদার কেচ্ছা-কাহিনী শোনাতেন এবং তার সবগুলোতেই ইঙ্গিত থাকত,—'যা খুশি তাই করো', এমন কি 'যাচ্ছেতাই করো'।

এ উপদেশ কিন্তু আমার মনের উপর কোনো দাগ কাটতে পারে নি—অন্তত তাই আমার বিশ্বাস।

এ ধরনের পরিবার আয়ারল্যাণ্ডে বিস্তর—এর মধ্যে কোনো বিদ্‌ঘুটে নূতনত্ব নেই। এর থেকে আমি কোনো হদিস পাই নি—দেখো, তুমি পাও কি না।

তবে কি বাইরের দূষিত আবহাওয়া? এমন কোনো পৈশাচিক ঘটনা যা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি, এবং সেই স্তম্ভনের সময় আমার অজানতে সে ঘটনা আমার হৃদয়মনে ঢুকে গিয়ে দুষ্ট জীবাণুর মতো বছরের পর বছর ধরে আমার সর্ব অচেতন সত্তা বিষিয়ে দিয়ে দিয়ে শেষটায় হঠাৎ একদিন আমার মগজে ঢুকে আমায় বিবেকবুদ্ধিহীন উন্মাদ করে দিল? কিংবা কোনো মারাত্মক প্রবঞ্চনা, —যে-দেবীকে হৃদয়ের পদ্মাসনে বসিয়ে দিনযামিনী পূজা করেছি, হঠাৎ দেখি সে মায়াবিনী, পিশাচিনী—আমার বুকের উপরে বসে আমারই হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করে রক্ত শোষণ করছে? কিংবা প্রেমের দেউলের মমতাপ্রতিমা গোপনে গোপনে বারাঙ্গনার আচরণ করছে—হঠাৎ একদিন ধরা পড়ে গেল, আমার বিশ্বসংসার অন্ধকার হয়ে গেল?

না। আমার চোখের সামনে ঘটে নি। শুনেছি। তা সে তুমিও শুনেছ, সবাই শুনে থাকে, বইয়ে পড়ে থাকে।

তবু কি উলটোটা? অবিশ্বাস্য আত্মবিসর্জন, বহুযুগের বিরহ-দহনের পর মধুময় পুনর্মিলন, সমরে লুপ্ত পুত্রের গৃহ-প্রত্যাগমনে মাতার বিগলিত আনন্দাশ্রু সিঞ্চন?

না। তাও দেখি নি। সেখানেও ইউ উইল ড্র ব্ল্যাঙ্ক!

তবে হ্যাঁ, আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা, মেব্‌ল্‌কে দেখা, তাকে পেয়েও না-পাওয়া।

॥ ১৫ ॥

আমার বাবা মা দুজনেই এক মাসের ভিতর মারা যান। আমি বৃত্তি পেয়ে লণ্ডনে পড়াশুনো করতে এলুম।

আমার মনে হয় বড় শহরে মানুষের জীবন বৈচিত্র্যহীন। অকস্মাৎ সাঙ্ঘাতিক সেখানে কিছু একটা ঘটে না। তার কারণ বড় শহরের জীবনস্রোত বয় অতিশয় তীব্র গতিতে। তুমি তার উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছ খরবেগে। সে বেগে চলার সময় ডাইনে বাঁয়ে মোড় নেওয়া অসম্ভব। আর ছোট শহর, কিংবা গ্রামে জীবনগতি শান্ত, মন্দ। সে যেন গ্রামের নদী। তার উপর দিয়ে ভেসে যাওয়ার সময় সামান্য খড়-কুটোটি নানা চক্করে বহু প্যাঁচ খেয়ে খেয়ে এগিয়ে যায়। দেখে মনে হয় তার জীবনে স্বাধীনতা অনেক বেশী।

মানুষের জীবনের উপর লণ্ডনের চাপ জগদ্দল, তার দাবি বহুল—কিন্তু বৈচিত্র্যহীন। সকাল থেকে রাত বারোটা অবধি মানুষ যে কী বদ্ধ পাগলের মতো ছুটোছুটি হুটোপুটি করে সেই তুমি মধুগঞ্জের লোক বুঝবে কী করে? এবং যতদূর দেখতে পাচ্ছি, থ্যাঙ্ক গড্, মধুগঞ্জকে কখনও বুঝতে হবে না।

কিন্তু জানো সোম, সেই খরস্রোতে ভেসে ভেসে হঠাৎ আমি একদিন শেষ সীমানায় পৌঁছে গেলুম। দেখি সম্মুখে ঘন নীল সমুদ্র আর তার উপর ফিরোজা আকাশের ঢাকনা। বিলেতের সমুদ্র আর আকাশ সচরাচর নীল রঙের বাহার ধরতে জানে না—কুয়াশা, বৃষ্টি আর বরফ তাকে করে রাখে ঘোলাটে, তামাটে, পাঁশুটে। আমার সঙ্গে সমুদ্রের চারি চক্ষের মিলন হল নিদাঘ মধ্যাহ্নে—নীলাম্বুজ আর নীলাকাশ সেদিন বর্ষণশেষে আতপ্ত কিশোর রৌদ্রে দেহখানি প্রসারিত করে দিয়েছিল।

সে সমুদ্র মেব্‌ল্।

তোমাকে বোঝানো অসম্ভব, সোম, কারণ এ জিনিস বোঝার জিনিস নয়। তোমার বহু সদগুণ আছে স্বীকার করি, কিন্তু প্রেম কী বস্তু তা তুমি জান না। কতবার দেখেছি ছোঁড়া-ছুঁড়ি পালিয়ে গিয়ে কেলেঙ্কারি করেছে, তুমি সর্বদাই সমাজের হয়ে তাদের উপর কড়া শাসন করেছ, পুলিসের কুলিশ-পাণি দিয়ে। তারা কিসের নেশায় পাগল হয়ে সমাজের সব বেড়া ভাঙল, সব দড়াদড়ি ছিঁড়ল তুমি কখনো বুঝতে পার নি। আমি দু-একবার ইঙ্গিত করে দেখেছি তুমি অন্ধ, বরঞ্চ নৈতিক, সামাজিক ধর্ম রক্ষা করা যার সর্ব প্রধান কর্তব্য সেই পাদ্রী বুড়ো-

বুড়ীর হৃদয়ে অনেক বেশি দরদ, তাদের চিত্ত বহুগুণে প্রসারিত।

মেব্‌ল্‌ সেই গ্রীষ্মের দুপুরে হাইড পার্কের গাছতলার বেঞ্চিতে বসে অলস নয়নে সার্পেণ্টাইনের জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেন দেখছিল।

তুমি তাকে দেখেছ, বহুবার বহু পরিবেশে দেখেছ, অবশ্য আমার চোখ দিয়ে দেখ নি, কিন্তু তুমি জান সে সুন্দরী। অসাধারণ সুন্দরী।

হিন্দু ধর্ম, হিন্দু দর্শনের অনেক কিছু আমি এদেশে এসে শুনেছি, পড়েছি; কিন্তু তার অল্প জিনিসই আমি বিশ্বাস করতে শিখেছি। তার একটা জন্মান্তরবাদ। না হলে কী করে বিশ্বাস করি সেই সামাজিক কড়াক্কড়ির যুগে বিনা মাধ্যমে কী করে আমাদের আলাপ হল, প্রথম দর্শনেই কী করে দুজনার হৃদয়ে একে অন্যের জন্য ভালোবাসা জন্মাল? এ যুদ্ধ বিলেতের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে, অজানা মানুষের সঙ্গে বিলেতে আলাপ-পরিচয় করা এখন আর কঠিন নয়, তার ধাক্কা সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমাদের আণ্ডাঘরেও এসে পৌঁছেছে, সে খবর তুমি জান, কিন্তু সে যুগে দু-দণ্ডের ভিতর এতখানি হৃদ্যতা পূর্বজন্মের সংস্কার ছাড়া অন্য কোনো স্বতঃসিদ্ধ দিয়ে বোঝানো যায় না

মেব্‌ল আমার কাছে সমুদ্রের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল।

মধুগঞ্জ আমাদের লণ্ডনকে হার মানায়। এই বক্সওয়ালারা কেন যে ভ্যানর-ভ্যানর করে মধুগঞ্জের নিন্দে করে আমি ঠিক বুঝতে পারি নে, বোধহয় করাটা ফ্যাশান, কিংবা হয়তো ভাবে, না করলে খানদানী সায়েবরা ভাববে ওরা বুঝি নেটিভ, কালা আদমী বনে গিয়েছে।

লণ্ডন থেকে মধুগঞ্জ! এর চেয়ে দূরতর পরিবর্তন আমি কল্পনা করতে পারি নে।

সেই মধুগঞ্জে আমি অনেক কিছু পেলুম। ভগবান অকৃপণভাবে ঢেলে দিলেন তাঁর সব দৌলত, তাঁর তাবৎ ঐশ্বর্য। নৌকো বাচ থেকে আরম্ভ করে পাদ্রী-টিলার মেয়েগুলি।

ভালোই। এদের কথা উঠল। তুমি জান আমি ওদের সঙ্গে ঢলাঢলি করার মতলব নিয়ে পাদ্রী-টিলায় যাই নি, কিন্তু এক জায়গায় আমার অজানতে আমি একটা ভুল করে ফেলি। প্রাচ্য দেশের মেয়েরা যে এত স্পর্শকাতর হয় আমি অনুমান করতে পারি নি তাই আমি তাদের সামান্যতম গতানুগতিক হৃদ্যতা জানাতেই হঠাৎ দেখি, ওরা দিচ্ছে তরুণীর অকুণ্ঠ প্রেম। আমার আপসোসের অন্ত নেই যে, সে ভালোবাসার ন্যায্য সম্মান আমি দেখাতে পারি নি। আশা করি ওরা জানতে পেরেছে যে, আমি ওদের ফিরিঙ্গি বলে অবহেলা করি নি।

আমি জানতুম, তুমি এই বিশ্বাসটি ওদের ভিতর জন্মাতে পারবে তোমার পাকা মুন্সিয়ানা দিয়ে, তাই তোমারই হাতে এটি সঁপে দিয়েছিলুম।

তারপর আমি বিলেতে গেলুম মেব্‌ল্‌কে নিয়ে আসতে।

এই পৃথিবীর গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে সর্বত্রই প্রতি মুহূর্তে নরনারীর ভিতর প্রেম মুকুলিত হচ্ছে বিকশিত হচ্ছে, তার ফল কখনো মধুময় কখনো তিক্ত—এই হল জীবনের দৈনন্দিন, গতানুগতিক ধারা। কিন্তু যদি প্রেমের মেলা দেখতে চাও, প্রেম যেখানে অন্য সব-কিছু ছাপিয়ে উপচে পড়ছে, তবে একটি-বারের জন্য কোনো এক জাহাজে করে সপ্তাহ তিনেকের জন্য কোথাও চলে যেয়ো। দেখবে কী উন্মাদ অবন্ধন মেলার ফূর্তি সেখানে চলে—ইচ্ছে করেই 'মেলা' বলছি কারণ এ জিনিস দৈনন্দিন নয়। জাহাজের অধিকাংশ নরনারী সেখানে সমাজের সর্বপ্রকার কড়া বন্ধন থেকে মুক্ত, প্রতিবেশীকে ডরিয়ে চলতে হয় না পাছে সে কেলেঙ্কারি কেচ্ছা সর্বত্র রটিয়ে দেয়—জাহাজ মোকামে পৌঁছলেই তো সবাই ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি, কে কাকে জানাতে যাবে, কে কী করেছে? এবং সবচেয়ে বড় কথা, এ তিন হপ্তা মানুষ জীবন-সংগ্রাম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, সর্বপ্রকারের দায়িত্ব থেকে পূর্ণ মুক্ত। আহার নিদ্রা আশ্রয়—এ তিন সমস্যার সমাধান হওয়া মাত্রই, তা সে যত সাময়িকই হোক না কেন,—তিন সপ্তাহ কি কম সময়?—মানুষের জাগে আসঙ্গলিপ্সা, যৌনক্ষুধা! সে যেমন বিরাট তেমনি বিকট—স্থলবিশেষে। তাই এ রকম জাহাজে মানুষ এডনিস না হয়েও পায় কার্তিকের কদর, মোনা-লিসা না হয়েও ভিনাসের পূজা।

বৃথা বিনয় করবো না। আমি জানি আমি কুরূপ কুচ্ছিত নই। তাই আমার কাছে তখন বহু হৃদয় অবারিতদ্বার, বহু যুবতী আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘন ঘন সাপ খেলাবার বাঁশি বাজাতে আরম্ভ করেছিল। আর দু-চারটি ভীরু লাজুক তরুণী নির্জনে পেলে ফিক করে একটুখানি হেসে কিশোরী-সুলভ নাতিস্ফীত নিতম্বে সচেতন ঢেউ তুলে দিয়ে জাহাজের নির্জনতর কোণের দিকে রওয়ানা দিত।

কিন্তু আমি তো চলেছি আমার বধূর সন্ধানে। আমার ফিয়াঁসে, যে আমার ব্রাইড হতে যাচ্ছে, আমার বঁধু, যে আমার বধূ হতে চলেছে। প্রপেলারের প্রতি আঘাত আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারই কাছে, এই লক্ষ লক্ষ টাকার জাহাজ, হাজার হাজার টাকার বেতনভোগী কর্মচারীরা এরা সবাই অহোরাত্র খাটছে আমাকেই, শুধু আমাকেই, আমার রাণীর কাছে নিয়ে যাবার জন্যে। ঝড়-

ঝঞ্ঝায় এ জাহাজ ডুবতে পারে না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লোপ পেলেও এ জাহাজ পৌঁছবে মার্সেলেস বন্দরে, যেখানে জাহাজ থেকে দেখতে পাব, আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিন মেব্‌ল্ যে পোশাক পরে হাইড পার্কে বসে ছিল, সেই পোশাক পরে বন্দরের পারে দাঁড়িয়ে তার মভ্ রঙের রুমাল দোলাচ্ছে।

'ভগবান কোথায়?'—নাস্তিক জিজ্ঞেস করেছিল সাধুকে। কৃচ্ছ্রসাধনাসক্ত দীর্ঘতপস্যারত চিরকুমার সাধু বলেছিলেন, 'তরুণ-তরুণীর চুম্বনের মাঝখানে থাকেন ভগবান।' আমার হৃদয় আর আমার মেব্‌লের রুমাল-নাড়ার মাঝখানে থাকবেন স্বয়ং ভগবান।

থাক, সোম। আগেই বলেছি তোমাকে এ-সব বলা বৃথা। তবু বলছি, কেন জান। হয়তো বুঝতে পারবে, হয়তো হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারবে। অবিশ্বাস্য তো কিছুই নয়, অসম্ভবই বা কোথায়?

॥ ১৬ ॥

তুমি যে-সব ইংরেজদের চিনেছ তাদের ভিতর সত্যকার শিক্ষিত লোক কম। এবং যে দু-একটি লোক সাহিত্য বা অন্য কোনো রসের সন্ধান কোনোকালে-বা হয়তো রাখত, তারাও আণ্ডাঘরের আবহাওয়ায় পড়ে এবং রসকষহীন সরকারী-বেসরকারী কাজ করে করে স্থূল এবং অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে। শেলি, কীট্‌স পড়ে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার জন্য বহুদিন বহু বৎসর ধরে মনে মনে হৃদয়ের অন্তস্তলে এক বিশেষ 'ধর্মসাধনা' করতে হয়। অল্প ইংরেজই সেটা করে থাকে, এবং করলেও সে আর পাঁচজনকে সে সম্বন্ধে কোনো খবর দেয় না। তাই ইচ্ছে করেই 'ধর্মসাধনা' সমাসটা ব্যবহার করলুম, কারণ তোমরা ঐ জিনিসকে করে থাক গোপনে গোপনে। আমার মনে হয় দুটো একই জিনিস, ধর্মসাধনা এবং কাব্যসাধনার শেষ রস নেই।

ফরাসীরা তোমাদের মতো। শক্ত সোমথ জোয়ান যদি গালগল্পের মাঝখানে হঠাৎ কবিতা আবৃত্তি আরম্ভ করে তবে আর পাঁচটা ফরাসী হকচকিয়ে ওঠে না, কিংবা বিষম খায় না। ফ্রান্সে তাই কাব্যজীবন এবং ব্যবহারিক জীবনের ভিতর কোনো দ্বন্দ্ব নেই। তাদের প্রেম যে রকম অনেকখানি খোলাখুলি, সে প্রেমকে তারা তেমনি কবিতা আবৃত্তি করে গান গেয়ে আর পাঁচজনের সামনে রূপ দিতে, প্রকাশ করতে লজ্জিত হয় না। তাই ইংরেজ হনিমুন করতে যায় ফ্রান্সে—জীবনের অন্তত ঐ কটা দিনের জন্য সে খোলাখুলি প্রেম

করতে চায়। তার জীবনের এ কটা দিন তোমাদের হোলির মতো। মাতব্বর কাশীশ্বর চক্রবর্তীকেও সেদিন আমি রং মেখে সং সেজে ঢং করতে দেখেছি। মুরুব্বী রায় বাহাদুর যদি প্যারিসে হনিমুন করতে যেতেন (ভাবতেই কি রকম হাসি পায়—প্যারিসের রাস্তায় চোগা-চাপকান-পরা রায়বাহাদুরের সঙ্গে নোলক-পরা চেলিতে জড়ানো আট বছরের বউ!) তবে তিনি অতি অবশ্য রাস্তার পাশের গাছতলায় দাঁড়িয়ে গলায় ঝুলানো হারমনিয়ামের প্যাঁ প্যাঁর সঙ্গে ভাটিয়ালি ধরতেন, খনে কনে-বউয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে ধেই ধেই করে খেমটা কিংবা পল্‌কা নাচ জুড়তেন। ফ্রান্স দেশের বোতলেই শ্যাম্পেন নয়, তার আকাশে বাতাসে শ্যাম্পেন ছড়ানো।

মার্সেলেস থেকে দশ মাইল দূরে ছোট্ট শহর আক্‌স্‌-আঁ-প্রভাঁসে আমরা বিয়ে করব বলে স্থির করলুম। বিয়ের ব্যবস্থা করতে করতে যে তিনদিন লাগল সে সময়টা আমরা মার্সেলেসের সেরা হোটেলে কাটালুম আলাদা কামরায়—তখনো বিয়ে হয় নি, এক ঘর করি কী করে? ফরাসীরা তাই দেখে কত না চোখ টিপে মুচকি হাসি হাসলে। একেই বলে ইংরেজের 'লেফাফা-দুরুস্তমি', ব্রিটিশ প্রুডারি, তোমাদের ভাষায় এদিকে ঘোমটা, ওদিকে খেমটা!

সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তার ঘরে যে যেতে পারতাম না তা নয়। এমন কি হোটেলওয়ালা বুদ্ধি করে আমাদের যে দুখানা ঘর দিয়েছিল তার মাঝখানে একটি দরজাও ছিল। সে দরজাটি ওয়ালপেপারের সঙ্গে এমন নিখুঁত কারিগরিতে মেশানো যে, আমাদের কারো নজরেই পড়ে নি। যে লিফ্‌ট্‌-বয় আমাদের সুটকেশ ঘরে নিয়ে এসেছিল তার বুঝতে বাকি রইল না যে, প্রেমের মন্দিরে আমরা একদম গাঁইয়া ভক্ত, আর ফরাসীরা সেখানে আমাদের তুলনায় বিদগ্ধ নাগরিক পাণ্ডা। অর্থাৎ ফরাসী লিফ্‌ট্‌-বয় পর্যন্ত বিলেতের ডন জুয়ানকে প্রেমের মুশায়েরায় দু-চারখানি মোলায়েম বয়েত শুনিয়ে দিতে পারে। একবাক্য ইংরেজি না বলে ছোকরা অতিশয় সংস্কৃত কায়দায় শুধু মুদ্রা দিয়ে বুঝিয়ে দিলে দরজাটা কোন্‌ জায়গায় এবং সেইটেই যেন আসল কথা নয়, যেন আসল কথা—ওটাকে দুদিক থেকেই বন্ধ করা যায়। মেব্‌লের মুখ একটুখানি রাঙা হয়ে গিয়েছিল।

যে দরজা বন্ধ করা যায়, সেটা খোলাও যায়। বাঙলা কথা।

জানি নে, মেব্‌ল্‌ তার দিকটে খোলা রেখেছিল কি না।

তোমাদের রাধাকেষ্টর দেখা হত কুঞ্জবনে, সেখানে দরজা-দেউড়ির বায়নাক্কা নেই। আমাদের দেশে দরজা নিয়ে বিস্তর কবিত্ব করা হয়ে গিয়েছে। অবশ্য তোমাকে সে বোঝানোর চেষ্টা পণ্ডশ্রম।

আমি কিন্তু যাই নি অন্য কারণে। যাকে দুদিন বাদে সব দিক দিয়ে আমি পাবই পাব, যে খনির সব মণি একদিন আমারই হবে, যে সমুদ্রের সব মুক্তা আমারই—একমাত্র আমারই গলায় একদিন দুলবে, সে খনিতে আমি ঢুকতে যাব কেন চোরের মতো, সে সমুদ্রে আমি কেন হতে যাব বোম্বেটে? মেব্‌ল্‌কে আমি বরণ করতে যাব বিশ্বসংসারের প্রসন্ন আশীর্বাদ নিয়ে।

এবং সবচেয়ে বড় কথা, যৌন সম্পর্কে যদিও আমার দেশ তোমাদের তুলনায় অনেকখানি ঢিলে তবুও জিনিসটে আমার কাছে কখনো সরল বলে মনে হয় নি। আমার মনে কেমন জানি একটা ভয় কী যেন একটা সন্দেহ সব সময়েই জেগে থাকত। আশ্চর্য, নয় কি? যে সরল রহস্যের ফলে বিশ্বসংসারে প্রতি মুহূর্তে নবজীবন লাভ করছে পশুপক্ষী, ফুলে রেণুতে যার সহজ প্রকাশ, তার প্রতি ভয়, তার প্রতি সন্দেহ! এ ভয়, এ সন্দেহ আমার এখনো যায় নি। তুমি হয়তো এ চিঠি শেষ করার পর তার কারণ আমার চেয়েও ভালো করে বুঝতে পারবে।

১৫ই আগস্ট

আমি ভেবেছিলুম, এ চিঠি আমি একদিনেই শেষ করতে পারব; এখন দেখছি, ভুল করেছি। এত কথা যে আমার বুকের ভিতর জমা হয়ে আছে সে-কথা আমি জানতুম না। আমার অজানতে যে আমি এতখানি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি এবং তারও এতখানি এখনো আমার স্মরণে রয়েছে সে-তত্ত্বই বা জানাব কী করে?

ওদিকে তুমি হয়তো অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে সব-কিছু এক ঝটকায় জেনে নেবার জন্য। কিন্তু সোম, জীবন তো আর রহস্য-উপন্যাস নয় যে, কৌতূহল দমন না করতে পারলে শেষ ক-খানা পাতা পড়েই সব-কিছু জেনে নেওয়া যায়। জীবন বরঞ্চ গানের মতো। তার গতি বিচিত্র, তার বিস্তার বহু। আমার সে গান তোমাদের ভাটিয়ালীর মত মধুর হয় নি এবং সরলও হয় নি—তা না হলে আজ আমার এ অবস্থা কেন—এ গানে অনেক কমসুরা, অনেক বেসুরা। সে গানের রেকর্ড তুমি এক মিনিটে বাজাতে গেলে আরো বেসুরা ঠেকবে, আমার প্রতি অবিচার করা হবে।

অ্যাক্স্‌-আঁ-প্রভাঁসের একটি ছোট্ট গির্জেয় যেদিন আমাদের বিয়ে হয়, সেদিন বিধাতা ছিলেন আমাদের উপর অপ্রসন্ন। পুরোত যখন ভগবানের নামে একে অন্যকে স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে দিচ্ছেন, তখন বাইরে ভগবান ছাড়ছিলেন তাঁর হুঙ্কার—বৃষ্টি ঝড় আর বজ্রপাতের ভিতর দিয়ে। অ্যাক্স্‌

সেদিন যেন প্রথম আষাঢ়ে মধুগঞ্জ যে রুদ্র রূপ নেয় তাই নিয়েছিল। আমি যখন মেব্‌লকে বিয়ের আঙটি পরাচ্ছিলুম ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎ চমকে উঠে গির্জের সমস্ত রঙীন শার্সিগুলোতে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। মেব্‌ল্ তখন শিউরে উঠেছিল। আমি তার হাতে একটু চাপ দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করেছিলুম। পুরোত যখন গভীর কণ্ঠে গির্জাতে সেই গতানুগতিক প্রশ্ন শুধালেন, এই যুবক-যুবতীর মিলনে কারো কোনো আপত্তি আছে কি না, তখন কড়কড় করে বাজ পড়েছিল—আরেকটু হলে গির্জের গাম্ভীর্য ভুলে গিয়ে মেব্‌ল্ আমাকে জড়িয়ে ধরত। মেব্‌ল বড় ধর্মভীরু, আকাশে বাতাসে, ঘাসে ঘাসে সে ভগবানের অদৃশ্য অঙ্গুলি দেখতে পায়। আমি তার হাতে আরো একটু চাপ দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করেছিলুম।

সেদিন কিন্তু এ-সব দুর্যোগ আমার মনে কোনো দাগ কাটে নি। সেদিনের সে দুর্যোগে আমি ভগবানের করাঙ্গুলিসঙ্কেত দেখি নি, আজও দেখছি নে কিন্তু কেন জানি নে আজ যেন সমস্ত জিনিসটা এক ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে আমার কাছে ধরা পড়েছে। দিনের আলোতে যে মাঠে ফুল কুড়িয়েছি, যে ঝরনায় পা ডুবিয়ে বসে ক্লান্তি জুড়িয়েছি, সন্ধ্যের অন্ধকারে সেখানে যেন প্রতি গর্তে কেউটের ফণা দেখতে পাচ্ছি। কী জানি, সব যেন ঘুলিয়ে গিয়েছে। কতবার ভেবেছি এ-সব কথা। কখনো এ-সব এলোমেলো চিন্তা পাট করে ভাঁজে ফেলে গুছিয়ে তুলতে পারি নি।

সে রাত্রে আবেগে, উত্তেজনায় মেব্‌ল্ আমার বুকে তার মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। কান্নার সঙ্গে সঙ্গে তার ঢেউ-খেলানো শরীরে যেন আরেক ধরনের ঢেউয়ের পর ঢেউ জেগে উঠেছিল। আমার হাত ছিল তার কোমরের উপর। আমি আমার হাত দিয়ে তার বিক্ষোভ শান্ত করার চেষ্টা করেছিলুম। চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি, এ দু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান সঞ্চয় হয় বেশি, রসগ্রহণ করা যায় কম। স্পর্শের মাধ্যমে পাওয়া যায় রস—অনুভূতি জ্ঞান যেটুকু সঞ্চয় হয় তা নগণ্য। স্পর্শের নিবিড়তা রসলোকে গভীরতম। সে মানুষকে একে অন্যের যত কাছে টেনে আনতে পারে অন্য কোনো ইন্দ্রিয় তা পারে না। চোখ দিয়ে যখন প্রিয়াকে দেখি কান দিয়ে যখন শুনি তার প্রেম নিবেদন, তখন সর্বচৈতন্য ভরে ওঠে এক বিপুল মাধুরীতে কিন্তু চুম্বনের ভিতর যখন তার স্পর্শলাভ করি তখন পাই গভীরতম একাত্মবোধ। বরঞ্চ চুম্বনেরও সীমা আছে, সেখানেও ক্লান্তি আছে ; কিন্তু গায়ে হাত বুলনোর কোনো সীমাবন্ধন নেই। তাই মায়ের গভীরতম ভালোবাসার প্রকাশ পুত্রের

গাত্রস্পর্শে। আরেকটু সাদামাঠা ভাষায় বলি, তোমাদেরই ভাষায়, মিঠে কথায় চিঁড়ে ভেজে না—তাতে দিতে হয় জল আর গুড়ের স্পর্শসুখ।

একটু চেষ্টা করলে হয়তো স্মরণ করতে পারবে ঠিক ঐ সময় মধুগঞ্জ অঞ্চলে হঠাৎ স্বদেশী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কর্তারা বিচলিত হয়ে আমাকে তার করেন, তদ্দণ্ডেই ছুটি বাতিল করে কর্মস্থলে ফিরে আসতে। সে তার লণ্ডন, প্যারিস বহু জায়গায় বিস্তর গুত্তা খেয়ে শেষটায় এসে পৌঁছয় অ্যাক্স্-আঁ-প্রভাঁসে আমাদের বিয়ের পরদিন ভোরবেলায়। তৎক্ষণাৎ ছুট দিতে হল মার্সেলেস বন্দরের দিকে।

মার্সেলেস বন্দরে জাহাজ ধরা আমাদের মধুগঞ্জের বাজার-ঘাটে নৌকো ধরার মতো। সেখানে দুনিয়ায় জাত-বেজাতের জাহাজ—এমন কি গ্রীক, মিশরী, তুর্কী পর্যন্ত—খেয়া নৌকার মতো বসে থাকে এবং সেখানে দিব্যি দরদস্তুর করা যায়, কত দামে তোমাকে ভূমধ্যসাগরের খেয়া পার করে পোর্ট সঈদ নিয়ে যাবে—মধুগঞ্জের ঘাটে যেরকম দর-কষাকষি করি। মার্সেলেসে ভারতগামী বড় জাহাজ না পেলে পোর্ট সঈদে গিয়ে সেখান থেকে অনায়াসে অন্য জাহাজ ধরা যায়—ঐ খাড়ি দিয়েই তো সব জাহাজকে বোম্বাই, কলম্ব যেতে হয়।

আমাদের কপাল ভালো না মন্দ বলতে পারব না; কোনো ভালো ব্যবস্থাই করতে পারলুম না। শেষটায় একটা মাল-জাহাজ জুটে গেল, সেটাই দেখলুম হিন্দুস্থান পৌঁছবে সক্কলের আগে, কারণ ছাড়বে ঘণ্টা তিনেক পরেই। তবে অসুবিধে এই যে, আমাদের নিজেদের জন্য কোনো কেবিন আর তাতে খালি নেই। আমাকে ঢুকতে হবে একটা পুরুষদের কেবিনে, আর মেব্‌ল্‌কে একটা মেয়েদের। একেবারে ভারতীয় ব্যবস্থা। মর্দানা জানানা।

মেব্‌ল্‌ খুঁত-খুঁত করেছিল।

আমি হেসে বলেছিলুম, যে দেশে যাচ্ছ সেখানে ঠিক এই ব্যবস্থা। বিলেতে স্মোকিং, নন্‌-স্মোকিং। ওদেশে লেডিজ এবং জেণ্টল্‌মেন।

আমার মনে হয়েছিল, ভালোই হল, তাড়াতাড়ির কী?

ছোট জাহাজের এক কোণে, নিভৃতে, গুটনো দড়াদড়ির মাঝখানে আমরা দুজনায় পাশাপাশি বসতুম। সমুদ্রের উদ্দাম হাওয়া মেব্‌লের চুল নিয়ে হুলস্থুল বাধাত, কখনো খানিকটে নোনা জলের সূক্ষ্ম কণা তার গালে চুমো খেয়ে যেত, কখনো বা সমুদ্রের চাঁদের জোয়ালো আলো এসে তার মুখ অদ্ভুত দীপ্তিতে উজ্জ্বল

করে তুলত। রাত একটা, দুটো, তিনটে বেজে যেত। একে অন্যের অবিচ্ছিন্ন সঙ্গসুখ বর্জন করে কেউই আপন কেবিনে যেতে রাজী হতুম না। কী হবে কেবিনে গিয়ে। সেখানে তো শুধু ঘুমের অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো অনুভূতি নেই। এখানে সমুদ্র-আকাশ, আলো-অন্ধকার, চন্দ্র-তারা তাদের কত অফুরন্ত সৌন্দর্য রাত্রির পর রাত্রি উছলে ঢেলে দিচ্ছে। কেউ দেখবার নেই। এই বিরাট সমুদ্রের ক ইঞ্চি জায়গা জুড়ে আছে ক-খানা জাহাজ? এবং সেই কটি জাহাজে সুষুপ্তিতে নিমগ্ন না হয়ে এ সৌন্দর্য পান করছে কটি নরনারী? আমিও এ সৌন্দর্য এ রকম ভাবে, তার পরিপূর্ণরূপে, ক্রমবর্ধমান গতিতে আগে কখনো দেখি নি। এর পূর্বে যে একবার এসেছি গিয়েছি তখন বেশির ভাগ সময় কেটেছে লাউঞ্জে তাস খেলে, 'বারে' হুইস্কি খেয়ে, কিংবা কেবিনে নাক ডাকিয়ে। 'বার' থেকে শেষ গেলাস খেয়ে কেবিনে যাবার সময় ডেকে দাঁড়িয়ে হয়তো দু-পাঁচ মিনিটের জন্য টুরিস্টদের মতো 'ও হাউ গ্র্যাণ্ড' বলেছি। পাকা ইংরেজ পাঁচজনের সামনে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনেকক্ষণ ধরে দেখবার সাহস ধরে না—পাছে লোকে ভাবে লোকটা হয়তো কবি। 'ওয়াট? দ্যাট চ্যাপি রাইটস্ পোয়েম্স্? গশ্! ওয়া(ট)ফ(র)! মাই গিনেস্ (গুডনেস্)!' তার উপর আমি—অব অল পার্সন্স্—পুলিসের লোক!

আমরা জাহাজে উঠেছিলুম কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে আর বোম্বায়ে নামি পূর্ণিমাতে।

এখানে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল, সোম, কিছু মনে কোরো না, সেটা যদি উল্লেখ করি। এর সঙ্গে আমার মূল বক্তব্যের কোনো যোগ নেই। তোমার মনে আছে কি না জানি নে, মধুগঞ্জে তোমার সঙ্গে পরিচয়ের দুদিন পরেই তুমি কথায় কথায় বলেছিলে, 'পরশু তো পূর্ণিমা, সমস্ত রাত নৌকো বাওয়া যাবে।' আমি তখন কিছু বলি নি। পরে দেখলুম, শুধু তুমি না, তোমাদের দেশের আর সবাইও চাঁদের বাড়া-কমা সম্বন্ধে সব সময়েই সচেতন। আমরা কেন অচেতন থাকি তার কারণ আমাদের দেশে বারো মাস যে কোন রাত্রে বৃষ্টি, ঝড় হতে পারে, শীতকালে বরফ, আর কুয়াশা তো লেগেই আছে চার শ পঁয়ষট্টি দিন—ইচ্ছে করেই চার শ বললুম। ওখানে কে হিসেব রাখে চাঁদ রাতের বেলায় কখন যায়, কখন আসে, মাজা-ঘষা কাঁসার থালার মতো ঝকঝক করে, না নরুনে কাটা নখের মতো আকাশ থেকে কেটে পড়ে গাছের ডগায় আটকে থাকে।

ভারতবর্ষের চাঁদকে না চিনে মফস্বলে কোন্ পুলিস ঠিকঠিক কাজ করতে পারে? পূর্ণিমাতে চুরির এলাকায় মোতায়েন করলে আধা ডজন পুলিস,

অমাবস্যায় তিনটে! একমাত্র বর্ষাকালেই আগেভাগে কিছু ঠিক করা যায় না। বিলেতে বারোমাস তাই।

কিন্তু আমি চাঁদকে সত্যি চিনতে শিখলুম জাহাজে, মেব্‌লের সঙ্গে। কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে চাঁদ কখন ওঠেন, কতখানি কাত হয়ে ওঠেন আর শুক্লা সপ্তমীতে চাঁদ কখন অস্ত যান, এদিকে কাত হয়ে না ওদিকে কাত হয়ে সে আমি ভালো করে জানলুম জাহাজে, ডেক-চেয়ারে, মেব্‌লের গা ঘেঁষে। ক্লান্তিতে সে বেচারী চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়ত, তবু কেবিনে ঘুমুতে যাবে না। আমি ডেক-চেয়ারে ঘুমুতে পারি নে তাতে কিন্তু আমার কোনো ক্ষোভ ছিল না।

১৭ই আগস্ট

ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে প্রচ্যের প্রথম পরিচয় হয় পোর্ট সঈদে।

পোর্ট সঈদের সঙ্গে গোটা মিশরের অতি অল্পই যোগসূত্র। তাই পোর্ট সঈদ দেখে মিশর সম্বন্ধে রায় প্রকাশ ভুল। ও-শহরটা জন্মেছে এবং বেঁচে আছে জাহাজ-যাত্রীদের কল্যাণে। এবং জাহাজে যে রকম বহু যাত্রী কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত হয়ে নব নব উল্লাস-উত্তেজনার সন্ধান করে, এখানেও ঠিক তাই। বরঞ্চ বলব বেশি। বরঞ্চ বলব, জাহাজে তুমি কী করলে না করলে তার সন্ধান তবু কেউ কেউ পেয়ে যেতে পারে, এখানে সে বালাই-ই নেই। এখানে তুমি ঘণ্টা পাঁচেক কী করে কাটালে, তার খবর জানবে কে? দেশভ্রমণ বড় ভাল জিনিস—তার 'এক্‌সস্‌ট্‌ পাইপ' দিয়ে মেলা পাপ বেরিয়ে যায়।

পোর্ট সঈদের পাপ লুকিয়ে রাখা যায় না। মেব্‌লের চোখে পর্যন্ত তার অভদ্র ইঙ্গিত খোঁচা মেরেছিল—যদিও আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নি, ও যেন সামান্য দু-একটা কেনাকাটা করে, আর গোটা দুই মসজিদ দেখেই জাহাজে ফেরে।

শেষটায় মেব্‌লকে বললুম, ও যে-দেশে যাচ্ছে, সেখানকার লোক লাঞ্চ, ডিনার আরম্ভ করে তেতো জিনিস দিয়ে। প্রাচ্যের সঙ্গে মোলাকাত-দাওয়াতের আরম্ভেই পোর্ট সঈদের উচ্ছেভাজা, যদিও অনেক বুড়বক্‌দের কাছে সেই বস্তুই ক্রিসমাসকেক্‌ লেডি ক্যানিং বলে মনে হয়।

পোর্ট সঈদ মিশরের প্রতীক নয়, বোম্বাইকে বরঞ্চ ভারতবর্ষের শহর বলা চলে। তাই যখন বোম্বাই দেখে মেব্‌ল খুশি হলো, তখন আমার ভয়-ভাবনা অনেকখানি কেটে গেল। যদিও সে বেচারী বোম্বাইয়ের রাস্তায় হাতি সাপ আর গৌরীশঙ্করের জন্য এদিক-ওদিক তাকিয়ে, দেখতে না পেয়ে একটু মন-মরা হয়েছিল বৈকি!

বোম্বাইয়ে নেমেই ধরতে হল কলকাতার মেল। সেখানে নেমে তড়িঘড়ি ফের শেয়ালদা—গোয়ালন্দ-চাঁদপুর হয়ে মধুগঞ্জে। মেব্‌ল্‌ অভিভূতের মতো গাড়িতে জানালার কাছে বসে, গোয়ালন্দী জাহাজে ডেক-চেয়ারে খাড়া হয়ে দুচোখ দিয়ে বাইরের দৃশ্য যেন গিলছিল। তার কাছে সবই নূতন, সবই বিচিত্র। তার আনন্দে কিন্তু কাঁটা ফোটাত তোমাদের দেশের দারিদ্র্য। স্টেশনে স্টেশনে ভিখিরি দেখে দেখে শেষটায় বেচারী অন্য দিকে মুখ ফেরাত। বরঞ্চ আমি আয়ারল্যাণ্ডের ছেলে, ইংরেজ রাজত্বের ফলে আমার দেশে কী হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমি কিছুটা সচেতন, কিন্তু লণ্ডনের মেয়ে মেব্‌ল্‌ এ-সব জানবে কী করে? আবার সব দারিদ্র্যের জন্য কেবল ইংরেজই দায়ী, এই সহজ সমাধানই বা তাকে বলি কী প্রকারে? ভাবলুম, মেব্‌ল্‌ বোকা মেয়ে নয়, নিজের থেকেই আস্তে আস্তে সবকিছু বুঝে নেবে।

মধুগঞ্জ আর আমাদের বাঙলোটি দেখে মেব্‌ল্‌ মুগ্ধ—ঠিক একদিন আমি যে রকম মুগ্ধ হয়েছিলুম। আম, জাম, নিম, লিচু গাছের কোনোটাই সে কখনো দেখে নি। খানার টেবিলে যে-সব ফল রাখা হল, তারও সব কটাই তার অজানা। 'কারি' যে এক নয়, দশ-বিশ রকমের হয়, সে কথা মধুগঞ্জে এসে প্রথম শুনল। এ-সব দেখে শুনে মেব্‌লের বিশ্বাস হল, অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডার-ল্যাণ্ডে ওয়াণ্ডার করবার মতো কিছুই নেই।

এ-সব জিনিস তোমাকে এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলছি কেন সোম? একটু পরেই বুঝতে পারবে।

অ্যাক্‌স্‌-আঁ-প্রঁভাস ছাড়ার পর মধুগঞ্জে এসেই আমাদের সত্যকার হনিমুন আরম্ভ হল। হনিমুন! হায় ভগবান, না শয়তান—কাকে ডাকব?

এক মাস ধরে প্রতি রাত্রে যে মর্মান্তিক সত্য আমার সর্বাঙ্গে চাবুক মেরে গেল, তার মূল ট্রাজেডি—আমি নির্বীর্য—ইম্পোটেণ্ট। মেব্‌লকে যৌনতৃপ্তি দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

কথাটা কত সহজে বলা হয়ে গেল। এ রকম সহজ কথা শোনা তোমার আমার দুজনেরই অভ্যাস—পুলিসের লোক হিসেবে। জজ কত সহজ সরল ভাষায় আসামীকে বলেন, 'তাই তোমার ফাঁসি।' কিন্তু সে কি তখন তার পূর্ণ অর্থ বুঝতে পারে? পরেও কি পারে? এর অর্থ তাকে বুঝতে হয় প্রাণ দিয়ে এবং প্রাণ দেবার পর বোঝাবুঝির রইলই বা কী?

আমি ইম্পোটেণ্ট। রায়টা কত সহজ। কিন্তু এর সম্পূর্ণ অর্থ আমি এখনো বুঝি নি। দিনে দিনে পলে পলে পদাঘাত খেয়ে খেয়ে যেটুকু বুঝতে

পেয়েছি সে জিনিস আমি তোমাকে কিংবা এ সংসারের অন্য কাউকে বোঝাব কী করে? আমার যেদিন ফাঁসি হবে সেদিন আমি বোঝাবুঝির বাইরে চলে যাব বটে, কিন্তু তোমরা হয়তো সেই দিনই খানিকটে বুঝতে পারবে।

পনেরো দিন পরে তাই আমি কলকাতা গিয়েছিলুম, ডাক্তারদের কাছে। তাঁরা অনেক পরীক্ষা করে যা বললেন সেটাও অতি সহজ। নিজের থেকে যদি না সারে তবে ওষুধপত্রে কিছু হবে না। কলকাতার ডাক্তারদের হাইকোর্টে আমার মৃত্যুদণ্ড বহাল রইল।

ফিরে এসে যখন শুনলুম তুমি রটিয়েছ আমি কলকাতা গিয়েছি সরকারী কাজে তখনই বুঝতে পারলুম, তোমার আনক্যানি ষষ্ঠবুদ্ধি দিয়ে তুমি বুঝতে পেরেছ যে, কিছু একটা হয়েছে এবং আর পাঁচজন যেন তার কোনো ইঙ্গিত না পায়—তাই ও গুজবটা রটিয়েছ। থ্যাঙ্কস্।

এত সরল জিনিস, কিন্তু আমার কাছে এখনো এটা রহস্য।

আমি দেখতে ভাল, সৌন্দর্যবোধ আমার আছে, আমি প্রাণবান পুরুষ, আমার স্বাস্থ্য ভালো, আবার জোর দিয়ে বলছি, সোম, আমার মতো স্বাস্থ্য পৃথিবীর কম লোকই পেয়েছে, আমার অর্থের অভাব নেই, বিলাসেও আমার ঝোঁক নেই, পাঁচজনের তুলনায় আমাকে বোকা বলা যেতে পারে না, এবং সব চেয়ে বড় কথা মেব্‌লের মতো সুন্দরী, প্রেমময়ী রমণী আমি পেয়েছি প্রিয়ারূপে পত্নীরূপে, সে আমাকে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালোবাসে, আমাকে সে হৃদয় দিয়ে বরণ করে নিয়েছে—

এই পরিপাটি প্যাটার্নটি বোনার পর ভগবানের এ কি নিষ্ঠুর ঠাট্টা না শয়তানের অট্টহাসি! এই পার্ফেক্ট প্যাটার্নটির উপর কে যেন ছড়িয়ে দিলে নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করে তার তাজা রক্ত। তোমাদের ভাষায় বলতে হলে, সুন্দর দুর্গাপ্রতিমা বহু যত্নে তৈরি করার পর তার উপর কে যেন ছিটিয়ে দিলে গোরক্ত। মর্মর মসজিদের মেহরাবে না-পাক শুয়রের খুন!

কেন, কেন, কেন?

আমি কোনো উত্তর পাই নি।

অনেক ভেবেছি। অনেক ভেবেছি বললে অল্পই বলা হল। আট বছর ধরে ঐ একটি কথাই ভেবেছি বললে ভুল বলা হবে না। কাজকর্মে লিপ্ত থাকার সময় আমার চেতন মন এ সমস্যা ভুলে যেত সত্য, কিন্তু হাতের কাজ শেষ হওয়া মাত্রই মন আবার সেই প্রশ্নে ডুব মারত। এখনো মারে। আমার এ জীবন-চৈতন্যের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার মন ঐ কথাই ভাববে। আমি শেষ

দিন পর্যন্ত ইডিয়ট ইস্বেসাইলের মতো খাদ্য শুধু চিবিয়েই যাব, কখনো গিলতে পারব না। এই যে পাঁচ লক্ষ ক্যাণ্ডল-লাইটের জোর সার্চলাইট আমার চোখের উপর জ্বলছে সেটাকে কখনো সুইচ্-অফ্ করতে পারব না।

নিরাশ হয়ে আমি এক বৎসর ধরে অনেক ধর্মগ্রন্থ পড়েছি। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি নি। সব ধর্মই দেখি সন্ধান করে একই বস্তু—তার নাম স্যালভেশন, মোক্ষ, নির্বাণ, নজাত। কিন্তু আমি তো স্যালভেশন চাইছি নে! আট বছরের বাচ্চা কি সুন্দরী কামনা করে?

তোমরা অর্থাৎ প্রাচ্যের লোকই তাবৎ ধর্ম বানিয়েছ। আমরা পশ্চিমের লোক, কী এক অদ্ভুত যোগাযোগের ফলে তারই একটা, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছি। কিন্তু মনে হয়, স্যালভেশন জিনিসটের প্রতি আমাদের ক্ষুধা নেই বলে আমরা ধর্মটা নিয়েও নিই নি। তা না হলে এদিকে বলছি, কেউ ডান গালে চড় মারলে বাঁ গাল এগিয়ে দেবে, ওদিকে দেখো জর্মনদের মারার জন্য আমরা শত শত কৌশল বের করছি, লক্ষ লক্ষ লোক মারছি। শুধু কি তাই? 'ডান গালে চড় মারলে বাঁ গাল এগিয়ে দেবে', এ ধর্মে যে লোক বিশ্বাস করে না তাকে এটা গেলাবার জন্য কত শার্লমেন, কত পোপ কত লোককে মেরেছে! পাদ্রী-টিলার বুড়ো জোন্‌কে বাদ দাও। বাদবাকি মিশনারিরা কী করছে? অসহায় নিরুপায় নিগ্রোদের জীবন অতিষ্ঠ করে তাদের ক্রীশ্চান বানাচ্ছে।

শুধু একটা ধর্মে আমি কিছুটা হদিস পেয়েছি। এবং আশ্চর্য সে ধর্মে আজ পৃথিবীতে বিশ্বাস করে বড জোর দশ লক্ষ লোক। পার্সীদের ধর্ম, জরথুস্ত্রী ধর্ম।

জরথুস্ত্র বলেন, সৃষ্টির প্রথম থেকেই আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব। আলোর প্রতীক আহুর মজদা—আমাদের ভাষায় ভগবান—আর অন্ধকারের প্রতীক আহির মন—আমাদের ভাষায় শয়তান। জরথুস্ত্রীদের মতে যারা আহুর মজদার পক্ষে তাদের বিশ্বাস, শেষ পর্যন্ত এ যুদ্ধে জয়ী হবেন তিনিই। আহির মন আহুর মজদার সঙ্গে পেরে উঠবে না।

সংসারে যা কিছু সত্য শিব সুন্দর—তা আহুর মজদার সৃষ্টি, আর যত কিছু মিথ্যা, অমঙ্গল, কদর্য—তা আহির মনের।

তবে কোন্ সুস্থ মানুষ এই শয়তানের পক্ষ নেবে?

সেই তো মজা সোম, সেই তো মজা।

দেখো নি, এ সংসারে উন্নতির জন্য, স্বার্থের খাতিরে মানুষ কতখানি মিথ্যাচারী, ক্রূর, মিত্রঘ্ন হয়। আমরা পুলিসের লোক, আমাদের বিশ্বাস এই ধরনের

লোকই পৃথিবীতে বেশি। এরা মুখে ভগবান আহুর মজদাকে মানে, পূজো চড়ায়, শিরনি বিলোয়, গির্জাতে মা-মেরির সামনে মোমবাতি জ্বালে, কিন্তু আসলে কি এরা আহির মনকেই জীবনদেবতারূপে বরণ করে নেয় নি? আপন জানা-অজানায় এরা কি মেনে নেয় নি যে—সুদূর ভবিষ্যতে যা হবার হবে, মজদা জিতুন আর মনই জিতুন, আমার এ জীবনকালে যখন দেখতে পাচ্ছি ক্রূর কঠিন মিথ্যাচারী না হয়ে আমি সাংসারিক উন্নতি করতে পারব না তখন আর গত্যন্তর কী?

এদের সবাইকে আমি দোষ দিই নে, সোম। কাচ্চা-বাচ্চা রয়েছে, তাদের খাওয়াতে পরাতে হবে, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধবের কাছে, বিশেষ করে স্ত্রীর কাছে—যে তোমাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে বসে আছে—, প্রতিদিন মাথা হেঁট করে স্বীকার করা যে আমি জীবনযুদ্ধে হেরেই চলেছি! কে শুনতে চায় সত্যা-বলম্বন করে কিংবা না করে—এ কর্ম কি সহজ?

তবেই দেখো সোম, পৃথিবীতে অধিকাংশ লোকই এ যাবৎ কার্যত স্বীকার করে নিয়েছে যে, উপস্থিত আহির মনই শক্তিশালী, তাকে না মেনে উপায় নেই। এমন কি তাদের একটা 'বনাফাইডি' 'ডিপেন্‌স্‌' পর্যন্ত রয়েছে। শেষ বিচারের দিন যখন আহুর মজদা এদের শুধাবেন, 'তোমরা আহির মনের পক্ষ নিয়েছিলে কেন?' উত্তরে তারা ক্ষীণকণ্ঠে বলবে—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তখন তিনিই শক্তিমান—'তখন, হুজুর, তিনিই ছিলেন শক্তিশালী, তাঁকে না মেনে উপায় ছিল কি?' এটা কি খুব সদুত্তর? কেন ভেবে দেখো, গ্রামের জুলুমবাজ জমিদারের ভয়ে যখন প্রজারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তখন তুমি কি সব সময় "ধর্মের শোলোক্‌" কপচাও?'

কিন্তু আমার জীবনে এ দর্শনের প্রয়োগ কোথায়?

পৃথিবীর সর্বত্র প্রাচীন শাস্ত্রেই আছে, অতি পূর্বযুগে নাকি একবার এক বিরাট বন্যা হয়েছিল; প্রাচীন আসিরীয় বাবিলনীয় প্রস্তরগাত্রে সে ঘটনার কথা খোদাই করা আছে, বাইবেলে তার বর্ণনা আছে, তোমাদের শাস্ত্রেও আছে কেশব তখন মীন-শরীর ধরে বেদ বাঁচিয়েছিলন, অর্থাৎ সে বন্যায় তোমাদের সভ্যতা সংস্কৃতি ভেসে যায় নি, কোনো এক মহাপুরুষ তার শ্রেষ্ঠতম জিনিস বাঁচাতে পেরেছিলেন।

এই বন্যা নিয়ে একটি আধা-খ্রীশ্চানী আধা-মুসলমানী গল্প আছে।

সেই বন্যা আসার পূর্বে জেহোভা তখনকার দিনের পয়গম্বর নূহকে ডেকে বললেন, বন্যায় সব ভেসে যাবে, তুমি একটা নৌকো বানিয়ে তাতে পৃথিবীর সব গাছ, ফুলের বীজ এবং যত প্রকারের প্রাণী এক-এক-জোড়া করে রেখো। বন্যায়

পর তাই দিয়ে পৃথিবী আবার আবাদ করবে। সাবধান, কিছু যেন খোয়া না যায়।

নূহ তাই করলেন, কিন্তু বন্যার পর দেখেন কী, ইঁদুরে তাঁর আঙুরের বীজ খেয়ে ফেলেছে। আঙুর ফলের রাজা। গোঁজামিল দিয়ে সে ফলটা হারিয়ে যাওয়ার কেচ্ছা তিনি চাপা দিতে পারবেন না। ভারি বিপদে পড়লেন।

ওদিকে কিন্তু হুঁশিয়ার শয়তানও সব মাল এক-এক প্রস্ত করে রেখেছিল। সে তখন নূহকে তার বাঁচানো আঙুরের বীজ দেবার প্রস্তাব করলে—তার বীজ তো আর ইঁদুর শয়তানি করে খেতে পারে না—অবশ্য কুমলতব নিয়ে। নূহের মনেও ধোঁকা ছিল, কিন্তু তিনি তখন নিরুপায়—বে-আঙুর দুনিয়া নিয়ে তিনি আল্লাকে মুখ দেখাবেন কী করে?

পৃথিবীর জমিতে শয়তানের স্বত্ব নেই। তাই শর্ত হল, নূহ দেবেন জমি, শয়তান দেবে আঙুরের বীজ। গাছের তদারকিও ৫০-৫০।

নূহ তো যত্ন করে সকাল সন্ধ্যা চারার গোড়ায় ঢালেন সুমিষ্ট, সুগন্ধি বসরাই গোলাপজল আর শয়তান ঢালে গোপনে গোপনে না-পাক শুয়রের রক্ত।

নূহের পাক পানির ফলে, ফলে উঠল মিষ্টি আঙুর ফল। আঙুরের মতো ফল পৃথিবীতে আর নেই। কিন্তু শয়তান যে দিয়েছিল না-পাক চীজ; তারই ফলে আঙুর পচিয়ে তৈরী হয় মদ। সেই মদ খেয়ে মানুষ করে মাতলামো, যত রকমের জঘন্য পাপ।

আহুর মজদা আমার জীবনের প্যাটার্ন গড়েছিলেন অতি যত্নে, ভালো কোনো রঙই তিনি সে প্যাটার্নে বাদ দেন নি, সে কথা তোমাকে পূর্বেই বলেছি।

আহির মন আড়ালে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। সে তার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন। প্যাটার্ন যখন শেষ হবার উপক্রম তখন সে তার ভিতর ছেড়ে দিল মাত্র একটি পোকা, এক রাত্রেই প্যাটার্ন কুটিকুটি হয়ে গেল।

বিশ্বকর্মা তিন ভুবনের সুন্দর সুন্দর জিনিস নিয়ে তিলে তিলে গড়লেন অনবদ্যা তিলোত্তমা। আহির মন তার রক্তে ঢেলে দিল গলিত কুষ্ঠের ব্যাধি।

এ প্যাটার্ন রিপু-করা, এ গলিত কুষ্ঠকে নিরাময় করা আহুর মজদার মুরদের বাইরে।

১৮ই আগস্ট

যৌবনে বেঁচে থাকার আনন্দেই (জোয়া দ্য ভিভ্র্) মানুষ এত মত্ত থাকে যে, মোক্ষের সন্ধান সে করে না। শেলি না কে যেন বলেছেন,

I have drunk deep of joy
And I will taste on other wine to-night.

যখন মানুষ সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়, অথবা যখন বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে ভয় পায় তখনই সে ও-সব জিনিস খোঁজে। এ-কথা শুধু ব্যক্তির পক্ষে সত্য নয়, গোটা জাতির পক্ষেও খাটে। তোমাদের জাতি যে কত পুরনো সেটা শুধু এই তত্ত্ব থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে তোমরা মোক্ষের অনুসন্ধান আরম্ভ করেছ খ্রীষ্ট-জন্মের পাঁচ শ কিংবা হাজার বছর পূর্বে। মুসলমানরা করল খ্রীষ্ট-জন্মের প্রায় ছ শ বছর পরে। তাই দেখো, এই মধুগঞ্জের মুসলমানরাই তোমাদের তুলনায় ফুর্তি-ফার্তি করে বেশি ; কামায় টাকাটা, খর্চা করে পাঁচসিকে।

আইরিশম্যানদের কাছেও মোক্ষ-সন্ধান এসেছে সম্প্রতি—তাও পাঁচহাত হয়ে, ঘষা-মাজা খেয়ে। তাই আমার জীবনে না ছিল মোক্ষ-সন্ধানের জাতীয় ঐতিহ্য, না ছিল কণামাত্র ব্যক্তিগত প্রয়োজন। যে সব ধর্মের কথা এসে যাচ্ছে সেগুলোর অনুসন্ধান আমি করেছি আহির মনের মার খেয়ে। এবং যে সব মীমাংসায় পৌঁছেছি (তার কটা সম্বন্ধেই বা আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ?—সম্পূর্ণ সত্য তো ভগবানের হাতে, মানুষের চেষ্টা তো ক্রমাগত যতদূর সম্ভব কাছে আসবার—) সেগুলো মাত্র কিছুদিন হল।

তাই আমার এ 'জবানবন্দিতে' আহুর মজদা, আহির মনের কথা আসা উচিত ছিল হয়তো সর্বশেষে। কিন্তু তা-ই বা বলি কি করে ? আমরা ইতিহাস লিখি ক্রনোলজিকালি—কোন্ ঘটনা আগে ঘটেছিল, কোন্‌টা পরে সেই অনুযায়ী। কিন্তু অভিধান লেখার সময় অ্যালফাবেটিকালি ; যে শব্দ পৃথিবীতে প্রথম জন্ম নিয়েছিল সেইটে দিয়েই আমরা অভিধান লেখা আরম্ভ করি নে। আমার জীবন অভিধান তো নয়ই, ইতিহাসও নয়। আমি মরে যাওয়ার পর আমার জীবন তোমার কাছে ইতিহাসের রূপ নেবে। ইতিহাসের বর্তমান থাকে না, ভবিষ্যৎ নেই, তার আছে শুধু ভূত। আমি বেঁচে আছি, কাজেই আমার ভবিষ্যৎ আছে, কিন্তু সে থেকেও নেই আর ভূত আর বর্তমান এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছে যে, তার জট ছাড়িয়ে পাকাপাকি কালানুক্রমিকভাবে সব কিছু বলতে পারব না।

আহির মনকে স্বীকার করে আমি অধর্ম করেছি ? অধর্ম অন্যায় যাই করে থাকি নে কেন, আমি কিন্তু ভণ্ডামি করি নি। সে-ই আমার সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা। কিন্তু আবার দেখো, আরেক নূতন ভিলেমায় পড়ে গেলুম। আমি যদি ভণ্ডামি ঘৃণা করি তবে আমি আবার আহুর মজদাপন্থী হয়ে গেলুম। ভণ্ডামি

তো আহির মনের, সত্যনিষ্ঠা মজদার। এ দ্বন্দ্বের কি অবসান নেই?

হয়তো আছে হয়তো নেই। তাই হয়তো তখন অন্তরের দ্বন্দ্ব মুলতবী রেখে দেখতে হয় কর্মক্ষেত্রে মানুষ কী করে। সেখানে তো মানুষকে অহরহ ডিসিশন—মীমাংসা, নিষ্পত্তি—করতে হয়। এ সংসারে সকলের ভিতরেই কিছু না কিছু হ্যামলেট লুকিয়ে আছে যে সর্বক্ষণ 'টু বি অর নট টু বি'র সন্দেহ-সমুদ্রে দোদুল দোলায় দোলে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ডন্ কিক্‌সট্‌ও রয়েছে যে ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে, নঙা-তলোয়ার হাতে নিয়ে যাকে তাকে তাড়া লাগায়—আমরা যাকে বলি বার্কস আপ দি রঙ্ ট্রী—যে গাছে বেড়াল ওঠে নি তারই তলায় দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে করতে থাকে ঘেউ-ঘেউ।

বেচারী মেব্‌ল্! সে আমার ডন কিক্‌সট্ রূপটাই চিনত। লণ্ডনে অ্যাক্‌স্-আঁ-প্রভাঁসে কিছুটা ঘটলেই আমি তড়িঘড়ি অ্যাক্‌শন নিয়ে তার একটা সমাধান করে দিতুম। ভুল যে করি নি তা নয়। একটা ঘটনার কথা বলি। অ্যাক্‌সের বনে গিয়েছি মেব্‌ল্‌কে নিয়ে বেড়াতে। হঠাৎ শুনি নারীকণ্ঠে পরিত্রাহি চিৎকার। ছুটে গিয়ে দেখি এক ছোকরা একটা মেয়েকে জাবড়ে ধরে চুমো খাবার চেষ্টা করছে, আর মেয়েটা—বাপরে বাপ সে কী তীক্ষ্ণকণ্ঠ—চেঁচাচ্ছে। আমি ডন কিক্‌সটের মতো ছোঁড়াটার কলার ধরে দিলুম হ্যাঁচকা টান আর গালে গোটা দুই চড়। মেয়েটা আমার দিকে তাকালে। আমি ভাবলুম, সে বুঝি আমার শিভালরির কদর জানাতে গিয়ে আমাকেই চুমো খেয়ে বসবে! কী হল, জান, সোম? মেয়েটা দৃঢ়পদে এগিয়ে এল আমার কাছে। তারপর বলা-নেই কওয়া-নেই, দুহাত দিয়ে ঠাস ঠাস করে মারলে আমার গালে—ছোঁড়াটার গালে নয়, আমার গালে—গণ্ডা পাঁচেক চড়! মোজা বুনুনির স্পীডে। আমি তো বিলকুল বেকুব। তারপর মেয়েটা ছোঁড়াটার হাত ধরে হনহন করে চলে গেল বনের ভিতর।

মেব্‌ল্ শেষ অঙ্কটা দেখতে পেয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে হাসছিল।

কী করে জানব, বলো, কোন্‌টা প্রেমের ন্যাকরামোর চিৎকার আর কোন্‌টা ধর্ষণভীতির সকরুণ আর্তরব! একেই বলে বার্কিঙ আপ দি রঙ্ ট্রী!

সেই আমি কলকাতার ডাক্তারদের শেষ রায় শুনে ফিরে এলুম মধুগঞ্জে। মেব্‌ল্‌কে আদর না করে ঝুপ করে বসে পড়লুম ডেক-চেয়ারে ঘণ্টা তিনেকের তরে। ডন তখন হ্যামলেটের রূপ নিতে আরম্ভ করেছে। মেব্‌ল্ তখন আমার কপালে হাত বুলিয়ে আদর করছিল—আমি সাড়া দিই নি।

সব কথা মেব্‌ল্‌কে খুলে বলার প্রয়োজন হয় নি। কলকাতা থেকে ফিরে

আসার পর আমি তার গাত্র স্পর্শ করছি নে দেখেই সে সমস্ত ব্যাপার নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছিল। পরের দিন ভোরবেলা দেখি, মেব্‌ল্ ঘরে নেই। বারান্দায় পেলুম তাকে, একটা মোড়ার উপর দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসে আছে। আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার সাহস পর্যন্ত করতে পারলুম না।

তোমাদের দেশে নাকি নিষ্কাম প্রেমের আদর্শ আছে। যৌনক্ষুধাকে অবহেলা করে তোমাদের বহুলোক জীবনধারণ করে। আমাদের ক্যাথলিক পাদ্রী আর মিস্টিকরা রমণী-সঙ্গ কামনা করে না, তোমাদের বিধবারা যে রকম যৌনক্ষুধার নিবৃত্তি করে থাকেন। কিন্তু সঙ্গে এঁরা সর্বপ্রকার প্রেমকেও কাঁটার মতো দেহ-মন থেকে তুলে দূরে ফেলে দেন। তাঁদের শুধু লড়তে হয় শারীরিক প্রলোভনের সঙ্গে। আমার বেলা তো তা নয়, আমি ভালবাসতে পারি, বাসিও, কিন্তু শরীর দিয়ে বাসতে পারব না। সেও হয়তো অসম্ভব কঠিন মনে হত না যদি মেব্‌ল্ আর আমি একসঙ্গে প্রতিজ্ঞা করে নিতুম, আমরা আমাদের প্রেম দেহের স্তরে নিয়ে যাব না।

তোমার মনে আছে, সোম, তোমার আমার সামনে আমাদের জেলের একটা ঘটনা? স্বদেশী কয়েদীকে শেষ বিদায় দিতে এসেছে তার স্ত্রী, বাচ্চাকে কোলে করে। বাপ চেয়েছিল ছেলেকে কোলে নিতে, বাচ্চাটাও মায়ের কোল থেকে ঝাঁপ দিচ্ছিল বাপের দিকে। মাঝখানে লোহার জাল।

আমরা দুজনাই সে জায়গা ছেড়ে চলে এসেছিলুম। অবান্তর, তবু যখন সুবাদটা এল তাই বলি, পরে আমার কাছে খবর এল, তুমি নাকি গোপনে তাদের মিলনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলে। খবরটা আমাদের দিয়েছিল জেলার, আরো গোপনে—তোমার বিরুদ্ধে আমাকে তাতানোর জন্য। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল, ব্যাটাকে ধরে হাণ্টার নিয়ে তার ন্যাংটো পাছায় আচ্ছা করে চাবকাই। ভাষাটা একটু অভদ্র হল, না সোম? কিন্তু আমি তখন খুনিয়া রাগের মাথায় যে অভদ্র ভাষা মনে মনে ব্যবহার করেছিলুম তারই হুবহু প্রকাশ দিলুম মাত্র। আহির মনকে মেনে নিয়েও ভণ্ডামি মেনে নিতে পারি নি, সে কথা আমি পূর্বেই বলেছি। সে কথা থাক।

আমার অবস্থা তখন আরো কঠোর। আমার আর মেব্‌লের মাঝখানে যে জাল রয়েছে সেটা একদিন ছিন্ন হয়ে গেলে যেতেও পারে—কলকাতার ডাক্তাররা সেই অতি ক্ষীণ আশাই দিয়েছিল—এবং প্রতিদিন প্রতি রাত্রি সেই আশাই আমাকে মুখ ভেঙচিয়েছে।

নিষ্কাম প্রেমের কথায় ফিরে যাই। কাব্য যদি মানবজীবনের দর্পণ হয় তবে

শুধাই তোমাদের সে দর্পণে নিষ্কাম প্রেমের কতটুকু আভাস মেলে? রায়বাহাদুর কাশীশ্বর আমাকে দিয়েছিলেন দুখানি সংস্কৃত কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ। মেঘদূত আর গীতগোবিন্দ। (পর্নোগ্রাফি আর রিয়েল আর্টের মধ্যে তফাত কী তাই নিয়ে তখন একটা মোকদ্দমা চলছিল; রায়বাহাদুরের মতে মেঘদূত-গীতগোবিন্দ আর্ট আর মিস্ট্রিজ অব দি কোর্ট অব লণ্ডন অশ্লীল, যদিও তাতে শরীরের খুঁটিনাটি বর্ণনা অনেক, অনেক কম)। এ বই দুখানিতে কী নিষ্কাম প্রেমের ছড়াছড়ি? অন্য বইয়ে থাকতে পারে এই ভেবে আমি রায়বাহাদুরের দ্বারস্থ হই। তিনি কবুল জবাব দিয়ে বললেন, 'সংস্কৃতে নিষ্কাম প্রেমের বালাই নেই, সে বস্তু এসেছে মুসলমান আগমনের পর বাঙলা-হিন্দীতে। খুব সম্ভব সুফীদের নিষ্কাম প্রেম থেকে এ বস্তু এ-দেশে পাচার হয়েছে। আমি তা হলে বলব, তোমরা যতদিন ভিরাইল, বীর্যবান ছিলে ততদিন নিষ্কাম প্রেম সম্বন্ধে ছিলে সম্পূর্ণ অচেতন। নিষ্কাম প্রেম অনৈসর্গিক। কিন্তু থাক তোমাদের হিন্দু-শাস্ত্র। আমি ক্রীশ্চানের ছেলে। আমি বরঞ্চ বাইবেলে যাই।

আমি বিলক্ষণ জানি বুড়ো পাদ্রী তোমাকে অনেক বাইবেল উপহার দিয়েছেন, বহুবার তোমাকে বইখানা পড়বার জন্য অনুরোধ করেছেন, কিন্তু তুমি পড় নি। কাজেই যে কটি লাইন তোমাকে শোনাব সেগুলো তুমি আগে কখনো শোন নি।

"How beautiful are thy feet with shoes, O prince's daughter !! The joints of thy thighs are like jewels, the work of the hands of cunning workman.

Thy navel is like a ronnd goblet, which wanteth not liquor : thy belly is like an heap of wheat set about with lilies.

Thy two breasts are like two young rose that are twins.

Thy neck is a tower of ivory ; thine eyes like the fish-pools in Heshbon, by the gate of Bathrabbim : thy nose is as the tower of Lebanon, which looketh toward Damascus.

Thine head upon thee is like Carmel, and the hair of thine head like purple ; the king is held in the galleries.

How fair and how pleasant are thou, O love for delights !

This thy stature is like to a palm tree, and thy breasts to clusters of grapes.

I said, I will go up to the palm tree, I will take hold of the boughs there of : now also thy breasts shall be as clusters of the vine, and the smell of thy nose like apples ;

And the roof of thy mouth like the best wine for my beloved, that goeth down sweetly, causing the lips of those that are asleep to speak.

I am beloved's, and his desire is towards me."

কী গম্ভীর, হাউ সাবলাইম ! পাশবিক যৌনক্ষুধাকে সৃষ্টির কী মহিমময় অনিন্দ্যসুন্দর নন্দন কাননে তুলে নিয়ে গেল তার স্বর্ণপক্ষ দিয়ে এ কবিতা ! এ যৌনক্ষুধা নন্দনের সুধায় সিঞ্চিত না থাকলে এর বর্ষণে ইন্দ্রপুরীর হাসি মুখে মেখে নিয়ে দেবশিশুরা মর্ত্যে অবতীর্ণ হত কী করে ?

বিরাট বাইবেলে এই একটি মাত্র প্রেমের কবিতা ছিটকে এসে পড়েছে। কী করে পড়ল তার সদুত্তর কোনো পণ্ডিত এখনো দিতে পারেন নি। তাই বোধ করি তাঁরা ধমক দিয়ে বলেন, এ প্রেম রূপক-রূপে নিতে হবে, এ প্রেমের সঙ্গে মানব-মানবীর প্রেমের কোনো সম্পর্ক নেই—এ প্রেম নাকি 'দি মিউচেল লাভ অব ক্রাইস্ট্ আণ্ড হিজ্ চার্চ' বর্ণনা করেছে। চার্চের বড় কর্তা স্বয়ং পোপ। এখানে আমি পোপের স্বার্থান্বেষী করাঙ্গুলি-সঙ্কেত দেখতে পাই।

তোমাদের আদিরসাত্মক কামরসে-ঠাসা বৈষ্ণব কবিতাও নাকি শুধু বৈকুণ্ঠের দেবদেবীর জন্য। সেগুলোকেও নাকি প্রতীক হিসেবে নিতে হয়। এখানে কার স্বার্থ লুকোনো আছে জানি নে।

আমি মানি নে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ-সব কবিতা শব্দার্থে নিতে হবে। যৌন সম্পর্ক জীবনের অন্যতম গভীর সত্য। তাকে স্বীকার করে আমাদের কবিরা সত্যকে স্বীকার করেছেন মাত্র। এতে কোনো দুঃসাহস বা মূঢ়তার প্রশ্ন ওঠে না। তোমাদের কোনো মন্দিরে যৌন সম্পর্কের নগ্ন প্রস্তরমূর্তি দেখে কেউ কেউ আশ্চর্য হয়। আমি হই নে। কাব্যে যে সত্য কবিরা অকুণ্ঠ ভাষায় বর্ণনা করে স্বীকৃতি দিয়েছেন, শিল্পী প্রস্তর-গাত্রে সেটা খোদাই করবে না কেন ?

তুমি বলবে, এ-সব গুরুগম্ভীর তত্ত্বের টীকা-টিপ্পনী কাটার কী অধিকার আমার? অধিকার তবে কার? পুরুত-পাণ্ডাদের, পাদ্রী-গোসাঁইদের? কিন্তু ভগবান তো তাঁদের পকেটের ভিতর। এ-সব তত্ত্বে তাঁদের কী প্রয়োজন? গীতগোবিন্দ, বাইবেল এগুলো তো আমার মতো পাপীতাপীদের জন্য সৃষ্ট হয়েছে। যে ভক্ত ভগবানকে পেয়ে গিয়েছেন তিনি মন্দিরে যাবেন কী করতে? মন্দিরে তো যাব আমি। এ-সবের মূল্য যাচাই করব আমি, অর্থ বের করব আমি।

জীবনের এই গভীরতম রহস্যাবৃত সত্যের অত্যন্ত কাছে এসে পড়েছি বলেই কি আহির মন আমাকে এর অনুভূতি থেকে বঞ্চিত করল?

২০শে আগস্ট

পলে পলে তিলে তিলে কত যুগ ধরে আমি কি দহনে দগ্ধ হয়েছি, সে শুধু আমিই জানি। এ দহন কিন্তু সময়ের মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায় না। বেদনা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য তোমাদের সাধকেরা বলেন, বেদনা আসে মনের বট্‌ল্‌নেকের ভিতর দিয়ে, সেই মনকে তুমি যদি আয়ত্তে আনতে পার তবে আর কোনো বেদনা-বোধ থাকবে না। এ-তত্ত্বটা আমি যাচাই করে দেখি নি, কারণ আমার মনে হয়েছে মনের বট্‌ল্‌নেক যদি আমি বন্ধ করে দিয়ে বেদনা-বোধকে থামিয়ে দি, তবে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দবোধের অনুভূতিও আমার চৈতন্যে প্রবেশ করতে পারবে না। তার অর্থ, সর্বপ্রকার অনুভূতি বিবর্জিত হয়ে জড়জগতে ইঁট-পাথরের মতো সুদ্ধমাত্র খানিকটে স্পেস নিয়ে এগসিস্ট করা। তাহলে আত্মহত্যা করলেই হয়। পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিলে গিয়ে যে যার পরিমিত জায়গা দখল করে অস্তিত্ব বজায় রাখবে। তফাত কোথায়?

আমাদের গুণীরা বলেন, হৃদয়-বেদনা ভুলতে হলে কাজের মধ্যে ঝাঁপ দাও। মন তখন কাজে এমনি নিমগ্ন হয়ে যাবে যে অন্য কিছু ভাবতে পারবে না। আমি তাই সেই সময়ে কাজে দিলুম ঝাঁপ। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, আমি হঠাৎ কী রকম আমার এলাকার খুন-খারাবির আদমশুমারি নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছিলুম, এলাকার বিরাট ম্যাপ তৈরী করে বদমায়েশির জায়গাগুলোতে চক্কর কেটে কেটে তার কেন্দ্রস্থলের বদমায়েশকে ধরবার চেষ্টা করেছিলুম; দাগী আসামী জেল থেকে খালাস পেলেই তার গ্রামকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকের গ্রামের চুরি-চামারির সংখ্যা বেড়ে যাওয়া থেকে তোমাদের কাছে সপ্রমাণ করলুম, ঘড়েল বদমাইশ আপন গাঁয়ে বদ-কাজ করে না।

তাতে করে শুধু তোমাদের অতিষ্ঠ করে তোলা হয়েছিল। আমার কোনো

লাভ হয় নি।-

কাজের ভিতর সমস্ত দিন তুমি যে বেদনা-বোধকে বাঁধ দিয়ে আটকে রেখে ভাবলে বেঁচে গেছ, সে তখন কাজের অবসানে তোমার সকল বাঁধ ভেঙে লণ্ডভণ্ড করে দেয় তোমার সর্ব অস্তিত্বকে। পলে পলে তিলে তিলে দিনভর তুমি যদি তোমার বেদনা-বোধকে নিয়ে পড়ে থাক, তাতে যদি কাজ কিংবা অন্য কোনো কৃত্রিম উপায়ে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা না কর, তবে তার ইনটেন্‌সিটি অনেকখানি কমে যায়। কিন্তু সলমনের বোতলে ভরা জিন্‌ যখন সন্ধ্যায় নিষ্কৃতি পায়, তখন তার বেধড়ক মার থেকে আর কোনো নিষ্কৃতি নেই।

সেই মার খেয়ে খেয়ে এ-পাশ ও-পাশ করে করে—যেন এ-গালে চড় খেয়ে ও পাশ হয়ে শুই, যেন ও-গালে চড় খেয়ে এ-পাশ হয়ে শুই—রাত বারোটায় এল ঘুম। কিন্তু শয়তান তোমায় নিষ্কৃতি দেবে কেন? ঘুম ভেঙে যাবে রাত দুটোয়।

পাশের খাটে মেব্‌ল্‌ শুয়ে। তার সোনালী ঢেউ-খেলানো এলো চুল চাঁদের আলোর সঙ্গে মিশে গিয়ে বালিশের উপর এঁকেছে বিচিত্র নক্সা। তার কপালে ঘামের একটু একটু ভেজার আভাস, চাঁদের আলো তারই উপর সামান্য চিকচিক করছে, বিলের 'ভেট'-ফুলের পাপড়ির উপর এই আলোই আমি অনেকবার দেখেছি, ভাওয়ালির জানলা দিয়ে। মেব্‌লের হাত দুখানি তার শরীরের দুদিকে আলসে লম্বমান হয়ে অর্ধমুষ্টিবদ্ধ যেন দুটি 'ভেট'-ফুলের কুঁড়ি। আর তার সমস্ত কিশোর তনু যেন গাদা করে রাখা শিউলি ফুলের পাপড়ি—হ্যাঁ, মনে পড়ে গেল শিউলি ছিল মেব্‌লের সবচেয়ে প্রিয় ফুল।

এই গরমের দেশে শীতের দেশের মেয়েকে চাঁদের আলোতে কী রকম অদ্ভুত, রহস্যময় দেখাত। আজ যদি হঠাৎ দেখি, আমার লিচুবনের ঘন সবুজের উপর গাদা গাদা বরফ জমেছে, তাহলে যে রকম সমস্ত বাগানখানা এক অবিশ্বাস্য সৌন্দর্যে ভরে উঠবে।

মেব্‌লের এই নিশিকান্ত সৌন্দর্য আমার আত্মার ক্ষুধাকে অনির্বচনীয় তৃপ্তিতে কত শতবার ভরে দিয়েছে। আস্বচ্ছ ফিকে বেগনি রঙের মসলিন নাইট-ড্রেসে জড়ানো মেব্‌লের শরীর আমার কবি-মানসের শুষ্ক মৃৎপাত্রকে অমৃতরসে বার বার ভরে দিয়েছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জ্বালিয়ে দিত আমার সর্ব-ধমনীতে এক অদম্য যৌনক্ষুধা।

মনে আছে, সোম, তুমি আর আমি একদিন মফস্বলের এক গ্রামে নিষ্ক্রিয় ক্রোধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম, সমস্ত গ্রামখানা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল—জল ছিল না বলে আমরা নিষ্ফল আক্রোশে শুধু ছটফট করেছিলুম।

সে আগুন তবু ভালো। নিরন্ন বিধবার শেষ কাঁথাখানা পুড়িয়ে দিয়ে সে আগুন তবু তো তৃপ্ত হল।

আমার এ বহ্নিজ্বালার শেষ নেই। পিরামিডের উপরে দাঁড়িয়ে আমি একদিন গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে সাহারার মরুভূমির দূরদিগন্তের শুষ্ক তৃষ্ণার দিকে তাকিয়েছিলুম, আর তার রুদ্রমূর্তি দেখে ভয়ে ভগবানের নাম পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলুম। আহির মন আমার সর্বশরীরে সেই সাহারার জ্বালা জ্বালিয়ে দিল।

শরীরে এ জ্বালা নিয়ে মানুষ সমাজে মিশতে পারে না। আমি ক্লাবে যাওয়া বন্ধ করে দিলুম, লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কমিয়ে কমিয়ে শেষটায় একেবারে আলেকজাণ্ডার সালকার্ক হয়ে গেলুম। বিষ্ণুছড়া আর মাদামপুরের মেমেদের ফোঁসফোঁসানি আর ছোবলা-ছুবলি থেকে বঞ্চিত হয়ে আমার কোনো কষ্ট হয় নি; কিন্তু পাদ্রী-টিলার মেয়েদের কলকল উচ্চহাস্য, তাদের লাজুক নয়নে আধা-প্রেমের ক্ষীণ আভাস আমার জীবন থেকে নির্বাসিত হয়ে তাকে করে দিল আরো ফাঁকা। কে যেন বলেছে, 'দি মোর লাইফ্ বিকামস্ এম্পটি দি হেভিয়ার ইট্ বিকাম্স টু ক্যারি ইট'। জীবন যতই ফাঁকা হয়ে যায়, তাকে বহন করা হয়ে যায় ততই শক্ত। বড় খাঁটি কথা বলেছে। তবু আমি জীবনের সেই শূন্য ধামা বইতে পারতুম, কিন্তু সে ধামার সর্বাঙ্গে ছিল বিছুটি।

খুব সম্ভব আমারই দেখাদেখি মেব্‌ল্‌ও বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিল। কী ভেবে বন্ধ করল জানি নে। তার মনের কথা কিন্তু আমি তোমাকে বোঝাতে যাব না। তার প্রতি আমি অবিচার করেছি কি না, তার বিচার একদিন হয় তো হবে, কিন্তু তার মনের কথা বলতে গিয়ে আমি যদি উনিশ-বিশ করে ফেলি তবে সে অবিচার আমাকে কেউ ক্ষমা করবে না।

আমার ভিতরকার ডন কিক্‌সট্ ক্রমে ক্রমে কাতর হতে হতে রোগশয্যায় পড়ল। আর আমি, ও-রেলি, আস্তে আস্তে হ্যামলেটের রূপ নিতে আরম্ভ করলুম। বরঞ্চ হ্যামলেট বক্তৃতা ঝাড়ত প্রচুর—সামান্যতম প্রভোকেশনে সে বর্‌বর্ করে নানা প্রকারের দার্শনিক রায় জাহির করত এন্তার—তোমাদের যাত্রা-গানে যে রকম ক্ষীণতম প্রভোকেশনে নায়ক-নায়িকা দূরে থাক, পাইক বরকন্দাজ পর্যন্ত লম্বা লম্বা গান গাইতে আরম্ভ করে। আমার মুখের কথাও শুকিয়ে গেল।

বেচারী মেব্‌ল্! গোড়ার দিকে সে আশ-কথা পাশ-কথা বলে বলে আমাকে আমার কচ্ছপের খোলের ভিতর থেকে বের করবার চেষ্টা করেছিল; শেষটায় সে চেষ্টাও ছেড়ে দিলে।

তখন আমি খেতে আরম্ভ করলুম মদ। মাস তিনেক দিন-রাত্তির আমি

তাম হয়ে পড়ে থাকতুম। বাটলার জয়সূর্য, যে কি না ধান্যেশ্বরী মালের পাঁট জলের মতো ঢকঢক করে গিলতে পারে, সে পর্যন্ত আমার পানের বহর দেখে রীতিমত ঘাবড়ে গেল। কখনো বলে হুইস্কি ফুরিয়ে গিয়েছে, কখনো বলে সোডা নেই। তারপর একদিন মাতাল হয়ে তার গালে মারলুম ঠাশ ঠাশ করে চড়। সংবিতে ফিরে বড় লজ্জা পেয়েছিলুম, সোম। আমি কি অশিক্ষিত 'বক্সওয়ালা' যে আমি এ রকম অন্যায় আচরণ করব!

মদ খেয়ে লাভ হয় নি। মদ খেলে মানুষের যৌনক্ষুধা উগ্রতর হয়, তৃপ্তির ক্ষমতা কমে যায়। আমার অতৃপ্তির আক্ষোভ তাই মদ খেয়ে কখনো কখনো বিকট রূপ ধরে ছিল। তার কথা বলতে আমার ঘেন্না ধরে।

কিন্তু আসল কথাটা আমি শুধু এড়িয়েই যাচ্ছি। আমি শুধু বোঝাতে চাই, আমি কী কঠোর যন্ত্রণার ভিতর আমার জীবনটা কাটালুম, আর সেইটে কিছুতেই প্রকাশ করতে পারছি নে! কিন্তু এ দুর্দৈবে আমি একা নই। তোমার মনে আছে—চৌধুরীর কেসটা? ভদ্রলোক কী শান্ত, দয়ালু প্রকৃতির, গরীব-দুঃখীদের ভিতর তাঁর দান-খয়রাতের কথা কে না জানে? আর কী অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন তাঁর স্ত্রী? দেখে মনে হত অনন্তযৌবনা—তাঁর ছেলেমেয়ে হয় নি। তাঁর ঘাড়টির কথা তোমার মনে পড়ে কি? রাজধানীর গর্ব নিয়ে যেন সে ঘাড় তাঁর মাথাটি তুলে ধরত। একদিন তাঁর সে ঘাড় নিচু হয়েছিল—আমি অবশ্য স্বচক্ষে দেখি নি। তাঁর স্বামী যেদিন হোমোসেক্সুয়েল কেসে ধরা পড়লেন।

আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি নি এ রকম সাধুলোক কী করে এ রকম নোংরামি করতে পারে। তিনি নিজে আমার খাশ-কামরায় স্বীকার করেছিলেন বলেই শেষটায় আমার প্রত্যয় হল।

কি বিড়ম্বিত জীবন! ভগবান ভদ্রলোককে স্বাভাবিক যৌনক্ষুধা দেন নি। তাঁর অনৈসর্গিক যৌনক্ষুধাকে তিনি অদ্ভুত বিক্রমে কত বৎসর চেপে রেখে রেখে হঠাৎ একদিন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে কুকর্মটা করে ফেললেন—শুনেছি তোমাদের সাধুসন্ন্যাসীদের মধ্যেও দৈবাৎ কখনো এ রকমধারা হয়েছে। সে ঘটনা বলতে গিয়ে ভদ্রলোকের মুখে যে আত্মাবমাননার প্রকাশ দেখেছিলুম, তার দাগ আমার মন থেকে কখনো উঠবে না। ভদ্রলোক শেষটায় বলেছিলেন, 'আমাকে এখন সমাজ ঘেন্না করবে, কুষ্ঠরোগীকে মানুষ যে রকম বর্জন করে চলে। আমি সমাজের জন্য কী করেছি, সে কথা সমাজ স্মরণ করবে না—আমি তাকে দোষও দিই নে—কিন্তু আমার সতী-সাধ্বী স্ত্রী, যিনি ভাবতেন আমি ধ্যান-ধারণায় আত্মসমর্পণ করেছি বলে তাঁকে অবহেলা করি, যাঁর পুত্রোৎপাদন-ঈপ্সাকে পর্যন্ত আমি সম্মান

দিই নি, তিনি কী ভাববেন ?'

ওঃ! এ কেসটা ধামা-চাপা দিতে তোমাকে কী বেগই না পেতে হয়েছিল। রায়বাহাদুর কাশীশ্বর যদি অযাচিতভাবে গুহ্য সন্ধিসুড়ক আমাদের বাতলে না দিতেন, তবে আমরা চৌধুরীকে বাঁচাতে পারতুম না। কিন্তু আমার বিস্ময়ের অবধি নেই, হিন্দু সমাজের বিরাট পাণ্ডা রায়বাহাদুর কী করে এতখানি দরাজ-দিল হলেন! তবে হ্যাঁ শুনেছি, তোমাদের সাধু-সন্ন্যাসীর ভিতরও এ রকম কিছু একটা হলে অন্য সন্ন্যাসীরা তাকে খুন করে না। হিমালয়ের উত্তরপ্রদেশে তাকে পাঠিয়ে দেয়। তোমাদের ধর্ম সত্যই বড় অদ্ভুত! কত শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলে তোমাদের সাধুরা কত সত্য আবিষ্কার করেছে, আর তার থেকে পেয়েছে অন্তহীন সহিষ্ণুতা।

তুমি হয়তো জান না, চৌধুরী আমাকে এখনো দক্ষিণের এক আশ্রম থেকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখে। শুনে খুশি হবে, তার স্ত্রী তার সঙ্গেই আছেন।

দু বৎসর কঠোর সংযমে নিজেকে মেব্‌লের কাছ থেকে দূরে রেখে এক গভীর রাত্রে নিজেকে সামলাতে না পেরে আমি তার কাছে যাই। কী হয়েছিল, তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা করব না।

সেই রাত্রে ভোরের দিকে মেব্‌ল্ জয়সূর্যের ঘরে যায়।

সেই ভোরেই সে আমার পায়ের উপর তার মাথা রেখে অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছিল। তার চুল ভিজে গিয়েছিল, আমার পা ভিজে গিয়েছিল। আমাদের দুজনের মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরয় নি।

থাক।

২২শে আগস্ট

মেব্‌ল্ যদি মরে যেত, তবে কি আমার এর চেয়ে বেশী কষ্ট হত? বলতে পারব না।

হঠাৎ যদি আমি অন্ধ হয়ে যেতুম, তাহলে কি বেশী কষ্ট পেতুম? বলতে পারব না। তখনো বলতে পারি নি, আজও পারব না।

আমি বিমূঢ়ের মতো বসে কয়েক দিন কাটাই।

আমার মনে হয় বড় শোক যখন আসে, তখন অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ প্রথম ধাক্কাতেই তার বেদনা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে না। আস্তে আস্তে যেমন যেমন দিন যায়, সঙ্গে সঙ্গে অসহায় হরিণ-শিশুর শরীরকে ঘিরে যেন পাইথনের পাশ একটার পর একটা করে বাড়তে থাকে। শুনেছি, সে নাকি তখন আর

আর্তস্বরে চিৎকার পর্যন্ত করে না। শেষ পাশ দেওয়ার পর পাইথন লাগায় আস্তে আস্তে চাপ। আমি কখনো দেখি নি। আমার মনে প্রশ্ন জাগে, হরিণ কি আমার চেয়ে বেশী কষ্ট পায়?

ফাঁসির আসামীও ঘুমোয়। ঘুম থেকে ওঠা মাত্রই নাকি তার মনে পড়ে অমুক দিন তার ফাঁসি। নিদ্রার কোল থেকে প্রাণ-রস যুগিয়ে নিয়ে মানব-শিশু যখন জাগল, তখনই তার স্মরণে এল, সেই প্রাণটি তার অমুক দিন যাবে। পড়েছি, কোমর অবধি পুঁতে মানুষকে যখন পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে বধ করা হয়, তখন প্রথম কয়েকটা পাথরের ঘা খেয়েই সে নাকি অজ্ঞান হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। চতুর্দিকের নরদানবরা তখন নাকি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে জল দিয়ে তাকে চৈতন্যে নিয়ে আসে। সংবিতে ফিরে এসে সে নাকি প্রথমটায় বুঝতে পারে না সে কোথায়—ট্রেনে ঘুম ভাঙলে আমরা যে রকম প্রথমটায় বুঝতে পারি নে, আমরা কোথায়। তারপর দুসরা কিস্তির প্রথম পাথরের ঘা খেয়েই নাকি সে সেই নির্মম সত্য বুঝতে পারে, তাকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারা হচ্ছে। বর্ণনায় পড়েছি, তাকে নাকি অন্তত বার পাঁচেক এই রকম সংবিতে ফিরিয়ে এনে এনে মারা হয়।

শুনেছি, যে লোক যতটা খুন করে, চীন দেশে নাকি তার ততবার ফাঁসি হয়। কিন্তু ফাঁসি একবারের বেশী হতে পারে কী করে? তোমরা এই নিয়ে একটা ঠাট্টা করো না, অমুক লোকটার তিন মাসের ফাঁসি? কিন্তু তা-ও হয়। বিদগ্ধ চীনেরা তারও একটা সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছে। আসামীর গলায় ফাঁস দিয়ে আস্তে আস্তে তার দম বন্ধ করে আনতে আনতে তাকে অজ্ঞান করে ফেলা হয়। অজ্ঞান হওয়া মাত্রই ফাঁস ঢিলে করে দিয়ে জল ঢেলে, হাওয়া করে তাকে ফের সংবিতে আনা হয়। যে যবার খুন করেছে, তার উপর এই প্রক্রিয়া ততবার চলে। প্রতিবার সংবিতে আসামাত্র তার কী মনে হয় ভেবে দেখো।

ধন্য সে-সব লেখক, যাঁরা এসব মর্মান্তিক ব্যাপার রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করেছেন। আমার মনে হয়, হয় তাঁরা স্যাডিস্ট, নয় তাঁরা আপন জীবনে, আমারই মতো কোনো এক কিংবা একাধিক নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গিয়েছেন।

এখনো বলছি, শারীরিক ফাঁসির সংখ্যার একটা সীমানা আছে। পাঁচ-সাত বার করার পর আসামী নিশ্চয়ই আর সংবিতে ফিরে আসে না—অচৈতন্য অবস্থা থেকে মৃত্যুর অতল গহ্বরে ডুবে যায়। কিন্তু মনের ফাঁসি, আত্মার ফাঁসির সীমা-সংখ্যা নেই। বাইরে প্রকৃতিতে যে রকম রেণুতে রেণুতে প্রতিক্ষণ কোটি কোটি

নবজন্মের সৃষ্টি, একই মানুষ সেই রকম ভিতরে ভিতরে মরে কোটি কোটি বার। এবং প্রতি দুই মৃত্যুর ভিতর যে সংবিৎ, তখন সে সংবিৎ শুধু তাকে জানিয়ে দেবার জন্য, এই শেষ নয়, এই মৃত্যুযন্ত্রণাই শেষ মৃত্যুযন্ত্রণা নয়, আরো অনেক-গুলো সম্মুখে রয়েছে।

এ-সব অভিজ্ঞতার সত্যতা সম্বন্ধে তোমার মনে যদি কোনো সন্দেহ থাকে তবে তারই একটা ক্ষুদ্রতম দৃষ্টান্ত আমি তোমাকে দিতে পারি যেখানে তুমি এ-সব অভিজ্ঞতার ক্ষীণতর রূপ খানিকটে যাচাই করে নিতে পারবে।

কোনো কোনো রুগীকে সারাবার জন্য তিন তিন বার অজ্ঞান করে অপারেশন করতে হয়। প্রথমবারে সে অতটা ডরায় না, কিন্তু প্রথম এবং দ্বিতীয়বারের মধ্যে কয়েক দিন এবং দ্বিতীয় তৃতীয় বারের মধ্যে কয়েক সপ্তাহ তার কী করে কেটেছিল, সে কথা তুমি তাদের কাউকে জিজ্ঞেসা করলে অনায়াসেই জেনে যাবে। তিন বারের পরও যদি সে না সারে, তখন, জান সোম, সে আর দ্বিতীয় কিস্তিতে চতুর্থ বারের মতো অপারেশন করাতে সম্মত হয় না। অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে, এদিক ওদিক লুটতে লুটতে খাট থেকে পড়ে গিয়ে যন্ত্রণা এড়াবার জন্য আত্মহত্যা করবে বলে কাকুতি-মিনতি করে বিষের জন্য, কিন্তু তবু আবার অপারেশন করাতে রাজী হয় না। তার সর্বক্ষণ মনে পড়ে, প্রথম অপারেশনের ক্লোরোফর্মের জড় নেশা কেটে যাওয়ার পর সে কী অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করেছিল, চিৎকার করার শক্তি পর্যন্ত ছিল না, গোঙরাতে গোঙরাতে মুখ দিয়ে শুধু ফেনা বের করেছিল।

সোম, আমার কিন্তু নিষ্কৃতি ছিল না। চিন্ময় বেদনার জগতে কোনো সরকারী আইন নেই, ডাক্তারী কোড নেই যে রোগীর বিনা অনুমতিতে তার অপারেশন করতে পারবে না। আমার মুখের প্রথম অপারেশনের ফেনা শুকতে না শুকতেই আমাকে সেই দুশমনের মতো যমদূতদর্শন ডোমেরা টেনে নিয়ে যেত অপারেশন ঘরের দিকে। সেখানে আমাকে অপারেশন করা হত অষ্টাদশ শতাব্দীর পদ্ধতিতে—যখন ক্লোরোফর্ম আবিষ্কৃত হয় নি। তারা আমাকে দুপায়ে তুলে ধরে মাথার উপর ঘোরাতে ঘোরাতে ভিরমি খাইয়ে, কিংবা তাতেও না হলে মাথায় ডাণ্ড মেরে অজ্ঞান করে অপারেশনের জন্য তৈরী করত। ছুরির ঘা ক্লোরোফর্মের নেশাকে কাটতে পারে না বলে আজকের দিনে অপারেশন চলে রোগীকে যন্ত্রণা না দিয়ে। আমার বেলা কিন্তু ছুরির ঘা আমাকে সংবিতে ফিরে নিয়ে আসত আর আমি সজ্ঞানে দেখতুম, আমার উপর ছুরি চলছে। পাছে আমার বিকৃত চিৎকারে সার্জেনদের অপারেশন করাতে বাধা জন্মায় তাই ডোমরা আমার মুখ চেপে ধরে রাখত। গুঙরে গুঙরে শরীর যে তার টর্‌চার্‌

থেকে খানিকটে—সে কত অল্প—নিষ্কৃতি পাবে তার সর্ব পন্থা বন্ধ।

চোখের সামনে মেব্‌ল্‌কে দেখতে হত প্রতিদিন।

কেন আমি তাকে খুন করলুম না প্রথম দিনই?

কিন্তু তার দোষ কী? সে তো আর আমাকে ত্যাগ করে ঐ বাটলারটাকে গ্রহণ করে নি। বদ্ধ পাগলও আমাদের দুজনকে একাসনে বসিয়ে বিচার করবে না। আমার মনে হয় বহু বাজারের মেয়েও তাকে ঘরে ঢুকতে দেবে না। কোথায় সে আর কোথায় আমি?

ঐখানেই তো ভুল। জয়সূর্যের থাকবার মত কিচ্ছুই নেই, সত্য, কিন্তু তার একটা সম্পদ আছে যেটা আমার নেই। সে সম্পদ কুকুর-বেড়ালেরও থাকে, সে কথা বলে লাভ কী? যে মানুষ দু মিনিট বাদে মরবে তাকে কি এই বলে সান্ত্বনা দেওয়া যায়, তুমি মরে যাবার পরও অনেক কুকুর-বেড়ালও বেঁচে থাকবে, তাই বলে কি তাদের বাঁচাটা তোমার মরার চেয়ে বড়? মেব্‌ল্‌ তো নিয়েছিল মাত্র এইটুকুই। তাকে ও জিনিস যে কোনো পুরুষই দিতে পারত। ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ যে রকম নর্দমা থেকে খুঁটে তুলে তুলে ভাত খায়। তাকে কি আমরা দোষ দিই?

গোড়ার দিকে আচ্ছন্নের মতো বসে এই সব চিন্তা করেছিলুম কিন্তু তখন সব ছিল ছেঁড়াছেঁড়া! কোনো বিশেষ চিন্তা বা যুক্তি নিয়ে সেটাকে যে তার চরম ফৈসালায় ফেলে গ্রহণ বা বর্জন করব সে শক্তি আমার ছিল না। ফড়িঙের মতো আমার মন এ-ঘাস থেকে ও-ঘাসে ক্ষণে ক্ষণে লাফ দিত, কোনো জায়গায় স্থির হয়ে বসে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারত না। আজও যে পারি তা নয়। তবে কয়েক মাসের জন্য একবার পেরেছিলুম, এমন কি সেই অনুযায়ী কাজও করেছিলুম, এবং সেইটে বলবার জন্যই তো এই চিঠি লেখা। সে কথা পরে হবে।

সব জেনে বুঝেও আমার মন অহরহ এক অন্ধ আক্রোশে ভরে থাকত।

তুমি তো জানো আমাদের সিভিল সার্জন আর্মস্ট্রঙের মেম তার ছোকরা আরদালিটাকে মোটর-সাইক্‌ল কিনে দিয়েছিল। এ শহরে কে না জানত তার রসময় কারণ। ওদিকে আর্মস্ট্রঙ তো আমার মতো মন্দভাগ্য ছিল না? মেম যখন ভারতীয় তাগড়া ছোকরার বাদামী রঙ, কালো চুল আর প্রাচ্যদেশীয় বর্বর চোখের (মাফ করো সোম, আমি তোমাকে অপমান করছি নে; কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমার দেশে খানদানীরা যে রকম আমাদের তুলনায় ঢের বেশী মার্জিত, ঠিক তেমনি তোমাদের চাষা-ভুষোরা আমাদের মজুরদের চেয়ে অনেক বেশী

প্রিমিটিভ, অনেক বেশী সেক্সি) প্রাণ-মাতানো নেশায় মজে গেল, তখন গোড়ার দিকে আর্মস্ট্রঙ বেশ কিছুটা চোটপাট করেছিল। এমন কি, আমার মনে হয় সে ইচ্ছে করলে আরদালিটাকে তাড়িয়ে দিতে পারত—মেম আর কী করতে পারত—কিন্তু সে করে নি। আমার মনে হয়, প্রাণবন্ত স্বাভাবিক যৌন-শক্তিশালী পুরুষ এসব ব্যাপারে অনেকখানি ক্ষমাশীল হয়. 'টু হেল্, চুলোয় যাকগে,' বলে সে শান্তমনে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ফিরে যায়। ঠিক কথা, কারণ আর্মস্ট্রঙ গিয়েছিল তেরিয়া হয়ে, উইথ ভেন্‌জেন্‌স। ঐ যে, কী সে বক্সওয়ালাটার নাম, যে তার টিলায় কুলী মেয়েদের হারেম পুষত? আর্মস্ট্রঙ তো প্রায়ই ওদিক পানে না-পাত্তা হয়ে যেত।

আবার দেখো, কিছুদিন পরে সায়েব মেম দুজনাতে ফের বেশ ভাব হয়ে গেল। আরদালি যে বরখাস্ত হল তা নয়, আর্মস্ট্রঙের হারেমগমনও বন্ধ হল না। ক্লাবে যেন তখন কোন্ এক সুরসিক বলেছিল, সিভিল সার্জন পরিবার দিশী-বিদেশী দুই খানাই পছন্দ করেন।

এ হল প্রাণবন্ত নরনারীর স্বাভাবিক সৌভাগ্য—তারা একটা 'মডুস ভিভেণ্ডি' বেঁচে থাকার পন্থা খুঁজে নিতে পারে। পুরুষ কিংবা স্ত্রী সেখানে কেউই পদদলিত কিংবা অপমানিত হয় নি। অপমান, আমার মনে হয়, আত্মার মৃত্যু। আর আত্মা যখন মরে যায় তখন মানুষ হয়ে যায় পশু। নির্মম জিঘাংসু এবং মারাত্মক পশু, কারণ আত্মা মরে গেলেও তার থেকে যায় বুদ্ধিবৃত্তি, যে বুদ্ধিবৃত্তি পশুর নেই। সে তখন হয়ে যায় হাইড্। যত রকম পাশবিক, নারকীয় জঘন্য পাপ তখন সে করতে পারে তার আহির-মনীয় বুদ্ধি, ছলচাতুরী দিয়ে।

আমারও তাই হয়েছিল। কিন্তু তার সব কথা বলার সময় এখনো আসে নি।

ঐ সময়ের অনেক কিছুই আমার মনে পড়ছে। তার একটা তোমাকে বলি।

জানো তো, পাদ্রী জোন্‌স্ গুড়ি-গুড়ি লোক, তোমরা যাকে বলো, 'ভালোমানুষ'। ধার্মিক লোক আকসারই তাই হয়। যদিও তাঁর অজানা ছিল না যে আমি তাঁকে পর্যন্ত বর্জন করেছি, তবু ভদ্রলোক রাস্তায় একদিন বেমক্কা দেখা হয়ে যাওয়াতে আমার সঙ্গ নিল—আমি তো তাঁকে গুড ঈভনিং বলে কেটে পড়ার চেষ্টাই করেছিলুম। আমি যে অশান্তিতে আছি সে কথা তো তাঁর অজানা ছিল না, কিন্তু সে অবস্থাতে যে পাদ্রীর উপদেশে কোনো ফললাভ হয় না, সে তত্ত্বও তিনি জানতেন না।

ইতি-উতি করে, ডোণ্ট্ পোক্ ইয়োর্ নোজ্ ইন্ মাই অ্যাফেয়ার্স (আপন চরকায় তেল দাওগে—এর তুলনায় অনেক মোলায়েম) এটা শোনার জন্য বেশ তৈরি হয়েই ভদ্রলোক আমাকে বললে, যার মর্মার্থ, ইতি-উতিটা বাদ দিয়ে বলছি সাদামাটা ভাষায়ই, তোমার কী বেদনা তা আমি জানি না। কিন্তু জানি, তুমি সুশীল ছেলে, তুমি ধর্মভীরু। তাই বলছি, ভগবান যদি তোমাকে অসুখী করে থাকেন তবে নিশ্চয়ই তার কোনো কারণ আছে। যখন সে যুক্তি আমরা খুঁজে পাচ্ছি নে তখন তুমি এই ভেবে নিজের মনকে সান্ত্বনা দাও না কেন যে, আমার তোমার চেয়েও অসুখী লোক এ সংসারে আছে।

সার্‌মন্‌টার মধ্যে খানিকটে সত্য আছে নিশ্চয়ই। ঐ যে আমাদের বাঁদরটা, হার্ভে, কী কুচ্ছিত তার চেহারা, আর তার বিদ্‌ঘুটে জামাকাপড় আর চলন-বলন। ক্লাবে কোনো মেয়ে তার সঙ্গে কথা কইতে চায় না, তার গা থেকে যা দুর্গন্ধ বেরোয় তাতে আমরাই নাক চেপে বাপ-বাপ করে পালাই। খাস খানদানী ইংরেজের বাচ্চা, পাদ্রী-টিলার যে কোনো মেয়ে তাকে বিয়ে করে জাতে উঠতে পারে কিন্তু বেচারীর কী দুরবস্থা! সেখানেও ক্রিস্‌মাসের রাত্তিরে গিয়ে পাত্তা পায় নি—কোনো মেয়ে তার সঙ্গে নাচে নি। নেচেছিলেন একমাত্র বুড়ী পাদ্রীমেম। তাঁর কথা আলাদা, অসাধারণ নারী।

আমি সে রাত্রে ক্লাব এড়াবার জন্যে পাদ্রী-টিলায় গিয়েছিলুম। মেয়েরা যা খুশি হয়েছিল তার স্মৃতি চিরকাল আমার মনের মধ্যে রইল। সেই আনন্দ সর্বাঙ্গে আতরের মতো মেখে নিয়ে যখন বাড়ি ফিরছি, তখন দেখি হার্ভে তার মুখে ক্লেদ আর গ্লানি মেখে নিয়ে শ্লথ গতিতে বাড়ি ফিরছে।

আমি বড় কষ্ট পেয়েছিলুম, কিন্তু জান, সান্ত্বনাও পেয়েছিলুম পাদ্রীর সার্‌মনের কথা ভেবে যে, আমার চেয়েও দুঃখী এ সংসারে আছে। বাড়িতে, আমার বুকের ভিতর যে জ্বালা জ্বলে জ্বলুক ; কিন্তু সমাজ তো আমাকে ঘেন্না করে না।

এই সান্ত্বনা নিয়ে যখন বাড়ি ফিরলুম তখন দেখি, টেবিলের উপর একটা ক্রিস্‌মাস প্যাকেট। খুলে দেখি, হাউসম্যানের কবিতার বই। আমার বন্ধু আর্নল্ড পাঠিয়েছে। ও বই আমি সে রাত্তিরে পেতুম না, কারণ সেদিন মধুগঞ্জে ডাক বিলি হয় না। কিন্তু পোস্টমাস্টার লাহিড়ী গভীর রাত্রেও ইংরেজদের ক্রিস্‌মাস ডাক বিতরণ করাত।

কবিতার বই। যেখানে খুশি পড়া যায়। খুলতেই চোখে পড়ল,

Little is the luck I've had

And oh, 'its comfort small
To think that many another lad
Has had no luck at all.

যে সান্ত্বনাটুকু নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলুম সেই মুহূর্তেই সেটি অন্তর্ধান করল। আর্নল্ড নয়, পাঠিয়েছিল আহির মন।

সব খবরই ক্রমে ক্রমে ক্লাব-বাড়িতে পৌঁছেছিল সে-কথা আমি জানি, কিন্তু কী চেহারা নিয়ে পৌঁছেছিল সে-কথা বলতে পারব না। একই ঘটনা স্বচক্ষে দেখে দুই সত্যবাদী লোক যে কি রকম ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা দিতে পারে সে সত্য, পুলিসের লোক হিসেবে, আমরা বেশ ভালো করেই জানি এবং সেই অমিলের ফাঁক দিয়েই যে আসামী নিষ্কৃতি পায় সে তত্ত্বও আমাদের অজানা নয়।

আণ্ডাঘর আমাকে বেকসুর খালাসি হয়তো দেয় নি, কিন্তু একটা বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হলুম যে, এ ব্যাপার নিয়ে ক্লাবের মুরুব্বিরা বেশী নাড়াচাড়া করতে তো চানই নি, যতদূর সম্ভব ধামা-চাপা দেবার চেষ্টাও করেছিলেন। এ স্থলে যে তাঁরা 'ঘুমন্ত কুকুরটাকে শুধুমাত্র জাগাতে চান নি' তাই নয়, 'বাকিং ডগটাকে' পর্যন্ত স্ট্রাঙল্ করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং অনেকখানি সক্ষমও হয়েছিলেন।

'বক্সওলাদের' নিয়ে আমিও বেখেয়ালে আর পাঁচজনের মতো ছোটখাটো ঠাট্টা-রসিকতা করেছি, কিন্তু যখনই তলিয়ে দেখছি, তখনি মনের ভিতর লজ্জা পেয়েছি। বক্সওলাদের তুলনায় আমি ভদ্র সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোক, আর এ সংসারের রীতি, দৈবদুর্বিপাকে বড়র যখন মাথা নিচু হয় তখন ছোট তাই দেখে হাসে। 'সার্ভ হিম রাইট', বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, তার মুখে তখন ঐ এক কথা। এই নিয়ে বাঙলায়ও একটা জোরদার প্রবাদ আছে, সেটা নিশ্চয়ই তোমার জানা, কারণ বাঙলা শেখার সময় তুমিই আমাকে এই প্রবাদের বইখানা দিয়েছিলে। বাঙলাটা আমার আর মনে নেই, তাই ইংরিজীটাই দিচ্ছি। 'হুয়েন্ দি এলিফেণ্ট সিঙ্কস্ ইনটু দি মায়ার, ঈভন্ দি ফ্রগ্ গিভস্ হিম্ এ কিক্!' আমাদের দেশের তুলনায় তোমাদের দেশে বড়-ছোটর পার্থক্য অনেক বেশী, তাই বোধ করি তোমাদের তুলনাটায় প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিটা ফুটে উঠেছে বেশী।

ক্লাব বাড়ির কোনো কোনো ব্যাঙ নিশ্চয়ই আমাকে লাথি মেরেছে, কিন্তু সেখানকার গণ্ডার, হিপো, অর্থাৎ মাদামপুর বিষ্ণুছড়া তাঁদের জিভের লকলকানি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এর জন্য ওঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নয় কি?

তবেই দেখ, আহুর মজদাও হাত গুটিয়ে বসে থাকেন নি। আহির মনের ক্রুর সর্পদংশনে আমার অন্তরাত্মা যাতে করে জর্জরিত না হয়ে যায় তাই তিনি আমার ধমনীতে ঢেলে দেবার চেষ্টা করলেন ক্লাব বাড়ির অযাচিত সহৃদয়তার সঞ্জীবনী সুধারস।

কিন্তু জান, সোম, শক্ত ব্যামোতে ওষুধ যদি ঠিক মাত্রায় না দেওয়া হয় তবে ফল হয় উলটো। বিষ তখন সেই ওষুধ থেকে নূতন শক্তি সঞ্চয় করে নেয়। বীজাণুকে সিদ্ধ করে মারতে গিয়ে তুমি যদি জল যথেষ্ট না ফোটাও তবে জল আরো বেশী বিষিয়ে ওঠে। আমার বেলা হল তাই, এবং সেই জিনিসটাই আমার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিল। আহির মন আমাকে তার দাসানুদাস করে ফেলল।

আমি ক্লাব বাড়ির সদাশয়তা দেখে, উপলব্ধি করলুম, সংসারে যত বড় অন্যায় অবিচার হোক না কেন, ধর্মের অনাচার অধর্মের যতই প্রসার হোক না কেন, একদল লোক সেটাকে চাপা দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যায়। এবং আশ্চর্য, তারা যে অসাধু তাও নয়। মাদামপুর বিষ্ণুছড়া এঁরা দুজনাই অতিশয় সহৃদয় ভদ্রলোক। এ পাপ ছড়িয়ে পড়লে অর্থাৎ আমাদের কেলেঙ্কারির কথা রাষ্ট্র হলে, ইউরোপীয় সমাজের অকল্যাণ হবে এই আশঙ্কায় তাঁরা সেটা চেপে রেখেছিলেন।

অর্থাৎ পাপ করলেই পুণ্যাত্মা তোমাকে ধরিয়ে দেবে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে—যেমন আমার বেলায়—সজ্জনরা সে পাপ লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করলেন!

এ-সম্বন্ধে বাকি কথা পরে হবে।

তুমি তখন ছুটি নিয়ে কাশী না গয়ায় কোথায় গিয়েছ।

এদিকে মধুগঞ্জে এল বন্যা।

দিন সাতেক ঝমাঝম বৃষ্টি। তারপর দিন তিনেক পিটির-পিটির। তাই নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই, কারণ আমাদের বছরের বরাদ্দ একশ বিশ ইঞ্চির তখনো একশ ইঞ্চি হয় নি। এমন সময় কোনো রকমের পূর্বাভাস না দিয়ে পাহাড় থেকে হুড়হুড় করে নেমে এল সাত-হাত-উঁচু জলের এক ধাক্কা। সঙ্গে নিয়ে এল বিরাট গাছের গুঁড়ি আর কুঁড়েঘরের আস্ত চাল। তার উপর আঁকড়ে ধরে আছে মৃত্যুভয়ে কম্পমান শত শত নরনারী, পশুপাখী, এমন কি, সাপ-বিচ্ছুও। সকলের সম্মুখেই মৃত্যু যখন সশরীর বর্তমান, মানুষ তখন সাপকে

মারে না, সাপ মানুষকে কামড়ায় না। ক্ষুধার উদ্রেকও নিশ্চয় তখন হয় না—একই বাঁশের উপর আমি তখন সাপের কাছে ইঁদুরকে বসে থাকতে দেখেছি। আর জলের তাড়া খেয়ে সাপ তো আমার ডিঙিতে আশ্রয় নিতে ধেয়ে এসেছে কত গণ্ডা—ওদিকে মাঝিরা লগি দিয়ে জলে ঝপাঝপ মার লাগাচ্ছে তারা যেন না আসে—তবু আসবেই।

মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত নরনারী উদ্ধারের জন্য চিৎকার পর্যন্ত করছে না। গোড়ার দিকে নিশ্চয়ই করেছিল। এখন বোধ হয় গলা ভেঙে গিয়েছে। আর বাঁচাবে কে? যে কখানা নৌকো ভেসে যাচ্ছে, সেগুলো মানুষের ভারে এই ডোবে কি ঐ ডোবে। যে লোকগুলো নৌকোয় আশ্রয় পেয়েছে তারা আসন্ন মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়ে হয়ে গিয়েছে কঠিন। আর একটি মাত্র শিশুকেও তারা নৌকোয় স্থান দিতে নারাজ।

জলের উপর দিবারাত্র ভেসে চলেছে অগুন্তি মড়া। গোরু, বাছুর, শেয়াল, কুকুর, মোষ—হাতি পর্যন্ত। ভেবে আমি কূলকিনারাই পেলুম না, পাহাড়ের উপর কতখানি তোড়ে জলের স্রোত নেমে আসলে একটা হাতি পর্যন্ত বেকাবু হয়ে নদীর জলে ভেসে এসেছে। একটা হাতি কোনোগতিকে সাঁতার কেটে কেটে পাড়ে এসে উঠল আমারই টিলার নিচে। দেখেই বুঝলুম, বুনো। তখন সে নির্জীব, কিন্তু পরে না আশপাশে আতঙ্কের সৃষ্টি করে, সেই আশঙ্কায় ওটাকে গুলি করে মারব কি না যখন ভাবছি, তখন মধুমাধব জমিদারির মাহুত—উঁচু জায়গার সন্ধানে সে তার হাতি নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল আমার পিছনের টিলায়—তাকে দিব্য পোষ মানিয়ে নিয়ে গেল আপন হাতির সঙ্গে বনের ভিতর। যাবার সময় আমাকে সেলাম করে বলল, 'এ হাতি আশ্রয় পেয়ে বেঁচে গেছে হুজুর। এ হাতি আর কখনো বনে ফিরে যাবে না, কারো অনিষ্টও করবে না। হাতি তো নেমক-হারাম জানোয়ার নয়।'

শুধু জল আর জল। বর্ষার প্রথম ধাক্কাতেই কাজলধারার কালো জল ঘোলা হয়ে গিয়েছিল। এখন সে হয়ে গেল সাদা। কিন্তু ধবল-কুষ্ঠের মতো কী রকম যেন এক বীভৎস সাদা। কোনো কোনো সাপের গায়ে আমি এ রঙ দেখে শিউরে উঠেছি এবং বিষাক্ত কি না সে খবর না নিয়েই মাথা ফাটিয়ে দিয়েছি। এ জলের মাথায় যদি লাঠি মেরে কেউ তাকে মেরে ফেলতে পারত!

প্রথম ধাক্কাতেই বান ভেঙে দিল আমাদের নদীর পাড়। ডুবিয়ে দিল শহরের নীচু জায়গার বাড়িঘর। ভাগ্যিস প্রথম জোর মারটা এসেছিল দিনের বেলায়, না হলে কতো লোক এবং আমাদেরই চেনা লোক যে এক ঘুম থেকে

আরেক ঘুমে চলে যেত তার সন্ধান পর্যন্ত আমরা পেতুম না। তারা আশ্রয় নিল জাত-বেজাতের নৌকোয়, বাকিরা এসে উঠল টিলা-টালার উপরে। আমাদের মধুগঞ্জে আছে কটাই বা তাঁবু! তারই সব কটা পড়ল এখানে-ওখানে। বাকিরা টিলা থেকে ডাল-পাতা কুড়িয়ে নিয়ে তুললে চালাঘর। মুদীরাও আশ্রয় নিয়েছে সেইখানেই—আর যাবেই বা কোথায়? তোমার পরিবারের আশ্রয়ের জন্যে আমি আমার ভাওয়ালি পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। সে নৌকো এনে বাঁধা হল আমার টিলার নিচের বটগাছের সঙ্গে।

আশ্চর্য, শহরে কোনো কুকীর্তি হলে আমরা যে কটা ভ্যাগাবণ্ড বকাটে ছোঁড়াকে সন্দেহ করে ধরে এনে তাদের ধরে চোটপাট লাগাতুম, তারাই দেখি সকলের পয়লা কোমর বেঁধে লেগে গেল উদ্ধারের কাজে। এক মুহূর্তেই কোথায় গেল তাদের তাস-পাশা, ইয়ার্কি-থিস্তি। আর সবচেয়ে ত্যাঁদোড় ঐ পরেশটা—যে আমার বাগানের লিচু পর্যন্ত চুরি করেছে, রায়বাহাদুর কাশীশ্বরকে পর্যন্ত যে আড়াল থেকে মুখ ভ্যাঙচায়—সে দেখি তার ইয়ারদের নিয়ে কলাগাছের ভেলা বানিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে নদীর উপরে। সেই বানের ভরা গাঙে! কত লোক বাঁচাল তারা! দিনের শেষে, সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখি আর সবাই চলে গিয়েছে, সে একা ভেলার উপরে বসে নদীর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। গায়ে ধুতির ভিজে খুঁট। আমার বরষাতিটা আমি তার দিকে ছুঁড়ে দিতে সে সেটা লুফে নিয়ে আমার দিকে ফের ছুঁড়ে ফেরত দিলে। বত্রিশখানা দাঁত বের করে এ-কান ও-কান জুড়ে হাঁ করলে—এই হল আমাদের 'থ্যাঙ্কস্, নো'র বাঙলা অনুবাদ।

তুমি জান সোম, বন্যার পর শহরে কোনো কুকর্মের জন্য ওদের সন্দেহ করলে, ডেকে শুধু 'বাপু, বাছা,' করতুম, দু-একবার জেনে শুনে ছেড়ে দিয়েছি। কড়া কথা বলতে প্রবৃত্তি হয় নি।

আহুর মজদা আর আহির মনে নিরন্তর এ কী দ্বন্দ্ব! আহির মনের যে চেলার জ্বালায় উদয়াস্ত সমস্ত পাড়া অতিষ্ঠ, সঙ্কটের সময় সে দেখি হঠাৎ আহুর মজদার ডাকে 'হা-জি-র' বলে তৈরী, প্রাণটা খোলামকুচির মতো বন্যার জলে ডুবিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত!

তোমার বিশ্বাস, কোনো কোনো মানুষ পাপাত্মা—ক্রিমিনাল মাইণ্ড নিয়ে জন্মায়। শেষবারের মতো বলেছি, তা নয় সোম, এরা সব মিস্‌ফিট্। এরা শুধু সঙ্কটের মাঝখানে জীবসত্তার চৈতন্যবোধে বেঁচে থাকার আনন্দ (জোয়া দ্য ভিভ্রে) পায়। দৈনন্দিন জীবন এদের কাছে অসহ্য একঘেয়ে বলে মনে হয়।

আমার দেশে এ রকম ছোঁড়ারা পল্টনে ঢুকে গিয়ে আপন জীবনের সার্থকতা পায়। তাই বাঙালী পল্টন খোলা মাত্রই আমি সর্বপ্রথম এদেরই ডেকে পাঠিয়েছিলুম। এরা যে সেখানে সুনাম করেছে, সে কথা তোমার অজানা নয়।

কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম।

সেই সর্বব্যাপী হাহাকারের ভিতর আমি কিন্তু একটি বড় মধুর দৃশ্য দেখেছি। আমার টিলা, পাঁদ্রী-টিলার চতুর্দিকে যখন আশ্রয়ার্থীরা চালা, মাচাঙ বানাতে ব্যস্ত, ভিজে কঞ্চি-বাঁশ দিয়ে আগুন জ্বালাতে গিয়ে মেয়েরা চোখের-জলে নাকের-জলে, তখন দেখি বাচ্চারা মহোল্লাসে শেক্সপীয়ারের 'প্রিম্‌রোজ্‌ পাথ টু ইটার্নেল বন-ফায়ারের' পিকনিক চড়ুই-ভাত বনের ভিতর সফল করে তুলেছে। এদের একের অন্যের সঙ্গে দেখা হয় ইস্কুল ঘরে, কিংবা খেলার মাঠে তা-ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। আজ যেন তারা সবাই এক বিরাট বাড়ির প্রকাণ্ড পরিবার। সে বাড়ির ছাদ আকাশ, দেয়াল টিলাগুলো, খেলবার জন্য দুনিয়ার গাছপালা; টিপ-টিপা আর নাশ্‌তার জন্য পিষ্টি-বৈচিমন, আনারালি, কালোজাম, বুনো কাঁঠাল। আর সবচেয়ে বড় আনন্দ, বাপ মা শাসন করে না, তারা আশ্রয় নির্মাণে মত্ত। এরা যত বাইরে বাইরে কাটায় ততই মঙ্গল। এই হনুমানের জ্বালায় টিলার হনুমানগুলো তখন বাপ-বাপ করে এ তল্লাট ছেড়ে পালিয়েছিল।

শেষটায় জল এসে ঢুকল আমার লিচুবাগানে।

আগে ছিল আমার বাড়ির সামনের গাছপালার সবুজ, তারপর কাজলধারায় কালো জল, তারপর ফের ধানক্ষেতের কাঁচা সবুজ এবং সর্বশেষে কালাই পাহাড়ের নীল রঙ। এখন আমার আর পাহাড়ের মাঝখানে শুধু নোংরা খোলা জলের একরঙা উদরী রোগীর ফুলে-উঠা পেটের মতো এক ভয়াবহ সত্তা। তারই মাঝে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে আছে কোনো ঘর, আর কোনো ঘর মাথা অবধি ডুবিয়ে—জলের উপর শুধু টিনের চারখানা চাল বসে আছে, মোষ যে রকম সর্বাঙ্গ জলে ডুবিয়ে দিয়ে শুধু মাথাটা উপরে ভাসিয়ে রাখে। সবকিছু জলে একাকার বলে আসল নদীটি কোথায়, সে শুধু বোঝা যাচ্ছে, তার উপর দিয়ে ভেসে যাওয়া কালো কালো ঢিপি থেকে—মড়া মোষ, শুয়োর, গরু আরো কত কী! আর আমার বারান্দায় লক্ষ লক্ষ কেঁচো—সাপ পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

সত্যি বলতে কী, তখন এ-সব দেখেও দেখি নি। আজ দেখছি, আমার অজানতে মন অনেক কিছু স্মরণ রেখেছে। আমি তখন পাঁচশটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত, যে-সব কাজ সম্বন্ধে আমার কণামাত্র অভিজ্ঞতা নেই।

তোমাদের জাতটা এমনিতে বড় ইনডিসিপ্লিণ্ড কিন্তু বিপদের সময় আমাদের

তুলনায় তোমরা অনেক বেশী কমন্‌সেনস্‌ ধর। আপনা থেকে কেমন যেন একটা ডিসিপ্লিন তোমাদের ভিতর এসে যায়। তা না হলে আমার সেই পাগলের মতে ছুটোছুটির ফলে ইষ্ট না হয়ে কী যে অনিষ্ট হত বলতে পারি নে।

সাত দিন ধরে আমি কলের মতো কাজ করে গিয়েছি—আমি সংবিতে ছিলুম না। এমন কি, আমার জীবনের আপন ট্র্যাজেডি সম্বন্ধেও আমি অচেতন হয়ে গিয়েছিলুম।

অষ্টম দিনে বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সংবিতে ফিরলুম। ডাঙশ মেরে মানুষ একে অন্যকে অজ্ঞান করে। আমাকে ডাঙশ মেরে আনা হলো সংবিতে।

বাঙলোয় এসে শুনলুম, মেব্‌লের বাচ্চা হয়েছে।

১২ই সেপ্টেম্বর

তোমাদের সকলের মুখে শুনি, কর্ম করে যাবে, ফললাভের আশা ত্যাগ করে। ফল দেওয়া-না-দেওয়া ভগবানের হাতে। এই নাকি তোমাদের সর্ব অভিজ্ঞতা, সর্বশাস্ত্রের মূল কথা।

মা মেরী সাক্ষী, আমি বন্যার সাত দিন কোনো ফললাভের আশা করে কাজ করি নি। আমি আমার আপন প্রাণ বিপন্ন করে যাদের বাঁচিয়েছিলুম, তাদের কেউ কেউ বন্যার পর কলেরায় মারা যায়। তাই নিয়ে আমি শোক করি নি। অন্য ফলের কোনো প্রশ্নই তো আমার মনে ওঠে নি।

কিন্তু কর্মফলের লোভ ত্যাগ করে যে মানুষ কাজ করে গেল, তাকে অর্থাৎ তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্রকে বুঝি তোমাদের ভগবান বকশিশ দেন জারজ সন্তান!

১লা ডিসেম্বর

যতই ভাবি মনকে এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্ত হতে দেব না, মূল কথা সংক্ষেপে বলে ফেলব, ততই দেখি আস-কথা, পাশ-কথা সব কথাই মনের ভিড় থেকে বাইরের প্রকাশে এসে নিষ্কৃতি পেতে চায়। অথচ মনের গভীর গুহাতে যে সব ভূতের নৃত্য অহরহ চলেছে তাদের একটাকেও তো আমি ভালো করে ধরতে পারছি নে। অজ্ঞানে, সজ্ঞানে, সুষুপ্তিতে, স্বপ্নে এরাই গড়ে তুলছে আমার জীবন-দর্শন—ভেন্ট-আন্‌শাউউঙ্‌—তারই বুদ্‌বুদ শুধু চেতন মনে ভিড় করে, আত্মপ্রকাশের জন্য।

সে মনের গুহায় আছে কত প্রাণী,—হ্যামলেট, ডন কিক্‌সট্‌, ডক্টর জীক্‌ল্‌, মিস্টার হাইড এবং তাঁদের পিছনে দাঁড়িয়ে এদের নাচাচ্ছেন আহুর মজদা, আহির

মন, হয়তো ছেলেবেলাকার আমার আরাধ্য দেবী মা-মেরি তখনো আমাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন করে ফেলেন নি—এখনো আমি মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখি, আমার ছেলেবেলাকার শহরের গির্জায় আমি হাঁটু গেড়ে উপাসনা করছি আর তিনি করুণ নয়ানে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন ; এ স্বপ্ন আমি বড় ডরাই।

কখনো দিনের পর দিন বারান্দায় জড়ের মতো বসে রইতুম হ্যামলেট হয়ে, আর তাকে ডক্টর জীকল্ কানে কানে বলত, 'এই ভালো, চুপ করে বসে থাকো। সংসারের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কী করতে পার তুমি ? কোন্ কর্মের কী ফল, তা আগেভাগে, জানবে কী করে !' ভুলে গেছ, অস্কার ওয়াইল্ডের সেই গল্পটা ? প্রভু যীশু এক অন্ধের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তার পর পথে যেতে যেতে একদিন দেখেন, এই লোকটা এক বারবনিতার দিকে লোলুপ নয়নে তাকিয়ে আছে। প্রভু বিরক্ত হয়ে তাকে শাসন করলেন। উত্তরে সে কাতর-কণ্ঠে বললে, 'আমার দৃষ্টিশক্তি ছিল না, আপনি আমাকে দয়া করে সে শক্তি দিলেন। এখন আমি তা দিয়ে অন্য কী করতুম, বলুন।' তাই দেখো, কোন কর্মের কী ফল তা স্বয়ং প্রভু যীশুই যখন জানেন না, তখন তুমি, কীটস্য কীট, তুমি জানবে কী করে ? কিংবা স্মরণ করো সেই চীনে গল্পটা। এক জমিদারের ছেলে বনে শিকার করতে গিয়ে পথ হারিয়ে গুম্ হয়ে গেল। পাড়া-প্রতিবেশী তার বাড়িতে এসে শোক প্রকাশ করে তাকে সান্ত্বনা জানালে। জমিদার ছিলেন জ্ঞানী লোক, শুধু বললেন, 'এ যে খারাপ হল, জানলে কী করে ?' তার দিনদশেক পরে ছেলেটা বন থেকে ফিরে এল একটা চমৎকার বুনো ঘোড়া সঙ্গে করে। সবাই এসে সানন্দে অভিনন্দন জানালে। জমিদার বললেন, 'এ যে ভালো হল, জানলে কী করে ?' তার কিছুদিন পর ছেলেটা ঐ বুনো ঘোড়া থেকে পড়ে পা-খানা ভেঙে ফেললে। সবাই এসে শোক প্রকাশ করলে। জমিদার বললেন, 'এ যে খারাপ হল, জানলে কী করে ?' তার কিছুদিন পর লাগল লড়াই, সম্রাটের লোক এসে ধরে নিয়ে গেল সব জোয়ানদের ; ছেলেটার পা ভাঙা বলে তাকে যেতে হল না। সবাই এসে আনন্দ জানালে। জমিদার বললেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবেই দেখো, কিসে কী হয়, বলবে কে ?

আর কখনো বা সেই মারমুখো ডন কিক্‌সট্‌কে আরো ওশকাতে লাগত তার পিছনে দাঁড়িয়ে মিস্টার হাইড। 'কী দেখছ, বসে বসে ? তোমার লজ্জা-শরম নেই, অপমান-বোধ নেই ? তুমি কী একটা পা-পোশ না আস্ত একটা ভেড়ুয়া ? আণ্ডা-ঘর তোমাকে নিয়ে কী ঠাণ্ডা-ব্যঙ্গ করে তার খবর রাখ ? ইস্তেক নেটিভ,

কালা-আদমী খানসামাগুলো ?' 'এদিকে চোরচোট্টার উপর কী রোয়াব ! ওঃ যেন কলকাত্তার হাই-কোর্টের বড় জজ সাহেব নেমে এসেছেন মধুগঞ্জের গুনাহ্-হারামি খতম করবার জন্যে, আর ওদিকে নিজের ঘরের বউ যে চুরি হয়ে গেল তার জন্যে কোনো গরমি নেই। সায়েবের গায়ে বুঝি মাছের রক্ত—তাও শিঙি মাছের না, একদম্ পুঁটি।' বুঝলে হে মহামান্যবরেষু, সিন্নোর ডন্ কিখোঠে, ব্যাটারা এই কথা কয় কত রঙে কত ঢঙে ! আর তোমার বাটলারটা ! তওবা, তওবা—তা তোমাকে বলে আর কী হবে ? এইবার লেগে যাও, তোমার—হোঃ, হোঃ, হোঃ, তো-মা-র ছেলের ব্যাপ্‌টিজমের ব্যবস্থা করাতে।'

এই রকমই একদিন ডন কিক্‌সট্, বা আমি, হঠাৎ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে করলুম বাচ্চার বাপ্তিস্মের প্রস্তাব, জয়সূর্যকে গড-ফাদার বানিয়ে। তোমার মনে থাকার কথা, কারণ সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলে তুমি।

কাকে অপমান করার জন্য এ প্রস্তাব আমি করেছিলুম ? মেব্‌ল্‌কে ? নিজেকে ? কী বলব ? ডন কিক্‌সট্ কি কোনো কিছু ভেবে-চিন্তে করে ? তবু লেখক সেরভান্তেসের মানসপুত্র ডন কিক্‌সট্ কখনো কারো কিছু অনিষ্ট করে নি। আমি ডন্ কিক্‌সটের, পিছনে ছিল যে মিস্টার হাইড।

গির্জেঘরের সে দৃশ্য তোমার মনে আছে ? মাঝে মাঝে আমার পর্যন্ত মনে হয়েছিল, কাজটা বোধ হয় ঠিক হল না।

তখন মিস্টার হাইড ধমক দিয়ে বলেছে, 'ফের !'

আর আহির মন বলেছে, 'জীতে রহো বেটা !'

আমি যা-কিছু করেছি তার জন্য তোমার কাছ থেকে আমি কোনো করুণা ভিক্ষা করছি নে, কোনো সহানুভূতিও চাইছি না, কিন্তু সোম, আমার ভিতর এই যে গোটা-ছয় ভিন্ন প্রকারের প্রবৃত্তি অষ্টপ্রহর অনবরত লড়াই চালাত আমাকে নির্মমভাবে এদিক-ওদিক টানা-হ্যাঁচড়া করত—একটা মড়াকে যে রকম দশটা শকুন ছেঁড়াছেঁড়ি করে—আমার জাগরণ বিষাক্ত করে রাখত, আমি ঘুমুতে গেলেই খাটটা নাড়াতে থাকত, ঘুমিয়ে পড়লে দুঃস্বপ্নের মতো বুক চেপে বসত, জেগে উঠেই দেখতুম তারা সব লোলুপ নয়নে পহর গুনছে, কখন আমি জাগব, কেউ দেবে চোখ ঠোকরে, কেউ ফুটো করে দেবে তালুটা—এরা আমাকে দিয়ে কী করেছিল সেইটে তুমি কিছুটা বুঝতে পারলেই আমি আমার জীবনের এ দিকটার কথা আর তুলব না।

আপিসে কাগজপত্র সই করার সময় তারিখ দিতে হয়, খবরের কাগজও মাঝে মাঝে পড়েছি, কাজেই দিন, মাস, বৎসর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন কখনো

হতে পারি নি। তাই জানি এই করে করে বছর পাঁচেক কেটে গেল।

সত্যি বলছি, সোম, বাইরের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, আমার জীবনে এ পাঁচ বছরে কিছুই ঘটে নি। লড়াই লেগেছিল বলে প্রচুর খেটেছি, হাট লুঠ বন্ধ করে রেখেছি, স্বদেশী আন্দোলনকে ছড়াতে দিই নি। সাধারণ মানুষের চরিত্র গড়ে ওঠে, তার জীবন বিকাশ লাভ করে এই সব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে, বাইরের ঘটনা তার মনকে গড়ে তোলে; আবার সেই মন তার ভবিষ্যৎ কর্মধারাকে নূতনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। আমার জীবনের উপর বাইরের কোনো ঘটনা এ পাঁচ বছর কোনো দাগ কাটতে পারে নি।

আর ভিতরের জীবনের কিছুটা ইঙ্গিত তোমাকে দিয়েছি। আর ভিতরকার জট যদি আমি নিজেই ভালো করে ছাড়াতে পারতুম তা হলে তোমাকে বলতুম—আমি পারি নি।

শুধু মেব্‌ল্‌ দূর হতে আরো দূরে চলে গেল।

যে মেব্‌ল্‌ একদিন মার্সেলেসে দাঁড়িয়ে মভ রঙের রুমাল নেড়ে নেড়ে জাহাজে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, পাড়ে নেমে আমি রেখেছিলুম তার কাঁধে আমার হাত দুখানি, সে চেপে ধরেছিল আমার বাহু দুখানি—সেই মেব্‌ল্‌ই হঠাৎ যেন আমাকে পাড়ে ফেলে উঠে পড়ল জাহাজে আর ধীরে ধীরে সে জাহাজ অদৃশ্য হলো অসীম নীলিমার অন্তহীন শূন্যতায়। কাতর আর্তনাদে, করুণ নিবেদনে আমি তাকে ডাকতে পর্যন্ত পারলুম না।

আর সেই মেব্‌ল্‌-ই এই বারান্দাতেই বসে, আমার থেকে তিন হাত দূরে।

শুধু বুঝলুম, আমার জীবন থেকে এ দ্বন্দ্ব কখনো যাবে না। শান্তি আমি কখনো পাব না।

৫ই ডিসেম্বর

পেট্রিকের জ্বর হয়েছে। সিভিল সার্জন দেখে গিয়েছে। বলেছে ভয় নেই। মেব্‌ল্‌ পাংশু মুখে বারান্দায় পায়চারি করছে। একবার হ্যাটটা মাথায় দিয়ে পাদ্রী-টিলার দিকে রওয়ানা হল। বহুকাল হল সে বাড়ি থেকে আদপেই বেরোয় নি। কিন্তু গেল না। ফিরে এল। তারপর বারান্দায় রেলিঙে দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ ধরে ভাবল।

আমি তো অন্ধ নই। দেখলুম, মাতৃত্বের রসে মেব্‌ল্‌ের দেহখানির প্রতি অঙ্গটি কী অপরূপ পরিপূর্ণতার সৌন্দর্য পেয়েছে। যেন এদেশের বর্ষার ভরা পুকুর।

অনেকক্ষণ পরে মেব্‌ল্‌ আমার সামনে এসে মাথা নিচু করে বললে, 'এদেশের আবহাওয়া পেট্রিকের সইছে না। তার পড়াশুনার ব্যবস্থাও এখানে ঠিকমত হবে না। আমরা বিলেত যাই। তুমিও সঙ্গে চলো না? তোমার তো অনেক ছুটি পাওনা আছে।'

বহুকাল পরে মেব্‌ল্‌ কথা বলল।

আমি বললুম, 'সেই ভালো। তবে আমি সঙ্গে আসতে পারব না। তোমরা ইংলণ্ডের কোথাও বাড়ি করে থাকো। আমি পরে সুযোগ পেলে যাব।'

মেব্‌ল্‌ মাথা নেড়ে সায় দিলে। সে কখনো আমার কোনো ইচ্ছায় আপন অনিচ্ছা জানায় নি, নিজের ইচ্ছা তো প্রকাশ করতই না!

এ রকম ধারা কোনো একটা পরিবর্তন আমার জীবন-প্যাটার্নে আসতে পারে সে কথা আমি কখনো ভেবে দেখি নি।

অথচ এ তো কিছু খুদার-খামাখা আজগুবী সমাধান নয়। চার-পাঁচ বছরের লেখাপড়ার সুবিধের জন্যে আমার মতো দু-পয়সাওয়ালা লোকের পরিবার আকছারই তো বিলেত যাচ্ছে।

তবু আমি সমস্ত রাত বিছানায় পড়ে রইলুম অসাড়ের মতো। শেষ রাত্রে একটু তন্দ্রা এসেছিল। আচমকা ঘুম ভাঙল ভোরের দিকে।

দেখি সমস্যা সমাধান করে ফেলেছি। সব সমস্যার সমাধানই হয় ঘুমে, স্বপ্নে কিংবা অবচেতন মনে।

মাত্র যে তিনটি প্রাণীর সঙ্গে আমার জীবনের যোগসূত্র, বরঞ্চ বলি, যে তিনটি প্রাণী আর আমাকে নিয়ে আমার জীবন, তারাই আমার জীবনকে অসহ্য করে তুলেছে পলে পলে, প্রতি ক্ষণে তারা আমার আয়ু ক্ষীণ করে নিয়ে আসছে, তিন দিক থেকে তিন রাহু আমার জীবনকে ক্রমে ক্রমে গ্রাস করে, একদিন বিলুপ্ত করে দেবে। এই নিয়ে আমার সিদ্ধান্তের আরম্ভ। পরের সিদ্ধান্তগুলো এক-এক করে এই :

দূরে চলে গিয়ে আমার উপর এদের শক্তি আরো বেড়ে যাবে। এ সংসারে এরা বেঁচে থাকবে, না আমি বেঁচে রইব?

আমি।

এরা পাপী, মরা উচিত এদেরই। মেব্‌ল্‌ পাপী, জয়সূর্য পাপী আর পেট্রিক ওদের পাপ-জাত সন্তান। আমি নির্দোষ, আমি কোনো পাপ করি নি। আমি কস্মিনকালেও কারো হকের ধন থেকে একটি কানাকড়িও কেড়ে নিই নি। এরাই

দিয়েছে আমাকে ফাঁকি, এরা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন আমাকে দেবে শুধু ফাঁকি।

এরা মরে গেলে আমি শান্তি পাব। আমার দ্বন্দ্বের সমাধান হবে।

খুন কী করে করা হয়, তার সব কটা পদ্ধতিই জানি আমরা। তুমি আমি অর্থাৎ পুলিশ। খুনীরা আপন আপন সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি অনুযায়ী পন্থা বেছে নিয়ে করে খুন। সব খুনের ইতিহাস, বিশ্লেষণ জড়ো হয় থানায়। কোন্ পন্থার কী গলদ, সামান্য কী একটা ত্রুটি কিংবা বিচ্যুতি এড়ালে খুনী ধরা পড়ত না, এসব তত্ত্ব আমাদের ভালো করে জানা। আমরা যদি নিখুঁত খুন না করতে পারি, তবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেন কোনো চ্যাঙা লোকও সে চাঁদ ধরবার আশা না করে।

এ তো চ্যালেঞ্জ নয়। এ তো অতি সোজা কাজ। কিন্তু অতি সরল কর্মও অবহেলার সঙ্গে করতে নেই।

আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই। আমার মনের গুহার হ্যামলেট, কিক্‌সট্, জীক্‌ল, হাইড, মজদা, মনু সবাই মরে গিয়েছে। এখন যা-সব আমি করতে যাচ্ছি, সে-সব ডেভিড ও-রেলির সম্পূর্ণ নিজস্ব।

নির্দ্বন্দ্ব চিত্তে যে রকম বন্যার কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলুম, পেট্রিকের বাপ্তিস্ম পরব করার সময় আমি যে রকম স্থির নিশ্চয় হয়ে এগিয়ে ছিলুম, এবারেও ঠিকই তাই।

সকালবেলা জয়সূর্যকে ডেকে বললুম, 'তুমি মেব্‌ল্‌দের জাহাজ ধরিয়ে দেবে বোম্বাই, মাদ্রাজ কিংবা অন্য কোনো বন্দরে। সেটা পরে স্থির হবে। তারপর তুমি কিছুদিনের জন্য সেখান থেকে সোজা দেশে যেয়ো। আগে যখন ছুটি চেয়েছিলে, তখন সুবিধে হয় নি, এখন আমার একলার কাজ আরদালিই করতে পারবে।'

জয়সূর্য খুশী না বেজার হল তার মুখ থেকে বোঝা গেল না।

আমি সেদিনই কুকটুক সাব ট্র্যাভেল এজেন্সিকে চিঠি লিখে দিলুম, কবে কোন্ বন্দর থেকে কোন্ জাহাজ ছাড়বে, জায়গা পাওয়া যাবে কিনা, ভাড়া কত—ইত্যাদি জানতে। ফলে যে সাত ডাঁই মালমশলা উপস্থিত হল, সে তো ঐ সময় তুমি এক দিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখেছ। আমার কেমন যেন আবছা আবছা মনে পড়ছে, সেদিন তোমার সঙ্গে একটু খিটখিটে ব্যবহার করেছিলুম। তার কারণ যদিও তখন আমি ঐসব কাগজপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলুম, কিন্তু আসলে তারই আড়ালে আমার অন্য প্ল্যানটাকে আমি ফিটফাট ওয়াটার-টাইট করে নিচ্ছিলুম।

বাইরের শোটাকে তার ফিনিশিং টাচ দেওয়ার জন্য আমার দরকার ছিল সুদ্ধ কয়েকখানা লাগেজ লেবেলের। কোনো কোনো ট্র্যাভেল এজেন্সি খদ্দেরকে আপন চালাকি দেখাবার জন্য কেবিন বুক হওয়ার পূর্বেই কিছু লাগেজ টিকেট পাঠিয়ে দেয়। যেমন যেমন মেব্‌লের এক-একটা সুটকেস, ওশ্‌ন্ ট্রাঙ্ক তৈরী হতে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে আমি তাদের উপর সেই লেবেল্‌গুলো সেঁটে দিতে লাগলুম।

ওদের দিকটা তৈরী, এখন আমার দিকটা ঠিক করতে হবে।

মানুষ মারা তো অতি সহজ, বিশেষ করে সে মানুষ যখন তোমার অভিসন্ধি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন। আসল সমস্যা মড়া নিয়ে। বেশীর ভাগ খুন ধরা পড়ে মড়া থেকে এবং খুনী ধরা পড়ে তার থেকে।

ক্রমে ক্রমে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। বাক্স-প্যাটরা তৈরী, রাস্তার জন্য অল্পস্বল্প খাবার দাবারও প্যাক করা হয়েছে। পরদিন ভোরবেলা আমি মেব্‌ল্‌দের মোটরে প্রায় কুড়ি মাইল দূরের রেল স্টেশনে পৌঁছে দেব।

সন্ধ্যের সময় চাকরবাকরদের ছুটি দিলুম। তারা যেন ভোরবেলা এসে মালপত্র মোটরে তুলে দেওয়াতে সাহায্য করে।

ডিনারের খবর নিয়ে যখন জয়সূর্য এল, তখন আমি হঠাৎ মেব্‌ল্‌কে বললুম, 'আজ এ ডিনারে জয়সূর্য আমাদের সঙ্গে বসে খানা খাক।'

মেব্‌ল্ অবাক হয়ে আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে ছিল। তার চোখে আপত্তির চিহ্ন ছিল।

আমি বললুম, 'আফটার অল, ও তোমাদেরই একজন। অন্তত এক দিনের জন্য তাকে তার ন্যায্য সম্মান দেখানো উচিত।'

মেব্‌ল্ চুপ করে রইল।

খানা টেবিলে জয়সূর্যকে বসতে দেখে পেট্রিক খুশি।

আমি বললুম, 'বাটলার, তুমি সুপটা নিয়ে এসো; মেব্‌ল্ তুমি নিয়ে আসবে মাংস; আর আমি নিয়ে আসব পুডিং।'

ব্যবস্থাটা সকলের মনঃপূত হল কি না তা ভাববার ফুরসত নেই। আমাকে আমার প্ল্যান-মাফিক কাজ করে যেতে হবে।

সে এক অদ্ভুত ডিনার। সবাই চুপ করে খেয়ে যাচ্ছে।

পুডিং আনার জন্য আমি গেলুম রান্নাঘরে।

পকেটে আর্সেনিক ছিল। ডাক্তারি শাস্ত্রে যে পরিমাণের প্রয়োজনের কথা বলে তার চেয়ে একটু বেশী করেই জয়সূর্য মেব্‌ল্ আর পেট্রিকের পুডিঙে মিশিয়ে দিলুম।

ওদের ছটফটানি, মৃত্যু-যন্ত্রণা আমি দেখি নি। আমি ততক্ষণে বড় লিচু-গাছটার কাছে গোর খুঁড়তে লেগে গিয়েছি। কাজ সহজ করার জন্য দুদিন আগে মালিকে দিয়ে সেখানে মৌসুমী ফুল ফোটাবার ফ্লাওয়ার বেড খুঁড়িয়ে রেখেছিলুম। এক বস্তা চুনও আনিয়ে রেখেছিলুম।

রাত প্রায় চারটের সময় গোর শেষ হল।

তারপর লাগেজগুলো নিজে মোটরে তুললুম চাকরদের আসবার আগেই বেরিয়ে যাব বলে, তাদের বলেছিলুম ছটায় আসতে। স্টেশনের পথে দশ মাইল দূরে বঁড়শীছড়া নদীর উপর যেখানে পোল, তারই ডান দিক দিয়ে যে ছোট্ট রাস্তা তারই উপর দিয়ে মোটর চালিয়ে নিয়ে গিয়ে সেখানে লাগেজগুলোর সঙ্গে ইট বেঁধে ডুবিয়ে দিলুম নদীর গভীরে।

তারপর বাড়ি ফিরে এসে শুয়ে পড়লুম।

আমাদের মহাকবি বলেছেন, ঘুম সঞ্জীবনী রসে প্রাণকে নবজীবন দান করে। সে কথা আমি মানি। কিন্তু তার উল্টোটাও হয়, তুমি লক্ষ্য করেছ কি? নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে গেলে, ভাবলে অন্তত ঘণ্টা দশেক গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকবে। আধঘণ্টা যেতে না যেতেই হঠাৎ পা দুটো হ্যাঁচকা টানে সটান খাড়া হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল!

শুনি আহির মনের অট্টহাসি। যে আত্মবিশ্বাস আর দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এতদিন প্ল্যানের প্রতিটি খুঁটিনাটি ঠিক ঠিক নিখুঁত-পরিপূর্ণ করে সমস্ত কর্ম সমাধান করলুম, ঘুম ভাঙতেই দেখি পায়ের তলার সে দৃঢ় ভূমি হঠাৎ ভলভলে কাদা হয়ে গিয়েছে আর আমি ক্রমাগত তলার দিকে ডুবে যাচ্ছি। ঘামে আমার সর্ব শরীর ভিজে গিয়েছে, আমি কলাপাতার মতো থরথর করে কাঁপছি। আমার শরীর, আমার মন আমার কব্জার বাইরে চলে গিয়েছে। হঠাৎ হয়তো বা চিৎকার করে ফেলি, 'আমি খুন করেছি। লিচুগাছটার তলা খোঁড়ো, সব কটা মড়া সেখানে পাবে!'

নিজের গলা সবলে নিজের হাতে চেপে ধরে কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করি। দেখি, হাত ওঠে না।

এই হল আহির মনের সবচেয়ে বড় শয়তানি। তোমাকে আত্মপ্রত্যয় দেবে, সাহস দেবে, সব বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হবার হাজারো সন্ধিসুভূত বাতলে দেবে, তারপর যে মুহূর্তে তার ইচ্ছামত কর্মটি সমাধান হয়ে গেল, অমনি তোমাকে তোমার বিভীষিকার হাতে সমর্পণ করে চলে যাবে।

আমি মর্মে মর্মে অনুভব করলুম, বিশ্বাসঘাতকতাকে সর্বদেশ সর্বশাস্ত্র কেন

সবচেয়ে বড় পাপ বলে নিন্দে করেছে।

তাই তখনো আমার যেটুকু শক্তি বাকি ছিল, তাই দিয়ে আমি আমার শেষ আশ্রয় আঁকড়ে ধরে রইলুম। সেটা কী?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং এখনো আছে, মেব্‌ল্‌দের খোঁজ কেউ করবে না। আমার কিংবা মেব্‌লের ত্রিসংসারে কেউ নেই যে, আমরা কোথায় তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে। বিলেতে যে দু-একজনের সঙ্গে আমাদের সামান্য পরিচয়, তারা ভাববে, আমরা এদেশে; এদেশের লোক ভাববে মেব্‌ল্‌রা বিলেতে। যদি বা কারো মনে কোনো সন্দেহ হয়, তবে সে বিষ্ণুছড়া মাদামপুরের মুরুব্বীদের মতো ভাববে, কাজ কি এ পাপ ঘেঁটিয়ে। খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে হয়তো বেরিয়ে পড়বে, মেব্‌ল্‌ ঐ নেটিভ বাটলারটার মিস্ট্রেস হয়ে গোপনে দিন কাটাচ্ছে। হয়তো বিলেতে কিংবা মসুরিতে। মসুরির কথা ওঠাতে মনে পড়ল, একবার আণ্ডা-ঘরে গুজোব রটে, মেব্‌ল্‌রা মসুরিতে। তার কারণ, মেব্‌ল্‌দের 'বিলেত যাওয়ার পর' আমি একবার মসুরিতে বেড়াতে গিয়ে হোটেলে উঠি; সেখানে একটি মেম ও তার বাচ্চার সঙ্গে আলাপ হয়। ওদের নিয়ে প্রায়ই বেড়াতে যেতুম বলে কেউ হয়তো আমাদের দেখে মেম এবং বাচ্চাকে ভালো করে সনাক্ত না করতে পেরে খবরটা রটিয়েছিল।

তা সে বিলেতেই হোক আর মসুরিতেই হোক, সে কেলেঙ্কারির হাঁড়ি কালা-আদমিদের হাটের মাঝখানে ভেঙে ইয়োরোপীয় সমাজের ক্ষতি বৈ লাভের সম্ভাবনা কী?

এটা আমি জানলুম সেইদিন, যেদিন আমাদের পারিবারিক কেলেঙ্কারি নিয়ে ক্লাব আলোচনা করে স্থির করল, এ নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো, 'লেট্‌ দি স্লিপিং ডগ্‌ লাই।'

তাই তোমাকে এই চিঠিতেই জোর দিয়ে লিখেছি, পাপ করলেই পুণ্যাত্মা তোমাকে ধরিয়ে দেবে না। তার ব্যক্তিগত স্বার্থ না থাকতে পারে, কিন্তু সামাজিক স্বার্থ হয়তো আছে, সে পাপ গোপন করার।

কাজেই আমাকে কেউ ধরিয়ে দেবে না।

১লা জুন

প্রিয় সোম,

প্রায় ছ মাস হল তোমাকে আমার চিঠি লেখা শেষ হয়। এরপর যে আবার কিছু লিখতে হবে সে কথা আমি ভাবি নি।

আজ কিন্তু নূতন করে লিখতে হচ্ছে। তার কারণ আমার হিসেবে একটু গোলমাল হয়ে গিয়েছে।

ত্রিসংসারে আমার বন্ধু নেই। যারা আছে তারা আমার, না-শত্রু না-মিত্র। এরা যাতে আমার খুন না ধরতে পারে, তার ব্যবস্থা আমি করেছিলুম এবং ধরার কাছাকাছি এলেও কেন যে আমাকে ধরিয়ে দেবে না তার কারণও আমি তোমাকে বলেছি।

কিন্তু অযাচিতভাবে এ সংসারে হঠাৎ যে আমার এক 'মিত্র' দেখা দেবেন এবং আমার 'মঙ্গল' এবং 'উপকার' করতে গিয়ে আমার খুন ধরে ফেলবেন এ কথা আমি কল্পনা করতে পারি নি। তাই হয়েছে।

আমি যুদ্ধের জন্য অনেক কিছু করেছিলুম বলে আই. জি. মুগ্ধ হয়ে আমার সম্বন্ধে যে-সব 'গুজোব' রটেছে সেগুলো খণ্ডন করতে চান। করতে গিয়ে তিনি এবং ভীন সত্যের প্রায় কাছাকাছি এসে গিয়েছেন, এ খবর আমি পেয়েছি।

এর জন্য আমি কোনো ব্যবস্থা করে রাখি নি, এখন আর করবারও উপায় নেই।

তাই যদি ধরা পড়ি তবে আমাকে হয়তো ঝুলতে হবে।

আমার জন্য শেষকৃত্য হয়তো তোমাকেই করতে হবে।

তাই আমার গোরের উপর নিচের দুটোর যে-কোনো একটা খোদাই করে দিতে পার :

(For a Godly Man's Tomb)

Here lies a piece of Christ ; a star in dust
A vein of gold ; a china dish that must
Be used in Heaven, when God shall feast the just.

কিংবা

(For a Wicked Man's Tomb)

Here lies the carcass of a cursed sinner,
Doomed to be roasted for the Devil's dinner.

ডেভিড ও-রেলি।

শব্‌নম

অমরাত্মা রাজশেখরকে

সাহিত্যাচার্য পরম শ্রদ্ধাস্পদ রাজশেখর বসুকে একখানা পুস্তক উৎসর্গ করিবার বাসনা আমি বহুকাল ধরিয়া মনে মনে পোষণ করিয়াছি, কিন্তু স্বরচনার মূল্য সম্বন্ধে সর্বদাই সন্দিহান থাকি বলিয়া সাহস সঞ্চয় করিতে পারি নাই। গত পৌষে তাঁহার শরীর অকস্মাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়াতে সর্ব শঙ্কা সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া তাঁহার দৌহিত্রের মাধ্যমে আমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি ভিক্ষা করি। রাজশেখর সহৃদয় সজ্জন ছিলেন—তাঁহার সদয় অনুমতি লাভ করিয়া অকিঞ্চন কৃতকৃতার্থ হয়।

আজ আমার ক্ষোভ অপরিসীম যে স্বহস্তে তাঁহার চরণকমলে পুস্তিকাখানি নিবেদন করিতে পারিলাম না।

বাদশা আমানুল্লার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ। না হলে আফগানিস্থানের মত বিদকুটে গোঁড়া দেশে বল্-ডান্সের ব্যবস্থা করতে যাবেন কেন? স্বাধীনতা দিবসে পাগমান শহরে আফগানিস্থানের প্রথম বল্-ডান্স হবে।

আমরা যারা বিদেশী তারা এ নিয়ে খুব উত্তেজিত হই নি। উত্তেজনাটা মোল্লাদের এবং তাদের চেলা অর্থাৎ ভিশ্‌তী, দর্জী, মুদী, চাকর-বাকরদের ভিতর।

আমার ভৃত্য আব্দুর রহ্‌মান সকালবেলা চা দেবার সময় বিড়বিড় করে বললে, 'জাত ধম্মো আর কিছু রইল না।'

আব্দুর রহমানের কথায় আমি বড় একটা কান দিই নে। আমি শ্রীকৃষ্ণ নই; 'জাত ধম্মো' বাঁচাবার ভার আমার স্কন্ধে নয়।

'ধেড়ে ধেড়ে হুনোরা ডপ্‌কি ডপ্‌কি মেনীদের গলা জড়িয়ে ধেই ধেই করে নৃত্য করবে।'

আমি শুধালুম, 'কোথায়? সিনেমায়?'

আর আব্দুর রহমানকে পায় কে? সে তখন সেই হবু ডান্সের যা একখানা সরেস রগরগে বয়ান ছাড়লে, তার সামনে রোমান কুকর্ম কুকীর্তি শিশু। শেষটায় বললে, 'রাত বারোটার সময় সমস্ত আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়। আর তারপর কি হয় সে-সব আমি জানি নে হুজুর।'

আমি বললুম, 'তোমার তাতে কি, ভেটকি-লোচন?'

আব্দুর রহমান চুপ করে গেল। 'ভেটকি লোচন,' 'ওরে আমার আহ্লাদের ফুটো ঘটি' এসব বললেই আব্দুর রহমান বুঝতে পারত বাবু বদমেজাজে আছেন। এগুলো আমি মাতৃভাষা বাংলাতেই বলতুম। আব্দুর রহমান ঝাণ্ডু লোক; বাংলা না বুঝেও বুঝত।

ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সন্ধ্যার সময় বেরিয়েছি। পাগমানের ঝোপে ঝাপে হেথা হোথা বিজলি বাতি জ্বলছে। পরিষ্কার তকতকে ঝকঝকে পিচ-ঢালা রাস্তা। আমি আপন মনে ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি, এটা হল ভাদ্দোর মাস। কাল জন্মাষ্টমী গেছে। আমার জন্মদিন। মা'র মুখে শোনা। এখন শিলেটে নিশ্চয়ই জোর বৃষ্টি হচ্ছে। মা দক্ষিণের ঘরের উত্তরের বারান্দায় মোড়ার উপর বসে আছে। তার কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ে চম্পা তার পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর হয়তো বা জিজ্ঞেস করছে, 'ছোট মিয়া ফিরবে কবে?'

বিদেশে বর্ষাকাল আমার কাল। কাবুল কান্দাহার জেরুজালেম বার্লিন কোথাও মনসুন নেই। ভাদ্দোর মাসের পচা বিষ্টিতে মা অস্থির। তাঁর নাইবার শাড়ি শুকোচ্ছে না, ভিজে কাঠের ধুঁয়োয় তিনি পাগল, আর আমি দেখছি হুড়মুড় করে বৃষ্টি নেমে আসছে, খানিকক্ষণ পরে আবার রোদ। আঙিনায় গোলাপ গাছে, রান্নাঘরের কোণে শিউলি গাছে, পিছনের চাউর গাছের পাতায় পাতায় কী খুশির ঝিলিমিলি।

এখানে সে শ্যামল-সুন্দরের দর্শন নেই।

সর্বনাশ! পথ হারিয়ে বসেছি। রাত ন-টা। রাস্তায় জনপ্রাণী নেই। কাকে পথ শুধোই!

ডান দিকে ঢাউস ইমারতে নাচের ব্যাণ্ডো বাজছে।

ওঃ! এটা তা হলে আমার ভৃত্য আব্দুর রহ্‌মান খান বর্ণিত সেই ডান্স-হল। এ বাড়ির খানসামা-বেয়ারা তা হলে আমাকে হোটেলের পথটা বাতলে দিতে পারবে। পিছনের চাকর-বাকরদের দরজার কাছে যাই।

গেলুম।

এমন সময় গটগট করে বেরিয়ে এলেন এক তরুণী।

প্রথম দেখেছিলুম কপালটি। যেন তৃতীয়ার ক্ষীণচন্দ্র। শুধু, চাঁদ হয় চাঁপা বর্ণের, এর কপালটি একদম পাগমান পাহাড়ের বরফের মতই ধবধবে সাদা। সেটি আপনি দেখেন নি? অতএব বলব, নির্জলা দুধের মত। সেও তো আপনি দেখেন নি। তা হলে বলি, বন-মল্লিকার পাপড়ির মত। ওর ভেজাল এখনও হয় নি।

নাকটি যেন ছোট বাঁশী। ওইটুকুন বাঁশীতে কি করে দুটো ফুটো হয় জানি নে। নাকের ডগা আবার অল্প অল্প কাঁপছে। গাল দুটি কাবুলেরই পাকা আপেলের মত লাল টুকটুকে, তবে তাতে এমন একটা শেড রয়েছে যার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় এটা রুজ দিয়ে তৈরী নয়। চোখ দুটি নীল না সবুজ বুঝতে পারলুম না। পরনে উত্তম কাটের গাউন। জুতো উঁচু হিলের।

রাজেশ্বরী কণ্ঠে হুকুম ঝাড়লে, 'সর্দার আওরঙ্গজেব খানের মোটর এদিকে ডাক তো।'

আমি থতমত খেয়ে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলুম।

মেয়েটি ততক্ষণে আমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছে আমি হোটেলের চাকর নই। তারপর বুঝেছে, আমি বিদেশী। প্রথমটায় ফরাসীতে

বললে, 'জ্য ভু দমাঁদ্‌ পার্‌দোঁ, মঁসিয়ো—মাপ করবেন—' তারপর বললে ফার্সীতে।

আমি আমার ভাঙা ভাঙা ফার্সীতেই বললুম, 'আমি দেখছি।'

সে বললে, 'চলুন।'

বেশ সপ্রতিভ মেয়ে। বয়স এই আঠারো-উনিশ।

পার্কিঙের জায়গায় পৌঁছনোর পূর্বেই বললে, 'না, আমাদের গাড়ি নেই।'

আমি বললুম, 'দেখি, অন্য কোনও গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারি কি না।'

নাসিকাটি ইঞ্চি খানেক উপরের দিকে তুলে মুখ বেঁকিয়ে অত্যন্ত গাঁইয়া ফার্সীতে বললে, 'সব ব্যাটা আনাচে কানাচে দাঁড়িয়ে বেলাল্লাপনা দেখছে। ড্রাইভার পাবেন কোথায়?'

আমার মুখ থেকে অজান্‌তে বেরিয়ে গেল 'কিসের বেলাল্লাপনা?'

মেয়েটি ঘুরে আমার দিকে মুখোমুখি হয়ে এক লহমায় আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত মেপে নিলে। তারপর বললে, 'আপনার কোনও তাড়া না থাকলে চলুন আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন।'

আমি 'নিশ্চয় নিশ্চয়' বলে সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়ালুম।

মেয়েটি সত্যি ভারি চটপটে।

চট্‌ করে শুধালে, 'আপনি এদেশে কতদিন আছেন?—পার্‌দোঁ—আমার ফ্রেঞ্চ প্রফেসর বলেছেন, অজানা লোককে প্রশ্ন শুধাতে নেই?'

আমি বললুম, 'আমারও তাই। কিন্তু আমি মানি নে।'

বোঁ করে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হয়ে বললে, 'একজাক্‌ৎমাঁ, একদম খাঁটি কথা। আপনার সঙ্গে চলছি, কিংবা মনে করুন আমার আব্বা-জান আপনার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন, আর আপনি আমায় কোন প্রশ্ন শুধালেন না, যেন আমি সাপ-ব্যাঙ কিছুই নই, আমিও শুধালুম না, যেন আপনার বাড়ি নেই, দেশ নেই। আমাদের দেশে তো জিজ্ঞাসাবাদ না করাটাই সখ্‌ৎ বেয়াদবী।'

আমি বললুম, 'আমার দেশেও তাই।'

ঝপ্‌ করে জিজ্ঞেস করে বসল, 'কোন্‌ দেশ?'

আমি বললুম, 'আমাকে দেখেই তো চেনা যায় আমি হিন্দুস্থানী।'

বললে, 'বা রে। হিন্দুস্থানীরা তো ফ্রেঞ্চ বলতে পারে না।'

আমি বললুম, 'কাবুলীরা বুঝি ফ্রেঞ্চ বলে!'

মেয়েটা খিলখিল করে হাসতে গিয়ে হঠাৎ যেন পা মচকে বসল। বলল,

'আমি আর হাঁটতে পারছি নে। উঁচু-হিল জুতো পরা আমার অভ্যাস নেই। চলুন, ওই পাশের টেনিস কোর্টে যাই। সেখানে বেঞ্চি আছে।'

জমজমাট অন্ধকার। ওই দূরে, সেই দূরে বিজলী-বাতি। সামান্য এক-ফালি পথ দিয়ে টেনিস কোর্টের দিকে এগুতে হল। একটু অসাবধান হওয়ায় তার বাহুতে আমার বাহু ঠেকে যাওয়াতে আমি বললুম, 'পারদোঁ—মাফ করুন।'

মেয়েটির হাসির অন্ত নেই। বললে, 'আপনার ফ্রেঞ্চ অদ্ভুত, আপনার ফার্সীও অদ্ভুত।'

আমার বয়স কম। লাগল। বললুম, 'মাদমোয়াজেল—'

'আমার নাম শব্‌নম।'

তদ্দণ্ডেই আমার দুঃখ কেটে গেল। এ রকম মিষ্টি নামওয়ালী মেয়ে যা-খুশী বলার হক্ক ধরে।

বেঞ্চিতে বসে হেলান দিয়ে পা দুখানা একেবারে হিন্দুকুশ পাহাড় ছাড়িয়ে কাতাখান্‌-বদখশান্‌ অবধি লম্বা করে দিয়ে বাঁ পা দিয়ে হুটুস্‌ করে ডান জুতো এক লাথে তাশকন্দ অবধি ছুঁড়ে মেরে বললে, 'বাঁচলুম।'

আমি বললুম, 'আমার উচ্চারণ খারাপ সে আমি জানি। কিন্তু ওটা বলে মানুষকে দুঃখ দেন কেন?'

চড়াক্‌সে একদম খাড়া হয়ে বসে, মোড় নিয়ে মুখোমুখি হয়ে বললে, 'আশ্চর্য! কে বললে আপনার উচ্চারণ খারাপ! আমি বলেছি 'অদ্ভুত'। অদ্ভুত মানে খারাপ? আপনার ফার্সী উচ্চারণে কেমন যেন পুরনো আতরের গন্ধ। দাঁড়ান, বলছি। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ঠাকুরমা সিন্দুক খুললে যে রকম পুরনো দিনের জমানো মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ বেরোয়। অন্য হিন্দুস্থানীরা কি রকম যেন ভোঁতা ভোঁতা ফার্সী বলে।'

আমি বললুম, 'ওরা তো সব পাঞ্জাবী। আমি বাঙলাদেশের লোক।'

এবার মেয়েটি প্রথমটায় একেবারে বাক্যহারা। তার পর বললে, 'বা-ঙ্গা-লা মুল্লুক! সেখানে তো শুনেছি পৃথিবীর শেষ। তার পর নাকি এক বিরাট অতল গর্ত। যতদূর দেখা যায়, কিছু নেই, কিছু নেই। সেখানে তাই রেলিং লাগানো আছে। পাছে কেউ পড়ে যায়। বাঙালীরাও নাকি তাই বাড়ি থেকে বেরয় না।'

আমি জানতুম, ভারতবর্ষে যে-সব কাবুলী যায় তারা বাঙলা দেশের পরে বড় কোথাও একটা যায় নি। এ সব গল্প নিশ্চয়ই তারা ছড়িয়েছে। আমি হেসে বললুম, 'কি বললেন? বাঙালীরা তাই বাড়ি থেকে বেরয় না? যেমন আমি? না?'

এই প্রথম মেয়েটি একটু কাতর হল। বললে, 'দেখুন, মঁসিয়ো—?'

আমি বললুম, 'আমার নাম মজনূন।'

'মজনূন !!!'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

'মজনূন মানে তো পাগল। জিন্ যখন কারো কাঁধে চাপে তখন "জিন্" শব্দের পাস্‌ট্ পার্টিসিপ্‌ল্ মজনূন দিয়েই তো পাগল বোঝানো হয়। এ নাম আপনাকে দিলে কে?'

আমি বললুম, 'আমার বাবার মুরশীদ। দেখুন শব্‌নম বানু, সকলেরই কি আপনার মত মিষ্টি নাম হয়! শব্‌নম মানে তো শিশিরবিন্দু, হিমকণা?'

'খুব ভোরে আমার জন্ম হয়েছিল।'

আমি গুন গুন করে বললুম,

"আমি তব সাথী
হে শেফালি, শরৎ-নিশির স্বপ্ন, শিশির সিঞ্চিত
প্রভাতের বিচ্ছেদ বেদনা।"

'বুঝিয়ে বলুন।'

আমি বললুম, 'আমাদের দেশে এক রকম ফুল হয় তার নাম শিউলি। কবি বলছেন, শরৎ-নিশি সমস্ত রাত স্বপ্ন দেখেছে শিউলি ফোটাবার—আর ভোর হতেই গাছকে বিচ্ছেদ-বেদনা দিয়ে ঝরে পড়ল সেই শিউলি।'

শব্‌নমের কবিত্ব-রস আছে। বললে, 'চমৎকার! একটি ফুল সমস্ত রাতের স্বপ্ন। আচ্ছা, আমার নাম যদি শব্‌নম শিউলি হয় তো কি রকম শোনায়?'

আমি বললুম, 'সে আপনি ধারণাই করতে পারবেন না, বাঙালীর কানে কতখানি মিষ্টি শোনায়।'

হেসে বললে, 'ফুল সম্বন্ধে কবি কিসাঈ কি বলেছেন জানেন?'

'আমি হাফিজ, সাদী আর অল্প রূমী পড়েছি মাত্র।'

'তবে শুনুন, "গুল্ নিমতীস্ত্ হিদ্‌য়া ফিরিস্তাদে আজ্ বেহেশ্‌ৎ,
মরদুম্ করীম্‌তর্ শওদ্ আন্দর্ নইম্-ই গুল্;
আয় গুল্-ফরূশ গুল্ চি ফরূশী বরায়ে সীম?
ওয়া আজ্ গুল্ অজীজ্‌তর চি সিতানী বি-সীম-ই-গুল্?"

'অমরাবতীর সওগাত এই ফুল এল ধরাতলে,
ফুলের পুণ্যে পাপী-তাপী লাগি স্বরগের দ্বার খোলে।

ওগো ফুলওয়ালী, কেন ফুল বেচো তুচ্ছ রূপার দরে ?
প্রিয়তর তুমি কি কিনিবে, বলো, রূপো দিয়ে তার তরে ?'

আমি বললুম, 'অদ্ভুত সুন্দর কবিতা। এটি আমায় বাঙলাতে অনুবাদ করতে হবে।'

'আপনি বুঝি ছন্দ গাঁথতে জানেন ?'

আমি বললুম, 'সর্বনাশ। আমি মাস্টারি করি।'

'সে আমি জানি। এদেশে দু' রকমের ভারতীয় আসে। হয় ব্যবসা-বাণিজ্য করতে, না হয় পড়াতে। তবে আপনাকে এর পূর্বে আমি কখনও দেখি নি। আচ্ছা, বলুন তো, আমানুল্লা বাদশার সব রকম সংস্কারকর্ম আপনার কি রকম লাগে ?'

'আমার লাগা না-লাগাতে কি ? আমি তো বিদেশী।'

'বিদেশী হলেও প্রতিবেশী তো। আমি ফ্রান্স থেকে ফেরার সময়—'

আমি অবাক হয়ে শুধালুম, 'ফ্রান্স থেকে—'

'ইংরেজের কল্যাণে বাবাকে নির্বাসনে যেতে হয়। আমার জন্ম প্যারিসে। সেখানে দশ বছর আর এখানে ন' বছর কাটিয়েছি। যাক্‌গে সে-কথা। দেশে ফেরার সময় বোম্বাই পেশোওয়ার হয়ে আসি। দাঁড়ান, ভেবে বলছি। ঠিক এই আগস্টেই আমরা এসেছিলুম। সে কী বৃষ্টি, বৃষ্টি আর বৃষ্টি! বোম্বাই থেকে লাহোর পর্যন্ত। ঝপ্‌ ঝপ্‌ ঝুপ্‌ ঝাপ। গাড়ির শব্দের সঙ্গে মিলে গিয়ে চমৎকার শোনায়। তা সে যাকগে। কিন্তু ওই বোম্বাই থেকে এই পেশোওয়ার—এর সঙ্গে তো ফ্রান্সের কোন মিল নেই। মিল আফগানিস্থানের সঙ্গে। দুটোই সুন্দর দেশ। আর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইরানী কবি কি বলেছেন, জানেন ?'

'হাফিজ যেন কি বলেছেন ?'

'না। আলীকুলী সলীম। বলেছেন :

"নীস্ত্‌ দর্‌ ইরান জমীন্‌ সামান-ই তহসীল কামাল
তা নিয়ামদ্‌ স্থ-ই হিন্দুস্তান হিনা রঙ্গীন্‌ ন্‌ শুদ্‌।"

'পরিপূর্ণতা পাবে তুমি কোথা ইরান দেশের ভূঁয়ে,
মেহ্‌দির পাতা কড়া লাল হয় ভারতের মাটি ছুঁয়ে।'

আমি শুধালুম, 'এদেশের হেনাতে কি কড়া রঙ হয় না ?'

'বাজে। ফিকে। হলদে।'

আমি বললুম, 'আপনি কথায় কথায় এত কবিতা বলতে পারেন কি করে?'

হেসে বললে, 'বাবা আওড়ান। আর ন' দশ বছরেও আমার আত্মসম্মান জ্ঞানটি ছিল অত্যুগ্র। প্যারিসে ক্লাসে ফরাসী কবিতা কেউ আওড়ালে আমি সঙ্গে সঙ্গে ফার্সী শুনিয়ে দিতুম।'

তারপর বললে, 'বড় রাস্তায় তো জন-মানব নেই। শুধু মনে হচ্ছে একখানা মোটর বার বার আসা-যাওয়া করছে। নয় কি? আপনি লক্ষ্য করেছেন?'

আমি বললুম, 'বোধ হয় তাই।'

বললে, 'তবে আমাকে বলেন নি কেন?'

আমি এক-মাথা লজ্জা পেয়ে বললুম, 'আমার ভালো লাগছিল বলে।'

মেয়েটি চুপ করে রইল।

আমি শুধালাম, 'ওটা কি আপনাদের গাড়ি? আপনাকে খুঁজছে?'

'উঁ।'

'তবে চলুন।'

'না।'

'আচ্ছা। কিন্তু আপনার বাড়ির লোক আপনার জন্যে দুশ্চিন্তা করবেন না?'

'তবে চলুন।' উঠে দাঁড়াল।

আমি বললুম, 'শব্‌নম বানু, আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

'তওবা! আপনাকে ভুল বুঝব কেন?'

রাস্তায় যেতে যেতে বেশ কিছু পরে সে-ই কথার খেই ধরে বললে, 'বিদেশীর সঙ্গে আলাপ করতে ওই তো আনন্দ। তার সম্বন্ধে কিছু জানি নে। সেও কিছু জানে না। সেই যে কবিতা আছে,

"মা আজ্‌ আগাজ্‌ ওয়া আন্‌জামে জাহান্‌ বে-খবরীম্‌
আওওল ও আখির-ই ঈন কুহ্‌নে কিতাব ইফ্‌তাদে অস্‌ৎ।"

'গোড়া আর শেষ এই সৃষ্টির জানা আছে, বলো, কার?
প্রাচীন এ পুঁথি গোড়া আর শেষে পাতা কটি ঝরা তার।'

এমন সময় ওই জলজলে আলোওলা পোড়ারমুখো মোটর এসে সামনে দাঁড়াল। শব্‌নম বানু বললে, 'চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দি।'

এতক্ষণ দুজনাতে বেশ কথাবার্তা হচ্ছিল। এখন ওই ড্রাইভারের সামনে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। প্যারিস থেকে এসে থাক্‌, আর খাস

কাবুলওলীই হোক, এরা যে কট্টর গোঁড়া সে কি কারও অজানা? বললুম, 'থাক। আমার হোটেল কাছেই।'

শব্‌নম বাহু বুদ্ধিমতী। বললে, 'বেশ। তবে, দেখুন আগা, আপনি কোন কারণে কণামাত্র সঙ্কোচ করবেন না। আমি কাউকে পরোয়া করি না।'

পরোয়া শব্দটি আসলে ফার্সী। শব্‌নম ওই শব্দটিই ব্যবহার করেছিল।

'আদাব আরজ।'

'খুদা হাফিজ।'

হোটেলে ঢোকবার সময় পিছনে শব্দ হওয়াতে তাকিয়ে দেখি, আব্দুর রহ্‌মান। নিজের থেকেই বললে, 'একটু বেড়াতে গিয়েছিলুম।'

আমি তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলুম ইনি একটি হস্তীমূর্খ না মর্কটচূড়ামণি?

সমস্ত রাত ঘুম এল না।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি আদম-সুরৎ—কালপুরুষ। অতি প্রসন্ন বদনে যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আকাশের পরিপূর্ণ শান্তি যেন তার অঙ্গের প্রতিটি তারায় সঞ্চিত করে আমার দিকে বিচ্ছুরিত করে পাঠাচ্ছেন।

একটি ফার্সী-কবিতা মনে পড়ল।

ইরানের এক সভাকবি নাকি চাঁড়ালদের সঙ্গে বসে ভাঁড়ে করে মদ্যপান করেছিলেন। রাজা তাই নিয়ে অনুযোগ করাতে তিনি বলেছিলেন,

'হাজার যোজন নিচেতে নামিয়া আকাশের ওই তারা
গোষ্পদে হ'ল প্রতিবিম্বিত; তাই হ'ল মানহারা?'

শেষরাত্রে কালো মেঘ এসে আকাশের তারা একটি একটি করে নিবিয়ে দিতে লাগল। আমার মন অজানা অস্বস্তিতে ভরে উঠতে লাগল। বিবেকানন্দ ইংরিজী কবিতায় লিখেছিলেন, 'দি স্টার্‌স্ আর্ ব্লটেড্ আউট'। সত্যেন দত্ত অনুবাদ করেছেন 'নিঃশেষে নিবেছে তারাদল'। কেমন যেন, কি-হবে কি-হবে একটা ভাব মনকে আচ্ছন্ন করে দিল।

শেষ রাত্রে নামল খাঁটি সিলেটি বৃষ্টি।

প্রসন্নাস্ত, প্রসন্নাস্ত আমার অস্ত সন্ধ্যার সবিতার!

খুদাতালা বেহদ মেহেরবান। আমার শেষ মনস্কামনা পূর্ণ করে দিলেন। কী মূর্খ আমি! আমার প্রত্যাশা যে করুণাময়ের অফুরন্ত দান ছাড়িয়ে যেতে

পারে, এ দণ্ড আমি করেছিলুম কোন্ গবেটামিতে ?

। ২ ।

ঘুম-ভাঙা-ঘুম-লাগা কল্পনা-স্বপ্নে-জড়ানো রাতের শেষ হল সূর্যোদয়ের অনেক পর। কাল রাত্রে তো পারিই নি, আজ সকালেও বুঝতে পারলুম না, কাল রাত্রে কি হয়ে গেল। এ কি আরম্ভ, না এই শেষ! এ কি অন্ধকার রাত্রে চন্দ্রোদয়ের মত আমার ভুবন প্রসারিত করে দেবে, না এ হঠাৎ চমক-মারা বিদ্যুল্লেখা শুধু ক্ষণেকের তরে সুদূর আকাশপটে আমার ভাগ্যের ব্যঙ্গচিত্র এঁকে লোপ পাবে!

আচ্ছন্নের মত জানলার ধারের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল চেয়ারে ঝোলানো আমার কোটের কাঁধের উপর এক গাছি লম্বা চুল।

কি করে এসে পৌঁছল? কে জানে, এ জগতে অলৌকিক ঘটনা কি করে ঘটে?

কিংবা এ ঘটনা কি অতিশয় দৈনন্দিন নিত্য প্রাচীন? যে বিধাতা প্রতিটি ক্ষুদ্র কীটেরও আহার যুগিয়ে দেন, তিনিই তো তৃষিত হিয়ার অপ্রত্যাশিত মরূদ্যান রচে দেন। কিন্তু তার কাছে তখন সেটা অলৌকিক।

কুবেরের লক্ষ মুদ্রা লাভ অলৌকিক নয়, কিন্তু নিরন্নের অপ্রত্যাশিত মুষ্টি-ভিক্ষা অলৌকিক। কিংবা বলব, সরলা গোপিনীদের কৃষ্ণলাভ অলৌকিক—ইন্দ্রসভায় কৃষ্ণের প্রবেশ দৈনন্দিন ঘটনা।

অথবা কি এই হঠাৎ লটারি-লাভ আমার হৃৎপিণ্ড বন্ধ করে দেবে! অন্ধকার রাতের দুশ্চিন্তা তার কালো চুলকে ভোরের সঙ্গে সঙ্গে সাদা করে দেবে?

কি করি? কি করি?

জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি অল্প অল্প বৃষ্টি। এই বৃষ্টিকেই কাল রাত্রে কত সোহাগের সঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিলুম। এখন কোন-কিছুর সন্ধানে বাইরে যেতে পারব না বলে সেই সোহাগের ধন বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু কোথায় সন্ধান?

সর্দার আওরঙ্গজেবের বাড়ি খুঁজে আমি পাব নিশ্চয়ই। সেই সুদূর বাঙলা-দেশ থেকে যখন কাবুল পৌঁছতে পেরেছি তবে এ আর কতটুকু! কিন্তু পেয়ে লাভ? সেখানে তো আর গট্‌গট্ করে ঢুকে গিয়ে বলতে পারব না, 'শব্‌নম বানুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।' এ দেশের ছেলেই এটা করতে পারে না,

আমি তো বিদেশী। আমি তো এমন কিছু স্বর্ণভাণ্ড নই যে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে মাটি চাপা পড়ে গেলেও লোকে জানতে পারলে খুঁড়ে বের করবে? বরঞ্চ শব্‌নমই স্বর্ণ-পাত্র। আমি ভিখারী, তার দিকে নিষ্কাম হৃদয়ে তাকালেও সর্দার আমার গর্দান নেবেন।

তা তিনি নিন। রাজারও একটা গর্দান, আমারও একটা। অথচ আশ্চর্য, রাজার গর্দান গেলে বিশ্বজোড়া হইহই পড়ে যায়—আমার বেলা হবে না। কিন্তু ওই কিশোরীকে জড়ানো?

এ তো বুদ্ধির কথা, যুক্তির কথা, সামান্য কাণ্ডজ্ঞানের কথা, কিন্তু হায়, হৃদয়েরও তো আপন নিজস্ব যুক্তিরাজ্য আছে, সে তো বুদ্ধির কাছে ভিখিরীর মত তার যুক্তি ভিক্ষা চায় না। আকাশের জল আর চোখের জল তো একই যুক্তি-কারণে ঝরে না।

আব্দুর রহ্‌মান এসে খবর দিলে, আজ দুপুরে হোটেলে মাছ। অন্যদিন হলে আনন্দে আমি তাকে বখশিশ দিতুম—এ দেশে এই প্রথম মাছের নাম শুনতে পেলুম। আজ শুধু অলস নয়নে তাকিয়ে রইলুম।

খেতে গিয়েছিলুম। এদিক ওদিক তাকাই নি। কারণ, কাবুল পাগমানে এখনও মেয়েরা রেস্তরাঁতে বেরয় না। অনেক সর্দারই খেতে এসেছিলেন; হয়তো সর্দার আওরঙ্গজেবও ছিলেন।

হঠাৎ মৃদু গুঞ্জরন আরম্ভ হল। তারপর সবাই ধড়মড় করে ছুরি-কাঁটা ফেলে উঠে দাঁড়াল। ব্যাপার কি? 'বাদশা, বাদশা' আসছেন।

আমার বুকের রক্ত হিম। এই সর্বনেশে দেশে কি স্বয়ং বাদশা বেরন মজনুন—অর্থাৎ পাগলদের কিংবা আসামীর সন্ধানে!

না। এটা সরকারী হোটেল। লাভ হচ্ছে না শুনে তিনি স্বয়ং এসেছেন বড় ভাই মুইন-উস্‌-সুল্‌তানের সঙ্গে পেট্রোনাইজ করতে। রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীনও তা হলে তীর্থ দরশনে আসতে পারে। রাজার সঙ্গে গেলে দীনের রাহা-খরচাটা বাদ পড়ে বটে কিন্তু সেও তো পুরুত-পাণ্ডাকে দু পয়সা বিলোয়। পরে দেখা গেল তাঁর হিসেবটা ভুল নয়।

অনেক রকম খাবারই সেদিন ছিল। এমন কি সদ্য ভারতবর্ষ থেকে আগত এক পেশোওয়ারী সদাগর পাতি নেবু পর্যন্ত বিলোলেন। অন্যান্য ঠাণ্ডা দেশের মত কাবুলেও কোন টক জিনিস জন্মায় না। আমারটা আমি গোপনে পকেটে পুরেছিলুম। পরে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তার গন্ধ শুঁকব বলে। দেশের গন্ধ কত দিন

হল পাই নি। যে মাছটি খেলুম সেটি ভালো হলেও তাতে দেশের গন্ধ ছিল না।

রাজা উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু কাবুলীদের অবশ্য-কর্তব্য ঢেকুরটি তুললেন না। আমরাও উঠলুম। আমার খাওয়া অনেকক্ষণ হল শেষ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রাজা না ওঠা পর্যন্ত প্রজাকে খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করে ভান করতে হয়, যেন তার খাওয়া তখনও শেষ হয় নি। রাজা তো প্রজার তুলনায় গোগ্রাসে গিলতে পারেন না। গিললে প্রজাকে আরও বেশী গেলবার ভান করতে হয়।

ইরান-তুরানে অতিথি নিমন্ত্রিত-বাড়ি এলে গৃহস্থকে ওই ভান করতে হয়।

এসব আমার চিন্তা-ধারা নয়। আমার সঙ্গে বসেছিলেন তিনজন ভারতীয় ব্যবসায়ী। এঁরাই গুনগুন করে এসব কথা উর্দুতে বলে যাচ্ছিলেন।

বেরিয়ে এসে দেখি বৃষ্টি থেমেছে। রোদ উঠেছে। গাছের ভেজা পাতা রোদের আলোতে ঝলমল করছে।

এখন বেরনো যায়। কিন্তু যাব কোথায়? সে চিন্তা তো আগেই করা হয়ে গিয়েছে! হলে কি হয়! পাগলামির প্রথম চিহ্ন, পাগল একই কথা বার বার বলে, একই গ্রাস বার বার চিবিয়ে চলে, গিলতে পারে না।

আর বেরতে গেলেই এই তিন ব্যবসায়ী দুশ্‌মন্‌ সঙ্গ নেবে। এরা এসেছে মাত্র কয়েকদিনের জন্য। কাবুলের ডাস্ট্‌বিনের ছবি তোলে, হ্যাট-পিনের পাইকারি দর শুধোয়।

আর আমার ঘরে তো রয়েছে আমার সেই অমূল্য নিধি। আজ সকালের সওগাত।

এদেশের সবুজ চা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। তিনটের সময় পা টিপে টিপে নিচে নামলুম। সেখানে চা খেয়েই বেরিয়ে যাব। এ সময় আর সবাই আপন আপন ঘরে চা খায়।

টী-রুমে ঢুকেই এক কোণে এক সঙ্গে অনেক কিছু দেখতে এবং শুনতে পেলুম। দেখি, আধ ডজনের বেশী কাবুলী তরুণী মাথার উপরকার হ্যাট থেকে ঝোলানো নেট্‌ বা বোরকার উত্তর-প্রান্ত—যাই বলা যাক না কেন—নামিয়ে, গোল টেবিল ঘিরে বসে কিচির মিচির লাগিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলুম, এ সময় হোটেলের নিচের তলাটা নির্জন থাকে বলে এই সুবাদে বেচারীরা ফুর্তি করতে, নূতন কিছু-একটা করতে এসেছে। এবং এঁদের বুদ্ধিদায়িনীটি কে সেটা বুঝতেও বিলম্ব হল না। শব্‌নম বানু স্বয়ং দাঁড়িয়ে ওয়েটারকে তদ্বিতম্বা করছেন ঝড়ের বেগে—'পেস্ট্রি নেই! কেন? কেক্‌ আছে। সে তো

বলেছ। অর্ডারও তো দিয়েছি। ডিমের স্যাণ্ডউইচ! কেন? শামী কাবাব দিয়ে স্যাণ্ডউইচ বানাতে পার না? মাথায় খেলে নি? যত সব—'

আমার দিকে পাশ ফিরে কথা বলছিলেন। হঠাৎ কেন জানি নে আমার দিকে তাকাতেই তাঁর মুখের কথা আমাকে দেখার সঙ্গে কলিশন লেগে থেমে গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে বোঁ করে চক্কর খেয়ে বারান্দায়। রওয়ানা দিলুম গেটের দিকে।

সেখানে পৌঁছতে না পৌঁছতেই পিছন থেকে কি একটা শব্দ শুনে ফিরে দেখি, সেই ওয়েটার।

'আপনাকে একটি বানু ডাকছেন।'

এসে দেখি, তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

হাসি-মুখে বললে, 'পালাচ্ছিলেন কেন। দাঁড়ান।'

হ্যাণ্ডব্যাগ খুলতে খুলতে বললে, 'আজ সকালে বাবাকে জিজ্ঞেস করলুম, বাংলাদেশ কোথায়? তিনি বললেন, ওদেশের এক রাজা নাকি আমাদের মহাকবি হাফিজকে তাঁর দেশে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি যেতে না পেরে একটি কবিতা লিখে পাঠান। সেটি আমি টুকে নিয়েছি। এই নিন।'

আমি তখন কিছুটা বাক্‌শক্তি ফিরে পেয়েছি। ধন্যবাদ জানিয়ে পকেটে রাখতে গিয়ে সেই নেবুটায় হাত ঠেকল।

হঠাৎ আমার কি হল? কোন চিন্তা না করে এই সামান্য-পরিচিতা বিদেশিনীর হাতে কি করে সেটা তুলে ধরলুম?

'এটা কি? ওঃ! নেবু? লীমুন। লীমুন-ই-হিন্দুস্তান!' নাকের কাছে তুলে ধরে শুঁকে বললে, 'পেলেন কোথায়? কী সুন্দর গন্ধ! কিন্তু ভিতরটা টক। না?' বলে আবার হাসল।

ওয়েটার চলে গেছে। চতুর্দিক নির্জন। দূরে দূরে মালীরা কাজ করছে মাত্র।

তবু আমার মুখে কথা নেই।

মেয়েটি একবার আমার মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালে।

আমি তাকিয়ে মাথা নিচু করলুম।

আস্তে আস্তে ভিতরে চলে গেল।

কী আহাম্মুখ! কী মূর্খ আমি!

প্রথম বারে না হয় বে-আদবী হত, কিন্তু এবারে এরকম অবস্থায়ও আমি শুধোতে পারলুম না, আবার দেখা হবে কি না? এবারে তো সে-ই ডেকেছিল।

কবিতা দিলে। সেই কবিতাটি পড়ার ভান করে, ওই প্রশ্নটা ভালো করে বলার ধরনটা ভেবে নিলেই তো হত। না, না। ভালোই করেছি। যদি সে চুপ করে যেত তা হলেই তো সর্বনাশ। 'না' বললে তো আমি খতম হয়ে যেতুম। কিন্তু তবু কী মূর্খ আমি! এই যে আঠারো ঘণ্টা একই চিন্তায় বার বার ফিরে এসেছি তার ভিতর একবারও ভেবে নিতে পারলুম না, হঠাৎ যদি দৈবযোগে আবার দেখা হয়ে যায় তা হলে কি করতে হয়, কি বলতে হয়, সে-ই সব চেয়ে বড় প্রশ্ন—আবার দেখা হবে কি?—সেইটে কি করে ভদ্রভাবে শুধোতে হয়?

ওরে মূর্খ? দিলি একটা নেবু!

তাও শুনতে হল ভিতরটা টক!

না, সে মীন করে নি।

আলবাৎ করেছে।

না।

। ৩ ।

আমি জানি, কাবুলের শেষ বল-ডান্স কাল রাত্রেই হয়ে গিয়েছে। তবু সন্ধ্যার পর সেই অন্ধকার ভুতুড়ে বাড়ির চতুর্দিকে ঘোরপাক খেলুম। জানি, আজ আর টেনিস কোর্টে কেউ আসবে না। তবু সেখানে গেলুম। শুধু, সেই বেঞ্চিটিতে বসতে পারলুম না। বসলুম, একটা দূরের বেঞ্চিতে ওইদিকে তাকিয়ে। হায় রে, নির্বোধ মন। তোমার কতই না দুরাশা! যদি, যদি কেউ মনের ভুলে সেখানে এসে বসে।

টেনিস খেলার ছলে পৃথিবীর সর্ব টেনিস-কোর্টেই বহু নরনারী আসে প্রিয়জনের সন্ধানে, তার সঙ্গ-সুখ মোহে। এই কোর্টেও আসে দেশী বিদেশী অনেক জন। আমিও আসতে পারি। কিন্তু আমার এসে লাভ? কাবুলী মেয়েরা তো এখনও বাইরে এসে কোন খেলা আরম্ভ করে নি।

আমার বন্ধু আসে যখন সব খেলা সাঙ্গ হয়ে যায়। এ খেলাতে তার শখ নেই। দিনের আলোতে খেলা তো সহজ—সবাই সবাইকে দেখতে পায়। তাতে আর রহস্য কোথায়? অন্ধকারের অজানাতে ঠিক-জনকে চিনে নিতে পারাই তো সব চেয়ে বড় খেলা। শিশু যেমন গভীরতম অন্ধকারে মাতৃস্তন খুঁজে পায়। তাই বুঝি মৃত্যুর ওপারে আমাদের জন্য সব চেয়ে বড় খেলা লীলাময় রেখেছেন।

মিথ্যা, মিথ্যা, সব মিথ্যা। কেউ এল না।

অত্যন্ত শ্লথ গতিতে সে রাত্রি বাড়ি ফিরেছিলুম। তীর্থযাত্রী যে রকম নিষ্ফল তীর্থ সেরে বাড়ি ফেরে।

ডিনার শেষ হয়ে গিয়েছিল। আব্দুর রহ্‌মান কিছু স্যাণ্ডউইচ সাজিয়ে রাখছিল। তাড়াতাড়ি বললে, 'এখনও কিচেন বোধহয় বন্ধ হয় নি; আমি গরম স্যুপ নিয়ে আসি।'

আমি বললুম, 'না।'

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ আব্দুর রহ্‌মান আমার কোট পাতলুন বুরুশ করতে করতে কথায় কথায় বললে, 'সর্দার আওরঙ্গজেব খান কাল সন্ধ্যায়ই বিবি বাচ্চা-বাচ্চী সমেত কাবুল চলে গেছেন। তাঁর পিসী গত হয়েছেন।'

অন্য সময় হলে হয়তো শুনেও শুনতুম না, কিংবা হয়তো অলস কণ্ঠে নীরস প্রশ্ন শুধাতুম, 'সর্দারটি কে?'

এখন আমি আব্দুর রহ্‌মান কি জানে, কি করে জানে, কতখানি জানে, এ-সবের বাইরে। একদিন হয়তো আরও অনেকে জানবে, তাতেই বা কি? সেই যে ইরানী কবি বলেছেন,

"কত না হস্ত চুমিলাম আমি অক্ষমালার মত,
কেউ খুলিল না কিস্মতে ছিল আমার গ্রন্থি যত!"

'দস্ত-ই হর-কস্‌রা ব্‌সানে সবহৎ বুসীদম্‌ চি সুদ
হীচ্‌ কস্‌ ন্‌ কশওদ আখির অক্‌দয়ে কারে মরা।'

অক্ষমালার মত পূতপবিত্র হয়ে সাধুসজ্জনের মন্ত্রোচ্চারণের পুণ্যকর্মে লেগেও যদি তারা 'গেরো' থেকেই যায়, তবে আব্দুর রহ্‌মানের হাতে দু পাক খেতেই বা আপত্তি কি?

প্রথমটা সত্যই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলুম।

অথচ দিনের আলো যতই ম্লান হতে লাগল, ততই মনে হতে লাগল এই জঙ্গলী পাগমান শহরটা বড়ই নোংরা। দুনিয়ার যত বাজে লোক জমায়েৎ হয়ে খামকা হই-হুল্লোড় করে। এর চেয়ে কাবুল ঢের ভালো।

দেখি, আব্দুর রহ্‌মানেরও ওই একই মত। অথচ এখানে সাত দিনের ছুটি কাটাবার জন্য সে-ই করেছিল চাপাচাপি। এখনো তার তিন দিন বাকি।

সকালে দেখি, আব্দুর রহ্‌মান বাক্স প্যাঁটরা গোছাতে আরম্ভ করেছে। মনস্থির করাতে সে ভারী ওস্তাদ।

হিন্দুস্থানী সদাগররা দুঃখিত হলেন। বললেন, 'কাবুলে আবার দেখা হবে।'

বাস্‌ পাগমানে ছাড়তেই মনে হল, সর্বনাশ।

শব্‌নম বানু যদি আবার পাগমানে ফিরে আসে?

আর ভাবতে পারি নে রে, বাবা!

॥ ৪ ॥

পুরাতন ভৃত্যকে ছেড়ে বাড়ি ফেরা পীড়াদায়ক হলেও, সে সঙ্গে থাকলেই যে গৃহ মধুময় হয়ে ওঠে তার কোন প্রমাণ আমি পেলুম না। সেই নিরানন্দ নির্জন গৃহ। খান কয়েক বই। এগুলো প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছে।

আচমকা একটা বুদ্ধি খেলল মাথায়। এক দোর বন্ধ হলে দশ দোর খুলে যায়, বোবার এক মুখ বন্ধ হলে দশ আঙুল তার ভাষা তর্জমা করে দেয়। আমার যদি সব দ্বার বন্ধ হয়ে গিয়ে মাত্র একটি খুলে যায় তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। সে দ্বার দিয়ে বেরিয়ে আমি কোথায় গিয়ে পৌছব তার খবরও আমি জানতে চাই নে। দিগন্তের কাবা'র ছবি আমি দেখতে চাই নে, হে প্রভু! তুমি শুধু একটি কদম্‌ ওঠাবার মত আলো ফেলো।

ফার্সী শিখব—যে ফার্সীকে এত দিন অবহেলা করেছি।

তরুণরা এটা শুনে নিরাশ হবে। তারা ওই সময়ে স্বপ্ন দেখে অসম্ভব অসম্ভব বিষয়ের। প্রিয়ার ঘরে যদি আগুন লাগে, দমকলের লোকও তাকে বাঁচাবার জন্যে সাহসে বুক বেঁধে না এগোয়, সে তখন কি রকম লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাকে বাঁচাবার জন্য। ইংরেজকে খুন করে প্রিয়া ধরা পড়েছে; ফাঁসির জন্য তৈরী হয়ে সে সব দোষ আপন স্কন্ধে তুলে নিল—প্রিয়া জানতে পর্যন্ত পারল না।

প্রবীণরা এসব স্বপ্নের কথায় হাসেন। আমি হাসি নে।

ধন্য হোক তাদের এ সুখ-স্বপ্ন। মৃত্যুঞ্জয় হোক তাদের এ দুরাশা! এ-গুলোই তো তপ্ত ভূতলকে সরস শ্যামল করে রেখেছে। নন্দন-কাননের যে হাসি মুখে নিয়ে শিশু মায়ের কোলে আসে, তরুণের সেই নন্দন-কানন থেকেই আকাশ-কুসুম চয়নে তার শেষ রেশ।

তার তুলনায় ফার্সী শেখা কিছুই নয়। বজ্র-নির্ঘোষে ঝিঁঝির নূপুর-নিক্কণ!

প্রবীণরা অবশ্য এটাকেই প্রশংসা করতেন। আজ যদি আমি শব্‌নম বানুকে চিঠি লিখতে যাই? আমার ফার্সী কাঁচা, ফরাসী দড়কচ্চা।

বেরলুম ফার্সী বইয়ের সন্ধানে, কাবুলী বন্ধুদের বাড়িতে। তারা খুশী হবে। নিরপরাধা অকারণে বর্জিতা প্রথমা প্রিয়ার সন্ধানে নির্গত প্রণয়ীর নব অভিসার প্রিয়জন প্রসন্ন বদনে আশীর্বাদ করে। ফার্সীকে আমি অকারণে বর্জন করেছিলুম।

এই বেরনোর পিছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না, এ কথা বলব না।

আজ কেন, সেদিনও আমার মাতৃভূমিতে ক্লাসিক্‌স্ অনাদৃত। অনুন্নত কাবুলে তা নয়। সেদিনও স্বয়ং মাইকেল যদি কলেজ স্ট্রীটে এসে নিজের বইয়ের সন্ধান করতেন তবে সেগুলো বের করা হত পিছনের গুদোম থেকে। তিনি তখন ইরানী কবির মতই দুঃখ করে বলতে পারতেন,

"রাজসভাতে এসেছিলেম বসতে দিলে পিছে,
সাগর জলে ময়লা ভাসে, মুক্তো থাকে নিচে।"

মাইকেলের দুঃখ বেশী। পুস্তক-সভাতেও তিনি পিছনে।

এখানে হাফিজ সাদী কলীম পয়লা শেল্‌ফে। কিছু বই কিনলুম। ধারের বইয়ে নাকি বিদ্যার্জন হয় না।

ফেরার পথে কলেজের ছেলেদের সঙ্গে দেখা। তারা চেপে ধরলে, কাবুল নদীতে সাঁতারে যেতে। মনে মনে বললুম, ওখানে যা জল তা দিয়ে কাশীরাম-দাসের জলের তিলকও ভালে কাটা যায় না। শেষটায় ঠিক হল তিন দিন পর, ছুটির শেষ দিনে।

তীব্র আবেগে ফল আসন্ন। তিন দিনেও অনেকখানি ফার্সী শেখা যায়।

তিন দিন পরে সাঁতারে এসেছি।

খানিকক্ষণ পরেই ছেলেরা আমার কথা ভুলে গিয়ে আপন আনন্দে মেতে উঠল। আমি আস্তে আস্তে ভাটির দিকে বুকজল ঠেলে ঠেলে, কখনও বা দু দিক থেকে নুয়ে পড়া গাছের পাতা চোখের সামনে থেকে হাত দিয়ে ঠেলে এগুতে লাগলুম। সামনে একটু গভীর জল। সাঁতার কেটে ডান পারে উঠে গাছের ঝোপে জিরোতে বসলুম। যত মন্দমন্থরই হোক, স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকতে সম্মোহন আছে।

পিছন থেকে শুনি, 'এই যে!'

তাকিয়ে দেখি, শব্‌নম।

এক লম্ফে জলে নামলুম। ভেবে নয়, চিন্তা করে নয়—সাপ দেখলে মানুষ যে রকম লাফ দেয়। আমার পরনে সাঁতারের কস্‌ট্যুম। কত যুগ যুগ সঞ্চিত প্রাচ্যভূমির এ সংস্কার।

'উঠে আসুন, উঠে আসুন, এখ্‌খুনি উঠে আসুন।'

কোন উত্তর নেই।

'উঠবেন না? আচ্ছা, তবে দেখাচ্ছি।' বলেই হ্যাণ্ডব্যাগ হাতড়াতে লাগল।

মেরেছে! না—মারবে—পিস্তল খুঁজছে নাকি?

কাতর কণ্ঠে বললে, 'দেখুন, আপনি মীন্‌ এডভেন্‌টেজ নেবেন না। আমার পিস্তলে গুলি নেই।' একটু ভেবে বললে, 'ও, বুঝেছি। পরনে কস্‌ট্যুম। তা, উঠে আসুন। এই নিন আমার গায়ের ওড়না। এইটে জড়িয়ে বসবেন।'

এ তো আরও মারাত্মক। কাবুলিনীবেশে ওড়না শুধু অঙ্গাভরণ নহে, কিছুটা অঙ্গাবরণও বটে।

ততক্ষণে আমার বেশ বিষয়ের সংস্কার কেটে গিয়েছে। তার চেয়েও যে প্রাচীন সংস্কার সেইটে এসে সোনার বাঁশী বাজাতে আরম্ভ করেছে। সে সংস্কারের সোহাগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নক্ষত্রলোক আপন গতি খুঁজে পায়।

'আপনি আমাকে কি করে খুঁজে পেলেন?'

প্রথমটায় চুপ করে গেলুম। মিথ্যে উত্তর দিতে যে একেবারেই ইচ্ছে যায় নি এ কথা বলব না।

শব্‌নম চুপ করে থাকতে পারে না। উত্তর না দিলে শাসায়। এবারে কিন্তু নীরব প্রতীক্ষায় বসে রইল।

ভালো ভাবেই বুঝে গেলুম এবারে সে উত্তর না নিয়ে ছাড়বে না। বললুম, 'আপনাকে আমি সব খানেই খুঁজছি।'

মুখ খুশিতে ভরে উঠল। হঠাৎ আবার আকাশের এক কোণে মেঘ দেখা দিল। শুধালে, 'আমাদের বাগান-বাড়ি কাছেই, জানতেন?'

কেন জানি নে, বলতে ইচ্ছে হল না যে, তাদের কাবুলের বাড়ি বাইরে থেকে যতটুকু দেখা যায় তার সবটুকু ওর বানানেওলা রাজমিস্ত্রির চেয়েও আমি বেশী জানি। বললুম, 'না।'

এবারে যেন তার কান্না পেল। বললে, 'ওঃ! বুঝেছি। সাঁতার কাটবার স্ফূর্তি করতে এসেছিলেন।'

এই এত দিনে আমার সত্যকার বাজল।

আজ না হয় ঠাট্টা-মস্করা, রঙ্গ-রসিকতা করে মনের গভীর আবেগ, তার গোপন ক্ষুধা, তার অসম্ভব অসম্ভব স্বপন-চয়ন, তার বদ্ধ পাগলামি যতখানি পারি ঢেকে চেপে বলছি কিন্তু তখন, হায়, এ হালকামি ছিল কোথায়?

বললুম, 'দেখুন, শব্‌নম বানু, আমি বিদেশী। বিদেশে অনেক মনোবেদনা। তার উপর যখন মানুষ ভালবাসে—'

সঙ্গে সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে শব্‌নম তার হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরল।

আমি ভয়ে লজ্জায় মারা গেলুম। ছি, ছি! আমি কী করে এ কথাটা বলে ফেললুম? কোথা থেকে আমার এ সাহস এল? কিন্তু আমি তো সাহসে বুক বেঁধে এ-কথা বলি নি। এ তো নিজের থেকেই বেরিয়ে গিয়েছে।

তার চেয়েও আশ্চর্য, শব্‌নম আমার মুখের উপর তার হাতের চাপও ছাড়ছে না।

'ব'লো না, ব'লো না। আমি ঠিক করেছিলুম ও কথাটা আমি আগে তোমাকে বলব।'

দু জনাই অনেকক্ষণ চুপ।

শব্‌নমই প্রথম কথা বললে।

বললে, 'আমি ভেবেছিলুম, আমি প্রথম বলব, আর তুমি আমাকে অবহেলা করবে।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'সে কি?'

তাড়াতাড়ি বললে, 'থাক্, থাক্! আজ এসব না। আরেক দিন এসব কথা হবে। আজ শুধু আনন্দের কথা বল। সব প্রথম বল, তুমি কখন আমাকে ভালবাসলে?'

আমি বললুম, 'সে কি করে বলি? তুমি কখন বাসলে বল।'

উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'সে অতি সহজ। হোটেলের বারান্দায় যখন তোমাকে ডেকে পাঠালুম। তুমি যখন কোন কথাই খুঁজে পাচ্ছিলে না, তখন। জান না ইস্‌ফাহানী কবি সাঈব কি বলেছেন,

"খমুশী হুজ্জতে নাতিক্ বুদ্ জুইআই-ই-গওহর্‌হা,
কি আজ গওওয়াস্ দর্ দরিয়া নফ্‌স্ বীরূন নমীআয়দ্।"

'গভীরে ডুবেছে যে জন, জানিবে মুক্তার সন্ধানে,
বুদ্বুদ হয়ে তার প্রশ্বাস ওঠে না উপর পানে।'

আমি বললুম, 'এ কবি সত্যই জীবন দেখেছিলেন ; কাবুলে এ কবি কিন্তু জন্মাতে পারত না।'

'কেন ?'

'ডুব দেবার মত জল এখানে কোথায় ?'

'সে কথা থাক্‌। আমার কিন্তু ভারী দুঃখ হয়, তুমি আমার বয়েতের পাল্টা বয়েৎ দিতে পার না বলে।'

আমি নিশ্বাস ফেলে বললুম, 'সে কি আমার হয় না।'

'চুপ। আবার ভুল করেছি। বলেছিলুম দুঃখের কথা তুলব না।'

'আমি কিন্তু জোর ফার্সী শিখতে আরম্ভ করেছি।'

'কী আনন্দ! বাবার মজলিসে কত বিদেশী আসে, কেউ ভালো ফার্সী বলতে পারে না। তুমি শিখলে আমার গর্ব হবে। তুমি আমারই জন্য শিখছ। সে আমি জানি।'

'তোমার মুখে "তুমি" বড় সুন্দর শোনায়।'

বাধা পড়ল। কার যেন গলার আওয়াজ।

তাড়াহুড়ো না করে আস্তে আস্তে বললে, 'এবার তুমি এস। তোমাকে খুদার আমানতে দিলুম।'

আমি জলে নামতে নামতে বললুম, 'আর কিছু বল।'

'আমি তোমাকে ভালবাসি।'

॥ ৫ ॥

"ঠেকেছিল মনোতরীখান
প্রাণনাশা সংশয়-চড়ায়,
ভাষাহীন আশা পেয়ে আজ
হর্ষে ভেসে চলে পুনরায়।

ছিল ঠেকে মনোতরীখান—
চলিল সে কাহার ইঙ্গিতে ?
কে গো তুমি দুর্জ্ঞেয় মহান ?
কে দেবতা এলে আজি চিতে ?"

যে চার্বাক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না, তিনি নাকি মঞ্জুভাষা'র কাছ থেকে

তাঁর প্রেমের প্রতিদানের আশা পেয়ে একদিনের তরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছিলেন।

"সেই একদিন শুধু জীবনে চার্বাক
নত হয়েছিল নিজে চরণে ধাতার
প্রেমের কল্যাণে শুধু সেই একদিন—
সে যে আনন্দের দিন—সে যে প্রত্যাশার॥"

(সত্যেন দত্তের কবিতা।)

আমি ছেলেবেলা থেকেই আল্লাকে ভয় করতে শিখেছি, কৈশোরে কাব্য পড়েছি, তাঁকে নাকি ভালবাসাও যায়, আর এই যৌবনপ্রদোষে এক লহমায় তিনি যেন হঠাৎ এক নবরাজ প্রেমরাজ হয়ে আমাকে ডেকে তাঁর সিংহাসনের পাশে বসালেন। শুধু তাই! ক্ষণে ক্ষণে আমার দিকে তাকিয়ে আমার প্রেম নিবেদনেরও প্রতীক্ষা করছেন। তাঁর চোখেও যেন পাব-কি-পাব-না'র ভয়। আশ্চর্য! আশ্চর্য!

"জ্ঞানের অগম্য তুমি প্রেমের ভিখারী
দ্বারে দ্বারে মাগো প্রেম নয়নেতে বারি।"

সব দ্বার ছেড়ে তিনি যেন একমাত্র আমারই দ্বারে এসেছেন।

না, না, তিনি দ্বারে আসেন নি। মৌলা—প্রভু—যখন আসেন, তখন তিনি 'ছপ্পর ফোঁড় করকে আতে হ্যাঁয়'—তিনি ছাত ভেঙে আসেন।

একটি কথা, দুটি চাউনি, তাতেই দেহের ক্ষুধা, হৃদয়ের তৃষ্ণা, মনের আকাঙ্ক্ষা সব ঘুচে যায়, সব পরিপূর্ণ হয়ে যায়!

ঘরে ফিরে দেখি সেখানে ভ্রমর গুঞ্জন করছে, পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে আবার রামধনু, তার-ই নিচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আমার ছেলেবেলাকার নর্মসখী গ্রামের ছোট নদীটি, এবং সমুখে এক গাদা শিউলি ফুল—সেই প্রথম সন্ধ্যার শিউলি ফুল—শব্‌নম শিউলি। আর না, আর না! থামো! থামো! আর আমার সইবে না।

পরদিন সন্ধ্যার সময় যখন আরাম-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে ভানুমতীমন্ত্র দিয়ে সেই স্বপ্নকে সঞ্জীবিত করছি এমন সময় ঘরে ঢুকলেন আপাদমস্তক ভারী কালো বোরকায় ঢাকা এক মহিলা।

আমি ভালো করে উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই বোরকা এক ঝটকায় সরে গেল।

শব্‌নম!

হাত দু'খানি এগিয়ে দিলে।

আমি ছুটে গিয়ে তার হাত দু'খানি আপন হাতে তুলে নিলুম। তার পর কাবুলী ধরনে রাজা-বাদশা, গুরু-মুর্শীদের হাত দুটি যে ভাবে চুমো খাওয়া হয় সেই ভাবে চুমো খেলুম।

বললে, 'হাঁটু গাড়ো।'

'জো হুকুম!'

'বল, "আমি সর্ব হৃদয় দিয়ে সর্বকাল তোমার সেবা করব"।'

'আমি সর্ব দেহ মন হৃদয় দিয়ে সেবা করব।'

খিলখিল করে হেসে উঠল।

ভানুমতীমন্ত্র নিশ্চয়ই মাত্রাধিক করা হয়ে গিয়েছিল। সে মন্ত্রে ইন্দ্রজাল সৃষ্ট হয়। এ যে সত্যজাল—না, সত্যের দৃঢ় ভূমি।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দু'হাত দিয়ে আমার মাথার দু'দিক চেপে ধরে হাসতে হাসতে বললে, 'আমি ভেবেছিলুম তুমি বিদ্রোহ ঘোষণা করে চিৎকার করে বলবে, "না, তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার কর"।'

আমি বললুম, 'আমাদের বাউল গেয়েছেন—একটু বদলে বলছি—

"কোথায় আমার ছত্র-দণ্ড কোথায় সিংহাসন?
প্রেমিকার পায়ের তলায় লুটায় জীবন"।'

'বেশ তো। তুমি ফার্সী শিখছ; আমি তা হলে বাঙলা শিখব।'

'সর্বনাশ! অমন কর্মটি করো না।'

'কেন?'

'তিন দিনে ধরে ফেলবে, আমি কত কম বাঙলা জানি।'

যেন আমার কথা শুনতে পায় নি। বললে, 'তুমি মুসাফির; কিন্তু ঘরটি সাজিয়েছ বেশ।' ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বেশ ঘুরে ঘুরে চতুর্দিক দেখলে। তারপর সোফাতে বসে বললে, 'এস।' আমি পাশে বসতে যেতেই বললে, 'না, চেয়ারটা সামনে টেনে এনে বোস।' আমি একটু ক্ষুণ্ণ হলুম। বললে, 'মুখোমুখি হয়ে বোস। তোমার মুখ দেখব।' তদ্দণ্ডেই মনটা খুশী হয়ে গেল—মানুষ কত সহজে ভুল মীমাংসায় পৌঁছয়!

আমি কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বললুম, 'তুমি ওই তাম্বু, মানে বোরকা পর কেন?'

'স্বচ্ছন্দে যেখানে খুশী আসা-যাওয়া করা যায় বলে। আহাম্মুখ ইউরোপীয়ানরা ভাবে, ওটা পুরুষের সৃষ্টি, মেয়েদের লুকিয়ে রাখবার জন্য।

আসলে ওটা মেয়েদেরই আবিষ্কার—আপন সুবিধের জন্য। আমি কিন্তু মাঝে মাঝে পরি, এ-দেশের পুরুষ এখনও মেয়েদের দিকে তাকাতে শেখে নি বলে—হ্যাটের সামনের পর্দায় আর কতটুকু ঢাকা পড়ে?' তারপর বললে, 'আচ্ছা, বল তো, তুমি পাগমান থেকে পালিয়ে এলে কেন?'

বললুম, 'আমি তো খবর পেলুম, তুমি কাবুল চলে এসেছ।'

'আমি তার পরদিনই পাগমান গিয়ে শুনি, তুমি কাবুলে চলে এসেছ।'

আমি শুধালুম, 'আচ্ছা, বল তো, আমাদের বন্ধুত্ব এত তাড়াতাড়ি হল কি করে?'

'আজব্ বাৎ শুধালে। তবে কি বন্ধুত্ব হবে যখন আমার বয়স ষাট আর তোমার বয়স একশ তিরিশ?'

আমি শুধালুম, 'আমাদের বয়সে কি এতই তফাত?'

'তোমার গম্ভীর গম্ভীর কথা শুনে মনে হয় তারও বেশী। আবার কখনও মনে হয়, তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোট। কিন্তু সেটা আসল উত্তর নয়। আসল উত্তর আরেক দিন বলব।'

'বলবে তো ঠিক?'

'নিশ্চয়।'

'আচ্ছা, এবারে তোমাকে একটা শেষ প্রশ্ন শুধাই। তুমি এত সাহস কোথায় পেলে? এই যে স্বচ্ছন্দে বল, কোন কিছুর পরোয়া তুমি কর না, সোজা আমার বাড়িতে চলে এলে—?'

'তুমি আমাকে ভালবাস—আমি তোমার বাড়িতে আসব না তা যাব কি গুল্-ই বাকাওলীর পরিস্তানে? জান, আমরা আসলে তুর্কী। আমাদের বাদশা আমানুল্লার গায়েও তুর্কী রক্ত আছে। আর তুর্কী রমণী কি জিনিস সেটা জানতেন আমানুল্লার বাপ শহীদ হবীবুল্লা। আমানুল্লার মায়ের প্যাঁচে তিনি পর্যন্ত হার মেনেছিলেন, জান? আমানুল্লার তো রাজা হওয়ার কথা ছিল না।'

'কিছু কিছু শুনেছি।'

'ভালো। গওহর্ শাদের নাম শুনেছ? ওই সুন্দর হিরাত শহরের চোদ্দ আনা সেই তুর্কী রমণীর তৈরি। তোমার আপন দেশে নূরজাহান বাদশা জাহাঙ্গীরকে চালাত না? মোমতাজ—আরও যেন কে কে? হারেমের ভিতরেই তুর্কী রমণী যে নল চালায় সেটা কতদূর যায় তার খবর রাখে কটা লোক?'

'তুমি অত ইতিহাস পড়লে কোথায়?'

'আমি পড়ি নি। আমি ইতিহাস, দর্শন, ভূগোল এ-সব পড়ি নে। আমার আনন্দ শুধু কাব্যে। স্কুলে বাধ্য হয়ে "তুর্কী রমণীর ইতিহাস" পড়তে হয়েছিল—তার থেকে বলছি। কিন্তু তাই বলে ভেবো না আমি আমার বে-পরোয়া ভাব ইতিহাস থেকে পেলুম। আর জান না, কবি কামালুদ্দীন কি বলেছেন—

"মরণের তরে দুটি দিন তুমি করো নাকো কোনো ভয়,
যেদিন মরণ আসে না; যেদিন আসিবে সে নিশ্চয়।" '

আমি বললুম, 'মৃত্যু ছাড়া অন্য বিপদও তো আছে।'

'কী আশ্চর্য! মৃত্যুর ওষুধই যখন পাওয়া গেল তখন অন্য ব্যামোর ওষুধ মিলবে না? তোমার বিপদ, আমার বিপদ, আমাদের দুজনের মেলানো বিপদ—তার দাওয়াই আমার কাছে আছে। কিন্তু বলব না।'

'কেন?'

'ওষুধের রসায়ন (প্রেস্‌ক্রিপশন) জানাজানি হয়ে গেলে রোগী সারে না—হেকিমদের বিশ্বাস।' তার পর সোফার কুশনগুলো জড়ো করে বালিশ বানিয়ে শুয়ে পড়ে বললে, 'তুমি পাশে এসে বোস।' একপাশে একটু জায়গা করে দিয়ে বললে, 'ওসব কথা কেন তোল? এখন বল, তুমি আমায় কোথায় কোথায় খুঁজলে? আমার শুনতে বড় ভালো লাগে।'

আমি বললুম, 'শব্‌নম বানু—'

'উহুঁ। হল না।'

'কি?'

'শব্‌নম শিউলি।'

এ নামে কত মধু ধরে। তাই বুঝি 'জপিতে জপিতে নাম অবশ হৈল তনু।'

কবার জপেছিলুম?

শব্‌নম বললে, 'উত্তর দাও।'

'তোমাকে আমি সবখানে খুঁজেছি।'

এতক্ষণ সে শিলওয়ার পরা ডান পা বাঁ হাঁটুর উপর তুলে দিয়ে মোজা-বিহীন ধবধবে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল আর তার পরের আঙুল নিয়ে খেলা করছিল; কখনও বা ওড়নাখানি বাঁ হাত দিয়ে তুলে ধরে ডান হাত দিয়ে তার খুঁট পাকাচ্ছিল।

ধড়মড় করে সটান উঠে বসে বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। নদী-পাড়ে বলেছিলে। আমি তখন অর্থ বুঝি নি। এখন কবি জামী বুঝিয়ে দিয়েছেন। এক্ষুনি বলছি, কিন্তু তার আগে বল, খোঁজার সময় যে-কোনো মেয়ে আসতে দেখলেই ভাবতে,

আমি আসছি। না? শোন তবে—

"আতুর হিয়ার নিদ্-হারা চোখে
অহরহ তুমি স্বামী,
দূর হতে দেখি যে কেহ আসিছে
তুমি এলে, ভাবি আমি।
মূর্খ দাঁড়ায়ে আছিল সেখানে'
শুধাল, 'রাসভ এলে?'
কহিলেন জামী 'বলিব তো আমি
তুমিই এসেছ'—হেলে।" '

প্রথমটায় আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। ভক্ত সাধকজন হঠাৎ একটা লোককে, আপন গা বাঁচিয়ে গাধা বানিয়ে দেবেন, এতখানি রসবোধ তাঁদের কাছে আশা করে কে?

সে কথা বলাতে শব্‌নম বললে, 'বহু কাবুলীকে আধ ঘণ্টা ধরে বোঝাতে হয়।'

আমি বললুম, 'আমার একটা কথা মনে পড়েছে।'

'শাবাশ্।' বলে জানু পেতে বসে, ডান কনুই হাঁটুর উপর, হাত গালের উপর রেখে, কাত হয়ে, চোখ বন্ধ করে বললে, 'বল।'

'মজনূঁর শেষ প্রাণ-নিশ্বাস করে লীন ধরাতলে
সেই নিশ্বাস ঘূর্ণির রূপে লায়লীকে খুঁজে চলে।'

'বুঝেছি। কিন্তু আরও বুঝিয়ে বল।'

আমি বললুম, 'মজনূ যখনই শুনত, তার প্রিয়া লায়লীকে নজ্‌দ্ মরুভূমির উপর দিয়ে উটে করে সরানো হচ্ছে সে তখন পাগলের মত এ-উট সে-উটের কাছে গিয়ে খুঁজত কোন্ মহ্‌মিলে (উটের হাওদা) লায়লী আছে। মজনূঁ মরে গেছেন কত শতাব্দী হল। কিন্তু এখনও তাঁর জীবিতাবস্থার প্রতিটি দীর্ঘশ্বাস মরুভূমির ছোট ছোট ঘূর্ণিবায়ু হয়ে লায়লীর মহ্‌মিল্ খুঁজছে। তুমি বুঝি কখনও মরুভূমি দেখ নি? ছোট ছোট ঘূর্ণিবায়ু (বগোলে) অল্প অল্প ধূলি উড়িয়ে এদিকে ধায়, ওদিকে ছোটে, সেদিকে খোঁজে?'

'না। কিন্তু মানুষের কল্পনা কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে তাই দেখে অবাক মানছি। উর্দুটা বল।'

মজনূঁকে দম্‌কী রওনক্ মুদ্দৎ হুঈ সিধারে
অব্ কৌ নজ্‌দ্‌কে বগোলে মহ্‌মিল্‌কো ঢুঁঢ়তে হৈঁ?'

এর ছ'টা শব্দ ফার্সী। শব্‌নম বুঝে গেল। বললে, 'অতি চমৎকার দোহা।'

আমি একটু কিন্তু-কিন্তু করে বললুম, 'বড্ড বেশী ঠাস বুনোট। আমার বুঝতে কষ্ট হয়েছিল।'

বললে, 'তার পর তুমি একে শুধালে, "শব্‌নম বানু কোথায় থাকে?" ওকে শুধালে, "সে কখন বেড়াতে বেরয়?"—ভাবলে কেউই তোমার গোপন খবর জানে না।'

'আমি কি এতই আহাম্মুক!'

আমার ডান হাতে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'শোন দিল-ই-মন, (আমার দিল্)—মূর্খই হও আর সোক্রাৎই (সক্রাটিস্) হও, প্রেম কেউ লুকিয়ে রাখতে পারে না। শোন,

"দিল গুমান দারদ কি পুশীদে অস্ত্ রাই-ই ইশ্‌ক্‌রা
শমরা ফানুস পন্‌দারদ্ কি পিনহান্ করদে অস্ত।

সরল হৃদয় মনে করে প্রেম লুকায়ে রাখিতে পারে,
কাঁচের ফানুস মনে মনে ভাবে লুকায়েছে শিখাটারে।"

কে পারে? কেউ পারে না। আজ না হয় কাল ধরা পড়বেই। আমি পারি? এই তো তুমি যে আমায় নেবুটি দিয়েছিলে—আমি সেটি নখ দিয়ে অল্প অল্প ঠোনা দিয়ে শুঁকছিলুম। হঠাৎ বাবা এসে শুধালেন, "নেবু যে! কোথায় পেলে?" আমি বললুম, "হোটেলে চা খেতে গিয়েছিলুম"—বাবা জানতেন, "সেখানে জুটল।" আমার মুখ যে তখন লাল হয়ে যায় নি, কি করে বলব? আব্বা বললেন যে, তিনিও লাঞ্চে একটা পেয়েছিলেন। কে দিলে, কি করে পেলে কিচ্ছু শুধালেন না। তিনিও একদিন জানবেন।'

'তখন?'

'তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি তো বিদেশী। আমার, শুধু আমার, আপন-দেশী। তোমার ভাবনা ভাববো আমি। বলেছি তো আমার কাছে ওষুধ আছে। ওসব কথা ছাড়। একটা কবিতা বল—আমাদের কথার সঙ্গে খাপ খাক আর নাই খাক।'

আমি বললুম 'খাপ খাইয়েই বলছি। তোমার মুখ লাল হওয়ার সঙ্গে তার মিল আছে, আবার কাঁচের চিমনি যে গর্ব করে সে প্রদীপের আলো লুকিয়েছে

তার সঙ্গেও মিল আছে। তবে এটা সংস্কৃতে এবং শ্লোকটার ভাবার্থ শুধু আমার মনে আছে—

"শুধাইনু 'হে নবীনা,
ভালোবাস মোরে কি না?'
রাঙা হ'ল তার মুখখানি;
প্রেম ছিল হৃদে ঢাকা।
তাই যবে হয় আঁকা
আকাশেতে লাল রঙ, জানি—
পাহাড়ের আড়ালেতে
সবিতা নিশ্চয় তাতে
রক্তাকাশ তাই নেই মানি।"'

শব্‌নম বললে, 'আবার বল।'

বললুম।

শব্‌নম বললে, 'এটি অতুলনীয়। বিশেষ করে প্রেমের সঙ্গে সূর্যেরই শুধু তুলনা হয়। আকাশ আর মুখ এক। ঘড়ি ঘড়ি রঙ বদলায়। সূর্য চিরন্তন। প্রেম-সূর্য একবার দেখা দিলে আর কোন ভাবনা নেই।'

আমি বললুম, 'তোমার বেলা একটা নেবুতেই মুখ লাল হয়ে গেল। প্রেম হলে কি হত?'

বিরক্তির ভান করে বলল, 'কি বললে? প্রেম নেই?'

আমিও বেদনার ভান করে বললুম, 'তুমিই তো বললে নেবুর ভিতর টক।'

'ও! আমি বলেছিলুম, "আঙুরগুলো টক"—সেই অর্থে। তোমাকে পাব না ভয়ে শেয়ালের মত মনকে বোঝাচ্ছিলুম।'

'তোমার সঙ্গে কথায় পারা ভার। তবে আরেকটা ফরিয়াদ জানাই।'

গভীর মনোযোগ সহকারে, অত্যন্ত দোষীর মত চেহারা করে বললে, 'আদেশ কর।'

আমি বললুম, 'আমার উচ্চারণে ঠাকুমার সিন্দুকের গন্ধ।'

খলখল করে হেসে উঠল; 'আচ্ছা পাগল তো। সার্থক নাম রেখেছিলেন তোমার আব্বা-জানের মুরশীদ। ওরে মজনুন সেই ভাল। জানেমন্ বলছিল—'

বাধা দিয়ে বললুম, 'সে আবার কে?'

দুষ্টু মেয়ে। বুঝে ফেলেছে। ভুরু কুঁচকে শুধালে, 'হিংসে হচ্ছে?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

আনন্দে আলিঙ্গন করতে গিয়ে যেন নিজেকে ঠেকালে। হাসিতে খুশিতে কান্নাতে মেশানো গলায় বললে, 'বাঁচালে, আমাকে বাঁচালে।'

অবাক হয়ে শুধালুম, 'মানে?'

'বাঁচালে, বাঁচালে। গুণী-জ্ঞানীরা বলেন, প্রিয়জনের মঙ্গলের জন্য তাকে যোগ্যতর ব্যক্তির হাতে তুলে দেবে, আত্মবিসর্জন করে নিজেকে মিলিয়ে দেবে—মানি নে, মানি নে, আমি একদম মানি নে। আজ যদি গওহর্‌শাদ্ কিংবা নূরজাহান তোমাকে ভালবেসে পেতে চান—'

আমি বললুম, 'শাবাশ্।'

'কি বললে? শাবাশ্? দেখাচ্ছি। প্রথম মারব ওদের। তখন যদি "শাবাশ্" বল তবে বেঁচে গেলে। না হলে তোমাকে মেরে থেঁতলে, পিষে শামী-কাবাব বানাব, নিদেন পক্ষে শিক।' হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে পিস্তল দেখালে।

আমি বললুম, 'ওতে বুলেট থাকে না।'

'সেদিনও ছিল।'

'জানেমন্ কে?'

'আমার জিগরের টুকরো, কলিজার আধা, দিলের খুন, চোখের রোশনাই, জানের মালিক—আমার জ্যাঠামণি। তোমার কাছে সিগারেট আছে। দাও তো।'

'শুধোবেন না, কোথায় পেলে?'

'উনি সব জানেন।'

'তুমি বলেছ?'

'না।'

'আরও কিছুক্ষণ বসি। সিনেমার লাইট নিবে গিয়েছিল বলে "শো" শেষ হতে দেরি হল। আমাকে বলতে হবে না।'

'জ্যাঠামণি?'

'তিনি বলেন, "সিনেমায় কেন যাও, বাছা? সিনেমা তো জীবনই দেখায়। তার চেয়ে জীবনটাকে সিনেমার মত দেখতে শেখ। অনেক হাঙ্গাম-হুজ্জৎ থেকে বেঁচে যাবে।" '

তারপর বললে, 'এবারে তুমি চুপ কর। আমি একটু দেখে নিই, ভেবে নিই।' লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে খানিকক্ষণ বড় চোখ আরও বড় করে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর চোখ বন্ধ করল।

একবার শুধু বললে, 'বল তো—। না থাক্।'

তারপর অনেকক্ষণ একেবারে নিশ্চল নিথর।

বললে, 'আমার পেয়ালা একেবারে পরিপূর্ণ করে ভরে দিয়েছেন করুণাময়। এই তোমার ঘর, তুমি পাশে বসে—এর বেশী কি বলব! নিশ্বাসে নিশ্বাসে আমি সব-কিছু শুষে নিয়েছি।'

এই প্রথম দেখলুম, শব্‌নম কোন কবির কবিতা দিয়ে আপন ভাব প্রকাশ করল না। কোন্ কবিতা পারত?

'উঠি।'

আমি বললুম, 'আবার কবে দেখা হবে?' এবারেও ভুলতে বসেছিলুম শুধাতে। আনন্দের সময় মানুষ দুঃখের দিনের সম্বল সঞ্চয় করতে ভুলে যায়। আসলে তা নয়। পরিপূর্ণতা যদি ভবিষ্যৎ দৈন্যের কথা স্মরণ করতে পারে, তবে সে পরিপূর্ণ হল কই?

বললে, 'তুমি শুধু এইটুকু বিশ্বাস কর, তোমাকে দেখবার জন্য আমার যে ব্যাকুলতা, তুমি কখনও সেটা ছাড়িয়ে যেতে পারবে না।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'দয়া করে কর। শান্তি পাবার ওই একমাত্র পথ। না হলে পাগলের মত ছুটোছুটি করবে। আর দেখ, তুমি যদি আমার কথাটা বিশ্বাস কর, তবে যদি কখনও আমার শক্তিক্ষয় হয়, তবে তখন আমি বিশ্বাস করব যে আমাকে পাবার জন্য তোমার যে ব্যাকুলতা সেটা আমি ছাড়িয়ে যেতে পারব না। তখন আমি পাব শান্তি।'

দোরের কাছে এসে শেষ কথা বললে, 'আমার বিরহে তুমি অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না—ওইটুকুতেই আমার চলবে।'

দ্বিতীয় খণ্ড

॥ ১ ॥

সকলেই বলে, পলে পলে তুষানলে দগ্ধ হওয়ার চেয়ে বহ্নিকুণ্ডে ঝম্প দেওয়া ভাল। আমি জানি, আমার সমুখে কত দীর্ঘ দিনের বিরহ। সেটা যদি আমি প্রথম দিনে জানতে পারতুম তা হলে সেটা কিছুতেই সইতে পারতুম না। আমার প্রার্থনামত আল্লাতালা আমাকে এক সঙ্গে একটি কদমের বেশী ওঠাতে দেন নি।

আলো দিয়েছিলেন, কিংবা বেদনা দিয়েছিলেন এক পা চলার—বিরহদিগন্ত কত দূরে দেখতে দেন নি। তাঁকে দোষ দিই কি করে?

আর শব্‌নম! সে তো শিউলি। শরৎ-নিশির স্বপ্ন—প্রভাতের বিচ্ছেদ-বেদনা। সে যখন ভোরবেলা সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, সে কি স্বেচ্ছায়?

ওই কঠিন কঠোর সময়েও সে একবার ঝড়ের মত আমার ঘরে এসেছিল।

এক নিশ্বাসে কথা শেষ করে কেঁদেছিল। ওই প্রথম আর ওই তার শেষ কান্না। তার বাবাকে আমানুল্লা কান্দাহারের গবর্নর করে পাঠাচ্ছেন। ফ্রান্সের নির্বাসন শেষ হওয়ার পর দেশে ফিরলেন বটে, কিন্তু আমানুল্লা আর সর্দার আওরঙ্গজেব খানেতে বনাবনি হল না; বিশেষত তিনি আমানুল্লার উগ্র ইউরোপীয় সংস্কার পদ্ধতি আদপেই পছন্দ করতেন না। এখন ইউরোপ যাবার মুখে তিনি বিশ্বাসী লোক খুঁজছেন। আওরঙ্গজেব নাকি প্রথমটায় যেতে চান নি। এখন স্থির হয়েছে, তিনি মাত্র তিন মাসের জন্য যাবেন। আওরঙ্গজেবের পিতৃভূমি কান্দাহার তিনি ভাল করে চেনেন—তিন মাস পরে অবস্থা দেখে আমানুল্লাকে জানাবেন, ঠিক কোন্ লোককে তাঁর পরের গবর্নর করে পাঠালে সে কান্দাহারের বিশ্বাস অর্জন করতে পারবে।

এত দুঃখের মাঝখানেও ওইটুকু ছিল আনন্দের বাণী। কাবুলে রাজনৈতিক মরুভূমিতে বাস এক রকম অসম্ভব। হয় তুমি রাজার পক্ষে, রাজার প্রিয়-ভাজন—নয় তুমি কারাগারে কিংবা ওপারে; শব্‌নম যদিও বললে তাঁর আব্বা এ-সব ব্যাপারে ঈষৎ উদাসীন। ফ্রান্সে নির্বাসনকালে তিনি সেখানকার স্যাঁ সীর মিলিটারি কলেজের অধ্যাপকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে মিলিটারি স্ট্রাটেজি সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা করেছিলেন, এখনও করেন—আর তার ফাঁকে ফাঁকে কাব্য-চর্চা।

সেদিন শব্‌নম তেজী তুর্কী রমণীর মত কথা বলে নি, কথায় কথায় কবিতা বলতে পারে নি। শুধু অনুনয় বিনয় করেছিল।

আমি শুধু একটি কথা বলেছিলুম, 'তোমার না গেলে হয় না?'

বেচারী ভেঙে পড়ে তখন।

টসটস করে, কোন আভাস না দিয়ে, ঝরে পড়েছিল অনেক ফোঁটা মোটা মোটা চোখের জল।

আমার দু হাত তুলে ধরে তাদেরই দু পিঠ দিয়ে আপন চোখের জল মুছতে মুছতে বলেছিল, 'ওইটেই তুমি শুধু শুধিয়ো না লক্ষ্মীটি। এই একটা প্রশ্ন আমার মাথার ভিতর ঢুকে যেন পোকার মত কুরে কুরে খাচ্ছে। না গেলে হয় না?

না গেলে হয় না ?—অসম্ভব, অসম্ভব। কিঞ্চিৎ কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছে, তুমি ওকে রুদ্রতর করো না।'

দরজার কাছে এসে তার কথামত দাঁড়ালুম।—বললে—যেটা সে আগের বারও বলেছিল, 'আমার বিরহে তুমি অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না।'

ওর তো কথা বলার অভাব নেই। বুঝলুম, প্রাণের কথা মাত্র একটি।

ভোরবেলা আমি আধো ঘুমে। সমস্ত রাত অনিদ্রায় কেটেছে। আমার শিয়রে বসে শব্‌নম। আমি চোখ মেলতেই সে দু হাত দিয়ে আমার চোখ বন্ধ করে দিল।

যেন শুনলুম, 'ব্‌ আমানে খুদা'—তোমাকে খুদার আমানতে রাখলুম। 'ব খুদা সপুর্দমৎ'—তোমাকে খুদার হাতে সর্পোদ করলুম।

'আমার বিরহে—'

সমস্ত ব্যাপারটা কয়েক সেকেণ্ডের। দীর্ঘতম স্বপ্নও নাকি মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের।

বলতে পারব না, সত্য না স্বপ্ন। শব্‌নমকে শুধোবার সুযোগ পাই নি। বোধ হয় সত্য-স্বপ্ন। কিংবা স্বপ্ন-সত্য।

প্রথম তিন মাস, তার পর চার মাস, তার পর ছ-মাস। আমানুল্লা বিদেশ থেকে এক এক দু দু মাসের ম্যায়াদ বাড়ান ; আর শব্‌নমরা ফিরতে পারে না।

সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেল।

শব্‌নমদের প্রাচীন ভৃত্য তোপল্‌ খান দু-তিন মাস অন্তর অন্তর একবার করে কাবুল আসে আর শব্‌নমদের চিঠি দিয়ে যায়—ডাককে অবিশ্বাস করার তার যথেষ্ট ন্যায্য হক ছিল।

সে চিঠিতে কি ছিল আমি বলতে পারব না। ফার্সীতে ফরাসীতে মেশানো চিঠি। যে শব্‌নম কথায় কথায় কবিতা বলতে পারত সে বিদায়ের সময়কার মত একটি কবিতাও উদ্ধৃত করে নি কিংবা করতে পারে নি। মাত্র একবার করেছিল। তাও আমি আমার চিঠিতে সে-কথার উল্লেখ করেছিলুম বলে। তখন লিখেছিল :

"আজ হনরে হালে খরাব্‌ মমন্‌ শুদ্‌ ইস্‌লাহ পজীর
হমচু ওয়রানে কি আজ গন্‌জে খুদ্‌ আবাদ ন্‌ শুদ্‌।"

'এত গুণ ধরি কি হইবে বলো দুরবস্থার মাঝে ?
পোড়া বাড়িটাতে লুকনো যে ধন—লাগে তার কোনো কাজে ?'

আর ছিল কান্না আর কান্না।

প্রত্যেকটি শব্দে, প্রত্যেকটি বাক্যে। এমন কি আমাকে খুশী করবার জন্যে যখন জোর করে কোন আনন্দ ঘটনার খবর দিত তখনও সেটি থাকত চোখের জলে ভেজা।

থাক্। আমার এ গুপ্তধনে কী আছে তার সামান্যতম ইঙ্গিত আমি দেব না। এখন এটি আমার চোখের জলে ভেজা।

এক বছর ঘুরে যাওয়ার পর আমি একদিন রোজা করলুম। সন্ধ্যার সময় গোসল করে, সামান্য ইফ্‌তার (পারণা) করে নমাজে বসলুম। দুপুর রাত্রে ঘুমুতে গেলুম। স্বপ্নে সত্যপথ নিরূপণের এই আমাদের একমাত্র পন্থা।

স্বপ্নাদেশ হল, কান্দাহার যেয়ো না। ভোর রাত্রে।

আমার মস্তকে বজ্রাঘাত। আমি ভেবেছিলুম, কোন আদেশই পাব না এবং বিবেককে সেই পন্থায় চালিয়ে দিয়ে আমি কান্দাহারের পথ নেব।

অবশ্য কুরান শরীফে এ প্রক্রিয়ার উল্লেখ নেই। কাজেই না মানলেও কোন পাপ হবে না। কোন কোন মৌলানা এ প্রক্রিয়া অপছন্দও করে থাকেন।

এমন সময় আব্দুর রহ্‌মান এসে ঘরে দাঁড়াল। আমি তার দিকে তাকালুম। বললে, 'কাল আমি কান্দাহার যাবার অনুমতি চাই।'

আব্দুর রহ্‌মান সেই যে পাগমানে গোড়ার দিকে একদিন বলেছিল আওরঙ্গজেব-পরিবার কাবুল চলে গিয়েছেন তারপর সে ওই বিষয়ে একটি কথাও বলে নি।

আমি শুধালুম, 'কেন ?'

'ওখানে আমার এক ভাগ্নে আছে। তোপল্‌ খান দু মাস হল আসে নি।'

এ দুটো কথাতে কি সম্পর্ক আছে ঠিক বুঝতে পারলুম না।—একটু চিন্তা করে স্থির করলুম, আব্দুর রহ্‌মানকে দিয়ে চিঠি লিখে কান্দাহার আসবার অনুমতি চাইব, আর আজ রাত্রে যদি কোন প্রত্যাদেশ না আসে তবে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তেও পারি। আব্দুর রহ্‌মান চলে গেল।

আমি নত মস্তকে শ্লথ গতিতে টেবিলের দিকে চললুম, চিঠিখানা তৈরী করে রাখতে। এই এক বৎসর আমি ফার্সী শিখেছি প্রাণপণ—সে-ই ছিল আমার বিরহে সান্ত্বনার তীর্থ—তবু চিঠি লিখতে সময় লাগে।

টেবিলের কাছে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি, শব্‌নম।

॥ ২ ॥

পরে শব্‌নমের কাছ থেকেই শুনেছি, আমি নাকি জাত-ইডিয়টের মত শুধু বিড়বিড় করে কি যেন একটা প্রশ্ন বার বার শুধিয়েছিলুম। 'তুমি কি করে এলে? আমি তো কোন শব্দ শুনি নি। তুমি কি করে এলে? আমি তো কোন শব্দ শুনি নি।' আমার বিস্ময় লাগে, এইটেই কি আমার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল!

অপমানিত, পদদলিত, ব্যঙ্গ-কশাঘাতে জর্জরিত নিরাশ দীনহীন জনকে যদি রাজাধিরাজ ধর্মরাজ সহসা আদর করে ডেকে নিয়ে সিংহাসনের এক পাশে বসান তখন তার কি অবস্থা হয়?

আশৈশব অপমানিত, যৌবনেও আপন নীচ-জন্ম সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন সূতপুত্র কর্ণ যেদিন মহামান্যা ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠা কুন্তীর কাছে শুনতে পেলেন তিনি হীনজন্মা নন, তখন তাঁর কি অবস্থা হয়েছিল?

শব্‌নম এতটুকু বদলায় নি। সৌন্দর্যহর কাল যেন তার সম্মুখে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল। গাত্রস্পর্শ করতে পারে নি। যাবার দিন যে রকমটি দেখেছিলুম, ঠিক সেই রকম। আমার বুকের ভিতর যে ছবি আমি এতদিন হিয়ার রক্ত দিয়ে মাখিয়ে রেখেছিলুম সে যেন আজ মুক্তিস্নান সেরে আমার সমুখে দেখা দিল। তার মুখে সব সময়েই শিশির-মধুমাস, আফগানিস্থান-হিন্দুস্থান বিরাজ করত; কপাল আফগানিস্থানের শীতের বরফের মত শুভ্র আর কপোল বোলপুরের বসন্ত-কিংশুকের মত রাঙা। হুবহু সেই রকমই আছে।

শুধু কোথায় যেন তবু পরিবর্তন হয়েছে। চোখে? সেইখানেই তো সর্ব-প্রথম পরিবর্তন আসে। না। ঠোঁটের কোণে? না। গালের টোল ভরে গিয়েছে? না সর্বসুদ্ধ? তাও না।

অকস্মাৎ বুঝে গেলুম ওর ভিতর আগুন জ্বলছে। সে আগুন সর্বাঙ্গ হতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

আমার কাছে এসে, দুহাত আমার কাঁধে রেখে মস্তকাঘ্রাণ করল। বনবাস-মুক্ত রামচন্দ্রকে কৌশল্যা যে-রকম মস্তকাঘ্রাণ করেছিলেন।

বললে, 'ছিঃ! তুমি রোগা হয়ে গিয়েছ।'

বুঝলুম, ওকে পুড়িয়েছে বেশী। এবং সইবার শক্তিও তার অনেক, অনেক

বেশী আমার চেয়ে। হৃদয়ঙ্গম করলুম, ওর কথাই ঠিক। ওর ব্যাকুলতাই বেশী। কিন্তু জীবনে বিশ্বাস ওকেই করতে হবে। মরুভূমিতে মাত্র দুজনার এই কাফেলাতে সে-ই নিশানদার সর্দার!

বড় ক্লান্ত কণ্ঠে বললে, 'আমাকে একটু ঘুমুতে দেবে?'

ঘুঙুরওয়ালা চরণচক্রপরা বাড়ির নতুন বউ চলাফেরা করার সময় যে রকম দক্ষিণী বীণা বাজে, ওর গলার শব্দ সেই রকম।

শুয়ে পড়ে একটি অতি ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'তুমি কিন্তু কোথাও যেয়ো না।'

আশ্চর্য এ আদেশ! আমি আবার যাব কোথায়? তখন বুঝলুম, যে আদেশ দেবার পূর্বেই প্রতিপালিত হয়ে গেছে সেইটেই সত্যকার আদেশ, যে বাক্য অর্থহীন সেইটেই সব অর্থ ধরে।

তবে শুনেছি, স্বয়ং লক্ষ্মী এলেন ভাগ্যহীন চাষার কপালে ফোঁটা দিতে। সে গেল নদীতে মুখ ধুতে। ফিরে এসে দেখে তিনি অন্তর্ধান করেছেন। ওরে মূর্খ, ঘামে-ভেজা কাদা-মাখা কপালেই তখন ফোঁটা নিয়ে নিতে হয়। এক বছরের অবহেলায় গৃহ শ্রীহীন। তাই বলে আমি কি এখন ছুটব ডেকোরেটরের দোকানে!

শব্‌নমের ঠোঁট অল্প অল্প নড়ছিল। তারপর সত্যই ঘুমিয়ে পড়ল।

আমি জানি, রোমান্টিকেরা, আমার তরুণ বন্ধুরা, মর্মাহত হবেন। দীর্ঘ অদর্শনের পর এই অপ্রত্যাশিত মিলন; আর একজন গেলেন ঘুমুতে! আর আমি কি করলুম? সত্যি বলছি, একখানা বই নিয়ে পড়তে লাগলুম। এক ঘণ্টা পরে দেখি, এক বর্ণও বুঝতে পারি নি। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধান? এক ঘণ্টারও বেশী সে ঘুমিয়েছিল। কতদিনের জমানো ঘুম কে জানে? কত দুশ্চিন্তা, কত দুর্ভাবনা সে ওই ঘুমে চিরকালের তরে গোর দিতে চায় কে জানে? ঘুম থেকে উঠে চুপ করে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি লাজুক ছেলে বিপদে পড়লে যে রকম হয় সেই গলায় বললুম, 'কিছু বলছ না যে?'

বললে—

'ওয়াসিল্ হরফ্-ই চুন্ ও চিরা বস্তে অস্ত্ লব্
চুন রহ্‌তমাম গশ্‌ৎ জর্স বি-জবান শওদ।'

'কাফেলা যখন পৌঁছিল গৃহে মরুভূমি হয়ে পার
সবাই নীরব। উটের গলায়ও ঘণ্টা বাজে না আর।'

বড় স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। যা বললে তার ভিতরই তার প্রতিবাদ রয়ে গিয়েছে। নিজের নীরবতা বোঝাতে গিয়ে শব্‌নম সরব হয়েছে। আর শুধু কি তাই? সেই পুরনো শব্‌নম—যে কবিতা ছাড়া কথা কইতে পারে না। যে পরওয়ানা প্রদীপের পানে ধায় না সে আবার পরওয়ানা! পরক্ষণেই বললুম, হে খুদা এ কি অপয়া চিন্তা এনে দিলে আমার মনে—এই আনন্দের দিনে? মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপলুম।

শুনতে পেয়েছে। শুধালে, 'কি বলছ?'

আমি পাছে ধরা পড়ে যাই তাই বললুম, 'তুমি ঘুমোবার আগে আমাকে কি যেন বলছিলে?'

'ও! বাড়ি ছাড়তে বারণ করেছিলুম, আর বলেছিলুম—

"দীরনে খানা-ই খুদ্ হর্ গদা শাহানশাহ্-ইস্ত্
কদম্ বারুন মনহ আজ হদ্দ-ই-খওয়িশ ও সুলতান বাশ্।"

'ভিখারী হলেও আপন বাড়িতে তুমি তো রাজার রাজা—
সে রাজ্য ছেড়ে বাহিরিয়া কেন মাত্র শুধু রাজা সাজা!'

'কী রকম?'

'এই মনে কর ইরানের শাহ্-ইন্‌শাহ্—রাজার রাজা, মহারাজা। তিনি যদি আজ এদেশে আসেন তবে আমরা বলব ইরানের শাহ্—রাজামাত্র। কারণ আমাদের তো রাজা রয়েছেন। আমাদের শাহের তিনি তো শাহ্ নন।'

'আর যদি বশ্যতা স্বীকার করেন?'

'কী বোকা!'

'হ্যাঁ! যেমন মনে কর তুমি তোমার আপন বাড়িতে অন্য অনেক জনের ভিতর শাহ্‌জাদা, কিংবা শাহ্‌জাদী, কিংবা ধরলুম শাহ্‌ই। কিন্তু এ বাড়িতে তুমি শাহ্-ইন্ শাহ্—মহারাজা।'

'ওতে আমার লোভ নেই।'

আমি দুঃখ পেলুম।

বললে, 'ওরে বোকা, ওরে হাবা, ওইখানে, ওইখানে'—বলে তার আঙুল দিয়ে আমার বুকের উপর বার বার খোঁচা দিতে লাগল। তারপর বলল, 'এবার তুমি বড় লক্ষ্মী ছেলে হয়ে গিয়েছ। এখনও একটা ফরিয়াদও কর নি।'

'করি নি? তা হলে কি করেছি এতদিন, প্রতি মুহূর্তে? হাফিজ সেটা জানতেন না? আমার হয়ে সেটা করে যান নি?—

"তুমি বলেছিলে 'ভাবনা কিসের ? আমি তোমারেই ভালবাসি ;
আনন্দে থাকো, ধৈর্য-সলিলে ভাবনা যে যাক ভাসি।'
ধৈর্য কোথায় ? কিবা সে হৃদয় ? হৃদয় কাহারে কয় ?
সে তো শুধু এক বিন্দু শোণিত আর ফরিয়াদ-রাশি।" '

বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বললে, '"ফরিয়াদ-রাশি" নয়, আছে "ভাবনার রাশি"।'

আমি বললুম, 'সে কি একই কথা নয় ?'

বললে, 'কথাটা ঠিক। হৃদয় মানেই চিন্তা, ভাবনা, ফরিয়াদ—অতি কালে-ভদ্রে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা—। সেই সান্ত্বনাটুকু না থাকলেই ভালো হত। বেদনা-বোধটা হয়তো আস্তে আস্তে অসাড় হয়ে যেত। কিস্মতের এ কী বিষসন্তোষী প্রবৃত্তি! নিরাশায় নুয়ে নুয়ে গাছটা মরে যাচ্ছে। মরতে দে না। তা হলে তো বাঁচি। না ; তখন দেবে সান্ত্বনার এক ফোঁটা জল। আবার বাঁচ, আবার মর। যেন বেলাভূমির সঙ্গে তরঙ্গের প্রেম। দূর থেকে সাদা দাঁত দেখিয়ে হেসে হেসে আসে, আবার চলে যায়, আবার আসে, আবার যায়।' হঠাৎ হেসে উঠে বলল, 'কিন্তু আমি শতবার মরতে রাজী আছি—একবার বাঁচবার তরে।' এটা যেন আপন মনের কথা। তারপর আমাকে শুধালে, 'এখন ফরিয়াদ করছ না কেন ?'

আমি বললুম, 'কাজল যতক্ষণ দূরে থাকে ততক্ষণ তার বিরুদ্ধে ফরিয়াদ—সে কালো। চোখে যখন মেখে নিই তখন তো তার কালিমা আর দেখতে পাই নে। সে তখন সৌন্দর্য বাড়ায়। এটা আমার নয়—কবি, দার্শনিক, পণ্ডিত তিরুবল্লুবেরের।'

'চমৎকার। আমাদেরও তো সুর্মা আছে, কিন্তু কেউ কিছু লিখেছে বলে তো মনে পড়ছে না। আরও একটা বল।'

'ওঁর কাব্য তো আমি সঙ্গে আনি নি। আচ্ছা দেখি।' একটু ভেবে বললুম, 'নিঠুর প্রিয়ের সম্বন্ধে প্রিয়া বলছেন, "সে আমার হৃদয়-বাড়িতে দিনে ঢোকে অন্তত লক্ষ বার কিন্তু তার বাড়িতে কি আমাকে একবারও ঢুকতে দেয় ? আমিই তাকে স্মরণ করি লক্ষ বার, সে একবারও করে না।" '

হঠাৎ দেখি শব্‌নম গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। কবিতাটি ভাল হোক মন্দ হোক এতে তো গম্ভীর হওয়ার মত কিছু নেই।

কান্নার সুরে বললে, 'আমার বাড়িতে নিয়ে যাই নি—তোমাকে ? কবে যাবে বল।'

আমি প্রথমটায় বুঝতে পারি নি 'বাড়ি' বলতে সে 'হৃদয়' বুঝেও সত্যকার

আপন বাড়ি বুঝেছে।

আমি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে তার দু হাত চেপে ধরলুম। মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরল না। কি যেন একটা 'হারাই হারাই' ভাব বুকটাকে ঝাঁঝরা করে দিল। আবার কথা বলতে গেলুম, পারলুম না।

আস্তে আস্তে তার হাত দুটি ছাড়িয়ে নিয়ে আমার হাতের উপর বুলোতে বুলোতে বললে, 'আমি পাগল, না, কি? বন্ধু, তুমি কিছু মনে করো না। এই এক বছর ধরে—'

বাধা দিয়ে অতি কষ্টে বললুম, 'আমার উপর মেহেরবান হও—প্রসন্ন হও। আমি কি জানি নে আমি কত অভাজন। তুমি এ শহরে—'

এবারে হেসে উঠে বাধা দিয়ে বললে, '—সবচেয়ে সুন্দরী (আমি কিন্তু তার কুল-গোষ্ঠীর কথা বলতে যাচ্ছিলুম)। না? আমি কুৎসিত হলে তুমি আমায় ভালবাসতে না—সে তো কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু আমি মাঝারি হলে কি করতে বল তো?'

আমি ঝড় কাটাতে ব্যস্ত। হালের সঙ্গে পাল। বললুম, 'এ রকম প্রশ্ন আমি কোনও বইয়ে পড়ি নি। সাধারণত মেয়ে শুধায়, সে সুন্দরী না হলে ভালবাসা পেত কি না?'

'উত্তর দাও।'

'আমি নিজে তো মাঝারি। তুমি তো বেসেছ। এবং সবচেয়ে বড় কথা, তুমি তুর্কী রমণী। তুমি—'

'ব্যস্, ব্যস্, থাক্ থাক্। এবার এদিকে এস। আমার ব্যাগটা খোল তো। হ্যাঁ ওই রুমালে বাঁধা জিনিস।'

সামনের টেবিলে সেটি রেখে রূপোতে সিল্কেতে কাজ করা কিংখাপের রুমালের গিঁট আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে খুলতে লাগল—যেন তীর্থের প্রসাদী। আমি এক দৃষ্টে দেখছিলুম তার আঙুলের খেলা। প্রত্যেকটি আঙুল যেন এক একটি ব্যালে নর্তকী। হাতের কবজি দুটি একদম নড়ছে না—আঙুলগুলো এখানে যায়, সেখানে যায়, একটা অসম্ভব অ্যাঙ্গল থেকে চট করে আরেক অসম্ভব অ্যাঙ্গেলে চলে যায়। পিয়ানো বাজানো এর কাছে কিছুই নয়; সে তো শুধু ডাইনে বাঁয়ের নড়ন চড়ন।

দুখানা রুমাল খোলার পর [illegible] নীল রঙে চামড়ায় বাঁধানো একখানি ছোট্ট বই। চামড়ার উপর [illegible]। চার কোণ জুড়ে টায়রা করে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল-লতা-পাতার [illegible]—তাই [illegible] বসে আছে

ক্ষুদে ক্ষুদে পাখি। বইয়ের মাঝখানে একটি জোয়ালো গোল মেডালিয়ন, নামাঙ্কন-স্বাক্ষরলাঞ্ছন সহ।

বললে, 'আরও কাছে এস।'

আঙুলের ডগা দিয়ে আস্তে আস্তে এক একটি করে পাতার প্রান্ত বুলিয়ে সেটিকে উল্টোয় আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে যেন একটি করে নূতন বাগান। পাতার মাঝখানে কুচকুচে কালো কালিতে হাতের লেখা ফার্সী কবিতা আর তার চতুর্দিকের বর্ডারে আবার সেই লতা আর পাখির ঘতিক। অতি ছোট্ট ছোট্ট গোলাপী রঙেটের পাশে ডালের উপর বসে ক্ষুদে ক্ষুদে বুলবুল। কখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে লতার উপর দুলছে, কখনও বা ঘাড় নিচু করে গোলাপ্ কুঁড়ির সঙ্গে কানে কানে কথা কইছে। সখী, জাগো, জাগো। পাঁচ-ছটা রঙের এক সপ্তকেই সংগীত বাঁধা হয়েছে, কিন্তু আসল পকড়্ সোনালী, নীল আর গোলাপীতে।

বললে, 'লেখাটা করে দিয়েছেন আগা-ই-আগা ওস্তাদ সির্-বুলন্দ কিজ্‌লবাশ। উনিই আমাদের শেষ জরীন্-কলম, সোনার কলমের মালিক। তাঁর ছেলে পর্যন্ত হিন্দুস্থান চলে গিয়েছে ছাপাখানার কাজ শিখতে!' একটি ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

প্রতি দু পাতার মাঝখানে এক একখানি করে অতি পাতলা সাদা কাগজ। আতর মাখানো।

বুঝিয়ে বললে, 'পোকায় কাটবে না আর আতরের তেলের স্নেহ কাগজকে শুকনো হতে দেবে না।' আমার মনে পড়ল সত্যেন দত্তের ফার্সী কবিতার অনুবাদ।

'তবু বসন্ত যৌবন সাথে দু'দিনেই লোপ পায়
কুসুমগন্ধী যৌবন পুঁথি পলে উলটিয়া যায়।'

আবার এ কী অপয়া বচন? না, না। সৃষ্টির প্রথম দিনের প্রথম বুলবুলের সঙ্গে প্রথম গোলাপের মৃদু মর্মর গানে মর্মের বাণীর কানাকানি এখনও আছে, চিরকাল থাকবে।

শব্‌নম কিন্তু-কিন্তু করে কি যেন বলতে চাইছে, বলছে না। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি সে-মুখ একেবারে সিঁদুরের মত টকটকে।

আমি তাকাতেই সেই মুখে যেন ঘামের ফোঁটা দেখা দিল। শব্‌নমের মুখে শব্‌নম! ঘাড় ফিরিয়ে অপরাধীর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আর বর্ডারগুলো আমার আঁকা!'

বলেই ছুটে গেল সিঁড়ির দিকে।

আমি হরিণশিশুকে নরগিস বনের ভিতর দিয়ে নাচতে দেখলুম। আমার বুখারা-কার্পেট ছিল নরগিস মতিফ।

সিঁড়ির মুখে গিয়ে হাঁকলে, 'আগা আব্দুর রহ্‌মান। চা খাবে?'

আব্দুর রহ্‌মান হুঙ্কার ছাড়লে, 'চশ্‌ম!'—যেন হুকুমটা কান্দাহার থেকে এসেছে, জবাব সেখানে পৌঁছনো চাই।

কী সৌজন্য! 'চা খাবে?'—'চা আন', নয়। অর্থাৎ তুমি যদি খাও, তবে আমিও যেন এক পেয়ালা পাই।' ভৃত্যকে সহচরের মত মধুর সম্ভাষণ। আর আমার আব্দুর রহ্‌মানও কিছু কম নয়। 'চশ্‌ম্'—অর্থাৎ আপনার ইচ্ছা অনিচ্ছা আমার 'চশ্‌ম', চোখের মত কিম্মৎবার, মূল্যবান।'

আমার মূল বিস্ময় কিন্তু এতে তো চাপা পড়ে না।

'তুমি এঁকেছ?'

নীরব বীণা।

'তুমি এঁকেছ?'

যেন অতি দূরে সে বীণার প্রথম পিড়িং শোনা গেল 'বড় কাঁচা।'

আমি সপ্তমে বললুম, 'কাঁচা? আশ্চর্য! কাঁচা? তাজ্জব ক-টা ওস্তাদ এ রকম পারে?'

এবারে কাছে এসে হেসে বললে, 'তুমি কিছু জান না। তাই তোমাকে কবিতা শুনিয়ে সুখ, তোমাকে ছবি দেখিয়ে আনন্দ।'

আমি রাগ করে বললুম, 'তুমি কি আমাকে অজ গাঁইয়া পেয়েছ? দিল্লীর মহাফিজখানাতে আমার দোস্ত রায় আমাকে কলমী কিতাব দেখায় নি?'

আমাকে খুশী করার জন্য বললে, 'তাই সই, তাই সই ওগো তাই সই। কিন্তু আমার ওস্তাদ আগা জমশীদ বুখারী বলেন, "রোজ আট ঘণ্টা করে ত্রিশ বছর আঁকার রেওয়াজ করলে তবে ছবি আঁকার কল রপ্ত হয়। এবং তারপর চলে যাবে চোখের জ্যোতি।"'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'বল কি?'

'হ্যাঁ। এবং বলেন, "কিন্তু কোনও দুঃখ নেই। তুমি নিজেই জান না তোমার মূল্য কি?"'

'মধু তার নিজ মূল্য নাহি জানে?'

খুশী হয়ে বললে, 'বিলকুল্! "—প্রকৃত জহুরী সমঝে যাবে তোমার প্রথম ছবিতে কোন্ শেষ কথা লুকনো আছে, আর তোমার শেষ ছবির সব মিলে যাবে

প্রথম ছবির প্রথম ঠেকায়।" তারপর তিনি খুব জোর দিয়ে বলতেন, "হুনরে যখন পরিপূর্ণতাই এসে গেল তখন আর পুনরাবৃত্তি করে লাভ কি? এবং যদিস্যাৎ তার পরও কিছু উদ্বৃত্ত থেকে যায় তবে সেইটে ভাঙিয়ে খাবে তোমার শিষ্যেরা—তাদের জন্যও তো কিছু রাখতে হয়। তখন তোমার পাকা গম-রঙের বেহালার সুর শোনা যাবে তাদের কাঁচা সবুজ বেহালার রেওয়াজে।" '

আমি বললুম, 'চমৎকার।'

'আমি তাঁর প্রত্যেকটি শব্দ কণ্ঠস্থ করে রেখেছি।'

আমি শুধালুম, 'কার কাব্য আছে এতে?'

'অনেকের। তোমাকে যেগুলো শুনিয়েছি আর যেগুলো শোনাব। তুমি যে ক-টি বলেছ তাও আছে। তবে বেশীর ভাগ আবু তালিব কলীম কাশানীর। ইনি আসলে ইরানী কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমাদের বাদশা জাহাঙ্গীরের সভাকবি হন। আর আছে সাঈব্ তবরীজীর। ইনিও হিন্দুস্থানে কিছুকাল ছিলেন—কলীমের বন্ধু। তখন ইরানে রব উঠেছে—

"সকল মাথায় তুর্কী নাচন তোমার লাগি, প্রিয়ে,
লক্ষপতি হবে সবাই হিন্দুস্থানে গিয়ে!"

এসব আমি এবারে কান্দাহারে শিখেছি। পরে বলব।'

বললে, 'তুমি কখনও জানবে কি, বুঝবে কি, ছবি আঁকার সময় প্রতিটি মুহূর্তে তুমি আমার সামনে ছিলে? প্রতিটি তুলির টানে আছে তোমার চুল, প্রতিটি বাঁকা রেখায় আছে তোমার ভুরু। তোমার হাসি থেকে নিয়েছি গোলাপী, তোমার স্বর থেকে নিয়েছি রূপালী।'

আমি বললুম, 'দয়া কর।'

'আমায় বলতে দাও। এই একবারের মত।'

'শেষ বুলবুলের চোখ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে জানেমন—বড়চাচা—ঘরে ঢুকে বললেন, "চলো মুসাফির, বাঁধ গাটুরিয়া, বহুদূর জানে হোয়েগা।" কাল সকালেই কাবুল যাত্রা। বাদশা আপন গাড়ি পাঠিয়েছেন। তাঁর সবুর সইছে না। তাই তো তোমাকে খবর দিতে পারি নি।'

আব্দুর রহ্‌মান চা নিয়ে এল। শব্‌নম বললে, 'আগা রহ্‌মান, তুমি তোপল খানকে প্রতিবারে কোর্মা-কালিয়া খাইয়েছ আর সিনেমা দেখিয়েছ। খুদা তোমার মঙ্গল করুন। এদিকে এস। এই নাও। কান্দাহার থেকে এনেছি।'

ব্যাগ খুলে শব্‌নম বের করলে তাবিজের মত ছোট্ট একখানি কুরান্ শরীফ।

সঙ্গে আতশী কাঁচ। তাই দিয়ে পড়তে হয়।

আব্দুর রহ্‌মান নিচু হয়ে হাত ছুঁইয়ে হাতখানি আপন চোখে চেপে ধরল। তারপর কুরান্‌খানি দু-হাতে মাথার উপর তুলে ধরে আস্তে আস্তে চলে গেল। তার মুখের ভাব কি করে বর্ণাই! জোয়ানের ইয়া ঝড়া মুখখানা যেন কচি শিশুর হাসিমুখে পরিণত হল।

কী অসাধারণ বুদ্ধিমতী এই শব্‌নম। জানত, অন্য কিছু আব্দুর রহ্‌মানকে গছানো যাবে না।

শব্‌নমের আঁকা বর্ডার দেখতে গিয়ে সে শুধালে, 'আচ্ছা বল তো, এই বুলবুলের নাম কি?'

আমি বললুম, 'বুলবুল তো এক রকমেরই হয়।'

'এই বুলবুল, এ বইয়ের সব বুলবুল শব্‌নম। বুলবুল এসেছিল বাগানে, সে-ই প্রথম গোলাপকে প্রেম নিবেদন করবে। এসে দেখে গোলাপ আগের থেকেই বাতাসে বাতাসে তার প্রেমের বারতা বিছিয়ে রেখেছে। গোলাপের কাছে পৌঁছবার বহু পূর্বেই সে সৌরভের ডাক শুনতে পেল, 'এস এস, প্রিয়া। মনে আছে?'

'তুমি কেন দুঃখ কর, বুলবুল? শব্‌নম যদি সমস্ত রাত গোলাপের উপর অশ্রুবর্ষণ না করত তবে কি সে ফুটতে পারত?'

জড়ানো কণ্ঠে বললে, 'সেই ভালো, ওগো শব্‌নমের শরৎ-নিশির স্বপ্ন। এই নাও তোমার বই।'

আমি প্রতিবাদ করেছি।

শান্ত কণ্ঠে বললে, 'এতে আছে আমার চোখের ঝরা জল। সে জল তো আমি চোখে পুরে নিতে পারব না। এই জল দেখে যখন তোমার চোখে জল টলটল করবে তখনই তো এ তার চরম মূল্য পাবে।'

আমি বইখানা দুই হাত দিয়ে তুলে ধরে ঠোঁট চেপে চুমা দিলুম—

কিন্তু আমার চোখ দুটি অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে।

শব্‌নম আস্তে আস্তে, অতি ধীরে ধীরে, ঘাড় ঘোরালে। তার চোখে ছিল স্বচ্ছ জলের অতল রহস্য।

আমি বললুম, 'কিন্তু বন্ধু, তুমি তো এর আগেই আমাকে সওগাত দিয়েছ।'

অবাক হয়ে বললে, 'কখন?'

'প্রথম রাত্রেই।' বলতে বলতে আমি ওয়েস্ট কোটের বুক পকেট থেকে বের করলুম একটি সোনার ভিজিটিং-কার্ড কেস। এটি আমি সওগাত রাখবার জন্য

প্যারিস থেকে আনিয়েছিলুম। শব্‌নমের হাতে দিলুম।

সে খুলে দেখে ভিতরে একখানি ভিজিটিং-কার্ড। সেই কার্ডে অতি সযত্নে জড়ানো একগাছি চুল।

'চোর, চোর' বলে চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল। তারপর ওস্তাদ সেতারী বাজনা আরম্ভ করার পূর্বে যে রকম সব কটা ঘাটের উপর টুংটাং করে হাত চালিয়ে নেন, সেইরকম পর্দার পর পর্দা হাসলে। বললে, 'তাই বল। আমি পরদিন সকালবেলা চুল আঁচড়াতে গিয়ে দেখি এক গাছা চুল কম। খোঁজ খোঁজ, ঢোঁড় ঢোঁড় রব পড়ে গেল চতুর্দিকে। শাজাদীর একগাছা চুল চুরি গেছে। বাদশা জানতে পেরে কোটালকে ডেকে কোফতা কাবাব করেন আর কি! আমি স্বয়ং গেলুম টেনিসকোর্টে, তারপর গেলুম হোটেলে, তোমার ঘরে—'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'আমার ঘরে?'

'হ্যাঁ রে, জান, হাঁ। আমার জান্ গিয়েছিল। তখন আকাশে আদম সুরৎ —কালপুরুষ। তারপর মেঘ। তারপর বৃষ্টি। আমার জান ভিজে নেয়ে বাড়ি ফিরল। সেই হৃদয়—যাকে তুমি বল, "সে তো একবিন্দু শোণিত আর ভাবনার রাশি"।'

'তাই বল! আমি ভেবেছিলুম, তোমার চোখ থেকে ভানুমতী বেরিয়ে কালপুরুষের আয়োনোস্ফিয়ারে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসে ঢুকল আমার চোখে।'

'ওরে খোদর সিধে, তাহলে যে এ ব্রহ্মাণ্ডে যত লোক তাকিয়েছিল—' হঠাৎ থমকে গিয়ে বললে, 'ওই য্ যা। যে কাজের জন্য এসেছিলুম তার আসলটাই ভুলে গিয়েছিলুম। তুমি বুধবার দিন সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে পারবে? এই ধর, তিনটে নাগাদ।'

আমি বললুম, 'কি যে বল? কিন্তু কেন? আমি যে ভয় পাচ্ছি।'

'এখনও তোমার ভয় গেল না? ওরে ভীরু, আমাকে বিশ্বাস করতে শেখ।'

ব্যাগটা খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করলেই বুঝতুম, এবারে তার যাবার সময় এসেছে।

শব্‌নম আমার দিকে তাকিয়ে ঘাড় কাত করলে।

আমি কাতর কণ্ঠে বললুম, 'ও-রকম তুমি হঠাৎ যেতে চাইলে আমার বড় বাজে। আমাকে একটু সয়ে নিতে দাও।'

বললে, 'আমি যখন আসি, তখন তো বল না, "বাইরে সিঁড়িতে গিয়ে বস, একটু সয়ে নিতে দাও"।'

তার বিদায়ের বেলা আমার কোন উত্তর যোগায় না।

দেউড়ির কাছে এসে আকাশের দিকে নাকটি তুলে দুবার শ্বাস নিলে। বললে, 'শব্‌নম পড়ছে।'

এবারে কথা বলার শক্তি দয়াময় দিলেন। বললুম, 'আমার শব্‌নম যেন মাত্র একটি গোলাপে বর্ষে।'

'গোলাপে ঢুকে সে মুক্তো হয়ে গিয়েছে।'

॥ ৩ ॥

আমি রোমান্টিক নই। এ-প্রেম আমার সাজে না। এ-প্রেম তারই জন্য, যে বেদনা সইতে জানে, যে সংগ্রামে ভয় পায় না।

আমি ছেলেবেলা থেকেই ভীরু। কৈশোরে সাহস করে কোনও মেয়ের সঙ্গে কথা কইতে পারি নি। অনাদৃতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কোনও কোনও মেয়ের স্বভাব। তারা যেচে কথা কইলে আমি লজ্জায় ঘেমে নেয়ে কি উত্তর দিয়েছি তা আমি চেষ্টা করেও স্মরণ করতে পারব না।

চণ্ডীদাস পড়ে পেয়েছি ভয়। দিনের পর দিন শ্রীরাধার মত সইতে হবে আমাকে বিরহ দহন? দরকার নেই আমার কানুর প্রেম। গোপিনীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা হওয়ার আমার কোনও প্রয়োজন নেই। বনস্পতি গৌরব নিয়ে, উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে, বিদ্যুৎপাত ঝঞ্ঝা-বাত সইবার মত শক্তি আর সাহস আমার নেই। আমি মেহদির বেড়া হয়ে থাকতেই রাজী। আর তিনি যদি তার উপর দয়া করে সাদা-মাটা দু-একটি ফুল ফোটান তবে আমি নিজেকে মহা ভাগ্যবান বলে তাঁকে বার বার নমস্কার করব।

আমি চেয়েছি ঘরের প্রেম, বধুর প্রেম,—বঁধুর প্রেম আমি চাই নি। সংসারের অবহেলা অনাদরের মাঝখানে এইটুকু সান্ত্বনা যে, বাড়ি ফিরলে আমি সেখানে সবচেয়ে আদরের ধন। সারা দিনমান সে আমার সঙ্গে থাকবে স্বপ্নের মত—আমি চলাফেরা করব সেই স্বপ্ন-সম্মোহনে, ঘুমে-চলার রোগী যে রকম হাঁটে। আর রাত্রিকালে সে পাশে থাকবে—জানলার কাছে চাঁদ যে রকম অপলক দৃষ্টিতে নিদ্রিতের শিয়রে জাগে।

মণি-ভরা, প্রবাল-হার-পরা নীলাক্ষী নীলাম্বুজের ঝড়-ঝঞ্ঝার অশান্তি-ঐশ্বর্য আমি চাই নি। গ্রামের নদীটি পর্যন্ত আমি হতে চাই নি। আমি হতে চেয়েছিলুম বাড়ির পিছনের ছোট্ট পুকুরটি। যেটি আমার বধুর, আমার নির্জনে প্যাঙ্গা সংসারের জননীর একান্ত আপন। সেখানে সামান্যতম তরঙ্গ উঠে আমাকে

বিক্ষুব্ধ করে না, আমার বধূকে ভীতার্ত করে না।

এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।

তবু ভাগ্যের কাছে স্বীকার করব, এই চল্লিশ ঘণ্টা আমার কেটেছে যেন এক অপূর্ব সংগীতের সুরলোকে। চল্লিশ ঘণ্টার দিগন্তে দেখতে পাচ্ছি, আমার তীর্থাবসানের দরগা-চূড়ো। আর যেতে যেতে দেখছি, পথের দুপাশে কত অতিথিশালার বিশ্রান্তি, কত সাধু-সজ্জন-সঙ্গম, শুনছি মন্দিরের ঘণ্টা, দূর হতে ভেসে-আসা ভোরবেলাকার আজান।

এবারে ঘরে ঢুকল ঝড়ের বেগে। যেন আসলে কত দেরি হয়ে গিয়েছে।

আমার সামনে এসে হিন্দুস্থানী কায়দায় নমস্কার-মুদ্রাতে হাত দুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললে, 'হামি তোকে ব্বালোবাসি।'

প্রথমটায় বুঝি নি। তারপর হো হো করে হেসে উঠেছিলুম।

'বুঝেছ?'

আমি বললুম, 'এ তুমি শিখলে কোথায়?'

আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে, আমার কথার উত্তর না দিয়ে বললে, 'আমি করলুম প্রেম নিবেদন, আর তুমি হাসলে।' চোখ থেকে আগুন বেরুচ্ছে না বটে, কিন্তু ভেজা দিনের দেশলাইয়ের মত কখন যে জ্বলবে ঠিক নেই।

আমি অতি কষ্টে তাকে শান্ত করলুম।

আমি কি মূর্খ! উচ্চারণ আর ব্যাকরণের দিকে গেল কান?—বক্তব্যটা উপেক্ষা করে গেলুম। ধন্য সেই রাজা যিনি ভিখারিণীর ছেঁড়া কাপড় দেখেন নি—দেখেছিলেন তার মুখ, তার হৃদয়, আর তাকে বসিয়েছিলেন সিংহাসনে। আমি আহাম্মুক, শাহ্‌জাদীকে দেখছি ভিখারিণীর বেশে।

নিজের গালে নিজে চড় মেরেছি বহুবার—এবার মারলুম লাথি!

বললে, 'হিংসে হল না কেন তোমার? কোনও ইয়াংম্যান্ আমাকে শিখিয়েছে সেই সন্দেহে?'

আমি বললুম, 'সে বাঙালী ইয়াংম্যান্ নয়।'

হার মেনে বললে, 'কান্দাহারে আমাদের এক চাপরাসী ছিল—সে যৌবনে কল্‌কাত্তায় নোকরী করত। তার কাছ থেকে শিখেছি।'

শব্‌নম ভালো করে উচ্চারণটা শিখল। কারণ এই কথাগুলো শুদ্ধভাবে বাঙলাতে বলতে বা উচ্চারণ করতে কোনও কাবুলীর অসুবিধা হওয়ার কারণ নেই। শুধু বাধল গিয়ে 'ভ' অক্ষরে। ভারতবর্ষের বাইরে মহাপ্রাণ বর্ণ নেই

বললেও চলে—এমন কিংকিংকিণ ভারতেও নেই।

শেষটায় যখন বললুম 'ঠিক' তখন ভারি খুশী হল। শুধালে, 'আর তো তোমার কোনও ফরিয়াদ নেই?'

আমি চিন্তা করে বললুম, 'আমার আর কোনও ফরিয়াদ নেই। ভবিষ্যতেও থাকবে না।'

সন্দেহ-নয়নে তাকিয়ে শুধালে, 'হঠাৎ?'

'হঠাৎ-ই। কাল রাত্রে মনে পড়ল একটি সংস্কৃত শ্লোক :—

"শত্রুর্দহতি সংযোগে বিয়োগে মিত্রমপ্যহো।
উভয়োর্দুঃখ দায়িত্বং কো ভেদঃ শত্রুমিত্রয়োঃ?"

'শত্রুর মিলনে মনে অতি কষ্ট হয়
বন্ধু বিচ্ছেদে হয় কষ্ট সাতিশয়।
উভয়েই বহু কষ্ট দেয় যদি মনে
শত্রু মিত্রে কিবা ভেদ তবে এ ভুবনে?'

(কবিভূষণ পূর্ণচন্দ্রের অনুবাদ)

শব্‌নম বললে, 'পয়লা নম্বরী প্যারাডক্‌স্। এরপর আর কোনও ফরিয়াদ থাকার কথা নয়।' তারপর চিন্তা করতে করতে বলল, 'কিন্তু এর উত্তরটা কি?'

'তুমি বল।'

'দোস্ত মঙ্গল কামনা করে, দুশমন বিনাশ কামনা করে। আমি কামনাটা বড় করে দেখি। ফলটা অত বড় করে না।'

আমি বললুম, 'শাবাশ! দোস্ত্‌-ই-জান্‌-ই-মন্‌—আমার দিলের দোস্ত—শাবাশ। হিন্দুস্থানের ধর্মগুরুও বলেছেন, মা ফলেষু কদাচন।'

আরও কিছু কথা হল।

আজ কিন্তু সমস্তক্ষণ লক্ষ্য করছিলুম, আজ যেন শব্‌নমের মন অন্য কোনো-খানে। হয়তো কোনও কথা বলতে চায় কিংবা শুধাতে চায়।

এমন সময় রাস্তায় হঠাৎ চেঁচামেচি আর আর্ত কণ্ঠরব শোনা গেল। এত জোর যে আমরা দুজনেই শুনতে পেলুম। শব্দটা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল দেখে আমি একটু উৎকণ্ঠিত হলুম। এমন সময় দূর হতে এক সঙ্গে অনেকগুলো বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ শোনা গেল। দুজনাতে নিচে নেমে খবর নিয়ে জানা গেল

ডাকাতের সর্দার ব্রাচ্চায়েসকাও কাবুল আক্রমণ করতে এসেছে। আমানুল্লাকে তাড়াবে।

আফগানিস্থানের এ-অধ্যায় বিস্ময়জনক। যে কোনও প্রামাণিক ইতিহাসে পাওয়া যায়। এক বাঙালী মুসলমানও এ-বিষয়ে লিখেছেন।

শব্‌নম আমাকে হাত ধরে উপরে নিয়ে এল।

ঘরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ঘন ঘন পায়চারি করতে লাগল। একবার বললে, 'আমানুল্লাকে বাবা বার বার বলেছেন, তিনি বারুদের পিপের উপর বসে আছেন, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতে চান নি। যাক্‌গে, আমার তাতে কি?'

এ রকম আর্তনাদ আর গুলির আওয়াজ মেশানো অট্টরোল আমি জীবনে কখনও শুনি নি। একবার ভাবলুম, শব্‌নমকে বলি, আমি আর আব্দুর রহ্‌মান তাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি কিন্তু সেই সঙ্কটে আমার সত্য কর্তব্য কি, কিছুতেই স্থির করতে পারলুম না। ঘরের চেয়ে রাস্তা যে বেশী বিপজ্জনক। ওদিকে আবার শব্‌নমদের আপন ভদ্রাসন নিশ্চয়ই আমার বাড়ির চেয়ে অনেক বেশী সুরক্ষিত। কি করি?

শব্‌নম পায়চারি করছে। আপন মনে বললে, 'কেউ জানতো না। বাবাও জানতেন না।'

পায়চারি বন্ধ করে বললে, 'শুনতে পাচ্ছ, বন্দুকের শব্দ এগিয়ে আসছে?'

বহু দূরের বন্দুকের শব্দ এগিয়ে আসছে না পিছিয়ে যাচ্ছে বোঝবার মত সূক্ষ্ম শ্রবণশক্তি সৃষ্টিকর্তা নিরীহ বঙ্গ সন্তানকে দেন নি।

শব্‌নম আবার বললে, 'আমার তাতে কি?'

আমি তার মানে বুঝতে পারলুম না।

আধঘণ্টার উপর হয়ে গিয়েছে—প্রথম বন্দুকের আওয়াজ শোনার পর।

এমন সময় তোপল্‌ খান এসে ঘরে ঢুকল। সেলাম করে শব্‌নমকে শুধালে, 'বাড়ি যাবে না, দিদি?'

শব্‌নম বললে, 'যাব। পরে। এখন তুমি নিচে গিয়ে আব্দুর রহ্‌মানের সঙ্গে দেউড়ি-দরজার উপর পাথর চাপাও। আর যা-যা সব করতে হয়।'

তোপল্‌ খান যেভাবে ঘাড় নেড়ে চলে গেল তার থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল শব্‌নমের প্রতি তোপলের নির্ভর মুর্শীদের উপর চেলার বিশ্বাসের মত। ভ্যালে-র কাছে তা হলে হিরোইন হওয়াটা অসম্ভব নয়।

শব্‌নমের মুখে হাসি ফুটেছে। আমার একটু দুঃখ হল। আমার গায়ের

জোর ওর মত হল না কেন।

শব্‌নম আমার সামনে মুখোমুখি হয়ে বললে, 'তুমি বড় সরল। ভাবলে, তোপল্‌কে দেখে আমি ভরসা পেলুম। এই বন্দুক পিস্তলের জমানায়? যাক্‌গে।'

বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললে, 'শোন।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

শান্ত কণ্ঠে, আমার চোখে চোখ রেখে বললে, 'আমি স্থির করেছি আমাদের বিয়ে হবে। তুমি?'

ধাক্কাটা কি রকম লেগেছিল আমি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করব না। আমার মুখে কথা ফোটে নি এবং চেহারায় যদি কোনও ভাব ফুটে থাকে তবে সেটা হতভম্বের।

সেই শান্ত কণ্ঠেই বললে, 'তোমার চোখ আমি চিনি। তোমাকে কিচ্ছু বলতে হবে না। এবারে আমি জিতেছি।'

তারপর চেয়ারটা কাছে টেনে এনে আমার দু জানুর উপর দু হাতে ভর করে সামনের দিকে ঝুঁকে বললে, 'এবারে সব কথা শোন।'

আমার মুখ দিয়ে তখনও কথা ফোটে নি।

বললে, 'আমি জানতুম, এর একটা বোঝা-পড়া একদিন করতেই হবে। তাই আজকের দিনটা ঠিক করেছিলুম, আস্তে ধীরে তোমার মনের গতি দেখে, প্রসন্ন মুহূর্তে আমি যে একান্ত সর্বস্বান্ত তোমার হতে চাই সেইটে জানাব। ইতিমধ্যে ডাকু এসে জিনিসটা যেমন কঠিন করে তুলল, তেমনি সহজও করে দিল। এখন কতদিন এ রকম চলবে, কেউ বলতে পারে না! আর সময় নেই। আজই, এখ্‌খুনি আমাদের বিয়ে।'

'হ্যাঁ, এখ্‌খুনি।'

আমি কিছু বলতে চাই নি।

'হ্যাঁ। এখ্‌খুনি। তুমি ভেবেছিলে, আমি উত্তেজিত হয়েছি, ডাকু এসেছে বলে। তা নয়। আমি খুঁজছিলুম বিয়ের দুজন সাক্ষী। আব্দুর রহ্‌মান তো আছেই কিন্তু ভিড় ঠেলে কাকে ডেকে নিয়ে আসি, রাস্তায় এই ভয়ে-পাগলদের ডাকলেও কেউ আসবে না। তোপল্‌ খান আসাতে আমার দুশ্চিন্তার অবসান হল।'

উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'তুমি ওজু করে এস।'

মোহগ্রস্তের মত ওজু সেরে বাইরে এসে দেখি তোপল্‌ আর রহ্‌মানে মিলে

ড্রইং রুমের আসবাবপত্র সরিয়ে মাঝখানে আরেকখানা কার্পেট পেতেছে। শুনেছি চাকরবাকরদের বখশিশ দিলে তারা খুশী হয়। এদের মুখে আজ যে বদান্যতা দেখলুম, সে তো লক্ষপতির মুখেও আমি কখনও দেখি নি।

শব্‌নম এক কোণে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে কী যেন পড়ছে। তার মুখচ্ছবি বড়ই শান্ত। আমি কাছে যেতে কী কী করতে হবে বলে দিল।

দুজনাতে মুখোমুখি হয়ে বসলুম। শব্‌নম মুখের উপর ওড়না টেনে দিয়ে মাথা নিচু করলে। আমি বললুম, 'আমি অমুক, অমুকের ছেলে, তুমি অমুক, অমুকের মেয়ে তোমাকে স্ত্রীধন দিয়ে—'

তোপল্‌ খান শুধালে, 'স্ত্রীধন কত ?'

আমি বললুম, 'আমার সর্বস্ব।'

তোপল্‌ খান বললে, 'একটা অঙ্ক বললে ভাল হয়।'

আমি জোর দিয়ে আবার বললুম, 'আমার সর্বস্ব।'

'—স্ত্রীধন দিয়ে মুহম্মদী চার শর্তে তোমাকে স্ত্রীরূপে পেতে চাই। তুমি রাজী ?'

এ যেন শব্‌নমের গলা নয়। দূর থেকে ভেসে আসছে, অতি মৃদুকণ্ঠে তার সম্মতি।

তিনবার ওই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হল। তিনবার সে সম্মতি জানালে।

আমি সাক্ষীদের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'আপনারা এই বিবাহের শাস্ত্র-সম্মত দুই সাক্ষী। আপনারা আমার প্রস্তাব আর মুসম্মৎ শব্‌নম বানুর সম্মতি তিনবার শুনেছেন ?'

দুজনাই বললে, 'শুনেছি।'

শব্‌নমের কথা ঠিক হলে আনুষ্ঠানিক বিবাহ এইখানেই শেষ। তোপল্‌ খান বহু বিয়ে দেখেছে বলে দু হাত তুলে একটা প্রার্থনা করল। আমিও হাত তুললুম। শব্‌নম মাথা নিচু করে একেবারে মাটির কাছে নামিয়ে, দু হাত দিয়ে প্রায় মুখ ঢেকে।

প্রার্থনাতে মাত্র একটি কথা ছিল। 'হে খুদা, আদম এবং হভার মধ্যে, ইউসুফ ও জোলেখার মধ্যে, হজ্‌রৎ ও খাদিজার মধ্যে যে প্রেম ছিল, এ দুজনার ভিতর সেই রকম প্রেম হোক।'

আব্দুর রহ্‌মান উদ্বাহু হয়ে প্রার্থনার সময় জোর গলায় ঘনঘন বলল, 'আমিন, আমিন—হে আল্লা তাই হোক, তাই হোক।'

আমিন! আমিন!! আমিন!!!

ওরা দুজন চলে যাওয়ার পর আমি যেখানে ছিলুম সেইখানেই বসে রইলুম। কিছুই তো জানি নে তারপর কি করতে হয়। শব্‌নমও কিছু বলে নি।

উঠে গিয়ে সামনে বসে বললুম, 'শব্‌নম।'

তাকিয়ে দেখি ওড়না ভেজা।

কিছু না ভেবেই ওড়না সরালুম। সুস্থ বুদ্ধিতে পারতুম না। দেখি, শব্‌নমের চোখ দিয়ে জল ঝরছে।

শুধালুম, 'এ কী?'

শব্‌নম চোখ মেলে বললে, 'বল।'

তখন দেখি, আমার বলবার কিছুই নেই।

তাকে তুলে ধরে সোফার দিকে নিয়ে যেতে গিয়ে দেখি সেটকে সরানো হয়েছে। আমি সেদিকে যাচ্ছিলুম। বললে, 'না। ওদের ডাক। তোমার ঘর আমি সেই রকমই চাই।' ঘর ঠিক করা হল।

বললে, 'তুমি শোও।'

আমার পাশে আধ-হেলান দিয়ে বসে আমার চুলের ভিতর আঙুল চালাতে চালাতে বলল, 'ঠিক এ-রকম হবে আমি ভাবি নি। আমি ভেবেছিলুম, হয়ত খানা-পিনা গান-বাজনা বোমা-বারুদ ফাটিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা আমি করতে পারব। আর তা সম্ভব না হলে আমি অন্যটার জন্যও তৈরী ছিলুম।'

আমি বললুম, 'এই তো ভাল।'

'সে কি আমি জানি নে? খানা-পিনা বন্ধু-সমাগম হল না, তার জন্যে আমাদের কি দুঃখ? তবে একটা পদ এত বেশী হচ্ছে যে আর সব পুষিয়ে দিচ্ছে। শুনছ শাদির 'শাদিয়ানা'? বোমা-বারুদ? কী রকম বন্দুক মেশিনগানের শব্দ হচ্ছে? আমানুল্লার শালীর বিয়েতেও এর এক আনা পরিমাণও হয় নি। ডাকাত আমাদের বিয়ের শাদিয়ানার ভার নিয়েছে—না? এও তো ডাকাতির বিয়ে!'

আমি কিচ্ছুটি বলি নি। আমার হিয়া কানায় কানায় ভরা। আমার জাহাজ বন্দরে ভিড়েছে। পাল দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে হাওয়াকে মুক্তি দিয়েছে। হাল-বৈঠা নিস্তব্ধ। উটের ঘণ্টা আর বাজছে না।

বললে, 'আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই।'

এবারে আমাকে মুখ খুলতে হল।

ডান হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরে বললে, 'আমার শওহর—স্বামী কথা বলে কম। শোন—

'তোমাকে বড় কষ্ট দিয়েছি। তুমি আমাকে কতখানি চাও, সে আমি জানতুম। আরও জানতুম, সর্বশেষে চাওয়া, সমাজের সামনে পাওয়া, তুমি সাহস করে নিজের মনের কাছেই চাইতে পার নি। আমার কাছে বলা—সে তো বহু দূরে। আমার কিন্তু তখন বড্ড কষ্ট হয়েছে। যখন নিতান্ত সইতে পারি নি তখন শুধু বলেছি, আমার কাছে ওষুধ আছে। তুমি নিশ্চয়ই আস্‌মান্‌-জমীন হাতড়েছ, কী ওষুধ? তুমি বিদেশী, তুমি কী করে জানবে যে, যত অসুবিধেই হোক আমি আমার দেশের, সমাজের সম্মতি নিয়েই বিয়ে করতে চাই। আমার জন্য অতখানি নয়, যতখানি তোমার জন্যে। তুমি কেন ডাকাতের বেশে আমাকে ছিনিয়ে নেবে? মায়-মুরুব্বী, ইয়ার-দোস্ত এবং আরও পাঁচজনের প্রসন্ন কল্যাণ আশীর্বাদের মাঝখানে, আমরা একে অন্যকে বরণ করব। গুল বুলবুল এক বাগিচাতেই থাকবে। চতুর্দিকে আরও ফুল আরও বুলবুল। আমি কোন্‌ দুঃখে আমার শাখা ছেড়ে তোমাকে ঠোঁটে করে নিয়ে মরুভূমির কিনারায় বসব?'

'সমাজ আপত্তি করলে?'

'থোড়াই পরোয়া করতুম। ধর্মমতে তুমি আমি, সমাজ কেন, বাপ-মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও বিয়ে করতে পারি। কিন্তু সমাজ কি শের না বাবুর, বাঘ না সিংহ, যে তাকে হামেহাল পিস্তল দেখাতে হবে? সমাজ তেজী ঘোড়া। দানা-পানি দেবে, তার পিঠে চড়বে। বেয়াড়ামি করলে পায়ের কাঁটা দিয়ে অল্প গুঁতো দেবে, আরও বেশি হলে চাবুক, আর একদম বিগড়ে গেলে পিস্তল। তারপর নূতন ঘোড়া কিনবে—নূতন সমাজ গড়বে।'

'আর এখন?'

'এখন তো সব-কিছু ফৈসালা হয়ে গেল। প্রথম বলি, কাবুলের সমাজ ঠিক আমাদের সমাজ নয়। আমাদের গুটিকয়েক পরিবার নিয়ে আমাদের সম্পূর্ণ সমাজ। সে সমাজ এখন আমাদের আশীর্বাদ করবে। জান, এদেশে এরকম বিশৃঙ্খলা প্রায়ই হয়। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে লড়াই, শহরে শহরে লড়াই, রাজায় রাজায় লড়াই। রাজায় ডাকুতে অবশ্য এই প্রথম। তখন ভিন্‌ মহল্লায় গিয়ে কখনও কখনও পনেরো দিন, এক মাস আটকা পড়ে যেতে হয়। সমাজ শুনে বলবে, '[illegible] ভাল। তারা শাস্ত্রানুযায়ী কাজ করেছে।' পরে যখন [illegible] শুনবেন, আগের থেকে মহব্বৎ ছিল, তখন তারা আরও

খুশী হয়ে দাড়ি দুলোতে দুলোতে বলবেন, 'বেহ্‌তর্‌ শুদ্‌, খয়্‌লী বেহ্‌তর্‌ শুদ্‌—আরও ভাল। লোকলজ্জার ভয়ে বিয়ে করার চেয়ে দিলের টানে বিয়ে করা অনেক ভাল—বহুৎ বেহ্‌তর্‌।

'তুমি কিন্তু ভেবো না, তোমার বাড়িতে পনেরো দিন থাকতে হবে বলে সেই অছিলা নিয়ে তোমাকে বিয়ে করেছি। তোমাকে বিয়ে করার জন্য আমি আমার হৃদয়ের হয়ে মনের কাছে প্রস্তাব পেশ করি হোটেলের বারান্দায়। মন বিচক্ষণ জন। সে সায় দিলে, অনেক ভেবে-চিন্তে—নদী তীরে।

'আর এখন? এখন যে ভূতের নৃত্য আরম্ভ হল তার শেষ কবে কোথায় কে জানে? তাই বিয়েটা চুকিয়ে রাখলুম। ফ্যাতাকঁপ্লি। আমার যা করার করা হয়ে গিয়েছে, এখন আর সবাই এর সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াক।'

দুঃখ করে ফের বললে, 'ওরা দেখছে আমাহুল্লার রাজমুকুট। ওদিকে তার যে শক্তিক্ষয় হয়ে যাচ্ছে সেটা কেউ লক্ষ্য করছে না। কবি সাঈব বড় বেদনাতেই বলেছিলেন:

"মোমবাতিটির আলোর মুকুট বাখানি কবি কী বলে!
কেউ দেখে না তো ওদিকে বেচারী পলে পলে যায় গলে।" '

তার পর শব্‌নমের মনে কী ভাবোদয় হল জানি নে। আমার কানের কাছে মুখ এনে সেটাতে দিল কামড়। বললে, 'ভেবো না, তোপল্‌খানের প্রার্থনা তোমার কান কামড়ানোর স্বর্গদ্বার আমার জন্য খুলে দিল। ও জানে না, তুমিও জান না, আমি তার অনেক পূর্বেই স্বর্গের ভিতরে বসে আছি। কিন্তু বন্ধু, আমার মনে সন্দেহ জাগছে, তুমি আমার কথায় কান দিচ্ছ না।'

আমি খোলাখুলি সব কিছু বলব বলে স্থির করেছি।

বললুম, 'দেখ শব্‌নম—'

'শব্‌নম শিউলি—না,—শিউলি শব্‌নম।'

আমি বললুম, 'শিশির-সিঞ্চিত শেফালি—শব্‌নমে ভেজা শিউলি। হিমিকা—'

'এটা কী শব্দ? আগে তো শুনি নি।'

'শব্‌নমের অতি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ। হিমালয় জান তো? তারই হিম। বাঙলায় শুধু হিমি।'

'আমার সব চেয়ে পছন্দ হয়েছে, "হিমিকা"।'

আমি বললুম,

"কানে কানে কহি তোরে
বধুরে যেদিন পাব, ডাকিব হিমিকা নাম ধরে।"

বললে, 'ভারি মধুর। আমার ইচ্ছা হয়, সমস্ত রাত এই রকম কবিতা শুনি। কিন্তু এখন বল, তুমি কী ভাবছিলে।'

'তোমার বাবা কি তোমার জন্য চিন্তিত হচ্ছেন না?' আমি ভয়ে ভয়ে কথাটা তুলেছিলুম। ও যদি কিছু মনে করে। আমার ভয় ভুল।

নিঃসঙ্কোচে বললে, 'আগে হলে বলতুম, তুমি তোমার বাড়ি থেকে আমাকে তাড়াচ্ছ। এখন এটা তো আমার বাড়ি। এটা আমার আশ্রয়। এক্ষুনি যে মুহম্মদী চার শর্তে আমাকে বিয়ে করলে তার এক শর্ত হচ্ছে স্ত্রীকে আশ্রয় দেওয়া।'

'আপন বাড়িতে আশ্রয় দেব তো বলি নি। সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়।'

চোখ পাকিয়ে বললে, 'এ কী হচ্ছে? চার শর্তের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাবার পূর্বেই তুমি শর্ত এড়াবার গলি খুঁজছ? তবে শোন, আমার আব্বাজান আমার জন্য এক দানা গম পর্যন্ত ভাববেন না। আমরা দু-দুটো লড়াই ফেসাদ্ দেখেছি। একবার তিনি আটকা পড়েন। আরেকবার আমি। তিনি বয়েৎ-বাজি (কবির লড়াই) করেছিলেন কোন এক আস্তাবলে আর আমি পাশবালিশ জাবড়ে ধরে ভঁস ভঁস করে ঘুমিয়েছিলুম এক বান্ধবীর বাড়িতে। আসলে তাঁর দুশ্চিন্তার অবধি থাকবে না, যখন শুনবেন, তোপল্ খান বাড়ি ফেরে নি। ষণ্ডা হলে কী হয়, মাথায় যা মগজ তা দিয়ে মাছ ধরার একটা টোপ পর্যন্ত হয় না। এই দেখলে না, আজ সন্ধ্যায় আরেকটু হলে আমাকে কী রকম ডুবিয়েছিল। তুমি বলছিলে, তোমার সর্বস্ব দেবে, স্ত্রীধন হিসেবে, আর ওই অগা তোপল্‌টা কনেপক্ষের সাক্ষী হয়ে "অঙ্ক" চেয়ে সেটা কমাতে যাচ্ছিল। আব্বা জানতে পেলে ওকে আইসক্রীমফালুদা করে ছাড়বেন।'

আমি শুধালুম, 'তিনি জানবেন নাকি?'

উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'নিশ্চয়ই জানবেন। আজ না হয় না-ই বা জানলেন।'

আমি শুধালুম, 'তখন?'

হেসে উঠে যা বললে সেটি রবীন্দ্রনাথ অতি সুন্দর ছন্দে গেঁথে দিয়ে গিয়েছেন:

"ওরে ভীরু, তোর উপরে নাই ভুবনের ভার।"

বললে, 'জানেমন্ জানে আমি প্রেমে পড়েছি। আর কিচ্ছু না। কিন্তু

আমার সম্পর্কে এক দিদিমণি আছেন। ক্রিশ্চিয়ানিটির মত পবিত্র পুণ্যবতী। তাঁকে সব খুলে বলে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি এক লহমা মাত্র চিন্তা না করেই বললেন, "যাকে তোর হৃদয় চায় তাকে বিয়ে করবার অধিকার তোকে আল্লা দিয়েছে। আর কারও হক নেই তোদের মাঝখানে দাঁড়াবার।" ব্যাস্। বুঝলে? আমার বাবা আমাকে ভালবাসেন।'

'সর্দার আওরঙ্গজেব খানকে আমি চটাতে পারি, দরকার হলে; কিন্তু আমার শ্বশুর মশাইয়ের বিরাগভাজন হতে চাই নে।'

খুশী হয়ে বললে, 'ঠিক তাই। আমিও তাই চাই বলে এত মারপ্যাঁচ। কিন্তু এ-বিষয়ে আজ এই শেষ কথা। গ্রামোফোনের এই শেষ রেকর্ড। বুঝলে?'

আর তার কী তুর্কী নাচ! কখনও ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে চোখ ঘুরিয়ে কংগ্রেসী লেকচার দেয়, কখনও ঝুপ করে কার্পেটের উপর বসে দু হাঁটু জড়িয়ে ধরে চিবুক হাঁটুর উপর রেখে, কখনও আর্ম-চেয়ারে বসে আমার কাছের চেয়ারটা টেনে এনে তার পা দুখানা লম্বা করে দিয়ে, কখনও আমার জানু জড়িয়ে ধরে আমার হাঁটুর উপর তার চিবুক রেখে, কখনও আমাকে দাঁড় করিয়ে নিজে সামনে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধের উপর দু হাত রেখে আর কখনও বা আমাকে সোফায় বসিয়ে একান্তে আমার পায়ের কাছে আসন নিয়ে।

আর ঘড়ি ঘড়ি আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, বল তো, তুমি আমাকে কতখানি ভালবাস? এক্ খরওয়ার? এক্-ও নীম্ খরওয়ার?—এক গাধা-বোঝাই, দেড় গাধা-বোঝাই? বহ্‌র-ই-হিন্দ্—ভারত সাগরের মত? খাইবার পাসের মত আঁকাবাঁকা না দারুল্-আমানের রাস্তার মত নাক-বরাবর সোজা? তোমার হিমিকার—ঠিক উচ্চারণ করেছি তো—গালের টোলের মত ভয়ঙ্কর গভীর, না হিন্দুকুশ্ পাহাড়ের মত উঁচু?'

কখনও উত্তরের জন্য অপেক্ষাই করে না, আর কখনও বা গ্যাঁট হয়ে বসে গালে হাত দিয়ে অতি ঠাণ্ডাভাবে উত্তরের প্রতীক্ষা করে—যেন আমার উত্তরের উপর তার জীবন-মরণ নির্ভর করছে।

আমি যদি একই প্রশ্ন শুধাই তবে ছোট্ট মেয়েটির মত চেঁচিয়ে বলে, 'না, না, আমি আগে শুধিয়েছি।'

আমি উত্তর দিতে গেলে স্কুল মাস্টারের মত উৎসাহ দিয়ে কথা যুগিয়ে দেয়, তুলনা সাপ্লাই করে, প্যাডিং ট্রিমিং যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে ওটাকে, পুজোর বাজারে প্রিয়জনের হাতে তুলে দেবার মত পোশাকী-দুরস্ত করে। আর

কখনও বা তীক্ষ্ণ নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে, ডান ভুরু ঠিক জায়গায় রেখে বাঁ ভুরুর বাঁ দিকটা ইঞ্চি খানেক উপরের দিকে তুলে আমাকে পইপই করে পাকা উকিলের মত ক্রস্ করে। 'হিমালয়ের মত উঁচু?—সে আমার দরকার নেই। আমার হিন্দুকুশ্ হলেই চলবে। তার হাইট্ কত? জান না? তবে বলছিলে কেন অতখানি উঁচু?'

একবার নিজে দেখালে, সে আমাকে ততখানি ভালবাসে।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে বাহু প্রসারিত করে পিছনের দিকে ঠেলতে ঠেলতে ব্যালে-নর্তকীর মত দু হাতে দু পিঠ প্রায় ছুঁইয়ে ফেলে বললে, 'অ্যাত্তো খানি। প্লাস—প্লাস—' বলতে বলতে আমার কাছে এসে, আমার চোখের সামনে তার কড়ে আঙুল তুলে ধরে বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে কড়ে আঙুলের ক্ষুদ্রতম কণায় ঠেকিয়ে বললে, 'প্লাস—অ্যাট্টুকুন্।' তার পর শুধালে, 'এর মানে বল তো?'

আমি বললুম, 'বলার একটা সুন্দর ধরন আর কী।'

'না। সবচেয়ে বেশি থেকে সবচেয়ে কম—দুয়ে মিলিয়ে, হল ইন্‌ফিনিটি।'

'ওই যুষা ভুলে গিয়েছিলুম—', বলে ছুটে জানলার ধারে গিয়ে বললে, 'ওই দেখ আদম-সুরৎ—পাগ্‌মানের আদম-সুরৎ, কালপুরুষ। আমাদের বিয়ের ভোজে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে—বেচারী!' আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি আমাদের প্রেমের সাক্ষী।'

আমি তাকে সপ্তর্ষির অরুন্ধতী বশিষ্ঠের গল্প বললুম। বৈদিক যুগে যে বর-কনেকে অরুন্ধতী দেখিয়ে ওঁরই মত তাকে পাশে পাশে থাকতে বলতে সেটাও বললুম।

শব্‌নম উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'কোথায়? কোথায় দেখিয়ে দাও তো আমায়।'

আকাশে তখনও সপ্তর্ষির উদয় হয় নি।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

॥ ৪ ॥

মাত্র একটি অঙ্গে আমাদের বিয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল।

শব্‌নম এই প্রথম খবর দিয়ে আসছিল বলে আব্দুর রহ্‌মান কাবুল বাজার ঝেঁটিয়ে খানা-পিনার সাজ-সরঞ্জাম কিনে রেখেছিল। রাত বারোটায় দস্তরখান

পাতা হল, পদের পর পদ আসতে লাগল। শব্‌নম ওদের নিমন্ত্রণ করল, আমাদের সঙ্গে বসে খেতে। সিন্ধুর ওপারে সেবকগণ প্রভু পরিবারের সঙ্গে বসে খেতে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত নয়। ওরা কিন্তু রাজি হল না। শোনাবার মতলবে ওদের ফিসফিস থেকে বোঝা গেল, ওরা বাজি ধরেছে, কে বেশী পোলাও খেতে পারে—প্রচুর সময় লাগার কথা।

শব্‌নম মাথা গুঁজে খেল। রুটি দিয়ে জড়িয়ে ধরে মাংস, তরকারি এমন কি ঝোল পর্যন্ত তুলে খেল, অথচ রুটি ছাড়া অন্য কোনও জিনিস হাতের সংস্পর্শে এল না, এ শুধু আমি দুজন লোককে করতে দেখেছি, শব্‌নম আর ভূপালের এক প্রধান মন্ত্রী। এদের খাওয়ার পর হাত ধোবার প্রয়োজন হয় না। রুটির যেটুকু ময়দার গুঁড়ো আঙুল ডগায় লেগেছে সেটুকু ন্যাপকিনে মুছে নিলেই হল। শব্‌নম আমাকে কিছু না বলে হাত ধুয়ে এসে আমার পাশে বসে বলল, 'তুমি কিছু মনে করো না; এসব ব্যাপারে আমার লজ্জা-বোধ একটু বেশী।'

বাইরে ভয়ঙ্কর শীত। চিমনিতে আবার কাঠ দেওয়া হল।

আগুনের সামনে আমরা দুজনা কার্পেটের উপর বসে আছি।

শব্‌নম প্যারিসের গল্প বলছে। মাঝে মাঝে আমার হাতখানা কোলে তুলে নিয়ে আদর করছে। একবার হৃদয় সম্বন্ধে কী একটা বলতে গিয়ে বললে, 'এই তো তোমার হার্ট—' বলে তার ডান হাত আমার বুকের উপর রাখতে গিয়ে তার হাত সেই ভিজিটিং-কার্ড কেসটায় ঠেকল। সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল।

আমি শুধালুম, 'কী হল?'

'তোমার ঘরে কাঁচি আছে?'

'বোস! শোবার ঘরে নিয়ে গিয়েছিলুম—এনে দিচ্ছি।'

বললে, 'বা রে। এখন আমি সর্বত্র যেতে পারি।' বলেই, পাখি যে রকম বসা অবস্থাতেই ওড়া আরম্ভ করতে পারে সেই রকম ফুড়ুত করে উড়ে গিয়ে কাঁচিখানি নিয়ে এল।

আমাকে মুখোমুখি বসিয়ে আমার হাতে কাঁচি দিয়ে বললে, 'আমার জুল্‌ফ্‌ কাটো।'

বাঙলা জুল্‌ফি কথাটা 'জুল্‌ফ্‌' থেকে এসেছে। ইরান তুরানের কুমারীদের অনেকেই দু গুচ্ছ অলক রগ থেকে কানের ডগা অবধি ঝুলিয়ে রাখে। শব্‌নমের চুল চেউ-খেলানো বলে তার জুল্‌ফ্‌ দুটির সৌন্দর্য ছিল অসাধারণ।

আমি ঠিক জানি নে, একদা বোধহয় ইরান তুরানের বর বাসর ঘরে নব-

বধূর জুল্‌ফ্‌ দুটি পুরোপুরিই কেটে দিত। এর পর যে-নূতন চুল গজাত নববধূর সে চুল কানের পিছনে অন্য চুলের সঙ্গে মিলিয়ে দিত। জুল্‌ফে হক কুমারীদের—ইরানে বলা হয় 'দুখ্‌তর্‌', সংস্কৃতে 'দুহিতৃ' স্পষ্ট বোঝা যায়, একই শব্দ। আজকাল এই জুল্‌ফ্‌ কাটার রেওয়াজ যে-সব জায়গায় আছে সেখানেও বোধ হয় জুল্‌ফের শুধু ডগাগুলোই কেটে দেওয়া হয়।

আমি বললুম, 'আমার হাত কেটে ফেললেও তোমার জুল্‌ফ্‌ কাটতে পারব না।'

অনুনয় করলে, 'তা হলে ডগাগুলো কেটে দাও।'

আমি বললুম, 'আমায় মাফ কর।'

'আমি চিরকালই কুমারী থাকব?'

'তুমি চিরকালই আমার সামনে পাগমানের সেই ডান্‌স্‌-হল থেকে নামছ, তুমি চিরকালই আমার প্রথম সন্ধ্যার হিমিকা। কিন্তু বল তো, তুমি এই জুল্‌ফ্‌ কাটা নিয়ে এত চাপ দিচ্ছ কেন?'

'তবে কাছে এস।'

আমি আমার দুই তর্জনী দিয়ে তার দুটি জুল্‌ফ্‌ আঙুল দিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে তার মুখ তুলে ধরে বললুম, 'বল।'

'দেখ, চারদিকে এই অশান্তি এই অনিশ্চয়তা, এর মাঝখানে তোমাকে নিঃশেষে পাবার জন্য আমার হৃদয় আমাকে ভরসা দিচ্ছে না।'

আমি বললুম, 'আমি তো চাই।'

আমার দু হাতে ধরা জুল্‌ফি-বন্ধনের মাঝখানে যতটা পারে মাথা দুলিয়ে বললে, 'না, না, না। তুমি আমাকে এত বেশি ভালবাস যে তোমার চাওয়া-না-চাওয়া সব লোপ পেয়েছে। আমার ভালবাসা তার কাছে দাঁড়াতেই পারে না।'

'এবারে ভাল করে শোন। বিয়ের আগে তোমার সঙ্গে আমি এমন কোনও আচরণ করি নি যার জন্যে আল্লার সামনে আমাকে লজ্জা পেতে হবে। কিন্তু তোমার অসাক্ষাতে, এখানে, কান্দাহারে, দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, দুপুর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে সন্ধ্যাপ্রদীপ না জেলে গৃহকোণে কতবার আমি তোমাকে আমার সর্বস্ব সমর্পণ করেছি, তুমি জান না। চতুর্দিকের বিশ্বসংসার তখন প্রতিবার লোপ পেয়ে গিয়েছে একেবারে নিঃশেষে। আমি যেন বেলা-ভূমিতে দাঁড়িয়ে, আর তুমি মহাসিন্ধু, দূর থেকে তরঙ্গে তরঙ্গে ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসছ। আমি দম নিয়ে নাকমুখ বন্ধ করার আগেই তুমি

আমাকে তরঙ্গের আলিঙ্গনে আমার সর্বসত্তা লোপ করে দিলে। আর, কখনও তুমি এসেছ ঝড়ের মত। আমার ওড়না তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, আমার জুল্‌ফ্‌-গুচ্ছের ভিতর ঢুকে গিয়ে তার প্রত্যেকটি চুল আলাদা আলাদা করে এদিকে ওদিকে উড়িয়ে দিয়ে, আমার চোখের প্রতিটি কাজলের গুঁড়ো কেড়ে নিয়ে, আর সর্বশেষে আমার প্রতিটি লোমকূপে শিহরণ জাগিয়ে আমাকে যেন তোমার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে কোথায় কোথায় উধাও হয়ে গেলে—কালপুরুষের পাশ দিয়ে কৃত্তিকা, সাত-ভাই-চম্পার ঝাঁকের মাঝখান দিয়ে।

'জ্ঞান ফিরতে দেখি, আমি মাথা ঝুঁকে বর্ডারের উপর বুল্‌বুলির চোখে তুলি লাগিয়ে বসে আছি।'

আমি চুপ করে শুনে গেলুম।

নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'তুমি পুরুষ, তুমি কী করে বুঝবে কুমারীর প্রেম। তুমি তো সমুদ্র তরঙ্গ, ঝড়ের ঘূর্ণি। আর আমার প্রেম?—স্বপ্নে স্বপ্ন বোনা শুক্তির মুক্তো। কত ছোট আর কত অজানার নিভৃত কোণে তার নীড়। কত আঁখি-পল্লব থেকে নিংড়ে নিংড়ে বের-করা এক ফোঁটা আঁখি-জল। আর তার প্রতিটি ক্ষুদ্রতম কণাতে আছে কুমারীর লজ্জা, ভয়, সংকোচ।'

চুপ করে গেল।

আমি কাঁচি হাতে নিয়ে জুল্‌ফ্‌ থেকে তিন গোছা চুল কেটে নিয়ে বললুম, 'এই মুক্ত করলুম আমি তোমার লজ্জা, সংকোচ, ভয়।'

আগুনের সামনে বসেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল বাইরে শীত কী রকম ঘনিয়ে আসছে। সে শীত যখন তার চরমে পৌঁছেছে তখনও শব্‌নম তার জুল্‌ফ্‌ কানের পিছনে ঠেলে দিতে দিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'এ কি নেমকহারামির চূড়ান্ত নয়—যে-বাড়িতে কুড়িটি বছর কাটিয়েছি সেটা আর নিজের আপন বাড়ি বলে মনে হচ্ছে না? আর এ বাড়ি? এ বাড়ি আসলে তোমার আপন বাড়িও নয়—এ বাড়িতে তো আমার শাশুড়ী-মা তোমাকে জন্ম দেন নি। তবু মনে হচ্ছে, এ বাড়িতেই যেন শিশুকাল থেকে আমরা খেলাধুলো ঝগড়াঝাঁটি মান-অভিমান করে করে আজ আমাদের চরম মিলনে পৌঁছুলুম।'

একটুখানি ভাবলে। তারপর মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'উহুঁ, এটাও যেন সম্পূর্ণ সত্য নয়। কেমন যেন মনে হচ্ছে, আমরা দুটি শিশু এ বাড়ির আঙিনাতে খেলা করছি, আর ও বাড়ির ছাদে বসে আব্বাজান, জানেমন্‌ একে অন্যের সঙ্গে গল্প করতে করতে আমাদের দিকে স্নেহ-দৃষ্টি রেখে সকল বিপদ আপদ ঠেকিয়ে

রাখছেন। খেলা ছেড়ে ছুটে গিয়ে একবার জানেমনের কোলে বসে জিরিয়ে আসি।'

আমার মোজাটা খুলতে খুলতে বলল, 'এই যে লাগল গোলমাল, এর শেষ কবে, আর কোথায়, কেউ বলতে পারে না। তোমাকে আবার কখন দেখতে পাব তাও জানি নে। তবে এখন আমার বুকভরা সান্ত্বনা। ওই বাচ্চা যদি কাল এসে যেত তা হলে আমাকে মহাবিপদে ফেলত। পাগলা-ভিড় ঠেলে এসে তোমাকে বিয়ে করতে হত। এখন আমি নিশ্চিন্ত মনে যাচ্ছি।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'এই শীতে? এত রাত্তিরে?'

'এই সময়টাই সব চেয়ে ভাল। ডাকুদের দামী দামী ওভারকোট নেই যে এই শীতে বেরুবে। কাল সকালে দেখবে কাবুলে মেলার ভিড়। চোর ডাকাত বেবাক মৌজুদ। প্রথম লুট আরম্ভ হলেই ওরা সব ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাচ্চা তো উপলক্ষ্য মাত্র। তুমি এ দেশের হালহকীকৎ জান অতি অল্প। আমাকে বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত হও।'

আমি সেদিন তাকে বিশ্বাস করেছি। আজও করি।

খুশী হয়ে বললে, 'এই তো চাই। আমি তোপল্‌ খানকে ডাকি। তুমি যাও, শুয়ে পড়। কতক্ষণ ধরে স্যুট পরে আছ।'

শীতের দেশ বলে আমি শিলওয়ার, চুড়িদার পাঞ্জাবি পরে শুই।

শোবার ঘরে ঢুকেই বলে, 'বাঃ! কী চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে! কিন্তু এ আবার কী রকমের কুর্তা? দু দিকে চেরা কেন? দেখি?' হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বললে, 'ও! পকেট! ভারী অরিজিনাল্‌ আইডিয়া তো! হাতে আবার পট্টি মেরে বোতাম! ও, বুঝেছি, খাবার সময় আস্তিন যাতে ঝোলে ডুবে না যায়। আমিও এরকম একটা করাব। সবাই বলবে, 'আমি কী অরিজিনাল্‌! এবারে তুমি শোও দিকি নি।'

তিন দিকে লেপ গুঁজতে গুঁজতে বললে, 'তুমি কণামাত্র দুশ্চিন্তা করো না: তোপল্‌ খান একটা সার্ভে করে এসেছে। আমার কথাই ঠিক। রাস্তায় কাক-কোকিল নেই। আচ্ছা, তুমি আমাকে স্বপ্নে দেখবে তো?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়ই।'

মাথা, জুল্‌ফ্‌, কানের দুল দোলাতে দোলাতে বললে, 'না, তা করতে পারবে না। আমার কড়া মানা। আমি খাটে শুয়ে ড্যাব ড্যাব করে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকব আর তুমি প্রেমসে তোমার স্বপন-চারিণীর সঙ্গে লীলা-খেলা করবে —সেটি হচ্ছে না। ও আমার সতীন—দজ্জাল বেটী ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।'

আমি বললুম, 'তুমিও আমাকে স্বপ্নে দেখলে পার।'

আশ্চর্য হয়ে বললে, 'বল কী তুমি? তুমি পুরুষমানুষ। চারটে প্রিয়েকে বিয়ে করতে পার, স্বপ্নে জাগরণে যে রকম খুশি ভাগাভাগি করতে পার। কিন্তু আমি মেয়েছেলে। আমার কেবল তুমি।'

আমি বললুম :

'স্বপন হইতে শতশত গুণে
প্রিয়তর বলে গুণি!'

অর্থ আর সুর দুইই তার মন পেল।

বললে, 'কান্দাহারে তোমাকে প্রতি রাত্রে স্বপ্নে আহ্বান জানাতুম। তখন তোমাকে বিয়ে করি নি, তাই। আচ্ছা, এবারে তুমি চুপ কর, আর চোখ বন্ধ কর।'

উঠে গিয়ে আলো নেবাল। ড্রইংরুম থেকে এ ঘরে সামান্য আলো আসে।

আমার ছোট্ট চারপাঈটির কাঠের বাজুতে হাল্কাভাবে বসে সেই আধো-আলো-অন্ধকারে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল—আমি বন্ধ চোখে সেটা চোখের তারাতে দেখতে পেলুম।

এবারে তার নিশ্বাস আমার ঠোঁটে এসে লাগছে।

ভীরু পাখির মত একবার তার ঠোঁট আমার ঠোঁট স্পর্শ করল—দুবার—শেষবারে একটু অতি ক্ষীণ চাপ।

এ অভিজ্ঞতা আমার জীবনে প্রথম নয়।

কৈশোরে যখন ওষ্ঠাধরের গোপন রহস্য আধা আধা কল্পনায় বুঝতে শিখছি তখন আমি আকাশের তারার সঙ্গে মিতালী পাতাবার জন্য রাত্রিযাপন করতুম খোলা বারান্দায়। শরতের ভোরবেলা দেখতুম পাশের শিউলি গাছের বিরহবেদনা—ফোঁটা ফোঁটা চোখের জলের শিউলি আমার চতুর্দিকে ছড়ানো।

এক ভোরে অনুভব করলুম ঠোঁটের উপর তারই একটি।

এ সেই হিমিকা-মাখা, শব্‌নম-ভেজা শিউলি!

॥ ৫ ॥

শব্‌নমের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফললো। পরদিন সকাল থেকেই কাবুল শহরের আশপাশের চোর ডাকু এসে 'রাজধানী' ভর্তি করে দিলে। দাঙ্গী খুনীরাও নাকি

গা-ঢাকা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে ; কারণ পুলিস হাওয়া, সাম্রী গায়েব।

এতে করে আর পাঁচজন কাবুলী যতখানি ভয় পেয়েছে, আমিও পেয়েছি ততটুকু। আসলে আমার বেদনা অন্যখানে। দেউড়িতে দাঁড়িয়ে দেখি, রাস্তা থেকে মেয়েরা সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গিয়েছে। বে-বোরকার তো কথাই হচ্ছে না, ফ্যাশনেব্‌ল্ বোরকাও দূরে থাক, দাদী-মা নানী-মার তাম্বুপানা বেঢপ বোরকার ছায়া পর্যন্ত রাস্তায় নেই।

শব্‌নম আসবে কি করে ?

দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই মারাত্মক শীতে দেউড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখ ফাটিয়ে ফেলেছি—কখন প্রথম বোরকা বেরুবে, কখন প্রথম বোরকা দেখতে পাব ? ব্যর্থ, ব্যর্থ, আর একটা দিন ব্যর্থ !

'জাগিনু যখন ঊষা হাসে নাই,
শুধানু "সে আসিবে কি ?"
চলে যায় সাঁঝ, আর আশা নাই,
সে ত' আসিল না, হায়, সখি !
নিশীথ রাতে ক্ষুব্ধ হৃদয়ে,
জাগিয়া লুটাই বিছানায় ;
আপন রচন ব্যর্থ স্বপন
দুখ ভারে নুয়ে ডুবে যায়।'

—(সত্যেন দত্তের অনুবাদ)

জর্মন কবি হাইনে আসলে ইহুদী—অর্থাৎ প্রাচ্য দেশীয়। অসহায় বিরহ বেদনার কাতরতা ইয়োরোপীয়রা বোঝে না। তাদের কাব্য সঞ্চয়নে এ-কবিতা ঠাঁই পায় না। অথচ এই কবিতাটিই ত্রিপদীতে গেঁথে দিলে কোন্ গোঁসাই বলতে পারবেন, এটি পদাবলী কীর্তন নয় ? এ তো সেই কথাই বলেছে—'মরমে ঝুরিয়া মরি।'

এক মাস হতে চলল। তোপল্ খানই বা কোথায় ?

আবার দাঁড়িয়েছি দেউড়িতে দুপুরবেলা।

ওই দূরের দক্ষিণ মহল্লার সদর দেউড়ি থেকে বেরল এই প্রথম বোরকা ! ধোপানীর কালো-বোরকা-সাদা-হয়ে-যাওয়া পুরনো ছাতা রঙের। আমার ধোপানীও এই রকম বোরকা পরে আসে। দুঃখিনী বেরিয়েছে পেটের ধান্দায়। কতদিন আর বাড়ি বসে বসে কাটাবে ? বেচারী আবার অল্প অল্প খুঁড়িয়ে

খুঁড়িয়ে হাঁটছে। আমার দেউড়ি পেরিয়ে উত্তর দিকে কাবুল নদীর পানে চলে গেল। শব্‌নমদের বাড়ি দক্ষিণ মহল্লারও দক্ষিণে। আমি আবার সেদিকে মুখ ফেরালুম। এবারে মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হয়েছে। প্রথম বোরকা তো বেরিয়েছে।

দু মিনিট হয় কি না হয়, এমন সময় কানের কাছে গলা শুনতে পেলুম, 'মিনিট দশেক এখানে দাঁড়িয়ে থেকে উপরে এস।'

আমার সর্বাঙ্গে শিহরণ। আমি আর দাঁড়াতে পারছি নে। আমার দাঁড়ানো যে শেষ হয়ে গিয়েছে।

ঘরে ঢুকে দেখি শব্‌নম কোথাও নেই। কম্পিত কণ্ঠে ডাকলুম, 'শব্‌নম! হিমিকা!' উত্তর নেই। আবার ডাকলুম, 'হিমি!'

চারপাঈর তলা থেকে উত্তর এল, 'কু।'

আমি এক লম্ফে কাছে গিয়ে লেপ বালিশসুদ্ধ খাট কাত করে দিয়ে দেখি, শব্‌নম খাটের তলায় কার্পেটের উপর দিব্য শুয়ে আছে। আমার চুড়িদার পাঞ্জাবিটি পরে। একটু ঢিলে-ঢালা হয়েছে বটে কিন্তু একটা জায়গায় ফিট হয়েছে চমৎকার—যেন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা কারিগর বিশ্বকর্মাকে দিয়ে সৃষ্টির সময়ই ফিট করিয়ে দিয়েছিলেন।

আশ্চর্য এই বিরহ বেদনার অন্ধকার। মিলনের প্রথম মুহূর্তেই সর্ব দুঃখ দূর হয়ে যায়—সে বিরহ এক দিনের হোক্ আর এক মাসেরই হোক্। অন্ধকার ঘরে আলো জ্বাললে যে রকম সে আলো তন্মুহূর্তেই অন্ধকারকে তাড়িয়ে দেয়—সে অন্ধকার এক মুহূর্তেরই হোক্ আর ফারাওয়ের কবরের পাঁচ হাজার বছরের পুরনো জমানো অন্ধকারই হোক্।

অভিমানের সুরে বললে, 'দশ মিনিট, আর এলে দশ ঘণ্টা পরে।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'সে কি? আমি তো ঘড়ি ধরে আট মিনিট পরে এসেছি।'

বললে, 'তোমার ঘড়ি পুরনো। কাবুল মিউজিয়ামের গান্ধার সেক্‌শন থেকে কিনেছ বুঝি?'

আমি বললুম, 'পুরনো ঘড়ি হলেই বুঝি খারাপ টাইম দেয়?'

আশ্চর্য হয়ে বললে, 'দেবে না? পুরনো খবরের কাগজ আজকের খবর দেয় নাকি?' খবরের কাগজের আসল নাম ক্রনিক্‌ল্, আর ঘড়ির আসল নাম ক্রনোমিটার। দুটোই ক্রনস্, সময়ের খবর দেয়। এতটুকু শব্দতত্ত্ব জানো না—প্যারিসের ক্লাস সিক্‌সে যা শেখানো হয়?'

আমি বললুম, 'তুমি বুঝি রোজ সকালে খবরের কাগজের সঙ্গে একটা নূতন ঘড়িও কেনো ?'

'তা কেন ? আমার ঘড়ি তো এইখানে।' বলে নিজের বুকে হাত দিলে। 'প্রথম দিনের ঘড়ি, নিত্য নবীন হয়ে চলেছে। দেখি, তোমার ঘড়িটা কি রকমের।' আমার বুকে কান পেতে বললে, 'জান, কি বলছে ?'

আমি বললুম, 'এক জাপানী শ্রমণ জীবনের দ্বন্দ্ব-ধ্বনি শুনতে পেয়ে বলেছেন, 'ভুল্'-'ঠিক', 'ভুল্'-'ঠিক্', 'ভুল্'-'ঠিক' ?'

'বাজে। বলছে, 'শব্'-'নম্', 'শব্'-'নম্', 'শব্'-'নম্' ! এইবারে আমারটা শোন।'

আমি তার এত কাছে আর কখনও আসি নি। আমার বুক তখন ধপধপ করছে।

'বুঝতে পেরেছ নাকি ?' নিজেই কথা যুগিয়ে দিচ্ছে। 'বুল্'-'বুল্', 'বুল্',-'বুল্', 'বুল্'-'বুল্' বলছে—না ?'

আমি অতি কষ্টে বললুম, 'হ্যাঁ।'

বললে, 'কলটা কিন্তু খুব ভাল না। মা মরেছে ওতে, নানী-মাও। কিন্তু ওকথা কক্ষনো তুলো না।'

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে ঘরের মাঝখানে দাঁড়ালে।

ডান পা একটু এগিয়ে দিয়ে, বাঁ হাতের মণিবন্ধ কোমরের উপর রেখে, ডান হাত আকাশের দিকে তুলে, অপেরার 'প্রিমা দন্না' ভঙ্গীতে মুচকি হেসে বললে, 'মেদাম্ এ মেসিয়ো! এই মুহূর্তে কাবুলের রাজা হতে চায় দুজন লোক। আমানুল্লা খান আর বাচ্চা-ই-সকাও। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি দুজনাতে মিলে আপোসে মিটমাট করে আমাকে বলে, "কাবুল শহর তোমাকে দিলুম"—তা হলে আমি কি করি ?' নাটকীয় ভঙ্গীতে আবার মৃদু হাস্য করলে। কী সুন্দর সে হাসি। গালের টোল দুটি আমার গাঁয়ের ছোট্ট মহুয়া-গাঙের ক্ষুদে ক্ষুদে দ'য়ের মত পাক খেতে লাগল, অথবা কি বলব, নজ্‌দের মরুভূমিতে মজনুঁর দীর্ঘনিশ্বাস-ঘূর্ণিচক্রের ছোট ছোট 'বগোলে' ?

আমি চারআনী টিকিট-দারের মত চেঁচিয়ে বললুম, 'সি'ল্ ভু প্লে, সি'ল্ ভু প্লে—মেহেরবানী করুন, মেহেরবানী করুন, বলুন, কি করবেন।'

একেবারে হুবহু 'প্রিমা দন্নার' ভঙ্গীতে গান গেয়ে উঠল,

Si le roi m'avait donne
Paris, sa grand 'ville,

Et qu'il me fallut quitter
L'amour de ma mie,
Je dirais au roi Henri
'Reprenez votre Paris.
J'aime mieux ma mie, o gai!
J'aime mieux ma mie!'

'এবারে তার ফার্সীটা শুনুন, মেদাম্ এ মেসিয়ো!

'গর ব্-এক্ মোই, তুর্ক-ই-শীরাজী,
ব্দহদ্ পাদ্শাহ্ ব্-মন্ শীরাজ্,
গোইম্ 'আয় পাদ্শাহ্ গরাচ বোওাদ্
শহ্র্-ই-শীরাজ শহ্র্-ই-বিআনবার,
তুর্ক্-ই-শীরাজী কাফী অস্ত্ মরা—
শহ্র্ ই-শীরাজ খইশ বসতান বাজ্।'

'রাজা যদি, দেয় মোরে ওই, আজব শহর পারি (Paris)
কিন্তু যদি, শর্ত করে, ছাড়তে তোমায়, প্যারী,
বলবো, 'ওগো, রাজা আঁরি (Henri),
এই ফিরে নাও তোমার পারি (Paris)
প্যারীর প্রেম যে অনেক ভারি,
তারে আমি ছাড়তে নারি!
ওগো, আমার প্যারী।'

ফার্সী অনুবাদটা গাইলে একদম 'ফতুজান' স্টাইলের কাবুলী লোকসঙ্গীতে।

প্যারিসে চারআনী টিকিটের জায়গা হলের সক্কলের পিছনে, উপরে, প্রায় ছাত ছুঁয়ে। তাই সেটাকে বলা হয় 'পারাদি'—প্যারাডাইস্—স্বর্গপুরী। খাঁটি জউরী, আসল সমাজদার, খানদানী কদরদানরা বসেন সেখানে। ঘন ঘন সাধুরব, বিকল্পে পচা ডিম হাজা টমাটো, শিটিফিটির খয়রাতি হাসপাতাল ওই স্বর্গপুরীতেই। স্টেজের ফাড়া-গর্দিশে বুদ্ধি বাতলে দেন ওনারই। ভিরমি-খাওয়া ধুম্সী নায়িকাকে কাঁধে করে বয়ে নিতে গিয়ে যদি টিঙটিঙে নায়ক হিমশিম খায় তবে এই সব দরদী জউরীরাই চিৎকার করে দাওয়াই বাতলান—'দুই কিস্তিতে নিয়ে যা—ফ্যাৎ দ্য ভাইয়াজ—মেক্ টু ট্রিপ্স্!'

আমি এদের অনুকরণে একাই এক শ হয়ে বিস্তর 'সাধু! সাধু, ব্রাভো,

ব্রাভো' বললুম।

সদয় হাসি হেসে খাজেস্তেবানু শব্‌নম বীবী ডাইনে বাঁয়ে সামনের দিকে বাও করে শোকরিয়া জানালেন, চম্পক করাঙ্গুলির প্রান্তদেশে মৃদুচুম্বন খেয়ে আঙুলটি উপরের দিকে তুলে ফুঁ দিয়ে চুম্বনটি 'পারাদি'—স্বর্গপুরীর—দিকে উড্ডীয়মান করে দিলেন।

আমি স্টেজের দিকে ডাঁই ডাঁই রজনীগন্ধার গুচ্ছ ছুঁড়ে পেলা দেবার মুদ্রা মারলুম।

দেবী প্রসন্নবয়ানে 'স্টেজ' থেকে অবতীর্ণা হয়ে সর্বজন সমক্ষে আমার বিরহ-তপ্ত আপাণ্ডুর ক্লান্ত ভালে তাঁর ঈষতার্দ্র মল্লিকাধর স্পর্শ করে নিশ্বাসসৌরভঘন অগুরু-কস্তুরী-চন্দন-মিশ্রিত ভ্রমর-গুঞ্জরিত প্রজাপতি-প্রকম্পিত চুম্বন প্রসাদ সিঞ্চন করলেন।

প্রসন্নোদয়, প্রসন্নোদয় আমার অদ্য উষার সবিতৃ উদয় প্রসন্নোদয়!

আমার জন্মজন্ম সঞ্চিত পুণ্য কর্মফল আজ উপারূঢ়!

আমি তার পদচুম্বন করতে যাচ্ছিলুম। 'কর কি?' 'কর কি?' বলে ব্যাকুল হয়ে সে আমায় ঠেকিয়ে দিয়ে দুখানি আপন গোলাপ-পাপড়ি এগিয়ে দিলে!

•

আশ্চর্য এ মেয়ে! দেখি, আর বিস্ময় মানি। ভয়ে আতঙ্কে তামাম কাবুল শহরের গা দিয়ে ঘাম বেরুচ্ছে—এই পাথর-ফাটা শীতে শহরের রাস্তার মুখ পর্যন্ত পরিশুষ্ক হয়ে গিয়েছে, আর এ মেয়ে তারই মাঝখানে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়ে কলকল খলখল করে হাসছে। প্রেমসাগরের কতখানি অতলে ডুব দিলে উপরের ঝড়ঝঞ্ঝা সম্বন্ধে এ রকম সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত উদাসীন হওয়া যায়?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার সব-কিছুর খবর রাখে।

বললে, 'এই যে ফ্রান্সের গাঁইয়া গান, এটার মর্মও আমাদুল্লা বুঝলেন না।

'বিদ্রোহীরা বলছে, তোমার বউ সুরাইয়া বিদেশে গিয়ে স্বৈরিণী হয়ে গিয়েছে—দ্বিচারিণী নয়, স্বৈরিণী। একে তুমি তালাক দাও, আমরা বিদ্রোহ বন্ধ করে দেব।

আমাদুল্লা নারাজ।'

আমি বললুম, 'তোমাদের কবিই তো বলেছেন,

কি বলিব, ভাই মূর্খের কিছু অভাব কি দুনিয়ায়,
পাগড়ি বাঁচাতে হরবকতই মাথাটারে বলি ছায়।'

মাথা নেড়ে বললে, 'না। এখানে পাগড়ি অর্থ প্রিয়া, মাথাটা কাবুল শহর।

'আমি বলি, "দিয়ে দে না, বাপু, কাবুল শহর, চলে যা না, বাপু, প্রিয়াকে নিয়ে প্যারিস্—যে প্যারিসের ঢঙে কাবুলের চেহারা বদলাতে গিয়ে আজ তুই এ-বিপদে পড়েছিস। নকল প্যারিস নিয়ে তোর কি হবে, আসল যখন হাতের কাছে? একটা কপিরই যখন দরকার তখন আসলটা নিয়ে কার্বন্-কপিটা ফেলে দে না। কাশ্মীরী-শালের উপরের দিকটাই গায়ে জড়িয়ে নে, উল্টো দিকটা দেখিয়ে তোর কি লাভ?" আশ্চর্য! তাঁর এখন ডান হাতে তলোয়ার, বাঁয়া বগলমে প্রিয়া—ডাকু পাকড়াবেন কৈসে?'

মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'আমার বয়ে গেছে।

কাজী নই আমি, মোল্লাও নই, আমার কি দায় বল!
শীরাজী খাইব, প্রিয়ার চুমিব ওই মুখ ঢলঢল।'

এর প্রথম ছত্র হাফিজের, দ্বিতীয়টি আমার।

আমি বললুম, 'শাবাশ! লাল শীরাজী খেতে হলে তোমার ওই গোলাপী ঠোঁটেই মানাবে ভালো। আমার কিন্তু দুটো মিলিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।'

'কি রকম?'

'তুমি পাশ ফিরে শুয়ে মৃদু হাস্য করবে। তখন তোমার গালের টোল হবে গভীরতম—আমি সেটিকে ভর্তি করব শীরাজী দিয়ে। তারপর আস্তে আস্তে—অতি ধীরে ধীরে সেই শীরাজী চুমোয় চুমোয় তুলে নেব।'

বললে, 'বাপ্‌স্! কী লয়ে কল্পনা, লম্বা রসনা, করিছে দৌড়াদৌড়ি। তা কল্পনা কর, কিন্তু ব্যস্ত হয়ো না। খৃষ্টানদের বঁ দিয়ো—ভগবান—তো এক মুহূর্তেই সৃষ্টি সম্পূর্ণ করে দিতে পারতেন; তবে তিনি ছ-দিন লাগালেন কেন?'

আমি বললুম, 'এবারে তুমি আমার কথার উত্তর দাও!'

সুশীলা বালিকার মত মাথা নীচু করে বললে, 'বল।'

'আব্বাজান কোথায়?'

'দুর্গে। আমানুল্লাকে মন্ত্রণা দিচ্ছেন। ট্যুব থেকে বেরিয়ে আসা ফালতো টুথপেস্ট ফের ভিতরে ঢোকাবার চেষ্টা করছেন।'

'তোপল্ খান?'

'লড়াইয়ে।'

'তুমি কি করে এলে?'

'রেওয়াজ করে করে। ধোপানীর তাম্বুটা যোগাড় করে প্রথম প্রথম কাছে-পিঠে বান্ধবীদের বাড়িতে ওদের তত্ত্ব-তাবাশ করতে গেলুম।'

একটু থেমে বললে, 'আচ্ছা বল তো, তোমাকে ভালোবাসার পর থেকে আমি ওদের কথা একদম ভুলে গিয়েছি। আমার যে সব সখীদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে তারাও আমাকে স্মরণ করে না। অথচ শুনেছি, পুরুষ-মানুষরা নাকি বিয়ের পর সখাদের অত সহজে ভোলে না? মেয়েরা তা হলে বেইমান নেমকহারাম?'

আমি বললুম, 'গুণীরা বলেন, প্রেম মেয়েদের সর্বস্ব, পুরুষের জীবনের মাত্র একটি অংশ। তাই বোধ হয় মেয়েরা ওই রকম করে। কিন্তু আমার মনে হয়, তা নয়। আমি বিদেশী, আমি অসহায়, আমি নিজের থেকে কোন কিছু করতে গেলেই হয়তো তোমাকে বিপদে ফেলা হবে মাত্র, এই ভেদে আমি হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় কিস্মতের কিল খাচ্ছি। তুমি সেটা জান বলে, সর্বক্ষণ তোমার চিন্তা, কি করে আমার সমস্ত দুশ্চিন্তা, আমার বিরহ-বেদনা তোমাকে কাছে পাওয়ার কামনা আপন কাঁধে নিয়ে আমাকে আর্ত শিশুর মত আদর করে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পার। তোমার সখীরা, আব্বা, জানেমন কেউই তো তোমার উপর কোন কিছুর জন্য এতটুকু নির্ভর করছেন না। আর আমি করছি সম্পূর্ণ নির্ভর তোমার উপর। তোমার জিম্মাদারী এখন বেড়ে গিয়েছে। জিম্মাদারী-বোধ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একাগ্রতা-বোধও বেড়ে যায়।'

বললে, 'সে না হয় তোমার আমার বেলা হয়—তুমি বিদেশী বলে।'

'অন্যদের বেলাও তাই। অধিকাংশ দেশেই মেয়ের জন্ম তো পরিবারের আপদ। সেই 'আপদ' যেদিন একটি লোককে পায়, যাকে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক বাকী জীবন তার উপর নির্ভর করতে হবে, তখন তার অবস্থা তোমারই মত হয়। কিন্তু আরেকটা কথা। এই একাগ্রতাটা মেয়েদের কিছু একচেটে নয়। লায়লীর জন্য মজনুঁর একাগ্রতাই তো তাকে পাগল বানিয়ে দিলে?'

শুধালে, 'কোন্ মজনুঁ?'

আমি বললুম, 'তার পর তুমি কি করলে বলছিলে?'

'ওঃ! পাড়ার সখীদের বাড়ি গিয়ে প্র্যাকটিস্ করলুম।'

আমি বললুম, 'শ্রীরাধা যে রকম আঙিনায় কলসী কলসী জল ঢেলে সেটাকে পিছল করে তুলে, বর্ষার রাতে পিছল অভিসার যাওয়ার প্র্যাকটিস করে নিতেন?'

ইরান তুরান আরবভূমির তাবৎ প্রেমের কাহিনী শব্‌নমের হৃদয়স্থ। তাই আমি তাকে শোনাতুম হিন্দুস্থানী রমণীর বেদনাবাণী। সে সব কাহিনীর রাজ-মুকুট সুচির অভাগিনী অভিমানিনী শ্রীরাধার চোখের জলের মুক্তো দিয়ে সাজাতে আমার বড় ভালো লাগে। কিন্তু একাধিকবার লক্ষ করেছি শব্‌নম যেন

শ্রীরাধাকে ঈষৎ ঈর্ষা করে।

বললে, 'হুঁ! তোমার শুধু শ্রীরাধা শ্রীরাধা! তা সে যাক্‌গে। তার পর ধোপানীর তাম্বু পরে বেরিয়ে পড়লুম তোমার উদ্দেশে। আমার ভাবনা ছিল শুধু আমার পা দুখানা নিয়ে। ও দুটো বোরকা দিয়ে সব সময় ভালো করে ঢাকা যায় না।'

আমি বললুম, 'রজকিনী চরণ বাংলা সাহিত্যের বুকের উপর।'

'মানে?'

আমি চোখ বন্ধ করে হিমির পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে মুদ্রিত নয়নে গান ধরলুম,

'শুন রজকিনী রামী
শীতল জানিয়া ও-দুটি চরণ
শরণ লইনু আমি!'

বললে, 'এ সুরটা সত্যি আমার প্রিয়। এর ভিতর কত মধুর আকুতি আর করুণ আত্মনিবেদন আছে।'

আমি বললুম, 'আচ্ছা, "শীতল চরণ" কেন বললে, বল তো?'

নাক তুলে বললে, 'বাঃ! সে তো সোজা। ধোপানী জলে দাঁড়িয়ে কাপড় আছড়ায় তাই।'

জাহাঁবাজ মেয়ে!

বললে, 'জান বঁধু, আজ ভোরবেলার আজান শুনে যখন আমার ঘুম ভাঙল তখন বুকের ভিতরটা যেন একেবারে ঝাঁঝরা ফাঁকা বলে মনে হল। কিছু নেই, কিছু নেই, যেন কিছু নেই। পেটটাও যেন একেবারে ফাঁপা, যেন দাঁড়াতে পারব না। বুকের ভিতর কি যেন একটা শূন্যতা শুধু ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্ছে। সব যেন নিঙড়ে নিঙড়ে নিচ্ছে। ওঠবার চেষ্টা করলুম, উঠতে পারলুম না। কোমরের সঙ্গে আমার বাকি শরীরের যেন কোন যোগ নেই।

'মোয়াজ্জিন তখন বলছে, "অস্‌-সালাতু খৈরুন্‌ মিন্‌ অন্‌-নওম্‌—" নিদ্রার চেয়ে উপাসনা ভালো।

'আমি কাতর নিবেদনে আল্লাকে বললুম, হে খুদাতালা, তোমার দুনিয়ায় তো কোনও কিছুরই অভাব নেই। আমাকে একটুখানি শক্তি দাও।'

আমি অনুনয় করে বললুম, 'থাক্‌ না।'

বললে, 'কাকে তা হলে বলি, বল। জানি, তুমি এ-সব শুনে কষ্ট পাও। কিন্তু তোমাকে কষ্ট দেবার জন্ত তো আমি আমার দুঃখের কথা বলছি নে।

আবার না বলেও থাকতে পারছি নে। এ কী দ্বন্দ্ব, বল তো ?'

আমি বললুম, 'তুমি বলে যাও। আমার শুনতেও ভাল লাগে যে সর্বক্ষণ আমি তোমার মনের ভিতর আছি। এও তো দ্বন্দ্ব।'

'তবে শোন, আর শুনেই ভুলে যেয়ো। না হলে আমার বিরহে তোমার বেদনার ভার সেই স্মৃতি আরও ভারী করে তুলবে। নিজে কষ্ট তো পাবেই, তার উপর আমার কষ্টের স্মরণে বেদনা পাবে বেশী।'

'এই যে ফাঁকা ভাব ভোরবেলাকার, এইটে বওয়াই সব চেয়ে বেশী শক্ত।'

'কে বল সহজ, ফাঁকা যাহা তারে, কাঁধেতে বহিতে সওয়া ?
জীবন যতই ফাঁকা হয়ে যায় ততই কঠিন বওয়া।'

'ফাঁকা জিনিস ভারি হয়ে যায়, এর কল্পনা কি আমি কখনও করতে পেরেছি ?

'কোন গতিকে এই দেহটাকে টেনে টেনে বাইরে এনে নমাজ পড়লুম। হায় রে নমাজ! চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেওয়াকে যদি নমাজ বলে তবে আমার মত নমাজ কেউ কখনও পড়ে নি।'

আমি অতি কষ্টে চোখের জল থামিয়ে বলেছিলুম, 'সেই তো সব চেয়ে পাক্ নমাজ।'

যেন শুনতে পায় নি। বললে, 'ইহ্‌দিনাস্ সীরাতা-ল্ মুস্তকীমে' এলুম—"আমাকে সরল পথে চালাও"—তখন মন সেই সোজা পথ ছেড়ে চলে গেল নূতন অজানা দুর্ভাবনায়। তবে কি আমি ভুল পথে চলেছি বলে তাতে এত কাঁটা, বিভীষিকার বিকৃত ভান ?'

আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'বল তো গো তুমি, তোমাকে বিয়ে করার আগে যে আমি তোমার গা দু'তিনবার ছুঁয়েছি, তোমাকে হৃদয়-বেদনা বলেছি, তোমাকে স্বপ্নে কল্পনায় জড়িয়ে হৃদয়ে টেনে নিয়েছি, সেই কি আমার পাপ ? আমি তো অন্য কোন পাপ করি নি।' এবারে উত্তরের জন্য চুপ করে গেল।

আমি বললুম, 'হিমি—'

'আঃ'! বলে গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে আমার কোলে মাথা গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর বাঁ হাত দিয়ে তার মাথার চেয়ে বড় খোঁপাটা আস্তে আস্তে আলগা করে দিল। সমস্ত পিঠ ছেয়ে ফেলে তার চুল লম্বা কুর্তার অঞ্চল-প্রান্ত অবধি পৌঁছল। আমি আঙুল দিয়ে তার গ্রীবা ছুঁয়ে ছুঁয়ে উপরের দিকে তুলে বিলি দিতে দিতে অলকস্তবক অতৃপ্ত নিশ্বাসে শুধে বললুম, 'হিমিকা, আমি তো বেশী ধর্মগ্রন্থ পড়ি নি, আমি কি বলব ?'

বললে, 'না, গো, না। আমি মোল্লার ফৎওয়া চাইছি নে। তোমার কথা বল।'

'আমিও শুধাই, সবই শাস্ত্র, হৃদয় বলে কিছু নেই?'

স্পষ্ট অনুভব করলুম, তার চোখের জলে আমার কোল ভিজে গেছে।

বললুম, 'কেঁদো না, লক্ষ্মীটি।'

বললে, 'তুমি মেহেরবানী করে আজকের মত শুধু আমাকে কাঁদতে দাও। আজ আমার শেষ সম্বল উজাড় করে দিয়ে আর কখনও কাঁদবো না।'

উঠে বসল। চোখ তখন ভেজা। শব্‌নমের আঁখিপল্লব বড় বেশী লম্বা। জোড়া লাগার পর উপরের সারি উপরের দিকে আর নিচের সারি নিচের দিকে অনেকখানি চলে গিয়েছে।

'জান তুমি, যখন সব সান্ত্বনার পথ বন্ধ হয়ে যায় তখন হৃদয় হঠাৎ এক আনন্দলোকের সন্ধান পায়? আছে তোমার অভিজ্ঞতা? আমার আজ ভোরে হল?

'আমি নিজেকে বললুম, আমি যাচ্ছি আমার দয়িতের মিলনে, আমার স্বামী সঙ্গমে। আল্লা আমাকে এ হক্ক দিয়েছেন। আমাদের মাঝখানে কেউ যদি এসে দাঁড়ায় তবে সে শয়তান। আমি তাকে গুলি করে মারবো—পাগলা কুকুরকে মানুষ যে রকম মারে, সাপের ফণা যে রকম রাইডিং বুট দিয়ে থেঁতলে দেয়।

'এই দেখ।'

পাশের স্তূপীকৃত বোরকার ভিতর থেকে বের করল এক বিরাট রিভলবার। তার হ্যাণ্ড-ব্যাগের সেই ছোট্ট পিস্তলের তুলনায় এটা ভয়াবহ দানব।

আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে মুখ ফেরালুম। চোখ দুটো দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। কাঠের মত শুকনো প্রত্যেক চোখের প্রত্যেক পল্লব—আলগা আলগা হয়ে দাঁড়িয়ে।

'প্রত্যেক শয়তানকে মারবো গুলি করে। অগুণতি, বেহিসাব—দরকার হলে। বোরকার ভিতরে রিভলবার উঁচু করে তাগের জন্য তৈরী ছিলুম সমস্ত সময়। কেউ সামনে দাঁড়ালেই গুলি। প্রশ্নটি শুধাবো না। বোরকার ভিতর থেকেই।

'তাদের মরা লাশের উপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে আসতুম, তোমার কাছে।

'কী? আমার ছেলে হবে শুধু শান্তির সুখময় নীড়ে? বক্‌রীর কলিজা নিয়ে জন্ম নেবে তারা তা হলে। আমার নাতি কিংবা তার ছেলে হয়তো কোন কলিজা নিয়েই জন্মাবে না। শুধু রক্ত পাম্প করার জন্য এতখানি জায়গা জুড়ে

এই বিরাট হৃদয়। আর আজ যদি আমি বিঘ্ন-বিপদ তুচ্ছ করে শয়তানকে জাহান্নমে পাঠিয়ে তোমার কাছে পৌঁছই তবে আমার ছেলে হবে বাঘের গুর্দা, সীনা, কলিজা নিয়ে।'

আমি শব্‌নমকে কখনও এরকম উত্তেজিত হতে দেখি নি। কি করে হল? এ তো মাত্র এক মাস। কান্দাহারে এক বছর কাটিয়ে আসার পরও তো এরকম ধারা দেখি নি। তবে কি সে কোনও দুর্ঘটনার আশঙ্কা করে বনদেবতার শান্তিকামী অগ্রদূত বিহঙ্গের মত কলরবস্বরে সবাইকে সাবধান করে দিতে চায়? না, কোনও কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করেছে, এই এক মাস ধরে?

বললুম, 'তোমার রুদ্ররূপকে আমি ভয় করি, শব্‌নম। তুমি তোমার প্রসন্ন কল্যাণ মুখ আমাকে দেখাও।'

'আমি বিশ্বাস করি, বিশ্বজনের শুভ আশীর্বাদ আমাদের মিলনের উপর আছে।'

কবিতা শুনতে পেলে সে ভারী খুশী হয় বলে আমি বললুম,

'দাবানল যবে বনস্পতিরে দগ্ধ দাহনে দহে
শুষ্কপত্র আর্দ্র পত্রে কোন না প্রভেদ সহে।'

শান্ত হয়ে গেল। বললে, 'কিস্মৎ!'

আমি তাকে আরও শান্ত হবার জন্যে চুপ করে রইলুম।

বললে, 'তুমি কিছু মনে করো না। ভেবেছিলুম বলব না, কিন্তু আমি পর পর তিনদিন উপোস করে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিলুম, তাই এ-উত্তেজনা। উপোসের পরে মনে হল, তুমি যে সেই পাতিনেবুটি দিয়েছিলে সেইটে যদি তাজা থাকতো তবে শরবত বানিয়ে খেতুম।'

আমি বললুম, 'হা অদৃষ্ট! আমার গাল টোল খায় না। তুমি কিসে ঢেলে খাবে? তা তুমি যত খুশী নেবু পাবে, আমাদের বাড়ির গাছে। আমরা যখন একসঙ্গে হিন্দুস্থান যাব—'

দেখি সে তার বড় বড় চোখ আরও বড় করে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

আমি ভয় পেয়ে বললুম, 'কি হল?'

বললে, 'তাজ্জব! তাজ্জব! আমার দিবাস্বপ্নে তো এ-আইটেমটা বিলকুল স্থান পায় নি। দাঁড়াও, আমাকে বলতে দাও। ট্রেনে একটা কুপেতে শুধু তুমি আর আমি। না। তারই বা কি দরকার? তোমাকে তো কখনও ভিড়ের মাঝখানে আমি পাই নি। সে আনন্দ আমি পুরোপুরি রসিয়ে রসিয়ে চাখবো।

ভিড়ের ধাক্কায় তুমি ছিটকে পড়েছ এক কোণে, দরজার কাছে, আর আমি আয়নার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে তোমার পানে পিছন ফিরে। আয়নাতে দেখছি তোমার মুখের কাতর ভাব, আমার জন্য ব্যর্থ পাও নি বলে। একটুখানি ঘাড় ফিরিয়ে তোমাকে হানবো মধুরতম কটাক্ষ—একগাড়ি লোকের কৌতূহল নয়নে তাকানোকে একদম পরোয়া না করে। আমার তখন কী গর্ব, তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার জন্য কত ভাবছ।'

আমি বললুম, 'শোন শব্‌নম, তোমাকে একটা সত্য কথা আজ বলে রাখি। আমার মত লক্ষ লক্ষ হিন্দুস্থানী আল্লার দুনিয়ায় রয়েছে। এমন কি এখানে যে কজন হিন্দুস্থানী আছে তার ভিতরও আমি অ্যাডোনিস্ বা রুডল্‌ফ্ ভালেন্টিনো নই। তোমার সৌন্দর্যের খ্যাতি ওদিকে আমু দরিয়া, পুবে পেশোওয়ার, পশ্চিমে কান্দাহার, দক্ষিণে দক্ষিণ-পাহাড় ছাড়িয়ে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে গেছে, কেউ জানে না। আমি শুনেছি ভারতীয় শিক্ষকদের কাছে, তাঁরা শুনেছেন তাঁদের স্ত্রীদের কাছ থেকে। তাঁরা বলেন, বাদশা আমানুল্লা নিতান্ত একদারনিষ্ঠ বলে তুমি অবিবাহিতা—একই দেশে তো দুটো রাজা থাকতে পারে না, যদিও একই গাছ-তলায় একশ'টা দরবেশ্ রাত্রি কাটায়। গর্ব যদি কারও হয় সে হবে আমার। তামাম হিন্দুস্থান তোমার দিকে তাকাবে আর ভাববে কোন্ পুণ্যের ফলে আমি তোমাকে পেয়েছি।'

বললে, 'শুনতে কী যে ভাল লাগে, কি বলব তোমায়। আমি জানি, আমার লজ্জা পাওয়া উচিত, মাথা নিচু করা উচিত কিন্তু আমি এমনি বে-আব্রু বেহায়া যে এসব কথা আমার আরও শুনতে ইচ্ছে করছে। যদি কুপে পেয়ে যাই তবে আমি খোলা জানালার উপর মুখ রেখে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকব, আর তুমি পিছনে বসে আমার পিঠের উপর খোলা চুলে মুখ গুঁজে এই সব কথা বলবে।'

তার পর আমার দিকে স্থির কিন্তু স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, 'শুনে রাখ, আমি আমার ভালবাসা দিয়ে দেহের সৌন্দর্যকে হার মানাবো। সে হবে পরিপূর্ণ একটি হিমকণিকার মত—যার প্রেমের ডাকে আকাশের শত লক্ষ তারা হবে প্রতিবিম্বিত, আর দিনের বেলা গভীর নীলাম্বুজের মত নীলাকাশ—তার অন্তহীন রহস্য নিয়ে।'

তারপর শব্‌নম পড়লো তার সফর্-ই-হিন্দুস্থান অর্থাৎ ভারত ভ্রমণ নিয়ে।

হিন্দুস্থানের রেল লাইনের দুপাশে অক্লেশে সে গজালে আঙুর বন, দিল্লীর কাছে এসে ব্রিজার্ডের বরফে ট্রেন আটকা পড়লো দুদিন, ডাইনিং কারে অর্ডার

দেওয়া মাত্র পেয়ে গেল কচি দুম্বার শিক্‌কবাব, ট্রেন পুরো পাক্কা একটা দিন ছুটলো ঘন চিনার বনের মাঝখান দিয়ে, আগ্রা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে সে কিনলে নরগিস্ ফুল আর হলদে গুল্-ই-দায়ুদী, মোমতাজের গোরে দেবার জন্ত। আর সর্বক্ষণ পাশের গাড়িতে বসে আছে তোপল্ খান, উরুর উপর দুখানি রাইফেল পাতা, পকেটে টোটা ভরা রিভলভার, বেল্টে দমস্কসের তলোয়ার—পাছে চার মুহম্মদী শর্তে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান খেলার কেনা টিকিট স্বামীটিকে কেউ কেড়ে নেয়!

আমার তো ভয় হচ্ছিল, আবার বুঝি শব্‌নম বোরকার ভিতর থেকেই পিস্তল মারতে আরম্ভ করে—মার্কিন গ্যাংস্টাররা যে রকম পকেটের ভিতর থেকেই তাগ করে দুশমন ঘায়েল করতে পারে।

নানাবিধ মুশকিল যাবতীয় ফাঁড়া-গর্দিশ এবং তার চেয়ে প্রচুরতর আনন্দের ভিতর দিয়ে শব্‌নম বীবী তো শেষটায় পৌঁছলেন পূর্ব বাংলায় তাঁর শ্বশুরের ভিটায়।

আমি নিশ্বাস ফেলে বললুম, 'বাঁচালে।'

'দাঁড়াও না, তোমার খালি তাড়া। হাফিজ বাঙলাদেশে না আসতে পেরে বাঙলার রাজদূতকে তার বাদশার জন্য কি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন? সেই যেটা তোমাকে হোটেলের বারান্দায় দিয়েছিলুম?'

আমি বললুম,

'হেরো, হেরো, বিস্ময়!
দেশ কাল হয় লয়!
সবে কাল রাতে জনম লইয়া এই শিশু কবিতাটি।
রওয়ানা হইল পাড়ি দেবে বলে এক বছরের ঘাটি।'

'তুমিও এক মাসের বধূ, এক বছরের পথ পাঁচ দিনে পৌঁছলে।'

'চুপ, চুপ, ওই বৈঠকখানায় মুরুব্বীরা বসে আছেন। ওঁদের গিয়ে প্রথমে সালাম করতে হবে, না সোজা অন্দর মহলে যেতে হবে? কী মুশকিল, কিচ্ছু যে জানি নে।'

আমি বললুম, 'এইবারে পথে এস—আমাকে যে কথা কইতে দাও না।'

'তোমার পায়ে পড়ি, বলে দাও না। এই কি দাদ নেবার সময়?'

আমি বললুম, 'প্রথম অন্দরে। মা বরবধূ বরণ করবেন যে।'

'সে আবার কি?'

'মা মোড়ায় বসবেন, আমি তাঁর ডান উরুতে বসব, তুমি বাঁ উরুতে বসবে—'

'সর্বনাশ! আমার ওজন তো কম নয়। তোমার কত?'

'একশ দশ পৌণ্ড।'

'কিলোগ্রামে বল।'

'সে হিসেব জানি নে।'

'দাঁড়াও, কাগজ পেন্সিল নিয়ে আসি।'

ওর আঁক কষার মাঝখানে আমি দরদ ভরা সুরে বললুম, 'হ্যাগা, তোমার হিসেবে তো দেখছি তোমার চারশ পৌণ্ড। আমার চেয়ে চারগুণ ভারি। তা হতেও পারে।'

'ইয়ার্কি ছাড়। ওটা—ওটা—ওটা হল গিয়ে আউন্স।'

'তা হলে তোমার ওজন আমার চার ভাগের এক ভাগ, হবেও বা।'

'সর্বনাশ! তাও তো হয় না। এখন কি করা যায়?'

আমি বললুম, 'আলতো আলতো বসলেই হবে।'

মা বরণ করলেন। কলাপাতা দিয়ে তেকোণা করে বানানো সমোসার মত পত্রপুটের ভিতর ধান—তিন কোণ দিয়ে বেরিয়ে আছে দূর্বা। আমাদের মাথার উপর অনেকগুলো রাখলেন। শব্‌নমের ওড়না তার হাঁটু পর্যন্ত নামানো।

আমার দুই ভাইঝি জাহানারা আর রাণী—'কুটিমুটি'—প্রায় মাটিতে শুয়ে পড়েছে নূতন চাচীর মুখ সক্কলেব পয়লা দেখবে বলে।

শব্‌নম স্বপ্ন দেখছে। আমি কথা বলে এক স্বপ্ন উড়িয়ে দিলে সে সঙ্গে সঙ্গে আরেক স্বপ্নে ঢুকে যায়। কিন্তু সব চেয়ে তার ভাল লাগে মায়ের কোলে ওই বসাটা।

একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'আমার রইল এ-জীবনে একটি মাত্র আশঙ্কা। মা যদি আমাকে ভালো না বাসে।'

আমি ব্যাকুল হয়ে বললুম, 'তুমি ওই ভয়টি করো না শব্‌নম—প্লীজ—লক্ষ্মীটি। তোমাকে ভালবাসবেন মা সবচেয়ে বেশী। তুমি কত দূরদেশ থেকে এসেছ, সব আপন জন ছেড়ে, শুধু আমাকে ভালবাস বলে। একথা মা এক মুহূর্তের তরেও ভুলতে পারবেন না। মাকে যদি কেউ ভালবাসে এক তিল, মা তাকে বাসেন একতাল। আমাকে যদি কেউ ভালবাসে এক কণা, মা তাকে বাসবেন দুই দুনিয়া—ইহলোক, পরলোক।'

'বাঁচালে। তুমি তো জান, আমার মা নেই।'

যাবার সময় শব্‌নম বললে, 'বিপদ ঘনিয়ে আসছে। শিগ্‌গিরই তার চরমে পৌঁছবে।'

আমি চিন্তিত হয়ে শুধালুম, 'তুমি কিছু জান ?'

বললে, 'না। আমি শুধু আমার হাড়ের ভিতর অনুভব করছি।'

'আবার কবে দেখা হবে ?'

'এরকম থাকলে রোজই আসতে পারব।'

তারপর দুজনাই অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলুম, মুখোমুখি হয়ে। বলার কথার অভাব আমাদের কারোরই হয় না, কিন্তু বিদায়ের সময় যতই ঘনিয়ে আসে ততই আমরা শুধু একে অন্যের দিকে তাকাই আর আপন মনে অজুহাত খুঁজি কি করে বিচ্ছেদ-মুহূর্ত আরও পিছিয়ে দেওয়া যায়। শব্‌নম আমার মনের কথা আমার বেদনাতুর চোখ দেখেই বুঝতে পারে আর নিজের চোখ দুটি নিচের দিকে নামায়। হয়তো তার চোখে জল এসেছে। কখনও বা জড়িয়ে-যাওয়া গলায় কি একটা বলতে গিয়ে থেমে যায়।

এবারে বললে, 'তুমি প্রতিবারে আমাকে দাও আগের বারের চেয়েও বেশী। যত বেদনা নিয়েই বিদায়ের সময়টা আসুক না কেন, পথে যেতে যেতে ভাবি তুমি যে আনন্দ দিয়েছ এর বেশী আর আসছে বার কি দেবে ? তবু তুমি দাও, প্রতিবারেই দাও, বেশী করে দাও, উজাড় করে দাও। কি দাও তুমি ? আমি অনেক বার ভেবেছি। উত্তর পাই নি। এই যে তুমি আমার সামনে বসে আছ, আমার রাজার রাজা, গোলামের গোলাম এই তো আমার আনন্দের পরিপূর্ণতার চরম সীমা। এর বেশী আমি কীই বা চাইতে পারি, তুমি কীই বা দিতে পার ? তবু পাই, প্রতি বারেই অদ্ভুত অনির্বচনীয় রসঘন আনন্দ। আর যখন তুমি আমাকে বল, "আমি তোমাকে ভালবাসি" তখন আমার দু'চোখ ফেটে বেরয় অশ্রু। আমার কাণায় কাণায় ভরা হৃদয়-পাত্র তখন যেন আর বেদনার কূল না মেনে উপচে পড়তে চায়। বল, তুমি আমায় কক্‌খনও ত্যাগ করবে না ?'

আমি থতমত খেয়ে গেলুম। এত কথা বলার পর এই অর্থহীন প্রশ্ন ? যেখানে আমরা পৌঁছেছি সেখানে এ-প্রশ্ন যে একেবারে অসম্ভব—পাগলেরও কল্পনার বাইরে।

বললে, 'তুমি আমাকে মার, সাজা দাও, ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে দাও, কিন্তু আমাকে ত্যাগ করো না।'

আমি কিচ্ছু বলি নি। শুধু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলুম।

বললে, 'বড় দুঃখে আজ সকালে একটি কবিতা লিখেছি। নিজে কখনও এ জিনিস লিখি নি বলে প্রথম দু লাইন এক বিদেশী কবির কাছ থেকে নিয়েছি।

কিন্তু আজ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে কবিতাটা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হচ্ছে। তোমার কলমটা দাও। এটা কিন্তু গদ্যে লিখবো। এখন পড়ো না—আমি চলে যাওয়ার পরে পড়ো।'

দেউড়িতে এসে অবাক হয়ে শুধোলে, 'তুমি আবার চললে কোথায়?'

আমি বললুম, 'তোমাকে পৌঁছে দিতে।'

দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'অসম্ভব।'

আমি তর্ক করি নি।

ওই একটি দিন, একটি বার, আমি আমার জীবনে তার আদেশ লঙ্ঘন করেছি। তর্ক না করে, আপত্তি না তুলে। শেষটায় সে হার মানল। আমি বেশ কিছুটা পিছনে তার উপর নজর রেখে রেখে চললুম। বাড়ির দেউড়িতে পৌঁছে একবার ঘুরে দাঁড়াল।

সে একটি শব্দও উচ্চারণ করে নি, কিন্তু আমি শুনেছি সে বলেছিল, 'তোমাকে খুদার হাতে সমর্পণ করলুম।'

বাড়ি ফিরে এসে কাগজখানা চোখের সামনে মেলে ধরলুম।'

'তোমার আমার মাঝখানে বঁধু অশ্রুর পারাবার
কেমনে হইব পার?
দুখ-রজনীর প্রেমের প্রদীপ ভাসায়ে দিলেম আমি
দীরঘ নিশ্বাস পালেতে দিলেম জানে অন্তরযামী।
শেষ দীপ-শিখা দিলেম তোমারে মোর কিছু নাহি আর
ত্বরা এস বঁধু, বেগে এস প্রভু, নামাও বেদনাভার।'

এর পর গদ্যে লেখা: 'এর আর প্রয়োজন নেই

তুমি যে অনির্বাণ দীপশিখা জ্বালিয়ে দিয়েছ—'

বাকিটা শেষ করে নি।

পুরুষ মানুষ হয়েও সে রাত্রে আমি কেঁদেছিলুম। 'হে পরমেশ্বর',—চোখের জলে বলেছিলুম, 'হে দয়াময়, আমাকে কেন পুরুষ করে জন্ম দিলে? এই বলহীনা সব বিপদ তুলে নেবে আপন মাথায়, আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখব? আমি কোনদিন তার কোনও কাজে লাগব না?'

॥ ৬ ॥

পরদিন সকালবেলাই খবর পেলুম, আমানুল্লার সৈন্যদল রাত্রিবেলা হেরে যাওয়াতে তিনি তাঁর বড় ভাইকে সিংহাসনে বসিয়ে কান্দাহার পালিয়ে গিয়েছেন।

রাস্তার অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর। বোরকা তো অন্তর্ধান করেছেই, তাগড়া জোয়ানরাও একলা একলি বেরয় না—এক একটা দলে অন্তত পাঁচ-সাতজন না থাকলে মানুষ নিজেকে নিরাপদ মনে করে না। বাচ্চার ডাকু সৈন্যদল রাস্তা ছেয়ে ফেলেছে।

তিন দিন পর আমানুল্লার দাদাও সিংহাসন ত্যাগ করে চলে গেলেন। বাচ্চা সাড়ম্বরে সিংহাসনে বসল।

এসব খবর যে কোনও প্রামাণিক আফগান ইতিহাসে সবিস্তার পাওয়া যায় —একথা পূর্বেই বলেছি। আমি ইতিহাস লিখতে বসি নি; বাচ্চার আপন হাতে জ্বালানো দাবানল শব্‌নম ও আমার মত নিরীহ শুষ্ক পত্রের দিকে কি ভাবে এগিয়ে এল সেইটে বোঝাবার জন্য হ্রস্বতম খেইগুলো ধরিয়ে দিচ্ছি মাত্র।

দু হাতে মাথা চেপে ধরে ভাবছি, কি করি, কি করি? কোন্ দিকে পথ, কোথায় আলো—আর কোনটাই বা আলেয়া?

সুখ চাই নে, আনন্দ চাই নে, এমন কি প্রিয়মিলনও চাই নে—কি করে এই দাবানল থেকে শব্‌নমকে রক্ষা করি?

আমি রক্ষা করবার কে?

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়িতে বুটের ধপাধপ শব্দ করে আব্দুর রহ্‌মান ঘরে ঢুকে প্রায় অস্ফুট স্বরে বললে, 'সর্দার আওরঙ্গজেব খান এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।' আব্দুর রহ্‌মানের গলা শুকিয়ে গিয়েছে।

আমি দুবার শুনেও প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারি নি।

তাড়াতাড়ি নীচে নেমে দেউড়ির দিকে এগিয়ে গেলুম।

মাথা নীচু করে কিচ্ছু না বলে নীরব অভ্যর্থনা জানালুম।

তিনি গম্ভীরে—এবং সেই অর্ধসম্বিতেও আমার মনে হল—প্রসন্ন অভিবাদন জানালেন। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'আপনার পরে'—অর্থাৎ 'আপনি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন।' তিনি কেন এসেছেন, এই ভাবনার ভিতরও আমি আশ্চর্য হয়ে

লক্ষ্য করলুম, শব্‌নমের গলা মধুর, এঁর গলা গম্ভীর, অথচ দু-গলারই আদল এক, ঝংকারসম ধ্বনি। যেন শব্‌নম বাপের পাগড়ি জোব্বা গোঁফদাড়ি পরে এসেছে।

আমি আপত্তি না জানিয়ে শুধু 'খানা-ই শুমা অস্ত্'—'এটা আপনার বাড়ি' বলে আগে আগে পথ দেখিয়ে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। ইরানী কায়দায় একবার 'এটা আপনার বাড়ি' বলার পর অভ্যাগতজন আদেশ করবেন, গৃহস্থ তাঁর কথা মত চলবে।

আমাকে আসন দেখিয়ে নিজে সোফায় বসলেন।

আমি কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইলুম। ইরান আফগানের মুরুব্বীরা এতে খুশী হয়ে বলেন, 'বাচ্চা খিজালৎ মী কশদ্—ছেলেটার আক্কু শরম-বোধ আছে।'

শুধালেন, 'আপনি আমার পরিচয় জানেন?'

আমি মৃদু কণ্ঠে বললুম, 'কিছু কিছু জানি।'

বললেন, 'তাই যথেষ্ট। আমিও আপনাকে কিছু কিছু চিনি। এদেশে এখন অল্প-বিস্তর বিদেশী আসতে আরম্ভ করেছেন কিন্তু আমি সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার সুযোগ এখনও পাই নি। তবে গেল বছর আপনাদের কলেজের বাৎসরিক পরবে আপনি এদেশে শিক্ষা-বিস্তার সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেইটে শোনবার সুযোগ আমার হয়েছিল। আপনি বড় একাগ্র মনে অত্যন্ত দরদ দিয়ে আপনার বক্তব্য পেশ করেছিলেন, সেটা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। আমার মনে হয়েছিল, আপনি এই পরদেশকে অনেকখানি ভালবেসে ফেলেছেন। নয় কি?'

আমি মাথা নীচু রেখেই বললুম, 'এদেশ আমাকে অবহেলা করে নি। এদেশে আমি আশাতীত ভালবাসা পেয়েছি। প্রতিদানের চেয়েও বেশি দেবার চেষ্টা করেছি।'

'এই তো ভদ্রজনের আচরণ।'

আমি তখন শুধু ভাবছি, তাঁর এখানে আসার রহস্য কি? তবে কি শব্‌নম তাঁকে কিছু বলেছে? তাই বা কি করে হয়?

নিজের থেকেই তিনি কাবুলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অতি সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় আমাকে বোঝালেন। তাঁর যুক্তিধারা থেকে পদে পদে প্রমাণ হল তিনি সাধারণ সৈন্যদেরও কঠিন জিনিস বোঝাতে অভ্যস্ত।

সর্বশেষ বললেন, 'আমি সোজা কথা বলাটাই পছন্দ করি। আমার মনে হচ্ছে, আপনিও সরল লোক। তাই আপনার কাছে অন্য লোক না পাঠিয়ে আমি নিজেই এসেছি। যদিও এ অবস্থায় নিজে আসাটার রেওয়াজ এদেশে নেই।

'আমি আমার নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠি নি। আমি সিপাই। প্রাণের প্রতি যাদের অত্যধিক মায়া তারা ফৌজে বেশী দিন থাকে না—অন্তত শুদ্ধমাত্র দু'পয়সা কামাবার জন্য আমার ফৌজে থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না।

'এবারে আপনাকে যা বলছি তা গোপনে।'

'আমার একটি কিশোরী কন্যা আছে। লোকে বলে অসাধারণ সুন্দরী। অন্তত তার সে খ্যাতি অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছে। আমি আজ বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছি বাচ্চা-ই-সকাওয়ের দ্বিতীয় সেনাপতি—প্রথম সেনাপতির ছোট ভাই—বছর দুই পূর্বে কাঠ বেচতে এসে তাকে কাবুলে দেখতে পেয়েছিল—আমার মেয়ে সচরাচর পর্দা মানতো না। যে জিনিস তখন তার বদ্ধ উন্মাদাবস্থার ও উৎকট কল্পনার বাইরে ছিল আজ সৈন্যদল প্রয়োগে সেটা অসম্ভব নাও হতে পারে।

'আপনি হিন্দুস্তানী। আপনি যদি আমার মেয়েকে বিয়ে করেন তবে সে হিন্দুস্তানী ন্যাশনালিটি পেয়ে যাবে। আমি আপনাদের রাজ-দূতাবাসে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি ; ভারতীয় এক বড় রাজকর্মচারী বললেন, "আইনত আমার মেয়ের যে অধিকার জন্মাবে সেটা তিনি রক্ষা করার সর্ব চেষ্টা করবেন।" যদিও প্রয়োজন ছিল না, তবুও কথা উঠেছিল, এখানে শিক্ষিত অবিবাহিত কে কে আছেন। সেই প্রসঙ্গে আপনার নাম যখন উঠল, মাত্র তখনই তিনি সন্তর্পণে তাঁর উৎসাহ দেখিয়েছেন।'

এই অভাবনীয় পরিস্থিতির সামনে পড়ে আমি বিস্ময়েই হোক, আনন্দেই হোক, কিছু না বুঝতে পেরেই হোক হয়তো একটা অস্ফুট শব্দ করেছিলুম।

তিনি বললেন, 'আপনি একটু চিন্তা করুন এবং তার পূর্বে বাকি কথা শুনে নিন।

'বাচ্চা-ই-সকাও এখন মোল্লাদের কথা মত চলে। অন্তত তারা বিবাহিতা স্ত্রীলোককে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়াটাতে সম্মতি দিতে পারবে না।

'ব্রিটিশ এ্যারোপ্লেন ভারতীয় নারীদের আপন দেশে নিয়ে যাচ্ছে। আপনাদের ভারতীয় কর্মচারী আমাকে সদয় আশ্বাস দিয়েছেন, প্রথম সুযোগেই তিনি আমার মেয়েকে হিন্দুস্তান পাঠিয়ে দেবেন।

'এদেশে ফরাসী জর্মন—বিদেশী প্রায় সবাই অবিবাহিত। কিন্তু আমার মেয়ে কিছুতেই ইউরোপীয় বিয়ে করবে না। প্রথমত তারা খৃষ্টান, দ্বিতীয় তাদের সাম্রাজ্যবাদ প্রবৃত্তি এবং তৃতীয়—বোধহয় এইটেই সর্বপ্রথম বলা উচিত ছিল—

তাদের শারীরিক অশুচিতা সে অত্যন্ত ঘৃণা করে। যদিও তার তমদ্দুন্-ফরহঙ্গের, তার বৈদগ্ধ্যের অর্ধেকেরও বেশী ফরাসী।

'এ কথাটা তুললুম, আপনি হয়তো শুধাবেন, আমার মেয়ের মত আছে কি না। আপনি মত দিলে তাকে আমি জিজ্ঞেস করব, কারণ ধর্মত আইনত সে প্রাপ্তবয়স্কা। যদি সে অমত করে, আশা করি আপনার অভিমানে লাগবে না। যে রকম আমি আপনাকে সরল মনে বলেছি, আপনি অমত করলে আমি কণামাত্র অপমানিত বোধ করব না।

'কারণ, হয়তো আপনারা আপনাদের গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে করেন না, আমরাও আমাদের গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে করি নে—যদিও ইসলাম এরকম গোষ্ঠী পাকানো নিন্দার চোখে দেখে। আপনি রাজী না হলে আমি কখনও ভাববো না, আপনি আমার মেয়েকে কিংবা আমাকে এবং আমার গোষ্ঠীকে খাটো করে দেখলেন।

'আমার মেয়ে সম্বন্ধে বাপ হয়ে আমি কি বলব। আমি প্রশংসা করতে চাই নে। সে আমার একমাত্র মেয়ে, ছেলেও নেই, তার গর্ভধারিণী—'

এই প্রথম তাঁর সরল দৃঢ় কথাতেও যেন একটু অতি ক্ষীণ কাঁপন শুনতে পেলুম।

'—অল্প বয়সে মারা যান। বাপ হয়ে তাই ইংরেজের মত ম্যাটার অব্ ফ্যাক্ট্ বা সাদামাটা ভাবে বলি, তার চারটে 'বি'-ই আছে। বিউটি, ব্রেন, বার্থ, ব্যাঙ্ক—অবশ্য চতুর্থটা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'সর্বশেষে আমি আপনাকে সাবধান করে দিতে চাই, আপনি রাজী হলে ফলস্বরূপ বাচ্চার সেনাপতির বিরাগভাজন হবেন।'

এতক্ষণ তিনি আমার দিকে ঝুঁকে, উরুতে দুই কনুই রেখে, চিবুক দুই হাতের উপর রেখে কথা বলছিলেন। এবারে শিরদাঁড়া খাড়া করে ফৌজী কায়দায় সোজা হয়ে বসে বললেন, 'এবারে আপনি চিন্তা করে বলুন।'

তিনি যে ভাবে শান্ত হয়ে আসনে বসলেন তার থেকে বোঝা গেল, প্রিয় অপ্রিয় নানারকম সংবাদ শুনে তিনি অভ্যস্ত। আমার 'না' তাকে বিচলিত করবে না, আমার 'হাঁ' তাঁকে প্রসন্ন করবে।

আমার 'হাঁ', 'না' ভাববার কি আছে! তবু আমি এতই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম যে প্রথমটায় আমি কিছুই বলতে পারি নি। তারপর মাথা নিচু রেখেই নববরের কণ্ঠে বলেছিলুম, 'আপনার কন্যাকে আমি আল্লাতালার মেহেরবানীর মত পেতে চাই।' আমি ইচ্ছে করেই আমার সম্মতি প্রস্তাবের রূপ

দিয়ে প্রকাশ করেছিলুম—কিন্তু আপন অজানতে। আমি বিশ্বাস করি, করুণাময় তাঁর অসীম দয়ায় মূককে যে শুধু ভাষাই দেন তা নয়, সৌজন্যের ভাষাও বলতে শেখান।

আওরঙ্গজেব খান দাঁড়িয়ে উঠে আমায় আলিঙ্গন করলেন।

আসন গ্রহণ করে বললেন, 'আমার কন্যার কিস্মৎ যদি ভালো থাকে তবে আপনি অসুখী হবেন না। আর আপনি আমার উপকার করলেন। জামাতার কাছে উপকৃত হওয়া বড় আনন্দের বিষয়।'

আমি বললুম, 'আপনি গুরুজন। যদি অনুমতি করেন তবে একটি নিবেদন আছে।' আমি আমার গলা ফিরে পেয়েছি।

প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, 'আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।'

আমি হাত জোড় করে বললুম, 'আপনি দয়া করে উপকারের কথা তুলবেন না। আমি আপনার কন্যার পাণি-প্রার্থনা করছি, শিষ্য যে রকম মুর্শীদের কাছে গুরু-কন্যা কামনা করে।'

এবারে তিনি বিচলিত হলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘন ঘন আমার মস্তক চুম্বন করতে করতে বললেন, 'বাচ্চা—বৎস—তুমি ভদ্র ঘরের ছেলে, তুমি ভদ্র ঘরের ছেলে। তোমার পিতামাতার আশীর্বাদ তোমার উপর আছে।'

আমি তাঁর হস্তচুম্বন করলুম।

নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'পাপাচার শুভবুদ্ধির চেয়ে দ্রুত গতিতে চলে। তাই শুভকর্ম শীঘ্র করতে হয়। বাচ্চার সেনাপতি জাফর খানের পাপবুদ্ধিকে হারাবার জন্য তোমাদের বিবাহ যতশীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করা উচিত। তুমি কি বল?'

আমি বললুম, 'আপনার কাছ থেকে আমার পরিচিত "শুভস্য শীঘ্রম্" বাক্যের প্রকৃত নিগূঢ় অর্থ বুঝলুম। এখন থেকে আমার আর কোন মতামত নেই।'

'আজ সন্ধ্যায়?'

'আজ সন্ধ্যায়।'

উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'সময় কম। ব্যবস্থা করতে হবে। কীই বা ব্যবস্থা করব? এই দুর্দিনে?'

আমি জানি শব্‌নম রাজী, কিন্তু ইনি কোন্ সাহসে সব ব্যবস্থা করার চিন্তাতে লেগে গেলেন। বোধহয় কন্যার জনকানুরাগে অখণ্ড বিশ্বাস ধরেন।

আমাকে কোনও কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে এক মুহূর্তেই অন্তর্ধান করলেন।

মুক্তি, মুক্তি, মুক্তি! আমি মুক্তি পেয়েছি।

আর আমাকে হাত-পা-বাঁধা অসহায়ের মত মার খেতে হবে না। ওই আমলেই বাংলাদেশে আমাদের মধ্যে রটেছিল যে টেগার্টের পুলিস বিপ্লবীদের হাত পা বেঁধে সর্বাঙ্গে মধু মাখিয়ে ডাঁশ পিঁপড়ের মাঝখানে ফেলে রাখে। আমাকে আর সে যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে না।

আমি এখন শব্‌নমের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারব।

তার মিলনের জন্য এখন আমাকে আর প্রহরের পর প্রহর গুনতে হবে না। আমি যে কোন মুহূর্তে তার সম্মুখে উপস্থিত হতে পারি। আমার দশদিন এখন সত্যিই নিরদ্বন্দ্বা হয়ে গেল।

পরিপূর্ণ আনন্দের সময় মানুষের মন ভিন্ন ভিন্ন দিকে ধায় না। একটা আনন্দ নিয়ে সে পড়ে থাকতে ভালবাসে। শিশুর মত একটি পুতুলই বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমুতে যায়। আমি আমার মুক্তির আনন্দ নিয়ে তন্ময় হয়ে পড়ে রইলুম, আমার অন্য সৌভাগ্যের কথা ভাববারই প্রয়োজন হল না, ফুরসত হল না।

এক ঘণ্টা হয় কি না হয়, এমন সময় আব্দুর রহ্‌মান সৌম্যদর্শন এক অতি বৃদ্ধকে আমার ঘরে নিয়ে এল। ধবধবে সাদা চাপ দাড়ি, সাদা গোঁফ—মোল্লাদের মত ছোট করে ছাঁটা নয়, সাদা বাবরী চুল, তার উপর সাদা পাগড়ি, চোখের পাতা এমন কি ভুরু পর্যন্ত বরফের মত সাদা। এবং সে সাদা বেয়ে যেন তেল ঝরে পড়ছে। এঁর বয়স কম হলে আমি বলতুম, এটা সাদা নয়, সত্যিকারের প্ল্যাটিনাম ব্লণ্ড।

আমি তাঁকে যত্ন করে বসালুম।

অতি সুন্দর ফার্সী উচ্চারণে বললেন, 'আমি আওরঙ্গজেব খানের গুরু। তার মেয়েরও গুরু। দুজনাকেই ফার্সী পড়িয়েছি। এখনও আমাদের তিন জনাতে মুশাইরা হয়।

'এই খানিকক্ষণ আগে আওরঙ্গজেব খান এসে আমায় সুখবর শোনালে, আপনার সঙ্গে শব্‌নমের শাদি আজ সন্ধ্যাবেলাই হবে। আমি বড় খুশী হয়েছি। আমি বড়ই খুশী হয়েছি।'

এইটুকু বলে তিনি দুখানা হাত তুলে আল্লার কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রার্থনা করলেন। আমিও হাত তুলে আস্তে 'আমিন' 'আমিন' বললুম।

বললেন, 'যেই শুনতে পেলুম, আপনার মুরুব্বী এখানে কেউ নেই, অমনি

আমি বললুম আমার উপর এর ভার রইল। আওরঙ্গজেব চায় নি যে এই খুন-রাহাজানির মাঝখানে আমি রাস্তায় বেরই। আমি তাকে স্পষ্ট বলে দিলুম, এ সংসারে আমি এমনিতেই আর বেশী দিন থাকব না—না হয় দুদিন আগেই গেলুম।'

আমি বললুম, 'আপনি শতায়ু হন।'

বৃদ্ধের রসবোধ আছে। বললেন, 'আমার বয়স আশী হয়েছে। আরও কুড়ি বছর বাঁচতে চাই নে। বরঞ্চ ওই কুড়িটি বছর আপনি আপনার আয়ুতে জুড়ে দিন কিংবা শব্‌নম বানু আর আপনাতে ভাগ করে। কোন জিনিস বরবাদ করাটা আমি আদপেই পছন্দ করি নে। এখন, প্রথম কথা: আওরঙ্গজেব খান আপনাকে জানাতে বলেছেন, "আজ সন্ধ্যায় আপনাদের বিবাহ।" আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাব।

'দ্বিতীয় কথা: আপনার বন্ধুবান্ধব কে কে এখানে আছেন তাঁদের নাম-ঠিকানা বলুন। আমি কিংবা আমার বাড়ির লোক তাঁদের নিমন্ত্রণ জানিয়ে আসবে উভয় পক্ষ থেকে। দুজন করে লোক যাবে।'

আমি বললুম, 'এই দুর্দিনে নিমন্ত্রণ করে কাকে আমি বিপদে ফেলি? তাদের কারোর যদি ভালমন্দ কিছু একটা হয় তবে তার বাল-বাচ্চার সামনে আমি আমার মুখ দেখাতে পারব না। আর আমার সেরকম মিত্র বা সখাও কেউ নেই। এঁদের সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে এখানে—তাও সহকর্মীরূপে। কিন্তু তার পূর্বে আমার উচিত আপনার বাড়িতে গিয়ে আপনাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করা।'

বৃদ্ধ ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'না, না, না। আপনি বিদেশী—এদেশের অবস্থা জানেন না। এখন শুদ্ধমাত্র লৌকিকতা করার জন্য রাস্তায় বেরনো উচিত নয়। আমি আপনার হয়ে তাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ জানাব। তারা সবাই বরপক্ষের হয়ে যাবে।

'এবারে আপনার খিদমতগার আব্দুর রহ্‌মানকে দাওয়াৎ করতে হবে।'

আমি বললুম, 'তাকে ডাকি।'

আবার ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'না, না, না। আমি তাকে হিন্দুস্তানী কায়দায় কনে পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ জানাব তার কাছে গিয়ে।

'তৃতীয় কথা: আপনার জামা-কাপড়ের ব্যবস্থা আমি করব। আমার মেয়ে আপনার মোটামুটি উচ্চতা আওরঙ্গজেব খানের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে এবং সেলাইয়ের কলে বসে গিয়েছে। এ-তো জোব্বার ব্যাপার, হাঙ্গামা কম।

এবার আপনি আমার বুকে বুক লাগিয়ে দাঁড়ান। আমি ঠিক ঠাহর করে নি।'

মোকা পেয়ে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে একটা আলিঙ্গনও দিলেন।

আমি তাঁর হস্তচুম্বন করে বললুম, 'আমার বলতে সাহস হচ্ছে না, কিন্তু কাপড়-চোপড়ের খরচটা?'

বৃদ্ধ সপ্রতিভ। বললে, 'নিশ্চয়! খয়রাতী বা ধারের জামাজোড়ায় বিয়ে করাটা মনহুসী—অপয়া।'

আমি বললুম, 'এদেশে ভারতীয় কারেন্সির কদর আছে বলে শুনেছি।'

তাঁকে আমার মনিব্যাগটা দিলুম।

তিনি দু-একখানা নোট তুলে নিয়ে বললেন, 'বিয়ের পর শব্‌নম আর আমার মেয়েতে বোঝাপড়া করে নেবে।'

বৃদ্ধ উঠলেন।

এঁর কথা বলার ধরন শোনবার মত। শব্‌নম বয়েৎ ছাড়ে মাঝে-মধ্যে, ইনি প্রায় প্রত্যেকটি কথা বললেন বয়েতের মারফতে। ঠিক বলতে পারব না, বোধ হয় তাঁর মেয়ে যে সেলাইয়ের কলে বসে গেছেন সেটাও বয়েতেই বলেছিলেন। কিন্তু শব্‌নমের বেলা যেরকম তাকে থামিয়ে টুকে নিতে পারি, এর বেলা সেটা পারলুম না বলে দুঃখ রয়ে গেল।

আব্দুর রহ্‌মানকে দাওয়াৎ জানিয়ে বিদায় নেবার সময় আমাকে বললেন, 'আপনাকে কয়েকটি বয়েৎ শোনালুম, আপনি তো আমাকে একটিও শোনালেন না। আপনার বুঝি ওতে মহব্বৎ নেই!'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'আপনাকে শোনাব আ-মি? আপনার তো সব বয়েৎ জানা।'

তিনি বললেন, 'সে কি কথা? চেনা গান লোকে শোনে না? নূতন লাইব্রেরিতে গেলে আমরা সর্বপ্রথম চেনা বইয়ের সন্ধান করি নে? জলসা-ঘরে গিয়েও প্রথম খুঁজি চেনা মুখ এবং বলতে নেই, গোরস্তানে গিয়েও প্রস্তরফলকে চেনা জনেরই নাম খুঁজি।'

বাপ্‌স্! চার চারটে তুলনা—এক নিশ্বাসে।

আমি সায় দিয়ে বললুম, 'আমার এক বন্ধু একটি কবিতা লিখেছেন। শুনবেন?' বলে নরগিসের···

তোমার আমার মাঝখানে বঁধু অশ্রুর পারাবার
কেমনে হইব পার—?

কবিতাটি শোনালুম। বুড়ো একেবারে থ' মেরে গেলেন। 'কাবুলের লোক

এরকম লিখেছে ? অসম্ভব ! ওর সঙ্গে আমার আলাপ করতেই হবে। বয়সে নিশ্চয়ই কাঁচা। চিন্তাশীল এবং স্পর্শকাতর। ছন্দে মিলে সবুজ রঙের কাঁচা ভাব একটু রয়েছে। যদি লেগে থাকে তবে ইরান হিন্দুস্তানে একদিন নাম করবে। ইন্‌ শা আল্লা, ইন্‌ শা আল্লা—আল্লা যদি দেন, আল্লা যদি করান।'

দেউড়িতে বললুম, 'আমাকে দয়া করে আপনি বলবেন না।'

হেসে বললেন, 'নওশাহ্‌, নূতন রাজা, নববর, তাই বলেছি। কাল থেকে তুমি বলব। আওরঙ্গজেবও বলেছিলেন, "বাচ্চা খিজালৎ মী কশদ্‌"—"ছেলেটির আব্রু-শরম-বোধ আছে।" আমি বড় খুশী হয়েছি, আগাজান। আর কানে কানে বলি, শব্‌নমের মত মেয়ে আমি আমার এই দীর্ঘ জীবনে দুটি দেখি নি। নাম সার্থক করে শব্‌নমের মত পবিত্র।'

অতি সত্য কথা। তবু আমার অভিমান হল। সবই শব্‌নম, শব্‌নম—আমি যেন কিচ্ছুই না।

॥ ৭ ॥

আমার প্রিয়া, আমার বউ, আমার বিবাহিত স্ত্রীকে আবার বিয়ে করতে চলেছি !

এ যেন একই দিনে দুবার সূর্যোদয়। কিন্তু তাও হয়। সূর্যোদয়ের একটু পরে ঘন মেঘে সূর্য পড়ল সম্পূর্ণ ঢাকা। সব কিছু ভাসা-ভাসা অন্ধকার—সূর্যোদয়ের পূর্বে যে রকম। মেঘ কেটে পরিষ্কার আকাশে আবার পূর্ণ সূর্যোদয় হল।

কিংবা বলব, ভারতবর্ষে মানুষ যেমন একই দেহ নিয়ে দুই জন্ম লাভ করে 'দ্বিজ' হয়। প্রথম জন্ম তার ব্যক্তিগত, দ্বিতীয়বারে লাভ করে গুরুর আশীর্বাদ, সমাজের সম্মতি। আমাদের এই দ্বিতীয় বিয়েতে আমরা পাব পিতার আশীর্বাদ, সমাজের মঙ্গল কামনা।

সুস্থ বর স্বাভাবিক অবস্থায়ও পরের দিন ঠিক ঠিক বলতে পারে না কি কি হয়েছিল, কোন্‌টার পর কি ঘটেছিল। আমার অবস্থা আরও খারাপ।

কিংখাপের জামা-জোব্বা পরে মাথা নিচু করে বসে আছি শাদির মজলিসের মাঝখানে। একবার মাথাটা অল্প উঁচু করে চারদিকে তাকালুম। মাত্র একটি পরিচিত মুখ দেখতে পেলুম। আমার কলেজের আমারই ছাত্র। তারই কচি মুখটি শুধু হাস্যোজ্জ্বল। আর সকলের মুখে আনন্দ আতঙ্কে মেশানো কেমন যেন এক আবছায়া-আবছায়া ভাব। আবার মাথা নিচু করলুম।

এবারের বিয়েতে শব্‌নম সভাতে এসে আমার মুখোমুখি হয়ে বসল না। আমার মুখপাত্র হয়ে একজন 'উকীল' দুজন সাক্ষীসহ অন্দরমহলে গিয়ে বিবাহে শব্‌নমের সম্মতি নিয়ে এসে মজলিসে আমার সামনে মুখোমুখি হয়ে বসে বললেন, 'অমুকের কন্যা অমুক, আপনি, অমুকের পুত্র অমুককে এত স্ত্রীধনে মুহম্মদী চার শর্তে বিবাহ করতে রাজী আছেন—আপনি কবুল আছেন?' বাকিটা প্রথম বারেরই মত।

হ্যাঁ, মনে পড়ল। এর আগে একটা দ্বন্দ্ব হয়ে গিয়েছে স্ত্রীধন কত হবে তাই নিয়ে। সাধারণত বর পক্ষ সেটা কমাতে চায়, কন্যা পক্ষ সেটা বাড়াতে চায়। এখানে হল উল্টো। পরিবারের ঐতিহ্য ও সম্মান বজায় রেখে আওরঙ্গজেব খান কমিয়ে কমিয়ে যে অঙ্ক বললেন, আমি তাঁর গুরুর মারফতে ঢের বেশী অঙ্ক জানিয়ে দিলুম। গুরুই শেষটায় রফারফি করে দিলেন।

বড় দুঃখে তোপল্ খানের কথা মনে পড়ল!

বর-বধুর মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করেছিলেন গুরু। সমস্তটা কবিতা কবিতায়। এবং সব কবিতা মাত্র একজন কবি মৌলানা জালালউদ্দীন রুমী-র থেকে নিয়ে। আশ্চর্য, কি করে জানলেন উনিই আমার সব চেয়ে প্রিয় কবি!

তারপর সব ঝাপসা।

আমার অপরিচিত এক ভারতীয় বোধহয় আমাকে মুরুব্বীদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি তাঁদের সম্মান জানাতে তাঁরা আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। সকলের পয়লা কার কাছে গিয়েছিলুম মনে নেই। শ্বশুরমশাই কিংবা জ্যাঠ-শ্বশুরমশাই—অর্থাৎ জানেমন্—আমি কারও মুখের দিকে তাকাই নি।

এসব কায়দা খাস আফগানী কি না আমি জানি নে। পরে শব্‌নমের কাছে শুনেছিলুম ওই অপরিচিত ভারতীয় মিত্রটি সব-কিছু আধা-আফগান আধা-হিন্দুস্তানী কায়দায় করিয়েছিলেন।

জিয়োবার জন্য আমাকে ছুটি দেওয়া হল। বেরুতেই দেখি আমার ছাত্রটি। সে আনন্দে, উৎসাহে সেখানে চেঁচামেচি লাগিয়েছে। আমার সম্বন্ধে তার গুণকীর্তনের যেটুকু কানে এসেছিল তার সিকি ভাগ সত্য হলে তুর্কীর খলিফার সিংহাসন ইস্তাম্বুল জাদুঘর থেকে বের করে এনে তার উপর আমাকে বসাতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নোবেল প্রাইজের সব কটা পুরস্কার নাগাড়ে এক শ বছর ধরে আমাকে দিয়ে যেতে হয়।

আমাকে দেখতে পেয়ে লাফ দিয়ে এসে আমার হাত দুখানার উপর তার দু চোখ চেপে ধরে বার বার বলে, 'হুজুর, এ কী আনন্দ, আপনি আমাদের দেশে

বিয়ে করলেন! হুজুর, ইত্যাদি।' শেষটায় বললে, 'কলেজের সবাই বড় পরিতৃপ্ত হবে, হুজুর, এ আমি বলে রাখছি?'

হায় রে কলেজ! আমরা তখনও জানতুম না বাচ্চা তিন দিন পরে কাবুলের তাবৎ ইস্কুল-কলেজ নস্যাৎ করে দেবে।

একটা ঘরে বসিয়ে তামাক সিগারেট সামনে রাখা হল। শব্‌নমের সমবয়সী আত্মীয়-স্বজনরা প্রথমটায় কিন্তু-কিন্তু করে পরে বাঁধন-ছাড়া বাছুরের মত লাফালাফি দাপাদাপি ঠাট্টা-রসিকতা করলে। আমার কবিতার শখ জেনে শেষটায় লেগে গেল বয়েতবাজি, কবিতার লড়াই এবং মুশাইরা। শুধু ফার্সী না—দুনিয়ার যত সব ভাষায়। তবে মোলায়েম প্রেমের কবিতার অধিকাংশই ছিল ফার্সীতে।

খবর এল, জানেমন্ আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

আমাকে সামনে বসিয়ে আমার সর্বাঙ্গে হাত বুললেন। এমন কি চোখে, নাকে, গালে, কপালে, ঠোঁটে পর্যন্ত। তখন দেখলুম, তিনি অন্ধ।

অতি মৃদু কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করলেন, 'শোন বাচ্চা, তোমাকে সব-কথা বলার মত লোক এ বাড়িতে আর কেউ নেই আমি ছাড়া। জন্মের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত শব্‌নম একদিনের তরেও আমার চোখের আড়াল হয় নি। আমি জন্মান্ধ নই, যৌবনে চোখের জ্যোতি হারাই। শব্‌নম সে জ্যোতি ফিরিয়ে এনেছে। আজ যদি কেউ বলে, শব্‌নমের ভালবাসার পথে আমি একটিমাত্র কাঁটা পুঁতলে আমার চোখের জ্যোতি ফিরে পাব তা হলে আমি সে প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দেব।

'প্রথম দিনই আমি বুঝতে পেরেছিলুম, সে ভালবেসে ফিরেছে। যখন ফিরে এল, তখনই শুনি তার গলা বদলে গিয়েছে, তার হাসি বদলে গিয়েছে, আমাকে আদর করার ধরন বদলে গিয়েছে। যেন এতদিন ছিল পাতার আড়ালে লুকানো ফুল—এখন তার উপর পড়েছে প্রভাত বেলার স্নিগ্ধ আলো। ঘরের কোণের প্রদীপ হঠাৎ যেন আকাশের বিদ্যুতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। তার নিশ্বাস-প্রশ্বাসে যেন নবীন মাধুরী এসে ধরা দিয়েছে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নূতন ছন্দে নূতন তালে নেচে উঠেছে।

'আমার থেকে দূরে চলে গেল? না, বাচ্চা, না। সেই তো প্রেমের রহস্য।

'এতদিনে বুঝতে পারল, আমি তাকে কতখানি ভালবেসেছি—তোমাকে ভালবাসার পর। আগে আমার কাছে আসত ঝড়ের মত, বেরিয়ে যেত

তীরের মত। এখন আমার সঙ্গে কাটায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তোমার বিরহ থেকে বুঝেছে, সে আড়ালে গেলে আমার কী দুশ্চিন্তা হয়। যে-বেদনা সে পেয়েছে, সেটা সে আমাকে দিতে চায় না। অথচ দুই ভালবাসার কত তফাত! আমার ভালবাসা স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকের মত, তোমার ভালবাসা মরুভূমিতে মরণাপন্ন তৃষ্ণার্তকে সঞ্জীবনী অমৃতবারি দেওয়ার মত।

'আমাকে কিছু বলে নি। আমিও জিজ্ঞেস করি নি। প্রেম গোপন রাখাতে যে গভীর আনন্দ আছে তার থেকে আমি তাকে বঞ্চিত করতে যাব কেন? শুনেছি প্রথম গর্ভধারণ করে বহু মাতা সেটা যত দিন পারে গোপন রাখে। নিভৃতে আপন মনে সেই ক্ষুদ্র শিশুটির কথা ধ্যান করতে করতে সে চলে যায় সেই স্বর্গলোকপানে, যেখান থেকে মুখে হাসি নিয়ে নেমে আসবে এই শিশুটি।

আমিও নিভৃতে অনেক চিন্তা করেছি, কে সে বীর যে শব্‌নমের চিত্তজয় করতে সক্ষম হয়েছে। তার সঙ্গে যাদের বিয়ে হতে পারে তাদের সবাইকে তো আমি চিনি। এদের কেউই নয়, সে-কথা নিশ্চয়।

বুঝলুম, কোন জায়গায় কোন বিপত্তি বাধা আছে তাই সে তোমাকে পুরোপুরি পাচ্ছে না। আমার বেদনার অন্ত রইল না। ওই একবার আমার নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মাল, কেন আমি জ্যোতিহীন হলুম। না হলে আমি তোমাদের বাধাবিঘ্ন সরিয়ে দিতুম না, যার সামনে দুজন দুদিক থেকে এসে থমকে দাঁড়িয়েছ?'

সে বেদনা আজ কেটে গিয়েছে বলে স্মরণে জানেমনের মুখ পরিতৃপ্তির স্মিত-হাস্যে কানায় কানায় ভরে উঠল।

আমি বললুম, 'আমি বিদেশী। আপনারা আমাকে হিমি—শব্‌নমের উপযুক্ত মনে করেন কি না সেই ভয়ে আমিও অসহায়ের মত মার খেয়েছি। আমি বুঝি।'

'তোমার গলাটি আমার ভারী পছন্দ হয়েছে। এখন তো ওই দিয়েই আমি মানুষকে চিনি। আরও কাছে এস বাচ্চা। আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দাও। শব্‌নম যে রকম দেয়। এ কি, তোমার হাত অত নরম কেন? প্রায় শব্‌নমের মত!'

আমি হেসে বললুম, 'বাঙলাদেশের লোক আপনাদের মত শক্তিশালী হয় না।'

'বাঙলাদেশ? তাই বল। তাই শব্‌নমের এত প্রশ্ন, হাফিজ বাঙলাদেশে

গেলেন না কেন, হাফিজের অর্থকষ্ট বাঙলার রাজা তো দূর করে দিতে পারতেন, আরও কত কি। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল, একদিন সে যখন এক অজানা কবির কবিতা পড়ে আমায় শোনাতে গেল। ভারী মধুর আর করুণ। ঠিক ফার্সী নয়, আবার ইউরোপীয় কবির ফার্সী অনুবাদ নয়। কেমন যেন চেনা চেনা অথচ অচেনা। আবার কেমন যেন এটা-ওটায় মেশানো। যেন গন্ধ গোলাপের, চেহারা কিন্তু নরগিসের, এ আবার বসন্তে না ফুটে ফুটেছে যেন শীতকালে। একটি কবিতা আমার বিশেষ করে মনে পড়ছে—"খুদ্‌-কুশী-ই-সিতারা"।' বৃদ্ধ থামলেন। যেন মনে মনে কবিতাটির চোখে-মুখে হাত বুলিয়ে নিলেন।

বুঝলুম, এটা 'তারকার আত্মহত্যা'।

আমি বললুম, 'এ কবির পিতা সুফী সাধক ছিলেন এবং অতি উত্তম ফার্সী জানতেন। কবি বাল্যবয়সে পিতার কোলে বসে বিস্তর ফার্সী গজল-কসীদা শুনেছেন। আসছে গ্রীষ্মে এখানে তাঁর আসবার কথা ছিল; বোধহয় আপনাদের কবি হাফিজ বাঙলাদেশে যেতে পারেন নি বলে বাংলার কবি তার প্রতিশোধ নিতে আসছিলেন। এখন তো সব-কিছু উলোট-পালোট হয়ে গেল।'

জানেমন্‌ বললেন, 'হাফিজের পাঁচ শ বছর পরে যোগাযোগ এসেছিল তোমাদের কবির মাধ্যমে। আরও ক'শ বছর লাগবে ফের এই যোগাযোগ হতে কে জানে? কে যেন এক বিদেশী জ্ঞানী দুঃখ করে বলেছেন, মানুষ একে অন্যকে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করে বেশী—দুজনের মাঝখানে সেতু বাঁধার চেষ্টা করে তার চেয়ে ঢের ঢের কম;—

হায় রে মানুষ
বাতুলতা তব
পাতাল চুমি;—
প্রাচীর যত না
গড়েছ, সেতু তো
গড়ো নি তুমি।

'তাই প্রার্থনা করি শব্‌নমে তোমাতে আজ যে সেতু গড়লে সেটি অক্ষয় হোক।'

আমি বললুম, 'আমেন—তাই হোক।'

এমন সময় খবর এল, ভোজে বরকে ডাকা হচ্ছে।

উঠবার সময় জানেমন্‌ আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমার যদি

একটা কথা বিশ্বাস কর, তবে বলি, শব্‌নমের মধ্যে এতটুকু খাদ নেই। ওকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলে তোমার কক্‌খনো কোনও ক্ষতি হবে না। মিথ্যা কখনও তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। শিশিরবিন্দুর মত সত্যই সে পবিত্র, স্বর্গ হতে সে এসেছে সম্পূর্ণ কলুষ-কালিমা মুক্ত হয়ে। আমি বুঝেছি, তুমিও বড় সরল প্রকৃতি ধর। তোমাদের মিলনে স্বর্গের আশীর্বাদ থাকবে।'

আমাকে উপহার দিলেন এক বিরাট বদখ্‌শানী রুবি। তার উপরে খোদাই সম্পূর্ণ কাবা শরীফের ছবি। এত বড় রুবি আর এ রকম সূক্ষ্ম খোদাই আমি কাবুল জাদুঘরেও দেখি নি অথচ আমি জানতুম, বদখ্‌শান আফগানিস্থানের প্রদেশ বলে কাবুলের জাদুঘরে রুবির যে সঞ্চয় আছে সেটি পৃথিবীতে অতুলনীয়।

বললেন, 'মনে যদি কখনও অশান্তি আসে তবে এটি আতশী কাচ দিয়ে দেখো। শুনেছি, জমজমের কুয়ো পর্যন্ত দেখা যায়। মাইক্রোস্কোপ দিয়ে নাকি জল ওঠাবার সাজসরঞ্জাম পর্যন্ত পরিষ্কার ফুটে ওঠে। এটি আমাদের পরিবারে ছ'শ বছর ধরে আছে। প্রার্থনা করি, কাবা যতদিন থাকবে, তোমাদের ভালবাসা ততদিন অক্ষয় থাকবে।'

'আমেন!'

তারপর আবার সব ঝাপসা। আবছায়া-আবছায়া মনে পড়ছে, ভোজে পাশে বসেছিল আমার ছাত্রটি। সে আমাকে এটা ওটা খাওয়াবার চেষ্টা করেছিল আর তার উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত আনন্দ সে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারছিল না। আমি নিজের অপ্রতিভ ভাব ঢাকার জন্য তাকে সংস্কৃতের 'হাঁহাং দত্যাৎ, হুঁহুঁং দত্যাৎ' এবং 'পরান্নং প্রাপ্য দুর্বুদ্ধে—' ফার্সীতে অনুবাদ করে মৃদু কণ্ঠে শুনিয়েছিলুম।

রাত প্রায় বারোটার সময় এক অপরিচিত নওজোয়ান আমাকে হাত ধরে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে তেতলার মুখে এক দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে বললে, 'বড়ই আফসোস, কি করে হৃদয়-দুয়ার ভেঙে নববরের—নওশাহের—নবীন বাদশার সিংহাসন লাভ করে অভিষিক্ত হতে হয় তার খবর আমি জানি নে। আমার সে সৌভাগ্য এখনও হয় নি। আপনাকে তাই কোন সদুপদেশ দিতে পারলুম না। তবে এটুকু জানি, শব্‌নম বানুর প্রসন্ন, অতিশয় সুপ্রসন্ন সম্মতি নিয়েই এই শুভ মুহূর্ত এসেছে। আজ পর্যন্ত কাবুল-কান্দাহার, জালালাবাদ-গজনীর কোন তরুণই সাহস করে শব্‌নম বানুর পাণি কামনা করতে পারে নি।

আপনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাই আপনি তরুণ সমাজের সুস্মিত অভিনন্দনসহ তাদের গর্বের ধনের সঙ্গে চারিচক্ষু মিলনে যাচ্ছেন। সুদিন এলে আমরা আপনাদের নিয়ে যে নয়া পরব করব তখন দেখতে পাবেন আপনি কারও দিলে এতখানি চোট না দিয়ে শব্‌নম বানুর দিল জয় করেছেন। এ রকম সচরাচর হয় না। শব্‌নম বানু অসাধারণ বলেই এই অসম্ভবটা সম্ভব হল। আবার অভিনন্দন জানাই।'

দরজা খুলে আমাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

সে ছবি আমি জীবনে কখনও ভুলব না।

যবে থেকে আমাদের এ-বিয়ে ঠিক হয়েছে তখন থেকে এ ছবিটি কি রকম হতে পারে তার নানা স্বপ্ন আমি সমস্ত দিন ধরে দেখেছি। বরযাত্রায় আসার সময়, বিয়েবাড়ির চাপা কলরব মৃদু গুঞ্জরণ, শাদি-মজলিসের গম্ভীর নৈস্তব্ধ্যে, এমন কি চাচা-জান যখন তাঁর স্নেহপ্লাবন দিয়ে আমার হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভাসিয়ে দিচ্ছিলেন তখনও—তখনও আমি একটার পর একটা ছবি মনে মনে এঁকেছি আর মুছেছি, মুছেছি আর এঁকেছি। কখনও দেখেছি সখীজন পরিবৃতা শব্‌নম বাসরঘরের কলগুঞ্জরণ মুখরিত উজ্জ্বলালোকে নববধূর অতিভূষণে জর্জরিতা, আভূমি বিনতা। আর কখনও দেখেছি সূচীভেদ্য অন্ধকার ঘরের একপ্রান্তে আমি জাত-মূর্খের মত দাঁড়িয়ে ভাবছি—কিংবা বলব, ভাবতেই পারছি নে, কি করা উচিত। হয়তো অনেক কষ্টে এদিক ওদিক হাতড়ে হাতড়ে আসবাবপত্রের ধারাল খোঁচা ধাক্কা খেয়ে খেয়ে কোনও গতিকে শব্‌নমের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, এমন সময়, এমন সময় হঠাৎ ঘরের চারিদিকে জ্বলে উঠল পঞ্চাশটা জোরাল টর্চ। সঙ্গে সঙ্গে অট্টরোল অট্টহাস্য। শব্‌নমের সখীরা চতুর্দিকের দেওয়ালের সঙ্গে গা মিশিয়ে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়েছিলেন এই শুভ মুহূর্তের জন্য। আলো জ্বালিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গাঁইয়া গান ধরলে,

'রুটি খায় নি, দাল খায় নি, খায় নি কভু দই,
হাড়-হাভাতে ওই এল রে—খাবে তোরে সই!
মরি, হায় হায় রে!'

কাবুলের বজ্র-বিগলন শীতে আমার মন ঘেমে ঢোল—না, না, ঢোল নয়, জগঝম্প।

সব ছবি ভুল, কুল্লে তসবির তালগোল পাকিয়ে প্রথমটায় পিকাস্‌সোতে পরিবর্তিত হয়ে অন্তর্ধান করল।

বিরাট ঘর। কাবুলের গৃহস্থ বাড়ির চারখানা বৈঠকখানা নিয়ে এই একটা ঘর।

তার সুদূরতম কোণে একটি গোল টেবিল। টেবিলক্লথ ভারী মখমলের—জমে-যাওয়া রক্তের কালচে লাল রঙের। তার উপরে সেই প্রাচীন যুগের গ্লোবওলা এক বিরাট রীডিং-ল্যাম্প। সমস্ত ঘর প্রায়ান্ধকার রেখে তার গোল আলো পড়েছে শব্‌নমের মাথার উপর, হাঁটুর উপর, পাদপীঠে রাখা তার ছোট্ট দুটি পায়ের উপর। ঠাণ্ডা মোলায়েম আলো—আর সেই আলোতে শব্‌নম বাঁ হাতে তুলে ধরে একখানা চটি বই পড়ছে।

শান্ত, নিস্তব্ধ, নির্দ্বন্দ্ব, গ্রন্থিমুক্ত বিশ্রান্তি।

ত্রিভুবনে আর যেন কোনও জনপ্রাণী কীটপতঙ্গ নেই শুধু একা শব্‌নম। সে প্রশান্ত চিত্তে অপেক্ষা করছে তার দয়িতের জন্য। সে আসছে দূর-দূরান্ত থেকে—যেখানে তৃতীয়ার ক্ষীণচন্দ্র গোধূলি লগনের তারাকে পাণ্ডু চুম্বন দিয়ে বাঁশবনের সবুজ নীড়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

আশ্চর্য! সে আমি। কে বিশ্বাস করবে সে আমি!

পা টিপে টিপে কিছুটা এগুতে না এগুতেই শব্‌নম মাথা তুলে আমার দিকে তাকালে। যত নিঃশব্দেই আমি এগুই না কেন, তার কান শুনতে পাক আর না-ই পাক, তার সদাজাগ্রত কোটিকর্ণ হৃদয় তো শুনতে পাবেই পাবে।

আমি দ্রুততর গতিতে এগুলুম। আমার হিয়ার বেগের সঙ্গে আমি পেরে উঠি কি করে?

শব্‌নম সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সিংহাসনই বটে। সেই কালচে লালের মখমলে মোড়া, সোনালী কাঁধ হাতলওলা, তার মাঝে মাঝে রয়েল ব্লুর মীনা দিয়ে আঙুরগুচ্ছ আঙুরপাতার নকশা কাটা সুউচ্চ সিংহাসন। বসবার সীট মাটি থেকে আট দশ ইঞ্চি উঁচু হয় কি না হয়, কিন্তু পিছনের হেলানো মানুষের মাথা ছাড়িয়ে আরও দু-মাথা উঁচু।

এই প্রথম শব্‌নম আমার সঙ্গে লৌকিকতা করে উঠে দাঁড়ালে।

আমার দিকে তাকিয়ে চোখ মুখ ঠোঁট গাল চিবুক নাসারন্ধ্র কানায় কানায় ভরে তুলে আমার দিকে তৃপ্তি দাক্ষিণ্য আর নর্মসম্ভাষণের মৃদু হাসি হাসলে।

গালের টোল কোন্ অতল গভীরে লীন হয়ে গিয়েছে। সেখানে অন্ধকার। আলো ঢুকতে পারে নি বলে? না, সেখানে কেউ এক ফোঁটা কাজল ঢেলে দিয়েছে বলে?

আজ শব্‌নম সেজেছে।

নববধূকে জবড়জঙ্গ করে সাজানোতে একটা গভীর তত্ত্ব রয়েছে। রূপহীনার দৈন্য তখন এমনই চাপা পড়ে যায় যে সহৃদয় লোক ভাবে, 'আহা, একে যদি সরল সহজভাবে সাজানো হত তবে মিষ্টি দেখাতো ; আর সুরূপার বেলাও ভাবে ওই একই কথা—না সাজালে তাকে আরও অনেক বেশী সুন্দর দেখাতো !'

শব্‌নমকে সেভাবে সাজানো হয় নি, কিংবা সেভাবে সে নিজেকে সাজাতে দেয় নি।

এ যেন পূর্ণচন্দ্রের দূরে দূরে কয়েকটি তারা ফোটানো হয়েছে—চন্দ্রের গরিমা বাড়ানোর জন্য। এ যেন উৎসব-গৃহের সৌন্দর্যের মাঝখানে ধূপকাঠি জ্বালানো হয়েছে। শব্‌নমের ভাষায় বলি, বাতাসে বাতাসে পাতা গোলাপ-সৌগন্ধ্যের মাঝখানে বুলবুলের বীথি-বৈতালিক।

তার চুলের বিচ্ছুরিত আলোর মাঝখানে থাকে থাকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বচ্ছ রূপালী শামা-প্রজাপতি। মাথায় অভ্র-আবীর ছড়ানো হয়েছে অশেষ সযত্নে, এক একটি কণা করে—তিন সখী বাসর গোধূলিতে আরম্ভ করে এইমাত্র বোধহয় কুন্তল প্রসাধন সমাপন করেছেন।

চোখের কোল, আঁখিপল্লব, ধনু-ভুরু এত উজ্জ্বল নীল কেন ? এ তো কাজল কিংবা সুর্মার রঙ নয়। এ যে এক নবীন জলুস। তবে কি নীলকান্তমণি চূর্ণ করে কাজলের কাজ করা হয়েছে ! তারই শেষ কয়টি কণা টোলের অতলে ছেড়ে দিয়েছে !

এঁকে বেঁকে নেমে-আসা দুই জুলফের ডগায় আবার সেই নীলমণি-চূর্ণ। একদিকে তুষারঅভ্র কর্ণশঙ্খ, অন্যদিকে রক্তকপোল।

সে কপোল এতই লাল যে আজ যেন কোনও প্রসাধন-প্রক্রিয়া দ্বারা সেটাকে ফিকে করা হয়েছে। বদখ্‌শানের রুবি-চূর্ণ দিয়ে ? তা হলে ঠোঁট দুটিকে টসটসে রসাল ফেটে-যায়-যায় আঙুরের মত নধর মধুর করে লালের এ-আভা আনা হল কিসের চূর্ণ দিয়ে ? এ রঙ তো আমি আমার দেশের বিম্ববিটপীর উচ্চতম শাখাতে পল্লববিতানের অন্তরালে দেখেছি—সেখানে মানুষের কলুষদৃষ্টি, দুষ্ট বালকের স্থূল হস্ত পৌঁছয় না।

ওষ্ঠ পূর্বভাগে, স্ফুরিত নাসারন্ধ্রের নিচে সামান্য, অতি সামান্য একটি নীলাঞ্জন রেখা। ভরা ভাদ্রের গোধূলি বেলা আকাশের বায়ু কোণে পুঞ্জে পুঞ্জে জমে ওঠা শ্যামাম্বুদে আমি দেখেছি এই রঙ। গভীর রহস্যে ভরা এই রঙ। তারই উপরে স্ফুরিত হচ্ছে শব্‌নমের দুটি ক্ষুদ্র নাসারন্ধ্র। নিচে অতি ক্ষীণ কম্প্রমান স্ফুরণ লেগেছে তার ওষ্ঠাধরে।

এই প্রথম দেখলুম তার চোখ দুটি। এ দুটি থেকে আগুনের ফুলকি বেরুতে দেখেছি, এ আঁখি দুটিতে আচম্বিতে জল ভরে ফেটে পড়তে দেখেছি, কিন্তু এ চোখ দুটিকে আমি কখনও দেখি নি। আজ এই প্রাচীন দিনের ল্যাম্প আমাদের মিলনের শুভলগ্নে ঠিক সেই আলোটি ফেললে যার দাক্ষিণ্যে আমি শব্‌নমের চোখ দুটি দেখতে পেলুম।

সবুজ না নীল? নীল না সবুজ? অতৃপ্ত নয়নে আমি সে দুটি আঁখির গভীরতম অতলে অনেকক্ষণ ধরে তাকালুম তবু বুঝতে পারলুম না সবুজ না নীল। হাঁ, হাঁ, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, হাঁ, দেখেছি বটে এই রঙ আসামের হাফ্‌লঙের কাছে। বড় বড় পাথরের মাঝখানে গিরিপ্রস্রবণ কুণ্ডের স্থির নীলজলের অতলে সবুজ শ্যাওলা। সেদিন ঠিক করতে পারি নি, কি রঙ দেখলুম, নীল না সবুজ—আজ বুঝলুম দুয়ের সংমিশ্রণে এমন এক কল্পলোকের রঙ প্রভাসিত হয় যে, সে রঙ ইহভূমের আর্টিস্টের পেলেটে তো নেই-ই, সৃষ্টিকর্তা যে আকাশে রঙ-বেরঙের তুলি বোলান তাতেও নেই।

শব্‌নমের স্মিত হাস্য ফুরোতে চায় না। কী মধুর হাসি!

কাবুলের মেয়েরা কি বিয়ের রাতে গয়না পরে না! শব্‌নম পরেছে সামান্য দু-তিনটি। তার সেই বিরাট খোঁপা জড়িয়ে একটি মোতির জাল। ঘনকৃষ্ণ কুন্তলদামের উপর স্তরে স্তরে, পাকে পাকে যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিমানীকণা ঝিলিমিলি মেলা লাগিয়েছে।

দু-কানে দুটি মুক্তোলতা ঝুলছে আর তার শেষপ্রান্তে একটি করে রক্তমণি রুবি। শুভ্র মরাল কণ্ঠের বরফের উপর যেন দু'ফোঁটা সদ্যঝরা তাজা রক্ত পড়েছে। এই, এখ্‌খুনি বুঝি রক্তের ফোঁটা দুটি ছড়াতে চুবসাতে আরম্ভ করবে।

কাবুলী কুর্তা গলা-বন্ধ হয়—বিশেষ করে মেয়েদের। আজ দেখি, গলা অনেকখানি নিচে ঘুরিয়ে কাটা হয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে একটি মোতির মালা। তার শেষপ্রান্তে কি, দেখতে পেলুম না। সেটি জামার ভিতরে। সে কী সৌভাগ্যবান! এই এতদিনে বুঝতে পারলুম কালিদাস কোন্ দুঃখে বলেছিলেন, 'হে সৌভাগ্যবান মুক্তা, তুমি একবার মাত্র লৌহশলাকায় বিদ্ধ হয়ে তার পর থেকেই প্রিয়ার বক্ষ-দেশে বিরাজ করছ; আমি মন্দভাগ্য শতবার বিরহশলাকায় সছিদ্র হয়েও সেখানে স্থান পাই নে।'

শব্‌নমের পরনে সাটিনের শিলওয়ার, কুর্তার রঙ ফিকে লাইলেক, ওড়না কচি কলাপাতা রঙের, এবং দুধে-আলতা সংমিশ্রণের মত সেই কচি কলাপাতা রঙের সঙ্গে দুধ মেশানো। ইতস্তত রূপালী জরির চুমকি। কলাবনে জোনাকির

দেয়ালি।

শব্‌নমের স্মিত হাস্য অন্তহীন। আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছি।

হাসতে হাসতে আমাকে গভীর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে আমার ঠোঁটের উপর তার স্ফুরিতাধরোষ্ঠ চেপে ধরে যেন অতৃপ্ত আবেগে আমার পাণ্ডুর অধরের শেষ রক্তবিন্দু শুষে নিতে লাগল।

আমি মোহ্যমান, কম্প্রবক্ষ, বেপথুমান। আমার দৈহিক স্পর্শকাতরতা অস্তমিত। আমার সর্বসত্তা শব্‌নমে বিলীন।

কোন্ দিগন্তে সে আমায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল, কোন্ তারা নির্ঝরের ছায়াপথে সে আমায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে, কোন্ সপ্তর্ষির তারাজাল ছিন্ন করে কোন্ কোন্ লোকে নিয়ে গিয়েছিল জানি নে। অচৈতন্য অবস্থায় দেখি, আমি শব্‌নমের সিংহাসনে বসে আছি, সে আমার কোলে আড়াআড়ি হয়ে বসে, তার বুক আমার বুকের উপর রেখে, ডান হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে, বাঁ হাত দিয়ে আমার গাল বুলোতে বুলোতে, তার মুখ আমার কানের উপর চেপে ধরে শুধোচ্ছে, 'খুশী? খুশী? খুশী? খু…???'

আমি আলিঙ্গন ঘনতর করে বলেছিলুম, 'আমি তোমার গোলাম। আমাকে তোমার সেবার কাজ দাও।'

শুধিয়ে চলেছে, 'খুশী? খুশী? খুশী—'

আমি বললুম, 'আল্লা সাক্ষী, আমি প্রথম যেদিন তোমাকে ভালবেসেছি সে দিন থেকে শত বিরহ-বেদনার পিছনেও খুশী। তুমি জান না, তুমি আছ, এতেই আমি খুশী। প্রথম দিনের প্রথম খুশীর প্রথম নবীনতা বারে বারে ফিরে আসছে।'

শব্‌নম গুনগুন করে ফরাসীতে গাইলে,

'করেছি আবিষ্কার
তোমারে ভালবাসিবার
প্রথম যেমন বেসেছিনু ভালো, সেই বাসি প্রতিবার।'

'নয় কি?'

আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই বললে, 'দাঁড়াও! আলো জ্বালি।'

আমার কথায় কান না দিয়ে ঘরের প্রায়ান্ধকার কোণ থেকে নিয়ে এল আঁকশি। তার ডগার ন্যাকড়ায় কি মাখানো জানি নে। শব্‌নম আনাড়ী হাতে দেশলাই জ্বালিয়ে সেটার কাছে নিতেই দপ্ করে জ্বলে উঠল। সেই জ্বলন্ত আঁকশি দিয়ে সে ঝাড়বাতির অগুনতি মোমবাতি জ্বালালে। ঘরের দেয়ালে দামী ফরাসী সিল্কের ওয়াল-পেপারে সে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখ

ধাঁধিয়ে দিলে।

আমার পায়ের কাছে পাদপীঠে বসে বললে, 'তুমি নূতন রাজা এসেছ, তোমাকে বরণ করার জন্য সব কটা আলো জ্বালতে হয়। যে বেশ পরেছ, তার জন্য এ আলোর প্রয়োজন। কী সুন্দরই না তোমাকে—'

'থাক্।'

'চুপ!—দেখাচ্ছে। আমার ওস্তাদের মেয়ের রুচি আছে।'

আমি বললুম, 'তোমাদের কবি হাফিজই তো বলেছেন।—

"বলে দাও বাতি না জ্বালায় আজি, আমোদের নাহি সীমা,
আজ প্রেয়সীর মুখ চন্দ্রের আনন্দ-পূর্ণিমা" '

(সত্যেন দত্ত)'

শব্‌নম বললে, 'ওঃ, হাফিজ! তিনি তো বলেছেন "আজ বাতি জ্বালিয়ো না—" অর্থাৎ তার পরব মাত্র দিনের তরে। আমাদের পরব হবে প্রতি রাত্রি। তাই আজ রাত্রের আনুষ্ঠানিক আলো মাত্র একবারের তরে জ্বালিয়ে দিলুম। ভয় করো না, তাও নিভিয়ে দিচ্ছি এখ্‌খুনি।'

আমি খুশী হয়ে বললুম, 'টেবিল ল্যাম্পের ওই ঠাণ্ডা আলোতে তোমাকে কী অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল কি বলব? মাথার চুল থেকে খালি পায়ের নখের ডগাটি পর্যন্ত কী এক অদ্ভুত রহস্যময় অথচ কী এক অনাবিল শান্তিতে ভরপুর হয়ে বিভাসিত হচ্ছিল, কি করে বোঝাই? আচ্ছা, মোজা-ছাড়া পায়ে তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না—বাইরে যা শীত!'

অবাক হয়ে বললে, 'বা রে! তুমি যে বলেছ আমার খালি পা দেখতে তোমার ভালো লাগে।'

আমি আপসোস করে বললুম, 'তোমার কতটুকু দেখতে পাই?'

চোখ পাকিয়ে বললে, 'চোপ! দুষ্টুমি করো না। চোখ ঝলসে যাবে। সেমেলে যখন জুপিটারের দেবরূপ দেখতে চেয়েছিলেন তখন তাঁর কি হয়েছিল জান না?'

আমি শুধালুম, 'কি হয়েছিল?'

'আলোতে পোকা পড়লে যেরকম ফট্ করে ফেটে যায়—তাই হয়েছিল! প্রত্যেক মানুষই জুপিটার। তার দেবরূপ উন্মোচন করা বিপজ্জনক। জান, তাকাতে গিয়ে আমারই মাঝে মাঝে ভয় হয়।'

ফুরুৎ করে উড়ে গিয়ে কোথা থেকে সিগারেট এনে ঠোঁটে চেপে, আনাড়ী ধরনে দেশলাই ধরিয়ে কাশতে কাশতে আমায় দিয়ে বললে, 'ভালো না লাগলে

ফেলে দিয়ো।'

এ দুর্দিনে এরকম সোনামুখী খুশবোদার মিশরী সিগারেট পেল কোথায়?

বললে, 'জানেমন্‌ তিন মাস অন্তর অন্তর তিন তিন হাজার করে মিশর থেকে আনায়। আমাকে ধরাবার চেষ্টা করেছিল—পারে নি। কিন্তু কেউ খেলে সিগারেটের গন্ধ আমার ভালোই লাগে। ন্যাকরা করে ওয়াক্‌, থুঃ বলতে পারি নে।'

আমি বললুম, 'সর্বনাশ। এই সুপার স্পেশাল সিগারেট যিনি খান তাঁর জন্যে তুমি এনেছিলে আমার সেই ওঁচা সিগারেট!'

বললে, 'আমার বন্ধুর সিগারেট। জানেমন্‌ দুটো ধরিয়ে একটা আমাকে দিয়ে বললে, "এ সিগারেট খেতে তো তোর আপত্তি হবে না"।'

আমি শঙ্কিত হয়ে শুধালুম, 'তুমি কি বলেছিলে?'

'নির্ভয়ে বলেছিলুম, "লব-সুখ্‌তে!"—পোড়ার ঠোঁটো, পোড়ার মুখো, যা খুশী বলতে পার। ওই পোড়ার সিগারেট খেয়ে খেয়ে জানেমন্‌ তার ঠোঁট মভ্‌ করে ফেলেছে, দেখ নি?'

আমি শুধালুম, 'তন্ময় হয়ে কি পড়ছিলে? "গুড্‌ বাই টু ফ্রীড্‌ম"?'

বললে, 'সে কি? বরঞ্চ তোমার লীলা খেলা বন্ধ হল। কিন্তু আগে বলি, তোমার নিশ্চয়ই হাসি পাচ্ছে, একই কনেকে দু-দুবার বিয়ে করছ বলে? আমারও পাচ্ছিল।—হঠাৎ মনে পড়ল, তোমাকে বলেছিলুম, তুমি দ্বিচারী—তুমি বাস্তবে আমাকে আদর কর, আর স্বপ্নে আরেক জনকে। আল্লাতালা তাই একই শব্‌নমের সঙ্গে তোমার দু-দুবার বিয়ে দিয়ে তোমাকে দ্বিচারী বদনাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন। স্বপ্নের শব্‌নম আর বাস্তবের হিমিকা এক হয়ে গেল। না?'

আমি বললুল, 'অতি সূক্ষ্ম যুক্তিজাল। কিংবা বলব হৃদয়ের ন্যায়-শাস্ত্র—নব্য "নব্য-ন্যায়"। তোমাকে তো বলেছি, হৃদয়ের যুক্তি তর্কশাস্ত্রের বিধিবিধানের অনুশাসন মানে না। আকাশের জল আর চোখের জল একই যুক্তিকারণে ঝরে না।'

আশ্চর্য হয়ে বললে, 'এ কথাটা তুমি আমাকে কক্‌খনো বল নি। এ ভারী নূতন কথা।'

আমি বললুম, 'হবেও বা, কারণ কোন্‌টা আমি তোমাকে বলি আর কোন্‌টা নিজেকে বলি এ দুটোতে আমার আকছারই ঘুলিয়ে যায়।'

আমার হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে শব্‌নম অনেকক্ষণ ধরে আমার দিকে

তাকিয়ে রইল।

আমি আশ্চর্য হয়ে চিন্তা করতে লাগলুম, শব্‌নম কি গিরগিটি? সে যেমন দেহের রঙ বদলায় সেই রকম শব্‌নম চোখের রঙ ঘড়ি ঘড়ি বদলাতে পারে। আলোর ফেরফারে তো এত বেশী অদলবদল হওয়ার কথা নয়। এখন তো দেখছি শ্যাওলার ঘন সবুজ, অথচ এই অল্প কিছুক্ষণ হল দেখেছি একেবারে স্বচ্ছ নীল। তবে কি ওর হৃদয়াবেগ, চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখের রঙও বদলায়! স্থির করলুম লক্ষ্য করে দেখতে হবে।

আমি মাথা নিচু করে, দুহাত দিয়ে তার মাথা তুলে, তার ঠোঁটের উপর ঠোঁট রাখলুম। আমার চোখ দুটি তার চোখের অতি কাছে এসে নিবিড় দৃষ্টিতে তার চোখের অতলে পৌঁছে গিয়েছে। শব্‌নম অজানা আবেশে চোখ দুটি বন্ধ করলে।

কতক্ষণ চলে গেল কে জানে? বুকের ঘড়ি যেন প্রতি মুহূর্তে প্রহরের ঘণ্টা বাজাচ্ছে। হিমিকাকে এই আমার প্রথম চুম্বন।

অনেকক্ষণ পরে, বোধহয় একশ বছর পরে, শব্‌নম তার ঠোঁট যতখানি সামান্যতম সরালে কথা বলা যায় সেটুকু সরিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'চুমো খাওয়া তোমাকেই সাজে। সেই নদীপাড়ে প্রথম হার মানার পর আমি মনস্থির করেছিলুম, সব জিনিস আমি দেব, আর তুমি নেবে। চুমো খাব আমি, আলিঙ্গন করব আমি, আর তোমাকে যে তোমার ছেলেমেয়ে দেব আমি, সে তো জানা কথা। এখন দেখছি, তা হয় না। চুমো খাওয়া পুরুষেই সাজে।'

আমি বললুম, 'কিন্তু আমি যদি বলি, তুমি যখন আমাকে চুমো খাও তখন আমার কাছে সেটা অনন্তগুণ মধুময় বলে মনে হয়?'

'বাঁচালে—' বলে ঠোঁটে ঠোঁট রেখে চাপ দিলে নিবিড় আবেশে।

জানি নে, কতক্ষণ, বহুক্ষণ পরে দেখি, শব্‌নম আমার কোলে মাথা রেখে যেন ঘুমুচ্ছে। বললে, 'আমার খোঁপাটা খুলে দাও।'

তারপর হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে আবার উড়ে গিয়ে ফিরে এল ফিরোজা রঙের চীনা কাচের একটি ডিকেণ্টার হাতে করে। কাচের ফিকে রঙের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে কড়া লালের বেগনী আভা।

বললে, 'পার্দনে মোয়া মঁশেব্—মাপ কর দোস্ত্—একদম ভুলে গিয়েছিলুম, তুমি আমার গালের টোল ভরে শীরাজী খেতে চেয়েছিলে।'

আমি রীতিমত ভয় পেয়ে বললুম, 'করেছ কি? এটা যোগাড় করতে গিয়ে জানাজানি হয় নি?'

শব্‌নম হেসে ফেটে আটখানা। বললে, 'তুমি কি ভেবেছ, তুমি মোল্লা-বাড়িতে বিয়ে করেছ? রাজা তিমুর থেকে আরম্ভ করে বাবুর হুমায়ুন—কে শরাব খেয়ে টং হয় নি বল তো? এ বাড়িতে আমার ঠাকুর্দা পর্যন্ত। তাঁর জমানো মাল এখনও নিচে যা আছে তা দিয়ে তিন পুরুষ চলবে।'

আমি বললুম, 'আমার দরকার নেই। আমি হাফিজের চেলা। তিনি বলেছেন,

"শর্করা মিঠা, আমারে বল না, হিমি! আমি তাহা জানি"—'

সঙ্গে সঙ্গে শব্‌নম গেয়ে উঠল,

'তবু সবচেয়ে, ভালবাসি ওই, মধুর অধরখানি!'

আমি বললুম, 'তুমি যে এত আলো জ্বালিয়েছ—তারও দরকার নেই—

"বলে দাও, বাতি না জ্বালায় আজি, আমোদের নাহি সীমা"—'

সেই আঁকশির উল্টো দিক দিয়ে আলো নেবাতে নেবাতে গুনগুন করে বার বার শব্‌নম গাইলে,

'আজ প্রেয়সীর মুখচন্দ্রের আনন্দ-পূর্ণিমা।'

তারপর ঘরের কোণ থেকে সেতার এনে আমার কোলের উপর বসে তার খোলা চুল আমার বুকের উপর ছেয়ে দিয়ে সমস্ত গজলটি বার বার অনেকবার গাইলে। তন্ময় হয়ে শেষের দুটি ছত্র অনেকক্ষণ ধরে, কখনও গুনগুন করে, কখনও বেশ একটু গলা চড়িয়ে গাইলে,

'প্রিয়ারে ছাড়িয়া থেকো না হাফিজ! ছেড় না অধর লাল
এ যে গোলাপের চামেলির দিন—এ যে উৎসব-কাল!'

আমি একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললুম, 'তোমার এত গুণ! তোমাকে আমি কোথায় রাখি। সুন্দর ইউসুফ শুধু যে সে-যুগের সব চেয়ে সুপুরুষ ছিলেন তাই নয়, তাঁর মত দূরদৃষ্টি নিয়ে জন্মেছিল অল্প লোকই, এবং সব চেয়ে বড় ছিল তাঁর চরিত্রবল। তাই তাঁর মা'র কোল থেকে কেড়ে নিয়ে তাঁকে বসিয়ে দিলে, সেই সুদূর মিশরের রাজ-সিংহাসনে।'

শব্‌নম বললে, 'হ্যাঁ। আর তাই মাতৃভূমি কিনানের স্মরণে,

"মিশর দেশের সিংহাসনেতে বসিয়া ইসুফ্ রাজা
কহিত, হায়রে! এর চেয়ে ভাল কিনানে ভিখারী সাজা!" '

দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে হাতে ধরে নিয়ে গেল দক্ষিণের দেয়ালের দিকে। থিয়েটারের পরদার মত একখানা মখমলের পরদা ছিল ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি ঝোলানো। একটানে সেটা সরাতেই সামনের খোলা পৃথিবী

তার অসীম সৌন্দর্য নিয়ে আমাকে একেবারে বাক্যহারা করে দিল।

দুখানা চেয়ার পাশাপাশি রেখে আমায় শুধালে, 'শীত করছে?'

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই পুস্তিনের একখানা ফারকোট দুজনার জানু থেকে পা অবধি জড়িয়ে দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে।

এ সৌন্দর্য শুধু শীতের দেশেই সম্ভবে।

সমুদ্রের জল আর বেলাভূমির বালির উপরে পূর্ণিমার আলো প্রতিফলিত হয়ে যে জ্যোৎস্না চোখ ধাঁধিয়ে দেয় এখানে যেন তারই পৌনঃপুনিক দশমিক—এখানে শত শত যোজন-জোড়া নিরন্ধ্র সর্বব্যাপী ধবলতম ধবল বরফের উপর প্রতিফলিত হয়ে এক পক্ষের পূর্ণচন্দ্র যেন শত পক্ষের জ্যোতি আহরণ করেছেন, হিমানী-যোগিনী উমারানীর এক বদন-ইন্দু চৌষট্টি যোগিনীর মুখেন্দীবর দীপান্বিতায় রূপান্তরিত হচ্ছেন।

দূরে পাগমান পর্বতের সানুদেশ, চূড়া—তারও দূর দিগন্তে হিন্দুকুশের অর্ধ-গগনচুম্বী শিখর, কাছে শিশির ঋতুর নিদ্রাবিজড়িত বিসর্পিল কাবুল নদী, আরও কাছের সুপ্তিময় নিষ্প্রদীপ গৃহ-গবাক্ষ চন্দ্রশালা-হর্ম্যমালা, পল্লবহীন নগ্ন বৃক্ষ, হৃত-পত্র শাখা-প্রশাখা, উদ্বাহু মিনার-মিনারিকা, বিপরীতার্ধডিম্ব গম্বুজ, গোরস্তানের শায়িত সারি সারি কবরের নামলাঞ্ছন-প্রস্তর-ফলক—সর্ব সৌন্দর্য সর্ব বিভীষিকা, সর্ব সর্বাধিকারীর অলঙ্কার, সর্ব সর্বহারার দৈন্য, ভদ্রাভদ্র সকলের উপর নির্বিচারে প্রসারিত হয়েছে তুষারের আস্তরণ। আকাশের মা-জননী যেন এক বিরাট শুভ্র কম্বল দিয়ে তাঁর একান্নপরিবারের ধনীদরিদ্র রাজা-প্রজা তাঁর সর্বসন্তান-সন্ততিকে আবরিত করে তাদের পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়েছেন।

কী নৈঃশব্দ্য, নৈস্তব্ধ্য! রাজপথের দ্বিতীয়যামের মদ্যানুরাগী, সখা, কন্দর্প সঙ্গীতস্তনিত গণিকাবল্লভ সকলেই একই প্রিয়ার গভীর আলিঙ্গন-সোহাগে সুষুপ্ত—সে প্রিয়া গৃহকোণের তপ্ত শয্যা। রাজপ্রাসাদের দুর্গপ্রাকারের প্রহর ডিণ্ডিম নিস্তব্ধ। কল্য উষার মধুর-কণ্ঠ মুআজ্জিন অদ্য নিশার নিদ্রাস্তরণে আকণ্ঠ বিলীন।

গম্ভীর প্রহেলিকাময় এ দৃশ্য। কে বলে একা, একটিমাত্র রঙ দিয়ে ছবি আঁকা যায় না? কে বলে একা একমাত্র, সা স্বর দিয়ে গান গাওয়া যায় না? কে বলে একা, একটি ফুল ভুবন পুলকিত করতে পারে না? এই সর্বব্যাপী শুভ্রতা-সৌরভে যে সঙ্গীত মধুরিমা আছে সে তো মানুষের সর্ব-চৈতন্যে প্রবেশ করে তাকেও বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে একাত্মদেহ করে দেয়। সৃষ্টিরহস্য তখন তার কাছে আর প্রহেলিকা থাকে না—সে তখন তারই

অংশাবতার। আমার হৃদয় তখন সে সৌন্দর্যে অবগাহন করতে করতে হিন্দুকুশ পেরিয়ে আমুদরিয়া তাশকন্দ ছাড়িয়ে বৈকালী হ্রদের কূলে কূলে সন্তরণ করছে।

আমাদের মাথার উপর পূর্ণচন্দ্র। এতক্ষণে আমার চোখ থেকে টেবিল ল্যাম্পের শেষ জ্যোতিঃকণার রেশ কেটে গিয়েছে। দেখি, প্রখর চন্দ্রালোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে শব্‌নমের সিত ভালে, স্ফুরিত নাসিকারন্ধ্রে, ঈষতার্দ্র ওষ্ঠাধরে, সমুন্নত কঞ্চুলিকা শিখরাগ্রে। বেলাতটের নীলাভ কৃষ্ণাম্বুর মত তার চোখের তারায় গভীর নৈস্তব্ধ্য। গিরিকুমারীর মরালগ্রীবা, হিন্দুকুশ গিরির মতই ধবল-শুভ্র। এতদিনে বুঝতে পারলুম অক্ষতযোনি গৌরীকে কেন গিরিরাজতনয়া বলে কল্পনা করা হয়েছে।

পূর্ণচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললুম, 'হে কম্‌রুল কওকাব্‌। এই কম্‌রুন্নিসাকে আশীর্বাদ কর। হে ইন্দুবর—না, না,—হে ইন্দুমৌলি, তুমি একদা গিরিকুমারীর শুভ্রশুচিতার চরম মূল্য দিয়েছিলে। আজ এই কাবুলগিরিকন্যাকে তুমি তোমার প্রসন্ন দক্ষিণ মুখ দেখাও। আমাদের বাতায়নপ্রান্তে এসে তোমার ইন্দীবর নয়ন উন্মীলন করে দেখ, এই কুমারীর কটিতট তোমারই মত, হে নটরাজ, তোমারই ডমরুকটির মত ক্ষীণচক্র—

"হেন ক্ষীণ কটি এ তিন ভুবনে নটরাজে শুধু রাজে
এ হিমা প্রতিমা আমারে বরিয়া নাহি যেন মরে লাজে।"

শব্‌নম আবার সেই প্রথম দর্শনের দীর্ঘ স্মিতহাস্য দিয়ে ঘরের ভিতর চন্দ্রালোক এনে শুধালে, 'আমার নূর-ই-চশম্‌—আঁখির আভা,—কি ভাবছ?'

আমি বললুম, 'গিরিরাজ হিন্দুকুশকে বলেছিলুম, তোমার মঙ্গল কামনা করতে।'

'সে কি বুৎ-পরস্তী—প্রতিমাপূজার শামিল নয়?'

'আলবত নয়। আমি যখন আমার বন্ধুকে বলি, আমার মঙ্গল কামনা কর, তখন কি আমি তার পূজো করি? আমি যখন গিয়াস-উদ্‌-দীন চিরাগ-দিল্লির কবরে গিয়ে বলি, "হে খাজা, তুমি আমার মঙ্গল কামনা কর", তখন কি আমি তাকে খুদা বানাই? অজ্ঞজন যখন মনে করে ওই গোরের কোন অলৌকিক শক্তি আছে, অর্থাৎ গোরেই আল্লার অংশ বিরাজ করছে তখনই হয় বুৎ-পরস্তী।'

আপন মনে একটু হেসে নিয়ে বললুম, 'আর এই বুৎ-পরস্তী আরম্ভ হয় তোমাদের দেশেই প্রথম। আজ যে অঞ্চলের নাম জালালাবাদ তারই নাম সংস্কৃতে গান্ধার—'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। মনে পড়েছে। এখনও জালালাবাদের বকরী-ছাগলকে

কাবুল-বাজারে বলে বুজ্-ই গান্ধারী। তার পর বল।'

'আলেকজাণ্ডারের গ্রীক সৈন্যরা যখন সেখানে থাকার ফলে বৌদ্ধ হয়ে গেল তখন তারাই সর্বপ্রথম গ্রীক দেব-দেবীর অনুকরণে বুদ্ধের মূর্তি গড়ে তাঁর পুজো করতে লাগল—ভারতবর্ষের আর সর্বত্র তখনও বুদ্ধের মূর্তি গড়া কড়া মানা, এমন কি বুদ্ধকে অলৌকিক শক্তির আধার রূপে ধারণা করে তাঁকে আল্লার আসনে বসানো বৌদ্ধদের কল্পনার বাইরে। সেই গ্রীক বৌদ্ধমূর্তি হিন্দুস্থানে ছড়িয়ে পড়বার পর, পরবর্তী যুগে সেই আর্টের নাম হল গান্ধার আর্ট।'

ভারি খুশি হয়ে বললে, 'ওঃ! আমরা মহাজন।'

আমি আরও খুশি হয়ে বললুম, 'বলে! এখনও কাবুলীরা আমাদের টাকা ধার দেয়।'

গম্ভীর হয়ে বললে, 'সে কথা থাক।' আরেকদিন এ কথা উঠলে পর শব্‌নম বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'ভারত আফগান উভয় সরকারে মিলে এ বদামি বন্ধ করে দেওয়া উচিত।'

'আর তোমাদের মেয়ে গান্ধারী আমাদের ছেলে ধৃতরাষ্ট্রকে বিয়ে করেছিল। তাদের হয়েছিল একশটা ছেলে আর একটি মেয়ে।'

'ক'টি বললে?'

'একশ এক।'

আমার হাঁটুতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বললে, 'হায়, হায়! আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। আমি স্থির করেছিলুম, আমিই তোমাকে একশটা আণ্ডা-বাচ্ছা দেব। এখন কি হবে?'

আমি আনমনে বাঁ হাত তার গ্রীবার উপর রেখে চুলে পাক মেরে ডান হাতে ডগাগুলো পাকের ভিতর ঢুকিয়ে চাপ দিতেই খাসা এলো-খোঁপা হয়ে গেল।

শব্‌নম আপন জীবন মরণ সমস্যার কথা ভুলে গিয়ে, ফার্ কোটের ঢাকনা ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে শুধালে, 'তিনসত্যি করে বল, তুমি ক-জন মেয়ের খোঁপা বেঁধে দিয়ে দিয়ে এ রকম হাত পাকিয়েছ?'

আমি অপাপবিদ্ধ স্বরে বললুম, 'মায়ের হাত জোড়া থাকলে আমাকে খোঁপাটা শক্ত করে দিতে বলতেন।'

আস্তে আস্তে ফের পাশে বসে বললে, 'যাক্! তোমার উপস্থিত বুদ্ধি আছে।'

অর্থাৎ বিশ্বাস করল কি না তার ইস্‌পার-উস্‌পার হল না।

আমি বললুম, 'তুমি সেদিন আমার হাত টিপতে টিপতে বললে, আমার হাত

বড্ড নরম। আমি সরল ইমানদার মানুষ—কই আমি তো শুধাই নি, তুমি ক-জন পুরুষের হাত টিপে টিপে এ তত্ত্বটা আবিষ্কার করলে?'

'বিস্তর। আব্বা, জানেমন্—এ যাবৎ। টিপে দেব আরও বিস্তর। তোমার আব্বা—বল তো ভাই, তোমার জানেমন্ কজন?'

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললে, 'ছিঃ! শওহরের সঙ্গে প্রথম রাত্রে তর্ক করতে নেই। তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে না, কি বই পড়ছি, যখন ঘরে ঢুকলে? আমার এক সখী বইখানা টেবিলের উপর রেখে গিয়েছিলেন। 'শব্-ই-জুফ্‌ফাফ্'—'বাসররাত্রি'। আল্লা-রসুলের দোহাই দিয়ে বিস্তর ভালো কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এ বইয়ের লেখক একটা উপদেশ দিয়েছে পঞ্চাশ বার—"শওহরের ভালো মন্দ বিচার করতে যেয়ো না। তিনি আল্লার দেওয়া উপহার।" '

আমি পরম পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললুম, 'এ লেখক শতায়ু হন, সহস্রায়ু হন। আমি নিশ্চিন্ত হলুম—কারণ আমি—'

বাধা দিয়ে বললে, 'তুমি একটু চুপ কর তো। আমি তোমাকে যে-কথা বলবার জন্য জানলার কাছে নিয়ে এসেছিলুম সেইটের আখেরী সমাধান করতে চাই—এ নিয়ে যেন আর কোনদিন কোনও বাক্-বিতণ্ডা না হয়।'

আমি সত্যই ভয় পেয়ে বললুম, 'আমি যে ভয় পাচ্ছি, হিমিকা।'

'আবার! শোন।

'ওই যে পূর্ণচন্দ্র তাকে সাক্ষী রেখে বলছি—'

আমি জুলিয়েটের মত তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললুম, 'না, না, ওকে না। বরঞ্চ তুমি ফজরের আজানের পূর্বেকার শব্‌নম হিমিকার নাম করে—'

'তা হলে তোমার প্রিয় গিরিরাজ হিন্দুকুশের উপর যে চির হিমিকা বিরাজ করছে, প্রচণ্ডতম নিদাঘেও যার ক্ষয়ক্ষতি হয় না—তাকে সামনে রেখে বলছি, তার দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি আত্মাবমাননা করো না, নিজেকে লঘু করে দেখো না। কুমারী কন্যা যে রকম প্রহরের পর প্রহর ধরে বছরের পর বছর আপন দয়িতের স্বপ্ন দেখে, মাতা যে রকম প্রথম গর্ভের কণিকাটিকে সোহাগ-কল্পনায় প্রতিদিন রক্তমাংস দিয়ে গড়ে তোলে, ঠিক তেমনি আমি তোমাকে তৈরি করেছি, সেই যে-দিন আমি প্রথম বুঝলুম, আমি অসম্পূর্ণ, আমি নিদ্রিতা শাহজাদী, আমি অন্ধ প্রদীপ, আমার দয়িত রাজপুত্র দূরদূরান্ত আমার প্রতীক্ষা-দিনান্তের ওপার থেকে এসে আমাকে সঞ্জীবিত করবে, অশ্রুজল সিঞ্চন করে করে আমি যে প্রেমের বল্লরী বাড়িয়ে তুলেছি, তারই করুণ করস্পর্শে পুষ্পে পুষ্পে

মঞ্জরিত হবে সে একদিন—আকাশ-কুসুম চয়ন করে করে রচেছি তার জন্ম আমার শব্-ই-জুফ্‌ফাফের ফুলশয্যা, প্রার্থনা করেছি, সে রাত্রে যেন পূর্ণচন্দ্র গিরিশিখরের মুকুটরূপে আকাশে উদয় হয়। সূর্যের প্রেম পেয়ে সে হয় ভাস্বর, আমার অন্ধবদনও তেমনি জ্যোতির্ময় হবে আমার বঁধুর ওষ্ঠাধরের সামান্যতম ছোঁয়াচ লেগে।

'তাই যখন তোমাকে প্রথম দেখলুম তখন আপন চোখকে বিশ্বাস করতে পারি নি।

'আমি আমার হৃদয়ে ঝাপসা ঝাপসা যে স্কেচ এতদিন ধরে এঁকেছিলুম এ যেন হঠাৎ ভাস্করের হাতে পরিপূর্ণ নির্মিত মূর্তি হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। চিন্ময় মৃত্ত সৌরভ যেন মৃন্ময় নিকুঞ্জবনের কুসুমদানে রূপান্তরিত হল।

'টেনিস কোর্টে তাই তত সহজে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারছিলুম কিন্তু সমস্তক্ষণই ভাবছিলুম অন্য কথা—

'মৃন্ময় চিন্ময় হয় সে আমি জানি। কি যেন এক ফলের কয়েক ফোঁটা রসকে শুকিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে করা হল ধুঁয়ো। তারই আড়াই পাক মগজের সেল্‌কে আলতো আলতো ছুঁতে না ছুঁতেই পথের অন্ধ ভিখারী দেখে, সে রাজ-বেশ পরে শুয়ে আছে বেহেশ্‌তের হুরীর কোলে মাথা দিয়ে। প্রণয়পীড়ায় ব্যথিত আতুর ক্রন্দন-প্রেয়সী হুরীরানী তারই দিকে তাকিয়ে আছে, করুণ নয়নে পথের ভিখারীর মত, যেন অভাগিনীর প্রেম-নিবেদন পদদলিত না হয়!

'অতদূর যাই কেন, আর এ তো নেশার কথা।

'একটি অতি তুচ্ছ কালো তিল। শীরজবাসিনী তুর্কী রমণী সাকীর গালে সেইটি দেখে হাফিজ তন্মুহূর্তেই তার বদলে সমর্‌কন্দ্‌ আর বুখারা দিয়ে ফকীর হয়ে গোরস্তানে গিয়ে বসে রইলেন।

'কিন্তু চিন্ময় মৃন্ময় হয় কি করে?

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি, বুঝেছি। পরে বুঝেছি, আরোও ভাল করে, মর্মান্তিক-রূপে—কান্দাহারে। আমার হৃদয়-বেদনা তো সম্পূর্ণ চিন্ময়। তারই পেয়ালা যখন ভরে যায় তখন সে উপচে পড়ে আঁখি-বারি রূপে। তুমি সুন্দর বলেছ, "আকাশের জল আর চোখের জল একই কারণে ঝরে না"—আমি তাতে যোগ দিলুম—তাদের উপাদানও সম্পূর্ণ আলাদা, একটা মৃন্ময় আরেকটা চিন্ময়, একটা বাঙ্ময়—সারা আকাশ মুখর করে তোলে, আরেকটা নৈস্তব্ধ্যে বিরাজ করে সর্ব মনময়।'

আমি স্থির করেছিলুম, কিছু বলব না। শব্‌নমের আত্মপ্রকাশের আকুবাকু

আমার স্পর্শকাতরাকে অভিভূত করে দিলে। আস্তে আস্তে বললুম, 'আমাদের এক কবি বলেছেন, তুমি আমার প্রিয়, কারণ "আমার হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির"।'

বললে, 'সুন্দর বলেছেন। কিন্তু আজ আমি কবিতার ওপারে।

'বিশ্বাস করবে না, ডান্‌স্ হলের সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় তোমাকে ভাল করে না দেখে হোটেলের বেয়ারা ভেবে যখন হুকুম দিয়েছিলুম, গাড়ি আনতে, তখনও ভেবেছিলুম এ কি রকম বেয়ারা—এর তো বেয়ারার বেয়ারিঙ নয়—ভালো করে তাকিয়ে দেখি, আজ পর্যন্ত যত মানুষ দেখেছি, যত বর্ণনা পড়েছি, যত ছবি দেখেছি এর বেয়ারিঙ তো তাদের একটার সঙ্গেও মিলছে না। তারপর কে যেন আমার বুকের ভিতরে ছবির খাতা মোচড় মেরে মেরে পাতার পর পাতা খুলে যেতে লাগল—তাতে ব্যথা—কিন্তু কী আনন্দ—এক এক বার তোমার দিকে তাকিয়ে দেখি আর ছবির দিকে তাকাই—কী অদ্ভুত—হুবহু মিলে যাচ্ছে। পথে যেতে যেতে, তোমার বাহুতে যখন আমার বাহু ঠেকল, খেলার জায়গায়, নদীর পাড়ে, তোমার ঘরে—এখনও দেখেই যাচ্ছি, দেখেই যাচ্ছি, এ দেখা আমার কখনও ফুরবে না। যেমন যেমন পাতা মিলিয়ে দেখছি, সঙ্গে সঙ্গে আরও নয়া নয়া তসবীর হয়ে যাচ্ছে।'

হঠাৎ সে হাঁটু গেড়ে আমার দুই জানু আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে কাতর কণ্ঠে বললে, 'ওগো, তুমি কেন ভাব, তুমি অতি সাধারণ জন? তোমার এই একটিমাত্র জিনিসই আমার বুকের ভিতর যেন ঝড় এনে আমার বুকের বরফ ধুনরীর মত তুলো-পেঁজা করে দেয়। আমার অসহ্য কষ্ট হয়। তুমি কেন আমার দিকে আতুরের মত তাকাও, তুমি কেন তোমার যা হক্ক তার কণাটুকু পেয়েও ভিখারীর মত গদ্‌গদ হও? তুমি কেন বিয়ের মন্ত্রোচ্চারণ শেষ হতে না হতেই সদম্ভে কাঁচি এনে আমার জুল্‌ফ কেটে দাও না, তুমি কেন আমার মুখের বসন দু হাত দিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেল না—সিংহ যে রকম হরিণীর মাংস টুকরো টুকরো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়?'

আমি নির্বাক।

চাঁদ বহুক্ষণ হল বাড়ির পিছনে আড়াল পড়েছে। আবছায়াতেও শব্‌নমের চোখ জলজল করছে।

হঠাৎ মধুর হেসে সুধীরে তার মাথাটি আমার জানুর উপর রেখে বললে, 'না, গো, না। সেইখানেই তো তুমি। তোমার অজানতে তোমার ভিতর একজন আছে যাকে আমি চিনি। সে বলে, "আমার যা হক্কের মাল আমার কাছে

তাই এসেছে—আমার তাড়া কিসের!" আর জান, তুমিই একমাত্র লোক যে আমার প্রতি মুহূর্তে কবিতা উদ্ধৃতি শুনে কখনও শুধায় নি, তুমি বাস্তবে বাস কর, না, কাব্যলোকে? তুমিই একমাত্র যে বুঝেছে যে কাব্যলোকে বাস না করলে বাস কি করব ইতিহাস-লোকে, না দর্শনলোক না ডাক্তারদের ছেঁড়া-খোঁড়ার শবলোকে? আর এ সব কোনও লোকেই যদি বাস না করি তবে তো নেমে আসবও সেই লোকে—গাধা গরু যেখানে ঘাস চিবোয় আর জাবর কাটে।

'কিন্তু এসব কিছু নয়, কিছু নয়। আসল কথা, সে তোমার মৃত্যুঞ্জয় প্রেম। আমি সুজাতা, সুচরিতা, সুস্মিতা আর আমার প্রেম যেন নববসন্তের মধু নরগিস—তোমার প্রেম ভরা-নিদাঘের বিরহরসঘন দ্রাক্ষাকুঞ্জ। তারই ছায়ায় আমি জিরবো, তারই দেহে হেলান দিয়ে আমি বসব, সেই আঙুর আমি জিভ আর তালুর মাঝখানে আস্তে আস্তে নিষ্পেষিত করে শুষে নেব। এই যে রকম এখন করছি।'

আমার মুখ কাছে টেনে নিল।

তারপর হঠাৎ হেসে উঠে শুধালে, 'বল দেখি মেয়েরা অনেকক্ষণ ধরে চুমো খেতে পারে না কেন?'

'কি করে বলব বল।'

দু-মিনিট মুখ বন্ধ করে থাকতে পারে না বলে। কথা কইতে ইচ্ছে যায়। আর শোন, জানেমন্ আমাকে ডেকে কি বললে, জান? বললে, তুমি নাকি আমার আঁধার ঘরের অনির্বাণ বিজলি। তোমার বুকের ভিতর নাকি বিদ্যুৎ-বহ্নি। আমরা একশ বছর বাঁচলেও নাকি তোমার প্রেম ক্ষণে ক্ষণে চমক দিয়ে আমাকে নিত্য নবীন করে রাখবে। আর সবচেয়ে মারাত্মক কথা কি বলেছে, জান? বলেছে, আমি যেন তোমার কাছ থেকে ভালবাসতে শিখি।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'তার মানে তুমি আমাকে বেশী ভালবাস। তাঁকে অবিশ্বাস করি কি করে? চোখের রোশনী নেই বলে তিনি হৃদয় দেখতে পান।'

আমার আহ্লাদের দুকূল প্লাবিত হয়ে গেল। শব্‌নমকে বুকে ধরে বললুম, 'বন্ধু তোমার ক্ষুদ্রতম দীর্ঘনিশ্বাস আমাকে কাতর করে। কিন্তু এখন যে দুশ্চিন্তায় তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সেটা দীর্ঘতর হোক।'

কান্না হাসিতে মিশিয়ে বললে, 'আমি স্বামী-সোহাগিনী।'

কাবুল নদীর ওপারে সার-বাঁধা পল্লবহীন দীর্ঘ তন্বঙ্গী চিনার গাছের দল দাঁড়িয়ে

আছে বরফে পা ডুবিয়ে। যেন নগ্না গোপিনীর দল হর্ম্যসারির পশ্চাতে লুকায়িত রাধামাধব চন্দ্রের কাছ থেকে বস্ত্র ভিক্ষা করছে। তাদের ছায়া দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে লাগল। চন্দ্রাভা পাণ্ডুর।

'এ কি?' বলে উঠল হঠাৎ হিমিকা। 'এ কি? এদিকে বলছি স্বামী-সোহাগিনী ওদিকে তার আরাম সুখের খেয়ালই নেই আমার মনে। তোমার ঘুম পায় নি?'

আমি বললুম, 'না তো। তোমার?'

'আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন সমস্ত জীবন ঘুমিয়ে এইমাত্র জেগে উঠলুম।'

উঠে গিয়ে আলমারি খুলে আমার জন্য পাজামা কুর্তা নিয়ে এল। বললে, 'দেখ দিকি মোটামুটি ফিট হয় কি না। আমি আন্দাজে সেলাই করেছি।'

গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে গেল, 'আমি তাকে নিয়ে যাব, আমার মায়ের বাড়িতে। মা আমায় শিখিয়ে দেবে। আমি তাকে পান করতে দেব সুগন্ধি মদিরা—আমারই ডালিম নিংড়ে বের করা রসের সুরভি মদিরা। তার বাম হাত রইবে আমার মাথার নিচে আর তার ডান হাত দিয়ে সে আমায় আলিঙ্গন করবে। আমার অনুরোধ, আমার আদেশ, অয়ি জেরুজালেম-বালা-দল আমার প্রেমকে চঞ্চলিত করো না, তাকে জাগ্রত করো না, যতক্ষণ সে না পরিতৃপ্ত হয়।...আমি তাকে নিয়ে যাব আমার মায়ের ঘরে—যে ঘরে আমার মা আমাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। আমি তাকে পান করতে দেব আমারই ডালিম নিংড়ে—'

চার হাজার বৎসরের পুরাতন বাসর রাতি গীতি।

পুরাতন!

। ৮ ।

তপ্ত শয্যায় শব্‌নমের গায়ে ঈষৎ শিহরণ। অচ্ছোদ সরসী নীরে রমণীর কম্পন?

মোতির মালাটি গলাতেই আছে। আমি সেটি দানা দানায় অল্প অল্প ঘোরাতে ঘোরাতে একটা লকেটে হাত ঠেকল। বললুম, 'এর ভিতরে কিছু আছে?'

চুপ।

আমি মালা ঘোরানো বন্ধ করে তার বুকের উপর হাত রেখে চুপ করে রইলুম।

হঠাৎ লেপ সরিয়ে উঠে উড়ল ঘরের কোণের অতিশয় ক্ষীণ শিখাটির দিকে। আমি দেখতে পেলুম, যেন ঝড়ে উড়ে গেল একটি গোলাপ ফুল, তার দীর্ঘ ডাঁটাটির চতুর্দিকে আলুলায়িত, হিল্লোলিত অতি সূক্ষ্ম, অতি ফিকে গোলাপী মসলিন। ক্ষীণালোকে তার প্রতিটি অঙ্গ দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছেও না।

আলো জোর করে দিয়েছে। এখন প্রতি অঙ্গ—। আমি চোখ বন্ধ করলুম।

আমার পাশে শুয়ে লকেটটি খুলে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললে, 'এই আমার শেষ গোপন ধন। এবারে আমি নিশ্চিন্ত হব।'

খুলে দেখি আমারই একটি ছোট্ট ফটো! অবাক হয়ে শুধালুম, 'এ তুমি কোথায় পেলে?'

বললে, 'চোখের জলে নাকের জলে।'

'সে কি?'—এত দিনে বুঝলুম, শব্‌নম কেন কখনও আমার ছবি চায় নি।

'আব্বা ইংরিজী কাগজ নেন—হিন্দুস্থানী। জশ্‌নের কয়েকদিন পরে তারই একটাতে দেখি পরবের সময় ব্রিটিশ লিগেশনে আর কাবুল টিমে যে ক্রিকেট ম্যাচ হয়েছিল তারই খান তিন ফটো। কান্দাহার থেকে লিখলুম ওই কাগজকে ছবিটার কণ্টাকট্ প্রিণ্ট পাঠাবার জন্য। মূল্যস্বরূপ পাঠালুম, এ দেশের কয়েক-খানা বিরল স্ট্যাম্প—বিদেশে পয়সা পাঠানো যে কী কঠিন সেই জ্ঞান হল চোখের জলে নাকের জলে। সান্ত্বনা এই, যে লোকটার হাতে চিঠিখানা পড়েছিল সে নিশ্চয়ই স্ট্যাম্প বোঝে। আমাকে অনেক আবোলতাবোল ছবির মাঝখানে ওই ছবিও পাঠালে খান তিনেক। তোমার ছবি তুলে নিয়ে লকেটে পুরে দিলুম। হল?'

আমি কি বলব? আমি তার মুক্তামালারুদ্রাক্ষের শেষ প্রান্তের ইষ্টমন্ত্র!

দিনযামিনী সায়ম্‌প্রাতে শিশিরবসন্তে বক্ষলগ্ন হয়ে এ শুনেছে শব্‌নমের আকুলতা ব্যাকুলতা—প্রতি হৃদয়স্পন্দনে। একে সিক্ত করে রেখেছে শব্‌নমের অসহ্য বিরহশর্বরীর তপ্ত আঁখিবারি।

আমি কল্পনা করে মনে মনে সে ছবি দেখছি, না শব্‌নম কথা বলছে? দুটোর মাঝখানে আজ আর কোনও পার্থক্য নেই। কিংবা তার না-বলা-ব্যথা যেন কোন্ মন্ত্রবলে শব্দতরঙ্গ উপেক্ষা করে তার হৃদ্‌স্পন্দন থেকে আমার হৃদ্‌স্পন্দনে অব্যবহিত সঞ্চারিত হচ্ছে। কণ্ঠাশ্লেষে বক্ষালিঙ্গনে চেতনা চেতনায় এই বিজড়ন অন্ত রজনীর তৃতীয় যামে আমা দোঁহাকার জ্যোতির্ময় অভিজ্ঞান, অপূর্বলব্ধ বৈভব।

কত না সোহাগে কত না গান গুনগুন করে শব্‌নম সে রাত্রে আমাকে কানে কানে শুনিয়েছিল। লায়লী মজনূঁর কাহিনী।

বাঙালী কীর্তনিয়া যে রকম রাধামাধবের কাহিনী নিবেদন করার সময় কখনও চণ্ডীদাস, কখনও জগদানন্দ, কখনও জ্ঞানদাস, কখনও বলরাম দাস, বহু পুষ্প থেকে মধু সঞ্চয় করে অমৃতভাণ্ড পরিপূর্ণ করে, শব্‌নম ঠিক তেমনি নিজামী, কখনও ফিরদৌসী, কখনও জামী, কখনও ফিগানী থেকে বাছাই বাছাই গান বের করে তাতে হিয়ার সমস্ত সোহাগ ঢেলে দিয়ে আমাকে সেই সুরলোকে উড়িয়ে নিয়ে গেল যেখানে সে আর আমি দুজনা, যেখানে কপোতী কপোতকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় উর্ধ্বতর প্রেম গগনাঙ্গনে।

কপোত-কপোতী দিয়েই সে তার কীর্তন আরম্ভ করেছিল। বয়ঃসন্ধিক্ষণে মুকুলিকা লায়লী পুষেছিল কপোত-কপোতী। যৌবন দেহলি-প্রান্তে সে কপোত-কপোতীকে দেখে আধো আধো বুঝতে শিখলে প্রেমের রহস্য।

দেহ তখন আর লায়লীর সৌন্দর্য ধরে রাখতে পারছে না। ওষ্ঠাধর বিকশিত হয়ে ডেকে এনেছে প্রথম উষার নীরব পদক্ষেপে গোলাপী আলোর অবতরণ। তারই দুপাশে শুভ্র শর্করার মত তার বদন-ইন্দুর বর্ণচ্ছটা, কিন্তু কপোল দুটির লালিমা হার মানিয়েছে বর্ষণ শেষের রক্তাক্ত সূর্যাস্তকে। রক্ত কপোল আর শুভ্র বদনপ্রান্তের মাঝখানে একটি কজ্জল-কৃষ্ণ তিল, যেন হাবশী বালক লাল গালের গোলাপ বাগানের প্রান্তদেশে খুলেছে শুভ্র শর্করার হাট। সে বালক তৃষিত। তারই পাশে লায়লীর গালের টোলটি। সে যেন আব্‌-ই-হায়াৎ, অমৃতবারির কূপ—অতল গভীর হতে উৎসারিত হচ্ছে অমৃতসুধা। স্মিত হাস্যের সামান্যতম নিপীড়নে উৎসমূলে যে আলোড়ন সৃষ্ট হয় তারই সৌন্দর্য প্লাবিত করে দেয় তার গুল্‌-বদন, ফুল্ল বল্লরী। সমুদ্র-কুমারীর চোখের জল জমে গিয়ে সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় নেয় যে মুক্তা সে-ই এসে আলোর সন্ধান পেয়েছে লায়লীর ওষ্ঠাধরের মাঝখানে। সে ওষ্ঠে আমন্ত্রণ, অধরের প্রত্যাখ্যান—মজনূঁর ওষ্ঠাধর যেদিন এদের সঙ্গে সম্মিলিত হবে সেদিন হবে এ-রহস্যের চূড়ান্ত সমাধান।

তরুণ রাজপুত্র কয়েস দূর হতে প্রথম দর্শনেই অভিভূত হয়ে আকুলি-বিকুলি করে কি ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিল সে তার বাল্যসখাও বুঝতে পারে নি। সর্পদষ্টাতুরকে আত্মজন যে রকম স্বগৃহে নিয়ে আসে, সখা সেইরকম কয়েসকে নিয়ে গেল আপন দেশে।

অন্তঃপুরবাসিনী অসূর্যম্পশ্যা লায়লীকে প্রেমের পুকার, হৃদয়ের আহ্বান

পাঠাবে কয়েস কি করে ?

এখানে এসে শব্‌নম যে কাহিনী বর্ণনা করল তার সঙ্গে আমাদের নল-দময়ন্তী কাহিনীর প্রচুর সাদৃশ্য আছে। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে হৃদয়ের কন্দর্পভার ধারণে অসমর্থ নলরাজ কুসুমায়ুধের অগ্রদূত রূপে পাঠিয়েছিলেন বন্ত-হংসকে, আর শব্‌নমের কাহিনীতে কয়েস লায়লীর নবশ্যামদূর্বাদল-বক্ষতলে পালিত কপোতকে বন্দী করে তার ক্ষীণপদে বিজড়িত করে পাঠিয়েছিল প্রেমের লিখন।

কি উত্তর দিয়েছিল লায়লী ? কে জানে ? কিন্তু আরব ভূমিতে আজও তাবৎ দরদী-হিয়া, শুষ্ক হৃদয়, সবাই জানে, সেই-দিন থেকে লায়লীর চোখে দেখা দিল এক অদ্ভুত জ্যোতি—ক্ষণে ক্ষণে কারণে অকারণে তার চোখে হিল্লোলিত হতে লাগল এক অদৃষ্ট-পূর্ব বিদ্যুৎলেখা।

রাজপ্রাসাদ থেকে যে দেওদার সারি চলে গেছে মরুভূমির প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত তারই শেষে ছিল ঝরনা-ধারা। এ দেওদার সুদূর হিমালয় থেকে আনিয়ে-ছিলেন লায়লীর এক পূর্বপুরুষ। কিংবদন্তী বলে, শস্যশ্যামল-সজল বনভূমির শিশু দেবদারু একমাত্র তাঁরই সোহাগ-মাতৃস্তন্য পেয়েছিল বলে এই অস্থিশুষ্ক খরভূমিতে পল্লবঘন বীথিকা নির্মাণ করতে পেরেছিল।

আর সেই ঝরনায় জল আনতে যেত নগরিকার কুমারীগণ।

যুগ যুগ ধরে তরুণ প্রেমিক দেওদার গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে বেণুরবে, কখনও বা গানে গানে প্রেমের আহ্বান পাঠিয়েছে প্রেমিকাকে।

দেবদারু অন্তরালে মরুভূমির সুদূর প্রান্তে ধীরে ধীরে উঠছে পূর্ণচন্দ্র। দীর্ঘ দেবদারুর ছায়ায় ছায়ায় যেখানে আলোছায়ার কম্প্রমান বেপথু আলিঙ্গন তারই পাশে গা মিশিয়ে দিয়ে মজনূঁ উদ্বাহু হয়ে ধীর স্থির কণ্ঠে লায়লীকে আহ্বান জানাচ্ছে অদৃশ্য গীতাঞ্জলি স্তবকে স্তবকে নিবেদন করে।

এ আহ্বান জনগণের সুপরিচিত কিন্তু আজ সন্ধ্যার এ আহ্বান যে রহস্যময় মন্ত্রশক্তি নিয়ে বসন্ত সমীরণের চঞ্চলমুখরতা মৌন করে দিল, দেবদারুপল্লবদলকে স্তম্ভিত করে দিল সে যেন ইহলোকবাসী মর মানবের ক্ষণমুখর হৃৎপিণ্ড স্পন্দনজাত নয়। গৃহে গৃহে বাতায়ন বন্ধ হল। হর্ম্যশিখর থেকে নাগর নাগরী দ্রুতপদে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করল। বৃদ্ধেরা মক্কার উদ্দেশে মুখ করে আকাশের দিকে দু হাত তুলে প্রার্থনায় রত হলেন।

কার ওই ছায়াময়ী অশরীরী দেহ ? কার হৃদয় ছুটে চলেছে দেহের আগে আগে—ওইখানে, যেখানে উর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত উৎসধারা বিগলিত আলিঙ্গনে সিক্ত করে দিচ্ছে দেবদারুদ্রুমকে ?

চৈতন্যের পরপারে অজরামর অন্তহীন আলিঙ্গন।

বেহেশ্‌ত্‌ ত্যাগ করে ফিরিশতাগণ তাঁদের চুম্বনের মাঝখানে এসে আপন চিন্ময়রূপ বিগলিত করে দিলেন।

সংস্কারমুক্ত-জনও প্রিয়াসহ তাজমহল দর্শনে যায় না। যমুনা পুলিনের কিংবদন্তী বলে, হংস-মিথুন পর্যন্ত বৃন্দাবন বর্জন করে—তাজমহলের উৎসজল এক সঙ্গে পান করে না। যমুনা বিরহের প্রতীক। অপিচ বাসরঘর প্রথম মিলনকে চিরজীবী করে রাখতে চায়। সেখানে বিরহ-গাথার ঠাঁই নেই। শব্‌নম অতি সংক্ষেপে ক্ষীণ কাকলিতে লায়লী মজনূঁর সে কাহিনী ছুঁয়ে গেল—কনিষ্ঠা যে রকম ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিনে তার কনিষ্ঠতম ভীরু অঙ্গুলি দিয়ে গ্রামভারি সর্বাগ্রজের কপালে তিলক দেয়।

বর্ষাভোরের ঘন মেঘ হঠাৎ কেটে গেলে যে রকম শত শত বিহঙ্গ বনস্পতিকে মুখরিত করে তোলে ঠিক সেই রকম অকস্মাৎ বিচ্ছুরিত হল শব্‌নমের আনন্দ গান।

মর্ত্যের ধুলার শরীর আর মৃত্যুঞ্জয় প্রেমকে ধরে রাখতে পারল না। দিগ্বলয়-প্রান্ত থেকে যে রামধনু উঠেছে মধ্য-গগনের স্বর্গদ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত তারই উপর দিয়ে হাত ধরাধরি করে লায়লী মজনূঁ চলেছে অমর্ত্যলোকে। কখনও গহন মেঘমায়া, কখনও তরল আলোছায়ার মাঝে মাঝে, কখনও চূর্ণ স্বর্ণরেণু সূর্যরশ্মি কণা আলোড়িত করে, কখনও ইন্দ্রধনুর ইন্দুনিভ বর্ণবন্যায় প্রবহমাণ হয়ে তারা পৌঁছল স্বর্গদ্বারে। জয়ধ্বনি বেজে উঠেছে বেহেশ্‌তের আনন্দাঙ্গনে। পরিপূর্ণ প্রণয়-প্রতীক স্বর্গ হতে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর সেখানে প্রত্যাবর্তন করছে অনিন্দ্য নবজন্ম নিয়ে, মরজীবনের জীর্ণ বাস ত্যাগ করে, সুরলোকের অসম্পূর্ণতা সর্বশ্রীময় করে দিতে।

সে কী ছবি! চতুর্দিকের হুরী ফিরিশতাগণের চোখে পলক পড়ছে না। দিব্যজ্যোতি ধারণ করে লায়লী মজনূঁ বসে আছেন মুখোমুখি হয়ে। ফিরিশতা-প্রবীণ জিব্‌রইল তাঁদের সম্মুখে ধরেছেন পানপাত্র—আল্লাতালা কুরান শরীফে যে শরাবুনতহুরা দেবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আছেন তাই জিব্‌রইলের হাত থেকে তুলে নিয়ে লায়লী এগিয়ে ধরেছেন মজনূর সামনে। দিব্যজ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেই সুধাপাত্র হতে।

চতুর্দিকে মধুর হতে মধুরতর সঙ্গীত :

হে প্রেম, তুমি ধন্য হলে লায়লী মজনূঁর বক্ষমাঝে স্থান পেয়ে।

হে প্রেম, তুমি অমরত্ব পেলে লায়লী মজনুঁর মৃত্যুর ভিতর দিয়ে!

খুদাতালার সিংহাসন থেকে ঐশীবাণী উচ্চারিত হল:

হে সুরলোকবাসীগণ! প্রেমের দহন দাহে দগ্ধ হয়ে অর্জন করেছ তোমরা সুরলোকের অক্ষয় আসন।

হে মর্ত্যবাসীগণ! সর্বচৈতন্য সর্বকল্পনার অতীত যে মহান সত্তা তিনি তাঁর বিশ্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপের একটি মাত্র রূপ স্বপ্রকাশ করেছেন মর্ত্যলোকে—তাঁর প্রেমরূপ।

তৃতীয় খণ্ড

॥ ১ ॥

যে মানুষ ছেলে-বয়স থেকে অন্ধের সেবা করেছে তার সেবা হয় নিখুঁত। এতখানি পাওয়ার পরও যে আমি শব্‌নমের সেবার দিকে খুঁতখুঁতে চোখে তাকিয়েছিলুম একথা বললে নিজের প্রতি অপরাধ করা হয়। আমি দেখেছিলুম, অনুভব করেছিলুম তার সেবানৈপুণ্য, আর্টিস্টের মডেল যে রকম ছবিটি যেমন যেমন এগোয় তাকে মাঝে মধ্যে সন্তুষ্ট নয়নে দেখা যায়।

ভোরবেলা অনুভব করলুম, চতুর্দিকে লেপ গুঁজে দেওয়ার সময় তার হাতের ভীরুস্পর্শ।

সকালবেলা সামনে যে ভাবে চায়ের সরঞ্জাম সাজালে তার থেকে বুঝলুম, কান্দাহারে যে হাত বুলবুল-গুলের মাঝখানে বিচরণ করেছে সে মাটিতেও নামতে জানে!

হঠাৎ লক্ষ্য করলুম, শব্‌নমের চোখ দুটি লাল। আমার হাতের পেয়ালা ঠোঁটে যাবার মাঝপথে থমকে দাঁড়াল।

শব্‌নম বুঝেছে। বললে, 'আজ অতি ভোরে বাবা কান্দাহারে চলে গিয়েছেন। তোপল্ খান এসে খবর দিলে, আমান উল্লা তাঁকে তাঁর শেষ ভরসার মালিকরূপে চিনতে পেরেছেন। বাবা জানেন, আমান উল্লার সর্ব আমির-ওমরাহ তাকে বর্জন করেছেন, কুরবানীর ছাগলকেও মানুষ জল দেয়, তারা—থাক্‌গে।

'যাবার সময় বলে গেছেন, তুমি যেন সকালবেলাই ব্রিটিশ লিগেশনে নিজে গিয়ে আমাদের বিয়ের দলিল জিম্মা করে আসো।'

'আর কি বলেছেন?'

'বলেছেন, সুযোগ পেলে তুমি একাই হিন্দুস্থানে চলে যেয়ো।'

'তুমি? সেই তো ভালো।'

'না। তুমি।' তার মুখ খুশীতে ভরে গিয়েছে। বললে, 'জান, আব্বা এখন তোমাকে আমার চেয়েও বেশী ভালবাসেন। বললেনও, "কেন বেচারীকে আমাদের ঘরোয়া বিপদের ভিতর জড়ালুম!" এই প্রথম দেখলুম, বাবা কোনও কাজের জন্য অনুশোচনা করলেন। তখন আমি তাঁকে বললুম—অবশ্য আমি আগেই স্থির করে রেখেছিলুম, এক দিন না এক দিন জানেমন্‌কে দিয়ে বলাব—যে তোমাকে আমি আগের থেকেই ভালবাসতুম। আমাদের প্রথম শাদির কথাটা কিন্তু বলি নি। সেটা বলব, যেদিন তাঁর কোলে তাঁর প্রথম নাতি দেব। বাবা ভারী খুশী হয়ে নিশ্চিন্ত মনে কান্দাহার গেছেন।'

'আমি ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করলুম। শেষটায় বললুম, তোপলের সঙ্গে একবার দেখা হল না।'

বললে, 'সে আস্তে আস্তে তোমাকে দেখে গেছে। তুমি তখন ঘুমুচ্ছিলে। আর তোমাকে বলতে বলে গেছে, সব-কিছু চুকেবুকে গেলে তার আপন দেশ মজার-ই-শরীফে আমাকে নিয়ে যেতে।'

ছোট্ট বাচ্চাকে মা যে রকম জামা-কাপড় পরাতে ইচ্ছে করে দেরি করে, প্রতিপদ চড়াবার পর বাচ্চাটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, শব্‌নম ঠিক সেই রকম আমাকে জামা-কাপড় পরালে। যখন আমার জুতোর ফিতে বাঁধতে গেল মাত্র তখনই বাধা দিয়েছিলুম।

শব্‌নমের মুখ হাসি-কান্না মাখানো। তার পিছনে গাম্ভীর্য। আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না।

দেউড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললে, 'বেশি দেরি করো না।'

তার পর কানে কানে বললে, 'তুমি আমার মিলনে অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না।'

বয়স্করা বেরুচ্ছে না—বাচ্চারা রাস্তায় খেলা করছে ঠিকই।

ইংরিজীতে প্রবাদ আছে, 'দেবদূত যেখানে যেতে ভয় পান, মূর্খেরা সেখানে চিন্তা না করে ঢোকে।' এর উল্টোটাও ঠিক। মৃত্যুভয় শুধু মূর্খের, তাই বয়স্করা রাস্তায় বেরুচ্ছে না। বাচ্চারা দেব-শিশু, তারা নির্ভয়ে খেলছে। যেটা খেলছে সেটা শুধু এই সময়েই এবং শীতের দেশেই সম্ভব। কাবুলের অষ্টাবক্রপৃষ্ঠ রাস্তায় জায়গায় জায়গায় জল জমে যায়—সে কিছু নূতন কারবার নয়—সেই জমা জল ফের জমে গিয়ে বরফ হয়ে দিব্য স্কেটিং-রিঙ্ক হয়ে দাঁড়ায়। সাবধানী পথিকও সেখানে পা হড়কে দড়াম করে আছাড় খায়। বাচ্চাদের সেইটেই স্বর্গপুরী।

অন্যত্র বলেছি, কাবুলীরা পয়জারে শত শত লোহার পেরেক ঠুকে নেয় বলে তার তলাটা সবসুদ্ধ জড়িয়ে মড়িয়ে হয়ে যায় পিছল। বাচ্চারা শুকনো মাটিতে একটুখানি দৌড়ে এসে সেই বরফের উপর নিজেকে ব্যালান্স্ করে সামনের দিকে একটু ভর দেয় এবং সাঁই করে বরফের অপর প্রান্তে পৌঁছে যায়। আমরা দেশে যে রকম নদীর ঢালু পাড়েতে জল ঢেলে সেটাকে পিছল করে সুপুরির খোল দিয়ে আসন বানিয়ে হুড়হুড় করে নিচে নেমে যাই।

মাঝে মাঝে দেউড়ির মুখে দাঁড়িয়ে কোনও কোনও মা ছেলেকে গালিগালাজ দিয়ে বাড়ির ভিতরে ডাকে—'আয় পিদর-সুখ্‌তে—ওরে পিতৃদেহ (বাপকে পুড়িয়ে মারে), তোর বাপ নির্বংশ হোক—তোর যম বাড়ির ভিতরে না বাইরে? এখখুনি ভিতরে আয় বলছি।'

'মাদর-সুখ্‌তে' বা 'মাতৃদেহ' কখনও শুনি নি। বোধহয় উড়ো খইয়ের মত নরকাগ্নিকুণ্ডও 'জনকায় নমঃ'।

ব্রিটিশ লিগেশনের যে কর্মচারীর সঙ্গে আমার শ্বশুর মশায়ের কথাবার্তা হয়েছিল তিনি আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। আমি কিছু বলার পূর্বেই আমাকে অভিনন্দন জানালেন, মিষ্টিমুখ করালেন। ইনি পেশাওয়ারের লোক। তবে কি কৌটিল্য ওই অঞ্চলের লোক? গুপ্তচর বিদ্যা উত্তরাধিকারসূত্রে দাক্ষিণ্য পেয়েছেন? কিন্তু লোকটি চমৎকার। বিয়ের দলিলখানা লোহার সিন্দুকে তুলতে তুলতে বললেন, 'অনবদ্য হাতের লেখা। মনে হয়, দলিল নয়, ছন্দে গাঁথা অভিনন্দন পত্র। আমি যত শীঘ্র পারি বাচ্চাই সকাওকে কথাচ্ছলে জানিয়ে দেব যে হিন্দুস্থানে আফগানিস্থানে যুগ যুগ ধরে যে 'আঁতাঁৎ কর্দিয়াল'—'হার্দিক রাখী-বন্ধন'—গড়ে উঠেছে, এই বিয়ের মারফতে তারই এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হল।'

যিনি এতখানি সহৃদয় তাঁকে ওকীব-হাল করতে হয়। তবু একটু চিন্তা করে বললুম, 'সর্দার আওরঙ্গজেব খান আজ ভোরে কান্দাহার চলে গেছেন।'

চমকে উঠে বললেন, 'সে কি!' একটু ভেবে বললেন, 'নিশ্চয়ই ছদ্মবেশে।'

আরও কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, 'এটা কি ভালো করলেন? আমি অবশ্য তাঁর রাজনৈতিক চালের কথা ভাবছি নে, আমি ভাবছি, তিনি এই দুর্দিনে সবাইকে কার হাতে ছেড়ে দিয়ে গেলেন?'

আমি কিছু বলবার পূর্বেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'অবশ্য তেমন কিছু দুশ্চিন্তা করার নেই।'

এই ভদ্রলোক আমাকে সাধারণত সহজে ছাড়তে চান না। আজ অবশ্য

দেশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে।

আমাদের দেশেই যখন বহু পাখি শীতকালে হাওয়া বদল করতে যায় তখন এই শীতের দেশে লতাপাতা কীটপতঙ্গহীন ঋতুতে থাকবে কে? তবু হঠাৎ দেখি, একজোড়া ক্ষুদে পাখি একে অন্যকে তাড়া করছে, বরফে লুটোপুটি খাচ্ছে, ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে পালক থেকে বরফের গুঁড়ো ঝাড়ছে। আমাকে দেখে উড়ে গিয়ে গাছের একটা ন্যাড়া ডালে বসল।

আমি জানি এসব পাখি মানুষের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে, এবং শুধু জেনরাই পিঁপড়েকে চিনি খাওয়ায় তাই নয়, কঠোর-দর্শন কাবুলী খানসাহেবকে আমি জোব্বার জেব থেকে শুকনো রুটি বের করে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে দিতে দেখেছি।

আমি গাছটার কাছে আসতে আবার উড়ে গিয়ে রাস্তার পাশের আরেকটা গাছে বসল। আমার পকেটে কিছু ছিল না বলে বড় দুঃখ হল। কাবুল শহরে না পৌঁছনো পর্যন্ত এরা উড়ে উড়ে আমাকে সঙ্গ দিল।

শব্‌নমের যত কাছে আসছি আমার হৃদয়ের ক্ষুধা ততই বেড়ে যাচ্ছে। কাল রাতে তাকে পেয়েছি পাওয়ার সীমা ছাড়িয়ে। আর আজ এই ঘণ্টা দুইয়ের বিচ্ছেদে প্রাণ এত ব্যাকুল হয়ে উঠল? এতদিন পরে বুঝতে পারলুম, লাখ লাখ যুগ ধরে হিয়ায় চেপে রাখলেও হিয়া জুড়োয় না।

এ কি? বাড়ির সদর দরজা খোলা কেন? কাবুলে তো এরকম হয় না—শান্তির সময়ে, দিন দুপুরেও।

একটু ইতস্তত করে বাড়িতে ঢুকলাম। এ কি! এত যে চাকর দাস-দাসী আঙ্গিনা ভর্তি করে থাকে, আজও সকালে বিয়ের পরের দিনের কি এক পরব তৈরি করতে লেগে গিয়েছিল, তারা সব গেল কোথায়? জিনিসপত্র তেমনি ছড়ানো। সিঁড়ির মুখে একটা কলসী কাত হয়ে পড়ে আছে; তার জল জমা হয়ে খানিকটা বরফ হয়ে গিয়েছে। কাবুলীরা কি অমঙ্গল চিহ্ন চেনে না?

আমার বুকের ভিতর কি রকম করতে লাগল। আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি নে!

কাকে ডাকি? আমি তো কারোরই নাম জানি নে।

হঠাৎ কি অজানা অমঙ্গল আশঙ্কা মনে জেগে উঠল। ছুটে গেলুম আমাদের বাসরঘরের দিকে। খোলা দরজা খাঁ খাঁ করছে।

'শব্‌নম', 'শব্‌নম'—চেঁচিয়ে উঠলুম। কোনও উত্তর নেই।

সব-কিছু সাজানো গোছানো। এক ট্রে চা পর্যন্ত। শুধু একদিকে একটি ছোট পেয়ালা চা—তার আধ পেয়ালা খাওয়া হয়েছে।

এঘর ওঘর সব ঘর খাঁখাঁ করছে। সেই পাগলের মত ছুটোছুটির ভিতর একই ঘরে ক-বার এসেছি বলতে পারব না। এমন কি জানেমনের ঘরেও গেলুম। সেখানে কেউ নেই।

আমার জ্ঞান বুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। আঙিনায় নেমে শুষ্ককণ্ঠে চেঁচাতে লাগলুম, 'কে আছ, কোথায় আছ?' 'কে আছ, কোথায় আছ?'

কতক্ষণ কেটে গেল কে বলতে পারে।

আমার পিছন থেকে কে এসে আমার দু-পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। এ বাড়ির চাকর। আমি ভাঙা গলায় যতই তাকে প্রশ্ন করি সে আরও চিৎকার করে কাঁদে। সে বরফের উপর শুয়ে পড়ে গোঙরাতে আরম্ভ করেছে।

দেউড়ি দিয়ে আরও লোক ঢুকছে। বাড়ির দাসদাসী। আমাকে ঘিরে তারা চিৎকার করে সবাই কাঁদছে। বুক-ফাটা কান্না—জিগরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। সবাই আমার পা, হাঁটু, জানু জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে।

এই অর্ধচেতন অবস্থায় বুঝতে পেরেছি, নিদারুণ অমঙ্গল না হলে এতগুলো মানুষ এরকম মাথা খুঁড়তে পারে না।

এরই মাঝখানে ভিড় ঠেলে সেই কলেজের ছোকরাটি আমার কাছে এগিয়ে এল। সেও পাগড়ির লেজ দিয়ে মুখ নাক ঢেকে সেটা বাঁ হাত দিয়ে ধরে আত্মগোপন করছে। প্রথমটায় আমিও তাকে চিনতে পারি নি। তার চোখে আতঙ্ক, ঘৃণা আর কান্না। পাড়া-প্রতিবেশীর ভিতর একমাত্র সে-ই সাহস করে দুঃসংবাদ দিতে এসেছে। যত বড় দুঃসংবাদই হোক আমি সেটা শুনব। অনিশ্চয়তার যন্ত্রণা থেকে হোক সেটা দুঃসহতর অসহ্য। কানের কাছে মুখ রেখে চেঁচিয়ে বললে, 'শব্‌নম বীবীকে বাচ্চার সেনাপতি জাফর খানের লোক নিয়ে গিয়েছে—।' আমার পায়ের তলায় যেন কিছু নেই। ছেলেটি আমার কোমর দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আকুল কণ্ঠে বললে, 'হুজুর, এ-সময়ে আপনি অবশ হবেন না। আপনার জ্যাঠা শ্বশুরমশাই তাঁর সন্ধানে আর্ক দুর্গে গিয়েছেন। আপনাকে বাড়িতে থাকতে বলে গিয়েছেন। বলে গিয়েছেন, আপনি যেন কিছুতেই না বেরোন।'

আমাকে ধরাধরি করে জানেমনের ঘরে পৌঁছে দিয়ে বললে, 'আমি আর্কে চললুম খবর নিতে।'

কতক্ষণ কি ভাবে কেটেছিল বলতে পারব না। দাসদাসীরা কাঁদছে। দু-একজন যেন কথাও বলছে, কান্নার সঙ্গে সঙ্গে। কেন সর্দার আওরঙ্গজেব চলে গেলেন? তিনি থাকলে তো এরকম হত না! কেন তিনি কড়া মানা করে গেলেন, কেউ যেন ডাকুদের সঙ্গে লড়তে না যায়? তোপল্ থাকলে, হুকুম পেলে একাই তো বিশজনকে শেষ করতে পারতো। ওরা—নিজেরাও তো কিছু কাপুরুষ নয়। আরও অনেক ফরিয়াদ তারা করেছিল।

এদের ভিতর যে সবচেয়ে বৃদ্ধ সে আমাকে বিছানা থেকে তুলে একটা চেয়ারে বসালে। তার চোখ শুকনো। মনে হল সে কাঁদে নি, কথাও বলে নি। আমি কোন কথা বুঝতে পারছি না দেখে আমাকে ধীর কণ্ঠে বললে, ছোট সাহেব, আপনি শক্ত হন। আপনি এ বাড়ির জোয়ান মালিক। আপনি ভেঙে পড়লে এই এতগুলো লোক পাগল হয়ে কি যে করবে ঠিক নেই। এরা প্রথমটায় প্রাণের ভয়ে প্রতিবেশীদের বাড়িতে লুকিয়েছিল। এখন আবার ক্ষেপে গিয়ে কি যে করবে বলা যায় না। বাচ্চার ডাকুরা লুটপাট করে নি কিন্তু এখন আর সবাই আসবে বাড়ি লুট করতে। আমি কিছুই বলি নি। এ বাড়িটা রক্ষা করাই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।'

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললে, 'দেখুন হুজুর, এ বাড়ির কত সম্মান, কত বড় ইজ্জত। সর্দার আওরঙ্গজেব পরিবারের বাস্তুভিটে না হয়ে আর কারও হলে এতক্ষণে পাড়া-প্রতিবেশীরাই এ বাড়ির দোর জানালা পর্যন্ত লুট করে নিয়ে যেত।'

আমি তখনও কোন সাড়া দিচ্ছি নে দেখে হতাশ কণ্ঠে বললে, 'এই যে এতগুলো লোক, এদের জীবন-মরণ আপনার হাতে। সর্দার হুকুম দিয়েছিলেন, বাচ্চার লোককে যেন কোনও বাধা না দেওয়া হয়। এখন অন্য লোক লুট করতে এসে এদের মেরে ফেলতে পারে—আপনি হুকুম না দিলে এরা পাগলের মত কি করে ফেলবে তার কোনই ঠিক নেই।'

ওই একই কথা বার বার বলে।

'আপনার শ্বশুরমশাই, জ্যাঠশ্বশুর মশাই আপনার প্রতি যে আদেশ রেখে গেছেন সেটা পালন করুন। শব্‌নম বীবীর জন্য যা করার সে তাঁর জানেমন্ করবেন।'

এবারে শেষ অস্ত্র ছাড়লে—'তিনি ফিরে এসে যদি শোনেন আপনি ভেঙে পড়েছিলেন তখন তিনি কি ভাববেন!'

আমি তখন উঠে দাঁড়িয়ে তাকে আদেশ করলুম, ব্রিটিশ লিজিয়নের সেই

ভারতীয় কর্মচারীকে সব খবর দিয়ে আসতে। কি ভাবে কি হয়েছিল আমি এখনও জানি নে—লিখে জানাব কী ?

এইবারে তার চোখে জল এল। অস্ফুট কণ্ঠে আল্লার বিরুদ্ধে কি এক ফরিয়াদ জানালে। রওয়ানা হওয়ার সময় তবু তার মুখের উপর কি রকম যেন একটা প্রসন্নতা দেখা গেল। বোধ হয় ভেবেছে, তবু শেষটায় বাড়ির কর্ণধার পাওয়া গেল।

হায় রে কর্ণধার !

একজনকে আদেশ দিতে বাকীরা কি জানি কি ভেবে, অন্ধভাবে কি যেন অনুভব করে চলে গেল।

আমি শব্‌নমের—আমার—আমাদের, আমাদের মিলন রাত্রির ঘরে আর যাই নি।

শব্‌নম নাকি দাস-দাসীদের হাতিয়ার নিয়ে বাড়ি রক্ষা করতে দেয় নি। বোরকাটা পরে নিয়ে ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলে গিয়েছিল। জানেমন্ ডাকাতদের বলেছিলেন, শব্‌নম বিবাহিতা রমণী। তাঁর কথায় কেউ কান দেয় নি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হন। দুজন লোক তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।

আমাকে কি এঁরা বাড়ির তদারকির জন্যই রেখে গেলেন ? আমি কি অন্য কোনও কাজের উপযুক্ত নই ?

আমি যাব আর্কে ? এ বাড়িতে আমার কি মোহ

এই সময়ে লোকে চা খায়। দেখি, শব্‌নমের বুড়ী সেবাদাসী চা নিয়ে এসেছে।

আমাকে একটি চিরকুট্ এগিয়ে দিলে। বোধহয় ভেবেছে, আমি কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়েছি।

দুটি মাত্র কথা। 'বাড়িতে থেকো। আমি ফিরব।'

আমি কাপুরুষ নই, আমি বীরও নই। এরকম অবস্থায় মানুষ ভানভণিতাও করতে পারে না। আমার ভিতরে যা আছে, তা ধরা পড়বেই।

বৃদ্ধকে বাড়িতে বসিয়ে যেতে পারতুম। অন্য কাউকে লিগেশনে পাঠালেই তো হত।

না, সর্দার হওয়ার মত ধাত দিয়ে বিধাতা আমাকে গড়েন নি।

কিন্তু লিগেশনে খবর পাঠাবার মত সম্বিতমান লোক ও-ই তো একমাত্র ছিল। অন্য কাউকে পাঠালে যে দুশ্চিন্তা থাকত সে লোকটা খবর ঠিক জায়গায় মত পৌঁছিয়েছে কি না।

না, সর্দার হওয়ার মত ধাত দিয়ে বিধাতা আমাকে গড়েন নি।

শব্‌নমের কোনও কথা তো আমি কখনও অমান্য করি নি। অনেকে অনেক কথা বলবে, অনেকে অনেক উপদেশ দেবে, তাই সে যাবার সময় স্থির বুদ্ধিতে পাকা আদেশ দিয়ে গিয়েছে।

এখন না হয় সবাই আমাকে বাড়িতে থাকতে বলছে, কিন্তু যদি বিপদ কেটে যায়, হাঁ, যদি বিপদ কেটে যায়, তবে একদিন সবাই ভাববে না যে আমি ভীরুর মত বাড়িতে হাত পা গুটিয়ে বসে রয়েছিলুম, সবাই যখন আর্কে!

হায় রে আত্মাভিমান! সবাই যেন বোঝে আমি বীরপুরুষ!

কার কাছে আত্মাভিমান? শব্‌নম কি এতদিনে জানে না, আমি বীর না কাপুরুষ! সে তো প্রথম দিনে—না, প্রথম মুহূর্তেই—আমাকে চিনে নিতে পারে নি?

লোকজনদের সবাই এখন আমার বাড়ি চেনে। একজনকে ডেকে বললুম, 'যাও তো, আব্দুর রহ্‌মানকে ডেকে নিয়ে এস।'

হে খুদাতালা, তুমি আমাকে পথ দেখাও। আমার আনন্দের দিনে তুমি আমাকে শিখিয়েছিলে তোমাকে স্মরণ রাখতে—আজ এই চরম সঙ্কটের দিনে সেই অনুগ্রহ কর, মহারাজ। আমি তোমাকেই স্মরণ করছি।

খবর এল, আব্দুর রহ্‌মান আমার ছাত্রের কাছ থেকে খবর পেয়ে প্রতিবেশী কর্নেলের ছেলেকে বাড়িতে বসিয়ে আর্কে চলে গেছে।

তারপর আমার মতিভ্রম আরম্ভ হল।

স্বপ্ন দেখি নি, সে আমি ঠিক ঠিক জানি। যেন স্পষ্ট, স্পষ্ট কেন স্পষ্ট হতেও স্পষ্টতর দেখতে পাচ্ছি, আমি মায়ের এক জানুতে, শব্‌নম অন্য জানুতে বসে আছে আর মা কলাপাতার সামোসাতে মোড়া ধান-দূর্বা আমাদের মাথার উপরে রেখে আশীর্বাদ করছেন। জাহানারা আর কুটি মুটি মাটিতে শুয়ে সকলের আগে নূতন চাচীর মুখ দেখবার চেষ্টা করছে।

সম্বিতে ফিরেছিলুম বোধ হয় মায়েরই পুণ্যবলে, তাঁরই আশীর্বাদের ফলে।

মনসুর সামনে দাঁড়িয়ে। সেই কলেজের সহৃদয়, বীর ছেলে।

নতমস্তকে বললে, 'আপনার জ্যাঠশ্বশুর সোজা নূতন-বাদশা বাচ্চা-ই-সকাওয়ের দরবারে চলে যান। সে আর্কে ছিল না। তিনি মোল্লাদের উদ্দেশ করে জাফর খান এবং তার দলবলকে চিৎকার করে অভিসম্পাত দিতে থাকেন। তাঁকে একটা ছোট কুঠরিতে বন্ধ করে রাখা হয়েছে।'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করে বললুম, 'তুমি আমার অনেক

উপকার করলে। এর চেয়ে মহত্তর কোনও গুরুদক্ষিণা নেই।'

রাস্তায় নেমে বললুম, 'এবারে তুমি বাড়ি যাও।'

বাড়ির লোক আবার অট্টরোল করে উঠেছে। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে চলতে চলতে আমাকে বার বার যেতে মানা করছে, আর বলছে সেখানে গিয়ে কোনও লাভ নেই।

আশ্চর্য! ওদের কথা, ওদের অনুনয় আমি ঠিক মত শুনি নি কিন্তু নেড়া চিনার গাছের ডগায় যে ষোড়শীর চাঁদ উঠেছে সেটা ঠিক লক্ষ্য করেছি। বুকে যেটুকু রক্ত ছিল সেও যেন জমে গেল। কাল রাত্রে শব্‌নম এই চাঁদের—

রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড়। আর্কে ঢোকে কার সাধ্য। ঘোড়সওয়ার অনেক। তারা বেপরোয়া মানুষের ভিতর দিয়ে, উপর দিয়ে, তাদের জখম করে চলেছে আরও বেপরোয়া হয়ে আর্কের দিকে, আর আর্কের ভিতর থেকে আরেক বিরাট জনধারা বেরিয়ে আসতে চাইছে শহরের দিকে। দু-দিক থেকেই জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তেই এবং দুই জনোচ্ছ্বাস মিলে গিয়ে যে খণ্ড খণ্ড আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে তার থেকে কোনও দিকেই কেউ এগুতে পিছোতে পারছে না। অথচ চাপ দুদিক থেকে বেড়েই যাচ্ছে ক্রমাগত। কেউ যেন আপন সম্বিতে নেই।

এই প্রথম আমি আমার আপন সম্বিতে ফিরে এলুম।

এতক্ষণে বুঝতে পারলুম, এ জনতা ভেদ করে মনসুরের আসতে সময় লেগেছিল কেন?

হঠাৎ দেখি, দূরে তিন জন ঘোড়সওয়ার জনতার উপর মাথা তুলে আর্ক থেকে বেরিয়ে শহরের দিকে আসছে। তাদের গতি অতি মন্থর, কিন্তু দৃঢ়। মাঝখানের সওয়ার নিষ্ক্রিয়, নিরুদ্বেগে বসে আছে। দু-পাশের দুই সওয়ার বল্লম না কি দিয়ে যেন নির্মমভাবে উন্মত্ত জনতাকে খোঁচা দিচ্ছে, পথ করে দেবার জন্য।

চাঁদের আলো মুখে পড়েছে। এ কি? এ তো জানেমন্!

চিৎকার করে উঠেছিলুম, 'জানেমন্, জানেমন্, জা—।'

কে শোনে?

আমার শরীরে হাতির বল থাকলেও আমি তাঁর দিকে এগুতে পারতুম না। জনতরঙ্গের যে সামান্যতম গতিবেগ সে আমাকে নিয়ে চলেছে বড় রাস্তার দিকে।

নিরঙ্কুশ দুর্ভাগ্য সারি বেঁধে আসছে দেখে নিপীড়িত জন পাছে অজ্ঞান

হয়ে সর্ব যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পায় তাই ব্যঙ্গরাজ কিম্মতধিপতি মাঝে মাঝে অভাগার কপালেও লক্ষ্মীর অঞ্চল বুলিয়ে দেন। আমি জনপীড়ায় অনিচ্ছায় সরছি শহরের দিকে, জানেমনের গতিও সেদিকে—যদিও তিনি অনেক দূরে। একটুখানি কম ভিড়ে পৌঁছতেই আমি নেমে গেলুম রাস্তার পাশের বরফ-জমা নয়ানজুলিতে। সেখানে তাঁর পৌঁছতে লাগল যেন অনন্তকাল। চার-পাঁচ জন লোক তাঁর ও অন্য দুই ঘোড়সওয়ারের গা ঘেঁষে ঘেঁষে চলেছে—এদের দলেরই হবে। এদেরই একজন আমাকে চিনতে পেরে চিৎকার করে উঠল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে জানেমন্‌কে ডেকেছিলুম, কিন্তু আমার গলা দিয়ে শব্দ বেরোয় নি।

জানেমনের মুখের দিকে আমি এক লহমার তরে তাকিয়েছিলুম।

বিকৃত, বিকট, বীভৎস—যেন এর কোনটাই নয়—কিংবা সব কটাই—তিনি কিন্তু সেগুলো যেন সংহরণ করে নিয়েছেন রুদ্ররাজ পূষনের মত। এক চোখ দিয়ে রক্ত ঝরে বাম গালে জমে আছে।

তিনি নেমে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর হৃদ্‌স্পন্দন আমি অনুভব করতে পারি নি। শুনেছি, যোগীরা নাকি স্বেচ্ছায় সেটা বন্ধ করে দিতে পারেন। মনে হল, তিনি স্বেচ্ছা-অনিচ্ছার বাইরে!

ঘোড়সওয়াররা আর্কের দিকে ফিরে গেল। সঙ্গীরা পিছনে পিছনে এল। তাদেরই একজন শুধু বার বার বিড়বিড় করে বলছে, 'আমার কোনও দোষ নেই।'

জানেমন্‌ আমাকে হাতে ধরে নিয়ে যে ভাবে দৃঢ়পদে চলেছেন তাতে আমাকেই জ্যোতিহীন বলে মনে হবে। তিনি কোনও কথা বলছিলেন না। তবু বুঝলুম, তিনি আমাদের কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করে ফেলেছেন। মাঝে মাঝে শুধু আমার ডান হাতখানা তাঁর বুকের উপর চেপে ধরছিলেন। আমার অশান্ত ভাব দেখে শেষটায় বললেন, 'শব্‌নম আর্কে নেই। তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।'

বাড়িতে ঢুকলে আবার কান্নার রোল পড়ল। শব্‌নমের বাড়ি ফেরার ক্ষীণতম আশাটুকুও আমাদের গেল।

॥ ২ ॥

জানেমন্ বললেন, 'বাছা, এবার নমাজের সময় হয়েছে। তুমি ইমাম হও।'

বয়োজ্যেষ্ঠ সচরাচর নমাজের ইমাম—অধিপতি—হন। বিকলাঙ্গ হন না। আমি আপত্তি জানাতে তিনি উত্তর না দিয়ে শুধু বললেন, 'আর, নমাজের শেষে দোওয়া মাঙ্‌বার সময় কোনও কিছু চেয়ো না। ওঁর যা প্রাপ্য তাঁকে তাই দেব।'

আল্লার উপর অভিমান!

মনসুরের কাছে সব শুনলুম।

বাচ্চা-ই-সকাও আর্কে ছিল না—জানেমন্ যখন সেখানে পৌঁছন। বাচ্চার খাস কামরার দিকে তিনি রওয়ানা হলে কেউ বাধা দেয় নি।

মনসুর বললে, 'আপনি জানেন না, হুজুর, এদেশের লোক বড় সাহেবকে কি সম্মানের চোখে দেখে। শুধু কি বাচ্চার জন্মভূমি?—ময়মনা হিরাত, মজার বদখ্‌শান সর্বত্রই লোকে জানে তিনি সুফী, তিনি আল্লার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। ডাকাতদের ভিতরও জাফর খান কি সহজে অত ঘোরতর পাষণ্ড খুঁজে পেয়েছিল যারা শব্‌নম বীবীকে ধরে—' ঢোক গিলে বললে, 'আমি বলছি, নিয়ে যেতে! এবং তারাও কি শেষ পর্যন্ত বাঁচবে?'

'বড় সায়েব বাচ্চার খাসকামরায় শব্দ শুনে বুঝলেন, মোল্লারা সেখানে জমাঅৎ। এরা কাবুল শহরের সব চেয়ে অপদার্থ। আমান উল্লার আমলে এরা প্রায় ভিক্ষা করে জিন্দেগী চালাচ্ছিল। এদের কোন গোসাঁই বড় সায়েবের নুন-নেমক খায় নি—তিনি তো দানের সময় পাত্রাপাত্র বিচার করেন না।

'বড় সায়েব সেখানে দাঁড়িয়ে বাচ্চাকে অভিসম্পাত করতে লাগলেন।

'সে আমি আপনাকে বলতে পারব না, হুজুর; এ তো গালগালাজ, চিৎকার চেঁচামেচি নয়। তিনি শান্ত, দৃঢ়, উচ্চকণ্ঠে যেন আল্লার হয়ে পৃথিবীর সর্ব নরাধম পশুকে তাদের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করে যাচ্ছিলেন।

'হঠাৎ তাঁর বন্ধ চোখ ফেটে রক্ত বেরল। আমার শোনা কথা, যৌবনে চোখের অপারেশন প্রায় শুকিয়ে গিয়ে জ্যোতি ফিরে পাবার মুখে তাঁর গলায় কি আটকে গিয়ে তিনি বিষম খান। তখন ব্যাণ্ডেজের উপর দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। সেই হয় সর্বনাশ। আজ আমি দেখি, কোনও কিছু না, হঠাৎ বন্ধ

চোখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে।

'পাপ-পুণ্যের কি জানি, হুজুর? আপনার কাছেই তো শিখছি। জানি কুমারী, বিধবা কোনও অবলাকে ধরে নিয়ে যাওয়া পাপ—আর ইনি তো বিবাহিতা রমণী। মোল্লারা, ওই অপদার্থ মোল্লারা—'

আমি ক্ষীণ কণ্ঠে বললুম, 'সব মোল্লাই কি—?'

বললে, 'সে আমি জানি, হুজুর। আপনিও তো একদিন ক্লাসে নিজেকে মোল্লা বংশের ছেলে বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। আমিও মোল্লা, মোল্লার বেশে ওইখানে গিয়েছিলুম বলে।

'সেই মোল্লাদের প্রবীণ যিনি, তাঁর আদেশে বড় সাহেবকে একটা কুঠরিতে নিয়ে বন্ধ করে রাখা হল। তাঁকে নিয়ে যাওয়ার পর সে বললে, "কি বলতে কি বলে ফেলবেন ইনি। হাজার হোক নূতন বাদশাকে চটিয়ে লাভ কি?" হয়তো এরা সত্যই আমাদের সাহায্য করতে চেয়েছিল।

'ফরসা লোকও ভয়ে পাংশু হয়—নির্লজ্জও লজ্জা পায়।

'সে সব কথা থাক।

'সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ খবর এল—কি করে, কোথা থেকে জানি নে, শব্‌নম বীবী জাফর খানকে গুলি করে মেরে ফেলেছেন।

'হুজুর, আপনি শক্ত হন।

'আর জাফরের যে দেহরক্ষী শব্‌নম বীবীকে বন্দী-খানায় নিয়ে যাচ্ছিল সে ও শব্‌নম বীবী দুজনেই অন্তর্ধান করেছেন।'

আমি বেরুবার জন্য তৈরী ছিলুম। বললুম, 'বৎস, তুমি আমার অনেক উপকার করেছ। এখন তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমি সন্ধানে বেরই।'

সে বললে, 'আপনি সব কথা শুনে নিন। বড় সায়েব সেই হুকুম করেছেন।

'যে রক্ষী শব্‌নম বীবীকে নিয়ে যাচ্ছিল সে এখন বড় সায়েবের পা ধরে কাঁদছে। তাকে ডাকব, না আমি বলব? আদেশ করুন।'

আমি কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি না।

বললে, 'ওর বাপদাদা সায়েবের নুন খেয়েছে কান্দাহারে। সে ডাকাত হয়ে বাচ্চার দলে ভিড়েছে। সে যা বলেছে তার মূল কথা শব্‌নম বীবীকে প্রথমটায় একটা কুঠরিতে বন্ধ করে রাখা হয়। সন্ধ্যার দিকে জাফর তাকে ডেকে পাঠায়। জাফর সে ঘরে একা ছিল। ভিতরে কি হয়েছিল কেউ বলতে পারবে না একমাত্র শব্‌নম বীবী ছাড়া। হঠাৎ একটি মাত্র গুলি ছোঁড়ার শব্দ

হল। দেহরক্ষীর দল যা দেখবে ভেবেছিল, তার উল্টোটা। জাফর খান ভুঁয়ে লুটিয়ে আর শব্‌নম বীবীর হাতে পিস্তল। হাসান আলী—আমাদের এই রক্ষী—বললে, সে কিছুই জানত না। আর পাঁচজন রক্ষীর সঙ্গে ছুটে গিয়ে সে এই প্রথম দেখলে তার মনিবদের ঘরের মেয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে।

'হাসান আলী ডাকাত—আহাম্মুখ নয়। সে তখন নাকি শব্‌নম বীবীকে বন্দীখানায় নিয়ে যাওয়ার ভান করে আর্কের দেউড়ির দিকে রওয়ানা দেয়।'

মনে পড়লো, শাস্তির সময়ও জানতুম না, শব্‌নমকে কোথায় খুঁজতে হবে।

'ইতিমধ্যে বাচ্চা-ই-সকাও আর্কে ফিরেছেন এবং তার কিছুক্ষণ পর হাজার হাজার লোক, এবং শত শত ঘোড়া-গাধা-খচ্চর চড়ে গাঁয়ের লোক এসেছে নূতন বাদশাকে অভিনন্দন জানাতে—সোজা ফার্সীতে বলে, ইনাম, বখশিশ, লুটেরা হিস্যা কুড়োতে। এরা একবার আর্কে ঢুকতে পারলে বেশ কিছুটা খণ্ড-যুদ্ধ লেগে যাওয়া বিচিত্র নয়। জাফর খান তাই আগেই হুকুম দিয়ে রেখেছিল, জনতা দুর্গে ঢোকবার চেষ্টা করলে তাদের যেন ঠেকানো হয়। লেগে গেল ধুন্ধুমার। আপনি তার শেষটুকু দেখেছেন, হুজুর—বুঝুন তখন কি হয়েছিল।

'বাচ্চা ফিরতেই মোল্লারা তাকে সব-কিছু বলে শব্‌নম বীবীকে ছেড়ে দিতে বলে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নাকি খবর আসে জাফর খান খুন হয়েছে। এবং আশ্চর্য, শব্‌নম বীবীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাচ্চার হুকুমে সমস্ত আর্ক তন্ন তন্ন করে তালাশ করা হয়েছে।'

আমি শুধালুম, 'হাসান আলী কি বলে?'

'ওই এক কথা—"আমার কোনও দোষ নেই, আমার কোনও কসুর নেই।" ভিড়ের চাপে নাকি একে অন্যের কাছ থেকে ছিটকে পড়ে।'

'সে কতক্ষণ হল?'

'ঘণ্টা দুই হবে। আপনি তো সে ভিড়ের এক আনা পরিমাণ দেখলেন।'

'হাসান আলীকে ডাক।'

এল। আমার যা জানার সব চেয়ে প্রয়োজন সে কি আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুধিয়ে জিজ্ঞেস করি নি। ওই এক কথা। হাসান আলী হঠাৎ দেখে, শব্‌নম বানু তার কাছে নেই—ওই এক কথা।

আমি মনসুরকে বললুম, 'চল।'

দেউড়িতে এসে মনসুর শুধালে, 'কোথায় যাবেন, হুজুর?'

তাই তো। কোথায় যাব? 'চল, আর্কে। না। চল, আব্দুর রহ্‌মান কোথায় দেখি।'

কর্নেলের বাড়ি পৌঁছতে মনসুর সেখানে খবর নিলে। যখন ফিরলো তখন তার মুখ থেকেই আমি বুঝতে পারলুম, কোনও খবর নেই। মনসুর কিছুক্ষণ পরে বললে, 'কর্নেলের বীবী আপনাকে বলতে বললেন, শব্‌নম বীবীকে লুকোবার প্রয়োজন হলে তিনি প্রস্তুত আছেন। তাঁদের গাঁয়ের বাড়ি সম্পূর্ণ নিরাপদ।' তার পর মনসুর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'কর্নেলের মত সজ্জন লোক মারা গেলেন যুদ্ধে—আর বেঁচে রইল এই ডাকাতরা।' তারপর বিড়বিড় করে স্কুলপাঠ্য বই থেকে বিখ্যাত কবিতা আবৃত্তি করল, "তন্বঙ্গী কুমারী লজ্জা নিবারণের ট্যানা নেই বলে বাড়ি থেকে বেরতে পারছে না, আর ওদিকে বড় লোকের কুকুর মখমলের বিছানায় শুয়ে আছে। হে সংসার, আমি তোমার মুখের উপর থুথু ফেলি।"

আমি কি বলব, কি ভাবব। মনসুরের দার্শনিক কাব্যবৃত্তি আমার ভালোও লাগে নি মন্দও লাগে নি।

মনসুর শেষ কথা বললে, 'কিন্তু দেখুন হুজুর কর্নেলের স্ত্রী ভেঙে পড়েন নি।'

আমি গুরু সে শিষ্য।

মনে নেই, হয়তো কোনও দিন ক্লাসে চরিত্রবল সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলুম।

আব্দুর রহ্‌মান বাড়ি ফেরে নি।

কাবুল নদীর পোলের উপর তার সঙ্গে দেখা। গায়ে ওভারকোট নেই। বাকি জামা-কাপড় টুকরো টুকরো। মনসুর তার সঙ্গে কথা বললে। বলার শোনার কিছু নেই। আব্দুর রহ্‌মান ঘণ্টা তিনেক ওই জনসমুদ্র মন্থন করেছে। গালে, বাহুতে, হাতের কাছে জখমও তার দেখতে পেলুম। কোনও গতিকে পা টেনে টেনে চলে আসছিল। কিছুতেই বাড়ি যেতে রাজী হল না।

আর্কের সামনে দুটি-একটি লোক। সেখানে মার্শল ল। পাঁচজনের বেশী একত্র দেখলে সান্ত্রীদের গুলি চালানোর হুকুম। জায়গাটা এখন প্রায় ফাঁকা।

আব্দুর রহ্‌মান মনসুরকে বললে, 'হুজুরকে বলুন, এ জায়গার সব তন্ন তন্ন করে দেখেছি। এই পেয়েছি।'

তাকিয়ে দেখি আমার পাঞ্জাবির—আমারই হবে—এক পাশের ছেঁড়া কাপড়ের সঙ্গে একটি পকেট। এদেশে এরকম সাইড পকেটওয়ালা পাঞ্জাবি হয়

না। এটা শব্‌নম আমার কাছ থেকে নমুনা হিসেবে নিয়ে গিয়েছিল, একদিন ওইটে আমার ঘরে পরেছিল।

এইটে পরেই কি সে আর্কে এসেছিল?

দয়াময়, দয়া কর।

অনেকক্ষণ পর মনসুর মৃদুস্বরে ফের শুধালে, 'কোথায় যাবেন, হুজুর?'

'তোমার বাড়ি।'

ভারি খুশী হয়ে বললে, 'তাই চলুন হুজুর।' আমি তাকে খুশী করার জন্য প্রস্তাবটি করি নি। তার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য। নেমক-হারামী? হ্যাঁ। কিন্তু আমি একা, একবার নিজের সঙ্গে একা হতে চাই।

আব্দুর রহ্‌মানকে নিয়েও বিপদ। শেষটায় যখন বললুম, কর্নেলের ছেলেকে বসিয়ে রাখার হক্ক আমাদের নেই—তার মা ওদিকে হয়তো ব্যাকুল হচ্ছেন তখন সে রাজী হল। বাড়িতে ঢোকবার সময় হঠাৎ তার মুখে হাসি ফুটল। কেন? হায় রে! যদি বীবী সায়েবা ওই বাড়িতে ওঠেন।

মনসুর আমাকে খাওয়াবার চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, সে জানে, আমি সমস্ত দিন কিছু খাই নি। আগের রাত্রে কতখানি খেয়েছিলুম, সে পাশে বসে দেখেছে—সে তো বরের খাওয়া!

তার প্রত্যেকটি কথা আমার বুকে বিঁধছিল। কেন সে কাল রাত্রের কথা আমাকে স্মরণ করায়? আমি বললুম, 'বাবা, আমি এখন কিছু খেতে গেলে বমি হবে।'

কোথায় যাই? কোথায় সন্ধান করি? কোথায় গেল সে? একটা মানুষ কি করে হঠাৎ অদৃশ্য হতে পারে? কেন দেখা দিচ্ছে না? জাফরকে খুন করল কাদের ভয়ে? খবর পাঠাচ্ছে না কেন? আমাকে জড়াতে চায় না বলে? কিংবা—কিংবা—না, না, আমি অমঙ্গল চিন্তা করব না।

এই দুপুর রাত্রে কার কাছে গিয়ে আমি সন্ধান নিই? কড়া নাড়লে তো কেউ দরজা খুলবে না। নিশ্চয়ই ডাকাত—বাচ্চার ডাকাত। গৃহস্থ গুলি ছুঁড়তে পারে। তা ছুঁড়ুক।

মাত্র একটি প্রাণীর কথা মনে পড়ল। শব্‌নম বিয়ের রাতে বলেছিল—না পরে? আমার যে সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে—যে তার সখীদের সে ভুলে গিয়েছে। তখন একজনের নাম ও করেছিল। সে-ই তা হলে সব চেয়ে তার প্রিয় সখী। বাড়িটা আবছা-আবছা চিনি—স্বামীর নাম থেকে। তখন শুনেছিলুম কান না

দিয়ে। সেখানেই যাই। আর্কের অতি কাছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ আশ্রয় নিতে হলে সেই তো সব চেয়ে কাছে।

আর্কের কাছে এসেছি। ক্লান্তিতে পা দু-খানা অবশ হয়ে এসেছে—না শীতে। হঠাৎ মনে হল, শব্‌নম যদি ইতিমধ্যে বাড়ি ফিরে থাকে? হে খুদা! পাগলের মত ছুটলুম বাড়ির দিকে।

বাড়ি থেকে আবার বেরিয়েছি। কেউ ছাড়তে চায় নি। জানেমন্ শুধু বলেছিলেন,—'বে-ফায়দা, বে-ফায়দা।' কিন্তু ঠেকাবার চেষ্টা করেন নি।

বাঁচালে। চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়েছে। রাত কটা হল? ঘড়িতে দম দেওয়া হয় নি। চাঁদটা কাল রাতের কথা বড্ড বেশী স্মরণ করিয়ে দেয়। যেন আমার আপন মন নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিতে কিছু কসুর করছে!

কাবুলে দিনদুপুরেও অপরিচিত জনকে কেউ কোনও বাড়ি বাতলে দেয় না। কে জানে তুমি কে? হয়তো রাজার গুপ্তচর। তার বিপদ ঘটাতে এসেছ। বন্ধুজন যদি হবে তবে তো বাড়ি তোমার চেনা থাকার কথা।

এ-রাজা আবার ডাকু। বেধড়ক লুটপাট হচ্ছে। তাব উপর রাত দুপুর। তিনটেও হতে পারে।

তবু বাড়ি খুঁজে পেয়েছিলুম। দরজাও খুলেছিল।

শব্‌নমের নব বর গভীর রাতে নিজের থেকে এসেছে—যার সঙ্গে কোনও চেনা-শোনা নেই। আনন্দোল্লাস হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এরা আর সব খবর ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছে। শোকে আনন্দে মিশিয়ে তারা আমাকে যা অভ্যর্থনা জানিয়েছিল সে-রকমধারা অপরিচিতের বাড়িতে কেউ কখনও পায় আমি কল্পনাই করতে পারি নি। মুরুব্বীরা কেমন যেন অপরাধীর মত ম্লান হাসি হেসে আমাদের একা রেখে চলে গেলেন। সখীর স্বামী বয়সে কম হলেও বিচক্ষণই লোক। আমাকে সখী—গুল্-বদন বানুর কাছে বসিয়ে কি একটা অছিলা করে উঠে গেলেন।

সম্পূর্ণ অপরিচিত আমি—শাস্ত্রে নিশ্চয়ই বারণ—তবু সে আমাকে একা পাওয়া মাত্রই আমার হাত দু-খানা নিজের হাতে তুলে চোখে ঠেকিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছিল। আমাদের নিয়ে সে কত সুখস্বপ্ন দেখেছিল সে-কথা বলতে বলতে বার বার তার গলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল আর কখনও বা হাউহাউ করে কেঁদে উঠেছিল।

'কোথায় যেতে পারে? তাকে কে না স্থান দেবে? কিন্তু আমার বাড়িতে না এসে সে অন্য কার বাড়িতে যাবে? আমার শ্বশুর তার জ্যেঠার

বিশেষ বন্ধু।'

হঠাৎ তার কি খেয়াল গেল জানি না। বলে উঠল, 'তাই হয়তো হবে, হ্যাঁ, তাই।' যেন আপন মনে চিন্তা করছে। আমি কোনও কথায় বাধা দিই নি। পাছে সামান্যতম কোনও দিক্‌নির্দেশ তারই ফলে কাটা পড়ে যায়, এবং পরে সেটা তার স্মরণে না আসে।

বললে, 'তাই বোধহয় সে তার অতি অল্প চেনা কোনও লোকের বাড়িতে গিয়েছে।' একসঙ্গে দু-জনাতে বলে উঠলুম, 'তাহলে খোঁজ নেব কোথায়?'

গুল্‌-বদন বানুর শোক, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগের গভীরতা আমার ভাগ্য নিপীড়নের কাছে এসে দাঁড়াল যেন একাত্মদেহ সখার মত। এ তো সান্ত্বনা নয়, প্রবোধ-বাণী নয়, এ যেন আমার হয়ে আরেকজন আমার সমস্ত দুর্ভাবনা আপন কাঁধে তুলে নিয়ে দূর-দূরান্তে তাকিয়ে দেখছে, কোথায় গিয়ে সে ভার নামানো যায়।

'কিন্তু খবর পাঠাচ্ছে না কেন? ধরা পড়ার ভয়ে, সুযোগ পায় নি বলে? কেউ তাকে আটকে রেখে সুযোগ দিচ্ছে না বলে?'—আপন মনে গুল্‌-বদন বানু কথা বলে যাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে আমার হাত দুখানা আপন হাতে তুলে নিচ্ছে।

'এই আমাদের প্রথম দর্শন—আর শব্‌নম কাছে নেই।'

এবার সে কেঁদে ফেললে।

তার স্বামী আপন হাতে খুঞ্চায় করে রুটি-গোস্ত নিয়ে এসেছেন। চাকরের মত হাত ধোবার জাম-বাটি ধারাযন্ত্র নিয়ে এলেন তারপর। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি ওঁকে শান্ত করবে, না, তুমিই ভেঙে পড়ছ।' অতি শান্তকণ্ঠে, কোনও অনুযোগ না করে।

আমি বললুম, 'আমার বমি হয়ে যাবে।'

সেই কণ্ঠেই বললেন, 'তা যাক্‌। যেটুকু পেটে রইবে সেইটুকুই কাজে লাগবে।'

পাশে বসে বাঁ হাত দিয়ে পিঠে হাত বুলতে বুলতে ডান হাত দিয়ে খাবার মুখে তুলে দিয়েছিলেন। গুল্‌-বদন সামনে এসে হাঁটু গেড়ে খাড়া গোড়ালির উপর বসে সামনে তোয়ালে ধরে দাসীর মত সেবার অপেক্ষা করছিল।

এরা বড়লোক। সেবা করার সুযোগ পেলে এরা জন্মদাসকে হার মানায়।

আমি বললুম, 'এবার উঠি।' আমার সব শোনা হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে গুল্‌-বদন বানু জানুর উপরে কাগজ রেখে পরিষ্কার গোটা-গোটা অক্ষরে শব্‌নমের সম্ভব-অসম্ভব সব পরিচিতদের ফিরিস্তি তৈরী করেছেন। স্বামী

মাঝে মাঝে তাকে সাহায্য করলেন। গুল্‌-বদন বার বার আমাকে বললে, 'তোমাকে কিছু করতে হবে না। এসব জায়গায় আমার শওহর—স্বামী—যাবেন।' তার স্বামী স্বল্পভাষী। বললেন, 'এ বাড়িতে আমার কোনও কাজ নেই। আমি ছোট ছেলে। আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমার কোনও ত্রুটি হবে না। আমানুল্লার পরিত্যক্ত যেসব সত্যকার ভালো গোয়েন্দা ছিল তারাই আমাকে সাহায্য করবে। কিন্তু কঠিন কাজ। আমি শব্‌নম বীবীকে চিনি। তিনি যদি মনস্থির করে থাকেন কেউ যেন তাঁর খবর না পায়, তবে তিনি এমনই পরিপাটিরূপে সেটা করবেন যে সে গিঁঠ খোলা বড় কঠিন হবে।'

আমি ধন্যবাদ জানাই নি। উঠে দাঁড়ালুম। গুল্‌-বদন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এ রাতে আপনি কোথায় যাবেন? ঝড় উঠেছে।'

তার স্বামী বললেন, 'চলুন।' চকমেলানো বাড়ির চত্বরে নামতে দেখি, উপরের বহু ঘরে আলো জ্বলছে। মুরুব্বীরা জেগে আছেন।

চত্বরেই বুঝলুম ঝড় কত বেগে চলেছে। যদিও চতুর্দিক তিনতলা ইমারতে ইমারতে নিরন্ধ্র বন্ধ।

দেউড়ি খুলতেই আমরা ব্লিজার্ডের ধাক্কায় পিছিয়ে গেলুম। বরফের সাইক্লোন। সামনে এক বিঘতও দেখা যায় না।

স্বামী বললেন, 'আপনি না দেখলে বিশ্বাস না করে ঘরের ভিতর শুধু ছট্‌ফট করতেন। এবারে চলুন। ঘরে গিয়ে আলো নেবাই। না হলে মুরুব্বীরা জেগে রইবেন।'

প্রথম আঘাতে মানুষ বিমূঢ় হয়ে যায়। তারপর আসে ভাগ্যবিধাতার উপর দিগ্বিদিক্‌শূন্য অন্ধ ক্রোধ। তারপর নির্জীব অসাড়তা।

কিন্তু সে জাড্যে নিদ্রা আসে না।

দেশের মেঘলা ভোর তবু বোঝা যায়। এ দেশে বরফের ঝড়ের পিছনে সূর্যোদয় পঞ্চেন্দ্রিয়াতীত ষড়যন্ত্রযোগে অনুভব করতে হয়।

ওরা বাধা দেয় নি। ঝড় থেমেছে কিন্তু যেভাবে একটানা বরফ পড়ছে তার ভিতর আমি কিছুতেই বাড়ির পথ খুঁজে পেতুম না। আমার বার বার মনে হচ্ছিল, পথপ্রদর্শক আমাকে ঠিক উল্টো পথে নিয়ে যাচ্ছে।

আশ্চর্য! এমন জিনিসও মানুষ এসময় ভোলে! গুল্‌-বদনের ফিরিস্তি সঙ্গে আনি নি!

আমি কোথায় পৌঁছলুম?

॥ ৩ ॥

বিরহের দিনে শব্‌নম বলেছিল, 'তুমি আমার বিরহে অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না।' আমি তার সে আদেশ পালন করেছি। বিধাতা ঘাড় ধরে করিয়েছিলেন।

যখন চিরন্তন মিলনের সুখস্বপ্ন সে দেখেছিল তখন সে বলেছিল—ওই—তার শেষ কথা এখনও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি—'তুমি আমার মিলনে অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না।' এ কথা স্মরণ হলে ভাগ্য-বিধাতার মুখ-ভেংচানি দেখতে পাই।

কিন্তু শব্‌নম তার কথা রাখে নি। সে তার শেষ আদেশ দিয়ে গিয়েছিল, আমি যেন বাড়িতে থাকি, সে ফিরে আসবে। সে আসে নি।

ক' বছর হল, আব্দুর রহ্‌মান?

কাবুল শহর আর তার আশ-পাশের গ্রামে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। লিগেশনের ভারতীয় কর্মচারী আমাকে বার বার পরিষ্কার বললেন, সে আর্কের ভিতর নেই। আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর গুপ্তচর তিনি সঙ্গে এনেছিলেন। আমার সামনেই তাকে তিনি ক্রস্‌ করলেন। এমন সব অসম্ভব অসম্ভব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন যেগুলো কখনও আমার মাথায় আসত না। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, অনুসন্ধানে কণামাত্র ত্রুটি হয় নি।

তার কিছুদিন পর তিনি একজন একজন করে তিনজন চর পাঠালেন। এরা কাবুল শহর ও উপত্যকার সব কটা গ্রাম ভালো করে দেখে নিয়েছে। ওগুলো আমি নিজে অনুসন্ধান করেছি বহুবার। কোনও কোনও গ্রামে আমার আপন ছাত্র আছে। মনসুরের কাছ থেকে খবর পেয়ে তারা সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় খানা-তালাশী হাট-মাঠ তালাশী সব-কিছু করেছে, কিন্তু আমার সামনে আসে নি—মনসুরকে নিষ্ফলতা জানিয়ে গিয়েছে। আমাকে তাদের গ্রামে, তাদের গৃহে অপ্রত্যাশিতভাবে আসতে দেখে তারা আমাকে কোথায় বসাবে, কি সেবা করবে ভেবে না পেয়ে অভিভূত হয়েছে। তিন শ' বছর আগে ভারতবর্ষে গুরু তার শিষ্যগৃহে অযাচিত আগমন করলে যা হত এখানে তাই হল। তারও বেশী। গুরুপত্নীর অনুসন্ধানে গাফিলি করবে এমন পাষণ্ড আফগানিস্থানে এখনও জন্মায় নি। লিগেশনের সব ক'জন চরই একবাক্যে স্বীকার করলে, তারা এমন কোনও জায়গায় যেতে পারে নি যেখানে আমি এবং আমার চেলারা তাদের পূর্বেই যায় নি।

এত দুঃখের ভিতরও মনসুর একদিন একটি হাসির কথা বলেছিল। তার ক্লাসের সব চেয়ে দুর্দান্ত ছেলে ছিল ইউসুফ। মনসুর বললে, 'এই কাবুল

উপত্যকার প্রথম চেরি, প্রথম নাসপাতি—তা সে যেখানেই পাকুক না কেন—খায় ইউসুফ। শব্‌নম বীবী ইউসুফের চোখের আড়ালে বেশীদিন থাকতে পারবেন না। এ শহরের সব দুঁদে ছেলের সর্দার সে-ই। ওদের নিয়ে সে লেগেছে। কোন বাড়িতে কে বীবীকে লুকিয়ে রাখতে পারবে আর ক-দিন?'

আমি শুধালুম, 'আর সবাই আমাকে দেখতে এল সে এল না?'

'সে বলেছে খবর না নিয়ে সে আপনার সঙ্গে দেখা করবে না।'

আমি যে অবস্থায়, তখন আমার কাছে সম্ভব অসম্ভব কোনও পার্থক্য নেই। তবু জানি উপত্যকার বাইরে এখন কেউ যেতে পারে না, এবং বাইরের লোক আসতে পারছে না বলেই খাওয়াদাওয়ার অভাবে গরীব-দুঃখীদের ভিতর দুর্ভিক্ষ লেগে গিয়েছে। সিগারেট তো কবে শেষ হয়েছে ঠিক নেই—চালান আসে হিন্দুস্থান থেকে—এ-বাড়ি ও-বাড়িতে তামাকের জন্য হাত পাতা-পাতি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কাবুলের পূর্বদিকের গিরিপথ বরফে সম্পূর্ণ বন্ধ। পশ্চিমের পথে গজনীর ডাকাতরা বসে আছে, বাচ্চা একটু বেখেয়াল হলেই উপত্যকায় ঢুকে লুটপাট আরম্ভ করবে এবং তার পর শহরের পালা। এই পশ্চিমের পথ দিয়েই আব্দুর রহ্‌মান গিয়েছে আওরঙ্গজেব খানকে খবর দিতে। যাবার সময় সে দরবেশের পোশাক পরে নিয়েছিল, এ ছাড়া আর কোনও মানুষ ডাকাতদের হাতে থেকে নিষ্কৃতি পায় না।

উত্তরের পথে বাচ্চা-ই-সকাওর গ্রাম। সে পথে তারই লোকজন ছাড়া কেউ আসা-যাওয়া করে না। দক্ষিণ দিকে পথ নেই, যেটুকু আছে তার উপর কত ফুট বরফ কে জানে!

পুরুষের পক্ষে বেরনো অসম্ভব, দরবেশবেশী আব্দুর রহ্‌মানও শেষ পর্যন্ত কান্দাহার পৌঁছবে কি না সে নিয়ে সকলেরই গভীর দুশ্চিন্তা, মেয়েছেলের তো কথাই ওঠে না। এই কাবুল উপত্যকাতেই শব্‌নম আছে, কিংবা—?

রাস্তায় যেতে যেতে একদিন দুই সম্পূর্ণ অজানা লোককে কথা বলাবলি করতে শুনেছিলাম। একজন বললে, 'আওরঙ্গজেব খানের মেয়ে বোধহয় কোনও বাড়িতে—গ্রামেই হওয়ার সম্ভাবনা বেশী—আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি সেখানে বোধহয় খুন হয়েছেন।'

অন্যজন শুধালে, 'তাঁকে খুন করবে কেন?'

সে বললে, 'বাচ্চার ভয়ে, জাফরের সঙ্গী-সাথী আত্মীয়স্বজনের ভয়ে। ধরা তো পড়বেই একদিন। তখন তার উপায় কী?'

আমি জানতুম বাচ্চা শব্‌নম বীবীর সন্ধানের জন্যে কোনও হুকুম দেয় নি।

জাফরের আত্মীয়স্বজনের তার জন্য রক্তের সন্ধানে বেরবার কথা; তারাও বেরোয় নি।

কোন্ ভরসায় তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলুম সে কথা বলতে পারব না। আপন পরিচয় দিয়ে তাদের করজোড়ে শুধিয়েছিলুম, তারা আমাকে কোনও নির্দেশ দিতে পারে কি না? দুজনাই অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে বার বার মাফ চেয়ে বললে, তারা সত্যই কোনও খবর জানে না—চা-খানায় আলোচনার খেই ধরে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল মাত্র। দ্বিতীয় লোকটি দৃঢ়কণ্ঠে একাধিকবার বললে, 'আমার বাড়িতে যদি কোনও মেয়েছেলে একবার ঢুকে আশ্রয় নিতে পারে, তবে আমি খুন না হওয়া পর্যন্ত তার দেখ-ভাল করব।'

কোনও খবরের সন্ধানে মানুষ এ-দেশে যায় সরাইয়ে কিংবা বড়বাজারে। বাজার বন্ধ। সরাইয়ে নূতন লোক তিন মাস ধরে আসে নি। পুরনোরা আটকা পড়ে কষ্টেশ্রেষ্টে দিন কাটাচ্ছে। সরাইয়ের মালিক আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও আমাকে প্রচুর খাতির-যত্ন করলে। বললে, 'ইউসুফ প্রায়ই এসে খবর নেয়, নূতন কোনও মুসাফির কোনও দিক দিয়ে শহরে ঢুকতে পেরেছে কি না! ওকে আমরা সবাই খুব ভালো করে চিনি। আগে এলে আমাদের ভিতর সামাল সামাল রব পড়ে যেত। এখন এসে একবার সকলের দিকে তাকায়, নূতন কেউ এসেছে কি না, আমাকে দু-একটি প্রশ্ন শুধায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে চলে যায়। এই যে আমার চত্বরে বরফজল জমেছে, আগে হলে ইউসুফ স্কেটিং করে করে এখানে পুরো দিনটা কাটিয়ে দিত।'

আমি তাকে শুধালুম, তার কি মনে হয়, শব্‌নম কোথায়?

অনেক চিন্তা করে বললে, 'দেখুন, আমি সরাই চালাই! তার পূর্বে আমার বাবা সরাই-ই চালাতেন। আমার জন্ম ওই উপরের তলার ছোট্ট কুঠরিতে। চোর-ডাকু, পীর-দরবেশ, ধনী-গরীব দূর-দরাজের মুসাফিরদের উপর কড়া নজর রেখে তাদের দেখ-ভাল করে আমার দাড়ি পাকল। আমাকে সব খবরই রাখতে হয়। আমি অনেক ভেবেছি। এই সরাইয়ে শীতের রাতে আগুনের চতুর্দিকে বসে দুনিয়ার যত গুণী-জ্ঞানী ঘড়েল-বদমাশরা এই নিয়ে অনেক আলোচনা করেছে, কিন্তু সবাই হার মেনেছে।'

তারপর অনেকক্ষণ ভেবে বললে, 'একমাত্র জায়গা কোনও দরবেশের আস্তানা। সেখানে অনেক গোপন কুঠরি গুহা থাকে। রাজনীতির খেলায় কেউ সম্পূর্ণ হার মানলে হয় পালায় মক্কা-শরীফে—সময় পেলে—না হয় আশ্রয় নেয় দরগা-আস্তানায়।'

আমি প্রত্যেক আস্তানায় একাধিকবার গিয়েছি।

আবার ভেবে বললে, 'তা-ই বা কি করে হয়? বয়স্ক লোকদের ফাঁকি দেওয়া যায়। কিন্তু বাচ্চাদের কাছ থেকে কোনও জিনিস গোপন রাখা অসম্ভব। ইউসুফ যখন লেগেছে তখন—? না, সে হয় না। আপনিও তো প্রত্যক দরগায় গিয়েছেন। পীর দরবেশরা অন্তত আপনাকে তো গোপন খবরটা দিয়ে আপনার এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতেন। দরবেশও তো মানুষ। দরবেশ হলেই তো হৃদয়টা আর খুইয়ে বসে না।'

বিদায় দেবার সময় সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বার বার সহৃদয় নিশ্চয়তা দিলে, যে-কোনও সময়ে কোনও দিকে যদি সে খবর পায় তবে নিজে এসে আমায় খবর দিয়ে যাবে।

জীবনই অভিজ্ঞতা, আর অভিজ্ঞতাই জীবন। অভিজ্ঞতাসমষ্টির নাম জীবন আর জীবনকে খণ্ড খণ্ড করে দেখলে এক-একটি অভিজ্ঞতা। এক-একটি অভিজ্ঞতা যেন এক ফোঁটা চোখের জলের রুদ্রাক্ষ। সব কটা গাঁথা হয়ে যে তসবী-মালা হয় তারই নাম জীবন।

একটি অক্ষ দিয়েই আমার সম্পূর্ণ মালা।

সেই অক্ষবিন্দুতে দেখলুম প্রতিবিম্বিত হচ্ছে বহুজনের মুখ। এরা কেন এত দরদী? এদের কী দায়, আমি শব্‌নমকে খুঁজে পেলুম কি না? আল্লা আমাকে মারছেন। তাই দেখে তো ভয় পেয়ে এদের উচিত আমার সঙ্গ বর্জন করা। কই, তারা তো তা করছে না! হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ল এদের এই অঞ্চলের একটি কাহিনী—

বাচ্চারা পেয়েছে বাদাম। ভাগাভাগি নিয়ে লেগেছে ঝগড়া। পণ্ডিত নস্‌রুদ্‌দীন খোজা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে করতে আল্লার প্রশংসাধ্বনি (হাম্‌দ্‌) উচ্চারণ করছিলেন। ছেলেরা তাঁকে মধ্যস্থ মানলে ভাগ-বখরা করে দেবার জন্য। তিনি হেসে শুধালেন, 'আল্লা যে ভাবে ভাগ করে দেয় সেই ভাবে, না মানুষের মত ভাগ করে দেব?' বাচ্চারাও কিংবা বলব বাচ্চারাই আল্লার গুণ মানে বেশী, সমস্বরে বললে, 'আল্লার মত।'

খোজা কাউকে দিলেন পাঁচটা, কাউকে দুটো, কাউকে একটাও না। বাচ্চারা অবাক হয়ে শুধালে, 'এ কি? একে কি ভাগ করা বলে?' খোজা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখ, আল্লা মানুষকে কোনও কিছু সমান সমান দিয়েছেন কি না। সে-রকম সমান ভাগাভাগি শুধু মানুষই করে।'

তাই বুঝি করুণাময় আমার প্রতি অকরুণ হয়েছেন দেখে মানুষ সেটা সহানুভূতি দিয়ে পুষিয়ে দিতে চায়। তাই বুঝি তিনি যখন বিধবার একমাত্র শিশুকে কেড়ে নেন তখন স্বপ্নদেবী তাকে বার বার মা-জননীর কোলে তুলে দেন। তাই বুঝি সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টিতে বার বার অসম্পূর্ণতা রেখে দেন—মানুষ যাতে করে সেটাকে পরিপূর্ণ করে তুলে ধরতে পারে।

কিন্তু আমার গুরু, আমার একমাত্র সাহেব, মুহম্মদ সাহেব যে বার বার বলেছেন, তিনি আল্লার পরিপূর্ণতা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেন, শঙ্কর যে বলেন তিনিই পরিপূর্ণ সত্য, অন্য সব মিথ্যা—তার কী?

আমার এই দুঃসহ বিরহ-ভার আর অসহায় অনিশ্চয়তা?

মিথ্যা।

মানলুম। কিন্তু এই যে এতগুলো লোকের অন্তরের দরদ তাদের কথায় ভাষায়, তাদের চোখের জলে টলটল করছে?

মিথ্যা।

মানি নে। আল্লা যদি তাঁর পরিপূর্ণতা কোনও জায়গায় প্রকাশ করে থাকেন তবে সেটা দরদী হৃদয়ে। সৃষ্টির সঙ্গেকার সেই প্রাচীন কথা আজ কি আমাকে নূতন করে বলতে হবে, 'বরঞ্চ আল্লার মসজিদ ভেঙে ফেল কিন্তু মানুষের হৃদয় ভেঙো না।'

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, বাসর রাতে লায়লী-মজনূঁ কাহিনী শেষ করেছিল শব্‌নম ওই কথা বলে, পরমেশ্বর এ সংসারে স্বপ্রকাশ হয়েছেন একটিমাত্র রূপে—সে প্রেমস্বরূপ।

আচ্ছন্নের মত বাড়ি ফিরেছিলুম।

জানেমনের ঘরে শব্‌নমের সখী।

তিনি বললেন, 'সেই ভালো। ওকে নিয়ে যাও সুফী সাহেবের কাছে।'

পাগলকে মানুষ নিয়ে যায় সাধুসন্তদের কাছে। আমি কি পাগল হয়ে গিয়েছি?

সখীর বর সঙ্গে চললেন। সখী অনুযোগের সুরে বললে, 'কোথায় না তুমি জ্যোতিহীন বৃদ্ধ চাচাশ্বশুরের সেবা করবে, না তিনি তোমার চিন্তায় ব্যাকুল!'

স্বামী বললে, 'থাক্ না এসব কথা।'

এই প্রথম একটি লোক পেলুম, যিনি আমাদের কথা কিছুই জানেন না।

সব কথা শুনে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাচ্চা, তোমার চাচাশ্বশুর জানেন না, এমন কি কথা আমার আছে যা তোমাকে আমি বলব? তিনি সংসারে থেকেও বৈরাগী। তিনি 'সুফ' (পশম) না পরলেও সুফী।'

আমি অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে বললুম, 'তিনি আমাকে কিছু বলেন নি।'

বললেন, 'তিনিই বা বলবেন কী, আমিই বা বলব কী? আমরা যা-কিছুই বলি না কেন, তুমি তো সেটা বোঝবার চেষ্টা করবে তোমার মন দিয়ে। সেই মন কী, তুমি তাকে চেন? এ যেন একটা কাঠি দিয়ে কাপড় মেপে দেখলে বারো কাঠি হল। যদি সেই কাঠিটা কতখানি লম্বা সেটা তোমার জানা না থাকে তবে কাপড় মেপে বারো বার না বাইশ বার জেনে তো লাভ হল না। নিজের মন হচ্ছে মাপকাঠি। সেই মনকে প্রথম চিনতে শেখ।'

সখী বললে, 'সে মন চেনা যায় কী প্রকারে?'

সুফী সাহেব আমার দিকে তাকালেন। আমি মাথা নেড়ে সায় দিলুম।

বললেন, 'মনকে শান্ত করতে হবে। বিক্ষুব্ধ জলরাশিতে বনানী প্রতিবিম্বিত হয় না।'

আমি শুধালুম, 'আরম্ভ করতে হবে কী করে?'

কণামাত্র চিন্তা না করে বললেন, 'সুফী-রাজ ইমাম গজ্জালী সকল সুফীদের হয়ে বলেছেন, "মন্দ আচরণ থেকে নিজেকে সংহত করে, বাহ্য জগৎ থেকে ইন্দ্রিয়গণের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে, নির্জনে চক্ষু বন্ধ করে, অন্তর্জগতের সঙ্গে আত্মার সংযোগ স্থাপনা করে, হৃদয় থেকে আল্লা আল্লা বলে তাঁকে স্মরণ করা।" '

আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি হেসে বললেন, 'বুঝেছি। তুমি এখন আল্লার উপর বিরূপ। তাতে কিছু যায় আসে না। মানুষের বিরূপ ভাব তাঁর প্রেমকে ছাড়িয়ে যেতে পারে—এ তার দম্ভ। কিন্তু সে-কথা এস্থলে অবান্তর। তুমি সেদিকে মন দিতে চাও না, তবে আপন আত্মার দিকে সমস্ত চৈতন্য একাগ্র কর। সেই আত্মা—যিনি সুখ-দুঃখের অতীত। হদীসে আছে, "মন্ অরফা নফ্‌সহু ফকদ্ অরফা রব্বাহু।" যে নিজেকে চিনতে পেরেছে সে তার প্রভুকে চিনতে পেরেছে।'

আরেকবার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি খেলে গেল।

'মন সর্বক্ষণ অন্য দিকে ধায়? তাতেই বা ক্ষতি কী? যাকে তুমি ভালোবাস তার সঙ্গে যদি একাত্ম দেহ হয়ে গিয়ে থাক তবে নিজের আত্মার দিকে, না তার দিকে মন রুজু করেছ তাতে কী এসে-যায়! সে তো শুধু নামের পার্থক্য।'

বেদনা আমার জিহ্বার জড়তা কেটে ফেলেছে। বললুম, 'একাত্ম দেহ হতে

পারলে তার বিরহে বেদনা পেতুম না, তার চিন্তা অসহ্য হত না।'

গভীর সস্নেহ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভয় নেই। ঠিক পথে চলেছ। একাধিক সূফী বলেছেন, আল্লার দিকে মন যাচ্ছে না আত্মার দিকে মন যাচ্ছে না—? নাই বা গেল। তোমার কাছে সব চেয়ে যা প্রিয় তাই নিয়ে ধ্যানে বস। সে যদি সত্যই প্রিয় হয় তবে মন সেটা থেকে সরবে কেন?—আর মূল কথা তো মনকে একাগ্র করা, অর্থাৎ মনকে শান্ত করা।

'আসলে কী জান, মন গঙ্গাফড়িঙের মত। ক্ষণে সে এদিকে লাফ দেয়, ক্ষণে ওদিকে লাফ দেয়। এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে চায় না। কিংবা বলতে পার, কাবুল উপত্যকার চাষার মত ছায়ায় জিরোচ্ছে, কিন্তু কিছুক্ষণ না যেতে-যেতেই রৌদ্রে গিয়ে কাজ করছে, ফের ছায়ায় ফিরে আসছে, ফের রৌদ্র ফের ছায়া।

'তার গায়ে জ্বর—তোমার মত। তাকে একনাগাড়ে সমস্ত দিন ছায়ায় শুইয়ে রাখতে হবে, তবে ছাড়বে তার জ্বর।

'তোমার মন হবে শান্ত।'

সূফী সাহেব থামলেন। আমি সব-কিছু ভুলে গিয়ে শুধালুম, 'তার পর?'

ইচ্ছে করে অবাক হওয়ার ভান করে বললেন, 'তার পর আর কি বাকী রইল? তখন মালিক যা করার করবেন। তুমি তখন শান্ত হ্রদ—মালিক তাঁর ছায়া ফেলবেন। তোমার অজ্ঞেয় অগম্য কিছুই থাকবে না।'

হেসে বললেন, 'তাঁকেও তো কিছু একটা করবার দিতে হয়। সব দুর্ভাবনা কি তোমার?'

আমি সেই পুরাতন প্রশ্ন শুধালুম, যে প্রশ্ন আজ নয়—বহুকাল ধরে মনে জেগে আছে, 'বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা যখন চিন্তা করি, কল্পনাতীত অন্তহীন দূরত্বের পিছনে বিরাটতর অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সংবাদ যখন বৈজ্ঞানিকেরা দেয় তখন ভাবি, আমি এই কীটের কীট, আমার জন্য আর কে কতখানি ভাবতে যাবে?'

সূফী সাহেব বললেন, 'সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে তোমার উপর। এই যে কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা বললে—তুমি কল্পনা কর না কেন, তিনি আরও কোটি কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক। তা হলেই তো তিনি সম্পূর্ণ একটা ব্রহ্মাণ্ড তোমার—একমাত্র তোমারই—দেখাশোনার জন্য মোতায়েন করতে পারেন। তা হলেই দেখতে পাবে লক্ষ লক্ষ ফিরিশত-দেবদূত তোমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, তোমার প্রতিটি নিশ্বাস-প্রশ্বাসের হিসাব রাখছেন হাজার হাজার দেবদূত, তোমার প্রতিটি হৃদস্পন্দনের খবর লিখে

রাখছেন লক্ষ লক্ষ ফিরিশতা। আর তুমি যদি কল্পনা কর তোমার খুদা মাত্র দশটা ব্রহ্মাণ্ডের মালিক তা হলে অবশ্য তুমি অসহায়।

'কিন্তু তিনি তো অনন্ত-রাজ। তিনি সংখ্যাতীতের মালিক।

'কত সহস্র ব্রহ্মাণ্ড চাও, একমাত্র তোমারই তদারকি করার জন্য?'

আমি অভিভূত হয়ে তাঁর কথা শুনে যাচ্ছি, এমন সময় তিনি আমাকে যেন সর্বাঙ্গ ধরে দিলেন এক ভীষণ নাড়া। বললেন, 'কিন্তু এ সব কথা বৃথা, এর কোনও মূল্যই নেই। কারণ গোড়াতেই বলেছি, আপন মনকে না চিনে সেই মন দিয়ে কোনও কিছু বোঝার চেষ্টা করা বৃথা। তার প্রমাণস্বরূপ দেখতে পাবে, বাড়ি পৌঁছতে না-পৌঁছতেই তোমার গাছতলার ছায়ায় চাষা আবার রৌদ্রে ঘোরাঘুরি করছে—তোমার মন আমার কথাগুলোর দিকে আর কান দিচ্ছে না। এবং এগুলো আমার কথা নয়—বড় বড় সুফীরা যা বলেছেন, তারই পুনরাবৃত্তি আমি করেছি মাত্র।'

আমি নিরাশ হয়ে বললুম, 'তা হলে উপায়?'

বেশ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'মনকে শান্ত করা। আর ভুলে যেয়ো না, সাধনা না করে কোন কিছু হয় না। পায়লোয়ানের উপদেশ পড়ে মাংসপেশী সবল হয় না, হেকিমীর কেতাব পড়ে পেটের অসুখ সারে না। মনকেও শান্ত করতে হয় মনের ব্যায়াম করে।

'আর ঠিক পথে চলেছ কি না তার পরখ—প্রতিবার সাধনা করার পর মনটা যেন প্রফুল্লতর বলে মনে হয়। ক্লান্তি বোধ যেন না হয়। পায়লোয়ানরাও বলেছেন, প্রতিবার ব্যায়াম করার পর শরীরটা যেন হাল্কা, ঝরঝরে বলে মনে হয়।

'না হলে বুঝতে হবে, ব্যায়ামে গলদ আছে।'

আমাদের সামনে হালুয়া ধরে বিদায় দিলেন।

আমরা আসন ছেড়ে উঠেছি এমন সময়ে তিনি হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাচ্চা, তোমার একটি আচরণে আমি খুশী হয়েছি। গ্রামের চাষা তিন মাস রোগে ভুগে শহরে এসে হেকিমের কাছ থেকে দাওয়াই নিয়েই শুধায়, "কাল সেরে যাবে তো?"—তুমি যে সে-রকম শুধাও নি, "ফল পাব কবে?"

'ফল নির্ভর করে তোমার কামনার দৃঢ়তার উপর। দিল্‌কে একরুজু করে যদি প্রাণপণ চাও, তবে দেখবে নতীজা নজ্‌দিক্—ফল সামনে।'

ধর্মে ধর্মে তুলনা করার মত মনের অবস্থা আমার তখন নয়। তবু মনে

পড়ে গেল, সংস্কৃত ব্যাকরণের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে গুরুকে শুধিয়েছিলুম, 'অনায়াসে সংস্কৃত কাব্য পড়তে পারব কবে?' তিনি বলেছিলেন, "তীব্র সংবেগানাম্ আসন্নঃ" অর্থাৎ "আবেগ তীব্র থাকলে ফল আসন্ন"।

তার পর বলেছিলেন, 'শুধু ভাষার ক্ষেত্রে নয়, সর্বত্রই এটা প্রযোজ্য—পতঞ্জলি বলেছেন "যোগসূত্রে", সাধনার ক্ষেত্রে।'

॥ ৪ ॥

আমার মন শান্ত হয় নি, অশান্তও থাকে নি। আমার মানসসরোবরের জল—জমে বরফ হয়ে গিয়েছে।

ওদিকে কাবুলের বরফ গলতে আরম্ভ করেছে। কাবুল উপত্যকার উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম গিরিপথে সঞ্চিত পর্বতপ্রমাণ তুষারস্তূপও গলতে আরম্ভ করেছে। এবার জনগণের গমনাগমন আরম্ভ হবে। যে সব পণ্যবাহিনী এখানে আটকা পড়েছিল তারা হন্তে হয়ে উঠেছে গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে বলে। কাবুল উপত্যকার বাইরে যারা আটকা পড়েছিল তারাও যে করেই হোক শহরে ঢোকবার চেষ্টা করবে। সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতিরও মরসুম গরম হয়ে উঠবে। বাচ্চার বাহুবল কাবুল উপত্যকার বাইরে সম্প্রসারিত নয়। কাজেই দু-দলে লড়াই লাগবে মোক্ষম। তার কারণ এ দেশের ডাকাত আর বণিকে তফাত কম। যে দু-দিন পূর্বে বণিক ছিল সে কিছুটা পয়সা জমিয়ে ডাকাতের দল গড়েছে। আবার যে দু-দিন পূর্বে ডাকাত ছিল সে কিছুটা পয়সা করে আজ পণ্যবাহিনী তৈরী করেছে এবং এর পরও অন্য এক শ্রেণীও আছে। এরা দুটো একসঙ্গে চালায়। পণ্যবাহিনী নিয়ে যেতে যেতে সুযোগ পেলে ডাকাতিও করে।

কিন্তু এ সবেতে আমার কী?

আমার স্বার্থ মাত্র এইটুকুই—কাবুল উপত্যকা তো তন্ন তন্ন করে দেখা হয়ে গিয়েছে। এবার যদি বাইরের থেকে কোনও খবর আসে।

আব্দুর রহ্‌মান এখনও কান্দাহার থেকে ফেরে নি। তার থেকেই আমার বোঝা উচিত এখনও গমনাগমন অসম্ভব।

জানেমনের সেবা করতে গিয়ে বার বার হার মানি।

তিনি ডান হাত বাড়িয়ে বাঁ দিকে কি যেন খুঁজলেন। আমি শুধালুম, 'জানেমা (আমাদের জান্), কী চাই?'

'না বাচ্চা, কিছু না।'

পীড়াপীড়ি করি। নিমকদান—লবণের পাত্র।

শব্‌নম জানত।

তিনি কবিতা আবৃত্তি করেন ; আমি প্রত্যুত্তর দিতে পারি নে।

প্রতি পদে ধরা পড়ে সেবার কাজে আমার অনভ্যাস, অপটুত্ব। অথচ ঠিক সেই কারণেই আমি তাঁর কাছে পেলুম আরও বেশী আদর-সোহাগ। শিশুর আধো-আধো কথা শুনে পিতামাতা যে রকম গদ্‌গদ হয়, আমার আধো-আধো সেবা তেমনি তাঁর হৃদয়ের দাক্ষিণ্যে যেন বান ডাকালে।

এক রকম লোক আছে যারা সর্বক্ষণ কথা বলে যাওয়ার পর দেখা যায়, তারা কিছুই বলে নি। অন্য দল সংখ্যায় কম। এঁদের নীরবতা যেন বাঙ্ময়। এঁরা নীরবতা দিয়ে এমন একটি বাতাবরণ সৃষ্টি করেন যে, শুভ মুহূর্তে সেই ঘন বাষ্পে তাঁরা একটি ফোঁটা বাক্‌-বারির ছোঁয়াচ দেওয়া মাত্রই আকাশ-বাতাস মুখর করে ঝরঝরধারে বারিধারা নেমে আসে!

এই রকম একটা সুযোগ পেয়ে আমি তাঁকে শুধালুম, 'আপনি আমার শ্বশুর মশাইকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন। আমাকে বলুন তো, তিনি কান্দাহার যাওয়ার সময় বাড়িতে কেন হুকুম রেখে গেলেন, ডাকাতদের যেন কোনও বাধা না দেওয়া হয়?'

জানেমন্‌ বললেন, 'আওরঙ্গজেব সাধারণ সেনাপতি নয়। প্রকৃত সেনাপতি যে রকম যুদ্ধ জয় করতে জানে, ঠিক সেই রকম জানে কখন আর জয়াশা করতে নেই। সেই সময় সে যতদূর সম্ভব স্বল্প ক্ষয়ক্ষতি হতে দিয়ে সৈন্যবাহিনী রণাঙ্গন থেকে হটিয়ে আনে।

'আওরঙ্গজেব জানত, বাধা দিলে এ বাড়ির কেউই প্রাণে বাঁচবে না। ওদিকে শব্‌নমের উপর ছিল তার অগাধ বিশ্বাস। এ-সব ব্যাপারে সে যে-কোনও পুরুষকে ছাড়িয়ে যায়।

'একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, শব্‌নম যদি অল্প কিছুক্ষণ জাফর খানকে আটকে রাখতে পারত, তা হলেই তো ততক্ষণে বাচ্চার হুকুম পৌঁছে যেত যে তাকে যেন নিরাপদে আপন বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

'সুফীদের অনেকেই তাই পরিপূর্ণ নিষ্ক্রিয়তায় বিশ্বাস করেন। সৎকর্ম, অসৎকর্ম, প্রয়োজনীয় কর্ম, অপ্রয়োজনীয় কর্ম যাই কর না কেন, তার ফলস্বরূপ উৎপাদিত হবে নূতন কর্ম—এবং ক্রমাগত বাড়তে থাকে সেই কর্ম-জিঞ্জির—চেন্‌-অ্যাকশন। এই কিস্মতের অক্ষমালার কোনও জায়গায় তো গিঁট খুলতে হবে।

না হলে এই অন্তহীন জপমালা তো ঘুরেই যাবে, ঘুরেই যাবে; এর তো শেষ নেই।

'অথচ এ-কথা আমি স্থির-নিশ্চয় জানি, শব্‌নম ঠাণ্ডা-মাথা মেয়ে। ক্ষণিক উত্তেজনায় সংবিৎ হারিয়ে উন্মাদ আচরণ সে করে না। নিশ্চয়ই কোন-কিছু একটা চরমে পৌঁছেছিল।'

আমি চিন্তা করে প্রত্যেকটি বাক্য হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করছি এমন সময় দাসীরা কলরব করে ঘরে ঢুকে বললে, একজন বোরকা-পরিহিতা রমণীকে হিন্দুকুশের গিরি উপত্যকায় দেখা গিয়েছে মজার-ই-শরীফের পথে যেতে।

চিৎকার চেঁচামেচির মাঝখানে এইটুকু বুঝতে আমাদের অনেকক্ষণ সময় লেগেছিল।

জানেমন্ নীরব।

আমি তাড়াতাড়ি মনসুরকে চিঠি লিখলুম, সে যেন পত্রপাঠ ইউসুফকে সঙ্গে নিয়ে আসে। অন্য লোক পাঠালুম সরাইখানাতে।

কিন্তু শব্‌নম আফগানিস্থানের উত্তরতম প্রদেশ সুদূরতম তীর্থ মজার-ই-শরীফের দিকে যাচ্ছে কেন? প্রাণরক্ষার্থে? সে কি জানে না জাফর খানের খুনের জন্য বাচ্চা তার খুন চায় না?

ঘণ্টা দুয়েকের ভিতর মনসুর এল। সহৃদয় সরাইওলাও স্বয়ং এসে উপস্থিত। ইউসুফ আসে নি। খবর পাঠিয়েছে, বহু বোরকা-পরা রমণী বহু তীর্থে একা একা যায়। এ রমণী কিছুতেই শব্‌নম বানু হতে পারেন না। আরও বলেছে, এ রকম গুজব এখন ঘড়ি ঘড়ি বাজারে রটবে—আমি যেন ও সবেতে কান না দিই।

মনসুর বললে, 'ইউসুফ তো আসবে না, পাকা খবর না নিয়ে। আমি এই গুজবটা শুনতে পাই কাল। সঙ্গে সঙ্গে গেলুম সরাইয়ে। তারা খবর পেয়েছে তার আগের দিন। তার পর গেলুম ইউসুফের কাছে। সে বললে, এসব পুরনো খবর। মিথ্যে—সে যাচাই করে দেখেছে। তার পর হুজুর, আমাকে হিসবে করে দেখালে, কাবুল গিরিপথের বরফ গলতে যে সময় লাগে তার আগে সেটা ছাড়িয়ে কেউ হিন্দুকুশ পৌঁছতে পারে না। ও মেয়ে হিন্দুকুশ অঞ্চল থেকেই বেরিয়েছে। আরও অনেক কি সব প্রমাণ দিলে যেগুলো আমি বুঝতেই পারলুম না।'

সকলেরই এক মত। ও মেয়ে কিছুতেই কাবুল থেকে বেরোয় নি। ওর সন্ধান করতে যাওয়া আর চাঁদের আলোতে কাপড় শুকোতে দেওয়া—একই কথা।

আমি সম্ভব অসম্ভব নানা প্রকারের যুক্তিহীন তর্ক এবং তর্কহীন নীরবতা দিয়ে আপাতদৃষ্টিতে যা অসম্ভব তা সম্ভব হতে পারে বোঝাবার চেষ্টা করলে সবাই এমন সব অভিজ্ঞতাপ্রসূত যুক্তি এবং প্রত্যক্ষদৃষ্ট আপত্তি তুললে যে শেষ-টায় আমি রেগে উঠলুম। তখন সবাই একে অন্যের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে চুপ করে গেল।

আমি আমার আহাম্মুকি বুঝতে পারলুম। এদের না চটিয়ে এদের কাছ থেকে আমার জেনে নেওয়া উচিত ছিল, মজার-ই-শরীফ যাবার জন্য আমার কী প্রস্তুতির প্রয়োজন? এখন যখন শুধালুম, সবাই আশকথা পাশকথা বলতে বলতে বাড়ি চলে গেল।

কান্দাহার থেকে শব্‌নমের কোনও খবর না পেয়ে শেষটায় স্বপ্নে প্রত্যাদেশ ভিক্ষে করেছিলুম, কান্দাহার যাব কি না, আজ রাত্রে ঠিক তেমনি সমস্ত হৃদয় মন ঢেলে দিয়ে নামাজ পড়লুম মাঝরাত অবধি। বার বার কাতর রোদনে প্রভুকে বললুম, 'হে করুণাময়, আমাকে দয়া কর, আমাকে দয়া কর।'

সেবারে প্রার্থনান্তে যেন তাঁরই কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, স্বপ্নে প্রত্যাদেশও পেয়েছিলুম, 'কান্দাহার যেয়ো না'—আমার তখন সেটা মনঃপূত হয় নি।

তাই কি করীম-করুণাময় আমাকে শিক্ষা দিতে চাইলেন তাঁর কাহির-রুদ্ররূপে?

সমস্ত রাত চোখে এক ফোঁটা নিদ্রা এল না।

সমস্ত দিন কাটল ওই ভাবে। মাঝে মাঝে তন্দ্রা আসে। ঘুমে প্রত্যাদেশ পাব আশা করে যেই শুতে যাই, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব নিদ্রার অন্তর্ধান। তিন দিন পর যখন নির্জীব, ক্লান্ত দেহে প্রত্যাদেশের শেষ আশা ছেড়ে দিলুম সেদিন সুনিদ্রা হল। আশা ছাড়লে দেখি ভগবানও সমঝে চলেন।

শব্‌নম যে রকম পুব-বাঙলার স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসত—যখন-তখন পেশাওয়ার গিয়ে দিল্লী কলকাতা হয়ে পুব-বাঙলায় পৌঁছত, আমিও সে-রকম মজার-ই-শরীফের স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসতুম। প্রথম দিন সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কি সত্যই জান না, হজরৎ আলী (কর্‌মল্লাহু ওয়াজহাহু—আল্লা তাঁর বদন জ্যোতির্ময় করুন) মারা যান আরবভূমিতে এবং তাঁর গোর সেখানেই! অশিক্ষিত অজ্ঞ লোকের মত বিশ্বাস কর তাঁর কবর উত্তর আফগানিস্থানে!'

আমি বললুম, 'যেখানে এত লোক তাদের শ্রদ্ধা জানায়, সেখানে না হয় আমি সেই শ্রদ্ধাটিকেই শ্রদ্ধা জানালুম।'

অবজ্ঞার সঙ্গে বললে, 'তা হলে কাবুলী মুটেমজুর যখন নূতন কোনও সোনা-বানানেওলা গুরুঠাকুর মুর্শীদবাবাজীর সন্ধান পেয়ে তার পায়ের উপর গিয়ে আছাড় খায়, তখন তুমিও সেদিকে ছুট লাগাও না কেন? যত সব!'

আমি বললুম, 'মজার-ই-শরীফে কিন্তু ইরান-তুরান-হিন্দুস্থান-আফগানিস্থানের বিস্তর কবি জমাঅৎ হয়ে কবর-চত্বরে সুন্দর সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করেন—মুশাইরা সেখানে সুবো-শাম্।'

সঙ্গে সঙ্গে শব্‌নমের মুখ খুশীতে ভরে উঠল, 'তাই নাকি? এতক্ষণ বল নি কেন? চল।'

উঠে দাঁড়িয়েছিল। যেন তদ্দণ্ডেই আমাদের যাত্রারম্ভ!

শব্‌নমের কাছে কল্পনা বাস্তবে কোন তফাত ছিল না। না হলে সে আমাকে ভালোবাসল কি করে?

আসলে আমার লোভ হত, হিউয়েন সাঙ তথাগতের দেশ ভারতবর্ষে যাবার সময় যে পথ বেয়ে মজার-ই-শরীফের কাছের বাহ্‌লীক নগরী—আজকের দিনের বল্‌খ্—থেকে বামিয়ানের কাছে হিন্দুকুশ পেরিয়ে কপিশ—আজকের দিনে কাবুল শহর—এসে পৌঁছেছিলেন সেই পথটি দেখার। তখনকার দিনে তুষারভূমি (আজকের তুখার—স্থান) পেরিয়ে যখন বৌদ্ধ শ্রমণ বাহ্‌লীকে পৌঁছলেন, তখনই তাঁর চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল, তিনি তাঁর অসহ পথশ্রম সার্থক মেনে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখেছিলেন একশত সঙ্ঘারাম, তিনশত স্থবির আর কত হাজার শ্রমণ-ভিক্ষু কে জানে? এরই কাছে কোথায় যেন এক ভারতীয় মহাস্থবির প্রজ্ঞাকরের কাছে তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন অভিধর্ম। আর বামিয়ানে পৌঁছে দেখেছিলেন, তারও বাড়া—হাজার হাজার—সঙ্ঘারাম—পর্বতগুহায়, সমতল ভূমিতে, উপত্যকায়। আর দেখেছিলেন, পাহাড়ের গায়ে দণ্ডায়মান, আসীন, শায়িত শত শত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বুদ্ধ-মূর্তি। শ'-দুশ' ফিট উঁচু!

তার পর তিনি পঞ্জশীর হয়ে পৌঁছেছিলেন কাবুল উপত্যকায়।

যবে থেকে এখানে এসেছি সেগুলোর সন্ধান করেছি এখানে। এখানে কীর্তিনাশা পদ্মা নদী নেই, এখানে কোনও-কিছুই সম্পূর্ণ লোপ পায় না। নবীন যুগের অবহেলা পেলে এখানে প্রাচীন যুগ মাটির তলায় আশ্রয় নিয়ে প্রতীক্ষা করে, কবে নবীনতর যুগের লোক শাবল-কোদাল নিয়ে তাদের সন্ধানে বেরবে।

তারও আগের কথা। আমি বাংলাদেশের লোক। হিউয়েন সাঙের

ভারততীর্থ-পরিক্রমার সর্বশেষ প্রাচ্য-প্রান্ত ছিল বাংলা। বগুড়ার কাছে মহাস্থান-গড় প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনে এসেছিলেন বল্‌খ্‌ থেকে হিউয়েন সাঙ—আর কয়েক শতাব্দী পরে সেখানেই আসেন ওই বল্‌খ্‌ থেকে দরবেশ শাহ্‌ সুলতান বল্‌খী—কত কাছাকাছি ছিল সেদিন বল্‌খ্‌ আর বগুড়া।

সেই খেঁই ধরে ধরে দেখেছি বিক্রমশীলা, নালন্দা। কাবুলে আসার পথে ট্রেন থেমেছিল এক মিনিটের তরে তক্ষশীলায়। সেখানে নামবার লোভ হয় নি এ কথা বলব না। তারপর পেশাওয়ার—কণিষ্কের রাজধানী। সেখানেও সময় পাই নি। গান্ধারভূমি জলালাবাদে শুধু আখ খেয়েই চিত্তকে সান্ত্বনা দিয়েছি যে, এই আখ খেয়েই হিউয়েন সাঙ শতমুখে প্রশংসা করেছিলেন। ভেবেছিলুম পরবর্তী যুগে এই যে আখের গুড় চীন দেশে গিয়ে রিফাইন্‌ড্‌ হয়ে শ্বেতবর্ণ ধরে যখন ফিরে এল, তখন চীনের স্মরণে এর নাম হল চিনি—তার পিছনে কি হিউয়েন সাঙ ছিলেন? একে উপহাস করেই কি আমাদের দেশে চীনের রাজার আম খাওয়ার গল্প হল?

আজ আবার এই সব কথা মনে পড়ছে। শব্‌নম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করত—পুব বাঙলায় তার শ্বশুরের ভিটেয় পৌঁছবার পথে এগুলো পড়ে বলে।

কিন্তু যখন কাবুল ছেড়ে আচ্ছন্নের মত বেরলুম মজার-ই-শরীফের সন্ধানে তখন এসব কিছুই মনে পড়ে নি। কী কাজে লাগবে আমার এই 'পাণ্ডিত্যে'র মধুভাণ্ড! জরা-জীর্ণ অর্ধলুপ্ত বাড়ির নিচে লুকনো যে সোনার তাল আছে, সেটা কি তার সামান্যতম উপকারে আসে? ওর শতাংশ ব্যয় করে বাড়িটা মেরামত হয়, কলি ফেরানো যায়, সে তার লুপ্ত যৌবন ফিরে পায়। শব্‌নমই বলেছিল,

'এত গুণ ধরি কী হইবে বল দুরবস্থার মাঝে,
পোড়া বাড়িটাতে লুকনো যে ধন লাগে তার কোনো কাজে?'

কবিতা আমার মুখস্থ থাকে না। শুধু শব্‌নমের উৎসাহের আতিশয্যে আমার নিষ্কর্মা স্মৃতিশক্তিও যেন ক্ষণেকের তরে জেগে উঠত। উর্দুতে বলেছিলুম,

দুর্দিনে, বল, কোথা সে সুজন হেথা তব সাথী হয়
আঁধার ঘনালে আপন ছায়াটি সেও, হেরো, হয় লয়!

তঙ্গ-দস্তীমে কৌন কিস্‌কা সাত দেতা হৈ?
কি তারিকীমেঁ সায়াভী জুদা হোতা হৈ হমসাঁসে!

আমার নিজের সামান্য জ্ঞান, কাবুলে ফরাসী রাজদূতাবাসের প্রত্নতাত্ত্বিক

যিনি জলালবাদ-গান্ধার এবং বামিয়ানে খোঁড়াখুঁড়ি করে শত শত ক্ষুদ্র বৃহৎ অনিন্দ্যসুন্দর বুদ্ধমূর্তি বের করেছিলেন—তাঁর দিনে দিনে দেওয়া অসংখ্য তথ্য ও তত্ত্বজ্ঞান, আমার কোনও কাজেই লাগল না।

কাজে লাগল সে এক সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।

কাবুল ছেড়ে আসার পর, হিন্দুকুশের চড়াই তখনও আরম্ভ হয়নি, এমন সময়—বেশ কিছুক্ষণ ধরে—ক্ষণে ক্ষণে আমার সেই আচ্ছন্ন অবস্থার ভিতরও আমার মনে হতে লাগল, এ জায়গায় আমি যেন পূর্বেও একবার, কিংবা একাধিকবার এসেছি। এ রকম অভিজ্ঞতা নাকি সকলের জীবনেই হয়—কেমন যেন স্বপ্নে না জাগরণে দেখা, আধচেনা-আধভোলা একটা জায়গা বা পরিবেষ্টনী এমনভাবে সামনে এসে উপস্থিত হয় যে মানুষ পথে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় আর ভাবে, সামনের মোড় নেওয়া মাত্রই একেবারে সম্পূর্ণ এক চেনা জায়গায় এসে পৌঁছবে।

তাই আমি বিশেষ কোনও খেয়াল করি নি।

হঠাৎ মোড় নিতেই দেখি, হাতে ঝুলনো ট্রাউট মাছ নিয়ে একটা লোক আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল—এ জায়গা আব্দুর রহ্‌মানের পঞ্জশীর!

সামনেই বাজার। ঢুকেই বাঁয়ে দর্জীর দোকান, ডাইনে ফলওলা—তারপর মুদী—সর্বশেষে চায়ের দোকান। নিদেন একশ'বার দেখেছি। দোকানীর মেহদী-মাখানো দাড়ি, কালো-সাদায় ডোরাকাটা পাগড়ি আব্দুর রহ্‌মানের চোখ দিয়ে আমার বহুকালের চেনা। আরেকটু হলেই তাকে অভিবাদন করে ফেলতুম। তার দৃষ্টিতে অপরিচিতের দিকে তাকানোর অলস কৌতূহলের স্পষ্টাভাস আমাকে ঠেকালে। এই চায়ের দোকানই আব্দুর রহ্‌মানের ফার্পো, পেলিটি।

আব্দুর রহ্‌মান নিরক্ষর। ফার্সী সাহিত্যে তার কোনও সঙ্গতি নেই। কিন্তু সম্পূর্ণ অচেনা জিনিস অজানা পরিবেশ যদি শুদ্ধমাত্র কয়েকটি অতি সাধারণ আটপৌরে শব্দের ব্যবহারে চোখের সামনে তুলে ধরাটা আর্টের সর্বপ্রধান আদর্শ হয়—বহু আলঙ্কারিক তাই বলেন—তবে আব্দুর রহ্‌মান অনায়াসে লোতি দোদে মমকে দোস্ত বলে ডাকবার হক্ক ধরে। এ বাজারে প্রত্যেকটি দোকান আমার চেনা—আর এখানে দাঁড়ানো নয়, আব্দুর রহ্‌মান সাবধান করে দিয়েছিল—ওই যে কাঁচা-পাকা দাড়িওলা লোকটা তামাক খাচ্ছে, সে বিদেশীকে পেলেই ভ্যাচর ভ্যাচর করে তার প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলে।

চায়ের দোকানে পেরোতেই বাঁ দিকে যে রাস্তা তারই শেষ বাড়ি আব্দুর রহ্‌মানদের। বাড়িতে সে নেই—কান্দাহারে। তার বাপকে আমি চিনি। ধরা পড়ার ভয় আছে।

সামনে খাড়া হিন্দুকুশ। আব্দুর রহ্‌মানদের মনে মনে সেলাম জানিয়ে একটু পা চালিয়ে তার দিকে এগোলুম।

হিন্দুকুশে এখনও বরফ তার সর্ব দার্ঢ্য নিয়ে বর্তমান। আসলে তার শরীর সাবুদানার চেয়েও সূক্ষ্ম কণা দিয়ে তৈরি আর হিমকণারই মত নরম। কিন্তু বসন্ত-সূর্যও একে গলাতে পারে নি। শক্তকে ভাঙা যায়, নরমকে ভাঙা শক্ত।

ঝড়-তুফানে দিশাহারা হয়ে আসন্ন মৃত্যু সম্মুখে দেখেছি, তখন জানতুম না যে এখানে পথ মাত্র একটিই, নিরুদ্দেশ হবার উপায় নেই। বামিয়ানেও পৌঁছলুম। বিরাট বুদ্ধমূর্তি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল বলেই চিনলুম, এ জায়গা বামিয়ান—না হলে কোনও জায়গার নাম আমি কাউকেও জিজ্ঞেস করি নি। মাঝে মাঝে শুধু জানতে চেয়েছি, কেউ বোরকা-পরা একটি মেয়েকে একা একা মজারের পথে যেতে দেখেছে কি না? 'হাঁ', 'না', 'কাবুলের দিকে গিয়েছে', 'না, মজারের দিকে গিয়েছে', 'কোন্ এক সরাইয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে'—সব ধরনের উত্তরই শুনেছি। দরদী জন আমাকে কাবুলে ফিরে যেতে বলেছে।

দেখি নি, দেখি নি, কিছুই দেখি নি। কয়েদীকে যখন পাঁচশ' মাইল হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তখন কি সে কিছু দেখে? সাইবেরিয়া নির্বাসনে গিয়েছেন সেরা সেরা সাহিত্যিক—তাঁরা কিছুই দেখেন নি। না হলে শোনাতেন না?

হায় রে হিউয়েন সাঙ! স্মৃতির কপালে শুধু করাঘাত।

হিউয়েন সাঙ এ পথে যেতে ঝড়-ঝঞ্ঝার মৃত্যুযন্ত্রণায় একাধিকবার তাঁর জীবন কাতর রোদনে তথাগতের চরণে নিবেদন করেছিলেন। আমি করি নি। তার কারণ এ নয় যে আমি ভিক্ষুশ্রেষ্ঠের চেয়েও অধিক বীতরাগ—দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন, সুখে বিগতস্পৃহ হয়ে গিয়েছিলুম। আমি হয়ে গিয়েছিলুম জড়, অবশ। ক্লোরোফর্মে বিগতচেতন রুগীর যখন পা কাটা যায়, সে যে তখন চিৎকার করে না তার কারণ এ নয় যে সে তখন কায়া-ক্লেশমুক্ত স্থিতধী মুনিপ্রবর। চিন্তামণির অন্বেষণে বিল্বমঙ্গল যা সব করেছিল সে সজ্ঞানে নয়—সম্পূর্ণ মোহাচ্ছন্ন অবস্থায়। কী সুন্দর নাম চিন্তামণি! এ নাম বাঙালী মেয়ে অবহেলা করে কেন? অহল্যার মত 'অসতী' ছিল বলে? হায়! আজ যদি ওঁর শুদ্ধজ্ঞানের এক কণা আমি পেয়ে যেতুম!

ক্রমে আমার সময়ের জ্ঞান লোপ পেল। কবে বেরিয়েছি, কবে মজার

পৌঁছব কোনও বোধই আর রইল না।

সরাইয়ের এক কোণে ঠেসান দিয়ে বসে আছি। যে কাফেলার সঙ্গে আজ ভোরে যোগ দিয়েছিলুম তারা কুঠরির মাঝখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে মৃদুস্বরে কথা বলছে। এদের বেশীর ভাগই আমুদরিয়া পারের উজবেগ। বাঙলা ভাষায় এদের বলে 'উজবুক'। এরা যে কি সরল বিশ্বাসে ট্যারচা চোখ মেলে তাকাতে জানে সে না দেখলে তুলনা শুনে বোঝা যায় না। এদের ভাষা আমার অজানা। কিন্তু এরা আমাকে ভালবেসেছে। আজ সকালে একরকম জোর করেই আমাকে একটা খচ্চরের উপর বসিয়ে দিয়েছিল।

হঠাৎ কানে গেল কে যেন বললে, 'জশ্‌ন্‌।'

সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার চোখের সামনে দেখতে পেলুম, স্বপ্নমায়া—মতিভ্রম কিছুই নয়, পরিষ্কার দেখতে পেলুম জশ্‌ন্‌ পরবের রাত্রে ডান্‌স্‌ হলের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে শব্‌নম। সে রাত্রে তার ছিল ভ্রূকুটিকুটিল ভাল, আজ দেখি সে ভ্রূবিলাসী, তার মুখে আনন্দহাসি।

তার পরই জ্ঞান হারাই।

॥ ৫ ॥

চোখ মেলে দেখি, শব্‌নমের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি। শুচিস্মিতা শব্‌নম প্রসন্নবয়ানে আমার দিকে তাকিয়ে।

হায় এ-ই সত্য হল না কেন? আস্তে আস্তে তার চেহারা মিলিয়ে গেল কেন?

এই 'বিকারে' কত দিন কেটেছিল জানি না। শব্‌নমকে কাছে পাওয়া, তার মুখে সান্ত্বনার বাণী শোনা যদি 'বিকার' হয় তবে আমি 'সুস্থ' হতে চাই নে। আমি সুস্থ হলুম কেন?

মজার-ই-শরীফে হজরৎ আলির কবর-চত্বরের এক প্রান্তে চুপচাপ বসে থাকি গভীর রাত্রি পর্যন্ত।

কাবুলের সুফী সাহেব আমার নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর পেয়ে সেখানকার সরাইখানাতে আমার সন্ধান নিয়ে কিছুদিনের ভিতরই জানতে পারলেন, আমাকে মজারের পথে দেখা গিয়েছে। আমার কাবুল ফেরার মেয়াদ যখন ফুরিয়ে গেল তখন তিনি বেরলেন আমার সন্ধানে। আমাকে যখন পেলেন তখন আমি মজারের কাছেই। উজবেগদের সাহায্যে আমাকে অচৈতন্যাবস্থায়ই এখানে নিয়ে আসেন।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। মধ্যগগনে দশমীর চন্দ্র। হাওয়া আসছে উত্তর-পুব—আমুদরিয়া আর বল্‌খ্‌ থেকে। মসজিদচত্বরে পুণ্যার্থীরা এবার সমবেত উপাসনা শেষ করে এখানে ওখানে নৈমিত্তিক (নফ্‌ল্‌) আরাধনা করছে। সুফীরা স্থাণুর মত নিষ্পলক দৃষ্টিতে, কিংবা মুদ্রিত নয়নে আপন গভীরে নিবিষ্ট। রাত গভীর হলে মজারের ছায়ায় কেউ বা মধুর কণ্ঠে জিক্‌র্‌ গেয়ে ওঠে।

এ সব রোজ দেখি, আবার রোজই ভুলে যাই। আমার স্মৃতিশক্তি কিছুই ধারণ করতে পারে না। প্রতিদিন মনে হয়, জীবনে এই প্রথম আঁখি মেলে এসব দেখছি। কোনদিন বা সরাই থেকে এখানে আসবার সময় পথ খুঁজে পাই না। শহরের লোক আমাকে চিনে গিয়েছে। কেউ-না-কেউ পথ দেখিয়ে রওজাতে পৌঁছিয়ে দিয়ে যায়।

আমি মজনূন, আমি পাগল—এ কথা আমি সরাইয়ে, রাস্তায় ফিসফিস কথাতে একাধিকবার শুনেছি। এ দেশে প্রিয়বিচ্ছেদে কাতর জনকে কেউ বিদ্রূপের চোখে দেখে না। শুনেছি, 'সভ্য' দেশের কেউ কেউ নাকি এদের এ দৃষ্টান্ত হালে অনুকরণ করতে শিখছেন। এদের চোখে দেখি, আমার জন্য নীরবে মঙ্গল কামনা। দরগায় বসে বসেও যে আমি নমাজ পড়ি নে, তাই নিয়ে এরা মোটেই বিচলিত নয়। 'মজনূনে'র উপর কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। আর একদিন শুনেছিলুম বোরকা-পরা দুটি তরুণীর একজন আরেকজনকে বলছে, 'কী তোর প্রেম যে তাই নিয়ে হর-হামেশা আপসা-আপসি করছিস! ওই দেখ্‌ প্রেম কী গরল! শব-ই-জুফ্‌কাফের ফুল শুকোবার আগেই এর প্রিয়া শুকিয়ে হাওয়া হয়ে যায়। হয়েছিস ওর মত তুই মজনূন—পাগল?'

আমি মাথা হেঁট করে এগিয়ে গিয়েছিলুম। প্রেম কি গরল? প্রেম তো অমৃত। আমার মত অপাত্রে পড়েছিল বলেই সঙ্গে সঙ্গে পাত্র চিড় খেল। আমার নামের মিতা আরবভূমির মজনূন তো পাগল হন নি। তিনি প্রেমের অমৃত খেয়ে পেয়েছিলেন দিব্য রূপ। সংসারের আর-কেউ সেটি খায় নি বলে ওঁর সে রূপ চিনতে না পেরে তাঁকে বলেছিল পাগল। যে দু-একটি চিত্রকর বুঝতে পেরেছিল, তারা ছবিতে সেই দিব্যজ্যোতি দেখবার চেষ্টা করেছে।

'সেরে উঠছি'। যদি এটাকে 'সেরে ওঠা' বলে। এতদিন অবশ ছিলুম, এখন এখানে ওখানে বেদনা পাচ্ছি। শব্‌নম এখন আর আমার সম্মুখে যখন-তখন উপস্থিত হয় না। হলেও তার মুখে বিষণ্ণ হাসি। সুফী সাহেবকে সেটা জানাতে তিনি ভারি খুশী হলেন। তাঁর শিষ্যদের বিশ্বাস তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী; তিনি অতিপ্রাকৃতে একদম বিশ্বাস করেন না। তিনি বিশ্বাস

করেন, শোকে কাতর অপ্রকৃতিস্থ লোকের মনে শান্তি এনে তাকে সবল সুস্থ করতে পারা এ পৃথিবীর সব চেয়ে বড় অলৌকিক ঐশী শক্তি।

এ কথা আমিও মানি। কিন্তু এই যে শব্‌নম আমাকে এসে দেখা দিয়ে যায়, এটাকে তিনি এত সন্দেহের চোখে দেখেন কেন? স্বপ্নে মায়ায় শব্‌নমের এই যে দান এ তো সত্যকে অসম্মান করে না—সে তো তখন অবাস্তব, অসত্যের পরীর ডানা পরে এসে আকাশকুসুম দিয়ে আমার গলায় ইন্দ্রমাল্য পরায় না। কৈশোরে এক সঞ্চয়িতায় পড়েছিলুম, কে যেন এক চীনদেশীয় ভাবুক বলেছেন, 'স্বপ্নে দেখলুম, আমি প্রজাপতির শরীর নিয়ে ফুরফুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখন জেগে উঠে আমার ভাবনা লেগেছে, এই যে আমি মানুষরূপে ঘুরে বেড়াচ্ছি এটা কি কোনও প্রজাপতির স্বপ্ন নয়—সে স্বপ্নে দেখছে যে সে মানুষের রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে?' সর্বসত্তা নিয়ে যেখানে সন্দেহ সেখানে তাঁর বিদ্বেষ আমার স্বপ্নের প্রতি!

সুফী সাহেব বললেন, জানেমন্ খবর পাঠিয়ে জানিয়েছেন, আমি কাবুল না ফিরলে তিনি নিজে আমার সন্ধানে বেরবেন। তাঁর লোক উত্তরের জন্য বসে আছে।

আমি তাঁর দিকে তাকালুম।

তিনি আমার প্রশ্ন বুঝতে পেরেছেন। শান্তকণ্ঠে বললেন, তার কোনও খবর নেই, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি সে ভালো আছে।

আমি বললুম, 'চলুন।'

আব্দুর রহ্‌মানের পিতাকে এবারে আর ফাঁকি দেওয়া যায় নি। ক্ষেত-খামারের কাজ করে বাকী সময় সে নাকি বাজারের চায়ের দোকানে বসে আমার প্রতীক্ষা করত। তার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা না হলেও সমস্ত বাজার আমাকে দেখামাত্রই যে রকম হুলুধ্বনি দিয়ে উঠেছিল তা থেকেই বুঝেছিলুম, বিখ্যাত বা কুখ্যাত হওয়া যায় নানা পদ্ধতিতে, এবং কোনও চেষ্টা না করেও।

তার উপর সুফী সাহেব বুড়োর মুরশীদ বা গুরু।

শুনলুম, আমানুল্লা কর্তৃক ফ্রান্সে নির্বাসিত তাঁর সিপাহসলার বা প্রধান সেনাপতি নাদির খান বাচ্চাকে তাড়াবার জন্য গজনী পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন। রঙরুটের অপেক্ষা না করে কান্দাহারেই আব্দুর রহ্‌মান তাঁর সৈন্যদলে ঢুকেছে।

শব্‌নমের কাছে শুনেছিলুম, ফ্রান্সের নির্বাসনে আমার শ্বশুর মশাই আর নাদির খানে তাঁদের পূর্বপরিচয় গভীরতর হয়েছিল। বহু যুগের পারিবারিক দ্বন্দ্ব ছিল বলেই একদিন যখন হঠাৎ মৈত্রী স্থাপিত হল তখন সেটা গভীরতম বন্ধুত্বের

রূপ নিল। ফ্রান্সে সব মেয়েরই একটি করে গড্‌-ফাদার থাকে, শব্‌নমের ছিল না বলে দুঃখ করতে নাদির নিজে যেচে তার গড্‌-ফাদার হবার সম্মান লাভ করেছিলেন—শব্‌নম বলেছিল। তবু আমার শ্বশুর আমানউল্লা আফগানিস্থান ত্যাগ না করা পর্যন্ত নাদিরের অভিযানে যোগ দেন নি।

আমার ভয় হল, বাচ্চা যদি জানেমনের উপর দাদ নেয়!

কুহ্‌-ই-দামন, জবল্‌-উস-সিরাজ অঞ্চল পেরবার সময় দেখি বাচ্চার সঙ্গী ডাকাতরা তাকে ডেজার্ট করে পালাচ্ছে! সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! অত্যাচারী মাস্টারের নিপীড়নে যখন নিরীহ শিশু ভ্যাক করে কেঁদে ফেলে তখন করুণা হয়, কিন্তু সেই স্যাডিস্ট মাস্টার যখন হেড-মাস্টারের হুড়ো খেয়ে কেঁচোটি হয়ে যান তখন ঘেন্না ধরে, হাসি পায়। নিরীহ বাছুরের দুশমন শূয়োরকে বাঘ তাড়া লাগালে যেমন মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠে। রাস্তার উপরে, এদিকে ওদিকে ছড়ানো তাদের পরিত্যক্ত লুটের মাল, দামী দামী রাইফেল। নাদির-বাঘ আসছে, ওগুলো কুড়োবার সাহস কারও নেই। শুনেছি কোনও শান্ত জনপদবাসী নাকি নিরপরাধ প্রশ্ন শুধিয়েছিল এক পলায়মান ডাকাতকে, সে কোন্‌ দিকে যাচ্ছে, আর অমনি নাকি ডাকাত বন্দুক ফেলে নিরস্ত্র পথচারীর পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল। ঐতিহাসিক খাফী খান তাহলে বোধহয় খুব বেশী বাড়িয়ে বলেন নি যে, আবদালী দিল্লী আসছে শুনে মারাঠা 'সৈন্যরা' নাকি 'আইমা' 'কাইমা'—অর্থাৎ অর্থাৎ মায়ের স্মরণে—চিৎকার করতে করতে যখন দিল্লী থেকে পালাচ্ছিল তখন নাকি শহরের রাঁড়ী-বুড়ীরাও ধমক দিয়ে ওদের নিরস্ত্র করে মালপত্র কেড়ে নিয়েছিল।

বিজয়ী নাদির কাবুলে প্রবেশ করলেন নগরীর পশ্চিম দ্বার দিয়ে। পরাজিত আমি উত্তর দ্বার দিয়ে।

॥ ৬ ॥

কত মাস, কত বৎসর কেটে গিয়েছে কে জানে!

বাদশা এবং আমার শ্বশুরও হার মেনেছেন।

সে নেই, এ-কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারব না। নিশ্চিহ্ন নিরুদ্দেশ হয়ে প্রত্যাবর্তন করার উদাহরণ ইতিহাসে বিরল নয়। তার চেয়ে বরঞ্চ নির্দয়তর সন্দেহই মেনে নেব—আমার প্রেমে কোনও অপরিপূর্ণতা ছিল বলেই শব্‌নম অন্তরালে বসে প্রতীক্ষা করছে, কবে আমি তাকে গ্রহণ করার জন্য

উপযুক্ত হব, কবে আমার বিরহ-বেদনা-বিক্ষুব্ধ সরোবর নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত হবে সেই শব্‌নমকমলিনীকে তার বক্ষে প্রস্ফুটিত করার জন্য।

নিশ্চয়ই আমার প্রেমে কোনও অপরিপূর্ণতা আছে।

শব্‌নমকেই একদিন সংস্কৃতে শুনিয়েছিলাম, শত্রু বেদনা দেয় মিলনে, মিত্র দেয় বিরহে—শত্রু-মিত্রে তা হলে পার্থক্য কোথায়? অথচ মিত্র যখন দূরে চলে যায় সে তো প্রিয়জনকে বেদনা দেবার জন্য যায় না। তবে কেন হাসিমুখে তাকে বিদায় দিতে পারি নে, তবে কেন হাসিমুখে তার পুনর্মিলনের জন্য প্রতীক্ষা করতে পারি নে—শব্‌নম যে রকম কান্দাহারে ম্লান মুখে, বিষণ্ণবদনে সন্ধ্যাদীপ জ্বালত সে রকম না, উজ্জ্বল প্রদীপ, উজ্জ্বলতর মুখ নিয়ে।

সুফী সাহেবও তো ওই কথাই বলেছিলেন—অন্যপ্রসঙ্গে! বলেছিলেন, প্রতিবার যোগাভ্যাসের পর দেহ মন যেন প্রফুল্লতর বলে বোধ হয়, না হলে বুঝতে হবে অভ্যাসের কোনও স্থলে ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। প্রেম-যোগেও নিশ্চয়ই তা হলে একই সত্য। সে যোগ, সে মিলনের পর যখন প্রিয়-বিচ্ছেদ আসে তখন আমার হৃদয় থেকে কাতর-ক্রন্দন বেরুবে কেন? আমি কেন হাসিমুখে মুহুর্মুহু বিরহ-দিনান্তের পানে তাকাতে পারব না, সেই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে যে, সময় হলে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হবেই হবে। আমি কি মূর্খ যে দাহন-বেলায় ইন্দুলেখা কামনা করব। আমি হব সমাহিত জ্যোতিষীর ন্যায়, যে সূর্যগ্রাসের সময় বর্বরের মত সূর্য চিরতরে লোপ পেল ভয়ে বিকট অট্টরব করে ওঠে না। অবলুপ্ত মধ্যাহ্ন-সূর্য তখন বিরাজ করেন তাঁর জ্ঞানাকাশে। শব্‌নম আমারই বুকের মাঝে চন্দ্রমা হয়ে নিত্য তো রাজে। শব্‌নম-শিশিরকুমারী প্রাতে যদি অন্তর্ধান হয়ে থাকে তবে কি আজই সন্ধ্যায় পুনরায় সে আমার শুষ্কাধরে সিঞ্চিত হবে না?

আমি কেন হাসিমুখ দেখাব না? আমি কি শ্মশানের বৈরাগ্য-বিলাসী নন্দী-ভৃঙ্গী যে দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে ত্রিভুবন শঙ্কান্বিত করব? আমার মৃত্যুঞ্জয় প্রেমের সঙ্গে হরিহরাত্মা আমিও মৃত্যুঞ্জয়—মধুমাসে আমার মিলনের লগ্ন আসবে, আমার ভালে তখন পুষ্পরেণু, বিরহ-দিগম্বর তখন প্রাতঃসূর্যরুচি রক্তাংশুক পরিধান করবে। না। আমি এখনই, এই মুহূর্তেই বরবেশ ধারণ করব—বিরহের অস্থিমালা চিতাভস্ম আমি এই শুভলগ্নেই ত্যাগ করলুম, আমার প্রতি মুহূর্তই শুভমুহূর্ত।

খৃষ্ট কি বলেন নি, উপবাস করলে ভণ্ডতপস্বীর মত শুষ্কমুখ নিয়ে দেখা দিয়ো না। তারা চায়, লোকে জানুক, তারা পুণ্যশীল। তুমি বেরুবে প্রসাধন করে, তৈলস্নিগ্ধ মস্তকে।

লোকে হাসবে, বলবে, এই যে লোকটা মজনুর মত পাগলপারা খুঁজেছে তার লায়লীকে, ঘূর্ণিবায়ু হয়ে প্রতি উটের মহ্‌মিলে, প্রতি সরাইয়ে, মজারে-কান্দাহারে খুঁজেছে তার শব্‌নমকে দুদিন আগে—সে কিনা আজই হেসে খেলে বেড়াচ্ছে।

তাই হোক, সেই আমার কাম্য।

শব্‌নম বলেছিল, 'তুমি আমার বিরহে অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না।'

অভ্যস্ত সবাই হয়, আমিও হব, তাতে আর কী সন্দেহ?

ধর্মনিষ্ঠ অথচ বিত্তশালী এক গোস্বামীকে তাঁর স্ত্রী হঠাৎ এসে একদিন কাঁদতে কাঁদতে দুঃসংবাদ দিলেন, তাঁদের নায়েব বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁদের সর্বস্ব অপহরণ করেছে। কালই তাঁদের রাস্তায় বসতে হবে। গৃহিণীর মুখের দিকে একটুখানি তাকিয়ে গোস্বামী আবার পুঁথিপাঠে মন দিলেন। তিনি কেঁদে বললেন, 'ওগো, তুমি যে কিছুই ভাবছ না, আমাদের কী হবে।'

গোস্বামী পুঁথি বন্ধ করে, হেসে বললেন, 'মুগ্ধে, আজ থেকে বিশ কিংবা ত্রিশ বৎসর পরে তুমি এই নিয়ে আর কান্নাকাটি করবে না। তোমার যে অভ্যাস হতে ত্রিশ বৎসর লাগবে আমি সেটা তিন মুহূর্তেই সেরে নিয়েছি।'

আমি ওই গোস্বামীর মত হব।

তিন লহমায় গোস্বামী অভ্যস্ত হয়ে গেলেন—এর রহস্যটা কী?

রহস্য আর কিছুই নয়। গোস্বামী শুধু একটু স্মরণ করে নিলেন, বিত্ত যেমন হঠাৎ যায়, তেমনি তার চেয়েও হঠাৎ ফিরে আসতে পারে। আরও হয়তো অনেক তত্ত্বকথা ভেবে নিয়েছিলেন, যথা, বিত্তনাশ সর্বনাশ নয়, বিত্তাবিত্ত সবই মায়া—কিন্তু ওসবে আমার প্রয়োজন নেই। প্রথম আগত প্রথম কারণই যথেষ্ট।

তার চেয়েও বড় কথা—শব্‌নম আমার সাধারণ ধনজনের মত বিত্ত নয়। সে কী, সে-কথা এখনও বলতে পারব না। সাধনা করে তা উপলব্ধির ধন।

স্বীকার করছি, জ্ঞানী গোস্বামীর মত তিন লহমায় আমি সে জিনিস পাই নি। সব জেনে-শুনেও আমাকে অনেক ফোঁটা চোখের জল ফেলতে হয়েছে—না-ফেলতে পেরে কষ্ট হয়েছে তারও বেশী। পাগল হতে হতে ফিরে এসেছি, সে শুধু শব্‌নমের কল্যাণে। পরীর প্রেমে মানুষ পাগল হয়। পরী মানে কল্পনার জিনিস। কিংবা বলব, প্রত্যেক রমণীর ভিতরই কিছুটা পরী লুকিয়ে থাকে। সেটাকে ভালবাসলেই সর্বনাশ। পুরুষ তখন পাগল হয়ে যায়। শব্‌নমের পরীর খাদ ছিল না। আমি পাগল হয়ে গেলে শব্‌নমের বদনামের অন্ত থাকত না।

আবার বলছি, তিন লহমায় আমি সে জিনিস পাই নি। ভালই হয়েছে। গোস্বামী হয়তো তিন লহমায় ত্রিশ বৎসরের পুঞ্জীভূত যন্ত্রণা এক ধাক্কায় সয়ে নেবার মত শক্তি ধরেন। আমার কি সে শক্তি আছে!

আমি সাধারণ বিরহ-বেদনার কথা বলছি না। পায়ের শব্দ শুনে সে বুঝি এসেছে ভাবা, ঘোড়ার গাড়ি বাড়ির সামনে দাঁড়াতে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বার বার নিরাশ হওয়া, কারও হাতে কোনও চিঠি দেখলেই সেটা শব্‌নমের মনে করা, বাড়ি থেকে বেরুতে না পারা—হঠাৎ যদি সে এসে যায় সেই আশায়, আবার না-বেরুতে পেরে তার সন্ধান করতে পারছি নে বলে যন্ত্রণা ভোগ, যে আসে তার মুখেই বিষাদ দেখে হঠাৎ রেগে ওঠা এবং পরে তার জন্য নিজেকে শাস্তি দেওয়া—এসব তো সকলেরই জানা। যে জানে না, সে-লোকের সঙ্গে আমার যেন কখনও দেখা না হয়। সে সুখী।

জানেমন্ বয়েৎ বলতে বলতে এমন একটি কান্দাহারী শব্দ ব্যবহার করলেন যেটি ইতিপূর্বে আমি মাত্র একবার শব্‌নমেরই মুখে শুনেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্ব চৈতন্য যেন লোপ পেল। কে যেন আমার মাথায় ডাঙশ মারলে—প্রথমটায় লাগে নি, তার পর হঠাৎ অসহ বেদনা, তারপর অতি ধীরে ধীরে সেটা কমল। ডাঙশ যেন চেখে-চেখে আমার যন্ত্রণাবোধটা উপভোগ করলে। এসব তো সকলেরই হয়। এ আর নূতন করে কীই বা বলব?

জানেমন্ এখন কথা বলেন আরও কম। শব্‌নমের কথা আমিই তুলে অনুযোগ করলুম। এখন আমার সামনে তার কথা আর কেউ তোলে না—পাছে আমার লাগে, বোঝে না, তাতে আমি ব্যথা পাই আরও বেশী—তাই আমাকেই তো তুলতে হবে তার কথা।

আমার দুখানি হাত তাঁর কোলে নিয়ে বললেন, 'বাচ্চা, শব্‌নম আমাকে দুঃখ দেবে কেন? আর দুঃখ যদি পেতেই হয়, তবে তার হাতেই যেন পাই। যে বন্দীখানায় সোক্রাৎকে (সোক্রাতেস) জহর খেতে হয়েছিল তার কর্তা ছিলেন তাঁরই এক শিষ্য এবং বিষপাত্র সোক্রাৎকে এগিয়ে দেওয়া ছিল তাঁরই কাজ। পাত্র আনবার পূর্বে তিনি কেঁদে বলেছিলেন, 'প্রভু, আমাকেই করতে হবে এই কাজ?' সোক্রাৎ পরম সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'আহা! সেই তো আনন্দ। না হলে যে ব্যক্তি আমার মৃত্যু কামনা করে সে যখন জিঘাংসাভরে পৈশাচিক আনন্দে ক্রূর হাসি হেসে আমার দিকে বিষভাণ্ড এগিয়ে দেয় সেটা তো সত্যই পীড়াদায়ক।' এই বেদনার পেয়ালা ভরা আছে শব্‌নমের আঁখি-বারিতে—'

আমার বুকে আবার ডাঙশ। সেখানে যেন বিদ্যুৎ-বিভাসে ধ্বন্যালোক হয়ে ফুটে উঠল শব্‌নম। তার দুঃখের মুহূর্তে আমাকে একদিন বলেছিল, 'কত আঁখি-পল্লব নিংড়ে নিংড়ে বের করা আমার এই এক ফোঁটা আঁখিবারি।' হায় রে কিস্মৎ! দুঃখের দিনেই তুমি বদ্‌-কিস্মতের স্মৃতিশক্তি প্রখর করে দাও!

শুনছি, জানেমন্‌ বলে যাচ্ছেন, 'সেই ভাল সেই ভাল।' ধীরে ধীরে আকাশের দিকে দুই বাহু প্রসারিত করে অজানার উদ্দেশে বললেন, 'সেই ভাল, হে কঠোর, হে নির্মম! একদিন তুমি আমার চোখের জ্যোতি কেড়ে নিয়েছিলে—আমি অনুযোগ করেছিলুম। তারপর শব্‌নমরূপে সেটা তুমি আমায় ফেরত দিলে শতগুণ জ্যোতির্ময় করে—আমি তোমার চরণে লুটিয়ে জন্ম-দাসের মত বার বার তোমার পদচুম্বন করি নি? আজ যদি তুমি আবার সেই জ্যোতি কেড়ে নিতে চাও তো নাও—আমি অনুযোগ করব না, ধন্যবাদও দেব না। কিন্তু এই হতভাগ্য পরদেশী কী করেছিল, আমাকে বল, তাকে তুমি—'

দেখি, তাঁর চোখ দুটি দিয়ে অল্প অল্প রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

একবার দেখেছি, একবারের কথা শুনেছি—এই তৃতীয়বার। এর পর আজ পর্যন্ত আর কখনও দেখি নি।

আমি আকুল হয়ে তাঁকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলুম। তাঁর চোখ মুছে দিতে দিতে মনে মনে শব্‌নমকে উদ্দেশ করে বললুম, 'হিমি, বিরহ-ব্যথায় যে আঁখি-বারি ঝরে সেটা শুকিয়ে যায়—প্রিয়-মিলনের সময় সেটা দেখানো যায় না। দেখাতে হলে সেটা বুকে করে বইতে হয়। তুমি যেদিন ফিরে আসবে সেদিন এই রক্তচিহ্ন দেখিয়ে তোমাকে বলব, 'জানেমন্‌ তোমার জন্য তাঁর বুকের ভিতর কী রকম রক্তরেখায় পদ্ম-আসন প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, দেখ।'

আমি জানেমন্‌কে চুম্বন দিতে দিতে বললুম, 'আপনি শান্ত হন। আপনি জানেন না, আমার হৃদয় এখন শান্ত।'

আমি জানতুম, জানেমন্‌ শব্‌নম উভয়ই—অন্তত ক্ষণেকে তার শোক ভুলে যান—ঋষি-কবিদের বাণী শুনতে পেলে। বললুম, 'আপনি সোক্রাতের যে-কথা উল্লেখ করলেন, সেই বলেছেন, আমাদের কবি আব্দুর রহীমন্‌ খান-ই-খানান—

"রহীমন্‌! তুমি বলো না লইতে অনাদরে দেওয়া সুধা—
আদর করিয়া বিষ দিলে কেহ মরিয়া মিটাব ক্ষুধা।

রহীমন্‌! হমে না সুহায় অমি পিয়াওৎ মান বিন্‌।
জো বিষ দেয় বোলায় মান সহিত মরিব ভালো॥"

আমাকে আরও কাছে টেনে এনে বললেন, 'সুন্দর! সুন্দর! দাঁড়াও, আমি ফার্সীতে অনুবাদ করি ;—মুখে মুখেই বললেন,

"আয় রহীমন্, না গো মরা—" '

॥ ৭ ॥

অনেকক্ষণ যেন ধ্যানে মগ্ন থেকে আমাকে শুধালেন, 'তুমি পেয়েছ ? কী পেয়েছ ?'

'সে কি আমি নিজেই ভাল করে বুঝতে পেরেছি যে আপনাকে বুঝিয়ে বলব। এর সাধনা তো আমৃত্যু, কিংবা হয়তো মৃত্যুর পরক্ষণেই বুঝব এতদিন শুধু বইয়ের মলাটখানাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছি, বইটার নাম পড়েই ভেবেছি ওর বিষয়বস্তু আমার জানা হয়ে গিয়েছে, তখন দেখব এতদিন কিছুই বুঝতে পারি নি। শব্‌নমই আমাকে একদিন বলেছিল, সামান্য একটু আলাদা জিনিস—

"গোড়া আর শেষ, এই সৃষ্টির
জানা আছে, বল কার ?
প্রাচীন এ পুঁথি, গোড়া আর শেষ
পাতা কটি ঝরা তার !"

হিরণ্ময় পাত্রের দিকে তাকিয়েই মুগ্ধ হৃদয়ে কেটে গিয়েছে সমস্ত জীবন—ওর ভিতরকার সত্যটি দেখতে পাই নি। বিকলবুদ্ধি শিশুর মত এতদিন চুষেছি চুষিকাঠি—এইবারে পেলুম মাতৃস্তন্যের অনাদি অতীত প্রবহমাণ সুধা-ধারা। সেই যে শিশুহারা মা তার বাচ্চাকে কাঁদতে কাঁদতে খুঁজেছিল আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি—চলার পথে যে ঝরে পড়েছিল তার মাতৃস্তন্যরস তাই দিয়েই তো দেবতারা তৈরি করলেন, মিল্‌কিওয়ে—আকাশগঙ্গার ছায়াপথ।

'এ জীবনেই তো পৌঁছই নি পাহাড়চূড়োয়, যেখান থেকে উপত্যকার পানে তাকিয়ে বলতে পারব, এই যে উপত্যকার কাঁটাবন খানাখন্দ, কাদা-পাথর, সাপ-জোঁকে ক্ষতবিক্ষত চরণে এখানে এসে পৌঁছেছি—এই উপত্যকাই কত সুন্দর দেখায় গিরিবাসীদের কাছে, যারা কখনও উপত্যকায় নামে নি—আমি কিছুটা উপরে এসেছি মাত্র, আর এর মধ্যেই কাঁটাবনকে নর্মকুঞ্জ বলে মনে হচ্ছে, কাদাভরা খালকে প্রাণদায়িনী স্রোতস্বিনী বলে মনে হচ্ছে। গিরিশিখরে পৌঁছলে সমস্ত ভুবন মধুময় বলে মনে হবে, এই আশা ধরি।

জানেমন্ স্মিতহাস্যে বললেন, 'বুঝেছি, কিন্তু এইটুকুই পেলে কী করে ?'

আমি বললুম, 'অদ্ভুত, সেও আশ্চর্য! মনে আছে, মাসখানেক আগে সখী

এসেছিল শব্‌নমের। ওর সঙ্গে দমকা হাওয়ার মত এল শব্‌নমের আতরের গন্ধ। গোয়ালিয়র না কোথা থেকে শব্‌নম আনিয়েছিল যে এক অজানা আতর তারই সবটা দিয়ে দিয়েছিল তার সখীকে—মাত্র একদিন ওইটে মেখে এসেছিল আমার—আমাদের—না, আমাদের সকলের বাড়িতে আমাদের প্রথম বিয়ের দিন—'।

'সে কী ?'

অজানতে বলে ফেলেছি। ভালই করেছি। আরও আগেই বলা উচিত ছিল।

কী আনন্দ আর পরিতৃপ্তির সঙ্গে বৃদ্ধ যোগী শুনলেন আমাদের বিয়ের কাহিনী! হাসবেন, না, কাঁদবেন কিছুই যেন ঠিক করতে পারছেন না। খানাতে দোম্বা না মুর্গীর বিরিয়ানী ছিল সেও তাঁর শোনা চাই, তোপলের স্ত্রীধন নিয়ে আহাম্মকির কথা ভাল করে জানা চাই। এক কথা দশবার শুনেও তাঁর মন ভরে না। আর বার বার বললেন, ওই তো আমার শব্‌নম। কী যে বল, গওহর শাদ, কোথায় নূরজাহান।'

কতদিন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনও তাঁর পরম মুখ-রোচক মজলিসের জলুস—আমাদের এই প্রথম বিয়ের কাহিনী।

শেষটায় শেষ প্রশ্ন শুধালেন, 'আচ্ছা, বিয়ের পর তোমাতে ওতে যখন প্রথম একলা-একলি হলে তখন সে প্রসন্ন হাসি হাসলে, না কাঁদলে ?'

আমার লজ্জা পাচ্ছিল, বললুম, 'কাঁদলে।'

'জানতুম, জানতুম। আমারই স্মরণে কেঁদেছিল।' এবারে মুখে পরিতৃপ্তির উপর বিজয়-হাস্য। বললেন, 'এইটুকুনই জানতে চেয়েছিলুম। এইবারে বল, তোমার সেই আতরের কথা।'

চেনা দিনের ভোলা গন্ধের আচমকা চড় খেয়েছিলুম, সেদিন। এর পূর্বে আমি জানতুম না, স্মৃতির অন্ধকার ঘরে সুগন্ধ আলোর চেয়েও সতেজ হয়ে মানুষকে কতখানি অভিভূত করতে পারে। আমি অনেকখানি মুহ্যমান হয়ে ওই সুবাস-বন্যায় যেন ভেসে চলে গিয়েছিলুম। আপনাদের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রীতি-সম্ভাষণ দান-প্রদান হয়েছিল—আমি কিছুই শুনতে পাই নি।

এইখানেই আরম্ভ।

শব্‌নম একদিন আমায় শুধিয়েছিল, "যখন সব সান্ত্বনার পথ বন্ধ হয়ে যায় তখন হৃদয় হঠাৎ এক আনন্দলোকের সন্ধান পায়"—এটা আমি জানি কি না ? আমি উত্তর দেবার সুযোগ পাই নি। আমাদের যে কবির এদেশে আসার কথা

ছিল, তিনি ছন্দে বলেছেন

"দুঃখ, তব যন্ত্রণায় যে দুর্দিনে চিত্ত উঠে ভরি,
দেহে মনে চতুর্দিকে তোমার প্রহরী
রোধ করে বাহিরের সান্ত্বনার দ্বার,
সেই ক্ষণে প্রাণ আপনার
নিগূঢ় ভাণ্ডার হতে গভীর সান্ত্বনা
বাহির করিয়া আনে ; অমৃতের কণা
গ'লে আসে অশ্রুজলে ;
সে আনন্দ দেখা দেয় অন্তরের তলে
যে আপন পরিপূর্ণতায়
আপন করিয়া লয় দুঃখবেদনায়।"

সঙ্গে সঙ্গে এক অবর্ণনীয় আনন্দ-মধুরিমা আমার সর্বদেহ-মনে ব্যাপ্ত করে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে গেল, পরীক্ষা পাসের জন্য মুখস্থ-করা বিদ্যের একটা অংশ—সেটা তখন বুঝি নি, এখন সুগন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সেটা জ্বলজ্বল করে চোখের সামনে ভেসে উঠল।

রাজপুত্র দারা শীকুহ্-কৃত উপনিষদের ফার্সী অনুবাদ তো আপনি পড়েছেন, কিন্তু সব উপনিষৎ অনুবাদ করেন নি বলে বলতে পারব না বৃহদারণ্যক তাতে আছে কিনা। তারই এক জায়গায় আমাদের দেশে এক দার্শনিক রাজা জনক গেছেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে। ঋষিকে শুধালেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, মানুষের জ্যোতি কী—অর্থাৎ তার বেঁচে থাকা, তার কাজকর্ম ঘোরাফেরা করা কিসের সাহায্যে হয়—কিংজ্যোতিরয়ং পুরুষঃ ?"

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "সূর্য।"

জনক শুধালেন, "সূর্য অস্ত গেলে ?—অস্তমিত আদিত্যে ?"

"চন্দ্রমা।"

"সূর্য চন্দ্র উভয়েই অস্ত গেলে—অস্তমিত আদিত্যে, যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ ?"

"অগ্নি।"

"অগ্নিও যখন নির্বাপিত হয় ?"

"বাক্—ধ্বনি। তাই যখন অন্ধকারে সে নিজের হাত পর্যন্ত ভাল করে দেখতে পায় না, তখন যেখান থেকে কোন শব্দ আসে, মানুষ সেখানে উপনীত হয়।"

এইবারে শেষ প্রশ্ন।

জনক শুধালেন, "সূর্য চন্দ্র গেছে, আগুন নিবেছে, নৈঃশব্দ্য বিরাজমান—তখন পুরুষের জ্যোতি কী?" সংস্কৃতটি ভারি সুন্দর, পদ্য ছন্দে যেন কবিতা। "অস্তমিত আদিত্যে, যাজ্ঞবল্ক্য, চন্দ্রমস্যস্তমিতে, শান্তেঽগ্নৌ, শান্তায়াং বাচি, কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ?"

যাজ্ঞবল্ক্য শেষ উত্তর দিলেন, "আত্মা।"

আমাদের কবির ভাষায় 'অন্তরের অন্তরতম পরিপূর্ণ আনন্দকণা।' আরবী ফারসী উর্দুতে যাকে আমরা বলি 'রূহ'। এ সব তো আপনি ভাল করেই জানেন।

আমার ধোঁকা লাগল অন্যখানে। যাজ্ঞবল্ক্য যখন চেনা জিনিস সূর্য থেকে আরম্ভ করে জনককে অজানা আত্মাতে নিয়ে যাচ্ছেন তখন 'অগ্নি'কে জ্যোতি বলার পর তিনি 'গন্ধ'কে মানুষের জ্যোতি বললেন না কেন? গন্ধ তো 'শব্দে'র চেয়ে অনেক বেশী দূরগামী। কোথায় রামগিরি আর কোথায় অলকা—কোথায় নাগপুর আর কোথায় কৈলাস—সেই রামগিরিশিখরে দাঁড়িয়ে বিরহী যক্ষ দক্ষিণগামী বাতাসকে আলিঙ্গন করেছিলেন। সেই বাতাসে হিমালয়ের দেবদারু গাছের গন্ধ পেয়ে ভেবেছিলেন, হয়তো এই বাতাসই তাঁর অলকাবাসী প্রিয়াঙ্গীর সর্বাঙ্গ চুম্বন করে এসেছে;

"হয়ত তোমারে সে পরশ করি' আসে,
হে প্রিয়া মনে মনে ভাবিয়া তাই
সকল অঙ্গেতে সে বায়ু মাখি লয়ে
পরশ তব যেন তাহাতে পাই।"

ফার্সী এবং সংস্কৃত ছন্দে প্রচুর মিল আছে; জানেমন্ তাই আমাকে একাধিকবার মূল সংস্কৃতটা আবৃত্তি করতে বললেন।

ভিত্বা সদ্যঃ কিশলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং
যে তৎক্ষীরস্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি।

আমি ভেবেছিলুম, এই খেই ধরে কাব্যালোচনাই চলবে কিন্তু জানেমন্‌ই বললেন, 'গন্ধের কথা বলছিলে।'

আমি বললুম, 'জী। আর যক্ষের সুবাসানুরাগ না হয় কবিত্ব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু আমি এমন গন্ধকাতর লোক দেখেছি, যে বেহারে দক্ষিণমুখো

হয়ে দাঁড়িয়ে বাতাসের গন্ধ নিতে নিতে আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে বাতাসে বাংলা সাগরের নোনা গন্ধস্পর্শ। এটা কল্পনা নয়।

'তা সে যা-ই হোক, ঋষি গন্ধকে জ্যোতিরূপে বাকের চেয়ে ন্যূনতর মনে করেছেন, কারণ শব্দের সাহায্যে আমরা অন্ধকারে যে দিগ্‌দর্শন পেয়ে উৎপত্তিস্থলে পৌঁছতে পারি সুবাস দিয়ে অতখানি পারি নে, কিংবা হয়তো স্বীকার করেও সংক্ষেপ করেছেন—যেমন স্পর্শের কথাও বলেন নি।

'কিন্তু আসল কথা এই একটুখানি সৌরভেই আমি যদি মুহ্যমান, অভিভূত হয়ে যাই তবে তার পরের সোপান এবং সেটা তো সোপান নয়, সে তো মঞ্জিল, সে তো সাগরসঙ্গম, সে-ই তো আত্মন্—সে তো দূরে নয়, কঠিন নয়। সে-ই তো এইমাত্র অনির্বাণ জ্যোতি, সে-ই তো নূর, ব্রহ্ম। সেই আলোতেই আমি অহরহ শব্‌নমকে দেখতে পাব। সূর্যচন্দ্র যখন অস্তমিত, অগ্নি যখন শান্ত তখন যদি শব্‌নম সুরভিবাস দিয়ে আমাকে পঞ্চেন্দ্রিয়াতীত করে দিতে পারে তবে আর এইটুকুতে নিরাশ হবার কিছু নেই। বিশ্বাস করা কঠিন, তখন সে জ্যোতি পেলুম আমার অন্তরেই।'

আমি চুপ করলুম। জানেমন্ বললেন, 'এতে অবিশ্বাসের তো কিছুই নেই। আমি যেটুকু পেয়েছি, সেটুকু চোখের আলো হারানোর শোকে—এবং আপন অন্তর থেকেই, বহু সাধনার পর। তুমি পেয়ে গেলে অল্প বয়সেই—সে শুধু পিতৃপুরুষের আশীর্বাদের ফলে।'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'কিন্তু চিরস্থায়ী নয় আমার এ সম্পদ। মাঝে মাঝে—'

জানেমন্ আমাকে কাছে টেনে এনে আমার মাথা তাঁর কোলের উপর রেখে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'আমারও তাই। আমাদের বন্ধু সুফী সাহেবেরও তাই। তার পর বল। আমার শুনতে বড় ভাল লাগছে। শব্‌নম ফিরে এলে তার সামনে আবার তুমি সব বলবে।'

কী আত্মপ্রত্যয়! যেন শব্‌নম এক লহমার তরে আমাদের জন্য তৃষ্ণার জল আনবার জন্য পাশের ঘরে গিয়েছে।

আস্তে আস্তে বললুম, 'আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ তাকে অরুন্ধতী তারা দেখাবার সুযোগ পাই নি বলে। এই যে আমি মজার-ই-শরীফ এলুম গেলুম—রাত্রিবেলা একবারও আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারি নি—যে-কোনও তারা দেখতে পেলেই সব বেদনা আবার এক সঙ্গে এসে আমাকে মুষড়ে ফেলবে বলে।

যে রাতে আমি প্রথম জ্যোতি পেলুম, তারই আলোকে আমি নির্ভয়ে অরুন্ধতীর দিকে তাকালুম। তিনি আমায় হাসিমুখে বললেন, "স্বর্গে আসতেই দেবতারা আমায় শুধালেন, 'তুমি কোন্ পুণ্যলোকে যাবে?' তাঁরা ভেবেছিলেন, যে-স্বামীর কোপন স্বভাব পদে পদে উভয়কে লাঞ্ছিত করেছে সেই কলহাস্পদ স্বামীর কাছে আমি যেতে চাইব না। কিন্তু আমি তাঁরই কাছে আছি। তুমি নিজের অসম্পূর্ণতার স্মরণে নিজেকে লাঞ্ছিত করো না। শব্‌নম আমারই মত তার বশিষ্ঠকে খুঁজে নেবে।"

সারা দিনমান কর্তব্যকার্য, নিত্যনৈমিত্তিক সব-কিছু করে যাই প্রসন্ন মনে, দাসী যে রকম মুনিব বাড়ির কাজকর্ম করে যায় নিষ্ঠার সঙ্গে, কিন্তু সর্বক্ষণ মন পড়ে থাকে তার আপন কুঁড়েঘরে, আপন শিশুটিকে যেখানে সে রেখে এসেছে—তার দিকে। সন্ধ্যায় ত্বরিত গতিতে যায় সেই শিশুর পানে ধেয়ে—মাতৃস্তনের উচ্ছলিত-মুখ সুধারসপীড়িত ব্যাকুল বক্ষ নিয়ে—তার ওষ্ঠাধর-নিপীড়নে জননীর সর্বাঙ্গে শিহরণের সঙ্গে সঙ্গে তার মুক্তি, তার আনন্দ-নির্বাণ।

আমিও দিবাবসানে ধেয়ে যাই আমাদের বাসরগৃহের নির্জন কোণে। এখানেই আমার জয়, আর এ ঘরেই আমার সর্বস্ব লয়; তাই বহুকাল ধরে এ-ঘরের কথা ভাবতে গেলেই আমার দেহমন বিকল হয়ে যেত। এখন যাই সেই ঘরে, ওই মায়ের চেয়েও তড়িৎ-ত্বরিত বেগে।

বিশ্বকর্মা যখন তিলোত্তমা গড়তে বসেছিলেন তখন সিংহ দিয়েছিল কটি, রম্ভা দিয়েছিল উরু, আর হরিণী যখন দিতে চাইলে তার চোখ, পদ্মকোরকও পেতে চাইলে সেই সম্মান, তখন নাকি বিশ্বকর্মা দুই বস্তুই প্রত্যাখ্যান করে, প্রভাতের শুকতারাকে দুই টুকরো করে গড়েছিলেন তিলোত্তমার দুটি চোখ। শব্‌নম যখন কান্দাহারে ছিল—

জানেমন্ বললেন, 'বড় কষ্ট পেয়েছে সে তখন। অত যে কঠিন মেয়ে, সেও তখন ভেঙে পড়ার উপক্রম করেছিল। তারপর বল।'

আমি বললুম, 'আমাকে তখন বিশ্বকর্মার মত ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ খুঁজে বেড়াতে হয় নি। তাকে স্মরণ করামাত্রই আস্তে আস্তে তার সমস্ত মূর্তি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত। রাধার ধ্যান ছিল সহজ, কারণ তাঁর কালিয়া ছিলেন কালা, চোখ বন্ধ করা মাত্রই তাঁকে দেখতে পেতেন—আমার কালা যে গৌরী। কিন্তু বিশ্বকর্মার সঙ্গে আমি তুলনাস্পদ নই। কারণ তাঁর তিলোত্তমা গড়ার সময় তিনি সৃষ্টিকর, চিত্রকর। আমার চারুসর্বাঙ্গীকে গড়ার সময় আমি তুলি ফটোগ্রাফ। তবে হ্যাঁ, মূর্তি গড়ার সময় আমার সামনে বিলাতী ভাস্করের মত

জীবন্ত মডেল থাকত না—খাঁটি ভারতীয় ভাস্করের মত প্রতিমালক্ষণানুযায়ী মূর্তিটি নির্মাণ করে সর্বশেষে তার সম্মিলিত পদযুগলের দুই পদনখকণার উপর ধীরে ধীরে রাখতুম আমার দুই ফোঁটা চোখের জল। এই আমার বুকের হিমিকাকণা—শব্‌নম।

কিন্তু এবারে আর তা নয়। এবারে আমি মূর্তি গড়ি নে।

এবারে সে আমার মনের মাধুরী, ধ্যানের ধারণা, আত্মনের জ্যোতি।

এবারে আমার আত্মচৈতন্য লোপ পেয়ে কেমন যেন এক সর্বকলুষমুক্ত অখণ্ড সত্তাতে আমি পরিণত হয়ে যাই। কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা সে নয়—অথচ সর্ব ইন্দ্রিয়ই সেখানে তন্মাত্র হয়ে আছে। কী করে বোঝাই! সঙ্গীত সমাপ্ত হওয়ার বহু বৎসর পরেও তাকে যখন স্মরণে এনে তার ধ্বনি বিশ্লেষণ করা যায়—এ যেন তারও পরের কথা। রাগিণী, তান, লয়, রস সবে ভুলে গিয়ে বাকী থাকে যে মাধুর্য—সে-ই শুদ্ধ মাধুর্য। অথচ বাস্তব জগতে সেটা হয় ক্ষীণ—এখানে যেন জেগে ওঠে বানের পর বান—গম্ভীর, করুণ, নিস্তব্ধ জ্যোতির্ময় ভূর্ভুবঃস্বঃ।

ওই তো শব্‌নম, ওই তো শব্‌নম, ওই তো শব্‌নম।

॥ ৮ ॥

শুধু দুটি কথা আমার মনের মধ্যে সর্বক্ষণ জেগে থাকে।

একটি উপনিষদের বাণী:

আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি
জড়তার নাগপাশে দেহ মন হইতে নিশ্চল।

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণাৎ
যদেষ আকাশো আনন্দো ন স্যাৎ।

আমার প্রথম আনন্দের দিনে হঠাৎ এটি আমার মনের ভিতরে এসেছিল—বহু বৎসর অদর্শনের পর প্রিয়জন আচমকা এসে আবির্ভূত হলে যে রকম হয়। তাকে কোথায় বসাব, কী দিয়ে আদর করব কিছুই ঠিক করে উঠতে পারি নি। এই যে আকাশ-বাতাস, সে আনন্দে পরিপূর্ণ না থাকলে, কে একটি মাত্র নিশ্বাস নিতে পারত এর থেকে?

সেই রাত্রে আমি আমাদের বাসরঘরে যাই। শব্‌নম যেদিন চলে যায়,

সেদিন কেন জানি নে তার কুরান-শরীফখানা টেবিলের উপর রেখে গিয়েছিল।

প্রত্যাদেশের সন্ধানে অনেকেই কুরান খুলে যেখানে খুশি সেখানে পড়ে। আমার কোনও প্রত্যাদেশের প্রয়োজন নেই। আমি এমনি খুলেছিলুম।

'ওয়া লাওলা ফদ্‌লুল্লাহি আলাইকুম্‌ ও রহ্‌মতহু ফী দ্দুনিয়া ওয়াল আখিরা—'

'ভূলোক দ্যুলোক যদি তাঁর দাক্ষিণ্য ও করুণায় পরিপূর্ণ না থাকত তবে—' তবে? সর্বকালের মানুষ সর্ব বিভীষিকা দেখেছে। তার নির্যাস—মানুষের অসম্পূর্ণতা তখন রুদ্রের বহ্নি (গজব) আহ্বান করে আনত, সৃষ্টি লোপ পেত।

মনে পড়ল, ছেলেবেলাকার কথা। দাদারা ইস্কুলে, আমার সে বয়স হয় নি। দুপুরবেলা মা আমাকে চওড়া লা৹পেড়ে ধুতি, তাঁরই হাতে-বোনা লেসের হাতওয়ালা কুর্তা, আর জরির টুপি পরিয়ে সামনে বসিয়ে কুরান পড়ত। এই জ্যোতি অনুচ্ছেদটিই মা'র বিশেষ প্রিয় ছিল—বহু বহু বিশ্বাসীর তাই। আমার স্মরণে ছিল শুধু দুটি শব্দ 'ফদল' আর 'রহমৎ'—উচ্ছ্বসিত দাক্ষিণ্য ও করুণা: তখন শব্দ দুটির অর্থ বা অন্য কোন-কিছু বুঝি নি। আজও কি সম্পূর্ণ বুঝেছি?

* * *

আরও সহজে বলি।

বয়স তখন দশ কি বারো। চটি বাংলা বইয়ে গল্পটি পড়েছিলুম, বড় হয়ে এ গল্পটি আর কোথাও চোখে পড়ে নি।

এক ইংরেজকে বন্দী করে নিয়ে যায় বেদুইন দল। দলপতি খানদানী শেখ তার মেয়ের উপর ভার দেন বন্দীকে খাওয়াবার।

ভাষাহীন প্রণয় হয় দুজনাতে। তাই শেষটায় বল্লভের বন্দীদশা আর সে সইতে পারল না।—শব্‌নমের লায়লী তো ওই দেশেরই মেয়ে। একদিন পিতা যখন পণ্যবাহিনী আক্রমণ করতে বেরিয়েছেন তখন সে খাদ্য আর তেজী আরবী ঘোড়া এনে বল্লভের দিকে তাকালে। দুজনার পালানো অসম্ভব। যদি ধরা পড়ে তবে দুহিতাহরণকারীকে প্রাণ দিয়ে তার শোধ দিতে হবে—ওই একটিমাত্র আশঙ্কা ছিল বলে সে সঙ্গ নিয়ে দয়িতের প্রাণ বিপন্ন করতে চায় নি। যাবার সময় ইংরেজ শুধু দুটি শব্দ বলে গিয়েছিল—'টম' আর 'লণ্ডন'।

এক মাস পরে দলপতির অনুচরগণ খবর আনল, ইংরেজ বন্দরে পৌঁছতে পেরে জাহাজ ধরেছে।

সরলা কুমারী চেষ্টা করেছিল তাকে ভোলবার—বহুদিন ধরে—পারে নি।

পালিয়ে গেল সমুদ্রপারে। সেখানে প্রতি জাহাজের প্রত্যেককে বলে, 'টম'—'লণ্ডন', 'টম'—'লণ্ডন'।

এক কাপ্তেনের দয়া হল। এ-বন্দর ও-বন্দর করে করে তাকে লণ্ডনে নামিয়ে দিল। ইতিমধ্যে মেয়েটি ওই দুটি শব্দ ছাড়া আর-এক বর্ণ ইংরিজি শেখে নি—সে কাউকে সঙ্গ দিত না। ওর দিকে কেউ তাকালে কিংবা প্রশ্ন শুধালে ম্লান হাসি হেসে বলত, 'টম'—'লণ্ডন'।

সেই বিশাল লণ্ডনের জনসমুদ্র। তার মাঝখান দিয়ে চলেছে একাকিনী বেদুইন-তরুণী। মুখে শুধু 'টম'—'লণ্ডন'। কত শত টম আছে লণ্ডনে, কে জানে, কত কোণে, কিংবা অন্যত্র, কিংবা ফের বিদেশে চলে গিয়েছে আমাদের টম।

হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে আসছে টম। চোখোচুখি হল। দুজনা ছুটে গিয়ে একে অন্যকে আলিঙ্গন করলে—সেই সদর রাস্তার বুকের উপর।

ঠিক তেমনি একদিন আসবে না শব্‌নম?

সে কি আমাকে বলে যায় নি, 'বাড়িতে থেকো। আমি ফিরব।'?

* * * *

॥ তামাম্ ন্ শুদ্ ॥

প্রেম

নিকোলাস লেস্‌কফ
রচিত
মৎসেন্‌স্ক জেলার
'লেডি ম্যাক্‌বেথ'

শ্রীমান অবধূতের করকমলে

সৈয়দ মুজতবা আলী

অনুবাদকের নিবেদন

নিকোলাই সেমোনোভিচ্ লেস্কফের 'প্রেম' (আসলে নাম 'মৎসেন্স্ক্ জেলার লেডি ম্যাক্‌বেৎ') গল্পটি আমার কাছে অনবদ্য এবং বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয় বলে মনে হয়। লেস্কফের জন্ম ১৮৩১-এ এবং মৃত্যু ১৮৯৫-এ। 'প্রেম' প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে। ঐ সময় তলস্তয় ও তুর্গেনিয়েফ্ তাঁদের খ্যাতির মধ্যগগনে। সে সময় লেখক হিসেবে নাম করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। আরেকটি কথা বললেই যথেষ্ট হবে। এর কয়েক বৎসর পরে যখন ফ্রান্সে মপাসাঁর ছোট গল্প মাসিকপত্রে বেরতে আরম্ভ করে তখন সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই—সেগুলোর অনুবাদ অন্যান্য ইয়োরোপীয় ভাষায় হতে থাকে, এক রুশ ভাষা ছাড়া—যদিও রুশদেশই সে যুগে ফ্রান্সের সবচেয়ে বেশি নকল করত। তার কারণ রুশাকাশে তখন একাধিক অত্যুজ্জ্বল গ্রহ উপ-গ্রহের সংযোগ।

এই উপন্যাসটি প্রায় যেন গ্রীক ট্রাজেডি। নিয়তির অলঙ্ঘ্য নির্দেশ, কিংবা বলতে পারেন প্রকৃতিদত্ত রজোগুণের কাম-তাড়নায় (কাতেরীনা) কিংবা নীচাশয়তায় (সের্‌গেই) এরা যেন কোন্ এক অজানিত করাল অস্তাচলের পানে এগিয়ে চলেছে। নিদারুণ কঠিন অবস্থায় পড়ে এরা তখন কি-সব অমানুষিক কাজ করে তারই উল্লেখ করতে গিয়ে স্বয়ং লেস্কফ্ই বলেছেন, 'যারা এই উপদেশ-বাণীতে কর্ণপাত করে না, এ-রকম বীভৎস অবস্থায় যাদের হৃদয়ে মৃত্যু-চিন্তা প্রলোভনের চেয়ে ভয়ের সৃষ্টি করে বেশি—তাদের করতে হয় বীভৎসতর এমন-কিছু যেটা এই আর্ত ক্রন্দন-ধ্বনির টুঁটি চেপে ধরে তাকে নীরব করে দেবে। এই তত্ত্বটি আমাদের নিত্যদিনের সাধারণ সাদামাটা সরল মানুষ উত্তমরূপেই হৃদয়ঙ্গম করতে জানে; এ অবস্থায় সে লাগাম ছেড়ে তার নির্ভেজাল নীচ পাশবিক প্রবৃত্তিকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দেয়; সে তখন সাজে সঙ, নিজেকে নিয়ে আরম্ভ করে নিষ্ঠুর খেলা, আর-পাঁচজন মানুষকে নিয়েও—তাদের কোমলতম হৃদয়ানুভূতি নিয়ে। এরা (এস্থলে সাইবেরিয়াগামী যাবজ্জীবন কঠোর কারাদণ্ডের কয়েদীর পাল) এমনিতেই অত্যধিক কোমল স্বভাব ধরে না—এ-রকম অবস্থায় পড়ে তারা হয়ে যায় দ্বিগুণ পিশাচ।'

এবং বীভৎস রসের সঙ্গে সঙ্গে এতে আছে অতি মধুর গীতিরস, রুশ নিদাঘ দিনান্তের অপূর্ব বর্ণনা, প্রেমের আকুতি-মিনতি, অভিমান, ক্ষণকলহ, মিলন-বিচ্ছেদ—এবং সর্বশেষে দয়িতের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ।

এস্থলে আমি ব্যক্তিগত ভাবে সভয়ে সবিনয় নিবেদন করি, এবং যুক্তি না দেখিয়ে সংক্ষেপেই করি, কাতেরীনা যত পাপাচারই করে থাকুক, তার একনিষ্ঠ প্রেম আমাকে মুগ্ধ করেছে। তথাকথিত ভদ্র মানবসমাজেও এ-জাতীয় প্রেম বিরল। চেখফের 'তুলালী' পড়ে তলস্তয় পরবর্তী যুগে যা বলেছেন, হয়তো এস্থলেও তা-ই বলতেন।

মপাসাঁর 'বেল্ আমি'-র সঙ্গে পাঠক এ নভেলিকার মিল দেখতে পাবেন। কিন্তু 'বেল্ আমি' প্রকাশিত হয় লেস্কফের বইয়ের কুড়ি বৎসর পরে। মপাসাঁর যৌবনে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত তুর্গেনিয়েফের—ফ্লোবেরের বাড়িতে। হয়তো বা সে সময় তুর্গেনিয়েফ্ গল্পটি মুখে মুখে মপাসাঁকে বলে থাকতে পারেন —কারণ মপাসাঁ যখন প্লটের জন্য মা'কে চিঠি লিখতে পারেন, তখন তাঁর প্রতি সদাস্নেহশীল গুরুসম তুর্গেনিয়েফ্‌কে যে তিনি এ বিষয়ে অনুরোধ করবেন তাতে আর বিচিত্র কি? মপাসাঁর চিঠিতেই রয়েছে, তিনি একবার তুর্গেনিয়েফ্‌কে জিজ্ঞেস করেন, মাতাল ইংরেজ খালাসী যদি হঠাৎ গান ধরে তবে তারা কি গান গাইবে—"গড্ সেভ্ দি কুইন?" তুর্গেনিয়েফ্ বললেন, বয়ঞ্চ গাইবে "রুল ব্রিটানিয়া" এবং সেইটি অনুবাদ করে তাঁকে সাহায্য করেন।

এ পুস্তকে আদিরসের প্রাধান্য হয়তো বাঙালী পাঠকের কিঞ্চিৎ পীড়ার কারণ হতে পারে। কিন্তু রুশ-সাহিত্যের মহারথীরাও এই ধরনেই লিখেছেন (তলস্তয়ের নেখলুদফ্-মাস্‌লভা, এবং গর্কির তো কথাই নেই)। বস্তুত এ বই যদি লিখতেই হয় তবে এ-ছাড়া গতি নেই। 'কুমারসম্ভব' লিখতে হলে কালিদাসের মতই লিখতে হয়, 'চৌরপঞ্চাশিকা' লিখতে হলে চুড়ের মত লিখতে হয়।

অনুবাদ করতে হলে যে-কটি গুণের প্রয়োজন হয়, তার একটিও আমার নেই। তাই আমি আমার একাধিক মিত্র তথা শিষ্যকে এই নভেলিকাটি অনুবাদ করার জন্য অনুরোধ করেছি। তাঁরা করেননি বলেই (মাঝখান থেকে বইখানি আমাকে তিন-তিনবার কিনতে হয়েছে!) আমি এটাতে হাত দিয়েছিলুম। করতে গিয়ে বুঝতে পারলুম, অনুবাদ-কর্ম কী কঠিন গর্ভযন্ত্রণা। নিজের আপন লেখা আপন পাঁঠা, কিন্তু পয়েরটা বলি দিতে হয় শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে। তদুপরি যে সমস্যা আমাকে সবচেয়ে চিন্তায় ফেলেছে সেটি এই: যদি সেটাকে মধুর বাঙলায় হুবহু আপন মাতৃভাষায় যে রকম বলি, শুনি, সে-রকম অনুবাদ করি তবে বাঙালী পাঠক সেটি হোঁচট না খেয়ে খেয়ে আরামে পড়ে যাবেন—কিন্তু তাতে রুশ-বৈশিষ্ট্য মারা যাবে। পক্ষান্তরে সে বৈশিষ্ট্য রাখতে গেলে অনুবাদ হয়ে যায়

আড়ষ্ট, পাঠক রস পায় না,—তা হলে আর বৃথা পরিশ্রম করলুম কেন? তবে মাঝে মাঝে ইকন্, সামোভার, আপেল গাছ, ভল্‌গা, নিজ্‌নি নভগরদ আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে—প্রয়োজনীয় রুশ আবহাওয়া তৈরি করে। তবু বলি, অনুবাদটি যোগ্য ব্যক্তির করা উচিত ছিল।

সর্বশেষে নিবেদন, কয়েক মাস ধরে নিদ্রাকৃচ্ছ্রতায় ভুগি। তখন চিকিৎসক উপদেশ দেন, কোনো মৌলিক রচনায় হাত না দিয়ে যেন অনুবাদ-কর্ম আরম্ভ করি—তাতে করে রোগশয্যার একঘেঁয়েমি থেকে খানিকটে মুক্তি পাবো। রোগশয্যার অজুহাত শুনে আমার অনুরাগী পাঠক (এ নিবেদনটি একমাত্র তাঁদেরই উদ্দেশে) যে অনুবাদ পছন্দ করে বসবেন, এ আশা আমার করা অনুচিত, কিন্তু কটু-কাটব্য করার সময় হয়তো সে-কথা ভেবে খানিকটে ক্ষমার চোখে দেখবেন। এবং অতি সর্বশেষ নিবেদন, অনিদ্রারোগে অনুবাদকর্ম অতিশয় উপকারী। এটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বললুম। আমার মত যাঁরা অনিদ্রায় ভুগছেন তাঁরা উপকৃত হবেন। কিমধিকমিতি॥

সৈয়দ মুজতবা আলী

পাত্রপাত্রী

রুশ উপন্যাসে একই পাত্রকে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রপাত্রী ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকে বলে নিম্নে তাদের নির্ঘণ্ট দেওয়া হল:

ইস্‌মাইলফ্‌	পরিবারের নাম
বরিস তিমোতেইয়েভিচ্‌ ইস্‌মাইলফ্‌ বরিস তিমোতেইয়েভিচ	বাড়ির কর্তা
জিনোভিই বরিসিচ্‌	পুত্র
কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না ইস্‌মাইলভা, কেট, একেতারীনা ল্‌ভভ্‌না, ল্‌ভভ্‌না	বরিসের পুত্রবধূ, জিনোভিইয়ের স্ত্রী
সের্‌গেই ফিলিপচ্‌, সেরেজ্‌কা, সেরেজেশ্‌কা, সেরেজেঙ্কা, সেরেজা	পুত্রবধূর প্রণয়ী
আক্‌সীনিয়া	পাচিকা
ফেদর জাখারফ্‌ লিয়ামিন, ফেদিয়া	সম্পত্তির অংশীদার বালক
তিয়োনা, সোনেৎকা ও অন্যান্য	কয়েদী

মাঝে মাঝে আমাদের এই অঞ্চলে এমন সব নরনারীর আবির্ভাব হয় যে, তারপর যত দীর্ঘকালই কেটে যাক না কেন, তাদের কথা স্মরণে এলেই যেন অন্তরাত্মা পর্যন্ত শিউরে ওঠে। এবং, এদের মধ্যে নিশ্চয়ই পড়ে এক ব্যবসায়ীর স্ত্রী, কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না ইস্‌মাইলভা। এর জীবন এমনই বীভৎস নাটকীয় রূপ নিয়েছিল যে, আমাদের সমাজের পাঁচজন ভদ্রলোক কোন এক মস্করাবাজের অনুকরণে একে নাম দিয়েছিল, 'ম্‌ৎসেন্‌স্ক্‌ জেলার লেডি ম্যাকবেৎ'।

কাতেরীনা তেমন কিছু অপূর্ব রূপসী ছিল না, কিন্তু চেহারাটি ছিল সত্যই সুশ্রী। তখন তার বয়েস সবে চব্বিশ; মাঝারি রকমের খাড়াই, ভালো গড়ন আর গলাটি যেন মার্বেল পাথরে কোঁদাই। ঘাড় থেকে বাহু নেমে এসেছে সুন্দর বাঁক নিয়ে, বুক আঁটসাঁট, নাকটি বাঁশীর মত শক্ত আর সোজা, শুভ্র উন্নত ললাট আর চুল এমনিই মিশমিশে কালো যে আসলে ওটাকে কালোয় নীলে মেশানো বলা যেতে পারে। তার বিয়ে হয়েছিল ব্যবসায়ী ইস্‌মাইলফের সঙ্গে। সে বিয়েটা প্রেম বা ঐ ধরনের অন্য কোনো কারণে হয় নি—আসলে ইস্‌মাইলফ্‌ তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল ঐ যা, আর কাতেরীনা গরীবের ঘরের মেয়ে বলে বিশেষ বাছবিচার করার উপায় তার ছিল না।

ইস্‌মাইলফ্‌ পরিবার আমাদের শহরে গণ্যমান্যদের ভিতরই। তাদের ব্যবসা ছিল সবচেয়ে সেরা ময়দার, গম পেষার জন্য বড় কল তারা ভাড়া নিয়েছিল, শহরের বাইরে ফলের বাগান থেকে তাদের বেশ দু'পয়সা আসতো এবং শহরের ভিতরে উত্তম বসত-বাড়ি। মোদ্দা কথায়, তারা ধনী ব্যবসায়ীগুষ্ঠীর ভিতরেরই একটি পরিবার। তার উপর পরিবারটিও মোটেই পুঞ্জিতে ভর্তি নয়। শ্বশুর তিমোতেইয়েভিচ্‌ ইস্‌মাইলফ্‌, আশীর মত বয়েস, বহুকাল পূর্বে তার স্ত্রী মারা গেছে। তার ছেলে, কাতেরীনার স্বামী জিনোভিই বরিসিচ্‌ পঞ্চাশের চেয়েও বেশ কিছু বেশী—আর সর্বশেষে কাতেরীনা, ব্যস্‌। পাঁচ বছর হল কাতেরীনার বিয়ে হয়েছে কিন্তু এখনো ছেলেপুলে কিছু হয়নি। প্রথম পক্ষের স্ত্রীও কোনো সন্তান রেখে যায়নি—জিনোভিইয়ের সঙ্গে কুড়ি বছর ঘর করার পরও। তার মৃত্যুর পর সে কাতেরীনাকে বিয়ে করে। এবারে সে আশা করেছিল, বুঝি ভগবানের আশীর্বাদ এ-বিয়ের উপর নেমে আসবে—বংশের সুখ্যাতি সম্পত্তি বাঁচাবার জন্য সন্তান হবে, কিন্তু কপাল মন্দ, কাতেরীনার কাছ থেকেও কিছু পেল না।

এই নিয়ে জিনোভিইয়ের মনস্তাপের অন্ত ছিল না, এবং শুধু সে-ই না, বুড়ো

বরিসেরও। কাতেরীনারও মনে এই নিয়ে গভীর দুঃখ ছিল। আর কিছু না হোক—এই যে অন্তহীন একঘেয়ে জীবন তাকে মূঢ় মোহ্যমান করে তুলছে তার থেকে সে নিষ্কৃতি পেত, ভগবান জানেন কতখানি আনন্দ পেত সে, যদি নাওয়ানো খাওয়ানো জামা-কাপড় পরানোর জন্য একটি বাচ্চা থাকতো তার—নিষ্কৃতি পেত এই বদ্ধ, উঁচু পাঁচিলওলা, মারমুখো কুকুরে ভর্তি বাড়িটার অসহ্য একঘেয়েমি থেকে। শুধু তাই নয়, ঐ এক থোঁটা শুনে শুনে তার প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল—'বিয়ে করতে গেলি কেন, তুই? একটা ভদ্রলোকের জীবন সর্বনাশ করলি তুই,—মাগী, বাঁজা পাঁঠি।' যেন মারাত্মক পাপটা তারই, সে পাপ তার স্বামীর বিরুদ্ধে, শ্বশুরের বিরুদ্ধে, এমন কি তাদের কুলে সাধু ব্যবসায়ীগুষ্ঠীর বিরুদ্ধে!

ধনৈশ্বর্য, আরাম-আয়েশে পরিপূর্ণ এই বাড়িতে কাতেরীনার ছিল সবচেয়ে নিঃসঙ্গ জীবন। দেখাটেখা করতে সে যেত খুবই কম এবং যদি বা তার স্বামীর সঙ্গে তার ব্যবসায়ী বন্ধুদের বাড়িতে যেত তাতেও কোনো আনন্দ ছিল না। ওরা সব প্রাচীন ধরনের কড়া লোক। তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত, সে কি ভাবে বসে, তার আচরণ কি রকম, সে কি ভাবে আসন ত্যাগ করে; ওদিকে কাতেরীনা তেজী মেয়ে এবং দুঃখদৈন্যে শৈশব কেটেছে বলে সে অনাড়ম্বর ও মুক্ত জীবনে অভ্যস্ত। পারলে সে এখখুনি দুটো বালতি দু'হাতে নিয়ে ছুটে যায় জাহাজঘাটে। সেখানে শুধু শেমিজ গায়ে স্নান করতে। কিংবা বেড়ার ফাঁক দিয়ে রাস্তার ঐ ছোঁড়াটার গায়ে বাদামের খোসা ছুঁড়ে মারতে। কিন্তু হায়, এখানে সব-কিছু সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভোর হওয়ার পূর্বেই তার শ্বশুর আর স্বামী ঘুম থেকে উঠে জালা জালা চা খেয়ে ছ'টার ভিতর কাজ-কারবারে বেরিয়ে যান, আর সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ একা-একা আলস্যে আলস্যে এ-ঘর ও-ঘর করে করে ঘুরে মরে। সবকিছু ছিমছাম, ফাঁকা। দেব-দেবীদের সামনে স্তিমিত প্রদীপ জ্বলছে। সমস্ত বাড়িতে আর কোনো জনমানবের চিহ্ন নেই, কারো কণ্ঠস্বরের লেশমাত্র নেই।

কাতেরীনা ফাঁকা এ-ঘর থেকে ফাঁকা ও-ঘরে যায়, তারপর আরেক দফা আরো খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে, তারপর একঘেয়েমির জন্য হাই তোলে। তারপর সরু সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে ওঠে উঁচুতে নিজেদের শোবার ঘরে। সেখানে খানিকক্ষণ অলস নয়নে তাকিয়ে থাকে নিচের দিকে যেখানে দড়ি বানাবার পাটসুতো ওজন করা হচ্ছে, কিংবা অতি উৎকৃষ্ট মিহিন ময়দা গুদোমে পোরা হচ্ছে। আবার সে হাই তোলে—তাই করে যেন সে খানিকটে আরাম পায়। তারপর ঘণ্টাখানেক, ঘণ্টা দুই ঘুমিয়ে ওঠার পর আবার আসবে সেই

একঘেয়েমি—রুশদেশের খাঁটি একঘেয়েমি, ব্যবসায়ী বাড়ির একঘেয়েমি। সে-একটানা, বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমি এমনই নিরন্ধ্র যে তাই লোকে বলে, তখন কোনো গতিকে কোনো একটা বৈচিত্র্য আনার জন্য মানুষ সানন্দে গলায় দড়ি দিয়ে দেখতে চায় তাতে করে কিছু একটা হয় কিনা। কাতেরীনার আবার বই পড়ারও বিশেষ শখ ছিল না; আর থাকলেই বা কি? বাড়িতে ছিল সর্বসুদ্ধ একখানা বই—কিয়েফ শহরে সংকলিত 'সন্তদের জীবনী'।

ধনদৌলতে ভরা শ্বশুরের এই বাড়িতে কাতেরীনার পুরো পাঁচটি বছর কেটে গেল অসহ একঘেয়েমিতে—মমতা-হীন স্বামীর সঙ্গে সহবাস করে। কিন্তু আকছারই যা হয়—এক্ষেত্রেও কেউ সেদিকে ক্ষণতরেও ভ্রূক্ষেপ করলো না।

॥ ২ ॥

কাতেরীনার বিয়ের ছ'বছর পর যে-বাঁধের জলে ইস্‌মাইলফ্‌দের গম-পেষার কল চলতো সেটা ফেটে গেল। আর অদৃষ্ট যেন ওদের ভেংচি কাটবার জন্যই ঠিক ঐ সময়ে মিলের উপর পড়লো প্রচণ্ড কাজের চাপ। তখন ধরা পড়ল যে ভাঙনটা প্রকাণ্ড। জল পৌঁচেছে সক্কলের নিচের ধাপে। জোড়াতালি দিয়ে কোনো গতিকে ভাঙনটাকে মেরামত করার সর্ব প্রচেষ্টা হল নিষ্ফল। জিনোভিই আশপাশের চতুর্দিক থেকে আপন লোকজন গম-কলে জড়ো করে সেখানে ঠায় বসে রইল দিনের পর দিন, রাত্তিরের পর রাত্তির। বুড়ো বাপ ওদিকে শহরের ব্যবসা-কারবার সামলালে। আর কাতেরীনার কাটতে লাগলো আরো নিঃসঙ্গ একটানা জীবন। গোড়ার দিকে স্বামী না থাকায় তার জীবনের একঘেয়েমি যেন চূড়ান্তে পৌঁছল, পরে আস্তে আস্তে তার মনে হল, এটা তবু ভালো—এতে করে যেন সে খানিকটে মুক্তি পেল। স্বামীর দিকে তার হৃদয়ের টান কখনো ছিল না। স্বামী না থাকায় তার উপর হাম্বাই-তাম্বাই করার মত লোক অন্তত একজন তো কমলো।

একদিন কাতেরীনা ছাতের উপরের ছোট্ট ঘরে জানলার পাশে বসে ক্রমাগত হাই তুলছিল। বিশেষ কিছু নিয়ে যে চিন্তা করছিল তা নয়। করে করে আপন হাই তোলা নিয়ে নিজেই যেন নিজের কাছে লজ্জা পেল। ওদিকে, বাইরের আঙিনায় চমৎকার দিনটি ফুটে উঠেছে; কুসুম কুসুম গরম, রৌদ্রোজ্জ্বল, আনন্দময়। বাগানের সবুজ বেড়ার ভিতর দিয়ে কাতেরীনা দেখছিল, ছোট-ছোট চঞ্চল পাখীগুলো কি রকম এক ডাল থেকে আরেক ডালে ফুরুৎ ফুরুৎ

করে উড়ছিল।

কাতেরীনা ভাবছিল, 'আচ্ছা, আমি সমস্ত দিন ধরে টানা হাই তুলি কেন? কি জানি। তার চেয়ে বরঞ্চ বেরিয়ে আঙিনায় গিয়ে বসি কিংবা বাগানে বেড়িয়ে আসি।'

কিংখাপের একটি পুরনো জামা পিঠে-কাঁধে ফেলে কাতেরীনা বেরিয়ে পড়ল।

বাইরে উজ্জ্বল আলো আর বাতাস যেন নব জীবন দেবার জন্য বইছে। ওদিকে গুদামঘরের কাছে উঁচু চকে সবাই প্রাণ-ভরা খুশীতে ঠা ঠা করে হাসছিল।

'অত রগড় কিসের?' কাতেরীনা তার শ্বশুরের কেরানীদের জিজ্ঞেস করলো।

'অর্থাৎ, ব্যাপারটা হচ্ছে, মা-ঠাকরুণ,—একাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না—আমরা একটা জ্যান্ত শূয়োরী ওজন করছিলুম।'

'শূয়োরী? সে আবার কি?'

'ঐ যে আক্‌সীনিয়া শূয়োরীটা। বাচ্চা ভাস্‌সীলিইকে বিইয়ে গির্জের পরবে আমাদের নেমন্তন্ন করলো না, তাকে'—উত্তর দিল হাসিভরা বেপরোয়া গলায় একটি ছোকরা। বেশ সাহসী সুন্দর চেহারা। মিশকালো চুল, অল্প অল্প দাড়ি সবে গজাচ্ছে। সের্‌গেই তার নাম।

ঐ মুহূর্তেই দাঁড়ে ঝোলানো ময়দা মাপার ধামা থেকে উঁকি মেরে উঠলে রাঁধুনী আক্‌সীনিয়ার চর্বিতে ভর্তি চেহারা আর গোলাপী গাল।

'বদমাইশ ব্যাটারা, শয়তান ব্যাটারা'—রাঁধুনী তখন গালাগালি জুড়েছে। সে তখন ধামা ঝোলানোর ডাণ্ডাটা ধরে কোনো গতিকে পাল্লা থেকে বেরবার চেষ্টা করছে।

'খাবার আগে তার ওজন ছিল প্রায় চার মণ। এখন যদি ভাল করে খড় খায় তবে আমাদের সব বাটখারা ফুরিয়ে যাবে।'—সেই সুন্দর ছোকরা বুঝিয়ে বললে। তারপর পাল্লাটা উল্টে রাঁধুনীকে ফেলে দিলে এক কোণের কতকগুলো বস্তার উপর।

রাঁধুনী হাসতে হাসতে গালমন্দ করছিল আর কাপড়-চোপড় ঠিকঠাক করাতে মন দিল।

'আচ্ছা, ভাবছি আমার ওজন কত হবে।' হাসতে হাসতে দড়ি ধরে মালের দিকটায় উঠে কাতেরীনা শুধলো।

'এক শ' পনেরো পাউণ্ডের সামান্য কম।' বাটখারা ফেলে সের্‌গেই বললে, 'আশ্চর্য!'

'এতে আশ্চর্য হবার কি আছে ?'

'আপনার যে অতখানি ওজন হবে আমি মোটেই ভাবতে পারিনি, কাতেরীনা লভভ্না। আমার কি মনে হয় জানেন ? আপনাকে দু' হাতে তুলে সমস্ত দিন কারো বয়ে বেড়ানো উচিত। এবং সে তাতে করে ক্লান্ত তো হবেই না, বরঞ্চ শুধু আনন্দই পাবে।'

'হুঃ! আমি তো আর পাঁচজনেরই মত মাটির মানুষ। তুমিও ক্লান্ত হয়ে পড়বে।'—এ ধরনের কথাবার্তা বলতে কাতেরীনা অভ্যস্ত ছিল না বলে উত্তর দিতে গিয়ে তার মুখ একটুখানি রাঙা হয়ে গেল এবং হঠাৎ তার এক অদম্য ইচ্ছা হল অফুরন্ত আনন্দ আর সরস কথাবার্তা বলে তার হৃদয়-মন ভরে নেয়।

সের্গেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়ে উঠলো, 'কক্খনো না, ভগবান সাক্ষী, আমি আপনাকে আমাদের পুণ্যভূমি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাবো।'

সাদামাটা পাতলা-দুব্লা একজন চাষা ময়দা মাপতে মাপতে বললো, 'ও হিসেব চলে না, সোনা। আমাদের কার কত ওজন তা দিয়ে কি হয় ? তুমি কি মনে করো আমাদের মাংস সব-কিছু করে ? আমাদের মাংসের ওজনের কোনো দাম নেই, বুঝলে দোস্ত। আমাদের ভিতর যে শক্তি আছে সেই শক্তিই সব-কিছু করে—আমাদের মাংস কিছুই করে না!'

আবার কাতেরীনা নিজেকে সংযত না করতে পেরে বলে ফেলল, 'বাঃ! আমার বয়েস যখন কম ছিল তখন আমার গায়ে ছিল বেশ জোর ; সব পুরুষই যে আমার সঙ্গে তখন পেরে উঠতো সে-কথাটা আদপেই মনের কোণে ঠাঁই দিয়ো না।'

সুশ্রী ছোকরা অনুরোধ জানিয়ে বললে, 'খুব ভালো কথা। তাই যদি হয় তবে আপনার ছোট্ট হাতটি আমায় একটু ধরতে দিন তো!'

কাতেরীনা হকচকিয়ে গেল কিন্তু হাত তবু দিলে বাড়িয়ে।

'লাগছে, লাগছে—ওঃ! আংটিটা ছেড়ে দাও। ওটাতে লাগছে'—সের্গেই কাতেরীনার হাত চেপে ধরতেই সে চিৎকার করে উঠলো আর অন্য হাত দিয়ে দিলে তার বুকে ধাক্কা। সের্গেই সঙ্গে সঙ্গে তার কর্ত্রীর হাত ছেড়ে দিয়ে ধাক্কার চোটে তাল সামলাতে না পেরে পাশের দিকে দু'পা সরে গেল।

সেই ছোটখাটো সাদামাটা চাষা অবাক হয়ে বললে, 'হুম্! লাও ঠেলা। মেয়েদের কথা আর বলছো না যে ?'

সের্গেই মাথার চুল ঝাঁকুনি মেরে পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে বলে উঠলো, 'না, না। আমাদের ধরাধরিটা ঠিক মত হোক, তবে তো।'

কাতেরীনা বললে, 'তবে এসো।' ততক্ষণে তারও মনে ফুর্তির ছোঁয়াচ লেগেছে। দুটি সুডৌল কনুই উপরের দিকে তুলে ধরে বললে, 'তবে এসো।'

সের্‌গেই তার তরুণী কর্ত্রীকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরে তার সুঠাম বুক আপন লাল শার্টের উপর চেপে ধরলো। কাতেরীনা তার কাঁধ সরাবার পূর্বেই সের্‌গেই তাকে শূন্যে তুলে ধরে দু'হাতে উপরের দিকে উঠিয়ে নিয়ে আপন বুকে চেপে ধরেছে। তারপর আস্তে আস্তে নামিয়ে নিয়ে একটা উল্টো ধামার উপর বসিয়ে দিল।

আপন দেহের যে-শক্তি সম্বন্ধে কাতেরীনা দম্ভ করেছিল তার একরত্তিও সে কাজে লাগাতে পারেনি। এবারে সে লালে লাল হয়ে গিয়ে ধামায় বসে কিংখাপের জামাটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে গায়ে ঠিক মত বসালো। তারপর চুপচাপ গুদোমবাড়ি ছেড়ে রওয়ানা দিল। মেকদার মাফিক যতখানি দরকার ঠিক ততখানি দেমাকের সঙ্গে সের্‌গেই গলা সাফ করে মজুরদের উদ্দেশে হাঁক দিয়ে বললে, 'ওরে ও গাধার পাল! ময়দার স্রোত বন্ধ হতে দিস নি, হালের উপর এলিয়ে পড়ে আরাম করিস নি। যদি কিছু থাকে বাকি, মোরা তো যাবো না ফাঁকি।'

ভাবখানা করলে যে এক্ষুনি যা হয়ে গেল সে যেন তার কোনো পরোয়াই করে না।

কাতেরীনার পিছনে হাঁপাতে হাঁপাতে যেতে যেতে রাঁধুনী তাকে বললে, 'ব্যাটাচ্ছেলে সেরেজ্‌কা মেয়েছেলের পিছনে কি রকম ডালকুত্তার মতই না লাগতে জানে! ঐ চোরটার নেই কি? শরীরের গঠন, চেহারা, মুখের ছবি—সব-কিছুই আছে। দুনিয়ার যে কোনো মেয়েই হোক, ঐ বদমায়েশটা এক লহমায় তাকে মাৎ করে দেবে, তারপর তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঠেলে দেবে পাপের রাস্তায়। আর কাউকে ভালোবেসে তার প্রতি অনুগত থাকার কথা যদি তোলেন, তবে ও রকম হাড়েটক বেইমানের জুড়ি পাবেন না।'

আগে যেতে যেতে যুবতী কর্ত্রী শুধালো, 'আচ্ছা, কি বলছিলুম, ঐ যে··· তোমার ছেলেটি বেঁচে আছে তো?'

'বেঁচে আছে, মা ঠাকরুণ, দিব্য জলজ্যান্ত বেঁচে আছে—ওর আর ভাবনা কিসের? ওদের যখন কেউ চায় না তখনই তারা প্রাণটাকে আঁকড়ে ধরে আরো জোর দিয়ে।'

'বাচ্চাটাকে দিল কে?'

'কে জানে? ঘটে গেল—বলতে পারেন মোটামুটি। যেসা বন্ধুবান্ধব থাকলে

ওরকম ধারা ঘটে যায় বইকি।'

'ঐ ছোঁড়াটা আমাদের সঙ্গে কি অনেকদিন ধরে আছে?'

'কার কথা বলছেন? সের্‌গেই?'

'হ্যাঁ।'

'মাসখানেক হবে। আগে সে কন্‌চনফ্‌দের ওখানে কাজ করতো। সেখানকার মুনিব ওকে খেদিয়ে দেন।' তারপর গলা নামিয়ে আস্তে আস্তে বললো, 'লোকে বলে সেখানে সে খুদ কর্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করেছিল···জাহান্নমে যাক ব্যাটা। সাহসটা দেখুন তো।'

॥ ৩ ॥

মধুর মধুর গরম, দুধের মত সাদা প্রায়ান্ধকার নেমে এসেছে শহরের উপর। জলের বাঁধের মেরামতির কাজ থেকে জিনোভিই এখনো ফেরেনি। সে রাত্রে শ্বশুরও বাড়িতে নেই। তার এক প্রাচীন দিনের বন্ধুর জন্মদিনের পরবে বুড়ো সেখানে গেছে। বলে গেছে রাত্রেও বাড়িতে খাবে না; কেউ যেন তার জন্য অপেক্ষা না করে। আর কিছু করবার ছিল না বলে কাতেরীনা সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে শোবার ঘরের খোলা জানলার উপর হেলান দিয়ে বসে বাদামের খোসা ছাড়াচ্ছে। রান্নাঘরে মজুরদের খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর এখন তারা আঙ্গিনার উপর দিয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে আপন আপন শোবার জায়গায় যাচ্ছে। কেউ গোলাবাড়িতে, কেউ মরাইয়ে, কেউ মিঠে মিঠে গন্ধের খড়ের গাদার দিকে। রান্নাঘর থেকে বেরুল সের্‌গেই সর্বশেষে। সে প্রথম আঙ্গিনার চতুর্দিকে রোঁদ দিয়ে তদারকী করলে, কুকুরগুলোর চেন খুলে দিলে, শিষ দিতে দিতে কাতেরীনার জানলার নিচে দিয়ে যাবার সময় উপরের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে তাকে অভিবাদন জানালে।

জানলার পাশে বসে কাতেরীনা মৃদুকণ্ঠে প্রত্যভিবাদন জানালো—বিরাট আঙ্গিনা খানিকক্ষণের ভিতরই নির্জন প্রান্তরের মত নিঃশব্দ হয়ে গেল।

মিনিট দুই যেতে না যেতে কাতেরীনার চাবি-বন্ধ ঘরের বাইরে কে যেন ডাকলো, 'ঠাকরুণ!'

কাতেরীনা ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, 'কে?'

কেরানী উত্তর দিলে, 'দয়া করে ভয় পাবেন না। আমি। আমি সের্‌গেই।'

'কি চাই তোমার, সের্‌গেই?'

'আমি আপনার দয়া ভিক্ষা করতে এসেছি, কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না; একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনার অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে এসেছি—আমাকে কৃপা করে এক মিনিটের জন্য ভিতরে আসতে দিন।'

কাতেরীনা চাবি ঘুরিয়ে দোর খুলে দিয়ে সের্‌গেইকে ঘরে ঢুকতে দিল।

'কি ব্যাপার, কি চাই?' জানলার কাছে ফিরে গিয়ে কাতেরীনা শুধলো।

'আমি আপনার কাছে এলুম জিজ্ঞেস করতে, আপনার কাছে চটি বই-টই কিছু আছে? আমাকে যদি দয়া করে পড়তে দেন। এখানে কী দুর্বিষহ একঘেয়ে জীবন।'

কাতেরীনা উত্তর দিলে, 'আমার কাছে কোনো প্রকারেরই বই নেই, সের্‌গেই। আমি তো পড়ি নে।'

সের্‌গেই ফরিয়াদ করলে, 'কী একঘেয়ে জীবন!'

'তোমার জীবন একঘেয়ে হবে কেন?'

'অপরাধ যদি না নেন তবে নিবেদন করি, একঘেয়ে লাগবে না কেন? আমার এখন যৌবন কাল, অথচ আমরা এখানে আছি মঠের সন্ন্যাসীদের মত। আর ভবিষ্যতের দিকে তাকালে দেখতে পাই, এই নির্জনতাতেই আমাকে পচে হেজে খতম হতে হবে, যতদিন না আমার কফিন-বাক্সের * ডালায় পেরেক ঠোকা হয়। মাঝে মাঝে আমি যে নৈরাশ্যের কোন্ চরমে পৌঁছই তা আর কি করে বোঝাই!'

'বিয়ে করো না কেন?'

'বিয়ে করবো? বলা বড় সোজা! এখানে আমি বিয়ে করবো কাকে? আমি তো বিশেষ কিছু জমিয়ে উঠতে পারি নে, আর বড়লোকের মেয়ে আমাকে বিয়ে করতে যাবে কেন? ওদিকে গরীব বলেই আমাদের শ্রেণীর মেয়ে মাত্রই লেখা-পড়ার ধার ধারে না—সে তো আপনি জানেন, কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না। তারা কি কখনো সত্যি সত্যি বুঝতে পারে, প্রেম বলতে কি বোঝায়! শুধু তাই নয়, বড়লোকদের ভিতর এ-বিষয়ে কি ধারণা সেটাও

---

* বাঙ্গালী মুসলমান 'কফন' বা 'কাফন' বলতে শবাচ্ছাদনের বস্ত্র বোঝে। (ইংরিজি 'শ্রাউড') শব্দটি ফার্সীর মাধ্যমে আরবী থেকে এসেছে। ইয়োরোপীয় ভাষায় 'কফিন' বলতে যে কাঠের বা পাথরের বাক্সে মৃতদেহ রেখে গোর দেওয়া হয় সেই বাক্স বোঝায়। উভয় শব্দই খুব সম্ভব গ্রীক 'কফিনস' থেকে এসেছে। ইংরিজি 'কফার'—'পেটিকা'—এই শব্দ থেকেই এসেছে।—অনুবাদক।

একবার চিন্তা করুন তো। এই ধরুন আপনার কথা; আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, সামান্যতম স্পর্শকাতরতা যার হৃদয়ে আছে তার কাছে আপনি সান্ত্বনার চিরন্তন উৎস। অথচ দেখুন দেখিনি তারা আপনাকে নিয়ে কি করছে? ময়না পাখীটির মত খাঁচায় পুরে রেখেছে।'

কাতেরীনার মুখ থেকে ফস্কে গেল, 'কথাটা সত্যি; আমি নিঃসঙ্গ।'

'তাই একঘেয়ে লাগবে না তো কী লাগবে মাদাম্—যে-ভাবে আপনি জীবন যাপন করছেন? আপনার অবস্থায় অন্যেরা যা করে থাকে, আপনার যদি সে রকম 'উপরি' কেউ থাকতোও, তবুই বা কি হত? তার সঙ্গে দেখা করাও তো আপনার পক্ষে অসম্ভব।'

'এই! তুমি···একটু সীমা পেরিয়ে যাচ্ছো। আমার একটি বাচ্চা থাকলেই, আমার তো মনে হয়, আমি সুখী হতুম।'

'কিন্তু একটু চিন্তা করুন; আমাকে যদি অনুমতি দেন তবে বলি, বাচ্চা জন্মাবার জন্য তার পিছনে তো কোনো-কিছু-একটা চাই—বাচ্চা তো আর আকাশ থেকে পড়ে না। আপনি কি মনে করেন আমি জানি নে আমাদের ব্যবসায়ীদের বউ-ঝিরা কি ভাবে জীবন কাটায়—এত বছর আমার মুনিবদের মাঝখানে বাস করেও? আমাদের একটা গীত আছে, 'আপন হৃদয়ে প্রেম না থাকলে, জীবন সে তো শুধু বিষণ্ণ দুরাশা!' আর সেই দুরাশা, সেই কামনা—আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি, কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না, আমার হৃদয় এমনই বেদনায় ভরে দিয়েছে যে, ইচ্ছে করে ইস্পাতের ছুরি দিয়ে হৃদয়টাকে বুকের মাঝখান থেকে কেটে বের করে আপনার কচি দুটি পায়ের উপর রাখি। আমি তাহলেই শান্ত হব—শতগুণ শান্তি ফিরে পাবো।'

'তোমার হৃদয় সম্বন্ধে কি যা-তা সব তুমি আমাকে বলছো? তার সঙ্গে আমার তো কোনো সম্পর্ক নেই। তুমি এইবারে আস্তে আস্তে রওয়ানা দাও।'

'না, দয়া করুন, ঠাকরুণ।' সের্‌গেই ততক্ষণে কাতেরীনার দিকে এক পা এগিয়ে এসেছে, তার সমস্ত শরীর তখন কেঁপে কেঁপে দুলে দুলে উঠছে। 'আমি জানি, হৃদয় দিয়ে অনুভব করছি, স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আপনার জীবনও এ-পৃথিবীতে আমার জীবনের মতই অত সহজ সরল ভাবে বয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু এখন শুধুমাত্র একটি কথা—' এ-কথাগুলো সে বলে গেল এক নিশ্বাসে—'এখন, এই মুহূর্তে, সব-কিছু আপনার হাতে, আপনার তাঁবেতে।'

'কি চাও তুমি? এ-সব কি হচ্ছে? এখানে আমার কাছে তুমি এসেছ কেন? আমি এখ্‌খুনি জানলা দিয়ে লাফ দেব'—কাতেরীনা যখন এ-কথাগুলো

বলছিল তখন তার মনে হচ্ছিল, কেমন যেন একটা অবর্ণনীয় ভয় তাকে অসহ্য বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরেছে ; সে তখনো জানলার চৌকাঠ আঁকড়ে ধরে আছে। 'ওগো, আমার তুলনাহীনা, ও আমার জীবনসমা! জানলা দিয়ে লাফ দেবার কি প্রয়োজন ?'—সহজ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সের্‌গেই এ-কথাগুলো কাতেরীনার কানে কানে মৃদুস্বরে বললে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে জানলা থেকে টেনে এনে গভীর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলো।

'ও, ও! আমাকে ছাড়'—মৃদু কাতর কণ্ঠে কাতেরীনা বললে ; সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সের্‌গেইর নিবিড় চুম্বন বর্ষণে তার শক্তি যেন ক্রমেই লোপ পাচ্ছিল। আপন অনিচ্ছায় তার দেহ কিন্তু সের্‌গেইয়ের দেহের সঙ্গে মিলে যাচ্ছিল।

সের্‌গেই তার কর্ত্রীকে শূন্যে তুলে নিয়ে দুই বাহুতে করে—যেন একটি ছোট্ট বাচ্চাকে তুলে ধরেছে—ঘরের অন্ধকার কোণে নিয়ে গেল।

সমস্ত ঘরে নীরবতা—শুধু শিয়রের খাড়া তক্তাতে ঝোলানো কাতেরীনার স্বামীর পোশাকী ট্যাঁকঘড়িটি টিকটিক করে যাচ্ছে ; কিন্তু সে আর কি বাধা দেবে!

'যাও।' আধঘণ্টা পরে কাতেরীনা সের্‌গেইয়ের দিকে না তাকিয়েই আলু-থালু চুল ছোট্ট একটি আয়নার সামনে ঠিক করতে করতে বললো।

'এখন আর আমি যাবো কেন ? বিশ্ব-সংসার খুঁজলেও তো এখন আর কোনো কারণ পাওয়া যাবে না।' সের্‌গেইয়ের কণ্ঠে এখন উল্লাসের স্বর।

'শ্বশুরমশাই বাড়ির সদর দরজা বন্ধ করে দেবেন যে।'

'কি বললে, আমার পরাণের মণি ? এতদিন ধরে তুমি কি শুধু তাদেরই নিয়ে নাড়াচাড়া করেছ যারা রমণীর কাছে পৌঁছতে হলে দরজা ভিন্ন অন্য কোনো পথ জানে না ? আমার ভিন্ন ব্যবস্থা। তোমার কাছে আসতে হলে, তোমার কাছ থেকে যেতে হলে আমার জন্য বহু দরজা খোলা রয়েছে।' ব্যালকনির খুঁটি দেখিয়ে উত্তর দিলে তরুণ।

॥ ৪ ॥

জিনোভিই সাত দিন হল বাড়ি ফেরে নি, আর এই সমস্ত সপ্তাহ ধরে তার স্ত্রী প্রতিটি রাত্রি সের্‌গেইয়ের সঙ্গে কাটিয়েছে সরস রভসে—শুভ্র প্রভাতের প্রথম আলোর প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত।

এই সাত রাত ধরে জিনোভিই রব্রিসিচের বেড্‌রুমে শ্বশুরমশাইয়ের ভাঁড়ার

থেকে নিয়ে আসা প্রচুর ওয়াইন পান করা হল, প্রচুর মিষ্ট-মিষ্টান্ন খাওয়া হল, তরুণী গৃহকর্ত্রীর মধুভরা ঠোঁট থেকে প্রচুর চুম্বন চুমুকে চুমুকে তোলা হল, তুলতুলে বালিশের উপর ঘন কৃষ্ণ অলকগুচ্ছ নিয়ে খেলাভরে প্রচুর আদর-সোহাগ করা হল। কিন্তু হায়, কোনো পথই আদ্যন্ত মসৃণ নয়—মাঝে মাঝে হোঁচট ঠোক্করও খেতে হয়।

বরিস তিমোতেইচের চোখে সে-রাত্রে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। বুড়ো রাত্রির লম্বা রঙীন ঝোল্লা পরে এ-ঘর ও-ঘর করে বেড়াচ্ছিল; জানলার কাছে এসে বাইরের দিকে তাকালো, তার পর আরেকটা জানলার কাছে এসে দেখে, লাল শার্ট পরা সেই খাপসুরৎ ছোকরা সের্‌গেই তার পুত্রবধূর জানলার একটা খুঁটি বেয়ে অতিশয় নীরব নিঃশব্দে নেমে যাচ্ছে। বরিস তিমোতেইচ্ ঝড়ের বেগে বেরিয়ে পড়ে চেপে ধরলো রোমিয়ো নটবরের পা দু'খানা। সে তখন সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রথমটায় চেয়েছিল বুড়োকে একখানা খাঁটি বিরাশী সিক্কা লাগায়—আকস্মিক উৎপাতে তারও মেজাজটা গিয়েছিল বিগড়ে—কিন্তু সেটা আর লাগালে না, ভাবলো, তাহলে একটা হট্টগোল আরম্ভ হয়ে যাবে।

বরিস তিমোতেইচ্ জিজ্ঞেস করলে, 'বল্ ব্যাটা চোর, কোথায় গিয়েছিলি?'

সের্‌গেই উত্তর দিলে, 'লাও! শুধোচ্ছে, কোথায় গিয়েছিলুম আমি! যেখানেই গিয়ে থাকি নে কেন, সেখানে আমি আর এখন নেই! হল, বরিস তিমোতেইচ্ মহাশয়, প্রিয়বরেষু!'

'আমার ছেলের বউয়ের ঘরে তুই রাত কাটিয়েছিস?'

'ঐ কথাটাই যদি জিজ্ঞেস করলেন কর্তা-ঠাকুর, তাহলে আবার বলি, আমি জানি, আমি রাত্তিরটা কোথায় কাটিয়েছি; কিন্তু এইবেলা তোমাকে একটি খাঁটি তত্ত্বকথা বলছি আমি, বরিস তিমোতেইচ্; যা হয়ে গিয়েছে সেটা তুমি আর কিছুতেই ফিরিয়ে আনতে পারবে না। খামোখা কেন তোমাদের শিষ্ট ব্যবসায়ী পরিবারের উপর এখন ফালতো কেলেঙ্কারি টেনে আনবে—অন্তত সেটা তো ঠেকাতে পারো। এখন আমাকে সরল ভাষায় বলো, আমাকে কি করতে হবে। তুমি কি দান পেলে সন্তুষ্ট হবে?'

'তোকে আমি পাঁচ শ' ঘা চাবুক কশাবো, ব্যাটা পিচেশ।'

'দোষ আমারই—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক!' সাহসী নাগর স্বীকৃত হল। 'এবারে বলো তোমার সঙ্গে কোথায় যেতে হবে; প্রাণ যা চায় সেই আনন্দ করে নাও—আমার রক্ত চেটে নাও।'

বরিস তখন সের্‌গেইকে শানে তৈরী তার ছোট্ট একটি গুদোম ঘরে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক চাবকাতে আরম্ভ করলো। যখন বুড়োর আর চাবুক মারার মত শক্তি একরত্তিও রইল না তখনই থামলো। সের্‌গেইয়ের গলা থেকে কিন্তু একবারের তরেও এতটুকু আর্তরব বেরোয়নি, তবে, হ্যাঁ, শার্টের আস্তিনে সে যে দাঁত কিড়িমিড়ি করে কামড়ে ধরেছিল তার অর্ধেকখানা শেষ পর্যন্ত সে চিবিয়ে কুটি কুটি করে ফেলেছিল।

সের্‌গেই মাটিতে পড়ে রইল। চাবুকে চাবুকে তার পিঠ তখন কামারের আগুনে পোড়া কড়াইয়ের মত লাল হয়ে গেছে। সেটা শুকোবার সময় দিয়ে বুড়ো তার পাশে এক ঘটি জল রেখে গুদোমঘরের দোরে বিরাট একটা তালায় চাবি মারলে। তারপর ছেলেকে আনবার জন্য লোক পাঠালে।

কিন্তু এই আজকের দিনেও* রাশার বড় রাস্তা ছাড়া অন্য রাস্তায় ছ' মাইল পথ আসা যাওয়া সাততাড়াতাড়িতে হয়ে ওঠে না, ওদিকে আবার কাতেরীনা যে সময়টুকু না হবার নয় তার বেশী একটি মাত্র ঘণ্টাও সের্‌গেই বিহনে কাটাতে পারে না। তার সুপ্ত প্রবৃত্তি তখন অকস্মাৎ পরিপূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হয়ে উঠেছে এবং ফলে সে এমনই দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে উঠেছে যে, তখন তার পথ রোধ করে কার সাধ্য! আতিপাতি খুঁজে সে বের করে ফেলেছে সের্‌গেই কোথায়। সেখানে লোহার দরজার ভিতর দিয়ে সের্‌গেইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সবকিছু ঠিকঠাক করে ছুটলো চাবির সন্ধানে।

শ্বশুরের কাছে গিয়ে মিনতি জানালে, 'সের্‌গেইকে ছেড়ে দাও, বাবা, লক্ষ্মীটি।'

বুড়োর মুখের রঙ স্রেফ সবুজ হয়ে গেল। এতখানি বেহায়ামির দুঃসাহস সে তার পাপিষ্ঠা পুত্রবধূর কাছে প্রত্যাশা করেনি—কারণ, পাপিষ্ঠা হোক আর বেহায়াই হোক, এতদিন সে ছিল বড় বাধ্য মেয়ে।

'এ কি আরম্ভ করলি তুই, তুই অমুক-তমুক?'—বুড়ো অশ্লীল ভাষায় তার বেহায়াপনা নিয়ে কটুকাটব্য আরম্ভ করলো।

'ওকে যেতে দাও, বাবা। আমি আমার বিবেক সাক্ষী রেখে শপথ করছি আমরা এখনো কোন পাপাচার করি নি।'

'পাপাচার করে নি! ওঃ! বলে কি?'—বুড়ো যেন আর কিছু না করতে পেরে শুধু দাঁত কিড়িমিড়ি দিতে লাগলো। 'এ ক' রাত্তির ধরে তোমরা উপরে

---

* ১৮৬৫ খৃঃ। —অনুবাদক।

কি করে সময় কাটাচ্ছিলে? দুজনাতে মিলে তোমার স্বামীর বালিশের ফেঁসো ফুলিয়ে ফালিয়ে তার জন্য জুৎসই করে রাখছিলে।'—বুড়ো ব্যঙ্গ করে উঠলো।

কাতেরীনা কিন্তু নাছোড়বান্দা; সেই এক বুলি ক্রমাগত বলে যেতে লাগলো, ওকে ছেড়ে দাও,—ফের আবার—ওকে ছেড়ে দাও।

বুড়ো বরিস বললে, 'এই যদি তোর বাসনা হয় তবে শুনে নে; তোর স্বামী ফেরার পর তোকে বাইরের ঐ আস্তাবলে নিয়ে গিয়ে আমরা দুজনাতে আপন হাতে চাবুক মারবো—সতী সাধ্বী রমণী কি না তুই! আর ঐ ব্যাটাকে নিয়ে কি করা হবে শুনবি—ইতর বদমাইশটাকে কালই পাঠাবো জেলে!'

এই ছিল বরিস তিমোতেইচের সিদ্ধান্ত; শুধু এইটুকু বলার আছে যে সে-সিদ্ধান্ত কখনো কর্মে রূপান্তরিত হল না।

॥ ৫ ॥

সেই রাত্রে বুড়ো বরিস ব্যাঙের ছাতা আর গমের পরিজ্ খেয়েছিল। খাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তার বুক-জ্বালা আরম্ভ হল; হঠাৎ তলপেটে তার অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হতে লাগল। খানিকক্ষণ পর বমির চোটে যেন তার নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসতে লাগল এবং ভোরের দিকে সে ভবলীলা সংবরণ করলো; হুবহু যে-রকম গুদোমবাড়ির ইঁদুরগুলো মারা যায়। এদেরই 'উপকারার্থে' কাতেরীনা আপন হাতে এক রকমের মারাত্মক সাদা গুঁড়ো মাখিয়ে খাবার তৈরি করতো—এ গুঁড়োটা কাতেরীনার হেপাজতেই থাকতো।

কাতেরীনা তার আপন সের্‌গেইকে বুড়োর গুদোমঘর থেকে মুক্ত করে নিয়ে সকলের চোখের সামনে, কণামাত্র লজ্জা-শরম না মেনে, শ্বশুরের চাবকানো থেকে সেরে ওঠার জন্য তাকে তার স্বামীর বিছানায় আরাম করে শুইয়ে দিল। ওদিকে কালবিলম্ব না করে শ্বশুরকে খৃষ্টধর্মের আচার-অনুষ্ঠান সহ গোর দেওয়া হল। অবশ্য লক্ষণীয় বলে মনে হতে পারে, কারো মনে কোনো সন্দেহের উদয় হয়নি; বরিস তিমোতেইচ্ যদি মরে গিয়ে থাকে তবে, হ্যাঁ, সে নিশ্চয়ই মারা গেছে ব্যাঙের ছাতা খেয়ে—আর, ওরকম কত লোক তো ব্যাঙের ছাতা খেয়ে আক-ছারই মারা যায়। ছেলের জন্য অপেক্ষা না করেই বুড়ো বরিসকে সাত-তাড়াতাড়ি গোর দেওয়া হয়েছিল, কারণ বছরের ঐ সময়টায় ভাপসা গরম পড়ে* আর যে লোকটা খবর নিয়ে গিয়েছিল সে জিনোভিই বরিসিচকে 'মিলে'

* ফলে মৃতদেহ খুব তাড়াতাড়ি পচতে আরম্ভ করে। —অনুবাদক।

পায়নি। ষাট মাইল আরো দূরে সে সস্তা কিছু জঙ্গলা জমির খবর পায় এবং সেটা দেখতে সে ঐ দিকে চলে গিয়েছিল। যাবার সময় সে আবার কাউকে পরিষ্কার করে বলে যায়নি ঠিক কোন্ জায়গায় যাচ্ছে।

সব ব্যবস্থা করে নেবার পর কাতেরীনা একদম বে-লাগাম হয়ে গেল। ভীরু সে কোনো কালেই ছিল না, কিন্তু এখন তার মনের ভিতর কি খেলছে তার কোনো পাত্তাই কেউ পেল না। পুরো পাক্কা হিম্মৎভরে সে চলা-ফেরা করতে লাগলো, বাড়ির সর্বপ্রকার কাজকর্মে ঠিকমত তদারকি করলো এবং সের্গেইকে এক লহমার তরে চোখের আড়াল হতে দিত না। বাড়িতে যারা কাজ করতো তারা সবাই এসব দেখে তাজ্জব ; কিন্তু কাতেরীনা দরাজ হাত দিয়ে প্রত্যেককে বশীভূত করার তত্ত্বটি বিলক্ষণ জানতো, সর্ববিস্ময় তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

যে যার আপন মনে অনুমান করলে, 'কর্ত্রীঠাকুরাণী আর সের্গেইয়ের ভিতর চলছে বেলেল্লাপনা—ঐ হল গিয়ে মোদ্দা কথা। এখন তো ওটা তারই শিরঃপীড়া, আমাদের কি, আর জবাবদিহি তো করতে হবে একলা তাকেই।'

ইতিমধ্যে সের্গেই তার স্বাস্থ্য, তার নমনীয় মাধুর্য পুনরায় ফিরে পেয়েছে আর বীরদের সেরা বীরের মত আবার কাতেরীনার উপরে শিকরে পাখীর মত চক্কর খেতে শুরু করেছে। আবার আরম্ভ হয়েছে তাদের আনন্দময় দিন-যামিনী! কিন্তু কালবেগ শুধু ওদের দুজনার তরেই তো আর এগিয়ে যাচ্ছিল না। ওদিকে দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর স্বামী হিসেবে বিড়ম্বিত জিনোভিই বরিসিচ্ দ্রুতবেগে আপন গৃহমুখে ধাবিত হয়েছে।

॥ ৬ ॥

আহারাদি শেষ করা হয়েছে। বাইরে তখনও দুর্দান্ত গরম আর চটপট যেদিক-খুশি-সেদিকে-মোড়-নিতে ওস্তাদ মাছিগুলোর উৎপাত অসহ্য হয়ে উঠেছে। কাতেরীনা তার শোবার ঘরের জানলার খড়খড়িগুলো বন্ধ করে তার উপরে ভিতরের দিকে একখানা ফ্ল্যানেলের পর্দা ঝুলিয়ে দিয়ে বণিক সম্প্রদায়ের সমাদৃত উঁচু খাটে সের্গেইকে নিয়ে বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়েছে। কাতেরীনা নিদ্রা জাগরণে আসা যাওয়া করছে, কিন্তু নিদ্রাই হোক আর জাগরণই হোক, তার মনে হচ্ছিল যেন তার মুখ ঘামে ভেসে যাচ্ছে আর প্রত্যেকটি নিশ্বাস অত্যন্ত গরম আর অতিশয় কষ্টের সঙ্গে ভিতরে যাচ্ছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছিল ঘুম থেকে

উঠে বাইরের বাগানে বসে চা খাবার বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আপ্রাণ শত চেষ্টাতেও সে কিছুতেই উঠে বসতে পারছিল না। শেষটায় রাঁধুনী এসে দরজায় টোকা দিল।

প্রচণ্ড পরিশ্রম করে সে পাশ ফিরল, তারপর একটা হুলো বেড়ালকে আদর করতে লাগল। কারণ ইতিমধ্যে একটা খাসা সুন্দর, পুরোবাড়ন্ত, ...র মত মোটাসোটা, খাজনা উশুলের পেয়াদার মত বিরাট একজোড়া গোঁফওলা বাদামী রঙের বেড়াল এসে তার আর সের্‌গেইয়ের মাঝখানে গা ঘষতে আরম্ভ করেছে। কাতেরীনা তার ঘন লোমের ভিতর আঙ্গুল চালিয়ে তাকে আদর করতে লাগল আর বেড়ালটাও তার ভোঁতা মুখ আর বোঁচা নাক দিয়ে কাতেরীনার কঠোর-কোমল বুকে চাপ দিচ্ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সোহাগের ঘর্‌র্ ঘর্‌র্ শব্দ ছেড়ে যেন গান গাইছিল—কাতেরীনার প্রেম নিয়ে, অতি কোমল মোলায়েম সুরে। কাতেরীনা অবাক হয়ে ভাবছিল, 'এই হোঁৎকা মোটকা বেড়ালটা ঘরে ঢুকলই বা কি করে আর এলই বা কেন?' কাতেরীনা আবার আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল, 'আমি খানিকটে সর জানলার চৌকাঠের উপর রেখেছিলুম; এই পাজী হুলোটাকে যদি তাড়া লাগিয়ে খেদিয়ে না দিই তবে সে বেবাক সর চেটে মেরে দেবে।' বেড়ালটাকে পাকড়ে ধরে বাইরে ফেলে দেবার সে যতই চেষ্টা করতে লাগল ততই সে যেন ঠিক কুয়াশার মত তার আঙ্গুলের ভিতর দিয়ে বার বার গলে যেতে লাগলো। বোবায় ধরা দুঃস্বপ্নের ভিতরও কাতেরীনা মনে মনে তর্ক করতে লাগল, 'তা সে যাক্‌গে, কিন্তু এই হুলো বেড়ালটা এখানে আদৌ এল কোত্থেকে? আমাদের শোবার ঘরে তো কস্মিনকালেও কোনো হুলো বেড়াল ছিল না; তবু, দেখো, কি রকম একটা ইয়া লাশ এখানে ঢুকে পড়েছে!' আবার কাতেরীনা তাকে পাকড়াবার চেষ্টা করলো, আবার বেড়ালটা হাওয়া হয়ে গেল। মনে তার ধোঁকা লাগলো, 'বা রে! এটা তবে কি? দেখি ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে—এটা কি আদপেই হুলো বেড়াল না কি?' হঠাৎ এক দারুণ ভয়ের বিভীষিকা যেন তার সর্বাঙ্গ চেপে ধরে কুল্লে নিদ্রা আর নিদ্রালু ভাব খেদিয়ে দিল। কাতেরীনা ঘরের চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখে বেড়ালটার নামগন্ধও নেই। শুধু তার সুদর্শন সের্‌গেই পাশে শুয়ে তার বুকের মাঝখানে আপন গরম মুখটি গুঁজে দিয়েছে।

কাতেরীনা বিছানায় উঠে বসল; চুম্বনে চুম্বনে সে সের্‌গেইকে আচ্ছন্ন করে দিল। তার আদর সোহাগ যেন শেষ হতেই চায় না। তারপর হাঁসের বুকের নরম পালকের আলুথালু বিছানাটাকে ছিমছাম করে দিয়ে বাগানে চা খেতে চলে

গেল। সূর্য তখন অস্তাচলে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে আর উষ্ণগর্ভা পৃথিবীর উপরে নেমে আসছে অপূর্বসুন্দর, সম্মোহনী সন্ধ্যা।

ফুলে ফুলে ঢাকা আপেল গাছের তলায় রাগ্-এর উপর বসলো কাতেরীনা চা খেতে। আক্সীনিয়াকে বললে, 'বড্ড বেশি ঘুমোতে ঘুমোতে অবেলা হয়ে গেল।' তারপর বাসন পোছার কাপড় দিয়ে একটা পিরিচ পুছতে পুছতে রাঁধুনীকে শুধলো, 'আচ্ছা, বল তো, এসবের অর্থ কি আক্সীনিয়া, সোনা?'

'কি? কিসের কি অর্থ, মা?'

'ওটা কিন্তু নিছক স্বপ্ন ছিল না। কোথাকার কোন্ এক হুলো বেড়াল বার বার শুধু আমার গা বেয়ে উঠছিল। আর-পাঁচটা বেড়ালের মত হুবহু জলজ্যান্ত বেড়াল। এর অর্থ কি?'

'এসব আপনি কি বলছেন?'

'সত্যি বলছি, একটা বেড়াল আমার গা বেয়ে উঠছিল।'

কি ভাবে বেড়ালটা তার গা বেয়ে উঠছিল সে-সব কথা তখন কাতেরীনা তাকে বললো।

'আপনি আবার ওটাকে আদর করতে গেলেন কেন?'

'তা, বাপু, আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? আমি নিজেই জানি নে, ওটাকে আদর করলুম কেন?'

'সত্যি সত্যি, বড্ডই তাজ্জব ব্যাপার এটা!'

'আমার নিজেরই বিস্ময়ের সীমা নেই।'

'এটাতে নিশ্চয়ই বোঝাচ্ছে কেউ না কেউ আপনার শত্রুতা না করে ছাড়বে না। কিংবা ঐ ধরনেরই কিছু একটা হবে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু ঠিক কি?'

'ঠিক ঠিক হুবহু কি হবে সেটা কেউই আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবে না,—ঠিক ঠিক, হুবহু কেউই পারবে না, সোনা মা, শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে, একটা না একটা কিছু ঘটবেই ঘটবে।'

কাতেরীনা বললে, 'আমি ঘুমে বার বার শুক্লপক্ষের ফালি চাঁদ দেখছিলুম, আর সেই বেড়ালটা।'

'ফালি চাঁদ?—তার অর্থ বাচ্চা হবে।'

কাতেরীনার মুখ লাল হয়ে উঠলো।

'সের্গেইকে কি তোমার কাছে এখানে নিচে পাঠিয়ে দেব, মা-মণি?'—কলে-কৌশলে ইঙ্গিত দিলে আক্সীনিয়া। আসলে কাতেরীনার বিশ্বাসের পাত্রী

হওয়ার জন্যে তার প্রাণ যেন বেরিয়ে আসছিল।

'হ্যাঁ, সেও তো বেশ কথা। ওকে গিয়ে পাঠিয়ে দাও। আমি তাকে চা দেব'খন।'

'আমিও তাই বলি—এখানে পাঠিয়ে দি।' আকৃসীনিয়াই প্রস্তাবটার নিষ্পত্তি করে দিল। তারপর পাতিহাঁসের মত হেলেদুলে বাগানের গেটের দিকে চললো।

কাতেরীনা সের্‌গেইকেও বেড়ালটার কথা বললে।

সের্‌গেই বললে, 'কিছু না, স্রেফ দিবাস্বপ্ন।'

'কিন্তু সেরেজা, আমি এর আগে এরকম দিবাস্বপ্ন কখনো দেখি নি কেন, সেইটে বুঝিয়ে বলো।'

'আগে কখনো হয় নি, এই প্রথম হল, এ রকম জিনিস তো নিত্যি নিত্যি হচ্ছে। এমন দিনও ছিল যখন আমি শুধু তোমাকে আড়চোখে একটুখানি দেখে নেবার সাহস করতে পারতুম না, আর তোমার জন্য আপন দুঃখে গুমরে মরতুম। আর এখন দেখো, সব-কিছু বদলে গিয়েছে। এই যে তোমার শ্বেতশুভ্র দেহ—এর সমস্তটি এখন আমার।'

সের্‌গেই কাতেরীনাকে বুকে ধরে আলিঙ্গন করলো, তারপর শূন্যে তুলে ঘুরিয়ে নিয়ে কৌতুকভরে তাকে নরম কম্বলের উপর ফেলে দিল।

কাতেরীনা বললে, 'ওগো, আমার মাথা ঘুরছে। সেরেজা, এই দিকে এস। আমার পাশে এসে বসো।'—সের্‌গেইকে ডাক দিয়ে কাতেরীনা অলস রভসার মৌন ইঙ্গিত দিয়ে শুয়ে পড়ল।

শুভ্র কুসুমদামে আচ্ছাদিত আপেল গাছের তলায় বেপরোয়া রসের নাগর হামা দিয়ে এসে কাতেরীনার পায়ের কাছে বসলো।

'আমাকে পাবার জন্য তুমি কাতর হয়েছিলে,—না? সেরেজা?'

'তুমি যদি শুধু জানতে কতখানি কাতর হয়েছিলুম!'

'সেটা কি রকম ছিল, আমাকে বুঝিয়ে বলো।'

'সে আমি কি করে বুঝিয়ে বলবো? অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার মর্মবেদনায় তিলে তিলে দগ্ধ হওয়া কি কেউ কখনো বোঝাতে পারে? আমার ছিল সেই।'

'তা হলে, সেরেজা, তুমি যে নিজেকে তিলে তিলে মেরে ফেলছিলে সেটা আমি অনুভব করলুম না কেন? লোকে তো বলে সেটা নাকি অনুভব করা যায়।'

সের্‌গেই নীরব থেকে এ প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল।

'তা হলে তুমি হরদম গান গাইছিলে কি করে, যদি আমার জন্য এতখানি তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে মরছিলে? কিছু ভয় নেই! আমি সব জানি। তুমি যে উঁচু বারান্দায় গান গাইতে সে তো আমি শুনতে পেতুম।'—কাতেরীনা সের্‌গেইকে আদর করতে করতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুধিয়ে যেতে লাগলো।

'গান গেয়েছিলুম তো কি হয়েছিল? একটা মশা জীবনভর গান গায়—সেটা কি ফুর্তির তোড়ে?'—বিরস কণ্ঠে সের্‌গেই উত্তর দিলে।

খানিকক্ষণের জন্য দুজনাই চুপচাপ। সের্‌গেইয়ের পূর্বরাগকীর্তন শুনে কাতেরীনার হৃদয় পরিপূর্ণ ভাবাবেশে বিহ্বল হয়ে গিয়েছে। কাতেরীনার বাসনা আরো কথা বলে কিন্তু সের্‌গেই ভুরু কুঁচকে কেমন যেন মৌনব্রত অবলম্বন করেছে।

ফুলে ফুলে ভরা আপেল গাছের শাখা-প্রশাখার পর্দার ভিতর দিয়ে স্বচ্ছ নীলাকাশ আর শান্ত প্রশান্ত পূর্ণচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে কাতেরীনা আবেশভরা কণ্ঠে বলে উঠলো, 'দেখো দেখো, সের্‌গেজা,—এ যে স্বর্গপুরী, স্বর্গপুরীতে যেন মেলা বসেছে।'

কাতেরীনা শুয়েছিল চিৎ হয়ে—চাঁদের আলো আপেল গাছের ফুল আর পাতার ভিতর দিয়ে এসে কাতেরীনার মুখ আর দেহের উপর বিচিত্র শুভ্র আলপনার কম্প্রমান শিহরণ জাগাচ্ছিল; বাতাস স্তব্ধ, শুধু সামান্যতম ক্ষীণ মলয় অর্ধসুপ্ত পত্রাবলীতে ঈষৎ কম্পন জাগিয়ে পূর্ণকুসুমিত তরু আর নব উদ্গত তৃণের মৃদু সৌরভ দূরদূরান্তে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বাতাস যেন অলসাবেশে পরিপূর্ণ—যেন সে বাতাস এনে দেয় সর্ব কর্মে অরুচি, আত্মার অসংযম, আর মনের ভিতর দুর্বোধ যত কামনারাজি।

কাতেরীনা কোনো সাড়া না পেয়ে আবার চুপ করে গেল, আর তাকিয়ে রইল ফিকে গোলাপি আপেলফুলগুচ্ছের ভিতর দিয়ে আকাশের দিকে। সের্‌গেইও কথা বলছিল না কিন্তু তার চিত্তকে আকাশ বিমোহিত করেনি। আপন হাঁটু দুটো দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে সে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল আপন বুট-জোড়ার দিকে।

আহা, যেন স্বর্ণজ্যোতি দিয়ে তৈরি রাত্রিটি। শান্ত, লঘু, সৌরভভরা আর প্রাণদায়িনী ঈষৎ উষ্ণতা! দূরে বহুদূরে, উপত্যকার পিছনে, বাগানের বহু দূরে কে যেন ধরেছে সুরেলা গীত; ঘন চেরী-তরু-ভরা বাগানের বেড়ার কাছে গেয়ে উঠলো একটি পাপিয়া শিহরিত উচ্চকণ্ঠে; উঁচু খুঁটিতে ঝোলানো কুয়েইল পাখীটি উত্তেজিত কণ্ঠে গেয়ে চলেছে সুরের প্রলাপ; ওদিকে আস্তাবলের

দেয়ালের পিছনে বিরাট একটা অশ্ব তন্দ্রালু হ্রেষারব তুললো, আর বাগানের বাইরে গোচারণ মাঠের উপর দিয়ে একপাল কুকুর দ্রুতবেগে ছুটে চলে গিয়ে অর্ধভগ্ন প্রাচীন হুনের ভাণ্ডারের কালো আবছায়ায় বিলীন হয়ে গেল।

কনুইয়ের উপর ভর করে কাতেরীনা একটুখানি উঠে বাগানের লম্বা লম্বা ঘাসের দিকে তাকালো—উজ্জ্বল চন্দ্রালোক ঘাসের উপর পড়ে ঝিলিমিলি লাগিয়েছে, তারই আভা গাছগুলোর ফুলে পাতায় নেচে নেচে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। যেন কল্পলোকের অবর্ণনীয়, অত্যুজ্জ্বল লক্ষ লক্ষ চন্দ্রচূর্ণ দীর্ঘ তৃণরাজিকে স্বর্ণমণ্ডিত করে দিয়েছে; এমনই তাদের নিরবচ্ছিন্ন কম্পন, এমনই তাদের নিরবচ্ছিন্ন স্পন্দন যে মনে হয় এরা বহ্নিশিখার প্রজাপতি কিংবা যেন বৃক্ষনিম্নের তৃণরাজি চন্দ্ররশ্মির জাল-আবরণে বন্দী হয়ে এদিকে ওদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়।

কাতেরীনা তাকিয়ে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে বললে, 'আহা, সেরেজা, কী মধুর, কী সুন্দর—সব সব!'

সের্‌গেই চতুর্দিকের দৃশ্যের দিকে তাচ্ছিল্য-নয়নে একবার শুধু তাকালে।

'তুমি অমন মন-মরা হয়ে আছ কেন, সেরেজো? না, আমার ভালোবাসার প্রতিও তোমার অবসাদ এসে গেছে?'

'কি আবোল-তাবোল বকছো?'—সের্‌গেই নীরস কণ্ঠে উত্তর দিলে; তারপর নিচু হয়ে কাতেরীনাকে অলস ভাবে চুমো দিল।

কাতেরীনার হৃদয়ে হিংসা এসেছে; বললে, 'তুমি প্রতারণা করছো সেরেজা; তোমার প্রেমে স্থিরতা নেই।'

সের্‌গেই শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলে, 'তোমার কথাগুলো আমার উদ্দেশে বলেছ এ-কথাই আমি স্বীকার করবো না।'

'তা হলে তুমি আমাকে এভাবে চুমো খেলে কেন?'

সের্‌গেই তাচ্ছিল্যভরে এর কোনো উত্তরই দিল না।

সের্‌গেইয়ের কোঁকড়া চুল নিয়ে খেলা করতে করতে কাতেরীনা বলে যেতে লাগল, 'স্বামী-স্ত্রীই তো শুধু একে অন্যকে এরকম চুমো খায়—যেন একে অন্যের ঠোঁট থেকে ঠোনা মেরে ময়লা মুছে দেয়। তুমি আমাকে এমন চুমো খাও, যেন আপেল গাছ উপর থেকে আমাদের উপর সবে-ফোটা ফুলের বর্ষণ লাগিয়ে দেয়।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক এই রকম, ঠিক এই রকম, ঠিক এই রকম!' চুপি চুপি কানে কানে গুঞ্জন করলে কাতেরীনা।—দয়িতকে ঘনতর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে সে

তখন হৃদয়াবেগে নিজেকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে কাতেরীনা বললে, 'সেরেজা, এবারে যা বলছি, তুমি মন দিয়ে শোনো। আচ্ছা বলো তো, সবাই কেন একবাক্যে বলে, তোমার প্রেমে স্থিরতা নেই।'

'আমার সম্বন্ধে কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে এসব মিথ্যে কথা বলে কে?'

'সবাই তো এই কথা বলে।'

'হয়তো যে সব হাড়ে হাড়ে অপদার্থগুলোকে আমি ত্যাগ করেছি, তারাই।'

'ওরে হাবা, ওসব অপদার্থগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার তোমার কী দরকার ছিল? যে মেয়ে সত্যি অপদার্থ তার সঙ্গে তুমি আদপেই প্রেম করতে যাবে কেন?'

'বলো, বলে যাও, বলা বড় সোজা। মানুষ কি সূক্ষ্ম বিচার বিবেচনা করে প্রেমে পড়ে? এর পিছনে কাজ করে একমাত্র প্রলোভন। ওদের কোনো একটার সঙ্গে বিধিভঙ্গ* করলে,—অতি সোজা, কোনো মতলব না, কিছু না, ব্যস্ হয়ে গেল। তারপর মেয়েটা রইল তোমার গলায় ঝুলে! গুলে খাওগে তারপর সেই প্রেম।'

'তা হলে, শোনো, সেরেজা! আমার পূর্বে কারা সব এসেছিল তাদের সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি নে, আর আমি ওদের সম্বন্ধে কোনো-কিছু জানতেও চাই নে। শুধু এইটুকু বলার আছে: তুমি নিজে আমাদের এই প্রেমের পথে আমাকে প্রলোভিত করে টেনে এনেছ, এবং তুমি নিজে খুব ভালো করেই জানো, আমি যে এতে পা দিয়েছি তার জন্য তোমার ছলা-কৌশল যতখানি দায়ী আমার নিজের কামনাও ততখানি—আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, সেরেজা, তুমি যদি কোনোদিন বেইমানী করো, তুমি যদি অন্য কারোর জন্য—তা সে যে-ই হোক্ না কেন আমাকে বর্জন করো, আমি তা হলে কস্মিনকালেও—মাফ করো, আমার হৃদয়ের বন্ধু,—এ-দেহে প্রাণ থাকতে কস্মিনকালেও তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে যাবো না।'

সের্গেই চমকে উঠলো।

'এসব কি বলছো, কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না, আমার চোখের মণি! আমাদের অবস্থাটার দিকে একবার ভালো করে চেয়ে দেখো। তুমি এখ্‌খুনি লক্ষ্য করেছ,

---

* যে দশটি বিধি (কমাণ্ডমেণ্ট) ইহুদি ও খৃষ্টান মানে তার অন্যতম—'ব্যভিচার করবে না'।

আমি কি রকম আনমনা হয়ে বসে ছিলুম কিন্তু তুমি একবারও শান্ত হয়ে ভাবো না, এই আনমনা হওয়াটা আমি ঠেকাতে পারি কি না। তুমি তো জানোই না, আমার বুকের ভিতর কি রকম শক্ত শক্ত রক্তের টুকরো জমা হয়ে আছে।'

'তোমার কি বেদনা, সেরেজা, তোমার বেদনা আমায় বলো!'

'এর আবার বলার কি থাকতে পারে? প্রথমত দেখ, অল্পদিনের মধ্যেই, ঈশ্বরের আশীর্বাদে তোমার স্বামী এসে উদয় হবেন, আর তুমি বলবে—সের্‌গেই ফিলেপিচ, দূর্ দূর্ বেরো এখান থেকে, আর যা তুই ঐ পেছনের আঙ্গিনায়, ছোকরারা যেখানে গান-টান গাইছে। আর সেখান থেকে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ, কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌নার শোবার ঘরে ছোট্ট পিদিমটি জলছে, আর তিনি কি রকম পালকের তুলতুলে বিছানাটি দু'হাত দিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে জুৎসই করে তাঁর সাতপাকের সোয়ামীর সঙ্গে শুয়ে আরাম করতে যাচ্ছেন।'

'অসম্ভব! ওরকম ধারা কখ্‌খনই হবে না'—সোল্লাসে টানা টানা স্বরে কাতেরীনা কথাগুলো বললে, আর সঙ্গে সঙ্গে কচি একখানি হাত নাড়িয়ে সের্‌গেইয়ের কথাগুলো যেন সামনের থেকে সরিয়ে দিল।

'কেন হবে না? আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি, এ পরিস্থিতি থেকে বেরবার জন্যে তোমার তো কোনো পথই নেই। তা সত্ত্বেও, বুঝলে কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না, আমারও একটা আপন হৃদয় আছে, আর নিদারুণ যন্ত্রণাটা আমি অনুভব করতে পারি।'

'ব্যস্ ব্যস্, হয়েছে। তোমার যথেষ্ট বলা হয়ে গিয়েছে।'

সের্‌গেইয়ের এই হিংসের অনুভূতিটা কাতেরীনাকে বড়ই আনন্দ দিল। জোরে হেসে উঠে সে ফের সের্‌গেইকে চুমোর পর চুমো খেতে লাগল।

অতি সাবধানে কাতেরীনার সম্পূর্ণ অনাচ্ছাদিত বাহুপাশ থেকে নিজের মস্তকটি মুক্ত করতে করতে সের্‌গেই কথার খেই ধরে বলে যেতে লাগলো, 'দ্বিতীয়ত, সমাজে আমার যে হীনতম অবস্থা সেটাই আমাকে বহুবার বাধ্য করেছে ব্যাপারটা সব দিক দিয়ে বিবেচনা করতে। এই মনে করো, আমি যদি সমাজে তোমার ধাপের মানুষ হতুম, আমি যদি 'ভদ্রলোক' বা ব্যবসায়ী হতুম, তা হলে এ দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে দিতে রাজী হতুম না—কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতিটা—তুমি নিজেই বিবেচনা করে দেখো—তোমার কাছে দাঁড়ালে আমি কে? অল্প দিনের ভিতরই তোমার স্বামী যখন তোমার কচি সাদা হাতটি ধরে তোমাদের শোবার ঘরে তোমাকে নিয়ে যাবে, আমাকে তখন সেটা নীরব হৃদয়ে সয়ে নিতে হবে, এবং হয়তো সেই

কারণেই আমি নিজেকে বাকী জীবন ধরে ঘেন্না করবো। কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না! বুঝলে—আমি তো সে দলের নই যারা যে কোনো একটা রমণীর সঙ্গে ফুর্তি করতে পারলেই অন্য কোনো-কিছুর পরোয়া করে না। প্রেম সত্য সত্য কি, সে অনুভূতি আমার আছে, আর সেটা যেন কালনাগিনীর মত আমার বুকের রক্ত শুষে শুষে খাচ্ছে।'

কাতেরীনা বাধা দিয়ে বললে, 'কিন্তু এসব কথা তুমি আমাকে বার বার বুঝিয়ে বলছো কেন?'

'কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না! না বলে করি কি, বলো। কি করি বলো। হয়তো বা এতদিনে সব কিছু তোমার স্বামীকে কাগজে কলমে ভালো করে বুঝিয়ে রিপোর্ট করা হয়ে গিয়েছে, খুব বেশি দূরের কথা নয়, হয়তো বা আসছে কাল থেকেই এখানে আর সের্‌গেইকে দেখতে পাওয়া যাবে না, তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে না।'

'না, না, ও নিয়ে তুমি একটি মাত্র কথা বলো না, সেরেজা! এটা কস্মিন-কালেও হতে পারে না। যা হোক্ তা হোক্, তোমাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারবো না।' চুম্বনে আলিঙ্গনে সোহাগ করে কাতেরীনা সের্‌গেইকে প্রবোধ দিতে লাগল। 'চূড়ান্ত নিষ্পত্তি যদি একদিন করবার সময়ই আসে, তবে··· হয় নিয়তি তাকে ওপারে নিয়ে যাবেন, নয় আমাকে, কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে থাকবেই।'

'সেটা তো সম্ভব নয়, কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না!'—বিষণ্ণ কণ্ঠে সের্‌গেই উত্তর দিল। তারপর মাথায় যেন দুঃখের ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'আমি যে এই প্রেম নিয়ে বেঁচে আছি তার জন্যে আমার নিজেরই দুঃখ হয়। সমাজে আমি যে ধাপে আছি সেই ধাপের কাউকে ভালোবাসলে হয়তো আমি সন্তুষ্টই হতুম। এও কি কখনো সম্ভব যে, তুমি চিরকাল আমার সত্য প্রেম হয়ে থাকবে? আর এখন আমার প্রণয়িনী হয়ে থাকাও কি তোমার পক্ষে গৌরবের বিষয়? আমি তো চাই পূত চিরন্তন দেউলের সামনে তোমার স্বামী হতে; তারপর তোমার তুলনায় তখন আমি নিজেকে হীন মনে করলেও আমি সমাজের সামনে বুক চেতিয়ে দেখাতে পারবো, আমার স্ত্রী আমাকে কতখানি সম্মানের চোখে দেখেন —কারণ আমি তাঁকে সম্মান করি—'

সের্‌গেইয়ের কথাগুলো কাতেরীনার মাথা ঘুলিয়ে দিয়েছে। তার ঈর্ষা, কাতেরীনাকে বিয়ে করার তার কামনা—এ কামনা মেয়েছেলে মাত্রেরই বড় প্রিয়, তা সে হোক্ না, বিয়ের পূর্বে তাদের অল্প দিনেরই পরিচয়। কাতেরীনা

এখন সের্‌গেইয়ের জন্যে আগুনের ভিতর দিয়ে যেতে প্রস্তুত, অতলে তলাতে তৈরি, কিংবা ভয়ঙ্কর কারাগারে অথবা ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মরতে। সের্‌গেই তখন কাতেরীনাকে তার প্রেমে এমনই মজিয়েছে যে, সে তার অন্তহীন আত্মসমর্পণ সের্‌গেইয়ের পদপ্রান্তে করে ফেলেছে। আনন্দে সে তখন আত্মহারা, তার রক্তে রিনিঝিনি বাজছে,—আর কোনো কথা শোনবার সব শক্তি তার তখন নেই। তাড়াতাড়ি হাতের তেলো দিয়ে সে সের্‌গেইয়ের মুখ বন্ধ করে দিয়ে তার মাথা আপন বুকে চেপে ধরে বললে, 'শোনো, এখন আমার জানা হয়ে গিয়েছে, তোমাকেও কি করে ব্যবসায়ী করে তোলা যায়, আর তোমার সঙ্গে কি ভাবে যথারীতি সসম্মানে বাস করা যায়। যতদিন না আমাদের অবস্থার চরম বোঝা-পড়ার সময় এসেছে—ততদিন কোনো-কিছু নিয়ে আমাকে আর বেদনা দিয়ো না।'

আবার আরম্ভ হল চুম্বন আর আদর-সোহাগ।

নিঃশব্দ নিশীথে, গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকা সত্ত্বেও গুদোমঘরের চালার ভিতর বুড়ো কেরানী শুনতে পাচ্ছিল ক্ষণে মৃদু আলাপের গুঞ্জন, ক্ষণে চাপা হাসির ইঙ্গিত—যেন কতকগুলো দুর্বৃত্ত বালক কোনো নির্বীর্য বৃদ্ধকে নিয়ে নিদারুণতম ঘৃণ্য ব্যঙ্গ করার জন্যে ষড়যন্ত্র করছে—ক্ষণে আনন্দের উচ্চহাস্য কলরোল—যেন সরোবরের পরীরা কাউকে নির্মম ভাবে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। এ-সবের উৎস কাতেরীনা। চাঁদের আলোতে সে যেন সাঁতার কাটছে, নরম কম্বলের উপর গড়াগড়ি দিচ্ছে আর রসকেলি করছে তার স্বামীর ছোকরা কেরানীর সঙ্গে। কুসুমাচ্ছাদিত আপেলবৃক্ষের কোমল ফুলদল তাদের উপর ক্ষণে ক্ষণে বর্ষিত হচ্ছিল—অবশেষে সে বর্ষণও ক্ষান্ত হল। ইতিমধ্যে নাতিদীর্ঘ নিদাঘ রজনী প্রবহমাণ—চন্দ্রমা উচ্চ ভাণ্ডার গৃহের চূড়ান্তরালে লুক্কায়িত থেকে পাণ্ডু হতে পাণ্ডুরতর নয়নে ধরণীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। হঠাৎ রান্নাঘরের ছাতের উপর দুটো বেড়ালের কানফাটানো দ্বৈতকণ্ঠ শোনা গেল। তারপর আরম্ভ হল খামচাখামচি, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে তীক্ষ্ণ গোঙরানোর শব্দ এবং সর্বশেষে পা হড়কে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল ছাদের সঙ্গে ঠেকনা দেওয়া তক্তার ডাঁই পিছলে—গোটা দু'তিন বেড়াল।

'চলো, শুতে যাই'—অতিশয় ক্লান্তির আবেশে রাগ্‌ ছেড়ে উঠতে উঠতে বললো কাতেরীনা। শায়িত অবস্থায় সেই সামান্য যে শেমিজ আর সাদা সায়া তার পরনে ছিল সেই বেশেই গণ্যমান্য সদাগর-বাড়ির আঙিনার উপর দিয়ে সে চললো। সেখানে তখন মরা-বাড়ির নিশ্চলতা আর নৈস্তব্ধ্য। সের্‌গেই রাগ্‌

আর কাতেরীনার খেলা-ভরে ছুঁড়ে-ফেলে-দেওয়া ব্লাউজ নিয়ে পিছনে পিছনে চললো।

॥ ৭ ॥

কাপড়-জামার শেষ রত্তিটুকু ছেড়ে ফেলে, মোমবাতি নিবিয়ে দিয়ে পালকের তুলতুলে বিছানাতে শুতে না শুতে কাতেরীনা সুষুপ্তি-গহ্বরে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেল। দিনভর ক্রীড়াকৌতুক আর উল্লাসরস এতই আকণ্ঠ পান করেছিল যে, সে এখন এমনই গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হল যে তার পা যেন ঘুমিয়ে পড়ল, হাতও যেন ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুমের ভিতর দিয়েও সে পরিষ্কার দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল এবং সেই আগের দিনের চেনা বেড়ালটা দুম্ করে তার বিছানায় পড়ল।

'বেড়ালটার এখানে আগমনের ব্যাপারটা আসলে তবে কি?'—ক্লান্ত কাতেরীনা আপন মনে যুক্তি-তর্ক করতে লাগল। 'আমি দোরের চাবি নিজেই লাগিয়েছি—বেশ ভেবে-চিন্তে বিবেচনা করেই—আর জানলাটাও বন্ধ।—তবু দেখি সেটা আবার এসে জুটেছে। দাঁড়াও, আমি ওটাকে এই মুহূর্তেই বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেব।' কাতেরীনা উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু তার হাত-পা যেন তার বশে নেই; ইতিমধ্যে বেড়ালটা তার শরীরের উপর দিয়ে সর্বত্র হাঁটাহাঁটি লাগিয়ে দিয়েছে। এবং তার গলার গর্‌র্ গর্‌র্ এমনই আশ্চর্য রকমের যে, সে যেন মানুষের গলায় কথা কইছিল। কাতেরীনার মনে হচ্ছিল যেন এক পাল ক্ষুদে ক্ষুদে পিঁপড়ে তার সর্বশরীরের উপর দিয়ে ছুটোছুটি লাগিয়েছে।

কাতেরীনা মনস্থির করে বললে, 'নাঃ, কালই আমাকে বিছানার উপর মঙ্গল জল ছিটোতে হবে—এ ছাড়া আর কোনো গতি নেই,—যেভাবে বেড়ালটা ভূতের মত আমার পিছনে লেগেছে তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এটা তাজ্জব ধরনের বেড়াল।'

ওদিকে বেড়ালটার সোহাগের গর্‌র্ গর্‌র্ একদম তার কান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। বোঁচা নাকটা তার শরীরের উপর চেপে দিয়ে বেড়ালটা বলে উঠলো, 'আচ্ছা, আমি কোন্ ধরনের বেড়াল সেই কথাটা ভাবছো—না? কিন্তু এ সন্দেহে তুমি এলে কিসের থেকে? সত্যি, তুমি কী অসম্ভব চালাক মেয়ে, কাতেরীনা লভভ্না; ঠিক ঠিক ধরে ফেলেছ আমি আদপেই বেড়াল নই, কারণ আমি আসলে আর কেউ না, আমি হচ্ছি সেই বিখ্যাত সম্মানিত সদাগর বরিস

তিমোতেইচ্। অবশ্য এটা হক্ কথা যে, ঠিক এই মুহূর্তেই আমি খুব বহাল তবিয়তে নেই—কারণ আমার ছেলের বউ আমাকে যে-সব খাসা খানা খাইয়ে আমার সেবা করেছে তারই চোটে আমার নাড়িভুঁড়ি ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। তাই হয়েছে কি'—বেড়ালটা সোহাগের গর্‌র্ গর্‌র্ করে যেতে লাগল—'আমি বড্ড কুঁকড়ে-সুকড়ে গিয়ে এখন শুধু হুলো বেড়াল হয়ে, যারা আমাকে সত্যি সত্যি জানে আমি কে, তাদের সামনেই আত্মপ্রকাশ করতে পারি। তা যেন হল ; আচ্ছা, আপনি এখন আপন বাড়িতে কি রকম আছেন, কি করছেন, কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না ? আপ্তবাক্যের সব ক'টি বিধি* আপনি কি ভক্তিভরে পালন করে যাচ্ছেন ? আমি সুচিন্তিত উদ্দেশ্য নিয়েই গোরস্তান থেকে এখানে এসেছি সুদ্ধুমাত্র দেখতে আপনি আর সের্‌গেই ফিলিপিচ্ আপনার স্বামীর বিছানাটাতে কি রকম ওঁম লাগাচ্ছেন। কিন্তু এখন তো আমি আর কিছু দেখতে পারি নে। আপনি খামোখা অত ডরাচ্ছেন কেন ; ব্যাপারটা হয়েছে কি, আপনি যে আমায় ফিস্টিটা খাইয়ে জান্ তর্‌র্‌র্ করে দিয়েছিলেন তারই ঠেলায় আমার আদরের পুতুল চোখ দুটি কোটর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আমার চোখ দুটোর দিকে সোজাসুজি তাকাও, পরাণ আমার,—ভয় পেয়ো না, মাইরি !'

কাতেরীনা সত্য সত্যই তাকিয়েছিল—আর সঙ্গে সঙ্গে তারস্বরে চিৎকার করে উঠলো। হুলো বেড়ালটা ফের তার আর সের্‌গেইয়ের মাঝখানে শুয়ে পড়েছে, আর তার মাথাটার জায়গায় বরিস্ তিমোতেইচের মাথা। ঠিক তারই মাথার মত বিরাট আকারের মাথা। আর দুটি কোটরে চোখের বদলে আগুনের দুটো চাকা ঘুরছে আর পাক খাচ্ছে, পাক খাচ্ছে আর ঘুরছে—যেদিকে যেমন খুশি !

সের্‌গেই জেগে উঠলো, কাতেরীনাকে শান্ত করে আবার ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু নিদ্রাদেবী কাতেরীনাকে ত্যাগ করে চলে গেছেন—ভালোই, এক হিসেবে ভালোই।

বিস্ফারিত নয়নে কাতেরীনা শুয়ে আছে ; হঠাৎ তার কানে এল কে যেন গেট বেয়ে উঠে বাড়ির ভিতরের আঙ্গিনার সামনে পৌঁছে গেছে। সে লোক যেই হোক, কুকুরগুলো তার দিকে ধাওয়া করেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তারা শান্ত হয়ে গেল—হয়তো বা তারা নবাগতের পা চাটতে আরম্ভ করেছে। তারপর

---

* অন্যতম বিধি 'ব্যভিচার করবে না'।

আরো এক মিনিট গেল। ক্লিক্ করে নিচের লোহার খিল খুলে গেল এবং দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল।

'হয় আমি শব্দগুলো কল্পনায় শুনছি, অথবা আমার জিনোভিই বরিসিচ্ ফিরে এসেছেন—এবং দরজা খুলেছেন ফালতো চাবিটি দিয়ে'—চট করে চিন্তাটা কাতেরীনার মাথায় খেলে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সের্গেইকে কনুই দিয়ে গুঁতো দিল।

'কান পেতে শোনো, সেরেজা,' বলে কাতেরীনা কনুইয়ের উপর ভর করে উঠে কান দুটো খাড়া করলে।

সত্যই কে যেন ধীর পদক্ষেপে, সাবধানে শরীরের ওজন এক পা থেকে আরেক পায়ে সরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরের চাবিমারা শোবার ঘরের দিকে আসছে।

সুদ্ধমাত্র শেমিজপরা অবস্থাতেই এক লাফ দিয়ে কাতেরীনা খাট ছেড়ে ব্যালকনির জানলা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সের্গেইও খালি পায়ে লাফ দিয়ে ব্যালকনিতে এসে নামবার জন্য তারই খুঁটিতে পা দিয়ে জড়িয়ে ধরলো—ঐ খুঁটি বেয়েই সে একাধিকবার তার প্রভুপত্নীর শোবার ঘর থেকে নিচে নেমেছে।

কাতেরীনা তার কানে কানে ফিস ফিস করে বললে, 'না, না ; দরকার নেই, দরকার নেই। তুমি এইখেনে শুয়ে থাকো···এখান থেকে নোড়ো না।' তারপর সের্গেইয়ের জুতো, কোট-পাতলুন তার পিছনে ছুঁড়ে দিয়ে লাফ মেরে কম্বলের তলায় ঢুকে শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

সের্গেই কাতেরীনার আদেশ পালন করলো ; খুঁটি বেয়ে নিচে না নেমে ছোট্ট ব্যালকনিটির কাঠের ছাতার নিচে আরাম করে লুকিয়ে রইল।

ইতিমধ্যে কাতেরীনা শুনতে পেয়েছে, তার স্বামী কিভাবে দরজার কাছে এল, এবং দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইল। এমন কি সে তার হিংসাভরা বুকের দ্রুত স্পন্দন পর্যন্ত শুনতে পেল। কিন্তু কাতেরীনার হৃদয়ে করুণার উদয় হল না। বরঞ্চ তাকে যেন ছেয়ে ফেলল পিশাচের অট্টহাস্য।

মনে মনে সে তার স্বামীকে উদ্দেশ করে বললো, 'যাও, গত কাল খোঁজো গে'—মৃদু হেসে সে যতদূর সম্ভব তালে তালে নিষ্পাপ শিশুটির মত দম ফেলতে লাগলো।

প্রায় দশ মিনিট ধরে এই লীলা চললো ; অবশেষে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর ঘুমনোর শব্দ শোনার জন্য অপেক্ষা করাটা জিনোভিইয়ের কাছে ক্লান্তিজনক হয়ে দাঁড়াল। সে তখন দরজায় টোকা দিল।

'কে ?' কাতেরীনা সাড়া দিলে কিন্তু একদম সঙ্গে সঙ্গে না, এবং গলাটা যেন নিদ্রায় জড়ানো।

জিনোভিই উত্তর দিল, 'তোমাদেরই একজন।'

'তুমি নাকি, জিনোভিই বরিসিচ্ ?'

'হ্যাঁ, আমি। যেন আমার গলা শুনতে পারছো না।'

কাতেরীনা সেই যে শুধু শেমিজ পরে শুয়েছিল সেই ভাবেই লাফ দিয়ে উঠে দরজা খুলে দিল, তারপর ফের লাফ দিয়ে গরম বিছানায় ঢুকলো।

কম্বল দিয়ে গা জড়াতে জড়াতে বললো, 'ঠিক ভোরের আগে কেমন যেন শীতটা জমে আসে।'

জিনোভিই বরিসিচ্ ঘরে ঢুকে চতুর্দিকে তাকালো, তারপর ইকনের সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করলো, মোমবাতি জ্বালিয়ে আবার চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলো। স্ত্রীকে শুধলো, 'কি রকম আছ—সব ঠিক চলছে ?'

কাতেরীনা উত্তর দিলে, 'নালিশ করার মত তেমন কিছু নয়।' তারপর উঠে বসে একটা ঢিলে সূতীর ব্লাউজ পরতে লাগল।

শুধলে, 'তোমার জন্য একটা সামোভারে* আঁচ দেব কি ?'

'তোমায় কিছু করতে হবে না ; আক্সীনিয়াকে ডাকো—সে তৈরি করুক।'

কাতেরীনা চটি পরে ছুটে বেরলো এবং ফিরলো আধঘণ্টাটাক পরে। এরই ভিতরে সে ছোট্ট সামোভারটিতে কাঠ-কয়লার আগুন ধরিয়ে নিয়েছে এবং অতিশয় সন্তর্পণে বিদ্যুৎবেগে একবার ছুটে গেছে ছোট্ট ব্যালকনিটির নিচে সের্গেইয়ের কাছে।

'এইখানে থাকো'—ফিস ফিস করে কাতেরীনা সের্গেইকে বললে।

সের্গেইও ফিস ফিস করে প্রশ্ন শুধলে, 'এখানে বসে থেকে কি লাভ হবে ?'

'ওঃ! তোমার মাথায় কি রত্তিভর মগজ নেই! আমি যতক্ষণ না অন্য ব্যবস্থা করি তুমি এইখানে থাকো।'

কাতেরীনা স্বয়ং তাকে আগের জায়গায় বসিয়ে দিয়ে চলে গেল।

সের্গেই বাইরের ছোট্ট ব্যালকনিতে বসে ভিতরে যা-কিছু হচ্ছিল সবই শুনতে

---

* ধাতুর পাত্র। এর নিচের তলায় কাঠ-কয়লার আগুন জ্বালানো হয়। উপরের থোপে জল। ট্যাপ্ খুলে চায়ের জন্য ফুটন্ত জল বের করা হয়। রাশান্‌রা এটা টেবিলের উপর রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চা খায়। 'দেশেবিদেশে' পৃ. ৩৩, ২৩১ ও অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

পারছিল। কাতেরীনা যে দরজা বন্ধ করে স্বামীর কাছে ফিরে এল সেটাও শুনতে পেল। ঘরের ভিতরকার টুঁ শব্দটিও পরিষ্কার তার কানে আসছিল।

জিনোভিই স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে, 'এতক্ষণ ধরে কোথায় আলসেমি করে সময় কাটালে?'

শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলে, 'আমি সামোভার তৈরি করছিলুম।'

কিছুক্ষণ ধরে আর কোনো কথাবার্তা হল না। বাইরের থেকে সেরগেই পরিষ্কার শুনতে পেল, জিনোভিই তার লম্বা কোটটা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখলো। তারপর সে চতুর্দিকে জল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, জোরসে নাক সাফ করে হাত মুখ ধুলো। এইবারে সে একখানা তোয়ালে চাইলে—সেটাও শোনা গেল। আবার কথাবার্তা শুরু হয়েছে।

স্বামী শুধলে, 'আচ্ছা, বলো তো তোমরা ঠিক কি ভাবে আমার বাপকে গোর দিলে?'

'ঠিক যে ভাবে হয়ে থাকে'—উত্তর দিল তার স্ত্রী। 'তিনি মারা গেলেন, সবাই মিলে তাকে গোর দিল।'

'কিন্তু সকলের কাছেই এটা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ঠেকেছে!'

'ভগবান জানেন শুধু।'—কাতেরীনা উত্তর দিয়ে ঠুং-ঠাং করে পেয়ালাগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

জিনোভিই বিষণ্ণ মুখে ঘরের ভিতর পাইচারি করতে লাগলো।

তারপর স্ত্রীকে আবার শুধলো, 'আর এখানে তুমি সময় কাটালে কি করে?'

'এখানে আমাদের আমোদ-আহ্লাদ কি, সে তো সবাই জানে—আমি আর কি বলবো; আমরা বল্ নাচে যাই নে, থিয়েটারও দেখি নে।'

'আমার তো মনে হল তোমার স্বামীকে দেখে তুমি বিশেষ কোনো আমোদ-আহ্লাদ অনুভব করো নি—আমোদ-আহ্লাদের কথাটাই যদি উঠলো—।' আড় নয়নে তাকিয়ে জিনোভিই বললে। এইবারে সে অবতরণিকায় পা দিয়েছে।

'তোমাতে আমাতে তো পর্শুদিন বিয়ে হয় নি যে দেখা হওয়া মাত্রই প্রেমে পাগল হয়ে একে অন্যের দিকে ধাওয়া করবো। বাড়ির কাজকর্মে ছুটোছুটি করতে করতে আমার পা দু'খানি ক্ষয়ে গেল—আর সে-সব তোমারই সুখের জন্য। কি করে যে আশা করো তোমাকে দেখামাত্র আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাব?'

কাতেরীনা সামোভার আনবার জন্য ছুটে বেরিয়ে গেল* আর ধাওয়া করলো

* কাঠ-কয়লার ধুঁয়োর শেষ রেশটুকু না বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সামোভার ঘরের ভিতর আনা হয় না।

সের্‌গেইয়ের দিকে। জামায় টান দিয়ে বললে, 'হাই তোলা বন্ধ করো! চোখ দুটো খোলা রাখো, সেরেজা!'

শ্রাদ্ধের জল যে কোন্ দিকে কতখানি গড়াবে সে সম্বন্ধে সের্‌গেই কোনো স্পষ্ট ধারণা করতে পারেনি, তাই সজাগ হয়ে রইল সে।

কাতেরীনা ফিরে এল। দেখে, জিনোভিই খাটের উপর হাঁটু গেড়ে পুঁতির কেস্‌সুদ্ধ তার ভ্রমণের ঘড়িটা শিয়রের খাড়া তক্তার সঙ্গে ঝোলাচ্ছে।

হঠাৎ সে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে—কেমন যেন একটু বাঁকা-বাঁকা ভাবে 'আচ্ছা, বল তো কাতেরীনা, তুমি তো ছিলে একেবারে একা; তবে এটা কি করে হল যে, তুমি জোড়া বিছানা সাজিয়ে রেখেছো?'

শান্তনয়নে তার দিকে তাকিয়ে কাতেরীনা বললে, 'কেন, আমি তো সর্বক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলুম।'

'কৃতজ্ঞতার ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার জন্য। আচ্ছা, এইবার দেখো, একটা জিনিস; এটা তোমার পালকের বিছানায় প্রবেশপথ পেল কি করে?'—জিনোভিই বরিসিচ্ বিছানার চাদরের উপর থেকে উলে বোনা সরু একটি বেল্ট তুলে নিয়ে এক প্রান্ত উপরের দিকে ধরে তার স্ত্রীর চোখের সামনে দোলাতে লাগল। আসলে এটা সের্‌গেইয়ের।

কাতেরীনা সামান্যতম দ্বিধা না করে বললো, 'আমি ওটা বাগানে কুড়িয়ে পেয়ে আমার স্কার্ট বাঁধার জন্য কাজে লাগিয়েছি।'

'বটে!' কথাগুলোয় বদখদ জোর দিয়ে জিনোভিই বললে, 'তোমার ঐ যে স্কার্ট, সে সম্বন্ধে আমরাও আরো দু'একটা কথা জানতে পেরেছি।'

'ঠিক কি শুনতে পেয়েছ?'

'ও! তোমার সব পুণ্য কর্ম!'

'সে-রকম কিছু হয় নি!'

'আচ্ছা, আচ্ছা; পরে সে সব দেখা যাবে, পরে সব-কিছু দেখা যাবে', খালি পেয়ালাটা ঠেলা মেরে তার স্ত্রীর সামনে ফেলে দিয়ে জিনোভিই উত্তর দিল।

কাতেরীনা এ-কথার উত্তরে কোনো সাড়া দিল না।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর জিনোভিই ভুরু কপালে তুলে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার তাবৎ কীর্তিকলাপ আমরা প্রশস্ত দিবালোকে টেনে বের করবো, বুঝলে কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না?'

কাতেরীনা উত্তর দিল, 'ভয়ে যারা ইঁদুরের গর্ত খোঁজে তোমার কাতেরীনা সে দলের নয়। সে অত সহজে ভয় পায় না।'

'কি বললে? কি বললে?' জিনোভিই গলা চড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলো।

'যাগগে ও-সব···আমি আমার ফেরির পসরা দু'বার হাঁকি নে।' স্ত্রী উত্তর দিলে।

'বটে! সাবধান! একটু সাবধান হও দিকিনি—বড্ড বেশি বকর্ বকর্ করতে শিখে গেছ তুমি, যবে থেকে একলা-একলি থাকছো—কি জানি কি করে?'

কাতেরীনা চোপা দিয়ে বললে, 'বকর্ বকর্ করতে আমার যদি প্রাণ চায় তবে তার বিরুদ্ধে কোনো মহামূল্যবান কারণ আছে কি?'

'দেখো, এখনো নিজের উপর নজর রাখো।'

'আমার নিজের উপর নজর রাখবার মত কিছুই নেই। কোথাকার কে লম্বা জিভ নাড়িয়ে তোমাকে যা-তা শুনিয়েছে, আর আমাকে বসে বসে হরেক রকমের গালি-গালাজ শুনতে হবে নাকি? এ আবার কি এক নতুন তামাশা আরম্ভ হল!'

'লম্বা জিভ হোক আর নাই হোক, তোমার ঢলাঢলির কেচ্ছা এখানে বিস্তর লোকই জেনে গিয়েছে।'

কাতেরীনা এবারে সত্যি সত্যি ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'কী ঢলাঢলি আমার?'

'আমি জানি কোন্‌টা।'

'তাই নাকি? যদি জানোই তবে চালাও: সাফ সাফ খুলে বলো।'

জিনোভিই কোনো উত্তর না দিয়ে খালি পেয়ালাটা আবার ঠেলা মেরে তার স্ত্রীর সামনে ফেললো।

স্বামীকে যেন খোঁচা দেবার জন্যে একটা চামচ তার স্বামীর পিরিচে খটাং করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘেন্নার সুরে বললে, 'আসলে পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তেমন কিছু বলবার মত নেই। না হলে বলো না, বলো, বলো আমাকে, কার সম্বন্ধে তারা তোমাকে বলেছে? কে সে আমার প্রেমিক যাকে আমি তোমার চেয়ে বেশী পছন্দ করি?'

'জানতে পাবে—অত তাড়া কিসের?'

'বলো না! তবে কি কেউ কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে সের্‌গেইয়ের সম্বন্ধে মিথ্যে মিথ্যে লাগিয়েছে? তাই কি না?'

'আমরা সব বের করবো, আমরা সব বের করবো, বাহারে বীবী কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না। তোমার উপর আমাদের যে অধিকার সেটা কেউ কেড়ে নেয় নি,

কেউ নিতে পারবেও না…তুমি শায়েস্তা হয়ে নিজের থেকেই নিজের সম্বন্ধে সব কিছু বলবে—'

'আখ্! আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে!' দাঁত কিড়িমিড়ি খেয়ে কাতেরীনা চিৎকার করে উঠলো,—রাগে তার মুখের রঙ সাদা বিছানার চাদরের মত হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ সে লাফ দিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কয়েক সেকেণ্ড পরে সের্‌গেইয়ের আস্তিন ধরে ঘরের ভিতর তাকে টেনে এনে কাতেরীনা বললে, 'এই তো, এখানে সে। ওকে আর আমাকে জিজ্ঞেস করো, যখন এত সব তোমার জানাই আছে। হয়তো যতখানি জেনে তৃপ্ত হও তার চেয়েও বেশী জানতে পাবে।'

আসলে জিনোভিই বরিসিচের মাথা তখন ঘুলিয়ে গিয়েছে। সে প্রথমটায় সের্‌গেইয়ের দিকে তাকালে—সে তখন দোরের খুঁটিটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর তাকালো তার স্ত্রীর দিকে—সে ততক্ষণে খাটের বাজুতে বসে বুকের উপর এক হাত দিয়ে আরেক হাতের কনুই ধরে আছে; সমস্ত ব্যাপারটা যে কোন্ জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে সে-সম্বন্ধে জিনোভিই কোনো অনুমানই করতে পারছিল না।

'এখানে তুই কি করছিস রে বিচ্ছু?' চেয়ার থেকে না উঠেই কোনো গতিকে সে বললে।

বেহায়ার মত কাতেরীনাই উত্তর দিলে, 'তুমি যা-সব খুব ভালো করে জানো সেগুলো সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞেস করো না? তুমি ভেবেছিলে আমাকে ঠ্যাঙাবার ভয় দেখাবে—' কাতেরীনা বলে যেতে লাগলো; তার চোখে কুমৎলব মিটমিট করছে, 'কিন্তু সেটা আর কক্‌খনই হয়ে উঠবে না। আর আমি? আমার যা করার সে আমি তোমার ঐ প্রতিজ্ঞাগুলো শোনার পূর্বেই স্থির করে রেখেছি, আর এখন সেগুলো তোমার উপর খাটাবো।'

জিনোভিই সের্‌গেইয়ের দিকে চেঁচিয়ে উঠলো, 'কি করছিস এখানে? বেরো!'

কাতেরীনা তাকে চোপা দিয়ে বললে, 'বেশ, বেশ, তারপর?'

ঝট্‌পট্ দোরটা নিখুঁত ভাবে বন্ধ করে চাবিটা সে পকেটে রাখলো, তারপর ঢিলে ব্লাউজসর্বস্বা বিছানায় ফের গড়াগড়ি দিতে লাগলো।

কেরানীকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বললে, 'এখানে তবে এসো সেরেজেচ্‌কা*

* সের্‌গেইয়ের আদরের ডাকনাম সেরেজা; এখানে স্বামীকে অপমান করে আরেক কাঠি আদর করে ডাকছে সেরেজেচ্‌কা—'কচি সেরেজা', 'সেরেজা দুলাল'।

এসো, এখানে এসো, আমার প্রাণের দুলাল।'

সের্‌গেই মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বাবরী চুল পিছনে ফেরালো ; তারপর সাহসীর মত বাড়ির কর্ত্রীর পাশে এসে বসলো।

'হে ভগবান, হে প্রভু! এসব কি হচ্ছে? তোরা কি করছিস—ওরে কাফেরের বাচ্চা'—জিনোভিইয়ের মুখ বেগনি হয়ে গিয়েছে, আরাম-কেদারা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে।

'বটে? তোমার পছন্দ হচ্ছে না? একবার তাকিয়ে দেখো না, ভালো করে তাকিয়ে দেখো আমার বাজপাখীটির চোখ কী রকম জলজল করে, দেখো না, কী সুন্দরই না সে!'

কাতেরীনা অট্টহাস্য করে উঠলো এবং স্বামীর সামনে সের্‌গেইকে আবেগভরে চুম্বন দিতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে তার গালে একটা চড় পড়ে যেন সেখানে আগুন ধরিয়ে দিল আর জিনোভিই লাফ দিয়ে ধাওয়া করলো ব্যালকনির খোলা জানলার দিকে।

॥ ৮ ॥

'আহ্‌হা! তাহলে এই ব্যবস্থাই হল! বেশ বন্ধু! তোমাকে আমার অনেক ধন্যবাদ জানাই! শুধু এইটের জন্যই আমি অপেক্ষা করছিলুম—' উঁচু গলায় বলে উঠলো কাতেরীনা, 'বেশ বেশ, তাহলে পষ্ট দেখা যাচ্ছে, আমারই মর্জি-মাফিক সব-কিছু হবে, তোমার মর্জি আর চলবে না।'

এক ধাক্কায় সের্‌গেইকে পাশ থেকে ঠেলে দিয়ে, বিদ্যুৎবেগে সে লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল তার স্বামীর ঘাড়ে; জিনোভিইও লাফ দিয়েছিল ব্যালকনির জানলার দিকে কিন্তু তার পূর্বেই কাতেরীনা তার সরু আঙুল জিনোভিইয়ের গলায় প্রায় ঢুকিয়ে দিয়ে চেপে ধরে তাকে ছুঁড়ে ফেলেছে মেঝের উপর—একগুচ্ছ কাটা তাজা শন মানুষ যে রকম অবহেলে ফেলে।

শরীরের সমস্ত ওজন নিয়ে বেগে পড়ার ফলে তার মাথা সজোরে ঠোক্কর খেল মেঝের উপর—আর মাথা গেল ঘুলিয়ে। সমস্ত ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি তার চরমে পৌঁছে গিয়ে স্বপ্রকাশ হতে পারে—তার সম্ভাবনা সে মোটেই আন্দাজ করতে পারে নি। তার উপর তার স্ত্রীর জীবনে এই প্রথম প্রচণ্ড আক্রমণ থেকে সে বুঝে গেল যে, তার হাত থেকে ছাড়ান পাওয়ার জন্য হেন কর্ম নেই

যে তার স্ত্রী করবে না, এবং তার বর্তমান অবস্থা সাতিশয় সঙ্কটময়। মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছিল বলে সে আর আর্তনাদ করে ওঠে নি—ভালো করেই সে বুঝে গিয়েছিল যে তার আর্তনাদ কারো কানে পৌছবে না, বরঞ্চ তাতে করে তার পরিণাম আরো দ্রুতগতিতে পৌছে যাবে। নীরবে সে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অবশেষে তার দৃষ্টি স্ত্রীর উপর ফেললো। সে দৃষ্টিতে ছিল জিঘাংসা, অভিসম্পাত আর তীব্রতম যন্ত্রণা। ওদিকে তার স্ত্রী সজোরে তার গলা যেন নিংড়ে ফেলছিল।

জিনোভিই আত্মরক্ষার চেষ্টা করলো না। তার মুষ্টিবদ্ধ প্রসারিত দুই বাহু আচমকা আচমকা খিঁচুনি দিয়ে উঠছিল। তার এক বাহু তখনো সম্পূর্ণ মুক্ত; অন্য বাহু কাতেরীনা তার হাঁটু দিয়ে মাটির সঙ্গে জোরে চেপে ধরেছে।

'ধরো জোরসে ওকে।' বিন্দুমাত্র উত্তেজনার রেশ না দেখিয়ে সে সের্‌গেইকে ফিসফিস করে আদেশ দিল। তারপর ফের স্বামীর দিকে মনোনিবেশ করল।

সের্‌গেই তার মুনিবের উপর বসে তার দুই হাঁটু দিয়ে মুনিবের দুই বাহু চেপে ধরলো। তারপর যেই সে কাতেরীনার হাতের নিচে জিনোভিইয়ের টুঁটি চেপে ধরতে গেছে অমনি সে নিজেই আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো। যে লোকটা তার এমন অন্যায় সর্বনাশ করেছে, তার উপর চোখ পড়তে, রক্ত দিয়ে রক্তের প্রতিশোধ নেবার দুর্বার কামনা জিনোভিইয়ের অবশিষ্ট সর্ব শক্তি উত্তেজিত করে দিল। ভয়াবহ বিক্রম প্রয়োগ করে সে সের্‌গেইয়ের হাঁটুর চাপ থেকে দুই হাত মুক্ত করে, সের্‌গেইয়ের মিশকালো বাবরী বজ্রমুষ্টিতে ধরে নিয়ে তার গলায় কামড় মেরে বসিয়ে দিল—হুবহু হিংস্র পশুর মত—তার দাঁত। কিন্তু এ আক্রমণ দীর্ঘস্থায়ী হল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জিনোভিই গোঁ গোঁ করে কাতরাতে আরম্ভ করলো; মাথা একপাশে হেলে পড়ল।

নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রায় সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে, বিবর্ণ কাতেরীনা তার স্বামী ও প্রেমিকের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে; তার ডান হাতে ছাঁচে ঢালাই ভারী একটা মোমবাতিদান—তার ভারী দিকটা নিচের দিকে ঝুলছে। জিনোভিইয়ের রগ আর গাল বেয়ে একটি অতি সূক্ষ্ম সুতোর মত বয়ে নামছিল চুনি রঙের লাল রক্ত।

'পাদ্রী সাহেবকে ডেকে পাঠাও—' স্তিমিত কণ্ঠে গোঙরে গোঙরে কোনো গতিকে জিনোভিই এ ক'টি কথা উচ্চারণ করলো—তার বুকের উপর সোয়ার সের্‌গেইয়ের থেকে সে ঘেন্নার সঙ্গে যতখানি পারে তার মাথা ঘুরিয়ে নিয়েছে। 'আমার অন্তিম অনুষ্ঠান করাতে চাই—' এ ক'টি কথা বেরলো আরো ক্ষীণস্বরে।

সে তখন ক্ষণে ক্ষণে শিউরে উঠছে আর চোখ বাঁকা করে দেখছে, তার চুলের নিচে যেখানটায় গরম রক্ত জমাট বাঁধছে।

'তুমি যে রকম আছ, সেই বেশ চলবে।' কাতেরীনা ফিস ফিস করলে, তারপর সের্‌গেইকে বললে, 'ব্যস্, ওকে নিয়ে আর আমাদের ঝামেলা বাড়াবার প্রয়োজন নেই : টুঁটিটা কষে চেপে ধরো।'

জিনোভিইয়ের গলা ঘড়ঘড় করে উঠলো।

কাতেরীনা উবু হয়ে তার দু'হাত দিয়ে সের্‌গেইয়ের দু'হাতে ভর দিয়ে জিনোভিইয়ের টুঁটি আরো চেপে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে কাতেরীনা জিনোভিইয়ের বুকের উপর কান পেতে শুনতে লাগল। পাঁচ মিনিট পর উঠে দাঁড়িয়ে সে বললো, 'ব্যস্, তার যা প্রাপ্য সে তাই পেয়েছে।'

সের্‌গেইও উঠে দাঁড়িয়ে গভীর নিশ্বাস নিল। জিনোভিই খতম হয়ে গেছে—তার শ্বাস-নালী থেৎলে গিয়েছে, তার কপালের রগ ফেটে গিয়েছে। তার মাথার বাঁদিকের নিচে রক্তের ছোট একটা থ্যাবড়া কিন্তু এতক্ষণে জমাট রক্ত আর চুলে সেঁটে গিয়েছে বলে জখম থেকে আর রক্ত বইছিল না।

সের্‌গেই বরিসিচ্‌কে মাটির নিচের মদের ভাঁড়ারে বয়ে নিয়ে গেল—এ কুটুরিটা ঠিক সেই পাথরের ছোট ভাঁড়ার ঘরের নিচে যেখানে মাত্র কিছুদিন পূর্বে স্বর্গীয় বরিস তিমোতেইচ্ এই সের্‌গেইকে তালাবন্ধ করে রেখেছিলেন। তারপর ফের কাতেরীনাদের শোবার ঘরে ফিরে এল। ইতিমধ্যে কাতেরীনা হাতের আস্তিন আর পরনের স্কার্ট গুটিয়ে নিয়ে সাবান আর ঘরপোঁছার ন্যাকড়া দিয়ে শোবার ঘরের মেঝের উপরকার জিনোভিইয়ের রক্তের দাগ অতিশয় কষ্ট-সহিষ্ণুতার সঙ্গে সাফ করতে লাগল। সামোভারের বিষ-মাখানো যে জল দিয়ে চা বানিয়ে জিনোভিই তার স্বাধিকার-চেতন, ক্ষুদ্র পুণ্যাত্মাটিকে গরম করে তুলছিল, সে জল তখনো ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি। তারই কৃপায় রক্তের দাগ নিশ্চিহ্ন অবলুপ্ত হল।

সামোভারের সঙ্গে কাপ ধোবার যে জাম-বাটি থাকে সেইটে এবং সাবান-মাখানো ন্যাকড়া তুলে নিয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে কাতেরীনা সের্‌গেইকে বললে, 'এসো, আমাকে আলো দেখাবে।' দরজার কাছে এসে বললে, 'আলো নিচু করে ধরো'—টুকরো টুকরো তক্তা জোড়া দিয়ে তৈরি যে মেঝে এবং সিঁড়ির উপর দিয়ে সের্‌গেই জিনোভিইয়ের মৃতদেহ টেনে টেনে মাটির নিচের মদের ভাঁড়ার পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল, কাতেরীনা সেই তক্তার প্রত্যেকটি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করলো।

রঙ্‌করা তক্তাগুলোর উপরে মাত্র দুটি জায়গায় রক্তের দাগ পাওয়া গেল—আকারে কালোজামের চেয়েও বড় নয়। ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে কাতেরীনা সেগুলো ঘষা মাত্রই দাগগুলো লোপ পেল।

'এইবারে ঠিক হয়েছে—যেমন কর্ম তেমন ফল—আপন বউয়ের পিছনে ওরকম গুপ্তচরের মত তক্কে তক্কে লেগে থেকো না—তার ঘাড়ে লাফ দেবার জন্য ওৎ পেতে থেকো না।'—কাতেরীনা বলতে বলতে শিরদাঁড়া সোজা করে উঠে দাঁড়িয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে শানবাঁধানো যে ছোট্ট কুটুরিতে সের্‌গেই বন্দী ছিল সে দিকে তাকাল।

সের্‌গেই বললে, 'সব-কিছু খতম হল'—নিজের গলা শুনে সে শিউরে উঠলো।

শোবার ঘরে যখন তারা ফিরে এল তখন সরু গোলাপী রেখার মত পূর্বাকাশ ছিন্ন করে উষার উদয় হচ্ছে—ফুলে ঢাকা আপেল গাছের উপর দিয়ে আলতো ভাবে ঢলে পড়ে, দেয়ালের উঁচু বেড়ার রেলিঙের ভিতর দিয়ে কাতেরীনার শোবার ঘরে উষা উঁকি মারলেন।

ঘরের বাইরে উঠোনের উপর দিয়ে যাচ্ছে বুড়ো কেরানী কাঁধের উপর ভেড়ার লোমের কোটটা চড়িয়ে, হাই তুলতে তুলতে, আর ডান হাতের তিন আঙুল দিয়ে গায়ের উপর ক্রুশের প্রতীক আঁকতে আঁকতে বুড়ো চলেছে রান্নাঘরের দিকে।

কাতেরীনা সাবধানে খড়খড়ির ফিতে টেনে সেটাকে বন্ধ করে দিয়ে সের্‌গেইকে পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো, যেন সে তার অন্তরের আত্মসত্তাটি পর্যন্ত দেখে নিয়ে সেই সত্তাটিকে চিনতে চায়।

সের্‌গেইয়ের কাঁধের উপর তার শ্বেতশুভ্র হাত দু'খানা রেখে বললে, 'কি গো, এইবারে তুমি তো সদাগরদের একজন হতে চললে।'

উত্তরে সের্‌গেই একটি শব্দ মাত্র করল না।

তার ঠোঁট দুটি স্ফুরিত হচ্ছিল; কোন যেন এক পীড়া তার দেহে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে। আর কাতেরীনার কিছুই হয় নি, শুধু তার ঠোঁট দুটিতে যেন শীত-শীত করছিল।

লোহার ডাণ্ডা আর ভারি শাবল ব্যবহার করার ফলে দু-এক দিনের ভিতরই সের্‌গেইয়ের হাতে মোটা মোটা ফোস্কা দেখা দিল; তাতে কি এসে যায়—জিনোভিই বরিসিচ্‌কে এমনই পরিপাটিরূপে তারই মাটির তলার কুটুরিতে পুঁতে ফেলা হল যে, তার বিধবা কিংবা বিধবার প্রেমিকের সাহায্য ছাড়া শেষ

বিচারের দিন পর্যন্ত কেউ তাকে খুঁজে পাবে না।

॥ ৯ ॥

সের্‌গেই লাল একখানা স্কার্ফ জড়িয়ে চলাফেরা করে। ইতিমধ্যে সের্‌গেইয়ের গলায় বরিস যে দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল তার দাগ শুকোবার পূর্বেই কাতেরীনার স্বামীর অনুপস্থিতি আশঙ্কাভরা জল্পনা-কল্পনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। বরিস সম্বন্ধে আর সকলের চেয়ে বেশী কথা বলতো সের্‌গেই নিজে। বিকেলের দিকে কোনো কোনো দিন ছোকরাদের সঙ্গে বেঞ্চিতে বসে সে বলে উঠতো, 'সত্যি, বলো তো, ভায়ারা, আমাদের কর্তা এখনো ফিরে এলেন না যে?'

তারাও তখন অবাক হয়ে ভাবতো ব্যাপারটা কি।

এমন সময় মিল থেকে খবর এল, অনেক দিন হল কর্তা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়েছেন। যে কোচম্যান গাড়িটা চালিয়েছিল সে বললে, জিনোভিইকে কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ বলে মনে হচ্ছিল এবং কেমন যেন বেখাপ্পা ভাবেই সে তাকে বিদায় দিয়েছিল; শহরের মঠের কাছে পৌঁছে সে তার কার্পেট-ব্যাগটি হাতে তুলে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে চলে যায়। এ কাহিনী শুনে তাদের মনের ধাঁধা আরো যেন বেড়ে গেল।

জিনোভিই বরিসিচ্‌ অন্তর্ধান করেছে; ব্যস্‌, এ সম্বন্ধে আর কারো কিছু বলার নেই। তাকে খুঁজে বের করবার জন্য চেষ্টা ও অনুসন্ধান আরম্ভ হল, কিন্তু তার ফলে কিছুই প্রকাশ পেল না; সে যেন হাওয়ার সঙ্গে গলে গিয়ে মিশে গিয়েছে। কোচম্যানটাকে অবশ্য গ্রেফ্‌তার করা হয়েছিল; তার কাছ থেকে মাত্র এইটুকু জানা গেল যে, জিনোভিই তাকে মঠের কাছে ছেড়ে দিয়ে একা চলে যায়। সমস্ত ব্যাপারটা মোটেই পরিষ্কার হল না; ওদিকে বিধবা কাতেরীনা সের্‌গেইয়ের সঙ্গে শান্তভাবে বেপরোয়া জীবন যাপন করতে লাগল। মাঝে মাঝে গুজব রটতো, জিনোভিইকে কখনো এখানে দেখা গিয়েছে, কখনো ওখানে দেখা গিয়েছে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আর বাড়ি ফিরে এল না। কাতেরীনা আর সকলের চেয়ে ভালো করেই জানতো, জিনোভিই আর কখনো ফিরে আসবে না, ফিরে আসতে পারে না।

এক মাস গেল, দু'মাস গেল, তিন মাস গেল—কাতেরীনা পেটের বাচ্চার ভার বেশ টের পেতে লাগল।

একদিন সে বললে, 'সের্‌গেইশ্‌কা, এবারে আমাদের ধন-দৌলত নিরাপদ হল।

আমি তোমাকে একটি বংশধর দেব।' সঙ্গে সঙ্গে শহরের কর্মকর্তাগণের কাছে দরখাস্ত করে জানালো: তার এবং তার বিষয়-সম্পত্তি—অমুক, তমুক—এবং সে বুঝতে পেরেছে, সন্দেহ নেই, সে অন্তঃসত্ত্বা; ইতিমধ্যে ইস্‌মাইলফ্‌ পরিবারের ব্যবসা-কারবার এক কদম এগোচ্ছে না; তাকে যেন তাবৎ লেনদেনের উপর সর্ব কর্তৃত্ব এবং স্থাবর সম্পত্তির সর্বত্র অবাধ গতিবিধির অধিকার দেওয়া হয়।

এত বড় একটা কারবার সম্পূর্ণ উচ্ছন্ন যাবে—এ তো কল্পনাতীত। কাতেরীনা তার স্বামীর আইনসঙ্গত স্ত্রী, মোটা রকমের কিংবা সন্দেহজনক দেনাও নেই; সুতরাং স্পষ্টই বোঝা গেল দরখাস্ত মঞ্জুর হবে। মঞ্জুর হলোও।

অতএব কাতেরীনা জীবন যাপন করতে লাগল—মহারাণীর মত চলন-বলন হল এবং তার দেখাদেখি অন্য পাঁচ জন আটপৌরে সেরেগাকে পোশাকী সের্‌গেই ফিলিপিচ্‌, কেষ্টাকে শ্রীকৃষ্ণ নামে সম্মানিত করতে লাগল। এমন সময় বলা-নেই-কওয়া-নেই আস্‌মান থেকে বিনামেঘে বজ্রাঘাত। লিভেন শহর থেকে আমাদের মেয়ারের কাছে এই মর্মে চিঠি এল যে, বরিস্‌ তিমোতেইচ্‌ যে মূলধন নিয়ে কাজ-কারবার করছিল সেটা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব ছিল না: তার অধিকাংশ এসেছিল তার এক নাবালক ভাগ্নের কাছ থেকে—তার নাম ফেদোর জাখারফ্‌ লিয়ামিন্‌; এবং আইনত একটা ফয়সালা না করে কারবারটা একা কাতেরীনার হাতে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে না। নোটিশটা এলে পর মেয়ার ব্যাপারটা নিয়ে কাতেরীনার সঙ্গে আলোচনা করলেন এবং তারপর এক সপ্তাহ যেতে না যেতে হঠাৎ লিভেন থেকে এসে উপস্থিত হলেন ছোট্টখাটো একটি বৃদ্ধা মহিলা—সঙ্গে একটি ছোট্ট ছেলে।

মহিলাটি বললেন, 'আমি স্বর্গত বরিস তিমোতেইভিচের সম্পর্কে বোন হই আর ইটি আমার ভাইপো ফেদোর লিয়ামিন্‌।'

কাতেরীনা তাদের অভ্যর্থনা জানালে।

আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে সের্‌গেই এদের আগমন এবং নবাগতদের প্রতি কাতেরীনার অভ্যর্থনা জ্ঞাপন দেখে পাদ্রীদের সাদা জোব্বার মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল!

বাড়ির কর্ত্রী কাতেরীনা সের্‌গেইকে জিজ্ঞেস করলে, 'একি? তোমার কি হয়েছে?' সে আঙ্গিনা ছেড়ে অতিথিদের পিছনে পিছনে হল্‌ঘর পর্যন্ত এসে তাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

'কিস্‌সু না, কিস্‌সুটি না।' হল্‌ঘর ছেড়ে সদর দরজার কাছে এসে সের্‌গেই উত্তর দিয়ে বললে, 'আমার মনে হচ্ছিল এই লিভেন্‌-গুষ্ঠী বাজি হারার পড়তা,

জেতার নয়।' তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বেরিয়ে গিয়ে পিছনের সদর দরজা বন্ধ করে দিল।

* * *

সে রাত্রে সামোভার ঘিরে বসে সের্‌গেই কাতেরীনাকে শুধলে, 'তাহলে আমরা এখন করি কি? তোমার আমার—আমাদের দুজনার—সব-কিছু যে ছাইভস্ম হয়ে গেল।'

'ছাইভস্ম কেন, সেরেজা?'

'নয় তো কি? এখন তো সব-কিছু ভাগাভাগি হয়ে যাবে। আমাদের হিস্যেয় যা পড়বে তা দিয়ে আমরা চালাবো কি করে?'

'কেন, সেরেজা? তোমার কি ভয় হচ্ছে, তুমি যথেষ্ট পাবে না?'

'আমি নিজের হিস্যের কথা ভাবছি নে। আমার শুধু সন্দেহ হচ্ছে, আমরা কি আর সুখী হতে পারবো?'

'এ দুর্ভাবনা তোমার মনে কেন উদয় হল? আমরা সুখী হতে পারবো না কেন?'

সের্‌গেই উত্তর দিল, 'তার কারণ, তোমার প্রতি আমার যে প্রেম, সে প্রেম চায় তোমাকে সমাজের উচ্চস্থানের মহিলারূপে দেখতে; আগে যে রকম নগণ্য জীবন যাপন করতে, সে রকম নয়। আর এখন সব-কিছু ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে; আমাদের আমদানী কমে যাওয়ার ফলে এখন আমাদের আরো টানাটানি করে চালাতে হবে।'

'তাতে করে আমার জীবনে তো কোনো হেরফের হবে না, সেরেজা।'

'ঠিক সেই কথাই তো হচ্ছে, কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না; তোমার কাছে সব-কিছু পছন্দ-সই বলে মনে হতে পারে, আমার কিন্তু কস্মিনকালেও তা মনে হবে না—এবং তার একমাত্র কারণ তোমাকে আমি মাত্রাধিক শ্রদ্ধা করি। তার উপর দেখো, সমস্তটা ঘটবে যত সব হিংসুটে ছোটলোকদের চোখের সামনে—সে-সব দেখে আমার বেদনার আর অন্ত থাকবে না। তুমি অবশ্য যা-খুশী তাই করতে পারো কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ পরিস্থিতিতে আমি কক্‌খনো সুখী হতে পারবো না।'

আর সের্‌গেই বার বার একটানা ঐ একই রাগিণী কাতেরীনার সম্মুখে গাইতে লাগল; ঐ ফেদোর লিয়ামিন্‌ ছোঁড়াটার জন্যে তার সর্বনাশ হয়েছে। সে যে আশা করেছিল, একদিন সে বণিকগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌নাকে বসাবে সে আশা পূরণের সম্ভাবনা থেকে সে বঞ্চিত হল।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে করেই হোক এ ধরনের আলাপ সের্‌গেই শেষ পর্যন্ত এই সমাধানেই নিয়ে আসতো যে, স্বামীর অন্তর্ধানের ন' মাসের ভিতর যদি কাতেরীনা তার পেটের বাচ্চাটিকে প্রসব করে তাবৎ সম্পত্তির অধিকারী হয়, তবে তাদের সুখের আর সীমা পরিসীমা থাকে না—কিন্তু মাঝখানে এই ফেদোর ছোঁড়াটা উড়ে এসে জুড়ে বসে তাদের সর্বনাশ করেছে।

॥ ১০ ॥

অকস্মাৎ সের্‌গেই ফেদোর লিয়ামিন্ এবং তার মালিকানা স্বত্ব সম্বন্ধে সর্ব আলোচনা বন্ধ করে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে ফেদোরের চিন্তা কাতেরীনার সর্ব হৃদয়-মন যেন গ্রাস করে বসল। দুশ্চিন্তা আশঙ্কা তাকে এমনই মোহাচ্ছন্ন করে তুললো যে, সে যেন তার জাল ছিন্ন করে কিছুতেই বেরুতে পারছিল না। এমন কি সের্‌গেইকে আদর-সোহাগ করা পর্যন্ত তার আর রুচছিল না। ঘুমন্ত অবস্থায়ই হোক, কিংবা ঘর-সংসারের কাজ-কর্ম করার সময়েই হোক, অথবা তার ইষ্ট-দেবতাকে স্মরণ করার সময়ই হোক—উদয়াস্ত তার মনে মাত্র একটি চিন্তা: 'এ যে এক্কেবারে ডাহা অবিচার। বাস্তবিকই—এ আবার কি? কোত্থেকে পুচকে একটা ছোঁড়া এসে জুটলো, আর আমি আমার সর্বস্ব থেকে বঞ্চিত হব? আমি এতখানি যন্ত্রণা সইলুম, পর্বতপ্রমাণ পাপের বোঝা আমার আত্মসত্তার উপর চাপালুম, আর কোনো হাঙ্গামা-হুজ্জৎ না পুইয়ে, খড়ের কুটোটি পর্যন্ত কুড়িয়ে না তুলে হঠাৎ এই ছোঁড়াটা এসে আমার তাবৎ-সর্বস্ব কেড়ে নেবে?...তাও না হয় বুঝতুম, দাবীদার ভারিক্কি বয়েসের কেউ যদি হত—তা নয়, একটা নাবালক কোথাকার,—পুচকে ছোঁড়া।'

* * *

বাইরে প্রথম শীতের আমেজ লেগেছে। জিনোভিই বরিসিচের কোনো খবরই কোন দিক থেকে এল না—আর আসবেই বা কি করে? কাতেরীনা ক্রমেই মোটা হয়ে উঠেছিল আর সমস্তক্ষণ ভাবনা-ভরা মন নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল। ওদিকে শহরের লম্বা রসনা তাকে নিয়ে,—তার কি করে এটা হল, তার কি করে সেটা হল তাই নিয়ে সুবোসাম জল্পনা-কল্পনা গুজোব-গুল্ নিয়ে মেতে উঠেছিল: যেমন,—এই যে ছুঁড়ি কাতেরীনাটা এ্যাদ্দিন ধরে ছিল বাঁজা পাঁঠিটা আর দিনকে দিন শুকোতে শুকোতে হয়ে যাচ্ছিল পুঁই ডাঁটাটির মতন,

এখন, হঠাৎ তার সামনের দিকটা ওরকম ধারা ফেঁপে উঠতে লাগল কেন? এবং এদিকে সম্পত্তির ছোকরা মালিক ফেদিয়া লিয়ামিন্ খরগোসের চামড়ার হাল্কা কোটটি পরে বাড়ির আঙ্গিনায় খেলাধুলো করে আর ছোট-ছোট গর্তে জমে-যাওয়া বরফ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ভেঙে ভেঙে দিন কাটাচ্ছিল।

রাঁধুনী আক্সীনিয়া আঙ্গিনার উপর দিয়ে তার পিছনে ছুটে যেতে যেতে চিৎকার করে করে ডাকছে, 'এ কি হচ্ছে ফেদোর ইগ্নাতিচ? খানদানী সদাগরের ছেলে তুমি,—এ কি হচ্ছে সব? গর্তের জলে-কাদায় মাখামাখি করা কি শেঠজীর ছেলের সাজে?'

কাতেরীনা আর তার বল্লভের সব-কিছু ওলোট-পালোট করে সম্পত্তির হিস্সেদারটি নিরীহ ছাগল-ছানার মত বাড়িময় তিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছে, তার চেয়েও নিরীহ অকাতর নিদ্রায় ঘুমোয় মাত্রাধিক স্নেহময়ী দিদিমার পাশে। জাগরণে বা স্বপ্নে কখনো তার মনে এক মুহূর্তের তরেও উদয় হয় নি সে কারো পাকা ধানে মই দিয়েছে কিংবা কারো সুখে এতটুকু ব্যাঘাত-ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে।

বড্ড বেশি ছুটোছুটির ফলে অবশেষে ফেদিয়ার জল-বসন্ত হল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বুকের ব্যথা। বেচারীকে তখন বাধ্য হয়ে শয্যাগ্রহণ করতে হল। গোড়ার দিকে জড়িমড়ি দিয়ে তার চিকিৎসা করা হল, শেষটায় ডাক্তার ডাকতে হল।

ডাক্তার ভিজিট দিতে শুরু করলেন। তাঁর প্রেসক্রিপশন্ মত ওষুধ ফেদিয়াকে প্রতি ঘণ্টায় খাওয়ানো হল—কখনো দিদিমা খাওয়াতেন, কখনো বা তাঁর অনুরোধে কাতেরীনা।

দিদিমা কাতেরীনাকে বলতেন, 'মা লক্ষ্মী সোনামণি কাতেরীনা আমার! বাচ্চাটিকে একটু দেখ-ভাল্ করো মা আমার। আমি জানি, শরীরের ভারে তোমার নিজেরই বড্ড বেশি চলাফেরা করতে কষ্ট হচ্ছে, আর মা ষষ্ঠীর কৃপার জন্য তুমিও অপেক্ষা করছো—তবু, বাচ্চাটির দিকে একটু নজর রেখো, লক্ষ্মীটি!'

কাতেরীনা অসম্মত হয় নি। বুড়ি যখনই গির্জার সন্ধ্যারতিতে যেত, কিংবা অহোরাত্র উপাসনায় 'রোগশয্যায় যন্ত্রণায় কাতর বাছা ফেদিয়ার' জন্য প্রার্থনা করতে অথবা ভোরবেলাকার প্রথম পূজার প্রসাদ ফেদিয়ার জন্য আনতে যেতে হত, কাতেরীনা তখন অসুস্থ বাচ্চাটির পাশে বসত, জল খাওয়াতো, সময়মত ওষুধ খাইয়ে দিত।

এই করে করে তাই যখন শীতের উপবাস আরম্ভের পরব উপলক্ষে বুড়ি সন্ধ্যারতি আর অহোরাত্র উপাসনা করার জন্য গির্জেয় গেল তখন যাবার পূর্বে 'আদরে'র কাতেরীনাকে অনুরোধ করে গেল সে যেন ফেদিয়ার যত্নআত্তি করে। ততদিনে ছেলেটি অবশ্য আরোগ্যলাভ করে উঠছিল।

কাতেরীনা ফেদিয়ার ঘরে ঢুকে দেখে সে কাঠবেড়ালীর চামড়ার তৈরি কোট পরে বিছানায় বসে 'সন্তদের জীবনকাহিনী' পড়ছে।

গদিওলা কুর্সীতে আরাম করে বসে কাতেরীনা শুধলো, 'কি পড়েছো, ফেদিয়া?'

'আমি সন্তদের জীবনকাহিনী পড়ছি, কাকীমা।'*

'ভালো লাগছে?'

'ভারী চমৎকার, কাকীমা।'

ফেদিয়া যখন কথা বলছিল তখন কনুইয়ের উপর ভর করে কাতেরীনা তার দিকে মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে দেখছিল। অকস্মাৎ তার অন্তস্তলে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাক্ষসের পাল যেন মুক্ত হয়ে আবার তার সেই পুরনো চিন্তাগুলো সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে ফেলল: এই ছোকরাটা তার কী সর্বনাশই না করেছে, এবং সে অন্তর্ধান করলে তার জীবন কত না আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কাতেরীনা চিন্তা-সাগরে ডুব দিয়ে ভাবতে লাগলো, 'এখন আর কীই বা হতে পারে? ছেলেটা এমনিতেই অসুস্থ, তাকে ওষুধ খেতে হচ্ছে…আর অসুখের সময় কত অঘটনই না ঘটতে পারে। লোকে আর কি বলবে? ডাক্তার ভুল ওষুধ দিয়েছিল!'

'তোমার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে, ফেদিয়া?'

'হ্যাঁ, কাকীমা। তোমার যদি কোনো অসুবিধা না হয়।' তারপর চামচে ভরা ওষুধ গিলে বললে, 'সন্তদের এই জীবনকাহিনী কী অদ্ভুত সুন্দর, কাকীমা।'

কাতেরীনা বললে, 'আরো পড়ো, বেশ করে পড়ো।' কাতেরীনা তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘরটার চতুর্দিকে তাকাতে গিয়ে তার দৃষ্টি নক্সা-কাটা ঘষা কাঁচের জানলাগুলোর উপর গিয়ে পড়লো। তখন বললো, 'এগুলোর খড়খড়ি বন্ধ করিয়ে নিতে হবে।' দাঁড়িয়ে উঠে কাতেরীনা পাশের ঘরে গেল, সেখান থেকে বসবার ঘর হয়ে উপরের তলায় নিজের ঘরে গিয়ে বসলো।

---

* আসলে 'বৌদি', কিন্তু রাশানরা আমাদের মত যৌথ পরিবারে বাস করে না বলে একে অন্যকে সম্বোধনের সময় আমাদের মত বাছবিচার করে না।

পাঁচ মিনিটের ভিতর সের্‌গেই তার কাছে এল। পরনে ফুলবাবুটির মত সীলের চামড়ার অন্তরদার পুস্তিনের পোশাক।

কাতেরীনা শুধলো, 'জানলার খড়খড়িগুলো বন্ধ করা হয়েছে?'

কাটখোট্টা সংক্ষেপে সের্‌গেই 'হ্যাঁ' বলে, কাঁচি দিয়ে মোমবাতির পোড়া পলতেটুকু কেটে ফেলে স্টোভটার কাছে এসে দাঁড়ালো।

সব-কিছু চুপচাপ।

কাতেরীনা জিজ্ঞেস করলো, 'আজ রাত্রে গির্জার উপাসনা অনেকক্ষণ অবধি চলবে—না?'

সের্‌গেই উত্তর দিল, 'কালকের পরবটা বড় রকমের; উপাসনা দীর্ঘ হবে।' আবার সব-কিছু চুপচাপ।

কাতেরীনা দাঁড়িয়ে উঠে বললো, 'আমাকে নিচে ফেদিয়ার কাছে যেতে হবে; সে সেখানে একেবারে একলা।'

ভুরু নিচু করে কাতেরীনার দিকে সোজা তাকিয়ে সের্‌গেই শুধলো, 'একেবারে একলা?'

'একেবারে একলা।' কাতেরীনা ফিস ফিস করে উত্তর দিয়ে শুধলো, 'কেন? তাতে কি হয়েছে?'

দুজনের চোখে চোখে যেন বিদ্যুতে বিদ্যুতে ধারাবহ্নি জ্বলে উঠলো; কিন্তু দুজনার ভিতর শব্দমাত্র বিনিময় হল না।

কাতেরীনা নিচের তলায় গিয়ে এ-ঘর ও-ঘর প্রত্যেকটি খালি ঘর ভালো করে তদারক করে নিল। সর্বত্র শান্ত,—নিঃশব্দ নৈস্তব্ধ্য। ইকনগুলোর নিচে মঙ্গলপ্রদীপ নিষ্কম্প জ্যোতি বিচ্ছুরিত করছে। কাতেরীনার ছায়া তার সমুখ দিকে যেন দ্রুততর গতিতে এগিয়ে গিয়ে প্রাচীর-গাত্রে প্রসারিত হচ্ছে। খড়খড়ি তুলে দেওয়ার ফলে জানলার উপর জমে-যাওয়া বরফ গলে গিয়ে চোখের জলের মত ঝরে পড়ছে। বিছানার উপর বালিশে ভর করে বসে ফেদিয়া তখনো পড়ছিল। কাতেরীনাকে দেখে সে শুধু বললে, 'কাকীমা, এ-বইখানা নাও, লক্ষ্মীটি, আর ইকনের তাক থেকে ঐ বইখানা দাও তো।'

কাতেরীনা তার অনুরোধ পালন করে বইখানা তাকে দিল।

'ফেদিয়া, এখন তুমি ঘুমিয়ে পড়লে ভালো হয় না?'

'না, কাকীমা, আমি দিদিমণির জন্য অপেক্ষা করবো।'

'দিদিমণির জন্য অপেক্ষা করবে কেন?'

'আমার জন্য অহোরাত্র-উপাসনার নৈবেদ্য আনার কথা দিয়েছে দিদিমণি।'

কাতেরীনার মুখ হঠাৎ একদম পাংশু হয়ে গেল। হৃৎপিণ্ডের নিচে সে এই প্রথম তার সন্তানের স্পন্দন অনুভব করলো। সমস্ত বুক তার হিম হয়ে গেল। ঘরের মাঝখানে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে আপন ঠাণ্ডা হাত দু'খানা গরম করবার জন্য ঘষতে ঘষতে বেরিয়ে গেল।

শোবার ঘরে নিঃশব্দে ঢুকে দেখল সের্‌গেই স্টোভের কাছে দাঁড়িয়ে। ফিস ফিস করে তাকে বললো, 'ঐখানে।'

প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে সের্‌গেই শুধলো, 'কি?' তার গলাতে কি যেন আটকে গেল।

'সে একেবারে একলা।'

সের্‌গেই ভুরু কোঁচকালো। তার শ্বাস-প্রশ্বাস ভারী হয়ে উঠেছে।

কাতেরীনা হঠাৎ দোরের দিকে রওয়ানা দিয়ে বললে, 'চলো।'

সের্‌গেই তাড়াতাড়ি জুতো খুলে ফেলে শুধলো, 'সঙ্গে কি নেব?'

কাতেরীনা অতি অস্ফুট কণ্ঠে বললে, 'কিছু না।' তারপর নীরবে সের্‌গেইয়ের হাত ধরে তাকে পিছনে পিছনে নিয়ে চললো।

॥ ১১ ॥

এই নিয়ে তিন বারের বার কাতেরীনা যখন অসুস্থ বালকের ঘরে ঢুকলো তখন সে হঠাৎ ভয়ে কেঁপে ওঠাতে বইখানা তার কোলে পড়ে গেল।

'কি হল, ফেদিয়া?'

বিছানার এক কোণে জড়সড় হয়ে ফেদিয়া ভীত স্মিত হাস্যে বললে, 'ও, হঠাৎ যেন কিসের ভয় পেলুম, কাকীমা।'

'কিসের ভয় পেলে?'

'তোমার সঙ্গে কে ছিল, কাকীমা?'

'কোথায়? আমার সঙ্গে তো কেউ ছিল না, লক্ষ্মীটি।'

'কেউ ছিল না?'

ফেদিয়া খাটের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা হয়ে, তার কাকীমা যে দোর দিয়ে ঢুকেছিল সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন খানিকটে আশ্বস্ত হল!

বললে, 'বোধ হয় আমার নিছক কল্পনাই হবে।'

কাতেরীনা খাটের খাড়া তক্তায় কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়েছিল। ফেদিয়া তার কাকীর দিকে তাকিয়ে বললে, তার মনে হচ্ছে, কেন জানি নে,

তাকে বড্ড ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

উত্তরে কাতেরীনা ইচ্ছে করে কেশে দরজার দিকে তাকিয়ে কি যেন প্রতীক্ষা করলে। সেখান থেকে এল—কাঠের মেঝে থেকে সামান্যতম মচমচ শব্দ।

'আমার নামে যে কুলগুরুর নাম—তাঁর জীবনকথা আমি পড়ছি, কাকীমা! বীরযোদ্ধা শহীদ হয়ে কি রকম পরমেশ্বরের কাছে প্রিয়রূপে গণ্য হলেন।'

কাতেরীনা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ভাইপো সোহাগ করে বললে, 'তুমি বসবে, কাকীমা? আমি তাহলে তোমাকে কাহিনীটা পড়ে শোনাই।'

কাতেরীনা উত্তর দিল, 'একটু দাঁড়াও, আমি এখ্‌খুনি আসছি। বসবার ঘরের মঙ্গল-প্রদীপটি ঠিক জ্বলছে কি না দেখে আসি।' সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল।

পাশের ঘরে যে ফিস ফিস করে কথা আরম্ভ হল সেটা অতিশয় নীরবের চেয়েও ক্ষীণ, কিন্তু চতুর্দিকে যে গভীর নৈস্তব্ধ্য বিরাজ করছিল তার ভিতর সেটা ফেদিয়ার তীক্ষ্ণ কর্ণে এসে পৌঁছল।

কান্নার জলভরা কণ্ঠে ছেলেটি চেঁচিয়ে উঠল, 'কাকীমা, ওখানে কি হচ্ছে? কার সঙ্গে তুমি কথা বলছো?' এক মুহূর্ত পরে আরো অশ্রু-ভরা কণ্ঠে আবার চেঁচিয়ে বললে, 'কাকীমা! এদিকে এস—আমার বড্ড ভয় করছে।' এবার সে যেন কাতেরীনার কণ্ঠে 'ঠিক আছে' শুনতে পেল এবং ভাবলো সেটা তারই উদ্দেশে বলা হয়েছে।

দৃঢ় পদক্ষেপে কাতেরীনা এসে এমন ভাবে দাঁড়ালো যে, তার শরীর ফেদিয়া আর বাইরে যাবার দরজার মাঝখানে। বেশ কড়া গলায় বললে, 'তুমি খালি খালি কিসের ভয় পাচ্ছো?' ঠিক তার পরই বললে, 'এইবারে তুমি শুয়ে পড়ো।'

'আমার যে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে না, কাকীমা!'

'না, না। তুমি এবারে ঘুমোও, ফেদিয়া—আমার কথা শোনো, শুয়ে পড়ো…সত্যি, রাত হয়েছে।'

'কিন্তু কেন এসব, কাকীমা। আমার যে মোটেই শুতে ইচ্ছে করছে না।'

'না, তুমি শুয়ে পড়, শুয়ে পড়।' কাতেরীনার স্বর আবার বদলে গিয়েছে, অল্প অল্প কাঁপছে। তারপর বাহু দুখানা তুলে ছেলেটাকে দুই কান দিয়ে চেপে ধরে খাটের শিয়রের দিকে শুইয়ে দিল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ফেদিয়া আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো; সে দেখতে পেয়েছে সের্‌গেইকে—ফ্যাকাশে মুখ, আর খালি পায়ে সে ঘরে ঢুকছে।

ত্রাসে, ভয়ের বিভীষিকায় ছেলেটা তালু পর্যন্ত মুখ খুলে ফেলেছে। কাতেরীনা সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরলো। কড়া গলায় বললো, 'শিগগির করো, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসো—চেপে ধরো ছেলেটাকে, ধস্তাধস্তি না করে।'

সের্‌গেই ছেলেটার দু হাত পা চেপে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে কাতেরীনা এক ঝটকায় বড় একটা পালকের বালিশ নিয়ে বলির পাঁঠা সেই ছোট্ট বালকের কচি মুখটি ঢেকে দিয়ে, বালিশের উপর ঝাপটে পড়ে তার শক্ত নরম স্তনের উপর চাপ দিতে লাগলো।

কবরের ভিতর যে স্তব্ধতা—প্রায় চার মিনিট ধরে সেটা ঘরে বিরাজ করলো।

অতি মৃদুকণ্ঠে কাতেরীনা বললে, 'ওর হয়ে গিয়েছে।'

কিন্তু—কিন্তু দাঁড়িয়ে উঠে সব-কিছু গোছগাছ করাতে লাগতে না লাগতে, বহু লুকনো পাপের রঙ্গভূমি, নিস্তব্ধ বাড়িটার দেয়ালগুলো সশব্দ তীব্র মুষ্ট্যাঘাতের পর মুষ্ট্যাঘাতে টলমল করে উঠলো; জানলাগুলো খড়খড়িয়ে উঠলো, ঘরের মেঝে দুলতে লাগলো, মঙ্গল-প্রদীপ ঝোলানোর সরু শিকল দুলে দুলে দেয়ালের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের উপর অদ্ভুত ছায়াছবির দৌড়াদৌড়ি লাগিয়ে দিল।

সের্‌গেই আতঙ্কে শিউরে উঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে লাগাল ছুট। কাতেরীনাও ছুটলো তাকে ধরবার জন্য। ওদিকে হট্টগোল তোলপাড় যেন তাদের পিছনে আসছে। যেন কোনো অপার্থিব শক্তি এই পাপালয়কে তার ভিত্তিতল পর্যন্ত ঝাঁকুনি দিয়ে ওলট-পালট করে দিচ্ছে।

কাতেরীনার ভয় হচ্ছিল, পাছে সের্‌গেই ত্রাসের তাড়নায় বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে তার আর্ত চেহারা দিয়ে সব-কিছু ফাঁস করে দেয়; সে কিন্তু ছুটলো সিঁড়ির দিকে উপরের তলায় যাবে বলে।

সের্‌গেই মাত্র কয়েকটি ধাপ উঠতেই অন্ধকারে একটা আধখোলা দরজার সঙ্গে খেল সরাসরি প্রচণ্ড এক ধাক্কা। আর্তনাদ করে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল নিচের দিকে—কুসংস্কার-ভরা আতঙ্কে সে তখন সম্পূর্ণ দিশেহারা হয়ে গিয়েছে।

গড় গড় করে তার গলা দিয়ে শুধু বেরুচ্ছে, 'জিনোভিই বরিসিচ্! জিনোভিই বরিসিচ্!' আর সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচের দিকে পা উপরের দিকে করে হুড়মুড়িয়ে পড়ার সময় কাতেরীনাকেও ফেলে দিয়ে নিয়ে চলেছে তার সঙ্গে।

কাতেরীনা শুধলো, 'কোথায়?'

সের্‌গেই আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো, 'ঐ যে, ঐ তো ঐখানে সে একটা লোহার পর্দার উপর বসে বসে আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। ঐ তো, ঐ—আবার এসেছে সে। শোনো, সে গর্জন করছে—গর্জন করছে সে আবার।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, অসংখ্য হস্ত রাস্তার দিকে মুখ-করা জানলাগুলোর উপর প্রচণ্ড ঘা দিচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে কে একজন বাড়ির দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে।

কাতেরীনা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে, 'ওরে হাবা। ওঠ্‌, উঠে পড়্‌, হাবা কোথাকার!' কথা ক'টি বলা শেষ করতে না করতে সে তীরের মতন ছুটে গেল ফেদিয়ার কাছে। মরা ছেলেটার মাথা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে বালিশের উপর এমনই ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখল যে মনে হয় সে ঘুমুচ্ছে। তারপর শত শত মুষ্টি যে দরজাটা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছিল সেইটে দৃঢ়হস্তে খুলে দিল।

সম্মুখে ভীষণ দৃশ্য। দলে দলে লোক রোয়াকের উপর ওঠবার চেষ্টা করছে। তাদের মাথার উপর দিয়ে কাতেরীনা দেখতে পেল সারি সারি অপরিচিত লোক উঁচু পাঁচিল টপকে বাড়ির আঙ্গিনায় নামছে—আর বাইরের রাস্তা উত্তেজিত কণ্ঠের কথা-বলাবলিতে গম্‌ গম্‌ করছে।

কোনো কিছু ভালো করে বোঝবার পূর্বে রোয়াকের দল কাতেরীনাকে উল্টে ফেলে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ঘরের ভিতরে।

॥ ১২ ॥

এই প্রচণ্ড উত্তেজনা, তুল-কালাম কাণ্ড এল কি করে?

বছরের বারোটা প্রধান পর্বের যে কোনোটার আগের রাত্রে কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌নাদের শহরের হাজার হাজার লোক শহরের সব-ক'টা গির্জা ভরে দিত। শহরটা যদিও মফস্বলের, তবু তার ব্যবসাবাণিজ্য শিল্পোৎপাদন নগণ্য নয়। ফলে যে সব গির্জায় ভোরবেলাকার 'ঈশ্বরের-সংযোগ' উপাসনা করা হত সেখানে এমনই প্রচণ্ড ভিড় জমতো যে, বলতে গেলে পোকামাকড়টিও সেখানে নড়াচড়া করার মত জায়গা পেত না। এসব গির্জেয় সমবেত ধর্মসঙ্গীত গাইতো শহরের বণিক সম্প্রদায়ের তরুণের দল। তাদের মূল-গায়েন, আপন ওস্তাদও সেখানে নিযুক্ত থাকতো।

আমাদের শহরবাসীরা প্রভুর গির্জার প্রতি অনুরক্ত উৎসাহী ভক্ত—তাই তাদের দিক দিয়ে দেখতে গেলে তারা সঙ্গীত ও অন্যান্য কলার সমজদার। গির্জার

বৈভব-উজ্জ্বল চাকচিক্য এবং অর্গেন সহ বহু কণ্ঠে গীত সঙ্গীত তাদের জীবনের একটি উচ্চতম পবিত্রতম বিমলানন্দ। যে গির্জায় যেদিন ঐক্যসঙ্গীত হত সেখানে আধখানা শহর ভিড় লেগে যেতো, বিশেষ করে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের তরুণ দলের, কেরানী-কুল, ছোকরার দল, ফুলবাবুর পাল, কল-কারখানার ছোট-বড় হুনুরি-কারিগর, এমন কি মিল-কারখানার মালিকরাও তাঁদের ভামিনীগণ সমভিব্যাহারে উপস্থিত হতেন। সবাই ভিড় লাগাতো একই গির্জায়: সবাই চাইতো যে করেই হোক অর্গেনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অষ্ট-কণ্ঠ-সঙ্গীত, কিংবা কোনো ওস্তাদ যখন সপ্তমে উঠে কঠিন কারুকার্য করেন সেগুলো শুনতে—তা সে নরকের অগ্নিকুণ্ডের গরম দিনেই হোক, আর পাথর-ফাটা কনকনে শীতেই হোক; গির্জার ঢাকা আঙ্গিনাতেই হোক, আর জানলার নিচে দাঁড়িয়েই হোক।

ইস্‌মাইলফদের পাড়ার গির্জেয় হবে সর্বমঙ্গলময়ী কুমারী মা-মেরির স্মরণে পরব। তাই তার আগের রাত্রে যখন ইস্‌মাইলফ্‌ পরিবারে ফেদিয়াকে নিয়ে পূর্ববর্ণিত নাটক অনুষ্ঠিত হচ্ছিল তখন তাবৎ শহরের তরুণদল ঐ গির্জেয় জড়ো হয়েছিল। গির্জে থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বেশ সোরগোল তুলে তারা সে সন্ধ্যার বিখ্যাত তার-সপ্তক-গায়কের গুণ নিয়ে, এবং ওঁরই মত সমান বিখ্যাত খাদ-গায়কের দৈব পদস্খলন নিয়ে আলোচনা করছিল।

কিন্তু সবাই যে কণ্ঠসঙ্গীত-আলোচনায় মেতে উঠেছিল তা নয়; দলের মধ্যে আর পাঁচজন আর পাঁচটা বিষয়ে অনুরাগী।

এদের মধ্যে ছিল একটি ছোকরা কলকব্জার হুনুরি। তাকে সম্প্রতি এখানকার একটি স্টীম-মিলের মালিক পেতের্সবুর্গ* থেকে আমদানী করেছেন। ইস্‌মাইলফ্‌দের বাড়ির কাছে আসতে সে বলে উঠলো, 'সবাই বলছে, মেয়েটা তাদের কেরানী সের্‌গেইকে নিয়ে রসকেলিতে অষ্টপ্রহর মেতে আছে।'

ভেড়ার চামড়ার অন্তরদার নীল সুতী কোটপরা একজন বললে, 'যাঃ! সে তো সব্বাই জানে। আর সেই কথাই যখন উঠলো—আজ রাত্রে সে গির্জেয় পর্যন্ত আসেনি।'

'গির্জেয়? কী যে বলছো? বদমাইশ মাগীটা পাপের কাদামাটি এমনই সর্বাঙ্গে মেখেছে যে, সে এখন না ডরায় ভগবানকে, না ডরায় আপন বিবেককে, না ডরায় ভদ্রজনের দৃষ্টিকে।'

কলকব্জার ছোকরাটি বললে, 'ঐ হোথা দেখ, ওদের বাড়িতে আলো

---

* বর্তমান লেনিনগ্রাদ।

জ্বলছে।' আঙুল তুলে সে দেখালে, খড়খড়ির ভিতর দিয়ে আসছে আলোর রেখা।

একাধিক গলা তাকে টুইয়ে দিয়ে বললে, 'ফাঁক দিয়ে একবার তাকিয়ে দেখ না, এবারে তারা কোন্ তালে আছে।'

দুই বন্ধুর কাঁধের উপর ভর করে কলকব্জার ছোকরাটি ফাঁকের ভিতর দিয়ে ভালো করে তাকাতে না তাকাতেই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'ভাইরা সব, ওরা কার যেন দম বন্ধ করে তাকে মারছে—বন্ধুরা সব, দম বন্ধ করে কাউকে মারছে!'

সঙ্গে সঙ্গে সে মরীয়া হয়ে দু হাত দিয়ে খড়খড়ির উপর থাবড়াতে লাগলো। তার দেখাদেখি আরো জনা দশেক লাফ দিয়ে জানলার উপর উঠে হাতের মুঠো দিয়ে খড়খড়ির উপর হাতুড়ি পেটা করতে আরম্ভ করে দিল।

প্রতি মুহূর্তে ভিড় বাড়তে লাগল, এবং এই করেই ইস্‌মাইলফ্‌দের বাড়ি পূর্বোল্লিখিত ভাবে আক্রান্ত হল।

* * *

ফেদিয়ার মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে কলকব্জার লোকটি সাক্ষ্য দিলে, 'আমি নিজে দেখেছি; আমি স্বচক্ষে দেখেছি; বাচ্চাটাকে চিৎ করে বিছানার উপর ফেলে দিয়ে দুজনাতে মিলে তার দম বন্ধ করে মারছিল।'

সের্‌গেইকে সেই রাত্রেই পুলিস-থানায় নিয়ে যাওয়া হল; দুজন প্রহরী কাতেরীনাকে তার শোবার-ঘরে নজরবন্দী করে রাখল।

* * *

ইস্‌মাইলফ্‌দের বাড়িতে অসহ শীত ছেয়ে পড়েছে। ঘর গরম করার স্টোভগুলো জ্বালানো হয়নি, সদর দরজা সর্বক্ষণ খোলা, কারণ দঙ্গলের পর দঙ্গল কৌতূহলীর দল একটার পর আরেকটা বাড়ির ভিতরে এসে ঢুকছে। সবাই গিয়ে দেখছে কফিনের ভিতর শুয়ে ফেদিয়া—আরেকটা ডালা-বন্ধ পুরো মখমলের পর্দা দিয়ে ঢাকা বড় কফিন*। ফেদিয়ার কপালের যেখানটায় ডাক্তার ময়না তদন্তের জন্য কেটেছিলেন সেখানকার লাল দাগটি ঢাকবার জন্য তার উপর রাখা হয়েছিল সাটিনের ফুল পাতা দিয়ে তৈরি একটি মালা। তদন্তে প্রকাশ পায়

---

* পরে বলা হয়েছে, এটাতে ছিল কাতেরীনার স্বামীর মৃতদেহ। এটা পচে গিয়েছিল বলে কফিনের ডালা বন্ধ করে তার উপর ভারী পর্দা ফেলে দেওয়া হয়েছিল—যাতে করে দুর্গন্ধ না বেরয়।

যে, ফেদিয়া দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে মারা যায়। সের্‌গেইকে ফেদিয়ার মৃতদেহের পাশে নিয়ে যাওয়ার পর, পাদ্রী ভয়াবহ শেষ বিচারের দিন এবং যারা কৃত পাপের জন্য অনুশোচনা করে না তাদের কি হবে সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলতে না বলতেই সে হাউ হাউ করে চোখের জলে ভেঙে পড়লো। সমস্ত প্রাণ খুলে দিয়ে সে যে ফেদিয়ার খুনী এ-কথাই যে স্বীকার করলো তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষা জানালো জিনোভিই বরিসিচের মরা লাশও যেন খুঁড়ে তোলা হয়—স্বীকার করলো যে, পাদ্রী-কৃত শেষ-অন্ত্যেষ্টির পুণ্যফল থেকে জিনোভিইকে বঞ্চিত করে সে তাকে মাটিতে পুঁতেছিল।

তখনো তার লাশ সম্পূর্ণ পচে যায় নি; সেটাকে খুঁড়ে তুলে একটা বিরাট সাইজের কফিনে রাখা হল। সর্বসাধারণকে ত্রাসে আতঙ্কিত করে সে তার দুটি পাপের সহকর্মিণীরূপে যুবতী গৃহকর্ত্রীর নাম উল্লেখ করলো।

সর্ব প্রশ্নের উত্তরে কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌নার মাত্র একটি উত্তর:—'আমি কিচ্ছু জানি নে; আমি এ-সব ব্যাপারের কিচ্ছু জানি নে।'

সের্‌গেইকে কাতেরীনার সামনে মুখোমুখি করে তাকে দিয়ে কাতেরীনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ানো হল। তার সব স্বীকৃতি শুনে কাতেরীনা নীরব বিস্ময়ে তার দিকে তাকালো—সে দৃষ্টিতে কিন্তু কোনো রোষের চিহ্ন ছিল না। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, 'সে যখন সব-কিছু বলার জন্য এতই উৎসুক তখন আমার কোনো-কিছু অস্বীকার করে আর কি হবে? আমি তাঁদের খুন করেছি।'

সবাই শুধোলে, 'কিন্তু কেন, কিসের জন্য?'

কাতেরীনা সের্‌গেইয়ের দিকে ইঙ্গিত করে বললে, 'ওর জন্য।'

সের্‌গেই মাথা হেঁট করলো।

আসামী দুজনাকে জেলে পোরা হল। এই বীভৎস কাণ্ডটা জনসাধারণের ভিতর এমনই কৌতূহল, ঘৃণা আর ক্রোধের সঞ্চার করেছিল যে, ঝটপট তার ফয়সালা হয়ে গেল। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে সের্‌গেই এবং তৃতীয় বণিক সঙ্ঘের জনৈক বণিকের বিধবা কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌নাকে ফৌজদারী আদালতের রায় শোনানো হল: তাদের আপন শহরের খোলা হাটে প্রথম তাদের চাবুক মারা হবে এবং তারপর সাইবেরিয়াতে কঠিন সশ্রম কারাদণ্ডে উভয়ের নির্বাসন। মার্চ মাসের এক ভোরবেলাকার নিদারুণ হিমের শীতে চাবুকদার কাতেরীনার অনাচ্ছাদিত দুগ্ধধবল পৃষ্ঠে আদালতের স্থির করা সংখ্যা গুনে গুনে চাবুকের ঘা মেরে মেরে নীল-লাল রঙের উঁচু ফুলে-ওঠা দগড়ার দাগ

তুললে। তারপর সের্‌গেই পিঠে কাঁধে তার হিস্তে পেল। সর্বশেষে তার সুন্দর মুখের উপর জ্বলন্ত লোহা দিয়ে তিনটি রেখা কেটে ভ্রাতৃহন্তা 'কেন্‌'-এর লাঞ্ছন অঙ্কন করে দিল।*

এসব ঘটনা ঘটার সময় আগা-গোড়া দেখা গেল, যে কোনো কারণেই হোক সের্‌গেই কিন্তু কাতেরীনার চেয়ে জনসাধারণের বেশী সহানুভূতি পেল। সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত অবস্থায় কৃষ্ণবর্ণ দণ্ডমঞ্চ থেকে নামবার সময় সে বার বার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, পক্ষান্তরে কাতেরীনা নেমে এল দৃঢ় পদক্ষেপে—তার একমাত্র দুশ্চিন্তা ছিল যাতে করে তার খসখসে শেমিজ আর কয়েদীদের কর্কশ কোটটা তার পিঠে সেঁটে না যায়।**

এমন কি জেল-হাসপাতালে যখন তাকে তার সদ্যোজাত শিশুকে দেখানো হল সে মাত্র এইটুকু বললে, 'আঃ, কে ওটাকে চায়?' কস্মিনকালেও গোঙরানো কাতরানোর একটি মাত্র শব্দ না করে, কস্মিনকালেও কারো বিরুদ্ধে কণামাত্র অভিযোগ না জানিয়ে সে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শক্ত তক্তার উপর বুকের ভার রেখে কুঁকড়ে পড়ে রইল।

॥ ১৩ ॥

সের্‌গেই ও কাতেরীনা অন্যান্য কয়েদীর সঙ্গে দল বেঁধে সাইবেরিয়ার উদ্দেশে বেরুলো বসন্ত ঋতুতে। পঞ্জিকায় সেটা বসন্ত ঋতু বলে লেখা আছে বটে, কিন্তু আসলে তখন সেই প্রবাদটাই সত্য যে, 'সূর্য আলোক দেন যথেষ্ট, কিন্তু গরমি দেন অতি অল্পই'।

---

* বাইবেলের প্রথম অধ্যায় 'সৃষ্টি পর্বে' বর্ণিত আছে, আদমের পুত্র কেন্‌ তার ভ্রাতা আবেলকে হত্যা করে; যেহেতু মানুষ মাত্রই একে অন্যের ভ্রাতা তাই খুনীর কপালে ছ্যাঁকা দিয়ে তিনটি চিরস্থায়ী লাঞ্ছন অঙ্কনের বর্বর প্রথা ইয়োরোপের প্রায় সর্বদেশেই উনবিংশ শতাব্দী অবধি প্রচলিত ছিল।

** অনুবাদকের মনে হয়, তার ভয় ছিল, কর্কশ উলের সুতো পিঠের ঘায়ে ঢুকে গেলে শুকোবার সময় সমস্ত পিঠের চামড়া অসমান হয়ে গিয়ে তার পিঠের মসৃণ সৌন্দর্য নষ্ট করবে। কিন্তু অতি অবশ্য মনে রাখা উচিত, সে শুধু তার বল্লভের ভোগের জন্য। আপন সৌন্দর্য নিয়ে কাতেরীনার নিজস্ব কোনো দম্ভ ছিল না—কাহিনীতে তার কোনো চিহ্ন নেই।

কাতেরীনার বাচ্চাটাকে বরিস তিমোতেইয়েভিচের সেই বুড়ি মামাতো বোনের হাতে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দেওয়া হল। কারণ সে দণ্ডিতা রমণীর নিহত স্বামীর আইনসম্মত সন্তান রূপে স্বীকৃত হল বলে এখন সে ইস্‌মাইলফ্‌ এবং ফেদিয়ার তাবৎ সম্পত্তির একমাত্র স্বত্বাধিকারী। এ ব্যবস্থাতে কাতেরীনা যথেষ্ট সন্তুষ্ট ছিল এবং বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিল পরিপূর্ণ তাচ্ছিল্যভরে। বহু অবাধ প্রণয়াবেগবিহ্বল রমণীর মত তার প্রেমও আপন দয়িতে অবিচল হয়ে রইল—দয়িতের সন্তানে সঞ্চারিত হল না।

আর শুধু বাচ্চাটার ব্যাপারেই নয়, সত্য বলতে কি, কাতেরীনার জীবনে এখন আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই, আলো নেই অন্ধকারও নেই ; না আছে অমঙ্গল না আছে মঙ্গল, দুঃখ নেই সুখও নেই, সে কিছুই বুঝতে পারে না, কাউকে ভালবাসে না—নিজেকে পর্যন্ত না। অস্থির হয়ে সে শুধু প্রতীক্ষা করছিল একটি জিনিসের : কয়েদীর দল রওয়ানা হবে কবে, কারণ তার হৃদয়ে তখন একমাত্র আশা, দলের ভিতর সে সের্‌গেইকে আবার দেখতে পাবে। আপন শিশুটির কথা ততদিনে সে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছে।

তার আশা তাকে ফাঁকি দিল না। মুখে 'কেন্‌'-এর লাঞ্ছন আঁকা, সর্বাঙ্গে ভারী শিকল বয়ে সের্‌গেইও রওয়ানা দিল তারই সঙ্গে একই ছোট দলটাতে।

যতই ঘৃণ্য হোক না কেন, মানুষ সর্ব অবস্থাতেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় এবং সর্ব অবস্থাতেই নিজ নিজ ক্ষুদ্র আনন্দের সন্ধান সাধ্যমত করে থাকে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার প্রয়োজন, কণা মাত্র প্রয়োজন, কাতেরীনার ছিল না। সে সের্‌গেইকে আবার দেখতে পাচ্ছে, এবং তার সঙ্গ পাওয়ার ফলে এই যে রাস্তা তাকে কঠিন কারাগারের নির্বাসনে নিয়ে যাচ্ছে সে-রাস্তাও তার কাছে আনন্দ-কুসুমে পুষ্পাচ্ছাদিত বলে মনে হতে লাগল।

কাতেরীনা তার ছিটের তৈরি ব্যাগে করে মূল্যবান জিনিস সঙ্গে নিয়েছিল অল্পই, এবং রোক টাকাকড়ি নিয়েছিল তার চেয়েও কম। এবং সে-সবও খর্চা হয়ে গেল নিজ্‌নি নফ্‌গরদ্‌* পৌছবার বহু পূর্বেই পাহারাওলাদের ঘুষ দিতে দিতে—যাতে করে সে রাস্তায় সের্‌গেইয়ের পাশে পাশে যেতে পারে, যাতে করে পথমধ্যে রাত্রি-যাপন আশ্রয়ের হিমশীতল এক কোণে, গভীর অন্ধকারে সে তার সের্‌গেইকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টাখানেক আলিঙ্গন করতে পারে।

ওদিকে কিন্তু কাতেরীনার 'কেন্‌'-মার্কা মারা বল্লভের হৃদয়ে কি জানি কি

* বিখ্যাত ঔপন্যাসিক মাক্‌সিম্‌ গর্কির নামে বর্তমান 'গর্কি'।

করে তার প্রতি স্নেহ-প্রেম শুকিয়ে গিয়েছে। কথা সে বলতো কমই, আর বললে মনে হত যেন আঁকশি দিয়ে কথাগুলো অতি কষ্টে টেনে টেনে বের করছে, আর এ-সব গোপন মিলনের মূল্য দিত সে অত্যল্পই—যার জন্য কাতেরীনাকে তার খাদ্য-পানীয়, আর তার আপন অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের জন্য যে-ক'টি সামান্য দু'চার পয়সা তার তখনো ছিল, সব-কিছু বিলিয়ে দিতে হত। এমন কি সের্‌গেই একাধিকবার বলতেও কসুর করলো না, 'ঐ যে অন্ধকার কোণে আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিচের 'ধুলো সরাবার' জন্য তুমি পাহারাওলাদের পয়সা দিচ্ছো সেগুলো আমাকে দিলেই পারো।'

মিনতিভরা কণ্ঠে কাতেরীনা বললে, 'আমি তো কুল্লে পঁচিশটি কপেক্ দিয়েছি, সেরেজেঙ্কা।'

'আর পঁচিশটি কপেক্ কি পয়সা নয়? পঁচিশটি কপেক্ কি রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া যায়? অতগুলো কপেক্ ক'বার পেয়েছ তুমি? ওদিকে ক'বার অতগুলো তুমি দিয়ে দিয়েছ, কে জানে।'

'কিন্তু ঐ করেই তো আমরা একে অন্যকে দেখতে পাই।'

'বটে? সেটা কি সহজ? ওতে করে আমরা কি আনন্দ পাই—এত সব নরক-যন্ত্রণার পর? আমার তো ইচ্ছে করে আমার জীবনটাকে পর্যন্ত অভিসম্পাত করি, আর এ ধরনের মিলনের উপর তো কথাই নেই।'

'কিন্তু সেরেজা, তোমাকে দেখতে পেলে আমার তো অন্য কোনো কিছুতেই এসে যায় না।'

'এসব ঘোর আহাম্মুকি।'—এই হল সের্‌গেইয়ের উত্তর।

এসব উত্তরে কাতেরীনা কখনো আপন ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে রক্ত বের করতো, আর কখনো বা নিশাকালীন মিলনের অন্ধকারে অশ্রুবর্ষণে অনভ্যস্ত তার সে দুটি চোখও তিক্ততার তীব্র বেদনায় ভরে যেত, কিন্তু সে সব-কিছু বরদাস্ত করে গেল, নীরবে যা ঘটার ঘটতে দিল, এবং নিজেকে নিজে ফাঁকি দিতে কসুর করলো না।

উভয়ের মধ্যে এই নূতন এক সম্পর্ক নিয়ে তারা নিজ্‌নি নফ্‌গরদ্ পৌঁছল। এখানে পৌঁছে তারা আরেক দল কয়েদীর সঙ্গে যোগ দিল—তারা এসেছে মস্কো অঞ্চল থেকে, যাবে ঐ একই সাইবেরিয়ায়।

নবাগত এই বিরাট বাহিনীর হরেক রকম চিড়িয়ার মাঝখানে, মেয়েদের দলে ছিল দুটি মেয়ে যারা সত্যই মনোযোগ আকর্ষণ করে। একটির নাম তিয়োনা, ইয়ারোস্লাভ্‌লের এক সিপাইয়ের স্ত্রী। এরকম চমৎকার কামবিলাসিনী মোহিনী

আর হয় না। সে লম্বা, আর আছে একমাথা চুলের ঘন কুন্তল বেণী, মদিরালস হরিদ্রাভ নয়ন, তার উপর নেমে এসে ছায়া দিচ্ছে নিবিড় আঁখিপল্লবের রহস্যময় অবগুণ্ঠন। অন্যটি সতেরো বছরের নিখুঁত খোদাই করা তরুণী। গায়ের বর্ণটি মোলায়েম গোলাপী, মুখটি ছোট্ট, কচি তাজা দুটি গালের উপর দুটি টোল, আর কয়েদীদের মাথা-বাঁধবার ছিটের রুমালের নিচে থেকে কপালে নেমে এসে এখানে ওখানে নাচছে ঢেউখেলানো সোনালি চুল। দলের সবাই তাকে সোনেৎকা নামে ডাকতো।

সুন্দরী রমণী তিয়োনার স্বভাবটি ছিল শান্ত, মদিরালস। দলের সবাই তাকে ভালো করেই চিনত, এবং তাকে জয় করতে সক্ষম হয়ে কোনো পুরুষই অত্যধিক উল্লাসভরে নৃত্য করতো না, কিংবা সে যখন তার তাবৎ কৃপাভিলাষীদের মস্তকে সমমূল্যের বিজয়-মুকুট পরিয়ে দিত তখন অত্যধিক শোকেও কেউ মোহ্যমান হত না।

পুরুষ-কয়েদীর দল মস্করার সুরে সমস্বরে বলতো, 'মেয়েদের ভিতর আমাদের তিয়োনা পিসি সব চেয়ে দরদী দিল্ ধরেন; কারো বুকে তিনি কস্মিনকালেও আঘাত দিতে পারেন না!'

সোনেৎকা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ঝোপের চিড়িয়া।

তার সম্বন্ধে তারা বলতো, 'যেন বান্ মাছ—পাক দেবে, মোচড় খাবে, কিন্তু কব্‌খনো শক্ত মুঠোয় ধরতে পারবে না।'

সোনেৎকার রুচি ছিল; চট্ করে যা-তা সে তো নিতই না, বরঞ্চ বলা যেতে পারে, বাড়াবাড়িই করতো। সে চাইতো কাম যেন তার সামনে ধরা হয় সাজসজ্জায়,—যেন সাদামাটা তরি-তরকারি তার সামনে না ধরে সেটা যেন তৈরি হয় তীক্ষ্ণ স্বাদের ঝাল-টকের সস্ দিয়ে,—কামে যেন থাকে হৃদয়দহন, আত্ম-ত্যাগ। আর তিয়োনা ছিল খাঁটি, নির্ভেজাল রুশ সরলতার নির্যাস। আর সে সরলতায় ভরা থাকতো এমনই অলসের আবেশ যে, কোনো পুরুষকে, 'কেন জ্বালাচ্ছো, ছেড়ে দাও আমাকে' বলবার মত উৎসাহ তার ছিল না। সে শুধু জানতো, সে স্ত্রীলিঙ্গের রমণী। এ জাতীয় রমণীকে বড়ই আদর করে ডাকাত-ডাকু, কয়েদীর দল আর পেতের্সবুর্গের সোশাল-ডেমোক্রাটিক গুষ্ঠী।

এই দুই রমণী সহ মস্কো থেকে আগত কয়েদীর দল যখন সের্‌গেই-কাতেরীনার দলের সঙ্গে মিলিত হল তখন এ দুটি রমণী নিয়ে এল কাতেরীনার জীবনে ট্রাজেডি।

দুই দলে সম্মিলিত হয়ে নিজ্‌নি থেকে কাজান রওয়ানা হওয়ার প্রথম দিন থেকেই সের্‌গেই কোনো প্রকারের ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় না করে উঠে পড়ে লেগে গেল সৈনিক বধূ তিয়োনার প্রণয়লাভের জন্য এবং স্পষ্টই বোঝা গেল কোনো প্রকারের অলঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক তার সামনে উপস্থিত হয়নি। অলসাবেশা তিয়োনা সের্‌গেইকে অযথা হতাশায় মন-মরা হতে দিল না—সে তার হৃদয়বশত কদাচ কোনো পুরুষকেই হতাশায় মন-মরা হতে দিত না। তৃতীয় কিংবা চতুর্থ রাত্রির আশ্রয়স্থলে সন্ধ্যার সময় কাতেরীনা ঘুষ দিয়ে তার সেরেজেচ্‌কার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করেছিল ; এখন সে নিদ্রাহীন চোখে প্রতীক্ষা করছিল, যে কোনো মুহূর্তে প্রহরী এসে আস্তে আস্তে তাকে নাড়া দিয়ে কানে কানে বলবে, 'ছুটে যাও! ঝটপট সেরে নিয়ো।' দরজা খুলে গেল, আর কে যেন, কোন্ এক রমণী তীরবেগে করিডর পানে ধাওয়া করলো ; দরজা আবার খুলে গেল, আবার আরেক রমণী তিলার্ধ নষ্ট না করে তার শোবার তক্তা থেকে লাফ দিয়ে উঠে প্রহরীর পিছনে অন্তর্ধান করলো ; অবশেষে কে যেন এসে তার সর্বাঙ্গ ঢাকা কর্কশ কোটে আস্তে আস্তে টান দিল। তৎক্ষণাৎ সে তার শোবার তক্তা থেকে লাফ দিয়ে উঠলো—তক্তাখানা কত না কয়েদীর গাত্র-ঘর্ষণে চিক্কণ-মসৃণ হয়ে গিয়েছে—কোটটা কাঁধের উপর ফেলে আস্তে আস্তে প্রহরীর গায়ে ধাক্কা দিল তাকে গন্তব্য-স্থল দেখিয়ে দেবার জন্য নিয়ে যেতে।

করিডরের মাত্র একটি জায়গায় অগভীর পিরিচের উপর ঢালাই মোমে প্রদীপের নিষ্প্রভ পলতেটি ক্ষীণ আলো দিচ্ছে। কাতেরীনা চলতে চলতে দু-তিনটি যুগল-মিলনের সঙ্গে ঠোক্কর খেল—গা মিলিয়ে দিয়ে তারা যতদূর সম্ভব অদৃশ্য হবার চেষ্টা করছিল। পুরুষদের ওয়ার্ড পেরিয়ে যাবার সময় কাতেরীনা শুনতে পেল তাদের দরজায় কাটা ছোট জানলার ভিতর দিয়ে চাপা হাসির শব্দ আসছিল।

পাহারাওলা বিড় বিড় করে কাতেরীনাকে বললে, 'হাসাহাসির রকমটা দেখছ?' তারপর তার কাঁধে ধরে একটা কোণের দিকে ঠেলে দিয়ে চলে গেল।

হাৎড়াতে গিয়ে কাতেরীনার একটা হাত পড়লো কর্কশ কোট আর দাড়ির উপর, দ্বিতীয় হাতটা স্পর্শ করলো কোন্ এক রমণীর গরম মুখের উপর।

সের্‌গেই নিচু গলায় শুধলে, 'কে?'

'কি, কি করছো তুমি এখানে? তোমার সঙ্গে এ কে?'

অন্ধকারে কাতেরীনা সজোরে তার সপত্নীর মাথা বাঁধার রুমালখানা ছিনিয়ে নিল। সেও সঙ্গে সঙ্গে তাকে এড়িয়ে দিল ছুট। করিডরে ধাক্কা খেয়ে পড়তে পড়তে সে বায়ুবেগে অন্তর্ধান করলো।

সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদের ওয়ার্ড থেকে উচ্চকণ্ঠে ফেটে উঠলো একশ' অট্টহাস্য!

কাতেরীনা ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, 'বদমাইশ', আর সের্‌গেইয়ের নবীন নাগরীর মাথা থেকে ছিনিয়ে নেওয়া রুমালের কোণ দিয়ে মারলো তার মুখে ঝাপটা। সের্‌গেই তার দিকে হাত তুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেও ইতিমধ্যে ছায়ার মত লঘুপদে করিডর দিয়ে ছুটে গিয়ে ধরেছে তার কুঠুরির হাতল। পুরুষদের ওয়ার্ড থেকে যে অট্টহাস্য তার পিছনে পিছনে ধাওয়া করেছিল সেটা আবার এমনি কলরবে ধ্বনিত হল যে, যে-পাহারাওয়ালাটা পিরিচের গালামোমের কাঁপা-কাঁপা বাতিটার সামনে বসে-সময় কাটাবার জন্য আপন বুটজুতোর ডগাটাকে লক্ষ্য করে মুখ থেকে থুথুর তীর ছুঁড়ছিল সে পর্যন্ত মাথা তুলে কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে উঠলো, 'চোপ্‌ ব্যাটারা!'

কাতেরীনা চুপচাপ শুয়ে পড়ে ভোর অবধি সামান্যতম নড়াচড়া না করে সেই রকমই পড়ে রইল। সে চাইছিল নিজেকে বলে, 'আমি তাকে আর ভালোবাসি নে' —আর অনুভব করছিল তাকে সে ভালোবাসে আরো গভীর ভাবে, আরো বেশী আবেগভরা উচ্ছ্বাসে। বার বার তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল সেই একই ছবি: তার ডান হাত অন্যটার মাথার নিচে থেকে থেকে কাঁপছে, তার বাঁ হাত চেপে ধরেছে অন্যটার কামাগ্নিতে জ্বলন্ত স্কন্ধদ্বয়।

হতভাগিনী কাঁদতে আরম্ভ করলো। নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে সর্ব দেহ-মন দিয়ে কামনা করতে লাগলো, ঐ সেই হাতটি যেন থাকে তার মাথার নিচে, সেই হাতটি যেন চেপে ধরে তার কাঁধ—হায়, সে কাঁধ এখন মৃগী রুগীর মত থেকে থেকে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠছে।

সেপাইয়ের বউ তিয়োনা তাকে ভোরবেলা জাগিয়ে দিয়ে বললে, 'তুমি অন্তত আমার রুমালখানা ফেরত দিতে পারো!'

'ও! তুমিই ছিলে তবে?'

'লক্ষ্মীটি, দাও না ফেরত!'

'কিন্তু তুমি আমাদের মাঝখানে আসছো কেন?'

'কেন, আমি কি করছি? তুমি কি ভেবেছো আমাদের ভিতর গভীর প্রণয়, না কি? না এমন কিছু সত্যি একটা মারাত্মক ব্যাপার যে যার জন্য তুমি রেগে টং হবে!'

কাতেরীনা একটুখানি চিন্তা করে বালিশের তলা থেকে আগের রাত্রের ছিনিয়ে নেওয়া রুমালখানা বের করে তিয়োনার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ ফেরালো।

তার হৃদয় হাল্কা হয়ে গেল।

আপন মনে বললে, 'ছিঃ! আমি কি এই রঙ-করা পিপেটাকে হিংসে করবো? চুলোয় যাক্ গে ওটা। তার সঙ্গে নিজেকে তুলনা করতেই আমার ঘেন্না ধরে।'

পরের দিন পথে যেতে যেতে সের্‌গেই তাকে বলতে লাগলো, 'শোনো, কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না, তোমাকে আমি কি বলতে চাই। দয়া করে তুমি তোমার মাথার ভিতর এই তত্ত্ব-কথাটি ভালো করে ঢুকিয়ে নাও তো যে, প্রথমত আমি তোমার জিনোভিই বরিসিচ্ নই, দ্বিতীয়ত তুমি এখন আর কোনো গেরেস্থারী সদাগরের বউ নও; সুতরাং মেহেরবানী করে এখন আর বড়মানষীর চাল মারবেন না। আমার ব্যাপারে আস্ত একটা পাঁঠির মত যত্রতত্র ঢুঁ মারলে সেটা আমি বরদাস্ত করবো না।'

এর উত্তরে কাতেরীনা কিছু বললো না এবং তারপর এক সপ্তাহ ধরে সে সের্‌গেইয়ের পাশে পাশে হাঁটলো বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটিমাত্র দৃষ্টি বা বাক্য-বিনিময় হল না। তাকেই করা হয়েছে আঘাত, তাই সে নিজের মর্যাদা বাঁচিয়ে তার এই—সের্‌গেইয়ের সঙ্গে তার এই—সর্বপ্রথম কলহ মিটিয়ে সমঝাওতা আনার জন্য তার দিকে এগিয়ে যেতে চাইল না।

এদিকে যখন সের্‌গেইয়ের প্রতি কাতেরীনার রাগ, ততদিনে সের্‌গেই কুন্দধবলা তন্বঙ্গী সোনেৎকার দিকে হরিণের মত কাতর নয়নে তাকাতে আরম্ভ করেছে এবং নর্মভরে তার হৃদয়-দুয়ারে প্রথম করাঘাত আরম্ভ করে দিয়েছে। কখনো সে তার সামনে নম্রতাভরে মাথা নিচু করে বলে, 'আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিবাদন' আর কখনো বা তার দিকে তাকিয়ে মধুর স্মিত হাস্য করে, আর পাশাপাশি এলে ছল করে তাকে হাত দিয়ে ঘিরে দেয় সোহাগের চাপ। কাতেরীনা সব-কিছুই লক্ষ্য করলো, আর তার বুকের ভিতরটা যেন আরো সিদ্ধ হতে লাগলো।

মাটির দিকে না তাকিয়ে যেন ধাক্কা খেতে খেতে এগুতে এগুতে কাতেরীনা তোলপাড় করতে লাগলো, 'কি জানি, তবে কি ওর সঙ্গে মিটিয়ে ফেলব্?' কিন্তু এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী বাধা দিতে লাগলো তার আত্মসম্মান—এগিয়ে গিয়ে মিটমাট করে ফেলতে। ইতিমধ্যে সের্‌গেই আরো নাছোড়বান্দা হয়ে

সেঁটে রইল সোনেৎকার পিছনে ; এবং সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, নাগালের বাইরের যে-সোনেৎকা এতদিন পাক দিতেন মোচড় খেতেন কিন্তু ধরা দিতেন না, এইবারে তিনি, যে কোন কারণেই হোক, হঠাৎ যেন পোষ মেনে নিচ্ছেন।

কথায় কথায় তিয়োনা একদিন কাতেরীনাকে বললে, 'তুমি আমাকে নিয়ে নালিশ করেছিলে না? কিন্তু আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করি নি। আমারটা ছিল আজ-আছে-কাল-নেই ধরনের দৈবাৎ ঘটে যাওয়ার একটা ব্যাপার ; এসেছিল, চলে গেল, মিলিয়ে গেল ; কিন্তু সাবধান, এই সোনেৎকাটার উপর নজর রেখো।'

কাতেরীনা মনস্থির করে আপন মনে বললে, 'জাহান্নমে যাক্ আমার এই আত্মসম্মান ; আজই আমি তার সঙ্গে মিটমাট করে ফেলব।' এবং তারপর ঐ একটিমাত্র চিন্তা নিয়ে পড়ে রইল, মিটমাট্ করে ফেলার জন্য সবচেয়ে ভাল কৌশলটা কি হবে?

কিন্তু কিছু করতে হল না ; সের্গেই নিজেই তাকে এই ধাঁধা থেকে বেরুবার পথ তৈরি করে দিল।

পরের আশ্রয়ে পৌঁছতেই সের্গেই কাতেরীনাকে ডেকে বললে, 'ল্ভভ্না, আজ রাত্রে এক মিনিটের তরে আমার কাছে এসো তো ; তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

কাতেরীনা চুপ করে রইল।

'কি হল? আমার উপর এখনো রেগে আছ নাকি? কথা বলবে না?'

কাতেরীনা এবারেও কোনো সাড়া দিল না।

কিন্তু পরের ঘাঁটির কাছে আসার সময় শুধু সের্গেই না, সবাই লক্ষ্য করলে যে, কাতেরীনা সর্দার পাহারাওলার চতুর্দিকে ঘুর ঘুর করছে, শেষটায় ভিক্ষায় পাওয়া* তার সতেরোটি কপেক্ সে সর্দারের হাতে গুঁজে দিল। মিনতিভরা কণ্ঠে তাকে বললে, 'আরো দশটা জমাতে পারলেই তোমাকে দেব।'

সর্দার পয়সা ক'টি আস্তিনের ভাঁজে লুকলো। বললে, 'ঠিক আছে।'

---

* আজকাল কি হয় অনুবাদকের জানা নেই, কিন্তু ১৯১৭-এর সমাজ বিবর্তের পূর্বের একাধিক লেখক এই মর্মস্পর্শী ভিক্ষার বর্ণনা দিয়েছেন। বৃষ্টি বরফে হুঁচোট হুমড়ি খেতে খেতে যখন এই সব হতভাগার দল সাইবেরিয়ায় আমৃত্যু নির্বাসনের দিকে এগুতো তখন বহু পরদুঃখকাতর গৃহী এমন কি ভিখারী আতুররাও এদের ভিক্ষে দিত। অনেক সময় অযাচিত ভাবে।

লেনদেন শেষ হয়ে গেলে সের্‌গেই 'ঘোৎ' করে খুশী প্রকাশ করে সোনেৎকার দিকে চোখের ইশারা মারলে।

ঘাঁটির সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে কাতেরীনাকে জড়িয়ে ধরে আর সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, 'ওগো, কাতেরীনা, লক্ষ্মীটি',—'শুনছিস ছোঁড়ারা, এর সঙ্গে তুলনা করতে পারি এমন মেয়ে তো সারা সংসারেও পাওয়া যায় না।'

কাতেরীনার মুখ লাল হয়ে উঠলো—আনন্দে সে তখন হাঁফাচ্ছে।

সন্ধ্যা হতে না হতেই নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল; একলম্ফে সে বেরিয়ে এল বললে কমই বলা হয়; তার সর্বাঙ্গ তখন ঘন ঘন শিহরিত হচ্ছে আর অন্ধকারে তার হাত সের্‌গেইয়ের সন্ধানে এখানে ওখানে খুঁজছে।

তাকে আলিঙ্গন করে আপন বুকে চেপে যেন দম বের করে সের্‌গেই বললে, 'আমার কেট্‌।'

চোখের জলের ভিতর দিয়ে কাতেরীনা উত্তর দিল, 'ওগো, আমার সর্বনাশের নিধি।' তার ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সে যেন ঝুলে রইল।

পাহারাওলা করিডরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি পাইচারি করতে করতে মাঝে মাঝে দাঁড়াচ্ছিল; বুটজুতোর ডগায় থুথুর তীর ছোঁড়া অভ্যাস করে ফের পাইচারি আরম্ভ করছিল; ক্লান্তিতে জীর্ণ কয়েদীরা দরজার ভিতরে নাক ডাকিয়ে যাচ্ছে; ঘর গরম করার স্টোভের নিচে কোথায় যেন একটা ইঁদুর কুট কুট করে কম্বল কাটছে; ঝিঁঝির দল একে অন্যের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রাণপণ চিৎকার করে যাচ্ছে—কাতেরীনা তখনো সপ্তম স্বর্গে।

কিন্তু হৃদয়াবেগ ভাবোচ্ছ্বাস স্তিমিত হল এবং রসকষহীন অনিবার্য বাক্যালাপ আরম্ভ হল।

করিডরের এক কোণে মেঝের উপর বসে সের্‌গেই নালিশ জানালে, 'আমি কী মারাত্মক যন্ত্রণায়ই না কষ্ট পাচ্ছি; পায়ের গোড়ালি থেকে হাঁটু অবধি হাড়গুলো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমায় পাগল করে তুলেছে।'

সের্‌গেইয়ের লম্বা কোটের ভিতর সোহাগভরে মাথা গুঁজে কাতেরীনা শুধলো, 'তা হলে কি করা যায়, সেরেজেশ্‌কা?'

'যদি না···কি জানি, হয়তো বা ওদের বলতে হবে, কাজানে পৌঁছলে আমাকে সেখানকার হাসপাতালে জায়গা করে দিতে। তাই করবো নাকি?'

'সে কি? কী যে বলছো, সেরেজা!'

'এ ছাড়া অন্য কি গতি আছে বলো; যন্ত্রণায় আমার যে প্রাণ যায়।'

'কিন্তু তা হলে তারা তো আমাকে আগে আগে খেদিয়ে নিয়ে যাবে, আর তুমি পড়ে রইবে পিছনে!'

'ঠিক কথা, কিন্তু আমি করি কি? আমি তোমাকে বললুম তো, পায়ের শিক্‌লি ঘষে ঘষে আমাকে যে মেরে ফেললে। শিকলিগুলো যেন ঘষতে ঘষতে আমার হাড়গুলোর ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। হয়তো বা কয়েকদিনের জন্য মেয়েদের লম্বা পশমের মোজা পরলে কিছু-একটা হয়।'

'লম্বা মোজা? আমার কাছে এখনো আনকোরা একজোড়া তো রয়েছে, সেরেজা!'

'তা হলে তো আর কথাই নেই।'

একটি মাত্র বাক্যব্যয় না করে কাতেরীনা ছুট দিয়ে ঢুকলো তার কুটুরিতে। শোবার তক্তার নিচের থেকে হাৎড়ে হাৎড়ে বের করলো তার ব্যাগটা। ফের ছুট দিল সের্‌গেইয়ের কাছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে নীল রঙের পুরু পশমের একজোড়া লম্বা মোজা; দুপাশে রঙিন সিল্কের মিহিন নক্‌শা জ্বল জ্বল করছে—বল্‌কফ্‌ শহরের তৈরি মোজা, এ মোজা তৈরি করেই সে শহর তার ন্যায্য খ্যাতি পেয়েছে।

কাতেরীনার শেষ মোজা জোড়াটি নিয়ে যেতে যেতে সের্‌গেই জোর দিয়ে বললে, 'এগুলো পরলে আর ভাবনা কি!'

কাতেরীনার কী আনন্দ! ফিরে এসে কঠিন তক্তায় অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল। শুনতেই পেল না, সে ফিরে আসার পর সোনেৎকা করিডরে বেরিয়ে গেল আর সেখানে সমস্ত রাত কাটিয়ে চুপে চুপে ভোরের ঠিক অল্প একটু আগে কখন ফিরে এল।

এ সমস্ত ঘটল কাজান পৌঁছবার দু ঘাঁটি পূর্বে।

॥ ১৫ ॥

ঘাঁটির বন্ধ গুমোট ঘরের দেউড়ি থেকে বেরুবামাত্রই কয়েদীদের রুদ্র অভ্যর্থনা জানালো শীতে জর্জর বৃষ্টি-বরফে মেশা অকরুণ দিবস। কাতেরীনা বেরিয়েছিল বুকে যথেষ্ট সাহস বেঁধে কিন্তু আপন সারিতে যোগ দেওয়া মাত্রই তার সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগলো, মুখের রঙ সবুজে পরিবর্তিত হয়ে গেল। তার চোখের সামনে বিশ্ব-সংসার অন্ধকার হয়ে গেল; তার প্রত্যেকটি হাড়ের জোড়া যেন তাকে ছুঁচের মত খোঁচাতে আরম্ভ করলো, যেন তার দুটি হাঁটু ভেঙে গেছে।—ঐ তার

সামনে সোনেৎকা দেমাক করে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে পায়ের নীল পশমের মোজা—তার উপরের সিল্কের মিহিন কাজ—কাতেরীনা কত না ভালো করেই চেনে!

কাতেরীনা চলতে লাগল—যেন তার সর্বাঙ্গের কোনো জায়গায় জীবন-রসের বিন্দুমাত্র আর অবশিষ্ট নেই। শুধু তার চোখ দুটো পূর্ণ জীবন্ত, চোখের কোটর থেকে বেরিয়ে এসে যেন ভয়াবহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সের্‌গেইয়ের দিকে—সে দৃষ্টি তাকে ছাড়ল না, এক পলকের তরেও না।

জিরোবার পরের ঘাঁটিতে পৌঁছানো মাত্রই কাতেরীনা শান্ত পদক্ষেপে সের্‌গেইয়ের কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে বললে, 'পিশাচ!' সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ সোজা তার চোখে থুথু ফেললে।

সের্‌গেই লাফ দিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু আর সবাই তাকে জোর করে ঠেকিয়ে রাখলো।

শুধু বললে, 'দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।'—আর হাত দিয়ে মুখ মুছলো।

আর-সবাই ব্যঙ্গ করে বললে, 'অতো রোয়াব কিসের, সেও তোমার মোকাবেলা করতে ডরায় না।' আর-সকলের ঠাট্টা-হাসির মাঝখানে সোনেৎকার কলহাস্য শোনালো বড়ই ফুর্তিতে ভরা।

সোনেৎকার সাহায্যে যে গোটা ষড়যন্ত্রটা গড়ে উঠেছিল সেটা এখন তার সম্পূর্ণ পছন্দমতই বিকশিত হচ্ছিল।

সের্‌গেই কাতেরীনাকে শাসালে, 'এত সহজে এর শেষ হবে না।'

জলঝড়ের ভিতর দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ক্লান্ত অবসন্ন, ছিন্নভিন্ন হৃদয় নিয়ে কাতেরীনা সে রাত্রিতে কয়েদীদের শক্ত বেঞ্চে ছেঁড়া তন্দ্রার ভিতর মোটেই টের পেল না, কখন দুটো কয়েদী মেয়েদের ওয়ার্ডে ঢুকলো।

ওরা ঢোকা মাত্রই সোনেৎকা তার বেঞ্চি থেকে গা তুলে নীরবে কাতেরীনাকে দেখিয়ে দিয়ে, ফের শুয়ে পড়ে কয়েদীদের লম্বা কোট দিয়ে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে নিল।

সেই মুহূর্তেই কে যেন কাতেরীনার লম্বা কোট তার গা থেকে তুলে নিয়ে মুখের উপর ছুঁড়ে ঢেকে দিল আর তার পিঠের সুদ্ধ মাত্র খসখসে শেমিজের উপর মোটা ডবল দড়ির শেষ প্রান্ত দিয়ে নির্মম চাষাড়ে বলপ্রয়োগ করে বেধড়ক চাবকাতে লাগলো।

কাতেরীনা চিৎকার করে উঠলো, কিন্তু মুখে-মাথায় জড়ানো কোটের ভিতর দিয়ে তার কণ্ঠস্বর বেরতে পারলো না। সে উঠে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু তাতেও ঐ একই অবস্থা—এক তাগড়া কয়েদী তার কাঁধের উপর বসে তার বাহু দুখানা জোরে চেপে ধরে রেখেছিল।

'পঞ্চাশ!' শেষ পর্যন্ত গুনে শেষ হল। কারোরই বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধা হল না, এটা সের্‌গেইয়ের গলা। দুই নিশাচর দোর দিয়ে অন্তর্ধান করলো।

কাতেরীনা কোট থেকে মাথা ছাড়িয়ে লাফ দিয়ে উঠলো; সেখানে কেউ নেই, কিন্তু অদূরে লম্বা কোটের নিচে কে যেন হাসছে, নির্মম ব্যঙ্গের ঘেন্না ঈর্ষার হাসি। কাতেরীনা সোনেৎকার হাসি চিনতে পারলো।

এ অপমান যে সর্ব-সীমানা পেরিয়ে গেল। আর সীমাহীন ঘৃণা যন্ত্রণা সেই মুহূর্তে কাতেরীনার অন্তরের অন্তস্তলকে যেন সিদ্ধ করতে লাগলো। মতিচ্ছন্ন পাগলের মত সে সমুখপানে ধেয়ে গেল, মতিচ্ছন্নের মত টলে পড়লো তিয়োনার বুকের উপর—পড়ার সময় সে তাকে তুলে ধরলো।

কাতেরীনা ঢলে পড়ল তিয়োনার বুকেব উপর। এই পূর্ণ উরসই কিছুদিন পূর্বে তারই বিশ্বাসঘাতক প্রেমিককে আনন্দ দিয়েছে পাপাত্মার কাম্য হেয় মাধুর্য দিয়ে। তারই উপর সে কেঁদে ভেঙে পড়ল তার অসহ বেদনার শোক নিয়ে। তারই সরলা কোমলা সপত্নীকে সে জড়িয়ে ধরলো, শিশু যে রকম মা'কে জড়িয়ে ধরে। এখন তারা দুজনাই এক সমান; দুজনাকে একই মূল্যে নামানো হয়েছে, দুজনাকেই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

দু'জনাই এক সমান···তিয়োনা—যার দিকে তার পয়লা খেয়াল গেল তার কাছেই যে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, আর কাতেরীনা—সে তার হৃদয়-নাট্যের শেষ দৃশ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু সত্য বলতে কি, এখন আর কোনো অবমাননা তার কাছে অবমাননা বলে মনে হয় না। তার চোখের জল শেষ করে সে এখন শক্ত হয়ে গিয়েছে, যেন সে পাথর হয়ে গিয়েছে, আর এখন সে কাঠের পুতুলের মত শান্ত হয়ে রোল্‌ কলে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলো।

ড্রাম বেজে উঠলো; দ্রম্‌-দ্রমাদম্‌-দ্রমাদম্‌-দ্রম্‌। শিকলে বাঁধা, শিকলহীন উভয় শ্রেণীর নিরানন্দ নিষ্প্রভ কয়েদীর দল যেন অদৃশ্য হস্তের ধাক্কা খেতে খেতে ঘাঁটির চত্বরে বেরিয়ে এল। সের্‌গেই আছে সেখানে, আর আছে তিয়োনা, সোনেৎকা, কাতেরীনা, আছে প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দণ্ডিত আদর্শ-বাদী এক কয়েদী—এক ইহুদির সঙ্গে শিকলে বাঁধা, একই শিকলে বাঁধা এক পোল আর তাতার।

প্রথম তারা একসঙ্গে জটলা করে দাঁড়িয়েছিল; পরে চলনসই রকমের শৃঙ্খলায় সারি বেঁধে তারা রওয়ানা দিল।

এরকম নিরানন্দ দৃশ্য বড়ই বিরল; পাঁচজনের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন,

উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হৃদয়ে যাদের কণামাত্র আশার ছায়াটুকু পর্যন্ত নেই—এরা কয়েকজন লোক কাঁচা রাস্তার হিমশীতল কালো কাদায় ডুবতে ডুবতে যেন এগিয়ে চলেছে। তাদের চতুর্দিকের সব-কিছু এমনি বিসদৃশ যে, আতঙ্কে মানুষের গা শিউরে ওঠে; অন্তহীন কাদামাটি, শিসার মত বিবর্ণ আকাশ, সর্বশেষ-পত্রবর্জিত নগ্ন সিক্ত উইলো গাছ—আর তাদের লম্বা লম্বা শাখায় বসে আছে উস্কোখুস্কো পালকসুদ্ধ দাঁড়কাকের দল। বাতাস কখনো গুমরে গুমরে ওঠে, তার কণ্ঠস্বর কখনো বা ক্রুদ্ধ, আর কখনো ছাড়ে তীব্র ক্রন্দন রব, আর কখনো বা ভীষণ হুঙ্কার।

এই বীভৎস দৃশ্য দৃশ্যের পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছে নরকের সেই গর্জন, যে-গর্জন মানুষের আত্মাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সে-গর্জনে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বাইবেলের মহাপুরুষ আইয়ুবের অভিসম্পাত—'ধ্বংস হোক সেই দিন যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করি', আর তাঁর প্রতি তাঁর স্ত্রীর উপদেশ: 'তোমার ভগবানকে অভিশাপ জানিয়ে মরে যাও।'

যারা এই উপদেশ-বাণীতে কর্ণপাত করে না, এ রকম বীভৎস অবস্থায় যাদের মনে মৃত্যু-চিন্তা প্রলোভনের চেয়ে ভয়ের সৃষ্টি করে বেশী—তাদের করতে হয় বীভৎসতর এমন কিছু যেটা এই আর্ত ক্রন্দনধ্বনির টুঁটি চেপে ধরে তাকে নীরব করে দেবে। এই তত্ত্বটি আমাদের নিত্যদিনের সাধারণ সাদামাটা সরল মানুষ উত্তমরূপেই হৃদয়ঙ্গম করতে জানে; এ রকম অবস্থায় সে লাগাম ছেড়ে তার নির্ভেজাল নীচ পাশবিক প্রবৃত্তিকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দেয়; সে তখন সাজতে যায় সঙ, নিজেকে নিয়ে আরম্ভ করে নিষ্ঠুর খেলা, অন্য পাঁচজন মানুষকে নিয়েও, তাদের কোমলতম হৃদয়ানুভূতি নিয়ে। এরা এমনিতেই অত্যধিক কোমল স্বভাব ধরে না—এ রকম অবস্থায় পড়ে তারা হয়ে যায় দ্বিগুণ পিশাচ।

* * *

কাতেরীনা-নিগ্রহের পরের দিন ভোরবেলা কয়েদীর দল যখন গ্রামের ভিতরকার ঘাঁটি ছেড়ে সবেমাত্র রাস্তায় নেমেছে তখন সেরগেই ইতর কণ্ঠে কাতেরীনাকে শুধলো, 'ওগো আমার পটের বীবী, সদাগরের ঘরণী—সম্মানিতা মহাশয়া সর্বাঙ্গীণ কুশলে স্বাস্থ্য উপভোগ করছেন তো?'

কথা ক'টা শেষ করেই সে তৎক্ষণাৎ সোনেৎকার দিকে ফিরে তাকে তার লম্বা কোটের এক পাশ দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে তার তীব্র কণ্ঠ তীব্রতর করে গেয়ে উঠলো:

'সোনালি চুলের কোমল মাথাটি দেখিনু জানালা দিয়া,
কুগ্রহ মোর,* ঘুমোও নি তুমি ? আবার ভাঙিবে হিয়া—!
বুকের ভিতর জড়ায়ে রাখিব মম গুণ্ঠনে, প্রিয়া।'

গানটা গাইতে গাইতে সের্‌গেই সোনেৎকাকে জড়িয়ে ধরে তামাম কয়েদীর পালের চোখের সম্মুখে তাকে সশব্দে চুম্বন করলো।

কাতেরীনা এসব দেখল, অথচ সত্যই যেন দেখতে পেল না। এমন অবস্থায় সে তখন পৌঁচেছে যেন প্রাণহীনা একটা পুতুল হেঁটে চলেছে আর সবাই তাকে খোঁচাতে আরম্ভ করেছে ; তাকে দেখাচ্ছে, সের্‌গেই কি রকম অশ্লীলভাবে সোনেৎকার সঙ্গে ঢলাঢলি লাগিয়েছে। সে তখন সকলের সর্বপ্রকার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বলির পাঁঠা।

যেন পিছন থেকে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে কাতেরীনা এগোচ্ছে। এ-অবস্থায়ও কেউ তাকে নিয়ে ঠাট্টা জুড়ে দিলে তিয়োনা মাঝখানে পড়তো ; বলতো, 'ছেড়ে দে না ওকে, পিচেশের দল, দেখছিস নে, ওর যে হয়ে এসেছে।'

এক ছোকরা কয়েদী যেন বাক্‌পটু হয়ে বললে, 'ওর ছোট্ট পা দু'খানি বোধ হয় ভিজে গিয়েছে।'

সের্‌গেই পাল্লা দিয়ে বললে, 'এ তথ্য সর্বজন-স্বীকৃত যে, আমাদের সম্ভ্রান্ত বণিক সম্প্রদায়ের মহিলাগণকে সাতিশয় সুকোমল ভাবে লালনপালন করা হয়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, তাঁর যদি একজোড়া গরম বীবীয়ানীর মোজা থাকতো তাহলে হাঙ্গামা কমে যেত।'

কাতেরীনা যেন গভীর নিদ্রা থেকে সাড়া দিল, জেগে উঠলো।

গুঁতোতে গুঁতোতে তাকে যেন সহ্যের সীমানার ওপারে ঠেলে দেওয়া হয়েছে —'ঘাসেতে লুকনো জঘন্য সাপ তুমি ! ঠাট্টা করে হাসো আমাকে নিয়ে—ইতর বদমায়েশ—হাসো, আরো হাসো !'

'কি বলছেন আপনি, সদাগরের পটের বীবী ! আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করার কোনো মৎলবই আমার নেই। আসলে সোনেৎকা হেথায় যখন সত্যই এত সুন্দর মোজা বিক্রি করছে, তখন ভাবলুম—কেন, দোষ করেছি নাকি ?

---

* যে রাত্রে সের্‌গেই ফাঁকি দিয়ে কাতেরীনার কাছ থেকে মোজা জোড়াটি আদায় করে, তখন কাতেরীনা তাকে 'আমার সর্বনাশের নিধি' বলে সোহাগ করেছিল। এখানে সেটা 'কুগ্রহ মোর'। কাতেরীনাকে সেই সোহাগ স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই সের্‌গেই বিশেষ করে এই গানটাই ধরলো।

আমাদের সদাগরের বেগম সায়েবা হয়তো একজোড়া কিনলেও কিনতে পারেন।'

প্রচুর হাস্যধ্বনি উঠলো। দম দেওয়া কলের মত কাতেরীনা সামনের দিকে পা ফেললো।

আবহাওয়া ক্রমাগত আরো খারাপ হচ্ছে। এতদিন যে ধূসর মেঘ আকাশ ঢেকে রেখেছিল এখন তার থেকে নেমে এল স্তরে স্তরে ভেজা-বরফের পাঁজ। মাটি ছোঁয়া মাত্রই এরা গলে গিয়ে রাস্তার কাদার গর্তকে করে দেয় আরো গভীর,—সেটাকে ঠেলে ঠেলে পা চালানো করে দেয় আরো অসহ্য কঠিন কঠোর। অবশেষে সম্মুখে দেখা দিল শিসার রঙের একটা রেখা। সে রেখার অন্য তীর চোখে ধরা পড়ে না। এই রেখাটি ভল্‌গা নদী। অল্প অল্প জোর হাওয়া ভল্‌গার উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বড় বড় কাটা কাটা ঢেউ সামনে পিছনে খেদিয়ে নিয়ে চলেছে।

সর্বাঙ্গ জবজবে ভেজা, শীতে কাঁপতে কাঁপতে কয়েদীর দল আস্তে আস্তে ঘাটে পৌঁছে খেয়ার বিরাট কাঠের ভেলার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

কালো ভেলার কাঠ থেকে জল ঝরছে। পাড়ে এসে ভিড়তে প্রহরীরা কয়েদীদের ভেলাতে ওঠবার ব্যবস্থা করতে লাগলো।

সর্বত্র ভেজা বরফের পোচ মাখা ভেলা ঘাট ছেড়ে উন্মত্ত নদীর ঢেউয়ের উপর দোলা খেতে লাগলো। ভেলা ছাড়ার সময় কয়েদীদের একজন বললে, 'কারা সব বলাবলি করছিল, ভেলাতে কার কাছে যেন বিক্রির জন্য ভদ্‌কা শরাব আছে।'

সের্‌গেই বললে, 'সত্যি বলতে কি, সামান্য কোনো মাল দিয়ে গলার নালিটা ভেজাবার এই সুযোগটা হারানো বড্ডই পরিতাপের বিষয় হবে।' সোনেৎকার ফুর্তির জন্য সে তখন কাতেরীনাকে বিদ্রূপের খোঁচা দিয়ে উৎপীড়ন করতে শুরু করেছে—'আপনি কি বলেন, আমাদের সদাগরের পটের বীবী? পুরনো বন্ধুত্বের খাতিরে এক পাত্তর ভদ্‌কা দিয়ে আমাদের চিত্তবিনোদন করলে কি রকম হয়? আহা, কিপ্‌টেমি করবেন না। স্মরণ করো, প্রিয়তমা, আমাদের অতীতের প্রেমের কথা! আমি আর তুমি—ওগো, আমার জীবনের আনন্দময়ী, তোমাতে আমাতে দুজনাতে কত না দীর্ঘ শরৎ-হেমন্তের রাত কাটিয়েছি পাশাপাশি বসে, তোমাতে আমাতে কত না আনন্দে সময় কাটিয়েছি কত না হেলা-ফেলায়; কেবলমাত্র তোমাতে আমাতে দুজনাতে মিলে তোমার প্রিয় আত্মীয়-আত্মজনকে ওপারের চিরশান্তিতে পাঠিয়েছি—একটিমাত্র পাদ্রীপুরুতের কণামাত্র সাহায্য না নিয়ে।'

শীতে কাতেরীনার সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছিল। সে-শীত তার জবজবে ভেজা কাপড়-জামা ভেদ করে তার অস্থি-মজ্জা পর্যন্ত পৌঁচচ্ছিল···তার উপর আরো কি যেন কি একটা তার সর্বসত্তা আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল। তার মাথা জ্বলছিল···

সত্যই যেন তার ভিতরে আগুন ধরানো হয়েছে…তার চোখের মণি অস্বাভাবিক রকমে বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছে, এক অদ্ভুত তীক্ষ্ণ জ্যোতি এসে সে মণির এখানে ওখানে নাচছে, আর তার দৃষ্টি ঢেউয়ের দোলার দিকে নিশ্চল নিবদ্ধ।

সোনেৎকার গলা ছোট্ট একটি রুপোর ঘণ্টার মত রিনিঝিনি করে উঠলো, 'মাইরি বলছি, এক ফোঁটা ভদ্‌কা পেলে আমি বেঁচে যেতুম ; এ শীতটা যে আমি কিছুতেই সইতে পারছি নে।'

সের্‌গেই ক্রমাগত খোঁচা দিয়ে যাচ্ছিল, 'আসুন না, আমার সদাগরের বেগম, আমাদের একটু খাইয়েই দিন না।'

ভৎর্সনা-ভরা মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে তিয়োনা বললে, 'ছিঃ! তুমি আবার কেন? বিবেক বলে কি তোমার কোনো বস্তু নেই?'

ছোকরা কয়েদী গর্দিউশ্‌কা তার সাহায্যে নেমে বললো, 'সত্যি, এসব ভালো হচ্ছে না।'

'ওর সম্বন্ধে তোমার বিবেকে না বাধলেও, অন্তত আর পাঁচজনের সামনে তোমার হায়া-শরম থাকা উচিত।'

সের্‌গেই তিয়োনার দিকে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, 'তুই মাগী বিশ্বতোষক! তুই আর তোর বিবেক! তুই কি সত্যি ভাবিস ওর জন্যে আমাকে আমার বিবেক খোঁচাবে? কে জানে, আমি আদপেই তাকে কখনো ভালোবেসেছিলুম কি না, আর এখন—এখন তো সোনেৎকার ছেঁড়া চটিজুতোটি পর্যন্ত ঐ চামড়া-ছোলা বেড়ালটার জঘন্য মুখের চেয়ে আমার ঢের বেশী ভালো লাগে। কিছু বলছো না যে? শোনো, আমি কি বলি। সে বরঞ্চ ঐ বাঁকামুখো গর্দিউশ্‌কাটার সঙ্গে পীরিত করুক ; কিংবা—' এবারে সে সন্তর্পণে চতুর্দিক দেখে নিয়ে হিজড়েপানা, ফেল্‌টের জোব্বা-পরা, মাথায়-ঝুঁটিদার-মিলিটারী-টুপিওলা, কয়েদীদের ঘোড়-সওয়ার অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তার চেয়েও ভালো হয় যদি দলের ঐ বড় অপিসারের সঙ্গে জুটে যায়—আর কিছু না হোক্ ঐ জোব্বার নিচে সে বৃষ্টিতে ভিজবে না।'

আবার সোনেৎকার গলা ছোট্ট একটি ঘণ্টার মত রিনিঝিনি করে উঠলো, 'আর, তখন সবাই তাকে অপিসারের বীবী বলে ডাকবে।'

ফোড়ন দিয়ে সের্‌গেই বললে, 'একদম খাঁটি কথা…আর এক জোড়া মোজার জন্য তার কাছ থেকে পয়সা যোগাড় করাটা হবে ছেলে-খেলা!'

কাতেরীনা আত্মপক্ষ সমর্থন করল না ; সে আরো স্থির অবিচল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ঢেউগুলোর দিকে, শুধু তার ঠোঁট দুটি নড়ছে। সের্‌গেইয়ের

জঘন্য কুবাক্যের ভিতর দিয়ে তার কানে আসছিল নদীর উত্তাল তরঙ্গের জৃম্ভন-বিজড়নের বিক্ষোভিত ধ্বনি, যন্ত্রণাসূচক আর্তরব। হঠাৎ একটা ঢেউ বিরাট হাই তুলে ভেঙে পড়ার সময় তার মাঝখানে কাতেরীনার সামনে দেখা দিল বরিস্ তিমোতেইয়েভিচের বিবর্ণ মুখ, আরেকটার মাঝখান থেকে উঁকি মেরে তাকালো তার স্বামী, তারপর সে ফেদিয়াকে কোলে নিয়ে ডাইনে বাঁয়ে দুলতে লাগলো—ফেদিয়ার অবশ্য মাথা ঢলে পড়েছে। কাতেরীনা তার দেবতার উদ্দেশে কোনো প্রার্থনা স্মরণে আনবার চেষ্টা করে ঠোঁট নাড়ালো, কিন্তু ক্ষীণস্বরে বেরিয়ে এল, 'তোমাতে আমাতে দুজনাতে কত না দীর্ঘ শরৎ-হেমন্তের রাত কাটিয়েছি পাশাপাশি বসে, তোমাতে আমাতে কত না আনন্দে সময় কাটিয়েছি কত না হেলাফেলায় ; এই বিরাট বিশ্ব থেকে তোমাতে আমাতে মানুষ ওপারে পাঠিয়েছি নিষ্ঠুর মৃত্যুর ভিতর দিয়ে।'

কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না কাঁপছিল। তার দৃষ্টি এদিক ওদিক ছুটোছুটি ছেড়ে ক্রমেই একটি বিন্দুতে নিবদ্ধ হয়ে আসছিল। সে দৃষ্টি পাগলিনীর মত। দু-একবার তার হাত দু'খানি মহাশূন্যের দিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে উঠে আবার পড়ে গেল। আরেক মিনিটকাল অতীত হল—হঠাৎ তার সমস্ত শরীর সামনে পিছনে দুলতে আরম্ভ করলো ; একবার এক মুহূর্তের তরেও তার দৃষ্টি কালো একটা ঢেউয়ের থেকে না সরিয়ে সে সামনের দিকে নিচু হয়ে সোনেৎকার পা দু'খানি চেপে ধরে এক ঝটকায় ভেলার পাশ ডিঙিয়ে তাকে সুদ্ধ নিয়ে ঝাঁপ দিল নদীর তরঙ্গে।

বিস্ময়ে সবাই যেন পাথর হয়ে গিয়েছে।

একটা ঢেউয়ের চূড়ায় কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না দেখা দিয়ে আবার তলিয়ে গেল ; আরেকটা ঢেউ সোনেৎকাকে তুলে ধরলো।

'নৌকোর আঁকশিটা! নৌকোর আঁকশিটা ছুড়ে দাও!'—ভেলা থেকে সমস্বরে চিৎকার উঠলো।

লম্বা দড়িতে বাঁধা নৌকার ভারী আঁকশিটা শূন্যে ঘোরপাক খেয়ে জলের উপর পড়ল। সোনেৎকা আবার জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। ভেলার পিছনকার স্রোতের টানে জলের নিচে অদৃশ্য অবস্থায় দ্রুতবেগে পিছিয়ে পড়ে সোনেৎকা দু সেকেণ্ড পরে আবার উপরের দিকে তার দু'বাহু উৎক্ষেপ করলো ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কাতেরীনা আরেকটা ঢেউয়ের উপরে প্রায় কোমর পর্যন্ত জলের উপর তুলে সোনেৎকার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো—দৃঢ় বর্ষা যে রকম ক্ষুদ্র মৎস্য-শাবকের ক্ষীণ প্রতিরোধ উপেক্ষা করে তাকে ভেদ করে চেপে ধরে।

দু'জনার কেউই আর উপরে উঠলো না।

দু-হারা

নূর-ই-চশ্‌ম্‌

শ্রীমান সৈয়দ জগলুল আলীর

করকমলে—

দু-হারা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বরোদার বিখ্যাত মহারাজা সয়াজী রাওয়ের কাছে আমি চাকরি নিয়ে যাই। শহরের আকার ও লোকসংখ্যা গুজরাতের অন্যান্য শহরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু স্বাধীন রাজ্য বলে ছোটখাটো মিউজিয়াম, তোষাখানা, চিড়িয়াখানা, রাজপ্রাসাদ, পালপরবে গাওনা-বাজনা এবং আর পাঁচটা জিনিস ছিল বলে একদিক দিয়ে দেখতে গেলে পাশের ধনী শহর আহমদাবাদের তুলনায় এর আপন বৈশিষ্ট্য ছিল।

আজ আর আমার ঠিক মনে নেই, মহারাজা নিজে মদ না খেলেও তাঁর ক'টি ছেলে দিবারাত্র বোতল সেবা করে করে বাপ-মায়ের চোখের সামনে মারা যান। ওঁদের মদ খাওয়া বন্ধ করার জন্য কিছুদিনের তরে তিনি তাবৎ বরোদা শহর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ড্রাই করে দেন, কিন্তু তাতেও কোনো ফলোদয় হয় নি। শেষ পর্যন্ত বাকি ছিলেন একমাত্র ধৈর্যশীল রাও। এঁকেও সাদা চোখে বড় একটা দেখা যেত না।

মহারাজার বড় ছেলের ছেলে—তিনিই তখন যুবরাজ—প্রতাপসিং রাও-ও প্রচুর মদ্যপান করতেন—এ নিয়ে বুড়া মহারাজার বড়ই দুঃখ ছিল—কিন্তু নাতি তখনো দু'কান কাটা হয়ে যান নি। রাজা হওয়ার পর তিনিও সম্পূর্ণ বেসামাল হয়ে গেলেন এবং ভারত স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর তিনি আকাট মূর্খ ইয়ারবক্সীর প্ররোচনায় ভারতের সঙ্গে লড়াই করতে চেয়েছিলেন! তিনি গদীচ্যুত হওয়ার পর তাঁর ছেলে ফতেহ্ সিং রাও মহারাজা উপাধি পান—এবং বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে সংযুক্ত বলে অনেকেই তাঁকে চেনেন। শুনেছি, মানুষ হিসেবে চমৎকার।

কিন্তু এসব অনেক পরের কথা।

বুড়া মহারাজার মদ্যের প্রতি অনীহা ছিল বলে বরোদা শহরে সংযমের পরিচয় পাওয়া যেত—বিশেষ করে যখন অন্যান্য নেটিভ স্টেটে মদ্যপানটাই সবচেয়ে বড় রাজকার্য বলে বিবেচনা করা হত, ও প্রজারাও যখন রাজাদর্শ অনুকরণে পরাঙ্মুখ ছিল না।

কিন্তু বুড়া মহারাজা বিস্তর বিলাতফের্তা যোগাড় করেছিলেন বলে প্রায়ই কারো না কারো বাড়িতে পার্টি বসত। দু-এক জায়গায় যে মদ নিয়ে বাড়াবাড়ি হত না, সে কথা বলতে পারি নে। তবে সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করতো গৃহকর্তার আপন সংযমের উপর।

এরই দু-একটা পার্টিতে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়। ভুল বললুম, পরিচয় হয়। কারণ এ রকম স্বল্পভাষী লোক আমি জীবনে কমই দেখেছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি চুপ করে বসে থাকতেন এক পাশে, এবং অতিশয় মনোযোগ সহকারে ধীরে ধীরে গেলাসের পর গেলাস নামিয়ে যেতেন। কিন্তু বানচাল হওয়া দূরে থাক, তাঁর চোখের পাতাটিও কখনো নড়তে দেখি নি। আমি জানতুম, ইনি বন্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বছর দশেক পূর্বে ডক্টরেট পাশ করে বরোদায় ফিরে এসে উচ্চতর পদে বহাল হন। আমিও বন্ থেকে বছর তিনেক পূর্বে পাশ করে আসি ও তিনি যে-সব গুরুর কাছে পড়াশোনা করেছিলেন আমিও তাঁদের কয়েক-জনের কাছে বিদ্যার্জন করার চেষ্টা করি। আমি তাই আশা করেছিলুম তিনি অন্তত আমার সঙ্গে দু-চারিটি কথা বলবেন—বন্ বিশ্ববিদ্যালয়, তাঁর সহপাঠী, তাঁর আমার উভয়ের গুরু, রাইন নদী, শহরের চতুর্দিকের বন-নদী-পাহাড়ের পিকনিক নিয়ে তিনি পুরানো দিনের স্মৃতি ঝালাবেন, নিদেন দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। আমি দু-তিনবার চেষ্টা দিয়ে দেখলুম, আমার পক্ষে তিনি বন্ থেকে পাশ না করে উত্তর মেরু থেকে পাশ করে থাকলে একই ফল হত। সাপের খোলসের মত তিনি বন্ শহরের স্মৃতি কোন্ আঁস্তাকুড়ে নির্বিকার চিত্তে ফেলে এসেছেন। আমি আর তাঁকে ঘাঁটালুম না।

এর পর কার্যোপলক্ষে আমি এক-আধবার তাঁর দফতরে যাই। এক্ষেত্রেও তদ্বৎ। নিতান্ত প্রয়োজন হলে বলেন ইয়েস, নইলে জিভে ক্লোরোফরম মেখে নিয়ে নিশ্চুপ।

বাড়ি ফিরে এসে তাঁর থীসিসখানা যোগাড় করে নিয়ে পড়লুম। অত্যুৎকৃষ্ট জর্মনে লেখা। নিশ্চয়ই কোনো জর্মনের সাহায্য নিয়ে। তা সে আমরা সবাই নিয়েছি এবং এখনো সর্ব অজর্মনই নিশ্চয়ই নেয়, কিন্তু ইনি পেয়েছিলেন সত্যকারের জউরির সাহায্য। তবে তিনি এখন কতখানি জর্মন বলতে এবং বুঝতে পড়তে পারেন তার হদিস পেলুম না। কারণ বরোদায় আসে অতি অল্প জর্মন, তারাও আবার ইংরিজি শেখার জন্য তৎপর। তদুপরি তৃতীয় ব্যক্তির সাক্ষাতে দেখা হলে এবং সে যদি জর্মন না জানে তবে তার অজানা ভাষায় কথা বলাটা বেয়া-দবিও বটে। এতাবৎ হয়তো তাই শ্রীযুত কাণের সামনে জর্মন বলার কোনো অনিবার্য পরিস্থিতি উপস্থিত হয় নি।

এর পরে আরো দু' বৎসর কেটে গেছে ঐ একই ভাবে। তবে ইতিমধ্যে আমার সর্বজ্ঞ বন্ধু পার্সী অধ্যাপক সোহরাব ওয়াডিয়া আমাকে বললেন, আপন অন্তরঙ্গ জাতভাইদের সঙ্গে নিভৃতে তিনি নাকি জিভটাতে লুব্রিকেটিং তেল ঢেলে

দেন এবং তখন তাঁর কথাবার্তা নাকি flows smoothly like oil, রসনার উপর অন্যত্র তাঁর সংযম অবিশ্বাস্য।

এই দু' বছর কাটার পর আমার হাতে ফোকটে কিঞ্চিৎ অর্থ জমে যায়। দয়াময় জানেন সেটা আমার দোষ নয়। সে যুগে বরোদায় খরচ করতে চাইলেও খরচ করার উপায় ছিল না। ওদিকে জর্মনিতে হিটলারের নাচন-কুদন দেখে অন্তত আমার মনে কোনো সন্দ রইল না, তাঁর ওয়াল্‌ট্‌স্‌ নাচ এবারে জর্মনির গণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরেও গড়াবে। এবং সেটা আকছারই গড়ায় প্রতিবেশী ফ্রান্সের আঙিনায়। দুই দেশেই আমার বিস্তর বন্ধু। এইবেলা তাহলে তাদের শেষ দর্শনে যাই। ১৯১৮ সালে জর্মনরা আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ করে ও রণাঙ্গনে গ্যাসও চালায়। এবারে শুরুই হবে ওসব দিয়ে—অনেক দূরপাল্লার বোমারু এবং জঙ্গী বিমান নিয়ে, তীব্রতর বিষাক্ত গ্যাস নিয়ে। ধুন্দুমার শেষ হলে আমার ক'জন বন্ধু যে আস্ত চামড়া নিয়ে বেরিয়ে আসবেন বলা কঠিন।

১৯৩৮-এর গরমিকালে ভেনিস মিলান হয়ে বন্‌ শহরে পৌঁছলুম। জাহাজে বিশেষ কিছু লক্ষ্য করবার ফুরসৎ পাই নি। প্রথম দিনেই আলাপ হয়ে যায় এক ফ্রেঞ্চ ইণ্ডোচায়নার তরুণীর সঙ্গে। অপূর্ব সুন্দরী। 'অপূর্ব' বললুম ভেবেচিন্তেই। আমার নিজের বিশ্বাস—এবং আমার সে-বিশ্বাসে আমার এক বিশ্বপর্যটক বন্ধু সোৎসাহে সায় দেন—দোআঁসলা রমণীরা সৌন্দর্যে সব সময়ই খাঁটিকে হার মানায়। পার্টিশনের পরের কথা বলতে পারি নে, কিন্তু তার পূর্বে কলকাতার ইলিয়ট রোড, ম্যাকলাউড স্ট্রীটের যে অংশে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সুন্দরীদের হাট বসতো—খারাপ অর্থে নেবেন না—সে রকমটা আমি প্যারিস ভিয়েনা কোথাও দেখি নি।

কিন্তু এ তো গেল আর্যে আর্যে সংমিশ্রণ। কিন্তু ইণ্ডোচায়নায় ফ্রেঞ্চ আর্য রক্ত ও চীনা মঙ্গোলিয়ান রক্তে সংমিশ্রণ। এ জিনিস আমার কাছে 'অপূর্ব' বলে মনে হয়েছিল। শুধু আমার কাছে নয়, অন্য অনেকেরই কাছে। কিন্তু হলে কি হয়, পানির দেবতা বদর্‌ পীর আমার প্রতি বড্ডই মেহেরবাণী ধরেন—সপত্নদের কেউই একবর্ণ ফরাসী বলতে পারেন না। আমি যে অত্যুত্তম ফরাসী বলতে পারি তাও নয়। কিন্তু কথায় আছে, 'শয়তানও বিপদে পড়লে মাছি ধরে ধরে খায়।' তরুণী যাবেন কোথায়! জাহাজে অবশ্য দু-একটি পাঁড় টুরিস্ট ছিলেন যাঁরা ফরাসী জানেন, কিন্তু পাঁড় টুরিস্ট হতে সময় লাগে—বয়সটা ততদিন কিছু চুপ করে দাঁড়িয়ে যাত্রাগান দেখে না—পাঁড় টুরিস্ট হয় বুড়ো-হাবড়া। ওদিকে সুভাষিত আছে, 'বৃদ্ধার আলিঙ্গন অপেক্ষা তরুণীর পদাঘাত শ্রেয়।'

প্রবাদটা উল্টো দিক থেকেও আকছারই খাটে। আমার তখন তরুণ বয়স, তদুপরি আমি বাঙলা দেশের লোক—গায়ে বেশ কিছুটা চীনা-মঙ্গোল রক্ত আছে। তরুণীর সেটা ভারী পছন্দ হয়েছে—বলতেও কসুর করলেন না।

আমার তখন এমনই অবস্থা যে ওঁর সঙ্গে পৃথিবীর অন্য প্রান্ত অবধি যেতে পারি। অবশ্য জানি, পৃথিবীটা গোল—আবার মোকামে ফিরে আসবো নিশ্চয়ই, এই যা ভরসা।

ভেনিস পৌঁছে জানা গেল, এ জাহাজ পৃথিবীর অন্য প্রান্ত অবধি যায় না। ইনি শুধু মাকু মারেন ইতালি ও বোম্বাইয়ের মধ্যিখানে। আমাদের মধ্যে প্রেম হয়েছিল গভীর, কিন্তু ব্যাডমিণ্টনের শাটল কক্ হতে যতখানি প্রেমের প্রয়োজন ততখানি তখনো হয়ে ওঠে নি। আসলে সব কিছু ভণ্ডুল হয়ে গিয়েছিল সফরটা তেরো দিনের ছিল বলে। তেরো সংখ্যাটা অপয়া। বারো কিংবা চোদ্দ দিনের হলে হয়তো একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেত। ভেনিস বন্দরে সজল নয়নে আমরা একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিলুম। আমার যেসব সপত্নরা (আজকের দিনের ভাষায় পুংসতীন) ফরাসী জানতো না বলে বিফল মনোরথ হয়েছিল তাদের মুখে পরিতৃপ্তির স্মিতহাস্য ফুটে উঠেছিল। বিদ্যেসাগর মশাই নাকি মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারলে উল্লাস বোধ করতেন; জানি নে তিনি কখনো এমন হাসি দেখেছেন কি না যেটা দেখলে মানুষের মাথায় খুন চাপে।

ব্রেন্নার পাস, অস্ট্রিয়া হয়ে জর্মনিতে ঢুকলুম। বন্ শহরে পৌঁছলুম সন্ধ্যার সময়।

বন্ প্রাচীন দিনের গলি-ঘুঁচির শহর। একে আমি আপন হাতের উল্টো পিঠের চেয়েও ভাল করে চিনি। মালপত্র হোটেলে নামিয়ে বেরিয়ে পড়লুম প্রাচীন দিনের সন্ধানে।

ওই তো সামনে হান্‌সেন্ রেস্তোরাঁ। দেখি তো, আমার দোস্ত বুড়ো ওয়েটার হান্‌স্ এখনো টিঁকে আছে কি না। যেই না ঢোকা, হান্‌সের সঙ্গে প্রায় হেড্-অন্ কলিশন। বুড়ো হান্‌স্ বাজিকর। দু-হাতে সে একসঙ্গে পাঁচ প্লেট—দু-হাতে চার প্লেট, পঞ্চমটা এই চারটের মধ্যিখানে, উপরে—সুপ রান্নাঘর থেকে খাবার ঘরে তার চিরপ্রচলিত পদ্ধতিতে নিয়ে আসছিল। কোনোগতিকে সামলে নিয়ে হুঙ্কার দিলে, 'ওই রে, আবার এসেছে সেই কালো শয়তানটা!' আমি বললুম, 'তোর জান নিতে।' 'হিটলার তোর জান নেবে—তুই ইহুদি!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে সেই লোকটার কথা ভাবলুম, যে দুঃখ করে বলেছিল, 'হায় মা, টাক তো দিলি, কিন্তু "ক"-এর সঙ্গে "আ"কারটা দিতে ভুলে গেলি।' আমি বললুম, 'ইহুদির কালো চুল দিলি, মা, কিন্তু তার পকেটের রেস্তটা দিতে

ভুলে গেলি।' হান্‌স্‌কে শুধালুম, 'তোমার ডিউটি কটা অবধি?' 'নটা।' 'তাহলে "কাইজার কার্লে" এসো নটায়।' 'কেন? আমেরিকায় পয়সাওলা কাকা মারা গেছে নাকি?' 'না, কোলারে।' 'সে আবার কোথায়?' 'ভারতবর্ষে সোনার খনি।' 'ওঃ! তাহলে একটা গোল্ড-ডিগার সঙ্গে নিয়ে আসবো।'

'গোল্ড-ডিগার' মানে যে-সব খাবসুরৎ মেয়ে প্রেমের অভিনয় করে আপনার মনি-ব্যাগটি ফাঁকা করতে সাহায্য করে। আপনারই উপকারার্থে। পোকা লাগার ভয়ে সেটাতে বাতাস খেলাতে চায়।

গোরস্তানে ঢুকলে আমরা চেনা লোকের গোরের সন্ধান করি; অচেনা লাইব্রেরিতে ঢুকলে চেনা লেখকের বই আছে কিনা তারই সন্ধান করি প্রথম। বন্‌ শহর নূতনত্ব অত্যন্ত অপছন্দ করে; তৎসত্ত্বেও দু-চারটে নূতন রেস্তোরাঁ কাফে জন্ম নিয়েছে। সেগুলো তদারক করার কণামাত্র কৌতূহল অনুভব করলুম না। কে বলে মানুষ নূতনত্ব চায়?

কুকুর যে রকম পথ হারিয়ে ফেললে আপন গন্ধ শুঁকে শুঁকে বাড়ি ফেরে, আমিও ঠিক তেমনি সাত দিন ধরে আজ ভেনুসবের্গ, কাল গোডেসবের্গ, পরশু জীবেনগেবের্গে, পরের দিন রাইনে লঞ্চ-বিহার করে করে আপন প্রাচীন দিনের গন্ধ খুজে খুঁজে কাটালুম; আর শহরের ভিতরকার গলি-ঘুঁচির রেস্তোরাঁ-বারের তো কথাই নেই।

অষ্টম দিনে ড্যুসলডর্ফে আমার প্রাচীন দিনের সতীর্থ পাউলকে ট্রাঙ্ক করলুম। প্রথমটায় সে একচোট গালাগালি দিলে আমি কেন আগে জানাই নি। আমি বললুম, 'কেন? বেতার তো আমার টুরের খবর প্রতিদিন বুলেটিনে ঝাড়ছে।'

শুধালে, 'কোন্‌ বেতার? দক্ষিণ মেরুর?'

'না, কন্‌সান্‌ট্রেশন ক্যাম্পের।'

'এই! চুপ চুপ!'

'না রে না, ভয় পাস নি। তোদের ফ্যুরারের সঙ্গে আমাদের এখন খুব দোস্তী। তিনি গোপনে আমাদের দু-একজন বেসরকারী নেতাকে শুধিয়েছেন, তিনি যদি ব্রিটন আক্রমণ করেন তবে ভারতীয়েরা তার মোকা নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে কি না।'

'থাক্‌ থাক্‌। আজ সন্ধ্যায় দেখা হবে।'

আমি বললুম, 'হাইল হিটলার।'

রিসীভার রাখার এক মিনিট যেতে না যেতে টেলিফোন বাজলো। রিসীভার তুললুম। অপর প্রান্ত থেকে অনুরোধ এল বামাকণ্ঠে, 'আমি কি ডক্টর সায়েডের

সঙ্গে কথা বলতে পারি ?'

'কথা বলছি।'

'আমি ট্রাঙ্ককল দফতর থেকে কথা বলছি। খানিকক্ষণ আগে আপনি ড্যুসলডর্ফে ট্রাঙ্ক কল করেছিলেন না ?'

সর্বনাশ! পাউলের ভয় তাহলে অমূলক নয়। নিশ্চয়ই নাৎসি স্পাই। আমাদের কথাবার্তা ট্যাপ করেছে। ক্ষীণকণ্ঠে বললুম, 'হ্যাঁ।'

'আপনি ইণ্ডিয়ান ?'

'কি করে—'

'না, না, মাফ করবেন—আপনার জর্মন উচ্চারণ খুবই খাঁটি, কিন্তু কি জানেন, আমি ট্রাঙ্ক কল একস্‌চেঞ্জে কাজ করি বলে নানান দেশের নানান ভাষা নানান উচ্চারণের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। শুধু কণ্ঠস্বর নিয়ে সব-কিছু বুঝতে হয় বলে অল্প দিনের ভিতরেই এ জিনিসটা আমাদের আয়ত্ত হয়ে যায়।'

আশ্চর্য নয়। মানুষ তার মাতৃভাষার বৈশিষ্ট্য বিদেশী ভাষা বলার সময় আপন অজানতে প্রকাশ করে ফেলে আর ওকীবহাল ব্যক্তি সেটা ধরে ফেলতে পারেন। শুনেছি লণ্ডনের কোন্ এক আর্ট একাডেমির অধ্যক্ষ যে কোনো ছবি দেখেই বলে দিতে পারতেন, কোন্ দেশের লোক এটা এঁকেছে। একই মডেল দেখে দেড়শটি ছেলে স্কেচ করেছে; তিনি দিব্য বলতে পারতেন, কোনটা ইংরেজের, কোনটা চীনার, আর কোনটা ভারতীয়ের। এবং যদিও মডেলের মেয়েটি ইংরেজ তবু সব চাইতে ভাল এঁকেছে ইণ্ডিয়ান। মনকে এরই স্মরণে সান্ত্বনা দিলুম, তবে বোধ হয় আমার জর্মন উচ্চারণ জর্মনদের চেয়েও ভাল!

অনেক ইতিউতি করে নারীকণ্ঠ বললে, 'আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমি বার বার ক্ষমা চাইছি, আমি কি পাঁচ মিনিটের জন্য আপনার দর্শন পেতে পারি? আমার একটু দরকার আছে। সেটা কিন্তু জরুরী নয়; আপনার যেদিন যখন সুবিধে হয়।'

তাড়াতাড়ি বললুম, 'পাঁচ মিনিট কেন—পাঁচ ঘণ্টা নিন। আমি এখানে ছুটিতে। দিন ক্ষণ আপনিই ঠিক করুন।'

'কাল হবে? আমার ডিউটি বিকেল পাঁচটা অবধি। আপনার হোটেলের পাশেই তো কাফে "হুফ্‌শ্লাগ্"। সেখানে সাড়ে পাঁচটায়? আমি আপনাকে ঠিক চিনে নেব। বন্ শহরে আপনিই হয়তো একমাত্র ইণ্ডিয়ান।'

পরদিন কাফের মুখেই একটি মহিলা এগিয়ে এসে বললেন, 'গুট্‌নট্‌াখ্! হের সায়েড্!'

আমি বললুম, 'গুটেন্‌টাখ্‌, ফ্রলাইন—'

এস্থলে প্রথম পরিচয়ে আপন নাম বলা হয়। ফ্রলাইন (কুমারী, মিস্‌) কি একটা অস্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, আমি ঠিক ধরতে পারলুম না। কিন্তু নিতান্ত জরুরী প্রয়োজন না হলে এস্থলে দু'বার প্রশ্ন করা—বিশেষ করে মহিলাকে—আদব-দুরস্ত নয়।

দেহের গঠনটি ভারী সুন্দর, আঁটসাঁট, দোহারা। প্রলম্বিত বাহু দুখানি এমনি সুডৌল যে, মনে হয় যেন দু গুচ্ছ রজনীগন্ধা। রাস্তার উজ্জ্বল আলোতে দেখছিলুম বলে লক্ষ্য করলুম কনুইয়ের কাছে মণি-খনির মত দুটি টোল। গোটা দেহটি যেন রসে রসে ভরা। শুধু দেহটি দেখলে যে কেউ বলবে, মধুভরা পূর্ণ যুবতী।

কিন্তু মুখটির দিকে তাকানো মাত্র যে-কোনো মানুষের মনের ভাব সম্পূর্ণ বদলে যাবে। ব্লাউজের গলার বোতাম থেকে আরম্ভ করে মাথার চুল পর্যন্ত—মনে হল এ যেন অন্য বয়সের ভিন্ন নারী। মুখের চামড়ায় এক কণা লাবণ্য এক কাঁচ্চা মসৃণতার তেল নেই। গলার চামড়া পর্যন্ত বেশ-কিছুটা ঝুলে পড়েছে। সিকি পরিমাণ চুলে পাক ধরেছে। আর চোখ দুটি—সেগুলোর যেন দর্শনশক্তিও হারিয়ে গিয়েছে—জ্যোতিহীন, প্রাণহীন। এর বয়েস কত হবে?—শুধু যদি মুখ থেকেই বিচার করতে হয়? আর সে কী বিষণ্ণ মুখ! বয়স বিচারের সময় সেই বিষণ্ণতাই তো হবে প্রধান সাক্ষী—জ্যোতিভ্রষ্ট চক্ষুতারকার চেয়েও কণ্ঠদেশের লোলচর্মের চেয়েও।

ইতিমধ্যে আমরা কাফেতে ঢুকে আসন নিয়েছি। মহিলাটি—না যুবতীটি, কি বলবো? (সেই যে কালিদাসের গল্পে বুড়ো স্বামীর ধড়ের সঙ্গে জোয়ান ভাইয়ের কাটা মুণ্ডু জুড়ে দিয়েছিল এক নারী)—ইতিমধ্যে দাস্তানা খুলে নিয়েছেন। মুখের সঙ্গে মিলিয়ে বেরলো হাত দুখানা—রসে ফাটো-ফাটো দেহের সঙ্গে মিলিয়ে নয়—নির্জীব, কোঁকড়ানো চামড়া; ইংরিজিতে বলে ক্রোজ ফীট, কাকের পা। অতি কষ্টে নিজেকে সামলেছিলুম।

বললেন, 'আপনাকে আমি নিমন্ত্রণ করেছি।' অর্থাৎ তিনি বিল শোধ করবেন। অন্য সময় হলে এ বারতা আমার কর্ণকুহরে নন্দন-কাননের স্বর্ণোজ্জ্বল মধুসিঞ্চন করতো। কিন্তু এই বিষণ্ণ মুখের সামনে আমার গলা দিয়ে যে কিছুই নামবে না। বললুম, 'আমি যখন এখানে পড়তুম—'

বাধা দিয়ে শুধোলেন, 'আপনিও পড়েছেন নাকি?'

এই 'ও'টার অর্থ কি?

আমি বললুম, 'তখন তো কোনো অবিবাহিত রমণীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা আমাদের মধ্যে রেওয়াজ ছিল না।'

তাঁর কণ্ঠটি ছিল এমনিতেই ক্ষীণ—এখন শোনালো মুমূর্ষুপ্রায়। যেন মাফ চেয়ে বললেন, 'ব্যত্যয় সব সময়ই দুটো একটা থাকে। কিন্তু দয়া করে আপনি এসব গায়ে মাখবেন না। আমি আপনার অপ্রিয় কোনো কাজ করতে চাই নে।'

কাফেতে এ সময়ে জর্মনদের ইয়া ইয়া লাশ ভামিনীদের ভিড়। ওয়েট্রেস এক কোণে একটি খালি টেবিল দেখিয়ে দিল। বুঝলুম, মহিলাটি পূর্বাহ্নেই টেবিলটি রিজার্ভ করে রেখেছিলেন। ব্যাগ খুলতে খুলতে বললেন, 'আপনি কি খেতে ভালবাসেন? চা নিশ্চয়ই। কিন্তু এদেশে যে চা বিক্রী হয় সে তো অখাদ্য। তবে আমার কাছে ভাল চা আছে। আমি লণ্ডন থেকে সেটা আনাই।' ব্যাগ থেকে বের করে একটি ছোট্ট পুলিন্দা তিনি ওয়েট্রেসের হাতে তুলে দিলেন। সে কিছু বললো না বলে বুঝলুম, এ ব্যবস্থায় সে অভ্যস্ত।

আমাদের অর্ডার না দেওয়া সত্ত্বেও ভাল ভাল কেক, স্যান্ড্উইজ্, টার্ট উপস্থিত হল। বুঝলুম, এগুলো পূর্বের থেকেই অর্ডার দেওয়া ছিল।

কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের দেশের খুব বেশী ছাত্র জর্মনিতে পড়তে আসে না—কি বলেন?'

আমি বললুম, 'অতি অল্পই। তাও বেশীর ভাগ শিখতে আসে সায়ান্স আর টেকনিকাল বিদ্যা।'

একটু হেসে বললেন, 'স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আপনি হিউম্যানিটিজের। আর বন্ তো তারই জন্য বিখ্যাত। তবে এখানে এসেছেন অল্প ভারতীয়ই। আপনারা যাঁরা এসেছিলেন, ভারতে তাঁদের কোনো সঙ্ঘ আছে কি, যার মাধ্যমে একে অন্যের সঙ্গে আপনারা যুক্ত থাকতে পারেন?'

আমি বললুম, 'না। এমন কি আমি এঁদের মাত্র দু-একজনকে চিনি। ভারতবর্ষ বিরাট দেশ—' বলে আমি চায়ে চুমুক দিলুম। তিনি বললেন, 'ডিব্রুগড় থেকে দ্বারকা, কুলু থেকে কন্যাকুমারী।' আমি তো অবাক! আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'আপনি অত ডীটেল জানলেন কোথা থেকে? এখানকার শিক্ষিত লোককে পর্যন্ত ইণ্ডার (ভারতীয়) আর ইণ্ডিয়ানার (রেড ইণ্ডিয়ান) এ দুয়ের পার্থক্য বুঝিয়ে বলতে হয়।'

'এবং তার পরও কেউ কেউ আপনাকে শুধোয়, আপনি ৎসেন্টাল আফ্রিকানার (সেণ্ট্রাল আফ্রিকান) না জ্যুড্ ইটালিয়েনার (সাউৎ ইটালিয়ান)?'

আমি আরো আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'আপনি অতশত জানলেন কি করে ?'

'পরে বলবো। কিন্তু আপনি ভারতে বন্-এর ছাত্রদের সম্বন্ধে কি যেন বলছিলেন ?'

'ভারতের বুদ্ধিজীবীর প্রধান অংশ থাকেন কলকাতায়। সেখানে থাকলেও খানিকটা যোগসূত্র থাকে। আমি থাকি ছোট্ট বরোদায়—'

অস্ফুট শব্দ শুনে আমি ওঁর মুখের দিকে তাকালুম। দেখি, তাঁর পাংশু মুখে যে দু-ফোঁটা রক্ত ছিল তাও অন্তর্ধান করেছে। ভয় পেয়ে শুধালুম, 'কি হল আপনার ?'

ঢোঁক গিলে খানিকটা সামলে নিয়ে বললেন, 'ও কিছু না। আমি অনিদ্রায় ভুগে ভুগে দুর্বল হয়ে পড়েছি। এখানে বড্ড লোকের ভিড়। সব বন্ধ। আমি আমার অফিস-ঘরের জানলা শীত গ্রীষ্ম সব সময় খোলা রাখি।'

আমি বললুম, 'তা হলে খোলায় চলুন।' তারপর শুধালুম, 'আপনার সহকর্মী অন্য মেয়েরা কিছু বলে না ?'

প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারেন নি। পরে বললেন, 'ও। আমি এককালে টেলিফোন গার্লই ছিলুম। এখন তারই বড় অফিসে কাজ করি। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজ। কিন্তু আগেরটাই ছিল ভালো।'

বাইরে বেরিয়ে আসতেই আমি বললুম, 'আমার মনে হচ্ছে আপনি বেশী হাঁটাহাঁটি করতে পারবেন না। তার চেয়ে চলুন, ওই যে প্রাচীন যুগের একখানা ঘোড়ার গাড়ি এখনো অবশিষ্ট আছে, তাই চড়ে রাইনের পাড়ে গিয়ে বসি।'

মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

আস্তে আস্তে শুধোলেন, 'গেলট্নার যে ঋগ্বেদের জর্মন অনুবাদ করেন সেইটের উপর নির্ভর করে যে একটি ইংরেজি অনুবাদ ভারতবর্ষ থেকে বেরোবার কথা ছিল, তার কি হল ?'

আমি এবারে সত্যই অবাক হলুম। গেলট্নারের অনুবাদ অনবদ্য। গত একশ বছরে ঋগ্বেদ সম্বন্ধে ইয়োরোপ তথা ভারতে যত গবেষণা হয়েছে গেলট্নারের কাছে তার একটিও অজানা ছিল না, এবং অনুবাদ করার সময় যেখানে যেটির দরকার হয়েছে সেখানে সেইটে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এ মহিলাটি যে অতিশয় সমীচীন ও সময়োপযোগী প্রস্তাবটির কথা বললেন সে সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতুম না। বিস্ময় প্রকাশ করে বললুম, 'কিন্তু আপনি এ সবের খবর পেলেন কোথায় ?'

তিনি চুপ করে রইলেন। গাড়ি মন্থর গতিতে বেটোফেনের প্রতিমূর্তির

পাশ দিয়ে, ম্যান্‌স্টার গির্জে পেরিয়ে, য়ুনিভার্সিটি হয়ে রাইনের পাশে এসে দাঁড়ালো।

গাড়ি থেকে নেমে তাকিয়ে দেখি, মহিলার মুখ তখনো ফ্যাকাশে। প্রস্তাব করলুম, 'ওই কাফেটার খোলা বারান্দায় গিয়ে বসি, আর আপনি কিছু একটা কড়া খান।' ওয়েটারকে বললুম কন্যাক্ নিয়ে আসতে।

দুই ঢোঁক কন্যাক্ খেয়ে যেন বল পেলেন। বললেন, 'আমি এখনো অবসরমত কিছু কিছু ইওলজির চর্চা করি। বছর বারো পূর্বে যখন আরম্ভ করি তখন পূর্ণোদ্যমেই করেছিলুম।'

তারপর আবার অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করলেন। রাইনের জলের উপর তখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। দু-একখানা মোটর বোট আসা-যাওয়া করছে মাত্র। বাতাস নিস্তব্ধ। এমনিতেই রাইনের সন্ধ্যা আমাকে বিষণ্ণ করে তোলে, আজ যেন রাইনের জলে চোখের জল ছলছল করছে।

মহিলাটি বললেন, 'কাল থেকে ভাবছি, কি করে কথাটি পাড়ি।'

যে কোনো কারণেই হোক মহিলাটি যে বেদনাতুর হয়ে আছেন সে-কথা আমি ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি। বললুম, 'আপনি দয়া করে কোনো সঙ্কোচ করবেন না। আমাদ্বারা যদি কোন-কিছু করা সম্ভব হয়, কিংবা সুদ্ধমাত্র আমাকে কিছু বলতে পেরে আপনার মন হালকা হয়—'

মানুষকে ক্রমাগত সান্ত্বনার বাক্য দিয়ে প্রত্যয় দিতে থাকলেই যে সে মনস্থির করতে পারে তা নয়; বরঞ্চ কথা বন্ধ করে দিলে সে আপন মনে ভাববার এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছবার সুযোগ পায়। আমি বন্-বয়েল শহরের মাঝখানে রাইনের উপরের পাথরের মোটা মোটা থামের তুলে-ধরা বিস্তীর্ণ স্পানওলা সুন্দর সেতুটির দিকে তাকিয়ে রইলুম। লোহার পুল কেমন যেন নদীর সঙ্গে খাপ খায় না—পাথর যেন জলের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়, উভয়েরই রঙ এক।

দুনিয়াতে হেন তালা আবিষ্কৃত হয় নি যেটা কলেকৌশলে, কখনো বা পশুবল প্রয়োগ করে, কখনো বা মোলায়েম আদরসোহাগ করে খোলা যায় না; ওদিকে আবার গেস্তাপো, ওগপু এ সব-কটা পদ্ধতি এবং আরো মেলা নয়া নয়া কৌশল খাটিয়েও বহু মানুষের মনের তালা খুলতে পারে নি। এবং হঠাৎ অকারণে কেন যে সেটা খুলে যায় তার হদিস কন্‌ফেশনের পাদ্রীসায়েব থেকে আরম্ভ করে আমাদের যৌবনকালের টেগার্ট পাষণ্ডও সন্ধান পায় নি।

মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা বলুন তো, দময়ন্তী নিদ্রাভঙ্গের পর দেখলেন নলরাজ নেই; তারপর তাঁর ইহজীবনে যদি নলের সঙ্গে আদৌ সাক্ষাৎ না হত

তবে তিনি নল সম্বন্ধে বা আপন অদৃষ্ট সম্বন্ধে কি ভাবতেন ?

নলোপাখ্যানের উল্লেখে আমি আশ্চর্য হলুম না! যে রমণী গেলটনারের বেদানুবাদের সঙ্গে সুপরিচিতা, নলরাজ তো তাঁর নিত্যালাপী আত্মীয়!

আমি একটু ভেবে বললুম, 'রসরাজও তো বৃন্দাবনে শ্রীমতীর কাছে ফিরে যান নি। তবু তো তিনি তাঁর প্রতি প্রত্যয় ত্যাগ করেন নি। মহাত্মা উদ্ধব যখন বৃন্দাবন দর্শন করে মথুরা ফিরে এলেন তখন রসরাজ সব শুনে বলেছিলেন, "বিরহাগ্নি যদি তাঁর এতই প্রবল হয় তবে তিনি জলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যান নি কেন ?" কী বেদরদী প্রশ্ন! কিন্তু শ্রীরাধা সেটা জানতেন বলে উদ্ধবকে বলতে বলে দিয়েছিলেন, তার অবিরাম অশ্রুধারা সেই অগ্নি বার বার নির্বাপিত করছে —"তনু জরি জাত জো ন অসুঁয়া ঢরত্ উধো"—যদুপতি শেষ প্রশ্ন শুধান, "আমার বিরহে তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায় নি কেন ?" এর উত্তরও উদ্ধব শিখে নিয়েছিলেন, "আপনি একদিন না একদিন বৃন্দাবনে ফিরবেন এই প্রত্যয়ই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে।"'

দময়ন্তী নিশ্চয়ই প্রত্যয় ছাড়েন নি।

মহিলা বললেন, 'তুলনাটা কি ঠিক হলো ? শ্রীরাধা তো মাঝে মাঝে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ পেতেন, তিনি কংস বধ করেছেন, তিনি কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে শান্তি স্থাপনার্থ দৌত্য করেছেন, জনসমাজের বৃহত্তর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন—এই ভেবে মনে সান্ত্বনা পেতেন—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'এবং রুক্মিণীকে—সে কুমারী আবার শিশুপালের বাগ্‌দত্তা বধূ—বিয়ে করেছেন, তার পর সত্যভামাকে, সর্বশেষে ভাল্লুকী—'

আমি নিজের থেকে থেমে গেলে পর মহিলাটি বললেন, 'শ্রীকৃষ্ণের উদাহরণ আপনিই তুলেছিলেন ; আমি তুলি নি।'

আমি বললুম, 'আপনি দময়ন্তীর কথা তুলেছিলেন—ভগবান করুন, আপনার নল যেন—'

তিনি মাথা নাড়তে আমি চুপ করে গেলুম।

বললেন, 'আপনি গোডেসবের্গ চেনেন ?'

আমি বললুম, 'বা রে, সেখানে তো আমি এক বছর বাস করেছি।'

'প্রফেসর কির্ফেল সেখানে বাস করতেন ; আমরা ছিলুম তাঁর প্রতিবেশী। আমি প্রতিদিন বন্ শহরে আসতুম চাকরি করতে। হঠাৎ একদিন দেখি তার পরের স্টপেজ হোখ্-ক্রয়েৎসে একজন বিদেশী উঠলেন। মুখখানা বিষণ্ণ। সেদিন আর কিছু লক্ষ্য করি নি। কাইজার প্লাৎসের স্টপেজে উনিও নামলেন। আমি

বইয়ের দোকান য়্যোর্‌শাইটে কাজ করতুম। আপন অজান্তেই লক্ষ্য করলুম বিদেশী য়ুনিভার্সিটিতে ঢুকলেন।

তিন-চার মাস প্রায় রোজই একই ট্রামে যেতুম, ভদ্রলোকের প্রতি আমার কোনো কৌতূহল ছিল না কিন্তু লক্ষ্য করলুম, বিদেশীর বিষণ্ণ ভাব আর কাটলো না।

তারপর একদিন তিনি আমাদের দোকানে এসে ঢুকলেন। আমি এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে তিনি একেবারে থতমত খেয়ে গেলেন। ভাবলুম এ আবার কোন্ দেশের লোক? এত লাজুক কেন?

ভাঙা ভাঙা জর্মন ভাষায় এক জর্মন ইণ্ডলজিস্টের বইয়ের ইংরিজি অনুবাদ চাইলেন। আমি একটু আশ্চর্য হলুম: জর্মনিতে বসে জর্মনের লেখা বই পড়লেই হয়। বললুম, "এটা লণ্ডন থেকে আনাতে হবে।" তারপর কিন্তু-কিন্তু করে বললুম, "মূল জর্মনটা পড়লেই তো ভাল হয়।"

তিনি বললেন, "আমার আছে, কিন্তু বুঝতে বড় অসুবিধা হয়।" সঙ্গে সঙ্গে বইখানা পোর্টফোলিয়ো থেকে বের করে কাউণ্টারের উপর রাখলেন।

আমি তখনো ইণ্ডলজির কিছুই জানতুম না—নামটাম টুকে নিয়ে তাঁকে দু-চারখানা ভাল অভিধান, সরল জর্মন বই, ব্যাকরণ দেখালুম। আমি ইংরিজি জানতুম বলে তাঁর ঠিক কোন্ কোন্‌টা কাজে লাগবে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মত সৎপরামর্শ দিলুম। আমি যেটা দেখাই সেটাই তিনি কিনে ফেলেন। শেষটায় আমিই হেসে বললুম, "এগুলো শেষ করুন। এর পরের ধাপের বই আমি বেছে রাখবো।" টাকা দিয়ে বইগুলো নিয়ে যখন চলে গেছেন তখন দেখি তাঁর ইণ্ডলজির বইখানা কাউণ্টারে ফেলে গেছেন। তা যান, কাল ট্রামে দিয়ে দিলেই হবে।

ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে এই আমার প্রথম পাঠ। এবং এখনো সে বইখানা মাঝে মাঝে পড়ি। ভিণ্টারনিৎসের ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস। এ বই দিয়ে আরম্ভ না করলে হয়তো ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আমার কৌতূহল অঙ্কুরেই মারা যেত।

ভিণ্টারনিৎস লেখেন অতি সরল জর্মন; তাই আশ্চর্য হলুম যে বইয়ের মালিক এতদিনেও এতখানি জর্মন শিখে উঠতে পারেন নি কেন?

আমি চেপে গেলুম যে, ঠিক এই বইখানাই ভিণ্টারনিৎস শান্তিনিকেতনে আমাদের পড়িয়েছিলেন।

আর পাঁচজন জর্মনের তুলনায় বিদেশীদের সম্বন্ধে আমার কৌতূহল কম। বইয়ের দোকানে কাজ করলে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় জাত-বেজাতের বই পড়া হয়ে যায়।

আমার কৌতূহল নিবৃত্তি হয়ে গিয়েছিল—অনেকখানি—ওই করে।

কিন্তু এই লোকটির প্রতি কেমন যেন আমার একটু দয়া হল। তবু এটা ঠিক, আমি নিশ্চয়ই গায়ে পড়ে তাঁকে সাহায্য করতে যেতুম না। তবে এ-কথাও ঠিক, ভিণ্টারনিৎসের বেদ অনুচ্ছেদে উষস্ আবাহন এবং জুয়াড়ির মনস্তাপ দুটোই আমার কল্পনাকে এক অপূর্ব উত্তেজনায় আলোড়িত করেছিল। উষামন্ত্র লিরিক, রহস্যময়, ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে, আর অবিশ্বাস্য বলে মনে হল যে, ওই একই সময়ে অতিশয় নিদারুণ বাস্তব জুয়োখেলা ও জুয়াড়িজীবনের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা একই সঞ্চয়নে স্থান পেয়েছে। আমার বাবা ছিলেন গ্রীক ভাষার অধ্যাপক। ইস্কুলে আর পাঁচটা ছেলেমেয়ে যা গ্রীক শেখে সেটা ম্যাট্রিক পাশের পরই ভুলে যায়। আমার পিতা সেটা হতে দেন নি। এখন আমার ইচ্ছে হল সংস্কৃত শেখার। তাই তাঁর সঙ্গে ভাল করে আলাপ করলুম। আমি তাঁর জন্য ভিণ্টারনিৎসের জর্মন থেকে ইংরিজি অনুবাদ করে দিতুম, আর তিনি আমাকে সংস্কৃত পড়াতেন।'

আমার মনে সর্বক্ষণ নানা প্রশ্নের উদয় হচ্ছিল, কিন্তু মহিলাকে বাধা দিলুম না।

ততক্ষণে কাফেতে উল্লাস, হৈ চৈ পড়ে গিয়েছে। জর্মন জনগণের বহুদিনের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। ঘড়ি ঘড়ি খবর আসছে, নাৎসি বিজয়-সেনানী কি ভাবে অস্ট্রিয়ার শহরের পর শহর দখল করে যাচ্ছে, তারা কি ভাবে সর্বত্র উদ্বাহু অভিনন্দিত হচ্ছে।

আমি একটু মুচকি হেসে বললুম, 'ভালুকও মানুষকে আলিঙ্গন করে শুনেছি, কিন্তু সে আলিঙ্গন—যাক্ গে।'

মহিলাটি একটু চমকে উঠলেন। বললেন, 'এসব মন্তব্য আপনি সাবধানে করবেন। কি করে জানলেন, আমি নাৎসি নই?'

আমি হেসে বললুম, 'জলবত্তরলম্—আপনি তো সংস্কৃত জানেন। তার মানে যে-জন বেদ পড়েছে, সে-ই জানে বেদের আর্যধর্মের সঙ্গে নাৎসিদের এই "আর্যামি"র বড়ফাট্টাইয়ের সূচ্যগ্র পরিমাণ সম্বন্ধ নেই। কিন্তু আপনি চিত্তবিক্ষেপ হতে দেবেন না। তার পরের কথা বলুন।'

একটু চিন্তা করে বললেন, 'প্রথমে সাহচর্য, তারপর বন্ধুত্ব, সর্বশেষে প্রণয় হল আমাদের দুজনাতে।'

এবারে অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'তিন বছরের প্রণয়—তারপর দশ বছর ধরে আমি তাঁর কোনো খবর পাই নি। এই দশ বছর আমার একা একা

কেটেছে। এই দীর্ঘ তেরো বছরের কথা আপনাকে বলতে গেলে ক'মাস ক' বছর লাগবার কথা তার সামান্যতম অনুমান আমার নেই।

এই শেষের দশ বৎসর কি করে কেটেছে, এখন কি করে কাটছে সেটা বোঝাবার চেষ্টাও আমি করবো না। আর সেটা শোনাবার জন্যও আমি আপনার দর্শন কামনা করি নি। এই যে বন্ বিশ্ববিদ্যালয় আমরা পেরিয়ে এলুম, এখানে পড়বার সময় ঠিক একশ বছর আগে, আমাদের সবচেয়ে সেরা লিরিক কবি হাইনে একটি চার লাইনের কবিতা লেখেন :

"প্রথমে আশাহত হয়েছিনু
ভেবেছিনু সবে না বেদনা ;
তবু তো কোনো মতে সয়েছিনু
কি ক'রে যে সে-কথা শুধিয়ো না।"

তীব্র বেদনার তীক্ষ্ণ প্রকাশ দেবার চেষ্টা করেছেন হাইনে বার বার, কিন্তু হার মেনে উপরের চতুষ্পদীটি রচেন। একশ বছর ধরে দেশ-বিদেশে লক্ষ লক্ষ নরনারী সেগুলো পড়ছে—'

এবারে আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'আমাদের পোয়েট টেগোর তাঁর প্রথম যৌবনে এক জর্মন মহিলার কাছ থেকে অল্প জর্মন শেখার পরই তাঁর গুটিদশেক কবিতা বাঙলায় অনুবাদ করেন। আপনি যেটি বললেন সেই চতুষ্পদীটিও তাতে আছে।'

'প্রথম যৌবনে তিনি কি শোক পেয়েছিলেন ?'

'তাঁর প্রাণাধিকা ভ্রাতৃবধূ আত্মহত্যা করেন। কিন্তু সে-কথা আরেকদিন হবে। আমি নিজে কাপুরুষতম এসকেপিস্ট ; তাই দুঃখের কথা এড়িয়ে চলি। তার চেয়ে আপনাদের সেই তিন বছরের আনন্দের কথা বলুন।'

'প্রথম বছর কেটেছে স্বপ্নের মত। স্বপ্ন যেমন চেনা-অচেনায় মিশে যায়, হঠাৎ চেনা জিনিস, চেনা মানুষ মনে হয় অচেনা, আবার অচেনা জন চেনা, এ যেন তাই। তাঁকে যখন মনে হয়েছে এঁর সব কিছু আমার চেনা হয়ে গিয়েছে তখন হঠাৎ মনে হয়েছে যেন ইনি আমার সম্পূর্ণ অজানা জন। আবার কেমন যেন এক প্রহেলিকার সামনে অন্ধকারে ব্যাকুল হয়ে হাতড়াচ্ছি—মধ্যরাত্রে হঠাৎ তাঁর ঘুমন্ত হাত পড়ল আমার গায়ের উপর আর সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে গেল। আমার চৈতন্যে তখন বিশ্বব্যাপী মাত্র একটি অনুভূতি—এই লোকটির মাঝেই আমার অস্তিত্ব, আমার অন্য কোনো সত্তা নেই। গোডেসবের্গের পিছনে নির্জনে গভীর পাইন বনে সকাল থেকে পরের দিন ভোর

অবধি কাটিয়েছি একটানা, রাইনের ওপারে বরফ ভেঙে ভেঙে উঠেছি মার্‌গারেটেন হোহ অবধি, ফ্যান্‌সি বলে শ্যাম্পেনের পর শ্যাম্পেন খেয়ে আমি অবশ হয়ে শুয়ে পড়েছি ডান্‌স-হলের সামনের ঘাসের উপর—তিনি পৌঁছে দিয়েছেন বাড়িতে।'

কেন জানি নে, হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলুম, 'উনি কখনো বে-এক্‌তেয়ার হতেন না?'

বললেন, 'আশ্চর্য, আপনি যে এ-প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন! না, কক্‌খনো না। এখানকার পাঁড়দের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে তাঁকে খেতে দেখেছি বহুবার, চোখের পাতাটি পর্যন্ত নড়তো না। অথচ তিনি একাধিক বার আমাকে বলেছেন, তাঁর জানা মতে তাঁর সাত পুরুষের কেউ কখনো মদ খায় নি।

কিন্তু প্রথম বছরের চেয়েও—অন্ততঃ আমার পক্ষে—মধুরতর আর গৌরবময় শেষের দুই বছর।

এক বৎসর ক্লাস আর সেমিনার করার পর অধ্যাপকের আদেশে তিনি আরম্ভ করলেন তাঁর ডক্টরেট থীসিসের প্রথম খসড়া—অবশ্য ইংরিজিতে। মোটামুটি তিনি কি লিখবেন সে সম্বন্ধে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন।'

থেমে গিয়ে তিনি অত্যন্ত করুণ নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার কাছে আমার একটা ভিক্ষা আছে—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'ছি ছি। আপনি আমাকে এখনো চিনলেন না!'

'চিনেছি বলেই চাইছি। এখন যা বলব, আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, কাউকে বলবেন না।'

আমি তাঁর হাতে—সেই শুষ্ক, জরাজীর্ণ হাতে চাপ দিলুম।

'প্রথম পরিচ্ছেদের কাঁচা খসড়া পড়ে আমি অবাক। একেবারে কিছুই হয় নি বললে অত্যুক্তি হয়, কিন্তু এতে যে কোনো বাঁধই নেই, বক্তব্য কোন্‌ দিকে যাচ্ছে তার কোনো নির্দেশ নেই—আছে গাদা গাদা ফ্যাক্‌ট্‌স্‌, এবং তার মধ্যেও কোনো সিস্‌টেম্‌ নেই।

কারণ ইতিমধ্যে আমি যে খুব বেশী সংস্কৃত শিখেছি তা নয়, তবে আপনি তো জানেন, জর্মন, ফরাসী এবং ইংরেজী, মাত্র এই তিনটি ভাষাতেই ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে এত বই লেখা হয়ে গিয়েছে যে সেগুলো মন দিয়ে বার বার পড়লে, নোট টুকে মুখস্থ করলে কার সাধ্য বলে আপনি সংস্কৃত জানেন না! যেদিন তিনি আমায় প্রথম তাঁর থীসিসের সাবজেক্ট—'গুপ্তযুগের কালচারাল লাইফ'—বলেন সেদিন থেকেই আমি ঐ বিষয়ের উপর যা পাওয়া যায় তাই পড়তে আরম্ভ

করেছি, নোট টুকেছি, মুখস্থ না করেও যতখানি সম্ভব মনে রাখবার চেষ্টা করেছি। আর সংস্কৃত তো সঙ্গে সঙ্গে চলছেই। আপনি তো আমাদের সিস্টেম জানেন। তাই তিন মাস যেতে না যেতেই আমি র‍্যাপিড্ রীডিং সিস্টেমে খানিকটা বুঝে কিছুটা না বুঝে কালিদাসের সব লেখা—এমন কি কালিদাসের নামে প্রচলিত অন্য জিনিসও পড়ে ফেলেছি। তবে আমার ব্যাকরণ জ্ঞান এখনো কাঁচা, যদিও গ্রীকের সাহায্যে শব্দতত্ত্বে আমার কিছুটা দখল আছে।

ওঁর ইংরিজিটা যে আমি জর্মনে অনুবাদ করবো সেটা তো ধরেই নেওয়া হয়েছিল। তারই অছিলা নিয়ে আমি সমস্তটা ঢেলে সেজে লিখলুম। পাছে তাঁর আত্মসম্মানে লাগে তাই বললুম, "তুমি এ-কাঠামোর উপর আরো ফ্যাক্টের কাদামাটি চাপাও, রঙ বোলাও।"

ইতিমধ্যে আমার বইয়ের দোকান আমাকে পাঠালো লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্‌ব্রিজে—আমাদের বইয়ের বাজার প্রসার করতে। তিনিও তাঁর প্রফেসরের কাছ থেকে ছুটি নিলেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে মাল-মশলার সন্ধানে যাবার জন্য।

সে সুযোগের অবহেলা আমি না করে আমাদের প্রকাশিত আর বিরল আউট অব প্রিন্ট কিছু কিছু বই নিয়ে দেখা করতে গেলুম লণ্ডন স্কুল অব্ ওরিয়েণ্টাল স্টাডিজের ইণ্ডলজি-অধ্যাপকদের সঙ্গে। তাঁরা আমায় ভারি খাতির করলেন, কেউ কেউ চায়ে ডিনারে নিমন্ত্রণও করলেন। আমি ঘুরে ফিরে শুধু গুপ্ত যুগের কালচারাল লাইফের দিকে কথার মোড় ফেরাই। ওঁরা অকৃপণ হৃদয়ে আপন আপন গবেষণার ফল বলে যেতে লাগলেন। একদিন এক অধ্যাপকের বাড়িতে নিমন্ত্রণে ছিলেন আরো দুজন ইণ্ডলজির অধ্যাপক। আমি গুপ্ত যুগ টুইয়ে দিতেই লেগে গেল তিন পণ্ডিতে লড়াই। ঘণ্টাখানেকের ভিতরই পরিষ্কার হয়ে গেল তিন জনার তিন থীসিস। একজন বললেন: গুপ্ত কেন, তার পরবর্তী যুগেরও সর্ব নাট্যের কাঠামো গ্রীক নাট্য থেকে নেওয়া। দ্বিতীয় জনের বক্তব্য: গুপ্ত যুগের চোদ্দ আনা কৃষ্টির মূলে দ্রাবিড়। বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারতের চোরাবালির ভিতর দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে গুপ্ত যুগে এসে নির্মল তৃষাহরা হ্রদে পরিণত হয়েছে। আর তৃতীয় জনের মতে গুপ্ত যুগের বেশীর ভাগ পরবর্তী যুগের—গুপ্ত যুগের নামে পাচার হচ্ছে। যে রকম ওমর খৈয়ামের দু'শ বছর পরে রচনা বিস্তর চতুষ্পদী তাঁর সঙ্কলনে ঢুকে গেছে।

ভোরের প্রথম বাস্ ধরে আমরা যে যার বাসায় ফিরেছিলুম।

তার পূর্বে আমি সবিনয়ে শুধিয়েছিলুম, আমি তাঁদের বক্তব্যের কিছু কিছু

ব্যবহার করতে পারি কি না। তিনজন একবাক্যে বলেছিলেন, "আলবৎ, নিশ্চয়, অতি অবশ্যই। এসব তো কমন নলেজ। তাই দয়া করে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো না। আমাদের বদনাম হবে যে আমরা কমন নলেজ গবেষণা বলে পাচার করি।" একেই বলে প্রকৃত বিনয়।

বাসে বাসেই আমি যতখানি স্মরণে আনতে পারি শর্টহ্যাণ্ড টুকতে আরম্ভ করি। বাড়ি ফিরে বিছানা না নিয়ে যখন কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি তখন বন্ধু বিছানায় বসে চোখ কচলাতে কচলাতে বেড্-টীর জন্য ঘণ্টা বাজালেন।

অক্স্‌ফোর্ড কেম্‌ব্রিজেও অধ্যাপকদের সাহায্য পেলুম।

তারপর বনে ফিরে এসে সেই সব বস্তু গুছিয়ে, খসড়া বানিয়ে ফেয়ার কপি টাইপ করে, তাঁর প্রোফেসরের মেরামতির পর সে অনুযায়ী আবার টাইপ করে পরিপূর্ণ থীসিস তৈরী হল।'

আমি বললুম, 'অর্থাৎ—'

তিনি ব্যাকুল হয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'না, না, না। আপনি ভুল ইনফারেন্‌স্ করছেন। সংস্কৃত ভাষাটি ছিল তাঁর সম্পূর্ণ করায়ত্ত। হেন ব্যাকরণ নেই যার প্রত্যেকটি সূত্র, নিপাতন, আর্ষপ্রয়োগ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল না। কঠিন কঠিন টেক্‌স্‌ট্ দুবার না পড়েই তিনি অর্থ বের করে দিতে পারতেন। বললে বিশ্বাস করবেন না, তিনি তাঁর অধ্যাপককে এই দুরূহ ব্যাপারে সাহায্য করতেন। তাঁর থীসিসে যে অসংখ্য বস্তু মূল সংস্কৃত থেকে নেওয়া হয়েছে তার অনুবাদে তো কোনো ভুল পাবেনই না, আর সেগুলোই করেছে তাঁর বইখানাকে রিচ ইন্ টেকস্‌চার—সমৃদ্ধশালী। তাঁর কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'আমি আপনার প্রত্যেকটি কথা মেনে নিচ্ছি।'

রমণীটি বড়ই সরলা। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'বাঁচালেন। এসব কথা আমি এ জীবনে কাউকে বলি নি। এবং আরেকটা কথা, ওঁকে তো ভাইভাও দিতে হয়েছিল।'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়ই।' ভাইভাতে কোন্ ক্লাস, আর রিটনে (অর্থাৎ) থীসিসে কোন্ ক্লাস পেয়েছিলেন সেটা আর শুধালুম না। তাহলে সর্বনাশ হয়ে যেত।

হঠাৎ মহিলাটি চমকে উঠে বললেন, 'ছি ছি! অনেক রাত হয়ে গিয়েছে; ওদিকে আপনার ডিনারের কথা আমি একবারও তুলি নি। কোথায় খাবেন বলুন?'

আমি কিন্তু-কিন্তু করছি দেখে বললেন, 'আমার ফ্ল্যাটে যাবেন? এখানেই,

বেশী দূরে না। গোডেসবের্গের সে-বাড়িতে আমি আর যাই না।'

আমি ইতিমধ্যে একাধিক বার লক্ষ্য করেছি যে মহিলাটি এখনো তাঁর ক্লান্তি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁকে বাড়িতে শুইয়ে দেওয়াই ভালো।

মোড় নিতেই দেখি সেই প্রাচীন দিনের শেষ ঘোড়ার গাড়িখানা যেন আমাদের জন্যই দাঁড়িয়ে। মহিলাটি যে-আমলের কথা বলছিলেন তখন এরও ছিল ভরা যৌবন। আমি বললুম, 'কি হে যাবে নাকি?'

টপ্ হ্যাট তুলে বাও করে বললে, 'নিশ্চয়ই, স্যর।' ঘোড়াকে বললে, 'চল্ বার্‌বা রস্‌সা—গোডেসবের্গ।'

আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'না হে না—'

বললে, 'সরি, স্যর! এই বছর পাঁচেক পূর্বেও তো আপনাকে ফ্যান্‌সি ডান্‌স্ থেকে ভোরবেলা হোথায় নিয়ে গিয়েছিলুম! হা হ্‌হা, হা হ্‌হা, আপনি তখন ভারী জলি ছিলেন, স্যর, নামবার সময় ঝপ করে আমার হ্যাটটি কেড়ে নিয়ে হাওয়া। হাহ্‌হা—পরে আমার ওল্‌ড উম্যান বলে কি না আমি হ্যাট বন্ধক দিয়ে বিয়ার খেয়েছি। হাহা হাহা! চল্, বার্‌বা রস্‌সা—'

মহিলাটি হেসে উঠলেন। তাঁর চেনা দিনের ভোলা দিনের দমকা বাতাস যেন হঠাৎ গলিটাকে ভরে দিয়ে সব শুকনো পাতা উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল রাইন বাগে। শহরের গলির ভিতর নির্বাসিতা সুসান্ দিবাস্বপ্নে যে রকম তার গাঁয়ের নদীটিকে শহরের গলি দিয়ে বয়ে যেতে দেখেছিল।*

তখনও আমার বয়েস ছিল কম, জানতুম না, আমার কপালে ভাগ্যবিধাতা লিখে রেখেছেন এমনই দুর্দৈব যে তখন আমার অন্ধ কারাগারে না বইবে চেনা দিনের ভোলা দিনের বাতাস, না বইবে সুসানের গ্রামের নদী—স্মৃতির আবর্জনা উড়িয়ে নিতে ভাসিয়ে দিতে।

গাড়ি-ভাড়াটা দেবার পর্যন্ত মোকা পেলুম না।

গেট খুলে বাড়িতে ঢোকার সময় শুনি, কোচম্যান বলছে, 'চ বার্‌বা রস্‌সা, —দেখলি তো, তখনি তো তোকে বলি নি অন্য সোয়ারি নিস্ নি। আজ আর না। চ, বাড়ি যাই।' আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বললে 'রেতে বেরাতে যখন খুশী ঐ সামনের গলিতে ঢুকে পয়লা বাড়ির সামনে বলবেন, "ডার্লিং বার্‌বা রস্‌সা!" সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি পাবেন তৈরী। সম্রাট বার্‌বা রস্‌সার মত আপনার

* "সরু গলির মোড়ে যখন দিনের আলো ঝরে
ময়না দাঁড়ে গাহে এমন গাইছে বছর ধরে।"
—ওয়ার্ডসওয়ার্থ, অনুবাদক সত্যেন দত্ত।

বার্‌বা রস্‌সাও দেখবেন ক্রুসেড লড়তে হোলি ল্যাণ্ডে যেতে তৈরী।'

জর্মন কেন, প্রায় সব জাতের লোকই কোনো বিশেষ দেশ ভ্রমণ করে এলে বা সে দেশ নিয়ে চর্চা করলে আপন বাড়ি ভর্তি করে ফেলে সে দেশের ভালোমন্দ মাঝারি রাবিশ-জাঙ্ক-বিল্‌জ-কীচ্‌শ্‌ দিয়ে। এঁর বাড়িতে পরিপূর্ণ ব্যত্যয় না হলেও একথা কেউ বলতে পারবে না যে ইনি সারাজীবন শুধু ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াই করেছেন। মাত্র একখানি ছবি—অজন্তার। রাহুল-জননী পুত্রকে নিয়ে দাঁড়িয়েছেন তথাগতের (তিনি ছবিতে নেই) সামনে। আর লেখা-পড়ার টেবিলের উপর সাংখ্যকার মহর্ষি কপিলের একটি মূর্তি। ইনি এটি যোগাড় করলেন কোথা থেকে? ওটা মূলে মূর্তি কি না জানি নে—হয়তো বা রিলীফ। আমি দেখেছি ছবিতে—বহু বৎসর হল।

কিন্তু অত বড় বড় ঘরওলা ফ্ল্যাট তিনি পোষেন কি করে?

আমার অনুমান ভুল নয়। ফ্ল্যাটে ঢুকে আমাকে আসন নিতে অনুরোধ করে তিনি সোফায় শুয়ে পড়লেন। একটু মাফ-চাওয়ার সুরে বললেন, 'আপনাদের দার্শনিক সর্বপল্লী মহাশয় নাকি লেখাপড়া পর্যন্ত খাটে শুয়ে শুয়ে করেন।'

ফোটোগ্রাফে মহারানী ভিক্টোরিয়ার বৃদ্ধ বয়সের যে ছবি দেখি হুবহু ঠিক সেই পোশাক পরে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যখণ্ড যেন ঘরে এসে ঢুকলেন। মহিলা আলাপ করিয়ে-দিয়ে বললেন, 'আমার আইমা। ঠাকুরমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাড়িতে আসেন। তাঁর ছেলে-নাতিরা ভালো ভালো ব্যবসা করেন। আইমা কিন্তু আমার সঙ্গেই থাকতে ভালোবাসেন।'

আমি বার বার বললুম, 'আমি নিরামিষাশী নই, আমার আহারাদির জন্য তুলকালাম করে রাইনের জলে আগুন লাগাতে হবে না, আমি সব খাই, টিনের খাদ্যেও অরুচি নেই।'

মহিলা বললেন, 'জানেন কি, হিটলার কড়া নিরামিষাশী?'

আমি বললুম, 'তা হলে নিরামিষ ভোজনের বিপক্ষে আরেকটা কড়া যুক্তি পেলুম! আর আপনি?'

ক্লান্তির সুরে বললেন, 'আইমা যা দেয়, তাই খাই।'

আমি বললুম, 'আপনি তাহলে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী!'

'অন্তত হিটলারের মত জৈন গৃহীও নই।'

ইনি সব জানেন।

আমাকে চেয়ারটা কাছে টেনে আনবার অনুরোধ করে বললেন, 'আচ্ছা,

আপনি নিওরসিস্, সাইকসিস্, মনমেনিয়া, ইদে ফিক্স—এসব কথাগুলোর অর্থ জানেন ?'

আমি বললুম, 'যাঁরা এসব নিয়ে কারবার করেন, তাঁরাই কি জানেন ? এই যে আমরা নিত্য নিত্য ধর্ম, নীতি, মরালিটি, রিয়ালিজম, আইডিয়ালিজম শব্দ ব্যবহার করি, এগুলোর ঠিক ঠিক অর্থ জানি ? তবে আপনি যেগুলো বললেন, তার ভিতর একটা জিনিস সব কটারই আছে : কোনো একটা চিন্তা সর্ব চৈতন্যকে এমনই গ্রাস করে ফেলে যে মানুষ তার থেকে অহোরাত্র চেষ্টা করেও নিষ্কৃতি পায় না।'

'দুষ্মন্ত যে রকম বলেছিলেন, তিনি শকুন্তলার চিন্তা মন থেকে কিছুতেই সরাতে পারছেন না, অপমানিত জন যে রকম আপ্রাণ চেষ্টা করেও অপমানের স্মৃতি মন থেকে তাড়াতে পারে না—বার বার সেটা ফিরে আসে।' তারপর বললেন, 'কিন্তু আশ্চর্য, কালিদাস অপমানের সঙ্গে বিরহবেদনার তুলনা দিলেন কেন ? শকুন্তলা তো দুষ্মন্তকে কোনো পীড়া দেন নি—অপমান দূরে থাক !'

আমি বললুম, 'শত্রু কাছে এসে দহন করে ; মিত্র দূরে গিয়ে দহন করে। দুজনেই দুঃখ দেয়—শত্রু মিত্রে কি প্রভেদ ?

শত্রুর্দহতি সংযোগে বিয়োগে মিত্রমপ্যহো।
উভয়োর্দুঃখ দায়িত্ব কো ভেদঃ শত্রুমিত্রয়োঃ ?

দুশ্মন দুষ্মন্তকে অপমানিত করলে তাঁর যে বেদনা-বোধ হত, শকুন্তলার বিরহও তাঁকে সেই পীড়াই দিচ্ছিল। তাই বোধ হয় কালিদাস উভয়কে পাশাপাশি বসিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও কিছুদিন পূর্বে বলেছেন, "তাঁর জন্মদিন ও মৃত্যুদিন কাছাকাছি এসে গেছে। একই মন্ত্রে দুজনকে আহ্বান জানাবেন"।'

ঘরের আলো যদিও সূক্ষ্ম মলমলের ভিতর দিয়ে রক্তাঙ্গীর গোলাপী আভার মত মোলায়েম, তবু শ্রীমতী দু'হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছিলেন।

এবারে উঠে বসে আমাকে বললেন, 'আপনাকে সর্বক্ষণ আমার আপন কথা বলে উৎপীড়িত করার ইচ্ছা আমার নেই—বিশেষ করে বাড়িতে টেনে এনে।

আর এখন বার বার মনে হচ্ছে কী লাভ ? নিউরটিক ইত্যাদি যে শব্দগুলো বললুম, তার ক'টা আমার বেলা প্রযোজ্য আমি জানি নে। কিন্তু এ-কথা দৃঢ়নিশ্চয় জানি, আমি নর্মাল নই। কখনো মনে হয়, আমার এই অনুভূতিটা সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, আবার হঠাৎ মাঝরাতে জেগে উঠে দেখি, সেটা সম্পূর্ণ মতিভ্রম। একটা ইদে ফিক্স্—ফিক্স্ট্ আইডিয়া থেকে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাই নে, এবং নিজের কোনো সিদ্ধান্তকে আর অবিচল চিত্তে গ্রহণ করতে

পারি নে। তাই দয়া করে আপনি এই নিউরটিক, মনমেনিয়াকের কোনো কথা গায়ে মাখবেন না।'

আমি বললুম, 'তথাস্তু (এবং সংস্কৃতেই বলেছিলুম)। কিন্তু আপনি কি যেন জানবার জন্য আমাকে ফোন করেছিলেন?'

'আরেকদিন হবে। আপনি এখানে আর কত দিন আছেন?'

'অন্তত দেড় মাস। কয়েকদিনের জন্য ড্যুসলডর্ফ যাবো, সেই যে বন্ধু পাউলকে ট্রাঙ্ককল্ করেছিলুম, তার ওখানে। আপনিও চলুন না।'

বললেন, 'মন্দ নয়; পরে দেখা যাবে।'

ইতিমধ্যে আইমা একটা বরফে ভর্তি অত্যুজ্জ্বল রুপালি বালতিতে করে এক বোতল শ্যাম্পেন আর এক বোতল মোজেল নিয়ে এসেছেন।

আমি বললুম 'সর্বনাশ!' আইমা কি যেন একটা বললেন। শুধু 'মাটিল্ডে' শব্দটি বুঝতে পারলুম। তাহলে এর ক্রিশ্চান নাম ঐ।

তিনি বললেন, 'হোখ্ ডয়েচ্স্—হাই জর্মন—ব্যুনেন্ আউস্প্রাখে দিয়ে উচ্চারণ করার ফ্যাশান আইমার কুমারী বয়সে চালু হয় নি বলে আমরা এখনো আলজাসের ডায়লেক্ট বলি। আর বোতলগুলো যদিও অত পুরনো নয়, তবু আমার পিতার আমলের। শ্যাম্পেন নাকি পুরনো হলে খারাপ হয়ে যায়। ভালো না লাগলে মোজেলটা খাবেন।'

আমি নিজে খাই আর না-ই খাই, এর মনে যদি একটু রঙ লাগে তবে আমি খুশী।

শুধালুম, 'আপনি কি এখনো ভারতীয় শাস্ত্রের চর্চা রেখেছেন? আপনার বিশেষ ইণ্টারেসট্ কিসে?'

'বিষয়টা কঠিন নয়। আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, বৈদিক যুগে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার ছিল। এমন কি হোমযজ্ঞেও স্ত্রী-পুরুষে সমান অধিকার—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'ইওলজি আমার সাবজেক্ট নয়। আপনি সবিস্তার না বললে মোষের সামনে বীণা বাজানোর মত হবে।'

তিনি বললেন, 'সে কি, আপনি তো ইণ্ডিয়ান!'

আমি বললুম, 'আপনাদের ইহুদিদের মত আমারও লয়েলটি দ্বি-ধা। আমাকে আমার পারিবারিক মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ রাখতে হয় আর যে দেশে পুরুষানুক্রমে আছি তার অতীত গৌরবেও আমার হিস্যে আছে। তবে আমাদের দেশের মেজরিটি আপনাদের নাৎসিদের মত নয়। আমাদের মুসলমান

কবি কাজীকে হিন্দুরা মাথায় তুলে নাচে, আর সেদিন নাৎসিদের একখানা বইয়ে পড়ছিলুম, ইহুদি হাইনে সম্বন্ধে বলেছে, "১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ থেকে অপরিচিত।" উচ্চাঙ্গের রসিকতা বলতে হবে! যে লোককে ১৮১৭।২০ থেকে তাবৎ জর্মনি ও পরবর্তী যুগের রসগ্রাহী বিশ্বজন চেনে তিনি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ 'অপরিচিত' হয়ে গেলেন, যেদিন হিটলার চ্যানসেলর হলেন!'

তারপর তাড়াতাড়ি বললুম, 'কিন্তু এসব থাক। আপনার কথা বলুন।'

'বৈদিক যুগে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার। স্মার্ত যুগেই সেটা কমতে আরম্ভ করলো। করে করে শেষ পর্যন্ত সতীদাহ পর্যন্ত।'

তারপর তিনি যে রকম সবিস্তর ধাপে ধাপে নামতে লাগলেন তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। স্মৃতির আমি জানি সামান্যই—কজন হিন্দুই জানে, স্মার্ত পণ্ডিত ভিন্ন? মন্বাদি যে-সব শাস্ত্রকারদের নাম তিনি বললেন, তার বারো আনাই আমার অজানা। এবং যেটা আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগলো সেটা এই যে, সর্বদাই তিনি চেষ্টা করছিলেন প্রত্যেক বিধানের পিছনে কি অর্থনৈতিক কারণ থাকতে পারে সেটা খুঁজে বার করার। অন্যতম মূল সূত্রস্বরূপ তিনি গোড়াতেই বলেছিলেন, 'কার্ল মার্কস্ বলেছেন, "যুগান্তকারী সামাজিক বিবর্তনের পিছনে রয়েছে অর্থনৈতিক কারণ"—কিন্তু সেটা আমি একমাত্র কারণ বলে স্বীকার করি নে; সার্টেনলি, যদিও সেটা দি মোস্ট্ ইমপর্টেন্ট কারণ।' এই সূত্রটি তিনি বার বার অতি সুকৌশলে প্রয়োগ করছিলেন।

সে রাত্রে তিনি যা বলেছিলেন তার সিকিভাগ লিখতে গেলে আমাকে একখানা পূর্ণাঙ্গ থীসিস বানাতে হয়!

শেষ করলেন এই বলে, 'শুনেছি, আপনাদের মডার্ণ মেয়েরা এখন নাকি তাদের সর্ব পরাধীনতা, দুরবস্থার জন্য স্মৃতিকারদের—অর্থাৎ পুরুষদের দোষ দেয়। কিন্তু সম্পূর্ণ দোষ ওঁদের নয়। মেয়েদেরও আছে। সে-কথা আরেকদিন হবে। আইমা নোটিশ দিয়েছেন।'

ইতিমধ্যে আমি একটি গেলাস চেয়ে নিয়ে সেইটে মোজেলে ভরে আইমার জন্য রান্নাঘরে নিয়ে যেতে বুড়ী প্রাচীন দিনের পদ্ধতিতে দাঁড়িয়ে উঠে দু'হাতে দু'দিকের স্কার্ট সামান্য তুলে কার্টসি করলেন। বললেন, 'না বাছা, অতখানি না।' বসার ঘরে এসে মাটিল্‌ডের গেলাসে প্রায় সবখানি ঢেলে দিয়ে 'স্বাস্থ্য পান' করলেন।

আমি মাটিল্‌ডেকে বললুম, 'আপনি না বলছিলেন, আপনি নিওরটিক? কিন্তু এতক্ষণ ধরে আপনি যে শাস্ত্র-চর্চা করলেন তার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত তো যুক্তিসঙ্গত প্রতিজ্ঞা, প্রত্যক্ষ ও ন্যায়সঙ্গত অনুমানের দৃঢ়ভূমির উপর নির্মাণ

করলেন। এমন কি নিওরসিসের পুনরাবৃত্তি প্রমাদ থেকেও আপনার ধারাবাহিক প্রামাণ্যবিন্যাস সম্পূর্ণ মুক্ত।'

মাটিল্‌ডে ম্লান হাসি হেসে বললেন, 'নিওরসিস, অনুভূতির রোগ। তার হৃৎভূমি আমাদের হৃৎপিণ্ডে, স্মৃতিশাস্ত্র মস্তিষ্ক রাজ্যের নাগরিক।'

তারপর ভেবে বললেন, 'সেখানেও যে হৃৎপিণ্ডের নিপীড়ন একেবারে পৌঁছয় না তা নয়। সেখানেও কিছুটা 'ইদে ফিক্‌স্' এসে গিয়ে মস্তিষ্ককে নূতন কিছু করতে দেয় না। অর্থাৎ আমি সেই "স্মৃতিশাস্ত্রে স্ত্রীজাতি" থেকে বেরিয়ে গিয়ে কোনো নূতন কিছুর সন্ধানে লাগতে পারি নে। এই বিষয়ে অত্যন্ত কাঁচা বই বেরুলেও, ওটাতে যে কোন তত্ত্ব নেই জেনে শুনেও সেইটেই পড়ি। দেখি তার বক্তব্য কোথায় কোথায় আমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে ক্লিক্ করছে, আর কোথায় কোথায় করছে না। এতে করে কোন্ নবীন জ্ঞান সঞ্চয় হয়, কোন্ চরম মোক্ষপ্রাপ্তি!—আর ওদিকে পড়ে রইল জ্ঞান-বিজ্ঞান-ভুবনের নবাবিষ্কৃত খনির নব নব মণি-ভাণ্ডার—অবহেলা অনাদরে। ঠাকুরমাকে এনে দিলুম বড়দিনের নূতন স্কার্ট, জ্যাকেট, বনেট, জুতো। ঠাকুরমা মুখ গুঁজে রইলেন তাঁর স্ত্রী-ধনের সারাটোগা সিন্দুকের ভিতর! সেনিলিটি, ভীমরতি, ইদে ফিক্‌স্!

চলুন—আইমার প্রতি সুবিচার করতে। এমনিতেই না, সেখানে অতি অবশ্য এ-সব কথা তুলবেন না।'

আইমার রান্নার বর্ণনা দেব না। সুশীল পাঠক, তোমার আশী বছরের পাকা-পাচিকা ঠাকুরমা যদি থাকেন তবে তুমি অনায়াসে বুঝে যাবে, এঁরা মিন-নোটিশে, দ্বিপ্রহর রাত্রেও কী ভানুমতীর ভোজবাজি দেখাতে পারেন।

এখানে 'ভোজ' আমি ভোজন অর্থেই নিচ্ছি। বিক্রমাদিত্য-মহিষীর ইন্দ্রজালও অবশ্য তাতে রয়েছে। আর আমাদের জনপদ কাহিনীতেও আছে, ভোজরাজদুহিতা কালিদাসকে ভোজ দিয়ে পরিতুষ্ট করতেন।

মে মাসে রাত একটায় রাইনল্যাণ্ডেও বেশ শীত পড়ে। বেরুবার সময় মাটিল্‌ডে জোর করে আমার স্কন্ধে তাঁর হাল্কা ম্যান্‌টল্‌টি চাপিয়ে দিয়েছিলেন।

বার্‌বা রস্‌সার কথা যে আমার মনে ছিল না তা নয়। কিন্তু আমার হোটেল কাছেই।

ভেন্‌সর্বেকভেক-এ নেমেই সামনে পড়ে কাস্‌লের বোটানিক্যাল গার্ডেনের চক্রাকার পরিখা। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দেখি অসংখ্য কুমুদিনী সৌরভজাল বিস্তার করেছে। চতুর্দিক নিঝ্‌ঝুম নীরব। আমাদের গ্রামাঞ্চলের চেয়েও নীরব—কারণ সেখানে বেওয়ারিশ কুকুর, বনের শেয়াল, দস্তী মোরগা—কেউ না

কেউ নিস্তব্ধতা ভাঙবেই। দূরে কাইজার প্লাৎসে দু-চারখানা মোটরের আনাগোনা আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু এরা নিরীহ নিদ্রালুর ঘুম ভাঙানোর জন্যই যে মোটরে হর্ন থাকে সেটা এখনো জানতে পারে নি।

বুকের ভিতরটা কি রকম মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। আমি কবি নই, আর্টিস্ট নই—আমার হৃদয় স্পর্শকাতর নয়, কিন্তু অকালে বিনাদোষে হৃতযৌবনা, কিংবা আমার ছোট বোনের সখী তরুণী মাধুরীর থানকাপড়, কিংবা রবীন্দ্রনাথের বিধবা মল্লিকা একমাত্র রুগ্ন সন্তানকে জলে বিসর্জন দিয়ে মকরবাহিনীর কাছ থেকে লব্ধস্বাস্থ্য সন্তানকে ফিরে পাবার আশায় কঙ্কণ-বলয়হীন হাত দুখানি বাড়িয়ে যখন দেখে—দেখে সব মিথ্যা, সব বঞ্চনা—এসব দেখলে কিংবা কবি দেখালে আমার মত মূঢ় জড়ভরতও চট করে দৈনন্দিন জীবনে ফিরে যেতে পারে না।

আমি কি ভালোবাসি নি?—আমার মত অপদার্থ ক্ষণতরে ভালোবাসা পেয়েও ছিল—পথের ভুলে অপদার্থের প্রাণের কূলে বসন্তপবন হঠাৎ কখন এসে যায়, আর যাবার সময় ছেড়ে যায় তার অঞ্চল থেকে গ্রীষ্মের খরতাপ, রৌদ্রদাহ, তৃষ্ণাবাণ। ইচ্ছা করেই। কিন্তু সে কথা থাক। খৃষ্টের বদনাম ছিল, তিনি মদ্যপ, তিনি নর্তকীকে সাহচর্য দেন। তিনি সব দেখেই বলেছিলেন, 'কাউকে বিচার করতে যেয়ো না।' পয়গম্বর বলেছেন, 'তোমার সবচেয়ে বড় দুশমন তোমার দুই কাঁধের মাঝখানে'—অর্থাৎ তুমি নিজে। তবে কে তোমার প্রতি অবিচার করেছে সে অনুসন্ধানে আপন জান্ পানি করো কেন?

এঁর ভিতরকার জ্বলন্ত বহ্নিশিখা এঁর মুখ আর হাত দুখানিই পুড়িয়ে ফেলল কেন? ঐ দুটিই মানুষের ভিতরকার মানুষকে প্রকাশ দেয়—সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, তার জন্ম-মৃত্যু। বিশেষ করে মানুষের হাত দুখানি প্রকাশ করে তার পরিবারের ঐতিহ্যগত স্পর্শকাতরতা, চিন্তাশীলতা কিংবা সে দুটি রসে রসে ভরা। মূঢ় জনের হাত দুখানি কচ্ছপের খোলের মত।

ইনি কি জানতেন, যখন তাঁর বন্ধুর থীসিস তিনি টাইপ করে দিচ্ছিলেন যে, প্রত্যেকটি হরপে ঠোকা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর আপন কফিন-বাক্সের ডালায় স্বহস্তে একটি একটি পেরেক পুঁতছেন?

স্বামী-সোহাগিনী কার্লোটা পাগলিনীর মত ছুটে এলেন সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের কাছে প্যারিসে, তারপর গেলেন তাঁর ভাশুর প্রবল প্রতাপান্বিত অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সম্রাটের কাছে—পায়ে পড়লেন তাঁদের, 'তোমরাই আমার স্বামীকে পাঠিয়েছিলে মেকসিকোর সম্রাট করে। আমাকে সামান্য একমুঠো সৈন্য

দাও। আমি তাঁকে বাচাতে পারবো।'

ওদিকে স্বামী মাকসিমীলিয়ান প্রহর গুনছেন কার্লোটার প্রত্যাবর্তন কিংবা অবধারিত মৃত্যুর জন্য। দ্বিতীয়টাই হল। খোয়ারেসের আদেশে তাঁকে দাঁড়াতে হল বন্দুকধারী সৈন্যদের সামনে। এমপেরর মাকসিমীলিয়ান ক্ষাত্রধর্মের শেষ আভিজাত্যের প্রতীক—মৃত্যুবেদীতে দাঁড়াবার পূর্বে বন্দুকধারীদের প্রত্যেককে তিনি একটি একটি করে সোনার মোহর দিলেন।

সব খবর কার্লোটা পেলেন, প্যারিস ভিয়েনায় ছুটোছুটির মাঝখানে। তাঁর মাথার ভিতর কি যেন একটা ঘটে গেল। তাঁর চোখে দেখা দিল এক অদ্ভুত দ্যুতি যার দিকে কেউই তাকাতে পারতো না। পারলে তাঁর সম্মুখ থেকে পালাত।

তারপর দীর্ঘ ষাট বৎসর ধরে তিনি কথা বলতেন ওপারের লোকের সঙ্গে। আর বার বার ফিরে আসতেন ঐ এক কথায়: তাঁর স্বামীকে বলতেন, 'মাক্‌স্‌ল্‌, মাক্‌স্‌ল্‌, সব দোষ আমারই। আমারই সব দোষ।'

আমি বিমূঢ়ের মত কিছুতেই ভেবে পাই নে মানুষের দোষ কোথায়, তার পাপই বা কি পুণ্যই বা কি?

কী সদাশিব, শান্ত এই বন্‌ শহর। কিন্তু তাই কি? চেস্টনাট গাছের ঘন পাতা থেকে ঝরে পড়ল আমার হাতের উপর এক ফোঁটা হিমিকাশ্রু। কার এ অশ্রু? আমি জানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে খুব কম মেয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসতো—আদৌ আসতো কি না জানি নে—তাই ছাত্রেরা প্রণয় জমাতো বন্‌-বালাদের সঙ্গে। তারপর টার্ম শেষ হতেই অনেকেই চলে যেত ভিন্ন য়ুনিভার্সিটিতে। তাই এ-প্রেমের নাম সেমেস্টার-লীবে বা এক টার্মের প্রণয়। কারো কারো প্রেম অবশ্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই আপন আপন অধ্যয়ন সমাপন করে উড়ে চলে যেত এদিক ওদিক। আর পড়ে রইত বন্‌-বালাদল তাদের অশ্রুজল নিয়ে।

বনের আপন তরুণ দলও এ পরিস্থিতির সঙ্গে সুপরিচিত।

আমার একটি ঘটনা মনে পড়লো। আমার এক বান্ধবীকে রাত্রিবেলা বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ঘরমুখো রওয়ানা হয়ে কয়েক পা এগিয়েছি এমন সময় শুনতে পেলুম বান্ধবী একতলার দিকে ডাকছে তার ঘুমন্ত ভাইকে নিচের সদর দরজা খুলে দেবার জন্য। আমার উল্টো দিক থেকে আমার দিকে এগিয়ে আসছে একটি তরুণ। সে ভেবেছে মেয়েটি বুঝি আমাকে ডাকছে, আর আমি সাড়া না দিয়ে চলে যাচ্ছি। আমাকে পাশ করার সময় মিনতি-ভরা মৃদু কণ্ঠে বললে,

'এত কঠিন হৃদয় হবেন না, যুঙার হার (ইয়াং জেণ্টলম্যান)।'

সে রাত্রে বনের গলিঘুঁচি বেয়ে বেয়ে অনেক ঘোরাঘুরি করেছিলুম। মনটা বড় অশান্ত। ভোরের দিকে হঠাৎ রোঁদের একজন পুলিস আমার সামনে দাঁড়িয়ে বুটের হিলে হিলে ক্লিক করে সেলুট দিল। আমি বললুম, 'গুটেন্ আব্‌ণ্ট।'

পুলিস বলল, 'গুড মর্নিং বলাই কালোপযোগী হবে। ভোর হতে চলেছে।'

তারপর গলা নামিয়ে বললে, 'এই নিয়ে আপনাকে তিনবার ক্রস করলুম। ইস্ট ভাস লোস্? এনিথিং রং?'

এ শহরের পুলিসও দরদী। আমি বললুম, 'না, অনেক ধন্যবাদ।'

বললে, 'এ রকম ছন্নের মত একা একা রাতভর ঘোরাঘুরি করে কি লাভ? চলো, ঐ বেঞ্চিটায় বসে আমার সঙ্গে একটা সিগারেট খাবে।'

আমি নিজের প্যাকেট বের করলুম। আমার সিগারেট নিতে খুব সহজে রাজী হল না।

বললে, 'তুমি ভ্যাগাবণ্ড নও, রাস্তাও হারাও নি, এবং চুরিতে যদি হাতখড়ি হয়ে থাকে তবে সে অতি সম্প্রতি। আমি তোমাকে কিছুটা চিনি। কয়েক বছর আগে যখন এখানে ছাত্র ছিলে তখন আমার বীটেই তোমার বাসা ছিল। তারপর কিছুদিন তোমাকে না দেখতে পেয়ে বুঝলুম আর পাঁচটা ফেৎলেস টমাটোর মত (জর্মনরা কেন টোমাটোকে faithless বলে, জানি নে) পাশ করে দেশে চলে গেছে। কিন্তু জানো, তোমাকে সে পর্যায়ে ফেলা যায় না। বিশ্বাস করবে না, তুমিই পয়লা বিদেশী যে পরীক্ষা পাশ করার পর চলে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে। কিছু মনে করো না, আমি বড় খোলাখুলি কথা বলি। হ্যাঁ, তোমার সেই প্ল্যাটিনাম ব্লণ্ড বান্ধবী গেল কোথায়? তোমাদের দু'জনার চুল ছিল এই শহরের দুই একস্ট্রীম। সবাই তাকাতো।'

আমি বললুম, 'ও! মার্লেনে? সে বিয়ে করে ফ্রিজিয়ান দ্বীপে চলে গেছে।'

'তাই বুঝি ছন্নের মত—?'

আমি ধীরে ধীরে বললুম, 'না, আজ একটি মেয়ের জীবনকাহিনী শুনে বড় দুঃখ হল। মন শান্ত হচ্ছিল না।'

বললে, 'সরি।'

সিগারেট শেষ করে গুপো উঠে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললে, 'তোমার পার্সনাল ব্যাপারে আমি ঢুঁ মারতে চাই নে সে তো স্বতঃসিদ্ধ। তাই শুধু বলি এই বন্ শহরে ক্রাইম এতই কম হয় যে, দুষ্টের দমন অপেক্ষা শিষ্টের পালন

করতে হয় আমাদের—অর্থাৎ পুলিসের—বেশী। আর্তের সাহায্য করতে গিয়ে কিন্তু আমি বার বার দেখেছি, সত্যকার সাহায্য করা অতি কঠিন, প্রায় অসম্ভব। জর্মনে একটা কথা আছে: মমতায় ভরা এই যে মায়ের শরীর, যে তার বাচ্চার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, সে কি পারে তার মুমূর্ষু শিশুকে তার মরণে সাহায্য করতে? এইটুকু দুধের বাচ্চাকেও মরতে হয় আপন মরণ। যে অজানা পথে যেতে ত্রিশ বছরের জোয়ানও ভয় পায়, আট বছরের শিশুকেও সেই পথে পা দিতে হয়।

কে কার সাহায্য করতে পারে?

পারেন শুধু মা মেরি।

আবার দেখা হবে, য়ুঙার হ্যার, শুধু শুধু মন খারাপ না করে হোটেলে গিয়ে শুয়ে পড়ো। আর দরকার হলে পুলিসের পুৎসির খবর নিয়ো।'

বড় দুশ্চিন্তায় পড়লুম। আমার ছাত্রজীবনের ল্যাণ্ড-লেডি এখন থাকেন ব্যুকেবুর্গ নামক ছোট্ট শহরে। তার পাশে একটা গ্যারিসন। তিনি এসেছিলেন বলে, এবং আমার খবর জানতেন বলে আমাকে ফোন করলেন, বললেন জরুরী খবর আছে। তাঁকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করলুম তাঁর প্রিয় 'আম্ রাইন' রেস্তোরাঁয়। সেখানে গিয়ে দেখি, তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমার বিস্ময় প্রকাশ করার পূর্বেই তিনি বললেন, 'নাৎসিদের গোয়েন্দাগিরি চরমে পৌঁছেছে। এঁদের অনেকেই দূর থেকে শুদ্ধমাত্র ঠোঁটের নড়া থেকে কথা বুঝে নিতে পারে। তাই বাইরেই জরুরী গোপন কথাটা সেরে নি।

'খবরের কাগজে নামগন্ধ নেই, লার্ক-হক জানে না, কিন্তু আমরা গ্যারিসনের কাছে থাকি, আমাদের কাছে ট্রুপ মুভমেণ্ট লুকানো অসম্ভব। পরশু রাতে প্রায় পঁচিশ হাজার সৈন্য গেছে চেক্-সুড্ এটেন্ সীমান্তে। লড়াই যদি আচমকা লেগে যায়, তবে আপনি ইণ্ডিয়ান, অতএব ব্রিটিশ, অতএব শত্রু। নজরবন্দী হয়ে থাকবেন। দেশ থেকে টাকা আসবে না। দুরবস্থার চরম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাই দেখেছি।'

তাঁর সদুপদেশ—না বললেও আমি বুঝলুম—ইংরেজ লড়াই হারলে যে তার নিজস্ব আবিষ্কার করা ভাষায় বলে 'বাহাদুরিকে সাথ হটনা' ('বীরত্বের সঙ্গে পলায়ন!'—শোলার পাথর বাটি, ডুববেও ভাসবেও) সেইটি আমার অবলম্বন করা।

বললুম, 'চলুন, ভিতরে গিয়ে খেতে খেতে চিন্তা করি।'

এ-রেস্তোরাঁর সঙ্গে ল্যাণ্ড-লেডির নিদেন চল্লিশ বছরের পরিচয়। মালিক, ওয়েট্রেস, সবাই উদ্বাহু হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালো।

হঠাৎ যদি এখন আমাকে জর্মনি ত্যাগ করতে হয়, তবে তার পূর্বে মাটিল্‌ডেকে তাঁর শেষ প্রশ্ন শুধোবার একটা সুযোগ দিতে হয়।

টেলিফোনে তাঁকে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ জানালুম আর টাপে-টোপে বোঝালুম, আমার বিশেষ প্রয়োজন।

ফিরে আসতে ফ্রাউ এশ্‌ ফিস ফিস করে বললেন, 'কাউণ্টারের পিছনে ঐ ওয়েট্রেসটিকে লক্ষ্য করুন। বেচারী পড়েছিল এক পিচেশের পাল্লায়। একটা গরীব ডাক্তারীর ছাত্র করে ওর সঙ্গে প্রণয়। মেয়েটি পুরো ছ' বছর ওর খরচা যোগায়। কথা ছিল শেষ পরীক্ষার পর সে তাকে বিয়ে করবে। পরীক্ষা পাসের তিন দিন পরে বদমাইশটা এক খানদানী, ধনী মেডিকেল স্টুডেণ্টকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে তাকে বিয়ে করেছে।'

মেজাজটা তেতো হয়ে গেল। আমি যে-সব ঘটনা শুনতে চাই নে সেগুলিই যেন গেস্টাপো ডালকুত্তার মত আমার পিছনে লেগেছে।

এশ্‌ বললেন, 'কিন্তু ধন্যি মেয়ে! রেস্তোরাঁর এই যে মালিক, সে মেয়েটাকে বড় স্নেহ করে। সে তো রেগে তার উকিল ভাইকে ফোন করে বললে, "লাগাও দু-দুটো মোকদ্দমা—একটা ফৌজদারী, একটা দেওয়ানী। ব্যাটাকে আমি জেলে পচাবো, আর ব্যাটার ডাক্‌তারি লাইসেন্স দিয়ে টয়লেট পেপার বানাবো।" কিন্তু ঐ যে বললুম, ধন্যি মেয়ে, কিছুতেই রাজী হল না কড়ে আঙুলটি পর্যন্ত তুলতে। কী আকাট, কী আকাট মেয়েগুলো!'

আমি কিছু না বলে বিরাট এক পীস কাঁচের দেওয়ালের ভিতর দিয়ে মাটিল্‌ডের জন্য পথ চেয়ে রইলুম। দেখা পাওয়া মাত্র বাইরে গিয়ে তাকে সব কথা বললুম।

মাটিল্‌ডে কিছুমাত্র আশ্চর্য না হয়ে বললেন, 'আমি অনেক কিছু আজ সকাল বেলা একস্‌চেঞ্জে গিয়েই জানতে পেরেছি। আমরা সব-কিছুই জানতে পাই। এমন কি, বার্লিনস্থ ফ্রান্সের রাজদূত মসিয়ো ফ্রাঁসোয়া পঁসে পর্যন্ত কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়েছেন।

আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন।'

খাওয়ার পর হোফ্‌ গার্ডেনে বেড়াতে বেড়াতে স্থির হল, কাল সকালের গাড়িতে আমি প্যারিস চলে যাব। ফাঁড়াটা কেটে গেলে আমি ফের বন্‌ চলে আসবো। নইলে—সে তখন দেখা যাবে।

ফ্রাউ এশ্‌কে আমরা ম্যানস্টার গির্জে অবধি পৌঁছে দিলুম। আচার-নিষ্ঠা রমণী পথে আমার মঙ্গলের জন্য একটা বাড়তি মোমবাতি কিনলেন—মা-মেরির পদপ্রান্তে জ্বালাবেন বলে।

মাটিল্‌ডেকে একস্‌চেঞ্জে পেঁৗছে দিয়ে বললুম, 'আপনার সঙ্গে ডিনার খাবো। ক'টায় আসবো ?'

'পাঁচটার পরে যে-কোনো সময়।'

হিটলারের উপর পিত্তিটা চটে গেল। একটা নিরীহ বঙ্গসন্তানকে তার ছুটিটা আরামসে কাটাতে দেয় না। কিন্তু গোস্‌সাটা অবিমিশ্র নয়। একটা অস্ট্রিয়ান ভ্যাগাবণ্ড, যুদ্ধে ছিল মাত্র করপরেল, সে কিনা আমাদের দুশমন মহামান্য ইংলণ্ডেশ্বর—যাঁর রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না, (অবশ্য ফরাসীরা বলে, 'ইংরেজকে ভারতীয়দের সঙ্গে অন্ধকারে ছেড়ে দিতে স্বয়ং "বঁ দিয়ো"—করুণাময় সৃষ্টিকর্তাও —সাহস পান না'—) এবং তাঁর স্নব্‌ কনজারভেটিভ গুষ্টিকে প্রায় চার বছর ধরে তুর্কী নাচন নাচাচ্ছে, এ-সুসমাচারটি কানে এলেই মনে হয়, ইটিকে লিপিবদ্ধ করার জন্য নয়া নয়া মথি মার্কের প্রয়োজন !

অপরাহ্ণের এই মধুর আলোতে কার না শরীর অলস আবেশে ভরে যায়। কাইজার প্লাৎসের ফোয়ারার উপর ক্ষণে ক্ষণে রামধনু লাগছে। পাশে, সেই ১৯৩০ থেকে পরিচয়ের বুড়ো উইলি দিশী-বিদেশী খবরের কাগজ বেচছে। জর্মন কায়দায় সে 'দি টাইমস'-কে 'টে টিমেস' উচ্চারণ করতো বলে আমরা কৌতুক অনুভব করতুম। কাছে এসে কানে কানে বললে, 'সব বিদেশী কাগজ বাজেয়াপ্ত। একটা বাজে কাগজ কি করে এসে গেছে, সক্কলের দৃষ্টি এড়িয়ে। আমার মেয়ে পড়ে বললো, প্যারিস লণ্ডনে ধুন্দুমার।' বলে পুট করে আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিল কাগজখানা।

নাঃ! এখন পড়ে কি হবে ? তার চেয়ে তাকিয়ে থাকবো চেস্‌নাট সারির দিকে, নাকে আসবে বোটানিকসের সুগন্ধ, কানে আসবে পপেলস্‌ডর্ফের এভিনিউর কাচ্চাবাচ্চাদের খেলাধূলার শব্দ, কিংবা কারো খোলা জানালা দিয়ে পিয়ানো প্রাকটিস। কিংবা—

পা দুটো লম্বা করে একটা বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে নিয়েছি।

সামনে মাটিল্‌ডে। অফিস থেকে বাড়ি আসা-যাওয়ার পথ তাঁর এইটেই। বললেন, 'কি স্বপ্ন দেখছিলেন ?'

আমি বললুম, 'সেই যে চীনা দার্শনিক বলেছিলেন, "স্বপ্নে দেখলুম আমি

প্রজাপতি হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছি। জেগে উঠে চিন্তায় পড়লুম, এই যে আমি ভাবছি আমি মানুষ, সে কি তবে প্রজাপতির স্বপ্ন? প্রজাপতি স্বপ্ন দেখছে, সে মানুষ হয়ে সোনালী রোদে রূপালি ঝর্নার কাছে বসে চা খাচ্ছে।"

মাটিল্‌ডে বললেন, 'স্বপ্নে যদি কিছু একটা হবেই, তবে প্রজাপতিটা লক্ষ্মীছাড়া মানুষ হতে যাবে কেন? বরঞ্চ রূপালি ঝর্না হলেই পারে। কত না পাহাড়, কত না সবুজ মাঠ, কত না পাইন বন পেরিয়ে সে হবে প্রশস্ত নদী, তার বুকের উপর দিয়ে ভেসে যাবে নলরাজের রাজহংস, ভরা পালে উড়ে যাবে ময়ূরপঙ্খী, তার বুকে কখনো উঠবে ঝড়ঝঞ্ঝা, কখনো প্রতিবিম্বিত হবে পূর্ণ চন্দ্র। সর্বশেষে সে পাবে তার চরম মোক্ষ পরমা শান্তি-সমুদ্রের সঙ্গে আপন সত্তা মিলিয়ে দিয়ে।'

আমি বললুম, 'অন্তত মানুষ এই স্বপ্নই দেখেছে: "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" —আসলে সেটা কবি রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন।'

'উত্তর মেঘ ও যক্ষের স্বপ্ন।'

কিছু উত্তর না দিয়ে মনে মনে বললুম, 'হায় সৃষ্টিকর্তা, প্রেমের ঠাকুর! কোথায় না এ-রমণী এ-সব কথা বলবে তার দয়িতের সঙ্গে, আর কোথায় সে এ-সব বলছে আমার মত কলাগাছকে। ওমর খৈয়াম তাই পৃথিবীর উপর থুথু ফেলতে চেয়েছিলেন।'

মাটিল্‌ডে কি খবর জানতে চান, সেটা আমি মোটামুটি অনুমান করতে পেরেছি, কিন্তু হায়, আমি তো তাঁকে এমন কিছু বলতে পারবো না, যা শুনে তাঁর বেদনাভার লাঘব হবে। তাই তিনি সেটা না শুধালেই আমি শান্তি পাই। কিন্তু আমি যদি তাঁকে শুধোবার সুযোগ না দি, তবে কি সেটা আমার পক্ষে অন্যায় হবে না? কাল যাচ্ছি প্যারিস। যদি সত্যি লড়াই লেগে যায়, তবে আমাদের দুজনাতে পুনরায় দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

যা হয় হবে, আমিই তাঁকে সে সুযোগ দেব।

ব্যালকনিতে লম্বমান হয়েছি দু'খানা ডেক্ চেয়ারে। বললুম, 'দুজনার ভালোবাসা যদি কোনো কমন ইনটারেস্টের চতুর্দিকে গড়ে ওঠে, তবে সেটা হয় বড় প্রাণবন্ত, মধুর ও দীর্ঘস্থায়ী। ব্রাউনিং আর মিসেস ব্রাউনিং দুজনা একে অন্যের মধ্যে মিশে যেতেন কবিতায় কবিতায়। এমন কি, শুষ্ক বিজ্ঞানও দুজন মানুষকে একই রসের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আপনার কথা যখনই ভাবি, তখনই মনে পড়ে প্রফেসর ও মাদাম ক্যুরির কথা।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর তিনি বললেন, 'আপনার এ-কথাটি কালিদাসও বলে গেছেন। "গৃহিণী, সচিব ইত্যাদি"—অতখানি আশা আমি

কখনো করি নি। এবং আমি আমাদের প্রণয়ের প্রথম দিন থেকেই জানতুম, ডিগ্রী পাওয়ার পরই তিনি চলে যাবেন আপন দেশে—না, দাঁড়ান, জানলুম কিছুদিন পরে। সংস্কৃত পড়াবার সময় তিনি মহাভারত থেকেও কিছুটা বেছে নেন। তাতে ছিল কচ ও দেবযানীর উপাখ্যান। আপনি ভাববেন না, তিনি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে ঐ উপাখ্যানটিই আমার জন্য বেছে নিয়েছিলেন। তা হলে হয়তো তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। কিন্তু কি জানি, কে জানে—'

হঠাৎ যেন দিশে পেয়ে বললেন, 'দেখুন, কাল আপনাকে যে-কথাটা বলেছিলুম, সেটা আবার, আরো জোর দিয়ে বলি, আমি নিওরটিক, আমার মন যখন কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছয়, তখন মনে হয়, সেইটেই ধ্রুব। আবার পরে দেখি, সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।'

হঠাৎ হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বিকৃত কণ্ঠে বললেন, 'শুধু এই দশ বছরের যন্ত্রণা মিথ্যা নয়।'

ক্ষীণ চন্দ্রালোকে দেখি, দু-হাতের ফাঁক দিয়ে বয়ে বেরুচ্ছে চোখের জল। কত বৎসরের চাপা কান্না, কে জানে? এর পূর্বেও তিনি তাঁর বেদনার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু চোখ দুটি ছলছল করতেও দেখি নি। আর এ যে-ধারা নেমে এসেছে, এ তো কোনো পরিণত বয়স্কা রমণীর কান্না নয়, এ যে অবুঝ শিশুর কান্নার মত। ইনি যখন শাস্ত্রালোচনা করেন তখন মনে হয়, ইনি আমার পিতার বয়সী, দৈনন্দিন আচরণে মনে হয়, ইনি আমার বড়দিদির বয়সী। আর এখন? এখন দেখি তিনি কাঁদছেন আমাদের পরিবারের সবচেয়ে ছোট, আমার অভিমানিনী ছোট বোনের মত। সে কোনো যুক্তি-তর্ক শোনে না, কোনো সান্ত্বনা মানে না। যেন সে এই বিশ্ব-সংসারে একেবারে একা—তার সঙ্গী শুধু তার চোখের জল।

কি আছে বলার, কি যায় লেখা?

কিন্তু তাঁর আত্মসংযম অসাধারণ। বছরের পর বছর চোখের জল চেপে রাখার ফলে শুকিয়ে গেছে তাঁর মুখ আর হাত দু'খানা। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তাঁর জীবনে এই তাঁর প্রথম ভেঙে পড়া।

তাঁর কান্নার ভিতর দিয়ে তিনি শুধু একটি অনুযোগ প্রকাশ করেছিলেন। ডিগ্রী লাভের কয়েক দিন পরই তাঁর বন্ধু দেশে ফিরে যান। বন্ স্টেশনে তিনি তাঁকে বিদায় দেন।

তারপর তাঁর কাছ থেকে একখানা চিঠি না, একখানা পোস্টকার্ড না, একটি ছত্র মাত্র না। নববর্ষে, জন্মদিনেও না। সেই যে বন্ স্টেশন থেকে তিনি

বিলীন হলেন, তারপর তিনি বেঁচে আছেন কি না, সে কথাও মাটিল্‌ডে জানেন না। মাটিল্‌ডে তাঁকে দু'খানা চিঠি লিখেছিলেন।

আমি জানতুম, এইবারে আমার অগ্নি-পরীক্ষা আসবে, কিন্তু পূর্বেই বলেছি, আমি স্থির করেছিলুম, আমি প্যারিস পালিয়ে গিয়ে সেটা এড়াবো না।

এপার ওপার—যে পারই হোক, হয়ে যাক।

যে-প্রশ্ন তিনি বার বার শুধোতে গিয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্বে শুধোতে পারেন নি, আমি নিজের থেকেই তার উত্তর দিলুম।

ধীরে ধীরে বললুম, 'আমি ডাঃ কাণেকে চিনি। চিনি বললে ভুল বলা হবে। সামাজিক অনুষ্ঠানে লৌকিকতার দু-চারটি কথা হয়েছে মাত্র।'

এবারে আমারও কড়া একটা কিছু খাওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। তারই ছল করে ঘরের ভিতরে চলে গেলুম। ইনি এটা সয়ে নিন।

ফিরে এলে মাটিল্‌ডে শুধোলেন, 'বরোদা তো ছোট শহর ; উনি নিশ্চয়ই জানেন, আপনিও বনের ছাত্র ছিলেন। সে নিয়ে কোনো কথাবার্তা হয় নি ?'

'না, আমি চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু উনি কোনো কৌতূহলই দেখালেন না। তবে আপনি নিশ্চয় জানেন, উনি কথা বলেন অত্যন্ত কম।'

মাটিল্‌ডে এক ঝটকায় খাড়া হয়ে বসলেন। প্রথমটায় বিস্ময়ে যেন বাক্য-হারা। 'কি বললেন আপনি! পাণ্ডুরঙ কথা বলেন কম! আমার সঙ্গে তো অনর্গল কথা বলতেন!'

মনে পড়ল আমার বন্ধু সোহরাব ওয়াডিয়ার মন্তব্য। পাণ্ডুরঙ শঙ্কর কাণে সম্বন্ধে। বললুম, 'যখন দেখলুম তাঁর কৌতূহল অত্যন্ত কম, তখন আমিও তাঁর সম্বন্ধে কোনো খবর নিই নি। তৎসত্ত্বেও তাঁর কথা উঠলে আমার এক বন্ধু বলেছিলেন, আপন জনের মাঝখানে—ঐ যে আপনি বললেন—উনি অনর্গল কথা বলেন।'

মনে হল, মাটিল্‌ডে যেন খানিকটা সান্ত্বনা পেলেন। তাতে আশ্চর্য হবার কি ? কবি রুমীর দিকে তাঁর গুরু রাস্তায় তাঁকে ক্রশ করার সময় একবার মাত্র একটুখানি স্মিতহাস্য করেছিলেন। সেইটুকুর অনুপ্রেরণায়ই তিনি রচলেন তাঁর মহাকাব্য।

এইবারে আমার শেষ বক্তব্যটুকু বলার সময় এসেছে।

আমি বললুম, 'মাটিল্‌ডে, ডাঃ কাণের কি করা উচিত ছিল না-ছিল সে জানেন বিধি। হয়তো আপনাকে যাবার পূর্বে সব-কিছু বুঝিয়ে দিয়ে গেলে ভালো হত, হয়তো না করে ভালোই করেছেন। আপনি যদি নিওরটিকই হয়ে গিয়ে থাকেন

—আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না—তা হলে উনি যাই করতেন না কেন, আপনি ভাবতেন, তার উল্টোটা করলেই ভালো হত।

কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা এই: কাণে বরোদার রাজ-প্রাসাদের গোপন-বিভাগে কাজ করেন। সেখানকার আইন অনেকটা ফরেন অফিসের মত। জানেন তো, বিদেশিনীকে বিয়ে করাও ওদের মানা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে-অনুমতিও তারা দেয়—ওদের সিনিকাল বিশ্বাস, বরঞ্চ মানুষ তার স্ত্রীর কাছ থেকে জিনিস গোপন রাখতে পারে, প্রণয়িনীর কাছ থেকে কিছুতেই নয়; এই তো সেদিন গ্যোয়েবলসের মত প্রতাপশালী মন্ত্রীও এই ধরনের ব্যাপারে হিটলার কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়েছেন। নেটিভ স্টেট মাত্রই চক্রান্তের চাণক্যালয়—আর রাজপ্রাসাদ! সেখানে পরস্পরবিরোধী একাধিক গোপন বিভাগ একে অন্যের বিরুদ্ধে সর্বক্ষণ চক্রান্ত-কর্মে মত্ত। আপনার সঙ্গে পত্রালাপ ধরা পড়তোই এক দিন না এক দিন, এবং তাঁর শত্রুপক্ষ যে সেটা কিভাবে কাজে লাগাতো তার কল্পনাও আমি করতে পারি নে। কাণেকে বৃহৎ সংসার পুষতে হয়—তিনিই একমাত্র উপার্জনক্ষম।'

দাঁড়িয়ে বললুম, 'এইবারে উঠি। কাল প্রভাতে প্যারিস গমন। হিটলার আমার সব প্রোগ্রাম তছনছ করে দিয়েছেন। সবাইকে আজ রাত্রেই চিঠি লিখে জানাতে হবে। তার উপর প্যাকিং রয়েছে।'

মাটিল্‌ডে যেন চিরকালের মত দাঁড়ালেন। আমার কাঁধের উপর হাত রেখে প্রায়ান্ধকারে আমার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইলেন। আমার মনে হল, আমি যেন তাঁর চোখে একটুখানি জ্যোতি দেখতে পেয়েছিলুম। সত্য জানেন অন্তর্যামী।

কিন্তু মিথ্যে বলেছিলুম আমি মাটিল্‌ডেকে। অন্তর্যামী যেন ক্ষমা করেন। আমি কাণের সাফাই গাই নি। আমি চেয়েছিলুম, মাটিল্‌ডের বুকের রক্ত দিয়ে গড়া তাঁর বল্লভ যেন ধূলিতলে লুণ্ঠিত না হয়। মাটিল্‌ডের জীবন তারই উপর নির্ভর করছে।

প্যারিসে পৌঁছনো মাত্রই শুনি, চেক সীমান্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে। হিটলার সৈন্য অপসারণ করেছেন। আমি আমার জাহাজের প্রিয়ার অনুসন্ধানে বেরুলুম না। কারণ, বনে থাকতেই তাঁর রোদনভরা প্রথম চিঠি পাই, 'আমি এখানে বাঁচবো কি করে? এ যে বড় হৃদয়হীন জায়গা। তুমি এখানে চলে এসো না, ডার্লিং।'

ভাগ্যিস্ আমি যাই নি। দু' দিন পরে দুসরা চিঠি 'কাল সহকর্মীদের সঙ্গে

গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছিলুম। ভেরি ইনটারেসটিং! মনে হচ্ছে, এখানে তিন বছর কাটাতে পারবো।' সাদা চিঠির কাগজে সাদা কালিতে লেখা প্রিয়ার প্রাঞ্জল বাণীটি বুঝতে আমার লহমা-ভর সময়ও লাগে নি। বস্তুত প্রথম চিঠি থেকেই সেটা আমার বুঝে নেওয়া উচিত ছিল। যে বলে, 'প্যারিস হৃদয়হীন', সে নিশ্চয়ই সেখানে পেঁছিনো মাত্রই পড়ি-মরি হয়ে, উদোম হিয়া নিয়ে হিয়ার সন্ধানে বেরিয়েছিল। ধন্য আমি, এহেন উদারহৃদয়ার সঙ্গে আমার হার্দিক পরিচয় হয়েছিল। ইনি কাণে গোত্রের নন; নিঃশব্দে, নীরবে মহাশূন্যে লীন হন না। প্যারিস ধন্য। মার্কিন প্রবাদ আছে, পুণ্যশীল মার্কিন মাত্রই মৃত্যুর পর জন্ম নেয় প্যারিসে।

আম্মো বেকার দিন কাটাই নি, কারণ, আমার যে কোনো কাজ নেই। করে করে তিন দিনের জায়গায় কেটে গেল দু' মাস। সর্বনাশ! প্যারিস বড়ই সহৃদয়, কিন্তু দরাজ-দিল নয়। কিপটেমি শিখতে হলে প্যারিসের খাঁটি বাসিন্দাদের সঙ্গে এক সপ্তাহ বাসই যথেষ্ট। শেষটায় রু দ্য সমরারের ইণ্ডিয়া-ক্লাবে জাতভাইদের সর্বনাশ করে তাদের তহবিল তছরূপ করে বিজয়গর্বে বন্ ফিরে এলুম। একদা নেপোলিয়ন যে-রকম প্যারিস থেকে বেরিয়ে হেলায় কলোন-বন্ জয় করেছিলেন।

মাটিল্‌ডেকে আমার উপর বেশী চাপ দিতে হল না। আমি সুড়সুড় করে তাঁর ফ্ল্যাটেই ঢুকলুম।

রবিবারে একসঙ্গে গির্জেয় গেলুম।

আইমা দেখি কাণের কাছ থেকে বেশ দু-চারটে ইণ্ডিয়ান ডিশ বানাতে শিখে নিয়েছিলেন। আর মাত্র তিন দিন বাকী। ভেনিস বন্দরে জাহাজ ধরে বোম্বাই পাড়ি দেব। ট্রাভেল আপিসে ভেনিস অবধি ট্রেনের টিকিট কেটে বাড়ি ফিরে দেখি ধুন্দুমার। গলা-কাটা মুর্গীর মত দুই রমণী এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছেন।

সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য! কাণে রাজপ্রাসাদের ঠিকানা দিয়ে মাটিল্‌ডেকে কেব্‌ল্ করেছেন, ভারতীয় ডাক্তারের উপদেশে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত তাঁর ছেলেকে ইয়োরোপ পাঠাচ্ছেন। মাটিল্‌ডে তার দেখ্-ভাল্ করতে পারবেন কি না যেন কেব্‌ল্ করে জানান।

মাটিল্‌ডের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে তিনি কেব্‌লের জবাব তো দিয়েছেনই, এখন বসে গেছেন আরেকটা কেব্‌লের মুশাবিদা করতে। আর আমাকে প্রশ্ন, ছেলেটার বয়স কত, কি ব্যামো হতে পারে, সে নিরামিষাশী কি

না, এবং সব চেয়ে বড় প্রশ্ন সে নামবে কোন্ বন্দরে? তিনি সেখানে উপস্থিত থাকতে চান, নইলে তাকে দেখবে কে? মুশাবিদা বন্ধ করে ফোন করেন কখনো বা ট্রাভেল আফিসকে কখনো বা তাঁর দপ্তরকে পাওনা ছুটির মঞ্জুরীর জন্য। হঠাৎ সব কিছু বন্ধ করে লেগে যান প্যাক করতে—হয় যাবেন মার্সেই, নয় রোম। সেখান থেকে ইটালিয়ান যে কোনো বন্দরে পৌছনো যায় ঘণ্টা কয়েকের ভিতর। নইলে এখান থেকে খবর পেয়ে তিনি ইটালিয়ান বন্দরে পৌছতে না পৌছতে জাহাজ হয়তো ভিড়ে যাবে সেখানে। ট্রাভেল দফতর অভয় দেয়, তিনি মানেন না। ইতিমধ্যে তারা পিয়ন মারফৎ পাঠিয়ে দিয়েছে, বোম্বাই-ভূমধ্যসাগরের তাবৎ জাহাজ কোম্পানির টাইমটেবল। আমি সেগুলো অধ্যয়ন করতে লেগে গেলুম গভীর মনোযোগ সহকারে।

তাঁর দ্বিতীয় কেব্‌ল্ যাওয়ার পর মাটিল্‌ডের মনে জাগলো আরেক ঝুড়ি বাস্তব-অবাস্তব প্রশ্ন। তৃতীয় মুশাবিদায় তিনি বসে যান।

হাত নিঙড়াতে নিঙড়াতে পায়চারি করেন আর বলেন, 'মাইন গট্, মাইন গট্'—'হে ভগবান, হে ভগবান!'

হঠাৎ ছুটে এলেন আমার কাছে। মুখ থেকে শেষ রক্তবিন্দু অন্তর্ধান করেছে। আর্তকণ্ঠে শুধালেন, 'হঠাৎ যদি যুদ্ধ লেগে যায়, তবে কি হবে?' আমি শান্ত কণ্ঠে বললুম, 'নিরপেক্ষ সুইটজারল্যাণ্ডে চলে যাবেন। সেখানে চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হবে না।' যক্ষ্মা হলে যে সেখানেই যেতে হবে সে কথা আর তুললুম না। শুধু বললুম, 'বরোদার কেব্‌ল্ মহারাজার অজানতে আসতে পারে না; আপনি তাঁর সাহায্য পাবেন। জর্মন পররাষ্ট্র দফতর বরোদার মহারাজকে প্রচুর সম্মান করে।' তিনি আশ্বস্ত হলেন।

গভীর রাত অবধি পাশের ঘরে তাঁর মৃদু পায়চারি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লুম।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যাবেলা আমাকে বললেন, তিনি মনস্থির করেছেন, আমার সঙ্গে পরের দিন ভেনিস যাবেন।

ট্রেনে উঠেই তিনি হঠাৎ অত্যন্ত শান্ত হয়ে গেলেন। ভেনিস না পৌছনো পর্যন্ত এখন আর কিছু করার নেই।

গভীর রাত্রে স্লীপিং কোচের ক্ষীণালোকে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি কী প্রশান্ত মমতাময় তাঁর মুখচ্ছবি! খানিকক্ষণ পরই ইটালিতে ঢুকবো—যে দেশের মাদোন্না-মাতৃমূর্তি সর্ব বিশ্বে সমাদৃত হয়। আমার মনে হল আমার এই মাটিল্‌ডের মুখে যে মাদোন্নার ছবি ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে এ ক'দিন ধরে প্রহরে প্রহরে, সে তো যে কোনো গীর্জার বেদীকে উজ্জ্বল করে দিতে পারে। এ

রমণী গর্ভে সন্তান না ধরেও মা-জননী মাদোন্নাদের ভিতর শাশ্বত আসন পেল।

কেন পাবে না? জাতকে আছে, একদা নিদারুণ দুর্ভিক্ষের সময় এক ভিখারিণী নগরপ্রান্তে খর্জুর বৃক্ষের অন্তরালে শিশুসন্তান প্রসব করে পৈশাচিক ক্ষুধার উৎপীড়নে গ্রাস করতে যাচ্ছিল তাকে। তারই পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এক বন্ধ্যা শ্রেষ্ঠিনী, সন্তান কামনা করে মহাকালের মন্দিরে পূজা দিতে। মাতৃস্নেহাতুরা অনুনয় করে নবজাতককে কিনতে চাইলেন। পিশাচিনী অট্টহাস্য করে উত্তর দেয়, তার ক্ষুধা মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা করতে পারবে না। বরনারী বললেন, 'তবে তিষ্ঠ; এই যে আমার বন্ধ্যাবক্ষের সুপুষ্ট স্তন, অকর্মণ্য নিষ্ফল এ স্তন কোনো শিশুকে দুগ্ধ যোগাতে পারে নি—এটা আমি খর্জুরপত্র দ্বারা কর্তন করে তোমাকে দেব। তোমার ক্ষুধা নিবৃত্ত হবে।' পাগলিনী আবার অট্টহাস্যে বললে, 'তুমি জানো না, আপন হাতে আপন মাংস কর্তন করাতে কী অসহ বেদনা, তাই বলছ।' রমণী বাক্যব্যয় না করে কর্তন আরম্ভ করতে না করতেই দরদর বেগে নির্গত হল সেই বন্ধ্যা স্তন থেকে রক্তের বদলে অফুরন্ত মাতৃদুগ্ধ। ভিখারিণী শিশু উভয়েই সে দুগ্ধ পান করে পরিতৃপ্ত হল। অলৌকিক অবিশ্বাস্য এ ঘটনার কথা শুনে তথাগতের শিষ্যরা তিনজনকেই নিয়ে এলেন তাঁর সামনে। অমিতাভ সানন্দে বললেন, 'মাতৃস্নেহ অলৌকিক ক্রিয়া উৎপাদনে সক্ষম।'

বাঞ্ছিতা মাটিল্‌ডের মুখে দিব্য জ্যোতি দেখা দেবে না কেন?

ভেনিস বন্দরে জাহাজের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মাটিল্‌ডে আমার হাত ধরে বার বার অনুরোধ করলেন, আমি যেন বোম্বাই পৌঁছেই কেব্‌ল্ করি, ছেলেটি কবে কোন্ জাহাজে ইয়োরোপ পৌঁচচ্ছে। তাঁর চোখে জল, কিন্তু তাতে আনন্দের রেশও ছিল।

বোম্বাই পৌঁছে খবর নিয়ে জানলুম, ছেলেটি চলে গেছে। মাটিল্‌ডেকে পাকা খবর জানিয়ে দিলুম।

বরোদায় পৌঁছবার মাসখানেক পরে বন্ধু ওয়াডিয়া—তাঁকে এসব কিছুই বলি নি—কথায় কথায় বললেন, কাণের ছেলেটি কখন যে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে কেউ টের পায় নি। খাটের উপর একখানা চিরকুট পাওয়া যায়। অসুস্থ শরীর নিয়ে সে চিরজীবন কারো বোঝা হয়ে থাকতে চায় নি।

আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোয় নি। হা, হতভাগ্য! তুমি জানতেও পারলে না, স্বয়ং মা মেরি তোমার জন্য বন্দরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন!

আর মাটিল্‌ডে!

প্রেমের প্রথম ভাগ

সর্বপ্রথমই করজোড়ে নিবেদন, এ অধম মরালিটি ইমমরালিটি কোনো কিছুই প্রচারের জন্য এই 'ফরাসী হ্যাণ্ডবুক ফর বিগিনার্স ইন লভ্' লিখতে বসে নি। অবশ্য স্বীকার করি, আমি প্রাচীনপন্থী কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলে নিই—যাতে করে আমার প্রতি অবিচার না হয়—মডার্ন কবিতা, ঐতিহাসিক উপন্যাস, ট্রাম-বাস পোড়ানো, পেট-কাটা ব্লাউজ ইত্যাদির বিরুদ্ধে না আছে আমার কোনো অভিযোগ, না চাই আমি দেশের জনসাধারণকে—তন্মধ্যে আমি নিজেও আছি—খৃষ্ট-বুদ্ধ রূপে দেখতে। বিশেষতঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস। জনসাধারণে রটে গেছে, আমি নাকি ঐ বস্তুর শত্রু। এটা আমার প্রতি বেদরদ জুলুম। প্রথমত, জনপ্রিয় কোনো জিনিস, অভ্যাস বা আদর্শের শত্রু হতে আমি কিছুতেই সম্মত হই নে। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে গেলে পথে যে সব খানাখন্দ পড়ে, সেগুলোর প্রতি লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি তো ওঁদের সেবা করে নিজেকে ধন্য মনে করেছি। বস্তুত আমি নিজেই একখানা লিখব বলে স্থির করেছি। তবে নিশ্চয়ই জানি অধুনা যেগুলি জনপ্রিয় তার চেয়ে আমার বই অনেক নিরেস হবে; ভরসা এই, দালদাই বাজারে বেশি বিক্রি হয়, আমারটার কাটতি সেই কারণেই হবে অধিকতর।

তবে আমার এ 'ফরাসী হ্যাণ্ডবুক' লেখার সময় ইতিহাসের শরণ নেব অল্পই। যদিও আমার মনে হয়, পেট-কাটা বা টপ-লেসের নিন্দায় যখন হরিশ মুখুজ্যেরা কলরব করে ওঠেন তখন আধুনিকাদের উচিত একটুখানি ইতিহাসের পাতা উল্টোনো, কিংবা ইতিহাসের বাস্তব নিদর্শনভূমি মিউজিয়মে গমন। জাতকে আছে, একটি জেদী রমণী বসন্তোৎসবে যাবার সময় একটি বিশেষ রকমের দুর্লভ ফুল কামনা করে তার স্বামীকে রাজার বাগানে চুরি করতে পাঠায়। ধরা পড়ে বেচারা যখন শূলে চড়েছে তখন সে তার নিষ্ঠুর অকালমৃত্যুর জন্য রোদন করে নি। সে উচ্চকণ্ঠে শোক প্রকাশ করছিল এই বলে, 'আমি মরছি তার জন্য আমার দুঃখ নেই, প্রিয়ে; আমার ক্ষোভ, তুমি তোমার প্রিয় পুষ্পপ্রসাধন করে যে বসন্তোৎসবে যেতে পারলে না তার জন্য।'

তা হলে সপ্রমাণ হল, তথাগতের যুগেও রমণী ফ্যাশানের জন্য এমন ফুলও কামনা করতেন, যেটা শুধু রাজবাড়িতেই পাওয়া যেত, এবং সেটা যোগাড় করার দুঃসাহসিক অভিযানের ফলস্বরূপ তিনি বিধবা হতেও রাজী ছিলেন। এবং শুধু তাই নয়, সে-যুগের স্বামীসম্প্রদায় অতিশয় দার-নিষ্ঠ ছিলেন। প্রিয়ার

মনোরঞ্জনার্থে হেলায় প্রাণ বিসর্জন দিতেন। এই দৃষ্টান্ত কি এ-যুগের যুবক-সম্প্রদায়কে আত্মোৎসর্গের স্বর্গীয় পন্থা অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করবে না?

অবশ্য পাঠক বলতে পারেন এ ধরনের ঘটনা সাতিশয় বিরল।

সাতিশয় বিরলই যদি হবে তবে আমাদের কবিগুরু ঐ ধরনের উদাহরণই জাতক থেকে নেবেন কেন?—

'—বালক কিশোর,
উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর। সে আমার অনুনয়ে
তব চুরি-অপবাদ নিজস্কন্ধে লয়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ।'

এবং যেন এ-কবিতাতেই প্রোপাগাণ্ডা কর্ম নিঃশেষ হল না বলে কবি বৃদ্ধ-বয়সে ঐ বিষয় নিয়ে আরো মনোরঞ্জক, আরো চিত্তচাঞ্চল্যকর গীতি-নৃত্য-নাট্য 'শ্যামা' রচনা করলেন।

এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি যে, আমার যতদূর মনে পড়ছে মূল জাতকে গল্পটি একটু অন্যরকমের। আমার স্মৃতিশক্তি হয়তো আমাকে ঠকাচ্ছে, কিন্তু আমার যেন মনে পড়ছে, উত্তীয়কে কোন কিছু না বলেই তাকে শ্যামা নগরপালের কাছে পাঠায়। তাকে আগের থেকেই শ্যামা বলে রেখেছিল, কিংবা উত্তীয়েরই হাত দিয়ে চিঠি লিখে তাকে জানায়, পত্রবাহককে শূলে চড়াও; বজ্রসেনকে মুক্তি দাও। এবং বোধ হয় ঘুষের টাকাও কিছু ছিল, আর সেটাও উত্তীয় তার আপন ভাণ্ডার থেকেই দিয়েছিল—তাবৎ ঘটনার কোনো কিছু না জেনেশুনেই। আবার মাফ চাইছি, ভুল হতে পারে, শ্যামা বোধ হয় উত্তীয়কে বলে 'তুমি এই চিঠি ও অর্থ—' সেটা শ্যামার কিংবা উত্তীয়ের—'নগরপালকে দিয়ে এলে আমি একান্ত তোমারই হব।'*

পাঠক স্বপ্নেও ভাববেন না, আমি শ্যামা বা পুষ্পবিলাসিনীর কার্যকলাপ

---

* রবীন্দ্রনাথ জাতক, ইতিহাস ও অন্যান্য কিংবদন্তীমূলক যে সকল কবিতা, গল্প, উপন্যাস রচনা করেছেন, সেগুলো মূলের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি কি কি পরিবর্তন করেছেন, সে সম্বন্ধে প্রামাণিক গবেষণা করে কেউ ডক্টরেট নেন না কেন?

সম্মতির চোখে দেখছি। আধুনিকাদের অধঃপাতগমনের অহেতুক অভিযোগ কানে এলে আমার এসব দৃষ্টান্ত মনে আসে, এই মাত্র।

তবে এ নিয়ে ভাববার আছে।

যে কালে মুরুব্বীরা মেয়ের বিয়ে ঠিক করে দিতেন, সে সময় ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের মুরুব্বীদের ভিতর ভালো বর পাওয়ার জন্য যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হত না তা নয়। বস্তুত যে কনের সঙ্গে লোভনীয় বরের বিয়ের কথাবার্তা এগিয়ে গেছে তার বিরুদ্ধে নাকি উড়ো চিঠি পর্যন্ত যেত তৃতীয় কন্যাপক্ষ থেকে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সংগ্রামে আবার নীতি কি! এবং কিছুমাত্র নতুন তত্ত্ব নয় যে, কুরু-পাণ্ডবরা কুরুক্ষেত্র সংগ্রামে যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন সে নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এ যুগে, বিশেষ করে কলকাতা এবং অন্যান্য বড় শহরে অনেক মেয়েকেই বাধ্য হয়ে বরের সন্ধানে বেরুতে হয়। এবং বররাও বেরোন কন্যার সন্ধানে। ফলে বিত্তশালী, রূপবতী বা উচ্চশিক্ষিতা যার যেমন অভিরুচি—কনের জন্য ছোকরাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগে যায়, এবং উল্টোটাও হয়। বোধ হয় সুলেখক সুবোধ ঘোষের গল্পেই পড়েছি, তিনটি মেয়ে তিনটি ফুলের তোড়া নিয়ে পাল্লা দেন এক শ াসালো বরকে স্টেশনে সী-অফ করতে গিয়ে।

এসব বিয়ে যে দেখা মাত্রই দুম্ করে স্থির হয় না সে-কথা বলা বাহুল্য। কিঞ্চিৎ পূর্বরাগ, প্রেম বা প্রেমের অভিনয়ের প্রয়োজন হয়। কোনো কোনো স্থলে এটাকে কোর্টশিপও বলা হয়। আমাদের দেশে একদা গান্ধর্ব-বিবাহের প্রচলন ছিল। সে বিবাহ হত বিবাহের পূর্বেকার প্রণয়ের ভিত্তিতে।

কিন্তু এদেশে এখনো প্রণয়ের কোনো কোড্ নির্মিত হয় নি, অর্থাৎ যুবক-যুবতীতে কতখানি প্রণয় হওয়ার পর ছেলে কিংবা মেয়ে আশা করতে পারে যে এবারে অন্য পক্ষ তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত, এবং তখন যদি সে হঠাৎ তাকে ত্যাগ করে অন্য কাউকে ভালোবাসতে আরম্ভ করে তবে সমাজে তার নিন্দা হয়। ইয়োরোপে মোটামুটি দুটো ধাপ আছে। দু'জনাতে প্রণয় হওয়ার ফলে যদি ছেলেটা মেয়েটিকে ফরাসীতে 'আমি', জর্মনে 'ফ্রয়েণ্ডিন্' ('গার্লফ্রেণ্ডে'র চেয়ে এটাকে ঘনিষ্ঠতর বলে ধরা হয়) বলে উল্লেখ করে তার তখনো মোটামুটি বিয়ের দায়িত্ব আসে না। এটা প্রথম ধাপ। কিন্তু ফরাসীতে 'ফিয়াঁসে'—জর্মনে ঐ একই শব্দ বা 'ফেরল্‌বট্' ব্যবহৃত হয়—পর্যায়ে পৌঁছলে সেটাকে দ্বিতীয় ধাপ বলা হয়। এবং সে সময় যদি যুবক তাকে এন্‌গেজমেণ্ট আংটি দেয় (অর্থাৎ মেয়েটি তখন 'বাগদত্তা' হল যদিও অর্থটা কিছু ভিন্ন) তবে সেটা বিয়ের প্রতিশ্রুতি

বলেই ধরা হয়। তারপর সে বিয়ে করতে না চাইলে অনেক স্থলে মেয়েটি আদালতে প্রতিজ্ঞা বা চুক্তিভঙ্গের মোকদ্দমা করে খেসারতি চাইতে পারে। সমাজে বদনাম তো হয়ই। মহাভারতে রুক্মিণী বাগদত্তা ছিলেন বলে পরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বিয়ে করলে শ্রীকৃষ্ণের শত্রুপক্ষ তাঁর নিন্দা করে।

এদেশে প্রণয়ের কোনো স্তরেই বোধহয় এরকম আংটি দেবার রেওয়াজ প্রচলিত হয় নি। তবে প্রণয় ঘনীভূত হওয়ার পর (কতটা ঘনীভূত এবং তার চিহ্ন কি, সেটা বলা কঠিন) যদি কোনো পক্ষ অকারণে 'রণে ভঙ্গ' দেয়, তবে তার যে বদনাম হয় সেটা সুনিশ্চিত। ইয়োরোপেও যে-মেয়ে অকারণে একাধিক প্রণয়ীকে পর পর ত্যাগ করে সে 'জিল্‌ট' এই বদনামটি পায়।

নিছক প্রেমের জন্য প্রেম—বিয়ে করার উদ্দেশ্য কারোরই নেই—এটা বোধ হয় এদেশে বিরল। ইয়োরোপে মোটেই বিরল নয়। ছাত্র, ছাত্রী, মেয়ে কেরানী, ছোকরা এসিসটেণ্টের ভিতর এ-জাতীয় প্রেম আকছারই হয়। এ-জাতীয় প্রণয়ের ফলে যদি কোনো কুমারী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যায় তবে কোনো কোনো স্থলে সে যুবকের বিরুদ্ধে খেসারতির মোকদ্দমা আনতে পারে। আমি যতদূর জানি, বিয়ে করতে বাধ্য করাতে পারে না—তবে রাশাতে বোধহয় সন্তানটি অন্তত পিতার নামটা আইনত পায়, অর্থাৎ জারজ রূপে ঘৃণার পাত্র হয় না। ইয়োরোপে যদি যুবা প্রমাণ করতে পারে যে, মেয়েটার একাধিক প্রণয়ী ছিল তবে তাকে বা অন্য কাউকে কোনো খেসারতি দিতে হয় না। এক বলশেভিক আমাকে বলেন, এক্ষেত্রে রাশায় সব ক'জনাকে খেসারতি ভাগাভাগি করে দিতে হয়।

তবে ইয়োয়োপের মেয়েরা যুগ যুগ ধরে প্রেমের মারফতে বিয়ে করেছে বলে অনেক কিছু জানে, এবং আর পাঁচজন বিচক্ষণ বান্ধবীদের কাছ থেকে উপদেশও পায়।

এদেশের তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে আমার যোগসূত্র নেই। তবে আমার সব সময়েই মনে হয়েছে আমাদের মেয়েরা বড় অসহায়।

* * *

সিরিয়স প্রবন্ধ লিখব বলে আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। আমি প্রণয়, বিবাহ, লাভ ফর লাভস্ সেক্ ইত্যাদি সম্বন্ধে ফরাসীদের দু-একটি মতামত লিখতে যাচ্ছিলুম মাত্র। এ বাবদে ফরাসীদের অধিকারই যে সব চেয়ে বেশি, সেকথা বিশ্বজন মেনে নিয়েছে। লোকে বলে অবাধ অবৈধ প্রেম নাকি ঐ দেশেই সব চেয়ে বেশি। আমি কিছু বলতে নারাজ, তবে একটা কথা জানি। ডিভোর্স বা লগ্নচ্ছেদ ফরাসীরা নেক্‌নজরে দেখে না। পারিবারিক শান্তি ও শিশুদের

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তারা বড়ই সচেতন। স্বামী-স্ত্রী দুজনাই কিঞ্চিৎ অসংযমী হলে ফরাসী সমাজ সয়ে নেয়, কিন্তু তারা একে অন্যকে ডিভোর্স করতে চাইলে সমাজ অসন্তুষ্ট হয়।

ইয়োরোপের উন্নত দেশগুলো যে-স্থলে গিয়ে পৌঁচেছে আমরাও একদিন সেখানে গিয়ে পৌঁছব, এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না (অবশ্য তার অর্থ এ নয় যে, আমি ইয়োরোপের প্রেম তথা বিবাহ-পদ্ধতির নিন্দা করছি। বস্তুত বাইরের অন্য সভ্যতা অন্য ঐতিহ্যের মানুষ হয়ে আমার পক্ষে ইয়োরোপীয় সভ্যতা বিচার করতে যাওয়াটা খুব যুক্তিসঙ্গত নয়। যাঁরা আমার চেয়ে বহু ঊর্ধ্বে উঠে প্রকৃত সত্য দেখতে পান তাঁরাই বোধহয় অনাসক্তভাবে আপন দেশ ও বিদেশ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করবার অধিকার ধরেন)। এদেশের ঐতিহ্য তাকে প্রেম বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে অন্য প্যাটার্ন বানাতে শেখাবে—এই আমার বিশ্বাস।

* * *

যে ফরাসী যুবতী কয়েকটি তরুণীকে হাসিঠাট্টার ভিতর দিয়ে সদুপদেশ দিচ্ছিলেন তাঁর কথাগুলো শুনে আমি আমোদ অনুভব করছিলুম। তরুণীদের ভাবভঙ্গি-কথাবার্তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল তাঁরা যুবতীটিকে প্রেমের ভুবনে রীতিমত 'সাকসেসফুল' বা বিজয়িনী বলে মনে করছিলেন। তিনি খাচ্ছিলেন কন্যাক্ ও চেসার, অতি ধীরে মন্থরে। অর্থাৎ সামান্য কয়েক ফোঁটা কন্যাক্ পান করে সঙ্গে সঙ্গে অন্য গেলাস থেকে এক ঢোক জল। এই জল কন্যাক্‌কে chase করে নিয়ে যায় বলে একে বলে 'চেসার'। যুবতীটি যে পান বাবদে শুধু সমজদার তাই নয়, আমার মনে হল তিনি এ বাবদে পরিপূর্ণ আত্মকর্তৃত্বও বজায় রাখেন।

লম্বা হোল্ডারে সিগরেট ধরিয়ে, ঊর্ধ্বপানে ধুঁয়োর একসারি চক্কর চালান করে বললেন, 'লেয়োঁ ব্লুমের কেতাবখানা মন দিয়ে পড়ো। বিবাহ সম্বন্ধে তিনি অনেক খাঁটি কথা বলেছেন।' ব্লুম একদা ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং তিনি তাঁর বইয়ে বলেন, প্রেম, যৌনজীবন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ যুবক-যুবতীর বিবাহ সাধারণত তাদের জীবনে দীর্ঘকালব্যাপী দাম্পত্য সুখশান্তি দিতে পারে না। উচিত, উভয় পক্ষেরই এ-সব বিষয়ে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পর বিয়ে করা। বলা বাহুল্য, এ বই প্রকাশিত হলে ইংলণ্ডের অনেকেই এটাকে 'শকিং' 'গর্হিত' বলে নিন্দা করেছিলেন।

সুন্দরীটি ব্লুমের মূল বক্তব্য প্রাঞ্জল ভাষায় পেশ করে বললেন, 'দেখো, আমি নিজে বিশ্বাস করি, নারী-পুরুষ দুই যুযুধান শক্তি, একে অন্যের শত্রু—'

একটি তরুণী কফির ঢোক গিলতে গিয়ে মারাত্মক বিষম খেয়ে বললে, 'আপনি

এ কি কথা বলছেন! কবি দুগ্যাঁ এখনো আপনার কথা ভুলতে পারেন নি—আপনি তাঁকে বিদায় দেওয়ার পরও। এখনো তাঁর মুখে ঐ এক মন্ত্র: আপনার মত প্রাণ-মন, সর্বহৃদয়, সর্বস্ব দিয়ে এরকম আত্মহারা হয়ে কেউ কখনো ভালোবাসতে পারে নি।'

যুবতী স্মিত হাস্যভরা চোখে তরুণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেচারী আঁদ্রে! তোমার এখনো অনেক-কিছু শেখবার বাকি আছে। আমি আর্টিস্ট। আমি যা-ই করি নে কেন, সেটাকে পরিপূর্ণতার চরমে পৌঁছিয়ে দিয়ে করি। যখনই ভালোবেসেছি, 'আত্মহারা' হয়েই ভালোবেসেছি। কিন্তু, ডার্লিং, ইহুদিও কি তার ব্যবসা আহার নিদ্রা ত্যাগ করে আত্মহারা হয়ে ভালোবাসে না? তাই বলে সে কি তার মুনাফার কথা ভুলে যায়? যে ব্যবসাকে সে আপন প্রিয়ার চেয়েও বেশি ভালোবাসে তাকে সে অকাতরে বিসর্জন দেয় না, যদি দেখে সেটা দেউলে হয়ে যাওয়ার উপক্রম?

তাই বলছিলুম, পুরুষ রমণীর শত্রু। যে কোনো পুরুষ আমাকে 'আত্মহারা' হয়ে ভালোবাসলেও একদিন সে আমাকে অকাতরে বিসর্জন দিতে পারে—আমি যে-রকম মঁসিয়ো দুগ্যাঁকে দিয়েছিলুম। অবশ্য আমি স্যাডিস্ট নই, তাই তাকে ড্রপ করার সময় যতদূর সম্ভব মোলায়েমভাবে সেটা সম্পাদন করি—তদুপরি বলা তো যায় না, কখন কাকে আবার প্রয়োজন হয়!'

আরেকটি তরুণী বললে, 'কিন্তু দান্তে—?'

মাদাম বললেন, 'ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি—যদিও ওঁর কাব্য আমার প্রেমপত্রে কাজে লেগেছে। ঐ ধরনের মানুষ আমি দেখি নি। তবে এইটুকু বলতে পারি, যারা কারো বিরহে বা মৃত্যুতে দীর্ঘদিন ধরে আপসা-আপসি করে সেটা শুধু তাদের আত্মম্ভরিতা। নিজের কাছে স্বীকার করতে চায় না যে, এই-বারে তার অন্য ব্যবসা ফাঁদা উচিত। মনস্তত্ত্বে ওদের বলা হয় ম্যাজোকিস্ট্—নিজকে নিজে কষ্ট দিয়ে সুখ পায়। ঐ যে-রকম অনেক সর্বত্যাগী অনাহারে থেকে সুখ পান! তোমার আমার স্বাস্থ্য আছে, ক্ষুধা আছে, আমরা নর্মেল্। খাদ্য যখন রয়েছে তখন উপোস করবো কোন্ দুঃখে?'

'তবে কি একনিষ্ঠ প্রেম বলে কিছুই নেই?'

'কী উৎপাত! কে বললে নেই? নিশ্চয়ই আছে। যখন যাকে ভালোবাসবে তখন তার প্রতি একনিষ্ঠ হবে, আঁদ্রের ভাষায় আত্মহারা হবে। একাধিক জনের সঙ্গেও অক্লেশে একনিষ্ঠ হওয়া যায়। ঐ তো আমার এক বন্ধু ছিলেন লিয়োঁতে। সেখানে মাঝে মাঝে উইক-এণ্ড করতে যেতুম। চমৎকার কথাবার্তা

বলতে জানেন। বাড়িটিও সুন্দর। প্যারিসে প্রতি বৃহস্পতিবারে আমার ফ্ল্যাটে আসতেন আরেক বন্ধু। উনি বিবাহিত। অন্য সময় সুযোগ পেতেন না। তা ছাড়া চাকরির উন্নতির জন্য অফিসের এক বৃদ্ধ কর্তার সঙ্গে তাঁর মোটরে মাঝে মাঝে বেরুতে হত। তিনি আবার ভয়ানক ভীতু। যদি কেউ দেখে ফেলে! তাই রাত্রে মোটরে করে শহর থেকে দূরে যেতে হয় তাঁর সঙ্গে। এদের প্রত্যেককে যদি একনিষ্ঠভাবে না ভালোবাসি তবে—ঐ যে বললুম পুরুষ মাত্রই শত্রু—সে শত্রু ধরে ফেলবে না আমার ভারসেটাইলিটি—বহুমুখী প্রতিভা? শুনেছি, এবং বিশ্বস্তসূত্রেই, যে রসরাজ কবি, যোদ্ধা, ঔপন্যাসিক, শাসনকর্তা দান্নুন্দ্‌জিয়ো একসঙ্গে একগণ্ডা সুন্দরীর সঙ্গে একনিষ্ঠ প্রেমের উচ্চাঙ্গ সাধনা করেছেন, তিনি একই সময়ে চারজনকে যে চার সিরীজ প্রেমপত্র লিখেছেন, তার প্রত্যেকটি অতিশয় অরিজিনাল মাধুর্যময় কবিত্বপূর্ণ—কোনো সিরীজের সঙ্গে কোনো সিরীজের সাদৃশ্য নেই। প্রত্যেকটি বল্লভা আপন সিরীজ পেয়ে ধন্যা হয়েছেন।'

তারপর আরেক তরুণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্যুজান্, তুমি এ লাইন ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেল। পল্ আর মার্সেল তোমাকে একই সময়ে ভালোবাসতো; আর তুমি মাত্র দুটোকে সামলাতে পারলে না? হায়! প্যারিস কোথায় এসে পৌঁচচ্ছে? আর ডার্লিং স্যুজান্, তুমি নাকি জানতেও না, পল্ আর মার্সেল উভয়েরই তখন আরেক প্রস্ত প্রিয়া ছিল!'

স্যুজান্ তাজ্জব মেনে বললো, 'তাই নাকি? মঁ দিয়ো!'

নানেৎ বললে 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল? দ্বিধা করে সিধা রাখো?'

মাদাম বললেন, 'ও! তা কেন? মেনাজ্ আ ত্রোয়া (menage a trois = management by three) যদিও এখন ফ্রান্সে একটু আউট অব ডেট্—তবু তিনজনে মিলেমিশে থাকাটা তো ট্রায়েল পেতে পারে, কিন্তু সব সময়েই মনে রাখতে হবে, শান্তিভঙ্গ যেন না হয়, নো স্ক্যাণ্ডাল, প্লীজ! আর ডুয়েল, খুন, আত্মহত্যা এগুলো তো বর্বরতার চরম—ভুল বললুম, বর্বরদের ভিতর এসব অপ্রিয় ঘটনা প্রায় কখনোই ঘটে না। এগুলো ঘটলে মনের অশান্তি খানিকটে হয় বটে, কিন্তু তার চেয়ে মারাত্মক বদনাম ছড়ায় ভবিষ্যতের বিয়ের বাজারে। অবশ্য এমন কোনো বদনাম নেই যেটা আস্তে আস্তে মুছে ফেলা যায় না। এবং কোনো কোনো স্থলে একাধিক পুরুষ আকৃষ্ট হয় 'ফাম্ ফাতাল্' (fatal woman), 'বিপজ্জনক রমণী'র প্রতি।'

ইনি তাঁদেরই একজন কি-না সেটা জানবার কৌতূহল আমার পক্ষে স্বাভাবিক।

ইতিমধ্যে তার কন্যাক্ শেষ হয়ে গিয়েছে দেখে গুটিতিনেক তরুণী একসঙ্গে ওয়েটারকে ডাকলে। যুবতী রাজ-রাজেশ্বরীর মত বাঁ হাতখানা দিয়ে যেন বাতাসের একাংশ দু'টুকরো করে অসম্মতি জানালেন, বললেন, 'সুইট্ অব্ ইউ, কিন্তু জানো তো আমার সোনার খনিতে এখন ডবল শিফ্‌টে কাজ চলছে। দ্বিতীয় শিফ্‌টায় আমি অবশ্য অনেকখানি সাহায্য করি। এমনিতেই আমি এক গাদা টাকার কুমিরকে চিনতুম, এখন আমার 'মারী' (স্বামী) প্রতি রাত্রেই দু-একটি নয়া নয়া বাঘ-ভাল্লুক শিকার করছেন আমাকে তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে।—তোমরা বরঞ্চ শ্যামপেন খাও।'

তরুণীদের একাধিক জন আনমনা হয়ে ভাবলে তাদের জীবনে এ সুদিন আসবে কবে?

হঠাৎ যেন বিজয়িনীর একটি গভীর তত্ত্বকথা মনে পড়লো। গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কিন্তু, যাদুরা, একটি কথা মনের ভিতর ভালো করে গেঁথে নিয়ো। ব্লুম এটা বলেন নি। সর্বপ্রেমের চরম গতি যখন পতিলাভ তখন সে-পথে নামবার আগে একটি মোক্ষম তত্ত্ব ভুললে চলবে না। ব্লুম বলেছেন, প্রথম ইদিক-উদিক প্রেম এবং ফ্যাকট্‌স অব্ লাইফ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পর, ইংরিজিতে পুরুষের বেলা যাকে বলা হয় 'বুনো ভুট্টা বপন'—সেইটে হয়ে গেলে পর বিয়ে করবে। তা হলে একের অন্যের প্রতি সহিষ্ণুতা হবে অনেক বেশি, একে অন্যকে সাহায্য করতে পারবে অনেক বেশি—দাম্পত্য জীবন তাই হবে দীর্ঘকালব্যাপী ও মধুর। ব্লুমের উদ্দেশ্য অতিশয় মহৎ এ-বিষয়ে কেউ সন্দেহ করবে না। আমি তো নিশ্চয়ই করবো না, কারণ তিনি অতিশয় নীতি-বাগীশ—'

কোরাস উঠলো তাবৎ তরুণী কণ্ঠে, 'কি বললেন, মাদাম?'

কণামাত্র বিচলিত না হয়ে মহিলাটি ধীরে সুস্থে আরেকটি সিগারেট ধরিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে বললেন, 'কট্টর নীতিবাগীশ, ধর্মভীরু, আচারনিষ্ঠ এবং ছিন্নভিন্ন উদ্দেশ্যহীন ফরাসীসমাজকে নৈতিক দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যগ্র। তিনি ইহুদি, এবং অনেকেই যে রকম তাঁর ইহুদি-ভ্রাতা ফ্রয়েট্‌কে ভুল বোঝে, এঁর বেলাও তাই হয়েছে। আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি এবং জানি তিনি নীতি, মরালিটিতে অতিশয় আস্থাবান। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন, প্রাচীন নীতি পরিবর্তন করে—বরং বলবো সেটাকে পরিপূর্ণভাবে কার্যকরী ও কল্যাণময়ী করে সম্পূর্ণতর করে তোলবার জন্য নবীন নীতির প্রয়োজন। তিনি সেইটে প্রবর্তন করতে চান। কিন্তু এই নবীন নীতি প্রবর্তন

করতে পারি শুধু আমরা ফরাসীরাই। যেরকম আমরাই সর্বপ্রথম ফরাসীবিদ্রোহ করে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা প্রবর্তন করি। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ, এমন কি জর্মনিরও লাগবে এ নীতি গ্রহণ করতে অন্তত একশ বছর। তারা তো এখনো গণতন্ত্রটাই রপ্ত করতে পারেনি। আর যেসব দেশ ধর্ম উৎপাদন করেছে—যেমন প্যালেস্টাইন, আরবদেশ, ইণ্ডিয়া, এরা এ নীতি কখনো গ্রহণ করতে পারবে না, আর যদি করে তবে তাদের সর্বনাশ হবে।'

আমি মনে মনে সম্পূর্ণ সায় দিলুম। এবং যোগ দিলুম, হয়তো চীন পারবে।

'কিন্তু একটা প্র্যাকটিকাল উপদেশ আমি দিই। বিয়ের পূর্বের সর্ব অভিজ্ঞতা যেন বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে হয়। তার প্রথম কারণ তারা প্রবীণতর, পক্কতর। তাদের কাছে শুধু প্রণয় নয়, জীবনের মূল্যবান আরো অনেক-কিছু শেখা যায়। কিন্তু খবরদার, আহাম্মুকের মত কক্‌খনো তাকে বলবে না, তোমার বউকে ডিভোর্স করে আমাকে বিয়ে করো। এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের ইঁদুরকে আকাট মূর্খও বিয়ে করে না।

আরেকটা কারণ বললে তোমাদের তরুণ-হৃদয়ে হয়তো একটু বাজবে।

ঐ বিবাহিতদেরই দু'পয়সা রেস্ত থাকে। বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে আর সেফ হাওয়া খেয়ে খেয়ে জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় হয় না। সেটা হয় জনসমাজে। ক্লাব, রেস্তোরাঁ, অপ্‌রা, জুয়োর কাসিনো, রেস্‌, রিভিয়েরা-সুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণ, এগুলো না করলে, না চষলে কোনো এলেমই হয় না, যেটা তোমার ভবিষ্যৎ স্বামী ও দাম্পত্য-জীবনে কাজে লাগবে।

আরেকটা সুবিধে, বলা তো যায় না, তিনি যদি মাত্রা সামলাতে না পেরে তোমাকে বিয়ে করতে চেয়ে বসেন, তুমি তখন অতিশয় ব্রীড়া সহকারে বলতে পারবে, "আমি চাই নে যে আপনার স্ত্রীকে ডিভোর্স করে আপনি একটি পরিবার নষ্ট করুন।"

এবং শেষ সুবিধে, যেদিন তুমি কেটে পড়তে চাইবে, সেদিন স্বচ্ছন্দে বলতে পারবে, "আমারও তো সংসার পাততে হবে, আমারও তো সমাজের প্রটেকশন দরকার", তারপর ব্লাশ করে বলবে, "আমিও তো, আমিও তো মা হতে চাই"।'

কি বলবো পাঠক, সে যা অনবদ্য অভিনয় করলেন সেই বিবাহিতা যুবতীটি—আহা, যেন ষোল বছরের তরুণীটি, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। ধন্য নটরানী প্যারিস, ধন্য তোমার অভিনয়, ধন্য তোমার নব মরালিটি! সাধে কি

লোকে বার বার বলে, 'সী প্যারিস এ্যাণ্ড ডাই'। প্যারিস দেখার পর পৃথিবীতে দেখবার মত আর তো কিছু থাকে না।

তবে আমার অনুরোধ, অন্যান্য বহু বস্তু নির্মাণ করার সময় ফ্রান্সে আইনত যেমন ছাপ মারতে হয়, 'নট্ ফর্ এক্স্পোর্ট'—'বিদেশে চালান নিষিদ্ধ', এই নব মরালিটির উপরও যেন তেমনি ছাপটি সযত্নে মারা হয়।

তবে আমি এটি আমদানি করলুম কেন? বুঝিয়ে বলি। বিদগ্ধা যুবতীটি যা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলেছিলেন আমি তার সহস্রাংশের একাংশও বলি নি। আমি শুধু সেটুকুই বলেছি, যেটুকু আপনার জানা থাকলে যদি কখনো প্যারিসের ঐ নব মরালিটিটি এদেশে চোরাবাজার দিয়ে বা স্মাগল্ড্ হয়ে চলে আসে তবে যেন তৎক্ষণাৎ সেটি চিনতে পারেন।

চার্লি চ্যাপলিন এই কর্মটি করেছিলেন। অনেকেই তার 'মঁসিয়ো ভেরুদু' ছবি দেখেছেন। চ্যাপলিনের পূর্বেও তার সময়ে ইয়োরোপের কোনো কোনো দার্শনিক সাড়ম্বর প্রচার করেন, জীবনসংগ্রামে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যেন সর্বাস্ত্র প্রয়োগ করে সর্ব প্রতিদ্বন্দ্বীকে 'অর দ্য কঁবা'—দরকার হলে খতম করে দেয়। সেই হাস্যাস্পদ দর্শনের বেকুব চরম পরিণতি প্রমাণ করার জন্য চ্যাপলিন দেখান কি-ভাবে একজন লোক একটার পর একটা ধনী প্রাপ্তবয়স্কা রমণীকে বিয়ে করে তাকে সুকৌশলে খুন করে অর্থ সঞ্চয় করতে থাকে। কিন্তু খুনের কৌশলটি ছবিতে দেখান নি।

আমিও বিদগ্ধা প্যারিসিনীর আসল অস্ত্রটির রহস্য সযত্নে গোপন রেখেছি।

মদ্যপন্থা ওরফে মধ্যপন্থা

মদ্যপান ভালো না মন্দ সে নিয়ে ইয়োরোপে কখনো কোনো আলোচনা হয় না—যেমন তাস খেলা ভালো না মন্দ সে-নিয়েও কোনো তর্কাতর্কি হয় না। কিন্তু এ-কথা সবাই স্বীকার করেন যে মাত্রাধিক মদ্যপান গর্হিত এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক—যে রকম তাস খেলাতে মাত্রাধিক বাজী রেখে, অর্থাৎ সেটাকে নিছক জুয়ো খেলায় পরিণত করে সর্বস্ব খুইয়ে দেওয়া নিশ্চয়ই অনুচিত।

এ দুটো ব্যসন যে আমি একসঙ্গে উত্থাপন করলুম সেটা কিছু এলোপাতাড়ি নয়। কুরান শরীফে এ-দুটিকে একসঙ্গে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এ দুটির উৎপত্তি-স্থল স্বয়ং শয়তান। তৎসত্ত্বেও ইদানীং পূর্ব পাকিস্তানের একখানি দৈনিকে আলোচনা হচ্ছে, মাত্রা মেনে, অতিশয় সাবধানে কিংবা স্বাস্থ্যলাভের

জন্য সামান্য মদ্যপান করা শাস্ত্রসম্মত কিনা ? এ বিষয়ে উৎকৃষ্ট আলোচনার জন্য যতখানি মুসলিম শাস্ত্রজ্ঞান থাকা উচিত আমার সেটি নেই। এবং শাস্ত্র ছাড়া লোকাচার, দেশাচার নামক প্রতিষ্ঠান আছে। উভয় বাঙলার এই দুটি আচারে মদ্যপান নিন্দিত। বরঞ্চ পশ্চিম বাঙলার কোনো কোনো জায়গায় তাড়ির প্রচলন আছে—পূব বাঙলায় সেটাও নেই, অন্তত আমার চোখে পড়ে নি।

মোদ্দা কথা এই যে, ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজে এবং অধিকাংশ অশিক্ষিত সমাজে মদ্যপান নিয়ে যে আলোচনা হয় সেটা নীতির দৃষ্টিবিন্দু থেকে, এ্যাজ এ প্রিন্সিপল। অর্থাৎ হিন্দুর কাছে গোমাংস যেমন আত্যন্তিক ভাবে বর্জনীয়—অতি সামান্য অংশ খাওয়াও মহাপাপ—মুসলমানের কাছে শূকর মাংসও সেইরূপ। তাই এদেশে মদ্যপান ঠিক সেই রকমই বর্জন করতে হবে কি না সেই প্রশ্নটা মাঝে মাঝে ওঠে।

ইতিমধ্যে ঔষধের মাধ্যমে অনেকেই সেটা প্রতিদিন পান করছেন—জানা-অজানায়। বেশীর ভাগ টনিকেই পনেরো, সতেরো পার্সেণ্ট এলকহল থাকে। একটি তরুণ এলকহলের তত্ত্ব না জেনে আমাকে এক বোতল টনিক দিয়ে বললে, 'অত্যুৎকৃষ্ট টনিক, স্যর! খাওয়ার সঙ্গেই মাথাটা চিম চিম করে, শরীরে বেশ ফুর্তির উদয় হয়।' আমি মনে মনে বললুম, 'বটে! ফুর্তিটা টনিকে ওষুধ থেকে না ঐ ১৭ পার্সেণ্ট মদ থেকে সেটা তো জানো না বৎস! অর্থাৎ পুচ্ছটি উত্তোলন করে—ইত্যাদি। কারণ টনিক বর্জিত ১৭ পার্সেণ্ট এলকহল সমন্বিত যে-কোনো মদ্য পান করলেই মাথাটা চিম চিম করে শরীরে বেশ ফুর্তির উদয় হয়।'

ভলতেয়ারের একটি 'আপ্তবাক্য' এত বেশী সুস্বাদ, এত বেশীবার মনে পড়ে যে সেটা আবার বললে পাঠক যেন বিরক্ত না হন। ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের যখন অতি সামান্য কিছুটা ইউরোপে পৌঁচেছে তখন এক শ্রেণীর কুসংস্কারবাদী বলতে আরম্ভ করলো, ভারতবাসীরা মন্ত্রের জোরে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। ঐ সময় এদেরই একজন ভলতেয়ারকে শুধোয়, 'মন্ত্রোচ্চারণ করে একপাল ভেড়া মেরে ফেলা যায় কিনা ?' ভলতেয়ার একটু বাঁকা হেসে বললেন, 'নিশ্চয়ই। তবে যাতে কোন গোলমাল না হয় তার জন্য আগের থেকে পালটাকে বেশ করে সেঁকো খাইয়ে দিয়ো।'

এই হচ্ছে আসল তত্ত্ব কথা—সেঁকোটাই সত্য ; মন্ত্রটা থাকলে ভালো, না থাকলে নেই।

ঠিক তেমনি ঐ যে টনিকের কথা একটু আগে বললুম, তার ঐ ১৭ পার্সেণ্টটাই সত্য ; বাকি যে সব ওষুধ-বিষুধ আছে সেগুলো থাকলে ভাল—

ইত্যাদি।

ঠিক তেমনি ছেলে বাড়িতে নিজের চেষ্টায় পরিশ্রম করে যেটুকু শেখে সেইটেই সেঁকো, সেইটেই ১৭ পার্সেণ্ট এলকহল। তারই জোরে ছেলে পরীক্ষা পাস করে—আমরা মাস্টাররা ক্লাসে যা পড়াই সেটা মন্ত্রোচ্চারণের মত ; থাকলে ভালো, না থাকলে নেই।

এই যে দেশটা চলছে সেটা জনসাধারণের শুভ বা অশুভ বুদ্ধি দ্বারা—সরকার যেটা আছে, সেটা মন্ত্রোচ্চারণের মত। এবং আজকাল তো আকছারই সেই মন্ত্রোচ্চারণও ভুলে ভুলে ভর্তি। থাক্ আর না। বৃদ্ধ বয়সে জেলে গিয়ে শহীদ হতে চাই নে।

ইয়োরোপীয়রা টনিকের অবান্তর মন্ত্রোচ্চারণ অর্থাৎ ওষুধটা বাদ দিয়ে শুধু এলকহলটাই খায়, তবে ১৭ পার্সেণ্টের মত কড়া করে নয়। কেউ খায় স্টাউট, কেউ খায় পোর্ট।

প্রাচ্যে ইহুদি, ক্যাথলিক ও পার্সীদের ধর্মানুষ্ঠানেও কিঞ্চিৎ মদ্যের প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু যাজক সম্প্রদায়ের সকলেই অত্যধিক মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য করে থাকেন।

গল্পচ্ছলে প্রচলিত আছে :

দ্বিপ্রহর রাত্রে এক ধার্মিক যুবক
নিদ্রা যায় ; ঐ তার একমাত্র শখ।
একমাত্র সুখ তার ঐ নিদ্রা বটে,
—পিতা তার বৃদ্ধ অতি, কখন কি ঘটে।
ভগিনীটি বড় হল, বিয়ে দেওয়া চাই
দিবারাত্রি খাটে, আহা, গোনে কড়ি পাই।
যৌবনেই লোলচর্ম হল অস্থি-সার
নিদ্রাতেই ভোলে তাই নির্দয় সংসার॥

আপনারা তো আর 'কেচ্ছা সাহিত্য' পড়েন না। হায়, আপনারা জানেন না, আপনারা কি নিধি হারালেন! 'বিদ্যাসুন্দর' পড়ে যখন আনন্দ পান, তখন কেচ্ছা সাহিত্যে নিশ্চয়ই পাবেন।

আমার নিজের বিশ্বাস কেচ্ছা সাহিত্যের অনুপ্রেরণাতেই বিদ্যাসুন্দরের সৃষ্টি। তা সে যাক।

এবারে কেচ্ছাটাই শুনুন :

এই কেচ্ছা শোনে যেবা এই কেচ্ছা পড়ে
উত্তম চাউল পাবে রেশনে না ল'ড়ে।
বারো আনা দরে পাবে কিলোর ইলিশ
সরিষার তেল পাবে না সয়ে গর্দিশ।
দেড়টি টাকায় কিলো শোনো পুণ্যবান
খুশীতে ভরপুর হবে জমীন আসমান ॥

এ সংসারে যে মেলা পাপ মেলা দুঃখ সে বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এগুলো আসে কোথা থেকে? সেমিতি—অর্থাৎ ইহুদি, খৃষ্টান, মুসলিম গুরুরা বলেন শয়তান মানুষকে কুপথে নিয়ে গিয়ে পাপ দুঃখের সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে ভারতীয় তিনটি ধর্মেরই বিশ্বাস পূর্বজন্মের অর্জিত পাপপুণ্যের দরুন এ জন্মেও সুখদুঃখ দেখা দেয়—কাজেই হিন্দুধর্মে শয়তানের প্রয়োজন নেই। একদা কিন্তু এই হিন্দু ধর্মেও শয়তান জাতীয় একটি অস্তিত্বের আবির্ভাব হয়ে উপযুক্ত প্র্যাকটিসের অভাবে লোপ পায়।

নল দময়ন্তীর উপাখ্যান যদিও মহাভারতে স্থান পেয়েছে তবু আমার বিশ্বাস মূল গল্পটি বৈদিক যুগেও প্রচলিত ছিল। গ্রীক দেবতা প্রমিথিয়ুস চোঙা বা নলের ভিতর করে আগুন চুরি করেন; নলরাজও ইন্ধন প্রজ্বলনে সুচতুর ছিলেন। স্বয়ং দেবতারা প্রমিথিয়ুসের শত্রুতা করেন। নলের শত্রুতা করে স্বয়ং দেবতারা দময়ন্তীর স্বয়ংবরে উপস্থিত হন—নলকে তাঁর বল্লভা থেকে বঞ্চিত করার জন্যে।

এই নলের শরীরে পাপ কলিরূপে প্রবেশ করেন। এই কলিই আর্যধর্মে শয়তানের অপজিট নাম্বার। মনে করুন সেই শয়তান বা কলি ঐ নিদ্রিত যুবকটির সামনে দিল দেখা:

হঠাৎ দেখিল মর্দ সম্মুখে শয়তান
নিদ্রা তার সঙ্গে সঙ্গে হৈল খানখান।
শয়তানের হাতে হেরে ভীষণ তরবার
আকাশ-পাতাল জুড়ে ফলাটা বিস্তার।
ত্রিনয়ন, কণ্ঠে তার নৃমুণ্ডের মালা
জিহ্বা তার রক্তময় যেন অগ্নি ঢালা।

ইটি আসলে কথকতা। অতএব তাবৎ বক্তব্য ছন্দে দিলে রসভঙ্গ হয়।

যুবক বেতস পত্রের ন্যায় কম্প্রমান।

শয়তান হুঙ্কার দিয়ে বললে, 'আজ থেকে স্বর্গ-মর্ত্য আমার পরিপূর্ণ দখলে এসেছে। তোকে আমি এই তরবারি দিয়ে দুই টুকরো করবো। তার পূর্বে

আমার স্তব গেয়ে নে।'

যুবা কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'আমার মরতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আমি মরে গেলে আমার বৃদ্ধ পিতার জন্যে কে অন্ন আহরণ করবে? আমাকে তুমি নিষ্কৃতি দাও।'

শয়তান ক্ষণতরে চিন্তা করে বললে, 'তোমাকে ছাড়তে পারি এক শর্তে। তুমি তোমার পিতাকে হত্যা করো। তাহলে তোমার সমস্যাও সমাধান হয়!' শয়তান অট্টহাস্য করে উঠলো।

পুত্র আর্ত ক্রন্দন করে বললে, 'অসম্ভব! সম্পূর্ণ অসম্ভব!

পিতা মোরে জন্ম দিল বাল্যেতে আরাম
কেমনে হইব আমি নেমকহারাম!'

'নেমকহারাম' শুনে শয়তানের ক্রোধ চরমে পৌঁচেছে। কারণ সে একদা আল্লার সঙ্গে নেমকহারামী করেছিল হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে—'হিত' অবশ্য শয়তানের ধারণা অনুযায়ী যেটা হিত—বললে, 'তা হলে তুমি তোমার ভগিনীকে ধর্ষণ করো।'

যুবা এবারে আর কোনো উত্তর দিল না। সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হল।

কিন্তু শয়তানের এ ব্যবস্থা মনঃপূত হবে কেন? সে চায় যুবাকে দিয়ে পাপ করাতে। তাই অন্য ট্যাকটিক অবলম্বন করে বললে, 'তোমাকে শেষ মুক্তির উপায় দিচ্ছি। এই নাও, এক পাত্র মদ্য পান করো।'

যুবা ভাবে:

মদ্য পান মহা পাপ সর্ব শাস্ত্রে কয়
এ পাপ করিলে গতি নরকে নিশ্চয়।
যাইব নরকে আমি নাহি কোনো ডর
শয়তানের শর্ত হীন, পাপিষ্ঠ, বর্বর।

অনিচ্ছায় সে করলে মদ্য পান। তারপর কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত।

মদ্যপান করে পরিপূর্ণ মত্তাবস্থায় পাপপুণ্যজ্ঞানহীন যুবা শয়তানের ঐ 'হীন পাপিষ্ঠ বর্বর' কর্ম দুটি করে ফেলল।

কাহিনীটি সর্বত্র বলা চলে না। কিন্তু যে মহাজন এটির কল্পনা করেন তিনি স্পষ্টত কাউকে ছেড়ে কথা বলতে চান নি, কোনো পাপ স্পেয়ার করতে চান নি। পৈশাচিক বীভৎস রস সৃষ্টি করে সর্ব মানবের হৃৎকন্দরে ভগবানের ভয় প্রবেশ করাতে চেয়েছিলেন।

এ তো গেল এক পক্ষ। অন্য পক্ষ কি বলেন, তার অনুসন্ধান আমি বহুকাল ধরে করে আসছি। কারণ আরব তথা অন্যান্য প্রাচ্যভূমিতে এ তথ্য সর্ববাদি-সম্মত যে, হেন কাহিনী এ পৃথিবীতে নেই যার বিপরীত গাথাও নির্মিত হয় নি। সেটিও পেয়েছি।

কিছুকাল পূর্বে টুরিজ্‌ম্‌-প্রসার সংস্থার আমি সদস্য হয়ে যাই—আমার একমাত্র 'গুণ' যে, কোন দেশই আমাকে দীর্ঘকাল সহ্য করতে পারে না বলে আমি সে-দেশ থেকে সংক্ষেপে বিতাড়িত হই, ফলে আমার বহু দেশবাস, বহু দেশদর্শন হয়। এসব দেশের দেওয়ানি আদালতে দেউলেদের যে লিস্ট টাঙানো থাকে তার প্রত্যেকটিতে আমার নাম পাবেন। যদি কোনোটিতে না পান তবে বুঝে নেবেন সে দেশে আমি নাম ভাঁড়িয়েছিলুম। বস্তুত আমি কোনো দেশের, কি স্বদেশের কি বিদেশের, কারো কাছে অঋণী থেকে মরতে চাই নে।

সেই টুরিজ্‌ম্‌ সংস্থার এক মিটিংএ জনৈক সজ্জন সভারম্ভেই বলেন, 'ভদ্র-মহোদয় ও মহিলাগণ, কর্মসূচী আরম্ভ করার পূর্বেই আমার একটি বক্তব্য নিবেদন করি।

প্রবাদ আছে, মুর্গী-ঘরে যদি শ্যাল ঢুকতে দাও, তবে সকালবেলার মম্‌লেটটির আশা ত্যাগ করেই ক'রো। তাই যদি দেশ থেকে মদ্যপান একদম ঝেঁটিয়ে বের করে দাও, তবে ইয়োরোপীয় টুরিস্টের আশা করো না; সে মম্‌লেটটি আমাদের প্লেট থেকে অন্তর্ধান করবে। অতএব, আপনারা এবং আপনাদের সরকার স্থির করুন, আপনারা টুরিজ্‌ম্‌ চান, না দেশকে মদ্যহীন করতে চান। আমার কাছে দুই-ই বরাবর।'

ভারী স্পষ্ট বক্তা। ওদিকে মুরুব্বীদের অনেকেই গান্ধীটুপি পরিহিত। এটাও চান ওটাও চান, কিন্তু কি করে উলঙ্গ ভাষায় বলেন, মদটা না হয় থাক। ওঁদের মতলব, এমন এক অভিনব কৌশল বের করা, যার প্রসাদে আণ্ডা না ভেঙেও মমলেট বানানো যায়! অতএব এসব ক্ষেত্রে যা উইদাউট ফেল্‌ করা হয় তাই সাব্যস্ত হল। পোস্টপোন করো।

মিটিঙের শেষে আমাদের জন্য লাঞ্চের ব্যবস্থা ছিল। আমি শঙ্কিত হয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিলুম। সরকারী পয়সায় লাঞ্চকে আমি লাঞ্ছনা নাম দিয়েছিলুম। ওদের ডিনারকে অনেকে সাপার বলতেন। আমি বলতুম suffer: সংক্ষেপে দুপুরে লাঞ্ছনা, রাত্রে suffer.

আমার অবস্থা দেখে সেই স্পষ্টভাষী বক্তা আমাকে সন্তর্পণে গাধা-বোটের মত টেনে টেনে করিডরে বের করে দে ছুট—ভদ্রতা বাঁচিয়ে। সেই হোটেলেই

তাঁর কামরা ছিল। সেখানে বসে আমার হাতে মেনু এগিয়ে দিলেন। উৎকৃষ্ট আহারাদি এল। তার পূর্বে জিন এল, বিয়ার এল। তিনি খেলেন সামান্যই।

বললেন, 'যত সব আদিখ্যেতা। কোনো জিনিসে একটা ক্লিয়ার পলিসি নেই। বিশ্বসুদ্ধু লোক মদ খেয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি দিক, এটা কেউই চায় না। ফ্রান্সের মত এলকহলিজম একটা সমস্যারূপে দেখা দিক, সেটাও কেউ চায় না। অথচ ইংরেজ—তথা তাবৎ ইয়োরোপীয়রা—বিজনেস পাকাপাকি করে দুপুর বেলা 'বারে' দাঁড়িয়ে।'

আমাকে বললেন, 'শুনেছি আপনি সাহিত্যিক। একটা ঐ মতীফের (ধরনের) গল্প শুনবেন?'

আমি বললুম 'আলবৎ, একশ বার।'

'হরপার্বতী সাইকল্ জানেন?' অর্থাৎ তাঁদের নিয়ে জনসাধারণের গল্প? তারা যে একে অন্যের সঙ্গে বাজী ধরেন?

এটা তারই একটা।

হরপার্বতী শূন্যমার্গে উড়ে যাচ্ছেন। আকাশ থেকে দেখতে পেলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পুণ্যার্থী গঙ্গাস্নান করছে। পার্বতী তাই দেখে মৃদু হাস্য করলেন।

শিব বললেন, 'কি হল?'

পার্বতী খিলখিল করে হেসে বললেন, 'এবারে তোমার নরকের পথ বন্ধ হল। বিষ্ণু বহুকাল ধরে যমের ঐ পশ্চিমের বাড়িটা চাইছিলেন সেটা পেয়ে যাবেন। বেচারী যম! জানো, যমের সহোদর উকিল ডাক্তারদের পসার কমে গেলে তাদের কি অবস্থা হয়?'

'পসার কমবে কেন?' শিব শিবনেত্র হয়ে শুধোলেন।

কৌতুকে হাসিলা উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া হর পানে। বললেন, 'কে আর যাবে নরকে? দেখছ না, তামাম দুনিয়ার লোক হদ্দমুদ্দ হয়ে গঙ্গাস্নান করছে। সবাই হবে নিষ্পাপ। নরকে যাবে কে? তোমাকে বলি নি পই পই করে ঐ গঙ্গাটাকে তাড়াও।' আমার হোস্টটি গল্প থামিয়ে শুধালেন, 'জানেন বোধহয়, গঙ্গা হলেন পার্বতীর সতীন!'

'গঙ্গা তরঙ্গিনী, শিবের শিরোমণি।'

হোস্ট বললেন, 'শিব এই গঙ্গাস্নানের কথা শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন,—কিন্তু তার পূর্বেই

'হর প্রতি প্রিয়ভাবে কন হৈমবতী,
বৎসরের ফলাফল থাক্ পশুপতি।

যমের রাজত্ব যাবে এইটুকু জানি
অমৃত-রেশন্-শপও স্বর্গ নেবে মানি।
ভেজাল না হয় শুরু এই লাগে ভয়
স্বর্গের হাউসিং লাগি চিন্ত মহাশয়।'

থুড়ি! আর কথকতা নয়। আমার হোস্ট এ-পদ্ধতি অবলম্বন করেন নি।

শিব কল্কেটা রথের স্টারগার্ড-এ (আকাশে মাড্-এর পরিবর্তে আকছারই নক্ষত্র চূর্ণ উড়ে এসে রথটা ধূলিময় করে বলে ওটা স্টারগার্ড) কল্কেটা ঠুকে ঠুকে সাফ করতে করতে বললেন, 'কিচ্ছু ভয় নাই, ডার্লিং। যারা স্নান করছে তারা এর পুণ্যফলে বিশ্বাস করে না।'

পার্বতী তাজ্জব মেনে বললেন, 'সে কী! তাবৎ পুরাণে যে পষ্ট লেখা রয়েছে। এখন তো ছাপাও হচ্ছে, বেতারেও প্রচার হয়, যে-পণ্ডিত নেহরু—'

শিব তখনো ইণ্ডিয়ার উপরে। ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া আইনের কথা ভেবে তাড়াতাড়ি বললেন, 'আমার কথা বিশ্বাস করো আমি প্রমাণ করতে পারি।'

যথারীতি দু'জনাতে বাজী ধরা হল—সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের ভিতর শিব প্রমাণ করবেন, গঙ্গাস্নান যারা করে তারা মা-গঙ্গার কল্যাণে নিষ্পাপ হল বলে বিশ্বাস করে না।

অতি প্রত্যুষে বাজীর চুক্তিমত পার্বতী রাজরাজেশ্বরীর মহিমাময় সজ্জা পরে কিন্তু অতিশয় বিষণ্ণ বদনে বসলেন গঙ্গাতীরে। আর তাঁর কোলে মাথা রেখে লম্বা হয়ে শুয়ে রইলেন শিবঠাকুর—তাঁর সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ!

গঙ্গাস্নান সেরে উঠে এ দৃশ্য দেখে প্রথম ব্রাহ্মণ অবাক। কৌতূহল দমন না করতে পেরে দরদী কণ্ঠে শুধালো, 'মা, এ কি ব্যাপার!'

নিখুঁত ক্ষুদ্র দুটি নাসারন্ধ্র দিয়ে উষ্ণতম দীর্ঘশ্বাস ফেলে পার্বতী বললেন, 'বাবা, আমার কপাল। দেখতেই তো পাচ্ছেন, আমার স্বামীর অবস্থা। তবে ভগবানের দয়ায় এক গণৎকারের সঙ্গে দেখা। সে তাঁর হাত দেখে বলেছে, কোন নিষ্পাপ পুরুষ তাঁকে স্পর্শ করা মাত্রই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন।'

ব্রাহ্মণ কাঁচুমাচু হয়ে 'হ্যাঁ মা, তা মা', বলে বাং মাছটির মত মোচড় মেরে হাওয়া।

পার্বতী তো বজ্রাহত। লোকটা এইমাত্র গঙ্গাস্নান করে নিষ্পাপ হয়ে মা গঙ্গার কোল থেকে বেরিয়ে এল। তার মুখেও দয়ামায়ার চিহ্ন। তবে কি—তবে কি গঙ্গাস্নানে তার বিশ্বাস—! শিব মৃদু হাস্য করলেন।

কিছুক্ষণ পরেই আরেক স্নান-সমাপ্ত দ্বিজ। কথোপকথন পূর্ববৎ। বাং

মাছের মোচড়টিও তদ্বৎ। পার্বতী দিশেহারা। ভোলানাথ আস্তদেশ বিস্তীর্ণ করলেন।

চললো যেন প্রশেসন। পার্বতীর গলা থেকে একই রেকর্ড বেজে চললো। ফল একই। ধূর্জটি গণ্ডা দুই হাই তুলে পদ্মনাভ স্মরণে এনে ঘুমিয়ে পড়লেন। দেবসমাজে এই হলো ঘুমের বড়ি সনেরিল্।

করে করে বেলা দ্বিপ্রহর। ভেঙে গেছে প্রভাতের হাট, কোলাহল থেমে গেছে, জনপদবাট পান্থহীন। গঙ্গাতীরও ভূতনাথের শ্মশানসম নির্জন।

অপরাহ্ণ। পার্বতীর ক্লান্তি এসে গেছে। বললেন, 'নন্দীকে ডাকো, বাড়ি যাই। আমি হার মানলুম।'

শিব বললেন, 'সন্ধ্যা অবধি থাকার কথা। তাই হবে।'

এ তো কলকাতা নয় যে বাবুরা হাওয়া খেতে সন্ধেবেলা গঙ্গাতীরে আসবেন। কাগ-কোকিলও সেখানে আর নেই।

এমন সময় ক্ষীণ কনে দেখার মিলোয় মিলোয় আলোতে দূর থেকে দেখা গেল এক ইয়ার-গোছ নটবর। ডান হাত দিয়ে তুড়ি দিতে দিতে গান গাইছে, 'লে লে সাকী, ভর দে পেয়ালা।' বাঁ বগলে হাফ-পাট। বদনটি তার প্রফুল্ল। আপন মনে গান গাইতে গাইতে এদিক পানেই আসছে।

আসন্ন সন্ধ্যায় নির্জন গঙ্গাতীরে অপরূপ সুন্দরী দেখে সে থমকে দাঁড়ালো। আপন মনে 'মাইরি' বলতে না বলতে হঠাৎ তার চোখ গেল সিঁথির সিঁদুরের দিকে। মাতাল যে কখন আচম্বিতে অকারণ পুলকে নেচে ওঠে, আর কখন যে সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ লজ্জা পেয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায়—সেটা পাকা শুঁড়ির শুঁড়িও আগেভাগে বলতে পারে না। এবং মাতালের পুলক এবং কুণ্ঠা দুইই তখন পৌঁছয় চরমে, হাফাহাফি সন্ধিস্থলের বেনের পথই যদি সে নেবে তবে তো সে নর্মাল! বোতলে পয়সা বরবাদ করবে কেন?

মাতালের কৌতূহল হল। তদুপরি সঙ্গে সঙ্গে তার ধর্মবুদ্ধিও জাগ্রত হল। মেয়েটাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত। এই ভরসন্ধেবেলায়—

কুণ্ঠায় যেন আপন পাঞ্জাবির ভিতর মায় পা দুখানা, সর্বশরীর লুকিয়ে নিয়ে বললে, 'মা, এই অবেলায়, আপনি, এখানে, জানেন না, কি বলবো, কিন্তু কেন?'

পার্বতী মাতাল দেখে প্রথমটায় সঙ্কুচিত হয়ে ঘাড়টা একটু ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন। মাতাল কিন্তু মাটির দিকে তাকিয়ে রইল ঠায় দাঁড়িয়ে। কী আর করেন জগন্মাতা পার্বতী? আর বলাও তো যায় না, মাতাল! কখন রঙ বদলায়।

থেমে থেমে বললেন তাঁর হ্রস্ব কাহিনী হ্রস্বতর নির্যাসরূপে।

সঙ্গে সঙ্গে মাতালের মুখে উৎসাহ আর আনন্দের দ্যুতি। হাসিও চাপতে পারে না।

কোন গতিকে বললে, 'হায় রে হায়, এই সামান্য বিষয় নিয়ে মা, তোমার দুর্ভাবনা! তুমি এক লহমা বসো তো মা শান্ত হয়ে।'

তারপর বললে, 'চতুর্দিকে কিন্তু চোর-চোট্টার পাল। হেঁ হেঁ—মা, কিছু মনে করো না, ঐ যে রইল বোতলটা তার উপর আধখানা চোখ রেখো।'

বিড়বিড় করে আপন মনে বললে, 'এই মাঘের শীতের ভরসন্ধেবেলা চানটা না করিয়ে ছাড়লে না। মহামূল্যবান নেশাটাও মেরে যাবে দড়কচ্ছা। তা আর কি করা যায়!'

ঝপ্ করে গঙ্গায় এক ডুব মেরে উপরে উঠে খপ্ করে ধরলে শিবের ঠ্যাঙখানা।

বত্রিশ নয় যেন চৌষট্টিখানা দাঁত বের করে বললে, 'হল মা-জননী? এই সামান্য জিনিসটের জন্যে তুমি এতখানি ব্যাকুল হয়ে গিয়েছিলে? ছিঃ মা, তোমার বিশ্বাস বড় কম!'

মাঝ গাঙের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ঐটে কি তোমাদের নৌকো? কে যেন ডাকছে? আমি তা হলে আসি। আমার আবার বেতো শরীর। পেন্নাম হই মা, বাবাজী সেরে তো উঠলো—এবারে একটু—ইয়ে মানে সাবধানে—।'

লাঞ্চ শেষ হয়ে এসেছে। সোফায় বসে সিগার ধরিয়ে হোস্ট বললেন, 'দেশ বোন্-ড্রাই হোক কিংবা উচ্ছন্নে যাক্—আমার কিচ্ছুটি বলার নেই। কিন্তু দু' একটা মাতাল না থাকলে ডেয়ারিং কাজ করবে কে?

আমারও নিজের কিচ্ছুটি বলার নেই। আমি দু'পক্ষেরই বক্তব্য নিবেদন করলুম মাত্র।

আমি পক্ষ নেবই বা কেন? এক পক্ষ বলছেন আমাকে ড্রাই করে ছাড়বেন, অন্য পক্ষ বলছেন, আমাকে ভিজিয়ে দেবেন। দু'পক্ষেই দারুণ লড়াই।

দুটো কুকুর যদি এক টুকরো হাড্ডি নিয়ে লড়াই করে, হাড্ডিটা তো তখন কোনো পক্ষে যোগ দিয়ে লড়াই করে না!

শ্রীচরণেষু

কতকগুলো খেলা প্রায় সব দেশের ছেলেমেয়েরাই খেলে। যেমন মনে করো, কানামাছি কিংবা লুকোচুরি। আবার মনে করো সাঁতার কাটা ;—সাহারার মরুভূমিতে, কিংবা মনে করো খুব বড় শহরে, যেখানে নদী পুকুর নেই, সেখানে যে সাঁতার কাটাটা খুব চালু হতে পারে না, সেটা অনায়াসেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। জল আছে অথচ সাঁতার কাটাটা লোকে খুব পছন্দ করে না, তাও হয়। শীতকালে ইয়োরোপের সব নদী-পুকুর জমে বরফ হয়ে যায় না, তবু সেই পাথর-ফাটা শীতে কেউ পারতপক্ষে জলে নামতে চায় না—সাঁতারের তো কথাই ওঠে না।

খেলাধুলো তাই নির্ভর করে অনেকটা দেশের আবহাওয়ার উপর। কিছু না কিছু জল প্রায় সব দেশেই আছে, তাই কাগজ বা পাতার ভেলা সবাই জলে ভাসায়। কিন্তু যে দেশে ঝমাঝ্-ঝম্ বৃষ্টি নেমে আঙ্গিনা ভরে গিয়ে চতুর্দিকে জল থৈ-থৈ করে না, সে দেশের ছেলে-মেয়েরা আর দাওয়ায় বসে আঙ্গিনার পুকুরে কাগজের ভেলা ভাসাবে কি করে? অথচ ভেলা-ভাসানোর মত আনন্দ কম খেলাতেই আছে। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বুড়ো বয়সে ছেলেবেলার কথা ভেবে গান রচেছেন :

পাতার ভেলা ভাসাই নীরে
পিছন পানে চাইনে ফিরে।

আর ছেলেমেয়েদের জন্য 'শিশু ভোলানাথে'র এ-কবিতাটি তোমরা নিশ্চয় জানো :

দেখছ-না কি নীল মেঘে আজ
আকাশ অন্ধকার?
সাত-সমুদ্র তেরো-নদী
আজকে হব পার।
নাই গোবিন্দ, নাই মুকুন্দ,
নাইকো হরিশ খোঁড়া—
তাই ভাবি যে কাকে আমি
করব আমার ঘোড়া।
কাগজ ছিঁড়ে এনেছি এই
বাবার খাতা থেকে,

নৌকো দে-না বানিয়ে—অমনি
দিস, মা, ছবি এঁকে।
রাগ করবেন বাবা বুঝি
দিল্লী থেকে ফিরে ?
ততক্ষণ যে চলে যাব
সাত-সমুদ্র-তীরে।

ভারী চমৎকার কবিতা! কিন্তু বাকীটা আর বললুম না। যাদের পড়া নেই, তারা যেন 'শিশু ভোলানাথ'খানা খোলে, এই হচ্ছে আমার মতলব।

তা সে কথা যাক্। বলছিলুম কি, আবহাওয়ার উপর খেলাধুলো অনেকটা নির্ভর করে। আমাদের দেশ জলে ভর্তি, বিশেষ করে পূব বাঙ্গলা, তাই আমাদের খেলাধুলো জমে ওঠে জলের ভিতরে বাইরে। তেমনি শীতের দেশে বরফ পড়ে বিস্তর, আর তাই নিয়ে ছেলেদের খেলাধুলোর অন্ত থাকে না। 'ধুলো' বলা অবশ্যি ভুল হলো, কারণ বরফে যখন মাঠ-ঘাট, হাট-বাট সব কিছু ছেয়ে যায়, তখন তামাম দেশে এক রত্তি ধুলোর সন্ধান আর পাওয়া যায় না।

কাবুলে যখন ছিলুম, তখন জানলা দিয়ে দেখতুম, ছেলেমেয়েরা সকাল থেকে পেঁজা বরফের গুঁড়ো হাতে নিয়ে ঢেলা পাকিয়ে একে ওকে ছুঁড়ে মারছে, সে ঢিল ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে চট করে সরে যাবার চেষ্টা করছে। যদি তাগমাফিক লেগে গেল তবে তুমি ওস্তাদ ছেলে, হাতের নিশান ভালো, হয়তো একদিন ভালো বোলার হতে পারবে। আর না লাগলেও তা নিয়ে ভাবনা করা চলবে না, কারণ ততক্ষণে হয়ত তোমার কানে এসে ধাঁই করে লেগেছে আর কারো ছুঁড়ে মারা গোলা। কানের ভিতর খানিকটা বরফের গুঁড়ো ঢুকে গিয়ে কানের ভিতরকার গরমে গলতে আরম্ভ করেছে। ভারী অস্বস্তি বোধ হয় তখন—মনে হয়—যেন কেউ সুড়সুড়ি দিচ্ছে। তখন খেলা বন্ধ করে কান সাফ করার জন্য দাঁড়াতে হয়। আর ছোঁড়াছুঁড়ির মধ্যিখানে ও রকম ধারা দাঁড়ানো মানেই আর পাঁচজনের তাগ হওয়া। মাথা নীচু করে যতক্ষণ তুমি কান সাফ করছো, ততক্ষণে এ-দিক, ও-দিক, চতুর্দিক থেকে গোটা দশেক গোলাও খেয়ে ফেলেছ।

তা বয়েই গেল। বরফের গোলা যত জোরেই গায়ে এসে লাগুক না কেন, তাতে করে চোট লাগে না। গায়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গেই গোলা চুরমার হয়ে যায়। কিছুটা বরফের গুঁড়ো অবশ্যি জামা-কাপড়ে লেগে থাকে। তা সেটা হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেললেই হয়—না হলে গরম জামা কাপড়ের ওম লেগে খানিকক্ষণ বাদে বরফ গলে গিয়ে কাপড় ভিজিয়ে দেবে।

বরফ জমলেই এ খেলা জমে উঠতো। আর আমি কাজকর্ম ধামাচাপা দিয়ে জানালার কাছে গিয়ে বসতুম।

এ খেলায় সত্যিকার ওস্তাদ ছিল একটি সাত-আট বছরের ছেলে। খেলার মধ্যিখানে সে এমনি চর্কিবাজির মত ঘুরত যে তার গায়ে গোলা ছোঁড়ে কার সাধ্যি। আর আমাদের দেশের পাকা লেঠেলের মত সে একাই জন আষ্টেককে অনায়াসে কাবু করে ফেলত। ভারী মিষ্টি চেহারা, পাকা আপেলের মত টুকটুকে দু'টি গাল, নীল চোখ, আর সেই দু'চোখে যেন দুনিয়ার যত দুষ্টুমি বাসা বেঁধে বসে আছে। নাম ইউসুফ, পাশের বাড়িতে থাকে, আর তার বাপ আমাদের কলেজের কেরানী। আমাকে পথে পেলে সেলাম করে কিন্তু সসম্ভ্রম সেলামের সময়ও চোখের দিকে তাকালে মনে হত ছেলেটা কোনো এক নতুন দুষ্টুমির তালে আছে। যদি জিজ্ঞেস করতুম, 'কি রকম আছিস?' তাহ'লে এক গাল হেসে কি একটা বলত, যার কোনো মানে হয় না। কিন্তু সেই হাসির ফাঁকে ফাঁকেও আমি স্পষ্ট দেখতে পেতুম কোনো একটা দুষ্টুমির সুযোগ পেলে সে আমাকেও ছাড়বে না।

সে-ই একদিন বাড়ি বয়ে এসে সোৎসাহে খবর দিয়ে গেল, আমি তাদের ইস্কুলে বদলি হয়ে এসেছি। তার চোখে মুখে হাসি আর খুশী। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, আমি তার চোখে যেটি লক্ষ্য করলুম সেটি হচ্ছে "এইবার আসুন স্যর, আপনাতে আমাতে এক হাত হয়ে যাবে।" আমি যে খুব ভয় পেলুম তা নয়, কারণ ছেলেবেলায় আমিও কম দুষ্টু ছিলাম না।

ওদের ইস্কুল বড় অদ্ভুত। পাঁচ-ছ' বছরের ছেলেদের ক্লাস ওয়ান থেকে আই-এ ক্লাসের ছেলেরা একই বাড়িতে পড়ে। তাই সেটাকে পাঠশালা বলতে পারো, হাইস্কুল বলতে পারো, আর কলেজ বললেও বাধবে না। আমি বদলি হলুম কলেজ বিভাগে—ফার্স্ট আর সেকেণ্ড ইয়ারের ছেলেদের ইংরিজি পড়াবার জন্য। এ দু' ক্লাস পড়িয়ে আমার হাতে মেলা সময় পড়ে থাকত বলে একদিন প্রিন্সিপাল অনুরোধ করলেন, আমি যদি ম্যাট্রিক ক্লাসের ছেলেদেরও ইংরিজি পড়াই তবে বড় উপকার হয়। আমি খানিকটে ভেবে নিয়ে বললুম, তার চেয়ে আমাকে বরঞ্চ ক্লাস ওয়ানে পড়াতে দিন। আসছে বছর ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও প্রোমোশন দেবেন—অর্থাৎ আমি টু'তে পড়াব, তার পরের বছর থ্রীতে। এই করে করে যাদের কলেজে টেনে নিয়ে আসতে পারব তাদের ইংরিজি জ্ঞান থেকে বুঝতে পারবো আমি ভালো পড়াতে পারি কি না। প্রিন্সিপাল তো কিছুতেই মানেন না; বলেন, 'সে কি কথা! আপনি পড়াবেন

ক্লাস ওয়ানে!' আমার প্রস্তাবটার তত্ত্ব বুঝতে তাঁর বেশ খানিকটা সময় লাগল। কাবুলী প্রিন্সিপালের বুদ্ধি—থাক, গুরুজনদের নিন্দে করতে নেই।

ওদিকে ক্লাস ওয়ানে হৈ হৈ রৈ রৈ। কলেজ বিভাগের অধ্যাপক আসছেন ক্লাস ওয়ানে পড়াতে!

আমার তখন আদপেই মনে ছিল না ইউসুফ ক্লাস ওয়ানে পড়ে। প্রথম দিন ক্লাসে ঢুকতেই দেখি, সে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সবাইকে কি যেন বোঝাচ্ছে। অনুমান করলুম, প্রতিবেশী হিসেবে সে আমার সম্বন্ধে যেটুকু জানে সেটুকু সকলকে সগর্বে সদম্ভে জানিয়ে দিচ্ছে। আমার চাকর আবদুর রহমানের সঙ্গে ইউসুফের আলাপ পরিচয় ছিল। আর আবদুর রহমান ভাবতো তার মনিবের মাথায় একটুখানি ছিট আছে। আবদুর রহমান যদি সেই সুখবরটি ইউসুফকে দিয়ে থাকে, আর সে যদি ক্লাসের সবাইকে সেই কথাটি জানিয়ে দেয়, তবেই হয়েছে!

ক্লাসে মাস্টার ঢুকলেই কাবুলের ছেলেরা মিলিটারি কায়দায় সেল্যুট দেয়—আফগানিস্থান মিলিটারি দেশ। আমি ক্লাসে ঢুকতেই ইউসুফ তড়াক করে সুপারি গাছের মত খাড়া হয়ে মিলিটারি সেল্যুটের হুকুম হাঁকল। তার পর খুশীতে ডগমগ হয়ে আপন সীটে গিয়ে বসল।

পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই ইউসুফ উঠে দাঁড়ালো। 'বাইরে যেতে পারি, স্যর?' আমি বললুম, 'যা, কিন্তু দেখ, আমি বাইরে যাওয়া-যাওয়ি জিনিসটা মোটেই পছন্দ করি নে। যাবি আর আসবি।' 'নিশ্চয় স্যর।' বলে আরেকটা মিলিটারি সেল্যুট ঠুকে বেরিয়ে গেল।

এক মিনিট যেতে না যেতে ইউসুফ ফিরে এল। তাই তো, ছেলেটা তা হলে অতটা দুষ্টু নয়। কিন্তু আরো তিন মিনিট যেতে না যেতে আমার ভুল ভাঙ্গলো। ইউসুফের পাশের ছেলেটা পড়ার মাঝখানে হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, 'স্যর, আমার পকেট ভিজে গিয়েছে,—এই ইউসুফটা আমার পকেটে বরফের ঢেলা রেখেছিল।' ইউসুফ আরো চেঁচিয়ে বলল, 'না স্যর, আমি রাখি নি।' ছেলেটা আরো চেঁচিয়ে বলল, 'আলবাৎ তুই রেখেছিস।'

ইউসুফ বলল, 'তোর ডান পকেট ভেজা, আমি তো বাঁ দিকে বসে আছি।' ছেলেটা বলল, 'তুই না হলে বরফ আনল কে? তুই তো এক্ষুনি বেরিয়ে গিয়েছিলি।'

হট্টগোলের ভিতর আমি যে তাবৎ তর্কাতর্কি স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলুম তা নয় কিন্তু কথা কাটাকাটিটা মোটের উপর এই রকম ধারায়ই চলেছিল। বিশেষ করে শেষের যুক্তিটা আমার মনের উপর বেশ জোর দাগ কাটল। ইউসুফ না

হলে বরফের ঢেলা আনল কে? আর বরফ তো আগের থেকে ঘরে এনে জমিয়ে রাখা যায় না—গলে যায়।

রাগের ভান করে কড়া হুকুম দিলুম, 'ইউসুফ, তুই বেঞ্চির উপর দাঁড়া।'

ইউসুফ বিন্দুমাত্র আপত্তি না করে তড়াক করে পলটনি কায়দায় বুট দিয়ে খটাস করে শব্দ করে বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে ফের সেল্যুট দিল। পূর্বেই বলেছি আফগানিস্থান মিলিটারি দেশ—ছোট ছেলেরা পর্যন্ত পলটনি জুতা পরে আর হুকুম তামিল করার সময় পলটনি সেল্যুট ঠোকে।

ভাবলুম, ইউসুফ আমাদের দেশের ছেলের মত 'বসি, স্যর?' বলে অনুনয় করবে। আদপেই না। চাঁদপানা মুখ করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। শেষটায় আমিই হার মানলুম। বললুম, 'বস্। আর ও রকম করিস নে।' ইউসুফ আরেকবার সেল্যুট জানিয়ে বসে পড়ল।

বাড়ি ফেরার সময় বুঝতে পারলুম, সব দেশের খেলাধুলা যে রকম আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে, দুষ্টুমিটাও ঠিক সে রকম অনেকটা আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশের ছেলেরা বরফের গুঁড়ো পাবে কোথায় যে তাই নিয়ে দুষ্টুমি করবে?

তারপর দু' তিন দিন ইউসুফ ঠাণ্ডা। ভাবলুম প্রথম দিনের সাজাতে হয়তো ইউসুফের আক্কেল হয়ে গিয়েছে। আর জ্বালাতন করবে না।

আমাদের দেশ গরম, তাই ঘরে ঘরে পাখার ব্যবস্থা থাকে। কাবুল ঠাণ্ডা, তাই সেখানে ক্লাসে ক্লাসে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা। একদিন ক্লাসে ঢুকে দেখি ঘরভর্তি ধুঁয়ো, আর চিমনির আগুন নিভে গিয়েছে।

ছেলেরা কাশছে আর ইউসুফ পাতলুনের দুই পকেটে হাত পুরে অত্যন্ত বিষণ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে। দেশে টানাপাখার দড়ি ছিঁড়ে গেলে যে রকম চাপরাসীর সন্ধানে ছেলে পাঠানো হয় আমি তেমনি বললাম, 'চাপরাসীকে ডাকো।' ইউসুফকে পাঠানো আমার মতলব ছিল না। কিন্তু সে চট করে 'এক্ষুনি ডাকছি স্যর' বলে হুট করে বেরিয়ে গেল। থামাবার ফুরসৎ পেলুম না।

মিনিট তিনেক পরে এলেন খুদ্ প্রিন্সিপাল। মুখে কেমন যেন একটু বিরক্তি। বললেন, 'আপনি নাকি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?' আমি তো অবাক!

'সে কি কথা! আমি আপনাকে ডেকে পাঠাবো কেন? আমার দরকার হলে আমি নিজেই তো আপনার কাছে যেতে পারি। আমি তো ডেকে পাঠিয়েছি চাপরাসীকে, আগুন নিভে গিয়েছে বলে।' প্রিন্সিপালের মুখ থেকে

বিরক্তির ভাব কেটে গিয়ে দেখা গেল রাগ। ইউসুফের দিকে ফিরে বললেন, 'তবে তুই আমাকে ডাকলি কেন?'

ইউসুফ তার ড্যাবড্যাবে চোখ হরিণের মত করুণ করে বলল, 'আমি তো শুনলুম, প্রিন্সিপাল সায়েবকে ডেকে নিয়ে আয়। তা কি জানি ওঁর ফার্সী আমি ঠিক বুঝতে পারি নি হয়তো।' প্রিন্সিপাল ইউসুফকে দুই ধমক দিয়ে চলে গেলেন।

কি ঘড়েল ছেলে রে বাবা! আমি বিদেশী বলে যে খুব ভালো ফার্সী বলতে পারি নে তার পুরো সুযোগ নিয়ে সে আমাকে এক দফা বোকা বানিয়ে দিল।

ততক্ষণে চাপরাসী এসে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুতেই আগুন জ্বলতে চায় না। ঘর আরো ধুঁয়োয় ভরে গিয়েছে। ছেলেরা কাশতে আরম্ভ করেছে, কারো কারো চোখ দিয়ে জল বেরুচ্ছে, আমার তো প্রায় দম বন্ধ হবার উপক্রম। চাপরাসী ততক্ষণে হার মেনে চলে গিয়েছে বুড়ো চাপরাসীর সন্ধানে —সে যদি কিছু করতে পারে। ইউসুফ বলল, 'স্যর, জানলাগুলো খুলে দিই?' আমি বললুম, 'দাও।' দম বন্ধ হয়ে তো আর মারা যেতে পারি নে।

এক মিনিটের হু-হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরের ভিতর ঢুকে আমাদের হাড়ে হাড়ে কাঁপন লাগিয়ে দিল। পড়াবো কি, আর পড়বেই বা কে? আমাদের দেশে যে রকম ভয়ঙ্কর গরমের দিনে ক্লাসের পড়ার দিকে মন যায় না, কাবুলে তেমনি দারুণ শীতের মাঝখানে পড়াশোনা করা অসম্ভব। হাতের আঙুল জমে গিয়েছে, কলম ধরতে পারছি নে, বইয়ের পাতা ওল্টানো যায় না। ছেলেরা ততক্ষণে আবার আপন আপন দস্তানা পরে নিয়েছে—আর দস্তানা-পরা হাতে লেখা, পাতা ওল্টানো, এসব কাজ আদপেই করা যায় না।

ততক্ষণে বুড়ো চাপরাসী এসেও হার মেনেছে। কিন্তু লোকটা বিচক্ষণ। খানিকক্ষণ চেষ্টা দেওয়ার পর বলল, 'ধুঁয়ো উপরের দিকে না উঠে ঘর ভরে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে ধুঁয়ো বেরোবার চোঙা কেউ বন্ধ করে দিয়েছে।'

তদারক করে দেখা গেল বুড়ো ঠিক কথাই বলেছে। চোঙার ভিতরে, উপরের দিকে হাত চালানোতে বেরিয়ে এল একটা ক্যানাস্তারার টিন, ছেঁড়া কম্বল দিয়ে জড়ানো। বোঝা গেল, বেশ যত্নের সঙ্গে, বুদ্ধি খরচ করে চোঙাটি বন্ধ করা হয়েছে, যাতে করে ধুঁয়ো উপরের দিকে না গিয়ে সমস্ত ক্লাস ভরে দেয়।

আমি হুঙ্কার দিয়ে বললুম, 'চোঙা বন্ধ করল কে?'

সমস্ত ক্লাস এক গলায় বলল, 'নিশ্চয়ই ইউসুফ। আর কে করতে যাবে?'

ইউসুফের দুশমন গোলাম রসুল বলল, 'আমি যখন ক্লাসে ঢুকি তখন ইউসুফ ছাড়া আর কেউ ক্লাসে ছিল না। নিশ্চয়ই ও করেছে।'

ইউসুফ বলল, 'আমি যখন ক্লাসে ঢুকলুম তখন গোলাম রসুল ছাড়া আর কেউ ক্লাসে ছিল না। নিশ্চয়ই ও করেছে।'

গোলাম রসুল চটে গিয়ে বলল, 'মিথ্যেবাদী!'

ইউসুফ মুরুব্বীর সুরে বলল, 'এই, স্যরের সামনে গালমন্দ করিস নে।'

কি জ্যাঠা ছেলে রে বাবা! বললুম, 'তুই এদিকে আয়।'

কুইক মার্চে সামনে এসে সেল্যুট দিল। আমি বললুম, 'তোকে ভালো রকমের সাজা দেওয়া উচিত। আজকে সমস্ত ক্লাসের পড়া নষ্ট করেছিস। ঢোক্ গিয়ে টেবিলের তলায়। চুপ করে সেখানে বসে থাকবি, আর কথাটি কয়েছিস কি তোর গলা কেটে ফেলব।'

সুড় সুড় করে টেবিলের তলায় গিয়ে ঢুকল।

কাবুলের ক্লাসে মাস্টার মশায়দের টেবিল বিলিতি কায়দায় বানানো হয়। অর্থাৎ তার তিন দিক ঢাকা। শুধু মাস্টার যে দিকে বসেন সেদিকটা খোলা। মনে করো খুব বড় একটা প্যাকিং কেসের ডালাটা খুলে নিয়ে তাই দিয়ে টেবিল বানাও আর খোলা দিকটায় পা ঢুকিয়ে দিয়ে বাক্সটা দিয়ে টেবিলের কাজ চালাও। আমি ঠিক তেমনি ভাবে ব'সে, আর ইউসুফ চুপ্ করে ভিতরে। নড়নচড়ন নট কিচ্ছু।

মনে হল ইউসুফের তা নিয়ে কোন খেদ নেই; কারণ পঞ্চাশ মিনিটের পিরিয়ডের প্রায় আধঘণ্টা সে ধুঁয়ো, প্রিন্সিপাল, আর চাপরাসী দিয়ে বরবাদ করে দেবার বিমলানন্দ আপন মনে রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করছে।

আমি ছেলেদের পড়াতুম মুখে মুখে। চেঁচিয়ে বলতুম I go, সমস্ত ক্লাস আমার পরে বলত I go, আমি বলতুম We go, ক্লাস বলত We go, এ রকম ধারা you go, you go, কিন্তু Rahim goes, Karim goes, তারপর হুঙ্কার দিয়ে বলতুম Rahim and Karim go-o-o-o।

ওদিকে ইউসুফ চুপচাপ। জিজ্ঞেস করলুম—'তুই বলছিস না কেন রে?' বাক্সের অথবা টেবিলের, যাই বলো—ভিতর থেকে ইউসুফের গলা শোনা গেল, 'ও তো আমি জানি।' আমি বললুম, 'বলে যা।' সে সমস্ত কনজুগেশনটা ভুল না করে গড় গড় করে আবৃত্তি করে গেল। হুঁ! ছেলেটা শয়তান বটে, কিন্তু পড়াশোনায় ভালো।

ঘণ্টা পড়লো। বললুম, 'ইউসুফ বেরিয়ে আয়।' সুড়ুৎ করে বেরিয়ে এল। বললুম, 'বল্ আর কক্‌খোনো করবি নে।' কি যেন একটা বিড় বিড় করে বলল, ঠিক বুঝতে পারলুম না।

ততক্ষণে ক্লাস ডিসমিস করে দিয়েছি বলে সে একটা ছোটাসে ছোটা সেল্যুট সেরে ডবল মার্চ করে বেরিয়ে গিয়েছে। তখন বুঝতে পারলুম, দুষ্টুমি করবে না এ প্রতিজ্ঞা করতে সে নারাজ, তাই তাড়াতাড়ি কেটে পড়েছে।

রেজিস্টার, বই, খড়ি, ডাস্টার গুছিয়ে নিয়ে যেই দাঁড়াব বলে টেবিলের তলা থেকে পা টেনে আনতে গিয়েছি অমনি দু'পা-ই আটকা পড়ে গেল। কি ব্যাপার! ঘাড় নিচু করে দেখি, আমার দু'জুতোর দুই ফিতে একসঙ্গে বাঁধা।

কি করে হল? এ তো বড় তাজ্জব! অবশ্যি, বুঝতে সময় লাগল না। আমার অভ্যাস পা দু'খানি একজোড় করে বসার। ইউসুফ তারই সুবিধে নিয়ে অতি আস্তে আস্তে ফিতের গিঁঠ খুলে দু'ফিতে অর্থাৎ দুই জুতো একসঙ্গে বেঁধে দিয়েছে! আর সে এমনি মোলায়েম কায়দায় যে, আমি কিছুই টের পাই নি!

আমি হার মানলুম।

বাড়ি ফেরার পথে দূর থেকে দেখি, বাড়ির দেউড়ির সামনে ইউসুফ আমার চাকর আব্দুর রহমানকে হাত-পা নেড়ে কি সব বোঝাচ্ছে, আর বিরাট-বপু আব্দুর রহমান সর্বাঙ্গ দুলিয়ে হেসে কুটিকুটি। আমাকে দেখেই ইউসুফ চট্‌পট্ চম্পট।

পরদিন কলেজ যাবার সময় আব্দুর রহমান জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'এক রকম বোতামওলা বুট ফিতেওলা জুতোর চেয়ে ভাল।'

আমি চটে গিয়ে বললুম, 'বস্ বস্, আর জ্যাঠামো করতে হবে না।'

পুচ্ছ (প্র) দর্শন

কুকুর মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে—এ-তথ্য কিছু নূতন নয়। কিন্তু কুকুরের কাটা লেজের অবশিষ্ট চার আঙুল পরিমাণ একটা ছ' ফুট লম্বা তাগড়া জোয়ানকে বাঁচিয়েছে—এটা অবিশ্বাস্য। কিন্তু যে-ব্যক্তি এ ঘটনাটির বর্ণনা আমাকে দেন, তিনি অনেকের কাছেই সুপরিচিত এবং তাঁরা সকলেই সানন্দে শপথ করতে প্রস্তুত হবেন যে, শ্রীযুত বিনায়ক রাও শিবরাম মসোজীকে কেউ কখনো মিথ্যা-ভাষণ করতে শোনেন নি।

আমার শুধু ক্ষোভ যে, বিনায়ক রাও যখন আমাকে প্রাগুক্ত ঘটনার সঙ্গে

বিজড়িত তাঁর হিমালয় ভ্রমণ বর্জন করে যান, তখন আমার সুদূর কল্পনাদৃষ্টি দিকচক্রবালে এতটুকু আভাস দেখতে পায় নি যে, আমার মত নগণ্যজনও একদিন বাঙলা সাহিত্যের সংস্পর্শে আসবে ; নইলে সেদিন আমি সাতিশয় শ্রদ্ধা ও যত্নসহকারে বিনায়ক রাওয়ের ভ্রমণকাহিনীটি সবিস্তার লিখে রাখতুম। কারণ, আমাদের পরিচিত জন নিত্য নিত্য মানসসরোবর দর্শনে যায় না ; তাও পিঠে মাত্র একটি হ্যাভারস্যাক নিয়ে। পরবর্তী যুগে আমাকে এক মারাঠা দম্পতি বলেন যে, মানসরোবরে (না মানস সরোবরে তাই আমি জানি নে) যাবার পথে ডাকাতের ভয় আছে বলে তাঁরা সঙ্গে সেপাইশান্ত্রী নিয়ে যান।

বিনায়ক রাও শ্রীযুত নন্দলালের শিষ্য এবং শিক্ষাশেষে তিনি গুরু নন্দলালের সহকর্মীরূপে কলাভবনের সহকারী অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। নন্দলাল যেরকম দেব-দেবীর ছবি আঁকতেন, বিনায়ক রাও তেমনি ভারতীয় দৃষ্টিবিন্দু থেকে ভারতীয় বাতাবরণে, ভারতীয় বেশভূষায় মাদন্না মা-মেরির একাধিক ছবি এঁকে দেশে-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেন। ইয়োরোপীয় চিত্রকরদের মাদন্না দেখে দেখে আমরা ভুলে গিয়েছিলুম যে, মা-মেরি প্যালেস্টাইন-বালা এবং প্যালেস্টাইন প্রাচ্যভূমি। বিনায়ক রাওয়ের একখানি উৎকৃষ্ট মাদন্না কিছুদিন পূর্বেও এলগিন রোডের একটি গির্জার শোভাবর্ধন করতো।

তিনি যে চিত্রকর ছিলেন, তার উল্লেখ করছি আমি অন্য কারণে। আর্টিস্ট মাত্রেরই অন্যতম প্রধান গুণ যে, তাঁরা কোনো বস্তু প্রাণী বা নৈসর্গিক দৃশ্য দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলো (ক্যারেকটারিস্টিক) লক্ষ্য করেন এবং ঠিক সেইগুলো মাত্র কয়েকটি আঁচড়ে প্রকাশ করতেই আমাদের কাছে রূপায়িত বিষয়বস্তু প্রাণবন্ত হয়ে ধরা দেয়। ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণনার সময় বিনায়ক রাও দৃশ্যের পর দৃশ্য মাত্র কয়েকটি ক্যারেকটারিস্টিক শব্দের দ্বারা প্রকাশ করতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি হিমালয়ের গিরি-পর্বত-তুষার-ঝঞ্ঝা চট্টি-কাফেলা সব যেন স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পেতুম। সেটা এখানে এখন আমার পক্ষে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব কারণ আমি কোনো অর্থেই আর্টিস্ট নই।

বিনায়ক রাওয়ের গভীর বন্ধুত্ব ছিল এক জাপানী ভদ্রলোকের সঙ্গে—নাম খুব সম্ভব ছিল—এতকাল পরে আমার সঠিক মনে নেই—হাসেগাওয়া। পাঁচ ফুটের বেশী দৈর্ঘ্য হয় কি না হয়, কিন্তু তাঁর প্রত্যেকটি পেশী ছিল যেন ইস্পাতের স্প্রিং দিয়ে তৈরি। প্রায় কিছু না খেয়েই কাটাতে পারতেন দিনের পর দিন এবং বীরভূমের ১১০ ডিগ্রীতেও তাঁর মুখে কোনো ভাবের পরিবর্তন দেখা যেত না। বিনায়ক রাওয়ের সঙ্গে তাঁর আরেকটা বিষয়ে ছিল হুবহু মিল, দুজনাই

অত্যন্ত স্বল্পভাষী। হাসেগাওয়াই প্রস্তাব করেন মানসসরোবরে যাওয়ার।

আমার আজ মনে নেই, কোন্ এক সীমান্তে গিয়ে ঐ পুণ্যসরোবরে যাবার জন্য পারমিট নিতে হয়। বিনায়ক রাও আমাকে বললেন, 'সব সরকারই বিদেশীদের ডরায়, ভাবে ওরা গুপ্তচর, কি মতলব নিয়ে এসেছে, কে জানে। ওসব জায়গায় তো যায় মাত্র দু'ধরনের লোক। তীর্থযাত্রী, আর যেটুকু সামান্য ব্যবসা-বাণিজ্য আছে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারবারী লোক—এরা যায় ক্যারাভান বা কাফেলার দল বানিয়ে। আমি খৃষ্টান, হাসেগাওয়া বৌদ্ধ; মানসসরোবর আমাদের কারোরই তীর্থ হতে পারে না। তবু ফর্মে লিখে দিলুম তীর্থযাত্রী, নইলে পারমিট অসম্ভব। হাসেগাওয়া বললেন, "আমরা গা-ঢাকা দিয়ে রইব, যতদিন না পারমিট পাই, পাছে আমাদের স্বরূপ না ধরা পড়ে। ইতিমধ্যে তোমাকে মাউণ্টেনীয়ারিং বা পাহাড় চড়ার আর্টে তালিম দেব।" ' বিনায়ক রাও বললেন, 'আমি তো মনে মনে হাসলুম। হাসেগাওয়ার তুলনায় আমি তো রীতিমত পাগলওয়ান। আমি পাহাড় চড়ি চড়্ চড়্ করে—ও আবার আমায় শেখাবে কি? কিন্তু ভুল ভাঙল প্রথম দিনই। পাশেই ছিল একটা ছোটখাটো পাহাড়। সেইটে দিয়েই হল আমার প্র্যাকটিস শুরু। হাসেগাওয়া আমাকে পই পই করে বার বার বললেন, "কনে-বউটির মত চলি চলি পা পা করে ওঠো, নইলে আখেরে পস্তাবে।" আমি মনে মনে বললুম, দুত্তোর তোর পা পা। চড় চড় করে উঠতে লাগলুম চড়াই বেয়ে—বাঘের শব্দ পেলে বাঁদর যে-ধরনে সোঁদরবনে সুন্দরী গাছ চড়ে। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু মশাই, ঘণ্টাদুই পরে দেখি অবস্থা সঙ্গীন। আর যে এক কদমও পা চলে না। ভিরমি যাবার উপক্রম। সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় আমি বসে পড়লুম একটা পাথরের উপর। ঘণ্টাটাক পরে হাসেগাওয়া আমাকে পাস্ করলেন, আমার দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হেসে। তিনি চূড়ায় উঠলেন। আমি বসে বসে দেখলুম। নেমে এলেন। বিশ্বাস করবেন না, সৈয়দসাহেব, আমার আত্মাভিমানে লাগল জোর চোট।'

আমি বললুম, 'দাক্ষিণাত্যের তীরু আন্নামলাইয়ের রমন মহর্ষির নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। তিনি অরুণাচলম পাহাড়ের উপর কাটান চল্লিশ না পঞ্চাশ বছর কিংবা ততোধিক। পাহাড়টা কিছু মারাত্মক উঁচু নয় কিন্তু ঝড়ে-বাদলায়, গরমে-ঠাণ্ডায়, কখনো বা অত্যন্ত অসুস্থ দুর্বল শরীর নিয়ে তাঁকে দিনে অন্তত একবার করে ওঠানামা করতে হত। এক পুণ্যশীলা গ্রামের মেয়ে তাঁর জন্য প্রতিদিন খাবার নিয়ে আসতো পাহাড়ের তলায়, যেখানে আজকের দিনের আশ্রম। তিনিও আমাদের ঐ চলি চলি পা পা-র উপদেশ দিয়েছেন, খুব ভালো

ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে। তারপর বলো।'

বিনায়ক রাও বললেন, 'পরদিন আরেকটা পাহাড়ে চেষ্টা দিলুম। সব জেনে-শুনেও আমার কিন্তু ঐ কনে-চাল কিছুতেই রপ্ত হচ্ছিল না। আর হাসেগাওয়া প্রতিদিন আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে পাস্ করতেন ও জিততেন লজ্জাকর মার্জিন রেখে।

'আমরা দিনের পর দিন প্রহর গুনছি—পারমিট আর আসে না, ওদিকে আমরা জনমানবহীন পাহাড়গুলো চড়ছি আর ভাবছি, আত্মগোপন করেছি উত্তমরূপেই। কিন্তু ইতিমধ্যে সীজন যে বেশ এগিয়ে গিয়েছে। আর বেশী দেরি হলে তো বরফ পড়তে আরম্ভ করবে।

'শেষটায় এক বড়কর্তার কাছে ডাক পড়ল। তাঁর প্রাসাদে উঠে দেখি, ইয়া আল্লা। তার সেই উঁচু টিলার স্ট্যাণ্ডের উপর খাড়া জোরদার টেলিস্কোপ। আমরা যখন অস্ট্রিচ পাখীর মত বালুতে মাথা গুঁজে আত্মগোপনের আত্মপ্রসাদ অনুভব করছি, ইনি তখন প্রতিদিন নির্ঝঞ্ঝাটে আমাদের প্রতিটি পাহাড় ওঠা পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং কৌতূহলী হয়ে আমাদের সম্বন্ধে সর্বসংবাদ সংগ্রহ করেছেন। বেশ রসিয়ে রসিয়ে আদ্যোপান্ত বললেন। আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল—ইস্তেক যে-জাপানী বদন অনুভূতি প্রকাশে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত ও অনিচ্ছুক সেটিও কিঞ্চিৎ বিকৃত হল।

'কিন্তু বৃথাই আতঙ্ক; আমরা খামোখাই ঘামের ফোঁটায় কুমীর দেখছিলুম। আমাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। বড়কর্তা সর্বসংবাদ শুনে আমাদের অভিযানাকাঙ্ক্ষা প্রসন্নতর দৃষ্টিতে আশীর্বাদ করেছেন। কারণ, আমরা ধর্ম বা অর্থ কোনোটাই সঞ্চয় করতে যাচ্ছি না—আমরা আসলে তীর্থযাত্রী নই, আর ব্যবসায়ী তো নই-ই। তবে তখনো জানতুম না, আরেকটু হলেই অনিচ্ছায়, অন্তত আমার, মোক্ষলাভটা হয়ে যেত।'

আমি বললুম, 'ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ তিনটের তো জমা-খরচ হল, আর কাম?'

মসোজী বললেন, 'রাম, রাম।' ওর মত প্যুরিটান আমি কোনো মঠ, কোনো মনাস্টেরিতে দেখি নি।

তারপর বিনায়ক রাও আমার চোখের সামনে একটার পর একটা ছবি এঁকে যেতে লাগলেন। কত না বনস্পতি, অজানা-অচেনা বিহঙ্গের সঙ্গে প্রথম পরিচয়, আন্দোলিত উপত্যকার উপর ক্রোশের পর ক্রোশব্যাপী দোদুল্যমান ফুলের বন্যা, পার্বত্য-নদী, জলপ্রপাত, অভ্রংলেহী পর্বত, পাতালস্পর্শী অন্ধকূপ, সংকটময় গিরি-সংকট, পান্থশালা, চট্টি, পার্বত্য শ্রমণদের জিহ্বানিষ্ক্রমণপূর্বক তৎসঙ্গে ঘন ঘন

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় আন্দোলন দ্বারা অভিবাদন, দুর্গন্ধময় স্নেহজাতীয় পদার্থসহ চা-পানের নিমন্ত্রণসহ অতিথি সৎকার। আরো এত সব বিজাতীয় বস্তু ও কল্পনাতীত অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছিলেন যে, সেগুলোর নির্ঘণ্ট মাত্র দিতে হলে প্রচুর অবকাশ ও প্রচুরতর পরিশ্রমের প্রয়োজন। য়েতি বা এবমিনেবল স্নোম্যান সম্বন্ধে যে-সব কাহিনী বর্ণন করেছিলেন শুধু সেগুলো শিকের হাঁড়িতে সযত্নে তুলে রেখেছি: অস্মদ্দেশীয় সম্পাদক ও প্রকাশকদের শেষশয্যায় সেগুলো তাঁদের রসিয়ে রসিয়ে শুনিয়ে শুনিয়ে তাঁদের শেষ যাত্রাটি বিভীষিকাময় করে দেবার জন্যে!

বিনায়ক রাও বললেন, 'ক্রমে ক্রমে আমরা লক্ষ্য করলুম, পাহাড় থেকে নেমে আসছে সবাই, উপরের দিকে যাচ্ছে না কেউই। চট্টির পর চট্টি দেখি হয় জনমানবহীন—দরজা-খা-খা করছে কিংবা তালাবন্ধ—সমস্ত শীতকালভর এখানে তো আর কেউ আসবে না।

'আমরা চড়াইয়ের দিকে শেষ কাফেলাও মিস্ করেছি।

'কিন্তু হাসেগাওয়ার ঐ একটি মহৎ সদ্‌গুণ যে, কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অত্যন্ত প্রয়োজন না হওয়ার পূর্বে তিনি ঐ নিয়ে মাথা ঘামান না।

'আমরা যতই উপরের দিকে উঠছি, ততই রাস্তা এবং চট্টি জনবিরল হতে লাগলো। শেষটায় আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলার পরও কাউকে নেমে আসতে দেখি না—ওঠার তো প্রশ্নই ওঠে না। তখন দেখি এক পরিত্যক্ত চট্টির সামনে একজন সাধু বসে আছেন। সন্ধ্যা হয়-হয়। মোক্ষম শীত পড়েছে কিন্তু সাধুজী কৌপিনসার। সর্বাঙ্গে ভস্মও মাখেন নি কিংবা অন্য কোনো ব্যবস্থারও প্রয়োজন-বোধ করেন নি। অথচ দেহটির দিকে তাকালে মনে হয়, এইমাত্র প্রচুর তেল ডলাইমলাই করে স্নান সেরে উঠেছেন—গা বেয়ে যেন তখনো তেল ঝরছে। আমাদের সঙ্গে চাপাতি ও শুকনো তরকারি ছিল। সাধুজীকে তার থেকে হিস্যে দিলুম। তিনি কোনো প্রকারের বাক্যালাপ না করে খেলেন। আমরাও কোনো প্রশ্ন শুধালুম না। পরের দিন ভোরবেলা দেখি, তিনি তখনো সেখানে ঠায় বসে। আমরা তাঁকে প্রণাম করে রাস্তায় নামবার সময় মনে হল এই যেন সর্বপ্রথম তাঁর চোখে ভাবের পরিবর্তন দেখা গেল—সে পরিবর্তনে যেন আমাদের প্রতি আশীর্বাদ রয়েছে। রাস্তায় নামার পর হাসেগাওয়া বললো, 'আমার দুশ্চিন্তা গেছে। আমাদের যখন উনি চড়াইয়ের পথে যেতে বারণ করলেন না, তখন মনে হচ্ছে, আমাদের যাত্রা সফল হবে।

'হিমালয়ের অন্যতম এই রহস্যের সমাধান এখনো হয় নি। এইসব একাধিক

সন্ন্যাসী সমস্ত শীতকালটা এসব জায়গায় কাটান কি করে? পাঁচ-সাত হাত বরফ এখানে তো জমেই—সেখানে না আগুন, না কোনো প্রকারের খাদ্য। এক চট্টিওলা আমাকে পরে বলেছিল, বরফের তলায় নাকি একরকমের লতা গজায়। তারই রস নাকি এদের খাদ্য, বস্ত্র, আগুন—সব।

'আর হাসেগাওয়া তুলে যাচ্ছে, একটার পর একটা ছবি। এই গিরি অভিযানে বেরুবার তার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য—যত পারে, যত রকমের হয়, ফোটোগ্রাফ তোলা। দাঁড়ান, আপনাকে বইখানা দেখাই।'

বিনায়ক রাও নিয়ে এলেন ঢাউস এক ফোটোগ্রাফের বই। মলাটের উপরকার ছবি দেখেই আমার বুঝতে বাকি রইল না যে, এই বই জাপানী। জার্মানরাও বোধহয় এরকম প্রিণ্ট করতে পারে না। কে বলবে এগুলো ব্লক থেকে তৈরি! মনে হয় কণ্টাক্ট প্রিণ্ট!

বিনায়ক রাও বললেন, 'জাপানে ফিরে গিয়ে হাসেগাওয়া তাঁর তোলা ছবির একটি প্রদর্শনী দেখান। সে-দেশের রসিক-বেরসিক সর্বসম্মতিক্রমে এই সঞ্চয়ন ফোটোগ্রাফির প্রথম বিশেষ পুরস্কার পায়।'

ছবি বোঝাবার জন্য এ-বইয়ে টেক্সট অত্যল্প। আমার বড় বাসনা ছিল বইখানা যেন ভারতের বাজারেও জাপানীরা ছাড়ে। কিন্তু ঠিক তখনই মার্কিন হিরোশিমার উপর এটম বোমা ফেলছে। পরবর্তীকালে আমি আবার কঁহা কঁহা মুল্লুকে চলে গেলুম।

এ-বইখানা আনাতে কিন্তু আমার অসুবিধা সৃষ্ট হল। বিনায়ক রাও বই আনার পর আর বর্ণনা দেন না। শুধু বলেন, 'এর পর আমরা এখানে এলুম' বলে দেখান একটা ফোটো, ফের দেখান আরেকটা অনবদ্য ছবি। কিন্তু এখন আমি সেসব ছবির সাহায্য বিনা তাঁদের যাত্রাপথের গাম্ভীর্য, মাধুর্য, বিস্ময়, সঙ্কট, চিত্র-বর্ণন করি কি প্রকারে! পাঠক, তুমি নিরাশ হলে, আমি নিরুপায়।

বিনায়ক রাও, হাসেগাওয়া তোমার ও আমার পরম সৌভাগ্য যে, ওঁরা দুজনা পথিমধ্যে একটি কাফেলা পেয়ে গেলেন—এবং অবিশ্বাস্য, সেটা যাচ্ছে উপরের দিকে। এদের ভিতর আছে তীর্থযাত্রী ও অল্পবিত্ত ব্যবসায়ী। এই শেষ কাফেলা। নানা কারণে এদের বড্ড বেশী দেরি হয়ে গিয়েছে বলে ব্যবসায়ীদের মনে শঙ্কা, বরফ-নামার পূর্বে এঁরা পাহাড় থেকে নামতে পারবেন কিনা। তীর্থযাত্রীদের মনে কিন্তু কোনো প্রকারের দুশ্চিন্তা নেই। এ-ধরনের তীর্থদর্শনে যারা বেরয়, তারা ঘরবাড়ির মোহ, প্রাণের মায়া সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়েই সম্মুখপানে পা ফেলে। পথিমধ্যে মৃত্যু, মানসে মৃত্যু, গৃহ-প্রত্যাবর্তন না

করা পর্যন্ত যেখানেই মৃত্যু হোক না কেন, তাঁরা আশ্রয় পাবেন ধূর্জটির নিবিড় জটার মাঝখানে—যে-জটা হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে চিরজাজ্বল্যমান।

আর কাফেলার ঐসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কথা চিন্তা করলে মনে হয়, কি বিচিত্র দ্বন্দ্বময় পরস্পরবিরোধী কার্যকলাপ এদের জীবনে। যে-প্রাণরক্ষার জন্য এরা দুটি মুঠি অন্ন উপার্জন করতে এসেছে এখানে, সেই প্রাণ তারা রিস্ক করছে প্রতি দিন, প্রতি বৎসর! হুবহু সার্কাসের স্টাণ্ট খেলাড়িদের মত—প্রাণধারণের জন্য যারা প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে প্রতি সন্ধ্যায়!

তা সে যাক্। এ-লেখাটি এখন সংক্ষিপ্ত করি। কারণ, হিমালয়ের বর্ণনাই যখন দিতে পারছি নে, তখন হিমালয় নিয়ে কাহিনী বলা শিবহীন দক্ষযজ্ঞ এবং যদ্যপি হিন্দু পুরাণের সঙ্গে পরিচয় আমার ঘনিষ্ঠ নয়, তবু এটুকু জানি, সে প্রলয়-কাণ্ড ঘটেছিল এই হিমালয়েই—দক্ষালয়ে।

আমি অরসিক। হঠাৎ শুধালুম, 'বিনায়ক রাও! তোমরা খেতে কি?'

'শেষের দিকে পথে যেতে যেতে—'পথ' বললুম বটে কিন্তু আমি আপনারা পথ বলতে যেটা বোঝেন, সেটাকে অপমান করতে চাই নে—আমার শ্যেনদৃষ্টি থাকতো কিসের উপর জানেন? শকুনি, শকুনি—আমি তখন সাক্ষাৎ শকুনি। শকুনি যেমন নির্মল নীলাকাশে ওড়ার সময়ও তাকিয়ে থাকে নিচে ভাগাড়ের দিকে, আমিও তাকিয়ে থাকতুম নিচের দিকে। কোথাও যদি ভারবাহী য়াক্ পশুর এক চাবড়া গোবর পেয়ে যাই। সে-ঘুঁটেতে আগুন ধরিয়ে ধুঁয়োর ভিতর নাড়াচাড়া করি, চেপে ধরি, দু হাত দিয়ে চড়চাপড় মেরে তৈরি করা এবড়ো-থেবড়ো রুটি—গুজরাতীতে যাকে বলে রোটলা, কাবুলী নানের চেয়েও তিন ডবল পুরু। কিন্তু সেই ডাঁশা রুটিই মনে হত সাক্ষাৎ অমৃত—ওল্ড্ টেস্টামেণ্টের বিধিদত্ত মান্না, যার স্বাদ আজো ইহুদিকুল ভুলতে পারে নি।'

বিনায়ক রাও বললেন, 'পঙ্গুও ঈশ্বরপ্রসাদাৎ গিরি লঙ্ঘন করে—এটা মানসে পৌঁছে জন্মের মত উপলব্ধি করলুম। হাসেগাওয়ার দর্শনই ঠিক—পঙ্গু বাধ্য হয়েই এগোয় অতি ধীরে-মন্থরে, তাই শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যায় মানসসরোবরে। পঙ্গুর কাছে যা বিধিদত্ত, সুস্থ মানুষকে সেটা শিখতে হয় পরিশ্রম করে।'[১]

---

১ চেকোশ্লোভাকিয়ার পাহাড়-পর্বত হিমালয়ের তুলনায় নগণ্য। সেখানে পাহাড় চড়তে গিয়ে শ্রীযুক্ত মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের যে অভিজ্ঞতা হয় সেটি এস্থলে তুলে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না।

বিনায়ক রাও ভেবে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, সরোবরে স্নান করেছিলুম। আমার জীবনের মহামূল্যবান অভিজ্ঞতার ভিতর এটা আমার চিরকাল মনে থাকবে।'

'সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেল—না? পুণ্যস্নান তো বটে।'

বিনায়ক রাও শিউরে উঠলেন, 'বাপরে বাপ! জলে দিয়েছি ঝাঁপ আর সঙ্গে সঙ্গে মেরেছি পারের দিকে লাফ। সেদিন আকাশ ছিল পরিষ্কার। দ্বিপ্রহরের সেই উগ্র রৌদ্রে আমি ঘণ্টাদুয়েক ছুটোছুটি করেছিলুম শরীরটাকে গরম করার জন্যে। ছুটেছি পাগলের মত দু-হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পা-দুটো ছুঁড়ে ছুঁড়ে আছাড় মেরে মেরে। তারপর ক্লান্ত হয়ে থামতে বাধ্য হয়েছি। ফাঁসির লাশের মত জিভ বেরিয়ে গিয়েছে হাঁপাতে হাঁপাতে। ফের ছুটতে হয়েছে গা গরম করার জন্য। গা আর কিছুতেই গরম হয় না। সে কী যন্ত্রণাভোগ!'

আমি বললুম, 'শুনেছি, গত যুদ্ধে যেসব এ্যার পাইলট শীতকালে ইংলিশ-চ্যানেলের জলে পড়েছে, তাদের কেউই কুড়ি মিনিটের বেশী বাঁচে নি।'

বিনায়ক রাও বললেন, 'লোকে বলে, অগ্নিপরীক্ষা! আমি বলি শীতের পরীক্ষা।'

'হ্যাঁ, আফ্রিকাবাসীরাও বলে—Heat hurts, cold kills.'

বিনায়ক রাও বললেন, 'হাসেগাওয়া প্রাণভরে ছবি তুললেন। তারপর প্রত্যাবর্তন। অন্য পথ দিয়ে।

মিরেক (একজন পাহাড়-বন-বিভাগের চৌকিদারকে) শুধোলে, 'আচ্ছা, আপনি এত আস্তে চলছেন কেন?'

প্রশ্ন শুনে চৌকিদার হোঃ হোঃ করে খুব খানিকটা হেসে নিলেন। তারপর বললেন—'শুনুন। বহু বছর, চল্লিশেরও উপর, বনের পথে, পাহাড়ে রাস্তায় নানান গতিতে হেঁটেছি। কখনও জোরে কখনও ধীরে। আপনাদের মত আগে হাঁটতুম, আরো জোরে হাঁটতুম। লাফিয়ে ঝাঁফিয়ে পাহাড়ে উঠে তার পর হাঁপাতুম। হাত-পা ছড়িয়ে ঘাসের উপর শুয়ে জিরিয়ে নিতুম, তারপর আবার চলতুম। কাজের তাগিদে কখনো সারাদিন হাঁটতে হয়েছে, কখনও সারারাত। কিন্তু এই যে এখনকার আমার চলার গতি দেখছেন, এ হচ্ছে বহুদিনের বহু সাধনার পর আবিষ্কৃত। এ গতিতে চললে কখনও ক্লান্তি আসবে না শরীরে। যত দূর-দূরান্তরে বনান্তরে যান না কেন, যাত্রার শুরুতে যেমন শরীর তাজা তমনিই থাকবে। চরণিক, প্রথম (বেঙ্গল) সংস্করণ, পৃ ১১৩।১৪।

'চলেছি তো চলেছি, তারপর এল আমাদের কঠিনতম সংকট। আমাদের একটা গিরিসংকট পেরুতে হবে। এবং এটা পৃথিবীর অন্যতম সর্বোচ্চ গিরি-সংকট। সমুদ্রতট থেকে বারো হাজার ফুট উঁচুতে না বাইশ হাজার আমার মনে নেই। এবং একটুখানি যাওয়ার পরই আরম্ভ হয় চড়াইয়ের পর চড়াই। ক্যারাভানের এক ব্যবসায়ী আমাকে বলেছিল, যেসব তীর্থযাত্রী মারা যায়, তাদের অধিকাংশই মরে এইখানে।

'ক্রমেই বাতাসের অক্সিজেন কমে আসছিল। অতিকষ্টে আমরা ধীরে ধীরে এগুচ্ছি। এমন সময় চোখে পড়ল একটা লোক অকাতরে ঘুমুচ্ছে 'পথের' এক-পাশে। কাছে এসে বুঝলুম, মৃতদেহ! এবং সম্পূর্ণ অবিকৃত মৃতদেহ। এ-বছরে মরেছে, না গেল বছরে বুঝতে পারলুম না। কারণ, আমি শুনেছিলুম, উপরে-নিচে বরফ থাকে বলে মড়া পচে না।

'এর পর আরো কয়েকটা। আমি মাত্র একবার একজনের মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম, আহা! সে কী শান্ত, প্রশান্ত, নিশ্চিন্ত মুখচ্ছবি। মায়ের কোলে ঘুমিয়ে-পড়া শিশুর মুখেও আমি এরকম আনন্দভরা আত্মসমর্পণের ছবি দেখি নি।

'ইতিমধ্যে আমার দৃষ্টি গেল অন্যদিকে। দেখি, আমাদের দলের একজন বৃদ্ধ তীর্থযাত্রী অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে। কারো সেদিকে ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত নেই। আমি জানতুম, এবং হাসেগাওয়াও আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, এখানে বলবান যুবা পুত্রও হাত বাড়িয়ে মাতাকে পর্যন্ত সাহায্য করতে পারে না। কারো শরীরে একবিন্দু উদ্বৃত্ত শক্তি নেই যে, সে সেটা অন্যের উপকারে লাগাবে। সামান্য দুটি কথা বলে যে সাহস দেবে সে শক্তিও তখন মানুষের থাকে না। আমার মনে হল, হালকা একটি পালক দিয়েও যদি কেউ আমাকে ঠোনা দেয় আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবো।

'আমি খুব ভালো করেই জানতুম, কাফেলা কারো জন্য অপেক্ষা করে না; করলে সমস্ত কাফেলা মরবে। আমাদের যে করেই হোক সন্ধ্যা নাগাদ সামনের আশ্রয়স্থলে পৌঁছুতে হবে।

'এমনিতেই আমাদের প্রত্যেকেরই ছিল শম্বুকগতি। আমি সেটাও কমিয়ে দিলুম ঐ বৃদ্ধকে সঙ্গ দিতে। হাসেগাওয়া বুঝতে পেরেছে। আমার দিকে রহস্যভরা নয়নে সে তাকাল। আমি ইঙ্গিতে জানালুম, সে যেন তার গতি শ্লথ না করে।'

এস্থলে আমি সামান্য একটি তথ্যের উল্লেখ না করলে কর্তব্যবিচ্যুতি হবে।

বিনায়ক রাওয়ের মত পরদুঃখকাতর মানুষ আমি এ-জীবনে কমই দেখেছি, এবং একেবারেই দেখি নি পরোপকার গোপন রাখতে তাঁর মত কৃতসঙ্কল্প জন। প্রভু যীশুর আদেশ 'তোমার বাঁ হাত যেন না জানতে পারে তোমার ডান হাত কি দান করলো' এরকম অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে আমি কোনো খৃষ্টান অখৃষ্টান কাউকে দেখি নি। কাফেলার বৃদ্ধের প্রতি তাঁর দরদ গোপন রাখতে পারলে তিনি নিশ্চয়ই তাই করতেন—এ সত্য আমি কুরান স্পর্শ করে বলতে রাজী আছি। কিন্তু এটা গোপন রাখলে তাঁর মূল বক্তব্য একেবারেই বিকলাঙ্গ হয়ে যেত বলে তিনি যতটা নিতান্তই না বললে নয়, সেইটুকুই বলেছিলেন।

বিনায়ক রাও সোদনের স্মরণে একটুখানি শ্বাস ফেলে বললেন,—'বৃদ্ধকে আমি বলবো কি—স্পষ্ট দেখতে পেলুম, সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে যেন কাফেলা থেকে সে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে। এই যে আমি তার তুলনায় শক্তিশালী, আমারই থেকে থেকে মনে সন্দেহ হচ্ছিল, আমিই কি পৌছতে পারবো গন্তব্যস্থলে? তখন হৃদয়ঙ্গম করলুম, এখানে এ-সঙ্কট থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য শারীরিক বলের প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন মানসিক বলের। এবং এ বৃদ্ধের সেটা যেন আর নেই। তীর্থদর্শন হয়ে যাওয়ার পর ফেরার মুখে অনেকেই সেটা হারিয়ে ফেলে—কারণ তখন তো সামনের দিকে আর কোনো উদ্দেশ্য নেই, আর কোনো চরম কাম্য বস্তু নেই। ফিরে তো যেতে হবে আবার সেই সংসারে, তার দিনযাপনের প্রাণ-ধারণের গ্লানির ভিতর।

'আমার মনে হচ্ছিল আমি নিজে যেন সন্তরণে অক্ষম, আরেক সন্তরণে অক্ষম জনকে সাহায্য করার নিষ্ফল প্রচেষ্টা করছি। তবু বললুম, "আরেকটুখানি পরেই উৎরাই। চলুন।" এই সামান্য কটি শব্দ বলতে গিয়েই যেন আমার দম বন্ধ হয়ে এল।

'বুড়ো আমার দিকে তার ঘোলাটে চোখ তুলে তাকিয়ে হঠাৎ কি যেন দেখতে পেল। অতি কষ্টে ধীরে ধীরে বললে, "বাবু, তোমার বোতল থেকে একটু শরাব।"

বিনায়ক রাও বললেন, 'আমি জীবনে কখনো শরাব স্পর্শ করি নি; আমার বুকের পকেটে ছিল চ্যাপ্টা বোতলে জল।

'কোনো গতিকে বললুম, "জল।" বুড়ো বিশ্বাস করে না। কাতর নয়নে তাকায়।

'আস্তে অতি আস্তে বুড়ো এগোচ্ছে ঐ শরাবের আশায়।

'এইভাবে খানিকক্ষণ চললো। হঠাৎ বুঝি বুড়ো লক্ষ্য করেছে কাফেলা একেবারেই অন্তর্ধান করেছে। কাঁপতে কাঁপতে বুড়ো বলল, "জিরোবো।" আমি শুষ্ককণ্ঠে যতখানি পারি চেঁচিয়ে বললুম, "না, না।" আমি জানি, এ জিরোনোর অর্থ কি। এই বসে পড়ার অর্থ, সে আর উঠে দাঁড়াবে না। তার মনে হবে এই তো পরমা শান্তি—আরাম, আরাম। আর শেষ নিদ্রায় ঢলে পড়বে।

'বুড়ো তার শেষ ক'টি কথা বললে যার অর্থ, এক ঢোক শরাব পেলে সে হয়তো সঙ্কট পেরুতে পারবে। আমার দিকে হাত বাড়ালো। আমি আর কী করি? দিলুম বোতল। সে টলতে টলতে বসে পড়ল। এ কী সর্বনাশ! তারপর বোতল মুখে দিয়ে যখন দেখল সত্যি জল, তখন আমার দিকে শেষবারের মত তাকিয়ে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়লো।

'এই শরাবের আশাতেই সে এতক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গে কোনো গতিকে এসেছে। এবারে শেষ আশা বিলীন হতে সে ঢলে পড়লো।

* * *

'চলেছি তো চলেছি। কতক্ষণ চলার পর উৎরাই আরম্ভ হয়েছিল, কখন যে উপত্যকায় নেমেছি সেগুলো আমার চৈতন্যসত্তা যেন গ্রহণ করে নি।

'সম্বিতে এলুম হঠাৎ বরফপাতের সঙ্গে সঙ্গে। অতি হাল্কা চাদরের মত কি যেন নেমে এল। তবু সম্মুখপানে খানিকটা দেখা যায়। ঈষৎ দ্রুততর গতিতে চলতে আরম্ভ করলুম। কয়েক মিনিট পরেই বরফপাত থেমে গেল। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। তারপর সামনের দিকে তাকিয়ে ভয়ে আতঙ্কে আমি হৃদয়ঙ্গম করলুম, একটুখানি বেশী আগেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বসেছি।

'সামনে উপত্যকা, এবং এইমাত্র যে বরফপাত হয়ে গেল তারই "কল্যাণে" মুছে গেছে কাফেলার পদচিহ্ন। এবং সঙ্কটটাকে যেন তার বীভৎসতম রূপ দেবার জন্য সামনে, ধীরে ধীরে, নেমে আসছে কুয়াশার জাল—দিনের আলো ম্লান হয়ে গেছে।

'তারই ভিতর দিয়ে লক্ষ্য করলুম, আরেকটু সামনে একটা পাথরের টিলা। সেখানে পৌঁছে আমাকে যেতে হবে হয় বাঁয়ে নয় ডাইনে। কিন্তু মনস্থির করি কি প্রকারে? বরফের উপর যে কোনো চিহ্নই নেই। তবু আমার মনে যেটুকু দিক্-বিদিক জ্ঞান ছিল সেটা পরিষ্কার বললে, যেতে হবে বাঁ দিকে।

'এমন সময় হঠাৎ কুয়াশার ভিতর যেন একটু ছিদ্র হল, এবং তার ভিতর দিয়ে এক মুহূর্তের তরে, যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, দেখি একটা কুকুরের ইঞ্চি-তিনেক লেজ, বোঁ করে ডান দিকে মোড় নিল, কুকুরটাকে কিন্তু দেখতে

পেলুম না—'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'কুকুর! কোথাকার কুকুর? কুকুরের কথা তো এতক্ষণ কিছু বলো নি!'

'ও। সত্যি ভুলে গিয়েছিলুম। ঐ কুকুরটা থাকতো একটা চট্টিতে। আমরা সে চট্টিতে, বৃষ্টির জন্য আটকা পড়ে, দিন তিনেক ছিলুম। ঐ সময় আমি ওটাকে সামান্য এটা সেটা খেতে দিয়েছি। সে-চট্টি ছাড়ার খানিকক্ষণ পরে দেখি, তিনি আমার পিছু নিয়েছেন। বিস্তর হাই-হুই করে পাথর ছুঁড়েও তাকে চট্টিতে ফেরত পাঠাতে পারলুম না।'

আমি বললুম, 'এই তো সেই জায়গা যেখানে যুধিষ্ঠিরের সারমেয় তাঁকে ত্যাগ করতে চায় নি।'

মসোজী বললেন, 'এসব কেন, কোনো কুকুরেরই লেজ কাটা উচিত নয়; তবু কে যেন বেচারীর বাচ্চা বয়সে তার লেজ কেটে দিয়েছিল। আমি দেখতে পেলুম সেই টুকরোটুকু, যেটুকু অবশিষ্ট ছিল। এবং সেটা মোড় নিল ডানদিকে।

'আমার অভিজ্ঞতা, আমার পর্যবেক্ষণ, আমার বিচারশক্তি সব—সব—আমাকে চিৎকার করে বলছিল, "বাঁ দিকে বাঁ দিকে মোড় নাও" আর অতি স্পষ্ট যদিও অতিশয় ক্ষণতরে আমি দেখলুম, কুকুরটার লেজ মোড় নিল ডান দিকে।

'আমি নিজের বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে কুকুরটার লেজকেই বিশ্বাস করলুম বেশী।

'কুকুরটাকে কিন্তু তখনকার মত আর দেখতে পেলুম না।

'ঘণ্টাটাক পরে চট্টিতে পৌঁছলুম। হাসেগাওয়া বললেন, আমি বুড়োর জন্য অপেক্ষা করার পর থেকেই কুকুরটা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছিল। শেষটায় সে অদৃশ্য হয়ে যায়।'

আমি শুধালুম, 'আর বাঁ দিকে মোড় নিলে কি হত?' প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেই বুঝলুম আমি একটা ইডিয়ট্।

বিনায়ক হেসে বললেন, 'তাহলে আপনি আপনার বন্ধু বিনায়ককে আর—'

আমি বললুম, 'ষাট ষাট'।[২]

---

২ বিনায়ক রাও আমাকে তাঁর মানস-গমন কাহিনী বহু বৎসর পূর্বে বলেছিলেন। এখন কেতাবপত্র ঘেঁটে লুপহোল্‌গুলো যে পূর্ণ করা যেত না তা নয়, কিন্তু আমার কেমন যেন মনে হল এই খাপছাড়া খাপছাড়া অসম্পূর্ণ পাঠটাই সত্যের নিকটতর থাকবে।

নটরাজনের একলব্যত্ব

বর্ষা নামার সঙ্গে সঙ্গেই পদ্মার উপর দিয়ে পূবৈয়া বায়ু বইতে আরম্ভ করে না। সে হাওয়া আসে তার দিন আষ্টেক পরে। কিন্তু তখনই সাড়া পড়ে যায় বন্দরে বন্দরে মাঝি-মহল্লায়। হালের বলদ পালের গরু বিক্রি করে তারা তখন কেনে নৌকোর পাল। পুরনো পালে জোড়াতালি দিয়ে যেখানে চলে যাওয়ার আশা, সেখানে চলে কাঁথার ছুঁচ আর মোটা সুতো। তার পর আসবে ঝোড়ো বেগে পূব হাওয়া। দেখ্ তো না দেখ্, নারায়ণগঞ্জী নৌকো পৌঁছে যায় রাজশাহী। বিশ্বাস করবেন না, স্রোতের উজানে, তর তর করে।

আমিও বসে আছি হাল ধরে, পাল তুলে—হাওয়া এই এল বলে। নোঙর নিই নি। এই শেষ যাত্রায় যেতে হয় এক ঝটকায়। কোথাও থামবার হুকুম নেই।

নাতি ডাবাটি এগিয়ে দিয়ে বললে, 'দাদু, তামুক খাও।'

হাওয়ার আশায় বসে থাকার প্রতিটি মুহূর্ত আনন্দ-আবেশে ভরে যায়।

নাতি বললে, 'দাদু, সারাজীবন ধরে পদ্মার উজান-ভাটা করলে। কত লোকের সঙ্গেই না তোমার দোস্তী হল। বাড়িতে থেকে খেত-খামার করে দোকানপাট চালালে তো অতশত লোকের সঙ্গে তোমার ভাবসাব হত না—আর বিদেশীই বা কিছু কম। কহাঁ কহাঁ মুল্লুকের রং-বেরংয়ের চিড়িয়া। আমারে কও, তাদের কথা।'

শ্রীযুত গাঙ্গুলীর পাহাড় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা একটু আগেই ফুটনোটে উল্লেখ করেছি। মোরাভিয়ার পাহাড় তেমন কিছু উঁচু নয়, কিন্তু বরফের ঝড়ে কিংবা নিছক ক্লান্তিবশতঃ পর্যটকের মরণবরণ একই পদ্ধতিতে হয়। গাঙ্গুলিমশাই লিখছেন :

'সেবারে দুটি স্লোভাক ছেলে প্রাড্‌য়েটের চুড়োয় এসে হাজির হল। তখন খুব বরফ পড়ছে। (সেখানকার) কাফিখানায় এক চুল জায়গা নেই—যত রাজ্যের শী-চালক সেখানে এসে জমেছে। এই দুই স্লোভাক ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু পেয়ালা গরম দুধ খেয়ে বেরিয়ে গেল। কোথায় যাচ্ছ জিজ্ঞেস করায় তারা জবাব দিলে—চের্তেনে সেডলো।

বরফ পড়লেও দিনটা মোটামুটি পরিষ্কার ছিল। কিন্তু ছেলে দুটি বেরিয়ে যাবার খানিক পরেই হঠাৎ কুয়াসা এসে চারিদিক ছেয়ে ফেললো। তারপর এই কুয়াসা কাটল না, ছেলে দুটিও ফিরে এল না। এদিকে অন্ধকার নেমে এল

আমি পদ্মা নদীর মাঝি নই। কিন্তু আমার জীবনধারা বয়ে গেছে পদ্মার চেয়েও দেশদেশান্তরে। কত না অদ্ভুত অদ্ভুত পরিস্থিতি, কত না বিচিত্র চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এখন পাল তুলে ওপারে যাবার মুখে ভাবছি, এঁদের কারো কারো সঙ্গে আপনাদেরও পরিচয় করিয়ে দি। কারণ এঁদের সম্বন্ধে অন্য কেউ যে মাথা ঘামাবে সে আশা আমার কম—প্রচলিতার্থে এঁরা দেশের

আর তারই সঙ্গে ঘন তুষারপাত শুরু হয়ে গেল।

কাফিখানার মালিক উদ্বিগ্ন হয়ে বিদেশী ছেলে দুটিকে খোঁজবার জন্যে কয়েক-জনকে পাঠালেন। তারা শী নিয়ে কোমরে টর্চ বেঁধে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে ঐ ঘন তুষারপাতের মধ্যে যাবে কোথায়? যাবেই বা কি করে? বিশেষ কিছু লাভ হল না। তারা ফিরে এল। কিন্তু ছেলে দুটি আর ফিরল না।

পরদিন সকালবেলা বরফের উপর রোদ পড়ে যখন চারিদিক ঝলমল করে উঠল, তখন দেখা গেল রাত ভোর এত বরফ পড়েছে যে ছেলে দুটি যদি কোথাও মরেও পড়ে গিয়ে থাকে তাদের দেহ খুঁজে বার করবার কোনো উপায় নেই। আশপাশের যত কুটির যত গ্রাম আছে সব জায়গা থেকে যখন খবর এল যে ছেলে দুটি কোথাও পৌঁছয় নি তখন বোঝা গেল এই অঞ্চলের বরফের মধ্যে তাদের সমাধি হয়েছে।

সারা শীতকাল ছেলে দুটি তাদের অজানা সমাধির মধ্যে রইল শুয়ে। তারপর যখন প্রথম বসন্তের হাওয়ায় বরফ গলতে আরম্ভ করল তখন তাদের অবিকৃত দেহ আবিষ্কার হয় এই জঙ্গলের মধ্যে। আশেপাশে অনেকগুলো আধপোড়া দেশলাই-এর কাঠি ছড়ানো।

বরফের মধ্যে পথ হারিয়ে যাওয়ার এই হচ্ছে বিপদ। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার মত হলে যে ক্লান্তি আসে সে বড় ভয়ানক ক্লান্তি। দু-চারটে দেশলাই জ্বেলে কি তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায়? দেহ মন চোখ সমস্ত ঘুমে জড়িয়ে আসে। হঠাৎ শীতের অনুভূতি আর থাকে না। মনে হয় বরফেরই কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়ি। তখন মনে হয় জেগে থাকার চেষ্টা করার মধ্যেই যত অস্বস্তি যত কষ্ট! ঘুমিয়ে পড়াই হচ্ছে আরাম! তারপর একবার সেই ঘুমের কোলে কেউ ঢলে পড়লে, সে ঘুম আর ভাঙ্গে না। বরফের মধ্যে মৃত্যুকে ঠিক জীবনের অবসান বলা যায় না—এ যেন এক গভীর সুষুপ্তি।'

কুতুবমিনার নন। অথচ আমার বিশ্বাস এঁরা যদি সত্যই এম্‌বিশাস্‌ হতেন তবে আজ আমার মত অখ্যাত জনের কাঁধে এঁদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবার ভার পড়তো না, আর পড়লেও সেটা আমি গ্রহণ করতুম না। কারণ এঁদের আমি ভালোবেসেছিলুম এঁরা লাওৎসের চেলা বলে। তাঁরই উপদেশ মত এঁরা জীবনের মধ্য-পথ অবলম্বন করেছিলেন। পাঁচজনের সঙ্গে মিলে মিশে, আপন প্রতিভা যতদূর সম্ভব চাপা রেখে গোপনে গোপনে তার পরিপূর্ণ বিকাশ দেবার চেষ্টা করেছেন। বাধা পড়লে লড়াই দিতেন মোক্ষম, কিন্তু সর্বক্ষণ এঁদের চরিত্রে একটা বৈরাগ্য ভাব থাকতো বলে মনে মনে বলতেন, 'হলে হল, না হলে নেই।'

কিন্তু আমাকে একটু সাবধানে, নাম পরিচয় ঢেকে চেপে লিখতে হবে। পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়েছি এঁরা জীবন-সভাস্থলে প্রধান অতিথির আসনে বসে ফুলের মালা পরতে চান নি, তাই পাঠক সহজেই বুঝে যাবেন, কারো লেখাতেও তাঁরা হ্যামলেট, রঘুপতি হতে চান না—আমার নাতিপরিচিত লেখাতেও না।

মনে করুন তার নাম নটরাজন। তার পিতা ছিলেন পদস্থ সরকারী কর্মচারী, আশা করেছিলেন ছেলেও তাঁর মত চারটে পাস দিয়ে একদিন তাঁরই মত বড় চাকরি করবে। অন্যায্য আশা করেন নি, কারণ নটরাজন ক্লাসের পয়লা নম্বরী না হলেও প্রোমোশন পেত অক্লেশে, আর একটা বিষয়ে ইস্কুলের ভিতরে বাইরে সবাইকে ছাড়িয়ে যেত অবহেলে। ছবি আঁকাতে। তার অঞ্চলে এখনও দেওয়ালে রঙিন ছবি আঁকার (ম্যুরাল) রেওয়াজ আছে। তারই ওস্তাদ পটুয়ারা স্বীকার করতেন, নটরাজনের চতুর্দশ পুরুষে যদিও কেউ কখনো ছবি আঁকেন নি—তাঁরা খানদানী, পটুয়া হতে যাবেন কোন্‌ দুঃখে—এ ছেলে যেন জন্মেছে তুলি হাতে নিয়ে। শুধু তাই না—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে এদেশে যখন হরেক রকম রঙের অভাব চরমে পৌঁচেছে তখন নটরাজন দেশের কাদামাটি কাঁকর পাথর ফুলপাতা থেকে বানাতে আরম্ভ করলো নানা রকমের রঙ। এটা ঠিক আর্টিস্টের কাজ নয়—এর খানিকটে কেমিস্ট্রি বাকিটা ক্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান্‌শিপ। পটুয়ারা নটরাজনকে প্রায় কোলে তুলে নিলেন। তখন তার বয়েস বারো-তেরো।

রবিবর্মা তার অঞ্চলেরই লোক। ওঁর ছবি কিন্তু নটরাজনকে বিশেষ বিচলিত করে নি। হঠাৎ একদিন সে দেখতে পেল নন্দলালের একখানা ছবি। জঘন্য রিপ্রডাক্‌শন্‌—রেজিস্ট্রেশন এতই টালমাটাল যে মনে হয় প্রিণ্টার তিনটি বোতল

টেনে তিনটে রঙ নিয়ে নেচেছে।

নটরাজন কিন্তু প্রথম ধাক্কায় স্তম্ভিত। দ্বিতীয় দর্শনে রোমাঞ্চিত। মধ্য রজনী অবধি সে ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

নটরাজন ছিল অসাধারণ পিতৃভক্ত। তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পিতা কি আশা পোষণ করেন সে তা জানতো। কি করে তাঁকে বলে যে সে তার গুরুর সন্ধান পেয়ে গিয়েছে; সর্বস্ব ত্যাগ করে তাঁর পদপ্রান্তে তাকে যেতেই হবে। তদুপরি কোথায় মালাবার আর কোথায় শান্তিনিকেতন!

পিতাই লক্ষ্য করলেন তার বিষণ্ণ ভাব। পিতাপুত্রে সখ্য ছিল—দূরত্ব নয়। সব শুনে বললেন, 'বাঁধা পথে যে চলে না তার কপালে দুঃখ অনেক। কিন্তু আপন পথ খুঁজে নেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখ আরো বেশী। তোমার উপর আমার আশীর্বাদ রইল।'

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম যুগ। যারা 'গোলামী-তালিম' চায় না, তারা যাবে কোথায়? বিশ্বকবি কবিগুরু যেন বিধির আদেশে ঠিক ঐ শুভলগ্নেই শান্তিনিকেতনে তাদের জন্য নীড় নির্মাণ করেছিলেন—যত্র বিশ্ব ভবত্যেক নীড়ম্। দূর সিন্ধু, মালাবার, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, আসাম থেকে ছেলেমেয়ে আসতে লাগলো—দলে দলে নয়, একটি দুটি করে।

যারা এল তাদের মধ্যে দু-চারটি ছিল লেখাপড়ায় বিদ্যেসাগর, বাপ-মা-খ্যাদানো বিশ্ববকাটে। বিশ্বভারতীই তো বিশ্ববকাটেদের উপযুক্ত স্থান, ঐ ছিল তাদের দৃঢ় বিশ্বাস! আসলে এরা ছিল কোনো কৌশলে ইস্কুল থেকে নাম কাটাবার তালে। অসহযোগের সহযোগিতায় তারা সে কর্মটি করলো নিশান উড়িয়ে দামামা বাজিয়ে।

বলা বাহুল্য আমি ছিলুম এই দলের।

হিন্দী-উর্দুতে বলে 'পাঁচো উঙলিয়া ঘীমেঁ আর গর্দন ডেগমে'—অর্থাৎ 'পাঁচ আঙুল ঘিয়ে আর গর্দানটাও হাঁড়ায় ঢুকিয়ে ভোজন।' আমরা যে ভূমানন্দ—ভূমা, বিশ্বপ্রেম, অমৃতের পুত্র এসব কথা তখন ছিল আমাদের ডালভাত—আমাদের মধুরতম স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি নি, এখানে এসে দেখি সে-অমৃত উপচে পড়ছে। সে যুগে বিশ্বভারতীর প্রথম নীতি ছিল, আমি অক্ষরে অক্ষরে তুলে দিচ্ছি: 'The system of examination will have no place in Visvabharati, nor will there be any conferring of degrees.'!!

বঙ্কিম চাটুয্যের কল্পনাশক্তি বড়ই দুর্বল। তিনি রচেছিলেন,

'ছাত্রজীবন ছিল সুখের জীবন
যদি না থাকিত এগজামিনেশন।'

বিশ্বভারতী বঙ্কিমের সে স্বপ্ন মূর্তমান করেছিল।

এবং ধর্মতঃ ন্যায্যতঃ প্রাগুক্তনীতির পিঠ পিঠ আসে: যেখানে পরীক্ষা নেই সেখানে ক্লাসে উপস্থিত হওয়া না-হওয়া ছাত্রের ইচ্ছাধীন। অতএব রেজিস্ট্রি নেই, রোল্-কল্ নেই!

আমাদের অভাব ছিল মাত্র একটি—উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট যা-ই হোক—চায়ের দোকান। তাই ছিল ঘরে ঘরে স্টোভ আর চায়ের সরঞ্জাম।

সত্যকুটিরের বারান্দায় মোড়ার উপর বসে শুনছি ভিতরে স্টোভের শব্দ। কেষ্‌নগরের মণি গাঙ্গুলী চা বানাচ্ছে। সামনে, গৌরপ্রাঙ্গণ পেরিয়ে, লাইব্রেরির বারান্দায় ঈষৎ প্রাণচাঞ্চল্য আরম্ভ হয়েছে। বৈতালিকের মূলগায়েন শ্রীযুক্ত অনাদি দস্তিদার (পরবর্তী যুগে খ্যাতিপ্রাপ্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতজ্ঞ) ও দোহারদের ফুলু রায় গান বাছাই করছেন। পূজনীয় বিধু-ক্ষিতি-হরি একটু পরেই আসবেন।

তখনকার দিনে প্রথা ছিল, যারা গত চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর এই প্রথম আশ্রমে এসেছে তারা ভোরের বৈতালিকে উপস্থিত হত। আমাদের দলটা 'গুডি গুডি'দের তুলনায় ছিল সংখ্যালঘু। অবশ্য আমরা দম্ভভরে গুরুদেবকেই উদ্ধৃত করে বলতুম, The rose which is single need not envy the thorns which are many. কিন্তু তক্কে তক্কে থাকতুম, দল বাড়াবার জন্য।

হঠাৎ চোখ পড়লো নয়া মালের দিকে। দূর থেকে মনে হল চেহারাটা ভালোই—ভালোমানুষ। জানলা দিয়ে ভিতরের গাঙ্গুলীকে বললুম, 'এসেছে রে'। গাঙ্গুলী এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে গান ধরলে,

'শুনে তোমার মুখের বাণী
আসবে ছুটে বনের প্রাণী—'

অর্থাৎ বিশ্বভারতীর ডাক শুনে বনের প্রাণীরা এসে জুটেছে!

ইনিই হলেন আমাদের নটরাজন।

দুপুরবেলা খাওয়ার পর তাকে গিয়ে শুধালুম, 'টেনিস খেলতে জানো?' বড়ই গাঁইয়া—মাস ছয় পূর্বে আমো ছিলুম, এবং বললে পেত্যয় যাবেন না, এখনো আছি—হকচকিয়ে 'ইয়েস ইয়েস, নো নো, ইয়েস ইয়েস' বললে। 'র‍্যাকেট নেই? কুছ পরোয়া ভী নেই, আমারটা দোব'খন।' এরপর ভাব হবে

না কেন ?

তবে লাভ হল না। কলাভবনের ছাত্র। আমাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় কম। তবে দেখলুম, বাউণ্ডুলে স্বভাব ধরে। তখন তখন স্কেচ বই নিয়ে খোঁয়াইডাঙার ভিতর ডুব মারে। সাঁওতাল গ্রাম থেকে ডিম কিনে এনে গোপনে যে সেদ্ধ করে খাওয়া যায়—আশ্রম তখনো নিরামিষাশী—সেটা ওকে শিখিয়ে দিলুম। সে তো নিত্যি নিত্যি খোঁয়াই পেরিয়ে সাঁওতাল গাঁয়ে যায়—তার পক্ষে ডিম যোগাড় করা সহজ।

কিন্তু ঐ গোবেচারাপারা ছোঁড়াটা পেটে যে কত এলেম ধরে সেটা অন্তত আমার কাছে ধরা পড়লো অল্পদিনের ভিতর। আমাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে অনেকক্ষণ অবধি এদিক থেকে, ওদিক থেকে, এগিয়ে পিছিয়ে পর্যবেক্ষণ করে তুললো দুটি ফোটো। পরে প্রিণ্ট দেখে আমার চক্ষুস্থির। এ যে, বাবা, প্রফেশনালেরও বাড়া! এবং আজ আমি হুহুরের দেবতা বিশ্বকর্মাকে সাক্ষী মেনে বলছি, পরবর্তী যুগে কি বার্লিন কি লণ্ডন কেউই টেকনিকালি আমার এমন পারফেক্ট ছবি তুলতে পারে নি—এবং স্মরণ রাখবেন, নটরাজনের না ছিল কৃত্রিম আলো বা স্টুডিয়ো।

এরপর যা দেখলুম সে আরো অবিশ্বাস্য। নটরাজনের অন্যতম গুরুর প্রথম মেয়ের বিয়ে। কোথায় গয়না গড়ানো যাবে সেই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। স্বল্পভাষী নটরাজন অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ শোনার পর বললে, 'আমাকে মাল-মশলা দিন। আমি করে দিচ্ছি।' সবাই অবাক ; 'তুমি শিখলে কোথায় ?' বললে 'শিখি নি, দেখেছি কি করে বানাতে হয়।' নন্দলাল চিরকালই এ্যাড-ভেঞ্চার-একস্‌পেরিমেণ্টের কলম্বাস। দিলেন হুকুম, 'ঝুলে পড়।'

বিশ্বকর্মাই জানেন স্যাকরার যন্ত্রপাতি কোত্থেকে সে যোগাড় করলো, কি কৌশলে কাজ সমাধা করলো। গয়না দেখে কে কি বলেছিলেন সেটা না বলে শুধু সবিনয় নিবেদন করি, হিন্দু বিয়েতে বরপক্ষ আকছারই সহিষ্ণুতায় যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে পাল্লা দিতে আসেন না—তাঁরা পর্যন্ত পঞ্চমুখে গয়নার প্রশংসা করেছিলেন।

নটরাজনের অন্যান্য গুণ উপস্থিত আর উল্লেখ করছি না। তার পরবর্তী ঘটনা বোঝার জন্য একটি গুণকীর্তন করি। এস্তেক বর্ণপরিচয় স্পর্শ না করে শুধু কান দিয়ে সে শিখেছিল অদ্ভুত সড়গড় চলতি বাঙলা। আমাকে শুধু গোড়ার দিকে একদিন শুধিয়েছিল, 'বাঙলার কি কোনো স্ট্যাণ্ডার্ড উচ্চারণ নেই ? উচ্চারণে উচ্চারণে যে আসমান জমীন ফারাক ? কোন্‌টা শিখি ?'

শান্তিনিকেতনে তখন ছিল নিরঙ্কুশ 'বাঙাল' রাজত্ব। 'পাঁচটা বাঁদরের'

বদলে 'পাস্টা বাদর' হামেশাই ঝোপঝাড় থেকে 'বেরিয়ে পড়ার' বদলে 'বেড়িয়ে পরতো', অবিড়াম ঝড় ঝড় বাড়ি-ধাড়ার মাঝখানে। আমি নটরাজনকে বললুম, 'আর যা কর্ কর্, দোহাই আল্লার, আমার উচ্চারণ নকল করিস্ নি। আমি বাঙালস্য বাঙাল—খাজা বাঙাল। আর করিস নি গুরুদেবের। তাঁর ভাষা, তাঁর উচ্চারণ তাঁর মুখেই শোভা পায়। করবি তো কর্ তোর গুরু নন্দলালের উচ্চারণ। বাঙলায় এম. এ. পাশ ধুরন্ধররাও ওরকম সরল চলতি বাঙলা বলতে পারে না।'

তার পর ঝাড়া বিশটি বছর আমাদের দুজনাতে দেখাসাক্ষাৎ হয় নি, চিঠি-পত্রও না। এই বিশ বৎসরের ভিতর বাঙলা দেশে থাকলে পৌষ মেলায় কখনো-সখনো শান্তিনিকেতন গিয়েছি। ওর সাক্ষাৎ পাই নি। সত্যি বলতে কি, ওর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম। শুধু কেউ কখনো অচলিত গান

জগপতি হে
সংশয় তিমির মাঝে
না হেরি গতি হে—

গাইলে মনে পড়তো নটরাজন ওর সুরটা বড় দরদভরা করুণ সুরে বাঁশীতে বাজাতো।

১৯৪৭ সাল। স্বরাজ যখন পাকা ফলটির মত পড়ি পড়ি করছে ঐ সময়ে আমি একদিন বাঙ্গালোরের এক রেস্তোরাঁয় বসে কফি খাচ্ছি। দেখি, তিনটি প্রাণী ঢুকে এককোণে আসন নিল। একজন চীনা কিংবা জাপানী ছোট্টখাট্টো এক মুঠো মেয়ে, দ্বিতীয়া সুডৌলা তরুণী—খুব সম্ভবত তামিল—এবং সঙ্গে এ কে? নটরাজন! চেহারা রত্তিভর বদলায় নি। শুধু কপালটি আরো চওড়া হয়েছে, চুলে বোধ হয় অতি সামান্য একটু পাক ধরেছে। আমার চেহারা বদলে গেছে আগা-পাশ-তলা কিন্তু আর্টিস্ট নটরাজনকে ফাঁকি দিতে হলে প্লাস্টিক সার্জারি করাতে হয়, এবং চোখ দুটো 'আই-ব্যাঙ্কে' জমা দিতে হয়। নটরাজন আমাকে দেখা মাত্র উঠে এসে আমাকে তার টেবিলে নিয়ে গিয়ে মহিলাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে। তামিলটি লেডি ডাক্তার, বিধবা, প্র্যাকটিস করেন, এবং জাপানীটি তাঁর স্ত্রী। শুধালাম, 'তুমি আবার জাপান গিয়েছিলে না কি?' সেই মুখচোরা নটরাজন মুখ-চোরাই রয়ে গেছে। বললে 'অনেক বছর কাটিয়েছি।'

সেদিন আর বেশী কথাবার্তা হল না। শুধু বললে, শহরের তিন মাইল দূরে

ফাঁকা জায়গায় সেরামিকের ছোটখাটো কারখানা করেছে, বাড়িও। আমাকে শনিবার দিন উইক-এণ্ড করতে সেখানে নিয়ে যাবে। আমার ঠিকানাটা টুকে নিল।

এস্থলে বলে রাখা কর্তব্য বিবেচনা করি, আমি কুমোরের হাঁড়িকুড়ি থেকে আরম্ভ করে সেরামিক, পর্সেলিন, গ্লেজড্ পটারি, ফাইয়াঁস এসবের কিছুই জানি নে। শুধু এইটুকু জানি যে স্টোনওয়েয়ার পাথরের জিনিস নয়—সেটা আমরা যাকে তামচিনি বলি, মেয়েরা যে সব বোয়ামে আচার-টাচার রাখেন। এটা উল্লেখ করার প্রয়োজন হল এই কারণে যে সেই সন্ধ্যায় এক বন্ধুকে নটরাজনের কথা তুলতে তিনি বললেন, 'সেরামিক বাবদে ও যা জানে না, সেটা জানার কোনো প্রয়োজন নেই। বিগেস্ট একস্পার্ট ইন দি ঈস্ট। এখানকার সরকারী সেরামিক ফ্যাক্টরির বড় কর্তা।'

শনির সন্ধ্যায় নটরাজন আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। তার বউ একটি-মাত্র কথা না বলে যা যত্ন-আত্তি করলে সেটা দেখে বুঝলুম কেন চীন-জাপানে প্রবাদ প্রচলিত আছে 'চীনা খাদ্য আর জাপানী স্ত্রী—স্বর্গ-সুখ : চীনা স্ত্রী আর জাপানী খাদ্য—নরক ভোগ।' জাপানী স্ত্রীজাতির মত কর্মঠ, শান্ত, সেবাপরায়ণ রমণী নাকি ইহসংসারে নেই।

আহারাদির পর নটরাজনের স্ত্রী বললেন, 'দুই বন্ধুতে কথাবার্তা বলুন।'

নানা কথা হওয়ার পর আমি বললুম, 'জাপানের কথা কও।'

নটরাজন সে রাত্রে কিছুটা বলেছিল, পরে আরো সবিস্তার।

বললে, 'শান্তিনিকেতন ছাড়ার পর আমার ধারণা হল যে আর্টসের চেয়ে ক্রাফ্‌টসেই আমার হাত খোলে বেশী।'

আমি বললুম, 'সে আর বলতে! সেই যে, গয়না বানিয়েছিলে!'

বললে, 'সে কথা আর তুলো না। হাত ছিল তখন বড্ড কাঁচা। তা সে যাক্। নানা ক্রাফ্‌টস্ শিখলুম অনেক জায়গায়। শেষটায় চোখ পড়লো পর্সেলিনের দিকে। সামান্য কিছুটা শেখার পরই বুঝলুম, এ একটা মারাত্মক ব্যাপার, একটা নূতন জগৎ, এর সাধনায় আস্ত একটা জীবন কেটে যায়। মেলা কেতাবপত্র ঘেঁটে আবিষ্কার করলুম যে, যদিও চীন এই কর্মে একদা সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল, ড্রেস্‌ডেন্‌ও একদা অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল, এখন কিন্তু জাপান এর রাজা।

ঘটি-বাটি বিক্রি করে চলে গেলুম জাপান।

টোকিয়ো পৌঁছনোর কয়েকদিন পরেই দেখি আমার ল্যাণ্ডলেডি চীনামাটি

নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। তার কাছ থেকে খবর পেলুম, পর্সেলিন অর্থাৎ চীনা-মাটির বাসনকোসন, কাপ-সসার বানানো এদেশে কুটিরশিল্পও বটে। সে কি করে হয়! যে মাটি দিয়ে পর্সেলিন তৈরী হয় তার থেকে বালু আর অন্যান্য খাদ সরাবার জন্য ব্যাপক বিস্তৃত ব্যবস্থা করতে হয় অনেকখানি জায়গা নিয়ে—আমি এখানে, বাঙালোরে এসে করেছি, কিন্তু ঠিক ওৎরাচ্ছে না, এখানকার মাটি ভালো নয়—খরচাও বিস্তর। ল্যাণ্ডলেডি বললে, বাজারে রেডিমেড কাদা বিক্রি হয়। আমি ল্যাণ্ডলেডিকে বললুম, সে না হয় হল, কিন্তু পোড়াবে (fire করবে) যে, তার জন্যে কিল্‌ন্ ফারনেস্ (পাঁজা) পাবে কোথায়?'

আমি বাধা দিয়ে নটরাজনকে বললুম, 'আমাদের কুমোররা—'

বললে, 'হায়, হায়! ঐ টেম্পারেচারে মাটির হাঁড়িকুড়ি হয়। গ্লেজড্ পটারির—এ দেশের সব বস্তুই তাই—জন্য আরো টেম্পারেচার তুলতে হয়, আর কমসে কম দু হাজার ফারেনহাইট না হলে—'

আমি বললুম, 'থাক্, থাক্। ওসব আমি বুঝবো না।'

বললে, 'হ্যাঁ সেই ভালো। তার পর খবর নিয়ে ন্যাজেমুড়ো অবধি ওকিবহাল হয়ে গেলুম। নিজের চাই শুধু একটা পটারস হুইল—কুমোরের চাক। বাজার থেকে রেডি-মেড কাদা এনে তাতে চড়িয়ে বানাবে যা খুশী। সেগুলো ভেজা থাকতে থাকতেই তার উপর আঁকবে ছবি—নিজস্ব আপন অনুপ্রেরণায়, এবং একই ছবি দুসরা সেটে আবার নকল করবে না, যে রকম খাস পেণ্টাররা একই ছবি দু'দুবার আঁকেন না। ছবি আঁকা শেষ হয়ে গেলে সেগুলো ঠেলায় করে নিয়ে যাবে কিল্‌ন্‌ওলার কাছে। বহু লোকের কাছ থেকে এক রাশ জমা হলে তবে সে ফায়ার করবে, নইলে খর্চায় পোষায় না। তবে মোটামুটি বলে দেয় কবে এলে তোমার মাল তৈরী পাবে। মাল খালাসীর সময় দেবে তার মজুরী। তার পর তুমি তোমার মাল পর্সেলিনের দোকানে দিয়ে আসতে পারো—তারা বিক্রি করে তাদের কমিশন নেবে—কিংবা তুমি ঠেলা ভাড়া করে তার উপর মাল সাজিয়ে ফেরি করে বেড়াতে পারো।'

আমি বললুম, 'ব্যবস্থাটা উত্তম বলতে হবে। তার পর?'

'জিনিসটা যে এত সরল সহজ করে এনেছে জাপানীরা সেটা আমি জানতুম না। সেইদিনই সব-কিছু যোগাড় করে লেগে গেলুম কাজে। টেকনিকেল দুটো একটা সামান্য জিনিস ল্যাণ্ডলেডির করার ধরন থেকে অনায়াসে শিখে নিলুম। আর এ ব্যাপারে তো এই আমার পয়লা হাতেখড়ি নয়। আর কাপ, পটে আঁকার মত ছবির বিষয়বস্তু নিয়েও আমার কোনো দুর্ভাবনা ছিল না।

মাল যখন সমূচা তৈরী হল, তখন কিছুটা দিলুম দোকানে, আর ঠেলা নিয়ে ফেরি করতে কার না শখ যায় ?

ভারতীয় বলে সর্বত্রই পেলুম অকৃপণ সৌজন্য ও সাহায্য। তুমি জানো কিনা জানি নে, এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এক ভবঘুরে জাপানী না জানি কি করে ভাসতে ভাসতে পৌঁছয় তোমাদের ঢাকা শহরে। ভাবতেই কি রকম মজা লাগে —দুনিয়ার সব জায়গা ছেড়ে ঢাকা। তবে ঐ চিরসবুজের দেশ—আমারও দেখা আছে—তাকে এমনি মুগ্ধ করলো যে, সে সেখানে একটা সাবানের কারখানা খুললো এবং শেষটায় একটি হিন্দু মেয়েকে বিয়েও করলো। বাপ মাকে দেখাবার জন্য একবার নিয়ে গেল তার বউকে জাপানে। 'বুদ্ধের দেশের মেয়ে জাপানে এসেছে' খবরটা দেশময় ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে। সেই অজ পাড়াগাঁ রাতারাতি হয়ে গেল জাপানের তীর্থভূমি। হাজার হাজার নরনারী লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল সেখানে কন্যার দর্শনাভিলাষে। ভাবো, মেয়েটার অবস্থা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকে বসতে হল পদ্মাসনে, আর নতনম্র জাপানীদের লাইন তাকে প্রণাম করে পাদ্যঅর্ঘ দিয়ে নিজেদের ধন্য মনে করলো।'

আমি বললুম, 'মহিলাটি ঢাকায় ফিরে তাঁর জাপান-অভিজ্ঞতা বাঙলায় লেখেন, বড় সবিনয় ভাষায়। আমি পড়েছি। সে তো এলাহি ব্যাপার হয়েছিল।'

'হবে না ? আমার আমলে আমাদের রাসবিহারীবাবু ছিলেন জাপানীদের সাক্ষাৎ দেবতা। ভারতবর্ষ থেকে জাপানে যে কেউ আসুক না কেন—এমন কি ইংরেজও—তার কাগজপত্র যেত ওঁর কাছে। তিনি 'না' বললে পত্রপাঠ আগন্তুকের জাপান ত্যাগ ছিল অনিবার্য। আর গুরুদেবের কাছ থেকে কেউ চিঠি নিয়ে এলে রাসবিহারীবাবু তাকে সমাজের সর্বোচ্চদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেন। বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধের জন্মদিনে তাঁর বাড়ি থেকে প্রসাদ বিতরণ হত —কিউ দাঁড়াতো মাইল দুয়েক লম্বা। সিঙাড়া না আমাদের দেশের কি একটা খাবার—জাপানীদের কাছে রোমান্টিক এবং হোলি।

আমি অবশ্য পারতপক্ষে মাতৃভূমির পরিচয় দিতুম না।

তবু বিক্রি হতে লাগলো প্রচুর। তার কারণ সরল। পাত্রের গায়ে অজানা ডিজাইন, নবীন ছবি—তা সে ভালো হোক আর মন্দই হোক—সকলেরই চিত্ত-চাঞ্চল্য এনে দেয়। তারই ফলে আমি পরমানন্দে দিন কাটাতে লাগলুম। ফেরি-টেরি আর করি নে—নিতান্ত দু'মাসে ছ'মাসে এক আধ দিন—রোমান্সের জন্য। করে করে দু বছর কেটে গেল।

একদিন ঐ ঠেলা গাছের ছায়ায় দাঁড় করিয়ে আমি জিরোচ্ছি, এমন সময় এক থুরথুরে অতিবৃদ্ধ জাপানী খানদানী সামুরাই—অন্তত আমার তাই মনে হল—থমকে দাঁড়ালেন ঠেলার সামনে। কিন্তু এঁর মুখে দেখি তীব্র বিরক্তি। পুরু পরকলার ভিতর দিয়ে ক্ষণে তাকান আমার দিকে, ক্ষণে ঠেলার মালের দিকে। জাপানীরা অসহ্য রকমের অসম্ভব ভদ্র; অসন্তুষ্টি কিছুতেই প্রকাশ করতে চায় না। এঁর কিন্তু ধৈর্যের বাঁধ যেন টুটে গেল। বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, 'এসব কি? এসব কি করেছ? যাও, যাও, ওস্তাদ ওসিমার[১] কাছে। তোমাকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না।' তার পর আমাকে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'এ রকম সুরেলা গলা নিয়ে কি বিশ্রী বেসুরা গান!'

আমি বাড়িতে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লুম। সত্যিই তো, আমি এ দু বছরে নূতন শিখেছি কি? কাদা কি করে তৈরী করতে হয় কিল্‌ন্‌ কি করে জ্বালাতে হয়—অন্য সব বাদ দিচ্ছি—কিছুই তো শিখি নি। দেশে ফিরলে ওগুলো আমায় করে দেবে কে? আর বাসনকোসনের শেপে, ছবিতে নিশ্চয়ই মারাত্মক ত্রুটি আছে, নইলে রাস্তার বুড়ো ওরকম খাপ্পা হল কেন?

চিন্তা করতে করতে মনে পড়লো শান্তিনিকেতন মন্দিরে গুরুদেবের একটা সার্‌মনের কথা। সোনার পাত্রে সত্য লুকানো রয়েছে—সবাই পাত্র দেখে মুগ্ধ, ভিতরে হাত দিয়ে খোঁজে না, সত্য কোথায়। আমার হয়েছে তাই। এখানে কাঁচা পয়সা কামিয়ে আমি অবহেলা করেছি সেরামিকের নিগূঢ় তত্ত্ব।

কিন্তু আর না।

ওস্তাদ ওসিমা সম্বন্ধে খবর নিয়ে কিন্তু বিশেষ ভরসা পেলুম না। তিনি বাস করেন এক অজ পাড়াগাঁয়ে, এবং গত দশ বছর ধরে কোনো শাগরেদ নিতে রাজী হন নি। তবে সবাই একবাক্যে বললেন, ওরকম গুণী এখন তো কেউ নেইই; সেরামিকের ইতিহাসেও কমই জন্মেছেন।

যা হয় হবে কুল-কপালে। সব জিনিসপত্র বিক্রি করে দিয়ে, একফালি বিছানা আর একটি সুটকেস নিয়ে পৌঁছলুম সেই গাঁয়ে, খুঁজে বের করলুম ওস্তাদের বাড়ি।

জাপানী ভাষা কিন্তু আমি বাঙলার মত সুদ্ধু কান দিয়ে শিখি নি। প্রথম দিন থেকে রীতিমত ব্যাকরণ অভিধান নিয়ে—তোমরা যে রকম আশ্রমে শাস্ত্রী

---

১ বর্তমান লেখক ওস্তাদের নাম ভুলে যাওয়াতে অন্যান্য কাল্পনিক নামের সঙ্গে ওসিমার আশ্রয় নিল।

মশায়ের কাছে সংস্কৃত—'

আমি বললুম, 'থাক্, থাক্।'

'ওস্তাদের ঘরে ঢুকে, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাঁকে প্রণাম করে অতিশয় বিনয়, ততোধিক বশ্যতা প্রকাশ করে তাঁর শিষ্য হওয়ার ভিক্ষা চাইলুম।

যেন বোমা ফাটলো ; 'বেরিয়ে যাও এক্ষুনি, বেরোও এখান থেকে।'

আমি ভয়ে ভয়ে এসেছিলুম সত্যি, কিন্তু এরকম পদাঘাত প্রত্যাশা করি নি।

আরম্ভ করলুম কাকুতিমিনতি, সুদূর ইণ্ডিয়া থেকে এসেছি, আমি হত্যে দেব ইত্যাদি। আর শুধু মাটিতে মাথা ঠেকাই।

অনেকক্ষণ পর তিনি অতিশয় শান্ত সংযত কণ্ঠে বললেন, "আমি কি করি না করি সে-কথা কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন বোধ করি নে। তবু তোমাকে বলছি—বিদেশী বলে। আমার কাছে লোক এসে দু'চার মাস তালিম নিয়ে পালিয়ে গিয়ে রটায় তারা আমার শিষ্য। কিছুই তারা শেখে নি—আর আমার নাম ভাঙিয়ে খায়। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি আর কোনো শিষ্য নেব না"।'

আমি বললুম, 'নটরাজন, বরোদার ওস্তাদ গাওয়াইয়া ফইয়াজ খানও হুবহু ঠিক একই কারণে তাঁর জীবনের শেষের দিকে আর কোনো চেলা নিতেন না।'

নটরাজন বললে, 'ওঁদের দোষ দিই নে, কিন্তু আমার দিকটাও তো দেখতে হবে। আমি আমার ওস্তাদকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলুম, আমি ওরকম কোনো কুমতলব নিয়ে আসি নি। তিনি অটল অচল, নির্বাক।

কি আর করি! বারান্দায় গিয়ে বসে রইলুম বিছানাটার উপর দেয়ালে হেলান দিয়ে—আমি না-ছোড়-বান্দা, জীবনমরণ আমার পণ।

ঘণ্টাখানেক পর ওস্তাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় চলে গেলেন—আমাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি এক লম্ফে ঘরের ভিতর ঢুকে তাঁর চাকরকে খুঁজে বের করে বললুম, "দাদা, এখন তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। তুমি আমায় সাহায্য করো।" সে আগেই গুরুর সঙ্গে আমার বাক্যালাপ শুনেছিল। তাকে বখশিশের লোভও দেখালুম। তার অনুমতি নিয়ে ওস্তাদের সব ক'খানা ঘরে লাগালুম ঝাঁট, ঝাড়াই-পোছাই, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তন্ন তন্ন করে। গামলার জল পাল্টালুম, রঙতুলি গুছিয়ে রাখলুম, জামা-কিমোনো ভাঁজ করলুম, বিছানা দুরুস্ত করলুম। তারপর ফের বারান্দায়, বিছানার উপর। ওস্তাদ ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে দরজার সামনে এক লহমার তরে একটু থমকে দাঁড়ালেন। কিন্তু নির্বাক। এবার চাকরকে চায়ের হুকুম দিলেন।

আমি আড়াল থেকে লক্ষ্য করলুম। ঘণ্টাখানেক পরে খেয়ে শুতে গেলেন। আমি গাঁয়ের যে একটি মাত্র খাবারের দোকান ছিল সেখানে শুঁটকি-ভাত খেয়ে এলুম। ওস্তাদ ঘুম থেকে উঠে চায়ের জন্য হাঁক দিতেই আমি রান্নাঘর থেকে চায়ের সরঞ্জাম এনে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে চা তৈরী করে কাপ এগিয়ে দিলুম। তিনি তখন আমার দিকে পিছন ফিরিয়ে ভেজা পাত্রে ছবি আঁকছিলেন। পেয়ালা হাতে নিয়েই ঘাড় ফিরিয়ে একবার ভ্রূকুটি-কুটিল নয়নে আমার দিকে তাকালেন। কিন্তু নির্বাক। এরপর আমি রঙ গুলে দিতে লাগলুম। যাই বলো, যাই কও—আমিও আর্টিস্ট। কখন কোন্ রঙের দরকার হবে আগের থেকেই বুঝতে পারি। তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় না। তিনি নির্বাক।

সে রাত্রে আমি বারান্দাতেই ঘুমিয়েছিলুম। কিন্তু ঐ এক রাত্রিই।

ভোর থেকেই লেগে গেলুম চাকরের কাজে। তার পরের দিন। ফের পরের দিন। চাকরটা এখন আর তাঁর ঘরেই ঢোকে না। তিনি নির্বাক।

আমি দু বেলা হোটেলে গিয়ে শুঁটকি-ভাত খাই, আর রাত্রে চাকরের পাশে শুই।

বিশ্বাস করবে না, এই করে করে প্রায় একমাস গেল। তিনি নির্বাক।

মাসখানেক পরে একরাত্রে আমি আমার ইচ্ছা আর কিছুতেই দমন করতে পারলুম না। যা দেখেছি সেইটে কাজে লাগাবার অদম্য কামনা আমার ঘুম তাড়িয়ে দিয়েছে। অতি চুপিসাড়ে ওস্তাদের পটার্স হুইলের পাশে বসে একটা জাম-বাটি তৈরি করতে লাগলুম তন্ময় হয়ে। হঠাৎ পিঠের উপর একটা বিরাশি সিক্কার কিল আর হুঙ্কার।

"কোন্ গর্দভ তোমাকে শিখিয়েছে ওরকম ধারা বাটি ধরতে? কোন্ মর্কট তোমাকে শিখিয়েছে ওরকম আঙুল চালাতে? প্রত্যেকটি জিনিস ভুল। যেন ইচ্ছে করে যেখানে যে ভুলটি করার সেটা মেহন্নত করে করে শিখেছ। হটো ইহাঁসে!"

গুরু প্রথম নিজে করলেন। কী বলবো ভাই, তাঁর দশটি আঙুল যেন দশটি নর্তকী। প্রত্যেকটির ফাংশন যেন ভিন্ন ভিন্ন, নাচে আপন আপন নাচ। তারপর আমাকে বসিয়ে আমার হাতে হাত ধরে শুরু করলেন গোড়ার থেকে। আর শুধু বলেন, "হা আমার অদৃষ্ট, এসব গলদ মেরামত করতে করতেই তো লেগে যাবে পাঁচটি বচ্ছর!"

এই আমার প্রথম পাঠ। ভোর অবধি চলেছিল।

সকালবেলা চা খেতে খেতে শান্ত কণ্ঠে বললেন, "ভুল প্র্যাকটিস যে কী

মারাত্মক হতে পারে তার কল্পনাও তোমার নেই। তোমার ঘর ঝাঁট দেওয়া, রঙ গোলা থেকে আমি অনুমান করেছিলুম তোমার হাত আছে, কিন্তু অসম্ভব খারাপ রেওয়াজ করে করে তার যে সর্বনাশ করে বসে আছো সেটা জানলে প্রথম দিনই পুলিস ডেকে তোমাকে তাড়িয়ে দিতুম। এখন দেখি, কি করা যায়। এও আমার এক নতুন শিক্ষা! তোমাকে নেব দুই শর্তে। প্রথম, আমি অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার কাজ জনসাধারণকে দেখাতে পারবে না। দ্বিতীয়, আমি অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তুমি শিক্ষা ক্ষান্ত দিয়ে পালাতে পারবে না।"

আমি বুদ্ধের নামে শপথ করলুম।

তারপর, ভাই, আরম্ভ হল আমার পিঠের উপর র‍্যাঁদা চালানো। একই কাজ একশ' বার করিয়েও তিনি তৃপ্ত হন না—আর মোস্ট্ এলিমেণ্টারি টাস্ক্। সঙ্গীতের উপমা দিয়ে বলতে পারি, এ যেন স্রেফ 'সা রে গা মা পা ধা নি সা, সা নি ধা পা মা গা রে সা। সা রে গা মা পা ধা নি—'

আমি বললুম, 'বোমা পড়ে জাপানী!'

নটরাজন অবাক হয়ে বললে, 'সে আবার কি?' আমি বললুম, 'সিলেটে গত যুদ্ধে প্রথম জাপানী বোমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য কবি রচেন,

সা রে গা মা পা ধা নি
বোমা পড়ে জাপানী
বোমার মধ্যে কালো সাপ
বিটিশে কয় বাপ রে বাপ!'

নটরাজন বললে, 'আমার অবস্থা তখন ব্রিটিশের চেয়েও খারাপ। তারা তো পালিয়ে বেঁচেছিল, আমার যে পালাবারও উপায় নেই। তবে গুরু এখন বাঙ্ময়। চা খেতে খেতে, বেড়াতে যেতে যেতে ফাইয়াঁস-পর্সেলিনের গুহ্যতম তত্ত্ব বোঝাতেন, কিন্তু রেওয়াজের বেলা সেই প্রাণঘাতী সা রে গা মা।

পাক্কা দেড়টি বছর পরে পেলুম দ্বিতীয় পাঠ!

ইতিমধ্যে দেখি, এ-দেশের ব্যাপারটাই আলাদা! অনেক দিন একটানা পাত্র গড়ে তার উপর ছবি এঁকে যখন এক ডাঁই তৈরী হল তখন গুরু কিল্‌নে সেগুলো ঢুকিয়ে করলেন 'ফায়ারিং'। ইতিমধ্যে পটারির সমঝদারদের কাছে নিমন্ত্রণ গেছে, অমুক দিন অমুকটার সময় তাঁর পটারির প্রদর্শনী। ঢাউস ঢাউস মোটর চড়ে, গ্রাম্যপথ সচকিত করে এলেন লক্ষপতিরা। তাঁরা চা খেলেন। সার্ভ করলুম। সবাই ভাবলেন আমি বিদেশী চাকর। একজন একটু কৌতূহল

দেখিয়েছিলেন, গুরু সেটা অঙ্কুরেই বিনাশ করলেন। তার পর ওঁদের সামনেই কিল্‌ন্‌ থেকে পটারি বের করা হল। পাঁচ শ থেকে আরম্ভ করে, এক এক সেট্‌ দু'হাজার তিন হাজার টাকায় সব—সব বিক্রি হয়ে গেল। দেশে, বিলেতে মানুষ যে রকম ছবি, মূর্তি কিনে নিয়ে আপন কলেক্‌শন বানায়।

তার পর আস্তে আস্তে অনুমতি পেলুম পাত্রের গায়ে ছবি আঁকবার। পুরো এক বছর ধরে পাত্র গড়ি, ছবি আঁকি কিন্তু কিল্‌নে ঢোকবার অনুমতি পাই নে। ভেঙে ফেলতে হয় সব। সে কী গর্ব্বযন্ত্রণা!

এমন সময় এল গুরুর আরেকটা প্রদর্শনী। আমি গোপনে গুরুর ভাঁইয়ের সঙ্গে আমার একটা কাপ এক কোণে রেখে দিলুম। ডিজাইন দিয়েছিলুম পার্শিয়ান। আমাদের দেশে তো সেরামিকের ঐতিহ্য নেই, আর পার্শিয়ান ডিজাইন জাপানে প্রায় অজানা।

চায়ের পর কিল্‌ন্‌ খোলার সময় প্রায় একই সময়ে সকলের দৃষ্টি পড়ে গেল আমার কাপটার উপর। আমি আশা করেছিলুম ওটা আমি গোপনে সরিয়ে নিতে পারবো। আমি তখন ছোঁ মেরে সেটা সরিয়ে করলুম পলায়ন। ওঁদের ভিতর তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে আমার কাপ নিয়ে নীলাম। গুরু বসবার ঘরে এসে আমাকে ডাকলেন। আমি এসে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে তাঁর পায়ের কাছে কাপটি রাখলুম। তখন তাঁরা বুঝলেন, এটা কার কাজ। গুরু স্মিত হাস্যে ওঁদের সবকিছু বয়ান করে বললেন, "শিগগিরই ওর আপন প্রদর্শনী হবে। আপনারা কে কি চান অর্ডার দিয়ে যান।"

ওরা চলে গেলে আমি সব বুঝিয়ে গুরুর কাছে মাফ চাইলুম। তিনি প্রসন্ন বদনে বললেন, "দু-চার মাসের ভিতর এমনিতেই হ'ত। তোমাকে কিছু বলি নি।"

আমি কাজে লেগে গেলুম। গুরু আপন কাজ বন্ধ করে দিয়ে পই পই করে তদারকি করলেন আমার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ বা অঙ্গুলিচালনা।

নিমন্ত্রণ-পত্র বেরুলো তাঁর নামে। আমার প্রথম প্রদর্শনী। গুরু বললেন, "তোমার একটা ফটো ছেপে দাও চিঠিতে।"

নটরাজন বললে, 'দাঁড়াও, সে চিঠির একটা কপি বোধহয় বউয়ের কাছে আছে।' তাঁকে স্মরণ করা হলে তিনি নিয়ে এলেন একটা এ্যালবাম্‌। তাতে মেলা প্রেস-কাটিংস। নটরাজনের প্রদর্শনীর রিভিউ। নিমন্ত্রণপত্রে তাজ্জব হয়ে দেখি ফটোতে নটরাজনের মাথায় খাস পাঠান পাগড়ি! আমি বললুম, 'এ কি?' বললে, 'ভাই, জাপানীরা ঐ পাগড়িটাই চেনে। ওঠা হলেই ইণ্ডিয়ান!'

আমি শুধালুম, 'তারপর!'

'প্রদর্শনী হল। গুরু ময়ূরটার মত প্যাখম তুলে ঘোরাঘুরি করলেন। বেবাক্ মাল বিক্রি হয়ে গেল। কাঁড়া কাঁড়া টাকা পেলুম। কাগজে কাগজে রিভিউ বেরুলো।'

নটরাজনের স্ত্রী বললেন, 'তিনি জাপানের অন্যতম সেরা আর্টিস্ট বলে স্বীকৃত হলেন।'

নটরাজন বললে, 'সে সব পরে হবে। আমার মস্তকে কিন্তু সাতদিন পরে সাক্ষাৎ বজ্রাঘাত। চাঁদের আলোতে ঝরনাতলায় চুকচুক করে সাকে খেতে খেতে গুরু বললেন, "এইবারে বৎস, তোমার ছুটি। টোকিওতে গিয়ে আপন পসরা মেলো।"

আমি আর্তকণ্ঠে বললুম, "গুরুদেব, আমার যে কিছুই শেখা হয় নি।"

গুরু বললেন, "বৎস, শেখার তো শেষ নেই। কিন্তু গুরুর কাছ থেকে তালিম নেবার একটা শেষ থাকে। তোমাদের ইস্কুল-কলেজেও তো শেষ উপাধি দিয়ে বিদায় দেয়। তখন কি আর গুরু শোনে তোমার মিনতি যে, তোমার কিছুই শেখা হয় নি? আমি যে সব হুনর্ পুরুষানুক্রমে পেয়েছি তার প্রত্যেকটি তোমাকে শিখিয়েছি। এবারে আরম্ভ করো সাধনা।"

আমার সব অনুনয়-বিনয় ব্যর্থ হল। বললেন, "মাঝে মাঝে এসো; তোমার কাজ দেখে আলোচনা করবো। নির্দেশ দেবো না, আলোচনা করবো।"

আমি পরের দিন আমার সঞ্চয়ের সব অর্থ গুরুর পদপ্রান্তে রাখলুম—গুরুদক্ষিণা। তিনি একটি কড়িও স্পর্শ করলেন না। অনেক চেষ্টা দিলুম। আবার তিনি নির্বাক! সেই প্রথম দিনের মত।'

বেশ খানিকক্ষণ কি যেন একটা ভেবে নিয়ে নটরাজন বললে, 'এর সঙ্গে কিন্তু একটা সাইড-ড্রামাও আছে।'

'সেটা কি?'

মুচকি হেসে বললে, 'তাঁর কন্যার—'

মিসেস উঠে বললেন, 'আমি চললুম।' তিনি সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া।

নটরাজন বললে, 'তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণের অনুমতি চাইলুম।'

আমি বললুম, 'সে কি! এর তো কিছু বলো নি!'

'বললুম তো, সে অন্য নাট্য। আরেক দিন বলবো।'

'গুরু কি বললেন?'

'দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। বললেন "আমার দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না যে আমার গুণী মেয়ে কোনো আনাড়ির হাতে পড়ে, যে সেরামিকের রস জানে না। তোমরা দুজনাতে আমার ঘরানা বাঁচিয়ে রাখবে, সমৃদ্ধ করবে।" আমার স্ত্রী সত্যি ভালো কাজ করতে পারে।'

* * *

পরের দিন শুধালুম, 'দেশে ফিরে কি করলে ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'আমি জানতুম এদেশে অলঙ্ঘ্য বাধাবিঘ্ন। কাদা-কিল্‌নের কথা বাদ দাও, আমার হ্যাণ্ডপেণ্টেড অরিজিনাল জিনিস পাঁচশ' হাজার টাকা দিয়ে কিনবে কে ? এদেশে তো এসব কেউ জানে না,—ভাববে আমি পাগল, একটা টী-সেটের জন্য পাঁচশ' টাকা চাইছি। এদেশে জাপানী ক্রকারি আসে মেশিনে তৈরী মাস্‌-প্রোডাকশন্‌। আমার তো প্রতি মাসে অন্তত সাতশ, হাজার টাকা চাই। জাপানে প্রতি মাসে পাঁচ-সাত হাজারও কামিয়েছি।'

আমি বললুম, 'এ কী ট্রাজেডি ! যা শিখলে তার সাধনা করতে পেলে না ?'

হেসে বললে, 'আমি কি পয়লা না শেষ ? বিদেশ থেকে উত্তম সায়ান্স শিখে এসে কত পণ্ডিত উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবে এদেশে শুকিয়ে মরে ! আর যারা ছবি আঁকে ? তাদেরই বা ক'জনের অন্ন জোটে ? তাই একটা চাকরি নিয়েছি—দেখি, অবসর সময়ে যদি কিছু—'

আমি উৎসাহের সঙ্গে বললুম, 'তোমার চাকরিটা তো ভালো। তোমাদের সেরামিক ফ্যাক্টরি শুনেছি, ভারতের সর্বোত্তম। সবচেয়ে বেশী টেম্পারেচর তুলতে পারো তোমাদের কিল্‌নে।'

অট্টহাস্য করে নটরাজন বললে, 'ইন্‌সুলেটার ! ইন্‌সুলেটার ! লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ! টেলিগ্রাফের খুঁটির মাথায় সাদা মুণ্ডুটা দেখেছ ? আমরা বানাই সেই মাল। অষ্টপ্রহর তাই বানিয়েও বাজারের খাঁই মেটাতে পারি নে। কোম্পানির ওতেই লাভ, ওতেই মুনাফা। আর দয়া করে ভুলো না, হরেক রকম ইন্‌সুলেটর সেরামিক পর্যায়েই পড়ে ! হা-হা হা-হা, যেমন দেয়ালে যে রঙ লাগায় সেও পেণ্টার, অবন ঠাকুরও পেণ্টার !'

ইন্‌সুলেটার হে, ইন্‌সুলেটার !!

বুড়ো-বুড়ী

'চিঠি নাকি, বাবাজী আজান ?'

'বিলক্ষণ, মসিয়ো···প্যারিস থেকে এসেছে।'

চিঠিখানি যে খুদ প্যারিস থেকে এসেছে তাই নিয়ে সাদা-দিল্ বাবাজী আজানের চিত্তে রীতিমত দেমাক।···কিন্তু আমার না। কে যেন আমায় বলে দিচ্ছিল, এই যে জ্যাঁ জাক্ রুসো সরণীর প্যারসিনী বলা নেই কওয়া নেই, সাত সকালে হঠাৎ আমার টেবিলের উপর এসে অবতীর্ণ হলেন, ইনি আমার পুরো দিনটারই সর্বনাশ করবেন। ঠিক। ভুল করি নি : বিশ্বেস না হয় দেখুন :

'আমার একটু উপকার করতে হবে, দোস্ত। তোকে এক দিনের তরে তোর ময়দা-কল বন্ধ করে সঙ্গে সঙ্গে এইগুইয়ের যেতে হবে···এইগুইয়ের বড় গণ্ডগ্রাম, তোর ওখান থেকে পাঁচ ছ কোশ—কিচ্ছু না, বেড়াতে বেড়াতে পৌঁছে যাবি। পৌঁছে অনাথাশ্রমের খোঁজ নিবি। আশ্রমের ঠিক পরের বাড়িটা একটু নিচু, জানলা-খড়খড়ি ছাই-রঙা, বাড়ির পিছনভাগে একটুখানি বাগান। কড়া না নেড়েই ঢুকে পড়বি,—দরজা হামেহাল খোলা থাকে—আর ঘরে ঢুকেই আচ্ছা জোরসে চেঁচিয়ে বলবি, "সজ্জনদের পেন্নাম জানাই! আমি মরিসের বন্ধু···" তখন দেখতে পাবি এক মুঠো সাইজের ছোট্ট একজোড়া বুড়ো-বুড়ী, ওঃ! সে কী বুড়ো! বুড়ো, তার চেয়েও বুড়ো, আদ্যিকালের বুড়ো-বুড়ী তাঁদের বিরাট আরাম কেদারার গর্ত থেকে তোর দিকে হাত তুলে ধরবেন, আর তুই তখন তাঁদের আমার হয়ে আলিঙ্গন করবি, চুমো খাবি, তোর সর্ব হৃদয় দিয়ে, যেন ওঁরা তোরই। তার পর সবাই মিলে গাল-গল্প আরম্ভ হবে ; ওঁনরা সুদ্দু আমার সম্বন্ধেই কথা কইবেন, আর কিচ্ছুটি না, সুদ্দু আমার কথা ; হাজার হাজার আবোল-তাবোল বকে যাবেন, তুই কিন্তু হাসবি নি···হাসবি নি কিন্তু, বুঝেছিস ?···এঁরা আমার ঠাকুদ্দা, ঠাকুমা, ওঁদের আগাপাস্তলা প্রাণ একমাত্র আমি—এবং আমাকে দশ বছর হল দেখেন নি···দশ বছর—দীর্ঘকাল! কিন্তু করি কি বল্! আমি—প্যারিস আমাকে জাবড়ে ধরে আছে ; ওঁদের ? ওঁদের আটকে রেখেছে বুড়ো বয়স··· এঁদের যা বয়স, আমাকে দেখবার জন্য রওয়ানা হলে পথিমধ্যে চালানী মালের মত টুকরো টুকরো হয়ে যাবেন···কিন্তু আমার কপাল ভালো, তুই তো ভাই, হোথায় আছিস, বেরাদর আমার, ময়দাকলের মালিক[১]—তোকে আদর-প্যার করে

---

১ আসলে দোদে নির্জনে বাস করার জন্য একটি অতিবৃদ্ধ পরিত্যক্ত মিল ভাড়া করেছিলেন, প্রায় বিনামূল্যে।

বেচারী বুড়ো-বুড়ীরা আনন্দ পাবে, যেন আমারই এ্যাট্টুখানিকে চুমো-চামা খাচ্ছে…আমি অনেক বার আমাদের কথা ওঁদের বলেছি, এবং আমাদের গভীর বন্ধুত্ব সম্বন্ধেও, যেটি কি না……'

জাহান্নামে যাক বন্ধুত্ব! ঠিক আজকের সকালটাতেই আবহাওয়াটি হয়েছে চমৎকার, কিন্তু বাউণ্ডুলের মত যত্র-তত্র চর্কিবাজি খাওয়ার মত আদপেই নয়। একে তো বইছে জোর হাওয়া, তদুপরি রৌদ্রটিও চড়চড়ে কড়া—প্রভাঁস অঞ্চলের খাঁটি দিন যাকে বলে। আমি ঠিক করে বসেছিলুম, দুটি পাহাড়ের টিপির মধ্যিখানে শুয়ে শুয়ে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দেব হুবহু একটি গিরগিটির মত, সূর্যালোক পান করতে করতে আর পাইন গাছের মর্মর গান শুনতে শুনতে—এমন সময় এল ঐ লক্ষ্মীছাড়া চিঠিটা…কিন্তু করা যায় কি কও? মিল্‌টা বন্ধ করলুম অভিসম্পাত দিতে দিতে, চাবিটা রেখে দিলুম বেরালটার আসা-যাওয়ার ছোট্ট গর্তটার ভিতর। লাঠিটা, পাইপটি—ব্যস্, নাবলুম রাস্তায়।

বেলা প্রায় দু'টোর সময় পৌঁছলুম এইগুইয়েরে। গাঁটা খাঁ খাঁ করছে, সবাই খেত-খামারে। ধুলোয় ঢাকা এল্‌ম্ গাছে ঝিল্লি ঝিঁঝিঁ করছে যেন নির্জন খোলামাঠের মধ্যিখানে। অবিশ্যি সরকারী বাড়িটার সামনের চত্বরে একটা গাধা রোদ পোয়াচ্ছিল বটে, আর গির্জের সামনের ফোয়ারায় একপাল পায়রাও ছিল, কিন্তু অনাথাশ্রমটি দেখিয়ে দেবার মত কেউই ছিল না। কিন্তু কপাল ভালো, হঠাৎ আমার সামনে যেন পরীর মত আত্মপ্রকাশ করলে এক বুড়ী। ঘরের সামনের এক কোণে উপু হয়ে বসে চরকা কাটছিল। শুধালুম তাকে। আর পরীটিরও ছিল দৈবীশক্তি। কড়ে আঙ্গুলটি তুলে দেখাতে না-দেখাতে তৎক্ষণাৎ চোখের সামনে যেন মন্ত্রবলে আমারই সামনে দাঁড়িয়ে উঠলো অনাথাশ্রমটি!…বিরাট, ভারিক্কি, কালো কুঠিবাড়ি। বেশ দেমাকের সঙ্গে তার দেউড়ির উপরের পাঁশুটে লাল রঙের প্রাচীন দিনের ক্রুশ—চতুর্দিকে আবার দু'ছত্তর লাতিনও দেখিয়ে দিচ্ছে! ঐ বাড়িটার পাশেই দেখতে পেলুম আরেকটি ছোট্ট বাড়ি। ছাইরঙের খড়খড়ি, পিছনে ছোট্ট বাগানটি…তদ্দণ্ডেই চিনে গেলুম, কড়া না নেড়েই ঢুকে পড়লুম।

আমার বাকী জীবন ধরে আমি সেই দীর্ঘ করিডরটি দেখব; মন্দ-মধুর ঠাণ্ডা, শান্ত-প্রশান্ত, দেয়ালগুলো গোলাপী রঙের, খড়খড়ির ভিতর দিয়ে দেখি বাগানটি যেন স্বচ্ছ রৌদ্রালোকে অল্প অল্প কাঁপছে, আর শার্সিগুলোর উপর ফুলপাতায় জড়ানো বেহালার ছবি আঁকা। আমার মনে হল আমি সেদেন্ যুগের প্রাচীন সম্ভ্রান্ত দরবারখানায় পৌঁছে গিয়েছি।…করিডরের শেষপ্রান্তে, ডানদিকে, আধ-

ভেজানো দরজার ভিতর দিয়ে আসছে দেয়াল-ঘড়ির টিক্-টাক্ শব্দ, আর একটি শিশু—ইস্কুলের বাচ্চার গলার শব্দে—প্রতি শব্দে থেমে থেমে পড়ছে : ত—খন··· সেণ্ট···ইরেনে[২]···চিৎকা···র···করে···বললেন···আমি···প্রভুর···যেন···গম··· শস্য···আমাকে···ময়দা···হতে···হয়ে···ঐ···সব···পশুদের···দাঁতের···পিষণে···। আমি ধীরে ধীরে মৃদু পদে সেই দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে ভিতরের দিকে তাকালুম।

শান্ত, অর্ধ দিবালোকে, ছোট্ট একটি কামরার ভিতর, গভীর একটা আরাম-কেদারার ভিতর ঘুমুচ্ছেন এক অতি বৃদ্ধ। গোলাপী ছোট্ট দুটি গাল, আঙুলের ডগা অবধি সর্ব শরীরের চামড়া কোঁচকানো, মুখ খোলা, হাত দুটি দু' জানুর উপর পাতা। তাঁর পায়ের কাছে নীল পোশাক পরা ছোট্ট একটি মেয়ে—মাথায় নান্‌দের মত টুপি, অনাথাশ্রমের মেয়েদের পোশাক পরা—সাধ্বী ইরেনের জীবনী পড়ছে—বইখানা আকারে তার চাইতেও বড়। এই অলৌকিক পুরাণ পাঠ যেন সমস্ত বাড়িটার উপর ক্রিয়া চালিয়েছে। বৃদ্ধ ঘুমুচ্ছেন তাঁর আরাম-কেদারায়, মাছিগুলো ছাতে, ক্যানারি পাখিগুলো এই হোথায় জানলার উপরে তাদের খাঁচায়। প্রকাণ্ড দেয়াল-ঘড়িটা নাক ডাকাচ্ছে—টিক্, টাক্, টিক্, টাক্। সমস্ত ঘরটাতে কেউই জেগে নেই—সুদ্দু মাত্র খড়খড়ির ভিতর যে একফালি সাদা, সোজা আলো এসে পড়েছে তার ভিতর ভর্তি জীবন্ত রশ্মি-কণা—তারা নাচছে তাদের পরমাণু নৃত্যের চক্রাকারের ওয়াল্‌ট্‌স্···এই ঘরজোড়া তন্দ্রালসের মাঝখানে সেই মেয়েটি গম্ভীর কণ্ঠে পড়ে যাচ্ছে : সঙ্গে···সঙ্গে···দুটো···সিংহ···লাফ···দিয়ে···পড়ল···তাঁর···উপর··· এবং···তাঁকে···উদর···সাৎ···করে···ফেলল···ঠিক ঐ মুহূর্তেই আমি ঘরে ঢুকলুম। স্বয়ং সেণ্ট ইরেনের সিংহ দুটোও ঐ সময়ে সে-ঘরে ঢুকলে এতখানি বিহ্বলতার স্তম্ভন সৃষ্টি করতে পারতো না। সে-যেন রীতিমত নাটকীয় আচমকা আবির্ভাব! বাচ্চাটা ডুকরে উঠলো, বিরাট কেতাবখানা পড়ে গেল, ক্যানারি পাখিগুলো জেগে উঠলো, দেয়াল-ঘড়িটা ঢং ঢং করে উঠলো, বুড়ো প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন—একেবারে হকচকিয়ে গেছেন—আর আমিও কেমন যেন বোকা বনে গিয়ে চৌকাঠে থমকে গিয়ে বেশ একটু জোর গলায় বলে উঠলুম :

'সুপ্রভাত, সজ্জনগণ! আমি মরিসের বন্ধু!'

---

২ কেউ যদি পান, আমাকে দয়া করে জানাবেন কি? আগের থেকেই ধন্যবাদ দিচ্ছি।

আহা! আপনারা যদি তখন তাঁকে দেখতে পেতেন—যদি দেখতে পেতেন, বেচারী বুড়োকে দেখতে পেতেন! দুই বাহু প্রসারিত করে আমাকে আলিঙ্গন করতে, আমার হাত দুখানা ধরে ঝাঁকুনি দিতে এগিয়ে এলেন, আর ঘরময় উত্তেজিত হয়ে ছুটোছুটি লাগিয়ে শুধু বলেন,

'হে দয়াময়, হে দয়াময়!'...

তাঁর মুখের সব কোঁচকানো চামড়া হাসিতে ভরে উঠেছে। আর তোতলাচ্ছেন,

'আ মসিয়ো,...আ মসিয়ো...'

তার পর কামরার শেষ প্রান্তে ডাক দিতে দিতে গেলেন:

'মামেৎ!'

একটা দরজা খুলে গেল। করিডরে যেন একটা ইঁদুরের পায়ের শব্দ শোনা গেল...ঐ যে মামেৎ! ঐ এক ফোঁটা বুড়ী—কী যে সুন্দর দেখাচ্ছিল—মাথায় গিঁট বাঁধানো বনেট্, পরনে কারমেলিট নান্‌দের ফিকে বাদামী রঙের পোশাক, হাতে নক্‌শা-কাটা রুমাল—আমাকে সেই প্রাচীন দিনের কায়দায় অভিনন্দন জানাবার জন্যে...ওঁদের দেখলেই কিন্তু বুকটা দরদে ভরে আসে, দুজনারই চেহারা একই রকমের! বুড়োর মাথার চুল বদলে দিয়ে বুড়ীর বনেট্ তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলে তাঁকেও মামেৎ নাম দেওয়া যেত!...শুধু সত্যিকার মামেৎকে নিশ্চয়ই তাঁর জীবনে চোখের জল ফেলতে হয়েছে অনেক বেশী, আর তাঁর সর্বাঙ্গের চামড়া কুঁকড়ে গিয়েছে আরো বেশী। বুড়োর মত ওঁরও সঙ্গে অনাথাশ্রমের একটি ছোট্ট মেয়ে, পরনে অন্য মেয়েটার মতই পোশাক, বুড়ীর সঙ্গে সর্বক্ষণ থাকে, কক্‌খনো তাঁর সঙ্গ ছাড়ে না—অনাথাশ্রমে আশ্রয়প্রাপ্ত দুটি বাচ্চা মেয়ে এই দুই বুড়ো-বুড়ীকে যেন আশ্রয় দিয়ে রক্ষণ করছে—এর চেয়ে হৃদয়স্পর্শী যেন আর কিছুই কল্পনা করা যায় না।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বুড়ী আমাকে গভীর সম্মান-অভিবাদন জানাতে আরম্ভ করছিলেন, কিন্তু বুড়ো একটি শব্দ দিয়েই তাঁর সসম্মান-অভিবাদন কেটে দু'-টুকরো করে ফেললেন:

'এ তো মরিসের বন্ধু...'

সঙ্গে সঙ্গে বুড়ী কাঁপতে লাগলেন, কেঁদে ফেললেন, রুমালখানা হারিয়ে ফেললেন, মুখ রাঙা হয়ে গেল, টকটকে লাল, বুড়োর চেয়েও বেশী লাল...হায়, বুড়ো-বুড়ী! এঁদের সর্ব শিরায় আছে মাত্র একটি ফোঁটা রক্ত, আর সামান্যতম অনুভূতির পরশ লাগলেই সেই ফোঁটাটি মুখে এসে পৌঁছে যায়।

'শিগ্‌গির, শিগ্‌গির—চেয়ার নিয়ে এস'…বুড়ী তাঁর বাচ্চাটিকে বললেন।

'জানলাটা খুলে দাও'—বুড়ো তাঁর বাচ্চাটিকে হুকুম দিলেন।

তার পর দু'জনাতে আমার দু' বাহু ধরে খুট খুট করে হেঁটে নিয়ে চললেন জানলার কাছে। সেটা পুরো খুলে দেওয়া হয়েছে যাতে করে ওঁরা আমাকে আরো ভালো করে দেখতে পান। আমরা এগিয়ে গেলুম আরাম-কেদারার কাছে। আমি বসলুম তাঁদের দুজনার মাঝখানে চেয়ারে। মেয়ে দুটি আমাদের পিছনে। তার পর আরম্ভ হল সওয়াল :

'কি রকম আছে সে? কি করে সে? এখানে আসে না কেন? সুখে আছে তো? ·'

এটা, ওটা, সেটা—কত শত কথা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

আর আমি? তাঁরা আমার বন্ধুবাবদে যে সব প্রশ্ন শুধোচ্ছিলেন সেগুলোর উত্তর আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সাধ্যমত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তো দিলুমই—যেগুলো জানা ছিল; আর যেগুলো জানা ছিল না সেগুলো নির্লজ্জভাবে বানিয়ে বানিয়ে। আর বিশেষভাবে অবশ্যই কিছুতেই স্বীকার করলুম না যে তার ঘরের জানলাগুলো ঠিকমত বন্ধ হয় কি না সেটা যে আমি লক্ষ্য করি নি, কিংবা তার ঘরের দেয়ালের কাগজগুলো কোন্ রঙের!

'তার ঘরের দেয়ালের কাগজগুলো কোন্ রঙের?…নীল রঙের ঠাকুমা, হাল্কা নীল—আসমানী রঙের—ফুলের মালার ছবি আঁকা।…'

'—তাই না?' বুড়ী একবারে গদ্‌গদ। তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সোনার চাঁদ ছেলেটি!'

বুড়ো সোৎসাহে যোগ দিলেন, 'সোনার চাঁদ ছেলে।'

আর আমি যতক্ষণ কথা বলছিলুম, তাঁরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে ক্ষণে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাচ্ছিলেন, ক্ষণে সামান্য স্মিতহাস্য করছিলেন, ক্ষণে চোখে চোখে ঠার মারছিলেন, ক্ষণে একে অন্যকে ঠিক ঠিক বুঝতে পারার ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন—কিংবা বুড়ো আমার একটু কাছে এসে আমায় বলেন,

'আরেকটু জোরে কও…ভালো করে শুনতে পায় না ও।'

আর উনিও, 'আরেকটু চেঁচিয়ে, লক্ষ্মীটি!…উনি সব কথা ভালো করে শুনতে পান না…'

আমি তখন গলাটা একটু চড়াই; দুজনাই তখন একটুখানি স্মিতহাস্যে আমাকে ধন্যবাদ জানান। আর তাঁদের সেই হাল্কা ফিকে স্মিতহাস্যভরা দৃষ্টি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে তাঁরা যেন আমার চোখের নিভৃততম গভীরে খুঁজে

দেখবার চেষ্টা করেন তাঁদের মরিসের ছবি ; আর আমার হৃদয়ও যেন আমার বন্ধুর ছবি তাঁদের চোখে দেখে একেবারে গলে যায়—আবছা-আবছা, ঘোমটা-ঢাকা, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, যেন অনেক দূরের থেকে, কুয়াশার ভিতর দিয়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে।

* * *

হঠাৎ বুড়ো তাঁর আরাম-কেদারার গভীর থেকে হকচকিয়ে উঠলেন :

'আমার কি মনে পড়লো, মামেৎ…সে বোধহয় এখনো দুপুরের খাবার খায় নি !'

আর মামেৎ আর্ত হয়ে শূন্যে তুলে দিয়েছেন হাত দুখানা :

'এখনো খায় নি !…হে দয়াময়, হে ভগবান !'

আমি ভাবলুম, এখনও বুঝি মরিসের কথাই হচ্ছে ; তাই তাঁদের বললুম যে, তাঁদের যাদু মরিস দুপুর হতে না হতেই খানার টেবিলে বসে যায়—তার চেয়ে দেরি সে কস্মিনকালেও করে না। কিন্তু না, এবারে উঠেছে আমার কথা। আর আমি যখন স্বীকার করলুম যে আমি তখনো খাই নি, তখন যে ধুন্দুমার আরম্ভ হল সেটা সত্যি দেখবার মত।

'শিগ্‌গির শিগ্‌গির নিয়ে এসো। ছুরি কাঁটা সব—ও বাচ্চারা! টেবিলটা ঘরের মধ্যিখানে নিয়ে এস। রবারের টেবিলক্লথ, ফুলের নক্সাদার বাসন-প্লেটগুলো! আঁর অত হাসাহাসি না করলেও আমাদের চলবে, বুঝলে! আর জল্‌দি, জল্‌দি, প্লীজ !'

আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই, তারা জলদি জলদিই করেছিল! তিনখানা পেলেট ভাঙতে যতখানি সময় লাগার কথা তার পূর্বেই টেবিল, খাবার-দাবার, সব তৈরী।

'সামান্য একটু ভালো-মন্দ নাশতা বই আর কিছু নয়'—আমাকে টেবিলের দিকে নিয়ে যেতে যেতে মামেৎ বললেন। 'শুধু তোমাকে একলা-একলিই খেতে হবে। আমরা ? আমরা সকাল বেলাই খেয়ে নিয়েছি।'

বেচারা বুড়ো-বুড়ী! যে কোনো সময়েই ওঁদের শুধোও না কেন, ওঁদের সব সময়েই ঐ এক উত্তর, তাঁরা সকাল সকালই খেয়ে নিয়েছেন।

মামেতের দেওয়া নাশ্‌তা—দুধ, খেজুর আর একখানা আস্ত 'পাই' ; ঐ দিয়ে কিন্তু মামেৎ আর তার ক্যানারি পাখীগুলোর নিদেন আটদিনের খাওয়া-দাওয়া চলে যায়…তাই ভাবো দিকি নি, আমি একাই তাবৎ মালের শেষ কণাটুকু খেয়ে ফেললুম!…আর টেবিলের চতুর্দিকে সে কী 'কেলেঙ্কারি'! ক্ষুদে দুই

নীলাম্বরী একে অন্যকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে ফিস্‌ফিস্ করছিল, আর খাঁচার ভিতরে ক্যানারিগুলোর ভাব, যেন মনে মনে বলছে, 'দেখেছ! এ কেমন ভদ্রলোক! গোটা পাইটাই খেয়ে ফেললে!'

কথাটা সত্যি। আমি প্রায় সমস্তটাই বেখেয়ালে খেয়ে ফেলেছি—কারণ আমি তখন ঐ শান্ত শীতল ঘরটার চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখছি সেখানে কেমন যেন প্রাচীন দিনের সৌরভ ভাসছিল···বিশেষ করে দুটি ছোট্ট খাট থেকে আমি আমার চোখ কিছুতেই ফেরাতে পারছিলুম না। প্রায় যেন ছোট্ট দুটি শিশুদের দোলনা। আমি কল্পনা করতে লাগলুম—সকালে, অতি ভোরে বুড়ো-বুড়ী ঝালর-লাগানো পর্দাঘেরা খাটের গভীরে শুয়ে। ভোর তিনটে বাজলো। ঐটেই সব বুড়ো-বুড়ীর জেগে ওঠার সময়।

—ঘুমুচ্ছো, মামেৎ?

—না গো।

—কি বলো, মরিস ছেলেটি বড় লক্ষ্মী—না?

—সে আর বলতে, বড্ড লক্ষ্মী ছেলে!

আর সুদ্ধমাত্র একটির পাশে আরেকটি, বুড়ো-বুড়ীর ছোট্ট দুটি খাট দেখে আমি ওদের দুজনার মধ্যে পুরোপুরি একটি কথাবার্তা কল্পনা করে নিলুম···

ইতিমধ্যে ঘরের অন্যপ্রান্তে, আলমারির সামনে একটা ভীষণ নাটকের অভিনয় চলছিল। ব্যাপারটা হয়েছে কি, ঐ আলমারির সবচেয়ে উপরের থাকে রয়েছে এক বোয়াম লিক্যোর-ব্রাণ্ডিতে মজানো চেরি। এটা দশ বৎসর ধরে মরিসের জন্য অপেক্ষা করছে। এখন সেটাকে নামাতে হবে যাতে করে আমি এটার উন্মোচন-পর্ব সমাধা করতে পারি। মামেতের সর্ব অনুনয় উপেক্ষা করে বুড়ো স্বয়ং লেগে গেছেন সেটাকে পাওয়ার প্রচেষ্টায়। ভয়ে আড়ষ্ট বউ—আর উনি একটা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে চেষ্টা করছেন সেটাকে পাড়তে··· পাঠক, যেখানে আছো সেখান থেকেই ছবিটি দেখতে পাবে: বুড়ো কাঁপছেন, ঝুলে পড়ে লম্বা হবার চেষ্টা করছেন, ক্ষুদে নীলাম্বরী মেয়ে দুটি চেয়ারটাকে জাবড়ে ধরে আছে। পিছনে মামেৎ হাঁপাচ্ছেন—হাত দুটি দু'দিকে মেলে ধরেছেন, আর এ সব-কিছুর উপর ভাসছে মৃদু সুগন্ধি নেবুর সৌরভ খোলা আলমারির ভিতর থেকে, থাকে থাকে সাজানো কাপড়ের ডাঁই থেকে।

অবশেষে, অশেষ মেহন্নতের পর, সেই সুপ্রসিদ্ধ বোয়ামটি আলমারি থেকে বের করা হল, আর তার সঙ্গে টোলে টোলে ভর্তি একটি রুপোর 'মগ'-পারা গেলাস—মরিস যখন ছোট্ট ছিল সেই আমলের। গেলাসটি চেরি দিয়ে আমার

জন্য কানায় কানায় ভর্তি করা হল; মরিস এই চেরি খেতে কতই না ভালোবাসতো! চেরি আর ব্রাণ্ডি ভরতে ভরতে বুড়ো খুশ-খানা-সমঝদারের মত আমার কানে কানে বললেন:

—'বুঝলে হে, তোমার কপাল ভালোই বলতে হবে, হ্যাঁ, তোমার কথাই কইছি, এখন যা খাবে…আমার গিন্নীই এটি তৈরী করেছেন…খাসা জিনিস খাবে এখন।'

হায়রে কপাল! ওঁর গিন্নী এটি তৈরী করেছেন সত্যি, কিন্তু চিনি দিতে গেছেন বেবাক ভুলে! তা আর কি করা যায় বলো! বুড়ো বয়সে কি আর মানুষের সবকিছু মনে থাকে! বেচারী মামেৎ আমার, সত্যি বলতে কি তোমার চেরিগুলো অখাদ্যের একশেষ; হলে কি হয়, আমি চোখের পাতাটি পর্যন্ত না নাড়িয়ে তলানি অবধি সাফ করে দিলুম।

* * *

খাওয়া শেষ হওয়ার পর আমি উঠে দাঁড়ালুম ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য। ওঁরা অবশ্যি সত্যই খুশী হতেন যদি আমি আরো কিছুক্ষণ থাকতুম, যাতে করে ওঁরা লক্ষ্মী ছেলে মরিস সম্বন্ধে আরো কথা বলতে পারেন, কিন্তু বেলা তখন ঢলে পড়েছে, মিলটাও দূরে—বিদায় নিতেই হয়।

আমার সঙ্গে সঙ্গে বুড়োও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

'—মামেৎ, আমার কোটটা!…আমি ওকে চত্বর অবধি পৌঁছে দিয়ে আসি।'

সত্যি বলতে কি, মামেৎ মনে মনে দ্বিধা বোধ করছিলেন, বেশ একটু শীত পড়েছে, এ সময় আমাকে চত্বর অবধি পৌঁছে দেওয়াটা ঠিক হবে কি না; কিন্তু সেটা মুখের ভাবে প্রকাশ করলেন না। শুধু শুনতে পেলুম, ঝিনুকের বোতামওলা, সোনালি নস্যি রঙের চমৎকার ফ্রক্-কোটটি পরিয়ে দিতে দিতে লক্ষ্মী ঠাকুরমাটি কর্তাকে নিচু গলায় শুধোলেন,

'তোমার ফিরতে দেরি হবে না তো?—কেমন?'

বুড়ো একটু দুষ্টুমির মুচকি হাসি হেসে বললেন,

'—হেঁ, হেঁ!…কি জানি…হয় তো বা…'[৩]

---

৩ যৌবনে যে ফুর্তিফার্তি করতে গিয়ে আর পাঁচজনের মত মাঝে-মধ্যে দেরিতে বাড়িতে ফিরতেন, মামেৎ বকাঝকা করতেন, এটাতে ঠাট্টা করে তারই ইঙ্গিত।

একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, ওঁদের হাসতে দেখে বাচ্চা দুটি হাসলে, আর খাঁচার কোণে বসে ক্যানারি দুটোও তাদের আপন ঢঙে হাসলে···নিতান্ত তোমাকেই বলছি, পাঠক, আমার মনে সন্দ হয়, ঐ চেরি-ব্রাণ্ডির গন্ধে ওরা সবাই বোধহয় একটুখানি বে-এক্তেয়ার হয়ে গিয়েছিলেন।

ঠাকুরদা আর আমি যখন রাস্তায় নামলুম তখন অন্ধকার হব-হব। একটু দূরের থেকে পিছনে পিছনে নীলপোশাকী ছোট্ট মেয়েটি আসছিল ওঁকে ফেরার সময় সঙ্গে করে নিয়ে আসবার জন্য—বুড়ো ওকে দেখতেও পান নি। তিনি সগর্বে আমার বাহু ধরে চলছিলেন যেন কতই না শক্তসমর্থ মদ্দা জোয়ান। মামেৎ ভরপুর হাসিমুখে দোরে দাঁড়িয়ে এসব দেখছিলেন, আর আমাদের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে খুশীতে মাথা নাড়ছিলেন যেন ভাবখানা এই 'যা-ই বলো, যা-ই কও,—আমার বুড়া এখনও তো দিব্য চলাফেরা করতে পারে।'[৪]

কোষ্ঠী-বিচার

আমি তো রেগে টং।

মুসলমান বাড়িতে সচরাচর গণৎকার আসে না, যদিও শুনেছি ঔরঙ্গজেবের মত গোঁড়া মুসলমান, হিটলারের মত কট্টর বিজ্ঞান-বিশ্বাসীরা নাকি রাশিকুণ্ডলী মাঝে-মধ্যে দেখে নিতেন। আমাদের বাড়িতে গণৎকার এসেছিল। তা আসুক। মেয়েরা জটলা পাকিয়েছিল। তা পাকাক। কাউকে রাজরাণী, কাউকে রাজেশ্বরী, কাউকে ডাক্তার হওয়ার আশা দিয়ে গিয়েছে—তা দিক, তাতেও আমার আপত্তি নেই। আমি রাগে টং হলুম যখন শুনলুম, পাশের বাড়ির আট বছরের মেয়ে মাধুরীলতা, আমার বোনের ক্লাসফ্রেণ্ড, সেও নাকি এসেছিল এবং গণৎকার বলেছে, তার কপালে বাল-বৈধব্য আছে।

বাল-বৈধব্য তার কপালে থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে—আমি জানব কি করে, আর গণৎকারই বা জানবে কি করে? আর যদিও ধরেও নিই গণৎকার জানতোই, তবে সে বরাহমিহির সেটা বলতে গেল কেন মেয়েটাকে —ঐ আট বছরের ফুলের মত মেয়েটিকে?

এই দৈববাণীর ফল আরম্ভ হল পরের দিন থেকেই।

মাধুরী শুরু করল দুনিয়ার কুল্লে ব্রত-উপবাস, পূজা-পারণা। ইতু, ঘেঁচু

---

৪ আল্‌ফঁস্ দোদের শব্দে শব্দে অনুবাদ

হেন দেবতা নেই যে সে খুঁজে খুঁজে বের করে বাড়িতে তার পুজো লাগায় নি। তার বাড়িতে ছিলেন আমাদের দেশে সব চাইতে নামকরা নিষ্ঠাবতী ঠাকুরমা—তিনি পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন, মাধুরীর পুজোপাটের ঠেলায়।

এসবের অর্থ অতি সরল। অতিশয় প্রাঞ্জল। মাধুরী ত্রিলোকবাসী সর্বদেব, সর্বমানব, এমন কি সর্ব ভূতপ্রেতকেও প্রসন্ন রাখতে চায়, যাতে করে তাঁরা তাকে বাল-বৈধব্যের হাত থেকে ঠেকিয়ে রাখেন।

কিন্তু মাধুরীর মুখের হাসি শুকিয়ে গিয়েছিল—আমার রাগ সেইখানটাতে। তার সর্বচৈতন্যে, সর্ব অস্তিত্বে মাত্র একটি চিন্তা; তাকে আমৃত্যু বাল্য-বৈধব্য বয়ে বেড়াতে হবে। এবং সে নাকি হবে শতায়ু! তার বাপ ঠাকুর্দা তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে তখন শুধু তার ডাগর চোখ দুটি মেলে তাকাতো, কোন কথা বলত না; স্পষ্ট বোঝা যেত আর সান্ত্বনাবাণী, স্তোকবাক্য, তত্ত্বকথা তার মনের উপর কোন দাগ কাটছে না।

মাধুরী তেমন কিছু অসাধারণ সুন্দরী ছিল না। তবে হ্যাঁ, তার চোখ দুটির মত চোখ আমি আর কোথাও দেখি নি। সেই চোখ দুটিতে তার আট বছর বয়সে যে মধুর হাসি আমি দেখতে পেয়েছিলুম সেটি আর কখনো দেখি নি। তার রঙ ছিল শ্যাম। কিন্তু মাধুর্যে ভরা। তাই সব সময়ই মনে হত, এ মেয়ের নাম মাধুরী সার্থক। সে সুন্দর নয়, মধুর। মধু তো আর গোলাপ ফুলের মত দেখতে সুন্দর হয় না।

ষোল বছর বয়সে মাধুরীর বিয়ে হল। কুলীন ঘরের মেয়ে। সে-দিক দিয়ে অন্ততঃ সবাই লুফে নেবে। ছেলেটি বিলেত-ফের্তা ইঞ্জিনীয়ার। মাদ্রাজে কর্ম করে। মাধুরীকে দেখে ওদের বাড়ির সকলেরই পছন্দ হয়েছে। আমি তখন বিদেশে।

আমার বোন মাধুরীকে বড্ড ভালবাসতো। তাই আমাকে লেখা তার চিঠি ভর্তি থাকত মাধুরীর কথায়। পুজোপাট তার নাকি বিয়ের পর আরো অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছে। মাদ্রাজে গিয়ে পেয়েছে আরেক নূতন সেট দেবদেবী। ওঁয়ারা তো ছিলেনই, এঁয়ারাও এসে জুটলেন। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, শুক্রবারে শুক্রবারে মসজিদে শির্ণী পাঠাতেও মাধুরীর কামাই যেত না।

বোন লিখেছিল, মাধুরীর স্বামীটি নাকি পয়লা নম্বরের বৈজ্ঞানিক, দেবদ্বিজে আদৌ ভক্তি নেই। মাধুরীর পালপার্বণের ঘটা দেখে সে নাকি রঙ্গ-রস করত, সেই পালপার্বণের আদিখ্যেতার—তার ভাষায়—কারণ শুনে নাকি হাসাহাসি করেছিল তার চেয়েও বেশী। তবে ছেলেটি খানদানী ঘরের ভদ্রছেলে ছিল বলে

এসব কথা তুলে মাধুরীর মনে কষ্ট দিতে চাইত না।

কিন্তু মোদ্দা কথা—বোন লিখেছিল—মাধুরী সুখী, মাধুরী স্বামী-সোহাগিনী।

যাক্। চিঠি পেয়ে ভারী খুশী হলুম।

তার ছ' মাস পরে বজ্রাঘাত।

মাদ্রাজে যুদ্ধের সময়, এক্‌স্‌প্লোশন না বোমাপাতের ফলে মাধুরীর স্বামী আপিসের চেয়ারের উপরই প্রাণত্যাগ করে।

সেদিন আপিস যাবার সময় সে নাকি মাধুরীকে বলে গিয়েছিল, 'তোমরা বাঙালীরা বড্ড ঢিলে। সময়ের কোন জ্ঞান নেই। আমি বাড়ি ফিরবো সাড়ে পাঁচটায়। তোমাকে যেন তৈরী পাই। দশ মিনিটের ভিতরে যেন বেরতে পারি। সিনেমা তোমার জন্য অপেক্ষা করবে না।'

মাধুরী পাঁচটা থেকে তৈরী হয়ে বসে ছিল। কে জানে, কোন্ শাড়ীখানা পরেছিল? সেই হলদে রঙেরটা? যেটা আমি তাকে প্রেজেন্ট করেছিলুম—ওর রঙের সঙ্গে সুন্দর মানাতো বলে? থাক্ ওসব। মোহনীয়া গল্প শোনাতে আমি আসি নি। সমস্ত ব্যাপারটাই এমনি ট্রাজিক যে তার উপর অলঙ্কার চাপাতে ইচ্ছে করে না।

ছ'টা বাজলো, সাতটা বাজলো—করে করে রাত এগারোটা হল। মাধুরী তার স্বামীকে এই প্রথম অন্‌পন্‌ক্‌চুয়েল হতে দেখল—এবং এই শেষ।

আর পাঁচজন বাঙালীই প্রথম দুর্ঘটনার খবর পান। তাঁরা রাত এগারোটায় এসে মাধুরীকে খবরটা দেন। সঙ্গে এসেছিলেন মাধুরীর এক বান্ধবী—ধর্মে তাঁর বিশ্বাস অবিচল ছিল বলে মাধুরীর সঙ্গে সখ্য হয়। তিনি খবরটা ভাঙেন। কি ভাষায়, সোজাসুজি না আশকথা-পাশকথা পাড়ার পর, জানি নে। তবে শুনেছি, মাধুরী একসঙ্গে এতজন লোককে রাত এগারোটার সময় বাড়িতে আসতে দেখেই কেঁদে উঠেছিল।

মাধুরী কলকাতায় ফিরে এল।

এখানেই শেষ? গণৎকারের কথাই ফলল? তাও নয়।

মাদ্রাজ ছাড়ার পূর্বে মাধুরী তার সখীকে তার কোষাকোষী আর সব পুজোপাটার জিনিসপত্র তার হাতে তুলে দিয়ে বলে, সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে। মাধুরী বলে নি—কিন্তু সখী বললেন, 'ও বলতে চেয়েছিল, এত করেও যখন দেবতাদের মন পেলুম না, তখন তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে আমার আর কি হবে? আমার তো অন্য আর কোনো জিনিসের প্রয়োজন নেই।'

কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

কলকাতায় ফিরে মাধুরী চাকরি নেয়। বস্তিতে করপরেশনের ইস্কুলে। সেখানে তার বসন্ত হয়। তার বোনঝি—ডাক্তার—বললে, 'ওয়ান বিগ্ ব্লার্ব—করবার কিছু নাই।'

সে শতায়ু হয়ে বাল-বৈধব্যের যন্ত্রণা উপভোগ করে নি। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে সে গত হয়। পরোপকারে প্রাণ দেয়। সে জিন্নৎবাসিনী, অমর্ত্যলোকে অনন্ত স্বামী-সোহাগিনী।

একটি অনমিত নাম : বনবিহারী মুখোপাধ্যায়

'স্বর্গীয়' লিখতে গিয়েই কলম থেমে গেল; এমন কি ক্ষণজন্মা, পুরুষসিংহ বনবিহারী মুখোপাধ্যায় 'পরলোক' গমন করেছেন,—এটা লিখতেও বাধো-বাধো ঠেকছে, কারণ বনবিহারী স্বর্গ, পরলোক, আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না।

বনবিহারীর পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখা প্রায় অসম্ভব, কারণ চাকরিজীবনে তাঁকে বাধ্য হয়ে আজ পাকশী, কাল মৈমনসিং, পরশু বগুড়া করতে হয়েছে—এবং অসময়ে বেকসুর বদলি হলেও তিনি হয়তো প্রতিবাদ জানাতেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো মেহেরবাণী চাইতেন না। বনবিহারী এ জীবনে কারো কাছ থেকে কোনো 'ফেবার' চান নি, এবং ভগবানের কাছ থেকে অতি অবশ্য, নিশ্চয়ই না। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তিনি সর্বপ্রথম কোথায় যান জানি নে, কিন্তু তার পরই চলে যান দেরাদুনে। সেখানে বেশ কয়েক বৎসর একটানা হোটেলে বাস করার পর হঠাৎ চলে যান—বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, আন্দামান। স্বেচ্ছায় এবং অতিশয় প্রসন্ন চিত্তে। বলা বাহুল্য, সেখানে রোমান্সের সন্ধানে যান নি। কাব্যে, সাহিত্যে তিনি কতখানি রোমান্টিসিজম বরদাস্ত করতেন বলা কঠিন, কিন্তু সংসার-জীবনে তিনি রোমান্টিসিজমের পিছনে দেখতে পেতেন, make belief, সত্য থেকে আত্মগোপন, এস্কেপিজম এবং ভণ্ডামি এবং এর সব কটাকেই তিনি অত্যন্ত ভ্রূকুটিকুটিল নয়নে তিরস্কার জানাতেন। তারপর হঠাৎ একদিন তিনি আবার ভারতে ফিরে এলেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর বাসস্থান পরিবর্তন আমাকে বড় পীড়া দিত। তাই তাঁকে অনুরোধ জানালুম, তিনি যেন দয়া করে আমার সঙ্গে বসবাস করেন। উত্তম হক মধ্যম হক, আমি মোগলাই, বিলিতি কিছু কিছু রাঁধতে পারি; সে সময়ে আমার বাসস্থানটি ছিল প্রশস্ত ও নির্জনে—শ্মশানের কাছে অবস্থিত। আমার নিজস্ব বই তো ছিলই, তদুপরি তাঁর পরিচিত একটি লাইব্রেরি কাছেই ছিল। অবশ্য সর্বপ্রধান প্রলোভন ছিলেন

তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত বিনোদবিহারী মুখুয্যে। তাঁর বাসাও নিকটে। এই ভাইটিকে বনবিহারী আপন হাতে মানুষ করেন এবং সে যেন ধর্ম, ঈশ্বর, পরকাল, উপাসনা ইত্যাদি সর্বপ্রকার সংস্কার থেকে মুক্ত থাকে সেজন্য কোনো ব্যবস্থার ত্রুটি করেন নি। বিনোদবিহারীর ডাক নাম 'নন্তু'। বনবিহারী তাঁকে ডাকতেন 'নাস্তিক' বা 'নাস্তে'। আমার বাড়িতে এসে বাস করলে তিনি যে তাঁর নাস্তেকে অক্লেশে দু'বেলা দেখতে পাবেন সেইটেতে বিশেষ জোর দিয়ে আমি আমার চিঠিতে নিবেদন জানিয়েছিলুম। বিনোদবিহারী প্রায় দশ বৎসর পূর্বে তাঁর চোখের জ্যোতি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেন ; তাই তাঁর পক্ষে অগ্রজ সন্নিধানে যাওয়া কঠিন ছিল।

আমি ক্ষীণ আশা নিয়েই আমন্ত্রণ-জানিয়েছিলুম, কারণ আমি তাঁর কৃতবিদ্য, বিত্তশালী, পিতৃভক্ত পুত্রকে উত্তমরূপেই চিনি। তাঁর শত কাতর অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি পুত্রের গৃহে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে রাজী হন নি। আমার আশা ছিল, আমি তাঁর কেউ নই, তিনি জানতেন যে আমি ধর্মে, সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী একটা আস্ত জড়ভরত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে অবিচল ভক্তি করি, এবং দাসের মত সেবা করবো ; বিশ্বসংসার নিয়ে তাঁর যত রকমের সমালোচনা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ আমি সহাস্য বদনে শুনেছি এবং শুনবো এবং তর্কযুদ্ধ করার মত লোকের অভাব হলে আমাকে দিয়েও কিছুটা কাজ চলবে—তিনি জানতেন, আমার জীবন কেটেছে 'তুলনাত্মক ধর্ম' চর্চায়।

তিনি এলেন না সত্য, কিন্তু আমাকে একটি অতিশয় প্রীতিপূর্ণ (তিনি সেন্টিমেন্টের আতিশয্য এতই অপছন্দ করতেন যে, সেফ্‌সাইডে থাকার জন্য সেটা বাক্যে, পত্রে সর্বত্র বর্জন করতেন) পত্র লিখে জানালেন, 'তোমার নিমন্ত্রণ মনে রইল, সময় হলেই আসবো।'

আমার ক্ষোভ-শোকের অন্ত নেই যে তাঁর সময় আর হল না। মনকে এই বলে সান্ত্বনা দি, আমি কে যে তিনি আমার সেবা গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করতেন।

শেষদিন পর্যন্ত, এত সব ঘোরাঘুরির মাঝখানেও সর্বত্র তাঁকে সঙ্গ দিয়েছেন তাঁর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী। বনবিহারীর অধিকাংশ লেখাই ছাপাখানা পর্যন্ত পৌঁছত না। প্রকাশিত হলে ফাইলে রাখতেন না, নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও বলতেন না, 'অমুক কাগজে আমার লেখা বেরিয়েছে, পড়ে দেখো।' তাঁর পরিপক্ক যৌবনে কিন্তু তিনি আমাদের মত বালকদের প্রতি সদয় ছিলেন। সম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ বহু লেখা তিনি সোৎসাহে আমাদের পড়ে শুনিয়েছেন।

এখনো যা-কিছু আছে তাই নিয়ে শ্রীযুত বঙ্কুবিহারী প্রামাণিক নিবন্ধ লিখতে পারবেন। কোন্ লেখা কোন্ উপলক্ষে লেখা হয়েছিল, কোন্ ব্যঙ্গচিত্র আঁকবার সময় কাকে তিনি মনে মনে সামনে দাঁড় করিয়েছিলেন, কিভাবে সমাজের কোন্ গুপ্ত পাপাচার তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, এর বেশীর ভাগই একমাত্র তাঁরই জানার কথা। এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রের এত বড় পণ্ডিত, অধ্যাপক ঐ বিষয়ে কখনো কিছু লেখেন নি এটা কেমন জানি বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয়। আমি নিজে জানি, ছাত্রদের দুই ধরনের ব্যাণ্ডেজ শিখিয়ে তাদের নাম বলে, দোষগুণ আপন অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ দিয়ে যাচাই করার পর একটা তৃতীয় ব্যাণ্ডেজ হয়তো শেখালেন। কোনো বুদ্ধিমান ছেলে হয়তো লক্ষ্য করলো এটার নাম তিনি বলেন নি ; শুধোলে পর বলতেন, 'ওঃ দ্যাট্ ওয়ান ? ওটা ব্যাণ্ডেজ আ লা বনবিহারী' (তিনি নিজের চেষ্টায় সুন্দর ফরাসী শিখেছিলেন ও উচ্চারণটিও তাঁর চমৎকার ছিল। আমি ফরাসী শিখতে আরম্ভ করেছি জেনে তিনি আমাকে মপাসাঁ পড়ে শুনিয়েছিলেন ; নতুবা নিতান্ত বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত বনবিহারী আপন বৃহৎ ক্ষুদ্র সর্বকৃতিত্বই লুকিয়ে রাখতেন)।

বনবিহারী সম্বন্ধে প্রামাণিক কিছু লেখা প্রায় অসম্ভব। কারণ প্রায় অসম্ভব শুধুমাত্র তাঁর প্রকাশিত লেখা ও ব্যঙ্গচিত্র যোগাড় করা। বেনামে ছদ্মনামে তো লিখেছেনই, তদুপরি নিজের সৃষ্টির প্রতি তাঁর কোন প্রকারের মোহ ছিল না বলে সেগুলোকে তাদের ন্যায্য সম্মান দেবার জন্য তিনি কোনো চেষ্টা তো করতেনই না, উল্টে নিতান্ত অজানা অচেনা কাগজে প্রায়ই বাছাই বাছাই লেখা ছাপিয়ে দিতেন। এবং আমার জানতে সত্যই ইচ্ছে করে, তিনি তাঁর লেখার জন্যে কখনো কোনো দক্ষিণা পেয়েছেন কিনা।

উপস্থিত আমি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ নিবেদন করছি ; যদি কোনো দিন তাঁর প্রকাশিত রচনা ও ছবির দশমাংশের এক অংশও যোগাড় করতে পারি তবে তাঁর জীবন-দর্শন সম্বন্ধেও কিছু পেশ করার ভরসা রাখি। অথবা হয়তো তখন দেখব, তাঁর জীবন-দর্শন ছিল যে, মানুষের পক্ষে কোনো প্রকারের শাশ্বত জীবনদর্শনে পৌঁছনো সম্পূর্ণ অসম্ভব, কারণ শাশ্বত বলে কোনো বস্তু, ধারণা বা আদর্শ এ-সংসারে আদপেই নেই।

'ভ্যানিটি অব্ ভ্যানিটিজ—অল ইজ ভ্যানিটি' বাইবেলের এই আপ্তবাক্য তাঁর মুখ দিয়ে বলাতে আমার বাধছে, কারণ নাটকীয় ভঙ্গিতে কোনো জিনিসই প্রকাশ করাতে তাঁর ছিল ঘোর আপত্তি। কারণ এসব ভঙ্গি, স্টাইল, পোজ থেকে উদ্ভূত হয় ধর্মগুরুর দঙ্গল—এবং বনবিহারীর সুদৃঢ় ধারণা ছিল যে তাঁদের সম্বন্ধে

আমরা যত কম শুনতে পাই ততই ভালো। বলার মত বিশেষ কিছু তো নেই—হয়তো বলতেন বনবিহারী—তাহলে বলতে গিয়ে অত ধানাইপানাই কেন?

বৃষের মত স্কন্ধ, আজানুলম্বিত বাহু—এসব শাস্ত্রসম্মত লক্ষণ দিয়ে বিচার করলে বনবিহারী নিশ্চয়ই সুপুরুষের পর্যায়ে পড়তেন না; তৎসত্ত্বেও বলি, বনবিহারীর মত অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বান্ সুপুরুষ আমি দেশ-বিদেশে অতি অল্পই দেখেছি। বাঙালী ফর্সা রঙ পছন্দ করে, কিন্তু বনবিহারীর গৌরবর্ণ আমি অন্য কোনো বাঙালীর চর্মে দেখি নি। বলা বাহুল্য যে সে বর্ণ ইংরেজের ধবলকুষ্ঠ শ্বেত নয়। গৌর হয়েও সে বর্ণে ছিল কৃষ্ণের স্নিগ্ধতা। তপ্তকাঞ্চন তো সে নয়ই, 'চাঁদের অমিয়াসনে চন্দন বাটিয়া'ও সে বর্ণ মাজা হয় নি। নদীয়ার গোসাঁইকে আমি দেখি নি, কিন্তু তাঁকে কল্পনায় দেখতে গেলে তাঁর অঙ্গে আমি বনবিহারীর বর্ণ চাপাই। তাঁর চুল ছিল কটা। আমি একদিন তাঁকে বলেছিলুম, 'ঋগ্বেদে না কোথায় যেন অগ্নির দাড়িকে রক্তবর্ণ বলা হয়েছে; আপনি দাড়ি রাখলে সেটা ক্রমে ক্রমে রক্তবর্ণ ধারণ করবে।' আমার সত্যই মনে হ'ত, কেমন যেন এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় কি যেন এক এ্যাটাভিজমের ফলে তিন হাজার বৎসর পর আর্য ঋষি গৌড়দ্বিজের গৃহে আবির্ভূত হয়েছেন। বনবিহারী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তর্কজাল বিস্তার করে পর্যায়ক্রমে, অপ্রমত্ত চিত্তে যে-সিদ্ধান্তটি সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন তার অর্থ: যারা বলে বাঙালীর গায়ে কিঞ্চিৎ আর্যরক্ত আছে এটা তাদের ভ্রম—যারা বলে বাঙালী পরিপূর্ণ আর্য—তাদের ভ্রমের চেয়েও মারাত্মক দুষ্টবুদ্ধিজাত ভ্রম।

ঐ সময়ে আমি রেনাঁর খৃষ্ট-জীবনী পড়ি অধ্যাপক হিড্‌জিভাই মরিসের কাছে।[১] প্রথম অধ্যায়েই তিনি লিখেছেন 'যে লোক মানুষে মানুষে পার্থক্য ঘোচাবার জন্য সর্বাধিক প্রচেষ্টা দিয়েছেন (অর্থাৎ খৃষ্ট) তাঁর ধমনীতে কোন্ জাতের রক্ত প্রবাহিত সে অনুসন্ধান করতে যাওয়া অনুচিত।' বনবিহারী সমস্ত জীবন ধরে বিস্তর অক্লান্ত জিহাদ লড়েছেন, কিন্তু বর্ণ বৈষম্য চোখে পড়লেই তিনি নিষ্কাশিত করতেন তাঁর শাণিততম তরবারি। এস্থলে বলে রাখা ভালো, বনবিহারী তাঁর জিহাদ চালাতেন হৃদয়হীন যুযুধানের মত। তাই সত্যের অপলাপ না করে অনায়াসে বলতে পারি, তাঁর মত মিলিটেন্ট নাস্তিক এ-দেশে তো কখনই জন্মায় নি, বিদেশেও নিশ্চয়ই মুষ্টিমেয়। 'পীসফুল কো-এগ্‌জিজস্টেনস্'

---

১ ইনি পার্সী দস্তুর (যাজক) সম্প্রদায়ের লোক; শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশী এঁর সম্বন্ধে লিখেছেন। 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' পৃ. ১২৫।

নীতিটি তিনি আদপেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। তিনি ছিলেন হাসপাতালের ভিতরে বাইরে সর্বত্রই, এবং টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ডিউটির সার্জন। তাঁর বক্তব্য, 'তোমার পায়ে হয়েছে গ্যাঙ্‌রীন, সেটা আমি কেটে ফেলে দেব। গ্যাঙ্‌রীনের সঙ্গে আবার পীসফুল কো-এগ্‌জিস্টেনস্‌ কি?' কিন্তু পাঠক ভুলে ক্ষণতরেও ভাববেন না, বনবিহারী অসহিষ্ণু ছিলেন। এর চেয়ে বৃহত্তর, হীনতর মিথ্যা ভাষণ কিছুই হতে পারে না। 'তুমি আস্তিক। তোমার মস্তিষ্ক থেকে আমি সেই অংশ ছুরি দিয়ে কেটে ফেলব। কিন্তু তোমার প্রতি আমি অসহিষ্ণু হব কেন? বস্তুত চিকিৎসক বলে আমার সহিষ্ণুতা অনেক বেশী। তোমার পরিচিত কারো সিফিলিস হলে তুমি শুধু সিফিলিস না, সেই লোকটিকেও বর্জন করো। আমি সিফিলিস দূরীভূত করি, কিন্তু সে হতভাগ্যকে তো দূর দূর করে দূরীভূত করার চিন্তা আমার স্বপ্নেও ঠাঁই দিই না। প্লেগ এলে তুমি এ শহরের নাগরিকদের বিষবৎ বিবেচনা করে তাদের বর্জন করো; আমি তা করি নে।' এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে শপথ করতে রাজী আছি এটা তাঁর বাগাস্ফালন নয়। কাব্যে আমরা বাক্‌ ও অর্থের সমন্বয় অনুসন্ধান করি, জীবনে করি বাক্‌ ও কর্মের। এ দুটির সমন্বয় বনবিহারীতে প্রকৃতিগত ছিল। বলতে যাচ্ছিলুম 'বিধিদত্ত', কিন্তু তাঁর আত্মাকে ক্ষুব্ধ করতে চাই নে। আবার ভুল করলুম, তিনি আত্মাতে বিশ্বাস করতেন না, কাজেই হাওয়ার কোমরে রশি বাঁধার মতই তাঁর আত্মাকে নিপীড়িত করার সম্ভাবনা!

বনবিহারী তাঁর বাল্যবয়সের অধিকাংশটা কাটান তাঁর মাতামহের সঙ্গে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তাঁর নাম ভুলে গিয়েছি কিন্তু সেটা বের করা কঠিন হবে না। এই মাতামহটি ছিলেন গত শতাব্দীর ধনুর্ধর, অপরাজিত দার্শনিক এবং নৈয়ায়িক। যে দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য উভয় দর্শনে ছিলেন সে যুগের চূড়ামণি, তিনি ছিলেন তাঁর নিত্যালাপী সখা। যে দ্বিজেন্দ্রনাথের গৃহে বঙ্কিমাদি মনীষিগণ আসতেন তত্ত্বালোচনার জন্য সেই দ্বিজেন্দ্রনাথ গিয়েছেন দিনের পর দিন এই নৈয়ায়িকের অপরিসর পথের ক্ষুদ্রতর গৃহে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন এমনই আপন-ভোলা সাদা দিলের মানুষ যে তর্কে বিরক্তির সঞ্চার হলে তাঁর কণ্ঠ তপ্ততর ও উচ্চতর হতে আরম্ভ করত—বনবিহারীর মাতামহ এ তত্ত্ব জানতেন বলে সেটা আদৌ গায়ে না মেখে পূর্বের চেয়ে ক্ষীণতর কণ্ঠে মোক্ষমতর যুক্তি পেশ করতেন। খাওয়ার বেলা গড়িয়ে যায়—দ্বিজেন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে বেহুঁশ। শেষটায় বেলা প্রায় তিনটায় উত্তেজিত হয়ে আসন ত্যাগ করে বলতেন, 'ঝকমারি, ঝকমারি, এসব লোকের সঙ্গে তর্ক করা; আমি চললুম এবং এই

আমার শেষ আসা।' বনবিহারীর মাতামহ ক্ষীণকণ্ঠে বলতেন, 'গিন্নী পুঁই-চচ্চড়ি রেঁধেছিল।' অট্টহাস্য করে দ্বিজেন্দ্রনাথ টেনে টেনে বলতেন, 'সেটা আগে বললেই হ'ত, আগে কইলেই হ'ত।' তারপর বারান্দায় প্রতীক্ষমাণ তাঁর 'গার্জেন'কে বলতেন (মহর্ষিদেব এই আপন-ভোলা যুবরাজের জন্য একটি তদারকদার নিযুক্ত করে রেখেছিলেন), 'যাও, বাড়ি থেকে দাঁত নিয়ে এসোগে।' শুধু খাবার সময়ই তিনি বাঁধানো দাঁত ব্যবহার করতেন। আমার ভাবতে বড় কৌতুক বোধ হয় যে, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠতম দৌহিত্র বাড়ির কোর্মা-কালিয়া ছেড়ে অনাড়ম্বর নৈয়ায়িকের অপরিসর বারান্দায় পিঁড়িতে বসে পুঁই-চচ্চড়ি চিবোতে চিবোতে উচ্চকণ্ঠে পাড়া সচকিত করে তার অকৃপণ প্রশস্তি গেয়ে চলেছেন।

পরদিন 'নাউ-চিঙড়ি'! 'নাউ'—লাউ না!

এ ধরনের একাধিক বিচিত্র বিষয় আমি ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি প্রাগুক্ত বিনোদবিহারী মহাশয়ের কাছ থেকে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধরাজিতে মাত্র দু'জন দার্শনিক পণ্ডিতের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে সপ্রশংস চিত্তে উল্লেখ করেছেন যাঁরা দার্শনিক ও তত্ত্ববিদের গুরুভার কর্তব্য আপন আপন স্কন্ধে অনায়াসে তুলে নিতে পারেন ; এঁদের একজন 'পুঁই-চচ্চড়ি'-রসিক দার্শনিক—বনবিহারীর মাতামহ। এবং তাঁর সম্বন্ধে বলি, সে যুগে পিরিলি ঠাকুররা অন্যান্য ব্রাহ্মণদের কাছে অপাঙ্‌ক্তেয় ছিলেন।

বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি, বনবিহারী বাল্য বয়সে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবস্থায়ও সূর্যোদয় থেকে প্রারম্ভ পূজা-অর্চনা শেষ করতে করতে কোনো কোনো দিন ক্লাসের সময় পেরিয়ে যেত। এটাতে আমার সামান্য বিস্ময় লাগে, কারণ আমি যে কয়টি প্রাচীনপন্থী নৈয়ায়িককে চিনি তাঁদের সকলেই পূজা-অর্চনা সম্বন্ধে ঈষৎ উদাসীন ছিলেন। আমার আপন গুরু পথে যেতে যেতে বারোয়ারি সরস্বতী প্রতিমা দেখে নাসিকা কুঞ্চিত করে বলেছিলেন, 'ন দেবায়, ন ধর্মায়।' অর্থাৎ হিন্দুশাস্ত্রে (অবশ্য তিনি স্মৃতি জানতেন অত্যল্পই এবং সেজন্য তাঁর কণামাত্র ক্ষোভও ছিল না) এ রকম পুজোর কোনো ব্যবস্থা নেই বৌদ্ধ ধর্মে ('ন ধর্মায়'-এর ধর্ম এস্থলে 'ধর্মং শরণং গচ্ছামি' থেকে নেওয়া) তো থাকার কথাই নয়। সঙ্গে সঙ্গে হয়তো সরস্বতীর যে 'কুখ্যাতি' (হয়তো অমূলক) আছে সেটা তাঁর স্মরণে আসতো। তা সে যাক। কারণ আমার ধর্মের সুফীদের ও খৃষ্টান মিস্টিকদের ভিতরও ক্রিয়াকর্মের প্রতি কিঞ্চিৎ অনাসক্তি লুক্কায়িত রয়েছে।

অকস্মাৎ একদিন বনবিহারী নাস্তিকরূপে সমাজে আত্মপ্রকাশ করলেন ও শুধু শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম (রিচুয়েল) নয়, শঙ্করাচার্যের নির্গুণ ব্রহ্ম থেকে হাঁচি টিক্‌টিকির বিরুদ্ধে তীব্র কর্কশ কণ্ঠে মারমুখো জিহাদ ঘোষণা করলেন। খৃষ্টান মিশনারী পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তা, উদ্দীপনা এবং যুদ্ধং দেহি মনোভাব দেখলে বিস্ময়ের সঙ্গে পরাজয় স্বীকার করতো। এই যে সামান্য আমি, আমার বয়েস তখন কত হবে? ষোলগোছ,—আমাকে পর্যন্ত প্রথম দর্শনের পাঁচ মিনিটের ভিতর, কলার অভাবে কুর্তার গলার মুরী ধরে শুধোলেন, 'তুমি ঈশ্বর মানো?'

আমি ভীত কণ্ঠে বললুম, 'আজ্ঞে আমার বিশ্বাস দৃঢ় নয়, অবিশ্বাসও দৃঢ় নয়।' আমি তখন জানতুম না, এই উত্তরই চার দশক পরে কলকাতার মডার্ন মহিলাদের ভিতর ফ্যাশন হয়ে দাঁড়াবে।

তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বিশ্বাস দৃঢ়ই হক, আর শিথিলই হক, সেইটে কিসের উপর স্থাপিত আমাকে বুঝিয়ে বলো।'

কী যুক্তি দেব আমি? যেটাই পেশ করি, সেটাই বুমেরাঙের মত ফিরে আসে ফের আমারই গলায়। ইতিমধ্যে আমার জন্য উত্তম মমলেট, ঘোলের শরবৎ এসেছে—দুপুর অবধি তর্ক চালালে অবশ্যই পুঁই-চচ্চড়ি আসতো!

আমি রণেভঙ্গ দিতে চাইলেও তিনি ছাড়েন না। আমি যে ধর্মের 'অধর্ম' পথে চলেছি সেইটে তিনি সপ্রমাণ করতে চান, সর্বদৃষ্টিকোণ থেকে, সর্বদৃষ্টিবিন্দু থেকে। এবং আমার সব চেয়ে বিস্ময় বোধ হল যে, আমি যে ক'জন ইয়োরোপীয় নাস্তিক দার্শনিকের নাম জানতুম—অবশ্য অত্যন্ত ভাসা-ভাসা ভাবে—তাঁদের কাছ থেকে বনবিহারী ঈশ্বরঘ্ন, ধর্মঘ্ন যুক্তি আহরণ করলেন না। বিস্তর তর্কজাল বিস্তৃত করার পর, মাঝে মাঝে তিনি সেগুলো সাম্ আপ্ করতেন, এ-দেশী পরিভাষায় সূত্ররূপে প্রকাশ করতেন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে! এই প্রথম আমার গোচরে এল যে, আর্যাবর্তের মত ধর্মাবর্তের দেশেও অসংখ্য নাস্তিক প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে বহুযুগ পূর্বেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে গিয়েছেন।

সেদিন আমি বড়ই উপকৃত হয়েছিলুম। ঈশ্বরবিশ্বাসে যে-সব বাতিল যুক্তি আছে সেগুলো থেকে মুক্ত হয়ে আমি ঈশ্বর সন্ধানে সত্য যুক্তি ও নিজস্ব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কথা চিন্তা করলুম। কিন্তু আমার কথা থাক।

পাঠক, আপনি মোটেই ভাববেন না, বনবিহারীর প্রধান সংগ্রাম ছিল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। তাঁর সংগ্রাম ছিল জড়তা, কুসংস্কার, ধর্মের নামে পাপাচার, সামাজিক অনাচার, তথাকথিত অপরাধীজনের প্রতি অসহিষ্ণুতা, যাজক সম্প্রদায়ের শোষণ, চিন্তা না করে বাঁধা পথে চলার বদ অভ্যাস, মহরমের

তাজিয়ার সামনে কুমড়ো-গড়াগড়ি, যৌন সম্পর্কের উপর তথাকথিত শালীনতার পর্দা টেনে আড়ালে আড়ালে কুমারী ও বিধবার সর্বনাশ, অশিক্ষিত ব্রাহ্মণের অকারণ দম্ভ, অব্রাহ্মণের অহেতুক দাস্যমনোবৃত্তি, তথাকথিত সত্যরক্ষার্থে সত্য গোপন, স্বার্থান্বেষণে বিদেশীর পদলেহন ও অন্ধানুকরণ কিন্তু যেখানে সে মহৎ সেটাকে প্রচলিত ধর্মের দোহাই দিয়ে বর্জন, বৎসরের পর বৎসর, প্রতি বৎসর রুগ্না অর্ধমৃতা স্ত্রীকে গর্ভদান করে তার কাতর রোদন অনুনয়-বিনয় পদদলিত করে তাকে অবশ্যম্ভাবী অকাল-মৃত্যুর দিকে বিতাড়ন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজে, ধর্মসভায় সচ্চরিত্র সজ্জন খ্যাতি অর্জন (বলা বাহুল্য চিকিৎসক হিসাবে ঠিক এই ট্র্যাজেডি তাঁর সামনে এসেছে বহু, বহুবার), গণিকালয় থেকে একাধিকবার বিবিধ মারাত্মক ব্যাধি আহরণ করে নিরপরাধ অর্ধাঙ্গিনীর শিরায় শিরায় সেই বিষ সংক্রামণ, একবার একটি মাত্র ভুল করার জন্য অনুতপ্তা রমণীকে ব্ল্যাকমেল করে তাকে পুনঃ পুনঃ ব্যভিচার করাতে বাধ্যকরণ—

হে ভগবান! এ যে অফুরন্ত ফর্দ! কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বনবিহারীর সিকি পরিমাণ প্রকাশিত—অপ্রকাশিতের হিসেব নিচ্ছি নে এবং অধিকাংশ লেখাই যে তিনি ছিঁড়ে ফেলতেন সেও বাদ দিচ্ছি—গদ্য পদ্য ব্যঙ্গচিত্র সংগ্রহ করে কেউ যদি তাঁর জিহাদের লক্ষ্য বিষয়গুলো সংকলন করেন তবে এ-স্থলে আমার প্রদত্ত নির্ঘণ্টের চেয়ে বহুগুণে বৃহত্তর ও কঠোরতর হবে।

কী নিদারুণ ব্যঙ্গ, বিতৃষ্ণা ও ঘৃণার সঙ্গে তিনি অন্যায় আচরণ, ভণ্ড কাপুরুষতাকে আক্রমণ করতেন সে তাঁর গুণগ্রাহী পাঠকমাত্রই জানেন। ভাষার শাণিত তরবারি তাঁর হাতে বিদ্যুৎবহ্নি বিচ্ছুরণ করতো এবং এই মরমিয়া মোলায়েম আ মরি বাঙলা ভাষাও যে কতখানি বহ্নিগর্ভা সে তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হ'ত বনবিহারীর অদম্য, নিঃশঙ্ক আঘাতের পর আঘাত থেকে। প্রত্যেক শব্দ প্রত্যেকটি বর্ণ বিশুদ্ধ যুক্তির উপর দণ্ডায়মান। শাস্ত্র ভাঙতে যখন যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন তখন শাস্ত্রের দোহাইয়ের তো কথাই ওঠে না, তিনি বিজ্ঞানের দোহাইও দিতেন না। কোনো কিছুই অভ্রান্ত নয়, কোনো সত্যই শাশ্বত নয়; অতএব প্রত্যেকটি সমস্যা নূতন করে যাচাই করে দেখতে হবে, এবং এই সাধনা চলবে আমৃত্যু।

ঈশ্বর-বিশ্বাসকে যে তিনি গোড়াতেই আক্রমণ করেছিলেন তার অর্থ এই নয় যে তিনি এই বিশ্বাস by itself, per se অন্যান্য সংস্কারের চেয়ে বেশী বিপজ্জনক বলে মনে করতেন। তাঁর ধারণা জন্মেছিল—এবং সেটা বিস্তর অনুসন্ধান ও গবেষণা করার পর, যে—এই বাংলা দেশে যত প্রকারের সামাজিক, অর্থনৈতিক

অন্যায় অবিচার হচ্ছে, যা কিছু নারীর ন্যায্য অধিকার ও পরিপূর্ণ বিকাশের অন্তরায় হচ্ছে,—আর ধর্মের নামে অনাচার শোষণের তো কথাই নেই—এ সব-কিছু হচ্ছে ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে।[২]

যে-সব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বনবিহারী লড়াই দিতেন তাদের বিরুদ্ধে কি অন্য বাঙালী লড়ে নি? নিশ্চয়ই লড়েছে। বর্ণবৈষম্য, আহারে-বিহারে স্ব স্ব সঙ্কীর্ণ গণ্ডী নির্মাণ, ধর্মের নামে অধর্মচর্চা—শাস্ত্রাধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করে তাদের কুসংস্কারে নিমজ্জিত রাখা, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তাকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন থেকে বঞ্চিত করা, ধর্মত্যাগীকে পুনরায় স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করার পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দেওয়া ইত্যাকার বহু বহু সংস্কার আচার দূর করার জন্য চৈতন্য সংগ্রাম দেন ও সর্বজনীন বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ এঁরা এবং আরো অনেকে মূঢ়তা, কুসংস্কার ও একাধিক পাপাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। এঁদের তুলনায় বনবিহারীকে চেনে কে?

কারণ বনবিহারী অন্য পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

প্রাগুক্ত সকলেই দেশ-দশকে পাপচিন্তা-পাপাচার থেকে মুক্ত করার জন্য শাস্ত্রের অর্থাৎ ধর্মের শরণ নিয়েছেন। বনবিহারী মানবিকতার শরণ নেন। প্রচলিত ধর্মও তাঁর শত্রু। একমাত্র ধর্মের moral, ethical যেটুকু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধোপে টেকে সেইটুকু গ্রহণ করা যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে একখানা চিঠিতে যা লেখেন তার নির্যাস ছিল এই, শাস্ত্র মেনে হিন্দু তার সামাজিক জীবন যাপন করে না। সে মানে লোকাচার, দেশাচার। বিদ্যাসাগর যদি সর্বশাস্ত্র দিয়েও দ্ব্যর্থহীন নিরঙ্কুশ সপ্রমাণ করেন যে, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, শাস্ত্রসিদ্ধ তবু হিন্দু সে-মীমাংসা গ্রাহ্য না করে আপন লোকাচার দেশাচার আগেরই মত মেনে নিয়ে বিধবার বিয়ে দেবে না। অতএব বিদ্যাসাগরের উচিত যুক্তি ন্যায় ও মানবিকতার (এই ধরনেরই কিছু, আমার সঠিক মনে নেই, তবে মোদ্দা—reasonএর উপর নির্ভর করা, শাস্ত্রের উপর না করে) উপর নির্ভর করা।

২ তাই তাঁর নিজস্ব মৌলিক ফরমূলা বা ডাক্তারি প্রেসক্রিপশন ছিল:—
ভগবান আমাকে বুদ্ধি দিয়েছেন। (এই স্বতঃসিদ্ধটি আস্তিকরা স্বীকার করেন ও বনবিহারী এটা উপস্থিত তর্কস্থলে মেনে নিচ্ছেন)
সেই বুদ্ধি বলছে, "ভগবান নেই"।
∴ ভগবান বলছেন, "ভগবান নেই"।

Q. E. D.

বিদ্যাসাগর উত্তরে কি লিখেছিলেন, আদৌ উত্তর দিয়েছিলেন কি না সেটা বহু অনুসন্ধান করেও আমি খুঁজে পাই নি।[৩] কিন্তু তিনি যে বঙ্কিমের উপদেশ গ্রহণ করেন নি, সে কথা কারো অবিদিত নেই। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, শাস্ত্রের সাহায্যে হয়তো বা কিছু কার্যোদ্ধার হবে, যুক্তিতর্ক দিয়ে কিছুই হবে না। বিদ্যাসাগর আপন দেশবাসীকে বিলক্ষণ চিনতেন।

অতএব প্রাগুক্ত রামমোহনাদি সকলেই লুথার জাতীয় সমাজ ও ধর্মসংস্কারক। যে বাইবেল পোপ মানেন, খৃষ্টান মাত্রই মানে—সেই বাইবেল দিয়েই তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন যে প্রত্যেক মানুষেরই বিধিদত্ত অধিকার আছে—আপন বুদ্ধি অনুযায়ী বাইবেল থেকে বাণী গ্রহণ করে আপন জীবন চালনা করার; 'চিরন্তন, অভ্রান্ত' কোনো পোপকে স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। তলস্তয়, গাঁধী এই সম্প্রদায়ের।

ভলতেয়ার এ পথ স্বীকার করেন নি। তিনি নির্ভর করেছিলেন যুক্তি (রীজন), শুভবুদ্ধি (মোটামুটি কমন সেন্‌স্), মানবতা ও ইতিহাসের শিক্ষার উপর। তাঁর কমনসেন্‌স্ ও ইতিহাসের উপর বরাত মানার একটা উদাহরণ দি। দক্ষিণ ভারতের হিন্দুরা ধর্মান্ধ হয়ে যে প্রথম খৃষ্টান মিশনারী সিন টমাসকে আক্রমণ করে হত্যা করেছিল বা পশ্চাদ্ধাবিত হলে পর তিনি গুহাগহ্বরে বিলীন হয়ে যান, সেই কিংবদন্তী অস্বীকার করে আলোচনা করতে গিয়ে ব্যঙ্গের সুরে ভলতেয়ার বলছেন, যে হিন্দুর পরধর্মে সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে আমরা বহুকাল ধরে বহু পর্যটকের কাছ থেকে শুনে আসছি, সেইটে হঠাৎ অবিশ্বাস করতে কাণ্ডজ্ঞানে (কমন সেন্‌সে) বাধে। এ দেশের বনবিহারী ভলতেয়ার—কিন্তু তিনি ভলতেয়ারের শিষ্য নন।

তবে জনসাধারণ বনবিহারীকে চেনে না কেন? তার সর্বপ্রধান কারণ, বনবিহারী নিজেকে কখনো সংস্কারক, যুগান্তকারী মহাপুরুষরূপে দেখেন নি। হয়তো তিনি ভাবতেন, উচ্চাসনে দণ্ডায়মান হয়ে অনলবর্ষী ভাষণের সাহায্যে জনসাধারণকে উত্তেজিত করে, কিংবা ভাবালুতার বন্যায় দেশকে ভাসিয়ে দিয়ে কোনো দীর্ঘস্থায়ী সুদৃঢ় পরিবর্তন আনা যায় না। কিংবা হয়তো স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিক বিনয়বশতঃ (সামান্য পরিচয়ের ন'সিকে লোক ভাবতো, তাঁর মত দম্ভী গর্বী ত্রিসংসারে বিরল—বিশেষতঃ লোকটা যখন স্বয়ং ঈশ্বরকে তাঁর যুগযুগাধিকৃত স্বর্গীয় সিংহাসন থেকে সরাতে চায়!) তিনি পেডেস্টেলে আরোহণ করতে

৩ কেউ যদি পান, আমাকে দয়া করে জানাবেন কি? আগের থেকেই ধন্যবাদ দিচ্ছি।

চাইতেন না, কিংবা হয়তো তিনি নৈরাশ্যবাদী ছিলেন। তা সে যা-হোক, আমরা যে তাঁর মত কিংবা তাঁর চেয়েও শক্তিশালী লোকের জন্য এখনো প্রস্তুত হই নি সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

কিন্তু কেন ?

বনবিহারী তো এমন কিছু নূতন কথা বলেন নি যা ভারতে কেউ কখনো বলে নি। স্থির হয়ে একটু ভাবলেই ধরা পড়বে ভারতবর্ষের চিন্তা-জগৎ (ধর্ম-শাস্ত্র-নীতি-আচার-ঐতিহ্য-কলা-জ্ঞানবিজ্ঞান) কি দিয়ে গড়া।

১। সনাতন হিন্দুধর্ম ২। বৌদ্ধধর্ম ৩। জৈনধর্ম ৪। দর্শনের মধ্যে নিরীশ্বর সাংখ্য ৫। চার্বাক প্রভৃতি লোকায়ত মতবাদ।

প্রথমটি বাদ দিলে বাকি চারটি চিন্তাধারাতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বার বার সাবধান-বাণী প্রচারিত হয়েছে, তোমার সুখ-শান্তি, তোমার পরমাগতি সম্পূর্ণ তোমারই হাতে ; দৃশ্য এবং অদৃশ্য কোনো লোকেই এমন কোনো অলৌকিক শক্তি নেই যে তোমাকে কোনো প্রকারে কণামাত্র সাহায্য করতে পারে। এই চিন্তাধারা আদৌ অর্বাচীন নয়। বৈদিক যুগে দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে যখন যাগযজ্ঞহোমপশুবলি সর্বত্র স্বীকৃত, ঋষিকবিগণ যখন তাঁদের উদ্দেশ্যে সবিস্ময়ে অপৌরুষেয় মন্ত্র উচ্চারণ করছেন, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাচ্ছি আরেকটি দ্বিধাজড়িত কণ্ঠ, আরেক সত্যান্বেষী প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন—ধন্য হোক সে প্রশ্ন, ধন্য হোক তার জন্ম-লগ্ন—'তাহলে কোন্ দেবতাকে আমি স্বীকার করবো ?' এই প্রশ্ন থেকেই আরম্ভ হল, চরম সত্যের—আলটিমেট রিয়েলিটির—অনুসন্ধান। এই প্রশ্নের দুটি উত্তর পাওয়া যাচ্ছে পরবর্তী আরণ্যক-উপনিষদের যুগে—বেদান্তের মূল সূত্র সব-কিছুই ব্রহ্ম, এই তিন ভুবন আনন্দময় ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত। দ্বিতীয় সম্পূর্ণ বিপরীত উত্তর জন্ম নেয় ঐ সময়েই, হয়তো তার পূর্বেই, এবং সবল কণ্ঠে ধ্বনিত হয় লোকায়ত মতবাদে এবং তারও পরে তীর্থঙ্করদের কণ্ঠে, বুদ্ধদেবের কণ্ঠে—দেবদেবীতে পরিপূর্ণ অনাস্থা প্রকাশ করে মানুষকে সৃষ্টির কেন্দ্ররূপে স্বীকার করা। এরই চরম বিকৃতরূপ—চার্বাকের মতবাদ, যে মতবাদ নৈতিক দায়িত্বে পর্যন্ত বিশ্বাস করে না।

বৌদ্ধধর্ম এ-দেশ থেকে লোপ পেয়েছে, কিন্তু সে মতবাদ সম্পূর্ণ বহিষ্কার করা সম্ভব হয় নি। তর্কযুদ্ধে পরাজিত কোনো এক সাংখ্যতীর্থ বোধ হয় বৌদ্ধবৈরী শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে বক্রোক্তি করেছিলেন, বৌদ্ধদর্শনের সঙ্গে যে এতখানি সন্ধি করেছে যে, সে মতবাদ আত্মসাৎ করতে তার বাধে নি, তাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলবো, না তবে কি বলবো ?

আর নিরীশ্বর জৈনরা তো, এখনো ভারতবর্ষে বাস করেন।

নিরীশ্বর সাংখ্যের চর্চা করেন এখনো বহু পণ্ডিত: যাঁদের মতে ঈশ্বর প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ।

নৈয়ায়িকরা কোন্ পন্থায়?

এবং এদেশের সহজিয়ারা সৃষ্টিকেন্দ্র করেছেন মানুষকে: 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

পূর্বেই বলেছি, বনবিহারী ভলতেয়ারের শিষ্য নন। তিনি ভলতেয়ারের শিষ্য এ-কথা তাঁর সামনে বললে তিনি নিশ্চয়ই তেড়ে আসতেন। অবশ্যই বলতেন, ভলতেয়ার যদি দেখেন যে তাঁর মতবাদ আমার মতবাদের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে তবে তিনি গর্ব অনুভব করতে পারেন; আমার তাতে কি? আবার তাঁকে যদি বলা হ'ত, তিনি ঐতিহ্যগত বৌদ্ধ-জৈন-সাংখ্য দর্শন প্রচার করছেন তবে তিনি নিশ্চয়ই আরো মারমুখো হতেন। নিশ্চয়ই বলতেন, 'চুলোয় যাক্ ("জাহান্নমে[৪] যাক", নিশ্চয়ই বলতেন না, কারণ যে জায়গা নেই, সেখানে কোনো মতবাদকে পাঠিয়ে বনবিহারী অবশ্যই সন্তুষ্ট হতেন না!) তোমার সাংখ্য জৈন মতবাদ; পিছন পানে তাকাও কেন? নিজের বুদ্ধি, নিজের যুক্তি, নিজের রেশনালিটির উপর নির্ভর করতে পারো না? কপিল-জীনের ঠ্যাকনা ছাড়া বুঝি দাঁড়ানো যায় না? তুমি আছ, আমি আছি—ব্যস্। আমরা বের করে নেব ন্যায় আচরণ কি? আর রাগ কোরো না, আমি আমারটা বহুপূর্বেই একাই বের করে নিয়েছি।'

ডন্ কুইকসটের সঙ্গে বনবিহারীর মাত্র একটা বিষয়ে পার্থক্য। বিস্তর মধ্যযুগীয় রোমান্টিক কাহিনী পড়ে পড়ে ডনের মাথা গরম হয়ে যায়। তিনি ভাবলেন তিনি সে যুগের শিভালরাস্ নাইটদের একজন।[৫] ব্যস্, আর যাবে

---

৪ জাহান্নম এসেছে হীব্রু গেহানেস থেকে;

বলা উচিত দুটো শব্দই কগ্নেট। এই গেহানেস প্যালেস্টাইনের ভ্যালি অব্ ডেথ্—ভৌগোলিক উপত্যকা।

৫ এ যুগের ভাইসচ্যান্সেলর হাস্সান সুহ্রাওয়ার্দী যখন লাটসাহেবকে বীণা-কল্যাণীর হাত থেকে বাঁচান তখন তাঁকে রাতারাতি (অর্থাৎ এক night নাইটে-ই) নাইট (knight) করা হয়। সেই উপলক্ষ্যে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র (?) শহীদ সুহ্রাওয়ার্দী একটি অতুলনীয় কবিতায় বলেন, 'মধ্যযুগে ড্র্যাগনের (রাক্ষস) হাত থেকে কুমারী উদ্ধার করে বীরপুরুষ নাইট হতেন. এ যুগে কুমারীর হাত থেকে ড্র্যাগনকে রক্ষা করে মানুষ নাইট হয়।'

কোথায়। দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে একাকী, সম্পূর্ণ একা তিনি খোলা তলওয়ার হাতে আক্রমণ করলেন জলযন্ত্রকে (উইণ্ড মিলকে)।

তারও বহু পরে যিনি এ-যুগের সর্বশেষ নাইট বলে নিজেকে প্রচার করেন তিনি ফীল্ড মার্শাল হেরমান্ গ্যেরিঙ—ন্যুর্নবের্গ মোকদ্দমায়। তাঁর কৃতিত্ব: জর্মনিতে তিনিই সর্বপ্রথম কন্‌সানট্রেশন ক্যাম্প স্থাপনা করেন (অবশ্য তার বহু পূর্বে ইংরেজ করেছিল বোয়ার-যুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকায়) এবং আইষমানের ইহুদি-হননে তাঁর সম্মতি ছিল। নিহত ইহুদিদের ভিতর লক্ষাধিক কুমারী কন্যাও ছিল।

বনবিহারী কপিল-জীন-চার্বাক পড়ে পড়ে ডনের মত মাথা গরম করেন নি। ধীরস্থির মনে চিন্তা করে, মীমাংসায় পৌঁছে তিনি আক্রমণ করলেন বঙ্গদেশের জগদ্দল জাড্যকে। এখনো তাঁর মাথা কতখানি ঠাণ্ডা সেটা বোঝা যায় এর থেকে যে, তখনো তাঁর ঠোঁটে হাস্য-ব্যঙ্গ-রস—তাঁর নব-প্রকাশিত নাস্তিক্য প্রচারকামী পত্রিকা 'বেপরোয়া'র (বাঙলা দেশে এ ধরনের কাগজ বোধ হয় এই প্রথম আর এই শেষ) প্রথম সংখ্যায় প্রথম 'war song'-এ তিনি বললেন,

'টলবো না কো অনুস্বার আর বিসর্গের
ঐ ছর্‌রাতে
কিংবা দেখে টিকির খাড়া সঙ্গীন !'

সে পত্রিকায় কি না থাকতো ? ধর্ম, দর্শন, নীতিশাস্ত্র থেকে আরম্ভ করে সাহিত্য, চিত্র—এন্তেক পদিপিসির মাদুলি, হাঁচি-টিকটিকি। এর পূর্বে তিনি 'ভারতবর্ষে' ব্যঙ্গচিত্রসহ বঙ্গজীবনবৈচিত্র্য তাবলো পদ্ধতিতে প্রকাশ করেছেন: তার একটি ছিল কেরানী—লোলচর্ম অস্থিসার জীর্ণবেশ রুক্ষ-কেশ কেরানীর ছবির নিচে ছিল,

'চাকরি গেল, চাকরি গেল, চাকরি রাখা
বিষম দায়
ঐ গো, বুঝি ন'টা বাজে, ঐ গো বুঝি
চাকরি যায় !
বিজলি-বাতির ফানুস হেন ঠুন্‌কো
মোদের চাকরি ভাই !
ফট করে সে ফাটে, কিন্তু ফাটার শব্দে
চমকে যাই।'

সর্বশেষে কেরানী যেন বৈদ্যগুরু, কবিরাজ, ডাক্তার, মহামান্য শ্রীযুত

বনবিহারী মুখোপাধ্যায়কেই ব্যঙ্গ করে বলছে (উইথ এ টুইস্টেড আইরিশ স্মাইল)—

'ভরা পেটে ছুটতে মানা ? চিবিয়ে খাওয়া স্বাস্থ্যকর ?
চাকরি আগে বাঁচাই দাদা, প্রাণ বাঁচানো সে তারপর।'

রবীন্দ্রসৃষ্টির সঙ্গে আমি ঈষৎ পরিচিত। রবীন্দ্ররসিকদের রচনা আমি পড়েছি। অধুনা 'রবীন্দ্রায়ণ'ও (অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সংকলন, তদুপরি অতুলনীয় সম্পাদন) অধ্যয়ন করেছি। তারপরও বলবো, মুক্তকণ্ঠে বলবো, বনবিহারীর মত রবীন্দ্রসৃষ্টির চৌকশ সমঝদার আমি দ্বিতীয়টি দেখি নি। তাই আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যে সব বিরুদ্ধ সমালোচনা বেরিয়েছে, তার মধ্যে বনবিহারীর সমালোচনাই সর্বোৎকৃষ্ট। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের অন্য সমালোচকদের প্রতি তিনি ছিলেন হাড়ে হাড়ে চটা। বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলতেন, 'রসসৃষ্টির পথে যত সব অবান্তর বস্তু নিয়ে বর্বরস্য শক্তিক্ষয়! রবীন্দ্রনাথ নাকি নগ্ন যৌনের অশ্লীল ছবি আঁকেন—তা তিনি আঁকেন নি। আর যদি আঁকেনই বা, তাতেই বা কি ? এ সব তো সম্পূর্ণ অবান্তর—রসসৃষ্টি হলেই হল! রবীন্দ্রনাথের রূপক নাকি অস্পষ্ট! তা হলে চশমা নাও—ওঁকে দোষ দিচ্ছো কেন ?'

তার পর বুঝিয়ে বলতেন, 'দে আর অল বার্কিং আপ দি রং ট্রী'—অর্থাৎ বেরালটা উঠেছে একটা গাছে, আর কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করছে অন্য গাছের গোড়ায়।

সত্যেন দত্তকে আজকের দিনে লোক আর স্মরণে আনেন না ; অথচ তিনি যখন সবে আসরে নেমেছেন, সেই সময় থেকেই বনবিহারী তাঁর প্রশংসা গেয়েছেন। সেই সত্যেন দত্তই যখন এই শতাব্দীর দ্বিতীয় শতকে মাঝে মাঝে অনুপ্রাস ও ছন্দের ম্যাজিকের (জাগ্‌লারি) 'কেরদানি' দেখাতেন, তখন বনবিহারী অতিষ্ঠ হয়ে 'বেপরোয়া'তে অপ্রিয় সমালোচনা করেন। আমরা তখন তাঁকে বলি, 'এগুলো নিছক এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট জাতীয় জিনিস ; আপনি অত সিরিয়াসলি নিচ্ছেন কেন ?' আরেক টিপ নস্য নিয়ে—এইটাই ছিল তাঁর একমাত্র বদঅভ্যাস, আর ঐ করে করে করেছিলেন তাঁর কণ্ঠস্বরের সর্বনাশ—বললেন, 'তা হলে ছাপানো কেন ? যে প্রচেষ্টা রসের পর্যায়ে ওঠে নি সেটা প্রকাশ করে বিড়ম্বিত হওয়ার কি প্রয়োজন ?'

দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র, রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথও বলতেন,

শতং বদ
মা লিখো

শতং লিখো
মা ছাপো।

* * *

আরো বহু স্মৃতি বার বার মনে উদয় হচ্ছে। একদা দুরারোগ্য রোগের অসহ্য যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাবার পথ তিনি আমাকে দেখিয়ে দেন। রিটায়ার করার বহু পরে তিনি একবার কলকাতায় এসে কি করে খবর পান আমি অসুস্থ। বিশ বছর ধরে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ নেই। তিনি খবর পাঠালেন। সব শুনে বললেন, 'এ রোগ সারে না—তবু তুমি পরেশ চক্রবর্তীর কাছে যাও। আমি বহু ছেলে পড়িয়েছি—সব ব্ল্যাঙ্কো। ঐ একটি ছেলের আক্কেলবুদ্ধি ছিল। বিলেত থেকে ও নিয়ে এসেছে এ টু জেড বিস্তর ডিগ্রী।' আমি তাঁর কাছে গেলে সে ডাক্তার বলেন, 'গুরু এই প্রথম আমাকে একটি রোগী পাঠালেন। কি বলেছেন উনি? এ রোগ সারে না? না, সারে।' তিনি আমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দিয়েছিলেন। এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করে করে নয়। প্রথম ওষুধ দিয়েই। কিন্তু সে আরেক কাহিনী। এবং সবচেয়ে সন্তাপের কথা, এই কৃতবিদ্য চিকিৎসক অল্প বয়সে গত হন।

* * *

৫ই জুলাই বনবিহারী পঞ্চভূতে লীন হন।

সাহিত্যিকশ্রেষ্ঠ 'বনফুল' তাঁর সম্বন্ধে 'দেশ' পত্রিকার ১৫ই শ্রাবণ সংখ্যায় অতি অল্প কয়েকটি কথা বলেছেন, কিন্তু হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে, এবং তার প্রত্যেকটি শব্দ যেন আমার বুকের উপর হাতুড়ি পিটছে। আমি এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে যা প্রকাশ করতে সক্ষম হই নি, তিনি অল্প কথাতেই সেটি মূর্তমান করেছেন।

"বঙ্গ সাহিত্য-ভাণ্ডারে তাঁর (বনবিহারীর) দান চিরকাল অম্লান হয়ে থাকবে। রাজনৈতিক সামাজিক কোনও অন্যায়ের সঙ্গে কখনও তিনি রফা করেন নি। অনবদ্য তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে সে-সবের বিরুদ্ধে সাহিত্যিক প্রতিবাদ তিনি করে গেছেন। সেকালের ভারতবর্ষ, বঙ্গবাণী, শনিবারের চিঠি, বেপরোয়া প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠায় তাঁর কীর্তি এখনও মণি-মুক্তার মতো ঝলমল করছে। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন অনমনীয় দুর্বার প্রকৃতির লোক। কখনও কারো অন্যায় সহ্য করতে পারেন নি। সুতরাং কারও সঙ্গে তিনি মানিয়ে চলতে পারেন নি, কারো সঙ্গে তাঁর বনে নি। এজন্যে শেষ জীবনে প্রায় একা একা নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে হয়েছে তাঁকে। অতিশয় বিচক্ষণ

চিকিৎসক ছিলেন। সিভিল সার্জন হয়ে বগুড়া থেকে রিটায়ার করেন।... পৃথিবীতে নিখুঁত মানুষ নেই, নিখুঁত মানুষের সন্ধানেই তাঁর সারা জীবন কেটেছে। কিন্তু কোথাও সে মানুষ পান নি। নিঃসঙ্গ জীবনই কাটাতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর একটি ভাই তাঁকে ছাড়েন নি। বঙ্কুবিহারীই শেষ পর্যন্ত ছিলেন তাঁর সঙ্গে। শেষে তিনি নিজের ঠিকানাও কাউকে জানাতেন না। গত ৫ই জুলাই তিনি মারা গেছেন।"

বনফুলই তো চেনে বনবিহারীকে। আর এই 'বনবিহারী' নাম সার্থক দিয়েছিলেন তাঁর গুরুজন! জনসমাজে বাস করেও তিনি যেন সারাজীবন 'বনেই' 'বিহার' করলেন।

আমার আর মাত্র দুটি কথা বলার আছে।

বনবিহারী যে হিন্দু-সমাজ ও বাঙালীর কঠোর সমালোচনা করে গিয়েছেন তার কারণ এই নয় যে, তিনি এই দুটিকেই পৃথিবীর নিকৃষ্টতম বলে মনে করতেন। তিনি নিজকে প্রফেট বা রিফর্মার বলে মনে করতেন না। কাজেই বিশ্বভুবনের তাবৎ জাড্য দূর করার ভার আপন স্কন্ধে তিনি তুলে নেন নি। এমন কি তাঁর হাতের আলোটিও তিনি উঁচু করে তুলে ধরেন নি। সে-আলো তাই পড়েছিল মাত্র তাঁর আশপাশের সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, সাহিত্যের উপর। তারই মলিনতাটুকু তিনি দেখিয়ে গিয়েছেন মাত্র। তবুও আমার মনে হয়েছে, তিনি রবীন্দ্রনাথের 'জ্যাঠামশাই' ও রলাঁর 'জ্যাঁ ক্রিস্তফ্'-এর সমন্বয়—কোনো কোনো ক্ষেত্রে। 'জ্যাঁ ক্রিস্তফ্' বনবিহারীর অন্যতম প্রিয় পুস্তক (ডাক্তার হয়েও—সিরিয়াস ডাক্তাররা সাহিত্যচর্চার সময় পান কম—তিনি সম্পূর্ণ নিজের সাধনায় বিশ্বসাহিত্যের কতখানি আয়ত্ত করেছিলেন সেটা বোঝাবার চেষ্টা করবো না)।

আজ তিনি জীবিত নেই, তাই বলবার সাহস পাচ্ছি, তিনি বাঙালীকে ভালোবাসতেন। তাঁর জীবিতাবস্থায় একথা বললে তিনি বোধ হয় আর আমার মুখ দর্শন করতেন না। বাঙালী বলতে তিনি হিন্দু—বিশেষ করে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু—মুসলমান, ইলিয়ট রোড অঞ্চলের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, সকলকেই বুঝতেন।

এইবারে আমার শেষ বক্তব্যটি নিবেদন করি। এ কথাটি তাঁর জীবিতাবস্থায় বললে তিনি সুনিশ্চিত রামদা নিয়ে আমার পশ্চাদ্দেশে ধাবমান হতেন।

ইংরিজিতে বলে—"মিক্স অব্ হিউমেন কাইণ্ডনেস্।"

অনিচ্ছায় বলছি, কিন্তু এস্থলে বলার প্রয়োজন, আমি বিস্তর দেশ-বিদেশ

দেখেছি। বহু সমাজসেবী, হাসপাতাল চালক মিশনারি, রেডক্রসের একনিষ্ঠ সেবক কর্মী সর্বত্যাগী মহাজন, স্তালিনগ্রাদের বিভীষিকাময় রক্তাক্ত রণাঙ্গন-প্রত্যাগত সার্জনকে আমি চিনি। বনবিহারীর হৃদয়ের অতিশয় গোপন কোণে যে ভুবন-জোড়া স্নেহমমতার ভাণ্ডার ছিল—সে রকম তো আর কোথাও দেখলুম না। সেই স্নেহমমতাই তাঁর আপন সুখশান্তি হরণ করেছিল। সেই বেদনাবোধই তাঁকে উত্তেজিত করতো খড়্গ ধারণ করে অন্যায়, অসত্য, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে।

এই স্নেহমমতা তিনি এমনই সঙ্গোপনে রেখেছিলেন যে, অধিকাংশ লোকই তাঁর কঠোর ভাষা, তীব্র কণ্ঠ, নির্মম ব্যঙ্গ শুনে বিভ্রান্ত হয়েছে। বনবিহারীর সেজন্য কণামাত্র ক্ষোভ ছিল না। তাঁর সহানুভূতি তিনি রাখতেন আরো গোপন করে।

আমরা বোধ হয় অত্যন্ত সহিষ্ণু। কিংবা যথেষ্ট ইতিহাস পড়ি নি। নইলে সোক্রাতেস খৃস্টের জন্য একদা যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল বনবিহারীর জন্য সেটা করা হল না কেন?

কিন্তু এই অনুভূতিগত অভিজ্ঞতা গদ্যে প্রকাশ করা যায় না।

বনবিহারীর প্রয়াণ উপলক্ষ্যে 'বনফুল' যে সনেটটি লিখেছেন সেটি উদ্ধৃত করি :—

'বনবিহারী মুখোপাধ্যায়'

পাষাণে আঘাত হানি, অসি তীক্ষ্ণধার
চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'ল? কঙ্কর কণ্টক
জয়ী হ'ল বিক্ষত করিয়া বার বার
বলিষ্ঠ পথিক-পদ? ধূর্ত ও বঞ্চক
সাধুরে লাঞ্ছিত করি' বিজয়-কেতন
আস্ফালন করিল আকাশে? অন্ধকার
গ্রাসিল কি রবি? না—না—নতি-নিবেদন
করি' পদে উচ্চকণ্ঠে কহি বারংবার
নহে ব্যর্থ, পরাজিত, হে বহ্নি-কমল
তমোহন্ত্রী, হে প্রদীপ্ত মশাল-বর্তিকা,
অগ্নি তব অনির্বাণ, চির-সমুজ্জ্বল,
অনবদ্য অপরূপ ঊর্ধ্বমুখী শিখা।

মহাপ্রস্থানের পথে বিগত অর্জুন
অস্ত্রাগারে রেখে গেছে শরপূর্ণ তূণ।

অদৃষ্টের রঙ্গরস

আওরেঙ্গজেব মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাবৎ ভারতবর্ষে লেগে গেল ধুন্ধুমার। বাদশাহ হবেন কে?

এস্থলে স্মরণ করিয়ে দি যে, আর্য এবং একাধিক আর্যেতর জাতির মধ্যে প্রথা—রাজার মৃত্যু হলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনা বাধায় সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তুর্কমানিস্তানের মোগলদের ভিতর এরকম কোনো ঐতিহ্য ছিল না। তাদের ছিল 'জোর যার মুল্লুক তার'। আরবদের ভিতর গোড়ার দিকে এই একই প্রবাদ অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট (খলীফা) নিযুক্ত হতেন, তবে 'জোরের' বদলে সেখানে ছিল চরিত্রের, শৌর্যবীর্যের, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব। তাই বলা হ'ত, 'সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হবেন খলীফা,—হন-না তিনি হাবশী (নিগ্রো)।' এবং সেটাও ঠিক করা হ'ত গণভোট দিয়ে।

তাই মোগল রাজা মারা যাওয়া মাত্রই, কিংবা তিনি অথর্ব অসমর্থ হয়ে পড়লেই লেগে যেত রাজপুত্রদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ। কোনো কোনো সময় রাজার নাতিরাও এবং অন্য বাজে লোকও এই লড়াইয়ের লটারিতে নেবে যেতেন। অবশ্য রাজরক্ত না থাকলে তাঁর সম্রাট হবার সম্ভাবনা থাকতো না। পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, ফররুখসিয়ারের রাজত্বের শেষের দিক থেকে মুহম্মদ শাহ বাদশা রঙীলার সিংহাসনারোহণ পর্যন্ত সিন্ধু দেশের সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় দিল্লীতে সিংহাসনের সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন। রাজার পর রাজাকে তাঁদের হাতে পুতুলের মত নাচতে হয়েছে। কিন্তু খ্যাতি, শক্তি, অর্থবলের মধ্যাহ্নগগনে থাকাকালীনও তাঁদের কারো তখ্‌ৎ-ই-তাউসে বসবার দুঃসাহস হয় নি। সৈয়দ পয়গম্বরের বংশধর,—তিনি সম্মান পাবেন মসজিদে, মক্তবে, মাদ্রাসায়—রাজসভায় কবিরূপে, ঐতিহাসিকরূপে—সমাজে গুরুরূপে, কিন্তু মোগল রাজবংশের রক্ত তাঁদের ধমনীতে ছিল না বলে দিল্লীর হিন্দু-মুসলমান তাঁদের বাদশাহ-সালামৎরূপে কিছুতেই এঁদের স্বীকার করতো না। ঠিক ঐ একই কারণে মারাঠা ও ইংরেজ দিল্লীর সিংহাসনে বসতে চায় নি। সিপাহ বিদ্রোহ চূর্ণবিচূর্ণ না করা পর্যন্ত ইংরেজ স্বয়ং মহারানী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের অধীশ্বরী বলে ঘোষণা করবার সাহস পায় নি। এবং সেটাও করেছিল অতিশয় সভয়ে।

রাজা বা সার্বভৌম আমীরের মৃত্যুর পর যুবরাজদের ভিতর ভ্রাতৃযুদ্ধের মারফতে কে সবচেয়ে শক্তিশালী সেটা বের করা তুর্কমানিস্তানের ছোট ছোট প্রদেশে প্রবল বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে না। কিন্তু ভারতের (এবং অনেক সময় কাবুল কান্দাহার গজনীর উপরও দিল্লীর আধিপত্য থাকতো) মত বিরাট দেশে এ প্রকারের যুদ্ধ বিকট অরাজকতা ও দীর্ঘকালব্যাপী অশান্তির সৃষ্টি করতো। লোকক্ষয়, অর্থক্ষয় তো হ'তই,—অনেক সময় একই ভূখণ্ডের উপর ক্রমাগত অভিযান ও পাল্টা অভিযান হওয়ার ফলে সেখানে চাষবাস হ'ত না, ফলে পরের বৎসর দুর্ভিক্ষ হ'ত। সাধারণজনের বাড়িঘরদোর তো নষ্ট হ'তই, কলাসৃষ্টির উত্তম উত্তম নিদর্শনও লোপ পেত। এইসব যুদ্ধবিগ্রহের ফলেই ইওরোপের তুলনায় এদেশে বেঁচে আছে অতি অল্প রাজপ্রাসাদ। কোনো কোনো স্থলে পলায়মান সৈন্য পথপ্রান্তের প্রতিটি ইঁদারাতে বিষ ফেলে যেত। ফলে বৎসরের পর বৎসর ধরে পার্শ্ববর্তী জনপদবাসীর একমাত্র জলের সন্ধান অব্যবহার্য হয়ে থাকতো।

এই দলাদলি মারামারি থেকে, কি দিল্লী-আগ্রার মত বৃহৎ নগর, কি সুদূর সুবের (প্রভিন্স্) ছোট শহর, আমীর-ওমরাহ, সিপাহসালার, ফৌজদার প্রায় কেউ নিষ্কৃতি পেতেন না। কারণ এঁদের প্রায় প্রত্যেকেই আহ্বান, আদেশ, অনুনয়-ভরা চিঠি পেতেন প্রত্যেক যুযুধান রাজপুত্রের কাছ থেকে—'আমাকে অর্থবল সৈন্যবল সহ এসে সাহায্য করো।' তখন প্রত্যেক আমীরের সামনে জীবনমরণ সমস্যা দাঁড়াতো—আখেরে জিতবে কোন্ ঘোড়াটা, ব্যাক্ করি কোন্‌টাকে? অতিশয় বিচক্ষণ কূটনৈতিকরাও রং হর্স ব্যাক্ করে আপন, এবং কোনো কোনো স্থলে সপরিবার, প্রাণ দিয়ে ভুলের খেসারতী দিয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষ থাকবার উপায় ছিল না। মোগল রাজপুত্র মাত্রই ইংরিজি প্রবাদটাতে বিশ্বাস করতেন, 'ওয়ান হু ইজ নট্ উইদ্ মী ইজ্ এগেন্স্ট্ মি', যে আমার সঙ্গে নয়, সে আমার বিপক্ষে।

নির্ঝঞ্ঝাটে প্রতিষ্ঠিত বাদশাদের তো কথাই নেই, অতিশয় টলটলায়মান সিংহাসনে বসে দু'দিনের রাজাও সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিতেন সেপাই-শান্ত্রী, ফাঁসুড়ের দল—তাঁর নিকটতম আত্মীয়দের উভয় চক্ষু অন্ধ করে দেবার জন্য—যেন তারা চিরতরে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে সিংহাসন লাভের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা না করতে পারে। শান্তিকামী, ধর্মাচরণে আজীবন নিযুক্ত, সিংহাসন আরোহণে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক জনেরও নিষ্কৃতি ছিল না। নিষ্কৃতি ছিল একমাত্র পন্থায়—আত্মীয়-স্বজন দেশ-দেশ ত্যাগ করে মক্কায় গিয়ে আশ্রয় নেওয়া। তবে সেটাও

করতে হ'ত আগেভাগে পরিপূর্ণ শান্তির সময়। একবার ধুন্ধুমার লেগে যাওয়া মাত্রই তামাম দেশে এসে যেত এমনই অশান্তি, লুটতরাজ যে তখন আর বন্দরে গিয়ে জাহাজ ধরার উপায় থাকতো না। এমন কি পরিপূর্ণ শান্তির সময়ও আগেভাগে শেষ রক্ষা বাবদে কসম্ খাওয়া যেত না—মক্কাতে নির্বাসিত বাইরাম খান নাকি পথমধ্যে গুজরাতে আকবরের গুপ্তচর দ্বারা নিহত হন।

ইংরেজ ফার্সীতে লিখিত ইতিহাসরাজির সব কটাকেই গণ্ডায় আণ্ডা মিলিয়ে নিন্দাবাদ করে বলেছে, এ-সবেতে আছে শুধু লড়াই আর লড়াই। বিবেচনা করি, ওগুলোতে যদি গণ্ডায় গণ্ডায় শান্তিকামী পীর-দরবেশ ঘুরে বেড়াতেন, কিংবা তার চেয়েও ভালো হ'ত যদি রাজা-প্রজায় সবাই মিলে চাঁদনি চৌকে হাল্লেলুইয়া হর্ষরব তুলে ইংরেজের আগমনী গান ধরতেন, তাহলে বোধ হয় শ্বেত সমালোচকরা সন্তুষ্ট হতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে মোগলরা যে-ঐতিহ্য সঙ্গে এনেছিল সেটা তার বিকৃততমরূপে দেখা দিল তাদের পতনের সময়। ফলে স্বার্থে স্বার্থে যে সংঘাত উপস্থিত হল তার সমাধান যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোনো পন্থায় সম্ভব ছিল না। ঐতিহাসিকরা সেসব যুদ্ধের বর্ণনা না দিয়ে দি নেশন অব্ শপ্‌লিফটারসের জন্য সেই সৎকর্মের টেকনীক্ বয়ান করলে সত্যের অপলাপ হ'ত।

কিন্তু এসব ইতিহাস শুধু যুদ্ধে যুদ্ধে ভর্তি ছিল একথা বললে আরেকটা খুব বড় সত্য গোপন করা হয়। এদের প্রচুর সাহিত্যিক মূল্যও যে ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তার পূর্বেই একটি সত্য স্বীকার করে নিই। বিদেশাগত কিছু লোক ভিন্ন এদেশের কারোরই মাতৃভাষা ফার্সী ছিল না। এবং মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষাতে শত ভেল্কিবাজি দেখাতে পারলেও সেখানে সত্যকার সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ তত্ত্বও অনস্বীকার্য যে, সাহিত্য যে উপাদানে নির্মিত হয় তার অভাব ভারতবর্ষে রচিত ফার্সী ইতিহাসে কখনো ঘটে নি। তুলনা দিয়ে বলা যায়, রামায়ণের কাহিনী যত কাঁচা ভাষাতেই রচা হোক না কেন তার চিত্তাকর্ষণী শক্তি কিছু না কিছু থাকবেই।

তাই ফার্সী ভাষায় রচনাকারী ঐতিহাসিকরা হামেশাই কোনো বাদশার রাজত্বকালের তাবৎ লড়াই, বাদশার প্রসন্ন দৃষ্টি লাভের জন্য আমীরদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কূটনৈতিক চতুরঙ্গ ক্রীড়ার মারপ্যাচ ইত্যাদি বর্ণনা করার পর পঞ্চমুখ হতেন বাদশার বিবাহের সালঙ্কার বর্ণনা দিতে; সেই উপলক্ষে সম্মিলিত কবিকুলের বর্ণনা দিতে, এবং সর্বশেষে বাদশার ব্যক্তিগত গুণাগুণের উল্লেখ করতে। সব সময় যে তাঁরা নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে সমর্থ হতেন তা নয়, কিন্তু

বাদশা সজ্জন হলে তাঁর গুণ বর্ণনায় পঞ্চমুখ হতে কোনো অসুবিধাই উপস্থিত হ'ত না।

যেমন গুজরাতের এক বাদশা ছিলেন অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ, পুণ্যশীল। তাঁর জীবিতাবস্থায়ই গুণমুগ্ধ প্রজাসাধারণ তাঁর নাম দেন 'অল্-হালীম্'—'পুণ্যশীল'। মিরাৎ-ই-সিকন্দরী গুজরাতের প্রখ্যাত ইতিহাস। তার লেখক অল্-হালীমের সময়কালীন যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা দেবার পর পরমানন্দে হুজুর বাদশার সর্বপ্রকারের পুণ্যশীল খামখেয়ালির বর্ণন-পর্বে প্রবেশ করেছেন। কে বলবে তখন আমাদের এই ঐতিহাসিক শুধু যুদ্ধবিগ্রহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েই উল্লাস বোধ করেন। বস্তুত এই অনুচ্ছেদে প্রবেশ করার পর মনে হয় তাঁর যেন আর কোনো তাড়া নেই, মাথুরে পৌঁছনের পর কীর্তনিয়ার যে অবস্থা হয়। এ ইতিহাস তাঁকে যে একদিন শেষ করে 'তামাম্ শুদ্' লিখতে হবে সে ভাবনা তাঁর চৈতন্য থেকে যেন সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে।

হুজুর অল্-হালীম্‌কে এক বিদেশাগত পাচক এক নূতন ধরনের পোলাও খাওয়ালে পর হুজুর পরম পরিতৃপ্তি প্রকাশ করে বললেন, 'উজীর। আমার প্রজারা কি কখনো-সখনো এরকমের পোলাও খায়?' উজীর স্মিতহাস্য করে বললেন, 'হুজুর, তা কখনো হয়!' হুজুর বললেন, 'একা একা খেয়ে আমি কেমন যেন সুখ পাচ্ছি নে।' হুকুম দিলেন, মহল্লা মহল্লায় বিরাট বিরাট পাত্রে করে যেন হুবহু ঐ রকমের পোলাও তৈরী করে তাবৎ আহমদাবাদবাসীদের খাওয়ানো হয়। আমাদের ঐতিহাসিকটি যেন ঈষৎ আমোদ উপভোগ করে ইঙ্গিত করেছেন, প্রধানমন্ত্রী হুজুরের এসব 'খামখেয়ালীর অপব্যয়' দেখে ভারী বিরক্ত হতেন।

তা সে যা-ই হোক তাবৎ আহমদাবাদবাসী সেদিন কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে দিনভর ফিস্টি খেলে। যে সাবরমতীর পারে বসে বহু যুগ পরে রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষুধিত পাষাণ' রচেছিলেন সেই সাবরমতীর পারে সেদিন আর কেউ ক্ষুধিত রইল না।

ঠিক ঐ রকমই দিল্লীর শেষ মোগলদের কোন্ এক বাদশার বিয়ের শোভাযাত্রায় উঁচু হাতীর পিঠ থেকে রূপো দিয়ে বানানো ফুল রাস্তার দু' পাশের দর্শকদের উপর মুঠো মুঠো ছড়ানো হয়। ঐতিহাসিক খাফী খান—কিংবা খুশ্-হাল্-চন্দ বা অন্য কেউ হতে পারেন, আমার মনে নেই—যখন তাঁর ইতিহাস লিখছেন তখন দিল্লীর বড় দুঃখের দিন। সেই জাঁকজমক শান্-শওকতের স্মরণে যেন উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছেন, 'এ অধমও সেই দর্শকদের মধ্যে ছিল। সেও তার কুর্তার দামন্ (অগ্রভাগ, অঞ্চল) দু' হাত দিয়ে প্রসারিত করে

উদ্‌গ্রীব আকাঙ্ক্ষায় প্রতীক্ষা করলো। এ অধমের কী সৌভাগ্য, কী খুশ-কিস্মৎ! আম্মো তিনটে ছোট ছোট ফুল পেয়ে গেলুম। জয় হোক দিল্লীশ্বরের! জগদীশ্বর তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন!'

এ যুগের ইতিহাস বিষাদময়, কিন্তু ঘটনাবহুল বলে একাধিক ফার্সীজ্ঞ হিন্দুও তার সুদীর্ঘ বিবরণ লিখে গিয়েছেন। তার একটি ঘটনার বর্ণনা দেবার জন্য বক্ষ্যমাণ লেখেন। কিন্তু তৎপূর্বে এক লহমার তরে আহমদাবাদ ফিরে যাই।

মিরাৎ-ই-সিকন্দরী ইতিহাস বলে, অল্‌-হালীম্‌ আহমদাবাদের দুর্দান্ত শীতে লক্ষ্য করলেন, গৃহহীনদের দুরবস্থা। আদেশ দিলেন যে, প্রতি চৌরাস্তায় যেন সন্ধ্যার পর কাঠ পুড়িয়ে আগুন জ্বালানো হয়। বহু গৃহহীন এমন কি গৃহস্থও সেই আগুন ঘিরে বসে আগুন পোহাতে পোহাতে গাল-গল্প, গান-বাজনা করে রাত কাটাতো। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে অল্‌-হালীম্‌ বৃহৎ আবাস নির্মাণ করে দিলেন—ভিখিরি-গরীবের বসবাসের জন্য। ঐতিহাসিকরা বলতে পারবেন, এ ধরনের 'পুয়োর হোম' পৃথিবীর এই সর্বপ্রথম কি না।

শীতে যাতে তারা কষ্ট না পায় তার জন্য লেপের ব্যবস্থাও হল। মিরাৎ-ই সিকন্দরীর লেখক বলছেন, 'কিন্তু এসব লক্ষ্মীছাড়া ভ্যাগাবণ্ডদের কেউ কেউ আপন আপন লেপ বিক্রী করে দিয়ে মদ খেত। খবরটা কি করে জানি হুজুরের কানে গিয়ে পৌঁছল।' আমার মনে সন্দেহ হয়, হয়তো বা আমাদের সেই সিনিক প্রধানমন্ত্রী উজীর-ই-আজম্‌ সাহেবই মজা চেখে চেখে বাঁকা নয়নে তাকিয়ে হুজুরের অপব্যয়ের চরম পরিণামটি হুজুরেরই খেদমতে পেশ করেন!

তিনি নিজে করে থাকলে সেটা বুমেরাঙের মত তাঁরই কাছে ফিরে আসে। হুজুর বললেন, 'এটা কি করে ঠেকানো যায়, বলো তো উজীর।' উজীর অন্য-দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ভাবখানা করলেন, স্বাধীন সম্ভ্রান্ত আসমুদ্র রাজস্থানব্যাপী গুর্জরভূমির মহামান্য সম্রাটের অতিমান্য প্রধানমন্ত্রী 'নেপক্যাতা' নিয়ে মাথা ঘামাতে পারেন না! হুজুর কিন্তু উজীরের অতশত সূক্ষ্মানুভূতির পশ্চাদ্ধাবন করেন না। বললেন, 'রাতটা ভেবে দেখো।' উজীর-ই-আলা যে ভাবে কুর্নিশ করে বিদায় নিলেন তাতে মনে হল না যে, তিনি ত্রিযামা-যামিনী অনিদ্রায় যাপন করবেন।

পরদিন ফজরের নমাজের পরই, অর্থাৎ ব্রাহ্ম-মুহূর্তেই প্রধানমন্ত্রীর তলব পড়লো। হুজুর সহাস্য আস্যে তাঁকে বললেন, 'বুঝলে হে উজীর সাহেব, আমিই কাল রাত্রে চিন্তা করে দাওয়াইটা বের করেছি। প্রত্যেককে আলাদা লেপ না দিয়ে চার-চারজনকে এক-একটা করে বড় লেপ দাও। চারজনই তো আর

মদের গোলাম হবে না যে এক জোট হয়ে লেপ বিক্রী করে দেবে। যারা খায় না তারা ঠেকাবে।'

এ ধরনের চুটকিতে মিরাৎ-ই-সিকন্দরী ভর্তি। তাছাড়া দীর্ঘতর কাহিনীও এ কেতাবে আছে। এমন কি বিশাল বিরাট বীরপুরুষ মুহম্মদ বেগড়ার (এর গোঁপ নাকি এতই দীর্ঘ ছিল যে তিনি তার দুই প্রান্ত মাথা ঘুরিয়ে পিছনে এনে ঘাড়ের উপরে গিঠ বেঁধে রাখতেন!) যৌন জীবনও তিনি নির্বিকারচিত্তে সালঙ্কার বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রাদেশিক ইতিহাস বলে এ কেতাব তার ন্যায্য মূল্য পায় নি।

শেষ মোগলদের ইতিহাসে একটি অতিশয় হতভাগ্যের জীবন ও একটি ঈষৎ হাস্যরস-মিশ্রিত ঘটনা—এই দুটি আমার মনে আসে। পুজোর বাজারে অন্য পত্রিকায় একটা করুণ রস লিখে আমার রেশন খতম। দ্বিতীয়টাই শুনুন।

পূর্বেই নিবেদন করেছি মোগলসম্রাট মাত্রেরই মৃত্যু হলে রাজপুত্রদের ভিতর লাগত যুদ্ধ। আওরেঙ্গজেবের মৃত্যুর পরও তার ব্যতিক্রম হল না। লড়াই জিতে বাদশাহ হলেন শাহ আলম বাহাদুর শাহ। পাঁচ বৎসর রাজত্বের পর তাঁর মৃত্যু হলে পুত্র জাহান্দার শাহ তখ্‌তে বসলেন। মোগল বংশের উপর আর কেউ এঁর মত কলঙ্ক-কালিমা লেপন করেন নি। একটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। একটি বাইজী—লাল্‌কুনওর্‌কে তিনি দিয়েছিলেন বেগমের সম্মান ও তাঁকে নিয়ে বেরোতেন দিল্লীর প্রকাশ্য রাস্তায় মদ্যপান করতে।[১] তখনকার দিনে আজকের পানওলার দোকানের মত মদের দোকান থাকতো—অর্থাৎ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোঁ করে এক পাত্র মদ্যপান করে ফের অন্য দোকানে আরেক পাত্র—করে করে বাড়ি পৌঁছনো যেত। কিংবা রাস্তায় গড়াগড়ি দেওয়া যেত। হুজুর বাদশাহ সালামৎ সেই বাইজী লাল্‌কুনওরের পাশে দাঁড়িয়ে এইসব অতি সাধারণ শ্রেণীর দোকান

---

১ এ যুগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে হিটলারের প্রধান সেনাপতি ব্লমবের্ক বৃদ্ধ বয়সে ভালো করে অনুসন্ধান না করে তাঁর স্টেনোকে বিয়ে করে ফেলেন। অথচ ইনি একদা একাধিক শহরে দেমি-মঁদেন ছিলেন। বিয়ের রাত্রে পৃথিবীর ঐ সর্বপ্রাচীন ব্যবসায়ের মেয়েরা তাদের পাড়ায় পাড়ায় বিয়েটা সেলেব্রেট করে—যেন তারা সমাজে কল্কে পেয়ে গেল—এবং শুধু তাই না, যে-সব পুলিস তাদের উপর চোটপাট করতো তাদের ফোন করে তাদের হেলথ্‌ ড্রিঙ্ক করে। পরে হিমলার দলীল-দস্তাবেজসহ হিটলারের কাছে কেলেঙ্কারিটা ফাঁস করলে পর তিনি ব্লমবের্ককে রিটায়ার করতে আদেশ দেন।

ও তাদের খদ্দেরের সঙ্গে ঢলাঢলি করতে করতে পাত্রের পর পাত্র গলায় ঢালতেন এবং লাল্‌কুনওরের তো কথাই নেই। তিনি একদা যে হাফ-গেরস্থ অঞ্চলে (ফরাসীতে হুবহু একেই বলে 'দেমি-মঁদ', এদের স্ত্রীলোক বাসিন্দা 'দেমি-মঁদেন') তাঁর ব্যবসা চালাতেন, সেখানকার লোফাররা এসে সেখানে জুটতো। বাদশা সালামৎ দরাজ দিলে ঢালাই পাইকিরি হিসাবে মদ্য বিতরণ করতেন। তখনকার দিনে দিল্লীর বাদশারা বয়েলের গাড়ি চড়ে বেড়াতে ভালোবাসতেন। তার ড্রাইভারও সেই সর্বজনীন গণতান্ত্রিক পানোৎসবে অপাংক্তেয় হয়ে রইত না। রাস্তায় ভিড় জমে যেত। আমীর-ওমরাহ হঠাৎ এসে পড়লে পাল্কি ঘুরিয়ে নিতেন ; পদাতিক ভদ্রজন এই বেলেল্লাপনার মাঝখানে পড়ে বিব্রত না হওয়ার জন্য গুত্তা মেরে ডাইনে বাঁয়ের কোনো দোকানে আশ্রয় নিতেন।

মুসলমান শাস্ত্রে মদ্যপান নিষিদ্ধ। অবশ্য দেশবাসী জানতো যে রাজা বাদশারা এ আইনটি এড়িয়ে যান, কিন্তু তাঁরাও চক্ষুলজ্জার খাতিরে খোলাখুলি-ভাবে সচরাচর মদ্যপান করতেন না। এ যুগে রাজা ফারুক প্রায় জাহান্‌দার শা'র মত আচরণ করে কাইরোর জনসাধারণের আক্কেল গুড়ুম করে দেন। রোজার মাসে—আবার বলছি উপবাসের মাসে তিনি তাঁর নিত্যপরিবর্তিত দেমি-মঁদেন নিয়ে প্রশস্ত দিবালোকে এক 'বার' থেকে আরেক 'বারে' ঘুরে বেড়াতেন—মাতা এবং প্রাসাদের অন্যান্য মুরুব্বীদের সর্ব সদুপদেশ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে। এঁরই পরিত্যক্তা এক দেমি-মঁদেন প্রেয়সী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এই 'মহাপুরুষটি' গুরুভোজন বা অত্যধিক পানের ফলে গতাসু হবেন। বহ্বান্ন ভক্ষণ করে রাজ্যচ্যুত অবস্থায় ইনি অধুনা রোম শহর থেকে সাধনোচিত ধামে গেছেন—ঝিনুকের ভিতরকার বস্তু মাত্রাধিক খাওয়ার ফলে।

তা যা-ই হোক্, জাহান্‌দার শাহ একদিন ইত্যাকার রোঁদ মারতে মারতে বেএক্তেয়ার হয়ে যান—না হওয়াটাই ছিল ব্যত্যয়—এবং আধামাতাল গাড়োয়ান হুজুর ও লাল্‌কুনওরকে কোনো গতিকে গাড়িতে তুলে পাশাপাশি শুইয়ে দিয়ে লালকেল্লা পানে গাড়ি চালায়। বয়েল দুটো সর্বশ্রেষ্ঠ জাতের। পথ চিনে সোজা কেল্লার ভিতরে প্রাসাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। লাল্‌কুনওর টলতে টলতে প্রাসাদে ঢুকলেন। বয়েল দুটো চললো—আপন মনে বয়েলখানার দিকে, কারণ গাড়োয়ান সম্পূর্ণ বেহুঁশ।

ঘণ্টাখানেক পরে পড়ল খোঁজ খোঁজ রব। বাদশা কোথায়, বাদশা কোথায় ? এ যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। খবরটা যদি রটে যায় তবে বাদশার যে-

কোনো ভাই, চাচা, ভাতিজা নিজেকে রাজা বলে অবশ্যই ঘোষণা করবেন এবং তাহলেই তো চিত্তির। বিরাট লালকেল্লা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল, কিন্তু হুজুর যেন মহাশূন্যে অন্তর্ধান করেছেন।

তখন এক সুবুদ্ধিমানের মাথায় অলৌকিক অনুপ্রেরণা এল। এক মাইল দূরের বয়েলখানাতে অনুসন্ধান করে দেখা গেল, হুজুর অঘোর নিদ্রায়, গাড়োয়ানও তদ্বৎ।

বলা বাহুল্য, পথচারী মদ্যপায়ী মহলে হুজুর অতিশয় জনপ্রিয় হলেও আমীর-ওমরাহ—মায় প্রধানমন্ত্রী, যদিও তিনি জানতেন; জাহান্দারশাহ তখ্‌ৎ-হীন হলে তাঁরও নবীন রাজার হাতে জীবন সংশয়—সকলেই তাঁর উপর বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন।

ওদিকে দুই প্রধান আমীর সিন্ধু দেশের সৈয়দ আব্দুল্লা ও সৈয়দ হুসেন আলী ব্যাক করছেন অন্য ঘোড়া—জাহান্দারশাহের ভ্রাতা আজীম্ উশ্-শান-এর পুত্র সুদর্শন, সুপুরুষ—বলা হয় তৈমুরের বংশে এরকম বলবান সুপুরুষ আর জন্মান নি—ফররুখ সিয়ারকে। তাঁরা দিল্লীর দিকে রওয়ানা হয়েছেন সিংহাসন অধিকার করতে। যুদ্ধে জাহান্দার পরাজিত হয়ে বন্দী হলেন। সিংহাসন হারিয়ে তিনি যত না শোক প্রকাশ করেছিলেন তার চেয়ে বেশী মর্মবেদনা প্রকাশ করলেন, বার বার বেদনাতুর, মিনতিভরা আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে, 'আমার লাল্‌কুনওরকে আমার কাছে আসতে দাও, দয়া করে লাল্‌কুনওরকে আসতে দাও।' সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তখনই তাঁদের স্বরূপ দেখাতে আরম্ভ করেছেন—অর্থাৎ তাঁরা গ্ল্যাডস্টোনের মত কিংমেকারস্, তাঁরা রাজা ম্যানুফেকচার করেন—লাল্‌কুনওর অনুমতি পেলেন জাহান্দার-এর বন্দীজীবনের সাথী হওয়ার।

অধম শুধু পটভূমিটি নির্মাণ করছে; নইলে জাহান্দার শাহ বা ফররুখ সিয়ার কেউই আমার লক্ষ্য প্রাণী নন। তবু ফররুখ সিয়ার সম্বন্ধে যৎসামান্য বলতে হয়। ইনি বুদ্ধি ধরতেন কম, এবং যে কূটনীতিতে ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ সেইটে প্রয়োগ করতে চাইতেন দুই ধুরন্ধর পক্কসিদ্ধ, অস্বাভাবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে। তাঁদের একজন প্রধানমন্ত্রীর ও অন্যজন প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করে বাদশাহ সালামৎকে প্রায় উপেক্ষা করে রাজত্ব চালনা করতে লাগলেন। নানাপ্রকার মেহেরবানী বণ্টন করে দুই ভাই শক্তিশালী আমীর-ওমরাহ গোষ্ঠী নির্মাণ করলেন এবং প্রত্যক্ষত সন্দেহ রইল না যে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে যাই করুন না কেন, শাহী ফৌজ তাঁদের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করবে না। বেচারা বাদশাহ ক্রমেই ক্ষমতা হারাতে লাগলেন এবং শেষটায় চেষ্টা দিলেন, যেসব ভাগ্যান্বেষী অ্যাডভেনচারাররা ইরান তুরান থেকে দিল্লী আসত তাদের নিয়ে একটা দল সৃষ্টি করতে।

একদা এঁদের মধ্যে যাঁরা সত্যকার কৃতবিদ্য কিংবা রণবিশারদ তাঁরা দিল্লী দরবারে ও জনসাধারণের ভিতর সম্মান পেতেন। কিন্তু পাঁচশত বৎসর মোগল রাজত্ব চলার পর দিল্লীর খাসবাসিন্দা মুসলমান ও হিন্দুগণ একটা জোরদার 'স্বদেশী' পার্টি তৈরী করে ফেলেছিলেন। সৈয়দ ভাইরা ছিলেন এ দলের নেতা। (দুর্ভাগ্যক্রমে এ যুগের ঐতিহাসিকরা এই 'স্বদেশী' দলের মাহাত্ম্য পরিপূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন নি; আর ইংরেজ ঐতিহাসিক অবশ্যই চাইতো না যে এরই অনুকরণে নিত্য নবাগত ইংরেজ ভাগ্যান্বেষীদের বিরুদ্ধে ভারতে একটা 'স্বদেশী' পার্টি গড়ে উঠুক)।

নিরুপায় হয়ে ফররুখ সিয়ার তাঁর শ্বশুর যোধপুরের রাজা অজিত সিংকে দিল্লীতে আসবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে দূত পাঠালেন। কারণ তখন তিনি সত্যই বুঝে গিয়েছিলেন যে, সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁকে আর বেশী দিন বরদাস্ত করবেন না। তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে অন্য ক্রীড়নক তখ্‌ৎ-ই-তাউসে বসাবেন।

অজিত সিং দিল্লী পৌঁছনো মাত্রই সৈয়দরা তাকে সংবর্ধনা করতে অগ্রসর হলেন—বাদশা সালামৎ তখন কার্যত লালকেল্লায় বন্দী। তাঁরা ঐ 'স্বদেশী' বিদেশীর জিগিরটি উচ্চকণ্ঠে গাইলেন। অজিত সিংও বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন, সৈয়দদের সঙ্গে মোকাবেলা করার মত শক্তি তাঁর নেই। ফররুখ সিয়ারকে সিংহাসনচ্যুত করা বাবদে তিনি সম্পূর্ণ সম্মতি স্পষ্ট ভাষায় দিয়েছিলেন কি না বলা কঠিন।

সৈয়দদ্বয় ফররুখ সিয়ারকে ধরে আনবার জন্য অন্দরে সৈন্য পাঠালেন। হারেমে রমণীরা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে উঠলেন। তুর্কী রমণীদের সাহস যথেষ্ট, নূরজাহান জাহানারা অতি কৃতিত্বের সঙ্গে তাবৎ ভারত শাসন করেছেন, কিন্তু এঁদের ভিতর কেউ সে রকম ছিলেন না, কিংবা হয়তো দম্ভী ফররুখ সিয়ার এঁদের মন্ত্রণায় কর্ণপাত করেন নি। অবশ্য তাঁকে সবলে টেনে আনতে দূতদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। কারণ তাঁর শরীরে ছিল অসাধারণ বল।

সৈয়দদ্বয়ের সামনে তাঁকে আনা হলে তাঁদের একজন আপন কলম-দান খুলে, চোখে সুরমা (কাজল) লাগাবার শলাকা ঘাতকের হাতে দিলেন। ফররুখ সিয়ারকে সবলে চিৎ করে ফেলে অন্ধ করা হল। তবে কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, ঐ নিষ্ঠুর কর্ম যে করেছিল সে তাঁকে সম্পূর্ণ অন্ধ করে নি—সে ভেবেছিল,

বলা তো যায় না, হয়তো একদিন তিনি আবার রাজা না হলেও যথেষ্ট শক্তিশালী হবেন, তখন সে মৃত্যুদণ্ড তো এড়াবেই, হয়তো বা বখশিশও পেতে পারে। ফররুখ সিয়ারকে নহবৎখানায় বন্দী করে রাখা হল। লালকেল্লার আজকের দিনের প্রধান প্রবেশপথ ও দেওয়ান-ই-আম-এর মাঝখানে এটা পড়ে।

ওদিকে কিন্তু দিল্লীর অন্য এক মহল্লায় এক ভিন্ন কমেডি শুরু হয়েছে।

সৈয়দদ্বয় অনেক চিন্তা ততোধিক তর্কবিতর্ক আলোচনা করে স্থির করেছেন যে, ফররুখ সিয়ারের খুড়ো রফী-উশ্-শানের (ইনি আজীম্-উশ্-শানের পরের ভ্রাতা—আওরেঙ্গজেবের দৌহিত্র) জ্যেষ্ঠ পুত্র তরুণ মুহম্মদ ইব্রাহীমকে সিংহাসনে বসানো হবে। সেই মর্মে দূত পাঠানো হয়েছে রফী-উশ্-শানের হাভেলিতে। সেখানে ইব্রাহীম তাঁর ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন সহ বাস করেন।

দূতের দল উপস্থিত হওয়া মাত্রই হাভেলিতে উচ্চৈঃস্বরে বামাকণ্ঠের ক্রন্দন রোদন চিৎকার অভিসম্পাত আরম্ভ হল।

কারণটা সরল। কয়েকদিন ধরেই দিল্লী শহর শত রকমের গুজবে ম-ম করছে। ফররুখ সিয়ার সিংহাসনচ্যুত হলে হতেও পারেন—যদিও অনেকেই প্রাণপণ আশা করছিলেন, অজিত সিং যাই করুন, আপন জামাতাকে সিংহাসন-চ্যুতি থেকে রক্ষা করবেন নিশ্চয়ই, নইলে তাঁর নিধন অবধারিত ও দিল্লীবাসীদের কাছে যে ব্যক্তি পুত্রকে হত্যা করে তার চেয়েও ঘৃণ্য—যে তার মেয়েকে বিধবা হতে দেয়। •(কিছুদিন পর ফররুখ সিয়ার নিহত হওয়ার পর অজিত সিং রাস্তায় বেরোলেই তাঁর সশস্ত্র পাইক-বরকন্দাজকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে রাস্তার ছোঁড়ারা তাঁর পাল্কীর দুই পাশে ছুটতে ছুটতে তারস্বরে ঐক্যতান ধরতো, 'দামাদকুশ, দামাদকুশ'—জামাতৃহন্তা, জামাতৃহন্তা! পুত্রকে হত্যা করে কেউ এভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন বলে আমার স্মরণে আসছে না।)

ফররুখ সিয়ার সিংহাসন হারালে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের যে কার প্রতি 'নেক্-নজর' —অবশ্য যে-ই রাজা হোন তাঁকে হতে হবে ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্তে পুত্তলিকা মাত্র—পড়বে তার কিছু স্থিরতা ছিল না। দূতরা তাই যখন হাভেলির সামনে এসে সুসংবাদ দিলে, তারা এসেছে সমারোহ সহকারে নবীন রাজা মুহম্মদ ইব্রাহীমকে তাঁর অভিষেকের জন্য নিয়ে যেতে, তখন সবাই নিঃসন্দেহে ভাবলে এটা একটা আস্ত ধাপ্পা। আসলে আর কেউ বাদশা হয়ে দূত পাঠিয়েছেন ইব্রাহীমকে ছলে বলে পকড় করে নিয়ে গিয়ে হয় হত্যা করতে, নিদেন অন্ধ করে দিতে—যাতে করে পরবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বীরা সম্পূর্ণ নির্মূল হয়; এ রেওয়াজ তো রাস্তার ভিখিরি পর্যন্ত জানে, জানবে না শুধু রাজবাড়ির হারেমের মহিলারা! তওবা! তওবা!!

বিরাট বাড়ি। বিস্তর কুটুরি, চিলেকোঠা। তদুপরি এসব কারবার তো দিল্লী শহরে হামে হাল লেগেই আছে। তাই দু-চারটে গুপ্তঘর, পালিয়ে যাবার সুড়ঙ্গও যে নেই, এ-কথাই বা বলবে কে? হারেম-মহিলারা তড়িঘড়ি ইব্রাহীম ও তার ছোট ভাই রফী উদ্-দৌলাকে কোথায় যে লুকিয়ে ফেললেন তার সন্ধান পেতে—আদৌ যদি পাওয়া যায়—লাগবে সময়। ওদিকে দূতদের পই পই করে বলা হয়েছে, তারা যাবে আর আসবে, ছররার মত দ্রুতবেগে, এবং পথমধ্যে যেন তিলার্ধকাল বিলম্ব না করে। কারণটি অতিশয় স্বপ্রকাশ। দিল্লী শহরের দুগ্ধ-পোষ্য শিশু পর্যন্ত জানে, একবার যদি খবর রটে যায় এবং সেটা কিছু মাত্র অসম্ভব নয়—যে ফররুখ সিয়ার সিংহাসনচ্যুত হয়ে গিয়েছেন এবং সে সিংহাসন তখনো শূন্য তা হলে আওরেঙ্গজেব-বংশের যে কোন রাজপুত্র দুঃসাহসে ভর করে নিজেকে বাদশা বলে ঘোষণা করে দেবে। সৈয়দ-ভায়ারা বিলক্ষণ জানতেন যে, যদিও আমীর-ওমরাহ সোওয়ার-সেপাই তাঁদের পক্ষে, তবু এ তত্ত্বটি ভুললে বিলকুল চলবে না যে, ফররুখ সিয়ার ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় সম্রাট। তারপর আরেকটা কথা। আওরেঙ্গজেবের এক বংশধর যদি অন্য বংশধরকে খেদিয়ে দিয়ে সিংহাসন দখল করেন, তবে জনসাধারণ হয়তো কোনো পক্ষই নেবে না। কিন্তু সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তো কোনো রাজাদেশে, সিংহাসনে হক্কধারী কোনো রাজপুত্রের হুকুমে বাদশাহ ফররুখ সিয়ারকে সিংহাসনচ্যুত করেন নি! তাঁরা কে? আসলে সিন্ধু প্রদেশের দুই ভাগ্যান্বেষী। একজন ফররুখ সিয়ারের প্রধানমন্ত্রী, অন্যজন প্রধান সেনাপতি। অর্থাৎ তাঁর কর্মচারী এবং তাঁরই নুনেনমক খেয়েছেন অন্তত ছ'টি বছর ধরে। তাই মনিবকে সিংহাসনচ্যুত করে এঁরা যে অপকর্মটি করলেন এটা নেমকহারামীর চূড়ান্ত! দিল্লীর জনসাধারণ উজবুক নয়। তারা যদি ক্ষেপে যায় তবে সৈন্য-সামন্ত নিয়েও দিল্লীকে ঠাণ্ডা করা রীতিমত মুশকিল হবে।

অতএব সৈয়দদের সর্বাপেক্ষা জরুরী প্রয়োজন, তড়িঘড়ি আওরেঙ্গজেবের কোন সন্তানকে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর কাছ থেকে ফরমান নিয়ে আইনত এবং ঐতিহ্যগত পন্থায় দিল্লীর রাজভক্ত প্রজাগণকে মোকাবেলা করা।

কিন্তু দূতরা গুপ্তঘরের সন্ধান পাবে কি করে? বাচ্চাটাকে কেড়ে নিতে চাইলে বেরালটা পর্যন্ত মারমুখো হয়ে ওঠে। এরা আবার তুর্কী রমণী—যুগ যুগ ধরে ইয়া তাগড়া তাগড়া মর্দকে কড়ে আঙুলের চতুর্দিকে ঘুরিয়েছে।

অবশ্যই পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, ফররুখ সিয়ারকে হারেমের ভিতর থেকে ধরে আনা গেল, আর এখন এই চ্যাংড়াটাকে কাবু করা যাচ্ছে না?

ব্যাপারটা সরল। ফররুখ সিয়ারের হারেমের তুর্কী রমণীরা যে বাদশার সঙ্গে

সঙ্গে সর্ব সম্মান হারিয়ে বসেছেন। এরা বাধা দিলে সেপাইরা তাদের উপর প্রয়োগ করবে পশুবল। এরা জানে দুদিন বাদেই এইসব নিষ্প্রভ, হতজ্যোতি, লুপ্তসম্মান সুন্দরীদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে 'সোহাগপুরা'তে। আল্লা জানেন, কোন্ কাষ্ঠরসিক এই পরিত্যক্তা রমণীদের দীনদরিদ্র নির্লজ্জভাবে অবহেলিত শেষ আশ্রয়স্থলকে 'সোহাগপুরা' নাম দিয়েছিল। এরা সেখানে পাবেন সেফ গ্রাসাচ্ছাদন। তার বীভৎস বর্ণনা থেকে আমি পাঠককে নিষ্কৃতি দিলুম।...কিন্তু যে ইব্রাহীম এখন রাজা হতে চললেন তাঁর মুরুব্বীদের তো ভিন্ন শিরঃপীড়া!

তাই নূতন রাজাকে আনতে গিয়ে দূতদের প্রাণ যায়-যায়। মরীয়া হয়ে তাঁর মা, মাসী, জ্যেঠি, খুড়ি এক কথায় তাবৎ রমণীরা আরম্ভ করেছেন দূতের গুষ্টীকে বেধড়ক ঠ্যাঙাতে। ছেঁড়া জুতো, খোঁচা খোঁচা খ্যাংরা-খররা, হেন বস্তু নেই যা দিয়ে তাঁরা ওদের পেটাতে কসুর করছেন। বেচারীরা খাচ্চে বেদরদ মার, দু'হাত দিয়ে যতখানি পারে সে মার ঠেকাবার চেষ্টা করছে। একখানা কাঠির ঝাঁটার সপাং করে মুখের উপর মার—সেটা কোন্ জঙ্গীলাটের কোন্ অস্ত্রের চেয়ে কম! বেচারীরা এঁদের গায়ে হাত তোলা দূরে থাক, ঠেলাটি পর্যন্ত দিতে পারে না। কালই তো এঁরা লালকেল্লার প্রাসাদে গিয়ে আবাস নেবেন। তখন বেচারীদের হালটা হবে কি? খুদ বাদশা সালামতের পিসিকে মেরেছিল ধাক্কা, খুড়িকে মেরেছিলে কনুই দিয়ে গুত্তা—বেয়াদবী বেতমিজী তবে আর কাকে বলে! বন্দ্ করো ব্যাটাদের পিঞ্জরা মেঁ, ঝুলিয়ে রাখো বদমাইশদের লাহোরী দরওয়াজার উপর! সৈয়দ-ভায়ারা কি তখন আর তাদের স্মরণে আনবেন!

এই একতরফা জেনানা আক্রমণ, তথা গৃহনির্মিত সাতিশয় মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রের দফে দফে বয়ান প্রত্যেক ঐতিহাসিক দিয়েছেন বড়ই প্রেমসে। এই মারপিটের বর্ণনাতে পৌঁছে এ যুগের ঐতিহাসিকরা ভাবেন, তাঁরা যেন বেহেশ্তে পৌঁছে গেছেন—নড়বার নামটি পর্যন্ত করেন না।

আর আর্ত চিৎকার উঠছে সম্মার্জনী-লাঞ্ছিত হতভাগ্যদের—'দোহাই আল্লার, কসম আল্লার, পয়গম্বর সাক্ষী, আমরা কোনো কুমৎলব নিয়ে আসি নি। আমরা এসেছি হুজুরকে তাঁর ন্যায্য তখ্তের উপর বসাতে।' কিন্তু অরণ্যে রোদন আর জনারণ্যে রোদনে ফারাক থাকলে জনসমাবেশকে 'অরণ্য' নাম দেওয়া হল কেন?

ওদিকে দুই 'কিং-মেকার্স' বা রাজা নির্মাণের রাজমিস্ত্রি মহা প্রতাপান্বিত শ্রীযুত সৈয়দ আব্দুল্লা ও সৈয়দ হুসেন আলী লালকেল্লার দিওয়ান-ই-আম-এর

ভিতর বসে আছেন যেন কাঠ-কয়লার আগুনে আঙ্গিঠার উপর। দূতের পর দূত পাঠিয়ে যাচ্ছেন রফী-উশ্-শানের হাভেলীতে, কিন্তু সে যেন সিংহের গুহাতে মানুষ পাঠানো। কেউই আর ফিরে আসে না। যে যায়, সে-ই ঝাঁটা-পেটার দ'য়ে লীন হয়ে যায়, কিংবা রাস্তা থেকে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে 'অগুরুচন্দন-ঠারের ভাষায়' বোঝাতে চেষ্টা করে যে, প্রতিটি মুহূর্ত জীবন-মরণ সমস্যা সঙ্কটময় করে তুলছে। ভিতরে একপাল লোক ছুটেছে গুপ্তঘরের সন্ধানে, তাদের পিছনে ছুটেছে জেনানা-রেজিমেণ্ট পেটিকোট-পল্টন আসমান-ফাটানো চিল্লি-চিৎকার করতে করতে। সর্বপ্রকারের সংগ্রামানভিজ্ঞ আপনাদের সেবক, এই দীন লেখক, তাঁদের হাতে যে সব মারণাস্ত্র আছে, তাঁদের রণকৌশল, ব্যূহনির্মাণাদির আর কী বর্ণনা দেবে? বাবুর্চিখানার খুন্তি সাঁড়াশী থেকে আরম্ভ করে সেই মোগল যুগে কত কি থাকতো তার বর্ণনা দেব নিরীহ বাঙালী, আমি! মাশাল্লা!

চতুর্দিকে, আকাশে-বাতাসে সেই অভূতপূর্ব উত্তেজনা, দ্রুতগতিতে ধাবমান বহুবিধ নরনারী, চিৎকার আর্তরব, আল্লার শপথ, রসুলের নামোচ্চারণ, হজরৎ আলীর অনুকম্পার জন্য করুণ ফরিয়াদ, মহরমের দিনের ইমাম হাসন-হুসেনের ঝাণ্ডা নিয়ে কাড়াকাড়ি হেন, এমন সময়—

এমন সময় অতি ধীরে ধীরে একটি বালক—বালকই বটে, কারণ সে অজাতশ্মশ্রু অজাতগুম্ফ—ঐ যে হোথা মুদির দোকান দেখা যাচ্ছে, সেখান থেকে ধীরে ধীরে এই হাভেলির সামনে এসে একবার মাত্র সেই হুলস্থূল কাণ্ডের দিকে একটা শান্ত দৃষ্টি ফেলে বাড়িতে ঢুকলো। তার পরনে সুনময়লা সুতির পাজামা, তার উপর একটা অতি সাধারণ কুর্তা। মাথায় টুপিটি পর্যন্ত নেই, পায়ে চটি আছে কি না ঠিক ঠাহর হল না। সে কুর্তার সামনের দিকটার (পূর্বোল্লিখিত 'দামন' বা অঞ্চল) দুই খুঁট দুই হাত দিয়ে এগিয়ে ধরে তাতে সামলে রেখেছে পায়রাকে খাওয়াবার দানা। স্পষ্ট বোঝা গেল, এইমাত্র পাড়ার মুদির দোকান থেকে সে বেসাতিটা কিনে এনেছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে তার বুঝতে বিলম্ব হল না যে, হট্টগোলের উৎপাতে পায়রাগুলো উধাও হয়ে গিয়েছে। তখন তার খেয়াল গেল চতুর্দিকের ছুটোছুটি আর চেল্লাচেল্লির দিকে। সে কিন্তু নির্বিকার। আস্তে আস্তে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করতে লাগলো—বাড়িটা যেন চাঁদনি চৌক।

এবারে বাইরে শোনা গেল এক পদস্থ অশ্বারোহীর কটুবাক্য আর তীব্র চিৎকার—ইনি অন্ততপক্ষে ফৌজদারই হবেন। 'ওরে সব না-মর্দ, বেওকুফ, বেকার নাকম্মার দল। এই এখ্খুনি বেরিয়ে আয়, কাম খতম্ করে। নইলে হজরৎ আলীর ঝাণ্ডার কসম খেয়ে বলছি, তোদের কিয়ামতের শেষ-বিচারের

দিন এই লহমাতেই হাজির হবে। আল্লার গজব, আল্লার লানৎ তোদের উপর, তোদের বাল্-বাচ্চার উপর।'

এই হুঁশিয়ারী, এই দিব্যিদিলাশা যেন তিলিস্‌মাৎ-ভানুমতীর কাজ করলো।

দূতদের দুজনার দৃষ্টি হঠাৎ গেল সেই দামনে-দানা-ভরা বালকটির দিকে। লাফ দিয়ে পড়লো সেই দুই নরদানব তার উপর। এক ঝটকায় তাকে কাঁধে ফেলে দে-ছুট দে-ছুট দেউড়ির দিকে, দেউড়ি ছাড়িয়ে রাস্তা পেরিয়ে আল্লায় মালুম কোন দিকে! কি যে ঘটলো কিচ্ছুই বোঝা গেল না। সঙ্গে সঙ্গে উঠলো বামাকুলের আর্তনাদ—'ইয়াল্লা, এরা যে রফী উদ্-দরজাৎকে নিয়ে গেল রে। ধরো, পাকড়ো ওদের। পাকড়ো, পাকড়ো, জানে ন্ পায়, যেতে না পায় যেন! ইয়া রহ্‌মান, ইয়া রহীম!'

কিন্তু কে ধরে তখন কাকে?

হারেমের মেয়েরা ভাবতেই পারেননি যে রফী-উশ্-শানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র নাবালক বাচ্চা রফী-উদ্-দরজাৎকে ধরে এরা চম্পট দেবে। যতক্ষণ এরা জেনানা জঙ্গীলাট হয়ে সার্বভৌম মহম্মদ ইব্রাহীম আর মধ্যম রফী উদ্-দৌলাকে পঞ্চত্ব, কম্‌সেকম্ অন্ধত্ব থেকে রক্ষা করছিলেন, ততক্ষণে, যার নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোনো ভয়-ভীতি ছিল না, সেই সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা রফী উদ্-দরজাৎকে নিয়ে 'দুশমন' উধাও হয়ে গিয়েছে।

আজব সেই লড়াই তাজ্জবভাবে ফৌরন্ থেমে গেল। দোস্ত দুশমন কোনো পক্ষের কেউ মারা গেল না, হার মানলো না, সন্ধি করলো না, ধরা দিল না—আচানক্ সবকুচ্‌হ্ বিলকুল ঠাণ্ডা!

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় দিওয়ান-ই-আম্ থেকে নহবৎখানা পর্যন্ত পাইচারির বদলে ছুটোছুটি আরম্ভ করেছেন। এঁরা বিস্তর লড়াই লড়েছেন, জীবন এঁদের বহুবার বিপন্ন হয়েছে, কিন্তু এবারে তাঁরা যে রকম ঘেমে নেয়ে কাঁই হয়ে গেলেন এরকমটা আর কখনো হন নি। ক্রোধে, জিঘাংসায় তাঁরা শুধু একে অন্যকে বলছেন, যে-কটা না-মর্দকে তাঁরা পাঠিয়েছিলেন তাঁদের জ্যান্ত শরীর থেকে চামড়া তোলবার হুকুম দেবেন, নয় ফোঁটা ফোঁটা গরম তেল তাদের ব্রহ্মতালুতে ঢেলে ঢেলে নিধন করবেন।

এমন সময় সেই দুই পাহলোয়ান এসে উপস্থিত শাহজাদা রফী উদ্-দরজাৎকে সঙ্গে নিয়ে।

শাহজাদা হোক আর ফকীরজাদাই হোক, সে কিন্তু পুঁটুলি পাকিয়ে দু হাত দিয়ে জোরে পাকড়ে আছে পায়রার দানা-ভর্তি তার কোঁচড়। এসব বাদশা-

উজীরের ব্যাপার দিল্লী শহরে এখন আছে তো তখন নেই—কিন্তু পায়রার দানা কটি পায়রার দানা, শাহজাদা মিয়া রফীর কাছে এটা ভয়ঙ্কর সত্য।

ইতিমধ্যে সৈয়দ ভায়ারা হুঙ্কার দিয়ে উঠেছেন, 'কম্‌বখ্‌ৎ, না-দান্‌—এ কাকে ধরে এনেছো তোমরা? বাদশা হবেন বড় ভাই, ধরে আনলে ছোটটাকে। তোমাদের জ্যান্ত না পুঁতলে—'

সৈয়দদ্বয় তখন নাগরিক, ফৌজদার এমন কি তৈমুরের বংশধর, বাবুর-হুমায়ুনের পুত্র-পৌত্র বাদশাহ-সালামৎদের ও জান-মালের মালিক। এ সব কথা দূত দুটি ভালো করেই জানে। কিন্তু আজকের ঝাঁটার মার তাদের করে দিয়েছে বেপরোয়া। চরম বিরক্তি আর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, 'যা পেয়েছেন তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হন। আর আমাদের মারুন আর কাটুন, যা খুশী করুন।'

দুই ভাই তাড়াতাড়িতে ব্যাপারটা জানতে পেরে বুঝলেন, এখন আবার নূতন করে পাইক-বরকন্দাজ পাঠিয়ে বড় দুই ভাইয়ের একজনকে—তাঁরা ইব্রাহীমের চেয়ে রফী উদ্‌-দৌলাকেই পছন্দ করেছিলেন বেশী—ধরে আনাতে সময় লেগে যাবে বিস্তর। আজকের ভাষায় ততক্ষণ টাইম-বম্‌ ফেটে যাবে!

একে দিয়েই তা হলে কাজ চালিয়ে নিতে হবে। গত্যন্তর কি?

আর ও নিয়ে মাথা ঘামিয়েই বা লাভ কি? ইব্রাহীমই হোক আর রফী উদ্‌-দৌলাই হোক, যেই হোক, তাকে তো হতে হবে ওঁদের হাতেরই পুতুল। সে পুতুল তার মায়ের গর্ভ-ফ্যাক্টরি থেকে পয়লা চালানে বেরিয়েছে, না তেসরা কিস্তিতে তাতে কীই বা যায় আসে? ফরাসী সম্রাটের চেয়েও সরল কণ্ঠে তখন তাঁরা বলতে পারতেন, 'লে' তা সে হু'—'ভারতবর্ষ? সে তো আমরা দু'ভাই!' বাদশা? যে কোনো গড্‌-ড্যাম আওরেঙ্গজেব-বংশের গর্ভস্রাব—!

নবীন রাজার অভিষেকের জন্য দুই ভ্রাতা তাঁর দুদিকে চলেছেন রাজার দুই বাহু ধরে। আল্লা জানেন, কার আদেশে তাঁর দুই বদ্ধমুঠি শিথিল করার ফলে এই এখন পায়রার দানা ঝরঝর করে দিওয়ান-ই-আমের পাথরের মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ল।

চতুর্দিকে সৈয়দদের মিত্র ও পরামর্শদাতা আমীর-ওমরাহ তাঁদের মহামূল্যবান কিংখাবের পাগড়ী, শুভ্র মলমলের আঙ্গারাখা, তার ভিতর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে নীচের সাচ্চা জরির বোনা সদরীয়ার সোনালী আভা, কোমরে কাশ্মীরের সর্বশ্রেষ্ঠ শাল দিয়ে তৈরী কোমরবন্ধ, তার বাঁ দিকে গোঁজা জাঁতির মত জামদর অস্ত্র, ডাইনে ঝুলছে দিমিশ্‌কের তলোয়ার—খাপের উপর মুষ্টিতে বিচিত্র মণিমাণিক্যের জড়োয়া কাজ, পরনে সাটিনের পাজামা, পায়ে জরির কাজ করা শুড়-তোলা

সিলিমশাহী। উষ্ণীষে মুক্তোর সিরপেঁচ, বুকে মোতির হার, হাতে হীরের আংটি।

এদের ভিতর দিয়ে চলেছেন বাদশাহজাদা। পরনে নুনময়লা পাজামা, গায় মামুলী কুর্তা। ব্যস্। পাঁচ লহমা পরে যিনি হবেন দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা! এ যে জগদীশ্বরের কৌতুকবোধের চূড়ান্ত নিদর্শন।

সৈয়দদের একজন শাহজাদার মাথায় বসিয়ে দিলেন তাঁর আপন পাগড়ী—মস্তকাভরণহীন অভিষেক কল্পনাতীত। সেই বিরাট সাইজের পাগড়ী শাহজাদার কান দুটো গিলে ফেলল। অন্য ভ্রাতা তাঁর মুক্তোর সাতলখা হার পরিয়ে দিলেন তাঁর গলায়। ময়লা কুর্তার উপর সে মালা দেখালো ঘোলা জলের উপর রাজহংস!

এবং রফী উদ্-দরজাৎ এই বেশেই বসলেন—যা-তা সিংহাসনের উপর নয়—আসল ময়ূর সিংহাসনের উপর। এও আরেক রঙ্গ। কারণ সচরাচর মোগল বাদশারা বসতেন আটপৌরে সিংহাসনের উপর। ফররুখ সিয়ারের অভিষেকের বাৎসরিক পরব না অন্য কোনো উপলক্ষে তোষাখানা থেকে আগের দিন ময়ূর-সিংহাসন আনানো হয়েছিল; সেটা তখনো তোষাখানায় ফেরত পাঠানো হয় নি বলে যেন কনট্রাস্টটা চরমে পৌঁছনোর জন্য পাজামা-কুর্তা পরে শ্রীযুত রফী বসলেন তারই উপর!

এর পরের ইতিহাস আরো চমকপ্রদ, আরো অচিন্তনীয়। কিন্তু তার ভিতর খুঁজে খুঁজে হায়রান হয়ে যাবেন, কিন্তু এরকম কৌতুকজনক বড়-কিছু একটা পাবেন না। আমি একেবারে কিছু পাই নি। শুধু খুন আর লড়াই। নৃশংস আর বীভৎস। আমি তাই বাকিটা সংক্ষেপেই বলি—নিতান্ত যাঁরা ছোট গল্প পড়ার পরও শুধোন, 'তারপর কি হল?' তাঁদের জন্য।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় শত্রুর শেষ রাখতে নেই বলে ফাঁসুড়ে পাঠিয়ে ফররুখ সিয়ারকে খুন করালেন। এক বছরের ভিতরই ধরা পড়লো রফী উদ্-দরজাতের যক্ষ্মা। সে বছর যেতে না যেতেই তিনি মারা গেলেন। মারা যাওয়ার পূর্বে তিনি তাঁর বড় ভাই রফী উদ্-দৌলাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে গেলেন। তিনিও ঐ বৎসরই মারা গেলেন। তারপর বাদশা হলেন মুহম্মদ শাহ বাদশাহ। তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। ইতিমধ্যে সৈয়দ ভ্রাতাদের দুর্দিন ঘনিয়ে এল। একজন আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হলেন, অন্যজন বন্দী অবস্থায় বিষপ্রয়োগবশতঃ।

বস্তুত এ যুগের ইতিহাস পড়লে বার বার স্মরণে আসে:

রাজত্ব-বধূরে যে-ই করে আলিঙ্গন
তীক্ষ্ণধার অসি পরে সে দেয় চুম্বন!

দ্বিজ

এই গত শারদীয়া বেতার জগতে 'কোষ্ঠীবিচার' নামক একটি কথিকা এ-অধম নিবেদন করে। বিবরণটি ছিল সত্য ঘটনা অবলম্বনে বর্ণিত। তৎসত্ত্বেও আমার এক দোস্ত সেটি পড়ে কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হন। আমি সবিনয় বললুম, 'ব্রাদার, এটা বরহক্ জলজ্যান্ত ঘটেছিল; আমাকে দুষছো কেন?' তিনি বললেন, 'তুমি সেটি রসস্বরূপে প্রকাশ করতে চেয়েছ; সেক্ষেত্রে সত্যি-মিথ্যের কোনো অজুহাত নেই।' একদম খাঁটি কথা। তাই এবারে কিন্তু যেটি নিবেদন করবো সেটি পড়ে তিনি প্রসন্ন হবেন, এমত আশা করি, আর আপনারা পাঁচজন তো আছেনই। এই সুবাদে আরেকটি সামান্য বক্তব্য আমার আছে। হিন্দু-মুসলমান বাঙালী-অবাঙালী কাউকেই আমি বেদনা দিতে চাই নে। দিলে সেটা অজানিত এবং তার জন্যে এইবেলাই বে-কৈফিয়ৎ মাফ চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু আমার বক্তব্য দুষ্টবুদ্ধিজনিত ভ্রমাত্মক সপ্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত সেটি সংহরণ করতে আমি অক্ষম—এটা গুরুর আদেশ।

এদানির কিছু লোক আবার আমার কাছ থেকে প্রাচীন দিনের শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে ভালোমন্দ শুনতে চান। আমি তাঁদের লুক্কায়িত বক্তব্যটিও বিলক্ষণ মালুম করতে পেরেছি; সেটি এই, 'যা বুড়োচ্ছ, দুদিন বাদেই ভীমরতি ধরবে এবং তখন হয়ে দাঁড়াবে একটি চৌকশ "লিটারারি বোর"; যত্তবধি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ তোমার আপন কথা ধানাই-পানাই না করে আশ্রমের কথা কও, গুরুদের কথা কও ইত্যাদি।'

তাই সই। দেশকাল ঠিক ঠিক রাখবো। পাত্র ভিন্ন নামে ভিন্ন বেশে আত্মপ্রকাশ করবেন।

১৯২০।২১ সনে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে কলেজ কোর্স খোলেন। ঐ সময় গাঁধীজী সরকারী ইস্কুল কলেজের পড়ুয়াদের গোলামী-তালিম বর্জন করতে আহ্বান জানান। ফলে ভারতের সর্বপ্রদেশ থেকে যে সব মেধাবী ছিল, গাঁধীজীর বাণী গ্রহণ করলো তারা, জমায়েৎ হল শান্তিনিকেতনে। আর এলেন কয়েকটি খাজা মাল, যাঁরা বছরের পর বছর পৌনঃপুনিক দশমিকের পাইকিরি হিসেবে বেধড়ক ফেল মেরে যাচ্ছিলেন। অবশ্য এদের একজন বলেছিল, 'ঐসন্ এ্যানসার বুক লিখেছিলুম, স্যর, যে এগজামিনার বললে "এনকোর"। তাইতে ফের একই পরীক্ষা দিতে হল।' এঁদের মধ্যে আমার মত গুণ্ডাপ্রকৃতির দু-চারটি কাবেল সন্তান ছিলেন।

ইতিমধ্যে এলেন বিশ্বনাথ তিরুমল রাও অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম্ থেকে। এঁকে নিয়ে যখন দু'দলে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল তখন ধরা পড়লো ইনি বরের পিসি, কনের মাসি। অর্থাৎ ইনি যেমন অনেকটা ইন্দ্রনাথের মত অন্ধকার রাস্তায় স্যাডিস্ট ক্লাস-টীচারের মাথায় হঠাৎ কম্বল ফেলে তাকে কয়েক ঘা বসিয়ে বাড়ি থেকে হাওয়া হয়ে এখানে চলে আসেন, ঠিক তেমনি কলাভবনে প্রবেশ করার পর দেখা গেল, তিনি একই হাতে পাঁচটা তুলি নাচাতে পারেন—যাদুকররা যেমন পাঁচটা বল নাচায়। স্কেচে ওস্তাদ, ফিনিশে তালেবর।

তদুপরি আরেকটি অতিশয় আশ্রমপ্রিয় সদ্‌গুণ তাঁর ছিল, যার প্রসাদাৎ তিনি সর্বত্রই কল্‌কে পেতেন। উচ্চতায় যদ্যপি পাঁচ ফুট দুই, কিন্তু পেশীগুলো যেন মানওয়ারি জাহাজের দড়া দিয়ে তৈরী, এবং ফুটবলে চৌকশ। বীরভূমের কাঁকরময় গ্রাউণ্ডে ডজন খানেক আছাড় খেয়ে সর্বাঙ্গে রক্তলাঞ্ছন আঁকার পরও তিনি বুলেটবেগে ছুট লাগাতে কসুর করতেন না এবং হাসিমুখে। বিচক্ষণ জন সে হাসিতে নষ্টামির গোপন চিহ্ন দেখতে পেত।

আমাদের দোস্তি প্রথম দিন থেকেই। নাম যখন শুধালুম সেটা দ্রুতগতিতে দায় সারার মত বলে নিয়ে জানালে, 'ওটা তোলা নাম। আমার ডাকনাম চিন্নি। তোমার?'

'সীতু।'

পরবর্তী যুগে চিন্নি, ওরফে মিঃ রাও, স্বর্গত শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে দিল্লীতে কাজ করে। তার ভুলে ভর্তি অনর্গল বাঙলা কথার তুবড়িবাজি রাশভারি শ্যামাপ্রসাদের মুখেও কৌতুকহাস্য এনে দিত এবং বিশেষ করে ঐ কারণেই তিনি চিন্নিকে মাত্রাধিক স্নেহ করতেন। চিন্নি উত্তম ইংরিজি বলতে পারত, কিন্তু তার বক্তব্য, দিল্লীর মন্ত্রণালয়ই হোক আর ভুবনডাঙার ঝুরঝুরে চায়ের দোকানই হোক, সে তার শান্তিনিকেতনে শেখা বাঙলা ছাড়বে কেন? স্বয়ং গুরুদেবের সঙ্গে সে বাঙলায় কথা কইত নির্ভয়ে—চারটিখানি কথা নয়, এবং শ্যামাপ্রসাদ এই তত্ত্বটি আবিষ্কার করে, চিন্নির ডজন ডজন ভুল-ভর্তি বাঙলা সম্বন্ধে বলতেন, 'রাও কিন্তু তার বাঙলা প্রতিদিন ইমপ্রুভ করে যাচ্ছে।' অর্থাৎ ভুল বাড়ছে!

শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রিত্ব রিজাইন দিলে পর চিন্নিও তার জুতো থেকে দিল্লীর ধুলো ঝেড়ে ফেলে মাদ্রাজ চলে যায়। সেখান থেকে ইউনেস্কোর আহ্বানে তাইল্যাণ্ড, কলম্বো, জিনীভা, ওয়াশিংটন, বাগদাদে কীর্তিজাল বিস্তার করে।

সে যে দড়মালে তৈরী সেটা আশ্রমে তার আঠারো বছর বয়সেই ধরা পড়ে। সেখানে ইস্কুলের ছেলেরা দুবেলা উপাসনা করে; প্রস্তাব হল আমাদেরও করতে

হবে। চিন্নি উচ্চকণ্ঠে জানিয়ে দিল সে নাস্তিক। ফৈসালা করার জন্য আমাদের মীটিং বসলো। প্রিন্সিপাল মেসেজ পাঠালেন, তিনি চান, আমরা যেন উপাসনা করি। চিন্নি বললে, 'ইস্কুলের ছেলেদের বাপ-মা উপাসনার কথা জেনেশুনেই বাচ্চাদের এখানে পাঠিয়েছেন। আমাদের অধিকাংশই এসেছি তাঁদের অমতে (এ কথাটা খুবই খাঁটি; আমাদের গার্জেনদের অধিকাংশই ছিলেন সরকারী চাকুরে; তাঁরা অসহযোগ আন্দোলনে সায় দেন কি প্রকারে? আমার পিতাকে তো ইংরেজ রীতিমত ভয় দেখায়)। আমরা সাবালক; আমি নাস্তিক।' চিন্নি পার্লামেণ্টেরেনও বটে—তার দোস্ত মসোজীকে চ্যালেঞ্জ করে বললে, 'তুমি তো ক্রীশ্চান; তোমার সর্ব প্রার্থনা পাঠাতে হয় প্রভু যীশুর মাধ্যমে। আশ্রমের উপাসনায় যোগ দেবে কি করে?' আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুই তো মিয়া ভাই (মুসলমান)! পাঁচবেকৎ নেমাজ করিস' (করবো বলে বাবার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে এসেছিলুম)। সভাপতির দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওর ঘাড়ে আরো দুটো চাপানো কি ধর্মসম্মত?' ইত্যাদি, ইত্যাদি। রেভারেণ্ড এ্যানড্রুজ আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন সভাকে রাজী করাতে। পাদ্রীসাহেবের যাবতীয় স্কিল, তদুপরি তাঁর সরল আন্তরিকতা, তিনি সবকিছু প্রয়োগ করে খুব সুন্দর বক্তৃতা দেন। কিন্তু ভোটে চিন্নিপন্থীরা কয়েকটি ভোটে জিতে গেল। তখন সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ হ'ল, গুরুদেব যা আদেশ দেবেন তাই হবে। এ্যান্ড্রুজ সাহেবকেই আমরা দূত করে পাঠালুম।

গুরুদেব মাত্র একটি শব্দ উচ্চারণ করেন—'না'।

এই গেল চিন্নির পরিচয়।

ইতিমধ্যে আরেকটি ছেলে এল অন্ধ্র থেকে। মাধব রাও। সেও চমৎকার ফুটবল খেলে।

* * *

রাজ রাজমহেন্দ্রবরাম নগর—অর্থাৎ রাজমনড্রীর শ্রীযুত জগন্নাথ রাও চিন্নির বন্ধু। তিনি চিন্নিদের বাড়ির ছেলের মত। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ব্রাহ্মছাত্র অন্ধ্রদেশের শ্রীযুত চালামায়া গুরুদেবের প্রচুর কবিতা গল্প উপন্যাস এবং বিশেষ করে তাঁর ধর্ম সম্বন্ধীয় রচনা অনবদ্য তেলুগুতে অনুবাদ করেন। জগন্নাথ রাও সেগুলো পড়ে আকণ্ঠ রবীন্দ্রভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। চিন্নির আশ্রমাগমনের ফলে তাঁর আশ্রমদর্শনের সদিচ্ছা প্রবলতর হল। চিন্নিকে আকস্মিক আনন্দদানের উদ্দেশ্যে তাকে কোনো প্রকারের নোটিশ না দিয়ে শুধু চিন্নির পিতামাতাকে জানিয়ে এক শুভপ্রাতে রওনা দিলেন কলকাতা অভিমুখে।

কলকাতায় উঠলেন বড়বাজার অঞ্চলে এক অন্ধ্র মেসে। সেখানে শুধোলেন, শান্তিনিকেতন কি প্রকারে যেতে হয়? কেউ কিছু জানে না বলে টাইমটেবল যোগাড় করা হল—সেখানেও শান্তিনিকেতনের সন্ধান নেই। তখন একজন বললে, কাছেই তো পোয়েটের বাড়ি; সেখানে গেলেই জানা যাবে। শ্রীযুত জগন্নাথ রাও তাই করলেন। সেখানে দেখেন 'বিশ্বভারতী পাবলিকেশন্‌স' দফতর খোলা বটে, কিন্তু লোকজন কেউ নেই। শেষটায় একটি ছোকরা কেরানীকে আবিষ্কার করা হলে সে বললে, হাওড়া থেকে যেতে হয়, সে কখনো ওখানে যায় নি। যাঁরা যাওয়া-আসা করেন, তাঁরা সবাই গেছেন শ্মশানে। শান্তিনিকেতনের কে এক মিস্টার রাও সেই ভোরে হাসপাতালে মারা গেছেন।

জগন্নাথ রাও ত্রিভুবন অন্ধকার দেখলেন। সম্বিতে ফিরে আর্তকণ্ঠে শুধোলেন, 'কে?' ছোকরাটি বললে, বড়ই দুঃখের বিষয়। মিস্টার রাও আশ্রমের হয়ে ফুটবল খেলতে যান শিউড়িতে। সেখানে খেলাতে জোর চোট লাগার ফলে তাঁর হার্নিয়া স্ট্রেন্‌গুলেটেড্‌ হয়ে যায়। এ্যান্‌ড্রুজ সাহেব এখানকার হাসপাতালকে জরুরী চিঠি লিখে লোকজন সহ তাঁকে পাঠান কাল রাত্রে। সবই করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে বাঁচানো গেল না।

জগন্নাথ রাও টলতে টলতে বেরিয়ে এলেন। চিন্নি ওয়াল্‌টেয়ারে আরেকবার এই রকম খেলার মাঠে বেহুঁশ হয়।

রাস্তা থেকে আবার ফিরে গেলেন ছোকরাটির কাছে। শুধোলেন, 'তার বাড়িতে তার পাঠানো হয়েছে?' ছোকরাটি বললে সে জানে না।

জগন্নাথ রাও মেসে ফিরে এসে শয্যা নিলেন। দেশবাসীরা পরামর্শ করে তাঁর কথামত চিন্নির বাড়িতে তার পাঠালেন দুঃসংবাদটা জানিয়ে।

জগন্নাথ রাওয়ের কোনোই ইচ্ছা আর রইল না শান্তিনিকেতন যাবার, কিন্তু তিনি পরিবারের বন্ধু—এখন এত দূর কলকাতা অবধি এসে যদি সবিস্তার খবর নেবার জন্য সেখানে না যান তবে সবাই দুঃখিত হবেন।

নিতান্ত কর্তব্যের পীড়নে জগন্নাথ রাও হাওড়া গিয়ে, বোলপুরের ট্রেন ধরলেন।

বিকেলের দিকে যখন আশ্রমে পৌঁছলেন তখন গেস্ট্‌ হাউসে হিতলাল (বর্তমান কালোর দোকানের কালোর পিতা) ভিন্ন কেউ ছিল না—হিতলাল ইংরিজি জানে না। জগন্নাথ বিছানাপত্র সেখানে রেখে বেরুলেন কলাভবনের সন্ধানে। চিন্নি তাঁকে কলাভবনের ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখত।

সে কলাভবন বাড়ি আর নেই। তবে তার ভিতটা এখনো দেখতে পাওয়া

যায়, গুরুদেবের 'দেহলী' বাড়ির কাছে, বোলপুর যাবার রাস্তার পাশে।

কলাভবন সে সময়টায় নির্জন থাকে। নিচের তলায় কাউকে না পেয়ে তিনি সিঁড়ি দিয়ে ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছে সেখান থেকে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখেন,—

আমি যাচ্ছিলুম বোলপুর—নস্যি কিনতে; হঠাৎ শুনি, সেই অবেলায় কলাভবনে শোরগোল, স্পষ্ট চিনতে পেলুম আর্টিস্ট রমেন চক্রবর্তীর গম্ভীর গলা। কিন্তু আর্ত কণ্ঠে…তুমি যাও, শিগগীর যাও, জল নিয়ে এস। আমি ততক্ষণে দেখছি,—

তিন লম্ফে সেখানে পৌঁছে দেখি, চিন্নি 'দেহলী' বাড়ির দিকে কালবোশেখী বেগে ছুটেছে। আমি সেদিকে খেয়াল না করে সিঁড়ি বেয়ে মাঝখানে উঠে দেখি কে একজন লোক দু'পা ইয়া ফাঁক আর দু'হাত ওয়া লম্বা করে ধূলি-শয়নে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। জোয়ারের সমুদ্র বেলাতটকে মড়া ফিরিয়ে দিলে সে যেরকম শুয়ে থাকে। ঠোঁট দুটো তার কাঁপছে, আর বিড় বিড় করে বলছে, 'চিন্নি, চিন্নি!' চক্রবর্তী বললেন, সে আবার কি? তিনি বিশ্বনাথ রাওয়ের ডাকনাম জানতেন না। আমি বুঝিয়ে বললুম। চক্রবর্তী বললেন, দেখো তো, সৈয়দ, ডাক্তার এসেছে কি না, বিকেলে তো মাঝে-সাঝে আসে। আমি বললুম, দেখি, মনে তো হচ্ছে ভিরমি কেটে যাচ্ছে।

খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে দেখি, ওদের কেউই আর সেখানে নেই।

চিন্নি ভালো অভিনয় করতে জানে। রাত্রে তার ঘরে সে দেখালে জগন্নাথ রাও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ তাকে দেখে—সে আর চক্রবর্তী তখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন—থমকে গিয়ে কাঁপতে লাগলেন। দু'হাত দুদিকে দুটো হাঁটুর সঙ্গে এক তালে মৃগী রুগীর মত কাঁপতে কাঁপতে ধপাস্। চিন্নি বললে, 'অবশ্য আমার মুখেও জগন্নাথ বিস্ময় দেখতে পেয়েই ভয় পেয়েছিল আরো বেশী। ভাগ্যিস্ রমেনবাবু সঙ্গে ছিলেন! আমাকে ঐ আবছায়া আলোতে একলা-একলি দেখতে পেলে তার কোনো সন্দেহ থাকতো না যে, আমার ভূত কলাভবনের মায়া কাটাতে না পেরে সন্ধ্যার নির্জনে সেখানে আবার এসেছে।'

হঠাৎ দেখি জগন্নাথ রাওয়ের মুখ একেবারে রক্তহীন, মাছের পেটের মত পাঁশুটে হয়ে গিয়েছে। কাঁপতে কাঁপতে যা বললেন তা শুনে রমেনবাবুর মত ঠাণ্ডা মাথা স্থিরবুদ্ধির লোক পর্যন্ত অচল দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এতক্ষণে জগন্নাথের খেয়াল গেছে যে, তিনি চিন্নির বাপ-মাকে তার করে জানিয়ে বসে আছেন যে চিন্নি নেই।

আমি তেড়ে বললুম, 'আপনি তো আচ্ছা—নেভার মাইণ্ড!—রাও তো

আপনাদের দেশে প্রত্যেক সেকেণ্ড ইডিয়ট।'

জগন্নাথ বার বার বলেন, 'চিন্নি তো আমায় জানায় নি যে আরেকজন অন্ধ্রবাসী এসেছে। তার উপর ফুটবল, তারপর পেটে—'

রমেনবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'ওহে! এতক্ষণ তো খুব রগড় করলে! শোনো, ব্যাপারটা সিরিয়স! এ্যান্‌ড্রুজ সাহেবের কাছে যাও। আর কারো টেলিগ্রাম বাপ-মা বিশ্বাস নাও করতে পারেন। গুরুদেব তো বার্লিনে!'

সাহেব মোটেই চটলেন না। নাস্তিক চিন্নির জন্য খাঁটি খৃষ্টান ছ'পাতা লম্বা তার করলেন সব বুঝিয়ে। আর আমি চিন্নিকে তাঁর সামনেই বললুম, এবার প্রার্থনা করোগে, বাড়িতে যেন ভালো-মন্দ কিছু একটা না হয়। দুই অন্ধ্র ভাইজ্যাগ্‌ বাগের ট্রেন ধরলেন।

চিন্নি ফোকটে ছুটি মেরে হপ্তা তিনেক পরে ফিরল। আমরা শুধালুম, 'কি, আপন ছেরাদ্দ সাঁপটাবার মত ঠিক সময়ে পৌঁচেছিলি তো? হুঁকোটা লে, খুলে ক'!'

চিন্নি বললে, 'টেলিগ্রাম পৌঁচেছিল দেরিতে। ইতিমধ্যে দাদাকে আনানো হয়েছে মাদ্রাজ থেকে। বাড়িতে কান্নাকাটি সে আর কি বলতে—অবশ্য আমার শোনা কথা। যেদিন তার পৌঁছল সেদিন বামুন এসেছে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করতে। আর ট্র্যাজেডিটা দেখ, বাড়িসুদ্ধ সবাই শোকে এমনি বিকল যে, কে একজন তারটা সই করে নিয়ে একপাশে রেখে দিয়েছে, ঘণ্টা দুই কেউ খোলে নি, ভেবেছে, কি আর হবে, কণ্ডলেন্‌স্‌-টেন্‌স্‌। খুলেছিল শেষটায় আমার ছোট ভাই। সেও নাকি প্রায় ঐ জগন্নাথ রাওয়ের মত পাঙাশ মেরে রাম ইডিয়টের মত গা-গা ডাক ছেড়েছিল। বাকিরা ভাবলে, আবার কে মরলো? তারপর কেউ বিশ্বাস করে না তারটাকে, যদিও সবাই করতে চায়। এ্যান্‌ড্রুজ সাহেব এত বিখ্যাত লোক, তিনি আমাদের চিন্নিটার জন্য ইত্যাদি…।'

শেষটায় বিশ্বাস করেছিলেন বটে, কিন্তু আমি না পৌঁছানো পর্যন্ত কারো কারো মনের ধোঁকা কাটে নি।

রাত্রে ছাতের উপর পাশাপাশি শুয়ে আছি দু'জনাতে। আমি বললুম, 'চিন্নি, ঘুমুলি?'

'না।'

'আর তোর মা?'

'বিশ্বাস করবি নে, সেটা ভারি ইন্‌ট্রেস্‌টিং। জগন্নাথ রাওয়ের তার পৌঁছনোর পর থেকেই মায়ের মুখে শুধু এক বুলি, "কিছুতেই হতে পারে না। আমার ছেলে

নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। এই তো বছরের পয়লা দিনে আমি গণৎকার ঠাকুরকে ফি বছরের মত এবারও সব ক'টা ছেলের কোষ্ঠী দেখিয়েছি। তিনি এবারও বলেছেন, চিন্নির সামনে ফাঁড়াটি পর্যন্ত নেই"।'

চিন্নি বললে, 'যখন পুরুতঠাকুর শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করতে এসেছে তখনো তার মুখে ঐ এক বুলি, "কি হবে এসব ব্যবস্থা করে? গণৎকার বলেছে, এ বছরে চিন্নির জ্বর-জ্বালাটি পর্যন্ত নেই"।'

কে তাঁর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে বোঝাবে চিন্নি নেই?

আর শ্রাদ্ধে যা টাকা খরচা হওয়ার কথা ছিল সেটা মা দিয়েছে গণৎকারকে।

শৈলজানন্দ রচনাবলী

ষষ্ঠ খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬১

সম্পাদক
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
সুমথনাথ ঘোষ
সবিতেন্দ্রনাথ রায়
মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা
শ্রীচুনী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ
সিল্ক স্ক্রীন ও
চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ ৭৩ হইতে এস. এন. রায়
কর্তৃক প্রকাশিত ও মানসী প্রেস, ৭৩ মানিকতলা স্ট্রীট, কলিঃ ৬ হইতে
শ্রীপ্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা	শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	৴০
তুলনাহীনা	...	১
শহ্‌র্‌-ইয়ার	...	১৮৭
গ্রন্থ-পরিচয়	...	৩৮৫

ভূমিকা

॥ এক ॥

সে আজ বিশ বছর আগেকার কথা। উত্তর কলকাতার এক কলেজে সুবহ্-শাম চেঁচাতাম অর্থাৎ সকাল দশটা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত আই. এ. বি এ. বি. কম. ক্লাসে পড়াতাম। সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেব তখন পাটনা বেতারকেন্দ্রের একজন কেষ্টুবিষ্টু। ঐ কলেজের কর্তৃপক্ষ বার্ষিক এক্সটেনশন-লেকচার-এর ব্যবস্থা করলেন। সে বছরের বক্তৃতা দেবেন আলি সাহেব। তিনদিনের বক্তৃতা, দক্ষিণা মন্দ নয়। বিষয়—বাংলাসাহিত্যে মানবিকতা। আলি সাহেব পাটনা থেকে এসে উঠলেন তাঁর পুরনো ডেরায়—পার্ক সার্কাসের পার্ল রোডের বাড়িতে। আমার সঙ্গে পূর্ব থেকেই চেনা ছিল বলে কলেজ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে রোজ দুপুরে ট্যাক্সি নিয়ে তাঁকে আনতে যেতাম। রোজই গিয়ে দেখতাম, লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরিহিত আলি সাহেব সারাঘরে পায়চারি করছেন।

—এ কি, এখনো আপনি তৈরী হননি?

—বোসো বৎস। অত তাড়া দিও না।

—ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

—থাকুক, ব্যাটাদের দু পয়সা খর্চা হোক। অত তাড়া দিও না। দাঁড়াও পান-জর্দা খাই, তবে তো যাব।

বলে নানা গল্প ফাঁদতেন। বার বার ঘড়ি দেখি, আর তাঁকে তাগাদা দিই। তিনি হাসিমুখে ইচ্ছে করে দেরি করতেন।

আলি সাহেব তিনদিনের বক্তৃতায় দেখিয়েছিলেন, বাংলাসাহিত্যে মানবিকতা বরাবরই ছিল ও আছে। ধর্মের প্রভাবে যে উচ্চকোটির সাহিত্য-সৃষ্টি হয়েছে, তার বাইরে লোকসাহিত্য জনজীবনের সুখদুঃখের মালা গত হাজার বছরে গাঁথা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় তা পেয়েছে অপরূপ বাণীরূপ।

প্রতিদিন এক ঘণ্টা বক্তৃতা। শ্রোতারা ষাট মিনিট ধরেই হেসে গড়িয়ে পড়তেন। আর আলি সাহেব গম্ভীর মুখে বক্তৃতা করতেন। একদিন বললেন, 'শ্রীহট্ট থেকে অনেক গ্রেট ম্যানের আবির্ভাব হয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেবের আদি বাড়ি শ্রীহট্টে। লালন ফকির, হাসনরাজার বাড়ি সিলেটে। অবশ্য আমার কথা এখানে তুলছি না।' (আলি সাহেবের বাড়ি সিলেটে সুরমা নদীর তীরে।)

এই কথা বলেই লালন ফকিরের গানের শ্লোক ঝাড়লেন—

মরার আগে মলে শমন-জ্বালা ঘুচে যায়।
জান্ গে সে মরা কেমন, মুরশীদ ধরে জানতে হয়॥

রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করে বলেন, গুরুদেব মর্তের কবি। তিনি এক মুহূর্তে আমাদের "নীলাম্বরের মর্মমাঝে" নিয়ে গেছেন, সেখানে "তারায় তারায় দীপ্তশিখার অগ্নি জ্বলে নিদ্রাবিহীন গগনতলে"। পরমুহূর্তেই মর্তে ফিরিয়ে এনেছেন, গেয়েছেন—

হেথা মন্দমধুর কানাকানি জলে স্থলে
শ্যামল মাটির ধরাতলে।
হেথা ঘাসে ঘাসে রঙিন ফুলের আলিঙ্গন
বনের পথে আঁধার-আলোর আলিম্পন।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের কবি, আলি সাহেব তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, তবু আমরা যেন না ভুলি তিনি বাংলার কবি। বুয়োনোস এইরেস থেকে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখেছিলেন 'চিঠি'—

দূর প্রবাসে সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে এনু,
হঠাৎ যেন বাজল কোথায় ফুলের বুকের বেণু।
আতি-পাতি খুঁজে শেষে বুঝি ব্যাপারখানা,
বাগানে সেই জুঁই ফুটেছে চিরদিনের জানা।
গন্ধটি তার পুরোপুরি বাংলাদেশের বাণী,
একটুও তো দেয় না আভাস এই দেশী ইস্পানি।
প্রকাশ্যে তার থাক না যতই সাদা মুখের ঢঙ,
কোমলতায় লুকিয়ে রাখে শ্যামল বুকের রঙ।

প্রবাসী কবি ব্যাকুল হয়ে দিনুর কাছে দেশের খবর চেয়ে ঐ 'চিঠি'তে লিখেছিলেন—

ঘরের খবর পাই নে কিছুই, গুজোব শুনি নাকি
কুলিশপাণি পুলিস কোথায় লাগায় হাঁকাহাঁকি।
শুনছি নাকি বাংলাদেশের গান হাসি সব ঠেলে
কুলুপ দিয়ে করছে আটক আলিপুরের জেলে।
হিমালয়ে যোগীশ্বরের রোষের কথা জানি,
অনঙ্গেরে জ্বালিয়ে ছিলেন চোখের আগুন হানি।
এবার নাকি সেই ভূধরে কলির ভূদেব যাঁরা
বাংলাদেশের যৌবনেরে জ্বালিয়ে করবে সারা।.....
প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে দুঃখ দেবার বড়াই,
জেনো মনে, তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই।

দুঃখ সহার তপস্যাতেই হোক বাঙালির জয়,···
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।
পালোয়ানের চেলারা সব ওঠে যেদিন খেপে,
ফোঁসে সর্প হিংসা-দর্প সজল পৃথ্বী ব্যেপে,
বীভৎস তার ক্ষুধার জ্বালায় জাগে দানব ভায়া,
গর্জি বলে, আমিই সত্য, দেবতা মিথ্যা মায়া ;
সেদিন যেন কৃপা করেন আমায় ভগবান,
মেশীন-গান-এর সম্মুখে গাই জুঁই ফুলের এই গান।

আজো স্পষ্ট মনে পড়ে বিশ বছর আগের সেই সভায় বক্তা আলি সাহেবের রূপ। ফর্সা লাল টকটকে মুখ, মুহূর্তমাত্র না থেমে স্মৃতি থেকে তুলে আনছেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা।

লেখক সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনার দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উপরের রেখাচিত্র থেকে পাই—মানবিকতা আর রবীন্দ্রানুগত্য। দুয়ে মিলে সৈয়দ সাহেব। তাঁর জীবনরসিকতা ও সদাজাগ্রত কৌতূহল সম্প্রদায়নিরপেক্ষ উদার মনোভাব ও বৈদগ্ধ্য, মানসিক আভিজাত্য ও নির্মলতা, গদ্যভাষার দীপ্তি ও শব্দসচেতনতা, বৈষ্ণবপদাবলীপ্রীতি ও সহজমানুষ প্রীতি. লঘুরসিকতা প্রবণতা আর হৃদয়-গভীরস্পর্শী অশ্রুমিশ্রিত হাসি ঃ সব কিছুরই হদিস পাওয়া যায় ঐ দুটি বৈশিষ্ট্যে। তিনি আড্ডাবাজ, মজলিশী মানুষ—একথা যেমন সত্য, হৃদয়ের গভীরে ডুবুরি, একথা তেমনি সত্য। তাঁর রম্যরচনায় হয়ত সব সময় আসল মানুষটা ধরা পড়েনি, কিন্তু উপন্যাসে ধরা পড়েই। জীবনের গভীরে ডুব মেরে তিনি দুয়েকটি রত্ন তুলে আনেন, প্রতি ক্ষেত্রেই সেটি কান্না-মেশানো। 'শবনম্,' 'অবিশ্বাস্য', 'শহ্‌র্-ইয়ার', 'তুলনাহীনা' তার পরিচয়স্থল।

বর্তমান খণ্ডে গৃহীত দুটি উপন্যাস—'শহ্‌র্-ইয়ার' (১৯৬৯) ও 'তুলনাহীনা' (১৯৭৪) লেখকের সাহিত্যজীবনের শেষ পর্বের রচনা। দুটি উপন্যাসেরই অবলম্বন মানবজীবনের অন্তহীন দুঃখবেদনা। 'দুঃখের কাব্যকে আমরা সুখের কাব্য অপেক্ষা অধিক সমাদর করি'—রবীন্দ্র-প্রদত্ত এই সূত্রকে মুজতবা আলী মান্য করেন। তাঁর উপন্যাস এই সূত্রের সব চেয়ে বড় প্রমাণ। জর্মান সাহিত্যিক জিগিসমুণ্ট ফন্ রাডেকি সংকলিত 'আ বে ৎসে ডেস্ লাখেনস্' (হাসির অ-আ, ক-খ) হাসির গল্পগুলির আলোচনা-প্রসঙ্গে (টুনি মেম' পশ্য) আলী সাহেব লিখেছেন,

> রাডেকি এ-অনুচ্ছেদ শেষ করেছেন এই বলে—'হাস্যরস মানুষে মানুষে যোগসূত্র স্থাপন করে।' আমি সম্পূর্ণ একমত নই। হাসির চেয়ে কান্না, আনন্দের চেয়ে বেদনাই আমাদের একে অন্যকে কাছে

টানে বেশী। এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হতে পারে। কিন্তু এস্থলে একটি সামান্য উদাহরণ দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে। বৈঠকখানায় বসে শুনতে পেলুম, বাড়ির বউ-ঝিরা রান্নাঘরে কাজ করতে করতে হঠাৎ একসঙ্গে হেসে উঠলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে হাসির হিস্যাদার হতে কিংবা কারণ অনুসন্ধান করতে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ির ভিতর ছুটে যাই নে। কিন্তু সবাই যদি একসঙ্গে ডুকরে কেঁদে ওঠে তবে অবশ্যই যাই।

[সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী ৩]

পরিহাসের তলায় অনেক বেদনাকে লুকিয়ে রাখার বা বহন করবার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল, 'দেশে-বিদেশে' বা 'চাচা-কাহিনী' গ্রন্থ দুটি তার প্রমাণ।

॥ দুই ॥

'শহ্‌র্‌-ইয়ার' উপন্যাসের মুখপাতে লেখকের উক্তি প্রণিধানযোগ্য ঃ

আমার আপন ভাগ্নী পর্যন্ত ফরিয়াদ করে, আমার লয়েল্‌টি-বোধ নেই ; মুসলমান হয়েও মুসলমানদের নিয়ে গল্প উপন্যাস লিখি নে। এবারে সে বুঝতে পারবে কেন লিখি নে।

মুসলমান মেয়েকে নিয়ে আলি সাহেব দুটি উপন্যাস লিখেছেন—'শবনম্‌' আর 'শহ্‌র্‌-ইয়ার'। দুয়ের মধ্যে মিল আছে। দুয়েরই নায়িকা অসামান্যা, দুয়েরই নায়ক লেখক স্বয়ং, দুয়েতেই প্রেমের, বেদনাময় কাহিনীর প্রাধান্য, দুয়েতেই রবীন্দ্রনাথের আধিপত্য, রবীন্দ্র-কাব্য আর রবীন্দ্র-সঙ্গীতে জীবনের ব্যর্থ সাধনার তাৎপর্য আর সান্ত্বনা অন্বেষণ ; দুয়েতেই তত্ত্বালোচনার প্রাধান্য —ঈশ্বরবিশ্বাসীর সত্যান্বেষণের পরিচয়দানের প্রয়াস, দুয়েতেই শিথিল-গ্রথিত কাহিনীতে নায়কের (ওরফে লেখকের) কথার নেশা মাত্রা ছাড়ায়।

তুলনা আর বেশি দূর টেনে লাভ নেই। ফিরে যাই 'শহ্‌র্‌-ইয়ার' উপন্যাসে। নায়িকা শহ্‌র্‌-ইয়ার আধুনিকা মুসলমান রমণী, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ লেখক রাখেননি। তাঁর সৌন্দর্য, বুদ্ধির দীপ্তি, আতিথ্য-পরায়ণতা ও কোমল সেবাপরায়ণতা নারীচরিত্রের ভূয়োভূয় প্রশংসাসূচক বর্ণনা করেছেন লেখক। শহ্‌র্‌-ইয়ার-এর দাম্পত্যজীবনের, তার সুভদ্র বিনয়ী ডাক্তার-স্বামীর নানা ছবি তিনি এঁকেছেন। শহ্‌র্‌-ইয়ার-এর সঙ্গে লেখক-নায়কের সম্পর্ক কী ? নায়কের কথায়—'আমার' বোনের চেয়েও বোন, প্রিয়ার চেয়েও প্রিয়া। তার সঙ্গে নায়কের হার্দিক সম্পর্ক যখন জমে উঠেছে, তখনি ভৃত্য জমীলের কাছ থেকে নায়ক জানতে পারল শহ্‌র্‌-ইয়ার পীর ধরেছে!

এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় শহ্‌র্‌-ইয়ার-এর ডাক্তার-স্বামী মৃতপ্রায় আর লেখক-নায়ক হতভম্ব। সে কিছুতেই এই অবিশ্বাস্য কথা মানতে চায় না, মনে নিতে চায় না।

> সাধারণতম মুসলমান মেয়েরও নামাজ-রোজার প্রতি যেটুকু টান থাকে সেটুকুকেও ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিলেও যেটুকু থাকার সম্ভাবনা তাও তো আমি শহ্‌র্‌-ইয়ারের কথাবার্তা চালচলনে কখনও দেখি নি। সে নিজেই আমাকে একাধিকবার বলেছে, তার দিল্‌ তার জান্‌, তার সবকিছুর এমারৎ দাঁড়িয়ে আছে—চৌষট খাম্বার উপর না—রবীন্দ্রনাথের গানের তিন হাজার গানের তিন হাজার স্তম্ভের উপর। সেখানে গুরুবাদই বা কোথায়, আর পীর সাহেব তো সেই হাজারো স্তম্ভের কোনো একটার পলস্তরা পর্যন্ত নন।

সেটাই তো রহস্য! এই উপন্যাসের রহস্য! এই রমণীর মণি, মমতার খনির রহস্য! বাউলের দেহতত্ত্বগীতে, লালন ফকীরের মারফতী গানে, কি রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীতে—কোনোটাতেই শহ্‌র্‌-ইয়ার-এর বিশেষ কোনো মোহ নেই, আর সে কি না পীর ধরেছে!

লেখক এই অসামান্য নায়িকার জীবনের চারটি স্তর দেখিয়েছেন। প্রথম স্তরে বাঙালী মুসলমান ঘরের মেয়ে অবরোধ ভেঙে কলেজে লেখাপড়া শিখেছে। দ্বিতীয় স্তরে সুগৃহিণী, মমতাময়ী সেবাপরায়ণা সঙ্গিনী, রবীন্দ্র-রসিকা; স্বামী থাকলেও সঙ্গিহীনা। তৃতীয় স্তরে পীরশরণাশ্রিতা। পরিণতি চতুর্থ স্তরে—বিদেশযাত্রিণী অন্তঃসত্ত্বা নারী।

শহ্‌র্‌-ইয়ার-এর ডাক্তার-স্বামী থাকে তার গবেষণা নিয়ে। বিশাল নির্জন গৃহে সঙ্গিহীনা সন্তানহীনা স্বামীসঙ্গবিচ্যুতা, শহ্‌র্‌-ইয়ার-এর দিন কাটে কি করে! সে আশ্রয় নিয়েছিল সাহিত্যে সঙ্গীতে—বিশেষ করে রবীন্দ্রলোকে। ঠিক সেই সময়ে নায়কের সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয়। দিনে দিনে এই আলাপ গাঢ়তর হয়েছে—নায়ক অনুভব করেছে নায়িকার নিঃসঙ্গতা। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে অবলম্বন করে নায়ক দিনে দিনে আবিষ্কার করেছে এই অসামান্যা নায়িকাকে। 'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশ-কুসুম চয়নে' গানের রেকর্ডখানি পরস্পরকে কাছাকাছি এনে দিয়েছে। শহ্‌র্‌-ইয়ার কেবল রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনুরাগিণী নয়, সুগায়িকাও। তার নিজের কথায়—'আমার জীবন-রস রবীন্দ্রসঙ্গীত। ঐ একটি-মাত্র জিনিস।' পর পর যে-সব রেকর্ড শহ্‌র্‌-ইয়ার বাজিয়েছে আর গেয়েছে, তার থেকে এই পরিচয়ের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। 'তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে কত আর সেতু বাঁধি', 'আমার নয়ন', 'ঐ মরণের সাগর পারে, চুপে চুপে তুমি এলে', 'কেন চোখের জলে ভাসিয়ে দিলাম না রে', 'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না', 'নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা', 'তোমায়

সাজাবো যতনে কুসুমে রতনে', 'হাটের ধুলো সয় না যে আর, কাতর করে প্রাণ', 'হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান', 'তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে'—এই সব গান নায়িকার আনন্দ আর বেদনা, নিঃসঙ্গতা আর সজনতা, জীবনানুরাগ আর আত্মখণ্ডনপ্রবণতাকে একই সঙ্গে প্রকাশ করে।

পরমবান্ধবী আর পীর-ভক্ত—শহ্‌র্‌-ইয়ার-এর দুটি রূপ নায়ককে করেছে বিভ্রান্ত।

> পীর-ভক্ত হওয়ার পূর্বে 'শহ্‌র্‌-ইয়ারের হার্দিক ও দৈহিক সৌন্দর্য একদিনে আমার কাছে স্বপ্রকাশ হয় নি। তার হাসি তার গান, দূর থেকে দেখা তার আপন মনে মনে একা একা তালসারির গা ঘেঁষে ভ্রমণ, আমার বাড়ির দোতলাতে তার আবাস নির্মাণ, মুসলমান রমণীর স্বাতন্ত্র্য নিয়ে তার অভিমান—তার আরো কত শত আহার শয্যাসন-ভোজন, কত কিছুর ভিতর দিয়ে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। দিনে দিনে সে আমার কাছে সুন্দরের চেয়ে সুন্দর, মধুরের চেয়ে মধুর হয়ে বিভাসিত হয়েছে। আর আজ? আজ থেকে আবার তাকে নূতন করে চিনতে হবে!

পীর-ভক্ত শহ্‌র্‌-ইয়ারকে দেখে নায়কের বেদনা আর ধন্ধ যায় না। এ যদি নতুন মানুষ হত তবে কোন ভাবনাই ছিল না। পুরনো মানুষকে নতুন করে চেনা বড় বেদনাদায়ী। আর এ-রমণীর সঙ্গে যদি নায়কের সম্পর্ক প্রণয়ের হত তবে তার আজকের অবহেলা অন্যদিনে পুষিয়ে যেত। প্রেম তো পূর্ণচন্দ্র। তাই তার চন্দ্র-গ্রহণও হয়। কিন্তু বন্ধুত্বও শুক্লপক্ষের চন্দ্রমার মত রাতে রাতে বাড়ে আর চতুর্দশীতে এসে থামে। পূর্ণিমাতে পেঁছিয় না। তাই তার গ্রহণ নেই ক্ষয়ও নেই, কৃষ্ণপক্ষও নেই। তবু—তবু এ বন্ধুত্বের উপর এ কিসের করাল ছায়া? এই চিন্তার অংকুশ নায়ককে বিদ্ধ করেছে। পীর-ভক্ত শহ্‌র্‌-ইয়ারকে নায়ক রবীন্দ্র-রেকর্ড বাজাতে বলেছে—'তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছ নীচে।' নায়িকা বাজিয়েছে কিন্তু তার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। সে তো আজ রবীন্দ্রগীতলোকে নেই, সে চলে গেছে সুফীপীরের দরবারে! রাতের আঁধারে নায়ক শুনেছে শহ্‌র্‌-ইয়ার অতি মধুর কণ্ঠে গাইছে জপগীতি—আরবী দোহা -'ইয়া লতীফুল্‌। তুফ্‌বি না। নাহ্‌নু' বিদক্‌/কুল্লি না।' (হে সুন্দর, তোমার সৌন্দর্য আমাদেরকে দাও। আমরা তোমার পূজারী, আমরা সকলেই।)

পীর-ভক্ত শহ্‌র্‌-ইয়ারকে নায়ক যতই দেখে ততই অবাক মানে। তাকে সে যতটা জানে, তার ডাক্তার স্বামী যতটা জানে, ততটাই সম্পূর্ণ জানা নয়। অনাত্মীয় অপরিচিত মানুষের (ভূতনাথ খান) চোখে শহ্‌র্‌-ইয়ার-এর যে পরিচয় পেল তাতে সে বিস্মিত হয়। শেষোক্তজনের কথায়—শহ্‌র্‌-ইয়ার

'অগ্নিশিখা'। পীর-ভক্ত শহ্‌র্‌-ইয়ারকে নায়ক বার বার রবীন্দ্র-ধর্মসঙ্গীতের আনন্দ অনুধাবন করাতে চেয়েছে, সে ম্লান হেসে জানিয়েছে—ঐসব গানের রেকর্ড তার বুকের ভিতর আর সাড়া জাগায় না।

উপন্যাসের অন্তিম অধ্যায়ে শহ্‌র্‌-ইয়ার দীর্ঘ পত্র মারফৎ জানিয়েছে তার মানসিক পরিবর্তনের ইতিহাস—তার দাম্পত্যজীবনের ট্রাজেডি—তার নিঃসঙ্গ নারীজীবনের বেদনাজীর্ণ কাহিনী। রবীন্দ্র-ধর্মসঙ্গীত আর তাকে টানে না, একথা স্বীকার করেও শহ্‌র্‌-ইয়ার রবীন্দ্রনাথেরই শরণ নিয়ে তার সমস্যার বিবরণ দিয়েছে—'যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা তোমায় জানাতাম'। জানিয়েছে, সে ঠিক ঠিক জানে না তার কিসের ব্যথা, অভাব কোন্‌খানে, যার ফলে বিলাসবৈভবের মাঝখানেও যেন কোনো এক অসম্পূর্ণতার নিপীড়ন তাকে অশান্ত করে তুলেছিল। শহ্‌র্‌-ইয়ার-এর সমস্যাটা কী? তা হল—পুরুষমানুষ কি কখনো নারীর মন বুঝতে পারে, চিনতে পারে, হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারে? শহ্‌র্‌-ইয়ার তার জীবনে শূন্যতার চরিত্র বিশ্লেষণ করেছে অতি নিপুণভাবে। পুনর্বার রবীন্দ্রনাথেরই শরণ নিয়ে জানিয়েছে তার পরিস্থিতি—'ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার / সম্মুখে ঘন আঁধার / পার আছে কোন্‌ দেশে। /··· হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা / চলেছে নিরুদ্দেশে। / পথের শেষ কোথায় শেষ কোথায় / কী আছে শেষে!' শহ্‌র্‌-ইয়ার-এর তীক্ষ্ণ আর্ত জিজ্ঞাসা—মেয়েদের এই শূন্যতা, দীনতা, ফ্রস্‌ট্রেশনের জন্য দায়ী কে! অন্ধ ঐতিহ্য-আনুগত্য নষ্ট করে দিয়েছে তার দাম্পত্য-জীবন, তার ব্যক্তি-জীবন। মুক্তি তবে কোন্‌ পথে? পীরের শরণ নিয়েছে সে। এ তার পরিবর্তন নয় নবজাগরণ। সে নিরাশাবাদী নয়—জীবনকে ঢেলে সাজতে হবে নতুন করে—এ বিশ্বাস তার আছে। 'রূপনারাণের কূলে/জেগে উঠিলাম/জানিলাম এ জগৎ/স্বপ্ন নয়': রবীন্দ্রনাথের অন্তিম কবিতা এই অসামান্যা নায়িকার কাছে নতুন তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে, কেবল একটিমাত্র শব্দ সে বদলে নিয়েছে—রূপনারায়ণের 'কোলে'।

শহ্‌র্‌-ইয়ার-এর এই বিশ্লেষণমূলক দীর্ঘ পত্র তার জীবনের টেস্টামেণ্ট। লেখক-নায়ক ধীরে ধীরে নিপুণতার সঙ্গে উন্মোচন করেছেন এই নায়িকার জীবনের তিনটি স্তর। আর—তারপর চতুর্থ স্তর—ওস্তাদের মার অন্তিমে—শহ্‌র্‌-ইয়ার-এর সঙ্গে ডাক্তার-স্বামীর ভুল ভেঙেছে—আগুনে পুড়েছে ট্রাডিশনে মোড়া পাষাণদুর্গ (স্বামীগৃহ)—শেষ হয়েছে স্বামীসঙ্গ বিচ্যুতার জীবন—স্বামীর সঙ্গে অন্তঃসত্ত্বা শহ্‌র্‌-ইয়ার এসেছে, চলেছে নবজীবনের সন্ধানে—সুইডেনে। সেখানে গিয়ে সে কি পাবে নির্জনতা? আবার দেখা হবে তো? নায়কের দুটি প্রশ্নের উত্তরে শহ্‌র্‌-ইয়ার ক্ষীণ কণ্ঠে জানিয়েছে—'কী জানি, কী হবে।'

জীবন অনন্ত রহস্যময়—কে জানে কী হবে?—'ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার/

সম্মুখে ঘন আঁধার/পরে আছে কোন্ দেশে।/……হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা/ চলেছে নিরুদ্দেশে। /পথের শেষ কোথায় শেষ কোথায় / কী আছে শেষে!' উপন্যাসের নায়িকার জীবনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এতো সার্থক ব্যবহার আমার আর জানা নেই।

॥ তিন ॥

লেখকের সর্বশেষ উপন্যাস 'তুলনাহীনা'র পটভূমি খৃষ্টাব্দের প্রথম কয়েকটি মাস, পটভূমি—প্রত্যক্ষে কলকাতা, আগরতলা, শিলং; অপ্রত্যক্ষে সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তান—ইয়েহিয়ার বুটের তলায় নিষ্পেষিত পূর্ব-পাকিস্তান—আজাদীর জন্য অপেক্ষারত রক্তস্নাত বদ্ধমুষ্টি পূর্ব-পাকিস্তান। সম্প্রতিকালের চড়াসুরে-বাঁধা সাংবাদিকতাশ্রয়ী উত্তেজক ঘটনাবলীর বিবরণ নয়, সাহিত্যের সৃষ্টিরূপে হাজির হয়েছে 'তুলনাহীনা'। এ উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা হিন্দু—কীর্তি চৌধুরী আর শিপ্রা রায়। সৈয়দ সাহেবের চারটে উপন্যাসই নায়িকা-প্রধান। 'তুলনাহীনা'র নায়িকা আর এক অসামান্যা নারী, যার ব্যক্তিত্বের প্রভায় সবাই মুগ্ধ, আলোকিত, ত্রস্ত, বিমূঢ়। শিপ্রা কলকাতার খানদানী উঁচু মহলের সোসাইটি-লেডি, বেয়ারাদের কথায়—'খাঁটি মিসিবাবা'। পবিত্র মহরম মাসে ইয়েহিয়া খুনখারাবী করতে ইতস্তত করতে পারে: এই ভুল ধারণার উপর কলকাতা-আগরতলা-শিলঙের অনেক হিন্দু-মুসলমান নির্ভর করেছিল। সকলেরই শিকড় আছে পূর্ব-পাকিস্তানে। কিন্তু সব ধর্মভীরু মুসলমান আর হিন্দুদের সব আশাভরসা নির্মূল করে বজ্রের মতো নেমে এল পঁচিশে মার্চের 'ক্র্যাক-ডাউন'। এই রক্তাক্ত পটভূমিটি এখানে প্রত্যক্ষে নেই, তবু দূর থেকেই তার প্রভাব পড়েছে ভারতের সর্বস্তরে সকল মানুষের উপর।

আলি সাহেবের সব লেখার মতই এ উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথ হাজির। বস্তুত তাঁর সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ সর্বগ, সর্বশক্তিমান। প্রেমিক কীর্তি চৌধুরীর (শিপ্রার সিলেটী ভাষায় আদরের ডাকে 'কিতা') সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠিতা শিপ্রা অপেক্ষা করছে শিলঙে। অপেক্ষা করে করে শিপ্রা যখন ধৈর্যের শেষ সীমানায় তখনি এল কীর্তি আগমন-সংবাদের 'তার'। আর তখনই লেখক পেয়ে গেলেন মোকা—এসে গেলেন রবীন্দ্রনাথ—শিলঙ আর দার্জিলিঙের তুলনামূলক বিচারের মধ্য দিয়ে—'দার্জিলিঙের তুলনাতে ঠান্ডা হেথায় কম হবে। একটা খদ্দর চাদর হলেই শীত-ভাঙানো সম্ভবে।' রবীন্দ্র-কবিতায় বর্ণিত শিলঙকে প্রতীক্ষার অবসান' শেষে নায়িকা লাইনে লাইনে মিলিয়ে নেয়—'এখানে খুব লাগল ভালো গাছের ফাঁকে চন্দ্রোদয়', এখানে 'বাতাস কেবল ঘুরে বেড়ায় পাইন বনের পল্লবে'। মেঘ আর রোদের, আলো আর ছায়ার

লুকোচুরি খেলা দেখছিল শিপ্রা শান্ত প্রতীক্ষায়—পাইনের শীর্ষ পল্লবের মৃদু আন্দোলন আর টুকরো নীলাকাশ।

'তুলনাহীনা' প্রেমের উপন্যাস। রবীন্দ্র-নিষ্ণাত লেখকের কলমে সৃষ্ট উপন্যাস পড়তে পড়তে মনে পড়ে যায় 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের কথা। কেবল রঙ্গস্থলের আকস্মিক সাদৃশ্য দেখে একথা লিখছি নে, প্রেমালাপনেও ও বন্যা-মিতার (লাবণ্যঅমিত রায়) কথা মনে পড়ে যায়। কীর্তিকে শিপ্রা আদর করে কখনো ডাকে 'কিতা', কখনও-বা 'মিতা'। শিপ্রা কীর্তিকে সেই অধরা প্রেমের বাঁধনে বাঁধতে চেয়েছে যে বাঁধনে অমিত রায় বাঁধতে চেয়েছিল লাবণ্যকে, তফাৎ এইখানে, লাবণ্য অমিতের প্রেমে শেষ ভরসা রাখেনি, কীর্তি শিপ্রার প্রেমে তা রাখতে চেয়েছে। রবীন্দ্র কাব্য আর উপন্যাসের ভাষার স্বাদ পাই মুজতবা আলির উপন্যাসে—

> আলিঙ্গন ঘনতর করে বাষ্পভরা কণ্ঠে কীর্তি বললে, 'এই তো আমার অক্ষয় সম্পদ। তোমার প্রেমই আমাকে দেখিয়ে দেবে পথ, ভরে দেবে আমার বুক সাহস দিয়ে, আর সবচেয়ে বড় কথা—আমার মত অপদার্থকে করে দেবে কর্মনিষ্ঠ। যেখানেই যাই না কেন, যেতে যেতে যতই ক্লান্ত হয়ে পড়ি না কেন, তোমার কথা ভাবলেই পাবো নবীন উৎসাহ।' (তুলনাহীনা, দ্বিতীয় খণ্ড, একাদশ অধ্যায়)

কিমাশ্চর্যমতঃপরম্! শহ্‌র্‌-ইয়ার তার শেষ চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের যে প্রেমগীতির শরণ নিয়েছে, শিপ্রা রায়ও বিদায়বেলায় সেই গানেরই শরণ নিয়েছে (তুলনাহীনা, দ্বিতীয় খণ্ড, একাদশ অধ্যায় পশ্য)। অথচ দুজনের সামাজিক ও মানসিক পরিস্থিতিতে কত ব্যবধান! আর এই ব্যবধান সত্ত্বেও দুজনে একই ধাতুতে গড়া। দুই নায়িকার বক্তব্য উপস্থাপন-রীতি কত আলাদা, তবু একই গানেরই ব্যবহার।

শহ্‌র্‌-ইয়ার-এর উক্তি ঃ

> আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত বেশ ভাল করেই চিনি।···তাঁর শেষের দিকের গানের একটিতে হট্‌-স্টাফের কিঞ্চিৎ পরশ আছে ঃ 'বাসনার রঙে লহরে লহরে রঙিন্ হল। /করুণ তোমার অরুণ অধরে তোলো হে তোলো॥' আর বার বার বলছেন 'পিয়ো হে পিয়ো।' সর্বশেষে বলছেন, আমার এই তুলে-ধরা পানপাত্র চুম্বনের সময় তোমার নিশ্বাস যেন (আমার) নিশ্বাসের সঙ্গে মিশে যায়। এই যে প্রিয়ার 'নবীন ঊষার পুষ্পসুবাসে'র মত নিশ্বাস, একে নিঃশেষে শোষণ করার মত সাব্‌লাইম কাম আর কী হতে পারে?'

অন্যদিকে অফুরন্ত আদরে কীর্তিকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে যে নায়িকা, সে-ও শরণ নিয়েছে একই গানের—

> কীর্তির ঠোঁটের কাছে এনে তার নিশ্বাস শিপ্রা আপন নাক দিয়ে নিঃশেষে শুষে নিয়ে গুনগুন করে গাইলে, 'আমাতে মিশাক্ তব নিশ্বাস নবীন ঊষার পুষ্প সুবাস—' বার বার। তারপর আবার বার বার 'বাসনার রঙে লহরে লহরে রঙিন হল, হে প্রিয়/ করুণ মম অরুণ অধর পিয়ো হে পিয়ো।' তারপর কীর্তনিয়া রীতিতে বার বার আখর দিলে, 'অরুণ অধর পিয়ো হে পিয়ো।' মাঝে মাঝে থেমে থেমে কীর্তির নিশ্বাস নিঃশেষে শুষে নিয়ে আপন বুক ভরে নেয়—তার শ্রান্তি নেই ক্লান্তি নেই।

'তুলনাহীনা' উপন্যাসের শেষে ইয়েহিয়ার বর্বর আক্রমণকে পর্যুদস্ত করে স্বাধীন বাংলাদেশ নিজের পায়ে দাঁড়াবেই, দাঁড়াবে, এই আশ্বাস উচ্চারিত হয়েছে, শিপ্রার রোমান্টিক প্রেম কীর্তিকে পেয়ে ধন্য হবে, সুখদ পরিণামেরও ইঙ্গিত আছে। শহ্‌র্-ইয়ার-এর ইন্‌টেলেকচুয়াল বিশ্লেষণ প্রবণতা শিপ্রার নেই, কিন্তু কীর্তির কথায়—"তুমি সত্যি শিপ্রা—শব্দটি এসেছে ক্ষিপ্রা থেকে, অর্থাৎ যে দ্রুতগতিতে চলে। তুমি প্রথম যেদিন আমার দিকে তাকিয়ে একটুখানি—কেউ-দেখলো-কেউ-না—প্রসন্ন স্মিত হাস্যের আভাস দিয়েছিলে"—সেদিনই শিপ্রা জেনে নিয়েছে কীর্তিকে। বাংলাদেশের শেষ বিজয়ের আশ্বাসের সঙ্গে মিশে আছে কীর্তির জন্য শিপ্রার ভালবাসা। 'শিশুর মত সরল চোখে তাই (কীর্তি) দেখতে পেল, সেই মধু মুখ, সেই মৃদু হাসি, সেই সুধাভরা আঁখি।'

দুটি অসামান্যা নারীচরিত্র সৃষ্টি করেছেন আলি সাহেব 'শহ্‌র্-ইয়ার' আর 'তুলনাহীনা' উপন্যাসে। এ দুটি উপন্যাস পড়ে কোন পাঠক বা পাঠিকা যদি ঠোঁট উল্টে বলেন, 'বড্ড বেশী রবীন্দ্রনাথ', তাহলে অনুমান করি, সৈয়দ মুজতবা আলি, শহ্‌র্-ইয়ার-এর মতই কবুল করবেন, "ঐ তো আমার দোষ! কোনো কিছু বলতে গেলেই আমার রসনায় এসে আসেন নেয় রবি ঠাকুর, কালিদাসের রসনায় যে-রকম বীণাপাণি আসর জমিয়ে মধুচক্র গড়তেন।"

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

তুলনাহীনা

খান সেনাদের হাতে নিহত
আমার পরম স্নেহের ভাগ্নে
ওয়ালীর স্মরণে…

"লে, চ', ঝপ্ করে আরেকটা গিলে ফেল্।"

"না, দাদা। আমার আর সইছে না।"

"ঐ তো তোদের দোষ। হুইস্কি, হুইস্কি আর হুইস্কি। স্কচ্ হুইস্কি। ভগবানের যেন খেয়ে-দেয়ে অন্য কোন কর্ম ছিল না। তাঁর কুল্লে রস ঢেলে দিলেন ঐ ধেধেড়ে পাহাড়ে স্কটল্যান্ডের খাজাদের মধ্যিখানে। আরে ব্যাটা ঐটেই যদি দুনিয়ার সব চেয়ে সেরা মাল হত তবে ঐ খেয়ে ওদেশের লোকগুলো দুনিয়ার সেরা সেরা কেষ্টবিষ্টু হল না কেন? বাবুরা তো এখনো ইংরেজের গোলাম। ওদিকে দেখ্, ফরাসীদের। গুণীনদের জাত। খায় দুনিয়ার সব চেয়ে সেরা মাল,—বর্দো, বর্গণ্ডি, শ্যাম্পেন্। নাচে, গানে, প্রেমে—"

কীর্তি বাধা দিয়ে বললে, "বাঁচালে, সুদিনদা, তুমি তো জানো, আমি হপ্তা দু'তিন ধরে—"

"একটি জান্-খুশ, দিল-তরুরুর্ পরীতে মজেছিস। তা বেশ, তা বেশ, তা বেশ। অতি উত্তম প্রস্তাব। তবে কি না আস্ত একটা আসুপ্ত ভলকানো। তা বেশ, তা বেশ!"

এই আমাদেরই গানে গন্ধের চেয়ে গণগন্ধে ভরা কলকাতারই একটি অতি বিখ্যাত বার্-এর সুমুখে দুটো দেড় গজী স্টেনলেস্ চোঙার লাল মুণ্ডুর উপর বসে দুই ইয়ার পঞ্চ মকারের শ্রেষ্ঠতম যে "ম"টি সর্ব বার্-এ খুশ্‌বায়ে ম ম করেন তারই সেবা করতে করতে মধ্যমণি তৃতীয় "ম"-এর আলোচনা-চরে নৌকো ভিড়িয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ করে দুজনাই ক্ষণতরে বার্-এর গর্ভদেশের প্রতি প্রীতিপ্রসন্ন নড্ করলেন। কারণ বার্-এর বারাঙ্গনা কও আর বরাঙ্গনাই কও, বার্-মেড্ শ্রীমতী বেয়াত্রিচে ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছেন, দুনো ইয়ারের গেলাস তলানিতে এসে ঠেকেছে এবং সেটা যে তিনি অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন তারই স্বীকৃতিস্বরূপ মোলায়েম মৃদুহাস্য মুখে মাখলেন। হেস্টিংস্ হার্ডিঞ্জের লীলাভূমি মহানগরীর মহা-বার্-এর মহারানীর এতখানি দূরদৃষ্টি ও পরাভাব-কাতরতা অবশ্যই আছে যে, এই খানদানি বার্-এ কোনো মেহমানকে কোনো কিছু নিজের থেকে চাইতে হয় না—তা সে "আই সে মিস্" বলে তাঁকে ডাক দিয়ে কিংবা শূন্য গেলাসের উপর ঠুংঠাং করে জলতরঙ্গ বাজিয়ে;—এমন কি উচ্চ মঞ্চাসনের সামান্যতম উস্‌খুস দ্বারা আপন অস্বস্তিটা প্রকাশ করে কোনো মেহমানকে কস্মিনকালেও সিন্নোরীনা বেয়াত্রিচের নেকনজর আকর্ষণ করতে হয় নি। সে-পরিস্থিতি, সে-ইন্‌কিলাব্ ঘটবার বহুপূর্বেই বেয়াত্রিচে নিঃসন্দেহে আত্মহত্যা করবেন। সে আত্মনাশ জাপানী হারাকিরি প্রতিষ্ঠানের চেয়েও স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়ংভু।...কবে, কবে সেই ফির্পো পেলিত্তি, তার পূর্বেকার স্পেনসার-এর আমলে এ দেশে এসেছিলেন বেয়াত্রিচে গোষ্ঠীর প্রথম মহিলা। বসন্তসেনাশ্রেণীয়া মনোরঞ্জনী, চিত্তহারিণী এ-পরিবার—বংশানুক্রমে।

এখনো আমাদের এই সমসাময়িক বেয়াত্রিচে বিপদে-আপদে উৎসবে-ব্যসনে সুদিনদা এবং তার পাঁচো ইয়ারের সম্মানরক্ষার্থে তাঁদের পার্টির মক্ষিরানীর রূপে সেখানে ত্রিযামা যামিনী যাপন করে আসেন। তাঁর এখন বয়ঃসন্ধিকাল, অবশ্য কিঞ্চিৎ ভিন্নার্থে; তিনি যৌবন আর ভরা যৌবনের মাঝখানে। আমাদের ইতিহাসে তিনি পরিপূর্ণ "স্টার" না হলেও ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুল্লেখার মত বার বার আমাদের সর্বাঙ্গে শিহরণ জাগিয়ে যাবেন।...তাই এই বেলাই তাঁর সম্বন্ধে কিছুটা বলে নিতে হল।

"আবার দেব?" কিংবা "ইয়েস্ প্লীজ?" বাঁধা গতে বেয়াত্রিচে ফ্যালনা বার্-মেডের মত খদ্দেরদের সম্মুখীন হন না। সামান্যতম মৃদুহাস্য দিয়ে জানালেন, "এই যে?" অর্থাৎ "জানি। কি চাই, কখন চাই, জানি। আসছে।"

দুই ইহারও মানানসই স্মিতহাস্য না-বলা থ্যাঙ্কু জানালেন।

ছিঁড়ে যাওয়া রসালাপের রিপুকর্মটি করতে করতে কীর্তিনাশ চৌধুরী ঈষৎ অভিমানের সুরে বললে, "সুদিনদা, তুমি মাইরি আমার চেয়ে আর ক' বছরের সিনিয়ার? আমাকে যা বলতে চাও সোজাসুজি কইলেই পারো। 'আস্ত একটা ভলকানো' কথাটার মানে কি? মিস্ শিপ্রা ভোরের শিশির-ভেজা শিউলিটি নন সে তো তুমি জানো আমার চেয়েও বেশী। আর পাঁচজনের তুলনায় তুমি তাঁকে কতখানি বেশী জানো—" কিঞ্চিৎ গলা খাঁকারির পর—"মানে, ইয়ে, কত দিক দিয়ে সেটা অবশ্য আমার অজানা, কিন্তু অশ্রাব্য হবে না, ভরসা আছে। তুমিই তো, বাপু, আমাকে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে তাঁর সঙ্গে।"

সুদিন চৌধুরী: "অপরাধ করেছিলুম কি? চুপ করে রইলি যে? এবং এই চুপ করে থাকাটাই সদুত্তর। শুধু তাই নয়, তার মধ্যে গভীরতম সত্য লুকনো আছে। এই যে তোদের পোয়েট রবিবাবু গেয়েছে,

'দেখা হয়েছিল, তোমাতে আমাতে
কী জানি কী মহা লগনে—'

কেন বাপু, 'শুভ লগনে' বললে অপরাধটা কি হত? অ। তা হলে তেনার অরিজিনালিটি থাকতো কোথায়?—তাই না? যেদো-মেদো, এস্তেক মুসলমান-দের গাঁইয়া পোয়েট বসিরুদ্দী মুদম খাঁ তক 'শুভ লগন'টা এ্যাসন জাবড়ে ধরে আছে যে ঠাকুর-বাড়ির তেতলার কবি, রাজপুত্তুর দ্বারকানাথের নাতি, আগাপাস্তলা একটা নয়া ধর্মের ভগীরথী দেবেনঠাকুরের নন্দন নোবেল ঘোড়ার রেসে পয়লা নম্বরী সওয়ার তিনি ঐ হাজাপচা 'শুভলগন'টা এস্তেমাল করেন কি প্রকারে? না? কিন্তু তা নয়। এ-উত্তরটা অতি রদ্দি মার্কা প্রোলেতারিয়ার যা-তা উত্তর। আসলে ঐ যে যেতে যেতে পথে দেখাটা হয়ে গিয়েছিল তার ফলে হল প্রেম,—পূর্বরাগ, অনুরাগ, চুম্বন, আলিঙ্গন-এটসেটরা-গয়রহ-ইত্যাদি,

কিন্তু সে-সব থাক্। ওসবের কথা তুললে কফি হৌসের তরুণরা তেড়ে আসে। প্রেমের এসব বস্তাপচা প্রাগৈতিহাসিক পদ্ধতি এখন যাদুঘরের মাল—ম্যুজিয়াম পিস্। হক্ কথা। কিন্তু দাদা, তার সঙ্গে সঙ্গে যে-বিরহ, হুস্ করে বিবিজান তোমাকে ঠাঠা রোদ্দুরের রাঁদেভুতে ছিবড়েটার মত ফেলে দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে চলে গেলেন লেকচারারটার সঙ্গে সিনেমায়—আরো কত কী, সেগুলো কি "শুভলগনে" দেখা হওয়ার সিম্‌টম্? মোটেই না। মিলনের চুম্বন=শুভ-লগন+রাঁদেভুতে কর্ণমর্দন=অশুভ লগন। একুনে, মহালগন।

তোকে যে ম্যাডাম শিপ্রার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলুম সেটা মহালগন। শিপ্রাপারে পেঁছে গেছিস, আর তোর মাথাব্যথা কিসের। শিপ্রা তো মধ্য-প্রদেশে? না? ঝেড়ে দে না একখানা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম ঐ প্রভিনসের টুরিস্ট ব্যুরোকে। ব্যস্। তবে হ্যাঁ, ওদের প্লেজার ট্রিপ লাঞ্চে আকছারই যাত্রী থাকে দেদার।

তা সে যাক্ গে। কথা হচ্ছিল,—"

আখ্-খ্-খ্। শাস্ত্রালোচনায় অহরহ বিঘ্নবিপত্তি!

কি ব্যাপার?

বার্-টার পাশেই ডাইনিং-ডান্‌সিং-কাবারে এই তিন প্রকারের আনন্দভবন মিলিয়ে ঢাউস এক জলসা-দরবার। বার্-এ তো মেয়েমদ্দে গিসগিস করছিল, সে তো প্রায় উদয়াস্ত লেগেই আছে। কিন্তু নবাব খাঞ্জা খাঁর আসল রঙ-মহল পাশের সেই পঞ্চরঙ্গের শ্রীরঙ্গমে একবার কেউ সম্মুখ সংগ্রাম লড়ে সে-ভিড়ে প্রবেশ করতে পারলে সে-ব্যক্তি আর কস্মিনকালেও বলবে না, কলকাতার বাস্‌গুলো বড্ড ক্রাউডেড। আপনি শক্তসমথ জোয়ান মন্দ মানুষ—আপনার নিতম্ব নির্মর্দিত হবে মুহুর্মুহু। আপনি ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন মানেন—আপন রিজার্ভড টেবিলে পেঁছিতে না পেঁছিতে আপনি দলিত মর্দিত পিষ্টিত এবং আলিঙ্গিত হবেন কেরালার তন্বী শ্যামা থেকে আরম্ভ করে, নর্ডিক ব্লণ্ডিনীগণের অকৃপণ সহযোগিতা পেরিয়ে সর্বশেষে পুঞ্জীভূত মাংসাধিকারিণী মার্কিনীদের সঙ্গে অগুন্‌তি কলিশন লাগিয়ে লাগিয়ে নব নব রেকর্ড নির্মাণ করে করে।

সেখানে লেগেছে আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন নয়া এক ধুন্ধুমার।

আমাদের দুই ইয়ার এসব ব্যাপারে সচরাচর নির্বিকার। বলতে গেলে এরা এবং এদের গণ্ডা দুই দোস্ত মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে হাঁটতে শিখেছেন এই জলসাঘরেরই মার্বেল পাথরের মেঝের উপরে।

কিন্তু আজ ভিন্ন গীত।

কাইরো না বেইরুৎ কোথা থেকে এসেছেন সদলবল এক বিশ্ববিজয়িনী নর্তকী। উর্বশী মেনকা থেকে আরম্ভ করে ইজাডরা ডান্‌কান্ আনা

পাভলোভা তক আবহমান কাল থেকে আর সবাই নেচেছেন দু-খানা পা দিয়ে, কিন্তু এই দিগ্বিজয়িনী নাচবেন পেট দিয়ে। সোনার পাথর বাটিও বুঝি কিন্তু, কিন্তু—পেট দিয়ে নাচ!

সাপ হাঁটে পেটের উপর দিয়ে কিন্তু সেও তো দেখি নাচের সময় পেটের তোয়াক্কা না করে নাচে কাঁধ দিয়ে, ফণা দিয়ে, কোমর দিয়ে, ল্যাজ দিয়ে, যদিও সাপের পেটটা তার দেহের আগাপাস্তলা জুড়ে। আর যদি ভাবার্থে নেন তবে এই সেই উদরসর্বস্ব ফিরিঙ্গি জাত, সেও তো পাক্কা দু'শটি বচ্ছর এ দেশের চাষাভুষোর অন্ন মেরে আপন পেট ফাটিয়ে দিলে, কিন্তু কই, তাকেও তো কখনো ঐ দুনিয়া-খেকো পেট দিয়ে নৃত্যের তালে তালে মা মহারানীর বন্দনা করতে দেখি নি!

যে কলকাতার তাবল্লোক পাঁচপেয়ে বাছুর দেখার তরে রিস্টওয়াচ গচ্ছা দিয়ে রেস্ত যোগাড় করে তারা আসবে না হদ্দমুদ্দ হয়ে এই বেলি-ডান্স্, ঔদরিক নৃত্য পেটভরে দেখতে!

দুই ইয়ার ঐ উত্তাল জনসমুদ্র উল্লঙ্ঘন অসমীচীন বিবেচনা করে যোগাড় করলেন একখানা উচ্চপদী চেয়ার। তার উপর দাঁড়াতেই স্পষ্ট দেখা গেল নাতিবিস্তীর্ণ নটমঞ্চ।

তখনো উচ্ছেভাজার পয়লাপদ শেষ হয় নি। অর্থাৎ নটরাজ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে নন্দীভৃঙ্গী দু কদম আনাড়ি নৃত্য নেচে নিচ্ছেন। তখন বোঝা গেল, হট্টগোলটা উঠেছিল বিরক্তি এবং কথঞ্চিৎ উষ্মা বশতও বটে—এসব হাবিজাবির ঠেলায় মেঘে মেঘে যে বেলা হয়ে গেল, আসল মাল বের করবে কখন? এরা কি পিত্তি না চটিয়ে খেতে জানে না?

হঠাৎ সব আলো ক্ষণতরে নিভে গেল। পাঁচ নাগর তার ফায়দাটা ওঠাবার পূর্বেই নন্দনকানন থেকে নেমে এল এক শ্যাফ্ট্ নীল আলো। আবছা আবছা দেখা গেল যেন সমুদ্র থেকে ভেসে উঠছেন মরুভূমির স্ফিন্ক্স্, কিন্তু, তন্বঙ্গী নারীরূপিণী এবং দেখা-না-দেখার আলোছায়ার ইন্দ্রপুরীর যেন ইন্দ্রধনু।

সে আবেশ কাটতে না কাটতেই আরো অকস্মাৎ কি হতে কি যেন হয়ে গেল। হলসুদ্ধু তাবজ্জন যেন বানের জলে হাবুডুবু খেতে লাগল। নাঃ! তেমন কিছু একটা প্রলয়ঙ্করী ব্যাপার নয়। মাত্র গণ্ডা দশেক সূর্য যেন জলসাঘরের মধ্যিখানে যেন একটা এটম বমের মত ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর তারই আচমকা ধাক্কায় তাবৎ পেট্রন-পেট্রনীদের চোখের মণি গেছে উল্টে—সেঁধিয়ে গেছে ভেতর বাগে।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে নটরানী—সেই বন্যার উপরে স্টেজের মাঝখানে।

সম্পূর্ণ নিশ্চল। চোখের পাতাটিতে পর্যন্ত কম্পন শিহরণ স্পন্দন কিছু

না, কিচ্ছুটি নেই। কিন্তু ঐ নিশ্চলতা থেকে সঙ্গে সঙ্গে যেন কোন্ এক চুম্বন সঙ্কলের দৃষ্টি টেনে নিয়ে গেল নটরানীর নাভিকুণ্ডলীর দিকে।

টগর ফুলের পাপড়ি কোমর বেঁকিয়ে যেন সর্বাঙ্গে পাক খেয়ে ঢলে পড়ে পাশের পাপড়িটির উপর, তিনি ফের তাঁর সখীর উপর এবং এই করে করে মাঝখানের স্থির বিন্দুটিকে কেন্দ্র করে সব কটি সখী যেন নেচেই যাচ্ছেন, নেচেই যাচ্ছেন একে অন্যের পিছনে—আমৃত্যু সে রাসনৃত্য!

নটরানীর নাভিকুণ্ডলীটি যেন টগরিনীদের রানী।

ক্ষুদ্রাতিতম ক্ষুদ্র নটরানীর নাভিটি; কেন্দ্র বিন্দুটি। আর সেই বিন্দুটিকে কেন্দ্র করে হুবহু টগরের পাপড়ির মত মাংস বলুন, পেশী বলুন একের পিছনে আরেকটি যেন নেচে চলেছে চক্রাকারে। নাভিকুণ্ডলীর দ'য়ে যেন ক্রমাগত পাকের পর পাক খেয়ে যাচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুগঠিত পেশী-পাপড়ি।

টগরের পাপড়ি নাচে এক জায়গায় ধীরস্থির দাঁড়িয়ে। এ-স্থলে তা নয়। এ-নারীর কুণ্ডলী-পাপড়ি পরিপূর্ণ প্রাণবন্ত। এরা একে অন্যের পশ্চাতে কভু দ্রুত কভু মন্দ লয়ে যেন চটুল পদক্ষেপে পটীয়সী রাশান বাল্-এ নর্তকীর মত নৃত্যে নৃত্যে চক্র রক্ষা করে।

নাভিকুণ্ডলী নিয়ে এ-হেন ভেল্কিবাজী দেখানো যে সুকঠিন, সুকঠিন কেন, অসম্ভব সে তত্ত্ব যে-কোনো মাস্‌ল্-ডান্‌সার কসম খেয়ে স্বীকার করে নেবে। কিন্তু এহ বাহ্য, আগে গিয়ে পূর্ণ সত্য অনুভব হয় তখন, যখন রাত-কানা জনও হঠাৎ লক্ষ্য করে যে নটরানীর বাদবাকি সর্বাঙ্গ নিশ্চল, নিষ্কম্প প্রদীপশিখাবৎ। বস্তুত ঐ যে ওটা গতিশীলা নির্ঝরিণী নয়, নিতান্তই সীমাবদ্ধ নিস্তরঙ্গ নিষ্প্রাণ সরোবর, অর্থাৎ দ'য়ের পাকচক্রে না থাকলে মনে কোনো দ্বিধারই উদয় হত না—'এ তো মেয়ে মেয়ে নয়, প্রতিমা নিশ্চয়।'

কীর্তিনাশ ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, "হুঁঃ। এ তো স্রেফ হুনুরির একটা কৌশল! এতে আর্ট কোথায় জানেন শুধু কুবের কুল মেড়ো গুষ্টি। পেরেকের বিছানার উপর শুয়ে শুয়ে কাটান যাঁরা বর্ষা-বসন্ত তেনারা তা হলে এ মহাপ্রাসাদের বিজয়িনী মিশরিনীর চেয়ে হাজার দফে গুনীন পাভলোভা-শঙ্করের গুরুর গুরু। হবেও বা। নইলে এ-মহফিলের চাঁইসব মেড়োরা এখানকার নাভিকুণ্ডে স্নান সেরে নাক বরাবর ধাওয়া করবেন কেন পেরেক শয্যাশায়ী গুরু মহারাজকে ঢিপ ঢিপ করে পেন্নাম জানাতে? ধন্যি, বাবা, তোমাদের আর্ট, নৃত্যকলা,—উর্বশীমার্গে মোক্ষলাভের চতুর্থ মার্গ!"

ইয়ার সুদিনদা ঢের ঢের উঁচু দরের খলিফে। কীর্তিনাশের পাঁজরে কনুই দিয়ে একখানা সরেস গুত্তা মেরে বললেন, "ওরে আচাভুয়ো' চাটচিস হুহস্কির বোতলটা, আর শুধোচ্ছিস এতে আবার নেশা কোথায়? সবুর কর এক লহমা। এখখুনি তেড়ে আসবে উড়ের হাত থেকে হোজের জলের তোড়ের মত রসের

মুগুর। কালবোশেখীর ঝড়ের আগে, দেখেছিস তো থমথমে ভাবখানা? তার পর লাগে বটগাছের মগডালে এ্যাটুনটুন কাঁপন। উপস্থিত শুরু হয়েছে তারই যেন দোহার। দাঁড়া না, হুড়মুড়িয়ে ঝড় নামলো বলে।"

একদম করেক্‌ট্‌ আবহাওয়ার পূর্বাভাস। বেতারকে ঢিঢ দিয়ে।

তবে হ্যাঁ, আলবৎ, ঝড়টা হুড়মুড়িয়ে নামে নি। নামলো ধীরে মন্থরে। কিন্তু দিগ্বলয় আচ্ছাদন করে।

পুকুরের মাঝখানে ঢিল ছুঁড়লে যেমন সেখান থেকে চক্রটি চতুর্দিকে চক্রাকারে ক্রমে ক্রমে সম্প্রসারিত হতে থাকে এ-ক্ষেত্রেও হুবহু তাই। নাভিকুণ্ডলীর নৃত্য ডাইনে বাঁয়ে সম্পূর্ণ নীবিবন্ধকে উদ্বেলিত করে তুললো। এদেশের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে যে-রসকে "বাজুবন্ধ খুল খুল যাওত" রূপে সূত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে এস্থলে সে-রসই বাজুচক্র ত্যাগ করে কটিচক্রে সঞ্চারিত হল। নাভিচক্র থেকে উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত হয়ে কম্পন আন্দোলন হল ঊর্ধ্বমুখী অধোগামী। সর্বদেহে কী আবেগ, কী আবেশ। হৃৎপিণ্ড মুহ্যমান।

পঞ্চেন্দ্রিয়, সর্বচৈতন্যের বিলুপ্তি আসন্ন।

বেয়ারা কীর্তিনাশের কানে কানে বললে, "হুজুর, আপকে লিয়ে বহুত জরুরী ফোন।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

"হ্যালো?"

"হ্যালো। কীর্তি? শোনো—"

এ যে এক্কেবারে নয়া ব্যাপার। কীর্তির হৃদয় দুয়ারে লিলি ডলি বুজু নরগিস মাঝে মাঝে টোকা দিয়েছে বটে কিন্তু সে নিতান্ত হলে হল, না হলে না গোছ—কিংবা অগত্যা ইংরিজিতে যাকে বলে অন্‌ এ রেনি ডে; আর এ হল ঠিক তার উল্টো, এখানে রেন্‌ নামলো খা খা খটখটে শুকনো মাঠে।

"তুমি আধঘণ্টাটাক পরে এখানে আসতে পারো?"

"কেন? ব্যাপার কি?"

"মানে? তুমি কি কিছুই বুঝতে পারো না? তোমার কি কখনো বয়স হবে না? কেন, কেন, কেন? মিস্ত্রিকে বুঝিয়ে বলতে হয় কেন তাকে ডাকছি, দর্জিকে ডাকার কারণটা তাকে বুঝিয়ে বলতে হয়। তুমি কোন্‌টা যে তোমাকে কারণ দেখাতে হবে?"

বেচারা কীর্তিনাশ। এই অবলোয় অকস্মাৎ অযাচিত অনুগ্রহ। এখন কি আর তার সে বোধশক্তি আছে যে কোন্‌টা ঘটে সকারণে আর কোন্‌টা ঘটে দেবতাদের যখন নিতান্তই কোনো-কিছু করবার থাকে না বলে মানৎলি

রিটার্নে "নাম্বার অব্ এ্যাক্শন্ টেকেন" দেখাবার তরে। শিপ্রা তখন দেবতাদের একজন। মূর্খ কীর্তির বোঝা উচিত ছিল, অকারণ অনুগ্রহই অনুগ্রহ।

হঠাৎ অতিশয় মধুরা নিস্তেজ গলায় "কীর্তি, আমার বড্ড লোনলি লাগছে যে। তুমি এসো।"

খুট!

কে বলে কীর্তির নাম কীর্তিনাশ। কীর্তিমান পুরুষ সে। কীর্তিনাশা নদী যখন ঐ বংশের সর্বশেষ সন্তানের সর্বশেষ পুকুরটি (!) পর্যন্ত গ্রাস করে ঢেউয়ের ডাকে ডাকে ঢেকুর তুলছেন তখন জন্ম নেয় এই সন্তান। বংশটা লোপ পেলেই করালী কীর্তিনাশা নদী আপন কৃতিত্বের পরিপূর্ণ সাফল্য লাভের আত্মপ্রসাদ প্রসাদাৎ অবশ্যই একটা কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করতেন যে ভূমি গ্রাস করেছেন তারই কোনো এক ভেসে-ওঠা অংশের বালুচরে। সেটা যখন নিতান্তই হল না তখন শেষ সন্তান কীর্তিনাশ নামের স্কন্ধে পীঠ স্থাপনা করে একাই চৌষট্টি-যোগিনী রূপে উচাটন নৃত্য নেচে যেতে লাগলেন।

ফোন ছেড়ে ভরাপাল তুলে বার-এ ফেরার সময় কীর্তিনাশ আপন পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে মনে মনে বললে, "ছোঃ, আমার নাম কীর্তিনাশ না কচুনাশ। শিপ্রাপুলিন-বিহারী নাগরদের এক ফু মেরে পাঠিয়ে দিলুম পদ্মার হে-পারে। সুদিনদাটা একদম বুড়বক্! বলে কি না, ছুঁড়িবুড়ির দোআঁশলা না কি যেন। যে রমণীর চতুর্দিকে অষ্টপ্রহর কবি সাহিত্যিক ফিলিমস্টাররা ঘুর ঘুর করছে, যার জিরোবার তরে একলহমা ফুরসৎ নেই সে-মেয়ে ফীল করছে লোনলি। তার হৃদয়টা অত সহজে ভরে না। সুদিনের কথার কোন মানে হয় না।

বার বার কীর্তিনাশের বুকের রক্তে রিনিরিনি করে বেজে উঠছে "আমি লোনলি"—এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সর্বচৈতন্যে ছড়িয়ে পড়ছে গভীর এক প্রশান্তি।

আবার তার মন ভরে জেগে উঠলো, "আমি লোনলি।" কেমন যেন মনের ভিতর হঠাৎ কে যেন একটা ইয়া লম্বা বিজয়-পতাকা খাড়া করে খটাস করে মিলিটারি কায়দায় তাকে একটা সেলুট ঠুকে জানালে সে বীর, সে বিজয়ী; শিপ্রা মহারানী ভিক্টরিয়ার স্বয়ংবরে সে প্রিন্স্ এলবার্ট। কে না জানে ইয়োরোপের সর্বদেশের রাজপুত্ররা তখন জমায়েত হয়েছিলেন লণ্ডনে যে যার রাজাড়ম্বর নিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে কীর্তিনাশের বুকের ভিতর কে যেন বলে উঠলো, "ছিঃ! এ কি কথা! এটা কি আলিপুরের ঘোড়দৌড় যে তুমি পয়লা নম্বরী হয়েছ বলে দেমাকে মাটিতে পা পড়ছে না—ফারাক শুধু এইটুকু, ঘোড়ার চারটে পা, তোমার দুটো।"

কে বোঝে এই সামান্য সত্যটুকু? ইহ সংসারের সুদূরতম প্রান্তে একটি রমণী—হোক সে সুন্দরী সদাচার, হোক সে উপেক্ষিতা কদাকার—তার জীবন

যেন হঠাৎ অর্থহীন হয়ে গিয়েছে, মহাশূন্যে সে যেন হঠাৎ একা, সে লোনলি। সে তখন স্মরণ করলো তোমাকে। "তোমাকে স্মরণ করেছে"—এর পর তো আর কোনো চরমতর সত্য নেই। এর থেকেই তো প্রতিষ্ঠিত হল যা জীবের কাছে চরমতম উপলব্ধি—সে আছে, তার অস্তিত্ব তার নিজের কাছে এই প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করলো।

* * *

"ওরে ইডিয়ট এদিকে আয়। কেটে পড়ছিস যে বড়!"

হ্যাঁ, আধ ঘণ্টা পরে যেতে বলেছে। ততক্ষণে ঝপ করে আরেকটা—

বার-এ তখন পুরো দমে যা তর্কাতর্কি চলেছে কোথায় লাগে তার কাছে উভয় ভিয়েৎনামের লড়াই। যদিও তর্কের বিষয়বস্তু কবে—সেই প্লাতো না লাওৎসের আমল থেকে।

ডান্‌স্‌—বেলি ডান্‌স্‌—সেক্‌স্‌।

সরকার পক্ষের প্রধান বক্তা কিউ সি শ্রীযুত সুদিনের মুখে এক বুলি। আর্ট ফর আর্টস সেক্‌। সঙ্গীত হোক, কাব্য হোক, নৃত্য হোক—তার একমাত্র উদ্দেশ্য রস সৃষ্টি করা। "বিদ্রোহী" কবিতা জনপ্রিয় হওয়ার ফলে দেশের স্বাধীনতা আড়াই মিনিট আগে এল না পরে এল, মোনা লিজার ছবি দেখে তাবৎ ফরাসিনী পুত্রশোকে কাতর অবস্থায়ও আ লা মোনা লিজা মুচকি মুচকি হেসেছিলেন কি না, কিংবা বিলকুল শব্দার্থে কান-কাটা ভান গগের ছবি দেখে চিত্রামোদীগণ আপন আপন কান কাটাবার জন্য সার্জনদের কসাইখানায় কিউ কেটেছিলেন কিনা সেটা সম্পূর্ণ অবান্তর। বেলি-ডান্‌স্‌ ইজ বেলি ডান্‌স্‌। আসল দ্রষ্টব্য, উদরমণি নাভিসরোবরে রূপসাগরের যে তুফান জেগে উঠলো সেইটে দেখে তোমার চিত্তরাজ্য কি আকুল হয়ে ওঠে নি ঐ সরোবরে অবগাহন করে হৃদয়জ্বালা জুড়োতে? তুমি কি ভুলে যাও নি ক্ষণতরে ক্ষুদ্র ঐ নাভি-কুণ্ড বিশাল চিল্কা কুণ্ড নয়, তুমি—"

কীর্তির মনে অন্য ভাবনা। শিপ্রার কাছে যাবো কোন্‌ ড্রিংক খেয়ে? হুইস্কি মুইস্কি চলবে না। বে-এক্তেয়ার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। একদম সাদা চোখেও যাওয়া যায় না। পুরুষের যে তেজস্‌ বিচ্ছুরিত হয় তার ব্যক্তিত্ব থেকে, তার পৌরুষ সত্তা থেকে সেইটেই তো রমণীকে মুগ্ধ করে বিহ্বল করে, সেটাকে কোনো একটা ড্রিংক মারফৎ কিঞ্চিৎ মরাল সাপর্ট তো দিতেই হয়। নাঃ—ওসব বিচার-বিবেচনা করা বেকার। কলকাতার কুল্লে নটবর, কড়ির কুবের, কালো-বাজারের নম্বরী নম্বরী ঘড়েল যাঁরা চালাকি আর মিষ্টি হাসির বঁড়শি দিয়ে চীফ ডিটেকটিভের নাড়িভুঁড়ি থেকে গোপন কথার এপেন্‌ডিক্‌স্‌ টেনে বার করতে পারে তাঁদের সব্বাই হার মেনেছেন শিপ্রাদেবীর টেনিস-লনের ওয়াটারলুতে। তিনি মোহাতুর হন, তাঁর সর্বাঙ্গে আবেশ লাগে, তাঁর বক্ষে অরণ্যমর্মর জেগে

ওঠে—সবই। ওদিকে কিন্তু বিচার-বুদ্ধির মেরুদার জ্ঞান অষ্টপ্রহর ঝাঁঝালো বাঙাল কাসুন্দির মত। তাই তোমার মাথাটি রাখতে হবে ফ্রিজের আইস বক্সে। তাঁর গড়া ট্রাফিক আইনের রেড লাইটটাকে পিংক মনে করে মাত্রা ছাড়িয়েছো তো গেছো। পক্ষান্তরে তিনি যে ভাগ্যবানকে গ্রান লাইট দেখান তার ট্রাফিক রেগুলেশন সম্বন্ধে, কীর্তিনাশের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। আজকের এই ভর রাতের ফোনে যেন কাঁচা সবুজের আবছা আবছা আভাস দেখতে পেল। সুতরাং বহু আত্মচিন্তা ততোধিক পরকীয়া কিংবদন্তি সুবিবেচনা করে কীর্তি স্থির নিশ্চয় হলেন এহেন পরিস্থিতিতে ড্রিংকরূপে ক্লেম দ্য মাঁৎ-ই প্রশস্ততম এবং তদনুযায়ী ড্রিংক শেলফের দ্বিতীয় স্তরের পূর্বতম প্রান্তে ক্ষণতরে কটাক্ষ হানলো। বেয়ারিচের বরদাপাণি সেদিকে প্রসারিত হল।

ড্রিংক সমস্যা সমাধান করার পর কীর্তির কান গেল বেলি-ডান্স্ তর্কাতর্কির দিকে।

সুদিন বৈরী শঙ্কর বলছে "রেখে দাও আর্ট ফর আর্টস সেক। নাইট ক্লাব, কাবারে ললিতকলা একাডেমি নাকি যে এখানে সেই কাইরো না মরক্কো থেকে আসবেন খাপসুরৎ খাপসুরৎ ডপকীরা প্যোর আর্ট আর এপলাইড আর্ট বাবদে আমাদের তালিম দিতে? উইদ্ ডেমোনস্ট্রেশন। সেইটেই হল আসল তত্ত্ব। আর আর্টের কথাই যদি উঠলো তবে বলি, প্রকৃত আর্ট আদ্যন্ত সবকিছু প্রকাশ করে না—ইঙ্গিত দেয় বহু না-বলা, অ-চাখা রসের প্রতি। আজকের নাচে নাভিকুণ্ডলী থেকে নৃত্যরস বহির্গত হয়ে ঊর্ধ্বলোকে শিহরণ কম্পন জাগিয়ে তুললো এবং নিম্নগামী হয়ে যে রূপে প্রকাশ দিল তার ইঙ্গিতটা ছিল কোন্ দিকে? সেটা অশ্লীল।"

এক ঠোঁটকাটা সদ্য বিলেতফের্তা হাবা সেজে শুধালো, "ইঙ্গিতটা কোন্ দিকে ছিল সেটা আগিয়ে বুঝিয়ে বলুন, তবে তো করা যাবে শ্লীল অশ্লীলের বিবেচনা।"

"আখ্! তুমি কি সেখানে ছিলে না? যৌনসঙ্গম।"

সুদিন অত্যন্ত বিরক্তি এবং তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, "যৌনসঙ্গম আবার কবে থেকে অশ্লীল হল?"

তৃতীয় অধ্যায়

"এসো।"

"আমাকে যে স্মরণ করেছ তাতে আমি ভারি খুশী হয়েছি। আসলে বলা উচিত ছিল, গর্ব অনুভব করেছি—"

"না আনন্দটাই বড়। কে কাকে কতখানি আনন্দ দিতে পারে বলো।"

"তোমার কথাই সই। কিন্তু হঠাৎ তুমি এ রকম লোনলি ফীল করলে কেন বলতো? কলকাতার কোন্ ক্লাব, কোন্ পার্টি, কোন্ শো থেকে তুমি প্রতিদিন নিমন্ত্রণ পাও না? অবারিত দ্বার একটা কথার কথা। তোমাকে তো সবাই লুফে নেয়। আর তুমি কি না লোনলি!"

কিছুমাত্র ছলনা বা ভান না করে শিপ্রা বললে, "কীর্তি, তোমার প্রাণরস অফুরন্ত, তোমার মত অহরহ সজীব আমি খুবই কম দেখেছি। তাই তুমি সহজে বুঝবে না, জনতার মাঝখানে একটা মানুষ কতখানি নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন, পরিত্যক্ত হতে পারে। আমার কথা বাদ দাও—এক্কেবারে পয়লা নম্বরিনীদের কথা চিন্তা করো তো: দিনের পর দিন তাঁরা পার্টি পরব ফান্‌কশনে যাচ্ছেন, তাঁদের চতুর্দিকে সমাজের সব চেয়ে উঁচু কাতারের পয়সাওলা, খ্যাতিমান শক্তিমান সব রকমের প্রভুরা। আর রয়েছে স্মার্ট সেট্। তারা স্মার্ট উইটি কথা বলে, টিপ্পনী কাটে আর সুন্দরী গরবিনীর স্মার্ট উত্তর দেন, যাঁরা পারেন না তাঁরা অন্তত মৃদু হাস্যের তারতম্য দিয়ে কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মাঝারি তার সার্টিফিকেট দেন। আচ্ছা, তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছ, এই সমস্ত ব্যাপারটার উদ্দেশ্য কি, অর্থ কি?

"না। তুমি ভালো করেই জানো, আমি খুব চিন্তাশীল প্রাণী নই।"

শিপ্রা তাঁর সুডৌল ঘাড়টি আরেকটু উঁচু করে কীর্তির চোখে চোখে তাকিয়ে বললে, "ওটা আর কিচ্ছু না। ওটা বর্তমান সমাজের একটা প্যাটার্ন মাত্র। চলছে, চলবে হয়তো বহুদিন ধরে, কিন্তু যে কোন মুহূর্তে আগাপাস্তলা বদলে যেতে পারে।"

„মানে?"

"অতি সহজ। লণ্ডনে এ-প্যাটার্ন অনেক দিন ধরে গড়ে উঠেছিল। এবং তার গোড়াপত্তন করেছিল সে-দেশের খানদানী লোক। অথচ যেই লাগল লড়াই অমনি তার বড় ভাগটা হয়ে গেল উধাও। বাকিটুকুও ভোল পাল্টে নিলে রাতারাতি। কোথায় গেল হাওয়ায় হাওয়ায় মিলে-যাওয়া সিল্কের বুক-কাটা, কোমর-ছ্যাঁচা গাউন, অদৃশ্য সিল্কের ফ্লেশ কালার মোজা আর ত্রিভঙ্গ গোড়ালির জুতো! সবাই পরে নিল কাঠখোট্টা চামড়ার চেয়ে পুরো কাঁথার য়ুনিফার্ম—প্রাইম মিনিস্টারের বেগম গিয়ে দাঁড়ালেন কিউয়ের ন্যাজে—রেশন শপের সামনে।

আর আমাদের এই কলকাতার প্যাটার্নটা—"

হঠাৎ থেমে গিয়ে শিপ্রাদেবী বললেন, "ওঃ! আই এম ফ্রাইটফুলি সরি। তুমি এখানে এসেছ বার ছেড়ে নাক বরাবর। আর তোমাকে একটা ড্রিংক অফার করি নি। কি খাবে বলো।"

কীর্তি আমতা আমতা করে বললে, "না—তা—"

শিপ্রা খিলখিল করে হেসে বললে, "পষ্ট গন্ধ পাচ্ছি খেয়ে এসেছ ক্রেম দ্য মাঁৎ—আরো কাছে এসে বসো দিকিনি।" যে-সোফাটাতে সে আধশোয়া অবস্থায় পা দুখানি গুটিয়ে রেখেছিল তারই একটুখানি একপাশে সরে গিয়ে একটান মেরে বসিয়ে বললে, "ঠিক ধরেছি। তা এই অবেলায় ক্রেম দ্য মাঁৎ কেন? জব্বর একটা ব্যানকুয়েট খাওয়ার পর ক্রেম দ্য মাঁৎ দিয়ে মুখশুদ্ধি করেছ বুঝি?"

কীর্তি আকাশ থেকে পড়ে বললে, "ব্যানকুয়েট! আজ আবার কিসের পরব যে ব্যানকুয়েট হবে। মানুলি ডিনারও তো পরশু দিন। অবাক করলে বাছা তুমি।"

"কিসের পরব? আজ তো পরবস্য পরব। গ্রেট বেলি ডান্সের গ্রেটার ব্যানকুয়েট। বেলি-ডান্স দেখবে বুঝি একাদশীর ফাঁকা পেট নিয়ে? বেলি-ডান্স দেখতে হয় ফুল বেলি নিয়ে। লিকউইড সলিডে হাফাহাফি। তা সে যাক্ গে। এসো আমরা দু'জনাতে সেলিব্রেট করি ঐ মারাত্মক অমিশনটা। শ্যাম্পেন খাবে? বলতে গেলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শ্যাম্পেন গোত্রের কয়েকজন আমার কাছে আছেন। তোমার জন্য বাকেটে বরফ দিয়ে রেখেছি। ঐ সেই ঘরটায় পাবে।"

শিপ্রার বেশভূষা, তার মোটরগাড়ি দেখলে যে-কোনো লোক ভাববে এ মহিলার যা রুচি, প্রতিটি আইটেম এমনই মানানসই যে তাঁর বাড়ি, ড্রইংরুম ডাইনিংরুম নিশ্চয়ই অতিশয় নিখুঁত কায়দায় সাজানো—কোনো প্রকারে কোনো জায়গায় ছন্দপতন হওয়া অসম্ভব। অথচ প্রথম দর্শনে স্মার্ট সেটের যে-কোনো ব্যক্তি বিস্মিত হবে। ঘরের একপ্রান্ত থেকে যে কালারস্কীম আরম্ভ হয়ে শেষ প্রান্ত অবধি ঢেউয়ে ঢেউয়ে বয়ে যাবে, আর আসবাবপত্র কার্পেট কার্টন ছাত দেয়াল, মাথার উপরের এবং চারদিকের আলো সেই স্কীমের সঙ্গে মিল খাইয়ে যেন একটা হারমনি গড়ে তুলবে এখানে সে কম্পজিশন একেবারে নেই সে-কথা বলা চলে না, আবার আছেও বলা চলে না। এ-কথা তো শিপ্রা-দেবীর বুদোওয়ার না দেখেও বলা চলে সেখানে দৃষ্টিকটু কিছুই থাকতে পারে না কিন্তু সেই অনিন্দ্যসুন্দর সামঞ্জস্যটা তো চোখে পড়ে না।

কিন্তু দুতিন দিন ধরে সে ঘরে বসলে, চা খেলে তখন বোঝা যায় শিপ্রা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে ঘরটি গুছিয়েছে। উদ্দেশ্য দুটি: আরাম এবং একবার এক জায়গায় আসন নিলে যেন ফের উঠতে না হয়। কোচ সোফার হাতার ভিতর থেকে অ্যাশট্রে, ড্রিংকের গেলাস রাখার রিং ইত্যাদি ছোটখাটো জিনিস তো বেরুবেই, ছোটখাটো ব্রেকফাস্ট খাবার মত ফোল্ড করা একটা ফ্রেমও ঠিক ফিট করে যায় যার উপর বেয়ারা খাবারের ট্রে চায়ের সরঞ্জাম অনায়াসে রেখে যেতে পারে। আর পাঁচটা অতিশয় ফ্যাশানেবল ড্রইংরুমে বেয়ারা ন্যাক্স

নিয়ে ঢুকলেই যে কী তুলকালাম কাণ্ড আরম্ভ হয় ভুক্তভোগী মাত্রই সেটা জানেন। পেগ টেবিলে স্ন্যাক্‌স ধরছে না, সেণ্টার টেবিলটা অনেক দূরে—লে আও আওর একঠু টেবিল ইত্যাদির মহা ঝামেলা। তারই ধাক্কায় ইতিমধ্যে গালগল্প টুকরো টুকেরো খান খান।

শিপ্রার বক্তব্য ঃ মানুষে মানুষে ভাবের আদান প্রদান, রসের দান ও গ্রহণ, অভিজ্ঞতার বিনিময়, একে অন্যের সঙ্গসুখ—এসব নিয়েই তো মানুষের সত্তা, তার অস্তিত্ব। ড্রইংরুম তো তারই কেন্দ্রভূমি। সেখানে যদি ড্রিংক স্ন্যাক পদে পদে বাধা দেয় তবে সেটা ব্যর্থ। নাই বা হল আমার বুদোওয়ার আল্‌ট্রা মর্ডান।

জর্মন সিলভারের বালতিতে করে কীর্তি শ্যাম্পেন নিয়ে এসেই শুধলো, "বল তো, ভাই, এই দু-দিনে যখন এক ফোঁটা বিয়ারের জন্য অর্জুনের মত পাতাল ভেদ করতে হয় তখন তুমি এই জাত শ্যাম্পেন পাও কোথা থেকে ?"

শিপ্রা আদর করে কীর্তিকে কাছে টেনে এনে বললে, "তোমার এত ভয় কিসের ? তোমার বেলা দেখি, 'ভয় করে তুই বিজয়ারে হারাবি ?' শ্যাম্পেন ? সে-কাহিনী. সরল, আর এক মিনিটে ফুরিয়ে যাবে। বাবার সঙ্গে আমি কিছু-কাল প্যারিসে ছিলুম। তখন এক গরীব ছোকরা ফরাসি আর্ট স্টুডেণ্টের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়—প্রায় প্রেমের কাছাকাছি। আমি সামান্য যেটুকু পকেট মানি পেতুম তাই দিয়ে তাকে প্রায় জোর করে এক দিন অতি সস্তা দরের এক বোতল শ্যাম্পেন খাইয়েছিলুম। আমরা দেশে ফিরে এলুম। তার পর দশ বছরের ভিতরই সে হুশ হুশ করে আর্টের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে একদম হলিউডে পেঁাছে গেল। ওদিকে মিলিয়নেরদের পোর্ট্রেট এঁকে পয়সা যা কামায় সে প্রায় পিকাসুসোর সঙ্গে নেক্‌ টু নেক্‌। শ্যাম্পেনের পাইকিরি বিক্রির সময় তার এজেণ্ট শ্যাম্পেন ডিস্‌ট্রিক্টে এসে হুজুরের জন্য যা কেন তার একটা হিস্যে সে পাঠিয়ে দেয় দার্জিলিঙের ঠিকানায়—ঠাণ্ডায় মোলায়েম থাকবে বলে।"

"তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় ?"

শিপ্রা হেসে কুটিকুটি ! কীর্তির গালে মোলায়েম একটা ঠোনা মেরে বলে, "ওরে মূর্খ, লণ্ডনে পাকা দু দুটো বচ্ছর কি হাইড পার্কে ঘাস খেয়েছিস শুধু ? সে যাচ্ছে ভেসে ভেসে দেশ থেকে দেশান্তরে, আমিও উধাও হচ্ছি কাঁহা কাঁহা মুল্লুকে। এক দিন কোন্‌ খেয়ালের মোহে এজেণ্টকে বলেছিল আমার যেন শ্যাম্পেনের অভাব না হয় ; তার পর এতদিন সে হয়তো সে-কথা বেবাক ভুলে গিয়েছে—তা সে যাক্‌। বেলি-ডান্‌স্‌ কি রকম লাগলো সেই কথা কও।"

কীর্তির অল্প অল্প নেশা হয়ে আসছে। গোড়ার দিকের জড়ত্ব অনেকখানি কেটে গিয়েছে। ওদিকে শিপ্রারও মুখের রঙ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। যুবতী

রমণীর প্রস্ফুটিতা চোখ দুটিতে যেন ক্রমে ক্রমে কিশোরীর সদ্য বিকশিত ভাব ফুটে উঠছে।

কীর্তির মুখে কথা ফুটছে। আকস্মিক আমন্ত্রণের বিহ্বলতা কেটে যাওয়ায় ওজন করে কথা কইবার ধরন অনেক পিছনে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে, "আমি আর নাচটা দেখলুম কই? বরঞ্চ স্মার্ট মাস্টার সুদিনকে সুধিয়ো। আমি বার ছাড়ার সময় সেখানেতে নাচের টপিক নৃত্য করছে—তাণ্ডব নৃত্য।"

"মানে?"

সংক্ষেপে বলতে গেলে হিং টিং ছট্। সুদিন বৈরীরা তারস্বরে ঘোষণা করছেন, "ঐ বেলি ডান্সে আছে দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস এবং ভালগার ইঙ্গিত—সর্বোপরি বেলি ডান্সে না আছে বেলি না আছে ডান্স্। এর বেশী আমি তোমাকে বলতে পারবো না। এটুকুও বলতুম না; খানিকক্ষণ আগে তুমি বলছিলে না, এটা একটা সোসাইটির প্যাটার্ন, তাই এটার উল্লেখ করলুম।"

শিপ্রা সিগারেট খায় কালে ভদ্রে। এবারে একটা ধরিয়ে ধীরে ধীরে বললে, "আমার একটি বিশিষ্ট বন্ধু আছেন। তুমি তাঁকে বোধ হয় চেন না—কারণ তিনি একদা ছিলেন কাইরো শহরের স্মার্ট সেটের ফ্রণ্ট বেঞ্চার। উত্তর আফ্রিকার—মরক্কো থেকে কাইরো অবধি—সবরকম নাচ তাঁর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা আছে। তিনি একদিন আমাকে—বলছিলেন, খাঁটি বেলি-ডান্স্ শিখতে হলে অন্তত বারোটি বছর একটানা রেওয়াজ করে যেতে হয়। আজ রাতে যে-মেয়েটি নাচলো সেও তো শুনেছি বারো বছর ধরে ট্রেনিং নিয়েছে। তাই আশ্চর্য লাগে, সুদুমাত্র ভালগার সাজেশন দেওয়ার জন্য বারো বছর ধরে ট্রেনিং!"

সব কথা কীর্তির কানে তখন আর ঢুকছিল না।

সেটা শ্যাম্পেনের প্রসাদে নয়। বরঞ্চ তার খনে মনে হচ্ছিল নেশা কেটে যাচ্ছে, খনে মনে হচ্ছিল নেশাটা যেন চড়াৎ করে তালুর ব্রহ্মদেশের চাড় বসছে। এবং এটাও তার জানা ছিল, দু' পাত্র রস-সেবনের সময় স্রেফ ফুর্তি ছাড়া কোনো দুশ্চিন্তা বা অন্য কোনো সমস্যাকে আমল দিলে এ-রকম ধারা হবেই। সর্বোপরি তার চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠছিল একটা ক্রিকেটের মাঠ।

কীর্তি একদা ভালো ক্রিকেট খেলতো।

কীর্তি মনের চোখে দেখছিল, পুরো একবছর ধরে বিপক্ষ ব্যাটিং করছে আর তাকে ফীলডিং করতে দেওয়া হয়েছে আউট ফীল্ডে, একদম কানট্রি সাইডে। অথচ তার দৃষ্টিশক্তি সতীক্ষ্ণ, ফাস্ট্ বোলিঙের বেলা সে আগেভাগেই ঠাহর করে নিতে পারে ব্যাটের কোণে লেগে বল স্নিক করলে কোন্ এঙ্গেলে আসবে, বাং মাছের মত সর্বাঙ্গে মোচড় খেয়ে প্রায় মাটি থেকে বল কুড়োতে পারে।

তথাপি ক্যাপটেন শিপ্রা তাকে পুরো একটি বছর ধরে তার পার্টিচক্রের

বঙ্গভূমিতে তাকে যেন এপ্রেন্টিস করালেন এক যুগ ধরে।

আর আজ? বড় বড় চাঁইদের উপেক্ষা করে, বলা নেই কওয়া নেই, একমাত্র তাকেই নিয়ে তিনি চলেছেন পিচ পরিদর্শনে!

চতুর্থ অধ্যায়

সর্ব বিশেষজ্ঞরা সম্পূর্ণ একমত, মানুষ যে সভ্যতার যাত্রাপথে এতখানি এগিয়ে গিয়েছে তার প্রধানতম কারণ মানুষ বংশানুক্রমে, পিতা পুত্রকে, এক পুরুষ পরের পুরুষকে তার অভিজ্ঞতা বিশদভাবে বর্ণনা করে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছে। তদুপরি প্রতি যুগের প্রতি পুরুষই পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতাকে উচ্চতর পর্যায়ে তুলবে বলে তার সংস্কার করেছে, নূতন অভিজ্ঞতা পূর্বতর ভাণ্ডারে যোগ দিয়ে সম্পূর্ণ সঞ্চয়কে পূর্ণতর করে তুলেছে।

শুধু একটি মারাত্মক, জীবন মরণ সমস্যার ব্যাপারে, সৃষ্টির সেই আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত এক ইঞ্চিও এগোতে পারে নি।

"তুমি কি আমায় ভালোবাসো?" এ প্রশ্নটি শুধোবার বেলা পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্য কোনো প্রাণীরই রক্তিভর কাজে লাগে না, এমন কি সমসাময়িক প্রতিবেশী, অন্তরঙ্গ ইয়ারদোস্তের উদাহরণ দিকনির্দেশ সম্পূর্ণ বেকার, বেফায়দা। আদম আদমের আমল থেকে আজ পর্যন্ত—তথা ভুবনবিখ্যাত মহাপুরুষরাও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, মহাপ্রলয়ের পর নবসৃষ্টির প্রারম্ভেও—মানুষ ঐ প্রাচীনতম প্রশ্নটি শুধোবার সময় সেই প্রথম দিনের মত বিলকুল হাবা বনে যাবে, কাৎরাতে কাৎরাতে যে-সব ধ্বনি প্রকাশ করবে সেগুলো একদম সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত কনফার্মড রাম-ইডিয়টের গোঙরানোর মত।

ওদিকে আবার শিপ্রার চরিত্র বিচিত্র। এমনিতে মনে হয় সে আর পাঁচটা টপ ক্লাস সোসাইটি গার্লেরই মত—গার্ল বললে স্বল্পোক্তি হয়, লেডি বললে আবার অতিশয়োক্তি হয়ে যায়। আজ চিত্রপ্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন, কাল প্রধান-মন্ত্রীকে মাল্যদান এ-সব কোনো প্রকারের সামাজিক, রাজনৈতিক "কর্তব্য কর্ম" করতে সে সম্পূর্ণ বিমুখ—যদিও দেশে এবং বিদেশে লেখাপড়াতে সে অসাধারণ না হলেও ডিবেটে ছিল অত্যুত্তম, উচ্চারণ ন্যাকামি বর্জিত। "দোষে"র মধ্যে ছিল স্মার্ট সেটের মত সে ট্যারচা ট্যারচা বাঙলা বলতে পারতো না।

তার আসল বৈশিষ্ট্য ছিল আলাপ আলোচনার সময় মারাত্মক সব অভিমত প্রকাশ করে স্মার্টেস্ট সেটকেও হাজার ভল্টের শক্ দেওয়া। পবিত্র, শাস্ত্রীয়, আচারসম্মত এ ধরনের শব্দ তার অভিধানে ছিল না, কারণ তার পিতাই স্বহস্তে সেগুলো ধুয়ে মুছে সাফ্ করে দিয়েছিলেন।

তদুপরি তার সঙ্গে প্যারিস লণ্ডন করার পর কোনো জিনিস বা "লজি" আঁকড়ে ধরার মত মনোবৃত্তি তার আর ছিল না। সামাজিক আচরণে কাউকেই খুব বেশী কাছে ঘেঁষতে দিত না, আবার হট যাও হট যাও সায়েবিয়ানা সে ছেলেবেলা থেকে বাড়িতে কখনো দেখে নি বলে সে-গন্ধ তার গায়ে ছিল না। কৈশোরে পুরো একটি বছরের অধিকাংশ সময় কেটেছে প্যারিসের "লক্ষ্মীছাড়া" লঝঝড়ে গরীব পেণ্টারদের সঙ্গে। সাম্যবাদ ফ্রানসের পার্লিমেণ্টে মূলমন্ত্র বটে কিন্তু তার পরিপূর্ণ সপ্রকাশ দেখতে হলে যেতে হয় লাতিন কোয়ার্টার মা সরস্বতীর সর্ব কলার—চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, ভাস্কর্য, নৃত্য, আরো কতো কী যে নিত্য নিত্য সৃষ্টি হয়—ঐ-সব কলার পাগলা চেলাদের মাঝখানে, যারা তিন-দিন ধরে একটা লোফ খায়।

কীর্তি এসব ডীটেল জানতো না কারণ শিপ্রা ঘড়ি ঘড়ি তার প্যারিস ভিয়েনার জেল্লাই নিয়ে কথা কওয়া দূরে থাক, ইংরিজি সাহিত্যের কথা উঠলেও সার্ত্র বা মারলোকে টেনে এনে নিজের বক্তব্য জোরদার করবার চেষ্টা দিত না। কীর্তি শুধু জানতো শিপ্রা প্যারিসে ছবি আঁকা আরম্ভ করে এবং এখনো চিলকোঠায় ঐ নিয়ে মাঝে মাঝে মশগুল হয়।

অতীতের ঐ সব নানা পরিবর্তনের ফলে শিপ্রার চতুর্দিকে এমন একটি আবহাওয়া বিরাজ করতো যে ঘনিষ্ঠতার বাড়াবাড়ি না করেও সরল জন তাকে মনের কথা বলতে পারতো। আর আমাদের শ্রীমান কীর্তিনাশকে নির্মাণকালে সৃষ্টিকর্তা যে প্যাঁচালো বুদ্ধির সংমিশ্রণ একদম করেন নি সেটা ক্লাবের অগারাজ বেয়ারাটি পর্যন্ত জানতো।

শ্যাম্পেনটাও পেটের ভিতর বুজ্ বুজ্ করছে।

কি করে যে হঠাৎ শিপ্রাকে শুধিয়ে বসলো, সেই জানে না: "আচ্ছা শিপ্রা, তুমি আমাকে অন্যদের চেয়ে বেশী পছন্দ করো?...আই, মীন, আই মীন আমাকে ভালোবাসো?" তার পর আবার গবেটের মত হুট্ করে বলে ফেললে, "হাও সিলি!"

গেলাসটা ছিল কানায় কানায় ভর্তি। চোঁ করে এক হ্যাঁচকায় খতম করে খট করে সেটা টেবিলের উপর রেখে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে রইলো।

কীর্তি ধরে নিয়েছিল, যে-মেয়ে এতদিন ধরে কারো ফাঁদে ধরা দেয় নি—যদিও মাঝে মধ্যে এর ওর নামের সঙ্গে জড়িয়ে ওর বদনাম রটেছে আবার আপনার থেকেই সেটা কেটেও গিয়েছে—সে বুঝি এহেন অবস্থায় স্মার্ট সমাজের সুপ্রচলিত পদ্ধতিতে খিলখিল করে হেসে উঠবে।

হল একেবারে অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া।

ধীরে ধীরে আধা শোওয়া অবস্থা থেকে উঠে বসে কীর্তিকে কাছে টেনে দুই বাহু দিয়ে আলিঙ্গনে বেঁধে খেল চুমো। তার পর তার গালে মুখে চোখে হাত

বুলিয়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ে। কীর্তি নির্বাক, অসাড়। এমন কি চুম্বন আলিঙ্গনের সময় সে সাড়াটুকু দিতে হয় তার বিহ্বল অবস্থায় সেটুকুও সে দিতে পারে নি।

রুদ্র তপস্যার বনে বহু ত্রাসে অত্যল্প আশে ভীরু অপ্সরা যে রকম প্রবেশ করে কীর্তির প্রশ্নটা বেরিয়ে এসেছিল সেই ভাবে।

উত্তরে সপ্তর্ষি মণ্ডলের উজ্জ্বলতম তারকারাজি উভয় হস্তে সপ্ত গ্রহের আকাশকুসুম বর্ষণ করে আচ্ছাদিত করে দিলেন এই ধূলির অতি সামান্য প্রাণী কীর্তিকে।

পঞ্চম অধ্যায়

শিপ্রারই বাড়িতে পার্টি। তার এক বান্ধবী ফিরেছেন হাওয়াই থেকে হনিমুন যাপন করে। তাদেরই অনারে সুদ্দুমাত্র পরিচিত জনকে নিয়ে মাঝারি গোছের শো। সবাই হেথাহোথা ঘোরাঘুরি করছেন গেলাস হাতে করে। বেয়ারাদের হাতের ট্রেতে আছে হুইস্কি, কন্যাক, ভোদকা আর বিয়ার। বর্দো বার্গেণ্ডি রাইন মজেলের রেওয়াজ এ-দেশে নেই বললেই চলে। যোগাড় করাও কঠিন, বিগড়ে যায় বড্ড তাড়াতাড়ি। কিন্তু শিপ্রার ওয়াইন-সেলার দার্জিলিঙের মোলায়েম আবহাওয়ায়। নিজেরও যেটুকু মোহ তা ঐ-সব কণ্টিনেনটাল দ্রব্যের প্রতি। সে-সবের জন্য ব্যবস্থা ড্রইংরুমের ভিতর। সেখানে যে দু'পাঁচজন চিড়িয়া আসন নিয়েছেন তাদের প্রায় সবাই ফরাসী জর্মন। তারা বিলক্ষণ অবগত আছে এই কলকাতা-সাহারায় শিপ্রাই একমাত্র ওয়েসিস্। সঠিক কোন টেম্পারেচারে এ-সব পানীয় ফুল্ল বিকশিত হয়ে এই ভিন্‌দেশে স্ব-দেশের রস সুবাস বিতরণ করবে সে তত্ত্বটিতে শিপ্রা স্পেশালিস্ট।

লনের এক প্রান্তে আসন নিয়েছেন সুদিনাদি স্মার্ট কোম্পানি। কীর্তি প্রাচীন রীতি অনুযায়ী প্রত্যন্ত প্রদেশে। আজ বসেছে সানন্দে। আজ গারাজে বসতেও তার কণামাত্র ক্ষোভ নেই। এ-উৎসবের হৃদয় পদ্মাসনে যে রাজার রাজা, বাইরের ভুবনে সে কোথায় কোন্ ধূলির ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হল সে সম্বন্ধে কোন মূর্খ হয় সচেতন!

তদারকির রোঁদে তার পাশ দিয়ে যাবার সময় শিপ্রা ক্ষণতরে কীর্তিকে উদ্দেশ করে বললে শুধু "হ্যালো"! ঠোঁটে সেই একবছরের পুরানো মৃদু হাস্য। কিন্তু সুদিন জানে আজকের এ কণ্ঠস্বর এ মৃদু হাস্য এক ভিন্নবাসিনী ভানুমতীর মদনরসে মন্ত্রপূত।

ইতিমধ্যে বধূ এসেছেন সুদিনাদির সামনে।

সুদিন এক গাল হেসে শুধলো, "কি গো সুন্দরী, হাওয়াই দ্বীপের হুলা

হুলা ডান্‌স্‌ রপ্ত করে এসেছ তো? এক চক্কর দেখিয়ে দাও না পাঁচজন রস-পিপাসুকে।"

বধূ বললেন, "নিশ্চয়, কিন্তু হাওয়াইয়ের সেই ঘাস পাবো কোথায়, নাচের ঘাগরা বানাবার তরে?"

সুদিন বললে, "সে আর এমন কি বিপত্তি। রাজকুমারী জাহানারা যে মসলিন পরে ঔরঙ্গজেবের সামনে সগর্বে উপস্থিত হয়েছিলেন সেটা যোগাড় করতে কতক্ষণ! সেইটে ফালি ফালি করে ঘাগরা বানিয়ে যদি পরেন—"

শঙ্কর বললে, "কী বেরসিক রে, বাবা। চাঁদের আলোর টানা আর রামধনুর পোড়েন দিয়ে বোনা হবে সে ঘাগরা। মিল্‌কি উইয়ের দুধ দিয়ে সেটি থাকবে ভেজানো—তবে না সেটি লেপটে থাকবে সর্বাঙ্গে। তবে না দেখা যাবে নৃত্যের তালে তালে প্রতিটি পেশীর আন্দোলন, সঙ্কোচন, সম্প্রসারণ।"

ইতিমধ্যে বর কনে এগিয়ে গেছেন আরেক দলকে "হেঁ হেঁ" করার জন্য।

চৌধুরী আখতর হুসেন শঙ্কর মিত্রকে ফিসফিসিয়ে বললেন, "বুড়ো ধেড়ে কাক। সাতান্ন ঘাটের পানি খেয়ে শেষটায় বিয়ে করলে নাত্নীর বয়সী মেয়েটাকে!"

মিত্তির বললে, "চৌধুরী, আমাদের সোশাল সিসটেমটা তুমি আদৌ বুঝতে পারো নি। পুরুষগুলো তো যায় গোল্লায়—ঐ যে বললে সাতান্ন ঘাটের ঘোলা জল খেয়ে খেয়ে। বিয়েও যদি করে ঐ ঢপের হাফ-বাইজীগুলোকে তবে জাতটা যাবে উচ্ছন্নে। অন্তত একটা সাইড তো ক্লীন রাখা দরকার।

নৃতত্ত্ব আর এগলো না। কারণ ইতিমধ্যে একটি তরুণী লাভার সহ উপস্থিত। ইনি সদ্য উনিশে পা দিয়েছেন বলে ক্লাবের প্রাচীন মেম্বার তার পিতা তাকে সোসাইটি করতে অনুমতি দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে রসালাপ বন্ধ হয়ে গেল।

এদের এই একটা মহৎ গুণ এক লহমায় ভোল পালটাতে জানে। এই ছিল জল-বিছুটি আর এই হয়ে গেল ধোয়া তুলসী পাতা। চৌধুরী বললে, "কি গো মিস্‌ ডাট্‌, বিলেত যাওয়ার কদ্দূর?"

ঠোঁট বেঁকিয়ে সুভা বললে, "ফরেন এক্‌শ্‌চেঞ্জ পাবো কোথা?"

মিত্তির বললেন, "লাও! আম্বালাল কস্তুরভাই আছে কি করতে? তার তো দেদার ফরেন টাকা? তোমার পিতৃদেবের লীগেল এডভাইস ভিন্ন দু'বাণ্ডিল বিড়ি কেনে না। সে তোমাকে লণ্ডন অক্সফোর্ড যেখানে প্রাণ যায় সর্বত্র পাউণ্ডের দরিয়ায় ডুবিয়ে রাখবে। তোমার আবার ভাবনা কি?"

সুভা একটা মামুলী উত্তর দিয়ে কেটে পড়লো। এ সব হচ্ছে কথার কথা—নিতান্ত কিছু একটা বলতে হয় বলে প্রসঙ্গটা উঠেছিল। নইলে আমাদের এ-গোষ্ঠীর কোনো এক্‌শ্‌চেঞ্জেরই কোনো ভাবনা নেই।

সর্বশেষে চৌধুরী ধীরে ধীরে প্রত্যেকটি কথা ওজন করে বললে, "ব্যাপারটা একটু ঘোলাটে হয়ে আসছে। ফরেন টাকার কুমীর তো শেঠ চন্দ্রবদন। ইংলণ্ডে আছে প্রায় লাখ খানেক পূর্ব পাকিস্তানী বাঙালী। তারা প্রতি বছর দেশে পাঠায় কয়েক কোটি টাকা। শেঠজীও তাদের কামানো পাউণ্ড কিনে নেয় সরকার যে রেটে টাকা দেয় তার চেয়ে বেশ কিছু বেশী মুনাফা দিয়ে। ওদিকে শেঠজী খবর পাঠায় নারায়ণগঞ্জে তার আমিনকে—সিলেটের অমুক শেখকে অত টাকা পাঠিয়ে দাও। এতে করে—"

এক হাফ-আনাড়ি বাধা দিয়ে বললে, "নারায়ণগঞ্জে শেঠজী পাকিস্তানী টাকা পায় কোথায়? সেখানকার মিল কারখানা তো সব আদমজী ফান্সি পশ্চিম পাকিস্তানীদের। সেখানে শেঠজীর কোন্ 'ধান্দা' যে তহবিল গড়বে?"

চৌধুরী মিষ্টি হেসে বললে, "তুমিও যেমন! আদমজীর টাকা খাটে অমৃতসরে শেঠজী মারফৎ এ্যাণ্ড ভাইস ভারসা। আচ্ছা, না হয় মেনেই নিলুম তোমার আজগুবী গুল। এই কলকাতার শহরে ইণ্ডিয়ান টাকা দিয়ে কিনতে চাও কত লক্ষ পাকিস্তানী টাকা—খাসা সস্তা ভাওয়ে? সিলেটের মোকামে পাকিস্তানী টাকাটা পাঠিয়ে দেবার জিম্মাদারী তো ঐ পাকিস্তানীর—শেঠজীর কি?"

কীর্তি এতক্ষণ চুপচাপ বসে একটা গেলাসও শেষ করতে পারে নি। আসলে তার শরীরে পাঁড় মাতালের রক্ত নেই। সে নয়া নয়া করে দেখছিল, গত রাতের স্বপ্ন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, উল্টে পাল্টে। আর দেখছিল, শিপ্রার দ্রুতপদে আসা-যাওয়া ছোট্ট দুটি পা ঘিরে শাড়ির পাড়ের খেলা। মেমসায়েবদের ফ্রক হয় শতেক ধরনের। প্রতি বচ্ছরে আবার মরসুম-মাফিক বার তিন চার কাট্ বদলায়, ভোল পালটায়। সব-কটাই যে একেবারে ফেলনা সে-কথা বলা চলে না কিন্তু এত চেষ্টা এত জিনিয়াস খাটিয়েও প্যারিস এমন একটা ফ্রক বানাতে পারে নি যেটা দুটি পা ঘিরে ঘিরে শাড়ির পাড়ের যে নৃত্য তার কাছে আসতে পারে। তার উপর শিপ্রার চলনভঙ্গিটি তার কোমরের বাঁকা-সোজা নড়াচড়া, কাঁধের ডাইনে বাঁয়ে হেলে-পড়াটার সঙ্গে এমনই মিল রেখে নিয়েছে যে তার হেথা হোথা আসা-যাওয়াটাই পাঁচ জনের চোখ ভরে দেয়। পাড়টি যেন আল্পনা এঁকে এঁকে সমস্ত লনটা ছেয়ে ফেলল।

কে কান দেয় তখন আদমজীর ফরেন টাকার দিকে? আমাদের কীর্তিবাবু না জানেন পলিটিক্স, না বোঝেন ইকনমিক্স্। তবু তার কানে গেল শেষ কথাটা চৌধুরীর:—

"এবার কিন্তু সব-কিছু আবার হয়তো ঢেলে সাজাতে হবে। আওয়ামী লীগ জিতেছে ইলেকশানে উইদ্ এ থাণ্ডারিং মেজরিটি। দরিয়ার বাকিটুকু ভালোয় ভালোয় পেরুতে পারলে লীগওলারা আদমজী ফান্সির থাউজেণ্ড পার্সেণ্ট মুনাফা বরদাস্ত করবে না।"

সুদিন বললে, "সে তো শুধু কেচ্ছা। আখেরে হয়তো বা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একদম কেটে পড়বে। কে জানে, হয়তো বা পুরোপুরি স্বাধীন হয়ে যাবে।"

"এ্যাঁ?" হঠাৎ যেন কীর্তির কানে জল গেল। ঐ স্বাধীনতা শব্দটার সঙ্গে তার কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। ছেলেবেলা থেকেই সে যা খুশী তাই করেছে। কালেভদ্রে যখন নিতান্ত বাধ্য হয়ে অনিচ্ছায় কোনো কিছু সয়ে নিতে হয়েছে তখনই পেয়েছে দারুণ পীড়া।

একবার শিপ্রাকে কথায় কথায় বলেও ছিল, "বিবেক নামক ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমার পরিচয় বড়ই কম। কিন্তু তিনিও মাঝে মাঝে মোকা পেয়ে যখন চাপ দিয়ে আমাকে বাধ্য করেন অপ্রিয় সব কাজ করতে তখন আমার জান্‌টা যেন ঠোঁটের কাছে এসে খাবি খেতে থাকে। বিবেকের চাপ কর্তব্য বাবুর চাপ—বাপ্‌রে বাপ। এর উপর আবার বাইরের চাপ। গোলামী!"

সুদিন বললে, "ওহে কীর্তিবাবু, চুপচাপ বসে বসে ঢুকুস ঢুকুস করছো যে বড়। এ্যাদ্দিন তুমিই তো, বাবা, ছিলে শিপ্রাদেবীর প্রতি পার্টিতে এডিকং! আজ সব ঝক্কি ওরই উপর ছেড়ে দিলে কেন বলো তো।"

"তা নয় সুদিনদা! আজ যাদের অনারে পার্টি ওদের ইয়ার দোস্তও এসেছেন জনা কয়েক। ও'রা তো নিত্যি নিত্যি এখানে আসেন না। আমার মত পাকা নন—ওরা ঠিকে। আজ ওদের একটা চান্‌স্ দিতে হয়। দেখছো না, ম্যাডামকে হেল্প করার ছলে থার্ড ক্লাস বেয়ারার চেয়েও আনাড়ি সার্ভিস দিচ্ছে। কিন্তু শ্রীমতীর সঙ্গে দু' এক দফে রসালাপ করার সুযোগ পাচ্ছে তো।"

"সার্ভিসের কথা তুলছো কেন? ওদের বাড়ি-ঠাকুরদা বাটলার ছিল না কি?"

"লণ্ডনের ক্ল্যারিজে চীফ ওয়েটারও সার্ভিসে তোমার কাছে হার মানবে। তোমার ঠাকুদ্দা তো ছিলেন কোম্পানির মুৎসুদ্দী। তবে—"

"চোক্কর ছোকরা।"

ঘণ্টা দুই হয়ে গেল পার্টি আরম্ভ হয়েছিল। এখন একা, জোড়া জোড়া, একসঙ্গে জনা তিনা বিদায় নিতে আরম্ভ করলেন। কোন এক সংস্কৃতের কবি বলেছেন, যেন পরাজিত বাহিনীর সৈন্যরা এক্কা দুক্কা হয়ে এদিক ওদিক ছিটকে পড়ে। আরেকটা ছোটখাটো দল চললো এক সঙ্গে—ওদের অন্য একটা পার্টি-ডিনারে নেমন্তন্ন। শিপ্রা আগের থেকেই মাফ চেয়ে নিয়েছিলো। এ-পার্টির দু'একজন বানচাল হয়ে যাওয়াতে সুদিন আর কীর্তি তাদের যেন আদর করতে করতে ড্রাইভারদের জিম্মায় মোটরে তুলে দিল। দু'একজন সুপ্ত এবং অর্ধ সুপ্ত। তাদেরও তুলে দেওয়া হল তদ্বৎ।

সুদিন বললে, "কীর্তি ভায়া, এবারে আরামসে একটা শেষ ড্রিংক খাই তোমার সঙ্গে। এ-সব পার্টিতে এত সব রকমারি চিড়িয়া আসে যে প্রাণখুলে

কথা বলা যায় না, আর প্রাণ খুলে কথা কইতে না পারলে গলা খুলে রস পান করবে কি করে ?"

লনের সুদূরতম প্রান্তে দুজনাতে বসে চুপ করে রইল।

শিপ্রা শেষ গেস্টকে বিদায় দিয়ে ধীর পদক্ষেপে ওদের কাছে এসে দাঁড়ালো।

সুদিন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "বসুন।"

এরা আপনজন। তাই শিপ্রা বললে, "না, ভাই, আমি নাইতে চললুম।"

ড্রিংক শেষ করে সুদিন উঠলো। বললে, "আমি 'ব্ল্যাক ক্যাট'-এ যাচ্ছি। তুই আসবি, এখানকার কাজ শেষ হলে ?"

বেয়ারাদের বিদায় দেওয়া থেকে আরম্ভ করে আরো পাঁচটা কাজ "রাউন্ড আপ" করার ভার প্রতি পার্টিতেই পড়ে কীর্তির ঘাড়ে।

সুদিন বললে, "তোর অনারারি নোকরিটাতে কি কোনো কালে প্রমোশন পাবি নে ?"

কীর্তি হেসে বললে, "কড়া কনট্রাক্ট করা আছে, অনারারি—ঠিক হৈ। কিন্তু, দাদা, পার্মেনেণ্ট।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

কীর্তি ?

শিপ্রা ?

হ্যাঁ। শোনো। বেড়াতে যাবে ? মোটরে। পুরো দিনটা। ফিরতে রাত দশটাও হয়ে যেতে পারে। কোথায় যাব ? সে তো তুমি ঠিক করবে। আমি মেয়েছেলে, একটা শখ জানালুম। তুমি পুরুষমানুষ। শেষ ডিসিশান তো তোমার হাতে ? হ্যাঁ একটা সুটকেস নিয়ে এসো—যদি ব্রেকডাউন-টাউন হয়ে যায়। আর সব আমি নিচ্ছি। শিগগির এসো !

কীর্তি ভাবলো, হুঁ সে পুরুষমানুষ, কুল্লে ডিসিশন তার হাতে। দু রাত্তির যেতে না যেতেই যে-শিপ্রাচক্রের প্রত্যন্ত প্রদেশে সে লিকলিক করতো হঠাৎ হয়ে গেল সে-চক্রের চক্রবর্তী। নিজেকে সাতিশয় মহিমান্বিত পদে উন্নীত দেখেও তার থেকে অবিমিশ্র আনন্দ আহরণ করতে পারলো না। সে বহুদিন বার বার অনুভব করেছে, শিপ্রার কমন সেন্স্, সাংসারিক বুদ্ধি তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী। যাকে বলে কালচার—সেখানে তো কোনো তুলনাই হয় না। সর্বোপরি কী স্ত্রীলোক কী পুরুষ কস্মিনকালেও কেউ কড়ে আঙুলটি তক্ তুলে ইঙ্গিত মাত্র দেয় নি তার ব্যক্তিত্বে রয়েছে বিকট একটা পৌরুষ ভাব।

সে ড্যুক অব এডিনবরা হতে রাজী আছে সানন্দে। কিন্তু রানী এলিজাবেথের সিংহাসনে বসতে যাবে কোন্ দুঃখে?

ভরসাও অবশ্য আছে শিপ্রা বুদ্ধিমতী মেয়ে। তাকে যে অযথা অকূল দরিয়ায় ডোবাবে সেটা একেবারেই অসম্ভব। যে মেয়ে কি না ইহজন্মে কোনো বেয়ারা বয়কে ডিসমিস করে নি। কলকাতা শহরে রীতিমত "লজ্জাস্কর" রেকর্ড।

তা সে যাক্‌গে। অত ভেবে কি হবে? কিন্তু ভাবনাটা সুখ দিচ্ছে যে।

যাত্রারম্ভের শেষ ফিনিশিং টাচ্ সমাপন করে শিপ্রা শুধোলে, "তুমি চালাবে? ড্রাইভার ছুটি নিয়েছে।"

আঁৎকে উঠে কীর্তিনাশ বললে, "সর্বনাশ! তবেই হয়েছে। তোমাকে কেউ বলে নি, আমি নিজে যখন গাড়ি চালাই তখন সেটাতে মড়া লাশকেও লিফ্‌ট দিতে রাজী হই নে। করবো অ্যাকসিডেণ্ট, পুলিস বলবে তারই ফলে লোকটা মারা গেছে।"

স্টিয়ারিঙে বসে শিপ্রা বললে, "ফাজলামো রাখো। সোভানী মোটরের জউরী। তার মুখে নিদেন একশ' বার শুনেছি তোমার মত মোটর মেরামতির হুনুরি এ-দেশে তো নেইই জর্মনিতেও মেলা ভার।"

"কে বলেছে? সোভানী? তা তো বলবেই। আহা, কালকের পার্টিতে যদি দেখতে তার নৃত্যকলা। তুমি তখন লনের অন্য কোণে, কোন্ এক কন্‌সাল না কি যেন—মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে মোলায়েম করছিলে। এদিকে সোভানী তার ইহা আড়াইমণী লাশটাকে লনের উপর বিন ঠেকনা দাঁড় করাতে পারছেন না, ওদিকে সে অন্ধ্র ফিল্ম স্টার গোলাবাম্মাকে ভরত নাট্যমের কি একটা দারুণ জিগ্‌জাগ্ স্টেপ দেখাবেই দেখাবে। দু পাত্তর টেনেই মগজটি গোবলেট। ভরত নৃত্য সশরীরে দেখাতে গিয়ে দু হাতের চেটো উল্টো করে কোমরে রাখলো লখনৌয়ের বাইজী স্টাইলে। তার পর সে হাতীর পায়ের সাইজের এক একখানা থাবা দিয়ে দেখাতে লাগল হরেক রকম মুদ্রা। কি একটা গানও ধরেছিলো বুঝি "বাজত ঘুঙুরিয়া" না কি যেন। শেষটায় জড়ানো গলায় গোলাবাম্মার দিকে সাতিশয় বিনয়নম্র লাজুক নয়নে তাকিয়ে বললে, "আপনার মতো গুণিনকে বুঝিয়ে বলতে হবে না—সেটা হবে কেরিইং কোল টু এ বার্ড ইন দি হ্যাণ্ড—এ নৃত্যটার মূল বক্তব্য হচ্ছে তন্বঙ্গী শ্রীরাধা রসরাজ কেষ্ট ঠাকুরকে তাঁর পূর্বরাগ নিবেদন করছেন।"

শিপ্রা খুশী হয়ে বললে, "পার্টিটা তো তাহলে দারুণ সাকসেসফুল হয়েছিল। আর কি দেখলে?"

"সেটা ঘটে নি তাই দেখেছি বলি কি প্রকারে?"

"যথা—"

"বাসন্তী আর সুশান্ত তো চিরন্তনী মানিক জোড়। পার্টি পরবের কথা বাদ দাও, তাঁরা হাঁচেন এক সঙ্গে, কাশেন এক সুরে। কাল দুজনা বসেছিলেন পার্টি নদীর দু'পারে—চখাচখীর মিলন হয় না, জানো তো। এ তারো বাড়া। যেন চির বিরহের সতীদাহে দু'পারে দু'জন দগ্ধ হবেন! মাঝে মাঝে আবার একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছিলেন। বাপস্। তখন চোখ থেকে আগুনের যা হল্কা বেরুচ্ছিল, আমি তো ভয়ে মরি, তোমার সাধের বাড়িটাতে না আগুন লেগে যায়।"

"আরো বিস্তর দেখবার ছিল, শোনবারও ছিল। হ্যাঁ, পূব বাঙলার পলিটিক্স্ নিয়ে দেখলুম দু'একজন চিন্তিত।"

শিপ্রা বললে, "তুমি তো খবরের কাগজের হেড লাইনগুলোও পড়ো না, সে আমি জানি। আর আমি পড়ি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ব্যাপারটা সত্যি বড্ড খারাপ মোড় নিচ্ছে।"

কীর্তি বুঝলো, শিপ্রা পূব বাংলার পলিটিক্স্টা খুবই সিরিয়াসলি নিয়েছে। তাই অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর শুধলো, "আমাদের কি বিশেষ গন্তব্যস্থল আছে?"

শিপ্রা বললে, "রসো গঙ্গা পেরোই। তারপর তুমি স্থির করবে। বোলপুর যাবে? শান্তিনিকেতন?"

কীর্তি বললে, "বোলপুর—হ্যাঁ।" তারপর ঈষৎ কাতর কণ্ঠে বললে, "শান্তিনিকেতনে যেতে কিন্তু আমার সঙ্কোচ বোধ হয়, এমন কি ভয় করে।"

শিপ্রা আশ্চর্য হয়ে শুধলো, "কেন?"

"ওখানে সঙ্গীত নৃত্য এসব তো আছেই তার উপর সেখানে হয় নানা-প্রকারের বিস্তর রিসার্চ। এ-সব তো আমি জানি নে, বুঝি নে। কারো না কারো সঙ্গে পরিচয় হয়ে যাওয়াটা সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়। তখন তিনি যদি কোনো প্রশ্ন শোধান বা আলোচনা পাড়েন তখন আমি মুখ খুললেই তো চিত্তির। আবার একদম চুপ করে থাকাটাও অভদ্রতা।"

"এ তোমার বাড়াবাড়ি, আমি ভালো করে জানি, তুমি রবীন্দ্রনাথের কবিতা বহু বৎসর ধরে মন দিয়ে পড়ছো। রবীন্দ্রসঙ্গীতের কালেকশন তোমার যা আছে সেটা রীতিমত বিরল।"

কীর্তি করুণতর কণ্ঠে বললে, "ভাই, সে আমার নিতান্ত আপন আনন্দ। কিন্তু আটঘাট বেঁধে যুক্তিপূর্ণ ভাষায় ঐ দিয়ে কিছু বলতে যাওয়া তো সম্পূর্ণ ভিন্ন শিরঃপীড়া।"

শিপ্রা বাঁ হাত দিয়ে কীর্তির উরু চাপড়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, "থাক্ না তা হলে আশ্রম দর্শন। এগোই তো উপস্থিত পশ্চিমদিকে। তারপর দেখা যাবে।"

কীর্তি বললে, "তুমি আমাকে ভুল বুঝলে আমার দুঃখের অবধি থাকবে না। যাকে বলে রবীন্দ্রদর্শন তার সঙ্গে আমার পরিচয় অতিশয় নগণ্য। তবু আমার একটা অন্ধবিশ্বাস—বরঞ্চ বললে ভালো হয় আমার ইনসটিনক্ট বলে—রবীন্দ্রনাথ আর বিবেকানন্দ এই দুটি লোক যা করে গেছেন সেটা পরিপূর্ণভাবে আপন বুকের রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে, ঐ দিয়ে মগজের সেলগুলোর গঠন পালটে নিতে আমাদের আরো একশ' বছর লাগবে।"

শিপ্রা বললে, "জর্মনরাও বলে গ্যোটেকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে তাদের আরো একশ' বছর লাগবে। একাধিক চিন্তাশীল লোক বলেছেন, গ্যোটের নির্দেশ যদি সত্যিই আমরা আমাদের চিন্তাধারায়, আদর্শ নির্মাণে মেনে নিয়ে থাকতুম তা হলে হিটলারের আবির্ভাব হত না।"

শীতকালে পশ্চিম বাঙলার বিশেষ করে বর্ধমান বীরভূম অঞ্চলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি থাকে না। তবে লক্ষ্য করলে প্রকৃতির একটা দিক মাঝে মাঝে বড়ই চমক লাগায়। ভোরবেলা ঘুম ভাঙলো। শার্সি দিয়ে তাকিয়ে ঠাহর করা গেল না দেবতা আকাশে উদয় হয়েছেন কি না। তারপর হঠাৎ এক ঝটকায় সব দুনিয়া সাফ, আসমান জমীন এমন কি হাওয়াটাও যেন আলোয় আলোময় হয়ে গেল। রাজা অনেক আগেই আকাশের বেশ উঁচু জায়গায় সিংহাসনে আসন নিয়ে বসেছিলেন। সামনে ছিল যবনিকা। লগ্নকাল প্রত্যাসন্ন হওয়া মাত্রই রাজাদেশে দ্বারী চক্ষের পলকে সে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছে।

আজ কুয়াশা কাটলো ধীরে ধীরে। মোটরও এগিয়েছিল সাবধানে। শ্রীরামপুর পেরনোর পর শিপ্রা বললে, "এরই কাছেপিঠে ডাইনে মোড় নিলে একটা পুকুর আছে। উঁচু পাড়িতে ছোট বড় গাছ-গাছালি রোদ্দুরটা পিঠ তাতালে সতরঞ্চি একটু সরিয়ে নিলেই হল। কিংবা বর্ধমান পেরিয়ে বাবার বন্ধুর বাগানবাড়ি। দশ বছর ধরে ফাঁকা। একটা মালী আছে মাত্র। কোন্‌টা পছন্দ? আমার কোনো চয়েস নেই।"

"এই শীতের সকালে চলাটাই লাগছে বেশ, বসাটার চেয়ে।"

যদিও ফ্লাস্কে বিস্তর চা কফি ছিল তবু একটা পেট্রল স্টেশনের পাশে দরমার দোকানের বেঞ্চিতে দু'জনাতে চা খেতে বসল।

কীর্তি দোকানীকে শুধলো, "ব্যবসা-বাণিজ্য কি রকম চলছে?"

অত্যন্ত সবিনয়ে বললে, "আমাদের খদ্দের তো গোরুর গাড়ি। এখন বাবুরা হুশ করে মোটরে চলে যান। বাস্‌ দাঁড়ালে সেও বা কতক্ষণ। গোরুর গাড়ি কমে যাচ্ছে। দোকানটাকে তাই খাড়া করতে পারছি নে।"

শুকনো দরদ শোনাবার মত এদের দু'জনার কেউ নয়।

কীর্তি বললে, "এটা বাঙলাদেশ, আবার ঢাকা সিলেটও বাংলাদেশ। কিন্তু আমার মনে হয় বাস্‌, মোটর বোধহয় বাঙালদেশের নৌকোকে এতখানি ঘায়েল

করতে পারে নি। তুমি কখনো বাঙালদেশে গেছ ?"

হেসে বললে, "খাঁটি বাঙালদেশের মাটিতে কখনো পা ফেলি নি, কিন্তু বাঙালাদেশে গিয়েছি। কোন্ এক স্টীমার কোম্পানির কি যেন এক পরবে কলকাতা থেকে সোঁদরবন হয়ে বাহাদুরাবাদ ঘাট না কি যেন। কী সুন্দর দেশ, কি বলবো। পরে আরো বলবো এখন চল।"

মোটর চালাতে চালাতে কিন্তু শিপ্রা বলে যেতে লাগলো প্যারিসের গল্প। কথায় কথায় শুধলো, "তুমিও তো প্যারিসে ছিলে ?"

"আমি একটা অপদার্থ। মোকামে পেঁছাই। সব বলবো।"

সপ্তম অধ্যায়

বাগানবাড়িটি শৌখিন নয় বটে কিন্তু মালীটাও আলসে নয়।

বাড়িটার প্রধান লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তার তিন দিকের প্রান্তর পরিমাণ বারান্দা-গুলো। বাগান, রাস্তা পেরিয়েই কাটা ধানে খোঁচা খোঁচা শূন্য ক্ষেত। দিগন্তে গ্রামের সবুজ আভা। মালী প্রাচীন দিনের, অধুনা লুপ্তপ্রায় আরামদায়ক দু'খানা ডেক-চেয়ার পেতে দিয়েছে। মোটর থেকে বের করে সতরঞ্চি কুশনও।

শিপ্রা বললে, "রবীন্দ্রনাথের গানে আছে, 'সন্ধ্যাবেলার চামেলি গো, সকালবেলার মল্লিকা', আর তোমাদের গানে আছে, 'দুপুরবেলার পিন্‌জিন্ গো সন্ধেবেলার উ-ই-স্কি।' কি খাবে বলো।"

বিলিতি পিন্‌ক্ জিন্ এদেশের বেয়ারা-বুলিতে পিন্‌জিন্। ছোট্ট গেলাসে প্রথমে কয়েক ফোঁটা বিটার্‌স্ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গেলাসে জিন্ ঢালা হয়। এটাকে জিন এণ্ড বিটার্‌স্‌ও বলেন কেউ কেউ। তবে এদেশে, বিশেষ করে গরমের দিনে, জিনের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা পাতি লেবুর রস দিয়ে গিমলেট্‌টাই পছন্দ করেন স্মার্ট সেটের অধিকাংশ মেম্বার।

কীর্তি সঙ্গে সঙ্গে বললে, "না, আমি সাদা চোখে কথা কইব।"

শিপ্রা আতঙ্কের ভান করে বললো, "আমাকে ভয় দেখাচ্ছ কেন গো ? তুমি কি জর্মন আর আমি ফ্রান্‌স যে যুদ্ধশেষে সন্ধির শর্ত নিয়ে দর কষাকষি করতে এসেছি ?"

প্রথমটায় সামান্য একটু হকচকিয়ে কীর্তি হেসে বললো, "ধরো তাই। কিন্তু আমার কোনোই শর্ত নেই। এতটা কাল আমি তোমার ভিতরে গণ্ডিতে ছিলুম না। তবু জানতুম, তুমি যে-ধরনের মানুষ—আমি কিছু চাইলে এ ধরনের লোক 'না' বলতে পারে না। তবে এখন, আমি বলছি এখন, তোমার কাছে আমি কোনো-কিছু চাইব কেন ? যদিও আমি আমার সর্বাঙ্গে গৌরবের কাঁথা জড়িয়ে

তোমার কাছে ভিখিরির মত দু'হাত এক জোড় করে এক কণা খুদের তরে উচ্চকণ্ঠে আবেদন আর দাবী দুইই জানাতে পারি।"

শিপ্রা বললে, "আমি যখন নিজের থেকে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় তোমার বুকের কাছে এসেছি তার সরল অর্থ, এবং আমার অধিকার তুমি আমাকে তোমার ডানার ভিতরে গুঁজে নিয়ে সর্ব বিপদ সর্ব আঘাত থেকে রক্ষা করবে। যেখানে কনের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো কথাই ওঠে না সেখানেও পিতা যখন সম্প্রদান করে তখনো তো বর জানে তার ঘাড়ে কি দায়িত্ব চাপানো হল। আর—"

বাধা দিয়ে অবিমিশ্র সরল এবং অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে কীর্তি বললে, "অপদার্থ। আমি যে কত বড় অপদার্থ সেইটে আমি জানি এবং সেটা তুমি আমাকে আজ এখানে না আনলে আজ দুপুরে তোমার বাড়িতে গিয়ে সেইটে ভালো করে বুঝিয়ে আসতুম। আমার মাত্র ঐ একটি বক্তব্য আছে ঃ সেটা—আমি অপদার্থ।"

তথ্যটা যাতে করে শিপ্রার চৈতন্যে গভীর দাগ কাটে তাই কীর্তি 'অপদার্থ' শব্দটার উপর পুরো জোর দিয়ে চুপ করে রইল।

তত্ত্বটা সত্য হোক মিথ্যে হোক, একটা বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কীর্তিকে যারাই চিনতো তারাই জানতো, ওর ভিতরে রত্তিভর ভড়ং নেই এবং সে যে অপদার্থ সেটা তার সরল, স্বাভাবিক অকৃত্রিম বিশ্বাস।

পক্ষান্তরে স্মার্ট, নন্-স্মার্ট সব চক্রই আপন আপন অভিজ্ঞতা থেকে নিঃসন্দেহে সোৎসাহে হলপ নিতে এগিয়ে আসতো যে শিপ্রার মত স্থির বুদ্ধি-ধারিণী কন্যার মাথায় হাত বুলোতে পারে এহেন ধুরন্ধর মহানগরীতে বিরল—সর্বসমক্ষে বুলোয় একমাত্র তার চাকর বেয়ারা ঝি আয়া।

তা হলে প্রশ্ন, জেনে বুঝে এই শিপ্রা "অপদার্থ" কীর্তিকে তার পার্টি রাউণ্ডে ইন্‌কাম ট্যাক্‌স্ অফিসারের সঙ্গে বচসা করার জন্য—অবশ্য ব্রীফিংটা পুরোপুরি শিপ্রারই—পাঠায় কেন? অবশ্য সেটা যে খুব একটা চোখে ঠেকত তা নয়। আর পাঁচজনকেও সে এ-কাজ ও-কাজের ভার দিত। তারাও সানন্দে কর্ম সমাপন করে দিত। তার কারণটাও জলের মত পরিষ্কার। এই জটিল কলকাতার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক করপরেশনিক যুক্তফ্রণ্টিক গোলক ধাঁধার ভিতরে বাইরে বহুজনকে নিত্য নিত্য এমন সব ব্যক্তিগত লজ্জাবতী-লতার মত সাতিশয় ডেলিকেট সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয় স্থলে বুদ্ধিমতী যে রমণী তার মৃদুহাস্য, তার দরদিয়া অনুরোধ তার মোহনিয়া ছল-কাতরতা দিয়ে গ্রন্থিমোচন করে দিতে পারে অধিকাংশ সমস্যাতেই।

অবশ্য নিঃসন্দেহে বলতে হয়, শিপ্রার চাণক্যদত্ত এই কূটনৈতিক দক্ষতার খবর জানতো অতি অল্প লোকই। সর্বসমক্ষে সে তাবৎ পার্টির প্রাণ, তাবৎ ক্লাবের জান্।

সেই শিপ্রা এই "অপদার্থ" কীর্তিটাকে কি তবে বাঁদর নাচ নাচাচ্ছে ?—যদিও সে যে শিপ্রার প্রসাদ পেয়েছে সেটা মাত্র দু' দিনের ভিতর কারোরই জানার কথা নয়। কাল যে পার্টি হয়ে গেল সেখানেও কীর্তিবাবু ছিলেন ঐতিহ্য অনুযায়ী পূর্ববং পার্টিফীল্ডের লাইনসম্যান। কোথায় ভুবন-ভাগানের ক্যাপটেন শিপ্রা, আর কোথায় সে !

কিন্তু বাঁদর নাচ নাচানো মেয়ে শিপ্রা নয়।

শিপ্রা তাকিয়ে আছে অলস নয়নে রাস্তার দিকে। সাঁওতাল মেয়েরা জোড়া জোড়ায় একে অন্যের আঙুলে আঙুল জড়িয়ে নিচু গলায় কোরাস গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরছে হাট থেকে কেনাকাটা সেরে। সাঁওতাল পুরুষের চিহ্নমাত্র নেই। একটি সাঁওতাল মেয়ে শুধু চলেছে জোড় না মিলিয়ে। হাতে একটা কঞ্চি। সেটা দিয়ে কখনো বা আস্ফালন করে, কখনো বা দু'কদম নেচে নেয়, কখনো বা কঞ্চি দিয়ে অন্য মেয়েগুলোকে শাসায় আর তারা খিলখিল করে হাসে। আসলে সাঁওতাল মেয়েরা হাটে বাজারে তাড়িফাড়ি খায় না। এ মেয়েটা ব্যত্যয়—এবং সাতিশয় ব্যত্যয়। বেশ খানিকটে গিলেছে। তাই তার এই ফুর্তি।

শিপ্রা তাড়াতাড়ি কীর্তিকে দৃশ্যটা দেখিয়ে বললে, "দেখো, দেখো এই মেয়েটা হচ্ছে আমার সাঁওতাল সংস্করণ—ওদের সোসাইটি গার্ল।"

কীর্তি প্রথমটায় আদৌ বুঝতে পারে নি, ব্যাপারটা কি। বললে, "ছিঃ ! এ-মেয়েটা তো রীতিমত বে-এক্তেয়ার।"

শিপ্রা বললে, "আহা, তুমি কিচ্ছু বোঝ না। ভিন্ন ভিন্ন সোসাইটির ভিন্ন ভিন্ন প্যাটার্নের বে-এক্তেয়ারির রকম-ফের হয়। আমাদের অজ পাড়াগাঁয়েও দু'একটি মেয়ের উড়ুক্কু উড়ুক্কু ভাব থাকে—তোমরা যাকে বলো, 'ফাইটি গার্ল', একেবারে যেন শব্দে শব্দে অনুবাদ। তার ফষ্টিনষ্টি আর প্যাবিসিনীর অর্ধোন্মত্ত তাণ্ডব লম্ফঝম্প কি একই প্যাটার্নের ? তবে হ্যাঁ, যেখানে মদের প্রচলন নেই সেখানে এসব ব্যাপারে মাত্রাধিক্য হয় না।" তারপর বেশ কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করে বললে, "জানো কীর্তি, আমি অনেক দেশ দেখেছি ; আমার জানা মতে পূব বাঙলার একটা বৈশিষ্ট্য যে ওরা মদ খায় না। চাষাভুষো তাড়ি খায় না, মধ্যবিত্তদের তো কথাই নেই আর পার্টিশনের আগে পর্যন্ত বড় বড় বেশ কিছু জমিদার কলকাতায় বাড়ি বানাতো ফুর্তিফার্তি এবং মদ্যপানের জন্য। ছোট্ট কুর্দিস্তানে কি হয় জানি নে কিন্তু পূব বাঙলার মত একটা মাঝারি রকমের দেশে মদের প্রচলন নেই, এটা সত্যই বিচিত্র ঠেকে আমার কাছে। ওদের কালচারটাই যেন বর্ধমান বীরভূম—এক কথায় রাঢ়ের থেকে স্বতন্ত্র।"

কীর্তি বললে, "হুঁ। কিন্তু ঢাকা বেতার যা রবীন্দ্রসঙ্গীত গায় সেটা কলকাতার চেয়ে কোনো অংশে খারাপ নয়। তবে পিণ্ডির রাজারা সেটা প্রায়

বন্ধ করে দিয়েছেন।"

শিপ্রা বাঁকা হাসি হেসে বললে, "তুমি অতশত খবর রাখো কি করে। তুমি না অপদার্থ।"

অষ্টম অধ্যায়

"কীর্তি।"

"ইয়েস, ম্যাডাম।"

"ঠাট্টা নয়। তোমাকে গুটিকয়েক কথা বলতে চাই।"

"দোহাই তোমার। আমি বড় আনন্দে ডুবে আছি। দয়া করে সেটাকে থাকতে দাও।"

"তুমি যদি আমার কথাগুলো ঠিক মত গ্রহণ করো, তোমার ভিতর যে স্বাভাবিক বুদ্ধি আছে তারই সাহায্য নিয়ে আমার কথাগুলো বুঝে নাও তবে তোমার আনন্দ কিছু মাত্র কমবে না। কলকাতায় আমার ঘরে শুয়ে শুয়ে তোমাকে যে এ-কথাগুলো বলা যেত না তা নয়। কিন্তু তুমি একাধিক বার বলেছ, আমার স্বরটি বড় রোমাণ্টিক। সেখানে যে আবহাওয়ায় তুমি কি বুঝতে কি বুঝবে, কি বলতে কি বলবে তার জন্যে পরে হয়তো পস্তাবে। তাই তোমাকে এখানে টেনে এনেছি। এখানে চতুর্দিকে লোকজন রয়েছে। হঠাৎ হৃদয়াবেগে আমার হাঁটু জড়িয়ে হাউ হাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়তে পারবে না, আমিও তখন সর্ব সংকল্প ভুলে গিয়ে তোমার কান্নায় গলে যাবো না।"

বেচারা কীর্তি কোন্ দিকে যে হাওয়া বইছে কিছুই অনুমান করতে পারছিল না। স্তব্ধ হয়ে শুধু শিপ্রার দিকে তাকিয়ে রইল।

শিপ্রাও সোজা স্থির পূর্ণ দৃষ্টিতে কীর্তির দু'চোখে আপন দু'চোখ রেখে তার স্বাভাবিক কণ্ঠে বললে, "আমি তোমার চেয়ে ছ'বছরের বড়, কিংবা বেশী, কম নিশ্চয়ই নয়। আমাদের বিয়ে হতে পারে না।" শিপ্রা সজ্ঞানে কথা বন্ধ করলো। হয়তো বা কীর্তির মুখ থেকে কোনো মন্তব্য প্রত্যাশা করছিল। হয়তো বা তার প্রত্যেকটি বক্তব্য যেন অক্ষরে অক্ষরে, তার সম্পূর্ণ অর্থ নিয়ে কীর্তির বোধগম্য হয় তার জন্য আপন নীরবতা দিয়ে তাকে সুযোগ দিচ্ছিল।

কিন্তু কোনো উত্তরই দিল না। কিন্তু সে যে বক্তব্যটা বুঝতে পেরেছে সেটা তার মুখের ভাব পরিবর্তন থেকেই বোঝা গেল।

শিপ্রা ঠিক আগেরই মত স্বাভাবিক কণ্ঠে বললে, "কিন্তু তারই ফলে আমাদের ভালোবাসাতে সামান্যতম আঁচড়টুকু লাগবে না, আমাদের ভালোবাসাতে কোনো দিক দিয়ে কোনো প্রকারের অসম্পূর্ণতা থাকবে না। কারণ আমি স্থির নিশ্চয় জানি, আমার সর্ব সত্তা দিয়ে অনুভব করেছি, তোমার ভালোবাসা একাগ্র

ভালোবাসা, তুমি আর তোমার প্রেম অভিন্ন সত্তা ; আর আমার প্রেম তুমি দিনে দিনে চিনে নিয়ো, আমি আশা ধরি, তুমি কোনো দিন তার শেষ অতলে পেঁছিতে পারবে না। এবং তার সঙ্গে যোগ দিয়ে বলি, এই কলকাতার শহরে শত শত গতানুগতিক যে-সব বিয়ে হচ্ছে সেখানে বর যা পায় তার চেয়ে তুমি পাবে এত বেশী যে দুটোর কোনো তুলনাই হয় না। সে-সব আমি স্বপ্নে দেখেছি, তুমি বাস্তবে পাবে। আর আমি তোমার কাছ থেকে কি পাবো, কি নেব সেটাও আমি ভালো করেই জানি।

তুমি যে আনন্দসাগরে ডুবে আছো সেটাতেই তুমি থাকবে—শুধু আমাকে পাবে পাশাপাশি।"

হায়রে কলকাতার রোমাণ্টিক সুখনীড় থেকে দূরে এসে পথপার্শ্বে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে যুগ্ম ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে সর্বপ্রকার কবিত্ব বর্জিত সাদামাটা ভাষায় আলোচনা করার নিষ্ফল প্রচেষ্টা !

এ বিশ্বাস অবশ্য শিপ্রার পরিচিত জনের ছিল যে, সে যদি কখনো প্রেমে পড়ে তার স্যাঁতসেঁতে-হৃদয় বাঙালীর মত রস-সায়রে হাবুডুবু খাবে না, তার প্রেম হবে পাক্কা ইংরিজি কায়দায়—বিজনেস ইজ বিজনেস—হোক না লেনদেনের বস্তু ওক কাঠের তক্তার স্থলে যুবক যুবতীর প্রেম।

কিন্তু এর পরই কৌতূহল জাগার কথা, শিপ্রার বক্তব্য শুনে—তা সে রোমাণ্টিক ভাষাতেই হোক কিংবা কাঠখোট্টা কাঠের ভাষাতেই হোক—আমাদের অপদার্থ কীর্তি ঠাকুরের হৃদয়মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো।

এ-কাহিনী যদি প্রেমের মোলায়েম গদ্য কাব্য হত তবে তারই সরস বর্ণনা দিয়ে হেসে খেলে দু'দশ অধ্যায় জুড়ে বিরাট রসসৌধ নির্মাণ করলে যুবজন উল্লসিত হতেন। কিন্তু এ-স্থলে এই যুবক যুবতী অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেচে, সে পথে প্রেম-রস মুখ্য নয় গৌণও নয়—সেটি তাদের পাথেয়।

আত্মম্ভরিতার গ্যাসে ভর্তি বেলুনমুণ্ড অকালকুষ্মাণ্ড ভিন্ন অন্য যে-কোনে সাদামাটা বাঙালী প্রেমমুগ্ধজন তার প্রতিদান পেলে এতই আত্মহারা হয় যে সে আর তখন প্রিয়ার অন্য কথা শুনতে পায় না। অনাগত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার সাবধান বাণী, দু'জনার শান্তিময় জীবন যাপনের জন্য সামান্য দু'একটি বোঝা-পড়ার কথা কিছুই তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। হারানো ছেলে ফিরে পেলে দুখিনী-মায়ের চতুর্দিকময় ঘন অন্ধকার যে রকম এক-মুহূর্তে অন্তর্ধান করে, কীর্তির বেলা হল তাই।

তার চেতনায় মাত্র একটি অনুভূতি—পেয়েছি, পেয়েছি, পেয়েছি।

এই আনন্দলোককে লণ্ডভণ্ড করবে কোন্ পাষণ্ড !

শিপ্রা তার মধুরতম হাসি দিয়ে কীর্তিকে নিরঙ্কুশ আত্মহারা করে দিয়ে বললে, "কীর্তি, তুমি যে আনন্দ সায়রে অবগাহন করছো সেটাতে আমি ঝড়

তুফান তুলতে চাই নে। আমার যা বলার সেটা বলা হয়ে গিয়েছে। তুমি রস-সায়র থেকে ওঠার পর তাই নিয়ে চিন্তা করে যদি কিছু বলার থাকে, কাল বলো। উপস্থিত তোমার সায়র থেকে যে দু'চারটি মুক্তো আহরণ করেছ সেগুলো দেখাও।"

সে-যাত্রা আর বোলপুর হল না। সামনে ময়ূর সিংহাসন। সেটা ছেড়ে কোন মূর্খ ধায় কাবুল কান্দাহার পানে সেখানে মোড়ার উপর বসবে বলে।

নবম অধ্যায়

কীর্তি আসামাত্রই শিপ্রা উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, "পড়েছো কাগজে পাজির পা-ঝাড়াদের ছুঁচোমোটা?"

কীর্তি হাবার মত তাকিয়ে রইলো।

শিপ্রা বললে, "বাবার সঙ্গে যখন প্যারিসে ছিলুম তখন ফরাসীদের মিলিটারি একাডেমি স্যাঁ সীরের কয়েকটি অফিসার বাবার সঙ্গে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুনিয়ার যত রকমের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতো। একদিন কি একটা মিলিটারি প্রশ্ন উঠলে তারই খেই ধরে যে চারটি কথাবার্তা হল তার থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল আর পাঁচটা বাঙালীর মত বাবা মিলিটারির কিছুই জানে না—এস্তেক মিলিটারির ইতিহাস—যা কিনা সহজ পাঠ্য—তাও পাল্টে দেখে নি। অফিসারগুষ্টি তো বিস্ময়ে নির্বাক। শেষটায় এক জাঁদরেল বললে, 'মসিয়ো, এ কী অদ্ভুত ঠাসবুনোট-জড়োয়া কাশ্মীরী শালের মাঝখানে একটা বিরাট ফুটো। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য চিত্রকলা—বিশেষ করে জুরিস প্রুডেনস থেকে আরম্ভ করে হেন বিষয় নেই যেটা আপনি হজম করে আপন সিস্টেমে বেমালুম মিশিয়ে নেন, আর মিলিটারি সায়েন্সের কিছুই জানেন না, এ যে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য!'

বাবা একটু সলজ্জ ভাষায় বললেন, 'ইংরেজ দু'শ' বচ্ছর ধরে বিশেষ করে বাঙালীদের ঐ জিনিসটার দিকে ঘেঁষতে দেয় নি। পাখি মারার সামান্য একটা শট্‌গান যোগাড় করতে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। মিলিটারি সায়েন্স তো প্যোর ফিজিক্স্ নয় যে পুরোনো খামের উল্টো পিঠে তার ফরমুলা লিখে কর্ম খতম করা যায়।'

তারা তখন উঠে পড়ে লেগে গেলো বাবাকে ঐ বিষয়টি শেখাবেই শেখাবে। কাঁহা কাঁহা মোকামে নিয়ে গিয়ে কি সব দেখাতো বোঝাতো খোদায় মালুম। ফরাসীদের যে সব চেয়ে বিরাট কলেবর বন্দুক কামানের কারখানা শ্লাইডার সেটা পর্যন্ত দেখিয়েছে।

কিন্তু এহ বাহ্য। শামিয়ানা সাইজের বৃহৎ বৃহৎ বাণ্ডিল বাণ্ডিল ম্যাপ

পাতা হত কার্পেটের উপর, এবং সব্বাই তারই উপর উপু হয়ে স্টাডি করতেন ইতিহাসের নামজাদা সব ক্যাম্পেন—নেপোলিয়নের আউস্টার লিৎস থেকে আরম্ভ করে এদানির ডি ডে নরমাঁদি ল্যাণ্ডিং। একদিন কোত্থেকে যোগাড় করে এনেছিল বাবুর বাদশার পানিপথ লড়াইয়ের স্ট্রাটেজি। সেটার অধ্যয়ন শেষ হলে ফরাসীরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে বার বার বলছিল, 'ফাঁতাসতিক, ফরামিদাবল—নে' স পা ?' অর্থাৎ ফ্যানটাসটিক্, ফরমিডেবল—নয় কি ? কিন্তু এহ বাহ্য।"

একটু দম নিয়ে তারপর শিপ্রা বললে, "কিন্তু যে-কথা বলতে চাইছিলুম সেটা এ-সবের বিচিত্র স্মৃতির চাপে প্রায় ভুলে যেতে বসেছিলুম। সব চেয়ে আমাকে মুগ্ধ—মুগ্ধ কেন আত্মহারা করেছিল এদের আদব-কায়দা এদের অপরিসীম সৌজন্য ভদ্রতা। এবং সর্বোপরি তাদের তীব্রতম আত্মসম্মানবোধ কাউকে কোনো কথা দিলে সেটা রাখবেই রাখবে—যায় যাক্ তাতে তার শেষ ফ্রাঁ। এবং সেটা দিয়েও যদি শেষ শোধবোধ না হয় তবে সোজা রাস্তা রয়েছে নাক বরাবর। কপালে পিস্তলটি রেখে গুড়ুম !···

"তাই বলছিলুম, এ-ছুঁচোমোটা কেন ? তুই ইয়েহিয়া, তুই বাবা প্রেসিডেন্ট ডিক্টেটর যা-খুশী তাই নিবি তো নে। পূব বাঙলার লোক যদি তোর আদেশ অমান্য করে তবে চালা তোর বন্দুক কামান। আজকের দুনিয়া পরশুর ইতিহাস বিচার করবে ধর্মাধর্ম।

ডিকটেটর হ' আর যাই হ' তোর আসল স্বত্বটা কি ? এবাভ্ অল তুই আমি ম্যান, অফিসার। তোর শরীরের রক্ত, বাইরের চামড়া অফিসারের ধাতু দিয়ে তৈরী। তোর ধর্ম, আত্মগৌরব আত্মসম্মানবোধ। অনার। কথা দিবি নি, দিস্ নি। কিন্তু একবার দিলে জান কবুল। কী দরকার ছিল তোর গণতন্ত্র ফের চালু করার তরে ওয়ার্ড অব অনার দেবার ? কি দায় পড়েছিল ইলেকশন করার ? আর এখন হল কি ? সোলজার, অফিসার হয়ে তুই তোর শপথ ভঙ্গ করলি, তোর স্বধর্ম ত্যাগ করলি। ভদ্র দেশ হলে অফিসারস ক্লাব থেকে তোর নাম কেটে দিত। ছ্যাঃ !"

এতক্ষণে আসমানের বেপরওয়া চিড়িয়া কীর্তিবাবুর কানে জল গেল। তাও যেত না যদি না পরশু রাতে তার দেবীর প্রসন্ন বয়ান নির্গত তাপহরা বিন্দু বিন্দু অমৃতবারি তার ব্যথাভরা হিয়াটাকে সদ্য ফোটা বেলফুলের মত বিকশিত করে দিত। সে-রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে পশথ নিয়েছিল, দেবীর পথ তার পথ। পরের দিন ভোরবেলা ইংরিজি কাগজটা তো পড়লই, একটা নেটিভ বাঙলা কাগজের খয়ের খাঁ ভী হয়ে গেল। কিন্তু দুদিন ধরে অনভ্যাসে ফোঁটা চড়চড় করছিল বড্ডই। দুনিয়ার বেকার হাবিজাবি না দিয়ে কাগজ ভর্তি করা যায় না ? অধিকাংশ খবরের অর্থ কি উদ্দেশ্য কি তার কোনো হদিসই পাচ্ছিল না

সে। আজ যদি কোনো নিরীহ বাঙালী হঠাৎ নটিংহামের একটা লোক্যাল ডেলি পড়তে বসে তবে তার যা অবস্থা হবে কীর্তির হল তাই। কিন্তু তার কপাল ভালো, কালকের বাঙলা কাগজে আওয়ামী লীগের একটি সমসাময়িক ইতিহাস-মূলক প্রবন্ধ ছিল। যাই বলো, যাই কও, কীর্তির বাপঠাকুদ্দা স্রেফ মাথা খাটিয়ে এন্তের টাকাকড়ি কামিয়েছিলেন। ম্যান-ইটার বাঘের বাচ্চা তো আর ভেড়ার ছানা হয় না—কীর্তির খুলিটাতে বেশ খানিকটে বংশলব্ধ মদ্যসিক্ত অর্ধসুপ্ত প্যাঁচালো ঘিলু বাবুর খোঁচাতে জেগে ওঠবার তরে তৈরী ছিল। পাকা নায়েব যে রকম শহুরে কাঁচা বাবুকে জমিদারির হালটা দু'দিনেই বেশ খানিকটে বুঝিয়ে দেয় এ ক্ষেত্রেও হল তাই।

সদ্যলব্ধ বিদ্যে ফলিয়ে বললে, "ঐ ইয়েহিয়া ঘুঘুর পেছনে রয়েছেন আস্ত একটা খাটাশ মিলিটারি ক্লিক্।"

শিপ্রার চোখের পাতা স্তব্ধ—যেন অর্ধাঙ্গে অবশ। "এ কি কথা শুনি আজি?" দুনিয়ার তাবৎ বাবদে বেহদ্দ বেখেয়াল বেকুব "নীচ কুলোদ্ভবা দাসীর" মুখে "সত্য মিথ্যা জ্ঞান তার" তবে "কি সম্ভবে?" কীর্তির মুখে মোস্ট আপ্ টু ডেট ইনসাইড স্টোরি।

বিমূঢ় ভাব কেটে যাওয়ার পর শিপ্রা শুধু বললে "তুমি না অপদার্থ কীর্তি?"

প্রশ্নটা যেন অদৃশ্য ফু মেরে উড়িয়ে দিয়ে বললে, "ছোঃ, এ-খবরটা আবার পদার্থ! খবরের কাগজ থেকে যে তত্ত্ব আধঘণ্টার ভিতর যোগাড় করা যায়।"

শিপ্রা আরও সাত বাঁও পানিমে। বললে, "খবরের কাগজ? ও-সব বদ্ অভ্যাস হল তোমার কবের থেকে?"

কীর্তি সবিনয়ঃ "সে অনেক কথা পরে হবে।"

শিপ্রাঃ "তাই সই তুমি যখন এ-সব বুঝতে আরম্ভ করেছো তখন তোমাকে আর একটা খবর জানাই। সেই যে বাবার দোস্ত বুড়ো ফরাসী জাঁদরেল বাঙলাদেশের মিলিটারি হিস্ট্রি যোগাড় করার চেষ্টা দিয়েছিলেন—নিছক আমরা ঐ দেশের লোক বলে। এটাও এক রকম দরদী হিয়ার আচরণ বলতে পারো। একদিন বাবাকে কথায় কথায় বললেন, ব্লাঙ্কো, ব্লাঙ্কো! প্রায় কিছুই যোগাড় করতে পারি নি। তবে দিল্লীতে লেখা এন্তের রাজনৈতিক ইতিহাস পেয়েছি বেশ কিছুটা। তার থেকে স্পষ্ট ধরা পড়ে দিল্লীর হুজুররা বেঙ্গলে মার খেয়েছেন বিস্তর। তাই সে-সম্বন্ধে নীরবতাটাই সমধিক। গ্রেট মোগল আকবরের নাম এ-দেশের লোকও শুনেছে। তিনিও দেখলুম বাঙলাদেশের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র জয় করতে পেরেছিলেন। জয় করেছিলেন তার ছেলে জাঁহাগির। মন্দ কপাল আমার, তার স্ট্র্যাটাজি খুঁজে পেলুম না।

কিন্তু যা পেয়েছি তার থেকে আমি বুঝেছি, এবং জোর গলায় বলতে

পারি—

তেরাঁ, তেরাঁ, পুনরপি তেরাঁ
মল্লভূমি, মল্লভূমি, মল্লভূমি—

এই বিরাট পৃথিবীতে আদ্যন্ত অদ্বিতীয়। বিরাট বিরাট নদী আর পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি যেখানে হয় সেই চেরাপুঞ্জি থেকে নেমে আকাশের জল। দুয়ে মিলে এমন সব ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি প্রকৃতির জলো ভূমি তৈরী করে যে সেগুলোর নাম ইয়োরোপীয় কোনো ভাষায় নেই। দেশী শব্দের একটা সুর মনে আছে "হাওর" না কি যেন। এমন কি মস্কো যেতে পথে যে জলোজমি সেটাও হিটলার পেরিয়ে যেতে পেরেছিল কিঞ্চিৎ লোকক্ষয় স্বীকার করে। কিন্তু তোমাদের দেশে আমাদের সনাতন সংগ্রাম পদ্ধতি চলবে না।"

শিপ্রা বললে, "আমি এ-সব আলোচনায় যোগ দিতুম না। তখন সেই প্রথম বললুম, 'কিন্তু, মঁসিয়ো ল্যা জেনারেল, আকাশে থেকে বমিং?' জেনারেল তো গডড্যাম গ্ল্যাড। আপন চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার কাছে এসে ফরাসীরা ভাবাবেগে, আনন্দোল্লাসে উত্তেজিত হলে যা করে তাই করলেন। সর্বপ্রথম আমার গালে খেলেন গুম্ফকণ্টকিত কিন্তু অতিশয় মিঠে মিঠে একটি চুম্বন, তার পর আমার চুলের উপর বুলোলেন তাঁর হাত, এবং সর্বশেষে রাজপ্রাসাদীয় কায়দায় দিলেন আমার বাঁ হাতটি তুলে ধরে একটি অতিশয় রিফাইনড চুম্বন।

প্রায় নৃত্য করতে করতে বার বার বলেন, "মাদ্‌মোয়াজেল, মাদ্‌মোয়াজেল্‌।" অর্থাৎ, "কল্যাণী, কল্যাণী।"

সে তো বুঝলুম—ফরাসীরা ঐ ভাবে বে-এক্তেয়ার হয়। তারপর কি বলতে চান তিনি? আর আমিই বা এমন কোন্‌ গূঢ় গুহ্য মিলিটারি স্ট্র্যাটেজিক ট্যাকটিকাল প্রশ্ন শুধিয়েছি যে ঝানু জাঁদরেল আত্মহারা হবেন!

আমার পাশে আসন নিয়ে কিঞ্চিৎ শান্ত হওয়ার পর বললেন, 'আমি বড্ড ভুল করেছি, মাদ্‌মোয়াজেল্‌, বড্ড ভুল বুঝেছি এতদিন ধরে। আমি মনে করেছিলাম, তুমি লণ্ডন প্যারিস সমাজে বাস করে করে দেশাত্মবোধ হারিয়ে ফেলেছ, কিন্তু এখন আমি দেখছি তুমি দেশের স্বার্থ, দেশের বিপদ সম্বন্ধে বেশ সচেতন। প্রশ্নটা তো অতিশয় সাদাসিধে, কিন্তু তারই ভিতর দিয়ে আমি তোমার অন্তরের অন্তস্তল অবধি দেখতে পেয়েছি।

শোনো, মাদমোয়াজেল, স্ত্রী হোক পুরুষ হোক সবচেয়ে মূল্যবান ধন মানুষের মনুষ্যত্ব। কিন্তু আমার দৃঢ়তম বিশ্বাস সেটাতে মানুষ পৌঁছয় দেশাত্মবোধ, ন্যাশনালিজম, পেট্রিয়টিজমের ভিতর দিয়ে এবং তার দৃঢ় ভূমি'—"

শিপ্রা বললে, "অবাক মানবে, কীর্তি, তার পর সেই বৃদ্ধ জেনারেল এক লাফে কোচ ছেড়ে, যেন অদৃশ্য এক পতাকা এক হাতে উঁচু করে ধরে, রাস্তার ছোকরাদের মত ঘরময় নাচতে নাচতে চেঁচাতে লাগলেন,

লিবের্‌তে, লিবের্‌তে, তুজ্‌র লা লিবের্‌তে
লিবার্টি, লিবার্টি, অলওয়েজ লিবার্টি
স্বাধীনতা স্বাধীনতা, স্বাধীনতা চিরদিনের।

দশম অধ্যায়

"উপরে চল। আমার কোনো বান্ধবী, বন্ধু দূরে থাক, কেউ কখনো দোতলায় ওঠে নি। বাবা কাউকে উপরে আনতেন না বলে আমি সে রীতিটা এখনো মেনে চলি। কিন্তু তোমাকে এখন সব-কিছু দেখে-চিনে নিতে হবে। তুমিই মালিক। যদি চাও, বাড়ি-ঘর যা-কিছু আছে, উইল করে তোমার হাতে সঁপে দেব—"

কীর্তি আঘাত পেল; বললে, "তুমি কি আমাকে এখনো চিনতে পারো নি?"

শিপ্রা তাড়াতাড়ি বললে, "সরি, আমি দুঃখিত। এই হল বাবার স্টাডি। এখানে বসে তিনি বৈষয়িক কাজকর্ম করতেন। আমার খেয়াল খুশীমত ঐ কোণের কোচটাতে বসে খবরের কাগজ, বইটই, মাঝে-মাঝে শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট পড়তুম। আমি জানতুম তিনি তাতে খুশী হতেন। কাজ করতে করতে কখনো গুনগুন করতেন, খুশী হলে শিস্‌ দিতেন। কোনো কারবার ঠিক তাঁর পছন্দমত না এগোলে গর্‌গর্‌ করে বিরক্তি প্রকাশ করতেন। আর প্রায়ই মাথা তুলে বেশ উঁচু গলায় বলতেন, 'দীজ আর লুকিং আপ,' আমাকে শুধোতেন, তোর জন্য শ'খানেক চা-বাগানের শেয়ার কিনবো?" আমি শুধু একটু মুচ্‌কি হাসতুম—আমি ও-সবের কীই বা বুঝতুম তখন? কিন্তু আমাকে কখনো ব্যবসা-বাণিজ্য শেখান নি। বলতেন, 'এসব শুকনো জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করলে মানুষের প্রাণরস শুকিয়ে যায়'—আমি অবশ্য কখনো তাঁর প্রাণরসে ভাটার টান পড়তে দেখি নি। শেষটায় বলতেন, 'তোকে কিচ্ছুটি শেখাতে হবে না। তুই পেয়েছিস আমার ঠাকুমার বুদ্ধি এবং বিশেষ করে বিচক্ষণতা। বাবা পেয়েছিল তার বুদ্ধির বারো আনা, আমি পেলুম আট আনা, তোতে ফের এক্কেবারে ফুল হাউস ন' সিকে। যেদিন দরকার হবে পুরো হপ্তাটাও লাগবে না, তুই হয়ে যাবি "শেয়ার মার্কেট কুইন," কিংবা মফৎ লাগল এবং দেওকরণ নানজীর সমন্বয়।' এবারে চলো এগিয়ে।"

বিরাট জোড়া খাটের বেড রুম। একশ' বছরের পুরনো স্টাইলের।

শিপ্রা বললে, "এখানে বাবার আর একটা ড্রইংরুম আর গেস্ট রুম আছে। তবে এগুলো কখনো ব্যবহার হয় নি। এইখানে বাবার হিস্যে শেষ। এই আমার বেড রুম।"

ছবিতে কীর্তি ফরাসী ধনী কুমারী কন্যার বেডরুম দেখেছে। এবারে আপন চোখে দেখল।

দেওয়ালে ওয়াল পেপারের বদলে খুব দামী সিল্কের ওয়ালকাভার। তার উপর আবার ভিন্ন ভিন্ন রঙিন সিল্ক দিয়ে বেহালাতে জড়ানো ফুলের মালার ডিজাইন। ছাতের চার কোণে চারটি দেবশিশুর বা-রিলীফ। তাদের হাত থেকে ঠিক মাঝখানে এসেছে চারটে ফুলের মালা। সেগুলো যেন ঝুলিয়ে রেখেছে একটা ফোয়ারার পাদপীঠচক্র। পায়ের নিচে ফরাসী কার্পেট।

আর খাটটি ছোট এবং সূক্ষ্ম কারুকার্যে ভরা। খাঁটি ফরাসী পালঙ্ক। এমন কি তিনদিকে ফরাসী কায়দায় সিল্কের কার্টেন ঝুলছে। বেড-কাভার ভারী কিন্তু সুতোগুলো অতি মিহিন। কার্টেন আর বেড-কাভারের ডিজাইন দেয়ালের সিল্কের সঙ্গে ম্যাচ কিন্তু মতীফ ভিন্ন—এখানে জলে চালিত ময়দা পেশার ওয়াটার মিল ডিজাইন। ঘরের এক কোণে ড্রেসিং টেবল—তার উপর বিচিত্র ঢপ ঢঙের বিস্তর শিশি বোতল, এক সারি কৌটো—অথচ কীর্তি খুব ভালো করেই লক্ষ্য করে বুঝেছিল শিপ্রা প্রসাধন করে সামান্যতম। সমস্ত ঘরটার কালার স্কীম মভ রঙের।

শিপ্রা বললে, "আমার অত বাহার সয় না। বাবা করিয়েছিলেন টপ টু বটম।"

পাশে শিপ্রার একান্তে বসার বুদওয়ার। তার মধ্যে দ্রষ্টব্য, মাঝারি সাইজের সেক্রেটারিয়েট এবং প্রায় সম্পূর্ণ একটা প্রান্ত জুড়ে বিরাট দৈত্যপ্রমাণ গ্রাণ্ড পিয়ানো।

কীর্তি বিস্ময় প্রকাশ করে বললে, "তোমাকে তো কখনো পিয়ানো বাজাতে শুনি নি।"

শিপ্রা বললে, "আমার বাজনা শোনাবার মত নয়। মাত্র দশ বছরের ছেঁড়া ছেঁড়া রেওয়াজে শোনাবার মত হাত পাকা হয় না। আমি বাজাই রাত ঘনালে আর অতি ভোরে। এবারে চলো বেলকনিতে।"

একাদশ অধ্যায়

"ভেবে নিয়েছ? অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করেছ? এখনো ব্যাক-আউট করার সময় আছে?"

কাতর কণ্ঠে কীর্তি বললে, "সমস্ত রাত ভেবেছি। কিন্তু কথাগুলো গুছিয়ে উঠতে পারি নি। আর ভয়ও করছে।"

শিপ্রা একটা কুশনওলা লম্বা হেলান চেয়ারে আধ-শোওয়া হয়ে সামনের

পার্কের দিকে তাকিয়েছিল। বললে, "ট্যারচা হয়ে বসো আর আমার দিকে না তাকিয়ে তাকাও পার্কের দিকে। সবুজ দিয়ে চোখ ভরে নাও। আর ভয়টা কিসের, শুনি।"

যেন প্রাণপণ সিংহের কেশর ধরে, মরি বাঁচি ভাব মুখে মেখে বললে, "মাত্র একটি কথা নিয়ে আমি সমস্ত রাত ভেবেছি। আমাদের যদি বিয়ে না হয় তবে তোমার যে নিন্দে হবে, সে-কথাটা কি ভেবে দেখেছ।"

শিপ্রা অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে সহজ গলায় বললে, "আমি জানতুম তুমি এ-কথাটা তুলবে কিন্তু তুমি না অপদার্থ? তাহলে এ দুশ্চিন্তা তোমার মাথায় ঢুকলো কি করে? কলকাতা-বোম্বায়ের স্মার্ট সেটের যে-কোনো বিবাহিত অবিবাহিত জোয়ান বুড়ো ক্ষণতরে চিন্তা না করে উল্লাসে নৃত্য করতো আমার মত মেয়েকে মিসট্রেস রূপে পেলে।"

কীর্তি লাফ দিয়ে উঠে শিপ্রার মুখ চেপে ধরে বললে, "মাথার দিব্যি দিচ্ছি, শিপ্রা, তুমি যদি ঐ শব্দটা আর কখনো ব্যবহার করো তবে ঐ তোমার পায়ের সামনে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব।"

কীর্তির হাতে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, "আচ্ছা আর বলবো না। তোমাকে তো দিব্যি কেটে বলেছি, আমি তোমার সব আদেশ মানবো।"

কীর্তি বললে, "সমস্ত রাত ঐ দুশ্চিন্তাটার সঙ্গে মাখানো ছিল 'আমি পেয়েছি, আমি তোমার অনুগ্রহ লাভ করেছি'। এবং আমি জানি আমার যে তিনটি সত্যকার খাঁটি বন্ধু, সুদিনদা, শঙ্কর আর খান সায়েব এরাও ঠিক এইভাবেই আমার অনুগ্রহ লাভের কথা ভাববে।"

শিপ্রা উঠে বসে বলল, "আমার যে লোকনিন্দাটা হবে সেকথা শুনে আমি হাসব না কাঁদব ভেবে পাই নে। লোকনিন্দার প্রাপকরূপে আমি ভেটারন্। আমার বয়স যখন ষোল পেরুল সেদিন বাবা আমাকে ডেকে বললেন, 'আজ থেকে তুই এ-বাড়ির মিসট্রেস আর আমি যে-সব পার্টি দিই তাতে হোস্টেস্। বুঝলি? আর আমি আমার ইয়ারদের যে-রকম পার্টি দি তুই যেদিন দিবি সেদিন আমাকে ডাকতে পারিস, নাও ডাকতে পারিস। বুঝলি তো?' সেদিন দুপুরবেলা বাবা আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ডস্, ইস্কুলের সব টীচার এবং অন্যান্য যাদের কাছে পড়েছি আর আমার ফ্রেণ্ডস—ছেলে এবং মেয়ে দুইই—সবাইকে দিলেন জব্বর একটা ভোজ। সেটাতে হোস্টেস হতে আমার কোনো অসুবিধে হয় নি যদিও বাবা নিচের তলায় নেমে আগের মত একবারও তদারকি করেন নি। শুধু খাবার সময় আমাদের হেডমিস্ট্রেসের পাশে বসে তাঁকে আদর-আপ্যায়ন করতে করতে আহারাদি করেছিলেন।

তোমরা আবার পার্টি করো! আর আমার পার্টিই বা কি? কে এক সোভানী একটুখানি বে-এক্তেয়ার হয়ে ভরত নৃত্যের নামে হস্তীনৃত্য নেচেছিল!

ঐখানেই তো ফুল স্টপ। বাবার পার্টিতে অন্তত জনা পাঁচেক বেহুঁশকে স্ট্রেচারে করে গাড়িতে তুলতে হত। জনা দশেককে দুজন তাগড়া জোয়ান বেয়ারা দু'দিক থেকে স্যাণ্ডউইচ করে মোটরে তুলে দিত।

অবশ্য বাবা আমাকে বিস্তর টিপস আগের থেকেই দিয়ে রেখেছিল। একটা এখনো মনে আছে। 'যদি লক্ষ্য করিস কেউ একটু বে-এক্তেয়ার হয়ে যাচ্ছে তার পাশে গিয়ে বসবি। তাকে আদর-সোহাগ করে বলবি, "আন্‌কল্‌, তুমি তো জানো, আজ থেকে আমি হোস্টেস। আমার ভারি ইচ্ছে আমি নিজে তোমাকে ড্রিংক দি। তুমি কোনো বেয়ারার ট্রে থেকে ড্রিংক তুলবে না। কথা দাও।" কথা নিজেই দেবে। খাস হোস্টেসের কোনো অনুরোধ কোনো লোক উপেক্ষা করে না। তারপর বার টেবিলে গিয়ে যে ড্রিংকই হোক না সেটা বেয়ারাকে পাতলা করে দিতে বলবি। তাকে বোঝাতে হবে না। তারপর খামকা টালবাহানা করে, এর ওর সঙ্গে দুটো কথা কয়ে বেশ দেরি করে এসে তোর সেই আন্‌কল্‌কে গেলাসটা আপন হাতে রেখে প্রথম তো হাজার দফা মাফ চাইবি তারপর জুড়ে দিবি লম্বা এক কাহিনী—গেলাসটা কিন্তু হাতে। গল্প শেষে গেলাস দিবি। তোর "আন্‌কল্‌টি" ও চক্ষুলজ্জায় তোর কাছে ঘন ঘন ড্রিংক চাইবে না। আর কেউ যদি নিতান্তই বেহেড টালমাটাল হয়ে যায় তবে মজুমদার, কাঞ্জিলাল, ভবতোষ এদের কাউকে একটু হিণ্ট দিয়ে আসবি। ওদের মাথা ঠাণ্ডা। সব সঙ্কটে মুশকিল-আসান।'

পার্টি শেষ হল। বাবা ভারি খুশি। বললেন, 'একদিন তুই যে-শহরেই যাস না কেন, নামজাদা হোস্টেস হবি। দু'চারটে পার্টি করার পর মজুমদার, কাঞ্জিলালকেও তোর দরকার হবে না।'

কিন্তু সেই দিন থেকেই আমার বদনাম শুরু। বিস্তর লোকের মুখে ছ্যা ছ্যা। বিশেষ করে মেয়েদের। এমন কি বাবার স্কুলফ্রেণ্ড চৌধুরী সাহেব বাবাকে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, এটা ঠিক হল না। বাবা বলেছিলেন, 'দেখো, চৌধুরী, তুমি খানদানী মুসলমান ঘরের ছেলে। তোমার চতুর্দশ পুরুষে কেউ মদ খায় নি, তবু তুমি মদ ধরেছ। শুনেছি অভ্যাসটা নাকি মুসলমানদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে। আর হিন্দুদের তো কথাই নেই। নিত্যি নিত্যি নূতন নূতন বার খুলছে এবং সেগুলো ভর্তি। বেশীর ভাগ ক্লাবে আসে সুন্দুমাত্র মদ খেতে। আর ড্রিংক পার্টির কথাই নেই। আমার মেয়ে অত্যন্ত স্বাধীনচেতা, সে আমি জানি তার ছোট্ট বয়স থেকে। তদুপরি তার হিউম্যান ইনট্রেস্ট অফুরন্ত। চাকরবাকররা তাদের বাড়ীতে তাদের সমাজে কি করে, না করে তার থেকে আরম্ভ করে সে কুইন ভিক্টোরিয়ার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বর্ণনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনেছে। এ-মেয়ে পার্টিতে যাবে না, সেটা প্রায় অসম্ভব। তাই পার্টিতে, ক্লাবে বার্‌-এ একটা ভদ্রমেয়ের আচরণ কি রকম হওয়া উচিত,

সে-সব জায়গার এটিকেট মেনে নিয়ে ভদ্রতা শালীনতা সহ কিভাবে মেলামেশা করবে, সেটা আমার কাছ থেকে শিখবে, না শিখবে ঐ সব পাঁড় মাতাল ডেঁপো ছোঁড়াদের কাছ থেকে? কোনো ক্লাবে বা পার্টিতে কেউ যদি অশালীন আচরণ করে তখন কি ভাবে চতুরতা এবং ডিপ্লোমেসির সঙ্গে নিজের ভদ্রতা নিজের ডিগনিটি বাঁচিয়ে তাকে ট্যাক্‌ল্‌ করতে সে-সব শেখাবে ঐ-সব ছোঁড়ারা? আর শুধু কি তাই? আজ তাকে বলে রেখেছিলুম সে যেন কর্নেল সরকারের টেবিলে দু'এক সিপ চাখে। আস্তে আস্তে তাকে ভোদকা আবসাঁতেরও দ্রব্যগুণ শেখাব। কোন্‌টা কতখানি ক্ষতি করে ও জেনে নেবে। তারপর কারো পাল্লায় পড়ে যা তা গিলে নিজের অনিষ্ট করবে না, বানচালও হবে না, কাকে কতখানি কি ঢেলে দিতে হবে সেটাও জেনে যাবে—হবে আইডিয়াল হোস্টেস। বাপের চেয়ে ভালো গুরু সে পাবে কোথায়?"

শিপ্রা বললে, "কথাটা অতি সত্য। আমার হাতেখড়ি হয়েছিল বাবার কাছে—পাশে এক গুরুমশাই বসেছিলেন মাত্র। ইস্কুল না-যাওয়া অবধি তাঁরই কাছে সব শিখেছি: প্রাইভেট ট্যুটার বাবা ককখনো রাখেন নি। কলেজে পড়ার সময়ও বাবার ঘরের এক কোণে বসে অধিকাংশ সময় পড়াশুনো করতুম। মাঝে মাঝে তাঁকে প্রশ্ন শুধোতুম। জানা থাকলে সুন্দর বুঝিয়ে দিতেন—আর কী অসীম ধৈর্য। না জানা থাকলে একগাল হেসে বলতেন, 'ওরে শিপি, তুই যে বাপ-মরা বিদ্যে রপ্ত করে নিচ্ছিস।' তারপর তাঁর কোনো এক বন্ধু বা পরিচিত স্কলারের কাছে পাঠিয়ে দেবার সময় বলতেন, শিখে এসে আমায় বাত্‌লে দিস্‌।' তাঁর আর একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, 'গুরুকে আপন বাড়িতে টেনে আনলে সত্য বিদ্যার্জন হয় না। গুরুগৃহে বসে থাকবে বারান্দার বেঞ্চিতে—গুরুর কখন কৃপা হয়'।"

কীর্তি মুগ্ধ হয়ে বললে, "শিপি, তুমি সত্যি ভাগ্যবতী।"

শিপ্রা বললে, "আমার নামে কি-সব বদনাম রটে তার খবর আমি রাখি নে—আমরা যারা পার্টি-ফার্টি করি তাদের মধ্যে কার না বদনাম হয়! কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো বিবাহিতা রমণী বলে নি, আমার বাড়ি থেকে তার স্বামী বেএক্তেয়ার হয়ে ফিরেছে। বাবা বলতেন, 'তুমি লেডি। এ-আইনটা বিশেষভাবে তোমার বেলা প্রযোজ্য।' আর আমি নিজে যে সব চেয়ে মোলায়েম ড্রিংকে সীমাবদ্ধ করে নিজেকে সংযত রাখবো সে-বিষয়ে তাঁর মনে কোনো দ্বিধা ছিল না।"

কীর্তি হাবা ছেলের মত গদ্‌গদ সুরে বললে, "সে কি আমরা জানি নে? কিন্তু ড্রিংক কেন, কোন্‌ ব্যাপারে তোমার সংযম সৌজন্যের অভাব। সুদিনদা যে জালা জালা খায়, ক্লাবের প্রেসিডেন্টকে পর্যন্ত ডোন্টো কেয়ারের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায় সেও তোমাকে রীতিমত সমীহ করে চলে। আমাকে বলে, 'ওরে মূর্খ!

তোরা ভাবিস শিপ্রা বুঝি বেখেয়ালে আমাদের এটা ওটা দেখতে পায় নি। ও-মেয়ে না দেখেও সব দেখে, না শুনেও সব শুনতে পায়। আর আসল গেরো কি জানিস, তার আচরণ বা কথায় প্রকাশ পাবে না, সে অপরাধ নিয়েছে। তাহলে তো গেরোটা ফস্ করে খুলে যেত—হাত পা ধরে মাপ চেয়ে নেওয়া যেত।' বলে এটাই নাকি তোমার ব্রহ্মাস্ত্র।"

শিপ্রা বললে, "যাঃ! বিশ্বভুবনটা রিফর্ম করার ভারটা কি আমার স্কন্ধে!"

"কিন্তু—"

শিপ্রা বললে, "আজ এ-সব অপ্রিয় আলোচনা এখানেই থাক। ইরানীরা যে-রকম বলে, 'তখন আলোচনার কার্পেটটা রোল করে গুটিয়ে এক কোণে খাড়া করে রাখা হল।' পরে না হয় আমরা ওটা আবার ঘরময় বিছিয়ে পুরনো আলোচনার শেষ রেশ ধরে নূতন করে ঢেলে সাজবো। আরেকটা কথা তোমায় বলি, কীর্তি। আমাকে যতশত গুণের গুদোম মনে করো না কেন, আমি অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করি দৈবে, অদৃষ্টে—আমি ফেটালিস্ট্, অনেকটা খৈয়ামের মত। তাঁর প্রত্যাদেশ, তারই ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ পেলে পেয়ালা অধরে ধরো। অর্থাৎ আনন্দ করো। সেটা তো মোটামুটি মানিই, কিন্তু সবচেয়ে সেই ফরাসী বৃদ্ধ জেনরেল আমাকে যে ধর্মে দীক্ষা দেন ঃ

লিবের্তে লিবের্তে, তুজুর লা লিবের্তে।"

দ্বাদশ অধ্যায়

খান সাহেবের সঙ্গে কীর্তির হঠাৎ মোলাকাৎ। খান সোৎসাহে বলে, "হ্যারে, কিতে, এদানির তুই শিপ্রা বেগমকে দেখেছিস? আরে, ভাই, বয়েস যেন দশটা বচ্ছর কমে গেছে। মোটরে যাচ্ছিল। আমাকে দেখে হাত নেড়ে নেড়ে যা প্যারটা জানালে, মাইরি, যেন আমি বহু বচ্ছরের লঙ লস্ট ব্রাদার। মেয়েদের ব্যাপারটাই ভানুমতীর খেল। আমি তো জানতুম বিয়ের জল পড়লে তবে না মেয়েদের জেল্লাই বাড়ে। কালা পেঁচিটা হয়ে যায় সোনালী ক্যানারি!"

কীর্তি ভদ্রতার মৃদু হাসি হেসে বললে, "শিপ্রা তো চিরকালের সুন্দরী।"

খানের মাথায় অন্য চিন্তা। ব্যবসার। সে-কথা কি শুক্‌নো মুখে পাড়া যায়! বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ যা বলেছিস। তা চ, ঝপ করে একটা খেয়ে নিবি। ফাস্ট ক্লাস গর্ডনস্।"

"এই অবেলায়?"

"বলিস কি রে? বেলা তিনটে অবেলা। চ চ।"

গুণীরা বলেন, অন্ধকার গুহায় আলো জ্বালালে সে-অন্ধকার হাজার বছরের

পুরনো হোক, আর দশ মিনিট পূর্বে কারো মশাল নিভে গিয়ে থাকার অন্ধকার হোক, দেশলাই দুটোকেই দূর করবে এক সময়েই, এক মুহূর্তেই। কিন্তু খান প্রতিবেশী বাল্যবন্ধু কীর্তির। "না যাবো না" বলে এক লহমায় সে-বন্ধুতে আগুন ধরানো যায় না। আসলে কীর্তির ইচ্ছা ছিল পানের মাত্রাটা আস্তে আস্তে কমানো।

আরাম করে বসে খান ঢক করে পয়লা গেলাস বটম্ আপ করে কীর্তিকে বললে, "হ্যাঁরে তুই তো কোথাও যাস নে। তবু একবার যাবি আমার সঙ্গে আগরতলায়? তুই থাকলে কুচক্রীরা সমঝে যাবে, তোর শেয়ারসুদ্ধ, তুই আছিস আমার পিছনে। দু'দিন আগে এরই ধাক্কায় আমাকে যেতে হল করাচী লাহোরে।"

কীর্তি হতভম্ব। তোৎলাতে তোৎলাতে বললে, "তোর কি মাথা খারাপ? সেই হাই-জ্যাকিঙের পর থেকে ওসব জায়গায় ইণ্ডিয়ান্ হয়ে গেলি কোন্ সাহসে?"

কীর্তির পিঠ চাপড়ে দিয়ে খান্ বললে, "বেশ বাওয়া, বেশ। চতুর্দিকে নজর ফেলে ওকীবহাল হয়ে উঠছিস। এবারে ব্যবসার দিকে একটু মন দে না।"

"তা সেখানে কি দেখলি, কি শুনলি?"

"আর বলিস নি। ওদের কাগজগুলোর ক্রুড ছুঁচোর মত ফিচেল মিথ্যে কথা বলার ধরন আর বহর দেখলে তোর মত অগাও তাজ্জব মানবে। বলে কি না, আওয়ামী লীগ গুণ্ডা ভাড়া করে ইলেকশন জিতেছে। বিদেশী রিপোর্টার-গুলো মিটমিট করে হাসে। আরে, ঝুট যদি বলবিই তবে বল্ হিটলারি স্টাইলে, গ্যোবেলসের সুপারফাইন সুতো দিয়ে বোন্ একটা মিহিন জাল। পূব বাঙলার পোনরো আনা লোক নাকি ইয়েহিয়াকে ফাদার মাদার রূপে দেখে—মসজিদে মসজিদে তাঁর জিন্দেগী আর ভালাই-এর জন্য দোয়া দরুদ পড়ে।

এর ফলে কি হবে জানিস? হিটলারী রাজের আখেরী ওক্তে যা হয়েছিল, ঠিক তাই। এরা হয়ে যাবে আপন প্রপাগাণ্ডার ভিকটিম! একদম টপ্-এ যারা আছে—ইয়েহিয়াকে ঘিরে—তারা জানে এসব মিথ্যে প্রপাগাণ্ডা। কিন্তু যদি আখেরে বাঙলাদেশ রুখে দাঁড়ায় তবে সেটাকে দমন করার প্রস্তুতির ভার যে শত শত অফিসারের কাঁধে পড়ছে, তারা তো জানে না এসব ডাহা মিথ্যে, তারা ভাববে এসব বাড়াবাড়ি, মশা মারার জন্য খামোখা সেই কোন সুদূর পূব পাকিস্তানে পাঠাতে হবে কামান ট্যাঙ্ক। কাজে আসবে গাফিলী। পানি কাদা সাপ জোঁকের দেশে এমনিতেই পশ্চিম পাকী সেপাই যেতে চায় না, এখন সেখানে যেতে হবে বিদ্রোহ দমন করতে? কিসের বিদ্রোহ? এ্যাদ্দিন ধরে তোমরা গাইলে ভিন্ন গীত। সাধারণ সেপাই যদি অফিসারকে অন্ধভাবে বিশ্বাস

না করে তবে আর্মির 'মরাল'টি হয়ে যায় ঝরঝরে।

আখেরে মামেলাটা এ-শেপ্ নেবে কি, না, সে জানেন আল্লা। কিন্তু লাহোর পিণ্ডির ক্লাবে ক্লাবে কী অন্ধ আত্মপ্রসাদ, কী কাণ্ডজ্ঞানহীন বড়-ফাট্টাই।

আর মদের কথা যদি তুলিস তো আমরা কলকত্তাইয়ারা ওদের তুলনায় শিশু, শিশু, শিশু। আমাদের সব চেয়ে বড় ক্লাবে সম্বৎসরে যে-পরিমাণ খাওয়া হয় তাই দিয়ে ওদের ছোটাসে ছোটা ক্লাবের কপালে তিলকটি কাটা যাবে না। জালা জালা মদের সঙ্গে সঙ্গে সব্বাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে গালি-গালাজে ভর্তি অশ্লীলতম ভাষায় যে সব নোংরা নর্দমায় তারা গড়াগড়ি দেয়, গল্পের নামে মোস্ট পয়েণ্টলেস যে-সব মলকুণ্ডের বর্ণনা দেয় সে-সব না শুনলে কোনো দেশের গাটারস্নাইপও বিশ্বাস করবে না যে নগরের সব চেয়ে সম্মানিত ক্লাবে ভদ্রসন্তানরা এসব বলে, শোনে আর চতুর্দিকে কী অট্টহাস্যের গমগমানি।

আমাকে এক্কেবারে চাটনি বানিয়ে ছিল সর্বশেষে এক জমিদার—ব্যারন বললেই ঠিক হয়—বাড়ির একটা বিরাট হলঘরে। ব্লু ফিল্ম কখনো দেখেছিস? তার বাস্তব—থাক্। তুই যে আমার ছেলেবেলার বন্ধু যার সামনে আমি হর হামেশা প্রাণ খুলে সব কথা বলেছি, তোকেও ভাই বলতে পারবো না।"

কীর্তি বললে, "বলারই বা কি দরকার?"

খান বললে, "না ভাই, শুধু বলার জন্যই বলছি নে। আমি শুধু ভাবি এই সব আত্মপ্রসাদমত্ত দিবান্ধ, মিথ্যা ভাষণ যাদের হাড়ে হাড়ে এমনই ঢুকে গেছে যে পবিত্র শপথগ্রহণের সময়ও কুণ্ঠা নেই, লজ্জা নেই, যৌন ব্যাপারে যারা পশুর চেয়েও অধম—এরা ভাবে এরা সভ্য, এদের তুলনায় পূব বাঙলার লোক জংলী, বর্বর। এ সব ব্রুটগুলো শাসন করতে চায় সরল, বিশ্বাসী, ভদ্র পূব বাঙলার লোককে!"

খান ভালোভাবেই জানতো, কীর্তির মত মাত্রা রক্ষায় অভ্যস্ত বনেদি ঘরের ছেলের কাছে এ-সব অবিশ্বাস্য, এ-সব তার কল্পনার বাইরে, তার দৃষ্টিচক্রের বহু বহু দূরে। পাকেচক্রে যদি বা সে এ-জাতীয় পশ্বাচারের কাছে-পিঠে এসে পড়ে তবে সঙ্গে সঙ্গে তার ইনসটিন্‌ক্‌টই তার লাগাম ধরে উল্টো পথে ডার্বি স্পীডে তাকে ছুটিয়ে দেবে। কিন্তু সে নিজে এ-যাত্রায়, বিশেষ করে ব্যারনের বাড়িতে যে পাইকিরি পাপাচার যে সামান্য অংশটুকু দেখেছিল, এবং পরে শুনেছে আর সব জমিদার বাড়িতেও এ-সব ডাল-ভাত, পুরুষানুক্রমে চলে আসছে তাই নিয়ে মনে মনে তোলপাড় করছিল এক একটা জাত এ-রকম পথে চলে কি কারণে? আর পাঁচটা জাতের সঙ্গে মেলামেশার পরও নিজেদের সভ্যতর মনে করে কোন্ যুক্তি দিয়ে? দুজনাই চুপ।

খানই শেষটায় বললে, "তুই তো জানিস আমাকে পুরো দুটি বৎসর লণ্ডনে

কাটাতে হয়েছিল, বাবার হুকুমে। ইংরেজের সঙ্গে আমার যে খুব-একটা দহরম-মহরম হয়েছিল তা নয় তবু তাদের চরিত্র, সামাজিক আচরণ খানিকটে আমার নজরে আসে। অবশ্য যে-সব বিশেষ বিশেষ সীমাবদ্ধ সম্প্রদায় থেকে ইংরেজ ভারতবর্ষে রাজত্ব করার জন্য লোক সংগ্রহ করতো তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি। কিন্তু সব চেয়ে বৃহৎ অভিজ্ঞতা আমি যেটা অনিচ্ছায় সঞ্চয় করেছি সেটা তাদের অজ্ঞতা, সর্বগ্রাসী অজ্ঞতা। শিক্ষিত অশিক্ষিত—তা তারা খবরের কাগজ পড়ুক আর নাই পড়ুক—শতকরা ৯৯ জন বাইরের দুনিয়ার কোনো খবর তারা রাখে না। ফ্রান্সে, শুনেছি, অজ্ঞতাটা তারো বাড়া।

পাঞ্জাবী সেপাইয়ের জনপদবধূ কি জানে, পূব বাঙলা কোথায়?—এবং সেখানকার বধূর বুকে তারই মত একটা সুখ দুঃখ, দুমুঠো অন্নের যেন অনটন না হয় তার তরে তারো জীবনভর একই দুশ্চিন্তা!

তুই শুনলে হাসবি, আমি লাহোর ক্লাবের মেম্বার, ইংরেজ ও গাঁইয়া মেয়ের অজ্ঞতার ভিতর বিশেষ কোনো তফাত দেখি নে। লাহোরের মেম্বার ভ্যাট্‌ভুট করে ইংরিজি বলতে পারে বলে আমরা ভুল ধারণা করে বসি তারা বুঝি আপ টু ডেট।

এই সর্বব্যাপী অজ্ঞতার মাঝখানে ইংরেজ শাসকের অজ্ঞতা তাকে দিয়েছিল ভারতীয়ের প্রতি অবজ্ঞা আর পাঞ্জাবী করে ঘৃণা পূব বাঙলার লোককে। তুই তো ঘটি, তবু নিশ্চয় জানিস ওরা বড় 'টাচি', বাঙলাকে অবহেলা করলে সে তার উত্তর দেয় তিন ডবল অবহেলা দিয়ে। ইংরেজের অবহেলার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে তাই তার একটু সময় লেগেছিল। কিন্তু ব্যাটা যেদিন ঠিক ঠিক বুঝে যাবে, পাঞ্জাবী শুয়ারটা তাকে ঘৃণা করে, তখন শুরু হবে আতসবাজি।"

খান খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললে, "সবই ঠিক, কিন্তু জানিস তো 'জোর যার মুল্লুক তার'। ব্যাটাদের শুধু বন্দুক নয়, আছে ট্যাঙ্ক প্লেন।"

কীর্তি বললে, "ইংরেজের কি ট্যাঙ্ক প্লেন ছিল না? তত্ত্ব কথার মূলে তত্ত্ব কি জানিস? আজ যদি ক্লেসিয়াস ক্লে আলী তোকে রাস্তায় পেয়ে এক ঘুষিতেই লম্বা করে দেয় সেটাতে তো তোর লজ্জা পাবার কিছু নেই, কিন্তু তার পর যদি তুই তার দাসত্ব স্বীকার করে নিস, সেখানে লজ্জা। ট্যাঙ্ক প্লেনের শক্তি দিয়ে কাল যদি পাঞ্জাবী ব্রুটের পাল পূব বাঙলাকে ছারখার করে দেয় তাতে বাঙাল লজ্জা পাবে কেন? শক্তিশালী হামেশাই দুর্বলকে পরাজিত করে।

কিন্তু তারপর যদি বাঙালরা পাঞ্জাবীর দাসত্ব স্বীকার করে নেয় তবে সেখানে বাঙালের লজ্জা। তুই আমি বাঙালী—আমাদেরও লজ্জা।"

শিপ্রা অভিমানের সুরে বললে, "এত দেরি করে এলে? এরই মধ্যে আমাকে অবহেলা?"

কীর্তি অবাক। সামলে নিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, "রবি ঠাকুর ছাড়া দেখছি আমাদের গতি নেই ঃ

'তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি।'

আমি এসেছি তোমার দেওয়া সময়ের দশ মিনিট আগে—এবং অতি ভয়ে ভয়ে। কারণ তোমাকে ঘরসংসার দেখতে হয়, তার উপর পুরো তদারকি করতে হয় ব্যবসা-সম্পত্তির। এবং সর্বোপরি কয়েকটা চ্যারিটির হিসাবপত্র দেখা। ইক্‌জ্যাক্‌ট টাইমের এক মিনিট পূর্বে এলে হয়তো বারান্দায় মোক্ষম এক ধাক্কা, কোন্ এক ঝুনঝুনিয়া বা ঠুনঠুনিয়ার সঙ্গে। আর তিনি হন যদি সিস্টার তেরেসা বা ক্লারা তা হলে তো কেলেঙ্কারি ব্যাপার। যাকে বলে, আমি মরমে মরে যাবো, তাঁর শরমে 'শেম্ শেম্'।"

শিপ্রা বললে, "উপরে চল।"

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললে, "চ্যারিটির কাজ যৎসামান্য। আমি নিজে সে-সব স্থলে যাই। সিস্টারদের পক্ষে এখানে আসা সহজ নয়। এবং শুনেছি ক্যাথলিক নান্‌দের অন্তত দুজন না হলে রাস্তায় বেরনো বারণ। সে-কথা থাক। আসল কথাটা শোনো। মনে কর কেউ যদি স্থির করে তার সাংসারিক সব অভাব দূর না হওয়া পর্যন্ত কোনো ভিখিরিকে ভিক্ষে দেবে না, কেউ যদি ভাবে বৈষয়িক সর্ব ব্যাপার গোছগাছ না করে বৃন্দাবন যাবো না, তা হলে এঁরও আজীবন ভিক্ষে দেওয়া হবে না ওঁরও কস্মিনকালে তীর্থদর্শন হবে না। প্রত্যেক দানকর্মে থাকে আত্মবিসর্জন, ক্ষতিস্বীকার তা সে যত সামান্যই হোক। এই যে তুমি ক্ষুদ্রতম এটিকেট রক্ষার্থে বন্ধুর সিগারেট আগে ধরিয়ে দিয়ে নিজেরটা পরে ধরাচ্ছো তাতেও আছে পাঁচ সেকেণ্ডের সেকরিফাইস।"

কীর্তি সোৎসাহে বললে, "হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়ছে, তুর্গেনিয়েফও বলেছেন, রকফেলারের লক্ষ লক্ষ ডলার দানের কথা যখন মনে আসে তখন আমার হৃদয়ে তার প্রতিদানে কৃতজ্ঞতা, কিন্তু যেদিন দেখলুম, আমাদের গ্রামে আটটি কাচ্চা-বাচ্চার বাপ এক অতি গরীব চাষা একটি অনাথ বাচ্চাকে বাড়িতে এনে আশ্রয় দিল তখন তার স্মরণে আমার মাথা গভীর, গভীরতম শ্রদ্ধায় নত হয়। চাষার ভয় ছিল তার বউ সংসার চালাবার জন্য প্রতিটি কোপেক গোনে, সে দারুণ চটে যাবে। সে শুধু রান্না করতে করতে শুধু আপন মনে মন্তব্য করেছিল, 'এখন থেকে আমরা সপ্তাহে যে একটা দিন পরবের রোববারে চীজ খেতুম সেটা ছাড়তে হবে।' আমার ঠিক ঠিক মনে নেই—"

"কিছু দরকার নেই এ ঘটনাটির বর্ণনা তুর্গেনিয়েফের ভাষায় দেবার। ছ'বছরের বাচ্চাও যদি এটি আধো আধো কথায় প্রকাশ করে তবু তার মূল্য এক কানাকড়ি কমবে না। লক্ষ টাকা দামের ফুলদানিতে একটি গোলাপ রাখো, আর চার আনার কাঁচের গেলাসে রাখো, গোলাপের সৌন্দর্য কি তখন আসমান জমীন ফারাক হয়ে যাবে?

কিন্তু তোমার উদাহরণ সত্যি ক্লাসিক পর্যায়ের। রকফেলার বিশ লক্ষ ডলার দান করে কি ক্ষতিটা স্বীকার করলেন? ব্যাঙ্কের খাতাতে কয়েকটা শূন্য কাটা পড়লো মাত্র। বস্তুত তন্মুহূর্তেই তিনি পাইকিরিতে আরো বিশখানা রোল্‌স্‌ কিনতে পারেন।"

তার নিভৃত বুদওয়ারে কীর্তিকে নিয়ে গিয়ে শিপ্রা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল তার ডিভানের উপর। কীর্তিকে বললে, "বসো আমার পায়ের কাছটায়—আমি কেষ্টঠাকুর না হলেও তুমি তো অর্জুন। তিনি বুদ্ধিমান; ঠাকুরের পায়ের কাছে আসন নিয়েছিলেন। নিছক বিনয় বশত নয়; তাঁর কুটিল স্বার্থ ছিল। আমারও তাই। তোমার মুখ দেখতে পাবো বলে।"

বলতে বলতে তার খোঁপা খুলে চুলে বিলি দিতে দিতে মাথার পাশের গোটা তিনেক কুশন ঢেকে দিল। কীর্তি লম্বায়, পরিমাণে এ-রকম রাশি রাশি চুলের স্তূপ আগে দেখে নি। বিস্ময়ে সেটার প্রশংসা করতে ভুলে গিয়ে বললে, "তোমার খোঁপা দেখে তো আমার কখনো মনে হয় নি, তোমার এত চুল।"

"কোঁকড়া চুলের ঐ একটিমাত্র সুবিধে। কিন্তু আমার বক্তব্য শেষ হয় নি।

"নির্দিষ্ট সময়ের আধ ঘণ্টা পূর্বে কিংবা হঠাৎ বিনু-নোটিশে এলে তুমি। তোমাকে তখন বসিয়ে রেখে টাকাকড়ির টানা-হ্যাঁচড়া করবো ঐ ঠুনঠুনিয়া না ঝুনঝুনিয়ার সঙ্গে—ঈভন ফাইভ মিনিটস্‌? নো, এ হানড্রেড টাইম নো। তাকে তদ্দণ্ডেই বিদায় দিলে কি হবে। একটা ডীল হয় তো হবে না। ঝুনঝুনিয়াও বিরক্ত হবেন।

ওরে হাবা, শোন্‌, এইটুকু যদি আমি ত্যাগ স্বীকার না করতে পারি তোর সঙ্গ পাবার তরে তবে তোর মূল্যটা কত? ডীলটাতে হয়তো আমার দশ হাজার টাকার মুনাফা হত। তা-হলে যে কোনো মুদি তোকে বলতে পারবে তোর দাম নিশ্চয়ই দশ হাজার টাকার চেয়ে কম—এ তো সোজা হিসেব। আর স্বয়ং যীশুখৃষ্টের মূল্য কত? মাত্র ত্রিশটি মুদ্রা। অবশ্য তাঁর যে-শিষ্য তাকে বেচে দিয়েছিল দুশমনদের কাছে সে ছিল গ্যালিলির জেলে। আজকের দিনেও সেখানে ত্রিশ মুদ্রা পর্বতপ্রমাণ। আর আমার কাছে দশ হাজার কি! ওদিকে দু'হাজার বছর ধরে দুনিয়ার ভদ্র ইতর সকলের কাছ থেকে জুডাস পাচ্ছে অভিসম্পাত। আমাকে দেবে ক'হাজার বছর ধরে ঝুনঝুনিয়ার কাছে তোমাকে বেচে দেওয়ার জন্য।"

তারপর আরামসে চোখ বন্ধ করে বললে, "ভাগ্যিস, মা কালীর আশীর্বাদে তুমি আমি কেউই যীশুখৃষ্ট নই।"

এমন সময় কোনো নোটিশ না দিয়ে কীর্তি হঠাৎ মাথা নিচু করে শিপ্রার একটা পায়ে চট করে চুমো খেয়ে অন্য পায়ে মুখ চেপে দিতে লাগলো দীর্ঘতর চুম্বন।

ধড়মড়িয়ে শিপ্রা উঠে বসে কীর্তির মাথা চেপে ধরে বলল, "ছি ছি! এ তুমি করছ কি?"

কীর্তি কোনো উত্তর দিল না। নিরাশ হয়ে শিপ্রা বসে রইল।

অনেকক্ষণ পরে কীর্তির চুল ধরে তার মাথা টেনে তুললো তখন বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ ভাব না দেখিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললো, "কেন? পদচুম্বন সমাসটা কি তোমার একেবারে অজানা। মানুষ গুরুর পদচুম্বন করে। কিন্তু আমি তো কখনো কোনো গুরুর কাছে দীক্ষা নেবার মত পাত্র নই। তুমিই তো আমার গুরু।"

বিস্মিত হয়ে শিপ্রা শুধলো, "সে কি?"

"শোনো নি, চণ্ডীদাস তাঁর রজকিনীকে গুরু আখ্যা দিয়েছেন তাঁর গীতে?"

"সে তো তিনি তাঁর সাধনার ক্ষেত্রে রামীকে অনেক রূপেই দেখেছেন, অনেক নামেই ডেকেছেন। তুমি তো অপদার্থ—অবশ্য তোমার আত্মোপলব্ধির ভাষায়।"

"অবাক করলে, গুরু, অপদার্থের তো গুরুর প্রয়োজন সর্বাধিক। খাঁটি সোনাতে কেউ কখনো পরশ পাথর ছোঁয়ায় নাকি। আচ্ছা, তর্কস্থানে না হয় গুরুর প্রসঙ্গ বাদই দিলুম। কিন্তু প্রিয়ার পদচুম্বন কি তার প্রসাদলব্ধ জন করে না। তুমি যাঁকে গুরুদেব বলে প্রায়ই উল্লেখ করো তিনি গেয়েছেন:

'অমল কোমল চরণকমলে চুমিনু বেদনাভরে—'

শিপ্রা বাধা দিয়ে বললে, "সে তো তাঁর জীবনদেবতার পদচুম্বন করেছেন তিনি।"

রীতিমত উত্তেজিত হয়ে কীর্তি বললে, "বা রে। এর কয়েক লাইন আগেই তো ওর সঙ্গে তার মহা সাড়ম্বরে, আনুষ্ঠানিকভাবে অনেক চক্র ততোধিক রেখার জাল এঁকে শুভলগ্ন স্থির করে, শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে পুরোহিত বৃদ্ধ বিপ্রের হাতে ধান্য দূর্বা তীর্থবারি এবং মন্ত্রসহ বিয়ে হল এবং সখীদল ও শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের পর সামাজিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করলো।

দোঁহাকার সাথে ফুলদল-সাথে বরষি লাজাঞ্জলি।

এবং এই যে একটা অভূতপূর্ব, ইতিহাসের সর্ব স্বয়ংবর বিবাহকে আপাদ-মস্তক লজ্জিত বিড়ম্বিত করি পাণিগ্রহণ—আমি এই পাণিগ্রহণ সমাসটির দিকে তোমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, শিপি—এই পাণিগ্রহণ মহোৎসবটি সমাধান হল এটির নির্যাস, এটির মধুরতম মধুমন্ত্র পাচ্ছি:

'অজানিত বধূ নীরবে সঁপিল শিহরিয়া কলেবর
হিমের মতন মোর করে তার তপ্ত কোমল কর।'

বধূ, বধূ, বধূ—আবার বলি বঁধু নয়, বধূ।

সেই বধূর পদচুম্বন করেছিলেন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ যার ভিতর সকল রসের ধারা সর্বদেশ সর্বকাল থেকে বয়ে এসে সম্মিলিত হয়েছিল।" দম নিয়ে কীর্তি বললে,

"তোমরা যা বলো তাই বলো, আমার কাছে বধূ যা জীবনদেবতাও তা।

এর পর দেখ, কবিতাটি তোমার আমার অতি কাছে চলে এল। কবিতার সখী পথ দেখিয়ে বরবধূকে বাসরঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখানে স্বয়ং তুমি। তারপর—

পাদপীঠ 'পরে চরণ প্রসারি শয়নে বসিলা বধূ—

তুমি যদি সে-ভাবে চরণ প্রসারিত করতে তবে আমি ছুটে গিয়ে পাদপীঠ সংগ্রহ করে আনতুম না। তুমি যে শয়নে চরণ প্রসারিত করলে। তাই তো আমাকে ঐ অবস্থাতেই পদচুম্বন করতে হল।"

ইতিমধ্যে শিপ্রা তার দুই হাঁটুর মাঝখানে মাথা গুঁজে বসে কীর্তির কবিতা আবৃত্তি, তার আপন টিকা কিছুটা শুনছিল। কিছুটা আপন মনে ভাবছিল। তার রাশি রাশি চুল চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কীর্তি মাত্র দু'দিন ধরে দরদী হিয়ার আহ্বান পেয়ে বক্ বক্ করতে শুরু করেছে। কিন্তু অতদিনের নীরব স্বভাব চট করে যায় না বলে চুপ করে শিপ্রার চুলের ভিতর এদিক ওদিক আঙুল চালাচ্ছে।

হঠাৎ শিপ্রা মাথা তুলে কীর্তির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ধীরে ধীরে স্পষ্ট স্বরে বললো, "এ-সব প্রাণের কথা কার না শুনতে ভালো লাগে? কিন্তু, কীতা, আমার মন বার বার ঘুরে ফিরে ঐ পাদপীঠ কথাটির দিকে যাচ্ছে। পাদপীঠ, সোজা বাঙলায় চৌকি, ইংরিজিতে পেডেস্টেল। তোমার হৃদয়ে দুদিনেই আমার যা মূর্তি গড়ে তুলছো তার পাদপীঠটা উঁচু হতে হতে এখন সেটা ময়দানের বিরাট বিরাট মূর্তির দশহাত উঁচু পাদপীঠ, স্ট্যান্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে।" একটু চিন্তা করে নিয়ে বললে, "না তুমি আরম্ভ করেছ পাদপীঠ দিয়ে। সেটাকে গড়েছো তোমার চেয়ে তিন মাথা উঁচু। তার উপর খাড়া করবে বা বসাবে নিশ্চয়ই কোনো দেবীপ্রতিমা—অন্য কিছু মানাবে কেন? এবং স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি সে দেবী আমি। নয় কি?"

কীর্তি মুগ্ধ হয়ে ভাবছিল, আহা, এই তো শিপ্রা। রবি-কাব্যের কত না অতলে ডুবেছে সে। অথচ প্রয়োজন মত আমার মত এমেচারের সঙ্গেও সে কদম কদম মিলিয়ে চলতে পারে। ঐ তো তার মহৎ গুণ। পার্টিতে, ব্যবসাতে বিয়েবাড়িতে সর্বত্রই সে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে।

শিপ্রার প্রশ্নের উত্তরে কীর্তি, যেন সমের শেষে মাথা দোলাতে দোলাতে বললে, "অবান্তর, অবান্তর এ-প্রশ্নটা। প্রশ্নটাই স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়ংসম্পূর্ণ!"

হায় রে কীর্তিঠাকুর! তুমি এখনো তোমার শিপ্রা চতুরাকে চিনতে পারো নি। সে যেন সন্দেহের ধন্দে দোটানা হয়ে বললে, "তোমার ঐ কবিতাতেই আছে, "বিয়ে বাড়িতে" ছিল।

'সিংহবাহিনী নারীর প্রতিমা দুই পাশে অপরূপ!'

বাঙ্গালোরী শাড়ি, বেনারসী ব্লাউজ আর ছেরামপুরী খোঁপা—ঐ তো আমার সাজ। এ কি মানাবে সিংগির ঘাড়ের উপর বসলে?

তার চেয়ে ওখানে বসে যদি আমি হীরা-পান্না বসানো সোনার চিরুনি দিয়ে কুহকিনী মায়াবিনীর মত চুল আঁচড়াই তবু না হয় ডেঁপো ছোঁড়ারা ওদিকে তাকিয়ে দু'একটা রসাল টিপ্পনী কাটবে!"

কীর্তির রোমান্সে এই পয়লা খোঁচা। এবারে আসছে কু দ্য গ্রাস, ক্লে'র মোক্ষম মুষ্ট্যাঘাতে রোমান্স্-বেলুনের শেষ সর্বনাশ।

অতি গুরুগম্ভীর হাস্যহীন আস্যে শিপ্রা বললে, "সবচেয়ে খাসা মানায়, যদি আমি সেখানে কোমরে আঁচল বেঁধে, টাটা স্টিলের কড়াইয়ের খাগড়াই কাঁসার খুন্তি দিয়ে তোমার জন্য পুঁই শাকের চচ্চড়ি ঘ্যাঁটাই।"

আহা, যেন একটি সার্থক গবিতা! এই একটি বাক্যকেই তিন অসমান হিস্যেয় ভাগ করে তিন লাইনে ছাপলেই কোথায় পাউন্ড, কোথায় বন্ধু সমর সেন?

ডাস্ট বিন্-এ পচা ইঁদুর
রিকশায় চীনা গণিকা

এগুলো মহাকাব্য রূপে স্বীকৃত হয়েছে। এবারে জুড়ে দিলে ময়দানের মিনারশিখরে ইশ্‌টিলের কড়াই।

কীর্তি যে ক্ষুণ্ণ হয়েছে সেটা স্পষ্ট বোঝা গেল। হার মানতে মানতে তবু শেষ বাণ ছাড়লে—

দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

অতি সোহাগভরে দু'হাত দিয়ে কীর্তির মাথা বুকে গুঁজে নিয়ে তার মধুরতম কণ্ঠে বললে,—সে কণ্ঠস্বর তার পিতা বড় ভালোবাসতেন—"ওরে ক্ষ্যাপা, প্রিয়াকে দেবতা করার জন্য প্রেমিক প্রেমিকা, উভয়েরই শাস্ত্রাধিকার অর্থাৎ প্রেমাধিকার চাই। তোমার কিছুটা আছে—বিধিদত্ত—কিন্তু দিনে দিনে সেটা বাড়বে না কমবে সেটাও জানেন একমাত্র বিধিই।

তুমি বার বার বলেছো, তুমি অপদার্থ, তাই তোমার ভিতর আমি কি দেখলুম যে তোমাকে ভালোবাসলুম? উত্তর দি নি। আজ বলি, ঐ প্রেমাধিকার। যাকে আমি নাম দি 'ধাতু'।"

কীর্তি শুধোলে, "ধাতু? বুঝিয়ে বলো।"

শিপ্রা বললে, "তোমাকে নির্মাণ করার সময় বিধাতা একটা বিশেষ ধাতুও মিশিয়ে ছিলেন। সেটা আমি চিনতে পেরেছি। এর বেশী বুঝিয়ে বলা যায় না। ওটা বোঝার জিনিস নয়, উপলব্ধির ধাতু। হয়তো নিজেই একদিন উপলব্ধি করতে পারবে। ব্যাস! এখন চুপ করো।"

চতুর্দশ অধ্যায়

কীর্তিদের ক্লাব-বারের উচ্চ উচ্চ দণ্ডাসনে বসে ডাইনে-বাঁয়ে স্টিয়ার করাটা যারা সব সময় পছন্দ করতেন না, তারা আসন নিতেন ছোট ছোট টেবিলের চতুর্দিকে। আবদার ড্রিংক এনে দিত টেবিলে টেবিলে। আবদার কথাটা ফার্সী থেকে এসেছে প্রাচীনতর যুগে, জোর চালু হয় কোম্পানির আমলে এবং ইদানীং মুমূর্ষু। যদিও আব শব্দের অর্থ জল, প্লেন ওয়াটার—যেমন আবহাওয়া—ও দার কথাটার অর্থ, যে ধরে, যেমন জিম্মেদার তথাপি রূঢ়ার্থে সে মদ্যাদি তরল দ্রব্যের রক্ষক ও পরিবেশক। ইরান দেশে এই ব্যক্তিই যদি ভদ্রশ্রেণীর শিক্ষিত তরুণ বা তরুণী হয় এবং বন্ধু বা বান্ধবী রূপে কাব্যালোচনা, সঙ্গীতাদির দ্বারা বিশেষ একজনকে আপ্যায়িত করে বা আসর জমিয়ে তোলে তবে তার নাম সাকী।

দণ্ডাসীনদের ভিতর কথাবার্তা হয় ছেঁড়া-ছেঁড়া। টেবিলওলাদের ভিতর মাঝে-মিশেলে দু'একটি বিষয় নিয়ে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী আলোচনাও হয় কিন্তু আমাদের রক বা পাড়ার চায়ের দোকানে—সেখানে প্রাগুক্ত ক্লাবের মত একে অন্যকে চেনে এবং প্রায় সব খদ্দেরই বেনামী একটা ক্লাবের অনারারি মেম্বার—যে রকম তর্কাতর্কির সাইক্লোন টর্নাডো বয়ে যায়, এই খানদানী ক্লাবে সেরকম হয় না। কারণ কেউই কোনো বিষয়ে সিরিয়াসলি নেয় না, কারোরই বিশেষ কোনো মতবাদে দৃঢ়বিশ্বাস নেই। তাঁরা শুধু একটি বিষয়ে অচঞ্চল দৃঢ়মত পোষণ করেন—পানের দ্রব্যটি যেন যে লোক যা নিত্যি নিত্যি খায় আজও যেন নির্ভেজাল তাই হয়। এবং যেহেতু সাধারণ মানুষ যদি কোনো বিশেষ একটা জিনিসের প্রতি তার সর্ব চৈতন্য সর্ব ধ্যান পরিপূর্ণ নিয়োগ করে দেয় তবে সে অন্য সর্ববাবদে অল্পাধিক উদাসীন হতে বাধ্য—অর্জুন যে-রকম পাখির চোখের দিকে তাগ করার সময় গুরু, ভ্রাতা এমন কি বৃক্ষটাকেও দেখতে পান নি। বাইবেলও বলেছেন, "দুই প্রভুর সেবা করা যায় না।"

আজ কিন্তু তর্কটা জমে উঠেছে। ইয়েহিয়া খান এসেছেন ঢাকায়। শেখ মুজীবের সঙ্গে একটা আপোস করতে। কীর্তি এসে দলে ভিড়লো আলোচনা যখন অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে—বসলো তার সুদিনদা ও ইয়ার খানের

পাশে। যে সমস্যা নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা হচ্ছে সেটাঃ ইয়েহিয়া কি সত্যই *আওয়ামী লীগের হাতে পূব বাংলার চোদ্দ আনা কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ?*

মিত্তির যদিও প্রায় প্রতি রাত্রেই কিঞ্চিৎ বে-এক্তেয়ার হয়ে বাড়ি ফেরে তবু সবাই জানে যে বদ্ধ মাতাল অবস্থায়ও সে যদি কাউকে কোনো কথা দেয় তবে পরের দিন সে-কথা তুললে, যদিও সে সে-কড়ার বিলকুল স্মরণে না আনতে পারে তবু ক্ষয়ক্ষতির পরোয়া না করে সত্য রক্ষা করবে। অতএব তার দৃষ্টি-বিন্দু এক্ষেত্রেও সেই ঐতিহ্যাগত। বললে,

"তোমরা ভুলে যাচ্ছো ইয়েহিয়া সেপাই, অফিসার। সে পলিটিশিয়ান নয় যে ঘড়ি ঘড়ি ভোল পালটাবে। ইংরেজ জাতটা পলিটিকস করে। আমাদের হোমরুল, অটনমি, হাফ-স্বরাজ, স্বরাজ দেবার হোলি প্রতিজ্ঞা করে সেটা ভঙ্গ করেছে। কতবার হিসেব নেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ঠিক একই সময়ে গোপনে আরবদের কাছে কসম খেল যুদ্ধ শেষে প্যালেস্টাইন ওদের হাতে সঁপে দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে টাকার কুমীর মার্কিনদের হুবহু ঐ একই প্রতিজ্ঞা করলে। যুদ্ধ শেষে চেষ্টা করলে, নিজেই সেটা হজম করার। শেষটায় যখন নিতান্তই বদহজমে যায় যায়, তখন আরব আর ইহুদিদের লড়িয়ে দিয়ে বাড়ি চলে গেল। এবং দুই পক্ষকেই আগুনের দরে আউট অব ডেট পুর্না পুর্না বন্দুক কামান বিক্রি করলে। ওদিকে দেখ দ্য গল। সেপাই। রাজ্য চালনার সময় আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষার আত্মসম্মান বজায় রাখতে গিয়ে পদে পদে মার খেয়েছে। ইয়েহিয়াও সেপাই।"

সুদিন বললে, "ইয়েহিয়া যদি সত্যিকার সেপাই হয় তবে পাক্কা সাড়ে তিনটি মাস ধরে ন্যাজ খেলানো কেন, বাবা ? ইলেকশন হয়েছে সেই ডিসেম্বরের প্রথম হপ্তায় আর আজ মার্চের মাঝামাঝি। এখনো ডেট স্থির হয় নি, এসেমব্লি কবে বসবে ?—বল্‌ না শঙ্কর, তোর মামা না এসেমব্লিতে কি যেন কোন্‌ ডাঙর নোকরি করে—এসেমব্লি ডাকতে কত দিন সময় লাগে ? আসলে সুদিনের মতলব শঙ্করকে তাতানো। কারণ শঙ্করজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য তর্কে সুদিনের বিপক্ষ মত তারস্বরে প্রচার করা। অন্য সর্ব বাবদে হরিহরাত্মা। আজ সব্বাইকে অবাক করে বললে, "মেরে-কেটে উইদ এ ভেরি লিবরেল মার্জিন—সাত দিন। কিন্তু সে প্রশ্নটা তোলার পূর্বে ভুলে যাচ্ছিস কেন ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি ইয়েহিয়া তো মার্চের প্রথম সপ্তাহে এসেমব্লি সেশন ডিক্লেয়ার করে ফের সেটা নাকচ করে দিলে। কি বলো, মিত্তির ? ইয়েহিয়া না সোলজার।"

ইউনুস মির্জা মেদিনীপুর না কোথাকার খাঁটি পাতি। রংটিও বায়স প্রায়। দেমাক করেন তিনি মোগল না পাঠান কি যেন ? বলতে ভালোবাসেন উর্দু—যদিও সেটা তালতলার স্ল্যাং। বেহারের নেটিভ আবদাররা পর্যন্ত সে বত্রিশ ভাজা শুনলে মুখ টিপে হাসে। উড়ে ঘেঁষা বাংলা শুনলে মারওয়াড়ি তক্‌ আপন

বাংলার পিঠে হাত চাপড়ায়। যেন মিত্তিরকে নিয়ে মিত্রপক্ষ রচনা করার জন্য অর্থাৎ ইয়েহিয়ার পক্ষ নিয়ে বললে, "কিন্তু ইয়েহিয়া যথেষ্ট কারণও দেখিয়েছেন।"

কীর্তিসখা খান ফ্যাকচুরিয়াস। "কারণ না কচু! লেম এক্সকিউজ এবং তার কারণ—ঘোড়াটার চারটে পা-ই আগা-পাস্তলা লেম।"

মিত্তির কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু খান বাধা দিয়ে বললে, "লীগে ইয়েহিয়ার যদি একটা সমঝোতা হয়ে যায় তবে তো ল্যাঠা চুকে গেল। সে-নিয়ে তর্কাতর্কি হাওয়ার কোমরে রাশি বাঁধার মত বিলকুল বেকার। আর যদি না হয় এবং ফলে পূব বাঙলা বিদ্রোহ করে—লীগ কুল্লে দেশের ভোট পেয়েছে তাই বিদ্রোহটা হবে তামাম দেশ জুড়ে—আর স্বভাবতই ইয়েহিয়া চালাবে খুন-খারাবীর দমননীতি। তখন পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ জন আর ভারত সরকার রি-এ্যাক্ট করবে কি ভাবে?"

শঙ্কর তার পূর্বমত কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে চিন্তিত চিত্তে বললে, "পাঞ্জাবী পাঠান সেপাইরা তাদের প্রতিবেশী, জাত-ভাই কাশ্মীরী মুসলমানদের সাহায্য দেবার নামে এসে তাদের ঘরবাড়ি কি রকম লুঠপাট করেছিল সেটা অন্তত আমার অজানা নয়। আর এই বহুদূরের বাঙালদেশে তারা নরম চামড়ার দস্তানা পরে পিউনিটিভ এ্যাকশন নেবে, সেটা দুরাশা।"

মির্জা নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললে, "যা-ই করুক না কেন, ওটা তো পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার।"

খান তো রেগে টং। "ঘরোয়া ব্যাপার! খাসা ডিপ্লোমেটিক ভাষা। যেটা ডাহা সত্য বিকৃতির ভদ্র বা ভণ্ড নাম। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের মেলা নিকট আত্মীয় রয়েছে পূব বাঙলায়, আর এখানে যে-সব হিন্দু রেফুজি পূব বাঙলা থেকে এসেছে তাদের সে দেশে মা-ভাই রয়েছে ঢের ঢের বেশী। তাদের গায়ে বুঝি রক্ত নেই? তাদের বেলা এটা শব্দার্থে সত্যার্থে ঘরোয়া ব্যাপার। তোমার বেলা ওটা ডাহা নির্জলা ফন্দী—মানুষ মারার অজুহাত।"

সুদিন বললে, "ফ্রান্স্ জর্মনির লড়াই ছিল ওদের দুজনার "ঘরোয়া ব্যাপার"। তবে কেন শতাধিক বৎসরের নিরপেক্ষ সুইটজারল্যাণ্ড হিটলার-লাঞ্ছিত কি ইহুদি, কি জর্মন পলাতক সবাইকে আশ্রয় দিল? এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বে-আইনীভাবে। এদের প্রায় কারোরই সরকারী পাসপোর্ট, সুইস ভিসা ছিল না।

আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী উচিত যে সুইস ফ্রণ্টিয়ারে সে-দেশে ঢোকার সময় যে ধরা পড়েছে তাকে ধাক্কা মেরে যে-দেশ থেকে সে বেরিয়ে এসেছে সে-দেশের পুলিসের হাতে সমর্পণ করা। অর্থাৎ পলাতক পুত্রকে ফের ডাইনীর

হাতে সমর্পণ করা।" ওরা সবাই ছিল জর্মন সিটিজেন। হিটলার তাদের নিয়ে কি করবে, না করবে, সেটা তার নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার। তবে সুইটজার ল্যাণ্ডের মত ভদ্র দেশ, ভদ্রতর সরকার দিনের পর দিন এ রকম বে-আইনী কর্ম করে ওদের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলো কেন? তদুপরি সুইস সরকার বেশ জানতো, হিটলার যখন হলাণ্ড, বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা চুক্তি উপেক্ষা করে দুটো দেশ দখল করে বসে আছে তখন প্রয়োজন বোধ হলে কিংবা নিতান্তই খামখেয়ালির ঝোঁকে সুইটজারল্যাণ্ডকেও আক্রমণ করতে পারে। বেআইনিভাবে পলাতক জর্মনদের আশ্রয় দেবার বিগলিতার্থ: সুইটজারল্যাণ্ড আক্রমণ বাবদে অর্ধসুপ্ত মেন-ঈটার হিটলার বাঘার ন্যাজ ধরে হ্যাঁচকা টান মারা।"

সোমেন চাটুয্যে বললে, "অত সাত সমুদ্দুর পাড়ি দিচ্ছো কেন বাওয়া? ঐ যে তোমার পূব পাকিস্তান থেকে তেইশটি বচ্ছর ধরে কখনো বানের জলের মত হুড়মুড়িয়ে, কখনো ঢেউয়ে ঢেউয়ে, আর ছিটেফোঁটায় তো অহরহ রেফুজি আসছে, তাদের ঢুকতে দিচ্ছো কোন্ আইনে। ওহে মির্জা সাহেব, ওদের ঠেলায় তোমার আমার প্রাণ যায়। তুমি, দাদা, যাও না বর্ডারে। তোমার গভীরতম পলিটিকাল ডক্ট্রিন ঘরোরা ব্যাপারটা প্রচার করো না ওদের সামনে—সবিস্তর সালঙ্কার। একটি কাজের মত কাজ হয়।"

শঙ্কর বললে, "ছিঃ চাটুয্যে! মির্জা সাহেব উচ্চাঙ্গের সমাজসেবক এবং ভারতপ্রেমী। তাঁর অকাল মৃত্যু কামনা করাটা কি ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে গৌরবের বিষয়!"

এমন সময় বেয়ারা মিস্টার মির্জার হাতে একখানা ভিজিটিং কার্ড এনে দিল। সেটার উপর চোখ প্রায় না বুলিয়েই মির্জা সক্কলের দিকে চোখের দৃষ্টি ঘোরাতে ঘোরাতে বললে, "জেণ্টলমেন, আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছেন। আপনারা যদি সদয় অনুমতি দেন তবে তাঁকে এখানে নিয়ে আসি, নইলে অন্য টেবিলে—"

তার সেই বিগলিত অনুরোধ শেষ হবার পূর্বেই সমস্বরে কোরাস গান উঠলো:

কোরাস
নিশ্চয়, নিশ্চয়
সানন্দে, সানন্দে
মেহেরবানী কীজীয়ে,
সার্টেনলি, সার্টেনলি

ক্লাবটা ইণ্টারনেশনাল, মেম্বাররা কসমপলিটান। এ-হেন অভ্যর্থনা সাতিশয় স্বাভাবিক। গ্রাম্য কবির আপ্তবাক্য এই ফ্যাশান-ক্লাবে বেশভূষোয় ঠিক ফিট করবে না কিন্তু ভিতরের রস একই। শহুরে শেমপেন আর গাঁইয়া তাড়ির

ধর্ম এক, বর্ণ ভিন্ন ঃ—

"যে রসে মগন
তাহাতে তখন
হোক না কুজন
হল মহাজন।"

শুধু খান আর কীর্তি উদ্বাহু হয়ে পাঞ্চজন্য আমন্ত্রণে যোগ দিল না।

মির্জা সেটা বোধহয় লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু তাতেই বা কি? ওভার-হুয়েলমিং মেজরিটি তাঁর পক্ষে। যদিও জানা কথা, আজ স্পষ্টতর হল যে আওয়ামি লীগের থাণ্ডারিং মেজরিটির চেয়ে ঢের ঢের বেশী কবুল করেন ভুট্টোর হুইসপারিং মাইনরিটিকে।

চাটুয্যে ফিসফিসিয়ে খানের কানে কানে বললে, "ব্যাটার হাড় কিপটেমি তার লোমে লোমে খাটাশের দুর্গন্ধ ছাড়ে। কখনো কোনো বন্ধুজনকে সঙ্গে আনতে দেখেছিস? তার সামনে চিচিং ফাঁক হয়ে যাবে যে। আজ শালাকে দু'তিন রোঁদ খাওয়াতে হবে অন্তত। বেটা উড়ে স্নবস্য স্নব। ওদিকে দোস্তটি খানদানী লখনওয়ী মনিষ্যি। জাতে ওঠবার তরে কোন্ না তিন পাত্তর খাওয়াবে? তুই অত মুখ গুমড়ো করেছিলি কেন রে, উল্লুক?"

"দ্যাখ, ও ব্যাটার দেওয়া শেমপেন আমার কাছে বিষ্ঠে। সত্যি বলতে কি, আল্লার কুদরতে ঐ মির্জা সম্বন্ধী যদি কোনো দিন দরাজ দিল হয়ে যায়, তবে তার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আর্সেনিক খেয়ে মরতে রাজী আছি আমি একশ' বার।"

"তুই বড্ড সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছিস। আর আজকের এই পূব বাঙলা নিয়ে ফ্যাশনেবল কথাবার্তার মাঝখানে হঠাৎ এ রকম সিরিয়াস হয়ে গেলিই বা কেন? এই দ্যাখ না তোর এক লেঙোটার ইয়ার শ্রীমান কীর্তিকে। চাঁদপারা মুখ করে কখনো কান দিলে, কখনো দিলে না।"

কীর্তি উঠে দাঁড়ালো। বললো, "আমি এক্ষুনি আসছি।" বলে এমন এক বিশেষ স্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল যেখানে রাজাও ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারেন না, লক্ষ মোটরের মালিক ফোর্ডকেও পায়ে হেঁটে যেতে হয়।

টয়লেট থেকে ফেরার সময় বারের পাশে আসতেই বেয়ারিচের চোখে চোখ পড়ল। ইঙ্গিতটা অস্পষ্টতমের চেয়েও এক বাঁও নিচে। তবু কীর্তি বারের সর্বশেষ দণ্ডাসনে বসতেই বেয়ারিচে কাছে এসে ফিসফিসিয়ে বললে, "তোমার সঙ্গে কথা আছে, মনামি।

"ডিউটির সময় খাওয়াটা আমার পছন্দ নয়। তবু তোমার সম্মানে—। কিন্তু দুটো ড্রিংকই অনুমী।"

"আস্তে বলো। নইলে বার-এর বোতলগুলো হাসতে হাসতে ফেটে পড়বে।

একে তুমি লেডি, তদুপরি অবিবাহিতা লেডি। তোমার আপন কেতাদুরস্ত দেশে কখনো কোনো সিন্নরীনা নোংরা লীরা হাতে তুলে একটা হুনোর জন্য পে করে ?"

"না, কিন্তু আমি তোমার বন্ধু, সেইটে আমার পরিচয় নম্বর এক। সিন্নোরা না সিন্নোরীনা—সেটাকে ঘোড়ার রেসে বলে 'অলসো র‍্যান'—মানে থার্ড প্লেসও পায় নি। এবারে মন দিয়ে শোনো। এখন ঘাড় ফিরিয়ে ডান দিকে তাকিয়ো না। পরে এক ঝলকে দেখে নিয়ো, কিন্তু ভালো করে চিনে নিয়ো। তোমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে বসে ঐ যে রামছাগল মির্জাটা, তার পাশে বসেছে তার এক ইয়ার-জান্ দিলের ইহার—একটা শয়তান ছাগল।

কেন যে তোমাকে বলছি, জানি নে। না, জানি।

তোমরা পাঁচো ইয়ারে বার-এর, টেবিলের পাশে বসে কত না আজেবাজে কথা বলো—কে বা শোনে কে বা দ্যায় কান ? কালেকস্মিনে অবশ্যি দু'একটা সিরিয়াস আলোচনা করো বটে, কিন্তু কেউই সিরিয়াসলি ও-সব গায়ে মাখো না। তোমাদের আলোচনা পিন টু এলিফেন্ট।

তিন দিন ধরে দেখছি, ঐ মির্জেটা রোজ রোজ আসছে, সাঁঝের পয়লা ঝোঁকেই। রোজই কানে আসছে পূব পাকিস্তান নিয়ে আলোচনা এবং রীতি-মত সিরিয়াস। তিনদিন ধরে। কেমন যেন খটকা লাগলো। কাল সন্ধ্যায় লক্ষ্য করলুম, তোমাদের অভ্যাসমত এক ব্যাপার থেকে অন্য ঘটনায় তোমাদের কথাবার্তা চলে গেলে ঐ মির্জেটা আবার সন্তর্পণে আলোচনাটার মোড় ফেরায় পাকিস্তানের দিকে। আমি তো বার-এর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত অবধি চৌকিদারি করি, সব কথা কানে যায় না, তবু আমার মনে হল মির্জা যত না নিজের কথা কয়, তার চেয়ে প্রশ্ন শুধিয়ে শুধিয়ে সব্বাইকে ওসকায়।"

কীর্তি অবিশ্বাসের সুরে কিন্তু দরদী গলায় বললে, "ও-সব তোমার কল্পনা, বেয়ারিচে ডার্লিং।"

বেয়ারিচে বললে, "কাল বেলা তিনটে অবধি তোমার মন্তব্যটা মেনে নিতে আমার বিশেষ আপত্তি হত না।

কাল বেলা তিনটেয় মির্জা বারে এলেন ঐ ইয়ারকে নিয়ে। বার তখন শূন্য। আমিও দুপুরের মিনি নিদ্রায় এক কোণে ঢুলছি। ঐ দূরের কোণটায় বারের উঁচু টুলে বসে নিচু গলায় গুজুর গুজুর আরম্ভ করলেন, মির্জা কখনো ভাঙা ভাঙা উর্দু বলে—সে উর্দু আমাদের এলিয়েট রোডের যমজ—ওটা আমার সড়গড়। কখনো বলে ইংরেজি—সেটা বুঝতে আমাকে বেগ পেতে হয় অবশ্য। কিন্তু সেইটে আসল কথা নয়। আসল কথা ওরা ভেবেছে আমি অতদূর থেকে তাদের কথা শুনতে পাবো না, বুঝতে পারবো না। আর আমি তো সামান্য বার্-মেড্। 'বুওনো দিও'—গুড্ লর্ড—তোমাদের চোখের একটি চুলের কাঁপন

থেকে এক শ' গজ দূরে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারি, কেউ এখন কন্যাকের বদলে উইস্কি চায়, কে একটা নোভালজিনের বড়ি চায়। আর দশ হাত দূরের থেকে ওদের ঠোঁটের করতাল বাজানো থেকে বুঝতে পারবো না, ওদের খুলির ভিতর কি সব বদামি আবজার করছে? জানো, শার্লক হোমস অন্ধকারে বেরালের চেয়ে দেখতো বেশী!

সর্বক্ষণ তারা কথা কইছিলো পূব আর পশ্চিম বাঙলার বাঙালীদের নিয়ে। দোস্তকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল মির্জা উভয় বাঙলার বাঙালীদের মধ্যে কোনো দোস্তী নেই। বললে, 'জানেন না, ১৯৬৫-র লড়াইয়ের সময় যে-সব পাঞ্জাবী পাঠান সেপাই বর্ডারে পাহারা দিচ্ছিল তাদের দিন কেটেছে বাদশাহী খানা খেয়ে, নবাবের হালে। গাঁয়ের বাঙালী মেয়েরা বিরয়ানী কোর্মা রেঁধেছে আর পুরুষগুলো বাঁকে করে সেগুলো ডেগ-ডেগচিতে নাকে নাকে ভ'রে নিয়ে গিয়েছে ওদের কাছে, আর—' "

হঠাৎ থেমে গিয়ে বেয়াত্রিচে বললে, "বাকিটা এখন না। আমার মনে হল ঐ বিদেশী ঘুঘুটি আমার দিকে একবার আড়নয়নে তাকালে যেন। তুমি এখন একটা চোটা পেগ পরিমাণ হেসে আমার গালে একটি মিষ্টিমধুর ঠোনা মারো। ভাবটা, যেন আমার সঙ্গে প্রেমালাপ করছিলে।"

কীর্তি কিন্তু অকৃত্রিম হাসি হেসেই ঠোনা মেরে বললে, "দান্তে তো তাঁর প্রিয়া বেয়াত্রিচের সঙ্গে কদাপি রসালাপ করে নি।"

দণ্ডাবতরণ করে চলেছে মৃদুপদে কীর্তি পার্টির দিকে। বিদেশী ঘুঘুকে যেন শুনিয়ে দিয়ে একটুখানি উঁচু গলায় বললে, "টেক কেয়ার! খান চটবে।"

কীর্তি ঘাড়টা একটু পেছনবাগে বেঁকিয়ে আরেক গাল হেসে বললে, "ও আমার আণ্ডার স্টাডি।"

"তোমার হাফ্ ড্রিংকটা পাঠিয়ে দিচ্ছি! বাব্বা! রসে টেটম্বুর। প্রেমের বন্যা যেন। পেটে আর এক ফোঁটাও ধরবে না।"

কীর্তি চেয়ারে বসতে না বসতে শুনতে পেল বিদেশী ইয়ার যেন যৎসামান্য ব্যঙ্গের সুরে টিপ্পনী কেটে বললেন, "কোনো কোনো বার-এর ভিতরে বাইরে দুদিকেই স্বরাজ। বন্দোবস্ত্ আচ্ছা হ্যায়।"

সুদিন বেশ কঠিন গলায় বললে, "সিন্নরীনা বেয়াত্রিচের পরিবার বহু ক্লাবের বহু মেম্বারের চেয়ে প্রাচীনতর। আমাদের কলকাত্তাই কায়দা—শিখতে অনেকেরই সময় লাগে, মিস্টার লারী।"

মির্জার মুখ একটু বেগনী হল। যদিও তার চামড়াটা গণ্ডারের—বাটা কোম্পানী কিনতে চেয়েছিল দক্ষিণ মেরু অভিযানের বুট বানাবার তরে।

লারী কিন্তু সত্যই বেয়াত্রিচের ঘুঘুবর। যেন বিরাট প্রশংসা শুনে আনন্দের হাসিতে খান খান।

ইতিমধ্যে মির্জা দাঁড়িয়ে উঠে কীর্তির সঙ্গে লারীর পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, ইনি আমাদের চৌধুরী কীর্তি সাহেব, আর ইনি মিঃ লারী।"

মিঃ লারী যে হ্যাণ্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়েছেন সেটা না-দেখার ভাব। ভান করে কীর্তি ওর দিকে ভালো করে না তাকিয়ে ছোটাসে ছোটা একটা "নমস্কার" বলে ঝপ করে বসে পড়লো।

চাটুয্যে গুনগুন করে খানকে শুনিয়ে বললে, "ব্যাটাচ্ছেলে মির্জাটা এ্যাদ্দিন ধরে আমাদের সঙ্গে ওঠবস করছে অথচ এটিকেটের 'এ' অক্ষরটিও তার রপ্ত হল না। পরিচয় করিয়ে দেবার সময় কার নাম আগে আর কার নাম পরে বলতে হয় এ্যাট্টুকুন হ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞান হল না।

চাটুয্যের জ্যাঠামশাই তাঁর কচ্ছপের খোল ড্রেস শার্ট বিলেত থেকে স্টার্চ করিয়ে আনতেন, আর আইনের বই বাঁধিয়ে আনাতেন প্যারিস থেকে। চাটুয্যের মামা রসাল ঘোষালকুল যে পরিবারের গুরু তাঁরই একজন ইণ্ডিয়ার প্রথম লর্ড। কায়দাকেতায় কেতাদুরস্ত।

কীর্তি দরদী কণ্ঠে বললে, "মিঃ মির্জা, আমার নাম কীর্তি চৌধুরী। পাঞ্জাবী মহাখানদানীদের মত চৌধুরী কীর্তি নই। আমি অতিশয় সাদামাটা বাঙালী—আল্লাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।"

মিঃ লারী বড়ই অমায়িক ব্যক্তি। মৃদুহাস্যে শুধোলেন, "পাঞ্জাবী হতে কি আপনার ঘোরতর আপত্তি?"

কীর্তি বুড়বকের মত মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, "পাঞ্জাবী—পাঞ্জাব —পঞ্চ+আব—পাঁচ রকমের জল। ওরে বাবা!"

লারী কীর্তির চেয়ে অধিক বুড়বকের মত প্রশ্নভরা মুখে এর ওর দিকে তাকালেন।

"আমাদের ক্লাব-মেম্বার চাটুয্যেরই পূর্বপুরুষগণ অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্ররাজির ভূরি ভূরি টীকাটিপ্পনী রচনা করে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন। বক্ষ্যমাণ চাটুয্যের কাছে সংস্কৃত গোমাংস বরাহমাংসবৎ বলা চলে না, কারণ উভয় মাংসেই তার ঔদরিক নীতি উদার, তবে সেটাকে সে মহামাংস অর্থাৎ মানুষের মাংস হিসাবে গণ্য করে। তাই এস্থলে টীকাকারের রক্ত কার গায়ে তার চেয়ে বেশী।"

লারীর দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে জ্ঞানদান করে বললে, "শব্দার্থে অর্থহীন, ভাবার্থে মহা মূল্যবান। 'পাঁচ ঘাটের জল খাই নে' এ-ইডিয়ামের অর্থ আমি যত্রতত্র সর্বত্র থেকে আমার পানীয় সঞ্চয় করি নে। আমার রুচি আছে। অর্থাৎ কীর্তিবাবু ফেস্‌টিডিয়াস, বাছেন চুস্‌ করেন, অর্থাৎ ভেরি choosy।"

লারীকে ঘায়েল করা কঠিন কর্ম।

বললেন, "বাঙালী আর্যের পূর্বপুরুষ তো পাঞ্জাব থেকে এসেছেন। তাঁরা

তো পাঞ্জাবী।"

অতিশয় মৃদুকণ্ঠে সুদিন বললে, "এবং তাদের পূর্বপুরুষ বাঁদর—ডারউইন বলেছে।" বলেই একটা কৃত্রিম হাই চাপতে চাপতে বললে, "ভেরি সরি, মিস্টার লারী। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত, গুড নাইট।" সকলের দিকে তাকিয়ে আরেকটা হাই চেপে, আরেকটা "গুড নাইট" হেঁকে বারের দিকে চলল।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই উঠে দাঁড়ালেন। লারী আর মির্জা ছাড়া।

কীর্তি মনে মনে বললে, "বেয়ারিচের সন্দটা বোধ হয় ঠিক। বাবুদের সব প্রশ্নের উত্তর এখনো পাওয়া যায় নি বলে সভা ভঙ্গে ক্ষুণ্ণমনা।"

তার সঙ্গে চললো মাদ্রাজী রঙ্গনাথন। সমস্ত সন্ধ্যা মুখ খোলে নি।

কীর্তি তাকে শুধোলো, "তুমি আর লারী যখন একসঙ্গে টয়লেট যাচ্ছিলে তখন আসতে যেতে কি গুজুর গুজুর করছিলে?"

"বলছিল, 'পূব পশ্চিম উভয় পাকিস্তান অভিন্ন অচ্ছেদ্য রাষ্ট্র। এক রাষ্ট্রাংশ যদি কেটে পড়ে তবে দ্রাবিড়রা যে উত্তর ভারত থেকে কেটে পড়তে চায় সে আন্দোলন কি বলবান হবে না? "সেপারেটিস্‌ট্‌ মুভমেণ্ট" আরো আবোল-তাবোল কী সব। সে মুভমেণ্ট ভারতকে দুর্বল করে দেবে। পূব বাংলার আন্দোলন দৃষ্টান্ত হয়ে, অপরোক্ষে ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।" সদানন্দ, সদানীরব রঙ্গনাথন শেষটায় বললে, "নোজি চ্যাপ, শুঁক শুঁক করছে সর্বক্ষণ!" বেরুবার সময় বেয়ারা কীর্তির হাতে একখানা চিরকুট দিলে। তাতে লেখা: "ডার্লিং কে,

কাল আমার অফ্‌ ডে। পাঁচটায় খানের ওখানে যাবো। তুমি আসতে পারবে? বাকি সব-কথা ওর সামনে হবে। তোমার

বী।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

শিপ্রা বেলকনির উপর অর্ধশায়িত অবস্থায় তাকিয়ে আছে পার্কের সবুজ ঘাসের দিকে। এ-সময়টায় কলকাতার ঘাস তার সবুজিমা অনেকখানি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু যে-জন অল্পে সন্তুষ্ট হতে জানে, অল্পের ভিতর বৃহতের সন্ধান পায় সে যৎসামান্য উপাদান থেকে তার রসের খাদ্য সংগ্রহ করে নিতে পারে। কলকাতায় থাকার মধ্যে আছে কি? নিচে ঘাস, উপরে আকাশ। রসগ্রাহীর কাছে দুটোই সজীব। ঘাস তার রঙ বদলায় ঋতুতে ঋতুতে। গ্রীষ্মের প্রতাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবুজ পরী তার ডানা দুটির উপর যে ক্রীম আপন হাতে তৈরী

করে মাখেন তাতে নীলের পরিমাণ দিতে থাকেন কম—রং প্রতিদিন হলদের দিকে চলতে থাকে।

এমন সময় হঠাৎ হয়তো একদিন অকাল বৃষ্টি হল। সঙ্গে সঙ্গে পরের দিনের প্রসাধনকালে সবুজ পরী আবার তার নাম সার্থক করার কথা স্মরণে ক্রীমে নীলের মেকদার বাড়িয়ে দেন।

কিন্তু যে-জন প্রতিদিন ঐ ঘাসের দিকে না তাকায়, সবুজের ধ্যানে অন্তত ক্ষণতরে নিমগন না হয় সে এই প্রাণবন্ত পরিবর্তনের রস থেকে হয় বঞ্চিত। শিপ্রা যাব থেকে প্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে সেই থেকে সে এ-রস চেখে আসছে। বিলেতে দুটো শীতকালে যখন মাঠ-বাট বরফে ঢেকে শ্বেতে শ্বেতে শ্বেতময়, তখন সে সেটার সৌন্দর্য উপভোগ করার সময় কিন্তু কলকাতার সে-সময়কার হলদে-ঘেঁষা সবুজ ঘাসের বিরহ-বেদনা অনুভব করেছে।

কলকাতার আকাশ অতিশয় সজীব। তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে হয় কৈশোরে—যখন জ্বর সর্দির ভয় কম—ছাতে শুয়ে। শহরের প্রদীপ যেমন যেমন নিভতে থাকে লাজুক আকাশবধূ তারই সঙ্গে সঙ্গে তারার মালা, অলঙ্কার একটির পর একটি পরতে থাকেন। হয়তো সে ঋতুতে প্রথমেই দেখতে পাবেন কেসিয়োপিয়া, কৃত্তিকা—সাতভাই চম্পা—কিংবা হয়তো বধূ প্রথমেই পরবেন কালপুরুষের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রমণিটি তারপরই সপ্তর্ষি। চক্ষু যদি নিদ্রাহীন হয় তবে স্পষ্ট দেখতে পাবেন অরুন্ধতী, তার স্বামী বশিষ্ঠের পাশে বসে ক্ষণতম মৃদুহাস্য করছেন মিটমিটিয়ে। হয়তো সে রাত্রে আকাশে তাঁর রঙ বদলাতে বদলাতে পরে নেবেন তাঁর মেখলা, নীবিবন্ধ আকাশ-গঙ্গা দিয়ে, দিগ্বলয়ের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত জুড়ে। সেই কটিবন্ধ থেকে ঝুলবে কত না অত্যুজ্জ্বল ক্ষীণ-জ্যোতি, মধ্যজ্যোতির মণিমাণিক্য। আর অভিসারিকার গতিবেগ এতই মৃদুমন্দ যে সেটা চোখেই পড়ে না। হঠাৎ দেখতে পাবেন পশ্চিমাকাশের একটি গয়না নেই—তার বদলে পূর্বাকাশে আর একটি উজ্জ্বলতর মণির স্তবক।

মর্ত্যের কোন্ রাজ-রাজ্যেশ্বরী অভিসারে যেতে যেতে এই ইন্দ্রপুরীর মণির মত ক্ষণে ক্ষণে অলঙ্কার পরিবর্তন করতে পেরেছেন।

কিন্তু হায়, এ-বধূ রাত্রি শেষে হয়ে যাবে বিধবা। উষস দেবীর আশীর্বাদ তার তরে নয়। তাঁর আগমনের আভাস পাওয়া মাত্রই বধূ সর্ব অলঙ্কার ধীরে ধীরে বর্জন করবেন। সর্বশেষে সর্বোজ্জ্বল শুকতারা মণিটি।

শিপ্রা এ-সৌন্দর্য উপভোগ করেছে বহুবার। আর সব বিষয়ে সে ইংরেজের মত কাঁটায় কাঁটায় চলে। নিত্যদিনের রুটিন কাজকর্মে কোনো কামাই দেয় না। শুধু ডাইরি লেখার বেলায় সে আর সর্ব বাঙালীর মত গাফিলীতে পরিপক্ক। সেই অনিয়মের ডাইরিতে, যেখানে শূন্যতারই রাজত্ব বেশী—

লেখা-পাতার ওয়েসিস সামান্য। সে কটির অধিকাংশে আছে আকাশের অভিসার যাত্রা।

হঠাৎ শিপ্রার মনে নূতন ভাবোদয় হল, হৃদয় মনের এই নবজাতক, এর কথা ডাইরিতে বলতে হবে।

ইতিমধ্যে অকালবৃষ্টি নেমে শিপ্রার পায়ের উপর সে-রাতের এবং প্রতি রাতের কীর্তির মত চুমো খেতে লাগলো। শিপ্রা চোখ দুটি বন্ধ করলো—"আহ!" পা সরাল না।

আর কীই বা দরকার! সে নেল্-পালিশ ব্যবহার করে না। আলতা মাখে কালেভদ্রে—নিতান্ত বুড়ী নাপতেনিটাকে নিরাশ না করার জন্য।

যেখানে মানুষ জানে, তার প্রিয়জন আসবেই আসবে, ঠিক সময়েই আসবে, এমন কি তার কিছু পূর্বেও আসতে পারে, সেখানে প্রতীক্ষার প্রতিটি মুহূর্ত মধুময়। কিন্তু যে স্থলে স্থিরতা থাকে না, আসবে কি আসবে না, সেখানে সন্দেহের দোলা হৃদয় মন অশান্ত বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তাই আরবী প্রবাদ বলে, "আল-ইন্তিজারু আশাদ্দু মিনা'ল মউৎ"—মৃত্যুর চেয়েও অধিক শক্তি ধারণ করে প্রতীক্ষা। কিন্তু মৃত্যু বা প্রতীক্ষা শিপ্রা-হৃদয়ের চেয়ে বলবান নয়।

দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজলো। বুকটা ধক্ করে উঠলো শিপ্রার। এ তো অসম্ভব। কীর্তি এখনো এল না!

মিনিট পাঁচেক কেটে গেল। আশ্চর্য!

কিন্তু ঐ তো হেড্-লাইটের জোর আলো গেটের উপরে পড়েছে। ছুটে গিয়ে গেট খুলে দেয় না কেন? দারওয়ানটা অতি নিষ্কর্মা। বৃথা পাঁচ মিনিটের উপর অযথা আরো আধ মিনিট। নাঃ! ঐত্তো।

শিপ্রা বেলকনি ছেড়ে সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়ালো।

স্বভাবতই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গেলে যে-উপরে দাঁড়িয়েছে তার পায়ের দিকে চোখ পড়ে। কীর্তি চেঁচিয়ে বললে, "এ কি? তোমার পা-ভেজা, শাড়ির অনেকখানি ভেজা। যাও, যাও। এখ্খুনি পা মুছে ফেলো—না আমি ভালো করে আচ্ছাসে রগড়ে রগড়ে বোন্ড্রাই করে দেব?"

শিপ্রা শান্ত কণ্ঠে বললে, "তুমি যখন রয়েছ—"

বুদওয়ারে ঢুকে শিপ্রা ডিভানে বসে পা-দুটি প্রসারিত করলো। বললে, "বাথরুমে বড় টাওয়েল আছে।"

সঙ্গে সঙ্গে দেখ তো না দেখ তো কীর্তি গেল আর এল।

পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বললে, "যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই। পেয়েছি একটি জলচৌকি—এই নাও। সেই মধুর চিন্ময় কবিতাটিকে এবারে সম্পূর্ণ মৃন্ময়

করা যাবে, এই সেই পাদপীঠ।

'পাদপীঠ 'পরে চরণ প্রসারি শয়নে বসিলা বধূ।'

কিন্তু কাপড় ছাড়ো, আগে কাপড় ছাড়ো। নইলে পা যে বার বার ভিজে যাবে।"

"কাপড় ছাড়ি কখন? তুমি যে রকম ক্ষিপ্র বেগে ঢুকলে আর ক্ষিপ্রগতিতে বেরুলে তাতে করে দোরের গোড়ার সঙ্গে তোমার কলিশন লাগলো জোর। ফলে ছিটকে এসে পেঁছিলে আরো স্পিলুট সেকেণ্ড পূর্বে। কাপড় ছাড়ি কখন? নিয়ে আসছি শাড়ি—কোনটা আনবো? এখানেই ছাড়ি।" সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটের উপর দুষ্টু হাসির আবেশ।

কীর্তির মুখের রঙ একটু বদলালো বোধ হয়।

শিপ্রা হাঁটু গেড়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "তুমি কি ভুলে গেলে, কীতা, মিতা আমি মমারুত্রের মত রন্দি পাড়ার বন্ধ পাগল মুক্ত পাগল আর্টিস্টদের পাঁচতলা ছ'তলার উপরকার স্টুডিওতে আনাগোনা করেছি পুরো একটি বছর। ঐ সব আকাশ-ছাঁয়া চিলকুটুরির থেকে বাইরে তাকালেই চোখে পড়ে মুক্ত-প্রকৃতি. নগ্ন আকাশ। কুটুরির ভিতরেও তাই। তারা "প্রকৃতাবস্থায়" প্রকৃতিদত্ত রূপে কেউ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে পোজ দিচ্ছে, কেউ পড়ি পড়ি সোফাটার উপর অঘোরে ঘুমুচ্ছে, কেউ এক কোণে কফি বানাচ্ছে। আমি যে শেষ পর্যন্ত 'অপ্রকৃতাবস্থায়ই' রয়ে গেলুম তার একমাত্র কারণ, মডেল হয়ে পোজ দিতে গিয়ে ওরা সর্বপ্রথম ন্যুড হয়। দি রেস্ট ফলোজ। আমি কখনো পোজ দি নি।...আচ্ছা কোন্ শাড়িটা পরে আসবো।"

তন্মুহূর্তেই অচিন্ত্য উত্তর "সেই জরি পাড়ের নীলাম্বরী।"

শিপ্রা চিন্তার ভান করে বললে, "সেটা তো ভেজা নয়।"

? ? ?

শিপ্রা বললে, "ওহো, তুমি তো পদাবলী রসের সোয়াদ জানো না, তবু তোমার সহজিয়া রসানুসন্ধানবৃত্তি তোমাকে ঠিক পথেই নিয়ে গিয়েছে। বুঝিয়ে বলি; আমি যদি নীলাম্বরীই পরি, তবে তার মূল রসটি অপূর্ণ থাকবে কেন। সে-শাড়ি ভেজা না হলে তুমি গাইতে শিখবে কি করে,

চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি

পরাণ সহিত মোর

এই আটটি মাত্র শব্দের মাধুর্যবৈভব প্রথম শ্রবণে কে না বিচলিত হয়েছে!

শিপ্রা বৃথা বিনয়াসক্ত নয়। নীলাম্বরী পরে নিয়ে তবু বললে, নীলাম্বরী পরতে হলে যতখানি শ্বেতাম্বরী হতে হয় আমি ততখানি ফর্সা নই।

কীর্তি চোখ বন্ধ করে আটটি শব্দে মেশানো রসের ককটেল চুক চুক করে চাখছে।

ওরে কীর্তিনাশ, বুদ্ধিনাশ, এ আটটি শব্দের রস গ্রহণ করার তরে একটা মানুষের একটা যৌবন যথেষ্ট নয়। ক'বার ক'টা যৌবন-জ্বালা সইতে হয় কে জানে?

শিপ্রা বললে, "মডেল হয়ে পোজ দি নি, ভেবো না তাই আমি গঙ্গোত্রীর জলে ধোয়া তুলসী পাতাটি।...সেটা বোধ হয় তুমি ইতিমধ্যে খানিকটে হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছ। নইলে আজ তুমি পাকী পাঁচ মিনিট লেটে আসতে না। কিংবা আমি এরি মধ্যে বাসি ফুল।"

কীর্তি চুপ করে শুনলো। অভিযোগের জবাবে কোনো সাফাই গাইলে না। হয় তো ভেবেছে, খুদ কোতোয়ালই যখন জানে তার মগজ গড়া ফরিয়াদ বিলকুল ঝুটমুট ঝুটা তখন বেকার তাবৎ বাৎ বজ্রসেনের।

শিপ্রা বললে, "বেয়াত্রিচে কি জানালো।"

"অনেক কথা। খান আর আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। এই ঘুঘু লারীটা ইয়েহিয়ার গুপ্তচর। মোটামুটি যে কটা তথ্য জানতে এসেছে তার প্রথম, ইয়েহিয়া মুজীবে যদি সমঝোতা না হয়, এবং ইয়েহিয়া দমননীতি চালায় তবে পশ্চিম বাঙলার হিন্দু মুসলমান পূব বাঙলার বিদ্রোহীদের প্রতি সমর্থন জানাবে কি? জানালে কতখানি? নকশাল পন্থীদের বন্দুক বোমা আছে? তারা সেগুলো পূব বাঙলায় পাঠাবে কি? আর কোন্ কোন্ রাজনৈতিক দলের অস্ত্রশস্ত্র আছে? পশ্চিম বাঙলা জনগণ কিংবা/এবং সরকার ভারত সরকারের উপর চাপ দেবে কি—পূব বাঙলাকে 'অল্ আউট' সাহায্য দেবার জন্য? দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান মতিগতি কি সে সম্বন্ধে লারী অলরেডি ওকীবহাল। লারী নাকি বিদ্রূপ করে মির্জাকে বলেছে, 'বুন্দুর পাল রাজত্ব করে দিল্লীতে। পূব পাকে বিদ্রোহ দেখা দিলে ঐ তো তাদের আল্লার পাঠানো বেহেস্তী মোকা—পূব বাঙলাকে পুরো মদদ দিয়ে বিদ্রোহ সফল করা, সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করে পশ্চিম পাককে চিরতরে দুবলা কমজোর করে দেওয়া। এই সামান্য তত্ত্বটি তারা এখনো সমঝে উঠতে পারে নি। তবে এ-কথাও সত্য, অবসরপ্রাপ্ত জেনরেল কল-এর মত কিছু জঙ্গী আদমী বলছেন, পূব বাঙলার বিদ্রোহ একটুখানি ছড়িয়ে পড়লেই সেখানে বিনা বাক্যব্যয়ে যুদ্ধে নেমে পড়ো। পূব বাঙলাকে স্বাধীন করে দাও। পশ্চিম পাক প্রান্তে আক্রমণ করবে না। সেখানে ডিফেনসিভ স্ট্রাটেজি।

দ্বিতীয় বৃহৎ প্রশ্ন, মির্জার মত যথেষ্ট বাঙালী মুসলমান পশ্চিম বাঙলায় আছে কি, যারা দিল-জান্ দিয়ে 'অখণ্ড পাকিস্তান'কে দ্বিখণ্ডিত হওয়ার বিরুদ্ধে জোর প্রপাগাণ্ডা চালাবে? তারা সন্তর্পণে অর্ধপ্রকাশ্যে হুইসপারিং প্রপাগাণ্ডা চালাবে তো, যে ভারতের স্বার্থ পূব বাঙলাকে সাহায্য না করা। পূব বাঙলা পাকিস্তান থেকে কেটে পড়লে দক্ষিণ ভারত ঠিক ঐ নজীর দেখিয়েই উত্তর

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কেটে পড়বে।"

শিপ্রা চুপ করে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সব-কথা শুনে যাচ্ছিল। তার মনে পড়ল ফ্রান্সের সেই বুড়ো জেনারেল তার পিতাকে বলেছিলেন, "রাজনীতি যখন দেউলে হয়ে যায় তখন সে-রাজনীতির উদ্দেশ্য সফল করতে হয় অন্য মাধ্যমে, অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে, অর্থাৎ পুরোপুরি সংগ্রাম চালিয়ে।" তার মনে চিন্তা এল, ইয়েহিয়া ঢাকায় যে রাজনীতির চাল চালছে তাতে লীগ কিস্তিমাত হবে না। অতএব দমননীতি অনিবার্য। কীর্তিকে শুধলো, "তোমাদের পকেট-ক্লাবে তোমাদের সঙ্গে বসে তো মাত্র একটি মাদ্রাজী—রঙ্গনাথন। সে কি বললে?"

কীর্তি উৎসাহিত হয়ে বললে, "তুমি সত্যি সত্যি অদ্ভুত একটা সিক্স্থ সেন্সের মালিক। নানা প্রকারের ইঙ্গিত সত্ত্বেও যখন সদানীরব তামিল সন্তান রাম-গঙ্গা কিছুই বললে না, তখন সে যখন টয়লেট যাচ্ছে তখন লারী তার সঙ্গ নিয়ে তাকে করলে ফ্রন্টেল্ এটাক্ কিন্তু ওর জিভের আর্তরাইটিস সারাবে, লারী! আমাকে অবশ্য লারী সম্বন্ধে তার মন্তব্য প্রকাশ করলো দুটি শব্দে 'নোজী পার্কার'।"

শিপ্রা বললে, "তার মানে টিকটিকি বিভীষণ, রঙ্গনাথন সেভেনথ্ সেন্স্ ধরে। তোমার সম্বন্ধে তার কি ধারণা জানো? মাস তিনেক পূর্বে আমারই এক পার্টিতে ওর পাশে গিয়ে বসেছি এমন সময় তুমি লন ক্রস করছিলে তখন, অব্ অল থিংস, বলে কি না, 'আমি যদি মেয়েছেলে হতুম তবে ঐ চ্যাপিটাকে নিশ্চয়ই বিয়ে করতুম'।"

কীর্তি বললে, "শূর্পণখার দেশে মেয়েরাই পুরুষকে তাড়া লাগায়। আর্য রামচন্দ্র, আদি কবি বাল্মীকি এ তত্ত্বটা জানতেন না বলে মেয়েটাকে নির্লজ্জা, বেহায়া ঠাউরে তাকে নিয়ে মস্করা করেছেন। দাঁড়াও, আমি বেয়াত্রিচেকে একবার ফোন করি। আজ তার অফ্ ডে বটে, বাড়ি ফেরার পথে তবু একবার ঢুঁ মেরে যাবে বলেছিল। আমাদের দুই ইয়েহিয়া-দাসের হালটা কি।"

ফরাসী কেতার বেডরুমে রোমানসের মৃদু সুবাস। সেখানে ফোন।

শিপ্রা তাড়াতাড়ি জলচৌকিটা সরালে এ ঘর থেকে। পাতল একখানা ডবল সাইজের শেতল-পাটি, করডুরয়ের ওড়ওলা কুশন—ওগুলো অতটা পিছলোয় না—এক প্রান্তে ছোট্ট শ্বেত পাথরের রেকাবিতে দুটি চাঁপা ফুল, অন্য প্রান্তে মুরাদাবাদী পানদান। নিজে শুয়ে পড়ল ঠিক মাঝখানে। বাঁ হাতে লম্বা হাণ্ডিলওলা আণ্ডাশেপের মসৃণতম রুপোর হাত-আয়না—ফরাসী স্টাইলের, অন্য হাতে বাজু সোনার পাতে মোড়া হাতির দাঁতের সিলেটী চিরুনি।

কীর্তি ফিরে এক নজরে সব দেখে বললে, "আহ্! এই তো দিল-আরাম গুলিস্তান, আর তুমি পরী—"

"নীলবসনা সুন্দরী—"

"বলো কি? ও-বই তো ছেলে-ছোকরারা পড়ে। মেয়েরাও?"

"অন্তত আমি। আর মনে হচ্ছে, তোমার ঐ ভিন্-দেশী টিকটিকিটি পাঁচকড়ির অরিন্দম—না কি যেন নাম—তার শাকরেদি করতে পারেন পাকা চুলে পেঁছিনো অব্দি।"

"ক্লাবে আমাদের পকেট-ক্লাব কেটে পড়েছে। ওদের সঙ্গ দিচ্ছে একমাত্র খান।"

"খান! বলো কি?"

"সে আজই স্থির করেছে, সুপার টিকটিকির পার্ট নিয়ে দুই ঘুঘুকে পাম্প করবে। মুখে 'জানি নে জানি নে' বললেও সে ইসলাম ও তার ইতিহাসের অনেক গভীরে ডুব মেরেছে। সেইটে ভাঙিয়ে বলবে কনফিডেন্স্ ট্রিকস্টার!" তারপর অতিশয় গম্ভীর মুখে ধীরে ধীরে বললে, "আজ সন্ধ্যায় কিন্তু বেয়াত্রিচে একটা মারাত্মক খবর দিয়েছে। সে নিজেই নাকি প্রথমটায় বিশ্বাস করতে পারে নি—ঘুঘু যখন মির্জাকে তার 'মরাল' চড়াবার জন্য তাকে বললে, ইয়েহিয়া এসেছে লীগকে স্রেফ ধাপ্পা মারতে। সমঝোতার কথাবার্তার বাহানায় ইয়েহিয়া শুধু সময় নিচ্চে, পাঞ্জাব-পাঠান সৈন্য আনতে। এবং শুধু তাই নয়, লীগ যদিবা স্ট্রাটেজি হিসেবে কিংবা মঙ্গলের জন্য ইয়েহিয়ার সর্ব শর্ত মেনে নেয়, তবুও ইয়েহিয়ার জুন্টা স্থির সমস্ত পূব বাংলার উপর দিয়ে মিলিটারি স্টীম রোলার চালাবে।"

"তার অর্থ?"

"সরল। যে-পরিমাণে ট্যাঙ্ক, আর্মাড কার আনা হচ্ছে তার থেকে বোঝা যাচ্ছে তামাম দেশটাকে খাকছার করে দেবে। অবশ্য অতখানি সবিস্তার লারী বলে নি। তাই বেয়াত্রিচের মনে ধোঁকা, সে ঠিক ঠিক শুনতে পেয়েছে কি না, বুঝতে পেরেছে কি না।"

শিপ্রা বহুক্ষণ হল আরশি চিরুনি এক পাশে রেখে দিয়ে পুরো মন দিয়ে প্রত্যেকটি শব্দ গ্রহণ করছিল।

উভয়ই অনেকক্ষণ ধরে আপন আপন মনে চিন্তা করছিল।

শেষটায় শিপ্রা বললে, 'ওখানে আন্দোলন হলে পশ্চিম বাঙলা নির্লিপ্ত থাকতে পারবে না।" তারপর শুধোলে, "আচ্ছা, বেয়াত্রিচে এ-ব্যাপারে অত উৎসাহী আর কৌতূহলী কেন?"

"ঠিক ঐ প্রশ্নটাই আমি ওকে শুধিয়েছিলুম। বললে, সে তার মার কাছে ক্লাস টেন্ অবধি পড়েছিল। তখন তাদের ইতালিয়ান রচনা সংকলনে ছিল মাদসীনির বক্তৃতা—স্বাধীনতা সংগ্রামের যুবাদের উদ্দেশে। সেগুলো তার মনে এমনই গভীর দাগ কেটেছে যে সেই সময় থেকে পৃথিবীর যেখানেই যে

জাতই স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেয় তখনই তার প্রতিটি খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। রাত্রে নাকি আবার মাদসীনির ভাষণ পড়ে তাঁর প্রতি তার শ্রদ্ধা আরো বেড়ে যায়।"

"খানদানী রক্ত আছে তার শরীরে। ও ক্লাব-বার-এর রানী, কিন্তু তোমাদের বার-এট-ল'র বারের চেয়ে আভিজাত্যে কোনো অংশে কম নয়।... কিন্তু আজ এ-আলোচনা এখানেই থাক। আমাকে চিন্তিত তো করেই, পীড়াও দেয়।"

কীর্তি সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল। হঠাৎ পানদানটার দিকে আঙুল তুলে শুধলো, "ঐ মুরাদাবাদী-তাজমহলটি পেলে কোথায়?"

"উনি ছিলেন বাবার ঠাকুমার নিত্যসহচরী। তুমি মাঝে মাঝে পান চিবোও বলে তোমার অনারে ওঁকে আলমারির উচ্চাসন থেকে নামিয়ে আমাদের সমাসনে বসিয়েছি।"

"তুমিও তো—"

"সে অতি কালে কস্মিনে। নেমন্তন্নের ভোজে বড্ড বেশী ঘি চর্বি থাকলে মুখটাকে পরিষ্কার করার জন্য? বাড়িতে একা একজনের জন্য পান রে, সুপুরি রে অত বায়নাক্কা সয় কে? হ্যাঁ, আগরতলা যাচ্ছো কবে?"

"বাইশ কিংবা তেইশে।"

"আমাকে ঠিক ঠিক জানিয়ো অন্তত একদিন আগে। তুমি আমাকে পিক আপ করবে, না আমি নিজে সোজা দমদমা যাবো। উয়েদার খারাপ হলে কিন্তু আমার গা গুলোয়।"

কীর্তি নির্বাক, স্তম্ভিত। সে তার প্রেমনিবেদন ভিন্ন অন্য সব অনুভূতি—ভয়, বিস্ময় ঘৃণা কোনো অনুভূতিই তার চোখে মুখে প্রকাশ করে না। কিন্তু আজ এখন তার বিস্ময় তাকে এমনি অভিভূত করলো যে সে-বিস্ময় যেন তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়লো।

শিপ্রা তো লক্ষ্য করবেই। তবু সহজ সুরে বললে, "কেন, কি হল?"

কীর্তি সহজ সুরের অন্য দিক-প্রান্তের শেষ সীমানায়। জাত ইডিয়টের মত চি চিঁ শব্দ করলে, "তুমি, তুমি যাবে?"

শিপ্রা যথেষ্ট সচেতন—কীর্তির মগজে তখন কোন্ ভূতের নৃত্য আরম্ভ হয়েছে। তবু সুন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, "বা, রে! তুমি ওটা ধরে নাও নি? অবশ্য তোমার সব ট্রিপে তোমার সঙ্গে সর্বত্র যাব তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এবারের যাত্রায় রয়েছে খান। এ রকম হোস্ট্ কোথায় পাবো আমরা? একবার একটা ছোট স্টেশন থেকে গাড়ি বেরিয়ে পড়েছে এমন সময় ধরা পড়লো হুইস্কির ন্যাজ সোডা ফুরিয়ে গিয়েছে। অমনি হোস্ট্ খান লম্ফ দিয়ে এলার্ম চেনের দিকে। সবাই চেঁচালো 'করো কি করো কি?

সামনেই সিলেটের সব চেয়ে বড় জংশন কুলাউড়া। ততক্ষণ জল দিয়েই হবে।' খান গাড়ি থামালো, চাকরকে ছোটালো স্টেশনে সোডার জন্য। গার্ডের হাতে ক'শ টাকা জমা দিয়েছিল সে নিয়ে মতভেদ আছে। বলেছিল, 'এই নাও, জরিমানার পঞ্চাশ টাকা, বাকিটা রইলো আরো জরিমানার জন্য। যতক্ষণ না বেয়ারা সোডা নিয়ে ফেরে ততক্ষণের ভিতর তুমি গাড়ি চালালেই ফের চেন টানবো।' গেস্টদের মধ্যে ছিলেন, আসামের আই. জি একজন ডাক্তর সেক্রেটারি, ল' এ্যান্ড অর্ডারের হর্তাকর্তা। এরা গার্ডকে মুখ দেখান কি করে? সবাই নাকি উল্টো দিকের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের অন্ধকারে মুখ ঢেকে ছিলেন।"

হঠাৎ শিপ্রা টানটান সোজা হয়ে বসে স্থির দৃষ্টিতে কীর্তির দিকে তাকিয়ে এবারে যেন—ইংরিজিতে যাকে বলে 'থিক্ অব্ দি ব্যাট্‌ল্', বিরাট রণক্ষেত্রের যে-অংশে লড়াই চলছে প্রচণ্ডতম প্রতিযোগিতায় এবং ঐখানেই খুব সম্ভব জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হবে—সে-জায়গায় পেঁছে বললে, "শোনো শ্রীযুত কীর্তিমান রায়চৌধুরী, তুমি ভাবছো এ-মেয়েটা এগিয়ে গিয়ে স্বেচ্ছায় লোক-নিন্দা গায়ে মাখতে যাচ্ছে কেন? তবে শোনো। এক নম্বর—" বলে ফরাসী কায়দায় ডান হাতের তর্জনী বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের উপর রেখে বললে, "আমি প্রথম দিনই তোমাকে স্পষ্ট বলেছি, সমাজের কুৎসা—আই কেয়ার এ ফিগ্ এ পিন, এ জট্, এ টিটল—"

বলে মারলে তুড়ি। ফের তর্জনীটি অনামিকার উপর রেখে বললে, "দুই নম্বর: আমরা যেমন যেমন ঘনিষ্ঠতর হব, কুৎসার নানা রকম বেরকমের ধ্বনি জেগে উঠবে চতুর্দিক থেকে যে-রকম ফিলারমনিক অর্কেস্ট্রায় হয়। বেজে উঠবে আরো যন্ত্র, আরো ধ্বনি, বাড়তে থাকবে ধ্বনির বৈচিত্র্য, ভল্যুম, উচ্চতা এবং শেষটায় পেঁছিবে ক্রেসেণ্ডো-তে—সর্বোচ্চস্তরে—যখন একসঙ্গে সব-কটা যন্ত্র তীব্রতম তুমুল নাদে হল্ ভরে দেবে।

আমি আগরতলা গেলে ফিরে এসেই শুনবো কনসার্ট ক্রেসেণ্ডোতে।" ফের মারলে তাচ্ছিল্যের তুড়ি।

এবারে মধ্যমা। "তোমার কি লোকনিন্দা হবে—"

এতক্ষণে কীর্তির কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হয়েছে। বাধা দিয়ে বললে, "সেটা আমাকে বলতে দাও, তোমার যদি আপত্তি না থাকে।"

বিনীত কণ্ঠে আবার যেন শিপ্রা নিবেদন করলো, "তাহলে তোমার কোনো ইচ্ছা, কোনো নির্দেশে আমার কোনো আপত্তি থাকতে পারে না-না-না। আমি চলবো তোমার আদেশে। আমার অভ্যাস—সেটা বিধিদত্ত—আমার বক্তব্য আমি স্পষ্ট ভাষায় জোরদার গলায় প্রকাশ করি। আসলে তুমি জোরদার, ঢের ঢের বেশী জোরদার।

এখন যদি বলো, 'না তুমি আগরতলা যাবে না' আমি নত মস্তকে সে-আদেশ মেনে নেব—এবং আমার অনুভূতির কোনো পরিবর্তন হবে না। তার পর বসে বসে প্রহর গুনব। কবে তুমি ফিরবে। তখন সেটা ধুমধামে করবো সেলিব্রেট। তুমি নিজেই স্বীকার করবে, তোমার আদেশ আমার হৃদয় মনে কোনো জায়গায় আঁচড়টি পর্যন্ত লাগে নি।"

এবারে কীর্তি বললে, "আমার সামাজিক নিন্দার কথা তুলেছিলে? তুমি বহুদর্শী—তোমার মুখে এটা আদৌ মানায়। পুরুষের কুৎসা রটনা—তার আয়ু ক'দিন? জলের তিলক কপালে কাটলে শুকোতে যতক্ষণ লাগে—বরঞ্চ বলি জিন্-এর। ওটা স্পিরিট, উপে যায় তড়িঘড়ি। দেখতে পাও না, এ-দেশের নিত্য দিনের ট্রাজেডি—এমন সব পাষণ্ড যাদের কোনো কুকীর্তি কারো অজানা নয় তাদের হাতে আমরা নিত্যনিয়ত সঁপে দিই না সদ্য ফোটা শিউলি ফুলের মত সরল নিষ্পাপ বধূদের?

আমার বদনাম! খতিয়ে দেখলে শুনবে, অনেকেই আমাকে হিংসে করছে, কেউ কেউ আভাসে ইঙ্গিতে তোমার কাছে আমার এমন সব বদ-অভ্যাস কুকর্ম কেচ্ছা—যে-গুলোর সঙ্গে জীবনে আমার কখনো পরিচয়ই হয় নি—দূর থেকে সন্তর্পণে এগিয়ে দেবে; সেখানে আমার চিন্তা করার কিছুই নেই। তুমি আমাকে ভালো করেই চেনো—আমার কোনো দুর্বলতা তোমার অজানা নয়। ফার্সীতে বলে, 'দুশমন কি করতে পারে, দোস্ত যদি মেহেরবান হয়?'—দু'চার জন বন্ধু আমার এমন আছে যাদের শরীরে মনে যথেষ্ট বল আছে এবং দরকার হলে যারা সঙ্কলের সামনে দু'পাঁচ জনকে ঠ্যাঙাতে হামেহাল তৈরী—তা তারা তাদের সামনেই হোক্ আর আড়ালেই হোক্ তোমার আমার সম্বন্ধে অপছন্দসই কোনো মন্তব্য করলে। কিন্তু এ কথাটার উল্লেখ করলুম, নিতান্ত কথায় কথায়, এটা অবান্তর।

আর অগুনতি লোক তোমার রুচির খুব একটা প্রশংসা করবে না, তুমি আমার মত অপদার্থকে বেছে নিয়েছো বলে।"

শিপ্রা কোনো মন্তব্য করলো না। সর্বশেষ কীর্তি বললে, "কুকুর ঘেউ ঘেউ করে; কাফেলা এগিয়ে যায়। দি ডগ বার্কস, দি ক্যারাভান পাসেস।"

ষোড়শ অধ্যায়

বাগডোগরা এ্যারপর্ট পেঁছিবার পাঁচ মিনিট আগে হঠাৎ শিপ্রা দেখে, পালে পালে সাদা ছোট ছোট মেঘের টুকরো যেন তেড়ে আসছে তাদের প্লেনের দিকে। প্লেন ঢুকে গেল মেঘের রাজ্যে। আবার তেমনি হঠাৎ প্লেনটা ফাঁকাতে বেরুতেই শিপ্রা দেখে পূর্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত জুড়ে শ্বেত-শুভ্র

হিমালয়। কী বিরাট, কী মহান, কী গম্ভীর সে গিরিরাজ। অথচ অতি দূরে থেকে দেখছে বলে মনে হল যেন মাত্র গজ তিনেক খাড়াইয়ের এবড়ো খেবড়ো একটা দেয়াল, পৃথিবী ইসপার উসপার হয়েছে। পাঁচিলের উপরের প্রান্ত যেন অসমান ঝালর-কাটা—উচ্চতায় শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিশেষ তারতম্য চোখে পড়ছে না বলে পর্বত প্রাচীরের উপরের রেখা কাটা কাটা—নীল আকাশের পটভূমিতে পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত নিরবচ্ছিন্ন প্রসারিত হয়ে।

কিন্তু হায়, ভালো করে দেখতে না দেখতেই প্লেন রানওয়ের দিকে নামতে লাগল। দূরের এবং কাছের গাছপালার পিছনে বিরাট হিমালয় পর্যন্ত ঢাকা পড়ে অদৃশ্য হল।

শিপ্রার শরীর রোমাঞ্চিত। এ-রকম দৃশ্য সে জীবনে কখনো দেখে নি। তার দু'চোখ হরিষে বিষাদে ভরে গিয়েছে। তখন হঠাৎ মনে এলো কীর্তির কথা—বিস্ময়ে উত্তেজনায় তার কথা মোটেই মনে পড়ে নি, তার দৃষ্টি সে-দিকে আকর্ষণ করে নি। গোটা দুই খোঁচা দিয়ে বার বার শুধলো, "দেখলে, দেখলে?"

"তোমার মাথাটা যে-ভাবে জানলার উপর চেপে ধরে শার্সিটা চিবোচ্ছিলে সেটার মার্জিন ধরে আমি মাত্র একটা কোণ দেখেছি। কিন্তু এর আগে আরো কয়েক বার দেখেছি।"

শিপ্রার উত্তেজনা তখনো পুরো মাত্রায়; "আমি প্লেন থেকে আল্‌প্‌স্‌ দেখছি অনেকবার। উপর দিয়ে ফ্লাই করার সময় জিনীভার বিরাট লেক থেকে ছোট ছোট ডোবাগুলোর নাম পর্যন্ত পিন্‌ ডাউন করতে পেরেছি। কিন্তু এ-রকম ওভারহুয়েলমিং দৃশ্য কখনো দেখি নি—যেটা মানুষের সর্বচৈতন্য আচ্ছন্ন করে তার সত্তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দেয়। কিন্তু কী ট্রাজেডি। দু'মিনিট দেখতে না দেখতে সব কিছু ঢাকা পড়ে গেল।"

খান সান্ত্বনা জানিয়ে বললে, "কিচ্ছু ভয় নেই, শোক করার নেই। বাগ-ডোগরা থেকে আমরা যাবো গৌহাটি—অনেকখানি পথ—হিমালয়ের সমান্তরাল রেখা ধরে। পুরো পথ ধরে বাঁ দিকে গিরিরাজকে যত প্রাণ চায় দেখবে আর পেন্নাম করবে। কিন্তু কালো চশমাটা পরে নিও। নইলে চোখ ডেমেজড হতে পারে।"

শিপ্রা বিপুল বিক্রমে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, "কেন? পার্বতী কি তার পিতা হিমালয়ের মুখের দিকে তাকাতেন না—না তিনি গগল্‌স্‌ পরতেন। আর হিমালয়ের শুভ্রতা যার তুলনায় মসীতুল্য, তাঁর প্রাতঃসূর্যরুচি শ্বেতাম্বর বর শঙ্কর? শুভদৃষ্টির লগ্নেও কি তিনি গান্ধারীর মত চোখে ফেটা বেঁধেছিলেন?"

কীর্তি বললে, "ওরকম অলৌকিক কর্ম শুধু মেয়েরাই পারে। আমরা তো

নহি বধূ, নহি কন্যা।"

শিপ্রা ব্যঙ্গ করে টিপ্পনী কাটলো, "অ। বধূর জন্য পাদপীঠ সংগ্রহ করাতেই সর্ব সাধনা সর্ব কামনা শেষ? বলে দেব খানকে সব? কেন? চন্দ্রবংশের সংবরণ নাকে যেন সূর্যের মেয়ে তপতীকে রানী করতে চেয়েছিলেন বলে শ্বশুরমশাই সূর্যের দিকে অপলক চক্ষে তাকাতে তাকাতে উপাসনা করে প্রার্থনা জানান নি?"

শিপ্রা কান্নায় কান্নায় ভেঙে পড়ে আর কি! প্লেন ফের আকাশে ওঠামাত্রই ধরা পড়লো মেঘ আর কুয়াশা এ-প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত হিমালয়ের রূপরেখা ঢেকে ফেলেছে। দেবতারা কী অকরুণ, কী নিষ্ঠুর।

খান পুনরায় সান্ত্বনা দিয়ে বললে, "ও সব মেঘ কুয়াশার নুইসেন্স যে কোনো সময় কেটে যেতে পারে। ততক্ষণ নিচের দিকে তাকাও না—ব্রহ্মপুত্র নদ। ইনিও তো হিমালয়ের জন্ম নিয়ে, বাপের মত ঠায় দাঁড়িয়ে না থেকে দেশের পর দেশ অতিক্রম করে যাচ্ছেন, পথিকের তৃষ্ণা নিবারণ করে, তাঁর অংশাবতার জনপদবধূর কলসীতে ঢুকে তাদের কাঁখে আরামসে বসে আনন্দধ্বনি 'ছলাৎ ছলাৎ' করছেন। তার পর তিনি আদর করে কোলে তুলে নেবেন গঙ্গাকে —দু'পথ ধরে দুজনাই বেরিয়েছিলেন হিমগিরি থেকে।...শুধোইগে পাইলটকে ঐ মেঘ বাবুদের গাত্রোৎপাটন করার আশু সম্ভাবনা আছে কি না।"

কামাখ্যার উপর দিয়ে যাবার সময় কীর্তি বললে, "এ জায়গার মেয়েরা বিদেশী পুরুষদের মেড়া বানিয়ে রাখে।"

শিপ্রা বললে, "আমাকে এখানে নামিয়ে দাও। ভালো করে দেখে নিক সব্বাই, সত্য সত্য তিন সত্যের মেড়ী কাকে বলে।"

কীর্তি বললে, "আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি, জোর গলায়, তোমার যা ইচ্ছার জোর, উইল-পাওয়ার আছে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু তোমার অনিচ্ছায় তোমাকে স্বর্গ ইন্দ্রাণী উর্বশীর আসনে বসাতে পারবেন না, মর্ত্যে চার্মিং মার্লেনে ডীটরিষ, সুঈট, লিলিয়ান হার্ভের মাধুর্য দিতে পারবেন না। নরকে যমরাজার পাটরানী যমীর কথা দূরে থাক। আর তোমার ইচ্ছা থাকলে তুমি মেড়ী, নেড়ী, ভেড়ী যা খুশী তাই হবার শক্তি ধরো—অর্থাৎ কারো তোয়াক্কা না করে। তুমি তো কলকাতাতে এখনো এক পাল মেড়া পোষো—"

শিপ্রা বাধা দিয়ে বললে, "থ্যাঙ্ক ইয়ু। কিন্তু বলো তো, আমি কি হতে চাই?"

কীর্তি চিন্তিত মনে আসমান-জমীন অনুসন্ধান করতে লাগলো।

শিপ্রা ডান দিকে একটু সরে বসে কীর্তির উরুতে হাত রেখে বললে, "কীর্তিপ্রিয়া।"

পেটুক গাণ্ডেপিণ্ডে খেতে খেতে মারা গিয়েছে তবু ভোজন কর্মে বিরতি দিতে পারে নি, এ-দৃশ্যটি প্রাচীন দিনের বহুবাম্নভোজনের একাধিক পরিবেশক চোখের সামনে দেখেছেন বলে দাবি করেন। কিন্তু স্পর্শকাতর রূপের পূজারী, সুন্দরের পিয়াসীদের সামনে প্রকৃতি অকৃপণ হস্তে ছবির পর ছবি, দৃশ্যের পর দৃশ্য, রূপের পর রূপ ঢেলে দেন তবে সে বেশীক্ষণ সে-দিকে তাকাতে পারে না। তার হৃদয় তখন আকুলিবিকুলি করে প্রত্যেকটি দৃশ্যের রস দিয়ে সে-যেন তার হিয়া রাঙিয়ে নিতে পারে—শ্রীকৃষ্ণ যে-রকম সুন্দরী রাধাকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, 'রাধে, তোমার চোলির রঙ দিয়ে আমার মস্তকাভরণ রাঙিয়ে দাও, (রাধা কি তবে ভ্রমবশত, না স্বেচ্ছায়, বুক চিরে তারই রক্ত দিয়ে কানুর মস্তকের চূড়া লালে লাল রঙিয়ে "কৃষ্ণচূড়া"র জন্ম দিলেন ?')—যাতে করে দুর্দিনে প্রাণের রসধারা যখন শুকিয়ে যায় সেই দারুণ দহন বেলায় এ-সব দৃশ্যের একটি একটি স্মরণে এনে নিজের ভাগ্যকে ক্ষমা করতে পারবে।

নিশ্চল হিমালয়, সচল ব্রহ্মপুত্র, বুকের উপর কত শত দ্বীপ শিশুর মতো প্রতিদিন বেড়ে বেড়ে বড় হয়ে উঠছে, জলের উপর ফোলা পালের স্ফীতবক্ষ বিশাল নিতম্বা মহাজনী নৌকার সারি যেন ডিমের খোসার সাইজ আর ওদেরই মত হেলে দুলে নির্ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, চরের পরিবর্তে হঠাৎ জেগে উঠছে, মাথা উঁচু করে ক্ষুদ্রায়তন উমানন্দ পাহাড় কিন্তু তার আকস্মিক অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব বুকে লাগায় চমক, গোয়াল পাড়ার ঘন সবুজ বাঁশ বেত আম-কাঁঠালের মাঝখান থেকে দাঁড়িয়ে উঠেছে হাজার হাজার অবঙ্কিম ঋজু গুবাক বৃক্ষের শুভ্রতা। কত দেখবে পিয়াসী শিপ্রা।

সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

গৌহাটি, শিলচর শেষটায় আগরতলা। টসটসে ভেজা ব্লটিঙের মত তার সৌন্দর্য গ্রহণশালার ভাণ্ডারী আর কোনো নবীন রস নিতে সম্মত হয় নি। শুধু শিলচর থেকে ত্রিপুরা পাহাড়ের উপর দিয়ে প্লেন যাচ্ছে তখন কীর্তি ডান দিকে হাত বাড়িয়ে বললে, "এই তোমার বাল্য সখী বিল্‌কিস্‌-এর দেশ, সিলেট !"

ধড়মড়িয়ে উঠে দেখে, বিল্‌কিস্‌ সত্যি বলেছিল, ফ্ল্যাট পূব বাঙলার মত সবুজে সবুজ তো বটেই, মাঝে মাঝে উঁচু নিচুর টিলাটালি, ক্ষুদে ক্ষুদে পাহাড়, আর সমস্ত দেশটা আঁকা-বাঁকা নদী-নালায় ভর্তি—সবুজ জেব্রার উপর ফালি ফালি ঘোলাজল স্বচ্ছ জলের ডোরা। মাঝে মাঝে আবার দিঘিও তো। না, স্মরণে এল বিল্‌কিস্‌ বলেছিল ওগুলো হাওর, লম্বা চওড়ায় অনায়াসে পাঁচ-সাত মাইল জুড়ে জল—মোস্ট ডেঞ্জারাস। শুধু দেখতে পেল না বিল্‌কিসের বর্ণনার ময়ূরের মত পেখম-মেলা বিরাট বিরাট কৃষ্ণচূড়ার নিচে, টিলার উপরে চা-বাগানের কলঘর, সানুদেশে চা গাছের ঝোপ, পাশের টিলার উপর ম্যানেজারের

নির্জন নিঃসঙ্গ ছিমছাম বাঙলো—প্লেন যাচ্ছিল খুবই উঁচু লেভেলে।

আগরতলার যে বাঙলোতে তারা উঠলে সেটা ওঠবার সিঁড়ি থেকে বাথরুমে জমাদার ঢোকবার দরজা পর্যন্ত সব-কিছু মেগনাম্ সাইজের। বাড়িটা বানিয়েছিল এক ইংরেজ—ত্রিপুরা থেকে বিশ্বের জুগুলোতে একদা সে হাতী সাপ্লাই করতো পাইকিরি হিসেবে, অন্য লোক যে-রকম ভেড়া-ছাগল বিক্রি করে। নীলকরদের কুঠীর মত এক একটা কামরা আস্ত এক একটা জলসা ঘর—ছাত যে কোন্ উঁচুতে দেখতে হলে দূরবীনের প্রয়োজন। তাবৎ বাড়িটা জুড়ে যেন হাঁ করে সব-কিছু গিলে ফেলে বিশাল বিস্তীর্ণ হল ঘর। প্রটেস্টান্ট্ ইংরেজ যেন ক্যাথলিক পোপের ভাটিকানকে পরাস্ত করতে চেয়েছিল। দেশে ফেরার সময় বাড়িটা বিক্রি করতে গিয়ে দেখে, ত্রিপুরার লোকের কাছে হাতী ঘরকী মুরগী বরাবর বলে তারা বর্মার রাজদত্ত "উপহার" শ্বেতহস্তী পোষার খরচটা সম্বন্ধে আগাপাস্তলা ওকীবহাল। অতএব শেষটায় এই শ্বেতোত্তর হস্তী ক্রয় করলেন আমাদের কলকাত্তাই খানের আব্বা সাহেব, বড়া খান।

শিপ্রা প্রথম পদার্পণের সময় এ-সব কিছুই লক্ষ্য করে নি। স্বপনচারিণীর মত বাথরুমে ঢুকল। বেরিয়ে সোজা ডাইনিং টেবিলে। সেখানে ইতিমধ্যে এসে গেছেন দুই ইয়ারের স্থানীয় ইয়ারের দু'পাঁচজন। সামনে গেলাস। শিপ্রা দেবীকে পরম ভক্তিভাবে নমস্কার জানিয়ে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আপন আপন গেলাস একটানে শেষ করে ফের নমস্কার জানিয়ে প্রসেশন-পদ্ধতিতে ইয়াররা বেরিয়ে গেলেন।

ক্লান্ত কণ্ঠে শিপ্রা শুধলো, "এরা পালালো কেন? আমি কি বাঘ?"

খান তাড়াতাড়ি বললে, "তুমি বাঘ না, তুমি ক্লান্ত। আর এরা যাবে কোথায়? বললেই আসবে, না বললেও আসবে। ওরা মফস্বলের লোক। তাদের দুশ্চিন্তা, বেগানা লোগর সাক্ষাতে বেগম সাবের সেবার (আহারাদির) তুরুট্ (ত্রুটি) হইতে পারে। বাদে তেনার লগে লগে আরাম করন লাগবো (শুতে যেতে হবে)।"

সীমান্তপারের পাকিস্তান থেকে এসেছে একাধিক বর্ণগোত্রের মাছ। কে বলে ভারত-পাকের সাধারণ জন জন্তু-জানোয়ারের প্রতি নির্দয়? ও-পার যাত্রী মা চিরতরে বিদায় নিচ্ছেন—পুত্র যেতে পারলো না তাঁর কাছে পাসপোর্ট ভিসার অভাবে। এ-পারের চাষা গিয়েছিল বর্ডার ক্রস করে ওপারে তার গুটি কবরেজের কাছে দাদীজানের জন্য "কফ্ নিবারণের" গুটি চারেক বড়ি আনতে। গুঁজে রেখেছিল পরনের দু'হাতী লুঙ্গির ট্যাঁকে। পড়লো ধরা। কস্টমসের ছোটবাবু তাঁর বিলিতি ফার্মাকপিয়ার ফিরিস্তিতে এই 'অসভ্য' ওষধির নাম—হল ডবল ফাইন। কিন্তু মাছের বেলা সদয়তর ব্যবস্থা—তার পাসপোর্ট লাগে না, তার ট্যাঁক কেউ খোলে না। 'কালো'তে এলেও

ইলিশের রং কালো হয় না, কই ধরা পড়ার ভয়ে, 'পাঙাশ' হয় না। দুটো বর্ডার ক্রস করে এসেছে খাসি পাহাড়ের কমলা নেবু।

শিপ্রা বললে, "মফস্বলের লোকের আহারাদি হয় মৌসুমে যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে। এখানে দেখি নেবুর দোসর আনারস।"

"তাই তো লোকে বলে 'বাঘের দুধও মেলে'। বাঘিনীও দুধ দেয় বিশেষ অবস্থায়। এখানে সর্বাবস্থায়—বাঘ তো পেটেবাচ্চা ধরে না—বাঘ ভী দুধ দেয়। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে অবস্থা বড়ই সঙ্গীন। বর্ডারে এখন আর রাইফেল-ধারী পুব বাঙলার পুলিশ নেই—তাদের স্থলে এসেছে মেশিনগান, নানাবিধ অটোমেটিক হাতে পাঞ্জাবী পাঠান আর্মিমেন—পশ্চাতে আর্মার্ড গাড়ি। কাছেই কুমিল্লা কেনটনমেণ্ট, ময়নামতীর ঘাঁটি। হাজার হাজার সেপাই অফিসার আবজাব করছে। পূর্বাঞ্চলে কুমিল্লাতেই পশ্চিমাদের সবচেয়ে ডাঙর কেনটনমেন্ট্।"

শিপ্রার আবছা আবছা মনে পড়ল, বাগডোগরা, এই আগরতলা এমন কি শিলচর কিছুটা দূরে হলেও সব কটাই ইণ্ডো-পাক বর্ডারের কাছাকাছি বলে সর্বত্রই এমন কি প্লেনের ভিতরও তার কানে এসেছে মাত্র একটি টপিক। সেটা রহস্যময় ও প্রশ্নে প্রশ্নে কণ্টকিত। সুন্দ মাত্র লীগকেই যদি শায়েস্তা করতে হয় তবে কামান কেন, ট্যাঙ্ক কেন, সাজোয়া গাড়ি কেন? তবে কি ইণ্ডিয়া এ টাক্ করার জন্য। তাই হবে। কারণ শেষ গুজোব, লীগ ইয়েহিয়াতে সমঝোতা হয়ে গিয়েছে। ভারত যদি আক্রান্ত হয়, চীন কী তবে ফের দুশ্মনী করবে?

আরো কত শত প্রশ্ন।

খেয়েই শিপ্রা মারলো ছুট—অনন্তকাল ধরে সে ঘুমুবে।

নিদ্রা-রেকর্ডে কুম্ভকর্ণের নাসিকা-গর্জন গোল্ড মেডল পেয়েছে কিন্তু রেকর্ড কৃত্তিবাস স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, ক্ষুদ্র নিদ্রাকর্মটি কিন্তু ছেঁদো। রইলেন শ্রীবিষ্ণু। অনন্তশয্যা। কিন্তু অবতার এবং/কিংবা অংশাবতার হয়ে যখন অবতীর্ণ হতেন। তন্দ্রাবস্থায়? হা, ধিক! শাস্ত্রাদির সম্যক অধ্যয়ন অসম্পূর্ণ রাখার কুফল বক্ষ্যমাণ পুস্তক।

তবু, অন্তত এটুকু বলা যেতে পারে সেই দিন-যামিনীর শিপ্রা নিদ্রা তার পূর্বতর রেকর্ড। তর্কাতীত ছ'লেংথে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছিল।

ঘুম একটুখানি কেটেছে মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে শিপ্রা অনুভব করলো, দুটি ছোট কোমল হাত—মেয়েছেলেরই নিশ্চয়—তার পা টিপে দিচ্ছে, কিন্তু চাপেতে যে-জোর, সেটা যেন পুরুষের। একটুখানি চোখ মেলে ক্ষীণালোকে দেখল, পাহাড়ী মেয়ে। এখানকার পাহাড়ীদের নাম কু কী—কিন্তু শিপ্রার মনে হচ্ছে, আর পাঁচজন বাঙালীদের মত গারো, লুসাই, কুকী সবই বরাবর।

কণ্ঠে অত্যন্ত বিরক্তি মিশিয়ে শুধোলে, "তোমাকে পা টিপতে বলেছে কে?"

কুণ্ঠিত কণ্ঠ; "কেউ না। আমার মিসি বাবা হায়রান হয়ে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়লে আমি তখন পা টিপে দিতুম। সে আরামসে বেশী ওক্‌ৎ ঘুমুতো। আমি আরো দু'মিনিট পরে চলে যেতুম—আপনার মালুম ভী হত না।"

বাঁচালে, বাবা। পা টেপো আর যাই টেপো, চুলটা তো আঁচড়ে দেবে। নইলে হাতের নড়া খসে যেত,—খুশী হল শিপ্রা।

"কটা বেজেছে?"

"গ্যারহ্‌ সে জ্যাদা।"

সর্বনাশ! ওদিকে কানে আসছে মফস্বলের বারান্দায় শ্যামবাজারী রকের তুফান।

হন্তদন্ত হয়ে উঠে বললে, "আয়া, তুমি ওদের গিয়ে বলো, আমি এখ্‌খুনি আসছি, ওদের কেউ যেন না পালায়" মফস্বলী এটিকেটের বাড়াবাড়ি অম্লান বদনে মেনে নেওয়াটাও এটিকেট নয়। "আর ফিরে এসে এখ্‌খুনি চুলটা আঁচড়ে দাও। আলোটা জ্বালো।"

সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ মাথার কোন্‌ অজানা কোণ থেকে একটা সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত তার মনে ভেসে উঠলো, "লারী যে মির্জাকে বলেছিল, তামাম পূব বাঙলার উপর স্টীম রোলার চালানো হবে সেইটেই ঠিক।" সে যখন গভীর নিদ্রায় অচেতন তখন তার অবচেতন মনে নানা গুজোব নানা তথ্যের কাটাকুটি করে সিম্‌প্লিফিকেশন অঙ্কের মত এই সরল রিজালটে পেঁচেছে। কিন্তু আশ্চর্য! এই নিয়ে এত যে বচসা, ভবিষ্যদ্বাণী ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে সে শুনলো, কেউ তো একবারের তরেও বললে না, ট্যাঙ্ক সাঁজোয়া গাড়ির ছয়লাপ, হয় ভারতকে ভয় দেখাবার জন্য কোনো গভীর কূটনৈতিক চাল, নয় সরাসরি ভারতকে আক্রমণ। সবাই বিনা চিন্তায় ধরে নিয়েছে, নিছক সোঁদরী কাঠের লাঠি নিয়ে লম্ফঝম্প করছে লীগ, যদি তাদের অন্য কোনো প্রকারের অস্ত্রের ব্যবস্থা থাকতো, তবে সেটা কস্মিনকালেও গোপন থাকতো না। অতএব ট্যাঙ্ক কামান ভারতের তরে—কিউ, ইউ, ডী। শিপ্রার মনে হল, তারা ওজনের আঁকে ধুরন্ধর পোদ্দারের মত অতখানি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যুক্তিতর্কের সিটিটাকে যাচাই করে দেখে নি। এরিথমেটিকের অঙ্ক কষেছে তার অবচেতন মন; এদের সচেতন মন যেন জিওমেট্রির স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে চলে গেছে জিওমেট্রিক টেনজেন্‌টে সরাসরি বিপরীত মুখে।

আয়া খোঁপাটা বাঁধলো কোন্ দূর বা নিকট পাহাড়িনী স্টাইলে সে-সমস্যার সমাধান না করেই ছুটলো বারান্দার হাইড পার্কী মিনি-মিটিঙের দিকে। দূর থেকেই লেডি-সুলভ মাঝারি গলায় বললে, "আপনারা কোনো তকলীফ করবেন না, প্লীজ। আমি এক পাশে বসে শুধু শুনবো।"

প্রথমটায় ওস্তাদী গানের অবতরণিকা আলাপের মত বাক্যালাপ কিঞ্চিৎ মন্দ মধুর ক্বচিৎ কাকলীর সুর ধরেছিল বটে কিন্তু পেটের ভিতরকার তরল দ্রব্যগুণ যাবে কোথা? দ্রুত তেতালে স্থগিত দারুণ সংগ্রামে তাঁরা ফিরে এলেন, দ্যাখ্ তো না দ্যাখ্, ডার্বি ঘোড়া ধূলির ঝড় উড়িয়ে।

সুস্পষ্ট দুটি দল। মধ্যপন্থা জনশূন্য। স্বয়ং চেয়ারমেন খান খনে ফ্রণ্ট বেঞ্চার খনে চেয়ার আসীন।

প্রথম পক্ষের বক্তব্য: ঢাকাতে সমঝোতা হয়ে গিয়েছে। মারপিট হবে না।

দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য: আদৌ হয় নি; হবেও না। ইয়েহিয়া জাত ঘুঘু। টালবাহানা দিয়ে সময় নিচ্ছে, শুধু আরো সৈন্যঅস্ত্রশস্ত্র জমায়েৎ করার জন্য।

শিপ্রা এ-সবের অধিকাংশই শুনেছে। বেয়ারিচে যা বলেছিল সেগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছিল মাত্র।

তুমুল তর্কযুদ্ধের সময় হঠাৎ এক এক সময় সবাই একসঙ্গে চুপ মেরে যায়।

সে-স্তব্ধতা ভাঙলেন একটি বয়স্ক মুসলমান। তিনি হংসমধ্যে বক। অবশ্য বকের মত জল খাচ্ছিলেন না, চুষছিলেন একটা নিম্বু পানি। বললেন, "একটা ঘটনা আমার কাছে বড় রহস্যময় ঠেকেছে। দিন কয়েক আগে দুটো পাঞ্জাবী সেপাই গিয়েছিল বাজারে। কী একটা সামান্য অজুহাত পেয়ে রাস্তার ছোঁড়ারা —হয়তো বা লীগের দু একজন ছিল—করেছে ওদের ডাহা বেইজ্জৎ। শেষটায় দু'জনারই পাতলুন—" মিয়া সাহেব যেন বিষম খেয়ে আচমকা থেমে গেলেন।

শিপ্রাই বুঝেছে সক্কলের পয়লা। অভয় বাণী শুনিয়ে বললে, "মৌলভী সায়েব, আপনার যা বলার অসঙ্কোচে বলে যান। আমি নাজুক, লজ্জাবতী লেডিদের একজন নই, যাঁরা কারো মুখে 'বাচ্ছা বিইয়েছি' শুনলে ভিরমি যান, তাঁরা "জন্ম দেন' ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার কাছে সর্বদাই প্রথমটাই প্রকৃতি-সম্মত এবং ভিরাইল ঠেকেছে।"

'মৌলভী সায়েব' কিন্তু সেদিক দিয়ে পাক্কা মডার্ন। ভদ্র রমণীর আদেশ অলঙ্ঘ্য। বললেন,—"পাতলুন কেড়ে নেয়। ভাগ্যিস অন্য হ্রস্বতর অঙ্গবস্ত্র পরনে ছিল, তাই মানে মানে ছাউনিতে ফিরতে পারলো।"

কেউ মৃদু হাস্য কেউবা অট্টহাস্য করলেন। শিপ্রা প্রথম শ্রেণীতে।

সায়েব বললেন, "কিন্তু আসল কথা, তারা ছাউনিতে ফিরে গিয়ে বন্দুক এবং ইয়ার-দোস্ত নিয়ে এসে বেধড়ক মার লাগালো না কেন, গুলি চালালো না

কেন, দোষী নির্দোষীকে অবিচারে—বে-ধড়ক? যা আকছারই হয়ে থাকে পাকিস্তানে। সেইখানেই তো রহস্য। তার কিছু করলো না, সেইটাই তো রহস্য।

এবারে শিপ্রা যেন আলোচনায় যোগ দিল। বললে, "শার্লক হোমসের অন্যতম রহস্য গল্পে আছে তিনি পুলিস ইনসপেকটরকে বললেন, 'রাত্রে কুকুরটার রহস্যময় আচরণের দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।' ইনসপেকটর আশ্চর্য হয়ে বললে, 'সে তো কিছু করে নি।' হোমস হেসে বললেন, 'সেইখানেই তো রহস্য'।" শিপ্রা থেমে গেল।

খান আর কীর্তি ছাড়া আর সবাই কৌতূহলী নয়নে শিপ্রার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো। এ-সজ্জনদের মাঝখানে মাত্র ওরা দু'জনাই জানে, শিপ্রা পয়েণ্টলেস, উদ্দেশ্যহীন গল্প বা উদ্ধৃতি কক্‌খনো ছাড়ে না।

মিঞা সাহেব কিন্তু ধরে ফেলেছে। সে হোমস পড়ে নি, তবু। কারণ তার বক্তব্যের সঙ্গে এটা মিলে যাচ্ছে। হয়তো বা তার এবং অন্য কিছুজনের গল্পটি স্মরণে এসেছে।

অন্য-সবাই স্কুল বয়ের মত পূর্বাপর সংযোগসহ সবিস্তার পূর্ণ বিবরণীর জন্য "গুরু" শিপ্রার দিকে তাকিয়ে আছে ব'লে সে বললে, "আস্তাবল থেকে দামী ঘোড়া গিয়েছিল চুরি, গভীর রাত্রে, অথচ সেটাকে পাহারা দেবার জন্য যে-কুকুরটা ছিল সেখানে, সে ঘেউ ঘেউ করে স্টেবল বয়গুলোকে জাগিয়ে তোলে নি। ডিটেকটিভ হোম্‌স্‌ তার থেকে অনুমান করলেন, চুরি করেছে কুকুরের কোনো ঘনিষ্ঠজন। পরে ধরা পড়লো, চুরি করেছিল জমিদারের আস্তাবল রক্ষক স্বয়ং—অসদুদ্দেশ্যে।"

মিঞা সায়েব সোৎসাহে বলল, "বিলকুল সহী বাৎ! সেপাই দুটো তার ভাই-বেরাদর, ইয়ার-দোস্তকে অতি অবশ্যই তাদের বে-ইজ্জতীর কাহিনী বলেছিল। তারা কিছু করলে না, কমাণ্ডান্‌ট্‌ও কিছু করলে না, এমন কি যেটা কম-সে-কম মিনিমামেস্‌ট্‌ সিভিল, পুলিসকে তদন্ত করার জন্য আদেশ করলে না। অর্থাৎ কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করলে না। বিগলিতার্থ যা স্বাভাবিক যা প্রত্যাশিত সেটা ঘটলো না। কেন?

অন্য গুহ্য খবর আমার না থাকলেও আমি এর থেকে এই অর্থই বের করতুম, কর্নেল কর্তা ওদের বুঝিয়ে বলেছেন,

এখনো তোদের সময় হয় নি।
যেথায় চল্‌লি যাস নি কো ধনি।

অর্থাৎ এ-তাবৎ প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও যে পরিমাণ সৈন্য পশ্চিম পাক থেকে যোগাড় করা হয়েছে সে-সংখ্যা দিয়ে লীগ এবং তাদের 'অন্ধ' সমর্থক পাগলা পাবলিককে শায়েস্তা করা যাবে না। তোদেরও সময় আসবে, মোকা পাবি

তোটা দিলসে জান্‌সে দাদ নেবার।"

ফিনফিনে ধুতি পাঞ্জাবি পরা ১৯২০/৩০-এর স্টাইলে চুলকাটা, ঘাড় কানের কাছে প্রায় কামানো এক ফুল-বাবু বললে, "অর্থাৎ, স্যাকরার টুং টুং, কামারের এক ঘা।"

মিঞাজী ভুরু কুঁচকে বললেন, "এক ঘা নয়, চক্কোত্তি। একশ' ঘা।"

এক সিলেটী কারবারি ফ্রান্‌স্‌ দেশে চালান দেয় কোলা ব্যাঙ। কুমিল্লার আশেপাশে খুদ শহরের সর্বাঙ্গে এন্তের বিজ্ঞাপন সেঁটেছে, এখানে কোলা ব্যাঙ ক্রয় করা হয়"; "কোলা ব্যাঙের" স্থলে কোনো কোনো বিজ্ঞাপনে আছে "ঘাড়ু ব্যাঙ"। এক খাস আগরতলী তাকে শুধলো, "কি ও হাজী, তুমি মুরগীর চালান বন্ধ করে দিয়েছ?" মিঞা হজ করার জন্য সুদূর মক্কা যাওয়া দূরে থাক, ঢাকা চাটগাঁ অবধি তার দৌড়। পরে এসেছে শার্ক স্কিনের পাতলুন, সিল্কের প্রিন্‌স্‌ কোট। এর অদ্ভুত "হাজী" ডাকনাম হল কি করে সে এক রহস্য এবং খাটো কান। শুধোলে, "কিতা?"

শিপ্রা কারো কথা কেটে আপন কথা কয় না। এস্থলে তার উত্তেজিত কৌতূহল ব্যত্যয় বাধালে। সঙ্গে সঙ্গে শুধলো, "হাজী সায়েব, 'কিতা' মানে কি?"

এ-তাবৎ ভদ্রা শিপ্রা কাউকে উপেক্ষা করে নি, আবার কারো প্রতি বিশেষ দৃষ্টিনিক্ষেপও করে নি।

হাজী তাই শিপ্রাবানুর নেক-নজর পেয়ে বিগলিত। কোমরে দু ভাঁজ হয়ে, বাও করে, ঘন ঘন কুর্নিশ ছেড়ে বললে, "জনাব বেগম-সাহেবা খানম-বানু, যে কোনো অর্বাচীন সিলেটী আপনাকে বলবে, 'কিতা' মানে 'কি'। আলবৎ। কিন্তু সেখানেই শব্দটার শেষ অর্থ খতম হয়ে দাঁড়ি কাটে নি। ওটা অনেক রহস্য ধরে। 'তুমি কিতা?' তার কতই না উত্তর হতে পারে—"

আর এক সিলেটী সেখানকার মদনমোহন কলেজের লেকচারার বললে, "গুরুর গানে যদি সামান্য পাঠান্তর করি"—বলেই দু'হাত দিয়ে দু'কান ছুঁলেন, অপরাধী যে-রকম মাফ চায়—"এবং বলি

'ওগো মিতা সুদূরের মিতা
আমার কী বেদনা জানো কি তা?'

তাহলে ঐ শেষ 'কি তা' সিলেটী 'কিতা'র রহস্য ধরে।"

শিপ্রা খুশী হয়ে দুই সিলেটীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার কীর্তি যাকে সে আদর করে 'কীতা' ডাকে তার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসলো।

হাজী পূর্বতর প্রশ্নের খেই ধরে বললে, "মুরগীর ব্যবসার ঠ্যালাতেই তো-

দাদা এখানে পালিয়ে এলুম। আমি লীগের রীতিমত সম্মানিত সদস্য। ওদিকে খুদ লীগ হাইকমাণ্ডের হুকুম কি না জানি নে, পাঞ্জাবী-পাঠানদের খানদানা সাপ্লাই বন্ধ করো। কিন্তু কার্যত গাঁয়ের লোকসুদ্দু এ্যামন ক্ষেপে গেছে, আমিও তাদের দলে, তাই ইচ্ছে থাকলেও মুরগী যোগাড় করতে পারি ক শ'?—ঐ কেনটনমেণ্টের তরে? ওটা তো অজানা থাকবে না। তার পর শা—সরি সরি—বড় কর্তা কর্নেল আমায় এত্তেলা পাঠালে—

কোরাস { বাপ্‌স্‌! সব্বোনাশা! কিতা কিতা! ইয়াল্লা!

ধুকুপুকু মুরগীবাচ্চার জানটা নিয়ে গেলুম কর্নেল সমীপে—'সুপুত্তুরে'র বাপ নিব্বংশ হোক! আমাকে এই মারে কি তেই মারে। আন্দেশা করছি, হিন্দুদের মত ধর্মপত্নীর সোনার কাঁকন-জোড়া খুলে আনলেই হত। বিক্কিরি করলে, এই মাগ্‌গির বাজারেও এক কেস স্কচ কেনা যায়। তারই নাকি এক বোতল পেটে ঢেলে 'ডাচ্‌ কারেজ' সঞ্চয় করে এলে হত। ব্যাটা—" শিপ্রার দিকে ক্ষণতরে তাকিয়ে সেলাম ঠুকে বললে, "ম্যাডাম! আপনি আমার এই 'অভদ্রস্থ' কথাগুলো এ্যাট্টুকুন মাফ করে দেবেন প্লীজ। 'য' ফলা শিখতে গিয়ে পাঠশালে পড়েছি,

'অশ্লীল কুবাক্য সদা মুখে ফোটে যার।
লোক সনে ঐক্য সখ্য রহে না তাহার'।"

শিপ্রা: "সাহেব, আপনি কি ভুলে গেলেন, আমি গোড়াতেই আপনাদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছি, আমি লেডি নই। আপনি দিল্‌ জাম্‌ ভরপুর করে গালাগাল দেন, আপনার ঐ কবিতার 'অশ্লীল কুবাক্য' এস্তেমাল করুন। আমার কলিজাটা নেচে উঠবে। ঐ হারামজাদারা আমার দু' চোখের দুশ্‌মন।"

হাজীকে তখন আর পায় কে? চেয়ার ছেড়ে উঠে অর্ধনৃত্য করে বললে, "শাবাশ, শাবাশ, ম্যাডাম। এবার আমার সত্য জ্ঞানোদয় হল আপনি নিকষ্যি কুলিন লেডি। আপনি পরমহংসী। পাতিহাঁস, পাতি নেড়ের মত পাতি লেডি এ-সব উত্তোমোত্তম ভাবব্যঞ্জক কটুবাক্য শুনে কানে আঙুল—অবশ্য ফুটো দুটো পুরোপুরি বন্ধ করেন না, কারণ তাঁদের জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবলা—আর চোখে মুখে "ছ্যা ছ্যা" করেন। আমার মনে কোনো সন্দ নেই আপনি রিয়েল স্টাফ, খাঁটি স্কচ, ও সরি সরি, আই মীন আপনি পুরো পাক্কা লেডি। বিশেষ করে 'হারামী'র পরিবর্তে রূঢ়তর কিন্তু হাইলি কালচারড—'জাদা'টা যোগ করে।

কী বলবো, ব্যাটা দেখি আমার হাঁড়ির খবরতক রাখে। বললে, তার পাঁচশ'র বদলে এখন থেকে হাজারটা মুরগীর দরকার। আমি পাক্কা ইংরেজিতে

বললুম, বাই দি লর্ড হ্যারি, পাবো কোথায় ? সম্বন্ধী ব্যাটা বললে, 'আমি জানি, তুমি রোজ ঢাকার হোটেলগুলোকে মুরগীর চালান পাঠাও।' আমিও কম যাই নে। ব্লাফ্-মাস্টারের বেলুন। বললুম, 'তা হলে আপনি সেপাই মারফত সেগুলো স্টেশন থেকে পকড়ুকে আনিয়ে নিন।' আমি জানতুম এখনও কামারের ঘা'য়ের লগন আসে নি।

তারপর কর্নেল হঠাৎ একদম খাদে নেমে বললে, 'মিস্টার মজুমদার, আমরা একটা পোলট্রি ফার্ম খুলতে চাই ময়নামতীতে। আপনি তো স্পেশালিস্ট। মেন্ পয়েন্টগুলো বাৎলে দিন। আপনার ব্যবসাতে চোট লাগবে না। আমার চাহিদা প্রতিদিন বেড়েই যাবে, কমবে না। তোমার থেকে আরো বেশী নেব।' আমি অবশ্য হরবকৎ জেন্টেলম্যান—আনাড়িকে নাড়ি-জ্ঞান শিখিয়ে বেহেস্তে যাবো না কেন ? সেই সব টিপ্সই দিলুম যে সব ঢাকা কলকাতা দেয় তাদের 'রুরাল ব্রডকাস্টে' পশুপক্ষী পালন বাবদে চাষাদের। শুনেছি, ওগুলো পালন করলে প্রতি তিন মাস অন্তর মুরগীর মড়ক অনিবার্য। অবশ্য আল্লা যদি আমাদের প্রতি সদয় হন। কিন্তু এহ বাহ্য। দাদারা, বলুন ইয়েহিয়া মুজীবে সমঝোতার সম্ভাবনা কতখানি ? তাহলে আর্মির সংখ্যা কমতো, না ?"

শিপ্রা বললে, "আমাকে এক বিদেশী জেনারেল বলেছিলেন, দেশের রাজধানী, বড় বড় শহরের পাকা পলিটিশিয়ান এমন কি আর্মির মধ্যস্তরের অফিসাররা বহুক্ষেত্রে যে সব টপ সিক্রেট জানতে পায় না, যেমন ট্রুপ মুভমেন্ট, গ্রামের সাধারণ লোকের কাছ থেকে তা লুকিয়ে রাখা যায় না। হাজী সাহেব অবশ্য জবরদস্ত সাপ্লায়ার। কিন্তু তিনিও তো মুরগী, আণ্ডা কিনবেন গাঁয়ের চাষা-ভূষোর কাছ থেকে। শাক-সব্জী, এক কথায় যাবতীয় তাজা মাল ওরাই বেচে ! জেনারেল বলছিলেন ইয়োরোপের যে-কোন কেন্টনমেন্ট থেকে মাত্র এক হাজার সৈন্য সরালে, সেও অতিশয় গোপনে, তবু আশপাশের গাঁয়ের লোক সেই সন্ধ্যায় 'পাব্'-এ বসে সঠিক নম্বরটি বলে দিত—একে অন্যের বিক্রির পরিমাণে খবর বদলাবদলি করে। এবং করেও।"

হাজী তো তার মতের সমর্থন পেয়ে খুশী। বাকী পাঁচজনও তাজ্জব মানলো। আর যে-সব কলকাতার সোসাইটি লেডিজ্ দেখেছে তারা, খানের নিমন্ত্রণেই তাঁরা এসেছেন আকছারই স্বামী বা ফিয়াঁসে সহ, তাঁরা তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছেন গেলাস-ফীল্ডে। ইনি তো এক ঘণ্টা হয়ে গেল ছোট্ট একটা ব্রাণ্ডির আধখানাও শেষ করতে পারেন নি, ওদিকে ইয়েহিয়া রাজার গল্প, যে সব গল্পের রাজা—সেটাতে দস্তুরমত তাদের অজানা সব তত্ত্বও যোগ দিতে পারেন।

আর কীর্তি তবে গর্বভরে আসমানী ঘোড়ায় চেপে তামাম শহরটার উপর হাওয়াই চক্কর মারছে।

খান মিটমিটিয়ে হাসছে। একবার হাত কচলাতে কচলাতে বললেও, "আমার বৃথা প্রশংসা করবেন না। এঁকে আমি গড়ি নি। ইনি আমার ইস্কুলে পড়েন নি। হেঁ হেঁ!" ফের সবিনয় ভাব, কেন মিছে লজ্জা দিচ্ছেন!

খানের প্যারা দোস্ত গোস্বামী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "তোমার প্রতি কোনো অবিচার হবে না; তোমার যা মগজের পরিমাণ সে-টুকুন দিয়ে ঐ সেই চাষার কবরেজী বাড়ীও হয় না। কিন্তু মোদ্দাটা হচ্ছে এই; আমরাও বই পড়ি, মাঝে মাঝে গুরুগম্ভীর ত্রৈমাসিক, বিলিতি লিটরারি সাপ্লিমেণ্ট—অবরে সবরে। তার কিছুটা মনেও গাঁথা হয়ে যায়। কিন্তু কই, সঠিক মোকায় তো সেগুলো কাজে লাগাতে পারি নে। ওদিকে দেখ, বেগম সাহেবা যে দু'চারটি কথা কইলেন তাতে তাঁর গভীর তত্ত্বজ্ঞান, গভীরতর স্বাধ্যায় তো ধরা পড়লই, কিন্তু কি অলৌকিক মোকা মাফিক সেগুলোর প্রয়োগ! দেশ—অর্থাৎ পার্টিতে গল্পগুজোব হচ্ছে এটা রয়েল সোসাইটির মীটিং নয়। পাত্র—আমরা অর্ধশিক্ষিত, ফুর্তির চিড়িয়া, তদুপরি ভিন্ন ভিন্ন ধান্দায় চড়ে বেড়াই, আমরা রিসার্চ করি নে। এবং সর্বশেষে সব চেয়ে ইম্পর্টেণ্ট—কাল, অর্থাৎ টাইমিং। মিঞা সাহেব বা হাজীর বক্তব্য শেষ হওয়ার বহু পূর্বেই তিনি ঠাহর করে নিয়েছিলেন, নলটা চলেছে কোন্ দিকে। যে-কোনো মুহূর্তে ইণ্টারাপ্ট করে—দেখেছো কোনো মেয়েছেলে কবে যার এ-অভ্যাসটি নেই এবং সেটাতে তাদের হক্ক আছে—তাঁর বক্তব্য তিনি বলতে পারতেন। না, তিনি অপেক্ষা করে রইলেন। যতক্ষণ না আমাদের মন তৈরী হয়, তাঁর প্রত্যেক শব্দ যেন আমাদের প্রত্যেকটি ব্রেন-সেলএ পুরো মাত্রায় আঘাত দেয়। এই অসাধারণ গুণটি বড়ই দুর্লভ, হে খান, বড়ই দুর্লভ।"

শিপ্রা চলে গেছে খাবার তদারকীতে—আজ এদের সকলের দাওয়াৎ, তাদের ফ্রেণ্ডস এ্যাণ্ড এনিমিজ সহ।

আপন আপন গেলাস নিয়ে সবাই ডাইনিং রুমে এলেন।

শিপ্রা লক্ষ্য করলে, হাজীকে সে তার পাশে বসালে এবং আর পাঁচজনের গালগল্পে কান না দিয়ে ডিনারের প্রায় অধিকাংশ সময়টা গম্ভীর মুখে গুজুর গুজুর করলে। অবশ্য টেবিলের কায়দা মেনে মেনে। শিপ্রা তো প্রায় সেই ষোল বছর থেকে হোস্টেস। ওদিকে গল্প করছে, শুনছে মনপ্রাণ দিয়ে যে অন্য দিকে কোনো খেয়ালই নেই, ওদিকে তার চোখ তো চোখ নয়, বন্দুক। প্রত্যেকটি গেস্টের প্রতি বন্দুকের অব্যর্থ নিশান। প্রত্যেকের মনে ধারণা হল শিপ্রা যেন একমাত্র তাকেই খেতে ডেকেছে আর সামনে বসে বাড়ছে। শ্রীহরি ও সখীগণ সহ শ্রীরাধা যখন চক্রাকারে নৃত্য করতেন, তখন শ্রীরাধা তো কথাই নেই, প্রত্যেকটি সখী দেখতেন তাঁরই পাশে পাশে কেষ্ট-ঠাকুর নেচে চলেছেন।

ডিনারের পর সবাই বিদায় নিলেন। রাত্রি তৃতীয় যামে পেঁচেছে। কৃষ্ণ-

পক্ষের চাঁদ উঠি উঠি করছে।

বিদায় নেবার সময় মিঞা সাহেব শিপ্রাকে বললেন, "এটা মহরমের মাস। ইয়েহিয়া কট্টর শীয়া। সুন্নীরা মহরম মাস পবিত্র বলে স্বীকার করে বটে কিন্তু শীয়াদের কাছে মহরমের মাহাত্ম্য সর্বাধিক—এমন কি দুই ঈদের মাস বা রোজার মাসের সঙ্গেও তার তুলনা হয় না। এই পবিত্র মাসে ইয়েহিয়া খুনখারাবী আরম্ভ করবে কি? কি জানি।"

শিপ্রা শুয়ে পড়েছে। ঘরে আলো জ্বলছে দেখে দরজার সামনে একটুখানি সামান্য নড়াচড়া করতেই শিপ্রা ডাকলো, "এসো।"

একটা চেয়ার টেনে পাশে বসতেই শিপ্রা বললে, "আঃ! এই তোমাকে পেলুম এখানে আসার পর থেকে একলা। ভিড়ে তোমাকে আমি হারিয়ে ফেলি। কীই বা ভিড় ছিল আজ! কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল যেন হাজার হাজার লোকের মেলা—আর তোমাকে হারিয়ে ফেলেছি, খুঁজছি—বার বার।"

শিপ্রার প্রসন্নতা দেখে কীর্তি সাহস সঞ্চয় করে বললে, "হাজীকে শুধোচ্ছিলুম তিনি কুমিল্লা আগরতলা এত ঘন ঘন মাকু মারেন কি করে। হাজী, তুড়ি মেরে বললেন, 'ও তো ডালভাত। আমার তিনটে ভিন্ন ভিন্ন নেশনালিটির তিনখানা পাসপোর্ট আছে। যখন যেটার দরকার হয় তাই দিয়ে চালাই। যদিস্যাৎ নিতান্তই আর্জেন্ট কাজ থাকে তবে বর্ডার চেক পোস্ট-এর লোকগুলোকে একটুখানি ইশারা দি। ব্যাস্। বাতলটা বাতলটা, বউয়ের জন্য জবাকুসুমটা ছেলের জন্য ইনস্ট্রুমেন্ট বক্সটা এ-সব তো আমি প্রায়ই সওগাত দি, পাসপোর্ট থাকলেও। আর তার চেয়েও জলদির মামেলা হলে কালোয়। যে-সব পথ-বিপথ দিয়ে কেন্ডুপাতা যায়, সুপুরি আসে, তার সব-কটা আমার নখাগ্র দর্পণে।' আমি শুধালুম, 'আমাকে বর্ডার অবধি দেখিয়ে নিয়ে আসতে পারবেন?' হেসে বললে, 'আমি রাতারাতি আপনার কাগজপত্র তৈরী করিয়ে কালই খাস কুমিল্লায় আপনাকে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু এখন পাকিস্তানে যাওয়াটা নিরাপদ নয়। তবে বর্ডার অবধি—সে তো হেসে খেলে। কালো পথগুলোও দেখাতে পারি। তবে মোটর ছেড়ে এদিক ওদিক খানিকটে হাঁটতে হবে।'

"তুমি যদি অনুমতি দাও, তবে একবার বর্ডার পর্যন্ত হয়ে আসি। প্লীজ।"

"খানকে বলেছ?"

"হ্যাঁ, সে সঙ্গে সঙ্গে বললে, তোমার অনুমতি নিতে।"

শিপ্রা চিন্তা না করেই বললে, "তবে যাও। তোমার কোনো ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি প্রতিবন্ধক হবো এ-পরিস্থিতিটা আমি কল্পনাই করতে পারি নে। এবং আমি জানি, তুমি গোঁয়ার নও—খামাখা বিপদ ডেকে আনবে না। আমার মনে

হল হাজী পাকা লোক। তুমি গাইড পেয়েছ সর্বোত্তম।"

কীর্তি বললে, "আর ঘণ্টা দু'তিন পরেই হাজী গাড়ি নিয়ে আসবে। তুমি কিন্তু তোমার কাঁচা ঘুমটি নষ্ট করো না। আমরা দুপুরের আগেই ফিরব।"

"আমাকে একটা চুমো দাও।"

চিরকালই শিপ্রার ঘুম ভাঙে পাশের মসজিদের ভোরের আজানের সঙ্গে সঙ্গে—সারা রাতের পার্টি থেকে ফিরে যত ভোরের মুখেই শুতে যাক না কেন? আজও দেখতে পেল হাজীর মোটরের হেডলাইট, শুনতে পেল বারান্দা দিয়ে কীর্তির এগিয়ে যাওয়া, কিন্তু বেরুল না।

সকালে খানের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে শুধলো, "আজ তোমার পার্টি কখন শুরু হবে—মোটামুটি।"

খান ইতস্তত করে বললে, "তুমি যদি অনুমতি দাও তবে আমি একটু কাজ সেরে আসি। মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের কাজ। এই ডামাডোলের বাজারে কিছুটা ব্যবসা গুটোতে হবে কিছুটা গুছোতে। নইলে যেতুম না।"

"বা রে, যাবে না কেন?"

আরাম পেল খান। বললে, "আর শোনো, যে ইংরেজ বাড়িটা বিক্রি করে সে তার বেশীর ভাগ বই ম্যাগাজিন রেখে গিয়েছে। বিলইয়ার্ড রুমের পাশের কামরায়। ইন্‌ট্রেসটিং কিছু পেয়েও যেতে পারো।"

কামরায় ফিরে দেখে, আয়া জরাজীর্ণ এক প্যাকেট তাসের প্রায় সব ক'খানা কার্পেটের উপর পেতে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছে, কি যেন হিসেব করছে আর বিড়বিড় করছে আপন মনে।

হঠাৎ শিপ্রাকে দেখে চরম লজ্জা পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে তাসগুলো এক ঝটকায় তুলে নিল। মাথা নিচু করে বার বার মাফ চাইলে।

শিপ্রা সেদিকে যেন কানই দিল না। বরঞ্চ বললে, "তা থামলে কেন? কি খেলছিলে, পেশেন্‌স?"

একটু হিম্মৎ পেয়ে তার খিচুড়ি ভাষায় বললে, "না, মিসি বাবা। আমি তার থেকে দেখছিলুম, কি কি হবে, মানে কি সব ঘটবে—"

"ফিউচার?"

"রাইট, মিসি বাবা। আর ভাগ্য গণনা। দুটো প্রায় একই। আমি যে মেমসায়েবের কাছে বাচ্চা বয়েস থেকে জোয়ানী তক্ নোকরি করেছি, তিনি আমায় তাসের বহুত কুছ খেল শেখান। আমার সঙ্গে রোজ দুপুরে খেলতেন। আমি ভেবেছিলুম, আপনার পায়ের শব্দ শুনতে পেলেই তাস ঝটপট তুলে নেব। বেয়াদবী মাফ করুন। আমি একদম মশগুল হয়ে গিয়েছিলুম।"

"কাট্ দ্যাট আউট। কোনো বেয়াদবী হয় নি। তা মশগুল হবার মত

কি পেয়েছিলে ?"

গম্ভীর স্বরে ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝাতে চেষ্টা করলো। বললো, "এই যে সবাই ভাবছে ফিনসে লড়াই শুরু হবে কি না, এক দফা জেসা হুয়া, সেইটে হবে কি না? মেমসাহেব বলতো, আমি পাহাড়ী—সাদা-দিল-ঔরৎ। আমরা নাকি ওদের চেয়ে ঢের ভালো ফিউচার দেখতে পারি।"

শিপ্রা একটা বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে অলস কৌতূহলে শুধলো, "কি দেখলে ?"

পাহাড়িনী ভ্রূকুঞ্চিত করে বললো, "সব আন্ধেরা, আন্ধেরা। এসা বড় একটা হয় না। ফিন্‌সে দেখি।" তাস শাফল্ করে শিপ্রার কাছে নিয়ে এসে বলল, "টোকা দীজীয়ে। তা হলে উয়োঠো হোগা আপকা গিন্‌না।" শিপ্রা লক্ষ্মী মেয়ে। তুরন্ত টোকা দিলে।

ইংরেজের ছেড়ে যাওয়া বইয়ের ভিতর সে পেয়েছে ইংরেজ লেখক উইলিয়ম মেকপীস থ্যাকারে ও সিলেট নিয়ে একখানা মোটা বই। তার জানা ছিল থ্যাকারের জন্ম হয়েছিল কলকাতায়। এই বইয়ের যে ক'খানা পাতা উল্টিয়েছে তাতে মনে হল লেখকের অন্য কোনো একটা নূতন গবেষণাপ্রসূত মতবাদ আছে। অবশ্য এটা ধ্রুব সত্য, থ্যাকারের পিতা সিলেটের সর্বময় কর্তা ছিলেন কিছুকাল। শিপ্রার চিন্তাধারা চললো অন্য দিকে। থ্যাকারে কি এ-সব মাম্বোজাম্বোতে বিশ্বাস করতেন? কিপলিং। আজকাল তো বিস্তর হিপি করে।

আয়া গভীরতম মনোযোগ সহকারে এক একখানা করে তাস ফেলে, আর আপন মনে বিড়বিড় করে। এমনই বাহ্যজ্ঞানশূন্য যে শিপ্রার প্রশ্ন প্রথমটায় তার কানেই ঢোকে নি। সংবিতে ফিরে বললে, "ঘোটালা, ফিন্‌সে ঘোটালা! এই তো দেখুন, বার বার পর পর তিনবার পাঞ্জা এসেছে। তো নিকলা, এক তরফমে পাঁচঠো আদমী। তার বাদে দেখিয়ে, দুটো দস্‌সা এসেছে। লাখ লাখ আদমী লেকিন মুশকিল আছে ইনকা। বোহৎ মুশকিল—দোঠাই কালা দস্‌সা। লেকিন উয়ো পাঁচঠো কিয়া? তিন বার আয়া। পেহলাই।"

শিপ্রা অনুমান করলো, দশের তাসগুলোকে আয়া জনতা হিসেবে নিয়েছে। কথায় বলে 'দশের মুখ খোদার তবল', এরই হুবহু লাতিন 'ভক্‌স পপুলি, ভক্‌স্ দেঈ' দশজনের গলা ঈশ্বরের গলা অতএব 'দশের তাস' পপুলি, পাবলিক, জনারণ্য অর্থাৎ আওয়ামী লীগ। কিন্তু তাদের বিপক্ষে আয়া প্রত্যাশা করেছে টেক্কা, কিংবা বাদশা অর্থাৎ ইয়েহিয়া। এসেছে পাঞ্জা। পঞ্চ আব্? পাঞ্জাব? হঠাৎ তার মনে পড়লো, লারী বলেছিল মির্জাকে, অনেকেরই বিশ্বাস, ইয়েহিয়ার তথাকথিত সমর্থক যে মিলিটারি জুন্টা আছে তারা সংখ্যায় পাঁচ এবং আসলে ওদের আদেশে ইয়েহিয়া ওঠ বস করে। শিপ্রা আপন মনে হেসে

উঠলো। 'ধর্মরাজের' পশ্চাতে 'পঞ্চপাণ্ডব'। না তাহলে ইয়েহিয়াটা সাইফার। আয়াকে এই পাঞ্চজন্য' তাসের মহাত্ম্য বোঝাতেই সে আনন্দে ফেটে পড়ে আর কি! বার বার বললে, পুরানা মেম সায়েবের চেয়ে মিসি বাবার নজর বহুৎ দূর দূর যায়, কাঁহা কাঁহা মুল্লুকে। বেরুল পর পর রুইতন আর ইস্কাপনের টেক্কা।

শিপ্রা, আয়া দুজনাতেই একই ওয়াটারলুতে। পরাজয়। কোনো অর্থ বেরয় না।

ভারত, পূর্ব বাঙলার কটা লোক তখন জানতো, ইয়েহিয়া হারেমের পাটরানী হবার জন্য চলেছে তখন জোর লড়াই। একজন ফর্সা পশ্চিম পাকী—লোকে তাঁর নাম দিয়েছে "জেনারেল রানী"; অন্য জন পূব বাঙলার শ্যামা, ডাকনাম ব্ল্যাক বিউটি।

এ-সব হোকাস পোকাসে শিপ্রার মত মেয়ের কৌতূহল দুরন্ত বাচ্চার হাতে বেলুনের মত "দীর্ঘজীবী"। শিপ্রা পুস্তকের সুগন্ধী বাগিচায় ডুব মারলো। আরব কবি বলেছেন, "পুস্তক সে যেন একটি বাগান, যেটাকে পকেটে পোরা যায়।" তারপর আয়ার 'ভবিষ্যৎ দৃষ্টির' ফলাফল শিপ্রার কানে আর যায় নি।

শুধু একবার শুনলো, "মুজীব। সঙ্গে সঙ্গে এলেন হরতনের বিবি—মুজীবের বীবী। তার বাদেই পর পর দুটো কালো গোলাম। ভেরি ব্যাড্, ভেরি ব্যাড্। উনি বন্দী অবস্থায় গোলামদের পাহারায় থাকবেন কয়েক মাস।"

আয়া যখন শেষটায় সব তাস গুটিয়ে নিল তখন হাই তোলার আভাসটা হাত দিয়ে চেপে শিপ্রা শুধলো, "হরেদরে কি দাঁড়ালো?"

আয়া ভদ্রতা জানে। বললে, "বড় খারাব তাস—এক্কে বাদ দুসরা। লেকিন এদের নসীব ঔরভী খারাব হত যদি না মিসি বাবা টোক দিতেন। সব্কে সব্ বদ কিস্মৎ। সক্কলের কপালে দুঃখ। তসল্লী (সান্ত্বনা) বস ইয়েহ—দুঃখের শেষে সুখ বেশী আখেরে।"

"তাহলেই হল", আনমনে বললে সে।

আয়া শুধোলে, "আপনার নসীব দেখবো?"

"প্লীজ ইয়োরসেল্ফ্।"

এবারে পুরো তাসে টোকা মারলে আয়া নিজেই। শিপ্রা আবার তার "বই-বাগানে" হেথা হোথা ঘুরতে লাগলো। বাগানটা কিন্তু তেমন আ মরি আ মরি করার মত নয়। যদি সিলেটী বান্ধবী বিল্কিসের সঙ্গে দেখা হয় তবে বইটার কথা তাকে বলবে? কিন্তু কোথায় কোন্ গ্রামাঞ্চলের জমিদার বাড়িতে হল তার বিয়ে। আবার দেখা হবার সম্ভাবনা কতখানি? হায়, শিপ্রা জানতো না, ত্রিপুরা পাহাড়ের উপর দিয়ে আসবার সময় সে যে-সব হাওর

দেখেছিল তারই একটার পারে বিল্‌কিস্‌দের বাড়ি, টিলার উপর, প্লেন থেকে ত্রিশ চল্লিশ মাইল মাত্র। পুনরায় ডবল হায়, হায়। জানা থাকলেই বা কি হত?

না, সে খুঁজতো এলোপাতাড়ি এবং ডাউন করতে পারতো না। কিন্তু তাতেও তো আছে সুখেদুখে মেশানো ছোট্ট একটি অনুভূতির আবেশ।

আয়া যেন বসে বসে উল্লাসে নৃত্য করছে। এ-রকম একটার পর একটা নিরবচ্ছিন্ন খুশ-কিস্মতের তাস সে কভীভী দেখে নি। "আচ্ছী শাদী, আচ্ছে বাল-বাচ্চে—" ভুরু কুঁচকে বললে, "লেকিন্‌ কম।" মাত্র কটি এই কথাই তার কানে এসেছিল। বিলকুল বোগাস্‌! মুচকি হেসে ভাবলে, পাহাড়ীদের ভিতরও তাহলে আর্যা গান্ধারী মাতৃকুল শ্রেষ্ঠা!"

অকস্মাৎ শিপ্রার খেয়াল গেল অকস্মাৎতর বেগে আয়া উপু হয়ে দুহাত দুবাহু দিয়ে সব তাস গুটিয়ে নিচ্ছে। শুধলো, কি হল?

নিশ্চুপ।

শিপ্রা একটুখানি কাত হয়ে আয়ার মুখের দিকে তাকালে। সে ইতিপূর্বে বিস্তর মঙ্গোলিয়ান টাইপের পাহাড়ী মেয়ে দেখেছে, এবং লক্ষ্য করেছিল, এদের ভাব-পরিবর্তন মুখের উপর অতি সামান্য রেখা আঁকে, রং পালটায়। এখন দেখে, আয়ার মুখ যেন কালো হয়ে গিয়েছে—ছোট্ট বাচ্চা কাঁদবার আগে যেরকম মুখ বিকৃত করে অনেকটা সেই রকম।

অবাক হয়ে শুধলো, "কি হল তোমার? খারাপ কিছু একটা দেখেছো? তুমি বড্ড সিমপ্‌ল। এ-সব কখনো কি সত্যি সত্যি ফলে? না হয় আমাকে বলেই দেখো, আমি কি ভাবে নিই।"

"না পুছিয়ে মিসি বাবা।" বলা শেষ হওয়ায় পূর্বেই, সেই কবেকার বাচ্চা বয়েস থেকে তার হাড়ে হাড়ে লোমে লোমে যে-সব ভদ্রতম দেশী-বিলিতি এটিকেট ঢুকে গিয়েছে, সেগুলো এক লহমায় ভুলে গিয়ে খাস পাহাড়ী মেয়ের মত দুই হাঁটুর উপর শাড়ি টেনে তুলে ছুট দিল বাবুর্চিখানার দিকে।

শিপ্রা একটু মুচকি হাসলো। সামান্য তাসের হেরফের ভুলিয়ে দিলে সরলা পাহাড়িনীর পূর্ণজীবনের অভ্যাস, শালীনতা বোধ—অবশ্য আয়ারই মতে—সেটা অলঙ্ঘনীয় শালীনতা—,সামান্য দু'খানা তাস এক টানে তাকে নিয়ে গেল সেই দুর্গন্ধ অন্ধকার গিরিগুহায়, তার ভিতরটা এক লহমায় ভরে দিল যুগ যুগ সঞ্চিত তার পিতৃপিতামহ পূর্বপুরুষদের ভীতি দিয়ে—হিংস্র জন্তুর ভয়, ঝঞ্ঝা-বিদ্যুতের ভয়, 'সভ্য' বিদেশীর বন্দুকের ভয় এবং সব চেয়ে বড় ভয়—পৈশাচিক প্রেত-দৈত্যের দানবিক অট্টহাস্যের বিভীষিকা।

সব জানে, সব বোঝে শিপ্রা কিন্তু তবু তার মনটা খচ্‌খচ করতে লাগলো।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

কীর্তি কাঁপছে। অন্য কারো চোখে পড়তো না, কিন্তু শিপ্রার চোখ ভালোবাসার চোখ, সে তো সব দেখতে পায়।

"কাঁপছো কেন?"

"কই আমি তো টের পাচ্ছি নে।"

"যাও, চান করে এসো, মাথার প্রত্যেকটি চুল পর্যন্ত ধুলোয় ধুলোয় সাদা, গেরুয়া।"

কীর্তির যে যাবার ইচ্ছে নেই, শিপ্রা খুবই টের পেয়েছে। কিন্তু সে চুপ করে রইল বলে কীর্তি বাধ্য হয়ে উঠলো।

শিপ্রা হলঘরে এল। বাইরে রোদ তেতে উঠেছে বলে হাজী বসেছে খানের মুখোমুখি হয়ে। দুপুরের পূর্বেই কীর্তিরা ফিরে এসেছে। নির্ধারিত সময়ের অল্প পূর্বে অপ্রত্যাশিত এই আগমন মনে যে কি আনন্দ দিয়েছিল সেটা সকলের কাছে এতই অকিঞ্চিৎ যে সে সেটা কাউকে খুলে বলতে পারবে না—হয়তো একমাত্র কীর্তিই তার সামান্য কিছুটা অংশের মূল্য হৃদয় দিয়ে নিতে পারবে, কাঞ্চন যতই অকিঞ্চিৎ হোক না কেন সে কাঞ্চন। হলবাইনের ছবিতে উল্লসিত ব্যক্তির মুক্ত অট্টহাস্যের চেয়ে মোনালিসার মৃদু হাসি ঢের বেশী অর্থধারী, রহস্যময়। মোটরের শব্দ শুনেই সে তাই দ্রুতপদে গিয়েছিল বারান্দায়, যদিও প্রাণ চেয়েছিল ছুটে যেতে। কীর্তির ধূলিধূসরিত অঙ্গ বস্ত্র দেখে সে যত না বিস্মিত হয়েছিল তার চেয়ে ঢের বেশী হল তার চেহারার আকস্মিক এক অজানা পরিবর্তন দেখে। ইতিমধ্যে আয়ার 'পত্রলেখা'র ভাগ্যগণনাজনিত খচখচানিটা এক মুহূর্তেই পেয়েছে লোপ—তার অজানাতে, এবং আবার ফিরে এসে পূর্বাসনে বসবার জন্য সেটাতে রুমাল বেঁধে "রিজর্ভড" হক্কের 'ইস্‌টাম্বো' মেরে যায় নি।

"কি কি দেখলেন বলুন।"

হাজী বললে, "দেখার মত খুব বেশী একটা কখনো ছিল না, এখনো নেই। কিন্তু এখন, আজ ক'দিন যা দেখেছি সেটাই ইঙ্গিত দিচ্ছে ভবিষ্যতের অদেখা অনেক কিছুর দিকে।"

খান বিয়ারে চুমুক দিয়ে সিগরেট ধরিয়ে বিজ্ঞের মত বললে, "এ তো সব সময়ই হয়! অদেখা জিনিস তো কোনো ইঙ্গিত দিতে পারে না—দেখা জিনিসই অদেখার ইঙ্গিত দেয়।"

শিপ্রা বললে, "যেমন সাহারার মাঝখানে দৃশ্যমান অন্তহীন বালুকা অদৃশ্য মৃত্যুর ইঙ্গিত দেয়, আষাঢ়ের ঘন বরিষণ অদেখা পাকা ধানের ইঙ্গিত দেয়।"

হাজী বললে, "একশ' বার মানি। তুলনাহীনার অতুলনীয়া তুলনা দুটি শুনে আরো বেশী মানি। কিন্তু ব্যত্যয় এইখানে যে দেখার জিনিসগুলো পরস্পর-বিরোধী অদেখার প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছে প্রতিপদে। একদিকে দেখুন ইমিগ্রেশন আইন মোটেই ঢিলে হয় নি ; অন্যদিকে লক্ষ্য করবেন যে সব ফালতো লোক ইণ্ডিয়ার দিকে আসছে—সবই হিন্দু—তাদের কোনো চেক করা হচ্ছে না। এরা ঠিক রেফুজী নয়। এমনিতে হয়তো এ-সময়টার আগরতলায় মামাবাড়িতে আসতো না, এখন জাস্ট টু বী অন্ দি সেফার সাইড্। আমার মনে কণা মাত্র সন্দেহ নেই ইয়েহিয়ার বিস্তর গুপ্তচর কালো পথে এদিকে আসছে। ওদিকে দেখুন, ত্রিপুরা রক্ষা করার জন্য কি কি গোপন মিলিটারি ব্যবস্থা করা হয়েছে জানি নে, কিন্তু পাবলিককে কি যথেষ্ট তৈরী করা হচ্ছে ?"

খান হেসে বললে, "কিচ্ছু ভয় নেই, হাজী। অন্তত স্পাইদের নিয়ে চিন্তা নেই। পিণ্ডিতে আজ যা ঘটে দিল্লী কাল তা জেনে যায়। আমাদের খবর তারা জানতে পায় পরশু। স্টাইলটা একটু নবাবী কি না।"

হাজী বললে, "কিন্তু সব মিলিয়ে, ওভার্ অল্ পিকচার কারো আছে কি ? এই যে আজ কীর্তিবাবু আমার সঙ্গে মোটরে গেলেন, এন্তের ক্ষেত চষলেন, দেখলেন কটুকুন ? ত্রিপুরার তিন দিকে পাক্ বর্ডার। বলতে গেলে পাক-সমুদ্রের মাঝখানে যেন ইণ্ডিয়া-দ্বীপাংশ। এর কতটুকু দেখেছি আমিই বা, আর কীর্তিবাবুই এক সকালে দেখবেন কতটুকু ?"

শিপ্রার কান পড়ে আছে কীর্তির পদধ্বনির তরে। "এত দেরি কেন ? ফ্যাশনেবল মেয়ের মত তার কাজে বাথরুম ঠাকুরঘর, আর ঠাকুরঘর বাথরুম নয় তো।"

হাজীকে সরাসরি শুধলো, "কীর্তি এত উত্তেজিত—না, এত বিচলিত, জাস্ট্ নট হিজ ওন সেল্ফ্ হল কেন ?"

আসমানের দিকে তাকিয়ে হাজী বললে, "জানেন আল্লা পাক। আমাকে খাদ কতবার বলেছে, কীর্তির মত 'হ্যাপি-গো-লাকি-ফেলো', হেল্-ফেলা-উয়েল-মেট হয় না। দুনিয়ার হাল-হালৎ সম্বন্ধে আস্ত একটি পরমহংস। প্যাখনার উপর দুশ্চিন্তার ফোঁটাটি পর্যন্ত জিরিয়ে নেবার ফুরসৎ পায় না। আর আজ ? বর্ডারে পেঁাছে কি হল, বুঝতে পারলুম না। আমি যা যা দেখেছি তিনিও ঐ সব দেখেছেন, তবে হ্যাঁ, আমি যে অদৃশ্যের প্রতি অলক্ষ্য ইঙ্গিতের কথা বলছিলুম সেগুলোতে আমি, ওয়াটসন, দেখেছি চায়ের পিরিচ, উনি, হোম্স্ দেখেছেন ফ্লাইং সসার্। তবে হ্যাঁ, মোটর মেরামতিতে আমি যখন ব্যস্ত তখন তিনি গামছা-পরা গামছা-কাঁধে কয়েকটা নিতান্ত দীনদুঃখীর সঙ্গে মিনিট কয়েক কথা কইলেন। কিন্তু কখন যে তাঁর গায়ে অল্প অল্প কাঁপন লেগেছে সেও আমি বুঝতে পারি নি—মোটরের ঝাঁকুনিতে। কথা এমনিতেই তিনি

বলেন কম, আর আমার নিজের বকর বকরের ঠেলায় নিজে আমি নিষ্কৃতি রাতে অন্য ঘরে গিয়েই শুই। কিন্তু এতে চিন্তিত হবার মত কিছু নেই আয়েম শ্যোর্। আর আপনাদের তো সব কিছু বলবেনই—একটু ঠাণ্ডা হলে পর। আমাকেও উনি কিছু পর ভাবেন না। আমাকেও বলবেন। নইলে আমাকেই বা বেছে নিলেন কেন গাইড হিসেবে—কোনো প্রকারের লৌকিকতা না করে?"

শিপ্রা বললে, "এ কথাটা ঠিক। আপনাকে সে একটা অতি তালেবর খলিফে লোক ঠাউরেছে। আচ্ছা, আমি এখন উঠি। জয়েন ইউ লেটার—টা টা।"

ঘরে গিয়ে খাটে শুতে না শুতেই চিরুনি নিয়ে আয়া হাজির। খানিকটে আঁচড়াবার পরই কীর্তি দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। আয়া বললে, "একটু পরে আসছি মিসি বাবা।"

কীর্তি সোজা ড্রেসিং টেবিলের টুলটা টেনে এনে বসল। শিপ্রার হাত-দুটি আপন দু'হাতে তুলে নিয়ে বললে, "তুমি আমার একটা অনুরোধ রাখবে?"

শিপ্রা তার হাত ছাড়িয়ে তুলে নিল কীর্তির হাত। তার উপর ভেজা চুমো খেয়ে বললে, "আমার তিন তিন বারের সত্য তুমি ভুলে যাও নি, আমি জানি। বলো।"

"তুমি কালই শিলঙ চলে যাও। সেখানে আমি আসছি সপ্তাহ খানেকের ভিতর। শিলচরে একদিনের জন্য নেমে করিমগঞ্জ বর্ডারটা দেখে নেব। তারপর শিলঙ এসে তোমাকে নিয়ে ডাউকি বর্ডার দেখতে যাবো। কাল যাবে শিলঙ? এখন ঐ জায়গাটাই সবচেয়ে নিরাপদ।"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু নিরাপদ বলে নয়। তোমার ইচ্ছে, তাই।"

শিপ্রা লক্ষ্য করলো, এখন কীর্তি আগের মত একটানা কাঁপছে না। মাঝে মাঝে, যেন অল্প নড়ে উঠে। শিপ্রা স্থির করেছে কীর্তিকে এখন কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে না। সে নিজের থেকেই বলবে, একটু পরে।

"আমি প্লেনের টিকিটের কথা হাজীকে বলে এখখুনি আসছি।"

ফিরে এসে বললে, "যাক্। বাঁচালে। ওরা অন্তত এটুকুন বুঝেছে, তোমার চলে যাওয়াই ভালো।"

যেই না ঐ কথাটি বলেছে অমনি তার মনের দরজা কে যেন হঠাৎ লাথি মেরে খুলে দিল।

প্রথমটায় দ্রুতগতিতে, যেন পাঠশালে ছেলে "পাখী সব" আবৃত্তি করছে, কারণ কি ভাবে তার সমস্ত বক্তব্যটা শিপ্রাকে গুছিয়ে বলবে সেটা সে ঘণ্টা তিনেক ধরে মুশাবিদা করেছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার—বাথরুমেও খসড়াটা আদালতী "ইস্টম্বো"র কাঠামোতে ঢোকাতে গিয়ে বিস্তর ধস্তাধস্তি করতে হয়েছে। সেটারও প্রথম ইমপর্টেণ্ট হাফ হয়ে গেল আদালতের প্রিমা ফাশিতে

উলট্রা ভিরেস্। ব্রিজ খেলায় যাকে বলে ভিয়েনা গ্যামবিট্। কীর্তি ধরে নিয়েছিল, শিপ্রা তাকে ফেলে শিলঙ যেতে রাজী হবে না এবং সেটাকে নাকচ করার জন্য তাকে সত্য এবং অর্ধসত্য যুক্তিতর্ক পেশ করতে হবে। পয়লা হাফ্ বিলকুল বরবাদ হয়ে গেল—কারণ শিপ্রা প্রস্তাবনার সঙ্গে সঙ্গেই কেতাবের ইনডেক্স্ পর্যন্ত মেনে নিল। এতে করে হয়ে গেল তার কুল্লে মুশাবিদা টালমাটাল। কিন্তু ধুয়োটা রইল ঠিক। সেটা পাঠক চেনেন। কীর্তিনাশ এ-স্থলে কীর্তিমান। শব্দটি "অপদার্থ"।

গড় গড় করে বলে যেতে লাগলো, "সব চেয়ে ভালো করে তুমি জানো, আমি অপদার্থ। আমি নিজে জানি সেটা তোমার চেয়েও বেশী। আজ হঠাৎ, দয়াময়ের অসীম করুণায়—দাঁড়াও ঠিক হল না, নিষ্ঠুর সম্মানসহ, এই অপদার্থের সামনে বিদ্যুল্লেখার সর্বোজ্জ্বল আলোক উদ্ভাসিত করে দিলেন, এবং শিশু যেরকম মাকে খুঁজে পায়—এ তুলনাটা তোমার কাছ থেকে শিখেছি, গুরু—অন্ধকারের শিশুর নৈসর্গিক জ্ঞান পন্থা সহ আমি সব-কিছু স্বচক্ষে আলোকিত প্রকৃতির সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার মাকে খুঁজে পেলুম এবং দেখে নিলুম।

কাল রাত্রে যে-সব আলোচনা হচ্ছিল সেটা সম্পূর্ণ ভুল আশঙ্কা নিয়ে নয়। সেটার প্রধান,—এবং যার চেয়ে অধিক গুরুত্ব ধরে তার অসম্পূর্ণতা—সর্পকে তারা মানবিক বুদ্ধির অক্ষম চন্দ্রালোকে রজ্জু বলে ভ্রম করেছে, স্বয়ং যমকে যমদূত বলে ধরে নিয়েছে এবং সেই সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক স্বতঃসিদ্ধ থেকে যাত্রারম্ভ হয়েছে বলে তাদের আলোচনার দিক নির্ণয় করা হল যে-সত্য স্বয়ং প্রত্যক্ষ তার সঙ্গে সমান্তরাল রেখা ধরে নয়, আলোচনার পথে চলে গেল টেন্‌জেনট-এ, কোণা কেটে এবং আলোচনা যতই অগ্রসর হতে লাগলো তার দূরত্ব প্রত্যক্ষ সত্যের দৃঢ়ভূমি থেকে বাড়তে বাড়তে বাস্তবতাহীন অন্তরীক্ষে অদৃশ্য হল।

কারণ এরা যমকে যমদূত, মহামারীকে ছিটেফোঁটা পেটের ব্যামো, ইয়ো রোপীর ব্ল্যাক ডেথকে সাময়িক মূর্ছা বলে ধরে নিয়েছে।

শিপ্রা বললে, "তোমার কাছে যেটা সত্যরূপে আবির্ভূত হয়েছে, তুমি সেটাকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছ, সেটা আমি উপলব্ধি না করেও সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নিচ্ছি—যে কর্ম ইতিপূর্বে আমি কখনো করি নি—কারণ এখন তোমার ধর্ম আমার ধর্ম। তোমার এ উপলব্ধি ধর্মজাত।" সত্যকার কৌতূহল সহ উঠে বসে শুধলো, "তোমার কথা থেকে মনে হল শুধু ইনসটিনক্ট্ বা ইনটুইশন দিয়ে তুমি তোমার সত্য উপলব্ধিতে পৌঁছও নি। খুলে বলো অন্য কিছু আছে কি?"

"আছে। কিন্তু সেটা খুদ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি নয়, কি যেন, কে যে আমাকে

ধাক্কা মেরে সেই দিকে এগিয়ে দিলে।

গামছা-পরা গামছা-কাঁধে আপাতদৃষ্টিতে গরীব দুটি চাষার সঙ্গে আজ আমার আলাপ হল।"

শিপ্রা বললে, "হাজী বলছিল বটে।"

হাজী সত্যই সব কাজের, সন্ধিসুড়ুকের কাজী। কিন্তু আজ সেও ভুল করেছে—অবশ্য সেটা যমদূতে যমে ঘুলিয়ে ফেলার মত অতখানি দূর পার্থক্য ধরে না। ওরা দু'জনাই উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপার্জনক্ষম শিক্ষিত যথেষ্ট সচ্ছল, শিক্ষিত ভদ্রসন্তান। একজন হিন্দু, অন্যজন তার প্রতিবেশী মুসলমান। রাজশাহী থেকে ওদের নামধাম বর্ণনাসহ মিলিটারি হুলিয়া বেরিয়েছে মোটা পুরস্কারের প্রলোভনসহ। যদিও মিলিটারি পূব বাঙলার পুলিশকে আর বিশ্বাস করে না—এ তত্ত্বটা এই আমি প্রথম শুনলুম—তাদের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ও ব্যত্যয় হিসেবে ওদের নামের হুলিয়া পাঠাচ্ছে। আর খুদ মিলিটারি তো জীপে করে ওদের সন্ধানে উত্তর বাঙলাটা চষে বেড়াচ্ছেই।

অপরাধ? কাল রাত্রে আমাদের পার্টিতে যে সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হয়েছিল সেটা ঠিক। ছোট বড় সব মিলিটারি ঘাঁটিতেই কমাণ্ডান্টরা সেপাইদের ঠেকিয়ে রেখেছে লুটপাট, অবিচারে যাকে তাকে গুলি করে মেরে বাদবাকি-জনদের হৃদয় মনে আতঙ্কের বিভীষিকা সৃষ্টি করে তাদের ক্লীব করে দেওয়া, এবং নারী হরণ করে ঘাঁটির ভিতর এনে রথেল নির্মাণ করা।

রাজশাহী একমাত্র ব্যত্যয়। কেন, সে-কথা শুধোবার কথা মনে ছিল না।

এই মার্চের প্রথম সপ্তাহে সেখানে দিবাদ্বিপ্রহরে পাঞ্জাবী সেপাই তাদের ভদ্রলোক প্রতিবেশীর দুটি মেয়েকে ধরে নিয়ে যায় ছাউনিতে, বাড়িতে ফেরত দেয় অন্যান্য অত্যাচার করার পর। এই দুই পলাতকের একজন তখন অন্যজনকে ডাক দেয়। একজন বাইসিক্ল চালাল, অন্যজনের হাতে মার্কিন ডিজপোজেলের ক্যাম্পকটের খোল—মোস্ট হার্মলেস লুকিং।

ভাবতে গায়ে কাঁটা দেয়, কী দুঃসাহস! এ তো সজ্ঞানে অবশ্য মৃত্যুর মুখের দিকে ধাবমান হওয়া। এগোলো ছাউনির দিকে, পুরো স্পীডে—সেপাইগুলো যাচ্ছিল পয়দল। শিগগীর দূর থেকে ওদের দেখতে পেল—সবসুদ্ধ ছ'জন। যতখানি অনুমান হল, সংজ্ঞাহীন মেয়ে দুটিকে রিকশায় বসে ধরে রেখেছে দুজন সেপাই। রাজশাহীর প্রত্যেকটি গলি, প্রত্যেকটি কুঁড়েঘরও তারা চেনে আপন বসত বাড়ির গলির মত। একটুখানি ঘুরতি পথে জোরসে সাইক্ল চালিয়ে তারা একটা অতি সরু আঁকাবাঁকা গলির মুখে পজিশন* নিয়ে

* ফৌজের কল্যাণে এখন বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম গ্রামের নিরক্ষরতমা চাষী মেয়েও 'পজিশন নেওয়া' কথাটার অর্থ ভালোভাবেই শিখেছে—হাতে কলমে। এরাই বাংলে দিত 'পজিশন নেওয়ার' সর্বোত্তম স্থানটি কোথায়—গাঁয়ের ভিতরে বাইরে, হাওরের ভাসমান 'দাম' সামনে রেখে

অপেক্ষা করল। শয়তানগুলোর জন্য। কী আশ্চর্য! অবস্থার ফেরে দুই শতাধিক বৎসর ধরে সংগ্রামে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ শ্রেণীও কি রকম হঠাৎ ইনস্টিন্‌-কটিভলি সর্বোত্তম মিলিটারি টেকটিক এস্থলে কি হবে সেটা সরাসরি উপলব্ধি করে ফেলেছে।

রিকশা দুটোকে তো এগিয়ে যেতে দেবেই। তারপর গেল আরো কয়েক-জন। সক্কলের পিছনের দুই না-পাকীকে এদের একজন দুটো কার্তুজ দিয়ে ঘায়েল করলো। প্রথম দুজনকে গুলি করলে পিছনের সবাই গলিটার মুখের দিকে এগিয়ে আসছে বলে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যেত ফায়ারিং হয়েছে কোন্‌ জায়গা থেকে। কিন্তু এই কূট পদ্ধতির ফলে সামনের সব কটা সেপাইকে ঘাড় ফিরিয়ে, সন্ধান করতে হল, ফায়ারিং কোনো বাড়ি থেকে, পাঁচিলের আড়াল থেকে গলিটার এ-মুখ থেকে, না রাস্তা ক্রস করার পর গলির ও-মুখ থেকে। ওরা সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকে গিয়েছে দুটো বাসা-বাড়ির টাট্টির মাঝখানের মেথরের পথ দিয়ে, খাটা পাইখানা চড়ে উসপার হয়ে, আরেক আঁকাবাঁকা গলি দিয়ে ঢুকলো একটা জীর্ণ বাসাবাড়ির খিড়কির দরজা দিয়ে।

গৃহস্বামী অর্ধপরিচিত। বুঝিয়ে বললে, 'আপনি যদি ঘুণাক্ষরেও স্বীকার করেন আপনি আমাদের দেখেছেন—কথা কয়েছেন বললে তো কথাই নেই—তবে আপনিও নিস্তার পাবেন না।' তার পর তাদের দামী পাতলুন বুশসার্ট বার্টার করে পেল তিনখানা গামছা—চারখানা ছিল না। উপদেশ দিলে 'জামা পাতলুন উপস্থিত বাসন মাজার ডোবাতে ডুবিয়ে রাখুন—যদিও তার খুব একটা দরকার নেই, কারণ আমরা যখন মেথরের পথে ঢুকি, তখনো বাকী খানগুলো পিছন ফিরে গলির মুখ অবধি পেঁছিয় নি।'

বন্দুক তারা গোটাপাঁচেক খাটা পাইখানা পেরুবার সময় যেটা সবচেয়ে জঙ্গলে ভর্তি, নোংরা সেটাতে পুঁতে দিয়ে দ্বিতীয় গলিতে ঢোকে নিরস্ত্র নিরীহ নাগরিকের মত।

তখন তাদের সামনে একমাত্র সমস্যা, রাত্রের মত বা দুদিনের মত আশ্রয় নেয় কোথায়? গামছা-পরা অবস্থায় সঙ্গের দশটাকার একগুচ্ছো নোট রাখে কোথায়? ওদের কপাল ভালো, একটা বাড়ির সামনে দেখতে পেল কাটা মুরগীর রক্ত। খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিন্নীমার কাছ থেকে ভিক্ষে চেয়ে নিলে খানিকটে হলুদ চুন আর ন্যাকড়া। নোট কখানা পায়ে সাজিয়ে তার উপর বাঁধলো নোংরা ন্যাকড়ার বাণ্ডেজ। তার উপর মাখালো মুরগীর রক্ত, কোনো জায়গায় বা কিঞ্চিৎ হলুদ রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে করা হল পুঁজের সাব্‌স্টিটুট্‌। এমার্‌-

---

তার পিছনে জলে কাঁধ অবধি ডুবিয়ে, চা-বাগানের টিলার সানুদেশে, চা-গাছের ঝোপের আড়ালে ইত্যাদি ইত্যাদি।

জেনসির জন্য দু'দুখানা দশটাকার নোট ভাঁজ করে পিটে পিটে প্রায় কবচের সাইজে এনে, কলাপাতা দিয়ে মুড়ে, বেঁধে মাড়ি আর গালের মাঝখানে দু'জনা দুটো গুঁজলে।

রাত্রিটা কোথায় কাটানো যায়, এই তখন সমস্যা। এদের একজন উকিল। তিনি সঙ্গীকে বললেন, আদালতে সঞ্চিত তাঁর অভিজ্ঞতা মতে ক্রিমিনাল মাত্রেরই একমাত্র ভরসা বেশ্যাবাড়ি। সেখানে যে-কোনো লোক 'বনা ফাইডি' ক্লায়েন্টরূপে যেতে পারে। কোনো পুলিশ, সেপাই আর যা শুধোয় শুধুক, এ-প্রশ্নটা "তুমি এখানে কেন?"—সম্পূর্ণ অবান্তর। ক্রিমিনালকে লুকিয়ে রাখা, আশ্রয় দেওয়া ওদের একটা সাইড প্রফেশন। কিন্তু এই গামছা-পরা লোক দুটোকে আশ্রয় দেবে কি? দেবে। যদি আগাম টাকা ফেলা যায়। উকিল তাই বুদ্ধি করে কিছুটা গালে পুরে রাখার ব্যবস্থা করেছিল। মেয়েদের পাড়ায় বরাতজোরে তারা আশ্রয় পেয়ে গেল। খেয়া পেরুবার সময় নৌকাডুবিতে ওদের জামাকাপড় ভেসে গেছে এ অজুহাত মেয়ে দুটো কতখানি বিশ্বাস করেছিল সেটা অবান্তর। রোক্কা দশটি টাকা সর্ব অজুহাতের চেয়ে বড় যুক্তি।

রাত্রে মেয়েগুলো আমাদের মিলিটারি সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতা শোনালে। প্রথমেই আরম্ভ করলো, 'বলে ওরা নাকি মুসলমান। ডোম চাঁড়ালকেও ওরকম মেয়েমানুষ গিলতে আমরা কক্‌খনো শুনি নি। কোনো দিন আমাদের নিয়ে যেত ছাউনিতে,—সেখানে যা হত বলে কাজ নেই—নীলাটা তো মারাই গেল। পালাতে পারলে তো বাঁচি। আশ্রয় দেবে কে? আর রোজ ঐ এক জিগির, ওদের সর্দার ভদ্রঘরের মেয়ে চান, আমরা যোগাড় করে দিলে মেলাই টাকা পাবো।' তারপর তারা প্রায়ই ঠা ঠা করে হেসে বলতো, 'মাস-খানেক পরে মুফতেই পাওয়া যাবে। ঢাকা থেকে খবর এলেই আমরা শুরু করবো সব-কুছ। একদিনেই ইস্কুল কলেজ থেকে এক ঝাপটায় নিয়ে যাবো সব কটা মেয়ে আর পাড়ায় পাড়ায় বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে'।"

কীর্তি দম নিয়ে বললে, "দুই বন্ধু এ-কথাগুলো পুরোপুরি বিশ্বাস করে নি, কিন্তু আমি করি।

সপ্তাহখানেক ওদের লেগেছিল পাবনা পেঁছিতে।"

শিপ্রা শুধলো, "ওরা অত দূরের পথ না নিয়ে পদ্মা পেরিয়ে ইণ্ডিয়া চলে গেল না কেন?"

"ওদের কপাল। ওরা ভুল খবর পেয়েছিল, চাঁপাই-নওয়ার গঞ্জ থেকে যশোর অবধি মিলিটারির কড়া পাহারা—অবশ্য সে-পাহারা মোতায়েন হয়েছে, সবে, সেদিন।

পাবনার পাশ দিয়ে যাবার সময় এক কনস্টেবল উকিলকে চিনে ফেলল। কিন্তু সে করলে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত আচরণ। ছুটে এসে তাকে কানে কানে

বললে, উকিলের নামে হুলিয়া বেরিয়েছে।...তখন জানতে পারলেন, পুলিশ আর ফৌজে তখন রীতিমত নিরস্ত্র লড়াই, পারলে ওদের আশ্রয় দেয়। পুলিশটাই দু'জনাকে জেলেডিঙিতে তুলে দেবার সময় বললে, "ঐ একটা মাত্র বাঁচাওতা রয়েছে এখনো। খানরা পানি বড্ড ডরায়। নৌকো দূরে থাক্, লঞ্চে পর্যন্ত উঠতে চায় না।"

কীর্তি কথার মোড় ফিরিয়ে বললে, "এদের হাতে এখন মাত্র দু'মাস সময়। পূব বাঙলার এদিকটায় বিশেষ করে চেরাপুঞ্জির তলাকার সিলেটে বর্ষা নামে কলকাতার অনেক আগে। দু'মাসেই কাজ গুটিয়ে নিতে হবে ওদের। তাই ওদের দণ্ড নেমে আসবে খুব শিগগিরই এ ধারণাটা কাল রাত্রেই আমার হয়েছিল; আজ এরা আপন অজানতে কনফার্ম করলে।

আরেকটা কথা; এরা বললে, সেই দূর রাজশাহী অঞ্চল থেকে এই আগরতলা অবধি বহুলোকের সঙ্গে তাদের আলাপচারী হয়েছে। একজন লোকও পায় নি যার ধারণা আছে, এবারে যে মিলিটারি জুলুম আসছে সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। ওরা ধরে নিয়েছে, পঁচিশ বছর ধরে নানা রাজা, নানা প্রকারের খেল দেখিয়েছেন, এবারও সেটা হবে—বেশীর ভাগেরই অবশ্য উইশফুল থিঙ্কিং সমঝোতা হয়ে যাবে—সেটারও প্রকৃতি হবে একই রকমের। উনিশ-বিশ হবে শুধু পরিমাণে।"

কীর্তি বললে, "ওদের দুজনাকে আমি তোমার কলকাতার ঠিকানা দিয়েছি।"

শিপ্রা একটু চমকে বললে, "তোমার প্রোগ্রাম কি?"

"যতটা বলেছি, ততখানি ঠিক আছে। আমি তোমাকে শিলঙে মীট করবো। তারপর কলকাতা যাবো। সেটার দিন স্থির করা তোমার হাতে। কলকাতায় ফিরে গিয়ে আমার কি হবে, আমি কি করবো সেটা আমার হাতে তো নয়ই, তোমার হাতেও নয়, খুব সম্ভব।"

শিপ্রা বললে, "ওদের দুজনার নাম দাও তো। আমি শিলঙ থেকে রামাকে জানাবো, এঁরা যদি আমার কলকাতা ফেরার আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তবে যেন ওদের কলকাতার ঠিকানা ঠিক ঠিক লিখে রাখে এবং বলে আমি ফিরে আসা মাত্রই ওদের সঙ্গে দেখা করবো। ঠিক তো?"

"তোমাকে তো কক্‌খনো অঠিক কাজ করতে দেখি নি। আয়াকে ডাকবো? তোমার খোঁপাটা বেঁধে দিক। আমাদের একবার হলে যাওয়া দরকার।"

তারপর হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে, দাঁড়িয়ে উঠে, মাথা নিচু করে শিপ্রার তরঙ্গে তরঙ্গে নেমে-আসা কুঞ্চিত কেশদামে মাথা গুঁজে দিয়ে পরিতৃপ্ত নিঃশ্বাসে বুক ভরে নিল।

শিপ্রা এলোখোঁপায় পাক লাগাতে লাগাতে বললে, "চলো, ডার্লিং। হ্যাঁ, সৃষ্টিকর্তা এতকাল ধরে তোমাকে অপদার্থ, অকর্মণ্য করে রাখেন নি, তিনি

তোমার ব্যাটারি চার্জ করেছিলেন। এইবারে খেলো, খেলো, তব ভৈরবখেলা।"

শিপ্রা লক্ষ্য করেছে, কীর্তির কম্পন সম্পূর্ণ থামে নি বটে, তব যেটুকু আছে বাইরের লোকের চোখে পড়ার মত নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

লাফ দিয়ে উঠলো হাজী। খনে দু'হাত দিয়ে কপালের রগ চেপে ধরে করুণ কণ্ঠে গোঙরায়, "গেলুম, গেলুম, আমায় ধরে তোল্" পরমুহূর্তে দু'হাতে বুক চেপে ধরে গভীর পরিতৃপ্তির শ্বাস ছেড়ে বলে, "আঃ কী আরাম, এসো ক্ষুদিরাম।"

শিপ্রা সোফাতে হাজীর পাশের জায়গায় বসে মুচকি হেসে বললে, "আমি একদম সোজা ঘোড়ার মুখ থেকে পাক্কায়েস্ট্ খবর পেয়েছি—তাও যে-সে ঘোড়া নয়, উত্তম স্কচ জাতীয় 'হোয়াইট হর্স'-এর মুখ থেকে, যে আপনি তিন বোতল 'হোয়াইট হর্স' গেলার পরও ঘোরঘট্টি অন্ধকারে পথ-বিপথ ঠাহর করে করে, কালোয় কালোয় বর্ডার ক্রস করতে পারেন। অতএব আপনি যে এই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দ্রব্যগুণের প্রভাবে—"

"বিষাদে হরিষ, ম্যাডাম হরিষে বিষাদ। এইমাত্র সেদিন আপনার আসার সঙ্গে সঙ্গে গোটা আগরতলাটা আলোয় আলোয় ঝলমল করে উঠলো। চোখ কচলালুম, দু'চোখ ভরে আরো দেখব বলে, চোখ খুলতেই দেখি, গোধূলির ম্লান আলো। আপনি গোধূলির ধূলি না ছুঁয়ে আপন ধুলো-পায়েই ফিরতি পথ ধরেছেন। হবে না বিষাদ? আর আপনার সঙ্গসুখের আনন্দটাও কী বেআইনী ক্ষণস্থায়ী।

কিন্তু এ বিষাদেও, হর্ষ না হোক, আমি একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারছি। উপস্থিত যা হাল তাতে গোটা পূব-পাকিস্তান এবং লাগোয়া আগরতলা কোনো প্রাণীর পক্ষে স্বাস্থ্যকর তো নয়ই বরঞ্চ আয়ুক্ষয়, এমন কি বায়ু নির্বাপণেরও যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত সম্ভাবনা আছে।"

শিপ্রা গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "পূর্ব পার্কের আগুন আগরতলাতেও ছড়িয়ে পড়তে পারে, এই তো আপনার আশঙ্কা? তবে বউ বাচ্চাদের কথা ভাবছেন না কেন? দিন না পাঠিয়ে আমার সঙ্গে। ভাই খান, তুমি একটা কসম খেয়ে তাঁকে ভরসা দাও, প্লীজ, যে আমার বাড়ীতে ওদের স্থানাভাব হবে না, আদর-যত্নের ত্রুটি হবে না। আমার মনে হয় আপনি এবং বাদবাকী বিবাহিত পুরুষের ৯৯% বন্ড ইরেসপনসিবল্—ঐ বিষয়টায় অন্তত।"

হাতজোড় করে হাজী বিনীত কণ্ঠে বললে, আমি করজোড়ে স্বীকার করছি দারা পুত্র সম্বন্ধে কোনো প্রকারের দুর্ভাবনা আমার সুখনিদ্রাটিকে কোনো

কালেই রক্তিভর জখম করতে পারে নি, কিন্তু ওদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আমি দশ বছর পূর্বেই একটা ফৈসালা করে রেখেছি। অবশ্য সবই ভগবানের হাতে। কিন্তু ইতিমধ্যে অর্থাৎ আজ ভোরে আমি অতি বিশ্বস্ত সূত্রে একটা ভয়াবহ সংবাদ পেয়েছি। কাহিনীটি প্রাচীন ও দীর্ঘ; আমি অতি, অতি সংক্ষেপে সারছি।

ইয়েহিয়া চায়, ভারতে একটা কমুনাল রায়েট লাগুক।

কমুনাল রায়েটের জন্য উত্তর ভারত ও পূর্ব-পাকিস্তানের জমীন সব সময়েই তৈরী। উত্তর ভারতের উগ্রতম পন্থী কিছু হিন্দু আছেন, যাঁরা পাকিস্তানের বিনাশ চান, এবং ভারতের মুসলমানদের নিতান্ত দায় পড়ে সহ্য করেন। এঁরা এই ইচ্ছেটা প্রকাশ করেন পলিটিকসের মুখোস পরিয়ে ('পাকিস্তান তৈরী হয়ে যাওয়া মাত্রই ভারত আক্রমণ করবে; তার পূর্বেই আমাদের আক্রমণ করা উচিত') এবং নিজেদের মনগড়া এক আজব হিন্দুধর্মের ঝাণ্ডা তুলে। আমি পরিপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ হিসেবে বলছি, তাঁরা যা প্রাণ চায় সে-পলিটিক্স্ করুন, কিন্তু সনাতন ধর্মের এ-রকম নীচ অবমাননা যেন না করেন—ধর্মে সইবে না।

আর ভারতের প্রতি বিশেষ করে বহু বহু পাঞ্জাবীদের ঘৃণা, বিদ্বেষ, নফরৎ, শত্রুতা এমনই প্রচণ্ড যে তার কোনো তুলনা নেই। এদেরও একটা আজব মনগড়া ইসলাম আছে যে-ইসলাম বলে, অমুসলমান মাত্রই কাফির এবং ভারতের কাফিরকুল তন্মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট অমানুষ। এদের কতল করা ইসলামের (তাদের মনগড়া ইসলামের) আদেশ—দোষী-নির্দোষী উভয়কে সমভাবে। এবং এদের স্ত্রীজাতিকে লুণ্ঠন করা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত। পাঠানদের রক্তে মজ্জায় থাকে সবচেয়ে বড় যে রিপু সেটা—লোভ, গৃধ্নু তা ও তজ্জনিত তস্কর বৃত্তি। কাফিরদের প্রতি তাদের ঘৃণা পাঞ্জাবীদের মত রিফাইনড মীন নয়। ফলে পিণ্ডিতে যে কোনো সরকারই রাজত্ব করুন না কেন, ভারত-বিদ্বেষ-নীতি তারা অবলম্বন করতে বাধ্য, এবং গোপনে সোৎসাহে বিশেষ করে পাঠানদের আপ্যায়িত করেন এই বলে, "দাঁড়াও না, দিল্লী লুণ্ঠন করার ব্যবস্থা শিগগীরই হচ্ছে।

উত্তর ভারতে কট্টর অখণ্ড পাকিস্তানপন্থী, যাদের সঙ্গে অন্য কারুরই তুলনা হয় না—বেহারী মুসলমান। এদের এক প্রভাবশালী অংশ কলকাতায় বাস করেন। তাঁদের পাকিস্তান-প্রীতি চৌদ্দ আনা পরিমাণ নিতান্ত হীন স্বার্থবশত। তাদের ভাই-বেরাদর, একদা যারা, কবিদের মত ঈষৎ অতিশয়োক্তি করে বলছি, পাটনা স্টেশনে কুলির কাজ করতো আজ তারা পূর্ব বাঙলায় ট্রাফিক ম্যানেজার, রেলওয়ে সেক্রেটারি। বাইতে তাঁরা উর্দু কথাবার্তা বলে খানদানী মনিষ্যি রূপে পরিচিত, ভিতরে বলেন, ভোজপুরী মঘী বা মৈথিলী। বিদ্যাপতি নিশ্চয়ই আপনার প্রিয় কবি; সে ভাষা যদি উর্দু হয় বর্ধমানের পদী পিসীর কোঁদলের

ভাষাও তাহলে উর্দু। এই বেহারীদের অর্ধশিক্ষিত সম্প্রদায় উর্দুর কল্যাণে পাঞ্জাবীদের সঙ্গে একজোট হয়ে পূব বাঙলাকে শুষছেন, হীনতম কলনীর মত। এরা এবং বেহার ও কলকাতার বেহারীগণ সূচ্যগ্র পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন পূব বাঙলাকে দিতে রাজী নয়। এরই উপর নির্ভর করছে তাদের পাকিস্তানে প্রীতি।"

শিপ্রা জিজ্ঞেস করলে, "এরা পার্টিশেনের সময় পশ্চিম পাকিস্তান গেল না কেন? সেখানে তো অন্তত শিক্ষিত পাঞ্জাবীরা উর্দু বলে, অশিক্ষিতেরাও অনেকখানি বোঝে। বাঙলায় এল কেন?"

হাজী বললে, "ঐ তো সরল রহস্য, ভদ্রে। পশ্চিম পাকিস্তানে ঐ সময়ে গেল উত্তর প্রদেশ ও দিল্লী অঞ্চলের অনবদ্য উর্দুভাষী বিস্তর লোক। ওদের সামনে বেহারীর উর্দু যেন রবীন্দ্রনাথের সামনে আমার কুমিল্যার খাজা বাঙলা! তদুপরি পাঞ্জাবীরাও রাইটলি অর রংলি দাবি করে তাদের উর্দু বেহারীদের উর্দুর চেয়ে বেহুতর—যদিও লক্ষ্ণৌ দিল্লীবাসীদের মতে দুটোই একটা গাধার দুটো কান।

পূব বাঙলায় যে-সব বেহারী আছে তারা পাঞ্জাবীদের চেয়ে নৃশংস পদ্ধতিতে লড়বে লীগের বিরুদ্ধে। পাঞ্জাবীরা অবস্থা মারাত্মক জানা মাত্রই ফিরে যাবে আপন দেশে, এরা যাবে কোথায়? দে হ্যাভ্ বার্নট দ্যার বুলক কার্টস।

এবং আছে আর একটা দল তামাম উত্তর ভারত জুড়ে। এবং পশ্চিম বাংলার মুসলমান বাঙালীও কিছু সংখ্যায় আছেন।"

তিন কলকাতাগত জনের চোখের সামনে ভেসে উঠলো মির্জার কুটিল মুখচ্ছবি।

"তবে এদের অধিকাংশ মক্তব-মাদ্রাসার লোক।"

ভারতের পূর্বাঞ্চলের এই ধরণের মুসলমানদের পাকপ্রীতিও স্বার্থজাত। এরা ভাবে, কাল যদি ভারতে কমুনাল রায়ট বাঁধে তবে আমরা যাবো কোথায়? পূব বাঙলাই তো হাতের কাছে। সে-দেশটা যদি লীগের পন্থা অবলম্বন করে স্বাধীন হয়ে যায়, তবে তারা ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। তখন আমরা মুসলমান বলে তো কোনো আদর, প্রেফারেন্স্ পাবো না। বেহারী মুসলমানরা আরো জানে, বাঙালী মুসলমান ভিতরের বাইরের দু'দল বেহারীকেই ধীরে ধীরে প্যাঁদাবে।

ইয়েহিয়া এজেন্ট যোগাড় করতে চায় এই পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা বিরোধী, অতএব পশ্চিম পাকপ্রেমী দল থেকে। এবং সব চেয়ে বেশী চায় কলকাতায়। কলকাতাবাসীর পয়সা আছে, তাদের পক্ষে পূব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাহায্য করা খুবই স্বাভাবিক। তাদের বিস্তর হিন্দু ইনটেলেকচুয়েল

সর্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম মনেপ্রাণে সমর্থন করে। এই পশ্চিম বাঙালী সাহায্য করবেই করবে অন্তত ভাষা বাবদে তার বেরাদর পূব বাঙালীকে। বেতার যন্ত্রটা তার প্রধান অস্ত্র।

অতএব কলকাতায় একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করতেই হবে। এবং সেটা আখেরে সাম্প্রদায়িক রূপ নেবেই নেবে। অবশ্য চেষ্টাটা দিতে হবে তাবৎ ভারতে আগুন জ্বালাতে।"

খান বললে, "কলকাতায় এসেছেন ঐ মন্ত্রধারী একটা আস্ত ঘুঘু। তার কথা তোমাকে বলি নি। নাম লারী—"

কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই হাজী "হার হায়" করছে আর মাথা থাবড়াচ্ছে। শেষটায় বললে, "ওকে আমি চিনি নে? ব্যাটা কুমিল্লাতে এলে সুধা পান করে কেণ্টনমেণ্টে। আর আমার বাড়িতে। কিন্তু বেরাদর, ওকে আমি হাড়ে হদ্দে চিনি। ব্যাটার কাছে পাকিস্তান হিন্দুস্তান মুসলমান কেরেস্থান সব বরাবর। মাত্র দুটি জিনিসের তরে সে স—ব করতে পারে। তার আপন স্বার্থের তরে। তার খাঁই প্রচণ্ড। মাতৃগর্ভে তার দাঁত ছিল না কেন, জানেন কীর্তিবাবু? মায়ের নাড়িভুঁড়ি খেয়ে ফেলত যে! সে চেনে দুটো জিনিস—একটাও বলা যেতে পারে—রূপচাঁদ ঠাকুর—টাকা, টাকা; ঐ দিয়ে মদ আর—থাক্‌গে। আপনি তো, কীর্তিবাবু, গোঁড়া হিন্দু নন। ওকে ছুঁইয়ে দিন কিঞ্চিৎ। টিকে গজিয়ে নামাবলী পরে—না, বরঞ্চ তান্ত্রিক পন্থাই বেটা বেছে নেবে। ওর কথা অন্য মোকায় সবিস্তর বলবে।"

শিপ্রার দিকে তাকিয়ে বললে, "আমি জানি, ম্যাডাম, আমি জানি আপনার ডানার নিচে আমার বউ বাচ্চা পাবে সর্বোত্তম প্রটেকশন। কিন্তু অপরাধ নেবেন না, দেবী, রায়টের সময় খুনখারাবী করে এ-পাড়ার গুণ্ডা ও-পাড়ায় গিয়ে এবং ভাইস ভার্সা। এক দল অন্য দলকে লেটেস্ট খবর দেয়, কার বাড়িতে সোনা দানা রুক্কা টাকা পাওয়া যাবে, কোন ব্যাচেলরের বাড়িতে পাওয়া যাবে না কিছুই। আমি রায়ট দেখেছি, ঢাকা কলকাতা দুই শহরেই।

কিন্তু মুসলমান পুষেছেন এ কথাটা প্রকাশ পাবেই পাবে, এবং তখন হামলা হবেই হবে।

আপনার বাড়ি এমনিতে লুঠ হবে না। দারওয়ানের বন্দুক আছে, বরঞ্চ তার চেয়ে বেশী বন্দুক চালাবেন আপনি, জানি, বিলক্ষণ জানি। ফরাসীদের কাছ থেকে শুধু একাডেমিক মিলিটারি স্ট্রাটেজি শিখেছেন আর ওরা আপনাকে আত্মরক্ষার্থে যেটুকু প্রয়োজন—বলতে কি তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী—বন্দুক পিস্তল চালাতে শেখায় নি সেটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। আপনার ভিতর দক্ষতা আছে, নৈপুণ্য আছে। সেটা লক্ষ্য করার পরও? প্রকৃত হুনুরি, সত্যকার আর্টিস্ট—তা তার আর্ট বন্দুক চালানোই হোক, আর ছবি আঁকাই

হোক—সে উপযুক্ত পাত্র পেলে তার ভিতর আপন হুনুর, সাধনালব্ধ সম্পদ রাখবেই রাখবে। ম্যাডাম যদি বলতেন যে ফরাসী 'আপাশ' সম্প্রদায়ের গুণীন পকেটমারদের সঙ্গে কাটিয়েছেন তা হলে—কার নামে কিরে কাটবো? —আপনারই সুন্দর নামে কাটি—বিচক্ষণ ব্যক্তির যা সর্বথা করা উচিত, আমি তাই করলুম—গলা কাট্যা ফেলাইলেও মনিব্যাগটা এখানে আনতুম না।

সিরিয়াসলি বলছি, কলকাতাতে দাঙ্গা লাগার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

সে অবস্থায় গোটাকয়েক মুসলমানের জিম্মেদারী আপনার স্কন্ধে চাপাই কোন্ বিবেকহীন বুদ্ধিতে?"

শিপ্রা বললে, "এ আপনার আদিখ্যাতা। প্রত্যেক দাঙ্গায় কত মুসলমান কত হিন্দুকে বাঁচিয়েছে, কত হিন্দু কত মুসলমানের প্রাণ রক্ষা করেছে, হাজী সাহেব।"

খান বললে, "শিপ্রাদি, প্রথমেই আমার একটা নিবেদন আছে। সবাই আমাকে হাজী বলে ডাকে, ব্যঙ্গ করে। একে তো হজ করি নি, অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান বাবদেও আমি গাফিল। প্রতিবারে আমাকে হাজী নামে ডেকে হয়তো ওঁদের ঐ ব্যঙ্গ করার পিছনে আছে তাঁদের সদিচ্ছা, আমি যেন ধর্মপথে চলি। অবশ্য, আল্লার ডাক শুনতে পেলে আমি কে, আমার ঘাড় তখন যাবে মক্কায়। কিন্তু আপনি আমাকে এ 'নামে' ডাকবেন না।"

শিপ্রা বললে, "আচ্ছা ডাকবো না। কিন্তু আমারও সদিচ্ছা হয় না, আপনি ধর্মপথে চলুন। আমার বিশ্বাস আপনার পথ ধর্মপথে গিয়ে মিশবে।"

হাজী আবেগভরে বললে, "আমেন, আমেন। তাই হোক তাই হোক।" মূল কথায় ফিরে গিয়ে হাজী বললে, "দাঙ্গার ভিতরও আল্লা তাঁর করুণা প্রকাশ করেছেন, যেমন আমার মত 'অপদার্থ' ও তাঁর দয়া পেয়েছে।"

কীর্তি: "দখুন হাজী, আমার সঙ্গে কম্পীট করতে যাবেন না। 'অপদার্থ' বলতে বোঝায় কীর্তি রায়!"

হাজী সবিনয়, "দাদা বয়েসে অজস্র হলেও এ ব্যাপারে আমি আপনার অনুজ, বিশ্বস্ত অনুগামী।.....

প্রতি দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলমান যখন একে অন্যকে বাঁচায়—তখনই দেখি, প্রতিবার, মানুষের মনুষ্যত্ব। স্বার্থপর পলিটিসিয়ানের প্রপাগাণ্ডা উপেক্ষা করে, পথভ্রষ্ট ধর্মযাজকদের অনুশাসনে কান না দিয়ে, সশস্ত্র গুণ্ডাদের ভীতি প্রদর্শনকে তুড়ি মেরে মানুষকে তখন সত্যের পথে, আর্তজনকে রক্ষার পথে চালায় কে?—সে তার মনুষ্যত্ব। বললে পেত্যয় যাবে না কেউ, আমার মত অপদার্থ—সরি—পাষণ্ডের ভিতরও খুব সম্ভব ঐ ধাতুটির একটি ক্ষুদ্রতম কণার ক্ষীণতম ছায়া অতি কালে-কস্মিনে চিলিক মেরে যায়—নইলে বুকে হাত দিয়ে বলুন তো আপনারা—দোহাই মনুষ্যত্বের—এতকাল ধরে বউ আমাকে বরদাস্ত করছে কি

করে ? হুঁঃ। কিন্তু ঐ লারী সম্প্রদায়ের ভিতর মনুষ্যত্বের অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমাকে বিস্তর পরিশ্রম করতে হয়েছে—মেহনৎ আমার সয় না।

কিন্তু, ম্যাডাম, আমার প্ল্যানটা আপনার সামনে পেশ করি।

আগরতলা বিপন্ন হলেই আমি বউ বাচ্চা নিয়ে চলে যাবো. কিছুটা মোটরে বা পুরোটাই হেঁটে চলে যাবো পার্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চলে, যার উপর দিয়ে আপনি প্লেনে উড়ে এলেন—সেখানকার পাহাড়ীদের সঙ্গে আমার বিস্তর ভাবসাব আছে। সেখানে এখনও প্রায় ফি বছর যাই শিকারে। প্রথম যৌবনে মেয়েগুলোর সঙ্গে নেচেছি, এদের তৈরী নেটিভ বিয়ার বিস্তর খেয়েছি। ইয়েহিয়ার বাপের সাধ্য নেই সেখানে নাক গলায়। আর ওরাও কারো সাতেপাঁচে নেই। এর চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা আমার কল্পনার বাইরে।

আর আপনার নিজস্ব, আপন কলকাতা তো আমার হাতের পাঁচ—নো—পাঁচ কোটি রইলই।"

কীর্তির দিকে তাকিয়ে বললে, "কই কীর্তিবাবু এ-অধম গাইড যে-টুকু পারে সে তো দেখালো। এবারে পাকেচক্রে কলকাতায় এলে বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাবেন তো ?"

কীর্তি কিছুমাত্র চিন্তা না করেই বললে, "আল্লা করুন এবার যেন বাঙালরা পাঞ্জাবীদের হাইকোর্ট দেখিয়ে দেয়।"

হাজী কার্পেটের উপর বসে পড়ে হাত দুটি উঁচু করে তুলে ধরলো। আবেগভরা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, "আমেন, আমেন।"

তৃতীয় অধ্যায়

স্পষ্ট মনে আছে শিপ্রার, বারটা ছিল বৃহস্পতি।

যে-বেয়ারা বিকেলের চা নিয়ে এল তার চেহারা-ছবি ধরনধারণ দেখে শিপ্রার ধারণা হল লোকটা বোধহয় সিলেটি। শুধলো, "তোমার দেশ কোথায় ?"

বেয়ারা বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। শিপ্রার চেহারা, চালচলন, তার প্রসাধনের যে কটি কৌটো শিশি ড্রেসিং টেবিলে সাজানো ছিল সেগুলোর খাস বিলিতি ঢপ ঢং দেখে তার প্রত্যয় হয়েছিল, ইনি অতি খাঁটি মিসি বাবা, অর্থাৎ ইনি জানেন শুধু ইংরেজি, আর সে যে উর্দু-অহমিয়া-খাসিয়া-সিলেটী ভাষার লাবড়াকে হিন্দুস্তানী নামে চেনে, সেইটে বলতে পারেন চালে কাঁকরে মিলিয়ে। তাঁর মুখে আচম্বিতে "বিসুদ্দ" বাঙলা ভাষা বেরিয়ে আসায় সে এমনি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছে যে তার মুখ থেকে, যেন রিফ্লেক্স্

এ্যাকশনের মত, বেরিয়ে গেল খাস সিলেটী, "কিতা কইলা ?"

আদর করে শিপ্রা যে নামে ডাকে "কীতা" কখনো সে জুড়ে দেয় "মিতা," এ-ক'দিন দুশ্চিন্তার ভিতরে কবি এ-শব্দের সঙ্গে যে মিল দিয়েছেন তারই স্মরণে মনে মনে বলেছে, আমি কি "বিস্মৃতা" ?

সিলেটী রহস্যময় "কিতা" শুনে তার বুক ছ্যাঁৎ করে উঠলো।

ইতিমধ্যে বেয়ারা নিজেকে সামলে নিয়ে হোটেলের "ভদ্রস্থ" হিন্দুস্তানীতে একাধিকবার বলেছে, "সিলেটী, মেমসাহেব," 'সিল্‌ট' মুল্লুক, মেম সাব্‌।"

"তুমি মুসলমান ? না ?"

"জরুর, জরুর। হাম্মা নাম শেখ গাব্রু, মেমসায়েব।" মনে মনে দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে, এই মিসি বাবাটি নিশ্চয়ই 'কেরামতী' জানেন—নইলে কোন্‌ দূরের মুল্লুক থেকে এসেই তাকে দেখে ধরে ফেলেছেন, সে এদেশেরই লোক নয় এবং সে মুসলমান। এবারে শিপ্রা যে প্রশ্ন শুধলো তাতে তার বিস্ময় পেঁছিল চরমে। একমাত্র তার সহকর্মী দেশ-ভাইদের দু'একজন তাকে তার জিন্দাগীতে মাত্র দু' একবার শুধিয়েছে।

"এখনো কি মহরম মাস চলছে ?"

এর সঠিক নির্ভুল উত্তর শ্রৈহট্ট অর্থাৎ শ্রীহট্ট, সিলেট-সন্তান গাব্রু মিঞার দেওয়া সম্ভবপর নয়। অবশ্য মহরমের শুক্লা দশমীতে (হিন্দু গণনায় একাদশী বা দ্বাদশী) হয়ে গেল মহরমের পরব—তাজিয়া তাবুদের প্রসেশনসহ। তার পর যে কটা দিন গেছে সেটা গুনে যোগ করলেই মহরমের ক' তারিখ, না পরের মাস সফর শুরু হয়ে গেছে ধরা পড়ে যায়। অবশ্য মিয়া গাব্রু ক'টা দিন গেছে আঙুল গুনে মোটামুটি খবরটা দিতে পারতো কিন্তু এহেন বিদ্যাধরী মিসিবাবা যিনি কিনা মহরম যে সুন্দু একটা পরব নয়, মাসও বটে, সে-হেন খাস ইসলামী খবর রাখেন তাঁকে তো উল্টো পাল্টো মাস তারিখ দেওয়া সখ্‌ৎ গুণাহ্‌ হবে।

হন্তদন্ত হয়ে বললে, "আমাদের মোল্লাজী বেয়ারাদের ঘরে থাকেন। তাঁর কাছ থেকে 'ইসলামী পঞ্জিকা' এখ্‌খুনি নিয়ে আসছি। সব খবর পাবেন।" হঠাৎ তার মনে ধোকা লাগলো : এৎনা খানদানী মিসি বাবা, ইনি বাঙলা, না হয় বাঙলা বলতে পারেন, কিন্তু পড়তে পারেন কি ? সভয়ে প্রশ্নটা শুধলো। শিপ্রা ঘাড়টি সামান্য বেঁকিয়ে মুচকি হাসলো। গোস্তকীর বিস্তর মাফ চেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো পাঁজি আনতে।

যবে থেকে শিপ্রা শিলঙ পেঁচেছে সেই থেকে কীর্তি বা খানের কোনো খবর না পেয়ে আস্তে আস্তে সে অধীর হয়ে উঠেছে। এখন শঙ্কার চৌকাঠে পা দিয়েছে। ঘরের ভিতর ভীতি, বিভীষিকা।

সব কটা খবরের কাগজ লাইন্‌-বাই-লাইন্‌ পড়েছে। সেগুলো এমনি

বিস্ফোরক উত্তেজনায় ভরা যে সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হয়—পাছে না একটু-খানি খোঁচা খেলেই বোমার মত ফেটে ওঠে। ওদিকে বিটউইন দি লাইন্‌স্‌ পড়ে শিপ্রা ঠিক বুঝে ফেলে, অন্তত আগরতলা থেকে পাঠানো সংবাদ হয় অতিরঞ্জিত, নয় মৌনগুঞ্জিত। হাজী, মিঞা সাহেব—

মিঞা সাহেবের নাম মনে আসতেই সে যেন তাঁর শেষ কথা কটি আবার শুনতে পেল। ডিনার শেষে, গভীর রাত্রে, খাস করে তার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় একমাত্র তাকেই বলেছিলেন, যেন তাকে খানিকটে আশ্বস্ত করার জন্য, কিংবা পরিস্থিতির যে ছবিটা তর্কাতর্কি, লেটেস্ট সংবাদের অদলবদলের রং দিয়ে নিমন্ত্রিতেরা এঁকেছিলেন সেটাতে একটা অংশ ফাঁকা রয়ে গিয়েছে—সেই ব্যক্তিনিরপেক্ষ তত্ত্বটির দিকে শিপ্রার নিছক দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য: পবিত্র মহরম মাসে কি কট্টর শীয়া ইয়েহিয়া খুন-খারাবী আরম্ভ করবে?

সেই গম্ভীর ইঙ্গিত ভরা প্রশ্নরূপে প্রকাশিত তত্ত্ব কথাটি শিপ্রার মনে আসতেই শিপ্রা কেমন যেন এক রকমের অকারণ অস্বস্তি অনুভব করেছিল। কিন্তু সেটা নির্ভর করছে, এখনো মহরমের মাস চলছে কি? তাই চোখের সামনে যে পড়েছে তাকেই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছে।

হায় রে প্রখরা বুদ্ধিমতী রমণী শিপ্রা? তুমি সমস্ত প্রাণমন দিয়ে কামনা করছো, যে গ্রহনক্ষত্র বিশেষ করে শশীকলা লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অলঙ্ঘ্য নিয়মে যে বেগে চলেছে, পূর্ণিমা অমাবস্যা এসেছে গিয়েছে, এদের গতিবেগ যেন অকস্মাৎ মন্থর হয়ে যায়, এই মহরম মাসটা যেন বিলম্বিত হতে বিলম্বিততর হয়ে, ২৯।৩০ দিনের পরিবর্তে ২৯।৩০ মাস ধরে চলে। শুধু তার প্রিয়, তার বল্লভ কীর্তির চতুর্দিকে দাবানলের প্রজ্বলন নিরুদ্ধ করার জন্য। তার ফলে কার কীই বা ক্ষতি হত? স্বয়ং যে রাজার রাজা মহারাজার কনিষ্ঠা-ইঙ্গিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে চলেছে তাঁরই বা কী ক্ষতি হত? তাই তো। হঠাৎ তার মনে এলো একটি গীত। তারই এক বাল্যসখা উভয়ের কৈশোরে এ-গীতিটি তাকে উপহার দিয়েছিল। কবিতাটি শিপ্রা ছাপাতে কখনো দেখে নি, কারণ 'কবি' ও বাংলা সাহিত্যে কণা মাত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন নি। বাইবেলে বর্ণিত কিশোরী তার বল্লভের সন্ধানে যে-রকম দোরে দোরে ঘা দিয়ে নিরাশ হয়েছিল, এ গীতি যে-কাগজে লেখা সেও বহু সম্পাদকের টেবিলের উপর ফ্যানের হাওয়াতে কাঁপতে কাঁপতে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয় নি। এমন কি তার প্রিয়া কালী পেঁচির দৃষ্টিও না।

মহরম দীর্ঘতর হলে সৃষ্টিকর্তার কীই বা হত ক্ষতি। গানটার মোতিফ ছিল একই:

কী বা হ'ত তোমার, রাজা,
একটু মোরে দিলে?

কীই বা ক্ষতি হ'ত কাহার
বিরাট এ নিখিলে ?
তোমার বিশ্ব বসুন্ধরা
অনন্ত বৈভবে ভরা ;
কণাটুকু যেত না তো
করুণা বর্ষিলে !

চন্দ্র সূর্য গ্রহে গ্রহে
সাজাও আলিম্পন
তারায় তারায় বাঁধো, তুমি
অলখ আলিঙ্গন ।
তোমার এ যে পূর্ণ ছবি
মিথ্যা হ'ত এর কি সব-ই
প্রিয়ার চোখে আমার চোখে
যদি যেত মিলে ।

শিপ্রার মনে আছে, কবিতা বা কবি কারোরই চোখের সামনে সেই ধূমসীর চোখ মেলে নি। অথচ আখেরে এ লক্ষ্মীছাড়িটা বিধির বিধানে পেয়েছিল কলাগাছ যে-রকম কার্তিককে পায়। এবং সে ছোঁড়া ছিল কুবের কুলের পিদ্দিম ! বিধির অধর্ম কি কোনোদিন বিধির বিধি কোনো সর্বেশ্বর বিচার করবেন না ? প্রলয় শেষে কিয়ামতের দিনে ?

যখন কবিতাটি শিপ্রা প্রথমে পড়ে তখন মনে হয়েছিল এটা ইণ্টার ক্লাস। তবু এক একটা নিতান্ত বাজে সুর যে রকম মানুষের পিছনে অষ্টপ্রহর লেগে থাকে, তাকে 'হুন্‌টু' করে এটাও করেছিল তাই। সেই মেয়েটা এবং এক ঝাঁক সম্পাদকের এই 'কাব্যের উপেক্ষিতা'কে আজ শিপ্রা—কবিগুরু যে-রকম ঊর্মিলাকে তাঁর করুণাধারা দিয়ে অভিষিক্ত করেছিলেন—সেই রকমই কবিতাটিকে তার হৃদয়-আসনে বসালো।

হঠাৎ ঐ অনবদ্য প্রবন্ধটির আরেকটি অংশ স্মরণে আসতে তার সর্বচৈতন্য বিকল হয়ে গেল। অবশ্য শুধু ভাবার্থটুকু। শব্দে শব্দে আছে ঃ

"সলজ্জ নবপ্রেমে আমোদিত বিকচোন্মুখ হৃদয়-মুকুলটি লইয়া স্বামীর সহিত যখন প্রথমতম মধুরতম পরিচয়ের আরম্ভ সময় সেই মুহূর্তে লক্ষ্মণ···বনে গমন করিলেন !"

কিছুতেই মনে আনতে পারলো না শিপ্রা, "আর্যপুত্র" ঊর্মিলাবিলাসী বনগমনের পূর্বে কয়দিন নববধূ নির্জনে সঙ্গোপনে একান্ত আপন ভাবে আর্য-পুত্রকে কণ্ঠাশ্লেষে আবদ্ধ রাখার অবসর পেয়েছিল ? সে তুলনায় শিপ্রা

ক'দিনের তরে কীর্তিকে? আর এখন সে কোথায়, কোন্ অবস্থায়।

চিন্তাধারা শিলাখণ্ডে বাধা পেল। ভালোই হল। জানলা দিয়ে দেখতে পেল, ঝঞ্ঝা-তাড়িত মেঘদূতের ন্যায় পবনবেগে আসছে গাব্রু শেখ। হাতে ঢাউস একখানা কেতাব, মুখে বিস্তৃত হাসি।

সাইজে এক্কেবারে যেন গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা। ভিতরে ওরই মত ফুলকপি মূলোর বিজ্ঞাপন, এবং মুসলমান ধর্মের আচার অনুষ্ঠান, পালপরবের সবিস্তর বর্ণন। তার বিস্তর শব্দ তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং কুটেশনগুলো যে কোন্ ভাষা থেকে নেওয়া সে সম্বন্ধে তার সামান্যতম ধারণা নেই। এই বিরাট দণ্ডকারণ্যে কোথায় মহরমের সন্ধান? হঠাৎ লক্ষ্য করলো পঞ্জিকার এক্কেবারে শেষপ্রান্তে ময়ূর পালকের বুক মার্ক সামান্য একটুখানি বেরিয়ে আছে। সেখানে কেতাব খুলতেই চোখে পড়ল আধপাতা জুড়ে বাংলা, মুসলমানি, শক, ইংরিজি, বিক্রম বহু অব্দের তারিখ গয়রহ দেওয়া আছে। হ্যাঁ, ২৫শে মার্চ, এখনো মহরম, থ্যাঙ্ক গড্।

মহরম মাসে শীয়া ইয়েহিয়া খুন-খারাবী করতে ইতস্তত করতে পারে। সেই নিছক চোরাবালির অনুমানের উপর, দ্যাখ তো না দ্যাখ, শিপ্রা গড়ে তুললো, ইয়াব্বড়া পর্বতপ্রমাণ দেউল—কোণারকের মন্দির। যে খায় চিনি তারে যোগায় চিন্তামণি। সে চিনির তলায় ফাটা সান্‌কি আছে, না মিং বংশীয় সর্বোৎকৃষ্ট পর্সেলিন—কোন্ মূর্খ করে তার বিচার?

বেয়ারা এতক্ষণে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করতে পেরেছে। শিলঙ শহরে বারো আনা লোকের মুখ চিন্তাকুল। এদের সকলেরই কেউ-না কেউ আছে—সিলেট, কুমিল্লাদিতে। এই সর্বব্যাপী দুশ্চিন্তা উপস্থিত অন্য কোন দুর্ভাবনাকে আমল দিচ্ছে না। মেমসায়েবের মুখে দুশ্চিন্তার আভাস সুস্পষ্ট। রেসেপ-শনিস্টের কাছে শুনেছে তিনি ডাক, তারের জন্য ব্যাকুল। অতএব তারই মত অবশ্যই মেমসায়েবের কেউ না কেউ পূব পাকে আছে। আপন অজানতেই যেন মুখ থেকে প্রশ্ন বেরিয়ে গেল, "মেমসায়েব, আপনার খোশ্-কুটুম কি কেউ পাকিস্তানে আছে।" সঙ্গে সঙ্গে তড়িঘড়ি বার বার আপন বে-আদবীর জন্য মাফ চাইলে। শিপ্রা তার দিকে সোজা তাকিয়ে বললে, "এতে মাফ চাইবার কি আছে! তোমার দিলে দরদ আছে। তাই শুধিয়েছ।"

গাব্রু মিঞা কি করে শিপ্রাকে চিনবে? সে বেচারী চেনে দুই জাতের মেমসায়েব। চা-বাগানের ইংরেজের স্ত্রী মেমসায়েব এবং তাঁদের অনুকরণে গড়া দিশী মেমসায়েব। এ-দু'জাত দূরে থাক সে কোনো জাতেরই মেমসায়েব, গিন্নীমা, বেগম সায়েব কিছুই নয়। বিধাতা তাকে কোন্ কোন্ ধাতু দিয়ে নির্মাণ করেছেন, পঞ্চভূতের মশলা মেশাবার সময় যে-তৃতীয়টি—তেজ—প্রচুর পরিমাণে ঢেলেছেন—সে বিষয়ে অবশ্য কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই,

সর্বোপরি তার স্বাধ্যায়, একাধিক। সমাজ দেশের সঙ্গে তার কুণ্ঠাহীন হৃদ্যতা, তার বিচিত্র বর্ণাঢ্য অভিজ্ঞতা তার জীবনদর্শন—এসব মিলিয়ে যে শিপ্রা, তাকে বিশ্লেষণ করবে কে? যার নির্মাণ, যার জীবন শিপ্রার চেয়েও বিচিত্র বৈভবে ভরা সে-ই তো? সে কোথায়? তবে কি না, ভালোবাসার সোনার কাঠির পরশ যার প্রাণে লেগেছে সে হয়তো পারে। কীর্তি হয়তো একদিন পারবে।

শিপ্রা বললে, "আমার দুই আপনজন আগরতলায়।"

এর উত্তরে গাব্রু যে মন্তব্য করেছিল তার জন্য সে মনে মনে নিজের গাল দুটোকে অকাতরে চড় মেরেছে। মোল্লাজীর কাছে কাঁদো কাঁদো হয়ে সে-কাহিনী যখন শোনালো তখন তিনি মনে মনে না—সশব্দে তার দু'গালে দুটো চড় কষিয়েছিলেন। এক সারি কটু শব্দ বলে গিয়েছিলেন অল্পশিক্ষিত মোল্লাজী তাঁর গুরুর কাছে যেগুলো শুনেছিলেন—আরবী ফারসী উর্দু, সিলেটী ভাষা উপভাষায়, "আহম্মক, নাদান, উল্লুকে পাট্টা" থেকে সিলেটী "আচাভুয়া হুমাভুতা" পর্যন্ত।

গাব্রু সরাসরি অজানতে বলে ফেলেছিল, "আখাউড়া আগরতলা তো বরাবর।"

বলতে না বলতেই সে বুঝতে পেরেছিল, কী সর্বনেশে কথা কটি তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। রাখালের মাসী যে-রকম বুঝেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করেছে, মিসি বাবার মুখ যেন মলিন হয়ে গেল।

গাব্রু প্রথমটায় ছুট লাগাতে চেয়েছিল, কিন্তু থেমে গেল। একখানা আধা সেলাম অসমাপ্ত রেখে ধীরে ধীরে কোয়ার্টারে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

রাত্রে খাবার নিয়ে এলো অন্য বেয়ারা। শিপ্রা শুধলো, "সে-বেয়ারার কি হল? আমি জানতে চেয়েছিলুম, সিলেটের খবর ঠিকমত পায় কি না, তার পরিবার—"

এ-বেয়ারা বৃদ্ধ, বহুদর্শী, নানান্ গেস্টের বহু উনুনে পোড় খেয়ে খেয়ে সে ঝামা হয়ে গিয়েছে। সে পর্যন্ত কুল্লে কায়দাকানুন ভুলে গিয়ে দু'হাত দিয়ে হঠাৎ চোখ মুখ ঢেকে ফেলল।

শিপ্রার প্রশ্নটা অসমাপ্তই রয়ে গেল। "কি হল—" বলতে গিয়ে থেমে গেল। বুড়ো নিঃশব্দে কাঁদছে—তার দু'হাতের কাঁপন থেকে বোঝা যাচ্ছে।

বুড়োকে কিছুক্ষণ কাঁদতে দিয়ে শিপ্রা বলল, "যাও তো মিঞা, মুখ ধুয়ে আসবার সময় মাস্টার্ড নিয়ে এসো।"

মাস্টার্ডের কোনো প্রয়োজন ছিল না শিপ্রার। তার মাথার ভিতর এক সঙ্গে বহু চিন্তা লড়ালড়ি করছে। কিন্তু অল্পক্ষণের ভিতরই সে কিছুটা শান্ত হয়ে কিছুটা মনস্থির করে ফেলেছে।

বুড়ো ফিরে এল।

শিপ্রা শুধলো, "মিঞা তুমি নামাজ পড়ো ?"

"জী মেমসায়েব।"

"রোজা রাখো।"

"জী, হাঁ।"

"আচ্ছা তবে শোনো। এ-সব তো করো আল্লার হুকুমে ? না ? আমি বুঝতে পেরেছি তুমিও সিলেটী,—তোমার বাল্-বাচ্চাও সেখানে ? না ?"

বুড়ো ঘাড় নাড়লো।

"তাহলে এবারে ভালো করে শোনো। সমস্ত জীবন ধরে নামাজ রোজা সব করলে আল্লার হুকুমে। তাঁর উপর নিশ্চয়ই তোমার ভরসা ছিল, নইলে হুকুম মানলে কেন ? তুমি আমার বাপের বয়েসী। অবশ্যই তোমার মাথার উপর দিয়ে বহুৎ ঝড় তুফান গিয়েছে। তাঁরই উপর ভরসা রেখে এ-সব বিপদ-আপদ কাটিয়েছ। এখন এই শেষ বয়সে সে ভরসা কম-জোর হয়ে গেল ? তুমি ভেঙে পড়লে ঐ অল্প-বয়সী বেয়ারাটাকে হিম্মৎ যোগাবে কে ? উপরে মালিক সব দেখছেন।

"আমার হাল তবে এবারে শোনো। আমি এখানে একা। তোমাদের তিনজন, ম্যানেজার-ট্যানেজার—ওরা কাজের লোক, আপন কাজ নিয়ে থাকেন। ব্যস্। আমি মেয়েছেলে। আমার এক দোস্ত, আরেকজন—তাকে আমি মহব্বত করি—দুজনা আটকা পড়েছে আগরতলায়! হয়তো বা বেরিয়ে আসতে পারবে, হয়তো বা পারবে না। আমার বাপ নেই, ভাই নেই। এবারে যাও, মিয়া, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। আর ঐ আহাম্মুখ ছোকরাটাকে বলো, সক্কলেরই দিল এখন কাতর। সে কি বলেছে, না বলেছে তাতে কি যায় আসে ? ভাবনা বাড়বে ? কমবে ? তার কথায় ? এখন যাও।"

এই যে আল্লার নাম নিয়ে শিপ্রা বুড়োকে শান্ত করলো, সে নিজে কি ঈশ্বর মানে ?

আর বহু লোকের মত শিপ্রা ছিল ধর্ম বাবদে মোটামুটি উদাসীন। প্যারিসে টুরিসট্ গাইড তাকে সুন্দর একপাল মার্কিনকে নিয়ে গিয়েছিল বিরাট এক গির্জা দেখাতে। গির্জা তখন ফাঁকা। শিপ্রা বেরুবার সময় গাইডকে বললে, "চমৎকার! ফুলদানীটা অতি সুন্দর। কিন্তু ফুল কোথায় ? মানুষ উপাসনা করছে—সে-ই তো গির্জার ফুল।" তারপর সে মাঝে মাঝে গির্জায় যেত উপাসনার সময়। বিশেষ করে মমার্ৎর্-এ পুরো শনির রাত হৈ-হুল্লোড় করে রবির ভোরে বাড়ি ফেরার মুখে। ক্যাথলিক গির্জার অর্গেন সঙ্গীত ধ্বনি-লোকের অপূর্ব গম্ভীর যেন বিরাট সিন্ধু। হাড়-পাকা নাস্তিকও সে সঙ্গীতে অবগাহন করে। পেচি নাস্তিক ঐ সঙ্গীতে ডুবে যাওয়ার ভয়ে গির্জাঘর এড়িয়ে চলে। শিপ্রার ভয় নেই, ভরসাও নেই।

একদা এক প্যারিসীনি তাকে শুধিয়েছিল, সে ঈশ্বর-বিশ্বাসী কি না ?

যেন শব্দগুলো বাছাই করে করে শিপ্রা বলেছিল, "ভগবান বাজারে বিক্রির রেডিমেড টমাটো কেচাপ্ নন—কিনে নিয়ে ব্যাগে পুরলেই হল। সমস্ত জীবন ধরে তাঁকে উপলব্ধি করতে হয়। অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে।"

রোদন-ক্রন্দনের বিকৃত মুখ, দুশ্চিন্তার শোকে ভেঙে পড়ার বিকট ভঙ্গী শিপ্রা আগেও দেখেছে। কিন্তু আজকের মত নয়।

কীর্তির সর্বাঙ্গ কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর্লোকের আকস্মিক পরিবর্তন শিপ্রার কাছে এক মুহূর্তে সরল স্বচ্ছ হয়ে গেল—নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যে-রকম আগের দিনের কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান পেয়ে যায়।

শিপ্রা কোচ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কটেজ ছেড়ে সুস্থ গতিতে হোটেলের মেন বিল্ডিঙে গিয়ে দাঁড়ালো রেসেপশনিস্টের মুখোমুখি হয়ে। স্মিত হাস্য দিয়ে আপ্যায়িত করলে "গুড্ ঈভনিং" সহ। পুনরায় "গুড্ ঈভনিং—এয়া-এর—"

হন্তদন্ত হয়ে ছোকরা বললে, "সরি, মিস রে—আমাকে উইল্‌সন্ বলে ডাকে সবাই—জিমি উইল্‌সন্।"

ছোকরা হকচকিয়ে গিয়েছে। এতদিন দু-চারবার শিপ্রাকে যখনই দেখেছে, তখনই তার মনে হয়েছে, ইনি অন্যলোকের প্রাণী। আজ রাত এগারোটায় সেই নিরাসক্তা, গম্ভীরা এ কী রূপে দিল দরশন! তার মন বলছে, "হাও লাভলি! হাও সুঈট।"

শিপ্রা সহজ সুরে শুধলো, "এনি নিউজ ?"

আসলে এতদিন সে কোনো রেসেপশনিস্টের সঙ্গে কথা বলে নি—পাছে কোনো অপ্রিয় গুজোব, সংবাদ, ওয়ার্নিং ওরা দিয়ে ফেলে। বিশ্বময় ঐ গোত্রের কর্মচারী অর্থাৎ রেসেপশনিস্টদের চোদ্দ আনা চ্যাটারবক্স্।

ছোকরা কাউণ্টারের উপর একটু ঝুঁকে ফিসফিসিয়ে বললে—যদিও স্থানটা জনশূন্য—"উয়েল মিস রে, বলবো কি বলবো না, বুঝতে পারছি নে। আমার এক বন্ধু আছে এখানকার ট্রাঙ্ক-কল দফতরে। ওরা অনেক কিছু শুনতে পায়। এখুখুনি সে আমায় ফোন করেছিল। তারই মত আরেক ট্রাঙ্ককর্মী শুনতে পেয়েছে ইণ্ডো-পাক বর্ডারের গারো না ডাউকি না যশোর কোথা থেকে কে যেন কাকে ট্রাঙ্ক-কল-এ বলেছে, আজ রাত্রেই নাকি ঢাকাতে ট্রাব্‌ল আরম্ভ হয়ে যেতে পারে। তা, তা, মিস রে, সেও যে খুব শ্যোর শুনেছে তা নয়।"

গুজোব হোক্, খবর হোক্ এইটেই যদি সে ঘণ্টাটাক পূর্বে শুনতে পেত তবে আপাদমস্তক মুষড়ে পড়তো। কিন্তু এখন তার বুকের ভিতর কে যেন একখানা টিন প্লেট বসিয়ে দিয়েছে।

স্বাভাবিক কণ্ঠে শুধলো, "আর যশোর, কুমিল্লা, বাদবাকী বর্ডার ?"

ছোকরা উত্তর দিলে, "আজ, এখুখুনি, তো আর কিছু বলে নি।" তারপর

খানিকক্ষণ ঘাড় চুলকে বললে, "কিন্তু দিন পাঁচেক আগে বলেছিল, গোলমাল লাগলে সব জায়গায় এক সঙ্গেই লাগবে। তবে সে শ্যোর ছিল না এটোল্। এখন কে শ্যোর হয়ে কি বলতে পারে ?'

শিপ্রা হাঁটুর কাছে কেমন যেন একটা দুর্বলতা অনুভব করলো।

খানিকক্ষণ না জানি কোন্ দেবতার কৃপায় তার দুশ্চিন্তা-বর্ষার অবিরল বারিধারা সম্পূর্ণ থেমে গিয়েছিল, কিন্তু তার পরের ইলশে গুঁড়ি ক্ষণে আসে ক্ষণে যায়। তারই স্বচ্ছ যবনিকা যেন নেমে এল তার বুকের ভিতর।

তবু মুখে হাসির ক্ষীণ পরশ লাগিয়ে বললে, "তোমার কথা খাঁটি, উইল্সন্। সব-কথা বিশ্বাস করলে কি আর মানুষ বাঁচতে পারে ? থ্যাঙ্ক য়্যু, অল্ দি সেম। গুড্ নাইট্—" শিপ্রা মনে মনে বললে, "ছেলেটি দরদী", লক্ষ্য করলো তার বুশ শার্টের বুকের কাটে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট একটা ক্রস্। বললে, "মাদার মেরি, তোমার মঙ্গল করুন। গুড্ নাইট্ ওল্ড্ ম্যান।"

জিমি যদিও ছোকরা বেয়ারের মত ও-রকম খুনিয়া "ফো পা" অর্থাৎ "সাপের ন্যাজ মাড়ায়" নি তবু শিপ্রার ভাব পরিবর্তন থেকে আমেজ করতে পেরেছিল সে বেসুরো কর্কশধ্বনি ছেড়ে বসেছে। এক ফো পা মেরামৎ করতে গিয়ে দুসরা কদম খাদে ফেলল না। কাউণ্টার ঘুরে শিপ্রার পাশে পাশে, কিন্তু সম্মানার্থে আধ কদম পিছনে পা ফেলে তাঁকে কটেজে পেঁাছিয়ে দিতে সঙ্গে চললো। যেতে যেতে বললো, "মাদার মেরি হেভেন্ আর্থের কুইন মেরি! তাঁকে আমার স্মরণে আনি আর নাই আনি, তাঁর করুণাধারা কখনো ক্ষান্ত হবে না।"

শিপ্রা মৃদু কণ্ঠে দরদভরে বললে, "আমেন।"

সঙ্গে সঙ্গে বহুদিনের অনভ্যাস সত্ত্বেও, ফরাসীদেশের আর পাঁচজনের মত অজানতেই ডান হাত দিয়ে বুকের উপর ক্রস চিহ্নের প্রতীক দেখালো।

উইল্সন্ একটু লজ্জা পেল। বিধর্মী পালন করলো সেই আচার—সে যেটা সমাজে পাঁচজনের অযথা দৃষ্টি আকর্ষণ না করার জন্য আপন সমাজের বাইরে এড়িয়ে যেত। কটেজের সামনে পেঁাছে বললো, "গুড নাইট, ম্যাডাম। এনি থিং এল্স্—আর কিছু ?"

এই অস্বস্তিজনক পরিস্থিতিতেও তার মনে পড়ল—প্রাচীন স্মৃতি নবীন পরিস্থিতির বিনা অনুমতিতেই উদয় হয়—প্যারিসের রেস্তোরাঁতে ওয়েটার খানা অর্ডার দফে দফে শেষ হওয়ার পর যখন জিজ্ঞেস করতো, "এনি থিং এল্স্ মাদাম" তখন তাদের মধ্যে বেপরোয়া মেয়ে বলে উঠতো, "হ্যাঁ, তোমার প্রেম !"

শিপ্রা বললে, "থ্যাঙ্ক ইউ, গুড্ নাইট, ইয়াং ম্যান্। মা মেরি তোমার মঙ্গল করুন।"

কুটিরে ঢুকে শিপ্রা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ভুলে গিয়েছে এর পর কি করতে হবে, তার পর কি, শুয়ে পড়বার আগে। মাথাটা যেন ভেকুয়াম। এবং সে বোধশক্তিও নেই। হাত মুখ ধোয়া, কাপড় ছাড়া, এসব নিত্য রাতের যান্ত্রিক রীতি—তবু—

এমন সময় কাঠের বারান্দায় দুমদাম করে পায়ের শব্দ হল। ছুটে আসছে কেউ। হঠাৎ একেবারে চুপ। আস্তে আস্তে দোরে টোকা। মৃদু কণ্ঠে "মাদাম, টেলিগ্রাম।"

তার হাত কেঁপেছিল কি না, পরে স্মরণ করতে পারে নি। শুধু একস্‌-পেরিমেণ্ট করে দেখেছিল বারান্দার ক্ষীণালোকে টেলিগ্রামটা পড়া যায় কিনা। তখন কিন্তু পেরেছিল।

বেচারা জিমি ঠায় দাঁড়িয়ে।

যেই দেখল, শিপ্রার মুখে হাসি ফুটেছে, ভদ্র হোটেলের বেবাক এটিকেট ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, "গুড্‌ নিউজ, ম্যাডাম?"

"থ্যাঙ্কু। হ্যাঁ।" জিমির তিন লম্ফে পলায়ন।

শিলচর থেকে তার। "সাতাশ তারিখে পেঁচিচ্ছি। কীতা খান।"

চতুর্থ অধ্যায়

শিলঙকে বলা হয়, "হিল স্টেশনের রানী" রাজা কে? দার্জিলিং?

রবীন্দ্রনাথ দুটোর তুলনা করেছেন অতিশয় সঙ্কীর্ণ পরিসরে:

"দার্জিলিঙের তুলনাতে ঠাণ্ডা হেথায় কম হবে,
একটা খদর চাদর হলেই শীত-ভাঙানো সম্ভবে।"

কিন্তু দার্জিলিঙের সঙ্গে তুলনা না করে তারপর শিলঙের যে-বর্ণনা দিয়েছেন তাতে শিলঙের প্রায় কোনো মাধুরিমাই বাদ পড়ে নি। যে পাইন বন শহরে পেঁছুবার বহু আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় সেটাই শিলঙের সব চেয়ে বড় আকর্ষণ। রবীন্দ্র কবিতাতে দু'দুবার তার উল্লেখ করেছেন।

খুব ভোরেই শিপ্রার ঘুম ভেঙেছে। কিন্তু এই পাইন বনের অকল্যাণে—বিশেষ করে যেখানে বনটা নিবিড় ঘন—কবি বর্ণিত:

"এখানে খুব লাগল ভালো গাছের ফাঁকে চন্দ্রোদয়" সেই চন্দ্রোদয়, সূর্যোদয় শিলঙের বহু জায়গা থেকেই দেখা যায় না। তাই শিপ্রার চোখে পড়েছে, অনেকক্ষণ ধরে ঘন পাইন বনের ছাঁকনির ভিতর দিয়ে গলে আসা প্রদোষের আধা আলোর কেমন যেন সবুজ সবুজ ভেজা ভেজা রেশের পরশ। কিন্তু কানে আসছিল যে—

বাতাস কেবল ঘুরে বেড়ায় পাইন বনের পল্লবে।

তারই ক্ষীণ ঝির ঝির মধুর, যেন কচিৎ জাগরিত বিহঙ্গ-কাকলী। শিপ্রা কিন্তু পূর্ণ জাগরিত। নিত্য উষায় তার সদভ্যাস—প্রথম আলোর চরণধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সে প্রথম পদক্ষেপ করে শয্যা থেকে ভূমিতে—কলকাতায় শেষের দু ভোরে করেছে পাদপীঠ 'পরে। কীর্তি সোনালী নীলের গালায় আঁকা, ঢেউ খেলানো পা-ওলা বর্মা দেশের একটি পাদপীঠ তার অজানতে একদিন চুপিসাড়ে রেখে গেছে।

বেদনার উত্তেজনাতে মানুষ তবু কিছুটা কাজকর্ম করতে পারে, কিন্তু নির্ভাবনার প্রশান্তি আনে অবসাদ।

ছোট্ট জানলাটির শার্সির ভিতর দিয়ে সে তাকিয়ে আছে মাঝারি পাইনের শীর্ষ পল্লবের মৃদু আন্দোলনের দিকে, আর হেথা হোথা টুকরো টুকরো নীলাকাশের পানে। ততখানি উপরে উঠতে দেবতার ঢের সময় লাগে। টিলার সানুদেশ পাইন পাতার ছুঁচে আবরিত। এখানে ওখানে সূর্যরশ্মির গোষ্পদ। চিকচিক করে তার পিচ্ছিলতা। কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে কেমন যেন একটা স্যাঁৎসেঁতে ভাব—মনটাকে প্রফুল্ল করে তোলে না।...একটি খাসিয়া মেয়ে পিছলে পাইন পাতার উপর পা টিপে টিপে সন্তর্পণে পাহাড় চড়ছে। মাঝে মাঝে পিছন পানে তাকাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে ওদিকে? ওখানে কাঠ কাটতে দেয় না। একটা ছোকরা এসে নিচের রাস্তা থেকে ডাকলে ওকে। মেয়েটা কিছু উত্তর না দিয়ে সন্তর্পণতা বর্জন করে লাফিয়ে লাফিয়ে চললো উপরের দিকে। কীই বা করে ছোঁড়াটা। সেও ছুটলো পিছনে। দু'জনাই অদৃশ্য। অনেকক্ষণ পর নেমে এল দু'জনা, হাত ধরাধরি করে, কিন্তু রাস্তায় নেমে একে অন্যের হাত ছেড়ে দিল। শিপ্রার মনে হল এদের রস আছে—নইলে এত সকালে লুকোচুরি খেলা!

বেয়ারা ভোরের চা নিয়ে এল। শিপ্রা বিছানা থেকেই বললে, বাইরের ঘরে রেখে যাও। সে সুসংবাদ পেয়েছে, ওকে মুখ দেখায় কি করে। কবির "বিনু" ছিল কমবয়সী—তার চিত্তে উদয় হয়েছিল ভাব, বিশ্বসংসারের দুঃখ না ঘোচাতে পারলে তার সেই হঠাৎ-পাওয়া আপন আনন্দ সম্পূর্ণ হবে না। শিপ্রার সে-সাধ হওয়ার কথা নয়, তবু চেনা জনের দুশ্চিন্তা, তার সামনে বেরোয় কোন্ মুখে।

আবার দুম্‌দাম্ শব্দের সঙ্গে নিস্তব্ধতা, টোকা, "কাম্ ইন্।"

তিনবার "গুড্ মর্নিং" বলার পর উত্তেজনায় ফেটে চৌচির জিমি একরাশ খবর দিলে। সেগুলো সংগ্রহ করেছে, কিছুটা বেতার থেকে, কিছু ট্রাঙ্ক-তারের বন্ধুর কাছ থেকে, কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় সবজান্তাদের ফোন করে, ফোন পেয়ে।

সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান সংবাদ। ঢাকায় কাল রাত থেকে লেগে গেছে ধুন্ধুমার। অন্য কোন্ কোন্ জায়গায় সে-খবর সঠিক কেউ বলতে পারে নি, তবে খুব সম্ভব সব ক্যানটনমেণ্ট টাউনে। জোর দিয়ে বার বার বললে, "শিলচর ইজ সেফ—পাকা খবর।"

"কি করে শ্যোর হলে জিমি?"

"গুড লর্ড! আমি আমার ট্রাঙ্ক-বন্ধুদের অতিষ্ঠ করে তুলি নি, সেই ভোরবেলা থেকে, শিলচরের খবর জানাতে?" মুচকী হেসে বললে, "ওরা হয়তো ভেবেছে আমার ফিয়াঁসে বুঝি শিলচরে।"

"আরেকটা ইমপর্টেণ্ট খবর, মাই লেডি, পাক্ আর্মি ইণ্ডিয়ান এলাকায় ঢুকবে না—এইটেই ৯৯% রিপোর্টার স্বামীনাথন তো বললে, সে তার লাস্ট শার্ট বেট্ করতে রাজী আছে? অতএব শিলচর ভেরী সেফ।"

"সিলেটের খবর?"

গলা নামিয়ে বললে, "ভালো নয়, মন্দও নয়। তবে স্বামীনাথন জোর গলায় বললে, সে নিজে জানে সিলেটে পাঞ্জাবী পাঠান সেপাই অতি অল্প—নেগলিজেবল!"

শিপ্রা একটু চিন্তা করে বললে, "দ্যাট্স্ ইট। বলো তো, জিমি, এখানকার সব চেয়ে সরেস রেডিয়ো-ডিলার কে?"

"গুডনেস মী! সে তো আমার ইয়ার বরুয়া। নাইস চ্যাপ। কিন্তু ম্যাডাম আপনি টাকা দেবেন না। শুধু দামটা জিজ্ঞেস করবেন। তারপর দেখি তার দৌড় কদ্দুর।"

"টাকা না দিলে—"

"দেবে না? মানে? হেভেনস্। ন'টার সময় দোকান খোলে যাকে বলে কারেক্ট টু দি গান।"

"কি দরকার দর-কষাকষি করে?"

"প্লীজ, ম্যাডাম। আমাকে অন্তত একটা চান্স্ দিন। আপনি এখন খুশী। লেট মী বী হ্যাপি ওলসো।"

শিপ্রা এখন গুজোব, খবর, ব্লাফ্ প্রপাগাণ্ডা, সব শুনতেই রাজী।

কাঁটায় কাঁটায় ন'টায় বরুয়ার দোকানে গেল ট্যাক্সি করে। সর্দারজী ঢাকা, কুমিল্লার যে-সব রোমাঞ্চকর গুল্-ই-বাকওলির কেচ্ছা শোনালে তার কাছে জিমির রিপোর্ট সরকারী এশতেহারের মত পানসে, বলে অনেক মীন করে নাথিং, যেন হাওয়ার কোমরে রশি বাঁধা। কোনো প্রকারের ওসকানি শিপ্রাকে দিতে হয় নি। সেদিন ডিকটেটর ইয়েহিয়ার কাহিনীই সকল কাহিনীর ডিকটেটর। এমন কি পুচকে ডিকটেটর ইয়েহিয়ার তুলনায় দানবকায় বড়া ডিকটেটর হিটলারের অতর্কিত রুশ আক্রমণের খবর তাঁর দুশমন চার্চিল

রুজভেল্ট দুজনাই জানতেন ও স্তালিনকে মাসখানেক পূর্বে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। মুসসোলীনির অতর্কিততর গ্রীস আক্রমণের পূর্বাভাস হিটলার পান নি। আমাদের পুচকে ডিকটেটর "হেইয়া সাব" কিন্তু কুল্লে ডিকটেটরকে এ-বাবদে ঘোল খাওয়ালেন। শেখের সঙ্গে সন্ধির কথাবার্তা দিনের পর দিন তিনি যখন চালিয়ে যাচ্ছেন, তখন পশ্চিম পাক থেকে তিনি আনাচ্ছেন টর্নাডো বেগে হাজার হাজার পাঠান-পাঞ্জাবী সঙ্গে সঙ্গে দিনের পর দিন। ২৫শে মার্চের দুপুর রাত পর্যন্ত ঢাকার অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করতো, ইয়েহিয়া মুজীবের মধ্যে একটা ফয়সালা হয়ে গিয়েছে। সদ্‌রু (শব্দার্থে "চক্রবর্তী") ইয়েহিয়া দু'একদিনের মধ্যেই ফৈসালার বিবরণ প্রকাশ করবেন। ২৬ মার্চ সকালে ইয়েহিয়া ভুট্টো মুজীবের সম্মিলিত হওয়ার পাক্কা এপয়েণ্টমেণ্ট। ২৫ মার্চ বিকেল পাঁচটায় ইয়েহিয়া ঢাকা ত্যাগ করলেন মুজীব এমন কি তাঁর বামহস্ত ভুট্টোকে পর্যন্ত কোনো খবর না দিয়ে। সেদিন সে-খবর জানতে পারলো অতি অল্প লোকই। খুদ ঢাকা শহরেও। আমি অফিসার ইয়েহিয়া তাবৎ সিভিলিয়ান ডিকটেটরদের শিখিয়ে দিলে একটি নবীন তত্ত্ব। আমি ডিসিপ্লিনে যে-কোনো প্ল্যান গোপন রাখা অফিসারদের "ধর্ম"—সিভিলিয়ানের পক্ষে সেটা অস্ত্রমাত্র।

শিলঙ জানতে পেরেছে ২৬ সকালে ধুন্ধুমারের খবর। যুদ্ধারম্ভের পূর্বেই ঢাকার রণাঙ্গন থেকে জঙ্গী লাটের পলায়ন—যথা, দুর্যোধনের হৃদয়ে সাহস দেবার জন্য না বাজিয়ে পিতামহ ভীষ্ম যদি চুপিসাড়ে পুষ্পক প্লেনে পলায়ন করতেন, তোবা! তোবা! শুনলেও পাপ হয়—এ-খবর হয় তো লাগে তাক না হয় তুক্কা রূপে কোনো কোনো ফলিত জ্যোতিষী অনুমান করেছিলেন মাত্র। ড্রাইভার সর্দারজী হয়তো পূর্বজন্মে জ্যোতিষী ছিল।

শিপ্রার স্মরণে এসেছে, আগরতলায় মিঞা সাহেবের কথা।

তাহলে শীয়া ইয়েহিয়া শেষ পর্যন্ত মহর্‌রমের পবিত্রতা বিনষ্ট করে ঐ মাসেই নরহত্যায় লিপ্ত হল।

"ইসলামী পঞ্জিকা"-খানাতে শিপ্রা শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হচ্ছিল বটে, কিন্তু ঠিক যে স্থলে সংক্ষেপে বলা হয়েছে, মুসলমানী হিসেবে দিবস আরম্ভ হয় সন্ধ্যা থেকে, সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে, সে অবধি পেঁছিয় নি। ২৫ মার্চ দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। কিন্তু সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে বিশ্ব মুসলিমের "স্যাবাৎ" পবিত্র জুম্মাবার, শুক্রবার। কট্টর শীয়া আরম্ভ করলেন তাঁর নরহত্যা শীয়া সুন্নী উভয় সম্প্রদায়ের পবিত্র জুম্মাবার রাত এগারোটায়, সুন্নীর কাছে পবিত্র, শীয়ার কাছে পবিত্রতম মুহরম মাসে!

শিপ্রা দোকানে ঢুকে বেছে নিল সবচেয়ে ভালো বেতারযন্ত্র—পরের মুখে ঝাল না খেয়ে সে স্বকর্ণে শুনতে চাইল ঢাকা, কলকাতা, পিণ্ডি, বিবিসি এবং জোরদার বিদেশী স্টেশনগুলো। দাম শুনে শুধলো সর্বোত্তম এরিয়ালের

সরঞ্জাম বরুয়ার লোক হোটেলে ফিট করে দিয়ে আসতে পারবে কি না, তার চাই আজই, এখ্খুনি। বলতে না বলতে জিমি এসে উপস্থিত। মাদামকে আরেক দফা সুপ্রভাত জানিয়ে তাঁকে বললে, "আপনার সেট পছন্দ হয়েছে? গুড্। এবারে আপনি সেটটি সঙ্গে নিয়ে যান, আর এই লাগিয়ে দিচ্ছি ঘণ্টা দুয়েকের তরে মোস্ট টেম্পরারি একটা এরিয়েলের তার। তারের অন্য প্রান্তটা কোনো একটা জানলা দিয়ে বাইরে ঝুলিয়ে দেবেন। দাঁড়ান, এই আমি ১৩ মিটারে লাগিয়ে দিচ্ছি নীডলটা। ডাইনে বাঁয়ে ওটাকে সামান্য নাড়লেই পেয়ে যাবেন এবিসি, আই মীন অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি না করপোরেশন কি যেন? মিনিট পনেরো পরেই পেয়ে যাবেন নিউজ বুলেটিন। ইণ্ডো-পাক খবর বিতরণে এরা প্রায়ই বিবিসিকে কানা করে দেয়। টাকা? সে আপনি আমাকে বরুয়ার নামে চেক দিয়ে দেবেন একাউণ্ট পেঈ। অবশ্য সেটা পছন্দ হলে। নইলে আজ বিকালে আমি বরুয়ার সেটটা—বেসট্ ইন্ দি ঈস্টা অব সুয়েজ, মাদাম।" বলে সেট তুলে নিয়ে চলল মাদামকে আধা বোটের মত পিছনে পিছনে টেনে।

প্যোরেস্ট অব্ দি প্যোর অহম সল্তান বড়ুয়া সমস্তক্ষণ দু'কান-ছোঁয়া মৃদু হাস্য, তৎসহযোগে ঘাড় নেড়ে নেড়ে, "অফ কোর্স্", "সার্টেনলি", "টাকার কথা কে তুলেছে?—নট মী,—বহক্, ম্যাডাম, বহক্, চেয়ারতায় বস্টে আজ্ঞা হোক" মৃদু কণ্ঠে বলে যাচ্ছে তো বলেই যাচ্ছে। শিপ্রা দু'একবার আপত্তি তোলবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল।

প্লাগে কনেকট করতে আর তার লটকাতে ক' মিনিট লাগে। নীডল একটু ছুঁতে না ছুঁতেই মেলবার্ন গাঁক্ গাঁক্ করে উঠলো, এরিয়ালের উদ্বাহু বামন বেতারের কল্যাণেই। ইতিমধ্যে দেখতে পেল এসে গেছে অহম দেশের গভীরতম অরণ্যের গগনচুম্বী বংশাবতংশদ্বয়। এ-হেন এরিয়েল দিয়ে কটকের চিঁউ চিঁউ মিঁউ মিঁউ থেকে টোকিয়োর গাঁক গাঁক শোনা যাবে পরিষ্কার—দাঁত মুখ খিঁচিয়ে স্পীকারে কান না সেঁটেও!

সমস্ত দিন কাটলো শিপ্রার এ স্টেশন ও স্টেশন শুনে শুনে।

বিশেষ করে কলকাতার ডি সি বেতার রিসেপশন এতই পীড়াদায়ক যে, সে সেখানে তাদের যন্ত্রটাকে কয়েক মাস নাড়াচাড়া করে একদম তালাক দিয়েছিল।

এখানে কী লাক্!

প্রথম সন্ধ্যাতেই, পিণ্ডি থেকে নীডল একটু সরে যেতেই শিপ্রা শুনতে পেল পরিষ্কার যদিও ঈষৎ মৃদু কণ্ঠে, "ইসি পারি, ইসি পারি।" "এখানে প্যারিস এখানে প্যারিস, মেদ্মোয়েজেল, মেদাম—"

শিপ্রা মুহ্যমান! কত বর্ষ, কতকাল পরে সে শুনতে পেল সেই প্রাচীন যুগের নিত্যদিনের সঙ্গী "ইসি পারি, ইসি পারি।" সংবিৎ হারিয়ে—প্যারিস

দিচ্ছিল খবর—সে-কথা কইতে লাগলো প্যারিসের সঙ্গে—"উই উই—হ্যাঁ হ্যাঁ, মে সার্তেনমা—নিশ্চয় নিশ্চয়—" তারপর কি একটা অনিবার্য দুর্ঘটনার সংবাদে "মে ক্য ভুলে ভু—আহা, তার আর কি করা যায়—" ফ্রানসবাসী যে কোথাকার কোন্ এক কনফারেনসে তাদের ফরেন মিনিস্টার যাচ্ছেন না শুনে মোটেই বিচলিত হয় নি—শুনে শিপ্রা ঘাড় গর্দান শ্রাগ করে মুখ বেঁকিয়ে বললে, "জ্য মা' ফু অসি—আম্মো থোড়াই কেয়ার করি।"

কে যেন দরজায় নক্ করলো। শিপ্রা তখন প্যারিসে।

"আঁত্রে, সিল্ ভু প্লে—ভিতরে আসুন প্লীজ। যেই দেখলো ঢুকেছে সেই জোয়ান সিলেটী বেয়ারা, অমনি কোথায় মিলিয়ে গেল প্যারিস! একটা ফুঁতে নিভে গেল পিদিমটি। অন্ধকার॥

পঞ্চম অধ্যায়

শিপ্রা ইংরিজি, ফরাসিস, বাঙলা বুঝতে পারে ভালো, কিছুটা হিন্দী।

সকালে মেলবার্ন হতে যাত্রা আরম্ভ করে পিণ্ড, দিল্লী হয়ে বিবিসি, দুপুরে জর্মনির কলোন, সন্ধ্যায় প্যারিস। সর্বশেষে চীন আর রাশা। ইতিমধ্যে হয়তো উটকো আজরবাইজান থেকে শুনলো ফরাসিতে কিংবা ভয়েস অব্ আমেরিকা থেকে বাংলাতে।

ফলে সব কিছু গেল ঘুলিয়ে। পরে কিছুতেই মনে পড়লো না স্বাধীন বাংলা বেতারের বাক্যস্ফূর্তি হয়েছিল কোন্ দিন, আর, ঢাকা বেতার লীগ-প্রেমীদের হাত থেকে খানরা ছিনিয়ে নিল কোন্ সময়—ছাব্বিশের সকালে। বস্তুত ঠিক সে-সময় শিপ্রা বেতার কিনতে বাজার গিয়েছে। তবে তার ভাসা-ভাসা একটা ধারণা হয়েছিল, খানদের অমানুষিক অত্যাচার এবং পাশবিক বর্বরতার সর্বপ্রথম সংবাদ দেয় এবিসি।

শেষ পর্যন্ত শিপ্রার হৃদয়ঙ্গম হল, বিস্তর স্টেশন শুনে বিশেষ কোনো লাভ হয় না। পঞ্চ পাণ্ডবের চেহারা হুবহু এক রকমের হলে দ্রৌপদী নিশ্চয়ই আপত্তি জানাতেন। এস্থলে গোটা পাঁচ—বিবিসি, মার্কিনী এবং গোটা দুত্তিন, একুনে ওকীবহাল পঞ্চ স্টেশন বিস্তর মেহন্নৎ ও দেদার পয়সা ঢেলে খবর সংগ্রহ করে; বাদবাকি কুল্লে দুনিয়ার বুড়ি বুড়ি স্টেশন এদের সঠিক সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কার্বন নন বটে কিন্তু ঐ পঞ্চ পাণ্ডব প্রদত্ত সংবাদের বিভিন্ন রকমের ঘ্যাঁট বানিয়ে বিতরণ করে। শিপ্রার এত প্যারা যে "ইসি পারি" তিনি পূব বাঙলা বাবদে প্রায়শ উদাসীন কিন্তু যখন নিন্দে করতে চায় তখন বিবিসির মত পিন-পিনিয়ে শ্যাম-কুল রক্ষা না করে, দ্যায় চুটিয়ে গালাগাল এবং মাঝে মাঝে একটা

হুলো আর মেনী বেড়াল গালগল্পের মাঝখানে এমন সব বর্ডার-ছোঁয়া আদি-রসাত্মক মাল ছাড়ে যে আমাদের এক্স্-প্যারিসিনী শিপ্রা ভিন্ন—মেয়ে নয়—যে কোনো পুরুষেরই পিলে চমকে উঠতো।

"লিবেরতে, লিবেরতে তুজুর লা লিবেরতে।"

কোন্ বেতার কতখানি "লিবেরতে" উপভোগ করে সে প্রশ্নটা শিপ্রার মনে আবার উদয় হল। বছর কয়েক আগে সে পাক-ভারত লড়াইয়ের সময় বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে আর-সবাই শুনতে চায় বলে সেও সঙ্গ দিয়ে কয়েকবার বিবিসি শুনেছিল। এখন মাত্র দু'দিন—অবশ্য বেশ বার কয়েক—বিবিসি শুনে তার মনে হল দায়িত্ববোধ মাত্রাধিক বেড়ে যাওয়ার ফলে সে ক্লীব হয়ে যাচ্ছে। আধা-ফর্সা সুন্দরীর আপন ফর্সাত্ব বাঁচানো সম্বন্ধে দায়িত্ববোধ যখন বড্ড বেশী বেড়ে যায় তখন সে যেমন রোদ্দুরে বেরুতে চায় না। চিন্তা করে শিপ্রা সিদ্ধান্ত করলো, এখন বিবিসির মূল্য নেতিবাচক। অমুক গুরুত্বপূর্ণ নিউজ-আইটেমটা পুব পাকের প্রতিবেশী বর্মা বেতার দিয়েছিল সকালবেলা, সেদিন তো নয়ই, পরের দিনও বিবিসি সেটা উল্লেখ করলো না, এমন কি বর্মার বরাত দিয়েও না। অতএব খবরটার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

ইতিমধ্যে পশ্চিম পাক বেতার যে একটাই রেকর্ড অনবরত, কিবা দিন কিবা রাত্রি, বাজিয়ে চলেছে—তার ধুয়া "তামাম পুরব বাঙালময় অখণ্ড শান্তি, অপার নিরাপত্তা।" ঐটা যে হবে সে তো নিতান্ত স্বাভাবিক। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রপাগাণ্ডা বিশারদ হের ডক্টর্ গ্যোবেল্স্ও শেষ পর্যন্ত আপন প্রপাগাণ্ডার হাড়কাঠে মুণ্ডুটি হারালেন। "বার্লিনের পতন কক্খনো হবে না," "বার্লিন কস্মিনকালেও পরাজিত হতে পারে না" এ জিগির তিনি শত শত বার শুনিয়েছেন বেতারে, বিশেষ বিশেষ বুলেটিনে, মার্চ ম্যুজিকের তেজীয়ান তাল-লয় সহ, বলীয়ান রণদামাদা সহযোগে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী বার্লিন নাগরিকদের—আজ যে-রকম হুবহু "পৃথিবীতে শান্তি অন্তরীক্ষে শান্তি" জিগির গাইছেন 'চোটা' ডিকটেটর ইয়েহিয়া—বার্লিন পতনের পূর্ব মুহূর্তে সেই কাপ্তান গ্যোবেল্স্ নিমজ্জমান বার্লিন-মানওয়ারী জাহাজ থেকে খালাসী লস্করকে আপন আপন নসীবের হাতে সমর্পণ করে এক লাফে লাইফ-বোটে আশ্রয় নেবেন কি করে? সে তো অনেক দূরের কথা—ইয়েহিয়ার তরে, এখন। এখন তার জীবনপুথির নয়া পাতা সে উল্টিয়েছে মাত্র। কিংবা সে নব-বর। আতশ বাজীর ফাঁকা আতশ—আগুন নয়, উৎসব-বহ্নি দাউদাউ করে জ্বলছে, জ্বালাচ্ছে হাট-বাড়ি, মন্দির-মসজিদ। কাঁচা বাঁশের খুঁটি আগুনে তেতে উঠে যে বিকট শব্দে ফেটে উঠছে তার কাছে কোথায় লাগে পাঠানের বিয়েতে রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজ?—লোকে বলে ইয়েহিয়া পাঠান, আসলে সে শীয়া দারওয়ান গুণ্টির ছেলে, জাতে কিজিলবাশ, পাঠান কুত্রাচ শীয়া হয় না। বিয়ের বর্ণ লাল, লালে

লাল, রক্ত লাল। আবির আর পিচকারী মারার তরে লাল রঙের কী প্রয়োজন? —মোগল ছবিতে হোলির দিনে, বিয়ের সাঁঝে পাঠান মোগল হারেম-মহিলারা পিচকারি দিয়ে টকটকে সুগন্ধি লাল জল—সুর্খ্-আব্ মারতেন একে অন্যের তনুদেহে—এন্তের মোগল তসবীরে আছে, মুসলিনের দুপাট্টা, সোনার চুমকিদার উড়িষ্যার ফিলিগিরি রুপোর তার আর রেশমী সুতোয় বোনা সদরিয়া ভেদ করে সিক্ত করে দিয়েছে শুভ্র ফেননিভ সিত কুণ্ডলিকা। নৃত্যের তালে নীবিবন্ধ শিথিল হতে শিথিলতর হয়ে উন্মোচিত করে দিয়েছে নাভিপদ্ম। লক্ষ্য ভেদ করো, মারো পিচকারি, হে হারেমরাজ নটবর ইয়েহিয়া মহরমের শুক্রের রাতে। কি? রক্তরাগরঞ্জিত বারি আর নেই!

কি ভাবনা তব ওহে সৈনিক,
হোয়ো নাকো ম্রিয়মাণ!

না, না, না—স্ফটিকাধার থেকে শিরাজের লাল পানি নিচ্ছো কেন, রসরাজ। যদি তুমি এখন ঢাকেশ্বরীর প্রসাদাৎ প্রাসাদে দুর্বার স্কন্ধাবার নির্মাণ করে থাকো তবে আনাও না রক্ত, জোয়ানদের তাজা খুন্, রমণীদের অঙ্গরক্ত। বুড়ীগঙ্গার পানি তো ডুবে মরেছে উপরের রক্তস্রোতের চাপে। কোনো লাস্যবতী ন্যাকরা করে বলতে পারবে না, বঁধু রং দিয়ো না গায়।

তুমি তো দিচ্ছ রক্ত। ড্যাম ইয়োর রং।...

সাতাশে মার্চ শিপ্রা ধীরপদে গেল রাত এগারটায় হলঘরে। উইলসন মাস্টার ছোট্ট একটা কমজোর বাল্‌ব ছাড়া, সবকটা আলো নিভিয়ে ঝিমুচ্ছে। যেন ঘিয়ের পিদিমের আলোতে একটা বাচ্চা ছেলে ঘুমুচ্ছে। কোনো প্রকারের শব্দ হলেই সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে নিদ্রালু ভাব কাটবার আগের থেকেই জপ করতে আরম্ভ করে, "ইয়েস্ প্লীজ! হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ।" কিন্তু শিপ্রা এসেছে অতিশয় নিঃশব্দে। এবং তার পায়ে দিল্লীর বিল্লী মোরান মহল্লার সেলিম-শাহী—এর সোল নাকি তৈরী হয় চামচিকের ডানা পিটে পিটে; সত্য নির্ণয় কঠিন। শিপ্রা দুই হাত আড়াআড়ি বিছিয়ে তার উপর বুকের ভর দিয়ে চুপসে দাঁড়িয়ে রইল। দেখছিল, সরল কিশোরের তন্দ্রা তার মুখচ্ছবি কী মধুর আর সরলতর করে দিয়েছে। এ-রকম আদুরে আদুরে মুখ থাকলে কী কিশোর, কী যুবা, কী শিশু সবাইকে কন্টিনেন্টে বলে "মাদারজ্ ডার্লিং" "মায়ের দুলাল"।

এক সময় জেগে উঠবেই। ধড়মড়িয়ে দাঁড়িয়ে "গুড্—" সম্পূর্ণ করার পূর্বেই শিপ্রা শুধোলে, "জিমি, সে, ইউ গট ব্যান্ড, কন্যাক্—ফ্রেণ্ড?"

জিমি থ। ইনি অবশ্যই সোসাইটি লেডি। এঁর চতুর্দিকে যে আবহাওয়া সে তো সোসাইটি লেডিরই উপযুক্ত, এবং সেও ইলিয়ট রোডের প্রাচীন দিনের এ্যাংলো—মদ্যের সঙ্গে শিশু বয়েস থেকে তার পরিচয়—তবু এ লেডির সঙ্গে

কন্যাক্ কেন, ব্যাণ্ডির ফোঁটা পর্যন্ত খাপ খাওয়াতে পারলো না। যে রকম তার ড্যাডি। পাল-পরব ভিন্ন তাকে সে কখনো সে-পাশ মাড়াতে দেখে নি।

জিমি ঃ "সার্টেনলি, সঙ্গে সোডা না প্লেন্ জল ?"

"সোডা আর জল দুইই। আর দুটো ওয়ান গ্লাস নিয়ে আসবে, সঙ্গে করে ? কিন্তু বঁ দিয়ো—ইয়াল্লা—কাউণ্টার সামলাবে কে ?"

"কী যে বলেন, মাদাম ! বেয়ারা রেখে যাবো। সে ডেকে দেবে। কিন্তু এখন তো বড় কিছু একটা কাজ থাকে না।"

শিপ্রা কটেজের ড্রইংরুমে জিমিকে মুখোমুখি বসিয়ে "হিয়ার ইজ লাক !" ব'লে জিমির গেলাসে আপন গেলাসের সঙ্গে টক্কর লাগিয়ে টুং করে ধ্বনিতরঙ্গ জাগালে।

জিমির বয়স কম হলেও বড় হোটেলের রেসেপশনিস্ট্ রূপে তার অভিজ্ঞতা হয়েছে বহু বিচিত্র এবং প্রচুর। সে তাগড়া জোয়ান, চেহারা মিষ্টি মিষ্টি, সব্বাইকে আপ্যায়িত করতে হামেহাল তৈরী। বিস্তর চা-বাগানের মেমসায়েব, নেটিভ মেমসায়েব, সোসাইটি লেডি, মার্কিন টুরিস্টিনী হিল স্টেশনে আসে নিছক যৌনক্ষুধা পরিতৃপ্ত করতে। তাদের ভিতর আবার গড্ ড্যাম্ পার্ভার্ট। কলকাতায় পুরুষরা বড় বড় হোটেলে ঢলাঢলি করেন। শঙ্কর তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সে-নাটকের অত্যুত্তম বর্ণনা এবং নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে যে রস সৃষ্টি করেছেন, সেটি গৌড়জন আনন্দে করিছে পান সুধা নিরবধি। অবশ্য ঢলাঢলির জন্য রমণী দরকার। অতএব তেনারাও আছেন, কিন্তু সেখানে তারা প্যাসিভ উপাদান মাত্র, যেমন হুইস্কি। কিন্তু বোম্বাই কলকাতাতে যৌন-ক্ষুধাতুরা রমণীরা সক্রিয় স্বাধীন পদ্ধতিতে রতি-সখার সঙ্গসুখ উপভোগ করার জন্য বড় বড় হোটেলের "সদ্ব্যবহার" করতে ঈষৎ কুণ্ঠিত হন। ফলে বংশানুক্রমে এঁরা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন সেটা বহুবিধ পথ আবিষ্কার করেছে। তার মধ্যে দু'টি পন্থা উৎকৃষ্ট। জাহাজে করে দরিয়ায় দরিয়ায় ভাসতে ভাসতে নব নব যৌনাভিজ্ঞতানন্দ সঞ্চয় অত্যুত্তম বটেক্, কিন্তু যদি অত্যধিক, সহ্যাতীত উৎকট উচ্ছৃঙ্খলতার দরুন সংকট দেখা দেয়—যদিও এস্থলে পরিষ্কার বলে রাখা ভালো, এ-সব টুরিস্ট জাহাজের অধিকাংশই ইহভুবনে সর্বজনবিদিত, সমর্থিত "জলচর সোনাগাছি"—সোনাগাছিকে অপমান করা এ-পুস্তকের উদ্দেশ্য নয়—তখন কাপ্তেনের আদেশে কাট্ আউট্, কেবিনে রুদ্ধাবস্থা থেকে সে রমণী মুক্তি পায় কি প্রকারে ? অথচ প্রতি রাত্রে কোটিপতিনীর অসহ্য প্রয়োজন একটা তাগড়া জোয়ানের, কোনো কোনো স্থলে একাধিক। কথিত আছে, রাশার জারীনা কাতেরীনার জন্য প্রতিদিন নিত্যনূতন গার্ড অব অনার উপস্থিত রাখা হত, নিত্য নবীন বলিষ্ঠ প্রিয়দর্শন আর্মি-অফিসার দ্বারা নির্মিত। মহারানী ফাইলের সম্মুখ দিয়ে ধীরপদে যেতে যেতে যাকে সে-সন্ধ্যার নর্মসখা রূপে

উৎকৃষ্ট মনে হত তার দিকে এক মুহূর্তের শতাংশেক মাত্র চোখের একটি ঝলক বুলিয়ে দিতেন। মহারানীর সহচর বয়স্যের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ক্ষুরধার অসিকে এক কটাক্ষে দ্বিখণ্ডিত করতে পারতো। মানুষ মাত্রেরই ভ্রান্তি হয় এ-প্রবাদটি বক্ষ্যমাণ বয়স্যের ক্ষেত্রে নিতান্ত অপ্রযোজ্য। যমরাজ সম্বন্ধে সুপ্রচলিত গল্পটির "ট্রাজেডি অব্ এরর" তিনি কুত্রাপি কদাচ ঘটাতে দেন নি—কিংবদন্তী সে-বিষয়ে সবিশেষ সোচ্চার।

কিন্তু মার্কিন কোটিধারিণীরা যা-ই করুন না কেন, জারের আর্মি অফিসারদের মত বিশ্ববাছাই সুদর্শন যুবক সংগ্রহ করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ জারের আর্মিতে বা রাজদরবারে প্রবেশ করার গৌরব তথা অর্থলাভার্থে পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকে বাছাই বাছাই সুদর্শন, দুঃসাহসী, ভদ্রাচারণ-সম্পন্ন যুবক আসতো সেণ্ট পীটারসবুর্গে, মস্কোতে। রুশের কালিদাস কবি-সম্রাট পুশকিন্-এর মাতামহ মূলত ছিলেন আবিসীনিয়ার হাবশী—পীটার দি গ্রেটের ফৌজে তিনি জেনারেল পদে উন্নীত হয়েছিলেন। আজ কী নিকসন, কী মাও সে তুং এ-সম্মেলন করতে অক্ষম। ন্যাশনালিটি তার বিষফল পাসপোর্ট—স্বদেশে আপন নাগরিকতা না হারিয়ে ভিন্ন দেশের ফৌজে ঢোকা আজকাল প্রায় অসম্ভব। শ্রীসুভাষের ফৌজ হিটলার বা মিকাডো-ফৌজের অঙ্গরূপে শপথ নেয় নি। এ-তত্ত্বটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, কারণ বাঙলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পূর্বে ও পরে এ-সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

অতএব মার্কিন কোটিধারিণীরা বিশ্বপরিক্রমায় বেরোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সভ্য অসভ্য নানা সৌন্দর্য উপভোগ করতে। হিল স্টেশনে অর্ধসভ্য, পূর্ণ অসভ্য সর্বশ্রেণীর মানুষ সুলভ। এঁদের অনেকেই অতিসভ্য ককটেল, মাত্রাধিক মার্জিত পুরুষসঙ্গ সর্বাধুনিক নৃত্য অত্যধিক উপভোগ করার ফলে এ-সবের তরে সোয়াদ রুচি হারিয়ে ফেলেন। তাঁরা তখন বোরোন প্রকৃতির সন্ধানে। সভ্যতা দ্বারা অকলুষিত তরুণ-তরুণীর সন্ধানে—যারা পূর্ণিমা রাতে গাঁয়ের ছোট্ট নদীটির পারে পারে বাঁশী বাজিয়ে প্রিয়াকে জানায় আহ্বান, প্রকৃতিদত্ত তার দেহটি মনুষ্যনির্মিত কোনো উপাদান দ্বারা কলঙ্কিত না করে তরুণী নির্মজ্জিত করে আছে তার দেহবল্লরীটি ঝরণাধারার স্বপ্নমগ্ন বালুচরের উপর। পূর্ণচন্দ্রের উজ্জ্বল রৌপ্যালোক তার ঘনকৃষ্ণ চিক্কণ মসৃণ চর্মে বার বার আঘাত হেনে চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

হিল স্টেশনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণঃ সমস্ত রাত ধরে পাহাড়ীদের সঙ্গে নৃত্যগীতে টুরিস্ট মগ্ন হলেন, লুকোচুরি খেললেন, সমতলভূমি হলে ছোট্ট নদীটিতে জলকেলি করলেন, ওদের হোম মেড্ বিয়ারে ধক্ অত্যল্প বলে বে-এক্তেয়ার হলেন না, ওদের আচার-ব্যবহার কায়দা-কেতায় খাপ খাইয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারলে ওরাই অতিথির (ঠিক শব্দ নয়, যেন ভিন্ গাঁয়ের জাতভাই)

নিঃসঙ্গতা সইবে না, গা ঘেঁষে বসে এমন এক বলা-না-বলার ভাষায় ভাবের আদান প্রদান করবে, আভাসে ইঙ্গিতে মৃদুহাস্যে লজ্জাবনত নয়নে কত না না-বলা-বাণী দিয়ে ভিনদেশীকে সম্পূর্ণ আপন করে নেবে। সখীরা কখনো কাছে এসে, কখনো দূরের থেকে সাহসিকাকে গানে-গীতে সঙ্গ দেবে, আর কখনো বা অশরীরিণীর মত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।...পক্ষান্তরে তাঁতের ঘরে বলদ ঢোকার মত রামপেঁচা গাড়লস্য গাড়ল কোনো কোনো টুরিস্ট ইডিয়টের মতো বেমক্কা জেব থেকে নোটের তাড়া বের করে সঙ্গিনীর হাতে ঠাস করে চড় খেয়েছে এ হেন বিপর্যয়ও অবিদিত নয়। এবং মাঝে-মধ্যে শ্রাদ্ধারম্ভ হয় সেখানেই। পরের দিন পাহাড়ী বেয়ারাদের ঠোঁট-কাটা-কোনো-একজন কাহিনীটি কীর্তন করে অন্য বেয়ারাদের কাছে এবং ক্রমে ক্রমে সেটা লেফাফা-দুরস্ত ক্লাবেও পেঁছে যায়। এ-পরিস্থিতিতে মাঝদরিয়ার জাহাজ থেকে নিষ্কৃতি কোথায়? হিল স্টেশনের সেই তো সুবিধে। চলে যাও অন্য কোনো স্টেশনে। "বেটার লাক্ নেক্সট্ টাইম এট নেক্স্ট্ প্লেস, ওল্ড বয়, ও রভোয়া।"

রাত তো কাটলো প্রকৃতির অকলুষ বাতাবরণে আনন্দঘন চৈতন্য থেকে চৈতন্যান্তরে।

দুপুরে টুরিস্ট ফের সভ্যতার উচ্চতম শিখায় আরোহণ করবে, অর্থাৎ ঝকঝকে চকচকে উচ্চ দণ্ডাসনে বসবে পেতল, স্টেনলেসের বার-এর সমুখে। বার-এর থাকে থাকে স্ফটিক পাত্রে বিচ্ছুরিত হচ্ছে নানা বর্ণের রশ্মিচ্ছটা। বার-মেড্ হেথায় মেড্ অব্ লিপস্টিক, রুজ, ম্যাসকারা মাখানো আঁখিপল্লব; ভুরুর স্থলে দুটি বঙ্কিম রেখা যেন অনঙ্গ বিহঙ্গ এই এক্ষুনি দুটি বিস্তৃত পক্ষ সামান্যতম কম্পন লাগাতে না লাগাতেই বিলীন হয়ে যাবে দিকচক্রবালে। মাথায় প্রতিদিন নিত্য নবীন কবরী। কভু বা বাবুই পাখির বাসা, কভু বা রেমব্রাণ্টের আঁকা বিদেশী সদাগরের পাগড়ি-পারা, কভু বা মুণ্ডুটা যেন আস্ত একটা টী পট—তার উপরে বসিয়ে দিয়েছে ভুটানী টী-কোজি।

উত্তম উত্তম পানীয়। দূর থেকে ভেসে আসছে, বিলিতি বাদ্যির বাজনা। দু' চক্কর শটিশে বা পেনশনারদের মত মন্থরগতিতে সম্মুখপানে মর্নিং ওয়াক, মন্থরতর গতিতে প্রত্যাবর্তন—ল্যামবেৎ ওয়াক।

কিন্তু বেচারী জিমি সভ্যতার এ-প্যাটার্নের সঙ্গে নিজেকে কখনো খাপ খাওয়াতে পারে নি। চা বাগিচার রন্দী থার্ড ক্লাস ইংরেজও যে ভিতরে ভিতরে তাকে "এ্যাংলো" বলে তাচ্ছিল্য করে সে সেটা আট বছর বয়সে প্রথম স্কুলে গিয়েই টের পেয়েছে, পরে অপমানিত বোধ করেছে, এখন অনেকটা সয়ে গিয়েছে। কারণ "বিজনেস ইজ বিজনেস," খদ্দেরকে সন্তুষ্ট করতেই হবে, হোক সে পাঁড় মাতাল, লম্পট ইংরেজ, হন তিনি মার্কিন লক্ষ ডলারের মালিক—

সেইখানেই তো সংকট। সে বড় হয়েছে তার কট্টর প্যুরিটান পিতার হাতে। তার মনে কোনো দ্বিধা ছিল না যে হোটেল বার-এ যে সভ্যতার প্যাটার্ন বিরাজ করে সেটা খৃষ্টানদের কলঙ্ক। কারণ এ-সব নারকীয় উচ্ছৃঙ্খলতা এদেশে প্রবর্তন করে ইংরেজ এবং তারা খৃষ্টান।

তদুপরি জিমির চেহারাটি যেমন মধুর—হাসলে দু'পাটি দাঁত ঝলমলিয়ে ওঠে—শরীরটাও তেমনি দড় মজবুৎ। সুন্দুমাত্র তার কব্জি কতটা চওড়া একবার তাকিয়ে দেখলেই হয়, বুকের পাটা থাক্। মার্কিন টুরিস্টিনীদের কেউ কেউ সর্বভুক, দূরের অনেককে নিকটতম বন্ধুরূপে পেতে চান। ঠেকাবে কি, কে? ডলার নেই?

একথা সত্য যে ম্যানেজার, প্রোপাইটারের ইচ্ছা এটা নয় যে জিমি অনিচ্ছায় হোটেলের বেসরকারী 'জিগোলো'—পুং বেশ্যা—রূপে মার্কিন মহিলাদের সঙ্গ দিক। অবশ্য এটাও সত্য, ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে গেলে হোটেলের কিছুটা বদনাম হবে। সেটা তাদের স্বার্থবিরুদ্ধ। পক্ষান্তরে জিমির অনমনীয়তায় ক্রুদ্ধ হয়ে কোন মার্কিন যদি পরদিন জিমির বিরুদ্ধে উল্টো-পাল্টা অভিযোগ আনেন সেটাও হোটেলের সুখ্যাতিকে ক্লিষ্ট করে—আর জিমির পক্ষে ভয়াবহ সংকট।

হোটেল-ম্যানেজারকুল উকীল ডাক্তারের চেয়েও বহুদর্শী। ম্যানেজার জানে অভিযোগ মিথ্যা।

তাই এহেন উভয় সংকটে ম্যানেজার মাত্রেরই মুখে মাত্র একটি বুলি, "ট্যাক্ট্, জিমি, ট্যাক্ট্। একটুখানি ট্যাক্ট্ দিয়ে ম্যানেজ করো না কেন? তোমার কি দরকার, জানো, জিমি? আরেক আউন্স্ ট্যাকট্।"

ব্যাপারটা ট্যাক্টের সীমা ত্রিসীমানার ওপারে সেটা জিমি সবিস্তর বুঝিয়ে বলেনি—কক্খনো। তার যথেষ্ট ট্যাক্ট্ আছে বলেই সে জানে, বলাটা হবে ট্যাক্ট্লেস। ম্যানেজারকে আহম্মুক বানিয়ে তার লাভ? সব জেনে বুঝেও তাঁর আত্মসম্মানে লাগবে চোট। তাই সেটা হবে মোক্ষম ট্যাক্ট্লেস। হুঁঃ ট্যাক্ট্? হিটলারকে বললেই হত, "একটুখানি ট্যাক্ট্ খর্চা করলেই তো স্তালিনগ্রাদের লড়াইটা জিততে পারতে!"

এবং ম্যানেজার সেটাও বুঝতে পারতো, দু'তিন দিন পরে অকারণে তার পিঠ চাপড়ে বলতো, "উয়েল, জিমি, জীবনটা কি রকম? হাও ইজ লাইফ?"

এই হোটেলের চাকরিতে জিমির এ-রকম অভিজ্ঞতা পূর্বে কখনো হয় নি।

চাকরির দৈনন্দিন জীবনে আপিসে হোটেলে দোকানে চাকুরের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ আছেই। এই যে ম্যানেজার এ্যাব্বড়া তনখা পায় তাকেও তো জাঁতাকলের ভিতর দিয়ে যেতে হয় প্রতিদিন। তবে হ্যাঁ, কারো কলটা বড্ড

ভারি, কারোটা অপেক্ষাকৃত হালকা।

এ-রকম ধারা রাত এগারোটায় তাকে এতদিন কোনো টুরিস্ট দুটো গেলাসসহ আহ্বান জানানো মাত্রই—বস্তুত জানানোর পূর্বেই সে গোঁফ দেখতে পেত—জানানোর পর শিকারি-বিড়ালসুদ্ধ। "ডিউটির সময় আমাদের ড্রিংক বারণ" "৩২ নম্বর অপেক্ষা করছেন টোকিও থেকে একটা ট্রাঙ্ক-কল; আমাকেই কানেক্ট্ করতে হবে" দুনিয়ার কুল্লে সত্য কারণ, মিথ্যে অজুহাত, দুটোর ককটেল অছিলা—এটা অবশ্য এখনো পরখ করে নেয় নি—"আবহাওয়া দপ্তর এখখুনি খবর দিয়েছে, কাঁটায় কাঁটায় এগারোটা দশে আমাদের হোটেলে দারুণ ভূমিকম্প হবে। সেটা সামলে নিয়ে, এই এলুম বলে, ম্যাডাম।" প্রায় সব-কটাই এস্তেমাল করেছে জিমি,—এখন তার রেস্তো তলানিতে খতম খতম করছে—এক কড়ির ফায়দা ওঠাতে পারে নি।

আজ এই তার জীবনে সর্বপ্রথম দুটো গেলাস সে নির্ভয়ে—না, নির্ভয়ে নয়—বড় তৃপ্তি আর আশা পূরণের দৃঢ় আশ্বাস নিয়ে এসেছে। ডিউটিতে, বাইরে, বাড়িতে—না, বাড়ি বলতে হতভাগার প্রায় কিছুই নেই, "গৃহে মাতা নাস্তি" এমন কি "অপ্রিয়বাদিনী ভার্যা চ" নেই—তার জীবন বৈচিত্র্যহীন। প্রত্যেকটি দিন যেন অন্তহীন একটা মালগাড়ির ওয়াগন—সব কটা হুবহু একই ঢঙ একই বহরের। জন্মমুহূর্তে এঞ্জিনটা চলে গেছে পশ্চিম দিকে অস্তাচলের দেশে, এখন সে দেখছে, রেল লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা ওয়াগনের পর ওয়াগন চলেছেতো চলেছেই। অবশ্য কোনোটার রং চটা, কোনোটা ডাইনে বাঁয়ে দুলছে, কোনোটা বা ঝাঁ চকচকে সদ্য বার্নিশ পালিশ করা। কিন্তু এ-মালগাড়ির শেষ কোথায়? পূর্বাচলের দিকে তাকিয়ে দেখে গাড়ির শেষান্ত সেখানে বিলীন, ফের অস্তাচলের দিকে তাকিয়ে দেখে প্রারম্ভাংশও সেখানে অদৃশ্য।

কী মহিমান্বিত, কী ডিগনিফাইড এই সুন্দরী। সামান্যতম অস্বস্তির চিহ্নমাত্র নেই তাঁর প্রশান্ত মুখচ্ছবিতে। আর কি সহজ সুরে বললেন, "তোমাকে আমার বড্ড ভালো লেগেছে, জিমি। তোমার মুখটা খাঁটি 'মাদারস ডার্লিঙে'র মত, কিন্তু দেহটা—বাই অল দ্যাট্ ইজ হোলি—কী মজবুত, ম্যাগনাম সাইজের হাড় দিয়ে তৈরি।...শোনো, তোমাকে ডেকে আনলুম, সেলিব্রেট করতে। স্টেশনটার কি নাম ধরতে পারি নি। বললে, রাশা নাকি অতি দৃঢ় ভাষায় ইয়েহিয়াকে বলেছে, রক্তারক্তি বন্ধ করতে। আমার মনটা যেন নাচছে। ...কই তুমি খাচ্ছো না কেন? আমি কিন্তু, ভাই, কিছু মনে করো না, এক গেলাসের বেশী খাই নে। তুমি নির্ভয়ে খেয়ে যাও। বানচাল হবার বহু আগেই তোমার একটা চুলের এ্যাট্রন কাঁপন দেখেই তোমাকে থামিয়ে দেব।"

জিমি মনে মনে বললে, "সে আবার বলতে! আস্ত বোতল গেলার মত

চীজ ইনি নন।" গেলাসটা নাক অবধি তুলে ধরে একটু বাও করে বললে, "আমাদের ভিতর সকলেই কোনো না কোনো দিক দিয়ে পূব বাঙলার সঙ্গে বিজড়িত। আমার মুরুব্বী মিস্টার সেন—হেম সেন—সিলেটে তাঁর বেশ কিছু টাকা পড়ে আছে। ভিজা পান নি সেখানে গিয়ে তদ্বির করার জন্য। শেষটায় আমি যাই, সিলেটের চা-বাগান ম্যানেজার এক ইংরেজকে পটিয়ে। বাগাতে পারলুম সামান্যই—এক বেহারীর বাচ্চা খামোখা দিলে বাগড়া পদে পদে। ঐ বিচ্ছু গুলোই বী ইন দি অয়েণ্টমেণ্ট। আর এটা তো নিশ্চয়ই শুনেছেন, আজ কোন্ এক মেজর জিয়া আজ সকালে চাটগাঁ বেতারে পূব বাঙলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন? কিন্তু ম্যাডাম, আপনার আনন্দে আমি পুরোপুরি যোগ দিতে পারছি নে। আমার ট্রাঙ্ককলের বন্ধু ঘণ্টাটাক আগে আমাকে জানালে সেই সুন্দরবন অঞ্চলের হাসনাবাদে, পশ্চিমে পদ্মা পেরিয়ে উত্তর বাগডোগরা অঞ্চলে আর এই আমাদের দক্ষিণের সিলেট বর্ডার পেরিয়ে দুটি পাঁচটি রেফুজি আসতে আরম্ভ করেছে, অলরেডি—"

"আর শিলচর?"

"যে দু'পাঁচটি ঐ পূব বর্ডারে ক্রস্ করেছে, তারা নিশ্চয়ই করিমগঞ্জেই আশ্রয় নেবে। আমি রেফ্যুজি দেখেছি অনেক। ওদের শরীরে কি কিছু আছে যে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে দূরে শিলচরে যাবে!"

"আমার বন্ধুরা তাহলে কাল নাও আসতে পারে?"

"আপনার অনুমতি নিয়ে, কেন?"

"ওরা বোধহয় রিফুজিদের সাহায্য করতে চাইবে।"

জিমি খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললে, "আপনারা তো কলকাতার লোক। অপরাধ নেবেন না, আমি কিই বা জানি। তবু বলি, সাহায্য করতে পারে কলকাতা আর দিল্লী। ড্যাডি আমাকে বলেছিল, চল্লিশের দশকে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তখন সব চেয়ে বেশী সাহায্য আসে কলকাতা থেকে। কিন্তু কলকাতার খাস বাসিন্দারা তো অনেক পরে জানতে পারবে, তাও আপন চোখে দেখে নয়, ওদের কী মরণ বাঁচন হাল। করিমগঞ্জ, শিলচরে ভলাণ্টিয়ারের অভাব হবে না, আমি শ্যোর। আপনার বন্ধুরা ইনফিনিটলি বেশী সাহায্য করতে পারবেন, কলকাতাতে চাল ডাল, ওষুধপত্র এবং টাকা—ইয়েস্ টাকা—যোগাড় করে। ও'রা তো আগরতলা, করিমগঞ্জ, শিলচরে যথেষ্ট দেখে শুনে ওয়াকিফ হয়ে গিয়েছেন। ও'রাই পারবেন কলকাতায় পাবলিক ওপিনিয়ন ফর্ম করতে। 'সরি', ম্যাডাম।

এবারে আর কম্পন শিহরণ নয়। এবারে কেমন যেন আড়ষ্ট আড়ষ্ট ভাব। খান তাকে সোজা নিয়ে গিয়েছে পাশের কটেজে। খাটে শুইয়ে বললো, "তুমি শিপ্রার সঙ্গে কথা কও তো, ভায়া। কিন্তু দোহাই আল্লার, সবটা বোলো না—কেটে ছেঁটে। আমার এখনো পিলে চমকাচ্ছে। আমি চললুম জিমিকে শুধোতে লেটেস্টটা কি? ওর গায়ের প্রত্যেকটা লোম বেতার এনটেনা।"

শিপ্রা বললে, "জিমি এখন অফ্‌ফ্‌ ডিউটি।"

"ঐ আনন্দেই থাকো। আমি আসছি জেনেও সে অফ্‌ফ্‌ হবে! পীপিং পীটারকে স্পষ্ট দেখতে পেলুম আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে। শেয়ানা ছোকরা, আমাদের ত্রিমূর্তি-মিলনে চতুর বলেই চতুরানন হতে চায় নি, ওয়ান—নো,—টু, টু-মেনি হতে যাবে কেন?"

শিপ্রা খুশী মনে খানের বকর বকর শুনছে; ততক্ষণে কীর্তি জিরিয়ে নিক, মনের জট ছাড়াক। বললে, "আমার ঘরে একটা বেতার আছে। মিনিট দশেক পরেই বিবিসি খবর।"

"আমাদের ত্রি-মূর্তির ঐ একটা মাত্র কমন পয়েন্ট। বেতারাসক্তি কারোরই নেই। শুনেছি, লেবাননের আরব চাষা হাল চালাবার সময় বলদের শিঙে ট্রানজিস্টার ঝুলিয়ে বেলি ডান্‌সের তালে তালে হেলে দুলে এগুতে থাকে। বেতার বটতলার মাল। এখন অগত্যা শুনি। কপাল!"

"বলদটাও তালে তালে পা ফেলে তো? তাহলে নিশ্চিন্ত মনে নটের গুরুর কাছে দীক্ষা নাও। তোমার তো, জানি, দুটোই বাঁ পা।"

"নো, মাদাম, ভূতের হয়। আমার চারটে।...তা কি হবে, কও (বার-এর 'কোন্ মদ্য খাবে'র পরিভাষা)? কীর্তি হোয়াট্ ইজ ইওর পয়জন? তোমার সর্বাঙ্গে বিষ ছড়িয়ে পড়েছে। কড়া বিষ খাও। চাঙা হয়ে উঠবে।"

শিপ্রা বললে, "ব্র্যান্ডি এ্যান্ড চেসার-ই ভালো। আর আমার জন্য আলাদা ক'রে পাঠিয়ো না। আমি ওরই থেকে এক-আধ চুমুক নেবো'খন।" খান অন্তর্ধান।

শিপ্রা ঝুঁকে নিচু হয়ে কীর্তির কানের লতি-তে চুমো খেয়ে কানে কানে বললো, "কাপড় ছাড়বে না, কীতা?"

"মিতা, এখন তুমিই আমার সব। আমি সব সয়ে নিয়ে সব করতে পারবো। আমি হৃদয় দিয়ে বলছি, শিপি, আমার সব অবশতা কেটে গিয়েছে। আগরতলাতে আমি সত্যি বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলুম, কিন্তু করিমগঞ্জে আমার বিভ্রান্তি অন্তর্ধান করলো। দাঁড়াও বুঝিয়ে বলি; আগরতলাতে যেন শীতের ছায়া-ঢাকা দুপুরে হঠাৎ কে আমায় পিছন থেকে ধাক্কা মেরে হিম-শীতল জলে ফেলে দিলে আর আমি সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় অবশ। এমন সময় দেখি, ওপারে

বুড়ো গোছের লোক দিব্য সাঁতার কেটে কেটে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে। ইতিমধ্যে আমার হাত-পা নিজের থেকেই একটু আধটু নড়াচড়া আরম্ভ করে দিয়েছে—রক্ত সঞ্চরণের প্রয়োজনবশত। আমি ভালো সাঁতার জানি, ডুবে মরতুম না নিশ্চয়ই। এবং অবশ্যই পত্র-পাঠ ফের ডাঙায় ফিরে আসতুম, কিন্তু ঠাণ্ডা জলের প্রতি বুড়োটার ঐ ন্যাক্কার-ভরা তাচ্ছিল্যে যেন আমার অজানতেই সর্বাঙ্গের জড়ত্ব ডাঙাশ মেরে তল্লাট-ছাড়া করে দিয়েছে। আম্মো ততক্ষণে পাঁই পাঁই করে মাঝ পুকুরে চক্কর মারছি আর ডুব সাঁতারে পুকুরের এপার ওপারে মাকু চালাচ্ছি। করিমগঞ্জে গিয়ে সে-বুড়োটার কাহিনী শুনলুম। কিন্তু তুমি কি খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিলে? খবর গুজোব যতই ছড়াচ্ছিল ততই তোমার কথা ভাবছিলুম।"

শিপ্রা সদয় মুচকি হেসে বললে, "প্রথম দিনটা বড্ড খারাপ গেল। দু' কান বন্ধ করে রইলুম পাছে খবর গুজোব শুনে ফেলি। তারপর কি যে হল জানি নে। নিজে যেচে খান যে-জিমির কথা বলছিল তার কাছে গেলুম। ও-রকম ছেলে হয় না। সে-ই আমার রয়টার, টাস্ এবং মাতাহারি।"

"মাতাহারি? স্পাই?"

"ইনটেলিজেন্স্ ম্যান।" আমি জানতুম না ট্রাঙ্ককল কর্মীদের ভিতর এত দোস্তী সমঝোতা থাকে। কোথায় জলপাইগুড়ি, কোথায় বনগাঁ শিলচর শিলঙ? একে অন্যকে কখনো দেখে নি কিন্তু গলা চেনে নাম জানে। ওরা যে অনেক কথাবার্তা শুনতে পায় সে তো জানা কথা। জিমির এক বন্ধু ট্রাঙ্কে কাজ করে। সে ইণ্ডো-পাক বর্ডারের যত সব তাজা খবর জিমিকে জানাতো। তাই জিমি আমার মাতাহারি ×১০০=০০

শেষটায় যখন শুনলুম ঢাকায় আরম্ভ হয়ে গিয়েছে শয়তানের কারবার—হেল্ লেট্ লুস্—তখন সব ভয় কেটে গেল।

পড়লো পড়লো ঐ তো ভয়
পড়ে গেলে সব-ই সয়॥"

কীর্তি বললে, "কী আশ্চর্য! আমার বুড়োর কাহিনী ঐ ট্রাঙ্ককল্ অপারেটার দোস্তী নিয়েই শুরু। ২৫ মার্চ বিকেলের দিকেই ঢাকার ট্রাঙ্ক কর্মীরা জেনে যায়, রাত্রেই আমি ক্র্যাক্ ডাউন ঢাকা, চাটগাঁ, আরো অনেক টাউনে একই সঙ্গে আরম্ভ হবে। আর্মির আপন বেতার, জোরালোট্রানস্মিটার আছে, কিন্তু কাজের চাপ সামলে উঠতে না পারলে ওরা সাধারণ ট্রাঙ্কেরই শরণ নেয়। নিশ্চয়ই টাপেটোপে এবং পাঞ্জাবী ডায়লেক্টে—ঢাকা থেকে অফিসাররা অন্যান্য শহরের অফিসারদের ইন্স্ট্রাকশন্স্ দিচ্ছিল ক্র্যাক ডাউন সম্বন্ধে। কিন্তু ট্রাঙ্কের লোক আড়ি না পেতেও আপন কাজের খাতিরেই কয়েকটা চালু ভাষা বেশ শিখে ফেলে—আর পাঞ্জাবী তো তারা শোনে নিত্যি

নিত্যি, সিভিল মিলিটারি দুইই।

আমি যে-বুড়োর বাহাদুরীর কথা বলছিলুম, তিনি আদৌ বুড়ো নন। এমন কি প্রৌঢ়ও বলা চলে না। বেঙ্গল রেজিমেণ্টের বাঙালী অফিসারদের একজন—মেজর। তিনি কি করে খবর পেলেন সিলেটের হবিগঞ্জ টাউনে বসে, ২৫-এর সন্ধ্যায় যে, আজ রাত্রেই শুরু হবে বোঝাপড়া? ট্রাঙ্ক কর্মীর কল্যাণে। অবশ্য অন্য মাধ্যমও হয়তো ছিল।

বেঙ্গল রেজিমেণ্টের একমাত্র বাঙালী হিন্দু অফিসার মেজর দত্ত তখন ছুটিতে, হবিগঞ্জ থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চিঠি পাঠালেন, সেই রাত্রেই, লোক মারফৎ, খবর জানিয়ে; তিনি পরদিনই না-পাক্ খানদের খতম করার জন্য সিলেটের দিকে রওয়ানা হবেন। দত্ত যোগ দেবেন কি?

দত্ত উত্তরে জানালেন, কাল ভোরেই তাঁর কাছে পেঁছবেন।

কীর্তি অনেকক্ষণ নিশ্চুপ বসে রইল। চোখ মেলে তাকিয়ে আছে শূন্য দৃষ্টিতে, যেন স্মরণে আনতে পারছে না, ভুলে-যাওয়া কোনো-কিছু। মাঝে মাঝে তাকায় শিপ্রার চোখের গভীরে—যেন সেখানেই পাবে রহস্যের সন্ধান। শেষটায় প্রত্যেকটি শব্দ, মনে হল যেন বাছাই করে করে ধীরে ধীরে বললো, "শিপ্রা, আমার বিস্ময়ের অবধি নেই, অত্যাশ্চর্য অলৌকিক এ-রকম একটা ব্যাপার যে আদৌ সম্ভবে তারই সামনে আমি দিশেহারা, সৃষ্টি রহস্যের চেয়েও ঘনতর রহস্য যেন সৃষ্টির এক নগণ্য অংশ, ঐ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হবিগঞ্জে—যার নাম তুমি আমি কেউই কখনো শুনি নি, শুনতুমও না—অকস্মাৎ কুয়াশার যবনিকায় বৃহত্তম, খুদ সৃষ্টি রহস্যকে ঢেকে ফেলতে পারে, এ যে সর্ব তর্ক-শাস্ত্রে, ন্যায় মীমাংসাকে অর্থহীন করে দেয়; অংশ কি কখনো পূর্ণের চেয়ে বৃহত্তর হতে পারে! সিন্ধু-বিন্দু কি কখনো সিন্ধুর চেয়ে বিরাটতর কায়া ধারণ করতে পারে? ২৫ মার্চের সন্ধ্যায় এই হবিগঞ্জের লোকটি কোন দুঃসাহসে একাই যুদ্ধঘোষণা করে দিল ইয়েহিয়া, তার ফৌজ এবং সবচেয়ে বাস্তব কঠিনতম শত্রু ওদের ট্যাঙ্ক, বমার প্লেন, সাঁজোয়া গাড়ি, বিরাট বিরাট কামানের বিরুদ্ধে? লোকটা তো গলির আধ-পাগলা পুচকে ছোঁড়াটার মত নয়, যে নিত্যি নিত্যি রাস্তায় রাস্তায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে স্তালিন হিটলার মা কালী মৌলা আলীর বিরুদ্ধে 'সশস্ত্র সংগ্রাম ঘোষণা' করে। দুজনার কাছ থেকে আমি ওর কথা শুনলুম। দু'জনাই একমত: লোকটা অতিশয় শান্ত প্রকৃতির, স্থির ধীর। তার দুর্দমনীয় চঞ্চলতা প্রকাশ পায় সুদ্দুমাত্র তার ঘন ঘন ঠা ঠা উচ্চহাস্যে—যেন সে সর্বক্ষণ তক্কে তক্কে আছে ঠা ঠা করার সুযোগের তরে।...মেজর সে। সে কি জানে না, ইয়েহিয়ার শক্তি কতখানি? পূব পশ্চিম উভয় পাকিস্তানে সৈন্য সংখ্যা কত,

কোন্ কোন্ শহরে আছে ক্যান্টনমেন্ট, ট্যাঙ্ক বোমারু জঙ্গী-বিমান সংখ্যা, সব—সব তার নখদর্পণে, সে যে তাদেরই একজন; সে জানবে না? সব জেনে শুনে সে হয়ে পড়লো একা, একান্ত একা ছিটকে পড়লো সেই সর্বগ্রাসী অসংখ্যের মাঝ থেকে? যেন গ্রহচ্যুত নক্ষত্রের মত ক্ষিপ্ত বেগে অদৃশ্য অজানার পানে ধেয়ে ধেয়ে জ্বলে পুড়ে ছাই-ভস্ম খাকধুলোতে—না,—নিঃশেষ নাস্তিতে পরিণত হতে?

কোরু মামদো-পিশাচ চাপলো তার স্কন্ধে যে হঠাৎ উদোম ভূতের নৃত্য আরম্ভ করে দিল সে!

জানো শিপ্রা বরিশালের খাজা বাঙাল আমার এক ক্লাস ফ্রেন্ড বিপদে পড়লেই, মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করতো,

'কী কল পাতাইছ তুমি?
বিনা বাইন্দে নাচি আমি।'

হ্যাঁ এ-ভূতের বাদ্যের সঙ্গতও নেই। কোথায় মৃদঙ্গ, জগঝম্প, ঢক্কা-ডিন্ডিম? এমন কি একটা বাঁশের বাঁশি—অর্থাৎ একটা রাইফেলও নেই কারো কাছে।

বললুম না, অজানা অদৃশ্যের উদ্দেশে?

শেখ সায়েব, আওয়ামী লীগের নেতারা সব কোথায় কে জানে?

কোনো প্রকারের নির্দেশ মেজর পান নি। ইনি যে পদক্ষেপ করলেন সেটা পরে ওঁদের সম্মতি পাবে কি—যদি, অবশ্য, তাঁরা স্বয়ং কোনো নিরাপদ আশ্রয় পান।

বরিশাল-খুলনা থেকে সিলেট, কক্সবাজার থেকে দিনাজপুর এই বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে এমন কোনো সংযোগ ব্যবস্থা নেই যে সংবাদ আদান-প্রদান মারফৎ ইয়েহিয়ার বর্বরতার ফলে কোন্ জায়গায় কি প্রকারের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল সে-সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হওয়া যায়।

তিন শ্রেণীর বাঙালী রাইফেলটা অন্তত চালাতে পারে

(ক) বেঙ্গল রেজিমেন্টের যে-সব অফিসার সেপাই বাঙালী

(খ) আধা-মিলিটারি বেঙ্গল রাইফল্স্

(গ) পুলিশের বেশ-কিছু সংখ্যা

এরা কি মেজরের পন্থা অবলম্বন করবে? যদি না করে তবে যে-সব কিশোরযুবক তাঁর চতুর্দিকে জড়ো হবে, রাইফেল চালানোর ঐ যৎসামান্য ট্রেনিংটুকুই বা ওদের দেবে কে?

এবং সব চেয়ে বড় প্রশ্ন, উপর থেকে নির্দেশ না-পাওয়া সত্ত্বেও গ্রামের লোক সাড়া দেবে কি?"

কীর্তি দম নিয়ে বললে, "এ রকম দফে দফে প্রশ্নের সংখ্যা অগুনতি।

মোদ্দা কথা ঃ অর্গেনাইজেশন নেই, নির্দেশ নেই, অস্ত্রশস্ত্র নেই।"

আমার লেটেস্ট খবর দুই মেজর কয়েকশ' রাইফেল নিয়ে এগুচ্ছেন শ্রীমঙ্গলের দিকে। সেখানে নাকি এক ঝাঁক খান রয়েছে।

তারপর কাল ২৭ মার্চ চাটগাঁ থেকে আমাদের এই মেজরেরই মত সমস্ত দায়িত্ব আপন স্কন্ধে নিয়ে মেজর জিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বাধীনতার সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন, চাটগাঁ বেতার মারফৎ। এখন দেখা যাক্ বাদবাকি দেশটা কি ভাবে সাড়া দেয়।"

শিপ্রা বললে, "তুমি যে সব সমস্যার অসম্পূর্ণ ফিরিস্তি দিলে ঠিক ঐগুলোই নিয়ে মেজর বিব্রত হয়েছেন, এমনতরো নাও হতে পারে। যারা তোমাকে বিবরণ দিয়েছে তারা পরিস্থিতিটা বিবেচনা করে তাদের যুক্তি বুদ্ধি অনুযায়ী এ সব প্রশ্ন তুলেছে। এই সমস্যাগুলো মেজরকে বিব্রত করুক আর নাই করুক, তাঁর অন্য সমস্যা থাক আর নাই থাক, প্রশ্নগুলোর কিন্তু একটা বাস্তব মূল্য আছে। এগুলোতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে, অন্তত হবিগঞ্জ অঞ্চলের সাধারণ জনের চিন্তাধারা, মনের অবস্থা। আমাদের কাছে তার মূল্য প্রচুর।"

কীর্তি মুগ্ধ হয়ে বললো, "মিতা, আমি কি বৃথাই বলি তুমি তুলনাহীনা। আমি শুধু সমস্যা আর প্রশ্নগুলোকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলুম, তোমার অন্তর্দৃষ্টি গিয়েছে সেগুলোর পটভূমির দিকে তীক্ষ্ণতম ক্ষুরধার নিয়ে।...বেচারী রবি কবি! তাঁকে যেতে হয়েছিল তুলনাহীনার সন্ধানে সাতসমুদ্র পেরিয়ে আর্জেনটীনা না কোথায় যেন।

'সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।'

আর আমি কী অবিশ্বাস্য ভাগ্যবান।"

শিপ্রা হেসে বললে, "আর আমি যদি বলি, আমি ভাগ্যবান, আমিও দেখেছি সমুদ্র না পেরিয়ে—

'অদ্যাপিও সেই খেলা খেলে গোরা রায়।
মধ্যে মধ্যে ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।"

এমন সময় ঘরটাকে দাপটে খান খান করে খান সাহেবের প্রবেশ।

গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললে, "মদ্যাদি যখন আরেক কদম এগুলেই সম্পূর্ণ বর্জন করে ফেলবে তখন মুসলমান ধর্মে দীক্ষা নিয়ে নাও না, এই বেলাই? আমার মত সদ্‌গুরু পাবে না। খুদ আরব মুল্লুকেও না। পাকী একটা ঘণ্টা আমি বেতার যন্ত্রটার কান মলে মলে, বিবিসি কলোন ভিয়েনা ঢুঁ মারার সঙ্গে সঙ্গে সাপটে দিলুম আধা বোতল গর্ডন। আর হেথায় হেরি, ফুলবাবু মশাই আর পটের বিবিটি কড়ে আঙুল পরিমাণ গেলাসটি শেষ করতে পারেন নি। একেই কি বলে সভ্যতা? হায় শ্রীমধু!...শোনো আমি এসেছি তোমাদের

বাইরে নিয়ে যেতে। সত্যি বলছি এ-রকম বন্ধ ঘরের অবশ বাতাসে গুজুর গুজুর করতে তোমাদের গুজুর গুজুরের উদ্দেশ্যই সফল হবে না। মুক্তি সংগ্রামের জন্য তৈরী হতে হলে চাই মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস। আরেকটা তত্ত্ব কথা বলি, তোমরা মদ ছেড়ে দিলেই বাঙালীরা রাতারাতি পাঞ্জাবীদের হাইকোর্ট দেখাতে পারবে না, আর মাত্রা বাড়ালেও লীগ তাদের আশা ভরসা বুড়ীগঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে না। এ্যাব্বড়া যুদ্ধটা যখন চাঁচল চালালো সে কি তখন নির্জলা উপবাস করেছিল। হ্যাঁ নির্জলা অতি অবশ্য বটেক; নির্জলা হুইস্কি ঐ সময়েই মাঝে মধ্যে সে টেনেছিল। রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না? তৈরী হও এখুখুনি।"

ঘর থেকে বেরুতেই দেখে জিমি দাঁড়িয়ে আছে।

খান তার গতানুগতিক সম্ভাষণ করার পূর্বেই জিমি নিচু গলায় বললে, "সব কথা বলতে গেলে এখানে দাঁড়িয়ে হয় না। কাল একজন নূতন গেস্ট এসেছে হোটেলে। আমাকে অ্যাংলো জেনে ড্রিংক অফার করলে, দোস্তী জমাবার তরে। তার ইংরেজি উচ্চারণ থেকে হানড্রেট পার্সেণ্ট শ্যোর লোকটা পাঞ্জাবী। কিন্তু কোন্ পাঞ্জাবের? অথচ হোটেলের খাতাতে লিখেছে, মিরাট। আমার কি রকম যেন ধোঁকা লাগছে। কারণটা হয়তো আপনার কাছে এপীল করবে না, তবু বলি। লোকটা যদি আর পাঁচটা টুরিস্টের মত আমাকে সোজাসুজি শুধতো, ইণ্ডো-পাক বর্ডার কত দূরে, কদ্দুর অবধি যাওয়া যায়, রেফুজিরা ভিড় লাগায় নি তো রাস্তায় তা হলে আমার মনে ধোঁকা লাগতো না। দিস্ জনি সোজা পথ না ধরে বিস্তর বীটিং এবাউট দি বুশ করে করে পেঁছিল চেরাপুঞ্জিতে—কী তার আগ্রহ, কত বৃষ্টিপাত, বছরে ক'দিন বৃষ্টি হয়, আর যত সব রাবিশ প্রশ্ন। তার পরও বর্ডারের পথ ধরলো না। ফের আশ কথা পাশ কথা। তারপর এল বর্ডারের টপিক্। আমি ইচ্ছা করেই ভাসা ভাসা উত্তর দিতে লাগলুম। কখনো বা রহস্যময় উত্তর ফিসফিস করে। স্পষ্ট দেখলুম তার ক্যোরিসিটি দারুণ উত্তেজিত হয়েছে। মুখোস খসে গেছে। হুস হুস করে একটার পর একটা প্রশ্ন শুধোতে লাগলো—মাঝেসাঝে বাজে প্রশ্নের ভেজাল দিয়ে আসল উদ্দেশ্য কামুফ্লাজ করতে ভুলে গিয়েছে। তার প্রশ্নের রকমারি থেকে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম ব্যাটা এখানে আসার আগেই সব কিছুর সন্ধান নিয়ে এসেছে। এখন শুধু লেটেস্ট অবস্থাটা জানতে চায়।

আরেকটা কথা: এখানে নেবেই চেল্লাচেল্লি, পথে তার ট্রানজিসটার খোয়া গিয়েছে। ম্যুজিক ভিন্ন সে দু'দণ্ড বাঁচতে পারে না। আমাকে সক্কলের পয়লাই শুধলো, এখানে ট্রানজিসটার পাওয়া যাবে তো, দোকান কোথায়? ছুটলো টী না খেয়েই। সঙ্গে সঙ্গে আমি বড়ুয়াকে ফোনে আমার সন্দেহের কথা জানালুম। বড়ুয়া তো একদম শ্যোর লোকটা ওয়েস্ট্ পাঞ্জাবের। এবারে শুনুন মজাটা।

যতবার আমি তার কামরার বারান্দা দিয়ে গিয়েছি কান পেতে শুনেছি, নো, নো, নো ম্যাজিক এটোল। লো ভলুমে শুনছে ন্যুজ। এনি উয়ে, টক্। ম্যাজিক ককখনো না।

আজ আমাকে শুধোচ্ছিল, অত উঁচু এ্যারিয়েল কার? তবে কি বেতার কর্মী? তবে—"

হঠাৎ জিমি থেমে গেল। বললে, "ঐ আসছে চিড়িয়াটি। আপনি পরিচয় না করতে চাইলে, স্যর কেটে পড়ুন। ও সকলের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ জমাতে চায়। দু'একবার স্নাব্‌ড্‌ও হয়েছে। অভ্যাস বদলায় নি।"

চিড়িয়া এসেই অতিশয় যৎকিঞ্চিৎ বিরক্তির সুরে বললেন, "বাজে ট্রানজিসটার। আচ্ছা, ঐ মিঃ বড়ুয়া, সে এটার দাম কেটে একটা পুরো পাক্কা রেডিয়ো সেট দেবে না, ঐরকম স্কাই হাই এরিয়েল সহ?"

"আমার তো মনে হয় না, মিঃ কুরেশী।" (বাজে কথা। কিন্তু জিমি বড়ুয়ার স্বার্থ দেখছে)

"কেন? হোটেল বলতে পারে না, আমি রেসপেকটেবল গেস্ট? ওর মেশিন বিগড়োই নি।"

"আমি পাতি রেসেপশনিস্ট্। বরঞ্চ ম্যানেজার পারেন।" (জিমি জানে, বেটা আখেরে বড় রেডিয়ো কিনবেই।)

খান মাঝখানে নাক গলিয়ে বললে, "আপনাদের কথার মাঝখানে বাট্ ইন করছি বলে অপরাধ নেবেন না। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি টুরিস্ট্। হেথা হোতা ঘুরে বেড়াবেন। ট্রানজিসটারটা কাজে লাগবে—আজকাল প্রতি বুলেটিনে গরম গরম খবর দিচ্ছে। আর বাড়ির বড় সেটটা দিয়ে শুনবেন রাত্রে ফরেন, দুবলা স্টেশন।"

চিড়িয়া সোৎসাহে খানের সঙ্গে জোর ঝাঁকুনি দিয়ে হ্যাণ্ড শেক করে "আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশী হলুম। আমার নাম রহমান কুরেশী—"

জিমি বিস্মিত হল, খান তখখুনি নিজের পরিচয় দিলে না কেন—যেটা স্বাভাবিক এটিকেট।

খান তখন কুরেশীকে বলছে, "বাট্ শ্যোরলি আই মেট্ ইউ এট্ লাহোর, প্রেসক্লাবে,—এই ফেব্রুয়ারী, না জানুয়ারিতে অর্থাৎ হাই জ্যাকিঙের আগে। আপনার গলায় ছিল ভারী মজার একটা টাই।"

এক মিলিমিটারের শতাংশের এক অংশ টাক লোকটা যেন বেসামাল হলো। একটু জোর গলায় বললে, "অসম্ভব। আমি কখনো পাকিস্তান যাই নি।" আরো সামান্য গলা চড়িয়ে "আমি ইণ্ডিয়ান সিট্‌জেন বাই বার্থ। উত্তরপ্রদেশ।"

খান প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, "আই এম সরি, অত্যন্ত দুঃখিত"…, অতঃপর তার একেবারে নিজস্ব "উর্দুতে"—"বেয়াদবী মাফ করেংগাহে।"

কুরেশী উর্দুতে তুফান তুলে টর্নাডোতে পেঁছিবার পূর্বেই খান ইংরিজিতে ফিরে গিয়ে বলল, "আমি উর্দু জানি না তাই বলে কি কোন্‌টা লক্ষ্ণৌয়ের উর্দু আর কোন্‌টা লাহোরের উর্দু তার তফাৎ জানি নে! আমি মুর্গ মুসল্লম বানাতে জানি নে, তাই বলে কোন্‌টা সুখাদ্য হয়েছে আর কোন্‌টা রদ্দি তাও জানি নে! লাহোরের কারো মুখে এমন কি স্যর ইকবালের ভাতিজার মুখেও এমন চোস্ত উর্দু শুনি নি।"

"থ্যাঙ্কু, খুদা হাফিজ" বলে কুরেশী ঈষৎ দ্রুতপদেই স্থান ত্যাগ করলেন। জিমি একটু গলা চড়িয়ে বললে, "আমি কি বড়ুয়াকে ফোন করবো আপনার ট্রানজিসটার বিষয়ে?"

কুরেশী শুনেও শুনলো না।

খান এক রকম জোর করে দুই ইয়ারকে নিয়ে গেল মরেল্লোতে। বললে, "এ দোকানের প্রতিষ্ঠাতা আমাদের বেয়াত্রিচের দেশ-ভাই, কিন্তু আভিজাত্যে বেয়াত্রিচের হেঁটোর বয়সী।" মানুষের হাতে তৈরী অপ্রাকৃতিক লোকটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য শিপ্রার খুবই পছন্দ হল। এমপরিয়ামে যদিও শিপ্রা গেল অনিচ্ছায় তবু আসামের "পাত" সিল্ক জীবনে সে এই দেখল প্রথম। খান শব্দতত্ত্ব ঝেড়ে বললে, "আমার চেয়েও যারা অগা তারা বলে পট্টবস্ত্র – সিল্ক— পাট থেকে তৈরী হয়। আমার মনে হয় এই "পাত" শব্দটা অনেক অহমিয়া "পাট" উচ্চারণ করে বলে ওটার "শুদ্ধি" করে পণ্ডিতেরা ওর নাম পট্টবস্ত্র দিয়েছেন।

বড়বাজারও দেখালে খান, বললে, "এই দেখ, মাতৃক সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ! তাবৎ দোকানীই খাসিয়া মেয়েছেলে। ব্যাটাছেলেগুলো বিড়ি ফোঁকে, জুয়ো খেলে আর প্রতি সন্ধ্যায় মদ খেয়ে মাতলামো করে, বউয়ের পয়সায়। তবে হ্যাঁ বউ যদি কোনো ইয়ারের সঙ্গে রাত্রিবাস করে আসে— কত পার্সেণ্ট করে জানি নে, আমার অতি সোহাগের খাসিয়া মেয়েদের সম্বন্ধে আমি অপ্রিয় কোনো কথা বলতে চাই নে—তবে স্বামীটির টুঁ ফ্যাঁ করার সামাজিক হক্ক নেই। অত্যুত্তম ব্যবস্থা।"

শিপ্রা বললে, "স্ত্রী পুরুষের সম্পর্ক বাবদে আজ পর্যন্ত কোনো সামাজিক ব্যবস্থারই প্রশংসা তো করা যায়ই না, গুণী জ্ঞানীরা স্বীকৃতি পর্যন্ত দেন নি। তাই বিশ্বজনের মতে পৃথিবীতে মাত্র যে একটি সর্বজনগ্রাহ্য প্রবাদ আছে সেটি "বিবাহ এক মাত্র জুয়োর বাজি খেলা (গ্যামলিং) যাতে দু'পক্ষই হেরে ক্ষতি-গ্রস্ত হতে পারে। যুধিষ্ঠির তো জুয়া খেলায় সর্বস্ব হারালেন। এর পর তার জুয়ো খেলা বন্ধ—বাজি ধরার স্টেক্‌ একটা কানাকড়িও নেই। দুর্যোধন ছোকরা চালাক। সে দিয়ে দিলে দ্রৌপদীকে ফেরত—সব জুয়ো যখন বন্ধ

তখন চলুক ঐ মোক্ষম জুয়োটি, যেখানে দুই পক্ষই হারে। এখানে এক দিকে একজন—দ্রৌপদী, অন্য দিকে পাঁচজন।"

খান শুধোলো, "পাঁচজন কেন? আমি তো শুনেছি, তিনি অর্জুনকে সব চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন, যে কারণে তাঁর পতন হল। অর্জুন অন্তত লুজার নন।"

শিপ্রা বললে, "আর অন্য মতে তিনি যে গোপনে কর্ণকে ভালবাসতেন সেটা জানো না? যে মোটর ড্রাইভারের ছেলে কর্ণ (তখনো কুন্তী ছাড়া কেউই জানে না, কর্ণ আসলে যুধিষ্ঠিরেরও অগ্রজ) প্রকাশ্য রাজসভায় ডাচেস্ বলো, এমপ্রেস, বলো, দ্রৌপদীকে সকলের চেয়ে এমন কি দুঃশাসনের চেয়েও বেশী অপমান করেছিল রূঢ় চণ্ডালের ভাষায়। বস্ত্রাকর্ষণ করাতে দুঃশাসনকে বলা যেতে পারে বর্বর, কিন্তু ভাষা দিয়ে অপমান করাতে কর্ণ ইতর, মীন। ভাষার মার মোক্ষমতম মার। অতএব দ্রৌপদীও লুজার। এবং সবচেয়ে বেশী লুজার। কারণ দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবকে কস্মিনকালেও অপমান করেন নি।"

এবারে কীর্তি মুখ খুললো, বিস্ময়ের ভান করে বললো, "অ। তাই বুঝি কেউ কেউ বিয়ে গ্যাম্বলটাকে ডরায়!"

সপ্তম অধ্যায়

টোকা দিয়েই কটেজে ঢুকে ছিল। কিন্তু হাবভাব দেখেই বোঝা গেল বিলক্ষণ উত্তেজিত।

শিপ্রা বললে, "এক কাপ চা?"

"থ্যাঙ্কু মাদাম।" খানের দিকে তাকিয়ে বললে, "মিঃ কুরেশী মিসিং—"

খান ইচ্ছা করেই শিপ্রাদের কিছু বলে নি—কুরেশীর সঙ্গে তার প্রেমালাপ সম্বন্ধে। জিমি কি বললে, "দাঁড়াও, এঁরা ব্যাকগ্রাউণ্ডটা জানেন না। বলে নিই।" বলা শেষ হলে কীর্তি মন্তব্য করলো, "মিসিং নয় এব্স্কণ্ডিই—পালিয়েছে।"

জিমি বললে, "সেই যে আপনার সঙ্গে কথা প্রায় শেষ না করে কুরেশী ঘরে চলে গেলেন তারপর লাঞ্চ, টী'তেও এলেন না। তা সে মেলাই টুরিস্ট আকছারই দু'তিনটে খাবার পর পর মিস্ করে যান। টী'র সময় বেয়ারা অনেকক্ষণ ধরে টোকা দিল—সাড়া দিলে না। ডিনারে এল না। সন্ধ্যা থেকে দুটো কামরাই অন্ধকার। রাত এগারোটায় কিন্তু একটা বেয়ারা দেখতে পেল ঘরে আলো জ্বলছে। টোকা দিয়ে সাড়া পেল না। সমস্ত রাত কিন্তু আলো জ্বললো। সংক্ষেপে বলছি, আজ সকাল দশটায় বেয়ারাদের সন্দেহে ম্যানেজার

পুলিশ ডেকেছেন। দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখা গেল সুট মুট শার্ট টাই সেভিঙের জিনিস সব বিছানার উপর ছড়ানো, ট্রানজিসটারও রয়েছে। তখন কে যেন লক্ষ্য করলো, নেই মাত্র একটি জিনিস—সুটকেসটা, অর্থাৎ শূন্য সুটকেসটা মাত্র নিয়ে লোকটা দুপুর রাতে উধাও হয়েছে। কাল রাতে আমার ডিউটি ছিল না। তাই পুলিশ আমাকে কিছু শুধোয় নি। শুধোলে কি বলবো, মিঃ খান ?"

"সত্যি কথা বলবে। সে যে-সব প্রশ্ন করেছিল আর তোমার উত্তর যতখানি স্মরণে আনতে পারো বলবে। তোমার মনে কি সন্দেহ হয়েছিল অথবা নিজের কোনো মন্তব্য প্রকাশ করবে না, পুলিশ সরাসরি জিজ্ঞেস না করলে। সর্বশেষে বলবে, তোমার যতদূর জানা মিঃ খানের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর আর কেউ তাকে দেখে নি। পুলিশ আমার কাছে আসবে। আমিও সরাসরি যে কটি কথা হয়েছিল বলবো। আমাকে জিজ্ঞেস না করলেও আ-মি আ-মা-র সন্দেহের কথা বললে বলতেও পারি। তুমি কোনো চিন্তা করো না, জিমি। আমি আমার ওয়ার্ড অব অনার দিচ্ছি তোমাকে, তোমার কেশাগ্রটুকুও কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। এখন তুমি নিশ্চিন্ত মনে ডিউটিতে ফিরে যাও।"

জিমি চলে যেতেই খান বললে, "জিমিকে বলি নি, এখন বলি, আমি লাহোরের প্রেস ক্লাবে কক্‌খনো যাই নি। ওটা প্যোর ব্লাফ।

শিপ্রা : "তাহলে ঠিক ঐটেই বললে কেন ?"

কীর্তি : "সোজা উত্তর : প্রেস ক্লাবে যায় ন্যুজ-মেন এবং খবরের সন্ধানে বিস্তর স্পাই। নেটিভ লাহোরের পাঞ্জাবী স্পাই যায় বিদেশী সংবাদ-দাতাদের পাম্প করতে। লোকটা যদি সত্যই স্পাই হয় তাহলে, তাহলে হয়তো সামান্য একটু বেসামাল হবে।"

শিপ্রা : "কিন্তু মজাদার টাই ?"

খান : "ওর গলায় ছিল যে টাইটা সেটার মত বিকট টাই আমি কখনো বাস্তবে বা ফিল্মেও দেখি নি। শিলঙের মত আণ্ডার ডেভালাপট্ শহরের হোটেলে-ক্লাবে অর্ধসভ্য ইংরেজ এখনো পরে 'এডওয়ার্ডিয়ান সোল্‌লেস্' টাই। সেটা দেখার পরও যে খলিফে ওরকমের আচাভূয়া টাই পরে, তার স্টকে পাদ্রী সায়েবদের পানসে টাই থাকার কথা নয়। এটাও ব্লাফ, আগের ব্লাফটা জোরদার করার জন্য।"

কীর্তি : "তার প্রতিক্রিয়ায় সে তার ন্যাশনালিটি নিয়ে চেল্লাচেল্লি করতে লাগলো। আর তুই তখন নিশ্চয়ই খুব বেকুব বনে গেলি ? না ?"

শিপ্রা : "এ কি কথা। সে তো তখন খুশী যে তার টেসট্ সফল হয়েছে।"

খান : "না কীর্তির অনুমানটাই ঠিক। এ রকম একটা থার্ড ক্লাস

টেস্টের মুখে নেহাত কাঁচা স্পাইও বিচলিত হয় না। সে যে স্পাই এটা আমি তখন আদৌ ধরে নিই নি। রোমাণ্টিক জিমি হয়তো ঘামের ফোঁটায় কুমীর দেখে ধরে নিয়েছে লোকটা স্পাই—আর যখন সর্বত্র পাক্ স্পাই ম ম করছে। তাই ব্যাটার চেল্লাচেল্লি শুনে আমি প্রথমটায় বেকুব বনে গিয়েছিলুম। তখন বুঝলুম, একমাত্র গাড়ল পাঞ্জাবীদের মধ্যে গাড়লস্য গাড়লই কল্পনা করতে পারে, সে পার্ফেক্ট স্পাই এবং শুধু তাই নয়, আর পাঁচটা, জাতভাই গাড়লের মনে বিশ্বাস জন্মাতে সমর্থ হয় যে সে স্পাই রানী মাতাহারির জারজ সন্তান কারণ তার উর্দু এ্যাসন চোস্ত লখ্নওয়ী যে এখনো বাপের সে-সুপুত্তুর পয়দা হয় নি যে ঠাহর করতে পারবে, সে আম্মাজানের গব্ব থেকে তেড়ে পাঞ্জাবী বুলির ফোয়ারা ছুটিয়েছে শালিমার বাগ-এর বেবাক ফোয়ারা এক জোট করে।"... খান নিজের রসিকতায় নিজেই খিলখিল করে হাসতে আরম্ভ করেছে। শেষটায় সামলে নিয়ে বললে, "লোকটা যেই না আমার ইচ্ছাকৃত বিকৃততর খাসে কলকাত্তাই উর্দুর দু'টি মাত্র লব্জো শুনেছে অমনি ছোটালে তার "উর্দু"—সে যে উত্তর প্রদেশের প্রকৃত সন্তান সেইটে সপ্রমাণ করার জন্য। আর বলবো কি, দিদি, সেটা শুনলে আমাদের পাড়ার পর্দানশীল কুলীন ঠাকরুন পদি পিসি পর্যন্ত বলে উঠতো, 'এ ম্যা—ভদ্রলোকের ছেলে, মাইরি, কতা কইচে ডাইভার সন্দার-জীর মতো—নোকের সামনে নজ্জা করে না!' অতিশয় নির্ভেজাল অমৃতসর-লাহোর-মার্কা পাঞ্জাবী উর্দু-প্লাস্টিকের পাতর-বাটি! সুনীতি চট্টো রেকর্ডে তুলে রাখতেন। আমাদের পাড়াতে এক বাঙাল ভদ্রলোক আছেন—তুই তো চিনিস রসরাজ ভশচায—ত্রিশ বছর ধরে। প্রায়ই বলতে শোনা যায় 'রারী (রাঢ়ী) দ্যাশে মাক্যা থাক্যা দ্যাশের আপন ব্বাসাটা (ভাষাটা) এক্কেবারে পাউরি গেছি, (ভুলে গিয়েছি, পাসরি গেছি)। এমনই আবেস্তা (অবস্থা) ওংকা (এখন) গিরিনি (গৃহিণী) পইরজন্ত (পর্যন্ত) আমার বিসুর্দ রারী ব্বাসা (বিশুদ্ধ রাঢ়ী ভাষা) বুস্তা পারইন না (বুঝতে পারেন না)।' মিঃ কুরেশী 'উর্দু' বলার সময় হুবহু ভশচাযের আত্মপ্রত্যয় নিয়ে আপন উত্তর প্রদেশীয়ত্ব সপ্রমাণ করার জন্য লেগেছিলেন ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুলের চর্বি খেয়ে।"

এমন সময় জিমি এসে বললো, "পুলিস আপনার কাছে আসতে চায়, না আপনি যাবেন।"

খান বললে, "আমিই যাচ্ছি। থাকতো আজ আই জি তালেবর দত্ত, হুঃ, আমাকে কেন, কাউকে কোন প্রশ্ন না শুধিয়ে, দ্যাখ তো না দ্যাখ, ক্যাক্ করে আপন হাতে পাকড়াতো হারামীকে।"

খান চলে গেলে শিপ্রা শুধলো, "খান লাহোরীটাকে টেস্ট্ না করে অগাটার চেয়ে অগা সেজে, ধীরে ধীরে খাঁটি মুসলমানত্ব জাহির ক'রে—সেটা

করতে পারতো সে কোনো ভান না করে, এবং অতি অনায়াসে, কারণ তুমিই বলেছো, সে ইসলামের ইতিহাস বহু বৎসর ধরে পড়েছে—এবং মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই, ভাই ইয়েহিয়া তার বড় ভাই সাহেব—মির্জা সেটা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে। তারপর লাহোরের মিঞাজীকে সাপ্লাই করতো ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে রগরগে বোগাস্ ইন্সাইড্ 'ইন্ফরমেশন', এবং পাম্প করতো তার পেট থেকে পশ্চিম পাক্ সম্বন্ধে যতখানি মাল বের করতে পারে, এবং সবচেয়ে ইমপর্টেণ্ট কনটাক্ট্ রাখার নাম করে ভারতে পাকিস্তানী ও হিন্দুস্তানী স্পাইদের যে-কটা নাম সংগ্রহ করতে পারে। দুচ্ছাই, ওসব আবার বলি কেন ?—লারী কোম্পানীকে সে যে-উদ্দেশ্য নিয়ে তেলিয়েছিল।"

কীর্তি বললে, "ও রকম একটা গণ্ডমূর্খকে কোনো দেশ যে স্পাই করে পাঠাতে পারে, সেটা বেচারী অনুমান করবে কি করে ? সে ভেবেছিল, একটুখানি ন্যাজ খেলানোর পর, ধরবে সাপের ন্যাজটা। কিন্তু পয়লা কোপেই বেরিয়ে এল সাপের বদলে কেঁচো। তবে মিঞা খুব একটা কাজে লাগতেন বলে মনে হয় না। ওকে হয়তো পাঠিয়েছিল, জেনে শুনে যে সে ধরা পড়বেই। ভারতের ক'দিন লাগে ওকে পাকড়াতে, পাকড়ে ওকে নিয়ে কি করে—অর্থাৎ ওর নাম করে, কিংবা ওকে বাধ্য করে বোগাস খবর পাঠায় কি, না, ওকে কিনে ফেলে নিজেদের স্পাই করে পশ্চিম পাকের এমন জায়গায় পাঠায় কি, না যেখানে সে পরিচিত নয়, এবং আরো অনেক কিছু—এবং তার থেকে বিচার করবে ইণ্ডিয়ান এ্যাণ্টি-স্পাই বিভাগ কতখানি চালাক, কতখানি আপ্-টু-ডেট্।"

শিপ্রা : "ঢাকা বেতার এখন খবর দেবে। কি বলে শুনি।"

প্রধান খবর ছিল, হামিদুল হক বিবৃতি দিয়েছেন, "এটা যুদ্ধ নয়, হত্যা নয়, বর্বরতাও নয়। সামান্য অপারেশন। তাতে দু'চারজন লোক মরবেই—"

কীর্তি : "মাই গড্!"

—"যারা আইন মেনে চলছে আমি তাদের কোনো ক্ষতি তো করছেই না, বরঞ্চ তাদের নিরাপত্তার জন্য সব ব্যবস্থা নিয়েছে। দেশ লীগ 'শয়তানদের' গুণ্ডামী থেকে রক্ষা পেয়েছে। এখন যা লুট রাহাজানি খুন হচ্ছে সে সব করছে লীগের লোক। গ্রামের লোক ভারী খুশী, আমি অপারেশনের খবর শুনে, আমার কাছে গাঁয়ের সব খবর আসে" এবং সর্ব প্রকারের কটুকাটব্য, জলজ্যান্ত মিথ্যা ভাষণ। সংক্ষেপে বলতে গেলে আয়নার উল্টো ছবির মত ইয়েহিয়া টিক্কার সপক্ষে অনবদ্য একখানা মাস্টার পীস।

শিপ্রা স্তম্ভিত হয়ে শুনলো। সে এমনি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছে যে গ্যোবেল্স্-এর তুলনা পর্যন্ত তার অবশ মনে সঞ্চারিত হল না।

কীর্তি অতখানি না। শুধোলে, "এই হকটি কে চেন ? ইনি বাঙালী মুসলমান। ইনি এবং একজন বাঙালী হিন্দু দু'জনাতে পার্টিশেনের পূর্বে

বর্মা থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য ফান্ড থেকে অন্তত লাখ তিরিশেক টাকা তজরূপ, চুরি, যা ইচ্ছে, বলো করাতে—ওদের নামে গ্রেফতারীর হুকুম বেরয়। ঠিক ঐ সময় পার্টিশন হল; হক্ ঢাকা অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। খুব সম্ভব এখনো তার নামে কলকাতায় এরেস্ট ওয়ারেণ্ট জারী আছে; এই চব্বিশ বছরে তিনি ভারতে পদার্পণ করেন নি। সেখানে রাজনীতির খেলাধুলোতে সুবিধে না করতে পেরে রাজনৈতিক বনবাসে চলে গেলেন—তখনকার মত। বর্মার কড়ি দিয়ে একটা দৈনিক খবরের কাগজ কিনে রেখেছিলেন; সেইটে দিয়ে আড়াল থেকে কল-কাঠি নাড়াতে লাগলেন। অনেকটা—"

"থামলে কেন?"

"অল্ রাইট—অনেকটা গোয়িং ইনটু টেম্পরারি রিটায়ারমেন্ট লাইক এন ওল্ড্ প্রসটিটুট, বিকাম এ হোল-টাইম, প্রফেশনাল পিম্প্ এ্যান্ড্ এওয়েট এ স্টেজ-ব্যাক এ্যাজ দি সোল্ ওনার অব্ ফুল-ফ্লেজেড্ ব্রথেল্স্।"

খানের প্রবেশ।

খান: চতুর্দিকে পুলিশ ছড়িয়ে পড়েছে; হুলিয়া বেরিয়েছে মিঞাকে পাকড়াবার জন্য।"

কীর্তি: চতুর্দিকে কেন? ও তো এখন সিধে ধাওয়া করবে সব চেয়ে নিকটের পাক্ বর্ডারের দিকে। এবং যাবে চেরাপুঞ্জির ঘুরতি পথে। জিমিকে যে পই পই করে চেরাপুঞ্জির খবর জিজ্ঞেস করেছিল সেটা শুধু কামুফ্লাজ নয়। পশ্চাদপসরণ—লাইন অব্ রিট্রীট—সম্বন্ধেও ওকীবহাল হওয়ার প্রচেষ্টা তাতে ছিল। এবং সে সোজা সরকারি সড়কও ধরবে না। খাসিয়ারা অতিথি-বৎসল। গ্রাম থেকে গ্রামান্তর হয়ে চেরাপুঞ্জি একপাশে রেখে—কি একটা জায়গার নাম, কি যেন, "উঠনি"—'মহাদেরে উঠনি' না কি যেন—সেটা অপরিহার্য—কয়েক শ' ধাপ সান-বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে চেরাপুঞ্জি অঞ্চলের উচ্চতা থেকে নামবে কি যেন একটা ছোট্ট খাসিয়া গ্রামে—কি এক 'পুঞ্জি'—সেখান থেকে কোম্পানিগঞ্জ, ভুলাগঞ্জ, জন্তিয়ার ওৎরাইটার পথ খুবই সুহজ। চেক্ পোস্টটার নাম বোধহয় ডাউকি। সে নিশ্চয়ই সেখানে যাবে না। ওখানেও পাক্-সিলেটে ঢোকার তরে বিস্তর চোরাবাজারের গুপ্তিপথ রয়েছে।...'স্পাই মাস্টার' যে-রকম ভয় পেয়েছে আর অ্যাক্কেলটিও গুড়ুম, সে তার বর্তমান মুক্ত-কচ্ছাবস্থায় দুকান-কাটার মত সদম্ভে গৌহাটির অষ্টপ্রহর গম্‌গম্ করা সরকারি বে-সরকারি কোনো পথই ধরতে পারে না।"

খান শুধোলে, "ম্যাপটি যোগাড় করলে কোত্থেকে?"

কীর্তি, তৃপ্ত বদনে: "হাজী সকল কাজের কাজী; নিজের থেকেই দিয়েছিল, টু মাইল টু এন ইঞ্চ ম্যাপগুলো।"

খান ঃ "তার পর প্রশ্ন উঠলো, লোকটা সব-কিছু ফেলে রেখে সুন্দুমাত্র খালি সুটকেসটা নিয়ে গেল কেন ? এমন কি ট্রানজিসটারও ফেলে গেল কেন ? অন্তত ডাউকি বর্ডারের অবস্থাটা তো গৌহাটি স্টেশন থেকে শুনতে পেত।"

কীর্তি ঃ "উত্তর অতি সরল। সুটকেসটাতে ছিল ফল্‌স্‌ বটম—গুপ্তি-তলা। সেখানে আর কিছু না থাক, ম্যাপ-ট্যাপ কম্পাস এমন কি ছোট ট্রান্‌স্‌মিটার থাকাও অসম্ভব নয়। কামরার ভিতর সেগুলো নিশ্চিহ্ন করা অসম্ভব। অতএব পয়লা মোকাতেই ওটা সে ফেলে দেবে যে-কোনো জঙ্গলা একটা খাদে—তার অভাব কি এখানে। তোকে যদি কখনো মার্ডার করি তবে শিলঙে ডেকয়্‌ করে এনে। লাশ গায়েব করার তরে আইডিয়াল প্রলোভিনী এখানকার খাদগুলো। লেকের পাশ দিয়ে যদি যায় তবে সেটা ব্যাড সেকেন্ড। কী মূর্খ লোকটা সেটা আরো বোঝা গেল ট্রানজিসটার সঙ্গে নেয় নি বলে।"

শিপ্রা বললে, "অনুমান করতে পারছি।"

খান বললে, "আমি সদাই ওয়াটসন। রহস্য সমাধান হয়ে যাওয়ার পরও সে-সমাধানের 'কৈশল'ও তার কাছে রহস্যময় থেকে যায়।"

কীর্তি বললে, "নিয়ে গেলে পুলিশের হুলিয়াতে অন্তত থাকতো 'সম্ভবত পলাতকের হাতে ট্রানজিসটার আছে'। তোরই মত পুলিশ ভাববে, ঐ যন্ত্রটি ছাড়া ওর চলবে কি করে ? ওদিকে সে সেটা সুটকেসে পুরলে সেটার ওজন বাড়বে। খাদের ঝোপঝাড়ে আটকা পড়বে না—তদুপরি পুলিশের অন্যতম সনাক্তীকরণ চিহ্নও তার হাতে নেই। পুলিশ কিছু বুদ্ধি খাটালে ও সামান্য তৎপর হলেই ওকে ধরতে পারবে সেই 'উঠনি'র নিচে। পকেটে যদি কিছু পায় তবে, কম্পাস আর ম্যাপ।"

খান বললে, "মিঞাকে নিয়ে দুর্ভাবনা করার কিছু নেই। তোকে ফার্সী প্রবাদটি তো একাধিকবার বলেছি, 'আহাম্মুখ দোস্তের চেয়ে আক্কেলওলা দুশ্‌মন্‌ ভালো।' কিন্তু ঐ মিঞাটার মত দুশ্‌মন্‌ যদি রাঁচির সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ইম্বেসাইল হয়, সে সম্বন্ধে প্রবাদ নীরব।"

শিপ্রা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, "এ রকম, একটু ভালো, আরো বোকা কত আসবে যাবে, সে নিয়ে মাথা ঘামালে হবে বর্বরস্য বলক্ষয়—আর তুমি, খান, মাত্র অর্ধ বর্বর। চলো না কলকাতায়, তোমার মত ধুরন্ধর চোখ না মেলেও দেখতে পাবে মার্কিন, রুশ, চীনা, বিশেষ করে উভয় পাকের চর কভু স্ববেশে কভু বা ছদ্মবেশে আবজাব করছে।"

কীর্তি বললে, "তোমাদের সম্মতি থাকলে কালই কলকাতা রওয়ানা হওয়া—"

খান আশ্চর্য হয়ে শুধোলে, "এত ম্যাপ ঘাঁটাঘাঁটির পর ডাউকি যাবে না ?"

কীর্তি শান্ত কণ্ঠে বললে, "করিমগঞ্জে যে দু'একটি শরণার্থী দেখেছি, সেই

প্যাটার্নই তো ইছামতী থেকে পদ্মা ব্রহ্মপুত্র ডাউকি, সর্বত্রই একই রূপে দেখা দেবে।"

খান বললে, "অ-অ-অ! হাতে হাঁড়ির একটা ভাত টেপা ঝোপের দশটা পাখির সমান।"

অষ্টম অধ্যায়

"জিমি!"

"ইয়েস, ম্যাডাম!"

"তুমি সত্যি ভেরি ভেরি ব্যাড্ বয়।"

"আমার ড্যাডি, অনুমতি করুন ম্যাডাম, আমাকে এইটুকু হাইট থেকে (হাত দিয়ে দেখিয়ে) এই সত্য বাক্যটি বলেছেন। আমার মনে যেটুকু সন্দেহ ছিল, আজ থেকে সেটা একদম লোপ পেল—"

"ফাজলামো করো না। সেই ভোর চারটে থেকে তোমাকে আমি খুঁজছি। সবাই বলে, তুমি অফ্ফ্ ডিউটি। সো হোয়াট্? শেষটায় গৌহাটির পথে তোমার বাড়ি গেলুম। পথে দেখি, সেই জোয়ান বেয়ারাটা, ভ্যাক করে যে কেঁদে ফেলেছিল আমার সামনে, সে ছুটেছে টাট্টু ঘোড়ার মত। জিজ্ঞেস করলুম, লিফ্ট্ চাই। বললে, তোমার বাড়ী যাচ্ছে, তোমাকে খবর দিতে। সেখানে শুনলুম, ইয়োর বেভ হ্যাজ্ নট বিন্ স্লেপ্ট ইন এটোল। আই লাইক দ্যাট্! কোথায় ছিলে সমস্ত রাত? আমি তোমার বাপ হলে এতক্ষণে আমার দুই উরুর উপর উপু করে ফেলে, উইদ দি রং সাইড অফ্ মাই ব্রাশ এমন প্যাঁদানি দিতুম—

হঠাৎ জিমিকে গৌহাটিতে পেয়ে এমন খুশী যে বহুদিন পরে অনর্গল বকর বকর করে যেতে লাগলো।

জিমি সবিনয় বললে—ছোকরাকে এরকম "বকাবকার" লাই ইতিপূর্বে কেউ কখনো দেয় নি, এণ্ড বাই হোয়াট এ ড্রীমল্যাণ্ড ফেয়ারি! মাদার মেরি তুমি এঁকে সর্ব অমঙ্গল থেকে রক্ষা করো, মা!—"ম্যাডাম, আমার ওজন ১৭০ পাউণ্ড, তাই এই মাটিতে লম্বা হচ্ছি! আপনি—" ছোকরা জীবনে এতখানি স্নেহ ইহজন্মে পায় নি। নইলে এ-রকম বাচালতা তার নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য ঠেকত। বাপের স্নেহ ছিল পুরুষের, পিতার স্নেহ।

"চুপ করো। এই চেয়ারটায় বসো তো।" তারপর হ্যাণ্ড-ব্যাগ খুলে সিল্কে মোড়া একটা কেস বের করলো। বললো, "খুলে দেখো। তুমি প'রো। আর বিয়ের বউয়ের আঙুলে আংটি পরাবে তো, চার্চের ভিতর? বেরিয়ে এসেই এটি তাকে পরিয়ে দেবে—ইফ্ আই বি অন দি আদার সাইড—"

"ম্যাডাম, প্লীজ !"

"শোনো। আমি বেঁচে থাকলে অন্য কথা। এখন সিরিয়াস হয়ে শোনো। এটা তোমাকে আমি ফ্রী দিচ্ছি না। আমি প্রতিদান চাই।"

জিমি হাত তুলেছে শপথ করতে।

"শুনে যাও, প্লীজ। তোমার হেল্প্ আমার দরকার হতে পারে, না, হবেই। হয়তো উইদাউট এনি নোটিস। হয়তো বা দিতে পারবো। তুমি 'না' বললে আই শান্ট্ টেক ইট্ এমিস্ এটোল। সী হোয়াট্ আই মীন ?"

"প্লীজ, ম্যাডাম। আমাকে মাত্র একটি কথা বলতে দিন। আমার ড্যাডির জীবনের আদর্শ তিনি নিয়েছিলেন কার কাছ থেকে আমি ঠিক জানি নে। বোধ হয় প্রিন্স্ কনসর্ট এলবার্টের এই 'মটো' ছিল। জর্মনে দুটি শব্দ, 'ইষ ডীনে' (Ich diene) 'আমি সেবা করি,' 'আমি সেবার জন্য', 'আই এম হিয়ার টু বি য়ুজড্।' আমিও সেই আদর্শে বিশ্বাস করি।"

"গুড্। আমি তোমাকে এমন কোনো সেবা করতে বলবো না, যেটা হীন কিংবা তোমাকে কোনো বিপদে পড়তে হবে। প্রথম সন্ধ্যাতেই আমি বুঝেছিলুম, পরের হিত করে তুমি আনন্দ পাও। তারপর যখন মিঃ খানের কাছ থেকে শুনলুম, পাঞ্জাবী গুপ্তচরের প্রতি তোমার ঘৃণা, এবং খানকে সব-কিছু তুমি বলেছো যাতে করে সে খানের বা অন্য কারোর অনিষ্ট না করতে পারে তখনই—ওয়েল নেভার মাইণ্ড—তুমি কবে কলকাতায় আসছো ?"

"আপনি যখনই আদেশ করবেন।"

"আচ্ছা, তোমাকে শেষ প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করি ঃ তোমার পিতা এবং তুমি বড় হওয়ার পর, তোমার সম্প্রদায়ের আর পাঁচজনের মত তোমরা ক্যানাডা বা অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেলে না কেন ?"

"ড্যাডি ছিলেন অতি এক্স্পার্ট বয়লার ইন্স্পেক্টর। কাজেই তিনি আর পাঁচজনের তুলনায় ঢের ঢের ভালো অফার পেয়েছিলেন। এবং তিনি এটাও জানতেন, তাঁর নিকট আত্মীয়স্বজন প্রায় সবাই মাইগ্রেট করার ফলে তাঁকে বৃদ্ধ বয়সে নিতান্তই নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হবে। তবু তিনি যান নি। কেউ জিজ্ঞেস করলে উত্তরটা এড়িয়ে যেতেন। মাত্র একদিন একবার আমাকে, একান্ত আমাকেই বলেছিলেন, 'যারা যাচ্ছে, যাক্। আমি কক্খনো বলবো না, তারা অন্যায় করছে। কিন্তু, মাই জিমি, আমি যে-দেশে জন্মেছি, যে-দেশকে আমি ছেলেবেলা থেকে ভালোবাসতে শিখেছি, সে-দেশ আমি ত্যাগ করতে পারবো না। আমি এ-দেশেই মরতে চাই, যাতে করে আমার বাপ পিতামোর হাড্ডির কাছে আমার হাড্ডিও ঠাঁই পায়—আই উয়াণ্ট মাই বোন্স্ টু বি গেদার্ড্ আনটুমাই ফোর ফাদার্স হোয়ার দে আর।' ম্যাডাম, আমার বেলাও তাই—সেম্ হিয়ার। আমি চলে গেলে তাঁর গোরে ফুল দেবে কে ?"

তাই তো, অবাক হয়ে ভাবলো মনে মনে শিপ্রা, তাই তো, খৃষ্টান মুসলমান যাদের গোর দেওয়ার রীতি, তারা চায় তাদের হাড়গুলো যেন তাদের বাপ পিতামোর হাড়ের কাছে স্থান পায়, কালক্রমে ধুলো হয়ে মিশে যায়। হৃদয় দিয়ে যারা এ-দেশকে ভালোবেসেছে তাদের পক্ষে এদেশ ত্যাগ না করার বিরুদ্ধে এটা একটা অতিরিক্ত 'হৃদয়ের যুক্তি'।

সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়লো, বার্টন না ওপেন্‌হাইম্‌ কার লেখাতে সে-যেন পড়েছে, বসরা বন্দর থেকে ভারতাগত জাহাজ যে-সব শত সহস্র মুসলমানদের ওষধি-রক্ষিত মৃতদেহ "সাত-সমুদ্র" পেরিয়ে নিয়ে এসেছে, তাদের বোঝাই করে এগিয়ে চলেছে মরুভূমির এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তে বিলীন শত সহস্র উষ্ট্র গর্দভের কাফেলা পুণ্যভূমি কারবালার দিকে, যেখানে তাঁদের নেতাজী শহীদ ইমাম হোসেনের রক্তধারা কারবালা-মরুভূমির সহস্রাধিক বৎসরের শুষ্ক বালুকা সিক্ত, রঞ্জিত করেছিল, যেখানে তাঁর অস্থি সমাহিত হয়েছিল তারই নিকটে একই মরুভূমিতে ভারতীয় অস্থি স্থান পাবে বলে, একই ধুলোয় ধূলি হবে বলে।

এবং এরই সঙ্গে তার মনে আরেকটি চিন্তা উদয় হয়ে তার দেহটা যেন বিষিয়ে দিল: জেনারেল ইয়েহিয়া অতিশয় গোঁড়া কট্টর শীয়া, এবং সম্প্রতি জানতে পেরেছে মিস্টার জুলফিকার আলী ভুট্টোও শীয়া—গোপনে গোপনে তিনিও ধর্মান্ধ, তাঁর শীয়া মতবাদ ভিন্ন অন্য সর্ব বর্ণ সর্ব গোত্রের মুসলমানের প্রতি তার প্রতিটি লোমকূপ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-হলাহলে জর্জরিত।

এবং সে সাম্প্রদায়িকতা এমনই বিশ্বব্যাপী—"যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ"—যে সে ধর্মান্ধতাকেও পরাস্ত করে ধর্মনিয়ন্ত্রিত পবিত্র মহরম মাসে, পুণ্য শুক্রের দিবসারম্ভে তাদের সর্ব পবিত্রতাকে কলুষিত করে শীয়াদের ধর্মবৈরী সুন্নী মূর্খ পাঠানকে উত্তেজিত নিয়োজিত করে তার ধর্মভ্রাতা পূব বাঙলার সুন্নী মুসলমানকে নিধন করতে, তার বধূভগ্নী কন্যাকে—। তাদের শেখানো হয়েছে পূব বাঙলার মুসলমান কাফির। ইয়েহিয়া শুধু মদের নেশায় বলতে ভুলে গিয়েছিলেন শীয়ারা সর্ব সুন্নীকে, অতএব পাঠানকেও কাফের মনে করে।

ইয়েহিয়ার পরলোক ইরাকের কারবালায়, ইহলোক শীয়া ইরানে তিনি ভুলতে পারেন না, ভুলতে চান না যে তাঁর পূর্বপুরুষ কিজিলবাশ্‌ গোষ্ঠী এসেছে ইরান থেকে—শুধু ভুলে গেছেন তারা ইরানে এসেছিল মূল মাতৃভূমি সুন্নী তুর্কোমানিস্তান থেকে। ইরানের সঙ্গে তাঁর দোস্তী; পূব বাঙলার সুন্নী তাঁর দুশমন। তাঁর দোস্ত ইরান তাই তাঁর সুন্নী নিধন কর্ম সুসমাপ্ত করার জন্য শানিয়ে দিচ্ছে তাঁর তলওয়ার, সওগাৎ পাঠাচ্ছে বোমারু বিমান।

হঠাৎ সংবিতে ফিরে এলো শিপ্রা। জিমি সম্বন্ধে শেষ কথা তার যা জানার ছিল সেটা জানা হয়ে গিয়েছে। তার আনুগত্য ইংলণ্ডে বা কানাডার প্রতি একসুট্রা টেরিটরিয়াল নয়।

আমাদের মেয়েরা একদা "অষ্ট অলংকার" দিয়ে প্রসাধন করতেন, "ওষ্ঠরঞ্জন" ইদানীং বহুস্থলে—হোটেলে, ট্রামে-বাসে, থিয়েটারে—তাঁদের এক মাত্র অলংকার। পক্ষান্তরে গোরা রায় অদ্যাপিও "অষ্টপদী" ব্রেকফাস্ট খায়! তারই এক ঢাউস সংস্করণ বেয়ারা এনে রাখলো জিমির সামনে।

শিপ্রা বললে, "আজ এই খাও। এতদিন তোমার কর্তব্যের আওতায় না পড়া সত্ত্বেও তুমিই যে আমার খানার তদারকি করতে সে আমি জানি।" একটু মৃদু হেসে বললে, "আর কলকাতার বাড়িতে খাবে পুঁইশাকের চচ্চড়ি আর মোচা-ঘণ্ট।"

"কিন্তু আপনি অর্ডার দিলেন কখন?"

"ওহে জনপদবাসী যুবক, আমি নাগরিকা। আমাদের টেকনিক ভিন্ন। আমার চেয়েও সুচতুরা, বিদগ্ধা নাগরিকার নাম বেয়াত্রিচে। আমাকে গুলে খেতে পারে। এসো কলকাতায়। এই এপ্রিলেই। ঐ কথাই রইল—ডান্?"

"ডান্! অনার ব্রাইট। ঐ কথাই রইল।"

শিপ্রা সেণ্টিমেণ্টাল নয়। শব্দটি ইংরিজিতে স্থান বিশেষে সব সময় প্রশংসনীয় নয়। বাঙলায় আমরা বলি "ভাবাবেগে গদ্‌গদ হওয়া", "উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হওয়া" কিংবা যে-রকম বলা হয়, পড়ুয়া প্রহ্লাদ যখন বর্ণমালার "ক" অক্ষরে এলেন, তখন কৃষ্ণ নামের স্মরণে ভাবাবেশ মূর্ছিত হয়েছিলেন। শিপ্রার অনুভূতি এস্থলে সে পর্যায়ের নয়। সে দেখতে পেয়েছিল জিমির ভিতর একাধিক চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য যে-গুলোকে সাধারণ জন রেসেপ্‌সনিস্টের মামুলী কর্তব্য বোধ মনে করে তার দিকে আরেকবার ভালো করে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করতো না। সব ভালো হোটেলেরই রেসেপ্‌সনিস্ট—এমন কি ক্লাব-চ্যাটার বক্‌সের সমগোত্রীয় হোটেল-স্নব হয় তো বলেই ফেলতো, ছোকরার উচ্চারণ "ট্যাশ্‌য়া"—চেষ্টা করে গেস্‌টের সেবা, কিন্তু সেবাই যে জিমির ধর্ম সেটা যত না বুদ্ধি দিয়ে ততোধিক অনুভূতি দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করেছিল শিপ্রা। শিপ্রার সেন্টিমেণ্ট আছে, কিন্তু সে সেন্টিমেণ্টাল নয় কারণ তার সেন্টিমেণ্টের পিছনে অহরহ জাগ্রত থাকে পর্যবেক্ষণশীল অন্তর্দৃষ্টি।

শিপ্রা আর জিমি লাউঞ্জে বসে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় একে অন্যকে যখন চিনে নিচ্ছিল, খান ততক্ষণে ঝপঝপ্ গোটা পাঁচেক জিন্ মোকামে পেঁছিয়ে দিয়েছে, রেস্তোরাঁতে বসে কীর্তি সঙ্গ দিয়েছে বটে কিন্তু সে আধ গেলাসও শেষ করতে পারে নি।

মাইক্রফোনে প্যাসেঞ্জারদের উদ্দেশে সমন জারী হয়েছে। খান খপ্ করে কীর্তির গেলাসটা তুলে নিয়ে বটম্ আপ করে বললে, "চ,—যত সব দুশ্চরিত্র পেঁচি মাতাল!"

লাউঞ্জে শিপ্রাদের সামনে দাঁড়িয়ে এবারে বাক্য সম্পূর্ণ করে বললে, "যত-

সব পেঁচি মাতালদের পাল্লায় পড়ে আমার চরিত্রটা ঝরঝরে হয়ে গেল।"

জিমি এখন শিপ্রার প্রটেজে। জিমির ইংরিজি ট্যাঁশুয়া হোক, আর নাই হোক্, তার বাঙলাটা খাজা ট্যাঁশ মার্কা। শিপ্রা প্রথম তাকে বুঝিয়ে বললে, "পাঁড় মাতাল অর্থাৎ কনফার্ম্ড বুজার, আর পেঁচি মাতাল মানে, যারা আধ ফোঁটা গিলতে না গিলতেই ঘরের ভিতর আটটা পাঁচিল দেখতে পায়।" তারপর খানকে শুধলো, "পেঁচির সহবতে দুশ্চরিত্র হলে কোন্ অলৌকিক অধ্যবসায় এবং ইন্দ্রজাল-ভানুমতীর সমন্বয়ে।"

খান হাহাকার সহকারে বললে, "হায় হায়, এই সামান্য তত্ত্বটুকু পর্যন্ত জানো না, সুন্দরী। তাই বলছো ভানুমতীর খেল। ঐ যে আমাদের পাঁড়স্য পাঁড় কেষনগরের ব্যারিস্টার গোসাঁই, তাকে লণ্ডনে পুলিশ ধরে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে। অপরাধ? রাস্তায় মাতলামো করেছে রাত দুটো অবধি। পুলিশ যা প্রমাণপত্র পেশ করলে তার সামনে হাকিমের মনে কোনো সন্দেহের অবকাশ রইল না, ব্যাটা পাঁড়। তবু জানো তো, ব্রিটিশ জাস্টিস, অপরাধের পুরো বয়ান শোনার পর তবে তো স্থির করবে, দণ্ডটা গুরু না লঘু হবে। আসামীকে শুধোলেন, এমন কি কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছিল, এমন কি কোনো বিপাকে পড়েছিলে যে ফলে বেহেড মাতলামোটা করলে?

গোসাঁই চিঁ চিঁ করে করুণ কণ্ঠে বললে, 'আমি দুজন অসচ্চরিত্র লোকের পাল্লায় পড়েছিলুম, ধর্মাবতার, ইওর অনার।'

জজ উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'খুলে কও।'

গোসাঁই অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে, 'মি লাট্, আমার সঙ্গী-দুটো যে এতখানি দুশ্চরিত্র জানা থাকলে আমি কস্মিনকালেও ওদের ছায়া পর্যন্ত মাড়াতুম না। দুই শুয়ারই—বেগ্ পার্ডন, স্যর—টি টি, টী টোটেলার মদ্যস্পর্শটা মুসলমানদের চেয়েও হারাম বলে বিশ্বাস করে। ক্রিস্মাস, আপন আপন জন্মদিনে পর্যন্ত মদ্যপান করে না।'

প্রহেলিকাচ্ছন্ন দ্বিধাভরা কণ্ঠে জজ ফের বললেন, 'আরো খুলে কও।'

'আর ছিল, হুজুর, একটা পুরো মেগ্নাম্ সাইজের হুইস্কির বোতল—খাঁটি স্কচ্, ছিপি পর্যন্ত খোলা হয় নি। সেই সমস্ত বোতলটা আমাকে একাই খতম করতে হল, পাষণ্ডেরা কিছুতেই হিস্যে নিলে না। মেগ্নাম্ বোতলে নেশা হবে না তো কি হবে? ঐ দুটো লোককে দুশ্চরিত্র বলবো না তো কি বলবো, কুসঙ্গ বলবো—'"

কলকাতার স্মার্ট্ সেট্-এর কায়দা-কেতা প্রটোকল-বাঁধা। কোন্ অঙ্গের রসিকতায় মুখে ফুটবে একটুখানি স্মিত হাস্যের ক্ষীণাভাস, কোন্ পর্যায়ের চুটকিলাতে শীতের ফাটা ঠোঁটের চেরা হাসি, মোনা-লিসা-স্মিতহাস্য করে করে

স্তরে স্তরে সর্বশেষে রবীন্দ্রাগ্রজ "বড়বাবু"র ঠাঠা অট্টহাস্য। শিপ্রা কোনো প্রটোকল কখনো মানে নি, তার হাস্যমাত্রা কি হবে সেটা 'মেট্-এর' আব-হাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু গাঁইয়া জিমি একহাতে মুখ চেপে অন্য হাতে পেট চেপে দু'ভাঁজ হয়ে গিয়েছে।

শিপ্রা বললে, "আম্মো সেই লণ্ডনী জজের মত রহস্যাচ্ছলা হয়ে শুধোই, এস্থলে কথিকাটি কি ভাবে প্রযোজ্য।"

"আরে কও কেনে? আমি সদাই সাথীরূপে রাখি ছ'টা বিগ্ হুইস্কি, ছ'টা 'ব্লা' জিন্—তোমাদের এই প্যারা কংগ্রেস সরকারের মেহেরবানীতে এ-সব সুধা ভারতময় লুকোচুরি খেলে, কটকে রাজরাজমহেন্দ্রবরম বা তিরুচিরপল্লী কোন্‌টা ড্রাই, কোন্‌টা ওয়েট, কোন্‌টা স্যাঁৎসেঁতে, সেটা আবার হঠাৎ এক লম্ফে বোনড্রাই হয়ে গিয়েছে কবে, তার নেই খবর—মরো গিয়ে সেখানে সুধার অভাবে। অতএব প্রকৃষ্টতম পন্থা ক্যাঙারু পদ্ধতি। আপন থলেতে আপন মাল নিয়ে চলা-ফেরা করা। আজ সঙ্গে ছিল ছ'টা বড়া জিন্ আর ছিল আন্দেশা, দুনো ইয়ারের তরে বাড়ন্ত হলেই তো সব্বোনাশ—নাশ নয় লাশ—আখেরে হল সর্বনাশই। ছ'টার সাড়ে পাঁচটা খেলুম আমি, ইয়ার খেলেন হাফ্। চরিত্র নষ্ট হল না আমার, এই পেঁচি মাতালটার পাল্লায় পড়ে? বরঞ্চ গোসাঁইয়ের কপাল ছিল ঢের ভালো, তার প্রলোভন ছিল মাত্র সেই বোতলটা। কাউকে খেতে দেখলে, কিংবা যদি কেউ সঙ্গ দেবে বলে জানা থাকে তবে প্রলোভনটা হয় প্যারাডাইজে সেই প্রথম নর-নারীর মত নজীরহীন, অভূতপূর্ব লালসা ভরা আপেল। এক পেগ আপেল, নো, আই মীন একটা আপেল—সেটা হাফাহাফি করে খেয়ে একে অন্যকে উৎসাহিত করলো। বাবু কীর্তিনাশ আমাকে সঙ্গ দেবার লোভ দেখিয়ে চাটলেন তাঁর জিন্‌টা, পেঁচি রাঁধুনী যে-রকম আড়াই ফোঁটা ঝোল চেটোতে নিয়ে দেড় বার চেটে নুনটা পরখ করে নেয়। এখন বলো, ভদ্রে শিপ্রা, সম্পূর্ণ মদ্যবর্জিত লোক এবং কীর্তি কে বেশী বিপজ্জনক দুশ্চরিত্র! তবে কি না, একটা সান্ত্বনার কথা, শুধু ঐ ছ'টা জিন্ পেগ নয়,—ছ' বোতল স্কচ আর তিন বোতল স্কচ লুট করেছি ঐ পাতি স্পাই পাঞ্জাবীটার ঘর থেকে।"

ত্রিমূর্তি বাক্‌হারা, স্পন্দনহীন। এলেফেণ্টার প্রস্তর ত্রিমূর্তি এদের তুলনায় তখন মুখরিত বাচাল।

নবম অধ্যায়

পোঃ আলীগ্রাম
গ্রাম পাহাড়পুর, সিলেট,

"দোয়া পর সমাচার এই,
স্নেহের শিপ্রা বোন—"

শিপ্রা যেন বিজলির শক্ খেল। খামের উপর ছিল ভারতীয় স্ট্যাম্প। ঠিকানাও অচেনা হাতের। অলস অবহেলায় চিঠি খুলেছে, আনমনে পড়তে শুরু করেছে—হঠাৎ বুঝতে পারলো এ যে বিল্‌কিসের চিঠি! কত যুগ পরে! চিঠির ডান কোণে তাকালো—হ্যাঁ, সিলেটের ঠিকানা। খামটা তড়িঘড়ি বাস্কেট থেকে তুলে নিল—ঠিকই তো দেখেছে। ভারতীয় স্ট্যাম্প। তারিখ বিশ। তখনো তো মানুষ পূর্ব বাঙলা ছেড়ে চলে যেতে আরম্ভ করে নি। পাঁচ সেকেণ্ডের ভিতর আগাগোড়া চিঠিটায় চোখ বুলিয়ে ধরে ফেলল জায়গাটা যেখানে তার উত্তর আছে। লিখেছে ঃ

"এখানকার অবস্থা এমনই অস্বাভাবিক যে চিঠিটা এক হিন্দু ভদ্রলোক মারফত ভারতে পাঠালুম। ভদ্রলোক সেই পার্টিশনের সময় থেকে সব রকমের ঝড়ঝঞ্ঝা সয়েছেন, কিছুতেই দেশত্যাগ করতে রাজী হন নি। কাল হঠাৎ এসে আমার মেয়েকে বললেন, তাঁকেও শেষ পর্যন্ত ভিটের মায়া ত্যাগ করতে হল। মেয়ে আশ্চর্য হল, কারণ আমাদের অনেকেই তো এখনো পুরো আশা ধরে আছেন, লীগ আর ইয়েহিয়াতে সমঝোতা হওয়া খুবই সম্ভবপর। অথচ একাধিক বার যখন হিন্দুদের চতুর্দিকে ঘোরঘুট্টি অন্ধকার, প্রায় সবাই পালাচ্ছে তখনো তিনি প্রতি সন্ধ্যায় এখানে এসে বৈঠকখানায় তোমার জামাইবাবুর সঙ্গে দাবা খেলে গেছেন। উপস্থিত হিন্দুদের ভিতর বিশেষ কোনো চাঞ্চল্য নেই, তবু তিনি বেবিকে বললেন, এত দিন বাইরের গুণ্ডা এসেছে মার-পিঠ লুঠতরাজ করতে, তাঁর হিন্দু-মুসলমান প্রতিবেশী, ইয়ার দোস্তের সাহায্যে তিনি তাদের ঠেকিয়েছেন। এবারে—তাঁর স্থির বিশ্বাস—স্বয়ং সরকার আসবে বেহদ্দ জুলুম করতে। জুলুম করতে আসে যে-সরকার তার জাত নেই, ধর্ম নেই। মুসলমান হিন্দু কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে না। বেবি তাঁর ইঙ্গিতের কিছুটা ধরতে পেরে ভয় পেয়ে শুধলো, মুসলমানদের উপরও জুলুম চলবে না কি? তিনি ভালো মন্দ কোন উত্তর না দিয়ে বেবির হাতে চন্দন কাঠের একগাছি মালা দিয়ে চলে গেলেন। ভশচায মশাই করিমগঞ্জ হয়ে কোথায় যাবেন সেটা এখনো স্থির করতে পারেন নি। দাদার বন্ধু শ্রীযুত দেশরঞ্জন চক্রবর্তী, করিমগঞ্জ, কাছাড়, ঠিকানায় উত্তর দিয়ো। ভশচায আমাদেরই মত

সাদামাটা মানুষ; তাঁর দিব্যদৃষ্টি আছে এ-রকম কোনো খবর বা গুজোব আমার কানে কখনো পেঁছিয় নি, ভবিষ্যদ্বাণী করতেও শুনি নি। তাই তাঁর দেশত্যাগ শুধু বেদনা দিচ্ছে। এর মধ্যে আশা বা নিরাশার কোনো আভাসই নেই।

বাইরে যথেষ্ট। মিনিটে মিনিটে রকমারি খবর গুজোব এখানে পেঁচাচ্ছে—আমাদের এই অজ পাড়াগাঁয়ে পর্যন্ত। কোন্‌টা সুখবর, কোন্‌টা দুঃসংবাদ সেটা পর্যন্ত সব সময় বোঝা যায় না—কারণ তারই ফল আখেরে কি হবে, কেউ অনুমান করতে পারে না। সর্বোপরি বেবি আর তার বেতার। ঢাকা বলে এক কথা, পিণ্ডি বলে উল্টোটা, লণ্ডন মনস্থির করতে পারে না। আমি শুধু জানতে চেয়েছিলুম, ইণ্ডিয়া ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে কি? কলকাতা শুনে তো মনে হয় না। কিন্তু কে জানে? হয়তো দিল্লীই জানে সবচেয়ে বেশী কিন্তু উচ্চবাচ্য করাটা সময়োপযোগী বলে মনে করছে না।"

চুপ করে শিপ্রা ভাবতে লাগলো—বাকি চিঠি পড়া স্থগিত রেখে। একরাশ চিন্তা একটা আরেকটাকে ঠেলে ফেলে কোনোটাই তার শেষ সীমানা অবধি পেঁছিয় না। শুধু একটু বেদনাবোধ তার হৃদয় মনের গভীর অতলে বসে আছে। তার কোনো পরিবর্তন নেই। ওয়ান জাস্‌ট্‌ কান্‌ট্‌ থিংক ইট আউট—বহুকাল ধরে সে জানে বিল্‌কিস্‌দিদের পক্ষে দেশত্যাগ করে কলকাতা চলে আসাটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কতকাল হয়ে গেল, কতবার সে অনুরোধ করেছে একবার দেশ থেকে বেরিয়ে আসতে—দু'দশ দিনের জন্য। সে নিজে যাবে স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে যাওয়াটা হয়ে গেল বটে কিন্তু সেটা পাহাড়পুর নয়, সেটা স্কটল্যাণ্ডের পাহাড়পর্বত, নদী হ্রদ। তারপর দীর্ঘ নীরবতা। আলস্য, জড়ত্ব।

আবার চিঠিখানা পড়তে আরম্ভ করলো, অন্য এক জায়গা থেকে। লিখছে, প্রকৃত বিশ্বাসযোগ্য দেশের খবর দেবার মত কিছুই নেই। সব পরস্পর-বিরোধী। এবং সবচেয়ে মারাত্মক যে পাপ বিষ প্রত্যেকের দেহমনকে আচ্ছন্ন করে তাকে নির্জীব, ক্লীব করে দিচ্ছে সেটা ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা। কেউ জানে না, কার কপালে কি আছে? কোনো সন্দেহ নেই, এখন, এই মুহূর্তে দেশের পনেরো আনা লোক—মেয়েছেলেরাও পিছিয়ে নেই—লীগপন্থী। সত্য বটে এ-রকম সর্বব্যাপী আন্দোলন আমি ইতিপূর্বে আর কখনো দেখি নি। তবু মনে ভয় জাগে একাধারে ভাবালুতার উচ্ছ্বাস, অন্য দিকে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন জড়ত্ব—এ দুটোর ভিতর জিতবে কোনটা যদি কখনো পরীক্ষা আসে।

শেষ কথা। বেশীর ভাগ লোকের বিশ্বাস, লীগ ইয়েহিয়াতে যদি সমঝোতা না হয় তবে পূর্ববঙ্গবাসী যে আন্দোলন আরম্ভ করবে এবং সেটাকে আয়ত্তে

আনার জন্য জুণ্টা যে দমননীতি প্রবর্তন করবে তার আন্দোলনটা সেই স্বদেশী যুগ থেকে আরম্ভ করে যে-ধারা বয়ে ইয়েহিয়াতে এসে পৌঁচেছে সেই সনাতন ধারা বয়েই চলবে, সেই প্যাটার্নই যুগধর্মের বর্ণে রঞ্জিত হয়ে স্বপ্রকাশ হবে—মাঝে মাঝে কখনো বা ভাষার জন্য, কখনো বা য়ুনিভার্সিটির উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে কয়েকটি নিষ্পাপ যুবক আত্মাহুতি দিয়ে শহীদ হবে; এবং ইয়েহিয়ার দমননীতিও সেই আলীপুর মামলার ফলস্বরূপ কয়েকটা দ্বীপান্তর ধরনের শাস্তি, জনতা ছত্রভঙ্গ করার জন্য টিয়ার গ্যাস, হাঙ্গার স্ট্রাইকের সময় রবারের নল দিলে জোর করে গেলানো, কখনো বা এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ, গোপনে গোপনে কিছুটা উৎপীড়ন—এই প্রাচীন রাজকীয় পন্থাই অবলম্বন করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে-পন্থার সমান্তরাল হয়ে চলবে সেই সনাতন তোষণ-নীতি—মোমেন খানদের সংখ্যা বাড়ানো হবে অকাতরে, স্পাই পোষা হবে অগণিত এবং অধুনা যে ছাত্র-আন্দোলন দ্রুতবেগে উগ্র হতে রুদ্রতর রূপ ধারণ করছে সেটাকে করায়ত্ত করার জন্য বিস্তর ছাত্র-স্পাইকে অকৃপণ হস্তে বিতরণ করা হবে দেদার কাঁচা টাকা, মাসিক মাইনে, তাদের ককটেল পার্টির জন্য কাপ্তাই ড্যামাবন্ধ পরিমাণ নিষিদ্ধ পানীয় এবং সমান্তরাল পন্থায় সঙ্গে সঙ্গে সানন্দে সসম্মানে এগিয়ে যাবে এতাবৎ সরকার কর্তৃক পদদলিত, সমাজ কর্তৃক লাঞ্ছিত ভাড়াটে গুণ্ডার পাল—যে-সব ভ্রষ্টমতি, দুষ্টবুদ্ধি, রাষ্ট্রদ্রোহী, পঞ্চনদবৈরী সম্প্রদায় সরকারের মেহেরবানী কদরদানী তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষা করে সদাশয় সরকারের প্যারাদের বদনমণ্ডলে আপন গণ্ডদ্বয় পূর্ণ নিষ্ঠীবন বিচ্ছুরিত করে লাঞ্ছিত করেছে—তাদের পৃষ্ঠস্কন্ধমস্তকে সরকারী ফরমান মাফিক লগুড়াঘাত করতে করতে।

বোন শিপ্রা, বুঝতেই পারছো, এটা আমার ভাষা নয়। আমাদের পাশের গাঁয়ের এক সরল গোসাঁইজীকে সেই দেশত্যাগী ভট্টাচার্য যাত্রাকালে একখানা চিঠি লেখেন। বেচারী গোসাঁই সেই চিঠি তোমার জামাইবাবুকে কাঁদতে কাঁদতে পড়ে শোনান।

সর্বশেষে ভশচায ইতিপূর্বেই যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন সেইটেই যেন প্রাণখুলে লিখেছেন, যেন গৌর গোসাঁইয়ের নরম বুকটি খান খান করার জন্য কিংবা যাবার বেলা সেটাতে হিম্মৎ ভরে দেবার জন্য। লিখেছেন, "এক দরবেশ একদা আমায় বললে, খুদা-পাক সব শহরে এবং প্রতিটি জনপদখণ্ডে চার চারজন করে সাধুপুরুষ "কুতুব" (মিনার) বা স্তম্ভ রাখেন। সে দেশ, সে জনপদ তাঁদেরই দৃঢ়াত্মার উপর নির্মিত। এ অঞ্চলে তুমি একজন, তোমার পিতা ছিলেন আর একজন। এঁরা স্বেচ্ছায় কদাচ, কুত্রাপি দেশত্যাগ করেন না। ভুবনেশ্বরের দৈবাদেশে যদি মাত্র একজনও দেশত্যাগ করেন তবে সে-দেশ, সে অঞ্চলের জনপ্রাণী কীটপতঙ্গ পর্যন্ত সমূলে বিনষ্ট হয়—"সমূলস্তু বিনশ্যতি", "মহতী

বিনষ্টি"—অন্য তিন মহাত্মা "কুৎব্"সহ। তুমি জানো—তোমাকে আর কী শেখাবো—সম্পূর্ণ গ্রাম যদিস্যাৎ খাণ্ডবদহনে ভস্মীভূত হয় তবে সর্বজনপূজ্য মহাকাল মন্দিরও নিষ্কৃতি পান না। দরবেশ ফার্সীতে বলেছিলেন ঃ

দাবানল যবে জনপদভূমি
দগ্ধদহনে দহে
কিবা মসজিদ, কবরসৌধ
প্রভেদ কিছু না সহে।

তুমি, গৌর, এ-অঞ্চল ছাড়লে এর সর্বনাশ হবে।

তাই যাত্রারম্ভে তোমাকে সে-প্রস্তাব দি নি।

গুরু সাক্ষী, তোমার আখড়া সাক্ষী, তার রাধামাধব বিগ্রহ সাক্ষী, আমি কস্মিনকালেও ভবিষ্যদ্বাণী করি নি। তবু একটা কথা বলে যাই, দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর ধরে আমি নিরবচ্ছিন্ন পূর্ব পাকিস্তানে বাস করেছি, তার দৈনন্দিন পরিবর্তন, ক্রমবিকাশ, পতন-অভ্যুদয় সাগ্রহে লক্ষ্য করেছি। এরই উপর নির্ভর করে আমার ভবিষ্যৎ দর্শন গণনা। এর সঙ্গে গণৎকারের ফলিত জ্যোতিষ গণনা পদ্ধতির কণামাত্র সাদৃশ্য সামঞ্জস্য তো নেইই, অপিচ ফলিত জ্যোতিষীর ব্যাক্যাড়ম্বরসহ ভ্রান্তিমুক্ত ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করার [illegible] কোনো প্রকারে রই শাস্ত্রাধিকার আমার নেই।

জনসাধারণের বিশ্বাস, ঢাকার দর কষাকষি নিষ্ফল হলে পূব পাক রাজনীতি সেই প্রাচীন ধারা বেয়েই চলবে, হয়তো ঈষৎ দ্রুততর বেগে। সঙ্গে সঙ্গে দমননীতিও তার ধারা বেয়ে চলবে, হয়তো ঈষৎ উদ্দামতর বেগে, রূঢ়তর পরিমাণে। মোদ্দা কথা প্যাটার্নের পরিবর্তন হবে না।

সেখানে আমার বক্তব্য, না, অবশ্যই হবে।

প্রথম সম্ভাবনা ঃ কলমের এক খোঁচাতে পূব পাক্ যে ধরনের স্বায়ত্তশাসন চায় সেইটে রাতারাতি পেয়ে যাবে। এটা কিছু অভিনব ইন্দ্রজাল নয়। খুদ পাকিস্তানের জন্ম ও স্বাধীনতা কলমের এক খোঁচাতেই হয়েছিল। সে উদ্দেশ্যে ক'জন লোক, কি স্বার্থত্যাগ করেছে, শুনি? ক'জন নেতা কারাবরণ নির্বাসন গরম করেছিলেন বলতে পারো? এক সিলেটী খালাসী তার সরল ভাষায় বলেছিল, 'স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তান অর্জন করলেন জিন্না সাহেব তাঁর পাতলুনের ভাঁজ—ক্রীজ—সমূচা চোস্ত্ রেখেই, ফাইভ ফিফ্‌টি ফাইভ ফুঁকতে ফুঁকতে। তিনি যদি গাঁধী নেহরুর মত জেলে ফেলে যেতেন তবে গোটা হিন্দুস্তানটাই তার কব্জাতে এসে যেত।' অন্তত এ-কথা তো সত্য যে, ইংরেজ অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে পাক্ রাষ্ট্র নির্মাণে সম্মতি দিল তখন হবু পাক্ নেতারা রীতিমত সংবিৎ হারিয়ে ফেলেছিলেন।...তারপর গেল তেইশ বৎসরের মধ্যে 'কলমের এক খোঁচাতে' কি রত্তিপরিমাণ স্বাধিকার অর্জন করতে পেরেছে?

সে প্যাটার্ন সম্পূর্ণ ভিন্ন। অবশ্য বলতে পারো, সেটা ১৯৪৭-এর প্যাটার্ন। তাই সই। আমার প্রতিপাদ্য ছিল গত তেইশ বৎসরের প্রচলিত প্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি আর হবে না। ইয়েহিয়ার কলমের এক খোঁচাতেই যদি স্বায়ত্তশাসন ভূমিষ্ঠ হয়—এবং এ-তথ্য সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য যে মধ্য ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তাঁর সে সদিচ্ছাই ছিল—তবে আর যা বলো, আর যা কও সোঁদরী কাঠের লাঠি আপাদমস্তক নিষ্প্রয়োজন। আমার ইয়ার মৌলবী সাহেবের জবানে, বিলকুল বেকার, বেফায়দা ফজুল! এটা বললুম, নিতান্ত কথাপ্রসঙ্গে।

বিকল্পে যদি তা না হয়, তবে 'ঈশ্বর রক্ষতু'! তখন যে দমননীতির বজ্রপাত হবে সেটাও সেই মান্ধাতার আমলী টিয়ার গ্যাস ছেড়ে হেথা হোথা বন্দুকের গণ্ডা কয়েক ফাঁকা আওয়াজ মেরে, দু'দশ জনকে শহীদ পর্যায়ে উত্তোলন করে পুনরায় সেই প্রাচীন প্যাটার্নের অনুকরণ করবে না। (খুদাতালার দোহাই, এঁরা আমার নিত্যপ্রাতঃস্মরণীয়) এটা হবে সম্পূর্ণ অভিনব, অভূতপূর্ব, অবিশ্বাস্য, অতুলনীয়। যদিও বা কলমের এক খোঁচায় স্বরাজ দানের উদাহরণ আমাদের কারো কারোর স্মরণ থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় নি, কিন্তু এই সিলেটে তথা পূর্ববঙ্গে দমননীতির চরমতম বীভৎস বিভীষিকার প্রকাশ [illegible] আমাদের স্মৃতি মন্থনে প্রভাসিত হচ্ছে না। অস্মদ্দেশীয় সাতিশয় নগণ্য সংখ্যক দু'একজন মাত্র জানেন যে আমাদের সমসাময়িক কালেই বহু দূরের এক সভ্য দেশে অভূতপূর্ব এক নবীন প্যাটার্ন বুনেছিলেন বহু বিচিত্র প্যাটার্নের সৃষ্টিতে পরিপূর্ণ ইতিহাসের এক অত্যুদ্ভূত অলিম্পন ডিকটেটর হিটলার। ক'জন জর্মন কল্পনা করতে পেরেছিল যে লুথার, কাণ্ট, গ্যোটে, বেটোফনের মত চিন্তাশীল, রুচিবান দেশে হঠাৎ এমন এক সৃষ্টিছাড়া কিং-নর আবির্ভূত হয়ে মাতৃভূমির সর্ব ঐতিহ্য সর্বসাধনার ধন লণ্ডভণ্ড করে এমন এক নৃশংস নিপীড়ন, সর্বব্যাপী নিধনযজ্ঞ প্রজ্বলিত করবে যে তার তুলনার জন্য মানুষকে এ-যুগ ছেড়ে যেতে হবে চেঙ্গিস আট্টিলার সন্ধানে?

আর ভুলো না গোসাঁই, হিটলার যুদ্ধজীবী ছিল না। তার উভয় কুল অসামরিক। সে নিজে চিত্রকর। এখানে ইয়েহিয়া, তার মন্ত্রণাদাতা, তার আদেশ বহনকারী সর্বভূতে আছে মাত্র একটি ভূত—তেজস্, অগ্নি, রণাগ্নি। এদের প্রত্যেককে তুমি ফৌজাবতার নাম দিতে পারো। এমন কি ইয়েহিয়া-হারেমের রানী, প্রধান রক্ষিতার জনসমাজে প্রচলিত আদুরে নাম "জেনারেল রানী"।

অতএব, যদিস্যাৎ কলমের খোঁচায় সমস্যার সমাধান না হয় তবে বিকল্পে কি হবে? সবাই ভাবছে সনাতন সঙ্গিনের খোঁচা। না। আমাদের সুদূর এই পাহাড়পুরেও খবর পৌঁছে গেছে ঢাকাতে কি পরিমাণ ট্যাঙ্ক জড়ো হচ্ছে এবং হবে। এবারকার প্যাটার্নে হিটলারের কীর্তিকে ইয়েহিয়ার বিস্ফোরক-চূর্ণ-ধূম্রে

ম্লান করে দেবে, অষ্টাঙ্গ আচ্ছাদিত করে সম্পূর্ণ অদৃশ্য করে দেবে। ঈশ্বরের অভিসম্পাতে যদি এই বিকল্পই সাধিত হয়—আমি সন্ধ্যাহ্নিকের পর প্রতি রাত্রে আমাদের গুরু পীর শাহজালালকে নতজানু হয়ে স্মরণ করিয়ে দি, তিনি তাঁর মাতৃভূমি আরব-ইয়েমেন ত্যাগ করে যেখানে এসে মুক্তি লাভ করলেন সে-দেশকে একমাত্র তিনিই রক্ষা করতে পারেন—তবে আমি যে অনিশ্চিত আশ্রয়ের সন্ধানে যাচ্ছি, সেখানে হয়তো নিষ্কৃতি পাবো না। তথাপি আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা ছাড়বো না, সুদিনের প্রতীক্ষায় দিন গুনবো।

মহাত্মাজী পদ্ধতিতে যদি দেশের মনস্কামনা পূর্ণ হয় তবে সোঁদরী কাঠের লাঠি বেকার!

বিকল্পে হিটলার পদ্ধতির ট্যাঙ্ক কামানের সামনে সোঁদরী কাঠের লাঠি বেফায়দা।

তুমি তোমার পিতা গোস্বামী সমাজের উজ্জ্বল নীলমণির পুত্র এবং শিষ্য। আমি জানি, তাই তুমি ওপারে যাবার জন্য নিত্যনিয়ত প্রস্তুত; এখন এপারে থাকার জন্য প্রস্তুত হও।

আমার শেষ অনুরোধ—"

চিঠিটি অসমাপ্ত। বিস্তর দারুণ ইনটারেসটিং বইয়ের শেষ ক'খানা পাতা ছিল না বলে বালিকা শিপ্রা কতবারই না নিষ্ফল আক্রোশে গর্জন করেছে। প্লটটা কী সুন্দর সাজানো, ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত কী অদ্ভুত অথচ বাস্তব, চরিত্রগুলো রহস্যের কুহেলিকাচ্ছন্ন সত্ত্বেও পাত্র-পাত্রী সুস্পষ্ট—পাতা কটির অভাবে অকস্মাৎ সবাই একসঙ্গে কর্পূর হয়ে গেল। কত কাল চলে গেল তারপর। এখন আর সে-অনুভূতির উদয় হয় না। মসিয়ো পোওয়ারো বা "দি সেণ্ট" অসমাপ্ত রেখেই, ফরাসী কায়দায় কাঁধে শ্রাগ্-এর সামান্য ছোঁওয়া লাগিয়ে বিলিয়ে দেয়।

জাল আবার এল সেই প্রাচীন দিনের অনুভূমি। অসমাপ্তির নিবিড়ঘন নৈরাশ্য—আক্রোশ দূরে থাক, ক্ষোভেরও শেষ রেশ সে-নৈরাশ্যে ঠাঁই পায় নি। যে লোকটি প্রতি শব্দে, প্রতি ছত্রে, প্রতি দরদী কথায় শিপ্রার চোখের সামনে জাজ্জ্বল্যমান হয়ে স্বপ্রকাশ করতে করতে তার সম্পূর্ণ আপন-প্রিয় হয়ে গিয়েছিল সে হঠাৎ কোন্ অদৃশ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এ যে মরণেরও অধিক মরণ। এ বড় অন্যায়, কঠিন অবিচার।...বিলকিসও এই আকস্মিক অসমাপ্তির উপর কোনো মন্তব্য করে নি।...আজ কোথায় এই জনপদ স্পষ্টবক্তা, সত্যদ্রষ্টা! হঠাৎ শিপ্রার সর্বাঙ্গ ভয়ে শিউরে উঠলো। হিটলারের আগমন ও ফলস্বরূপ শাশ্বত রাষ্ট্রাদর্শবৈরী শ্মশান-ধূম্রে গঠিত পৈশাচিক "তৃতীয় রাষ্ট্রের" গোড়াপত্তন শিপ্রা জয়ী ভটচাযের মত সামান্য যে ক'টি জর্মন বিধিদত্ত দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেখতে পেয়েছিলেন তাঁদের প্রায় সবাই প্রাণ দেন সূক্ষ্ম

দৃঢ় তারে ঝুলতে ঝুলতে ক্রমে ক্রমে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস হতে হতে। কসাই যে-রকম হুক্-এ ঝুলিয়ে রাখে শূকর বাছুরের মৃতদেহ, এঁদের নগ্ন শবও হিমঘরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল দিনের পর দিন—শত্রু-মিত্র সর্বজনের দর্শন ও শিক্ষা-দানার্থে।

প্রক্রিয়ার পূর্ণ ফিল্ম্ হিটলার প্রতি রাত্রে ডিনারের পর সবান্ধব আদ্যন্ত দেখতেন, আপন প্রাইভেট সিনেমা হলে।

দশম অধ্যায়

নির্জীব কণ্ঠে কীর্তি বললে, "শুনেছ, শিপ্রা ?"

শিপ্রা উঠে গিয়ে কীর্তির দু'জানুর উপর কোলে বসে ডান হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে, বাঁ হাত দিয়ে তার মাথা বুলোতে বুলোতে বললে, "কিছু কিছু শুনেছি বই কি ? আজকাল বিদেশী বেতারগুলো—কাপুরুষ, মীন্, ইতর, কি গাল দেব ভেবে পাই নে—একটু একটু সাহস সঞ্চয় করতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু তোমার মুখে শোনা সে তো ভিন্ন—"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কীর্তি বললে, "শুনে কোনো আনন্দ পাবে না। সব খবরই দুঃখের। একটিমাত্র খবর আমাকে এই নৈরাশ্যের মধ্যে মাঝে মাঝে আশার আলোক দেখায়। সুন্দরবনের পাশ থেকে হাসনাবাদ, যশোর হয়ে—সীমান্তের যতখানি কাছে যেতে দেয়—গিয়েছি ভগবানগোলা, পদ্মার ওপারে পূব বাঙলার সারদা পুলিশ কলেজ, আইয়ুব ক্যাডেট কলেজ—দুটো জায়গাতেই হারামীরা হানা দিয়ে পুলিশকে খুন করেছে। ভাগ্যিস, ক্যাডেট কলেজের বাঙালী প্রিনসিপ্যালে ঝাণ্ডু ঝাণ্ডু পলিটিশিয়ানদের বহু পূর্বেই অশথ গাছের মগডালের কাঁপন থেকেই কালবৈশাখীর পূর্বাভাস ঠিক ঠিক ধরে ফেলেছিল বলে মিঞাজী ছেলেদের আপন আপন বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল। এই বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরাই হারামীদের চার নম্বরী শিকার—"

"চার নম্বরী মানে ?"

"অস্ত্র ব্যবহার যারা জানে, তারা ওদের শিকার। পয়লা নম্বর, বেঙ্গল রেজিমেণ্টের বাঙালী—এরাই ৬৫-র যুদ্ধে লাহোর বাঁচিয়েছিল এবং যত সব বড়ফাট্টাই করনেওলা পাঞ্জাবী পাঠান বলে তারা রণবীর, যোদ্ধার জাত, মার্শাল রেস, এদের সব্বাইকে ঢিড দিয়ে পেয়েছিল সবচেয়ে বেশী মেড্‌ল্ আর ডেকোরেশন। তার প্রতিদান স্বরূপ এই সব প্রাণরক্ষকদের যেখানে মেড্‌ল্ ঝোলে সেখানে ঢুকিয়েছে রঞ্জ-বুলেট, ইয়েহিয়া মেড্‌ল্—আইয়ুব মেড্‌লের জায়গায়। দুই নম্বর : ঈস্ট পাকিস্তান রাইফ্‌ল্‌স্—এরা সশস্ত্র পুলিশ।

রাইফেল চালাতে জানে, ব্যস। তিন নম্বর: সাধারণ পুলিশ, যাদের কেউ কেউ একটু আধটু বন্দুক চালাতে পারে। এগুলোর কথা আমরা আগেই শুনেছিলুম। এবার এসেছে চার নম্বর: যে-কটি ক্যাডেট পূব বাঙলায় আছে তাদের ছাত্র এবং প্রাক্তন ছাত্র—এরাও কিছুটা রাইফেল চালাতে জানে। এদের বেশ কিছু ছেলে—কত আর বয়েস হবে, ষোল-সতেরো—পদ্মা পেরিয়ে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে এসে এখানে ওখানে জড়ো হয়েছে। একটি ছেলে—কি বলবো, শিপ্রা, সে কী লাবণ্যভরা মুখ, আর সর্বক্ষণ চোখেমুখে হাসি লেগেই আছে, আমার কান্না পেল, বয়স তার চোদ্দ হয় কি না হয়!"

শিপ্রা কেমন যেন অজানতে কীর্তির কোল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার মনে পড়লো, ভট্টাচার্য তাঁর বন্ধু গোস্বামীকে লিখেছিলেন, এবারকার প্যাটার্ন যাই হোক না কেন, সেটা হবে সম্পূর্ণ অচিন্ত্যনীয়। নইলে চোদ্দ বছরের বাচ্চা—? না তো, অভিমন্যুর বয়স কত ছিল?—মনে আনতে পারলো না শিপ্রা।

কীর্তি যে ছিন্নালিঙ্গন হয়েছে সেটা সে লক্ষ্যই করে নি। গলাতে একটু জোর দিয়ে বলে যেতে লাগলো, "তোমাকে শক্ত হতে হবে শিপ্রা, এ-ছাড়া অন্য গতি নেই। এখন শোনো। আমরা সেই চোদ্দ বছরের ছেলেটিকে মোটরে তুলে নিয়েছিলুম। কথায় কথায় বললে, যেন তেমন বলার মত কিছু নয়, জাসট্ এমনি, কে যেন কাকে খেয়া নৌকোয় বলছিল, ২৫শে ছিল বিষ্যুৎবার—"

শিপ্রা বললে, "হ্যাঁ, ২৭শে মুহর্‌রম্ ছিল ঐ দিন। পর দিন অমাবস্যা।" "ইসলামী পঞ্জিকা" পড়ে পড়ে তার সব-কিছু সড়গড় হয়ে গিয়েছিল। এমন কি "মুহর্‌রম্" যে শুদ্ধ উচ্চারণ সেটাও শিখেছে ঐ পঞ্জিকার মেহেরবানীতে। বললে, "পরে বুঝিয়ে দেব।"

কীর্তি বললে, "শনিবার দিন সকালে ঢাকাতে কারফ্যু ছিল না। এক ভদ্রলোক বেরিয়েছেন তাঁর বন্ধুর সন্ধানে। সে বন্ধু থাকেন যে-পাড়ায় তার পাশের বাজারটা আগের দিন ভোরে হারামীরা পুড়িয়ে দিয়েছে। সেখানে তাঁর সন্ধান না পেয়ে তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন সেই পোড়া বাজারের এক পাশে। এমন সময় একটা ছোট্ট বাচ্চা, 'মা, মা' বলে ডেকে কাঁদতে কাঁদতে রাস্তা পার হতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছে—এমনিতেই সে ভালো করে চলতে শেখে নি, তার উপর দু' চোখ জলে ভরে যাওয়াতে কিছুই ঠিক ঠিক দেখতে পারছিল না। রাস্তার ওপার থেকে এক বুড়ি ভাঙা গলায় ডাকছে, 'ওরে দুলাল, ও দুলু, আয় এদিকে আয়।' দেশের স্বাভাবিক অবস্থায় ভদ্রলোক হয়তো কিছুই লক্ষ্য করতেন না। এখন কিন্তু শুধোলেন, কি হয়েছে? বুড়ি বললে, 'পরশুদিন ওর বাপ রিকশা চালাতে বেরিয়েছিল; এখনো ফেরে নি। রোজ রাত দুপুরে ফেরে। সে-রাতেই তো চাদ্দিকে গোলাগুলি চললো। ভোরের দিকে বাচ্চাটার

মা রাস্তা পেরোচ্ছিল জল আনতে, এমন সময় কোত্থেকে একটা মিলিটারি গাড়ি এদিক দিয়ে জোর হাঁকিয়ে যাচ্ছিল। থমকে দাঁড়ালো। বউটাকে গোটা তিনেক সেপাই একটানে গাড়ীতে তুলে নিয়ে চলে গেল, আমি রাস্তায় পেঁছিতে না পেঁছিতে। দেখলাম গাড়ি বোঝাই অল্পবয়সী অনেকগুলো মেয়েছেলে। মোল্লাজীর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লুম—আমার ছেলে বউয়ের খবর নেবার তরে। তিনি বললেন, মেয়েগুলোকে ছাউনিতে নিয়ে গিয়েছে। ওরা আর ফিরবে না—"

শিপ্রা এতক্ষণ কীর্তির মুখোমুখি টান টান খাড়া হয়ে সব শুনছিল। আস্তে আস্তে ডান হাত মুঠো করে, শক্ত—আরো শক্ত চাপ দিতে লাগলো। নখগুলো বুঝি তেলোতে ঢুকে যাবে। বাঁ হাত দিয়ে ডান মুঠো জোর চেপে ধরলো। ডাইনে বাঁয়ে সে অল্প অল্প টাল খেতে শুরু করেছে। মাথাটা একদিকে কাত হয়ে গিয়েছে, মেলে যাওয়া চোখ দৃষ্টিহীন, কীর্তির চোখের মণি ভেদ করে মহাশূন্যে বিলীন। কীর্তি দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি তার কোমর ধরতে গেছে। শিপ্রা তাকে নিরস্ত করে শুধোলে, "তুমি মনস্থির করেছ, তুমি কি করবে ?"

অতিশয় শান্ত কণ্ঠে কীর্তি বললে, "সে তো আমি আগরতলাতেই করেছি, তুমি জানো। তবে হয়তো আমার অজান্তে লারীর কুচক্রের ব্যাখ্যান শুনে আত্মার মন বিরূপ হয়ে বিদ্রোহ করেছিল। এ কী ঔদ্ধত্য! নিরীহ পূব বাঙলার লোককে নিয়ে তোমরা বন্দুকের জোরে যা-খুশি করতে পারো ?"

শিপ্রার চট করে মনে পড়লো, বহুদিনকার ভুলে যাওয়া একটা ঘটনা। খান তাকে বলেছিল, "ঐ যে আমার ক্যাবলা শান্ত কীর্তিকান্ত—ওর মত নির্ঝঞ্ঝাটে প্যালারাম এ-দুনিয়ায় খুঁজতে হলে শকুন্তলার আশ্রমে-ফাশ্রমে যেতে হয়। মাত্র একটিবার একটা ব্যত্যয় ঘটেছিল—কেউ যদি দোসরা একটা বলতে পারে, আমি হাজার টাকা দিতে রাজী। 'বার্ আসিয়াতিকের' টাকার কুমীর মালিক—খোট্টা ফোট্টা হবে—খামখা, অন্তত কীর্তির বিশ্বাস, বিলকুল বে-কারণ, খামখা, ঠাস করে চড় মেরেছিল এইটুকুন একটা বয়কে। কীর্তি প্রথমটায় কিছুক্ষণ ধরে চিন্তা করলো। তারপর আমাদের কিচ্ছুটি না বলে মালিকের সামনে কি যেন ফিস্‌ফিস্ করলে। মাইন্‌ড ইয়ু—আগাপাস্তলা সাদা চোখে। মালিক ব্যাটাও কুল্লে দুনিয়ার মত জানতো, কীর্তিকান্ত সাতিশয় কর্মে ক্লান্ত শান্তশিষ্ট প্রাণী। সেই হল তার ব্যাকরণে ভুল। যেমন গুণ্ডাকে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করা যায়, তেমনি শান্ত স্বভাবকে বস করতে হয় শান্ত স্বভাব দিয়ে। সে কীর্তির দিকে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে কি যেন একটা বললে। সঙ্গে সঙ্গে কীর্তি ঠাস ঠাস করে মালিককে মারলে দুটো চড়। হৈহৈ রৈরৈ। পুলিশ এল। মালিকের বক্তব্য, হোটেল বার-এ যে-কোনো ব্যক্তি আইন প্রয়োগ করার ভার

আপন স্কন্ধে নিয়ে—টেকিং ল' ইন হিজ ঔন হ্যাণ্ড—ভায়লেণ্ট এ্যাকশন নেয় তাকে সে 'বার'-থেকে বের করে দিতে পারে। কীর্তির বক্তব্য, বয় যা করে থাকুক না কেন, মালিক আইন প্রয়োগ করার ভার আপন স্কন্ধে নিয়ে ভায়লেণ্ট এ্যাকশন করেছে—প্রথম—কীর্তির আগে। অতএব সে 'বার্' ছেড়ে বেরিয়ে যাক্। কে যেন মাফ চাইবার প্রস্তাব করাতে কীর্তি তাকে লাগায় তাড়া।...শেষটায় মোকদ্দমায় কীর্তির জরিমানা হয়। আর মালিককে জজ ভবিষ্যতে সাবধান হওয়ার জন্য ওয়ার্নিং দেন। পরদিন থেকে কীর্তি তিন বেলা ঐ বারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায়। 'এশিয়ান বার'-এ কীর্তির প্রবেশ নিষেধ এ-হুকুম আদালত দেন নি। হনুমান লঙ্কায় ন্যাজ পুড়িয়েছিলেন বলে তাঁকে কি আর ফিন্‌সে সেখানে যেতে দেওয়া হয় নি। কীর্তি মালিকের উপর কড়া চোখ রাখে, আর মাঝে মাঝে নোটবুকে কি সব টোকে। মালিকের প্রাণ অতিষ্ঠ। তার শেষ আশা, কীর্তি এ-কর্ম কতদিন চালাবে?—ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে। উঁহু। ঠিক উল্টো। প্র্যাকটিসের ফলে অভ্যাস। অভ্যাস হয়ে যাওয়ায় সে তিন বেলার ম্যাদ আরো বাড়াতে লাগলো। মালিক বেয়ারা, বয়কে ভালো করে শাসন করতে পারে না, মালিক চোখ রাঙালেই দেয়াল ঘড়ি থেকে টাইমটা নোটবুকে কীর্তি টুকে নেয়—চড় মারার বাসনা মালিকের মাথায় উঠেছে। চাকরবাকরের পোয়া বারো। তাদের শাসন করলেই তারা এক ঝলক কীর্তির দিকে তাকায়। কীর্তি নোটবুক খোলে।...শেষটায় মালিকই হার মানলো। মাফটাফ কি যেন, মনে নেই।"

খান যদিও শিপ্রাকে বার বার বলেছিল, সবাই তখন কীর্তি যে আণ্ডার ডগ্-এর তরে মালিককে চড়, সরকারকে জরিমানা দিল, তার জন্য পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছিল, তবু শিপ্রা লক্ষ্য করেছিল ঘটনার অন্য আরেকটা দিক—সেটা কীর্তির ধৈর্য। ক্ষণতরে উত্তেজিত হয়ে চড় মারা, জরিমানার খেসারতি দেওয়াটা বিরল নয়, কিন্তু দিনের পর দিন ধৈর্য ধরে স্বেচ্ছায় একটা রুটিন মেনে চলা বঙ্গ সন্তানের পক্ষে যে কী "গব্বযন্তনা" সেটা শিপ্রা জানে—নইলে যে-বাঙলা সাহিত্যে সব কিছু আছে সেখানে নিত্য দিনের সহজ কর্ম ডাইরি-লিখন এবং তার থেকে যে ডাইরি-সাহিত্য গড়ে ওঠে—ইয়োরোপে যার ছড়াছড়ি—সেটা একদম নেই কেন?

আজ পূর্ব বাঙলার সাহায্যে দেবার মত যে বিরল 'ধাতু' কীর্তির আছে, সেটা তার ক্লান্তিহীন, নিরবচ্ছিন্ন, অতন্দ্র ধৈর্য। সবুর সে করতে জানে; মেওয়াও সে চায় না।

কীর্তির চেয়েও আরো শান্ত কণ্ঠে শিপ্রা বললে, "কোনো প্রকারের অত্যাচারই তুমি বরদাস্ত করতে পারো না, সেটা আমি অনেক আগেই জানতুম আর আমাকেও এটা কতখানি পীড়া দেয়, সেও তুমি জানো। এ-ছাড়া তোমার

অন্য কোনো কারণ আছে ?"

কীর্তি খানিকক্ষণ চুপ করে ভেবে নিয়ে বললে, "পূব বাঙলার পাশে গিয়ে পশ্চিম বাঙলার দাঁড়ানোটা আমার কাছে এতই স্বতঃসিদ্ধ যে নিজের জন্য আমি কোনো যুক্তি, ঐতিহাসিক নজীর বা আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের সমর্থন খুঁজি নি। তবে সেদিন খানের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার মনে পড়ল একজন লোকের কথা। কপাল আমার মন্দ ; একদা বাধ্য হয়ে অধ্যয়ন করতে হয় আমাকে, আন্তর্জাতিক আইন। এ-বিষয়ে বহু দেশের বহু আইনজ্ঞ বিস্তর গ্রন্থ লিখেছেন ; তদুপরি ছিলেন জিনীভা কনভেনশন, সাধনোচিত ধামে গত, লীগ অব নেশনস্, আছেন জীবন্মৃতের চেয়েও অধম সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জ—"

'ডাক্তারেতে বলে যখন "মরেছে এই লোক,"
তাহার তরে মিথ্যা করা শোক,
কিন্তু যখন বলে "জীবন্মৃত"
সেটা শোনায় তিতো।'

এবং এমনই নোংরা রকমের তিতো শোনায় যে কবি স্বয়ং পুস্তকাকারে ছাপার সময় এ লাইন কটি বাদ দেন। সে-কথা থাক্। "আন্তর্জাতিক আইন" শব্দ দুটো শুনলেই আমার তেতো হাসি পায়। বহুবাড়ম্বরপূর্ণ স্ফীতোদর-এর ধারাগুলো নির্মিত হওয়ার বহু আগের থেকেই হোমরাচোমরা রাষ্ট্রগুলো সেগুলো তো ভেঙেছেই, নির্মিত হব-হচ্ছি হব-হচ্ছি যখন করছে, তখনো এগুলো মদমত্ত উদ্ধত পদাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বার বার প্রমাণ করেছে এর ভারিক্কি ভারিক্কি ধারা-উপধারা সব 'পেপার টাইগারস', এগুলোতে বিশ্বাস করার ভান, ভক্তির ভণ্ডামি দেখায়, একমাত্র নপুংসক, পদলেহী, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল কতগুলো রাজনৈতিক যারা আপন আপন দেশের জনসাধারণের স্বীকৃতি না পেয়ে ঐ সব অস্তিত্বহীন 'আন্তর্জাতিক আইনে'র দোহাই দিয়ে—অনেকটা নেই-ভূত খেদানেওলা ওঝার আগড়ম-বাগড়ম বিড়বিড় করে—ইউনাইটেড নেশনসের পবিত্র জর্ডনজলে বাপ্তিস্ম হয়ে আপন আপন দেশে ফিরে গিয়ে প্রেসিডেন্ট, ডিকটেটর রূপে স্বৈরতন্ত্রের অবাধ অত্যাচার-অবিচার চালায়—সুন্দমাত্র টিকে থাকার জন্য। তাদের জন্য প্রতি মাসের টায় টায় পয়লা তারিখে আসে বন্দুক কামান, রোক্কা রূপেয়া তনখা বৃহৎবৃহৎ রাষ্ট্রের কাছ থেকে যারা এইসব 'রাষ্ট্রপ্রধানদের' মারফত তাদের দেশগুলোকে শোষণ করে—প্রতি মাসের পয়লা তারিখে, 'বাড়িউলী' ও ভাড়াটিনীদের কাছ থেকে এতখানি টায়-টায় তার অতিশয় হক্কের পাওনা অষ্ট-গণ্ডা, ন'সিকে পায় না। পুতুল রাজার পাল আর তাদের মনিব দু'দলই প্রতিদিন দুই কায়দায় দুনিয়াটাকে শুনিয়ে দিচ্ছে, 'আন্তর্জাতিক আইন'—ফোঃ! ছোঃ!"

শিপ্রা জানলা দিয়ে শূন্যদৃষ্টিতে পার্কের নিরস ঘাসের দিকে তাকিয়ে

নির্জীব কণ্ঠে বললে, "আমারও দেঁতো, তেতো হাসির সঙ্গে বেরিয়ে আসছে সেই প্রবাদপ্রায় তত্ত্বকথাটি, তোমারই ভূতের মত উল্টো পা চালিয়ে, 'কাদম্বিনী বাঁচিয়া প্রমাণ করিতেছে, সে বাঁচে নাই'।"

কীর্তি বললে, "তাই সুর মিলিয়ে গাইতে প্রাণ চায়, 'ভীরু মাধবী, বাঁচিবে কি মরিবে কি? দ্বিধা কেন?' কিন্তু নিদারুণতম তত্ত্ব, মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হতে হয়, শিপ্রা, যখন সেই লোকটির কথা স্মরণে আসে, যাঁর কথা খানকে বলছিলুম। হল্যাণ্ডের হুগো গ্রটিয়ুস, একাধারে বহুবিষয়ে পণ্ডিত, বিশেষ করে ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রে অর্থাৎ জুরিস্প্রুডেনসে অসাধারণ প্রভাবশালী ব্যক্তিটির সম্বন্ধে কমিয়ে সমিয়ে বলতে গেলেও আস্ত একটা দিন কেটে যাবে। ভাবো দিকি নি, সেই কোন্ ১৬২৫-এর কাছাকাছি এক সময়ে এই লোকটি নির্বাসনে, প্যারিসে প্রকাশ করেন "যুদ্ধ ও শান্তিবিষয়ক আইন-কানুন"। সেই আমলে লোকটি স্বাধীন মতবাদ প্রচার করার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন স্বদেশে। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তাঁর ছিল আর একটি লুকনো গুণ, যে-সম্বন্ধে কড়া দণ্ডধর জেলার এবং অন্য সর্বজন ছিলেন তিমিরান্ধকারে—তাঁর নিপুণ চতুরতা। তাই দুই বছর যেতে না যেতে গ্রটিয়ুস হল্যাণ্ডের জেল থেকে পালিয়ে, যখন, সে-দেশময় হুঙ্কার উঠেছে, "ধরো ধরো পাকড়ো পাকড়ো" তারি মাঝখান দিয়ে, নিজস্ব চতুরতা প্রসাদাৎ দিব্য স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে প্যারিসে পেঁছিলেন। ফ্রান্সের রাজা সসম্মানে তাঁকে নিরাপদ আশ্রয় দিয়ে রাখেন। আজো সে-রাজা গুণীজনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন।

আন্তর্জাতিক আইনে' বিশ্বাস করো, আর না-ই বা করো গ্রটিয়ুস্ তার জন্মদাতা বলে আজ সর্বত্র স্বীকৃত। তাঁর যে-সব বিধান তখনকার গুণী-জ্ঞানীদের স্তম্ভিত করে দিয়েছিল আজও সেগুলো বহুলোককে বিস্মিত করে, এবং নিশ্চয়ই বিগ ইয়েহিয়া এবং জুণ্টার বিগার কর্ণে বদ্ধ উন্মাদের প্রলাপবৎ শোনাবে।

সর্বপ্রথম তিনি বলছেন, মানুষে মানুষে যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, নেশনে নেশনে তাই হবে। ব্যক্তি বিশেষ অন্য ব্যক্তির অনিষ্ট করলে যে রকম তাকে দমন করা হয়, ঠিক সেই রকম একই মাপকাটি দিয়ে বিচার করতে হবে এক নেশন অন্য নেশনের অনিষ্ট করছে কিনা, যদি করে থাকে তবে সে নেশনকে দমন করতে হবে। এ-কথাগুলো নীতি হিসেবে অনেকেই মেনে নেবে। অবশ্য ভণ্ড মুচকি হাসি সহ।

কিন্তু এরপরই তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, যে ব্যবস্থা অবলম্বন বাধ্যতামূলক করতে চেয়েছেন সেটা আজ যদি ইউনাইটেড নেশন্সে কেউ প্রস্তাব করে তবে প্রভু খৃষ্টের ন্যায় তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। দুই নেশনে যদি লড়াই লাগে তবে ছোট বড় কোনো নেশনই নিরপেক্ষ

থাকতে পারবে না, সে হক্ক তার নেই।"

শিপ্রা আশ্চর্য হয়ে বললে, "সে কি? সব নেশনকে নামতে হবে লড়াইয়ে?"

উৎসাহিত হয়ে কীর্তি বললে, "ঠিক ধরেছ, গুরু। আমিও প্রথমটায় আমার চোখ দু'টোকে বিশ্বাস করতে পারি নি। আমি তো বাঙলায় বললুম 'নিরপেক্ষ' থাকতে পারবে না। আসলে গ্রটিয়ুস ব্যবহার করেছেন, 'নন্-বেলিজারেন্ট্', হতে পারবে না, 'অস্ত্র সংবরণ' করে থাকতে পারবে না—তিনি সজ্ঞানে 'নিউট্রেল' শব্দটি এড়িয়ে গেছেন, সে তো তিনি কাউকেই থাকতে দেবেন না। ঐ যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া বশত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে নেশনের সামান্যতম ক্ষয়ক্ষতি হয় নি তাকেও দোষী নেশনকে সাজা দেবার জন্য অস্ত্র-ধারণ করতে হবে।"

"সাজা দেবার জন্য!"

"হ্যাঁ, সুন্দুমাত্র কড়া শাসনের শাস্তি দেবার জন্য। তাতে করে সে-রাষ্ট্রের গৌরব বৃদ্ধি পেল কি না, আখেরে তার ক্ষতির পরিমাণটা কি দাঁড়াবে—এ সমস্ত কুটিল অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা সম্পূর্ণ অবহেলা করে।"

শিপ্রা ধপ করে মেঝেতে বসে পড়লো। কীর্তির একটা হাত তুলে নিয়ে সেটা দিয়ে আপন কপালে থাবড়া মেরে বললে, "হায় রে কপাল! সাড়ে তিনশ' বছর হতে চললো ভদ্রলোকের কোন্ প্রস্তাবটা কে মেনেছে? কোন্ রাষ্ট্র আজ জানে না, পূব বাঙলায় আজ কি হচ্ছে? মাত্র ত্রিশ বছর আগে পৃথিবীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় শক্তিশালী রাষ্ট্র—বাকি দু'জনা আগের থেকেই হাত গুটিয়ে আরাম করছিলেন—তারই প্রধানমন্ত্রী ঘাড় ফিরিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলেন যখন হাহাকার রব উঠেছে অস্ট্রিয়ায়, তার কাতর আর্তনাদ ধেয়ে চলেছে লণ্ডন পানে—ধর্ষণ করছে তাকে গুণ্ডা হিটলার!...কে বলে নির্লজ্জতারও একটা সীমা আছে? বছরটা ঘুরলো কি না, পড়ি মরি হয়ে এবার ছুটলো সেই সৌন্দর্যামোদী গোরা রাজ—চেকদের স্বহস্তে যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ করার জন্য যাতে করে পিশাচ পুজোর পুরুত হিটলারের এক ঘাতেই পটপট করে সারি বেঁধে সব কটা মুণ্ডুই—থাক।"

কীর্তি একটু চিন্তা করে বললে. "হিটলারের কীর্তি-কাহিনী পড়লে শিউরে উঠতুম একদিন। এখন মনে হয় বেচারীর শেষ সান্ত্বনাটুকুও গেল।"

"মানে?"

"সাধনোচিতপ্রাপ্ত ধামে বসে সে অন্তত একটা গর্ব অনুভব করতো যে, এ-যুগে সজ্ঞানে তার মত নিষ্ঠুরতা আর কেউ দেখাতে পারে নি। পঁচিশের পৈশুন্য-রাত্রে, ইতিমধ্যে বাঙালীর মরণ কামড় খেয়ে সেখানে ইয়েহিয়ার বেশ ক'টি চেলা হিটলারের সঙ্গ পেয়ে 'হাইল হিটলার' 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' সম্ভাষণান্তে দু'দণ্ড রসালাপ করতে বসে গেলেন। যথাভ্যাস, হিটলার কাউকে

মুখটি খোলার মোকামাত্র না দিয়ে তাঁর গৌরবময় দিনের মুনিকী কায়দায় বলে যেতে লাগলেন, গ্যাস চেম্বার—তার চেয়েও সস্তায় মানুষ খতম করার ইনজেকশন আবিষ্কার, ইহুদি রমণীদের কুন্তলদাম দিয়ে মোলায়েমতম তাকিয়া-কুশন নির্মাণ, লাশের নীল উল্কিতে চিত্রবিচিত্র চামড়া দিয়ে তৈরী ল্যাম্প-শেড —ওহোহো! সেগুলো কী অপূর্ব আলো-ছায়ার আলিম্পন ঘরের সর্বত্র বিচ্ছুরিত করে দিত—"

বাধা দিয়ে এক পাঠান বললে, 'খাবসুরত নয়ী নয়ী চীজের বাৎই যদি তুললেন, তবে, আমার মনে হয়, হুজুর, গৃহস্থ ঘরের উচ্চ কুচ বিশিষ্টা…' হঠাৎ কীর্তি থেমে গেল।

শিপ্রার তিক্ত মুখ কীর্তি ইতিপূর্বে আর দেখে নি। বললে, "এখনো লজ্জা! ভয় তোমার গেছে, জানি, কোনো কালেই খুব-একটা ছিল না। ঘৃণাটা আমাদের কখনো যাবে না। তোমার সম্মুখে যে কঠোর কর্তব্য উপস্থিত সেখানে সহকর্মী সংগ্রহ করার জন্য তোমাকে লজ্জাশরম সম্পূর্ণ বর্জন করে স্ত্রীপুরুষ সকলকেই বলতে হবে হীনতম অশ্লীলতম আচরণের কথা।"

কীর্তি নীরস কণ্ঠে: "পাঠান বললে, 'আমরা জনাদশেক একটা কলেজের মেয়েকে ধর্ষণ করার পর মেয়েটা আমারই নিচে খাবি খেতে লাগলো। বেহুঁশ হওয়ার আগে 'পানি পানি' বলে গোঙরাচ্ছিল, আধমরা গলায় আস্তে আস্তে 'ইয়া আল্লা! ইয়া রসুল!' আরো কী কী সব বিড়বিড় করছিল, আমি জানি নে ওসব, কিন্তু ডেরা ইসমাঈল খানের মৌলবী সাহেবের জবানে শুনেছি। তারপর হাত পা খিঁচতে খিঁচতে হঠাৎ চোখ দুটো ইয়াব্বড়া তাম্বুর মত খুলে গেল। দেখি, চোখের কালো মণিটনি কিচ্ছু নেই, একদম সাদা চোখ দুটো জড়ু ছিঁড়ে ফেলে সমুচা উল্টে গিয়ে ভিতরের দিকটা বাইরে বেরিয়ে এসেছে,—আমাদের সর্দারকে ফাঁসী দেওয়ার পর লাশে এ্যাসা চোখ দেখেছিলুম—মার্বেলের মত ধবধবে সাদাতে কিন্তু রক্তের ছিট গোলাবী রঙ ধরে তার পাকা আপেলের গোলাবী গালের মত হয়ে গিয়েছিল।—তখন গাল দুটো হলদে রঙের পুঁজ মাফিক—আলবৎ তখন না, যখন সে ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে পড়েছিল আপন জান নেবার জন্য আর আমরা নিচে তখন তৈয়ার ছিলুম ওকে পাকড়াবার জন্য। আরো কতো পড়লো, আমরা গপাগপ্ পড়ার আগেই ধরে নিলুম। জ্যায়সাকে পাক্কা মেওয়া। হিটলার সাহেব, কী বাতাই আপকো। সবসে খাবসুরৎ দেখলুম, লাল খুন তার দুধের মতো সফেদ উরুর উপর—ওয়াহ্, ওয়াহ্। সব-কুছ আমার পীর সাহেবের মেহেরবানীতে।…কিন্তু, হুজুর, জওয়ান ঔরৎটা বড়া বেতমীজ ছিল। কুছ না—অচানক দম বন্ধ—ছট্‌সে মরে গেল। আমাদের শের দিল খান গয়রহ তিন বেরাদর তখনো বাকী। লেকিন ওরা পাক্কা মর্দ। জিন্দা মুর্দাতে

ফরক করনেওয়ালা পাঠানকা বেটা ওরা নয়। জঙ্গী খান একটা চোচীর ডগা কামড়ে মুখে পুরলো। আমি ছোরা দিয়ে দুসরাটা কেটে—এ্যাসা বড়া কভীভী দেখবার খুশ-কিস্মৎ আমার জিন্দেগীতে হয় নি— পুরা সমুচা হাড্ডিতক কেটে আমার সঙ্গীনের ডগায় খোঁচা দিয়ে সঙীন উঁচা করে ধরলুম। তারপর সব ভাই বেরাদরের তালে তালে হাততালি শুনতে পেয়ে সঙ্গীন উঁচা করে জুড়ে দিলুম মহরম মিছিলের নাচ—আপনি, জনাব-ই-আলা-হিটলার-সায়েব হয়তো জানেন না, মহরম আমাদের সবসে খাস, সবসে পাক্ মাস—আর তখনো চলছে মহরম। মেজর আসদ খান আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'বড়া বড়হীয়া খেদমৎ করেছ পুরব-পাকিস্তানের কাফির লেড়কীকে খতম করে—পাক্ মহরম মাসে। সোনার মেডেল পাবে। আমি সুপারিশী চিঠিঠি আজই ভেজ দেব।'

হিটলারের লাল গাল তখন হলদে। সর্বাঙ্গে কম্পন।

এমন সময় কে একজন কঠিন দর্শন অপরিচিত, য়ুনিফর্ম-পরা অফিসার এসে উপস্থিত। সেটা হিন্দুর নরক, মুসলমানের দোজখ্, খৃষ্টানের হেল, ইহুদির গেহান্নেম, গ্রীকদের কলাসিস্ কোনো "মুল্লুকেরই" উর্দী নয়। পাঠানরা ঠাহর করতে পারছিল না, তারা কোথায় এসেছে। তবে এটা যে বেহেশৎ বা দোজখ্ কোনোটাই নয় সেটা বুঝে গিয়েছিল। হিটলার ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছিলেন—অত্যন্ত বিষণ্ণ বদনে।

অফিসার ডানহাত তুলে "হাইল হিটলার" সম্ভাষণ জানিয়ে শুধোলে, "আপনি চলে যাচ্ছেন কেন? এ প্রতিষ্ঠানের দ্বারোদ্ঘাটনের সময় আপনিই ছিলেন প্রথম এবং একমাত্র সদস্য—যাকে বলে ফাউনডেশন মেম্বার। আপনি তকলীফ করে অন্যত্র যাবেন কেন?"

হিটলার বিষণ্ণতর বদনে বললেন, "আমি বিখ্যাত জর্মন গোষ্ঠীর একজন; কিন্তু আজ বড়ই লজ্জা পেয়েছি কতকগুলো আকাট, পাঁড় বর্বরের কথায়। আপনারা আমার সাধনোচিত ধাম নির্ণয় না করতে পেরে এই নবীন প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেন। আমার কোনো আপত্তি নেই—কারণ ইহুদিদের জন্য আমিই এক নয়া নিধনাগার—গ্যাস চেম্বার—নির্মাণ করি। কিন্তু এই পাঠানদের সামনে আমাকে নিত্য নিত্য লজ্জা পেতে হবে, এটা আমার সইবে না। আমাকে বরঞ্চ ডিমোট করে নিম্নাঙ্গের যে-কোনো অগ্নি পুরীষ কুণ্ডে পাঠান।"

অফিসার বিস্মিত হয়ে শুধোলেন, "লজ্জাটা কিসের? আমি অতিশয় প্রাচীন সর্বাভিজ্ঞ অফিসার। আদম ইভের প্রথম পাপ থেকে আরম্ভ করে হেন কোনো অতিশয় উর্বর মস্তিষ্কধারীর অচিন্ত্যনীয় কল্পনা-প্রসূত কোনো আচরণ দেখি নি—অপরাধ নেবেন না—যেটা আপনাকে লজ্জা দিতে পারে।"

হিটলার বললেন, "থ্যাংকু! আমি গর্ব অনুভব করছি। কিন্তু শুনুন,

আমি ফ্রান্সকে পদানত করেছি, আরেকটু হলে আমার চেয়ে ঢের ছোট ক্যালিবারের চার্চিলকেও ঘায়েল করতুম, গ্যাস চেম্বার, অনেক নূতন নূতন উৎপীড়ন পন্থা আবিষ্কার করেছি—সে নিয়ে আমার কোনো অহমিকা নেই। গর্ব, আত্মপ্রসাদ, দম্ভ, ঔদ্ধত্য ছিল আমার মাত্র একটি সামান্য, সংকীর্ণ বিষয়ে—যেটাকে হোমরা চোমরা পলিটিশিয়ান, মিলিয়নের, রাজারাজড়া, বীরবীরেন্দ্র কেউই কণামাত্র সম্মান দেন না, বস্তুত অবহেলা, তাচ্ছিল্য করেন, এমন কি কৃপার চোখে দেখেন—সে বিষয় আর্ট। এ-তাবৎ আমার দৃঢ়তম বিশ্বাস ছিল, কলানৈপুণ্যে আমি কল্পনা পরীর পাখায় ভর করে যে সর্বোচ্চ গগনে উড্ডীয়মান হয়ে নব নব সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম উৎকট উৎকট দৈহিক মানসিক যন্ত্রণাদায়িনী পদ্ধতি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলুম, সেগুলি মহাপ্রলয় পর্যন্ত মহামানবের অভাবনীয় গৌরব, বিশ্বমানবের অকল্পনীয় বৈভব হয়ে মহাপ্রলয় পর্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে আমার জয়ধ্বনি গাইবে। এই মাত্র আমার সে-বিশ্বাস নস্যাৎ হল। এখন শুনছি, দিক দিগন্তব্যাপী টিটিক্কার।...মহামূর্খ যে-পাঠানের না আছে সাহিত্য না আছে নাট্য যাদের সঙ্গীত শুনে শিবাশৃগাল সোল্লাসে উপযুক্ত শিষ্যপ্রাপ্তির পরিতুষ্টিতে চিৎকারিয়া নব নব কর্ণপটহ বিদারিণী "রাগ-রাগিণী" দ্বারা বনস্পতি মরুভূমি প্রকম্পিত করে—সেই পাঠান আজ আমাকে সর্বজন সমক্ষে, নিপীড়ন কলাশাস্ত্র ও তজ্জনিত সঙ্গীনাগ্রে স্তন সম্বলিত নৃত্যে প্রথম ভাগের প্রথম ছত্র শিক্ষা দান করলো! যে-লোকে আছি তার অন্ত নেই তাই সেখানে অন্তিম বাসনাও নেই, নইলে এই মুহূর্তে বাম করতল নিষ্ঠীবনপূর্ণ করে সেই কুণ্ডে নিমজ্জিত হয়ে সর্ব অবসান ঘটাতুম। আমি চললুম'।"

কীর্তি বললে, "এটা এক ভদ্রলোক আমাকে রসিয়ে রসিয়ে শোনাচ্ছিলেন যে-জায়গার একটা লজ্‌ঝড় ছাউনিতে—তার নামটাও বিকট—'ফাঁসি দেওয়া' না কি যেন। সেই বাগডোগরা যেখান থেকে তুমি হিমালয় দেখেছিলে, তারই কাছে। ভদ্রলোক নিষ্ঠাবান মুসলমান। পূব পাক্ থেকে এপারে এসে ছেলে-ছোকরাদের জড়ো করে বন্দুক চালাতে শেখাচ্ছিলেন। কথায় কথায় তাঁর মুখে গড়ে নতুন নতুন হাসির গল্প, কিংবা হাসি-কান্নায় মেশানো। আমি একটা খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে অধোমুখে দেখছিলুম সেই হাস্যমধুর লোকটি খোলা আকাশের নিচে, জায়নামাজ পেতে প্রায় দুপুর রাত অবধি নামাজ পড়লেন, দু'হাত তুলে প্রার্থনা করার সময় গুনগুন করে গীত গাইলেন। তিনিই তাঁর আপাতদৃষ্টিতে স্রেফ গুলতানী শেষ করে সভাপঙ্গের আমাকে বললেন, 'আচ্ছা, চৌধুরী সায়েব, বলুন তো হিটলার ইহুদিকুলকে নির্মূল করার সময় কি খুব বেশী ইহুদি স্পাই, স্যাদিস্ত-এর মদৎ পেয়েছিল? আমি যদ্দুর জানি খুব অল্প কয়েকজন মাত্র।'

আমি বললুম, 'স্পাই স্যাদিস্ত আদৌ পায় নি। যেটুকু যে-ক'জন করেছে

সেটা হিটলার-হিমলারের সেপাইদের গুলিভরা বন্দুকের সঙ্গীনের খোঁচা খেয়ে খেয়ে।'

'অথচ দেখুন, মাতাল লম্পট ইয়েহিয়া ওদিকে আবার কট্টর শীয়া। ভুট্টোর বাপ স্যর শাহ নাওয়াজ খান ভুট্টোকে খাঁটি সিন্ধী মুসলমান বলা চলে না। সিন্ধু দেশের অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করে খুদ আরবদের হাত থেকে অষ্টম শতাব্দীতে। পক্ষান্তরে ভুট্টোর হিন্দু পূর্বপুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেন রাজপুতানাতে সপ্তদশ শতাব্দীতে। পরে সিন্ধুদেশে চলে আসেন এবং ক্রমে ক্রমে বিরাট বিস্তীর্ণ, আল্লা জানেন কত লক্ষ বিঘের জমিদারি গড়ে তোলেন'।"

শিপ্রা বললে, "বাপ্‌স্‌! একবার ভাবো তো মারওয়াড়, রাজপুতানার যারা এদেশে বসবাস করছে, তারা যদি মাছ মাংস খেয়ে আমাদের সঙ্গে এক হয়ে যেত, তবে আমরা, বাঙালীরা কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতুম না। পূব বাঙলায় যদি তারা মুসলমান হয়ে যেত—, থাক। বলো কি বলছিলে।"

"ভদ্রলোক বললেন, 'ভুট্টোর পিতা জমিদারীর জোরে ক্রমে ক্রমে জুনাগড় স্টেটের প্রধানমন্ত্রী হলেন। দেশবিভাগের সময় মিঃ জিন্নার নির্দেশ অনুসারে তিনি নওয়াব সাহেবকে জুনাগড় যেন পাকিস্তানের সঙ্গে মিলিত হয় সেই মন্ত্রণা দেন। কিন্তু হিন্দু মুসলমান প্রজারা রুখে দাঁড়ালো। শেষ ফল তো জানেন। শাহ নাওয়াজ শেষ চিঠিতে জিন্নাকে লিখলেন, "জুনাগড়ের মুসলমানদের পাকিস্তান-প্রীতি নেই বললেও চলে"।

'কিন্তু আশ্চর্য, শাহ নাওয়াজ গোষ্ঠী শীয়া এবং অত্যন্ত গোঁড়া শীয়া। উভয় বাঙলায়ই শীয়ার যে ছিটেফোঁটার ভগ্নাংশ লোকচক্ষুর অন্তরালে বাস করে সিন্ধুতে তারও বাড়া—আছি-কি-না-আছি গোছ। তৎসত্ত্বেও।

'শাহ্‌ নাওয়াজ খানের চারজন বীবী ছিলেন। জনৈক প্রাজ্ঞ সমসাময়িক ঐতিহাসিক-কাম-সাংবাদিক এ-প্রসঙ্গে বলেছেন, এই ধরনের পরিবারে এইটেই ছিল রীতি। সে-সিদ্ধান্তে তিনি পেঁছিলেন কি করে, সেটা আমি বুঝতে পারি নি—যদিও আমি পূব পাকের নিম্নতম স্তরের জজ ছিলুম বটে, তবু শুধু যে সেই দেশের মুসলিম আইনানুযায়ী সম্পত্তি বণ্টন ব্যবস্থার গভীরে প্রবেশ করতে হয়েছিল তাই নয়, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মুসলমান, আধা-মুসলমান, সিকি মুসলমানদের উপর সম্পত্তি বণ্টন ব্যাপারে দেশাচার কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তার গবেষণাও আমাকে করতে হয়েছে। কিন্তু এ-সব শপ্‌ শুনতে কি আপনার মন যাচ্ছে?'

আমি সবিনয় বললুম, 'ধর্মাবতার, হুজুরই, বেগ্‌ পার্ডন, মহামান্য আদালতই বিচার করুন। যদি অনুমতি দেন তবে নিবেদন, আমি খবরের কাগজের রিপোর্টার নই।'

বাধা দিয়ে ছোট জজ বললেন, 'সেটা আর বলতে হবে না। সংবাদদাতা

গুষ্টির নিতান্ত চ্যাংড়া ভিন্ন কোন্ বড়া সাব ঢাকার ইণ্টারকণ্টিনেন্টাল বার্, কলকাতায় তো জাত-বেজাতের এন্তের, ত্যাগ করে হোটেলের দুর্গম প্যাসেজ, বিপদসংকুল বারান্দা পর্যন্ত বেরন সন্দেশ সংগ্রহণার্থে ? মাফ করবেন—আপনি বলুন।'

'ও সে তেমন কিছু নয়, মোদ্দা কথা, ওদেরও অধম যারা তামাশা দেখবার তরে হাসনাবাদ থেকে করিমগঞ্জ আগরতলা অবধি রোঁদ মারে, আমি তাদেরও কেউ নই, আর আপনাদের মত, স্বয়ং আল্লাতালা দ্বারা নির্বাচিত শ্রেষ্ঠতম সৃষ্ট দেবদূতের কাছে এসে দাঁড়াবার মত দম্ভ, হীন কৃপার পাত্র বাতুল আমি—'

জজ জিভ কেটে 'ছি ছি, তওবা তওবা' বলে কানে আঙুল দিলেন। 'এ-সব না-হক অভদ্রভাবে বন্ধ না করলে আল্লা পাক আমাকে আমার মায়ের কোলে ফিরে যেতে দেবেন না।' কীর্তি বললে, "ভাবালুতা, ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্বল্য জজদের সর্বথা বর্জনীয়।" তাই তাঁর আম্মাজানের কথাটা আপন অবিবেচনা মনে করে সেটা ঢাকবার জন্য তাড়াতাড়ি খেই তুলে নিয়ে বললেন, 'ভারতের যত্রতত্র ভূস্বামী, যত্র তত্র একদারনিষ্ঠতা—এটা মূল সূত্র, অবশ্য বাস্তবতর হবে "একদারদাসত্ব"। চারটে বিয়ে করে বারটা ছেলে পয়দা করলে, ভাগ, তস্য ভাগের ফলে তিন পুরুষেই জমিদারী নিকুচি। অতএব "রীতি" চার স্ত্রী নয়, এক স্ত্রী এবং হারেমে জনাতিনা "খাদেমা" অর্থাৎ সেবিকা, কিংবা ঐ জমিদার বিগ্রহের "সেবাদাসী"ও বলতে পারেন। নিতান্ত যারা আল্লাকে বড্ড বেশী ডরায় তারা দু'জন সাক্ষী সামনে রেখে বিয়ের একটা ভড়ং করে। তা সে যাক্ গে। মোদ্দা কথা, মিঃ জুলৎ-ফিকার আলী ভুট্টোর মাতা শাহ নাওয়াজকে বিয়ের প্রাক্কালে হিন্দুধর্ম বর্জন করেন। পশ্চিম পাকিস্তানেরই একাধিক কাগজ একাধিকবার বলে, বিয়েটা নাকি আদৌ হয় নি। ভুট্টো প্রেমীজন প্রমাণ স্বরূপ বলেন, বিবাহে গুলাম মহম্মদ হিদায়েৎউল্লা ও উল্লেখযোগ্য কিছু লোক ছিলেন। নিন্দুক বলে, "ওটা বিয়ের মজলিস্ ছিল না মোটেই। ইংরেজ যেটাকে বলে nautch—বাইনাচ। প্রধান নর্তকী কে ছিলেন, সে আলোচনা ঐতিহাসিক-কাম্-সাংবাদিকরা করবেন।

বিয়ে হয়েছিল কি না, সেটা তর্কাধীন। জানি যে, আপনার কি মত, কিন্তু সেটা আমার মনের উপর কণামাত্র রেখাপাত করে না। তর্কাতীত সত্য, জুল-ফিকারের মাতা হিন্দুরূপে জন্ম নেন। তার উপরও আমি কোনো প্রাধান্য আরোপ করি নে। এক হজরৎ আলী ছাড়া আমাদের পয়গম্বরের সব শিষ্যই তো মুসলিম হওয়ার আগে আরবদের বর্বর 'ধর্ম' মেনে চলতেন।

কিন্তু যারা ফ্রয়েট্ পদ্ধতি দ্বারা মিঃ ভুট্টোর সর্বপ্রধান 'ধর্ম'—ভারতের প্রতি এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব, হিন্দুদের প্রতি তার প্রতি লোমকূপে প্রোথিত বিদ্বেষ, ভদ্রজনবর্জিত ভাষায় সুযোগে, কুযোগে, অযোগে নিত্য নিত্য

তাদের প্রতি কুৎসিততম গালিগালাজ, এই একটিমাত্র অটল অবিচল অপরিবর্তনীয় অবিমিশ্র ধাতু দিয়ে নির্মিত তার সত্তা। তবে কি তার দেহে যে হিন্দু রক্ত আছে সেইটে অস্বীকার করার জন্য, লোকে যেন সেটা স্মরণেও না আনতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই হিটলার প্রশংসিত নীতি, হিট্ হিট্ হিট্, হাতুড়ি দিয়ে হানো, হানো, হানো যতক্ষণ না লোকে পুনরাবৃত্তির ফলে হিপনোটাইজড, সম্মোহিত অবস্থায় তোমার বাণী, সত্যই হোক মিথ্যাই হোক, গলাধঃকরণ করে?

অপরাধ নেবেন না, আমার স্মৃতি-রাজ্যে শেক্সপীয়রকে দেবার মত আসন নেই—হেমলেট না কে যেন বলেছিলেন তাঁর দেহে তাঁর মাতার যে অংশটুকু আছে সেটা তিনি ছিঁড়ে ফেলে দিতে চান অথচ ভুট্টোর মাতৃদেবী হয়তো সতী সাধ্বী নারী ছিলেন। এবং আমি এ-সব কথা আদৌ তুলতাম না যদি ভুট্টো স্বয়ং একাধিক বার শেখ সাহেবের "ব্যাকগ্রাউন্ড" নিয়ে গবেষণা করার নির্দেশ না দিয়ে থাকতেন। শেখের ব্যাকগ্রাউন্ড জানে না কে? আমারই মত পূব বাঙলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মামুলী মুসলমান তিনি। ভুট্টো সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন, পূব বাঙলার সমস্ত "অনাসৃষ্টির" জন্য দায়ী মুজীব এবং তাঁর ব্যাকগ্রাউন্ড। একথা তথাপি তর্কাতীত সত্য যে মুজীবের মাতার সঙ্গে তাঁর পিতার বিবাহ হয়েছিল কি না সে প্রশ্ন ফরিদপুর অঞ্চলের লীগবৈরী, মুজীবের আশু পরলোক গমনাকাঙ্ক্ষী নেমকহারাম বিহারীরা পর্যন্ত করে নি এবং বিয়েটা প্রমাণ করার জন্য কোনো প্রধানমন্ত্রী হেদায়েৎউল্লার উপস্থিতিও প্রয়োজন হয় নি।

ভুট্টো ইসলামের কোনো নির্দেশই মানেন না। ওদিকে ভয়ঙ্কর শীয়া।

জুন্টার নির্দেশে যে-মেজর-জেনারেল ইস্কন্দর মির্জা সর্বপ্রথম "আইনত" ডিকটেটর হয়ে তিন সপ্তাহ রাজত্ব করেন তিনিও গোঁড়া শীয়া। মির্জাই ধর্ম-ভ্রাতা ভুট্টোকে আপন "উপদেষ্টা" রূপে বা "মন্ত্রণা সভায়" ডেকে নিয়ে রাজনীতির সুন্নৎ (সারকামশিসন) করান—অবশ্যই শীয়া কায়দায়। অবান্তর নয় যে মির্জাকে ডিকটেটরিতে প্রমোশন দেবার ষড়যন্ত্রটা করা হয় এক শীয়া-ভবনে, ভুট্টোজনকের প্রাসাদে।

ইয়েহিয়াও গোঁড়া শীয়া। শীয়ারা বিশ্বাস করেন, সুন্নীরা তো মুসলিম নয়ই, তারা কাফির। এবং চরমপন্থী শীয়াদের স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস, সুন্নীমাত্রই "ওয়াজিব উল্ কৎল্" অর্থাৎ সুন্নী দর্শনমাত্রই তাকে নিধন করা শাস্ত্রাদেশ।

ওদিকে জুন্টাতে কোনো শীয়া আছেন বলে শুনি নি। ইসকন্দরের আমল থেকে এযাবৎ জুন্টাই পাক রাষ্ট্রের একমাত্র শক্তিধর।

সেই সুন্নী জুন্টাকে বোকা বানিয়ে, পূব 'বাঙলার মুসলমান মাত্রই "কাফির" সে-তালিম "মুসলমান" পাঞ্জাবী-পাঠান-বেলুচের অস্থিমজ্জায় উত্তমরূপে ঢুকিয়ে দিয়ে অগণিত বাঙালী মুসলমানকে করালে খুন, তাদের অবলাদের করালে ধর্ষণ, তাদের ঘরদোরে জ্বালালে খাণ্ডবদাহন—মাত্র দুটি শীয়া। অত্যদ্ভুত

পৈশাচিক নৈপুণ্য না থাকলে দুটি মাত্র শীয়া—ইয়েহিয়া এবং ভুট্টো—যাদের কাছে উভয়াপাক্-এর অগণিত সুন্নীই "কাফির" এক পাক্-এর কাফির দিয়ে অন্য পাক্-এর কাফির উৎপাটন করার মত ধৃষ্টতা হৃদয়ে ধরতে পারতো কি ?

হিটলার পেরেছিল কি জর্মনির "কাফির" ইহুদিদের বোকা বানিয়ে, তাতিয়ে দিয়ে ফ্রান্সের "কাফির" ইহুদিদের হত্যাধর্ষণলুণ্ঠন করাতে ? দূরেই থাক সে দুরাশা ! বরঞ্চ সে যাদের মর্ত্যের আদর্শ মানব (সুপার মেন) উপাধি দিয়ে চির জীবন প্রপাগাণ্ডা চালালে, সেই নর্ডিক্ জাতের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ—সম্ভ্রান্ত অনেক অফিসার, রমেল সহ, তিন তিন বার চেষ্টা দিল তাকে হত্যা করতে। ফলে দু হাজার থেকে পাঁচ হাজার—কে জানে কত—নর্ডিক্ সুপার মেনকে মেশিন গান্-এর গুলিতে, ফাঁসি কাঠে, শক্ত সরু তারে ঝুলতে ঝুলতে আধ ঘণ্টাটাক শূন্যে পা দুটো আছড়াতে আছড়াতে—এ-পদ্ধতিতে ফাঁসির মত এক ঝটকায় না—দম বন্ধ হয়ে প্রাণ দিলে। এ-যাবৎ কোনো শীয়ার শরীরে আঁচড়টি তক লাগে নি।

এবারে বলুন, চৌধুরী সাহেব, সেই অনামা অমর্ত্য লোকে কার নীচাসন—হিটলারের না ইয়েহিয়ার ফাঁসুড়েদের ?"

একাদশ অধ্যায়

আলিঙ্গন ঘনতর করে বাষ্প-ভরা কণ্ঠে কীর্তি বললে, "এই তো আমার অক্ষয় সম্পদ। তোমার প্রেমই আমাকে দেখিয়ে দেবে পথ, ভরে দেবে আমার বুক সাহস দিয়ে, আর সবচেয়ে বড় কথা—আমার মত অপদার্থকে করে দেবে কর্মনিষ্ঠ। যেখানেই যাই না কেন, যেতে যেতে যতই ক্লান্ত হয়ে পড়ি না কেন, তোমার কথা ভাবলেই পাবো নবীন উৎসাহ।"

মৃদুকণ্ঠে শিপ্রা বললে, "তোমাকে আমার অদেয় কিছু নেই।"

কীর্তি কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল।

শিপ্রা বিদায়-বেলার পীড়া হাল্কা করে দেবার জন্য বললে, "একজন নীরবে চিন্তামগ্ন হলে অন্যজন প্রায়ই বলে, 'তুমি কি ভাবছো সেটা যদি আমাকে জানাও তবে তোমাকে একটা পেনি দেব—এ পেনি ফর ইয়োর থট্'; আমি যদি এটা পাল্টে বলে দিতে পারি, তুমি এখন কি ভাবছো, তুমি একটা পেনি দেবে ?"

কীর্তি তবু চুপ।

শিপ্রা বাসনার লহরে লহরে রঙিন দুটি ঠোঁট দিয়ে কীর্তিকে নিবিড় চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করে দিয়ে বললে, "তুই ভাবছিস, মিতা, 'এখন যদি বলি,

আমাকে বিয়ে করো তবে শিপি আগের মত আর না বলতে পারবে না, এইমাত্র যখন কথা দিয়েছে আমাকে তার অদেয় কিছু নেই।' বল্, কিতা, ঠিক ধরেছি কি না?"

কীর্তি একটিমাত্র শব্দে উত্তর দিল, "ঠিক।"

শিপ্রা অভিমানের ছল করে বললে, "বা রে! তুমি কোনো উৎসাহ দেখাচ্ছো না যে! একদিন আমার দুর্বলতম মুহূর্তে—যেদিন আমি আমার সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছিলুম তোমাকে, অগ্রণী হয়ে, নিজের থেকে নারীর শেষ সম্বল—তুমি আমায় বলো নি, ঐটেই তোমার একমাত্র ভাবনা। আমি তখন সেটাকে হাল্কা করে দেবার জন্য বলেছিলুম, "হৃদয় আর ভাবনা তো একই সত্তা ঃ

'কিবা সে হৃদয়? হৃদয় কাহারে কয়?
সে তো একবিন্দু শোণিত আর ভাবনার রাশি।'

শেষ ভাবনা উধাও হয়ে যাবে শেষ কামনা পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। তখন রইবে শুধু এক বিন্দু শোণিত; ভাবনাটা উধাও হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে লোপ হৃদয়ও। ভাবনা-ভরা হৃদয়-হারা সুন্দুমাত্র এক বিন্দু শোণিত তো মানুষ ভিন্ন সব প্রাণীরই আছে। ভাবনাভরা শোণিত বিন্দুটির নামই তো কীর্তি ঠাকুর। আমার ঠাকুর।' উত্তরে তুমি বলেছিলে 'তোমার মন্তব্যটাতে শোণিত বিন্দুও নেই।'...আজ যদি কবির সুরেলা গলার সঙ্গে আমার বেসুরো গলা মিশিয়ে অর্থাৎ একটু পরিবর্তন করে গাই, জানি সেটা জনসমাজে করলে হবে ধৃষ্টতা, কিন্তু তুমি আমি মধুর ভাষে দীন, হিয়া প্রকাশে হীন, তাই কবি সেটা ক্ষমা করবেন—

'হৃদয়-বাসনা পূর্ণ হল আজি
হেরি আঁখি-ভরা মনে
মম প্রিয়া চিত্তমাঝে বসি স্থির আসনে।'

তা হলে?"

কীর্তি তখনো চুপ।

শিপ্রার আদর যেন অফুরন্ত। বললে, "আজ আমার পেনি জমাবার দিন। যদি বলতে পারি এখন তুমি কি ভাবছো, আরেকটা পেনি দেবে?"

"বলো।"

"মিতা, আমি জানি যে, তুমি জানো, আমি কি উত্তর দেব। এবং সেই নিয়ে তোমার মনে তোলপাড় আরম্ভ হয়েছে। আগে ছিল ভাবনা, এখন দুর্ভাবনা।"

কীর্তির ঠোঁটের কাছে এনে তার নিশ্বাস শিপ্রা আপন নাক দিয়ে নিঃশেষে শুষে নিয়ে গুনগুন করে গাইলে, "আমাতে মিশাক্ তব নিশ্বাস নবীন উষার

পুষ্প সুবাস—" বার বার। তারপর আবার বার বার "বাসনার রঙে লহরে লহরে রঙিন হল, হে প্রিয়/করুণ মম অরুণ অধর পিয়ো হে পিয়ো।" তার পর কীর্তনিয়া রীতিতে বার বার আখর দিলে, "অরুণ অধর পিয়ো হে পিয়ো।" মাঝে মাঝে থেমে থেমে কীর্তির নিশ্বাস নিঃশেষে শুষে নিয়ে আপন বুক ভরে নেয়—তার শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই।

হঠাৎ একবার দীর্ঘশ্বাস চাপার চেষ্টা করা সত্ত্বেও সেটা কীর্তির গাল ছুঁয়ে গেল। কীর্তির দু'হাত দিয়ে ছড়িয়ে পড়া ঘন কোঁকড়া চুলের নিচে আধা হারিয়ে যাওয়া মুখটি কাছে টেনে এনে বললে, "বলো দেখি, তুমি কি অস্বস্তি বোধ করছো?"

শিপ্রা চোখের উপর থেকে চুল সরিয়ে ঠোঁটে মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়ে বললে, "অস্বস্তি কিসের? নিজের ভিতরের দিকে তাকিয়ে শুধু আমি একটু হতাশ হলুম। আমি আশা করেছিলুম, বাবার বন্ধু ফরাসী ফৌজী অফিসাররা যেরকম ভালো মন্দ, বিপদ আপদ, সুখ দুঃখ, সব অবস্থাতেই ধরে নেয় যে এটাই প্রকৃতির নিয়ম, এটাই তো স্বাভাবিক, আটপৌরে—এমন কি আমাদের কবির সর্বশেষ কবিতার যে প্রায় সর্বশেষ ছত্রে আছে, 'অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে' ঠিক তাও নয়, ছলনাটাও তাদের কাছে ছলনা নয়, ওটা অত্যন্ত স্বাভাবিক কিন্তু কবির 'অনায়াস' বেশীর ভাগ চরিত্রেই থাকে এবং সেটার মূল্য দেয় শোল্‌ডার শ্রাগ করে, 'তাঁ পি' বলে, মানে, 'জানা তো ছিলই, জীবনটা একটানা শ্যাম্পেন আর কাভিয়ার হতে পারে না, জেনারেল ব্যাটা আটকে দিলে প্রমোশনটা, আর প্রিয়া তো হর হামেহাল উঁচিয়ে আছেন জিল্‌টু করার পিস্তল, —তারপর সেই স্বাভাবিক আটপৌরেটার সামনে তার আচরণটাও অনায়াস লব্ধ —প্যারিসের 'প্রিমা দন্নার' অযাচিত প্রেম যদিস্যাৎ অকস্মাৎ বিলকুল ফ্রুকে লটারির প্রাইজের মত পেয়ে যায় তবে অনায়াসে তাকে নিয়ে সগর্বে বুক ফুলিয়ে বেড়িয়ে বেড়াবে, আবার বিকল্পে যদি উপলব্ধি করে, পরের দিন জুয়োর দেনা শোধ না করতে পারলে মান-ইজ্জৎ থাকবে না, তখন তো সেই নিত্য দিনের 'তাঁ পি'—সো মাচ্‌ দি ওয়ার্স আছেই—প্রিয়ার মুখটি সাদরে তুলে ধরার মতই অনায়াসে পিস্তলটা তুলে ধরে ঠেকাবে রগে—আমি আশা করেছিলুম একটানা বহু সায়ং সন্ধ্যা তাঁদের অনায়াস সঙ্গ পেয়েছিলুম বলে আমিও তাদের শোল্‌ডার শ্রাগ করে 'তাঁ পি'—'বয়ে গেল'—বলতে পারবো, অন্তত খানিকটে।"

কীর্তি করুণ কণ্ঠে বললে, "কেন অযথা আত্মনিন্দা করো? আমার যদি কাল ভোরের প্লেনে করে মোলায়েম সুইটজারল্যাণ্ডে যাবার প্ল্যান থাকতো তা হলে তুমি সেটাকেও অত অনায়াসে নিতে পারতে না। যাকে ভালোবাসি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে থাকলেও হারাই-হারাই ভাবনাটা সব সময়ই জেগে থাকে হৃদয়ের কোন্‌ এক গোপন কোণে। তার উপর তুমি মেয়েছেলে।

পুরুষের হৃদয় যদি একবিন্দু শোণিত আর ভাবনার রাশি দিয়ে গড়া হয়, তবে মেয়েদের বেলা একবিন্দু শোণিত আর রোদনের রাশি। আসলে আমার প্রশ্নটাই ভুল। আমি কিংবা খান তো এমন কোথাও যাবো না, যা তোমার অস্বস্তির কারণ হতে পারে, আমি কিংবা খান বন্দুক চালিয়ে কটা পাঠানকে খতম করতে পারবো? ছোকরা জিমি পর্যন্ত জানে, তুমিই তো বলেছিলে, আমাদের কাজ কলকাতায়। সেই ঘুঘু লারীটা পর্যন্ত জানে, নজর রাখতে হবে কলকাতার উপর। এবং আমাদের বড় বড় ক্লাবগুলোর উপরও। যে সব ছেলে-ছোকরারা সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে পূব বাঙলাকে সাহায্য করতে চায়, তারা টাকার জন্য, বন্দুকের জন্য যাবে যে সব পয়সাওলাদের কাছে তারা তো এসব ক্লাবেরই মেম্বার। এবং এরা লারী ফারীর সামনেও বেপরোয়া বলে দেবে, ছোকরাদের জন্য একসপ্লোসিভ যোগাড় করতে কার লবেজান, কে এক রাশ টাকা দিয়ে ছেলেদের পাঠিয়েছে নাগা পাহাড়, সেখানে যদি জাপানীদের ফেলে-যাওয়া বন্দুক মেশিনগান নাগাদের কাছ থেকে কেনা যায়। ইণ্ডিয়া গাভর্নমেণ্ট এখনো আসরে নামে নি বলে ছেলেরা কি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে, না মুরুব্বীরা তাদের শুধু হাতে ফিরিয়ে দেবে। শুধু কি তাই, খান বলে নি বুঝি, বাংলাদেশের এক রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার এ-পারে সময়মত চলে এসেই শুনতে পেলেন, অমুক বাঙালী হিন্দু অফিসার বর্ডারে মোতায়েন হয়েছেন। 'ইআল্লা' বলে এক লম্ফে তাঁর কাছে উপস্থিত। ব্যাপার কি? পার্টিশেনের পূর্বে দু'জনা একই জায়গায় ট্রেনিং পেয়েছিলেন, পার্টিশেনের সময় পর্যন্ত একই আর্মিতে কাজ করেছিলেন। দু'জনাতে দোস্তী হয়েছিল গভীর। গিয়েই বললেন, 'জানো তো, দোস্ত, আমি রিটায়ার করেছি বটে কিন্তু দেশে যে সংকট এসেছে সেটার মোকাবেলা যথাসাধ্য আমি করবই করবো—এই ভরসা যদি আমার দেশের লোক রাখে তবে কি সেটা অন্যায় হবে?' আসলে অতখানি লম্বা-চওড়া অজুহাত একে অন্যকে এঁরা কখনো দেন নি। এক ইয়ার আরেক ইয়ারকে দেখা মাত্রই বুঝে গিয়েছেন ব্যাপারটা কি। বাক্য ব্যয় না করে ইয়ারকে নিয়ে গেলেন অস্ত্রাগারে হাত দিয়ে কুল্লে হাতিয়ার দেখিয়ে বললেন, "যা খুশি নিয়ে যাও, যত খুশী নিয়ে যাও—হেল্‌প্‌ ইয়োরসেলফ্‌'। সত্যি বলছি—"

শিপ্রার অবসাদ আগাপাস্তলা উধাও। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো। ফরাসী অফিসারদের কাছ থেকে সে—শুধু ফৌজী-তত্ত্বকথাই শোনে নি, শুনেছে বিস্তর গুলও তাদের মুখে—নইলে আর্মিতে ঢুকবেই বা কেন, গুল মারার সনাতন ট্রাডিশনটাই বা ডোবাবে কেন? কিন্তু এ রকম একটা সৃষ্টিছাড়া ভূতুড়ে গুল? ঢোক গিলে রাম-তোতলার মত টক্কর ঠোক্কর খেতে খেতে শুধলো, "সে কি করে হয়? তুমি সত্যি জানো? এ তো বিশ্বজোড়া শান্তির সময়ও অসম্ভব।

আর এখানে সরকার যাকে পাঠিয়েছে সীমান্ত রক্ষার জন্য, তাঁর কি হাল হবে? বলা তো যায় না, ইয়েহিয়া জাঁতাকলে পড়লে দুর্যোগটা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য কোন্ না কোন্ ডেসপারেট মিলিটারি গ্যাম্বল শুরু করে দেবে। তার শেষ তাস দিয়ে। আক্রমণ করবে আইনত নিরপেক্ষ কিন্তু কার্যত বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল ভারতকে—যাতে করে রাষ্ট্রপুঞ্জ ইণ্টারফিয়ার করে দুই পক্ষকে ঠেকায় আর ইয়েহিয়া সেই লুপহোল দিয়ে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে যায়।

কীর্তি সোল্লাসে বললে, "শুধু ইয়েহিয়াই বুঝি কলিযুগের নিরেস যুধিষ্ঠির! সত্য যুগের আসল যুধিষ্ঠির, না ইয়েহিয়া কে যে জুয়োতে বেশী বুদ্দুমি দেখাতেন সেটা বাঙলার ইতিহাসে একটা চিরন্তনী সমস্যা হয়ে রইবে। সেই গুপ্তযুগ কিংবা তারো আগের থেকে কত না রাজা, পাঠান মোগল কেউ বাদ যান নি, এদেশে এসেছে জুয়ো খেলতে, ওদের সক্কলেরই মারাত্মক প্রয়োজন ছিল, যুদ্ধের জন্য হাতীর। ত্রিপুরাতে প্রচুর সে মাল, প্রতিবেশী সিলেটীরা এখনো পৃথিবীর সেরা মাহুত। ইংরেজ বোম্বাই, মাদ্রাজ যে কোনো জায়গায় জুয়ো পার্টি বসাতে পারতো। কিন্তু বেছে নিল বাঙলা। ধনী দেশ, অন্তত তখন পর্যন্ত ছিল – আমাদের তরফ থেকে স্টেকটা হবে ভারি। জিওপলিটিক নামক আধা-বিজ্ঞানটি তখনো আবিষ্কৃত হয় নি, কিন্তু তথ্যগুলো তো ছিল—আমাদের বুদ্দু এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে কে যেন কথাচ্ছলে বলে, 'অক্সিজেন আবিষ্কৃত হয়, ১৭৭৪-এ'। মন্ত্রী সবিস্ময়ে শুধোলেন, 'তার আগে মানুষ বাঁচতো কি দিয়ে?' তারপর পাঁচ আঙুলে খ্যাঁস খ্যাঁস করে দাড়ির উকুনকে আদর করতে করতে ডরালু গলায় শুধোলেন, 'কিন্তু সাপ্লাই ঠিক আছে তো?"—

শিপ্রা শুধোলে, "তুমি একদিন কথায় কথায় বলছিলে না ডাঙর ইয়েহিয়ার আর বড়া বড়া জুণ্টা-গোসাঁইদের কানও বড় বড় হয়—তখন মনে পড়ে নি ভলতের এ-সম্বন্ধে একটি সুন্দর এপিগ্রাম লিখেছেন চার ছত্রে, অনেকটা আমাদের সুভাষিতের মত, হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্রে বিস্তর আছে—"

কীর্তি ঠিক বুঝতে না পেরে শুধোলে, "পঞ্চতন্ত্র? সে তো কোন্ এক মোল্লা না কে যেন বাঙলা একটা সাপ্তাহিকে লেখে।"

শিপ্রা বললে, "দম্ভ আছে লোকটার! স্বয়ং বিষ্ণুশর্মা যে বই লিখে দূর মার্কিন মুল্লুক পর্যন্ত প্রাতঃস্মরণীয় লেখক হলেন, তাঁর গল্পের কাছে কখনো কেউ আসতে পারবে নাকি যে সে তার রঙবাজ্ গুলতানির জন্য পঞ্চতন্ত্র নাম বেছে নিলে।"

কীর্তি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, "বাঁচালে! আমি ভেবেছিলুম মাস্টারের পড়ানো সেই 'আগম পুরাণ বেদ পঞ্চতন্ত্রকথা' বুঝি আমাদের যে তন্ত্রটন্ত্র আছে তারই পাঁচটাতে মিলে কোনো একটা সিনথেসিস।...যাকগে...ভলতেরের একটা এপিগ্রাম বলতে যাচ্ছিলে না?"

"হ্যাঁ।

'এলাস! লেজোরেই দে গ্রাঁ
স' সুভাঁ দ্য গ্রাঁদ্ জ' অরেই'

'হায়! বড়লোকদের যে আকছারই বড় বড় কান হয়', অর্থাৎ গাধার কান। স্বভাবতই ইঙ্গিত রয়েছে, এদের মস্তিষ্কও ঐ প্রাণীটার মত।"

কীর্তি বললে, "তাই তো রক্ষে। বড়লোকদের ধন-দৌলত আছে, যশ প্রতিপত্তি প্রচুর। তার উপর যদি মগজটিও সরেস ধরনের হত তবে গরীবদের আর বাঁচতে হত না। তাদের হাড় মাস খেয়ে চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাতো। এই ধরো না টিক্কা ইয়েহিয়ার একটা মোক্ষম মুখখোমি। আজ যে সমস্ত পূব বাঙলায় বড়র অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছোট রুখে দাঁড়িয়েছে, মুক্তি-বাহিনী ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে—দর্শন বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব নিকুচি করে দিয়ে সামথিং গ্রোইং আউট অব নাথিং—তার জন্য ঐ মূর্খনীতি আচরণ কতখানি দায়ী সে-কথা ইতিহাস একদিন বিচার করবে। এটা আমার নিজস্ব বিশ্লেষণ, আপন খেয়াল নয়। মনে আছে তোমার, শিলঙে তোমাকে বলেছিলুম হবিগঞ্জের এক পাগলা-জগাই, শব্দে শব্দে,

ঢাল নেই, তলওয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার
ট্যাঙ্ক কামান হামলা করে, হুঙ্কারে 'মার মার'!

সেই মেজর আমার এক মুরুব্বীকে বলেছেন, "পশ্চিমে রাত্রেই টিক্কা প্রয়োজনের চেয়েও ঢের ঢের অপর্যাপ্ত সৈন্যবল, আধুনিকতম ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি, কামান সর্ব বল নিয়ে আক্রমণ করলে তিন শ্রেণীর লোককে। প্রথম দল বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালী। একদা পাকিস্তানের, বস্তুত পশ্চিম পাকিস্তানের হয়ে এরাই লড়েছিল আইয়ুব খানী যুদ্ধে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ এবং তাঁর অল্পক্ষণ পরেই মামুলী পুলিশকে আক্রমণ করে [illegible] স্ত করে দিল। এদের মাত্র যে কিছু লোক পালাতে সক্ষম হয়েছিল, তা[illegible] পূব বাঙলায় সুন্দ মাত্রই এরা জানে, কি করে রাইফেল চালানো শেখাতে হয়। এদের নিয়েই গড়ে উঠলো বাঙলা দেশময় মুক্তিবাহিনীর ছোট ছোট দল। এখন প্রশ্ন এই, এদের কিছু সংখ্যক লোক লীগের প্রতি কতখানি দরদী ছিল সেটা বলা কঠিন—জুণ্টা অবশ্যই সেটা আদৌ হিসেবে ধরে নি, তাদের পুরো পাক্কা ধারণা, এদের সমূলে বিনাশ করতে কী আর বেগ পেতে হবে, সময়ই বা লাগবে কতটুকু?—বমার অব্ বেলুচিস্তানের ঐ বাবদে দম্ভ তো আজ দেশে-বিদেশে কারো অজানা নেই—কিন্তু এ-কথা তো সত্যি, যে এই তিন শ্রেণীর লোক ডিসিপ্লিন্ কাকে বলে সেটা অতি উত্তমরূপে জানে, উপরওলার আদেশ এ-স্থলে 'বমার' হোক, 'বুচার' হোক, টিক্কা খানের—আদেশ তারা অন্তত একশ' বছর ধরে মেনে নিতে অভ্যস্ত, এবং সর্বশেষ কথা—পাক আল্লার নামে কসম খেয়ে তারা রাষ্ট্রপতির

আনুগত্য স্বীকার করেছে। তাই প্রশ্ন, এদের এ-ভাবে টিক্কা যদি আক্রমণ না করতো তবে কি এরা নিজের থেকে বিদ্রোহ করতো' ?"

কীর্তি থামলো। যেন সামান্য একটু চিন্তা করে বললে, "এ-প্রশ্নের উত্তর মেজর কখনো পাবেন না। করতোই, সেটা জোর গলায় বলা চলে না, আবার আলবৎ করতো না তার উত্তরও তম্বৎ। তবে মেজরের একটা সত্য নির্ণয় তর্কাতীত। ওরা আক্রান্ত না হলে, এবং তারই ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ না দিলে মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলাটা তো প্রায় অসম্ভব হত। আবার, তাদেরই চোখের সামনে গ্রামাঞ্চলে দিনের পর দিন, 'মুক্তি' গড়ে না উঠলে, গ্রামের লোক তো মনোবল হারিয়ে ফেলত—বুখে দাঁড়ানো দূরে থাক্, বিরুদ্ধ ভাব অন্তরে অন্তরে পোষণ করতই বা ক'দিন ? এবং তার শেষে যখন বর্বররা ব্যাপকভাবে সর্বত্র হত্যা-লুণ্ঠন-দহন-ধর্ষণ আরম্ভ করতো—এবং করতো তার সর্বাবস্থাতেই—তখন ? তখন তো টু লেট্, তখন কে গড়ে তুলতো মুক্তি বাহিনী ?"

শিপ্রা বললে, "আমার মনে হয়, ভারত যে সরাসরি ইয়েহিয়ার গালে চড় মারছে না, তার প্রধান কারণ, সে দেখতে চায়, বাংলাদেশে যে 'বিদ্রোহ' মনোবৃত্তি দেখা দিয়েছে সেটা বাঙালীর নিত্যকালের হুজুগে মেতে ওঠার সোডা-বোতলের গ্যাস কিনা। সেটা ঠিক ঠিক অনুমান না করে তড়িঘড়ি পুরোদম যুদ্ধে যদি নেমে যায় এখুনি, এবং অল্পদিন পরেই পূব বাঙলার মনোবল ভেঙে যায় তবে যে শেষটায় ভারতকে বিশ্বের কাছে বিড়ম্বিত হতে হবে। ওদিকে ফরাসী অফিসারদের একজন আমাকে লিখেছেন, নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, মিলিটারি দৃষ্টিবিন্দু থেকে—জোর দিয়ে বলেছেন একমাত্র প্যোরলি মিলিটারি স্ট্র্যাটেজির বিচারে—এইটেই ভারতের সুবর্ণ সুযোগ, এই বেলায়ই ভারতের যুদ্ধে নেমে যাওয়া উচিত।...তা তো বুঝলুম, কিন্তু প্রশ্ন, সব জেনেশুনে পৃথিবীর প্রায় সব নেশনই চুপ করে আছে কেন ?"

"বা—রে ! তোমার আপন দেশ ভারতবর্ষও তো এখনো স্বাধীন বাংলা-দেশকে স্বীকৃতি দেয় নি।"

"সে কি কথা ! একটা দেশের সরকারই বুঝি সব ! আমরা—তুমি, আমি —আমরা বুঝি দেশের মালিক নই ! এই বাঙলাদেশেই তুমি কখনো দেখেছো, ঘটি বাঙাল হঠাৎ এক হয়ে গিয়ে পূব বাঙলার বেদনায় চিৎকার করে বলে উঠেছে, 'ভাই আমরা আছি'। আর এটাও তো স্বীকার করতে হবে, আজ পর্যন্ত ভারতই সবচেয়ে খোলাখুলিভাবে, স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছে, তার পূর্বতম সহানুভূতি কার প্রতি। তুমি জানো—"

কীর্তি কেন যে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সেটা বুঝতে না পেরে শিপ্রা থামলো। তার হাতখানা আপন হাতে তুলে নিয়ে শুধোলে, "বন্ধু, আমার কোনো কথা

কি তোমাকে পীড়া দিল ?"

কীর্তির মুখে অমনি হাসি ফুটলো। কণ্ঠস্বরে যেন সর্ব মধু ঢেলে দিয়ে বললে, "শিপ্রা তুমি সত্যি শিপ্রা—শব্দটি এসেছে ক্ষিপ্রা থেকে, অর্থাৎ যে দ্রুতগতিতে চলে। তুমি প্রথম যেদিন আমার দিকে তাকিয়ে একটুখানি—কেউ-দেখলো-কেউ-না—প্রসন্ন স্মিত হাস্যের আভাস দিয়েছিলে, সেদিনই সর্ব-প্রথম আমি একটা বড় বাঙলা অভিধানের স্মরণ নি। তারই কল্যাণে বুঝতে পারি যে শিপ্রা বা ক্ষিপ্রা—"

"ক্ষিপ্রা বললে আরো মানানসই হয়।"

চিন্তাকুল বদনে কীর্তি যেন আপন মনে বললে, "প্রেমে পাগলিনীকে খ্যাপা বা ক্ষিপ্তা বলেছেন কবি, কিন্তু সংক্ষিপ্তা যেন না হয় আমার প্রতি তোমার প্রেম-প্রীতি-আসক্তিটি—"

শিপ্রা করুণ কণ্ঠে অনুনয় করলো, "বলবে না, রাজা, আমার কোন্ কথায় তোমার বুকের ভিতর থেকে গরম বাতাস বেরল—হঠাৎ, কোনো আভাস না দিয়ে !"

কীর্তি যেন ঝটিতি রাজাদেশ পালনে শশব্যস্ত হয়ে বললে, "বলছি, গুরু, বলছি। যে-মুহূর্তে তুমি বললে, পশ্চিম বাঙলার লোক আজ যেন সমবেত কণ্ঠে পূব বাঙলার ডাকে সাড়া দিয়ে সাহস দিচ্ছে, 'আমরা আছি' আমার মনে তৎক্ষণাৎ সেই দুশ্চিন্তা, সেই কবেকার আগরতলায় যার জন্ম, সেটা অহরহ আমাকে আশা নিরাশায় ক্ষণে আকাশে তোলে, ক্ষণে মাটিতে আছাড় মারে। পূব বাঙলা দাঁড়িয়েছে প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে। সে-শক্তিকে একমাত্র সৈন্যবল ছাড়া আর সব দিচ্ছে পূর্বাচল অস্তাচলের দুই বৃহত্তম রাষ্ট্র—যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য সবচেয়ে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, প্লেন যা চাই তাই, যুদ্ধ যদি দীর্ঘদিন ধরে চলে তবে পশ্চিম পাক্‌কে তার জন্য অপর্যাপ্ত অকাতর অর্থসাহায্য,—সে-সব সাহায্য যদি সুন্দমাত্র পশ্চিম পাকেই যেত তবু না হয় একটা ব্লাফ মারা যেত এগুলো পশ্চিম পাক্‌কে দেওয়া হচ্ছে, ভারত আফগানিস্তান ও রুশ একজোট হয়ে যেন পশ্চিম পাক্ আক্রমণ করে 'বিশ্বশান্তি' ভঙ্গ না করে !—এগুলো খোলাখুলি-ভাবে পাঠানো হচ্ছে পূব বাঙলায় হারামীদের হাতে, তারা কি নয়া ধরনের বিশ্বশান্তি রক্ষা করছে সেটা জেনেশুনে যাতে করে তারা আরো নির্ভয়ে, জীবন বিপন্ন না করে আরো নিধনধর্ষণলুণ্ঠনদহন কর্ম আরো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে করতে পারে। শুধু কি তাই,—নিরীহ গ্রামবাসী নরনারীকে কি ভাবে যম-দূতেরও বাড়া নিষ্ঠুর নির্যাতনের ভয় দেখাতে হয়, কি প্রকারে স্বামী পিতা পুত্রের সম্মুখে অবলা নারীকে ধর্ষণ করে মানুষের শেষ সম্পদ তার আব্রুইজ্জৎ ইমান কোন্ কোন্ বীভৎসতা দ্বারা বিনাশ করে তাকে ক্লীব পশুত্বে পরিণত করার বিভীষিকা দেখাতে হয় সে-সব 'নীতি' কায়দা শেখাবার জন্য বিত্তশালী

দেশে বাছাই বাছাই সাদিস্তুদের জন্য একটা—কেউ কেউ বলেন একাধিক—বিশেষ স্কুল খোলা হয়েছে—খানদানী মিলিটারি অফিসার ও জোয়ানদের জন্য। আইয়ুবের সামনেই সেখানে পশ্চিম পাকের আর্মি বাছাই বাছাই লোক পাঠায়। ইয়েহিয়ার সেদিকে খুব একটা নজর ছিল না, কিন্তু জুল্টা জানতো, হাওয়া একদিন কোন্ দিক দিয়ে বইবে। তারা সে 'ইস্কুলে' ছাত্র পাঠাতে কোনো কসুর করে নি। আসলে আজ আর এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, যে স্বয়ং আইয়ুবই জানতেন, পুব পাক্ আর পশ্চিম পাকে একদিন মোকাবেলা হবেই হবে।

তাই সব চেয়ে বড় প্রশ্ন, জনপদবাসী কতদিন ধরে এ অত্যাচার সইতে পারবে? তারা যদি মনোবল হারায় তবে তো সর্বনাশ! প্রবলতর শত্রুর হাতে পর্যুদস্ত হওয়াতে লজ্জার কিছু নেই, কিন্তু সে পরাজয় স্বীকার করে নেওয়াতে, তার দাসত্বে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়াতে সর্বনাশের চেয়ে সর্বনাশ। কারণ তার ফল ভোগ করতে হবে তাদের সন্তানদের—বংশানুক্রমে।

ছোট বড় শহর আয়ত্তে রাখা খানদের পক্ষে কঠিন হবে না। কিন্তু গ্রামের পর গ্রাম, হাজার হাজার গ্রাম আয়ত্তে আনা অসম্ভব। কিন্তু যদি জনপদবাসী বশ্যতা স্বীকার করে নেয় তবে এই সব বাচ্চারা, ক্ষুদে ক্ষুদে বাচ্চারা, সুন্দুমাত্র দু'চারটে উটকো বন্দুক নিয়ে ট্যাঙ্ক সাঁজোয়া গাড়ির মোকাবেলা করছে, তারা পা জমাবে কোথায়?

জানো শিপ্রা, চিঁড়ে মুড়ি খেয়ে বেরয় খানদের সন্ধানে। বেতার নেই, কোনো প্রকারের যোগসূত্র নেই এক গ্রুপের সঙ্গে অন্য গ্রুপের,—আর ক' রাউন্ড গুলিই বা পায় এরা যাত্রাপথে নামবার সময়—চাষাভুষো যদি এদের আশ্রয় না দেয়, চিঁড়ে মুড়ি না যোগায়, খানদের সন্ধান না বাতলায় তবে ক'দিন লড়বে তারা?"

শিপ্রা অন্ধকার জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে, পার্কের উপরের রাস্তায় ক্ষীণ একটা আলোর দিকে। তার মনে ক্ষণে ক্ষণে ভয় জাগছিল ওদের জয়াশা আমাদের জয়াশা ঐ আলোরই মত ক্ষীণ। আবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে সাহস জেগে উঠছিল, প্যারিসের সেই বুড়ো জেনারেলের স্মরণে। তিনি বলেছিলেন, 'মাদ্মোয়াজেল যতক্ষণ না একটা জাত পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে, ততক্ষণ সে পরাজিত হয় নি'। এবং শেষ যে আপ্তবাক্যটি বলেছিলেন সেইটে সে মুখ ফুটে কীর্তিকে শোনালে:

"'যে ভেঙে গিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছে, তাকে প্রবলতম শক্তিও দাঁড় করাতে পারে না। যে জাত ভেঙে পড়ে নি, সেও যেন অপরের সাহায্যের উপর বড্ড বেশী ভরসা না রাখে'।"

অকস্মাৎ, অপ্রত্যাশিত, অত্যদ্ভুত হল কীর্তির প্রতিক্রিয়া! সোফা ছেড়ে

প্রায় নাচ শুরু করে দিলে ঘরময়। শিপ্রা অবাক। এমন কি দারুণ নয়া সত্য ছিল তার কথা কটিতে ?

শিপ্রার হাত দুখানি আপন হাতে তুলে বললে, "বাঁচালে তুমি আমাকে। আমি কেন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলুম এইবারে বলি,—যে কথাটা, কবে সেই আগরতলা থেকে আমার মনের ভিতর ঘোরপাক খাচ্ছিল কিন্তু বলার মত সাহস যোগাড় করতে পারি নি। আমি জানি, অনেকে মনে করে বাইরে তুমি যে রূপেই দেখা দাও না কেন, যেমন মনে করো হিস্পানি টাঙ্গো নাচে স্পেনের কনসালকে পার্টনার পেলে এদেশের অজানা টাঙ্গোর জন্মভূমিতে যে রীতিতে একে অন্যের সঙ্গে সেঁটে গিয়ে দুহুঁ দুহুঁ কুহু কুহু করতে করতে দো-দুল-দোলা জাগাও সেটা তোমার নিতান্ত বাহ্যরূপ, আসলে তোমার হৃদয় নামক বস্তুটি গড়া স্টেনলেস স্টীল দিয়ে। নাগরমল তুষ্ণীয়াল ভেজাল স্টেনলেসের রাজা, একদা তোমার এডমায়ারারদের রিংসীটে যে বসতো সে চিনবে না খাঁটি বস্তু ! কিন্তু আমি প্রথম দিন থেকেই জানি, কী দারুণ রোমান্টিক তুমি। প্রমাণ স্বরূপ পেশ করতে পারতুম ; হৃদয়ের শত সহস্র সংজ্ঞা, বহু বিচিত্র বর্ণনা আছে। তবু তুমি হৃদয় বলতে 'ভাবনার রাশিটাই' যে তার মূল ধাতু সেটা মেনে নিয়েছ কেন ? এবং সেই ভাবনারাশির সঙ্গে টানাপোড়েন জড়িয়ে রয়েছে একটা অনাগত নৈরাশ্য—যেটা আমার মনে অহরহ এনে দেয় অজানা ভীতি।"

শিপ্রা চায় না, তার আপন মনের মানুষ কোনো দুঃখ পায়—তা সে বাস্তব বা কাল্পনিক যা-ই হোক না কেন। বললে, "আমি নৈরাশ্যবাদী নই। আমার কাছে বিশ্বসৃষ্টির কোনো অর্থ বা মূল্য এখনো ধরা পড়ে নি। এর বেশী কিছু পষ্টাপষ্টি বলতে গেলেই আমি নিজের সঙ্গে নিজেই তর্কে জড়িয়ে পড়বো।"

কীর্তি যেন একটু সাহস পেল। বললে, "তাহলে তুমি বুঝতে পারবে—অন্তত অনেকখানি। কিন্তু আমি যতদূর সংক্ষেপে পারি বলতে চাই, আমার বুকে একটা কাঁটা অহরহ খচ্ খচ্ করে খোঁচাচ্ছে সেটার কথা বলা দূরে থাক, ভাবতেও আমি চাই নে।

আমি জানি, তুমি রোমান্টিক। তাই আমার মত অপদার্থ যখন একদিন তার জড়ত্ব ঝেড়ে ফেলল তখন তোমার আশা হয়েছে, আমি অবশ্যই একটা কৃতিত্ব দেখাতে পারবো—অসাধারণ না হোক, মামুলী বিস্বাদ, মিডিওকারের চেয়ে উচ্চ স্তরের, অন্তত সে ভিন্ন স্তরের তো হবেই, যতই ক্ষুদ্রতম ক্ষুদ্র হোক না কেন আমার সাফল্য তার মধ্যে কিছু-না-কিছু একটা অসাধারণত্ব থাকবেই। কারণ, আমার জড়ত্বটা ছিল মিডিওকারের দৈনন্দিন কাজকর্মের মামুলী বিরস চঞ্চলতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন—অসাধারণ বললেও অত্যুক্তি নয়, প্রশস্তি তো নয়ই।...কিন্তু আমি যতই ঘুরে ফিরে সব-কিছু দেখি, কোন্ পথে মুক্তি কোন্

দিকে আশার আলো তার সন্ধানে সর্ব চৈতন্য নিয়োজিত করি—সেখানে কণামাত্র জড়ত্ব নেই, প্রচেষ্টাতে বিন্দুমাত্র শিথিলতা নেই,—ততই স্পষ্ট অনুভব করি, আমি এমন কোনো সফলতা অর্জন করতে পারবো না, যা দেখে তুমি গর্ব অনুভব করতে পারো—"

এতক্ষণ কীর্তি কথা কইছিল মাথা নিচু করে। অকস্মাৎ যেন তার বুকে পরশ লাগলো তারই চেনা আরেকটি বুকের অজানা স্পন্দন—অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনই শুধু সে শিহরণ জাগাতে পারে। চকিতে মাথা তুলে তাকালো শিপ্রার বিহ্বল মুখের দিকে।

আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে আছে "দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে স্নেহময়ী তুমি মাতা"। সে মাতা আমাদের জনগণভাগ্যবিধাতাতেই সীমাবদ্ধ নন। সে মাতা দেশকালের অতীত—সে মা-জননী চিরন্তনী। তাঁর পরিচিত জনের নিত্যদিনের পরিচয় তাঁকে করে দেয় আমাদের কাছে অপরিচিত। নিত্য দিনের প্রাচীন অভ্যাস, সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে ক'জন ভাগ্যবান তাঁকে অকস্মাৎ একদিন চিনে ফেলতে পারার তুলনাহীন সম্পদ অক্ষয় অধিকার পায়। তাই না খৃষ্ট বলেছেন, শিশুর মত সরল হতে হবে তাঁকে দেখতে যদি চাও।

শিশুর মত সরল চোখে তাই দেখতে পেল, সেই মধু মুখ, সেই মৃদু হাসি, সেই সুধাভরা আঁখি। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

শিশুকে আদর করার মত শিপ্রা টেনে আনলো কীর্তিকে তার কোলের দিকে।

মা মেরির মত প্রসন্ন কল্যাণ মুখ স্মিতহাস্যে আলোকিত করে বললে, "তোর মত সরল লোক আজ বিরল। তুই কি সত্যি ভেবেছিস, আমি মনের কোণে কখনো ঠাঁই দিয়েছি, তুই একদিন গারিবাল্‌দি হবি, মাদ্‌জীনি'র মত হীরো হবি! আর, দূর বিদেশের জন্য 'খুনিয়া' এক হীরো, আটপৌরে সমাজেও যে হীরোর মত দাপাদাপি করতো, সেই বায়রন গেলেন গ্রীসে, দেশটাকে মুক্ত করতে হীরো স্টাইলে—মারা গেলেন বিষ্টিতে ভিজে, বেতো সর্দিতে, তার সঙ্গে এসে জুটেছিল স্যাঁৎসেঁতে বিলুয়া হাওয়ার জ্বর, পূব বাঙলায়ও বিলের অনটন নেই। এই বুঝি হীরোজনোচিত শেষ শয্যা গ্রহণের নাটুকে কায়দা! ওদিকে তাঁর প্রথম যৌবনের 'অসামাজিক আচরণ' তাঁর দেশবাসীরা তাদের বুকের পাথরে খোদাই করে রেখেছে খুবই গভীর অক্ষরে। গ্রীসের মত একটা প্রাচীন সভ্য দেশের জন্য তাঁর সর্বস্বদান, আত্মত্যাগ, অকালমৃত্যুবরণ খান খান হয়ে গেল, না পেলেন ঠাঁই সেই পাথরে টক্কর খেয়ে। শেষটায় সেই নটিংহাম যেখানে একদা ডাকু-বীর রবিনহুড্‌ তার প্রতাপ দেখিয়েছিল সেইখানে বীর বায়রন পেলেন ছ'ফুট লম্বা তিন ফুট চওড়া গর্তে তাঁর চিরদিনের আবাস। ...আর এখন তো দুনিয়া জুড়ে গণতন্ত্রের জয়জয়কার। কম্যুনিস্ট্‌ ভায়ারাও রব

তুলেছেন. 'প্রিয়েরে দেবতা করা' চলবে না, চলবে না, চলবে না। ব্যক্তিবিশেষ কিছুই নয়। আমিও বলি, যদি কেউ থাকে তবে সে হরিপদ কেরানী।

বিস্তর লোক এখনো বলে, এককালে তো সবাই বলতো, প্রকৃত বীরের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ যদি দেখতে চাও তবে তার সন্ধান পাবে চার্চিল-এ। বলতে গেলে ঐ একটি মাত্র লোক, অবহেলিত, বহু বৎসর ধরে তার পার্টিদ্বারা প্রায় অপমানিত, কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করতে রাজী হল না—বাঙলাদেশ যেন এঁরই মত কস্মিনকালেও না করে—হিটলার যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চরম লাঞ্ছনা-সহ পলায়িত ইংরেজের দেশে উইক্‌এনড্‌ কাটাবার জন্য স্যাণ্ডউইচের রুটি কাটছেন। শত লক্ষ প্রাজ্ঞজন এখনো বিশ্বাস করেন, সেই বিকট সংকট থেকে, সুনিশ্চিত বিনাশ থেকে ইংলণ্ডে ও অসুর্যস্তি কলোনিগুলোকে অবশ্যম্ভাবী শৃঙ্খলাবদ্ধ দাসত্ব থেকে পরিত্রাণ করতে আবির্ভূত হলেন, শ্বেত-কল্কি চার্চিলা-বতার! কিন্তু···কিন্তু বুঝলে মিতা, স্বয়ং সেই চার্চিলও ভুলে গেলেন—কৃষ্ণাবতারও তো পরবর্তীকালে সীতা স্মরণে আনতে পারেন নি—বেবাক ভুলে গেলেন তে হি দিবসা গতাঃ! এখন আর লাটবেলাটের বীরত্বের খড়ম পুজো করার দিন নেই। এখন গণতন্ত্র আর একচ্ছত্র মানে না, জমিদার বাড়িতে পাত পাড়তে যায় না, এখন পাঁচো ইয়ারে মিলে লাগায় পাড়ায় পাড়ায় বারোয়ারী পুজো। সামন্ত জয়সেনের বীরত্বের যুগ ভিক্ষুণী সুপ্রিয়াদের ছায়াতলে ম্লান। তিন মাস যেতে না যেতেই পঞ্চপিতার এক পিতা ভয়ত্রাতা চার্চিল পেলেন তাঁর চরম অসম্মান। এককালে পিতা পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করতো, গণতন্ত্রের যুগে পুত্র-গণ—তারাই গণ, তারাই গণপতি, কবির ভাষায়, "জয়ধ্বজা ঐ যে তাদের গগন জুড়ে/পুব হতে কোন্‌ পশ্চিমেতে যায় রে উড়ে—এখন পুত্রগণ পিতাকে ত্যাজ্যপিতা করে।"

কীর্তি আরামের নিশ্বাস ফেলে বললে, "আমার পিতা আমাকে অসংখ্যবার ত্যাজ্যপুত্র করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তুমি যে গণতন্ত্র গণতন্ত্র কপচাচ্ছো, বলছো, পুব হতে কোন্‌ পশ্চিমেতে যায় রে উড়ে, সেটা পুবের কোন্‌ দেশে চালু হয়েছে কও?"

"তোমার কথাও ঠিক, আমার কথাও ঠিক। গণতন্ত্রের পিটুলি গোলাতে যখন পাঞ্জাবীদের অরুচি ধরলো তখন তারা আইয়ুবকে বানালে ডিকটেটর। অন্য দেশে যুদ্ধক্ষেত্রে—ফীল্ড-এ—জয়লাভ করে জাঁদরেলরা হতেন ফীল্ড মার্শাল; মার্শাল ল' জারী করে আইয়ুব খেতাব নিলেন ফীল্ড মার্শাল। জেনারেল ইয়েহিয়া সেটার কার্বন কপি হলেন না। তাই তাঁর জঙ্গীগুষ্টি তাঁর প্রথম যৌবনের রক্ষিতা, বর্তমানে ইয়া ধুমসী লাশকে খেতাব দিয়েছে 'জেনারেল রানী'। চীনেরা যে-রকম কাগজের বাঘ বানায়, পাক্‌ ভারতেও পেপার ডেমোক্রেসী, পেপার ডিকটেটর, পেপার প'পাদুর—'জেনারেল রানী'।"

কীর্তিকে আরো কাছে টেনে নিয়ে কিছুটা তিক্ততা কিছুটা করুণা মেশানো গলায় বললে, "তোমার শক্তিতে যা আছে, তাই তুমি করবে। লঙ জাম্প মেডেলিস্ট্ও আপন ছায়া লাফ দিয়ে ডিঙোতে পারে না। আরেকটা সত্যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পূব বাঙলা যদি স্বাধীনতা লাভ করতে সক্ষম হয় তবে স্বাধীনতা আনবে সে-দেশের চাষাভূষা, মাল্লামাঝি এমন কি লেঠেল-ডাকাতও কিছুদিনের তরে পৈতৃক ব্যবস্থা ক্ষান্ত দিয়ে—তারা গণতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, পঞ্চতন্ত্র কিছুই বোঝে না। বোঝবার দরকারও নেই। সেই নিরীহ চাষা-বউকে ধর্ষণ করছে ইয়েহিয়া। ইছামতীর ওপার থেকে ওদের আর্তচিৎকার শোনা যায় এপারে, আমাদের পারে। একটা অতি নগণ্য সাপ্তাহিক থেকে আমার এক বন্ধু কাটিং পাঠিয়েছে—তাতে এক ফরাসী দরদী বলছে, "যেন তারা আপন জাত ভাই, এখনো যাদের দেশভাই বলে মনে করে, সে-সব পশ্চিমবঙ্গের লোককে চিৎকার করে আপন অসহায় অবস্থা জানিয়ে সাহায্য মাঙছে। তাদের আপন মরদরা তো সন্ধেবেলায়ই বন্দুকের গুলিতেই মরেছে আপন চোখের সামনে। তারপর সমস্ত রাত ধরে চলেছে অত্যাচার, টর্চলাইট দিয়ে বনবাদাড় থেকে খুঁজে বের করছে নতুন নতুন শিকার।"

উত্তরে তোমরা বলেছ, "ভাই, আমরা আছি।

তুমি যাবে পূব দিকে, ছায়ার মত তোমার পিছনে 'আমি আছি'।।"

শহ্‌র্‌-ইয়ার

উৎসর্গ

শ্রীমান পশুপতি খানের

করকমলে—

যৌবনে আমার মাথায় ছিল কাঁথার মত চুল। সেলুনের তো কথাই নেই, গাঁয়ের নাপতে পর্যন্ত ছাঁটতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যেত। কাজেই সমস্ত অপারেশনটা এমনই দীর্ঘস্থায়ী আর একঘেঁয়ে লাগতো যে আমি ঘুমের বড়ি খেয়ে নিয়ে সেলুনে ঢুকতুম। চুলকাটা শেষ হলে পর সেলুনের নাপতে ধাক্কা-ধাক্কি করে ঘুম ভাঙিয়ে দিত। সেদিনও হয়েছে তাই। কিন্তু—ইয়াল্লা, আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখি চুলের যা বাহারে 'কট্' দিয়েছে সে নিয়ে চিতা-শয্যায় পর্যন্ত ওঠা যায় না, ডোম পোড়াতে রাজী হবে না। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই। মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গিয়েছে। মহা বিরক্তি আর উষ্মা গোস্‌সাসহ রাস্তায় নাবলুম।

ঠিক যে ভয়টি করেছিলুম তাই। দশ পা যেতে না যেতেই পাড়ার 'উত্তম কুমারের সঙ্গে দেখা। উভয়েই থমকে দাঁড়ালুম। আমার মস্তকে তখন বজ্রপাত হলে আমি বেঁচে যেতুম—উত্তমকুমার তা হলে সে বাহারে 'হেয়ার কট' দেখতে পেত না। কিন্তু আমি জানি, আপনারা পেত্যয় যাবেন না, উত্তর শুধোলে, 'খাসা ফ্যাশানে চুলটা ছেঁটেছে তো হে—সেলুনটা কোথায়? তোমার আবিষ্কার বুঝি?' গোড়ায় ভেবেছিলুম বাবু আমাকে নিয়ে মস্করা করছেন। পরে দেখলুম, না। সে গড্ ড্যাম সিরিয়স।

সেই দিন থেকে একটি বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হয়ে গিয়েছি। যা-ই করো, যা-ই পরো কেউ না কেউ সেটার প্রশংসা করবেই। এমন কি যা-ই লেখ না কেন ॥ সে লেখা সাগররমাপদমণীন্দ্রাশু সবাই ফেরত পাঠানোর পরও দেখবে, সেটি লুফে নেবার মত লোকও আছে।

তাই আমার বিশ্বাস, কোন্‌টা যে সরেস সাহিত্য আর কোন্‌টা যে নিরেস, সে সম্বন্ধে হলপ করে কিছু বলা যায় না। যদি বলেন, সবাই অমুকের লেখার নিন্দা করছে তবে আমি উত্তর দেব: প্রথমত ভোট দিয়ে সাহিত্য বিচার করা যায় না (এমন কি রাশায় নাকি একবার গণভোট—প্লেবিসিট—নেওয়া হয়, ভগবান আছেন কি নেই এবং ভগবান শতকরা একটি ভোট পান!), দ্বিতীয়ত, ভালো করে খুঁজলে নিশ্চয়ই সে-লেখকের তারিফদার পাঠকও পাবেন।

তাই আমার পরের স্টেপ: সরেস সাহিত্যিক এবং নিরেস সাহিত্যিকে পার্থক্য করা অসম্ভব।

অবশ্য আপনারা নিশ্চয়ই বলতে পারেন, আমি নিরেস সাহিত্যিক বলে এই মতবাদটি প্রচার করছি। আমি ঘাড় পেতে মেনে নিলুম।

মেনে নিয়েছি বলেই ট্রেনে প্লেনে—বিশেষ করে ট্রেনে—আমি আমার পরিচয় দি নে। দু'একবার আমার সঙ্গীসাথীরা মানা না শুনে ট্রেনে আলোচনার মাঝখানে অপরিচিতদের কাছে আমার নাম প্রকাশ করে দেন। দেখলুম, আমার ভয় বা ভরসা অমূলক। কেউ কেউ আমাকে চিনতে

পারলেন। যদিও আমি নিরেস লেখক।

এসবের স্মরণে, একদিন যখন আমি একটা মহা বিপদে পড়েছি তখন নিষ্কৃতি পাবার জন্য আমার নাম, আমি যে সাহিত্যিক সে কথাটা প্রকাশ করলুম। সঙ্গে সঙ্গে যেন বোমা ফাটার শব্দ। কে একজন ব্যঙ্গ শ্লেষ ঠাট্টা মস্করা সব কিছুর একটা ঘ্যাঁট বানিয়ে বললেন, 'সাহিত্যিক! ছোঃ! এরকম ঢের ঢের সাহিত্যিক দেখছি নিত্যি নিত্যি। আমি মশাই আমাদের পাড়ার লাইব্রেরী কমিটির মেম্বার—কই, আপনার নাম তো কখনো শুনি নি!' আর-সবাই তাঁরই কথায় সায় দিলে।

ঐদিন থেকে স্থির করেছি, জেলে যাবো, ফাঁসীতে ঝুলবো তাও সই কিন্তু নিজের পরিচয় প্রকাশ করবো না। পেঁয়াজ পয়জার দুই-ই কবুল বিলকুল উল্লুকই শুধু করে।

* * *

আমার আপন ভাগ্নী পর্যন্ত ফরিয়াদ করে, আমার লয়েলটি-বোধ নেই; মুসলমান হয়েও মুসলমানদের গিয়ে গল্প উপন্যাস লিখি নে। এবারে সে বুঝতে পারবে কেন লিখি নে।

খুব বেশী দিনের কথা নয়, বোলপুর থেকে শেয়ালদা যাচ্ছি। এবং পূর্ব সংকল্পমত অনুযায়ী মুখ যা বন্ধ করেছি তারপর কি ইরেসপনসিবল কি রেসপনসিবল কোনো 'টকে'র জন্যই ডিআই আর আমার গোঁপাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না—যদ্যপি তখন কম্পার্টমেণ্টে তুমুল তর্ক বেধেছে শ্লীল অশ্লীল সাহিত্যের জাতিভেদ নিয়ে। একবার লোভও হয়েছিল কিছু বলি, যখন একে অন্যে সবাই সবাইকে শুধতে আরম্ভ করেছেন, কেউ লেডি চ্যাটারলিজ লাভারজ পড়েছেন কি না? দেখা গেল কেউই পড়েন নি। আমার পড়া ছিল। কিন্তু পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে আলোচনাতে কোনো প্রকারের সাহায্য করলুম না—পাছে ঐ খেই ধরে শেষটায় কেউ না দুম্ করে শুধিয়ে বসে, 'মহাশয়ের নাম?'—এদেশে এখনো অধিকাংশ লোক নাম জিজ্ঞাসা করাতে কোনো-কিছু আপত্তিজনক দেখতে পায় না। আমিও পাই নে— অবশ্য আমি যখন কৌতূহলী হয়ে অন্যকে শুধোই, ভাইস-ভারসা নয়।

তবু আমি চুপ, এবং এমনই নিশ্চুপ যে স্বয়ং কম্যুনিস্ট ফরেন আপিস পর্যন্ত আমার বাক-সংযম দেখে, 'খরশুশো, খরশুশো', শাবাশ শাবাশ জয়ধ্বনি তুলতো।

মাঝে মাঝে লক্ষ্য করছিলুম, এক কোণে যে একটি যুবতী বসে আছেন তিনি যেন আমার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন—আড়নয়নে না, পুরোপাক্কা সাহস ভরেই। আমি বিশেষ শঙ্কিত হলুম না, কারণ পারতপক্ষে আমি কাউকে আমার ফটো উপহার দি না, আর খবরের কাগজে আমার যা ছবি উঠেছে তার তুলনায় আলীপুরের শিম্পানজীর ছবি উঠেছে ঢের ঢের বেশি।

১৮৩০ না ৪০ খৃষ্টাব্দে আসামে বুনো চায়ের গাছ আবিষ্কারের দিন থেকে আজ পর্যন্ত বর্ধমান-কেল্‌নার খবর পায় নি যে চা নামক পানীয় আদৌ এ পৃথিবীতে আছে এবং বাঙলা দেশেও পাওয়া যায়। কারণ গত চল্লিশ বৎসর ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করেও আমি বর্ধমান-কেল্‌নারের কাছ থেকে চা আদায় করতে পারি নি। এ তত্ত্বটি অনেকেই জানেন ; কাজেই বর্ধমানে গাড়ি দাঁড়ানো মাত্রই কামরার অধিকাংশ লোকই চায়ের নিষ্ফল সন্ধানে প্ল্যাটফর্মে নেবে গেলেন। আমি মুসলমান—শ্রীশ্রীগীতার মা ফলেষু কদাচনতে না-হক্‌ক কেন বিশ্বাস করতে যাবো ? বসে রইলুম ঠায়।

এমন সময় হুঙ্কার শোনা গেল, 'এই যে আলী সায়েব, চললেন কোথায় ?' এবং সঙ্গে সঙ্গে মালপত্রসহ রেলের মজুমদারের প্রবেশ। আমি ভালোমন্দ কিছু বলার পূর্বেই ফের প্রশ্ন, 'তারপর ? "শবনম" কি রকম কাটছে ?'

এর পর যা ঘটলো সেটা অবিশ্বাস্য না হলেও আমার জীবনে ইতিপূর্বে কখনো ঘটে নি। সেই অন্য প্রান্তে যুবতীটি হরিণীর মত ছুটে এসে, আমার 'আরে করেন কি, করেন কি, থামুন' সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, মুসলমানী কায়দায় পা ছুঁয়ে সেলাম করে বাঙ্কের উপর উঠে বসলেন আমার মুখোমুখি হয়ে। ঠিক যেরকম গুরু-শিষ্য পদ্মাসীন হয়ে মুখোমুখি হয়ে বসেন। কারণ, একটু আরাম করার জন্য আমি ইতিপূর্বে বাঙ্কের হাতলটাকে হেলান বানিয়ে বসেছিলুম হাফ-পদ্মাসনে। যুবতী যে-ভাবে আসন নিলেন তাতে আমাদের একে অন্যের হাঁটুতে হাঁটুতে আধ ইঞ্চিরও ব্যবধান নয়। এবং সমস্ত অভিযানটি তিনি সম্পূর্ণ করলেন মজুমদার, তাঁর মালবাহী-কুলী, দু'একজন প্যাসেঞ্জার যাঁরা ভাঁড়ের চায়েতেই সন্তুষ্ট হয়ে ইতিমধ্যে গাড়ীতে উঠে পড়েছেন—এঁদের সক্‌কলের ব্যূহ অবহেলে ভেদ করে।

হার্ড-বয়েলড মজুমদারও যে বেকুবের মত তাকাতে পারে এটা আমি জানতুম না। আমার কথা বাদ দেওয়া যেতে পারে। আমি যে বেকুব সে আমি চার বছর বয়েস থেকে বড়দার মুখে শুনেছি ; এখনো শুনি।

যুবতী একবার শুধু বাইরের দিকে তাকিয়ে বেশ উচ্চ কণ্ঠে ডাকলেন, 'ওগো, এদিকে এসো—আমাদের আলী সাহেব !' আমাকে শুধু বললেন, 'বে-আদবী মাফ করবেন, আমি প্রথমটায় ঠিক চিনতে পারি নি।' ব্যস্‌ তখনকার মত আর কিচ্ছু না। আমি তো মুঠোর মধ্যে এসে গিয়েছি—বাদবাকি ধীরেসুস্থে হবে।

ইতিমধ্যে ঐ 'ওগো'-টি, এবং আর পাঁচজনও কামরায় ঢুকলেন। যুবতীর আদেশে তিনি তাঁর পরিচয় দিলেন। ডাঃ জুলফিকার আলী খান। যেমন দেবী তেমন দেবা নন। ভদ্রলোক বরঞ্চ একটু মুখ-চোরা। শুধু একটু খুশীমুখে বললেন, 'ইনি আপনার প্রকৃত ভক্ত পাঠিকা।' দেবী মুখঝামটা দিলেন,

'আর তুমি বুঝি না?' ভদ্রলোক কোনো গতিকে জান বাঁচিয়ে কামরার অন্য কোণের দিকে পাড়ি দিলেন।

নিজের অপ্রতিভ ভাব কাটাবার জন্য আমি যুবতীর সঙ্গে মজুমদারের আলাপ করিয়ে দিলুম। বাঁ হাত দিয়ে ঘোমটাটি তোলার একটুখানি ইঙ্গিত দিয়ে বললেন, 'আপনাকে বহুৎ শুক্‌রিয়া। 'শবনম' বীবীকে এ কামরায় দাওয়াৎ না করলে আমি তাঁর স্বামীকে পুরোপুরি চিনে নিতে পারতুম না।'

সেই বর্ধমান থেকে দক্ষিণেশ্বর অবধি বেগম খান কি কি প্রশ্ন শুধিয়েছিলেন, তাঁর আপন মনের কথা কি কি বলেছিলেন তার পুরো বয়ান কেন, নির্যাস দেওয়াও আমার তাগতের বাইরে। গোড়ার দিকে তো তাঁর কোন কথাই আমার কানে ঢুকছিল না। বেচারী ডাঃ খান যে বেশ কিছুটা অপ্রতিভ হয়েছেন সে তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। বিশেষত দেবীর বসার ধরনটা। আমার দু হাঁটুর সঙ্গে তাঁর দু হাঁটু ছুঁইয়ে দিয়ে, আমাকে শব্দার্থে কোণ-ঠাসা করে—আমিই বা করি কী, নড়তে গেলেই যে হাঁটুতে গোত্তা লাগবে—আসন না নিয়ে যদি 'ভদ্রস্থতার' দূরত্ব বজায় রেখে স্কুল-গার্লটির মত ব্রীড়াভরা ব্যবহার করতো তা হলে তো ওদিকে আর কারো দৃষ্টি আকৃষ্ট হতো না। এ তো আকছারই হয়। গোড়াতেই আমি নিবেদন করি নি, সব লেখকই বরাবর? সক্কলেরই কিছু-না-কিছু ভক্ত, অন্ধ স্তাবক থাকার কথা। তদুপরি এ মেয়ে মুসলমান। বাকি গাড়ি হিন্দু। অবশ্য আমাকে আর ঐ হাফ-হিন্দু মোন্দারকে বাদ দিয়ে। হিন্দুদের ধারণা—এবং সেটা হয়তো ভুল নয়—যে, মুসলমান মেয়েরা মাত্রাধিক লাজুক (নইলে বোরকা পরতে যাবে কেন?) কিন্তু এখানে যে ঠিক তার উল্টোটা!

তা সে যাই হোক, গাড়ির সবাই ভদ্রসন্তান; তাঁরা আমাদের দু'জনকে আল্লার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের নিয়ে পড়লেন। বেগম খান শুধু মাঝে মাঝে মজুমদারকে তাঁর বাক্য সমর্থনের জন্য বরাত দিচ্ছিলেন। সেও এতক্ষণে হালে পানি পেয়ে গিয়েছে বলে শুধু যে সায় দিচ্ছিল তাই নয়, মাঝে মাঝে খাসা টুইয়েও দিচ্ছিল। তখন আর বেগমকে পায় কে? 'একে ছিল নাচিয়ে বুড়ি, তায় পেল মৃদঙ্গের তাল!' আমার মনে পড়লো মজুমদার কলেজ আমলে মেয়েদের নিয়ে মস্করা করে কবিতা লিখে রীতিমত নটরিয়াস হয়েছিল। বাঁদরটার খাসলৎ তিরিশটি বচ্ছরেও বদলালো না!

আমি শুধু একটি বার বেগমকে শুধিয়েছিলুম, 'আচ্ছা মিসিস খান—'

বাধা দিয়ে বললেন, 'আমার নাম শহ্‌র্‌-ইয়ার—আরব্য রজনীর শহ্‌র্‌-ইয়ার।'

'আচ্ছা, বেগম শহ্‌র্‌—'

'না, শুধু শহ্‌র্‌-ইয়ার।'

'আচ্ছা, শহ্‌র্‌-ইয়ার, আপনি কি কখনো সত্যকার বড় লেখকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন—যেমন মনে করুন, পরশুরাম—'

'সত্যিকার, মিথ্যেকার জানি নে,—আপনি বড় লেখক।'

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম, 'যাক। আমার কিন্তু সত্যি একবার দেখতে ইচ্ছে করে, কোনো গ্রেট লেখকের সঙ্গে পরিচিত হলে আপনি কি করেন। বোধ হয় কবিগুরু যে বর্ণনা দিয়েছেন,

'অমল কমল চরণ কোমল চুমিনু বেদনা ভরে—'

বেগম খান সঙ্গে সঙ্গে পদপূরণ করে বললে,

'বাধা না মানিয়া ব্যাকুল অশ্রু পড়িতে লাগিল ঝরে।'

আমি অবাক হয়ে ভাবলুম, এই কবিতাটি যে খুব পরিচিত তা নয়, তবু মেয়েটি এর সঙ্গে পরিচিত। এর কাছে কি তবে মুড়ি-মুড়কির একই দর!

এবারে আমি শক্ত কণ্ঠে বললুম, 'দেখুন, আপনি যদি আমার রচনা সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ না করেন, তবে আমি আর একটি মাত্র কথা বলবো না।'

বিন্দুমাত্র দঃখ প্রকাশ না করে বললে, 'আপনার মর্‌জী। ভবিষ্যতে তো সুযোগ পাবো। আমার ভাবনা কি? কলকাতায় আপনার বাসা কোথায়?'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'আমি কি লক্ষপতি? শান্তিনিকেতনের বাসা ঠেলতে গিয়েই আমি লবেজান! বন্ধুর বাসায় উঠবো।'

সঙ্গে সঙ্গে আসন ত্যাগ করে চলে গেল স্বামীর কাছে। আমিও তন্মুহূর্তেই পা নামিয়ে বাঙেক সোজা হয়ে বসলুম। পদ্মাসনব্যূহের দুই হাঁটুতে আমি আর হরগিজ বন্দী হবো না।

একটু পরেই ডাক্তার খানকে সঙ্গে নিয়ে এসে আমকে মাঝখানে বসিয়ে দুজনা দুদিকে বসল। আমি বললুম, 'ভাল হলো আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে। মরার আগে একটা ট্রাংক কল পাবেন। তখন এসে শেষ ইনজেকশনটি দিয়ে দেবেন।'

ডাক্তার বললেন, 'তওবা, তওবা! আর আমি তো প্র্যাকটিক্যাল ডাক্তারী ক্রমেই ভুলে যাচ্ছি। আমি তো রিসার্চ নিয়ে পড়ে আছি।'

বেগম ফিসফিস করে ডাক্তারকে বললেন, 'আঃ! যা কইবার তাই কও না!'

ডাক্তার বললেন, 'যদি ইজাজৎ দেন তবে একটা আরজ্‌ আছে। শুনলুম, কলকাতায় আপনি এক দোস্তের বাড়িতে উঠবেন। তার চেয়ে এবারে আমাদের একটা চান্‌স্‌ দিলে আমরা সেটা মেহেরবাণী মেনে বড় খুশী হব। আমাদের বাড়িতে প্রচুর জায়গা আছে। যদি হিম্মত দেন তো বলি, আপনার কোনো তকলীফ হবে না।'

আমি অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললুম, 'কিন্তু এ-যাত্রায় হবে না, আমারই

কপাল মন্দ। আসছে বার নিশ্চয়ই।'

বেগম ডাগর চোখ মেলে বললেন, 'আপনার দোস্ত কি ডাক্তার?'

আমি বললুম, 'ঠিক তার উল্টো। বহুকাল ধরে শয্যাশায়ী।'

বেগম বললেন, 'আমাদের বাড়িতে ঐ আরেকটি মাইনর সুবিধে। যা খুশী খান, যত খুশী খান, কিংবা তিন দিন ধরে কিছুই খেলেন না, হিমে সমস্ত রাত ছাতে চক্কর মারুন, যা খুশী করুন—ডাক্তার তো হাতের কাছে রয়েছে, ভয় কি?'

আমি হেসে বললুম, 'উনি না ডাক্তারী বেবাক ভুলে গিয়েছেন!'

বেগম বললেন, 'কী যেন—নউজুবিল্লা, বলতে নেই—হাতীর দাম লাখ টাকা।'

আমি ভালো করে বুঝিয়ে বললুম যে আমার শয্যাশায়ী বন্ধু আমার জন্য প্রহর গুনছে। তাই সেখানে না গিয়ে উপায় নেই। কিন্তু আসছে বারে অতি অবশ্য, সাত সত্য, তিন কসম ওঁরাই হবেন আমার কলকাতার অন্নদাতা—মেজুমান্।

ট্রেন দক্ষিণেশ্বরে থামলো বলে বেঁচে গেলুম। আমার এক চেনা এবং দোস্ত, পাশের ভিমকোতে কাজ করে; বোস বলেছিল স্টেশনে আমাকে দেখতে আসবে। লাফ দিয়ে নামলুম প্ল্যাটফর্মে। মজুমদারও বোসকে চেনেন। তিনিও নামলেন।

কই, রাস্কেলটা আসে নি!

মজুমদার বললেন, 'জানেন আলী সাহেব, মেয়েটি বড়ই সরলা। কিন্তু যে কোনো লোক অতি সহজেই ভুল বুঝে মনে করতে পারে উনি বুঝি পুশিং ফ্লার্ট। এ টাইপ আমি খুব বেশি দেখি নি কিন্তু যা দু'একটি দেখেছি সেও মুসলমান পরিবারে।'

আমি বললুম, 'আমারও তাই মনে হয়, কিন্তু আপনি এ মীমাংসায় পেঁছিলেন কোন্ পর্যবেক্ষণের ফলে?'

মজুমদার আমাকে ধাক্কা দিয়ে কামরায় তুলে দিয়ে নিজে পিছনে ঢুকলেন। বললেন, 'পরে হবে।'

এবারে কামরাতে সার্বজনীন আলোচনা হলো হিন্দুসমাজে যে ডিভোর্স বা লগ্নচ্ছেদ প্রবর্তন হয়েছে তাই নিয়ে। মুসলমানদের ভিতর তো গোড়ার থেকেই আছে; কিন্তু প্রশ্ন তার সুবিধে নেয় বাঙলা দেশের কি পরিমাণ মুসলমান নরনারী? অল্পই। তবে হিন্দুদের বেলা? আলোচনাটা জমলো ভালো, কারণ ডাক্তার আর আমি, হিন্দুদের অজানা, মুসলমানদের পারিবারিক ভিত্তি সম্বন্ধে তথ্য সাপ্লাই করলুম, আর হিন্দুরা তাই নিয়ে স্পেকুলেট করলেন।

বেগম সাহেব মুখ খুললেন না। তবে ওস্তাদের মার শেষ রাতে। ট্রেন যখন শেয়ালদা পেঁছিল তখন তিনি মোক্ষম বাণ ছাড়লেন, 'হিন্দুদের মেয়ে-

ইস্কুলে এখনো স্ট্যাণ্ডার্ড টেক্‌স্‌ট্‌ বুক ভূদেববাবুর পারিবারিক প্রবন্ধ। আমার বান্ধবীর মেয়েকে দিন সাতেক আগেও পড়িয়েছি।'

দুই

হিন্দরা বলে মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক। বোধ হয় কথাটা সত্য, নইলে শহ্‌র্‌-ইয়ার আমার ক্যালিবারের লেখককে নিয়ে অতখানি মাতামাতি করবে কেন? এদেশে তো আর গণ্ডায় গণ্ডায় মুসলমান লেখক নেই, কাজেই আলী, আলীই সই। কথায় আছে, বিপদে পড়লে শয়তান তক্‌ মাছি ধরে ধরে খায়।

উপস্থিত অবশ্য স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মাছিই শয়তান খাবে। কথাবার্তায় তো মনে হলো ডাক্তার পরিবার কলকাতার খানদানীদের একটি। অতএব নিশ্চয়ই উত্তম মোগলাই খানাপিনার অনটন হবে না। সুভাষিতের একটি দোহা সামান্য ট্যারচা করলে অর্থ দাঁড়ায় 'পণ্ডিতদের সবই গুণ; দোষের মধ্যে এই যে, ব্যাটারা বড় মূর্খ।' হিন্দুদের বেলাও তাই। ওদের অনেক গুণ; দোষের মধ্যে এই যে, তারা মাংস রাঁধতে জানে না। সেটা মেরামৎ করার জন্য সমস্ত জীবন ধরে—জীবনটা তো ওদের সঙ্গেই কাটালুম—চেষ্টা দিয়েছি। মাতাল যেমন গাঁঠের পয়সা খর্চা করে অন্যকে মদ খেতে শেখায়, পরে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে নেশাটি করবে বলে, আমিও তেমনি বিস্তর হিন্দুকে গায়ে পড়ে মোগলাই শেখাবার চেষ্টা করেছি, অর্থাৎ ফাঁকি দিয়ে শটকে শেখাবার মেহন্নৎ বরদাস্ত করেছি, পরে তারই মেওয়াটি খাবো বলে, কিন্তু হলে কি হয়, ঐ যে মুসলমানরা বলে হিন্দুরা বড় সংকীর্ণচেতা, আপন ধর্মের গণ্ডীর ভিতর কাউকে 'ভাই-ব্রাদার' বলে নিতে চায় না, রান্নার বেলা অন্তত নিশ্চয়ই তাই। তা সে যাক্‌ গে, এখন যখন শহ্‌র্‌-ইয়ার গঙ্গোদক জুটে গেছে তখন কূপোদকের কি প্রয়োজন।

কিন্তু হায়, নল রাজার ভাজা মাছটির মত আমার মুর্গ্‌-মুসল্লমগুলো হঠাৎ প্যাখনা গজিয়ে ডানা মেলে 'কোক্কোরো' রব ছেড়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ট্রেনে কথা ছিল, যেখানেই উঠি না কেন, ডাক্তার-পরিবারে প্রথম একটা ডিনার দিয়ে 'মুখবন্ধ' অবতরণিকা সেরে পরের পরিপাটি ব্যবস্থা করা হবে, কিন্তু বন্ধুর বাড়িতে উঠেই দেখি আমার নামে টেলিগ্রাম—তদ্দণ্ডেই শান্তিনিকেতন ফিরে যেতে হবে।

সে রাত্রেই আপার-ইণ্ডিয়া ধরতে হলো। রেলের মোন্দার ঠেলেঠুলে একটা কামরায় ঢুকিয়ে দিলে।

ঘণ্টু বাগচীকে বরাত দিয়ে এলুম সে যেন আমার আকস্মিক নির্ঘণ্ট পরিবর্তনটা শহ্‌র্‌-ইয়ার বানুকে জানিয়ে দেয়। আমার রাঢ়ী, বৈদিক, কুলীন,

মৌলিক মেলা চেলা আছে, কিন্তু মুসলমানকে ট্যাক্‌ল্‌ করতে হলে বারেন্দ্রই প্রশস্ততম। ওরা এখনো বদনা ব্যবহার করে।

বোলপুরে ফিরে হপ্তা তিনেক সাধনার ফলে মুর্গী রোস্টের শোক ভুলে গিয়ে যখন পুনরায় ঝিঙ্গে-পোস্ত, কলাইয়ের ডাল আর টমাটোর টকে মনোনিবেশ করছি এমন সময় শুনি তীব্র মধুর বামা-কণ্ঠ। আমার বাড়িটা একেবারে শ্মশানের গা ঘেঁষে, অর্থাৎ লোকালয় থেকে দূরে নির্জনে। বামা-কণ্ঠ কেন, কোনো কণ্ঠই সেখানে শোনা যায় না। বারান্দায় বেরিয়েই দেখি, শহ্‌রু-ইয়ার, দূরে ডাক্তার, তারো দূরে প্রাচীন যুগের ইয়া লাশ মোটর গাড়ি।

আমার মুখ দিয়ে কথা ফোটে নি। শহ্‌রু-ইয়ার পুরো-পাক্কা বাঙালী-মুসলমানী কায়দায় মাটিতে বসে, মাথায় ঘোমটা টেনে, দু'হাত দিয়ে আমার দু'পা ছুঁয়ে সালাম করলো। আমি তাকে দোয়া জানালুম, মনে মনে দরূদ পড়লুম।

এবারে দেখি ওর ভিন্ন রূপ। আমি আশঙ্কা করেছিলুম সে কলরব করে নানান অভিযোগ আরম্ভ করবে—খবর না দিয়ে চলে এলুম, এসে একটা চিঠি-পত্র দিলুম না—বাকি আর বলতে হবে না; মেয়েরা ফরিয়াদ আরম্ভ করলে যাদুকরের মত ফাঁকা বাতাস থেকে ফরিয়াদের খরগোশ বের করতে পারে।

শুধু অত্যন্ত নরম গলায় বললে, 'আমরা কোনো প্রকারের খবর না দিয়ে এসে আপনাকে কোনো বিপদে ফেলি নি তো?'

আমি বললুম, 'আমি সত্যই ভারি খুশী হয়েছি যে আপনারা আমাকে আপনজন ভেবে কোনো প্রকারের লৌকিকতা না করে সোজা এখানে চলে এসেছেন বলে।'

ইতিমধ্যে ডাক্তার এসে পৌঁচেছেন। তাঁর সঙ্গে কোলাকুলি করে তাঁকেও সেই কথা বললুম এবং যোগ করলুম, 'আপনারা জানেন না, এদেশে আমার খুব বেশি আপনজন নেই।'

শহ্‌রু-ইয়ারের চোখ দুটি বোধ হয় সামান্য একটু ছলছল করছিল। বললে, 'আমাদেরও বেশির ভাগ আপনজন পাকিস্তান চলে গিয়েছেন। আমার দাদারা, দিদিরা সবাই। সেদিক দিয়ে আমার কর্তা লাকি।'

আমি কিছু বলার পূর্বেই ডাক্তার প্রায় হাতজোড় করে বললেন, 'আমার একটা গরীবানা আরজু আছে।'

আমি বললুম, 'কী উৎপাত। আমাকে চিনতে আপনার ক'শতাব্দী লাগবে?'

'তা হলে বলি; আপনার চেলা ঘণ্টুবাবু এসেছিলেন আপনার চলে যাওয়ার খবর দিতে। উনি সত্যি আপনার আপনজন। তাঁকে ইনি নানা রকমের প্রশ্ন শুধোন—এ জায়গা সম্বন্ধে। ঘণ্টুবাবু বললেন, আপনি নাকি বাজার-হাট থেকে অনেক দূরে থাকেন, এবং চাকর-বাকর কামাই দিলে নাকি শুধু টিন-

ফুড খেয়ে চালিয়ে দেন। তাই আমরা এটা-সেটা কিছু কিছু সঙ্গে এনেছি। যদি—'

আমি বললুম, 'কী আশ্চর্য! নদীতে চানে যাবার সময় কলসী ভরে জল নিয়ে যাওয়া আহাম্মুখী, কিন্তু আমার এই সাহারা-নিবাসে জল না নিয়ে আসা ততোধিক আহাম্মুখী। আপনি সমুচা হগ্‌বাজার কিনে এনে থাকলেও অন্তত আমার কোনো আপত্তি নেই। চলুন, আপনাদের ঘর দেখিয়ে দি; হাত মুখ ধোবেন।'

আমার লোকটি খুব মন্দ রাঁধে না। সে-বিষয়ে আমার অত্যধিক দুশ্চিন্তা ছিল না।

বারান্দায় বসে আছি। হঠাৎ দেখি শহ্‌র্‌-ইয়ার তালগাছ সারির গা ঘেঁষে ঘেঁষে একা একা চলেছেন রেল লাইনের দিকে। আমি বসার ঘরে ঢুকলুম ডাক্তারের খবর নিতে। তিনি দেখি আমার জর্মন এনসাইক্লোপীডিয়া খুলে একটার পর একটা ছবি দেখে যাচ্ছেন—আরামসে বড় কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে। আমি যেতেই বললেন, 'শহ্‌র্‌-ইয়ার বেড়াতে বেরিয়েছে; ও একা থাকতে ভালোবাসে আবার, মজার কথা, খানিকক্ষণ পরে সঙ্গী না হলেও চলে না। এই দেখুন না, একশ কুড়ি মাইল ঠেঙিয়ে এল এখানে আপনার সঙ্গে দেখা করতে, আর আপনার সঙ্গে দু'টি কথা না বলে হুট্‌ করে বেড়াতে চলে গেল একা একা।'

'তা আপনি সঙ্গে গেলেন না কেন?'

'ওর মুড্‌ আমি জানি। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলে বেঁধে নিয়ে যেতো—আমি শত আপত্তি জানালেও। বেড়াক না একটু আপন মনে। আপনার বাড়ির বড় সুবিধে—সিঁড়ি দিয়ে নামা মাত্রই বেড়াবার মাঠ আরম্ভ হয়ে গেল! কলকাতার হাল তো জানেন।' তারপর একটু থেমে গিয়ে বললেন, 'কিন্তু আপনার কাছে অনুরোধ, আপনার ডেলি রুটিন আমাদের আসাতে যেন আপসেট্‌ না হয়।'

আমি হেসে বললুম, 'আপনি নির্ভয়ে থাকুন, ডাক্তার, আমার রুটিন বলে কিছু নেই। আমি শুধু বলি, এন্‌জয় ইয়োরসেলভস। আচ্ছা, এখন চলুন না, আমরা ম্যাডামকে খোঁয়াইডাঙার মাঝখানে গিয়ে আবিষ্কার করে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসি। এখানে এই বিরাট খোলামেলার মাঝখানে যে কি রকম টপ করে অন্ধকারটি ড্রপ করেন সেটা শহুরেরা অনুমানও করতে পারে না।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বললুম, 'ঐ ওখানে যে গোটা দুই ভিতের মত ঢিপি দেখতে পাচ্ছেন ঐটেই এ অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু জায়গা। সেখানে উঠলেই ঠাহর হয়ে যাবে বীবী কোথায় কবিত্ব করছেন।'

ডাক্তারটি স্বল্পভাষী। আমি শুধালুম, 'আপনি ডাক্তারির কি নিয়ে কাজ করছেন?'

বললেন, 'এখনো ঠিক হদিস পাচ্ছি নে। ভাবছিলুম, যমজ, বামন এদের স্কেলিটেন নিয়ে।'

আমি বললুম, 'ডক্টর ইয়াংকার যা নিয়ে—'

তিনি অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ালেন। শুধোলেন, 'আপনি জানলেন কি করে?'

আমি বললুম, 'আপনারা দু'জনাই বড় সরল আর কর্তাভজা'। 'কর্তাভজা' ইচ্ছে করেই বললুম। 'কর্তার গুণ আছে কি না চিন্তা পর্যন্ত করেন না। আপনি খুব ভালো করেই জানেন, আমি ডাক্তারির কিছুই জানি নে; অতএব ইয়াংকারকে চেনা আমার পক্ষে আকস্মিক যোগাযোগ বই আর কিছু না। বন্ শহরে আমি যখন পড়তুম তখন তিনি আমার প্রতিবেশী এবং আমার সংস্কৃতের অধ্যাপকের বন্ধু ছিলেন। মোটামুটি ঐ সময়, অর্থাৎ ১৯৩৩/৩৪-এ তিনি পুরো মানুষের এক্সরে নেবার কল আপন হাতে বানান। ও-সব কথা আরেক দিন হবে। এই তো পৌঁছে গেছি আমাদের এভারেস্টে, আর ঐ—ঐ যে—দুটো তাল গাছের মাঝখানে বসে আছেন বেগম সাহেবা।'

অতদূরে আমাদের সাধারণ কথাবার্তার কণ্ঠস্বর পৌঁছনোর কথা নয়। কিন্তু এই নির্জনতার গভীরতম নৈস্তব্ধ্যে বোধ হয় ধ্বনি ও টেলিপ্যাথির মাঝখানে এক তৃতীয় ট্র্যান্স্মিটারহীন বেতার বার্তা বহন করে! শহ্‌র-ইয়ার হঠাৎ অকারণে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই আমাদের দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার আলসেশিয়ান 'মাস্টার' তাঁর দিকে ছুট লাগালো।

মাঝপথে দেখা হতেই আমি বললুম, 'আত্মচিন্তার জন্য এ ভূমি প্রশস্ততম।'

বানু বললেন, 'না, আমি 'শব্‌নমের' কথা ভাবছিলুম।'

আমি বললুম, 'দেখুন, ম্যাডাম, আপনাদের আনন্দ দেবার জন্যে আমার পক্ষে যা করা সম্ভব আমি তাই করবো। ঐ তাল গাছটা যদি চড়তে বলেন তারও চেষ্টা দিয়ে দেখতে পারি কিন্তু একটি জিনিস করতে আমার সাতিশয় বিতৃষ্ণা। আপনারা দু'জনাই আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট; তাই যদি আমি করজোড়ে একটি মেহেরবাণী—'

শহ্‌র-ইয়ার যদি বটতলার চার আনা দরের সাক্ষীর পেশা কবুল করতেন, তবে তিনি ও-লাইনের সুলতানা রিজিয়া হতেন নিশ্চয়ই। উকীল আধখানা প্রশ্ন শুধোতে না শুধোতেই বটতলার ঘড়েল সাক্ষী আমেজ করে ফেলে, উকিলের নল কোন্ দিকে নিশানা করেছে। আমাকে বাধা দিয়ে শহ্‌র-ইয়ার বললেন, 'আর বলতে হবে না। ট্রেনে বেশ ধমক দিয়ে বলেছিলেন আপনি নিজের রচনা নিয়ে আলোচনা পছন্দ করেন না, এখানে সেটা ভদ্রভাবে বলতে যাচ্ছিলেন—এই তো? আচ্ছা, আমি মেনে নিচ্ছি, যদিও অতিশয় অনিচ্ছায়। শুধু একটা শেষ প্রশ্ন শোধাবো; আপত্তি আছে?'

আমি উৎফুল্ল হয়ে বললুম, 'চালান গাড়ি ! ফাঁসির খানা খেয়ে নিন।'

'শব্‌নমের সঙ্গে সেই শেষ বিরহের পর আপনাদের আবার কখনো দেখা হয়েছিল ?'

আমি বললুম, 'এ প্রশ্ন একাধিক পাঠক-পাঠিকা আমাকে বাচনিক, পত্র মারফৎ শুধিয়েছেন। তাঁর মধ্যে একজন হিন্দু মহিলা ; পাবনার মেয়ে স্কুলের হেডমিস্‌ট্রেস্‌। অন্যদের আমি এ প্রশ্নের উত্তর দি না। এঁর বেলা ব্যত্যয় করলুম। লিখলুম, "মহাশয়া, আপনি যখন পাবনা সেকেণ্ডারি স্কুলের হেড-মিস্‌ট্রেস্‌ তবে নিশ্চয়ই আপনার স্কুল রাজশাহী ডিভিজনে পড়ে। আমার স্ত্রী সেখানকার স্কুল-ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস। তিনি যখন আবার আপনার স্কুল দেখতে আসবেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলে পাকা উত্তর পাবেন।" আপনাকে ঠিক তা বলছি নে। তবে তারই কাছাকাছি ; আমার গৃহিণী বছরে একাধিকবার পুত্রদ্বয়সহ এখানে আসেন। পথিমধ্যে কলকাতায় কয়েক ঘণ্টা জিরোতে হয়। এবার না হয় আপনাদের ওখানেই উঠতে বলবো।'

শহ্‌র্‌-ইয়ারকে সেই ট্রেনে দেখেছিলুম উল্লাসে লম্ফ দিতে, আর দেখলুম এই। সেবারে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের, এবারে অবিমিশ্রিত উল্লাসের। শুধোলেন, 'কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে পারবো তো ?'

আমি বললুম, 'কী আশ্চর্য ! সেটা আপনাদের দু'জনকার একান্ত নিজস্ব, অল রাইট্‌স্‌ রিজার্ভড কারবার। সেখানে আমিই বা কে, আর ডাক্তার জুল্‌-ফিকারই বা কে ? কি বলেন ডক্‌ ?'

ডাক্তার বললেন, 'আমার বীবী কি আলোচনা করবেন আর কি করবেন না তার উপর আমাকে আমাদের ইমাম আবু হানিফা সাহেব কোনো হক্‌ দিয়ে থাকলেও—খুব সম্ভব তিনি দেন নি—আমি কসম খেয়ে বলছি, আমি হক্‌ চাই নে—আমি চাই শান্তি।

আমি বললুম, 'আমেন, আমেন ! হায়, এই না-হক্কের উপর গড়া দুনিয়ার সিকি পরিমাণ স্বামী-সমাজ যদি আমাদের ডাক্তারের এই মহামূল্যবান তত্ত্ব-কথাটি মেনে নিত তবে বাদবাকী তাঁদের সদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ডিভোর্স প্রতিষ্ঠানটির উচ্ছেদ সমাপন করতো।'

ইতিমধ্যে আমরা বাড়ি পেঁছে গিয়েছি।

শহ্‌র্‌-ইয়ারকে বললুম, 'একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলুম। আমার কাছে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভালো ভালো রেকর্ড আছে যার বেশির ভাগ 'না কাম, না অর্থ' নাইদার ফর লাভ নর ফর মানি আজ আর পাওয়া যায় না। যখন খুশী বাজাবেন। রাত তিনটেয় বাজালেও আমার আহার-শয্যাসন-ভোজন কোনো কিছুরই ব্যাঘাত হয় না।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার বললে, 'আমি এখ্‌খুনি দেখবো।' হুট্‌ করে চলে গেল।

আমি বললুম, 'ডাক্তার, আপনার বাঙলাতে বিস্তর আরবী-ফার্সী শব্দ থাকে। এটা কি আপনাদের পরিবারেরই বৈশিষ্ট্য, না আপনাদের গোষ্ঠীর, কিংবা আপনারা যে মহল্লায় বাস করেন ?'

ডাক্তার বললেন, 'বিশ্বাস করুন, আমি একটি আস্ত অশিক্ষিত প্রাণী। চিকিৎসাশাস্ত্র—আমি বলি স্বাস্থ্যশাস্ত্র, তার মানে হাইজীন নয়—আমাকে এমনই মোহাচ্ছন্ন করেছে যে আমি যেটুকু সামান্য সাহিত্য, ইতিহাস এমন কি গণিত ইস্কুল-কলেজে পড়েছি সে সব ভুলে গিয়েছি। শহ্‌র্‌-ইয়ারের সঙ্গে একই জিনিস উপভোগ করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি একাধিকবার চেষ্টা করেছি তার সব শখের বিষয়ে দিল্‌-চস্‌পী নিতে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়ে উঠলো না। সে এক ট্রাজেডি—সে কথা পরে হবে। তা সে যাই হোক, মোদ্দা কথা এই, আপনি যে প্রশ্ন শুধিয়েছেন সেটার উত্তর দিতে হলে যে সব বিষয় জানার দরকার তার একটাও আমি জানি নে। তবে যেটুকু শুনেছি তার থেকে বলতে পারি, জব চার্ণকের আমলের তো কথাই নেই, এমন কি ক্লাইভের সময় এবং তার পরও কোনো ভদ্র মুসলমান এবং হিন্দু ও নবাবের মুর্শিদাবাদ, খানদানী-ঢাকা ছেড়ে এই ভুঁইফোড় আপ্‌স্টার্ট কলকাতায় আসতে চায় নি। আমার পিতৃপুরুষ আসেন রাজা রামমোহন রায়ের আমলে, বাধ্য হয়ে, কোনো রাজনৈতিক কারণে। তাঁরা আপোসে কি ভাষা বলতেন, জানি নে, তবে আমার ঠাকুরদার আমল পর্যন্ত তাঁরা ফার্সী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষাতে লেখেন নি। আমার পিতা 'হুতোমে'র ভাষা বলতে পারতেন, কলকাতার উর্দু ডায়লেকট এবং উত্তর ভারতের বিশুদ্ধ দরবারী উর্দুও, কিন্তু আমার মা ছিলেন খাস শান্তিপুরের মেয়ে। তিনি উর্দু জানতেন না এবং সেটা শেখবার চেষ্টাও করেন নি। আমাকেও কেউ উর্দু শেখাবার চেষ্টা করে নি। ফলে আমি যে কোন্‌ বাঙলা বলি সে আমিও জানি নে। খুব সম্ভব ডাইলিয়ুটেড হুতোম। আমার হিন্দু ক্লাস-ফ্রেণ্ডরা আমার ভাষা নিয়ে ঠাট্টা করতো। কিন্তু তাদেরই একজন—খানদানী কলকাত্তাই সোনার বেনে—আমাকে বলেছিল, তার ঠাকুরমা আমারই মত বাঙলা বলেন।'

আমি বললুম, 'আশ্চর্য ! বাঙলা ভাষা কী তাড়াতাড়ি তার ভোল বদলেছে ! ভারতচন্দ্র এমন কি আলাল হুতোম দুজনাই আপনার চেয়ে বেশী আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন। অবশ্য বেনামী লেখাতে বিদ্যেসাগর মশাই আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন হুতোমের চেয়ে কম। কিন্তু তিনিও যা করেছেন সেটা নগণ্য নয়। আজ যদি প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, বিদ্যেসাগর কলকাতায় নেমে আড্ডা জমান তবে তাই শুনে বোধ হয় আপনার হিন্দু ক্লাস-ফ্রেণ্ডরা ভিরমি যাবেন। কাজেই আমার পরামর্শ যদি নেন তবে বলবো, আপনার ভাষা বদলাবেন না। কেউ যদি মুখ টিপে হাসে, হাসুক। আমার অঞ্চলের ব্রাহ্মণ

পণ্ডিতরাও অত্যন্ত সংস্কৃতঘন বাঙলা বলেন—যেমন 'হপ্তা দুত্তিন' না বলে বলেন 'পক্ষাধিককাল' এবং তাই শুনে হিন্দু মুসলমান উভয়ই কৌতুক অনুভব করে। তাতে কি যায় আসে ?'

এমন সময় শহ্‌র্‌-ইয়ার চিন্তাকুল ভাল নিয়ে সভাস্থলে উপস্থিত। শুধোলেন, 'আপনার রেকর্ড-সঞ্চয়ন অদ্ভুত। আপনি বাছাই করেছিলেন কি ভাবে ?'

আমি হেসে বললুম, 'কোনো ভাবেই না। আমি বরদায় ছিলুম ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৪। এই সময়টার মধ্যে যা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেকর্ড বেরিয়েছে তাই কিনেছি—কোনো প্রকারের বাছবিচার না করে। তার বহু বৎসর পর মোহরদি দু'চারখানা রেকর্ড আমাকে দেয়—ব্যস্‌। ৪৪-এর পর, আজ পর্যন্ত, কোথাও ভালো করে আসন পেতে বসতে পারি নি। ফলে কলেকশনটা বাড়াতে পারি নি। সে নিয়ে আমার কোনো মনস্তাপ নেই।

"সাধের জিনিস ঘরে এনেই
এনে দেখি লাভ কিছু নেই।
খোঁজার পরে চলে আবার খোঁজা।"

চলুন মাদাম, চলুন মসিয়ো ল্য দক্‌ত্যোর,

দুইটি বস্তু প্রতি মানবেরে টানিতেছে বরাবর।
দানাপানি টানে একদিক থেকে অন্যদিকেতে গোর ॥
দো চীজ্‌ আদম্‌রা কশদ্‌ জোর্‌ জোর্‌
য়কী আব্‌ ও দানা দিগর খাক্‌-ই-গোর

ঐ তো এ-বাড়ির দানা-পানির প্রতীক দিলবর জান্‌ সশরীরে উপস্থিত। আমি তার রান্নার প্রশংসা বা নিন্দা কিছুই করবো না। আপনি শহ্‌র্‌-ইয়ার বানু যখন এখানে রয়েছেন তখন আহারাদির জিম্মেদারী আপনার।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, 'আপনার রচনা সম্বন্ধে আলোচনা ট্যাব্‌ ; তার উল্লেখ না করে বলছি, আপনি খেতে ভালোবাসেন সেকথা আমি জানি, কিন্তু—'

আমি যেন আসমান থেকে পড়ে তাঁর বক্তব্যে বাধা দিয়ে বললুম, 'আপনিও পেঁচি-টেপির মত এই ভুলটা করলেন ? লেখার সঙ্গে জীবনের কতখানি সম্পর্ক ? রবিঠাকুর নিদেন হাজারটি প্রেমের কবিতা লিখেছেন। অতএব, তিনি সমস্তক্ষণ প্রেমে পড়ার জন্য ছোঁক ছোঁক করতেন ? সেই সুদূর ইয়োরোপে বসে মাইকেল কপোতাক্ষর স্মরণে কি যেন লিখেছেন—'সতত পড় হে নদ আমার স্মরণে' ; ফিরে এসে সামান্যতম চেষ্টা দিয়েছিলেন এক ঘণ্টার তরেও ঐ নদীর পারে যাবার ! এ তো আমি চিন্তা না করেই বলছি। খুঁজলে এমন সব উদাহরণ পাবেন যে আপনার চক্ষুস্থির হয়ে যাবে। একাধিক কবি লিখছেন, আ মরি আ মরি গোছ প্লাতোনিক, দেহাতীত শিশির-বিন্দুর ন্যায় পূতপবিত্র স্বর্গীয়

প্রেমের কবিতা—ওদিকে, তাঁদেরই একজন, হাইনে, বেরুতেন নিশাভাগে প্যারিসের কুখ্যাত—নেভার মাইন্ড, আপনি ডাক্তারের স্ত্রী, সহজে শক্‌ট্‌ হবেন না—'

'এবং আমাদের বিয়ে হয়েছে দশটি বছর আগে', বললেন শহ্‌র-ইয়ার।

তিন

'একি! আপনি এখানে!'

বাড়িটার একাধিক বারান্দা, তার একাধিক প্রান্তে একান্তে অন্তরালে বসে থাকা যায়। তারই একটাতে বসে আমি পূর্বাকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। আজ কৃষ্ণপক্ষের ষষ্ঠী বা সপ্তমী, রাত প্রায় এগারোটা, একটু পরেই চাঁদ উঠবে, তারই আভাস লেগেছে তালের সারিতে। ঘরের ভিতরে শহ্‌র্‌-ইয়ার রবীন্দ্র-সঙ্গীত বাজাচ্ছিল। তার বাজানোর পদ্ধতিটা সত্যই বিদগ্ধ। একটা গান বাজানোর পর অন্তত মিনিট দশেক পর আরেকটা বাজায়। অনেকক্ষণ ধরে তার কোনো সাড়াশব্দ শুনতে পাইনি বলে ভেবেছিলুম সে বুঝি শুতে গেছে। ডাক্তার আমার ঘরে পেয়ে গেছেন ন্যুরন্‌বের্ক মোকদ্দমার একখানা বই—যেটাতে যুদ্ধের সময় নাৎসি ডাক্তারদের অদ্ভুত অদ্ভুত এক্‌স্‌পেরিমেন্টের পরিপূর্ণ বর্ণনা দেওয়া আছে। রাত দশটা বাজতে না বাজতেই তিনি সেই বই নিয়ে রাতের মত উধাও।

শহ্‌র্‌-ইয়ার বারান্দার নিভৃত প্রান্তে আমাকে আবিষ্কার করলেন।

আমি বললুম, 'ঠিক সময়ে এসেছেন। একটু পরেই চাঁদ উঠবে আর এই জায়গাটা থেকেই সে দৃশ্যটি সবচেয়ে ভালো দেখা যায়। ডাক্তারের ঘরে তো এখনো আলো জ্বলছে; ওকে ডেকে আনুন না।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'শুনুন, আপনার সঙ্গে সোজাসুজি পরিষ্কার কথা হয়ে যাওয়াই ভালো। আমার স্বামীর অনুপস্থিতিতে কি আমার সঙ্গ পেলে আপনার অস্বস্তি বোধ হয়?'

ঠিক ধরেছে! আমার বোঝা উচিত ছিল শহ্‌র্‌-ইয়ারের বুদ্ধি এবং স্পর্শ-কাতরতা দুইই তীক্ষ্ণ। কিন্তু আমি এর উত্তর দেব কি?

আমি বললুম, 'না। কিন্তু তিনি যদি সেটা পছন্দ না করেন তবে আমি দুঃখিত হব।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার বললেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আপনি তো জ্ঞানী লোক; আপনি তো বুঝলেন যে, তাঁর কোনো আপত্তি থাকলে তিনি আমাকে আপনার এখানে নিয়ে আসবেন কেন?'

আমি বললুম, 'আমাদের এই বাঙলা দেশে মুসলমান মেয়েরা সবে মাত্র অন্দর

মহল থেকে বেরিয়েছেন। এঁরা পরপুরুষের সঙ্গে কি ভাবে মেলা-মেশা করবেন, কতখানি কাছে আসতে পারবেন এ সম্বন্ধে আমাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই, থাকার কথাও নয়। ইয়োরোপে এ বাবদে মোটামুটি একটা কোড্‌ তৈরী হয়ে গিয়েছে, কয়েক পুরুষের মেলা-মেশা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে। এই দেখুন না, কণ্টিনেণ্টের একটা মজার কোড্‌। নাচের মজলিসে কোনো বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ হলো, কিন্তু পরিচয়টা তাঁর স্বামী করিয়ে দেন নি। এস্থলে আমি যদি মহিলাটির সহিত ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করি তবে লোকে আমাকে আর যা বলে বলুক 'ছোট লোক' বলবে না। পক্ষান্তরে স্বয়ং স্বামী যদি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেন, এবং তারো বাড়া, যদি তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণে করে খাইয়েদাইয়ে—এবং তারপর যদি স্বামীর অজানতে আমি মহিলার সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করি তবে সমাজ আমাকে বলবে 'ছোটলোক', 'নেমকহারাম'। ভাবখানা এই, ভদ্রলোক তোমাকে বিশ্বাস করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন, আপন স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, আর তুমি সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করলে! আবার—'

আমার 'লেকচার' আর শেষ হল না। ইতিমধ্যে শুনি শহ্‌র্‌-ইয়ার খিল খিল করে হাসতে আরম্ভ করেছেন। হাসি আর কিছুতেই থামে না। ইয়োরোপীয় সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার এই সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে এতখানি হাসবার কি থাকতে পারে, আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না।

হাসি পুরো থামার পূর্বেই শহ্‌র্‌-ইয়ার বলতে লাগলেন, এবং বলার মাঝে মাঝেও চাপা হাসি কলকলিয়ে উঠলো—'আপনি কি বেবাক ভুলে গেলেন, ট্রেনে আমি নিজে, স্বেচ্ছায়, গায়ে পড়ে, ইংরিজিতে যাকে বলে উইদাউট এনি প্রোভোকেশন আপনার সঙ্গে আলাপ করেছিলুম?'

আমি বললুম, 'কী আশ্চর্য! আমি এমনি একটা উদাহরণ দিচ্ছিলুম। আমি কি আর আপনি আমি ডাক্তারের কথা ভাবছিলুম?'

শহ্‌র্‌-ইয়ার তবু হাসতে হাসতে বললেন, 'বুঝেছি বুঝেছি, খুব ভালো করেই বুঝেছি। ইয়োরোপের উদাহরণ যে এদেশে খাটে না সে আমি ভালো করেই জানি। ইয়োরোপের কেন, বাঙালী হিন্দুর উদাহরণও আমাদের বেলা সর্বক্ষেত্রে খাটে না, সেও তো জানা কথা। জানেন, এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি।'

'যে সাহিত্য মানুষ পড়ে সেটা যে তার জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করবে এ তো জানা কথা। বাঙলা সাহিত্য গড়ে তুলেছে হিন্দুরা। বৈষ্ণব পদাবলী থেকে রবীন্দ্রনাথ। সৈয়দ আলাওল বা নজরুল ইসলাম তো এমন কোনো জোরালো ভিন্ন আদর্শ দিয়ে যান নি যার উল্লেখ করা যেতে পারে। এই হিন্দুর গড়া বাঙলা সাহিত্যে বিবাহিতা নারীর আদর্শ কি, সে তো সবাই জানে। সে

সহধর্মিণী, অর্ধাঙ্গিনী এবং সর্বোপরি সে পতিব্রতা। ওদিকে দেখুন আপনার স্ত্রী আপনার সহধর্মিণী নাও হতে পারেন, তিনি যদি খৃষ্টান হন। এবং এই 'পতিব্রতা'র আদর্শটা আমাদের, মুসলমানদের ভিতর তো ঠিক সে রকম নয়। কোনো সন্দেহ নেই, স্ত্রী সেবা করবে, ভালোবাসবে তার স্বামীকে, তার সুখ-দুঃখের ভাগী হবে, তার আদেশ মেনে চলবে—কিন্তু, এখানে একটা বিরাট কিন্তু আসে—স্ত্রী তার সর্বসত্তা সর্বব্যক্তিত্ব সর্বঅস্তিত্ব স্বামীতে লীন করে দিয়ে 'পতিব্রতা' হবে এ কনসেপশন তো আমাদের ভিতর নেই। খুব একটা বাইরের মামুলী উদাহরণ নিন। আমার আব্বাজানের নাম মুহম্মদআল্লা বখ্শ খান—তাঁর পূর্বপুরুষ পাঠান হন আর নাই হন, তাঁরা সাতপুরুষ 'খান' উপাধি ব্যবহার করেছেন। আমার আম্মা আবার চৌধুরী বাড়ীর মেয়ে—তাই তিনি শেষ দিন পর্যন্ত নামসই করেছেন মিহ্রুন্নিসা চৌধুরী। তিনি মাত্র কয়েক বছর হলো ওপারে গেছেন। শেষের দিকে সবাই যখন হালফ্যাশান মাফিক তাঁকে বেগম খান, মিসেস খান বলে সম্বোধন করছে তিনি তখনো সই করছেন, মিহ্রুন্নিসা চৌধুরী।'

আমি শুধালুম, 'সমস্যাটা ঠিক কোন্‌খানে আমি বুঝতে পারছি নে। অর্থাৎ বাঙালী মুসলমান মেয়ের বিশেষ সমস্যাটা কোন্‌খানে?'

শহ্রু-ইয়ার বড় মধুরে হাসল। বললে, 'আমার মগজটা বড্ডই ঘোলাটে আর হৃদয়—সেটা যেন ফেটে ফেটে বেরুতে চায়, তাই না আপনাদের বাঙাল মেয়ে বলেছে,

ইচ্ছা করে কলিজাডারে
গামছা দিয়া বান্ধি—

শুনুন। হিন্দু মেয়েরা অন্দর থেকে বেরিয়েছেন কবে? বছর তিরিশের বেশী হবে না। অথচ স্বরাজ লাভের ফলে এবং অর্থনৈতিক অবনতি বশতঃ কিংবা আকাশে বাতাসে এক অভিনব সর্বব্যাপী স্বাধীনতার আবহাওয়া সৃষ্ট হওয়ার দরুন এই দশ-পনরো বৎসরেই মুসলমান মেয়েরা দ্রুত হিন্দুদের কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। গত ত্রিশ বৎসর ধরে হিন্দু মেয়েরা এই যে তাদের আংশিক স্বাধীনতা ক্রমে ক্রমে বাড়িয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তারা জানা-অজানার চেষ্টা করছে সে স্বাধীনতা ঠিক কি ভাবে কাজে লাগাবে, তার কোড্‌স্ কি, তার নর্‌ম্ কি। একটা সামান্য দৃষ্টান্ত নিন। কণ্টিনেণ্টে কোনো মেয়ে যদি বিয়ের উদ্দেশ্য কিংবা অন্য যে-কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই হোক তার পরিচিতের সংখ্যা বাড়াতে চায় তবে সে তার বান্ধবী—নিদেন ল্যাণ্ডলেডির সঙ্গে নাচের হলে যায়। পুরুষরা এসে বাও করে নাচবার জন্য নিমন্ত্রণ জানায়—তার জন্য কোনো ফর্মাল ইন্‌ট্রোডাকশন দরকার নেই—এবং এই করে করে মেয়েরা যত খুশী তাদের পরিচিতের সংখ্যা

বাড়াতে পারে। এদেশে এখনো সমস্তটা চান্‌স্‌। বান্ধবীর মাধ্যমে, আপিসের সহকর্মিণীদের মাধ্যমে যে আলাপ-পরিচয় হয় সেটাকে 'উটকো' মেথড—অর্থাৎ চান্‌স্‌ বলা যেতে পারে।

আমার বক্তব্য, হিন্দু মেয়েরা যে উদ্দেশে চলেছে সেটা মুসলমানদের ঠিক সুট করবে না।

একটা কথা তো ঠিক, স্ত্রী-স্বাধীনতা অর্‌ নো স্ত্রী-স্বাধীনতা সাড়ে পনরো আনা মেয়ে বিয়ে করে মা হতে চায়। পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে. আপনি স্বাধীন স্বেচ্ছায় হিন্দু মেয়ে বর বাছাই করে নিয়ে হবে—কি হবে?—পতিব্রতা।

মুসলমান মেয়েও ঠিক ঐ একই পন্থায় আপন স্বামী বেছে নেবে কিন্তু সে হিন্দু মেয়ের মত পতিব্রতা হওয়ার আদর্শ বরণ করে নিতে পারবে না। দোহাই আল্লার, তার অর্থ এই নয় যে সে অসতী হবে—তওবা, তওবা!—তার অর্থ, আবার বলছি, সে তার সর্বসত্তা স্বামীতে বিলীন করে দিতে পারবে না।

আপনি ভাববেন না, আমি কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ সে-কথা বলছি—আমি শুধু পার্থক্যটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি।'

আমি বললুম, 'পতিব্রতা-ফতিব্রতার আদর্শ আজকাল হিন্দু রমণীরা কি আর খুব বেশী বিশ্বাস করে? আর 'আজকাল'ই বলছি কেন? ইংরেজী সভ্যতা-কৃষ্টির সংস্পর্শে এসে তারা সতীদাহ বন্ধ করলো, বিধবা-বিবাহ আইন পাস করালো, তারপর সিভিল মেরিজ যার ভিতর তালাকের ব্যবস্থা রয়েছে, হালে হিন্দুশাস্ত্র মত বিবাহ-প্রতিষ্ঠানের ভিতরও তালাকের ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা হয়েছে।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার বানু দেখলুম অনেক চিন্তা করে রেখেছেন। বললেন, 'সতীদাহ বন্ধ করাটা হিন্দুকে মেনে নিতে হয়েছে, নইলে সাজা পেতে হয়। কিন্তু যেখানে বাছাই করার স্বাধীনতা রয়েছে সেখানে হিন্দু নারী কোন্‌টা বরণ করেছে? এ যাবৎ কটা বিধবা বিবাহ হয়েছে—'

আমি বললুম, 'মুসলমান মেয়েদের ভিতরই বা কটা হয়? কিংবা ধরুন তালাক। এদেশের মুসলমান ভদ্রসমাজে কি আরবিস্তানের আধার আধারও তালাক হয়?'

শহ্‌র্‌-ইয়ার বললেন, 'আরবিস্তানে তালাক দেয় পুরুষে—মেয়েদের তালাক দেবার অধিকার এতই সীমাবদ্ধ যে সে-অধিকার আদপেই নেই বললে চলে। আমি মেয়েদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা তুলছি—যেমন বিধবা-বিবাহ। প্রশ্ন উঠবে, আরো অধিক সংখ্যক মুসলিম বাল-বিধবা বিয়ে করল না কেন?

আসলে কি জানেন, পরাধীন অবস্থায় মানুষে মানুষে পার্থক্য কমতে থাকে; স্বাধীন অবস্থায় মানুষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ফুটে বেরোয়। অর্থনৈতিক এবং

অন্যান্য নানা কারণে এদেশের মুসলমান রমণী উভয়ই ছিল স্বাধীনতালুপ্ত হারেমবন্ধ (বরঞ্চ আফগানিস্থান, ইরান আরবের মেয়েরা বোরকা পরে রাস্তায় বেরোয়, আত্মীয়স্বজনের মোলাকাৎ করে এমন কি বাজার-হাটেও যায়—এদেশে সে ব্যবস্থাও ছিল না)। তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দুইই এক। এই যে আপনার ড্রইংরুম—এর ভিতর ডার্বি ঘোড়া এবং ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়াকে ছেড়ে দিলে দুজনাই ছুটবে মোটামুটি একই বেগে। কিন্তু ছেড়ে দিন আপনার বাড়ির সামনের খোলা মাঠে। তখন কোথায় ডার্বি, আর কোথায় ছ্যাকড়া! যার যার ভিতরকার সুপ্ত বৈশিষ্ট্য তখন পরিপূর্ণ মাত্রায় চোখের সামনে জাজ্বল্যমান হয়।

অন্দর মহল থেকে বেরিয়ে আসুক হিন্দু মুসলমান দুই নারীই; তখন দেখতে পাবেন তাদের পার্থক্য কোন্ জায়গায়।

আবার বলছি, কসম আল্লার, আমি আদৌ বলছি না, মুসলমান মেয়ে হিন্দু মেয়ের চেয়ে সুপেরিয়র; আমি বলছি, সে ডিফরেণ্ট।'

এমন সময় দুটো তালগাছের মাঝখান দিয়ে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ একটা গাছের উপর ঈষৎ হেলান দিয়ে আকাশের পূর্বপ্রান্ত আলোকিত করে দিলেন।

শহ্‌র-ইয়ার বললে, 'আহ্! বড় সুন্দর এ জায়গাটা। অতএব এখন থাক নারী-সমস্যা!'

চুপ করে তাকিয়ে আছি ল'বাবুর বাড়ির পরিত্যক্ত ভিটে ছাড়িয়ে, রেল লাইন পেরিয়ে তালসারির দিকে। বার বার এ দৃশ্য দেখেও আমি তৃপ্ত হই নে, কিন্তু এও সত্য শহ্‌র্-ইয়ারের আনন্দ তার এখানে আসা অবধি প্রত্যেক আনন্দ ছাড়িয়ে যায়। চুপ করে আছে বটে কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল তার সর্বাঙ্গ থেকে যেন সে-আনন্দ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

ঘোরঘুট্টি অন্ধকার দূর করতে করতে চাঁদ আর কিছুক্ষণ পরেই তার জ্যোতিঃশক্তির শেষ সীমানায় পেঁছিবেন—এরপর রাতভর যে আলো সেই আলোই থাকবে। আমি শহ্‌র্-ইয়ারকে বললুম, 'পূর্ণিমা চাঁদের যেন বড় দেমাক, অন্তত এর তুলনায়। আচ্ছা, একবার ডাক্তারকে ডেকে দেখালে হয় না?'

বললে, 'নিশ্চয়ই, কিন্তু কি জানেন, উনি নিজেই বলেন, এসব দৃশ্যের সৌন্দর্য তিনি বুঝতে পারেন কিন্তু সেটা তাঁর হৃদয় স্পর্শ করে না। ওঁদিকে অসম্ভব ভদ্রলোক বলে আমরা যতক্ষণ চাই তিনি আমাদের সঙ্গ দেবেন—এবং বিশ্বাস করবেন না, সানন্দে। এবং তাতে কণামাত্র ভণ্ডামি নেই। ঠিক সেই রকম শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। দরকার হলে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সঙ্গীতের সূক্ষ্মতম তত্ত্ব নিয়ে বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। কারণ সমস্ত সঙ্গীতশাস্ত্র তিনি কঠোর কঠিন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আয়ত্ত করেছেন। জানেন, একবার একটি অজানা অচেনা তরুণ গাওয়াইয়াকে এক জলসায় গোটাকয়েক

দম্ভী অযথা আক্রমণ করে—ঘরানা ঘরানায় আড়াআড়ি তো এদেশে একটা কেলেঙ্কারির ব্যাপার। কেন জানি নে, উনি গেলেন ক্ষেপে—অবশ্য বাইরে তার কণামাত্র প্রকাশ তিনি হতে দেন নি, কখনো দেন না, একমাত্র আমিই শুধু বুঝতে পেরেছিলুম—এবং তারপর সেকি তর্কযুদ্ধ! শুধু যে সেই তরুণের ন্যায্য প্রাপ্য সম্মান সপ্রমাণ করে দিলেন তাই নয়, তার বিরুদ্ধপক্ষের মহারথীদের সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে নিরপেক্ষ পাঁচজনের মনে গভীর সন্দেহ জাগিয়ে বাড়ি ফিরলেন। অথচ তিনি আমাকে বহুবার বলেছেন, সঙ্গীত তাঁর হৃদয় স্পর্শ করে না! কী জানি, হয়তো ডাক্তারি শেখার পূর্বে রসগ্রহণ করার ব্লটিং পেপারখানা করকরে শুকনোই ছিল; এখন সেটা চিকিৎসা-জ্ঞানে জবজব।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, 'কি জানি! আমার প্রতি তাঁর ভালোবাসাটাও বোধ হয় ঐ ধরনের! তবে কিনা, বিয়ের দশ বছর পরে, এই ত্রিশ বছর বয়সে এটা নিয়ে চিন্তা করা বেকার!'

হঠাৎ উঠে বললেন, 'এবারে শুতে যাই। যে ঘরখানা আমায় দিয়েছেন তার জানলা দিয়ে মেটানেল আনকল মিঃ মুনের সঙ্গে মনে মনে রসালাপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়বো। কিন্তু তার পূর্বে একখানা শেষ রেকর্ড বাজাবো। বলুন, কি বাজাবো?'

আমি চিন্তা না করেই বললুম, "কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশ-কুসুম চয়নে।"

চার

পরের দিন ওরা চলে যাওয়ার সময় আমাকে দিয়ে যে শুধু কলকাতা আসার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল তাই নয়, শহর্-ইয়ার পাকা মহকুমা মোক্তারের মত ক্রস্ এগজামিনেশন করে করে একেবারে তারিখ এমন কি কোন্ ট্রেন ধরতে হবে সেটা পর্যন্ত ঠিক করে দিয়ে গেল। একাধিকবার বললো, 'এখানে তো দেখে গেলুম, আপনি কিভাবে থাকেন, আমাদের ওখানে সেভাবেই ব্যবস্থা করবো। আপনার খুব অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না।'

তিন দিন পরেই চিঠি:

১২ গোলাম সিদ্দিক রোড,
কলকাতা

"সালাম পর আরজ এই,

আপনার ওখানে কিভাবে আমার সময়টা কাটল সেটা আপনি নিজেই দেখেছেন।

আমরা আলোচনা করছিলুম, মুসলমান মেয়েদের নিয়ে, যারা অন্দরমহল

থেকে বেরিয়ে আসছে ; বলুন তো, আপনার ওখানে গিয়ে আমি যে-আনন্দ ও বৈভব—গনীমৎ শব্দটা আরও ভালো—পেলুম, কটা মুসলমান মেয়ের ভাগ্যে সেটা জোটে ? আমরা যে কী গরীব সে তো আপনি জানেন না, কারণ আপনি সমস্ত জীবন কাটিয়েছেন আপনার হিন্দু আত্মজনদের সঙ্গে।

স্বাধীনতা বড় সম্পদ। আমরা, মুসলমান মেয়েরাও ক্রমে ক্রমে স্বাধীন হচ্ছি কিন্তু সে-স্বাধীনতার ফল আস্বাদন করার সুযোগ পাচ্ছি কই ? মনে হয়, আমি যেন একাকিনী কোনো নির্জন দ্বীপে বাস করছি ; প্যাঁটরায় লক্ষ টাকা কিন্তু কিনব কি ? লোকালয়ে এই লক্ষ টাকা দিয়ে যে কত কিছু করা যায় সেটা না জানা থাকলে ব্যঙ্গটা অতখানি নিষ্ঠুর মনে হতো না। এই লক্ষ টাকা বিলিয়ে দিয়েও আমি আনন্দ পেতুম। কিন্তু দেব কাকে ?

আপনার ডাক্তার লেবরেটরিতে গেছেন সকাল সাতটায় ; তাঁকে ফের পাবো রাত আটটায়—কপাল যদি মন্দ না হয় !

আপনি আমার বহুৎ বহুৎ আদাব তসলিমাৎ জানবেন।

খাকসার

শহ্‌রু-ইয়ার"।

অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চিঠিখানা পড়লুম। এই প্রথম নয়, আগেও ভেবেছি, এ-মেয়ের অভাব কোন্‌খানটায় ? স্বামী আপন কাজ নিয়ে ব্যস্ত বলে সে তার যথেষ্ট সঙ্গ পায় না—এইটেই দুঃখ ? উহুঁ, তা নয়। এ মেয়ে গতানুগতিক অর্থে শিক্ষিতা নয় ; এ মেয়ে বিদগ্ধা এবং এর কল্পনাশক্তি আছে। দিন-যামিনীর অষ্টপ্রহরের প্রত্যেকটি প্রহর নিঙড়ে নিঙড়ে তার থেকে কি করে আনন্দ-রস বের করতে হয় সে সেটা খুব ভালো করেই জানে। তাকে তাস মেলে 'পেশেনস্' খেলে দিন কাটাতে হবে না। এ মেয়ে গোপালভাঁড়, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে। গোপাল ঢেউ গুনে পয়সা কামিয়েছিল। এ মেয়ে ঢেউ গুনে আনন্দের ভাণ্ডার ভরে তুলবে। এবং বাড়ি ফিরে তাই দিয়ে হরিমুট লাগাবে।

আচমকা খেয়াল গেল, কই, আমার কলকাতা যাওয়ার কথা তো কিছু লিখলো না ? যাক্ গে—তার জন্য এখনো সময় আছে।

কোন্ এক পোড়ার বিশ্ববিদ্যালয় 'তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্ব' প্রবর্তন করতে চায়। আমাকে অনুরোধ করেছে প্ল্যানটা করে দিতে। সাধারণ অবস্থায় এসব বুনো হাঁস খেদাতে আমি তো রাজীই হই না, উল্টে কয়েকটি সরল প্রাঞ্জল বাক্যে এমন সব আপত্তি উত্থাপন করি যে তারা প্ল্যানটার আঁতুড়ঘরে তার গলায় নুন ঠেসে দেয়। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সে-পথ বন্ধ। পোশাকি সরকারী চিঠির এক কোণে আমার বন্ধু—সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চেন্‌সেলর—ক্ষুদে ক্ষুদে হরফে ফরাসীতে লিখেছেন, 'বাপের সুপুত্তুরের মত প্ল্যানটি পাঠিয়ো, নইলে

এ-শহরের যে-সব পাওনাদারদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছিলে তাদের প্রত্যেককে তোমার বর্তমান ঠিকানাটি জানিয়ে দেব—উইদ মাই বেস্‌ট্‌ কমপ্লিমেণ্টস্‌।'

প্ল্যানটা তৈরী করা তো সোজা—কিন্তু সেমেণ্ট কই, লোহা কোথায়? অর্থাৎ এই পবিত্র আর্যভূমিতে যাবনিক ধর্মগুলোর মেটিরিয়েল পাই কোথায়?

তারই যোগাড়-যন্ত্রের দুর্ভাবনায় দিনগুলো কোন্‌ পথে যে চলে গেল খেয়ালই করিনি। অবশেষে একদা রাত্রে দ্বিপ্রহরে ত্রিশটি পাতার শেষ পাতাটি টাইপ করে ঘুমুতে গেলুম।

'মাস্টার' বড় ঘেউ ঘেউ করছে,—চতুর্দিকে প্রতি রাত্রে চুরি হচ্ছে সে খবর বাবুর্চী আমায় দিয়েছিল—কিন্তু এ চোরটা তো একেবারেই রামছাগল। দু'দুটো আলসেশিয়ান আমার বাড়িতে। এ দেশটাই মোস্ট ইন্‌কমপিটেণ্ট, চোরগুলো পর্যন্ত নিষ্কর্মা—দিনের বেলা একটু খবরাখবর নিলেই তো বুঝতে পারতো ভদ্র চোরের পক্ষেই এ বাড়ি ভাদ্রবধূ।

নাঃ! উঠতেই হলো। 'মাস্টার' ওরকম করছে কেন? বিষাক্ত খাবার দিচ্ছে না কি কেউ?

দরজা খুলে বারান্দার আলো জ্বাললুম।

দু'বার চোখ কচলালুম। গায়ে চিমটি কাটলে অবশ্য ভালো হতো—স্বপ্নটা তাহলে উপে যেত।

ব্যাকরণে যখন সে ভুল হয়েই গেল তখন স্বীকার করতেই হয় সামনের ডেকচেয়ারে বসে শহ্‌র্‌-ইয়ার ঠোঙ্গা থেকে শিককাবাব বের করে করে মাস্টারকে খাওয়াচ্ছেন। আমাকে দেখে তাচ্ছিল্যভরে বললেন, 'আপনি আবার উঠলেন কেন!'

আমি বললুম, 'বেশ, শুতে যাচ্ছি। শুধু একটা কথা শুধোই, শ্মশানের কাছে এসে টাঙার পথ যেখানে শেষ হয় সেখান থেকে আপনি এলেন কি করে? তার পর তো পথ নেই, অন্ধকার—'

'ও। রিকশাওয়ালা খানিকটে পথ এসেছিল। আমি বিদেয় করে দিলুম। ব্যাগটা তো ভারী নয়।'

রবীন্দ্রনাথের মত কবি পরিপক্ক বয়সে তাঁর যত অভিজ্ঞতা, অন্যের হৃদয়ে তাঁর অনুভূতি সঞ্চারণ করার যত দক্ষতা, তাঁর সম্মোহিনী ভাষা অলংকারধ্বনি সর্বস্ব প্রয়োগ করে একটি দীর্ঘ কবিতার মাঝখানে এসে থমকে দাঁড়িয়ে, যেন হার মেনে বলছেন, দুটি শব্দ—

বৃথা বাক্য।

যামিনীর তৃতীয় যামে, জীবনেরও তৃতীয় যামে অর্থাৎ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে গুরুবদননিঃসৃত এই আপ্তবাক্যটি পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করলুম। চুপ করে বসে থাকা ভিন্ন গতি কি?

মাস্টারকে খাওয়ানো শেষ হলে বাথরুমে গিয়ে হাত ধুয়ে এসে, ঘোমটা টেনে আগের চেয়ে আরো বিনয়নম্র সেলাম করলো।

পাশে চেয়ার এনে বসে বললে, 'আজ আর চাঁদ উঠবে না। না?'

আমি বললুম, 'আজ শুক্লা-পঞ্চমী। চন্দ্র অনেকক্ষণ হলো অস্ত গেছে। আচ্ছা আমি শুধু আপনাকে একটি প্রশ্ন শুধবো। এ আসাটা কিভাবে হলো?'

অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললে, 'একটি কেন, আপনি যত খুশী আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারেন; আমি নিশ্চয়ই আমার সাধ্যমত উত্তর দেব। কথা ছিল উনি লেবরেটরি থেকে সন্ধ্যা আটটায় ফিরে আসবেন। আমরা খেয়েদেয়ে সাড়ে ন'টার গাড়ি ধরে এখানে দেড়টায় পেঁছিব। তিনি নিশ্চয়ই কাজে ডুবে গিয়ে সব কথা ভুলে গেছেন, আর এরকম তো মাঝে মাঝে হয়ই। আমি আদপেই দোষ দিচ্ছি নে। যে যে-জিনিস ভালোবাসে তাতে মজে গিয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে যাবে এ তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমি তাঁর জন্য শেষ মুহূর্ত অপেক্ষা করে দুটি খেয়ে স্টেশনে এসে গাড়ি ধরলুম।'

'আমি তো কাল বিকেল পাঁচটার গাড়িতে কলকাতা আসতুমই।'

'এক্‌জেক্‌ট্‌লি। যাতে সেটাতে কোনো নড়চড় না হয় তাই আসা।'

এবারে পরিপূর্ণ বিশ্বাসে মনে মনে বললুম, 'বৃথা বাক্য।'

বললুম, 'দুটি খেয়ে বেরিয়েছেন, এখন অল্প অল্প খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই। সামান্য কিছু খাবেন?'

'আর ক'ঘণ্টা বাকি? সকালবেলা চা খাবো।'

আমি একটু হেসে বললুম, 'কে বললে মুসলমান মেয়ে, বিশেষ করে আপনি, আপনাদের স্বাধীনতার ফল উপভোগ করতে পারছেন না? কটা হিন্দু মেয়েরই এ রকম সাহস আছে?'

খুশী হয়ে বললে, 'এবং ঠিক সেই কারণেই এইখানে বসে আপনাকে বলেছিলুম, মুসলমান মেয়ে ডিফরেণ্ট, কিন্তু কলকাতায় ফিরে গিয়ে যত চিন্তা করতে লাগলুম, ততই মনে হলো এই যে আমি বারবার ডিফরেণ্ট ডিফরেণ্ট বলছি এটা আমারই কাছে খুব পরিষ্কার নয়, এবং যেটুকু পরিষ্কার সেটুকুও বুদ্ধি দিয়ে বুঝিনি, অনুভব করেছি হৃদয় দিয়ে। বুদ্ধির জিনিস বোঝানো তেমন কিছু কঠিন নয়, কিন্তু অনুভূতির জিনিস অন্যের ভিতর সঞ্চারিত করতে পারে শুধু আর্টিস্ট—সেও বহু সাধনার পর। কিন্তু এ সব কথা পরে হবে। আপনি ঘুমুতে যাবেন না?'

'আর আপনি?'

'আমি একটা কাজ সঙ্গে নিয়ে এসেছি। তার কিছুটা এইখানে বসে করবো। ওয়েস্ট জর্মনি থেকে একটা খবরের কাগজ এ-দেশের নারীসমাজের অবস্থা জানতে চেয়েছে। কিন্তু বিপদ হলো গিয়ে যে লেখাটেখার অভ্যাস একে তো আমার নেই, তার উপর ইয়োরোপীয় কাগজের জন্য লেখা, ইয়োরোপ গিয়ে

কন্টিনেন্টাল ডিগ্রী যোগাড় করা, আরো কত কী—এক কথায় ইয়োরোপ ইয়োরোপ সর্বক্ষণ ইয়োরোপ এই মনোবৃত্তিটাই আমাকে পীড়া দেয়। তাই লেখাটা তৈরী করবার জন্য কোনো উৎসাহ পাচ্ছি নে। কিন্তু আর না, আপনি দয়া করে শুতে যান।'

'নিশ্চয়ই যাবো, যদি আপনিও কাজটা আজ রাতের মত মুলতুবী রেখে ঘুমুতে যান।'

'আপনার কোনো আদেশ আমি কখনো অমান্য করেছি?'

শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম, এ মেয়ে কী ধাতু দিয়ে তৈরী? এক দিক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, আমার পর্দানশীন মা বোনের মত শান্ত, নম্র, বিনয়ী। ট্রেনে একবার ঐ যেটুকু যা হামলা করেছিল—সেটা নিশ্চয়ই ব্যত্যয়। আর এই যে দুপুর রাতে আমার বাড়িতে আসা, সেটা সে পর্যায়ে পড়ে না। এটার মূলে আছে, আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা। মেয়েটির মন-হৃদয় যে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ সে-বিষয়ে আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই। এই আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তার সঙ্গে নিষ্পাপ চরিত্রের সম্মেলন এটা বিরল এবং এর সঙ্গে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তি বা অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে আসা না-আসা অচ্ছেদ্য সম্পর্কে গ্রথিত নয়। সম্পূর্ণা অশিক্ষিতা কট্টর পর্দানশীন আমার সম্পর্কে এক ভাবী তাঁর স্বামীর নষ্টাচারে ক্রুদ্ধ হয়ে রাতদুপুরে থানা-ঘাটে হাঁকডাক ছেড়ে নৌকো যোগাড় করে চলে যান কয়েক মাইল দূরের গোসাঁইদের আখড়ায়। একে তো ছোট সেই শহরের সবাই সে কেলেঙ্কারির কথা জেনে যায়, তদুপরি ঐ আখড়াটির মোহান্তের আবার খুব সুনাম ছিল না। শুধু তাই নয়, বৌদিটি আখড়ায় দু'দিন কাটানোর পর ফের সেই পাটনিকে ডেকে পাঠিয়ে ফিরে এলেন শহরে। দাসীকে দিয়ে জড়ো করালেন পাঁচজন মুরুব্বীকে। ওঁরা সবাই এসেছিলেন অত্যন্ত অনিচ্ছায়, কিন্তু জানতেন না এলে আমার বৌদিটি এঁদের প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে যা হুলস্থুল লাগাবে তার চেয়ে পঞ্চায়েতে যাওয়াই ভালো—বৌদির পয়েন্ট অতি পরিষ্কার—'আপনারা বিচার করে দিন, আমার তালাক পাওয়ার হক্ক আছে কিনা।' মুসলমান হিসাবে এস্থলে কেউ বৌদির আচরণে কোনো খুঁৎ ধরতে পারে না। শেষটায় বৌদি তালাক পেল, নির্মম কাবুলীর মত তার মহর, অর্থাৎ স্ত্রীধনের প্রত্যেক কড়ি আদায় করে মক্কা চলে গিয়ে সেখানে বাকী জীবন কাটালো। এর সব-কিছু সম্ভব হলো কারণ আমাদের অঞ্চলের সবাই জানতো, ঐ বৌদির মত পুণ্যশীলা নারী আমাদের মধ্যে কমই আছেন। এবং তাঁর সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস—আমি যা করছি ঠিকই করছি।

বৌদির উদাহরণটি মনে এল বটে এবং শহ্‌র্‌-ইয়ারের চরিত্রের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের মিল আছে বটে, কিন্তু দু'জনার বাতাবরণে আসমান-জমীন ফারাক। আমার সম্পর্কের দাদাটি ছিলেন মাইডিয়ার লোক, কিন্তু একেতে—অর্থাৎ এক-

মাত্র ভাবীতে তাঁর 'জিনিয়াস' সীমাবদ্ধ না রেখে ভূমাতে সুখের সন্ধান করতেন। ডাক্তার জুল্‌ফিকার তাঁর ঠিক বিপরীত। অতিশয় একদারনিষ্ঠ—এমন কি স্ত্রীর খামখেয়ালি পর্যন্ত হাসিমুখে মেনে নিয়ে তাঁকে সঙ্গ দেন। শহ্‌রু-ইয়ারও তাঁকে গভীর ভাবে ভালোবাসেন এবং ভক্তি করেন—সেটা এ যুগে কিছু কম কথা নয়।

তবে ?

তারপর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

স্বপ্নে শুনছিলুম কে যেন অতি মধুর কণ্ঠে গান গাইছে। প্রত্যেকটি স্বর, প্রত্যেকটি শব্দ যেন এক একটি নিটোল শিশিরবিন্দু। আর শিশিরবিন্দুরই মত যেন আপনার থেকে জমে উঠছে; তার পিছনে কোনো সচেতন প্রচেষ্টা নেই। এরকম স্বতঃস্ফূর্ত মধুর ধ্বনি বছরের পর বছর আপ্রাণ রেওয়াজ করে হয় না—এর সঙ্গে একমাত্র তুলনা করে শুধু বলা যায় এ যেন মাতৃস্তন্যে সহজ দুগ্ধসঞ্চার। সহজে বয় তার স্রোত। সহজে পান করে নবজাত শিশু। যে শুনবে সে-ই পান করবে এ-সঙ্গীত শিশুরই মত অপ্রচেষ্টায়।

ধীরে ধীরে উঠে সঙ্গীত-উৎসের সন্ধানে বেরুলুম। কোথা থেকে আসছে এ-সঙ্গীত ? বেহেশ্‌ৎ থেকে না হ'লে খুঁজে পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব নাও হতে পারে। মাটিতে পা ফেলতেই বুঝলুম এটা স্বপ্ন নয়। মোটামুটি অনুমান করলুম কোন্ জায়গায় এ-গানের উৎস।

এ বাড়ির দেড়তলায় একটি ছোট্ট কুটুরি আছে। সেখানে দেখি শহ্‌রু-ইয়ার নড়াচড়া করে কি-সব সাজাচ্ছে। আমাকে দেখেই শুধলো, 'চা খেয়েছেন ?'

'না।'

'বসুন এই মোড়াটায়, আমি বানিয়ে দিচ্ছি। কাটু স্টেশনে গেছে, ফেরার পথে হাট করে নিয়ে আসবে—আজকে হাটবার।'

তখন ভালো করে তাকিয়ে দেখি শহ্‌রু-ইয়ার কুটুরিটি চা বানাবার, এবং সেইখানেই আরামে বসে চা খাবার অতি চমৎকার ব্যবস্থা করেছে। বললে, 'এ ঘরের যা যা প্রয়োজন সেগুলো আমি বাক্সের ভিতর রেখে এসেছি স্টেশনে। কাটু আনতে গেছে। আপনি জানেন না, আমি বেলা-অবেলায় চা খাই। তাই এ-ব্যবস্থা। রান্নাতে আমার কোন শখ নেই। তবে মা ডাকসাইটে রান্নার আর্টিস্ট ছিলেন। হাঁসের বাচ্চা কি আর সাঁতার কাটতে পারে না—তাই যদি নিতান্তই চান—'

একটু থেমে বললে, 'ভয় নেই, ভয় নেই। এ বাড়িটাকে আমরা উইক-এণ্ড কটেজ রূপে দেখছি নে। এটা কি রকম জানেন ? খুব বড়লোক যে-রকম ব্যাঙ্কে টাকা রাখে। ওটা খরচ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ মাসের আমদানিটাই পুরো খরচ হয় না কোনো মাসেই।'

আমি বললুম, 'আমার কি মনে হয় জানেন ? আপনি যদি এখানে এসে

আনন্দ পান তবে যত খুশী আসবেন। কিন্তু ভালো হয় ডাক্তারকে যদি সঙ্গে নিয়ে আসেন। বিশেষ করে এই কারণে বলছি, ভদ্রলোক যে রকম বেদম খাটছে সেটা তার পক্ষে ভালো নয়। এখানে এলে দেহমন দুইই তাঁর জুড়োয়, আমার তো তাই মনে হয়। ওদিকে আপনারও কোনো অসুবিধা হবে না, কারণ আমি খুব ভালো করেই জানি আপনি এখানে আপন মনে ঘুরে বেড়ালে, আমার সঙ্গে বসে গল্প করলে উনি ভারি খুশী হন। নয় কি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'ওঁকে ওঁর কাজ থেকে ছিনিয়ে এখানে আনা বা অন্য কোনখানে, সে আমার শক্তির বাইরে।'

তার পর একটু চিন্তা করে নিয়ে বললেন, 'হয়তো সব-কিছুই আমার আদিখ্যেতা। আমার সমস্যা আর এমন কি নূতন? আমার শ্বশুরমশাইকে আমি দেখি নি, কিন্তু শুনেছি সেই যে সকালবেলা বৈঠকখানায় গিয়ে বসতেন, তার পর ফের অন্দরমহলে ঢুকতেন রাতদুপুরে কিংবা তারও পরে—দু'বেলার খাওয়া-দাওয়াই ঐ বৈঠকখানায় ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে। সে হিসেবে তো আমি অনেক ভালো।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'আর আপনার শাশুড়ী এ-ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন?'

'কি জানি। তখনকার প্যাটার্নটাই ছিল আলাদা। আমার চোখের সামনে ছবিটা যেন পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে না। কারণ আমার বাপের বাড়িতে ছিল অন্য প্যাটার্ন। আম্মাকে আমি অল্প বয়সেই হারাই। আব্বা সমস্ত দিন কাটাতেন নামাজ পড়ে, তসবী, তিলাওত আর দীনিয়াতির কিতাব পড়ে। সংসারের সঙ্গে তাঁর মাত্র এইটুকু যোগ ছিল যে বেশ কড়া নজরে রাখতেন, আমার যত্ন-আত্তি ঠিক মত হচ্ছে কি না। থাক্, এসব কথা এক দিনে ফুরোতে নেই। মেয়েছেলের পুঁজিই বা কতটুকু? ছেলেরা ঘোরাঘুরি করে, কত রকমের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাদের হয়। আপনিই কত না ভ্রমণ করেছেন, কত না অদ্ভুত অদ্ভুত—'

আমি বললুম, 'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। আমার বড় ভাইসাহেব তাঁর জীবনে মাত্র একবার কলকাতা আসেন, সেখান থেকে আমাকে দেখবার জন্য এই বোলপুর—ব্যস্! মেজদা বুঝি একবার আগ্রা গিয়ে সেখানে দু'টিমাত্র দিন ছিল। দেশ-ভ্রমণের শখ তাঁদের মাইনাস নিল্। অন্য লোকে আমার ভ্রমণ সম্বন্ধে যা খুশী রোমাণ্টিক ধারণা পোষণ করে করুক, কিন্তু আমি জানি, আমরা তিন ভাই যখন একসঙ্গে বসে আলাপচারী করি তখন কার দৌড় কতখানি। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না—ওসবেতে কিচ্ছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না।'

'হুঁ' অনেক-কিছু দেখেছেন বলে এ-সব কথা কইছেন। আচ্ছা, এবারে আমি নাইতে, সাজগোজ করতে চললুম।'

* * *

সমস্ত দিন শহ্‌র্‌-ইয়ার আপন কামরা থেকে বেরুলো না। তবে কি সে নিজের সঙ্গে কোনো রকমের বোঝাপড়া করছে? তা হলে মাঝে মাঝে আবার গান গেয়ে উঠছে কেন? আল্লা জানে তার কিসের অভাব। একাধিকবার সে বলছে সে মুসলমান মেয়ে, বহু যুগ পরে এ-যুগে এসে অন্দরমহল থেকে বেরিয়েছে; তাই তার সমস্যা এক নূতন প্যাটার্নের প্রথমাংশ—ক্রমে ক্রমে বহু মেয়ের চোখের জল আর ঠোঁটের হাসি দিয়ে প্যাটার্ন সম্পূর্ণ হবে। তারপর নব যুগান্তরে সমস্ত প্যাটার্নটা যাবে মুছে, ভাগ্যবিধাতা বসে যাবেন আবার নূতন আল্পনা আঁকতে।

কিন্তু আমার কাছে এটা কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না যে শহ্‌র্‌-ইয়ার মুসলমান।

আইনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে হিন্দু মেয়ে আর মুসলমান মেয়ের মধ্যে অধিকারে পার্থক্য আছে। এবং সে আইনের ভিত কুরান-হদীসে। হিন্দুধর্মের ব্যবস্থা অন্য রকম—যেমন, হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণেতর হিন্দুর কোনো ধর্মানুষ্ঠান অবশ্যকর্তব্য নয়। মুসলমানকে দিনে পাঁচ ওক্‌ৎ নামাজ পড়তে হয়, খৃষ্টানকে রববারে রববারে গির্জেয় যেতে হয়, ইহুদিকে শনিবারে সিনাগগে, এবং খুদ হিন্দুধর্মে একমাত্র ব্রাহ্মণকে সন্ধ্যাহ্নিক করতে হয়। সেখানেও আবার স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ধর্মানুষ্ঠান। কিন্তু মুসলমানদের বেলা স্ত্রী-পুরুষে কোনো পার্থক্য নেই: পুরুষকে যে-রকম পাঁচ ওক্‌ৎ নামাজ পড়তে হয়, পুরো রোজার মাস উপোস করতে হয়, স্ত্রীলোককেও তাই। এবং তারই ফলে জানা-অজানাতে মুসলমান মেয়ে অনুভব করে যে স্বয়ং আল্লার সামনে যখন নামাজ রোজার মারফতে পুরুষ স্ত্রীলোককে একইভাবে দাঁড়াতে হয় তখন এই পৃথিবীতেই তার অধিকার কম হবে কেন? অবশ্য কর্মক্ষেত্রে অধিকারভেদ থাকার কথা, কিন্তু মূল নীতি তো অতিশয় অপরিবর্তনীয় সুদৃঢ়।

পক্ষান্তরে ধর্ম যাই বলুক আইন-কানুন যে আদেশই দিক একই দেশে যুগ যুগ ধরে থাকার ফলে সামাজিক প্যাটার্ন ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে খুব বেশী ভিন্ন হয় না। এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় প্যালেস্টাইনে। ইহুদি, খৃষ্টান, মুসলমান এই তিন সম্প্রদায়ের ভিতর তিন ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের আদেশ অনুযায়ী স্ত্রী-পুরুষে তিন ভিন্ন প্রকারের অধিকারভেদ—অথচ কর্মক্ষেত্রে দেখা যায় সামাজিক প্যাটার্ন তিন সমাজেরই মোটামুটি এক। একটি ছোট উদাহরণ মনে পড়লো: হিটলারের ভয়ে যখন ইহুদি নরনারীরা জর্মনি ত্যাগ করে জেরুজালেমে এল তখন বার্লিনের কোনো কোনো অত্যাধুনিক যুবতী সুন্দমাত্র শর্ট শার্ট পরে রাস্তায় বেরুতে আরম্ভ করলো। এই বে-আব্রু বেহায়া বেশ দেখে জেরুজালেমের আদিম ইহুদিরা লজ্জায় ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিত, এবং নিজেদের সবচেয়ে বেশী কুণ্ঠিত বিড়ম্বিত বোধ করতো প্রতিবেশী খৃষ্টান ও মুসলমানের

সম্মুখে। কারণ তিন সম্প্রদায়েরই একই মান, একই স্ট্যাণ্ডার্ড আব্রু, ইজ্জৎ, হায়া সম্বন্ধে।

মনে মনে ভাবলুম, শহ্‌র্‌-ইয়ার যা-ই বলুক, বাঙলা দেশেও কি তাই নয়? এমন কি আমাদের ইলিয়ট রোডের এংলো-ইণ্ডিয়ানদের আচরণ লণ্ডনের খৃষ্টানদের সঙ্গে যত না মেলে তার চেয়ে বেশী সাদৃশ্য ধরে প্রতিবেশী হিন্দু-মুসলমানের সঙ্গে।

তারপর দুপুরে শহ্‌র্‌-ইয়ারের সঙ্গে দেখা।

খানার টেবিলে বাবুর্চী একটা মাংসের কালিয়া দেখিয়ে বললে, এটা বেগম সায়েবা রেঁধেছেন। খেয়ে দেখি, আশ্চর্য, একেবারে হুবহু কাবুলী রীতিতে তৈরী। কিন্তু রাঁধলো কখন?

শহ্‌র্‌-ইয়ার বোধ হয় একটুখানি মৌজে ছিলেন। বললেন, 'আমার মা এক কাবুলীর কাছ থেকে এটা শেখেন।' তারপর আরম্ভ করলো সেই কাবুলীর ইতিহাস। 'কেন জানি নে সেই খান সায়েবের এ-দেশটা ভারী পছন্দ হয়ে যায়। আব্বা তাঁকে একটু জমি দিলেন। সে মামুলী ধরনের ঘরবাড়ি বেঁধে বিয়ে করলো আমাদেরই এক রায়তের মেয়েকে। তার পর ডালভাত খেয়ে খেয়ে সে তার পাঠানত্ব ভুলে গেল, গাঁয়ের লোকও সেটা গেল ভুলে।

বিয়ের পরের বছর খানের একটি মেয়ে হয়েছিল। তার পনেরো বছর পর খান মেয়ের জন্য একটি বর বাছাই করে তার বীবীকে সুখবরটা দিল। কিন্তু পরের দিন সকালে বীবী খানকে জানালেন, মেয়ে তাকে পরিষ্কার বলে দিয়েছে এ-বর তার পছন্দ হয় নি।

তাজ্জবকী বাৎ! বাঙলা দেশের মুসলমান মেয়ে বিয়ের কথাটি মাত্র উঠলেই লজ্জায় ঘেমে নেয়ে কাঁই হয়ে যায়। তার যে একটা মতামত থাকতে পারে সে নিয়ে তো কেউ কখনো মাথা ঘামায় না। এ আবার কি? খান বউকে অভয় জানিয়ে বললে যে আখেরে সব দুরস্ত হয়ে যাবে এবং বিয়ের ব্যবস্থা করে যেতে লাগলো। হয়েও গেল সব-কিছু ঠিকঠাক। বরপক্ষ এলেন ঢাক ঢোল বাজিয়ে, আতশবাজি পোড়াতে পোড়াতে। তারপর যথারীতি এক উকিল আর দুই সাক্ষী বিয়ের মজলিস থেকে বরের প্রস্তাব নিয়ে গেলেন অন্দরমহলে—সেখানে কনেকে সাজিয়েগুজিয়ে, লম্বা ঘোমটা সহযোগে তাকে একটি আস্ত পুঁটুলি বানিয়ে চতুর্দিকে বসেছেন তার সখীরা। সখীদের কাজ হচ্ছে, উকিল বিয়ের প্রস্তাব করার পর কনে লজ্জায় 'হাঁ' বলতে দেরি করে বলে তাঁরা তখন কনেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে 'কবুল' বলায়। উকিল প্রস্তাব পেশ করলেন। ভুল বললুম, প্রস্তাব ভালো করে শেষ করার পূর্বেই মেয়ে পরিষ্কার গলায় বলে উঠলো, "না, কবুল নয়"।'

হঠাৎ কাহিনী থামিয়ে আমাকে বললে, 'কই, আপনার কাবুলী-কালিয়া

খাচ্ছেন না যে বড় ?'

আমি বললুম, 'কী আশ্চর্য রসভঙ্গ করতে পারেন আপনি ! বখতিয়ার খিলজীর আমল থেকে অই সুবে বাংলার সুদীর্ঘ ইতিহাসে কোন্ মুসলমান বঙ্গনারী এ রকম "কবুল নয়" বলেছে, শুনি ? তারপর কি হলো বলুন।'

'আমি সেখানে ছিলুম না, তবু খানিকটে অনুমান করতে পারি। ঐ কনের মজলিসে একশ'টা বাজ একসঙ্গে পড়লেও বোধ হয় তার চেয়ে বেশী ধুন্দুমার লাগাতে পারতো না। তারই ভিতর যাঁদের একটু মাথা ঠাণ্ডা ছিল তাঁরা কনেকে পাশের ঘরে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে বোঝাতে আরম্ভ করলেন, হাতে পায়ে ধরলেন তাঁদের মাথায়, তাঁদের গোষ্ঠীর মাথায় যেন কেলেঙ্কারি না চাপায়। কনের মামারা তো পাগল হয়ে যাবার উপক্রম। আর বাপ, কাবুলি খান সাহেব —সে তার সর্ব পাঠানত্ব হারিয়ে ফেলা সত্ত্বেও একটা সামান্য জিনিসে তখনো তার কিছুটা আটকা পড়েছিল, সেটা তার প্রাচীন দিনের একখানা তলওয়ারে। কুড়ি বছর ধরে সে ঐ তলওয়ারখানা সাফসুৎরো রেখেছে। ঐটে নিয়ে করলো ধাওয়া মেয়েকে খুন করবে বলে।

ওদিকে বাইরে বরপক্ষের কানে খবরটা পেঁছে গিয়েছে। একসঙ্গে গর্জে উঠলো সবাই, "এ কী বেইজ্জতি !" আমাদের গাঁয়ের লোক দলে ভারি কিন্তু হলে কি হয়, ওদের সঙ্গে ছিল জনাতিনেক জহাঁবাজ লেঠেল—বরের মুরুব্বীদের ভিতর। আর জানেন তো, চাষাভুষোর বিয়েতে নানা রকমের ঢং তামাশার মেকি লড়াই হয়—ভাবটা যেন বরপক্ষ কনেকে ডাকাতি করে লুটে নিয়ে যাচ্ছে—তাই সঙ্গে এনেছে যার যার লাঠি। ব্যস্ ! লাগ্ লাগ্ লাগ্। আমাদের গাঁয়ের মোল্লাজী, মসজিদের ইমাম সাহেব, এমন কি বরপক্ষ যে তাদের মোল্লাজী সঙ্গে এনেছিল তিনি পর্যন্ত, সবাই মিলে আল্লা রসুলের দোহাই দিয়ে ওদের ঠেকাবার জন্য প্রায় পায়ে ধরেন আর কি ?

শেষটায় আমার চাচা খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে লড়াই ঠেকালেন। নিজের থেকেই বললেন, বিয়ের জন্য বরপক্ষের যা খরচা-পত্র হয়েছে তিনিই সেটা দিয়ে দেবেন।

কিন্তু বরপক্ষ কনে না নিয়ে শুধু 'হাতে' যদি বাড়ি ফেরে তবে সারা রাস্তা ধরে তাদের শুনতে হবে পাঁচখানা গাঁয়ের টিটকারি। তার ব্যবস্থাও চাচা করে দিলেন। ওদের মোল্লাজীকে আড়ালে নিয়ে আলাপ করে খবর পেলেন আমাদের পাশের গাঁয়ে বরপক্ষের পাল্টাঘর আছে ও তাদের একটি মেয়েকে এই বরের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য একটা ইশারাও দিয়েছিল। চাচা বরের বাপ-চাচার সঙ্গে কথা বলে আমাদের মোড়লকে তাঁর নিজের ঘোড়া দিয়ে বলে দিলেন সে যেন আমার চাচার হয়ে বিয়ের প্রস্তাবটা পাড়ে। চাচা নামকরা জমিদার আর এরা সাধারণ রায়ৎ—এ যে কত বড় সম্মান আর ইজ্জতের কথা—'

আমি বললুম, 'খুব বুঝতে পেরেছি। আমার আব্বাকে বিয়েশাদীর দোয়া-দরুদ পড়তে আমার জীবনে মাত্র একবার আমি দেখেছি। আমাদের বাড়ির দাসীর যখন বিয়ে হল আমাদের এক কুটুম-বাড়ির চাকরের সঙ্গে, পরের দিন বরের দেমাকটা যদি দেখতেন! তারপর কি হল বলুন।'

'তারপর আর বিশেষ কিছু বলার নেই। সেই রাত্রেই বরপক্ষ পাশের গাঁয়ে গিয়ে বিয়েশাদী সাঙ্গ করে কনে নিয়ে মান-ইজ্জতের সঙ্গে বাড়ি ফিরলো। তবে শুনেছি, আমাদের গাঁ থেকে বেরবার সময় তারা নাকি ভিতরে ভিতরে শাসিয়ে গিয়েছিল যে এ-তল্লাটের মাথা, আমার চাচা, তাদের হাত বন্ধ করে দিলেন কিন্তু সামনের হাটবারের দিন আমাদের গাঁয়ের লোক যেন হুঁশিয়ার হয়ে হাট করতে যায়।'

'আর কনেটা?'

'সে কি আর বেশীক্ষণ চাপা থাকে, কার সঙ্গে সে মজেছে? ছোঁড়াটা অবশ্যি তুলকালাম দেখে গা-ঢাকা দিয়েছিল। তালাশ করে ধরে নিয়ে এসে বর-সাজানো হল।'

'তা মেয়েটা ওরকম শেষ মুহূর্তে এরকম নাটুকে কাণ্ড করলো কেন?'

'ওর নাকি কোনো দোষ নেই। সে বেচারী তার মাকে অনেকবার তার অমত বেশ জোর গলায়ই জানিয়েছিল, কিন্তু মা পাঠানকে বার বার বিরক্ত করতে সাহস পায় নি। আশা করেছিল, শেষ পর্যন্ত সব কিছু দুরস্ত হয়ে যাবে।'

আমাদের খাওয়া অনেকক্ষণ সাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু উঠি-উঠি করে উঠি নি। আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলুম, শহর্-ইয়ার অন্য কিছু-একটা ভাবছে এবং সেইটে চাপা দেবার জন্য ঘটনাটি বলে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললে, 'চলুন।'

বসার ঘরে এসে বললে, 'কিন্তু খানের মেয়ের বিয়ে বাবদে আসল কথাটি আপনাকে এখনো বলা হয় নি। মেয়েটির বিয়ে চুকে-বুকে যাওয়ার মাসখানেক পরে খান একদিন তার বউকে বললে যে, সে বড় খুশ যে তার মেয়ের গায়ে পাঠান রক্ত আছে। ঐ রকম ঘটনা পাঠান মুল্লুকে নিত্যি নিত্যি না ঘটলেও ব্যাপারটা একেবারে অজানা নয়।'

আমি বললুম, 'তবেই দেখুন, ইসলাম যে-সব অধিকার আমাদের দিয়েছে আমরা সেগুলো ব্যবহার করি নে। শুনেছি, আরবভূমিতে এখনো নাকি মেয়েরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মাঝে মাঝে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়।'

শহর্-ইয়ার একটু হেসে বললে, 'ঠিক ঐ জিনিসই এখন বাঙলা দেশে অল্প অল্প আরম্ভ হয়েছে। যে-সব মুসলমান মেয়েরা এখন ছেলেদের সঙ্গে কিছুটা অবাধে মেলামেশা করে তারা নিশ্চয়ই কিছুটা হিন্ট্ দেওয়ার পর ছেলেরা বিয়ের

প্রস্তাব পাড়ে।'

আমি বললুম, 'ইংরেজীতেও বলে Courtship is the process of a woman allowing herself to be chased by a man till she catches him.'

শহর্-ইয়ারের পছন্দ হল প্রবাদটি। তারপর বললে, 'তবেই দেখুন, যে অধিকার মুসলমান মেয়ের ছিল ইসলামের গোড়াপত্তনের সময় থেকে, সেইটেই সে ব্যবহার করলো ইংরিজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে, অন্দরমহল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর। পাঠান মেয়েরা কিন্তু চিরকাল ধরে এ-হক্কটা দরকার হলেই কাজে লাগিয়েছে। শুনেছি, তারা নাকি অনেক ক্ষেত্রেই বাপ-মার তোয়াক্কা না রেখে আপন পছন্দের ছেলেকে ভালোবাসতে জানে। আপনি তো আপনার লেখা নিয়ে কোনো আলোচনা করতে আমাকে দেন না, কিন্তু কাবুলে ঐ যে একটি পাঠান মেয়ে আপনাকে ভালোবেসেছিল—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'আপনি নির্ভয়ে, প্রাণভরে 'মণিকে' নিয়ে যত খুশী আলোচনা করতে পারেন। এ কাহিনীতে আমি এমনই না-পাস্ ফেল মেরেছি যে ওটার কথা স্মরণে এলে 'মণি'র কাছে মনে মনে বার বার লজ্জা পাই আর মাফ চাই—এত বৎসর পরেও।'

'সে কি? আমি বুঝতে পারলুম না।'

আমি গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বললুম, 'মণির কাহিনী গল্প নয়, হাজার পার্সেন্ট সত্য। আমি তার সিকির সিকিও ফুটিয়ে তুলতে পারি নি। আমি আমার জীবনে মাত্র একটি বার—ঐ নিষ্পাপ কিশোরী মণির কাছ থেকে—অকুণ্ঠ, সর্বত্যাগী, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য প্রণয় পেয়েছি। ও ছিল সত্যই কাবুল পাহাড়ের চূড়োর উপরকার ভার্জিন স্নো—এটা আমার ভাষা নয়, এটা বলেছিলেন মণির মুনিব বলো, জাত ভাই বলো—জানো তো পাঠানরা সাম্যবাদে কি রকম মারাত্মক বিশ্বাসী - সেই রসকষহীন স্টোন-হার্ড-বয়েলড্ ডিপ্লোমেট শেখ মহবুব আলী খান। তিনি আমাকে একাধিকবার বলেছিলেন যে, পেশাওয়ারে তাঁদের পরিবারে পরে এখানে ব্রিটিশ লিগেশনে পাঠান চীফ একাউন্টেন্ট থেকে আরম্ভ করে পাঠান অরডারলি পর্যন্ত—আবার সেই প্রাণঘাতী ডিমোক্লেসি—মণির কৃপাদৃষ্টি লাভ করতে চেয়েছিল, কেউ কেউ বিশুদ্ধ পাঠান-রীতিতে মহবুব আলীর কাছে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে মহবুব আলীর শেষ কথাগুলো, "ওমেদারদের দৃঢ়তম প্রচেষ্টাও যেন মণির মনে কোনো ক্ষণেকের তরে ছায়াটুকু পর্যন্ত ফেলতে পারে নি। যেন ওসবের কোনো অর্থই হয় না, যেন তার বয়েস ষোল নয়—চার। তাই বলছিলুম, ভার্জিন স্নো, যার উপর রক্তিভর ধুলোবালি পড়ে নি। তারপর সে আপনাকে দেখল—একবার দরজা খুলে দেবার সময়, আরেকবার যখন আপনার জন্য

নাশ্‌তা নিয়ে এল। সেদিন আপনি এখানে ছিলেন আধ ঘণ্টাটাক। পরদিন আমার স্ত্রী বললেন, মণি যেন জীবনে এই প্রথম জেগে উঠলো। নরনারীর একে অন্যের প্রতি বাছাই-অবাছাই-না-করা আকর্ষণ, বিবাহ, মাতৃত্ব সব যেন ঐ দিন এক লহমায় সে বুঝে গেল।" এ সমস্ত 'কবিত্ব' একজন ধুরন্ধর ডিপ্লোমেটের মুখ থেকে—হৃদয়ের সূক্ষ্মানুভূতি, স্পর্শকাতরতা যার কাছে আকাশকুসুম, সোনার পাথরবাটি।

মণির সেই প্রেম পরিপূর্ণভাবে অনুভব করেছিলুম আমি, কিন্তু তার প্রেমের আবেগ, সে প্রেমের ভিতর তার সম্মোহিত অবস্থা, যেন সে নিশির-ডাকে-পাওয়ার মত চোখ বন্ধ করে ভিতরকার প্রেমের প্রদীপালোকে চলেছে দয়িতের অভিসারে কাবুলের শঙ্কাসঙ্কুল গিরিপর্বত লঙ্ঘন করে—এসব পারলুম না আপনাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে। জানেন তো, আমাদের কোনো কমন্‌ল্যানগুইজ ছিল না?—তৎসত্ত্বেও আমার হৃদয়ে মণির প্রতিটি হৃদ্‌স্পন্দন সঞ্চারিত হয়েছিল অব্যবহিত ভাবে।

আমার আফসোস, আফসোস,—হাজার আফসোস—যে আমি মণির প্রেমের নেমক খেয়ে সে নেমকের কিস্‌মৎ দিতে পারলুম না,—আমার সব সময় মনে হয় আমি যেন নেমকহারাম রয়ে গেলুম। জানেন, মণির এই বেদনা-কাহিনী লেখার পর সেটা আর কখনো পড়ি নি? লেখার সময়ই আমি প্রতি লহমায় হৃদয় দিয়ে অনুভব করছিলুম, সুর লাগছে না, কিন্তু প্রাণপণ আশা করছিলুম যে সৃষ্টিকর্তা আমাদের নগণ্য সৃষ্টির চলার পথ তৈরী করে দেন তিনি কোনো এক মিরাক্‌ল্‌ অবতীর্ণ করে শেষরক্ষা করে দেবেন। কিন্তু আফসোস, তিনি প্রসন্ন হলেন না।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার গভীর দরদ দিয়ে শুনছিল। শেষটায় বললে, 'মাফ করবেন, আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলুম না। কিন্তু তবু জানতে ইচ্ছে করে, আপনার এই ধারণাটা জন্মালো কি করে?'

'অত্যধিক আত্মপ্রত্যয়, দম্ভ। আমি ভেবেছিলুম এ তো জলজ্যান্ত ঘটনা। কোনো-কিছু বাড়াতে কমাতে হবে না। স্মৃতির গভীরে কলম ডোবাবো আর লিখব। এতে তো কোনো মুশকিল নেই। সেই হলো আমার কাল। আপন কল্পনা, সহানুভূতি বাদ পড়ে গেল—এক কথায় আমার হৃদয়রক্তে রাঙা হয়ে রক্তশতদলের মত মণি ফুটে উঠলো না। হয়ে গেল ফোটোগ্রাফ—সেও আবার রদ্দি ফোটোগ্রাফ। ফোকাস ঢিলে, কোথাও ওভার-এক্‌স্‌পোজড কোথাও বা আণ্ডার। ফ্ল্যাট, কণ্ট্রাস্ট নেই আর ক্যামেরাও বাঁকা করে ধরা ছিল বলে টিলটেড্‌।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার শব্দার্থে তামাম শহরের ইয়ার। ইনি আমার লেখার অকৃত্রিম ইয়ার। ঘন ঘন মাথা নেড়ে নেড়ে আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে।

স্টেশনে আমার পরিচিত দু'চারজনের সঙ্গে দেখা। সবাই এক কামরায় উঠলুম—যদিও আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলুম, শহ্‌র্‌-ইয়ারের এ ব্যবস্থাটা আদৌ মনঃপূত হয় নি। তাই আমি আরো বিশেষ করে ওদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলুম না।

শহ্‌র্‌-ইয়ারকে অপূর্ব সুন্দরী বলা চলে না কিন্তু তাঁর সৌন্দর্যে অপূর্বতা আছে। সে সৌন্দর্য তিনি ধারণ করেছেন অতিশয় সহজে, এমন কি অবহেলা-ভরে বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। পুরুষানুক্রমে বিত্তশালীজন যে রকম তার বৈভব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে ধনী-দরিদ্রের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করে। আমার মনে হচ্ছিল, এঁকে একটুখানি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, ইনি সুন্দরী-কুলে জন্ম নিয়েছেন, সুন্দরীদের ভিতর বড় হয়েছেন, তাঁর সৌন্দর্য নিয়ে ছেলে-বেলায় কেউ আদিখ্যেতা করে নি বলে তিনি এ বিষয়ে এমনই সহজ সরল যে সৌন্দর্যহীনারা তাঁর সৌন্দর্যকে ঈর্ষা করবে না, সুন্দরীরা তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিনী রূপে দেখবে না। তাঁর সৌন্দর্যের অপূর্বতা কিছুটা তাঁর বর্ণে। বংশানুক্রমে পর্দার আড়ালে বাস করার ফলে তাঁর শান্ত গৌর বর্ণকে 'অসূর্যম্পশ্যা' বর্ণ নাম দেওয়া যেতে পারে। এ বর্ণ সকলেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে অতি অবশ্য কিন্তু সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করবে সে-কথা বলা যায় না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এ রঙের প্রতি আমার নাড়ির টান আছে—আমার মা-বোন সকলেরই এই ধরনের রঙ—কেউ একটু বেশী গৌরী কেউ বা কম। তদুপরি শহ্‌র্‌-ইয়ার এখন পূর্ণ-যৌবনা—অনুমান করলুম তাঁর বয়স পঁচিশ থেকে আটাশের কোনো জায়গায় হবে। মাথায় সিঁদুর থাকার কথা নয়, এবং যদিও বেশভূষা হুবহু বিবাহিতা বাঙালী হিন্দু মেয়ের মত তবু কোথায় যেন, কেমন যেন একটা পার্থক্য রয়েছে। আমি কিছুতেই সে-পার্থক্যটা খুঁজে বের করতে পারলুম না। আমার এক অসাধারণ গুণী চিত্রকর বন্ধু আছেন এবং অদ্ভুত তাঁর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ শক্তি। তিনি থাকলে আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারতেন। পর্দানশীন খানদানী মুসলমান গৌরীদের রঙ তিনি লক্ষ্য করে আমার সামনে একদিন ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন।

পরিচিতেরা দু'এক বার তাঁর দিকে আড়নয়নে তাকিয়েছিলেন—এ মেয়ে যে আর পাঁচটি সুন্দরী থেকে ভিন্ন সেটা হয়তো ওঁদের চোখেও ধরা পড়েছিল। শহ্‌র্‌-ইয়ার কিন্তু সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বিকার। কে বলবে, এঁর মা-দিদিমা যুগ যুগ ধরে পর্দার আড়ালে জীবন কাটানোর পর ইনিই প্রথম বেগানা পুরুষদের সামনে আত্মপ্রকাশ করেছেন!

কামরাটা সব চেয়ে বড় সাইজের যা হয়। তিনি কিন্তু আমার পাশে না বসে

আসন নিলেন সুদূরতম প্রান্তে। বেঞ্চির উপর পা তুলে মুড়ে বসে, কিন্তু আমার দিকে মুখোমুখি হয়ে। আমাদের পাঁচজনের ভিতর নানারকম আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হলো। সকলেই বুদ্ধিজীবী—বিষয়বস্তুর অনটন হওয়ার কথা নয়। শহ্‌র্‌-ইয়ার সেদিকে মনোযোগ দিচ্ছেন কি না, বুঝতে পারলুম না।

কবে হয়ে গিয়েছে এঁর বিয়ে, কিন্তু বাপের বাড়িতে বিয়ের পূর্বে মেয়েকে যে তালিম দেওয়া হয়—শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে সে কি ভাবে বসবে চলবে এবং বিশেষ করে অঙ্গসঞ্চালন নিরোধ করে থাকবে—সেটা মোটেই অনভ্যাসবশতঃ বিস্মৃত হয় নি। সেই যে বোলপুরে যে-ভাবে আসন নিয়েছিল বর্ধমান পর্যন্ত তার সামান্যতম নড়চড় হল না।

বর্ধমানে প্রায় সবাই চায়ের সন্ধানে প্ল্যাটফর্মে নামলেন। এঁরা হিন্দু না, এঁরা অপটিমিস্ট।

শহ্‌র্‌-ইয়ারের পাশে গিয়ে বসে বললুম, 'শহ্‌র্‌-ইয়ার, এখানে কিন্তু আপনি একমাত্র আমার ইয়ার।'

মুখে স্মিতহাস্য ফুটিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, এইখানেই আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু শুধু এখানে কেন, আপনি তো সর্বত্রই আমার একমাত্র ইয়ার।'

আমি বললুম,

'ঘোড়ায় আমার জুটিবে সওয়ার, ইয়ার পাইবে সাকী।'

'মানে?'

'আমি আপনার চেয়ে বয়সে ডবল না হলেও তারই কাছাকাছি। আমার পালে ওপার যাবার হাওয়া লাগে-লাগে। তখন আপনি, হে আমার সাকী, নূতন ইয়ার পাবেন।'

রীতিমত বেদনা-ভরা কণ্ঠে বললে, 'ছিঃ, আপনি এসব কথা বলেন কেন? ভাষার উপর আপনার বিধিদত্ত অধিকার আছে। সেটা আপনার হাতে ধারালো তলওয়ার, সাবধানে ব্যবহার না করলে আমার মত সরল জন, যে বিশ্বাস করে আপনার অতি কাছে এসেছে তার বুকের ভিতর তার ফলাটা হঠাৎ ঢুকে গিয়ে খামোকা রক্তবওয়াবে না? আপনার কাছ থেকে আমার বহুৎ আশা, বহু বহু বৎসর আপনার সাহায্য আমি পাবো বলে নিশ্চিত ধরে নিয়েছি।'

'আচ্ছা, শহ্‌র্‌-ইয়ার, আপনি ইস্কুল কলেজ গিয়েছেন, সে সূত্রে নিশ্চয়ই দু'-পাঁচজনের সঙ্গে আপনার আলাপ-পরিচয় হয়েছে। অন্তত কোনো কোনো অধ্যাপকের স্নেহ আপনি অতি অবশ্যই পেয়েছেন, কারণ আমি জানি আপনি পড়াশুনায় অসাধারণ ভালো ছিলেন, আপনার আদব-কায়দা মানুষকে নিশ্চিন্ত মনে মেলামেশার সুযোগ করে দেয়, এবং তদুপরি মুসলমান ছাত্রী এই দশ বছর আগেও এতই বিরল ছিল যে হিন্দু অধ্যাপকরা তাদের বিশেষ আদরের চোখে দেখতেন—হয়তো বা তাতে নূতনের প্রতি খানিকটে কৌতূহলও মেশানো

থাকতো। বিয়ের পরে আপনার স্বামীর ইয়ার-দোস্তের সঙ্গেও আপনার কিছুটা ঘনিষ্ঠতা না হয়ে যায় না। এদের ভিতর কেউ নেই যার সঙ্গ পেলে, যার সঙ্গে কথা বলে আপনি আনন্দ পান?'

'না।' ব্যস্, ঐ একটি শব্দ। এত ক্ষুদ্র পরিষ্কার উত্তর আমাকে রীতিমত হকচকিয়ে দিল।

'কিন্তু—' আমার আর কথা বলা হল না। প্রায় চিৎকার করে উঠলুম, 'এ আমি কি দেখছি! মরীচিকা, মরুতৃষা, মিরাজ? ভানুমতী, ইন্দ্রজাল? না, না, এসব কিছুই নয়। আমার চোখ দুটো বিলকুল বরবাদ হয়ে গিয়েছে। ভাই শহ্‌র্-ইয়ার, কলকাতায় নেমেই সোজা চশমার দোকান।'

আমার উত্তেজনার কারণ সরল নয়, অতি কুটিল। বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করি। সরকারী হুকুমে যখন সর্ব রেলওয়ে স্টেশনের মদের 'বার' বন্ধ হয়ে গেল, তখন এই পুণ্যভূমি বর্ধমান স্টেশনের কেলনার হয় ভেবেছিলেন চা, বিয়ার, হুইস্কি একই জিনিস, সব কটাই পৈশাচিক মাদকদ্রব্য, কিংবা চা মদ্য না হলেও উত্তেজক দ্রব্য তো বটে। অতএব কংগ্রেসের অকৃত্রিম সদস্য, হিসেবে কংগ্রেস ধর্মানুযায়ী তাঁরা মদ্য জাতীয় সর্ব উত্তেজক আবর্জনার সঙ্গে চাকেও কুলোর বাতাস দিয়ে তাড়িয়ে দেন। এ তত্ত্বটি আমি সাতিশয় বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছি। কেউ যদি সন্দেহ প্রকাশ করে, আমি তা হলে তাকে দেখে নেব—কি কি করবো, এখন বলছি নে, কিন্তু সর্বপ্রথমেই যে আমি তার বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা আনবো সে-বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চয়।

এহেন দৃঢ় প্রত্যয় যখন আমার হৃদয়মনে দড় থানা গড়ে টাইট বসে আছে, তখন যদি বর্ধমান রেল কামরায় কেলনারের লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে—মনে রাখবেন, আমরা তাকে অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা, কিংবা তার চেয়েও ভালো, বাস্-ট্যাক্সি পারমিটের প্রলোভন দেখাই নি—আবার বলছি আপন খেয়াল-খুশী, মর্জিমোতাবেক, মেহেরবানী মাফিক একখানা ট্রেতে ঢাউস পট চা, রুটি-মমলেট সামনে ধরে সবিনয় বলে, 'মেমসায়েব, আপকী চা' তবে কি আপনার নলেজ বাই ইনফারেন্স্ এই হবে না, যে আপনার চোখ আল্লার গজবে বিলকুল বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে? এ তো মাতালের সিঙ্গল বস্তু ডবল দেখা নয়। এ যে যা নেই তা দেখা, আকাশকুসুম শোঁকা, গাড়ির কামরার মধ্যিখানে রাজার পিসি কুমড়ো দিয়ে ক্রিকেট খেলতে খেলতে ফ্রেম থেকে খুলে আমসত্ত্ব ভাজা খাচ্ছেন তাই দেখা!

'না, না, না। ইয়ার শহ্‌র্-ইয়ার, এ সেই আরব্য রজনীর অন্-নশ্‌শারের কাল্পনিক ডিনার! আমি এসব 'জিনিস' স্পর্শ করার চেষ্টা করে হাওয়ার কোমরে রশি বাঁধনেওয়ালার মত সমুখের 'বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রমে'র ওয়েটিং লিস্টে নাম লিখিয়ে বাদবাকী জীবন ঝুলে থাকতে চাই নে।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার বললেন, আপনার হুঁশিয়ারী অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। তবে এ-সম্পর্কে সামান্য একটি কথা আছে। আপনি যখন কাটুকে টাকা দিয়ে বাড়িঘর খবরদারীর কথা বলছিলেন তখন আমি স্টেশনের লোককে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়ে ব্যবস্থাটা করিয়েছিলুম। এবারে খান।'

ওঃ! এ খাওয়াতে ডবল সুখ! আর সবাই জান পানি করে পেয়েছে ভাঁড়ের পানি—না চা? সে একই কথা।

আমি আগের সীটে ফিরে গেলুম না।

এবারে ডাক্তার গাফিলী করেন নি, কিংবা ভুলেও যান নি। তাঁর পিতার আমলের সেই ঢাউস পাল্কী গাড়ির মত মোটর নিয়ে স্টেশনে হাজির। লক্ষ্য করলুম, ডাক্তারদের সামাজিক আচরণ যদিও আর পাঁচজন হিন্দুদেরই মত, তবু বাড়ির বাইরে বিশেষ করে যেটাকে বলা হয় পাব্লিক প্লেস সেখানে স্ত্রীর সামনে এখনো একটু আড়ষ্ট, যেন সবে পরশু দিন তাঁদের শাদী হয়েছে।

প্রথমটায় রাস্তার উপরকার দোকানপাট, দুটো একটা গারাজ দেখে সেগুলোর পিছনে কি বস্তু আছে ঠিক অনুমান করতে পারি নি। মোড় নিয়ে খোলা গেটের ভিতর দিয়ে গাড়ি তখন সংকীর্ণ একটা গলিপানা প্যাসেজের ভিতর দিয়ে ঢুকছে।

গাড়ি থেকে নেমে আগাপাস্তলা তাবিয়ে দেখি বিরাট প্রকাণ্ড প্রাচীন যুগের একটা বাড়ি—বরঞ্চ ফরাসীতে বলা উচিত শাটো। ক্ষীণ আলোকিত আকাশের অনেকখানি ঢেকে রেখেছে বাড়িটা—তার থেকেই অনুমান করলুম সেটার সাইজ। কারণ সমস্ত বাড়িটা অন্ধকার, অপ্রদীপ। শুধু দোতলার বৃহৎ একটা অংশের সারিবাঁধা অনেকগুলো জানলা দিয়ে বেরুচ্ছে যেন আলোর বন্যা। এ যুগেও যে কলকাতায় এ রকম অতিকায় বসত-বাটি আছে সে ধারণা আমার ছিল না। বাড়িটা কিন্তু রাজামহারাজাদের কলকাতার ফ্যান্সি প্যালেস প্যাটার্নে তৈরী করা হয় নি। গাড়িবারান্দায় যে একটি আলো জ্বলছিল তারই আলোকে দেখলুম, অলঙ্কারবর্জিত সাদামাটা—কিন্তু খুবই টেঁকসই দড় মাল-মশলা দিয়ে বাড়িটা তৈরী। পরিষ্কার বোঝা গেল যে যিনি বাড়িটা তৈরী করান তাঁর অসংখ্য ঘরকামরার দরকার ছিল বলে সেটাকে যতদূর সম্ভব বড় আকারের করে তৈরী করিয়েছিলেন এবং সেই সময় এটাও স্থির করেছিলেন যে তাঁর বংশধরগণকে যেন অন্তত দু'শ বছর ধরে অন্য বাড়ি বানাবার প্রয়োজন না হয়।

দারওয়ানসহ জনা পাঁচেক লোক এগিয়ে এল। 'হঠাৎ নবাব'দের উর্দি পরা লোকজনের হাফ মিলিটারি সেলুটাদির আশঙ্কা আমি করি নি। তারাও মুসলমানী কায়দায় অল্প ঝুঁকে সালাম জানালো। কোনো জায়গায় কোনো কৃত্রিমতা নেই। ডাক্তার কথা বলে যাচ্ছেন, ম্যাডাম—মনে হল যেন ক্রমেই গম্ভীর হতে গম্ভীরতর হয়ে যাচ্ছেন। মুসাফিরীর ক্লান্তিও হতে পারে।

বাড়ির বিপুল আকারের তুলনায় দোতলা যাবার সিঁড়ি যতখানি প্রশস্ত হওয়ার কথা ততখানি নয়, যদিও প্রয়োজনের চেয়েও বেশী।

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলুম যখন দোতলার একটা অতি দীর্ঘ বারান্দার উপর দিয়ে যেতে যেতে খোলা দরজা দিয়ে ডাইনের দিকে দেখি, একটার পর একটা মাঝারি সাইজের বেডরুম ড্রইংরুম, মাঝে মাঝে ডইনিংরুম—কখনো দিশী ধরনের, কখনো বা বিলিতি স্টাইলের। দু'একটা কামরা মনে হল যেন বাচ্চাদের পড়াশুনোর ঘর। বেডরুমগুলোর কোনোটাতে প্রাচীন দিনের জোড়া পালঙ্ক, কোনোটাতে ছোট ছোট তিনখানা তক্তপোষ। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য কোনো ঘরে একটি মাত্র জনপ্রাণী নেই, বিছানাপত্র কিন্তু ছিমছাম তৈরী আর প্রায় প্রত্যেকটি কামরায় বিজলী বাতি জ্বলছে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে ডান দিকে মোড় নেবার সময় আমি আবার লক্ষ্য করেছিলুম বাঁ দিকে এটারই মত একটা দীর্ঘ উইঙ, রাইট এঙ্গেলে এটার সঙ্গে লেগে ইংরিজি এল শেপ তৈরী করেছে। সেটা কিন্তু অন্ধকার।

অবশেষে দীর্ঘ অভিযান শেষ করে আমরা একটা বড় সাইজের ড্রইংরুমে ঢুকলুম। আমাকে বসিয়ে বললেন, 'আমার বন্ধু-বান্ধবরা দেখা করতে এলে এখানেই বসেন; তাঁরাই পছন্দ করে এটা বেছে নিয়েছেন। একটু পরেই আপনার ঘর দেখাচ্ছি—শহ্‌রু-ইয়ার সেটা চেক্ আপ করে নিক্। ঘরটা ভাল না লাগলে কাল আপনার খুশীমত যে কোনো একটা পছন্দ করে নেবেন। বাঁ দিকে মাদামের বুদোওয়ার—সমস্তটা দিন তিনি ঐখানেই কাটান। আর এই ডান দিকে আপনার ঘর—অন্তত এ-রাত্রিটার মত। চলুন, দেখি, কদ্দুর কি হল। শহ্‌রু-ইয়ার আবার একটু অতিরিক্ত পিটপিটে, তায় আবার আপনার প্রতি তার হিমালয়ান ভক্তি।'

অ। মাদাম একেবারে ন'সিকে বিলিতি। একটা চেয়ারে বসে তদারকী করছেন—বেয়ারাটা আমার দুটো সুটকেস থেকে জিনিসপত্র, জামাকাপড় বের করে ঠিক ঠিক জায়গায় রাখছে কি না। আমার দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন হাসি হেসে বললেন, 'বসুন, বসুন। আপনার বইপত্র, কাগজকলম পাশের ঘরে আপনার স্টাডিতে। অন্তরঙ্গ বন্ধু—' এবারে মুখে কৌতুকের হাসি, 'কিংবা বান্ধবী দেখা করতে এলে ঐ স্টাডিতে নিরিবিলিতে তাঁকে এনটারটেন করতে পারবেন। আর এই এখানে বাথরুমের দরজা। হাতমুখ ধোবেন, না গোসল করবেন? আমি ছুট লাগাচ্ছি এখন, ডালভাতের তদারকি করতে। বেয়ারা এসে আপনাকে নিয়ে যাবে—আমি বাসনবর্তন থেকে ফুর্সৎ না পেলে।' ডাক্তারকে শুধোলেন, 'হ্যাঁ গা তুমি খেয়ে দেয়ে পেটটান করে ফেলো নি তো?' ফের আমাকে বললেন, 'লেবরেটরি থেকে ফেরা মাত্রই উনি খাবার টেবিলের দিকে যে স্পীডে ধাওয়া করেন যে দেখে মনে হয়, বহু শত বৎসরের

বিরহ কাটানোর পর মজনু প্রিয়া লাইলিকে দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু ভদ্রলোকের একটি অতিশয় মহৎ সদ্‌গুণ আছে—যেটি প্রতি যুগে প্রতি দেশে বিবাহিতা রমণী মাত্রই আপন পরম সৌভাগ্য বলে মনে করবে। হিন্দু হলে বলবে, না জানি কত শত যুগ তপস্যা করে এ-হেন বর পেলুম, আর আমি বলি আমার বহু মুরুব্বীর বহু দিল্-এর দোওয়ার ফলে এ-হেন কর্তা পেয়েছি। সেই মহৎ সদ্‌গুণটি কি? খানা-টেবিলের পানে ধাওয়া করে সেখানে যদি দেখেন সের্ফ প্লেন এক ধামা মুড়ি, কিংবা পক্ষান্তরে যদি দেখেন কোর্মা-কালিয়া-মুসল্লম-কাবাব-পোলাও গয়রহ তখন এই সহৃদয় মহাজনের কাছে দুই পক্ষই বরাবর! আর না—আমি চললুম।'

ডাক্তার খাটের বাজুতে বসে লাজুক হাসি হাসতে হাসতে বললেন, 'একেই তো বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিলেন একখানা উয়েল-লুব্রিকেটেড রসনা—ডাক্তার হিসাবে নিতান্ত হিউমেন এনাটমি জানি বলে একখানা রসনাই বললুম, ইতরজন বলবে শতাধিক—তদুপরি আপনার সঙ্গে পরিচয়ের খুশ-কিস্মৎ নেক্-নসীব হওয়ার পর থেকে তার উপর ভর করেছে একটা আস্ত সাহিত্যিক জল-জ্যান্ত মামদো। আপনার সাহিত্যিক গুণটা পেলেও না হয় সেটা সয়ে নিতুম। তা নয়। রামকে না পেয়ে পেয়েছে তার খড়ম। এখন আমার ব্রহ্মতালুর উপর শুকনো সুপুরি রেখে অষ্টপ্রহর দমাদম পিটুনি—সেই আপনি, রামচন্দ্রজী, আপনার খড়ম যে বরায়ে মেহেরবানী এনাম দিয়েছিলেন তাই দিয়ে। ওফ্।'

আমি বললুম, 'শত যুগের তপস্যা-ফপস্যা জানি নে, ডাক্তার, কিন্তু আপনি যে রত্নটি পেয়েছেন সেটি অতিশয় কপালী লোকেও পায় কি না-পায় সন্দেহ। আর আমার জান্-কলিজা-দিল থেকে দোওয়া আসছে, আপনারা যেন একে অন্যের অক্লান্ত কদর দিতে দিতে দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ, দরাজের চেয়েও দরাজ জীবন যাপন করেন। আমেন!'

ডাক্তার বললেন, 'আমার সব মুরুব্বীজন ওপারে। এপারে মাত্র একজন—আপনি। আল্লা যেন আপনাকে একশ' বছরের জিন্দেগী দেন। আমেন, আমেন।'

রুচিশ্রী অনাড়ম্বর খানা খাওয়া শেষ হলে পর একটুখানি ইতিউতি করে ডাক্তার বললেন, 'আজকের মত আমাকে মাফ করে দেবেন, স্যর? দিনভর বেদম খাটুনি গিয়েছে। আমার চোখ জড়িয়ে আসছে—ওদিকে আবার এশার নমাজ এখনো পড়া হয় নি।'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। কাল সকালে দেখা হবে তো? না আপনি লেবরেটরিতে গিয়ে সেখানে ফজরের নমাজ পড়েন? গুড নাইট, ডাক্তার। খুদা-হাফিজ!'

ডাক্তার মাথা নিচু করে বললেন, 'গুড নাইট, স্যর।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'আপনি আসাতে আমি যে কী আনন্দ পেয়েছি—'

আমি বললুম, 'থাক্, থাক্।'

শহ্‌র্-ইয়ার উঠে বললেন, 'আমি ঠিক দু'মিনিটের ভিতর ফিরে আসছি।'

ডাক্তার তারস্বরে প্রতিবাদ জানালেন। শহ্‌র্-ইয়ার সেদিকে কান না দিয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন।

আমি শোবার ঘরে এসে ধীরে সুস্থে কাপড় ছেড়ে সবে একখানা বই নিয়ে বসেছি এমন সময় ম্যাডাম এসে উপস্থিত। যেন মাফ চেয়ে বললেন, 'ও'র নমাজের ব্যবস্থাটা আমি নিজের হাতে করে দি। ঐ একটি ব্যাপারে, সত্যি বলছি ঐ একটি মাত্র ব্যাপারে উনি সহজে সন্তুষ্ট হন না। আর-সবাই তো বছরের পর বছর একই জায়নমাজে নমাজ সেরে সেটি ভাঁজ করে রেখে দেয়, পরের বারের জন্য?—উনি বললেন "উহুঁ—কত ধুলোবালি ময়লা জমে তার উপরে।" তাই তাঁর প্লেন লংক্লথের তিনখানা জায়নমাজ আমি পালাক্রমে রোজ রাত্রে কেচে রাখি। উনি অবশ্য বলেছিলেন বেয়ারা কাচুক না। কিন্তু আমি জানি, আমার হাতে কাচা জায়নমাজে তিনি প্রসন্নতর চিত্তে নমাজ পড়েন।'

আমি ঈষৎ বিস্মিত হয়েছিলুম, সেই এশার নমাজের কথা শুনে। এবারে পুরো মাত্রায়। শুধালুম, 'উনি কি নমাজ-রোজাতে খুব আসক্ত? তাই তো মনে হচ্ছে।'

শহ্‌র্-ইয়ার বললেন, 'আসক্ত! ঐ দুটি মাত্র ধাতু দিয়েই তো তাঁর জীবন গড়া। নমাজ-রোজা আর রিসার্চ।'

আমি হাসতে হাসতে মাথা দোলাতে দোলাতে বললুম, 'আমি সব জানি, আমার কোনো জিনিস অজানা নেই। আমি পয়গম্বর হজরৎ মুহম্মদ সল্লাল্লাহু ওয়া আলাইহি সসলাম-এর বংশধর, তদুপরি আমি সাতিশয় সম্মানিত পীর খান-দানের ছাওয়াল, তদুপরি আমার ঠাকুরদা দাদামশাই দু'জনাই ছিলেন জঁহাবাজ মৌলানা। আমি জানবো না তো কে জানবে? আপনি? ডাক্তার? আবাদন্! হরগিজ নহী।' বলে তিনটি আঙুল তুলে ঘন ঘন আন্দোলন করতে করতে বললুম, ট্রিনিটি, ট্রিনিটি—পিতা পরমেশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা। আপনি সেই পবিত্র আত্মা। আপনি সেই পবিত্র আত্মা—রূপকার্থে ও শব্দার্থে। কিংবা, ভদ্রে বেগমসাহেবা, কাছে এসে অস্মদ্দেশীয় গীতাটি স্মরণ করুন। জ্ঞান-যোগ—সে ডাক্তারের রিসার্চ। কর্মযোগ—সে তাঁর আরাধনা ক্রিয়া-কর্ম। ভক্তিযোগ—সে আপনার প্রতি তাঁর অবিচল ভালোবাসা। আপনাদের উভয়ের এ জীবনে সুখ আছে এবং অন্য লোকে মোক্ষ-নজাৎ! অবশ্য দ্বিতীয়টা যেন একশ' বছর পরে আসে। কারণ ফার্সীতে বলে, দের আএদ, দুরুস্ত আএদ —যেটা দের-এ অর্থাৎ দেরিতে আসে সেটাই দুরুস্ত—পরিপাটি—হয়ে আসে।'

আমার উৎসাহের বন্যায় শহ্‌র্‌-ইয়ার ডুবু ডুবু। সাদা-মাটা ভাষায় বললেন, 'আপনার মুখে মধু, কানে মধু—এই যেন চিরকাল আপনার কিস্মতে থাকে।' আর আপনার শুভেচ্ছা-দোয়ার জন্য আমার যা কর্তব্য কাল, শুক্রবার, সেটি করবো। আপনার সলামৎ-কল্যাণের জন্য মহল্লার মসজিদে শিনী পাঠাবো। নমাজান্তে জমায়েৎ ধর্মনিষ্ঠজন আপনার আত্মার জন্য দোয়া করবেন।'

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম, বে-ফায়দা, বে-কার, ইয়ার! বে-ফায়দা, বেকার। আমার মত পাষণ্ড পাপীর জন্য শিনী পাঠানো তপ্তকটাহে বিন্দুমাত্র বারিসিঞ্চনতুল্য! তা সে যাক্—আল্লা মেহেরবান, তাঁর কাছ থেকে শেষ বিচারের দিনে মাফের আশা রাখি। এবারে বলুন তো, নমাজ-রোজার প্রতি আপনার কি রকম টান?'

দুঃখ করে বললেন, 'আমার বদ্‌-নসীব। আল্লা আমাকে সেদিকে মতিগতি দেন নি।'

'কর্তা অনুযোগ করেন না?'

'একদম না। ভদ্রলোক কক্‌খনো কাউকে কোনো জিনিস করতে বলেন না—ভালোও না, মন্দও না। এমন কি তাঁর মডার্ন বন্ধুবান্ধবদের কেউ কেউ তাঁর আচারনিষ্ঠতা নিয়ে অল্পস্বল্প স্নেহসিক্ত কৌতুকের ইঙ্গিত করলে তিনি শুধু মিটমিটিয়ে হাসেন। শুধু তাই নয়, মাঝেমধ্যে ধর্ম নিয়ে তাঁদের ভিতর আলোচনা আরম্ভ হলে তিনি সব-কিছু শোনেন মন দিয়ে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁরা তাঁকে কক্‌খনো সে আলোচনায় যোগ দেওয়াতে পারেন নি। বিশ্বাস করবেন না, আমার সঙ্গে তো সব বিষয়েই কথাবার্তা হয়—আমার সঙ্গে পর্যন্ত তিনি কখনো ঐ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন নি, আমি সূত্রপাত করলেও না। এই দেখুন, রববারে কাজে বেরন না বলে ফজরের নমাজ পড়ে প্রথম এক ঘণ্টা কুরান পড়েন সুর করে 'কারীদের' মত। তারপর খানতিনেক ইংরিজি বাংলা অনুবাদ আর একখানা আরবী টীকা নিয়ে আরেক ঘণ্টা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি শব্দের গভীরে গিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে নোট করে টোকেন। আমি তাঁকে একদিন ঐ অধ্যয়নের দিকটা আমার সঙ্গে করতে অনুরোধ জানিয়েছিলুম। তিনি বললেন, "আমি নিজে এতই অল্প জানি যে তোমাকে কম্‌পিটেণ্টলি সাহায্য করার শক্তি আমার মধ্যে নেই। আমি বরং তোমার জন্য একজন ভালো মৌলানা যোগাড় করে দিচ্ছি।" আমি বললুম, থাক। আপনিই তো কবি ওমর খৈয়ামের একটি চতুষ্পদী অনুবাদ করেছেন,

"তব সাথে, প্রিয়ে মরুভূমি গিয়ে
পথ ভুলে তবু মরি,
তোমারে ছাড়িয়া মসজিদে গিয়া
কি হবে মন্ত্র স্মরি!"

আমি বললুম, 'এটা কি ডাক্তারের উচিত হল? পরিপূর্ণ সত্য একমাত্র আল্লার হাতে; আমাদের শুধু চেষ্টা তার কতখানি কাছে আসতে পারি। ডাক্তার কি ভাবছেন, তিনি যে মৌলানা এনে দেবেন কুরান শরীফ সম্বন্ধে তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে? আমি ডাক্তার হলে বলতুম, "মোস্ট ওয়েল্‌কাম্‌!" তার পর একসঙ্গে পড়তে গিয়ে যদি আপনি দেখতেন যে ব্যাপারটা থ্রী-লেগড্‌ রেস হয়ে যাচ্ছে তখন চিন্তা করতুম, এখন তা হলে কি করা যায়? তার বদলে মৌলানা এনে লাভ? তিনি তো প্রথম ঝাড়া পাঁচটি বৎসর আপনাকে ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করাবেন, এবং তারপর? আপনি, ডাক্তার, আমি—আমরা কুরানে যা খুঁজি, মৌলানা তো সেটা খোঁজেন না। তাই দাঁড়াবে:

তৃষ্ণায় চাহিনু মোরা এক ঘটি জল
মৌলানা এনে দিল আধখানা বেল!

আপনি ডাক্তারের প্রস্তাব না মেনে বেশ করেছেন। কিন্তু ডাক্তারের কথা ওঠাতে মনে পড়লো, বেচারী সমস্ত দিন খেটেছে, আপনার সঙ্গে দু-চারটে কথা বললে তার শরীর-মন জুড়োবে। আপনি যান না।'

শহ্‌রু-ইয়ারের সে কী খিলখিল হাসি। হাসতে হাসতে যেন চোখে জল দেখা গেল। বললে, 'ইয়া আল্লা! আপনি আছেন কোন্‌ ভবে? এশার নমাজ সেরে বালিশের উপর ভালো করে মাথাটি রাখার আগেই তো তাঁর আগের থেকে তৈরী পরিপাটি নিদ্রাটি আরম্ভ হয়ে যায়। যেন যন্ত্রটি হাতে নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বাজনা—আলাপ না, বিলম্বিত না, আর যন্ত্রটা বাঁধার তো কথাই ওঠে না। আর হপ্তায় ক'দিন আল্লায় মালুম, শুতে গিয়ে দেখি তিনি নমাজ সেরে জায়নমাজেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। খাটে ওঠবার আর তর সয় নি। আর সে কী ঘুম, কী ঘুম! অত্যন্ত নিষ্পাপ মানুষ ভিন্ন অন্য লোক বোধ হয় আল্লার কাছ থেকে এ-ইনামটি পায় না।'

আমি শুধালুম, 'এ বাড়ীতে আপনার সঙ্গী-সাথী কেউ আছে?'

অবাক হয়ে বললেন, 'এ বাড়িতে?'

'হ্যাঁ।'

বললেন, 'এ বাড়ীতে তো আমরা দুজন থাকি। সঙ্গী-সাথী আসবে কোত্থেকে?'

এবার আমার আশ্চর্য হবার পালা। শুধালুম, 'এই যে গণ্ডায় গণ্ডায় সাজানো-গোছানো ঘর পেরিয়ে এলুম।'

'কেউ থাকে না তো।'

'ঐ যে উইংটা—এল শেপের মত এসে লেগেছে?'

'সেখানেই বা থাকবে কে? ওখানে তো আলোই জ্বালানো হয় না।'

'নিচের তলায়, তেতলায়?'

'সেগুলোও তো অন্ধকার দেখলেন। কেউ থাকে না উপরে, নিচে। থাকি আমরা দুজনে আর যে ক'টি লোক দেখলেন, আমরা যখন গাড়ি থেকে নামলুম।'

আমি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললুম, 'এই বিরাট বাড়িতে মাত্র দু'জন লোক!'

শহ্‌র্‌-ইয়ার একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন, 'আপনার ভয় করছে? কিন্তু এটা ভূতুড়ে বাড়ি নয়, রহস্য উপন্যাসের 'অভিশপ্ত পুরী'ও নয়। যিনি এ বাড়ি বানিয়েছিলেন—সে ক'যুগের কথা আমি জানি নে—তাঁর পরিবার, ইষ্টকুটুমগুষ্টি নিয়ে এ বাড়িটাও নাকি যথেষ্ট বড় ছিল না। কিন্তু আমি সত্যি বিশেষ কিছু জানি নে। উনিও যে খুব বেশী কিছু জানেন, তাও তো মনে হয় না! ওঁকে জিজ্ঞেস করবেন নিঃসঙ্কোচে। এ বংশের, এ বাড়ির কোনো গোপন রহস্য নেই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।' তারপর একটু ভেবে বললেন, 'আর উনিই বা বলবেন কি? সেই খুদায় মালুম ক'শ লোকের পরিবার কমতে কমতে মাত্র এক জনাতে এসে ঠেকলো তারই তো ইতিহাস? আমার মনে হয় না, তিনি খুব বেশি কিছু একটা জানেন—আর এ বাবদে তাঁর কোনো কৌতূহলও নেই। তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কত বিরাট বিরাট পরিবার প্রতিদিন 'বল ক্ষীণ' 'আয়ুহীন' হয়ে ক্ষয় পেয়ে যাচ্ছে, অতীতে গেছে, ভবিষ্যতেও যাবে। এতে বৈচিত্র্যই বা কি, আর রোমানসই বা কোথায়? আর, এ তো শুধু একটা পরিবার। কত জাতকে জাত কত নেশনকে নেশন পৃথিবীর উপর থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে, তারই বা খবর রাখে কে?'

আমি বললুম, 'থাক্‌ এসব দুঃখের কথা। আমি এখানে রোমানসের সন্ধানে আসি নি সে তো আপনি জানেন। এবারে বেশ মোলায়েম, মধুর, দিল-চস্‌প্‌ কোনো একটি বিষয়বস্তুর অবতারণা করুন। আপনার নামের মিতা বাগদাদের শহ্‌র্‌-ইয়ার শহর-জাদী এক হাজার এক রাত্রি গল্প বলেছিলেন। আপনি না হয় হাজারের শেষের এক রাত্রি সেইটে আরম্ভ করুন, বা শেষ করুন।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার বললেন, 'যবে থেকে এখানে এসেছেন, সেই থেকে তো আমি সুযোগ খুঁজছি।'

আমি বললুম, 'মাফ করে দেবেন।'

তিনি বললেন, 'আপনার দোষ কে বললে? বলছিলুম কি, আমারও রবীন্দ্র সঙ্গীত রেকর্ডের একটি মামুলী সঞ্চয়ন আছে। দু'একখানা শুনবেন?'

'নিশ্চয়ই, একশ বার এবং ধরে নিচ্ছি ডাক্তারের বিধিদত্ত যোগনিদ্রা তাতে ব্যাহত হবে না।'

আশ্চর্য, আমার শোবার ঘরের দেয়ালে শহ্‌র্‌-ইয়ার বোতাম টিপে একটা চাকনা চিৎ করালেন। ভিতরের ক্যাবিনেট বা কুলুঙ্গি থেকে যেন রেল লাইনের উপর দিয়ে স্লাইড্‌ করে বেরল একটি রেডিয়োগ্রাম। এ না হয় বুঝলুম,

কিন্তু ঘরের পশ্চিম প্রান্তের এস-পার-উস-পার জোড়া দেয়ালে বিল্‌ট্‌-ইন্‌ দেরাজের স্লাইডিং দরজাগুলো যখন এদিক ওদিক সরাতে আরম্ভ করলেন তখন তার 'মামুলী সঞ্চয়ন' দেখে—আমি বাঙাল—জীবনে এই দ্বিতীয় বার হাইকোর্ট দেখলুম। দশবিশ বছর ধরে প্রত্যেকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড না কিনলে তো এ রকম বিরাট সঞ্চয়ন হয় না। এবং খাস মার্কিন স্টাইলে সেগুলো কার্ড ইনডেক্‌সিং পদ্ধতিতে সাজানো। গোটা ছয় কার্ডশেল্‌ফ্‌ আমার সামনের টেবিলে রেখে বললেন, 'ক্যাটলগ দেখতে চান তো এই রইল। আমার নিজের দরকার নেই। আমার মুখস্থ আছে। আরেকটা কথা, এ সঞ্চয়নের অনেক out of print রেকর্ড কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে পুনা রেকর্ড নতুনের দামে কেনা।' তারপর আমাকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই লাগালেন, 'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশকুসুম চয়নে'—এ গানটা যেন আমাদের উভয় পক্ষের সম্মিলিত 'বিস্‌মিল্লা' 'আল্লার নামে আরম্ভ করি'-র মত।

শহ্‌র্‌-ইয়ার দেখলুম গান শোনার সময় চোখ বন্ধ করে পাষাণ-মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন।

এখানেও সেই বোলপুর পদ্ধতি। দুটো গানের মাঝখানে দীর্ঘ অবকাশ দেন।

আমাকে শুধোলেন, 'এবারে আপনার পছন্দ কি?'

আমি আমার কণ্ঠে পরিপূর্ণ আন্তরিকতা প্রকাশ করে বললুম, 'আমি এই রবীন্দ্রসঙ্গীতের শপথ নিয়ে বলছি, আপনার আমার রুচি একই। আমার বাড়িতে আপনি বাছাই করে যে-সব গান বাজিয়েছিলেন তার থেকেই আমার এ দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে।'

বললেন, 'মুশকিলে ফেললেন! আমি যখন নিতান্ত নিজের জন্যও বাছাই করি তখনো আমার এক যুগ কেটে যায় একটা রেকর্ড বাছাই করতে।' তারপর রেডিয়োগ্রামের দিকে যেতে যেতে আপন মনে বললেন, 'হুঁঃ! তারও দাওয়াই বের করেছি। কাল আমি শুয়ে থাকবো পাটরাণীর মত আর এই পীরের সন্তানকে বলবো রেকর্ড বাজিয়ে গানের সূত্রপাত করে পাপ সঞ্চয় করুন তিনি।'

এবার বাজালেন, 'তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে কত আর সেতু বাঁধি।'

তার মোহভঙ্গ হওয়ার পর যখন আমার কাছে এসে বসলেন তখন আমি তাঁকে শুধালুম, 'আপনার আত্মার খাদ্য কি?'

'আরো বুঝিয়ে বলুন।'

'দেহ ছাড়া আছে মানুষের মন, হৃদয়, আত্মা। আপনার বেলা এঁরা পরিতৃপ্ত হন কি পেলে? যেমন মনে করুন, সাহিত্যচর্চা, নাট্যদর্শন, সঙ্গীতশ্রবণ,—এমন

কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ, বা যেমন আপনার স্বামীর বেলা সৃষ্টিকর্তার আরাধনা, কিংবা—'

বাধা দিয়ে বললেন, 'এবারে বুঝেছি এবং তারপর উত্তর দিতে আমাকে আদপেই বাছ-বিচার করতে হবে না, একলহমা চিন্তা করতে হবে না। আমার জীবন-রস রবীন্দ্রসঙ্গীত। ঐ একটি মাত্র জিনিস।'

আমি বললুম, 'ব্যস্‌?'

'ব্যস্‌।'

এবারে বাজালেন, 'আমার নয়ন—'

কাছে এলে ফের শুধালুম, 'রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া আর কি?'

বললেন, 'এর অনেক, অনেক পরে আসে যে-সব জিনিস সেগুলোর মধ্যে একাধিক জিনিস আমাকে আনন্দ দেয়, মুগ্ধ করে, সম্মোহিত করে, আত্মবিস্মৃত করে, কিন্তু এরা আমার প্রাণরস নয়।'

'সেগুলো কি?'

'যেমন ধরুন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, শরৎচাটুয্যের বড় গল্প, আপনার শবনম্‌,—'

আমি বললুম, 'থাক্‌, থাক্‌। এ নামগুলো আর কখনো এক নিশ্বাসে করবেন না। লোকে বলবে, আপনার রসবোধ অদ্ভুত, বিজার্‌, গ্রোটেস্ক।'

'বলুক। আমি কুমারস্বামী নই, স্টেলা ক্রামরিশও হতে চাই নে।'

এবারে বাজালেন আরও একটা আমার প্রিয় গান।

ফিরে এসে আমার পায়ের কাছে বসলেন। আমি লম্বা হয়ে শুয়ে উত্তম যন্ত্রে, সমঝদার কর্তৃক সযত্নে বাজানো বে-জখমী রেকর্ড শুনছিলুম—পরম পরিতৃপ্তি ও শান্তিলাভ করে আমি যেন আমার সর্ব দেহ মন কোনো এক মন্দাকিনী ধারায় ভাসিয়ে দিয়েছি। মৃদুকণ্ঠে বললে, 'আপনার পা টিপে দি?"

আমি সর্পাহতবৎ লাফ দিয়ে উঠে খাড়া হয়ে বসে বললুম, 'এ আবার কি?'

দেখি, তাঁর মুখ থেকে সর্বশেষ রক্তবিন্দু অন্তর্ধান করেছে। আমার দিকে তাকালেন না, দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে চুপ করে বসে আছেন।

আমি তখন আস্তে আস্তে বুঝতে পারছি, ভুল আমারই, উত্তেজিত হওয়াটা আমার গাঁইয়া বেকুবী হয়েছে। সেটা ঢাকবার জন্য রেডিয়োগ্রামের কাছে গিয়ে না দেখে-চেয়ে আগের রেকর্ডটার উল্টো পিঠটা বাজাবার চেষ্টা করলুম কিন্তু মেসিনটা এমনই নূতন মডেলের যে কোন্‌ বোতাম টিপলে কি হয়, কোন্‌ স্ক্রুর কি ফানকশন অনুমান না করতে পেরে ভ্যাবাচ্যাকার মত দাঁড়িয়ে রইলুম। শহ্‌র্‌-ইয়ার বুঝতে পেরে কাছে এসে বললেন—আল্লাকে শুক্‌র্‌, তাঁর গলায় কণামাত্র উত্তাপ বা অভিমান নেই—'এখন আমি বাজাই। কাল আপনাকে দেখিয়ে দেব। তা হলে আপনার ইচ্ছেমত যখন খুশী তখন বাজাতে পারবেন।

তাই এই ঘরটাতেই আপনার থাকার ব্যবস্থা করেছিলুম।' কথাগুলো শুনে লজ্জায় আমার যেন মাথা কাটা গেল। এ মেয়ের অনেক গুণ প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই লক্ষ্য করেছি কিন্তু সে যে এতখানি দয়ালু আর ক্ষমাশীলা সেটা লক্ষ্য করে যেমন লজ্জা পেলুম তেমনি আনন্দও হল যে এমন সদ্‌গুণ শুধু যে পৃথিবী থেকে অন্তর্ধান করে নি তাই নয়, আমারই এক পরিচিতার ভিতর পরিপূর্ণ মাত্রায় রয়েছে।

রেকর্ড চালু করে দিয়ে এবারে শহ্‌রু-ইয়ার চেয়ারে বসলেন। আমি ততক্ষণে বিছানায় আবার লম্বা হয়েছি।

বললুম, 'শহ্‌রু-ইয়ার।'

'জী?'

'আগে যেখানে বসেছিলেন সেইখানেই এসে বসুন।'

'জী' বলে এসে বসলো।

আমি বললুম, 'টিপতে হবে না, হাত বুলিয়ে দিন।' এবারে তাঁর মুখ আগের মতই উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

আমি বললুম, 'আমি বড়ই মূর্খ। মনে আছে আপনারা দুজনা যখন বোলপুরে আসেন তখন প্রথম পাঁচ মিনিটের ভিতরই আমি বলেছিলুম, "এদেশে আমার আত্মজন নেই?" তখন লক্ষ্য করেছিলুম, আপনার চোখ ছলছল করেছিল। তারপরও দেখুন দেখি, আমি কত বড় বেকুব।'

শহ্‌রু-ইয়ার হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'থাক্ না। এই সামান্য জিনিস নিয়ে—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'আমি কত বেকুব দেখুন। আচ্ছা, কাল যদি আমার শক্ত ব্যামো হয়, তা হলে আপনিই তো আমার দেহমনের সম্পূর্ণ ভার নেবেন এবং নার্স যা করে তার চেয়েও বেশী করবেন। নয় কি? তবে আজ আমার এত লজ্জা কেন?'

এবারে শহ্‌রু-ইয়ার শিশিরবিন্দুটির মত ঝলমল করে উঠলো।

উঠে এসে আমার মুখের উপর তাঁর হাত রেখে আদরে ভরা দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'আপনাকে বলি নি আর কথা না বলতে। এই আপনার মুখ বন্ধ করলুম। দেখি, কি করে ফের কথা বলেন। আসলে আপনার যাতে এখানে কোনো অসুবিধা না হয় তাই কাটুকে আমি আপনার কি কি দরকার, আপনার ডেলি রুটিন কি এসব অনেক প্রশ্ন শুধিয়েছিলুম। কথায় কথায় সে বললে, আপনি গা টেপাতে ভালোবাসেন তাই। এবার সব ভুলে যান।' হাত মুখ থেকে সরালেন।

বললুম, 'ভুলে গিয়েছি!'

হাসলেন। শুধালেন, 'এবারে কি বাজাব?'

ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে বললুম, 'ঐ মরণের সাগর পারে, চুপেচুপে তুমি এলে।'

সঙ্গে সঙ্গে একদম ডেড্ স্টপ। তারপর আমার হাতের কাছে খাটের বাজুতে বসে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর অতি ধীরে ধীরে বললেন, 'এই বারে আমার মনের অন্ধকারতম কোণেও আর কোনো সন্দেহ রইল না যে আপনার আমার রুচি এমনই অস্বাভাবিক ধরনের এক যে, আর কেউ জানতে পারলে বলবে, আমি আপনার অন্ধ ভক্ত বলে আমার রুচি আপনার রুচির কার্বন কপি মাত্র। অথচ কী আর বলবো, এ গান আমাকে যে রকম আত্মহারা করে দেয় অন্য কোনো গান সে-রকম পারে না। জানেন, এ গান কিন্তু এখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত সমঝদারদের ভিতরও অতি, অতি দৈবে-সৈবে গাওয়া হয়। এবং যে দু'বার শুনেছি সেও একদম বাইরের অজানা অচেনা গাওয়াইয়া গেয়েছে—অর্থাৎ সমঝদারদের চেলাচেলীর কেউ না। আমার তো বিস্ময় বোধ হয়, রেকর্ড কোম্পানি কোন্ সাহসে এ-গানটি বাছাই করলো। দিনু বাবুর চাপের দরুন না কি?

'আর কী অদ্ভুত সাহস দেখিয়েছেন আপনার গুরুদেব এই গানে।

'ভুবন-মোহন স্বপন রূপে'—কি বস্তাপচা সমাস এই 'ভুবনমোহন'-টা। কোনো মেয়ের নাম ভুবনমোহিনী শুনলেই তো আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে জগদম্বা, রক্ষাকালী, ক্ষান্তমণি! না? অথচ এই গানের ঠিক এ জায়গাটায় সমাসটা শুনে নিজের কানটাকে-বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না যে, এই ঝুলি-ঝাড়া, সাতান্ন ঘাটের জল খাওয়া, হেকনির্ড, ক্লিশে সমাসটি এত মধু ধরে, তার এত বৈভব, এত গৌরব! সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধ চোখের তারা দুটি যেন আকাশের দিকে ধাওয়া করে—নইলে সমস্ত ভুবন কিভাবে মোহন হল সেটা দেখবে কি করে অনেকখানি উঁচুতে না উঠে, সেখান থেকে নিচের দিকে, ভুবনের দিকে না তাকিয়ে! আর তার পর? ঐ উর্ধ্বলোক থেকে যখন বিশ্বভুবনের মোহনীয়া রূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে আস্বাদন করছি তখন অকস্মাৎ কি নিদারুণ গভীর গহ্বরে পতন! শুনি,

বন্ধ ছিলাম এই জীবনের অন্ধকূপে—

আমার চোখের সামনে তখন কী বীভৎস দৃশ্য ভেসে ওঠে, জানেন! আমাদের গ্রামাঞ্চলের লোক এখনো বিশ্বাস করে, কোনো কোনো বিরাট ধনের মালিক তার সমস্ত ধন কোনো এক গভীর অন্ধকার গহ্বরে পুঁতে রেখে যায়, এবং সেটাকে পাহারা দেবার জন্য চুরি-করে-আনা একটি আট বছরের শিশুকে জন্মের মত শেষবার তাকে ভালো করে খাইয়েদাইয়ে, সাজিয়েগুজিয়ে সেই ধনের পাশে বসিয়ে গুহা-গহ্বর বাইরের থেকে সীল করে দেয়। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, সেই ক্ষুদ্র বালকটি যেন অন্ধভাবে ধীরে ধীরে

আপন অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করছে। তার পর অনুনয়-বিনয়, তার পর রোদন; সর্বশেষে তার ক্ষুদ্র মুষ্টি দিয়ে চতুর্দিকের দেয়ালে আঘাতের পর আঘাত—'

আমি বললুম, 'দয়া করে ক্ষান্ত দিন, আমি আর শুনতে চাই নে।'

বললেন, 'তবে থাক! ঐ যে 'বন্ধ ছিলাম অন্ধকূপে'—আমাদের প্রত্যেকের জীবন কি তাই নয়? অন্ধকূপের দেয়ালে জীবনভর করে যাচ্ছি মুষ্ট্যাঘাত আর আর্তনাদ, "ওগো খোলো খোলো, আমাকে আলোবাতাসে বেরুতে দাও।"

তারপর 'ভুবনমোহন' রূপ নিয়ে মৃত্যু এসে দেয় নিষ্কৃতি—সে 'শ্যামসমান' মোহনীয়া। এ কী ভ্রান্ত ধারণা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে যে মৃত্যু বিকট বীভৎস! সে আসা মাত্রই ঊর্ধ্বপানে তাকিয়ে দেখি, আকাশে 'স্তরে স্তরে সন্ধ্যাদীপের প্রদীপ জ্বালা'—কত না নক্ষত্র স্তরে স্তরে প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতীক্ষা করছে আমাকে অমর্ত্যলোকের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে বলে, আর পদপ্রান্তে—যে মর্ত্যভূমি থেকে বিদায় নিচ্ছি সেখানে ঝিল্লি-সঙ্গীতের সঙ্গে পুষ্পবনের গন্ধধূপের সৌরভ!

আপনাকে শুধোই, আপনি বয়সে বড়, অনেক-কিছু পড়বার, শোনবার সুযোগ পেয়েছেন—এ রকম আরেকখানা গান কেউ কখনো রচতে পেরেছে?"

আমি বললুম, 'না, কিন্তু আপনি যে-রকম গানটিকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছেন, ক'জন বাঙালী পারে সেটা?'

শহ্‌রু-ইয়ার অনেকক্ষণ ধরে সমুখপানে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। শেষটায় বললেন, 'ঠিক কোন্ দিক দিয়ে আরম্ভ করবো বুঝতে পারছি নে। আমি যে গানটিকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছি তার জন্য আমার হৃদয় ছিল প্রস্তুত। কিন্তু সে প্রস্তুতিটি নির্মিত হল কি প্রকারে? রবীন্দ্রনাথের গানে গানে। ভিলেজ ইডিয়টেরও হৃদয় আছে কিন্তু সেই আকারহীন পিণ্ড সারাজীবন ধরে একই পিণ্ড থেকে যায়। আমার হৃদয় প্রতি নূতন গানের সামনে নূতন আকার ধরেছে, যেন সে শিল্পীর হাতের কাদা। ঐ চিন্ময় গান শুনতে শুনতে আমার হৃদয় যেন ঐ গানেরই মৃন্ময় রূপ ধারণ করে একটি মূর্তিরূপ ধারণ করে। গানটি যেন শিল্পী। গানের প্রতিটি সুর প্রতিটি শব্দ তার আঙুলের চাপ। সুরে সুরে শব্দে শব্দে অর্থাৎ গান-শিল্পীর আঙুলের চাপে চাপে মূর্তিটি সম্পূর্ণ হয়েছে। তারপর শুনলুম আরেকটি গান। আগের মূর্তিটি তন্মুহূর্তেই আবার শিল্পীর হাতে কাদাতে পরিবর্তিত হয়েছে। সুরে সুরে শব্দে শব্দে আবার সে এক নবীন মৃন্ময় মূর্তিতে পরিণত হল। এভাবে আমার হৃদয় কত শত মূর্তিতে পরিণত হয়েছে কত শত গানে গানে। আর এখন? এখন চেনা গানের দুটি শব্দ শোনা মাত্রই সম্পূর্ণ মূর্তি আপনার থেকেই তার আকার, তার রূপ নিয়ে নেয়। অথবা অন্য তুলনা দিয়ে বলবো, রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি গান যেন ভিন্ন আকারের রঙিন কি পানপাত্র, আর আমার হৃদয় বর্ণহীন

তরল দ্রব্য। ঐ গানের পাত্রে প্রবেশ করে সে নেয় তার আকার, তার রঙ।

আমার সুখ-দুঃখের অনুভূতি, আমার মান-অভিমান, বিরহ-মিলনের অশ্রুপাত আনন্দোল্লাস আমার সর্বপ্রকারে সূক্ষ্মানুভূতি, স্পর্শকাতরতা—সব, সব নির্মাণ করেছে, প্রাণবন্ত করেছে রবীন্দ্রনাথের গান; সেই শত শত গানই শিল্পী—স্রষ্টা!'

আমি চুপ করে, কোনো বাধা না দিয়ে প্রত্যেকটি শব্দ হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করছিলুম। বললুম, 'আমরা হিন্দু আর মুসলমান মেয়ের হৃদয়বৃত্তি নিয়ে আলোচনা করছিলুম। সেই সুবাদে আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মসঙ্গীতে যে চরম সত্তার কাছে আত্মনিবেদন করেছেন তিনি তো মুসলমান সুফীদের 'অল-হক্‌' পরম 'সত্য' সত্তাস্বরূপ। এ গানগুলো আরবী বা ফার্সীতে অনুবাদ করলে কারো সাধ্য নেই যে বলতে পারো এগুলো রচেছে এমন এক কবি যে মুসলমান নয়। আপনি মুসলমান। এ গানগুলো শুনে আপনার হৃদয় কি রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানের চেয়ে বেশী সাড়া দেয়?'

গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বললে, 'ঔখানেই তো ট্র্যাজেডি। কয়েকটি ব্যত্যয় বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ধর্মসঙ্গীতই আমার বুকে তুফান তোলে না। তুললে তো আমার সব সমস্যা ঘুচে যেত। আমার দেহমন সেই চরম সত্তার কাছে নিবেদন করে পরমা শান্তি পেতুম। একেই তো বলে ধর্মানুরাগ। বরঞ্চ দেখুন, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করবো না, আল্লা মানুষের রূপ ধারণ করে অবতার রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন এবং তৎসত্ত্বেও যে ধর্মসঙ্গীতটি আমার হৃদয়ের ভিতর দুরন্ত তুফান তোলে, সেটি—

মেরে তো গিরিধর গোপাল
দোসরা তো কোঈ নহী রে—

চরম অসহায় অবস্থায় এ-ভজনটি যে আমি কত সহস্র বার কখনো চিৎকার করে এই নির্জন বাড়িতে গেয়েছি, কখনো গাড়িতে বসে গুনগুনিয়ে, আর সবচেয়ে বেশী জনসমাজে—বস্তুত সেখানেই আমি সবচেয়ে বেশী একা, বর্জিতা, অসহায় শক্তিহীনা বলে নিজেকে অনুভব করি—নিঃশব্দে শুধু হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন নিয়ে।'

* * *

নিঝুম নীরব সে গৃহ, বিরাট ভবন স্তব্ধ, বাইরের ভুবন তন্দ্রামগ্ন।

হয়তো এস্থলে আমার উচিত ছিল সহানুভূতি প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করা শহ্‌র্‌-ইয়ার কেন নিজেকে 'বর্জিতা' 'অসহায়' বলে মনে করেন। কিন্তু করলুম না।

'সর্বনাশ!' হঠাৎ বলে উঠলেন শহ্‌র্‌-ইয়ার। 'তিনটে বেজে গেছে, আপনি ঘুমুন, আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। ছি ছি, আমার একেবারে কোনো

কান্ডজ্ঞানই নেই !'

ছয়

আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, সৃষ্টিকর্তা নারী পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন ধাতু দিয়ে গড়েছেন। শহ্‌র্‌-ইয়ার ঘুমিয়েছে ক'ঘণ্টা ? তিন ঘণ্টা ? সাড়ে তিন ঘণ্টার বেশী নিশ্চয়ই নয়। সাড়ে সাতটায় খাবার ঘরে চা খেতে এসে দেখি, তার চেহারা যেন শিশির-ধোয়া শিউলি ফুলটি। কোনো সন্দেহ নেই, সৃষ্টিকর্তা তাদের প্রতি বেশী মেহেরবান।

শহ্‌র-ইয়ার ডাক্তারের ব্রেকফাস্টের তদারকি করছে, সঙ্গে সঙ্গে তার লাঞ্চের জন্য স্যান্ডউইচ সন্দেশ এটা সেটা ছোট্ট টিফিনবক্সে সাজাচ্ছে এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে বাজার-সরকারকে হাটের ফিরিস্তি বলে যাচ্ছে। আমাকে এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে বললে, 'আপনি দুপুরে, রাত্রে কি খাবেন যদি বলেন তবে এই বেলাই হাটের সঙ্গে সেগুলো এসে যাবে।'

আমি বললুম, 'দোহাই আপনার ! আমাকে নিষ্কৃতি দিন। আপনি তো দেখেছেন, আমি আমার বাড়িতে একেবারে একা। দিনের পর দিন কাঁচা, পাকা—সব বাজারের ফিরিস্তি বানানোর মত একঘেয়ে মেয়েলী কাজ করতে হয় আমাকে। আমি ছুটি চাই।'

কাছে বেরবার পোশাক পরে ডাক্তার এলেন। ভালো ঘুম হয়েছে কি না শুধোলেন, সকালবেলা যে শুধু চা না খেয়ে এটা সেটা খাওয়া উচিত সেটা শোনালেন এবং তারপর দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, 'আমার কপাল, তাছাড়া আর কি বলবো। এশার নমাজ যেই না শেষ হয় অমনি সুলেমান বাদশার দুই জিন্‌ আমার দুই চোখের পাতার উপর তাদের আড়াই'শ মন ওজন নিয়ে হয় সওয়ার। আপ্রাণ চেষ্টা করে তখন পাঁচটি মিনিটও জেগে থাকতে পারি নে। সকালবেলা উঠেই বুকে পাপ হিংসার উদয় হল—আপনারা দুজনাতে যে মজলিস জমালেন আমি তার হিস্যেদার হতে পারলুম না বলে।'

আমি বললুম, 'আপনি বিশ্বাস করবেন যে আমি আপনাকে বার বার মিস্‌ করেছি ?'

ডাক্তার বললেন, 'কোথায় না সান্ত্বনা পাবো, শোকটা আমার আরো উথলে উঠছে।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার সঙ্কোচের সঙ্গেই ডাক্তারকে বললেন, 'তাহলে আজ একটু বেলাবেলি বাড়ি ফিরলেই তো ও'র সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য খানিকক্ষণ সময় পাবে।'

ডাক্তার সোৎসাহে বললেন, 'ঠিক বলেছো। আজ তাহলে গাড়ি সাতটায়

সময়ই পাঠিয়ে দিয়ো।' আমাকে বললেন, 'গাড়ি আমাকে পেঁছে দিয়েই ফেরৎ আসবে। আপনি যদি কোথাও যেতে চান তো কোনো অসুবিধে হবে না। এমন কি সাতটার সময় গাড়ি না পাঠাতে পারলেও আমার কোনো হাঙ্গামা হবে না। আমাদের দফতরে একটি হর-ফন্‌-মৌলা, সকল-কাজের-কাজী চাপরাসী আছে—জিনিয়াস লোকটা। এই কলকাতা শহরের একশ' মাইল রেডিয়াসের ভিতরও যদি কুল্লে একখানা ট্যাক্‌সি খালি থাকে তবে সে সেটা পাবেই পাবে—যেন ব্লাড হাউণ্ডের মত সে ট্যাক্‌সির বদ্‌বো শুঁকতে পায়।'

আমি বললুম, 'আমি বাড়ি থেকে বেরুচ্ছিই না; আমার কোনো প্রকারের এন্‌গেজমেণ্ট নেই।'

ডাক্তার বললেন, 'তাহলে তো আরো ভালো। শহ্‌র্‌-ইয়ার আপনাকে নিয়ে যাবে এখানে সেখানে, সর্বশেষে তার প্যারা প্যারা বইয়ের দোকানে। আর ইতিমধ্যে যদি ইচ্ছে হয়, তবে আমাদের পাঁচ-পুরুষের জমানো আরবী ফার্সী কেতাব ঘাঁটতে পারেন আমাদের লাইব্রেরীতে—একপাশে আছে, আমার কেনা কিছু ইংরেজী আর বাঙলা বই। না, না, না। তওবা! ডাক্তারী বই এখানে থাকবে কেন?'

হঠাৎ যেন নূতন অনুপ্রেরণা পেয়ে বললেন, 'আপনার বাগচী, ভটচায, চাটুয্যে চেলাদের একদিন ডাকুন না এখানে, কলকাত্তাই মোগলাই খানা খেতে? দোস্ত আপনাদেরও? না, তাহলে বোধ হয় ঠিক জমবে না। আলাদা আলাদা করে দাওয়াৎ করলেই ভালো। কি বলেন আপনি?'

আমি নষ্টামির চোখে বললুম, 'তার চেয়ে শহ্‌র্‌-ইয়ার তাঁর বান্ধবীদের স্মরণ করুন। তাঁদের সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ করে সেই গোলাপজলে শুকনো জানটাকে ভিজিয়ে নেব।'

ডাক্তার যেন সম্মুখে ভূত দেখতে পেয়ে বললেন, 'ওরে বাপরে! ওর মত জেলাস আর পজেসিভ রমণী আপনি ত্রিসংসারে পাবেন না। বরঞ্চ আপনাকে আমাকে দুজনাকে চিরজন্মের মত যমের হাতে ছেড়ে দেবে, তবু তার বান্ধবীর হাতে এক মিনিটের তরেও ছাড়বে না—হোক না সে বান্ধবীর বয়েস নব্বুই।'

টেবিল ছেড়ে উঠে বললেন, 'তাহলে স্যর, খুদা হাফিজ টিল উই মীট এগেন।'

বউয়ের দিকে তাকিয়ে একটু লাজুক হাসি হেসে বুলেট-বেগে বেরিয়ে গেলেন।

অনেকক্ষণ পরে ম্লান হাসি হেসে শহ্‌র্‌-ইয়ার বললেন, 'আপনি সত্যি বিশ্বাস করেন, তিনি আজ সাতটায় ফিরবেন? সময়মত ফেরা, না-ফেরা কি ওঁর এখ্‌তেয়ারে? সেটা তো সম্পূর্ণ তাঁর কাজের নেশার হাতে। নেশা না কাটা পর্যন্ত কি মাতাল দাঁড়িয়ে উঠে চলতে পারে? আজ যদি সাতটায় কাটে

তো ভালো। আর যদি তার বদলে দশটায় কাটে, তবে সেটা কাটার পর, ঐ মাতালেরই মত আপনার পা ধরে মাফ চাইবেন একশ' বার, হাজার বার। আপনাকে উনি যা শ্রদ্ধা করেন তাতে আপনাকে অবহেলা করা তাঁর স্বপ্নেরও বাইরে। কিন্তু নেশা জিনিসটা নেশা। কাজের নেশা, ঘোড়ার নেশা, প্রেমের নেশা।'

একটু ভেবে নিয়ে দুঃখের সুরে বলেন, 'আমার যদি কোনো একটা নেশা থাকতো তাহলে 'এই জীবনের অন্ধকূপের' তলায় দিব্য মাতাল হয়ে পড়ে রইতুম।'

আমি বললুম, 'আপনি না-হক্ পেসিমিস্ট।'

'আমি পেসিমিস্ট নই। আমি ইমোশোনাল—বড্ড বেশী স্পর্শকাতর—মাত্রাধিক অনুভূতিশীল। এবং তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আপনার গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। তাঁর শত শত গানের শত শত মেশিনের ভিতর দিয়ে আমার কলিজাটাকে এস্পার-উস্পার করে কিমা-কিমা বানিয়ে ছেড়েছেন। তবে এখন আর এসব কথা বলবো না। এ প্রসঙ্গের জন্য পুণ্য লগ্ন রাত্রে, গান শোনার মাঝে মাঝে। আর ঐ আমার কর্তাটি যে বললেন, আমি জেলাস, আমি পজেসিভ সেটা উনি চিন্তা না করে বলেছেন—'

আমি বললুম, 'কি বলছেন! উনি মস্করা করেছেন।'

'না, উনি চিন্তা না করেও একদম খাঁটি সত্য কথা বলেছেন। আমি খুব ভালো করেই জানি আমি জেলাস্ :এবং আমার হক্ আমার সম্পদ সম্বন্ধে সর্বক্ষণ সচেতন। তবে হ্যাঁ, আমি লড়নেওয়ালী নই। কেউ হামলা করলে আমি তখন আমার চোখের জলের সঙ্গ খুঁজি।'

আমি বললুম, 'খাঁটি মুসলমান বঙ্গ রমণী! কোথায় গেল মুসলমান পাঠান রমণীর দৃপ্তকণ্ঠের জঙ্গী জবাব, 'না, কবুল না।' ?'

গুনগুন করে গান ধরলো, 'কেন চোখের জলে ভাসিয়ে দিলাম না রে।' সঙ্গে সঙ্গে দিব্য লাঞ্চের টেবিল সাজানো, ব্রেকফাস্টের জিনিস সরিয়ে নিয়ে যথাস্থানে রাখা, ফাঁকে ফাঁকে রান্নাঘরের তদারকী করা, বাঙলা কথায় পুরো গেরস্থালির কাজ করে যেতে লাগলো—গান-গাওয়াতে কোনো খিরকিচ না লাগিয়ে। বাইরে থেকে যে কেউ সে-গাওয়া শুনে নিঃসন্দেহে ভাবতো, চোখ বন্ধ করে প্রাণমন ঢেলে তন্ময় হয়ে কেউ গানটি গাইছে।

শেষ হলে আমি বললুম, 'আমার মতের মূল্য অনেকেই দেয়, তাই বলছি, আপনি বড় সুন্দর গাইতে পারেন। কিন্তু বাইরে, মজলিসে কোথাও গেয়েছেন বলে শুনি নি, কাগজেও দেখি নি।'

বললো, 'একই বিষয়বস্তু কেউ লেকচাররূপে সভাস্থলে-প্রকাশ করে, অন্যে ঘরের ভিতর পাঁচকথার মাঝখানে বলে। আমার গান—যদি সত্যিই সেটা গানের

স্তরে ওঠে—দ্বিতীয় পর্যায়ের। বাড়িতে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে, এ গান তার জায়গা খুঁজে নিয়েছে। সভাস্থলে গাইলে নিশ্চয়ই আমার গান আড়ষ্ট শুষ্ক কাষ্ঠ হয়ে যাবে।' সঙ্গে সঙ্গে একটি গানের মাঝখান থেকে গেয়ে উঠলেন,

'সভায় তোমার ও কেহ নয়,
ওর সাথে নেই ঘরের প্রণয়
যাওয়া-আসার আভাস নিয়ে
রয়েছে এক পাশে।'

এ গানের ঘরের প্রণয়ীও নেই। নিতান্ত আমার কাজকর্মের নিরালা দিনের, নির্জন অবসরের এক পাশে পড়ে থেকে বেচারী আমাকে সঙ্গ দেয়।'

'নজরুল ইসলামের গানে শখ নেই? আর কিছু না হোক, মুসলমান হিসেবে, অন্তত যেগুলোর যোগ আমাদের ধর্মের সঙ্গে আছে?'

'আছে কিন্তু মুশকিল স্বরলিপি যোগাড় করা। আর যে-ভাবে সচরাচর গাওয়া হয় সেটা আমার পছন্দ নয়। কুক্ষণে তিনি 'বিদ্রোহী' রচেছিলেন। গাওয়াইয়ারা এখন তাঁর শান্ত লিরিকগানেও ঐ বিদ্রোহী সুর লাগান। বিলকুল বেখাপ্পা। এমন কি বিশ্বাস করবেন না, তাঁর 'ঝিঙে ফুলের' মত লক্ষে গোটেক, ধরা-ছোঁওয়ার বাইরের 'নাজুক' কবিতাটিও আবৃত্তি করা হয় 'মোশন' ঢুকিয়ে, জোশ লাগিয়ে! বদখদ বরবাদ! চলুন, আমার কাজ উপস্থিত এখানে খতম। বাজার আসুক; তখন দোসরা কিস্তি।'

আমি বেরুতে বেরুতে বললুম, 'একটি রেওয়াজ আমি পৃথিবীর সর্বত্রই লক্ষ্য করেছি। স্বামী স্ত্রী ভিন্ন অন্য তৃতীয় প্রাণী যে-বাড়িতে নেই, এবং স্বামী লাঞ্চ খেতে বাড়ি আসেন না, সেখানে স্ত্রী লাঞ্চ রাঁধে না। কি খায় সে অবশ্য দেশভেদে খাদ্য ভেদ। জানি নে লাঞ্চের পরিবর্তে আপনি কি খান। বিশ্বাস করুন আমি সেই খেয়েই সন্তুষ্ট হব। সের্ফ আমার জন্য আসমান জমীন স্থানচ্যুত করে আগা খানের খাওয়ার মত লাঞ্চ তৈরী করতে হবে না।'

চলতে চলতে বললেন, 'আপনার লোক দিলজান শেখও বলছিল আপনি লাঞ্চের তোয়াক্কা করেন না। ডিনারও নাকি প্রায়ই মীটসেফ্‌ থেকে বের করে রাতদুপুরে খান। কিন্তু এ বাড়িতে আমি বে-চারা, নিরুপায়। ইসলামী অনুশাসন অনুসারে এ বাড়িতে শতাধিক বর্ষ ধরে অলঙ্ঘ্য ঐতিহ্য, প্রভু-ভৃত্য খাবেন একই খানা। চাকররা সরু চাল খেতে পছন্দ করে না এই আর্জী পেশ করায় কর্তা সরু চাল ছেড়ে দিয়ে মোটা ধরেছেন! আমার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে ওরা মোড় থেকে মাঝে মধ্যে ফুচকা নিয়ে আসে—জানেন তো কি রকম ধুলোবালির সঙ্গে মিলে মিশে সে-ফুচকার 'মাটির শরীর'। কোনো দিন যদি দৈবাৎ ওঁর চোখের সামনে পড়ে যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে লম্ফ দিয়ে ঠোঙা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে চিৎকার, "দে, দে আমায় দে। একা একা খাস নি। গুনাহ্‌

হবে।" শুনুন, মশাই, শরিয়তের অভিনব ব্যাখ্যা! চাকরকে না দিয়ে মুনিব যদি একা একা খুশ্ খানা খায় তবে সেটা অশোভন (মকরুহ্) বলা হয়েছে, গুনা (পাপ) কি না জানি নে, কিন্তু মুনিবকে বাদ দিয়ে চাকর যদি—এবং সেটা মুনিবেরই পয়সায়—মামুলীই কিছু একটা খায় তবে নাকি সেটা চাকরের গুনাহ্। আবার ফুচকা খেতে খেতে গম্ভীর কণ্ঠে সদুপদেশ বিতরণ: "দ্যাখ্, রাস্তার ফুচকা খাস্ নি। জার্মটার্ম থাকে। অসুখ-বিসুখ করে।" তারপর আবার বিড় বিড় করে বলেন, "বাড়ির ফুচকা কিন্তু অখাদ্য রদ্দি।" এই তো এখানকার হাল। অতএব আপনি খান আর না খান, আমি খাই আর না খাই, দুপুরের রান্না হবে ঠিক ঠিক। কাল সন্ধ্যায় দেখলেন না, ঘরের পর ঘর সাজানো—জনপ্রাণী নেই? এটাও ঐতিহ্য!'

আমি বললুম, 'আরেকটা কথা। আজ বিকেলে সাড়ে ছ'টায় আপনাকে নিয়ে আমার প্রয়োজন। অবশ্য আপনার যদি ঐ সময় অন্য কোনো কাজ নাথাকে।'

'কি ব্যাপার? আমার তো ভয় করছে।'

আমি হাসতে হাসতে বললুম, 'রত্তিভর ভয়ের কারণ নেই। বঙ্গবালাদের—অবশ্য সবই হিন্দু—'লাজুক' তবিয়ৎ বাবদে আমি ওয়াকিফ্-হাল।'

উনি গান গাইতে গাইতে বিদায় নিলেন,

'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না,
হায় ভীরু প্রেম, হায় রে।'

দুপুরে খেতে বসার সঙ্গে সঙ্গে শহ্রু-ইয়ার বললেন, 'ক'বার যে গিয়েছি আপনার বন্ধ দরজার কাছে! দোরে কান পেতে না দেখেও স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি আপনি পড়ছেন। তাই দোরে টোকা দি নি।'

আমি বললুম, 'সর্বনাশ করেছেন। আমি জাগ্রত অবস্থায় কিছু-একটা না পড়ে থাকতে পারি নে। আর সর্বক্ষণ পড়ি বলে যে কোনো সময়ে যত ঘণ্টার জন্য চান আমি সে-পড়া মুলতুবী রাখতে পারি। তাই আপনি যে সময় খুশী যত ঘণ্টার তরে খুশী আমার কাছে এসে গল্প করতে পারেন, রেকর্ড বাজাতে পারেন—যা খুশী তাই। ও! অত প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন কেন? বিস্তর পড়ি বলে? হায়, হায়, হায়! জানেন, মাথা থাবড়াতে ইচ্ছে করে যখন কেউ বলে, কিংবা তার মুখের ভাব থেকে বুঝতে পারি যে, সে ভাবছে, আমি পড়ে পড়ে জ্ঞানসমুদ্রের গভীর থেকে গভীরতর স্তরে ডুব দিচ্ছি। বিশ্বাস করুন, কসম খেয়ে বলছি, জ্ঞান যৎসামান্য একটু আধটু হয়তো মাঝে-সাঝে বাড়ে, আসলে কিন্তু আমি পড়ি ওটা আমার নেশা, নেশা, নেশা। এক্কেবারে নেশার মত। মাতালকে শুধোবেন, সে বলবে, প্রথম দু'তিন পাত্তর তার দেহমনের জড়তা কাটে, সে সময় মনে ফুর্তিও লাগে কিন্তু তার পর যে সে খেয়ে যায় সেটা

নিতান্তই মেকানিকেলি। সর্বশেষে সে নিস্তেজ হয়ে আসে, তবু খাওয়া বন্ধ করে না। তাই তো ওটার নাম নেশা। যতক্ষণ মদ তাকে আনন্দ দিচ্ছে ততক্ষণ তো সেটা কাজের জিনিস—খুব বেশী গালাগাল দিতে চাইলে হয়তো বলতে পারেন বিলাসিতা—কিন্তু যখন সেটা আর আনন্দ না দিয়ে তাকে নিস্তেজ থেকে নিস্তেজতর স্তরে নামিয়ে নিয়ে যায় তখন সেটা রীতিমত নিন্দনীয় নেশা। আমার পড়া ঐ ধরনের। আপনার চোখ থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারছি আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন নি। আরেক দিন না হয় আরো গভীরে গিয়ে আপনাকে বোঝাবো। আপনিও যদি না বোঝেন তবে আমার শেষ নোঙর ভাঙলো।

কিন্তু আপনার কর্তার বেলা ব্যাপারটা অন্য রকম। প্রথমতঃ তাঁর বয়েস কম বলে এখনো বহু বৎসর ধরে তাঁকে নানা রকম তথ্য ও তত্ত্ব সঞ্চয় করে জ্ঞানবৈভব বাড়াতে হবে এবং দ্বিতীয়তঃ তারই সাহায্যে তাঁর জীবনদর্শন—জর্মনরা বলে ভেল্টআনশাউউঙ, গড়ে উঠবে। সব জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার আদর্শ এই জীবনদর্শন নির্মাণ করা। কিন্তু আজ এখানেই ফুলস্টপ না, ফুলেস্ট স্টপ!'

শহ্‌র্‌-ইয়ার বললেন, 'আচ্ছা। এখনকার মত না হয় বিশ্বাসই করে নিলুম।'

বললুম, 'শাবাশ! এই জন্যই তো আপনাকে এত ভালোবাসি। তর্কাতর্কি অত্যুত্তম প্রতিষ্ঠান কিন্তু সেটা সময়মত, কিছু সময়ের জন্য, মুলতুবী রাখার মত সহিষ্ণুতা আর বদান্যতা যেন দিলের ভিতর থাকে। গাঁয়ের মেয়েরা অবশ্য কোঁদল মুলতুবী রাখে অন্য কারণে। সংসারের কাজে ফিরে যেতে হবে বলে দুই লড়নেওয়ালী তখন জিহ্বাস্ত্র সংবরণ করে অদৃশ্য কাগজকালিতে টেম্পরারি আর্মিস্টিস সই করে; এবং তার প্রতীক, দুজনা দুই শূন্য ধামা ধপ্‌ করে মাটিতে উবু করে কোঁদলটা 'ধামাচাপা' দিয়ে রেখে যার যার ঘরে চলে যায়। কাজকর্ম শেষ হলে উভয় পক্ষ রণাঙ্গনে ফিরে এসে ধামা দুটো তুলে নিয়ে কোঁদলকে দেয় নিষ্কৃতি। তার পর ফিন্‌ শুরুসে।

কিন্তু, মাদাম, বললে পেত্যয় যাবেন না, এই যে রেজালা নামক সরেস জিনিসটি খাচ্ছি, এটা যে তৈরী করেছে সে মাইকেল এঞ্জেলো—রান্নার কলাসৃষ্টিতে।'

মাদাম আমার দিকে না তাকিয়ে বললেন, 'আপনার বাড়ি সব দিক দিয়ে আমার অনেক বেশী ভালো লাগে। সেখানে আমার দেহমনে এক অপূর্ব নিরবচ্ছিন্ন শান্তি নেমে আসে। ঐ একটি মাত্র জায়গা যেখানে আল্লাকে শুক্‌র্‌ দেবার জন্য তসবী জপতে ইচ্ছে করে।'

আমি বললুম, 'হুঁঃ! দিলজান শেখের রান্না—তাও বোলপুর হাটে যা পাওয়া যায় সেই আড়াইখানা শুকনো পটোল, চিমসে উচ্ছে আর সজনের ডাঁটা, সুপিচ্ছিল কলাইয়ের ডাল, ঝিঙে-পোস্ত তদাভাবে বড়িপোস্ত দিয়ে, কুকুরের

জিভের মত যে রুটিকে টেনে-টেনে খাবার টেবিলের এসপার-ওসপার করা যায় তাই দিয়ে ব্রেকফাস্ট। তারপর শোবার জন্য শক্ত কাঠের তক্তপোষ এবং বাথরুমে কলের জল নেই। এমন কি সেই আদ্যিযুগের গ্রামোফোনটা বাজাতে গেলে দম দিতে দিতে হঠাৎ বেবাক হাতখানা ধড় থেকে আলাদা হয়ে যায়। রাত্রে, হয় এমনি নিষুতি নিঝঝুম যে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়, নয় শেয়ালের কনসার্ট ঘণ্টার পর ঘণ্টা—নাগাড়ে।'

আবার বলি, 'হুঁ! রমণীর রুচি যে কত বিদকুটে, বদখৎ হতে পারে এই তার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ!'

হঠাৎ মুখ তুলে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে দেখি, শহ্‌রু-ইয়ারের দু'গাল বেয়ে জল পড়ছে।

আমি হতবুদ্ধি হয়ে মাফ চাইতে গিয়ে কি যে অসংলগ্ন কথা তোতলাতে তোতলাতে বলেছিলুম সেটা তখনো নিজেই বুঝতে পারি নি এবং এখন স্মরণে আনা তো সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কিন্তু আল্লার কী আপন হাতে গড়া এই মেয়ে শহ্‌রু-ইয়ার! আমার বিহ্বল অবস্থা দেখে সঙ্গে সঙ্গে সে তার সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব কব্‌জায় এনে দু-চারটি কথা দিয়ে আমাকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবার মত অবস্থার সৃষ্টি করে দিল। বললে, 'আমার রসিকতাবোধ ইদানীং বড্ড কমে গেছে—কতকগুলো আকস্মিক অপ্রিয় ঘটনা ঘটে যাওয়ায়। এই যা সব এখুখুনি বললেন, তার সব কটি কথা সত্য, কিন্তু আপনার কাছে মিথ্যা, আমার কাছে আরো মিথ্যা। যদি সত্যই হবে, তবে আমি আপনার বাড়ীতে প্রতিবার আসামাত্রই এত প্রাণভরা আনন্দে আমার দিকে এগিয়ে আসেন কেন, আপনার বুকের ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে বেরিয়ে আসে না আপনার মহব্বৎ, আপনার প্যার, আপনার হাঁক-ডাক, চেল্লা-চেল্লিতে? কই, আপনি যে সব অনটনট অসুবিধার লিস্টি দিলেন তার দুর্ভাবনায় তো ক্ষণতরেও আপনাকে ভ্রূকুঞ্চন করতে দেখি নি। মনে আছে, একদিন রুটি খারাপ ছিল বলে টোস্টগুলো মিইয়ে যায়—কই, আপনি তো একবারও আমাদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেন নি বা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেন নি। তবে আজ হঠাৎ এসব কেন? দেখুন সিতারা সাহেব—'

এবারে আমি বিস্ময়ের যেন বিজলি শক্ খেয়ে শুধালুম, 'আমার ডাকনামটা আপনাকে বললে কে?'

মোনালিজার মত রহস্যভরা নয়নে তাকিয়ে বললে, 'যদি বলি এটাও ঐ তর্কের মত উপস্থিত ধামাচাপা দিয়ে মুলতবী রাখা যাক্, তবে আপনার আপত্তি আছে?'

আমি বললুম, 'হরগিজ নহী। যে কোনো একদিন বললেই হলো।'

এতক্ষণ খাচ্ছিল বলে শহ্‌রু-ইয়ার কোনো গান ধরতে পারে নি। সে-কর্ম সমাধান হতেই সিতারা (তারা) তাকে টুইয়ে দিল ঐ কর্মে ফিরে যেতে।

শুরু করলো,

নিবিড় ঘন আঁধারে
জ্বলিছে ধ্রুবতারা
মন রে মোর পাথারে
হোস নে দিশেহারা !

অনেকক্ষণ ধরে চোখ বন্ধ করে গাইল। বুঝলুম, এটি তার বিশেষ প্রিয় গান।

আমি বললুম, 'ভুলবেন না অখণ্ড সৌভাগ্যবতী শহ্‌র্‌-ইয়ার, এই গানের মূল মন্ত্রটি—'শোভন এই ভুবনে রাখিয়ো ভালোবাসা'। আর কাজের কথা শুনুন—অবশ্য গানের মূল মন্ত্রটি সর্ব কাজের চেয়েও মহান—আজ সাড়ে ছ'টার সময় আপনার সঙ্গে আমার রাঁদেভু—কয়েক মিনিট আগে এলেই ভালো এবং বাইরে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে আসবেন, প্লীজ। পটের বীবী সাজতে পারেন, নাও পারেন। সাজবার সময়কার মুড্‌মাফিক। আচ্ছা, গাড়িটা পাওয়া যাবে তো ?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু বলুন তো, আমায় কোথায় নিয়ে যাবেন ?'

'এমনই সাদামাটা সর্ব রোমান্‌স্‌ বিবর্জিত স্থলে যে সেটা সত্যি বলার মত নয়। কাজেই সর্ব সারপ্রাইজের ভয়-ভরসা বর্জন করে দিন এই বেলাই।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার

নিশিদিন ভরসা রাখিস
ওরে মন হবেই হবে

গুনগুন করতে করতে চলে গেল।

সাত

'হা।।জির্‌!' 'হা'টার উচ্চারণ আরবী কায়দায় যতদূর সম্ভব দীর্ঘ এবং জির্‌টি সেই অনুপাতে হ্রস্বের চেয়েও হ্রস্ব।

আমি বললুম, 'এ কি! এ যে একেবারে রাজরাজেশ্বরীর বেশে সেজেছো ?'

সঙ্গে সঙ্গে গান ধরলো, ' "তোমায় সাজাবো যতনে কুসুমে রতনে
কেয়ূরে কঙ্কণে কুঙ্কুমে চন্দনে ।।" '

পূর্বেই বলেছি, পুরোপাক্কা বঙ্গ হিন্দু রমণীর বেশ পরলেও শহ্‌র্‌-ইয়ারের সঙ্গে হিন্দু রমণীর কোথায় যেন একটা পার্থক্য থেকে যায়। উহুঁ! মাথায় এক থাবড়া সিঁদুর বসিয়ে দিলেও সে পার্থক্য ঘোচবার নয়। এতদিন তাকে প্রতিবারেই দেখেছি সাদামাটা বেশে ; আজকের এ বেশেও সেই পার্থক্য, বরঞ্চ একটু বেশী।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললে, 'কেন ? আমার কি সাজতে সাধ

যায় না ?'

আমি বললুম, 'এর চেয়ে অনেক বেশী ঘন ঘন যাওয়া উচিত। সাজসজ্জা করলে সকলেরই যে সৌন্দর্যবৃদ্ধি হয় তা নয়। এবং কারো কারো বেলা মনে হয় এ যেন ভিন্ন, অচেনা জন। আপনার বেলা দুটোর একটাও নয়। আর সব চেয়ে বড় কথা আপনি আপনার সৌন্দর্য সম্বন্ধে যে রকম সম্পূর্ণ অচেতন থেকে সেটিকে অবহেলে ধারণ করেন, আপনার সাজসজ্জা প্রসাধনও আপনি ঠিক সেই ভাবে দেহে তুলে নিয়েছেন। মনে হয়, আপনি এই বেশেই নিত্যদিনের গৃহকর্ম করেন, ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্ধন সমস্যা সমাধান করেন। যে-কথাগুলো বললুম তার সব কটি আমি শেষ-বিচারের দিনের সৃষ্টিকর্তার সামনে, ডাক পড়া মাত্র, আপনারি মত হা। জির্ বলে কসম খেয়ে বলতে রাজী আছি—অবশ্য যদি এই বেলা এই বেশে আপনি আপনার একটি ছবি তুলিয়ে দেন—কারণ 'তর্সাবিরে জানাঁ' সে সময় 'দর্-বগল' না হলে চলবে না।'

'সে আবার কি ? মনে হচ্ছে ফার্সী। বুঝিয়ে বলুন।'

আমি বললুম, 'সমূহ মুশকিলে আমাকে ফাঁসালেন। দোহাটি শুনেছি গুরুর কাছে—ওস্তাদ বললুম না, কারণ তিনি ছিলেন কন্নৌজের কট্টর গোঁড়া ব্রাহ্মণ এবং জানতেন উৎকৃষ্টতম ফার্সী—আমার বয়েস যখন তেরো-চোদ্দো। তারপর এটি আমি অন্য কারো মুখে শুনি নি, ছাপাতেও দেখি নি। কাজেই আমার পাঠে ছন্দপতন ও যাবতীয় গলদ থাকার প্রভূত সম্ভাবনা। অর্থ হচ্ছে এই, শেষ বিচারের দিন (দর্ কিয়ামৎ) প্রত্যেককেই (হর্ কস্) সে সমস্ত জীবন ধরে যা যা পাপ কর্ম, পুণ্য কর্ম করেছে এবং করে নি তারই একটি পুরো রিপোর্ট (আমলনামা বা শুধু নামা বা নাম) আপন আপন হাতে ধরে (দস্ত্ গীরদ্) দাঁড়াবে। আমিও নিজে (মন্ নীজ) হাজির হব (হাজির মীশওম) বগলদাবায় (দর্ বগল্) প্রিয়ার তর্সাবিরটি (তর্সাবিরে জানাঁ) নিয়ে।

'অর্থাৎ ঐ লোকটি সেই শেষ বিচারের সর্বমান্য পাক-পবিত্র বিচারপতিকে বলবে, 'অন্যেরা আপন আপন কৃতকর্মের পুরো বয়ানের 'আমল-নামা' নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু, হুজুর, আমার কোনো আমল-নামা নেই। তার কারণও সাতিশয় সরল। আমি সমস্ত জীবন ধরে আর-কিছু করি নি—জীবনভর শুধু আমার প্রিয়ার ছবিটি এঁকেছি আর দেখেছি, দেখেছি আর এঁকেছি। সেইটিই আমার কৃতকর্মের 'আমল-নামা'। এই নিন্, হুজুর, দেখে নিন্!' তাই বলছিলুম, অষ্ট-অলঙ্কার-পরা আপনার এখনকার একটি ছবি আমাকে দিন। নইলে শেষ বিচারের আদালতে জেরার চোটে আমার জেরবার হয়ে যাবে—একসিবিট নাম্বার ওয়ান এণ্ড লাস্ট্ না থাকলে।'

শহ্রু-ইয়ার বললেন, 'আমার অল্প বয়সে আমাদের বাড়িতে প্রায়ই মৌলবী-মৌলানারা আসতেন। তখন এরকম কল্পনাতীত, অসম্ভব অসম্ভব

প্রেমের দোহা অনেকগুলো শুনেছি। এসবেতে অতিশয়োক্তি নিশ্চয়ই, তবু কেমন যেন মনে হয়, ঐ যুগে ওরা বোধ হয় আমাদের তুলনায় প্রেমের মূল্য দিত ঢের ঢের বেশী। আচ্ছা, সে তত্ত্ব বাদ দিয়ে আপনার বর্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য পরামর্শ দিই ; আপনি আমার ছবি আঁকুন !'

আমি ভীত রুদ্ধ কণ্ঠে বললুম, 'আর হঠাৎ যদি 'শবনম্‌' এসে পড়ে ছবিটা দেখে ? ও তো আসবে অতি অবশ্যই। ও যাবার সময় যখন বলে গিয়েছিল সে ফিরে আসছে তখন সে আসবে নিশ্চয়, দৃঢ় নিশ্চয়।'

তাচ্ছিল্যভরে শহ্‌র-ইয়ার বললে, 'এখন এলে আপনি তাকে চিনতেই পারবেন না।'

রীতিমত তাজ্জব বনে বললুম, 'আপনার মুখে এই কথা ! আপনার অনুভূতির কলিজাটা না রবিঠাকুরের কিমা-মেশিনে তুলো-পেঁজা হয়ে গিয়েছে ! শবনমের অনন্ত তারুণ্য তো কখনো পরিবর্তিত হতে পারে না—তাকে তো আমি গড়েছি আমার জিগর কলিজার বিন্দু বিন্দু খুন্‌ দিয়ে এবং সে নির্মাণ বহু শত যোজন পেরিয়ে এখনো পূর্ণোদ্যমে অগ্রগামী। আচ্ছা, এ যুক্তিটা না হয় বাদই দিন। ধরুন, একশ বছর পরে নিতান্ত দৈবদুর্ঘটনা বশতঃ, কিংবা কোনো ছোকরা লাইব্রেরি-এসিসটেন্ট 'শবনম্‌' সম্বন্ধে লিখিত আমার আর পাঁচখানা নগণ্য পুস্তকের মত এই পুস্তকখানি পড়লো, নিতান্ত অনিচ্ছায়, সুদ্ধমাত্র বইটা ক্যাটালগের কোন্‌ কোঠে পড়বে সেইটে ঠাহর করার জন্য। একশ বছর পরে পড়ছে বলে কি আপনার ধারণা শবনম্‌ তখন একশ বছর বয়সের জরাজীর্ণা বৃদ্ধা হয়ে সে ছোকরার সামনে আবির্ভূত হবে ?'

রসভঙ্গ করে ড্রাইভার বিনয়নম্র কণ্ঠে শুধলো, 'সরকার, যাবো কোথায় ?'

'সাহেব যেখানে কাজ করেন।'

ককিয়ে উঠে শহ্‌র্‌-ইয়ার বললে, 'ঐ রসকসহীন জায়গায় যাবার জন্য আমি এই বেশভূষা সর্বাঙ্গে চড়ালুম ! হা আমার কপাল ! এ কপাল কি আর কখনো বদলাবে না ? আপনার সঙ্গ পেয়েও না ?' আরেকটু হলে কেঁদে ফেলতো আর কি !

আমি দৃঢ় কণ্ঠে বললুম, 'আপনি আমাদের ইসলামের কিছুই জানেন না। তাহলে অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন একটি হদীস। জ্ঞানসঞ্চয় এবং পুণ্যলাভ দুইই হবে। অবশ্য আমি ঘটনাটি শব্দে শব্দে টায় টায় বলতে পারবো না, কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণনে যে কোনো প্রকারে উনিশ-বিশ হবে না তার জিম্মাদারী আমি নিচ্ছি—যদিও আল্লাই সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বজ্ঞ (ওয়াল্লাহু আ'লম্‌) !'

একদা এক অভিযানান্তে আল্লার পয়গম্বর যখন তাঁর সঙ্গীসাথীসহ তাঁদের বাসভূমি মদীনা শহরে প্রত্যাবর্তন করছেন, তখন তিনি লক্ষ্য করলেন, দলের এক আরব যুবা বড় অসহিষ্ণু ভাবে তার উটকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সকলের আগে

আগে যাবার চেষ্টা করছে। আরবরা বড়ই সাম্যবাদী—এরকম অবস্থায় দলের মুরব্বীরাই যে দলের পুরোভাগে থাকবেন এমন কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। তৎসত্ত্বেও ঐ যুবাটির অসহিষ্ণুতা হজরতের চোখে পড়ল। তিনি তাঁর পাশের উট-সওয়ারকে শুধোলেন, "ব্যাপার কি? লোকটার অত তাড়া কিসের?" সে বললে, "হে আল্লার প্রেরিত পুরুষ! এ-যুবা অতি সম্প্রতি বিবাহ করেছে। তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি পেঁছিতে চায়।" হজরৎ বললেন, "আচ্ছা, ওকে আমার কাছে একবার ডেকে নিয়ে এসো তো।" হজরতের আহ্বান শুনে যুবা শ্লাঘা অনুভব করে তাঁর কাছে এল। হজরৎ বললেন, "বৎস, শোনো। তুমি যদি সক্কলের পয়লা পয়লা উট চালিয়ে সক্কলের পয়লা আপন বাড়িতে পেঁছে যাও তবে খুব সম্ভব দেখতে পাবে তোমার নববিবাহিতা বধূ এই আকস্মিক প্রত্যাবর্তনের সংবাদ জানতো না বলে বিরহিণী হয়তো তার আটপৌরে অতিশয় মামুলী বেশ-ভূষা অযত্নে অবহেলায় পরিধান করে বিষণ্ণ বদনে বসে আছে। সে দৃশ্য তোমার মনঃপূত নাও হতে পারে, তুমি পুলকিত নাও হতে পারো। পক্ষান্তরে তুমি যদি দলের সকলের পিছনে থাকো তবে যে-মুহূর্তে মদিনাবাসী দলের পুরোভাগ দেখতে পাবে তন্মুহূর্তেই শহরের সর্বত্র আনন্দ-দামামা বেজে উঠবে, এবং যেহেতু তুমি দলের সর্বপশ্চাতে আছ তাই বাড়ি পেঁছিতে তোমার সময় লাগবে বেশী—ইতিমধ্যে তোমার বধূ সেই অবসরে উত্তম প্রসাধন করে, উৎকৃষ্ট বেশ-ভূষা ধারণ করে তোমাকে প্রসন্ন অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রফুল্ল বদনে তোমার জন্য অপেক্ষা করার সুযোগ পাবে।" তাই বলি, শহ্‌রু-ইয়ার, আপনার সর্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার, আপনার মধুরতম মৃদুহাস্য কার জন্য? অপরিচিতজনের জন্য, পথগামী জনতার জন্য—সেখানেও মনে রাখবেন রাস্তাঘাটে স্বেচ্ছায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অলঙ্কার প্রদর্শন ইসলামে নিন্দনীয়। অতএব আপনার বেশভূষা নিশ্চয়ই অপরিচিতজনের জন্যে নয়। আপনি যখনই স্বামীর কাছে যাবেন তখন আপনার বেশভূষা হবে রাজরাণীর মত, তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন যেন তিনিও আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের রাজাধিরাজ, এবং তিনিও যখন আপনার কাছে আসবেন তখন আসবেন সম্রাটের বেশে এবং আপনার সঙ্গে কথা বলবেন যেন আপনি রাজরাজেশ্বরী।

হঠাৎ গলা নামিয়ে ঘরোয়া সুরে বললুম, 'জানেন, শহ্‌রু-ইয়ার, তাই আমার তাজ্জব লাগে যখন দেখি আমাদের মেয়েরা—কি হিন্দু কি মুসলমান—বাড়িতে ট্যানা পরে মেলছের মত স্বামীর চোখের সামনে আনাগোনা করছে, আর যত পাউডার যত অলঙ্কার বাড়ি থেকে বেরবার সময়! যেন ঐ হতভাগা স্বামীটাই এসেছে বানের জলে ভেসে।'

শহ্‌রু-ইয়ার চিন্তিত হয়ে শুধোলেন, 'আমি কি বাড়িতে সত্যি মেলছের মত থাকি।'

আমি হেসে বললুম, 'আদপেই না। আপনি জেনে-না-জেনে সৌন্দর্যের

এতই কদর দেন যে আপনার পক্ষে অসুন্দর বেশ পরা অসম্ভব, অসুন্দর আচরণ অসম্ভব, অসুন্দর—'

'ব্যস্‌, ব্যস্‌, হয়েছে। কিন্তু বাড়িতে সাজতেগুজতে কি রকম যেন শরম শরম লাগে। লোকে কি ভাববে?'

আমি প্রায় হুঙ্কার দিয়ে বললুম, 'আমার যত রাগ তো ঠিক ঐখানেই। 'লোক' বলতে আপনি কাদের মীন করছেন? চাকর-বাকর এবং যে দু'একটা উটকো লোক যারা বিন্‌-নোটিশে কাজে-অকাজে বাড়িতে আসে। আমার প্রশ্ন, আপনি তাদের বিয়ে করেছেন, না ডাক্তারকে? তারা কি ভাবলো, আপসে কি বলাবলি করলো তাতে কি যায় আসে? আচ্ছা, এখন তবে এ আলোচনা আজ থাক্‌। আমরা মোকামে পেঁছে গিয়েছি? আপনি ড্রাইভারকে বলুন না, সে যেন ডাক্তারকে গিয়ে বলে আমি গাড়িতে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছি।' ড্রাইভার চলে গেলে বললুম, 'এইবারে দেখি, আমার সোনার চাঁদটি কি করেন। শহ্‌র্‌-ইয়ার, আমিও একদা রিসার্চ করেছি এবং কেউ এসে এভাবে উৎপাত করলে বড্ডই বিরক্ত হয়েছি। কিন্তু আমার আপনার অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, সেটা পাঁচ-সাত মিনিটের ভিতরই অন্তর্ধান করে। বিশেষ করে যারা ডিস্টার্ব করলো তারা যদি তার আপন জন হয়—যাদের সঙ্গলাভে সে আনন্দ পায়। দু' পাঁচ মিনিট তাদের সঙ্গে কথা বলতে না বলতেই রিসার্চের ভানুমতী কেটে যায়।'

জোর পাঁচ মিনিট, দেখি ডাক্তার টাট্টু ঘোড়ার মত ছুটে আসছেন। শহ্‌র্‌-ইয়ারকে দেখে সামান্য বিস্মিত হলেন বটে কিন্তু তাঁর নিজের ভিতরকার কী এক উত্তেজনা সব-কিছু ছাপিয়ে যেন উপচে পড়ছে। মেশিনগানের চাইতেও দ্রুততর বেগে আমাকে বলে যেতে লাগলেন, 'ওঃ! আমার কিস্মৎটা আজ সত্যই বড় ভালো, বড়ই ভালো। এই দশ মিনিট আগে আমি আপনাদের ফোন করে পেলুম না। মহা বিপদে পড়লুম, করি কি? হয়েছে কি জানেন, আমার এক ভেরি ডিয়ার ফ্রেন্ড বউকে নিয়ে দিল্লী থেকে এসেছে। কাল ভোরের প্লেনে ফের দিল্লী চলে যাবে। আপনাকে সে চেনে, দিল্লীতে আপনার লেক্‌চার শুনেছে, দু'একবার আপনার সঙ্গে সামান্য কথাবার্তাও বলেছে। আপনার গ্রেট এড্‌মায়ারার। আর তার বউ যখন এসেছে তখন শহ্‌র্‌-ইয়ারকে নিয়ে যেতে হয়, নইলে বড় অভদ্রতা হয়। দিল্লীর খানদানী ঘরের ছেলে—ভাববে কলকাত্তার লোক তমীজ তহজীব কিছুই জানে না। আপনারা এসে আমায় বাঁচালেন। চলুন, চলুন, আর দেরি না। আমি ওকে কথা দিয়েছি, আপনাদের নিয়ে গ্রেট ঈস্টার্নে সাতটা সাড়ে সাতটার ভিতর পেঁছব! আঃ। বাঁচলুম, আল্লার কী মেহেরবানী।'

আমি বললুম, 'এত নমাজ রোজা করার পর আল্লা আপনাকে মেহেরবানী

দেখাবে না তো দেখাবে কাকে?' ওদিকে গাড়ির ভিতরকার আলো-অন্ধকারে না দেখেও যেন গাঢ় অন্ধকারেই বিদ্যুল্লেখার মত উজ্জ্বলতম জ্যোতিতে দেখলুম, শহ্‌র্‌-ইয়ারের গ্রেট ঈস্টার্নে যাবার উৎসাহ ফ্রীজিং পয়েন্টেরও নিচে; আমারও তদ্বৎ। কিন্তু উপায় কি? ডাক্তারের বাব্‌লিং সফেন উত্তেজনা, তার অবিমিশ্র আনন্দ বরবাদ করতে পারে নিতান্ত পাষণ্ড জন। তদুপরি বেচারী ডাক্তার তো বারো মাস শুধু লেবরেটরি আর বাড়ি, এরই ভিতর মাকু চালায়। করুক না বেচারী একটুখানি ফুর্তি! আমরা দু'জনা না হয় সারেঙ্গী তবলার সঙ্গতই দেব।

হোটেলের সব ক'জন রেসেপসনিস্ট ওরকম লম্ফ দিয়ে উঠে ডাক্তারকে অতখানি সসম্ভ্রম অভ্যর্থনা জানায় কেন—ডাক্তার তো এখানে আসে অতিশয় কালেভদ্রে? লিফটের দিকে যেতে যেতে অনুমান করলুম, ডাক্তারের বাপ ঠাকুর্দা এঁরা কলকাতার প্রাচীন খানদানী বিত্তশালী লোক; এ হোটেলে আসুন আর নাই আসুন এরকম একটা হোটেল নিশ্চয়ই কোনো না কোনো সময়ে এঁদের আনুকূল্য পেয়েছে।

শহ্‌র্‌-ইয়ার ও আমি দুজনাই চুপ। ডাক্তার কিন্তু সেটা আদৌ লক্ষ্য করে নি। এমনিতে মুখচোরা, লাজুক—এখন,—এখন কেন, যবে থেকে আমাদের সঙ্গে দেখা সেই থেকে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। অনুমান করলুম, দিল্লী-আগত জনের সঙ্গে একদা নিশ্চয়ই বন্ধুত্ব তার সুগভীর ছিল। নইলে এত উৎসাহ, এত উত্তেজনা!

ভালো, বড় ঘরই পেয়েছেন দিল্লীর মেহমানদ্বয়।

ভদ্রলোকের পরনে অতি দামী কাপড়ের অত্যুত্তম দর্জির হাতে বানানো সুট। শার্ট, টাই একটু যেন বেশী আত্মপ্রকাশ করছে। সুপুরুষ না হলেও ভদ্র চেহারা। আর অতিথিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তার আরামের ব্যবস্থা করাতে দিল্লীর লোক পাকা, এটিকেট-দুরুস্ত।

ম্যাডামটি কিন্তু কনট সার্কলের খাঁটি চক্রবর্তিনীদের একজন। সর্বপ্রথমই চোখে পড়ে এঁর ব্লাউজটি। সেটির নাম ব্লাউজ দেব, না কাঁচুলির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলে উল্লেখ করবো? এই পেট-কাটা ব্লাউজ যে তাঁর শরীরের উত্তমার্ধ আচ্ছাদিত করার জন্য নির্মিত হয় নি সেটা দেখামাত্রই বোঝা যায়। সেটা যেন সে চিৎকার করে প্রচার করছে। আমরা ঘরে ঢোকার সময় তিনি তাঁর শাড়ির ক্ষুদ্রতম অঞ্চলাংশ একবারের তরে তাঁর কাঁধে আলতো ভাবে রেখেছিলেন। আমরা ভালো করে আসন নেবার পূর্বেই সেটি স্থানচ্যুত হয়ে উরুতে স্তূপীকৃত হলো। এর পর সেটি আর প্রমোটেড হয় নি। আমি ভাবলুম, শাড়ি ছেড়ে ইনি রাজপুতানীদের মত ঘাগরা পরলে তো অনেকখানি কাপড়ের সাশ্রয় হয়। কিন্তু এহ বাহ্য। আসলে দেখতে হয় তাঁর মেক আপ। এরকম চুলের ঢপ

আমি ইতিপূর্বে কখনো দেখি নি—খুব সম্ভব প্যারিসের ফ্যাশান পত্রিকা দেখে দেখে হেয়ার ড্রেসার তাঁর মাথার উপরকার ঐ তাজমহলটি নির্মাণ করেছে। ঠোঁটে যে রঙ মেখেছেন সেটা লাল তো নিশ্চয়ই নয়, হয়তো ব্রোন্‌জ বলা যেতে পারে। নখের রঙ অলিভ গ্রীন। কিন্তু সংস্কৃত কবিকুলের মত আমি যদি তাঁর দেহ এবং প্রসাধন এস্থলে দফে দফে বর্ণাতে যাই তবে সর্বপ্রথমই আমাকে বৎসরাধিক কাল তাঁর প্রসাধন নির্মাণে যে-সব গূঢ় রহস্যাবৃত রসায়নাদি সাহায্য করেছে তাদের নিয়ে একাগ্রমনে গবেষণা করতে হবে। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকগণ অবহেলে থার্মোমিটার দিয়ে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের টেম্পারেচার অর্জুনকে দিয়ে নিতে পারেন, কিন্তু এযুগের বর্ণনাতে আমি ব্রা'র নম্বর নিয়ে গুবলেট করলে কেউ তো আমায় ছেড়ে কথা কইবে না।

হোস্টেলের সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় একবার সামান্য একটু মোকা পেয়ে শহ্‌র্‌-ইয়ার ফিস ফিস করে আমাকে বলেছিল, 'আপনার জন্যই আজ আমার এই লাঞ্ছনা। এরা ভাববে আমি মারোয়াড়িদের মত আমার গয়নার দেমাক করতে এসেছি।' আমি বললুম, 'কিন্তু ডাক্তার তো আপনার এই অ্যাকসিডেন্টাল গয়না পরা দেখে খুশী হয়েছেন। তাঁর বন্ধুর কাছে বউকে তো আর বিধবার বেশে নিয়ে যেতে পারেন না।'

আমরা কেউ ড্রিংক করি না শুনে মহফিলের পয়লা রাগিণীটিই সামান্য কম্‌-সুরা হয়ে শুরু হলো। দিল্লী নগরীর মনসুর মুহম্মদ সাহেব বিড় বিড় করে যা বললেন তার মোটামুটি অর্থ, বিংশ শতাব্দীর সঙ্গে মানিয়ে চলতে হলে তেরো'শ বছরের প্রাচীন বিধি-বিধান একটু-আধটু, এদিক-ওদিক উনিশ-বিশ করতে হয়। বেগম মনসুর এক ঢোঁক শেরি গিলে মাথা নেড়ে সায় দিলেন। ডাক্তার তেরো'শ বছরের পুর্না কায়দায় এখনো নমাজ পড়েন, উপোস করেন; তবু তিনি কোনো আপত্তি জানালেন না। ওদিকে এ বাবদে উদাসীন শহ্‌র্‌-ইয়ারের মুখ দেখি লাল হয়ে উঠেছে।

তারপর বিশেষ কোনো সূত্র ধরে বাক্যালাপ এগলো না। আমরা যাকে বলি আশকথা পাশকথা। কথার ফাঁকে ফাঁকে মালুম হলো, মনসুর সাহেব একদা এই কলকাতার কারমাইকেল হস্টেলে বাসা বেঁধে বছর দুত্তিন পড়াশুনো করেছিলেন এবং সে সময়ে ডাক্তারের সঙ্গে দোস্তী হয়। আমার তাই মনে হচ্ছিল, শ্রেষ্ঠতম ব্যবস্থা হতো যদি দুই ইয়ারের 'দোকলা-দোকলি' বসে দুহুঁ দুহুঁ কুহু কুহু করতেন—শহ্‌র্‌-ইয়ার আর আমার তো কথাই নেই, মাদাম মনসুর পর্যন্ত দ্য এ—ওয়ান টু মেনি। অর্থাৎ সাকুল্যে থ্রী টু মেনি।

মনসুর এবং তাঁর বীবী মাঝেমধ্যে যে দু'একটি ইংরিজি কথা কইলেন সেগুলো শুদ্ধ এবং ভাল উচ্চারণে, অথচ কেন যে তাঁরা অধিকাংশ সময়ই উর্দু চালিয়ে যেতে লাগলেন সেটা বুঝতে পারলুম না। ও'রা তো স্পষ্ট দেখতে

পাচ্ছেন ডাক্তারের যা উর্দু জ্ঞান সেটা দিয়ে বহুৎ ব-তকলীফ্ ব-মুশকিল কাজ চালানো যায় কি না যায় সে নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে, আমার ভাঙা-চোরা উর্দু আমি সভাস্থলে পেশ না করে, যে কটি বাক্য বলেছি সে সবই ইংরিজিতে এবং শহ্‌র-ইয়ার যে উর্দুর প্রতি পরিপূর্ণ ঔদাসীন্য দেখিয়ে এ পর্যন্ত তার জীবন কাটিয়ে দিয়েছে সেটা আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলুম তার সঙ্গে বোলপুর থেকে কলকাতা একসঙ্গে আসার সময়। কি মুটে, কি চা-ওলা, কি রেস্তোরাঁ-বয় কারো সঙ্গে সে ভুলেও বিশুদ্ধ বাঙলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষার সাহায্য নেবার প্রয়োজন বোধ করে নি। এস্থলেও সে ব্যত্যয় করে নি, তবে বাঙলা না বলে বলেছে ইংরিজি—অবশ্য মুখ খুলেছে সামান্য দু'একবার মাত্র। এসব দেখেশুনেও দেবা-দেবী দুজনা যে উর্দু কপচাচ্ছিলেন তার থেকে যে কোনো লোকের মনে সন্দেহ জাগা নিতান্ত খামখেয়ালী নয় যে, এঁরা যেন একান্তই 'উর্দু আন্‌জুমনের' মিশনারিরূপে এই 'বর্বর' বাঙলা দেশে 'বিসুর্দ' উর্দু ফলাতে এসেছেন!

এ-অভিজ্ঞতা আমার একাধিকবার ইতিপূর্বেও হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ তথা দিল্লীবাসিন্দা কলকাতার মুসলমানদের মাঝখানে বসে উর্দু তড়পাবার সময় ভাবখানা করেন যে ওনারাই একমাত্র 'খানদানী মনিষ্যি', খাস বেহেশতে জিব্রাইল গয়রহ দেবদূতরা উর্দুতেই বাৎচিৎ করেন—অবশ্য তাঁরা সকলেই বাল্যকালে মনুষ্যরূপ ধারণ করে নিদেন বছর দশ দিল্লী-লক্ষ্ণৌয়ে উর্দুটা রপ্ত করে যান। উত্তরপ্রদেশ দিল্লীর উর্দুওলাদের এই হম্-বড়াইর জন্য অবশ্য বেশ-কিছুটা দায়ী কলকাতার মুসলমানই। সে-বেচারী হিন্দু-প্রধান কলকাতায়—যেখানে উর্দুসহ আগত মুসলমান কল্কে পায় না—তার জাতভাইকে যতখানি পারে সৌজন্য দেখাতে চায় এবং তার চেয়েও বড় কথা, তার মনের কোণে আছে উর্দুর প্রতি একটা সপ্রশংস মোহ। কিন্তু তার অর্থ অবশ্য নিশ্চয়ই এ নয় যে, সে তার মাইকেল-কবি-কাজী নিয়ে গর্ব অনুভব করে না। সে-রকম কোনো বাগ-বিতণ্ডা উপস্থিত হলে সে ওঁদের জন্য জোর লড়াই দেয়। তবে লক্ষ্য করেছি, উর্দুওলারা এ রকম তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে চান না; তাঁদের ভিতর যাঁরা চালাক তাঁরা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানেন, বরঞ্চ কলকাত্তাই মুসলমান কিছু কিছু গালিব ইক্‌বাল পড়েছে, এঁরা টেগোরের নাম শুনেছেন—বাদবাকি ব্লাঙ্কো।

দুর্ভাগ্যক্রমে ডাক্তারের বন্ধু তাঁর উর্দুর ঝাণ্ডা ব্যোমলোকের এমনই উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে হয়েস্ট করতে লাগলেন যে, আমার তো ভয় হলো ওটা না এভারেস্টের চূড়ো ছাড়িয়ে বেহেশ্‌তের 'লস্ট এণ্ড ফাউণ্ড' দফতরে গিয়ে পেঁছিয়! ডাক্তার নিরীহ মানুষ—হুঁ হুঁ করে যাচ্ছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। শহ্‌র-ইয়ারের মুখে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করলুম না। আর আমি যে অনারোগ্য, গোরস্তানগমনোৎসাহী কঠিন ব্যাধিতে কাতর তারই নিষ্পেষণে 'নিশ্চুপ'—

সে ব্যামোর নাম 'সুপেরিয়রিটি কমপ্লেক্‌স্‌।' আমি আমার মাতৃভাষা নিয়ে এমনই শশব্যস্ত যে অন্য ভাষা তার চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের কি না সে চিন্তা আমার পুরু নিকেট খুলিটা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকতে পারে না।

কথায় কথায় মনসুর সাহেব বললেন, উর্দুর প্রচার ও প্রসারের জন্য কলকাতা মাদ্রাসায় ব্যাপকতর ব্যবস্থা করা উচিত যাতে করে তাবৎ কলকাতার মুসলমান ছেলেমেয়ে সেখানে গিয়ে উর্দু শিখতে পারে।

আশ্চর্য! এতক্ষণ যে শহ্‌র্‌-ইয়ার বিলকুল চুপসে বসে আড়াই ফোঁটা নিম্বু-পানি চোষাতে সর্বচৈতন্য নিয়োজিত করে সময় কাটাচ্ছিল সে হঠাৎ বলে বসলো, 'কলকাতা মাদ্রাসা ইসলাম ধর্মশাস্ত্রের চর্চা করে; কুরান, হদীস, ফিকাহ্‌ এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। সেগুলো এ টু জেড আররীতে। তাই সেখানে আরবী ভাষা শেখানো হয় এবং নিতান্তই যখন সাহিত্যও ব্যতিরেকে ভাষা শেখানো যায় না তাই কিছুটা আরবী সাহিত্যও শেখায়। ফার্সী শেখায় অতিশয় নগণ্য পরিমাণে এবং গভীর অনিচ্ছায়—তার কারণ ফার্সী সাতশ বছর ধরে এদেশের রাষ্ট্রভাষা ও বিদগ্ধ জনের ভাষা ছিল বলে সেটা চট্‌ করে ঝেড়ে ফেলা যায় না। যে সব কাচ্চাবাচ্চাদের মাতৃভাষা উর্দু, তাদের হয়তো যৎসামান্য উর্দুও শেখায়। কিন্তু মাদ্রাসার একমাত্র ও সর্বপ্রধান কর্ম হচ্ছে ইসলামশাস্ত্র চর্চা, ইসলামিক থিয়োলজি। সে হঠাৎ 'ব্যাপকভাবে'—এবং নিতান্ত মিনিমাম প্রয়োজনের বাড়া যে কোনো ভাবে উর্দু পড়াবার ব্যবস্থা করবে কেন?'

বিস্ময়ে আমি হতচৈতন্য! ঠাকুরদার নাম স্মরণ করতে পারছি নে!

কিন্তু মোক্ষম তাজ্জব মেনেছেন 'মৌলানা' মনসুর।

বাজারে যতখানি গাম্ভীর্য সেদিন বেচা হচ্ছিল তার সাকুল্যে স্টক কিনে, সর্ব মুখে মেখে বললেন, 'উর্দুভাষা ও সাহিত্য এদেশে ইসলামের প্রতিভূ!'

শহ্‌র্‌-ইয়ার বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, 'তাই নাকি? তা হলে বিবেচনা করি, প্রত্যেক মুসলিমের যেটা প্রথম কর্তব্য—অর্থাৎ ইসলাম-ধর্ম-তত্ত্ব-শিক্ষা, সে সম্বন্ধে কি উর্দুতে ভূরি ভূরি কেতাবপত্র রয়েছে? কিন্তু আমি তো শুনেছি—অবশ্য আমার সংবাদদাতা ভুল করে থাকতে পারেন—আপনারা কুরান শরীফের উর্দু অনুবাদ ছাপিয়েছেন মাত্র পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বে। তারও ত্রিশ বৎসর পূর্বে হিন্দু গিরিশবাবু বাঙলাতে কুরান অনুবাদ ছাপিয়েছিলেন।'

তাঁর কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই মনসুর বললেন, 'আরবীর সঙ্গে উর্দুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।'

আমি জানি শহ্‌র্‌-ইয়ার আগের পয়েন্টে আরো অনেক-কিছু বলতে পারতেন, কিন্তু প্রতিপক্ষ যখন 'ভিন্ন রণাঙ্গনে' চলে গেলেন তখন শহ্‌র্‌-ইয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত। বললেন, 'সে আবার কি করে হলো? আরবী ভাষা হিব্রুর মত সেমেটিক; উর্দু ভাষা বাঙলারই মত আর্য-গোষ্ঠীর ভাষা।

সম্বন্ধটা নিবিড়তর হলো কি করে ?'

মনসুরের মুখ ক্রমেই লাল হতে আরো লাল হচ্ছে। ডাক্তার নীরব, কিন্তু ঈষৎ অপ্রতিভ। মাদাম মনসুর পানপ্রসাদাৎ ইতিমধ্যেই ঈষৎ বে-এখতেয়ার। আমি চুপ। কারণ শহ্‌র্‌-ইয়ার তার তলওয়ার চালাচ্ছে পাকা ওস্তাদের মত। তার মুখে রক্তিভর উত্তেজনা নেই।

মনসুর বললেন, 'উর্দু তার শব্দসম্পদ আহরণ করে আরবী থেকে।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার বললেন, 'So what ? উর্দু কেন, বাঙলার তুলনায়ও ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়ের ভাষা নিয়েছে অতি সামান্য পরিমাণ আরবী শব্দ এবং ওগুলো যে আরবীর মত সেমেটিক গোষ্ঠীর ভাষা নয় সেও তো জানা কথা। কিন্তু ইন্দোনেশিয়োরা যে রকম ইসলামী ঝাণ্ডা খাড়া করেছে, পেরেছে সে-রকম এদেশের উর্দুওলারা ? আমি তো শুনতে পাই, দিল্লী আগ্রা লক্ষ্ণৌ এলাহাবাদের স্কুলে স্কুলে উর্দু সরিয়ে হিন্দী শেখানো হচ্ছে। উর্দুওলারা কী লড়াই দিচ্ছেন তার বিরুদ্ধে ? 'আকাশবাণী' স্বরাজের পর থেকে আর উর্দুতে নিউজ বুলেটিন দেয় না, শুনছি শিগগীরই দেবে। তবে সেটা পণ্ডিতজীর চাপে। আপনাদের আন্দোলনের ফলে নয়।'

মনসুর ফেটে যাওয়ার উপক্রম। বললেন, 'আমরা পাকিস্তান নির্মাণ করেছি।'

এই প্রথম শহ্‌র্‌-ইয়ারের কণ্ঠে ঈষৎ ব্যঙ্গের পরশ লাগলো। বললো, 'তাই নাকি ? আমি তো শুনেছি বাঙলার মুসলমান—যাদের অধিকাংশ এখন পূর্ব পাকিস্তানে বাস করে, এবং সংখ্যায় পশ্চিম পাকিস্তানীদের চেয়ে বেশী তাদেরই ক্রেডিট বেশী। তা উর্দু যদি এতই ইসলামী ভাষা হবে, তবে পূর্ব পাকিস্তানীরা উর্দুকে তাদের অঞ্চলে রাষ্ট্রভাষা করছে না কেন ? শুনেছি, তাদের মাতৃভাষা বাঙলার জন্য লড়তে গিয়ে কেউ কেউ প্রাণ দেওয়াতে 'শহীদ'রূপে আজও পরিচিত হচ্ছে। আর পশ্চিম পাকিস্তানেই বা উর্দু কোথায় ? সিন্ধীরা বলে সিন্ধী ভাষা, বেলুচরা বেলুচী, পাঠানরা পশতু—রইল বাকি পাঞ্জাব। তারা তো বলে পাঞ্জাবী, শেখে উর্দু। কিন্তু ইতিমধ্যেই তো সেখানে আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে, পাঞ্জাবী কথ্যভাষা, শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যম করার জন্য সেটাকে লিখিত রূপ দিয়ে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার ইজ্জৎ দেওয়া। এ-জাতীয় সম্মান পাঞ্জাবী কথ্যভাষা তো আগেও পেয়েছে। গুরু নানকের 'গ্রন্থসাহেব' তো পাঞ্জাবী কথ্যভাষায় রচিত। কিন্তু এসব বিবরণ থাক্‌—আমি পশ্চিম পাকিস্তান সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নই। কিন্তু এ সম্পর্কে আমার একটি শেষ নিবেদন আছে। আপনি বললেন, আপনারা, অর্থাৎ উর্দুভাষীরা পাকিস্তান নির্মাণ করেছেন। উত্তম প্রস্তাব। আজকের দিনের পাকিস্তানীরা যে কায়েদ-ই-আজম মরহুম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ সাহেবকে তাদের 'জাতির পিতা' বলে

সর্বোচ্চ সম্মান দেয়, তাঁর মাতৃভাষা কি উর্দু ছিল ?'

মনসুর চুপ করে রইলেন। তর্ক যে আরও চালাতে পারতেন না তা নয়। কারণ যুক্তির অভাবেই যদি তর্কের সমাপ্তি ঘটাবার কারণ হতো, তবে পৃথিবীর শতকরা নিরানব্বই ভাগ এই মুহূর্তেই মুখ বন্ধ করে গোরের নীরবতার আশ্রয় নিত।

ডাক্তার কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় মনসুর বললেন, 'বাঙলা হিন্দু ভাষা—তার প্রভাব বাঙালী মুসলমানকে হিন্দু-মনোবৃত্তির দাস করে দেয়।'

'দাস' কথাটা বোধ হয় শহ্‌র্‌-ইয়ারকে বলদের সামনে লাল পতাকা দেখানোর মত হলো। স্পষ্ট দেখলুম, তার মুখে সামান্যতম কাঠিন্য দেখা গেল। তার পরিমাণ এতই সামান্য যে শুধু আমিই সেটা লক্ষ্য করলুম। কারণ এতদিন ধরে ত'র নয়নে বদনে বহু ভাবের খেলা আমি দেখেছি। বেশীর ভাগ সময় তার মুখ শান্ত। ভদ্র পরিবারের বধূর মত। কিন্তু সামান্যতম রসের সন্ধান পেলেই মুচকি হাসে কিংবা খলখলিয়ে। বিষণ্ণ, চিন্তিত, বিহ্বল আরো বহু ভাবের খেলা তার চোখেমুখে আমি দেখেছি, কিন্তু ঐ ভদ্রবধূর শান্তিমাখা মুখে সব চেয়ে বেশী দেখেছি তার রহস্য-ভরা আঁখি। কঠিনতা কখনো দেখি নি।

বললে, 'বাঙলার শ্রেষ্ঠ ধর্মসঙ্গীত টেগোরের। সেগুলেতে হনুমানজী, রামচন্দ্রজী কেউই নেই। আছেন যিনি, তিনি সুফীদের অল্‌-হক্‌, অল-জমীল—ট্রুথ এণ্ড বিউটি। আপনি যখন এদেশে বাঙালী হস্টেলে বাঙালী-মুসলমানদের ভিতর তিন বছর বাস করে বিস্তর বাঙলা শুনেছেন, তখন আশা করতে পারি এসব টেগোর-সং-এর কিছু কিছু সে যুগে আপনার কানে পেঁাচেছিল এবং তার কিঞ্চিৎ রসগ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন—বাঙালী বন্ধুবান্ধবদের শুধিয়ে অন্তত মোটামুটি অর্থটা জেনে নিয়েছিলেন।'

যেন গৌরীশঙ্করের চূড়ো থেকে গুরুগম্ভীর ঐশী বাণী নেমে এল ঃ

'না, বাঙলা শেখার কোনো জরুরৎ আমার ছিল না।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার হঠাৎ কি রকম যেন বদলে গিয়ে একেবারে ভিন্ন কণ্ঠে বললে, 'সে তো ঠিকই করেছেন। এদেশে কত ইংরেজ বক্‌স্‌ওলা দশ-বিশ বছর কাটিয়ে যায়, এক বর্ণ বাঙলা না শিখে। আপনারই বা কী জরুরৎ।'

'বক্‌স্‌ওলা' কথাটা আমি স্বরাজলাভের পর আদৌ শুনি নি। ইংরেজ চাকুরে সিভিলিয়ান 'স্নব'রা চা-বাগিচার অশিক্ষিত—এমন কি বর্বর বললেও অত্যুক্তি হয় না—সায়েবদের এই বিদ্রূপসূচক নাম দিয়েছিল—চায়ের পেটি বা 'বক্‌স্‌' নিয়ে তাদের কারবার করতে হয় বলে। মনসুর সাহেব হয়তো কথাটা পূর্বে কখনো শোনেন নি তাই অর্থটা ধরতে পারেন নি। জিজ্ঞেস করলেন, 'বক্‌স্‌ওলা কি ?'

শহ্‌র্‌-ইয়ার যেন প্রশ্নটা শুনতেই পায় নি এ রকম ভাব করে মিসিস মনসুরের দিকে ঝুঁকে দরদভরা কণ্ঠে কি যেন শুধলো।

তর্ক থেমে গেছে কিন্তু তবু মনসুর থামতে চান না। তিনি উর্দু সাহিত্যের ঐশ্বর্য ও প্রসাদগুণ সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে চললেন। তার অধিকাংশই খাঁটি সত্য কথা, কিন্তু বলার ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে কেমন যেন একটা কর্কশ কর্কশ ইঙ্গিত, 'তোমার বাঙলায় এ রকম আছে?' ঐ গোছ। কিন্তু শহ্‌র্‌-ইয়ার সেই যে মুখ বন্ধ করেছিল আর একবারের তরেও খুললো না। এই অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে ইরাণীরা বলেন, 'তখন আলোচনার কার্পেট রোল্‌ করে তুলে নিয়ে খাড়া করে একপাশে রেখে দেওয়া হলো।' উপস্থিত তারও বাড়া কিছু যেন চোখের সামনে দেখতে পেলুম। যেই শহ্‌র্‌-ইয়ার সামান্যতম আভাস পেল যে দ্রব্যগুণেই হোক আর যে কোন কারণেই হোক মনসুর আবার সেই কার্পেটটা গড়গড়িয়ে খুলতে চান, ধুরন্ধরী সঙ্গে সঙ্গে এক লম্ফে যেন টাইট হয়ে গিয়ে বসলো সেই রোল করা কার্পেটটার উপর।

আল্লায় মালুম, মনসুর সাহেবের লেকচার কখন শেষ হবে। আমার প্রিয় বান্ধব ডাক্তার সাহেব আবার কারো কথা মাঝখানে কেটে দিয়ে আপন কথা বলতে একেবারেই অসমর্থ। ওদিকে আমি যেন আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে একটা দুর্গন্ধ পেলুম যে ডাক্তারের ইচ্ছে আমাদের সকলকে বাইরে কোনো মোগলাই রেস্তোরাঁতে খাওয়াতে চান এবং এখানে আসবার সময় সেটা বলতে ভুলে গেছেন। সর্বনাশ! তা হলেই হয়েছে! কী করি, কী করি! মনে পড়লো, ইস্কুলের পণ্ডিত মশাই আমাকে একদিন বলেছিলেন, 'সাহিত্যিক হতে হলে যে কটি গুণের প্রয়োজন, যেমন ভাষার উপর দখল, কল্পনাশক্তি এবং আরো বহুবিধ কলাকৌশল তার মাত্র একটি তোর আছে—নির্জলা মিথ্যে বলার নির্লজ্জ চতুরতা।' জয় গুরু, জয় গুরু! তোমার মহিমা অপার। তোমাকে স্মরণ করা মাত্রই অজ্ঞান-তিমির-অন্ধকার দূরীভূত হয়ে গেল: সম্মুখে দেখি দিব্য জ্যোতি, সত্য জ্যোতি।

যেই মনসুর সাহেব দিতে গেছেন গেলাসে আরেকটি চুমুক অমনি আমি সবাইকে না শুনিয়ে আবার শুনিয়েও শহ্‌র্‌-ইয়ারকে বললুম, 'আমি তা হলে উঠি। আপনি বাবুর্চিকে বলে এসেছেন তো কি ভাবে আমার পথ্যিটা তৈরী করবে?' তার পর লজ্জায় কাচুমাচু হয়ে মনসুর সাহেবকে বললুম, 'আপনার বন্ধু ডাক্তার সাহেবের আপন হাতের চিকিৎসার জন্যই আমার মফঃস্বল থেকে শহরে আসা। পাছে অপথ্য কুপথ্য করি তাই আমাকে প্রায় তালাবন্ধ করে রেখেছেন আপন বাড়িতে, হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। আপনার সঙ্গে আবার পরিচয় হওয়ায় বড় আনন্দ হলো, হেঁ হেঁ।' ডাক্তার গোবেচারা ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকালে। শহ্‌র্‌-ইয়ার আমার কথা শেষ হওয়ার বহু পূর্বেই আমার

মতলবটা ভালো করেই বুঝে নিয়েছে—আমি নিঃসন্দেহ, সেও এখান থেকে পালাবার পথ খুঁজছিল, কিন্তু বেচারী মেয়েছেলে হয়েও না পারে অশিক্ষিত পটুত্বের অভিনয় করতে, না পারে নির্জলা মিছে কথা কইতে। এবারে আমি একটা পথ করে দেওয়া মাত্রই সে চেয়ার ছেড়ে এমন ভাবে ঘাড় নাড়ালে যে তার থেকে এও হয় ওও হয়। ডাক্তার বিশেষ মনঃক্ষুন্ন হলেন বলে মনে হলো না—কারো কোনো ইচ্ছাতে বাধা দেওয়া তার ধাতেই নেই। এ রকম মহামানব সংসারে বড়ই বিরল।

বিস্তর শেকহ্যান্ড, খুদা হাফিজ, ফী আমানিল্লাহ, বঁ ভওয়াইয়াজ বলার পর শহ্‌র্‌-ইয়ার শুধু মনসুর সাহেবকে দুটি অনুরোধ জানালে, আসছেবার কলকাতায় এলে যেন তাঁদের ওখানে ওঠেন এবং আজ রাত্রের মত যেন ডাক্তারকে একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেন। মাদাম মনসুরকে শহ্‌র্‌-ইয়ার এ অনুরোধ আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে করিডরে পেঁছিনো মাত্রই শহ্‌র্‌-ইয়ার গান ধরলো, আর বেশ উচ্চকণ্ঠেই, অবশ্য এ সময় কেউ যদি আদপেই কাছে-পিঠে থাকে তবে সে সে-ব্লকের বেয়ারা—

'হাটের ধুলো সয় না যে আর, কাতর করে প্রাণ।
তোমার সুরসুরধুনীর ধারায় করাও আমায় স্নান।'

আট

ড্রাইভার শুধোলে, 'কোথায় যাবো, আম্মা?'

শহ্‌র্‌-ইয়ার ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে বললে, 'বেহেশ্‌ৎ কিংবা দোজখ্‌—যেটা এ জায়গা থেকে বেশী দূরে।

বেচারী ড্রাইভার বুঝতে পারে নি। আমি বললুম, 'উপস্থিত গঙ্গা-পারে চলো। পরে দেখা যাবে।'

একটা জায়গায় ভিড় সামান্য কম। আমি বললুম, 'শহ্‌র্‌-ইয়ার, এখানে ঐ গাছতলায় একটু বসবেন?'

বললে, 'নিশ্চয়ই বসব, একটুখানি তাজা হাওয়া বুকের ভিতর ভরে নি। গ্রেট ঈস্টার্ন তবু পদে আছে, অন্য হোটেলগুলোতে যেন আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। গঙ্গার হাওয়া গঙ্গাজলের চেয়ে ঢের ভালো। তাই হিন্দুরা গঙ্গাস্নানের পরিবর্তে এখন গঙ্গার হাওয়া খেয়ে পাপমুক্ত হয়। এ হাওয়ার বহু গুণ। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম আবৃত্তি করলো,

'নমো নমো নমো সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধসমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।'

তারপর গান ধরলো, 'হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান—

তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান—'

হঠাৎ গান বন্ধ করে বললো, 'মিস্টার মনসুর কিন্তু লোক খারাপ নয়—কি বলেন আপনি? আসলে কি জানেন, ওঁরা থাকেন এক ভুবনে, আমাদের বাস সম্পূর্ণ অন্য ভুবনে। বিপদ শুধু এই, ওঁরা আমাদের কনভার্ট করতে চান।'

আমি বললুম, 'কনভার্ট করাটা কি দোষের? ঐটেই তো মুসলমানদের স্ট্রং পয়েন্ট। কাইরোর অজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বিষয় সবাইকে পড়তে হয়। কি করে অমুসলমানকে মুসলমান করা যায়! মনসুর মিশনারীর দোষ বিশ্বসুদ্ধ লোককে উর্দুতে কনভার্ট করার চেষ্টাতে গলদ নয়—গলদ তার পদ্ধতিতে, মেথডে, মডুস্ অপেরাণ্ডিতে। দম্ভ নিয়ে প্রচার আরম্ভ করলে যাকে কনভার্ট করতে চাও, সে সঙ্গে সঙ্গে ভাববে, আমি যত ভালো উর্দুই শিখি না কেন, এঁর সঙ্গে তো কখনো কাঁধ মেলাতে পারবো না, কারণ উর্দু এঁর মাতৃভাষা। অতএব বাকী জীবন ধরে ওঁর মুখের দম্ভোদ্গীরণ আমাকে সয়েই যেতে হবে। কী দরকার গায়ে পড়ে করুণার পাত্র হওয়ার! তার চেয়ে থাকি আমি আমার বাঙলা নিয়ে। দু-পাঁচটা ভুল সে ভাষাতে করলে কীই বা এমন দুশ্চিন্তা—পাড়া-প্রতিবেশীরাও করে। আমরা সবাই বরাবর। ঐ উর্দুর গোসাঁইও নিশ্চয় দু'-পাঁচটা ভুল করেন তাঁর চোস্ত উর্দুতে—মানুষ তো আর আল্লা নয়—কিন্তু সে ভুল তো আমার ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবো কি করে? কিন্তু এসব নিয়ে এখন আর চিন্তা করেন কেন? এ তো অতি সাধারণ, স্থূল দৈনন্দিন ঘটনা। দেখলেন না, আমি আলোচনায় মোটেই যোগ দিলুম না।'

'সে তো স্পষ্ট দেখলুম। এবারে বলুন, কাইরোতে ইসলাম-প্রচার-পদ্ধতি সুচারুরূপে শেখার পর ক'জন অমুসলমানকে মুসলমান করেছেন?'

আমি বললুম, 'প্রথম তো নিজেকেই সামলাই। আমার মত গুনাহ্গার—পাপী মুসলমান এ-সংসারে খুব বেশী নেই। আগে তো একটা মিনিমাম স্ট্যাণ্ডার্ডে পৌঁছই, তবে না প্রচারকার্য আরম্ভ করার হক্ক্ জন্মাবে।'

শহ্রু-ইয়ারের চেহারা দেখে মনে হল আমি যুক্তি দেখিয়ে তাঁকে আমার সঙ্গে একমত করাতে পারি নি। সো ভী আচ্ছা। শেষ বিচারের দিনে তিনি যদি সাক্ষ্য দেন যে আমি খুব খারাপ মুসলমান ছিলুম না—অন্ততঃ আমি নিজের সম্বন্ধে যতটা ভেবেছিলুম তার চেয়ে কম—সেও একটা ভরসার কথা।

বললুম, 'একটু সরে এসে এই গাছটার তলায় ঐ শিকড় দুটোর মাঝখানে বসুন। এখানে বসলে তদ্দণ্ডেই মেয়ে মাত্রেরই একটি বিশেষ শক্তিলাভ হয়। নির্ভয়ে নির্বিচারে মিথ্যে কথা বলতে যখন তার আর কোনো বাধাবন্ধ থাকে না। পরের দিন বিকেলে আর একটি ছেলের সঙ্গে তার লীলাখেলার

এপয়েণ্টমেণ্ট—আজ সন্ধ্যায় এখানে বসলে সে অকুণ্ঠ ভাষায় নির্দ্বন্দ্ব বিবেক নিয়ে গদ্‌গদ হয়ে অন্য জনকে বলতে পারে, 'আই লাফ্‌ ইউ, আই লাফ্‌ ইউ।'

'"লাফ" কেন, "লাভই তো উচ্চারণ। ভাষাটা তো আর জর্মন নয় যে 'ভি' 'এফ' হবে?'

'এটা সর্বাধুনিক, chic উচ্চারণ।'

'না। আমার মনে হয় তা নয়। মেয়েটা "আই লাফ্‌ এট ইউ, আই লাফ এট ইউ"। "এট"-টা উহ্য রেখেছিল, ভদ্রতার খাতিরে।' সঙ্গে সঙ্গে শহ্‌র্‌-ইয়ার হেসে ওঠাতে সাদা দাঁতগুলো ঝিলমিল করে উঠলো কিন্তু মুখের রঙটি অন্দরমহলের বংশানুক্রমিক ধবলের চূড়ান্তে পৌঁছে গেছে বলে কন্ট্রাসটার খোলতাই জুৎসই হল না—মুখের রঙ কালো হলে যে রকম হতো।

শহ্‌র্‌-ইয়ার মুচকি হেসে হেসে বললে, 'আচ্ছা, বলুন তো, একটা মেয়ের যদি দুজন প্রেমিক থাকে, এবং সে-যদি দুজনকেই পরিতৃপ্ত করতে পারে, তাতে সমাজেরই বা কি, আর আপনি শিক্ষিত লোক, আপনারই বা কি মরেল অবজেক্‌সন থাকতে পারে?'

আমি বললুম, 'সমাজের আপত্তি বা আমার মরেল অবজেক্‌শন এগুলো পরের কথা। আসলে কি জানেন, জিনিসটা ঠিক স্বাভাবিক ভাবে চলতে পারে না। মেয়েটাকে সর্বক্ষণ লুকোচুরি খেলতে হয়, সর্বক্ষণ ভয়, দু'জনার একজন কখন না অন্যজনের গন্ধ পেয়ে যায়—বিবাহিতা রমণী উপপতি রাখলে তাকে যে রকম অষ্টপ্রহর আশঙ্কায় আশঙ্কায় কাটাতে হয়। একে তো মেয়েটার স্বাভাবিক সুস্থ জীবন বরবাদ—তদুপরি ব্যাপারটা খুব বেশী দিন গোপন থাকে না, জানাজানি হয়ে যায়। জানাজানি হয়ে যাওয়ার পূর্বেই যদি মেয়েটা এই দোটানার স্ট্রেন সইতে না পেরে একজনকে বিদায় দেয় তখন তার এবং ছেলেটার বন্ধুমহলে সে 'জিল্‌ট্‌' রূপে মশহুর হয়ে যায়, কারণ, তারা তো আর জানে না যে মেয়েটা দুটো ভিন্ন লোকের সঙ্গে একই সময়ে লীলাখেলা চালাচ্ছিল এবং সে স্ট্রেন সইতে না পেরে একজনকে বিদেয় দিয়েছে। আর আসল তত্ত্ব জানা-জানি হয়ে গেলে তো আরো চিত্তির। তখন রাস্তা দিয়ে যাবার সময় পাড়ার নটবররা তার গায়ে পড়ে 'প্রেম' নিবেদন করে। ভাবখানা এই, দুজন যখন ছিলই তখন তিনজনেই বা কি দোষ? আর সর্বশেষে বলি, মেয়েটার পক্ষে ছেলেটাকে বিদায় দেওয়ার 'জিল্‌টিং' কর্মটি কি অতই সহজ! চিন্তা করুন, ছেলেটার মোহ যদি তখনো কেটে না গিয়ে থাকে তবে সে চোখের জল ফেলবে, প্রাচীন দিনের প্রণয় স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার শপথ কাড়বে! না 'জিল্‌টিং' কর্মটি শুধু 'জিল্‌টেড্‌' হতভাগার পক্ষেই অপমানজনক তাই নয়, যে জিল্‌ট্‌ করে তার পক্ষেও পীড়াদায়ক!'

শহ্‌র্‌-ইয়ার বললে, 'এ যুগের অবিবাহিতা তরুণী যুবতীদের চেয়ে আমার

বয়স খুব বেশী নয়, তবু এদের সঙ্গে আমার যোগসূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। তাই জানতে ইচ্ছে করে এদেশে আমাদের অল্প বয়সে শেখা একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শ কি ধীরে ধীরে কিংবা দ্রুতবেগে জিল্‌টিং নামক নয়া মালের জন্য জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে, কিংবা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে?'

আমার চিত্তে কৌতুকরসের সঞ্চার হল। বললুম, 'আমার বয়সটি কি নিতান্তই প্রেমে পড়-পড় তরুণদের বয়স, যে তাদের সঙ্গে আপনার চেয়ে আমার দহরম-মহরম শ'দুই লিটার বেশী! এবং আমি বাস করি মফঃস্বলে!'

'কী জ্বালা! আপনার যে গণ্ডায় গণ্ডায় চ্যাংড়া চেলা রয়েছে। আর আমার বিশ্বাস পুরুষমানুষ নিজের থেকে নিতান্ত না চাইলে সহজে বুড়ো হয় না। সে কথা থাক্, আমার প্রশ্নটার উত্তর দিন।'

'দেখুন এ-প্রশ্নের উত্তর ঠিক ঠিক কেউ দিতে পারে না। সবাই শুধু আপন আপন একটা খসড়া গোছ, একচোখা ধারণা প্রকাশ করতে পারে। আমার ধারণাটা প্রকাশ করার পূর্বে একটি অতি হ্রস্ব ভূমিকা দি। এক অতিশয় সহৃদয় বাঙালী সমস্ত জীবন জেলের বড়কর্তা রূপে কাজ করে পেনশন নেওয়ার পর কি একটা ঘটনা উপলক্ষে বলেন, তাঁর জেলে একবার একজন গুণী পণ্ডিত আসেন যাঁর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বিষয় ছিল মনস্তত্ত্ব, এবং বিশেষ করে অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব। দেশ-বিদেশের জেলে তিনি তাঁর অধ্যয়ন-রিসার্চ করেন সাজা-প্রাপ্ত অপরাধীদের নিয়ে এবং তাঁর একটি অতিশয় বিরল গুণ ছিল এই যে, যত হাড়-পাকা, মুখ-চাপা কয়েদীই হোক না কেন, তাঁর বাক্য তাঁর আচরণ, এক কথায় তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে সে তার হৃদয়ের গোপনতম কথা প্রকাশ না করে থাকতে পারতো না। মাসখানেক কাজ করার পর তিনি আমাদের এই বাঙালী জেলারটিকে বলেন, ভারতবর্ষের একাধিক জেলে রিসার্চ করার পরও তিনি এযাবৎ একটিমাত্র জাতক্রিমিনাল, অর্থাৎ যে নিরুদ্বেগে, বিবেক নামক প্রতিবন্ধকের নুইসেন্স সম্বন্ধে অষ্টপ্রহর সম্পূর্ণ অচেতন থেকে ক্রাইমের পর ক্রাইম করে যায়, জাস্ট ফর ইট্‌স্ ওন সেক্—এরকম প্রাণী এদেশে পান নি, তার মানে এদেশে জাত-ক্রিমিনাল নেই। আমারও মনে হয় এদেশে 'জাত-জিল্‌ট্' নেই। সুগন্ধমাত্র ফুলে ফুলে মধু পান করার জন্য একটার পর একটা পুরুষ জিল্‌ট্ করে করে যৌবনটা কাটাচ্ছে এ রকম রমণী এদেশে বোধ হয় বিরল। এই যে আপনি হিন্দু নারীর পতিব্রতা হওয়ার আদর্শের কথা একাধিকবার তুলেছেন, সেই সংস্কারটা এদেশের তরুণীর ভিতর আবির্ভূত হয়—যেই সে প্রথম প্রেমে পড়ে। আর আপনার যে উদাহরণ;—একটি তরুণী দুটো প্রেমিকের সঙ্গে একই সময়ে প্রেম চালিয়ে যাচ্ছে, সেটাও এদেশে হয় অন্য কারণে। আমার মনে হয়, একটু অনুসন্ধান করলেই ধরা পড়বে, বেচারী মনস্থির করতে পারছে না, দুটোর কোন্‌টাকে বিয়ে করলে সে আখেরে সুখী

হবে, এবং তাই কোনোটাকেই হাতছাড়া করতে পারছে না।

আপনার প্রশ্নের উত্তর খানিকটে তো দিলুম, কিন্তু আমার প্রশ্ন 'জিল্টিং' নামক অতি প্রাচীন অথচ নিত্যনবীন কর্মটির প্রতি আপনার এ কৌতূহল কেন? আমি নির্ভয়ে, নিঃসন্দেহে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারি আপনি কখনই 'জিল্টিং' রহস্যের মর্মস্থলে পৌঁছতে পারবেন না। আপনি হিন্দু হলে বলতুম, এ জন্মে না, জন্ম-জন্মান্তরেও না।'

'কেন, আমি কি এতই ইডিয়ট?'

আমি বললুম, 'তওবা,! তওবা!! আপনি ইডিয়েট হতে যাবেন কেন? আপনি অতিশয় বুদ্ধিমতী—এ-কথা আমি কেন, আমার গুরুর গুরুও বলবেন। কিন্তু, কল্যাণী, এ তো বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার বস্তু নয়। এটা সম্পূর্ণ অনুভূতির ব্যাপার, এবং মনে রাখবেন, আপনি আমাকে অতি উত্তমরূপে, পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে বুঝিয়েছেন আপনার অনুভূতি, আপনার স্পর্শকাতরতা এর সব-কিছু গড়ে উঠেছে, আকার নিয়েছে, আর্দ্রতা পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানের ভিতর দিয়ে। এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলেছেন, আপনি আপনার হৃদয়ের খাদ্য আহরণ করেন ঐ একমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে।

কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতে জিল্টিং নিয়ে গান কই? জিল্টেড্ হওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা কি কস্মিনকালেও তাঁর হয়েছিল? শুধু প্রভাত মুখো কেন, ঠাকুর-বাড়ির প্রাচীনতম বৃদ্ধবৃদ্ধা এবং সে-বাড়ির সঙ্গে বাল্যকাল থেকে সংশ্লিষ্ট জন কেউই তো কখনো সামান্যতম ইঙ্গিত দেন নি যে রবীন্দ্রনাথ কখনো কাউকে ভালোবেসে জিল্টেড্ হয়েছেন। তাঁর প্রেমের গানের মূল সুর মূল বক্তব্য কি? 'আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলুম, তুমিও আমাকে বেসেছিলে। তার পর তুমি হঠাৎ অকালে চলে গেলে। তাই

এখন আমার বেলা নাহি আর
বহিব একাকী বিরহের ভার?

কিংবা

তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে
কত আর সেতু বাঁধি।

এটা অবশ্যই তাঁর দুর্ভাগ্য যে তাঁর প্রিয়া অকালে অন্য লোকে চলে গেলেন। এই দুর্ভাগ্য নিয়েই তিনি রূপ দিয়েছেন শত শত গানে—দু'দশ বছর ধরে নয়, সমস্ত জীবন ধরে—কিন্তু মোতিফ এক: 'তুমি চলে গেলে; আমি আর কতকাল ধরে তোমার বিরহ-ব্যথা সইব?'

শহ্‌র্‌-ইয়ার বললে, 'মাফ করবেন—হঠাৎ আমার মনে একটা প্রশ্ন এল। আমার অনুভূতি আমার ইমোশান যেমন রবীন্দ্রনাথের গান গড়ে দিয়েছে আপনার ক্ষেত্রেও কি তাই নয়? আপনি তো তাঁকে কাছের থেকে দেখেছেন, তাঁর বহু

বহু গান আপনি এবং আপনার সতীর্থরাই সর্বপ্রথম শুনেছেন।'

আমি বললুম, 'গুরু যেন অপরাধ না নেন! আমার অনুভূতি জগৎ নির্মিত হয়েছে অন্য বস্তু দিয়ে। গুরুর কাছ থেকে সিকি পরিমাণও নিয়েছি কিনা সন্দেহ।'

শহুর-ইয়ার বিস্মিত হয়ে শুধোলো, 'তবে কোথা থেকে?'

'বৈষ্ণব পদাবলী থেকে।'

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন বাঙলা দেশের সর্বত্রই যে মোতিফ নিয়ে সব চেয়ে বেশী গান গাওয়া হয় সেটি রাধাকৃষ্ণের। এবং আরো পরিষ্কার হয়, আরো সংকীর্ণ পরিসরে সেটা জাজ্বল্যমান হয় যদি বলি আসলে মোতিফটা শ্রীরাধার বিরহ। সেই বিরহের গান গাওয়া হয়, নিত্য নব রচা হয় বাঙলাদেশের নানা অঞ্চলে নানা সুরে। কথার দিকে শ্রীরাধার বিরহ-যন্ত্রণার সর্বোত্তম অতুলনীয় প্রকাশ এই আমাদের বীরভূমের চণ্ডীদাসে। এঁর পরে আসেন বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ইত্যাদি। মুসলমান কবিও বিস্তর আছেন তবে একমাত্র সৈয়দ মর্তুজা ছাড়া আর কেউ খুব উচ্চস্তরে উঠতে পারেন নি—যদিও তাঁদের সহৃদয়তা, শ্রীরাধার প্রতি তাঁদের অনুরাগ ও সহানুভূতি হিন্দু কবিদের চেয়ে কণামাত্র কম নয়।

আর সুরের দিক দিয়ে শ্রীরাধার বিরহসঙ্গীতের সর্বোত্তম অতুলনীয় বিকাশ ফুটে উঠেছে কীর্তনীয়াদের কণ্ঠে, সুরে।

আমি ঐতিহাসিক নই, তাই বলতে পারবো না, কত শত বৎসর ধরে কত হাজার বৈষ্ণব কবি তাঁদের আপন আপন বিরহবেদনার নিদারুণ অভিজ্ঞতা শ্রীরাধার কণ্ঠে শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ রেখে গেছেন। অর্থাৎ তাঁরা নবীন কাব্য রচনা করে, নূতন নূতন নায়ক-নায়িকা নির্মাণ করে, যেমন মনে করুন, নলদময়ন্তী কিংবা লায়লী মজনুন, তাঁদের কণ্ঠ দিয়ে আপন আপন বিরহযন্ত্রণার অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন নি। তাবৎ বৈষ্ণব কবিদের বিরহবেদনা শ্রীরাধার বিরহবেদনা, আর যুগ যুগ ধরে শ্রীরাধার কণ্ঠে সঞ্চিত তাবৎ বিরহগাথা সর্ব বৈষ্ণব কবির গৌরব-সম্পদ!

নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে, এমন কি আপন প্রিয়াকে রঙ্গমঞ্চ থেকে নির্বাসিত করে দুজনারই নিষ্ঠুরতম বিরহজ্বালার অভিজ্ঞতা ব্রজসুন্দরীর কণ্ঠে সমর্পণ—এই যে প্রক্রিয়াটি এর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ সচেতন ছিলেন। আপনার মনে আছে, বোলপুরে পারুল বনে যেতে যেতে এক সকালে আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করে আপনাকে শোনাই—কোনো টীকাটিপ্পনী না করে?—

সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই-প্রেমগান

বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে
বিরহ-তাপিত ?

অবশ্য আমারও ইচ্ছে করে গুরুকে সবিনয় জিজ্ঞেস করতে, তাঁর বেলা, যাঁর 'বিরহ-তাপিত' অশ্রু তাঁকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল, যাঁর 'মুখ' যাঁর 'আঁখি' হতে

'——এত প্রেমকথা
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি——'

করেছিলেন তিনিও, তাঁর প্রতি তিনি তাঁর কাব্যে সুবিচার করেছেন তো ?

ঠিক ঐ একই প্রক্রিয়ায়ই ইয়োরোপের বহু বহু কবি 'ত্রিস্তান আর ইজলদে'র প্রেমগাথায় আপন আপন নিজস্ব প্রেম, বিরহ, মিলন—অবশ্য মিলন অংশ সর্ব কাব্যেই অতি ক্ষুদ্র অংশ পায়—অকাতরে ঢেলে দিয়েছেন। কিন্তু বাঙলা দেশের বিরাট বৈষ্ণবগাথার তুলনায় ত্রিস্তানগাথা সূচ্যগ্র পরিমাণ।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার এতক্ষণ গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। এবারে শুধলো, 'কই, আমি তো ত্রিস্তান ইজলদে কাহিনীর নাম পর্যন্ত শুনি নি।'

বড় বেদনার গাথা। আর ইয়োরোপীয় এজাতীয় যত গাথা আছে তাদের মধ্যে আমি এটাকেই সর্বোচ্চ আসন দি। আপনি যে শোনেন নি সেটাও খুব বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে ইয়োরোপের লোক ক্রমেই এ সব গাথার প্রতি উদাসীন হয়ে যাচ্ছে। তাই দেখে 'ফ্রেঞ্চ একাডেমি'—এবং জানেন তো পৃথিবীর আর কোন একাডেমি এর একশ' যোজন কাছে আসতে পারে না—প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে তাঁদেরই এক সদস্যের স্কন্ধে গুরুভারটি দেন তিনি যেন ত্রিস্তান সম্বন্ধে যে কটি ব্যালাড পাওয়া যায় তারই উপর নির্ভর করে কালোপযোগী একখানা নবীন 'ত্রিস্তান' রচনা করেন। সে 'ত্রিস্তান' আমাকে মুগ্ধ করে, এবং তার বাঙলা অনুবাদ আমি আরম্ভ করি কিন্তু শেষ করতে পারি নি।

মূল কথায় ফিরে আসি। এবং যদি অনুমতি দেন, তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়েই আরম্ভ করি। আপনার খুব খারাপ লাগবে না, কারণ আপনি আমি দুজনাই মুসলমান; ওদিকে রাধাকৃষ্ণের কাব্যরূপ রসস্বরূপ বাদ দিলে তাঁরা হিন্দুদের—বিশেষ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের—উপাস্য দেব-দেবী এবং শ্রীকৃষ্ণ শুধু বৃন্দাবনের রসরাজ নন, তিনি গীতাকার রূপে বিষ্ণুর অবতার। আমি মানুষ হয়েছি আচারনিষ্ঠ মুসলমান পরিবারে। অথচ যে গানটি আমার আট বৎসর বয়সে মনে অদ্ভুত এক নবীন অনুভূতির সঞ্চার করেছিল সেটি

"—দেখা হইল না রে শ্যাম,
আমার এই নতুন বয়সের কালে—"

এ বিষয় নিয়ে ব্যক্তিগত অংশটা যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি সারি, যদিও আমার অভিজ্ঞতাটার কিঞ্চিৎ—অতি সামান্য—মূল্যও আছে।'

শহুর-ইয়ার দৃঢ় অথচ সবিনয় মধুর কণ্ঠে বললেন, 'আপনি দয়া করে কোন বস্তু বাদ দেবেন না। কীর্তন গান রেকর্ডে, বেতার থেকে আমি শুনেছি কিন্তু ওর গভীরে আমি কখনো প্রবেশ করি নি।'

আমি বললুম, 'তার কারণও আমি জানি। জানতে চাইলে পরে বুঝিয়ে বলবো।

হ্যাঁ। আমি পানির দেশের লোক, চতুর্দিকে জল আর জল! সঙ্গে সঙ্গে ভোরে, সন্ধ্যায়, রাত্রি দ্বিপ্রহরের অনেক পরেও ভাটিয়ালি গীত। নিশ্চয়ই প্রথম শুনেছি মায়ের কোলে শুয়ে শুয়ে। সামান্যতম বোধশক্তি হওয়ার পর থেকেই শুনেছি কান পেতে এবং অতি শীঘ্রই সেটা আমার রক্তের সঙ্গে মিশে যায়, যে রকম আমার দেশের দানাপানি আমার রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। কিন্তু ঐ 'দেখা হইল না রে শ্যাম'-এর আগেকার কোন গানই আমার মনে নেই।

আমাদের পরিবার আচারনিষ্ঠ, তার ঐতিহ্যে কট্টর প্যুরিটান। গান-বাজনা আমাদের পরিবারে বরাহমাংসবৎ ঘৃণ্য। কিন্তু সে কোন্ নিয়তি আমাকে ঐ গানের দিক আকৃষ্ট করলো জানি নে। আট বছর বয়সে 'নতুন বয়সের কালে' দেখা না হওয়ার ট্রাজেডি হৃদয়ঙ্গম করার কথা নয়। তবে আকর্ষণ করলো কি? জানি নে, সত্যি জানি নে।

তার পর বহু গান শুনতে শুনতে পরিচিত হলুম রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে। আমাদের দুজনারই প্রিয় গান 'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা'-র 'নূতন ভুবন নূতন দ্যুলোকে' যেন অকস্মাৎ আমার মত দীন অকিঞ্চনজন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত প্রবেশাধিকার পেল। আপনারই মত যখন আমার হৃদয়ানুভূতি রবীন্দ্রসঙ্গীতের রসগন্ধবৈভবে নির্মিত হচ্ছে তখন হঠাৎ পরিচয় হল চণ্ডীদাসের সঙ্গে। তার তাবৎ গানের সঙ্কলন ঘণ্টা তিনেকের ভিতর পড়ে শেষ করা যায়। আমার লেগেছিল পূর্ণ একটি বৎসর। ইতিমধ্যে জানতে পারলুম চণ্ডীদাসের জন্মস্থল নানুর আমাদের বোলপুর থেকে মাত্র মাইল আষ্টেক দূরে। এক বন্ধুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে গেলুম সেখানে পয়দল। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা, জমিদার অনাদিবাবুর ছোট ভাই শোনালেন কীর্তন গান। তিনি আমাকে ফরমাইশ করতে বললে আমি চণ্ডীদাস থেকে বেছে বেছে আমার আদরের গানগুলো পেশ করলুম। মাত্র কয়েক বছর হল শুনলুম, তিনি গত হয়েছেন, তাঁর সদ্গতি হোক!

তারপর বহুবার শুনেছি সন্ধ্যা আটটা-দশটা থেকে ভোর অবধি কীর্তন গান। তার বর্ণনা আপনাকে আরেকদিন দেব। এদেশ থেকে বহু উত্তম উত্তম প্রথা প্রতিদিন লোপ পাচ্ছে; আমার গভীরতম শোক, দুর্নিবার হাহাকার—যার কোনো সান্ত্বনা নেই যে সমস্ত রাত ধরে কীর্তন গান গাওয়ার প্রথা প্রায়

সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। আমার মতামতের কী মূল্য? তবু যাবার পূর্বে নিবেদন করে যাই ঐটেই ছিল বাঙলার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ঐতিহ্যগত সম্পদ—এর লক্ষ যোজন কাছে আর কোনো সম্পদ কোনো বৈভব আসতে পারে না।

বিবেকানন্দ 'কুমড়ো গড়াগড়ি' কথাটা একাধিকবার ব্যবহার করেছেন—কারণ ছবিটা যেন চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে।

কীর্তনের আসরে ছেলে-বুড়ো রাধার বিরহবেদনা শুনে 'কুমড়ো গড়াগড়ি' দেয়। আমি দিই নি কিন্তু দুই চোখ বেয়ে অবিরল অশ্রুধারা বয়ে গেছে।

গুরু ক্ষমা করবেন, আপনিও অপরাধ নেবেন না, শহ্‌র্‌-ইয়ার; কারণ আপনার অনুভূতি-ভুবন গড়ে তুলেছে আমার গুরুর শতাধিক গান, কিন্তু যদি বলি, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সর্বোত্তম সম্মেলনেও আমি কাউকে কাঁদতে দেখি নি, কুমড়ো গড়াগড়ির কথা বাদ দাও।

ব্যস্‌! আমি অন্য আর কোনো তুলনা করবো না, নিতান্ত প্রয়োজন না হলে। ইতিমধ্যে বলে রাখি, রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশ্ববৈভবে অতুলনীয়। যে জর্মন 'লীডার' ইয়োরোপে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত, রবীন্দ্রসঙ্গীত তার চেয়ে অনেক বেশী সূক্ষ্ম, তার বৈচিত্র্য এবং বহুমুখী বিকাশ কাব্যলোকে তাবল্লোক ছাড়িয়ে চলে গেছে বহু ঊর্ধ্বে।

কিন্তু প্রশ্ন, কীর্তন শুনে বালবৃদ্ধ (আমি যখন প্রথম শুনে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কান্নার শব্দ চাপতে চেয়েছিলুম তখন আমার বয়স ষোল) 'কুমড়ো গড়াগড়ি' দেয় কেন? আমি অবশ্যই এখানে আড়াইখানা কীর্তনের রেকর্ড বা বেতারে আধঘণ্টা কীর্তন প্রোগ্রাম শোনার কথা ভাবছি নে—দ্বিতীয়টা তো বহুবিধ যন্ত্রের খচখচানি এবং অংশতঃ সেই কারণে কীর্তনীয়ার অবোধ্য শব্দোচ্চারণ সমস্ত ব্যাপারটাকে সত্যকার কীর্তনের এক হাস্যাস্পদ ব্যঙ্গরূপে আধঘণ্টা ধরে মুখ ভ্যাংচায়। আজকের দিনে তাই শতগুণে শ্রেয়ঃ—নিভৃতে নির্জনে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাসাদি সশ্রদ্ধ বারংবার পঠন—প্রহরের পর প্রহর ব্যাপী। সে সময়ে গানগুলি যে সুরবর্জিত হয়ে দীনদরিদ্ররূপে হৃদয়ে প্রবেশ করছে সেটা আমার দুর্দৈব কিন্তু তবু সেটাকেও নমস্কার—সেও লক্ষগুণে শ্রেয়, প্রাগুক্ত ঐ অর্ধঘণ্টাব্যাপী নির্মম লাঞ্ছনার চেয়ে। সাহস নেই কলকাতা আকাশবাণীর সূর্যাস্ত থেকে রাত্রি দ্বিপ্রহর অবধি জনতিনেক কীর্তনীয়া—মূল গায়েন উত্তম হওয়া চাই—এনে একটানা, অবিশ্রান্ত সুদ্ধমাত্র কীর্তন শোনাবার?

বিরক্ত হয়ো না, শহ্‌র্‌-ইয়ার, এ-নিয়ে আমার ক্ষোভ কোনো সান্ত্বনা মানে না, তাই তোমাকে বললুম।

আরেকটা কথা। জানো বোধ হয়, পাঁচমেশালী গানের মজলিসে কারো যদি কীর্তন গাইবার প্রোগ্রাম থাকে—বেশীক্ষণ না, ধরো আধঘণ্টাটাক—তবে সেটা আসে পুরো প্রোগ্রামের একবারে সর্বশেষে। কেন জানো? ঐ উটকো

কীর্তনটাও যদি মোটামুটি রসের পর্যায়ে উঠে যায় তবে তার পর আর কেউ অন্য কোনো গান জমাতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথও কীর্তন সুরের ম্যাজিক জানতেন—কীর্তনের কথার তো কথাই নেই—তাই তিনি এ যুগে যে গান সর্বপ্রথম রেকর্ডে দিলেন সেটি কীর্তন সুরে।

এ সবই বাহ্য। সব চেয়ে বড় প্রশ্ন, কীর্তনে আছে কি যে শ্রোতা কুমড়ো গড়াগড়ি দেবে?

আছে অবহেলিত, অপমানিত, পদদলিত প্রেম। শ্রীরাধার মুখ দিয়ে সহস্র সহস্র কবি শত শত বৎসর ধরে যা বলিয়েছেন তার সারাংশ দেওয়া কি সহজ, না আমার বাদবাকি জীবনটাতে কুলোবে!

রাধা বেচারী বিবাহিতা কন্যা। ওদিকে কৃষ্ণ অতি শিশুবয়েস থেকেই করেছেন একাধিক অলৌকিক কর্ম—মিরাকুল্—বৃন্দাবনের সর্বত্র তাঁর যশ প্রচারিত হয়ে গিয়েছে। বৃন্দাবনে সুন্দরী কুমারী গোপিনীরও অভাব নেই। সেই বালক কৃষ্ণকে ভালোবাসে সর্ব গোপিনী, তাদের মাতা, পিতামহী, বৃন্দাবনের সর্ব নরনারী। যে কোনো কুমারী কৃষ্ণের অনুরাগ পেলে জীবন ধন্য মনে করবে কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে মুগ্ধ করলেন, আকর্ষণ করলেন, সম্মোহিত করলেন, আত্মহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্যা করলেন বিবাহিতা শ্রীরাধাকে। একদিকে তার আনন্দ-গরবের অন্ত নেই, অন্যদিকে তার শাশুড়ী ননদী করে তুললো তার জীবন বিষময়। অলঙ্ঘ্য বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে পাগলিনী শ্রীরাধা ছুটে আসতেন কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শোনা মাত্রই। শত দুঃখ শত যন্ত্রণার মাঝখানেও শ্রীরাধা আনন্দে আত্মহারা—আর হবেই বা না কেন? শ্রীকৃষ্ণের মত প্রেমিক এই ভারতবর্ষে জন্মেছে ক'টি!

তার পর একদিন শ্রীকৃষ্ণ সেই সর্বত্যাগিনী রাধার প্রেম অকাতরে অবহেলা করে—আমি বলি অপমানিত পদদলিত করে চলে গেলেন মথুরায়।

'শহ্‌র্-ইয়ার, তুমি মথুরা বৃন্দাবন দেখেছ?'

'মোটরে দিল্লী থেকে আগ্রা যাওয়ার সময় দেখেছি। ও দুটো তো খুব কাছাকাছি। দুটোর শেষপ্রান্ত তো প্রায় মিলে গেছে।'

'ঠিক বলেছ। সেই মথুরা থেকে তিনি এক দিনের তরে, এক মিনিটের তরে বৃন্দাবনে আসেন নি শ্রীরাধাকে দেখতে। উল্টে বৃন্দাবনের ঐ অতি পাশের মথুরায়, বলতে গেলে শ্রীরাধার কানের পাশে তিনি ঢাকঢোল বাজিয়ে করতে লাগলেন একটার পর একটা বিয়ে—রুক্মিণী, সত্যভামা, আরো কে কে আমি ভুলে গিয়েছি, মনে রাখবার কোনো সদিচ্ছাও আমার কোনোকালে হয় নি।

বুঝলে শহ্‌র্-ইয়ার, একেই বলে টায়-টায় 'জিল্টেড্' লাভ্। তামাম বিশ্বসাহিত্য তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও এই হতভাগিনী 'জিল্টেড্' শ্রীরাধার শত যোজন কাছে আসতে এমন রিক্তা হৃতসর্বস্বা তুমি পাবে না।

তাই আকারে, গাম্ভীর্যে, মহিমায় হিমালয়ের মত বিরাট কলেবর বৈষ্ণব সাহিত্যের মূল সুর—লাইট-মোতিফ—জিল্টেড্‌ লাভ, পদদলিত প্রেম।

সে সাহিত্যে দুঃখিনী শ্রীরাধার হৃদয়-বেদনা যে কত কবি কত দিক দিয়ে দেখেছেন, কত ভাবে বর্ণনা করেছেন, তার সামান্যতম অংশ কেউ অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে পারবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিক ঠিক কি বলেছেন বই না খুলে বলা যায় না তবে যা বলেছেন তার সারাংশ এই, মদ দেখলে নেশা হয় না, শুঁকলেও না, চাখলেও না, এমন কি সর্বাঙ্গে মাখলেও না। মদ গিলতে হয়।

পদাবলীরস আকন্ঠ গিলতে হয়।'

নয়

আজ রববার। সপ্তাহে মাত্র এই একটি দিন ডাক্তার আর শহ্‌র্‌-ইয়ার একে অন্যকে নিরবচ্ছিন্নরূপে পায়। এ দিনটায় আমি দ্য ব্রো—ওয়ান টু মেনি—হতে চাই নে। তাই ব্রেকফাস্টে পর্যন্ত গেলুম না। খাই তো কুল্লে দু কাপ চা—সে কর্মটি শুয়ে শুয়ে দিব্য করা যায়। মোগলাই কণ্ঠে বেয়ারাকে চা আনতে হুকুম দিলুম। কিন্তু উল্টা বুঝলি রাম। চায়ের সঙ্গে সঙ্গে এলেন 'কপোত-কপোতী'। ডাক্তারের মুখে পুরো উদ্বেগ। ঢুকেই নার্ভাস কণ্ঠে দ্রুতগতিতে বলতে লাগলেন, 'আপনার কি হয়েছে? শরীর খারাপ? জ্বর? ব্যথাট্যথা?' শহ্‌র্‌-ইয়ার খাটের পৈথানে কাঠের বাজু ধরে শুধু তাকিয়ে আছে। তার মুখে উদ্বেগের কোনো চিহ্ন নেই।

আমি ভালো করে কিছু বলার পূর্বেই ডাক্তার খাটের বাজুতে বসে আমার হাতখানা আপন হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'আমি প্রথম দিনই স্থির করেছিলুম, সুযোগমত আপনার শরীরটা একটু দেখে নেব। এইবেলা সেটা করা যাক। আজ রববার, বেশ আহিস্তা আহিস্তা রফ্‌তা রফ্‌তা।'

আমি দ্রুতগতিতে বোঝাতে চেষ্টা করলুম, আমার স্বাস্থ্যটা পুরুষ্টু পাঁঠার মত, হজম করতে পারি ভেজালতম তেল, নিদ্রা ভিলেজ ইডিয়টের চেয়েও গভীরতর—ভুল বললুম, বলা উচিত ছিল রোঁদের পুলিশের চেয়েও। ডাক্তার কোনো প্রকারের আপত্তি না জানিয়ে, প্রশান্ত নিঃশব্দ হাসি মারফৎ প্রসন্নতা প্রকাশ করে আমার দেহটি বদখলে এনে তাঁর ইচ্ছামত উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলেন, যেন ঘড়েল ক্যাশিয়ার হাজার টাকার নোটের কোনো না কোনো জালের চিহ্ন খুঁজে বের করবেই করবে—কারণ ইতিমধ্যে, স্বামীর আদেশ হওয়ার পূর্বেই শহ্‌র্‌-ইয়ার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ব্লাডপ্রেশারের যন্ত্র, স্টিতস্কোপ এবং আরো কিছু আমার অচেনা যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার একাধিকবার বললেন, 'আমি ডাক্তারী ভুলে গিয়েছি

সে কথা তো আপনাকে বলেছি। এটা নিছক, প্রাথমিক আনাড়ি পরীক্ষা। পরে আমার এক বন্ধু এসে পাকা ভাবে দেখে যাবেন।'

আমি বললুম, 'আমি কি হিন্দুসমাজের অরক্ষণীয়া যে আমাকে কাঁচা দেখা পাকা দেখা সব জুলুমই সইতে হবে?'

ডাক্তার খুশী মুখে বললেন, 'ভালোই হল, ঐ কনে-দেখার কথাটা উঠলো। আপনার কাছে আমার একটা সবিনয় আরজ আছে। কিন্তু আপনার যদি কণামাত্র আপত্তি থাকে তবে আপনি দয়া করে অসঙ্কোচে আপনার অসম্মতি জানিয়ে দেবেন। আমি কথা দিচ্ছি, আমি নিরাশ হব না।'

আমি বললুম, 'অত তকল্লুফ করেন কেন? বলুন না খুলে।'

খোঁড়াদের চলার মত ইনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কথা বললেন। 'মানে, অর্থাৎ, ব্যাপারটা হচ্ছে এই; আমার অতি দূরসম্পর্কের একটি ভাগ্নী আছে। বাপ-মা-নেই—অরক্ষণীয়া বলা যেতে পারে। আপনাদের অঞ্চলে বিয়ের প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা কি পদ্ধতিতে হয় আমার জানা নেই। এ অঞ্চলে কিন্তু কনেপক্ষ কখনোই বিয়ের প্রস্তাব পাঠায় না—সে বড় শরমের কথা। হিন্দুদের মত প্রোফেশনাল ঘটকও আমাদের নেই। তাই চতুর্দিকে আটঘাট বেঁধে কনের মামার ভায়রা-ভাইয়ের ভগ্নীপতি, পারলে তার চেয়েও দূরসম্পর্কের কেউ তার কোনো বন্ধুকে—আত্মীয়কে নয়—বরের ভগ্নীপতির মেসোমশায়ের বেয়াইয়ের কোনো বন্ধুকে যেন ইঙ্গিত দেয় এই বিয়েটা সম্বন্ধে। তার পর স্টেপ বাই স্টেপ সেটা এগোয়। সেগুলো না হয় নাই বললুম। এক্ষেত্রে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। আজ সকালে বরের এক নিকটআত্মীয় এখানে আসছেন—ভদ্রলোক আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত নন—কথাবার্তা আরেকটুখানি পাকাপাকি করার জন্য। আপনি তো জানেন, এসব দুনিয়াদারী বাবদে আমি একটি আস্ত গাধা। তাই আপনি যদি সেখানে—'

আমি বললুম, 'আমি সানন্দে উপস্থিত থেকে আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত, কিন্তু বিপদ কি জানেন, আমি এসব ক্ষেত্রে অত্যন্ত অভিমানী। আলোচনার সময় যদি আমার কখনো মনে হয়, বরপক্ষ আমাদের কনেকে যেন নিতান্ত মেহেরবাণী করে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন কিংবা—থাক্, অর্থাৎ বাংলা কথায়, কনে কিংবা তার আর্থিক অবস্থা অথবা তার বংশমর্যাদা সম্বন্ধে কোনো প্রকারের সামান্যতম কটাক্ষ যদি বরপক্ষ করে তবে লেগে যাবে ফৌজদারী। আমি খুব ভালো করেই জানি, সেক্ষেত্রে আমার সভাস্থল পরিত্যাগ করা উচিত, কারণ আলোচনা চালু রাখার জন্যে তো অন্য মুরুব্বীরাও রয়েছেন, কিন্তু আমি পারি না, আমি ত্রিভুবন অন্ধকার দেখি ও আমার ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে যেন ধুঁয়ো বেরুতে থাকে। অতএব বড়ই প্রয়োজনীয় প্রশ্ন, আলোচনায় আমার যোগদান করাটা কি আপনাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়?'

আমার কথা শুনে দুজনাই এমন হাসি লাগালেন যে তার আর শেষই হয় না। ডাক্তার তাঁর বউকে সঙ্গে সঙ্গে কি যে বলছেন সেটা আমার ঠাহর হল না। পরে শুনলুম বলছেন, 'ঠিক আমার আপন মামুর মত, হুবহু যেন আমার আপন মামু এ কথাগুলো কইলেন! তুমি তাঁকে দেখো নি শহ্‌র্‌-ইয়ার—তিনি চলে যান আমি যখন ম্যাট্রিকে। কী দম্ভ, কী দেমাক ছিল ভদ্রলোকের! কিন্তু ঐ একমাত্র বিয়ের আলাপের সময়। অন্য সময় মাটির মানুষ বললেও কমিয়ে বলা হয়। আর তাঁর দোস্তী ছিল কাদের সঙ্গে, জানো? দুনিয়ার যত মুটেমজুর, গাড়োয়ান বিড়িওলার সঙ্গে। তিনি গত হলে পর আমরা তো বেশ জাঁকজমক করে তাঁর ফাতিহা (শ্রাদ্ধ) করলুম, আর বিশ্বাস করবে না, শহ্‌র্‌-ইয়ার, আরেকটা আলাদা করলো তাঁর টাঙাওলা বিড়িওলা দোস্তরা—দু' পয়সা, চার পয়সা করে চাঁদা তুলে তুলে।'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়ই অত্যন্ত খানদানী ঘরের শরীফ আদমী ছিলেন।'

ডাক্তার বললেন, 'দি বেস্ট না হলেও ওয়ান অব্‌ দি ভেরি বেস্ট্‌ ইন মুর্শিদাবাদ। কিন্তু আপনি আঁচলেন কি করে।'

উচ্চতম স্তরের লোক ভিন্ন অন্য কেউ নিম্নতম স্তরের সঙ্গে মেশবার হিম্মৎ কলিজায় ধরে না।'

ডাক্তার বললেন, 'সে তো বুঝলুম, কিন্তু আপনি, স্যার, কি এখনো ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাস করেন?'

আমি বললুম, 'ঠিক তার উল্টো। আমি বিংশ শতাব্দীও পেরিয়ে গিয়েছি। যে-কোনো প্রকারেই হোক মেয়েকে বিয়ে দিতেই হবে এই মান্ধাতার আমলের কুসংস্কার আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা পরে হবে। ওনরা আসবেন কখন?'

'দেরি নেই, এনি মিনিট।'

'তা হলে তাড়াতাড়ি জেনে নিই। কনের মা'র মহর (স্ত্রীধন) কত ছিল?'

ডাক্তার ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে বললেন, 'তাই-তো। ওদের আবার ফোন নেই যে শুধবো।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার বললে, 'দশ হাজার।'

'সঙ্গে সেকুরিটি হিসেবে জমি-জমা, কলকাতার কোনো স্থাবর সম্পত্তি?'

'না।'

'মুহম্মদী চার শর্ত ছাড়া অন্য কোনো শর্ত ছিল যেটা বর ভাঙলে মেয়ে তালাক চাইতে পারবে।'

'না।'

'কনের কোনো ভাই-বোন আছে?'

'একটি দিদি ছিল। বিয়ের অল্প দিন পরেই মারা যায়।'

'কাবিন্-নামায় (ম্যারেজ কণ্ট্রাক্টে) ওর স্ত্রীধন (মহ্‌র্) কত ছিল ?'

'হাজার পনরো।'

"ওরা কত গয়না দিয়েছিল ?"

'হাজার তিনেকের।'

'আর আমরা ?'

'ঐ হাজার তিনেক। তবে জেহেজের খাটতোশক, ড্রেসিং টেবিল, পেতলের কলসীটলসী নিয়ে হাজার পাঁচেক হবে।'

শহ্‌র্-ইয়ারই সব কটা উত্তর দিলে।

ডাক্তার সত্যই একটা নিষ্কর্মা খোদার খাশী। ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু আমাদের কথাবার্তা শোনে আর তাকানোর ভাব থেকে অতি স্পষ্ট বোঝা যায়, এ সব প্রশ্নোত্তরের তাৎপর্য তার মস্তকে আদৌ প্রবেশ করে নি।

শহ্‌র্-ইয়ারকে শুধালুম, 'বরের বাড়ির মেয়েরা হরেদরে কত স্ত্রীধন পেয়েছে এবং বরেরা আপন আপন দুল্‌হিন্‌কে (কনেকে) কত টাকার গয়নাগাঁটি দিয়েছে সেটা বোধ হয় জানেন না এবং আমাদের সুচতুর ডাক্তারও সে খবর গোপনে গোপনে সংগ্রহ করেন নি। না ?'

আমার অনুমান সত্য।

ডাক্তার মেয়েটি কি কি পাশ দিয়েছে, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারে কিনা এসব খবর দিতে আরম্ভ করেছেন। আমি বললুম, 'ওসব জেনে কি হবে ? তার জোরে স্ত্রীধন বাড়াবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। বরপক্ষ তাদের অন্যান্য ছেলের বিয়েতে কাবিন্-নামায় কনেপক্ষের প্যাঁচের টাইটে কি কি দিয়েছে সেটা জানতে পারলে, বেটার্ স্টিল ওদের দু'চারখানা কাবিন্-নামার কপি যদি গোপনে গোপনে যোগাড় করে রাখতেন তবে সেগুলো হতো আমার এ্যাটম্ বম্। এখন যা অবস্থা, মনে হচ্ছে, গাধা বন্দুকটি পর্যন্ত হাতে নেই।'

প্রাইজ-ইডিয়ট আর কারে কয় ! ডাক্তার বলে কি না, বরপক্ষকে শুধোলেই তো সব জানা যাবে।

আমার কান্না পাবার উপক্রম। বললুম, 'ওরা জলজ্যান্ত মিথ্যে খবর দেবে। আর আমিও কনেপক্ষের সুবিধের জন্যে যে থাণ্ডারিং মিথ্যে বলবো না, সে প্রতিজ্ঞাও করছি নে।'

শহ্‌র্-ইয়ারকে শুধালুম, আপনি আমাদের সঙ্গে বসবেন ?'

'না।'

'এক্‌সেলেণ্ট ! কিন্তু আপনি কোথাও পালাবেন না। কোনো খবরের দরকার হলে আপনার কাছে কোনো অছিলায় চলে আসব।'

'আমি ওঁদের জন্যে খাবার-দাবার তৈরী করার তদারকিতে থাকবো।'

বেয়ারা খবর দিল ওঁরা এসেছেন। ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগতিতে এগিয়ে

গেলেন। আমি পা বাড়াতেই শহর-ইয়ার দুষ্টু মুচকি হাসি হেসে বললে, 'আপনাকে যে কত রূপেই না দেখব! এখন দেখছি ঘটক রূপে। এও এক নব রূপ।' গুনগুন করে গান ধরলো—

তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে

ডাক্তার মহা সাড়ম্বরে বরপক্ষের দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন এবং বললেন, আমি যে কনেপক্ষের হয়ে এই আলোচনায় যোগ দিতে রাজি হয়েছি তার জন্য তিনি এবং তাঁর পরিবার নিজেকে অত্যন্ত গর্বিত অনুভব করছেন। কনেপক্ষের দু'জনও তাঁদের আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং বললেন, আমার নাম তাঁদের গোষ্ঠীতে অজানা নয়।

ডাক্তার বললেন, 'ইনি আছেন বলে আমার আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই যে, আমরা অতি সহজেই সব বিষয়েই একমত হয়ে যেতে পারবো।'

আমি এ-জাতীয় অদৃশ্য সশস্ত্র সংগ্রাম—অজ্ঞজন যাকে বলে বিবাহের শর্তগুলি স্থির করার জন্য বর ও কনে পক্ষের মধ্যে আলোচনা—শেষবারের মত দেখেছি দেশে। তার পর দু'একটি বিয়ে-শাদীতে আনুষ্ঠানিকভাবে পেট ভরে খেয়ে এসেছি—ব্যস্।

আমি সেই ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার শেষ অদৃশ্য সশস্ত্র সংগ্রামে আমার অদৃশ্য তলওয়ারটাতে শান দিতে লাগলুম।

কিন্তু হা কপাল! সব বেকার, সব বরবাদ, সব ভণ্ডুল।

এজাতীয় আলোচনা সব সময়ই আরম্ভ হয় মহর্ বা স্ত্রীধনের পরিমাণ নিয়ে। কনের দিদির স্ত্রীধন পনেরো হাজার ছিল, তারই স্মরণে গুনগুন করলুম, 'কুড়ি হাজার।'

আমি ছিলুম তৈরী যে তাঁরা মৃদু হাস্য করে অতিশয় ভদ্রতা সহকারে দশ হাজার দিয়ে দর-কষাকষি আরম্ভ করবেন। ইয়া আল্লা! কোথায় কি? দু'জনাই অতি প্রসন্ন বদনে সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে নিলেন! আমি তো সাত হাত পানিমেঁ!

মৃদুকণ্ঠে বললুম, 'আপনারা তো সবই জানেন, কনের বাড়ির হালও জানেন; গয়নাগাঁটি আমরা আর কি দেব! আপনারাই বরঞ্চ একটা আন্দাজ দিন!'

ফের ফাটলো বম্-শেল! দু'জনাই সাততাড়াতাড়ি বললেন, 'এ কি বলছেন, সাহেব। না, না, না। আপনারা যা খুশ্ দিলে দেবেন আমাদের পক্ষে সেইটেই গণিমৎ (বৈভব, সৌভাগ্য)।

তার পর ওঁরা নিজের থেকে যা বললেন তা শুনে, বিশেষ করে 'থার্টি ইয়ারস উয়োরের' স্মরণে, আমি আমার কান দুটোকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। ওঁরা কনেকে কি গয়নাগাঁটি দেবেন সে প্রশ্ন ইতিউতি করে আমি শুধোবার পূর্বেই তাঁরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললেন, 'মাফ করবেন, আর আমাদের পক্ষ

থেকে তো বলার কিছুই নেই। আপনারা জানেন দুল্‌হার (বরের) ভাইবোন নেই। কাজেই দুল্‌হিনই শাশুড়ীর সব-কিছু পাবেন এ তো জানা কথা, আর আমরাও সেই কথাই দিচ্ছি। তার দাম—' ভদ্রলোক সঙ্গীকে শুধোলেন, 'কত হবে ভায়া?' সঙ্গী বললেন, 'হালে যাচাই করা হয়েছিল। কুড়ি হাজারের কম না। তিন পুরুষের পুরনো গয়না, নূতন করে গড়াতে হবে।'

'কুড়ি হাজার'—বলে কি! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তড়িঘড়ি বললুম, 'অমন কর্ম্মটি করতে যাবেন না। আল্লার মেহেরবাণীতে ভালোয় ভালোয় আক্‌ৎ-রসুমাৎ (পরিপূর্ণ শাদী) হয়ে যাক তখন না হয় দুল্‌হিন্‌ তাঁর শাশুড়ীর সঙ্গে পরামর্শ করে যা করার করবেন। কি বলেন ডাক্তার? আর আপনারা?'

দুজনেই সানন্দে সায় দিয়ে, একজন বললেন, 'আমার মেয়ে বলছিল, পুরনো ফ্যাশান নাকি আবার হালফ্যাশান হচ্ছে! এখন ভেঙে গড়ালে পরে হয়তো দুল্‌হিনই—' কথাটা তিনি আর শেষ করলেন না।

ইতিমধ্যে নাশ্‌তা আসতে আরম্ভ করেছে। সে আসা আর শেষ হয় না। নাশ্‌তা না বলে এটাকে হক্‌ক-মাফিক ব্যানকুয়েট বলা উচিত। বরপক্ষ ক্রমাগত আমাদের শুনিয়ে একে অন্যকে বলে চলেছেন, 'হবে না কেন? চিরকালই হয়ে আসছে এরকম। এঁয়ার ওয়ালেদের (পিতার) আমলে আমি কতবার খেয়েছি এ রকম। আমার দাদাকে (ঠাকুন্দা) কত শত বার বলতে শুনেছি, এঁয়ার ঠাকুরদ্দার শাদীর দাওয়াৎ! তিন রকমের খানা তাইয়ার হয়েছিল। তিন বাবুর্চীর একজন এসেছিল পাটনা থেকে, অন্যজন দিল্লী থেকে আর তিসরা হায়দ্রাবাদ নিজামের খাস বাবুর্চী-খানা থেকে। আর—' চললো তো চললো—তার যেন শেষ নেই।

নাশ্‌তার বাসন-বর্তন খাওয়াদাওয়ার পর যখন সরিয়ে নেওয়া হল তখন আমি অতিশয় মোলায়েম সুরে বললুম, 'আমার একটি আরজ আছে; যদি অভয় দেন—'

উভয়ে সমস্বরে বললেন, 'আপনি আরজ না, হুকুম্‌ করুন।'

আমি বললুম, 'আমি যা বলতে যাচ্ছি সেটা বোধ হয় আদালতে টেকে না। কুরান শরীফের কানুন মতাবেক যে কোনো মুসলমান চারিটি বীবী একই সময়ে রাখতে পারে। এখন আমরা যদি কাবিন্‌-নামায় দুলহার কাছে শর্ত নিই অর্থাৎ আপনারা যদি মেহেরবাণী করে সে শর্ত কবুল করেন যে তিনি দুল্‌হিনের বিনা অনুমতিতে দুসরী শাদী করবেন না, তবে আইনত সেটা বোধ হয় আলট্রা ভাইরেস্‌। আদালত খুব সম্ভব বলবে, "কুরান শরীফ মুসলিমকে যে হক্‌ক দিয়েছেন, মানুষ একে অন্যের কাছ থেকে শর্ত আদায় করে সে হক্‌ক খর্ব করতে পারে না।" আমি এতক্ষণ ধরে এই সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা করছিলুম।'

কন্যাপক্ষ বললেন, 'আমরা খুশীর সঙ্গে সে শর্ত দেব। সে শর্ত আপনাদের

তরফ থেকে নিতে তো কোনো দোষ নেই। তার মূল্য শেষ পর্যন্ত যদি না থাকে তো নেই। এখন নিতে আপত্তি কি?'

সমস্ত বাক্যালাপটা আমার কাছে অত্যন্ত অবাস্তব ঠেকছিল। কোথায় গেল সেই ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার লড়াই? আলোচনার নামে চিৎকার, রাগারাগি, নাশ্‌তা স্পর্শ না করে বরপক্ষের সভাত্যাগ; এমন কি বিয়ের রাত্রেও—উভয় পক্ষ তদ্দিনে বিয়ের প্রস্তুতির জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করে ফেলেছেন—কাবিন্‌-নামা লেখার সময় সামান্য একটা শর্ত নিয়ে বচসা, তারপর মারামারি, সর্বশেষে বিয়ে ভণ্ডুল করে বরপক্ষ বাড়ি যাবার পথে অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে বিবাহ-পর্ব সমাধান করে মুখরক্ষা করলো—এ ব্যাপারও মাঝে মাঝে হয়েছে।

আর আজ দেখি ঠিক তার উল্টো! আমি যা শর্ত চাই সেটাতেই তাঁরা রাজী! যেন সমস্ত কলকাতা শহরে আর কোনো বিবাহযোগ্যা কুমারী নেই! এই ত্রিশ বছরে দুনিয়াটা কি আগাপাস্তলা বদলে গেল?

এ অবস্থায় আর খাঁই বাড়ানো চামারের আচরণ হবে। শুধু বললুম, 'আর বাকী যেসব ছোটখাটো শর্ত আছে, যেমন আমাদের মেয়ে যদি—আল্লা না করুক—শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে মনোমালিন্য হেতু বাপের বাড়িতে এসে কিছুকাল বা দীর্ঘকাল বাস করে তবে সে শ্বশুরবাড়ি থেকে কত টাকা মাসোহারা পাবে, আপনারা যে স্ত্রীধন দেবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন তার জিম্মাদার কে কে হবেন, এ সবের জন্য আর চিন্তা করতে হবে না। বিয়ের পূর্বে আমাদের উকীলের সঙ্গে আপনাদের উকীল বসে এ-সব ফর্মালিটিগুলো দুরস্ত করে নেবেন। আজ আমি এতই খুশী যে বিনা তর্কে বিনা বাধায় বড় বড় শর্তগুলো সম্বন্ধে একমত হতে পেরেছি যে অন্য আর কোনো ছোট শর্ত স্পর্শ করতে চাই নে।'

সবাই সমস্বরে তখন আমাকে অনুরোধ করলেন আমি যেন আল্লার কাছে শুক্‌রিয়া জানিয়ে একটি মনাজাত (প্রার্থনা) করি। এসব মোল্লাদের (পুরুৎদের) কাজ,—তারা দু'পয়সা পায়ও—এসব আমাদের (অর্থাৎ 'স্মৃতি-রত্নদের') কাজ নয়। তবু অতিশয় প্রসন্ন চিত্তে আল্লাকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনা সমাপ্ত করলুম।

দশ

ডাক্তার বললেন, 'আমার খুব ছেলেবেলায় এ বাড়ির দু'তিনজন অতি বৃদ্ধ মুরুব্বীর কোলে বসে তাঁদের আদর পেয়েছি, আর মনে আছে, আমাকে আদর করতে করতে হঠাৎ তাঁরা কেঁদে ফেলতেন। আমি তখন এই বিরাট বাড়ির বিরাট গোষ্ঠীর একমাত্র সন্তান। আপনি যে-সব প্রশ্ন শুধোলেন, এর অধিকাংশের উত্তর এই মুরুব্বীরা নিশ্চয়ই জানতেন, কিন্তু আমি তখন এতই

অবোধ শিশু যে আমাকে তাঁরা প্রাচীন দিনের কোনো কাহিনীই বলেন নি।'

একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে বললেন, 'কিন্তু এই বৃদ্ধেরা একটা গভীর পরিতৃপ্তি সঙ্গে নিয়েই ওপারে গেছেন। ঐ নিতান্ত শিশুবয়সেই আমি ওঁদের নামাজের সময় তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে, বসে, সজ্‌দা দিয়ে তাঁদের অনুকরণ করতুম, তাঁদের কোলে বসে মসজিদে যেতুম, আর বাড়িতে শিনী বিলোবার সময় সদর দরজায় তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতুম। আমাকে তাঁরা তখন একটা খুব উঁচু কুর্সীতে বসিয়ে জমায়েৎ গরীব-দুঃখী, নায়েব-গোমস্তা সবাইকে বলতেন, ইনিই বাড়ির মালিক; এঁর হুকুমমত চললে আমাদের দোওয়া তোমাদের উপর থাকবে।' আর সবচেয়ে মজার কথা কি জানেন, সৈয়দ সাহেব, আমার আপন ঠাকুন্দার বড় ভাইসাহেব, যিনি তখন বাড়ি চালাতেন, তিনি প্রায় প্রতিদিন আমার পড়ার ঘরে এসে বলতেন, 'ভাইয়া, শোনো। মির্জাপুর (উনি অবশ্য মীরজাফর-ই বলতেন) অঞ্চলে আজ আরেকটা বাড়ি কেনা হলো। ঠিক আছে তো?' কিংবা ঐ ধরনের ব্যবসায় সংক্রান্ত কিছু-একটা। আজ ঐ ছবিটা যখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে তখন হাসি পায়। ঠাকুন্দা খবরটা দেবার সময় ভাবখানা করতেন, যেন তিনি আমার নায়েব, কিছু একটা করে এসে হুজুরের পাকা সম্মতি চাইছেন! এরকম একাধিক ছবি আমার চোখের সামনে এখনো আবছা-আবছা ভাসে।

ছ'মাসের ভিতর তিন ঠাকুন্দাকেই গোরস্তানে রেখে এলুম। আমার তখনকার শিশুমনের অবস্থা আপনাকে বোঝাবার চেষ্টা করবো না।

ঐ যে পুরো একটা উইং জুড়ে রোজ সন্ধ্যায় সাজানো-গোছানো ঘরে আলো জ্বলে তাঁরা ঐখানে বাস করতেন, তাঁদের আপন আপন শ্বশুরবাড়ির কিংবা ঐ ধরনের কিছু কিছু জ্ঞাতি-গোষ্ঠী নিয়ে। বহু বৎসর পরে আমাদের প্রাচীন দিনের নায়েব সাহেব আমাকে বলেন, 'ঐ বুড়া ঠাকুন্দারা তাঁদের মৃত্যুর বছরখানেক আগে কলকাতার অন্যত্র পুষ্যিদের জন্য ভালো ব্যবস্থা করে দেন, ঠাকুন্দারা নাকি চান নি যে তাঁরা এ বাড়িতে পরবর্তীকালে আমার কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করেন।'

আমি শুধালুম, 'এই নায়েব নিশ্চয়ই বৃদ্ধ বয়সে মারা যান। তিনি আপনাকে প্রাচীন দিনের কোনো কাহিনী বলেন নি? পাড়ার আর পাঁচ বুড়ো?'

'কি করে বোঝাই, ডাক্তার সাহেব, বাপ-মা, আমার আপন ঠাকুন্দা নিয়ে চারজন ঠাকুন্দা—আমার আপন ঠাকুন্দা আর পাঁচজন চাচা মারা যান আমার জন্মের পূর্বে—এঁদের সবাইকে হারিয়ে ছ'বছর বয়েস থেকে আমি একা—এই বিশাল বাড়িতে একা। শুধু নায়েব সাহেবের ক্ষুদ্র পরিবার এবং তাঁর এক বিধবা পুত্রবধূ—ইনিই আমাকে মানুষ করেন আপন ছেলের মত করে। কিন্তু আমার এমনই কিস্মৎ, এঁরাও সবাই চলে গেলেন ওপারে—ততদিনে আমি মেডিকেল

কলেজের ফাইনাল ইয়ারে। বাকি রইলেন, শুধু আমার ঐ মা-টি। তাঁকেও হারালুম এমন এক সময় যে আমি রাত্রে হাউ হাউ করে কেঁদেছি। এই মা আমার আত্মগোপন করে শহ্‌র্‌-ইয়ারকে গোপনে দেখে এসে আমাকে বললেন, 'জুল্‌ফিকার, আমি নিজে দুল্‌হিন দেখে তোর বিয়ে ঠিক করে এসেছি। এই-বারে তুই রাজী হলেই আমি পাকা খবর পাঠাই।' আমি জানতুম, ঐ নিঃসন্তান বৃদ্ধার ঐ একটি মাত্র শেষ শখ। তাঁর সঙ্গে আমার কোনো রক্তসম্পর্ক নেই, সুদূরতম আত্মীয়তাও নেই, অথচ তিনি আমাকে দিনে দিনে মানুষ করে তুলেছেন সামান্যতম প্রতিদানের চিন্তা পর্যন্ত না করে,—ঘোর নেমকহারামী হতো এঁর শেষ আশা পূর্ণ না করলে। আর বিয়ে তো করতেই হবে একদিন —বংশরক্ষা করার জন্য, অন্য কোনো কারণ থাক্‌ আর নাইবা থাক্‌। বিয়ে না করলে আমার পিতৃপুরুষ পরলোক থেকে আমাকে অভিসম্পাত দেবেন, এ-কুসংস্কার আমার নেই; কিন্তু তাঁরা যতদিন এ-লোকে ছিলেন ততদিন আমিই, একমাত্র আমিই যে তাঁদের শেষ আশা, আমিই তাঁদের বংশরক্ষা করবো—সে-আশা যে এ বাড়ির বাতাসের সঙ্গে গিয়ে মিশে প্রতি মুহূর্তে আমার প্রতিটি-নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমাকে প্রাণবায়ু দিচ্ছে। এক মুহূর্ত চিন্তা না করে সম্মতি দিলুম।'

আমি শুধালুম, 'ইতিমধ্যে আপনি প্রেমেট্রেমে পড়েন নি? কলকাতার ডাক্তারি শিক্ষাবিভাগ পাছে আমার বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা করে তাই সভয়ে বলছি, অন্যদের তুলনায় প্রেমট্রেম করার সুবিধে আপনাদেরই তো বেশী। আর আপনার চেহারা, ধনদৌলত—'

হেসে বললেন, 'প্রেমট্রেম হয় নি, তবে মাঝে মাঝে যে চিত্তচাঞ্চল্য হয় নি একথা অস্বীকার করলে গুনাহ্‌ হবে। তবে কি জানেন, আমি যে মুসলমান সে-বিষয়ে আমি সচেতন এবং তাই নিয়ে আমার গর্ববোধ আছে। ওদিকে হিন্দুরা নিজেদের মুসলমানের চাইতে শ্রেষ্ঠতর মনে করেন। সেটা নিতান্তই স্বাভাবিক। প্রত্যেক জাতই—একস্‌ট্রীম এবনরমেল কন্ডিশন না হলে—নিজেকে অন্য জাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। অবশ্য এসব বাবদে সম্পূর্ণ উদাসীন মহাজনও কিছু কিছু সব সময়ই পাওয়া যায়। আমার সহপাঠী সহকর্মী প্রায় সবাই হিন্দু, কিছু কিছু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, যে দু'একজন মুসলমান তাঁরা থাকেন হস্টেলে। কয়েকজন হিন্দুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয়—এখনো আছে—এবং তাঁরা অত্যন্ত সজ্জন বলে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মা-বোনদের সঙ্গে আলাপও করিয়ে দেন। সেখানে প্রেম করে হিন্দু পরিবারে বিপর্যয় কাণ্ড বাধাবার কোনো বাসনাই আমার ছিল না—তদুপরি কোনো হিন্দু তরুণী যে আমার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন সেটাও আমার গোচরে আসে নি।'

আমি বললুম, 'অত অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে প্রেম হয় না। তারপর কি

হল, বলুন।'

ডাক্তার বললেন, 'পাক্কা হক্ কথা বলেছেন। আচ্ছা, তবে এখন পুরনো কথায় ফিরে যাই। বিয়ের সম্মতি পেয়ে আমার মা তো আসমানের চাঁদ হাতে পেলেন। বাড়ির লোকজন পাড়াপড়শী সবাইকে বার বার শোনান—যা দিন কাল পড়েছে, আপন গর্ভের সন্তান মায়ের মরার সময় মুখে এক ফোঁটা জল দেয় না। আর আমার জুল্‌ফিকার একবার একটা প্রশ্ন পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলো না, দুল্‌হিন কোথাকার, লেখাপড়ি করেছে কি না, দেখতে কি রকম। বললে, মা, তুমি যখন পছন্দ করেছ, তখন নিশ্চয়ই ভালো হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি দিলে।

তারপর বুড়ির দিনগুলো কাটলো বিয়ের ব্যবস্থা করতে।

আমাদের বিয়ের ঠিক সাতদিন আগে তিনি হার্টফেল করে বিদায় নিলেন।'

ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে থাকার পর বললেন, 'হ্যাঁ, ঐ প্রাচীন যুগের নায়েব সাহেবের কথা হচ্ছিল যিনি যখের মত এ গোষ্ঠীর বিষয়-সম্পত্তি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আগলিয়েছেন। তিনি নিশ্চয়ই অনেক কিছু বলতে পারতেন, কিন্তু বলেন নি, কারণ আমার দিক থেকে তিনি কখনো কণামাত্র কৌতূহল দেখতে পান নি। আর তিনিই বা এসব কথা আমার স্মরণে এনে কি আনন্দ পাবেন? ঠাকুন্দাদের বয়েসী নায়েব সাহেব আমার ঠাকুন্দার বাবাকেও তাঁর ছেলেবেলায় দেখেছেন, তাঁর জন্ম হলে নাকি আকবরী মোহর দিয়ে তিনি তাঁর মুখ দেখেছিলেন। কারণ তাঁর বাপ ছিলেন আমার ঠাকুন্দার ঠাকুন্দার নায়েব। এবং সেই ঠাকুন্দার ঠাকুন্দার আব্বা বানান এই বাড়িটা। তিনি তাঁর ভাই বেরাদর ভাতিজা ভাগিনা, আপন এবং ভাই-ভাতিজাদের শালা-শালাজ জ্ঞাতি-গোষ্ঠী পুষ্যি, মসজিদের ইমাম সায়েব, মোয়াজ্জিন (যে আজান দেয়), পাশের মকতবের গোটা চারেক মৌলবী—মকতবটা বহুকাল উঠে গেছে—বিষয়-আশয় দেখবার দু'পাঁচজন কর্মচারী, ডজনখানেক মাদ্রাসার গরীব ছাত্র নিয়ে এ বাড়িতে থাকতেন। এইটুকু ভাসা-ভাসা ভাবে শুনেছি।

কিন্তু মোদ্দা কথা এই: ঠাকুন্দাদের গোর দেবার সময় আমার অতীত এবং এ-বাড়ির অতীতকেও আমি যেন আমার অজানতে সঙ্গে সঙ্গে গোর দিলুম। বুদ্ধিসুদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার অতীতের প্রতি কৌতূহল, আকর্ষণ দুটোই যেন আরো নিভে যেতে লাগল, বরঞ্চ উল্টে অতীতের প্রতি যেন আমার একটা রোষ জন্মাল। মনে হলো সে আমার প্রতি ভয়ঙ্কর অবিচার করেছে। আমাকেও তো সে অনায়াসে মেরে ফেলতে পারতো। আমি কি তার যক্ষ যে এ বাড়ি ভূতের মত আগলাবো?

আমার মনে হয়, বুড়ো নায়েব এবং পাড়ার পাঁচবুড়ো আমার চোখেমুখে অতীতের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা দেখতে পেতেন এবং তাই স্বেচ্ছায় ঐ পাঁক

ঘ্যাটাতেন না।

আর বলতে গেলে তাঁরা বলবেনই বা কি? সেই ১৮২৫-এর গমগমে বাড়ি কি করে একজনাতে এসে ঠেকলো। একজন একজন করে সক্কলের বংশলোপ পেল—এ ছাড়া আর কি? আপনিই বলুন, সে-সব শুনতে কার ইচ্ছে যায়?

তবে হ্যাঁ, কারো যদি ইচ্ছে যায় পুরো ইতিহাসটা গড়ে তোলবার, তবে সে সেটা করতে পারে—কিন্তু বিস্তর তকলীফ বরদাশ্ত করার পর। নিচের তলায় 'এল্' উইঙের শেষ দুখানা ঘরে আছে, যাকে বলতে পারেন আমাদের পারিবারিক আর্কাইভ অর্থাৎ মহাফেজখানা। ১৭৮০ বা ৯০ খৃষ্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত যেমন যেমন দলীল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্রের আদান-প্রদান, জমা-খরচের হিসেব-নিকেশ, কর্মচারীদের রিপোর্ট, মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাগজ এবং আরো শত রকমের ভিন্ন ভিন্ন কাগজপত্র, টুকিটাকি প্র্যাকটিকাল কারবার-ব্যবসায়ের জন্য বেকার হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো রেখে দেওয়া হয় ঐ দুখানা ঘরে। বেশ যত্নের সঙ্গেই রাখা হয়েছে, এবং পুরুষানুক্রমে নায়েবরাও সেগুলোর যত্ন নেন। শহর্-ইয়ারও মাস তিনেক অন্তর অন্তর সেগুলোর তদারক করে। আমার লজ্জা পাওয়া উচিত, আমার কিন্তু মাষা পরিমাণ দিল্-চস্পী এ-সব কাগজপত্রের প্রতি নেই।'

আমি চুপ করে ভাবলুম এবং ডাক্তারকে মোটেই কোন দোষ দিতে পারলুম না। যে অতীত তাঁর গোষ্ঠীর সব-কিছু নির্মম ভাবে কেড়ে নিয়েছে তাকে আবার যত্নআত্তি করে পুঁথির পাতায় লেখার কি প্রয়োজন? এবং এর সঙ্গে আরেকটা তত্ত্ব বিজড়িত আছে। পরিবারের অতীত ইতিহাস নিয়ে যারা নাড়া-চাড়া করে তাদের বেশীর ভাগই কেমন যেন পূর্ব ইতিহাসের স্মরণে বেশ কিছুটা দম্ভী হয়ে যায়। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের ডাক্তার তো ফকীর, সুফীর বিনয় আচরণ ধরেন, সংসারে থেকে, গৃহীরূপে।

একটু প্র্যাকটিকাল বুদ্ধি দেখিয়ে শুধালুম, 'এই যে শূন্য অন্ধকার একতলা, দোতলার একটা পুরো উইং, তেতলা—এগুলোর একটা ব্যবস্থা করেন না কেন?'

'কি ব্যবস্থা? ভাড়া দেওয়া ছাড়া আর গতি কি? কলকাতায় আমার যে-সব বাড়ি ভাড়ায় খাটছে তার আমদানীই আমাদের দু'জনার পক্ষে যথেষ্টেরও ঢের ঢের বেশী। পরিবার যে অনতিবিলম্বে বৃহত্তর হবে তার সম্ভাবনাও তো দেখছি নে।'

এর পর ডাক্তার কি বলেছিলেন সেটা আমি সম্পূর্ণ মিস করলুম, কারণ আমার মনে তখন অদম্য ইচ্ছা যে তাঁকে শুধোই: দশ বছর হলো তাঁদের বিয়ে হয়েছে, এখনো কোনো বংশধর না আসার কারণ কি? তিনি স্বয়ং ডাক্তার, তিনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিতে পারেন, প্রয়োজন হলে বিদেশে

যেতে পারেন, কিন্তু ইচ্ছেটা অতি কষ্টে দমন করলুম। আমি ভীরু; যদি কোনো অপ্রিয় সংবাদ শুনতে হয়।

আবার কান পেতে শুনলুম, বলছেন, 'অতি বিশ্বস্ত আমাদেরই প্রাচীন নায়েব বংশের ছেলে এখন নায়েব আছেন, কর্মচারীরাও বিশ্বস্ত, তবু আমার জান পানি পানি। নায়েবকে আমি সর্ব ডিসিশন নেবার ভার কমপক্ষে সাতান্নবার বলেছি, বিরক্ত হয়ে কাগজ লিখে ডাকে তার বাড়িতে পাঠিয়েছি। কোনো ফল হয় নি। সে কাজ করে যায় তার আববার কাছ থেকে ঐতিহ্যগত যে পদ্ধতিতে কাজ শিখেছে। দুদিন অন্তর অন্তর এ-বাড়িতে এসে সভয় নয়নে উঁকিঝুঁকি মারে—হুজুরকে কখন বিরক্ত না করে দুটো ডিশিসন ফাইনেলাইজ করে নেওয়া যায়। এই উঁকিঝুঁকিটা আমাকে বিরক্ত করে আরো বেশী। আমি কি বাঘ, তাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলব! যদ্দিন তার বাপ বেঁচেছিলেন, আমি ছিলুম সুখে। সপ্তাহে একদিন এসে দশ মিনিট ধরে গড়গড় করে যা কিছু করেছেন সেগুলো বলে নিয়ে শুধোতেন, "ঠিক আছে তো, মিয়া?" অনেকটা আমার সেই ঠাকুন্দার রিপোর্ট দেওয়ার মত। অবশ্য প্রায় দুটি বচ্ছর সর্ব আপত্তি, প্রতিবাদ, চিৎকার সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, বলতে গেলে প্রায় আমার কানে ধরে সব কটা বাড়ি বার বার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখিয়েছেন, সব কাজ শিখিয়েছেন। ঐ সব বাড়ি আর তাদের ভাড়াটে আমার জন্য দুনিয়ার দোজখ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

এখন যদি একতলা আর তিনতলাটা ভাড়া দি তবে সেটা খাল কেটে ঘরে কুমির আনা নয়, সেটা হবে ক্লাইভ এনে ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপনা করা। সিরাজ্-উদ্দৌলার মত আমার মুণ্ডুটি যাওয়াও বিচিত্র নয়।

অন্য কোনো ব্যবস্থার কথা যে একেবারেই ভাবি নি তা নয়, কিন্তু আমার সময় কোথায়?'

এগারো

আল্লাতালা যাকে খুশী তোলেন, যাকে খুশী নামান—এ সত্যটি পাপীতাপী আমরা প্রায়ই ভুলে যাই।

ডাক্তারের ভাগ্নীর বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে। তার অবতরণিকায় যে কৃতিত্ব সব-কিছু দুরুস্ত-সহী করেছিলুম তাই নিয়ে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ—এমন কি দম্ভ বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না—অনুভব করছিলুম। অবশ্য বরপক্ষ যদি একটুখানি লড়াই দিত তা হলে তাদের ঘায়েল করে কৃতিত্ব ও আত্মপ্রসাদ হতো পরিতৃপ্তি ভরা। তা ওরা যদি লড়াই না দেয়, তবে আমি তো আর ডন্‌কুইসটের মত উইণ্ডমিল আক্রমণ করতে পারি নে!

কিন্তু শুয়ে শুয়ে সব-কিছু বিচার-বিবেচনা করার পরও যে সুখ পাচ্ছিলুম, সেটা অস্বীকার করবো না।

এমন সময় মুচকি মুচকি হেসে শহ্‌র্‌-ইয়ার খাটের পৈথানে দাঁড়াল।

বিজয়ী সেনাপতি যে রকম পদাতিকের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, আমিও ঠিক তেমনি শহ্‌র্‌-ইয়ারকে যেন মেহেরবাণী মন্‌জুর করে বললুম, 'বসতে পারেন।'

তারপরই ফাটলো আমার ঢাউস বেলুনটা!

শহ্‌র্‌-ইয়ার হাসিমুখে বললে, 'বলুন তো, আমরা কতবার আলোচনা করেছি—মুসলমান মেয়েদের পর্দার আড়াল থেকে বেরনো নিয়ে। পাল্লায় তুলেছি একদিকে সুবিধেগুলো, অন্যদিকে অসুবিধাগুলো এবং যেহেতু আমরা উভয়ই শেষরত্তিতক্‌ ইমানদার সদাগর তাই কখনো আপনি বাটখারার পর বাটখারা চাপিয়ে গেছেন একদিকে আমি আর অন্য পাল্লায় চাপিয়ে গেছি মালের পর মাল। তারপর হয়তো আপনি চাপিয়েছেন মাল আর আমি বাটখারা। তার অর্থ, আমাদের আলোচনার স্বপক্ষে বিপক্ষে যা যা যুক্তি আমরা বের করেছি কেউ কোনোটা লুকিয়ে রাখি নি। নয় কি?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়ই। এ নিয়ে তো আমরা কেউ কোনো প্রকারের সন্দেহ এযাবৎ প্রকাশ করি নি। আপনার মনে কি কোনো সন্দেহের উদয় হচ্ছে!'

শহ্‌র্‌-ইয়ার জিভ কেটে বললে, 'উপরে আল্লা; সন্দেহের অবকাশ নেই।

আমি শুধু এসেছিলুম আরেকটি অতি সদ্য আবিষ্কৃত যুক্তি নিয়ে যেটা মুসলমান মেয়েদের অন্দর-ত্যাগের স্বপক্ষে যায়। আপনি তো সেদিন আমাদের ভাগ্নীর জন্য অবিশ্বাস্য অঙ্কের স্ত্রীধন, প্রচুর গয়না, এমন কি শেষ পর্যন্ত আইনে টেকে কি না টেকে এমন একটি শর্তও ভাগ্নীর সুবিধার জন্য আপনার সুললিত রসনা সঞ্চারণ করে বিস্তর দৌলত জয় করে, রূপকার্থে বলছি, লোহার সিন্দুকে তুলে রাখলেন। আপনার ডাক্তার সে কেরদানী দেখে অচৈতন্য। পাছে আপনার ন্যাজ মোটা হয় তাই তাঁর সবিস্তর প্রশস্তিগীতি আর গাইবো না। তবে একটি বাক্য আপনাকে শোনাই। তিনি বললেন, "এরকম মধুর, ললিত বিদগ্ধ ভাষা ব্যবহার করে মানুষ যে নিষ্ঠুর কাবুলীওলার মত তার প্রাপ্যের অগুনতি গুণ বেশী চাইতে পারে—এ আমি স্বকর্ণে না শুনলে কক্‌খনো বিশ্বাস করতুম না।" তা সে যাক্‌। এইবারে আসল তত্ত্বটি অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন।

আমাদের ভাগ্নী তো তার প্রাচীনপন্থী চাচার সঙ্গে ঝগড়া-কাজিয়া করে যেতে আরম্ভ করলো কলেজে—অবশ্যই 'কালো তাঁবু' নামক বোরকা সর্বাঙ্গে লেপ্টে নয়। মেয়েটি যে বেহেশ্‌তের হুরীর মত খাপসুরত, তা নয়—তবে সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী আর চলাফেরায়, কথাবার্তা বলায় হায়া-শরম আছে। লেখাপড়ায়

খুব ভালো, প্লেস পাবার সম্ভাবনাও কিছুটা আছে, এবং গোঁড়া চাচাটিকে না জানিয়ে হিন্দু বান্ধবীদের বাড়িতে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল ইসলাম ও অতুলপ্রসাদের গানও বেশ খানিকটে আয়ত্ত করে ফেলল। গলাটি মিষ্টি, তাই গানের ভুলচুক-গুলো ওরই তলায় চাপা পড়ে যায়। চাচাটি অবশ্য এসব কীর্তিকলাপের কিছুই জানেন না, শুধু মাঝে মাঝে দেরিতে বাড়ি ফিরলে একটুআধটু চোটপাট করেন। তাও খুব বেশী না, কারণ তিনি কখনো কলেজে পড়েন নি, তদুপরি কুনো মানুষ—তাই কলেজের কায়দা-কেতা, এমনিতে কখন কলেজ ছুটি হয়, ফানক্শন থাকলেই বা কখন, সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ বে-খবর।

কিন্তু বাদবাকি দুনিয়াটা তো আর বেখেয়াল নয়। একটি এম. এ. ক্লাসের ছেলে তাকে লক্ষ্য করছিল বছর দুই ধরে। কারণ ভাগ্নীটি যে-বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে গান শিখত ছেলেটি থাকে তার সামনের বাড়িতেই। প্রথমে মুগ্ধ হয়েছিল ভাগ্নীর মিষ্টি গলাটি শুনে, তারপর সামান্য অনুসন্ধান করে তার সম্বন্ধে বাদবাকি খবর যোগাড় করলো। বিবেচনা করি ছোকরা আকাশ-ছোঁয়া লম্ফ মেরেছিল যখন জানতে পারলো মেয়েটি তারই মত মুসলমান। ইতিমধ্যে সে আবার এম. এ. পাশ করে কোন্ একটা কলেজের লেকচারার হয়ে গিয়েছে। তাকে তখন ঠেকায় কে?

ভাগ্নীর নামঠিকানা, তার সম্বন্ধে যাবতীয় বৃত্তান্ত তার চাচাতো ভাবীকে বয়ান করে বললে, বিয়ের প্রস্তাব পাঠাও—অবশ্য সোজাসুজি না, কনেপক্ষের এক দূর আত্মীয়ের কাছে। আলাপচারী বেশ খানিকটে এগিয়ে যাওয়ার পর স্থির হল, অমুক দিন বরপক্ষ থেকে অমুক অমুক মুরুব্বী মহরু ইত্যাদি স্থির করবার জন্য আমাদের বাড়িতে আসবেন। ইতিমধ্যে অবশ্য ভাগ্নীর চাচা খবর নিয়ে জেনেছেন ছেলেটি সত্যই অত্যুত্তম দুলহার পর্যায়ে পড়ে।

আমাদের এখানে এসে আলোচনা করার আগের দিন সেই দুই ভদ্র-লোক—যাঁদের সঙ্গে পরে আপনি কথাবার্তা কইলেন—দুলহার বাপ-মা এবং অতিশয় অন্তরঙ্গ আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বসে আলোচনা করে জেনে নিলেন, মহরু গয়নাগাঁটি, ফালতো শর্ত যদি আমরা চাই ইত্যাদি তাবৎ আইটেমে তাঁরা কতখানি মেকসিমামে উঠতে পারেন। এবং আকছারই এ-সব ক্ষেত্রে যা হয় তার ব্যত্যয়ও হলো না। রাত দুটো না তিনটে অবধি দফে দফে আলোচনা করার সময় বিস্তর মতভেদ, প্রচুর তর্কাতর্কি ততোধিক মনোমালিন্য হলো। দুলহার চাচার অনেকগুলো ছেলে। তাঁর বক্তব্য—এবং সে-বক্তব্য অতিশয় যুক্তিসঙ্গত—যে, তোমরা যদি আজ দরাজদিলে, মুক্তহস্তে বরপক্ষের দাবীদাওয়া মেনে নাও তবে আমার ছেলেগুলোর বিয়েতেও দুলহীন পক্ষ এই বিয়ের নজির দেখিয়ে এরই অনুপাতে দাবী করে বসবে প্রচণ্ড মহরু অষ্ট-অলঙ্কারের বদলে অষ্টগণ্ডা এবং খুদায় মালুম আর কি কি। অতএব সর্ববাবদে

ম্যাক্‌সিমামটা আরো নিচে নামাও, কলকাতায় দুল্‌হিনের অভাব নেই, তাঁরই পরিচিতদের ভিতরে এন্তার ডানা-কাটা হুরীপরী রয়েছে।

সবাই তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন; তাঁর ভয় সম্পূর্ণ অমূলক। অর্থনৈতিক চাপেই হোক বা সামাজিক যে কোনো কারণেই হোক, এখন মুসলমান মেয়ের অবস্থা প্রায় হিন্দু মেয়েরই মত। তাদেরই মত এখন বরপক্ষই জোরদার পক্ষ। দুল্‌হার চাচা তাঁর এতগুলো ছেলে নিয়ে তো রীতিমত ম্যারেজ-মার্কেট কর্ণার করবেন—এবং ঐ ধরনের আরো কত কী।

তা সে যা-ই হোক, রাত প্রায় দুটো না তিনটের সময় রফারফি হয়ে দফে দফে ম্যাকসিমামগুলো পিন্‌ ডাউন্‌ করা হলো।

এ সভাতে দুল্‌হার থাকার কথা নয়। সে ছিলও না। কিন্তু সামনের ঘরে তার চাচাতো ভাবীর সঙ্গে বসে আলোচনার প্রত্যেকটি শব্দ বুঝতে তার কোনো অসুবিধা হয় নি। সে গুম্‌ হয়ে বসে রইল।

পরদিন অতি ভোরে ভাবীর মারফৎ সে তার আব্বাকে খবর পাঠালে, দুল্‌হিন্‌ পক্ষের সব দাবীদাওয়া যেন তাঁদের চাহিদা-মাফিক মেনে নেওয়া হয়। দুল্‌হা পক্ষের দর-কষাকষির দরুন যদি শাদী ভেস্তে যায় তবে সে স্কলারশিপ নিয়ে নাকবরাবর বিলেত চলে যাবে এবং কস্মিনকালেও এদেশে ফিরবে না। পক্ষান্তরে শাদী যদি হয়ে যায় তবে সে চাচাতো ভাইদের পরিবারের পছন্দমত জায়গায় তাদের শাদীর জিম্মাদারী এইবেলাই আপন স্কন্ধে নিচ্ছে।

প্রথমটায় তো লেগে গেল হৈহৈ রৈরৈ। কিন্তু বাপ-মা জানতেন, ছেলেটা ভয়ংকর একগুঁয়ে এবং চাচাও জানতেন তার কথার নড়চড় হয় না। ভাইদের বিয়ে সম্বন্ধে যে প্রতিজ্ঞা করেছে সেটা রাখবেই। অতএব শেষটায় সেই দুই ভদ্রলোককে সর্বাবাবদে আকাশে-ছোঁয়া ম্যাকসিমামের সর্ব এখতেয়ার দেওয়া হল।

অবশ্য আপনার কেরদানি কিছু কম নয়।

আমি চটে গিয়ে বললুম, 'ব্যস্‌, ব্যস্‌ হয়েছে।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার আমার কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'আহা! আপনি কেন বিরক্ত হচ্ছেন? আপনি না থাকলে আপনার ডাক্তার সাহস করে পাঁচ হাজারেরও মহ্‌র্‌ চাইতে পারতেন না। আর বরপক্ষ যে সুবোধ বালকদ্বয়ের ন্যায় আপনার সব তলব মেনে নেবে, এ তত্ত্বটা না জেনেই তো আপনি কনের জন্য বেস্ট্‌ টার্মস গুছিয়ে নিলেন। আচ্ছা, আমি কি বলি আর কি কই সে আপনি বাদ দিয়ে শুধু এইটুকু শুনে রাখুন; ডাক্তারের ভাগ্নীবাড়িতে আপনার খ্যাতি রটেছে যে আপনি এমনই ত্রিকালজ্ঞ পীরসাহেব যে বরপক্ষের উপর এক ঝলক চোখ বোলাতে না বোলাতেই সাফসুৎরো অতিশয় পরিপাটিরূপে মালুম করে নিয়েছিলেন যে ওঁরা আপনার তলব মাত্র আপনার খেদমতে পেশ করার

জন্য সঙ্গে ফ্লাস্কে করে বাঘের দুধ নিয়ে এসেছিল।'

বললুম, আপ্যায়িত হলুম এবং আজ সন্ধ্যের গাড়িতেই আমি বোলপুর চললুম।'

শহ্‌রু-ইয়ার সেদিকে খেয়াল না দিয়ে বললে, 'কিন্তু আসল কথাটা যে এখনো বলা হয় নি। আমি কোন্ কথা দিয়ে আমার বয়ান আরম্ভ করেছিলুম মনে আছে?—মুসলমান মেয়ে অন্দরমহল ত্যাগ করলে তার সুবিধে-অসুবিধের কথা। এইবারে দেখুন, ডাক্তার সাহেবের ভাগ্নী যদি জনানা ত্যাগ করে কলেজ যাওয়া আরম্ভ না করতো তবে কি এরকম একটি উৎকৃষ্ট বরের নজরে পড়তো, এবং এরকম সসম্মানে তার বিয়ের ব্যবস্থা হতে পারতো? ও যদি ম্যাট্রিকের পর চাচার সঙ্গে ফসাদ করে না বেরিয়ে পড়ে অন্দরমহলে বসে বসে দিন কাটাতো তবে কি তার চাচা মাথা খুঁড়েও এ-রকম একটি বর জোটাতে পারতেন?'

আমি বললুম, 'গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে সেই কবে যে আমার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছে সেটা স্মরণেই আসছে না। এদিকে আবার কলকাতা আর রাঢ়ের মুসলমানদের সঙ্গেও যোগাযোগ হয় নি। তাই জানতে ইচ্ছা করে, আপনাদের ভিতরও মেয়ের জন্য বর যোগাড় করা কি একটা সামাজিক সমস্যা হয়ে উঠেছে?'

আমাদের আত্মীয়স্বজন তো নেই বললেই হয়; তবু যেটুকু খবর কানে আসে তার থেকে মনে হয়, কলকাতার মুসলমান সমাজের প্যাটার্ন ক্রমেই হিন্দু প্যাটার্নের কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। অর্থাৎ মুসলমান যুবকও চায়, তার স্ত্রী যেন শিক্ষিতা হয়, গানটান জানলে তো আরো ভালো, এবং সে নিজে যদি লেখা-পড়ার নাম করে থাকে তবে হয়তো মনে মনে এ-আশাও পোষণ করে যে শ্বশুর তাকে বিলেত পাঠাবে। তবে যতদূর জানি, এদের খাঁইগুলো এখনো রূঢ় কর্কশরূপে সমাজে প্রকাশ করা হয় না।'

আমি বললুম, 'সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে হিন্দু সমাজ ও তার প্যাটার্ন বদলে বদলে আমাদের কাছে চলে আসছে। আমার ছেলেবেলায় হিন্দুর পণপ্রথা যতখানি নির্দয় ছিল আজ তো নিশ্চয়ই ততখানি নয়। আর 'লভ্ ম্যারেজের' সংখ্যা যতই বাড়বে, পণপ্রথা ততই বাতিল হতে থাকবে।'

শহ্‌রু-ইয়ার বললে, 'আমার কিন্তু ভারি কৌতূহল হয়, এই যে হিন্দুরা ডিভোর্স, মনোগেমি, বাপের সম্পত্তিতে মেয়ের অধিকার এসব আইন চালু করলো তার ফল আখেরে হিন্দু সমাজকে কি ভাবে পরিবর্তন করবে?

'গ্রামাঞ্চলে কিছুই হবে না। মনোগেমি ছাড়া আর দুটো আইন তো মুসলমানদের ছিলই। তবু আমাদের সমাজে ডিভোর্স হতো ক'টা? বাপের সম্পত্তির হিস্যে নিয়ে ক'টা মেয়ে ভাইদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা লড়েছে? আর মনোগেমি আইন না থাকা সত্ত্বেও বাঙলা দেশের ক'টা মুসলমান ভদ্রলোক দুটো বউ পুষেছে? হিন্দুদের বিধবা-বিবাহ আইনসম্মত হয়েছে প্রায় একশ বছর

আগে। ভদ্র হিন্দু সমাজে তার ফলে প্রতি বৎসর ক'টা বিধবা-বিবাহ হয়? না, দিদি, এদেশের অদৃশ্য, অলিখিত আইন—মেয়েরা যেন মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে। তা সে মুসলমানই হোক, আর হিন্দুই হোক।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'বোধ হয় আপনার কথাই ঠিক।'

আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলুম, 'কিন্তু যা বললুম, তার সঙ্গে আমার আরেকটা কথা যোগ না দিলে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেটা সোজা বাঙলায় এই, বলি তো অনেক কথা, কিন্তু যখনই চিন্তা করি তখনই দেখি, আমাদের সমাজ যে কোন্ দিকে চলেছে তার কোনো কিছুই অনুমান করতে পারছি না।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার আমার সর্বশেষ মন্তব্যটি বোধ হয় শুনতে পায় নি; দেখি, দৃষ্টি যেন দেয়ালের ভিতর দিয়ে দূর-দূরান্তর চলে গিয়েছে। হঠাৎ বললে, 'এদেশের মেয়েরা আপন পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে সামান্যতম প্রতিবাদ জানাবে কি করে? তার জন্য তো আপনার ঐ শ্রীরাধাই দায়ী। বৈষ্ণব কবিরাই তো তাঁকে শত শত গানে সহিষ্ণুতার সাক্ষাৎ মূর্তিমতী প্রতিমারূপে নির্মাণ করে তুলেছেন। কৃষ্ণ তাঁর প্রতি যে অবিচার করে চলে গেলেন তাই নিয়ে তাঁর রোদনক্রন্দন হাহাকার আছে শত শত গানে, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিংবা বিদ্রোহ, অভিসম্পাত না হয় বাদই দিলুম, আছে কি কোনোখানে? উল্টে তিনি তো বসে রইলেন গালে হাত দিয়ে ঠাকুরের প্রতীক্ষায়। যদি তিনি কোনোদিন ফিরে আসেন! এই শ্রীরাধাই তো হলেন আমাদের হিন্দু প্রতিবেশিনীর আদর্শ!'

শহ্‌র্‌-ইয়ার গরম। অবশ্য মাত্রাধিক নয়।

আমি বললুম, 'সুন্দরী, আপনি এখন যা বললেন তার উত্তরে আমাকে একখানা পূর্ণাঙ্গ থীসিস ঝাড়তে হয়। অতিশয় সংক্ষেপে উত্তর দি।

ইসলাম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আরবদের অন্ধকার যুগে—জাহিলীয়ায়—অতি উচ্চাঙ্গের কাব্য রচিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, সে কাব্যে ইসলামের একেশ্বরবাদ তো নেইই, যা আছে সে-সব জিনিস কেউ বিশ্বাস করলে তাকে আর মুসলমান বলে গণ্য করা যাবে না, অথচ এসব কাব্য পড়েন শিক্ষিত আরব মাত্রই—তা সে তিনি ধার্মিক মৌলানাই হোন, আর সাদামাটা কাব্য-রসিকই হোন—কিন্তু বিশুদ্ধ কাব্যরূপে, অতি অবশ্যই তার থেকে ধর্মানুপ্রেরণা পাবার জন্য নয়। তাই আমার তাজ্জব লাগে, যখন এদেশের গোঁড়ারা আপত্তি তোলেন কোনো মুসলমান বালক বাঙলা সাহিত্যের গভীরে প্রবেশ করার জন্য রামায়ণ, মহাভারত, পদাবলী, মঙ্গলকাব্য পড়লে। মধ্যযুগের একাধিক মুসলিম কবি বাণী-বন্দনা দিয়ে তাঁদের কাব্য রচনার গোড়াপত্তন করেছেন। অথচ কাব্যের গভীরে

প্রবেশ করলেই দেখা যায়, এঁদের প্রায় সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামের মূল সরল নীতি বাঙলার মাধ্যমে প্রচার করা। আরেকটা উদাহরণ নিন। পরধর্ম বাবদে খৃষ্টান মিশনারিরা যে অত্যধিক সহিষ্ণু এ-কথা তাঁদের পরম শত্রুরাও বলবে না। অথচ এঁদের অধিকাংশই গ্রীক শেখার সময়—ঐ ভাষাটি না শিখে নিউ টেস্টামেণ্ট মূলে পড়ার উপায় নেই—বিস্তর দেবদেবীতে ভর্তি প্রাক-খৃষ্ট গ্রীকসাহিত্য গভীরতম শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়েন। হাতের কাছের আর একটা উদাহরণ নিন। ইরাণে ইসলাম আগমনের পূর্বে যেসব রাজা, বীর, প্রেমিক-প্রেমিকার কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত ছিল, সেগুলো নিয়ে মুসলমান ফিরদৌসী লিখলেন তাঁর মহাকাব্য 'শাহনামা'—সে কাব্য পড়েন না কোন্ মৌলানা?

আপনি হয়তো বলবেন, পদাবলী সাহিত্য বৈষ্ণব ধর্মের অঙ্গবিশেষ; অতএব সে সাহিত্য থেকে হিন্দু তার জীবনাদর্শ গ্রহণ করেন। উত্তম প্রস্তাব। আপনি ভাবছেন বাঙলার হিন্দু রমণী শ্রীরাধার কাছ থেকে তার সহিষ্ণুতা শিখেছে। কিন্তু কই, সে তো তারই অনুকরণে আপন স্বামী ত্যাগ করে অন্য পুরুষে হৃদয় দান করে না। এদেশের কোনো মেয়েরই প্রশংসা করতে হলে আমরা সর্বপ্রথমই বলি, আহা, কী সতীলক্ষ্মী মেয়েটি!'

অবশ্য এর সঙ্গে আরেকটি তত্ত্ব যোগ না করলে সম্পূর্ণ সত্য বলা হয় না।

রাধাকৃষ্ণের প্রেম অনেকেই রূপক রূপে গ্রহণ করেন। রাধা মানবাত্মার প্রতীক। কৃষ্ণ পরমাত্মার। কৃষ্ণমিলনের জন্য রাধার হাহাকার আর পরমাত্মার কামনায় মানবাত্মার হাহাকার একই ক্রন্দন।

সূফীদের ভিতরেও ঐ জিনিসটি আছে। আপনি পাঁচজন মৌলানাকে জিজ্ঞেস করলে তার অন্তত চারজন বলবেন, হাফিজ যেখানে মদ্যপানের উল্লেখ করছেন সে মদ্য মদ্য নয়। সে মদ্য আল্লার প্রতি মহব্বৎ—ভগবদ্প্রেম। যে সাকী মদ্য বিতরণ করেন তিনি মুর্শীদ অর্থাৎ গুরু। তিনি শিষ্যকে মদ্যপানে আসক্ত করান—গূঢ়ার্থে আল্লার প্রেমে অচৈতন্য হতে, সেই চরম সত্তা পরমাত্মায় আপনা সত্তা সম্পূর্ণ বিলীন করে দিতে শিক্ষা দেন।

পার্থিব প্রেমকে আধ্যাত্মিক প্রেমের স্তরে নিয়ে যাবার জন্য খৃষ্টান এবং ইহুদি মিস্টিক—রহস্যবাদী—ভক্তও ঐ প্রতীকের শরণাপন্ন হন।

কিন্তু আপনি আমি—আমরা সাধারণ মানুষ। আমরা কাব্য পড়ি কাব্য-রসের জন্য। আর কোনোদিন যদি আপনার ধর্মানুরাগ নিবিড়তর হয় তবে আপনার ভাবনা কি? আপনার ঘরেই তো দেখলুম ইমাম গজ্জালীর 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' বাঙলা অনুবাদে।'

বারো

পরিপূর্ণ সুখশান্তির উপর অকস্মাৎ কী ভাবে বজ্রপাত হয়—এই আমার বিকটতম অভিজ্ঞতা।

ইতিমধ্যে আমি অভিমন্যুকে হার মানিয়ে, শহ্‌র্‌-ইয়ার ও ডাক্তার নির্মিত চক্রব্যূহ ভেদ করে মোকামে ফিরে এসেছি।

আবার সেই খাড়াবড়ি-উচ্ছেতে যখন অধরোষ্ঠ পরিপূর্ণ বিতিক্ত তখন হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলুম, ডাক্তার পরিবার আমাকে যেন 'কট্‌' করেছে। আমি পর পর দু'খানা চিঠি লিখলুম শহ্‌র্‌-ইয়ারকে। কোনো উত্তর পেলুম না। এ যে নিদারুণ অবিশ্বাস্য! তখন লিখলুম ডাক্তারকে। অবিশ্বাস্যের তারতম্য হয়? হয়। এ যেন আরো অবিশ্বাস্য! এ যেন সেই প্রাচীন যুগের টেলিফোনে 'নো রিপ্লাই মিস্‌?'

আমি কি হীন, নীচ! যাক্‌ গে চুলোয়। বলে যেই বারান্দায় বেড়িয়েছি, দেখি, দূর থেকে মাঠ ঠেঙ্গিয়ে আসছে ডাক্তার। আর তাকে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে যাচ্ছে আমার আলসেশিয়ান 'মাস্টার' তার রিজার্ভ স্পীডও ছেড়ে দিয়ে।

আমি বারান্দা ছেড়ে যেই রোদ্দুরে নামতে যাচ্ছি এমন সময় লক্ষ্য করলুম, দূর থেকে ডাক্তার হাত নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করছে, আমি যেন অযথা এই কড়া রোদ্দুরে না নামি।

ডাক্তার পৌঁছল। লগেজ দূরের কথা, হাতে একটি এটাচি পর্যন্ত নেই।

এ-বাড়ির কর্তা দিলবরজান—কুক্‌-শেফ্‌-মেজরডমো—দুই মিনিটের ভিতর বালতি করে জল সাবান গামছা ধুঁদুল ডাক্তারের পায়ের কাছে রাখলো। ডাক্তার তার আপন-জন। মনে নেই, কখন কোন্‌ বারে সে দিলবরের কোন্‌ এক মাসীকে বাঁচিয়ে দ্যায়!

ডাক্তারের চুল উস্কোখুস্কো। হাত দুটো অল্প অল্প কাঁপছে। কপালে ঘামের ফোঁটা।

শুধু দেহের দিক দিয়ে, এ ধরনের অপ্রমত্ত, শান্তসমাহিতচিত্ত লোকও যে রাতারাতি হঠাৎ মৃগী রুগীর মত চেহারা ধারণ করতে পারে, এ যেন সুফী-সাধুর অকস্মাৎ মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা পেয়ে নীরব আর্তনাদ!

আমি এমনই হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম যে তাঁকে কুশল প্রশ্নও শুধোতে পারলুম না। কিংবা হয়তো আমার মগ্নচৈতন্য তার অতল থেকে কোনো প্রকারে প্রতিক্রিয়া আমার চৈতন্যলোকে পাঠাতে সম্মত হলো না। আর কুশল প্রশ্ন শুধোবেই বা কি? যা দেখছি সে তো জড়ভরতও লক্ষ্য করতো। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

আল্লা যেন হঠাৎ আমাকে আদেশ দিলেন। 'দিলবরজানকে বললুম, 'এখানে না। ওঁকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে চান করিয়ে, তাজা জামাকাপড় পরিয়ে নিয়ে আয়।'

যে ডাক্তার কারো কোনো প্রকারের সাহায্য নিতে সদাই কুণ্ঠিত, বিব্রত—বিদ্রোহী পর্যন্ত বলা চলে—সেই ডাক্তার কলের পুতুলের মত দিলবরের পিছনে পিছনে চলে গেল।

আমি বাথরুমের দরজার কাছে গিয়ে শুধালুম—কি করে শুধালুম জানি নে—'শহ্‌রু-ইয়ার ?'

যেন পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে উত্তর এল, ভালো আছে। না, ভুল বললুম। শুধু ঘাড় নাড়িয়ে ঐ সংবাদটুকু দিলে।

তাহলে কি হয়েছে ?

এরপর তাকে খাওয়াবার চেষ্টা, শোওয়াবার চেষ্টা, কথা বলাবার চেষ্টা—এসব নিষ্ফল প্রচেষ্টার পীড়াদায়ক বর্ণনা দিয়ে কে কাকে পীড়া দিতে চায় !

কোথা থেকে মানুষ কখন কি অনুপ্রেরণা পায় কে জানে ? দিলবরকে বললুম, 'যাও, রিকশা নিয়ে এসো। আমরা কলকাতা যাচ্ছি। আর ডাক্তারের কোট-পাতলুন আমার সুটকেসেই ভরে দাও।' এ লোকটাকে আবার কাপড় ছাড়ানো—সে তো হবে আলট্রামডার্ন সোসাইটি লেডির রুগ্ন বাচ্চাকে সায়েবী কায়দায় বেকার পাঁচবার কাপড় বদলানো।

আমি অন্ধভাবে বুঝতে পেরেছি, এখানে ডাক্তারকে আটকে রেখে কোনো লাভ নেই। যা হবার হবে কলকাতায়। ডাক্তারের জীবন বলতে বোঝায় তার দুটি শ্বাস-প্রশ্বাস—তার শহ্‌রু-ইয়ার আর তার রিসার্চ। এবং যেহেতু শহ্‌রু-ইয়ারকে সঙ্গে নিয়ে আসে নি, অতএব নিশ্চয়ই সে-ই। তার যে ডাক্তার ঘাড় নেড়ে জানালে সে ঠিক আছে—ও, না, সে তো আমার অনুমান।

সঙ্গে নিলুম ইমাম গজ্জালীর কিমিয়া আর হুজবেরীর কশ্‌ফ্‌-অল্‌-মহজুব।

রিকশাতে উঠে ইচ্ছে করেই আরম্ভ করলুম, বকর-বকর। কিন্তু সেটা মোটেই সহজ কর্ম হয় নি। আর সহজ কঠিন যাই হোক, ফল হল সম্পূর্ণ বেকার। এ যেন ধুঁয়োর সঙ্গে কুয়াশার লড়াই। এমন কি তাতে করে ধুঁয়াশাও তৈরী হল না।

ডাক্তার আচারনিষ্ঠ মুসলিম। তাই আরম্ভ করলুম ধর্মতত্ত্ব নিয়ে যেন কিছুটা আত্মচিন্তা কিছুটা বক্তৃতা। একটা বিশেষ মতলব নিয়ে।

বললুম, 'আপনি তো ইমাম গজ্জালীর ভক্ত। তাঁর জীবনটাও ভারী অদ্ভুত। তিনি ছিলেন বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাস্থবির—যে আমলে কি না, হয়তো এক চীন ছাড়া অন্য কোথাও ঐ 'বিশ্ববিদ্যালয়ের' জুড়ি ছিল না—আমি অবশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যাপীঠের সমন্বয়কে বিশ্ববিদ্যালয় অর্থে ধরছি না। একে তো

সর্বজনমান্য রেক্টর, তদুপরি শাস্ত্রীরূপে তিনি মুসলিম জগতে সর্বপ্রখ্যাত। রাজদত্ত অত্যুত্তম পোশাক পরিধান করে যেতেন রাজদরবারেও।

হঠাৎ একদিন তাঁর খেয়াল গেল, এ সব তাবৎ কর্ম অর্থহীন—বর্বরস্য শক্তিক্ষয়—ভ্যানিটি অব্‌ ভ্যানিটিস, অল্‌ ইজ ভ্যানিটি, বাইবেলের ভাষায়। সেই রাত্রেই মাত্র একখানা কম্বল নিয়ে বাগদাদ থেকে অন্তর্ধান। পেঁছিলেন গিয়ে সিরিয়ার দমশকশে—আশ্রয় নিলেন মসজিদে, ছদ্মনামে। সেই মসজিদের ইমাম ছিলেন উচ্চস্তরের পণ্ডিত। তাঁর সঙ্গে একদিন শাস্ত্রালোচনা হতে হতে সেই পণ্ডিত বললেন, 'এ আবার আপনি কি বলছেন! স্বয়ং ইমাম গজ্জালীর মত সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলেছেন ঠিক তার বিপরীত বাক্যটি!'

গজ্জালী ভাবলেন, আর এ-স্থলে থাকা নয়। কোন্‌ দিন এরা জেনে যাবে আমার প্রকৃত পরিচয়। আর সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাবে আমার ধ্যানধারণার সর্ব অবসর।

সেই রাত্রেই অন্তর্ধান করলেন বয়তুল্‌ মুকদ্দস—জেরুজালেমের দিকে। সেখান থেকে গেলেন ইহুদি, আরব, খৃষ্টান তিন কুলের পূর্বপুরুষ হজরত ইব্রাহিমের পুণ্য সমাধি দর্শন করে অশেষ পুণ্যলাভার্থে। ভারতবর্ষে হিন্দুরা যে রকম পুণ্যতীর্থে দেবতাকে কোনো কিছু প্রিয় খাদ্য বা অন্য-কিছু দান করে, ঠিক সেই রকম ইব্রাহিমের মোকামে মুসলমানরা একটা বা একাধিক শপথ নেয়। ইমাম নিলেন তিনটি। তার মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল, 'এ জীবনে আমি কোনো বিতর্কমূলক বাক্য কন্‌ট্রভার্সিয়াল) উত্থাপন করবো না।'

এখানে এসে আমি চুপ করে গেলুম। স্বেচ্ছায় এবং অতিশয় কূট উদ্দেশ্য নিয়ে।

জয় হোক ভারতীয় রেলের! শতম্‌ জীব, সহস্রং জীব—ভারতীয় রেলের কর্মকর্তাগণ!

বোলপুর স্টেশন আমাকে দু'খানা ফার্স্ট ক্লাস টিকিট বেচলে।

দার্জিলিং মেল পেঁছিল—এই অতি সামান্য নস্যবৎ—দু'ঘণ্টা লেটে, যাকে বলে 'বিলম্বিত গাড়ীয়াঁদের' একটি হয়ে। তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস সব ক'টা কামরা যে দার্জিলিং থেকেই প্রতি আউন্‌স্‌ ভর্তি, সে খবর না জেনে—খুব সম্ভব জেনেই—বোলপুর স্টেশন টিকিট বেচেছে। দার্জিলিঙের ক'গণ্ডা মেয়ে-ইস্কুলের ছুটি হয়েছে জানি নে—নীলে নীলে উর্দিপরা মেয়েরা কাঁঠাল-বোঝাই করে ফেলেছে সব ক'টা কামরা।

সে দুঃস্বপ্ন আজ আর আমার নেই—কি করে কোন্‌ কামরায় উঠেছিলুম। খুব সম্ভব ক্যাট্‌ল্‌ ট্রাকে, কিংবা হয়তো এঞ্জিনের ফারনেসে। এক দিক দিয়ে ভালোই হল। সে সংকটময় অভিযানে দুজনা দুই কোণে ছিটকে পড়েছি। ডাক্তারের মনটাকে পুনরায় সজীব করার গুরুভার থেকে রেহাই পেলুম বটে,

কিন্তু আমার মনটা ক্রমেই নির্জীব হতে লাগলো।

দিলবরকে বলেছিলুম কলকাতায় ট্রাঙ্ক-কল্ করতে। ডাক্তারদের সেই প্রাচীন দিনের গাড়িটা এত দিনে আমার বড় প্যারা হয়ে গিয়েছিল। সেও স্টেশনে আসে নি। দুঃখের দিনে নির্জীব প্রাণীও প্রিয়জনকে ত্যাগ করে বলেই কবি হাহাকার করেছেন—

তঙ্গ দস্তীমে কৌন্ কিসকা সাথ দেতা হৈ
কি তারিকী মেঁ সায়া ভী জুদা হোতা হৈ ইন্সাঁসে।
দুর্দিনে বলো, কোথা সে সুজন হেথা তব সাথী হয় ?
আঁধার ঘনালে আপন ছায়াটি সেও, হেরো, হয় লয়॥

অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার। যে পুরো সম্পূর্ণ ফাঁকা উইংটি ঠাকুর্দাদের স্মরণে ডাক্তারের আদেশানুযায়ী চিরন্তন দেয়ালি উৎসব করতো সেটিও অন্ধকার। আমি আমার ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। স্পষ্ট বোঝা গেল বেয়ারাই সেটা গোছগাছ করেছে। শহ্রু-ইয়ার কোথায় ? কে জানে ? আমি শুধালুম না। ডাক্তার বললেন, তিনি খাবেন না। ট্রেনের ভিড়ে সন্ধ্যায় নামাজ পড়তে পারেন নি। এখন এষার নামাজ পড়ে ঘুমুবেন। কিন্তু শহ্রু-ইয়ার কোথায়, যার পরম পরিতৃপ্তি ছিল স্বহস্তে তাঁর নামাজের ব্যবস্থা করে দেবার ?

আমি স্থির করলুম, ডাক্তার যতক্ষণ না নিজের থেকে কথা পাড়ে আমি কিছু শুধোবো না।

বিছানায় শুয়ে বই পড়ছি। এমন সময় আমার প্যারা বেয়ারা—শহ্রু-ইয়ারেরও—ঘরে ঢুকলো। অন্য সময় তার মুখে হাসিই লেগে থাকতো, আজ সে যন্ত্রের মত তার নৈমিত্তিক কর্তব্যগুলো করে যেতে লাগলো।

আমি খুব ভালো করেই জানি গৃহস্থের পারিবারিক ব্যাপার কারকুন-কর্মচারী সহচর-সেবকদের শুধোতে নেই, তবু বড় দুঃখে মনে পড়লো শহ্রু-ইয়ার দিলবরজানকে আমার আচার-অভ্যাস সম্বন্ধে একদা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুধিয়েছিল, যাতে করে আমি তাদের কলকাতার বাড়িতে এলে আমার কোনো অসুবিধা না হয়।

তবু দ্বিধাভরা মনে জমীল শেখকে শুধালুম, 'আমাদের ট্রাঙ্ক-কল সময়মত পৌঁছয় নি ?'

'জী হাঁ, সে তো সন্ধ্যা সাতটার সময়ই। আমিই ধরেছিলুম।'

'তবে ?'

প্রশ্নটার তাৎপর্য ঠিক বুঝেছে। বললে, 'মা জী বাড়িতে ছিলেন না। তিনি তো দুপুরবেলাই গাড়ি নিয়ে তাঁর পীর সাহেবের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন, আমি—'

শহ্রু-ইয়ারের পীর ! বলে কি ! হাবার মত শুধালুম, 'পীর !'

জমীল ঘাড় ফিরিয়ে যেন অতি অনিচ্ছায় অত্যন্ত আফসোস করে আস্তে আস্তে বললে, 'সেখানেই তো প্রায় সমস্ত দিন কাটান।' তারপর যতদূর সম্ভব আদব-ইনসানিয়ৎ বাঁচিয়ে, 'সালাম হুজুর, গরীবের বেয়াদবী মাফ করবেন' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আল্লার কসম খেয়ে বলছি, জমীল যদি বলতো, শহ্‌র্‌-ইয়ার আত্মহত্যা করেছে তা হলেও আমি এরকম বুড়বক্‌ বনে যেতুম না! শহ্‌র্‌-ইয়ার পীর ধরেছে! এ যে বাতুলের বাতুলতার চেয়েও অবিশ্বাস্য। সাধারণতম মুসলমান মেয়েরও নামাজ-রোজার প্রতি যেটুকু টান থাকে সেটুকুকেও ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিলেও যেটুকু থাকার সম্ভাবনা তাও তো আমি শহ্‌র্‌-ইয়ারের কথাবার্তা চাল-চলনে কখনো দেখি নি। সে নিজেই আমাকে একাধিকবার বলেছে, তার দিল্‌ তার জান্‌, তার সব কিছুর এমারৎ দাঁড়িয়ে আছে—চৌষট খাম্বার উপর নয় রবীন্দ্রনাথের তিন হাজার গানের তিন হাজার স্তম্ভের উপর। সেখানে গুরুবাদই বা কোথায়, আর পীর সাহেব তো সেই হাজারো স্তম্ভের কোনো একটার পলস্তরা পর্যন্ত নন।

আর এই রমণীর মণি মমতার খনি—সে তো কিছু পাগলা গারদের ইমবে-সাইল নয় যে চায়ের কাপে জল ভরে, পেন্সিলের ডগায় সুতো-বঁড়শি লাগিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করবে! গুরু বুঝি তা হলে চায়ের কাপ্‌, আর শহ্‌র্‌-ইয়ারের ভক্তি সেই পেন্সিলের বঁড়শি! তাই দিয়ে সে ধরবে ভগবদ্‌-প্রেম, নজাৎ-মোক্ষ!

তাও বুঝতুম যদি তার বাউলদের দেহতত্ত্ব গীতে, লালন ফকীরের রহস্যবাদ-মারিফতী জনপদসঙ্গীতের প্রতি মমতা থাকতো! এমন কি এই যে রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীত, বাউল-গান—তার প্রতিও শহ্‌র্‌-ইয়ারের বিশেষ কোনো মোহ নেই—সে-কথাও তো সে আমাকে স্পষ্ট বলেছে!

খাটে শুয়ে, বই হাতে নিয়ে পড়ছি, পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছি—তার এক বর্ণও মাথায় ঢুকছে না; ভাবছি শুধু শহ্‌র্‌-ইয়ারের কথা, যাকে আল্লা মেহের-বাণী করে আমার কাছে এনে দিলেন, যে আমার বোনের চেয়েও বোন, প্রিয়ার চেয়েও প্রিয়া!

রাত তখন এগারোটা। শহ্‌র্‌-ইয়ার ঘরে ঢুকলো।

তাকে কি ভাবে দেখব, সে নিয়ে আমার মনে তোলপাড় হচ্ছিল যখন থেকে শুনতে পেয়েছি, সে 'গুরু লাভ' করেছে।

যেমনটি ছিল, তেমনটিই আছে। শুধু পূর্বেকার মত যখন খাটের পৈথানে এসে খাড়া কাঠের টুকরো ধরে দাঁড়ালো তখন স্পষ্ট লক্ষ্য করলুম, চোখ দুটোর উপর যেন অতি হাল্কা স্বচ্ছ দুখানা ফিলমের মত কি রকম যেন কুয়াশা-কুয়াশার মত আবরণ। এ জিনিসটে আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না। কারণ কুয়াশাভাব থাকা সত্ত্বেও তাতে রয়েছে কেমন যেন একটা বিভ্রান্ত দ্যোতি।

পীর-ভক্ত হওয়ার পূর্বে শহ্‌রু-ইয়ারের হার্দিক ও দৈহিক সৌন্দর্য একদিনে আমার কাছে স্বপ্রকাশ হয় নি। তার হাসি তার গান, দূরে থেকে দেখা তার আপন মনে মনে একা একা তালসারির গা ঘেঁষে ঘেঁষে ভ্রমণ, আমার বাড়ির দেড়তলাতে তার আবাস নির্মাণ, মুসলমান রমণীর স্বাতন্ত্র্য নিয়ে তার অভিমান —তার আরো কত শত আহারশয্যাসনভোজন, কত কিছুর ভিতর দিয়ে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। দিনে দিনে সে আমার কাছে সুন্দরের চেয়ে সুন্দর, মধুরের চেয়ে মধুর হয়ে বিভাসিত হয়েছে।

আর আজ? আজ থেকে আবার তাকে নূতন করে চিনতে হবে। এ যদি একেবারে নূতন মানুষ হতো তবে তো কোনো ভাবনাই ছিল না। নূতন মানুষের সঙ্গে তো আমাদের জীবনভর পরিচয় হয়। কোনো পুরনো মানুষকে আবার নূতন করে চেনা? সামান্য লেখক হিসেবে বলতে পারি: নূতন লেখা তো দু'দিন অন্তর-অন্তরই লিখতে হয়, কিন্তু কোনো একটা লেখা যদি হারিয়ে যায় এবং সেইটেই আবার নূতন করে লিখতে হয়, তখন যা যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে যেতে হয় সে-তত্ত্বটা শুধোন গিয়ে—আমাকে না—খ্যাতনামা লেখকদের।

এর চেয়েও সোজা উদাহরণ দি। আপনি রইলেন পড়ে দেশে। বন্ধু বিলেত থেকে ফিরলেন পাঁচ বছর পরে। তার সঙ্গে ফের বন্ধুত্ব জমাতে গিয়ে খান নি মার?

আশ্চর্য! এখনো শুধোলে না, আমার কোনো অসুবিধা হয় নি তো, খাওয়া-দাওয়া কি রকম হয়েছে—কিছুই না। না, আমি আশ্চর্য হই নি। আমি ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পেরেছি।

আমি স্থির করেছি আমি কোনো ফরিয়াদ করবো না—চিঠির উত্তর দিলে না কেন, আপন হাতে প্রত্যেকটি জিনিস বেছে বেছে—বহুৎ কিছু কলকাতা থেকে সঙ্গে এনে—আমার বাড়ির দেড়তলাতে যে তোমার বাড়ি বানালে সেটা এরকম ছেঁড়া চটিজুতোর মত না বলে না কয়ে হঠাৎ এরকম উৎখাত করে দিলে কেন; না না, কিছু শুধোবো না। আমি ভাবখানা করবো, সে হঠাৎ যেন কোনো এতিমখানা বা নাইট ইস্কুলে এমনই মেতে গিয়েছিল যে আমার তত্ত্ব-তাবাশ করতে পারে নি। সমস্তটা সহজ ভাবেই গ্রহণ করবো। কিন্তু হায়, সহজ হওয়া কি এতই সহজ? সহজিয়া ধর্মের মূল মন্ত্র 'সহজ হবি, সহজ হবি'—সেটা যদি অতই সহজ হবে তবে বিশ্বসংসারের তাবৎ ধার্মিক অধার্মিক সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে ঐ ধর্মই গ্রহণ করলো না কেন?

ওদিকে হৃদয় ভরে আসে অভিমানের বেদনায়।

এ-রমণীর সঙ্গে যদি আমার সম্পর্ক প্রণয়ের হতো তবে তার আজকের অবহেলা আমার হৃদয়ে অন্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো। প্রেম তো পূর্ণচন্দ্র। তাই তার চন্দ্রগ্রহণও হয়। কিন্তু বন্ধুত্বও শুক্লপক্ষের চন্দ্রমার মত রাতে রাতে

বাড়ে এবং চতুর্দশীতে এসে থামে। পূর্ণিমাতে পৌঁছয় না। তাই তার গ্রহণ নেই, ক্ষয়ও নেই, কৃষ্ণপক্ষও নেই। তবে আমাদের বন্ধুত্বের উপর এ কিসের করাল ছায়া!

কিন্তু অতশত চিন্তা করার পূর্বেই প্রাচীন দিনের অভ্যাসমত মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'কি পড়ছো, আজকাল?' ঐটেই ছিল আমাদের প্রিয় অবতরণিকা—যা দিয়ে 'মুখবন্ধ' নয়, মুখ খোলা হতো।

বললুম, 'বসো।'

কেমন যেন সংকোচের সঙ্গে খাটের বাজুতে বসলো।

এই মেয়েই না একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার পদসেবা করতে চেয়েছিল।

তবে কি পীরের মানা—গুরুর বারণ—পরপুরুষস্পর্শ বিষবৎ বর্জনীয়?

নিকুচি, নিকুচি। পীরের গুষ্টি আর গুরুর দঙ্গল!

'অভিমানের বদলেতে নেব তোমার মালা' এ-সব মরমিয়া মাল আমার তরে নয়। আমার হল রাগ। এই নিষ্পাপ শিশুটিকে কে শেখালে এইসব কাল্পনিক পাপ? কে সে পীর? তাকে একবার দেখে নিতে হবে। কিন্তু পীরের নিকুচি যতই করি না কেন, আমার ঠাকুরদা থেকে ঊর্ধ্বতম ক'পুরুষ যে পীর ছিলেন সে তত্ত্ব অদ্যাপিও বিলক্ষণ অবগত আছে তরফ্ পরগণার কিছু কিছু চাষাভূষো, মোল্লামুনশী। এরা বংশানুক্রমে আমাদের পরিবারের শিষ্য। কিন্তু আমার পিতা এবং আমার অগ্রজেরা পীর হতে রাজী হলেন না বলে এদের অধিকাংশই অন্য পীরের আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু গুরুভক্তি শুধু গুরুতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, সে-ভক্তি গুরুর বংশধরগণকেও নিষ্কৃতি দেয় না; তাই এদের কয়েকটি পরিবার অন্য পীর বরণ না করে দু'তিন পুরুষ ধরে অবিশ্বাস্য ধৈর্য ধরে বসে আছে, আমার দাদাদের বা আমার বেটা-নাতি যদি সদয় হয়ে কোনো এক দিন এদের বেটা-নাতিদের শাগিদ-(সাকরেদ) রূপে গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে যে-পীর বাঙলাদেশে এসে আমাদের বংশ স্থাপনা করেন তাঁর দর্গাতে এই সব প্রতীক্ষমাণ সাকরেদরা শিরণী চড়াচ্ছে, ফুল সাজাচ্ছে, মানত মানছে।

মাত্র এই দু'পুরুষ—আমার পিতা আর আমরা তিন ভাই—পীর হতে রাজী হই নি। তাই বলে চোদ্দপুরুষ যে-সব ধ্যানধারণা করেছে, সাকরেদদের দীক্ষা দিয়েছে, ধর্মপথে চালিয়েছে সেটা কি দু'পুরুষেই আমার রক্ত থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? হাঁসকে দুপুরুষ খাঁচায় বন্ধ রাখার পর তৃতীয় পুরুষের বাচ্চাদের জলে ছেড়ে দিলে কি তারা সাঁতার না কাটতে পেরে পাথর-বাটির মত জলে ডুবে মরবে!

এই তো মাত্র দু'তিন বৎসর পূর্বে শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষ আমার উপর হামলা করে অনুরোধ—আদেশও বলতে পারেন—করলেন, পৌষমেলা ও সমাবর্তন উৎসবের প্রাক্কালে যে সাম্বৎসরিক উপাসনা করা হয় তাতে আচার্যের

আসন গ্রহণ করতে। আমি সাতিশয় সবিনয় সবিস্তর অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলুম। ওঁদের বলি নি কিন্তু আমি মনে মনে জানি এসব কর্ম ক'রে পুরুত-মোল্লারা পেটের অন্ন জোটায়—অবশ্য এ-স্থলে এঁরা আমাকে একটি কানাকড়িও দেবেন না, সে-কথা আমি বিলক্ষণ অবগত ছিলুম। আবার এ তথ্যও তো জানি যে, বিপদে-আপদে কাছেপিঠে নিতান্তই কোনো মোল্লা-মুন্‌শী ছিল না বলে আমার পিতৃ-পুরুষ এ-সব ক্রিয়াকর্ম কালেকস্মিনে অত্যন্ত অনিচ্ছায় সমাধান করেছেন। পূর্বেই বলেছি, তবুও আমি আপত্তি জানিয়েছিলুম। তখন কর্তৃপক্ষ তাঁদের আখেরী মোক্ষম বজ্রবাণ ছেড়ে বললেন, আমারই উপর ভরসা করে তাঁরা অন্য কোনো ব্যবস্থা করেন নি ; এই শেষ মুহূর্তে অন্য ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমার সন্দেহপিচেশ মন অনুমান করলো, অন্য কোনো ডাঙর্ চাঁইকে হয়তো কর্তারা কাবু করে রেখেছিলেন এবং তিনি শেষ মুহূর্তে তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে খবর পাঠিয়ে কত্তাদের সমূহ বিপদে ফেলেছেন। বিপদে পড়লে শয়তানও মাছি ধরে ধরে খায়। তাই এসেছেন অধমের কাছে। অবশ্য এনারা শয়তান নন, আস্মো মাছি নই। আমি শুধু রিলেটিভিটি সিম্‌প্লিফাইড থ্রু প্রভার্ব বোঝাবার জন্য এই প্রবাদটি উদ্ধৃত করলুম।

তখন অবশ্য আমি তিন কবুল পড়ে মুসলমান যে-রকম বিয়ে করে সে-রকম ধারা আমার সম্মতি দিলুম।

এটা আমার 'পীরত্ব' প্রমাণ করার জন্য শহ্‌রু-ইয়ারকে বলবোই বলবো। সে কোন্ দম্ভভরে চিত্তপ্রসাদ অনুভব করছে যে তার পীরই ইহলোক পরলোকের একমাত্র পীর! আমি সপ্রমাণ করে ছাড়বো, বেলাভূমিতে তাঁর পীরই একমাত্র নুড়ি নন, আরো 'বিস্তরে বিস্তর' আছে, এবং আমি তো রীতিমত একটা বোল্‌ডার—এ্যাব্বড়া পাথরের চাঁই।

অবশ্য সেও ধুরন্ধরী। সে যদি শুধোয়, শান্তিনিকেতনে আচার্যের কর্ম আমি কিভাবে সমাধান করলুম তখন আমি কিছুটি না বলে সাক্ষী মানবো কলকাতার একখানি অতি প্রখ্যাত দৈনিকের সম্পাদক মহাশয়কে। তিনি সে-উপাসনায় উপস্থিত ছিলেন।

গতানুগতিক সাধারণ অবস্থায় আমি আত্মচিন্তার জন্য এতখানি ফুরসৎ পেতুম না। ইতিমধ্যে শহ্‌রু-ইয়ারের সফেন বুদ্‌বুদিত চিত্ত কথায় কথায় বক-বকানিতে ফেটে পড়তো। কিংবা তিনখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে ফেলত—তার অভ্যাস অনুযায়ী প্রত্যেকটি অসমাপ্ত রেখে।

এমন কি, এদানির সে কি পড়ছে, আমার সেই প্রথম প্রশ্নের উত্তরও এ-তাবৎ সে দেয় নি।

আমি বললুম, 'জানো, শহ্‌রু-ইয়ার, আমার চতুর্দশ পুরুষ কিংবা ততোধিক ছিলেন পীর—সুফী?'

এতক্ষণ অবধি শহ্‌র্‌-ইয়ার ছিল আপন মনের গভীর গহনে আত্মচিন্তায় নিমগ্না। "পীর", "সূফী" এ-দুটি শব্দ তার কানে যেতেই সে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলো। তার নিষ্প্রভ, কুয়াশা-মাখা চোখ দুটি সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন দিনের মত জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠলো।

কিন্তু মুখ দিয়ে কথা ফুটলো যেন হোঁচট খেতে খেতে।

শুধলো, 'সে—সে—সে কি? আপনি—আপনি—আপনি তো আমাকে কখনো বলেন নি। কি বললেন?—সূফী?'

আমি তন্মুহূর্তেই বুঝে গেলুম, শহ্‌র্‌-ইয়ারের পীর তাকে সূফীমার্গে দীক্ষিত করেছেন। কিংবা চেষ্টা করেছেন।

আমি কিন্তু অত সহজে ধরা দেব না। তুমি কি আমার কানু যে, বাঁশী শুনেই উদোম হয়ে ছুটবো!

আমি প্রাচীন দিনের চটুলতা আনবার ভান করে বললুম, 'তা, আমি তো কখনো বলি নি—তুমিও শুধোও নি—আমি প্রথম যৌবনে ক'বার প্রেমে পড়েছিলুম, তুমি তো কখনো শুধোও নি—'

কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করে মনে মনে কিছুটা তৃপ্তি পেলুম। শহ্‌র্‌-ইয়ারের গুরু তাকে অজগরের মত আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে ধরতে পারেন নি। নইলে অন্য গুরু অন্য সূফী সম্বন্ধে সে কণামাত্র কৌতূহল দেখাতো না। বরঞ্চ এ-স্থলে কুরুচিরা মাত্রই অন্য গুরুর কথা উঠলেই তাকে নস্যাৎ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। প্রাচীন দিনের আপ্তবাক্য মনে এল—অন্যের পিতার নিন্দাবাদ না করেও আপন পিতার প্রশংসা করা যায়।

ওদিকে দেখি, শহ্‌র্‌-ইয়ার আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আর এই সর্বপ্রথম দেখলুম, আমার 'রসিকতা' প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তার সদাশান্ত ভালের এক প্রান্তে, আঁখিকোণে যেন সামান্যতম অসহিষ্ণুতার ভ্রূকুঞ্চন পরশ লাগিয়ে চলে গেল।

আর দুঃখ হল এই দেখে যে, যে-শহর্‌-ইয়ার আমার ভোঁতা রসিকতাতেও একটুখানি সদয় স্মিতহাস্য করতো—দু'একবার বলেওছে, "এটা কিন্তু জুৎসই হল না"—সে আজ রসিকতার পুকুরে (মানছি, ঘোলা জলের এঁদোপুকুরে) যেন সাক্ষাৎ পরমহংসিনী হয়ে গিয়েছেন!

এ-অভিজ্ঞতা আমার বহুকালের। যে-কোনো-কিছুতেই মানুষ মজে গিয়ে সিরিয়স হলেই সবচেয়ে সর্বপ্রথম তার লোপ পায় রসবোধ। এর প্রকৃষ্টতম উদাহরণ প্রেমের বেলা। রসে টইটম্বুর পাড়ার সুকুমার যখন প্রথম প্রেমে পড়ে—ইংরিজিতে যাকে বলে 'কাফ লভ্'—তখন তাকে যদি আপনি কোনো কিছু না জেনেশুনে নিতান্ত হার্মলেসলি শুধোন 'কি হে মুখখানা এত শুকনো কেন?' সে তখন সেই কাঠিয়াওয়াড়ি চাষার মত তেড়ে বলবে, শুখু-শুখুকে

লকড়ি বন্ জাউংগা—তেরা ক্যা শালা।'

ধর্মরাজ্যে আমাদের অখণ্ডসৌভাগ্যবতী খাজিস্তে-বানু মুসম্মৎ বেগম শুহ্‌রু-ইয়ার—আল্লা তাঁর শান্-শওকৎ লুৎফ্-নজাকৎ হাজার চন্দ্ বৃদ্ধি করুন!—কোন্ গৌরীশংকরের শীর্ষদেশে তথাগতা হয়েছেন সে জানেন তাঁর অধুনালব্ধ পীর সাহেব; আমার কিন্তু এ তত্ত্ব বিলক্ষণ মালুম হচ্ছে, বীবীজান তাঁর স্বামী এস্তেক বাড়ির খানসামা-বাবুরচি এবং আর পাঁচজনের লবেজান করে এনেছেন তো বটেই, আমার সঙ্গে তাঁর যে রসে রসে ভরা রসের মিতালী দিনে দিনে গড়ে উঠেছিল সেই শিশু নীপতরুটি অধুনা অবহেলার খর তপনে বিবর্ণ পাণ্ডুর; আসন্ন কালবৈশাখীতে ধূলিদলিতা এবং শ্রাবণে হবে কর্দমমর্দিতা।

শান্তকণ্ঠে বললুম, 'তুমিই তো আমাকে একাধিকবার বলেছ—এখন মনে হচ্ছে, তাতে হয়তো সামান্য বিষাদের সুর মাখানো ছিল—যে, রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীতে তোমার বুকে তুফান তোলে না। অথচ তার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবারই শ্লাঘার সঙ্গে নিজেকে ধন্য মেনেছ যে রবীন্দ্রনাথের প্রেম-প্রকৃতির গান তোমার অস্থিমজ্জা তোমার অনিন্দ্যমোহন চিন্ময় ভুবন নির্মাণ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের সেই ধর্মসঙ্গীত এবারে একটু কান পেতে শোনো তো।

আমাদের পরিবারে একাধিক সাধক সুফীমার্গ অবলম্বন করেছিলেন। এ-পন্থার শেষ পথচারিণী ছিল আমার ছোট বোন সৈয়েদা হবীবুন্নেসা, সে এখন ও-পারে। আমার এক ভাগ্নী ঢাকাতে বাংলার অধ্যাপনা করে। সে তার সম্বন্ধে প্রামাণিক প্রবন্ধ লিখেছে। আমার এই বোনটি আবার ছিল সিলেটের 'পীরানী'। প্রতি ভোরে তার বাড়ির সামনে জমে যেত মেয়েছেলেদের ভিড়। তারা এসেছে বোনের দোওয়া নিতে কাচ্চাবাচ্চাদের অসুখ সারানোর জন্য, বন্ধ্যারা এসেছে মা হবার জন্য, আরো কত কী! আমার বোন তাবিজ-কবজ পানি-পড়া কিচ্ছুটি দিত না। এক এক জন করে মেয়েরা ঘরে ঢুকতো আর সে শুধু আশীর্বাদ করতো। বহুকাল ধরে, কেন জানি নে, সে শয্যাগ্রহণ করেছিল। শুয়ে শুয়ে গুন গুন করে গান গাইত। সুফীতত্ত্বের মারিফতী গান। এবং নিজেই সুর দিয়ে অনেকগুলো গান রচেছিল। ঢাকা বেতার মাঝে মাঝে সেগুলো শোনায়। তার একটা গীতিসংকলন আমার আব্বা প্রকাশ করেন। কিন্তু সে কথা থাক। আমি বলছিলুম—

শহ্‌রু-ইয়ার প্রাচীন দিনের দৃঢ়কণ্ঠে বাধা দিয়ে বললে, 'না। আপনার বোনের কথা বলুন।'

আমি দৃঢ়তর কণ্ঠে বললুম 'না।' আমিও এখন তপ্ত গরম। তুমি যদি শুরু নিয়ে মেতে উঠে আপন-জন, বেগানা-জন সর্বজনকে স্বচ্ছন্দে অবহেলা করতে পারো, তবে আমিও তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে তারও বেশী অবহেলা করতে পারি।

বললুম 'তুমি প্রশ্ন শুধিয়েছিলে, আমাদের পরিবারের সুফীদের সম্বন্ধে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু কিছু বললুম। নইলে কোথায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনমান্য ধর্মসঙ্গীত—আফ্‌টার অল্‌, গীতাঞ্জলির ধর্মসঙ্গীতই তো তাঁকে নোবেল প্রাইজ পাইয়ে দেয়—আর কোথায় আমার ছোট বোনের মারিফতী সুফীগীতি!'

আমি কিন্তু তখন মনে মনে বেশ খানিকটে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করছি। বীবীকে যে তাঁর আকস্মিক ধর্মোন্মত্ততার কচ্ছপের খোল থেকে (তওবা! তওবা!! কাছিম আমাদের কাছে হারাম—পাপবিদ্ধ অপবিত্র—না হলেও মকরূহ, অর্থাৎ বর্জনীয়) বের করতে পেরেছি সেটাও তো কিছু হেলাফেলার ফেলনা নয়।

যদিও আমি নম্রা শান্তা সুফী-কন্যার অগ্রজ তবু তুর্ক্‌-সিপাহীর মোগলাই কণ্ঠে আদেশ দিলুম, 'ঐ রেকর্ডটা বাজাও তো—

"তাই তোমার আনন্দ আমার'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে" ॥'

শহ্‌র্‌-ইয়ার রেকর্ডটি লাগালো। এতদিন অন্য গানের বেলা মাঝে মাঝে সে যে-রকম গুনগুন করতো, এ-গানে সে সেটা করলে না। ধর্মসঙ্গীত তা'র মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে সেটা ঠিক ঠিক বুঝতে পারলুম না।

গান শেষ হলে বললুম, 'জানো শহ্‌র্‌-ইয়ার, এ-গানেরই একটি লোকায়ত রূপ আছে:

জ্ঞানের অগম্য তুমি, প্রেমের ভিখারী।
দ্বারে দ্বারে মাগো প্রেম নয়নেতে বারি ॥
কোথায় তোমার ছত্রদণ্ড কোথায় সিংহাসন।
পাতকীর চরণতলে লুটায় আসন ॥'

শহ্‌র্‌-ইয়ার কোনো কিছু বলার পূর্বেই আমি আদেশ দিলুম, 'অনেক রাত হয়েছে; ঘুমুতে যাও।'

আসলে শহ্‌র্‌-ইয়ার এখন ধর্মপথে স্বপনচারিণী। পরিপূর্ণ সুষুপ্ত অবস্থায় কোনো কোনো মুদ্রিতাঁখি নারী-পুরুষ দৃঢ় পদক্ষেপে ভয়-নির্ভয়াতীত অবস্থায় ভ্রমণ করে সংকীর্ণতম আলিসার উপর দিয়ে—কোন্‌ বিধাতা বা অপদেবতার অদৃশ্য করাঙ্গুলি সঙ্কেতে কে জানে? এই স্বপনচারীর হাল তখন বড়ই নাজুক এবং সংকটময়। অকস্মাৎ কেউ তখন তার নাম ধরে ডেকে উঠলে বা তার গাত্রস্পর্শ করলে সে তার সম্মোহিত ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং সেই মুহূর্তেই কোনো একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে [illegible] সেটেই অসম্ভব নয়।

শহ্‌র্‌-ইয়ার এখন সে ক্ষুরস্য ধারা সুফীরহস্যের কেশ-পরিমাণ সংকীর্ণ পথের উপর দিয়ে এই নব-অভিযানে বেরিয়েছে—অর্ধসম্মোহিত অর্ধসচেতনাবস্থায়—তাকে এখন আকস্মিক তর্ক-মুদ্গর দ্বারা সচকিত জাগরণে ফিরিয়ে আনা কি আদৌ সমীচীন হবে ?—যদ্যপি সেটা আদপেই সম্ভবে।

কিন্তু প্রশ্ন, তাকে জাগাতে যাবো কেন ? নিতান্ত জড়বাদী চার্বাকপন্থী ভিন্ন এ দায়িত্ব নেবে কোন্ সব-জান্তা প্যাকম্বর ! হয়তো সে সত্য পথেই চলেছে। তদুপরি আমার জানা আছে, খৃষ্টান, মুসলিম, জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু, ভক্তিতত্ত্বের, বহু তথাগত মহাত্মা বলে গেছেন, এ-মার্গে পদার্পণ করার প্রথম অবস্থায়—অবতরণিকায়—প্রায় প্রত্যেক সত্য সাধকই অল্পাধিককাল মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় কাটায়। সামান্য মানবীর প্রেমমুগ্ধ দান্তেও নাকি মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় দিক্‌ভ্রান্তের মত যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতেন। আর এ-নারী তো মুগ্ধা সবচেয়ে 'সর্বনেশে' প্রেমে।

কিংবা এ-নারী কি এখন দ্বিতীয় মন্‌জিলে—খৃষ্টান মিষ্টিকরা যাকে বলে মেনশন ? এখানে নাকি আসে এ্যারিডিটি—উষরতা, অনুর্বরতা। জগদ্বল্লভ নাকি ভক্তকে গোড়ার দিকেই এক ঝলক 'দর্শন দিয়ে মিলিয়ে যান। শ্রীরাধা তাঁর বল্লভ রসরাজের সঙ্গ সুখ কতকাল পেয়েছিলেন সেটা পরবর্তীকালে—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের পর—তিনি নিজেই বলতে পারতেন না। সিলেটের একাধিক গ্রাম্যগীতিতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'আমার মরম তাঁর স্মরণে বলে আমি তাঁকে পেয়েছি ঐটুকু সময়ের তরে বিদ্যুল্লতার পৃথিবীতলে পেঁছিতে যতখানি সময় লাগে।' তারপরই আরম্ভ হয় আকুলি-বিকুলি।

বৃন্দাবন ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-গমন এবং সাধককে একবার ক্ষণতরে 'দর্শন' দিয়ে জগদ্বল্লভের অন্তর্ধান—সম্পূর্ণ একই ঘটনা।

তখন সেই উষরকালে সর্ব প্রেমিকই প্রেমিকাই আর 'গৃহবাসিনী' হয়ে থাকতে চায় না, তার তখন 'কোন প্রয়োজন রজত কাঞ্চন,' সে তখন 'গেরুয়া বসন অঙ্গেতে' ধরে তার স্নেহময়ী মাতাকে পর্যন্ত ত্যাগ করে।

শহ্‌র্‌-ইয়ার যে আত্মজন প্রিয়জনকে অবহেলা করেছে সেটা তো সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় নয়।

বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের জন্য, ক্যাথলিক নান্‌-দের জন্য যে রকম সংঘ মনাস্‌ট্রি আছে, মুসলমান রমণীর জন্য সে-রকম কিছু একটা থাকলে এতদিনে হয়তো সে সেখানে আশ্রয় নিয়ে নিত। জীবন কাটাতো ধ্যানধারণায়, উপবাস-কৃচ্ছ্রসাধনে, জনসেবায়—

সেবা ?

আমি যে এতক্ষণ শহ্‌র্‌-ইয়ারের সমর্থনে যুক্তিতর্ক দিয়ে মহলের পর মহল গড়ে তুলছিলুম সেই চিন্ময় এমারৎ এক লহমায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে ধূলিদলিত—মাত্র একটি শব্দের অনধিকার প্রবেশে। 'সেবা' !

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, নবীন সাধকের প্রতি সূফী সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু হুজবেরীর প্রত্যাদেশ ঃ—

সাধনার প্রথম বৎসরে মানুষের সেবা করবে,
দ্বিতীয় বৎসরে আল্লার সেবা করবে,
তৃতীয় বৎসরে আত্মদর্শনে নিয়োজিত হবে।

ডাক্তার, আমি, বাড়ির এত যে খেদমৎগার সুবো-শাম শহর্‌-ইয়ারের মুখের পানে তাকিয়ে থাকে, তাকে সত্যকার মা জেনে আম্মা বলে ডাকে—আমরা কি মানুষ নই ? সাধনার প্রথম বৎসরে তো মানুষের সেবা করারই প্রত্যাদেশ।

একদা শহ্‌র্‌-ইয়ারকে বলেছিলুম, তোমার সর্বাঙ্গসুন্দর বেশভূষা হবে তোমার স্বামীর জন্য। আর আজ যদি তুমি সর্বসুন্দরের সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করো, তবে তার সর্বপ্রথম সর্বোত্তম সেবা পাবে তোমার স্বামী।

তেরো

খুব বেশীক্ষণ আত্মচিন্তা করি নি। দেহের ক্লান্তি তো ছিলই, তদুপরি ডাক্তারের বিপাক-বিহ্বলতা, শহ্‌র্‌-ইয়ারের দূরত্ব-দূরত্ব ভাব আমার মনকেও অসাড় করে তুলেছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম অল্পক্ষণের মধ্যেই। হজরত পয়গম্বর বলেছেন—যদিও তাঁর বাক্যটি কোনো শাস্ত্রগ্রন্থে আমি স্বচক্ষে দেখিনি—'মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা পণ্ডিতের নিদ্রা শ্রেয়ঃ।' কিন্তু মূর্খের নিদ্রা কোন্ পর্যায়ে পড়ে সে-সম্বন্ধে কোনো আপ্তবাক্য আমি এ-তাবৎ শুনি নি, শাস্ত্রেও দেখি নি। আমি মূর্খ। জাগ্রতাবস্থায় আমার পাপাত্মা সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে না। তাই বোধ হয় তিনি নিদ্রিতাবস্থায় তাঁর নামগান শুনিয়ে দেন।

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে সম্পূর্ণ সচেতন হলুম।

শুনতে পেলুম, বেশ কিছুটা দূর থেকে অতি মধুর কণ্ঠে জপগীতি ঃ

ইয়া লতীফুল্‌/ তুফ্‌বি না।
নাহ্‌নু 'বিদক্‌/কুল্লি না ॥

আরবী ভাষার দোঁহা।

হে সুন্দর, তোমার সৌন্দর্য আমাদেরকে দাও।
(কারণ) আমরা তোমার পূজারী, আমরা সকলেই।

আমার মনে ধোঁকা লাগল, শহ্‌র্‌-ইয়ার কি এ-দোঁহাটির গভীরে পেঁছে পুরোপুরি মর্মার্থটি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে ?

যে আল্লাকে এ-স্থলে আহ্বান করা হচ্ছে তিনি 'লতীফ'। শব্দটি সুন্দর এবং করুণাময় দুই অর্থই ধরে। অর্থাৎ একই শব্দে তাঁকে 'শিবম্‌' ও সুন্দরম্‌' বলা হচ্ছে। এখানে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে 'উল্‌তুফ' !

এর একটি অর্থ সরল—'তুমি করুণাময় হও' ('বি' 'না'—আমাদের প্রতি) কিন্তু অন্য অর্থ—'তোমার সৌন্দর্য আমাদের প্রতি বিকিরণ করো' কিংবা/এবং 'আমাদেরকেও সুন্দর করে তোলা।'

আল্লার বহু গুণ বোঝাবার জন্য মানুষ তাঁকে বহু নাম দিয়েছে। কিন্তু সুফীদের কাছে তিনি 'হক্‌ক্‌', অর্থাৎ 'সত্যম্‌'। প্রখ্যাত সুফী মনসুর অল্‌-হল্‌লাজ 'আনাল্‌ হক্‌ক্‌', অর্থাৎ 'আমিই সত্য' 'আমিই ব্রহ্ম' প্রচার করার দরুন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। কথিত আছে, যখন তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কর্তিত হয় তখন প্রতি খণ্ড থেকে রব ওঠে 'আনাল্‌ হক্‌ক্‌, আনাল্‌ হক্‌ক্‌!'

শহ্‌রু-ইয়ার 'সত্যে'র সন্ধানে বেরিয়েছে, না সুন্দরের সন্ধানে?

তার ললিত কণ্ঠের করুণ জপের ('জিক্‌রু') :

'—সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রুসাথে মিলিত মধুর
.....আছে তাহে সমাপ্তির ব্যথা,
আছে তাহে নবতম আরম্ভের মঙ্গল-বারতা।'

কিন্তু আপন অনিচ্ছা সত্ত্বেও লক্ষ্য করলুম শহ্‌রু-ইয়ারের কণ্ঠস্বর তাদের শোবার ঘর থেকে আসছে না। তবে কি সে স্বামীসঙ্গ ত্যাগ করেছে! ইস-লামের আইন-অনুযায়ী সে তো তা পারে না, তার স্বামীও পারে না।

কিন্তু আমিই বা ঘামের ফোঁটায় কুমীর দেখছি কেন?

হয়তো ত্রিযামাযামিনীব্যাপী তার জিক্‌রু স্বামীর নিদ্রাকে ব্যাঘাত করবে বলে সে অন্য কামরায় আশ্রয় নিয়েছে।

অবসন্ন মনে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালুম। রাত্রির কলকাতার আকাশ যেন নির্গুণ ব্রহ্ম। কোনোরকম পরিবর্তন তার হয় না। সদাই একই, কেমন যেন হিমানীর গ্লানি-মাখা পাণ্ডুর ধূসর। শুনেছি, যুদ্ধের সময় নাকি ব্ল্যাক-আউটের কল্যাণে কলকাতার 'মডার্ন' কবিরা জীবনে প্রথম চন্দ্রমা দেখতে পান, এবং ভয়ে আঁতকে উঠেছিলেন।

এটা কাল সকালেই শহ্‌রু-ইয়ারকে বলতে হবে। সে আকছারই 'কবিতা' নিয়ে টকঝাল ফোড়ন কাটে—ওদিকে এসব আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েও। একদিন বিষাদমাখা সুরে আমাকে বলেছিল, 'আমি যে এ-সব কবিতাতে রস পাই নে তার জন্য কি আমার দুঃখ হয় না? আমি এরই মধ্যে এত বুড়িয়ে গেলুম কি করে যে নবীনদের সুর আমার প্রাণে সাড়া জাগাতে পারে না?'

তখন হঠাৎ মনে ব্যথা জাগলো, সে-সব উষা-রসের নিশা তো তার আর নেই।

এ-সব ব্যথার উপশমের জন্য বিধাতা সৃষ্টি করেছেন নিদ্রা।

বেলাতে ঘুম ভাঙল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললুম, 'বাঁচালে, বাবা।' এতক্ষণে নিশ্চয়ই ডাক্তার চলে গেছেন কর্মস্থলে এবং শহুর্-ইয়ার গেছেন তাঁর পীরের আস্তানায়। কে যেতে চায় ঐ নিরানন্দ ড্রাইনিংরুমে? আর এই তো প্রথম আমরা তিনজন একসঙ্গে মুখোমুখি হব। কি হবে গিয়ে ঐ আড়ষ্ট মূক সমাজে। আমি তো আর বাগ্দেবী নই যে, মূককে বাচাল করে তুলবো!

কিন্তু শান্তি কোথায়? কৌটিল্য যে বলেছেন, উৎসবে ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে যে সঙ্গ দেয় সেই ব্যক্তিই বান্ধব—তার কি?

ব্যসন মানে অত্যধিক আসক্তিজনিত বিপত্তি। শহুর্-ইয়ারের এই অত্যধিক ধর্মাসক্তিও এক প্রকারের ব্যসন। কিন্তু এটাই বা দীর্ঘস্থায়ী হবে কে বলতে পারে? অবশেষে সে হয়তো তার ভারসাম্য ফিরে পাবে এবং সর্বশেষে সে শব্দার্থে ডাক্তারের সহধর্মিণী হবে। ভুল বললুম, এতদিন ধরে ডাক্তার তো ভেবেছে, সে যে ক্রিয়াকর্ম করে যাচ্ছে সেখানেই তার ধর্মজীবনের পরিসমাপ্তি—সেই শুষ্ক আচারানুষ্ঠানের বিশীর্ণ তরুমূলে বরঞ্চ শহুর্-ইয়ার তখন সিঞ্চন করবে সুফী সন্তদের প্রেম-উৎস থেকে আহরিত নব মন্দাকিনীধারা। ধর্মবাবদে কৌতূহলী অথচ সেটাকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে যে ধ্যানধারণা সাধনা-উপাসনার প্রয়োজন সে-খাতায় সম্পূর্ণ রিক্ত এই যে অধম—সেও উপকৃত হবে।

'গুড মর্নিং, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং' হেঁকে খানা-কামরায় ঢুকলুম।

ডাক্তারকে অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লতর দেখাচ্ছে। তবে কি এই খোদার-সিধে লোকটা ঐ দুরাশা নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে যে, আমি আসার দরুন তার সব মুশকিল আসান হয়ে যাবে! মূর্খ, মূর্খ, মূর্খ! আমি কি টেলিফোনের 199 যে, 'হোয়েন ইন্ ট্রবল'-এ নম্বর রিং করলেই সর্ব ঝামেলা ফৈসালা হয়ে যাবে, না আমি পীরপ্যাকম্বর-গুরুগোসাঁইয়ের খ্যাট?—যদ্যপি শহুর্-ইয়ারের নবলব্ধ গরিমা—রোওয়াব্টাকে কথঞ্চিৎ ঘায়েল করার জন্য কাল রাত্রে আমি মুখে মুখে হাইজাম্প লঙজাম্প মেরেছি বিস্তর—শহুর্-ইয়ারের 'জিক্রের সেই লতীফ্' তাঁর 'লুৎফ্' (দাক্ষিণ্য) বর্ষণ করে বর্বরতম আমার এ মদদর্প যেন ক্ষমা করে দেন।

ডাক্তারকে শুধালুম, 'কই, আজ যে এত্তা ল্যাটে? তবে কি যে-সব কঙ্কাল নিয়ে রিসার্চ করছেন তারা সরকারী ধর্মঘট করেছে, না রবিঠাকুরের 'কঙ্কালে'র মত মোলায়েম মোলায়েম গল্প বলার জন্য মহিলা-মহলে'র প্যাটার্নে 'কঙ্কাল-মহল' প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাবৎ কঙ্কাল বেতার থেকে দাওয়াৎ পেয়েছ?'

অনুমান করলুম, ডাক্তার সজ্ঞানে কর্মস্থলে যেতে বিলম্ব করছে। বউকে যতখানি পারে ঠেকিয়ে রাখছে।

ডাক্তার বললেন, 'তা আর বিচিত্র কি? শহুর্-ইয়ারই কিছু দিন পূর্বে বলছিল বেতারের হাঁড়িতে যা চাল বাড়ন্ত, আমার কঙ্কালের না ডাক পড়ে?'

শহ্‌র্‌-ইয়ার তখন ডাক্তারের লাঞ্চের জন্য স্যালাডে যে মায়োনেজ দেবে তার জন্য ডিমের কুসুম, সরষের তেল আর নেবু নিয়ে বসেছে।

আমি তার দিকে তাকিয়ে বললুম, 'তবেই দেখ, ইয়ার, শুধু যে "গ্রেট মাইন্‌ড্‌জ্‌ থিন্‌ক এলাইক" তাই নয়, দৈবাৎ কখনো-সখনো কোনো 'নীলমণি-চন্দ্রমায়' তোমার মত গ্রেট মাইন্‌ড্‌ আর আমার মত স্মল মাইন্‌ড্‌ ও একই রকম চিন্তা করে। আর তুমি যে বেতার তথা কঙ্কালতত্ত্ব ডাক্তারকে বলেছ সেটি আমি একটি ব্যঙ্গচিত্রেও দেখেছি। গত যুদ্ধে হিটলারের যখন তাবৎ সৈন্য খতম, তখন আমাদেরই ডাক্তারের মত এক ডাক্তার বার্লিনের যাদুঘরে গিয়ে একটা কঙ্কালের পাঁজরার উপর স্টিতস্কোপ রেখে পাশের রংরুট আপিসারকে বলছেন, "হ্যাঁ, ফিট্‌ ফর্‌ দি আর্মি!"

তারপর কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললুম, 'আমি তো শুনেছি, মায়োনেজ তৈরী হয় অলিভ অয়েল আর সিরকা দিয়ে।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার আমার দিকে না তাকিয়েই বললে, 'ঠিকই শুনেছেন, কিন্তু অনেকেই তো মায়োনেজের ধক্‌ বাড়াবার জন্য ফিকে অলিভ অয়েলে ঝাঁজালো মাসটার্ড পাউডার দেয়। ও দুটোতে মিশে তা হলে তো সর্ষের তেলেই দাঁড়াবে। আর ইয়োরোপে টক নেবু নেই বলেই তো শুনেছি, তারা ভিনিগার ব্যবহার করে। নেবু অনেক তাজা।'

ইতিমধ্যে জমীল এসে শুধলো, কি খাব?

উদাত্ত কণ্ঠে বললুম, 'ব্রাদার, আমি তো ব্রেকফাস্ট খাই নে। কিন্তু কাল রাত্রের খানাতে ঠিক রুচি ছিল না বলে মেকদারে একটু কমতি পড়ে গিয়েছিল। ...দাও কিছু একটা।' শেষ কথা দুটি বললুম ঈষৎ অবহেলা ভরে।

আমার মৎলব, শহ্‌র্‌-ইয়ারকে ইঙ্গিতে অতি মোলায়েম একটি খোঁচা দেওয়া। ভাবখানা এই, 'তুমি সামনে বসে ভালো করে খাবার জন্য চোটপাট করবে, রসালাপের মধুসিঞ্চন করবে, তবে তো আমার জিভে জল, পেটে জারক রসের ছয়লাপ জাগবে। নইলে আমার কি আর অন্যত্র অন্ন জোটে না?'

এবারে শহ্‌র্‌-ইয়ার মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো। সে-দৃষ্টিতে আমি যেন দেখতে পেলুম, কেমন যেন একটা বেদনা-ভরা নৈরাশ্য।

তবে কি সে বলতে চায়, সে খেয়ালখুশীতে আমাকে অবহেলা করে নি; আমাকে, তার স্বামীকে সেবা করার মত শক্তি তার আর নেই।

তারপর ধীরে ধীরে জমীলের কাছে গিয়ে বললে, 'আমি খাবার তৈরী করছি, তুমি কমলালেবুর রস ঠিক করো।'

আমার আপসোস হল। কী দরকার ছিল আমার এ-অভিমান দেখাবার। আমি না স্থির করেছিলুম, আমি অভিমান করবো না। আমি, অগা, কি করে জানবো এ-মেয়ের বুকের ভিতর কি তুফান উঠেছে? আমি কি করে বুঝবো

ওর মনের কথা ? আপন মা-ই কি সব সময় বুঝতে পারে, তার সন্তানের আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব ? আমার তরুণ বয়সে দেখেছি, একাধিক সুশিক্ষিতা মাতা পুত্রকে স্বাধীনতা সংগ্রামে নামতে বাধা দিয়েছেন। হয়তো সন্তানের অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ কারাবাসের দুঃখ-যন্ত্রণা মাতাকে ত্রাসাতুর করে তুলেছিল। যাই হোক যাই থাক, মা তো তখন বুঝতে পারে নি, ছেলে বিভীষিকা দেখছে, সে যদি তার আদর্শ ত্যাগ করে কারাগারের বাইরে থেকে যায় তবে সেই মুক্ত পৃথিবী তখন তার পক্ষে হয়ে দাঁড়াবে বৃহত্তর, বৃহত্তম কারাগার !

শহ্‌র্‌-ইয়ার আমার কে, যে, আমি তার হৃদয়মনের আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব আপন হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারবো ? মুসলমান সমাজের ভিতর আমাদের দু'জনার মধ্যে যে সম্পর্ক দিন দিন ক্রমশঃ বিকশিত হচ্ছিল, সে রকম সম্পর্ক আমাদের সমাজে কিছুদিন পূর্বেও ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব, এখনো সাতিশয় বিরল। খুদ আরব দেশ, ইরান-তুরান আফগানিস্তান এমন কি এদেশের হরিয়ানা মধ্যপ্রদেশও তো এ-সব বাবদে বাঙালী মুসলমান সমাজের ঢের ঢের পিছনে। ও-সব দেশে আমাদের সম্পর্ক নিয়ে হদীস খুঁজতে যাওয়া বিলকুল বেকার। বরঞ্চ শহ্‌র্‌-ইয়ার ও আমার উভয়ের অনুভূতিক্ষেত্রে যিনি আবাল্য রসসিঞ্চন করেছেন, সেই রবীন্দ্রনাথকে শুধোই। তিনি এই সম্পর্ক নিয়ে চিন্তা করে করে পৌঁছেছিলেন কবি বাণভট্টের 'কাদম্বরী' আখ্যানে। সেখানে পত্রলেখা নাম্নী তরুণী কুমারী যুবরাজ চন্দ্রাপীড়ের 'পত্নী নয়, প্রণয়িনীও নয়, কিংকরীও নয়, পুরুষের সহচরী'।

কিন্তু শহ্‌র্‌-ইয়ার আমার সহচরী কেন, নর্মসহচরীও তো নয়।

তদুপরি সে বিবাহিতা, স্বামীর প্রতি অনুরক্তা ; আমিও একদারনিষ্ঠ।

কবিগুরু তীক্ষ্ণদৃষ্টির খরতর শর কিন্তু আমাদের এই 'নাজুক' বা ডেলিকেট্‌ সম্পর্কের অন্তত একটি সূক্ষ্মতম কেন্দ্রবিন্দুকে লক্ষ্যভেদ করতে পেরেছে। 'পত্রলেখা যেখানে (চন্দ্রাপীড়ের সান্নিধ্যে) আসিয়া যে অতি অল্প স্থানে আশ্রয় লইয়াছে সেখানে তাহার আসিবার কোনোপ্রকার প্রয়োজন ছিল না। স্থানটি তাহার পক্ষে বড় সংকীর্ণ, একটু এদিকে ওদিকে পা দিলেই সংকট।'

পরিস্থিতিতে অবশ্য পার্থক্য আছে। পত্রলেখা ছিলেন চন্দ্রাপীড়ের তাম্বুল-করঙ্কবাহিনী পরিচারিকা ; চন্দ্রাপীড় যুবরাজ। যুবরাজকে তো সাবধানে পা ফেলতে হয় না। কিন্তু শহ্‌র্‌-ইয়ার ও আমার সম্পর্ক তো 'বরাবরেষু'।

তাই শহ্‌র্‌-ইয়ারের 'স্থানটি তাহার পক্ষে' যেমন 'বড় সংকীর্ণ' আমারও 'একটু এদিকে ওদিকে পা ফেলিলেই সংকট'।

তার প্রতি আমার সহানুভূতি, তার প্রতি আমার ভালোবাসা, তার অন্তরের দ্বন্দ্বে তাকে সহায়তা করা—এ সবই যেন 'একটু এদিকে ওদিকে পা না ফেলে' ! তা হলেই সংকট।

আমার চিন্তাধারায় বাধা পড়লো। ডাক্তার আসন ছেড়ে উঠে বললে, 'তা হলে আসি; আজ বড্ড দেরি হয়ে গেছে।' আমিও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালুম, অর্ধসমাপ্ত ব্রেকফাস্ট টেবিলে রেখে। বললুম, 'আমাকেও একটুখানি বাইরে যেতে হবে। আপনি আমাকে ড্রপ্ করতে পারবেন?'

উভয়েই আশ্চর্য। কারণ আমি এ-বাড়ি থেকে মাত্র একবার বেরিয়েছিলুম —তাও ওদেরই সঙ্গে।

ডাক্তার বললে, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়! কিন্তু আপনি ব্রেকফাস্ট শেষ করুন।'

আমি তাচ্ছিল্য-ভরা কণ্ঠে বললুম, 'ওঃ! ব্রেকফাস্ট! সে বালাই যা আমি কালেকস্মিনে খাই, সে তো বুড়ি ছোঁওয়ার মত।'

এটা নিছক শহ্‌র্-ইয়ারকে খুশী করার জন্য। সে যেন না ভাবে যে, সত্য-সত্যই কাল রাত্রে আমি অভুক্ত ছিলুম।

ওষুধ কিছুটা ধরলো, শহ্‌র্-ইয়ার আমার দিকে যেন একটুখানি কৃষ্ণনয়নে তাকালো। মেয়েটি সর্বার্থে অতুলনীয়া।

ওরা কিছু শুধোয় নি। আমি নিজের থেকেই বললুম, 'চললুম অভিসারে। আমার সিঁথির সিঁদুরের সন্ধানে।'

ডাক্তার তো বিস্ময়বিহ্বল, সিঁথির সিঁদুর? সে আবার কি?' শহ্‌র্-ইয়ারও তদ্বৎ।

একগাল হেসে বললুম, 'আমার পাবলিশার গো, আমার পাবলিশার। উনি আছেন বলেই তো দু'পয়সা পাই, মাছ-মাংস খাই। সিঁথির সিঁদুর না তো কি?' ওদের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষা না করেই বললুম, 'আমার ফিরতে দেরি হবে। আমার পাবলিশার রীতিমত খানদানী মনিষ্যি। সায়েবসুবোদের মত পয়লা নম্বরী হোটেলে লাঞ্চ খান। বিজনেস টক্‌মক্ যা-কিছু সেসব হোটেলের 'বার'-এ—পিন্‌জিন্ (পিংক্ জিন্) গেলাশের থারমোমিটার সাইজের ডাঁটাটি ঘোরাতে ঘোরাতে।...আমার গাড়ির দরকার নেই।'

আমার ইচ্ছা, শহ্‌র্-ইয়ারের এদানীংকার প্রোগ্রাম ডিস্টার্ব না করা। মুরশিদমঞ্জিলে যাবার জন্য তার যদি নিত্যিনিত্য পারিবারিক গাড়ির প্রয়োজন হয় তবে তাই হোক্। আমি রাত না করে ফিরবো না।

আমি আশা করেছিলুম, সে বুঝে যাবে এটা আমার কোনো অভিমানজাত প্রত্যাখ্যান নয়। কিছুটা প্রসন্ন নয়নে আমার দিকে মুহূর্তেক তাকাবে।

রহস্যময়ী এ নারী। শুধু বললে, 'আমারও তো গাড়ির দরকার নেই।'

আমার খুশী হওয়ার কথা, কারণ এ-যুগে মায় ড্রাইভার চোপ্পর দিনের জন্য মোটরপ্রাপ্তি যেন চৌরঙ্গীতে সোঁদরবনের কেঁদো বাঘ-সওয়ার গাজী পীরের ইয়ার দক্ষিণ-রায়ের দাক্ষিণ্যপ্রাপ্তি। কিন্তু আমার উল্টে হল গোশ্‌শা। ওঃ!

তুমি বুঝি ধরে নিয়েছো, যানাভাবে দ্বিপ্রহর রৌদ্রে, ঘর্মাক্ত কলেবরে যত বেশী ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে গুরুর পদপ্রান্তে পেঁছবে সেই অনুপাতে তোমার মুরশিদসেবার পুণ্যধ্বজা মনুমেণ্ট ছাড়িয়ে আল্লাতালার কুর্সিপানে ধাওয়া করবে! 'তক্‌লীফ বরদাস্ত করাতেই সওয়াব্‌' 'কৃচ্ছ্রসাধনেই পুণ্য'—অর্ধসিদ্ধ বৈরাগ্যবিলাসীদের মুখে এ-জাতীয় জনপদসুলভ নীতিবাক্য শুনে শুনে এক কামিল্‌ সুফী বিরক্তি-ভরে বক্রোক্তি করেছিলেন, 'তবে চড়ো না গে' প্রতি ভোরে হিমালয়ের চূড়ো, সেখানে পড়ো গে' ফজরের নামাজ! বেহেশ্‌তের বেবাক ফেরেস্তা সেই হুদো হুদো পুণ্যের খতেন রাখতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাবেন। আর চূড়ো চড়ার বেপথে যদি টেঁসে যাও তবে তা তো হাজার দফে বেহ্‌তর্‌। তখন তুমি পাবে শহীদের উচ্চাসন। পূর্বকৃত সর্বপাপভার থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সরাসরি চলে যাবে বেহেশ্‌তে!'

না গো, শহ্‌র্‌-ইয়ার, তোমার পুণ্যপন্থা আমি অত সহজে নিষ্কণ্টক করে দেব না। দুপুরে বাড়িতে খাবও না। তোমার প্রোগ্রাম-প্ল্যান আমি এতই নর্মাল সহজ করে দেব যে তুমি কৃচ্ছ্রসাধন করার রন্ধ্রটি পর্যন্ত খুঁজে পাবে না। আমি সতী বেহুলার চেয়ে ঢের বেশী চালাক।

উপস্থিত আমি স্রেফ একটি বারের তরে তোমার মুরশিদ্‌-বিরিঞ্চ-বাবার মুখারিবন্দরুচিটির দর্শনলাভ করে যে পুণ্যসঞ্চয় হবে সেইটে মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দেব স্বর্গের পোস্টাপিসে—হোথায় সীট রিজার্ভেশনের জন্য ইনসিও-রেন্‌সের পয়লা কিস্তি!

আহা, শহ্‌র্‌-ইয়ার, তুমি দর্শন পেয়ে গেলে, তুমি ভাগ্যবতী ঃ—

'অদ্যাপিও সেই খেলা খেলে গোরা যায়।
মধ্যে মধ্যে ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥'

এবং ততোধিক বিস্ময় মানতে হয় যে আবাল্য ধর্মশাস্ত্র, এমন কি ধর্মসঙ্গীতও উপেক্ষা করে কোন্‌ মন্ত্রবলে কোন্‌ পুণ্যফলে নিরঙ্কুশ অব্যবহিত পদ্ধতিতে আজ অকস্মাৎ হৃদয়ঙ্গম করে ফেললে,

'যদ্যপি আমার গুরু বেশ্যাবাড়ি যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥'

চৌদ্দ

সর্বপ্রকারের বাদ-প্রতিবাদ অখণ্ড উপেক্ষা করে গেলুম শোবার ঘরে। চীনাংশুক-অঙ্গবাসটি স্কন্ধোপরি লম্বমান করে দৃঢ়পদক্ষেপে দৃকপাত না করে সোপান অবরোহণান্তে রাজসিক পদ্ধতিতে আরোহণ করলুম সেই মান্ধাতাতাতযুবনাশ্ব সমসাময়িক স্বতশ্চলশকটে।

ডাক্তার সভয় সবিনয় কণ্ঠে অনুরোধ করলেন, 'গাড়িটা রাখুন না সমস্ত দিন আপনার সঙ্গে। আমি ভারি খুশী হব। আর জানেন তো কলকাতায় যান-বাহনের হাল।'

আমি স্থির কণ্ঠে বললুম, 'আপনাকে কোনো বাবদেই "না" বলতে আমার বড় বাধে। কিন্তু ক্ষণতরে বিবেচনা করুন, আমি বেরিয়েছি চতুর্বর্গের দ্বিতীয় বর্গের অর্থাৎ অর্থের সন্ধানে; পক্ষান্তরে শহ্‌র্‌-ইয়ার বেরুবেন চতুর্থ বর্গ অর্থাৎ মোক্ষের সন্ধানে। কার সেবাতে এস্থলে নিয়োজিত হবে এই শকট?' তারপর মৃদুহাস্য করে বললুম, 'অপরাধ নেবেন না, শকটটিও মুমুর্ষু তথা মুমুক্ষু—তারও তো ভূত-ভবিষ্যৎ আছে। সেইবা যাবে না কেন রাজেন্দ্রাণী সঙ্গমে দেবদর্শনে?'

ডাক্তার নিম-সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'এ গাড়ি আমি অতি অবশ্যই স্ক্রেপ-রূপে বিক্রী করবো না। তাকে তার আপন গারাজচ্যুতও করবো না। এবং নিশ্চয়ই রাখবো নিত্য রানিং অর্ডারে, আপনার ভাষায় স্বতশ্চলাবস্থায়।'

আমি প্রসন্ন বদনে বললুম, 'আর আপনার নাতি সেটি চড়ে 'ভিন্‌টেজ কার' রেসে নামবে।'

বলতে পারবো না, হয়তো আমার দৃষ্টিভ্রম—কিন্তু আমার যেন মনে হল ডাক্তার অন্যদিকে অতি সামান্য মুখ ফেরালেন।

আমি সে-কুহেলি কাটাবার জন্য শুধালুম, 'ডাক্তার, আপনার মনে আছে, গত বর্ষারম্ভে আপনারা যখন শান্তিনিকেতনে বেড়াতে এসেছিলেন তখন একদিন অপরাহ্নে ওঠে প্রচণ্ড কালবৈশাখীর ঝড়, তারপর মুদ্গরধারে শিলাবৃষ্টিপাত এবং সর্বশেষে রুপালি ঝালরের মত ঝিম্‌ঝিম্‌ বরষন? শহ্‌র্‌-ইয়ার বৃষ্টিতে ভিজতে বলে একা চলে যায় আদিত্যপুরের দিকে?

আমরা দুজনাতে তখন বারান্দায় বসে অনেকক্ষণ ধরে ইসলামের প্রচার ও প্রসার নিয়ে আলোচনা করি। শেষের দিকে আপনি ইসলাম সম্বন্ধে ভালো ভালো রেফ্‌রেন্‌স্‌ বইয়ের একটি ফিরিস্তি আমার কাছে চান। সে-নির্ঘণ্ট শেষ করার পূর্বেই শহ্‌র্‌-ইয়ার বাড়ি ফেরে।—তাই তখন দশ খণ্ডে অসমাপ্ত একখানি অতুলনীয় গ্রন্থের কথা আমার আর বলা হয়ে ওঠে নি।

বইখানির—বরঞ্চ বলা উচিত এই "ইসলামবিশ্বকোষ"-এর নাম "আন্নালি দেল্‌ ইসলাম" অর্থাৎ অ্যানালস্‌ অব্‌ ইসলাম, ইতালীয় ভাষায় লেখা। কিন্তু তার পূর্বে এই অজাতশত্রু বিশ্বকোষের একক স্রষ্টার পরিচয় কিছুটা দিই। এঁর নাম প্রিন্‌স্‌—ডিউকও বলা হয়—লেওনে (অর্থাৎ সিংহ) কাএতানি। ইতালীর তিনটি পরিবারের যদি নাম করতে হয়, যাঁদের সঙ্গে রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আছে তাহলে কাএতানি পরিবারের নাম বাদ যাবে না। কিন্তু এহ বাহ্য।

আসলে এ-পরিবারের যশ প্রতিপত্তি আরম্ভ হয় যখন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে

এ-পরিবারেরই একজন বনিফাতিয়ুস নাম নিয়ে তদানীন্তন খৃষ্ট-জগতের পোপ নির্বাচিত হন। ইনি ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত ও কূটনীতিতে চাণক্য! ওদিকে যুদ্ধবিদ্যায়ও পারদর্শী। ডেনমার্কের রাজাকে তিনি পদানত করেন এবং ফ্রান্সের সম্রাটকেও প্রায় শেষ করে এনেছিলেন। কিন্তু এসব তথ্য বলার কোনো প্রয়োজন নেই—এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে তাঁর সমসাময়িক অমর কবি দান্তে তাঁকে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কাব্যে যীশুখৃষ্টের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু এহ বাহ্য। তত্ত্ব কথা এই যে বনিফাতিয়ুস সে-যুগের সর্বোত্তম দার্শনিক স্পেনের মুসলমান আবু রুশ্দের দর্শন প্রায় সর্বাংশে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। এটা প্রায় অবিশ্বাস্য। কারণ আবুরুশ্দ্ (ঐ যুগেই তাঁর দর্শন একাদশ খণ্ডে লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়—লাতিনে রুশ্দের নাম আভেরএস্) যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রমাণ করতেন যে মৃত্যুর পর মানবাত্মা অনন্ত স্বর্গভোগ বা অনন্ত নরকযন্ত্রণা সহ্য করতে পারে না। তার কারণ অনন্ততা, আনন্ত্যগুণের অধিকারী একমাত্র মহান আল্লা। মানবাত্মা নয়, এবং অনন্ত স্বর্গ অনন্ত নরকের আনন্ত্যগুণ স্বীকার করলে এরা সকলেই সেই মহান আল্লার (বেদান্তের ভাষায় একমেবাদ্বৈতম্ ব্রহ্মের) প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যাবে—এ-ধারণা কিম্ভূতকিমাকার অশ্বডিম্ব—আটারলি এব্সার্ড। তাই আবু রুশ্দের মতে মৃতাত্মারা স্বর্গ-নরক যথোপযুক্ত কাল ভোগ করার পর আল্লাতালা অবশেষে সর্ব আত্মা, স্বর্গ, নরক সব, সব-কিছু নিজের মধ্যে আপনাতে সংহরণ করে নেবেন। তখন তিনি আবার একম্, অদ্বৈতম্।'

ডাক্তার বাধা দিয়ে বললেন, 'এই মতবাদটা আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারি নি। একটু সবিস্তার বলুন।'

আমি বললুম, 'নোঃ! আমি দর্শন প্রচার করি নে। আমি শোনাই কাহিনী। একটি করুণ কাহিনী শোনাবার জন্য আমি এস্থলে অতি সংক্ষেপে একটি পটভূমি নির্মাণ করলুম মাত্র। তৎপূর্বে আরো আধ মিলিগ্রাম দর্শনবিলাস করতে হবে। এদিকে আবার খৃষ্টান মাত্রেরই অটল অচল বিশ্বাস পুণ্যাত্মা অনন্ত স্বর্গসুখ এবং পাপাত্মা অনন্ত নরকযন্ত্রণা পাবে। ওদিকে পোপ, খৃষ্টজগতের পিতা, যাঁর পুণ্যাস্যনির্গত প্রতিটি বাক্য শাস্ত্রাতিশাস্ত্র আপ্তবাক্য, সেই সর্বশাস্ত্রবিশারদ পোপ বনিফাতিয়ুস 'ম্লেচ্ছ যবন' দার্শনিক আবুরুশ্দের মতবাদ এমনই আকণ্ঠ গিলে বসে আছেন যে তিনি তাঁর সহকর্মী কার্ডিনালদের সমক্ষে গোপন রাখতেন না যে, তিনি মৃতাত্মার অনন্ত স্বর্গনরক-ভোগাদিতে বিশ্বাস করেন না। তাই পূর্বেই বলেছি, এটা প্রায় অবিশ্বাস্য। খুদ বাইবেলের বিরুদ্ধে এই 'ম্লেচ্ছ' 'যাবনিক' মতবাদ প্রচার করার জন্য পোপকে দণ্ডভোগ করতে হয়েছিল। তারই উল্লেখ করে কবি দান্তে বিলাপ করে তাঁর মহাকাব্যে লিখেছেন, যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে তাঁর জল্লাদরা যেরকম তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছিল

ঠিক সেই রকম 'প্রভু যীশুকে দ্বিতীয় বারের মত ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা হল।

কিন্তু এক বাহ্য।

যে কাএতানি পরিবারে এই পোপের জন্ম সে-পরিবারে যুগ যুগ ধরে বহু পণ্ডিত, বহু গবেষক জন্ম নিয়েছেন। এ-পরিবারের শেষ পণ্ডিত, আমার অতিশয় শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক লেওনে কাএতানি। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, কিন্তু আমি প্রমাণ করতে পারবো না যে, এই পোপের উপর আরব দার্শনিক আবু রুশ্‌দের প্রভাব সম্বন্ধে তাঁর পারিবারিক ও পোপদের প্রচলিত ইতিহাস অধ্যয়ন করার ফলে তিনি আরবী ভাষা ও মুসলিম সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হন।

পর পর দু'খানি অত্যুত্তম গ্রন্থ প্রকাশ করে তিনি ইয়োরোপ তথা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম ভূখণ্ডে নব "শমসু-ল্-উলেমা" (জ্ঞান-ভাস্কর) রূপে আন্তরিক অভ্যর্থনা ও অকুণ্ঠ প্রশস্তি লাভ করলেন। তখন তিনি স্থির করলেন, এ-সব উটকো বই না লিখে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ জীবন নিয়োজিত করবেন ইসলামের একখানা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করাতে। বিদ্বজ্জন সোল্লাসে হর্ষধ্বনি তথা সাধুবাদ প্রকাশ করলেন।'

ইতিমধ্যে লক্ষ্য করলুম, মেডিকেল কলেজ আর বেশী দূরে নয়। বললুম, 'এবার আমি আমার মোদ্দা কথাতে চলে এসেছি।

রাজপরিবারের অংশবিশেষ, অসাধারণ সুপুরুষ, সংগীতচিত্রভাস্কর্য ইত্যাদির সক্রিয় সমঝদার কাএতানি প্রেমাবদ্ধ হলেন এক পরমা সুন্দরী, সর্বগুণান্বিতা রোমান রমণীর সঙ্গে। সৌভাগ্যক্রমে প্রেমটি হল উভয়ত ও গভীরতম।

বিবাহ হয়ে গেল। তাবৎ ইতালী এক কণ্ঠে বললে, তাদের দেশের নীলাম্বুজের ন্যায় গভীর নীলাকাশের সঙ্গে চক্রবালবিস্তৃত ইন্দ্রধনুর এহেন পূর্ণাঙ্গ আলিঙ্গন ইতিপূর্বে তাদের এবং সর্ববিশ্বপূজ্য 'রোমেও জুলিয়েতের' প্রেমভূমিতেও হয় নি।

তারপর আমাদের লেওনে—"নরসিংহ"—ডুব দিলেন তাঁর ইসলামের ইতিহাস—তাঁর "আন্নালি" বা "অ্যানালস্—" গ্রন্থে।

বউ এসে বললেন, "ওগো, শুনছো, কাল সন্ধ্যায় আমাদেরই তস্কানীনি আসছেন সঙ্গীত পরিচালনা করতে। ঐ দেখো টিকিট পাঠিয়েছেন। অন্য লোকে হন্যে হয়ে ধন্না দিচ্ছে শুদ্ধমাত্র ওঁর দর্শন পাবার জন্য।"

লেওনের মুখ বিবর্ণ। অপরাধীর মত বললেন, "কিন্তু আমার 'আন্নালি'—এ-অধ্যায়টা শেষ না করে—আচ্ছা, কাল দেখব।"

কিন্তু 'কাল'ও সেই 'দেখবো'টা দেখা হয়ে উঠলো না। লেওনে ডুব মেরেছেন 'আন্নালি'র গভীর অরণ্যে।

তারপর এলেন দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ টেনর গাওয়াইয়া কারুজো। ফল তদ্বৎ। মাঝে মাঝে বলতেন, "তা তুমি, ডার্লিং (দিলেত্তো), দিনোর সঙ্গে যাও

না কেন ? সে তো সর্বসঙ্গীতে আমার চেয়ে ঢের ঢের বেশী সমঝদার। আমার আন্নালি—"

বউ ঠোঁট চেপে বললেন, "দিনো তার 'প্যতীত্‌ আমির' (প্রিয়া বান্ধবী-র) সঙ্গে যাচ্ছে।"

আকাশপানে হানি যুগল ভুরু লেওনে অবাক হয়ে শুধোলেন, "সে কি ? দিনোর তো সুন্দরী বউ রয়েছে। এই হালেই বিয়ে করেছে। এর-ই মধ্যে 'প্যতীত আমি' ?"

যা শুনেছি, তারই স্মরণে যতটুকু মনে আসছে তাই বলছি, বউ নাকি ঠোঁট দুটি আরো কঠিন ভাবে চেপে চলে যাচ্ছিল—

লেওনে তোৎলাতে তোৎলাতে—তিনি ছিলেন লক্ষ্মীট্যারার মত অতিশয় যৎকিঞ্চিৎ লক্ষ্মী-তোৎলা—বললেন, 'কিন্তু, কিন্তু, ডালিং, আমার আন্নালি, আ—'

আন্নালি, অন্নালি—আবার সেই আন্নালি।

প্রেমিক, রসিক, ললিতকলার বিদগ্ধ সমঝদার লেওনে এখন হয়ে গিয়েছেন সুধমাত্র পণ্ডিত। পণ্ডিতেরও বউ থাকে। কিন্তু এ-স্থলে লেওনের একটি 'প্যতীত্‌ আমি' তাঁর হৃদয়াসন জুড়ে বসে গেছেন। আন্নালি।

লেওনে যে তাঁর বউকে সর্ব হৃদয় দিয়ে ভালোবেসে তার পদপ্রান্তে তাঁর সর্বাত্মা নিবেদন করেছেন এ-তত্ত্ব তাইবেরিয়ো রোমবাসী জেনে গিয়েছে। বস্তুতঃ লেডিকিলার রোমান নটবররা তখন ফিস্‌ফিস্‌ গুজগুজ করতে আরম্ভ করেছে, লেওনেটা একটা স্ত্রৈণ, ভেড়ুয়া ভাত্তুয়া (পূর্ববঙ্গের ভাষায় বউয়ের দেওয়া 'ভাত' না পেলে যে ক্লীবের দিন গোজরান হয় না) আস্ত একটা নপুংসক।

এদিকে লেওনে তাঁর সর্বসত্তা স্ত্রীর কাছে নিবেদন করে নিশ্চিন্ত। তাঁর দেবী যে তাঁর আন্নালিকে তার সপত্নী, তার "প্যতীত্‌ আমি" রূপে কস্মিনকালেও ধরে নিতে পারে সেটা তার সুদূরতম কল্পনারও বাইরে। কিন্তু ডাক্তার, এই দগ্ধ জগতে কত ঢপবেঢপেরই না সতীন হয়। সেই যে হিংসুটে দ্বিতীয়পক্ষ দেখলো তার স্বামী একটা মড়ার খুলি বেড়ার কঞ্চির উপরে রাখছে, সঙ্গে সঙ্গে মীমাংসা করে ফেললে, এটা নিশ্চয়ই তার মৃতা সপত্নী সীমন্তিনীর সীমন্ত-বহনকারী মস্তকের খুলি ! তাই না মিনষের পরাণে এত সোহাগের বান জেগেছে ! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি। তন্মুহূর্তেই—না, বরঞ্চ বলবো—তন্মুহূর্তেরও তিন মিনিট আগে, রাষ্ট্রভাষায় যাকে বলে "ফোরনকে পাঁচ মিনট পেহ্‌লে", সেই খুলিটা ফেলে দিলে বাড়ির পিছনের বিষ্ঠাকুণ্ডে। সে কেচ্ছা থাক, ডাক্তার, এ-বাবদে আমি বিস্তর গবেষণা করেছি—সুবিধে-কুবিধে মত কোনো এক সময়ে সেটা হবে। শুধু একটি আপ্তবাক্য বলি, এ-দেশের হরিপদ কেরানী

যে তার কুল্লে জীবনের দশটা-পাঁচটা বেচে দিয়েছে তার জন্য তার বউ খেদ করে না। কিন্তু বাবদ-বাকি ষোল সতেরো ঘণ্টা সেই পদী-বউ হয়ে যায় রাজরাজ্যেশ্বরী পট্টমহিষী রানী পদ্মিনী পদ্মাবতী—শাহ্-ইন্-শাহ্ বাদশা আলাউদ্-দীনও সেখানে ইতর জন।

আমাদের পণ্ডিত লেওনে একটি আস্ত মূর্খ।

এই সামান্য তত্ত্বটুকু পর্যন্ত জানেন না, গভীর, উভয়পাক্ষিক প্রেমের পর, বিয়ে হওয়ার পরও অনেক কিছু করার থাকে। সেগুলো অতি ছোটখাটো জিনিস। কিন্তু ছোট হলেই কি ছোট জিনিস সর্বাবস্থাতেই ছোট, বড় জিনিস বড়? পিপীলিকা অতিশয় ক্ষুদ্র প্রাণী; হাতি বৃহত্তম। চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বানানের বেলা? সেখানে পিপীলিকার বানান ঢের বেশী শক্ত—হাতির তুলনায়।

লেওনে মূর্খ। তিনি বুঝতে পারেন নি, এসব ছোটখাটো অনেক ব্যাপার আছে। বউকে কনসার্টে নিয়ে যাওয়া, তার জন্মদিন বা নামকরণ দিন স্মরণে রেখে ভালোমন্দ কিছু-একটা সওগাৎ নিয়ে আসা, বিবাহের বর্ষাবর্তনের দিন হৈ-হুল্লোড় করে বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করে উত্তমরূপে সমাধান করা—এ-সব কিছুই লেওনের স্মৃতিতে আসে না। আন্নালির গভীর গর্ভে এসব জিনিস ডুবে গিয়ে সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ।

হঠাৎ এক সকালে লেওনে ব্রেক্‌ফাস্ট খেতে এসে দেখেন, তাঁর পেলেটের উপর ছোট্ট একটি চিরকুট।

এবং ইতিমধ্যে তাঁর মত আপন-ভোলা লোকও লক্ষ্য করলেন, যে-বউ সদাসর্বদা তাঁর ব্রেক্‌ফাস্ট তৈরী করে দিত, সেও সেখানে নেই।

চিরকুটটি খুলে পড়লেন, "আমি তোমার ভবন পরিত্যাগ করলুম। অপরাধ নিয়ো না।"

ডাক্তার হতভম্ব।

তারপর রাম-গরেটের মত তোৎলাতে তোৎলাতে যা শুধলো তার বিগলিতার্থ, এ-রকম একটি সর্বগুণসম্পন্না মহিলা যিনি তাঁর আপন দয়িতের পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন পেয়েছেন তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেলেন?

আবার নূতন করে বুঝতে পারলুম, আমাদের এই মাইডিয়ার লার্নেড ডাক্তারটি হয়তো তাঁর চিকিৎসা-শাস্ত্রজ্ঞানপ্রসাদাৎ মড়াকে জ্যান্ত করতে পারেন, কিন্তু জ্যান্ত লোক যে দৈহিক মৃত্যু ভিন্ন অন্য নানাভাবে মরতে পারে—কএস যেরকম লায়লীকে ভালোবেসে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়ে লোকমুখে প্রচারিত মজনুন (যার স্কন্ধে জিন্=ভূত চেপেছে) উপাধি পান—এ-সবের কোনো এনট্রি তাঁর জীবনের খাতাতে নেই। তাঁর কাছে সব-কিছুই সরল

সিলজিমে প্রকাশ করা যায় ঃ—

ডাক্তার শহ্‌র্‌-ইয়ারকে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করেছেন।

শহ্‌র্‌-ইয়ার ডাক্তারকে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করেছে।

অতএব এঁদের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ আসতে পারে না।

কিউ ই ডি!!!

প্রভু যীশু নাকি বলেছেন, শুধু রুটি খেয়েই মানুষ বাঁচে না, ঠিক তেমনি বলা যেতে পারে দাম্পত্যজীবনে শুধু প্রেম দিয়েই পেট ভরে না।

কিন্তু এসব তত্ত্বকথা ডাক্তারকে এখন বলে আর কি লাভ? মেঘে মেঘে যে বেলা হয়ে গিয়েছে।

বললুম, 'ডাক্তার, আমাকে অনেকেই শুধোয়—বিশেষ করে আমার মস্তান চেলারা শুধোয়, কোন্ দেশের রমণী আমাকে সব চেয়ে বেশী মুগ্ধ করেছে। কী প্রশ্ন? আমি কি দেশে দেশে কান্তা, দেশে দেশে প্রিয়া করে বেড়িয়েছি না কি যে, এর পাকি উত্তর দেব! তবে নিতান্ত 'হাই-কোর্ট' মাত্রই দেখি নি বলে চোখ কান খোলা ছিল। এবং লক্ষ্য করেছি, স্পেন আর ইতালির মেয়েরা হয় তেজী আর স্বামী হ'ক প্রেমিক হ'ক তার উপর যে হক্‌ক বর্তায় সে সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানটি হয় খুবই টনটনে—ভয়ঙ্কর জেলাস। 'অভিমান' শব্দের ইংরিজি প্রতিশব্দ নেই, ইতালি ভাষায়ও খুব সম্ভব নেই। তবু ইতালির নিম্নশ্রেণীতে হিংসুটে রমণী প্রতি গলিতে গণ্ডায় গণ্ডায়, আর ভদ্রসমাজে অভিমানিনীরা অভিমানের চূড়ান্তে পৌঁছে আত্মহত্যাতে বোধ করি জাপানীদেরও হার মানায়। কাএতানির বউ এক অর্থে আত্মহত্যাই করলেন, এবং করলেন একটি জলজ্যান্ত খুন। কিন্তু এহ বাহ্য।

লেওনের মনে এর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সে-সম্বন্ধে সবিস্তর সংবাদ কেউই দিতে পারে নি। তবে তাঁর পরবর্তী আচরণ থেকে এ-সম্বন্ধে কিছুটা অনুমান করা যায়।

আন্নালির দশাংশের একাংশ তখনো শেষ হয় নি।

তার পর একদিন লেওনে ইতালি থেকে উধাও। কেউ জানে না কোথায় গেছেন।

তার কিছুদিন পরে খবর এল লেওনে তাঁর বিরাট জমিদারী বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে চলে গেছেন দূরের চেয়ে দূর সুদূর ক্যানাডায়। সেখানে সামান্য জমি-জমাসহ একটি কুটির খরিদ করেছেন। বনের ভিতর।

সেখানে দিন কাটান কি করে?

সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি জলের ধারে, বঁড়শি ফেলে।

কে জানে মাছ ধরা পড়তো কিনা।

আর তাঁর হাজার হাজার বই—অন্তত ত্রিশটি ভাষায়—যার উপর নির্ভর

করে, যে সব ইঁট-সুরকি দিয়ে তিনি তাঁর আন্নালি কুৎবমিনার গড়ে তুলেছিলেন ?

জানি নে। কিন্তু এ-কথা জানি, তিনি ক্যানাডা যাবার সময় একখানা বইও সঙ্গে নিয়ে যান নি।'

ডাক্তার বললেন, সে কি কথা ? তাঁর সমস্ত সাধনা বিসর্জন দিলেন ?'

'তাই তো বললুম, লেওনের বউ তাঁকে ছেড়ে যাবার সময় খুন করে গেলেন, পণ্ডিত লেওনেকে। আর যেহেতুক পণ্ডিত লেওনেই ছিলেন লেওনের চোদ্দ আন্না সত্তা তাই বলা যেতে পারে, তিনি লেওনেকেই খুন করলেন।

তিনি যেন যাবার সময় বলে গেলেন, "আন্নালিই যদি তোমার আরাধ্য দেবী হন, তবে আমার স্থান কোথায় ?"

লেওনে যেন উত্তরে বললেন, "তুমিই ছিলে আমার জীবনের আরাধ্যা। আন্নালি নয়। প্রমাণ ? সেই অসমাপ্ত আন্নালি-প্রতিমাকে ভেঙে চুরমার করে চললুম নিরুদ্দেশে।"

এবং আমার মনে হয়, লেওনে যেন পত্নীর উদ্দেশে বলতে চেয়েছিলেন, "তুমি রোমান সমাজের উচ্চশিক্ষিতা রমণী হয়েও বুঝতে পারলে না, আমি কাকে কোন্ জিনিসকে কতখানি মূল্য দিই।"

এ-কাহিনীর সমাপ্তি এখানেই নয়।

লেওনে কিন্তু তাঁর তাবৎ পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট করতে পারেন নি বা তাঁর সেদিকে হুঁশ ছিল না। কাজেই দশ-দশ বিরাট ভলুমে বেরুলো তাঁর আন্নালির অতিশয় অসমাপ্ত অংশ। আরবী প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবরা সেটিকে রাজমুকুটের কুহ্-ই-নুরের মত সম্মান দেন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবরা আন্দেশা করতে লাগলেন, লেওনেকে কি করে সেই পাণ্ডববর্জিত ক্যানাডা থেকে ফিরিয়ে এনে পুনরায় তাঁকে সুস্থ স্বাভাবিক করা যায়—যাতে করে অন্তত তিনি তাঁর আন্নালি সমাপ্ত করে যান।

এক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবদের সাধারণ সম্মেলনের পর পণ্ডিতরা গোপন বৈঠকে বসে স্থির করলেন কয়েকজন সমঝদার গোরেম্ভারী বৃদ্ধ পণ্ডিতকে পাঠাতে হবে, ডেপুটেশন, লেওনের কাছে। এঁদের সবাইকে বিনয়ী লেওনে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। এঁরা আপন আপন খরচে পৌঁছলেন, পৃথিবীর সেই সুদূর অন্য প্রান্তে ক্যানাডার ভ্যানকুভারে—বিনু নোটিশে। লেওনে সবাইকে তাঁর সরল অনাড়ম্বর কায়দায় অভ্যর্থনা জানালেন।

ডেপুটেশন ডিনারের পর কফি-লিকোর খেতে খেতে অতিশয় যুক্তিসম্মত পদ্ধতিতে, তাঁদের সমস্ত ধার, সমস্ত ভার, লেওনের স্কন্ধে নামিয়ে কি সব উপদেশ দিয়েছিলেন, কি সব অনুনয়বিনয় করেছিলেন তার কোনো প্রতিবেদন বা রিপোর্ট নেই, তবে আমি কল্পনা-রাজ্যে উড্ডীন হয়ে কিছুটা অনুমান করতে

পারি। কিন্তু আমার অনুমানে কি যায় আসে! এ যে এক বিরাট ট্রাজেডি। এ তো শুধু দুটি নরনারীর ব্যক্তিগত মান-অভিমান বিরহ-মিলন এবং সর্বশেষে অন্তহীন বিচ্ছেদের কাহিনী নয়—যেটা হর-আকছারই হচ্ছে—এখানে যে তার বাড়া রয়েছে, অকস্মাৎ অকালে ঐকটি প্রজ্ঞাপ্রদীপের অন্ধকারে নিলয়। শুধু পণ্ডিতজন না, য়ুরোপের বহু সাধারণ জনও আশা করেছিল, লেওনের আন্নালির জ্যোতিঃ ইস্‌লাম-ইতিহাসের বহু অন্ধকার গুহাগহ্বর প্রদীপ্ত করে তুলবে—কারণ লেওনে লিখতেন অতিশয় সাদামাটা সরল ইতালিয় ভাষা।

ডেপুটেশনের সর্ব বক্তব্য লেওনে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সঙ্গে শুনে বললেন, কয়েকদিন চিন্তা করে তিনি ডেপুটেশনকে তাঁর শেষ মীমাংসা জানাবেন।

ডেপুটেশন দেশে ফিরে গেল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরও তাঁরা লেওনের তরফ থেকে কোনো চিঠি পান নি।

লেওনে কাএতানি তাঁর খোলস দেহটি ত্যাগ করে ইহলোক ছাড়েন ক্যানাডাতেই, খৃষ্ট জন্মদিবসে, বড়দিনে, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে। তাঁর জন্ম রোম শহরে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে। আমার গুরু আমাকে এ-কাহিনীটি বলেন লেওনের মরজগৎ ত্যাগ করার প্রায় এক বৎসর পূর্বে।

যুদ্ধে মিসিং জোওয়ানের মা যেরকম বছরের পর বছর নিস্তব্ধ, সহিষ্ণু প্রতীক্ষা করে, তার দুলাল একদিন নিশ্চয়ই ফিরে আসবে, আমার গুরু আরবী শাস্ত্রে অতুলনীয় পণ্ডিত, স্নেহময়ী মাতার ন্যায় বহু বৎসর ধরে প্রতীক্ষা করতেন লেওনে একদিন আবার তাঁর ক্যানাডার অরণ্যানীর বনবাস ত্যাগ করে ফিরে আসবেন তাঁর মাতৃভূমি ইতালীতে। তার পর অধ্যাপক গুনগুন করে যেন আপন মনে বলতেন, "লেওনের মত এরকম স্পর্শকাতর লোক কি আমৃত্যু বিদেশ-বিভুঁইয়ে পড়ে থাকবে? নাঃ, হতেই পারে না। সে নিশ্চয়ই মৃত্যুর পূর্বে রোমে ফিরে আসবে। যাতে করে তার হাড্ডিগুলো তার মায়ের হাড্ডিগুলোর পাশে শেষ-শয্যায় শয়ান করা হয়।" কিন্তু আমার গুরুর এ দুরাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নি।'

ততক্ষণে ডাক্তার আবার খানিকটে সংবিতে ফিরে এসে কি যেন শুধোচ্ছে। আমি ঈষৎ উত্তপ্ত কণ্ঠে বললুম, 'ব্যস, আমরা মেডিকেল কলেজে পেঁছে গিয়েছি। এবারে আমি পাবলিশার্সদের কাছে যাচ্ছি।'

মনে মনে বললুম, বুদ্ধুটা এখনো যদি না বোঝে আমি কোন্ দিকে নল চালাচ্ছি, তবে ঝকমারি, ঝকমারি, হাজার বার ঝকমারি।

প্রকাশকদের সঙ্গে আমার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা এস্থলে অবান্তর।

তবে এস্থলে এ-বাবদে একটি কথা বলতে হয়। শহ্‌র্‌-ইয়ারদের বিস্তর টাকাকড়ি। আমার অর্থাভাব সে ভালোভাবেই বুঝতো, কিন্তু বুদ্ধিমতী রমণী বলে আরো জানতো আমাকে কোনো প্রকারের সাহায্য করতে চাইলে আমার আত্মাভিমানে লাগবে।

একদিন তাকে ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিলুম, 'আমি জীবনে সাতবার না আটবার ক'বার চাকরি রিজাইন দিয়েছি বলতে পারবো না। কারো সঙ্গে আমার বনে না। যখন চাকরিতে থাকি, তখন 'সাহিত্য-সৃষ্টি'র কোনো কথাই ওঠে না। মাইনের টাকা তো আসছে। বই লেখার কী প্রয়োজন? চাকরি যখন থাকে না, তখন 'পঞ্চতন্ত্র', 'শকুনম্‌' এসব আবোলতাবোল লিখতে হয়।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার তাজ্জব হয়ে শুধিয়েছিল, 'আপনি শুধু টাকার জন্য লেখেন!'

আমি বলেছিলুম, 'এগ্‌জ্যাক্‌ট্‌লি! মোস্ট্‌ সার্টেনলি!'

তারপর বলেছিলুম, 'জানো, শহ্‌র-ইয়ার, এ-বাবদে অন্তহীন সাহিত্যাকাশে আমিই একমাত্র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তারকা নই। মহা মহা গ্রহ-উপগ্রহও ঐ একই নভোমণ্ডলে বিরাজ করার সময় বলেছেন, লজ্জাঘৃণাভয় অনায়াসে তাচ্ছিল্য করে বলেছেন, কথাগুলো আমার ঠিক ঠিক মনে নেই, তবে মোদ্দা কথা এই, "নান্‌ বাট্‌ এ ফুল রাইট্‌স একসেপ্ট ফর মানি" অর্থাৎ "অর্থাগম ভিন্ন অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে লেখে শুধু গাড়োলরাই।" স্বয়ং ডক্টর জনসন বলেছেন, "আমি লিখি টাকার জন্য!" বুঝলে ইয়ার, 'শহ্‌র-ইয়ার?'

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চন করে শহ্‌র্‌-ইয়ার শুধিয়েছিল, 'আচ্ছা, কাল যদি আপনি দশ লক্ষ টাকার লটারি জিতে যান তবে কি করবেন?' (আমি জানতুম, ডাক্তারের জমিদারী, কলকাতার গণ্ডা গণ্ডা বাড়ি থেকে প্রতি মাসে ওদের দশ-পনরো হাজার টাকা আমদানি হয়, আর ব্যাঙ্কে আছে দশ-পঁচিশ লাখ)।

আমি সোল্লাসে বললুম, 'দশ লাখ? পাঁচ লাখ পেলেই আমার কাজ হাসিল। সঙ্গে সঙ্গে কালি কলম কাগজ পুড়িয়ে দিয়ে বলব, বাঁচলুম। এখন থেকে লিখব শুধু প্রেমপত্র, আর, আর চেকের উল্টো দিকে নাম সই।'

শহ্‌র-ইয়ার টাকাকড়ি বাবদে বড়ই অনভিজ্ঞা। শুধলো, 'চেকের উল্টো-পিঠে সই, তার অর্থ কি?' আমি লক্ষ্য করলুম, প্রেমপত্র নিয়ে সে কোনো প্রশ্ন শুধলো না। আর চেক্‌ফেক্‌ তো তার স্বামীর নায়েব সই করে। সে-সব জিনিস তার জানার কথা নয়।

বললুম, 'চেকের উল্টোপিঠে সই, মানে, সে-টাকা আমি পাবো। আর এ-পিঠে সই, তার মানে টাকাটা আমাকে দিতে হচ্ছে। জানো না, দিশী ছড়া:—

"হরি হে রাজা করো, রাজা করো।
যার ধারি তারে মারো॥
যার ধারি দু'চার আনা,
তারে করো দিন-কানা।
যার ধারি দু'শ চারশ'
তারে করো নির্বংশ॥"

বুঝলে চেকের এ-পিঠে সই করার প্রতি আমার অনীহা কেন?'

এস্থলে বলে রাখাটা প্রয়োজন মনে করি যে, আমার যে ক'টি ইয়েসমেন চেলা আছে, তারা সবাই তখন বলে, "না, স্যর! আপনার দশ লাখ টাকা পাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। ভগবান করুন, আপনার যেন চাকরি না জোটে। তাহা হইলে আপনি লেখনী বন্ধ করিবেন না। ফলস্বরূপ বঙ্গসাহিত্য শ্রীবৃদ্ধিশালী হইবেক, শনৈঃ শনৈঃ উন্নতিমার্গে উচ্চাশ্রমে প্রবেশ করিবেক।"

কিন্তু শহ্‌র্‌-ইয়ার এস্থলে সে-বুলি আওড়ালো না। সে বুদ্ধিমতী মেয়ে। বিলক্ষণ জানে, আমার 'সাহিত্যসৃষ্টি' সাম্প্রতিক যত মূল্যই ধরুক তার দীর্ঘস্থায়ী মূল্য নাও থাকতে পারে।

তা সে যাই হোক, প্রকাশকের কাছে দরিদ্র লেখকের দু'পাঁচ টাকার জন্য ধন্নে দেওয়াটা সে বিতৃষ্ণার সঙ্গে শুনে যেত। তার সহানুভূতি ছিল লেখকের সঙ্গে।

তাই জানতুম সে আমাকে শুধোবে না, আমি টাকা পেলুম কি না।

ড্রাইভার যখন বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীটে পেঁছিল তখন তাকে বললুম, 'তুমি বাড়ি যাও, আমি ট্যাক্‌সি ধরে ফিরব। মা-জী পীরের বাড়ি যাবেন। গাড়িটার দরকার হবে।'

কাঁচুমাচু হয়ে বললে, "কিন্তুক সায়েব যে বললেন, আমি আপনার জন্য গাড়িটা রাখি।"

স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, ড্রাইভারও শহ্‌র্‌-ইয়ারের এই গুরু নিয়ে মাতামাতি পছন্দ করে না।

তাই দৃঢ় এবং মোলায়েম কণ্ঠে বললুম, 'না, ভাই, তুমি বাড়ি যাও।'

ড্রাইভারকে শুধিয়েছিলুম, পীরের নাম ঠিকানা কি?

ঘণ্টাখানেক পরে সেই উদ্দেশে রওয়ানা দিলুম।

আমার এক মুসলমান চেলা একদিন আমাকে বলেছিল, সে নাকি তার এক ল্যাটাই-ভক্ত দোস্তের পাল্লায় পড়ে সেই দোস্তের পীর দর্শনে যায়। গিয়ে তাজ্জব মেনে দেখে, গুরু বসে আছেন একটা বিরাট হলের মাঝখানে। আর তাঁকে ঘিরে গোটা আষ্টেক ডপকী ছুঁড়ী দাঁড়িয়ে। তাদের উত্তমাঙ্গে ব্লাউজ-চোলী

নেই। ক্ষণে ক্ষণে শাড়ি খসে পড়ে গিয়ে বক্ষঃস্থল অনাবৃত করে দিচ্ছে। কেউ তখন শাড়ি তোলে, কেউ তোলে না। আর গুরু বলছেন, 'এই দেখো, আমি চতুর্দিকে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছি, কিন্তু আমার ঘি গলছে না।'

আমি ভেবেছিলুম, অতখানি না হলেও অনেকটা ঐ রকমেরই হবে। শহুর-ইয়ার নিশ্চয়ই কোনো বুজরুক শালটেনের পাল্লায় পড়েছে।

বিরাট গৃহে বসে আছেন পীরসাহেব। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে হতভম্ব।

পীরটি তো আমার প্রাচীন দিনের বন্ধু আমীনুর রশীদ মজুমদার !!

ষোল

আমি স্তম্ভিত।

আমি বেকুবের মত বাক্যহারা। এমন কি পীরসাহেবকে সেলামটা পর্যন্ত করতে ভুলে গিয়েছি। পীর মানি আর নাই মানি, স্বেচ্ছায় পীরের আস্তানায় গিয়ে তাকে সেলামটা পর্যন্ত করলুম না, এতখানি বেয়াদব, বেতমীজ মস্তান আমি নই।

বাড়িটা খুঁজে বের করতে আমার কিছুমাত্র অসুবিধা হয় নি। পার্ক সার্কাস আমার চেনা পাড়া। পীরমুর্শিদরা সচরাচর এ-পাড়াতেই আস্তানা গাড়েন। আমার এক পুত্রবৎ সখা মুসলমান ছেলে, কচিবাবু যে আমাকে একদিন বলেছিল, ঐ পীরসাহেবের কথা, গিয়ে দেখেছিল পীরসাহেবের চতুর্দিক গোটা আষ্টেক খাপসুরত ডপকী হুরী তাঁর চতুর্দিকে তাঁকে ঘিরে বসে আছে। আর তিনি নাকি ক্ষণে ক্ষণে উদ্বাহু হয়ে বলছেন, 'এই দেখো, এই দেখো, আমার চতুর্দিকে আমি আগুন জ্বালিয়ে রেখেছি, কিন্তু আমার ঘি গলছে না, আমার ঘি গলছে না।' কচিবাবু নাকি একেবারে বেবাক নির্বাক হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

আমি কিন্তু সেভাবে হতভম্ব হই নি।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় মনে হয়েছিল, একতলাতে বাড়ির মালিক সপরিবার বাস করেন, দোতলাতে পর্দা চিক ঝিলিমিলির প্রাচুর্য থেকে অনুমান করলুম, এখানে পীরসাহেবের শিষ্যারা আলাদা ভাবে থাকেন, আসেন।

তেতলায় যে ঘরে পীরসাহেব বসে আছেন সেটি অনাড়ম্বর। খানচারেক তক্তপোশ মিলিয়ে একটি ফরাশ। পীরসাহেব ছোট্ট একটি তাকিয়াতে হেলান দিয়ে ঐ তক্তপোশেই উপবিষ্ট কয়েকজন শিষ্যকে কি-একখানা চটি বই থেকে পড়ে শোনাচ্ছেন।

তক্তপোশের এ-পারে কয়েকখানি চামড়ামোড়া আরাম-কেদারা।

এ-সবেতে হতভম্ব হবার মত কিছু নেই।

পীরসাহেবের চতুর্দিকে ঘি-গলানেউলী অষ্টরমণী নেই, এমন কি চিত্রে

খৃস্টান সেণ্টদের মস্তকের চতুর্দিকে যে 'হেলো' বা 'জ্যোতিঃচক্র' থাকে সেটি পর্যন্ত তাঁর মস্তক ঘিরে নেই।

লৌকিক, অলৌকিক, কুলৌকিক কোনো কিছুই নেই। অত্যন্ত সাদামাটা পরিস্থিতি।

আমি স্তম্ভিত হলুম পীরসাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে।

আমি আন্দেশা করেছিলুম, দেখতে পাবো এক বুজরুক, ভণ্ড, শার্লাটেন। আমারই ভুল, আমারই বোঝা উচিত ছিল, শহ্‌র্‌-ইয়ার এ-রকম কাঁচা মেয়ে নয় যে বুজরুকি দেখে বানচাল হবে।

আমি অবাক, এই পীরটি আমার সাতিশয় পরিচিত জন।

বছর পঁচিশেক পূর্বে এঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর খ্যাতনামা পুত্র, পণ্ডিত বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের বাড়িতে—বরদায়; বিনয়তোষ ও আমি তখন বরদাতে সরকারী কর্ম করি। পীর খাঁটি বাঙালী মুসলমান।

শহ্‌র্‌-ইয়ারকে মনে মনে পুনরায় সানন্দ নমস্কার জানালুম। বাঙালী মাত্রই —কী হিন্দু, কী মুসলমান—হরবকত তাকিয়ে থাকে পশ্চিমবাগে। কন্নৌজের ব্রাহ্মণগুরু, দিল্লীর মুসলমানপীর এঁরা যেন এই 'পাপ' বঙ্গদেশে আসেন পশ্চিমের কোনো-এক 'পুণ্যলোক থেকে। একমাত্র কাবুলে দেখেছি, সেখানকার হাজার ষাটেক হিন্দু পুববাগে তাকায়, কারণ পশ্চিমবাগে তো আর কোনো হিন্দু নেই। তাই প্রতি দু'তিন বৎসর অন্তর তাদের এক গুরু আসেন বৃন্দাবন থেকে। তাদের মন্ত্র নেওয়া প্রাচ্চিত্তির-ফিত্তির করা বছর দুয়েকের জন্য বন্ধ থাকে।

শহ্‌র্‌-ইয়ারের হৃদয় মন গড়ে দিয়েছেন বাঙালী রবীন্দ্রনাথ।

ধর্মক্ষেত্রে সে যখন অবতরণ করলো তখন সে বরণ করেছে, বাঙালী পীর। বাঙালী পীরই তো বাঙালী রমণীর অভাব-অপরিপূর্ণতা বুঝতে পারবে সব চাইতে বেশী। শহ্‌র্‌-ইয়ার পশ্চিমবাগে তাকায় নি।

এই পীরটির নাম— অবশ্য তখনো তিনি পীর হন নি—আমীনুর রশীদ মজুমদার। তিনি গুজরাতে এসেছিলেন মধ্যযুগের পীরদের আস্তানার সন্ধানে। কবীর, দাদু, জমাল কমাল, বুড্ঢন্ এঁদের অনেকেই তাঁদের হিন্দু-মুসলমান-সম্প্রীতিমূলক মতবাদ প্রচার করেন গুজরাতে। তদুপরি বরদার অতি কাছেই নর্মদা নদী বয়ে যাচ্ছেন। হিমালয়ে প্রধানত থাকেন সাধু-সন্ন্যাসী। নর্মদার পারে পারে থাকেন পীর-ফকীর সাধু-সন্ন্যাসী দুই সম্প্রদায়। স্বর্গত অরবিন্দ ঘোষ বরদায় অধ্যাপনা করার সময় প্রতি শনি-সোম কাটাতেন নর্মদার পারে পারে উভয়ের সন্ধানে।

এই আমীন সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে তখনই বুঝে গিয়েছিলুম যে, বিনয়-তোষ সত্যই একটি সত্যান্বেষীকে বাড়িতে এনেছেন তাঁর চিন্তাধারা তাঁরা

অভিজ্ঞতা জানবার জন্য।

বিনয়তোষের ধর্মপত্নী ছিলেন ভূদেববাবুর আদর্শ ছাড়িয়েও প্রাচীনতরা হিন্দু-গৃহিণী। এদিকে পূজাআচ্চা ব্রত-উপবাসে পান থেকে চুন খসতো না, ওদিকে দরিদ্রনারায়ণ অতিথি সেবার বেলা তিনি বিলকুল নিষ্পরোয়া 'মুচি-মোচরমান' ডোমচাঁড়ালের সেবা করে যেতেন। বিরাট কাঁসার থালায় তিনি আমীনুর রশীদ মিঞার সেবা করলেন।

বিনয়তোষের অনুরোধে তাঁর ওপেল গাড়িতে করে মিঞাকে তাঁর বাসস্থানে নিয়ে গেলুম। সেখানে গিয়ে দেখি, তিনি একটি নিমবস্তী অশান্ত অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছেন।

আমি একটু আবছা আবছা ভাবে যেন ক্ষীণস্ফুট আত্মচিন্তা করলুম, 'এখানে আপনার অসুবিধা হচ্ছে না?'

আমীন সাহেবের স্মিতহাস্যটি বড় মধুর এবং কিঞ্চিৎ রহস্যময়। বললেন, 'তেমন কি আর অসুবিধে। এদের অধিকাংশই মুসলমান। কাপড়ের মিলে কাজ করে। মদ খায়, জুয়ো খেলে আর বউকে ঠ্যাঙায়। কিন্তু আমার মত বেকারের প্রতি তাদের স্নেহ আছে প্রচুর। তবে মাঝে মাঝে বড্ড বেশী চিৎকার হৈহুল্লোড়ের দরুন আমার কাজের একটু-আধটু অসুবিধে হয় বৈ কি!'

আমি একটু আশ্চর্য হয়ে শুধিয়েছিলুম, 'আপনার কাজটা কি?'

রশীদ সাহেব কোনো উত্তর দেন নি। আমি অনুমান করলুম, তিনি যে শুধু নর্মদার পারে পারে তত্ত্বানুসন্ধান করছেন তাই নয়, খুব সম্ভব ধ্যানধারণা, জিকুর-তসবী, যোগাভ্যাস, সুফী-চিত্তবৃত্তি-নিরোধও করে থাকেন

অতিশয় সবিনয় কিন্তু কিন্তু করে নিবেদন করলুম, 'আপনার যদি কোনো আপত্তি না থাকে তবে আমার বাড়িতে এসে থাকুন না।'

'কী দরকার! এই তো বেশ চলে যাচ্ছে। আপনাদের অসুবিধে হবে হয়তো।'

আমি বললুম, 'আমি তো একা থাকি। মাত্র একটি পাচক আছে। তবে সে মাছ-মাংস ছোঁয় না। ফলে আমিও বাড়িতে নিরামিষাশী। আপনার একটু কষ্ট হবে। আর আমার দিন কাটে কলেজে। অপরাহ্ণ আর রাত্রির এক যাম কাটাই আমার পার্শী সহকর্মী অধ্যাপক ওয়াডিয়ার বাড়িতে।'

জানি নে, হয়তো এই নিরামিষের চ্যালেঞ্জ মৎস্যভুক বঙ্গসন্তানকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসে।

কিন্তু আমীন মিঞা যদিও মাঝে মাঝে আমাকে নর্মদার পীর-ফকির সাধু-সন্ন্যাসীদের কাহিনী শোনাতেন তবু তিনি ছিলেন ঘোরতম সংসারী। প্রতি ভোরে ফজরের নামাজ পড়ে পাচক ইন্দ্ররায়কে নিয়ে বেরুতেন বাজারে। কেনা-কাটা সেরে বাড়ি ফিরে কুটনো কুটতেন, কয়লা ভাঙতেন, উনুন ধরাতেন আর

ইন্দ্ররায়কে হাতেকলমে বাতলাতেন কি প্রকারে ছানার ডালনা, ধোঁকার ঝোল, বড়ির চচ্চড়ি তৈরি করতে হয়।

আমি অত বোকা নই। আমি বুঝে গিয়েছি, তিনি কারো স্কন্ধারোহণ করে মুফতে থাকতে চান না। বরং যদ্যপি আমি সংসার চালানো বাবদে একটা আস্ত অগা, তথাপি লক্ষ্য করলুম, চিরকুমারকে বিবাহ বাবদে উৎসাহিত করে লোকে যে বলে, 'টু ক্যান লিভ্‌ অ্যাজ চীপলি অ্যাজ ওয়ান'—স্বামীস্ত্রীর যা খরচা অবিবাহিত পুরুষেরও সেই খরচা—সেটা কিছু মিথ্যে প্রলোভনকারী স্তোকবাক্য নয়। দু'জনার খরচাতে তিনজনেরও চলে। তদুপরি তখন ছিল সস্তাকড়ির বাজার।

বড় আনন্দে বড় শান্তিতে কেটেছিল ঐ ছ'টি মাস। কখনো আমীন মিঞার ঘরে, কখনো ৺বিনয়তোষের বারান্দায়, কখনো ওয়াডিয়ার রকে আমাদের চার-জনাতে নানাপ্রকারের আলোচনা হতো। সবচেয়ে মজার লাগত, বিনয়তোষ তন্ত্রঘেঁষা, আমীন মিঞা ভক্তিমার্গের সুফী, আর বরদা-আহমদাবাদ, সুরাট-বোম্বাইয়ের তাবৎজন জানতো, চার্বাকের পর সোহরাব ওয়াডিয়ার মত পাঁড় নাস্তিক কস্মিনকালেও ইহভুবনে অবতীর্ণ হন নি।

তারপর একদিন আমাদের কাউকে, এমন কি তাঁর জান দিলের দোস্তো ইন্দ্ররায়কে ছায়ামাত্র আভাস-ইঙ্গিত না দিয়ে আমীন মিঞা এক গভীর দ্বিপ্রহর রাত্রে নিরুদ্দেশ। জানতুম, অনুসন্ধান বৃথা, তবু আমরা তিনজনাই মাঝে-মধ্যে সেটা করেছিলুম। কোনো ফল হয় নি।

তার পরিপূর্ণ ত্রিশ বৎসর পর আবার আমাদের চারি চক্ষে মিলন।

পীরও কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলেন; তবে পীর, পুলিশ, ব্যারিস্টার, ডাক্তার সংসারের এত শত বিচিত্র জিনিস দেখবার সুবিধে-কুবিধে পান যে তাঁদের অভিজ্ঞতার কেলাইডেস্কোপ যত বিচিত্র প্যাটার্নই তৈরী করুক না কেন এঁরা সংবিৎ হারান না। 'কোন্‌ বাঁকে কী ধন দেখাবে, কোন্‌খানে কী দায় ঠেকাবে?' এই অপ্রত্যাশিতের আশা কবিদের—পীর পুলিশের নয়।

ততক্ষণে আমি সংবিতে ফিরেছি। আদব-মাফিক মাথা ঝুঁকিয়ে ওঁকে একটা সালাম জানিয়েছি। তিনি প্রত্যভিবাদন জানালেন। যদিও আমার শোনা ছিল, বহু পীর বহু গুরু প্রতিনমস্কার করেন না।

কারণ এত রবাহূত, অনাহূত এমন কি অবাঞ্ছিত জনও পীরের ঘরে সুবোশাম্‌ আনাগোনা করে যে এক পলিটিশিয়ান ভিন্ন অন্য কোনো প্রাণীর সাধ্য নেই যে, প্রত্যেককে ব্যক্তিগত 'সালামালিক' জানায়, বা 'শতংজীব' বলে।

আস্তানায় গিয়েছিলুম বেলা প্রায় চারটার সময়। ঐ সময় 'আসরের নামাজ' বা অপরাহ্ণকালীন উপাসনা আরম্ভ হয়। পীরসাহেব আসন ত্যাগ করে অন্য ঘরে

চলে গেলেন—অনুমান করলুম, নামাজ পড়তে। মুরীদান (শিষ্য সম্প্রদায়) পাশের মসজিদে নামাজ পড়তে রওয়ানা হলেন। আমি 'কি করবো, কি করবো' ভাবছি এমন সময় একজন পেরেমভারী চেলা এসে আমাকে কানে কানে বললেন, 'হুজুর আপনাকে তসলিমাৎ জানিয়েছেন। হুজুরের নামাজ-ঘরে একটুখানি আসবেন কি?' যে সসম্ভ্রম-কণ্ঠে চেলাটি আমাকে দাওয়াৎ-সন্দেশটি জানালেন, তার থেকে অনায়াসে বুঝে গেলুম যে পীরের নামাজ-ঘর হোলি অব্ হোলিজ, সানুথটুম-সানুক্টরুম, হিন্দু-মন্দিরের গর্ভগৃহপ্রায়। সেখানে প্রবেশাধিকার অল্পজনেরই। আর আমি প্রথম ধাক্কাতেই!

নামাজ-ঘরে ঢুকতেই পীর আমাকে আলিঙ্গন করলেন, তারপর ঘরের এক কোণে পাতা একখানি সিলেটি শেতল-পাটিতে আমাকে বসালেন, নিজেও বসলেন। দু' একটি কুশল প্রশ্ন শুধিয়ে বললেন, 'আপনি একটু নাশ্তা করুন। ততক্ষণে আমি নামাজটি সেরে নি।'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'সে কি করে হয়? আপনি নামাজ সারুন। তারপর একসঙ্গে খাব।'

অভিমানভরা কণ্ঠে পীর আমীন বললেন, 'এই তো আপনার সখার প্রতি ভালোবাসা, আর এই তো আপনার স্মৃতিশক্তি! আমি যে দিনে একবার খাই সেও ভুলে গেছেন?'

আমি বেহদ্ শরম পেলুম। এটা আমার মনে রাখা উচিত ছিল। তাই লজ্জাটা ঢাকবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে আমার মত মূর্খের মাথায়ও একটি মিথ্যা সদুত্তর জুটে গেল—নিছক আল্লার মেহেরবাণীতেই বলতে হবে। কারণ আসমান-জমীনে কে না জানে, মা সরস্বতী মূর্খকেই (যথা কালিদাস) হরহামেশা দয়া করেন; নইলে ঢালাকরা নিশ্চয়ই এতদিনে আমার মত কুল্লে বেওয়ারিশ বেকুবের সর্বস্ব গ্রাস করে, আমাদের 'সত্য নাশ' করে আমাদের পিতামহাশয়দের নির্বংশ করতো।

সেই কিস্মৎ-প্রসাদাৎ প্রাপ্ত কদুত্তরটি দিতে গিয়ে জড়িত কণ্ঠে বললুম, 'তা-তা-তা, সে-সে, সে তখন আপনি—আপনি ছিলেন আমার গরীবখানায়—'

পীরের কপালে যেন হাল্কা মেঘের সামান্য আবছা পড়েছে। তাই দেখে আমি থেমে গেলুম। তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আর এখন আমি পীর—না? এখন আমি যত খুশী গাণ্ডেপিণ্ডে গোগ্রাসে যত চাই তত গোস্ত গিলতে পারি—না?'

থেমে গেলেন। আমি আশঙ্কা করেছিলুম, এর পর তিনি আমাকে খোঁটা দিয়ে বলবেন, 'তাই আমি পীর হয়েছি—না? চেলাদের ঘাড় ভেঙে তাদের মগজ দিয়ে মুড়ি-ঘণ্ট খাবো বলে—না?'

না। এ লোকটি যে অতিশয় ভদ্র।

আমি চুপ করে গিয়েছি দেখে বললেন, 'ভাই সৈয়দ সাহেব, আমি জানি, আপনি খাঁটি পীরের নাতি। আপনি কথার মুখে কথায় কথায় ওটা বলে ফেলেছেন।

আমি খুশী হয়ে বললুম, 'আমি যে পীরের নাতি সেটা মেহেরবাণী করে আর তুলবেন না, সেটা দয়া করে ভুলে যান। আপনি তো নিশ্চয়ই ভুলে যান নি, ধর্মবাবদে আমি একটা আস্ত চিনির বলদ। ওটা দেখেছি, শুঁকেছি, ওর দরদাম নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছি, কিন্তু ওটা ককখনো চাখি নি—খেয়ে দেখা তো দূরে।'

তিনি বললেন, 'এসব কথা পরে হবে ; কেন আমি এখানে আছি, কেন আমি 'পীর' রূপে এখানে 'দর্শন' দিচ্ছি—'

ইতিমধ্যে সেই গেরেমভারী চেলা একটা বিরাট ট্রে নিয়ে এসে আমার পাশে রেখেছেন। তার উপর অতিশয় সযত্নে সাজানো দু'খানি মুড়মুড়ে চেহারা তেকোনা পরোটা, গ্রেট্‌ ঈস্‌টারনের পাঁউরুটির মত ফোলানো টেবো-টেবো বিরাট একটি মমলেট, ডুমো-ডুমো আলু-ভাজা, এবং কাঁচা-লঙ্কার আচার।

আমি আবার পেলুম দারুণ শক্‌। এ সব যা এসেছে এ তো আমার জন্য তৈরী করা শহ্‌র্‌-ইয়ারের ফেভারেট মেনু!

এ তো আমাদে উভয়ের প্রিয় মেনু!

কি করে শহ্‌র্‌-ইয়ার জানলো, আমি এখানে এসেছি?

কিন্তু এ-শক্‌টা সামলাতে না-সামলাতে পেলুম এর চেয়ে মোক্ষমতার দুসরা শক্‌।

পীরসাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, শহ্‌র্‌-ইয়ার বানু।' আর কিছু না বলে খাটে উঠে নামাজ পড়তে আরম্ভ করলেন।

সতেরো

আমি মিরাক্‌ল্‌ বা অলৌকিক কাণ্ডকারখানায় বিশ্বাস করি নে। যে ইরান কর্তাভজাগিরিতে ভারতের সঙ্গে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারে তারই এক গুণীজন হাফ-মস্করা করে বলেছেন :

'পীরেরা ওড়েন না, ওঁদের চেলারা ওঁদেরকে ওড়ায়।'

'পীরহা নমীপরন্‌দ্‌, শাগিরদান উনহারা মীপরানদ।'

বিশেষতঃ, এই পীর আমীন সাহেবকে আমি অন্তরঙ্গভাবে একদা চিনেছিলুম। তিনি যে এ-রকম একটা বাজে স্টান্‌ট্‌ মারবেন—খাস করে আমার উপর—যে, তিনি অলৌকিক প্রক্রিয়ায় ধরে ফেলেছেন, আমি শহ্‌র্‌-ইয়ারের সন্ধানে এসেছি সেটা আমি বিশ্বাস করতে নারাজ। কাজেই সে-কথা পরে জিজ্ঞেস করে জেনে নেব।

কিন্তু শহ্‌র্‌-ইয়ার জানলো কি করে যে আমি এখানে এসেছি ?

সে নিজে পর্দা মানে না, কিন্তু পীরসাহেব যে তাঁর শিষ্যাদের সম্পর্কে কিছুটা মানেন সেটা দোতলার চিক্‌, পর্দা থেকে খানিকটে অনুমান করেছিলুম। কিন্তু সেই চিকের আড়াল থেকে শহ্‌র্‌-ইয়ার যে উঁকিঝুঁকি মারবে সে-রকম মেয়ে তো সে নয়। বরঞ্চ আজকের মত মেনে নিলুম, শহ্‌র্‌-ইয়ার অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী হয়েছে। আজ বাড়ি ফিরে যদি কথা ওঠে, তবে সেই ইরানী গুণীর হাফ-মস্করাকে ডবল প্রমোশন দিয়ে তাকে বলবো—

'পীরেরা ওড়েন না, কিন্তু ও'দের চেলাদের, বিশেষ করে 'চেলী'দের কেউ কেউ ওড়েন।'

'পীরহা নমীপরন্‌দ্‌, ওয়া লাকিল বা'জী শাগিরাদান্‌ সখ্‌সান জনানা মীপরন্‌দ্‌।'

এতে তাজ্জব বনবার মত কী'ই বা আছে ? ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিশ্বজয় করেন নি কিন্তু তাঁর শিষ্য বাগ্মীরাজ বিবেকানন্দ করেছিলেন !

একজন নামাজ পড়ছেন, তার অনতিদূরে আরেকজন খাচ্ছে—এটা দৃষ্টিমধুর না হলেও ইসলামে বারণ নয়। হুঁঃ ! বারণ হবে কেন ? দূর-সম্পর্কের আমার ফুফুকে দেখেছি, বাচ্চার মুখে মাই তুলে দিয়ে তসবী-মালা জপ করতে।

আমি কোনো প্রকারের শব্দ না করে মিনিমামতম পরোটা খাচ্ছি—যদ্যপি শহ্‌র্‌-ইয়ারের আপন হাতে সযত্নে তৈরী (এটা ভুল বললুম, তাকে আমি অযত্নে কখনো কোনো কাজ করতে দেখিনি) খাস্তা, ক্রিস্‌প্‌, মুরমুরে পরোটা মর্মর-ধ্বনিবিবর্জিত কায়দায় খেতে পারাটা একটি মিনি-মিরাক্‌ল্‌—এমন সময় আমার চিন্তাম্বরের একপ্রান্তে একটি বিদ্যুল্লেখা খেলে গেল।

ওঃ ! তোমার আপন বাড়িতে আমি কি খাই না-খাই সে-বাবদে তুমি আমার যত না দেখ-ভাল করো তার চেয়ে এখানে তোমার হুঁশিয়ারি ঢের বেশী টনটনে ! গুরুর বাড়ির ইজ্জৎ ? না ?

অভিমানভরে হাত-চলা বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার বিবেকাম্বরে আরেকটি সৎ বুদ্ধির বিদ্যুল্লতা শাখা-প্রশাখা মেলে দিল ঃ

আমি কী নেমকহারাম ! মাত্র অর্ধদিবস, তার চেয়েও কম, হয়তো সম্পূর্ণ অজানায়, সে বাড়িতে ছিল না বলে আমি আমার পরিচিত পরিচর্যা পাই নি। আর সঙ্গে সঙ্গে বেবাক ভুলে গেলুম তার এতদিনের দিল্‌-ঢালা খেদমৎ, প্রাণ-ভরা সেবা ? ছিঃ ! এ তো সেই প্রাচীন কাহিনীর নিত্যদিনের পুনরাবৃত্তি ! যে-লোক একদা আমাকে হাতী দিয়েছে, ঘোড়া দিয়েছে, সে আজ বেরালটা দিল না বলে তন্মুহূর্তেই নিলাজ নেমকহারামের মত তাবৎ অতীতের অকৃপণ

দান ভুলে গিয়ে 'মার মার, কাট কাট' হুহুঙ্কার ছেড়ে তার পশ্চাতে খাণ্ডার নিয়ে তাড়া করা!

তদুপরি আরেকটা রীতি-রেওয়াজ মনে পড়ল। যদিও আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই তবু বিশ্বস্তজনের কাছে শুনেছি, যে পীরের কিছুমাত্র সামর্থ্য আছে সেখানেই মহিলা-শিষ্যারা আপন হাতে রান্নাবান্না করে, নাশ্‌তা বানিয়ে সমাগত জনের সেবা করেন। এ-রীতি তো অত্যন্ত স্বাভাবিক।

যে কাজ যারা উত্তমরূপে করতে পারে বিধাতা তাদেরই স্কন্ধে সে কাজ চাপান।

নইলে তিনি শেয়ালের কাঁধে দিতেন সিংহের কেশর, বেরালকে দিতেন হাতীর শুঁড়।

শহ্‌র্‌-ইয়ার যে বস্তু সব-চেয়ে ভালো তৈরী করতে পারে সেইটেই করেছে।

মনে শান্তি পেলুম। পীর মিরাকল্‌ করতে পারুন আর না-ই পারুন, বহু তৃষিত নরনারী শুষ্ক হৃদয় নিয়ে যেখানে ভক্তিভরে সমবেত হয়েছে সেখানে আল্লাতালা কিছু-না-কিছু শান্তির সুধাবারি বর্ষণ করবেনই করবেন!

এর সঙ্গে অবশ্য আরেকটি কথা যোগ দিতে হয়। শহ্‌র্‌-ইয়ারকে আমি দিনে দিনে, এতদিনে যে-ভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করেছি, তারপর তার যে-কানো আচরণ—সে আপাতদৃষ্টিতে যতই অপ্রিয় হোক্‌—গ্রহণ করতে গোপনে গোপনে সে-হৃদয় সব সময়ই তৈরী। চোরাবাজারীর চোরাই মাল নেবার জন্য কালো-বাজারী যে-রকম তৈরী থাকে।

প্রসন্ন মনে আবার হাত চালালুম। পরোটার অন্যপ্রান্ত চুরমুরুলুম।

অপরাহ্নের যে-আস্‌রের নামাজ পীর পড়ছিলেন শাস্ত্রাদেশে সেটি হুস্ব।

পীরসাহেব পনেরো মিনিটের ভিতর নামাজ শেষ করে উঠলেন। আমি উঠে দাঁড়ালুম। তিনি ঘরের এক কোণ থেকে একটা ভাঁজকরা ডেক চেয়ার টেনে এনে আমার সামনে সেটি পেতে বসলেন।

আমি চুপ করে আছি। যদিও একদা তিনি আমার সখা ছিলেন তবু তিনি আমার চেয়ে বয়সে বড়। বাক্যালাপ তিনিই আরম্ভ করবেন।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না; তিনিই বললেন, শহ্‌র্‌-ইয়ারের কথা ভাবছি।

আমার মনে সেই প্রথম প্রশ্নের পুনরুদয় হলো, তিনি জানলেন কি করে, আমি শহ্‌র্‌-ইয়ারের সন্ধানে এখানে এসেছি? তবু চুপ করে রইলুম।

বললেন, 'আমার কাছে অনেক লোক আসে। মনে আছে আপনার, আমরা যখন একসঙ্গে বরদাতে বাস করতুম তখন একদিন আপনি রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আমাকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন?—

"ভক্ত কবীর সিদ্ধপুরুষ খ্যাতি রটিয়াছে দেশে।
কুটির তাহার ঘিরিয়া দাঁড়ালো লাখো নরনারী এসে।
কেহ কহে, 'মোর রোগ দূর করি মন্ত্র পড়িয়া দেহো',
সন্তান লাগি করে কাঁদাকাটি বন্ধ্যা রমণী কেহ।
কেহ বলে 'তব দৈব ক্ষমতা চক্ষে দেখাও মোরে',
কেহ কয় 'ভবে আছেন বিধাতা বুঝাও প্রমাণ করে'।"

রবীন্দ্রনাথ মহান্ কবি। তিনি মানুষের কামনা-বাসনার সংক্ষিপ্ত একটি ফিরিস্তির ব্যঞ্জনা দিয়ে বাকিটা বিদগ্ধ পাঠকের কল্পনাশক্তির উপর বরাৎ দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আমাকে তো কল্পনা করতে হয় না। মানুষের সম্ভব অসম্ভব সব অভিলাষই আমাকে শুনতে হয়। বিশ্বাস করবেন কি, সৈয়দ সাহেব, জাল দলিলপত্র তৈরী করে, ভেজাল মোকদ্দমা রুজু করে আমার কাছে স্বেচ্ছায় অকপটে সেই কপটতা কবুল করে অনুরোধ জানায় আমি যদি তার জন্য সামান্য একটু দোওয়া করি তবে সে মোকদ্দমাটা জিতে যায়!'

আমি বিস্ময় মেনে বললুম, 'সে কি?'

ম্লান হাসির ইঙ্গিত দিয়ে পীর বললেন, 'উকীল, বৈদ্য আর পীরের কাছে কোনো কিছু লুকোতে নেই, এই হলো এদের বিশ্বাস। বিশেষ করে পীরের কাছে তো নয়ই। কারণ তিনি নাকি দিব্যদৃষ্টি দিয়ে মনের গোপন কথা দেখতে পান! এক পীরসাহেব তো কোনো মেয়েছেলেকে সামনে আসতে দিতেন না, কারণ তাঁর "আধ্যাত্মিক" শ্যেনদৃষ্টি নাকি কাপড়জামা ভেদ করে সব কিছু দেখতে পায়।'

আমি বললুম, 'থাক!'

'আপনি তো জানেন, আমি পারতপক্ষে ভালোমন্দের যাচাই করতে যাই নে। তবু শুনুন, সেদিন এক মারওয়াড়ি জৈন এসে উপস্থিত। ওদিকে জৈন কিন্তু এদিকে করুণাময়ের করুণাতে তার অশেষ বিশ্বাস। লোকটির সঙ্গে কথাবার্তা বলে বড় আনন্দ হলো। বড় সরল, অকপট, সজ্জন। ইতিমধ্যে শহ্‌রু-ইয়ার তাঁর জন্যে এক জাম-বাটি লস্‌সী পাঠিয়েছে। আমাদের কথাবার্তা সে বারান্দায় আড়ালে বসে শুনছিল। তার থেকে অনুমান করেছে, ইনি ছোঁয়াছুঁয়ি মানেন না, নইলে হিন্দু অভ্যাগতদের অনুমতি ভিন্ন সে কোনো খাবারের জিনিস ওঁদের সামনে পেশ করে না। আর আপনি তো জানেন, মেয়েটির দেহমনহৃদয় কতখানি সরলতা দিয়ে গড়া। সে মোহমুক্ত বলে প্রায়ই ভুল করে ভাবে ইহসংসারের সবাই বুঝি তারই মত সংস্কারমুক্ত।—শহ্‌রু-ইয়ারের কথা কিন্তু পরে হবে। এবারে সেই মারওয়াড়ি সজ্জনের কথা শুনুন। ...লস্‌সী সামনে আসতেই তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। আমি বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বললুম, "না, না, আপনাকে খেতে হবে না। আপনি হয়তো স্বতন্ত্র

পানাহার করেন না। সেটা তো কিছু মন্দ আচরণ নয়। আমিও তো বাড়ির বাইরে কোথাও খাই নে।" তখন তিনি কি বললেন জানেন? তিনি নিরামিষাশী। আমি একটু আশ্চর্য হয়ে শুধালুম, লস্‌সী আবার আমিষ হয় কি প্রকারে? তিনি যা বললেন তার অর্থ একটা পশুর রক্তমাংস নিংড়ে যে নির্যাস বেরয় সেটা সব চেয়ে কড়া আমিষ। তিনি খান—না, পান করেন সুন্দু মাত্র ডাবের জল। অন্য কোনো-কিছু খান না। সুন্দুমাত্র ডাবের জল খেয়ে লোকটি গত পঁচিশ বৎসর ধরে বেঁচে আছে!'

আমি বললুম, 'এ-ধরনের ডায়েটিং হয়, সে তো জানতুম না।'

পীর বললেন, 'আপনি ভাবছেন, আমি পীর ব'নে গ্যাঁট হয়ে বসে আছি বলে আমার আর-কিছু জানবার নেই, শেখবার নেই! হাজার দফা ভুল! নিত্য নিত্য শিখছি। তার পর শুনুন বাকিটা। হঠাৎ, বলা নেই, কওয়া নেই, ভদ্রলোক দু' হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে যা বললেন তার অর্থ, তাঁর ছেলেটা জাহান্নমে গেছে। মদমাংস মেয়েমানুষ নিয়ে অষ্টপ্রহর মেতে আছে। বুঝুন ব্যাপারটা, সৈয়দ সাহেব। যে-লোক মাছমাংস এমন কি দুধ পর্যন্ত না খেয়ে অজাতশত্রু হয়ে জীবনধারণ করতে চায়, তারই একমাত্র পুত্র হয়ে উঠেছে তার সব চেয়ে বড় শত্রু! তার পরিবারের শত্রু, তার বংশপরম্পরায় ঐতিহ্যের শত্রু, পিতৃপিতামহের আচরিত ধর্মের শত্রু।

সর্বশেষে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "আমি নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে কোনো পাপ করেছিলুম, তার জন্য আজ আমি এই শাস্তি পাচ্ছি। আপনি আমার ছেলের জন্য দোওয়া করুন।"

বলুন তো, তার সঙ্গে তখন পূর্বজন্ম পরজন্ম আলোচনা করে কী লাভ! আর দোওয়া তো আমি সকলের জন্যই করি, আপনিও করেন, কিন্তু, আমি কি মিরাক্‌ল্‌ করতে পারি?'

তার পর পীর বেদনাপীড়িত কণ্ঠে বললেন, 'কেন লোকে বিশ্বাস করে, আমি অলৌকিক কর্ম করতে সক্ষম!'

পীরসাহেব অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে রইলেন বলে আমাকে বাধ্য হয়ে সে-নীরবতা ভঙ্গ করতে হলো। বললুম, 'আপনাকে এ-সব ব্যাপারে আমার কিছু বলতে যাওয়া গোস্তাকি হবে। অপরাধ নেবেন না। তবু বলি, এ-সব লোক আসে আপনার কাছে ভক্তি-বিশ্বাসসহ। আপনি তাদের জন্য দোওয়া-আশীর্বাদ করলেই তারা পরিতৃপ্ত হয়।'

পীর বললেন, 'ঠিক। আমি তাই মারওয়াড়িকে বললুম, "আপনি শান্ত হোন।" তারপর তাঁকে এই নামাজের ঘরে এনে দু'জনাতে একাসনে বসে আল্লার কাছে দোওয়া মাঙলুম।'

এর পর পীর একদম চুপ মেরে গেলেন বলে আমাকে বাধ্য হয়ে শুধোতে

হলো, 'তার পর কি হলো ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'তার পর দীর্ঘ তিন মাস ধরে সে ভদ্রলোকের আর দর্শন নেই।'

তারপর আমি শহ্‌র্‌-ইয়ারের মুখে খবর পেলুম, ছেলেটি নাকি সৎপথে ফিরে এসেছে, এবং সে-ভদ্রলোক আমাদের পাড়ার জরাজীর্ণ মসজিদটি নিদেন ত্রিশ হাজার টাকা খর্চা করে মেরামত করে দিয়েছেন। ঠিক ঠিক বলতে পারি নে, হয়তো আমি মুসলমান বলেই।

আচ্ছা এবারে বলুন তো, এর মধ্যে আমার কেরামতি—মিরাক্‌ল্‌ কি ?'

আমি আর কি বলি ! কাকতালীয় হতে পারে, আল্লার অযাচিত অনুগ্রহ হতে পারে। কে জানে কি ? আমি চুপ করে নিরুত্তর রইলুম।

পীরসাহেব তখন স্মিতহাস্য করে বললেন, 'শহ্‌র্‌-ইয়ার কিন্তু তখন কি মন্তব্য করেছিল জানেন ?

কিন্তু আমি অতশত নানাবিধ জিনিস আপনাকে বলছি কেন বলুন তো ? ঐ সব শত শত হরেক রকমের লোকের মাঝখানে এখানে এল শহ্‌র্‌-ইয়ার।

কিন্তু আপনি একটু চিন্তা করবেন তো, শহ্‌র্‌-ইয়ার তখন কি মন্তব্য করেছিল ?'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে পীরসাহেব বললেন, 'ভক্ত কবীরের কাছে কে কি চেয়েছিল, সে তো জানেন। আমি কবীর সাহেবের পদধূলি হবার মত যোগ্যতাও ধরি নে, তবু আমারই কাছে কারা কি চায়, তার দুই প্রান্তের দু'টি এক্‌স্‌ট্রীম উদাহরণ আপনাকে দিলুম।

আজ পর্যন্ত আমি যে-সব পীরদের আস্তানায় ঘুরেছি, এবং আমার এই ডেরাতে যারা আসে, এদের ভিতর এমন একজনও দেখি নি, যে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ দিল নিয়ে এসেছে। অবশ্য বেশ-কিছু লোক আসেন তথাকথিত 'শাস্ত্রালোচনা' করতে। সেও এক বিলাস, ফ্যাশান। তা হোক্‌। আল্লা পাক্‌ কার জন্য কোন্‌ পথ স্থির করে দিয়েছেন, তার কী জানি আমি !

এরই মাঝখানে এল শহ্‌র্‌-ইয়ার। এক মুহূর্তেই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, সে কোনো কামনা নিয়ে আসে নি। বিশ্বাস করবেন না, সে আজ পর্যন্ত একবারের মতও আমার সঙ্গে 'শাস্ত্রালোচনা' পর্যন্ত করে নি। এযাবৎ একটি প্রশ্নমাত্রও শুধোয় নি।'

আমি হতভম্ব হয়ে শুধোলুম, 'সে কি ?'

'হ্যাঁ। এটা আপাতদৃষ্টিতে রহস্যময় মনে হতে পারে। সেটার সমাধান হলো, একদিন যখন শুনতে পেলুম, শহ্‌র্‌ ইয়ার কার যেন প্রশ্নের উত্তরে জনান্তিকে বলছে, সে এমন কিছু জিনিয়াস নয় যে উদ্ভট নতুন কোনো প্রশ্ন শুধোবে। সে নাকি অতিশয় সাধারণ মেয়ে। তার মনে অতিশয় সাধারণ

প্রশ্নই জাগে। সেগুলো কেউ না কেউ আমাকে শুধোবেই। আমি উত্তর দেব। ব্যস্‌, হয়ে গেল। কী দরকার ওঁকে—অর্থাৎ আমাকে—বিরক্ত করে।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'তা হলে সে আপনার শিষ্যা হলো কেন ?

পীরসাহেব একটু চমকে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে বললেন, 'আমার কোনো শিষ্য-শিষ্যা নেই। আমি কখনো মুরশীদরূপে মন্ত্র দিয়ে কাউকে শিষ্য বা শিষ্যারূপে গ্রহণ করি নি !'

আমি হতভম্ব।

ইতিমধ্যে বিস্তর লোক পাশের ঘরে জমায়েৎ হয়েছে।

এবং সান্ধ্য নামাজের আজান শোনা গেল।

পীর এবার এদের সঙ্গে নামাজ পড়বেন। তারপর শাস্ত্রালোচনা তত্ত্বালোচনা হবে হয়তো।

আমি হতভম্ব অবস্থাতেই বিদায় নিলুম।

আঠারো

যা জানতে চেয়েছিলুম তার কিছুই জানা হলো না; কল্পনায় যে ছবি এঁকেছিলুম তার সঙ্গে বাস্তবের ফিঙার প্রিন্ট একদম মিলল না। উল্টে রহস্যটা আরো ঘনীভূত হলো। কোনো-কিছুর সঙ্গে কোনো কিছুই খাপ খাচ্ছে না।

আমি কলকাতা থেকে আকছারই ট্রেনে করে বোলপুর যাই। একবার বোলপুর স্টেশনে ঢোকার পূর্বে সব-কিছু কেমন যেন গোবলেট্‌ পাকিয়ে গেল। কই, এতক্ষণে তো অজয় ব্রিজের উপর দিয়ে গাড়িটা গম গম করে পেরবে, তার পরে বাঁ দিকে পুকুর, ডানদিকে জরাজীর্ণ একটা দোতলা—কই সে-সব গেল কোথায় ? উল্টে মাথার উপর দিয়ে হুশ করে একটা ওভারব্রিজ চলে গেল ! এটা আবার রাতারাতি কবে তৈরী হলো ! এখন হঠাৎ আমার হুঁশ হলো, এবারে আমি কলকাতা থেকে বোলপুর আসছি না, আসছি ভাগলপুর থেকে। অর্থাৎ আমি স্টেশনে ঢুকছি দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে নয়, উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ভেল্কিবাজি। উত্তর হয়ে গেল দক্ষিণ, পূব হয়ে গেল পশ্চিম। বাইরের দুদিকের দৃশ্য ফটাফট্‌ ফিট করে গেল।

তবে কি আমি শহ্‌র্‌-ইয়ার রহস্যের দিকে এগুচ্ছিলাম উল্টো দিক দিয়ে ? তবে কি আমার অবচেতন মন প্রতীক্ষা করছিল, পীর আমার দিক্‌-ভ্রান্তি দেখিয়ে দেবেন আর সঙ্গে সঙ্গে শহ্‌র্‌-ইয়ার রহস্য অর্থাৎ তার আকস্মিক গুরুধর্মের কাছে ঐকান্তিক আত্মসমর্পণ, সাংসারিক নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের প্রতি প্রচ্ছন্ন ঔদাস্য, ত্রিযামা যামিনী ব্যাপি জপ-জিক্‌র্‌—এসব তার পূর্ববর্তী জীবনের সঙ্গে সহজ সরল ভাবে ফিট করে যাবে, সর্ব রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে ?

বরঞ্চ পীর যে সব দুটি একটি তথ্য পরিবেশ করলেন সেগুলো যেন চকিতে চকিতে বিজলী আলো হয়ে চোখেতে আরো বেশী ধাঁধা লাগালো।

সিঁড়ি দিয়ে আপন মনে ভাবতে ভাবতে নামছি এমন সময় জানা-অজানায় লক্ষ্য করলুম, কালো নরুনপেড়ে শাড়ি-পরা একটি বৃদ্ধা মহিলা নেমে যাচ্ছেন। মনে হলো হিন্দু বিধবা। আকণ্ঠ রহস্যনিমজ্জিত অবস্থায়ও আমার মনে রক্তিভর কৌতুক সঞ্চারিত হয়ে মানসিক মৃদুহাস্য বিকসিত হলো।...কে বলে, এদেশে হিন্দু মুসলমান সুন্দু ঝগড়া-ফসাদই করে! যান্ না, যে কোনো পীর-মুর্শিদ গুরু-গোসাঁইয়ের আস্তানায়। হিন্দু-মুসলমান তো পাবেনই, তদুপরি পাবেন গণ্ডাখানেক দিশী সাহেব, দু'চারটি খাস বিলিতি গোরা। তবে হ্যাঁ, কবিরাজ ওমর খৈয়াম বলেছেন, সর্ব ধর্মের সর্বোত্তম সম্মেলন পাবে শুঁড়িখানায়। সেখানে সব জাত, সব জাতি, সব ধর্ম সম্মিলিত হয়ে নির্বিচারে একাসনে বসে পরমানন্দে মদিরাপাত্রে চুম্বন দেয়।*

কিন্তু ভুললে চলবে না, সুফী-ফকীর সাধুসন্তরা সাবধান করে দিয়েছেন, এস্থলে মদিরা প্রতীক মাত্র, সিম্‌বল্। মদিরা বলতে এস্থলে ভগবদ্‌প্রেম বোঝায়। তাই তো পীর গুরুর আস্তানায় এত শত ছাপান্ন দেশের ইউ-নাইটেড নেশন, এবং তারো বাড়া, ইউনাইটেড রিলিজিয়ন ইউনাইটেড জাতবেজাতের সম্মেলন। এরা এখানে এসে জন্মগত পার্থিব সর্বপার্থক্য অগ্রাহ্য করে গুরুমুরশীদ—যিনি সাকী—তাঁর হাত থেকে ভগবদ্‌প্রেমের পেয়ালা-ভরা শরাব তুলে নেয়।...থাক্ গে এসব আত্মচিন্তা।

ততক্ষণে পেভমেণ্টে নেমে গিয়েছি।

সামনে দেখি একটা বেশ গাট্টাগোট্টা জোয়ান মর্দ—কেমন যেন ঈষৎ চেনা-চেনা—একটা কালো মোটর গাড়ির স্প্রিং-ভাঙা দরজাটা নারকোলের সরু দড়ি দিয়ে বাঁধছে।

আমার পাশে ততক্ষণে সেই বৃদ্ধা হিন্দু বিধবাটি এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে দেখে সেই জোয়ান (মিলিটারি অর্থে নয়, রূঢ়ার্থে) তাঁর দিকে এগিয়ে এল। হঠাৎ তার চোখ পড়ল আমার চোখের উপর। সঙ্গে সঙ্গেই একে অন্যকে চিনে ফেললুম।...বেশ কয়েক বছর পর পুনর্মিলন।

এ তো আমার শ্বশুরবাড়ির দ্যাশের লোক! নাম, ভূতনাথ খান। 'খান'

---

* ইরানের এক গণ্যমান্য সভাকবি নাকি নিকৃষ্টতম শুঁড়িখানায় চাঁড়ালদের সঙ্গে বসে ভাঁড়ে করে মদ্যপান করছিলেন। নগরপাল মারফৎ খবরটা জানতে পেরে বাদশা নাকি অনুযোগ করাতে কবি একটি দোহা রচনা করেন:

"হাজার যোজন নিচেতে নামিয়া আকাশের ঐ তারা
গোষ্পদে হ'ল প্রতিবিম্বিত; তাই হ'ল মানহারা?"

শব্ নম্, পৃ ১০।

পদবী মুসলমানের হলেও ওটা ওদের সম্পূর্ণ একচেটে নয়। খান হিন্দুসন্তান।

'তুমি এখানে?' অবাক হয়েই শুধোলুম। খানকে আমি চিনি। মহা পাষণ্ড। দেবদ্বিজে ভক্তি নেই, পীর মুর্শিদের তো কথাই ওঠে না।

'আপনি এখানে?' সেও সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো। কারণ সে বিলক্ষণ জানতো আমি পীরটীরের সন্ধানে কখনো বেরুই না। খান ঝাণ্ডু ছোকরা। তাই পুরো পাক্কা 'তরুণ', 'মডার্ণ' হয়েও প্রাচীন প্রবাদে বিশ্বাস করে, কাগে কাগের মাংস খায় না।

বৃদ্ধাকে কোমরে জড়িয়ে ধরে সে তাঁকে মোটরের পিছনের সীটে বসালো, কোনো প্রকারের প্রতিবাদ না শুনে আমাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে সামনে বসালে। স্টার্ট দিতে দিতে পিছনের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বললে, 'ঠাকুমা, এঁকে তুমি কখনো দেখ নি, কিন্তু চিনবে। তোমার ঐ শাজাদপুরের প্রতিবেশী মৌলবী বশীরুদ্দীনের মেয়েকে বিয়ে করেছেন—'

বাকিটা কি বলেছিল আমার কানে আসে নি। বৃদ্ধা তাকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে 'চুপ কর—'বলে তাঁর কম্পিত শীর্ণ হস্ত আমার মস্তকে রেখে বার বার আশীর্বাদ করতে লাগলেন। খানের সেই ভিস্টেজকারের নানাবিধ কর্কশ কানফাটা কোলাহল ভেদ করে যে ক'টি শব্দ আমার কানে এসে পৌঁছল তার একটি বাক্য শুধু বুঝতে পারলুম, "আঃ! তুমি আমার বশীর ভাইসাহেবের মাইয়ারে বিয়া করছো।" বুড়ি একই কথা বার বার আউড়ে যেতে লাগলেন।

আমার মনে দৃঢ়প্রত্যয় হল, বুড়ির কাপড়ের খুঁটে আকব্বরী মোহর বাঁধা ছিল না বলে তিনি সাড়ম্বর জামাইয়ের মুখদর্শন কর্ম সমাধান করতে পারলেন না। বুড়ি পিছনের সীটে গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়লেন। হায় দিদিমা, তুমি হয়তো এখন মনে মনে চিন্তা করছো, জামাইরে কি খাওয়াইমু!

আমি খানকে শুধালুম, 'তুমি ঐ পীরের আস্তানায় জুটলে কি করে?'

খান তার সেলফ-মেড্ একটা সিগারেট আমার দিকে এগিয়ে ধরে বললে, 'না, আমার কোনো ইনট্রেস্ট্ নেই। ঠাকুরমাকে আপিসে যাওয়ার সময় ড্রপ্ করে যাই, ফেরার সময় দুই এক পেগ স্যাঁট স্যাঁট করে নামিয়ে, ঠিক মগরীবের নামাজের ওক্তে তাঁকে ফের পিক্ অপ্ করে নি—'

ঠাকুরমা যাতে শুনতে না পান তাই ফিসফিস করে শুধালুম, 'সে তো বুঝলুম, কিন্তু আমি তো জানতুম, তোমার ঠাকুরমা নিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণী। তিনি আবার এই মুসলমান পীরের কাছে এলেন কি করে?'

খান বললে, 'অতি সহজ এর উত্তর। তাঁর নাৎনির মারফৎ। সেই নাৎনির এক ক্লাসফ্রেণ্ডের সঙ্গে ঠাকুরমার পরিচয় হয়। মেয়েটা মুসলমান।'

'ওরে বাব্বা!'

শিউরে উঠে ভূতনাথ খান বললে, অগ্নিশিখা, মশাই, অগ্নিশিখা।

অগ্নিকুণ্ডও বলতে পারেন। জহরব্রতের অগ্নিকুণ্ড। যেখানে গণ্ডায় গণ্ডায় লেডি-কিলার ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দিতে পারে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো নটবরই সে-অগ্নিকুণ্ডের কাছে যাবারও ইজাজৎ পান নি—ঝাঁপ দেওয়া দূরের কথা। লেডি-কিলার হিসেবে আম্মো কম যাই নে, হেঁহেঁ হেঁহেঁ, কিন্তু ঐ মুসলমানীর দিকে এক নজর বুলোতেই—সে তখন পীরসাহেবের বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নামছিল—হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেলুম এ-রমণী ফাঁসুড়ে। তার একটিমাত্র চাউনি যেন অদৃশ্য একখানা রুমালে পরিবর্তিত হয়ে সাঁ করে উড়ে এসে লটবরবাবুর গলাটিতে ফাঁস লাগিয়ে, জস্‌ট্‌ স্ট্রেঙলস্‌ হিম্‌ টু ডেথ, কিংবা বলতে পারেন, তার হী-ম্যান হবার প্ল্যানটি নস্যাৎ করে দেয়! বাপ্‌স্‌।'

রগ্‌রগে বর্ণনাটা শুনে আমার মনে কেমন যেন একটু কৌতূহল হলো। শুধালুম 'নামটা জানো?'

'দাঁড়ান, বলছি, স্যার। আরব্য উপন্যাসের কোন্‌ এক নায়িকা না নায়কের নাম। শহর-জাদী?' শহর-বানু? হ্যাঁ, হ্যাঁ, শহ্‌র-ইয়ার—'

আজ আমার বার বার স্তম্ভিত হবার অর্থাৎ নিশ্চল নির্বাক স্তম্ভে পরিণত হওয়ার পালা।

শুনেছি, একদা নগরের একাংশ সহস্র স্তম্ভের ('খাম্বা'র) উপর নির্মিত হয়েছিল বলে অদ্যকার ক্যাম্বে বন্দরকে গুজরাতিতে 'খাম্বাৎ' বলা হয়, প্রাচীন যুগে 'স্তম্ভপুরী' বলা হত। দিল্লীবাসীর কাছে এ-শব্দতত্ত্ব ফজুল। সেথাকার চৌষট্টিটি স্তম্ভের উপর খাড়া বলে আকবর বাদশার দুধবাপ আজীজ কোকলতাসের কবরকে 'চৌসট্‌ খাম্বা' বলা হয়।

আজ আমি এতবার হেথাহোথা স্তম্ভে পরিণত হয়েছি যে আমার উপর দিয়ে অনায়াসে কলকাতার ওভার-হেড রেলওয়ে নির্মাণ করা যায়!

ইতিমধ্যে ভূতনাথ ফের বকর বকর আরম্ভ করেছে। আমি ফের ফিসফিস করে বললুম, 'চুপ, চুপ। ঠাকুরমা শুনতে পাবেন। তুমি নিতান্ত অর্বাচীন; তাই জানো না, প্রাচীনারা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে-একটি মহৎ সদ্‌গুণ রপ্ত করে নেন সেটি হচ্ছে, যে-কথা তাঁরা শুনতে চান না, সেটা তাঁদের কানের কাছে কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে শোনালেও শোনেন না, আর যেটি তাঁরা শুনতে চান সেটি তুমি বাঁশবনের কলমর্মরের ভিতর 'রাজার মাথায় শিং গোছ গোপনে গোপনে বললেও তাঁরা দিব্য শুনতে পান। তাই তো তাঁরা দীর্ঘজীবী হন! আফ্‌টার্‌ অল্‌ কানের ভিতর দিয়ে যে-সব কথা মরমে পৌঁছে তার চৌদ্দ আনাই তো দুঃসংবাদ। অন্তত এ-যুগে।'

ভূতনাথ নিশ্চয়ই ভূতকালটা সম্বন্ধে ওয়াকিফ্‌-হাল। তদুপরি সে 'বৃথা-মাংস' খায় না, বৃথা তর্ক করে না। গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'সর্ব যুগেই, সত্যযুগেও।' পূর্বেই বলেছি, সে একটা আস্ত চার্বাক। আর আমার যদ্দুর

জানা, প্রথম চার্বাক এই পুণ্যভূমিতে অবতীর্ণ হন সত্য ও ত্রেতাযুগের মধ্যখানে। ভূতনাথ জাতিস্মর।

ঠাকুমা গুটি গুটি রান্নাঘরের দিকে রওয়ানা হলেন।

খাইছে!

ঠাকুমা নিশ্চয়ই তাঁর ভাইয়া বশীরুদ্দীনের জন্য যে ভাবে লুচি ভাজতেন সেইভাবে ভাজবার জন্য ভূতনাথের বউকে ফরমান ঝাড়বেন। তার বয়স ত্রিশ হয় কি না হয়। আমাদের পাড়ার চ্যাংড়া হীরু রায় বাজাবে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খানের সামনে বাজনা! তওবা, তওবা!

তা সে যাক্‌ গে।

ইতিমধ্যে ভূতনাথ আমাকে তার হাফ প্রাচীনপন্থী বৈঠকখানায় বসিয়ে ব্যাপারটি সংক্ষেপে সারলো:

'আপনি ঠিক বলেছেন, আমার ঠাকুরমা নিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণী। এখনো স্বপাকে খান। আমাকে তাঁর হেঁসেলে ঢুকতে দেন না। ইংরিজিতে একটা শব্দ আছে—এমরাল। মরাল নয়, ইমরালও নয়। আমার ঠাকুরমা এলিবারেল। তিনি ধর্মবাবদে লিবারেল নন্‌, ইলিবিরেলও নন—তিনি এলিবারেল। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলতে হয়, কারণ ঐ শহ্‌র্‌-ইয়ার বীবীর সঙ্গে তাঁর একটা সম্পর্ক আছে—অবশ্য সেটা অনেক পরের কথা।

উত্তরবঙ্গের কোন্‌ হিন্দু সর্ব মুসলমানের সংস্পর্শ বর্জন করে বাস করেছে কবে? তাই তিনিও মুসলমানদের কিছুটা চেনেন। যেমন আপনার মরহুম শ্বশুর সাহেবকে খুব ভালো ভাবেই চিনতেন।

কিন্তু আপন ধর্মচার তিনি করতেন—এখনো করেন—তাঁর মা শাশুড়ী যে-ভাবে করেছেন হুবহু সেইরূপ। অন্য ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর কোনো কৌতূহল কখনো ছিল না—এখনো নেই এবং সেখানে পুনরায় আসেন ঐ শহ্‌র্‌-ইয়ার বীবী। এমন কি এই হিন্দুধর্মেই যে—পুজা আচ্চার নানাবিধ পদ্ধতি রয়েছে সে সম্বন্ধে ঠাকুমা ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। তাই বলছিলুম তিনি ধর্মবাবদে ছিলেন এলিবারেল। তিনি তো, আর-পাঁচটা ধর্ম সম্বন্ধে ওয়াকিফ-হাল হয়ে সেগুলো রিজেক্‌ট্‌ করেন নি। সে হলে না হয় বলতুম, তিনি ইলিবিরেল, কট্টর, কনজারভেটিভ। হাওয়ার ধাক্কায় যখন তেতলার আলসে থেকে ফুলের টব্‌ নিরীহ পদাতিকের কাঁধে পড়ে তাকে জখম করে তখন কি সে-টব্‌ চিন্তা করে এই কর্মটি করেছে? সে কি চিন্তা করে জানতে পেরেছে, উক্ত পদাতিক অতিশয় পাপিষ্ঠ ব্যক্তি? অতএব ফুলের টব্‌-এর এ-কর্মটি এমরাল। ঠিক ঐ ভাবেই আমার ঠাকুরমার যাবতীয় চিন্তাধারা কর্মপদ্ধতি পুজা-আচ্চা সব, সব-কিছু ছিল এলিবারেল। ফুলের টব্‌-এর মতই তিনি ছিলেন অন্য পাঁচটা ধর্ম

সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, আন্‌কন্‌শাস,—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'থাক্‌, তোমার এসব কচকচানি। আমি জানতে চেয়েছিলুম, তোমার নিষ্ঠাবতী হিন্দু ঠাকুমা ঐ মস্‌লা পীরের মোকামে পেঁছিলেন কি করে?'

খান বড় সহিষ্ণু ব্যক্তি। বললে, স্যর, ঐ সময়ই নাট্যমঞ্চে শহ্‌রু-ইয়ার বানুর অবতরণ। তাই আমি তার পটভূমি নির্মাণ করছিলুম মাত্র। এইবারে আসল মোদ্দা কথায় পেঁছে গিয়েছি। শুনুন।

দেশ-বিভাগের পর ঠাকুমাকে প্রায় দৈহিক বল প্রয়োগ করে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। তিনি তাঁর শ্বশুরের ভিটে স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে ছাড়তে চান নি। এ-রকম বিস্তর কেস্‌ আপনি রেফুজি কলোনিগুলোতে পাবেন।

ঠাকুমার সঙ্গে দেশত্যাগ করে এসেছিল তাঁরই পিতৃকুলের সুদূর সম্পর্কের একটি অরক্ষণীয়া। রান্নাবান্না ধোয়ামোছার পরও আর কিছু করবার নেই বলে সে কলেজ যেত। ঠাকুমা ব্রাহ্মণী, ন্যাচ্‌রলী আত্মীয় পালিতা কন্যাও ব্রাহ্মণী। কিন্তু, মোশয়, সে যে-ক্লাসফ্রেণ্ডের সঙ্গে প্রেমে পড়লো সে এক বদ্দি সন্তান। তাকে বিয়ে করতে চায়।

ঠাকুমা তো শুনে রেগে কাঁই! কী! বদ্যির সঙ্গে বামুন মেয়ের বিয়ে! বরঞ্চ গোহত্যা করা যায়, গোমাংস ভক্ষণ করা যায়, কিন্তুক বামুনের সঙ্গে বদ্যি! বরঞ্চ ছুঁড়িটা ডোমচাঁড়াল, মুচিমোচরমান বিয়ে করুক। কারণ ঠাকুরমার মনঃসিন্দুকে একটি আপ্তবাক্য প্রায় গোপন তত্ত্বরূপে লুক্কায়িত আছে:

"একশ' গোখরোর বিষ নিয়ে সৃষ্টিকর্তা একটি বদ্যি তৈরী করেন।"

কিন্তু ঠাকুরমা জানতেন না যে, "একশ' বদ্যির বিষ নিয়ে সৃষ্টিকর্তা একটি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ তৈরী করেন।" আমরা বারেন্দ্র।' ভূতনাথ তার হোম্‌মেড্‌ সিগরেটে আগুন ধরাবার জন্য ক্ষণতরে চুপ করে গেল।

আমি গুনগুন করে বললুম, 'এবং একশ'টি বারেন্দ্রের বিষ দিয়ে আল্লাতালা তৈরী করেন একটি সৈয়দ।'

খান আস্ত একটা চাণক্য। কিন্তু এ-নীতিটি জানতো না। খানিকক্ষণ এই নবীন তত্ত্বটির গভীর জলে থাবি খেয়ে খেয়ে বললে।'

'তাই বুঝি সৈয়দরা এত বিরল?'

আমি বললুম, 'চোপ্‌, তুমি যা বলছিলে, তাই বলো।'

খান তাবৎ বাক্য হজম করে নিয়ে বললে, 'এ-হেন সময়ে, যে-নাট্যে ছিলেন সুন্দুমাত্র দুটি প্রাণী, ঠাকুমা এবং অরক্ষণীয়া, সেখানে প্রবেশ করলেন বীরপদভরে পৃথিবী প্রকম্পিতা করে একটি তৃতীয়া প্রাণী।

ভুল বললুম, স্যর, আমার মনে হল যেন আমাদের সরু গলি দিয়ে ঢুকলো

একটি জলন্ত মশাল। অথচ অলিম্পিকের টর্চ-বেয়ারার নেই। সুন্দুমাত্র মশালটাই যেন স্বাবলম্ব হয়ে, গলি পেরিয়ে, আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে, ঠাকুরমার ঘরে ঢুকলো।

সেই মশাল শহ্‌র্‌-ইয়ার। আপনাকে বলি নি, অগ্নিশিখা?'

আমি শুধালুম, 'কেন এসেছিল?'

'আজ্ঞে—'

এমন সময় ঠাকুমা আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। হাতে পাথরের থালা। খান ঠোঁটে আঙুল রেখে ইঙ্গিত দিলে, এই আর ও-কাহিনী বলা চলবে না।*

উনিশ

এত দিনে বুঝতে পারলুম, শহ্‌র্‌-ইয়ারকে আমি চিনি নি, চেনবার চেষ্টাও করি নি। কোনো মানুষকে দিনের পর দিন দেখলে, তার সঙ্গে কথা কইলেও তার একটা মাত্র দিক চেনা হয়। কারণ যার যে-রকম প্রবৃত্তি, সে সেই রকম ভাবেই অন্যজনকে গ্রহণ করে। শহ্‌র্‌-ইয়ার মদ্য আমার মনের পাত্র যখন পূর্ণ করলো তখন সে শেপ্‌ নিল আমার মনের গেলাসেরই শেপ্‌। কিন্তু সেইটেই যে তার একমাত্র শেপ্‌ নয় সেটা আমি আনমনে ভুলে গিয়েছিলুম। এমন কি তার স্বামী, ডাক্তার তাকে কি শেপ্‌-এ নিয়েছে সেটাও আমি ভেবে দেখিনি। এবং সে-ই বা তার গড়া—অবশ্য তার মনের মাধুরী মিশিয়ে গড়া শহ্‌র্‌-ইহারকে যে শেপ্‌ দিয়েছে সে নিয়ে আমার সঙ্গে 'ডিপ্লোমেটিক ডিস্‌প্যাচ একশ্‌চেঞ্জ' করতে যাবে কেন?

এইবারে একটি 'তৃতীয় পক্ষ' পেলুম যে শহর্‌-ইয়ারকে দেখেছে, একটুখানি দূরের থেকে—এবং তাতে করেই পেয়েছিল বেসট্‌ পারস্‌পেক্‌টিভ্‌—এবং তারই ভাষায়, সেই 'অগ্নিশিখা'কে সাইজ অপ্‌ করতে গিয়ে একদম বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে। আমিও মনে মনে বললুম, অগ্নিশিখা তো তরল দ্রব্য নয় যে তাকে তোমার মনের পেয়ালায় ঢেলে নিয়ে আপন শেপ্‌ দেবে!

ঠাকুমা চলে যেতেই ভূতনাথ দরজাতে ডবল খিল দিলে।

ছেঁড়া কথার খেই তুলে নিয়ে বললে, 'দ্রৌপদী, মশাই, সাক্ষাৎ দ্রৌপদী।"

---

* এই উপন্যাসের পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে আমি লিখি যে, প্রসিদ্ধ ইওরোপীয় প্রণয়গাথা "ত্রিস্তান ইজল্‌দে" বাঙলাতে অনুবাদিত হয় নি। বড়ই আনন্দের সঙ্গে জানাই, পক্ষাধিককাল পূর্বে জনৈক সাতিশয় মেহেরবান পাঠক আমাকে জানিয়েছেন যে তিনি স্বয়ং ঐ গাথা নিয়ে একটি—কিছুটা অনুবাদ, কিছুটা স্বয়ংসৃষ্ট—"ত্রিস্তান" কাহিনী বাঙলায় রচনা করেছেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে বে-এক্তেয়ার মহব্বৎ বশতঃ ঐ পুস্তিকার একখণ্ড আমাকে সওগাৎ করেছেন।

আমি শুধালুম, দ্রৌপদীর সঙ্গে তুলনা করছো কেন ?'

এক গাল হেসে বললে, 'কেন, স্যর, আপনিই তো হালে একখানা গবেষণাপূর্ণ রসরচনা ছেড়েছেন যাতে দেখিয়েছেন, এ-সংসারে একটি প্রাণ, তাও রমণী, কি করে পাঁচ-পাঁচশটা মন্দাকে তর্কযুদ্ধে চাটনি বানাতে পারে। সেই নারীই তো দ্রৌপদী। দুঃশাসন যখন তাঁকে জোর করে কুরুসভাস্থলে টেনে এনে হাজির করলো তখন তিনি যে স্বাধীনা, তাঁকে যে তাঁর অনিচ্ছায় প্রকাশ্য সভাস্থলে টেনে আনা সম্পূর্ণ বে-আইনী, আজকের আদালতী ভাষায় যাকে বলে 'আলট্রা ভাইরীসা' তাঁর সেই বক্তব্য যখন তিনি অকাট্য যুক্তির পর যুক্তি দিয়ে পেশ করতে লাগলেন, ভুল বললুম, পুশ্ করতে লাগলেন, সজোরে কড়া কড়া যুক্তিসহ —তখন কী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মদেব, কী দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিষ্ঠাচারী দ্রোণাচার্য কেউ কি কোনো উত্তর দিতে পেরেছিলেন ?···তার এক হাজার বছর পরে সোক্রাতেস—না ? তারপর এ-তাবৎ ব্রাঙ্কো ! না—?'

আমি অধৈর্য হয়ে বললুম, 'থাক ! তোমার কচকচানি থামাও। শহ্‌র্‌-ইয়ারের কথা কও !'

পূর্বেই বলেছি শ্রীমান ভূতনাথ বৃথা তর্ক করে না। ঘাড় নেড়ে বললে, 'শহ্‌র্‌-ইয়ারের কথাই তাবৎ শহরের ইয়ার—অথবা হওয়া উচিত।

ভেবে দেখুন, ঠাকুমা একা। শহ্‌র্‌-ইয়ার একাই একশ' দ্রৌপদী। ঠাকুমা পারবেন কেন ? শহ্‌র্‌-ইয়ার কি যুক্তিতর্ক উত্থাপন করেছিলেন সে আমার জানা নেই, কারণ আমার কলিজাতে পুকুর খোঁড়ার ভয় দেখালেও তখন আমি সে-সভাঙ্গমে যেতে রাজী হতুম না। ঠাকুমা একে মেয়েছেলে তদুপরি বৃদ্ধা। তাঁর কথা আলাদা। কিন্তু আমি মন্দা। আমাকে ঐ দ্রৌপদী চিবিয়ে গিলে ফেলত না—যদিস্যাৎ তার মনে ক্ষণতরেও সন্দেহ হতো, আমি ঠাকুমার পক্ষ সমর্থন করতে এসেছি !'

আমি সত্যিই তাজ্জব মানলুম। শহ্‌র্‌-ইয়ারকে তো আমি চিনি, শান্তা, স্নিগ্ধা কল্যাণীয়া রূপে। সে যে তর্কাঙ্গনে রণরঙ্গিনী হয়ে তার রুদ্রাণী রূপ দেখাতে পারে সে কল্পনা তো আমি কখনো করতে পারি নি।···তাই তো বলছিলুম, 'তৃতীয় পক্ষে'র মতামত অবর্জনীয়।

ইতিমধ্যে ভূতনাথ ঘাড় চুলকে চুলকে বললে, 'পরে আমার কানে কি একটা ঐতিহাসিক যুক্তিও এসেছিল। বেগম্ শহ্‌র্‌-ইয়ার যা বলেছিলেন তার মোদ্দা নির্যাস ছিল ঃ

বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ শ্রমণকে একাসনে বসিয়ে বার বার বলতেন, "ব্রাহ্মণ-শ্রমণ, ব্রাহ্মণ-শ্রমণ।"

তার বহু শত বৎসর পর, বৌদ্ধধর্ম যখন এদেশ থেকে লোপ পেল, তখন সর্বশেষে, এই শ্রমণরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলেন। এবং হিন্দুধর্মানুযায়ী বিবাহাদি

করলেন। তাঁদেরই বর্তমান বংশধর বৈদ্যসম্প্রদায়। অতএব তাঁরা ব্রাহ্মণদেরই মত কুলসম্মান ধারণ করেন। একদা তারা শ্রমণরূপে লোকসেবার জন্য আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করতেন, হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করার পর তাঁরা সেই বৈদ্য-বিদ্যাই জীবিকারূপে গ্রহণ করলেন। তারপর—'

আমার কান তারপর ভূতনাথের আর কোনো কথাই গ্রহণ করে নি। কারণ আমার মন তখন বিস্ময়বিমূঢ়। আমি ভালো করেই জানতুম, শহ্‌র্‌-ইয়ার ইহজন্মে কখনো কোনো প্রকারের গবেষণা করে নি।...এমন কি তার স্বামী যে মেডিকাল রিসার্চে আচৈতন্য নিমজ্জিত সেটাও সে বোধ হয় হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারে নি। অবশ্য সে এযাবত ইতালির লেওনে কাএতানির স্ত্রীর মত বিদ্রোহ ঘোষণা করে নি।

তবে কি তাবৎ সমস্যা এভাবে দেখতে হবে যে, কাএতানির স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন, আর শহ্‌র্‌-ইয়ার স্বামীকে ত্যাগ না করে ধর্মে আশ্রয় নিয়েছে!

ভূতনাথ বললে, 'সে বিয়ে তো নির্বিঘ্নে হল। কিন্তু আমার মনে হয়, বীবী শহ্‌র্‌-ইয়ার ঠাকুমাকে কাবু করেছিলেন, যুক্তিতর্ক দিয়ে নয়, তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে। "ব্যক্তিত্ব" বা পার্সনলাটি বললে অল্পই বলা হয়। বরঞ্চ ঐ যে আমি বললুম, "অগ্নিশিখা"—সেই অগ্নিশিখা যেন আগুনের পরশমণি হয়ে ঠাকুরমাকে—'

হঠাৎ ভূতনাথের ভাব পরিবর্তন হল। আপন উৎসাহের আবেগ আতিশয্যের ভাটি গাঙে এতক্ষণ অবধি সে এমনই ভেসে চলেছিল যে শহ্‌র্‌-ইয়ার সম্বন্ধে আমার কৌতূহলটা কেন সে-সম্বন্ধে সে আদৌ সচেতন হয় নি। এখন যেন হঠাৎ তাঁর কানে জল গেল।

ভুরু কুঁচকে আমার দিকে ঈষৎ সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে—অবশ্য পরিপূর্ণ লাল-বাজারী ডবল-ব্যারেল বন্দুকের দু'নাল উঁচিয়ে নয়—জিজ্ঞেস করলে, 'স্যর, আপনি কি ওনাকে চেনেন?'

'হ্যাঁ।'

বেচারা ভূতনাথ! অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বললে, 'মাফ করবেন, স্যর, প্লীজ। আপনার সামনে ওঁর সম্বন্ধে আমার এটা-ওটা বলাটা বড্ডই বেয়াদবী হয়ে গিয়েছে।'

আমি বললুম, 'সে কি কথা! তুমি তো এখনো তার কোনো নিন্দে করো নি। এবং ভবিষ্যতে করবে বলেও তো মনে হয় না। এটাকে তো পরনিন্দা পরচর্চা বলা চলে না।...আর আমি জানতে চেয়েছিলুম বলেই তো তুমি আমাকে এ-সব বললে। আর, এগুলো আমার কাজে লাগবে।'

যেন একটুখানি শঙ্কিত হয়ে খান শুধোলে, 'এনি ট্রবল, স্যর?'

আমি বললুম, 'ইয়েস্‌। কিন্তু সে-কথা পরে হবে। তুমি যা বলছিলে,

বলে যাও।'

কথঞ্চিৎ শান্তি পেয়ে ভূতনাথ বললে, 'বলার মত তেমন আর বিশেষ-কিছু নেই। পূর্বেই বলেছি, বিয়ে হয়ে গেল। চতুর্দিকে শান্তি। শহুর-ইয়ার ঠাকুমাকে দেখতে আসেন কি না তাও জানি নে।...ইতিমধ্যে ঠাকুমা যখন নিশ্চিন্দ মনে ওপারে যাবার জন্য যাব-যাচ্ছি যাব-যাচ্ছি করছেন তখন তাঁর জীবনসন্ধ্যায় এল একটা দুর্ঘটনা। তাঁর এক পিঠাপিঠো ছোট ভাই বহু বৎসর ধরে হিমালয়ে ঘোরাঘুরি করতেন, দু'তিন মাস অন্তর অন্তর দিদিকে পোস্ট-কার্ডও লিখতেন।

হঠাৎ একদিন এক চিঠি এল সেই ভাইয়ের এক বন্ধুর কাছ থেকে—তিনিও তাঁর সঙ্গে হিমালয় পর্যটন করতেন। চিঠির মূল বক্তব্য ছিল, মাস তিনেক ধরে সেই ভাইয়ের সন্ধান নেই।

ঠাকুমার আদেশে আমাকেই যেতে হল হিমালয়ে তাঁর খোঁজে। সে দীর্ঘ নিষ্ফল কাহিনী আপনাকে আর শোনাবো না। তিন মাস পর ঠাকুমার আদেশে কলকাতায় ফিরে এলুম।

এসে দেখি, যা ভেবেছিলুম ঠিক তার উল্টো।

ঠাকুমা শান্ত প্রশান্ত।

আমি অনুসন্ধান করে জানতে পারলুম, ইতিমধ্যে ঐ শহুর-ইয়ার বীবী নাকি ঠাকুমাকে কোন্ এক পীরের আস্তানায় নিয়ে গিয়েছেন এবং সেখানে তিনি মনের শান্তি পেয়েছেন। সে তো খুব ভালো কথা। দেহমনের শান্তিই তো সর্বপ্রধান কাম্য। কিন্তু আপনি জানেন, আমি এ-সব গুরুপীর কর্তা-ভজাদের একদম পছন্দ করি নে।'

আমি বললুম, 'আমিও করি না।'

ভূতনাথ বললে, 'কিন্তু অনুসন্ধান করে জানলুম, শহুর-ইয়ার নাকি ঠাকুমাকে পীরের আস্তানায় নিয়ে যাবার পূর্বে পাকাপাকিভাবে বলেছে, "পীর সাহেব আপনার ভাইকে হিমালয় থেকে এখানে উড়িয়ে নিয়ে আসবেন না। কিন্তু আমি আশা রাখি, তিনি আপনাকে কিছুটা মনের শান্তি এনে দিতে পারবেন—আল্লার কৃপায়"।'

ভূতনাথ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'তাই তো এই মহিলার প্রতি আমার এত শ্রদ্ধা।'

কুড়ি

কলকাতা মহানগরীর কোনো কোনো অঞ্চলে মধ্যরাত্রে যে নৈস্তব্ধ্য উপভোগ করা যায় গ্রামাঞ্চলে সেটা অতখানি সহজলভ্য নয়। যদ্যপি কবিরা ভিন্ন মত পোষণ করেন। জনপদবাসী দুপুর রাত্রে কেমন যেন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে জানে না। এ-বাড়ি থেকে নিদ্রাহীন বৃদ্ধের কাশির শব্দ, ও-বাড়ি থেকে চোর সম্বন্ধে মাত্রাধিক সচেতন মরাই-ভরা ধানের গেরেমভারী মালিকের গলা-খাঁকরি, চিকিৎসাভাবে কাতর জ্বরাতুর শিশুর নির্জীব গোঙরানো এসব তো আছেই, তার উপর পশুপক্ষীর নানা রকমের শব্দ। তারা যেন মধ্যরাত্রে একাধিক শত্রুর অতর্কিত আক্রমণের ভয়ে আতঙ্কিত। অথচ বেশ লক্ষ্য করা যায়, এদের ভিতর তখন এক রকমের অপ্রত্যাশিত সহযোগিতা দেখা দেয়। হঠাৎ মোরগটা ভয় পেয়ে ডেকে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে উঠলো, ছাগলটা ম্যাঁ ম্যাঁ করলো, সর্বশেষে পাশের গোয়ালের গাইটা একটুখানি ঘড় ঘড় করলো,—খুব সম্ভব চেক্ অপ্ করে নিলো, অধুনা প্রসবিত তার বাছুরটি পাশ ছেড়ে কোথাও চলে যায় নি তো!

একমাত্র ব্যত্যয় আমার আলসেশিয়ান 'মাস্টার'। সে ঐ ঐকতানে কস্মিনকালেও যোগ দেয় না, যদিও তার কণ্ঠই এ-অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা গ্রাম্ভারী। সোজা বাঙলায়, গম্ভীর অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী! তার কারণ সে তার আচার-আচরণে অনুকরণ করে আমাকে। আমি নীরব থাকলে সেও নিশ্চুপ। আমিও তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করি—সর্বোপরি তার ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা। কিন্তু এ-শীলে সে আমাকে রোজই হার মানায়।

হুঁঃ। ঠিক। শহুর্-ইয়ারকে আমি একটি আলসেশিয়ান-ছানা সওগাৎ দেব।

হঠাৎ একটা লোক আমার সামনে দাঁড়িয়ে বললে, 'হুজুর, মাফ করবেন। এই তো আমাদের বাড়ি।'

ওঃ হো! তাই তো। আমি এ-বাড়ি ছাড়িয়ে বেখেয়ালে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে চলে যেতুম, কে জানে।

অর্থাৎ এই লোকটিকে মোতায়েন করা হয়েছে, আমি যদি রাত সাড়ে তেরটার সময় বাড়ির সামনে চক্কর খাই তখন সে যেন আমাকে ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু এই লোকটাকে মোতায়েন করল কে? ডাক্তার? তার তো অতখানি কমন্ সেন্স নেই। শহুর্-ইয়ার? সে তো পীরের আস্তানা থেকে ফেরে অনেক রাতে।

দীর্ঘ চত্বর পেরিয়ে যখন বাড়িতে ঢুকলুম, তখন দেখি আরো দুটি লোক জেগে বসে আছে। স্পষ্টতঃ আমার-ই জন্য। আমি লজ্জা পেলুম। তিন-তিনটে লোককে এ-রকম গভীর রাত অবধি জাগিয়ে রাখা সত্যই অন্যায়।

এ-পাপ আর বাড়ানো নয়। চুপিসাড়ে আপন ঘরে ঢুকে অতিশয় মোলায়েমসে খাটে শুয়ে পড়বো। আলোটি পর্যন্ত জ্বালাবো না। সুইচের ক্লিক্-এ যদি ডাক্তার, শহ্‌র্-ইয়ারের ঘুম ভেঙ্গে যায়, আর আমার ঘরে হামলা করে!

এক কথায়, মাতাল যে-রকম গভীর রাত্রে বাড়ি ফেরে।

অতিশয় সন্তর্পণে দরজার হান্ডিলটি ঘুরিয়ে ঘরে ঢুকে আমি অবাক! ঘর আলোয় আলোময়। আমার খাটের পৈথানের কাছে যে কেদারা তার উপর বসে আছে শহ্‌র্-ইয়ার!

কিছু বলার পূর্বেই সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আপনি আমাকে আর কত সাজা দেবেন?'

আমার মুখে কোনো উত্তর জোগালো না। কিসের সাজা? ওকে দেব আমি সাজা! ওর মত আমার আপন জন এ-দেশে আর কে আছে?

এ-স্থলে সাধারণজন যা বলে, তাই বললুম 'বসো!'

কিন্তু শহ্‌র্-ইয়ার যেন লড়াইয়ে নেমেছে।

তার চেহারা দেখে কেচ্ছা-সাহিত্যের দুটি লাইন আমার মনে পড়ল:

'রাণীর আকৃতি দেখি বিদরে পরাণ।
নাকের শোওয়াস যেন বৈশাখী তুফান॥'

কিন্তু আমি কোন মতামত প্রকাশ করার পূর্বেই সে বললে, 'আমি খুব ভালো করেই জানি, কলকাতার রাস্তাঘাট আপনি একদম চেনেন না। ওদিকে গাড়ি-ড্রাইভার দিলেন ছেড়ে। এদিকে রাত একটা। তখন কার মনে দুশ্চিন্তা হয় না, বলুন তো!'

এ-সব অভিযোগ সত্ত্বেও আমার হৃদয় বড় প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। কারণ, এতক্ষণে আমার কাছে বেশ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, কাল রাত্রে, আজ সকালে তার চোখে অর্ধসুপ্ত, আচ্ছন্ন-আচ্ছন্ন যে ভাবটা ছিল সেটা প্রায় অন্তর্ধান করেছে। সেই প্রাচীন দিনের শহ্‌র্-ইয়ারের অনেকখানি—সবখানি না—যেন ফিরে এসেছে। এর কারণটা কি? তখনো বুঝতে পারি নি। পরে পেরেছিলুম। সে-কথা আরো পরে হবে। কিন্তু উপস্থিত তার এই অবস্থা পরিবর্তনের পুরো-পুরি ফায়দাটা ওঠাতে হবে।

আমি গোবেচারি সেজে বললুম, 'তা তো বটেই। আমি যে কলকাতার রাস্তাঘাট চিনি নে সে তো ন'সিকে সত্য কথা। এই তো, আজ সন্ধ্যায়ই, আমি ট্যাক্সি ধরে গেলুম ধর্মতলা আর চৌরঙ্গীর ক্রসিং-এ। আমি জানতুম, সেখানে ঠন্‌ঠনের কিংবা কালীঘাটের মা-কালীর মন্দির। ও মা! কোথায় কি! সেখানে দেখি টিপ্পু সুলতানের মসজিদ। কি আর করি। ওজু করে দু'রেকাৎ নফল্ নামাজ পড়ে নিলুম। তারপর বেরুলুম দক্ষিণেশ্বর বাগে। সেখানে তো জানতুম, মৌলা আলীর দরগা—'

এতক্ষণে শহ্‌র্‌-ইয়ারের ধৈর্যচ্যুতি হলো।

তবু, প্রাচীন দিনের মত শান্ত কণ্ঠে বললো, 'দেখুন, আপনারা সাহিত্য সৃষ্টি করেন। আপনাদের কল্পনাশক্তি সাধারণজনের চেয়ে অনেক বেশী, ভাষা আপনাদের আয়ত্তে, স্টাইল আপনাদের দখলে। সেই ক্ষমতা নিয়ে আপনারা অনেক-কিছু করতে পারেন—লোকে ধন্য ধন্য করে। কিন্তু আমাদের নিতান্ত ব্যক্তিগত জীবনে আপনি সে-সব শস্ত্র ব্যবহার করেন কেন? সেটা কি উচিত? আমরা কি তার উত্তর দিতে পারি? আমরা—'

প্রাচীন দিনের শহ্‌র্‌-ইয়ার যেন নবীন হয়ে দেখা দিচ্ছে।

আমি তারই সুযোগ নিয়ে মন্তব্য করলুম, 'বড় খাঁটি কথা বলেছ, শহ্‌র্‌-ইয়ার। এ-কর্ম বড়ই অনুচিত!...আমি তোমারই পক্ষে একটি উদাহরণ দি :—

আমাদের শান্তিনিকেতনে কয়েক বৎসর পূর্বে একটি অপ্রিয় ঘটনা ঘটে। তার জন্যে কে দায়ী আমি সঠিক জানি নে। হয় জনৈক অধ্যাপক, নয় ছাত্ররা। তখন শান্তিনিকেতনবাসী জনৈক প্রখ্যাত লেখক ছাত্রদের বিরুদ্ধে একটা কঠোর কঠিন মন্তব্যপূর্ণ পত্র খবরের কাগজে প্রকাশ করেন।...তুমি এখুনি যা বললে, তারই স্বপক্ষে আমি এ-ঘটনাটার উল্লেখ করছি।...তখন ছাত্ররা করে কি? সেই প্রখ্যাত সাহিত্যিকের শাণিত তরবারির বিরুদ্ধে লড়তে যাবে কে? তারা ফোর্থ-ইয়ার ফিফথ-ইয়ারের ছাত্র। তাদের ভিতর তো কেউ সাহিত্যিক নয়।...সিংহ লড়বে সিংহের সঙ্গে, বাঁদর—'

আমি থেমে গেলুম। কিন্তু শহ্‌র্‌-ইয়ার চুপ করে রইল।

ইতিমধ্যে আমি আস্তে আস্তে আপন মনে বুঝে গিয়েছি, শহ্‌র্‌-ইয়ার কেন আপন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে।

অবশ্য নিঃসন্দেহ, নির্দ্বন্দ্ব কোনো-কিছু বলা কঠিন।

সে ভয় করেছিল, তার পীরেতে আমাতে লাগবে লড়াই!

ফলে সে হারাবে পীরকে, নয় আমাকে।

এই দ্বন্দ্বের সামনে পড়ে কাল সন্ধ্যায় সে ডুব মেরেছিল ধ্যানের গভীরে। সেই ধ্যানের পথ সুগম করার জন্য অনেকেই বহুক্ষণ ধরে জপ-জিক্‌র্‌ করেন। শহ্‌র্‌-ইয়ার তাই কাল রাত্রে 'লতীফ' 'সুন্দরের নাম জপ করেছিল। শুনেছি, বহু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধক জপ করতে করতে 'দশা' (আরবীতে 'হাল') প্রাপ্ত হন।

এ-নিয়ে তো দিনের পর দিন আলোচনা করা যায়, এবং আমি কিছুটা করেছিও, শহ্‌র্‌-ইয়ারের পীরের সঙ্গে বরদায়। কিন্তু এ-সব করে আমার কি লাভ? আমি চাই শহ্‌র্‌-ইয়ারের মঙ্গল, ডাক্তারের মঙ্গল এবং আমরা তিনজন এতদিন যে-পথ ধরে চলেছি—সুখেদুঃখে হাসিকান্নার ভিতর দিয়ে - সে-পথ দিয়েই যেন চলতে পারি। এরই মধ্যে একজন ছিটকে পড়ে যদি স্বয়ং পরব্রহ্মকেও

পেয়ে যায় তাতে ডাক্তারের কি লাভ, আমারই বা কি লাভ? বুদ্ধদেব বৈরাগ্য আর সন্ন্যাস দিয়ে বিশ্বজয় করেছিলেন; কিন্তু সে ধন কি পিতা তথা রাজা শুদ্ধোধনকে আনন্দ দান করতে পেরেছিল? তিনি তো কামনা করেছিলেন, পুত্র যেন যুবরাজরূপে দিগ্বিজয় করে। এবং গোপা-যশোধরা? তিনিও তো চেয়েছিলেন, একদিন রাজমহিষী হবেন, তাঁর পুত্র যুবরাজ রাহুলের রাজমাতা হবেন।

কিন্তু যে-কথা বলছিলুম:

পীরেতে আমাতে কোনো ঝগড়া-কাজিয়া তো হলই না, বরঞ্চ প্রকাশ পেল, দুজনকার বহুদিনের হৃদ্যতা। শহুর-ইয়ারের যেন একটা দুঃস্বপ্ন কেটে গেল, তার যেন দশ দিশি ভেল নিরদ্বন্দ্বা।

* * *

হঠাৎ না ভেবে-চিন্তেই বলে ফেললুম, 'আচ্ছা, শহুর-ইয়ার, এখন রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীত তোমাকে আনন্দ দেয়?' "এখন" শব্দটাতে বেশ জোর দিলুম। 'আগে তো তুমি পছন্দ করতে না।'

একটুখানি ম্লান হাসি হেসে বললে, 'না'।

আমি বললুম, 'সে কি? এখন তুমি যে-পথে চলেছ সেখানে তো তাঁর ধর্মসঙ্গীত তোমাকে অনেক-কিছু দিতে পারে, তোমার একটা অবলম্বন হতে পারে।'

মাথা নিচু করে বললে, 'হলো না। কাল দুপুরেই—আপনি তখন বাড়িতে ছিলেন না—আবার কিছু রেকর্ড বাজালুম। অস্বীকার করছি নে, খুব সুন্দর লাগল। ভাষা, ছন্দ, মিল সবই সুন্দর। এমন কি আল্লাকে নূতন নূতন রূপে দেখা, নূতন নূতন পন্থায় তাঁর কাছে এগিয়ে যাবার প্রচেষ্টা সবই বড় সুন্দর। আমার মন যে কতবার নেচে উঠেছিল, সে আর কী বলবো!...কিন্তু, কিন্তু, আমার বুকের ভিতরে কোনো সাড়া জাগলো না।'

আমি বললুম, 'আমার কাছে, কেমন যেন হেঁয়ালির মত ঠেকছে। বুঝিয়ে বলো।'

এবারে একটুখানি মধুরে উচ্চহাস্য করলো—'আপনাকেও বোঝাতে হবে?'

উঠে দাঁড়িয়ে দক্ষিণের জানলা খুলে দিল।

আহ্। বাইরে কী নিরন্ধ্র নৈস্তব্ধ্য। গ্রামে নয়, কলকাতাতেই এটা সম্ভবে।

বন্ধ জানলা খুলে দিলে বাইরের বাতাস যে রকম কামরাটাকে ঠাণ্ডা করে দেয়, হুবহু সেই রকম বাইরের নিস্তব্ধতা যেন আমাদের তর্কালোচনাটাকে শীতল করে দিল।

শহুর-ইয়ার বললে, 'জানলার কাছে আসুন। আরাম পাবেন।'

আমি শয্যাত্যাগ করে সেই প্রশস্ত জানলার অন্য প্রান্তে দাঁড়ালুম।

শহ্‌র্‌-ইয়ার ধীরে ধীরে আমার কাছে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। আমার দু'হাত তখন জানলার আড়ের উপর। সে তার ডান হাত আমার বাঁ হাতে বুলোতে বুলোতে বলল, 'এই নিচের আঙিনার দিকে তাকান। এখানে ভোর-সাঁজ ভিখিরি-আতুর আসে। তাদের জন্য ব্যবস্থা আছে এ-বাড়ি পত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু এ-আঙিনায় সব চেয়ে বেশী আদরযত্ন কারা পায় জানেন? খঞ্জনি-হাতে বোষ্টমি, একতারা-হাতে বাউল, সারেঙ্গী-হাতে ফকীর। আপনি হয়তো ভাবছেন, এরা সদাই শুধু আধ্যাত্মিক পারলৌকিক, 'এ সংসার নশ্বর', এই সব নিয়েই গীত গায়—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'মোটেই না, এরা বহু ধরনের গীত জানে।'

ভারী খুশী হয়ে বললে, 'ঠিক ধরেছেন। অবশ্য আমি ভালো করে জানতুম, আপনার কাছে এ-তত্ত্ব অজানা নয়। তাই আপনাকে একটুখানি খুঁচিয়ে আমি সুখ পাই। কিন্তু সে-কথা থাক।

আমার বিয়ের রাত্রে, গভীর রাত্রে, এই আঙিনাতেই তারা অনেক মধুর মধুর গান আমাকে ডাক্তারকে শুনিয়ে গিয়েছিল। তারই একটি ছত্র আমার কানে এখনো বাজে ঃ

"শ্যামলীয়াকে দরশন লাগি পরহুঁ কুসুম্বী সাড়ী"

বুঝুন, কী অদ্ভুত কালার্‌-কনট্রাস্‌ট-সেন্‌স্‌। শ্রীকৃষ্ণ শ্যামল। তাই শ্রীরাধা তাঁর শ্যামবর্ণের কনট্রাস্‌ট্‌ করার জন্য হলদে রঙের—কুসুম্বী রঙের শাড়ি পরে অভিসারে বেরিয়েছেন।

কিন্তু মোদ্দা কথাটা এইবারে আপনাকে বলি।

আমি সেই বিয়ের রাত্রির পর থেকেই এখানে দাঁড়িয়ে শতসহস্র বার এদের গীত—বিশেষ করে ধর্মসংগীত শুনেছি। বরঞ্চ এদের এই সরল, অনাড়ম্বর, সর্ব অলঙ্কার বিবর্জিত ভক্তিগীতি মাঝে মাঝে আমার বুকে সাড়া জাগিয়েছে, এমন কি তুফান তুলেছে,—মনে হঠাৎ-চমক লাগায় নি শুধু। তার কারণ, অন্তত আমার মনে হয়, এদের অভাবের অন্ত নেই, এরা গরীব-দুঃখী অনাথ-আতুর। খুদাতালা ছাড়া এদের অন্য কোনো গতি নেই। তাই এদের গীতে থাকে আন্তরিকতা, ডীপেস্ট সিনসিয়ারিটি।

কিন্তু বিশ্বকবি, আবার বলছি, সর্ববিশ্বের কবি রবীন্দ্রনাথ তো এই হতভাগাদের একজন নন। তিনি তো অনাথ আতুর নন। তাঁর ভক্তিগীতিতে ওদের মর্মান্তিকতা, ঐকান্তিকতা, সর্বাঙ্গীণ আত্মসমর্পণের সুর বাজবে কি করে? তিনি—'

আর আমি থাকতে পারলুম না। বাধা দিয়ে বললুম, 'এ তুমি কী আবোল-তাবোল বকতে আরম্ভ করলে শহ্‌র্‌-ইয়ার! অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, আশ্রয়াভাব—এই গুলোই বুঝি ইহজীবনের পরম দুর্দৈব, চরম বিনষ্টি? রবীন্দ্রনাথের বয়স

চল্লিশ হতে-না-হতেই তাঁর যুবতী স্ত্রীর মৃত্যু হলো, তার পাঁচ বছরের ভিতর গেল তাঁর এক ছেলে, এক মেয়ে। তাদের বয়স তখন কত? এগারো, তেরো। অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় অকাল মৃত্যু। তাঁর বাল্য-কৈশোরের কথা তুলতে চাই নে। সেই বা কিছু কম? ছেলেবেলায়ই ওপারে গেলেন তাঁর মা। সেই মায়ের আসন নিলেন তাঁর বৌদি। শুধু তাই নয়, সেই মহীয়সী নারীই কিশোর রবিকে হাতে ধরে নিয়ে এসে প্রবেশ করালেন জহান্-মুশায়েরায়, বিশ্বকবি-সম্মেলনাঙ্গনে।...আজ যদি আমাকে কেউ শুধোয়, রবীন্দ্রনাথ কার কাছে সব চেয়ে বেশী ঋণী, তবে নিশ্চয়ই বলবো, তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলবো, তার চেয়েও বেশী ঋণী তিনি তাঁর বৌদির কাছে।... সেই বৌদি আত্মহত্যা করলেন একদিন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন কত? বাইশ, তেইশ! এই নারীই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যদীক্ষা। তাঁর রুচি, তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ কাব্য রচনা করেছেন তাঁর জীবনের প্রথম বারো বৎসর ধরে।

অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব সব মানি। কিন্তু আবার শুধোই, এগুলোই কি শেষ কথা? আত্মহত্যা, পর পর আত্মজনবিয়োগ এগুলো কিছুই নয়?

এই যে তুমি বার বার "অনাথ আতুর, অনাথ আতুর" বলছো, এই সমাসটি তুমি কোত্থেকে নিয়েছ, জানো? তোমার জানা-অজানতে?

সেও রবীন্দ্রনাথের।

"শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন—
এসেছে তোমার দ্বারে, শূন্য ফেরে না যেন॥"

এ-গীতে কি রবীন্দ্রনাথ বিধাতার প্রধান মন্ত্রী?—তিনি যেন হুজুরকে বলছেন, "মহারাজ, এই অনাথ আতুর জনকে অবহেলা করবেন না।" তিনি তখন স্বয়ং, নিজে, ঐ অনাথ আতুরদের একজন। অবশ্য তাঁর অন্নবস্ত্র যথেষ্ট ছিল, কিন্তু প্রভু খৃষ্ট কি সর্বাপেক্ষা সার সত্য বলেন নি, মানুষ শুধু রুটি খেয়েই বেঁচে থাকে না। ঈশ্বরের করুণাই (ওয়ার্ড) তাঁর প্রধানতম আশ্রয়।

আর এও তুমি ভালো করে জানো, রবীন্দ্রনাথকে তার অর্ধেক জীবন—১৯০১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে বিশ্বময় ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। বিশ্বভিখারীদের তিনি ছিলেন ওয়ার্লড্ চ্যামপিয়ন নম্বর ওয়ান। পৃথিবীর হেন প্রান্ত নেই যেখানে তিনি ভিক্ষা করতে যান নি। তাঁর পূর্বে স্বামীজী। এবং দুজনাই ফিরেছিলেন, ঐ গানের "শূন্য ফেরে না যেন" প্রার্থনায় নিষ্ফল হয়ে।

রবীন্দ্রনাথ বেরিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর জন্য। তিনি "বিশ্বপ্রেম", "বিশ্ব-ভারতী"—"বিশ্ব" শব্দ দিয়ে একাধিক সমাস নির্মাণ করেছেন; আমি, অধম, তাঁরই সমাস নির্মাণের অনুকরণে তাঁকে খেতাব দিয়েছি "বিশ্বভিক্ষুক"। এ হক

আমার কিছুটা আছে। রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপাধি ঠাকুর। কিন্তু তাঁর বংশপরিচয় "পীরিলি" বা "পীর" + "আলী" দিয়ে। আম্মো "আলী"। আমারও "পীর" বংশ। কিন্তু থাক্‌, এসব হাল্কা কথা।

তুমি হয়তো বলবে—তুমি কেন, অনেকেই বলবে—এসব সখের ভিখিরি-গিরি। আমি এ-নিয়ে তর্কাতর্কি করতে চাই নে। কারণ স্বয়ং কবিই গেয়েছেন,

"এরে ভিখারী সাজায়ে
কী রঙ্গ তুমি করিলে,
হাসিতে আকাশ ভরিলে ॥"

কিন্তু এহ বাহ্য।

আমি বার বার জোর দিতে চাই তাঁর মাথার উপর দিয়ে যে আত্মহত্যা, যে-সব অকালমৃত্যুর ঝড় বয়ে গেল, তারই উপর। সেখানে তিনি অনাথের চেয়েও অনাথ, আতুরের চেয়ে আতুর।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার বড় শান্ত মেয়ে। কোনো আপত্তি জানালো না দেখে আমার উৎসাহ বেড়ে গেল। বললুম, 'আচ্ছা, রাশার সম্রাট জার নিকলাসের নাম শুনেছ?'

'না তো।'

'কিছু এসে যায় না। এইটুকুই যথেষ্ট যে তাঁর কোনো অভাব ছিল না। ইয়োরোপের রাজা-সম্রাটদের ভিতর তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বিত্তশালী। দোর্দণ্ড প্রতাপ। তাঁরই রচিত একটি কবিতার শেষ দুটি লাইন আমার মনে পড়ছে, আবছা আবছা। ভুল করলে অপরাধ নিয়ো না। সত্যেন দত্তের অনুবাদ:

"কাতরে কাটাই
সারা দিনমান
কাঁদিয়া কাটাই নিশা।
সহি, দহি, ডাকি
ভগবানে আমি
শান্তির নাহি দিশা ॥"

এর চেয়ে আন্তরিকতা ভরা, হৃদয়ের গভীরতম গুহা থেকে উচ্ছ্বসিত কাতরতা ভরা আর্তরব তুমি কি চাও?

না হয় রাশার জার-এর কথা থাক্‌।

কুরান শরীফ এবং এদিক ওদিক নানা কেতাবে রাজা দাউদের—King David-এর কাহিনী নিশ্চয়ই কিছু কিছু পড়েছ? ইনি শুধু প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহই ছিলেন না, তিনি বাইবেল কুরান উভয় কর্তৃক স্বীকৃত পয়গম্বর।

ভগবৎ-বিরহে কাতর এই রাজার Psalms বাইবেলে পড়েছ?

"কতদিন ধরে, এমন করিয়া
ভুলিয়া রহিবে প্রভু ?"

"Why standest thou afar off, O Lord ? Why hidest thou thyself in times of trouble ?"

আরো শুনবে ?'

শহ্‌রু-ইয়ার মাথা না তুলেই বললে, 'আমার একটা কথা আছে—'

আমি বললুম, 'অনেক রাত হয়েছে। কাল সে-সব হবে।'

তারপর ছাড়লুম আমার সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশেষ অগ্নিবাণ ঃ

'তোমারও তো ধনদৌলতের কোনো অভাব নেই। তবে তুমি কেন সকাল সন্ধ্যা ছুটছো পীর সাহেবের বাড়িতে ? ভেবেচিন্তে কাল বুঝিয়ে বলো।'

একুশ

কি একটা স্বপ্ন দেখে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলুম।

স্বপ্ন কি, তার অর্থ কি, সে ভবিষ্যদ্বাণী করে কি না, এসব বাবদে এখনো মানুষ কিছুই জানে না। অনেক গুণী-জ্ঞানী অবশ্য অনেক-কিছু বলেছেন। আরি বের্গসন্ থেকে ফ্রয়েট সাহেব পর্যন্ত। পড়ে বিশেষ কোনো লাভ হয় নি—অন্তত আমার।

তবে এ-বাবদে একটি সাত বছরের ছেলে যা বলেছিল সেটা সব পণ্ডিতকে হার মানায়। অন্তত, স্বপ্ন জিনিসটা কি, সে-সম্বন্ধে তার আপন বর্ণনা। ডাক্তার তাকে শুধিয়েছিলেন, সে স্বপ্ন দেখে কি না ? পুট্ করে উত্তর দিল, 'ও, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সিনেমা দেখা ? না ?'

বেশ উত্তর। কিন্তু এখানেই শেষ কথা নয়। আমি এর থেকে একটা তত্ত্বও আবিষ্কার করেছি—কারণ একাধিক শাস্ত্রগ্রন্থ বলেছেন, স্বর্গরাজ্যে সর্বপ্রথম প্রবেশাধিকার শিশুদের। সেই তত্ত্বটি সূত্ররূপে প্রকাশ করলে দাঁড়ায় ঃ আজকের দিনের বাঙলা ফিল্ম্ দেখে যেমন আসছে বছরে বাঙলার ভবিষ্যৎ কি হবে সে-সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না, ঠিক তেমনি আজ রাত্রে আমি যা স্বপ্ন দেখলুম, তার থেকে তিন মাস পরে আমার কি হবে, সে-হদীস খোঁজা সম্পূর্ণ নিষ্ফল।... তার চেয়ে অনেক নিরাপদ, তাস ফেলে ভবিষ্যৎ নির্ণয় করে সেই অনুযায়ী কার্য করা, কিংবা তার চেয়েও ভালো, অচেনা বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় ধাপের সংখ্যা জোড় না বেজোড়, গুনে গুনে সেটা বের করে আপন কর্তব্য নির্ধারণ করা। জোড় হলে মোলায়েম কায়দায় কাজ হাসিল করার চেষ্টা—বেজোড় হলে লোকটার মাথায় সুপুরি রেখে খড়ম পেটানোর মত শ্মশান-চিকিৎসায়।

কিন্তু আমি স্বপ্নটা দেখেছিলুম একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে।

সেই বাচ্চাটার মত সিনেমা দেখি নি। আমার ফিল্‌ম্‌টা যেন 'যান্ত্রিক গোলযোগে' (অবশ্য তার অন্য 'প্রোগ্রাম' শেষে মরমিয়া ভণ্ডস্বরে কেউ ক্ষমা চায় নি) কেটে যায়। কিন্তু সিনেমার বাক্‌যন্ত্রটি বিকল হয় নি। সে যেন সাথীহারা বিধবার মত একই রোদন বার বার কেঁদে যাচ্ছিল: 'সবই বৃথা, সবই মিথ্যা, সবই বৃথা, সবই মিথ্যা।'...বোধ হয় ফিল্‌ম্‌টা বাইবেলের কোনো কাহিনী অবলম্বন করে তার রূপ বাণী পেয়েছিল। কারণ, তারই সঙ্গে সঙ্গে ইংরিজিতে ঠিক ঐ একই সন্তাপ কানে আসছিল, 'ভ্যানিটি অব্‌ ভ্যানিটিজ; অল্‌ ইজ্‌ ভ্যানিটি।' যেন বৌদ্ধদের সেই 'সর্বং শূন্যং, সর্বং ক্ষণিকম্‌।'

এবং সঙ্গে সঙ্গে কী আশ্চর্য! বহু, বহু বৎসর পূর্বে দক্ষিণভারতের 'অরুণাচলে' শোনা একটি সংস্কৃত মন্ত্র কানে আসছিল:

'কর্তুরাজ্ঞয়া
প্রাপ্যতে ফলম্‌।
কর্ম কিং পরং
কর্ম তজ্জড়ম্‌॥'

এর বাঙলা অনুবাদ আমার এমনই সুপরিচিত যে, স্বপ্নশেষে সেটিও আমার স্মৃতিপটে ধরা দিল:

'ঈশ্বরাজ্ঞাধীন কর্ম ফলপ্রসূ হয়।
জড় কর্ম সেই হেতু ঈশ বাচ্য নয়॥'

অর্থাৎ কর্ম জিনিসটাই জড়।...ঐ একই কথা—তুমি যে ভাবছো, তোমার যে 'অহংকার', তুমি কর্ম করছো এবং সেই কর্ম থেকে ফল প্রসবিত হচ্ছে সেটা সর্বৈব মিথ্যা, সেটা ভ্যানিটি ('অহংকার')।

বলতে পারবো না, কটা ভাষাতে, গদ্যে পদ্যে, পদ্যে গদ্যে মেশানো ভাষায়, কত সুরে এই ফিলার্‌মনিক্‌ অর্কেস্ট্রা চলেছিল।

কিন্তু তখনো স্বপ্ন শেষ হয় নি।

শেষ হলো সেই অরুণাচলমের আরেকটি শ্লোক দিয়ে:

'ঈশ্বরার্পিতং
নেচ্ছয়া কৃতম।
চিত্তশোধকং
মুক্তিসাধকম্‌॥'

পাঁজরে যেন গুত্তা খেয়ে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলুম।

স্বপ্নলব্ধ প্রত্যাদেশে আমি বিশ্বাস করি নে। কিন্তু এবারে আমার ঘাড়ে হুড়-মুড়িয়ে আস্ত একটা ট্রাকের চল্লিশ মণ ইঁট যে-ভাবে পড়লো তাতে অত্যন্ত বিমূঢ় অবস্থায়ও আমি হৃদয়ঙ্গম করলুম, আমার কর্ম দ্বারা কোনো কিছুরই সমাধান হবে না, শহ্‌র্‌-ইয়ার, ডাক্তার, পীর সাহেব—এদের জট ছাড়ানো আমার

'কম-' নয়, আমার 'কম-' ঈশ্বর-অর্পিত' নয়।

অতএব এ-পুরী থেকে পলায়নই প্রশস্ততম পন্থা।

* * *

তখনো ফজরের নামাজের আজান পড়ে নি। চন্দ্র অস্তে নেমেছে, কিন্তু তখনো রাত রয়েছে। পূর্ব দিকের অলস নয়নে তখনো রক্তভাতি ফুটে ওঠে নি।

প্রথম একটা চিরকুট লিখলুম। তার পর হাতের কাছে যা পড়ে, নুন ময়লা ধুতি কুর্তা পরে, গরীবের যা রেস্ত তাই পকেটে পুরে চোর এবং অভিসারিকার সম্মিলিত নিঃশব্দ চরণক্ষেপে নিচের তলার সদর দরজার কাছে এসে দেখি, দরজা খোলা। আল্লা মেহেরবান্। তখন দেখি, বৃদ্ধ দারওয়ান শূন্য বদনা দোলাতে দোলাতে দরজা দিয়ে ঢুকছে। পরিষ্কার বোঝা গেল, বৃদ্ধ ফজরের নামাজের পূর্বেকার তাহাজ্জুদের নামাজও পড়ে।

মনে পড়ল, বহু বহু বৎসর পূর্বে, ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথের বাসভবনের অতি কাছে, 'নূতন বাড়িতে' কয়েক মাসের জন্য আমার আশ্রয় জুটেছিল। তখন অনিদ্রাকাতরতাবশত অনিচ্ছায় শয্যাত্যাগ করে আমলকী গাছের তলায় পাইচারি করতে করতে দেখেছি, শুভ্রতম বস্ত্রে আচ্ছাদিত গুরুদেব পূর্বাস্য হয়ে উপাসনা করছেন। পরে তাঁর তৎকালীন ভৃত্য সাধু'র কাছে শুনেছি, তিনি আগের সন্ধ্যায় তোলা বাসি জলে কী শীত কী গ্রীষ্মে স্নানাদি সমাপন করে উপাসনায় বসতেন। তাঁর সর্বাগ্রজ, তাঁর চেয়ে একুশ বছরের বড় দ্বিজেন্দ্রনাথকেও আমি শান্তি-নিকেতনের অন্য প্রান্তে ঐ একই আচার-নিষ্ঠা করতে দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষাট ; বড়বাবুর একাশি।

কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম। কিন্তু এসব প্রাচীন দিনের কাহিনী বলার লোভ সম্বরণ করা বড় কঠিন। অনেকে আবার শুনতেও চায় যে।

* * *

ঘটিদের একটা মহৎ গুণ, তারা অহেতুক কৌতূহল দেখায় না। যদিও আড়ালে আবডালে বসে তক্কে তক্কে থেকে আপনার হাঁড়ির খবর, পেটের খবর, যে সাদামাটা পোর্টফোলিও নিয়ে বাড়িতে ঢুকলেন, বেরুলেন তার ভিতরকার খবর সব জেনে নেয়। আর বাঙালরা এ-বাবদে বুদ্ধু। বেমক্কা প্রশ্ন করে অন্য পক্ষকে সন্দিহান করে তোলে। ঘটি তখ্খুনি জিভে কানে ক্লরফর্ম ঢেলে, ঠোঁট দুটো স্টিকিং প্ল্যাস্টার দিয়ে সেঁটে নিয়ে চড়চড় করে কেটে পড়ে।

তদুপরি এ-বৃদ্ধ দারওয়ান এ-বাড়ির অনেক কিছুই দেখেছে। বেশীর ভাগই দুঃখের। যে-বাড়ি একদা গমগম করতো, সে এখন কোথায় এসে ঠেকেছে! ভূতুড়ে বাড়ি বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। সে জানে, প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে যে-সব উত্তর শুনতে হয়, তার অধিকাংশই অপ্রিয়।

আমি তার দিকে চিরকুটটি এগিয়ে দিয়ে বললুম, 'সাহেব, বেগম-সাহবকো

দেনা।' খুদা-হাফিজ' 'অভি আয়া' (সেটা হবে মিথ্যে) এ-সব তো বললুমই না বখশিশ্‌ দিলে তো এক মুহূর্তেই সর্ব কামুফ্লাজ ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

চিরকুটে লেখা ছিল, 'আমি বোলপুর চললুম; সময়মত আবার আসবো।'

'যঃ পলায়তি স জীবতি।' আমি ম্লেচ্ছ, দেব-ভাষা জানি নে। 'স জীবতি' না, হয়ে 'যুবতী' ও হতে পারে। সতীত্ব রক্ষা করতে হলে যুবতীকে পলায়ন করতে হয় বই কি!

* * * * *

প্রথম হাওড়াগামী ট্রামের জন্যে মনে মনে অপেক্ষা করতে করতে কদম কদম বাড়িয়ে হাওড়াবাগে এগিয়ে চললুম।

ট্রাম এল। উঠলুম। পাঁচ কদম যেতে না যেতেই বুঝলুম, 'তে হি নো দিবসা গতাঃ।' আমাদের ছেলেবেলায় ট্রাম গাড়ির কি-সব যেন থাকতো স্প্রিঙিং, শক্‌-এব্‌জরবার আরো কত কী। গাড়ি এমনই মোলায়েমে যেত যে, মনে হতো ওয়াই এম সি এ'র বিলিয়ার্ড টেবিল পেতে এখানে ওয়ার্লড্‌ চ্যাম্পিয়ানশিপ দিব্য খেলা যেতে পারে। বস্তুত তখনকার দিনে এরকম আরামদায়ক নিরাপদ বাহন কলকাতায় আর দ্বিতীয়টি ছিল না। আর আজ! প্রতি আচমকা ধাক্কাতে মনে ভয় হলো, কাল রাত্রিতে যা খেয়েছি তারা বুঝি সব রিটার্ন টিকিট নিয়ে গিয়েছিল, এই বুঝি সবাই একসঙ্গে হুড়মুড়িয়ে মোকামে ফেরৎ এসে কণ্ডাকটরের কাছে 'গৃহ কমিশনের রিপোর্ট' পেশ করবেন, আমি ভোরবেলাকার বেহেড মাতাল।

০৬'৫০-এ বারাউনি প্যাসেঞ্জার ধরে নির্বিঘ্নে বোলপুর ফিরলুম।

কিন্তু বর্ধমানে চা জুটলো না। বর্ধমানে চা যোগাড় করার ভানুমতী খেল গুণীন্‌ একমাত্র শহ্‌র্‌-ইয়ারই নব নব ইন্দ্রজালে নির্মাণ করে দেখাতে পারেন। সে তো ছিল না।

ট্রেনে মাত্র একটি চিন্তা আমার মনের ভিতর ঘোরপাক খাচ্ছিল।

এই যে আমি কাউকে কিছু না বলে কয়ে সরে পড়লুম, এটাকে ইয়োরোপের প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব পণ্ডিতেরা নাম দিয়েছেন 'পলায়ন-মনোবৃত্তি' না কি যেন—বোধ হয় 'এস্‌কেপিজম'—রাজভাষায়। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তাঁদের সংস্কৃত 'পাণ্ডিত্যে'র দ্বিরদরদস্তম্ভের উচ্চাসনে বসে যে তত্ত্ব প্রচার করেন—ইংরেজ 'পণ্ডিত'রা তো বটেনই, এবং তাদেরই নুন-নেমক-খেকোহনুকরণকারী জর্মন ফরাসি 'পণ্ডিতের'ও একাধিক জন—সে তত্ত্বের নির্যাস: 'ভারতীয় সাধু-সন্ত, গুণীজ্ঞানী, দার্শনিক-পণ্ডিত সবাই, সকলেই অত্যন্ত স্বার্থপর, সেল্‌ফিশ্‌। তারা শুধু আপন আপন মোক্ষ, আপন আপন নির্বাণ-কৈবল্যানন্দ লাভের জন্য অষ্টপ্রহর ব্যতিব্যস্ত। বিশ্বসংসারের আতুরকাতরজনের জন্য তাদের কণামাত্র শিরঃপীড়া নেই, নো হিউমেন সিম্‌পেথি, নো পরোপকার প্রবৃত্তি। এই

ভারতীয়দের দর্শন—কী সাংখ্য, কী বেদান্ত, কী যোগ—সর্বত্রই পাবে এক অনুশাসন, "আত্মচিন্তা করো, আপন মোক্ষচিন্তা করো।" মোস্ট্ সেল্ফিশ্ এগোইস্টিক ফিলসফি।'

এসব অর্ধভুক্ত বমননিঃসৃত 'আপ্তবাক্য' যুক্তিতর্কদ্বারা খণ্ডন করা যায় না। ভূতকে বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে ঘায়েল করা যায় না। সেখানে দরকার—জৈসন কে তৈসন—তেজী সরষে, ঝাঁজালো লঙ্কা পোড়ানো।

সে মুষ্টিযোগ রপ্ত ছিল একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের। এ-স্থলে তিনি প্রয়োগ করলেন ঝাঁজালো লঙ্কা-পোড়া। অর্থাৎ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। অতিশয় সিদ্ধহস্তে। অথচ সে পুণ্যশ্লোক রচনা এমনই সুনিপুণ প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তথা সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা-ভরা যে, আজো, অর্ধশতাব্দাধিক কাল পরও, এখনো কোনো কোনো 'ভরতপ্রেমী' 'হিন্দু সভ্যতা তথা মর্যাদা রক্ষাকরনেওয়ালা বামনাবতার মনডুলী' বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গ বুঝতে না পেরে 'বঙ্কিম মুর্দাবাদ, বঙ্কিম মুর্দাবাদ' জিগির তুলে গগনচুম্বী লম্ফপ্রদানে উদ্যত হন।

বঙ্কিমের সেই 'রামায়ণ সমালোচনার' কথা ভাবছি।

অবশ্য এ-সব ব্যঙ্গ ছাড়াও এদেশের পণ্ডিতগণ দার্শনিক পদ্ধতিতেও ইয়োরোপীয় 'পণ্ডিতদের' মুখ-তোড় উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু হায়, দর্শনশাস্ত্রে আমার আলিফের নামে ঠ্যাঙা। আমি অন্য-দৃষ্টি অন্য দর্শনের আশ্রয় নি।

অপবাদটা ছিল কি? আমরা নাকি বড্ডই স্বার্থপর, নিজের মোক্ষচিন্তা-ভিন্ন অন্য কারো কোনো উপকার বা সেবার কথা আদৌ ভাবি নে।

এস্থলে আমার বক্তব্যটি—তার মূল্য অসাধারণ কিছু একটা হবে না জানি—সামান্য একটি পর্যবেক্ষণ দিয়ে আরম্ভ করি। এই বাঙলা দেশে সব চেয়ে বেশী কোন্ গ্রন্থখানা পড়া হয়? অতি অবশ্যই মহাভারত। মূল সংস্কৃত, মহাত্মা কালীপ্রসন্নের অনুবাদ, বা রাজশেখরীয়, কিংবা কাশীরামের বাঙলায় রূপান্তরিত মহাভারত কিছু-না-কিছু-একটা পড়ে নি এমন বাঙালী পাওয়া অসম্ভব। এই হিসেবের ভিতর বাঙালী মুসলমানও আসে। প্রমাণস্বরূপ একটি তথ্য নিবেদন করি। দেশ-বিভাগের প্রায় পনেরো বৎসর পর আমি একটি পাকিস্তানবাসিনী মুসলিম ইন্স্পেকট্রেস্ অব্ স্কুলস্কে শুধোই, 'আমাদের দেশে কাচ্চা-বাচ্চাদের ভিতর এখন কোন্ কোন্ বই সব চেয়ে বেশী পড়া হয়?' ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে বললেন, 'রামায়ণ-মহাভারত—বরঞ্চ বলা উচিত মহাভারত-রামায়ণ—কারণ মহাভারতই কাচ্চাবাচ্চারা পছন্দ করে বেশী। তবে তারা প্রামাণিক বিরাট মহাভারত পড়ে না। গ্রামাঞ্চলে হিন্দু পরিবারে এখনো কাশীরাম, কিন্তু বাচ্চারা পড়ে "মহাভারতের গল্প" এই ধরনের সাদা-সোজা চটি বই।' তারপর একটু চিন্তা করে বললেন, 'অবশ্য ব্যত্যয়ও আছে। আমার বারো বছরের ছেলেটা ইতিমধ্যেই তার মামার মত "পুস্তক-কীট" হয়ে

গিয়েছে। তাকে কালীপ্রসন্ন আর রাজশেখর দুইই দিয়েছিলুম। মাস দুই পরে আমার প্রশ্নের উত্তরে বললে, "রাজশেখর বাবুর ভাষাটি বড় সহজ আর সুন্দর। কিন্তু সব-কিছুর বড় ঠাসাঠাসি। কালীপ্রসন্নবাবুটা বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে লেখা। আরাম করে ধীরে ধীরে পড়া যায়"।' এর পর মহিলাটি একটু হেসে বললেন, 'জানেন,—বয়স্ক মুসলমানদের কথা বাদ দিন, তাঁরা তো দেশ-বিভাগের পূর্বেই কারিকুলাম-মাফিক রামায়ণ-মহাভারত অন্নদামঙ্গল মনসামঙ্গল এ-সবেরই কিছু কিছু পড়েছিলেন—কিন্তু পার্টিশনের এই পনেরো বৎসর পরও, আমাদের মুসলমান বাচ্চারা "দাতাকর্ণ"-কে চেনে বেশী, কর্ণের অর্পাজিট নাম্বার আরব দেশের দাতাকর্ণ হাতিম তাঈ-কে চেনে কম।'

এই মহাভারতটি যখন বালবৃদ্ধবনিতার এতই সুপ্রিয় সুখপাঠ্য, তখন দেখা যাক্, এ-মহাগ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের শেষ উপদেশ কি—ভুল বললুম, 'উপদেশ' নয়, আপন আত্মবিসর্জনকর্মদ্বারা দৃষ্টান্ত-নির্মাণ, আদর্শ নির্দেশ—সেটি কি ?

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রাণাধিক প্রিয় চারি ভ্রাতা, মাতা কুন্তীর পরই যে নারী তাঁর জীবনে সর্বাপেক্ষা সমাদৃতা, যাঁর শপথ রক্ষার্থে এই শান্তিপ্রিয় যুধিষ্ঠির নৃশংস কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হলেন, সেই নারী, এবং পর পর তাঁর চার ভ্রাতা মহাপ্রস্থানিকপর্বে বর্ণিত হিমালয় অতিক্রম করার সময় একে একে যখন মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, তখন পরম স্নেহশীল যুধিষ্ঠির তাঁদের জন্য ক্ষণতরেও শোক করেন নি, কারো প্রতি মুহূর্তেক দৃষ্টিপাত না করে সমাহিতচিত্তে অগ্রসর হতে লাগলেন। এ-সময় সে-ই কুক্কুর, যে হস্তিনাপুর থেকে এঁদের অনুগামী হয়েছিল, সে-ই শুধু যুধিষ্ঠিরের পশ্চাতে।

এমন সময় ভূমণ্ডল নভোমণ্ডল রথশব্দে নিনাদিত করে দেবরাজ স্বর্গরাজ ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে সমুপস্থিত হয়ে বললেন, 'মহারাজ, তুমি অবিলম্বে এই রথে সমারূঢ় হয়ে স্বর্গারোহণ করো।'

এর পর উভয়ে অনেক কথাবার্তা হলো। আমার ভাষায় বলি, বিস্তর দর কষাকষি হলো। শেষটায় সমঝাওতা ভী হলো। ঐ যে-রকম দেশ-বিভাগের পূর্বে কংগ্রেস লীগে হয়েছিল। কিন্তু সে তুলনার এখানেই সমাপ্তি। ইতিমধ্যে চতুর্থপাণ্ডব এবং দ্রৌপদী স্বর্গারোহণ করেছেন।

এর পর, পুনরায় আমার নগণ্য ভাষাতেই বলি, বখেড়া লাগল সেই নেড়ি কুত্তাটাকে নিয়ে। যুধিষ্ঠির ফরিয়াদ করে বলছেন, 'এ কুত্তাটা আমার সঙ্গে সঙ্গে এত দীর্ঘদিন ধরে এসেছে। একে ওখানে ছেড়ে গেলে আমার পক্ষে বড়ই নিষ্ঠুর আচরণ হবে।'

সরল ইন্দ্র মনে মনে ভাবলেন, এ তো মহা ফ্যাসাদ। এই যুধিষ্ঠিরটা তো আপন স্বার্থ কখনো বোঝে নি, এখনও কি আপন কল্যাণ বোঝে না ? প্রকাশ্যে বললেন, 'ধর্মরাজ, আজ তুমি অতুল সম্পদ্, পরমসিদ্ধি, অমরত্ব ও আমার স্বরূপত্ব

লাভ করবে (এই 'স্বরূপত্ব লাভ'টা আমি আজো বুঝতে পারি নি ; মরলোকের ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তো স্বর্গলোকে তাঁর স্বরূপত্ব লাভ করবেন স্বর্গের যম-রাজার অস্তিত্বে বিলীন হয়ে—ইন্দ্রের স্বরূপত্ব লাভ করবেন তো তাঁর পুত্র অর্জুন!)। এসব বিদকুটে বয়নাক্কা করো না। আমার-এই অতি পূত, হেভেনলি বেহেশ্‌তের রথে ঐ নেড়ি, ঘেয়ো অতিশয় অপবিত্র কুকুর—আর হাইড্রফবিয়া থাকাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়—কি করে ঢুকতে পারে?'

* * *

এ-সব তাবৎ কাহিনী সক্কলেরই জানা। আমি শুধু আমার আপন ভাষাতে কাহিনীটির পুনরাবৃত্তি করার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। কেউ যেন অপরাধ না নেন। যুগ যুগ ধরে আসমুদ্র-হিমাচল সবাই আপন আপন ভাষাতে মহাভারত নয়া নয়া করে লিখেছে। আমি যবন। আপ্তবাক্য বেদে আমার শাস্ত্রাধিকার নেই। কিন্তু মহাভারতে অতি অবশ্যই আছে। সাবধান! বাধা দেবেন না। কমুনাল রায়োট লাগিয়ে আপন হক্ক কেড়ে নেব।

কিন্তু এহ বাহ্য।

ইয়োরোপীয়রা বলে আমরা স্বার্থপর। তবে আমাদের এই যে সর্বপরিচিত সর্বজনসম্মানিত গ্রন্থে যুধিষ্ঠির বলছেন, তাঁর স্বর্গসুখের তরে কোনো লোভ নেই, তিনি মোক্ষলুব্ধ নন, এমন কি স্বর্গে না যেতে পারলে তিনি যে তাঁর ভ্রাতৃবর্গ, কুন্তী, পাঞ্চালীর সঙ্গসুখও পাবেন না, তাতেও তাঁর ক্ষোভ নেই—কিন্তু, কিন্তু, তিনি—

এই 'ভক্ত শরণাগত' কুকুরটিকে কিছুতেই পরিত্যাগ করতে পারবেন না।

* * *

ট্রেনে কলকাতা থেকে আসতে আসতে এই সব কথা ভাবছিলুম। স্বপ্নে যে শুনেছিলুম, যার মোদ্দা ছিল,

'ওরে ভীরু, তোমার উপর নাই ভুবনের ভার।
হালের কাছে মাঝি আছে, করবে তরী পার॥'

'তুই কলকাতা ছেড়ে পালা'। না, যুধিষ্ঠিরকে সামনে রেখে সেই পন্থা অবলম্বন করবো?—অবশ্য আমি যুধিষ্ঠির নই বলে, আমার যেটুকু সঙ্গতি আছে সেইটুকু সম্বল করে নিয়ে।

হজরৎ নবী প্রায়ই বলতেন, 'আল্লার উপর নির্ভর (তওয়াক্কুল্) রেখো।' একদা এক বেদুইন শুধলো, 'তবে কি, হুজুর, দিনান্তে উটগুলোকে দড়ি দিয়ে না বেঁধে মরুভূমিতে ছেড়ে দেব—আল্লার উপর নির্ভর করে?' পয়গম্বর মৃদুহাস্য করে বলেছিলেন, 'না। দড়ি দিয়ে খুঁটিতে বেঁধে আল্লার উপর নির্ভর রাখবে।' অর্থাৎ বাঁধার পরও ঝড়ঝঞ্ঝা আসতে পারে, দড়ি ছিঁড়ে যেতে পারে, চোর এসে দড়ি কেটে উট চুরি করে নিয়ে যেতে পারে—ঐ সব অবোধ্য দৈব-

দুর্বিপাকের জন্য আল্লার উপর নির্ভর করতে হয়।

তবে কি আমার কলকাতাতে রয়ে গিয়ে যেটুকু করার সেইটুকু করাই উচিত ছিল—আল্লার উপর নির্ভর করে—অর্থাৎ 'মা ফলেষু কদাচন' করে?

* * *

শুতে যাবার সময় হঠাৎ একটি কথা মনে পড়ে যাওয়াতে আপন মনে একটু হাসলুম।

সেই পাকিস্তানী মহিলাকে শুধিয়েছিলুম, বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ এই নাপাক কুকুরটা মহাভারতে ঢুকলো কেন?

তিনি বলেছিলেন, 'আমি ভেবে দেখেছি কথাটা।...আসলে কি জানেন, মহাভারত সব বয়সের লোকের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে—বাচ্চাদের জন্যও।

তারা কুকুর বেরাল ভালোবাসে। তাই তারা কুকুরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ দেখে মুগ্ধ হয়। ঐটেই তাদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মত্যাগ।'

বাইশ

কলকাতা,

হাজার হাজার আদাব তসলিমাৎ পর পাক জনাবে আরজ এই,

সৈয়দ সাহেব,

আমি ভেবেছিলাম, দু'একদিনের ভিতর আপনাকে সব-কথা খুলে বলার সুযোগ পাব, কিন্তু আপনি হঠাৎ চলে গেলেন। আপনার ডাক্তার বিস্মিত ও ঈষৎ নিরাশ হয়েছেন। কিন্তু আমি চিন্তা করে দেখলুম, এই ভালো। আপনার সামনে আমার বক্তব্য রাখার সঙ্গে সঙ্গে আপনি এমন সব আপত্তি, প্রতিসমস্যা তুলতেন যে, শেষ পর্যন্ত আমার কোনো কিছুই বলা হয়ে উঠতো না। তাই চিঠিই ভালো। কে যেন আপন ডায়েরি লেখার প্রারম্ভেই বলেছেন, মানুষের চেয়ে কাগজ ঢের বেশী সহিষ্ণু।

অবশ্য এ-কথা আবার অতিশয় সত্য যে পত্র লেখার অভ্যাস আমার নেই। ভাষার উপর আমার যেটুকু দখল সেও নগণ্য। তাই যা লিখব তা হবে অগোছালো। তবে তার সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাটিও বলি; আমার ভাবনা-চিন্তা সবই এমনই অগোছালো যে অগোছালো ভাষাই আমার অগোছালো মনোভাবকে তার উপযুক্ত প্রকাশ দেবে। তদুপরি আমি জানি, আপনি গোছালো অগোছালো সব রাবিশ সব সারবস্তু মেশানো যে ঘ্যাঁট, তার থেকে সত্য নির্যাসটি বের করতে পারেন।

আপনি হয়তো অধৈর্য হয়ে উঠছেন। আমি মোদ্দা কথায় আসছি না কেন? সেটাতে আসবার উপায় জানা থাকলে তো অনেক গণ্ডগোলই কেটে যেত।

আপনার গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীত আমার বুকে তুফান তোলে না, সে কথা আপনাকে আমি বলেছি। এখনও ফের বলছি—আপনার সে-রাত্রের দীর্ঘ ডিফেন্সের পরও। অথচ এস্থলে আমাকে তাঁরই শরণ নিতে হলো।

গানটি আপনি নিশ্চয়ই জানেন :

'যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা
তোমায় জানাতাম।'

এস্থলে আমি এটা স্বীকার করে নিচ্ছি, যে, কবিগুরুর তুলনায় আমি শোকদুঃখ পেয়েছি অনেক অনেক কম। আপনি সে-রাত্রে তাঁর একটার পর একটা দুর্দৈবের কাহিনী বলার পূর্বে আমি সেদিকে ও-ভাবে কখনো খেয়াল করি নি। আপনার এই সুন্দুমাত্র তথ্যোল্লেখ আমার মনে গভীর দাগ কেটেছে। আমি ভাবছিলুম, রবীন্দ্রনাথ পর পর এতগুলো শোক পাওয়ার পরও কি জানতে পারলেন না, তাঁর 'কিসের ব্যথা', তাঁর শোকটা কোন্ দিক থেকে আসছে?

তাই অসংকোচে স্বীকার করছি, আমি এখনো ঠিক ঠিক জানি নে, 'আমার কিসের ব্যথা', আমার অভাব কোন্খানে, যার ফলে বিলাসবৈভবের মাঝখানেও যেন কোনো এক অসম্পূর্ণতার নিপীড়ন আমাকে অশান্ত করে তুলেছিল।

কিন্তু এখানে এসেই আমার বিপত্তি—এতদিন ধরে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে। আপনার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে। এবং সত্য বলতে কি, তার অনেক আগের থেকেই। কিশোরী অবস্থায় যখন প্রথম পরপুরুষের সঙ্গে আলাপ হয় তখন থেকেই। পুরুষ কথাটার উপর আমি এখানে জোর দিচ্ছি।

আমার বিপত্তি, আমার সমস্যা—পুরুষমানুষ কি কখনো নারীর মন বুঝতে পারে, চিনতে পারে, হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারে? সাহিত্যজ্ঞ সমালোচক পণ্ডিতরা বলেন, সার্থক সাহিত্যিকের ঐ তো কর্ম, ঐ তো তার সত্যকার সাধনার্জিত সিদ্ধি। জমিদার রবীন্দ্রনাথ গরীব পোস্টমাস্টার, ভিন্‌দেশী কাবুলীওলার বুকের ভিতর প্রবেশ করে তাদের হৃদয়ানুভূতি স্পন্দনে স্পন্দনে আপন স্পন্দন দিয়ে অনুভব করে তাঁর সৃজনীকলায় সেই অনুভূতিটি প্রকাশ করেন। যে কবি, যে সাহিত্যিক আপন নিজস্ব সত্তা সম্পূর্ণ বিস্মরণ করে, অপরের সত্তায় বিলীন হয়ে যত বেশী গ্রহণ করে আপন সৃজনে প্রকাশ করতে পারেন তিনিই তত বেশী সা-র্থক কবি, সাহিত্যিক।

এ-তত্ত্বটা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু আমার দৃঢ়তর বিশ্বাস, পুরুষ কবি, পুরুষ সাহিত্যিক কখনো, কস্মিনকালেও নারীর হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে নি, পারবেও না; তার কারণ কি, কেন পারে না, সে নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করেছি, কিন্তু কোনো সদুত্তর পাই নি।

যদিও কিঞ্চিৎ অবান্তর তবু এই প্রসঙ্গে একটি কথা তুলি। নারী-হৃদয়ের স্পন্দন এবং পুরুষ-হৃদয়ের প্রতিস্পন্দনের আলোচনা নয়; নারী পুরুষের একে

অন্যকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করার যে চিন্ময় প্রেম সেটাও নয়। আমি নিতান্ত মৃন্ময়, শারীরিক যৌন সম্পর্কের কথা তুলছি। আজকাল সাহিত্যিক, তাঁদের পাঠক সম্প্রদায়, খবরের কাগজে পত্র-লেখকের দল সবাই নির্ভয়ে এ-সব আলোচনা সর্বজনসমক্ষে করে থাকেন। আমার কিন্তু এখনো বাধো বাধো ঠেকে। কত হাজার বৎসরের 'না, না'-র taboo আজ অকস্মাৎ পেরিয়ে যাই কি প্রকারে?

তবে আমার এইটুকু সান্ত্বনা, যাঁর আপ্তবাক্যের শরণ আমি নিচ্ছি, তিনি আপনার গুরুর গুরু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যে 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে আপনি বহু বৎসর ধরে বিজড়িত সেই পত্রিকাতেই বেরিয়েছিল তাঁর একখানা চিঠি। আমার শব্দে শব্দে মনে নেই। তবে মূল তত্ত্বটি আমার মনে জ্বলজ্বল করছে।

কে যেন তাঁকে শুধিয়েছিল, পুরুষ যখন কখনো কোনো রমণীকে দেখে কামাতুর হয় (এখানে দেহাতীত স্বর্গীয় প্লাতনিক প্রেমের কথা হচ্ছে না), তার কামকে উত্তেজিত করে রমণীর কোন্ কোন্ জিনিস?

তার মুখমণ্ডল, তার ওষ্ঠাধর, তার নয়নাপ্নি, তার কুচদ্বয়, তার নিতম্ব, তার উরু।

এইবারে প্রশ্ন, কোনো পুরুষকে দেখে যখন কোনো রমণী কামাতুরা হয় তখন কি দেখে তার কামবহ্নি প্রজ্বলিত হয়?

যে-ভদ্রলোক দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথকে এ-প্রশ্ন শুধিয়েছিলেন তাঁর পত্র 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু 'দেশে' প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রনাথের পত্রোত্তর থেকে সে-প্রশ্নের মোটামুটি স্বরূপ অনুমান করা যায়।

আবার বলছি, দ্বিজেন্দ্রনাথ কি উত্তর দিয়েছিলেন সেটি আক্ষরিক, হুবহু আমার মনে নেই। তিনি যা লিখেছিলেন তার মোদ্দা তাৎপর্য ছিল; তিনি যে এ-সম্বন্ধে কোনো চিন্তা করেন নি, তা নয়। কিন্তু কোনো সদুত্তর খুঁজে পান নি।

তারপর ছিল ইংরিজি একটি সেন্টেন্স। যতদূর মনে পড়ছে, তিনি লিখলেন, But why ask me? Ask Rabi. He deals in them. অর্থাৎ বলতে চেয়েছিলেন, তিনি দার্শনিক, এ-সব ব্যাপারে তিনি বিশেষজ্ঞ নন; তবে লাকিলি তাঁর ছোট ভাইটি এ-বাবদে স্পেশালিস্ট; তিনি প্রেম, কাম, নিষ্কাম প্রেম সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত দিতে পারেন।

কিন্তু সৈয়দ সাহেব, পীর সাহেব, আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস কনিষ্ঠ ভ্রাতাটিও এ-বিষয়ে খুব বেশী ওয়াকিফহাল ছিলেন না। প্রথম যৌবনে তিনি এ-সব নিয়ে কবিতা লিখেছেন,। কিন্তু বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করার পর তিনি—যাকে বলে হট্-স্টাফ—সেটাকে তাঁর গানের বিষয়বস্তু করেন নি। বোধ হয় ভেবেছিলেন, তাঁর রচিত হট্-স্টাফ্ গান আশ্রমের ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণীরা দিনের পর দিন শুনবে, এটা কেমন যেন বাঞ্ছনীয় নয়। এবং এগুলো তো আর ওয়াটার-

টাইট কমপার্টমেণ্টে বন্ধ করে খাস কলকাতার বয়স্কদের কন্‌জাম্‌প্‌শনের জন্য চালান দেওয়া যায় না। ওগুলোর বেশ কিছু ভাগ বুমরাঙের মত ফিরে আসবে সেই বোলপুরেই—প্রথম যুগে গ্রামোফান রেকর্ডের "কল্যাণে", পরবর্তী যুগে বেতার তো ঘরে ঘরে।

অযথা বিনয় আমার সয় না। আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত বেশ ভালো করেই চিনি, অবশ্য বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগের মত তাঁর গানের "ফুলস্টপ-কমা স্পেশালিস্‌ট্‌" নই। তাই অফ্‌হ্যান্‌ড্‌ বলছি তাঁর শেষের দিকের গানের একটিতে হট্‌-স্টাফের কিঞ্চিৎ পরশ আছে ঃ—

"বাসনার রঙে লহরে লহরে
রঙিন হল।
করুণ তোমার অরুণ অধরে
তোলো হে তোলো।"

আর বার বার বলছেন, "পিয়ো হে পিয়ো।" সর্বশেষে বলছেন, আমার এই তুলে-ধরা পান-পাত্র চুম্বনের সময় তোমার নিশ্বাস যেন (আমার) নিশ্বাসের সঙ্গে মিশে যায়।

এই যে প্রিয়ার "নবীন উষার পুষ্পসুবাসের" মত নিশ্বাস, একে নিঃশেষে শোষণ করার মত সাব্‌লাইম্‌ কাম আর কী হতে পারে?

কিন্তু আপনার মুখেই শুনেছি, রবীন্দ্রভক্তদের ভিতর এ-গানটি খুব একটা চালু নয়। অথচ দেখুন, সিনেমা এটা নিয়েছে, গ্রামোফোন এটা রেকর্ড করেছে। মাফ করবেন, আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, এইসব তথাকথিত রবীন্দ্রভক্তদের চেয়ে ব্যবসায়ী সিনেমা, গ্রামোফোন কোম্পানি রবীন্দ্রনাথ ক বহু বহু বার অধিকতর সম্মান দেখিয়েছে, নিজেদের সুরুচির পরিচয় দিয়েছে।

হ্যাঁ, আগে ভাবি নি, এখন হঠাৎ মনে পড়লো আরেকটি গানের কথা। এটি অবশ্য হট্‌-স্টাফ্‌ নয়, কিন্তু আমার মূল বক্তব্যের সঙ্গে এর যোগ রয়েছে।

"ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো
আমার মুখের আঁচলখানি।
ঢাকা থাকে না হায় গো,
তারে রাখতে নারি টানি॥
আমার রইল না লাজলজ্জা,
আমার ঘুচল গো সাজসজ্জা—
তুমি দেখলে আমারে
এমন প্রলয়-মাঝে আনি
আমায় এমন মরণ হানি॥"

আচ্ছা, চিন্তা করুন তো এ-গানটি কোন্‌ সময়ের রচনা? ভাষার পারিপাট্য,

স্বতঃস্ফূর্ত মিলের বাহার, আরো কত না কারুকার্য—যেগুলো চোখে পড়ে না, কারণ প্রকৃত সার্থক কলার ভিতরে তারা নিজেদের এফার্টলেসলি বিলীন করে দিয়েছে—এগুলো তো ঐ গানের পরবর্তী শ্লোকের ভাষায় "আকাশ উজলি" লাগিয়ে বিজুলি আমাকে পরিষ্কার ইঙ্গিত দিচ্ছে, গানটি কবির পরিপক্ক বয়সের অত্যুৎকৃষ্ট সৃজন। নিশ্চয়ই এ-শতাব্দীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকে।

কিন্তু যে গুণী আমাকে এ-গানটি শুনিয়েছিলেন এবং শেখাবারও চেষ্টা করেছিলেন তিনি "গীতবিতানে" যে মুদ্রিত পাঠ আছে তার থেকে মাত্র একটি শব্দ পরিবর্তন করে গানটি গেয়েছিলেন : ছাপাতে আছে, ঝড়ের দুর্দান্ত বাতাসে কে যেন আর্তরব করছে, তবে 'মুখের আঁচলখানি উড়ে যাচ্ছে।'

গুণী বলেছিলেন, "১৯২০-১৯৩০"-এ মুখের আঁচল উড়ে যাওয়াতে কোন্ মেয়ে এরকম চিল-চ্যাঁচানো চেল্লাচেল্লি পাড়া-জাগানো হৈ-হুল্লোড় আরম্ভ করবে ? তার নাকি "সাজসজ্জা লাজলজ্জা" বেবাক কপ্পূর হয়ে গেল। (এস্থলে বলি, ঐ গুণীটি আপনার ভাষার অনুকরণ করেন।) আর শুধু কি তাই ? তাকে "প্রলয় মাঝে আনি/এমন মরণ হানি"—"তুমি দেখলে আমারে !"—'

গুণী বললেন, 'এটা হতেই পারে না। আসলে গানটি কি ছিল জানেন ? সে যখন ভূমিষ্ঠ হয় সে ছিল তখন উলঙ্গ। সে গান ছিল,

"ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো
আমার বুকের
বসনখানি"

অর্থাৎ ঝড়ে মুখের "আঁচলখানি" যায় নি, গেছে "বুকের বসনখানি"।

কিন্তু গানটি প্রথমবার গাওয়া মাত্রই যাঁরা সে নিতান্ত ঘরোয়া জলসাতে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা কেমন যেন অস্বস্তি অস্বস্তি ভাব প্রকাশ করে কেউ বা জানলা দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে লাগলেন, কেউ বা পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ খুঁটতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ নূতন গান প্রথমবার সর্বজন-সমক্ষে গাওয়া হয়ে যাওয়ার পরই আপন প্যাঁসনে চশমাটি পরে নিয়ে সকলের মুখের দিকে এক নজর চোখ বুলিয়ে নিতেন এবং বুঝে যেতেন, নূতন গানটি শ্রোতাদের হৃদয়-মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এবারে তিনি বুঝে গেলেন, কোনো কিছুতে একটা খটকা বেধেছে—যেটা অবশ্য ছিল বড় বিরল। তাই কাকে যেন শুধোলেন—আমার ঠিক ঠিক মনে নেই—ব্যাপারটা কি ? কারণ আজ আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, গানটি অপূর্ব।

তখন কে যেন একজন সভয়ে বললেন, "ঐ বুকের বসন" কেউ, কেউ মিসআণ্ডারস্টেণ্ড করতে পারে হয়তো।"

রবীন্দ্রনাথ এ-সব রসের আসরে তর্কাতর্কি করতেন না। চুপ করে একটু-খানি ভেবে বললেন, "আচ্ছা দেখছি।"

আশ্রমে রাত্রের খাবার ঘণ্টা পড়ে গেল। সভা ভঙ্গ হলো।

তার পর দিনই টেলিগ্রাম পেয়ে কলকাতায় ফিরে আসতে হলো। তার কিছুদিন পরে ছাপাতে দেখি,—গানটি কোথায় যেন বেরিয়েছিল—"বুকের বসনের" বদলে "মুখের আঁচল" এই বিরূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।"

"গুণী কিছুটা সহানুভূতিমাখা সুরে আপন বক্তব্য শেষ করলেন এই বলে, "অর্থাৎ সেই নগ্ন নবজাত শিশু গানটির উপর রবীন্দ্রনাথ পরিয়ে দিলেন চোগা-চাপকান—পাঁচজনের পাল্লায় পড়ে।...এ-সম্বন্ধে আমার মতামত তো বললুম, কিন্তু কবি, সুরকার, নব নব রাগরাগিণীর সৃষ্টিকর্তা রবীন্দ্রনাথকে সমালোচনা করার—নিন্দাবাদ দূরে থাক—আমার কী অধিকার! আমার অতি নগণ্য রসবোধ যা বলে, সেইটেই প্রকাশ করলুম মাত্র।

* * *

কিন্তু প্রিয় সৈয়দ সাহেব, এই যে মুখের আঁচল, বুকের বসন নিয়ে কাহিনীটি ঐ গুণী কীর্তন করেছিলেন সেটা ন'সিকে লিজেণ্ডারি বা—আপনাদের রকের ভাষায় গুলও হতে পারে, কিংবা এর ভিতর সিকি পরিমাণ সত্যও থাকতে পারে। কারণ ঐ গুণী প্রধানত গাইতেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। সেখানে তাঁকে ক্রমাগত ইম্প্রভাইজ করতে হয়, নব নব রস সৃষ্টি করার জন্য নব নব কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। সেটা পরে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। তাই তো সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ওস্তাদদের নিয়ে এত গণ্ডায় গণ্ডায় লিজেণ্ড। হয়তো তিনি সেটা নিছক কল্পনা দিয়ে রঙে রসে জাল বুনেছেন, এবং বার বার একে ওকে সেটা বলে বলে, সেই "রেওয়াজের" ফল স্বরূপ নিজেই এখন সে-কাহিনী সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন।

আপনিই না এক দিন বলেছিলেন, "পরিপূর্ণ পাক্কা মিথ্যেবাদী হওয়ার পথে যেতে যেতে যারা উত্তম সুযোগ না পেয়ে দড়কচ্চা মেরে গেল, অর্থাৎ যাদের গ্রোথ্ স্টান্টেড্ হয়ে গেল, তারাই আর্টিস্ট, সাহিত্যিক, কবি, আরো কত কী!

তবে ঐ যে-লিজেণ্ডটির কাহিনী এই মাত্র বললুম, সেটা সত্য না হলেও হওয়া উচিত ছিল,—এবং যাই হোক্, যাই থাক্—কাহিনীটি ক্যারেক্টারিস্টিক এবং টিপিকাল।

কিন্তু আপনি এতক্ষণে নিশ্চয়ই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন—আবার ভাবছেন, আপনাকে আমার এ-চিঠি লেখার উদ্দেশ্যটা কি? এখুখুনি বলছি।

আমার বক্তব্য, কী রবীন্দ্রনাথ, কী কালিদাস, কী বুদ্ধদেব—কেউই রমণী-রহস্য এ-যাবত আদৌ বুঝে উঠতে পারেন নি। সহস্র বৎসরের এই সাধনার ধন পুরুষমানুষ অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে শুধু খুঁজেছে কিন্তু সন্ধান পায় নি।

প্রশ্নটা তো অতি সরল। যা দিয়ে আমি এ-চিঠি আরম্ভ করেছি। উপস্থিত কঠিনতর সমস্যা, রহস্যগুলো বাদ দিন। সেই যে অতিশয় সাদামাটা প্রশ্ন:

পুরুষের কি দেখে রমণী কামাতুর হয়? এবং সেটা শুধু নারী পুরুষেই সীমাবদ্ধ নয়। পশুপক্ষী কীটপতঙ্গেও সেটা সমানভাবে বিদ্যমান। অর্থাৎ অবজেকটিভ্‌ স্টাডি করারও পূর্ণ সুযোগ রয়েছে।

অথচ কিমাশ্চর্যমতঃপরম্‌! হাজার হাজার বৎসর চেষ্টা করেও পুরুষজাত যখন এর সমাধান বের করতে পারে নি, তখন এই ভেড়ার পাল, এই পুরুষজাত—অপরাধ নেবেন না—বের করবে স্ত্রীচরিত্রের রহস্য, তাদের প্রেমের প্রহেলিকা—যেটা শারীরিক সম্পর্কের বহু বহু ঊর্ধ্বে—তাদের হৃদয়ের আধা-আলো অন্ধকারের কুহেলিকা!

তাই নিবেদন, এই পুরুষজাতকে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। ডাক্তার না, পীর না, আপনিও না।

পুরুষজাতটা যে মেয়েদের তুলনায় মূর্খ এবং আপন মঙ্গল কোন্‌ দিকে সেটা না বুঝে বাঁদরের মত যে-ডালে বসে আছে সেই ডালটাই কাটে কুড়িয়ে-পাওয়া করাত দিয়ে। নইলে এই সাত হাজার বছর ধরে এত যুদ্ধ, এত রক্তপাত! আমার নিজের বিশ্বাস, স্ত্রীজাতি যদি এ-সংসারের সর্ব গবর্ণমেণ্ট চালাতো, কিংবা এখনো চালায় তবে ও-রকম-ধারা হবে না। আজো যদি ইউনাইটেড নেশনস্‌ থেকে সব কটা পুরুষকে ঝেঁটিয়ে বের করে দিয়ে নারীসমাজকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবে তারা ন'মাস দশদিনের ভিতর মার্কিন-রুশ-মৈত্রী প্রসব করবে! আমি আপনার মত দেশবিদেশ ঘুরি নি; যেটুকু দেখেছি তার মধ্যে সব চেয়ে মুগ্ধ হয়েছি, শিলঙের খাসিয়া সমাজে বাস করে—কারণ সে-সমাজ চালায় মেয়েরা। শুনেছি বর্মার সমাজব্যবস্থাও বড়ই সহজ সরল পদ্ধতিতে গড়া।

আরেকটা কথা: হজরৎ মুহম্মদ নবী ইসলাম স্থাপনা করেন। এবং সে শুভকর্মের প্রারম্ভিক মঙ্গলশঙ্খ কাকে দিয়ে বাজালেন? কাকে তিনি সর্বপ্রথম এই নবীন ধর্মে দীক্ষিত করলেন? তিনি তো বীবী খাদিজা—নারী। তার পর আসেন পুরুষ সম্প্রদায়, হজরৎ আলী, আবু বকর্‌, ওমর ইত্যাদি। তা হলে দেখুন, আপনি মুসলমান, আমি মুসলমান, অন্ততঃ আমাদের স্বীকার করতে হবে যে সর্বজ্ঞ আল্লাতালা—যিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং—তিনিই তাঁর শেষ-ধর্ম প্রচারের সময় একটি নারীকে সর্বোচ্চ আসন দিয়েছিলেন। ফাতিমা জিন্নাহ্‌ যখন পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট হবার জন্য আইয়ুব সাহেবের বিরুদ্ধে দাঁড়ান তখন কলকাতার কোনো কোনো মুসলমান আপত্তি জানিয়ে বলেন, তিনি নারী। আমি তখন বলেছিলুম, পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট হওয়ার চেয়ে মুসলিম জাহানে সর্বপ্রথম মুসলমানরূপে দীক্ষিত হওয়ার শ্লাঘাগৌরব অনেক অনেক বেশী—কোনো তুলনাই হয় না। সেই সম্মান যখন একটি নারী তেরশ' বছর পূর্বে পেয়েছে তখন আরেকটি আজ প্রেসিডেণ্ট হতে পারবেন না কেন?

তখন তাঁরা তর্ক তোলেন, কিন্তু হজরৎ নবী তো পুরুষ।

আমি বলি, তিনি তো আল্লার বাণী—যার নাম ইসলাম—আল্লার কাছে মিশন রূপে পেয়ে বীবী খাদিজাকে সেইটি দিলেন। স্বয়ং নবী তো এ-হিসেবের মধ্যে পড়েন না। (এ-স্থলে আমার মনের একটি ধোঁকা জানাই। উত্তর চাই নে। কারণ পূর্বেই বলেছি, আপনাদের কাউকে দিয়ে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। এ-চিঠির উত্তর আপনাকে লিখতে হবে না, কারণ সেটি আমি পাবো না।...ব্রাহ্মধর্মের সর্বপ্রথম ব্রাহ্ম কে? প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামমোহন? তবে তাঁকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করলো কে?...কিংবা নিন্ বুদ্ধদেব। তিনি স্বয়ং কি বৌদ্ধ? তাঁকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করলো কে? অন্যদের বেলা, যেমন খৃষ্ট, রামমোহনের বেলা অনুমান করতে পারি, স্বয়ং গড্ (য়াহ্‌ভে) বা পরব্রহ্ম খৃষ্টকে খৃষ্টধর্মে, রামমোহনকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করেন, কিন্তু বুদ্ধের বেলা? তিনি তো ভগবান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, এবং বলেছেন তিনি, তাঁরা (দেবতারা) থাকলেও তাঁরা মানুষকে সাহায্য করার ব্যাপারে অশক্ত। তা হলে?...এবং আজকের দিনের ভাষায় মার্ক্‌স্ কি মার্কসিস্ট? লেনিন অবশ্যই মার্কসিস্ট, কিন্তু লেলিন কি লেনিনিস্ট?)

কিন্তু একটা কথা পুরুষমাত্রকেই স্বীকার করতে হবে।

আল্লার হুকুমেই দৃশ্য অদৃশ্য সব-লোকই চলে, কিন্তু মানুষের কৃতিত্বও তো মাঝে মাঝে স্বীকার করতে হয়।

"অদ্যাপিও মধ্যে মধ্যে পুণ্যবান হয়।
নারীরে স্বীকার করি জয় জয় কয়।"

হজরৎ নবী এঁদেরই একজন। বড় বিরল, বড় বিরল, হেন জন যে নারীকে চিনে নিয়ে তার প্রকৃত ন্যায্য স্বীকৃতি দেয়। তাই হজরৎ বলেছিলেন,

"বেহেশ্‌ৎ মাতার চরণপ্রান্তে।"

এবং নিশ্চয়ই তখন একাধিক দীক্ষিত মুসলমানের অমুসলমান মাতা ছিল। হজরৎ এ-স্থলে কোনো ব্যত্যয় করেছেন বলে তো জানি নে। এবং এ-কথাও জানি হজরৎ শিশুকালেই তাঁর মা'কে হারান।

আমি হাড়ে হাড়ে অনুভব করতে পারছি, আপনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।

আমি করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে নিবেদন করছি, আপনার উদ্দেশে লেখা এই চিঠিই আমার শেষ চিঠি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। পূর্বেই বলেছি, এ-চিঠির উত্তরও আপনাকে লিখতে হবে না।

আপনিই আমাকে একদিন বলেছিলেন, যখন আপনার কোনো পাঠক বহু সমস্যাবিজড়িত, নানাবিধ প্রশ্নসম্বলিত দীর্ঘ পত্র লিখে, দফে দফে তার প্রতিটি প্রশ্নের সদুত্তরসহ দীর্ঘতর উত্তরের প্রত্যাশা করে তখন আপনি মনে মনে স্মিতহাস্য করে বলেন, ভদ্রলোক যা জানতে চেয়েছেন, সেগুলো একটু গুছিয়ে রম্যরচনাকারে "দেশ" বা "আনন্দবাজারে" পাঠিয়ে দিলে তো আমার দিব্য

দু'পয়সা হয়। আর লেখা জিনিসটা নাকি আপনার পেশা। ওটা আপনার নেশা নয়। এবং পেশার জিনিস তো কেউ ফ্রী বিলিয়ে বেড়ায় না। আমি তাই আপনার কাছ থেকে কোনো কিছু মুফতে চাই নে।

(শহ্‌র্‌-ইয়ারের চিঠি এতখানি পড়ার পর অকস্মাৎ "শংখচূড়ের ডংশনের" মত আমাকে সে-চিঠি স্মরণে এনে দিল, আমি এমনই পাষণ্ড যে, যবে থেকে, পোড়া পেটের দায়ে লেখা জিনিসটাকে পেশারূপে স্বীকার করে নিয়েছি, সেই থেকেই, শহ্‌র্‌-বর্ণিত ঐ কারণবশতই আপন বউকে পর্যন্ত দীর্ঘ প্রেমপত্র লিখি নি। স্তম্ভিত হয়ে ভাবলুম, সেই যে স্যাকরা যে তার মায়ের গয়নায় ভেজাল দিয়েছিল আমি তার চেয়েও অধম। স্যাকরা তবু ভালো মন্দ যাহোক মা'কে এক-জোড়া কাঁকন তো দিয়েছিল, আমি সেটিও প্রকাশক সম্পাদককে পাঠাচ্ছি! ...এই অনুশোচনার মাঝখানে আমার মনে যে শেষ চিন্তাটির উদয় হলো সেটি এই ঃ এ-হেন নির্মম আচরণে হয়তো আমিই একা নই। নেইবনে হয়তো আমি একাই খাটাশ হয়েও বাঘের সম্মান পাচ্ছি নে। আরো দু'চারটে খাটাশ আছেন। কিন্তু হায়, তাঁরা তো আমাকে পত্র লিখে তাঁদের হাঁড়ির খবর জানাবেন না!)

* * *

আত্মচিন্তা স্বদেহ-'ডংশন' স্থগিত রেখে আবার শহ্‌র-ইয়ারের চিঠিতে ফিরে গেলুম। এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করছি, নির্লজ্জের মত স্বীকার করছি, অকস্মাৎ পুরুষবিদ্বেষে রূপান্তরিত এ-রমণীর জাতক্রোধে পরিপূর্ণ এই পত্রখানা আমার খুব একটা মন্দ লাগছিল না।

এর পর ইয়ার লিখছে,—

আদিখেত্তা, না, আদিখ্যেতা? কিন্তু আপনি এই মেয়েলী শব্দটি বুঝবেন। আপনি ভাবছেন, আমি আদিখেত্তা, বা আপনাদের ভাষায় "আধিক্যতা" করছি। কিন্তু আপনি তো অন্তত এইটুকু জানেন—যদিও, অপরাধ নেবেন না, স্ত্রী-চরিত্রে আপনার জ্ঞান এবং অনুভূতি ঠিক ততটুকু, যতটুকু একটা অন্ধ এস্কিমোর আছে, হুগলি নদীর অগভীর বিপদসঙ্কুল ধারায় পাইলট জাহাজ চালাবার—আপনি নিশ্চয়ই জানেন, এ-হাহাকার দৈন্যের মরুভূমিতে আমি একা নই, আমার মত বিস্তর রমণী রয়েছে যাদের জীবন শূন্য। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই—বিশেষ করে হিন্দু রমণী—সেটা জীবনভর এমনই আশ্চর্য সঙ্গোপনে রাখে যে তাদের নিকটতম আত্মজনও তার আভাসমাত্র পায় না। গুরুর গানে আছে তাঁর বেদনার

"ভরা সে পাত্র তারে বুকে করে
বেড়ানু বহিয়া সারা রাতি ধরে।"

আর এই রমণীদের বেলা তাদের বেদনার

"ভরা সে পাত্র তারে বুকে করে
বেড়ানু বহিয়া সারা আয়ু ধরে।"

ঐ যে আপনার 'ভক্ত' খানের ঠাকুরমা। তিনি যে তাঁর সমস্ত জীবন শূন্যে শূন্যে কাটিয়েছেন তার আভাস কি তার জাদু ভূতনাথ (হোয়াট এ নেম ! আমার বিশ্বাস ওর বাপ-মা তার নাম রেখেছিলেন 'অনিন্দ্যসুন্দর খান' এবং বড় হয়ে, এ্যাজ এ প্রটেস্ট্, সে অন্য এক্স্ট্রিমে গিয়ে, এফিডেভিট দিয়ে 'ভূতনাথ' নাম নেয়) পর্যন্ত পেয়েছে ?

ঐ ঠাকুরমার শূন্যতা এবং আমার শূন্যতা যেন হংসমিথুনের মত আমাদের একে অন্যকে কাছে টেনে নিয়ে আসে। ওঁদকে উনি নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণী এবং আমিও গরবিনী মুসলমানী। শুনেছি, প্রলয়ংকরী বন্যার সময় একই গাছের-গুঁড়ির উপর ঠাসাঠাসি করে সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর, নকুল, গোসাপ নিরাপদ তীরের আশায় ভেসে ভেসে যায়। কেউ তখন কারো শত্রুতা করে না, এমন কি আপন অসহায় ভক্ষ্য প্রাণীকেও তখন আক্রমণ করে না। আর আমাতে ঠাকুমাতে তো পান্না-সোনায় মিল্‌টি মানানসই। আমরা দুজনা বসে আছি একই নৌকায়। একমাত্র রাজনৈতিক সুবিধাবাদীরা বলে, হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কটা অহিনকুলের—আজকের দিনের ভাষায় বুর্জুয়া প্রলেতারিয়ার)। আর আমাদের উভয়ের সামনে,

"ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার, সম্মুখে ঘন আঁধার
পার আছে কোন্ দেশে ॥...
হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা
চলেছে নিরুদ্দেশে ॥
পথের শেষ কোথায় শেষ কোথায়
কী আছে শেষে !"

ঐ তো আমার 'দোষ'। কোনো-কিছু বলতে গেলেই আমার রসনায় এসে আসন নেন রবিঠাকুর, কালিদাসের রসনায় যে-রকম বীণাপানি আসন জমিয়ে মধুচক্র গড়তেন। আর লোকে ভাবে—হয়তো ঠিকই ভাবে—আমার নিজস্ব কোনো ভাব-ভাষা নেই, আমি "চিত্রিতা গর্দভী"—রবিকাব্যের গামলার নীল রঙে আমার ধবলকুষ্ঠের মত সাদা চামড়াটি ছুপিয়ে নিয়ে নবজলধরশ্যাম কলির মেকি কেষ্ট হয়ে গিয়েছি !

কিন্তু আপনি জানেন, আপনাকে অসংখ্য বার বলেছি, আমি রাজা পিগমালিয়োন—এস্থলে রবীন্দ্রনাথ নির্মিত মর্মরমূর্তি। বরঞ্চ তারো বাড়া। পিগ্‌মালিয়োন তাঁর গড়া প্রস্তরমূর্তিতে প্রাণসঞ্চার করতে অক্ষম ছিলেন বলে দেবী আফ্রোদিতে'কে প্রার্থনা করেন, তাঁর সেই মূর্তিটিকে জীবন্ত করে দিতে। দেবীরা—পূর্বের কথা স্মরণ করে দিয়ে আবার বলছি, পুরুষের তুলনায় তাঁরা

চিরন্তনী করুণাময়ী। "ধন্য মা মেরি, তুমি, মা, পূর্ণা করুণাময়ী" সর্বদেবীর সর্বশেষ সর্বাঙ্গসুন্দরী মা-জননী—দেবী আফ্রোদিতে রাজার বর পূর্ণ করে দিলেন। এ-স্থলে দেবীর এমন কী কেরামতী, কী কেরদানী! পক্ষান্তরে দেখুন, আমার এই মূর্তদেহ নির্মাণের জন্য, প্রশংসা হোক, নিন্দা হোক, সেটা পাবেন আমার জনক-জননী। কিন্তু সে-দেহটাকে চিন্ময় করলো কে? গানে গানে, রসে রসে, রামধনুর সপ্তবর্ণের সঙ্গে মিশিয়ে তার ভিতর দিয়ে উড়ে-যাওয়া নন্দনকানন-পারিজাত রঙে রঞ্জিত প্রজাপতির কোমল-পেলব ডানা দুটির বিচিত্র বর্ণে, নবীন উষার পুষ্পসুবাসে, প্রেমে প্রেমে, বিরহে বিরহে, বেদনা বেদনায় কে নিরমিল আমার হৃদয়, আমার স্পর্শকাতরতা, কোণের প্রদীপ যে-রকমজ্যোতিঃসমুদ্রে মিলিয়ে যায় হুবহু সেইরকম সৌন্দর্যসাগরে ক্ষণে ক্ষণে দিনে দিনে আমার নিজের সত্তাকে বিলীন করে দেবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত আকুলতা—এটি নির্মাণ করলো কে? মহাপ্রভুর বর্ণ দেখে কে যেন রচেছিলেন —শব্দে শব্দে মনে নেই—

"চাঁদের অমিয়া সনে চন্দন বাটিয়া গো,
কে মাজিল গোরার দেহখানি!"

ভারী সুন্দর! আকাশের চাঁদ আর পৃথিবীর চন্দন—অর্থাৎ স্বর্গের দেবতা চন্দ্র আর এই মাটির পৃথিবীর চন্দন দিয়ে, কুন্দসী দ্বারা স্বর্গমর্ত্যের সমন্বয়ে মাজা হল গৌরাঙ্গের দেহখানি! কিন্তু মহাপ্রভুর ভাষাতেই বলি এহ বাহ্য। 'দেহ' তো বাইরের বস্তু।

বার্ণাড শ' রাজা পিগমালিয়োনকে অবশ্যই ছাড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি তাঁর মূর্তি এলাইজাকে দিলেন সুমিষ্ট ভাষা এবং সুভদ্র বিষয় নিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট সমাজে আলোচনা করার অনবদ্য দক্ষতা।

শ'কে ছাড়িয়ে বহু বহু সম্মুখে এগিয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। আমার চিৎময় হৃদ্‌ময় জগৎ নির্মাণ করে তিনি আমাকে যে বৈভব দিয়েছেন, শ'র সৃষ্টি তার শতাংশের একাংশও পায় নি।

আপনাদের ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে আপনার সম্মুখে শেষবারের মত আমার শেষ গুরুদক্ষিণা নিবেদন করে গেলুম।

* * *

কিন্তু মেয়েদের এই শূন্যতা, দীনতা, ফ্রাসট্রেশনের জন্য দায়ী কে?

নারী হয়েও বলবো, তার জন্য সর্বাগ্রে দায়ী রমণীকুল। প্রধানতঃ।

আপনারই গুরু স্বর্গত ক্ষিতিমোহন সেনের "দেশে" প্রকাশিত রচনাতে একটি সুভাষিত পড়েছিলুম,

"কুঠারমালিনং দৃষ্ট্বা
সর্বে কম্পান্বিতা দ্রুমাঃ।

বৃদ্ধ দ্রুমো বক্তি, "মা ভৈঃ
ন সন্তি জ্ঞাতয়ো মম" ॥

"কুঠারমালাধারীকে দেখে সমস্ত গাছ যখন কম্পান্বিত তখন বৃদ্ধ একটি গাছ বললে, 'এখনই কিসের ভয়? এখনো আমাদের (জ্ঞাতি) কোনো গাছ বা বৃক্ষাংশ ওর পিছনে এসে যোগ দেয়নি'।

শহ্‌র্‌-ইয়ার লিখছে, বড় হক্‌ কথা। কামারের তৈরী কুড়োলের সুন্দুমাত্র লোহার অংশটুকুন দিয়ে কাঠুরে আর কি করতে পারে, যতক্ষণ না কাঠের টুকরো দিয়ে ঐ লোহায় ঢুকিয়ে হ্যাণ্ডিল বানায়। পুরুষজাত ঐ লোহা; সাহায্য পেল মেয়েদের সহযোগিতার কাঠের হ্যাণ্ডিল। তাই দিয়ে যে-মেয়েরই একটু 'বাড়' হয় তাকে কাটে, আর যেগুলো নিতান্ত নিরীহ চারা গাছ বা যে-সব বছর-বিয়ানীরা গণ্ডায় গণ্ডায় বাচ্চা বিইয়ে বিইয়ে জীবন্মৃত তাদের রেহাই দেয়।

এই সব অপকর্মে যুগ যুগ ধরে সাহায্য করেছে মেয়েরাই। শুনেছি, সতীদাহের পুণ্যসঞ্চয় করার জন্য বিধবাকে প্ররোচিত করেছে সমাজাগ্রগণ্যা নারীরাই।

এত দিন বলি নি, এই বারে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার বেলা বলি, এই কলকাতার মুসলমান মেয়েরা—দু'চারটি হিন্দুও আছেন—আপনার সঙ্গে আমার অবাধ মেলা-মেশা দেখে ঢিঢিট্রাকার দেয় নি? বেহায়া বেআব্রু বেপর্দা বেশরম, তওবা তওবা বলে নি? তবে কি না, আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, "চাঁদের অমিয়া সনে চন্দন বাটিয়া" হয়তো আমার দেহ এমন কি হৃদয়ও মাজা হয়েছে, কিন্তু আমার মস্তিষ্ক, তজ্জনিত বুদ্ধি এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অবহেলা করার মত আমার গণ্ডারচর্মবিনিন্দিত দার্ঢ্য নির্মিত হয়েছে, সুইডেনের প্যোর স্টেন্‌লেস্‌ স্টীল ও সাউথ আফ্রিকার আন্‌-কাট্‌ ডায়মণ্ড মিশিয়ে। আর আছেন, ভূতনাথের ঠাকুমা। যাঁকে বলতে পারেন আমার টাওয়ার অব্‌ পাওয়ার।

তদুপরি আমার অভিজ্ঞতা বলে, এই সব "আজ-আছে-কাল-নেই" জিভের লিকলিকিনি অনেকখানি বিয়সন্তোষমনা পরশ্রীকাতরতা বশতঃ। ইলিয়েট রোডের সায়েব মেমরা বড়দিনে যখন নানাবিধ ফুর্তির সঙ্গে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে ধেই ধেই করে নৃত্য করে তখন আমরা—হিন্দু-মুসলমানরা—প্রাণভরে ছ্যা ছ্যা করি বটে, কিন্তু তখন কসম খেতে হলে ধোওয়া তুলসী পাতাটির পার্ট প্লে করা বন্ধ করে স্বীকার করতে হবে, মনের গোপন কোণে হিংসেয় মরি, "হায়! আমাদের রন্দী বুড্‌ঢা সমাজ এ-আনন্দ থেকে আমাদের বঞ্চিত করলো কেন?" নয় কি? সত্য বলুন। কিন্তু আপনার কথা আলাদা। আপনি বিদেশে বিস্তর নেচেছেন, আর এখন, আমাদের মত নিরীহদের মৃদুমন্দ নাচাচ্ছেন। আহা! গোস্‌সা করলেন না তো? শুনেছি, সৈয়দরা বড্ড রাগী হন। তবে সঙ্গে সঙ্গে একটা সান্ত্বনার বাণীও পেয়েছি; ওঁয়াদের রাগ নাকি খড়ের আগুনের মত—

ধপ্‌ করে জ্বলে আর ঝপ্‌ করে যায় নিভে—সঙ্গে সঙ্গে।

অবশ্য একটা জিনিস আমাকে গোড়ার দিকে কিছুটা বেদনা দিয়েছিল—এই সব নগণ্য ক্ষুদে ক্ষুদে, কিন্তু বিষেভর্তি চেরা-জিভ যখন আমার স্বামী, আপনার বন্ধু ডাক্তারের বিরুদ্ধে হিস্‌ হিস্‌ করে বিষ বমন করতো। সেখানে আমি যে নাচার। আমি কি রকম জানেন? আপনার ডাক্তার যখন কোনো রুগীকে ইন্‌জেকশন দেয় তখন আমি সেদিকে তাকাতে পারি নে। আমার বলতে ইচ্ছে করে, না হয় দাও না, বাপু, ইনজেকশনটা আমাকেই।

অবশ্য আল্লার মেহেরবাণী। ডাক্তারের কাছে এ-সব হাম্‌লা পেঁছিয় না। তাঁর রিসার্চ-ক্লরফরুম্‌ দিয়ে তিনি তাঁর পঞ্চেন্দ্রিয় অবশ অসাড় করে রেখেছেন।

আপনাকে বলেছি কি সেই গল্পটা? এটি আমি শুনেছি বাচ্চা বয়সে আমাদের বাড়ির এক নিরক্ষরা দাসীর কাছ থেকে। তাই এটা হয়তো লোকমুখে প্রচলিত আঞ্চলিক কাহিনী মাত্র—কেতাব-পত্রে স্থান পায় নি বলে হয়তো আপনার অজানা।

এক বাদশা প্রায়ই রাজধানী থেকে দূরে বনের প্রান্তে একটি নির্জন উদ্যান-ভবনে চলে যেতেন শান্তির জন্য। সেখানে বালক যুবরাজের ক্রীড়াসঙ্গী নর্মসখা-রূপে জুটে যায় এক রাখাল ছেলে। তাদের সখ্যে রাজপুত্র কৃষকপুত্রের ব্যবধান ছিল না।

বাদশা মারা গেলে পর যুববাজ বাদশা হলেন। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর ধরে যুবরাজ আর সুযোগ পান নি সেই উদ্যানভবনে আসার। যখন এলেন তখন সন্ধান নিলেন তাঁর রাখাল বন্ধুর—স্বয়ং গেলেন তার পর্ণকুটিরে। রাখাল ছেলে পূর্বেরই মত মোড়ামুড়ি দিল। যুবরাজ শুধোলেন, "তোমার বাপকে দেখছি না যে?"

"তিনি তো কবে গত হয়েছেন! আল্লা তাঁর আত্মার মঙ্গল করুন।"

"গোর দিলে কোথায়?"

"ঐ তো হোথায়, খেজুর গাছটার তলায়। বাবা ঐ গাছের রস আর তাড়ি খেতে ভালোবাসতো বলে আমাকে আদেশ দিয়ে গিয়েছিল তাকে যেন ওরই পায়ের কাছে গোর দি।" (নাগরিক বিদগ্ধ ওমর খৈয়ামও দ্রাক্ষাকুঞ্জে সমাধি দিতে বলেছিলেন, না?)

রাখাল ছেলে জানতো, আগের বাদশা গত হয়েছেন। তাই শুধলো, "আর হুজুর বাদশা'র গোর কোথায় দেওয়া হলো?"

ঈষৎ গর্বভরে নবীন রাজা বললেন, "জানো তো রাজা-বাদশারা বড় নিমক-হারাম হয়, বাপের গোরের উপর কোনো এমারৎ বানায় নাও।...আমি, ভাই, সেরকম নই। বাবার গোরের উপর বিরাট উঁচু সৌধ নির্মাণ করেছি, দেশ-বিদেশ থেকে সর্বোত্তম মার্বেল পাথর যোগাড় করে।...এই বনের বাইরে

গেলেই তার চূড়োটা এখান থেকেও স্পষ্ট দেখা যায়।"

রাখাল ছেলে বললে, "সে আর দেখি নি? কিন্তু তুমি, ভাই, করেছ কি? শেষবিচার কিয়ামতের দিন. আল্লার হুকুমে ফিরিশ্‌তা ইসরাফিল যখন শিঙে বাজাবেন তখন কত লক্ষ মণ পাথর খুঁড়ে খুঁড়ে ভেঙে ভেঙে উঠতে হবে বেহেশ্‌ৎ বাগে। তাঁর জন্য এ মেহেন্নতী তৈরী করলে কেন?...আর আমার বাবা তার গোরের উপরকার আধ হাত মাটি এক ধাক্কায় ভেঙে ফেলে হুশ হুশ করে চলে যাবে আল্লার পায়ের কাছে।"

* * *

প্রিয় সৈয়দ সাহেব, আমাকে দিয়েছে জ্যান্ত গোর বিরাট ইঁট-সুরকির এই বাড়িতে। বধূ হয়ে যে-সন্ধ্যায় এ-বাড়িতে প্রথম প্রবেশ করি তখনই আমার শরীরটা কেমন যেন একটা শীতলতার পরশে সির্‌সির্‌ করেছিল, যদিও আমার পরনে তখন অতি পুরু আড়ি-বেল বেনারসী শাড়ি, কিংখাপের জামা আর সর্বাঙ্গ জড়িয়ে আপনার ডাক্তারের ঠাকুমার কাশ্মীরী শাল—যার সাচ্চা জরির ওজনই হবে আধসের।

আপনি এ-বাড়ির অতি অল্প অংশই চেনেন। এ-বাড়ির পুরো পরিক্রমা দিতে হলে ঘণ্টাটাক লাগার কথা। আমাকে কয়েক দিন পর পরই এ-পরিক্রমা লাগাতে হয়। প্রথম প্রথম খুব একটা মন্দ লাগতো না—প্রাচীন দিনের কতশত সম্পদ, টুকিটাকি, নবীন দিনের সঞ্চয়ও কিছু কম যায় না—এস্তেক কার যেন প্রেজেণ্ট দেওয়া একটা টেলিভিসন সেট্‌—যদিও কবে যে এটা কাজে লাগবে, সেটা ভবিষ্যতের গর্ভে! যেন যাদুঘরে এটা-ওটা দেখছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি।

কিন্তু চিন্তা করুন, যদি আপনাকে যাদুঘরে আহারনিদ্রা দাম্পত্য-জীবন যাপন করতে হয়, তবে কি রকম হাল হয়!

তবু বলি, এও কিছু নয়। সামান্য ইঁট-পাথর, প্রাচীন দিনের সঞ্চয়—এরা প্রাণহীন। এরা আমার মত সজীব প্রাণচঞ্চল জীবকে আর কতখানি সম্মোহিত করবে?

কিন্তু এরা যে সবাই সর্বক্ষণ চিৎকার করে করে আমাকে শোনাচ্ছে,

"ট্র্যাডিশন! ট্র্যাডিশন!! ঐতিহ্য! ঐতিহ্য!!"

সবাই বলছে, সাত পুরুষ ধরে এই খানদানী পরিবারে যা চলে আসছে, সেইটে তোমাকে মেনে চলতে হবে, বাঁচিয়ে রাখতে হবে, এবং মরার সময়ও তার ভবিষ্যতের জন্য পরিপাটি ব্যবস্থা করে যেতে হবে।

আর যারা জ্যান্ত? নায়েব, তাঁর পরিবারবর্গ, এ-বাড়ির দারওয়ান ড্রাইভার বাবুর্চি চাকর হালালখোর, পাশের মসজিদের ইমাম মোয়াজ্জিন সক্কলের চেহারাতেই ঐ একটি শব্দ নিঃশব্দে ফুটে উঠছে: ট্র্যাডিশন। বিগলিতার্থ: বেগমসাহেবা যদি খানদানী প্রাচীন পন্থা মেনে চলেন তবে আমরা তাঁর

গোলামের গোলাম, আমরা নামাজের পর পাঁচ বেকৎ আল্লার পদপ্রান্তে লুটিয়ে বলবো, "ইয়া খুদা, এই শহ্‌র্‌-ইয়ার বানু 'জিল্‌লুল্লা', এই দুনিয়ায় 'আল্লার ছায়া'। তাঁরই সুশীতল ছায়াতে আমাদের জীবন, আমাদের সংসার, আমাদের মৃত্যু, আমাদের মোক্ষ। তুমি তাঁকে শতায়ু করো, সহস্রায়ু করো! আমেন!"

আমি সিনিক্‌ নই। তাদের এ-প্রার্থনায়, তাদের ঐতিহ্যরক্ষার্থ-কামনায় প্রচুর আন্তরিকতা আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আছে সেই আদিম ইন্‌স্‌টিন্‌ক্‌ট্‌, জীবনসংগ্রামে কোনোগতিকে টিকে থাকবার, কোনোগতিকে বেঁচে থাকবার প্রচেষ্টা।...আজ যদি কালীঘাটের মন্দির নিশ্চিহ্ন করে পুরুৎ পুজোরীদের আদেশ দেন "চরে খাও গে!" তবে তারা যাবে কোথায়? বর্তমান যুগোপযোগী জীবনসংগ্রামে যুদ্ধ করার মত কোনো ট্রেনিং তো এদের দেওয়া হয় নি। এদের অবস্থা হবে, খাঁচার পাখিকে হঠাৎ ছেড়ে দিলে যা হয়। খাঁচার লৌহদুর্গে দীর্ঘ-কাল বাস করে সে আত্মরক্ষার কৌশল ভুলে গিয়েছে, দু'বেলা গেরস্তের তৈরী ছোলা-ফড়িং খেয়ে খেয়ে ভুলে গিয়েছে আপন খাদ্য সংগ্রহ করার ছলা-কলা।

আবার আমার 'লোক-লস্করের' কথায় ফিরে আসি। এদের সবাইকে যদি আমি কাল ডিসমিস করে দি,—সে এক্তেয়ার ডাক্তার আমাকে দিয়েছেন—তবে কি হবে? অধিকাংশই না খেয়ে মরবে। তারা শুধু জানে ট্র্যাডিশন। তাদের জন্ম হয়েছে এ শতাব্দীতে, কিন্তু মৃত্যু হয়ে গিয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই।

আমি একাধিকবার চেষ্টা দিয়েছিলুম এ-বাড়িতে ফ্রেশ্‌ ব্লাড আমদানি করতে। চালাক চতুর দু'একটি ছোকরাকে বয়্‌ হিসেবে নিয়ে এসেছি। জানেন কি হলো? পক্ষাধিক কাল যেতে না যেতেই তারা ভিড়ে গেল প্রাচীনপন্থী দারওয়ান বাবুর্চির সঙ্গে। বুঝে গেল, রুটির ঐ-পিঠেই মাখন মাখানো রয়েছে। সিনেমা যাওয়া পর্যন্ত তারা বন্ধ করে দিল। অক্লেশে হৃদয়ঙ্গম করলুম, দেড়শ' কিংবা তারো বেশী ট্র্যাডিশনের মায়াজাল ছিন্ন করার মত মোহমুদ্গর আমি রাতারাতি—রাতারাতি দূরে থাক, বাকি জীবনভর চেষ্টা করলেও—নির্মাণ করতে পারবো না।

অবশ্য আমার দেবতুল্য স্বামী আমাকে বাসরঘরেই সর্বস্বাধীনতা দিয়ে-ছিলেন, সর্ব বাবদে—সে-কথা আমি আপনাকে পূর্বেই বলেছি। কিন্তু স্বাধীনতা দিলেই তো সব মুশকিল আসান হয়ে যায় না। স্বাধীনতা পেয়ে খাঁচার পাখিটার কি হয়েছিল? অনাহারে যখন ভিরমি গিয়ে চৈত্রের ফাটাচেরা মাঠে পড়ে আছে, তখন শিকরে পাখি তাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গাছের ডালে বসে কুরে কুরে তার জিগর-কলিজা খেল।

* * * *

সে-কথা জানে বলেই এ-বাড়ির লোক আমাকে প্রথম দিনই খাঁচাতে পুরতে চেয়েছিল। ওরা সবাই ট্র্যাডিশনের খাঁচাতে। খাঁচার ভিতরকার

নিরাপত্তা, অন্নজল বাইরে কোথায় পাবে? আমাদের এক সমাজতত্ত্ববিদ নাকি বলেছেন, ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা না পেলেই নাকি আমাদের পক্ষে ভালো হতো। ওঁর বক্তব্য, ইংরেজ আমলে নাকি আমাদের ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্র-ইন্ধনের দুশ্চিন্তা ছিল অনেক কম।

এই বারে মোদ্দা কথা বলি। সেই রাখাল ছেলের বন্ধুর পিতা বাদশা তাঁর সমাধিসৌধের প্রস্তর ভেঙে ভেঙে উঠতে যত না হিমসিম খাবেন, তার সঙ্গে আমার এই উৎকট সংকটের কোনো তুলনাই হয় না। জ্যান্ত গোরের মানুষ আপন ছটফটানিতে নিরুদ্ধ-নিঃশ্বাস হয়ে প্রাণবায়ু ত্যাগ করে।

তথাপি আমি ঐ খানদানী পাষাণদুর্গে থাকতে চাই নি। ঠিক মনে নেই, তবে গল্পটি খুব সম্ভব সার্থকা সাহিত্যিকা শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা দেবীর; একটি বালিকা স্বাধীনতা আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি যুবকের সংস্পর্শে এসে স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়। অহেতুক যোগাযোগের ফলে তার কিন্তু বিয়ে হয়ে গেল এক অতি দুর্ধর্ষ কৃষাণরক্তশোষক জমিদারের ছেলের সঙ্গে। আমার মনে নেই, মেয়েটি হয়তো বা অনিচ্ছায় বিয়ে করেছিল, কিংবা হয়তো বলদৃপ্ত পদে স্বামীগৃহে প্রবেশ করেছিল, কঠোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে এ-জমিদার পুরুষ-ক্রমে যা করেছেন, যেটা দু ছত্রে বলা যায়,

"পাকা রাস্তা বানিয়ে বসে দুঃখীর বুক জুড়ি
ভগবানের ব্যথার 'পরে হাঁকায় সে চার-ঘুড়ি।"

(আবার রবীন্দ্রনাথ! এই মুহম্মদী মামদোর উপর তিনি আর কত বৎসর ভর করে থাকবেন!) সেই পিচেশী রক্তশোষণ সে চিরতরে বন্ধ করবে—আপ্রাণ সংগ্রাম দিয়ে, প্রয়োজন হলে পরমারাধ্য স্বামীকে পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ দিয়ে, ডিফাই করে।

এবং দিয়েও ছিল সে মোক্ষম লড়াই তাঁর খাণ্ডারনী শাশুড়ীর বিরুদ্ধে—তিনিই ছিলেন এই প্রজা-শোষণ-উচাটনের চক্রবর্তিনী।

সংক্ষেপে সারি। তার বহু বৎসর পরে কি পরিস্থিতি উদ্ভাসিত হলো? সেই পূর্বেরটাই। যথা পূর্বং তথা পরং! যদ্বৎ তদ্বৎ পূর্ববৎ। ইতিমধ্যে শাশুড়ী মারা গিয়েছেন এবং সেই "বিদ্রোহী" তনুদেহধারিণী বধূটি দশাসই গাড়ুগর্দম্ কলেবর ধারণ করে হয়ে গেছেন সে-অঞ্চলের ডাকসাঁইটে রক্তশোষিণী!

ট্র্যাডিশন! ট্র্যাডিশন!! সেই দ' থেকে বাঁচে কটা ডিঙি?

কিংবা রবীন্দ্রনাথের সেই কথিকাটি স্মরণে আনুন;

"বুড়ো কর্তার মরণকালে দেশসুদ্ধ সবাই বলে উঠল, 'তুমি গেলে আমাদের কী দশা হবে।'...দেবতা দয়া করে বললেন...'লোকটা ভূত হয়েই এদের ঘাড়ে চেপে থাক না। মানুষের মৃত্যু আছে, ভূতের তো মৃত্যু নেই।"

সেই ভূতই হলো ট্র্যাডিশন!

তারপর মনে আছে সেই ভূত-ট্র্যাডিশনের পায়ের কাছে "দেশসুদ্ধ সবাইকে" কি খাজনা দিতে হলো ?

"শ্মশান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় হা হা করে উত্তর আসে [খাজনা দেবে] 'আব্রু দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে'।" ।

সৈয়দ সাহেব, আমি ট্র্যাডিশন ভূতের খর্পরে সে-'খাজনা' দিতে রাজী ছিলুম না। তার কারণ এ নয় যে আমি কৃপণ। কিন্তু এ-মূল্য দিলে যে আমার সর্বসত্তা লোপ পাবে, আমার ধর্ম আমার ইমান যাবে।

সুভদ্রা আশাপূর্ণার সেই বধূর মত দিনে দিনে আপন সত্তা হারিয়ে হারিয়ে আমি আমার শ্বশুরবাড়ির অচলায়তনে বিলোপ হতে চাই নি। সেইটেই হতো আমার মহতী বিনষ্টি।...

কিন্তু তবু জানেন, সৈয়দ সাহেব, হাসিকান্না হীরাপান্না রান্নাবান্না নিয়ে আমার দৈনন্দিন জীবন কেটে যাচ্ছিল। আমাদের কচিকাঁচা বয়সে একটা মামুলী রসিকতার কথোপকথন ছিল, "কি লো, কি রকম আছিস ?" "কেটে যাচ্ছে, কিন্তু রক্ত পড়ছে না।" আমার বেলা কিন্তু "দিন কাটার" সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ড কেটে কেটে রক্ত ঝরে ঝরে ফুসফুসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে সেগুলোকে বন্ধ করে দিয়ে আমার শ্বাসপ্রশ্বাস নিরুদ্ধনিঃশ্বাস করে তুলছিল। সর্বশেষে একদিন আমাকে ডুবে মরতে হতো, আমার আপন দিল-ঝরা খুনে। আমি কর্তার কাছে শুনেছি, যুদ্ধের সময় বুলেটের সামান্যতম এক অংশ যদি হৃৎপিণ্ডে ঢুকে সেটাকে জখম করতে পারে তবে তারই রক্তক্ষরণের ফলে সমস্ত ফুসফুস ফ্লাডেড্‌ হয়ে যায়, এবং বেচারা আপন রক্তে ড্রাউনড হয়ে মারা যায়।

অবশ্য আমার বেলা বুলেটের টুকরো নয়। ঐ ভূতুড়ে বাড়ির ট্র্যাডিশনের একখানা আস্ত চাঁই।...

আপনি অবশ্যই শুধোবেন, অকস্মাৎ তোমার এ-পরিবর্তন এল কি করে ?

পরিবর্তন নয়। জাগরণ। নব জাগরণ।

* *

"রূপনারাণের কূলে
জেগে উঠিলাম
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ..."

আমার 'নব জাগরণের' পর আমি এ-কবিতাটি নিয়ে অনেক ভেবেছি। স্পষ্টত এখানে রূপনারাণ রূপকার্থে। অবশ্য এর পিছনে কিছুটা বাস্তবতাও

থাকতে পারে। শুধু পদ্মায় নয়, কবি গঙ্গাতেও নৌকোয় করে সফরে বেরুতেন। হয়তো বজবজ অঞ্চলে কোথাও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন; হঠাৎ ঘুম ভাঙল ডায়মণ্ডহারবারের একটু আগে যেখানে রূপনারায়ণ নদী গঙ্গার সঙ্গে এসে মিশেছে। জেগে উঠলেন রূপনারাণের কূলে, 'কোলে'ও হতে পারত। স্বপ্ন' দেখছিলেন এতক্ষণ। অর্থাৎ তাঁর আশী বৎসরের জীবন স্বপ্নে স্বপ্নে, স্বপ্নের অবাস্তবতায় কাটাবার পর হঠাৎ রূপনারাণের কূলে পরিপূর্ণ বাস্তবের অর্থাৎ 'রূপের' সম্মুখীন হলেন। এক আলঙ্কারিক রূপের ডেফিনিশন দিতে গিয়ে বলেছেন, ভূষণ না থাকলেও যাকে ভূষিত বলে মনে হয় তাই 'রূপ'। অর্থাৎ পিওর, নেকেড রিয়ালিটি। তার কোনো ভূষণ নেই।

আর 'নারায়ণ' অর্থ তো জানি; নরনারী যাঁর কাছে আশ্রয় নেয়।

আমি অন্তত এই অর্থেই কবিতাটি নিয়েছি।

তাই আমি জপ করি সেই আল্লার (নারায়ণ) আশ্রয় নিয়ে, তাঁর রূপ-স্বরূপকে স্মরণ করে, যার নাম "লতীফ্" (সুন্দর)। এবং তিনি শিব এবং সত্যও বটেন।

কারণ আমি যখন আমার রূপনারাণের তীরে পেঁছিলুম, রূঢ়তমরূপে আমার নিদ্রাভঙ্গের 'দ্বিজত্বের' সম্মুখীন হলুম তখন শুধু যে আমার পূর্ববর্ণিত

ট্র্যাডিশন! ট্র্যাডিশন!!

ট্র্যাডিশনের পাষাণপ্রাচীর নির্মিত 'অচলায়তন' দেখতে পেলুম, তাই নয়।

আতঙ্ক, বিস্ময়, এমন কি নৈরাশ্যে প্রায় জীবন্মৃতাবস্থায় আমি আরো অনেক অন্ধপ্রাচীর, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের চতুর্দিকে যেরকম চার দফে ইলেকট্রিফাইড লোহার কাঁটাজাল থাকে সেগুলোও দেখতে পেলুম।

এবং তার চেয়েও মারাত্মক বিভীষিকাময়ঃ ভুল আদর্শ, ভুল মরালিটি, বেকার 'পরোপকার,' মহাশূন্যে দোদুল্যমান আলোকলতার উপর স্তরে স্তরে ফুটে-ওঠা সঙ্গীতের ক্ষণস্থায়ী আকাশকুসুম, কবি বায়রনের ভাষায়

"এ যেন জীর্ণ প্রাসাদ ঘেরিয়া
শ্যামা লতিকার শোভা,
নিকটে ধূসর জর্জর অতি
দূরে হতে মনোলোভা॥"

আর কি সব ভুল দেখেছিলুম তার ফিরিস্তি আপনাকে দিতে গেলে পুরো একখানা "মোহম্মদী পঞ্জিকা" লিখতে হবে। এক কথায় দেহের ভুল, হৃদয়ের ভুল, মনের ভুল—পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভুল। অর্থাৎ কিশোরী অবস্থা থেকেই শুরু করেছি ভুল এবং চলেছি ভুল পথে।

আমি নিরাশাবাদী নই, অতএব ঢেলে সাজাতে হবে নতুন করে। জীবনের

সঙ্গে রিটার্ন ম্যাচের এখনো সময় আছে—প্রস্তুতি করবার।

* * *

কিন্তু পন্থা কি ?

শিশু যেমন মায়ের হাতে মার খেয়ে মায়ের কোলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি তেমনি "রূপনারাণের কূলে" নয় "রূপনারায়ণের কোলে" আছাড় খেয়ে পড়লুম।

"বিশ্বরূপে"র অতিশয় রূঢ় প্রকাশ এই পৃথিবীতে আমরা যাকে "সৌন্দর্য" বলি, তার সঙ্গে আমার কিছুটা পরিচয় ছিল। অতি ক্ষুদ্র কীট ও তার জীবন-স্পন্দনে অন্তহীন গ্রহসূর্য তারায় তারায় যে জীবনস্পন্দন আছে তার লক্ষা-ক্ষৌহিণী অংশ যতখানি অন্ধভাবে অনুভব করে, ঠিক ঐ অতি অল্পখানি। সেই-ই প্রচুর! পর্যাপ্তেরও প্রচুরতর অপর্যাপ্ত! আরব্য রজনীর অনু-নশ্‌শার এক-ঝুড়ি ডিম দিয়ে কারবার আরম্ভ করে উজিরবানুকে বিয়ে করবার প্ল্যান করেছিল। তার হিসেবে রত্তিভর ভুল ছিল না—ভুল ছিল তার হঠকারিতায়। আর আমার হাতে তো কুল্লে সর্বসাকুল্যে মাত্র একটি ডিম। কার্ডিনাল নিউম্যান কি গেয়েছিলেন—স্মৃতিদৌর্বল্যের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করছি—"আমি তো যাত্রা-শেষের দূরদিগন্তের কাম্যভূমি দেখতে চাই নে; আমাকে, প্রভু; একটি পা ফেলার মত আলো দেখাও।" "আই ডু নট্ উয়োণ্ট টু সী দ্য ডিসটেণ্ট সীন/ ওন্লি স্টেপ ইনাফ্ ফর মী।" তাই আমি "বিশ্বরূপ লতীফের" সন্ধানে বেরলুম।

এরপর আমার যে সব নব নব অভিজ্ঞতা হলো তার বর্ণনা দেবার ভাষা আমার নেই, কখনো হবে না, কারণ আমি তাপসী রাবেয়া নই। আমি সব-কিছু ঝাপসা ঝাপসা দেখছি। তাই আপনি আমার চোখ কেমন যেন কুয়াশা-ভরা ফিল্‌মে-ঢাকা দেখেছিলেন।

অতএব অতি সংক্ষেপে সারছি।

প্রথমেই আপনার কথা মনে পড়েছিল। কিন্তু চিন্তা করে দেখলুম, আপনি স্বপ্নমগ্ন না হলেও রূপনারাণের তীরে আপনি এখনো পৌঁছননি। প্রার্থনা করি, কখনো যেন না পৌঁছতে হয়।

সবাইকে যে পৌঁছতে হবে এমন কার, কোন্ মাথার দিব্যি ? যদি রূপনারাণে পৌঁছতেই হয় তবে যেন পৌঁছেন আপনার গুরুরই মত আশী বছর বয়সে। আমার কপাল মন্দ (মুনিঋষিরা হয়তো বলবেন "ভাগ্যবন্ত" আমি "অখণ্ড-সৌভাগ্যবতী"), আমি যৌবনেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছি। কোনো ইয়োরোপীয় বিলাসরভসে নিমজ্জিত এক ধনীর সন্তান যৌবনে বলেছিলেন "স্যালভেশন, মুক্তি, মোক্ষ ? নিশ্চয়ই চাই, প্রভু। কিন্তু not just yet—" অর্থাৎ একটু পরে হলে হয় না, প্রভু ? আমার বিলাসবাসনা তেমন কিছু একটা নেই, কিন্তু আমার যে ভয় করে।···আপনার কাছে যাওয়া হলো না।

তখন পেলুম পীর সাহেবকে। আমার বড় আনন্দ, আপনি তাঁকে ভুল বোঝেন নি। তিনি কক্‌খনো আদৌ আমার উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে চান নি। বরঞ্চ তিনি যেন হলেন এমবারাসট—যেন একটা ধন্দে পড়লেন। বুঝে গেলুম, তাঁর যেন মনে হয়, যৌবনের কাম বাসনা ইত্যাদি খানিকটে পুড়িয়ে নিয়ে তার পর ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে নামা প্রশস্ততর।

* * *

আপনি জানেন, যদিও ধর্মেকর্মে আমার আসক্তি ছিল সামান্যই, তবু আমি শ্রীঅরবিন্দের আধা-ধর্ম-আধা-কালচারাল লেখাগুলো সব সময়ই মন দিয়ে পড়েছি। বুঝেছি অবশ্য সিকি পরিমাণ। তাঁর কথা আমার মনে পড়ল সর্বশেষে। কৃপণ যে-রকম তার শেষ মোহরটির কথা স্মরণ করে সব খতম হয়ে যাওয়ার পর।

তাঁর সে-লেখাটির নাম বোধ হয় উত্তরপাড়া ভাষণ।

আলীপুরের বোমার মামলা তখন সবে শেষ হয়েছে। সমস্ত বাঙলা দেশ উদগ্রীব, এবারে শ্রীঅরবিন্দ বাঙলা দেশকে কোন পথে নিয়ে যাবেন। আর বাঙলা দেশের সঙ্গে বিজড়িত রয়েছে সমস্ত ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ।

কী গুরুতর দায়িত্ব! মাত্র একটি লোকের স্কন্ধে!

তখন তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার মূল কথা একটি বাক্যে বলা যেতে পারে,—তিনি আপন ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে কিছুদিনের জন্য নির্জনে চিন্তা করতে চান।

আর আমি তো সামান্য প্রাণী। আমার এ-ছাড়া অন্য কোনো গতি আর আছে কি?

আমি খুব ভালো করেই জানি, আমার স্বামীর অত্যন্ত কষ্ট হবে। এ-রকম ফেরেশতার মত স্বামী কটা মেয়ে পায়! তাই জানি, যখন তাঁর কাছ থেকে বিদায়ের অনুমতি চাইব তিনি আমাকে বাধা দেবেন না। তিনি নিজে ধার্মিক —তাই বলে যে তিনি আমার ধর্মজীবনের অভিযানে বাধা দেবেন না, তা নয়। আমি যে দিনের পর দিন বাড়িতে বসে বসে ঝুরে মরবো সেটা তিনি কিছুতেই সইতে পারবেন না।

হায় আল্লাতালা! আমাকে তুমি এ কী নির্দেশ দিলে যার জন্য আমার এই প্রাণপ্রিয় স্বামী, আমার মালিককে ছেড়ে যেতে হচ্ছে! সৈয়দ সাহেব, আমি জানি আর আমার স্বামী জানেন, আমাদের আজও মনে হয়, আমাদের বিয়ে যেন সবেমাত্র কয়েক দিন আগে হয়েছে। আমরা যেন এইমাত্র বাজ্‌-গশ্‌তী (বাঙলায় কি বলে? দ্বিরাগমন?) সেরে স্টীমারের কেবিনে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একে অন্যকে চিনে নিচ্ছি। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, "আমি কী ভাগ্যবান!" লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। মাথায়

ঘোমটা টেনে তাঁর পদস্পর্শ করে বললুম, "আপনি এ কী করলেন? আমি যে এখনই এই কথাটিই বলতে যাচ্ছিলুম।"

তিনি হো হো করে হেসে উঠে বলেছিলেন, "পাগলী!"

ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আজ প্রমাণ হতে চললো, আমি পাগলিনী। নইলে আমি আমার এমন মনিব ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছি কেন?

কত বলবো? এর যে শেষ নেই।

* * *

আপনাকে ছেড়ে যেতে আমার নিজের জন্য কষ্ট হয়—আপনি কতখানি বেদনা পাবেন, সে-কথা আমি ভাবছি নে। যাবার বেলা শেষ একটি কথা বলি। যবে থেকে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় (আল্লা সে-দিনটিকে রোশ্‌নীময় করুন!) তখন থেকেই লক্ষ্য করেছি, আপনার ভক্ত চেলার সংখ্যা খুব নগণ্য নয়। হয়তো আপনার চেয়ে কাঁচা লেখকের ভক্তের সংখ্যা আরো বেশী। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে আমি আশ্চর্য হয়েছিলুম এবং অতিশয় পুলকিত হয়েছিলুম। আপনার "ভক্তা" নেই, আপনার কোনো রমণী উপাসিকা নেই। আমিই তখন হলুম আপনার অদ্বিতীয়া সখী, নর্মসহচরী—যে নামে ডাকতে চান, ডাকুন। এ-হেন গৌরবের আসন ত্যাগ করে যেতে চায় কোন্ মুখী! তবু যেতে হবে।

সর্বশেষে আপনাকে, নিতান্ত আপনাকে একটি কথা বলি:

ঐ যে কবিতা—কবিতা বলা ভুল, এ যেন আপ্তবাক্য—"রূপনারাণের কোলে/জেগে উঠিলাম" এর শেষ দুটি লাইনকে আমি অকুণ্ঠ স্বীকার দিতে পারছি নে। লাইন দুটি;

"সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।"

এখানে আমি কুষ্টিয়ার লালনফকীরের আপ্তবাক্য মেনে নিয়েছি। তিনি বলেছেন, "এখন আমার দেহ সুস্থ, মন সবল, পঞ্চেন্দ্রিয় সচেতন। এ-অবস্থায় যদি আল্লাকে না পাই তবে কি আমি পাব মৃত্যুর পর?—যখন আমার দেহমন প্রাণহীন, অচল অসাড়?" আমি "সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে" মৃত্যু দিয়ে "সকল দেনা শোধ" করবো না।

আমার যা পাবার সে আমি এই জীবনেই, জীবন্ত অবস্থাতেই পাব।

খুদা হাফিজ্! ফী আমানিল্লা!!

আপনার স্নেহধন্য কনীজ্
শহুর্-ইয়ার

হাত থেকে ঝরঝর করে সব কটি পাতা বারান্দার মেঝেতে পড়ে গেল।

এতক্ষণ আমার (এবং শহুর্-ইয়ারেরও)। আদরের আলসেশীয়ান কুকুর

"মাস্টার" আমার পাশে শুয়ে মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছিল।

এখন হঠাৎ বারান্দার পূর্ব প্রান্তে গিয়ে নিচের দু'পায়ের উপর বসে উপরের দু'পা আকাশের দিকে তুলে দিয়ে চিৎকার করে ডুকরে ডুকরে আর্তরব ছাড়তে আরম্ভ করলো। সম্পূর্ণ অহেতুক, অকারণ।

তবে কি মাস্টার বুঝতে পেরেছে, তার আমার প্রিয়বিচ্ছেদ। আল্লাই জানেন সে গোপন রহস্য।

* * *

অবসন্ন মনে মৃত দেহে শয্যা নিলুম। ঘুম আসছে না।

দুপুর রাত্রে হঠাৎ দেখি মাস্টার বিদ্যুৎবেগে নালার দিকে ছুটে চলেছে। হয়ত শেয়ালের গন্ধ পেয়েছে।

তার খানিকক্ষণ পরে ঐ দুপুর রাত্রে কে যেন বারান্দায় উঠল। উঠুক। আমার এমন কিছু নেই যা চুরি যেতে পারে।

হঠাৎ শুনি ডাক্তারের গলা। আমার কামরার ভিতরেই।

এক লম্ফে দাঁড়িয়ে উঠে তাকে আলিঙ্গন করলুম। বাতি জ্বাললুম।

এ কী! আমি ভেবেছিলুম ওকে পাবো অর্ধ উন্মত্ত অবস্থায়। দেখি, লোকটার মুখে তিন পোঁচ আনন্দের পলস্তরা।

কোনো প্রকারের ভূমিকা না দিয়ে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বললে,

"নাম্বার ওয়ান ঃ আমাদের বসতবাড়ি পরশুদিন পুড়ে ছাই।

নাম্বার টু ঃ আমরা আগামী কাল যাচ্ছি সুইডেনে। আমার রিসার্চের কাজ সেখানেই ভালো হবে।

নাম্বার থ্রী ঃ (কাছে এসে ফিসফিস করে বললেন) শহরু-ইয়ার অন্তঃসত্ত্বা।

নাম্বার ফোর ঃ—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "সে কোথায়?"

"বারান্দায়। মাস্টারকে খাওয়াচ্ছে।"

* * *

বারান্দায় এসে শহরু-ইয়ারকে বললুম, "সুইডেনে তুমি নির্জনতা পাবে।"

তারপর শুধালুম, "আবার দেখা হবে তো?"

সে তার ডান হাত তুলে—দেখি, আমি তাকে ঢাকা থেকে এনে যে শাঁখার কঙ্কন দিয়েছিলুম সেইটে পরেছে—সে-হাত তুলে আস্তে আস্তে ক্ষীণকণ্ঠে বললে, "কী জানি, কী হবে।"

* * *

আমার এক বন্ধু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুশয্যায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন। তিনি আমাকে বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর পূর্বে তাঁর দুর্বল হাত তুলে বলেন—তখন তাঁর চৈতন্য ছিল কি না জানি নে—"কী জানি, কী হবে।"'

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

সপ্তম খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৫৫

সম্পাদক
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
সুমথনাথ ঘোষ
সবিতেন্দ্রনাথ রায়
মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা
শ্রীচুনী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ
সিল্ক স্ক্রীন ও
চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে
এস এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ শশী প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৬ হইতে অশোককুমার ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা	শ্রীঅরুণ বসু	ক—ছ
জলে-ডাঙায়		১
ভবঘুরে ও অন্যান্য		১০৫
মুসাফির		২৬৭
গ্রন্থ-পরিচয়		৪১১

ভূমিকা

সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবকে বেশ কয়েকবার চোখে দেখেছি, তাঁর মজলিশি বৈঠক কিংবা মশলাদার বক্তৃতাও শুনেছি। যদিচ সে সব স্মৃতি মনের অটোগ্রাফ-খাতায় দস্তখত রাখার মত ব্যাপার। কালেভদ্রে খুলে দেখা আর অটোগ্রাফ-শিকারিদের কাছে ছাতি-ফোলানো ছাড়া তা দিয়ে আর কিছুই করা যায় না। ভূমিকা লেখা তো দূরে থাক। তবু হক কথা, আলী সাহেব আমার বন্ধু, আমার মতো আরো অসংখ্য পাঠকের অন্তরঙ্গ বন্ধু, আমাদের তিনি কস্মিনকালে না চিনলেও। বয়েসের যে ব্যবধানই থাকুক, তাঁর সেই দেশে বিদেশে থেকে শুরু করে পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়, মায় এই রচনাবলী প্রকাশ পর্যন্ত, এত কাছের মানুষ তামাম দুনিয়ায় আর কেউ হতে পারে বলে জানি না। আমি বিদেশ ঢুঁড়ি নি (দেশটাই ভাল করে চষা হল না), জর্ডনের জল খাই নি, ডুসেলডর্ফের কাদায় পা হড়কে যায়নি, জিবুটি বন্দরের শস্তা কাফের বসে নিম্বুপানির গেলাসের ওপর থেকে চামর দিয়ে ভনভনে মাছি তাড়াইনি, জালালাবাদের ১২০ ডিগ্রি গরম থেকে খায়-ই জম্বারের ৬০ ডিগ্রিতে পেঁছিয়ে আরামের সুখনিশ্বাস ছাড়িনি, কাইরোর মুক্তাঙ্গন হোটেলে বসে পোলাও-পোরা শসা চিবোইনি, গডেসবার্গের নির্জন রাস্তায় গেরস্তবাড়ি ঢুকে কেক-প্যাস্ট্রিও সাঁটাইনি। কিন্তু এর সবই আমার নখদর্পণে। হয়ত বা আপনাদের অনেকেরও। কারণ আলী সাহেবের সঙ্গে এসব জায়গায় আমাদের জবর ঘোরা হয়ে গেছে। প্লেনে চেপে সাহেববাবুর মত নয়; সিফ পায়ে হেঁটে, লজ্‌ঝড় ট্যাক্সিতে উঠে, কখনো বা জাহাজের জনতা-ডেকে, কভুবা ট্রেনে, যখন যেমন সুবিধে। কখন পেরিয়ে এসেছি লন্ডন, প্যারিস, রোম, সেখান থেকে মিউনিক—খেয়ালও নেই। আলী সাহেব আমাকে হাত ধরে ট্রাফালগার স্কোয়ারে নিয়ে যাননি, বাকিংহাম প্যালেস দেখাননি, বাঙাল হয়েও হাইকোর্ট দেখাননি। ইফেল টাওয়ারের ধারে-কাছেও তিনি নেই। গ্লস্টরের ড্যুক যেখানে লাঞ্চ খান সেখানেও উনি আপনাকে ঢোকাবেন না। বেশি পীড়াপীড়ি করলে বড়জোর উনি কেনসিংটন গার্ডেনে কোন খানদানি ইংরেজের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন, কিন্তু নিজে বন্ শহরের শহরতলির প্রান্তে টেরমের-এর বাড়ি গিয়ে তার খাণ্ডারনি গিন্নির কাছে বসে গরম সুপ খাবেন। অবশ্য এরই মধ্যে আপনার আমার আরো কিছু অভিজ্ঞতা

হয়ে গেছে। যেমন ধরুন, এক বদম ব্রিটিশ মিউজিয়াম ঘোরা হয়ে গেছে, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজহার বিশ্ববিদ্যালয় খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছি—এখন পাত্তাড়ি বগলে ঢুকে পড়তে যা বাকি, শুধু স্কলারশিপটা জোটেনি। কাইরোর রাস্তাঘাট মোটামুটি চেনা হয়ে গেছে, পোর্ট সঈদ গিয়ে জাহাজ ধরতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। চাই কি, জুরিখ এ্যারপোর্টে নেমে ট্রানজিট প্যাসেঞ্জারের খোঁয়াড় থেকে কী কৌশলে বিনা 'ভিজা'য় বাইরে বেরুনো যায়, তাও শেখা হয়ে গেছে। তবে আপশোষের কথা কোন শ্রীমতী ফ্রিডি বাওয়ান বা হিজেল সেখানে আপনার-আমার জন্যে হাপিত্যেশে অপেক্ষা করবে না।

সৈয়দ মুজতবা আলীর সাহিত্যিক জীবন দীর্ঘকালের নয়, গ্রন্থসংখ্যা খুব একটা কম না হলেও বেশি নয়, আর সেগুলো না গল্প না উপন্যাস। রম্যরচনা কথাটা আমার তেমন পছন্দ নয়। বেল লেংরই বলি আর পারসোনাল এসে-ই বলি, আলী সাহেবকে তেমন ধারা অ্যাকাডেমিক শিরোনামের মধ্যে বাঁধতে মন চায় না। ভ্রমণসাহিত্য হিসেবে তাঁর কিছু কিছু গ্রন্থের পরিচিতি হয়ত বেমানান নয়, যদিও তার জাত আলাদা, সঞ্জীবচন্দ্র যেমন পিঁয়াজ আর পলাণ্ডুর জাতিভেদ করেছিলেন। অথচ এ সবই আলী সাহেবের জীবনকথা, তাঁর নিজেরই অভিজ্ঞতার ঝুলিঝাড়া সম্পদ। আত্মজীবনের বাইরে গিয়ে তিনি কোন গল্প ফাঁদেননি। দু-চারটে কেতাব ছাড়া, আলীসাহিত্য সবটাই তাঁর নিজের জীবনের বর্ণালী, বানিয়ে বলার চতুরালি নয়। অস্তাচলের ধারে এসেই তিনি পূর্বাচলের পানে তাকিয়েছেন, মারিয়ানের ঠাকুরমার মত বলেছেন, এস্ ইস্ট্ সো লাঙে হের—সে সব কত পুরনো কথা, সব কি মনে আছে? তা নেই-নেই করেও কম নেই। তাই ঝাড়া চল্লিশ বছরের ইতিহাস ঠারেঠোরে রয়ে-বসে বলতে হয়েছে। তাঁর মুসাফির পঁথির এক জায়গায় তিনি কবুল করেছেন, "সে সব অভিজ্ঞতা সুসংলগ্ন ভাবে ক্রমানুক্রমে লিখে উঠতে পারি নি। কিন্তু আমি ভরসা রাখি যে, সুচতুর পাঠক আমার প্রকাশিত পুস্তক থেকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত টুকি-টাকি ছিটেফোঁটা জুড়ে দিয়ে জিগ্‌শ্যো পাজ্‌ল সমাধান করতে পারবেন—অর্থাৎ একটি মোজাইক নির্মাণ করতে পারবেন; তদর্থঃ মোটামুটি একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি পেয়ে যাবেন। যদিও তার আউটলাইনগুলো সূক্ষ্ম শার্প হবে না, বহু ডীটেল বাদ পড়ে যাবে, কিন্তু তাতে করে কিছু আসে যায় না।" সত্যি কিছু আসে-যায় না, কিতু তাও কি তিনি সহজে লিখেছেন? তাঁর মত 'মুডি' লেখক বাঙলা

সাহিত্যে সম্ভবত বেশি নেই, ছিলেন না। ঐ মুসাফির বইতেই এক জায়গায় তিনি বায়নাক্কা ধরে বলেছেন, 'আমার জীবনস্মৃতি লিপিবদ্ধ করার মত দুর্গতি আমার কখনো হবে না সে আমি জানি।' গ্রুস গট্ ভগবানের আশীর্বাদ, এত কাণ্ডের পরও গোটা কুড়ি বই!

আলী সাহেবের ভবঘুরে বইতে কিছু বিষয়াশ্রিত রচনা আছে, তাছাড়া জলে-ডাঙায় ভবঘুরে মুসাফির সবই ভ্রমণকথা। কিন্তু এ কেমন ভ্রমণ? স্বীকার করি তিনি অনেক মুলুক চষে বেড়িয়েছেন, অনেক শহর-বন্দরের ধুলো অনেক নদীর পানি খেয়েছেন। কিন্তু ভ্রমণের জন্য কদাচ নয়—মুসাফিরের কৈফিয়তেই সে কথা কবুল করা হয়েছে। আর তাঁর ভ্রমণকাহিনীও তাঁর 'অনিচ্ছার' সৃষ্টি এবং তাও ভ্রমণের অনেককাল পরে, যখন ভ্রমণের স্মৃতির ওপর ধুলোর পলেস্তারা পড়ে গেছে। ভ্রমণের তো অ্যানিভারসারি হয় না—পুরনো ভ্রমণের জাবর কাটা সবাই পছন্দ করেন না। পুরনো ঘিয়ে বাতের ব্যথা কমে কিন্তু ভাত খাওয়া যায় না। আমাদের এক প্রাচীনকালের হাফগিন্নি লেখক সঞ্জীবচন্দ্র বুড়ো বয়েসে পালামৌ ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিখতে গিয়ে দুই বয়েসের চোখ আর মনের মধ্যে গুবলেট করে ফেলেছেন। আলী সাহেবও সেই উমরে কলম ধরেছেন, যখন চোখে-দেখা কানে-শোনা জিভে-চাখা অভিজ্ঞতা অনেকটাই পিছনে হটে গেছে, এখন সম্বল শুধু স্মৃতির গুমর। একে ভ্রমণকথা পাঠক বলতে চান বলবেন, না হয় নাই বলবেন। এখানে কোন দিনলিপি নেই, সময়ের গরমিল যথেষ্ট, কখনো ত্রেতা থেকে দ্বাপরে হাজির, এটা বলতে সেটা এসে ঢুকেছে, আশকথা পাশকথার ছড়াছড়ি। লেখক নিজেও তা জানেন। তাই প্রায় লেখাতেই এই বেপাত্তা বর্ণনার জন্য হাত কচলাতে থাকেন। বলেন, "কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম। ট্র্যাম্পকে নিয়ে এই তো বিপদ। সে যে রকম রাস্তায় নাক বরাবর চলতে জানে না, তার কাহিনীও ঠিক তেমনি পারলেই সদর রাস্তা ছেড়ে এর খিড়কির দরজার দিকে তাকায়, ঝোপের আড়াল থেকে ওর পিছনের পুকুরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ভবঘুরে।" কিন্তু আলী সাহেবের অনুরক্ত পাঠকদের এইটেই লাভের, কারণ এই ধরনের রসকরা মশকরা শুনতেই তাঁরা ভালবাসেন বেশি। এ কালের পাঠক নিশ্চয় আলী সাহেবের কাছ থেকে 'ইয়োরোপে সাড়ে তিন মাস', 'হাবুলের কাবুল-ভ্রমণ' শুনতে চায় না। লেখক নিজেও জানেন, "এখন এত শত লোক নিত্য নিত্য বঙ্গো ইন কঙ্গোতে উইক এণ্ড

কাটাতে যায়, জবল্ অল্ অলবীয়াতে হানিমুনের প্রথমার্ধ ঘুরে আসে যে 'ফ্রান্স ভ্রমণ' কিংবা 'মন্তে কার্লো দর্শন' শিরোনামা এখন সে অবজ্ঞার চোখে দেখে। এইজন্যই বলছিলুম, আলী সাহেবের ভ্রমণকাহিনী গতানুগতিক ট্রাভেল্ লিটারেচার নয়। কোনো দেশের মননসাধনা চিৎপ্রকর্ষের পরিচয় তো লাইব্রেরিতে বসেই পাওয়া যায়। কিন্তু সে দেশের আসল রূপ সেখানকার সাধারণ মানুষের কাছে। মুজতবা আলী লিখেছেন, "সে দেশের টাঙ্গাওলা-বিড়িওলা-ড্রাইভার কারখানার মজুর কী ভাবে কী চিন্তা করে সেটা জানতে হলে সে দেশে না গিয়ে উপায় নেই। কারণ তারা বই লেখে না, খবরের কাগজে সম্পাদককে চিঠি লিখে নালিশ ফরিয়াদ জানায় না। তাদের কান্নাকাটি গালমন্দ যা কিছু করার সব কিছুই তারা করে এদেশের চায়ের দোকানে, ওদেশে 'পাবে', অর্থাৎ শরাবখানায়।" আলী সাহেবের সঙ্গী হয়ে তাই ভিনদেশের পাবে-শরাবখানায়-কাফে-রেস্তোরায় ঢুকে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয় তা পুরো একটা দেশ আবিষ্কারেরই সমতুল। কেনসিংটন গির্জার পাশে ছোট্ট শরাবখানায় সেই বুড়ির সঙ্গে আলাপের কথা কি ভুলে যাচ্ছেন? সেই সঙ্গে কত খুঁটিনাটি, রান্নাঘরের মেনু, পানভোজনের ফিরিস্তি, গাছপালা-গাড়িঘোড়ার ছবি, কত প্রবাদপ্রবচন, আবহাওয়ার তত্ত্ব, সাহিত্যের খবর, রাজনীতি-সমাজনীতি, মামলা ও হামলার বিবরণ, পথঘাটের নকশা, কত বয়েৎ ও কটুবাক্য ফুলঝুরির মত ঝরে তাঁর কলমে। মুজতবা আলীর সাহিত্যকে তাই বলতে ইচ্ছে করে এনসাইক্লোপিডিয়া আলীয়ানা। তামাম দুনিয়ার খালাসীদের খবর রাখেন মানুষটি, তা সে নোয়াখাল্যা সিলেট্যাই হোক, আর হামবুর্গ ভেনেসেরই হোক। ইহুদি থেকে বেদে, উদ্বাস্তু থেকে যাযাবর, অনেক অনিকেত জীবনের কাহিনী আমরা পড়েছি। কিন্তু জলজন্তুপ্রাণ সমুদ্র-সমর্পিত, জাহাজের মাঝিমাল্লা খালাসী কাপ্তেনদের উদ্‌ভূমি জীবনের কাহিনী এমন লবণাক্ত ভিজে ভাষায় আর কে বলতে পারেন? কিন্তু এও সব নয়। আলীর থলিতে হরেক পশরা। তাতে বিবিসির আবহাওয়ার পূর্বাভাস (ঝড়ের পরে ঘোষিত), এলিয়টের ক্যাথলিক রক্ষণশীলতা, আকাশবাণীর রেডিয়ো একটিভিটি-নিরোধক স্টুডিও, হিটলার বরিশালের লোক, আরব সাগরের আবহাওয়া, ফরাসি খাদ্যের উৎপত্তির ইতিহাস, আহার সম্পর্কে ফরাসি গুণী রশফুকোনের বাণী, 'ক্রন্দসী'র বৈদিক শব্দতত্ত্ব, ইন্ডোলজির ইতিবৃত্ত, এশিয়াটিক সোসাইটির জন্মকথা, বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত চর্চার ইতিহাস, জর্মন এনসাই-ক্লোপিডিয়ায় 'ঠাকুর' শব্দের ব্যাখ্যান, হিটলারের বিবাহকালীন আবেদনপত্র,

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভিলহেলম্ ফন হুমবলট্-এর মনীষা, সোকোত্রা দ্বীপের ভূতত্ত্ব, সোমালিল্যাণ্ডের উপর ইয়োরোপের রাজনীতির জুডো, 'বোম্বেটে' শব্দের হদ্দমুদ্দ—কী নেই সেখানে? অথচ লেখক বলছেন, তিনি নতুন কিছু লেখেননি, নতুন কিছু দেখেননি—প্ল্যু সা শাঁজ প্ল্যু সে লা সেম শোজ, দি মোর ইট চেঞ্জেস দি মোর ইট ইজ দি সেম থিং।

তবু এর মধ্যে রসনার্ঘ্যের দিকেই মুজতবা সাহেবের নেকনজর বেশি, তাতে সন্দ নেই। তাঁর দেহাবসানের পর দেশ পত্রিকার একটি প্রবন্ধে ('সৈয়দ মুজতবা আলী') হীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন, তিনি যেমন করে বলতেন ঠিক তেমনি করেই লিখতেন, বলার আর্ট আর লেখার আর্ট তাঁর কাছে অভিন্ন ছিল। আলী সাহেবের এক অন্তরঙ্গজন আমীনুর রশীদ চৌধুরী আর একটি প্রবন্ধে ('মুজতবাকথা') সজনীকান্ত দাসের স্মৃতি উদ্ধার করে জানিয়েছিলেন যে একবার আলী সাহেব নাকি রাস্তায় দাঁড়িয়ে, এবং পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেলে পাশের কাফেয় বসে, দুনীয়ার মদ্যপানীয়ের জাতগুষ্ঠির ফিরিস্তি দিয়েছিলেন। কথা শেষ হলে দেখা গেল, সাঁঝবাতি জ্বলে গেছে অথচ শ্রোতাদের দুপুরের খাওয়া হয়নি। 'ভবঘুরে ও অন্যান্য' নামক গ্রন্থের 'হুঁসিয়ার' লেখাটি পাঠ করলেই পাঠকের মালুম হবে এ সব কথা কত সত্যি ছিল আলী সাহেবের জীবনে। এই এক চিলতে প্রবন্ধেই তিনি হুড়মুড় করে হর-দুনিয়ার মদ্যপানীয়ের নাড়িনক্ষত্রের বিবরণ দিয়েছেন। ফ্রান্সের বোর্দো অঞ্চলের ক্লারেট মদ, বার্গেণ্ডির ওয়াইন, শ্যাম্পেন কেন বুজবুজ করে বার্গেণ্ড করে না, হাঙ্গেরির টকাই ও বাঙলার পচাই, সাঁওতালি হাড়িয়া আর ইতালির কিয়ান্তি, আপেল ফার্মেণ্ট করে কেমন করে সাইডার ও মধু ফার্মেণ্ট করে মীড হয়, চোলাই কাকে বলে—এসব খবরে রচনাটি জবজব করছে। তিপ্পান্ন সালের নীরেনস্টাইনারের কী গুণ, লণ্ডনের বারের ভুঁড়িওয়ালা ওয়াইন মাস্টারের চেয়ে আলী সাহেব কম জানেন, এ কথা হলফ করে কেউ বলতে সাহস পাবেন না। আর দুনিয়ার পানশালের খবর তাঁর পকেটে—একটু একটু করে খুশবু ছাড়েন, চারদিক ম-ম করে। একবার চটেমটে তিনি লিখেছিলেন, "ভোজনাদি সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করলেই কোনো কোনো উন্নাসিক পাঠক নাকি বিরক্ত হন" (মুসাফির দ্রষ্টব্য)। তওবা তওবা। সে পাঠকের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ নেই। সেই মুকুন্দরামের আমল থেকেই বাঙালির মন পাকশালে। আর সেই পাকশালের বেদব্যাস মুজতবাজীর মহাভারত খাদ্য-পর্ব শোনাই হল গিয়ে পুণ্যবানের কাজ। ঘ্রাণে যদি অর্ধ, শ্রবণে তাহলে

কোয়ার্টার ভোজন। আমরা আলী সাহেবের দৌলতে স্প্যানিশ রেস্তোঁরায় মুর পদ্ধতিতে তৈরি বিরয়ানি চেখেছি, ফরাসি মেনুর পিয়েস দ্য রেজিসতাঁসে চোখ বুলিয়েছি, মারিয়ানার ঠাকুরমার তৈরি 'রে রাগু' অর্থাৎ কিনা কোফতাকাটা হরিণের মাংস আর ফ্রান্সের মাটির নিচে ফলানো সবজি 'ট্রাফেল' টেস্ট করেছি। বাঁধাকপির টক আচার 'ক্রাউট' আর পিঁয়াজ পুদিনার ওমলেট 'ওর্জেব' দুটোই পছন্দ। কিন্তু এখানেই তো সৈয়দ মুজতবা আলীর কেরামতি নয়। সালাদ য়ুস, সালাদ আলা, মায়োনেজ-এর স্বাদ শেষ হবার আগেই তাঁর পকেট থেকে বেরোয় হাইনের কবিতা। রাইনের ধারে গেঁয়ো 'পাবে' কুমারী কোটে লেখককে হাইনের যে কবিতা শোনায়, সঙ্গে সঙ্গে ফস করে তিনি যতীন বাগচী কৃত তার অনুবাদ আমাদের শুনিয়ে দেন ; মারিয়ানার মুখে হাইনের কবিতা শুনে সত্যেন দত্তের ঠিক-ঠিক অনুবাদটি তাঁর মনে পড়ে ; ওমর খৈয়ামের জুতসই বয়েৎ ঝেড়ে তৎক্ষণাৎ কান্তিচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ পেশ করেন তিনি, এমন কি ফিটজেরালডের পাশে দুম করে তার ফরাসি অনুবাদটিও দিয়ে দেন। আলী সাহেব তাই অতুলনীয়—কিন্তু তুলনামূলক তত্ত্বালোচনায় তাঁর বড়ই আগ্রহ। নিজে তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব আর তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ছাত্র। কিন্তু তুলনামূলক পানভোজনতত্ত্ব, ভূগোলতত্ত্ব, নারীমনস্তত্ত্ব, পুলিসি কর্তব্যতত্ত্ব কিছুতেই তাঁর কৌতূহলের কমতি নেই। হাইনের গঙ্গাস্তব আর কলকাতার জাপানি আক্রমণের সময়কার ছড়া, পাশাপাশি গ্যাঁট হয়ে বসে তাঁর লেখায়। মিশরের মরুভূমিতে আবুল আফসিয়ার ভাড়া-করা ট্যাক্সির শব্দের সঙ্গে সাদৃশ্যসূত্রে তুলসীদাসী রামায়ণের ভাষা ফিনকি দিয়ে ওঠে তাঁর কানে (কটকটহি মরকট বিকট ভট কোটি কোটিনহ ধাবহি—বানরদের কোলাহলের বর্ণনা)। কাইরোর রাস্তায় Fools Restaurant (ফুল আরবি শব্দ,=সিমবীচি) দেখে তাঁর মনে পড়ে যায় কলকাতার রাস্তায় 'কপির সিঙাড়া' বিজ্ঞাপনের দিকে)।

এই তুলনামূলক মেজাজেই দুনিয়ার খোশগল্প গুরগুরিয়ে ওঠে আলী সাহেবের পেটে, মোকা মাফিক বেরুবার জন্য। পৃথিবীর সব দেশের সমাজেই মৌখিক গল্পসাহিত্যের একটি বিচিত্র বিপুল সম্পদ অলিখিত হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। আলী সাহেব সেই গল্পের একজন পাকা ভাণ্ডারী। কিন্তু তিনি মার্চেন, সাগা, ইভেনতির, হালড্রি, নভেলা, হিরোটেল-এর কারবারি নন। অ্যানেকডোট, খোশ গল্প, ক্ষুদ্র উপাখ্যান, ড্রল, টিটবিট্স্, জেস্ট, কৌতুক নক্শা ঝিলমিলিয়ে ওঠে তাঁর মুখে, আর তখনি, কিছু কিছু তুলনাসূত্রে, ঠিক ঠিক

মোকায় এসে পড়ে তার দেশবিদেশের জাতভাইগুলো। তাঁর সাহিত্যের একটা বড় আকর্ষণ এই গল্প। অনেকক্ষণ অন্ধকারে ট্রেন ছুটলে ছোট্ট ছেলে ভাবে ইস্টিশান আসছে না কেন? তেমনি অনেকক্ষণ ভারি ভারি কথা চললে পাঠক ভাবে গল্প আসছে না কেন? তা আলী সাহেবের ট্রেন লোকাল গাড়ি, ইস্টিশান ঘন ঘন। গুরু কথার মাঝখানে হৈ হৈ করে ওঠে অ্যানেকডোট। এই প্রত্যাশায় তাঁর লেখার পাতায় এঁটেল পোকার মত চোখ আটকে থাকে পাঠকের। চুটকুলা স্টেটের রায়বাহাদুর তিনি, দিল্লগীপসন্দ কিস্সার দিল্লীশ্বরো। আর এখানেও সেই তুলনার আগ্রহ ঘনিয়ে ওঠে তাঁর চিত্তে, একই গল্পের দেশান্তরী রূপ বা সাইকল্ অনর্গল তিনি শুনিয়ে যান। খোশ গল্প যে একটা আর্ট এ সত্য একালে আলী সাহেবই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এই বইয়ের ভূমিকা একমাত্র আলী সাহেবই লিখে দিতে পারতেন, তাঁরই লেখা উচিত ছিল, তিনিই একমাত্র তাঁর বইয়ের ভূমিকা লেখার হকদার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই লেখা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু হায়, আমরা যখন জলে-ডাঙায়, মুসাফির, ভবঘুরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছি, তখন আলী সাহেব গ্রহসূর্য তারায় তারায় ভ্রাম্যমান। 'সে বড় মজার ভ্রমণ, তাতে টিকিট লাগে না,'ভিজার'ও দরকার হয় না।' জলে-ডাঙায়-এর উৎসর্গপত্রে ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে তিনি লিখে গেছেন, 'কিন্তু হায় সেখান থেকে ভ্রমণকাহিনী পাঠাবার কোনো ব্যবস্থা এখনো হয় নি। ফেরবারও উপায় নেই।'

তাই ভবঘুরে আলী সাহেবের গ্রহসূর্য-তারালোক ভ্রমণের কাহিনী আর এই লোকে আমাদের পড়ার সুযোগ হবে না।

অরুণ বসু

জলে-ডাঙায়

উৎসর্গ

বাবা ফিরোজ,

ভ্রমণ-কাহিনী তুমি যেদিন প্রথম পড়তে শুরু করবে সেদিন খুব সম্ভব আমি গ্রহ-সূর্যে তারায়-তারায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। সে বড় মজার ভ্রমণ—তাতে টিকিট লাগে না, 'ভিজা'রও দরকার নেই। কিন্তু, হায়, সেখান থেকে ভ্রমণ-কাহিনী পাঠাবার কোনো ব্যবস্থা এখনো হয়নি। ফেরবারও উপায় নেই।

তাই এই বেলাই এটা লিখে রাখছি।

তোমার
আব্বু

বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ার কর্মটি সব সময়ই এক হুলুস্থুল ব্যাপার, তুমুল কাণ্ড! তাতে দুটো জিনিস সকলেরই চোখে পড়ে; সে দুটো—ছুটোছুটি আর চেঁচামেচি।

তোমাদের কারো কারো হয়তো ধারণা যে সায়েব-সুবোরা যাবতীয় কাজকর্ম সারা করে যতদূর সম্ভব চুপিসাড়ে আর আমরা চিৎকারে চিৎকারে পাড়ার লোকের প্রাণ অতিষ্ঠ না করে কিছুই করে উঠতে পারি নে। ধারণাটা যে খুব ভুল সে কথা আমি বলবো না। সিনেমায় নিশ্চয়ই দেখেছ, ইংরেজরা ব্যাঙকুইট্ (ভোজ) খায় কি রকম কোনো প্রকারের শব্দ না করে। বাটলাররা নিঃশব্দে আসছে যাচ্ছে, ছুরিকাঁটার সামান্য একটু ঠুং-ঠাং; কথাবার্তা হচ্ছে মৃদু গুঞ্জরণে, সব-কিছু অতিশয় পরিপাটি, ছিমছাম।

আর আমাদের দাওয়াতে, পাল-পরবের ভোজে, যগ্যির নেমন্তন্নে?

তার বর্ণনা দেবার ক্ষমতা কি আমার আছে? বিশেষ করে এ-সব বিষয়ে আমার গুরু সুকুমার রায় যখন তাঁর অজর অমর বর্ণনা প্ল্যাটিনামাক্ষরে রেখে দিয়ে গিয়েছেন। শোনো ঃ

'এই দিকে এসে তবে লয়ে ভোজভাণ্ড
সমুখে চাহিয়া দেখ কি ভীষণ কাণ্ড!
কেহ কহে 'দে আন্' কেহ হাঁকে 'লুচি'
কেহ কাঁদে শূন্য মুখে পাতখানি মুছি।
হোথা দেখি দুই প্রভু পাত্র লয়ে হাতে
হাতাহাতি গুঁতাগুঁতি দ্বন্দ্বরণে মাতে।
কেবা শোনে কার কথা সকলেই কর্তা
অনাহারে কত ধারে হল প্রাণহত্যা।'

বলে কি! ভোজের নেমন্তন্নে অনাহারে প্রাণহত্যা! আলবাত! না হলে বাঙালীর নেমন্তন্ন হতে যাবে কেন? পছন্দ না হলে যাও না ফাঁপোতে। খাও না আলোনা, আধাসেদ্ধ শুয়োরের মুণ্ডু কিংবা কিসের যেন ন্যাজ!

কিন্তু জাহাজ ছাড়ার সময় সব শেয়ালের এক রা।

আমি ভেনিসে দাঁড়িয়ে ইটালির জাহাজ ছাড়তে দেখেছি—জাহাজে বন্দরে, ডাঙায় জলে উভয় পক্ষের খালাসীরা মাকারনি-খেকো খাঁটি ইটালিয়ান; আমি মার্সেলেসের বন্দরেও ঐ কর্ম দেখেছি—উভয় পক্ষের খালাসীরাই ব্যাঙ-খেকো সরেস ফরাসিস্; আমি ডোভারে দাঁড়িয়ে ঐ প্রক্রিয়াই সাতিশয় মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করেছি—দু পক্ষের বাঁদরগুলোই বীফস্টেক-খেকো খাটাশ-মুখো ইংরেজ। আর গঙ্গায়, গোয়ালন্দে, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জে যে কতশত বার এই লড়াই দেখেছি তার তো লেখাজোখা নেই। উভয় পক্ষে আমরাই দেশভাই জাতভাই দাড়ি-দোলানো, লুঙি-ঝোলানো সিলট্যা, নোয়াখাল্যা।

বন্দরে বন্দরে তখন যে চিৎকার, অট্টরব ও হুঙ্কারধ্বনি ওঠে সে সর্বত্র

একই প্রকারের। একই গন্ধ, একই স্বাদ। চোখ বন্ধ করে বলতে পারবে না, নারায়ণগঞ্জে দাঁড়িয়ে চাঁটগাঁইয়া শুনছ, না হামবুর্গে জর্মন শুনছ।

ডেকে রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে প্রথমটায় তোমার মনে এই ধারণা হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয় যে, জাহাজ এবং ডাঙার, উভয়ের পক্ষের খালাসীরা একমত হয়ে জাহাজটাকে ডাঙার দড়াদড়ির বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি দিতে চায়। কিন্তু ঐ তো মারাত্মক ভুল করলে, দাদা? আসলে দু পক্ষের মতলব একটা খণ্ডযুদ্ধ লাগানো। জাহাজ ছাড়ানো-বাঁধানো নিছক একটা উপলক্ষ্য মাত্র। যে খালাসী জাহাজের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি তুর্কী ঘোড়ার তেজে ছুটছে, সে যে মাঝে মাঝে ডাঙার খালাসীর দিকে মুখ খিঁচিয়ে কি বলছে তার শব্দ সেই ধুন্দুমারের ভিতর শোনা যাচ্ছে না সত্যি কিন্তু একটু কল্পনাশক্তি এবং ঈষৎ খালাসী-মনস্তত্ত্ব তোমার রপ্ত থাকলে স্পষ্ট বুঝতে পারবে, তার অতিশয় প্রাঞ্জল বক্তব্য, 'ওরে ও গাড়ুগুঁম ইস্টুপিড, দড়িটা যে বাঁ দিকে গিঁট খেয়ে গিয়েছে, সেটা কি তোর চোখে মাস্তুল গুঁজে দেখিয়ে দিতে হবে। ওরে ও'—(পুনরায় কটুবাক্য)—

এই মধুরসবাণীর জুতসই সদুত্তর যে ডাঙার কনে-পক্ষ চড়াক্‌সে দিতে পারে না, সে কথা আদপেই ভেব না। অবশ্য তারও গলা শুনতে পাবে না, শুধু দেখতে পাবে অতি রমণীয় মুখভঙ্গি কিংবা মুখ-বিকৃতি, এবং বুঝতে হবে অনুমানে।

জাহাজের দিকে মুখ তুলে ফ্যাঁচ করে খানিকটে থুথু ফেলে বলবে, 'ওরে মর্কটস্য মর্কট, তোর দিকটা ভাল করে জড়িয়ে নে না। জাহাজের টানে এ-দিকটা তো আপনার থেকে খুলে যাবে। একটা দড়ির মনের কথা জানিস নে আর এসেছিস জাহাজের কামে। তার চেয়ে দেশে গিয়ে ঠাকুরমার উকুন বাছতে পারিস নে? ওরে ও হামান-দিস্তের থ্যাঁতলামুখো'—(পুনরায় কটুবাক্য)—

একটুখানি কল্পনার সাবান হাতে থাকলে ঐ অবস্থায় বিস্তর বাস্তবের বুদ্বুদ ওড়াতে পারবে।

ওদিকে এসব কলরব—মাইকেলের ভাষায় 'রথচক্র-ঘর্ঘর-কোদণ্ড-ট'কার' ছাপিয়ে উঠছে ঘন ঘন জাহাজের ভেঁপুর শব্দ—ভেঁ, ভেঁ—ভেঁ, ভেঁ—

তার অর্থ, যদি সে ছোট জাহাজের প্রতি হয়, 'ওরে ও ছোকরা, সর্ না। আমি যে এক্ষুনি ওদিকে আসছি দেখতে পাচ্ছিস নে? ধাক্কা লাগলে যে সাড়ে বত্রিশভাজা হয়ে যাবি, তখন কি টুকরোগুলো জোড়া লাগাবি গাঁদাপাতার রস দিয়ে?' আর যদি তোমার জাহাজের চেয়ে বড় জাহাজ হয়, তবে তার অর্থ, 'এই যে দাদা, নমস্কারম্। একটু বাঁ দিকে সরতে আজ্ঞা হয়, আমি তা হলে ডান দিকে সুড়ুৎ করে কেটে পড়তে পারি।' এবং এই ভেঁপু বাজানোর একটা তৃতীয় অর্থও আছে। প্রত্যেক জাহাজের মাঝিমাল্লারা আপন ভেঁপুর শব্দ চেনে। কেউ যদি তখনো বন্দরের কোনো কোণে আনন্দরসে মত্ত হয়ে থাকে, তবে ভেঁপুর শব্দ শুনে তৎক্ষণাৎ তার চৈতন্যোদয় হয় এবং জাহাজ ধরার জন্য

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগায়।

আমি একবার একজন খালাসীকে সাঁতরে এসে জাহাজে উঠতে দেখেছি। তখন তার আর সব খালাসী ভাইয়ারা যা গালিগালাজ দিয়েছিল তা শুনে আমি কানে আঙুল দিয়ে বাপ বাপ করে সরে পড়েছিলুম। ইংরাজিতে বলে, 'হি ক্যান্ সুএ্যার লাইক্ এ সেলার' অর্থাৎ খালাসীরা কটুবাক্য বলাতে এ দুনিয়ার সব চাইতে ওস্তাদ। ওরা যে-ভাষা ব্যবহার করে সেটা বর্জন করতে পারলে দেশ-বিদেশে তুমি মিষ্টভাষীরূপে খ্যাতি অর্জন করতে পারবে।

তোমার যদি ফার্সী-পড়নে-ওলা ক্লাস-ফ্রেন্ড থাকে তবে তাকে জিজ্ঞেস করো, 'ইস্কন্দর্-ই-রুমীরা পুরসীদ্—অর্থাৎ 'আলেকজান্ডার দি গ্রেটকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল'—দিয়ে যে গল্প আরম্ভ, তার গোটাটা কি? গল্পটা হচ্ছে, সিকন্দরশাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'ভদ্রতা আপনি কার কাছ থেকে শিখেছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'বে-আদবদের কাছ থেকে? 'সে কি প্রকারে সম্ভব?' 'তারা যা করে আমি তাই বর্জন করেছি।'

খুব যে একটা দারুণ চালাক গল্প হল তা বলছি নে। তবে জাহাজের খালাসীদের—বিশেষ করে ইংরেজ খালাসীদের—ভাষাটা বর্জন করলেই লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

জাহাজের সিঁড়ি ওঠার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেখবে দু-একটা লোক এক লাফে তিন ধাপ ডিঙোতে ডিঙোতে জাহাজে উঠছে। এরা কি একটু সময় করে আগে-ভাগে আসতে পারে না? আসলে তা নয়। কোনো বেচারীকে কাস্টম-হাউস (যারা আমদানী-রপ্তানী মালের উপর কড়া নজর রেখে মাশুল তোলে) আটকে রেখেছিল, শেষ মুহূর্তে খালাস পেয়েছে, কেউ বা আধ ঘণ্টা আগে খবর পেয়েছে কোন যাত্রী এ জাহাজে যাবে না বলে খালি বার্থটা সে পেয়ে গিয়েছে কিংবা কেউ শহর দেখতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিল, কোনো গতিকে এইমাত্র বন্দর আর জাহাজ খুঁজে পেয়েছে।

'বদর বদর' বলে জাহাজ বন্দরের বন্ধন থেকে মুক্তি পেল।

অজানা সমুদ্রের বুকে ভেসে যাওয়ার ঔৎসুক্য এক দিকে আছে, আবার ডাঙা থেকে ছুটি নেবার সময় মানুষের মন সব সময়ই একটা অব্যক্ত বেদনায় ভরে ওঠে। অপার সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, সীমার শেষের দিগ্বলয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মুক্ত মনের যত অগাধ আনন্দই পাও না কেন, ঝঞ্ঝাবাত্যার সঙ্গে দুর্বার সংগ্রাম করে করে ক্ষণে-বাঁচা ক্ষণে-মরার অতুলনীয় যত অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় কর না কেন, মাটির কোলে ফিরে আসার মত মধুময় অভিজ্ঞতা অন্য কিছুতেই পাবে না। তাই ভ্রমণকারীদের গুরু, গুরুদেব বহু নদ-নদী সাগর-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার পর বলেছেন,—

'ফিরে চল, ফিরে চল মাটির টানে
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।'

জাহাজ ছাড়তে ছাড়তে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

আমি জাহাজের পিছন দিকে রেলিঙের উপর ভর করে তাকিয়ে রইলুম

আলোকমালায় সুসজ্জিত মহানগরীর—পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বন্দরের দিকে। সেখানে রাস্তায় রাস্তায়, সমুদ্রের জাহাজে জাহাজে আর জেলেদের ডিঙিতে ডিঙিতে কোথাও বা সারে সারে প্রদীপশ্রেণী আর কোথাও বা এখানে একটা, ওখানে দুটো, সেখানে একঝাঁক— যেন মাটির সাত-ভাই-চম্পা।

আমরা দেয়ালি জ্বালি বছরের মাত্র এক শুভদিনে। ওখানে সম্বৎসর দেয়ালির উৎসব। এদের প্রতিদিনের প্রতি গোধূলিতে শুভ লগ্ন। আর এদের এ উৎসব আমাদের চেয়ে কত সর্বজনীন! এতে সাড়া দেয় সর্ব ধর্ম সর্ব সম্প্রদায়ের নর-নারী···হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসিক-মুসলমান-খ্রীষ্টানী!

আমি জানি, বৈজ্ঞানিকরা বলেন, কোনো কোনো ছোট্ট পাখির রঙ যে সবুজ তার কারণ সে যেন গাছের পাতার সঙ্গে নিজের রঙ মিলিয়ে দিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে, যাতে করে শিকরে পাখি তাকে দেখতে পেয়ে ছোঁ মেরে না নিয়ে যেতে পারে! তাই নাকি আমের রঙও কাঁচা বয়সে থাকে সবুজ— যাতে পাখি না দেখতে পায়, এবং পেকে গেলে হয়ে যায় লাল, যাতে করে পাখির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে— যাতে সে যেন ঠুকরে ঠুকরে তাকে গাছ থেকে আলাদা করে দেয়, নিচে পড়ে তার আঁটি যেন নতুন গাছ গজাতে পারে।

বৈজ্ঞানিকদের ব্যাখ্যা ভুল, আমি বলি কি করে। বিজ্ঞানের আমি জানি কতটুকু, বুঝি কতখানি? কিন্তু আমার সরল সৌন্দর্য-তিয়াসী মন এসব জেনেশুনেও বলে, 'না, পাখি যে সবুজ, সে শুধু তার নিজের সৌন্দর্য আর আমার চোখের আনন্দ বাড়াবার জন্যে। এর ভিতর ছোট হোক, বড় হোক, কোনো স্বার্থ লুকনো নেই। সৌন্দর্য শুধু সুন্দর হওয়ার জন্যই।'

ঠিক তেমনি আমি জানি, পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে প্রতি গোধূলিতে যে আলোর বান জেগে ওঠে, তার মধ্যে স্বার্থ লুকনো আছে। ঐ আলো দিয়ে মানুষ একে অন্যকে দেখতে পায়, বাপ ঐ আলোতে বাড়ি ফেরে, মা তার শিশুকে খুঁজে পায়, সবাই আপন আপন গৃহস্থালির কাজ করে; কিন্তু তবু, যখনই আমি দূরের থেকে এই আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখি, তখনি মনে হয় এগুলো জ্বালানো হয়েছে সুধমাত্র দেয়ালির উৎসবকে সফল করার জন্য। তার ভিতরে যেন আর কোনো স্বার্থ নেই।

অকূল সমুদ্রে পথহারা নাবিক তারার আলোয় ফের পথ খুঁজে পায়। সেই স্বার্থের সত্য উপেক্ষা করে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন—

'তুমি কত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে
কি উৎসবের লগনে।'

বন্দরের আলোর দিকে তাকিয়ে যদি আমিও ভগবানের উদ্দেশে বলি,—

'মোরা কত আলো জ্বালিয়েছি ঐ চরণে
কি আরতির লগনে।'

তবে কি বড্ড বেশী ভুল বলা হবে?

অনেক দূরে চলে এসেছি! পাড়ের আলো ক্রমেই ম্লান হয়ে আসছে। তবু এখনো দেখতে পাই, হুশ করে এক-একখানা জেলে-ডিঙি আমাদের পাশ

দিয়ে উলটো দিকে চলে যাচ্ছে। আসলে কিন্তু সে হুশ করে চলে যায় নি। সে ছিল দাঁড়িয়েই, কারণ তার গলুই সমুদ্রের দিকে মুখ করে আছে, আমরা তাকে পেরিয়ে গেলুম মাত্র।

আশ্চর্য, এত রাত অবধি পাড় থেকে এত দূরে তারা মাছ ধরছে!

এখন যদি ঝড় ওঠে তবে তারা করবে কি? নৌকো যদি ডুবে যায় তবে তারা তো এতখানি জল পাড়ি দিয়ে ডাঙায় পেঁছিতে পারবে না। তবে তারা এ রকম বিপজ্জনক পেশা নিয়ে পড়ে থাকে কেন? লাভের আশায়? নিশ্চয় নয়। সে তত্ত্ব আমি বিলক্ষণ জানি। আমি একবার কয়েক মাসের জন্য মাদ্রাজের সমুদ্রপাড়ে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে ছিলুম। তারই পাশে ছিল, একেবারে সমুদ্রের গা ঘেঁষে এক জেলেপাড়া। আমি পাকা ছটি মাস ওদের জীবনযাত্রাপ্রণালী দেখেছি। ওদের দৈন্য দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। আমাদের গরিব চাষারাও এদের তুলনায় বড়লোক, এমন কি, আমাদের আদিবাসীরা, সাঁওতাল ভীলেরাও এদের চেয়ে অনেক বেশী সুখস্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করে। তোমাদের ভিতর যারা পুরীর জেলেদের দেখেছ তারাই আমার কথায় সায় দেবে।

তবে কি এরা অন্য কোনো সুযোগ পায় না বলে এই বিপদসঙ্কুল, কঠিন অথচ দুঃখের জীবন নিয়ে পড়ে থাকে? আমার সেই মাদ্রাজী বন্ধু বললে, তা নয়, এরা নাকি খোলা সমুদ্র এত ভালোবাসে যে তাকে ছেড়ে মাঠের কাজে যেতে কিছুতেই রাজী হয় না। ঝড়ের সময় মাছ ধরা প্রায় অসম্ভব বলে তখন উপোস করে দিন কাটাবে, ক্ষুধায় প্রাণ অতিষ্ঠ হলে, ভুখা কাচ্চাবাচ্চাদের কান্না সহ্য করতে না পারলে সেই ঝড়েই বেরয় মাছ ধরতে আর ডুবে মরে সমুদ্রের অথৈ জলে।—তবু জল ছেড়ে ডাঙার ধান্দায় যেতে রাজী হয় না।

এবং নৌকোর মাঝি-মাল্লা, জাহাজের খালাসীদের বেলাও তাই। এদের জীবন এতখানি অভিশপ্ত নয়, জানি, কিন্তু এরাও ডাঙায় ফিরে যেতে রাজী হয় না। এমন কি, যে চাষা সাতশ পুরুষ ধরে খেতের কাজ করেছে, সেও যদি দুর্ভিক্ষের সময় দু পয়সা কামাবার জন্য সমুদ্রে যায় তবে কিছুদিন পরই তাকে আর ডাঙার কাজে নিয়ে যাওয়া যায় না। আর পুরনো খালাসীদের তো কথাই নেই। গোঁপদাড়ি পেকে গিয়েছে, সমুদ্রের নোনা জল আর নোনা হাওয়ায় চামড়ার রঙটি ব্রোন্‌জের মতো হয়ে গিয়েছে, আর কদিন বাঁচবে তার ঠিক নেই, জাহাজে কেউ চাকরি দিতে চায় না, তবু পড়ে থাকবে খিদিরপুরের এক ঘিঞ্জি আড্ডায় আর উদয়াস্ত এ-জাহাজ ও-জাহাজ করে করে বেড়াবে চাকরির সন্ধানে। ওদিকে বেশ দু পয়সা জমিয়েছে। ইচ্ছে করলেই দেশের গাঁয়ের তেঁতুলগাছতলায় নাতি-নাতনীর পাখার হাওয়া খেতে খেতে গল্পগুল বলতে বলতে দুটি চোখ বুঝতে পারে।

সমুদ্রের প্রতি এদের কেমন যেন একটা 'নেশা' আছে, সে সম্বন্ধে তারা একটু লজ্জিত। কেন, তা জানি নে। তুমি যদি বল, 'তা, চৌধুরীর পো' চৌধুরী পো বলে সম্বোধন করলে ওরা বড় খুশী হয়—'দু-পয়সা তো

কামিয়েছ, আর কেন এ-জাহাজে ও-জাহাজে ঝকমারির কাজ করা। তার চেয়ে দেশে গিয়ে আল্লা-রসুলের নাম স্মরণ কর, আখেরের কথা ভাববার সময় কি এখনো আসে নি?'

বড় কাচুমাচু হয়ে বুড়ো বলবে, 'না, ঠাকুর, তা নয়।' দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে বলবে, 'আর দুটি বচ্ছর কাম করলেই সব সুরাহা হয়ে যাবে। দু-পয়সা না নিয়ে নাতি-নাতনীদের ঘাড়ে চাপতে লজ্জা করে।'

একদম বাজে কথা। বুড়ো জাহাজের কামে ঢোকে যখন তার বয়স আঠারো। আজ সে সত্তর। এই বাহান্ন বৎসর ধরে সে দেশে টাকা পাঠিয়েছে ভালো করে ঘর-বাড়ি বানাবার জন্য, জমি-জমা কেনার জন্য। এখন তার পরিবারের এত সচ্ছল অবস্থা যে, ওরা জমিদারকে পর্যন্ত টাকা ধার দেয়। আর বুড়ো বলে কিনা ব্যাটা-ভাইপো নাতি-নাতনী তাকে দু-মুঠো অন্ন খেতে দেবে না!

সমুদ্রের প্রতি কোনো কোনো জাহাজ-কাপ্তেনের এত মায়া যে বুড়ো বয়সে তারা বাড়ি বানায় ঠিক সমুদ্রের পাড়ে, এবং বাড়িটার ঢপ্‌ও কিম্ভুত-কিমাকার! দেখতে আদপেই বাড়ির মতো নয়, একদম হুবহু জাহাজের মতো—অবশ্য মাটির সঙ্গে যোগ রেখে যতখানি সম্ভব। আর তারই চিলে-কোঠায় সাজিয়ে রাখে কম্পাস, দূরবীন, ম্যাপ, জাহাজের স্টিয়ারিঙ হুঈল এবং জাহাজ চালাবার অন্যান্য যাবতীয় সরঞ্জাম। বাড়ির আর কাউকে বুড়ো সেখানে ঢুকতে দেয় না—য়ুনিফর্মপরা না থাকলে জাহাজের ও-জায়গায় তো কাউকে যেতে দেওয়া হয় না—এবং সে সেখানে পাইপটা কামড়ে ধরে সমস্ত দিন বিড়বিড় করে 'খালাসীদের' বকাঝকা করে। ঝড়বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। তখন সে একাই একশ। 'জাহাজ' বাঁচাবার জন্য সে তখন খেপে গিয়ে 'ব্রিজ'ময় দাবড়ে বেড়ায়, 'টেলিফোনে' চিৎকার করে 'এঞ্জিন-ঘরকে' হুকুম হাঁকে, 'আরো জলদি'; 'পুরো স্পীডে', কখনো বা বরসাতিটা গায়ে চাপিয়ে 'ডেকের' তদারকি করে ভিজে কাঁই হয়ে ফিরবে। ঝড় না থামা পর্যন্ত তার দম ফেলার ফুরসত নেই, ঘুমুতে যাবার তো কথাই ওঠে না। ঝড় থামলে হাঁফ ছেড়ে বলবে, 'ওঃ, কি বাঁচনটাই না বেঁচে গিয়েছি। আমি না থাকলে সব ব্যাটা আজ ডুবে মরত। আজকালকার ছোঁড়ারা জাহাজ চালাবার কিস্‌-সু-টি জানে না।' তারপর টেবিলে বসে আঁকাবাঁকা অক্ষরে 'জাহাজের' ক্রুদের ধন্যবাদ জানাবে, তারা যে তার হুকুম তামিল করে জাহাজ বাঁচাতে পেরেছে তার জন্য। তার পর ঝড়ের ধাক্কায় জাহাজ যে কোথায় ছিটকে পড়েছে তার 'বেয়ারিঙ' নেবে বিস্তর ল্যাটিটুড-লঙ্গিটুড কষে এবং শেষটায় হাঁটু গেড়ে ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়ে পরম পরিতৃপ্তি সহকারে হাই তুলতে তুলতে আপন 'কেবিনে' শুতে যাবে।

তিন দিন পরে গুম গুম করে 'জাহাজ' থেকে নেমে সে পাড়ার আড্ডায় যাবে গল্প করতে—'জাহাজ' বন্দরে এসে ভিড়েছে কি না! সেখানে সেই মারাত্মক ঝড়ের একটা ভয়ঙ্কর বর্ণনা দিয়ে শেষটায় পাইপ কামড়াতে কামড়াতে

বলবে, 'আর না, এই আমার শেষ সফর। বুড়ো হাড়ে আর জলঝড় সয় না।' সবাই হা-হা করে বলবে, 'সে কি, কাপ্তেন, আপনার আর তেমন কি বয়স হল?' কাপ্তেনও 'হে'-হে'' করে মহাখুশী হয়ে 'জাহাজে' ফিরবে।

আমি আরো দুই শ্রেণীর লোককে চিনি যারা কিছুতেই বাসা বাঁধতে চায় না।

দেশ-বিদেশে আমি বিস্তর বেদে দেখেছি। এরা আজ এখানে কাল ওখানে, পরশু আরো দূরে, অন্য কোথাও। কখন্ কোন্ জায়গায় কোন্ মেলা শুরু হবে, কখন্ শেষ হবে, সব তাদের জানা! মেলায় মেলায় গিয়ে কেনা-কাটা করবে, নাচ দেখাবে, গান শোনাবে, হাত গুনবে, কিন্তু কোথাও স্থির হয়ে বেশী দিন থাকবে না। গ্রীষ্মের খরদাহ, বর্ষার অবিরল বৃষ্টি সব মাথাও করে চলেছে তো চলেছে, কিসের নেশায় কেউ বলতে পারে না। বাচ্চাদের লেখাশড়া শেখাবার চাড় নেই, তাদের অসুখ-বিসুখ করলে ডাক্তার বদ্যিরও তোয়াক্কা করে না। যা হবার হোক, বাসা তারা কিছুতেই বাঁধবে না। বাড়ির মায়া কি তারা কখনো জানে নি, কোন দিন জানবেও না।

ইংলণ্ড দুশ বছর ধরে চেষ্টা করে আসছে এদের কোনো জায়গায় পাকাপাকি ভাবে বসিয়ে দিতে। টাকা-পয়সা দিয়েছে, কিন্তু না, না, না, এরা কিছুতেই কোনো জায়গার কেনা-গোলাম হয়ে থাকতে চায় না। ইংলণ্ড যে এখনো তার দেশে প্রাথমিক শিক্ষার হার শতকরা পুরো একশ করতে পারে নি তার প্রধান কারণ এই বেদেরা। এরা তো আর কোনো জায়গায় বেশী দিন টিকে থাকে না যে এদের বাচ্চারা ইস্কুলে যাবে? শেষটায় ইংরেজ এদের জন্য ভ্রাম্যমান পাঠশালা খুলেছে, অর্থাৎ পাঠশালার মাস্টার শেলেট-পেনসিল নিয়ে ভবঘুরে হয়ে তাদের পিছন পিছন তাড়া লাগাচ্ছে, কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা, তারা যেমন ছিল তেমনি আছে।

খোলা-মেলার সন্তান এরা,—গণ্ডীর ভিতর বন্ধ হতে চায় না।

কিন্তু এদের সবাইকে হার মানায় কারা জান?

রবীন্দ্রনাথ যাদের সম্বন্ধে বলেছেন,

'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।'

এই যে আরব-সাগর পাড়ি দিয়ে আদন বন্দরের দিকে যাচ্ছি এরা সেই দেশের লোক। সৃষ্টির আদিম প্রভাত থেকে এরা আরবের এই মরুভূমিতে ঘোরাঘুরি করছে। এরা এদিক-ওদিক যেতে যেতে কখনো ইরানের সজল উপত্যকার কাছে এসে পেঁছেছে, কখনো লেবাননের ঘন বনমর্মরধ্বনিও শুনতে পেয়েছে কিন্তু এসব জায়গায় নিশ্চিন্ত মনে বসবাস করার কণামাত্র লোভ এদের কখনো হয় নি। বরঞ্চ মরুভূমির এক মরুদ্যান থেকে আরেক মরুদ্যান যাবার পথে সমস্ত ক্যারাভান (দল) জলের অভাবে মারা গেল—এ বীভৎস সত্য তাদের কাছে অজানা নয়, তবু তারা ঐ পথ ধরেই চলবে, কোনো জায়গায় স্থায়ী বসবাসের প্রস্তাব তাদের মাথায় বজ্রাঘাতের ন্যায়।

জানি, এক কালে আরব দেশ বড় গরিব ছিল, কৃত্রিম উপায়ে জলের ব্যবস্থা করতে পারত না বলে সেখানে চাষ-আবাদের কোনো প্রশ্নই উঠত না। কিন্তু হালে নজ্‌দ-হিজাজের রাজা ইবনে সউদ[১] পেট্রল বিক্রি করে মার্কিনদের কাছ থেকে এত কোটি কোটি ডলার পেয়েছেন যে সে-কড়ি কি করে খরচা করবেন তার কোনো উপায়ই খুঁজে পাচ্ছেন না। শেষটায় মেলা যন্ত্রপাতি কিনে তিনি বিস্তর জায়গায় জল সেঁচে সেগুলোকে খেত-খামারের জন্য তৈরী করে বেদুইনদের বললেন, তারা যেন মরুভূমির প্রাণঘাতী যাযাবরবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে এসব জায়গায় বাড়িঘর বাঁধে।

কার গোয়াল, কে দেয় ধুনো!

সে সব জায়গায় তখন তালগাছের মতো উঁচু আগাছা গজাচ্ছে।

বেদুইন তার উট-খচ্চর, গাধা-ঘোড়া নিয়ে আগের মতোই এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। উটের লোমের তাঁবুর ভিতর রাত্রিবাস করে। তৃষ্ণায় যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয় তখন তার প্রিয় উটের কণ্ঠ কেটে তারই ভিতরকার জমানো জল খায়। শেষটায় জলের অভাবে গাধা-খচ্চর, বউ-বাচ্চা সহ গুষ্ঠীসুদ্ধ মারা যায়।

তবু 'পা-জমিয়ে' কোথাও নীড় বানাবে না।

এই সব তত্ত্বচিন্তায় মশগুল হয়ে ছিলুম এমন সময় হুশ করে আরেকখানা জেলে-নৌকা পাশ দিয়ে চলে গেল। দেখি, ক্যাম্বিসের ছইয়ের নিচে লোহার উনুন জেলে বুড়ো রান্না চাপিয়েছে। কল্পনা কি না বলতে পারব না, মনে হল ফোড়নের গন্ধ যেন নাকে এসে পৌঁছল। কল্পনা হোক আর যাই হোক তত্ত্বচিন্তা লোপ পেয়ে তদ্দণ্ডেই ক্ষুধার উদ্রেক হল।

ওদিকে কবে শেষ ব্যাচের শেষ ডিনার খাওয়া হয়ে গিয়েছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ, তত্ত্বচিন্তায় মনোবীক্ষণ বিলক্ষণ সুখনীয় প্রচেষ্টা কিন্তু ভক্ষণ-ডিণ্ডিম উপেক্ষা করা সর্বাংশে অর্বাচীনের লক্ষণ।

তবু দেখি, যদি কিছু জোটে, না হলে পেটে কিল মেরে শুয়ে পড়বো আর কি।

দশ পা যেতে না যেতেই দেখি আমার দুই তরুণ বন্ধু পল আর পার্সি 'রামি' খেলছে। আমাকে দেখে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'গুড ঈভনিং, স্যার!'

আমি বললুম, 'হ্যালো', অর্থাৎ 'এই যে।'

তারপর ঈষৎ অভিমানের সুরে বললুম, 'আমাকে একলা ফেলে তাস খেলছ যে বড়! জান, তাস ব্যসন-বিশেষ, তাসে অযথা কালক্ষয় হয়, গুণীরা বলেন—'

ওরা বাধা দিচ্ছে না বলে আমাকেই থামতে হল।

পার্সি বললে, 'যথার্থ বলেছেন, স্যার!'

পল বললে, 'হক্ কথা। কিন্তু স্যার, আমরা তো এতক্ষণ আপনার

১। এঁর ছেলে সম্প্রতি করাচীতে বেড়াতে এসেছিলেন

ডিনার যোগাড় করে কেবিনে গুছিয়ে রাখাতে—'

আমি বললুম, 'সে কি হে ?'

পার্সি বললে, 'আজ্ঞে। যখন দেখলুম, আপনি ডিনারের ঘণ্টা শুনেও উঠলেন না, তখনই আমরা ব্যবস্থাটা করে ফেললুম।'

সোনার চাঁদ ছেলেরা। ইচ্ছে হচ্ছিল, দুজনকে দু-বগলে নিয়ে উল্লাসে নাগানৃত্য জুড়ে দি। কিন্তু বয়সে কম হলে হবে কি, ওজনের দিক দিয়ে ওরা আমার চেয়ে ঢের বেশী ভারিক্কী মুরুব্বী। বাসনাটা তাই বিকাশ লাভ করল না। বললুম, 'তবে চলো ব্রাদার্স, কেবিনে।'

॥ ২ ॥

'গড্ডলিকা-প্রবাহে' অর্থাৎ ভিড়ের সঙ্গে মানুষ গা ভাসিয়ে দেয় কেন ? তাতে সুবিধে এই ;—আর পাঁচজনের যা গতি, তোমারও তাই হবে। এবং যেহেতু সংসারের আর পাঁচজন হেসে-খেলে বেঁচে আছে, অতএব তুমিও দিব্য তাদেরই মতো সুখে-দুঃখে বঁচে থাকবে।

আর যদি গড্ডলিকায় না মিশে একলা পথে চল তবে যেমন হঠাৎ গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে যেতে পার ঠিক তেমনি মোড় ফিরতেই আচমকা হয়তো দেখতে পাব, ব্যাঘ্রাচার্য-বৃহল্লাঙ্গুল থাবা পেতে সামনে বসে ন্যাজ আছড়াচ্ছেন !

গুপ্তধনটা একা পেয়েছিলে বলে সেটা যেমন তোমার একারই, ঠিক তেমনি বাঘের মোকাবেলা করতে হবে তোমাকে একাই।

তাই বেশির ভাগ লোক সর্বনাশা ক্ষতির ভয়ে অত্যধিক লাভের লোভ না করে গড্ডলিকার সঙ্গে মিশে যায়।

জাহাজেও তাই। তুমি যদি আর পাঁচজনের সঙ্গে ঘুম থেকে জাগ তবে সেই ভিড়ে তুমি ঝটপট তোমার 'বেড-টী'র কাপটি পাবে না। আর যদি খুব সকাল সকাল কিংবা আর সকলের চেয়ে দেরিতে ওঠো তবে চা-টি পেয়ে যাবে তন্মুহূর্তেই, কিন্তু আবার কোনো দিন দেখবে, তখনো আগুন জ্বালা হয় নি বলে চায়ের অনেক দেরি, কিংবা এত দেরিতে উঠেছ যে 'বেড-টী'র পাট উঠে গিয়ে তখন 'ব্রেকফাস্ট' আরম্ভ হয়ে গিয়েছে বলে তোমার 'বেড-টী' মাঠে অর্থাৎ দরিয়ায় মারা গিয়েছে।

ইংরিজিতে একেই বলে, 'নো রিস্ক্, নো গেন' অর্থাৎ একটুখানি ঝুঁকি যদি নিতে রাজী না হও তবে লাভও হবে না। লটারি জিততে হলে অন্তত একটা টিকিট কেনার রিস্ক্ নিতে হয়।

সেদিন ঝুঁকিটা নিয়ে সুবিধে হল না। চা-টা মিস্ করে বিরসবদনে ডেকে এসে বসলুম।

এক মিনিটের ভিতর পল আর পার্সির উদয়।

পল ফিস-ফিস করে কানে কানে বলল, 'নূতন সব 'বার্ডি'দের (—অর্থাৎ

'চিড়িয়াদের') দেখেছেন, স্যার ?'

এরা সব নবাগত যাত্রী। কলম্বোয় জাহাজ ধরেছে। বেচারীরা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, ডেক-চেয়ার পাতবার ভালো জারগার সন্ধানে। কিন্তু পাবে কোথায় ? আমরা যে আগে-ভাগেই সব জায়গা দখল করে আসন-জমীন জমিয়ে বসে আছি—মাদ্রাজ থেকে।

এ তো দুনিয়ার সর্বত্র হামেশাই হচ্ছে। মীটিঙে, ফুটবলের মাঠে সর্বদাই আগে গিয়ে ভালো জায়গা দখল করার চেষ্টা সবাই করে থাকে। এমন কি রান্নাঘরের দাওয়ায় বসি ঠিক দরজাটির কাছে। মা রান্নাঘর থেকে খাবার নিয়ে বেরিয়েই সক্কলের পয়লা দেবে আমাকে।

ভাল জায়গায় বসতে পারাতে দুটো সুখ। একটা ভালো জায়গা পেয়েছ বলে এবং দ্বিতীয়টা তার চেয়েও বড়। বেশ আরাম করে বসে চিনে-বাদাম খেতে খেতে অলস নিরাসক্ত ভাবে তাকিয়ে দেখতে, অন্যেরা ফ্যা-ফ্যা করে কি ভাবে ভালো জায়গার সন্ধানে ঘুরে মরছে। পরিচিত এবং অপ্রিয় লোক হলে তো কথাই নেই। 'এই যে ভড় মশাই, জায়গা পাচ্ছেন না বুঝি ?' বলে ফিক করে একটুখানি সদুপদেশ বিতরণ করবে, 'কেন, ঐ দিকে তো মেলা জায়গা রয়েছে', বলে হাতখানা মাথার উপর তুলে চতুর্দিকে ঘুরিয়ে দেবে। তার থেকে কেউই বুঝতে পারবে না, কোন্ দিকে জায়গা খালি। লোকটা দৃষ্টি দিয়ে বিষবৃষ্টি নিক্ষেপ করে গজরাতে গজরাতে তোমার সৃষ্টির আড়াল হবে !

আঃ ! এ সংসারে ভগবান তাঁর অসীম করুণায় আমাদের জন্য কত আনন্দই না রেখেছেন ! কে বলে সংসার মায়াময় অনিত্য ? সে বোধ হয় ফুটবলের মাঠে কখনো ভাল সীট পায় নি।

আমি পল-পার্সিকে জিজ্ঞেস করলুম, 'অদ্যকার প্রোগ্রাম কি ?'

পল বললে, 'প্রথমত, জিম্নাস্টিক্-হলে গমন।'

'সেখানকার কর্ম-তালিকা কি ?'

'একটুখানি রোইং করব।'

'রোইং ? সেখানে কি নৌকো, বৈঠে, জল আছে ?'

'সব আছে, শুধু জল নেই।'

'?'

বৈঠেগুলোর সঙ্গে এমন ভাবে স্প্রিং লাগানো আছে যে জল থাকলে বৈঠাকে যতখানি বাধা দিত স্প্রিং ঠিক ততখানি দেয়। কাজেই শুকনোয় বসে বৈঠে চালানোর প্র্যাকটিস আর পরিশ্রম দুই-ই হয়।'

আমি বললুম, 'উঁহু। আমার মন সাড়া দিচ্ছে না। আমাদের দেশে আমরা বৈঠে মারি দু হাত দিয়ে তুলে ধরে। তোমার কায়দাটা রপ্ত করে আমার কোনো লাভ হবে না।'

পল বললে, 'তাহলে প্যারালেল বার, ডাম্বেল কিছু একটা ?'

'উঁহু।'

পার্সি বললে, 'তাহলে পলে আমাতে বক্সিং লড়ব। আপনি রেফারী

হবেন।'

'আমি তো ওর তত্ত্ব কিছুই জানি নে।'

'আমরা শিখিয়ে দেব।'

'উঁহু।'

পল তখন ধীরে ধীরে বলল, 'আসলে আপনি কোনো রকম নড়াচড়া করতে চান না। একসেরসাইজের কথা না হয় রইল কিন্তু আর সবাই তো সকাল-বিকেল জাহাজটাকে কয়েকবার প্রদক্ষিণ দেয় শরীরটাকে ঠিক রাখবার জন্য। আপনি তো তাও করেন না। কেন বলুন তো?'

আমি বললুম, 'আরেক দিন হবে। উপস্থিত অদ্যকার অন্য কর্মসূচী কি?'

পার্সি বললে, 'আজ এগারোটায় লাউঞ্জে চেম্বার মুজিক। তাই না হয় শোনা যাবে।'

পল আপত্তি জানাল। বললে, 'যে লোকটা বেহালা বাজায় তার বাজনা শুনে মনে হয়, দুটো হুলো বেরালে মারামারি লাগিয়েছে।'

পার্সি বললে, 'ঐ তো পলের দোষ। বড্ড পিটপিটে। আরে বাপু, যাচ্ছিস তো সস্তা ফরাসী 'মেসাজেরি মারিতিম্' জাহাজে আর আশা করছিস, ক্রাইজলার এসে তোর কেবিনের জানলার কাছে চাঁদের আলোতে বেহালা দিয়ে সেরেনেড বাজাবেন!'

আমি বললুম, 'আমাদের দেশে এক বুড়ী কিনে আনল এক পয়সার তেল। পরে দেখে তাতে একটা মরা মাছি। দোকানীকে ফেরত দিতে গিয়ে বললে, 'তেলে মরা মাছি।' দোকানী বললে, 'এক পয়সার তেলে কি তুমি একটা মরা হাতি আশা করেছিলে?'

পার্সি বললে, 'এইবার আপনাকে বাগে পেয়েছি, স্যার! আপনি যে গল্পটি বললেন তার যে বিলিতি মুদ্রণটি আমি জানি সে এর চেয়ে সরেস।'

আমি চোখ বন্ধ করে বললুম, 'কীর্তন কর।'

পার্সি বললে, 'এই আমাদের পলেরই মতো এক পিটপিটে মেমসায়েব গিয়েছেন মোজা কিনতে। কোন মোজাই তাঁর পছন্দ হয় না। শেষটায় সবচেয়ে সস্তায় এক শিলিঙে তিনি এক জোড়া মোজা কিনলেন। দোকানী যখন মোজা প্যাক করছে তখন তাঁর চোখে পড়ল মোজাতে অতি ছোট্ট একটি ল্যাডার—'

আমি শুধোলুম, 'ল্যাডার মানে কি? ল্যাডার মানে তো মই।'

'আজ্ঞে, মোজার একগাছা টানার সুতো যদি ছিঁড়ে যায় তবে ঐ জায়গায় শুধু পড়েনগুলো একটার উপর একটা এমন ভাবে থাকে যেন মনে হয় সিঁড়ি কিংবা মই। তাই ওটাকে তখন ল্যাডার বলা হয়।'

আমি বললুম, 'থ্যাঙ্কিউ; শেখা হল। তারপর কি হল?'

'মেম বললেন, "ও মোজা আমি নেব না, ওতে একটা ল্যাডার রয়েছে।"

দোকানী বললে, "এক শিলিঙের মোজাতে কি আপনি একটা মার্বেল স্টেয়ারকেস আশা করেছিলেন, ম্যাডাম?"'

আমি বললুম, 'সাবাস, তোমার বলা গল্পটি আমার গার্হস্থ্য সংস্করণের রাজসংস্করণ বলা যেতে পারে। তদুপরি তোমরা তো রাজার জাত।'

পার্সি বললে, 'ও কথাটা নাই বা তুললেন, স্যর!'

আমি আমার চোখ বন্ধ করে বললুম, 'জাহাজের দুর্বিষহ গতানুগতিক জীবনকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করবার জন্য কোম্পানি অদ্য অন্য কি ব্যবস্থা করেছেন?'

পার্সি বললে, 'সঙ্গীতে যখন পলের আপত্তি তখন আমি ভাবছি ঐ সময়টায় আমি সেলুনে চুল কাটাতে যাবো।'

আমি হন্তদন্ত হয়ে বললুম, 'অমন কর্মটি গলা কেটে ফেললেও করতে যেয়ো না, পার্সি! তোমার চুল কেটে দেবে নিশ্চয়ই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমার 'হজামত'ও করে দেবে।'

কথাটা বুঝতে পারলুম না, স্যর!'

আমি বললুম, ওটা একটা উর্দু কথার আড়। এর অর্থ, তোমার চুল নিশ্চয়ই কেটে দেবে ভালো করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাথাটিও মুড়িয়ে দেবে।'

পার্সি আরো সাত হাত জলে। 'শুধোলে, চুল যদি ভালো করে কাটে তবে মাথা মুড়োবে কি করে?'

আমি বললুম 'তোমার চুল কাটবে শব্দার্থে, কিন্তু মাথা মুড়োবে বক্রার্থে, অর্থাৎ মেটাফরিকালি। মোদ্দা কথা তোমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করবে। জাহাজে চুল কাটানোর দর্শনী পঞ্চ মুদ্রা।'

পল বললেন, 'সে কি স্যর? চীন দেশে তো পাঁচ টাকায় কুড়ি বার চুল কাটানো যায়!'

আমি বললুম, 'ভারতবর্ষেও তাই। এমন কি বিশ্বফ্যাশানের রাজধানী প্যারিসেও চুল কাটাতে পাঁচ টাকা লাগে না। ব্যাপারটা হয়েছে কি, জাহাজের ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছেন পয়সাওলা বড়লোকেরা। তাঁরা পাঁচ টাকার কমে চুল কাটান না। কাজেই রেট বেঁধে দেওয়া হয়েছে পাঁচ টাকা। আমাদের কথা বাদ দাও, এখন যদি কোন ডেকপ্যাসেঞ্জারও চুল কাটাতে যায় তবে তাকেও দিতে হবে পাঁচ টাকা।'

'তা হলে উপায়? একমাথা চুল নিয়ে লণ্ডনে নামলে পিসিমা কি ভাববেন? তার উপর পিসিমাকে দেখব জীবনে এই প্রথম, পিসিমার কথা উঠলে বাবা মা যে ভাবে সমীহ করে কথা বলেন তার থেকে মনে হয় তিনি খুব সোজা মহিলা নন। তা হলে পাঁচটা টাকা দরিয়ার জলে ভেসে গেল আর কি, একদম শব্দার্থে।'

আমি বললুম, 'আদপেই না। জিবুটি বন্দরে চুল কাটাবে। বিবেচনা করি, সেখানে চুল কাটাতে এক শিলিঙেরও কম লাগবে।'

পল বললে, 'আমরা যখন বন্দরে রোদ লাগাব তখন পার্সিটা একটা ঘিঞ্জি সেলুনে বসে চুল কাটাবে। তা হলে তার উপযুক্ত শিক্ষা হয়।'

পার্সি আমার দিকে করুণ নয়নে তাকাল।

আমি বললুম, 'তা কেন? বন্দর দেখার পর তোমাতে আমাতে যখন

কাফেতে বসে কফি খাবো তখন পার্সি চুল কাটাবে। চাই কি, হয়তো সেলুনের বারান্দায় বসেই কফি খেতে খেতে পার্সিকে আমাদের মহামূল্যবান সঙ্গসুখ দেব, অমূল্য উপদেশ বিতরণ করব।'

পার্সি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বাও করে বললে, 'এ যাত্রায় আপনার সঙ্গে পরিচয় না হলে, স্যর, আমাদের যে কি হত—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'কিছুই হত না। আমার সঙ্গে বজর-বজর না করে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে, পাঁচ-রকমের ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে আলাপচারি হত। অনেক দেখতে, কম শুনতে।'

দুজনাই সঙ্গে সঙ্গে কেটে পড়ল!

আমি আরব সাগরের আবহাওয়া সম্বন্ধে একখানা বিরাট কেতাব নিয়ে পড়তে লেগে গেলুম।

॥ ৩ ॥

আরবের তুলনায় বাঙালী যে অতিশয় নিরীহ সে বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয় কিন্তু আরব সাগর, সাগর হয়েও বঙ্গোপসাগরের উপসাগরের চেয়ে অনেক বেশী শান্ত এবং ঠাণ্ডা। মাদ্রাজ থেকে কলম্ব পর্যন্ত অধিকাংশ যাত্রী সী-সিকনেসে বেশ কাবু হয়ে থাকার পর এখানে তাঁরা বেশ চাঙা হয়ে উঠেছেন। উত্তর-পূব দিকে মৃদু-মন্দ মৌসুমী হাওয়া বইছে তখনো—এই হাওয়ায় পাল তুলে দিয়েই ভাস্কো দা গামা আফ্রিকা থেকে ভারতে পেঁছিতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই সময়ে ঐ হাওয়া ভারতের দিকে বয় সে আবিষ্কার গামার নয়। আরবরা এ হাওয়ার গতিবিধি সম্বন্ধে বিলক্ষণ ওকিব-হাল ছিল এবং বিশেষ ঋতুতে (মৌসুম) এ হাওয়া বয় বলে এর নাম দিয়েছিল মৌসুমী হাওয়া। ইংরিজী শব্দ 'মনসুন' এবং বাঙলা 'মরশুম' এই মৌসুম শব্দ থেকে এসেছে। কিন্তু মৌসুমী হাওয়ার খানিকটে সন্ধান পাওয়ার পরও গামা একা সাহস করে আরব সাগর পাড়ি দিতে পারেন নি। আফ্রিকা থেকে একজন আরবকে জোর করে জাহাজের 'পাইলট' রূপে এনেছিলেন।

রোমানরাও নিশ্চয়ই এ হাওয়ার খবর কিছুটা রাখত। না হলে আরবদের বহু পূর্বে দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে তারা এতখানি ব্যবসা-বাণিজ্য করল কি করে? এখনো দক্ষিণ-ভারতের বহু জায়গায় মাটির তলা থেকে রোমান মুদ্রা বেরোয়।

তারও পূর্বে গ্রীক, ফিনিশিয়ানরা এ হাওয়ার খবর কতখানি রাখত আমার বিদ্যে অত দূরে পেঁছয় নি। তোমরা যদি কেতাবপত্র ঘেঁটে আমাকে খবরটা জানাও তবে বড় খুশী হই।

এই হাওয়াটাকেই ট্যারচা কেটে কেটে আমাদের জাহাজ এগোচ্ছে। এ হাওয়া যতক্ষণ মোলায়েম ভাবে চলেন ততক্ষণ কোনো ভাবনা নাই। জাহাজ অল্প-স্বল্প দোলে বটে তবু উলটো দিক থেকে বইছে বলে গরমে বেগুন-পোড়া হতে হয় না। কিন্তু ইনি রুদ্রমূর্তি ধরলেই জাহাজময় পরিত্রাহি চিৎকার

Library

উঠবে। এবং বছরের এ সময়টায় তিনি যে মাসে অন্তত দু-তিনবার জাহাজ-গুলোকে লণ্ডভণ্ড করে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগে যান সে 'সুখবরটা' আবহাওয়ার বইখানাতে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে।

আবহাওয়ার বিজ্ঞান ঝড় ওঠবার পূর্বাভাস খানিকটা দিতে পারে বটে কিন্তু আরব সাগরের মাঝখানে যে ঝড় উঠল সে যে তার পর কোন্ দিকে ধাওয়া করবে সে সম্বন্ধে আগে-ভাগে কোনোকিছু বলে দেওয়া প্রায় অসম্ভব।

তাই সে ঝড় যদি পূব দিকে ধাওয়া করে তবে ভারতের বিপদ; বোম্বাই, কারওয়ার, তিরু অনন্তপুরম্ (শ্রীঅনন্তপুর, ট্রিভাণ্ডরম্) অঞ্চল লণ্ডভণ্ড করে দেবে যদি উত্তর দিকে যায় তবে পার্সিয়ান গল্ফ্ এবং আরব-উপকূলের বিপদ আর যদি পশ্চিম পানে আক্রমণ করে তবে আদন বন্দর এবং আফ্রিকার সোমালি-দেশের প্রাণ যায়-যায়।

একবার নাকি এই রকম একটা ঝড়ের পর সোমালিদের ওবোক শহরে মাত্র একখানা বাড়ি খাড়া ছিল। যে ঝড়ে শহরের সব বাড়ি পড়ে যায়, তার সঙ্গে যদি মাঝদরিয়ায় আমাদের জাহাজের মোলাকাত হয় তবে অবস্থাটা কি রকম হবে খানিকটা অনুমান করা যায়।

তবে আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, এ রকম ঝড়ের সঙ্গে মানুষের এক বারের বেশী দেখা হয় না। প্রথম ধাক্কাতেই পাতাল-প্রাপ্তি!

'পাতাল-প্রাপ্তি' কথাটা কি ঠিক হল? কোথায় যেন পড়েছি, জাহাজ ডুবে গেলে পাতাল অবধি নাকি পেঁছিয় না। খানিকটে নাবার পর ভারী জল ছিন্ন করে জাহাজ নাকি আর তলার দিকে যেতে পারে না। তখন সে ত্রিশঙ্কুর মতো ঐখানেই ভাসতে থাকে।

ভাবতে কি রকম অদ্ভুত লাগে! সমুদ্রের এক বিশেষ স্তরে তাহলে যত সব জাহাজ ডোবে তারা যতদিন না জরাজীর্ণ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায় তত-দিন শুধু ঘোরাফেরাই করবে!

জলে যা, হাওয়াতেই বোধকরি তাই। বেলুন-টেলুন জোরদার করে ছাড়তে পারলে বোধ হয় উড়তে উড়তে তারা এক বিশেষ স্তরে পেঁছিলে ঐখানেই ঝুলতে থাকবে—না পারবে নিচের দিকে নামতে, না পারবে উপরের দিকে যেতে। তারই অবস্থা কল্পনা করে বোধ হয় মুনি-ঋষিরা ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ-মর্ত্যের মাঝখানে ঝুলে থাকার কথা কল্পনা করেছিলেন।

আমাকে অবশ্য কখনো কোনো জায়গায় ঝুলে থাকতে হবে না। দ্বিপ্রহরে এবং সন্ধ্যায় যা গুরুভোজন করে থাকি তার ফলে ডুবলে পাথরবাটির মতো তরতর করে একদম নাক-বরাবর পাতালে পেঁছে যাব। আহারাদির পর আমার যা ওজন হয় সে গুরুভার সমুদ্রের যে-কোনো নোনা জলকে অনায়াসে ছিন্ন করতে পারে। আমার ভাবনা শুধু আমার মুণ্ডুটাকে নিয়ে। মগজ সেটাতে এক রত্তিও নেই বলে সেটা এমনি ফাঁপা যে, কখন যে ধড়টি ছেড়ে হুশ করে চন্দ্র-সূর্যের পানে ধাওয়া করবে তার কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। হাজারো লোকের ভিড়ের মধ্যে যদি আমাকে সনাক্ত করতে চাও তবে শুধু লক্ষ্য কোরো

কোন্ লোকটা দু হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে নড়া-চড়া করছে।

অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলুম আমার সখা এবং সতীর্থ—একই তীর্থে যখন যাচ্ছি তখন 'সতীর্থ' বলাতে কারো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়—শ্রীমান্ পল কোথা থেকে একটা টেলিস্কোপ যোগাড় করে একদৃষ্টে দক্ষিণ পানে তাকিয়ে আছে। ভাবলুম, ঐ দিক দিয়ে বোধ হয় কোনো জাহাজ যাচ্ছে আর সে তার নামটা পড়ার চেষ্টা করছে।

আমাকে দাঁড়াতে দেখে কাছে এসে বললে, 'ঐ দূরে যেন ল্যাণ্ড দেখা যাচ্ছে।'

আমি বললুম 'ল্যাণ্ড নয়, আইল্যাণ্ড। ওটা বোধ হয় মাল-দ্বীপপুঞ্জের কোনো একটা হবে।'

পল বললে, 'কই, ওগুলোর নাম তো কখনো শুনি নি!'

আমি বললুম, 'শুনবে কি করে? এই জাহাজে যে এত লোক, এঁদের সব্বাইকে জিজ্ঞেস করো ওঁদের কেউ মালদ্বীপ গিয়েছেন কি না? অদ্দূরেই বা কেন? শুধু জিজ্ঞেস করো, মালদ্বীপবাসী কারো সঙ্গে কখনো ওঁদের দেখা হয়েছে কি না? তাই মালদ্বীপ নিয়ে এ বিশ্বভুবনে কারো কোনো কৌতূহল নেই।'

'আপনি জানলেন কি করে?'

'শুনেছি মালদ্বীপের লোকেরা খুব ধর্মভীরু হয়। এক মালদ্বীপবাসীর তাই ইচ্ছা হয়, তার ছেলেকে মুসলিম শাস্ত্র শেখাবার। মালদ্বীপে তার কোনো ব্যবস্থা নেই বলে তিনি ছেলেকে কাইরোর আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান;—ঐটেই ইসলামী শাস্ত্র শেখার জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা বিশ্ববিদ্যালয়। ছেলেটির সঙ্গে আমার আলাপ হয় ঐখানে। বহুবার দেখা হয়েছিল বলে সে আমাকে তার দেশ সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলেছিল, তবে সে অনেককাল হল বলে আজ আর বিশেষ কিছু মনে নেই।

'ওখানে নাকি সবসুদ্ধ হাজার দুই ছোট ছোট দ্বীপ আছে এবং তার অনেকগুলোতেই খাবার জল নেই বলে কোনো প্রকারের বসতি নেই। মাল-দ্বীপের ছেলেটি আমায় বলেছিল, "আপনি যদি এ রকম দশ-বিশটা দ্বীপ নিয়ে বলেন, এগুলো আপনার, আপনি এদের রাজা, তা হলে আমরা তাতে কণামাত্র আপত্তি জানাব না।" অন্যগুলোতেও বিশেষ কিছু ফলে না; সবচেয়ে বড় দ্বীপটার দৈর্ঘ্য নাকি মাত্র দু মাইল। মালদ্বীপের সুলতান সেখানে থাকেন এবং তাঁর নাকি ছোট্ট একখানা মোটর গাড়ি আছে। তবে সেখানে সব চেয়ে লম্বা রাস্তার দৈর্ঘ্য মাত্র দু মাইল সেখানে ওটা চালিয়ে তিনি কি সুখ পান তা তিনিই বলতে পারবেন।

'মালদ্বীপে আছে প্রচুর নারকেল গাছ আর দ্বীপের চতুর্দিকে জাত-বেজাতের মাছ কিলবিল করছে। মাছের শুঁটকি আর নারকোলে নৌকো ভর্তি করে পাল তুলে দিয়ে তারা রওয়ানা হয় সিংহলের দিকে মৌসুমী হাওয়া বইতে আরম্ভ করলেই। হাওয়া তখন মালদ্বীপ থেকে সিংহলের দিকে বয়। সমস্ত বর্ষাকালটা

সিংহলে ঐ সব বিক্রি করে এবং বদলে চাল ডাল কাপড় কেরোসিন তেল কেনে। কেনাকাটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তাদের নাকি সেখানে বহুদিন কাটাতে হয়, কারণ উলটো হাওয়া বইতে আরম্ভ করবে শীতের সুরুতে। তার আগে তো ফেরার উপায় নেই।'

পার্সি বললে, 'কেন স্যর, এখন তো শীতকাল নয়। আমরা তো হাওয়ার উলটো দিকেই যাচ্ছি।'

আমি বললুম, 'ভ্রাতঃ, আমাদের জাহাজ চলে কলে, হাওয়ার তোয়াক্কা সে করে থোড়াই। মালদ্বীপে কোনো কলের জাহাজ যায় না, খরচায় পোষায় না বলে। তাই আজ পর্যন্ত কোনো টুরিস্ট মালদ্বীপ যায় নি।

'তাই মালদ্বীপের ছোকরাটি আমায় বলেছিল, "আমাদের ভাষাতে 'অতিথি' শব্দটার কোনো প্রতিশব্দ নেই। তার কারণ বহুশত বৎসর ধরে আমাদের দেশে ভিনদিশী লোক আসেনি। আমরা এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যা অল্পস্বল্প যাওয়া-আসা করি তা এতই কাছাকাছির ব্যাপার যে কাউকে অন্যের বাড়িতে রাত্রিযাপন করতে হয় না।" তারপর আমায় বলেছিল, "আপনার নেমন্তন্ন রইল মালদ্বীপ ভ্রমণের, কিন্তু আমি জানি, আপনি কখনো আসবেন না। যদিস্যাৎ এসে যান তাই আগের থেকে বলে রাখছি, আপনাকে এর বাড়ি ওর বাড়ি করে করে অন্তত বছর তিনেক সেখানে কাটাতে হবে। খাবেন-দাবেন, নারকোল গাছের তলাতে চাঁদের আলোয় গাওনা-বাজনা শুনবেন, ব্যস, আর কি চাই!"

'যখন শুনেছিলুম তখন যে যাবার লোভ হয় নি এ-কথা বলব না। ঝাড়া তিনটি বচ্ছর (এবং মালদ্বীপের ছেলেটি আশা দিয়েছিল যে সেখানে যাহা তিন তাহা তিরানব্বুই। কিচ্ছুটি করতে হবে না, এবং শুধু তিন বৎসর না, বাকি জীবনটাই কিছু করতে হবে না। এ-কথাটা ভাবলেই যেন চিত্তবনের উপর দিয়ে মর্মর গান তুলে মন্দমিঠে মলয় বাতাস বয়ে যায়। একজামিনের ভাবনা, কেষ্টার কাছে দু টাকার দেনা, সব কিছু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এক মুহূর্তেই মুক্তি। অহো!

'কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ
দিবা-রাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ—
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তা তা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ॥'

এ-সব আত্মচিন্তার সব কিছুই যে পল-পার্সিকে প্রকাশ করে বলেছিলুম তা নয়, তবে একটা কথা মনে আছে, ওরা যখন উৎসাহিত হয়ে মালদ্বীপে বাকি জীবনটা কাটাবে বলে আমাকে সে খবরটা দিলে তখন আমি বলেছিলুম,—

'বাকি জীবন কেন, তিনটি মাসও সেখানে কাটাতে পারবে না। তার কারণ যেখানে কোন কাজ করার নেই, সেখানে কাজ না করাটাই হয়ে দাঁড়ায় কাজের কাজ। এবং সে ভয়াবহ কাজ। কারণ, অন্য যে-কোন কাজই নাও না কেন, যেমন মনে করো এগজামিন্—তারও শেষ আছে, বি-এ, এম-এ, পি-এইচ্-ডি,—তার পর আর কোনো পরীক্ষা নেই। কিংবা মনে করো উঁচু

পাহাড়ে চড়া। পাঁচ হাজার, দশ হাজার, ত্রিশ হাজার ফুট, যাই হোক না কেন তারও একটা সীমা আছে। কিন্তু 'কাজ নেই'—এ হল একটা জিনিস যা নেই, কাজেই তার আরম্ভও নেই শেষও নেই। যে জিনিসের শেষ নেই সে জিনিস শেষ পর্যন্ত সইতে পারা যায় না।

'কিংবা অন্য দিক দিয়ে ব্যাপারটাকে দেখতে পারো।

'আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মনে করো একটা ঘর। ঘরে আসল জিনিস—দি ইমপর্টেণ্ট্ এলমণ্ট—হল তার ফাঁকাটা, আমরা তাতে আসবাবপত্র রাখি, খাই-দাই, সেখানে রৌদ্রবৃষ্টি থেকে শরীরটা বাঁচাই। ঘরের দেয়ালগুলো কিন্তু এসব কাজে লাগছে না। অর্থাৎ ইমপর্টেণ্ট্ হল ফাঁকাটা, নিরেট দেয়ালটা নয়। তাই বলে দেয়ালটা বাদ দিলে চলবে না। দেয়ালহীন ফাঁকা হল ময়দানের ফাঁকা, সেখানে আশ্রয় জোটে না।

'তাই গুরুদেব বলেছেন, মানুষের জীবনের অবসরটা হচ্ছে ঘরের ফাঁকটার মতো, সে-ই দেয় আমাদের প্রবেশের পথ কিন্তু কিছুটা কাজের দেয়াল দিয়ে সেই ফাঁকা অবসরটাকে যদি ঘিরে না রাখো তবে তার থেকে কোন সুবিধা ওঠাতে পারো না। কিন্তু কাজ করবে যতদূর সম্ভব কম। কারণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্চো, ঘরের মধ্যে ফাঁকাটা দেয়ালের তুলনায় পরিমাণে অনেক বেশী।'

তারপর আমি বললুম, 'কিন্তু ভ্রাতৃদ্বয়, আমার গুরুদেব এই তত্ত্বটি প্রকাশ করেছেন ভারি সুন্দর ভাষায় আর সুমিষ্ট ব্যঞ্জনায়, কিছুটা উস্টার সসের হাস্য-কৌতুক মিশিয়ে দিয়ে। আমি তার অনুকরণ করব কি করে?

'কিন্তু মূল সিদ্ধান্ত এই,—মালদ্বীপের একটানা কর্মহীনতার ফাঁকাটা অসহ্য হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তার চতুর্দিকে সামান্যতম কাজের দেয়াল নেই বলে।'

একটানা এতখানি কথা বলার দরুন ক্লান্ত হয়ে ডেক-চেয়ারে গা এলিয়ে দিলুম।

তখন লক্ষ্য করলুম, পল ঘন ঘন ঘাড় চুলকোচ্ছে। তার পর হঠাৎ ডান হাতটা মুঠো করে মাথায় ধাঁই করে গুত্তা মেরে বললে; 'পেয়েছি, পেয়েছি, এই বারে পেয়েছি।'

কি পেয়েছে সেইটে আমি শুধোবার পূর্বেই পার্সি বললে, 'ঐ হচ্ছে পলের ধরন। কোনো একটা কথা স্মরণে আনবার চেষ্টা করার সময় সে ঘন ঘন ঘাড় চুলকোয়। মনে এসে যাওয়া মাত্রই ঠাস করে মাথায় মারবে এক ঘুষি। ক্লাসেও ও তাই করে আমরা তাই নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে থাকি। এইবারে শুনুন, ও কি বলে।'

পল বললে, 'কোনো নতুন কথা নয়, স্যার! তবে আপনার গুরুর তুলনাতে মনে পড়ে গেল আমাদের গুরু 'কন্‌ফুৎস'র (আমার মনে বড় আনন্দ হল যে ইংরেজ ছেলেটি 'কন্‌-ফু-ৎস'কে 'আমাদের গুরু' বলে সম্মান জানাল—ভারতবর্ষের ইংরেজ ছেলে-বুড়ো বুদ্ধকে কখনো 'আমাদের গুরু' বলে নি) এ বিষয়ে অন্য এক তুলনা। যদি অনুমতি দেন—'

আমি বললুম, 'কী জ্বালা! তোমার এই চীনা লৌকিকতা—ভদ্রতা

আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললে। 'কন্‌-ফু-ৎস'র তত্ত্বচিন্তা শুনতে চায় না কোন্‌ মর্কট? জানো, ঋষি কন্‌-ফু-ৎস আমাদের মহাপুরুষ গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক? ঐ সময়েই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ইরানে জরথুস্ত্র, গ্রীসে সোক্রাতেস-প্লাতো-আরিস্ততেলেসে, প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের ভিতরে—তা থাক গে, তোমার কথা বলো।'

পল বললে, 'সরি, সরি। কন্‌-ফু-ৎস বলেছেন, 'একটি পেয়ালার আসল (ইমপর্টেণ্ট্‌) জিনিস কি? তার ফাঁকা জায়গাটা, না তার পর্সেলেনের ভাগটা? ফাঁকা জায়গাটাতেই আমরা রাখি জল, শরবত, চা। কিন্তু পর্সেলেন না থাকলে ফাঁকাটা আদপেই কোনো উপকার করতে পারে না। অতএব কাজের পর্সেলেন দিয়ে অকাজের ফাঁকাটা ঘিরে রাখতে হয়। এবং শুধু তাই নয়, পর্সেলেন যত পাতলা হয়, পেয়ালার কদর ততই বেশী। অর্থাৎ কাজ করবে যতদূর সম্ভব সামান্যতম।'

তার পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে কাও-টাও করে অর্থাৎ চীনা পদ্ধতিতে আমাকে হাঁটু আর মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে বললে,—

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'ফের তোমার চীনে সৌজন্য?'

বললে, 'সরি, সরি। কিন্তু স্যার ঐ মালদ্বীপের কথা ওঠাতে আর আপনি আপনার গুরুদেবের কথা বলতে আমার কাছে 'কন-ফু-ৎস'র তত্ত্বচিন্তা আজ সরল হয়ে গেল। ওঁর এ বাণী বহুবার শুনেছি, অনেকবার পড়েছি কিন্তু আজ এই প্রথম—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'চোপ্‌।'

॥ ৪ ॥

কোনো কোনো জাহাজে কি যেন এক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হাওয়াকে ঠাণ্ডা করে সেইটে জাহাজের সর্বত্র চালিয়ে দেওয়া হয়। মনে হয়, এই রৌদ্রদগ্ধ, জ্বরতপ্ত বিরাট জাহাজরূপী লৌহদানবকে তার মা যেন ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তার গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু পারেন কতখানি? বরঞ্চ রেলগাড়ি প্ল্যাটফর্মে প্ল্যাটফর্মে ছায়াতে দু-দশ মিনিট ঠাণ্ডা হবার সুযোগ পায়, কিংবা উপত্যকার ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় তার গায়ে এসে পাহাড়ের ছায়া পড়ে, ঘন শালবনের ভিতর দিয়েও গাড়ি কখনো কখনো বনানীর স্নিগ্ধচ্ছায়া লাভ করে, এবং সুড়ঙ্গ হলে তো কথাই নেই—সেখানকার ঠাণ্ডা তো রীতিমত বরফের বাক্সের ভিতরকারের মতো—কিন্তু জাহাজের কপালে এসব কিছুই নেই। একে তো দিগ্‌দিগন্তব্যাপী জ্বলছে রৌদ্রের বিরাট চিতা, তার উপর সূর্য তার প্রতাপ বাড়িয়ে দিচ্ছেন সমুদ্রের জলের উপর প্রতিফলিত হয়ে। কালো চশমা পরেও তখন সেদিকে তাকানো যায় না। রাত্রে অল্প অল্প ঠাণ্ডা হাওয়া বয় বটে, কিন্তু সে ঠাণ্ডাতে গা জুড়োবার পূর্বেই দেখা দেন পূর্বাকাশে সূর্য্যি-মাস্টার ফের তাঁর রোদের চাবুক হাতে নিয়ে। ভগবান তাঁকে দিয়েছেন লক্ষ লক্ষ কর,

এবং সেই লক্ষ লক্ষ হাতে তিনি নিয়েছেন লক্ষ লক্ষ পাকা কাঁঠির সোনালি রঙের চাবুক। দেখা মাত্রই গায়ের সব কটা লোম কাঁটা দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের জাহাজে ঠাণ্ডা বাতাস চালানোর ব্যবস্থা ছিল না—অর্থাৎ সেটা অ্যার-কণ্ডিশনড্ নয়। কাজেই কি দিনের বেলা কি রাত্রে কখনো ভালো করে ঘুমোবার সুযোগ বঙ্গোপসাগর, আরব সমুদ্র কিংবা লাল দরিয়ায় মানুষ পায় না।

দুপুর রাত থেকে হয়তো ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে আরম্ভ করল। ডেকে বসে তুমি গা জুড়োলে। কিন্তু তখন যে কেবিনে ঢুকে বিছানা নেবে তার উপায় নেই। সেখানে ওই ঠাণ্ডা হাওয়া যেতে পারে না বলে অসহ্য গুমোট গরম। গড়ের মাঠে ঠাণ্ডা হয়ে ফিরে এসে গলিবাড়িতে ঘুমোবার চেষ্টা করার সঙ্গে এর খানিকটে তুলনা হয়।

ডেকে যে আরাম করে ঘুমোবে তারও উপায় নেই। ঘুমোলে হয়তো রাত দুটোর সময়। চারটে বাজতে না বাজতেই খালাসীরা ডেকে বালতি বালতি জল ঢেলে সেখানে যে বন্যা জাগিয়ে তোলে তার মাঝখানে মাছও ঘুমোতে পারে না। তখন যাবে কোথায়? কেবিনে ঢুকলে মনে হবে যেন রুটি বানানোর তন্দুরে—আভুনে—তোমাকে রোস্ট করা হবে।

এই অবস্থা চলবে ভূমধ্যসাগর না পেঁছিনো পর্যন্ত।

তবে সান্ত্বনা এইটুকু যে, তোমাদের বয়েসী ছেলেমেয়েরা ঠাণ্ডা-গরম সম্বন্ধে আমাদের মত এতখানি সচেতন নয়। পল পার্সি তাই যখন কেবিনের ভিতর নাক ফরফরাত আমি তখন ডেকে বসে আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে থাকতুম। তখন বই পড়তে কিংবা দেশের আত্মীয়স্বজনকে চিঠি লিখতে পর্যন্ত ইচ্ছে করে না।

মাঝে মাঝে ডেক-চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়তুম।

একদিন কেন জানি নে হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই সামনে দেখি এক অপরূপ মূর্তি!

ভদ্রলোক কোট-পাতলুন-টাই পরেছেন ঠিকই কিন্তু সে পাতলুন ঢিলে পাজামার চেয়েও বোধ করি চৌড়া, কোট নেবে এসেছে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত আর মান-মুনিয়া দাড়ির তলায় টাইটা আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে মাত্র। ওঁর বেশ-ভূষায়—ভুল করলুম, 'ভূষা'-জাতীয় কোনো বালাই ওঁর বেশে ছিল না—অনেক কিছুই দেখবার মতো ছিল কিন্তু প্রথম দর্শনেই আমি সব কটা লক্ষ্য করি নি, পরে ক্রমে ক্রমে লক্ষ্য করে অনেক কিছুই শিখেছিলুম। উপস্থিত লক্ষ্য করলুম, তাঁর কোটে ব্রেসট্ পকেট বাদ দিয়েও আরো দু সারি ফালতো পকেট। তাই বোধ হয়, কোটটা দৈর্ঘ্যে হাঁটু পর্যন্ত নেমে এসেছে।

এঁকে তো এতদিন জাহাজে দেখি নি! ইনি ছিলেন কোথায়? তবে কি ইনি কলম্বতে উঠেছেন? তা হলেও এ দুদিন ইনি ছিলেন কোথায়?

ভদ্রলোক সোজাসুজি বললেন, 'গুড নাইট।'

বিলিতি কায়দা-কেতা যদিও আমি ভালো করে জানি নে তবু অন্তত এইটুকু

জানি যে 'গুড নাইট' ওদেশে বিদায় নেবার অভিবাদন—আমরা যে রকম যে কোনো সময় বিদায় নিতে হলে বলি, 'তবে আসি।' দেখা হওয়া মাত্রই কেউ যদি বলে, 'তবে এখন আসি' তবে বুঝব লোকটা বাঙালী নয়। তাই তাঁর 'গুড নাইট' থেকে অনুমান করলুম, ইনি যদিও বিলিতি বেশ ধারণ করেছেন তবু আসলে ভারতীয়।

আমি বললুম, 'বেঠিয়ে।'

আমার বাঁদিকে প্যার্সির শূন্য ডেক-চেয়ার। তিনি তার-ই উপরে বসে পড়ে আমাকে বললেন, 'আমার নাম আবুল্ আস্‌ফিয়া, নূর উদ্দীন, মুহম্মদ আব্দুল করীম সিদ্দীকী।'

আমার অজানাতেই আমি বলে ফেলেছিলুম 'বাপ্‌স্'। কেন, সে কথা কি আর খুলে বলতে হবে? তবু বলি।

আমি মুসলমান। আমার নাম সৈয়দ মুজতবা আলী, আমার পিতার নাম সৈয়দ সিকন্দর আলী। আমার ঠাকুরদাদার নাম সৈয়দ মুশরুরফ্ আলী। ভারতীয় মুসলমানের নাম সচরাচর তিন শব্দেই শেষ হয়। তাই এঁর আড়াই-গজী নামে যে আমি হক্‌চকিয়ে যাব তাতে আর বিচিত্র কি?

বিবেচনা করি, তিনিও বিলক্ষণ জানতেন। কারণ চেয়ারে বসেই, তিনি তাঁর অন্যতম পকেট থেকে বের করলেন একটি সুন্দর সোনার কেস্। তার থেকে একটি ভিজিটিং কার্ড বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'নামটা একটু লম্বা। তাই এইটে নিন।'

আমি তো আরো অবাক। ভিজিটিং কার্ডের কেস্ হয় তা আমি জানি। কারণ ভিজিটিং কার্ড সুন্দর সুচিক্কণ। যাঁদের তা থাকে তাঁদের কেউ কেউ সেটা কেসে রাখেন। যেমন মনে করো, ইনশুওরেন্সের দালাল, খবরের কাগজের সংবাদদাতা কিংবা ভোটের ক্যানভাসার। কিন্তু ওঁদেরও তো কেস্ দেখেছি জর্মন সিলভারের তৈরী। ভিজিটিং কার্ডের সোনার কেস্ পূর্বে আমি কখনো দেখি নি।

সেই বিস্ময় সামলাতে না সামলাতেই তিনি আরেক পকেটে হাত চালিয়ে ডুবুরির মতো গভীর তল থেকে বের করলেন এক সোনার সিগারেট কেস্। ও রকম কেস্ আমি শুধু স্বপ্নে আর সিনেমায় ফিল্ম-স্টারদের হাতে দেখেছি, বাস্তবে এই প্রথম সাক্ষাৎ। ডেকের অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ আলোতেও সেটা যা ঝলমল করে উঠল তার সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায় শুধু স্যাকরা-বাড়ি থেকে সদ্য-আসা গয়নার সঙ্গে। কেসের এক কোণে আবার কি যেন এক নীল রঙের পাথর দিয়ে আলপনা এঁকে ইংরিজি অক্ষরে ভদ্রলোকের সেই লম্বা নামের গুটি দু-তিন আদ্যক্ষর। কেস্‌টি আবার সাইজেও বিরাট। নিদেনপক্ষে ত্রিশটি সিগারেট ধরবে। আমার সামনে কেসটি খুলে ধরে আরেক পকেট থেকে বের করলেন একটি লাইটার। তার উপরে জয়পুরী মিনার কাজ। হঠাৎ দেখলে মনে হয় জমিদারবাড়ির বড় গিন্নিমার কবচ কিংবা মাদুলি।

আমার মনের ভিতর দিয়ে হুড়-হুড় করে এক পল্টন সেপাইয়ের মতো

পঞ্চাশ সার প্রশ্ন চলে গেল।

তার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, এ রকম লজঝড় কোট-পাতলুনের ভিতর অত সব সুন্দর সুন্দর দামী দামী জিনিস লোকটা রেখেছে কেন ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন, এমন সব দামী মাল যার পকেটে আছে, সে ফার্স্ট ক্লাসে না গিয়ে, আমার মতো গরিবের সঙ্গে টুরিস্ট্ ক্লাসে যাচ্ছে কেন ?

তৃতীয় প্রশ্ন—তা সে যাক গে। কারণ সব কটা প্রশ্নের পুরো ফর্দ এখানে দিতে গেলে আমার বাকি দিনটা কেটে যাবে। আর তোমাদেরও বুদ্ধিসুদ্ধি আছে, ভদ্রলোকের বর্ণনা শুনে তোমাদের মনেও সেই সব প্রশ্ন জাগবে যেগুলো আমার মনে জেগেছিল। তবে আর সেগুলো সবিস্তার বলি কেন ?

কিন্তু প্রশ্নগুলোর উত্তর পাই কি প্রকারে ?

তিনি বয়সে আমার চেয়ে ঢের বড়। তিনি যদি আলাপচারি আরম্ভ না করেন তবে আমি তাঁকে প্রশ্ন শুধাই কি করে ? মুরুব্বীদের আদেশ, ছেলেবেলা থেকেই শুনেছি, বড়রা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন—ছোটরা উত্তর দেবে। সে আদেশ লঙ্ঘন করব কি করে ? বিশেষ করে বিদেশে, যেখানকার কায়দা-কেতা জানি নে। সেখানে দেশের গুরুজনদের আদেশ স্মরণ করা ভিন্ন অন্য পুঁজি আছে কি ?

আধ ঘণ্টাটাক কেটে গিয়েছে। ইতিমধ্যে আমি তাঁর দু-দুটো সিগারেট পুড়িয়েছি। ফের যখন তৃতীয়টা বাড়িয়ে দিলেন তখন আমাকে বেশ দৃঢ় ভাবে 'না' বলতে হল। সঙ্গে সঙ্গে সাহস সঞ্চয় করে শুধালুম, 'আপনি যাচ্ছেন কোথায় ?'

যেন প্রশ্ন শুনতে পান নি। আমিও চাপ দিলুম না।

আমি খানিকক্ষণ পরে বললুম, 'মাফ করবেন, আমি শুতে চললুম, গুড নাইট।' বললেন, 'গুড নাইট।'

কী জানি, লোকটা কেন কথা বলে না। বোধ হয় জিভে বাত হয়েছে। কিংবা হয়তো ওর দেশে কথা বলাতেও রেশনের আইন চলে। যাক গে, কি হবে ভেবে।

পরদিন সকালবেলা পল-পার্সিকে নিয়ে আমি যখন সংসারের যাবতীয় কঠিন কঠিন প্রশ্ন এবং সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত, এমন সময় সেই ভদ্রলোক এসে আবার উপস্থিত। আমিও ওদের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিতেই তিনি তাঁর আরেকটা পকেটে হাত চালিয়ে বের করলেন একরাশ সুইস চকলেট, ইংরিজী টফি এবং মার্কিন চুইংগাম্। পল-পার্সি গুটি কয়েক হাতে তুলে নিয়ে যতই বলে, 'আর না, আর না', তিনি কিন্তু বাড়ানো হাত গুটোন না। ওদিকে মুখে কোনো কথা নেই। শেষটায় বিষণ্ণ বদনে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন।

আমরা খানিকটে ইতি-উতি করে পুনরায় নিজেদের গল্পে ফিরে গেলুম। তখন দেখি, ভাষণে অরুচি হলেও তিনি শ্রবণে কিছুমাত্র পশ্চাদ্‌পদ নন। আমাদের গল্পের মাঝে মাঝে তাগমাফিক 'হুঁ', 'হাঁ', দিব্যি বলে যেতে লাগলেন। তারপর আমাদের তিনজনকে কিছুতেই 'লাইম স্কোয়াশ' খাওয়াতে না পেরে আস্তে আস্তে উঠে চলে গেলেন।

উঠে যাওয়া মাত্রই আমি পলকে শুধালুম, 'এ কি রকম চিড়িয়া হে ?'

পল বললে, 'কলম্বতে উঠেছেন। পকেট-ভর্তি দুনিয়ার সব টুকিটাকি, মিষ্টি-মিঠাই। যার সঙ্গে দেখা তাকেই কিছু-না-কিছু একটা অফার করেন। কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁকে কথা বলতে শুনি নি।'

আমি বললুম, 'জিজ্ঞেস করে দেখতে হবে তো।'

পল বললে, 'উত্তর কি পাবেন ?'

বললুম, 'ঠিক বলেছ, কাল রাত্রে তো পাই নি।'

এঁর সম্বন্ধে যে এত কথা বললুম, তার কারণ এঁর সঙ্গে পরে আমাদের খুব বন্ধুত্ব জমে গিয়েছিল ; সে কথা সময় এলে হবে।

॥ ৫ ॥

পল বিজ্ঞ কণ্ঠে বললে, 'কলম্বো থেকে আদন বন্দর ২০৮২ মাইল রাস্তা। জাহাজে ছদিন লাগে। মাঝখানে দ্বীপ-টীপ নেই, অন্তত আমার ম্যাপে নেই। তবে আদনের ঠিক আগেই সোকোত্রা দ্বীপ। সেটা হয়তো দেখতে পাব।'

আমি বললুম, 'যদি রাত্রিবেলা ঐ জায়গা দিয়ে যাই তবে দেখবে কি করে ? আর দিনের বেলা হলেও অতখানি পাশ দিয়ে বোধ হয় জাহাজ যাবে না। তার কারণ, বড় বড় দ্বীপের আশপাশে বিস্তর ছোট ছোট দ্বীপও জলের তলায় মাথা ডুবিয়ে শুয়ে থাকে। এর কোনোটার সঙ্গে জাহাজ যদি ধাক্কা খায় তবে আর আমরা সামনের দিকে এগব না—এগিয়ে যাব তলার দিকে।'

এদিকে কথা বলে যাচ্ছি, ওদিকে আমার বার বার মনে হতে লাগল, সোকোত্রা নামটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। হঠাৎ আমার মাথার ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমার বাবার মাসী, মেসোমশাই তাঁদের দুই ছেলেকে নিয়ে গত শতকের শেষের দিকে মক্কায় হজ করতে গিয়েছিলেন এবং আমার খুব ছেলেবেলায় তাঁর কাছ থেকে সে ভ্রমণের অনেক গল্প আমি শুনেছিলুম। আমার এই দাদীটি ছিলেন গল্প বলায় ভারি ওস্তাদ। রাত্রির রান্না না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমাদের গল্প বলে বলে দিব্য জাগিয়ে রাখতে পারতেন এবং যেই চাচীরা খবর দিতেন, রান্না তৈরী, অমনি তিনি বেশ কায়দা করে গল্পটা শেষ করে দিতে পারতেন। আমরা টেরই পেতুম না, আমাদের সামনে তিনি একটা ন্যাজকাটা হনুমান রেখে চলে গেলেন। আমাদের মনে হত গল্পটা যেন একটা আস্ত ডানাকাটা পরী।

সেই দাদীর মুখে শুনেছিলুম, সোকোত্রার কাছে এসে নাকি যাত্রীদের মুখ শুকিয়ে যেত। জলের স্রোতের তোড়ে আর পাগলা হাওয়ার থাবড়ায় জাহাজ নাকি হুড়মুড়িয়ে গিয়ে পড়ত কোনো একটা ডুবন্ত দ্বীপের ঘাড়ে আর হয়ে যেত হাজারো টুকরোয় খানখান। কেউ বা জাহাজের তক্তা, কেউ বা ডুবন্ত দ্বীপের শ্যাওলা-মাখানো পাথর আঁকড়ে ধরে প্রাণপণ চিৎকার করত 'বাঁচাও, বাঁচাও',

কিন্তু কে বাঁচায় কাকে, কোথায় আলো, কোথায় তীর! ক্রমে ক্রমে তাদের হাতের মুঠি শিথিল হয়ে আসত, একে একে জলের তলে লীন হয়ে যেত।

দাদী যে ভাবে বর্ণনা দিয়ে যেতেন, তাতে আমি সব কিছু ভুলে দুশ্চিন্তায় আকুল হয়ে উঠতুম, দাদী বাঁচলেন না, দাদীও ডুবে গেলেন! মনেই হত না, জলজ্যান্ত দাদী আমাকে কোলে বসিয়ে গল্প বলছেন। শেষটায় বলতেন, 'আমাদের জাহাজের কিছু হয় নি, এ সব ঘটেছিল অন্য জাহাজে। সে জাহাজে করে গিয়েছিলেন তোর বন্ধু ময়না মিয়ার ঠাকুর্দা। জানিস তো, তিনি আর ফেরেন নি। খুদাতালা তাঁকে বেহেশ্‌তে নিয়ে গিয়েছেন। মক্কার হজের পথে কেউ যদি মারা যায় তবে তার আর পাপ-পুণ্যের বিচার হয় না, সে সোজা স্বর্গে চলে যায়।

দাদী এ রকম গল্প বলে যেতেন অনেকক্ষণ ধরে আর একই গল্প বলতে পারতেন বহুবার। প্রতিবারেই মনে হত চেনা গল্প অচেনা রূপে দেখছি। কিংবা বলতে পারো, দাদী-বাড়ির রাঙা বৌদিকে যেন কখনো দেখছি রাস-মণ্ডল শাড়িতে, কখনো বুলবুল চশ্‌মে। (হায়, এ সব সুন্দর সুন্দর শাড়ি আজ গেল কোথায়!)

দাদীর গল্পের কথা আজ যখন ভাবি তখন মনে হয় দাদী তাঁর বর্ণনাতে আরব্য উপন্যাসের সাহায্য বেশ কিছু নিতেন। আরব্য উপন্যাসের রকম-বেরকমের গল্পের মধ্যে সমুদ্রযাত্রা, জাহাজডুবি, অচেনা দেশ, অজানা দ্বীপ সম্বন্ধে গল্প বিস্তর। সিন্দবাদ নাবিকের গল্প পড়ে মনে হয়, জলের পীর বদর সাহেব যেন আইন বানিয়ে দিয়েছিলেন, যে জাহাজ ডুববে সেটাতেই যেন সিন্দবাদ থাকে।

আরব্য উপন্যাসে যে এত সমুদ্র-যাত্রার গল্প, তার প্রধান কারণ, আরবরা এক কালে সমুদ্রের রাজা ছিল আজ যে রকম মার্কিন-ইংরেজের জাহাজ পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে দেখা যায়। তার কারণ বুঝতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না। আরব দেশের সাড়ে তিন দিকে সমুদ্র, তাই আরবরা সমুদ্রকে ডরায় না, আমরা যে রকম পদ্মা-মেঘনাকে ডরাই নে, যদিও পশ্চিমারা গোয়ালন্দের পদ্মা দেখে হনুমানজীর নাম স্মরণ করতে থাকে—বোধ হয় লম্ফ দিয়ে পেরবার জন্য। আরবদের পূর্বে ছিল রোমানরা বাদশা—আরবরা তাদের যুদ্ধে হারিয়ে ক্রমে ক্রমে তাদেরই মতো অবাধে অনায়াসে সমুদ্র যাতায়াত আরম্ভ করল। ম্যাপে দেখতে পাবে, মক্কা সমুদ্র থেকে বেশী দূরে নয়। আরবরা তখন লাল দরিয়া পেরিয়ে মৌসুমী হাওয়ায় ভর করে ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসা জুড়ল।

এ সব কথা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ আবার সোকোত্রার কথা মনে পড়ে গেল। দাদীমার সোকোত্রা স্মরণ করিয়ে দিল গ্রীকদের দেওয়া সোকোত্রার নাম 'দিয়োস্‌করিদেস্‌', সঙ্গে সঙ্গে হুশ-হুশ করে মনে পড়ে গেল যে পণ্ডিতেরা বলেন, এই 'দিয়োস্‌করিদেস্‌' নাম এসেছে সংস্কৃত 'দ্বীপ-সুখাধার' থেকে। আরবরা যখন এই দ্বীপে প্রথম নামল তখন ভারতীয় বোম্বেটেদের সঙ্গে এদের

লাগল ঝগড়া। সে ঝগড়া কত দিন ধরে চলছিল বলা শক্ত, কারণ আমাদের সমাজপতিরা তখন সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে কড়া কড়া আইন জারি করতে আরম্ভ করেছেন। আমার মনে হয়, এদেশ থেকে কোনো সাহায্য না পাওয়াতে এরা ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়ে যায়, কিংবা ঐ দেশের লোকের সঙ্গে মিলে মিশে গিয়ে এক হয়ে যায়—যে রকম শ্যাম, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে বহু শতাব্দীর আদান-প্রদানের পর এক দিন আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। খুব সম্ভব ঐ সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করারই ফলে। ভারতীয়েরা কিন্তু সোকোত্রায় তাদের একটি চিহ্ন রেখে গিয়েছে ; সোকোত্রার গাই-গোরু জাতে সিন্ধু দেশের। আশ্চর্য, সভ্যতার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কিন্তু তার পোষা গোরু-ঘোড়া শতাব্দীর পর শতাব্দী বেঁচে থেকে তার প্রভুর কথা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মোগল-পাঠানের রাজত্ব ভারতবর্ষ থেকে কবে লোপ পেয়ে গিয়েছে কিন্তু তাদের আনা গোলাপ ফুল আমাদের বাগানে আরো কত শত বৎসর রাজত্ব করবে কে জানে!

আমি চোখ বন্ধ করে আত্মচিন্তায় মগ্ন হলেই পল-পার্সি আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে অন্য কিছু একটায় লেগে যেত। আমি তাদের সন্ধানে বেরিয়ে দেখি, তারা লাউঞ্জে বসে চিঠি লিখছে। আমাকে দেখে পার্সি শুধালে, 'জাহাজে যে ফরাসী ডাক-টিকিট পাওয়া যায় তাই দিয়ে এ চিঠি চীন দেশে যাবে তো?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়। এমন কি জিবুটি বন্দরের ডাকঘরেও যদি ছাড় তবু যাবে। কারণ জিবুটি বন্দর ফরাসীদের। কিন্তু যদি পোর্টসঈদ বন্দরে ছাড় তবে টিকিট মিশর দেশে বাতিল বলে চিঠিখানা যাবে বেয়ারিং পোস্টে।'

'কিন্তু যদি পোর্টসঈদে পেঁছে জাহাজের লেটার-বকসে ছাড়ি?'

'তা হলে ঠিক।'

তারপর বললুম, 'হুঁ। তবে বন্দরে নেমে মিশরী ডাক-টিকিট লাগানোই ভালো।'

'কেন, স্যার?'

আমি বললুম, 'বৎস, আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে, চীন দেশে তোমার একটি ছোট বোন রয়েছে। সে নিশ্চয়ই ডাক-টিকিট জমায়। তুমি যদি বন্দরে বন্দরে ফরাসী টিকিট সাঁটো তাতে তার কি লাভ? মিশরী টিকিট পেলে কি সে খুশী হবে না? তাও আবার দাদার চিঠিতে!'

পার্সি আবার ভ্যাচর-ভ্যাচর আরম্ভ করলে—চুলকাটা সমস্যার সমাধান যখন আমি করে দিয়েছিলুম ঠিক সেই রকম—আমার সঙ্গে দেখা না হলে—

আমি বললুম, 'ব্যস, ব্যস। আর শোনো স্ট্যাম্প লাগাবার সময়, এক পয়সা, দু পয়সা, এক আনা, ছ পয়সা করে চোদ্দ পয়সার টিকিট লাগাবে— দুম করে সুদ্ধ একটা চোদ্দ পয়সার টিকিট লাগিয়ো না। বোন তাহলে এক ধাক্কাতেই অনেকগুলো টিকিট পেয়ে যাবে।'

ততক্ষণে পল এসে আমার সঙ্গ নিয়েছে। আস্তে আস্তে শুধাল, 'সোকোত্রা দ্বীপের কথা ওঠাতে আপনি কি ভাবছিলেন?'

আমি বললুম, 'অনেক কিছু।' এবং তার খানিকটে তাকে শুনিয়ে দিলুম।

পল দেখেছি পার্সির মতো সমস্তক্ষণ এটা-ওটা নিয়ে মেতে থাকে না। মাঝে মাঝে জাহাজের এক কোণে বসে বই-টই পড়ে। তাই খানিকক্ষণ চুপ করে আমার কথাগুলো হজম করে নিয়ে বলল, 'বিষয়টা সত্যি ভারি ইনটেরেস্টিঙ্। সমুদ্রে সব প্রথম কে আধিপত্য করলে, তার পর কে, তারাই বা সেটা হারাল কেন, আজ যে মার্কিন আর ইংরেজ আধিপত্য করছে সেটাই বা আর কত দিন থাকবে? এবং তার পর আধিপত্য পাবে কে?'

আমি একটু ভেবে বললুম, 'বোধ হয় আফ্রিকার নিগ্রোরা। ফিনিশিয়ান, গ্রীক, রোমান, ভারতীয়, চীনা, আরব, পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ ইত্যাদি যাবতীয় জাতই তো পালা করে রাজত্ব করলে—একমাত্র ওরাই বাদ গেছে। এখন বোধ হয় ওদের পালা। আর ম্যাপে দেখছ তো, কী বিরাট মহাদেশ, ওতে কোটি কোটি লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান স্ত্রী-পুরুষ গম্‌গম্ করছে।'

পল বললে, 'কিন্তু ওদের বুদ্ধিসুদ্ধি?'

আমি বললুম, 'সে তো দুই পুরুষের কথা। লেগে গেলে একশ বছরের ভিতর একটা জাত অন্য সব কটা জাতকে হারিয়ে দিতে পারে। বরঞ্চ পুরনো সভ্য জাত যারা আধ-মরা হয়ে গিয়েছে, তাদের নূতন করে বলিষ্ঠ প্রাণবন্ত করে রাজার আসনে বসানো কঠিন। একবার ছাঁচে ঢালাই করে যে মাল তৈরী করা হয়েছে তাকে-ফের পিটে-ঠুকে নূতন আকার দেওয়া কঠিন—সেই তো হচ্ছে আজকের দিনের চীনা, ভারতীয় এবং আরো মেলা প্রাচীন জাতের নূতন সমস্যা।'

পল জিজ্ঞেস করলে, 'ভারতীয়েরাও এককালে সমুদ্রে রাজত্ব করেছে নাকি?'

আমি বললুম, সে-কথা আজ প্রায় সবাই ভুলে গিয়েছে। কিন্তু সেজন্য তাদের দোষ দেওয়া অনুচিত। কারণ, ভারতীয়েরা নিজেই সে ইতিহাসের সন্ধান রাখে না। অথচ আমার যতদূর জানা, তাতে তারা লাল দরিয়া থেকে চীনা সমুদ্র পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে শ্যাম, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়াতে রাজত্বও করেছে। তার পর একদিন আমাদের সমাজপতিরা সমুদ্রযাত্রা বারণ করে দিলেন। খুব সম্ভব আমাদের সাম্রাজ্য বিস্তার তাঁরা পছন্দ করেন নি। তাই হয়তো তাঁরা বলতে চেয়েছিলেন, যে-দেশ জয় করেছ তারই আর পাঁচ জনের সঙ্গে মিলে-মিশে এক হয়ে যাও, আপন দেশে ফিরে আসার কোনো প্রয়োজন নেই।'

পল বললে, 'আমার জীবনের এই ষোল বৎসর কাটল চীনে কিন্তু ভারতের সঙ্গে চীনের কখনো কোনো যোগ হয়েছিল বলে শুনি নি। শুধু শুনেছি বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে এসেছিল। কিন্তু সে তো কটমটে ব্যাপার!'

আমি বললুম, 'অতিশয়। ও পাড়া মাড়িয়ো না। কিন্তু চীন-ভারতের মধ্যে একবার একটি ভারি চমৎকার মজাদার দোস্তি হয়েছিল। শুনবে?'

পল বললে, 'তা আর বলতে! কিন্তু পার্সিটা গেল কোথায়? কুকুর-ছানার মতো ও যেন সমস্তক্ষণ নিজের ল্যাজ খুঁজে বেড়ায়। ওরে ও পার্সি!'

জিরাফ-কাহিনী

দিল্লীতে যখন পাঠান-মোগল রাজত্ব করত তখন সামান্যতম সুযোগ পেলেই বাঙলা দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার চেষ্টা করত। বাঙলার প্রধান সুবিধে এই যে, সেখানে নদী-নালা বিল-হাওর বিস্তর এবং পাঠান-মোগলের আপন পিতৃভূমি কিংবা দিল্লীতে ও-সব জিনিস নেই বলেই তারা যখনই বিদ্রোহ দমন করতে এসে বাঙলার জল দেখত তখনই তাদের মুখে জল যেত শুকিয়ে। দেশটা পিছলে, অভ্যাস না থাকলে দাঁড়ানো কঠিন।

এই রকম একটা সুযোগ পেয়ে বাঙলার এক শাসন-কর্তা স্বাধীন হয়ে রাজা হয়ে যান। রাজাটি একটু খামখেয়ালি ছিলেন। তা না হলে কোথায় ইরান আর কোথায় বাঙলা দেশ! তিনি সেখানে দূত পাঠালেন বিস্তর দামী দামী সওগাত সঙ্গে দিয়ে ইরানের সব চেয়ে সেরা কবি হাফিজকে বাঙলা দেশে নিমন্ত্রণ করার জন্য। চিঠিতে লিখলেন, 'হে কবি, তোমার সুমধুর তথা উদাত্ত কণ্ঠে তামাম ইরান দেশ ভরে গিয়েছে। ইরান ক্ষুদ্র দেশ, তোমার কণ্ঠস্ফূর্তির জন্য সেখানে আর স্থান নেই। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ বিরাট দেশ, এখানে এস, তোমার কণ্ঠস্বর এখানে প্রচুর জায়গা পাবে।' তার সরল অর্থ, ইরানে আর কটা লোক তোমার সত্যকার কদর করতে পারবে? এ-দেশের লোকসংখ্যা প্রচুর। এইখানে চলে এস।

হাফিজের তখন বয়স হয়েছে। তাঁর বুড়ো হাড়-কখানা তখন আর দীর্ঘ ভ্রমণ আর দীর্ঘতর প্রবাসের জন্য দেশ ছাড়তে নারাজ। তাই কবি একটি সুন্দর কবিতা লিখে না আসতে পারার জন্য বিস্তর দুঃখ প্রকাশ করলেন।

বাঙলা দেশের সরকারী দলিল-দস্তাবেজে এ ঘটনার কোনো উল্লেখ নাই। এর ইতিহাস পাওয়া গিয়েছে ইরানের খাতাপত্র থেকে[১]।

তার পরের রাজার দৃষ্টি গেল সেই সুদূর চীন দেশের দিকে। কিন্তু চীন সম্রাটকে তো আর বাঙলা দেশে নিমন্ত্রণ করা যায় না? কাজেই রাজদূতকে বহু উত্তম উপঢৌকন দিয়ে চীনের সম্রাটকে বাঙলার রাজার আনন্দ-অভিবাদন জানালেন।

চীন-সম্রাট সুদূর বাঙলা দেশের রাজার সৌজন্য-ভদ্রতার পরিচয় পেয়ে পরম আপ্যায়িত হলেন। চীন বিত্তশালী দেশ। প্রতিদানে পাঠালেন আরো বেশী মূল্যবান উপঢৌকন। সে রাজা কিন্তু ততদিনে রাজার রাজার দেশে চলে গিয়েছেন।

নূতন রাজা তখন ভাবলেন, চীনের সম্রাটকে আমি কি দিতে পারি যা তাঁর নেই! রাজদূতকে মনের কথা খুলে তাঁর উপদেশ চাইলেন। রাজদূতটি

১। এককালে বাঙলা দেশে প্রচুর হাফিজ পড়া হত। এখনও কেউ কেউ 'নেত্র নাই বাঞ্ছা হেরি বিধুর বদন, কর্ণ নাই, চাই শুনি ভ্রমর গুঞ্জন' 'সম্ভাব শতক'-এর বাঙলা অনুবাদ পড়েন। হাফিজের সব চেয়ে উত্তম বাঙলা অনুবাদ করেছেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

ছিলেন অতিশয় বিচক্ষণ লোক। তিনি যখন চীনে ছিলেন তখন চীন দেশের আচার-ব্যবহার বিশ্বাস-অবিশ্বাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করেছিলেন। বললেন, 'চীনের বহু লোকের বিশ্বাস, গাছের চেয়ে উঁচু মাথাওলা যে এক পয়মন্ত প্রাণী আছে সে যদি কখনো চীন দেশে আসে তবে সে দেশের শস্য তার-ই মাথার মতো উঁচু হবে।

রাজা শুধালে, 'কি সে প্রাণী?'

রাজদূত বললেন, 'জিরাফ। আফ্রিকাতে পাওয়া যায়।'

রাজা বললেন, 'আনাও আফ্রিকা থেকে।'

যেন চাট্টিখানি কথা! কোথায় বাঙলা দেশ, আর কোথায় আফ্রিকা! আজ যে এই বিরাট বিরাট কলের জাহাজ দুনিয়ার সর্বত্র আনাগোনা করে, তার-ই একটাতে জিরাফ পোরা কি সহজ! তখনকার দিনের পালের জাহাজে আফ্রিকা থেকে বাঙলা দেশ, সেখান থেকে আবার চীন—ক'মাস, কিংবা ক-বছর লাগবে কে জানে? ততদিন তার জন্য ঐ অকূল দরিয়ায় ঘাস-পাতা পাবে কোথায়—দেখতি পাচ্ছি এই কলের জাহাজেই আমাদের শাক-সবজী স্যালাড্ খেতে দেয় অল্প—তার অন্যান্য তদারকি কি সহজ?

তখনকার দিনে আরব কারবারীরা আফ্রিকা, সোকোত্রা, সিংহল হয়ে বাঙলা দেশে ব্যবসা করতে যেত। রাজা হুকুম দিলেন, 'জিরাফ নিয়ে এস।'

জিরাফ এল। কি খেয়ে এল, কত দিনে এল, কিছুই বলতে পারব না। রাজা জিরাফ দেখে ভারি খুশী। হুকুম দিলেন, 'চীন সম্রাটকে ভেট দিয়ে এস।'

সেই চীন! জাহাজে করে! কত দিন লাগল কে জানে!

চীন-সম্রাট সংবাদ পেয়ে যে কতখানি খুশী হয়েছিলেন তার খানিকটে কল্পনা করা যায়। তিনি হুকুম দিলেন, প্রাণীটার জন্য খুব উঁচু করে আস্তাবল বানাও।

বলা তো যায় না, তার মুণ্ডুটা মেঘে ঠেকবে, না চাঁদে ঠোক্কর লাগাবে!

দীর্ঘ ভ্রমণের পর জিরাফ যখন জিরিয়ে-জুরিয়ে তৈরী তখন শুভদিন শুভক্ষণ দেখে,চীন-সম্রাট পাত্র-অমাত্য-সভাসদসহ শোভাযাত্রা করে জিরাফদর্শনে বেরলেন। সঙ্গে নিলেন, বিশেষ করে, রাজচিত্রকর এবং সভাকবি।

সম্রাট জিরাফ দেখে গভীর আনন্দ লাভ করলেন। সভাসদ ধন্য ধন্য করলেন। আপামর জনসাধারণ গভীরতর সন্তোষ লাভ করল,—তাদের গুরুজন বলেছিলেন যে এ রকম অদ্ভুত প্রাণী পৃথিবীতে আছে, এবং সে একদিন চীন দেশে আসবে, সেটা কিছু অন্যায় বলেন নি। যারা সন্দেহ করত তাদের মুণ্ডু-গুলো এখন টেনে টেনে ঐ জিরাফের মুণ্ডুটার মতো উঁচু করে দেওয়া উচিত।

সম্রাট চিত্রকরকে আদেশ দিলেন, 'এই শুভদিবস চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য তুমি এই জিরাফের একটি উত্তম চিত্র অঙ্কন করো!'

ছবি আঁকা হল।

সম্রাট কবিকে আদেশ করলেন, 'তুমি এই শুভ অনুষ্ঠানের বর্ণনা ছন্দে বেঁধে ছবিতে লিখে রাখো।'

তাই করা হল।

গল্প শেষ করে বললুম, 'সে ছবির প্রিন্ট আমি কাগজে দেখেছি।'

পল শুধালে, 'স্যর, আপনি কি চীনা ভাষা পড়তে পারেন?'

আমি বললুম, 'আদপেই না। আমার এক বন্ধু চীনা শিখেছে সে-ভাষাতে বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ার জন্য। জানো তো, আমাদের বহু শাস্ত্র এ দেশে বৌদ্ধধর্ম লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু চীনা অনুবাদে এখনো বেঁচে আছে। আমার বন্ধু বৌদ্ধ শাস্ত্র খুঁজতে খুঁজতে এই অদ্ভুত কাহিনীর সাক্ষাৎ পায়। তারই বাঙলা অনুবাদ করে, ছবিসুদ্ধ সেটা বাঙলা কাগজে ছাপায়। তা না হলে বাঙলা দেশের লোক কখনো এ কাহিনী জানতে পারত না, কারণ বাঙলা দেশে এ-সম্বন্ধে কোনো ইতিহাস বা দলিল-পত্র নেই।

পার্সি বললে, 'কিন্তু স্যর, এটা তো ইতিহাসের মতো শোনাল না! এ যে গল্পকে ছাড়িয়ে যায়।'

আমি বললুম, 'কেন বৎস, তোমার মাতৃভাষাতেই তো রয়েছে, 'ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান্ ফিক্শন্' সত্য ঘটনা গল্পের চেয়েও চমকপ্রদ।'

এবং আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস যে ঘটনার বর্ণনা মানুষকে গল্পের চেয়েও বেশী সজাগ করে না তুলতে পারে, সে ঘটনার কোনো ঐতিহাসিক মূল্য নেই। কিংবা বলব, যে লোক ঘটনাটার বর্ণনা দিয়েছে সে সত্যকার ঐতিহাসিক নয়। আমার দেশে এ রকম কাঠখোট্টা ঐতিহাসিক বেশী।

॥ ৬ ॥

কলরব, চিৎকার, তারস্বরে আর্তনাদ! কি হল, কি হয়েছে? তবে কি জাহাজে বোম্বেটে পড়েছে? বায়স্কোপে যে রকম দেখি, বোম্বেটেরা দু হাতে দুই পিস্তল, দুপাটি দাঁতে ছোরা কামড়ে ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে এক জাহাজ থেকে আরেক জাহাজ আক্রমণ করে? তার পর হঠাৎ কানের পর্দা ফাটিয়ে এক ভয়ংকর প্রলয়ংকর বিস্ফোরণ—বারুদ-গোদামে আগুন লেগে সেটা ফেটে গিয়েছে। তারই আগুন জাহাজের দড়াদড়ি পাল-মাস্তুলে লেগে গিয়ে সমস্ত জাহাজ দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠেছে।

নাঃ! স্বপ্ন। বাঁচলুম। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গিয়েছে। চোখ মেলতে দেখি, কেবিনের সব কটা আলো জ্বলছে আর সামনে দাঁড়িয়ে পল আর পার্সি। পল দাঁড়িয়ে আছে সত্যি কিন্তু পার্সিটা জুলু না হটেনটট্ কি যেন এক বিকট আফ্রিকান নৃত্য জুড়েছে—আফ্রিকান-ই হবে, কারণ ঐ মহাদেশেরই গা ঘেঁষে তো এখন আমরা যাচ্ছি।

তা আফ্রিকার হটেনটটীয় মার্তণ্ড-তাণ্ডব নৃত্যই হোক আর ইয়োরোপীয় মাৎসুর্কা কিংবা ল্যামবেথ-উয়োক্-ই হোক—আমি অবশ্য এ দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্যই দেখতে পাই নে, সঙ্গীতে তো আদৌ না—পার্সি এ সময়ে

আমার কেবিনে এসে বিন্‌-নোটিশে নাচ জুড়বে কেন ?

নাঃ, নাচ নয়। বেচারী উত্তেজনায় তিড়িং-বিড়িং করছে আর যে কাতর রোদন জানাচ্ছে সেটার 'সামারি' করলে দাঁড়ায় ;—

'হায়. হায়, সব কিছু সাড়ে-সর্বনাশ হয়ে গেল, স্যর! আপনি এখনো অকাতরে নাক ডাকাচ্ছেন। আমার জীবন বিফল হল, পলের জীবনও বৃথায় গেল। জাহাজ রাতারাতি ডুবসাঁতার কেটে জিবুটি বন্দরে পেঁছে গিয়েছে। সবাই জামা-কাপড় পরে. ব্রেকফাস্ট খেয়ে পারে নামবার জন্য তৈরী, আর আপনি,—হায়, হায় !'

(এ বইখানার যদি ফিল্‌ম্‌ হয় তবে এ স্থলে 'অশ্রুবর্ষণ ও ঘন ঘন দীর্ঘ-নিশ্বাস')

আমি চোখ বন্ধ করলুম দেখে পার্সি এবারে ডুকরে কেঁদে উঠল।

আমি শান্ত কণ্ঠে শুধালুম, 'জাহাজ যদি জিবুটি পেঁছে গিয়ে থাকে তবে এখনো এঞ্জিনের শব্দ শুনতে পারছি কেন ?

পার্সি অসহিষ্ণুতা চাপবার চেষ্টা করে বললে, 'এঞ্জিন বন্ধ করা না-করা তো এক মিনিটের ব্যাপার।'

আমি বললুম, 'নৌ-ভ্রমণে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা বলে, এঞ্জিন বন্ধ হওয়ার পরও জাহাজ থেকে নামতে নামতে ঘণ্টা দুয়েক কেটে যায়।'

পল এই প্রথম মুখ খুললে ; বললে, 'বন্দর যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

আমি বললুম, 'দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার চুড়োটা স্পষ্ট দেখা যায়, তাই বলে কি সেখানে দশ মিনিটে পেঁছানো যায় ?'

তার পর বললুম, 'কিন্তু এ সব কুতর্ক। আমি হাতে-নাতে আমার বক্তব্য প্রমাণ করে দিচ্ছি।'

তার পর অতি ধীরে-সুস্থে দাড়ি কামাতে আরম্ভ করলুম। পল আমার কথা শুনে অনেকখানি আশ্বস্ত হয়েছে কিন্তু পার্সি তখনো ব্যস্ত-সমস্ত। আমাকে তাড়া লাগাতে গিয়ে দাড়ি কামানোর বুরুশটা এগিয়ে দিতে গিয়ে তুলে ধরে দাঁতের বুরুশ—ঐটে দিয়ে গাল ঘষলে মুখপোড়া হনুমান হতে কতক্ষণ—টাই ভেবে সামনে ধরে ড্রেসিং গাউনের কোমরবন্ধটা। তারপর চা-রুটি, মাখম-আণ্ডাতে অপূর্ব এক ঘ্যাঁট বানিয়ে আমার সামনে ধরে চতুর্দিকে ঘোরপাক খেতে লাগল—বাড়িতে জিনিসপত্র বাঁধাই-ছাঁদাই করার সময় পাপিটা যে রকম এর পা ওর পার ভিতর দিয়ে ঘোরপাক খায় এবং বাড়িসুদ্ধ লোককে চটিয়ে তোলে।

শেষটায় বেগতিক দেখে আমিও একটু তাড়াহুড়ো করে সদলবলে ডেকে এলুম

উপরে তখন আর সবাই অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে তাস পাশা, গালগল্পে ফিরে গিয়েছে।

পল চোখে দূরবীন লাগিয়ে বললে, 'কই, স্যর, বন্দর কোথায় ? আমি তো দেখতে পাচ্ছি, ধু-ধু করছে মরুভূমি আর টিনের বাক্সের মতো কয়েক সার এক-

যেয়ে বাড়ি।' -

আমি বললুম, 'এর-ই নাম জিবুটি বন্দর।'

'ঐ মরুভূমিতে দেখবার মতো আছে কি?'

'কিচ্ছু না। তবে কি জানো, ভিন্‌দেশ পরদেশের ভিতর দিয়ে যাবার সময় অত-শত বাছবিচার করতে নেই—বিশেষত এই অল্প বয়সে। চিড়িয়াখানায় যখন ঢুকেছ, তখন বাঘ-সিংঙি দেখার সঙ্গে সঙ্গে খটাশটাও দেখে নেওয়াই ভালো। আর কে জানে, কোন্ মোড় ঘুরতে কোন্ এক অপ্রত্যাশিত জিনিস বা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে না? মোকামে পেঁছিনোর পর না হয় জমা-খরচ করা যাবে, কোন্‌টা ভালো লাগল আর কোন্‌টা লাগল না।'

জাহাজ থেকে তড়-তড় করে সিঁড়ি ভেঙে ডাঙায় নামা যায় পৃথিবীর ভালো ভালো বন্দরেই। এখানে তাই পারে যেতে হল মোটর লঞ্চ করে। জিবুটির চেয়েও নিকৃষ্ট বন্দর পৃথিবীতে হয়তো আছে কিন্তু আমার দেখার মধ্যে ঐটেই সব চেয়ে অপ্রিয়দর্শন ও বৈচিত্র্যহীন বন্দর। মরুভূমির প্রত্যন্ত-ভূমিতে বন্দরটি গড়ে তোলা হয়েছে একমাত্র রাজ্যবিস্তারের লোভে। এবং এ মরুভূমিকে কোনো প্রকারের শ্যামলিমা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব জেনেই কেউ কোনোদিন কণামাত্র চেষ্টা করে নি একে একটুখানি আরামদায়ক করার।

ডাঙা থেকে সোজা চলে গিয়েছে একটা ধুলোয় ভর্তি রাস্তা বন্দরের চোক বা ঠিক মাঝখানে। তার পর সেখান থেকে এদিকে ওদিকে দু-চারটে রাস্তা গিয়েছে বটে কিন্তু বড় রাস্তাটা দেখার পর ও-সব গলিতে ঢোকার প্রবৃত্তি সুস্থলোকের হওয়ার কথা নয়। বড় রাস্তার দুদিকে সাদা চুনকাম-করা বাড়িগুলো এমনি মুখ গুমসো করে দাঁড়িয়ে আছে যে, বাড়ির বাসিন্দারাও বোধ করি এ-সব বাড়িতে ঢোকার সময় দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ শুকনো ঢোক গেলে কিংবা বাঁ হাত দিয়ে ঘাড়ের ডান দিকটা চুলকে নেয়। ছোট গলির মুখে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখি, মাটির তৈরী দেয়াল-ছাদের ছোট ছোট ঘর, না, ঘর নয়, গহ্বর কিংবা গুহাও বলতে পারো। বৃষ্টি এদেশে এতই ছিটেফোঁটা হয় যে, ছাত গলে গিয়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। আর থাকলেই বা কি, এদেশে তো আর ঘাস-পাতা গজায় না যে তাই দিয়ে চাল বানাবে?

এর-ই ভিতরে মানুষ থাকে, মা ছেলেকে ভালোবাসে, তাই ভাইকে স্নেহ করে, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সবই হয়।

কিন্তু আমি এত আশ্চর্য হচ্ছি কেন? আমি কি কখনো গলির ঘিঞ্জি বস্তির ভিতর ঢুকি নি—কলকাতায়? সেখানে দেখি নি কী দৈন্য, কী দুর্দশা! তবে আজ এখানে আশ্চর্য হচ্ছি কেন? বোধ হয় বিদেশে এ জিনিস প্রত্যাশা করি নি বলে, কিংবা দেশের দৈন্য দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি বলে বিদেশে তার অন্য রূপ দেখে চমকে উঠলুম।

এইখানেই মহামানব এবং হীনপ্রাণে পার্থক্য! মহাপুরুষরা দৈন্য দেখে

কখনো অভ্যস্ত হন না। কখনো বলেন না, এ তো সর্বত্রই হচ্ছে, অহরহ হচ্ছে, ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি। দৈন্য তাঁদের সব সময়ই গভীর পীড়া দেয়—যদিও আমরা অনেক সময় তাঁদের চেহারা দেখে সেটা বুঝতে পারি নে। তার পর একদিন তাঁরা সুযোগ পান, যে সুযোগের প্রতীক্ষায় তাঁরা বছরের পর বছর প্রহর গুনছিলেন, কিংবা যে সুযোগ তাঁরা ক্ষণে ক্ষণে দিনে দিনে আপন হাতে গড়ে তুলছিলেন, এবং এরই বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"অখ্যাত অজ্ঞাত রহি দীর্ঘকাল হে রাজবৈরাগী, গিরিদরী-তলে
বর্ষার নির্ঝর যথা শৈল বিদারিয়া উঠে জাগি পরিপূর্ণ বলে
সেই মত বাহিরিলে ; বিশ্বলোক ভাবিলে বিস্ময়ে যাহার পতাকা
অম্বর আচ্ছন্ন করে এত কাল এত ক্ষুদ্র হয়ে কোথা ছিল ঢাকা ॥"

তাই যখন হঠাৎ একদিন এক অরবিন্দ ঘোষ, এক চিত্তরঞ্জন দাশ এসে আমাদের মাঝখানে দেখা দেন তখন আমাদের আর বিস্ময়ের অবধি থাকে না। আজন্ম, আশৈশব, অনটনমুক্ত বিলাসে জীবন যাপন করে হঠাৎ একদিন তাঁরা সব কিছু বিসর্জন করে গিয়ে দাঁড়ান গরীব দুঃখী, আতুর অভাজনের মাঝখানে। যে দৈন্য দেখে ভিতরে ভিতরে গভীর বেদনা পেতেন, সে দৈন্য ঘুচাতে গিয়ে তাঁরা তখন পান গভীরতর বেদনা। কিন্তু সত্যের জয় শেষ পর্যন্ত হবেই হবে।

"—তাই উঠে বাজি
জয়শঙ্খ তাঁর ? তোমার দক্ষিণ করে
তাই কি দিলেন আজি কঠোর আদরে
দুঃখের দারুণ দীপ আলোক যাহার
জ্বলিয়াছে বিদ্ধ করি দেশের আঁধার
ধ্রুবতারকার মতো। জয় তব জয়।"

কিন্তু এত সব কথা তোমাদের শোনাচ্ছি কেন ? তার কারণ গত রাত্রে জাহাজে বসে বসে আফ্রিকা মহাদেশ এবং বিশেষ করে যে সোমালি দেশের ভিতর জিবুটি বন্দর অবস্থিত তারই কথা ভাবছিলুম বলে। এবং সেই সোমালিদের দুঃখ-দৈন্য ঘুচাবার জন্য যে একটি লোক বিদেশী শত্রুদের সঙ্গে প্রাণ দিয়ে লড়েছিল তার কথা বার বার মনে পড়ছিল বলে।

ইয়োরোপীয় বর্বরতার চূড়ান্ত বিকাশ দেখতে হলে পড়তে হয় আফ্রিকার ইতিহাস—ইংরেজ শাসিত ভারতের ইতিহাস তার তুলনায় নগণ্য।

পর্তুগীজ, ইংরেজ, জর্মন, ফরাসী বেলজিয়াম—কত বলব। ইয়োরোপীয় বহু জাত, কম জাত, বজ্জাত, এই আফ্রিকায় একদিন এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সাম্রাজ্য বিস্তারের বর্বর পাশবিক ক্ষুধা নিয়ে, শকুনের পাল যে-রকম মরা গোরুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভুল বললুম ; শকুনিদের উপর অবিচার করা হল, কারণ তারা তো জ্যান্ত পশুর উপর কোনো ঝাঁপ দেয় না। এই ইয়োরোপীয়রা এসে ছেঁকে ধরল সোমালি, নিগ্রো, বান্টু, হটেনটটদের। তাদের হাতে-পায়ে বেঁধে মুর্গীলাদাই ঝাঁকার মতো জাহাজ ভর্তি করে নিয়ে গেল আমেরিকায়।

কত লক্ষ নিগ্রো দাস যে তখন অসহ্য যন্ত্রণায় মারা গেল তার নিদারুণ করুণ বর্ণনা পাবে 'আঙকল্ টমস্ ক্যাবিন' পুস্তকে—বইখানা পড়ে দেখো। ইংরিজী ভালো বুঝতে না পারলে বাঙলা অনুবাদ 'টম কাকার কুটির' পড়লেই হবে—আমি ছেলেবেলায় বাঙলাতেই পড়েছিলুম।

আর আফ্রিকার ভিতরে যা করলে তার ইতিহাস আজও লেখা হয় নি। বিখ্যাত ফরাসী লেখক আঁদ্রে জিদ কঙ্গো সম্বন্ধে একখানা বই লিখে এমনই বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন যে তাঁর মতো দুঃসাহসী না হলে ঐ সম্বন্ধে কেউ আর উচ্চবাচ্য করতে সাহস পায় না। আর লিখলেই বা কি, প্রকাশক পাবে না। প্রকাশক পেলেই বা কি? কাগজে কাগজে বেরুবে তার বিরুদ্ধে রূঢ় মন্তব্য, অশ্লীল সমালোচনা। তখন আর কোনো পুস্তক-বিক্রেতা তোমার বই তার দোকানে রাখবে না। তবু জেনে রাখা ভাল, এমন মহাজনও আছেন যাঁরা এ সব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও বই লেখেন, ছাপান, প্রকাশ করেন এবং লোকে সে সব পড়ে বলে দেশে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি হয়।

সোমালি দেশের উপর রাজত্ব করতে এসেছিল বিস্তর জাতঃ তাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত টিকে রইল ফরাসী, ইংরেজ ও ইতালীয়।

ব্রিটিশ-সোমালি দেশে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন মুহম্মদ বিন আব্দুল্লা ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। নিরস্ত্র কিংবা ভাঙাচোরা বন্দুক আর তীর-ধনুকে সজ্জিত সোমালিরা তাঁর চতুর্দিকে এসে জড়ো হল অসীম সাহস নিয়ে—ইয়োরোপীয় কামান মেশিনগানের বিপক্ষে। এদিকে ইতালীয় এবং ব্রিটিশে সোমালি দেশের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে মারামারি, ওদিকে কিন্তু দুই দলই এক হয়ে গেলেন মোল্লা মুহম্মদের স্বাধীনতা প্রচেষ্টাকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য।

দুই পক্ষেরই বিস্তর হার-জিত হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোল্লাই ইয়োরোপীয়দের খেদিয়ে খেদিয়ে লাল-দরিয়ার পার পর্যন্ত পেঁছিয়ে দিলেন। ইংরেজ তখন সোমালিদের উপর রাজত্ব করার আশা ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রপারে দুর্গ বানিয়ে তার-ই ভিতর বসে রইল লাল-দরিয়ার বন্দরগুলোকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য।

সারা সোমালি দেশে জয়ধ্বনি জেগে উঠল—সোমালি স্বাধীন। তখন ইংরেজ তাঁকে নাম দিল, 'ম্যাড্ মোল্লা' অর্থাৎ 'পাগলা মোল্লা', আমাদের গাঁধীকে যে-রকম একদিন নাম দিয়েছিল, 'নেকেড্ ফকীর' অর্থাৎ 'উলঙ্গ ফকীর।' হেরে যাওয়ার পর মুখ ভ্যাংচানো ছাড়া করবার কী থাকে, বলো?

কিন্তু হায়, খুব বেশী বৎসর গেল না। ১৯১৪-১৮র প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইয়োরোপীয়রা অ্যারোপ্লেন থেকে বোমা মেরে মানুষকে কাবু করার কৌশল শিখে গিয়েছে। তাই দিয়ে যখন আবার তারা হানা দিলে তখন মোল্লাকে সে সময়কার মতো পরাজয় স্বীকার করে আশ্রয় গ্রহণ করতে হল ভিন দেশে।

মোল্লা সেই অনাদৃত অবহেলায় আবার সাধনা করতে লাগলেন স্বাধীনতা জয়ের নূতন সন্ধানে। কিন্তু হায়, দীর্ঘ বাইশ বৎসরের কঠিন যুদ্ধ, নিদারুণ কৃচ্ছ্রসাধনে তাঁর স্বাস্থ্য তখন ভেঙ্গে গিয়েছে। শেষ পরাজয়ের এক বৎসর পর, যে-ভগবানের নাম স্মরণ করে বাইশ বৎসর পূর্বে তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামে

নেমেছিলেন তাঁরই নাম স্মরণ করে সেই লোক চলে গেলেন যেখানে খুব সম্ভব সাদা-কালোর দ্বন্দ্ব নেই।

এই যে জিবুটি বন্দরে বসে বসে চোখের সামনে তাগড়া লম্বা জোয়ান সোমালিদের দেখছি, তারাও নাকি তখন চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল।

বীরের কাহিনী থেকে আমরা উৎসাহ সঞ্চয় করব, তা না হলে আমি এ দুঃখের কাহিনী তুললুম কেন? তার কারণ বুঝিয়ে বলার পূর্বে একটি কথা আমি বেশ জোর দিয়ে বলতে চাই।

'ফরাসীরা বড় খারাপ', ইংরেজ চোরের জাত' এ রকম কথার কোনো অর্থ হয় না। ভারতবর্ষে বিস্তর পকেটমার আছে, তাই বলে কেউ যদি গাল দেয় 'ভারতবাসীরা পকেটমার' তা হলে অধর্মের কথা হয়। 'ইংরেজ জাত অত্যাচারী' এ-কথা বলার কোনো অর্থ হয় না।

তাই যখন অধর্ম অরাজকতা দেখি, তখন সংযম বর্জন করে তদ্দণ্ডেই অস্ত্র-ধারণ করা অনুচিত। বহু জাত বহু বার করে দেখেছে, কোনো ফল হয় নি; হিংসা আর রক্তপাত শুধু বেড়েই গিয়েছে।

তাই মহাত্মাজী অহিংসার বাণী প্রচার করেছেন। অহিংসা দিয়ে হিংসা জয় করতে হবে। এর চেয়ে মহৎ শিক্ষা আর কিছু নেই। ভারতবর্ষ যদি তাই দিয়ে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ-সংগ্রাম, লুণ্ঠন-শোষণ রুদ্ধ করতে পারে তবে পৃথিবীর ইতিহাসে সে সর্বসভ্য জাতি বলে গণ্য হবে।

এবং শেষ কথা—সব চেয়ে বড় কথা—

আমাদের যেন রাজ্যলোভ না হয়। এদের অন্যায় আচরণ দেখে আমরা যেন সতর্ক হই। আমরা দু'শ বৎসর ধরে পরাধীন ছিলুম। পরাধীনতার বেদনা আমরা জানি। আমরা যেন কাউকে পরাধীন না করি!

॥ ৭ ॥

পল জিজ্ঞেস করলে, 'একদৃষ্টে কি দেখছেন স্যর? আমি তো তেমন কিছু নয়নাভিরাম দেখতে পারছি নে।'

বললুম, 'আমি কিঞ্চিৎ শার্লক হোমসগিরি করছি। ঐ যে লোকটা যাচ্ছে দেখতে পারছ? সে ঐ পাশের দোকান থেকে বেরিয়ে এল তো? দোকানের সাইন-বোর্ডে লেখা 'ফ্রিজোর', তাই লোকটার ঘাড়ের দিকটা দেখে অনুমান করছিলুম, জিবুটি বন্দরের নাপিতদের কোন্ পর্যায়ে ফেলি?'

পার্সি বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার ঠিক মনে আছে। আমি তো চুল কাটাবার কথা বেবাক ভুলে গিয়েছিলুম। চলুন ঢুকে পড়ি।'

আমি বললুম, 'তা পারো। তবে কি না, মনে হচ্ছে, এ-দেশে কোদাল দিয়ে চুল কাটে।'

পার্সি বললে, 'কোদাল দিয়েই কাটুক, আর কাস্তে দিয়েই কামাক, আমার তো গত্যন্তর নেই।'

নাপিত ভায়া ফরাসী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা জানেন না। আমি তাকে মোটামুটি বুঝিয়ে দিলুম, পার্সির প্রয়োজনটা কি।

কিন্তু দোকানটা এতই ছোট যে, পল আর আমি সেখানে বসবার জায়গা পেলুম না। বারান্দাও নেই। পার্সিকে বললুম, তার চুল কাটা শেষ হলেই সে যেন বন্দরের চৌমাথার কাফেতে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

চৌমাথায় একটি মাত্র কাফে। সব কটা দরজা খোলা বলে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, খদ্দের গিস-গিস করছে। কিন্তু এইটুকু হাতের-তেলো-পরিমাণ বন্দর, এখানে মেলার গোরুর হাট বসল কি করে?

ভিতরে গিয়ে দেখি, এ কি, এ যে আমাদের জাহাজেরই ডাইনিঙ রুম! খদ্দেরের সব কজনাই আমাদের অতিশয় সুপরিচিত সহযাত্রীর দল। এ বন্দর 'দেখা' দশ মিনিটেই শেষ হয়ে যায় বলে, সবাই এসে জড়ো হয়েছেন ঐ একটি মাত্র কাফেতেই। তাই কাফে গুলজার। এবং সবাই বসেছেন আপন আপন টেবিল নিয়ে। অর্থাৎ জাহাজের ডাইনিঙ রুমে যে চারজন কিংবা ছজন বসেন এক টেবিল নিয়ে, ঠিক সেই রকম এখানেও বসেছেন আপন আপন গুষ্টি নিয়ে।

এক কোণে বসেছে গুটিকয়েক লোক, উদাস নয়নে, শূন্যের দিকে তাকিয়ে। জাহাজে এদের কখনো দেখি নি। আন্দাজ করলুম, এরাই তবে জিবুটির বাসিন্দা। জরাজীর্ণ বেশভূষা।

কিন্তু এ সব পরের কথা। কাফেতে ঢুকেই প্রথম চোখে পড়ে এ দেশের মাছি। 'চোখে পড়ে' বাক্যটি শব্দার্থেই বললুম, কারণ কাফেতে ঢোকার পূর্বেই এক ঝাঁক মাছি আমার চোখে থাবড়া মেরে গেল।

কাফের টেবিলের উপর মাছি বসেছে আলপনা কেটে, 'বারের' কাউণ্টারে বসেছে ঝাঁকে ঝাঁকে, খদ্দেরের পিঠে, হ্যাটে,—হেন স্থান নেই যেখানে মাছি বসতে ভয় পেয়েছে।

দু-গেলাস 'নিম্বু-পানি' টেবিলে আসা মাত্রই তার উপরে, চুমুক দেবার জায়গায়, বসল গোটা আষ্টেক মাছি। পল হাত দিয়ে তাড়া দিতেই গোটা কয়েক পড়ে গেল শরবতের ভিতর। পল বললে, 'ঐ যু যা।'

আমি বললুম, 'আরেকটা অর্ডার দি?'

সবিনয়ে বললে, 'না, স্যর; আমার এমনিতেই ঘিন-ঘিন করছে। আর পয়সা খরচা করে দরকার নেই।'

তখন তাকিয়ে দেখি, অধিকাংশ খদ্দেরের গেলাসই পুরো ভর্তি।

ততক্ষণে ওয়েটার দুটি চামর দিয়ে গেছে। আমরাও চামর দুটি হাতে নিয়ে অন্য সব খদ্দেরদের সঙ্গে কোরাসে মাছি তাড়াতে শুরু করলুম।

সে এক অপরূপ দৃশ্য! জন পঞ্চাশেক খদ্দের যেন এক অদৃশ্য রাজাধিরাজের চতুর্দিকে জীবন-মরণ পণ করে চামর দোলাচ্ছে। ডাইনে চামর,

বাঁয়ে চামর, মাথার উপরে চামর, টেবিলের তলায় চামর। আর তার-ই তাড়ায় মাছিগুলো যূথভ্রষ্ট কিংবা ছন্নছাড়া হয়ে কখনো ঢোকে পলের নাকে, কখনো ঢোকে আমার মুখে। কথাবার্তা পর্যন্ত প্রায় বন্ধ। শুধু চামরের সাঁই-সাঁই আর মাছির ভন্-ভন্! রুশ-জর্মনে লড়াই!

মাত্র সেই চারটি খাস জিবুটি বাসিন্দে নিশ্চল নীরব। অনুমান করলুম, মাছি তাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, এবং মাছিদের সঙ্গে লড়নেওলা জাহাজ-যাত্রীর দলও তাদের গা-সওয়া। এরকম লড়াইও তারা নিত্যি নিত্যি দেখে।

তখন লক্ষ্য করলুম তাদের শরবৎ পানের প্রক্রিয়াটা। তারা চামর তো দোলায়ই না, হাত দিয়েও গেলাসের মুখ থেকে মাছি খেদায় না। গেলাস মুখে দেবার পূর্বে সেটাতে একটু মোলায়েম ঠোনা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে মাছিগুলো ইঞ্চি তিনেক উপরে ওঠা মাত্রই গেলাসটি টুক করে টেনে এনে চুমুক লাগায়। ঘিনপিত এদের নেই।

পলও লক্ষ্য করে আমাকে কানে কানে শুধোলে, 'এ লক্ষ্মীছাড়া জায়গায় এ-সব লোক থাকে কেন?'

আমি বললুম, 'সে বড় দীর্ঘ কাহিনী। অর্থাৎ এদের প্রত্যেককে যদি জিজ্ঞেস কর তবে শুনবে, প্রত্যেকের জীবনের দীর্ঘ এবং বৈচিত্র্যময় কাহিনী।'

এ সংসারে সর্বত্রই এক রকম লোক আছে যারা রাতারাতি লক্ষপতি হতে চায়। খেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-নোকরি কোনো কাজেই ওদের মন যায় না। অত খাটে কে, অত লড়ে কে?—এই তাদের ভাবখানা।

সিনেমায় নিশ্চয় দেখেছ, হঠাৎ খবর রটল আফ্রিকার কোথায় যেন সোনা পাওয়া গিয়েছে; সেখানে মাটির উপর-নিচে সর্বত্র তাল তাল সোনা পড়ে আছে আর অমনি চলল দলে দলে দুনিয়ার লোক—সেই সোনা যোগাড় করে রাতা-রাতি বড়লোক হওয়ার জন্য। সিনেমা কত রঙ-চঙেই না সে দৃশ্য দেখায়। অনাহারে তৃষ্ণায় পড়ে আছে, এখানে মড়া সেখানে মড়া। কোনো কোনো জায়গায় বাপ-মা, বেটা-বেটী চলেছে এক ভাঙা গাড়িতে করে—ছেলেটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে, মেয়েটা ভিরমি গেছে। বাপ টিনের ক্যানাস্তারা হাতে করে ধুঁকতে ধুঁকতে জল খুঁজতে গিয়ে এ পাথরে টক্কর খেয়ে পড়ে যাচ্ছে ও পাথরে ঠোক্কর খেয়ে জখম হচ্ছে। মায়ের চোখে জলের কণা পর্যন্ত নেই—যেন অসাড় অবশ হয়ে গিয়েছে।

এগিয়ে চলেছে, এগিয়ে চলেছে, এরা এগিয়ে চলেছে। এ ছাড়া উপায় নেই। থামলে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু, এগুলে বাঁচলে বাঁচতেও পারো।

কজন পেঁছয়, কজন সোনা পায়, তার ভিতর কজন জনসমাজে ফিরে এসে সে ধন ভোগ করতে পারে, তার কোনো সরকারী কিংবা বে-সরকারী সেনসাস্ কখনো হয় নি। তার হলেই বা কি? যাদের এ ধরনের নেশা জন্মগত তাদের ঠেকাবে কোন্ আদমশুমারী?

কিংবা হয়তো এদেরই একজন লেগে গেল কোম্পানী বানিয়ে, শেয়ার বিক্রি করে টাকা তুলতে। কেন? কোন্ এক বোম্বেটে কাপ্তান কোন্ এক অজানা

দ্বীপে কোটি কোটি টাকার ধন নিয়ে উধাও হয়ে যায়। সেই দ্বীপ খুঁজে বের করতে হবে, সেই ধন উদ্ধার করে রাতারাতি বড়লোক হতে হবে। যে সমুদ্রে ঐ দ্বীপটার থাকার কথা সেখানে যাত্রী-জাহাজ বা মাল-জাহাজ কিছুই যায় না। সে দ্বীপে নাকি খাবার জল পর্যন্ত নেই। ঐ বোম্বেটে কাপ্তান নাকি জলতৃষ্ণায় মারা গিয়েছিল। আরো কত রকম উড়ো খবর।

যে কোম্পানি খুললে, সে বলে বেড়াচ্ছে তার কাছে ম্যাপ রয়েছে ঐ দ্বীপে যাবার জন্য। সাধারণ লোক বলে, 'কই, ম্যাপটা দেখি।' লোকটা বলে, 'আব্দার! তারপর তুমি টাকাটা মেরে দাও আর কি?' কিন্তু রাতারাতি বড়লোক হওয়ার দল অত-শত শুধায় না। তারা কোম্পানির শেয়ারও কেনে না—পয়সা থাকলেও কেনে না। তারা গিয়ে কান্নাকাটি লাগায় লোকটার কাছে—'খালাসী করে, বাবুর্চি করে আমাদের নিয়ে চল তোমার সঙ্গে। তনখা-মাইনে কিছু চাই নে।' কাপ্তেনও ঐ রকম লোকই খুঁজছে,—শক্ত তাগড়া জোয়ান, মরতে যারা ডরায় না।

তারপর একদিন সে জাহাজ রওয়ানা হল। কিন্তু আর ফিরে এল না।

কিংবা ফিরে এল মাত্র কয়েকজন লোক। কিছুই পাওয়া যায় নি বলে এরা তাকে খুন করেছে। তখন লাগে পুলিস তাদের পিছনে। মোকদ্দমা হয়, আরো কত কি?

পল কাফের সেই চারটি জিবুটিবাসীর দিকে তাকিয়ে ফিস-ফিস করে আমাকে শুধালে, 'এরা সব ঐ ধরনের লোক?'

আমি বললুম, 'না, তবে ওদের বংশধর। বংশধর অর্থে ওদের ছেলে-নাতি নয়, কারণ ও ধরনের লোক বিয়ে-থা বড় একটা করে না। 'বংশধর' বলছি, এরা ঐ দলেরই লোক, যারা রাতারতি বড়লোক হতে চায়। কিন্তু আজকের দিনে তো আর সোনা পাওয়ার গুজোব ভালো করে রটতে পারে না,—তার আগেই খবরের কাগজওয়ালা প্লেন ভাড়া করে সব কিছু তদারক করে জানিয়ে দেয়, সমস্তটা ধাপ্পা। কিংবা জাহাজ ভাড়া করার কথাও ওঠে না। প্লেনে করে ঝটপট সব কিছু সারা যায়। হেলিকপ্টার হওয়াতে আরো সুবিধে হয়েছে। একেবারে মাটির গা ছুঁয়ে ভালো করে সব কিছুই তদারক করা যায়।'

তাই এরা সব করে আফিং চালান, কিংবা মনে করো কোনো দেশে বিদ্রোহ হয়েছে—বিদ্রোহীদের কাছে বে-আইনী ভাবে বন্দুক-মেশিনগান ইত্যাদি বিক্রি।

যখন কিছুতেই কিছু হয় না, কিংবা সামান্য যে টাকা করেছিল তা ফুঁকে দিয়েছে, ওদিকে বয়সও হয়ে গিয়েছে, গায়ে আর জোর নেই, তখন তারা জিবুটির মতো লক্ষ্মীছাড়া বন্দরে এসে দু পয়সা কামাবার চেষ্টা করে, আর নূতন নূতন অসম্ভব অসম্ভব অ্যাডভেঞ্চারের স্বপ্ন দেখে। জিবুটির মতো অসহ্য গরম আর মারাত্মক রোগ-ব্যাধির ভিতর কোন্ সুস্থ-মস্তিষ্ক লোক কাজের সন্ধানে আসবে? কিন্তু এদের আছে কষ্ট সহ্য করার অসাধারণ ক্ষমতা। তাই এদের জন্য এখানে কিছু একটা জুটে যায়। এই যেমন মনে করো, এখান থেকে যে রেল-লাইন শুরু হয়ে আবিসিনিয়ার রাজধানী আদ্দিস-আবাবা অবধি গিয়েছে—প্রায় পাঁচ

শ মাইলের ধাক্কা। সে লাইনে তো নানা রকমের কাজ আছেই, তার উপর ওরই মারফতে ব্যবসা-বাণিজ্য যা হবার তা-ও হয়। ঐ সব করে, আর একে অন্যকে আপন আপন যৌবনের দুর্দেমির গল্প বলে।

পাছে পল ভুল বোঝে তাই তাড়াতাড়ি বললুম, 'কিন্তু এই যে চারটি লোক বসে আছে, ঠিক এরাই যে এ ধরনের অ্যাডভেঞ্চারার সে কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে হওয়ার সম্ভাবনা আছে—ঐটুকু যা কথা।'

ইতিমধ্যে মুখে একটা মাছি ঢুকে যাওয়াতে বিষম খেয়ে কাশতে আরম্ভ করলুম। শান্ত হলে পর পল শুধালে, 'এদের কথা শুনে এদের প্রতি করুণা হওয়া উচিত, না অন্য কোনো প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নে।'

আমি অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললুম, 'আমার কি মনে হয় জানো? কেউ যখন করুণার সন্ধান করে তখনই প্রশ্ন জাগে, এ লোকটা করুণার পাত্র কি না? কিন্তু এরা তো কারো তোয়াক্কা করে না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এরা আশা রাখে, স্বপ্ন দেখে, রাস্তার মোড় ঘুরতেই, নদীর বাঁক নিতেই সামনে পাবে পরীস্থান, যেখানে গাছের পাতা রুপোর, ফল সোনার, যেখানে শিশিরের ফোঁটাতে হাত দিলেই তারা হীরের দানা হয়ে যায়, যেখানে—'

আরেকটুখানি কবিত্ব করার বাসনা হয়েছিল কিন্তু ইতিমধ্যে পার্সি মাছি তাড়াতে তাড়াতে এসে উপস্থিত। চেয়ারে বসে টেবিলের উপর রাখলো ও-দ্য-কলনের এক ঢাউস বোতল। মুখে হাসি, চোখে খুশি—বোতলের নয় পার্সির।

আমি বোতলটা হাতে নিয়ে দেখি, দুনিয়ার সব চাইতে ডাকসাইটে ও-দ্য-কলন—খাস কলন শহরের তৈরী কলনের জল—Eau de Cologne! 4711 মার্কা!

পার্সি বললে, 'দাঁও মেরেছি স্যর! বলুন তো এর দাম বোম্বাই কিংবা লণ্ডনে কত?'

আমি বললুম, 'শিলিং বারো-চোদ্দ হবে।'

লঙ্কা জয় এবং সীতাকে উদ্ধার করেও বোধ হয় রামচন্দ্রজী এতখানি পরিতৃপ্তির হাসি হাসেন নি। তবু হনুমান কি করেছিলেন তার খানিকটে আভাস পেলুম, পার্সির বুক চাপড়ানো দেখে।

'তিন শিলিং, স্যর, তিন শিলিং! সবে মাত্র, কুল্‌লে, জস্‌ট্‌; তিন শিলিং! নট্‌ এ পেনি মোর, নট ঈভন এ রেড ফার্দিং মোর।'

এমন সময় দেখি, কাফের আরেক কোণ থেকে সেই আবুল আসফিয়া—কি কি যেন—সিদ্দীকী সায়েব তার সেই লম্বা কোট আর ঝোলা পাতলুন পরে আমাদের দিকে আসছেন। ইনি আমাদের সেই বন্ধু যিনি সবাইকে লাইমজুস, চকলেট খাওয়ান—কিন্তু যাঁর কঞ্জুসি কথা কওয়াতে।

আমরা উঠে তাকে অভ্যর্থনা জানালুম।

তিনি বসেই বোতলটা হাতে তুলে নিয়ে ডাক্তাররা যে রকম এক্‌স্‌রে'র প্লেট দেখে সেই রকম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন।

পার্সি পুনরায় মৃদু হাস্য করে বললে, 'একদম খাঁটি জিনিস।'

আবুল আসফিয়া মুখ বন্ধ রেখেই নাক দিয়ে বললেন, 'হুঁ।'

তারপর অনেকক্ষণ পরে অতি অনিচ্ছায় মুখ খুলে শুধালেন, 'ওটা কার জন্য কিনলে?'

পার্সি বললে 'পিসিমার জন্য।'

আবুল আসফিয়া বললেন, 'বোতলটার ছিপি না খুললে বিলেতে নামবার সময় তোমাকে প্রচুর কাস্টমসের ট্যাক্স দিতে হবে। এমন কি এ জাহাজে ওঠার সময়ও—তবে সে আমি ঠিক জানি নে।'

পার্সি আমার দিকে তাকালে।

আমি বললুম, 'ছিপি খোলা থাকলে ওটা তোমার আপন ব্যবহারের জিনিস হয়ে গেল; তাই ট্যাক্স দিতে হয় না।'

অনেকক্ষণ পর আবুল আসফিয়া বললেন, 'যখন খুলতেই হবে তখন এই বেলা খুলে ফেলাই ভালো।'

আমরা সবাই—পার্সিও—বললুম, 'সেই ভালো।'

ওয়েটার একটা কর্ক স্ক্রু নিয়ে এল। আবুল আসফিয়া পরিপাটী হাতে বোতল খুলে প্রথম কর্কটার ভিতরের দিক শুঁকলেন, তারপর বোতলের জিনিস একটু ভেবে নিয়ে আমাদের শোঁকালেন।

কোনো গন্ধ নেই।

যেন জল—প্লেন, 'নির্জলা' জল!

পার্সি তো একেবারে হতভম্ব। অনেকক্ষণ পর সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে বললে, 'কিন্তু ছিপি, সীল সবই তো ঠিক?'

আবুল আসফিয়া বললেন, 'এ সব ছোট বন্দরে পুলিশের কড়াক্কড়ি নেই বলে নানা রকমের লোক অনেক অজানা প্রক্রিয়ায় আসল জিনিস সরিয়ে নিয়ে মেকি কিংবা প্লেন জল চালায়।'

আমি পলকে কানে কানে বললুম, 'হয়তো আমাদেরই একজন "অ্যাড-ভেঞ্চারার"।'

পাশের টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখি, খাস জিবুটি-বাসিন্দারা দরদ-ভরা আঁখিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। অনুমান করতে বেগ পেতে হল না, এরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে।

পার্সিও খানিকটে বুঝতে পেরেছে। বলল, 'যাত্রীরা বোকা কি না, তাই এ শয়তানিটা তাদের উপরই করা যায়। আর প্রতি জাহাজেই আসে এক জাহাজ—'

পল বাধা দিয়ে বললে, 'পার্সি!'

পার্সি চটে উঠে বললে, 'ওঃ, আর উনিই যেন এক মহা কন্-ফু-ৎস!'

জাহাজে ফেরার সময়, আবুল আসফিয়াকে একবার একা পেয়ে শুধালুম, 'ছোঁড়াটাকে বড় নিরাশ করলেন।'

বললেন, 'উপায় কি? না হলে প্রতি বন্দরে মার খেত যে!'

॥ ৮ ॥

গুণীরা বলেন, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে কথা বলবে।

জিবুটি ত্যাগ করার সময় পার্সি বন্দরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'লক্ষ্মীছাড়া জায়গাটা। ও-দ্য-কলনের খেদটা তখনো তার মন থেকে যায় নি। তাই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই কথাটা বলল।

ঘণ্টা খানেকের ভিতর উঠল ঝড়। তেমন কিছু মারাত্মক নয় কিন্তু 'সী সিকনেস্' দিয়ে মানুষের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। পার্সিই প্রথম বিছানা নিল। বমি করতে করতে তার মুখ তখন সরষে ফুলের রঙ ধরেছে। ভাঙা গাল দুটো দেখে মনে হয় সত্তর বছরের বুড়ো।

আমি নিজে যে খুব সুস্থ অনুভব করছিলুম তা নয়; তবু পার্সিকে বললুম, 'তবে যে, বৎস, জিবুটি বন্দরকে কটু-কাটব্য করছিলে? এখন ঐ লক্ষ্মীছাড়া বন্দরেই পা দিতে পারলে যে দু মিনিটেই চাঙ্গা হয়ে উঠতে। মাটিকে তাচ্ছিল্য করতে নেই—অন্তত যতক্ষণ মাটির থেকে দূরে আছে—তা সে জলের তলাতে সাবমেরিনেই হোক, উপরে জাহাজেই হোক, কিংবা তারো উপরে বাতাসে ভর করে অ্যারোপ্লেনেই হোক। তা সে যাক গে। এখন বুঝতে পারলে গুণীরা কেন বলেছেন, অগ্র-পশ্চাৎ ইত্যাদি?'

পার্সি কিন্তু তৈরী ছেলে। সেই ছট্‌ফটানির ভিতর থেকে কাতরাতে কাতরাতে বলল, 'কিন্তু এখন যদি কোনো ডুবন্ত দ্বীপের মাটিতে ধাক্কা লেগে জাহাজখানা চৌচির হয়ে যায় তখনো মাটির গুণগান করবেন নাকি?'

আমি বললুম, 'ঐ যু যা! এতখানি ভেবে তো আর কথাটা বলি নি।'

পল তার খাটে বসে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। আস্তে আস্তে বললে, 'জাহাজ যদি মাটিতে লেগে চৌচির হয়ে যায় তবে তো সেটা মাটির দোষ নয়। জাহাজ জোরের সঙ্গে ধাক্কা দেয় বলেই তো খানখান হয়ে যায়। আস্তে আস্তে চললে মাটির বাধা পেয়ে জাহাজ বড় জোর দাঁড়িয়ে যাবে—ভাঙবে কেন? মাকে পর্যন্ত জোরে ধাক্কা দিলে চড় খেতে হয়, আর মাটি দেবে না?'

আমি উল্লসিত হয়ে বললুম, 'সাধু, সাধু! তুলনাটি চমৎকার! তবে কি না আমার দুঃখ, বাঙলা ভাষায় এ নিয়ে যে শব্দ দুটো আছে তার pun তোমরা বুঝবে না। মা হচ্ছেন 'মাদার' আর 'মাটি' হচ্ছেন 'দি মাদার' কিংবা 'আর্থ'।'

পল বললে, 'বিলক্ষণ বুঝেছি, Good Earth!'

পার্সি বিরক্ত হয়ে বললে, 'পলের তুলনাটা নিশ্চয়ই চোরাই মাল।'

আমি বললুম, 'সাধুর টাকাতে দু সের দুধ, চোরের টাকাতেও দু সের দুধ। টাকার দাম একই। তুলনাটা ভালো। তা সে পলের আপন মালই হোক আর চোরাই মালই হোক। তা সে কথা থাক। তুমি কিন্তু 'সী সিকনেসে' কাতর হয়ে ভয় পেয়ো না। এ ব্যামোতে কেউ কখনো মারা যায় নি।'

পার্সি চিঁ-চিঁ করে বললে, 'শেষ ভরসাটাও কেড়ে নিলেন, স্যর ? আমি তো ভরসা করেছিলুম, আর বেশীক্ষণ ভুগতে হবে না, মরে গিয়ে নিষ্কৃতি পাবো।'

পল বললে, 'আগাছা সহজে মরে না।'

আমি বললুম, 'থাক, থাক। চলো, পল, উপরে যাই। আমরা তিনজনা মিলে 'সী সিক্‌নেস্‌কে' বড্ড বেশী লাই দিচ্ছি।'

পল বেরুতে বেরুতে বললে, 'হক কথা। পার্সির সঙ্গে একা পড়লে যে-কোনো ব্যামো বাপ-বাপ করে পালাবার পথ পাবে না।'

উপরে এসে দেখি, আবুল আসফিয়া কোথা থেকে এক জোরদার দূরবীন যোগাড় করে কি যেন দেখবার চেষ্টা করছেন। এ সব জাহাজ কখনো পাড়ের গা ঘেঁষে চলে না। তাই জোরালো দূরবীন দিয়েও বিশেষ কিছু দেখা যায় না। পল আমাকে শুধালে, 'কি দেখছেন উনি ?'

আমি বললুম, 'আবুল আসফিয়া মুসলমান এবং মনে হচ্ছে ধর্মে তাঁর অনুরাগও আছে। লাল দরিয়ার এক পারে সোমালি-ভূমি, হাবসী মুল্লুক এবং মিশর, অন্য পারে আরব দেশ। মহাপুরুষ মুহম্মদ আরব দেশে জন্মেছিলেন, ঐ দেশে ইসলাম প্রচার করেন। মক্কা-মদীনা সবই তো ঐখানে।'

পল বললে, 'ইংরিজীতে যখনই কোনো জিনিসের কেন্দ্রভূমির উল্লেখ করতে হয় তখন বলা হয়, যেমন ধরুন সঙ্গীতের বেলায়, 'ভিয়েনা ইজ দি মেক্কা অব মিউজিক'—এ তো আপনি নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু বিশেষ করে মক্কা বলা হয় কেন ? মক্কা তো আর তেমন কিছু বড় শহর নয়।'

আমি বললুম, 'পৃথিবীতে গোটা তিনেক বিশ্বধর্ম আছে অর্থাৎ এ ধর্ম-গুলো যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছে সেখানেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে নি—দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন মনে করো বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম এবং ইসলাম। কিন্তু পৃথিবীর বহু বৌদ্ধ কিংবা খ্রীষ্টান কোনো বিশেষ পুণ্যদিবসে এক বিশেষজায়গায় একত্র হয় না—মুসলমানরা যে রকম হজের দিনে মক্কায় একত্র হয়। কোথায় মরক্কো, কোথায় সাইবোরিয়া আর কোথায় তোমার চীন—পৃথিবীর যে সব দেশে মুসলমান আছে সে সব দেশের লোককে সেদিন তুমি মক্কায় পাবে। শুনেছি, সেদিন নাকি মক্কার রাস্তায় দুনিয়ার প্রায় সব ভাষাই শুনতে পাওয়া যায়।'

'তাতে করে লাভ ?'

আমি বললুম, 'লাভ মক্কাবাসীদের নিশ্চয়ই হয়। তীর্থযাত্রীরা যে পয়সা খরচ করে তার সবই তো ওরা পায়। কিন্তু আসলে সে উদ্দেশ্য নিয়ে এ-প্রথা সৃষ্টি হয় নি। মুহম্মদ সাহেবের ইচ্ছা ছিল যে পৃথিবীর সব দেশের মুসল-মানকে যদি একত্র করা যায় তবে তাদের ভিতর ঐক্য এবং ভ্রাতৃভাব বাড়বে। আমরা যখন বাড়িতে উপাসনা না করে গির্জায় কিংবা মসজিদে যাই তখন তারও তো অন্যতম উদ্দেশ্য আপন ধর্মের লোকের সঙ্গে এক হওয়া। মুহম্মদ সাহেব বোধ হয় এই জিনিসটাই বড় করে, সমস্ত পৃথিবী নিয়ে করতে চেয়েছিলেন।'

পল অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললে, 'আমরা তো বড়দিনের পরবে প্রভু যীশুর জন্মস্থল বেথলেহেমে জড়ো হই নে। হলে কি ভালো হত না? তা হলে তো খ্রীষ্টানদের ভিতরও ঐক্য সখ্য বাড়ত।'

আমি আরো বেশী ভেবে বললুম, 'তা হলে বোধ হয় রোমে পোপের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হত।'

কিন্তু থাক এসব কথা। আমার কোনো ক্যাথলিক পাঠক কিংবা পাঠিকা যেন মনে না করেন যে আমি পোপকে শ্রদ্ধা করি নে। পৃথিবীর শত শত লক্ষ লক্ষ লোক যাঁকে সম্মানের চোখে দেখে তাঁকে অশ্রদ্ধা করলে সঙ্গে সঙ্গে সেই শত শত লক্ষ লক্ষ লোককে অশ্রদ্ধা করা হয়। অতটা বেয়াদব আমি নই। বিশেষত আমি ভারতীয়। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, সব ধর্মকে শ্রদ্ধা জানাতে হয়।

॥ ৯ ॥

ঝড় থেমেছে। সমুদ্র শান্ত। ঝড়ের পর বাতাস বয় না বলে অসহ্য গরম আর গুমোট। এ যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাই কি প্রকারে?

নিষ্কৃতির জন্য মানুষ ডাঙায় যা করে, জলে অর্থাৎ জাহাজেও তা-ই। এক দল লোক বুদ্ধিমান। কাজে কিংবা অকাজে এমনি ডুব মারে যে, গরমের অত্যাচার সম্বন্ধে অনেকখানি অচেতন হয়ে যায়। বোকার দল শুধু ছট্‌ফট করে। ক্ষণে এটা করে, ক্ষণে ওটা নাড়ে, ক্ষণে ঘুমাবার চেষ্টা করে, ক্ষণে জেগে থাকতে গিয়ে আরো বেশী কষ্ট পায়।

জাহাজেও তাই। একদল লোক দিবা-রাত্তির তাস খেলে। সকাল বেলাকার আণ্ডা-রুটি খেয়ে সেই যে তারা তাসের সায়রে ডুব দেয়, তারপর রাত বারোটা-একটা-দুটো অবধি তাদের টিকি টেনেও সে সায়র থেকে তোলা যায় না। লাঞ্চ সাপার খেতে যা দু-একবার তাস ছাড়তে হয়, ব্যাস—ঐ। তখন হয় বলে 'কী গরম', নয় ঐ তাসের জেরই খানার টেবিলে টানে। চার ইস্কাপন্ না ডেকে তিন বে-তরুপ বললে ভালো হত, পুনরপি ডবল না বলে সে কি আহাম্মুকিই না করেছে!

জাহাজের বে-সরকারী ইতিহাস বলে, একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা তাস খেলেছে এমন ঘটনাও নাকি বিরল নয়। এরা গরমে কাতর হয় না, শীতেও বেকাবু হয় না। ভগবান এদের প্রতি সদয়।

দাবাখেলার চর্চা পৃথিবীতে ক্রমেই কমে আসছে। আসলে কিন্তু দাবাড়েরাই এ ব্যাপারে দুনিয়ার আর সবাইকেই মাত করতে পারে। দাবাখেলায় যে মানুষ কি রকম বাহ্যজ্ঞানশূন্য হতে পারে, সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। 'পরশুরাম' লিখেছেন, এক দাবাড়েকে যখন চাকর এসে বললে, 'চা দেব কি করে?—দুধ ছিঁড়ে গেছে' তখন দাবাড়ে খেলার নেশায় বললে, 'কি জ্বালা,

সেলাই করে নে না।'

আরেক দল শুধু বই পড়ে। তবে বেশীর ভাগই দেখছি, ডিটেকটিভ উপন্যাস। ভালো বই দিবা-রাত্র পড়ছে এরকম ঘটনা খুব কমই দেখেছি।

আরেক দল মারে আড্ডা। সঙ্গে সঙ্গে গুনগুন করে—আড্ডার যেটা প্রধান 'মেনু'—পরনিন্দা, পরচর্চা। সেগুলো বলতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু পাছে কোনো পাঠক ফস করে শুধায়, 'এগুলো আপনি জানলেন কি করে, যদি নিজে পরনিন্দা না করে থাকেন?' তাই আর বললুম না।

আরো নানা গুষ্ঠী নানা সম্প্রদায় আছে, কিন্তু আবুল আসফিয়া কোনো গোত্রেই পড়েন না। তিনি আড্ডাবাজদের সঙ্গে বসেন না বটে, কিন্তু আড্ডা মারেন না—খেয়া-নৌকার মাঝি যে রকম নদী পেরয়, কিন্তু ওপারে নাবে না। একথা পূর্বেই বলেছি, কিন্তু আজ হঠাৎ তাঁকে দেখি অন্যরূপে। খুলে কই।

পার্সি সেরে উঠে আবার জাহাজময় লম্ফ-ঝম্প লাগিয়েছে। যেখানেই যাই সেখানেই পার্সি। মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে, তবে কি পার্সির জন আষ্টেক যমজ ভাই আছে নাকি? একই লোক সাত জায়গায় একসঙ্গে থাকবে কি করে?

সে-ই খবরটা আনলে।

কি খবর?

জাহাজ সুয়েজ বন্দরে পেঁছিনোর পর ঢুকবে সুয়েজ খালে। খালটি একশ মাইল লম্বা। দু পাড়ে মরুভূমির বালু বলে জাহাজকে এগতে হয় ঘণ্টায় পাঁচ মাইল বেগে। তাহলে লাগল প্রায় কুড়ি-বাইশ ঘণ্টা। খালের এ-মুখে সুয়েজ বন্দর, ও-মুখে সঈদ বন্দর। আমরা যদি সুয়েজ বন্দরে নেমে ট্রেন ধরে কাইরো চলে যাই এবং পিরামিড দেখে সেখান থেকে ট্রেন ধরে সঈদ বন্দর পেঁছই, তবে আপনাদের আপন জাহাজই আবার ধরতে পারব। যদিও আমরা মোটামুটি একটা ত্রিভুজের দুই বাহু পরিভ্রমণ করব—আর সুয়েজ খাল মাত্র এক বাহু—তবু রেলগাড়ি তাড়াতাড়ি যাবে বলে আমরা কাইরোতে এটা ওটা দেখবার জন্য ঘণ্টা দশেক সময় পাব।

কিন্তু যদি সুয়েজ বন্দরে নেমে সময়মত ট্রেন না পাই, কিংবা যদি কাইরো থেকে সময়মত সঈদ বন্দরের ট্রেন না পাই আর সেখানে জাহাজ না ধরতে পারি, তখন কি হবে উপায়?

পার্সি অসহিষ্ণু হয়ে বললে, 'সে তো কুক কোম্পানির জিম্মাদারি। তারাই তো এ টুর—না এক্‌সকার্শন, কি বলব?—বন্দোবস্ত করেছে। প্রতি জাহাজের জন্যই করে। বিস্তর লোক যায়। চলুন না, নোটিশ বোর্ডে দেখিয়ে দিচ্ছি—কুকের বিজ্ঞাপন।'

ত্রিমূর্তি সেখানে গিয়ে সাতিশয় মনোযোগ সহকারে প্রস্তাবটি অধ্যয়ন করলুম।

কিন্তু প্রস্তাবটির শেষ ছত্র পড়ে আমাদের আক্কেল গুড়ুম নয়, দড়াম করে ফেটে গেল। এই এক্‌স্‌কার্শন—বন-ভোজ কিংবা শহর-ভোজ, যাই বলো, যাচ্ছি তো কাইরো 'শহরে'—যাঁরা করতে চান তাঁদের প্রত্যেককে দিতে হবে সাত

পৌণ্ড অর্থাৎ প্রায় একশ টাকা। পল বললে, 'হরি, হরি,' (অবশ্য ইংরিজীতে 'গুড হেভেনস', 'মাই গুডনেস' এই জাতীয় কিছু একটা) এত টাকা যদি আমার থাকবেই তবে কি আমি এই জাহাজে ফার্স্ট ক্লাসে যেতুম না?'

আমি বেদনাতুর হওয়ার ভান করে বললুম, 'কেন ভাই, আমরা কি এতই খারাপ লোক যে আমাদের এড়াবার জন্য তুমি ফার্স্ট ক্লাসে যেতে চাও?'

পল তো লজ্জায় লাল হয়ে তোতলাতে আরম্ভ করলে।

আর পার্সি? সে তো হনুমানের মতো চক্রাকারে নৃত্য করে বলতে লাগল, 'বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে। করো মস্করা স্যারের সঙ্গে! বোঝো ঠ্যালা!'

আমি বললুম, 'ব্যস, ব্যস্। হয়েছে। হয়েছে। কিন্তু পার্সি, একশ টাকা তো চাট্টিখানি কথা নয়। আমাকেই তো টাল-মাটাল হয়ে টাকাটা টানতে হবে।'

পার্সিকে দমানো শক্ত। বললে, 'অপরাধ নেবেন না, স্যর, কিন্তু আমি-ই বা কোন হেনরি ফোর্ড কিংবা মিডাস্ রোট্‌শিলল্‌ট্? কিন্তু আমি মনস্থির করেছি, আমার জেবের শেষ পেনি দিয়ে আমি পিরামিড দেখবই দেখব। চীনা দেওয়াল দেখার পর পিরামিড দেখব না আমি? মুখ দেখাব তা হলে কি করে? তার চেয়েও খারাপ, আয়নাতে নিজেরই মুখ দেখব কি করে?'

অনেক আলোচনা, বিস্তর গবেষণা করা হল। শেষটায় স্থির হল, পিরামিড-দর্শন আমাদের কপালে নেই। গালে হাত দিয়ে যখন ত্রিমূর্তি আপন মনে সেই শোক ভোলাবার চেষ্টা করছি এমন সময় আবুল আসফিয়া মুখ খুললেন।

তাঁর সনাতন অভ্যাস অনুযায়ী তিনি আমাদের আলোচনা শুনে যাচ্ছিলেন। ভালো মন্দ কিছুই বলেন নি। আমরা যখন স্থির করলুম, আমরা ট্রিপটা নেব না তখন তিনি বললেন, 'এর চেয়ে সস্তাতেও হয়।'

আমরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে শুধালুম, 'কি করে? কি করে?'

বললেন, 'সে কথা পরে হবে।'

তার পর আপন চেয়ার ছেড়ে খানা-কামরার দিকে চলে গেলেন।

॥ ১০ ॥

পল আর পার্সিকে এখন আর বড় একটা দেখতে পাই নে। ওরা আবুল আসফিয়ার কোটের উপর ডাকটিকিটের মত সেঁটে বসেছে—ছিনে জোঁকের মতো লেগে আছে বললে কমিয়ে বলা হয়, কারণ রক্ত শোষা শেষ হলে তবু ছিনে জোঁক কামড় ছাড়ে—এরা খামের উপর ডাকটিকিটের মতো, যেখানেই আবুল আসফিয়া সেখানেই তারা। মুখে এক বুলি, এক প্রশ্ন—কি করে সস্তায় কাইরো গিয়ে সেখান থেকে সস্তাতেই ফের সঈদ বন্দরে জাহাজ ধরা যায়? আবুল আসফিয়া বলেন, 'হবে, হবে, সময় এলে সবই হবে।'

শেষটায় জাহাজ যেদিন সুয়েজ বন্দরে পেঁছিবে তার আগের দিন তিনি

রহস্যটি সমাধান করলেন। অতি সরল মীমাংসা। আমাদের মাথায় খেলে নি।

আবুল আসফিয়া বললেন, 'কুক কোম্পানির লোক টুরিসট্ সায়েব-সুবোদের নিয়ে যাবে গাড়িতে ফার্স্ট ক্লাসে করে—সুয়েজ থেকে কাইরো, এবং কাইরো থেকে সঈদ বন্দর। কাইরোতে যে রাত্রি-বাস করতে হবে তার ব্যবস্থাও হবে অতিশয় খানদানী, অতএব মাগগী হোটেলে। আমরা যাব থার্ডে, এবং উঠব একটা সস্তা হোটেলে। তা হলেই হল।'

প্রথমটায় আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। সম্বিতে ফেরা মাত্র আমার মনে আরেকটি কঠিন সমস্যার উদয় হল। যদি কোনো জায়গায় আমরা ট্রেন মিস করি কিংবা অন্য কোনো দুর্ঘটনার মুখে পড়ে যাই আর শেষটায় সঈদ বন্দরে ঠিক সময়ে পেঁছে জাহাজ না ধরতে পারি তবে যে আমাদের চক্ষু চড়ক গাছ। বরঞ্চ চা খেতে প্ল্যাটফর্মে নেমেছি, আর গাড়ি মাল-পত্র নিয়ে চলে গেল সে সমস্যারও সমাধান আছে কিন্তু জাহাজ চলে গেলে কত দিন সঈদ বন্দরে পড়ে থাকতে হবে, তার কি খরচা, নূতন জাহাজে নূতন টিকিটের জন্য কি গচ্ছা এসব তো কিছুই জানি নে। কুকের লোক এ সব বিপদ-আপদের জন্য জিম্মেদার, কিন্তু আবুল আসফিয়াকে জিম্মেদার করে তো আর আমাদের চারখানা হাত গজাবে না? তাঁকে তো আর বলতে পারব না, 'মশাই, আপনার পাল্লায় পড়ে এত টাকার গচ্ছা হল—আপনি সেটা ঢালুন।'

শেষের কথাটা বাদ দিয়ে আমার সমস্যাটা নিবেদন করাতে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় মাত্র একটি বাক্য বললেন, 'নো রিস্ক, নো গেন'—সোজা বাঙলায়, 'খেলেন দই রমাকান্ত আর বিকারের বেলা গোবন্দন' সে হয় না। তুমি যদি দই খেতে চাও তবে বিকারটা হবে তোমারই। মাগুর মাছ ধরতে হলে গর্তে হাত দিতে হবে তোমাকেই। কিছুটা ঝুঁকি নিতে রাজী না হলে কোনো প্রকারের লাভও হয় না।

আবুল আসফিয়ার 'নো রিস্ক, নো গেন' এই চারটি কথা—চাট্টিখানি কথ নয়—শুনে পল দুশ্চিন্তা-ভরা গলায় বললে, 'তাই তো!'

পার্সি মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে বললে, 'সেই তো।'

আমি বললুম, 'ঐ তো।'

পল বললে, 'কিংবা মনে করুন কাইরোতে পথ হারিয়ে ফেললুম। আবুল আসফিয়া কি কাইরোর ভাষা জানেন? সেখানকার লোকে কি বুলি বলে তার নামই তো জানি নে।'

পার্সি বললে, 'দেখো পল, তুমি কি জানি জানো না তার ফিরিস্তি বানাবার এই কি প্রশস্ততম সময়? তাতে আবার সময়ও তো লাগবে বিস্তর।'

আমি পার্সিকে ফাঁকা ধমক দিয়ে বললুম, 'আবার!' পলকে বললুম, 'আরবী। কিন্তু কিছু কিছু লোক নিশ্চয়ই ইংরিজী ফরাসী জানে। রাস্তা ফের খুঁজে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।'

পল বললে, 'যাবে নিশ্চয়ই। কিন্তু ততক্ষণে হয়তো জাহাজ বন্দর ছেড়ে

চলে গিয়েছে।'

আরো অনেক অসুবিধার কথা উঠল। তবে সোজা কথা এই দাঁড়াল, একটা দেশের ভাষার এক বর্ণ না জেনে, এতখানি কম সময় হাতে নিয়ে সে দেশে ঘোরাঘুরি করা কি সমীচীন? এতই যদি সোজা এবং সস্তা হবে তবে এতগুলো লোক কুকের ন্যাজ ধরে যাচ্ছে কেন? একা-একা কিংবা আপন-আপন দল পাকিয়ে গেলেই তো পারত। তাই দেখা যাচ্ছে আবুল আসফিয়ার 'নো রিস্ক্, নো গেন' প্রবাদে—অন্তত এক্ষেত্রে—'রিস্ক্' ন সিকে, গেন্ মেরে-কেটে চোদ্দ পয়সা। রবি ঠাকুর বলেছেন,

'আমার মতে জগৎটাতে ভালোটারই প্রাধান্য,—
মন্দ যদি তিন-চল্লিশ, ভালোর সংখ্যা সাতান্ন।'

যদি আমাদের রিস্ক সাতান্ন আর গেন্ তিন-চল্লিশ হত তা হলেও আমরা কানাইলালের মতো সোল্লাসে 'ইয়াল্লা' বলে ঝুলে পড়তুম—যাচ্ছি তো মুসলমান দেশে।

তখন স্থির হল, আবুল আসফিয়াকে পাকড়াও করে আরেক দফা সবিস্তর সওয়াল জবাব না করে কোনো কিছু পাকাপাকি মনস্থির করা যাবে না।

ধুয়া-ভুয়া করে করে, বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর আমরা আবুল আসফিয়াকে পেলুম উপরের ডেকের এক কোণে, আপন মনে গুনগুনিয়ে গান গাইছেন। আমাদের দেখে, আমাদের কিছু বলার পূর্বেই বেশ একটু চড়া গলায় বললেন, 'আমি কোনো কথা শুনতে চাই নে। আমি কোনো উত্তর দিতে পারব না। আমি কাইরো যাব। তোমরা আসতে চাও ভালো, না আসতে চাও আরো ভালো।'

সঙ্গে সঙ্গে যেন আরো একটা শব্দ শুনতে পেলুম—শব্দটা ফার্সী, 'বুজ-দিল'—অর্থাৎ বকরির কলিজা, অর্থাৎ 'ভীতুরা সব'।

এই শান্তপ্রকৃতির সদাশিব লোকটির কাছ থেকে আমরা এ-আচরণ প্রত্যাশা করি নি। এ যেন সেনাপতির আদেশ, 'আমি তা হলে একাকী শত্রু-সৈন্য আক্রমণ করব, তোমরা আসো আর নাই আসো।' ত্রিমূর্তি লগুড়াহত সার-মেয়বৎ নিম্নপুচ্ছ হয়ে স্ব-স্ব আসনে ফিরে এলুম। কারো মুখে কথা নেই। নিঃশব্দে আহারাদি করে যে যার কেবিনে শুয়ে পড়লুম।

'সিংহের ন্যাজে মোচড় দিতে নেই' কথাটি অতি খাঁটি, কিন্তু আবুল আসফিয়া সিংহ না মর্কট সেটা তো এখনো কিছু বোঝা গেল না। তাঁর আচরণ তেজীয়ান না লেজীয়ানের লক্ষণ তার তো কোনো হদিস পাওয়া গেল না।

॥ ১১ ॥

পরদিন নিদ্রাভঙ্গে কেবিন ছেড়ে উপরে আসতেই দেখি হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড! এক দল লোক আবুল আসফিয়াকে ঘিরে নানা রকমের প্রশ্ন শুধোচ্ছে। কুক

কোম্পানি কাইরো দেখবার জন্য চায় একশ টাকা আর আপনি বলেন, পঞ্চাশ টাকাতেই হয়, সেটা কি প্রকারে সম্ভব? আরেক দল বলে, তারাও আসতে রাজী কিন্তু যদিস্যাৎ কোনো প্রকারের গড়বড়-সড়বড় হয়ে যায় আর তারা জাহাজ না ধরতে পারে তখন যে ভয়ংকর বিপদ উপস্থিত হবে তার কি সমাধান?

অর্থাৎ ইতিমধ্যে আমাদেরই মত আমাদের গরিব সহযাত্রীরা জেনে গিয়েছে সস্তাতেও কাইরো এবং পিরামিড দেখা যায়। কাজেই এখন আর পল, পার্সি, আমি এই ত্রিমূর্তি, এবং আবুল আসফিয়াকে নিলে চতুর্মুখ—এখন আর তা নয়, এখন সমস্যাটা সহস্রনয়না হয়ে গিয়েছে, জনগণমন সাড়া দিয়েছে।

আবুল আসফিয়া কেবল মাঝে মাঝে বলেন, 'হো জায়গা, সব কুছ হো জায়গা।'

হিন্দুস্তানী বলছেন কেন? তিনি তো ইংরিজী জানেন। তখন লক্ষ্য করলুম, যে সব দল তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাদের ভিতর রয়েছে ফরাসী, জর্মন, স্পেনিশ, রুশ আরো কত কি। এরা সবাই বোঝে, এমন কোনো ভাষা ইহ-সংসারে নেই। তাই তিনি নিশ্চিন্ত মনে মাতৃভাষায় কথা বলে যাচ্ছেন। ইংরিজি বললে যা, হিন্দুস্তানী বললেও তা। ফল একই।

এমন সময় আমাদের দলের সব চেয়ে সুন্দরী মহিলা মধুর এবং দরদভরা গলায় বললেন, 'মসিয়ো আবুল, যদি কোনো কারণে আমরা জাহাজ মিস্ করি তখন যে আমরা মহা বিপদে পড়ব। আপনি তো আমাদের কাউকে তার অনিচ্ছায় জোর করে নিয়ে যাচ্ছেন না যে আপনাকে তখন জিম্মাদার হতে বলব?'

ক্লোদেৎ শেনিয়ের যা বললেন, তার মোটামুটি অর্থ, 'আপনি যে আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন তার জিম্মাদারি আপনার নয়, কিন্তু যদি কোনো রকমের বিপর্যয় উপস্থিত হয় তবে তার গুরুত্বটা আপনি ভালো করে বিবেচনা করে দেখলে হয় না কি?'

উপস্থিত সকলের মনোভাব মহিলাটি যেন অতি ললিত ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন। সবাই চিৎকার করে সায় দিলে আপন আপন ভাষায়।

ফরাসী দল—উই উই,
জর্মন দল—ইয়া ইয়া,
ইতালীয় দল—সি সি,
একটি রাশান—দা দা,
গুটি কয়েক ভারতীয়—ঠিক হৈ ঠিক হৈ,
পল পার্সি—ইয়েস ইয়েস,
আমি নিজে কিছু বলি নি,—কিন্তু সে কথা যাক।

আবুল আসফিয়া উত্তরে ঘাড় নিচু করে বললেন, 'মৈ জিম্মেদার হুঁ।'

তাঁকে যদিও কেউ জিম্মেদার হবার শর্ত চায় নি তবু তিনি জিম্মাদার, এটা সম্পূর্ণ তাঁরই দায়িত্ব!

চাকরির সন্ধানে গিয়ে এক বাঙালী বড় সাহেব ইংরেজকে খুশী করার জন্য বলেছিল, 'হুজুর আপনার বাঙলোতে আসবার জন্য ভয়ের চোটে পা আর ওঠে না। যদি এক পা এগোই তো তিন কদম পিছিয়ে যাই।' বড় সায়েব মাত্রই যে গাধা হয় তা নয়,—এ সায়েবের বুদ্ধি ছিল। বাবুর কথা শেষ হতে না হতেই শুধাল, 'তা হলে এখানে পেঁছিলে কি করে?' সায়েব যে বাবুর বিনয় বচন এতখানি শব্দার্থে নেবেন বেচারী সেটা অনুমান করতে পারে নি। প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু চাকরির ফিকিরে বাঙালীর কাছে কোনো কসরত কোনো কৌশলই অজানা নেই। একটিমাত্র শুকনো ঢোঁক না গিলেই বললে, 'হুজুর, তাই আমি আপন বাড়ির দিকে মুখ করে চলতে আরম্ভ করলুম আর এই দেখুন দিব্য হুজুরের বাঙালোতে পেঁছে গিয়েছি।'

গল্পের বাকিটা আমার মনে নেই, তবে আবুল আসফিয়ার কাইরো ভ্রমণ প্রস্তাবে উমেদাররা যদি এক পা এগোন তবে তিন পা পিছিয়ে যান। পল, পার্সি আর আমি ছাড়া কেউই পাকাপাকি কথা দেন না, আমাদের পার্টিতে আসছেন কি না। অথচ ঘড়িঘড়ি তরো-বেতরো প্রশ্ন। গাড়ি যদি মিস্ করি, কাইরোতে হোটেলে যদি জায়গা না মেলে, যদি রাত্রিবেলা হয় আর আকাশে চাঁদ না থাকে তবে পিরামিড দেখব কি ক'রে, আরো কত কি বিদঘুটে সব প্রশ্ন। ওদিকে আবুল আসফিয়া আপন কেবিনে খিল দিয়ে শুয়ে আছেন। প্রশ্নের ঠেলা সামলাতে হচ্ছে আমাদেরই —আমরা যেন ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম ভারতীয় ভাইসরয়! শেষটায় আমরাও গা-ঢাকা দিতে আরম্ভ করলুম।

সন্ধ্যার ঝোঁকে জাহাজ সুয়েজ বন্দরে পেঁছিল। সুয়েজ খালের মুখে এসে জাহাজ নোঙর ফেলতেই ডাঙা থেকে একটা স্টীম-লঞ্চ এসে জাহাজের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। তখন জানা গেল আবুল আসফিয়ার দলে সবসুদ্ধ আমরা নজন যাচ্ছি। তাঁকে নিয়ে দশ জন।

কুকের গাইড স্টীম-লঞ্চে করে ডাঙা থেকে জাহাজে এসেছিল। দেখলুম, তার দলে বারো জন যাত্রী। তা হলে আমাদের দশ জন এমন মন্দ কি!

গাইড চড়চড় করে সিঁড়ি বেয়ে লঞ্চে নামল—পিছনে পিছনে তার দলের বারো জন নামল পাণ্ডা-গরুর ন্যাজ ধরে পাপী যে রকম ধারা বৈতরণী পেরোয়। আমাদের আবুল আসফিয়াও চচ্চড় করে নামলেন যেন কত যুগের ঝানু গাইড!

কুকের গাইড এ রকম ব্যাপার আগে কখনো দেখে নি। তার তদ্বির জিম্মেদারী উপেক্ষা করে এক পাল লোক চলেছে আপন গোঠ বেঁধে—এতখানি রিস্ক্ নিয়ে—এ ব্যাপার তার কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। আবুল আসফিয়ার দিকে যে ধরনে তাকালে তাতে সে দুর্বাসা হলে তিনি নিশ্চয়ই পুড়ে খাক হয়ে যেতেন—উনিই তো তার মক্কেল মেরেছেন।

তখন ভালো করে দেখলুম আবুল আসফিয়ার নবীন বেশভূষা। সেই

ঝুলে-পড়া আঠারো-পকেটি কোট, মাটি-ছোঁয়া চোঙা-পানা পাতলুন তিনি বর্জন করে পরেছেন, একদম ফার্স্ট ক্লাস নেভি ব্লু সুট—কোট, পাতলুন ওয়েস্ট কোট সমেত—সোনালি বেনারসি সিল্কের টাই, তদুপরি ডাইমন্ড টাই-পিন, পায়ে পেটেন্ট লেদারের মোলায়েম জুতো, তদুপরি ফন্ রঙের স্প্যাট, মাথায় উচ্চাঙ্গের ফেলট্ হ্যাট, গরম বলে বাঁ হাতে ধরে রেখেছেন নেবু রঙের কিড্ গ্লাভস্ ডান হাতে চামড়ার একটি পোর্টফোলিয়ো।

বিবেচনা করলুম, এই সুটে আঠারোটা পকেট নেই বলে তিনি পোর্ট-ফোলিয়োতে টফি চক্‌লেট, সিগরেট্ ভর্তি করেছেন।

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ঘন নীলাকাশ কেমন যেন সূর্যের লাল আপন নীলে মিলে বেগুনি রঙ ধরতে আরম্ভ করলে। তারই আভাতে লাল দরিয়ার আনীল জলে ফিকে বেগুনি রঙ ধরে নিচ্ছে। ভূমধ্যসাগর থেকে, একশ মাইল পেরিয়ে আসছে মন্দমধুর ঠাণ্ডা হাওয়া। সে হাওয়া লাল দরিয়ার এই শেষ প্রান্তে তুলেছে ছোট ছোট তরঙ্গ। তার-ই উপর দিয়ে দুলে দুলে আসছে আমাদের স্টীমলঞ্চ। তার রঙ আসলে সাদা কিন্তু এই নীল লাল বেগুনির পাল্লায় পড়ে তারো রঙ যেন বেগুনি হতে আরম্ভ করলে।

স্টীমলঞ্চটি শুভ্রপুচ্ছ রাজহংসবৎ। রাজহাঁস সাঁতার কেটে যাবার সময় যে রকম শুভ্র বীচিতরঙ্গ জাগিয়ে তোলে, এ তরণীটিও তেমনি প্রপেলারের তাড়নায় জাগিয়ে তুলছে শুভ্র ফেননিভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রে অসংখ্য চক্রাবর্ত। বড় জাহাজের বিরাট প্রপেলার যখন এ রকম আবর্ত জাগায় তখন সেদিকে তাকাতে ভয় করে, মনে হয় ঐ দয়ে পড়লে আর রক্ষে নেই কিন্তু ক্ষুদে লঞ্চের ছোট্ট ছোট্ট দয়ের একটি সরল মাধুর্য আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকা যায়।

সূর্য অস্ত গেল মিশর মরুভূমির পিছনে। পদ্মার সূর্যাস্ত, সমুদ্রের সূর্যাস্ত যেমন আপন আপন বৈশিষ্ট ধরে ঠিক তেমনি মরুভূমির সূর্যাস্তও এক দর্শনীয় সৌন্দর্য। সোনালী বালিতে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে সেটা আকাশের বুকে হানা দেয় এবং ক্ষণে ক্ষণে সেখানকার রঙ বদলাতে থাকে। তার একটা রঙ ঠিক চেনা কোন জিনিসের রঙ সেটা বুঝতে না বুঝতে সে রঙ বদলে গিয়ে অন্য জিনিসের রঙ ধরে ফেলে। আমাদের কথা বাদ দাও, পাকা আর্টিস্টরা পর্যন্ত এই রঙের খেলা দেখে আপন রঙের পেলেটের দিকে তাকাতে চান না।

সুয়েজ বন্দরে ইংরেজ সৈন্যদের একটা ঘাঁটি আছে। তাই রবি ঠাকুরের ভাষায় 'বড় সায়েবের বিবিগুলো নাইতে নেমেছে।' কেউ আবার ছোট্ট ছোট্ট নৌকো করে এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করছে। নোকোগুলি হালফ্যাশনের ক্যাম্বিসে তৈরী। নৌকোর পাঁজর ভেনেস্তা কাঠের দড় শলা দিয়ে বানিয়ে তার উপর ক্যাম্বিস মুড়ে দেওয়া হয়েছে। এ জাতীয় নৌকো কলাপ্ সিবল্-পোর্টেবল্ অর্থাৎ নৌ-ভ্রমণের পর ভেনেস্তার পাঁজর আর ক্যাম্বিসের চামড়া আলাদা আলাদা করে নিয়ে, ব্যাগের ভিতর প্যাক্ করে বাড়ি নিয়ে যাওয়া যায়। ওজন দশ সেরের চেয়েও কম। পরিপাটি ব্যবস্থা। অবশ্য নৌকো-গুলো খুবই ছোট। দুজন মুখোমুখি হয়ে কায়ক্লেশে বসতে পারে।

মাঝখানে সামান্য একটু ফাঁকা জায়গা সেখানে জল বাঁচিয়ে টুকিটাকি জিনিস রাখার ব্যবস্থা আছে। একজোড়া গুণী দেখি সেখানে একটা পোর্টেবলের উপর রেকর্ড লাগিয়েছে ব্লু ডানয়্যুবের।

ঐ তো মানুষের স্বভাব, কিংবা বলব বঙ্গজাতি। যেখানে আছে সেখানে থাকতে চায় না। যে জোড়া ব্লু ডানয়্যুব বাজাচ্ছে তাদের যদি এক্ষুনি ডানয়্যুব নদীর উপরে ভাসিয়ে দাও তবে তারা গাইতে শুরু করবে, 'মাই হার্ট ইজ ইন্ দি হাইল্যান্ড ; মাই হার্ট ইজ নট্ হিয়ার' !

তাকে যদি তখন তুমি স্কটল্যান্ডের হাইল্যান্ডে নিয়ে যাও তবে সে গাইতে আরম্ভ করবে, 'ইম্ রোজেন-গার্তন ফন্ সাঁসুসী' অর্থাৎ 'সাঁসুসীর গোলাপ-বাগানে'—সাঁসুসী পৎস্‌দামে, বার্লিনের কাছে। তখন যদি তুমি তাকে বার্লিন নিয়ে যাও তবে সে গাইতে আরম্ভ করবে ভারতবর্ষের গান। জর্মানির বড় কবি কি গেয়েছেন শোনো,

গঙ্গার পার—মধুর গন্ধ ত্রিভুবন আলো ভরা—
কত না বিরাট বনস্পতিরে ধরে
পুরুষ রমণী সুন্দর আর শান্ত প্রকৃতি-ধরা
নতজানু হয়ে শতদলে পূজা করে।

আম্ গাঙ্গেস্ ডুফ্‌টেট্‌স্ লয়েশ্টট্‌স্
উন্‌ট্ রীসেন্‌বয়মে ব্লুয়েন,
উন্‌ট্ শ্যোনে স্টিলে মেনশেন
ফর্ লটসব্লুমেন ক্লিয়েন।

এবং সেখানেও যখন মন ওঠে না তখন গেয়ে ওঠেন স্বপ্নপুরীর গান, যে পুরী কেউ কখনো দেখে নি, যার সঙ্গে আমাদের মত সাধারণ জনের কোনই পরিচয় নেই, কবিরাই শুধু যাকে মর্ত্যলোকে নামিয়ে আনার চেষ্টা করেন—

কোথা হায় সেই আনন্দনিকেতন ?
স্বপ্নেই শুধু দেখি সে ভুবন আমি,
রবিকর এল, কেটে গেছে হায়, যামী
ফেনার মতন মিলে গেল এ স্বপন।

আখ, ইয়েনেস লান্‌ট ডের্ ভনে,
ডাস্ জে ইষ্ অফ্‌ট্ ইম্ ট্রাউম ;
ডখ্ কম্‌ট্ ডী মর্গেন্‌জনে,
ফেরফ্লীস্‌ট্‌স্ ভী আইটেল্‌শাউম।

আমি কিন্তু যেখানে আছি সেখানে থাকতেই ভালোবাসি। নিতান্ত বিপদে না পড়লে আমি আপন গাঁ ছেড়ে বেরতে রাজী হই নে। দেশভ্রমণ আমার দু চোখের দুশমন। তাই যখন রবিঠাকুর আপন ভূমির গান গেয়ে ওঠেন তখন আমি উদ্বাহু হয়ে নৃত্য আরম্ভ করি। শোনো—

তোমরা বল, স্বর্গ ভালো
সেথায় আলো
রঙে রঙে আকাশ রাঙায়
সারা বেলা
ফুলের খেলা
পারুলডাঙায় !
হক না ভালো যত ইচ্ছে—
কেড়ে নিচ্ছে
কেই বা তাকে বলো, কাকী ?
যেমন আছি
তোমার কাছেই
তেমনি থাকি !
ঐ আমাদের গোলাবাড়ি
গোরুর গাড়ি
পড়ে আছে চাকা ভাঙা,
গাবের ডালে
পাতার লালে
আকাশ রাঙা।
সন্ধ্যেবেলায় গল্প বলে
রাখো কোলে
মিটমিটিয়ে জ্বলে বাতি।
চালতা-শাখে
পেঁচা ডাকে
বাড়ে রাতি।
স্বর্গে যাওয়া দেব ফাঁকি
বলছি, কাকী,
দেখব আমায় কে কী করে।
চিরকালই
রইব খালি।
তোমার ঘরে।

এ ছেলে তার কাকীমার কোলে বসে গলা জড়িয়ে যা বলেছে সে-ই আমার প্রাণের গান, তাতে আমার সর্ব দেহ-মন সাড়া দেয়। বিস্তর দেশভ্রমণের পর আমি তাই এই ধরণের একটি কবিতা লিখেছিলুম। কত না ঝুলোঝুলি, তারো বেশী ধন্নে দেবার পর যখন কোনো সম্পাদক সেটা ছাপতে রাজী হন নি—'বসুমতী'র সম্পাদকও তাঁদেরই একজন—তখন তোমাদের ঘাড়ে আজ আর সেটা চাপাই কোন অধর্ম বুদ্ধিতে ?

দুম করে ধাক্কা লাগতে সংবিতে ফিরে এলুম। লঞ্চ পাড়ে লেগেছে। কিন্তু

এরকম ধাক্কা লাগায় কেন ? আমাদের গোয়ালন্দ চাঁদপুরে তো এরকম বেয়াদবী ধাক্কা দিয়ে জাহাজ পাড়ে ভিড়ে না !

আবার !

'সেই পূর্ণিমা-সন্ধ্যায়,
দেশ পানে মন ধায়।'

॥ ১৩ ॥

সুয়েজ বন্দর কিছু ফেলনা বন্দর নয়। বন্দরটার 'সামরিক' গুরুত্ব—স্ট্রাটেজিক ইম্পর্টেন্স্—আছে বলে ইংরাজকে তার নৌবহরের একটা অংশ এখানে রাখতে হয়। যে সব গোরাদের ক্যাম্বিসের নৌকোয় করে জলকেলি করতে দেখেছিলুম তারাই এই সব নৌবহরের তদারকি করে। ফলে তাদের জন্য এখানে দিব্য একটা কলোনি গড়ে উঠেছে।

কিন্তু কিছুই নয়, কিছুই নয়, পূর্বের তুলনায় আজ সুয়েজ বন্দরের কি আর জমক জৌলুস ! কেপ অব গুড হোপের পথ না বেরনো পর্যন্ত, এমন কি তার পরও ভারতবর্ষ, বর্মা, মালয়, যবদ্বীপ, চীন থেকে যে-সব জিনিস রপ্তানি হত তার অধিকাংশই সমুদ্রপথে এসে নামত সুয়েজ বন্দরে—এবং ভুললে চলবে না, তখনকার দিনে প্রাচ্যই রপ্তানি করত বেশী। এখান থেকেই ফিনিশিয়ানরা, তার পরে গ্রীক, তার পর রোমান, তারপর আরবরা ভারতের দিকে রওয়ানা হত। ভারত থেকে মাল এনে সুয়েজে নামানো হত। সুয়েজ থেকে একটা খালে করে এসব মাল যেত কাইরোতে এবং সেখান থেকে নীল নদ বয়ে সে মাল পঁছিত আলেক-জেনড্রিয়ার—আরবীতে যাকে বলে ইস্কন্দরিয়া। সেখান থেকে ভেনিসের মাধ্যমে তাবৎ ইয়োরোপ।

এই সব মাল কেনা-কাটা আমদানি রপ্তানিতে ভারতবর্ষের প্রচুর সদাগর-শ্রেষ্ঠী, মাঝি-মাল্লার বিরাট অংশ ছিল। যে যুগে ভাস্কো-দা-গামা এ পথকে নাকচ করে দেবার জন্য আফ্রিকা ঘুরে ভারতে আসার পথ বের করলেন সে যুগে পূর্বপ্রাচ্যের তাবৎ ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল ভারতীয় এবং সুয়েজ অঞ্চলের মিশরীয়দের হাতে।

এক দিকে ভারতীয় এবং মিশরীয় ; অন্য দিকে ভাস্কো-দা-গামার বংশধর পর্তুগীজ দল।

জাত তুলে কথা কইতে নেই, তাই ইশারা-ইঙ্গিতে কই। এই যে পর্তুগীজ গুণ্ডারা গোয়া নিয়ে আজ দাবড়াদাবড়ি করছে এ-কিছু নূতন নয়। ওদের স্বভাব ঐ। এক কালে তারা জলের বোম্বেটে ছিল, এখন তারা ডাঙার গুণ্ডা। 'বোম্বেটে' শব্দের মূল আর অর্থ অনুসন্ধান করলেই কথাটা সপ্রমাণ হবে। 'বোম্বেটে' কিছু বাঙালীদের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে বানানো আজগুবি কথা নয়। 'বোম্বেটে' শব্দ এসেছে ঐ পর্তুগীজদের ভাষা থেকেই—bombardeiro, অর্থাৎ যারা না-বলে না-কয়ে যত্র-তত্র bomba—বোমা ফেলে। হয়তো বলবে, আমাদের

কলকাতাতেই কেউ কেউ এরকম বোমা ফেলে থাকে,—কিন্তু তাদের সংখ্যা এতই নগণ্য এবং ঘৃণ্য যে আজ তাবৎ কলকাতাবাসীকে কেউ বোম্বেটে নাম দেয় নি। কিন্তু তাবৎ পর্তুগীজরাই এই অপকর্ম করত বলে তাদের নাম হয়ে গেল 'বোম্বেটে'।

ওদের দ্বিতীয় নাম—আমাদের বাঙলা ভাষাতেই—'হারমদ'। সেটাও পর্তুগীজ কথা 'armada' থেকে এসেছে। বিখ্যাত কোষকার স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস তাঁর সুবিখ্যাত অভিধানে এ শব্দের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন, 'পর্তুগীজ জলদস্যুরা যখন বাঙলা দেশের সুন্দরবন অঞ্চলে প্রথম হানা দেয় তখন তাদের অসহ্য অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাঙালীরা সুন্দরবন অঞ্চল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। আমাদের ঘরোয়া কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে আছে,—

'ফিরিঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বহিয়া যায় হারমদের ডরে॥'

অর্থাৎ এই সব 'হারমদ'—'armada,' 'বোম্বেটে' 'bombardeiro'-দের ডরে তখন দক্ষিণ-বাঙলার লোক নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারত না।

এস্থলে যদিও অবান্তর, তবু প্রশ্ন, বাঙালীরা এত ভয় পেয়ে পালাল কেন?

উত্তরে বলি, যে-কোনো বন্দরে, জাহাজ থেকে নেমে, এক পাল লোক সেটাকে লুট-তরাজ করতে পারে। এটা আদপেই কোনো কঠিন কর্ম নয়, যদি,—

এইখানেই এক বিরাট 'যদি'—

যদি সে রাজা তার সমুদ্র-কূল রক্ষার জন্য নৌবহর মোতায়েন না করেন। জনপদ রক্ষা করার জন্য যে রকম পুলিস-সেপাই রাজাকেই রাখতে হয়, ঠিক তেমনি সমুদ্র-কুলবাসীদের হেপাজতির জন্য রাজাকেই নৌবহর রাখতে হয়।

কিন্তু হায়, তখন বাঙলা দেশ হুমায়ুন, আকবর মোগল বাদশাহের হুকুমে চলে। মোগলরা এদেশে এসেছে মধ্য এশিয়ার মরুভূমি থেকে। তারা শক্ত মাটির উপরে খাড়া পদাতিক, অশ্ববাহিনী, হস্তিযূথ, উষ্ট্রবাহিনী চতুরঙ্গ সৈন্য-সামন্তের কি প্রয়োজন সে-তত্ত্ব বিলক্ষণ বোঝে, কিন্তু নৌবহর রাখার গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন। বাঙলা, উড়িষ্যা, গুজরাত থেকে তাদের কাছে অনেক করুণ আবেদন নিবেদন গেল—'হুজুরেরা দয়া করে একটা নৌবহরের ব্যবস্থা করুন; না হলে আমরা ধনে-প্রাণে মানে-ইজ্জতে গেলুম।'

কথাগুলো একদম শব্দার্থে খাঁটি। 'ধন' গেল, কারণ, পর্তুগীজ বোম্বেটে-দের অত্যাচারে ব্যবসা-বাণিজ্য আমদানী-রপ্তানি বন্ধ। 'প্রাণ' যায়, কারণ তারা বন্দরে বন্দরে লুঠ-তরাজের সময় যে-সব খুন-খারাবি করে তারই ফলে বন্দরগুলো উজাড় হতে চলল। মান-ইজ্জত? ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে পর্তুগালের হাটবাজারে গোলাম-বাঁদী, দাসদাসীরূপে বিক্রয় করছে।

কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! মোগল বাদশারা বসে আছেন পশ্চিম পানে, খাইবার-পাসের দিকে তাকিয়ে। ঐ থেকেই তাঁরা এসেছেন স্বয়ং, তাঁদের পূর্বে এসেছে পাঠান শক্-হুন্-সিথিয়ান্-এরিয়ান। তাই তাঁরা তৈরী করেছেন

চতুরঙ্গ। ওদের ঠেকাবার জন্য। নৌবহর চুলোয় যাক গে। ভারতবর্ষ তো কখনো সমুদ্রপথে পরাজিত এবং অধিকৃত হয় নি। তার জন্য বৃথা দুশ্চিন্তা এবং অযথা অর্থক্ষয় অতিশয় অপ্রয়োজনীয়।

ফলে কি হল? পর্তুগীজদের তাড়িয়ে দিয়ে ইংরেজ সমুদ্রপথেই মোগলদের মুণ্ডু কেটে এদেশে রাজ্যবিস্তার করল।

সেকথা পরের কথা। উপস্থিত আমরা আলোচনা করছি, ভারতীয় উপকূল বাসীরা পর্তুগীজদের সঙ্গে যে লড়াই দিয়েছিল তাই নিয়ে। এরা তো মোগল-দের কাছ থেকে কোনো সাহায্যই পেল না, উলটে যারা লড়ছিল, তাদের সঙ্গে আরম্ভ করলেন শত্রুতা।

গুজরাতের রাজা বাহাদুর শাহ্ বাদশাহ তখন লড়ছিলেন পর্তুগীজ বোম্বেটের সঙ্গে। তার প্রধান কারণ, গুজরাতের সুরট, ব্রউচ (ভৃগু), খম্বাত (Cambay, স্তম্ভপুরী) ভিতর দিয়ে উত্তর-ভারতের যাবতীয় পণ্যবস্তু ইউরোপ যেত। সে ব্যবসা তখন পর্তুগীজ বোম্বেটেদের অত্যাচারে মর-মর। বাহাদুর শাহ্ বাদশার তখন দুই শত্রু। একদিকে সমুদ্রপথে পর্তুগীজ, অন্যদিকে স্থলপথে রাজপুত। প্রথম রাজপুতদের হারিয়ে দিয়ে পর্তুগীজদের খতম করার প্ল্যান করে তিনি পর্তুগীজদের সঙ্গে করলেন—আর্মিস্টিস্—সমরকালীন সন্ধি। তারপর হানা দিলেন রাজপুতানায়।

দিল্লীতে তখন রাজত্ব করেন বাদশা হুমায়ুন। ইতিহাসে নিশ্চয়ই পড়েছ, তখন এক রাজপুতানী শাহ-ইন্-শাহ্ দিল্লীশ্বর জগদীশ্বরকে পাঠালেন রাখী। সেই রাখীর সম্মানার্থে হুমায়ুন ছুটলেন রাজপুতানার দিকে। বুঝলেন না, বাহাদুর শাহ্ হেরে গেলে পর্তুগীজদের আর ঠেকাতে পারবেন না। পূর্বেই বলেছি, নৌবহর নৌসাম্রাজ্য বলতে কি বুঝায়, মোগলরা সে কথা আদপেই বুঝত না।

হুমায়ুন রাজপুতানায় পেঁছিলেন দেরিতে। বাহাদুর শাহ্ বাদশাহ তখন রাজপুতানা জয় করে ফেলেছেন। রাজপুতানীরা জোহরব্রতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। হুমায়ুন তখন আক্রমণ করলেন বাহাদুর শাহকে। বাহাদুর তখন পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন চম্পানির দুর্গে। সেখানে কি করে হুমায়ুন দুর্গ জয় করলেন, সে কাহিনী অবশ্য ইতিহাসে পড়েছ। ইতিমধ্যে বাহাদুর দুর্গ ত্যাগ করে পালিয়েছেন গুজরাতে আপন রাজধানী আহমদাবাদের দিকে। হুমায়ুন সেদিকে তাড়া লাগাতে তিনি পালালেন সৌরাষ্ট্র অর্থাৎ কঠিওয়াড়ার দিকে। সেখানকার কোনো কোনো উপকূলে তখন পর্তুগীজরা বেশ পা জমিয়ে বসেছে।

ইতিমধ্যে হুমায়ুন খবর পেলেন, বিহারের রাজা শের শাহ দিল্লী জয় করার উদ্দেশ্যে সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তদ্দণ্ডেই তিনি বাহাদুরকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে চললেন দিল্লীর দিকে। সেখানে শের শাহের কাছে মার খেয়ে তিনি পালালেন কাবুলে। তারপর শের শাহ ব্যস্ত হয়ে রইলেন, উত্তর ভারতে আপন প্রতিষ্ঠা কায়েম করতে বাহাদুরকে তাড়া দেবার ফুরসত তাঁর নেই।

বাহাদুর হাঁফ ছেড়ে বেঁচে বললেন, 'এইবারে তবে পর্তুগীজ বদমায়েশদের ঠান্ডা করি। পর্তুগীজরা ততদিনে বুঝতে পেরেছে, বাহাদুরের পিছনে তখন আর শত্রু নেই। তাই তারা আরম্ভ করলে তাদের পুরনো বদমায়েশি। বাহাদুর শাহকে আমন্ত্রণ জানালে, তাদের জাহাজে এসে, ব্যবসা-বাণিজ্য সন্ধি-চুক্তি সম্বন্ধে যাবতীয় আলোচনা-পরামর্শ করার জন্য।

বাহাদুর আহাম্মুখের মত কেন গেলেন, সেই নিয়ে বিস্তর ঐতিহাসিক বহু আলোচনা-গবেষণা করেছেন। সে নিয়ে আজ আর আলোচনা করে কোনো লাভ নেই।

তা সে যাই হোক, একথা কিন্তু সত্য, বাহাদুর জাহাজে ওঠা মাত্রই বুঝতে পারলেন, তিনি ফাঁদে পা দিয়েছেন। পর্তুগীজদের বদ-মতলব তাঁকে খুন করার, তাঁর সঙ্গে সন্ধি-সুলেহ্ করার জন্য নয়। তক্ষুনি তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে—সাঁতরে পারে ওঠার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে দশ-বিশটা পর্তুগীজও হাতে বৈঠা নিয়ে তাঁর পিছনে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই সব বৈঠে দিয়ে গুজরাতের শাহ ইন্‌শাহ্ বাদ্‌শাহ্ বাহাদুর শাহের মাথা ফাটিয়ে দিলে।

পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের এই শেষ লড়াই।

* * *

কিন্তু আজ সুয়েজ বন্দরে ঢোকার সময় আমি দেশপানে ফিরে গিয়ে এসব কথা পাড়ছি কেন?

কারণ, এই সুয়েজের রাজাকেই বাহাদুর তখন ডেকেছিলেন তাঁর নৌবাহিনী নিয়ে এসে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে তাঁকে নৌ-সমরে সাহায্য করতে। পূর্বেই বলেছি, সুয়েজও বেশ জানত, পর্তুগীজদের বোম্বেটেগিরি তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কতখানি মারাত্মক। শুধু বাহাদুর নয়, তাঁর পূর্বপুরুষগণও বার বার এঁদের ডেকেছেন, দুয়ে মিলে পর্তুগীজদের একাধিকবার ঝিঙে-পোস্ত চন্দন-বাঁটা করেছেন!

তারা তখন যেসব কামান এনেছিল সেগুলো ফেরত নিয়ে যায় নি। গুজরাতের বাদশা যখন বললেন, 'এগুলো রেখে যাচ্ছেন কেন?' তখন তারা বলেছিল, 'এই সব পর্তুগীজ বদমায়েশরা আবার কখন হানা দেবে তার ঠিক-ঠিকানা কি? আবার তখন কামান নিয়ে আসার হাঙ্গামা-হুজ্জোত ঠেলবার কি প্রয়োজন?'

এ ঘটনার দশ বৎসর পর আকবর গুজরাত জয় করেন। তিনি কামান-গুলো দেখে তাদের পূর্ববর্তী ইতিহাস জেনেও নৌ-বাহিনী নৌ-সমরের মূল্য বুঝতে পারেন নি। তাই পর্তুগীজরা জিতল। তাদের হারিয়ে দিয়ে ইংরেজ জিতল। ক্রমে ক্রমে মাদ্রাজ কলকাতা হয়ে তাবৎ ভারতবর্ষে আপন রাজ্য বিস্তার করল।

* * *

আজ সুয়েজে ঢুকে সেই কথাই স্মরণে এল, এই সুয়েজের লোকই একদিন আমাদের সঙ্গে একজোট হয়ে পর্তুগীজ বর্বরতার বিরুদ্ধে কী লড়াই-ই না দিয়েছিল!

সম্বিতে ফিরে এলুম। দেখি, বখেড়া লেগে গিয়েছে। বন্দরে নেমে যে দপ্তরের ভিতর দিয়ে যেতে হয় সেখানে আমাদের—অর্থাৎ আবুল আসফিয়ার দলকে আটকে দিয়েছেন বন্দরের কর্তারা। কেন, কি ব্যাপার? আমাদের হেল্‌থ সার্টিফিকেট কই? সে আবার কি জ্বালা? দিব্য তো বাবা লঞ্চ থেকে নেমে পায়ে হেঁটে এখানে এলুম, স্ট্রেচারে চেপে কিংবা মড়ার খাটিয়ায় শুয়ে আসে নি; তবে আমাদের হেল্‌থ সম্বন্ধে এত সন্দ কেন? 'উঁহুঁ', কর্তারা বলছেন, আমরা যে ভিতরে ভিতরে বসন্ত, প্লেগ, কলেরা, ৎসেৎসে জ্বর (সে আবার কি মশাই?) স্পটেড ফীভার (ততোধিক সমস্যা; আলপনা-কাটা জ্বর?) ইত্যাদি যাবতীয় মারাত্মক রোগে ভুগছি না তার সার্টিফিকেট কই। আমরা যে এসব পাপিষ্ঠ রোগ তাঁদের সোনার দেশ মিশরে ছড়াব না, তার কি জিম্মাদারি?

শুনে পার্সি বলছে, 'স্যর, এসব মারাত্মক রোগেই যদি ভুগব, তবে বাপ-মার সেবাশুশ্রূষা ছেড়ে, পাদ্রীসাহেবের শেষ ধর্মবচন না শুনে এখানে আসব কেন?'

দ্যাশের লোক প্রতুল সেন বলছে, 'মিশরের সঙ্গে এরকম ধারা দুশমনি আমরা করতে যাব কেন?'

তার বউ রমা বলছে, 'পিরামিড তোমাদের গৌরবের বস্তু; আমাদের যে-রকম তাজমহল। তার কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ সে বিচারের সুযোগ না দিয়ে আপনারা আপন দেশের প্রতি কি অবিচার করছেন, বুঝতে পারছেন কি?'

আমি কানে কানে রমাকে শুধালুম, 'তবে কুকের সঙ্গে যে সব লোক এসেছিল তারা পেরুল কি করে?'

রমা বললে, 'চুপ করুন; ওরা যে ঐ সব হলদে হলদে কাগজ দেখালে। আমাদেরও আছে। জাহাজে ফেলে এসেছি। আমরা তো জানতুম না এখানে ওসব রাবিশের দরকার হবে। কুকের লোক জানত, ওরা তাই সার্টিফিকেট এনেছিল।'

ওঃ! তখন মনে পড়ল, পাসপোর্ট নেবার সময় ভ্যাক্‌সিনেশন ইনকুলেশন করিয়েছিলুম বটে এবং ফলে একখানা হলদে রঙের সার্টিফিকেটও পেয়েছিলুম বটে। সেইটে নেই বলেই এখানে এ গর্দিশ।

কিন্তু এ শিরঃপীড়া তো আমাদের নয়। আবুল আসফিয়া যখন আমাদের দলের নেতা তখন তাঁরই তো বোঝা উচিত ছিল যে ঐ ম্যাটমেটে হলদে রঙের কাগজটা আমাদের সঙ্গে নিয়ে আসা অতিশয় প্রয়োজনীয়। এই সামান্য কাণ্ড-জ্ঞান যার নেই—

চিন্তাধারায় বাধা পড়ল। দেখি, পল আমার হাত টানছে, আর কানে কানে বলছে, 'চলুন, জাহাজে ফিরে যাই।'

কিন্তু আবুল আসফিয়া কোথায়?

তিনি দেখি নিশ্চিন্ত মনে, একে সিগরেট দিচ্ছেন, ওকে টফি খাওয়াচ্ছেন, তাকে চকলেট গেলাচ্ছেন। কোলে আবার একটা বাচ্চা! খোদায় মালুম কার?

লোকটা তাহলে বদ্ধ পাগল! পাগলের সংস্পর্শ ত্যাগ করাই ধর্মাদেশ।

পলের হাত ধরে পোর্ট-আপিস ছেড়ে সমুদ্রের কিনারায় পেঁছিলুম। তখন দেখি আমাদের জাহাজ ভোঁ-ভোঁ করে ভোঁ-ভোঁ।

॥ ১৫ ॥

দেশভ্রমণ আমি বিস্তর করেছি। সামান্য কিছু ঘটতে না ঘটতেই আমি বিচলিত হয়ে পড়ি নে। রিফ্রেশমেণ্ট রুমে চা খেতে গিয়েছি, ওদিকে গাড়ি আমার বাক্স-তোরঙ্গ বিছানা-বালিশ নিয়ে চলে গিয়েছে, বিদেশে-বিভুঁইয়ে মনি-ব্যাগ চুরি যাওয়াতে আমি কপর্দকহীন, ইতালির এক রেস্তোরাঁয় দুই দলে ছোরা-ছুরি হচ্ছে—আমি নিরীহ বাঙালী এক কোণে দেয়ালের চুনকামের মতো হয়ে গিয়ে আত্ম-গোপন করার চেষ্টা করছি—এ সব ঘটনা আমার জীবনে একাধিকবার ঘটেছে কিন্তু এবার সুয়েজ বন্দরে, আবুল আসফিয়ার পাল্লায় পড়ে যে বিপদে পড়লুম তার সঙ্গে অন্য কোনো গর্দিশের তুলনা হয় না।

আমাদের জাহাজ তার আপন পথে চলে গিয়েছে। আমরা এখানে আটকা পড়েছি হেল্‌থ সার্টিফিকেট নেই বলে। তা হলে এখানকার কোনো হোটেলে উঠতে হয় এবং প্রতি জাহাজে ধন্না দিতে হয়, আমাদের জায়গা দেবে কি না। খুব সম্ভব দেবে না। কারণ সেই পোড়ারমুখো হেল্‌থ সার্টিফিকেট না থাকলে জাহাজেও উঠতে দেয় না। এস্থলে 'জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ' নয়, এখানে 'জলে সাপ, ডাঙায়ও সাপ।'

জাপানী আক্রমণের সময় একটা গাঁইয়া গান শুনেছিলুম,

সা রে গা মা পা ধা নি
বোমা পড়ে জাপানী
বোমা-ভরা কালো সাপ
ব্রিটিশে কয় 'বাপ রে, বাপ!'

তাই মনে হল, জাপানীরা যেন জলে ডাঙায়, উভয়ত হেল্‌থ সার্টিফিকেটের সাপ ফেলে গেছে।

আর ডাঙার হোটেলে থাকতে দেবেই বা কদিন? আমাদের ট্যাঁকে যা কড়ি তার খবর হোটেলওয়ালা ঠিক ঠিক ঠাহর করতে পেরে নিশ্চয়ই আমাদের 'দুদ্দুর' করে তাড়িয়ে দেবে। তখন যাব কোথায়, খাব কি? তখন অবস্থা হবে সুয়েজ বন্দরের ধনী-গরিব সকলের কাছে ভিখ-মাঙবার। কিন্তু কেউ কিছু দেবে কি? রেল-ইস্টিশানে যখন কেউ এসে বলে, 'মশাই, মনিব্যাগ চুরি গিয়েছে; চার গণ্ডা পয়সা দিন, বাড়ির ইস্টিশানে যেতে পারব, 'তখন কি কেউ শোনা মাত্রই পয়সা ঢালে?

ইয়া আল্লা, এ কোথায় ফেললে, বাবা ? এ যেন অকুল সমুদ্রের মাঝখানে দ্বীপবাস।

মানুষ যখন ভেবে ভেবে কোনো কিছুর কুল-কিনারা করতে পারে না তখন অন্যের উপর নির্ভর করার চেষ্টা করে। পল-পার্সিকে নিয়ে ফিরে গেলুম আবুল অসফিয়ার কাছে।

তিনি দেখি ঠিক সেই মুহূর্তেই পোর্ট অফিসারকে শুধাচ্ছেন, তা হলে হেল্‌থ সার্টিফিকেট কোথায় পাওয়া যায় ?'

এ যেন পাগলের প্রশ্ন ! হেল্‌থ সার্টিফিকেট তো পাওয়া যাও আপন দেশে ; এখানে পাব কি করে ?

তাই আপন কানকে বিশ্বাস করতে পারলুম না যখন অফিসার বললেন, 'কেন, ঐ তো পাশের দফ্‌তরে।'

তাহলে এতক্ষণ ধরে এ-সব টানা-হ্যাঁচড়ার কি ছিল প্রয়োজন ? ভালো করে শোনার পূর্বেই আমরা সব কটা প্রাণী ছুট দিলুম সেই দফ্‌তরের দিকে। জলের সাপ, ডাঙার সাপ, সা-রে গা-মার জাপানী সাপ সব কটা তখন এক জোটে যেন আমাদের তাড়া লাগিয়েছে।

দফ্‌তরের দরওয়াজা খোলাই ছিল। দেখি, এক বিরাট-বপু ভদ্রলোক ছোট্ট একখানা চেয়ার তাঁর বিশাল কলেবর গুঁজে-পুরে টেবিলের উপর পা দুখানি তুলে ঘুমুচ্ছেন। আমরা অট্টরোল করে না ঢুকলে নিশ্চয়ই তাঁর নাকের ফরফরানি শুনতে পেতুম। আমাদের, 'হেল্‌থ সার্টিফিকেট,' 'হেল্‌থ সার্টিফিকেট, 'প্লীজ' 'প্লীজ' এই উৎকট সমবেত সঙ্গীতে—অবশ্য ইয়োরোপীয় সঙ্গীত, যার এক সপ্তকে বাজে তোড়ী অন্য সপ্তকে পূরবী—ভদ্রলোক চেয়ার-সুদ্ধ লাফ মেরে উঠলেন।

শতকরা নিরানব্বুই জন যাত্রী হেল্‌থ সার্টিফিকেট নিয়ে বন্দরে নামে। সুতরাং এ ভদ্রলোকের শতকরা নিরানব্বুই ঘণ্টাই কাটে আধো ঘুমে, আধো জাগরণে। তাই আমরা কি বেদনায় কাতর হয়ে তাঁর কাছে এসেছি, সেটা বুঝতে তাঁর বেশ একটু সময় লাগল।

তাঁর ভাষা আমরা বুঝি নে, তিনি আমাদের ভাষা বোঝেন না। তৎসত্ত্বেও যে মারাত্মক দুঃসংবাদ তিনি দিলেন তার সরল প্রাঞ্জল অর্থ, যে-ডাক্তার আমাদের পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট দেবেন তিনি বাড়ি চলে গেছেন।

গোটা সাতেক ভাষায় তখন যে আর্তরব উঠলো তাকে বাঙলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়,—

ঐ যু-যা !

ফরাসীরা বলেছিল, 'ম' দিয়ো, ম' দিয়ো !'

জর্মনরা বলেছিল, 'হের গট্‌, হের গট্‌ !'

ইরাণীরা বলেছিল, 'ইয়াল্লা, ইয়া খুদা।'

আর কে কি বলেছিল, মনে নেই।

কিন্তু সৃষ্টিকর্তার অসীম করুণা, আল্লাতালার বেহদ্‌ মেহেরবানি, রাখে কেষ্ট মারে কে, ধন্যবাদ ধন্যবাদ, শুনি অপিসার বলছেন, 'কিন্তু আপনারা যখন

বহাল তবিয়তে, দিব্য ঘোরাফেরা করছেন, তখন আপনারা নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যবান। সার্টিফিকেট আমিই দেব। এই নিন ফর্ম। ফিল্ অপ্ করুন।' বলেই এক-তাড়া বিশ্রী নোংরা বাদামী ফরম আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। কিন্তু আমার মনে হল, আহা কী সুন্দর! যেন ইস্কুলের প্রোগ্রেস-রিপোর্ট, আর সব ক-টাতে লেখা আছে আমি ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছি।

শকুনির পাল যে রকম মড়ার উপর পড়ে, আমরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লুম সেই 'গাজী মিয়ার বস্তানির' উপর। উহুঁ, ভুল উপমা হল, বীভৎস রসের উপমা দিতে আলংকারিকরা বারণ করেছেন। তাহলে বলি, ফাঁসির হুকুম নাকচ করে দেবার অধিকার পেলে মা যে রকম নাকচের ফর্মের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

উৎসাহে, উত্তেজনায় আমাদের সব্বাইকার মাথা তখন ঘুলিয়ে গিয়েছে। ফর্মে প্রশ্ন, 'কোন সালে তোমার জন্ম?' কিছুতেই মনে পড়ছে না, ১৮০৪—না ১৭০৪? প্রশ্ন, 'কোন বন্দরে জাহাজ ধরেছ?' বেবাক ভুলে গিয়েছি, হংকং না তিব্বত! প্রশ্ন, 'যাবে কোথায়?' হায়, হায়, টাকের বাকি আড়াই গাছা চুল ছিঁড়ে ফেললুম, তবু কিছুতেই মনে পড়ছে না, শনিগ্রহে না ধ্রুবতারায়!

তা সে যাক্ গে, আমরা কি লিখেছিলুম তাই নিয়ে উৎকণ্ঠিত হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। পরে জানলুম, সেই সহৃদয় অপিসারটি ইংরিজি পড়তে পারেন না।

ঝপাঝপ বেগনি স্ট্যাম্প মেরে তিনি আমাদের গণ্ডা আড়াই সার্টিফিকেট ঝেড়ে দিলেন। আমরা সেগুলো বসরাই গোলাপের মতো বুকে গুঁজে খোলা-খোঁয়াড়ের গরুর মতো বন্দরের অপিস থেকে সুড়সুড় করে স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে বেরিয়ে এলুম। এখন আমরা ইচ্ছে করলে কেপ্ কম্‌রিন যেতে পারি, ইচ্ছে না করলে কোথাও যাবো না।

পল বললে, 'স্যর, কি লিখতে কি লিখেছি, কিচ্ছুটি জানি নে।'

আমি বললুম, 'কিচ্ছু পরোয়া কোরো না, ভাই! আম্মো তদবৎ!'

ফরাসী রমণী হেসে বললেন, 'মসিয়ো পল, আমাকে যদি জিজ্ঞেস করত, তুমি বকরী না মানুষ? তা হলে আমি প্রথম খানিকটে ব্যা ব্যা করে নিতুম, তার পর আপন মনে খানিকটে ফরাসী বলে নিয়ে দেখতুম কোন্‌টা ভালো শোনাচ্ছে এবং সেই হিসেবে লিখে দিতুম বক্‌রী না মানুষ।'

তারপর খানিকটে ভেবে নিয়ে বললেন, 'অবশ্য বকরীর সম্ভাবনাই ছিল বেশী।'

আমার বুকে বজ্র বাজল। নিজের প্রতি এ যে অতিশয় অহেতুক অশ্রদ্ধা। বললুম, 'মাদ্‌মোয়াজেল, বরঞ্চ 'কোকিল' লিখলে আমি আপত্তি জানাতুম না। আপনার মধুর কণ্ঠ—'

'ব্যস, ব্যস, হয়েছে, হয়েছে; থ্যাঙ্কয়্যু!'

ততক্ষণে রেল-স্টেশনের কাছে এসে পেঁছেচি। দূর থেকে দেখি, ট্রেন দাঁড়িয়ে। আমরা পা চালালুম। কিন্তু গেটের কাছে আসতে না আসতেই ট্রেন-খানা 'ধ্যাৎ, ধ্যাৎ' করে যেন আমাদের ঠাট্টা করে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে গেল।

এবং একটা লোক—চেনা-চেনা মনে হল—আমাদের দিকে হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে বিদায় জানালে, তার পর যেন কত না বিরহবেদনাতুর সেই ভাবে দু-হাতের উল্টো দিক দিয়ে অদৃশ্য অশ্রু মুছলে।

এ মস্করার অর্থ কি ?

শুনলুম, আজ সন্ধ্যায় কাইরো যাবার শেষ ট্রেন এই চলে গেল। কাল সকালের ট্রেন ধরলে কাইরো মাথায় থাকুন সঈদ বন্দরে পেঁছিতে পারব না, অর্থাৎ নির্ঘাত জাহাজ মিস করব। এই শেষ ট্রেন ছিল আমাদের শেষ ভরসা।

এ দুঃসংবাদ শুনে আমি তো মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়লুম।

কিন্তু ভগবান মানুষকে নিয়ে এ রকম লীলা-খেলা করেন কেন ? সেই যদি সুয়েজ বন্দরে আটক হতে হল, সেই যদি বোট্ মিস করতে হল, তবে ঐ হেল্থ সার্টিফিকেটের প্রথম খোঁয়াড়ে আটকা পড়লেই তো হত। সে ফাঁড়া কাটিয়ে এসে এখানে আবার কানমলা খাবার কি প্রয়োজন ছিল ?

শুনেছি, কোনো কোনো জেলার ফাঁসির আসামীকে নাকি গারদের দরজা সামান্য খুলে রেখে জেল থেকে পালাবার সুযোগ দেয়। আসামী ভাবে, জেলার বেখেয়ালে দরজা খুলে রেখে গিয়েছে। তার পর অনেক গা-ঢাকা দিয়ে, একে এড়িয়ে, ওকে বাঁচিয়ে যখন সে জেলের সামনে মুক্ত বাতাসে এসে ভাবে সে বেঁচে গেছে, ঠিক তখনই তাকে জাবড়ে ধরে দুই পাহারাওয়ালা—সঙ্গে জেলার। জেলার তাকে চুমো খেয়ে বলে, 'ভাই, জীবন কত দুঃখে ভরা। তার থেকে তুমি নিষ্কৃতি পাবে, কাল ভোরে। আহাম্মুখের মতো সে-নিষ্কৃতি থেকে এই হেয় নিষ্কৃতির চেষ্টা তুমি কেন করছিলে, সখা ?'

পরদিন তার ফাঁসি হয়।

আমার মনে হয়, ফাঁসির চেয়েও ঐ যে জেলের বাইরে ধরা-পড়া সেটা অনেক কঠোর, কঠিন, নির্মম।

কারণ, মৃত্যু, সে তো কিছু কঠিন কঠোর অভিজ্ঞতা নয়। ডাক্তাররাও বলেন, রোগে মানুষ কষ্ট পায়, কিন্তু ঠিক প্রাণত্যাগ করার সময় মানুষ কোনো বেদনা অনুভব করে না।

তাই গুরুদেব বলছেন,—

"কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়
জয় অজানার জয় !"

ঠিক সেই রকমই এক মহাপুরুষ—হিটলারের নৃশংসতার বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন বলে এঁর ফাঁসি হয়—জেলে বসে কবিতা লিখেছিলেন,

ডু কান্‌সট্ উন্‌স্ ডুর্ষ্ ডেস টডেস ট্যুরেন্
ট্রয়েমেন্ত্ ফ্যুরেন্
উন্‌ট্ মাখস্‌ট্ উন্‌স্ আউফ আইনমাল্ ফ্রাই।

তুমি আমাদের মৃত্যুর দ্বার দিয়ে হাতে ধরে নিয়ে চল।
—আমরা যেন স্বপ্নে চলেছি—
হঠাৎ দেখি, আমরা স্বাধীন।

এই বই ছোটদের জন্য লেখা। তারা হয়তো শুধবে, মৃত্যুর কথা তাদের শোনাচ্ছি কেন? আমার মনে হয়, শোনানো উচিত। সাধারণত বড়রা ছোটদের যত আহাম্মুখ মনে করেন আমি বুড়ো হয়েও সে রকম ভাবি নে।

আমার যখন বয়স তেরো, তখন আমার সব চেয়ে ছোট ভাই বছর দুয়েক বয়সে মারা যায়। ভারী সুন্দর ছেলে সে। আমার কোলে বসতে বড্ড ভালোবাসত। ঐ দু বছর বয়সে সে আমার সাইকেলের রডে বসে হ্যাণ্ডেল আঁকড়ে ধরে থাকত আর আমি বাড়ির লনে পাক লাগাতুম। মাঝে মাঝে সে খল-খল করে হেসে উঠত আর মা বারন্দায় দাঁড়িয়ে খুশী হয়ে আমাদের দিকে তাকাতেন কিন্তু মাঝে মাঝে বলতেন, 'থাক, হয়েছে। এখন ওকে তুই নামিয়ে দে।'

এক দিন সে চলে গেল।

আমি বড্ড কষ্ট পেয়েছিলুম।

তখন আমায় কেউ বুঝিয়ে বলে নি, মৃত্যু কাকে বলে? তার অর্থ যদি আমাকে তখন কেউ বুঝিয়ে বলত তবে বেদনা লাঘব হত।

বড়রা ভাবেন, ছোটদের বেদনাবোধ কম। সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

তোমরা যারা আমার বই পড়ছ, তোমাদের কেউই কি ভাইবোন হারাও নি? সে বুঝবে।

কবিগুরুর ছোট ভাই-বোন ছিলেন না। তাই বিস্ময় মানি, তিনি কি করে লিখলেন,—

কাকা বলেন, সময় হলে
সবাই চলে
যায় কোথা সেই স্বর্গপারে।
বল্ তো কাকী
সত্যি তা কি একেবারে?
তিনি বলেন, যাবার আগে
তন্দ্রা লাগে
ঘণ্টা কখন ওঠে বাজি,
দ্বারের পাশে
তখন আসে
ঘাটের মাঝি।
বাবা গেছেন এমনি করে
কখন ভোরে
তখন আমি বিছানাতে।

তেমনি মাখন
গেল কখন
অনেক রাতে।*

এই কাকাটি সত্যই ছোট ছেলের বেদনা বুঝতেন।

কিন্তু মূল কথা থেকে কত দূরে এসে পড়েছি। তাই মৃত্যু সম্বন্ধে শেষ কথা বলে মূল কথায় ফিরে যাই। ভগবানে আমার অবিচল বিশ্বাস। তাই আমি জানি, আমি যখন মরণের সিংহদ্বার পার হব তখন দেখব, বাবা, ঠাকুরদা, তাঁর বাবা, তাঁর বাবা আরো কত শত ঊর্ধ্ব-পুরুষ সৌম্যবদনে এগিয়ে আসছেন, আমাকে তাঁদের মাঝখানে বরণ করে নেবার জন্য। এবং জানি, জানি, নিশ্চয় জানি, তাঁদের সকলের সামনে দাঁড়িয়ে, আমার মা আমার ছোট ভাইকে হাসিমুখে কোলে নিয়ে। তার চেয়েও আশ্চর্য বোধ হয়, যখন মনের চোখে ছবি দেখি, আমার এই ছোট ভাই, একদা টলটলায়মান পায়ে আমার মায়ের দিকে এগিয়ে এসেছিল, তাঁকে আপনজনের মধ্যে নিয়ে যাবার জন্য, তাঁর কোলে ওঠার জন্য। সে তো ও-লোকে গিয়েছিল মায়ের বহু পূর্বে।

আমি যখন সে-লোকে যাব তখন ভগবান শুধাবেন, 'তুমি কি চাও?' আমি তৎক্ষণাৎ বলব, 'একখানা বাইসিকেল।' পাওয়া মাত্রই তাতে ভাইকে রডে চড়িয়ে স্বর্গের লনে চক্কর লাগাব। সে খল-খল করে হাসবে। মা দেখবে, কিন্তু কক্‌খনো বলবে না, 'থাক, হয়েছে। এখন ওকে তুই নামিয়ে দে।'

* * * *

অতএব সব বিপদ থেকেই নিষ্কৃতি আছে। গাড়ি গেছে তো গেছে তাতে ভয় পাবার অত কি?

দেখি, আবুল আসফিয়া নেই।

আমাদের এই অকূল সমুদ্র আর অন্তহীন মরুভূমির মাঝখানে ফেলে দিয়ে লোকটা পালাল নাকি?

স্টেশনের বাইরে তাঁর খোঁজ করতে এসে দেখি, তিনি এক জরাজীর্ণ মোটর গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে রসালাপ আরম্ভ করেছেন। অনুমান করলুম তিনি ট্যাক্‌সি-যোগে কাইরো পেঁছিবার চেষ্টাতে আছেন।

কিন্তু ট্যাক্‌সিওলারা আমাদের মঙ্জমান অবস্থা বিলক্ষণ বুঝে গিয়েছে এবং যা দর হাঁকছে তা দিয়ে দুখানি নূতন ট্যাক্‌সি কেনা যায়।

আবুল আসফিয়া তাকে বহুতর ধর্মের কাহিনী শোনাবার চেষ্টা করলেন, ততোধিক ভারত-মিশরীয় মৈত্রীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন এবং সর্বশেষে তিনি মুসলমান সেও মুসলমান, সে-সত্যের দোহাই-কসম খেলেন কিন্তু ট্যাক্‌সিওলাটি ধর্মে মুসলমান হলেও কর্মে খাঁটি দুর্যোধন। বিনা যুদ্ধে সে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি এগোবে না।

আবুল আসফিয়ার চোখে-মুখে কিন্তু কোনো উষ্মার লক্ষণ নেই। ভৃগু-

---

* শিশু ভোলানাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১০৮ পৃঃ।

পদাহত তিতিক্ষু শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তিনি তখন চললেন হেল্‌থ আপিসের দিকে। আমিও পিছু নিলুম।

সেই বিরাট-বপু ভদ্রলোক, যিনি আমাদের সার্টিফিকেট দিয়ে প্রথম ফাঁড়া থেকে উদ্ধার করেছিলেন তিনি ততক্ষণে আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। এবারে তাঁকে জাগাতে গিয়ে আবুল আসফিয়াকে রীতিমত বেগ পেতে হল।

তাঁকে তখন তিনি যা বললেন, তার সরল অর্থ, তিনি ডাকাতকে ডরান না, ডাকাত বন্দুক উঁচালে তিনিও বন্দুক তুলতে জানেন, কিন্তু এরকম বন্দুকহীন ডাকাতির বিরুদ্ধে লড়বার মতো হাতিয়ার তো তাঁর নেই। অবশ্য তিনি ঘাবড়ান নি, কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করবেনই ; তবে কি না আফিসারটি যদি একটু সাহায্য করেন তবে আমাদের উপকার হয়, তাঁরও পুণ্য হয়।

অফিসার বললেন, 'চলুন।'

তিনি ট্যাক্‌সিওলাদের সঙ্গে দু-চারটি কথা বলেই আমাদের জানালেন কত দিতে হবে। হিসেব করে দেখা গেল, গাড়িতে ফার্স্ট ক্লাসে যা লাগত, ট্যাক্‌সিতে তাই লাগবে। আমরা তাতেই খুশী। কাইরো তো পেঁছিব, পোর্টসঈদে তো জাহাজ ধরতে পারব, তবে আর ভাবনা কি ?

আমরা হুড়মুড় করে দুখানা ট্যাক্‌সিতে কাঁঠাল বোঝাই হয়ে গেলুম।

আমি অফিসারকে ধন্যবাদ দিয়ে ওঠার সময় বললুম, 'আপনি আমাদের জন্য এতখানি করলেন। সত্যই আপনার দয়ার শরীর।'

তিনি ভাঙা-ভাঙা ইংরিজীতে যা বললেন, তা শুনে আমি অবাক। তার অর্থ, তাঁর শরীর আদপেই দয়ার শরীর নয়। তিনি কিছুমাত্র পরোপকার করেন নি। আমরা এক পাল ভিখিরী যদি সুয়েজ বন্দরে আটকা পড়ে যাই তবে শেষ পর্যন্ত তাঁদেরই ঘাড়ে পড়ব। আমাদের তাড়াতে পেরে তিনি বেঁচে গেছেন—ইত্যাদি।

আমি আপত্তি জানিয়ে মোটরে বসে ভদ্রলোকের কথাগুলো ভাবতে লাগলুম।

হঠাৎ বুঝতে পারলুম ব্যাপারটা কি—বহু দিন পূর্বেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে যাওয়াতে।

রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী ছিলেন তাঁর দাদার নাতি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমার এক চিত্রকর বন্ধু, বিনোদবিহারী একদিন তাঁর দূরবীনটি ধার নিলে—বেচারী চোখে দেখতে পেত কম। কয়েক দিন পরে সেটা ফেরত দিতে গেলে দিনুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রকম দেখলে ?'

'আজ্ঞে, চমৎকার !' বিনোদ এত দূরের জিনিস এর আগে কখনো দেখতে পায় নি।

'তবে ওটা তোমার কাছেই রেখে দাও। লোকে বড্ড জ্বালাতন করে। আজ এটা এ চায়, কাল ওটা ও চায়, পরশু ওটা সে চায়। আমি পেরে উঠি নে। তোমার কাছেই ওটা থাক।'

বিনোদ একাধিকবার চেষ্টা করেও সে দূরবীন ফেরত দিতে পারে নি।

এই হল খানদানী লোকের পরোপকার করার পদ্ধতি। সে দেখায়, যেন সে আদপেই পরোপকার করে নি। নিতান্ত নিজের মঙ্গলের জন্য, আগাগোড়া সে স্বার্থপরের মতো কাজ করেছে।

বুঝলুম, এ অফিসারটিও দিনুবাবুর সগোত্র। ইচ্ছে করেই 'সগোত্র' শব্দটি ব্যবহার করলুম ; আমার বিশ্বাস, ইহ-সংসারের যাবতীয় ভদ্রলোক একই গোত্রের —তা তাঁরা ব্রাহ্মণ হন আর চণ্ডাল হন, হিন্দু হন আর মুসলমান হন, কাফ্রী হন আর নর্ডিক হন।

ততক্ষণে আমরা বন্দর ছেড়ে মরুভূমিতে ঢুকে গিয়েছি। পিছনে তাকিয়ে দেখি, শহরের বিজলি বাতি ক্রমেই নিষ্প্রভ হয়ে আসছে—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো স্মৃতি যে রকম আবছায়া-আবছায়া হতে থাকে।

॥ ১৬ ॥

মরুভূমির উপর চন্দ্রালোক ! সে এক অদ্ভুত দৃশ্য ! সে দৃশ্য বাঙলাদেশের সবুজ শ্যামলিমার মাঝখানে দেখা যায় না। তবে যদি কখনো পদ্মার বিরাট বালুচড়ায় পূর্ণিমা-রাতে বেড়াতে যাও—রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই যেতেন এবং 'নিশীথে' গল্প তারি পটভূমিতে লেখা—তাহলে তার খানিকটে আস্বাদ পাবে।

সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন ভুতুড়ে বলে মনে হয়। চোখ চলে যাচ্ছে দূর দিগন্তে, অথচ হঠাৎ যেন ঝাপসা আবছায়া পর্দায় ধাক্কা খেয়ে থেমে যায়। মনে হয়, যেন দেখতে পাচ্ছি, তবু ঠিক ঠিক দেখতে পারছি নে, চিনতে পারছি তবু ঠিক ঠিক চিনতে পারছি নে। চতুর্দিকে ফটফটে জ্যোৎস্নার আলো যেন উপচে পড়ে ; মনে হয় এ-আলোতে অক্লেশে খবরের কাগজ পড়া যায়, অথচ এ আলোতে লাল কালোর তফাত যেন ঘুচতে চায় না। মেঘলা দিনে এর চেয়ে অনেক ক্ষীণালোকে রঙের পার্থক্য অনেক বেশী ধরা পড়ে।

তাই,

মনে হল পাখি, মনে হল মেঘ, মনে হল কিশলয়,
ভালো করে যেই দেখিবারে যাই মনে হল কিছু নয়।
দুই ধারে একি প্রাসাদের সারি, অথবা তরুর মূল
অথবা এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারই মনের ভুল ?

মাঝে মাঝে আবার হঠাৎ মোটরের দু-মাথা উঁচুতে ফুটে ওঠে, জ্বল-জ্বল দুটি ছোট সবুজ আলো ; ওগুলো কি ? ভূতের চোখ নাকি ? শুনেছি ভূতের চোখই সবুজ রঙের হয়। নাঃ ! কাছে আসতে দেখি উটের ক্যারাভান —এদেশের ভাষাতে যাকে বলে 'কাফেলা' (কবি নজরুল ইসলাম এ শব্দটি বাঙলায় ব্যবহার করেছেন)। উটের চোখের উপর মোটরের হেডলাইট পড়াতে চোখ দুটো সবুজ হয়ে আমাদের চোখে ধরা দিয়েছে। দেশে গরু-বলদের চোখে আলো পড়ে ঠিক এই রকমই হয়, কিন্তু বলদের চোখে যে লেভেলে দেখি উটের

চোখে তার অনেক উপরে দেখতে পেলুম বলে এতখানি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম।

আর কেনই পাব না বল? জনমানবহীন মরুভূমির ভিতর দিয়ে চলেছ, রাত্রি বেলা—আবার বলছি, রাত্রিবেলা। মরুভূমি সম্বন্ধে কত গল্প, কত সত্য, কত মিথ্যে পড়েছি ছেলেবেলায়। তৃষ্ণায় সেখানে বেদুইন মারা যায়, মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য বেদুইন তার পুত্রের চেয়ে প্রিয়তর উটের গলা কাটে, সেখান থেকে উটের জমানো জল খেয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য, তৃষ্ণায় মতিচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে সে হঠাৎ কাপড়-চোপড় ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে সূর্যের দিকে জিভ দেখিয়ে নাচে আর শুষ্ককণ্ঠে বীভৎস গলায় গান জোড়ে,

তুই আমার কি করতে পারিস তুই ক্যা রে?
তুই —(অশ্লীলবাক্য)—তুই ক্যা রে?

এবং তার চেয়েও বদ্‌খদ্‌ বেতালা 'পদ্য'।

যদি মোটর ভেঙে যায়? যদি কাল সন্ধ্যে অবধি এ রাস্তা দিয়ে আর কোনো মোটর না আসে? পষ্ট দেখতে পেলুম এ গাড়ি রওনা হওয়ার পূর্বে পাঁচশ গ্যালন জল সঙ্গে তুলে নেয় নি; তখন কি হবে উপায়?

কিন্তু করুণাময়কে অসীম ধন্যবাদ, পল-পার্সি দেখলুম অন্য ধরনের ছেলে। তারা সেই জরাজীর্ণ মোটর গাড়ির কটকটাহি মরকট বিকট ভট কোটি কোটিন্‌হ ধাবহি (তুলসীদাস তাঁর রামায়ণে বানরদের কলরোলের বর্ণনা দিতে গিয়ে 'ট'-এর অনুপ্রাস ব্যবহার করেছেন) শব্দ ছাপিয়ে বিকটতর কটকট করছে। তাদের কী আনন্দ!

পল: 'সব-কিছু ভালো করে দেখে নে; মাকে যাবতীয় জিনিস যেন গুছিয়ে লিখতে পারি।'

পার্সি: 'তোর জীবনে এই তুই প্রথম একটা খাঁটি কথা কইলি। কোনো জিনিস যেন বাদ না পড়ে। ওঃ, মরুভূমির ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। জাহাজে চড়ার সময় কি কল্পনা করতে পেরেছিলুম, জাহাজে চড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফোকটে মরু-ভূমির ভিতর দিয়ে চড়ে যাব?'

পল: 'ঠিক বলেছিস্‌। আর মা-বাবা কী রকম আশ্চর্য হবেন, ভাব দিকিনি! কিন্তু, ভাই, ওনারা যদি তখন ধমক দেন, জাহাজ ছেড়ে তোমরা এ রকম বাউণ্ডুলিপনা করতে গিয়েছিলে কেন? তখন?'

পার্সি বললে: 'ঐ তো তোর দোষ! সমস্তক্ষণ ভয়ে মরিস। তখন কি আর একটা সদুত্তর খুঁজে পাব না? ঐ স্যার রয়েছেন। ওঁকে জিজ্ঞাসা কর না। উনি কি বলেন।'

আমি বললুম: 'দোষ দেবেন, তো তখন দেবেন। এখন সে আলোচনা করতে গিয়ে দেখবার জিনিস অবহেলা করবে নাকি? বিশেষত, যদি আমাদের অভিযান অন্যায় কর্মই হয়ে থাকে, সেটাকে যখন রদ করার শক্তি আমাদের হাতে নেই।'

পার্সি বললে: 'আর ফিরে গিয়েই বা কি লাভ? আমাদের জাহাজ তো অনেকক্ষণ হল ছেড়ে দিয়েছে।'

চালাক ছেলে সব দিকে খেয়াল রাখে।

মরুভূমিতে দিনের বেলা যে রকম প্রচণ্ড গরম, রাত্রেও ঠিক তেমনি বিকট শীত। বৈজ্ঞানিকেরা তার একটা অত্যুৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা দেন বটে, কিন্তু ধোপে সেটা কতখানি টেকে আমি যাচাই না করে বলতে পারব না। উপস্থিত শুধু এইটুকু বলতে পারি, জাহাজে দিনের পর দিন রাতের পর রাত দুঃসহ গরমে হাড়মাস যেন আচার হয়ে গিয়েছিল ; ঠাণ্ডা বাতাসের পরশ পেয়ে সর্বাঙ্গ যেন জলে-ভেজা জুঁই ফুলের মত ফুলে উঠল।

এ ধরনের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে একাধিকবার হয়েছে। পেশাওয়ার, জালালাবাদের ১২০।১২২ ডিগ্রী সওয়ার পর আমি খাক্-ই জব্বারের ৬০ ডিগ্রীতে পেঁছিতে কী আরাম অনুভব করেছিলুম সে বর্ণনা অন্যত্র করেছি। কোথায় ? উঁহু, সেটি হচ্ছে না। বললেই বলবে, আমি সুযোগ পেয়ে আমার অন্য বইয়ের বিজ্ঞাপন এখানে নিখর্চায় চালিয়ে দিচ্ছি।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম মনে নেই। যখন মোটরের হঠাৎ একটুখানি জোর ঝাঁকুনিতে ঘুম ভাঙল তখন দেখি চোখের সামনে সারি সারি আলো। কাইরো পেঁছে গিয়েছি। গাড়ির আর সবাই তখনো ঘুমোচ্ছে। আমার সন্দেহ হল ড্রাইভারও বোধ করি ঘুমোচ্ছে। গাড়ি আপন মনে বাড়ির দিকে চলেছে ; সোয়ার ঘুমিয়ে পড়লেও ঘোড়া যে রকম আপন বাড়ি খুঁজে নেয়।

পার্সিকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিয়ে বললুম ঃ 'তবে না, বৎস, বলেছিলে, মরুভূমির সব টুকিটাকি পর্যন্ত মনের নোট বুকে টুকে নেবে ?' যেন আমি নিজে কতই না জেগে ছিলুম।

পার্সিও তালেবর ছেলে। তখুনি দিলে পলের কানে ধরে একখানা আড়াই-গজী টান। আমি পার্সিকে যা বলেছিলুম সে পলকে তাই শুনিয়ে দিলে। পল বেচারী আর কি করে ? সে আস্তে আস্তে মাদমোয়াজেল শেনিয়েকে জাগিয়ে দিয়ে বললে, 'কাইরো পেঁছে গিয়েছি।'

বাঙলা দেশে কথায় কয়—পশ্চিম বাঙলায় বলে কি না জানি নে—'সায়েব বিবিকে মারলেন চড়, বিবি বাঁদীকে দিলেন ট্যাঙ্গা, বাঁদী বেরালকে মারলে লাথি, বেরাল খামছে দিলে নুনের ছালাটাকে।'

সংসারে এই রীতি।

এখানে অবশ্য প্রবাদ টায়টায় মিলল না। তাই পল অতি সবিনয়ে মেম-সাহেবকে জাগিয়ে দিলে।

মাদমোয়াজেল হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে পাউডার বের করে নাকে ঘষতে ঘষতে ফরাসীতে শুধালেন,—আমার বিশ্বাস ফরাসিনীরা ঘুমন্ত অবস্থায়ও ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাতে পারেন এবং লাগান—'আমরা কোথায় পেঁছিলুম, মসিয়ো ?'

'ল্য ক্যার।'

পল বেশ খানিকটে ফরাসী জানত। আমাকে শুধালে ঃ 'ল্য ক্যার্' অর্থ হল 'দি কাইরো'। 'ল্য'টা আবার পুংলিঙ্গ। একটা শহরের আবার পুংলিঙ্গ

স্ত্রীলিঙ্গ কি করে হয় ?'

আমি বললুম ঃ 'অত বিদ্যে আমার নেই, বাপু ! তবে এইটুকু জানি এ-বাবদে ফরাসীই একমাত্র আসামী নয়। আমরা ব্রহ্মপুত্রকে বলি নদ, অর্থাৎ পুংলিঙ্গ এবং গঙ্গাকে বলি নদী, অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ। কেন বলি জানি নে।'

পার্সি বললে ঃ 'আমরা রেজরাই বা জাহাজকে 'শী' অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ দিয়েছি কেন ?'

আমি বললুম ঃ 'উপস্থিত এ আলোচনা অক্সফোর্ডের জন্য মুলতুবী রেখে দাও—সেখানেই তো পড়তে যাচ্ছ—এবং নিশির কাইরোর সৌন্দর্যটি উপভোগ করে নাও।'

সত্যি, এরকম সৌন্দর্য সচরাচর চোখে পড়ে না। আমরা যখন চন্দননগর থেকে কলকাতা পেঁছই তখন মাঝখানে ঘন বসতি আর বিস্তর জোরালো বাতি থাকে বলে কলকাতার রোশনাই ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারি নে। এখানে মরুভূমি পেরিয়ে হঠাৎ শহর বলে একসঙ্গে সব কটা আলো চোখে পড়ে এক অদ্ভুত মরীচিকার সৃষ্টি করে।

ছ-তলা বাড়ির উপরে—অবশ্য বাড়িটা দেখা যাচ্ছে না—দেখি, লাল আলোতে জ্বালানো শেলাইয়ের কলের ছুঁচ ঘন ঘন উঠছে নামছে, আর সবুজ আলোর চাকা ঘুরেই যাচ্ছে ঘুরেই যাচ্ছে। নিচে এক বিলিতি কোম্পানির নাম। আমার মনে হল, হায় ! কলটার নাম যদি 'উষা' হত। সেদিন আসবে যেদিন ভারতীয়—যাক গে।

আরো কত রকমের প্রজ্বলিত বিজ্ঞাপন। এ বিষয়ে কলকাতা কাইরোর বহু পিছনে।

করে করে শহরতলীতে ঢুকলুম। কলকাতার শহরতলী রাত এগারোটায় অঘোরে ঘুমোয়। কাইরোর সব চোখ খোলা—অর্থাৎ খোলা জানালা দিয়ে সারি সারি আলো দেখা যাচ্ছে। আর রাস্তার কথা বাদ দাও। এই শহর-তলীতেই কত না রেস্তোরাঁ, কত না 'কাফে' খোলা ; খদ্দেরে খদ্দেরে গিসগিস করছে। (আমাদের যে রকম চায়ের দোকান, মিশরীদের তেমনি 'কাফে' অর্থাৎ কফির দোকান। আমি প্রায়ই ভাবি কফির দোকান যদি 'কাফে' হতে পারে তবে চায়ের দোকান 'চাফে' হয় না কেন ? 'চলো, ভাই, চাফেতে যাই' বলতে কি দোষ ?)

আবার বলছি রাত তখন এগারোটা। আমি বিস্তর বড় বড় শহর দেখছি, কাইরোর মতো নিশাচর শহর কোথাও চোখে পড়ে নি।

কাইরোর রান্নার খুশবাইয়ে রাস্তা ম ম করছে। মাঝে মাঝে নাকে এসে এমন ধাক্কা লাগায় যে মনে হয় নেমে পড়ে এখানেই চাট্টি খেয়ে যাই। অবশ্য রেস্তোরাঁগুলো আমাদের পাড়ার চায়ের দোকানেরই মতো নোংরা। তাতে কি যায়-আসে ? কে যেন বলেছে, 'নোংরা রেস্তোরাঁতেই রান্না হয় ভালো ; কালো গাই কি সাদা দুধ দেয় না ?'

আমার খেতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ঐসব সায়েব-মেমরা যখন

রয়েছেন। তাঁরা 'ম' দিয়ো', 'হ্যার গট্' কি যে বলবেন তার তো ঠিকঠিকানা নেই।

আচম্বিতে দুখানা গাড়িই দাঁড়াল। বসে বসে সবাই অসাড় হয়ে গিয়েছি। সব্বাই নেমে পড়লুম। সক্কলেরই মনে এক কামনা। আড়ামোড়া দিয়ে নি, পা দুটো চালিয়ে নি, হাত দুখানা ঘুরিয়ে নি।

এমন সময় আবুল আসফিয়া আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, মাথা পিছনের দিকে ঈষৎ ঠেলে দিয়ে, হাত দুখানা সামনের দিকে সম্প্রসারিত করে, পোলিটিশিয়নদের কায়দায় শ্রদ্ধানন্দ-পার্কী লেকচার ঝাড়তে আরম্ভ করলেন, কিন্তু ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে,—

'মেদাম, মেদ্‌মোয়াজেল, এ মেসিয়ো'—

(ভদ্রমহিলাগণ, ভদ্রকুমারীগণ এবং ভদ্রমহোদয়গণ)

আমরা সকলেই এক্ষণে তৃষ্ণার্ত এবং ক্ষুধাতুর। নগরী প্রবেশ করতঃ আমরা প্রথমেই উত্তম কিংবা মধ্যম শ্রেণীর ভোজনালয়ে আহারাদি সমাপন করব। কিন্তু প্রশ্ন, সেখানে খেতে দেবে কি? জাহাজে যা দেয় তা-ই। সেই বিস্বাদ সুপ, বিস্বাদতর স্টু, তদিতর পুডিং। অর্থাৎ সেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কিংবা অ্যাংলো-ইজিপ্‌শিয়ন—যাই বলুন—রস-কষহীন খানা।

পক্ষান্তরে, 'এই শররতলীতে যদি আমরা কিঞ্চিৎ আদিম এবং অকৃত্রিম মিশরীয় খাদ্য, মিশরীয় পদ্ধতীতে সুপক্ক খাদ্য, ভোজন করি তবে কি এক নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে না?'

আমরা কিছু বলার পূর্বেই তিনি হাত দুখানা গুটিয়ে নিয়ে বাঁ হাত দিয়ে ঘাড়ের ডান দিকটা চুলকোতে চুলকোতে বললেন: 'অতি অবশ্য, রেস্তোরাঁগুলো নোংরা। চেয়ার-টেবিল সাফ-সুৎরো নয়, কিন্তু মেদাম, মাদমোয়াজেল, মেসিয়ো, আমরা তো আর টেবিল-চেয়ার খেতে যাচ্ছি নে। আমরা খেতে যাচ্ছি খানা। জাহাজের রান্না যখন আমাদের খুন করতে পারে নি, তখন এ রান্নাই বা করবে কি করে? আপনারাই বলুন!'

কেউ কিছু বলার পূর্বেই পার্সি চেঁচিয়ে উঠলো: 'অফ্‌কোস্, অফ্‌কোস্—আলবত, আলবত, আমরা নিশ্চয়ই যাব। আমরা যখন মিশরীয় হাওয়াতেই শ্বাস নিচ্ছি, মিশরীয় জলই খাব, মিশরীয় খাদ্য খাব না কেন?'

মাদমোয়াজেল শেনিয়ে বললেন: 'যাঁরা খেতে চান না, তাঁরা খাবেন না। আমি যাচ্ছি।'

আর আমি বুঝলুম, ফরাসীদেশটা কতখানি স্বাধীনতার দেশ। স্বাধীনতা ফরাসীদের হাড়ে-হাড়ে মজ্জায়-মজ্জায়।

শেনিয়ে ছিলেন আমাদের মধ্যে সব চেয়ে ডেলিকেট প্রাণী। জাহাজের রান্না তাঁর পছন্দসই ছিল না বলে তিনি টোস্ট, দুধ, ডিম, মটর, কফি,আলুসেদ্ধ খেয়ে প্রাণ ধারণ করতেন। তিনি যখন রাজা তখন—?

আমার মনে হয়, আমরা যে তখনই সবাই নিকটতম রেস্তোরাঁয় হুড়মুড় করে ঢুকলুম তার একমাত্র কারণ এই নয় যে, মাদমোয়াজেল ঢুকতে প্রস্তুত, আমার

মনে হয়, আর সবাইও তখন মিশরী খানার এক্সপেরিমেন্ট করবার জন্য তৈরী। এবং সর্বোত্তম কারণ সবাই তখন ক্ষুধায় কাতর। কোথায় কোন্ খানদানী রেস্তোরাঁয় কখন পেঁছিব তার কি ঠিক-ঠিকানা? এবং হয়তো ততক্ষণে সব মাল কাবার। খেতে হবে মাখন-রুটি, দিতে হবে মুর্গী-মটনের দর। তার চেয়ে ভরভর খুশবাইয়ের খাবারই প্রশস্ততর। হাতের কাছে যা পাচ্ছি তাই ভালো, সেই নিয়ে খুশী।

রবি ঠাকুর বলেছেন,

'কাছের সোহাগ ছাড়বে কেন
দূরের দুরাশাতে?'

ইরানী কবি ওমর খৈয়ামও বলেছেন,

Oh, take the Cash, and let the Credit go,
Nor heed the rumble of a distant Drum!

কান্তি ঘোষ তার বাঙলা অনুবাদ করেছেন,

'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাক,
দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে, মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক!'

* * *

রেস্তোরাঁগুলো ছুটে এসে আমাদের আদর-কদর করে অভ্যর্থনা (ইসতিক্-বাল) জানালে। তার 'বয়-রা' বত্রিশখানা দাঁতের মুলো দেখিয়ে আকর্ণ হাসলে। তড়িঘড়ি তিনখানা ছোট ছোট টেবিল একজোড় করে, চেয়ার সাজিয়ে আমাদের বসবার ব্যবস্থা করা হল, রান্নাঘর থেকে স্বয়ং বাবুর্চী ছুটে এসে তোয়ালে কাঁধে বার বার ঝুঁকে ঝুঁকে সেলাম জানালে। বসতে গিয়ে দেখি, শ্যামবাজারের সেই লোহার চেয়ার। শীত-গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই বসতে গেলে ছ্যাঁকা দেয়।

আমি তখন আমার অভিজ্ঞতা গিলছি। অর্থাৎ দেখছি, বয়গুলোর কী সুন্দর দাঁত! এরকম দুধের মত সুন্দর দাঁত হয় কি করে? সে দাঁতের সামনে এরকম রক্তকরবীর মতো রাঙা ঠোঁট এরা পেল কোথা থেকে? এবং ঠোঁটের সীমান্ত থেকেই সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে কী অদ্ভুত এক নবীন রঙ! এ রঙ আমার দেশের শ্যামল নয়, এ যেন কি এক ব্রোঞ্জ রঙ! কী মসৃণ কী সুন্দর!

কিন্তু সর্বাধিক মনোরম বাবুর্চীর ভুঁড়িটা। ওঃ! কী বিশাল, কী বিপুল, কী জাঁদরেল!

তার থেকেই অনুমান করলুম আমরা ভালো রেস্তোরাঁতেই ঢুকেছি।

ইতিমধ্যে আবুল আসফিয়া এবং মাদমোয়াজেল শেনিয়ে বাবুর্চীকে নিয়ে খুদ রান্নাঘরে চলে গিয়েছেন, আহারাদির বাছাই-তদারক করতে এবং গোটা-চারেক ছোকরা এসে আমাদের চতুর্দিক ঘিরে চেঁচাচ্ছে, 'ব্যুৎ বালিশ, ব্যুৎ বালিশ!'

সে আবার কী যন্ত্রণা?!?!

বুঝতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না ; কারণ এদের সকলের হাতে কাঠের বাক্স আর গোটা দুই করে বুরুশ। ততক্ষণে আবার মনে মনে ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনা করে বুঝে নিয়েছি, আরবীতে 'ট' নেই বলে 'বুট' হয়ে গিয়েছে 'বুৎ' এবং 'প' নেই বলে 'পলিশ' হয়ে গিছে 'বালিশ'—একুনে দাঁড়াল 'বুৎ বালিশ'! তাই আরবরা পণ্ডিত জওয়াহরলালের নাম উচ্চারণ করে 'বান্দিৎ জওয়াহরলাল!' ভাগ্যিস আরবী ভাষায় 'ট' নেই। থাকলে নিরীহ 'পণ্ডিত' আরবিস্থানের 'ব্যাণ্ডিট' হয়ে যেতেন! আদন অঞ্চলের আরবীতে আবার 'গ' নেই, তাই তারা 'গান্ধী'র নাম উচ্চারণ করে 'জান্দী'। অবশ্য সেটা কিছু মন্দ নয়,—সত্যের জন্য 'জান দি' বলেই তো তিনি প্রাণ দান করে দেহত্যাগ করলেন।

বাঙালী তেড়ি কাটতে ব্যস্ত, ইংরেজ সমস্তক্ষণ টাইটা ঠিক গলার মাঝখানে আছে কিনা তার তদারকিতে ব্যস্ত, শিখেরা পাগড়ি বাঁধতে ঘণ্টাখানেক সময় নেয়, কাবুলীরা হামেহাল জুতোতে পেরেক ঠোকাতে ব্যতিব্যস্ত, আর কাইরো-বাসীরা দেখলুম, 'বুৎ বালিশের' নেশাতে মশগুল। তা না হলে রাত দুপুরে গণ্ডায় গণ্ডায় বুৎ-বালিশওয়ালারা কাফে রেস্তোরাঁয় ধন্না দিতে যাবে কেন?

তবে হ্যাঁ, পালিশ করতে জানে বটে। স্পিরিট দিয়ে পুরনো রঙ ছাড়ালে, সাবানজল দিয়ে অন্য সব ময়লা সাফ করলে, ক্রীম লাগালে, পালিশ ছোঁয়ালে, প্রথম হালকা ক্যাম্বিস পরে মোলায়েম সিল্ক দিয়ে জুতোর জৌলুস বাড়ালে। তখন জুতোর যা অবস্থা! তাতে তখন আয়নার মতো মুখ দেখা যায়। বুরুশের ব্যবহার তো প্রায় করলেই না—চামড়া নাকি তাতে জখম হয়ে যায়।

কিন্তু আশ্চর্য বোধ হল, সেই ঝাঁ চকচকে জুতোজোড়াকে সর্বশেষে কাপড় দিয়ে ঘষে অল্প—অতি অল্প—ম্যাটমেটে করে দিল কেন? এতখানি মেহন্নত চাকচিক্য জাগানোর পর সেটাকে ম্যাটমেটে করে দেবার কি অর্থ?

একটা গল্প মনে পড়ল ঃ

এক সাহেব পেসট্রিওলাকে অর্ডার দিলেন একটা জন্মদিনের কেক বানাবার জন্যে। কেকের উপরে যেন সোনালী নীলে তাঁর নামের আদ্য অক্ষর পি. বি. ডাবলইউ লেখা থাকে। ডেলিভারি নেবার সময় দোকানদারকে বললেন, 'হুঁ' কেকটি দেখাচ্ছে উত্তম, কিন্তু হরফগুলো বানানো হয়েছে সোজা অক্ষরে। আমি চাই ট্যারচা ধরনে, ফ্লরাল ডিজাইনে।'

দোকানী খদ্দেরকে সন্তুষ্ট করতে চায়। বললে, 'এক্ষুনি করে দিচ্ছি। জন্ম-দিনের ব্যাপার—চাট্টিখানি কথা নয়।'

প্রচুর পরিশ্রম করে সে কেকের উপরটা চেঁচে নিলে। তারপর প্রচুরতম গলদঘর্ম হয়ে তার উপর হরফগুলো বাঁকা ধরনে আঁকলে, আরো মেলা ফুল ঝালর চতুর্দিকে সাজালে।

সায়েব বললেন, 'শাবাশ, উত্তম হয়েছে।'

দোকানী খুশী হয়ে শুধালে, 'প্যাক করে আপনাকে দেব, না, কোনো বিশেষ ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে হবে?'

সায়েব হেসে বললেন, 'কোনোটাই না। আমি ওটা নিজেই খাবো।'

বলেই ছুরি দিয়ে চাক্‌লা চাক্‌লা করে গব-গব করে আস্ত কেকটা গিললেন।

দোকানী তো থ। তাহলে অত-শত করার কি ছিল প্রয়োজন ?

বুৎ বালিশের বেলাও তাই।

বুৎ বালিশওলাকে শুধালুম, পালিশ কমিয়ে দেওয়ার কারণটা কি ?

একটুখানি হকচকিয়ে সামলে নিয়ে বললে, 'গাঁইয়ারাই শুধু অত্যধিক চাকচিক্য পছন্দ করে। শহরের ভদ্রলোক সব জিনিসেরই মেকদার মেনে চলেন।'

অ—অ—অ—!

তখন মনে পড়ল, অবন ঠাকুরও বলেছেন, ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা আগের দিনে সোনার গয়না পরে পালকিতে বেরুবার সময় তার উপর মলমলের পট্টি বেঁধে নিতেন। বড্ড বেশী চাকচিক্য নাকি গ্রাম্যজনসুলভ বর্বরতা !

॥ ১৭ ॥

আমরা তেতো, নোনা, ঝাল, টক, মিষ্টি এই পাঁচ রস দিয়ে ভোজন সমাপন করি। ইংরেজ খায় মিষ্টি আর নোনা ; ঝাল অতি সামান্য, টক তার চেয়েও কম এবং তেতো জিনিস যে খাওয়া যায়, ইংরেজের সেটা জানা নেই। তাই ইংরিজী রান্না আমাদের কাছে ভোঁতা এবং বিস্বাদ বলে মনে হয়। অবশ্য ইংরেজ ভালো কেক-পেসট্রি-পুডিং বানাতে জানে—তাও সে শিখেছে ইতালিয়ানদের কাছ থেকে এবং এ-কথাও বলবো আমাদের সন্দেশ রসগোল্লার তুলনায় এ-সব জিনিস এমন কী, যে নাম শুনে মূর্ছা যাব ?

মিশরীয় রান্না ভারতীয় রান্নার মামাতো বোন—অবশ্য ভারতীয় মোগলাই রান্নার। আমি প্রমাণ করতে পারব না, কিন্তু বহু দেশে বহু রান্না খেয়ে আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, মোগলরা এ-দেশে যে মোগলাই রান্নার তাজমহল বানালেন (এবং ভুললে চলবে না, সে রান্না তাঁরা আপন দেশে নির্মাণ করতে পারেন নি, কারণ ওঁদের মাতৃভূমি তুর্কীস্থানে গরম মশলা গজায় না) তারই অনুকরণে আফগানিস্থান, ইরান, আরবীস্থান, মিশর—ইস্তেক স্পেন অবধি আপন আপন ক্ষুদে ক্ষুদে রান্নার তাজমহল বানাতে চেষ্টা করেছে। এ রান্নার প্রভাব পূর্ব ইয়োরোপের গ্রীস, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া, ইতালি পর্যন্ত পেঁছেছে।

এ সব তত্ত্ব আমার বহুদিনকার পরের আবিষ্কার। উপস্থিত আবুল আসফিয়া আর ক্লোদেৎ নিয়ে এলেন বারকোশে হরেক রকম খাবারের নমুনা। তাতে দেখলুম, রয়েছে মুর্গী মুসল্লম, শিক কাবাব, শামী কাবাব আর গোটা পাঁচ-ছয় অজানা জিনিস। জানা জিনিসগুলো যে ঠিক ঠিক কলকাত্তাই খুশবাই নিয়ে এল তা নয়, কিন্তু তাতেই বা কি ? জাহাজের আইরিশ স্টু আর ইটালিয়ান মাকারনি খেয়ে খেয়ে পেটে তো চড়া পড়ে গিয়েছে ; এখন

এ-সব জিনিসই অমৃত। আমার প্রাণ অবশ্য তখন কাঁদছিল চারটি আতপ চাল, উচ্ছেভাজা, সোনামুগের ডাল, পটলভাজা আর মাছের ঝোলের জন্য—অত-শত বলি কেন, শুধু ঝোল-ভাতের জন্য—কিন্তু ওসব জিনিস তো আর বাঙলা দেশের বাইরে পাওয়া যায় না, কাজেই শোক করে কি লাভ?

তাই দেখিয়ে দিলুম, আমার কোন্ কোন্ জিনিসের প্রয়োজন সেই বারকোশ থেকেই।

পাশের টেবিলে দেখি, একটা লোক তার প্লেটে দুটি শশা নিয়ে খেতে বসেছে। দুটি শশা—তা সে যত তিন ডবল সাইজই হোক না—কি করে মানুষের সম্পূর্ণ ডিনার হতে পারে, বহু চিন্তা করেও তার সমাধান করতে পারলুম না। তাও আবার দোকানে ঢুকে, টেবিল-চেয়ার নিয়ে, সস্-চাটনি সাজিয়ে! আর ইংলণ্ডের মতো 'খানদানী' দেশেও তো মানুষ রাস্তায় দুটো আপেল কিনে চিবোয়—রেস্তোরাঁয় ঢুকে সস্-চাটনি নিয়ে সেগুলো খেতে বসে না। তবে কি এদেশ ইংলণ্ডের চেয়েও খানদানীতর? এদেশে কি এমন সব সর্বনেশে আইন-কানুন আছে যে রাস্তায় শশা বিক্রি বারণ, যে-রকম শিবঠাকুরের আপন দেশে,

'কেউ যদি পা পিছলে পড়ে,
প্যায়দা এসে পাকড়ে ধরে,
কাজীর কাছে হয় বিচার
একুশ টাকা দণ্ড তার
সেথায় সন্ধ্যে ছটার আগে,
হাঁচতে হলে টিকিট লাগে;
হাঁচলে পরে বিনা টিকিটে—
দমদমাদম্ লাগায় পিঠে,
কোটাল এসে নস্যি ঝাড়ে—
একুশ দকা হাঁচিয়ে মারে।'[১]

কি জানি কি ব্যাপার!

এমন সময় দেখি, সেই লোকটা শশা চিবুতে আরম্ভ না করে তার মাঝখানে দিলে দু হাতে চাপ। অমনি হড়হড় করে বেরিয়ে এল পোলাও-জাতীয় কী যেন বস্তু, এবং তাতেও আবার কি যেন মেশানো। আমি তো অবাক! হোটেল-ওয়ালাকে গিয়ে বললুম, 'যা আছে কুলকপালে, আমি ঐ শশাই খাব।'

এল দুখানা শশা।[২] কাঁটা দিয়ে একটুখানি চাপ দিতেই বেরিয়ে এল পোলাও। সে পোলাওয়ের ভিতর আবার অতি ছোট ছোট মাংসের টুকরো (এদেশে যাকে বলা হয় 'কিমা'), টমাটোর কুচি এবং গুঁড়নো পনীর। বুঝলুম এ-সব জিনিস পুরেছে সেদ্ধ শশার ভিতর এবং সেই শশাটা সর্বশেষে ঘিয়ে

১ সুকুমার রায়, আবোল-তাবোল, পৃঃ ৩২, তৃতীয় সিগনেট সংস্করণ
২ আসলে শশা নয়, এক রকমের ছোট লাউ।

ভেজে নিয়েছে। যেন মাছ-পটলের দোল্‌মা—শুধু মাছের বদলে এখানকার শশায় পোলাও, মাংস, টমাটো এবং চীজ! তার-ই ফলে অপূর্ব এই চীজ।

শশাকে চাক্তি করে পোলাওয়ের সঙ্গে মুখে দিয়ে বুঝলুম, একই গ্রাসে একই সঙ্গে ভাত, মাংস, সব্জী, ফল এবং 'সেভরি' খাওয়া হয়ে গেল।

আর সে কী সোয়াদ! মুখে দেওয়া মাত্র মাখনের মতো গলে যায়।

এ রকম পাচেক্কে পাঁচ পদ আমি পৃথিবীতে আর কোথাও খাই নি।

আরেকটা জিনিস খেলুম সে-ও অতুলনীয়। মিশরি সিম-বীচি। 'আলীবাবা' বায়স্কোপে যে সব বিরাট বিরাট উঁচু তেলের জালা দেখেছ, তারই গোটা দু-তিন সিমেতে ভর্তি করে সমস্ত রাত ধরে চালায় সিদ্ধকর্ম। সেই সিমে অলিভঅয়েল আর এক রকমের মশলা মিশিয়ে খেতে দেয় সকাল বেলা থেকে। আমরা খেলুম রাত্তিরে। তার যা সোয়াদ!—এখনো জিভে লেগে আছে। আমাদের সিমবীচি তার কাছে কিছুই না। পল-পার্সি'ও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করলে চীন দেশের সোয়াবীনও এর সামনে কেন, পিছনেও দাঁড়াতে পারে না।

শুনলুম এই সিম-বীচি গরিব থেকে আরম্ভ করে মিশরের রাজা দু-সন্ধ্যা খেয়ে থাকেন। হোটেলওয়ালা বললে, পিরামিড-নির্মাতা এক ফারাও-মহারাজা নাকি এই বীন খেতে এত ভালবাসতেন যে, প্রজাদের বারণ করে দিয়েছিলেন তারা কেউ যেন বীন না খায়! সাধে কি আর লোকে ফারাওদের খামখেয়ালি বলত?

শুনলুম এই বীনের আরবী শব্দ 'ফুল'।

পরের দিন সকাল বেলাকার ঘটনা। কিন্তু এর সঙ্গে যোগ আছে বলে এই সুবাদেই বলে নি।

কাইরোতে ফরাসী, গ্রীক, ইতালী, ইংরেজ বসবাস করে বলে এবং জাত-বেজাতের বিস্তর টুরিস্ট আসে বলে কাইরোর বহু দোকানী তরো-বেতরো ভাষায় সাইন-বোর্ড সাজায়। পরদিন সকাল বেলা আমরা যখন শহরের আনাচে কানাচে ঘুরচি তখন দেখি, এক সাইন-বোর্ডে লেখা—

FOOL'S RESTAURANT

পল, পার্সি আমি একসঙ্গেই বোর্ডটা দেখেছিলাম। একসঙ্গেই থ মেরে দাঁড়িয়ে গেলুম। একসঙ্গেই অট্টহাস্য করে উঠলুম।

"আহাম্মুকদের রেস্তোরাঁ।"

বলে কি?

তখন হঠাৎ ঝাঁ করে আমার মনে পড়ল Fool শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে 'ফুল' অর্থাৎ 'বীন' অর্থাৎ 'সিমের বীচি' অর্থে। "আহাম্মুক" অর্থে নয়। অর্থাৎ এ দোকানী উত্তম 'সিম-বীচি' বেচে। তার পর দোকানের সামনে আমরা ত্রিমূর্তি উঁকিঝুঁকি মেরে দেখি, যে কটি খদ্দের সেখানে বসে আছে তাদের সকলেরই সামনে শুধু সিম-বীচি—'ফুল'—'Fool'।

* * * *

হাসলে তো?

আমিও হেসেছিলুম।

কিন্তু তার পর কলকাতা ফিরে—বহু বৎসর পরে—দেখি, এক দোকানের সাইন-বোর্ডে লেখা।

"কপির শিঙাড়া"

অর্থাৎ ফুলকপির-পুর-দেওয়া শিঙাড়া। এই তো?

আমি কিন্তু 'কপি' শব্দের অর্থ নিলুম 'বাঁদর'। অর্থাৎ বাঁদরদের শিঙাড়া। তা হলে অর্থ দাঁড়াল, ও-দোকানে যারা শিঙাড়া খেতে যায় তারা বাঁদর। অর্থাৎ Fool's Restaurant তে যে রকম আহাম্মুকরা যায়!

যেমন মনে করো, যখন সাইন-বোর্ডে লেখা থাকে,—

"টাকের ঔষধ"

তখন কি তার অর্থ, 'টাকা' দিয়ে এ ঔষধ তৈরী করা হয়েছে? তার অর্থ এ ঔষধ টেকোদের জন্য। অতএব 'কপির শিঙাড়া'র অর্থ ফুলকপি দিয়ে বানানো শিঙাড়া নয়, 'কপি'—বাঁদরদের জন্য এ শিঙাড়া!

বিজ্ঞাপনে মানুষ জানা-অজানাতে—অজানাতেই বেশী—কত যে রসিকতার সৃষ্টি করে তার একটা সচিত্র কলেকশন করেছিল আমার এক ভাইপো। 'ছবি'টা মন্দ নয়। তার মধ্যে একটা ছিল;—

বিসুর্দ্দ ব্রাণ্ডনের হাটিয়াল।
মচ্ছ—চার আনা
মাঙ্গশ—আট আনা
নিড়ামিস—ছয় আনা

যাক্ গে এসব কথা। আবার কাইরো ফিরে যাই। আহারাদি সমাপ্ত করে আমরা ফের গাড়িতে উঠলুম। আবুল আসফিয়া দেখলুম ড্রাইভারদের নিজের পয়সায় খাওয়ালেন। তার পর গাড়িতে উঠে বললেন, 'কাইরোতে ট্যাক্সি চালাবার অনুমতি তোমাদের নেই। অথচ আমরা তোমাদের বাইরে থেকে নিয়ে এসেছি। আমাদের যেখানে খুশি নিয়ে গিয়ে দুপয়সা কামাতে পারো।'

তারা তো প্রাঞ্জল প্রস্তাবখানা শুনে আলহাদে আটখানা। কিন্তু আবুল আসফিয়া যে দর হাঁকলেন তা শুনে তাদের পেটের 'ফুল' পর্যন্ত আচমকা লাফ মেরে গলা পর্যন্ত পেঁছে গেল।

ব্যাপারটা হয়েছে কি, আবুল আসফিয়া ইতিমধ্যে কাইরোতে ট্যাক্সি ফি মাইলে কত নেয় তার খবরটা জেনে নিয়েছেন এবং হাঁকছেন তার চেয়ে অনেক কম। এবার তিনি ওদের বাগে পেয়েছেন। ওরা বেশী কিছু আপত্তি জানালেই তিনি অভিমানভরা কণ্ঠে বলেন, 'তা ভাই, তোমরা যদি না যেতে চাও তবে যাবে না। আমি তো আর তোমাদের বাধ্য করতে পারি নে। তোমাদের যদি, ভাই, বড্ড বেশী পয়সা হয়ে যাওয়ায় আর কামাতে না চাও, তা হলে আমি আর কি করতে পারি বলো? আল্লা তালাও তো কুরান শরীফে বলেছেন, 'সন্তুষ্টি সদ্‌গুণ'।

তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তবে, ভাইরা, আমরা, তা হলে অন্য ট্যাক্সি নি। তোমরা সুয়েজ ফিরে যাও। আল্লা তোমাদের সঙ্গে থাকুন; রসুল তোমাদের আশীর্বাদ করুন। কিন্তু ভাই, এ ক-ঘণ্টা তোমাদের সঙ্গে কেটেছিল বড় আনন্দে।'

কেটেছিল আনন্দে না কচু! পারলে আবুল আসফিয়া ওদের গলা কাটতেন।

কিন্তু আশ্চর্য হলুম লোকটার 'ভণ্ডামি' দেখে। গুটিকয়েক টাকা বাঁচাবার জন্য কি অভিনয়ই না লোকটা করলে!

আর পায়রার মতো বকবকানি! এবং এ সেই লোক যে জাহাজে যে-ভাবে মুখ বন্ধ করে থাকত তাতে মনে হত কথা বলা রেশনড হয়ে গিয়েছে।

ঠিক আবুল আসফিয়ার দরে নয়, তার চেয়ে সামান্য একটু বেশী রেটে তারা শেষটায় রাজী হল।

আবুল আসফিয়া মোগলাই কণ্ঠে বললেন, 'পিরামিড'। ততক্ষণে আমরা কাইরো শহরের ঠিক মাঝখানে ঢুকে গিয়েছি।

কোথায় লাগে কলকাতা রাত বারোটার সময় কাইরোর কাছে। গণ্ডায় গণ্ডায় রেস্তোরাঁ, হোটেল, সিনেমা, ডান্স-হল, কাবারে। খদ্দেরে খদ্দেরে তামাম শহরটা আবজাব্ করছে।

আর কত জাত-বেজাতের লোক।

ঐ দেখ, অতি খানদানী নিগ্রো। ভেড়ার লোমের মতো কোঁকড়া কালো চুল, লাল লাল পুরু দুখানা ঠোঁট, বোঁচা নাক, ঝিনুকের মতো দাঁত আর কালো চামড়ার কী অসীম সৌন্দর্য! আমি জানি এরা তেল মাখে না, কিন্তু আহা, ওদের সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন তেল ঝরছে। এদের চামড়া এতই সুচিক্কণ সুমসৃণ যে আমার মনে হয়, এদের শরীরে মশা-মাছি বসতে পারে না—পিছ'ল পড়ে মশার পা ছখানা কম্পাউণ্ড ফ্রেকচর হয়ে যায়, ছ মাস পট্টি বেঁধে হাসপাতালে থাকতে হয়।

ঐ দেখো, সুদানবাসী। সবাই প্রায় ছ ফুট লম্বা। আর লম্বা আলখাল্লা পরেছে বলে মনে হয় দৈর্ঘ্য ছ ফুটের চেয়েও বেশী। এদের রঙ ব্রোঞ্জের মতো। এদের ঠোঁট নিগ্রোদের মতো পুরু নয়, টকটকে লালও নয়। কিন্তু সবচেয়ে দেখবার মতো জিনিস ওদের দুখানি বাহু একেবারে শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে আজানুলম্বিত—অর্থাৎ জানুর শেষ পর্যন্ত যেখানে হাঁটুর হাড্ডি অর্থাৎ 'নী ক্যাপ' সেই অবধি।

শ্রীরামচন্দ্রের বাহু ছিল আজানুলম্বিত এবং তাঁর রঙ ছিল নবজলধরশ্যাম, কিংবা নবদূর্বাদলশ্যাম। তবে কি শ্যামবর্ণ কিংবা ব্রোঞ্জ-বর্ণ না হলে বাহু এতখানি লম্বা হয় না? তবে কি ফর্সাদের হাত বেঁটে, শ্যামলিয়াদের হাত লম্বা? কে জানে! সুযোগ পেলে কোনো এক নৃতাত্ত্বিককে জিজ্ঞেস করতে হবে।

হঠাৎ দেখি, সম্মুখে হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কাণ্ড! লোকে লোকারণ্য?

সমস্ত রাস্তা জুড়ে এত ভিড় যে দুখানা গাড়িকেই বাধ্য হয়ে দাঁড়াতে হল। আমি বারণ করার পূর্বেই পল পার্সি দুজনাই লাফ দিয়ে উঠে গেল হুডের উপর। ওরা দেখতে চায়, ভিড়ের মাঝখানের ব্যাপারটা কি। আমার ওসব জিনিস দেখবার বয়স গেছে। মাদমোয়াজেল ক্লবেৎ শেনিয়ে পর্যন্ত উঁচি উঁচি করছিলেন; আমি তাঁকে বাইরে যেতে বারণ করলুম।

ইতিমধ্যে ঘোড় সওয়ার পুলিস এসে রাস্তা খানিকটে সাফ করে দেওয়াতে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চললো। পল-পার্সি হুড্ থেকে নেমে এসে আমার দু পাশে বসেছে।

আমাকে কিচ্ছুটি জিজ্ঞেস করতে হল না, ব্যাপার কি। ওরা উত্তেজনায় তিড়িং-বিড়িং করে লাফাচ্ছে। একসঙ্গে কথা বলছে। শেষটায় পলকে বাধা দিয়ে আমি বললুম, 'পার্সি, তুমিই বলো কি হয়েছিল?'

'ঐ যে আপনি দেখলেন সুদানবাসীদের, তাদেরই এক জন একটা ইংরেজ-সেপাইয়ের গলা ধরেছে বাঁ হাত দিয়ে আর ঠাস্-ঠাস্ করে কয়ে চড় মারছে ডান হাত দিয়ে। গোরা কিছুই করতে পারছে না, কারণ সুদানীর হাত লম্বা বলে গোরাকে এমনই দূরে রেখেছে যে, গোরা তার গাল নাগাল পাচ্ছে না। এ রকম তো চলল মিনিট দু-তিন। তার পর পুলিশ এসে গোরাকে ধরে নিয়ে চলে গেল।'

আমি আশ্চর্য হয়ে শুধালুম, 'সুদানীই তো ঠ্যাঙাচ্ছিল, তাকে ধরে নিয়ে গেল না? যে মার খেল তাকে ধরে নিয়ে গেল, যে মার দিলে তাকে ধরে নিয়ে গেল না, এটা কি করে হয়?'

পল-পার্সি সমস্বরে বললে, 'সেই তো মজার কথা, স্যর! সাংহাই-টাংহাই কোনো জায়গাতে কেউ যদি গোরাকে ঠ্যাঙায়, তবে তাকেই ঠ্যাঙাতে-ঠ্যাঙাতে পুলিশ থানায় নিয়ে যায়। কেউ একবারের তরেও প্রশ্ন করে না দোষটা কার?'

আমি তখন ড্রাইভারকে রহস্য সমাধান করার জন্য অনুরোধ জানালুম।

ড্রাইভার বললে, 'দারোয়ানীর কাজ এ-দেশে করে সুদানীরা। তাদের উপর কাইরোবাসীদের অসীম বিশ্বাস। কোনো সুদানী কখনো কোনো প্রকারের বিশ্বাসঘাতকতা করে নি, এ কথা আমি বলতে পারব না, কিন্তু আমার কানে কখনও পৌঁছয় নি। এরা বড়ই ধর্মপ্রাণ। পাঁচ ওক্ৎ নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজ যায়, তসবী জপে। আর বসে বসে বাড়ি আগলায়।' এই যে সুদানী গোরাকে মার দিচ্ছিল, সে এক রেস্তোরাঁর দারোয়ান। গোরা রেস্তোরাঁয় খেয়ে-দেয়ে পয়সা না দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল বলে হোটেলওলা তাকে চ্যালেঞ্জ করে খেল ঘুষি। তখন সুদানী দারোয়ান তার যা কর্তব্য তাই করেছে। পুলিশ একবার জিজ্ঞেস করে বিশ্বাস করেছে সুদানীকে, আর ধরে নিয়ে গিয়েছে গোরাকে। সবাই জানে, সুদানীরা বড় শান্ত স্বভাব, তারা মারপিটের ধার ধারে না।'

যাক্, সব বোঝা গেল। কিন্তু একটা কথা স্বীকার করব; একা একা কারো সাহায্য না নিয়ে, পল্টনের গোরাকে ঠ্যাঙাতে পারে সুদানীই। পাঠান পারে কি না জানি নে। পারলে পারতেও পারে, কিন্তু তার বাহু আজানুলম্বিত নয়

বলে সেও নিশ্চয় দু-চার ঘা খাবে।

কাইরোতে বৃষ্টি হয় অতি দৈবাৎ। তা-ও দু-এক ইঞ্চির বেশী নয়। তাই লোকজন সব বসেছে হোটেল-কাফের বারান্দায় কিংবা চাতালে। শুনলুম, এখানকার বায়স্কোপও বেশীর ভাগ হয় খোলামেলাতে।

বাঙলা দেশে আমরাও চায়ের দোকানে বসে গালগল্প করে সময় কাটাই। কেউ কেউ হয়তো রোজ একই দোকানে গিয়ে ঘণ্টা দুয়েক কাটায়, কিন্তু কাফেতে বসে দিনের বেশীর ভাগ সময় কাটানোর রেওয়াজ আরম্ভ হয় ফ্রণ্টিয়ার থেকে। কাবুলে দেখবে, চার বন্ধু চলেছেন বরফ ভেঙে চা-খানায় গিয়ে গল্পগুজোব করবেন বলে—যেন বাড়িতে বসে ও-কর্মটি করা যায় না। ওদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলে, 'বাড়িতে মুরুব্বীরা রয়েছেন, কখন এসে কাকে ধমক লাগান তার ঠিক নেই। কিংবা হয়তো বলবেন, দেখ বাছা, ফিরোজ বখৎ, যাও দিকিনি মামার বাড়িতে—(আড়াই মাইলের ধাক্কা) সেখানে গিয়ে মামাকে বলো, আমার নাকের ফুসকুড়িটা একটু সেরেছে, তিনি যেন চিন্তা না করেন। আর দেখো, আসবার সময় ধোপানীকে একটু শুধিয়ে এসো—(সে আরো দেড় মাইলের চক্কর)—আমার নীল জোব্বা,—ইত্যাদি।

'এবং সব চেয়ে বড় কারণ, বাড়িতে মা-জ্যাঠাইমা ওরকম জালা জালা চা দিতে রাজী হন না। ওনারা যে কঞ্জুস তা নয়। আমি যদি একটুখানি বলি, জ্যাঠাইমা, আমার বন্ধুরা এসেছে, ওরা বলেছে, পিসিমার বিয়ের দিনে আপনি যে দুম্বা-মুসল্লম করেছিলেন তারা সেইটে খাবে। কিন্তু ওদের বায়নাক্কা, দুম্বার ভিতর যেন কোফতা পোলাও আর মুর্গী থাকে, মুর্গীর ভিতর যেন কিমা পোলাও আর আণ্ডা থাকে এবং আণ্ডার ভিতর যেন পোনা মাছের পুর থাকে,—জ্যাঠাইমা তদ্দণ্ডেই লেগে যাবেন ঐ বিরাট রান্না করতে। তাতে দশ-বিশ টাকা যা লাগে লাগুক।

'অথচ আমাদের চায়ের খরচা এক সন্ধ্যায় কতটুকুন? দু আনা চার আনা, মেরেকেটে আট আনা। উহুঁ, সেটি হচ্ছে না। ঘন ঘন চা খেলে নাকি ক্ষিদে মরে যায়, আহারের রুচি একদম কমে লোপ পেয়ে যায়।

'তাই ভাই, চায়ের দোকানই প্রশস্ততর। সেখানে এক বার ঢুকতে পারলে বাবা-চাচার তম্বিতম্বার ভয় নেই, মামা-বাড়িতে গিয়ে বাবার নাকের ফুসকুড়িটার লেটেস্ট বুলেটিন ঝাড়তে হয় না, জালা-জালা চা পাওয়া যায়, অন্য দু-চার জন ইয়ার দোস্তের সঙ্গে মোলাকাতও হয়, তাস-দাবা যা খুশি খেলাও যায়—সেখানে যাব না তো, যাব কোথায়?'

প্রথম বারেই প্রথম কাবুলী ভদ্রসন্তান যে আমাকে এই সব কারণ এক নিশ্বাসে বুঝিয়ে বলেছিল তা নয়, একাধিক লোককে জিজ্ঞেস করে ক্রমে ক্রমে চায়ের দোকানে যাবার যাবতীয় কারণ আমি জানতে পেরেছিলুম।

আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, এঁরা সত্য কথাই বলেছিলেন, এবং এঁরা যে ঘর ছেড়ে চায়ের দোকানে যান তাতে আপত্তি করবার কিছুই নেই।

কিন্তু প্রশ্ন, বাঙালীদের বেলাও তো এই সব আপত্তি-ওজুহাত টেকে। আমাদের মা-পিসিরাও চান না আমরা যেন বড্ড বেশী চা গিলি, বাবা-কাকাও ফাই-ফরমায়েস দেওয়াতে অতিশয় তৎপর; তবে আমরা চায়ের দোকানকে বাড়ির ড্রইংরুম করে তুলি নে কেন?

এর সদুত্তর আমি এযাবৎ পাই নি। তা সে যাই হোক, এটা বেশ লক্ষ্য করলুম, রাত বারোটা-একটা অবধি কাফেতে বসে সময় কাটানোতে কাইরোবাসী সবচেয়ে বড় ওস্তাদ; বন্ধুর বাড়িতে জমানো আড্ডা দশটা-এগারটার ভিতর ভেঙে যায়, কারণ বাড়িসুদ্ধ লোক তাড়া লাগায় খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়ার জন্যে। এখানে সে ভয় নেই। উঠি-উঠি করে কেউই ওঠে না। বাড়ির লোকেরও অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। তারা আর একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছে। শুনেছি, এখানকার কোনো কোনো কাফে খোলে রাত বারোটায়!

মোটর গাড়ি বড্ড তাড়াতাড়ি চলে বলে ভালো করে সব-কিছু দেখতে পেলুম না। কিন্তু এইবারে চোখের সামনে ভেসে উঠল অতিরমণীয় এক দৃশ্য! নাইল, নীল নদ।

আমি পুব বাংলার ছেলে। যা-তা নদী আমাকে বোকা বানাতে পারে না। আমি যে গাঙে সাঁতার কাটতে শিখেছি সেই ছোট্ট মনু নদ থেকে আরম্ভ করে আমি বিস্তর মেঘনা-পদ্মা, গঙ্গা-যমুনা এবং পরবর্তী যুগে গোদাবরী-কৃষ্ণা-কাবেরী-তাপ্তী-নর্মদা-সিন্ধু, ইয়োরোপে রাইন-ডানয়্যুব-মোজেল-রোন দেখেছি। নদী দেখলে আর পাঁচ জন বাঙালের মতো আমিও গামছা খুঁজতে আরম্ভ করি—ঐ নদীতে কটা লোক গত সাতশ বছরে ডুবে মরেছিল তার স্টাটিস্‌টিক্‌সের সন্ধান না নিয়ে—একটা ডিঙি কি কৌশলে চুরি করা যায় তার সন্ধানে মাথায় গামছা বেঁধে নি, পাটনিকে কি প্রকারে ফাঁকি দিয়ে খেয়া নৌকো থেকে নামতে হয় সেটা এক মুহূর্তেই আবিষ্কার করে ফেলি।

এই যে পৃথিবীর সবচেয়ে মধুর ভাটিয়ালী গীত! সৃষ্টিকর্তা যদি তাঁর পুব-বাঙলার লীলাঙ্গনে শত শত নদীর আলপনা না আঁকতেন তবে কি কখনো ভাটিয়ালী গানের সৃষ্টি হত? আর এ কথাও ভাবি তিনি রচেছেন মোহনিয়া প্রবাহিনী আর আমরা তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রচেছি ভাটিয়ালী। অবশ্য তাঁরই কাছ থেকে ধার করে! আমরা যখন ও—ও—ও—বলে ভাটিয়ালীর লম্বা সুর ধরি, মাঝে মাঝে কাঁপন জাগাই তখন কি স্পষ্ট শুনতে পাও না, দেখতে পাও না, 'ও—'র লম্বা টানে যেন নদী শান্ত হয়ে এগিয়ে চলছে, যখন কাঁপন লাগাই তখন মনে হয় না, নদী যেন হঠাৎ থমকে গিয়ে দ'য়ের সৃষ্টি করেছে?

প্যারিস-ভিয়েনার রসিকজনের সম্মুখে আমি আমার হাজারোটা নদী কাঁধে বয়ে নিয়ে হাজির করতে পারব না, কিন্তু ভাটিয়ালীর একখানা উত্তম রেকর্ড শুনিয়ে দিতে পারি।

আমি বে-আক্কেল তাই একবার করেছিলুম। তার কি জরিমানা দিয়েছিলুম শোনো।

ভিয়েনাতে পাশের ঘরে থাকত এক রাশান। সে এসেছিল সেখানে

কন্টিনেন্টাল সঙ্গীত শিখতে। ভিয়েনা শহর বেটোফেন্ মোৎসার্টের কর্মভূমি —আমাদের যে রকম তানসেন্, ত্যাগরাজ, বাঙালীর যে রকম রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইল্লাম।

ভিয়েনা ডানয়্যুব নদীর পারে। 'ব্লু ডানয়্যুব' তোমাদের কেউ কেউ হয়তো শুনেছ।

একদিন সেই রাশান বলল, 'ডানয়্যুব ফানয়্যুব সব আজে-বাজে নদী। এই সব নদী থেকে আর কি গান বেরিয়েছে যে পাল্লা দেবে আমার রাশার ভল্‌গা নদী থেকে আর ভল্‌গার মাঝির গান উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে? তুমি 'গড্'-'ফড' কি সব মানো, না? আমি মানি নে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি প্রকৃতিকে। তারই অন্যতম মধুর প্রকাশ নদীতে। সেই নদীকে আমরা মাধুর্যে হার মানাই ভল্‌গা মাঝির গান দিয়ে।'[৩]

বাড়ি ফেরা মাত্রই সে ভল্‌গা-মাঝির রেকর্ড শোনালো। আমি মুগ্ধ হয়ে বললুম, 'চমৎকার!'

কিন্তু ততক্ষণে আমার বাঙাল রক্ত গরম হয়ে উঠেছে। বাঙালরা অবশ্য জানে, তার অর্থ কি? 'ঘটি' অর্থাৎ পশ্চিম-বাঙলার লোক তাই নিয়ে হাসা-হাসি করে করুক। আমার তাতে কোনো খেদ নেই। ওরা তো আমাদের ভাটিয়ালী ভালোবাসে, আমরা তো ওদের 'বাউল' শুনে 'বাউলে' হয়ে যাই।

আমার গরম রক্ত তখন টগবগ করে বলছে, 'বাঙলা দেশ শত শত নদীর দেশ। রাশাতে আর ক-টা নদী আছে? তারই একটা, ভল্‌গা। সে নদী হারিয়ে দেবে বাঙলা দেশের তাবৎ নদীকে? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।'

ভাগ্যিস, আব্বাসউদ্দিনের 'রঙিলা নায়ের মাঝি' আমার কাছে ছিল। সেইটে চড়িয়ে দিলুম রাশানের গ্রামোফোনে।

সে চোখ বন্ধ করে শুনলে। তার পর বললে—যা বললে তার অর্থ— 'ধাপ্পা'।

আমি বললুম 'মানে?'

সে বললে, 'সুরটি অতি উচ্চশ্রেণীর এবং তার চেয়েও বেশী কানে ধরা পড়ে ওর অভিনবত্ব। আমি করজোড়ে স্বীকার করছি, এ রকম গীত আমি পূর্বে কখনো শুনি নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলবো, এ গীত লোক-গীত নয়। কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো ভূমিতেই গ্রাম্য গীতে এতগুলো 'নোট' লাগে না। তাই বলছিলুম তুমি ধাপ্পা দিচ্ছো।'

আমি বললুম, 'বাছা, ঐ হল ভাটিয়ালির বৈশিষ্ট্য। ও যতখানি ওঠা-নামা করে পৃথিবীর আর কোনো লোক-গীত তা করে না।'

কিছুতেই স্বীকার করে না ওটা লোক-গীত। তার ধারণা ওটা লোক-গীত এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মাঝখানে উপস্থিত ঝুলছে, আর কয়েক বৎসর যেতে না

৩ রবীন্দ্রনাথও এই 'দম্ভ' করেছেন তাঁর 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল' গানে। রেকর্ডে গেয়েছেন, শ্রীযুক্তা রাজেশ্বরী বাসুদেব।

যেতেই কোনো গুণী সেটাকে 'উচ্চাঙ্গ' শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে বরণ করে তুলে নেবেন।

তার পর এক দিন সে স্বীকার করলে। বি বি সি-র কল্যাণে। বি বি সি পৃথিবীর লোক-গীত শোনাতে শোনাতে ভাটিয়ালী শুনিয়ে বললে এটা পূব বাঙলার লোক-গীত।

আমি লড়াই জিতলুম কিন্তু তখন থেকেই শুরু হল আমার জরিমানা। আশ্চর্য লাগছে না, যে জিতলে সে দেবে জরিমানা? হয়, প্রায়ই হয়। মার্কিনিংরেজ জর্মনি জয় করে বহু বৎসর ধরে সেখানে ঢেলেছে এবং এখনো ঢালছে বিস্তর টাকা। সে কথা যাক, জরিমানাটা কি ভাবে দিতে হল বুঝিয়ে বলি।

এর পর যখনই সে আমাকে সাজা দিতে চাইত তখনই তার বেয়ালাতে বাজাতে আরম্ভ করত ভাটিয়ালির সুর।

বোঝ অবস্থাটা! বিদেশ-বিভুঁইয়ে একেই দেশের জন্য মন আঁকুপাঁকু করে তার উপর ভাটিয়ালির করুণ টান!

রবীন্দ্রনাথের শ্রীকণ্ঠবাবুর মতো[৪] আমি কাতর রোদনে তাঁকে বেয়ালা বন্ধ করতে অনুনয়-বিনয় করতুম।

কিন্তু আজও বলি, লোকটা যা বেয়ালাতে ভাটিয়ালি চড়াতে পারত তার তুলনা হয় না।

কত দেশ ঘুরলুম, কত লোক দেখলুম, কত অজানা জনের প্রীতি পেলুম, কত জানা জনের দুর্ব্যবহার, হিটলারের মতো বিরাট পুরুষের উত্থান-পতন দেখলুম, সে সব বড় বড় জিনিস প্রায় ভুলে গিয়েছি, কিছু এই সব ছোটখাটো জিনিস কিছুতেই ভুলতে পারি নে। মনে হয় যেন আজ সকালের ঘটনা।

চাঁদের আলোতে দেখছি, নীলের উপর দিয়ে চলেছে মাঝারি ধরনের খোলা মহাজনী নৌকা—হাওয়াতে কাত হয়ে তেকোণা পাল পেটুক ছেলের মত পেট ফুলিয়ে দিয়ে। হাওয়া বইছে সামান্যই, কিন্তু এই পেটুক পাল এর ওর সবার হাওয়াই খাবার যেন কেড়ে নিয়ে পেটটাকে ঢাকের মতো ফুলিয়ে তুলেছে। ভয় হয়, আর সামান্য একটুখানি জোর হাওয়া বইলেই, হয় পালটা এক ঝটকায় চৌচির হয়ে যাবে, নয় নৌকোটা পেছনের ধাক্কা খেয়ে গোটা আড়াই ডিগবাজি খেয়ে নীলের অতলে তলিয়ে যাবে।

এই নীলের জল দিয়ে এ দেশের চাষ হয়। এই নীল তাঁর বুকে ধরে সে চাষের ফসল মিশরের সর্বত্র পেঁছিয়ে দেন। তাই এ দেশের কবি গেয়েছেন:

ওগো নীলনদপ্লাবিতা ধরণী আমি ভালোবাসি তোরে,
ঐ ভালোবাসা ধর্ম আমার কর্ম আমার ওরে।

---

৪ রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, ২১৫ পৃঃ।

পিরামিড ! পিরামিড !! পিরামিড !!!

কোনো প্রকাশের আশ্চর্য প্রকাশ করতে হলে আমরা তিনটে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন—!!!—দিই। তাই কি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে তিনটে পিরামিড ? কিংবা উল্টোটা ? তিনটে পিরামিড ছিল বলে আমরা তিনবার আশ্চর্য হই ?

এই পিরামিডগুলো সম্বন্ধে বিশ্বজুড়ে যা গাদা গাদা বই লেখা হয়ে গিয়েছে তার ফিরিস্তি দিতে গেলেই একখানা আস্ত জলে-ডাঙায় লিখতে হয়। কারণ এই তিনটে পিরামিড পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো কীর্তিস্তম্ভ—যুগ যুগ ধরে মানুষ এদের সামনে দাঁড়িয়ে বিস্তর জল্পনা-কল্পনা করেছে, দেয়ালে-খোদাই এদের লিপি উদ্ধার করে এদের সম্বন্ধে পাকা খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছে, জান তো, পিরামিডের ঠিক মাঝখানে একটা কুটুরিতে বিস্তর ধনদৌলত জড়ো করা আছে—তারই পথ অনুসন্ধান করছে পাকা সাড়ে ছ হাজার বছর ধরে। ইরানী, গ্রীক, রোমান, আরব, তুর্কী, ফরাসী, ইংরেজ, পর পর সবাই এদেশ জয় করার পর প্রথমেই চেষ্টা করেছে পিরামিডের হাজার হাজার মণ পাথর ভেঙে মাঝখানের কুটুরিতে ঢুকে তার ধনদৌলত লুট করার। কিন্তু আশ্চর্য, যিনি শেষ পর্যন্ত ঢুকতে পারলেন তিনি ধন লুটের মতলবে ঢোকেন নি। তিনি ঢুকেছিলেন নিছক ঐতিহাসিক জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য। ফারাওয়ের রাজমিস্ত্রীরা কুটুরি বানানো শেষ করার পরে বেরোবার সময় এমন-ই মস্ত পাথর দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে বাইরের দেয়ালে পালিশ পলস্তরা লাগিয়ে দেয় যে, পৃথিবীর মানুষের সাড়ে ছ হাজার বছর লাগল ভিতরে যাবার রাস্তা বের করতে !

মিশরের ভিতরে-বাইরে আরও পিরামিড আছে, কিন্তু গিজে অঞ্চলের যে তিনটে পিরামিডের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে, সেগুলোই ভুবন-বিখ্যাত, পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম।

রাজা	নির্মাণের সময়	ভূমিতে দৈর্ঘ্য	উচ্চতা
খুফু	৪৭০০ খ্রীঃ পূঃ	৭৫৫ ফুট	৪৮১ ফুট
খাফ্রা	৪৬০০ „ „	৭০৬ „	৪৭১ „
সেনকাওরা	৪৫৫০ „ „	৩৪৬ „	২১০ „

প্রায় পাঁচশো ফুট উঁচু বললে, না দেখে চট করে পিরামিডের উচ্চতা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায় না। এমন কি চোখের সামনে দেখেও ধারণা করা যায় না, এরা ঠিক কতখানি উঁচু। চ্যাপ্টা আকারের একটা বিরাট জিনিস আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে পাঁচশো ফুট উঁচু না হয়ে যদি চোঙার মতো একই সাইজ রেখে উঁচু হত, তবে স্পষ্ট বোঝা যেত পাঁচশো ফুটের উচ্চতা কতখানি উঁচু !

বোঝা যায়, দূরে চলে গেলে। গিজে এবং কাইরো ছেড়ে বহু দূরে চলে যাওয়ার পরও হঠাৎ চোখে পড়ে তিনটে পিরামিড, সব কিছু ছাড়িয়ে, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। আর পিরামিড ছেড়ে যদি সোজা মরুভূমির ভিতর দিয়ে চলে যাও, তবে মনে হবে সাহারার শেষ প্রান্তে পেঁছে যাওয়ার পরও বুঝি পিরামিড দেখা যাবে !

তাই বোঝা যায়, এ বস্তু তৈরি করতে কেন তেইশ লক্ষ টুকরো পাথরের প্রয়োজন হয়েছিল। 'টুকরো' বলতে একটু কমিয়ে বলা হল, কারণ এর চার-পাঁচ টুকরো একত্রে করলে একখানা ছোটখাটো এঞ্জিনের সাইজ এবং ওজন হয়। কিংবা বলতে পারো, ছ ফুট উঁচু এবং তিন ফুট চওড়া করে এ পাথর নিয়ে একটা দেয়াল বানালে সে দেয়াল লম্বায় ছ'শ পঞ্চাশ মাইল হবে। অর্থাৎ সে দেয়াল কলকাতা থেকে দার্জিলিং গিয়ে আবার ফিরে আসতে পারবে!

সবচেয়ে বড় পিরামিডটা বানাতে নাকি এক লক্ষ লোকের বিশ বৎসর লেগেছিল।

ভেবে কূল-কিনারা পাওয়া যায় না, সে সম্রাটের কতখানি ঐশ্বর্য আর প্রতাপ ছিল, যিনি আপন রাজধানীর পাশে এক লক্ষ লোককে বিশ বচ্ছর খাওয়াতে-পরাতে পেরেছিলেন। অন্য খরচের কথা বাদ দাও, এই এক লক্ষ লোকের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য যে বিরাট প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন সেটা গড়ে তোলা এবং তাকে বিশ বচ্ছর ধরে চালু রাখা তারাই করতে পারে, যারা সভ্যতার খুব একটা উঁচু স্তরে উঠে গিয়েছে।

এইবারে আমরা পিরামিড নির্মাণের কারণের কাছে পেঁছে গিয়েছি।

প্রথম কারণ সকলেরই জানা। ফারাওরা (সম্রাটরা) বিশ্বাস করতেন, তাঁদের শরীর যদি মৃত্যুর পর পচে যায় কিংবা কোনো প্রকারের আঘাতে ক্ষত হয়, তবে তাঁরা পরলোকে অনন্ত জীবন পাবেন না। তাই মৃত্যুর পর তাঁদের দেহকে 'মামি' বানিয়ে সেটাকে এমন একটা শক্ত পিরামিডের ভিতর রাখা হত যে, তার ভিতরে ঢুকে কেউ যেন 'মামি'কে ছুঁতে পর্যন্ত না পারে। কিন্তু হায়, তাঁদের এ-বাসনা পূর্ণ হয় নি। পূর্বেই বলেছি, হাজার হাজার বছর চেষ্টা করে দুষ্ট (অর্থাৎ ডাকাতরা) এবং শিষ্টেরা (অর্থাৎ পণ্ডিতেরা) শেষ পর্যন্ত তাদের গোপন কবরে ঢুকতে পেরেছেন। তাই করে অবশ্য গোণত কোনো কোনো ফারাওয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে—পণ্ডিতেরা তাদের মামি সযত্নে জাদুঘরে সাজিয়ে রেখেছেন। সেখানে তাঁরা অক্ষত দেহে মহাপ্রলয়ের দিন গুনছেন, যেদিন তাঁরা নব দেহ নব যৌবন ফিরে পেয়ে অমৃতলোকে অনন্ত জীবন আরম্ভ করবেন।

কিন্তু যদি ইতিমধ্যে আরেকটা বিশ্বযুদ্ধ লেগে যায়? ফলে গুটিকয়েক অ্যাটম বম পড়ে? তবে?

আমার মনে ভরসা, এঁরা যখন চোর-ডাকু ধনিক-পণ্ডিতের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে এত হাজার বৎসর অক্ষত দেহে আছেন তখন মহাপ্রলয় পর্যন্ত পেঁছে যাবেন-ই যাবেন। এ্যাটম বম্ পড়ার উপক্রম হলে আমি বরঞ্চ তারই একটার গা ঘেঁষে গিয়ে বসব। মামিটা রক্ষাকবচের মতো হয়ে তার দেহকে তো বাঁচাবেই, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও বাঁচিয়ে দেবে। চাই কি, গোটা শহরটাই হয়তো বেঁচে যাবে!

পিরামিড নির্মাণের দ্বিতীয় কারণ,—এই কারণের উল্লেখ করেই আমি এ অনুচ্ছেদ আরম্ভ করেছি—

ফারাওরা বলতে চেয়েছিলেন, সভ্যতার যে স্তরে আমরা এসে পেঁাচেছি, আমরা যে প্রতাপশালী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছি, সেগুলো যেন এই পিরামিডের মতো অজর অমর এবং বিশেষ করে অপরিবর্তনীয় হয়ে থাকে। 'পরিবর্তন যেন না হয়', 'যা আছে তাই থাকবে', এই ছিল পিরামিড গড়ার দ্বিতীয় কারণ। পিরামিড জগদ্দল পাথর হয়ে—অতি শব্দার্থে জগদ্দল পাথরই বটে—যুগ যুগ ধরে আমাদের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য, রাজবংশ, ধর্মনীতি, সব কিছু অপরিবর্তনীয় করে চেপে ধরে রাখবে।

তাই পিরামিড দেখে মানুষের মনে জাগে ভয়। আজ যদি সেই ফারাওরা বেঁচে থাকতেন, তবে তার প্রতি জাগত ভীতি। এই পিরামিড যে তৈরী করতে পেরেছে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার কল্পনাও তো মানুষ করতে পারে না।

তাজমহলের গীতিরস কঠিন মানুষের পাষাণ হৃদয়কেও গলিয়ে দেয়, কুতুবমিনারের ঋজু দেহ উন্নতশির দুর্বলজনকে সবল হয়ে দাঁড়াতে শেখায় এই দুই রস কাব্যের, সঙ্গীতের প্রাণ। তাজমহল নিয়ে তাজমহলের মতো কবিতা রচনা করা যায়, কিন্তু পিরামিড নিয়ে কবিতা হয়েছে বলে শুনি নি। বরঞ্চ পিরামিডের দোহাই দিয়ে বেঙ্গল অর্ডিনান্সের অনুকরণে আজ এক নূতন ইজিপসিয়ান অর্ডিনান্স তৈরী করা যায়।

কিন্তু হায়, ফারাওরা 'অপরিবর্তনে'র যে অর্ডিনান্স জারি করে বিরাট পিরামিড গড়েছিলেন, সেটা টিকল না। ফারাও বংশ ধ্বংস হল, দূর ইরানের রাজারা মিশর লণ্ডভণ্ড করে দিল, তারপর গ্রীক, রোমান এবং শেষটায় সারা মিশরের লোক ইসলাম গ্রহণ করে সম্পূর্ণ নূতন পথে চলল। মুসলমানরা দেহ এবং আত্মার পার্থক্য চেনে। অনন্ত জীবন পাওয়ার জন্য দেহটাকে যে মামি করে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই, সে কথা তারা বোঝে।

কিন্তু ফারাওদের দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। প্রায় সব দেশেই মানুষ উন্নতির চরম শিখরে পেঁাছে বলেছে, 'এই ঠিক জায়গায় এসে পেঁাচেছি, আর এগিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই। যা সঞ্চয় করেছি তাই বেঁচে থাকুক, সেইটেই অপরিবর্তনীয় হয়ে থাক।' ফলে হয়েছে পতন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন এই বিষয় নিয়ে 'তাজমহলের' মতো কবিতা লিখেছেন তখন আমার আর বাক্যব্যয় করার কি প্রয়োজন?

॥ ১৯ ॥

চাঁদের আলোতে বিশ্বজন তাজমহল দেখবার জন্য জড় হয়।

পিরামিডের বেলাও তাই।

চতুর্দিকে লোকজন গিসগিস করছে। এদেশের মেলাতেও বোধ করি এত ভিড় হয় না।

অবশ্য তার কারণও আছে। নিতান্ত শীতকাল ছাড়া গরমের দেশে দিনের

বেলা কোনো জিনিস অনেকক্ষণ ধরে রসিয়ে রসিয়ে দেখা যায় না। বিশেষ করে যেখানে কোন সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখবার বালাই নেই সেখানে তো আরো ভালো। তাজের মিহি কাজ চাঁদের আলোতে চোখে পড়ে না, তবু সবসুদ্ধ মিলিয়ে তার যে অপূর্ব সামঞ্জস্য চাঁদের আলোতে ধরা দেয় দিনের কড়া আলোতে সেটা দর্শককে ফাঁকি দেয় বলে মানুষ চাঁদের আলোতে তাজ দেখে। পিরামিডে সে রকম কোনো নৈপুণ্য নেই, তদুপরি পিরামিডের চতুর্দিকে মরুভূমি বলে সেখানে দিনের বেলাকার গরম পীড়াদায়ক, কাজেই নিতান্ত শীতকাল ছাড়া দিনের বেলা কম লোকই পিরামিড দেখতে যায়।

পক্ষান্তরে শীতের দেশে ব্যবস্থা অন্যরকম। আমি ফুটফুটে চাঁদের আলোতে কলোন্ গির্জার পাশ দিয়ে শীতের রাতে হি-হি করে বহুবার বাড়ি ফিরেছি। কাক-কোকিল দেখতে পাই নি।

পল পার্সি আর আমাদের দলের আরো কয়েকজন পিরামিডের মাঝখানকার কবর-গৃহ দেখতে গেছেন। আমি যাই নি।

আমি বসে বসে শুনছি, জাত-বেজাতের কিচিরমিচির, স্যাণ্ডউইচ খোলার সময় কাগজের মড়মড়, সোডা-লেমনেড খোলার ফটাফট। ইয়োরোপীয়েরা খাবার ব্যবস্থা সঙ্গে না নিয়ে তিন পা চলতে পারে না। পিরামিড হোক আর নিমতলাই হোক, মোকামে পেঁছিনো মাত্রই বলবে, 'টম, বাস্কেটটা এই দিকে দাও তো। ডিক্ তুমি ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালো' আর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে 'ডার্লিং, আপেলগুলো ভুলে যাও নি তো?' ইতিমধ্যে হ্যারি হয়তো গ্রামোফোনের জাঁতা চালিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য যদি দলে মেয়েরা ভারী হন তবে কোনো কিছুই শুনতে পাওয়া যায় না। 'লাভলি', 'গ্র্যাণ্ড', 'সবলাইম' ইত্যাদি শব্দে তখন যে ঘ্যাঁট তৈরী হয় তার কোনটা কি, ঠিক ঠাহর করা যায় না।

কোনো কোনো ট্যুরিস্ট আমাকে বলেছেন, নায়াগ্রার গম্ভীর জল-নির্ঘোষ শুনতে হলে নাকি মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে যেতে নেই। যে ধ্বনি তাদের ভিতর ওঠে তাতে নাকি নায়াগ্রার—থাক, মেয়েরা আমার উপর এমনিতেই চটে আছেন। কিন্তু আমার উপর চটে আর লাভ কি? ওঁয়াদের খাস-পেয়ারা কবি রবি ঠাকুরই এ-বাবদে কি বলেছেন?—

'ছেলেরা ধরিল পাঠ, বুড়ারা তামুক,
এক দণ্ডে খুলে গেল রমণীর মুখ।'

পল-পার্সি ফিরে এসেছে। আমি শুধালুম, 'কি দেখলে, বাছারা?' তারপর নোটবুক খুলে বললুম, 'গুছিয়ে বলো, সব কিছু টুকে নেব; আমি তো বে-আক্কেলের মতো এইখানে বসে বসে সময় কাটালুম।'

পার্সি করুণ কণ্ঠে বললে, 'আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবেন না, স্যর। দেখেছি কচু পোড়া। মশালের আলোতে হাতের তেলো চোখে পড়ে না। তারই জোরে বিস্তর সুড়ঙ্গ পেরিয়ে একটা চৌকো ঘরে শেষটায় পেঁছিলুম। বেবাক ভোঁ ভোঁ। এক কোণে একখানা ভাঙা ঝাঁটা পর্যন্ত নেই। গাইড বললে, "ব্যস্ ফিরে চলুন।" আপনি তখনই বারণ করলেন না কেন?'

আমি বললুম, 'বারণ করলে কি শুনতে? বাকী জীবন মনটা খুঁতখুঁত করতো না, ফারাওয়ের শেষ শোওয়ার ঘর দেখা হল না? এ হল দিল্লীর লাড্ডু।'

শুধালে, 'সে আবার কি?'

আমি বুঝিয়ে বললুম।

পল বললে, 'গাইড বলছিল, পিরামিডের যে বিরাট বিরাট পাথর সেগুলো নাকি টেনে টেনে নদীর ওপার থেকে এখানে আনা হয়েছিল। আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না—ওর যা ইংরেজী!'

আমি বললুম 'ঠিকই বলেছে। নীলের এপারে পাথর পাওয়া যায় না। তাই ওপার থেকে পাথর কেটে ভেলায় করে এপারে নিয়ে আসা হত। আর সে যুগে মানুষ চাকা কি করে বানাতে হয় জানত না বলে সেই পাথরগুলো ধাক্কা দিয়ে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেত। কাঠ বাঁশ দিয়ে পথ তৈরী করা হত পিছলে নিয়ে যাবার সুবিধের জন্য। এবং শুনেছি, সে পথে নাকি ঘড়া ঘড়া তেল ঢালা হত, সেটাকে পিছলে করার জন্যে। আশ্চর্য নয়! এর ছটা পাথরে যখন একটা এঞ্জিনের আকার ধরতে পারে, এবং স্পষ্ট দেখেছি, এঞ্জিন রেল লাইন থেকে কাত হয়ে পড়ে গেলে তাকে খাড়া করবার জন্য আজকের দিনের কপিকল পর্যন্ত কি রকম হিমশিম খায়, তখন তো তেল-ঘি ঢালার কথা আর অবিশ্বাস করা যায় না।'

তখন আলোচনা আরম্ভ হল চাকা আবিষ্কার নিয়ে। আগুন যে রকম মানুষকে সভ্যতার পথ দেখিয়ে দিল, চাকাও মানুষকে ঠিক তেমনি বাকি পথটুকু অক্লেশে চলতে শেখালে। শুনেছি, ভারতের মোন্-জো-দড়োতে প্রথম চাকা আবিষ্কার হয় এবং ক্রমে ক্রমে সেটা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

আমরা এখনো যখন পালকি চড়ি তখন বোধ হয় সেই আদিম যুগে ফিরে যাই, যখন মানুষ চাকা আবিষ্কার করতে শেখে নি। ছজন বেয়ারা একটি মেয়েকে বইতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে যায়, ঘড়ি ঘড়ি জিরোয় আর গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খায়; ওদিকে একজন রিক্সাওলা দুটো লাশকে দিব্য টেনে নিয়ে যায়—সবই চাকার কল্যাণে।

আবুল আসফিয়া বললেন, 'চাকা এরা আবিষ্কার করতে পারে নি সত্যি, কিন্তু হাতের নৈপুণ্যে এরা আর সবাইকে হার মানিয়েছে। এই যে হাজার হাজার টনী লক্ষ লক্ষ পাথর একটার গায়ে আরেকটা জোড়া দিয়েছে, সেখানে এক ইঞ্চির হাজার ভাগের এক ভাগের কাজ। আজকের দিনের জহুরীরা, চশমা বানানেওলারাও এত সূক্ষ্ম কাজ করতে পারে কি না সন্দেহ আর জহুরীদের কাজ তো এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি মাল নিয়ে। এরা সামলেছে লক্ষ লক্ষ ইঞ্চি।'

আমরা শুধালুম, 'তা হলে তারা সে নৈপুণ্য কোনো সূক্ষ্ম কলা নির্মাণে, কোনো সৌন্দর্যসৃষ্টিতে প্রয়োগ করল না কেন?'

আবুল আসফিয়া বললেন, 'সেটা দেখতে পাওয়া যায় তাদের মন্দিরগাত্রে, তাদের প্রস্তরমূর্তিতে।'

হায়, সেগুলো এখন দেখবার উপায় নেই।

পার্সি ততক্ষণে বালু জড়ো করে বালিশ বানিয়ে তারই উপর মাথা দিয়ে শুয়ে পড়েছে। তত্ত্বালোচনার প্রতি তার একটা বিধিদত্ত আজন্মলব্ধ নিরংকুশ বৈরাগ্য আছে। স্বতই ভক্তিভরে মাথা নত হয়ে আসে।

আবুল আসফিয়া বললেন, 'অনেক রাত হয়েছে। শহরে ফেরা যাক।'

পল অনেকক্ষণ ধরে গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবছিল। মোটরের দিকে যেতে যেতে বললে,'আমার কিন্তু সমস্ত জিনিসটা একটা হিউজ ওয়েস্ট বলে মনে হয়।' আমরা সবাই চুপ করে শুনলুম।

আমাদের দলের মধ্যে একটি প্রৌঢ়া মহিলা ছিলেন। তিনি বললেন, 'না, মসিয়ো পল। পিরামিডের একটা গুণ আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। এর সামনে দাঁড়ালে, বয়সের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, আমাকেও তরুণী বলে মনে হয়।'

একটা কথার মতো বটে।

আমি বললুম, 'শাবাশ!'

॥ ২০ ॥

মানুষের চেহারা জাগ্রত অবস্থায় এক রকম, ঘুমন্ত অবস্থায় অন্য রকম। শহরের বেলাতেও তাই। জাগ্রত অবস্থায় কোনো মানুষকে বেশ চালাক-চতুর বলে মনে হয়, কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় তাকেই দেখায় আস্ত হাবা গঙ্গারামের মতো। দুপুর বেলা লালদিঘি গমগম করে, রাত্রে সেখানে গা ছমছম করে। আমাদের পাড়া পার্ক সার্কাসের ট্রাম ডিপো অঞ্চল দুপুরবেলা ঘুমিয়ে পড়ে, সন্ধ্যায় হোটেলগুলো যেন কোরাস গান গেয়ে ওঠে।

রসের ক্ষেত্রে আমি ছেলে-বুড়োতে তফাত করি নে। আট বছরের ছেলে মহাভারত পড়ে সুখ পায়, আশী বছরের বুড়োও আনন্দ পায়। আবার আট বছরের ছেলে দিব্য কীর্তন গেয়ে শুনিয়ে দিলে, ষাট বছরের সুরকানা পণ্ডিত ধরতে পারলে না, সেটা কীর্তন না বাউল! অর্থাৎ রসবোধের ক্ষমতা বয়সের উপর নির্ভর করে না।

কিন্তু কোনো কোনো ছোটখাটো রস বয়সের উপর নির্ভর করে। আট বছরে সিগরেট খেয়ে কোনো লাভ নেই, আঠারোতেই রাস্তায় মার্বেল খেলার রস শুকিয়ে যায়। ঠিক তেমনি রাতের শহর ছোটদের জন্য নয়। তুলনা দিয়ে বলি; সকাল আটটায় আট বছরের ছেলেকে আটখানা ট্যাকসি ডাকতে পাঠাতে পারি, কিন্তু রাত দশটায় দশ বছরের ছেলেকে দশ জায়গায় পাঠাতে পারি নে।

কিন্তু যে-সব দুঁদে ছেলেরা—যেমন পল পার্সি—রাত দুটোর সময় জেগে আছে, তাদের নিয়ে কি করা যায়? আবুল আসফিয়া অভয় জানিয়ে বললেন,

কাইরোতে এমন সব নাচের জায়গা আছে, যেখানে বাপ্ মা আপন ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দ করতে যান!

তারই একটা 'কাবারে'-তে যাওয়া হল।

খোলাতে। উপরে মুক্ত আকাশ। চতুর্দিকে জাপানী ফানুসে ঢাকা রঙ-বেরঙের আলোর জ্যোতি ক্ষীণ বলে উপরের দিকে খানিকক্ষণ তাকালে গম্ভীর আকাশের গায়ে চটুল তারার মিটমিটে নাচ দেখা যায়।

শ'খানেক ছোট ছোট টেবিল। এক প্রান্তে স্টেজ। ডাইনে বাঁয়ে উইঙ নেই, পিছনে শুধু হুবহু শুক্তির এক পাটির মতো কিংবা বলতে পারো, সাপের ফণার মতো উঁচু হয়ে ডগার কাছে নিচের থেকে বেঁকে আছে স্টেজের বিরাট ব্যাকগ্রাউন্ড। শুক্তিতে আবার ঢেউ-খেলানো—এ রকম ছোট্ট সাইজের ঝিনুক সমুদ্রপাড়ে কুড়িয়ে পাওয়া যায়—দেখতে ভারি চমৎকার। ব্যাকগ্রাউন্ডের পিছনে এরই আড়ালে গ্রীনরুম নাকি, না মাটির নিচে সুড়ঙ্গ করে?

হঠাৎ সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল। ভাবছি ব্যাপার কি। পল পার্সিকে কানে কানে বললুম, 'মনিব্যাগ চেপে ধরো। বলা তো যায় না, বিদেশ-বিভুঁই জায়গা।'

নাঃ, আলো জ্বলতে দেখি, শুক্তির সামনে এক স্ফিন্‌ক্‌স। পিরামিডের পাশে আমরা স্ফিন্‌ক্‌সের পাথরের মূর্তি দেখেছি—অবশ্য এর চাইতে পাঁচশো গুণে বড়। স্ফিন্‌ক্‌স্ মিশরের সম্রাট ফারাওয়ের প্রতিমূর্তি। মুখটা রাজারই মতো, শুধু শক্তি আর প্রতাপ বোঝানোর জন্য শরীরটা সিংহের।

পিছন থেকে বেরিয়ে এল ছটি মেয়ে। গলা থেকে পা অবধি ধবধবে সাদা শেমিজের মতো লম্বা জামা পরা। রাস্তায় মিশরী মেয়েদের এ রকম জামা পরতে দেখেছি। তবে অন্য রঙের।

আস্তে আস্তে তারা স্ফিন্‌ক্‌সের চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচতে আরম্ভ করল। বড় মৃদু পদক্ষেপ। পায়রা যে-রকম নিঃশব্দ পদসঞ্চারণে হাঁটে। চাঁদ যে রকম আকাশের উপর দিয়ে তারার ফুলকে না মাড়িয়ে আকাশের এপার-ওপার হয়।

পায়ে ঘুঙুর নেই, হাতে কাঁকন নেই। শুধু থেকে থেকে সমের একটু আগে তেহাইয়ের সময় থেকে বাঁশি, খঞ্জনী আর ঢোলের সামান্য একটুখানি সঙ্গীত। বড় করুণ, অতি বিষাদে ভরা। নীলনদের এপার থেকে মা যেন ওপারের ছেলেকে সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফেরার জন্য ডাকছে। এ ডাক আমি জীবনে বহুবার শুনেছি। যে মা-ই ডাকুক না কেন, আমি যেন সে ডাকে আমার মায়ের গলা শুনতে পাই।

সে ডাক বদলে গেল। এবারে শুনতে পাচ্ছি অন্য স্বর। এ যেন মা ছেলেকে ঘুম থেকে জাগাবার চেষ্টা করছে। এ গলায় গোড়ার দিকে ছিল অনুনয়-বিনয়। তার পর আরম্ভ হল আশা-উদ্দীপনার বাণী। সঙ্গীত জোরালো হয়ে আসছে। পদক্ষেপ দ্রুততর হয়েছে। ছটি নয় এখন মনে হচ্ছে যেন ষাটটি মেয়ে দ্রুত হতে দ্রুততর লয়ে নৃত্যাঙ্গন অপূর্ব আলিম্পনে পরিপূর্ণ করে

দিয়েছে ! আর পদক্ষেপের কণামাত্র স্থান নেই।

স্বপ্নে অজানা লিপি,অচেনা বাণী মানুষ যেমন হঠাৎ কোনো এক ইন্দ্রজালের প্রভাবে বুঝে ফেলে, আমি ঠিক তেমনি হঠাৎ বুঝে গেলুম নাচের অর্থটা কি। এ শুধু অর্থবিহীন পদক্ষেপ নয়, ব্যঞ্জনাহীন হস্ত-বিন্যাস নয়। নর্তকীরা নব মিশরের প্রতীক। এরা প্রাচীন মিশরের প্রতীক স্ফিন্‌ক্‌স্‌কে তার যুগ-যুগান্ত-ব্যাপী নিদ্রা থেকে জাগরিত করতে চাইছে। সে তার লুপ্ত গৌরব নিয়ে সুপ্তিজাল ছিন্নভিন্ন করে আবার মিশরে সুপ্রতিষ্ঠিত হোক, বিদেশী স্বৈরতন্ত্রের কুহেলিকা উদ্‌ঘাটন করে সেই প্রাচীন সবিতার নবীন মূর্তি দ্যুলোক ভূলোক উদ্ভাসিত করুক।

তবে কি আমারই মনের ভুল ? দেখি, স্ফিন্‌ক্‌স্‌ মূর্তির মুখে যেন হাসি ফুটে উঠেছে। এ কি জাদুকরের ভানুমতী, না সৃষ্টিকর্তার অলৌকিক আশীর্বাদ ?

আবার অন্ধকার হয়ে গেল।

নিদ্রিতের চোখে যে রকম পড়ে, আমার চোখে ঠিক তেমনি এসে পড়ল পশ্চিমাকাশ থেকে চন্দ্রাস্তের রক্তছটা আর পূর্বাকাশ থেকে নব অনুণোদয়ের পূর্বাভাস।

জয় মিশরভূমির জয়।

॥ ২১ ॥

ইংরেজীতে কি যেন একটা প্রবাদ আছে,—

Early to bed and early to rise

তার পর কি যেন সব হয় ? হ্যাঁ বাঙলাটা মনে পড়েছে ; —

সকাল সকাল শুতে যাওয়া সকাল বেলা ওঠা,
স্বাস্থ্য পাবে বিদ্যে হবে, টাকাও হয় মোটা।

গ্রামের তুলনায় শহরে টাকা বেশী, রাস্তায় রাস্তায় বিদ্যের ভাণ্ডার ইস্কুল-কলেজ, আর শহরবাসীকে অজর অমর করে রাখবার জন্য কত ডাক্তার-কবিরাজ-হেকিম না খেয়ে মরছে তার হিসেব রাখে কে ? তাই বোধ হয় শহরের লোক সকাল সকাল শুতে যাওয়ার আর সকাল বেলা ওঠার প্রয়োজন বোধ করে না। গ্রামের লোক তাই এখনো ভোরবেলা ওঠে। কাইরো শহর তাই এখনো ঘুমুচ্ছে—অবশ্য নাক ডাকিয়ে নয়।

আবুল আসফিয়া বললেন, 'তা ঠিক, কিন্তু মুসলমানদের প্রথম নমাজ পড়তে হয় কাক-কোকিল ডাকার পয়লা। এদেশে তাদের বড় বড় মসজিদ-মাদ্রাসা আজহর পাড়ায়। সেখানেই যাওয়া যাক। তারা নিশ্চয়ই ঘুম থেকে উঠেছে।'

উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু মসজিদের নমাজীদের দেখবার জন্য এই সুদূর কাইরো শহরে আসা কেন ? আপন কলকাতায় জাকারিয়া স্ট্রীটে গেলেই হয় !

উঁহু, সেইটেই নাকি কাইরোর প্রবীণ অঞ্চল। অবশ্য পিরামিডের তুলনায় অতিকায় নবীন—বয়স মাত্র এক হাজার বৎসর, কিঞ্চিৎ এদিক-ওদিক। প্রাচ্যের রোমাণ্টিক নগরী কাইরো বলতে জগজ্জনের মনে আরবিস্থানের যে রঙীন তসবির ফুটে ওঠে সে বস্তু নাকি এখনো ঐ অঞ্চলেই পাওয়া যায়।

ট্রাম কিন্তু তখনই চলতে আরম্ভ করেছে। কলকাতার ট্রামের তুলনায় অতিশয় লজঝড় এবং ছুটির দিনে ইস্কুল-কলেজের মতো ফাঁকা।

পয়লা ট্রাম দেখা মাত্রই আবুল আসফিয়া তড়িঘড়ি ট্যাক্সিওলাদের পাওনা পয়সা বুঝিয়ে দিয়ে বিদেয় করে দিয়েছেন। পয়সা বাঁচাবার এ ফিকির সবাই জানে কিন্তু বিদেশ-বিভুঁইয়ে কে জানে কোন ট্রাম কোথায় যায়? আপন কলকাতাতেই যখন ট্রামের গুবলেটে নিত্যি নিত্যি কালীঘাট যেতে গিয়ে পেঁছে যাই মৌলা আলী, কিংবা বলতে পারো মর মর অবস্থায় মেডিকেল কলেজে না পেঁছে ট্রাম ভিড়ল নিমতলায়! 'বল্ হরি, হরি বল!'

আবুল আসফিয়া বললেন, 'আল্লা আছেন, ভাবনা কি।'

'তব সাথী হয়ে দগ্ধ মরুতে
পথ ভুলে তবু মরি
তোমারে ত্যজিয়া মসজিদে গিয়া
কি হবে মন্ত্র স্মরি!'

তবু খুব ভরসা পেলুম না। হরিই বলো আর আল্লাই বলো, তাঁরা সব ক-জনা এই কটা বাউণ্ডুলের জন্য অন্য সব কিছু ছেড়ে দিয়ে এই অবেলায় ঠিক ট্রাম ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পাঠাবার তদারকিতে বসে আছেন—এ ভরসা করতে হলে যতখানি বিশ্বাসী হতে হয় আমি ঠিক ততখানি নই। তা হই আর না-ই হই, আর পাঁচ জনের সঙ্গে সঙ্গে ট্রামেই উঠতে হল।

রাস্তা ক্রমেই সরু হয়ে আসছে। পৃথিবীর সর্বত্র যা হয়—খোলা-মেলার নূতন শহর থেকে নোংরা ঘিঞ্জি পুরানো শহরে ঢোকবার সময়।

রাস্তার দুদিকে দোকান-পাট এখনো বন্ধ। দু-একটা কফির দোকান খুলিখুলি করছে। ফুটপাথের উপর লোহার চেয়ারের উপর পদ্মাসনে বসে দু-চারটি সুদানী দারোয়ান তসবী টপকাচ্ছে, খবরের কাগজওলার দোকানের সামনে অল্প একটু ভিড়, চাকরবাকররা হনহন করে চলেছে বড় সায়েবদের বাড়ি পেঁছিতে দেরি হয়ে গিয়েছে বলে।

তরল অন্ধকার সরল আলোর জন্যে ক্রমেই জায়গা করে দিচ্ছে। কালো চুলের মাঝখানে সাদা সিঁথি ফুটে উঠেছে। তার উপর দেখা যাচ্ছে লাল সিঁদুরের পোঁছ। আকাশ বাতাসের এই লীলা-খেলাতে সব কিছু পষ্টাপষ্টি দেখা গেল তা নয়, কিন্তু ট্রামের জানালার উপর মাথা রেখে আধো ঘুমে আধো জাগরণে জড়ানো জড়ানো হয়ে সব কিছুই যেন কিছু কিছু দেখা হল। স্বপ্নে ঘুমে জাগরণে মেশানো অভিজ্ঞতা ভাষাতে প্রকাশ করা কঠিন। ছবিতে এ জিনিস ফোটানো যায় অনেক অক্লেশে। তাই বোধ হয় চিত্রকরদের সূর্যোদয়ের ছবি, সাহিত্যের সূর্যোদয়কে প্রায়ই হার মানায়।

সবচেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছিল মসজিদের চুড়ো (মিনার)-গুলোকে। কুৎবু-মিনার যারা দেখেছে তারাই জানে তার সৌন্দর্য কি। মনে হয় সে যেন পৃথিবীর ধুলো-মাটির প্রাণী নয়। সে যেন কোনো রাজাধিরাজের উষ্ণীষ—দেশের আপামর জনসাধারণের বহু ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে ভগবানের আপন হাতের অভিষেক আশীর্বাদের পরশ পাচ্ছে।

তবু কুৎবের পা মাটিতে ঠেকেছে। এদের বহু মিনার দাঁড়িয়ে আছে আল্লার নামাজের ঘর মসজিদের উপর। কিন্তু এরা জানে উপরের দিকে আল্লার কাছে যাওয়ার অর্থ কি। সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যতই উপরের দিকে যাচ্ছে ততই ভয়ে জড়সড় হয়ে সরু হয়ে যাচ্ছে—ক্লাসের গাব্দা-গোব্দা ছেলেও যে-রকম হেড মাস্টারের সামনে শরকাঠিটি হয়ে যায়। কিন্তু দ্যুলোক আর সবিতা যেন ওদের অভয় দিচ্ছেন। আকাশ যেন তাঁর আপন নীলাম্বরী তাদের পরিয়ে দিতে এসেছেন—পিছনের দিকটা পরা হয়ে গিয়েছে, আর সবিতা যেন অরুণালোকের লম্বা লম্বা দড়ির ফাঁস লাগিয়ে তাদের খাড়া রাখবার চেষ্টা করছেন। তাই দেখে ওমর খৈয়াম বললেন,

And lo ! the Hunter of the East has caught
The Sultan's turret in a noose of light.

(Fitzgerald)

কান্তি ঘোষের ইংরিজী অনুবাদ সচরাচর উত্তম কিন্তু এস্থলে আমি একটু আপত্তি জানাই। তাঁর অনুবাদে আছে,—

পূব-গগনের দেব শিকারীর স্বর্ণ-উজল কিরণ তীর
পড়ল এসে রাজপ্রাসাদের মিনার যেথা উচ্চ শির ! (কান্তি ঘোষ)।

আসলে কিন্তু সূর্যালোক তীরের মতো মিনারের উপর আঘাত দিতে পারে আবার 'নুস্'—ফাঁসের মতোও তাকে জড়িয়ে ধরতে পারে। তফাত বিশেষ কিছু নেই আর 'পাগলা' কবিরা কত যে উদ্ভট উপমা দেয় তার কি ইয়ত্তা আছে? তবে কি না অনুবাদের বেলা মূলের যত কাছে থাকা যায় ততই মঙ্গল।[১]

প্রকৃতির গড়া নীল, আর মানুষের গড়া পিরামিডের পরেই মিশরের মসজিদ ভুবন-বিখ্যাত এবং সৌন্দর্যে অতুলনীয়। পৃথিবীর বহু সমঝদার শুদ্ধমাত্র এই মসজিদগুলোকেই প্রাণভরে দেখবার জন্য সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে কাইরোতে আসেন। পিরামিড যারা বানিয়েছিল তাদের বংশধররাই এ-সব মসজিদ তৈরী করেছে কিন্তু এদের গায়ে ইতিমধ্যে কিঞ্চিৎ ইরানী, গ্রীক, রোমান এবং পরবর্তী যুগে বিস্তর আরব-রক্ত ঢুকে পড়েছিল বলে এরা মসজিদগুলো বানিয়েছে ভিন্ন শৈলীতে। বিশেষত—পূর্বেই বলেছি—পিরামিড তার লক্ষ লক্ষ মণ ওজন নিয়ে মাটির উপর ভারিক্কি চালে বসে আছে, তার রাজা যে ভাবে প্রজাদের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মতো বসতেন তারই অনুকরণ করে। পরবর্তী যুগের

১ স্বর্গীয় কান্তি ঘোষ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আর বহু গুণী-জনের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে এ-অধমও তাঁর অনুবাদে উচ্ছ্বসিত।

মসজিদ যারা বানিয়েছিল তারা মুসলমান। তারা রাজার রাজা সৃষ্টিকর্তাকে দেয় সর্বোচ্চ স্থান। তাই তাদের মসজিদের মিনারগুলো উপরের দিকে ধেয়ে চলেছে দ্যুলোকেশ্বরের সন্ধানে। কিংবা বলতে পারো তারা দাঁড়িয়ে আছে, মুসলমান নমাজ পড়ার সময় যে রকম প্রতিদিন পাঁচ বার সোজা হয়ে আল্লার সামনে দাঁড়ায়। তাই পিরামিডে ভীতিরস, মসজিদে গীতিরস।

পল পার্সি দেখলুম এ রসে ঈষৎ বঞ্চিত। আমরা পুরনো কাইরোর মাঝখানে পেঁছিতেই ট্রাম ছেড়ে একটা মসজিদের অদৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্য দেখতে আরম্ভ করেছি ; ওরা দেখি, মা-মাসীর তম্বিতে গিয়ে শীতের গঙ্গাস্নানের সময় আমরা যা করি তাই করছে। গঙ্গা যে সুন্দর সেটা স্বীকার করছে কিন্তু তাতে নিমজ্জিত হওয়ার আনন্দ সম্বন্ধে সন্দিহান।

পার্সি একটু ঠোঁটকাটা। হক কথা—অর্থাৎ যেটাকে সে হক ভাবে, সেটা টক হলেও ক্যাট ক্যাট করে বলতে পারে। পলের ভাবটা একটু আলাদা। অশ্বত্থামা যদি পিটুলি-গোলা খেয়ে সানন্দে তাণ্ডব নৃত্য জোড়ে তবে পার্সি তাকে তন্মুহূর্তে বলে দেবে যে দুধের বদলে তাকে ঘোল দিয়ে ফাঁকি দেওয়া হয়েছে, আর পল ভাববে, কি হবে ওর ভুল ভাঙিয়ে তার আনন্দটি নষ্ট করতে, ও যে আনন্দ পাচ্ছে তাতে তো কারো কোনো লোকসান হচ্ছে না।

পার্সি বললে, 'হুঃ! যত সব! পিরামিড? হ্যাঁ বুঝি। মোক্ষম ব্যাপার। চারটিখানি কথা নয়। পারি ও রকম একটা বানাতে? মানলুম, এ মসজিদটা সুন্দর কিন্তু এটা বানানো আর তেমন কি?'

পার্সিও মসজিদ দেখে বে-এক্তেয়ার হয় নি। সে কথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু এ যুক্তিটা তারও মনঃপূত হল না। শুধালে, 'পারো তুমি বানাতে?'

'আলবত।'

আমি বললুম, 'সন্দেহের কিঞ্চিৎ অবকাশ আছে। আজকের দিনে যে সব কল-কব্জা দিয়ে নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস তৈরী করা যায় তাই দিয়ে পিরামিড তৈরী করা অসম্ভব নয়। কিন্তু এ মসজিদে যে নিপুণ মোলায়েম কারুকার্য আছে সে রকম করবার মতো হাত আজকের দিনে আর কারো নাই। আর থাকলেই বা কি? সেটা তো হবে নকল। তুমি যদি একটা বিরাট দীঘি খোঁড়ো তবে এ কথা কেউ বলবে না, এটা অমুক দীঘির নকল। তুমি যদি একটা পিরামিড বানাও তবে কেউ বলবে না এটা পিরামিডের নকল, কারণ সব পিরামিডই হুবহু একই প্রকারের, কোনোটা বেশী বড় কোনোটা কম বড়। কিন্তু তুমি যদি 'হ্যামলেট'-খানা নকল করে মাসিক পত্রিকায় পাঠাও তবে তারা ছাপবে না, বলবে নকল। তুলনাটা মনঃপূত হল না? তবে বলি, তুমি যদি মোনালিজার ছবি পর্যন্ত হুবহু এঁকে ফেলো তবে সবাই বলবে, নকল, তবে ওস্তাদের হাত বটে, 'বাঃ।' কেউ বলবে না, 'আঃ'।'

পল শুধালে, 'বাঃ' আর 'আঃ'-এর তফাতটা কি?'

আমি বললুম, 'যেখানে শুদ্ধমাত্র হাতের ওস্তাদী কিংবা ঐ জাতীয় কিছু একটা, যেমন মনে করো মাটির থেকে একশ হাত উপরে একটা দড়ির উপর হেঁটে

চলে যাওয়া, কিংবা মনে করো সিঙ্গিটার মুখের ভিতর আপন মুণ্ডুটা ঢুকিয়ে দেওয়া, এক কথায় সার্কাসের তাবৎ কসরত দেখে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলি, 'বাঃ!' পিরামিডের বেলাও তাই, বলি 'বাঃ।' কিন্তু অমিতাভের উত্তম প্রতিকৃতিতে তাঁর শান্ত প্রশান্ত মুখচ্ছবি কিংবা মাদন্নার মুখে বিগলিত মাতৃরস দেখে আমরা রসের সায়রে ডুবতে ডুবতে বলি, 'আঃ! কি আরাম! কি সৌন্দর্য!' 'বাঃ'-এর কেরদানি যতই কঠিন, যতই রোমাঞ্চকর হক না কেন তার শেষ মূল্য 'আঃ-এর জিনিসের চেয়ে কম। এভারেস্টের চুড়োয় ওঠা যত কঠিনই হোক না, তার মূল্য তিয়াসী পথিককে এক পাত্র জল দেওয়ার চেয়ে অনেক কম। এই যে পার্সি বললে, সে পিরামিড বানানোর মতো কঠিন কর্ম করতে পারে না, সেইটেই সব কিছু যাচাই করার শেষ কষ্টিপাথর নয়। শেক্সপীয়র খুব সম্ভব দড়ির উপরে ধেই ধেই করে নৃত্য করতে পারতেন না। তাই বলে ঐ কর্ম তার 'হ্যামলেটের' চেয়ে মূল্যবান এ রায় কে দেবে? আসলে দুটো আলাদা জিনিস। তুলনা করাই ভুল। পিরামিডে আছে ইঞ্জিনিয়ারিং হুনোর-হেমকৎ (স্কিল) আর মসজিদে আছে রসসৃষ্টি (আর্টিস্টিক ক্রিয়েশন)।

ইতিমধ্যে দেখি একটি মিশরীয় জাব্বা-জোব্বা-পরা ছাত্র আজহর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মসজিদ থেকে বেরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে আসছে। চেহারা দেখে ভারতীয় বলেই মনে হল।

॥ ২২ ॥

আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স পুরো-পাক্কা এক হাজার বৎসর। অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, প্যারিস, বার্লিন এর চেয়ে কয়েক'শ বছরের ছোট। তবু আজ যে সব গুণীজ্ঞানীর নাম পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এঁরা ঐ-সব ইয়োরোপীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র। আজহর থেকে যাঁরা বেরোন তাঁদের নাম তো শুনতে পাই নে। হ্যাঁ, মনে পড়ল, মিশরের গাঁধী বলতে যাঁকে বোঝায় সেই সা'দ জগলুল পাশা ছিলেন আজহরের ছাত্র। কিন্তু আর কারো নাম শুনতে পাই নে কেন?

আশ্চর্য! মুসলমানরা যখন স্পেন দখল করল তখন তারা সেখানে আজহরের অনুকরণে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ল। প্যারিস য়ুনিভার্সিটির গোড়াপত্তন যাঁরা করেন, তাঁদের অনেকেই লেখা-পড়া শিখেছিলেন স্পেনের মুসলমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। এবং প্রথম দিককার পাঠ্যপুস্তকগুলো পর্যন্ত আরবী বই থেকে লাতিনে অনুবাদ করা। আজ আর আজহরের নাম কেউ করে না, করে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের।

কিন্তু আশ্চর্য হই কেন? একদা এই ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারতবর্ষের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। গ্রীকরা আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিল। পরবর্তী যুগে ইয়োরোপীয়েরা আমাদের কাছ থেকে শূন্যের ব্যবহার শিখল (লক্ষ্য করেছ বোধ হয় রোমান হরফে যখন I, II, X, XII, C M, লেখ তখন শূন্যের

ব্যবহার আদপেই হয় না) এবং তারই ফলে তাদের গণিত-শাস্ত্র কী অসাধারণ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল। আরবরা চরক সুশ্রুতের অনুবাদ করলে, আরো কত কী। একাদশ শতকে ভারত আক্রমণকারী সুলতান মাহমুদের সভাপণ্ডিত অল-বীরুনী সংস্কৃত শিখে ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে বই লেখেন তা পড়ে সে যুগের মুসলিম জগৎ অবাক হয়ে ভারতবর্ষের গুণগান করেছিল। তারও পরবর্তী যুগে সম্রাট আওরঙ্গজেবের বড় ভাই দারা শীকুর উপনিষদ সম্বন্ধে ফার্সী বই লাতিনে তর্জমা হয়ে যখন ইয়োরোপে বেরলো তখন সে-বই নিয়ে ইয়োরোপে কী তোলপাড়ই না হয়েছিল। সে যুগের সেরা দার্শনিক শোপেন-হাওয়ার তখন বলেছিলেন, 'এ-বই আমার জীবনের শেষ কটা দিন শান্তিতে ভরে দেবে।' ঐ সময়েই বিশ্বকবি গ্যোটে শকুন্তলার অনুবাদ পড়ে ঘন ঘন 'সাধু, সাধু' বলেছিলেন।

এখনো ভারতবর্ষের, আজহরের পুরনো সম্পদের সম্মান ইয়োরোপীয়রা করে কিন্তু আজকের দিনে যাঁরা শুধু সংস্কৃত কিংবা মিশরে আরবীর চর্চা নিয়ে পড়ে থাকেন তাঁদের নাম কেউ করে না। তাঁরা এমন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন না কেন যা পড়ে বিশ্বজন বিমোহিত হয়ে পুনরায় 'সাধু, সাধু' রবে হুংকার তোলে?

হায় এঁদের সৃজনী শক্তি ফুরিয়ে গিয়েছে। কেন ফুরলো? তার একমাত্র কারণ, এক বিশেষ যুগে এসে এরা ভাবলেন এঁদের সব কিছু করা হয়ে গিয়েছে, নূতন আর কিছু করবার নেই, পুরনো পুঁজি ভাঙিয়ে খেলেই চলবে।

এবং তার চেয়েও মারাত্মক কথা, এরা অন্যের কাছ থেকে আর কিছু শিখতে চান না। এঁদের দম্ভ দেখে তাই স্তম্ভিত হতে হয়।

আজহরের ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্স্ কেমিস্ট্রি বট্‌নি পড়ানো হয়?'

সে শুধালে, 'এ-সব কি?'

অনেক কষ্টে বোঝালুম।

সে বললে, 'ধর্মশাস্ত্রে যা নেই, তা জেনে আমার কি হবে?'

আমি বললুম, 'অতিশয় হক্ কথা। ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো গতি নেই, কিন্তু ভ্রাতঃ, তোমার পা যদি আজ আছাড় খেয়ে ভেঙে যায় আর ডাক্তার বলে, এক্সরে করে দেখতে হবে কোন্ জায়গায় ভেঙেছে, তখন কি ধর্মশাস্ত্রে এক্সরে-র কল বানাবার সন্ধান পাবে?'

উত্তরে কি বলেছিল মনে নেই। 'ধর্ম রক্ষা করবেন' এই জাতীয় কিছু একটা। কিন্তু ইতিমধ্যে দেখি, পল পার্সি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তত্ত্বালোচনা পার্সিকে বিকল করে সে-কথা পূর্বেই বলেছি, কিন্তু এস্থলে পল পর্যন্ত বিচল হয়ে পড়লো। আমি যখন একটু থেমেছি তখন দেখি তারা এক দোকানীর সঙ্গে দরদস্তুর করছে।

কি ব্যাপার? মিশরের পিরামিডের ভিতর যে সব টুকি-টাকি জিনিস পাওয়া গিয়েছে তারই কিছু কিছু এখানে বিক্রি হচ্ছে। আমি বললুম, 'এ-সব

তো মহামূল্যবান জিনিস, ওগুলো কেনার কড়ি আমাদের কাছে আসবে কোত্থেকে, আর মিশরী সরকার সেগুলো যাদুঘরে সাজিয়ে না রেখে বাজারে বিক্রি করবার জন্য ছাড়বেই বা কেন ?'

দোকানী বললে, 'একই জিনিস এত অসংখ্য পিরামিডে এত বেশী পাওয়া গিয়েছে যে সেগুলো সরকার বাজারে ছেড়েছে—ভালোগুলো অবশ্য যাদুঘরে সাজানো আছে—এবং দামও তাই বেশী নয়।'

আমি কিনি কিনছি, কিনি কিনছি করছি, এমন সময় সেই আজহরের ছেলেটি আমার কানে কানে বললে, 'তাই যদি হবে, তবে ওর দোকানের পিছনের কারখানাতে কি সব তৈরী হচ্ছে ? চলুন না, কারখানাটা দেখে আসবেন।'

আমি বললুম, 'কি আর হবে দেখে ? জর্মনিতে তৈরী কাশ্মীরী শাল, জাপানে তৈরী 'খাঁটি' 'অতিশয় খাঁটি' ভারতীয় খদ্দর, কলকাতায় তৈরী জর্মন ওষুধ এসব তো বহু বার দেখা হয়ে গিয়েছে। ওর থেকে নূতন আর কি তত্ত্বলাভ হবে ?'

পল পার্সিকে বললুম, 'পাশের ছেলের খাতা থেকে টুকলি করা আর এই জাল মাল তৈরী করাতে কোনো তফাত নেই।'

পল বললে, 'মাস্টার ধরতে পারলে কান মলে দেন।'

আমি বললুম, 'সরকারও মাঝে মাঝে এদের কান মলে দেয়।'

তখন হঠাৎ খেয়াল হল, আজহরী ছেলেটি যে ফিস-ফিস করে কানে কানে কথা বলেছিল, সেটা বাঙলায়। তৎক্ষণাৎ তাঁকে শুধালুম, 'আপনি কি বাঙালী ?'

সে বললে, 'হাঁ।'

তার পর শুনলুম, বর্ধমানে বাড়ি, দশ বছর বয়সে এখানে সে এসেছে। বাঙলা প্রায় ভুলে গিয়েছে। আরো চার বছর অর্থাৎ সবসুদ্ধ বারো বছর এদেশে কাটিয়ে ফের বর্ধমানে ফিরে যাবে।

সেখানে ফিরে গিয়ে কি করবে ? এই আরবী বিদ্যের কদর তো ভারতবর্ষে নেই ? তাতে আশ্চর্য হবারই বা কি ? কাশী থেকে বারো বছর সংস্কৃত শিখে বর্ধমানে ফিরলে তার পাণ্ডিত্যেরই বা মূল্য দেয় কে ? তাকেও তো সেখানে উপোস করতে হয়। একেও তাই করতে হবে। আজ আর প্রাচীন শাস্ত্রের পাণ্ডিত্যকে কেউ সম্মান করে না।

কিন্তু ছেলেটির দেখলুম তাই নিয়ে কোনো দুর্ভাবনা নেই। বাপ ধার্মিক লোক ছেলেকে ধর্মশিক্ষা করতে পাঠিয়েছেন, তাই শিখে সে দেশে ফিরে যাবে, তার পর যা হবার তাই হবে।

দলের কেউ এ-দোকানের সামনে দাঁড়াচ্ছে, কেউ ও-দোকানের সামনে দাঁড়াচ্ছে। কেনাকাটা হচ্ছে অতি সামান্য। টুকি-টাকি নাড়াচাড়াতে আনন্দ অনেক বেশী—খরচাও তাতে নেই। এই করে করে আমরা সমস্ত দিন কাটিয়ে দিতে পারতুম, কিন্তু হঠাৎ দলের একজন স্মরণ করিয়ে দিলেন, আমাদের

পোর্ট-সঈদের ট্রেন ধরতে হবে আটটায়। আবুল আসফিয়াকে স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি বললেন, 'চলুন।' কিন্তু তাঁর হাবভাবে কোনো তাড়া নেই।

অতি অনিচ্ছায় ট্রামে উঠতে হল। আজহরের ছেলেটি আমার সঙ্গে বাঙলা কথা কইতে পেয়ে আমার সঙ্গ ছাড়াতে চায় না। সেও চললো আমাদের সঙ্গে। আরবী ভাষা এখন তার জীবনের মূলমন্ত্র, কিন্তু তাই বলে কি মাতৃভাষা বাঙলার মায়া এত সহজে কাটানো যায়?

ঘ্যাচাঙ করে ট্রাম দাঁড়াল। কি ব্যাপার? আগের একটা ট্রাম মোড় নিতে গিয়ে লাইন থেকে ছিটকে পড়েছে। বাদবাকি সব ট্রাম তার পিছনে গড্ডালিকায় দাঁড়িয়ে। লোহার ডাণ্ডা দিয়ে জনকয়েক লোক ছিটকে-পড়া ট্রামটাকে লাইনে ফেরত নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। চেষ্টার চেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে বেশী। লম্বা লম্বা আলখাল্লা উড়িয়ে রাস্তার ছেলে বুড়ো ট্রামটার চতুর্দিকে ছুটোছুটি লাগিয়েছে। আর কত প্রকারেরই না উপদেশ, আদেশ অনবরত ট্রামের ভিতর বাহির দুদিক থেকেই উপছে পড়ছে! দেশের হরির লুঠ এর কাছে লাগে কোথায়?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজাটা রসিয়ে রসিয়ে দেখছি, এমন সময় দলের একজনের হুঁশ হল, আটটায় যে আমাদের ট্রেন ধরতে হবে। আমার দেহ-মন কিন্তু ঐ রণাঙ্গন থেকে তখন কিছুতেই সরছিল না। কারণ ইতিমধ্যে দেখি, ট্রামটা কি পদ্ধতিতে ফের লাইনে তোলা যায় তাই নিয়ে দুইটি দলের সৃষ্টি হয়েছে। যারা ডিপো থেকে এতক্ষণে এসে পেঁছেচে তারা বাতলাচ্ছে এক প্রকারের রণকৌশল, আর সব কটা ট্রামের ড্রাইভার, কণ্ডাক্টরের দল সে রণকৌশলের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছে অন্য জিহাদ। ব্যাপারটা তখন এমনি চরমে পেঁছেচে যে উভয় পক্ষ তখন লোহার ডাণ্ডা হাতে করে মুখোমুখি হয়ে সদম্ভে সগর্বে সর্বপ্রকারের আস্ফালন কর্ম সুষ্ঠু পদ্ধতিতে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে নিয়ে চলেছে। দুই দলের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন ট্রামের যাত্রী এবং রাস্তার লোক। আর রাস্তার ছেঁড়ারা আলখাল্লা উড়িয়ে তাদের চতুর্দিকে পাঁই-পাঁই করে ঘুরছে, বোঁ করে মধ্যিখান দিয়ে ইস্পার-উস্পার হয়ে যাচ্ছে, ধরা পড়ে কখনো বা দু-একটা চড়-চাপড়ও খাচ্ছে।

একটা 'ফাস্‌টো কেলাস্‌' লড়াইয়ের পূর্বরাগ কিংবা পূর্বাভাস!

কিন্তু হায় পৃথিবীর কত সৎকর্মই না অসম্পূর্ণ রেখে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয়। এই যে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, নিধিরামকে একদিন মোকা-মাফিক আচ্ছাসে উত্তম-মধ্যম দেব, তার পূর্বেই তো ম্যাট্রিক পাস করে ইস্কুল ছাড়তে হল! আর নিধে রাস্কেলটা ফেল মেরে পড়ে রইল ইস্কুলে। কী অন্যায় অবিচার! নিধেটা লেখাপড়ায় একটা আস্ত বিদ্যেসাগর, সে কথা জানি, কিন্তু আরো কত খাটাশও তো ম্যাট্রিক পাশ করে। ও করলেই বা কোন্‌ মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? আমিও তো দুটো কিল মারার সুযোগ পেতুম। এই সব অবিচার দেখে সংসারের প্রতি আমার তখন ঘেন্না ধরে গিয়েছিল।

আজও তাই হল। দলের লোকের তাড়ায়। তখন আর বেশী সময় হাতে

নেই। ট্যাক্সি নিতে হল।

বুকিং আপিসের সামনে যাত্রার দলের হনুমানের ন্যাজের মতো প্যাঁচ পাকানো কিউ Q। কেউ কেউ ওটাকে U বলে বলে W-ও বলে থাকেন, কারণ জায়গার অভাব থাকলে কিউ সচরাচর এই রকম শেপ-ই নিয়ে থাকে। অথচ গাড়ি ধরার সময় তখন মাত্র পাঁচ মিনিট। আবুল আসফিয়া কিউ-এতে দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে বললুম, 'ট্রেন মিস্ নির্ঘাত।' তিনি বললেন, 'আপনারা স্টেশনে যান।'

স্টেশনে কখন কোন্ প্লাটফর্ম থেকে গাড়ি ছাড়বে তার খবর নিয়ে যখন সেই প্ল্যাটফর্মের মুখে দাঁড়ালুম, তখন গেট-চেকার ভাঙা-ভাঙা ইংরাজিতে শোধালে,—

'আপনারা যাবেন কোথায় ?'

'পোর্টসঈদ।' (সমবেত সঙ্গীতে)

'তবে ট্রেনে গিয়ে আসন নিচ্ছেন না কেন ?'

তাই শুনে পড়ি-মরি হয়ে এক দল দিল ছুট ট্রেনের দিকে, আরেক দল যাবে কি যাবে না এই ভাবে ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে রইল দাঁড়িয়ে, নড়লুম না আমরা তিন জন, পল, পার্সি আর আমি।

পল বললে, 'আমাদের টিকিট এখনো কাটা হয় নি।'

চেকার ছোকরা বললে, 'আপনারা যান।'

মনে হল ছোকরাটি বুদ্ধিমান। আমাদের চেহারা-ছবি দেখে এঁচেছে, আমরা ফাঁকি দিয়ে গাড়ি চড়ার তালে নই। আমরা যখন পয়সা দেবার জন্য তৈরী তখন আমাদের ঠেকিয়ে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই।

আমার মন তখন যাব-যাব করছে। তখন পলের কথাতে বুঝলুম, সে কতখানি ভদ্র ছেলে। আমাকে বললে, 'আবুল আসফিয়াকে ছেড়ে আমরা যাব না।'

সেই উৎকট সংকটের সময়ও আমার মনে পড়ল, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও বিশেষ অবস্থায় স্বর্গে যেতে রাজী হন নি।

আমাদের চোখের সামনে স্টেশনের বিরাট ঘড়ি। সেটা তখন দেখাচ্ছে, ৭, ৫৯।

কলাপ্সিবল্ গেটের ভিতর দিয়ে দেখছি, আমাদের ট্রেনের গার্ড বীরোচিত ধীরপদে টহল দিচ্ছে, আর মাঝে মাঝে ট্যাঁকঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে।

মিশর তো প্রাচ্য দেশ, আরামের দেশ, অনপনক্চুয়ালিটির দেশ। ওরা আবার সময়মতো গাড়ি ছাড়ার যবনিকা পদ্ধতি শিখল কোথা থেকে ? সংসারের অবিচারের প্রতি আবার আমার ঘেন্না ধরল। ট্রেন তো বাবা, সর্বত্রই নিত্যি নিত্যি লেট যায়। এই যে সোনার মুল্লুক ইংলণ্ড, যার প্রশংসায় এ পোড়ার দেশের সবাই পঞ্চমুখ দশানন, সেই দেশ সম্বন্ধেই শুনেছি, এক ডেলি প্যাসেঞ্জারের ট্রেন রোজ লেট যেত এবং বেচারী তাই নিয়ে অনেক আবেদন-ক্রন্দন করার পর একদিন সত্যি সত্যি কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে ট্রেন স্টেশনে

এল। লোকটি উল্লাসভরে স্টেশন-মাস্টারকে কন্‌গ্রাচুলেট করাতে মাস্টার বিমর্ষ বদনে বললে, 'এটা গতকালের ট্রেন ; ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা লেট।'

সেই পরানের দ্যাশ বিলেতেই যদি এই ব্যবস্থা তবে এই খানদানী গেরেম-ভারী মিশরে মানুষ কি শুদ্ধমাত্র আমাদের দলকে ভ্যাংচাবার জন্যই কণ্টকে কণ্টকে ট্রেন ছাড়তে চায় ?

দেখি, গার্ড সাহেব দোদুল্যমান গতিতে আমাদের দিকে আসছে। চেকারকে কি যেন শুধালে তার পর উত্তর শুনে আমাকে বললে, 'আর তো সময় নেই, গাড়িতে উঠুন।'

লোকটির সৌজন্যে আমি সম্মোহিত হয়ে গেলুম। কে আমরা, আমাদের জন্য ওর অত দরদ কিসের ? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, আমরা মার্কিন টুরিস্ট নই যে তাকে কাঁড়া-কাঁড়া সোনার মোহর টিপ্‌স দেব। মিশরের ট্রেন লোহা-লক্কড়ের বটে, কিন্তু মিশরীয় গার্ডের দিল মহব্বতের খুনে তৈরী।

আমি পাগল-পারা খুঁজছি সৌজন্য ভদ্রতার আরবী, তুর্কী, ফার্সী বাক্য, যা দিয়ে আমি তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। ইংরিজীতে তো আছে শুধু ছাই, 'থ্যাঙ্কু' ফরাসীতে 'মেসি' 'মেসি', জর্মনেও নাকি 'ডাঙ্ক' না 'ডাঙ্কে' কি যেন একটা আছে কিন্তু ঐ সামান্য একটা দুটো শব্দ দিয়ে গার্ড-সায়েবের সৌজন্য-সমুদ্রে আমার হাল পানি পাবে কেন ?

তবুও তেরিয়া হয়ে বলে গেলুম, 'আনা উশকুরুকুম' 'চোক তশক্কুর এদরং এফেন্দং', খৈলি তশক্কুর মিদমহাতান্‌, কুরবান্‌' আরো কত কী, উল্টা-সুল্টা। তার মোদ্দা অর্থ, 'মহাশয় যে সৌজন্য দেখাইলেন, তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুগ-যুগান্তব্যাপি অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে কিন্তু হাল্‌ফিল্‌ আমরা লৌহবর্ত্ম-শকটে আরোহণ করিতে অক্ষম যেহেতুক্‌ আমাদের পরমমিত্র চরমসখা শ্রীশ্রীমান আবুল আসফিয়া নুরউদ্দিন মুহম্মদ আব্দুল করীম সিদ্দীকীকে পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তর গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।'

সঙ্গে সঙ্গে আরবী, তুর্কী,ফার্সী তিন ভাষাতেই বিস্তর ক্ষমা ভিক্ষা করলুম।

আর মনে মনে মোক্ষম চটছি আবুল আসফিয়ার উপর। লোকটার কি কণামাত্র কাণ্ডজ্ঞান নেই ? দলের নেতা হয়ে কোনো রকম দায়িত্ব বোধ নেই ? সাধে কি ভারতবর্ষ স্বরাজ্য থেকে বঞ্চিত !

হঠাৎ পল-পার্সি দিল ছুট। তারা আবুল আসফিয়াকে দেখতে পেয়েছে। এবং আশ্চর্য, লোকটা তখনো নিশ্চিন্ত মনে রেলের এক কর্মচারীকে স্টেশনের বড় ঘড়িটা দেখিয়ে দেখিয়ে কি যেন বোঝাচ্ছে। বোঝাচ্ছে কচু ! নিশ্চয়ই বোঝাচ্ছে, ওদের ঘড়ি ফাস্‌ট্‌ যাচ্ছে। তা যাচ্ছে তো যাচ্ছে, সে কথা বুঝিয়ে কি তোমার টাকেতে চুল গজাবে—ওদিকে ট্রেন মিস করে ?

কথার মাঝখানেই পল আর পার্সি পিছন থেকে তাঁকে দু হাতে ধরে দিলে হ্যাঁচকা টান। তার পর দিল ছুট গাড়ির দিকে। আমিও পড়ি-মরি হয়ে সেদিকে। দলের যারা ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল তারাও জয়োল্লাসে হুঙ্কার দিয়ে উঠেছে। আবুল আসফিয়া হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছেন। স্টেশনের

আন্তর্জাতিক জনতা যে যার পথ ভুলে তাকিয়ে রয়েছে আমাদের দিকে। পুলিস দিয়েছে হুইস্‌ল্‌। তবে কি দিনে দুপুরে কিড্‌ন্যাপিং! কিন্তু এ তো,

'উল্টো বুঝলি রাম, ওরে উল্টো বুঝলি রাম,
কারে কর্‌লি ঘোড়া, আর কার মুখে লাগাম?'

এখানে তো বুড়ো-ধাড়িকে পাকড়ে নিয়ে চলেছে দুটো চ্যাংড়া!

গাড়ি ঠিক সময়ে ছেড়েছিল না লেটে, আবুল আসফিয়ার ঘড়ি ঠিক না রেলের ঘড়ি ঠিক এ সব সূক্ষ্ম প্রশ্নের সমাধান হল না। গার্ড সায়েব যে ভাবে পিছন থেকে পাকা হাতে আমাদের ধাক্কা দিয়ে দিয়ে গাড়িতে ওঠালে তার থেকে অনুমান করলুম, এ প্রকারের কর্ম করে করে তার হাত ঝানু হয়ে গিয়েছে।

আবুল আসফিয়া তখনো পলকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন, তাঁর ঐ ঘড়িটাই সুইজারল্যান্ডের ক্রনোমিটার পরীক্ষায় পয়লা প্রাইজ পেয়েছিল। মিশরীয়দের সময়-জ্ঞান নেই। আমরাও অতিশয় সরল। চিলে কান নিয়ে গেল শুনেই—

॥ ২৩ ॥

আহা! সুন্দর দেশ!

খালে-নালায় ভর্তি। গাড়ি মিনিটে মিনিটে গম্‌, গড়ম্‌, গড়ড়ম্‌ করে সে সব নালার উপর দিয়ে পেরুচ্ছে। তারপর গাড়ি বলে 'বড়্‌ঠাকুরপো-ছোট্‌ঠাকুরপো', 'বড়্‌ঠাকুরপো-ছোট্‌ঠাকুরপো', তারপর ফের নালার উপর 'গম', 'গড়ম্‌', 'গড়ড়ড়ম'। আর গাড়ির শব্দ যে এত মিষ্টি কে জানত? এ ট্রেন মিস করলে আর দেখতে হত না!

খাল-নালা তো বললুম, কিন্তু এক-একটি নদ-নদী এমনই চওড়া যে বোধ করি সেগুলো নীলেরই শাখা-প্রশাখা। আর সেগুলোতে জলে-ডাঙার মাঝখানে ফাঁক প্রায় নেই। নিতান্ত বর্ষাকাল ছাড়া আমাদের নদীর জল যান তলিয়ে, আর পাড়গুলো থাকেন খাড়া হয়ে। সে জল অত নিচু থেকে উপরে তোলা যায় না বলে সে জল থেকেও নেই। চাষী তাই দিয়ে শীতকালে আরেকটা ফসল তুলতে পারে না। এদেশের লোক সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে চাষবাস শেখার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের একমাত্র নদী নীলের গা থেকে এত হাজার হাজার খাল নালা কেটে রেখেছিল যে সে নদী গভীর হবার সুযোগ পায় নি এবং ফলে নীলের জল দেশটাকে বারো মাস টেটম্বুর করে রাখে।

খেতভরা ধান গম কার্পাস! সবুজে সবুজে ছয়লাপ। মাঝে মাঝে খেজুর-গাছের সারি, আর কখনো বা এখানে একটা সেখানে একটা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষেতের পাহারা দিচ্ছে।

আর নদীর উপর দিয়ে চলেছে উঁচু উঁচু তেকোণা পাল তুলে দিয়ে লম্বা লম্বা নৌকো। এ দেশে বৃষ্টি প্রায় হয় না বলে নৌকোতে ছইয়ের ব্যবস্থা প্রায় নেই। জোর হাওয়ায় নৌকাগুলো চলেছে দ্রুতগতিতে। পালের দড়ি ছিঁড়ে

গেলে নৌকো যে ডুবে যাবে সে ডরভয় এদের নেই। তবে বোধ করি এদেশে দমকা হাওয়া হঠাৎ এসে নৌকোকে এলোপাতাড়ি ধাক্কা লাগায় না।

সবুজ খেত, নানারঙের পাল, ঘোর ঘন নীল আকাশ, চল্ চল্ ছল্ ছল্ জল মনটাকে গভীর শান্তি আর পরিপূর্ণ আনন্দে ভরে দেয়। গাড়ির জানালার উপরে মুখ রেখে আধ-বোজা চোখে সে সৌন্দর্যরস পান করছি, আর ভাবছি, এই সৌন্দর্য দেখার জন্যেই তো বহুলোক রেলগাড়ি চড়বে, আমি যদি এদেশে থাকবার সুযোগ পেতুম তবে প্রতি শনিবারে রেলে চড়ে যে দিকে খুশি চলে যেতুম! কিছু না, শুধু নৌকো, জল, খেত আর আকাশ দেখে দেখে দিনরাত কাটিয়ে দিতুম।

রাতের কথায় মনে পড়ল, চাঁদের আলোতে এ সৌন্দর্য নেবে অন্য এক ভিন্ন রূপ। সেটা দেখবার সুযোগ হল না—এখানটায়, এবারে।

মাঝে মাঝে নদী, নৌকো, খেজুরগাছ সব-কিছু ছাড়িয়ে দেখতে পাই সেই তিনটে বিরাট পিরামিড। কত দূরে চলে এসেছি তবু তারা মাঝে মাঝে মুখ দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে, আবার কাছের গাছের পিছনে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, আবার মুখ দেখাচ্ছে। তখনই বুঝতে পারলুম, পিরামিডগুলো কত উঁচু। কাছের থেকে যেটা স্পষ্ট বুঝতে পারি নি।

কম্পার্টমেণ্টের মাঝখান দিয়ে চলাফেরার পথ—কলকাতার ট্রামগাড়িতে যে রকম। সেই পথ দিয়ে যে কত রকমের ফেরিওয়ালা এল গেল তার হিসেব রাখা ভার। কমলালেবু, কলা, রুটি থেকে আরম্ভ করে নোটবুক, চিরুনি, মোজা, ঘড়ি, লটারির টিকিট হেন বস্তু নেই যা ফেরিওলা দু চার বার না দেখালে—মনে হল লোহার সিন্দুক এবং আস্ত মোটর গাড়ি মাত্র এই দুই বস্তুই বোধ করি ফেরি করা হল না।

এক কোণে দেখি জাব্বা-জোব্বা-পরা এক মৌলানা সায়েব হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন আর তাঁকে ঘিরে বসেছে এক পাল ছোকরা—তারাও পরেছে জাব্বা-জোব্বা, তাদের মাথায় ও লাল ফেজ টুপিতে প্যাঁচানো পাগড়ি। দু-চার জন সাধারণ যাত্রীও দলে ভিড়ে বক্তৃতা শুনছে। পাশের এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলুম, ইনি আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ছুটি-ছাটায় যখন গ্রামের বাড়ি যান তখন তাঁর প্রিয় শিষ্যেরা তাঁর সঙ্গে তাঁরই বাড়ি যায়। সমস্তক্ষণ চলে জ্ঞানচর্চা। ট্রেনের অন্য লোকও সে শাস্ত্রচর্চা কান পেতে শোনে।

উত্তম ব্যবস্থা! প্রাচীন যুগে গুরুগৃহে বাস এবং বর্তমান যুগের কলেজে গিয়ে পড়াশুনো করা দুটোর উত্তম সমন্বয়। মাঝখানে থার্ড ক্লাস গাড়ির প্যাসেঞ্জার, চাষাভুষোরাও এদের জ্ঞানের কিছুটা পেয়ে গেল। আমাদের দেশের চাষারা তো প্রফেসরদের জ্ঞানের একরত্তিও পায় না।

সঙ্গে সঙ্গে ফেরিওলার কাছ থেকে কলামুলো কিনে নিয়ে মৌলানা সায়েব খাচ্ছেন, ছেলেদেরও খাওয়াচ্ছেন। সেও পরিপাটি ব্যবস্থা।

হরেকরকম ফেরিওলাই তো গেল। এখন এলেন আরেক মূর্তি। মুখে এক গাল হাসি—আপন মনেই হাসছে—পরনে লজঝড় কোট-পাতলুন, নোংরা

শার্ট, টাইয়ের 'নট্'টা ট্যারচা হয়ে কলারের ভিতর ঢুকে গিয়েছে, আর হাতে এক তাড়া রঙিন ছবিতে ভর্তি, হ্যাণ্ডবিল-প্যাম্ফ্লিট্।

কেন যে আমাকেই বেছে নিলে বলতে পারব না। বোধ হয় আমাকেই সব চেয়ে বেশী বোকা-বোকা দেখাচ্ছিল। ফেরিওলারা বোকাকেই সকলের পয়লা পাকড়াও করে এ তো জানা কথা।

এক গাল হাসির উপর আরেক পোঁচ মুচকি হাসি লেপটে দিয়ে শুধালে, 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে, স্যর?'

ইয়োরোপীয় জাহাজ চড়ে মেজাজ খানিকটে বিলিতি রঙ ধরে ফেলেছে। বলতে যাচ্ছিলুম, তোমার তাতে কি? কিন্তু মনে পড়ল, মিশর প্রাচ্য দেশ, এ প্রশ্ন শুধনো অভদ্রতা কিংবা অনধিকার প্রবেশ নয়। বললুম, 'পোর্ট সঈদ।'

'তার পর?'

মোগলাই মেজাজ চেপে নিয়ে বাঙালী কণ্ঠে বললুম, 'ইয়োরোপ।'

'ওঃ, তাই বলুন। কিন্তু ইয়োরোপ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, তার আগে এই মিশরের পাশের দেশ প্যালেস্টাইনটা ঘুরে আসুন না।' আমি তো একেবারে থ। হরেকরকমের ফেরিওলা তো দেখলুম। কেউ বিক্রি করে ছ পয়সার জুতোর ফিতে, কেউ বিক্রি করে পাঁচশ টাকার সোনার ঘড়ি, কিন্তু একটা আস্ত দেশ বিক্রির জন্য তার আড়কাটি ট্রেনের ভিতর ঘোরাঘুরি করবে, এ-ও কি কখনো বিশ্বাস করা যায়? তবু ব্যাপারটা ভালো করে জেনে নেবার জন্য শুধালুম, 'আপনি বুঝি দেশ বিক্রি করেন?'

সে আমার কোনো কথার উত্তর না দিয়ে আরেক গাল হেসে তার হাতের তাড়ার ভিতর থেকে কি একটা খুঁজতে আরম্ভ করলে। ইতিমধ্যে আমার পাশের ভদ্রলোক তাকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। সে ঝুপ করে বসে পড়ে তার হাতের ডাঁই থেকে বের করলে প্যালেস্টাইনের হরেকরকম ছবিওলা একখানা রঙচঙা প্যাম্ফ্লিট। তার উপর দেখি মোটা-মোটা অক্ষরে লেখা প্যালেস্টাইন 'Palestine, The Land of the Lord', 'প্রভুর জন্মভূমি' ইত্যাদি আরো কত কী! তারপর বললে, 'দেশ বিক্রি করি? হ্যাঁ, তাই বটে, তবে কি না আপনি যে ভাবে ধরেছেন, ঠিক সে ভাবে নয়। কিন্তু সে-কথা পরে হবে। উপস্থিত দেখুন তো, কী চমৎকার দেশে আপনাকে যেতে বলছি। যে-দেশে প্রভু জীজাস্ ক্রাইস্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আপনি নিশ্চয় প্রভুর—'

আমার ভারি বিরক্তি বোধ হল। এসব লোক কি ভাবে? ভারতবর্ষের লোক যীশুর নাম শোনে নি? তেড়ে বললুম, 'The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham begat'—ইত্যাদি ইত্যাদি,—চড়চড় করে মথি-লিখিত সুসমাচার থেকে মুখস্থ বলে যেতে লাগলুম, প্রভু যীশুর ঠিকুজি কুলজি। লোকটা কিন্তু একদম না দমে গিয়ে বললে, 'ঠিক, ঠিক। এই দেখুন, সেই জায়গা যেখানে প্রভু জন্ম নিলেন। একটা সরাইয়ের আস্তাবলে। মা মেরি আর তাঁর বর যোসেফ তখন প্যালেস্টাইন থেকে এই মিশরের দিকে আসছিলেন। বেৎলেহেম

গ্রামে সন্ধ্যা হল। সরাইয়ে জায়গা না পেয়ে মা-মেরি আশ্রয় নিলেন আস্তাবলে। এই দেখুন সেই আস্তাবলের ছবি। কত চিত্রকরই না এ ছবি এঁকেছেন। কত যুগ ধরে। তার পর দেখুন, নাজারেৎ গ্রামের ছবি। যোসেফ সেখানে ছুতোরের কাজ করতেন, আর মা-মেরি যেতেন জল আনতে। এই দেখুন—'

আমি বললুম, 'ব্যস, ব্যস, হয়েছে। কিন্তু আপনি আমার মুশকিলটা আদপেই বুঝতে পারেন নি। আমি যদি পোর্টসঈদ থেকে 'প্রভুর জন্মভূমি প্যালেস্টাইনে' চলে যাই তবে সেখানে ফিরে এসে ইয়োরোপে যাবার জন্য আমাকে নতুন করে জাহাজের টিকিট কাটতে হবে। তার পয়সা দেবে কে?—না হয় প্যালেস্টাইন তীর্থ-দর্শন-খর্চা আমি কোনো গতিকে, কেঁদে-কোকিয়ে সামলে নিলুম। এক জাহাজের টিকিট একই জায়গা যাবার জন্য দু-দুবার কাটবার মতো পয়সা কিন্তু আমার নেই।'

আড়কাঠি তো হেসেই কুটিকুটি। আমি বিরক্ত। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে, 'জাহাজের ডবল ভাড়া লাগবে কেন? আপনি যে জাহাজে করে পোর্টসঈদে এসেছেন সেই কোম্পানিরই আরেকখানা জাহাজ পনেরো দিন পর সেখানে এসে ইয়োরোপ যাবে। আপনি সে জাহাজে গেলেন কিংবা এ জাহাজে গেলেন তাতে কোম্পানির কি ক্ষতিবৃদ্ধি? ডবল পয়সা নিতে যাবে কেন? আর ঐ পনেরো দিনে আপনি দেখে নেবেন প্যালেস্টাইন।'

আমি বললুম, 'হুঁ, হুঁ-উ-উ—কিন্তু সে জাহাজে যদি সীট না থাকে?'

লোকটার ধৈর্যও অসীম। সর্বমুখে বুদ্ধদেবের মতো করুণার হাসি হেসে বললে, 'কে বললে থাকবে না? এখন তো অফ্ সীজন্, স্ল্যাক পিয়েরিয়েড, অর্থাৎ যাত্রীর ভিড় নেই। আপনি যে জাহাজে এলেন তার কি অর্ধেকখানা ফাঁকা ছিল না। আসছে জাহাজ গড়ের মাঠ।'

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলুম। চিন্তাশীল লোক বলে নয়। আসলে সব কিছু বুঝতেই আর পাঁচ জনের তুলনায় আমার একটু বেশী সময় লাগে। ব্রেন-বক্সে আল্লাতালা রিসিভিং সেট্‌টা দিয়েছেন অতিশয় নিকৃষ্ট পর্যায়ের। বাল্‌বগুলো গরম হতে লাগে মিনিট তিন। তার পরও চিত্তির। তিনটে স্টেশন গুবলেট পাকিয়ে দেয় শুধু কড়া শিষ। কিছুই বুঝতে পারি নে।

হঠাৎ মাথায় একটা প্রশ্ন এল। জানো বোধ হয়, অগা বোকারা মাঝে মাঝে, অর্থাৎ বছরে দু-একবার, পাকা স্যানার মতো দু-একটা প্রশ্ন ওঠাতে পারে। তাই শুধালুম, 'কিন্তু আমি প্যালেস্টাইন গেলে তোমার টাকে কি চুল গজাবে? তোমার তাতে কি লাভ?'

লোকটা এইবারে একটু বিরক্ত হল। প্রশ্নটা মোক্ষম কঠিন বলে, না 'টাক টাক' করলুম বলে ঠিক বুঝতে পারলুম না। আমার মগজ তখন ঐ একটা কঠিন প্রশ্ন শুধবার ধকল কাটাতে গিয়ে হাঁপাতে আরম্ভ করছে।

বললে, 'আমার কি লাভ? আমার লাভ বিস্তর না হলেও অল্প। অর্থাৎ অল্প-বিস্তর। বুঝিয়ে বলি। আপনাকে নিয়ে যাবো কুকের আপিসে। তাদের

কাছ থেকে কাটবেন আপনার পয়লা গন্তব্যস্থল, প্যালেস্টাইনের রাজধানী জেরুজালেমের টিকিট। ন্যায্য ভাড়াই দেবেন। কিন্তু কুক্ আমাকে দেবে কমিশন—'

আমি শুধালুম, 'কুক্ তোমাকে কমিশন দিতে যাবে কেন?'

আমার বুদ্ধির 'প্রাখর্য' দেখে লোকটা প্রায় হতাশ হয়ে বললে, 'প্যালেস্টাইন সরকার কুক্‌কে পয়সা দেয়, তার দেশে টুরিস্ট্ নিয়ে যাবার জন্য তাতে করে সরকারের দু পয়সা লাভ হয়। তাই তারা কুক্‌কে দেয় কমিশন, কুক্ তার-ই খানিকটে দেয় আমাকে। তারা তো আর ট্রেনে ট্রেনে খদ্দেরের সন্ধানে টো-টো করতে পারে না। ঐ কর্মটি করি আমি। তাই আমার হয় কিঞ্চিৎ মুনাফা। বুঝলেন তো?'

পাছে লোকটা আমাকে ফের বোকা বানিয়ে দেয়, তাই তাড়াতাড়ি বললুম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি, বুঝেছি, বিলক্ষণ বুঝেছি।' যদিও আমি ততখানি সংসারী বুদ্ধি ধরি নে বলে ঐ সব কমিশন-ফমিশনের মারপ্যাঁচ আদপেই ধরতে পারি নি।

কিন্তু লক্ষ্য করলুম, সে প্যাটপ্যাট করে আমার হ্যাণ্ড-ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে আছে। তার উপরে মোটা-মোটা হরফে লেখা ছিল ALI, লোকটা শুধলে, 'ব্যাগটা আপনার?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

'বাঃ। তা হলে তো আপনি মুসলমান। আর জেরুজালেম মুসলমানদের তীর্থভূমি— মক্কার পরেই তার স্থান। আল্লাতাল্লা মুহম্মদ সায়েবকে রাত্রে আরব থেকে জেরুজালেমে এনে সেখান থেকে স্বর্গদর্শনে নিয়ে যান। জেরুজালেমের সে জায়গাটার উপর এখন মস্‌জিদ্-উল্-আক্‌সা। বিরাট সে মসজিদ, অদ্ভুত তার গঠন। এই কিছুদিন হল আপনাদের দেশেরই রাজা হাইদ্রাবাদের নিজাম সেটাকে দশ লক্ষ টাকা খরচ করে মেরামত করে দিয়েছেন। দেখতে যাবেন না সেটা?'

তারপর বললে, 'আসলে কি জানেন? আসলে জেরুজালেম হল ধর্মের ত্রিবেণী। ইহুদি, খৃষ্টান আর মুসলমান ধর্ম এখানে এসে মিলেছে। এক ঢিলে তিন পাখি।'

তীর্থ দেখলে পুণ্য হয়, কি না হয়, সে কথা আমি কখনো ভালো করে ভেবে দেখি নি। কিন্তু হিন্দুদের কাশী, বৌদ্ধদের রাজগীর যখন দেখেছি, তখন এ তিনটেই বা বাদ যাবে কেন? বিশেষ কোনো ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আমি আদপেই পছন্দ করি নে। তাকেই বলে কম্যুনালিজম। সৃষ্টিকর্তা যখন তাঁর অসীম করুণায় এতগুলো ধর্ম বানিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই সব-কটাতেই কিছু-না-কিছু আছে। আর বিশেষ করে মা ভারি খুশি হবে, যখন শুনবে আমি বয়ৎ-উল্-মুকদ্দস্ ('পুণ্যভূমি অর্থাৎ জেরুজালেম) দর্শন করেছি। তাঁর বাবাও মক্কা অবধি পেঁছিতে পেরেছিলেন—বয়ৎ-উল্-মুকদ্দস্ দেখেন নি। সেখানে শুনেছি, অতি উত্তম তসবী (জপমালা) পাওয়া যায়। এক গাছা কিনে দিলে

মা যা-খুশী হবে। সাত বকৎ নমাজ পড়ার সময় (মুসলমানরা সচরাচর পড়ে পাঁচ বকৎ—মা পড়ে সাত) মা তসবী গুনবে, আর আমার উপর ভারি খুশি হবে।

* * *

পল আর পার্সি অবশ্য অত্যন্ত দুঃখিত হল। পার্সি বললে, 'আমাদের ফেলে আপনি চলে যাচ্ছেন প্যালেস্টাইন! আপনি না বলেছিলেন, ভূমধ্য-সাগরের নানা জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখাবেন, ইটালি আর সিসিলি, তার পর কর্সিকা আর সার্ডিনিয়ার ভিতর দিয়ে জাহাজ যাবার সময়, ভিসুভিয়স, আরো কত কী দেখাবেন?'

আমি স্বার্থপর, পাষণ্ড। পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলুম। তবু হাতজোড় করে মাপ চাইলুম।

পল পার্সির দিকে তাকিয়ে বললে, 'ছি, পার্সি! স্যর ধর্মের জায়গা দেখতে ভারি ভালোবাসেন। এ সুযোগ ছাড়বেন কেন?'

তবু আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

এক দিকে বন্ধুজন, আরেক দিকে মায়ের তসবী।

সংসার কি শুধু দ্বন্দ্বেতেই ভরা?

পরিশিষ্ট

প্যালেস্টাইন ভ্রমণ যে এ পুস্তকের অংশ হতে পারত না তা নয়। কিন্তু পল আর পার্সি সঙ্গে না থাকলে সে বই তোমাদের বয়সী ছেলে-মেয়েদের কাছে ভালো লাগবে না বলে আমার বিশ্বাস। সে-বই হয়ে যাবে নিতান্তই বয়সীদের জন্য।

মানুষ বই লিখে বন্ধুজনকে উৎসর্গ করে। আমি প্যালেস্টাইন সম্বন্ধে না-লেখা ভ্রমণ-কাহিনী উৎসর্গ করলুম মিত্রদ্বয় পল এবং পার্সিকে।

ভবঘুরে ও অন্যান্য

শ্রীযুক্তা সরোজিনী হটীসিং-কে
শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ

খৃষ্ট

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান মেরামতির সময় অন্যতম আইন করলেন, যে সব শব্দ বাঙলায় অত্যধিক প্রচলিত হয়ে গিয়েছে সেগুলোকে বদলাবার প্রয়োজন নেই। তবে কি 'খৃষ্ট' এবং 'খৃষ্টাব্দ' যথেষ্ট প্রচলিত ছিল না যে ওগুলোকে খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টাব্দ করা হল? এবং এই নূতন বানান কি খুব শুদ্ধ? প্রথমত, খ্রী-তে দীর্ঘ ঈকার কেন? আমার কান তো বলছে, আমি হ্রস্বই শুনেছি; দ্বিতীয়ত, গ্রীকরা তো 'ষ্ট' বলে না—বলে 'স্ত'। অতএব অতি বিশুদ্ধ যদি লিখতেই হয় তবে লেখা উচিত খ্রিস্ত। 'খৃষ্ট' লেখার স্বপক্ষে আমার অন্য যুক্তি, কথাটা সংস্কৃত 'ঘৃষ' ধাতু, 'ঘর্ষিত', 'মর্দিত' অর্থেই গ্রীকে ব্যবহৃত হয় (এনয়েনটেড)—অর্থাৎ 'স্নেহাসিক্ত'—'স্নেহঘর্ষিত'। ঘৃষ্ট এবং খৃষ্ট তাই হুবহু একই শব্দ (Thou anointest my head with oil; Psalms No 23, v5—এখনও পুব বাঙলার গ্রামাঞ্চলে বিয়েবাড়ীতে নিমন্ত্রিত রবাহূত রমণীদের মাথা তৈল 'ঘৃষ্ট' করা হয়; আমি কাষ্ঠরসিক নই, হলে মার্কিনী পদে তৈল-মর্দন করে যে পদোন্নতি হয়, সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতুম; ভাষায়ও to butter up কথাটা আছে)। 'খ্রী'-এর চেয়ে 'খৃ' লেখাতে ছাপাখানারও বোধ হয় সুবিধা বেশী এবং সর্বশেষ যুক্তি, খৃষ্টানরা যেরকম 'এক্স' অক্ষর ও ক্রুশ চিহ্ন প্রভু যীশুর সম্মানার্থে আলাদা করে রেখেছেন, আমরাও নাহয় 'খৃ'-টি তাঁরই জন্য রেখে দিলুম।

* * *

ধর্মের ইতিহাস পড়ার সময় আমার সব সময়ই আশ্চর্য বোধ হয়েছে যে, বুদ্ধ খৃষ্ট, মুহম্মদ (দ) যখন যুগ-পরিবর্তক মহান বাণী প্রচার করেছেন, তখন গুণী-জ্ঞানী যত না তাঁদের চতুর্দিকে সমবেত হয়েছেন, তার চেয়ে বেশী সমবেত হয়েছে সর্ব-হারার দল। হজরৎ মুহম্মদের প্রথম শিষ্যের বহুলাংশ ক্রীতদাস, দীনহীন; খৃষ্টের শিষ্যগণ জেলে (এবং জেলে যে চাষার চেয়েও গরীব হয়, সে-ও জানা কথা) এবং তিনি পাপী-তাপী, মদ্যবিক্রেতা এবং পাপিষ্ঠা রমণীকে (মেরি ম্যাগডলীন) সঙ্গ দিতে কুণ্ঠিত হতেন না বলে সে-যুগে নিন্দাভাজন হয়েছেন। এই মহাপুরুষদ্বয়ের বিনাশ কামনা করেছেন সে-যুগের পদস্থ ব্যক্তিরাই। বুদ্ধের শিষ্য মহামগ্গলায়ন ও সারিপুত্ত অসংখ্য দীনহীন পথের ভিখারীকে প্রব্রজ্যা দিয়ে যে শিষ্য করেছিলেন, সে-কথা জাতক পড়লেই জানা যায়। বুদ্ধকে রাষ্ট্রের বিপক্ষে দাঁড়াতে হয় নি বলে তিনি রাজসম্মান ও শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদের অর্থও পেয়েছিলেন, খৃষ্ট কাউকেই পান নি, এবং নবী মুহম্মদ আবু বকর ও ওমরের মত সামান্য দুএকটি আদর্শবাদী শিষ্য পেয়েছিলেন।

মার্কস ঠিক কি ভাষায় বলেছিলেন বলতে পারবো না, কিন্তু তাঁর অন্যতম মূল বক্তব্য ছিল যে, অর্থনৈতিক কারণ ভিন্ন কোনো বিরাট আন্দোলন পৃথিবীতে হয় না। বৌদ্ধ, জৈন, জরথুস্ত্রী, খ্রীষ্ট, ইসলাম—এই পাঁচটি পৃথিবীর বড় বড় আন্দোলন—হিন্দু এবং ইহুদী ধর্ম কোনো ব্যক্তিবিশেষের চতুর্দিকে গড়ে ওঠে

নি বলে এগুলো উপস্থিত বাদ দেওয়া যেতে পারে— ।[১] তাই মনে প্রশ্ন জাগে, এদের পিছনে অর্থনৈতিক কারণ ছিল, কি ছিল না ?

মার্কস এই পাঁচটি আন্দোলনকে তাঁর অর্থনৈতিক ছকে ফেলে বিচার করেছিলেন কি না জানি নে, কিংবা যে-যুগে তিনি তাঁর ছক নির্মাণ করেন, সে যুগে হয়তো এইসব ধর্মান্দোলনের ইতিহাস ব্যাপকভাবে ইয়োরোপীয় ভাষায় লিখিত তথা অনূদিত হয় নি বলে তাঁকে তার মাল-মশলা যোগাতে পারে নি।

খৃষ্টের সময় অর্থনৈতিক কুব্যবস্থা চরমে পেঁাচেছে। শোষক সম্প্রদায় জেরুজালেমে জিহোভার মন্দির প্রায় ব্যাঙ্কিং হৌসে পরিবর্তিত করে ফেলেছে—যীশু সেখান থেকে তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছেন (মার্ক ১১।১৫)—খাজনা-ট্যাক্সে মানুষ জর্জর। যীশু, মুহম্মদ, বুদ্ধ সকলেই আত্মা, অবিনশ্বর জীবন ও নির্বাণের গূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার করেছেন, সহজ সরল ভাষায় চরম সত্য প্রকাশ করেছেন, রোগশোকমুক্ত অনন্ত জীবনের সন্ধান দিয়েছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সকলেই নূতন ধন-বণ্টন-পদ্ধতি প্রচলিত করতে চেয়েছিলেন এবং তারই ফলে অসংখ্য দীনদুঃখী—এবং প্রধানত তারাই —তাঁদের চতুর্দিকে সমবেত হয়েছিল। খৃষ্ট যে কামিজ নিয়ে গেলে জোব্বা দিতে বলেছেন, সে কিছু মুখের কথা নয়। তার মহাপ্রস্থানের পর নবনির্মিত খৃষ্টসমাজের যে বর্ণনা পাই, তার থেকে মনে হয় মার্কস যে ভাবী আদর্শ সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন, তাই সফল হয়ে গিয়েছে, সবাই 'সই পেয়েছির দেশে'র তুল্যাধিকারী নাগরিক ঃ

And all that believed were together, and had all things common ; and sold their possessions and goods and parted them to all men, as every man had need··· and the multitude of them that believed were of one heart and one soul : neither said any of them that ought of the things which he possessed was his own ; but they had all things common····· ···Neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of lands or houses sold them, and brought the prices of the things that were sold and laid them down at the apostle's feet ; aud distribution was made unto every man according as he had need. (Acts : 2 & 4).

হজরত মুহম্মদ মক্কাতে যতদিন একেশ্বরবাদ ও আল্লার মাহাত্ম্য প্রচার করেছিলেন, ততদিন মক্কাবাসী তাঁর উপর অসন্তুষ্ট ছিল না, কিন্তু তিনি যখন নবীন ধন-বণ্টন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাইলেন, তখনই মক্কার পদস্থ জনেরা তাঁর প্রাণ-নাশের সংকল্প করল। পরবর্তী যুগের ইসলামে এই নবীন ধন-বণ্টন-পদ্ধতির প্রাধান্য ঐতিহাসিক মাত্রেরই জানা আছে। ইরানের এক

১ আমার মনে হয়, শংকর ও চৈতন্যের সময় বড় দুটো আন্দোলন হয়েছিল, কিন্তু এখানে দীর্ঘ আলোচনার স্থানাভাব।

আরব গভর্নর তখন দুঃখ করে বলেছিলেন, এই যে আজ হাজার হাজার ইরানী মুসলমান হচ্ছে, সেটা ইসলামের জন্য নয়, আর্থিক সুবিধা পাচ্ছে বলে।[২]

জরথুস্ত্রের আমলে দ্বন্দ্ব বেধেছে—একদিকে কৃষি ও গো-পালন, অন্যদিকে যাযাবর বৃত্তি ও লুণ্ঠন। জরথুস্ত্র দেশের ধনবৃদ্ধির জন্য কৃষি-গো-পালনের রীতি প্রবর্তন করতে চাইলে শত্রুপক্ষের হস্তে প্রাণ হারান। তাঁর 'ধর্ম' কিন্তু জয়লাভ করলো।

বুদ্ধের সময় তপোবন প্রথা প্রায় উঠে গিয়েছে, বন-জঙ্গল সাফ করা হয়ে গিয়েছে—বিস্তর লোক ভিক্ষুকের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদিকে ছোট ছোট অংসখ্য রাজ্য তাদের অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের চরমে পেঁছে এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে রাজ্যে রাজ্যে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা না করলে আর সমস্ত দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় না ; অথচ জাতকে দেখতে পাই, কেউ আপন রাষ্ট্রের প্রত্যন্ত প্রদেশ ত্যাগ করে ভিন্ন রাজ্যে প্রবেশ করতে গেলেই তাকে মেরে ফেলা হচ্ছে। বুদ্ধ ঐসব নিরন্নদের সংঘের অন্নবস্ত্র দিয়ে পাঠালেন ভিন্ন রাজ্যে শান্তির বাণী প্রচার করতে—তাদের বিশেষ বেশ পরানো হল, যাতে করে সবাই তাদের সহজে চিনতে পারে। গোড়ার দিকে নিশ্চয়ই কিছু ভিক্ষু মারা গিয়েছিলেন ; পরে এঁরা অক্লেশে রাজ্য থেকে রাজ্যান্তরে গেলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়লো, ঐক্য সৃষ্টি হল এবং তাই সর্ব-ভারতের মৌর্য রাজ্য সংস্থাপিত হল।

আমি একথা বলছি না যে, দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও নবীন ধনবণ্টন পদ্ধতি প্রচলন করাই মহাপুরুষদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ; আমার বক্তব্য তাঁরা এগুলোকে অবহেলা তো করেনই নি, বরঞ্চ অত্যন্ত জোর দিয়েছিলেন বলেই 'হ্যাভনট' 'প্রলেটারিয়া' 'সর্বহারা'রা প্রথম এসে জুটেছিল। কয়েক শতাব্দী পর ফের দেখা দেয়, আবার সেই শোষকের দল, পাদ্রীপুরুৎ-মোল্লারূপে। এঁরা আর ধনবণ্টনের কথা তোলেন না—আচার অনুষ্ঠান, পূজা-প্রায়শ্চিত্তের কথাই বার বার বড় গলায় গান।

ধর্মের এই অর্থনৈতিক দিকটা নিয়ে এখনো কোনো ভালো চর্চা হয় নি ॥

কই সে ?

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাত্মবোধ, গ্যোটের ভূয়োদর্শন, শেক্‌স্‌পীয়রের মানব-চরিত্রজ্ঞতা সামান্য জনও কিছু না কিছু উপলব্ধি করতে পারে। সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীকে দিয়েছেন মাত্র একটি হিমালয় ; আমাদের মানসলোকে এই তিনজনই তিনটি হিমালয়। সাধারণ জন দূরে থেকেও এঁদের গাম্ভীর্য-মাধুর্য দেখে

২ তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে ইসলামের আদর্শবাদ এদের কেউই বুঝতে পারে নি। বস্তুতঃ ইসলামের সাম্যবাদ, একেশ্বরবাদ, হজরতের সরল জীবনাদর্শ বহু লোককে অভিভূত করে।

বিস্ময় বোধ করে—চূড়ান্তে অধিরোহন করেন অল্প মহাত্মাই। আরো হয়তো একাধিক হিমালয় এ-ভূমিতে, অন্যান্য ভূমিতে আছেন—ভাষা ও দূরত্বের কুহেলিকায় আজও তাঁরা লুক্কায়িত।

এছাড়া প্রত্যেক পাঠকেরই আপন-আপন অতি আপন প্রিয় কবি আছেন। তাঁদের কেউ কেউ হয়তো বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নি,—হয়তো তাঁদের সে মেধা নেই ; এঁদের স্বীকার করে নিয়েও আমরা এঁদের নাম বিশ্বকবিদের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে বলি না।

আমি দুজন কবিকে বড় প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। আমারই সৌভাগ্য, এঁদের একজন বাঙালী—চণ্ডীদাস, অন্য জন জর্মন, নাম হাইনে। প্রশ্ন উঠতে পারে, বড় বড় কবিদের ছেড়ে এঁদের প্রিয় বলে বরণ করেছি কেন? কারণটা তুলনা দিয়ে বোঝালে সরল হয়। রাজবাড়ির ঐশ্বর্য দেখে বিমোহিত হই, বিনোবাজীর ব্যক্তিত্ব দেখে বাক্যস্ফূর্তি হয় না, কিন্তু রাজবাড়িতে তথা বিনোবাজীর সাহচর্যে থাকবার মত কৌতূহল যদি বা দু'একদিনের জন্য হয়, তাঁদের সঙ্গে অহরহ বাস করতে হলে আমার মত সাধারণ জনের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসবে।

চণ্ডীদাসকে নিয়ে ষোল, আর হাইনেকে নিয়ে সতের বছর বয়েস থেকে ঘর করছি। একদিনের তরে কোনো প্রকার অস্বস্তি বোধ করি নি। আমি জানি, এ-বিষয়টি আরো সরল করে বুঝিয়ে বলা যায়, কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। কারণ প্রত্যেকেরই আপন-আপন প্রাণপ্রিয় ঘরোয়া কবি আছেন—শেক্‌স্‌পীয়র গ্যোটে নিয়ে ঘর করেন অল্প লোকই—তাঁরা এতক্ষণে আমার বক্তব্যটি পরিষ্কার বুঝে গিয়েছেন। নিজের পিঠ কখনো নিজে দেখি নি, কিন্তু সেটা যে আছে সে-কথা অন্য লোককে যুক্তিতর্ক দিয়ে সপ্রমাণ করতে হয় না।

চণ্ডীদাস ও হাইনের মত সরল ভাষাতে হৃদয়ের গভীরতম বেদনা কেউ বলতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ আর গ্যোটেও অতি সরল ভাষায় কথা বলতে জানতেন, কিন্তু তাঁরা সৃষ্টি-রহস্যের এমন সব কঠিন জিনিস নিয়ে আপন আপন কাব্য-লোক রচনা করেছেন যে সেখানে তাঁদের ভাষা বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দুর্জ্ঞেয় হতে বাধ্য। চণ্ডীদাস, হাইনে তাঁদের, আমাদের হৃদয়-বেদনালোকের বাইরে কখনো যেতে চান নি। তাঁরা গান গেয়েছেন, আমাদের আঙ্গিনায় তেঁতুলের ছায়ায় বসে—তারা-ঝরা-নির্ঝরের ছায়াপথ ধরে ধরে তাঁরা সপ্তর্ষির গগনাঙ্গন পেঁছে সেখানকার অমর্ত্য গান গান নি।

চণ্ডীদাসকে সব বাঙালীই চেনে, হাইনের পরিচয় দি।

আমাদের পরিচিত জনের মাধ্যমেই আরম্ভ করি।

যাঁরা গত শতাব্দীতে ইয়োরোপে সংস্কৃতচর্চা নিয়ে কিঞ্চিন্মাত্র আলোচনা করেছেন তাঁরাই আউগুস্টুস্‌ ভিল্‌হেল্‌ম্‌ ফন্‌ শ্লেগেলের সঙ্গে পরিচিত।

জর্মনির বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়েই সর্বপ্রথম সংস্কৃত চর্চার জন্য আসন প্রস্তুত করা হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এই আসনে অধ্যাপকরূপে বিরাজ করতেন। এক দিকে তিনি সংস্কৃতের নাট্যকাব্যের সঙ্গে পরিচিত, অন্য দিক দিয়ে তখন-

কার গৌরবভাস্কর ফরাসী সাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্য ভোগ করেছিলেন বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যসম্রাজ্ঞী মাদাম দ্য স্তালের সখা ও উপদেষ্টারূপে। তাই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ছাড়াও পড়াতেন নন্দনশাস্ত্র বা অলংকার। এক বৎসর যেতে না যেতে হাইনে বন্ এলেন আইন পড়তে। শ্লেগেলের বক্তৃতা শুনে তিনি এমনই অভিভূত হয়ে গেলেন যে আইনকে তিনি নির্বাসনে পাঠালেন।

শ্লেগেল অলংকার পড়াবার সময় নিজেকে গ্রীক লাতিন ফরাসী জর্মনের ভিতর সীমাবদ্ধ করে রাখতেন না। ঘন ঘন সংস্কৃত কাব্যোপবনে প্রবেশ করে গুচ্ছ গুচ্ছ গীতাঞ্জলির সঞ্চয়িতা তাঁর শিষ্যদের সামনে তুলে ধরতেন। হাইনের বয়স তখন একুশ-বাইশ। সেই সর্বজনমান্য প্রবীণ জ্ঞানবৃদ্ধ রসিকজননমস্য শ্লেগেলের কাছে হাইনে একদিন নিয়ে গেলেন তাঁর একগুচ্ছ সরল কবিতা।

'উত্তম, উত্তম কবিতা, কিন্তু তোমাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। বড্ড বেশী পুরনো অলংকারের ছড়াছড়ি, নিজের কথায় আড় কবিতাকে কৃত্রিম করে ফেলেছে।' দুরুদুরু বুকে হাইনে মৃদু আপত্তি জানালেন। শ্লেগেল নির্দয় সমালোচক। বললেন, 'বুঝেছি, বুঝেছি। কিন্তু তোমার কাব্যরাণী এখনো পরে আছেন জবরজঙ্গ জামাকাপড়, তাঁর মুখে বড্ড বেশী কালো তিল, তাঁর ক্ষীণ কটি আর কত ক্ষীণ করবে, তাঁর খোঁপা যে আকাশে উঠে গেছে। একে ভালোবাসার যুগ তোমার পেরিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু বন্ধু, তোমার ভাস্কর কাব্যলক্ষ্মী ঘুমিয়ে আছেন কে জানে কোন্ ইন্দ্রজালের মোহাচ্ছন্ন মায়ায় উত্তর দেশে। নিভৃত নির্জনে। প্রেমাতুর, বিরহ-বেদনায় বিবর্ণ কত না তরুণ রাজপুত্র বেরিয়েছেন তাঁর সন্ধানে। হয়তো তুমিই, —তুমিই বন্ধু সেই ভানুমতী মন্ত্র পড়ে তাঁকে দীর্ঘ শর্বরীর দীর্ঘতর নিদ্রা থেকে জাগরিত করবে। ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠবে চতুর্দিকে, বনস্পতি গান গেয়ে উঠবে, প্রকৃতিও জেগে উঠবে আপন জড়নিদ্রা থেকে। জর্মন কাব্যলক্ষ্মীর চতুর্দিকের প্রাকার ধ্বংসাবশেষ রূপান্তরিত হবে স্বর্ণোজ্জ্বল রাজপ্রাসাদে। গ্রীসের সুরপুত্রগণ আবার এসে অবতীর্ণ হবেন তাঁদের চিরনবীন দেবসজ্জার মহিমায়·····প্রার্থনা করি আপোল্লো দেব তোমার প্রতি পদক্ষেপের দিকে অবিচল দৃষ্টি রাখুন।'

হাইনের জীবনীকার বলেন, কোনো সুরাই তরুণ হাইনেকে এতখানি উত্তেজিত করতে পারে নি—সে যুগের আলংকারিক-শ্রেষ্ঠের কয়েকটি কথায় তাঁকে যতখানি সোমাচ্ছন্ন করেছিল। রসরাজ শ্লেগেল স্বহস্তে হাইনের মস্তকে কবির রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছেন!

এর কিছুদিন পরে,—হাইনে তখনো কলেজের ছাত্র,—বেরল তাঁর কবিতার বই, "বুখ ড্যার লীডার," "গানের বই," কিন্তু এর অনুবাদ "গীতাঞ্জলি" করলেই ঠিক হয়। আমরা "অঞ্জলি" বলতে যা বুঝি সেটা ইয়োরোপেও আছে, কিন্তু ঠিক শব্দটি নেই। গানের বইখানা পড়ার পর স্পষ্টই বোঝা যায়, 'অঞ্জলি' শব্দটি ইয়োরোপে থাকলে হাইনে অতি নিশ্চয় ঐটেই ব্যবহার করতেন—কারণ এর অনেকগুলিই তাঁর প্রথমা প্রিয়ার পদপঙ্কজে অর্পিত প্রণয়প্রসূনাঞ্জলি।

সমস্ত জর্মনি সাত দিনের ভিতর এই কলেজের ছোকরার জয়ধ্বনি গেয়ে উঠল। হাইনে জর্মন কাব্যে আনলেন এক নূতন সুর। অথচ সত্য বলতে কি এই সুরে কিছুমাত্র নূতনত্ব নেই, কারণ গীতিগুলি সরলতম ভাষায় রচিত। সরল ভাষা ব্যবহার করা তো আর বিশ্বসাহিত্যে কিছু নূতন নয়। কিন্তু জর্মন কাব্যে ঐটেই হল এক সম্পূর্ণ নবীন সুর—কারণ জর্মনদের বিশ্বাস তাদের ঐতিহ্য তাদের সংস্কৃতি এমনই এক অবর্ণনীয় কুহেলিকাঘন আত্মোপলব্ধি-প্রচেষ্টা এবং অর্ধসফলতা-অর্ধনৈরাশ্যে আচ্ছাদিত যে সেটা সরল ভাষায় কিছুতেই প্রকাশ করা যায় না। হাইনে দেখিয়ে দিলেন সেটা যায়। যে রকম সবাই যখন বলেছিল, অসম্ভব, তখন মধুসূদন দেখিয়ে দিয়েছিলেন, অমিত্রাক্ষরে বাঙলা কাব্যসৃষ্টি করা যায়।

হাইনের কবিতা সরল। সকলেই জানেন সরল ভাষায় লেখা কঠিন। সেটাও আয়ত্ত করা যায়। আয়ত্ত করা যায় না—সরল কিন্তু অসাধারণ হওয়া। 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল'—সরল অথচ বিরল লেখা।

ইংরেজীতে হাউসমানের সঙ্গে হাইনের তুলনা করা হয়। শুনতে পাই হাউসমানের 'শ্রপ শা ল্যাডের' মত কোনো ইংরেজী কবিতার বই এত বেশী বিক্রয় হয় নি—প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। সাধারণ জন পড়েছে বইখানা সরল বলে, গুণীরা কিনেছেন বিরল বলে। পাঠককে অনুরোধ করি, দুজনারই লেখা তলিয়ে পড়তে। হাইনে অনেক উঁচুতে।[১]

হাইনের কবিতা বাঙলায় অনুবাদ করেছেন প্রধানত সত্যেন্দ্র দত্ত। 'তীর্থ সলিল ও তীর্থ রেণু'তে—এবং হয়তো অন্যান্য পুস্তকেও কিছু কিছু আছে। আর করেছেন যতীন্দ্র মোহন বাগচী।[২]

এঁর বই যোগাড় করতে পারি নি, আমি ১৩১৭ সনের প্রবাসীতে পড়েছি।

১ Edmund Wilson মার্কিন সমালোচক। আমি যে তাঁকে শ্রদ্ধা করি তার প্রধান কারণ তিনি এলিয়েটকে অপ্রিয় সত্য বলতে জানেন। হাইনে হাউসমান সম্বন্ধে তিনি বলেন,

There is immediate emotional experience in Housman of the same kind that there is in Heine, whom he imitated and to whom he has been compared. But Heine, for all his misfortunes, moves at ease in a large world. There is in his work an exhilaration of advantures, in travel, in love etc. Doleful his accents may sometimes be, he always lets in air and light to the mind. But Housman is closed from the beginning. His world has no opening horizons etc. "The Triple Thinkers," p. 71

২ পরে জানতে পারি, বাঙলায় সর্বপ্রথম অনুবাদ করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে।

'ডী রোজ, ডী লীলিয়ে, ডী টাউবে' দি রোজ, দি লিলি, দি ডাভের' অনুবাদ করেছেন :'

গোলাপ, কমল, কপোত, প্রভাত রবি—
ভালবাসিতাম কত যে এসবে আগে,
সে সব গিয়েছে, এখন কেবল তুমি,
তোমারি মূর্তি পরাণে কেবল জাগে !
নিখিল প্রেমের নির্ঝর—তুমি সে সবি—
তুমিই গোলাপ, কমল, কোপত, রবি।

(বাগচী, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৭)

এবারে সত্যেন দত্তের একটি :

জাগিনু যখন ঊষা হাসে নাই,
শুধানু "সে আবিবে কি ?"
চলে যায় সাঁঝ আর আশা নাই,
সে ত' আসিল না, হায়, সখি ?

নিশীথে রাতে ক্ষুব্ধ হৃদয়ে
জাগিয়া লুটাই বিছানায় ;
আপন রচন ব্যর্থ স্বপন
দুখ ভারে নুয়ে ডুবে যায়।

ভারতবর্ষের প্রভাব হাইনের কবিতায় খুব বেশী আছে বলা যায় না। তাঁর পূর্ববর্তী হিমালয় গ্যোটেই যখন হাইনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি—চণ্ডীদাসের উপর কার প্রভাব !—তখন সে আশা দুরাশা। তবু একটি কবিতার উল্লেখ করি—

গঙ্গার পার—মধুর গন্ধ ত্রিভুবন
আলো ভরা—
কত না বিরাট বনস্পতিরে ধরে
পুরুষ রমণী সুন্দর আর শান্ত প্রকৃতি-ধরা
নতজানু হয়ে শতদলে পূজা করে।

(লেখকের অনুবাদ)

এক দিক দিয়ে হাইনে গীতিকাব্য রচয়িতা, অন্য দিক দিয়ে তিনি সমস্ত জীবন লড়েছেন জর্মনির সাধারণ জনের ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য। সেই 'দোষে' তাঁকে যৌবনেই নির্বাসন বরণ করতে হয়। জীবনের বেশীর ভাগ তিনি কাটান প্যারিসে। সেখান থেকে তিনি কী রাজার সম্মান পেয়েছিলেন, সে কথা লিখেছেন ভিক্টর হ্যুগোর গুরু ফরাসী সাহিত্যের তখনকার দিনের গ্র্যান্ড মাস্টার গোতিয়ের। আর হাইনের সখা ও সহচর ছিলেন সঙ্গীতের গ্র্যান্ড মাস্টার রসসীনি। যদিও পরের কথা, তবু এই সুবাদে একটি মধুর গল্প মনে পড়ল।

জীবনের শেষ আট বছর হাইনের কাটে ঐ প্যারিসেই, রোগশয্যায়, অবশ

অথর্ব হয়ে—অসহ্য যন্ত্রণায়। কার্ল মার্কস্ যখন তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন তখন হাইনের চোখের পাতা আঙুল দিয়ে তুলে ধরতে হয়েছিল—যাতে করে তিনি মার্কস্‌কে দেখতে পান। এর কিছু দিন পর হাইনের বাড়িতে আগুন লাগে। বিরাট বপু দরওয়ান রোগজীর্ণ হাইনেকে কোলে করে নিয়ে গেল নিরাপদ জায়গায়। আগুন নেভানোর পর যখন তাঁকে দরওয়ান আবার কোলে তুলে নিয়ে এল তখন হাইনে মৃদু হাসি হেসে তাঁর এক সখাকে বললেন, 'হামবুর্গে মাকে লিখে দাও, প্যারিসের লোক আমাকে এত ভালোবাসে যে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

সেই সরল দরওয়ান কথাটির গভীর অর্থ বুঝেছিল কি না জানি নে। শুনতে পেয়ে সে বলেছিল, 'হ্যাঁ, মসিয়ো, তাই লিখে দিন।'

ঘটনাটির ভিতর অনেকখানি বেদনা লুকনো আছে। নির্বাসিত হাইনে যতদিন পারেন মায়ের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন যে তিনি আর নড়া-চড়া করতে পারেন না।

পাশ্চাত্ত্য কবিরা মায়ের উদ্দেশে বা স্মরণে বড় একটা কবিতা লেখেন না। ইহুদি হাইনের গায়ে প্রাচ্য দেশীয় রক্ত ছিল বলে তিনি ব্যত্যয়। অল্প লোকই হাইনের মত মাকে ভালোবেসেছে। প্যারিসে থাকাকালীন মাত্র দু'বার তিনি গোপনে জর্মানি যান। দু'বারই মাকে দেখবার জন্য। আমার নিজের মনে সন্দেহ আছে, পুলিস জানতে পেরেও বোধ হয় সাধারণের কবি হাইনেকে ধরিয়ে দেয় নি। পুলিস কবিতা না লিখতে পারে, কিন্তু পুলিসেরও তো মা থাকে।

মাতার উদ্দেশে লেখা হাইনের কবিতা অদ্বিতীয় বলার সাহস আমি না পেলেও বলবো অতুলনীয়। এবং আশ্চর্য, কবিতাটি করুণ এবং মধুর সুরে রচা নয়। ভাষা অবশ্য অত্যন্ত সরল, কিন্তু মূল সুরে আছে দার্ঢ্য এবং দম্ভ। কাইজারের সঙ্গে প্রজা-মিত্র হাইনের ছিল কলহ—আমার মনে প্রশ্ন জাগে হাইনের সখা রজকিনী-সাধক চণ্ডীদাসকে কি মুকুটহীন কাইজার ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয় নি—এবং তাই তিনি কবিতা আরম্ভ করেছেন,

উচ্চশির উচ্চে রাখা অভ্যাস আমার
আমরা প্রকৃতি জেনো অতীব কঠোর
রাজারো অবজ্ঞা-দৃষ্টি পারে না তো মোর
দৃষ্টি কভু নত করে। কিন্তু মাগো—

আর তার পর কী আকুলি-বিকুলি! তোমার সামনে, মা, আপনার থেকে মাথা নিচু হয়ে আসে। স্মরণে আসে, কত না অপরাধ করেছি, কত কিছু না করে তোমার পুণ্য হৃদয়কে বেদনা দিয়েছি বার বার। তার স্মৃতি আমাকে যে কী পীড়া দেয়, জানো মা?

সত্যেন দত্তের অনুবাদ তুলে দিতে ইচ্ছে করছে না,—প্রত্যেক অনুতপ্ত জনের মত আমারও মন আঁকুবাঁকু করে, হাইনের মাতৃমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমিও আমার মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ করে যাই।

কবিতাটির দ্বিতীয় ভাগে অন্য সুর।

তোমাকে ছেড়ে মা, মূর্খের মত আমি গিয়েছি পৃথিবীর অন্য প্রান্তে—ভালোবাসার সন্ধানে। দোরে দোরে ভিখিরির মত ভালোবাসার জন্য করেছি করাঘাত। আর পেয়েছি শুধু নিদারুণ ঘৃণা। তারপর যখন ক্ষত-বিক্ষত শ্লথ চরণে বাড়ি ফিরেছি তখন দোরের সামনে তুমি মা এগিয়ে এসেছ আমার দিকে—

হার মানলুম। সত্যেন দত্তের অনুবাদটিই পড়ুন।

আশ্চর্য লাগে, এই হাইনে লোকটি সরল ভাষায় কি করে রুদ্র করুণ উভয় রসই তৈরী করতে জানতেন। আর আমার সব চেয়ে ভালো লাগে তাঁর হাসি-কান্নায় মেলানো লেখাগুলো। তারই হ্রস্ব একটি শোনাবার জন্য দীর্ঘ এই ভূমিকা। আমি নিরুপায়। হায়, আমার তো সে শক্তি নেই যার কৃপায় লেখক মহাত্মাজনকেও স্বল্পে প্রকাশ করতে পারে।

সম্রাট ম্যাক্সিমীলীয়নের কাহিনী বলতে গিয়ে হাইনে অনুতাপ করছেন, যে কাহিনীটি তাঁর ভালো করে মনে নেই—অনেককালের কথা কি না। আপসোস করে বলছেন, এ সব জিনিস মানুষ সহজেই ভুলে যায়,—বিশেষ করে যখন তাঁকে প্রতি মাসে প্রফেসারের রোক্কা মাইনে দেওয়া হয় না, আপন ক্লাস-লেকচারের নোটবই থেকে মাঝে-মধ্যে পড়ে নিয়ে স্মৃতিটা ঝালিয়ে নেবার জন্য।

ম্যাক্সিমীলীয়ন পাষাণ প্রাচীরের কঠিন কারাগারে। তাঁর আমীর-ওমরাহ, উজীর-নাজীর সবাই তাঁকে বর্জন করেছে। কেউ সামান্যতম চেষ্টা করছে না, তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করার। কী ঘেন্নায়ই না ম্যাক্সিমীলীয়ন তাঁর গৌরবদিনের সেই পা-চাটা দলের কথা মাঝে মাঝে স্মরণ করেছিলেন।

এমন সময় সর্বাঙ্গ কম্বলে ঢেকে এসে ঢুকলো কারাগারের নির্জন কক্ষে একটা লোক। কে এ? এক ঝটকায় কম্বল ছুঁড়ে ফেলে দিতেই সম্রাট দেখেন, এ যে রাজসভার ভাঁড়, সং, বিশ্বাসী কুন্‌ৎস্‌ ফন্‌ ড্যার রোজেন। আশার বাণী, আত্মবিশ্বাসের মন্ত্র নিয়ে এল শেষটায় রাজসভার মূর্খ—সং কুন্‌ৎস্‌!

'ওঠো, মহারাজ, তোমার শৃঙ্খল ভাঙবার দিন এল। কারামুক্তির সময় এসেছে। নব-জীবন আরম্ভ হল। অমানিশি অতীত—ঐ হেরো, বাইরে প্রথম ঊষার উদয়।'

'ওরে মূর্খ, ওরে আমার হাবা কুন্‌ৎস্‌! ভুল করেছিস, রে ভুল করেছিস। উজ্জ্বল খড়্গ দেখে তুই ভেবেছিস সূর্য, আর যেটাকে তুই ঊষার লালিমা মনে করেছিস সে রক্ত।'

'না, মহারাজ, ওটা সূর্যই বটে, যদিও অসম্ভব সম্ভব হয়েছে—ওটা উদয় হচ্ছে পশ্চিমাকাশে—ছ'হাজার বছর ধরে মানুষ ওটাকে পূব দিকেই উঠতে দেখেছে—এখনো কি ওর সময় হয় নি যে একবার রাস্তা বদলে পশ্চিম দিকে উঠে দেখে কি রকম লাগে!'

'কুন্‌ৎস্‌ ফন্‌ ড্যার রোজেন, বল্‌ দেখি তো হাবা আমার, তোর টুপিতে যে ছোট ছোট ঘুঙুর বাঁধা থাকতো সেগুলো গেল কোথায়?'

'দুঃখের কথা তোলেন কেন, মহারাজ! আপনার দুর্দিনের কথা ভেবে ভেবে মাথা নাড়াতে নাড়াতে ঘুঙুরগুলো খসে গেল; কিন্তু তাতে টুপির কোনো ক্ষতি হয় নি।'

'কুন্‌ৎস্‌ ফন্‌ ড্যার রোজেন, ওরে মূর্খ, বল্‌ তো, রে, বাইরে ও কিসের শব্দ?'

'আস্তে, মহারাজ। কামার কারাগারের দরজা ভাঙছে। শীঘ্রই আপনি আবার মুক্ত স্বাধীন হবেন—সম্রাট।'

'আমি কি সত্যই সম্রাট? হায়, শুধু রাজসভার মূর্খের মুখেই আমি এ-কথা শুনলুম।'

'ও রকম করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবেন না প্রভু! কারাগারের বিষের হাওয়া আপনাকে নির্জীব করে ফেলেছে। আপনি যখন আবার সম্রাট হবেন তখন ধমনীতে ধমনীতে অনুভব করবেন সেই বীর রাজ-রক্ত, আপনি আবার হবেন গর্বিত সম্রাট, দম্ভী সম্রাট। আবার হবেন দাক্ষিণ্যময় এবং আবার করবেন অন্যায় অবিচার, হাসিমুখে, এবং আবার হবেন নেমকহারাম—রাজাবাদশাদের যা স্বভাব।'

'কুন্‌ৎস্‌ ফন্‌ ড্যার রোজেন, বল্‌ তো হাবা, আমি যখন আবার স্বাধীন হব, তখন তুই কি করবি?'

'আমি আমার টুপিতে ফের ঘুঙুর সেলাই করবো।'

'আর তোর বিশ্বস্ততা প্রভুভক্তির বদলে তোকে কি প্রতিদান, কি পুরস্কার দেব?'

'আঃ। আমার দিলের বাদশাকে কি বলবো! দয়া করে আমার ফাঁসির হুকুমটা দেবেন না।'

এইখানে হাইনে তাঁর গল্পটি শেষ করেছেন।

আমরা বলি 'হা, হতোস্মি, হা হতোস্মি! রাজসভার ভাঁড়ই হোক, আর সঙই হোক, সভা-মূর্খ হোক আর পুণ্যশ্লোক গর্দভই হোক, কুন্‌ৎস্‌ বিলক্ষণ জানতো, রাজারাজড়ার কৃতজ্ঞতাবোধ কতখানি!'

কিন্তু কাহিনীটির তাৎপর্য কি?

হাইনে সেটি গল্পের মাঝখানেই বুনে দিয়েছেন। সে যুগের গল্পে দুটো ক্লাইমেক্‌স্‌ চলতো না বলে আমি সেটি শেষের-কবিতা রূপে রেখে দিয়েছি।

'হে পিতৃভূমি জর্মনি! হে আমার প্রিয় জর্মন জনগণ! আমি তোমাদের কুন্‌ৎস্‌ ফন্‌ রোজেন। তার একমাত্র ধর্ম ছিল আনন্দ, যার কর্ম ছিল তোমাদের মঙ্গলদিনে তোমাদের আনন্দবর্ধন করা, তোমাদের দুর্দিনে কারা-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে তোমাদের জন্য অভয়বাণী নিয়ে আসা। এই দেখো, আমার দীর্ঘ আচ্ছাদনের ভিতর লুকিয়ে এনেছি তোমার সুদৃঢ় রাজদণ্ড, তোমার সুন্দর রাজমুকুট—আমাকে স্মরণ করতে পারছ না, তুমি মহারাজ? আমি যদি তোমাকে মুক্ত নাও করতে পারি, সান্ত্বনা তো অন্তত দিতে পারব। অন্তত তো তোমার কাছে এমন একজন আপন-জন রইল যে তোমার সঙ্গে

তোমার দুঃখ-বেদনার কথা কইবে ; তোমাকে আশার বাণী শোনাবে ; যে তোমাকে ভালোবাসে ; যার সর্বশেষ রসের কথা সর্বশেষ রক্তবিন্দু তোমারই সেবার জন্য। হে আমার দেশবাসিগণ, তোমরাই তো প্রকৃত সম্রাট, তোমরাই তো দেশের প্রকৃত প্রভু। তোমাদের ইচ্ছা, এমন কি তোমাদের খেয়াল-খুশীই তো দেশের প্রকৃত শক্তি—এ শক্তি 'বিধি-দত্ত' 'রাজদণ্ডকে' অনায়াসে পদদলিত করে। হতে পারে আজ তোমরা পদশৃঙ্খলিত, কারাগারে নিক্ষিপ্ত—কিন্তু আর কত দিন ? ঐ হেরো, মুক্তির নব অরুণোদয় !'

* *

হে বাঙালী, আজ তুমি দুর্দশার চরমে পেঁচেছো।

কোথায় তোমার কুনৎস্ ফন্ ড্যার রোজেন ? যে তোমাকে আশার বাণী শোনাবে ? ॥

খোশগল্প

যখন তখন লোকে বলে, 'গল্প বলো।'

এ বাবদে স্বর্গত ক্ষিতিমোহন সেনের একাধিক রসাল উত্তর আছে। তিনি বাঙাল উচ্চারণে তখন বলতেন, 'ঘর লেপ্যা মুছ্যা, আতুড় ঘর বানাইয়া, মা ষষ্ঠীর গেছে বাচ্যা বাচলেই তো আর বাচ্যা পয়দা হয় না। নয় মাস দশ দিন সময় লাগে।' অর্থাৎ গল্পের সময় এলে তবে গল্প বেরবে।

ইহুদিদের গল্প এর চেয়ে একটু ভালো। কেন, সে-কথা পরে বলছি।

এক ভালো কথক রাব্বী (ইহুদিদের পণ্ডিত পুরুৎ) অনেকখানি হাঁটার পর অতিথি হয়ে উঠেছেন এক পরিচিত চাষার বাড়িতে। চাষা-বৌ জানতো, রাব্বী গল্প করতে ভারি ওস্তাদ। পাদ্য-অর্ঘ্য না দিয়েই আরম্ভ করেছে, 'গল্প বলুন, গল্প বলুন।' ইতিমধ্যে চাষা ভিন গাঁয়ের মেলা থেকে ফিরেছে একটা ছাগী কিনে। চাষা-বৌ সঙ্গে সঙ্গেই গল্পের বায়না বন্ধ করে দুইতে গেছে ছাগীকে—ইহুদি তো ! এক ফোঁটা দুধ বেরল না দেখে চাষা-বৌ বেজার মুখে স্বামীকে শুধালো, 'এ কি ছাগী আনলে গো ?' বিচক্ষণ চাষা হেসে বললে, 'ওটা হেঁটে হেঁটে হয়রান হয়ে গিয়েছে। দানাপানি দাও—দুধ ঠিকই দেবে।' রাব্বী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'সেই কথাই তো হচ্ছে। দানা-পানি না পেলে আমিই বা গল্প বলি কি করে ?'

ক্ষিতিমোহনবাবু ইহুদি ছিলেন না বলে, নিজের সুবিধেটা উত্তরের মারফতে গুছিয়ে নিতে পারেন নি—ইহুদি পারে।

এ গল্পটা মনে রাখবেন। কাজে লাগবে। অন্তত চা-টা পাঁপড়ভাজাটা আসবে নিশ্চয়ই।

সঙ্গে সঙ্গে ইহুদি, স্কটম্যান সাইকল্ চালাতে আরম্ভ করে দেবেন। সে আবার কি ? এসোসিয়েশন অফ আইডিয়াজ, অর্থাৎ এক চিন্তার খেই ধরে অন্য চিন্তা,

সেটা থেকে আবার অন্য চিন্তা, এই রকম করে করে মোকামে পেঁছে যাবেন। এখনো বুঝতে পারলেন না ? তবে একটা গল্প দিয়েই বোঝাই।

সেই যে বাঁদর ছেলে কিছুতেই শটকে শিখবে না, এ ছেলে তেমনি পেটুক—যা- কিছু শিখতে দেওয়া হয়, পেঁছে যাবেই যাবে মিষ্টি-সন্দেশে। তাকে একং দশং শিখতে দেওয়া হয়েছে। বলছে,

'একং, দশং, শতং, সহস্র, অযুত, লক্ষ্মী, সরস্বতী—'

(মন্তব্য ঃ 'লক্ষ' না বলে বলে ফেলেছে 'লক্ষ্মী' এবং তিনি যখন দেবী তখন তাঁর এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ থেকে চলে গেছে আরেক দেবী সরস্বতীতে ; তার পর বলছে,)

'লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক, অগ্রহায়ণ—'

(মন্তব্য ঃ 'কার্তিক' মাসও বটে, তাই এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজে চলে গেল অগ্রহায়ণ পোষে)

অগ্রহায়ণ, পোষ, মাগ, ছেলে-পিলে—'

(মন্তব্য ঃ 'মাঘ'কে আমরা 'মাগ'ই উচ্চারণ করে থাকি। তার থেকে 'ছেলে-পিলে')

'পিলে, জ্বর, শর্দী, কাশী—'

(মন্তব্য ঃ তার থেকে যাবতীয় তীর্থ !—)

'কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, গয়া, পুরী—'

'পুরী, সন্দেশ, রসগোল্লা, মিহিদানা, বোঁদে, খাজা, লেডিকিনি—'

ব্যাস ! পুরী তো খাদ্য, এবং ভালো খাদ্য। অতএব তার এসোসিয়েশনে বাদবাকি উত্তম উত্তম আহারাদি ! পেঁছে গেল মোকামে !

এই এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ থেকে গল্পের খেই ধরে নেওয়া যায়।

ইহুদির কথা যখন উঠেছে তখন ইহুদীর কঞ্জুসী, স্কটম্যানের কঞ্জুসী তাবৎ কঞ্জুসীর গল্প আরম্ভ করে দিতে পারেন।

এগুলোকে আবার সাইক্লও বলা হয়। এটা হল কঞ্জুসীর সাইক্ল—অর্থাৎ দুনিয়ার যত রকম হাড়কিপটেমির গল্প এই সাইক্লে ঢুকে যাবে। ঠিক সেই রকম আরো গণ্ডায় গণ্ডায় সাইক্ল আছে। স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর উপর অত্যাচার, স্ত্রীকে লুকিয়ে পরস্ত্রীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি, ট্রেন লেটের সাইক্ল, ডেলি পেসেঞ্জারের সাইক্ল, চালাকির সাইক্ল—

চালাকির সাইক্ল এ দেশে গোপালভাঁড় সাইক্লই বলা হয়। অর্থাৎ চালাকির যে কোনো গল্প আপনি গোপালের নামে চালিয়ে যেতে পারেন, কেউ কিছু বলবে না। ইংরেজীতে এটাকে 'র‍্যাঙ্কেট' 'অমনিবাস' গল্পগুষ্টিও বলা চলে।

গোপালের অপজিট নাম্বার অর্থাৎ তাঁরই মত চালাক ছোকরা প্রায় সব দেশেই আছে। প্রাচীন অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির রাজদরবারে ছিলেন মিকশ, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর অধিকাংশ গল্পই সমাজে কল্কে পায় না, ভিয়েনার ভাষায় গেজেলশাফ্‌টফেইষ নয় (সমাজে অচল)। সেদিক দিয়েও গোপালের সঙ্গে

তাঁর গলাগলি।

কিন্তু এ সংসারে বুদ্ধিমানের চেয়ে আহাম্মুখের সংখ্যাই বেশী, তাই আহাম্মুখীর সাইক্লই পাবেন দুনিয়ার সর্বত্র। অধুনা কেন্দ্রের এক প্রাক্তন মন্ত্রীকে কেন্দ্র করে একটি বিরাট সাইক্ল তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে। এঁর জুড়ি ভিয়েনাতে গ্রাফ ফন্ ববে, পশ্চিম ভারতে শেখ চিল্লি (আমার ঠিক মনে নেই, তবে বোধ করি শ্রীযুক্তা সীতা শাস্তার হিন্দুস্থানী উপকথাতে এঁর গল্প আছে), এবং সুইটজারল্যাণ্ডে পল্‌ডি।

পল্‌ডির গল্প অফুরন্ত। আমি গত দশ বছর ধরে একখানা সুইস্ পত্রিকার গ্রাহক। প্রতি সপ্তাহে পল্‌ডি নিয়ে একটি ব্যঙ্গচিত্র থাকে। চলেছে তো চলেছে। এখনো তার শেষ নেই। কখনো যে হবে মনে হয় না।

কিছুমাত্র না ভেবে গোটা কয়েক বলি ঃ—

বন্ধু ঃ জানো পল্‌ডি অক্‌সিজেন ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। ১৭৭০-এ ওটা আবিষ্কৃত হয়।

পল্‌ডি ঃ তার আগে মানুষ বাঁচতো কি করে ?

কিংবা

পল্‌ডি ঃ (আমেরিকান টুরিস্টকে এক কাস্‌ল্ দেখিয়ে) ঐ ওখানে আমার জন্ম হয়। আপনার জন্ম হয় কোন্‌খানে ?

টুরিস্ট ঃ হাসপাতালে।

পল্‌ডি ঃ সর্বনাশ ! কি হয়েছিল আপনার ?

কিংবা

বাড়িউলী ঃ সে কি মিঃ পল্‌ডি ? দশ টাকার মণিঅর্ডার, আর আপনি দিলেন পাঁচ টাকা বক্‌শিশ !

পল্‌ডি ঃ হেঁ, হেঁ, ঐ তো বোঝো না আর কিপ্‌টেমি করো। ঘন ঘন আসবে যে !

কিংবা

পল্‌ডি ঘোড়ার রেসে গিয়ে শুধোচ্ছেন ঃ ঘোড়াগুলো এরকম পাগল পারা ছুটছে কেন ?

বন্ধু ঃ কি আশ্চর্য, পল্‌ডি তাও জানো না ! যেটা ফার্স্ট হবে সেটা প্রাইজ পাবে যে।

পল্‌ডি ঃ তা হলে অন্যগুলো ছুটছে কেন ?

এর থেকে আপনি রেসের গল্পের মাধ্যমে কুট্টি সাইক্লে অনায়াসে চলে যেতে পারেন। যেমন,

কুট্টি রেসে গিয়ে বেট্ করেছে এক অতি নিকৃষ্ট ঘোড়া। এসেছে সর্বশেষে। তার এক বন্ধু—আরেক কুট্টি—ঠাট্টা করে বললে, 'কি ঘোড়া (উচ্চারণ অবশ্য 'গোরা'—আমি বোঝার সুবিধের জন্য সেগুলো বাদ দিয়েই লিখছি) লাগাইলায় মিয়া ! আইলো সক্কলের পিছনে ?'

কুট্টি দমবার পাত্র নয়। বললে, 'কন্ কি কত্তা ! দ্যাখলেন না, যেন বাঘের

বাচ্চা—বেবাকগুলিরে খ্যাদাইয়া লইয়া গেল !'

কুট্টি সম্প্রদায়ের সঙ্গে পূব-পশ্চিম উভয় বাঙলার রসিকমণ্ডলীই একদা সুপরিচিত ছিলেন। নবীনদের জানাই, এরা ঢাকা শহরের খানদানী গাড়োয়ান-গোষ্ঠী। মোগল সৈন্যবাহিনীর শেষ ঘোড়সওয়ার বা ক্যাভালরি। রিক্‌শার অভিসম্পাতে এরা অধুনা লুপ্তপ্রায়। বহুদেশ ভ্রমণ করার পর আমি নির্ভয়ে বলতে পারি, অশিক্ষিত জনের ভিতর এদের মত witty (হাজির-জবাব এবং সুরসিক বাক্‌-চতুর) নাগরিক আমি হিল্লী-দিল্লী কলোন-বুলোন কোথাও দেখি নি।

এই নিন একটি ছোট ঘটনা। প্রথম পশ্চিম বাঙলার 'সংস্করণ'টি দিচ্ছি। এক পয়সার তেল কিনে ঘরে এনে বুড়ী দেখে তাতে একটা মরা মাছি। দোকানীকে গিয়ে অনুযোগ জানাতে সে বললে, 'এক পয়সার তেলে কি তুমি মরা হাতি আশা করেছিলে !' এর রাশান সংস্করণটি আরো একটু কাঁচা। এক কপেকের (প্রায় এক পয়সা) রুটি কিনে এনে ছিঁড়ে দেখে এক বুড়ী তাতে এক টুকরো ন্যাকড়া। দোকানীকে অনুযোগ করাতে সে বললে, 'এক কপেকের রুটির ভিতর কি তুমি আস্ত একখানা হীরের টুকরো আশা করেছিলে ?' এর ইংরিজী 'সংস্করণে' আছে, এক ইংরেজ রমণী এক শিলিঙে এক জোড়া মোজা কিনে এনে বাড়িতে দেখেন তাতে একটি ল্যাডার (অর্থাৎ মই—মোজার একটি টানা সুতো ছিঁড়ে গেলে পড়েনের সুতো একটার পর একটা যেন মইয়ের এক একটা ধাপ-কাঠির মত দেখায় বলে ওর নাম ল্যাডার)। দোকানীকে অনুযোগ জানাতে সে বললে, 'এক শিলিঙের মোজাতে কি আপনি, ম্যাডাম, একখানা রাজকীয় মার্বেল স্টেয়ারকেস্‌ আশা করেছিলেন !'

এবারে সর্বশেষ শুনুন কুট্টি সংস্করণ। সে একখানা ঝুরঝুরে বাড়ি ভাড়া দিয়েছে পুলিসের এসাইকে। বর্ষাকালে কুট্টিকে ডেকে নিয়ে তিনি দেখাচ্ছেন, এখানে জল ঝরছে, ওখানে জল পড়ছে—জল জল সর্বত্র জল পড়ছে। পুলিসের লোক বলে কুট্টি সাহস করে কোনো মন্তব্য বা টিপ্পনী কাটতে পারছে না যদিও প্রতি মুহূর্তেই মাথায় খেলছে বিস্তর। শেষটায় না থাকতে পেরে বেরবার সময় বললে, 'ভাড়া তো দ্যান্‌ কুল্লে পাঁচটি টাকা। পানি পড়বে না তো কি শরবৎ পড়বে ?'

কুট্টি সম্বন্ধে আমি দীর্ঘতর আলোচনা অন্যত্র করেছি—পাঠক সেটি পড়ে দেখতে পারেন। আমার শোক-পরিতাপের অন্ত নেই যে, এ সম্প্রদায় প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চললো। আমি জানি এদের উইট্‌, এদের রিপোর্ট লেখাতে ও ছাপাতে সঠিক প্রকাশ করা যায় না ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ-সম্প্রদায় সম্পূর্ণ লোপ পাওয়ার পূর্বে পূব বাঙলার কোনো দরদীজন যদি এদের গল্পগুলির একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন, তবে তিনি উভয় বাঙলার রসিকমণ্ডলীর ধন্যবাদার্হ হবেন।

* * *

পাঠক ভাববেন না, আমি মিষ্ট মিষ্ট গল্প বলার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা

করেছি। আদপেই না। তাহলে আমি অনেক উত্তম উত্তম গল্প পেশ করতুম। এখানে গল্পের সাইকল্‌ ও এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ, কিংবা বলতে পারেন এসোসিয়েশন অব স্টরিজ বোঝাবার জন্য যে সব গল্পের প্রয়োজন আমি তারই কাঁচা পাকা সব কিছু মিশিয়ে কয়েকটি গল্প নিবেদন করেছি মাত্র। (এবং সত্য বলতে কি, আসলে কোনো গল্পই কাঁচা কিংবা পাকা, নিরেস কিংবা সরেস নয়। মোকা-মাফিক জুৎসই করে যদি তাগ-মাফিক গল্প বলতে পারেন, তবে অত্যন্ত কাঁচা গল্পও শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তহরণ করতে সমর্থ হবে, পক্ষান্তরে তথাকথিত শ্রেষ্ঠ গল্পও যদি হঠাৎ বেমক্কা বলে বসেন, তবে রসিকমণ্ডলী বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকাবেন।)

গল্প বলার আর্ট, গল্প লেখার আর্টেরই মত বিধিদত্ত প্রতিভা ও সাধনা সহযোগে শিখতে হয়—এবং দুই আর্টই ভিন্ন। অতি সামান্য, সাধারণ গল্পও পূজনীয় স্বর্গত ক্ষিতিমোহন অতি সুন্দর রূপ দিয়ে প্রকাশ করতে পারতেন—অথচ তাঁর লেখা রচনায় সে-জিনিসের কোনো আভাসই পাবেন না; পক্ষান্তরে শ্রদ্ধেয় স্বর্গত রাজশেখরবাবু লিখে গিয়েছেন বিশ্বসাহিত্যের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ হাসির গল্প, অথচ তিনি বৈঠক-মজলিসে ছিলেন রাশভারী প্রকৃতির। গল্প-বলার সময় কেউ কেউ অভিনয় যোগ করে থাকেন। সুলেখক অবধূত এ বাবদে একটি পয়লা নম্বরী ওস্তাদ। যদি কখনো তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয় তবে চন্দননগর চুঁচড়ো অঞ্চলের বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক কি ভাবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন তার বর্ণনা দিতে বলবেন। কিন্তু এ প্রবন্ধের গোড়াতে যে সাবধান বাণী দিয়ে আরম্ভ করেছি, সেটি ভুলবেন না। বেমক্কা যখন তখন অনুরোধ করেছেন, কি মরেছেন। অবধূত তেড়ে আসবে। অবধূত কেন, রসিকজন মাত্রই তেড়ে আসে। এই তো সেদিন অবধূত বলছিল, 'জানেন, মাস কয়েক পূর্বে ১১০ ডিগ্রীর গরমে যখন ঘণ্টাতিনেক আইঢাই করার পর সবে চোখে অল্প একটু তন্দ্রা লেগে আসছে এমন সময় পাড়া সচকিত করে টেলিগ্রাফ পিয়ন ঢঙের সজোরে কড়া নাড়া। দরজা খুলতে দেখি দুই অচেনা ভদ্রলোক। কড়া-রদ্দুর, রাস্তার ধুলোমুলোয় জড়িয়ে চেহারা পর্যন্ত ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। কি ব্যাপার? 'আজ্ঞে, আদালতে শুনতে পেলুম, আমাদের মোকদ্দমা উঠতে এখনও ঘণ্টা-দুয়েক বাকি, তাই আপনার সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ করতে এলুম।' আমি অবধূতকে শুধোলুম, 'আপনি কি করলেন?' অবধূত উদাস নয়নে ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। আমি বেশি ঘাঁটালুম না। কারণ মনে পড়ে গেল, মোটামুটি ঐ সময়ে চুঁচড়োর জোড়াঘাটের কাছে, সদর রাস্তার উপর দুটো লাশ পাওয়া যায়। খুনী ফেরার। এখনো ব্যাপারটা হিল্যে হয় নি।

ভালো করে গল্প বলতে হলে আরো মেলা জিনিস শিখতে হয়—এবং সেগুলো শেখানো যায় না। আমি স্বয়ং তো আদৌ কোনো প্রকারের গল্প বলতে পারি নে। প্লট ভুলে যাই, কি দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম, কি দিয়ে শেষ করবো তার খেই হারিয়ে ফেলি, গল্প আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই খিল খিল করে হাসতে আরম্ভ করি, 'ঐ যা, কি বলছিলুম' প্রতি দু' সেকেণ্ড অন্তর অন্তর

আসে, ইতিমধ্যে কেউ হাই তুললে তাকে তেড়ে যাই, শেষটায় সভাস্থ কেউ দয়া-পরবশ হয়ে গল্পটা শেষ করে দেন—কারণ যে গল্পটি আমি আরম্ভ করেছিলুম সেটি মজলিসে ইতিপূর্বে, আমারই মুখে, ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাবে অন্তত পঞ্চাশ-বার শুনে, জোড়া-তাড়া দিয়ে খাড়া করতে পেরেছে। তদুপরি আমার জিভে ক্লনিক বাত, আমি তোৎলা এবং সামনের দুপাটিতে আটটি দাঁত নেই।

তাহলে শুধোবেন, তবে তুমি এ প্রবন্ধ লিখছ কেন? উত্তর অতি সরল। ফেল করা স্টুডেন্ট ভালো প্রাইভেট ট্যুটর হয়। আমি গল্প বলার আর্টটা শেখার বিস্তর কস্ত করে ফেল মেরেছি বলে এখন এর ট্যুটরি লাইনে আমিই সম্রাট।

* * *

কিন্তু এ আর্ট এখন মৃতপ্রায়; কারণটা বুঝিয়ে বলি।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, গল্পের কাঁচা পাকা কিছুই নেই, মোকা-মাফিক বলতে পারা, এবং বলার ধরনের উপর ঐ জিনিস সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

এ তত্ত্বটি সব চেয়ে ভালো করে জানেন, বিশ্ব-গল্পকথক সম্প্রদায় (ওয়ার্ল্ড স্টরি-টেলারস্ ফেডারেশন)। মার্কিন মুল্লুকে প্রতি বৎসর এঁদের অধিবেশন হয় এবং পৃথিবীর সর্বকোণ থেকে ডাঙর ডাঙর সদস্যরা সেখানে জমায়েত হন। এঁরা বিলক্ষণ জানেন, গল্প মোকা-মাফিক এবং কায়দা-মাফিক বলতে হয়। চীনের ম্যান্ডারিন সদস্য যে গল্পটি বলতে যাচ্ছেন সেটি হয়তো সব চেয়ে ভালো বলতে পারেন বঙ্গো-ইন-কঙ্গোর লুসাবুবু। ওদিকে পৃথিবীর তাবৎ সরেস গল্পই এঁরা জানেন। কি হবে, চীনার কাঁচা ভাষায় পাকা দাড়িওয়ালা ঐ গল্প তিনশ তেষট্টি বারের মত শুনে। অতএব এঁরা একজোটে বসে পৃথিবীর সব কটি সুন্দর সুন্দর গল্প জড়ো করে তাতে নম্বর বসিয়ে দিয়েছেন। যেমন মনে করুন, কুট্টির সেই পানি পড়ার বদলে শরবৎ পড়ার গল্পটার নম্বর ১৯৮।

এখন সে অধিবেশনে গল্প বলার পরিস্থিতিটা কি রূপ?

যেমন মনে করুন, কথার কথা বলছি, সদস্যরা অধিবেশনের গুরু গুরু কর্মভার সমাধান করে ব্যানকুয়েট খেতে বসেছেন। 'ব্যানকুয়েট' বললুম বটে, আসলে অতি সস্তা লাঞ্চ—'লাঞ্চনা'ও বলতে পারেন, একদম দা'ঠাকুরের পাইস হোটেল মেলের। এক মেম্বর ডালে পেলেন মরা মাছি। অমনি তাঁর মনে পড়ে গেল, সেই বুড়ীর এক পয়সার তেলে মরা মাছি, কিংবা 'পানি না পড়ে শরবৎ পড়বে নাকি' গল্প। তিনি তখন গল্পটি না বলে শুধু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন নম্বর '১৯৮'!

সঙ্গে সঙ্গেই হো হো অট্টহাস্য। একজন হাসতে হাসতে কাৎ হয়ে পাশের জনের পাঁজরে খোঁচা দিয়ে বার বার বলছেন, 'শুনলে? শুনলে? কি রকম একখানা খাসগল্প ছাড়লে!' আরেকজনের পেটে খিল ধরে গিয়েছে—তাকে মাসাজ করতে শুরু করেছেন আরেক সদস্য।

* * *

অতএব নিবেদন, এ সব গল্প শিখে আর লাভ কি? এদেশেও কালে বিশ্ব-গল্পকথক-সম্প্রদায়ের ব্রাঞ্চ-আপিস বসবে, সব গল্পের কপালে কপালে নম্বর

পড়বে, আপনি আমি কোনো-কিছু বলার পূর্বেই কেউ না কেউ নম্বর হেঁকে যাবে। তারপর নীলাম। ৯৮ নম্বর বলতে না বলতেই এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজে কারো মনে পড়ে যাবে অন্য গল্প তিনি হাঁকবেন ২৭২। তারপর ৩১৮—আর সঙ্গে সঙ্গে হাসির হররা, রগড়ের গড়িয়াহাট—আপনি আমি তখন কোথায় ?

হ্যাঁ, অবশ্য, যতদিন না ব্রাঞ্চ-আপিস কায়েম হয় ততদিন অবশ্য এইসব টুটা-ফুটা গল্প দিয়ে ত্রি-লেগেড রেস রান করতে পারেন। কিংবা দুষ্ট ছেলেকে শাসন করার জন্য গুরুমশাই যে রকম বলতেন, 'যতক্ষণ বেত না আসে ততক্ষণ কানমলা চলুক।'

বাই দি উয়ে—এ গল্পটাও কাজে লাগে। নেমন্তন্ন বাড়িতে চপ কাটলেট না আসা পর্যন্ত লুচি ছোলার ডাল খেতে খেতে বলতে পারেন, 'যতক্ষণ বেত না আসে ততক্ষণ কানমলা চলুক।'

শের্শে লা ফাম্

(Cherchez la femme)

খুন, রাহাজানি, চুরি, ডাকাতি যাই হোক না কেন, এক ফরাসী হাকিম বিচারের সময় অসহিষ্ণু হয়ে বার বার শুধোতেন, 'মেয়েটা কোথায় ? শের্শে লা ফাম্—মেয়েটাকে খোঁজো !' তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, দুনিয়ার কুল্লে খুন-খারাবীর পিছনে কোনো না কোনো রমণী ঘাপটি মেরে বসে আছে। আসামী, ফরিয়াদী, সাক্ষী, কোনো না কোনো রূপে তাকে আদালতে সশরীরে উপস্থিত (হাবেয়াস কর্পুস) না করা পর্যন্ত মোকদ্দমার কোনো সুরাহা হবে না। অতএব শের্শে লা ফাম্—মেয়েটাকে খোঁজো ! একবার ইনশিওরেন্স মোকদ্দমা ছিল কোনো চিমনি-পরিদর্শককে নিয়ে। একশ ফুট উঁচু থেকে সে পড়ে যায়। তার খেসারতি মঞ্জুর হয়ে গেলে উকিল শুধালেন, 'কই, হুজুর, এ মোকদ্দমায় আপনার শের্শে লা ফাম্ তো খাটলো না ?' হুজুর দমবার পাত্র নয়। সোল্লাসে বললেন, 'খোঁজো, খোঁজো, পাবে।' হবি তো হ—তাই ! তালাশীতে বেরল, সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় সে হঠাৎ নিচের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছিল এক সুন্দরী রমণীর দিকে—পড়ে মরল পা হড়কে !

* * *

আকাশবাণী সম্বন্ধে নানাপ্রকারের ফরিয়াদ প্রায়ই শোনা যায়। আল্লার দুনিয়া সম্বন্ধেই যখন হামেহাল নালিশ লেগেই আছে তখন এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

গুণীজ্ঞানীরা বলেন, প্রাচ্যের মানুষ অন্তর্মুখী—প্রতীচ্যের বহির্মুখী। এত বড় তত্ত্বকথার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো কথা বলার হক্ক আমার নেই। তবে একটা জিনিস আমি স্বচক্ষে লক্ষ্য করেছি—গরমের দেশের লোক বারান্দা রক

তেঁতুলতলায় দিন কাটায় আর পশ্চিমের লোক বাড়ির ভিতর।

আমরা আপিস-আদালত কলেজ-কারখানা থেকে বেরিয়েই একটুখানি হাওয়া খেয়ে গা-টা জুড়িয়ে নিতে চাই। 'ঈভনিং ওয়ক' 'মর্নিং ওয়ক' সমাস-গুলো ইংরিজী ভাষাতে সত্যই চালু আছে কিনা, কিংবা ইংরেজ এদেশে এসে নির্মাণ করেছে, জানি নে, কিন্তু ও দুটোর রেওয়াজ শীতের দেশে যে বেশী নেই সে-কথা বিলক্ষণ জানি। আমরা তাই ময়দানে, গঙ্গার পারে হাওয়া-টাওয়া খেয়ে বাড়ি ফিরি। নিতান্ত শীতকালের কয়েকটি দিন ছাড়া কখনো ঘরের ভিতর ঢুকতে চাই নে। রকে বসে রাস্তায় লোকজনের আনাগোনা দেখি। পক্ষান্তরে শীতের দেশের লোক ছুটি পাওয়া মাত্রই ছুট দেয় বাড়ির দিকে। আপিসে-দপ্তরে আগুনের ব্যবস্থা উত্তম নয়—ওদিকে গৃহিণী বসবার ঘরে গনগনে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছেন। পড়িমরি হয়ে বাড়ি পেঁছেই সে পা দুটি আগুনের দিকে বাড়িয়ে বসে যায় আরাম চেয়ারে, খুলে দেয় রেডিয়ো। আমাদের রকে রেডিয়ো থাকে না, বৈঠকখানাতেও কমই—কারণ বাড়ির মেয়ে-ছেলেরা ওটা নিয়ে হরবকতই নাড়াচাড়া করে। তাই ওটা থাকে অন্দরমহলেই।

আমাদের যাত্রাগান, কবির লড়াই সবই খোলামেলায়। এ যুগের প্রধান আমোদ ফুটবল ও ক্রিকেট খেলাতে। নিতান্ত সিনেমাটা ঘরের ভিতর। কিন্তু সিনেমাও চেষ্টা করে সেটা ভুলিয়ে দিতে। ঘড়ি ঘড়ি মাঠ-ময়দান, নদীপুকুর, পাহাড়-সমুদ্র দেখায় বলে খানিকক্ষণ পরেই ভুলে যাই যে ঘরের ভিতর বন্ধ রয়েছি। তবু পাছে অন্য কোনো খোলামেলার আমোদের সন্ধান পেয়ে আমরা পালিয়ে যাই তাই সিনেমাওলারা ওটাকে এ্যারকণ্ডিশন করে মাঠ-রক-বৈঠক-খানার চেয়েও আরামদায়ক করে রাখে। কারণ ইয়োরোপে যে মুহূর্তে ঘরে বসে টেলিভিশনের সাহায্যে সিনেমায় আনন্দ পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে গাহকের অভাবে আট থেকে দশ আনা পরিমাণ সিনেমা উঠে গেল।

আমাদের দেশের মেয়েরা হুট্ করে রাস্তায় বেরতে পারে না, সিনেমা চায়ের দোকানে যেতে পারে না, তাই রেড়িয়োটা ওদের কাছে এক বিধিদত্ত সওগাত। কর্তা-বাচ্চারা আপিস ইস্কুল চলে যাওয়ার পর তাঁরা নেয়ে খেয়ে চুল ঝুলিয়ে দিয়ে মুচড়ে দেন রেডিয়োর কানটা পাশের বাড়ির রেডিয়োটা যে গাঁক্‌গাঁক্ করে আপনার বিরক্তির উৎপাদন করে তার প্রধান কারণ ও-বাড়ির বৌমা এ-ঘর ও-ঘরে যেখানেই কাজ করুন না কেন সেটা যাতে করে সর্বত্রই শুনতে পান তার জন্য ওটাকে চড়া সুরে বেঁধে রেখেছেন।—মহিলা-মহল তো আছেই, তারপর সিংহল বেতারের বিস্তর ফিল্মী-গানা যেগুলো বউমা, দিদিমণি সিনেমাতে একবার শুনেছিলেন, এখন বার বার শুনে শুনে কণ্ঠস্থ করতে চান।

পুরুষরা এদেশে যদিও বা বেতার শোনে তবে সেটা খেয়েদেয়ে খবরটা শোনার জন্যে। এবং তার পরই আকাশবাণী আরম্ভ করে দেয় উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় কালোয়াতী সঙ্গীত। ওসবে কার, মশাই, ইনট্রেস্ট? কিংবা হয়তো তখন ইংরিজীতে টক শুনলেন, মন্ত্রী মশাই বক্তৃতা দিচ্ছেন, জাপানের ড্রাই-ফার্মিং কিংবা জান্‌জিবারের কোপারেটিভ সিস্টেম সম্বন্ধে।

মেয়েরাই যে আকাশবাণীর—অন্তত কলকাতা কেন্দ্রের—মালিক সে কথা যদি বিশ্বাস করতে রাজী না হন তবে আমি আর একটি মোক্ষম প্রমাণ কাগজে কলমে পেশ করতে পারি।

'বেতার-জগৎ' পাক্ষিক পত্রিকাখানির বিজ্ঞাপনগুলো মন দিয়ে পড়লে দেখতে পাবেন তাতে আছে, গয়না, প্রসাধন দ্রব্য, ভেজিটেবল ওয়েল, শাড়ি, কাপড়কাচা সাবান। টাইয়ের বিজ্ঞাপন একটি আছে—সেখানে এক তরুণী টাইটি পরিয়ে দিচ্ছেন তাঁর প্রিয়জনকে, অর্থাৎ বিজ্ঞাপনটি মেয়েদের জন্যই। কিন্তু সব চেয়ে মারাত্মক কথা – বইয়ের বিজ্ঞাপন প্রায় নেই। এবং এই 'দেশ' পত্রিকাতে সেই জিনিসেরই ছয়লাপ। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, 'বেতার জগৎ' মেয়েদের কাগজ, আর 'দেশ' প্রধানত পুরুষের কাগজ।

ইয়োরোপের উচ্চতম শিক্ষিত লোকেরা বেতার শোনেন এবং তাঁদেরই চাপে বিবিসিকে একটি 'হাইব্রাও'—উন্নাসিক—থার্ড প্রোগ্রাম আরম্ভ করতে হল। কলকাতা আকাশবাণীর সব চেয়ে পপুলার প্রোগ্রাম—ড্রামা। সে সময় বেতার-যন্ত্রের চতুর্দিকে কারা ভিড় জমায় পাঠক সেটি লক্ষ্য করে দেখবেন। আমার নিজের ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস 'আকাশবাণী কলকাতা' যদি প্রতিদিন এক ঘণ্টা ব্যাপী ড্রামা চালায় (এবং তাতে যথা পরিমিত রোদন, আক্রোশ, হুঙ্কার এবং ন্যাকামি থাকে) তবে লাইসেন্সের সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে।

এটা আমি কিছু মস্করা করে বলছি নে। আমার মূল বক্তব্য এই, যখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মেয়েরা কলকাতার রেডিয়ো-কেন্দ্র দখল করে নিয়েছেন (এবং তাঁরা মোটামুটি সন্তুষ্টই আছেন, কারণ খবরের কাগজে কোনো নিন্দাসূচক চিঠি তাঁদের তরফ থেকে আমি বড় একটা দেখি নি) আর পুরুষরা ঐ জিনিসটে অবহেলা করে যাচ্ছেন (যাঁরা ওস্তাদী গাওনা গান, তাঁদের চেলাচামুণ্ডা এবং শ্রোতৃসংখ্যা এতই কম যে 'অনুরোধের আসরে' ওস্তাদী গান গাইবার অনুরোধ আসে অতিশয়, সাতিশয়, কালেকস্মিনে) তখন কেন বৃথা হাবি-জাবি নানা প্রোগ্রাম দিয়ে 'রুচি মার্জিত করা,' অর্ধলুপ্ত ধামার ধ্রুপদ পুনর্জীবিত করার চেষ্টা, স্বরাজ লাভের পর জেলে কত গ্রেন কুইনিন দেওয়ার ফলে কত পার্সেণ্ট ম্যালেরিয়া রুগী কমলো সেইটি সাড়ম্বরে শোনানো, ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান্—কমুনিটি প্রজেক্ট ড্রাইফার্মিং ইন জনজিবার (কিংবা জাপানও হতে পারে, আমার মনে নেই) শোনানো ?

তাই বলে কি কলকাতা বেতার কেন্দ্র শুধু রান্নার রেসিপি আর স্যাংসেতে নাটক শোনাবে ? আদপেই না। এবং সেইটে নিবেদন করার জন্যই আমি এতক্ষণ অবতরণিকা করছিলুম।

এদেশের মেয়েরা শিক্ষায় পুরুষদের বেমানানসই পিছনে। সাহিত্য সঙ্গীত নাট্যে তাঁদের রুচি সম্বন্ধে অনেকেই অনেক রকম অপ্রিয় মন্তব্য করে থাকেন—এমন কি মেয়েরাও। কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করবো না—মেয়েরা আত্মোন্নতি চায় না।

তাই আমার বক্তব্য, ঐ 'মহিলা মহল' ব্যাপারটি ব্যাপকতর করুন। বেলাদি

ইন্দিরাদি উত্তম ব্রডকাস্টার, কিন্তু প্ল্যান করুন, কি করে দেশের সব চেয়ে গুণী-জ্ঞানীকে—স্ত্রী এবং পুরুষ দুইই—এ কাজে লাগানো যায়। অবকাশরঞ্জন আনন্দদানকে আস্তে আস্তে উচ্চতর পর্যায়ে তোলা, শিক্ষার প্রসার, সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ, বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচয় দান—ইত্যাদি তাবৎ ব্যাপার, অনেকখানি—সময় নিয়ে—এমন কি বেতারের বারো আনা সময় নিয়ে—ধীরে ধীরে উচ্চতর পর্যায়ে তুলুন, এবং সর্বক্ষণ ঐ মেয়েদের চোখের সামনে রেখে। পাঠক এবং শ্রোতা যোগাড় করা বড় কঠিন। এস্থলে যখন পেয়ে গেছেন তখন এই বেতারের মাধ্যমে দিন না একটা আপ্রাণ চেষ্টা এঁদের আরো আনন্দ দিতে—এঁদের নারীত্ব মনুষ্যত্ব সফলতর পূর্ণতম করতে। জাপানী চাষ শুনিয়ে পুরুষকে তো পাচ্ছেনই না, শেষটায় মেয়েদের হারাবেন। ইতো ভ্রষ্ট ততো নষ্ট।

পুরুষদের জন্য অন্য একটা চ্যানেল (ওয়েভ লেনথ্) নিয়ে নূতন একটা চেষ্টা দিতে পারেন। ফল অবশ্য কিছু হবে না। কারণটা গোড়াতেই নিবেদন করেছি।

লেডি চ্যাটারলি

নিমিত্ত মাত্র। আসলে প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে, সাহিত্যে শ্লীল অশ্লীলে কি কোনো পার্থক্য নেই? যদি থাকে তবে তার বিভাগ করবো কোন্ সংজ্ঞা দিয়ে? আর যদি করা যায় তবে পুলিসের সাহায্য নিয়ে অশ্লীল জিনিস বন্ধ করবো, না অন্য কোনো পন্থা আছে?

এ প্রশ্ন আজ এই প্রথম ওঠে নি সেকথা সবাই জানেন, এবং এ কথাও নিশ্চয়ই জানি যে, এ প্রশ্নের চূড়ান্ত সমাধান কোনো দিনই হবে না—যতদিন না মানুষ গল্প লিখবে, ছবি আঁকবে, একে অন্যের সঙ্গে কথা কইবে, এমন কি অঙ্গভঙ্গী করবে (অধুনা কলকাতার এক বিখ্যাত হোটেলে কোনো নর্তকীর নৃত্য দেখে পুলিস বলে, এগুলো অশ্লীল, নর্তকী ও ম্যানেজার বলেন, ওগুলো উচ্চাঙ্গের নৃত্যকলা, আদালত বলেন, মহিলাটির নৃত্যের পিছনে বহু বৎসরের একনিষ্ঠ কঠোর সাধনা রয়েছে এবং সে নৃত্য কলাসৃষ্টি)।

লেডি চ্যাটারলি খালাস পেলে পর বিলেতে এ নিয়ে প্রচুর তোলপাড় হয়—অবশ্য স্মরণ রাখা ভালো যে, মার্কিন আদালতে লেডি চ্যাটারলির লয়ার ('লাভার' না লিখে আমেরিকা 'লয়ার'—'উকিল' লিখেছিল) পূর্বেই জিতে গিয়েছিলেন, এবং গত ত্রিশ বৎসর বইখানা কণ্টিনেন্টের সর্বত্রই ইংরিজীতেও অনুবাদে পাওয়া যেত। আরো মনে রাখা ভালো যে, এসব বাবদে ইংরেজ সব চেয়ে পদী পিসি মার্কা, অর্থাৎ গোঁড়া। একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। লেঁও ব্লুম্ যখন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী তখন তিনি একখানা বই বের করেন, নাম 'মারিয়াজ'—বিবাহ। ভূদেববাবুর 'পারিবারিক প্রবন্ধ' গোছের বই—যদিও

রুমের মূল বক্তব্য ভূদেববাবুর ঠিক উল্টো। নানা কথার ভিতর তাঁর অন্যতম মূল বক্তব্য ছিল, যুবক-যুবতীরা বিয়ের পূর্বে পরিপূর্ণ যৌন অভিজ্ঞতা করে নিয়ে বিয়ে করলেই ভালো—তা হলে একে অন্যকে বোঝার সুবিধে হয়, বিবাহবিচ্ছেদের আশংকা কমে যায় (!)। ইংরেজ সমালোচক তখন বলেছিলেন যে, ইংলণ্ডের কোনো প্রধানমন্ত্রী যদি আপন নামে এরকম একখানা বই প্রকাশ করতেন তবে পরের দিনই তাঁকে মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিতে হত।

তাই চ্যাটারলি জিতে যাওয়ার পর একাধিক প্রাচীনপন্থী বললেন,

(১) এ বইয়ে যে 'নৈতিক আদর্শ' প্রচারিত হয়েছে সেটা ইংরেজের যুগ যুগ সঞ্চিত নৈতিক ঐতিহ্যকে চ্যালেঞ্জ করেছে ও লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ নরনারী এতে করে মর্মাহত হবেন।

(২) এ বইয়ের অনুকরণে যদি বিলাতের যুবক-যুবতীরা তাদের যৌন আদর্শ নির্মাণ করে তবে দেশের সর্বনাশ হবে।

(৩) এ বই আইনে জিতে যাওয়ায় এর অনুকরণে—লাই পেয়ে—অশ্লীল তর ও জঘন্যতর বই বাজার ছেয়ে ফেলবে।

(৪) এই বই জিতে যাওয়ায় সাহিত্যিক তথা সাধারণ নাগরিক আইন-রাজ্যে অনেকখানি এগিয়ে গেল বটে, কিন্তু নীতির রাজ্যে সে পিছিয়ে গেল। দা-কাটা বাঙলায় ;—আইনের জয়, ধর্মের পরাজয়।

নবীনরা বললেন,

(১) স্ত্রী-পুরুষের যে সম্পর্ক গোঁড়া ইংলণ্ড বড় জোর বরদাস্ত করে নিত, লরেন্স যার সত্য মূল্য দেখিয়ে (কোনো কোনো সমালোচক 'স্পিরিচুয়াল' পর্যন্ত বলেছেন) সমাজের অশেষ কল্যাণ করেছেন তারই জয় হয়েছে।

(২) বাজারে যখন ভূরি ভূরি অশ্লীল, পাপ, পৈশাচিক উত্তেজনাদায়ক বই অবাধে বিক্রি হচ্ছে তখন লরেন্সের এই উত্তম সাহিত্য নির্বাসিত করা শুধু যে আহাম্মুকী তা নয়, অন্যায়ও বটে।

(৩) শক্তিশালী সত্যোন্মোচনকারী লেখকদের এখন আর পুলিসের ভয়ে বিশেষ বিশেষ বিষয় বর্জন করতে হবে না।

(৪) অশ্লীল কদর্য পুস্তক কামকে কর্দমের স্তরে টেনে নামিয়ে আনে। লরেন্সের বই তাকে সম্মানের উচ্চাসনে বসিয়েছে।

সংস্কৃত অলংকারে শ্লীল অশ্লীল নিয়ে কিছুটা আলোচনা আছে। কিন্তু আইন করে কোনো বই বন্ধ করে দেবার প্রস্তাব কেউ করেছেন বলে শুনি নি। হয়তো তার প্রধান কারণ এই যে, বুদ্ধের আমলেই সংস্কৃত সাধারণ জনের পক্ষে কঠিন ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে ; সে ভাষা আয়ত্ত করতে করতে মানুষের এতখানি বয়েস হয়ে যেত যে, তখন কি পড়ছে না পড়ছে তার দায়িত্ব তারই হাতে ছেড়ে দেওয়া যেত।

কিন্তু আরবীতে লেখা আরব্যোপন্যাস ? সে তো অল্প আরবী শেখার পরেই পড়া যায়। বাজারে যে আরব্যরজনী ইংরিজী বা বাঙলাতে পাওয়া যায় সেগুলোর কথা হচ্ছে না ; তথাকথিত 'আপত্তিজনক' অংশগুলো সেগুলোতে

নির্মমভাবে কেটে দেওয়া হয়। বারো না আট ভল্যুমে বার্টনের যে ইংরিজী অনুবাদ আছে তাতেও তিনি হিমসিম খেয়ে 'আনট্রেন্স্লেটেবল' বলে বেশ কিছু বাদ দিয়েছেন। এমন কি বাইবলতে ক্যাথলিক পাদ্রীদের দ্বারা প্রকাশিত আরবী আরব্যরজনীতেও বিস্তর জিনিস বাদ পড়েছে। এবং আরবভূমিতে ছেলেবুড়ো সবাই পড়ে সেই সম্পূর্ণ সংস্করণ—কেউ কিছু বলে না।

ফার্সীতে লেখা জালালউদ্দীন রুমীর মস্নবী গ্রন্থের উল্লেখ করতে পেলে আমি বড় আনন্দ বোধ করি। এ বই ইরানের গীতা এবং এতে হেন পাপাচার নাই যার বিশদ বিবরণ নেওয়া হয় নি। ইংরিজীতে অনুবাদ করার সময় অনুবাদক সেসব অংশ লাতিনে অনুবাদ করেছেন। (সংস্কৃত শিখতে শিখতে মানুষ যে রকম হয়ে যায় এবং ধরে নেওয়া হয় তার শাস্ত্রাধিকার হয়েছে—লাতিনের বেলাও তাই।) অথচ ইরান ভূমিতে আট বছরের ছেলেও যদি মস্নবী নিয়ে বসে, পিতা এবং গুরু তাতে আনন্দিত হন।

বাংলা গদ্য আরম্ভ হয় 'পরিষ্কার হাত' নিয়ে এবং উনিশ শতকের শেষের দিকে দেখতে পাই, ভারতচন্দ্র অশ্লীল আখ্যা পাচ্ছেন। ভিক্টোরিয় যুগের ছুঁৎবাই তখন আমাদের পেয়ে বসেছে। এরই মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ 'চৌর-পঞ্চাশিকা' গীতিকাব্যের উদ্দেশে গেয়ে উঠলেন,

'ওগো সুন্দর চোর
বিদ্যা তোমার কোন্ সন্ধ্যার
কনক-চাঁপার ডোর।' (১৩০৪ সন) কল্পনা।

ভারতচন্দ্র 'বিদ্যাসুন্দর' রচেছেন এই চৌরপঞ্চাশিকার প্লট নিয়েই এবং এ কাব্যের বাংলা অনুবাদও করেছেন। এরকম অনবদ্য খণ্ডকাব্য সংস্কৃত সাহিত্য বিরল।

শ্লীল অশ্লীলে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে। সৎসঙ্গ অসৎসঙ্গে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে। এমন কি কাব্য অশ্লীল না হয়েও অনুচিত হতে পারে। অনেকে মনে করেন, স্বয়ং কালিদাস এ পার্থক্য জানতেন না। কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গ সম্বন্ধে কবিরাজ রাজেন্দ্রভূষণ বলেছেন, 'জগন্মাতা ও জগৎপিতার এই সম্ভোগ একটা বিরাট ব্যাপার হইলেও, পড়িতে লজ্জা জন্মে। তাই আলঙ্কারিকগণ এই অষ্টম সর্গের উপর "অত্যন্তমনুচিতম্" বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। তবে চিত্রের জন্য যেমন চিত্র দেখা, তেমনই এই হরপার্বতীর বিহার পাঠ, ইহাতে দেখিবার ও শিখিবার বস্তু প্রচুর। কবির এই আলেখ্য দেখিয়া চমকাইলে, মহামায়ার "বিপরীতরতাতুরাম্" এই ধ্যানাংশেরও পরিহাস করিতে হয় এবং আদিকবি বাল্মীকি-কৃত গঙ্গাস্তবের "তুঙ্গস্তনাস্ফালিতম্" প্রভৃতি অংশ বাদ দিতে হয়। কাব্য কাব্য, তাহা উপনিষদের চক্ষে দেখিতে যাঁহারা চান বা দেখেন, তাঁহাদের উহা না পড়াই ভালো।'*

* পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, কালিদাসের গ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ, বসুমতী, পৃঃ ১৫৫ পাদটীকা।

কালিদাসের তুলনায় বামন লরেন্স্ নাকি কামকে স্বর্গীয় (স্পিরিচুয়াল) স্তরে তুলতে চেয়েছিলেন ! তা তিনি চেয়েছিলেন কিনা, পেরেছিলেন কিনা সে কথা আমি জানি না,—তবে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস, কালিদাস চেয়েছিলেন এবং তাই জগন্মাতা ও জগৎপিতার দাম্পত্যপ্রেম বর্ণনা করেছিলেন। কারণ কামকে যদি সত্যই পূতপবিত্র করতে হয়, তবে সর্ব দেশকালপাত্রে পূজ্য পিতামাতা এবং তাঁদেরও পূজ্য জগন্মাতা ও জগৎপিতার দাম্পত্য প্রেমের চেয়েও উচ্চতর লোক তো আর কোথাও নেই।

স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, কোনো কোনো আলংকারিকের মতে তিনি সক্ষম হন নি, কারণ তাঁরা বলেছেন, কালিদাস 'অত্যন্ত অনুচিত' কর্ম করেছেন। পড়ার সময় 'লজ্জাবোধ' সত্ত্বেও বিদ্যাভূষণ কিন্তু তাঁর নিন্দা করেন নি। পড়ার সময় আমার সংকোচ বোধ হয় নি, কারণ প্রতি ছত্রে আমি পতীক্ষায় ছিলাম, কালিদাস আমাকে তাঁর অতুলনীয় কাব্যসৃষ্টি প্রসাদাৎ সর্বশেষে আমাকে এমন দ্যোলোকে উত্তীয়মান করে দেবেন যেখানে কামের পার্থিব মলিনতার কথা আমার স্মরণেই থাকবে না। হয়তো আমি অক্ষম, কিংবা কালিদাসের সে শক্তি ছিল না। ব্যাসের যে সে শক্তি ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কাম সম্বন্ধে ব্যাসের মনে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না বলে তিনি নির্লিপ্ত ভাবে তার বর্ণনা দিয়েছেন।

রচনা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। সংক্ষেপে নিবেদন,

ইয়োরোপের অনুকরণে যদি আমরা অত্যধিক শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে কামকে সাহিত্য থেকে তাড়িয়ে দিই তবে নিছক নির্জলা অশ্লীল রচনা উত্তরোত্তর বেড়েই যাবে। আর্টের কাজ তাকে আর পাঁচটা বিষয়বস্তুর মত আপন কাব্যলোকে রসস্বরূপে প্রকাশ করা। কালিদাস করেছেন, চণ্ডীদাস কবি করেছেন, বিদ্যাপতি ভারতচন্দ্র করেছেন।

অশ্লীল সাহিত্য তাড়াবার জন্য পুলিস সেন্সর বোর্ড বিশেষ কিছু করতে পারবে না। মার্কিন মুল্লুকে তারা আপন হার মেনে নিয়েছে। বিশেষত সাহিত্যিকরাই যখন শ্লীল অশ্লীলে ঠিক কোথায় পার্থক্য সে জিনিসটা সংজ্ঞা এবং বর্ণনা দিয়ে ভালো করে বুঝিয়ে বলতে পারেন নি।

সংস্কৃত আরবী ফার্সীতে নিছক অশ্লীল রচনা অতি অল্প। তার কারণ গুণীজ্ঞানীর রুচিবোধ ও সাধারণ জনের শুভবুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান-বোধ (কমন সেন্স)। নির্ভর করতে হবে প্রধানত এই দুটি জিনিসের উপর।

পাঠক হয়তো শুধোবেন, চ্যাটারলি বইখানা আমি পড়েছি কিনা? পড়েছি। যৌবনে প্যারিসে কাফেতে বসে পড়েছি। ভালো লাগে নি। লরেন্স্ যা প্রমাণ করতে চেয়েছেন সে অতি সাধারণ জিনিস। এবং ঐ অতি সাধারণ স্বতঃসিদ্ধ জিনিস প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি দেগেছেন বিরাট বিরাট কামান। এবং কামানগুলো পরিষ্কার নয়।

ছুঁসিয়ার

আমরা মফঃস্বলের লোক। কলকাতা শহরে কি হয়, না হয়, আমাদের পক্ষে খবর রাখা সম্ভবপর নয়। বয়েসও হয়েছে; ছেলেছোকরাদের মতিগতি, কর্ম-কারবারের সঠিক খবরও কানে এসে পেঁছোয় না।

মাস কয়েক পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তানে বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানকার এক কাগজে পড়লুম ইউনেস্কো নাকি কিছুদিন পূর্বে পৃথিবীর বড় বড় শহরে মদ্যপান কোন্ বহরে বাড়ছে, তার একটা জরিপ নেন এবং ফলে একটি মারাত্মক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। সেটি এই ঃ—পৃথিবীর বড় বড় শহরের যে কটাতে মদ্যপান ভয়ংকররূপে (ইন এ্যান এলার্মিং ডিগ্রী) বেড়ে যাচ্ছে, কলকাতা তার মধ্যে প্রধান স্থান ধরেন!

বাঙালী সব দিক দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু অন্তত একটা দিকে এগিয়ে যাচ্ছে শুনে আমার উল্লাস বোধ করা উচিত ছিল, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও পারলুম না। ঢাকার এক আমওলাকে যখন বলেছিলুম যে তার আম বড় 'ছোডো' 'ছোডো', তখন সে এক গাল হেসে দেমাক করে বলেছিল, 'কিন্তু, কত্তা, আডি (আঁঠি) গুলাইন্ বরো আছে!'[১] সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে যাবার আম ছোট, আর মদ্যপানের 'আডিডা' 'মোডা' এ-চিন্তাটা রসাল নয়—কোনো অর্থেই!

ফেরার মুখে কলকাতাতে ডেকে পাঠালুম দ্বিজেনকে। কলেজের ছোকরা—অর্থাৎ কলেজ যাওয়ার নাম করে কপি হৌস যায়—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ; শুনেছি এদের মাথায় পেরেক পুঁতলে ইস্ক্রু হয়ে বেরোয়—মগজে এ্যাসন প্যাঁচ; তদুপরি আমার শাগরেদ্!

তাকে আমার অধুনালব্ধ মাদকীয় জ্ঞানটুকু জানিয়ে বললুম, 'আমি তো জানতুম, ইণ্ডিয়া শনৈঃ শনৈঃ ড্রাই হয়ে যাচ্ছে—এ আবার কি নূতন কথা শুনি?'

গুরুকে জ্ঞানদান করতে পারলে শিষ্য মাত্রই পুলকানুভব করে—কাবেল, নাবালক যাই হোক না কেন। ক্ষণতরেও চিন্তা না করে বললে, 'মদ্যপান কলকাতাতে কারা বাড়াচ্ছে জানি নে, তবে একটা কথা ঠিক ঠিক বলতে পারি, কলেজের ছোকরাদের ভিতর ও জিনিসটা ভয়ংকর বেড়ে যাচ্ছে; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 'ভয়ংকর' 'ভীষণ' 'দারুণ' কথাগুলো আমরা না ভেবেই

১ এর একটি ইংরিজী পাঠান্তর আছে। বিখ্যাত 'রম্য-রচনা (বেল্লেংর্) লেখক চার্লস ল্যাম্ (এদেশে প্রধানত 'শেক্সপিয়ারের গল্প' প্রণেতা রূপে পরিচিত) প্রায়ই দফতরে দেরিতে পেঁছিতেন। একদা বড়বাবু তাঁকে হাতে-নাতে ধরে ফেলে বললেন, 'মিঃ ল্যাম্, আমার কাছে খবর পেঁচেছে, আপনি আপিসে দেরিতে আসেন।' ল্যাম্ নাকি ঢাকার আমওলার মতই এক গাল হেসে বলেছিলেন, 'কিন্তু এ খবর কি পেঁচেছে যে, আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাই?'

বলে থাকি, কিন্তু ইউনেস্কো যখন 'এলার্মিং' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তখন সঠিক 'ভয়ংকরই' বলতে চেয়েছেন। দ্বিজেন সেটা কনফার্ম করলে। (কলেজের ছোকরারা আমার উপর সদয় থাকুন ; এটা আমার মত নয়, দ্বিজেনের।')[২]

বললে, 'এবারে যে মধুপুরে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি নি, তার কারণ আমি আদপেই মধুপুর যাই নি—যখন শুনলুম, ইয়াররা যাচ্ছেন বিয়ার পার্টি করতে সেখানে। ওদের চাপ ঠেকানো আমার পক্ষে অসম্ভব হত —এদিকে মায়ের পা ছুঁয়ে কিরে কেটেছি মদ খাব না।'

শ্রাদ্ধ তাহলে অনেকখানি গড়িয়েছে।

সে সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে দেখি, মেলাই কলেজের ছেলেমেয়ে এসেছে। আমার ভাতিজীর ইয়ারী-বক্সিনী, বন্ধুবান্ধব। মাঝে-মধ্যে ওদের সঙ্গে বসলে ওরা খুশীই হয়।

ইচ্ছে করেই ফুর্তি-ফার্তির দিকে কথার নল চালালুম। চোর ধরা পড়লো। অর্থাৎ মদ্যপানের কথা উঠল।

সেদিন আমার বিস্তর জ্ঞান সঞ্চয় হয়েছিল। একের অজ্ঞতা যে অন্যের জ্ঞান সঞ্চয়ের হেতু হতে পারে, সে-কথা এতদিন জানতুম না।

এক 'গুণী' হঠাৎ বলে উঠলো, বিয়ারে আবার নেশা হয়!'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'বলিস্ কি রে? ইয়োরোপের শতকরা ৮৫ জন লোক যখন নেশা করতে চায়, তখন তো বিয়ারই খায়। ওয়াইন খায় কটা লোক, স্পিরিট—'

বাধা দিয়ে বললে, 'বিয়ারও তো ওয়াইন।'

আমি আরো আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'তওবা, তওবা! শুনলে গুনাহ হয়। ওয়াইনে কত পার্সেন্টেজ এলকহল, আর বিয়ারে কত পার্সেন্ট, স্পিরিটে—'

'এলকহল?'

'বাই উয়েইট অথবা ভলুম। দিশীটা—মানে ভদ্‌কার খুড়তুতো ভাই—তার হিসেব আণ্ডার প্রুফ, অভার প্রুফে। লিক্যোর—'

'মানে লিকার?'

আমি প্রায় বাক্যহারা। 'লিক্যোর তো আবিষ্কার করেছে প্রধানতঃ ক্যাথলিক সাধুসন্ন্যাসীরা (মঙ্ক)। বেনিডিক্‌টিন—'

'সাধুসন্তরা আবিষ্কার করলেন মদ!'

পূর্বেই বলেছি, সেদিন আমার বিস্তর জ্ঞানার্জন হয়েছিল। ওদের অজ্ঞতা থেকে।

তারো পূর্বে বলা উচিত ছিল যে, আমি মদ্যপানবিরোধী। তবে সরকার যে পদ্ধতিতে এগোচ্ছেন, তার সঙ্গে আমার মতের মিল হল না। সে কথা আরেকদিন হবে।

ঔষধার্থে ডাক্তাররা কখনো কখনো মদ দিয়ে থাকেন। ব্র্যান্ডির চেয়েও শ্যাম্পেন গিলিয়ে দিলে ভিরমি কাটে তাড়াতাড়ি। কিন্তু ব্র্যান্ডির চেয়ে শ্যাম্পেনে খরচ বেশী পড়ে বলে কন্টিনেন্টের ভালো ভালো নার্সিং হোম ছাড়া অন্য কোথাও বড় একটা ব্যবহার করা হয় না। কৃত্রিম ক্ষুধা উদ্রেকের জন্যও শেরি বা পোর্ট ব্যবহৃত হয়। এ সব ব্যাপার সম্বন্ধে আমার হাঁ, না, কিছু বলার নেই। তবে শীতের দেশে ব্র্যান্ডি না খেয়ে গুড়ের সঙ্গে কালো কফি খেলেও শরীর গরম হয়—এবং প্রতিক্রিয়াও কম। বহু ধর্মপ্রাণ হিন্দু এবং মুসলমান কবরেজ-হেকিমের আদেশ সত্ত্বেও সুরাপান করেন নি—ভয়ংকর একটা কিছু ক্ষতি হতেও শুনি নি।

মোদ্দা কথায় ফেরা যাক।

বিয়ারে নেশা হয় না, এর মত মারাত্মক ভুল আর কিছুই নেই। পূর্বেই বলেছি, ইয়োরোপে শতকরা ৮৫ জন লোক বিয়ার খেয়েই নেশা করে মাতলামো করে।

'ওয়াইন' বলতে যদিও সাধারণতঃ মাদক দ্রব্য বোঝায়, তবু এর আসল অর্থ, আঙুর পচিয়ে যে সুরা প্রস্তুত হয়, তারই নাম ওয়াইন। 'দ্রাক্ষাসব'-এর শব্দে শব্দে অনুবাদ (অবশ্য বাজারে যে-সব তথাকথিত দ্রাক্ষাসব আছে, তার ভিতর কি বস্তু আছে আমার জানা নেই)।

বিয়ারে ৪ থেকে ৬ পারসেন্ট এলকহল থাকে—বাদবাকি প্রায় সবটাই জল। নেশা হয় এই এলকহলেই। ওয়াইনের পার্সেন্টেজ দশ থেকে পনেরো। তবু বিয়ার খেয়েই নেশা করে বেশী লোক। ওয়াইন খান গুণীরা—এবং ওয়াইন মানুষকে চিন্তাশীলও অপেক্ষাকৃত বিমর্ষ করে তোলে।

পৃথিবীতে সব চেয়ে ভালো ওয়াইন হয় ফ্রান্সে। বোর্দো (Bordeaux) অঞ্চলে তৈরী হাল্কা লাল রঙের এই ওয়াইনকে ইংরিজীতে বলা হয় ক্ল্যারেট। তাছাড়া আছে বার্গেন্ডি এবং শ্যাম্পেন অঞ্চলের বিখ্যাত ওয়াইন। এসব ওয়াইন আঙুর পচিয়ে ফার্মেন্ট করার সময় যদি কার্বন ডায়োক্সাইড বেরিয়ে না যেতে দেওয়া হয়, তবে সেটাকে 'সফেন' ওয়াইন (এফারভেসেন্ট) বলা হয়। বোর্দো বার্গেন্ডি বুজবুজ করে না—শ্যাম্পেন করে। শ্যাম্পেন খোলা মাত্রই তাই তার কর্ক লাফ দিয়ে ছাতে ওঠে, এবং তার বুদ্বুদ পেটের ইনটেসটিনাল ওয়ালে খোঁচা মারে বলে নেশা হয় তাড়াতাড়ি (ভিরমি কাটে তড়িঘড়ি) এবং স্টিল (অর্থাৎ 'ফেনাহীন') ওয়াইনের মত কিছুটা বিমর্ষ-বিমর্ষ সে তো করেই না, উল্টে চিত্তাকাশে উড়ুক্কু উড়ুক্কু ভাবটা হয় তাড়াতাড়ি।

জর্মনির বিখ্যাত ওয়াইন রাইন (ইংরিজীতে হক্) ও মোজেল। রাইন ওয়াইনের শ্যাম্পেনও হয়, তবে তাকে বলা হয় জেক্ট। শ্যাম্পেনের তুলনায় জেক্ট্ নিকৃষ্ট। অথচ এই জেক্ট্ ফ্রান্সে বেচে হের ফন্ রিবেনট্রপ প্রচুর পয়সা কামান। হিটলার নিজে মদ খেতেন না, কিন্তু যখন শুনলেন রিবেনট্রপ শ্যাম্পেনের দেশে ওঁচা জেক্ট্ বিক্রি করতে পেরেছেন, তখন বিমোহিত হয়ে বললেন, 'যে ব্যক্তি জেক্টের মত রদ্দি মাল ফ্রান্সে বেচতে পারে, সে পয়লা নম্বরী সেলস্ম্যান। একে আমার চাই—এ আমার আইডিয়াজ ইংলন্ডে বেচতে

পারবে।' সবাই জানেন, ইনি পরে হিটলারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হয়েছিলেন ও সর্বশেষে ন্যুরনবের্গে ফাঁসীকাঠে ঝুলেছিলেন।

হাঙ্গেরির বিখ্যাত ওয়াইন টকাই ও ইতালির কিয়ান্তি।

কাশ্মীরের আঙুর দিয়ে ভালো ওয়াইন হওয়ার কথা। তাই তৈরী করে চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকায় চালান দেওয়ার আমি পক্ষপাতী। অবশ্য ওরা যদি কখনো ড্রাই হতে চায়, তবে অন্য কথা।

আপেল ফার্মেণ্ট করে হয় সাইডার, মধু ফার্মেণ্ট করে হয় মীড (সংস্কৃত 'মধু' থেকে মধ্বী, গ্রীকে মেথু মানে মদ, জর্মনে মেট্—সব শব্দই সংস্কৃত মধু থেকে)। আমের রস ফার্মেণ্ট করে মদ খেতেন বিখ্যাত কবি গালিব। আনারস ও কালোজাম পচিয়েও নাকি ভালো ওয়াইন হয়। সাঁওতাল, আদিবাসী ও বিস্তর পার্বত্য জাতি ভাত পচিয়ে বিয়ার বানিয়ে খায়; কিন্তু ফার্মেণ্ট করার ভালো কায়দা জানে না বলে তিন সাড়ে তিনের চেয়ে বেশী এলকহল পচাইয়ে তুলতে পারে না। এদের সর্বস্ব, এদের জরু-গোরু এমন কি এদের সরল আত্মার পর্যন্ত সর্বনাশ করেছে ইংরেজ—চোলাই (ডেসটিলড্) 'ধান্যেশ্বরী' কালীমার্কা এদের মধ্যে চালু করে। এই 'ধান্যেশ্বরী' একেবারে সম্পূর্ণ বন্ধ না করা পর্যন্ত এদের উদ্ধার নেই। আমার কথা বিশ্বাস না হলে উড়িষ্যার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নবকৃষ্ণ চৌধুরীকে শুধোবেন। ইনি আদিবাসীদের জন্য বহু আত্মত্যাগ করেছেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত অনুগুল আশ্রমে আদিবাসীরাও শিক্ষালাভ করে। ইনিও আদিবাসীদের ড্রাই করতে চান; কিন্তু সরকার যেভাবে এগোচ্ছেন তার সঙ্গে তাঁর একদম মতের মিল হয় না।

জাপানীদের সাকে মদ ভাতেরই পচাই, চীনাদের পচাই, 'চু'-য়ে কিঞ্চিৎ ভুট্টা মেশানো থাকে।

ভারতবর্ষের তাড়ি (ফার্মেণ্টেড খেজুর কিংবা তালের রস) বস্তুটিকে ওয়াইন পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। পৃথিবীর তাবৎ মাদক দ্রব্যের ভিতর এই বস্তুটিই অনিষ্ট করে সব চেয়ে কম। একমাত্র এই জিনিসটাই সম্পূর্ণ বন্ধ করা উচিত কি না সে বিষয়ে আমার মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। তবে খাঁটি তাড়ি সচরাচর পাওয়া যায় না; লোভী শুঁড়িরা তাড়ির সঙ্গে দিশী চোলাই মদ (ধান্যেশ্বরী) মিশিয়ে তার এলকহল বাড়িয়ে বিক্রি করে। মাতালরাও সচরাচর নির্বোধ হয়।

* * *

এতক্ষণ পচাই অর্থাৎ ফার্মেণ্টেড বস্তু সম্বন্ধে বর্ণনা হচ্ছিল। এবারে ডেসটিলড বা চোলাই। চোলাই বস্তুর নাম স্পিরিটস্—যদিও শব্দটি সর্ব-প্রকার মাদক দ্রব্যের জন্যও ব্যবহার হয়।

আঙুর পচিয়ে ওয়াইন বানিয়ে সেটাকে বক যন্ত্র দিয়ে চোলাই করলে হয় ব্র্যাণ্ডি—অর্থাৎ ব্র্যাণ্ড করা বা পোড়ানো হয়েছে। একমাত্র ফরাসী দেশের ব্র্যাণ্ডিকেই (তাও সব ব্র্যাণ্ডি নয়) বলা হয় কন্যাক্ (Cognac)। মল্ট-বার্লিকে পচিয়ে হয় বিয়ার; সেটাকে চোলাই করলে হয় হুইস্কি। তাড়ি চোলাই করলে

হয় এরেক (শব্দটা আসলে 'আরক' কিন্তু আরক অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয় বলেই এস্থলে 'এরেক' প্রয়োগ করা হল)। সেটাকে দুবার চোলাই করে খেতেন বদ্ধ মাতাল বাদশা জাহাঙ্গীর। এরেকে ষাট পার্সেন্ট এলকহল হয়—ডবল ডেসটিল করলে আশী পর্যন্ত ওঠার কথা। সেইটে খেতেন নির্জলা! আখের রস ফার্মেন্ট করার পর চোলাই করলে হয় 'রাম্'। সংস্কৃতে 'গৌড়ী'—গুড় থেকে হয় বলে। জামেকার রাম্ বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু ভারতীয় রাম্ যদি সযত্নে তৈরী করে চালান দেওয়া হয়, তবে জামেকাকে ঘায়েল করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। আমি ফরেন এক্সচেঞ্জ বাড়ানোর স্বপ্ন দেখি বলেই এই প্রস্তাবটি পাড়লুম। রামে এত লাভ যে তারই ফলে চিনির কারবারীরা চিনি সস্তা দরে দিতে পারে। জাভার চিনি একদা এই কারণেই সস্তা ছিল। জিন তৈরি হয় শস্য দিয়ে এবং পরে জেনিপার জামের সঙ্গে মেশানো হয়। খুশবাইটা ঐ জেনিপার থেকে আসে।

এসব চোলাই করা স্পিরিটসে ৩৫ থেকে আরম্ভ করে ৮০ ভাগ এলকহল থাকে। হুইস্কি ব্র্যান্ডির চেয়ে রামে এলকহল বেশী, তার চেয়ে বেশী ডবল-চোলাই এরেকে এবং সব চেয়ে বেশী আব্স্যাঁতে! তাই ওটাকে 'সবুজ শয়তান' বলা হয়। শুনেছি, ও জিনিস বছর তিনেক নিয়মিত ভাবে খেলে মানুষ হয় পাগল হয়ে যায়, না হয় আত্মহত্যা করে, কিংবা ডেলিরিয়াম ট্রেমেনসে মারা যায়। ইয়োরোপের একাধিক দেশে এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে।[৩]

সচরাচর মানুষ এসব স্পিরিটস নির্জলা খায় না। হুইস্কিতে যে পরিমাণ সোডা বা জল মেশানো হয় তাতে করে তার এলকহল ডাইলুটেড হয়ে শক্তি কমে যায়। ফলে এক গেলাস হুইস্কি-সোডাতে যতখানি নেশা হয়, দু গেলাস বিয়ারে তাই হয়। অবশ্য নির্জলা হুইস্কি যতখানি খেয়ে স্বাস্থ্যের সর্বনাশ করা যায়, বিয়ারে প্রচুর জল আছে বলে ততখানি পেটে ধরে না বলে খাওয়া যায় না। তবে অবশ্য কেউ যদি অতি ধীরে ধীরে হুইস্কি খায় এবং অন্যজন সাততাড়াতাড়ি বিয়ার খায় তবে দ্বিতীয় জনেরই নেশা হবে আগে।

অতএব বিয়ারে নেশা হয় না, এ বড় মারাত্মক ভুল ধারণা। ভুবনবিখ্যাত ম্যুনিক-বিয়ারে তো আছে কুল্লে তিন, সাড়ে তিন পারসেন্ট এলকহল। যারা রাস্তায় মাতলামো করে, তারা তো ঐ খেয়েই করে।[৪]

এদেশে আরেকটা বিপদ আছে। আঙুর সহজে পাওয়া যায় না বলে আমাদের অনেক ব্র্যান্ডিতেই আছে ডাইলুটেড এলকহল এবং তার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্র্যান্ডির সিনথেটিক সেন্ট—অর্থাৎ আঙুরের রস এতে নেই। অনেক সরল লোক ফ্লু-সর্দি সারাবার জন্যে, কিংবা দুর্বল রোগীর ক্ষুধা বাড়াবার জন্য

---

৩ আব্স্যাঁতের শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে একটি ফরাসী গল্পের অনুবাদ করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরে, নাম 'সবুজ শয়তান'। বসুমতী গ্রন্থাবলী।

৪ আশ্চর্যের বিষয়, ইয়োরোপের সব শহরের মধ্যে ম্যুনিকই সব চেয়ে বেশী দুধ খায়। আমাদের গড়াডরের মত।

এই 'ব্র্যান্ডি' খাইয়ে রোগীর ইষ্টের পরিবর্তে অনিষ্ট ডেকে আনেন। এ-বিষয়ে সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত—বিশেষ করে যে সব লোক নিজে নিজের বা আত্মীয়জনের ডাক্তারী করেন।

ফ্রান্সে অত্যধিক মদ্যপান এমনি সমস্যাতে এসে দাঁড়িয়েছে যে, তার একটা প্রতিবিধান করা বড়ই প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। কিন্তু কেউই সাহস করে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারছেন না। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাঁদেজ-ফ্রাঁস চেষ্টা করেছিলেন; অনেকে বলেন প্রধানমন্ত্রিত্ব হারান তিনি প্রধানত এবং গুহ্যত এই কারণে। আমেরিকা ও নরওয়েও চেষ্টা করেছিল, সফল হয় নি। রাজা যদিও আইনের বাইরে তবু নরওয়ের রাজা একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন, 'দেখা যাচ্ছে, মদ না-খাওয়ার আইন একমাত্র আমিই মানি—আর সবাই তো শুনি বে-আইনি খেয়ে যাচ্ছে।'

বৈদিক, বৌদ্ধ ও গুপ্ত যুগে মাদকদ্রব্য সেবন করা হত ও জুয়াখেলার রেওয়াজ ছিল। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস শঙ্করাচার্য যে নব হিন্দু ধর্ম প্রচার করলেন সেই সময় থেকেই জনসাধারণে মদ্যপান ও জুয়াখেলা প্রায় বন্ধ হয়ে যায় (অবশ্য মুনিঋষিরা মাদক দ্রব্য ও ব্যসন বারণ করেছিলেন খৃষ্টের পূর্বেই) এবং পাঠান-মোগল যুগে রাজা রাজড়া এবং উজীর-বাদশারাই প্রধানত মাদক দ্রব্য সেবন করেছেন। 'চরমে চরম মিশে' বলেই বোধ হয় অনুন্নত সম্প্রদায় ও আদি-বাসীরাও খেয়েছে। ভারতবর্ষ কোন্ অবিশ্বাস্য অলৌকিক পদ্ধতিতে এদেশে একদা মদ জুয়া প্রায় নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছিল সেটা আমি আবিষ্কার করতে পারি নি। পারলে আজ কাজে লাগানো যেত। ইংরেজ আমলে মদ্য-পানের কিছুটা প্রচার হয়—মাইকেল ও শিশির ভাদুড়ী নীলকণ্ঠ হতে পারলে ভালো হত। ঐ সময় ব্রাহ্মসমাজ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গাঁধী যে জীবন ও আদর্শ সামনে ধরেন তার ফলে মদ্যপান প্রসার লাভ করতে পারে নি। শুনলুম, এখন নাকি কোনো কোনো তরুণ 'র‍্যাঁবো-র‍্যাঁবো ভেরেরেন-ভেরেরেন' করে এবং ওদের মত উত্তম (?) কবিতা না লিখে অন্য জিনিসটার সাধনায় সুখ পায় বেশী। ইতিমধ্যে কলকারখানা হওয়ার দরুন চা-বাগানে জুট মিলে মদ ভয়ংকর-মূর্তিতে দেখা দিল। মাঝিমাল্লারা অর্থাৎ সেলাররা মাতলামোর জন্য বিখ্যাত—কিন্তু আশ্চর্য, ভারতীয় ও পাকিস্তানী খালাসীরা মদ খায় না। আমাদের সৈন্যবাহিনীতে যেটুকু মদ্যপান হয় তাও তুচ্ছ। কলকাতার শিখেদের দেখে কেউ যেন না ভাবেন যে, দিল্লী-অমৃতসরের সম্ভ্রান্ত শিখরা মদ খান। ধর্মপ্রাণ শিখ মদ্যপানকে মুসলমানের চেয়েও বেশী ঘৃণা করেন ও বলেন, ইংরেজ শিখকে পল্টনে ঢুকিয়ে মদ খেতে শেখায়।

হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ধর্ম ও ইসলামে মদ্যপান নিন্দিত—ইহুদী খৃষ্টান ও জরথুস্ত্রী ধর্মে পরিমিত মদ্যপানকে বরদাস্ত করা হয়েছে। এবং ঐ সব ধর্মের বহু প্রগতিশীল গুণী-জ্ঞানীরা অধুনা মদ্যপানবিরোধী।

মদ্যপান এখনো এদেশে কালমূর্তিতে দেখা দেয় নি, কিন্তু আগের থেকে সাবধান হওয়া ভালো। কিন্তু—পূর্বেই বলেছি—সরকার যে ভাবে এগোচ্ছেন

তার সঙ্গে আমার মত মেলে না। একটা উদাহরণ দি। কয়েক বৎসর পূর্বে দিল্লী শহরে পাব্লিক ড্রিংকিং অর্থাৎ বার রেস্তোরাঁতে মদ খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হল। হুকুম হল, যারা খাবে তারা মদের দোকান থেকে পুরো বোতল কিনে নিয়ে অন্যত্র খাবে। অন্যত্র মানে কোথায়? স্পষ্টতঃ বোঝা গেল বাড়িতে। কারণ পার্কে বা গাছতলায় বসে খাওয়াও বারণ। আমার প্রশ্ন, এটা কি ভালো হল? একদম বন্ধ করে দাও, সে কথা বুঝি; কিন্তু যে দেশে মদ খাওয়াটা নিন্দনীয় বলে ধরা হয়—বিশেষত মা-বোনেরা এর পাপস্পর্শের চিন্তাতেও শিউরে উঠেন—সেখানে ঐ জিনিস বাড়ির ভিতর প্রবর্তন কি উত্তম প্রস্তাব? শুনেছি দিল্লীতে একাধিক পরিবারে এই নিয়ে দাম্পত্য কলহ হয়েছে। খুবই স্বাভাবিক। এতদিন স্বামী বাইরে বাইরে খেয়ে বাড়ি ফিরতেন। ছেলেমেয়েরা অধিকাংশ স্থলেই কিছু জানতো না। এখন দাঁড়ালো অন্য পরিস্থিতি। ওদিকে ব্যাচেলারদের বৈঠকখানাতে যে হট্টগোল আরম্ভ হল তার প্রতিবাদ করতে প্রতিবাসীরা সাহস পেলেন অল্পই—মাতালকে ঘাঁটানো চাট্টিখানি কথা নয়।

দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি বারে ঢুকে সামান্য একটু খেয়ে ক্লান্তি দূর করে বাড়িতে এসে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়তো, তাকে এখন কিনতে হল পুরো বোতল। প্রলোভনে পড়ে তার মাত্রা বেড়ে গিয়ে শেষটায় তার পক্ষে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাওয়াটা অসম্ভব নয়।

তৃতীয়ত—এবং এইটেই সব চেয়ে মারাত্মক—বাড়িতে বাপের মদ্যপান ছেলেমেয়েরা দেখবেই। অনুকরণটাও অস্বাভাবিক নয়। অর্থাৎ নূতন কনভার্ট করার ব্যবস্থা করলুম।

শুনলুম, হালে নাকি কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের উপর চাপ দিয়েছেন যে পাবলিক ড্রিংকিং বন্ধ করো। উত্তরে নাকি পশ্চিমবঙ্গ সরকার উপরের কয়েকটি যুক্তি ব্যবহার করে আপত্তি জানিয়েছেন। ফলে হবে বলে মনে হয় না, কারণ পূর্বেই বলেছি, কেন্দ্রীয় সরকারকে একাধিকবার এ-সব যুক্তি শোনানো হয়েছে।

* * *

মোদ্দা কথা এই :—

যে দেশে মদ্যপান নিন্দনীয়, যে দেশে মদ্যপান জনসাধারণে ব্যাপকভাবে প্রচলিত নয়, সেখানে মদ্যপান একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে, যদি—

যদি নূতন কনভার্ট না হয়, অর্থাৎ তরুণদের যদি মদ্যপানের কোনো সুযোগ, কুযোগ কোনো যোগাযোগ না দেওয়া হয়।

আমাদের সর্বপ্রচেষ্টা ঐ দিকে নিয়োজিত করা উচিত।

পৌষ মেলা

হয়তো মেলাতে বসেই আপনি এ-লেখাটি পড়ছেন। না-হলে মেলাতে আসার সময় এখনো আছে। মোটরে আসতে পারেন, অবশ্য যদি পণ্ডিতজী দুর্গাপুর থেকে শান্তিনিকেতন মোটরে এসে থাকেন। তাঁর আসার সঙ্গে আপনার মোটরে আসার একটা অদৃশ্য সূক্ষ্ম কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। তিনি মোটরে এলে অজয় নদের উপরে কজওয়েটি তৈরী হবে, বিকল্পে তিনি যদি হেলিকপ্টারে আসেন—এখানকার ফার্পো কালোর দোকানে সেই গুজোরব—তবে উড়িষ্যা ভাষায় 'আপনারো কপালো ভাঙিলো।' সাধে কি আর মাইকেল গেয়েছেন, 'রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীন যথা দূর তীর্থ দরশনে'—সে ব্যবস্থার পরিবর্তন এখনো হয় নি।

এসে কিন্তু কোনো লাভ নেই। কারণ 'জেলা বীরভূমের অন্তঃপাতী ডিস্ট্রিক্ট রেজেস্টারী বীরভূম সবরেজেস্টারী বোলপুর পরগণে সেনভূম তালুক সুপুরের অন্তর্গত হুদা বোলপুরে পত্তনীর ডোল খারিজান মৌজে ভুবননগর ইস্তেক—' ভাববেন না, আমি সুকুমার রায়ের 'কাকালত নামা' থেকে চুরি করছি, ইটি পাবেন শান্তিনিকেতন ট্রস্টডীডের পয়লা পাতায়, সেকথা পরে হবে—সিকিটি ফেলবার জায়গা নেই। কারো না কারো মাথায় আটকে যাবে, কিংবা স্ত্রী-পুরুষের পদতাড়নে যে পুঞ্জীভূত ধূলিস্তর আকাশে-বাতাসে জমে উঠেছে, তারই একটিতে। অন্য মেলার তুলনায় এখানে মেয়েদের সংখ্যা কিছু নগণ্য নয়, অথচ ভাবতে অবাক লাগে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আশ্রমের মাস্টারদের গৃহিণী-কন্যারা যখন মেলা দেখার প্রথম অনুমতি পেলেন—শ্রীসদনের কল্পনাও তখন কেউ করতে পারেন নি—তখন তাঁদের আনা হয়েছিল গোরুর গাড়িতে করে এবং তাঁরা মেলার প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে, গাড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেলা দেখেছিলেন।

এই মেলাটি বিশ্বভারতীর চেয়ে বয়েসে বড়। এ কথা বলতে হল বিশেষ করে, তার কারণ, যে-বেদীর উপর বসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপাসনা করতেন, সে-বেদীর পাশ দিয়ে যাবার সময় গেল মেলার সময় শুনি, এক গুণী আরেক গুণীকে বুঝিয়ে বলছেন, এই বেদীর নিচে রবীন্দ্রনাথের পূত-অস্থি প্রোথিত আছে! আশ্চর্য চিহ্ন দিলুম এহেন তত্ত্ব নিতান্তই আমার কল্পনার বাইরে বলে, কিন্তু আসলে আমার আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। আমাদের কেন্দ্রের এক মন্ত্রী বোম্বাই না কোথায় যেন রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উপলক্ষে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রথম ইংরিজীতে রচনা লিখে বুঝতে পারলেন, মাতৃভাষা বাংলাতেই ফিরে যাওয়া উচিত।' গীতাঞ্জলি অনুবাদ করার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজীতে বিশেষ কিছু লিখেছেন বলে জানতুম না, পরে চিন্তা করে বুঝলুম, মন্ত্রীবর মাইকেল এবং রবীন্দ্রনাথ গুবলেট করে ফেলেছেন! (এবারে আশ্চর্য চিহ্ন যে তাগ মাফিক লেগেছে সে-কথা হর ব্যাকরণবাগীশই কবুল করবেন।) 'শতবার্ষিকী' 'শত বার সিকি' ভেবে এঁরা যদি এখন পঁচিশ টাকা খর্চা করেন তবে আমি আর বিস্মিত হব না। 'পানটা' আমার নয়—এটা স্বয়ং কবিগুরু করে গেছেন।

তা সে-কথা এখন থাক। যে গুণী শান্তিনিকেতন ছাতিমতলার অভিনব ব্যাখ্যা দিচ্ছিল তাকে শুধু মনে মনে বলেছিলুম, 'সাবধানে থাকিস, বাপু! তোকে না শেষটায় কেন্দ্রের মন্ত্রী বানিয়ে দেয়।'

অতএব অতি সংক্ষেপে মেলাটির ইতিহাস বলি। এতে কোনো গবেষণা নেই।

১২৬৮ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরবর্তী-যুগের বিখ্যাত লর্ড সিন্‌হা অব্ রায়পুর পরিবারে নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন। রাইপুর জায়গাটি বোলপুর স্টেশনের কাছেই। মহর্ষিদেব একাধিকবার এই রাইপুরে আসা-যাওয়া করেন এবং গমনাগমনের সময় এ অঞ্চলের উঁচু-নিচু খোয়াই-ডাঙার দিগন্ত-বিস্তৃত অর্ধ-মরুভূমিসদৃশ নির্জন ভূমির গাম্ভীর্য তাঁকে আকৃষ্ট করে। আশ্রম স্থাপনার আদিযুগের ঐতিহাসিক ও প্রথম 'আশ্রমধারী' স্বর্গত অঘোর চট্টোপাধ্যায় বলেন,

'রায়পুর যাতায়াত করিবার সময় এই দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরের অপূর্ব গাম্ভীর্যে মহর্ষির চিত্ত আকৃষ্ট হয়। এই বিশাল প্রান্তরে দৃষ্টি অবারিত, অনন্ত আকাশ ব্যতীত দিগলয়ে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। অনন্তস্বরূপের এই উদাত্ত সৌন্দর্যে তাঁহার হৃদয়মন প্লাবিত হইল, উন্মুক্ত আকাশতলে এই নির্জন প্রান্তর তপস্যার একান্ত অনুকূল বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল।' (শান্তিনিকেতন আশ্রম, ১৩৩৫-১৩৩৬, পৃ ১১)

চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমি যখন এখানে আসি তখনও ঐ দৃশ্য ছিল। এখন এত বেশী গাছপালা বাড়িঘর বাঁধ-বন লাগানো হয়েছে যে সে-দৃশ্যের কল্পনা করা কঠিন। তবে 'হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ' ইত্যাদি কবিতায় ও গ্রীষ্ম-বর্ষার বহুশত গানে রবীন্দ্রনাথ সে যুগের শান্তিনিকেতনের বর্ণনা রেখে গেছেন। আর প্রাচীনতম যুগের বর্ণনা আছে 'জীবনস্মৃতি'তে।

১০ই ফাল্গুন, ১২৬৯ সনে মহর্ষি বর্তমানে যেখানে লাইব্রেরি, 'শান্তিনিকেতন বাড়ি,' মন্দির (গ্রাম্য লোকের কাছে এখনও এ-জায়গা 'কাঁচা বাংলা' নামে পরিচিত) এই জায়গাটি, মোট কুড়ি বিঘা জমি বার্ষিক পাঁচ টাকা খাজনায় (!) মৌরসী পাট্টা নেন। ধ্যান-ধারণার জন্য মহর্ষি সর্বপ্রথম এখানে যে বাড়িটি তৈরী করেন সেটি মন্দিরের মুখোমুখি এবং 'শান্তিনিকেতন বাড়ি' নামে পরিচিত।

১২৯০ সনের পর মহর্ষিদেব আর কখনও শান্তিনিকেতনে আসেন নি।

২৬শে ফাল্গুন, ১২৯৪ সনে মহর্ষি শান্তিনিকেতনের বাড়ি-বাগান জমিজমা ধর্মচর্চা, বিদ্যালয় স্থাপন ও বাৎসরিক মেলা প্রবর্তনের জন্য ট্রাস্টডীড করে সর্বসাধারণের উদ্দেশে উৎসর্গ করেন।

৪ঠা কার্তিক, শুক্রবার, ১২৯৫, অপরাহ্নে আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর্ব সমাধান হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্গত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় আচার্যের কর্ম করেন।

৯ই কার্তিক ১২৯৫ বুধবারে এখনও প্রচলিত প্রতি বুধবারের প্রথম উপাসনা করেন প্রথম আশ্রমধারী অঘোর চট্টোপাধ্যায়।

২২শে অগ্রহায়ণ ১২৯৭ সনে 'মন্দিরে'র ভিত্তিস্থাপনা করেন মহর্ষিদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র দার্শনিকপ্রবর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। উপাসনা করেছিলেন তিনি, তাঁর মধ্যম ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেন এবং সঙ্গীত করেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। একটি তাম্রফলকে তারিখ প্রভৃতি খোদিত ছিল। সেই ফলক, সেইদিনের 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা, সেই মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', পঞ্চরত্ন ও প্রচলিত মুদ্রা ভিত্তিমূলে প্রেথিত হয়। তাম্রফলকে ছিল,

'ওঁ তৎসৎ। ঠক্কুর বংশাবতংসেন পরমমহর্ষিণা শ্রীমতা দেবেন্দ্রনাথ শর্মণা ধর্মোপচয়ার্থং শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠাপিতমিদং ব্রহ্মমন্দিরং। শুভমস্তু ১৮১২ শক, ১৯৫৮ সম্বৎ, ৪৯৯১ কলাব্দ অগ্রহায়ণ ২২, রবিবাসর।' (পূর্বোল্লিখিত পুস্তকে জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃ ৯০)

৭ই পৌষ ১২৯৮ তারিখে দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠ করে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করেন।

তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে দরিদ্রদের অন্নদান।

চতুর্থ বার্ষিক উৎসবে সর্বপ্রথম আতশবাজি পোড়ানো হয়।

পঞ্চম বার্ষিক উৎসবে সর্বপ্রথম মেলা ও যাত্রাগানের ব্যবস্থা হয়।

অতএব ১৩০৩ সালে পৌষ-মেলার আরম্ভ।

১৩০৯ সালে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বা স্কুল স্থাপনা। ১৩২৫ সালে কলেজ বা বিশ্বভারতীর পত্তন। ১৩২৬ সালে গ্রীষ্মাবকাশের পর অধ্যাপনা আরম্ভ হয়। ১৩২৮/১৯২১-এ বিশ্বভারতীর (য়ুনিভার্সিটি রূপে) উদ্বোধন।

পূর্বে মহর্ষিদেবের যে ট্রাস্টডীডের উল্লেখ করেছি তাতে আছে ঃ—

'ধর্মভাব উদ্দীপনের জন্য ট্রস্টীগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাইবার উদ্যোগ করিবেন। এই মেলাতে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের সাধুপুরুষেরা আসিয়া ধর্মবিচার ও ধর্মালাপ করিতে পারিবেন। এই মেলার উৎসবে কোন প্রকার পৌত্তলিক আরাধনা হইবে না ও কুৎসিত আমোদ-উল্লাস হইতে পারিবে না, মদ্য মাংস ব্যতীত এই মেলায় সর্বপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ-বিক্রয় হইতে পারিবে।'

আমার মনে হয় এই মেলার সময় যদি দেশ-বিদেশের সর্ব ধর্মের গুণী-জ্ঞানী সাধক-পণ্ডিত সম্প্রদায়কে আমন্ত্রণ করে তিনদিনব্যাপী ধর্মালোচনা ধর্মসভার পত্তন (কংগ্রেস অব অল ফেৎস) হয়, তবে আমরা যুগধর্ম অনুসরণ করে মহর্ষিদেবের শুভেচ্ছা সফলতর করতে পারব ॥

পঞ্চতন্ত্র

মাভৈঃ!

বাঙালী সব দিক দিয়েই পিছিয়ে যাচ্ছে, এরকম একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। কথাটা ঠিক কিনা, হলপ খেয়ে বলা কঠিন, কারণ দেশ-বিভাগের ফলে তার যে খানিকটে শক্তিক্ষয় হয়েছে সে বিষয়ে তো কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। পার্লামেন্টে যদি আপনার সদস্য সংখ্যা কমে যায় তবে সব-কিছুই কাটতে হয় ধার দিয়ে—ভার দিয়ে কাটার সুযোগ আর মোটেই

জোটে না।

দিল্লীতে থাকাকালীন আমি একটি বিষয় নিয়ে কিঞ্চিৎ চিন্তা করেছিলুম। কেন্দ্রে অর্থাৎ ইউ পি এস সি-তে বাঙালী যথেষ্ট চাকরি পাচ্ছে কি না? ঐ অনুষ্ঠানের সদস্য না হয়েও যাঁরা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁদের বিশ্বাস, বাঙালীর এতে যতখানি কৃতকার্য হওয়া উচিত ততখানি সে হচ্ছে না। একদা বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমাকেও সেখানে ডাকা হয়েছিল; আমি তখন চোখকান খোলা এবং খাড়া রেখে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করেছিলুম।

দিল্লীতে এখন যাঁরা বসবাস করেন তাঁরা বিলিতি কিংবা বিলিতি ঘ্যাষা পোশাক পরেন ছুরিকাঁটা দিয়ে খাওয়া প্রচুর বাড়িতে চালু হয়েছে, ইংরিজী আদব-কায়দা, বিশেষ করে ইংরিজী এটিকেট এঁদের কাছে আর সম্পূর্ণ অজানা নয়।

ইউ পি এস সি-র তাবৎ মেম্বারই সায়েবীয়ানা পছন্দ করেন, এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু যেখানে যে-আবহাওয়া বিদ্যমান, মানুষ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তার থেকেই প্রাণবায়ু গ্রহণ করে। তাই যদি বাঙালী ছেলের পোশাক ছিমছাম না হয়, চেয়ার টেনে বসার সময় সে যদি শব্দ করে, মোকামাফিক পার্ডন, থ্যাঙ্কু না বলতে পারে এবং সর্বক্ষণ ঘন ঘন পা দোলায় তবে সদস্যরা আপন অজান্তেই যে তার প্রতি কিঞ্চিৎ বিমুখ হয়ে ওঠেন সেটা কিছু আশ্চর্যজনক বস্তু নয়।

কিন্তু আসল বিপদ অন্যত্র। বাঙালী উমেদার ইংরিজীতে ভাব প্রকাশ করতে পারে না। পাঞ্জাবী, হিন্দীভাষী কিংবা মারাঠী যে ইংরিজী বলে সেটা কিছু 'আমরি' আমরি' করবার মত নয়,—বিশেষত পাঞ্জাবী, হিন্দীভাষী ও সিন্ধীদের ইংরিজীজ্ঞান 'শিলিং-শকার' ও 'পেনি-হরার' থেকেই আহরিত। তা হোক. কিন্তু ঐসব বুঝে-না-বুঝেই যারা বেশী পড়ে তাদের কথা বলার অভ্যাস হয়ে যায় বেশী, অন্তত 'থ্যাঙ্কু' 'পার্ডন', 'আই এম অ্যাফ্রেড' তারা তাগমাফিক লাগিয়ে দিতে কসুর করে না।

এ স্থলে ইতিহাসের দিকে এক নজর তাকাতে হয়।

মুসলমান আগমনের পর থেকে ১৮৪০।৪২ পর্যন্ত বাঙলা দেশের ব্রাহ্মণ তথা বৈদ্য সম্প্রদায়ের বিস্তর লোক সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেন, এবং মুসলমান ও কায়স্থরা ফার্সী (এবং কিঞ্চিৎ আরবীর), চর্চা করেন। এদেশের বড় বড় সরকারী চাকরি, যেমন সরকার (চীফ সেক্রেটারী), কানুনগো (লিগেল রিমেমব্রেন্সার), বখ্শী (একাউণ্টেণ্ট জেনারেল—পে-মাস্টার) অর্থাৎ এডমিনস্ট্রেটিভ তাবৎ ডাঙর ডাঙর নোকরিই করেন কায়েস্থরা; ইংরেজের আদেশে এঁরাই কলকাতাতে প্রথম ইংরিজী শিখতে আরম্ভ করেন—বস্তুত ফার্সী তাঁদের মাতৃভাষা ছিল না বলে তাঁরা সেটা অনায়াসে ত্যাগ করে ইংরিজী আরম্ভ করে দিয়েছিলেন—এবং ফলে হাইকোর্টটি তাঁদের হাতে চলে যায়। ব্রাহ্মণরা আসেন পরে; তাই তাঁরা পেলেন বিশ্ববিদ্যালয়। মুসলমান আসেন সর্বশেষে, তাঁদের কপালে কিছুই জোটে নি।

তা সে যাই হোক্, আমরা বাঙালী প্রথমেই সাততাড়াতাড়ি ইংরিজী শিখেছিলুম বলে বেহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এস্তক সিন্ধুদেশ পর্যন্ত আমরা ছড়িয়ে পড়ি।

এর পর অন্যান্য প্রদেশেও বিস্তর লোক ইংরিজী শিখতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে আমাদের চাহিদা ও কদর কমতে লাগল, এসব কথা সকলেই জানেন, কিন্তু এর সঙ্গে আরেকটি তত্ত্ব বিশেষভাবে বিজড়িত এবং সেই তত্ত্বটির প্রতি আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

যে দুটি জাতীয় সঙ্গীত ভারতের সর্বত্র সম্মানিত সে দুটিই বাঙলা দেশেই রচিত হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম সর্বপ্রথম আরম্ভ হয় বাঙলা দেশেই। এটা কিছু আকস্মিক যোগাযোগ নয়। এর কারণ বাঙালী আপন দেশ ভালোবাসে এবং সে বিদ্রোহী[১]। দেশকে ভালোবাসলে মানুষ তার ভাষাকেও ভালোবাসতে শেখে।

আশ্চর্য, ইংরিজী ভালো করে আসন জমাবার পূর্বেই বাঙলা দেশে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। (ঠিক সেই রকম ফার্সী যখন একদা আসন জমাতে যায়, তখন কবি সৈয়দ সুলতান আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন,

'আল্লায় বলিছে "মুই যে-দেশে যে-ভাষ,
সে দেশে সে-ভাবে করলুম রসুল প্রকাশ।"
যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন।
সেই ভাষা তাহার অমূল্য সেই ধন॥')

এবং আরো আশ্চর্যের বিষয়, সে বিদ্রোহের কাণ্ডারী ছিলেন সে যুগের সব-চেয়ে বড় ইংরিজী (ফরাসী, লাতিন, গ্রীক) ভাষার সুপণ্ডিত মাইকেল। কাজেই যদিও সে উইলসেন, কেশবসেন ও ইস্টিসেন এই তিন সেনের কাছে জাত দিয়ে ছুরি কাঁটা ধরতে শিখল (আজ যা দিল্লীতে বড়ই কদর পাচ্ছে) তবু সঙ্গে সঙ্গে ওর বিনাশের চারাকে জল দিয়ে বাঁচাতে আরম্ভ করলো। এটাকে বাঙালীর স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। এ সময় সে গাছেরও খেয়েছে, তলারও কুড়িয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই চোখে পড়ল, বাঙালী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরিজী বইয়ের আমদানী বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যে রকম কাতর হয়ে পড়েছিল এবারে সে সে-রকম হাঁসফাঁস করলো না। স্বরাজ লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, বাঙালী ইংরিজী ভাষা, আচার-ব্যবহার, কায়দা-কেদা থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে এবং ফলে দিল্লীতে আর কল্কে, সরি, সের্ভিয়েট—পায় না।

১ 'বিদ্রোহী' আমি কথার কথারূপে বলছি না। বস্তুত বাঙালী যে বিদ্রোহী তার ইতিহাস এখনো লেখা হয় নি। (ক) দোয়ারের ব্রহ্মণ্যধর্ম তাকে অভিভূত করতে পারে নি, ফলে সে সংস্কৃত উচ্চারণ গ্রহণ করে নি, (খ) বৌদ্ধ জৈনের নিরামিষ সে গ্রহণ করে নি, (গ) মুসলমান আমলে বাঙলা দেশই সব চেয়ে বেশী লড়াই দিয়েছে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ইত্যাদি বিস্তর বিষয়-বস্তু নিয়ে সে ইতিহাস লিখতে হবে।

তর্ক করে, দলীল-দস্তাবেজ দিয়ে সপ্রমাণ করতে হলে ভুরি ভুরি লিখতে হবে। তা না হয় লিখলুম, কিন্তু পড়বে কে? তাই সংক্ষেপে বলি,

পৃথিবীর সভ্যাসভ্য কোনো দেশই বিদেশী ভাষা দিয়ে বেশী দিন কারবার চালায় না। আজকের দিনে তো নয়ই। ফার্সী এদেশে ছ'শ বছর ধরে রাষ্ট্র-ভাষা ছিল—আমরা একে চিরন্তনী ভাষা বলে গ্রহণ করি নি।

তাই হিন্দী, গুজরাতী মারাঠীওলারাও একদিন ইংরেজী বর্জন করে আপন আপন মাতৃভাষায় কাজকারবার করতে গিয়ে দেখবেন, আমরা বাঙালীরা অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছি, মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গিয়েছে—কারণ আমরা অনেক পূর্বে আরম্ভ করেছিলুম। তখন যখন কেন্দ্রে আপন আপন মাতৃভাষায় পরীক্ষা দিতে হবে তখন আবার আমরা সেই যুগে ফিরে যাব, যখন একমাত্র বাঙালীই ইংরিজী জানত। হিন্দী কখনো ব্যাপকভাবে বাধ্যতামূলক হবে না, আর হলেও বাঙালীকে যেমন মাতৃভাষার উপর হিন্দীতে পরীক্ষা দিতে হবে, হিন্দীওলাকে হিন্দী ভিন্ন অন্য একটি ভাষায় পরীক্ষা দিতে হবে। অমাতৃভাষা অমাতৃভাষায় কাটাকুটি গিয়ে রইবে বাঙলা বনাম হিন্দী। তাই অবস্থা একই দাঁড়াবে—আমরা এগিয়ে যাব।

তাই মা ভৈঃ॥

দেহি দেহি

কিছুদিন পূর্বে আমার এক আত্মজন এসে, আমাকে শুধাল, 'আপনার কি অত্যন্ত অর্থাভাব হয়েছে?'

আমি ইহুদীদের মত পাল্টা প্রশ্ন শুধালুম, 'কেন, তোমার কি অর্থপ্রাচুর্য হয়েছে? ধার দেবে?' সে ধনী, আমি জানি।

বললে, 'সিনেমার কাগজে যে লিখেছেন!'

আমি বললুম, 'আমার যতদূর জানা আছে, একমাত্র এই বাঙলা দেশেই বহু সিনেমার কাগজ সাহিত্যিকদের কাছে লেখা চায়, এবং এমন কোনো শর্তও করে না যে সিনেমা সম্বন্ধেই লিখতে হবে। অন্যান্য দেশে সিনেমার কাগজ সাহিত্যের তোয়াক্কা তো করেই না, উল্টে ভালো ভালো সাহিত্যের কাগজ সিনেমা সম্বন্ধে লেখে। এ সম্মানটা আমাদের যতদিন দেখাচ্ছে ততদিন সেটা নেব না কেন?

দ্বিতীয়তঃ এই ধরো তোমার মনিহারী দোকানে আমরা পাঁচজন যাই, দর কষাকষি করি নে। ঐ সময়ে গাঁয়ের খদ্দেরও ভয়ে বেশী দরদস্তুর করে না। ফলে তোমার দোকানের টোন্ অন্য দোকানের চেয়ে ভালো হয় নি—বুকে হাত দিয়ে কও! অন্য দোকানে এখনো মেছোহাটার দরাদরি—ভুল বললুম—মেছো হাটেও এখন দর-কষাকষি বিস্তর কমে গেছে, যবে থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী চাকর না পাঠিয়ে নিজেরা বাজার যেতে আরম্ভ করেছে। ভালো সাহিত্যিকরা—আমার কথা বাদ দাও—যতদিন 'জলসা'তে লিখবে ততদিন তো সে কুরুচির প্রশ্রয় দিতে পারবে না।

তৃতীয়তঃ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'কুন্তলীন' তেলের পুরস্কার পাবার জন্য সেখানে কম্পীট করেছিলেন। তেলের ব্যবসার দোকান ও ফিল্মের কাগজে তফাৎটা কি ?'

বাকিটা বলার পূর্বেই বাবাজী শুধালেন, 'আপনি কি রবীন্দ্রনাথ ?'

আমি তৈরী ছিলুম। বললুম, 'এর উত্তর আমি জানি, বাঙলা দেশ জানে—তুমি বুঝি জানো না—?'

সেই যে গল্প আছে ;—দুই বন্ধু রাস্তা দিয়ে যাবার সময় কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনে একজন ভয় পাওয়াতে অন্যজন সাহস দিয়ে বললে, 'ইংরিজী প্রবাদ জানিস,—"বার্কিং ডগ ডাজ নট বাইট"—যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে সে কামড়ায় না।' দ্বিতীয় জন বললে, 'প্রবাদটা তুই জানিস, আমিও জানি। কিন্তু কুকুরটা কি জানে ?' আমি রবীন্দ্রনাথ নই সে কথা আমি জানি, আমার পাঠক সম্প্রদায়ও জানে—এখন প্রশ্ন তুমি জানো কি না ?'

বাধা দিয়ে বললে, 'কিন্তু—?'

আমি বললুম, 'মেলা ঘেউঘেউ ক'রো না। শোনো।

চতুর্থতঃ তুমি ফিলিম দেখতে যাও, আর আমি ফিলিমের কাগজে লিখতে পারবো না ?

পঞ্চমতঃ তুমি জানলে কি করে আমি 'জলসা'য় লিখেছি ? লোকমুখে ?'

ছেলেটি সত্যবাদী। বললে, 'না, নিজে পড়েছি।'

আমি বললুম, 'লাও ! তুমি যে কাগজ পড় আমি সেটাতে লিখব না ? তবে কি তুমি 'জলসা'তে অশ্লীল লেখার সন্ধানে গিয়ে আমার লেখা পড়ে হতাশ হয়েছ ? তবে কি ফিল্মের কাগজে শ্লীল লেখা, তথাকথিত উচ্চাঙ্গ গবেষণা-মূলক (কিংবা মডার্ণ কবিতার উন্নাসিক) পত্রিকায় অশ্লীল লেখার চেয়ে ভালো ?'

'আপনি তো প্যারাডক্সে ফেললেন। সেই যে সোক্রাতিসের গল্প—'

আমি বললুম, 'কোন্‌টা ?'

এক গাল হেসে বললে, 'কেন ? আপনারই কাছ থেকে শোনা। নিরপরাধ সোক্রাতিসকে যখন বিষ খাইয়ে মারার সরকারী হুকুম হল তখন তার স্ত্রী ক্ষাণ্ডিপে কেঁদে বলেছিলেন, 'তুমি কোনো অপরাধ করো নি আর তোমার হল প্রাণদণ্ড।' সোক্রাতিস বললেন, 'তবে কি আমি অপরাধ করে মৃত্যুদণ্ড পেলে এর চেয়ে ভালো হত ?'

(পাঠক সম্প্রদায় আমার সূক্ষ্ম হাত-সাফাইটি লক্ষ্য করলেন কি ? ইদানীং আমার বদনাম হয়েছে যে, আমি একই কথা বার বার বলি। সেইটে পরের মুখে বলিয়ে অথচ নিজে শাবাশীটি কি কায়দায় নিলুম !)

তারপর বললুম, 'ষষ্ঠতঃ—থাক্ গে। প্রথম কারণটাই যথেষ্ট। ন্যায়শাস্ত্রও তাই বলে, 'প্রথম কারণ যথেষ্ট হলে অন্য কারণে যাবে না।' সেই ইরানী গল্পটি শোনো নি ?

অনেক কালের কথা। ইরানে তখন ইংরেজের এমনই আধিপত্য যে, হুকুম ছিল ইরানের বৃহত্তর বন্দরেও যদি ইংরেজের ক্ষুদ্রতম মালজাহাজ পৌঁছয়

তবে তার সম্মানে কামান দাগতে হবে। এখন হয়েছে কি, ঘটনাক্রমে একটি ইরানী ছোকরা ফরাসী দেশে লেখাপড়া সেরে এসে আপন দেশে ছোট্ট একটি বন্দরে প্রধান আপিসারের কর্ম পেয়েছে। ফরাসী দেশে সে আবার শিখে ফেলেছে মেলা বড় বড় কথা, 'সাম্য' 'মৈত্রী' 'স্বাধীনতা', আরো বিস্তর যা তা। মাথা গরম।

প্রথম দিনেই সেই বন্দরে এসেছে এক বিরাট মানওয়ারী জাহাজ—ব্যাটল-শিপ না কি যেন কয়! ছোকরা কামান দাগলে না, পাড়ে গিয়ে জাহাজের অভ্যর্থনা জানালে না।

আধঘণ্টা যেতে না যেতেই তার দফতরে দুম দুম করে ঢুকলেন জাহাজের এ্যাডমিরাল না কি যেন চাঁই আপিসার। মুখ লাল, গোঁফ লাল, দাঁত পর্যন্ত লাল।

ইরানী ইয়াংম্যান্। অতএব অতিশয় ভদ্র। দাঁড়িয়ে উঠে বিস্তর 'ব' জুর', ইত্যাদি জানালে। ইংরেজ শুধু চেঁচাচ্ছে "কামান দাগলে না কেন, ইউইউ—ইত্যাদি।"

ছোকরা বললে, "স্যার, ইয়োর অনার, একসেলেন্সি, শান্ত হয়ে বসুন। কামান না দাগার বাইশটি কারণ ছিল। না বসলে বলি কি করে?"

ইংরেজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের কামান দাগার মত চেঁচিয়ে বল্লে, "বলে যাও বাইশটা কারণ।"

ছোকরা বললে, "প্রথম কারণঃ বারুদ ছিল না।"

ইংরেজ ঝুপ করে চেয়ারে বসে পড়ে বললে, "ব্যস্! আর একুশটা কারণ বলতে হবে না। একটাই যথেষ্ট। বারুদ ছিল না, কামান দাগবে কি করে!"

তারপর বললুম, 'গল্পটা মনে রেখো। কাজে লাগবে। বিশেষ করে যখন তোমার হাতে থাকবে মাত্র একটি কারণ—বাইশটে নেই। সদম্ভে গল্পটি বলে এমন ভাবে তাকাবে যেন তোমার হাতে আরো পঞ্চশত তর্কবাণ ছিল!'

বাবাজী গলায় এক ঢোক চা ফেলে এমন ভাবে কোঁৎ করে গিললে যে, মনে হল আমার উপদেশটি ট্যাবলেটের মত সঙ্গে সঙ্গে পেট-তল করলে। তারপর শুধালে, 'আপনি ফিল্মী কাগজে লেখেন অথচ ফিল্ম্ দেখতে যান না, তার কারণটা কি?'

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে ভাবলুম। এ বিষয় নিয়ে এই যে আমি প্রথম ভাবলুম তা নয়। এবং এটা শুধুমাত্র একলা আমারই ভাবনা, তাও নয়।

বাবাজী ফের বললে, 'দিশী ফিলমের স্ট্যাণ্ডার্ড বিদেশীর মত নয় বলে?'

এটার উত্তর আমি জানি। বললুম, 'কে বললে তোমায় বিদেশী ছবির মান উঁচু? বিদেশী ছবির ভালোগুলো আসে এ দেশে। ওদেশের নিজের কনজম্পশনের ছবি তো তুমি দেখ নি। সেগুলো যে কী রদ্দি তা তো তুমি জানো না। আর ওরা ভাবে আমাদের সব ছবিই সত্যজিৎ রায়ের তৈরী।'

'তা হলে?'

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললুম, 'এ এক বিরাট সমস্যা। তার পুরো

ধাক্কা এদেশে এখনো এসে লাগে নি। ইয়োরোপ আমেরিকার গুণীজ্ঞানীরা রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, পঁচিশ বৎসর পরের ঐতিহাসিকরা কি শেষটায় বলবে, সভ্য মানুষের পতন আরম্ভ হয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে? এ যুগের সিনেমা, ট্র্যাশ নভেল, অশ্লীল সাহিত্য, বাচ্চাদের জন্য রগরগে খুন-ডাকাতির ছবির বই তো ছিলই—এখন এসে জুটেছে টেলিভিশন।'

'আইন করে বন্ধ করে দেয় না কেন?'

'আমেরিকাতে 'আমেরিকান সিভিল লিবার্টিস ইউনিয়ন' নামক একটি নাগরিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠান আছে। যখনই কোন অশ্লীল পুস্তক বা ঐ জাতীয় কোনো জিনিসের বিরুদ্ধে পুলিস মোকদ্দমা করে তখন ঐ প্রতিষ্ঠান এসে পুলিসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বলে, 'পুলিস সাহিত্যিকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে।' সরকার পক্ষের উকিল যখন প্রত্যুত্তরে বলেন, 'এসব রাবিশ সাহিত্য নামের উপযুক্ত নয়,' তখন অন্যপক্ষ বলে, 'সে হচ্ছে নিছক রুচির কথা।' বিপদ আরো এক জায়গায় রয়েছে। পুলিসপক্ষ এখনো এমন একটা সংজ্ঞা বের করতে পারে নি যা দিয়ে শ্লীল-অশ্লীলের পরিষ্কার পার্থক্য করা যায়। এ নিয়ে দুঃখ করে কি হবে! সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রেও এ নিয়ে বিস্তর আলোচনার পর গুণীরা এক মত হয়ে বলতে পারেন নি শ্লীল-অশ্লীলে পার্থক্য করা যায় কি প্রকারে—বলেছেন আমাদের বাঘা পণ্ডিত গোসাঁইজী। ইয়োরোপ আমেরিকায় আবার আরেক বিপদ। যাঁরা ডাহা অশ্লীল জিনিসের সামান্যতম প্রতিবাদ জানান তাঁদের বিরুদ্ধে অমনি 'মার মার কাট কাট' অট্টরব জেগে ওঠে—সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা গুটিকয়েক চোখাচোখা বাক্যবাণ শুনতে পান—'এরা প্রগতির শত্রু, এরা আর্টের শত্রু, স্বাধীনতার শত্রু।' এ পক্ষে যে সবাই স্বার্থপর নীচ লোক রয়েছে তা নয়। ভালো ভালো ডাক্তাররা বলেছেন, 'অশ্লীল সাহিত্য, খুনোখুনির ছবি ঐ সব জিনিস তৃষ্ণার্ত জনের নৈতিক স্বাস্থ্য উন্নতি হয় তো নাও করতে পারে কিন্তু ঐ সব দেখেশুনে তাদের নৈতিক ব্যালান্স্ অনেকটা রক্ষা পায়।' তখন প্রশ্ন উঠবে, 'কিন্তু যারা ওসব জিনিস সম্বন্ধে তৃষ্ণার্ত নয় তাদের হাতে পড়লে?' উত্তরে এঁরা বলেন 'তাদের যে কোনো ক্ষতি হয় সেটা তো কোনো সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কোনো কমিশন, কোনো তদন্ত করে সপ্রমাণ করতে পারেন নি।'

ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, আজ আমেরিকাতে অশ্লীল সাহিত্য বা ছবির বিরুদ্ধে কার্যত কোনো আইনই নেই। তাই সেদিন আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন কয়েকটি অতি-আধুনিক ছাত্র (এদের বলা হয় 'পোস্ট্-হাইব্রাও') একখানি অশ্লীল মাসিক বের করলে—অবশ্য তাদের মতে নয়, ভাইস চ্যান্সেলারের মতে—তখন তিনি কিছু না করতে পেরে ডাক বিভাগের শরণাপন্ন হলেন; তাদের পুরোনো ঝাঁপিতে একটি অতিপ্রাচীন রক্ষাকবচ আছে—'ডাক বিভাগ যদি মনে করেন কোনো চিঠি বা প্যাকেটে অশ্লীল বস্তু আছে তবে তাঁরা সেটি গ্রহণ করবেন না।' এই করে অন্তত কাগজটার প্রসার ঠেকানো গেল,

প্রচার বন্ধ হল না।

'সর্বনাশ! তা হলে উপায়? এদেশেও তাই হবে নাকি?'

'তুমি ভবিষ্যতের ভয় পাচ্ছো, এদিকে অনেকেই যে মনে করেন আমাদের দিশী ছবি যথেষ্ট—অথবা যথা-অনিষ্ট – অশ্লীল হয়ে বসে আছে তাদের কথা ভাবছো না কেন? আমি আদপেই অস্বীকার করছি নে যে আমাদের অনেক ছবিতে অশ্লীলতার ইঙ্গিত থাকে। কিন্তু আমাদের মডার্ন কবিতায় কোনো কোনো কবি যে 'আর্টে'র নামে অশ্লীলতার চরমে পেঁছিন তার বেলা কি? তোমার যদি মনে হয়, ফিল্ম্ ভেবেচিন্তে বাঁদর গড়ছে, গড়ুক। তোমার দেখবার ইচ্ছে নেই, না দেখলেই হল। কিন্তু কবিরা যে শিব গড়তে বাঁদর গড়েছেন সেখানে তুমি শিব দর্শনে গিয়ে পেলে বাঁদর—তার কি? তার তো কোনো সেনসর বোর্ড নেই। অথচ এরা তো রবীন্দ্র, রাজশেখর, সুকুমার রায়কে হটিয়ে দিতে পারেন নি; 'মনমোহন সিরীজে'র বিক্রী বেশী, না তারাশংকরের বেশী? আসলে শ্লীল হক অশ্লীল হক, যে বস্তু সত্য রসের (আর্টের) পর্যায়ে ওঠে না সেটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সংস্কৃত সাহিত্যে নিশ্চয়ই বিস্তর অশ্লীল বস্তু লেখা হয়েছিল—না হলে শ্লীল-অশ্লীল নিয়ে আলঙ্কারিকেরা আলোচনা করলেন কেন? তাই আজ আশ্চর্য হই, সে সব অশ্লীল বই টিকে রইল না কেন?

তার অর্থ এই নয়, অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আপত্তি করার কোনো প্রয়োজন নেই—অবশ্য তোমার যদি মনে হয় ফিলিমগুলোর অনেকটাই অশ্লীল। আমি অন্য কথাগুলো বললুম, যাতে করে তুমি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ না হও। গণতন্ত্র যখন করেছ তখন 'গণ-কলচর', 'গণ-সাহিত্য', 'গণ-ফিল্ম্' হবেই হবে। তার জন্য তৈরী থাকা উচিত। কিন্তু গণতন্ত্রের তুমি আমি দুজনেই যখন 'গণ', তখন আমারও আমাদের রুচি অনুযায়ী আমাদের যেখানে যেখানে বাধে সেখানে আপত্তি জানিয়ে যাব। আর সত্যজিৎ রায় তো আছেনই। তাঁর নীরব আপত্তিই তো সবচেয়ে জোরালো আপত্তি। আবার তিনিও যদি প্যুরিটানিজমের চূড়ান্তে পেঁছে শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে মানুষের অন্যতম ক্ষুধা—যে ক্ষুধাকে কবিরা যুগ যুগ ধরে সুন্দর মধুর রূপে প্রকাশ করেছেন—উপেক্ষা করেন, তবে তিনিও উপেক্ষিত হবেন। তার কারণ মানুষ অশ্লীলতা চায়, সে নয়। তার কারণ, কোনো জিনিসের চরমে পেঁছিলে সে জিনিস দিয়ে আর্ট হয় না।

তাই এক ফার্সী আলঙ্কারিক আর্টের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অন্যান্য নানা মূল্যবান কথার ভিতর বলেছেন,—আর্ট='সনাখতন-ই-হদ্-ই-হর চীজ'। এর সব কটি কথাই বাঙলায় চলে। সনাখ্তন্=সনাক্ত করা, চেনা, জানা, হদ্=হদ্দ, সীমা; হর=প্রত্যেক, চীজ=বস্তু, চীজ। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর সীমা কোন জায়গায় সেইটে বুঝে লেখাই আর্ট-সৃষ্টি করা।'

বাবাজী চলে যাওয়ার পর অলস কৌতুহলে একখানা ফরাসী মাসিক হাতে তুললুম। নাম 'প্রাভ' অর্থাৎ 'প্রমাণ'—বাঙলায় এ মাসিক বের করতে হলে নাম হবে 'প্রামাণিক'। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ইয়োরোপে যে 'কংগ্রেস ফর দি লিবার্টি অব্ কালচার' 'সংস্কৃতি স্বাধীনতা সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়, তার দশম অধিবেশন হয় বার্লিনে, এই জুলাই মাসে। যে অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ দেন বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক, সমাজতত্ত্ববিদ্ দেনিস দ্য রুজমোঁ—'প্রাভে'র আগষ্ট সংখ্যায় সেটি ছাপা হয়েছে। স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্যাখ্যান দিতে গিয়ে দ্য রুজমোঁ বলেছেন ঃ

এই যে আমরা প্রত্যেক জিনিসের 'চরমতম' চূড়ান্তে পেঁছে গিয়ে এক জিনিস থেকে অন্য জিনিস আহাম্মুখের মত আলাদা আলাদা করে রাখছি—একদিকে আর্টের সৌন্দর্যচর্চা অন্যদিকে দৈনন্দিন জীবনের শ্রীহীন আয়ুক্ষয়, একদিকে কঠিন পরিশ্রম অন্যদিকে গভীর মানসিক চর্চা, একদিকে বিমূর্ত সূক্ষ্ম জ্ঞানান্বেষণ অন্য দিকে টেকনিক্যাল ফলিত কর্ম,—এরা যে প্রতিদিন একে অন্যের দিকে তাকিয়ে বিকৃত মুখভঙ্গী করছে, এর অবসান হোক।

এর প্রয়োজন পশ্চিম মহাদেশেই বেশী। কিন্তু এখন সর্ব মহাদেশকে একত্র হয়ে তাদের আপন আপন সঞ্চয় বিশ্ববাসীর উপকারের জন্য তুলে ধরতে হবে ঃ—

ইয়োরোপের চিন্তাবৃত্তিজাত ফল (যার থেকে টেকনিক্যাল কর্মবুদ্ধি বেরিয়েছে),

আফ্রিকার প্রাণশক্তি (যা সে বাঁচিয়ে রেখেছে, আর সকলের চেয়ে ভালো, তার সঙ্গীত, নৃত্য, ছন্দ, অনুভূতির কল্যাণে),

ভারতের আত্মা—যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত তার ঐতিহ্যগত সম্পদ।

আমার মস্তকে বজ্রাঘাত! ওদিক ইয়োরোপ হাত পেতেছে আমাদের দিকে সর্বোত্তম সম্পদের জন্য—কে না জানে সর্বোত্তম সম্পদ আত্মার উপলব্ধি—আর এদিকে আমি মরছি আমেরিকার ভয়ে!!

নিরলঙ্কার

একটি লোকের কাছে আমি নানা দিক দিয়ে কৃতজ্ঞ ছিলুম। মাসাধিককাল আমি যখন টাইফয়েডে অজ্ঞান, সে তখন আমার সেবা করে বাঁচিয়ে তোলে। ভালো করেছে, কি মন্দ করেছে, সে অবশ্য অন্য কথা। আর শুধু আমিই না, আমাদের পার্ক সার্কাস পাড়ার বিস্তর লোক তার কাছে নানান দিক দিয়ে ঋণী। মাঝারি রকমের পাস-টাস দিয়েছে—পরীক্ষার ঠিক আগে তার জোর চাহিদা। বেশ দু' পয়সা কামায়—ধার চাইতে হলে ও-ই ফার্স্ট চইস। আর বললুম তো, রুগীর সেবায় ঝানু নার্সকে হার মানায়।

তার যে কেন হঠাৎ শখ গেল সাহিত্যিক হবার বোঝা কঠিন।

একটা ফার্স লিখেছে। তার বিষয়বস্তু ঃ ধনী ব্যবসায়ী তাঁর ম্যানেজারের উপর ভার দিয়েছেন, কলেজ-পাস মেয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে ইণ্টারভ্যু নিয়ে বর বাছাই করতে। নাটকের আরম্ভ ইণ্টারভ্যু দিয়ে। কেউ কবি, কেউ গবিতা লিখে গবি, কেউ ফিলিম স্টার—আরো কত কি।

পড়ে আমার কান্না পেল। দুই কারণে। অত্যন্ত প্রিয়জনের নিষ্ফল প্রচেষ্টা দেখলে যে রকম কান্না পায়, এবং দ্বিতীয়ত ঐ কথাটি ওকে বলি কি প্রকারে? ওটা কিছুই হয় নি, ওকে বলতে গেলে আমার মাথা কাটা যাবে। শেষটায় মাথা নিচু করে, ঘাড় চুলকে বললুম, 'বুঝলে, মামা, আমি ফার্স-টার্স বিশেষ পড়ি নি, দেখি নি আদপেই অথচ এ-সব জিনিস স্টেজে দেখার এবং শোনার।'

মামা সদানন্দ পুরুষ। একগাল হেসে বললে, 'যা বলেছিস। আমিও ঠিক তাই ভাবছিলুম।'

সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললুম।

ওমা, কোথায় কি। হঠাৎ পাড়ার চায়ের দোকানে শুনি মামার, ফার্স ট্যাংরা না বেনে-পুকুরে কোথায় যেন রিহার্সেল হচ্ছে। সর্বনাশ। বলি, 'ও চাটুয্যে, এখন উপায়?'

সোমেন যদিও নিকষ্যি, তবু কথা কয় কলকাতার খাস বাসিন্দা বনেদি সোনার বেনেদের মত। অর্থাৎ আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারে 'হুতোম' 'আলাল'কে আড়াই লেন্থ পিছনে ফেলে। দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত বের করে বললে, 'উপায় নদারদ্। দেখি নসিবে কি কি গর্দিশ আছে?'

তারপর মামা একদিন ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে ফার্স-অভিনয়ের লগ্ন রাঁদেভু বাৎলে গেলেন। ট্যাংরা, গোবরায় নয়! রাজাবাজারের কোন এক গলির ভিতরে।

চাটুয্যের বাড়ি মসজিদ বাড়ি স্ট্রীটে। ওখানে কখনো যাই নি। ভাবলুম, সেদিন ওখানেই আশ্রয় নেব। মামা সময় পেলেও আমাকে খুঁজে পাবে না।

চাটুয্যে তো আমাকে দেখে অবাক। ব্যাপার শুনে বললে, 'তা আপনি চা পাঁপড় খান আমাকে তো যেতেই হবে।' চাটুয্যে চাণক্যের সেই আইডিয়াল বান্ধব—রাজদ্বারে শ্মশানে ইত্যাদি। আর এটা যে মামার ফ্যুনরেল সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দ ছিল না।

ঘণ্টা দুই দাঁত কিড়মিড়ি দিয়ে বার বার রাজাবাজারের দৃশ্যটা মনশ্চক্ষু থেকে তাড়াবার চেষ্টা করলুম। কিছুতেই কিছু হল না। কোথাকার কে এক কবি বলেছে, সদ্য লাঞ্ছিত জন যে রকম বার বার চেষ্টা করেও অপমানের কটুবাক্য মন থেকে সরাতে পারে না।

এমন সময় চাটুয্যে এক ঢাউস প্রাইভিট গাড়ি নিয়ে উপস্থিত। তার সর্বাঙ্গ থেকে উত্তেজনা ঠিকরে পড়ছে। মুখে শুধু 'এলাহি ব্যাপার, পেল্লায় কাণ্ড।' বুঝলুম, মামাকে উদ্ধারের সৎকার্যে, কিংবা নিমতলার সৎকারে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু চাটুয্যে ঢাউস গাড়ি পেল কোথায়—পায় তো কুল্লে পঞ্চাশ টাকা, খাদি প্রতিষ্ঠানে।

গলির বাইরে থেকে শুনতে পেলুম তুমুল অট্টরব। বুঝলুম, গর্দিশ পেল্লায়।

ওমা, এ কি? কোথায় না দেখব, মামা লিনচুট্ হচ্ছে—দেখি, হাজার দুই লোক হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে, হেথা হোথা কেউ কেউ পেটে খিল ধরেছে বলে ডান দিক চেপে ধরে কাতরাচ্ছে, আরেক দঙ্গল লোক হাসতে হাসতে মুখ বিকৃত করে কাঁদছে। সে এক ম্যাস্ হিস্টিরিয়ার হাসির শেয়ার-বাজার কিংবা এবং রেসের মাঠ। হস্তেক চাটুয্যে হেঁড়ে গলায় চেঁচাচ্ছে, 'চাক্কু মারছে, চাক্কু মাইরা দিছে।'

ইতিমধ্যে ফার্স শেষ হয়েছে। মামাকে স্টেজে দাঁড় করানো হয়েছে। মামা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'এ সম্মান সম্পূর্ণ আমার প্রাপ্য নয়। বস্তুত সবটাই পাবেন, সুসাহিত্যিক আকাদেমি কর্তৃক সম্মানিত শ্রীযুত গজেন্দ্রশংকর সান্যাল। একমাত্র তাঁরই পরামর্শে আমি এটা স্টেজ করি। পাড়ার আর সবাই বলেছিল, এটা সাপ ব্যাঙ কিছুই হয় নি।'

বুঝতেই পারছেন, আমার নাম গজা সান্যাল। তখন আরেক ধুন্দুমার। আমার গলা জিরাফের মত হলেও অত মালার স্থান হত না। নিতান্ত রঙ্গদর্শী গৌরকিশোর সেখানে সেদিন উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে আমাকে সময়মত না সরালে, বঙ্গীয় পাঠক-মণ্ডলী উল্লিখিত 'কলকাতার কাছেই কবির মহাপ্রস্থান' বই থেকে বঞ্চিত হত।

বাড়ি ফেরার পরও আমার মাথা তাজ্জিম মাজ্জিম করছিল। নল ছেড়ে দিয়ে তলায় মাথা রেখে মনে মনে বললুম, 'অয়ি বাগেশ্বরী, তোমার সৃষ্টিরহস্য আমাকে একটু বুঝিয়ে বলো তো। মামার ঐ ফার্স পড়ে এ-পাড়ার সক্কলের তো কন্না পেয়েছিল। তবে কি পাড়ার মেধো ও-পাড়ার মধুসূদন?'

বিস্তর অলংকারশাস্ত্র পড়ে আমার মনে একটা আত্মম্ভরিতা হয়েছিল, আমি বলতে পারি কোন্ রচনা রসোত্তীর্ণ হয়েছে, কোন্টা হয় নি। এখন দেখি ভুল।

ভামহ, বামন, ক্রোচে, বের্গসোঁ, তাহা হোসেন, আবু সঈদ আইয়ুব সবাইকে পরের দিন বস্তা বেঁধে শিশি-বোতলওলার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলুম।

আমি জানি, আমার পাঠকমণ্ডলী অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'তোমার যেমন বুদ্ধি! পার্ক সার্কাসের রদ্দি বই পেল রাজাবাজারের সম্মান। আর তুমি তাই করলে বামন ভামহকে প্রত্যাখান! জৈসন্‌কে তৈসন্ শুঁটকিসে বেগন—যার সঙ্গে যার মেলে—শুঁটকির সঙ্গে বেগুনই তো চলে। রাজাবাজার পার্ক সার্কাসে গলাগলি হবে না?"

কথাটা ঠিক। ফার্সীতেও বলে,

স্বজাতির সনে স্বজাতি উড়িবে মিলিত হয়ে
পায়রার সাথে পায়রা শিকরে শিকরে লয়ে!
The same with same shall take its flight,
The dove with dove and kite with kite.
কুনদ্ হম-জিন্‌স্ বা হম্-জিন্‌স্ পরওয়াজ
কবুতর্ বা কবুতর্ বাজ্ বা বাজ্।

এসব অতিশয় খাঁটি কথা। কিন্তু প্রশ্ন, শেকসপীয়র মলিয়ের জনসাধারণের—রাজা-উজির গুণীজ্ঞানীর কথা হচ্ছে না—চিত্ত জয় করেছিলেন যে রস দিয়ে সেটি খুব উচ্চাঙ্গের রস? মাঝে মাঝে তো রীতিমত অশ্লীল। এবং শেকসপীয়র যে আজও খাতির পাচ্ছেন তার কারণ জনসাধারণ তিনশ বছর ওঁর নাটক দেখতে চেয়ে চেয়ে ওগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছিল বলে। শুধুমাত্র গুণীজ্ঞানীর কদর পেলে ওঁর নাট্য আজ পাওয়া যেত লাইব্রেরির টপ শেলফে—সেটা উচ্চাসন হলেও অপ্রয়োজনীয় বই-ই রাখা হয় সেখানে।

আরেকটা উদাহরণ দি: ওস্তাদ মরহুম ফৈয়াজ খানের শিষ্য শ্রীমান সন্তোষ রায়ের কাছে শোনা। রাস্তায় এক ভিখিরির গাঁইয়া গান শুনে ফৈয়াজ তাকে আদরযত্ন করে বাড়ি নিয়ে গিয়ে, তার সেই গাঁইয়া গানের এক অংশ শিখে নিয়ে, তাকে 'গুরুদক্ষিণা' দিয়ে বিদায় দিলেন। কয়েক দিন পরে সেই টুকরোটি তাঁর অতিশয় উচ্চাঙ্গ ওস্তাদী গানে বেমালুম জুড়ে দিয়ে বড় বড় ওস্তাদদের কাছে শাবাশী পেলেন—ওরকম ভয়ঙ্কর অরিজিনাল অলঙ্কার কেউ কখনো শোনে নি।

আরেকটি নিবেদন করি: মেজর জেনরল স্লীমান গেল শতাব্দীর গোড়ার দিকে এক রাত্রি কাটান দিল্লী থেকে মাইল দশেক দূরের এক গ্রামে। রাত্রে শোনেন ইঁদারা থেকে বলদ দিয়ে জল তোলার সময় এক চাষা অন্য চাষাকে মিষ্টি টানা সুরে 'হুঁশিয়ার', 'খবরদার,' 'সবুর' বলছে। পরদিন সেকথা এক ভারতীয় কর্মচারীর সামনে উল্লেখ করাতে সে বলল, 'তানসেন মাঝে মাঝে এখানে এসে এসব সুর শিখে নিয়ে আপন সৃষ্টিতে জুড়ে দিতেন।'

মামার ফার্সটা চেয়ে নিয়ে আবার নূতন করে পড়লুম। নাঃ! আমি ফৈয়াজ নই, তানসেনও নই। আর কোন বস্তুই আমার কোনো কাজে লাগে না। মামাকে দোষ দেওয়া বৃথা।

সমস্তটা ডাহা অন্‌রিয়েল. কোনো প্রকারের বাস্তবতা নেই কোনোখানে।

তখন মনে পড়লো ওস্কার ওয়াইল্‌ডের একটি গল্প। তিনি সেটি তাঁর সখা এবং শিষ্য আঁদ্রে জিদকে বলেছিলেন। তিনি সেটি ওয়াইল্‌ড সম্বন্ধে লেখা তাঁর 'ইন মেমোরিয়াম (সুভনীর)' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। নিজের ভাষায় গল্পটা বলি—ও বই পাই কোথায়?

গ্রামের চাষাভুষোরা এক কবিকে খাওয়াতো পরাতো। কবির একমাত্র কাজ ছিল সন্ধ্যের পর আড্ডাতে বসে গল্প বলা। চাষারা শুধতো, 'কবি আজ কি দেখলে?' আর কবি সুন্দর সুন্দর গল্প শোনাতো। রোজ একই প্রশ্ন। একদিন যখন ঐ শুধোলে, তখন কবি বললে, 'আজ যা দেখেছি তা অপূর্ব। ঐ পাশের বনটাতে গিয়েছিলুম বেড়াতে। বেজায় গরম। গাছতলায় যখন জিরোচ্ছি তখন, ওমা, কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ দেখি, একটা গাছের ফোকর থেকে বেরিয়ে এল এক পরী। তারপর আরেকটি, তারপর আরেকটি, ক'রে ক'রে সাতটি। আর সর্বশেষে বেরুলেন রানী। মাথায় হীরের ফুলে তৈরী মুকুট, পাখনা দুটি চরকা-কাটা-বুড়ীর সুতো দিয়ে তৈরী। হাতে সোনার বাঁশী। সাতটি পরীর চক্করের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাজাতে লাগল সেই সোনার বাঁশী।

তারপর নাচতে নাচতে তারা এগিয়ে চলল সাগরের দিকে। আমিও ঘাপটি মেরে পিছনে পিছনে। সেখানে গিয়ে এরা গান গেয়ে বাঁশী বাজিয়ে কাদের যেন ডাকলে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল সমুদ্রকন্যা। সবুজ তাদের চুল—তাই আঁচড়াচ্ছে সোনার চিরুনি দিয়ে। সন্ধ্যা অবধি, ভাই, তাদের গান শুনলুম, নাচ দেখলুম—তারপর তারা চাঁদের আলোয় মিলিয়ে গেল।'

সবাই বললে, 'তোফা খাসা, বেড়ে।

কবি রোজই এ রকম গল্প বলে।

একদিন হয়েছে কি, কবি গিয়েছে ঐ বনে, আর সত্য সত্যই একটা গাছের ফোকর থেকে বেরলো সাতটি পরী, তারা নাচতে নাচতে গেল সমুদ্রপারে, সেখানে জল থেকে বেরিয়ে এল সমুদ্রকন্যা। কবি একদৃষ্টে দেখলে।

সেদিন সন্ধ্যায় চাষারা নিত্যিকার মতো শুধোলে, 'কবি আজ কি দেখলে বলো।'

কবি গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'কিচ্ছু দেখি নি।'

অর্থ সরল। যে বস্তু মৃন্ময় রূপে চোখের সামনে ধরা দিল, সেটাকে নিয়ে কবি করবে কি? কবির ভুবন তো চিন্ময়, কল্পনার রাজ্য। বাস্তবে যে জিনিস দেখা হয়ে গেল তার ঠাঁই কল্পনা রাজ্যে, কাব্যের জগতে আর কোথায়। চার চক্ষু মিলনের পর বধূকে তো আর কল্পনা কল্পনায় তিলোত্তমা বানিয়ে বেহশ্‌তের হুরীপরীর শামিল করা যায় না।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে ওয়াইল্‌ডের আরেকটি ফরিয়াদ, সৃষ্টিতে আছে শুধু একঘেয়েমি। প্রকৃতি বিস্তর মেহনৎ করে যদি একটি ফুল ফোটায় (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে/ধরণীর তলে/,ফুটিয়াছে এ মাধবী/,) তবে বার বার তারই পুনরাবৃত্তি করে, অপিচ কবির সৃষ্টি নিরঙ্কুশ একক, সৃষ্টিকর্তারই মত একমেবাদ্বিতীয়ম্‌, এক জিনিস সে দুবার করে না, অন্যের নকল তো করেই না, নিজেরও কার্বনকপি হতে চায় না।

ওয়াইল্‌ডের বহুপূর্বে জর্মন কবি শিলার বলেছিলেন, 'প্রকৃতি প্রবেশ করা মাত্র কবি অন্তর্ধান করেন।'

আর রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে কি বলেছেন, সেকথা অন্যত্র বলার সুযোগ আমার হয়েছে। পুনরাবৃত্তির ভয় বাধ্য হয়ে বর্জন করে বলছি, তিনি প্রকৃতির সওগাৎ কদম ফুল দেখে বলেছেন, ওটা ঋতুস্থায়ী, আর আমার সৃষ্টি অজরামর,

আজ এনে দিলে হয়তো দেবে না কাল
রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল
এ গান আমার শ্রাবণে শ্রাবণে
তব বিস্মৃতি স্রোতের প্লাবনে
ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী
বহি তব সম্মান।

এ আবার কি রকমের সম্মান হল!

প্রকৃতিকে সব কবি হেনস্তা করার বর্ণনা দেবার পর, আবার ক্ষণতরে ওয়াই-

লণ্ডে ফিরে যাই।

আচ্ছা, মনে করুন, ওয়াইলণ্ডের সেই গ্রাম্য কবি যদি চাষাদের একদিন বলতো, 'আজ ভাই, আবার সেই বনে গিয়েছিলুম। দেখি, গাছতলায় বসে এক পথিক তার সঙ্গীকে বলছে, সে তার পুরনো চাকরকে নিয়ে তীর্থ করতে যায়, সেখানে চাকরটা মারা যায়; তাই নিয়ে সে বিস্তর আপসা-আপসি করছিল।'

চাষারা নিশ্চয়ই ঠোঁট বেঁকিয়ে বলতো, 'এতে আবার বলার মত কি আছে —এতো আকছারই হচ্ছে।'

কিন্তু মনে করুন তখন যদি কবি, 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটি আবৃত্তি করতো? বিষয়বস্তু উভয় ক্ষেত্রে একই।

কবিতাটিতে যে অতি উত্তম রসসৃষ্টি হয়েছে সে সম্বন্ধে এ-যাবৎ কেউ কখনো সন্দেহ করে নি।

অথচ ওয়াইলণ্ড বর্ণিত কবির 'পরী-সিন্ধুবালা' অবাস্তব, 'পুরাতন ভৃত্যে'র বিষয়বস্তু অতিশয় বাস্তব। 'পুরাতন ভৃত্য' মনে না ধরলে 'দেবতার গ্রাস' নিন। সেটা তো অতিশয় বাস্তব—আইন করে বন্ধ করতে হয়েছিল, পরীর নাচ বন্ধ করার জন্য আইন তৈরী হয় না।

তা হলে দাঁড়ালো এই, বাস্তব হোক, কাল্পনিক হোক—প্রাকৃত হোক, অতি-প্রাকৃত হোক—যে কোনো বিষয়বস্তু রসোত্তীর্ণ হতে পারে যদি—

এইখানেই আলঙ্কারিকদের ওয়াটারলু। কি সে জিনিস, কি সে যাদুর কাঠি, কি সে ভানুমতীর মন্ত্র যার পরশ পেয়ে পুরাতন ভৃত্য আর বনের পরী কাব্যরসাঙ্গনে একই তালে, একই লয়ে চটুল নৃত্য আরম্ভ করে? কিংবা বাস্তবে না নেচেও কাব্যেতে নাচা হয়ে যায়? যথা—

জোন বললে,—'চ্যাটার্জি, এই আনন্দের দিনে তুমি অমন গ্লাম হয়ে ব'সে থেকো না, আমাদের নাচে যোগ দাও।'

বললুম,—'মাদার লক্ষ্মী, আমার কোমরে বাত। নাচতে কবিরাজের বারণ আছে।'

(শুনুন কথা! পৃথিবর উপরে—হাউ অন্ আর্থ—কবিরাজ কি করে কল্পনা করতে পারে যে, ষাট বছরের বুড়া গাঁইয়া চাটুয্যের বলড্যান্সের অভ্যাস আছে; আগে-ভাগে বারণ করে দিতে হবে!)

'ভনুমতী' বলে ভালোই করেছি। ম্যাজিকের জোরেই শরৎকালে আম ফলানো যায়। দীপক গেয়ে আগুন ধরানো যায়, মল্লার গেয়ে বৃষ্টি নামানো যায়। কিন্তু সত্য সঙ্গীতজ্ঞ নাকি তাতে কণামাত্র বিচলিত না হয়ে বলেন, 'এর চেয়ে ঢের বেশী সার্থক হবে সঙ্গীত যদি সদ্য-বিধবাকে সান্ত্বনা দিতে পারে, স্বাধিকারপ্রমত্তকে শান্ত করতে পারে।'[১] এবং কিছু না করেও যে সার্থক সঙ্গীত হতে পারে সে তো জানা কথা।

১ ধর্মজগতেও এই ম্যাজিকের বড় সম্মান। সাধু সম্বন্ধে যদি গ্রামে রটে তিনি লোহাকে সোনা করতে পারেন, তবে এ বিষয়ে নির্লোভজনও তার

আর্টে এই ম্যাজিক জিনিসটির সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ :—

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা
ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি,
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর
সাতটি যেন পোষা পাখি।
শাণিত তরবারি গলাটি যেন,
নাচিয়া ফিরে দশদিকে,
কখন কোথা যায় না পাই দিশা,
বিজুলি হেন ঝিকমিকে।
আপনি গড়ি তোলে বিপদজাল
আপনি কাটি দেয় তাহা।
সভার লোকে শুনে অবাক মানে,
সঘনে বলে, বাহা বাহা ॥

এখানে বিশেষ করে লক্ষ্য করবার জিনিস, সভার লোকে 'বাহা বাহা' বলছে, কেউ কিন্তু 'আহা আহা' বলে নি।

পার্থক্যটা কোথায় ?

দড়ির উপর নাচ দেখে বলি 'বাঃ', যাদুকর যখন চিরতনের টেক্কাকে ইস্কাপনের দুরি বানায় তখন বলি 'বা রে—'কাশীনাথ যখন গানের টেকনিক্যাল স্কিল (ম্যাজিক) দেখায় তখন বলি, 'বাঃ', কিন্তু যখন কবি গান,

'তোমার চরণে আমার পরানে,
লাগিল প্রেমের ফাঁসি—'

তখন মনে হয়, যেন আমারই বিরহতপস্যাশ্রান্ত ভালে প্রিয়া তাঁর আপন কণ্ঠের যূথীরমালে আমার সর্ব দহনদাহ ঘুচিয়ে দিলেন। চরম পরিতৃপ্তিতে হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে বেরিয়ে আসে, 'আ—আ—হ !'

আশ্চর্য হলে বলি 'বাঃ', পরিতৃপ্তি হলে বলি 'আহ্'। ম্যাজিক 'বাম্বা-

কাছে ধর্মোপদেশ চায়—যেন যে ম্যাজিক দেখায়, সে বুঝি ধর্মও বোঝে। রাজা রামমোহনের সঙ্গে খৃষ্টানদের ঐ নিয়ে বেধেছিল। তিনি খৃষ্টের অলৌকিক কর্মে (জলকে মদে পরিবর্তন করা ইত্যাদি) বিশ্বাস করতেন না। মুসলমানদের ভিতর দুই দল আছেন। একদল বলেন, হজরৎ মুহম্মদ অলৌকিক কর্ম দেখাতে রাজী হতেন না, বলতেন, 'আমি যা বলেছি সেইটা সত্য না মিথ্যা যাচাই করে নাও।' কোনো এক সাধু নাকি ত্রিশ বৎসর সাধনার পর পায়ে হেঁটে নদী পেরোতে পারতেন। তাই শুনে কবীর বলেছিলেন, 'এক পয়সা দিয়ে যখন খেয়া পার হওয়া যায়, তখন ঐ মূর্খের ত্রিশ বৎসরের সাধনার দাম তো এক পয়সা !'

রস বিচারেও বলা যেতে পারে, একটি কাঠি দিয়েই যখন সব কটা প্রদীপ জ্বালানো যায়, তখন ওর জন্যে সঙ্গীতে ত্রিশ বৎসর সাধনা করার কি প্রয়োজন ?

বাব্বা', আর্টে 'আহাহা !'

'হাঁ'-কে 'না' করা, 'না'-কে 'হাঁ' করা কঠিন নয়, কিন্তু উভয়কে মধুরতর করাই আর্ট, সেইটে কঠিন, ঐটেই আলংকারিকদের ওয়াটারলু। এবং সব চেয়ে কঠিন, মধুরকে মধুরতর করা। ফুল তো সুন্দর, তাকে সুন্দরতর করা যায় কি করে ? স্বয়ং খৃষ্ট বলেছেন, লিলিফুলকে তুলি দিয়ে রঙ মাখায় কে ?'

অথচ জাপানী শ্রমণ রিয়োকোয়ান রচলেন—

কি মধুর দেখি রেশমের গাছে
ফুটিয়াছে ফুলগুলি
কোমল পেলব করিল তাদের
ভোরের কুয়াশা তুলি।

কি সে ভোরের কুয়াশা তুলি যা সব-কিছুকে মধুর মেদুর, কোমল পেলব করে দেয় ?

দৃষ্টান্ত দেই :—

প্রাচ্য ভূখণ্ড হইতে পবন আসিয়া আমাকে দোদুল্যমান করাতে আমি মুগ্ধ হইয়া 'আ মরি, আ মরি' বলিতেছি—

কবির তুলির পরশ পেয়ে হয়ে যায়; 'পুব হাওয়াতে দেয় দোলা মরি মরি'—

আমি বললুম, সব বনে ছায়া ক্রমে ক্রমে ঘন হইতে ঘনতর হইতেছে—

কবির তুলি লাগাতে হল, 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে।'

কিংবা আমি বললুম, শুক্লপক্ষের পঞ্চদশী রাত্রে পথ দিয়া যাইবার সময় যখন চন্দ্রোদয় হইয়াছে, তখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল ; তাহাকে কি শুভলগ্ন বলিব, জানি না।

'যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে
চাঁদ উঠেছিল গগনে।
দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে
কী জানি কী মহা লগনে।'

পাঠক হয় তো বলবেন, 'তুমি বলেছ গদ্যে,—সে যেন পায়ে চলা ; আর কবি বলেছেন ছন্দে—সে যেন নাচা।'

উত্তম প্রস্তাব। ছন্দে বলি,

পথিমধ্যে তোমার সঙ্গে
পূর্ণিমাতে দেখা
বলবো একে মহা লগন
ছিল ভালে লেখা।

কবিতা হল, কিন্তু রসসৃষ্টি হল না।

আর নিখুঁত, নিটোল ছন্দ মিল হলেই যদি কবিতা হয় তবে নিচের কবিতা-টির নোবেল প্রাইজ পাওয়ার কথা :—

হর প্রতি প্রিয় ভাষে কন হৈমবতী
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি।
কোন গ্রহ রাজা হৈল কেবা মন্ত্রিবর
প্রকাশ করিয়া তাহা কহ দিগম্বর!

অলংকারের দিক দিয়ে কবিতাটি দিগম্বরই বটে।

এই যে তুলি সব-কিছু মধুময় করে তোলে, কি দিয়ে এ বস্তু তৈরী, কি করে এর ব্যবহার শিখতে হয়? এ কি সম্পূর্ণ বিধিদত্ত না পরিশ্রম করে এর খানিকটে আয়ত্ত করা যায়?

ঘটিতে টোল দেখলে চট করে টের পাই, কিন্তু নিটোল ঘটি বানাই কি করে?

আর এই তো সেই তুলি সে যখন আপন মনে চলে তখন সে গীতিকাব্য—লিরিক—'মেঘদূত'। যখন ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত, চরিত্রের ক্রমবিকাশের উপর এর ছোঁয়া লাগে সে তখন কাব্য—'রঘুবংশ'। যখন ধর্মকে ছুঁয়ে যায় সে তখন 'গীতা', 'কুরান', 'বাইবেল'।

আচার্য তেজেশচন্দ্র সেন

রবীন্দ্রনাথ গত হলে বোম্বাইয়ে তাঁর স্মরণে সম্মিলিত এক শোকসভায় শুনতে পাই, 'আসুন আমরা রবীন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুতে—'

সেই সর্বব্যাপী শোকের মাঝখানে ঐ 'অকালমৃত্যু' কথাটি শুনে কারো কারো অধরপ্রান্তে ম্লান হাসির সামান্যতম রেখাটি ফুটে উঠেছিল। সকলেই বোধ হয় ভেবেছিলেন, আশীতে পরলোকগমন ঠিক অকালমৃত্যু নয়!

আমি কিন্তু সচেতন হলুম—সত্যই তো, যদিও মহিলাটি হয়তো চিন্তা করে অকালমৃত্যু বাক্যটি ব্যবহার করেন নি, কথাটি অতিশয় সত্য। যে-কবি প্রতিদিন নিত্য নবীনের সন্ধানে তরুণের ন্যায় উদ্‌গ্রীব, তাকে নব নব রূপে-রসে পরিবেশন করার সময় যাঁর লেখনীতে নবীন অভিজ্ঞতা ও প্রাচীন প্রকাশ-দক্ষতা সমন্বিত হয়, চৈতন্যহীন হওয়ার কয়েক দণ্ড পূর্বেও যিনি অধ্যাত্মলোকে এক নবীন জ্যোতির সন্ধান পেয়ে সে-জ্যোতি কখনো ছন্দ মেনে, কখনো মিল না মেনে তারই উপযোগী ভাষায় প্রকাশ করার সময় কঠিন রোগপীড়ন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন, যিনি আরো দীর্ঘ সুদীর্ঘকাল অবধি আরো নবীন নবীন অভিজ্ঞতার জন্যে প্রস্তুত—আশী কেন দুই শতেও তাঁর লেখনী স্তব্ধ হলে সে মৃত্যু অকালমৃত্যু। পক্ষান্তরে সাহিত্যের ইতিহাসে এমন বহু কবির উল্লেখ পাই, যাঁদের সৃষ্টিসত্তার মৃত্যু হয়েছে চল্লিশে—দেহত্যাগ যদিও তাঁরা করেছেন নব্বুইয়ে।

আচার্য তেজেশচন্দ্রের দেহত্যাগ একাত্তরে হয়েও সেটা অকাল দেহত্যাগ। তিনি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বিধিদত্ত অদ্ভুত অদ্ভুত ক্ষমতা নিয়ে জন্মান নি, কিন্তু

এ কথা কেউ অস্বীকার করবেন না, সৃষ্টিকর্তা এই সংসার রঙ্গমঞ্চে যে পার্টে তাঁকে পাঠিয়েছিলেন, সেটি তিনি প্রতিদিন অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্‌যাপন করার পর প্রতি রাত্রে প্রস্তুত হতেন আগামী প্রাতে সেই অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য।

তেজেশচন্দ্রের সহকর্মী মৌলানা জিয়াউদ্দিনের স্মরণে উভয়ের গুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—

কারো কবিত্ব, কারো বীরত্ব,
কারো অর্থের খ্যাতি—
কেহ-বা প্রজার সুহৃদ্‌ সহায়
কেহ-বা রাজার জ্ঞাতি—

এবং তার পর সামান্য একটু পরিবর্তন করে কবির ভাষাতেই তেজেশচন্দ্রের উদ্দেশে বলি,—

তুমি আপনার শিষ্যজনের
প্রশ্নেতে দিতে সাড়া,
ফুরাতে ফুরাতে রবে তবু তাহা
সকল খ্যাতির বাড়া।

বাস্তবিক এই একটি লোক তেজেশচন্দ্র, যাঁকে স্বভাব-কবির মত স্বভাব-গুরু বা জন্ম-গুরু বলা যেতে পারে। সত্তরেও তাঁর মৃত্যু অকালমৃত্যু।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ষোল-সতের বৎসর বয়সে তিনি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে আসেন। আশ্রম-স্থবিররা কেউই ঠিক বলতে পারেন না, তিনি এখানে গুরুরূপে না শিষ্যরূপে এসেছিলেন। তবে এ-কথা সত্য, অল্পদিনের ভিতরই তিনি শিক্ষকতা আরম্ভ করে দেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ষোল বৎসরের বালক জানেই বা কি—কটা পাস দিয়েছে, সেটা না-হয় বাদই দেওয়া গেল—পড়াবেই বা কি?

এ-প্রথা এদেশে অপ্রচলিত নয়। গুরুগৃহে বিদ্যাসঞ্চয় করার সময় কনিষ্ঠকে বিদ্যাদান করার প্রথা এদেশে আবহমানকাল থেকে চলে আসছে। গ্রামের পাঠশালাতে এখনো 'সর্দার পড়ুয়া' নিচের শ্রেণীতে পড়ায়।

তারপর তিনি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করেছেন। এত দীর্ঘ-কাল ব্যাপী অধ্যাপনা নাকি পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

শুনেছি, শান্তিনিকেতন বিহঙ্গশাবক যখন একদিন পক্ষবিস্তার করে মহানগরীর আকাশের দিকে তাকালে—অর্থাৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে চাইলে—তখন তেজেশচন্দ্র নাকি কুণ্ঠিত স্বরে রবীন্দ্র-নাথকে বলেছিলেন, 'আমি তাহলে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে পাসটাসগুলো করি।' রবীন্দ্রনাথ নাকি হেসে বলেছিলেন, 'ওসব তোমাকে করতে হবে না!'

কিন্তু এই পঞ্চাশ বৎসরের স্বাধ্যায়লব্ধ বিষয়বস্তু কি?

সঙ্গীতে তার বিধিদত্ত প্রতিভা ছিল। তিনি বেহালা বাজাতে পারতেন। ওদিকে শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ বিলাতি বাদ্যযন্ত্র বর্জন করেছিলেন। একমাত্র

তেজেশচন্দ্রকেই দেখেছি রবীন্দ্রনাথের সামনে যখন দিনেন্দ্রনাথ বর্ষামঙ্গল বসন্তোৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের সমবেত সঙ্গীত পরিচালনা করতেন, তখন তেজেশচন্দ্র বেহালা বাজাতেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরলিপি, গায়নপদ্ধতি গায়কী ঘরানা নিয়ে কিছুদিন ধরে যে ভুতের নৃত্য আরম্ভ হয়েছে, তার ভিতরে তিনিই ছিলেন বিজ্ঞ রবীন্দ্র-সঙ্গীতসুরজ্ঞ। তাঁর নাম কেউ করেন নি—তিনিও তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বেঁচেছিলেন।

সাহিত্যে তাঁর প্রচুর রসবোধ ছিল। ১৯১৯/২০ সালে যখন শান্তিনিকেতনে ফরাসী ভাষা শিক্ষার সূত্রপাত হয় তখন তিনি অগ্রণী হয়ে, ফরাসী শিখে আনাতোল ফ্রাঁসের রচনা বাঙলার অনুবাদ করেন ও তখনকার 'শান্তিনিকেতন' মাসিক পত্রিকায় পর পর প্রবন্ধ লেখেন। সুদূরে শ্রীহট্টে বসে সেগুলো পড়ে আমি বড়ই উপকৃত হই। এই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম চিন্ময় এবং বাঙ্ময় পরিচয়।

শান্তিনিকেতন প্রধানত সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলার পীঠভূমি। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে একাধিকবার ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন যে তিনি অর্থাভাবে এখানে সামান্যতম লেবরেটরি নির্মাণ করে বিজ্ঞান-চর্চার কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন নি। তাঁর সে শোক কথঞ্চিৎ প্রশমিত করেছিলেন, জগদানন্দ রায় ও তেজেশচন্দ্র সেন। বিজ্ঞানাগার ছাড়াও কোনো কোনো বিজ্ঞান অন্তত কিছুটা শেখা যায়। উদ্ভিদবিদ্যা ও বিহঙ্গজ্ঞান। আরও একাধিক সম্পূর্ণ বিজ্ঞান তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, কিন্তু ঐসব বিষয়ে আমার কণামাত্র সঞ্চয় নেই বলে, তেজেশ-চন্দ্রের প্রতি অবিচার করার ভয়ে নিরস্ত হতে হল।

এই সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করার সময় তেজেশচন্দ্রের সম্মুখে অহরহ থাকতো তাঁর ছাত্রসমাজ। সাধক মাত্রই চারুসর্বাঙ্গ অমূর্ত জ্ঞানের সন্ধান করেন-- তেজেশচন্দ্রও তাই করতেন—কিন্তু তিনি বার বার সেই ছাত্রসমাজকে স্মরণ করে তাদের যা দরকার, তার বাইরে সহজে যেতে চাইতেন না। তিনি তাঁর জীবনসাধনা দিয়ে প্রমাণ করেছেন, মানুষের শক্তি অসীম নয়, ছাত্রসেবাই যদি করতে হয়, তবে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে অন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করবে।

তাঁর বহু শিষ্যই জানতো, তিনি বিজ্ঞানের গভীর থেকে মুক্তা আহরণ করে তাদের সামনে ধরেছেন—পরবর্তীকালে ভালো ভালো বিজ্ঞানাগার থেকে এম. এস-সি পাস করার পর অনেকেই সেটা আরো পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছে। এদের কেউ কেউ যখন সাংবাদিক-জগতে প্রবেশ করল, তখন তাদের অনুরোধের তাড়নায় তিনি সেগুলি প্রবন্ধাকারে লিখে দেন। 'আনন্দবাজারে' 'দেশে' তাঁর প্রচুর লেখা বেরিয়েছে। এই তো সেদিন মাত্র কলকাতা থেকে আমার উপর তাগিদ এল, তেজেশবাবুর পিছনে লেগে থাকো, যতক্ষণ না তাঁর লেখাটি শেষ হয়।

ছেলেবেলায় আমরা এই শান্তিনিকেতনে দেখেছি ছাতিমফুল, শালফুল আর বকুল। খোয়াইভাঙাতে আনন্দ। তাই এই তিনটি প্রথমোক্ত কবিজনবল্লভ পুষ্প-বন্দনা যখন নিতান্তই শেষ হয়ে গেল, তখন রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

'যেদিন প্রথম কবি-গান
বসন্তের জাগাল আহ্বান
ছন্দের উৎসব সভাতলে,
সেদিন মালতী যূথী জাতি
কৌতূহলে উঠেছিল মাতি
ছুটে এসেছিল দলে দলে।
আসিল মল্লিকা চম্পা কুরুবক
কাঞ্চন করবী
সুরের বরণমাল্যে সবারে
বরিয়া নিল কবি।
কী সংকোচে এলে না যে,
সভার দুয়ার হল বন্ধ
সব পিছে রহিল আবদ্ধ।

মোটামুটি ঐ সময়ে হঠাৎ দেখা গেল, তেজেশচন্দ্র সেন মাথায় সাঁওতালি টোকা, হাতে নিড়েন নিয়ে ১১৪ ডিগ্রী গরমে আশ্রমের সর্বত্র খোঁচাখুচি আরম্ভ করেছেন। কি ব্যাপার? তিনি তাঁর ষোল বৎসরের সঞ্চিত উদ্ভিদবিদ্যা কাজে লাগিয়ে হাতে-নিড়েনে দেখিয়ে দেবেন, এই কাঁকর-বালি-উই-পাথর, ক্ষণে জলাভাব ক্ষণে অতিবৃষ্টির খোয়াইভাঙাতেও মরসুমী ফুল ফোটানো যায়। বাধ্য হয়ে 'আকন্দে' যাবার প্রয়োজন নেই।

আজকের লোক এ সব সহজে বিশ্বাস করবেন না। এখানে এখন ভারতের সব ফুল তো ফোটেই, তার ওপর ফোটে নানা বিদেশী ফুল, এমন কি অযত্নে আগাছার মত - রবীন্দ্রনাথের বহু বিদেশী শিষ্য-সখা এগুলো নানা দেশ থেকে তেজেশচন্দ্রের কৃতকার্যতার পর এখানে পাঠাতে আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথের 'বনবাণী'তে তার অনেকখানি ইতিহাস আছে। আজ যে 'উত্তরায়ণে' এত ফুলের বাহার, সেটা সম্ভব হল তেজেশচন্দ্রের পরীক্ষা সফল হল বলে।

বোধ হয় এই সফলতা জানিয়েই তিনি রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন। প্রভাত মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র-জীবনীতে লিখেছেন, 'ভিয়েনা প্রবাসকালে কবিকে শান্তিনিকেতন হইতে তথাকার পুরাতন শিক্ষক তেজেশচন্দ্র সেন গাছপালা সম্বন্ধে কতকগুলি রচনা পাঠাইয়া দেন। তাহার উত্তরে (২৩ শে অক্টোবর, ১৯২৬) কবি লিখিতেছেন, "তোমার লেখাগুলির মধ্যে শান্তিনিকেতনের গাছপালাগুলি মর্মরধ্বনি ক'রে উঠচে! তাতেই আমার মন পুলকিত করে দিল।" পরবর্তী কালে তাঁর উদ্দেশে আবার লিখেছেন,

'একথা কারো মনে রবে কি কালি,
মাটির পরে গেলে হৃদয় ঢালি।'

কার্তিকের বউ কলাগাছ। অকৃতদার তেজেশচন্দ্র বরণ করেছিলেন একটি তালগাছকে। আমার মনে হয় শান্তিনিকেতনের প্রতীক সপ্তপর্ণী না হয়ে তালগাছ হওয়া উচিত। এখানকার আদিম ছাতিম গাছটি খুঁজে বের করতে হয়।

অথচ এখানে পেঁছিবার বহু পূর্বেই দূর থেকে দেখা যায়, আশ্রমের এদিক-ওদিক সারি সারি তালগাছ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে দিগন্তের পানে তাকিয়ে আছে অপ্রত্যাশিত মিত্রের আগমন আশংকায়। তালগাছগুলি যে যুগের, তখন বীরভূমে ডাকাতের অনটন ছিল না। দ্বিজেন্দ্রনাথকে বলতে শুনেছি (১৯২৫) তিনি যখন চল্লিশ বৎসর পূর্বে এদেশে প্রথম আসেন, তখনো ঐ তালগাছ-গুলোর ঐ উচ্চতাই ছিল।

শান্তিনিকেতনে বোধ হয় এমন কেউ আসেন নি যিনি, একটি তালগাছকে ঘিরে গোল একখানা কুটির দেখেন নি। মন্দিরে উত্তর-পূর্ব কোণে, ডাকঘরের প্রায়-মুখোমুখি। এটি তেজেশচন্দ্রের নীড়।

রবীন্দ্রনাথের 'বনবাণী'তে একটি কবিতা আছে 'কুটিরবাসী'। কবিতাটির ভূমিকা-স্বরূপ তিনি লেখেন,

তরুবিলাসী আমাদের এক তরুণ বন্ধু এই আশ্রমের কোণে পথের ধারে এক খানি গোলাকার কুটির রচনা (এখানে লক্ষণীয় নির্মাণ নয়—'রচনা') করেছেন। সেটি আছে একটি পুরাতন তালগাছের চরণ বেষ্টন ক'রে। তাই তার নাম হয়েছে তালধ্বজ। এটি যেন মৌচাকের মতো নিভৃতবাসের মধু দিয়ে ভরা। লোভনীয় বলেই মনে করি, সেই সঙ্গে এও মনে হয়, বাসস্থান সম্বন্ধে অধিকার-ভেদ আছে ঃ যেখানে আশ্রয় নেবার ইচ্ছা থাকে সেখানে হয়তো আশ্রয় নেবার যোগ্যতা থাকে না।'

তেজেশ-শিষ্যমণ্ডলীর কাছে 'কুটিরবাসী' কবিতাটি সুপরিচিত। এর দুটি পাঠ আছে। পাঠকমাত্রকেই এ-দুটি মর্মস্পর্শী কবিতাটি পড়তে অনুরোধ করি। আমি মাত্র কয়েকটি ছত্র তুলে দিচ্ছি—

'তোমারি মত তব
কুটিরখানি,
স্নিগ্ধ ছায়া তার
বলে না বাণী।
তাহার শিয়রেতে তালের গাছে
বিরল পাতা ক'টি আলোয় নাচে,
সম্মুখে খোলা মাঠ
করিছে ধু-ধু
দাঁড়ায়ে দূরে দূরে
খেজুর শুধু।
কীর্তিজালে ঘেরা আমি তো ভাবি
তোমার ঘরে ছিল আমারো দাবি ;
হারায়ে ফেলেছি সে
ঘূর্ণিবায়ে,
অনেক কাজে আর,
অনেক দায়ে।'

যাঁর সরল, নিষ্কাম জীবন দেখে বিশ্বকবি পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে আপন মনে নিজের সম্বন্ধে জমা-খরচ নিতে গিয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের আর বেশী কিছু বলার কি থাকতে পারে ?

শুধু এইটুকু বলি—তেজেশচন্দ্র নির্জন লোকচক্ষুর অগোচরে থাকতে ভালোবাসতেন। তাই যাবার সময়ও তিনি সকলের অগোচরে চলে গেলেন। ভোরবেলা জাগতে গিয়ে দেখা গেল, লোকচক্ষুর অগোচরে তিনি চলে গিয়েছেন।

নাত্যুচ্চশিক্ষা

এদেশে ছেলেদের প্রায় সবাই ম্যাট্রিক পাসের পর কলেজ পানে ধাওয়া করে। তার কারণ কি এদেশের গুণীজ্ঞানীরা 'উচ্চশিক্ষা চাই' 'উচ্চশিক্ষা চাই' বলে বড্ডবেশী চেচামেচি করেছেন বলে! তাঁরা তো আরো বেশী হট্টগোল করে বলেন, 'সিনেমা ফুটবলে অত বেশী যাস নি', 'রকবাজি কমা', 'পরীক্ষার হলে আসবাব পত্র ভাঙিস নি', কই, কেউ তো শোনে না। উচ্চশিক্ষার বেলাতেই হঠাৎ তাদের অত্যধিক মুরুব্বী-মহব্বৎ বেড়ে যাবে এ-কথা তো চট করে বিশ্বাস করা যায় না। আসলে তারা কলেজ পানে ধাওয়া করে দুই কারণে,

(ক) ম্যাট্রিক পাস করার পর অন্য কিছু করার নেই বলে, এবং

(খ) চাকরি পেতে হলে বি এ-টা অন্তত থাকা চাইই।

এ অবস্থাটা আমাদের দেশের একচেটে নয়। অন্যান্য দেশেও এটা মধ্যে মধ্যে হয়ে থাকে। একটা উদাহরণ দিই।

আশা করি, একথা কেউ বলবেন না, জর্মনি অশিক্ষিত দেশ। সেখানে আমি যখন ১৯২৯ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকি, তখন দেখি দুই পিরিয়ডের মধ্যে করিডরে করিডরে এত ভিড় যে চলা-ফেরা করা রীতিমত কষ্টের ব্যাপার।

আমি আশ্চর্য হই নি। ভেবেছিলুম, জর্মন উচ্চশিক্ষিতদের দেশ, ভিড় হবে না কেন ? কিছুদিন পরে কিন্তু আমার ভুল ভাঙলো, যখন শুনলুম, এক অধ্যাপক দুঃখ করে বলছেন, 'এত বেশী ছেলেমেয়ে এসে ভিড় জমিয়েছে যে পড়াই কি করে ?' আমি তাঁকে জিজ্ঞেসবাদ করে জানতে পারলুম, জর্মনিতে ছেলে-মেয়েরা ১৭।১৮।১৯ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ে বা পাস করে সচরাচর কাজকর্মে চাকরি-বাকরিতে ঢুকে যায় ; মাত্র কিছু সংখ্যক (ক) মেধাবী ছেলে-মেয়ে—উচ্চশিক্ষার প্রতি যাদের একটা প্রাণের টান আছে—তারা, (খ) যে সব অধ্যাপক, জজ, ব্যারিস্টারের পরিবারে অনেক পুরুষ ধরে উচ্চশিক্ষার ঐতিহ্য আছে তাদের ছেলেমেয়ে (কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেধাবী না হয়েও) এবং (গ) উচ্চশিক্ষার পালিশ-লোভী হঠাৎ-নবাবদের দু একটা ছেলেমেয়ে—এই তিন শ্রেণীর ছাত্রই পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতো (মেধাবী ছেলেদের প্রায় সবাই স্কলারশিপ পায় এবং আর গাধাদের উঁচু মাইনে দিতে হয় 'নাকের ভিতর

দিয়ে,) এবং অধিকাংশই সেই কারণে উচ্চশিক্ষার জন্য উৎসুক এবং শাস্ত্রাধিকারী। এখন অর্থাৎ ১৯২৯ সালে বেকারের সংখ্যা এত অসম্ভব রকমে বেড়ে গিয়েছে যে ছেলেছোকরারা, এমন কি মেয়েরাও কাজকর্মে চাকরি-বাকরিতে কোনো রকম ওপ্‌নিং না পেয়ে বেনো জলের মত বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকছে।

এই তো গেল ১৯২৯-এর কথা। ৩০।৩১।৩২ ক্রমাগত এদের সংখ্যা বেড়েই চললো। ১৯৩৩-এ হিটলার জর্মনির চ্যানসেলর হলেন। আমি দেশে ফিরেছিলুম ৩২-এ।

১৯৩৮ ফের জর্মনি বেড়াতে গিয়ে আমার এক বৃদ্ধ অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করতে যাই বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথমটায় ভেবেছিলুম, ছুটির দিন বুঝি, না হলে করিডরগুলি অত ফাঁকা কেন? অধ্যাপক বুঝিয়ে বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়টাই ফাঁকা; হিটলার বেকার সমস্যা সমাধান করে দেওয়াতে ছেলেরা এখন ম্যাট্রিক পাস না-পাস করেই কাজে ঢুকে যায়, পয়সা কামাচ্ছে বলে বিয়ে করছে, তাই মেয়েরাও কলেজে আসছে না, এমন কি মেধাবী ছেলেদের অনেকেই বলে, ৬।৭ বছর ঘণ্টে ঘণ্টে পাস করে যখন কাজে ঢুকবো তখন দেখবো যারা ৬।৭ বছর আগে ঢুকেছিল তারা কামাচ্ছে বেশী। লাভ? বেনোজল এখন ভাঁটার টানে খাবার জলও টেনে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

আমার আশ্চর্য বোধ হল। আমার বিশ্বাস ছিল ধনী দেশে (যেখানে বেকার নেই) বুঝি উচ্চশিক্ষার তৃষ্ণা বেশী, গরীব দেশে কম। এখন দেখি উল্টো!

এ বিষয় নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করেছি। ফলস্বরূপ আমার যে ধারণা হয়েছে সেটা যে আমি সপ্রমাণ করতে পারবো তা নয়। তবে আপনারা চিন্তা করে দেখতে পারেন।

মানুষ যা চায় পারতপক্ষে সেই দিকেই ধায়। ১৮।১৯।২০ বৎসরে মানুষ আপন হাতে কিছু একটা করতে চায়, গড়তে চায়, ঐ সময়ে তার স্বাধীনতা প্রবৃত্তিটা প্রখরতর হয় বলে কিছু-একটা অর্থকরী করতে চায়, এবং তৃতীয়ত সে তখন সঙ্গিনী খুঁজতে আরম্ভ করে। মোদ্দা কথা, সে তখন আপন বাড়ি বেঁধে, বউ এনে পয়সাকড়ি কামিয়ে ছা-পোষা গেরস্ত হতে চায়।

প্রাচীন ভারতে কি ব্যবস্থা ছিল?—ধরে নিচ্ছি আমরা তখন এতখানি বেকার গরীব ছিলুম না। গুণীজ্ঞানীরা আমাকে বললেন, 'ঐ ১৭।১৮।১৯-এ গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য সমাপন—অর্থাৎ লেখাপড়া শেষ করে—গৃহস্থাশ্রমে ঢুকতো, অর্থাৎ বিয়ে-শাদী করে টাকা পয়সা কামিয়ে সংসার চালাতো। তবে হ্যাঁ, দীর্ঘতর ব্রহ্মচর্যের ব্যবস্থাও ছিল; ২৬।২৮।৩০-এ সংসারধর্মে প্রবেশ করছে, এ-ও হয়।' বুঝলুম, এই শেষের দল, আমাদের আজকের দিনের বি এ, এম. এ, পি এচ. ডি. কিংবা আরো সুপার পি. এচ. ডি.'র দল।

লেখাপড়া করাটা কি খুব স্বাভাবিক, না সকলের পক্ষে আনন্দের বিষয়? দিনের পর দিন ৩০।৪০।৫০ বছর পর্যন্ত একটা লোক বইয়ের ভিতর মুখ গুঁজে

বসে আছে, মাঝে মাঝে কাগজে খসখস করছে এইটে স্বাভাবিক, না ফসল ফলানো, খাল কাটা, এমারৎ তোলা, দোকানপাট চালানো, ঐসব কর্মে দৌড়-ঝাঁপ করা, শরীরের অবাধ চলাচল চালু রাখা—এসব স্বাভাবিক ? অবশ্য ভাববেন না, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বুঝি সংসারে ঢুকে সব রকম লেখাপড়া একদম বন্ধ করে দেয়। অবসর সময় যার যে রকম রুচি সে রকম করে। বস্তুত ইয়োরোপে প্রায়ই দেখতে পাবেন, ম্যাট্রিক পাস পাদ্রী (পরে কিছু ধর্মশিক্ষা করেছে মাত্র) অবসর সময়েই অধ্যয়নের ফলে ভূতত্ত্ব, পুরাতত্ত্বে নাম করেছে,—টমাস মানের মত প্রচুর সাহিত্যিক আছেন যাঁরা কখনো কলেজ যান নি। আর লেখালেখি করে নাম করাটাই তো সব চেয়ে বড় কথা নয়। কাজ-কর্মে, লোকসেবার মাধ্যমে, পরিবার পালন করে, অবসর সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনার ভিতর দিয়ে মানুষ জীবনকে যতখানি সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারে, কর্ম-অভিজ্ঞতা-জ্ঞান দিয়ে জীবনকে যতখানি মধুময় এবং ঐশ্বর্যশালী করতে পারে সেইটেই তো বড় কথা। পক্ষান্তরে পাণ্ডিত্যে যাদের স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ তারা উচ্চশিক্ষা লাভ করে ঐ কর্মে লিপ্ত হবে।

অবশ্য মনে রাখতে হবে কন্টিনেন্টে ১৭।১৮-এর পূর্বে কেউ ম্যাট্রিক পাস করে না। এবং তাদের ঐ সময়ের ভিতর এমনই নিবিড় (inten-e) শিক্ষা দেওয়া হয় যে ওরই কল্যাণে পরবর্তী জীবনে সে অনেক কিছু আপনচেষ্টাতেই শিখতে পারে, রস নিতে পারে।

এদেশে ছেলেমেয়েকে ১৭।১৮ অবধি ইস্কুলে রাখুন আর নাই রাখুন, উত্তম পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করুন আর নাই করুন, প্রশ্ন এই তারা বেরিয়ে এসে করবে কি ? কৃষি, বাণিজ্য, কলকব্জা বানানো, ম্যাট্রিকে তাকে যাই শেখান না কেন, বাইরে এসে তার ওপনিং কোথায় ? যত ভালো কৃষিই সে শিখুক না কেন, গ্রামে যেটুকু জমি সে যোগাড় করতে পারবে তাতে সে জাপানের ড্রাই-ফার্মিংই করুক আর আইরল্যাণ্ডের কো-অপারেটিভই করুক, ঐ দিয়ে আণ্ডা-বাচ্চা পুষতে পারবে ? আমি সাধারণ প্রতিভাবান ছেলেকে তিন বছরে তিনটে বিদেশী ভাষা শিখিয়ে দিতে পারি, যার জোরে সে ইয়োরোপে ভাল কাজ পাবে। এখানে ?

কাজেই বাইরের অনুকূল পরিস্থিতি, আবহাওয়া, ওপনিংও সৃষ্টি করতে হবে।

তা সে দেশকে ইনডাসট্রিয়ালাইজ বা এগ্রিকালচারাইজ বা অন্যান্য যা-কিছু হোক সে সব 'আইজ' করে, কিংবা অন্য কিছু করে। সেটা কি করে করতে হয় আমি জানি নে।

ততদিন কলেজে কলেজে ভিড়। অনিচ্ছুক লেখাপড়া করবে—আখেরে যার কোনো মূল্যও নেই। দেশের অর্থক্ষয়, শক্তিক্ষয়। সর্ব অপচয়।

কথায় বলে, 'ওরে পাগল, কাপড় পরিস নে কেন ?' পাগল বললে, 'পাড় পছন্দ হয় না।' আমাদের হয়েছে উল্টোটা। ভাবছি, 'উচ্চশিক্ষার' যত বস্তা বস্তা কাপড় ছেলের ঘাড়ে পিঠে বাঁধবো ততই সে সুবেশ নটবর হবে ॥

ইংরেজের সুনাম, সে স্বদেশপ্রেমী। বিদেশে প্রত্যেক ইংরেজকেই তাই তার দেশের 'বেসরকারী' রাজদূত বলা হয়। মুসলমান মাত্রই মিশনারী। বিধর্মীকে ইসলামে টেনে আনার মত পুণ্য তার কাছে কমই আছে। এবং সে পুণ্যের বিনিময়ে অর্থগ্রহণ মহাপাপ। ইসলামে তাই মাইনে দিয়ে বা অন্য কোনো প্রকারের অর্থসাহায্য করে মিশনারী সম্প্রদায় গড়া হয় না। প্রত্যেক মুসলিম ব্যবসায়ীই তার ধর্মের মিশনারী। আফ্রিকায় এখনও মুসলমান হাতির দাঁতের কারবারী অনারারি মিশনারী পাল্লা দেয় মাইনে-খোর খৃষ্টান মিশনারীর সঙ্গে। মাইনে নেওয়ার অসুবিধা এই যে বিধর্মী স্বভাবতই সন্দেহ করে যে মিশনারী তার ধর্মপ্রচার করছে সে শুধু নিজের পেট পোষবার জন্য।

আরব বণিকরা সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসে বেকার হিন্দু মাঝিমাল্লাকে আহ্বান জানালে,'এসো আমাদের নৌকায় করে—দেশ-দেশান্তরে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে, মাঝিমাল্লার কাজ করবে, তোমার শ্রীবৃদ্ধি হবে। তুমি সমাজচ্যুত হবে? আমি তোমাকে আমার সমাজে গ্রহণ করবো। সে সমাজ ক্ষুদ্র নয়। তুমি লাভবান হবে। আর আমার সমাজে নবদীক্ষিতের সম্মান সর্বোচ্চ এবং আমার সমাজে জাতিভেদ নেই।'

মুসলমানদের সুবিধা এই ছিল যে তাদের পূর্বে যারা এসেছিল তারা আপন ধর্মে অন্য লোককে দীক্ষিত করতো না, এবং আরব মুসলিমদের ভিতর যে সাম্যবাদ অত্যন্ত প্রখর সে কথা সবাই জানে।

আমার বিশ্বাস এই করে ইসলাম পূব বাঙলায় প্রচারিত হয় ৭।৮।৯ম শতাব্দীতে।

হিন্দুসমাজের আরেকটা বিপদ যে মানুষ সেখানে অনিচ্ছায় জাতিচ্যুত হতে পারে। কোনো হিন্দু যদি ভালোবাসা বশত ধর্মান্তরিত তার ভাই মুসলমান বা খৃষ্টানকে তার বাড়িতে তার সঙ্গে খেতে বসতে দেয় তবে সমাজ সে হিন্দুকেও বর্জন করে। মুসলমান যদি তার খৃষ্টান ভাইকে বাড়িতে থাকতে দেয় তবে সমাজচ্যুত হয় না। তাকে পরিষ্কার বলতে হয়, সে ইসলামে বিশ্বাস করে না, তবে সে সমাজচ্যুত হবে। হিন্দু তার ধর্মে বিশ্বাস রেখেও সমাজচ্যুত হতে পারে। রামমোহন, আদি ব্রাহ্মসমাজের কথা স্মরণ করিলেই কথাটা সুস্পষ্ট হয়।

কাজেই কোন মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত নাবিক তার হিন্দু চাষা ভাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় পেলে তারও জাত যেত। সবাই যে আশ্রয় দিয়েছে তা নয়, কিন্তু যারা দিয়েছে তারা শেষ পর্যন্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছায় মুসলমানই হয়ে গিয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এতটা ছড়ালো কি করে? তার একটি তুলনা দিতে পারি। প্যালেস্টাইন থেকে প্রথম প্রথম যে সব খৃষ্টানদের রোমে ক্রীতদাসরূপে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাদের কি ভাবে সিংহের মুখে ফেলে দেওয়া হত সে ছবি অনেকেই নিশ্চয় সিনেমায় দেখেছেন—কুও ভাদিস্ পুস্তক কিংবা ছবি এদেশেও অপরিচিত নয়। অথচ এদেরই সংখ্যা একদিন এমনই বেড়ে গেল যে

সে দেশের সীজারকেও শেষটায় খৃষ্টান হতে হল। এবং আশ্চর্য, রোমের পোপকে আজকেও রোমান সম্প্রদায়ের লোক হতে হয়। এরও জন্য উদাহরণ আছে। ইসলামের শেষের দিকের খলীফারা তুর্ক। আরব রক্ত এদের গায়ে একেবারেই নেই।

এবং খিলজীর বঙ্গাগমনের পূর্বেই বণিকদের কাছে খবর পেয়ে আস্তে আস্তে ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত (বণিকরা মিশনারী বটেন, কিন্তু সব সময় শাস্ত্রী হন না) সদাচারী মুসলমান সাধুসন্ত পূর্ববঙ্গে আসতে আরম্ভ করেন। এঁদের নাতি-বিস্তৃত খবর এবং আমাদের মূল বক্তব্য নিয়ে আলোচনা পাঠক পাবেন ডক্টর মহম্মদ এনামুল হকের বই 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম' পুস্তিকায়। আমাদের এই নিয়ে অনেক মতভেদ আছে সত্য[১] কিন্তু আমাদের মূল সিদ্ধান্ত একই—সমুদ্রপথেই ইসলাম পূব বাঙলায় আসে! মমাগ্রজ সৈয়দ মরতুজা আলী সাহেবের চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট সম্বন্ধে লিখিত একাধিক প্রবন্ধে পাঠক আরো খবর পাবেন।

এই সাধু-সন্তরা ইসলাম প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন সন্দেহ নেই এবং হিন্দু রাজা তথা জনসাধারণ বিধর্মী সাধু-সন্তদের প্রতিও আকৃষ্ট হন এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু মূল তত্ত্ব এই যে বণিকরা কতকগুলো কেন্দ্র নির্মাণ না করে থাকলে এঁরা অতখানি করতে পারতেন না। একটি উদাহরণ নিবেদন করি: ভারতবর্ষের সর্বত্র সুপরিচিত পাঁচজন চিশতী সম্প্রদায়ের সন্তদের মধ্যে তিনজনের কর্মভূমি ও সমাধি দিল্লীতে। কুৎবুউদ্দীন বখতিয়ার কাকী (এঁর কবর কুৎবুমিনারের কাছে), নিজামউদ্দীন (এঁকে নিয়েই দিল্লী দূর অস্ত গল্প), এবং নাসিরউদ্দীন চিরাগ দিল্লী বহু শিষ্য পেয়েছিলেন কিন্তু এঁরা ধর্ম পরিবর্তন করেন নি, দিল্লীতে এখনো তাঁদের উর্সপর্বে হিন্দু এবং শিখ ভক্ত অধিকতর এবং সর্বপ্রধান কথা—দিল্লী কখনো মুসলমান প্রধান হয় নি।

মুসলমান বাদশারা কতখানি সাহায্য করেছিলেন? আমার বিশ্বাস, অল্পই। যেখানে শুদ্ধমাত্র অস্ত্রবলে বিধর্মী এসে রাজ্য স্থাপন করে—পূর্বে যেখানে বিজয়ীর আপন ধর্মীয় কেউ ছিল না—সে সেখানে যদি প্রজার ধর্মে হস্তক্ষেপ করে তবে তাকে বেশী দিন রাজত্ব করতে হয় না। পূর্ব বাঙলায় পরিস্থিতি অন্য রকম ছিল। রাজারা পূর্ব দীক্ষিত মুসলমানদের সুখ-সুবিধা দিয়ে প্রতিবেশী হিন্দুকে আকৃষ্ট করতে পারতেন।

কু দ্য পালে (রাজপ্রাসাদে হঠাৎ রাজাকে সরানো), কু দেতা (দেশে হঠাৎ সশস্ত্র বা বেআইনী রাষ্ট্র পরিবর্তন) এ ফরাসী কথাগুলো আমাদের কাছে এখন সুপরিচিত। বিশেষ করে সুয়েজ থেকে আরম্ভ করে চীন পর্যন্ত এ ঘটনা এখন নিত্য নিত্য হচ্ছে।

১ খলীফা হারুন অর্ রশীদের ৭৮৮ খৃ. মুদ্রিত একটি মুদ্রা পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসস্তূপে আবিষ্কৃত হয়েছে। এ আবিষ্কারের মূল্য আমি খুব বেশী দিই না—হক সাহেব দেন।

বখতিয়ার খিলজী অষ্টাদশ অশ্বারোহী নিয়ে করেছিলেন, কু দ্য পালে। সেটা কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রশ্ন, পরদিনই রাজার সৈন্যরা এসে লড়াই দিল না কেন?

তবে কি জনসাধারণ, সৈন্যদল রাজার আচরণে অসন্তুষ্ট ছিল? কোনো কোনো ঐতিহাসিক সে ইঙ্গিত দিয়েছেন। এর দৃষ্টান্তও আছে। আরবের মুষ্টিমেয় প্রথম সৈন্যবাহিনী যখন মরুভূমি অতিক্রম করে মহাপরাক্রান্ত ইরান রাজকে আক্রমণ করলো তখন সেই বিরাট শক্তিশালী রাজবাহিনী অতিশয় অনিচ্ছায় যুদ্ধে নামল। আরবরা বিজয়ী হল। ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিকরা বলছেন, ইরানে তার পূর্বেই খবর রটে গিয়েছে, হজরৎ মুহম্মদ নামীয় এক আরব মহাপুরুষ হ্যাভনট, নিঃশব্দের জন্য নূতন আশার বাণী নিয়ে এসেছেন। এরা সে ধর্মে বিশ্বাসী।

আমার প্রশ্ন, তবে কি পূব বাঙলার মুসলমান তখন অসন্তুষ্ট জনসাধারণের মধ্যে হজরতের বাণী হোক আর নাই হোক খিলজীকে পরিত্রাণ কর্তারূপে, কিংবা যে কোনো মুসলমান অভিযানকারীকে ঐ রূপে অঙ্কিত করে এমনই আবহাওয়ার সৃষ্টি করে রেখেছিল যে খিলজী তার কু দ্য পালেকে পরে কু দেতাতে পরিবর্তিত করতে পেরেছিলেন? ॥

গেজেটেড অফিসার কবি

এ সংসারে দীনবন্ধুর বড়ই অভাব। তবে জগবন্ধুর কল্যাণে এ অধমের দু'-একজন আছেন। তাঁরা মাঝে-মধ্যে দয়া করে আমাকে দু'একখানা অতিশয় উচ্চাঙ্গের, সাতিশয়, 'হাইব্রাও'—'উন্নাসিক' মাসিক পাঠান। আগের দিন হলে আমার আর কোনো দুঃখ রইত না। এসব মাসিক থেকে চুরি করে হপ্তার পর হপ্তা দিব্য অরিজিনাল লেখা লিখে দেশে নাম করে ফেলতুম, কারণ এদেশে ক'টা গ্যোটে আছেন যে আমার লেখা পড়ে বলবেন, 'মহাশয়, আপনার লেখাতে অনেক অরিজিনাল এবং অনেক সুন্দর কথা আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যেগুলো অরিজিনাল সেগুলো সুন্দর নয়, আর যেগুলো সুন্দর সেগুলো অরিজিনাল নয়।' চুরি করতে এখন অসুবিধাটা কি? সব চেয়ে বড় অসুবিধা, ত্রিশ বৎসর আগেও আমি এসব লেখা পড়ে বেশ বুঝতে পারতুম, এখন আর পারি নে। তার কারণ, ইয়োরোপীয় লেখকের অধিকাংশই, ইংরিজীতে যাকে বলে বিউইল-ডার্ড—হতভম্ভ দিক্‌ভ্রান্ত, মাথা গুবলেট—যা খুশি বলতে পারেন। নিজের কৃষ্টি-কলচর সম্বন্ধে এদের মনে দ্বিধা, হৃদয়-দ্বন্দ্বের অন্ত নেই; শ্লীল-অশ্লীল বিবেচনা করতে গিয়ে লেডি চ্যাটার্লির মত সাধারণ বই এঁদের তালুক-মুলুক-কুল্লে দেশে হালের চাটগাঁইয়া সাইক্লোন তোলে; এক দেশের বড় পাদ্রী অন্য দেশের বড় পাদ্রীর সঙ্গে সামান্য লৌকিকতার দেখা করতে গেলে তারা হুররা রব ছেড়ে বলে, এবারে তাবৎ মুশকিল্ আসান, ঘড়ি ঘড়ি কলচরল কনফারেনস্,

তাড়াতাড়ি ফের নেশার অবসাদ, পুনরায় খোঁয়ারি—

আর সর্বক্ষণ আর্তরব ! ঐ এল রে, ঐ খেল রে ! কে ? কম্যুনিস্ট ।

এঁরা এই একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ মনস্থির করে ফেলেছেন যে, কম্যুনিস্ট এলে এঁদের আর কোনো গতি নেই । ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিলকুল বরবাদ হবে । সারি বেঁধে সবাই সাইবেরিয়া ।

ওদিকে কম্যুনিস্টরা অভয় দিয়ে বলছে, আমরা এলেই তো তোমাদের পরিত্রাণ । ধনপতির অত্যাচারে খেতে পারছো না, পরতে পাও না, রাষ্ট্র তোমাদের জন্য কড়ে আঙুলটি তোলে না, বস্তা-পচা ধর্মের আফিঙ পর্যন্ত এখন যে তোমাদের নেশায় বুঁদ করে রাখবে তারও উপায় নেই, ইত্যাদি অনেক মূল্যবান কথা ।

পশ্চিম ইয়োরোপের লেখকরা কম্যুনিস্টদের এই অভয়বাণী, যে তাঁরা এলে পর ক্যাপিটালিস্ট দেশের লেখকরা অন্তত পক্ষে খেয়ে পরে বাঁচবে, কতখানি মনে মনে বিশ্বাস করেন সে-কথা বলা-কঠিন, কিন্তু তাঁরা কম্যুনিস্টদের এই অভয়-বাণীর পরিপূর্ণ সুযোগ নিচ্ছেন ।

সেইটে ইদানীং একটি পত্রিকাতে সরল ভাষায় আলোচিত হয়েছে । ঐটেই নিবেদন করি । বাকি—ঐ যে বললুম—বিউইলডার্ড জিনিস, সে তো আর চুরি করা যায় না, খালি-পকেট মারা যায় না, কিংবা বলতে পারেন, হাওয়ার কোমরে রশি বাঁধা যায় না ।

সুইডেন থেকে জনৈক সুইস সংবাদদাতা তাঁর দেশের খবরের কাগজে সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, দেশের লেখকেরা তাঁদের মূল্য বৃদ্ধির জন্য সরকারকে উদ্ব্যস্ত করে তুলেছেন (এস্থলে আমার মন্তব্য, ভাবটা এই, কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে লেখক কত সুখে আছে, এদিকে তোমার তথাকথিত জনকল্যাণ রাষ্ট্র আমাদের জন্য কিছুই করছে না, অনেকটা 'পাশের বাড়ির চাটুজ্যে তার গিন্নীকে কি রকম গয়না দিয়েছে দ্যাখো গে' গোছ) । পত্রলেখক সুইডেনের লেখক সম্প্রদায় সরকার থেকে যে সব অর্থসাহায্য পান তার যে সবিস্তর নির্ঘণ্ট দিয়েছেন তার থেকে মাত্র একটি আমি তুলে দিচ্ছি—এ দেশে চালালে মন্দ হয় না—সাধারণ পাঠাগার থেকে যে পাঠক ধার নিয়ে বই পড়ে তার প্রত্যেক বারের জন্য সরকার—পাঠক নয়—লেখককে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দেন । সেটা সামান্যই, কিন্তু জনপ্রিয় লেখকের কাছে সেটা কিছু সামান্য নয় ।

হালে তাই ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড এবং সুইডেনের লেখক সম্প্রদায়ের মুরুব্বীরা সমবেত হয়ে রেডিয়ো টেলিভিসনে তাঁদের ফরিয়াদ ক্রন্দন শুনিয়েছেন ও দেখিয়েছেন । হেলসিঙ্কি শহরের তালকিস্‌ৎ বললেন, 'সরকার লেখকদের বই কিনে পাঠাগারে পাঠাগারে ফ্রী বিতরণ করে লেখককে বদলে দেন করুণার মুষ্টিভিক্ষা (উপরে যেটা উল্লেখ করেছি) । অপিচ, পশ্য পশ্য, ঐ লেখক নামক জীবটি না থাকলে তামাম বইয়ের ব্যবসা লাটে উঠতো । প্রকাশক, মুদ্রাকর, দপ্তরী, পুস্তক বিক্রেতা, এমন কি পুস্তক সমালোচকের পর্যন্ত পাকা-পোক্ত আমদানি আছে, নেই কেবল লেখকের, তাকে সর্বক্ষণ কাঁপতে হয় অনিশ্চয়তার

ভয়ে ভয়ে। সুইডিশ লেখক-সম্প্রদায়ের প্রধান মুরুব্বী বললেন, 'পূর্বে লেখক ছিল গরীবদের মধ্যে একজন গরীব; আজ সে-ই একমাত্র গরীব।' যখন অকরুণ ইঙ্গিত করা হল, আজকের দিনে লেখকদেরও বড্ড বেশী ছড়াছড়ি, তখন তিনি বললেন, 'হিমালয়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য শুধু পাহাড়ের চূড়ো দিয়ে নির্মিত হয় না।'

শেষ পর্যন্ত এঁরা দাবী জানিয়েছেন, সরকারকে ওরকম ভিক্ষে দিলে চলবে না (বর্তমান লেখকের মন্তব্য: ব্যক্তিগতভাবে আমার কণা পরিমাণ ভিক্ষা নিতে কণামাত্র আপত্তি নেই); দিতে হবে পাকা-পোক্ত মাইনে। তবেই সে নিশ্চিন্ত মনে, পূর্ণ স্বাধীনতায় আপন সৃষ্টিকার্য করে যেতে পারবে, এবং তার জন্য সে সরকারের কাছে বাধ্যবাধক হবে না (রাশার প্রতি ইঙ্গিত নাকি?)। এঁদের মতে সরকার এবং ফ্রী পাঠাগার থেকে লেখকরা বর্তমানে যা পান সেটাকে দশগুণ বাড়িয়ে দিলেও তাঁরা সে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য পাবেন না, যার কৃপায়, অন্য চাকরি না করে তারা দারাপুত্র পোষণ করে আপন কার্যে মন দিতে পারবেন।

তারপর ইংরেজ, যুগোশ্লাভ সুইডিশ ও জর্মন লেখকরা আপন আপন দেশ থেকেই টেলিফোন যোগে আপন আপন মন্তব্য সুইডেনে পাঠালেন ও সেখানকার বেতার কেন্দ্র থেকে সেগুলো বিশ্ব-সংসারের জন্য বেতারিত হল।

জর্মনির হাইন্‌রিষ ব্যোল বললেন, 'ঈশ্বর রক্ষতু (ফর হেভেন্‌স্‌ সেক, উম্‌ হিম্মেল্‌স্‌ বিলেন্‌)! সর্বনাশ হবে—লেখক যদি সরকারের মাইনে-খোর হয়। সে সৃষ্টির কাজ করে যাবে নিছক সৃষ্টিরই জন্যে। এই আমাদের জর্মনিতে পঁইত্রিশ হাজার লেখক আছেন (সর্বনাশ! এই সোনার বাঙলায় পঁয়ত্রিশ হাজার ক্রেতা নেই)। কে এমন মাপকাঠি বের করবে যা দিয়ে স্থির করা হবে, কোন্‌ লেখক কত পাবেন? কৃতকার্য লেখকই যে মূল্যবান লেখক এ কথা বলে কে (সাক্‌সেস এবং কোয়ালিটি সমার্থসূচক নয়)।'

লণ্ডন থেকে রবার্ট গ্রেভসেরও বিচলিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'আমার আটটি সন্তান। সত্য বলতে কি, এদের পালা-পোষা আমার পক্ষে সব সময় সহজ হয় নি। তাই বলে যে-কাজ আমি এখনো আদপেই করি নি তার জন্য আগেভাগেই পয়সা নিয়ে বসবো? ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে, "হি হু পেজ দি পাইপার কমাণ্ড দি ট্যুন—যে কড়ি ফেলে সে-ই হুকুম দেয় কোন্‌ সুর গাইতে হবে।" আমি আমার ইচ্ছেমত যে সুর খুশী গাইব।'

আর বেলগ্রেড থেকে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল ডুসান মাটিকের,—'না, দয়া করে চাকুরে কবি তৈরী করতে যাবেন না। আমরা কারো চাকরি করি নে। কবিতা রচনা করা আর ফর্ম ফিল্‌ আপ করা এক কাজ নয়। মানুষকে লেখক হবার জন্য জোর করা যায় না, কবিতা রচনা করার সময় কোনো কবি কর্তব্য বোধ থেকে তা করে না, বরঞ্চ সে রচে যখন ভিতরকার তাড়না সে আর থামিয়ে রাখতে পারে না। কি করে মানুষ যে কবিকে সরকারী চাকুরে বানাবে তা তো আমার বুদ্ধির অগম্য……।'

এসব নিদারুণ মন্তব্য শোনার পরও কিন্তু সুইডেনের ঔপন্যাসিক ফল্‌কে ইসাকসন তাঁর সুইডিস নৌকার হাল ছাড়লেন না, অর্থাৎ সরকারী সাহায্যের প্রস্তাবটা। বললেন, 'কত ভালো লেখক দৈনন্দিন জীবনধারণ সমস্যায় এমনই ভারগ্রস্ত যে, লেখার কাজ করে উঠতে পারেন না। সরকারের কিছু একটা করা উচিত··· ।' তার মানে এই নয়, সুইডেনের সব লেখকই এই মত পোষণ করেন। জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক আকে ভার্সিং বলেছেন, 'প্রচুর, প্রচুর আমি শিখেছি মানব-চরিত্রের, গড়ে তুলেছি আমার জীবনদর্শন, আমার জীবনের পেশা থেকে।' এঁর পেশা দারোয়ানী। অর্থাৎ বাড়ির দরওয়ান। পত্রলেখক জাল্‌ৎসার চিঠি শেষ করেছেন এই মন্তব্য করে, 'বাড়ির দরওয়ানই যদি এত ভালো লেখে তবে চিন্তা করো তো হোটেলের পোর্টার (দরওয়ানই তো) আরো কত শতগুণে ভালো লিখবে!' অর্থাৎ কাকতালীয়!

* * *

লেখাটি পড়ে শোনাতে আমার একজন প্রিয় লেখক-বন্ধু আশ্চর্য হয়ে শুধোলেন, 'বলেন কি মশাই! ওসব দেশে পাঠক যখন প্রতিবার লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে যায় তার জন্য লেখককে পয়সা দেয়। আর এদেশের লাইব্রেরি আমার কাছ থেকে ফ্রী বই চায়! বইটার দাম পর্যন্ত দিতে চায় না।'

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললুম, 'গরীব দেশ!' তারপর বললুম, 'কিন্তু ভেবে দেখুন, না চাইলে কি আরো ভালো হত? একদম পড়তেই চায় না, সেটা কি আরো ভালো হত? প্রিয়ার বিরহ বেদনা পীড়াদায়ক; কিন্তু যার একদম কোনো প্রিয়াই নেই?'

বন্ধু অধৈর্য হয়ে শুধোলেন, 'তোমার কাছে চাইলে তুমি কি করতে?'

আমার চিত্তে সহসা কবিত্বের উদয় হল। বাইরের দিকে তাকিয়ে উদাস নয়নে প্রকৃতির সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে লাগলুম।

বাচুভাই শুক্ল

বরোদা-আহমদাবাদ-বোম্বাই করছি, আর বার বার মনে পড়ছে, স্বর্গত বাচুভাই শুক্লের কথা। ইনি রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন।

১৯২১ বিশ্বভারতীর কলেজ-(উত্তর)-বিভাগ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সেই সুদূর সৌরাষ্ট্র থেকে এসে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের পদপ্রান্তে আসন নেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে যে দুজন বিশ্বভারতীর শেষ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে উপাধি লাভ করেন, ইনি তাঁদেরই একজন। বিশ্বভারতীর সর্বপ্রথম সমাবর্তন উৎসব হয় ১৯২৭। বাচুভাই রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে তাঁর উপাধি-পত্র গ্রহণ করেন। শুনেছি, স্বয়ং নন্দলাল সে উপাধি-পত্রের পরিকল্পনা ও চিত্রণকর্ম করেছিলেন। পরবর্তী যুগে তিনি গুজরাতী ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদকরূপে খ্যাতি লাভ করেন।

দাড়িগোঁফ গজাবার চিহ্নমাত্র নেই—সেই সুদূর কাঠিয়াওয়াড় থেকে এসে ছোকরাটি সীট পেল সত্য-কুটিরে। কয়েক দিন যেতে না যেতে তার হল টাই-ফয়েড। বাসুদেব বিশ্বনাথ গোখলে ও আমি তাকে আমাদের কামরায় নিয়ে এলুম। সেই তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯২১ সালে। তারপর ১৯৫৭ সালে তাঁর অকালমৃত্যুর দিন পর্যন্ত আমাদের যোগসূত্র কখনো ছিন্ন হয় নি।

তাঁর গুরু ছিলেন মার্ক কলিন্‌স্‌। তাঁর কাছে বাচুভাই উপাধি লাভ করার পরও দীর্ঘ সাত বৎসর তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। আমিও কলিন্‌সের শিষ্য। তাই তাঁর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। ইনি জাতে আইরিশ, শিক্ষালাভ করেন অক্সফোর্ড জর্মনির লাইপ্‌ৎসিগে। এই বছর দুই পূর্বে লাইপ্‌ৎসিগ বিশ্ববিদ্যালয় তার কোনো পরব উপলক্ষে মালমশলা যোগাড় করতে গিয়ে বিশ্বভারতীকে প্রশ্ন করে পাঠায়, কলিন্‌স্‌ এখানে কি কি কাজ করে গেছেন? অর্থাৎ ছাত্র হিসেবেই তিনি সেখানে এত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন যে পরবর্তী যুগের অধ্যাপকেরা তাঁর কীর্তি-কলাপের সন্ধানে এদেশেও তাঁর খবর নিতে উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। কেউ দশটা ভাষা জানে, কেউ বিশটা জানে একথা শুনলে আমি কণামাত্র বিচলিত হই নে। কারণ মার্সেই, পোর্ট সঈদ, সিঙ্গাপুরের দালাল দোভাষীরাও দশভাষী, বিশভাষী। কিন্তু কলিন্‌স্‌ ছিলেন সত্যকার ভাষার জহুরী। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, তিনি আমাকে তুর্কী ভাষায় বাবুরের আত্মজীবনী অনুবাদ করে করে শুনিয়েছেন, শেলির প্রমিথিয়ুস্‌ আন-বাউন্ড পড়াবার সময় ইস্কিলাসের গ্রীক প্রমিথিয়ুস্‌ থেকে মুখস্থ বলে গেছেন, আমি তাঁকে একখানা আরবী স্থাপত্যের বই দেখাতে তিনি তার ছবি কুফী-আরবীতে লেখা ইন্‌সক্রিপশন অনুবাদ করে করে শুনিয়েছিলেন। তার সঙ্গে মাত্র এইটুকু যোগ করি আমার জীবনের সেই তিন বৎসরে আমি কখনো গুরু কলিন্‌স্‌কে কোনো প্রাচীন-অর্বাচীন চেনা-অচেনা ভাষার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে শুনি নি, 'আমি তো এ ভাষা জানি নে'—অবশ্য সে-সব ভাষারই কথা হচ্ছে যার যে কোনো একটা অন্তত একজন লোকও পড়তে পারে।

বাচুভাই ছিলেই তাঁরই পুত্রপ্রতিম প্রিয় শিষ্য। কিন্তু বাচুভাই জানতেন, এ দেশে বিস্তর ভাষা শেখার মত মাল-মশলা নেই, তাই তিনি বিস্তারে না গিয়ে গিয়েছিলেন গভীরে। বস্তুত তিনি শান্তিনিকেতনে শিখেছিলেন মাত্র একটি জিনিস—ভাষাতত্ত্ব। নিজের চেষ্টায় শিখেছিলেন সংস্কৃত। আমরা যেরকম খাবলে খাবলে—অর্থাৎ স্কিপ করে করে—রাবিশ বাঙলা উপন্যাস পড়ি (সব বাঙলা উপন্যাস রাবিশ বলছি নে), বাচুভাই ঠিক তেমনি সংস্কৃত পড়তে পারতেন।

বোম্বাইয়ে ফিরে গিয়ে তিনি সর্বপ্রথম লেখেন একখানি অতি উপাদেয় গুজরাতী ব্যাকরণ। ভারতীয় অর্বাচীন ভাষাদের মধ্যে এই ব্যাকরণই যে সর্বোত্তম সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা সচরাচর বাঙলা ব্যাকরণের নাম দিয়ে লিখে থাকি সংস্কৃত ব্যাকরণ। ভারতের অন্যান্য অর্বাচীন ভাষাগুলিতেও তাই। গুজরাতী একমাত্র ব্যত্যয়—বাচুভাইয়ের কল্যাণে।

বরোদায় গাইকোয়াড় সীরিজে এটি প্রকাশিত হয়।

এই সময়ে তিনি অন্য লোকের সহযোগিতায় বোম্বাইয়ে একটি ইস্কুল খোলেন। সাধারণ ইস্কুল, কিন্তু অনেকখানি শান্তিনিকেতন ইস্কুল প্যাটার্নের। অন্যান্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে শেখানো হত রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্র নৃত্য-নাট্য। বাধ্য হয়ে তাঁকে তখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুজরাতী অনুবাদ করতে হয়, এবং শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তথা বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে গুজরাতী রসিক সম্প্রদায়ের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই তাঁর জীবনের চরম ব্রত হয়ে দাঁড়ায়। বোম্বাইয়ে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ তিনিই প্রতিষ্ঠিত করেন। সেখানকার টেগোর সোসাইটির তিনিই অন্যতম উদ্যোক্তা।

বিয়াল্লিশের আন্দোলন আরম্ভ করার প্রাক্কালে মহাত্মাজী গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের শেষ অনুরোধ, এণ্ড্রুজ মেমোরিয়াল ফাণ্ডের জন্য অর্থসঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে বোম্বাইয়ে আসেন। এসেই খবর দেন বাচুভাইকে, তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনবেন। বাচুভাই তাঁর ইস্কুলের গুজরাতি ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁকে শুনিয়ে এলেন—বিশ্বাস করবেন না—বাঙলা ভাষাতেই রবীন্দ্রসঙ্গীত। 'জীবন যখন শুকায়ে যায়,' 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে এবং আরো অনেক গান। রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাচুভাইয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল—তিনি জানতেন, মহাত্মাজী যখন শান্তিনিকেতন ইস্কুলে অধ্যক্ষ ছিলেন, ঠিক সেই সময় রবীন্দ্রনাথ কোন্ কোন্ গান রচেছিলেন এবং স্বভাবতই সেগুলোই মহাত্মাজীর বিশেষ করে জানার কথা। গাঁধীজীর ফরমায়েশমত বাচুভাই সেদিন তাঁকে সব গানই শোনাতে পেয়েছিলেন। সেদিন আজো, ক'জন বাঙালী পারে?

রবীন্দ্রনাথের তাবৎ নৃত্য-নাট্য তিনি অনুবাদ করেছেন। 'গোরা', 'নৌকাডুবি'র মত বৃহৎ বৃহৎ উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ সর্বাঙ্গসুন্দর অনুবাদ করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের আরো কত রচনা, কত গান, কত কবিতা, কত ছোট গল্প যে অতিশয় সাধুতার সঙ্গে অনুবাদ করেছেন তার সম্পূর্ণ ফিরিস্তি দেওয়া আমার ক্ষমতার বাইরে—যদিও ঐ সময়ে আমি গুজরাতেই ছিলুম এবং সাহিত্যজগতে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে সানন্দে সোৎসাহে লক্ষ্য করেছি। এই সাধুতা আকস্মিক ঘটনা নয়। বাচুভাই তাঁর 'অরিজিনাল' আইডিয়া রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের ভিতর দিয়ে প্রচার করতে চান নি—সাধারণ অনুবাদকরা যা আকছারই করে থাকেন। কারণ তাঁর নিজের মৌলিক উপন্যাস এবং নাট্য গুজরাতী সাহিত্যে বছরের সেরা বইরূপে সম্মানিত হয়েছে।

নাট্যে এবং নৃত্য-নাট্যে, ফিল্ম এবং রঙ্গমঞ্চে বাচুভাইয়ের কৃতিত্বখ্যাতি গুজরাতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আকাশবাণী তাঁকে দিল্লিতে বড় চাকরি দিয়ে নিয়ে যান—তাঁর কাজ ছিল সর্বভারতের তাবৎ রেডিয়োড্রামার মূল্য বিচার করে সেই অনুযায়ী আকাশবাণীকে নির্দেশ দেওয়া। কিন্তু ঐ সময়ও তিনি সমস্ত অবকাশ ব্যয় করেছেন রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প গুজরাতীতে অনুবাদ করাতে—সাহিত্য আকাদেমির অনুরোধে। এ কাজটি তিনি সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন।

পঞ্চাশ পেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই গুজরাতী সাহিত্যের এই প্রতিভাবান লেখক সে সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি করে ইহলোক ত্যাগ করেন।

আমাদের শোক, বাঙলা সাহিত্যের গুজরাতী এম্বেসেডার প্লেনিপটেনশিয়ারি অকালে তাঁর কাজ পূর্ণ করে, কিন্তু আমাদের কাজ অসম্পূর্ণ রেখে চলে গেলেন। আমার ব্যক্তিগত শোকের কথা বলবো না। তাঁর একমাত্র কিশোর পুত্রকে কাছে এনে আমাকেই দুঃসংবাদ দিতে হয়েছিল, তার পিতা ইহলোক ত্যাগ করেছেন।।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী

টমাস মান্ সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন; পক্ষান্তরে হিটলার বিশ্বাস করতেন হটেনটট এবং ফরাসী-জর্মন ইংরেজ বরাবর নয়; অতএব পৃথিবীটাকে যদি ভালো করেই চালাতে হয়, তবে সে-কাজটা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতের উপরই ছেড়ে দেওয়া সমীচীন। হিটলার মান্‌কে ডেকে পাঠালেন তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে। মান্ নারাজ হলেন। হিটলার চটে গিয়ে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়কে হুকুম দিলেন, মান্‌কে যে অনারারি ডক্টরেট দেওয়া হয়েছিল সেটা যেন প্রত্যাহার করা হয়। উত্তরে মান্ এই সর্বপ্রথম নাৎসি 'জীবনদর্শন' সম্পর্কে আপন মত প্রকাশ করলেন। অতুলনীয় সে পত্র বিশ্বসাহিত্যে—রাজনীতিতে তার মূল্য কি আছে ঐ বাবদে গুণীরা তা বলতে পারবেন। আমি বলতে পারি, সে-পত্র আমার মনে মিলটনের এরিয়োপেজিটিকার চেয়েও গভীরতর রেখা কেটে গেছে।

ডক্টরেট হারানোতে মান্ আদৌ মনঃক্ষুণ্ণ হন নি। স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে বলছি, মান্ তাঁর খোলা চিঠি আরম্ভ করেছিলেন এইভাবে—'আজ আমি ডাক খোলার সঙ্গে সঙ্গে বন্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাচার পেলুম, আমাকে একদা যে অনারারি ডক্টরেট দেওয়া হয়েছিল, সেটা প্রত্যাহার করা হয়েছে। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি কখনো বিদ্যাভ্যাস করি নি বলে সঠিক জানি নে এ সংবাদটি কি ভাবে সর্বসাধারণকে অবগত করানো হয়। অনুমান করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে সেটা সেঁটে দেওয়া হয়। আমার অনুমান যদি সত্য হয়, তবে অনুরোধ করি, ঐ নোটিশের পাশে আরেকটি নোটিশও যেন সেঁটে দেওয়া হয়—বনের চিঠির সঙ্গে সঙ্গে একই ডাকে হার্ভার্ড (কিংবা অন্য কোনো মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়, আমার ঠিক মনে নেই—সে-মু-আ) আমাকে জানিয়েছেন যে, তাঁরা আমাকে অনারারি ডক্টরেট দিয়েছেন। এই সুবাদে এটাও বলে রাখি, বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট আমি কখনো আমার নামের সঙ্গে জুড়ি নি কিংবা অন্য কোনো প্রকারে কাজে লাগাই নি; হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেটও কাজে লাগালুম এই প্রথম এবং এই শেষবারের মত। কিন্তু কেন—?'

এই বলে মান্ জর্মনির সংস্কৃতি ঐতিহ্য তথা আদৌ ইয়োরোপীয় সভ্যতা

বৈদগ্ধ্য বলতে কি বোঝায়, নাৎসি 'জীবনদর্শন' কিংবা বলি 'অদূরদর্শন' কি সেই সম্বন্ধে শাস্ত, বজ্রদৃঢ় কণ্ঠে প্রকাশ করেছেন আপন অতিশয় সুচিন্তিত যুক্তি-তর্ক-অভিজ্ঞতা-প্রসূত অভিমত। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, গভীর দরদ দিয়ে। সেই যে জাপানী যক্ষ্মারোগী চিত্রকর, যে তার বুক কেটে তার থেকে তুলি দিয়ে রক্ত তুলে তুলে নিয়ে ছবি এঁকেছিল, ঠিক সেই রকম।

তারপর মান্ নীরব হলেন। কারণ তিনি রাজনৈতিক নন।

তারপর প্রায় সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাণ্ডবনৃত্য নেচে নিয়ে চলে গেল। কে তখন স্মরণ করে মানের ক্ষীণ কাকলি? তারপর তথাকথিত শান্তি। মনের বাসনা গেল আপন মাতৃভূমি পুনর্দর্শন করার। পশ্চিম জর্মনিতে তিনি এলেন। শেকস্‌পীয়র আজ ইংলণ্ডে ফিরে এলে এর সিকি সম্মানে তুষ্ট হতেন।

মান্ কম্যুনিজম পছন্দ করতেন না, তবে কতখানি অপছন্দ করতেন সেটা আমার পক্ষে বলা অসম্ভব, কারণ তাঁর তাবৎ লেখা এ-দেশে পাবার যো নেই।[১] তাই এক জর্মন তাঁকে ভীরু কণ্ঠে শুধোলেন, 'আপনি কি পূর্ব জর্মনিও (কম্যুনিস্ট জর্মনি) যাবেন?

মান্ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'জর্মন ভাষা যেখানে পূজা পায় সে ভূমিই আমার মাতৃভূমি।'

এত দীর্ঘ অবতরণিকা দেবার কারণ, অনেকেই মনে করেন মান্ এসকে-পিস্ট ছিলেন—এই সুবাদে ঘটনাটির উল্লেখ করার সুযোগ হ'ল।

শিলঙ, কটক, পাটনা—এই তিন জায়গায় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের তিনটি বড় কেন্দ্র আছে। এ-তিনটির সঙ্গে আমি সুপরিচিত। ভাগলপুর, এলাহাবাদ, জব্বলপুর এবং আরো নানা জায়গায়ও আছে কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্ষীণ।[২]

এদের নানারকম সমস্যা আছে। তার চরম নির্দশন তো হালে আসামের সর্বত্র হয়ে গেল।

১ নেতিবাচক বাক্য বলা বড় কঠিন; অস্তিবাচক বাক্য বলা সহজ। দৃষ্টান্ত: আমাকে যদি কেউ শুধোয়, 'ঘোড়া' শব্দ বাঙলাতে আছে কিনা; আমি অতি অবশ্য বলব 'নিশ্চয়ই', কারণ এ শব্দ আমি বাঙলা পুস্তকে শতাধিকবার পেয়েছি, কিন্তু কেউ যদি শুধোয়, 'কটহ' শব্দ বাঙলা শব্দ কি না, তবে আমি কি উত্তর দিই? এযাবৎ চোখে পড়ে নি, তাই বলে কি বলবো, বাঙলা শব্দ নয়—কারণ আমি তো তাবৎ বাঙলা বই, পুঁথি, পাণ্ডুলিপি পড়ি নি যে, হলফ করে বলবো, এটা বাঙলা শব্দ নয়।

২ ভাগলপুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; আমার অগ্রজপ্রতিম জনৈক বন্ধু 'ভাগলপুরের বাঙলা ও বাঙালী' এই বিষয়ে একখানি প্রামাণিক পুস্তিকা লিখেছেন। সেটির দিকে এই বেলায়ই আমার পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে রাখছি।

প্রধান সমস্যা এই : মনে করুন আমি পটনায় ডাক্তারি করি। আমার ঠাকুরদা সেখানে গিয়ে প্রথম বসবাস করেন। আদি নিবাস বিক্রমপুরের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র এখন সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আগে রাষ্ট্রভাষা ইংরিজী ছিল বলে আমি শিখেছিলুম বাঙলা এবং ইংরিজী। হিন্দীর বিশেষ প্রয়োজন হত না বলে ওটা আমি মেহন্নৎ করে শিখি নি। ধাই-আয়াদের কাছ থেকে রাস্তাঘাটে ওটা আমি 'পিক্ অপ' করে নিয়েছিলুম।

এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। হিন্দী রাষ্ট্রভাষা। আমার ছেলে যদি বিহারীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে চায় তবে তাকে অত্যুত্তম হিন্দী শিখতে হবে। সে যখন কথা বলবে তখন যেন কেউ ঘুণাক্ষরেও না বুঝতে পারে যে হিন্দী তার মাতৃভাষা নয় ; আর উচ্চারণ তার কথন-শৈলী নিয়ে যেন কোনো হিন্দী-ভাষা টিটকারি না দিতে পারে।

এতখানি হিন্দী তাকে শেখানো যদি আমার আদর্শ হয় তবে তাকে অতি ছেলেবেলা থেকেই পাঠাতে হবে হিন্দী পাঠশালায়। শুধু তাই নয়, যেহেতু বাড়িতে সে বাঙলা বলে, সে হ্যান্ডিক্যাপ কাটিয়ে ওঠবার জন্য তার জন্য আমার ফালতো ব্যবস্থাও করতে হবে। এসব তাবৎ ব্যবস্থা যদি করি তবে সে উত্তম হিন্দী শিখবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে যদি হরিনাথ দের মতন ভাষাবাবদে সব্যসাচী না হয়—এবং সে সম্ভাবনাই বেশী—তবে তার বাঙলা থেকে যাবে কাঁচা।

অথচ দেখুন, ভদ্রসন্তানই তার পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করে। ভদ্রসন্তানই পুত্রকে শিক্ষা দেয়, পিতাকে মাতাকে পিতৃপুরুষকে শ্রদ্ধা জানাতে। তার সরল অর্থ, পরিবারগত জাতিগত ঐতিহ্যকে সম্মান জানাতে। এর সব-কিছুই করতে হয় মাতৃভাষার মারফতে। ছেলেবেলা থেকে হিন্দী শেখার ফলে মাতৃভাষা হবেন অবহেলিত। এবং তারই শেষ ফল :—পাটনার সর্বত্র সে সম্মান পাবে তার হিন্দীর জোরে, কিন্তু আপন বাড়িতে সে পরদেশী, আপন ঐতিহ্য তার ধমনীতে প্রবেশ করতে পারলো না,—সে বর্বর। এবং তার জন্য দায়ী আমি।

বোম্বাইয়ের বাঙালী ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা ম্যাট্রিক পাস করে বাঙলা মাতৃভাষা নিয়ে। এরা বড় সুন্দর বাঙলা লেখে। এ কথা আমি জানি ; তার কারণ স্বর্গত শ্যামাপ্রসাদবাবুর কল্যাণে (ভুল হলে কেউ শুধরে দেবেন) যখন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলাকে অন্যতম পরীক্ষার ভাষারূপে স্বীকার করে নিলেন তখন আমি হলাম তাদের এগজামিনার। তেরো বৎসর পরে আবার সে ইস্কুল দেখতে গিয়েছিলুম। বড় আনন্দ হল। সে যুগের দু'চারটি শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর পরিচিতি স্মিতহাস্য বয়ানও দেখতে পেলুম।

এঁরা বোম্বাইয়ে বাঙলা ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমার অনুরোধ, ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা যেন মারাঠী ভাষা অবহেলা না করে ॥

রবীন্দ্র রসের ফিল্মরূপ

অনেকেই হয়তো মনে করতে পারেন মুনিঋষিদের মত পরিবর্তন হয় না; আজীবন একই বাণী প্রচার করে যান। আমি এ মত পোষণ করি নে। আমরা বিশ্বাস করি তাঁদেরও পরিবর্তন হয়, তবে আমার আরেকটি অন্ধ-বিশ্বাস,—মত পরিবর্তন সত্ত্বেও তাঁদের একটি মূল সুর বরাবরই বজায় থাকে।

রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপনা করেন তখন এটাকে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বা ব্রহ্মবিদ্যালয় বলা হত। ছেলেরা জুতো পরতো না, নিরামিষ খেত, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণেতরের জন্য পৃথক পৃথক পঙক্তি ছিল; এমন কি প্রশ্ন উঠেছিল, ব্রাহ্মণ ছাত্র কায়স্থ গুরুর পদধূলি নেবে কি না!

সেই শান্তিনিকেতনেই, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায়ই, পৃথক পৃথক পঙক্তি উঠে গেল, আমিষ প্রচলিত হল, গ্রামোফোন বাজলো, ফিল্ম দেখানো হল। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পূর্বেই শান্তিনিকেতন সত্যার্থে বিশ্বভারতী বা ইণ্টারন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটি রূপে পরিচিত হল। বস্তুত এরকম উদার সর্বজনীন বাসস্থল পৃথিবীতে কোথাও নেই।

* * *

একদিকে তিনি যেমন চাইতেন আমাদের চাষবাসের ট্র্যাক্টর এবং অন্যান্য কলকব্জা প্রচলিত হয়ে আমাদের ফসলোৎপাদন বৃদ্ধি করুক, অন্যদিকে ঠিক তেমনি ইয়োরোপের মানুষ কি ভাবে অত্যধিক যন্ত্রপাতির নিপীড়নে তার মনুষ্যত্ব হারাচ্ছে সে সম্বন্ধে তাঁর তীব্র মন্তব্য বিশ্বজনকে জানিয়ে গিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর জীবনদর্শন কি ছিল তার আলোচনা কঠিন এবং দীর্ঘ, আমাদের সামনে প্রশ্ন—আজ যে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প, উপন্যাস, নাট্য, নৃত্যনাট্য ফিল্মে আত্মপ্রকাশ করছে সেটা কি ভাবে করলে তিনি আনন্দিত হতেন?

এ-কথা সত্য, প্রথম যৌবনে তিনি গ্রামোফোনের প্রতি বিরূপ ছিলেন এবং পরবর্তী কালে তিনি তার জন্য গেয়েওছেন। পিয়ানোযোগে তাঁর একাধিক নাট্য মঞ্চস্থ হয়েছে অথচ তিনি হারমোনিয়াম পছন্দ করতেন না। ফিল্মের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা ছিল না; এমন কি শুনেছি তাঁর 'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়' গানটিতে তিনি যে সুর দিয়েছেন তাতে কিছুটা ফিল্মের রস দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এবং 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী' জাতীয় একাধিক গানে যে বিলিতি সুর আছে সে তো জানা কথা।

প্রথম নিন রেডিয়োর কথা।

আমার বিস্ময় বোধ হয়, কোন সাহসে রেডিও নাট্যে প্রডুসার রবীন্দ্রনাটকের কাটছাঁট করেন!

গান, কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস প্রত্যেক রসবস্তুরই একটা নির্দিষ্ট আয়তন আছে এবং সেটি ধরা পড়ে রসবস্তুটি সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হয়ে আত্মপ্রকাশ করার পর। 'আগুনের পরশমণি'কে তিন ঘণ্টা ধরে পালা কীর্তনের মত করে গাইলে তার রস বাড়ে না, আবার কোনো মার্কিন কোটিপতির আদেশে তাজ-

মহলকে কাটছাঁট করে তার জাহাজে করে নিয়ে যাবার মত সাইজ-সই করে দেবার চেষ্টাও বাতুলতা।

এই কিছুদিন পূর্বে বেতারে রবীন্দ্রনাথের একটি নাটক শুনছিলুম। এক ঘণ্টাতে সেটাকে ফিট করার জন্য তার উপর যে কী নির্মম কাঁচি চালানো হয়েছিল সেটা সর্বকঠিন প্রতিবাদেরও বাইরে চলে যায়। শব্দে শব্দে ছত্রে ছত্রে, প্রশ্ন উত্তরে, ঘটনা ঘটনায় যতখানি সময় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি তুলে ধরলেন তাতে কাট-ছাঁট করলে যে কী রসভঙ্গ হয় সে শুধু ঐ সব দাম্ভিকেরা বোঝে না। আমার মনে হয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও যদি অতি অনিচ্ছায় কোনো কারণে রাজী হতেন ওটাকে ছোট করতে, তবে তাঁকেও বিষম বিপাকে পড়তে হত। স্থাপত্যের বেলা জিনিসটা আরো সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। আজ যদি পুরাতত্ত্ব বিভাগ তদারকির খরচ কমাবার জন্য তাজমহলটাকে আকারে ক্ষুদ্রতর করার চেষ্টা করেন তবে কি অবস্থা হয় চিন্তা করুন তো। কিংবা ফিল্মেরই উদাহরণ নিন। বছর পাঁচেক পূর্বে আমি একটা নামকরা বিদেশী ফিল্ম দেখে অবাক হয়ে বললুম, প্রত্যেক অংশই সুন্দর কিন্তু তবু রস জমলো না। তখন খবর নিয়ে জানা গেল, ফিল্ম বোর্ডএর উপর এমনি নির্মম কাঁচি চালিয়েছেন যে তার একটা বিপুল ভাগ কাটা পড়েছে। যেমন মনে করুন তাজের গম্বুজ এবং দুটি মিনারিকা কেটে নেওয়া হলে পর তার যে রকম চেহারা দাঁড়াবে!

আমার প্রশ্ন, কি দরকার? দুনিয়ায় এতশত জিনিস যখন রয়েছে যেগুলো বেতারের সময় অনুযায়ী পরিবেশন করা যায় তখন কী প্রয়োজন সর্বাঙ্গসুন্দর জিনিস বিকলাঙ্গ করার? হনুমান হনুমানই সই, কিন্তু শিব কেটে ঠুঁটো জগন্নাথ করার কি প্রয়োজন?

দুই নম্বর: রবীন্দ্রনাথের নাট্যের শব্দ পরিবর্তন। কিছুদিন পূর্বে একটি নাট্যে এ রকম পরিবর্তন শুনে কান যখন ঝালাপালা—বস্তুত কিছুক্ষণ শোনার পরই আমার মনে হল, এ ভাষা রবীন্দ্রনাথের হতেই পারে না এবং তাই বইখানি চোখের সামনে খুলে ধরে নাট্যটি শুনছিলুম—তখন এক জায়গায় দেখি ছাপাতে আছে 'কে তুমি'? এবং নাট্যে বলা হল 'তুমি কে'?

এ দুটোর তফাত তো ইস্কুল-বয়ও জানে।

নাট্যমঞ্চে হলে তবুও না হয় ভাবতুম, হয়তো নট ভালো করে মুখস্থ করেন নি, কিন্তু এ তো বেতারের ব্যাপার—ছাপা বই তো সামনে রয়েছে।

পুনরায় প্রশ্ন করি, কী প্রয়োজন, কী প্রয়োজন? জানি, পনেরো আনা শ্রোতা ভাষা সম্বন্ধে অত সচেতন নয়, কিন্তু যেখানে কোনো প্রয়োজন নেই সেখানে এক আনা লোককেই বা কেন পীড়া দেওয়া?

তিন নম্বর—এবং সেইটেই সব চেয়ে মারাত্মক!

রবীন্দ্রনাথের একটি গল্পকে নাটক করা হয়েছে। গল্পটি গত শতকের শেষের কিংবা এই শতকের গোড়ার পটভূমিতে আঁকা এবং নিম্ন মধ্যবর্তী শ্রেণী নিয়ে লেখা। বাপ-মায়েতে ঠিক হয়েছে অমুকের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দেওয়া হবে। তখন বাপ তাঁর স্ত্রীকে শুধোচ্ছেন, 'তোমার মেয়ে কি বলে?' মা যে

কী ন্যাকরার সুরে বললে সে অবর্ণনীয়—'ওকে জিজ্ঞেস করবে কি ? সে তো সকাল-বিকাল ওরই ঘরে ঘুর ঘুর করছে।' সক্কলের পয়লা কথা, সে যুগে মেয়েকে বিয়ের পূর্বে ওরকম জিজ্ঞেস করা হত না, সে কাকে বিয়ে করতে চায়, দ্বিতীয়ত মেয়ের প্রেমে পড়া নিয়ে সে যুগে বাপে-মায়ে এরকম 'ন্যাকরা' করে কথা বলা হত না।

আমার কাছে এমনি বেখাপ্পা লাগলো যে, আমি কিছুতেই বুঝতে পারলুম না রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ জিনিস কি প্রকারে সম্ভব ! তখন উঠে বই খুলে পড়ে দেখি, মেয়ের মতামত জানবার জন্য বাপ-মায়েতে এই কথোপকথন গল্পটিতে আদৌ নেই !

সস্তা, কুরুচিপূর্ণ, ন্যক্কারজনক বাজে নাটক শুনে শুনে আমাদের রুচি এমনিই বিগড়ে গিয়েছে যে, প্রডুসার মনে করেন যে প্রচুর পরিমাণে ন্যাকামোর লঙ্কাফোড়ন না দিলে আমরা আর কোনো জিনিসই সুস্বাদু বলে গ্রহণ করতে পারবো না ! দোষ শুধু প্রডুসারের নয়—আমাদেরও।

তবে প্রশ্ন উঠতে পারে ঃ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই অনেক কিছু করেছেন।

যেমন মনে করুন 'শ্যামা' নাট্য তাঁর 'পরিশোধ' কবিতার উপর গড়া। আবার 'পরিশোধে'র প্লটটি জাতক থেকে নেওয়া। তাতেও আবার রবীন্দ্রনাথ মূল প্লটকে শেষের দিকে খানিকটা বদলে দিয়েছেন। এস্থলে বক্তব্য, জাতকের গল্পেতে থাকে শুধু প্লটই। সেখানে অন্য কোন রসের পরিবেশ থাকে না বলে সেই প্লট নিয়ে কৃতকর্মা রসনির্মাতা গল্প উপন্যাস নাট্য নির্মাণ করতে পারেন। অর্থাৎ দেবীর কাঠামোর উপর মাটি-কাদা-রঙ লাগিয়ে প্রতিমা নির্মাণ করা এক কথা- সেটা সহজও, যে যার খুশীমত করে তাকে সুন্দর করতে পারলেই হল—কিন্তু প্রস্তুত প্রতিমার উপর আরো মাটি লাগিয়ে হাত দুটিকে আরো লম্বা করা, কিংবা দশ হাতের উপর আরো দুটি চড়িয়ে দেওয়া, সে সম্পূর্ণ অন্য কথা। দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পরিশোধ'কে 'শ্যামা'তে পরিবর্তিত করতে পারেন তাঁর সে শক্তি আছে। সে রকম শক্তিমান আমাদের ভিতর কই ? এবং আমার মনে হয় সে রকম শক্তিমান ফিল্ম-ডিরেক্টর রবীন্দ্র-নাথকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া না করেও এমন প্লট অন্যত্র পাবে যেখানে সে তার জিনিয়াস, তার সৃজনীশক্তি আরো সহজে, আরো সুন্দর করে দেখাতে পারবে।

জাতক পড়ুন, জাতক পড়ুন জাতক পড়ুন। ওর মত ভাণ্ডার কোনো ভাষাতেই নেই।

এবং রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে জাতকের প্লট নিয়ে কবিতা এবং নাট্য করতেন সেই টেক্‌নীকটি রপ্ত করে নিন ॥

সম্পাদক লেখক পাঠক

শ্রীযুত জলসা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

মহাশয়,

সচরাচর আমি পাঠকদের জন্যই আপনার কাগজে লিখে থাকি (এবং আপনার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি যে প্রতি সংখ্যায়ই কিছু লেখা দেব)। আপনার পড়ার জন্য নয়। কারণ আমি নিন্দুকের মুখে শুনেছি, সম্পাদকেরা এত ঝামেলার ভিতর পত্রিকা প্রকাশ করেন যে তারপর প্রবন্ধগুলো পড়ার মত মুখে আর তাঁদের লালা থাকে না। কথাটা হয়তো একেবারে মিথ্যা নয়। কারণ

তিন্তিড়ী পলাণ্ডু লংকা লয়ে সযতনে
উচ্ছে আর ইক্ষুগুড় করি বিড়ম্বিত
প্রপঞ্চ ফোড়ন লয়ে

যেদিন আমি রন্ধন-কর্ম সমাধান করি, সেদিন আমারও ক্ষিদে সম্পূর্ণ লোপ পায়। কাজেই আপনার বিরুদ্ধে যে প্রিমা ফাশি কেস্ একেবারেই নেই, সে-কথা বলতে পারবেন না। অন্তত আমার লেখা যে আপনি একেবারেই পড়েন না, সে বিষয়ে আমি সুনিশ্চয়—কারণ পড়া থাকলে দ্বিতীয়বারের জন্য লেখা চাইতেন না। ন্যাড়া একাধিকবার যেতে পারে বেলতলা— নিমতলা কিন্তু যায় একবারই।

ইতিমধ্যে আমি কথা দিয়েও কথা রাখতে পারি নি। অথচ দোষটা পড়েছে নিশ্চয়ই আপনার ঘাড়ে। বাঙলাতে বলে,

খেলেন দই রমাকান্ত
বিকারের বেলা গোবিন্দন!

অর্থাৎ জবান খেলাপ করলুম আমি, বিকারটা হল আপনার।

'অয়, অয়, জানতি পারো না'—আকছারই হয়। তার কারণটাও সরল। যে-দোষ আপনি করেছেন, তার গালমন্দ আপনিই খাবেন, এ তো হক্ কথা, এ তো আপনার ন্যায্য প্রাপ্য। তাই তাতে আপনার ক্ষোভ থাকাটা অশোভন, কিন্তু সংসারটাতো ন্যায়ের উপর চলে না, সে কথা তো আপনি বিলক্ষণ জানেন— তাই মাঝে মাঝে অন্যায় অপবাদ সইতে হয়। আপনারই কাগজে দেখলুম, এক পাঠক আপনাদের টাইট দিয়েছেন, রাবিশ লেখা ছাপেন কেন? উত্তরদাতা বেচারী মুখ শুকনো করে (আমি হরফগুলোর মারফতেই তাঁর চেহারাটি স্পষ্ট দেখতে পেলুম) বলছেন, নাচার, নাচার স্যর! নামকরা লেখক। অনুরোধ জানিয়েছিলুম, একটি লেখা দিতে—অজানা জনকে তো আর অনুরোধ করতে পারি নে, বৃষ্টিতে ভেজার ভয়ে পুকুরে তো আর ডুব মারতে পারি নে—তারপর এসে উপস্থিত এই খাজা মাল। না ছাপিয়ে করি কি?'

বিলকুল সচ্চী বাৎ (আপনার কাগজে হিন্দী উর্দু শব্দের বগ্‌হার দিতে আমার বাধে না, কারণ আপনার পাঠক সম্প্রদায় পাইকিরি দরে হিন্দী ফিলিম

দেখে দেখে দিব্য হিন্দী বুঝতে পারেন)! কারণ ফ্রান্স-জর্মনিতেও বলে, বরঞ্চ রদ্দি মাল খেয়ে পেটের অসুখ করবো, তবু শা—হোটেলওলাকে ফেরৎ দেব না, পয়সা যখন দিতেই হবে,—পাছে অন্য খদ্দেরকে বিক্রি করে ডবল পয়সা কামায়!' অতএব আমার মতে ছাপিয়ে দেওয়াটাই সুবুদ্ধিমানের কর্ম।

এ হেন অবস্থায় একটা মাস যে মিস্ গেছে, সেটা কি খুব খারাপ হল? বুঝলেন না? তাহলে একটি সত্যি ঘটনা বলি ঃ

ফিল্মাকাশের পূর্ণচন্দ্র শ্রীযুত দেবকী বসু আমার বন্ধু। দিল্লীতে যখন তাঁর 'রত্নদ্বীপে'র হিন্দী কার্বন কপি দেখানো হয়, তখন দিল্লীর ফিল্ম সম্প্রদায় তাঁকে সেখানে নিমন্ত্রণ করে অভ্যর্থনা জানায়। স্বাগতাভিভাষণটি বলবার অনুরোধ আমাকেই করা হয়েছিল। কেন, তা জানি নে। এই তো ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো নয়। দেবকীবাবু যদি চটকদার রাবিশ ফিল্ম বানাতেন, তবে আমি ডাক পেলে আশ্চর্য হতুম না। তখন বুঝলুম, 'মুক্তো ফেলতে ডুবুরী' অর্থাৎ জউরী, সে সত্যই মুক্তোর মূল্য জানে, সে জলে নামে না—নামে মুক্তো বাবদে আনাড়ি ডুবুরী। কারণ আমি ফিল্ম দেখতে যাই নে—এরকম একটা বদনাম তরুণদের মধ্যে আমার আছে। বৃদ্ধেরা অবশ্য খুশী হয়ে বলবেন, 'বা, বা, বেড়ে ছেলে, খাসা ছেলে।' আমি কিন্তু বৃদ্ধের প্রশংসার চেয়ে তরুণের নিন্দাই কামনা করি। সংস্কৃতেও বলে বৃদ্ধার আলিঙ্গনের চিয়ে তরুণীর পদাঘাত শ্রেয়।'

যাক সেকথা। সেই সূত্রে দেবকীবাবুর পুত্র দিলীপের সঙ্গেও পরিচয় হয়। তদ্দণ্ডেই সে আমার ন্যাওটা হয়ে যায়। খাসা ছেলে। ফিল্ম দেখেও বেড়ে ছেলে—তরুণ বৃদ্ধ এক সুরেই বলবেন।

সে ডাক্তারি প্র্যাকটিসে নামার কয়েক বৎসর পর—আমি তখন ঘরের ছেলে কলকাতায় ফিরে এসেছি—দেবকীবাবু আমাকে একদিন শুধোলেন, 'দিলীপ কি রকম ডাক্তার!'

মিত্রপুত্রের প্রশংসা করতে সবাই আনন্দ পায়; একগাল হেসে বললুম, 'চৌকশ, তালেবর।'

'মানে?'

'অতি সরল। এই দেখুন না, মাস ছয় আগে আমার হল দারুণ আর্ত-রাইটিস—আর্তরব ছেড়ে ডাকলুম ডাকসাইটে অমুক ডাক্তারকে। তিনি ওষুধ দেওয়ার পর আমার এমনি অবস্থা যে আর্তরব স্মার্তরব কোন রবই আর ছাড়িতে পারি নে। তখন এলেন আরেক বাঘা ডাক্তার। তিনি নাকি মড়াকে জ্যান্ত করতে পারেন। আমার বেলা হয় উল্টো; জ্যান্তকে মরা করতে লাগলেন। যাই যাই। সেই যে—

এক দুই তিন,
নাড়ি বড় ক্ষীণ।
চার পাঁচ ছয়,
কি হয় না হয়।

সাত আট নয়,
মরিবে নিশ্চয়।
দশ এগারো বারো,
খাট যোগাড় করো।
আঠারো উনিশ কুড়ি
বল্ "হরি হরি।"

কী আর করি? মরি তো মরি, মরবো না হয় দিলীপেরই হাতে। আর যা হোক হোক, আমাকে মানে। ভোঁতা নীড্‌ল দিয়ে শেষ ইন্‌জেকশনটা দেবে না।'

আমি থামলুম। দেবকীবাবু রুদ্ধশ্বাসে, শঙ্কিত কণ্ঠে শুধোলেন, 'তার-পর কি হল? আপনি বেঁচে উঠেছিলেন কি?'

আমি বললুম, 'দিলীপ বাড়িতে ছিল না, তাই আসতে পারল না। আমি সেরে উঠলুম।"

তবেই দেখুন, সে ভালো ডাক্তার কি না।'

সম্পাদক মশাই, আপনাদেরও কি সেই অবস্থা নয়? ডাকসাইটে অমুক লেখকের লেখা ছাপালেন। কাগজ নাবলো নিচে। বাঁচতে গিয়ে ডেকে পাঠালেন আর এক বাঘা লেখককে। আপনাদের অবস্থা হল আরো খারাপ! তখন আমি দিলীপ—কাঁচা লেখক—চাইলেন আমার লেখা। আমি বরদায়। লেখা পাঠাতে পারলুম না। হুশ করে আপনার কাগজের মান উঁচু হয়ে গেল। বিশ্বাস না হয়, আপনার সেলস্ ডিপার্টমেণ্টে খবর নিন—যে সংখ্যায় আমার লেখা ছিল না সেটি শুধু ইণ্ডো-পাকিস্তান ক্রিকেট টিকিটের মত বিক্রী হয় নি, ডাকে বিস্তরে বিস্তর খোয়া যায় নি, হয়তো বা আপনার অজানতে কালোবাজারও হয়েছে। বলতে কি, ঐ সংখ্যাটি আমারও বড্ড ভালো লেগেছে। বিশেষ করে রঞ্জনের লেখাটি এবং ভোম্বে থেকে বৌমিকের 'প্রশ্নবান'। বস্তুত, আমি আজ ঠিক করেছিলুম এ সংখ্যাটি নিয়েই আলোচনা করবো কিন্তু উপস্থিত মাত্র দু' একটি মন্তব্য করে সে-আলোচনা মুলতুবি রাখি।

যেমন মনে করুন, রঞ্জন লিখেছেন, 'বম্বের চিত্রনির্মাতা ঠিকই ধরেছেন যে অধিকাংশ দর্শক আড়াই ঘণ্টার জন্য (যখন ছবি ওই সময়ে শেষ হয়) আপন আসন্ন পরিবেশ থেকে অব্যাহতি পেতে চায়।' সত্যই কি তাই? তবে আমার প্রশ্ন, বৃদ্ধের আসন্ন পরিবেশ মৃত্যুর। এবং মৃত্যুভয় সব চেয়ে বড় ভয়। তবে বৃদ্ধেরা সিনেমা দেখতে যায় না কেন? আবার দেখুন, লড়াই যখন চলতে থাকে তখন ছুটি-ফেরা জোয়ান সেপাই জোর সিনেমা যায়। চল্লিশ এবং পঞ্চাশের মাঝামাঝি সময়েই এদেশের পরিবেশ সর্বাপেক্ষা নিরানন্দময়। ছেলে-দের পড়াবার পয়সা নেই, মেয়েরা বড় হয়েছে অথচ বর জুটছে না, চাকরিতে আর যে একটা মহৎ পদোন্নতি হবে সে সম্ভাবনাও আর নেই—তবুও ঐ বয়সের

লোক সিনেমায় যায় কম। অথচ তার কলেজী ছেলে—যার ঘাড়ে এখনো সংসারের চাপ পড়ে নি, খেলাধুলো সে করতে পারে, রকবাজিও তোফা জিনিস, তার আসন্ন পরিবেশ প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের তুলনায় অনেক কম ভয়াবহ—সেই বা ড্যাং ড্যাং করে সিনেমায় যায় কেন? না আমার মন সাড়া দিচ্ছে না।

মঞ্জু বসু আমাদের ভৌমিক সায়েবকে শুধিয়েছেন, 'বারাঙ্গনার বীরাঙ্গনাতে রূপান্তরিতের একটি উদাহরণ দিন।' ভৌমিক ঠিক উত্তরই দিয়েছেন—'বাজিরাও প্রেমিকা মস্তানা বেগম্।'

আমি উল্টোটার বিস্তর উদাহরণ দিতে পারি। বীরাঙ্গনা কি করে বারাঙ্গনা হয়। যে কোনো খবরের কাগজে যে কোনো দিন দেখতে পাবেন। আমি তো প্রথম দিনে হকচকিয়ে উঠেছিলুম। এক বিখ্যাত বাঙলা দৈনিকের প্রথম পাতার এক কোণে দেখি, একটি সৌম্যদর্শন মহিলার ফটোগ্রাফ এবং নিচে লেখা 'বারাঙ্গনা—অমুক'। এদের কি মাথা খারাপ, না এরা পাগল যে বারাঙ্গনার ছবি কাগজের পয়লা পাতায় ঘটা করে ছাপায়। তলায় আবার পরিচয়—'মহিলাটি বঁটি হাতে একা একটা ডাকাতকে ঘায়েল করে প্রাণ হারান।' তখন আমার কানে জল গেল। বাঙলা হরফের উপরের ও নীচের দিকের অংশ প্রায়ই ভেঙে যায়। ী দীর্ঘঈকারের উপরের লুপটি ভেঙে যাওয়াতে 'বী' বদলে হয়ে গিয়েছে 'বা'। এটা এক দিনের নয়। উপরের লুপ, ('বঞ্চিত' শব্দের উপরের হুক ভেঙে গেলে অবস্থা আরো মারাত্মক), নিচের হ্রস্বউকার গণ্ডায় গণ্ডায় নিত্যি নিত্যি ভাঙে। আমরা অভ্যাসবশে পড়ে যাই বলে লক্ষ্য করি নে। যদি ঠিক যে-রকম ছাপাটি হয়েছে—ভাঙাচোরার পর—সে-রকমটি পড়েন তবে দেখবেন বিস্তর বীরাঙ্গনা বারাঙ্গনা হচ্ছেন, এবং আরো অনেক সরেস উদাহরণ পাবেন যেগুলো স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে ছাপলে আমি সমাজে মুখ দেখাতে পারতুম না। আপনাকে বলে রাখি, এখনো পারি নে—তবে সেটা পাওনাদারের ভয়ে।

অরুণ গুহ শুধিয়েছেন, 'এমন একটি আশ্চর্য জিনিসের নাম বলুন, যা আজ আছে কিন্তু ত্রিশ বৎসর আগে ছিল না।' ভৌমিক উত্তর দিয়েছেন, 'শচীন ভৌমিক।' সরেস উত্তর।

তারপর অরুণ গুহ ফের শুধিয়েছেন, 'এমন একটি জিনিসের নাম বলুন যা না থাকলে বিশ্বের কোন ক্ষতি হত না।' ভৌমিক উত্তর দিয়েছেন, 'অরুণ গুহ।' আমি শচীন ভৌমিক হলে লিখতুম, 'শচীন ভৌমিক'—এবারেও। কারণটা বুঝিয়ে বলি।

রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী চলেছে, সেই সুবাদ নিয়েই বলছি—

বিলাতের বিখ্যাত স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজীন একবার পৃথিবী সেরা সেরা গুণীজ্ঞানীদের প্রশ্ন শোধান,

১। আপনার সব চেয়ে প্রিয় পাপমতি কি (হোয়াট ইজ ইয়োর বেস্ট ফেভরিট ভাইস)?

২। আপনার সব চেয়ে প্রিয় পুণ্যমতী কি (হোয়াট ইজ ইয়োর মোস্ট ফেভরিট ভার্চু)?

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

১। ইন্‌কন্‌সিস্‌টেনসি (অর্থাৎ কোনো জিনিসে অবিচল থাকতে পারি নে—অর্থাৎ মত বদলাই)।

২। ইন্‌কনসিস্‌টেন্‌সি (অর্থাৎ কোনো জিনিসে অবিচল থাকতে পারি নে—অর্থাৎ মত বদলাই)।

একবার চিন্তা করলেই দেখবেন, ইন্‌কন্‌সিস্‌টেন্‌সি জিনিসটা পাপ বটে, পুণ্যও বটে।

যখন আমি স্বার্থের অংশ কিংবা শত্রুভয়ে কাপুরুষের মতন আপন সত্য মত বদলাই (কুলোকে বলে এ ব্যামোটা রাজনৈতিকদের ভিতরই বেশী—'টার্ণ-কোট' এর নাম) তখন আমার ইন্‌কন্‌সিস্‌টেন্‌সি পাপ। আবার যখন বুঝতে পারি আমার পূর্বমত ভুল ছিল, তখন লোক-লজ্জাকে ড্যাম-কেয়ার করে, এমন কি প্রয়োজন হলে স্বার্থত্যাগ করেও যখন মত বদলাই তখন আমার ইন্‌কন্‌-সিস্‌টেন্‌সি সাতিশয় পুণ্যকর্ম।

ঠিক সেইরকম ভৌমিক সায়েব যখন বলেন তিনি ত্রিশ বৎসরের আশ্চর্য জিনিস, আমরা সানন্দে সায় দিই। কারণ তিনি সুন্দর সুন্দর এবং চোখা-চোখা, মৌলিক এবং চিন্তাশীল উত্তর দিতে পারেন। কখনো আনন্দিত হয়ে বলি 'বাঃ', কখনো মার খেয়ে বলি 'আঃ'।

আর তিনি না থাকলেও কোনো ক্ষতি হত না। ইংরিজীতে বলে, 'যা তোমার অজানা সে তোমাকে বেদনা দিতে পারে না।' কিংবা বলবো, 'আমরা জানিলাম না, আমরা কি হারাইতেছি।'

একটু চিন্তা করে দেখুন, কথাটা শুধু ভৌমিক সাহেব না, টলস্টয় কালিদাস, আপনি আমি সকলের বেলাই খাটে কিনা।

* * *

রবীন্দ্রনাথ ও ইন্‌কন্‌সিস্‌টেন্‌সির সুবাদে আমাদের দুটি নিবেদন আছে।

গেল মাসে মিস গেছে তার জন্যই আমি সম্পূর্ণ দায়ী নই। বড় লেখক হলে আমি অনায়াসে বলতে পারতুম, 'মশাই, ইন্‌স্‌পিরেশন্‌ আসে নি—আমি কি দর্জি না ছুতোর অর্ডার-মাফিক মাল দেব ?' তা নয়। আমি সাধারণ লেখক। আমি আজ পর্যন্ত ইন্‌স্‌পায়ার্ড হয়ে লিখি নি। আমি লিখি পেটের ধান্দায়। পূর্বেই বলেছি, চতুর্দিকে আমার পাওনাদার। কে বলে আমি টাকার মূল্য বুঝি নে ? যতবার ফুরিয়ে গিয়েছে ততবারই হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। একটু বেশী ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে, তবু না বলে উপায় নেই, আপনি হয়তো লক্ষ্য করেন নি, আমি চাকরিতে থাকাকালীন কোনো প্রকারের 'সাহিত্যসৃষ্টি' করি নে—চাকরিতে থাকাকালীন আমার কোন বই বেরয় নি। তখন তো পকেট গরম, লিখতে যাবে কোন্‌ মূর্খ ! অতএব ইন্‌স্‌পিরেশনের দোহাই কাড়লে অধর্ম হবে।

আমি গিয়েছিলুম বরদা। সেখানে আমি মধ্য যৌবনে আট বছর কাজ করি। ১৯৪৭-এ বরদা ছাড়ি। সেখানে রবি শতবার্ষিকী উদ্বোধন করতে

আমাকে আহ্বান জানানো হয়, পুরনো চেনা লোক বলে, অন্য কোন কারণে নয়। না গেলে নেমক-হারামী হত। ট্রেনে লেখা যেত না? না। আপনি যদি গবেষণামূলক উচ্চাঙ্গ উন্নাসিক গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ চাইতেন সে আমি গণ্ডায় গণ্ডায় ট্রেনে-বাসে, ভেস্‌টিবুলে-তরুমূলে যেখানে সেখানে বসে—না বসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও লিখে দিতে পারি। কিন্তু একটুখানি রসের ভিয়েন দিতে গেলেই চিত্তির। তার জন্য ইন্‌স্‌পিরেশন্‌ না হোক, অবকাশটি চাই। সাধে কি আর জি. কে চেস্টারটন বলেছিলেন, 'টাইম্‌স্‌ কাগজের গুরুগম্ভীর সম্পদকীয় কলাম আমি দিনের পর দিন আধ ঘণ্টার ভিতর লিখে দিতে পারি, কিন্তু ঐ যে ট্রাম-বাসের কাগজ 'টিট্‌ বিটস'—তার পয়লা পাতার বিশটি রসিকতার চুটকিলা গল্প একসঙ্গে আমি কখনো রচনা করে উঠতে পারবো না।' অথচ কে না জানে, চেস্টারটন ছিলেন সে যুগের সুরসিক লেখক। আর আমি? থাক গে।

দ্বিতীয়ত ঐ ইন্‌কন্‌সিস্‌টেন্‌সির কথা। ওটার বাড়াবাড়ি করলে লোকে ভাববে পাগল। গল্পটা তাই নিয়ে।

ট্রেনে ফেরার মুখে এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে শোনা। ওটা উনি কোন ছাপা বই থেকে পড়ে বলেছেন কি না হলপ করে বলতে পারবো না, তবে এই-টুকু বলতে পারি সেই থেকে যাকে বলেছি, তিনি উত্তরে বলেছেন, এটা তিনি আগে কখনো শোনেন নি। আজ দোলপূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ ছিল—তার সঙ্গেও এর কিঞ্চিৎ যোগ (অর্থাৎ এশোসিয়েশন অব্‌ আইডিয়াজ) রয়েছে।

ক্লাস-টীচার বললেন, 'গত শতাব্দীর সূর্যগ্রহণ সংখ্যা থেকে চন্দ্রগ্রহণ সংখ্যা বিয়োগ করে, তোমার কলারের সাইজের সঙ্গে এ বাড়ির থামের সংখ্যা যোগ দিয়ে, পদীপিসির নামকে ক্ষান্তমাসির নাম দিয়ে ভাগ করে বল দিকিনি আমার বয়স কত?'

ছেলেরা তো অবাক! এ কখনো হয়!

একটি চালাক ছোকরা হাত তুলে বললে, 'আমি পারি, স্যর।'

টীচার বললেন, 'বল।'

'চুয়াল্লিশ।'

টীচার ভারী খুশী হয়ে বললেন, ঠিক বলেছিস। কিন্তু স্টেপগুলো বাৎলা তো, কি করে তুই সঠিক রেজাল্টে পেঁছিলি।'

ছেলেটি তিন গাল হেসে বললে, 'মাত্র তিনটি স্টেপ, স্যর। অতি সোজা :—

আমাদের বাড়িতে একটা আধ-পাগলা আছে;

তার বয়স বাইশ;

অতএব আপনার বয়স চুয়াল্লিশ॥'

রবীন্দ্র রচনাবলী

রবীন্দ্র রচনাবলী/জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ/বিশ্বভারতীর সৌজনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে শিক্ষাসচিব শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন কর্তৃক প্রকাশিত/২৫ বৈশাখ ১৩৬৮/বিশ্বভারতীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে গ্রন্থ সম্পাদনের সহায়তা করেছেন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীঅমিয়কুমার সেন।

রবীন্দ্র রচনাবলী সদ্য প্রকাশিত এই দুই খণ্ড যে আমার এবং আমার মত রবীন্দ্রানুরাগী বহু সহস্র পাঠকের মনে কি গভীর পরিতৃপ্তি সৃষ্টি করেছে সেটি এই অবকাশেই প্রকাশ না করলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা বাঙালী জনমতের প্রতি বিলক্ষণ অবিচার করা হবে। উভয়েরই কৃতিত্ব সমান। রবীন্দ্রশতাব্দী উপলক্ষে সুলভ রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশিত হোক, এই ঐকান্তিক ও ঐক্যবদ্ধ কামনা দেশের কাগজে কাগজে প্রকাশিত হয়েছে ; আমরা, যাদের কথার কোনো মূল্যই নেই, যতদূর সম্ভব অনুনয়-বিনয় করেছি কর্তৃপক্ষের কাছে, উৎসাহ দিয়েছি যাঁরা বাঙালীর হয়ে তাঁদের কামনাটি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জানিয়েছেন। অবশ্য বলে রাখা উচিত, এই উভয় কর্তৃপক্ষের ভিতর বিস্তর রবীন্দ্রানুরাগীও আছেন যাঁরা এই সুলভ রচনাবলী প্রকাশের জন্য জনমত তৈরী হওয়ার পূর্বেই এ ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। বলা বাহুল্য, এঁদের সকলেই বিস্তর বিরুদ্ধাচরণ অতিক্রম করে আজ সাফল্যের দ্বারে এসে পেঁৗচেছেন। বলা আরো বাহুল্য বিরুদ্ধাচারিগণ যে রবীন্দ্র-ভক্তি নন এ কথা বললে অন্যায় বলা হবে। কি কারণে তাঁরা এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন নি সে প্রসঙ্গ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

এই দুই খণ্ড যে ছাপা, বাঁধাই, কাগজ, ছবি, কবির হস্তলিপি ইত্যাদি নিয়ে অনবদ্য সে-বিষয়ে কোনো তর্কের অবকাশ নেই।

কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা, প্রথম আড়াই বা তিন খণ্ডেই আমরা কবির তাবৎ কবিতা ও প্রচুর গান একসঙ্গে পেয়ে যাচ্ছি। যাঁরা প্রাচীন রচনাবলী নিয়ে কাজ করতেন তাঁরাই জানেন রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা বের করতে আমাদের কী বেগই না পেতে হত। কোনো বিশেষ ছোট গল্প, নাট্য বা প্রবন্ধ নিয়ে প্রায় ঐ একই অসুবিধায় পড়তে হত। এই দ্বিতীয় অসুবিধাটিও বর্তমান রচনাবলী দূর করে দেবে— কারণ এতে প্রাচীন রচনাবলীর মত চার রকমের জিনিসের (১. কবিতা ও গান, ২. নাটক ও প্রহসন, ৩ উপন্যাস ও গল্প ৪. প্রবন্ধ) পাঁচমেশালি থাকবে না।

আমি রবীন্দ্রসৃষ্টির বিশেষজ্ঞ নই, কিন্তু আরো বহু বঙ্গসন্তানের মত রবীন্দ্রনাথের কোনো বিশেষ কবিতা পাঠ করে ভাবোদয় হলে সেটা তাদেরই মত প্রকাশ করতে চেয়েছি। এযাবৎ সেটাও করতে পারি নি তার কারণ ঐ ছাব্বিশ খণ্ড নিয়ে রেফেরেন্স খুঁজে বেড়ানো আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। আমার শোক—নবীন রচনাবলীখানা কুড়ি বৎসর পূর্বে পেলে হয়তো

এই নিয়ে কোনো বৃহৎ কাজে হাত দিতে পারতুম। বক্তব্য একটু ব্যক্তিগত হয়ে গেল, কিন্তু আমার একাধিক অনুরাগী পাঠক এই নিয়ে ফরিয়াদ করেছেন বলেই এই সাফাইটি গাইতে হল। আমি কিন্তু প্রাচীন রচনাবলীর নিন্দা করার উদ্দেশ্য নিয়ে এ প্রবন্ধিকা লিখতে বসি নি—যাঁরা চার রকমের লেখা পাঁচমেশালী করেছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্য শুভই ছিল, সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

এখন প্রশ্ন, নবীন রচনাবলীর সম্পাদনা কি রকমে হয়েছে।

আমি বলবো উত্তম, অতি উত্তম। কিন্তু সর্বাঙ্গ-সুন্দর সম্পাদনা হতে এখনো একশ' কিংবা দুশ' বছর লাগবে। কারণ এ কাজ দশজন পণ্ডিতকে দশ বছর খাটিয়ে নিলেই হয় না।

প্রথমত, কবির তাবৎ প্রকাশিত রচনাবলীর প্রথম প্রকাশের ফোটোস্টাট, তাঁর জীবিতাবস্থায় তিনি যে-সব পরিবর্তন করেছিলেন সে সব এবং তাঁর পাণ্ডুলিপি (এগুলো সংগ্রহ করতে কতদিন লাগবে, কেউ বলতে পারে না) যেমন যেমন পাওয়া যাবে তারও ফোটোস্টাট (অন্য একটা নূতন সস্তা পদ্ধতিও হালে বেরিয়েছে) বের করতে হবে। তাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে কবির দেহত্যাগের পর যে-সব পুনর্মুদ্রণ এবং নূতন সংস্করণ বেরিয়েছে তাতে যে সব পরিবর্তন করা হয়েছে সেগুলি পাণ্ডুলিপি-সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত হয়েছে কিনা। এখন এ কাজ সম্ভব নয়। ত্রিশ বৎসর পর যখন এ সব পুস্তকের উপর কারো কোনো কপিরাইট থাকবে না, তখনই উৎসাহী, অগ্রণী নানা প্রকারের প্রকাশক নানা রকম জিনিস প্রকাশ করে পণ্ডিতদের সামনে তুলে ধরবেন। তাঁরা বাঙলার ভিতরে বাইরে বসে বসে যে-সব গবেষণা প্রকাশ করলেন যে সমস্ত যাচাই বাছাই করে ধীরে ধীরে তৈরী হবে প্রামাণিক সংস্করণ। একটি তুলনা দিই; জর্মন কবি হাইনরিষ হাইনের মৃত্যু-শতাব্দী উদ্‌যাপিত হয়েছে বছর পাঁচেক পূর্বে (আমরা রবীন্দ্রনাথের জন্ম শত-বার্ষিকী করছি এখন) এবং আজও তাঁর চিঠিপত্র মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হচ্ছে! কবে শেষ হবে, অনুমান করা কঠিন।

নবীন রচনাবলীর সম্পাদকগণ এ ধরনের কাজে হাত না দিয়ে যে প্রাচীন রচনাবলী যেভাবে ছাপা হয়েছিল মোটামুটি সেভাবেই ছেপেছেন সেইটেই করেছেন ভালো। 'মোটামুটি' কথাটা বোঝাবার জন্য একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ দিই; প্রাচীন রচনাবলীর একাদশ খণ্ডে, গীতাঞ্জলি পুস্তকে আছে—

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।

গীতবিতানেও তাই। কিন্তু ব্রহ্মসঙ্গীতে 'নিকটে'র পর কমা নেই। অর্থাৎ 'নিকট-বন্ধু'রূপে পড়া যেতে পারে। আমরাও ছেলেবেলায় ঐ অর্থে পড়েছি—'বন্ধুকে' ভকেটিভ কেসে নিই নি। জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণের (২য় খণ্ড,

২১৬ পৃষ্ঠায়) পাচ্ছি 'নিকট বন্ধু,'—মাঝখানে কমা নেই। অর্থাৎ ব্রহ্ম-সঙ্গীতেও আমরা ছেলেবেলায় যেটি শুনেছি সেই পাঠ। কবিতাটির পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রসদনে নেই। ওদিকে ঐ সদনের জনৈক দায়িত্বশীল কর্মচারী আমাকে বলেছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের আপন হাতে অটোগ্রাফ বইয়ে লেখা এই কবিতা-টিতে 'নিকট' ও 'বন্ধুর' মাঝখানে কমা পেয়েছেন।

নবীন সংস্করণের সম্পাদকগণ কমা না দিয়ে ভালো করেছেন না ভুল করেছেন সেটা পরবর্তীকালে হয়তো স্থির হবে। উপস্থিত এই পাঠটি দেওয়াতে, আমাদের ভিতর যে আলোচনা হত সেটি সজীব রইল, এবং আরো পাঁচজনের সামনেও প্রকাশ পেল।

প্রাচীন সংস্করণ কপি করাতে নবীন সংস্করণে আরো কিছু কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে সন্দেহ নেই, কিন্তু পূর্বেই বলেছি গত্যন্তর ছিল না। যেমন প্রাচীন রচনাবলী পূরবী পুস্তকের 'দুঃখ-সম্পদ' কবিতাটি শেষ হয়েছে, 'তখন বুঝিতে পারি আপনার মাঝে। আপন অমরাবতী চিরদিন গোপনে বিরাজে।' কিন্তু রবীন্দ্র সদনে সুরক্ষিত ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপিতে এর পর আরো ছয়টি ছত্র আছে—

যখনি কুঁড়ির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেয় তাপে,
তখনি ত জানি, ফুল চিরদিন ছিল ভাপে।
দুঃখ চেয়ে আরো বড় না থাকিতে কিছু
জীবনের প্রতিদিন হ'ত মাথা নীচু
তবে জীবনের অবসান
মৃত্যুর বিদ্রূপ হাস্যে আনিত চরম অসম্মান।

দু'একটি শব্দের তফাৎ নয় বলে এ কয়টি লাইনের বিশেষ মূল্য আছে ও প্রাচীন রচনাবলীর গ্রন্থ-পরিচয়ে দেওয়া আছে। যদিও বাজারে প্রচলিত ভাদ্র ১৩৬৩ পুনর্মুদ্রণের 'পূরবী'তে নেই।

* * *

ঠিক সেই রকম বানান, সমাসবদ্ধ শব্দ লেখার পদ্ধতি নিয়েও নানা কথা উঠবে, নানা আলোচনা হবে। কিন্তু বর্তমান সম্পাদকগণ সেদিকে না গিয়ে ভালোই করেছেন। প্রাচীন রচনাবলী নানা প্রতিকূল অবস্থার মাঝখানে সম্পাদিত ও মুদ্রিত হয়েছিল। তাতে অনেক বিষয়ে অনেকের মতান্তর থাকবে। আমরা চেয়েছিলুম, সেই প্রাচীন সংস্করণেরই একটি সুলভ, কবিতা গল্প ইত্যাদি আলাদা আলাদা করা হ্যাণ্ডি সংস্করণ। তাই পেয়েছি॥

বাঙলা দেশ

কতকগুলো প্রশ্ন আমাকে ছেলেবেলা থেকেই চিন্তান্বিত করেছে এগুলোর সদুত্তর আমি বহু জায়গায় অনুসন্ধান করে কয়েকটি মীমাংসায় পৌঁচেছি বটে কিন্তু যতখানি দলিল-দস্তাবেজ থাকলে এগুলো প্রমাণ রূপে পেশ করা যায় ততখানি

করে উঠতে পারি নি। তার প্রধান কারণ আমার আলসেমি নয়—দস্তাবেজের অপ্রাচুর্যই তার আসল কারণ। অনেকদিন ধরে তাই ভেবেছি, আমার যা বলবার তা বলে ফেলি—দলিল থাক আর নাই থাক—যারা এসব লাইনে কাজ করেন, হয়তো তাঁদের উপকারে লেগে যেতে পারে। 'দেশ' সম্পাদকও এই মত পোষণ করেন—বস্তুত তাঁরই অনুরোধে আমি আমার সমস্যা ও মীমাংসাগুলি পাঠকদের সামনে পেশ করছি, কিন্তু আবার সাবধান করে দিচ্ছি, যথেষ্ট প্রমাণপঞ্জি আমার হাতে নেই।

আমার প্রথম প্রশ্ন, দিল্লী আগ্রা পাঠান-মুগলদের রাজধানী ছিল। সেখানে মুসলমানের সংখ্যা অত কম কেন? যুক্তপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিম বাঙলার দিকে যতই এগোই, ততই দেখি মুসলমানের সংখ্যা কমে আসছে—সেইটেই স্বাভাবিক—কিন্তু হঠাৎ পুব বাঙলায় এসে এদের সংখ্যাধিক্য কেন? দিল্লীর বাদশা দিল্লী, এলাহাবাদ ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ পুব বাঙলায়ই তলোয়ার চালিয়ে জনসাধারণকে মুসলমান করলেন কেন? উত্তরে কেউ কেউ বলেন, দিল্লীর বাদশারা তলোয়ার চালান নি, চালিয়েছিল বাঙলার স্বাধীন পাঠান বাদশারা। তাই যদি হবে, তবে যে যুগে বেহার, বিজাপুর আহমদাবাদেও স্বাধীন পাঠান রাজারা ছিলেন। তাঁরাই বা তলোয়ার চালালেন না কেন? কেউ কেউ বলেন, বাঙলা দেশ বৌদ্ধ-প্রধান স্থান ছিল—তারা ভালো করে পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরে যাবার পূর্বেই মুসলমান ধর্ম বাঙলা দেশে আসে বলে এদের অনেকেই মুসলমান হয়ে যায়। এর উত্তরে আমার নিবেদন,—রাজগির, বুদ্ধগয়া, পাটলিপুত্র, নালন্দা, বিক্রমশিলা সবই বিহার প্রদেশে—সে তো আরো বৌদ্ধ-প্রধান ছিল। তবে তারাই বা মুসলমান হল না কেন?

সর্বশেষে আরো সামান্য একটি বক্তব্য আছে। বহুকাল পূর্বে (শ্রাবণ, ১৩৫৮, 'বসুমতী') আমি স্বামী বিবেকানন্দের একটি উদ্ধৃতিতে পড়ি,

"ভারতবর্ষের দরিদ্রগণের মধ্যে মুসলমান এত সংখ্যাধিক্য কেন? এ কথা বলা মূর্খতা যে তরবারির সাহায্যে তাহাদিগকে ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছিল।.....বস্তুত জমিদার ও পুরুতবর্গের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য ইহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল। আর সেইজন্য বাঙলা দেশে যেখানে জমিদারের বিশেষ সংখ্যাধিক্য সেখানে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশী।"[১]

আমার মূল বক্তব্যের সঙ্গে স্বামীজীর কথা কিছুটা মিলে। পরে তার দীর্ঘতর আলোচনা হবে। উপস্থিত তরবারির সাহায্যে যে ব্যাপক ভাবে ধর্ম প্রচার করা যায় না, সেই সিদ্ধান্তটি মেনে নিয়ে এগোচ্ছি।

আরবভূমি যদিও মরুময়, তবু তার তিন দিকে সমুদ্র। নৌযাত্রায় আরবরা

১ এ উদ্ধৃতিতে যে কয়েকটি ফুটকি আছে, সেগুলো প্রবন্ধের সংকলন কর্তাই দিয়েছিলেন। মূল সম্পূর্ণ লেখাটি পেলে আমাদের আলোচনার সুবিধে হয়।

তাই কখনো পরাঙ্মুখ ছিল না। বিশেষত হজরৎ মহম্মদের সময় তারা ঐক্য-বদ্ধ হয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নৌপথে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ে দুখানা উত্তম গ্রন্থ এলাহাবাদ একাডেমি থেকে উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে—আরবোঁকী জাহাজরাণী (আরব নৌবিদ্যা) ও হিন্দ ও আরবকী তাল্লুকাৎ (ভারত ও আরবের যোগসূত্র)। অতদূর না গিয়ে যারা আরব্যোপন্যাসের সিন্দ-বাদকে স্মরণে আনতে পারবেন তাঁরাই বলতে পারবেন এক বিশেষ যুগে আরবজাতি কী দুর্দান্ত সমুদ্রাভিযানই করেছে।[২] ওরাই মৌসুমী (শব্দটি আসলে আরবী ও ইংরিজী মনসুনও তার থেকে) বাতাস আবিষ্কার করে ও ফলে উপকূল ধরে ধরে না এসে এডেন-সোকোত্রা থেকে সোজা সিংহল-ভারত আসা সুগম ও দ্রুততর হয়ে যায়।

স্থলপথে আরবরা, ইরান আফগানিস্থান জয় করে। জলপথে সিন্ধুদেশ।

এ ছাড়া সমুদ্রপথে যারা বাণিজ্য করতে ছড়িয়ে পড়ল তাদের নিয়েই আজ আমার আলোচনা। এরা প্রথমে সোকোত্রা (সংস্কৃত, 'দ্বীপ সুখদ্বার'—এডেনের কাছেই,) তার পর মালদ্বীপ লাক্ষাদ্বীপে ইসলাম প্রচার করে। দক্ষিণ ভারতে পারে নি, (পূব বাঙলার কথা পরে হবে), বর্মায় পারে নি, মালয় ও ইন্দোনেশিয়ায় পেরেছিল।

হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা কেন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল আমি ঠিক জানি নে, তবে যাঁরা বৌদ্ধদের পরাস্ত করে হিন্দুধর্ম পুনর্জীবিত করেছিলেন তাঁরা হয়তো চান নি যে সাগর-পারের বৌদ্ধদের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগসূত্র থাকে—যার ফলে আবার একদিন বৌদ্ধধর্ম মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

তা সে যাই হোক, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে পূব বাঙলার মাল্লা-মাঝি, আমদানী-রপ্তানি ব্যবসায়ীদের দুরবস্থা চরমে। আজো যে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, সিলেটের মাঝি-মাল্লারা দুনিয়ার সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় (আজ তারা আবার ইংলণ্ডে বসতি স্থাপন করতে আরম্ভ করেছে, প্লেন চার্টার করে পূব বাঙলায় বেড়াতে আসে) এটা কিছু নূতন নয়। হিন্দু বৌদ্ধ যুগে এরাই বাঙলার তাবৎ এবং পূব ভারতের প্রচুর মাল আমদানি-রপ্তানি করেছে, নৌ-নির্মাণ ও নৌবহর চালিয়েছিল বটেই।

সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হওয়ায় ফলে প্রধানত এরাই হল অন্নহীন।

আরব ভৌগোলিক (ও ঐতিহাসিকরা) বলেন, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতেই (অর্থাৎ বখতিয়ার খিলজীর বহু পূর্বেই) আরবরা চটগ্রামে উপনিবেশ স্থাপন করেছে ও এ বন্দরেই সব কিছু সংগ্রহ করে (হিন্দুরা তো যাবে না) দক্ষিণ-পূবেও ছড়িয়ে পড়ত।

আরবী ভাষাতে 'চ' ও 'গ' অক্ষর নেই। 'ট' 'ত'-তেও পার্থক্য নেই। সেই হয়েছে বিপদ। তদুপরি নকলনবিশদের ভুল-ত্রুটি তো আছেই। কাজেই যদি

২ আরব্যোপন্যাসের প্রথম গল্পটি জাতক থেকে নেওয়া। সতীদাহ ও কোনার্ক মন্দিরের 'প্রতিচ্ছবি'ও ঐ পুস্তকে পাওয়া যায়।

বা চট্টগ্রাম শব্দটি বোঝা যায়, তবু পরবর্তী যুগে এরা, 'সপ্তগ্রাম' ও 'সোনার গাঁ'-র সঙ্গেও এটা ঘুলিয়ে দিয়েছে। তারো পরবর্তী যুগের পর্তুগীজরা তাই চট্টগ্রামের উল্লেখ করতো পোর্টে গ্রান্ডে (বড় বন্দর) ও সপ্তগ্রামকে পোর্টে পিক্কোনে (ছোট বন্দর) বলে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বর্তমান ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের সমুদ্র তটেই আরবরা বসতি স্থাপন করে—সিলেটের সঙ্গে জলপথে যাতায়াত আরও সহজ ছিল। এরাই মিশনারি এবং বণিক—একাধারে। এরাই অষ্টম নবম শতাব্দীতে, একদা যারা মাঝি-মাল্লা ছিল, সেই সব হিন্দুদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করতে আরম্ভ করে। এ তত্ত্বটা মেনে নিলে 'অষ্টাদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গ জয়' অন্য দৃষ্টিতে দেখা যায়। কিন্তু তার জন্য নূতন অধ্যায় প্রয়োজন ॥

ভবঘুরে

ছন্নছাড়া, গৃহ হারা, বাউণ্ডুলে, ভবঘুরে, যাযাবর—কত হরেক রকম রঙবেরঙের শব্দই না আছে বাঙলাতে ভ্যাগাবণ্ড বোঝাবার জন্য। কিন্তু তবু সত্যকার বাউণ্ডুলিপনা করতে হলে সব চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা—গেরুয়াধারণ। ইরান-তুরান-আরবিস্থানে দরবেশ সাজা। ইয়োরোপে এই ঐতিহ্যমূলক পরিপাটি ব্যবস্থা না থাকলেও অন্যান্য মুষ্টিযোগ আছে যার কৃপায় মোটামুটি কাজ চলে যায়। সেগুলোর কথা পরে হবে।

তবে এই সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করার আগে একটুখানি ভেবে-চিন্তে নেওয়া দরকার। একটি ছোট উদাহরণ দেই।

আমি তখন বরদায়। বহু বৎসর আগেকার কথা। হঠাৎ সেখানে এক বঙ্গ সন্তানের উদয়। ছোকরা এম. এ পাস করে কি করে সেখানে একটা চাকুরি জুটিয়ে বসেছে—মাইনে সামান্যই, কষ্টে-শ্রেষ্ঠে দিন কেটে যায়।

ছোকরা আমাদের সঙ্গে মেলেমেশে বটে কিন্তু শনির সন্ধ্যা থেকে সোমের সকাল পর্যন্ত তার পাত্তা পাওয়া যায় না—অথচ ঐ সময়টাতেই তো চাকুরেদের দহরম-মহরম, গাল-গল্প করা, বিশেষ করে যখন বিনয়তোষের বাড়িতে রবির দুপুরে ভুরি-ভোজনের জন্য তাবৎ বাঙালীর ঢালাও নেমন্তন্ন। অনুসন্ধান না করেই জানা গেল বাঁড়ুয্যে ছোকরার দু-পায়ে দুখানা এ্যাঁবড়া বড়া বড়া চক্কর। শনির দুপুরে আপিস ছুটি হতে না হ'তেই সে ছুট দেয় ইষ্টিশান পানে। সেখানে কোন একটা গাড়ি পেলেই হল। টিকিট মিন্-টিকিটে চললো সে ইঞ্জিনের এক চোখা দৃষ্টিতে সে যেদিকে ধায়।

পূর্বেই বলেছি, এহেন সৃষ্টি-ছাড়া কর্মের জন্য সন্ন্যাসী-বেশ প্রশস্ততম। হিন্দু-মুসলমান টিকিট-চেকারের কথা বাদ দিন, সে যুগের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দুঁদে চেকার পর্যন্ত মিন্-টিকিটের গেরুয়াকে ট্রেন থেকে নামাতো না—বিড়বিড় করতে করতে আমিই একাধিক বার শুনেছি, 'গড্ ড্যাম হোলি ম্যান—নাথিং

ডুইং।' অর্থাৎ ওটা খোদার খাসী, কিচ্ছুটি করার যো নেই।'

আমাদের বাঁড়ুয্যে ছোকরাটি অতিশয় চৌকশ তালেবর। দু'টি উইক-এণ্ডের বাউণ্ডুলিপনা করতে না করতেই আবিষ্কার করে ফেললে এই হৃদয়-রঞ্জন তথ্যটি —সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের চক্কর দুটি টাইমপীসের ছেঁড়া স্প্রীং-এর মত ছিটকে তার পা দুটিকেও ছাড়িয়ে গেল। বিশেষ করে যেদিন খবর পেল, সৌরাষ্ট্রের বীরমগাম ওয়াচওয়ান থেকে আরম্ভ করে ভাওনগর দ্বারকাতীর্থ অবধি বহু ট্রেনে একটি ইস্পিশেল কামরা থাকে যার নাম 'মেণ্ডিকেণ্ট কম্পার্টমেণ্ট'; গেরুয়া পরা থাকলেই সে কামরায় মিন্ টিকিটে উঠতে দেয়। সেখানে নাকি সাধু-সন্ন্যাসীরা আপোসে নির্বিঘ্নে আত্মচিন্তা-ধর্মচিন্তা পরব্রহ্মে মনোনিবেশ করতে পারেন। তবে নেহাত বেলেল্লা নাস্তিকদের মুখে শুনেছি সেখানে নাকি বিশেষ এক ধোঁয়ার গন্ধ এমনই প্রচণ্ড যে কাগে বগে সেখান থেকে বাপ-বাপ করে পালায় —দুষ্টেরা আরো বাঁকা হাসি হেসে বলে, আসলে নিরীহ প্যাসেঞ্জারদের ঐ কৈবল্য ধূম্রের উৎপাত থেকে বাঁচানোর জন্য ঐ খয়রাতী মেণ্ডিকেণ্ট কম্পার্টমেণ্টের উৎপত্তি। কিন্তু আমাদের বাঁড়ুয্যে তার থোড়াই পরোয়া করে—আসলে সে খাস দর্জিপাড়ার ছেলে, বাবা,—ছোকরা বয়েস থেকে বিস্তর ইটালিয়ান (অর্থাৎ ইঁটের উপর বসে) ছিলিমফাটানো দেখেছে, দু'চার কাচ্চা যে নাকে ঢোকে নি সে-কথাও কসম খেয়ে অস্বীকার করতে সে নারাজ। দুআ ভুআ না করে বাঁড়ুয্যে তদ্দণ্ডেই ধুতিখানি গেরুয়া রঙে ছুপিয়ে মাদ্রাজী প্যাটার্নে লুঙ্গিপানা করে পরলো, বাসন্তী রঙ করাতে গিয়ে গেরুয়াতে জাতান্তরিত তার একখানি উড়ুনি আগের থেকেই ছিল। 'ব্যোম ভোলানাথ' বলতে বলতে বাঁড়ুয্যে চাপলো 'মণ্ডিকেণ্ট কম্পার্টমেণ্টে'। বাবাজী চলেছেন সোমনাথ দর্শনে।

আমাদের বাঁড়ুয্যে কিপ্‌টে নয়। মিন্ টিকিটে চড়ার পরও তার ট্যাঁকে ছুঁচোর নেত্য। তাই আহারাদিতেও তাকে হাত টেনে হাত বাড়াতে হত পয়সা দিতে। তাই ঐ ব্যাপারে রিট্রেঞ্চমেণ্ট করতে গিয়ে সে আবিষ্কার করলো আরেকটি তথ্য—পুরী তরকারি, দহিবড়া-শিঙাড়ার চেয়ে শিককাবাব ঢের সস্তা, পোষ্টাইও বটে। এক পেট পরোটা-শিককাবাব খেয়ে নিলে শুবো-শাম ত্রিযামা-যামিনী নিশ্চিন্তি।

'গোস্ত-রোটী কাবাব-রোটী' যেই না ফেরিওয়ালা দিয়েছে হাঁক অমনি বাঁড়ুয্যে তিন লম্ফে দরজার কাছে এসে তাকে দিল ডাক। লোকটা প্রথমে কেমন যেন হকচকিয়ে গেল।—আসতে চাইল না। বাঁড়ুয্যে ঘন ঘন ডাকে, 'আরে দেখতে নাহি পারতা হায়, হাম তুমকো ডাকতে ডাকতে গলা ফাটাতা হায়—' সে-হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা না বলে 'লোণ্ট্রভাষা' বলাই উচিত। এক-একটি লবজো যেন ইঁটের থান।

ফেরিওলা কাছে এসে কাঁচুমাচু হয়ে হিন্দী-গুজরাতীতে বুঝিয়ে বললে, 'সাধুজী এ তোমার খাওয়ার জিনিস নয়। বাঁড়ুয্যে গেল চটে। সে কি এতই অগা যে জানে না, শিককাবাব কোন্ অখাদ্য চাতুষ্পদ থেকে তৈরী হয়! তেড়ে বললে, 'হাম ক্যা খাতা হায়, নাহী খাতা হায়, তোমার ক্যা ভেটকি-লোচন?'

ফেরিওলা তর্ক না করে,—স্পষ্ট বোঝা গেল অনিচ্ছায়—কাবাব রুটি দিয়ে পয়সাগুলো না গুনেই ধামাতে ফেলে চলে গেল।

ট্রেন ছেড়েছে। বাঁড়ুয্যে কাবাব রুটি মুখে দিতে গিয়েছে—লক্ষ্য করে নি, কামরার থমথমে ভাবটা। এমন সময় দশটা হেড়ে গলায় একসঙ্গে হুঙ্কার উঠলো, 'এই শালা, ক্যা খাতা হৈ?'

প্রথমটায় বাঁড়ুয্যে বুঝতে পারে নি। আস্তে আস্তে তার চৈতন্যোদয় হতে লাগল—সন্ন্যাসীদের প্রাণঘাতী চিৎকারের ফলে। 'শালা পাষণ্ড, নাস্তিক। অখাদ্য খায়, ওদিকে ধরেছে গেরুয়া। চোর ডাকাত কিংবা খুনীও হতে পারে। ফেরার হয়ে ধরেছে ভেক। এই করতে তো সাধু-সন্ন্যাসীদের বদনাম হয়েছে, যে তাদের কেউ কেউ আসলে ফেরারী আসামী।'

বাঁড়ুয্যে কি করে বলে সে জানতো না, ওটা অখাদ্য। একে মাংস, তায়—। ওদিকে ওরা ফেরিওলাতে বাঁড়ুয্যেতে যে কথা-কাটাকাটি হয়েছে সেটা যে ভালো করেই শুনেছে, তাও ওদের কথা থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল।

ওদিকে সন্ন্যাসীরা এক বাক্য স্থির করে ফেলেছে, এই নরপশুকে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দিয়ে এর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করানো হোক। দু' একটা ষণ্ডা তার দিকে তখন এগিয়ে আসছে।

বাঁড়ুয্যের মনের অবস্থা কল্পনা করুন। চেন টানার ব্যবস্থা থাকলেও-সেদিকেও দুশমনদের ভিড়। সে বিকল অবশ। এরকম অবশ্য-মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে কটা লোক?

একজন তার দু বাহুতে হাত দিয়ে ধরতেই কম্পার্টমেণ্টের এক কোণ থেকে হুঙ্কার এল, 'ঠহরো।' সবাই সেদিকে তাকালে। এক অতি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী উপরের দিকে হাত তুলেছেন। ইনি এতক্ষণ এদের আলোচনায় যোগ দেন নি।

বললেন, 'সাধুরা সব শোনো। এঁর গায়ে হাত তুলো না। ইনি কি ধরনের সন্ন্যাসী তোমরা জান না। উনি যে দেশ থেকে এসেছেন সে দেশের এক জাতের সন্ন্যাসীকে সব-কিছু খেতে হয়, লজ্জা ঘৃণা ভয় ওঁদের ত্যাগ করতে হয়। শুধু ত্যাগ নয় সানন্দে গ্রহণ করতে হয়। ইনি সেই শ্রেণীর সন্ন্যাসী। তোমরা তো জানো না সন্ন্যাসের গুরু বুদ্ধদেব শুয়োরের মাংস খেয়ে নির্বাণ লাভ করেছিলেন। এঁকে একদিন ঐ পর্যায়ে উঠতে হবে। মৃত্যুভয় এঁর নেই। দেখলে না উনি এখনো পর্যন্ত একটি শব্দ, মাত্র করেন নি। ঘৃণা এবং ভয় থেকে উনি মুক্ত হয়েছেন। বোধ হয় একমাত্র লজ্জা-জয়টি এখনো তাঁর হয় নি। তাই এখনো পরনে লজ্জাবরণ। সেও তিনি একদিন জয় করবেন।

তোমরা ওঁর গায়ে হাত দিয়ো না।'

কতখানি বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর যুক্তিবাদের ফলে, কতখানি তার সৌম্যদর্শন শান্ত বচনের ফলে মারমুখো সন্ন্যাসীরা ঠাণ্ডা হল বলা কঠিন।

বাঁড়ুয্যে সেযাত্রায় বেঁচে গেল।

দু-তিন স্টেশন পরই সব সন্ন্যাসী নেমে গেল ঐ বৃদ্ধ ছাড়া।

তখন তিনি বাঁড়ুয্যেকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, 'বাবুজী

এযাত্রায় ভগবানের দয়ায় বেঁচে গেছ, ভবিষ্যতে সাবধান হয়ো।'

* * *

সেই থেকে ঐ বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সন্ধান আমি প্রতি তীর্থেই করি। উনি যদি একবার আমার গৃহিণীকে বুঝিয়ে দেন, আমিও একটা অবধূত-টবধূত তাহলে ওর খাই-বয়নাক্কা-নথ ঝামটা থেকে নিষ্কৃতি পাই। দশটা মারমুখো সন্ন্যাসীকে ঠাণ্ডা করতে পারলেন আর ওকে পারবেন না? কি জানি!

* * *

ভবঘুরে সব দেশেই আছে কিন্তু শীত এলেই ইয়োরোপের ভবঘুরেদের সর্বনাশ। ঐ জমাট বরফের শীতে বাইরে শোওয়া অসম্ভব। যদি বা কেউ পার্কের বেঞ্চের উপরে খবরের কাগজ পেতে (এই খবরের কাগজ সত্যি শরীরটাকে খুব গরম করে রাখে; হিমালয়ের চটিতে যদি দু'খানা কম্বলেও শীত না ভাঙে তবে কম্বলের উপর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কয়েকখানা খবরের কাগজের শীট সন্তর্পণে বিছিয়ে নেবেন। আমি কোন কোন খানদানী ট্র্যাম্পকে বুকে-পিঠে খবরের কাগজ জড়িয়ে তার উপর ছেঁড়া শার্ট পরতে দেখেছি) শোবার চেষ্টা করে তবে বেদরদ পুলিস এসে লাগায় হুনো। প্যারিসে তখন কেউ কেউ আশ্রয় নেয় নদীর কোনো একটা ব্রিজের তলায় শুকনো ডাঙায়। সেখানেও সকালবেলা পুলিস আবিষ্কার করে শীতে জমে গিয়ে মরা ট্র্যাম্প। পাশে দু'-একটা মরা চড়ুইও! গরমের আশায় মানুষের শরীরের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। গর্কি না কার যেন লেখাতে পড়েছি, এক ট্র্যাম্প ছোকরাকে সমস্ত রাত জড়িয়ে ধরে একটি ট্র্যাম্প মেয়ে সমস্ত রাত কাটিয়ে যে যার পথে—কিংবা বিপথেও বলতে পারেন—চলে গেল। (এদেশে বর্ষাকাল তাই বুদ্ধদেবও সন্ন্যাসীর সংঘে আশ্রয় নিতে আদেশ দিয়ে গেছেন।)

এই বিপথে কথাটার উপর আমি জোর দিতে চাই। গ্লোব-ট্রটার জীবটি আদপেই ভবঘুরে নয়—যদিও একটা শব্দ যেন আরেকটা শব্দের অনুবাদ। গ্লোবট্রটার সমুখপানে এগিয়ে চলে, তার নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল আছে। ভবঘুরে যেখানে খুশী দু'চারদিন এমন কি দু'চার মাসও স্বচ্ছন্দে কাটায়, এমন কি কোনো দয়া শীলের আশ্রয়ে সুখেও কাটায়। কিন্তু হঠাৎ একদিন বলা-নেই কওয়া-নেই, হুট করে নেবে যায় রাস্তায়। কেন? কেউ জানে না। ওরা নিজেরাই জানে না। শুধু এইটুকু বলা যায়, সুখের নীড় তাদের বেশীদিন সয় না—নামে দুঃখের পথে; আবার দুঃখের পথে চলতে চলতে সন্ধান করে একটু সুখের আশ্রয়। দুটোই তার চাই, আর কোনটাই তার চাই নে। এ বড় সৃষ্টিছাড়া দ্বন্দ্ব সৃষ্টিছাড়াদের।

যাদের ভিতরে গোপনে চুরি করার রোগ ঘাপটি মেরে বসে আছে—ওটাকে সত্যই দৈহিক রোগের মত মানসিক রোগ ব'লে ধরে নেওয়া হয়েছে বলে এটার নাম ক্লেপ্টোমেনিয়া—তাদের জন্য আমাদের শাস্ত্রকাররা বৎসরে একদিন চুরি করার—তাও ফলমূল মাত্র—অনুমতি দিয়েছেন। ওটা যেন এক্‌জস্ট পাইপ। ঠিক তেমনি হোলির দিন একটুখানি বেএক্তেয়ার হওয়ার অনুমতি কর্তারা

আমাদের দিয়েছেন। এটাও অন্য আরেক ধরনের এক্‌জস্ট পাইপ।

জর্মন জাতটা একটু চিন্তাশীল। তারা স্থির করলে এই বাউণ্ডুলেপনা যাদের রক্তে ঘাপটি মেরে বসে আছে—এদের নাম ভাণ্ডার-ফ্যোগোল অর্থাৎ ওয়াণ্ডারিং বার্ডজ অর্থাৎ উড়ুক্কু পাখী—তাদের জন্য জায়গায় জায়গায় অতিশয় সস্তায় রেস্ট হাউস করে দাও, যেখানে তারা নিজে রেঁধে খেতে পারবে, যদি অতি সস্তায় তৈয়ারী খানা খায় তবে বাসন বর্তন মেজে দিতে হবে, যদি ফ্রী বালিশের ওয়াড় বিছানার চাদর চায় তবে সেগুলো কিংবা আগের রাত্রের জন্য কারোর ব্যবহার-করা বাসি ওয়াড়-চাদর কেচে দিতে হবে যাতে করে, ইচ্ছে করলে, সে অতি ভোরেই ফের রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে পারে। ওদের রান্নাঘরে নিজের আলু-মালু সেদ্ধ করে খেলে আর চাদর ওয়াড় না চাইলে রাত্রি-বাস একদম ফ্রী।

উড়ুক্কু পাখীরা অনেক সময় দল বেঁধে বেরোয়; সঙ্গে রান্নাবান্নার জিনিস এবং বিশেষ করে বাজনার যন্ত্র—ৎসী হারমনিকা (হাত অর্গিন) ব্যাঞ্জো, মাণ্ডলিন। ঐ সব রেস্ট হাউসের কমন রুমে তারা গাওনা-বাজনা নাচানাচি করে সমস্ত রাত কাটাতো। অনেকেই শনির দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোমের সকালে বাড়ি ফিরত। কেউ-কেউ পুরো গরমের ছুটি, কেউ-কেউ দীর্ঘ-তর অনির্দিষ্টকাল।

এ-সব আমার শোনা কথা।

রাস্তার ট্র্যাম্পকে অনেকেই লিফট্ দেয়। জোড়া পাখী যদি হয় তবে লিফ্‌ট পাওয়া আরো সোজা, একটু কৌশল করলেই। ছেলেটা দাঁড়ায় গাছের আড়ালে। মেয়েটা ফ্রক হাঁটু পর্যন্ত তুলে গার্টার ফিট করার ভান করে সুডোল পা-টি দেখায়। রসিক নটবর গাড়ি থামিয়ে মধুর হেসে দরজা খোলেন। ছোকরা তখন আড়াল থেকে আস্তে আস্তে এসে পিছনে দাঁড়ায়, নটবর তখন ব্যাক-আউট করেন কি করে? করলেও দৈবাৎ। যে উড়ুক্কু পক্ষিনী আমাকে গল্পটি বলেছিল তার পা-টি ছিল সত্যই সুন্দর। তা সে যাক গে।

অনেকেই আবার লিফ্‌ট্ দিতে ডরায়। তাদের বিরুদ্ধে নিম্নের গল্পটি প্রচলিত :—

কুখ্যাত ডার্টমুর জেলের সামনে সদ্য খালাসপ্রাপ্ত দুজন কয়েদী লিফটের জন্য হাত তুলছে। যে ভদ্রলোক মোটর দাঁড় করালেন তিনি কাছে এসে যখন বুঝতে পারলেন এরা কয়েদী তখন গড়িমসি করতে লাগলেন। তারা অনেক কাকুতি-মিনতি করে বোঝালে তারা সামান্য চোর—খুনীটুনী নয়। সামনের টাউনে পৌঁছে দিলেই বাস ধরে রাতারাতি বাড়ি পেঁছিতে পারবে। ভদ্রলোক অনেকটা অনিচ্ছায়ই রাজী হলেন। পরের টাউনে ভদ্রলোকের ও বাড়ি। পরের টাউনে পৌঁছতেই লাইটিং টাইম হয়ে গিয়েছে। ওদিকে ওঁর হেডলাইট ছিল খারাপ। পড়লেন ধরা। পুলিশ ফুটবোর্ডে পা রেখে নম্বর টুকে হিপ পকেটে নোটবুক-খানা রেখে দিয়ে চলে গেল। ভদ্রলোক আপসোস করে বললেন, তোমাদের সঙ্গে কথা কইতে যে তিন মিনিট বাজে খর্চা হল সেটা না করলে এতক্ষণ আমি বাড়ি পেঁছে যেতুম। এখন পুলিশ কোর্টে আমার জেরবার হয়ে যাবে। লোকে কি

আর সাধে বলে কারো উপকার করতে নেই ! দুইখালাস পাওয়া কয়েদী হাসতে হাসতে গাড়ি থেকে নামার সময় বললে, 'আপনার কিছু ভয় নেই, হুজুর, আপনার নামে কোনো সমন আসবে না। এই নিন সেই পুলিসের নোটবুক—যাতে আপনার গাড়ীর নম্বর টোকা ছিল। আমরা পুলিসের পকেট তখনই পিক করেছি। আসলে পকেট মেরেই ধরা পড়াতে আমাদের জেল হয়েছিল। আপনি আমাদের উপকার করতে গিয়ে বিপদে পড়বেন, এটা আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি কি প্রকারে বলুন !

আমি নিজে কখনো খানদানী বাউণ্ডুলে ব'নে বাড়ি থেকে বেরোই নি ; তবে হেঁটে সাইকে, আধা-বোটে—অর্থাৎ কোনো প্রকারের রাহা খরচা না করে হাইকিং করেছি বিস্তর।

আমি তখন রাইন নদীর পারে বন্ শহরে বাস করি। রাইনের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার জন্য পৃথিবীর লোক সেখানে প্লেজার স্টীমারে করে উজান-ভাটা করে। আমিও একবার করার পর আমার মনে বাসনা জাগলো ঐ অঞ্চলেই হাইক্ করে রাইন তো দেখবো দেখবোই, সঙ্গে সঙ্গে ঐ এলাকার গিরি-পর্বত, উপত্যকার ক্ষেতখামার, গ্রামাঞ্চলের বাড়ি ঘরদোর, নিরিবিলি গ্রাম্যজীবন সব কিছুই দেখে নেব। আর যদি রাইন অঞ্চল ভালো না লাগে তবে চলে যাব যেদিক খুশী।

আমার -ল্যাণ্ড-লেডিই আমাকে রাস্তা-দুরস্ত করে দিলে। মাথায় প্রকাণ্ড ঘেরের ছাতা-হ্যাট। পশমের পুরু শার্টের উপর চামড়ার কোট। চামড়ার শার্ট। সাইক্লোমোজা। ভারী বুট জুতো।

শব্দার্থে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা একটি হেভার-স্যাক। তার ভিতরে রান্নার সরঞ্জাম, অর্থাৎ অতি, অতি হাল্কা এবং পাতলা কিন্তু বেশ শক্ত এলুমিনিয়ামের সসপেন জাতীয় বস্তু, প্লেট, চামচে—ছুরি-কাঁটা নিই নি—স্পিরিট স্টোভ এবং অত্যন্ত ছোট সাইজের বলে দুবার মাত্র হাঁড়ি চড়ানো যায়—কয়েক গোলা চর্বি, কিঞ্চিৎ মাখন, নুন-লঙ্কা আর একটি রবারের বালিশ—ফুঁ দিয়ে ফোলান যায়।

আর বিশেষ কিছু ছিল বলে মনে পড়ছে না। এসবে আমার খর্চা হয়েছিল অতি সামান্যই, কারণ বাড়ির একাধিক লোক এসব বস্তু একাধিক বার ব্যবহার করেছেন। এস্তেক কোট পাতলুনে একাধিক তালি ! ল্যাণ্ড-লেডি বুঝিয়ে বললে, উকীলের গাউনের মত এ-সব বস্তু যত পুরোন হয় ততই সে খানদানী ট্র্যাম্প !

পকেটে হাইনের 'বুখ ড্যার লীডার'—কবিতার বই। কবি হাইনে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় এ বইয়ের কবিতাগুলো লিখেছিলেন। এতে রাইন নদী বার বার আত্মপ্রকাশ করেছেন।

রবির অতি ভোরে গির্জার প্রথম ম্যাসে হাজিরা দিয়ে রাস্তায় নামলুম।

॥ ৩ ॥

একটা কোঁৎকা ছাড়া হাইকিঙে বেরোতে নেই। অবশ্য সর্বক্ষণ সদর রাস্তার উপর দিয়ে চললে তার বড় প্রয়োজন হয় না, কিন্তু সদর রাস্তার দুপাশে আলুক্ষেত, আপেল বাগান থাকে না, লোকজন যারা থাকে তারাও ট্রাম্প ভিখিরি পছন্দ করে না। পিঠের ব্যাগটা খালি হয়ে গেলে সেটা বিনু-খর্চায় ভরে নিতে হলে অজ পাড়াগাঁই প্রশস্ততম।

কিন্তু যত প্রচণ্ড শিক্ষিত দেশই হোক না কেন পাড়াগাঁয়ে দু' একটা বদ-মেজাজী কুকুর থাকবেই। এবং তারা পয়লা নম্বরের স্নব্। ছিমছাম ফিটফাট সুট পরে গটগট করে চলে যান—কিচ্ছুটি বলবে না। কিন্তু আপনি বেরিয়েছেন হাইকিঙে—যতই ফিটফাট হয়ে বাড়ি থেকে বেরোন না কেন, লজঝড় কাক বক তাড়ানোর স্কেয়ার-ক্রো বনে যেতে আপনার দুদিনও লাগবে না। দু'দিন কেন, গাছতলায় এক রাত কাটানোর পর সকালবেলাই সুটমুটের যা চেহারা হয় তার মিল অনেকটা ভ্যাগাবণ্ড চার্লিরই মত, এবং ঐ স্নব কুকুরগুলো তখন ভাবে, আপনাকে ভগবান নির্মাণ করেছেন নিছক তাদের ডিনার লাঞ্চের মাংস যোগাবার জন্য—সিঙিকে যেমন হরিণ দিয়েছেন, বাঘকে যে রকম শুয়ার দিয়েছেন। পেছন থেকে হঠাৎ কামড় মেরে আপনার পায়ের ডিম কি করে সরানো যায় সেই তাদের একমাত্র উচ্চাভিলাষ। ওটাতে আপনারও যে কোনো প্রকারের প্রয়োজন থাকতে পারে সে বিষয়ে ওরা সম্পূর্ণ উদাসীন।

আমার ল্যাণ্ড-লেডি হাতে লাঠি তুলে দিতে দিতে বললে, এক জর্মন গিয়েছে ঘোর শীতকালে স্পেনে। স্পেনের গ্রামাঞ্চল যে বিশ্ব-সারমেয়ের ইউনাইটেড নেশন সেটা ভদ্রলোক জানতেন না। তারই গণ্ডা তিনেক তাঁকে দিয়েছে হুড়ো। ভদ্রলোক আর কিছু না পেয়ে রাস্তা থেকে পাথর কুড়োতে গিয়ে দেখেন সেগুলো জমিতে জোর সেঁটে রয়েছে—আসলে হয়েছে কি শীতে জল জমে বরফের ভিতর সেগুলো মোক্ষম আটকে গেছে। ভদ্রলোক খাঁটি গ্লোব-ট্রটারের মত আত্মচিন্তা করলেন, 'অদ্ভুত দেশ! কুকুরগুলোকে এরা রাস্তায় ছেড়ে দেয়, আর পাথরগুলোকে চেন্ দিয়ে বেঁধে রাখে।'

ল্যাণ্ড-লেডিকে বলতে হল না—আমি বিলক্ষণ জানতুম, তদুপরি আমার শ্যামমনোহর বর্ণটি অষ্টাবক্র স্কন্ধ-কটি—ভদ্রাভদ্র যে কোনো সারমেয় সন্তানই এই ভিনদেশী চীজটিকে তাড়া লাগানো একাধারে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন এবং আয়বর্ধন রূপে ধরে নেবে—লক্ষ্য করেন নি চীনেম্যান আমাদের গাঁয়ে ঢুকলে কি হয়!

কোঁৎকাটা ঠুকতে ঠুকতে শহর ছেড়ে মেঠো পথে নামলুম।

খৃষ্টান দেশে রববারে ক্ষেতখামারের কাজও ক্ষান্ত থাকে। পথের দুধারের ফসল ক্ষেতে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। রাস্তায়ও মাত্র দু'একটি লোকের সঙ্গে অনেকক্ষণ চলার পর দেখা হয়। তারাও গ্রামের লোক বলে হ্যাট তুলে গুটেন-টাখ্ বা গুটেন মর্গেন (শুভদিন বা শুভ দিবস) বলে আমাকে অভিবাদন

জানায়। বিহার মধ্য-প্রদেশের গ্রামাঞ্চলেও ঠিক এই রকম অপরিচিত জনকেও 'রাম রাম' বলে অভিবাদন করার পদ্ধতি আছে। কাবুলে তারও বাড়া। একবার আমি শহরের বাইরের উপত্যকায় বেড়াতে গিয়েছিলুম। রাস্তা প্রায় জনমানবহীন। বিরাট শিলওয়ার এবং বিরাটতর পাগড়ী পরা মাত্র একটি কাবুলী ধীরে মন্থরে চলেছে—গ্রামের লোক শহুরেদের তুলনায় হাঁটে অতি মন্থর গমনে এবং তারো চেয়ে মন্দ গতিতে চলে যারা একদম পাহাড়ের উপর থাকে। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি তাকে ধরে ফেললুম। ঘাড় ফিরিয়ে অলস কৌতূহলে আমার দিকে তাকিয়ে, 'ভালো তো ? কুশল তো ?' শুধিয়েই আমার দিকে এক গুচ্ছ স্যালাড পাতা এগিয়ে দিলে। এস্থলে এটিকেট কি বলে জানি নে—আমি একটি পাতা তুলে নিলুম। তখন এগিয়ে দিলে বাঁ হাতের পাতার ঠোঙাটি। সেটাতে দেখি হলদে-লালচে রঙের ঘন কি একটা পদার্থ। আমি বোকার মত তাকিয়ে আছি দেখে সে নিজে একখানা স্যালাড পাতা নিয়ে ঐ তরল পদার্থে গুত্তা মেরে মুখে পুরে চিবোতে লাগল। আমিও করলুম। দেখি, জিনিসটা মধু এবং অত্যুত্তম মধু। ঐ প্রথম শিখলুম, কাবুলীরা তেল-নুন-সিরকা দিয়ে স্যালাড পাতা খায় না, খায় মধু দিয়ে। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়, মোদ্দা কথা দেহাতী কাবুলী যদি কিছু খেতে খেতে রাস্তা দিয়ে চলে তবে পরিচিত অপরিচিত সবাইকে তার হিস্যা এগিয়ে দেবেই দেবে। এবং স্ট্রিক্‌ট্‌লি ব্রাদারলি ডিভিজন্‌—অর্থাৎ আমার একখানা পাতা চিবানো শেষ না হতে হতেই আরেকখানা পাতা এবং 'মধুভাণ্ড' এগিয়ে দেয়। পরে গ্রামে ঢোকা মাত্রই সে আমাকে এক চায়ের দোকানে টেনে নিয়ে যায় এবং দাম দেবার জন্য আখেরে বিস্তর ধস্তাধস্তি করে। কিন্তু থাক সে কথা—এটা আছে 'কাবুলে ভবঘুরেমি' অনুচ্ছেদে।

এস্থলে স্থির করলুম, অপরিচিতকেও নমস্কার জানানো যখন এ-দেশে রেওয়াজ তবে এবার থেকে আমিই করবো।

আধঘণ্টাটাক পরে দেখি এগিয়ে আসছে একজন। বয়সে আমার চেয়ে বড়ও বটে। ও মোকা পাবার পূর্বেই আমি বেশ চেঁচিয়ে বললুম, 'গ্রুস গট্‌!'

এস্থলে নব জর্মন শিক্ষার্থীদের বলে রাখি, জর্মনভাষী জর্মন এবং সুইস সচরাচর 'গুটেনাখ গুড্‌ ডে', শুভদিবস ইত্যাদি বলে থাকে, কারণ এরা বড্ড সেকুলারাইজড (ধর্মনিরপেক্ষ) হয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে অস্ট্রিয়াবাসী জর্মন-ভাষীগণের অনেকেই এখনো 'গ্রুস গট্‌'—'ভগবানের আশীর্বাদ' বলে থাকে। এদেশের মুসলমানরা আল্লাকে স্মরণ করেই 'সালাম' বলেন, হিন্দুরা 'রাম রাম' এবং বিদায় নেবার বেলা গুজরাতে 'জয় জয়! জয় শিব, জয় শঙ্কর।'

স্পষ্ট বোঝা গেল লোকটা 'গ্রুস গটের' জন্য আদপেই তৈরী ছিল না। 'গুটেনটাখ, গুটেনটাখ' বলে শেষটায় বার কয়েক 'গ্রুস গট্‌, বলে সমানে দাঁড়াল। শুধালে, 'কোথায় যাচ্ছ ?'

ইংলণ্ডে গ্রামাঞ্চলের এটিকেট জানি নে। সেখানেও বোধ হয় শহুরেদের কড়াক্কড়ি নেই।

বললুম, 'বিশেষ কোথাও যাচ্ছি নে। ঐ সামনের গ্রামটায় দুপুরবেলা একটু জেরোবো। রাতটা কাটাবো, তারপরের কোনো একটা গ্রামে, কিংবা গাছ-তলায়।'

বললে, 'আমি যাচ্ছি শহরে।' তার পর বললে, 'চলো না, ঐ গাছতলায় একটু জিরোনো যাক।' আমি বললুম, 'বিলক্ষণ।' ভবঘুরেমির ঐ একটা ডাঙর সুবিধে। না হয় কেটেই গেল ঐ গাছতলাটায় ঘণ্টা কয়েক—যদিও ওটা তেঁতুল গাছ নয় এবং ন'জন সুজন তো এখনো দেখতে পাচ্ছি নে।

চতুর্দিক নির্জন নিস্তব্ধ। ইয়োরোপেও মধ্যদিন আসন্ন হলে পাখী গান বন্ধ করে। শুধু দূর অতি দূর থেকে গির্জায় ঘণ্টা অনেকক্ষণ ধরে বেজে যাচ্ছে। রবির দুপুরের ঐ শেষ আরতি—হাই ম্যাস—তাই অনেকক্ষণ ধরে ঘণ্টা বেজেই চলেছে দূর-দূরান্তে—ঐ বহুদূরে যেখানে দেখা যাচ্ছে ভিনাস পাহাড়ের চূড়ার উপর গাছের ডগাগুলো।

বললে, 'আসলে পাইপটা অনেকক্ষণ টানি নি; তাই এই জিরোনো।' তারপর শুধালে, 'তোমার দেশ কোথায়?' আমি বললুম, 'আমি ইণ্ডার (ভারতীয়)।' এমনি চমক খেল যে তার হ্যাটটা তিন ইঞ্চি কাৎ হয়ে গেল। তোৎলালে, 'ইণ্ডিয়ানার?'

'ইণ্ডার' অর্থাৎ 'ইণ্ডিয়ান', আর 'ইণ্ডিয়ানার' অর্থ 'রেড্ ইণ্ডিয়ান।' দেহাতীদের কথা বাদ দিন, শহরে অর্ধ-শিক্ষিতেরাও এ দুটোতে আকছারই ঘুলিয়ে ফেলে। অনেক রকম করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, আমি কোন্ দেশের লোক। শেষ পর্যন্ত সে বুঝতে পেরেছিল কি না জানি নে তবে তার বিস্ময় যে চরমে পেঁচেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আর বার বার শুধু মাথা নাড়ে আর বলে, 'বিপদে ফেললে, বড় বিপদে ফেললে!'

আমি শুধালুম 'কিসের বিপদ?'

'কত ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে কত দেশ-দেশান্তরে যাচ্ছে—আমার তাতে কি! কিন্তু তুমি অত দূর দেশের লোক, আমার গাঁয়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছ, আমার সঙ্গে আলাপ হল আর তোমাকে আমার বাড়ি নিয়ে যেতে পারলুম না—এতে দুঃখ হয় না আমার?'

তারপর মরীয়া হয়ে বললে, 'আসলে কি জানো, আমার স্ত্রী একটি জাঁতিকল? দুনিয়ার লোকের হাড় গুঁড়িয়ে দেওয়াই ওঁর স্বভাব। না হলে তোমাকে বলতুম, আমার বাড়িতে বিকেল অবধি জিরিয়ে নিতে—আমিও ফিরে আসতুম।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'কত লোক ইয়ার-দোস্তকে দাওয়াৎ করে খাওয়ায়, গাল-গল্প করে, আমার কপালে সেটি নেই।'

আমি তাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, তার সহৃদয়তাই আমাকে যথেষ্ট মুগ্ধ করেছে, যদি সম্ভব হয় তবে ফেরার মুখে তার খবর নেব।

পুনরায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'কিছু মনে করো না, কিন্তু ভবঘুরেদের কি আর কথা রাখবার উপায় আছে? আমার নামটা কিন্তু মনে রেখো—টেরমের।'

আমি বললুম, 'সে কি! আমি তো ফের বন্ শহরে ফিরে যাবো। এই নাও আমার ঠিকানা। সেখানে আমার খবর নিয়ো। দুজনাতে ফুর্তি করা যাবে।

খুশী হয়ে উঠলো। বললে, 'বড্ডই জরুরী কাজ তাই। উকিল বসে আছে, এই রববারেও, আমার জন্যে। টাকাটা না দিলে সোমবার দিন কিস্তি খেলাপ হবে।'

আমি বললুম, 'ভগবান্ তোমার সঙ্গে থাকুন।' বললে, 'যতদিন না আবার দেখা হয়।'

দশ পা এগিয়েছি কি না, এমন সময় শুনি পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলছে, 'ঐ সামনের মোড় নিতেই দেখতে পাবে ডানদিকে এক-পাল ভেড়া চরছে। ওখানে কিন্তু দাঁড়িয়ো না। ভেড়াগুলোকে সামলায় এক দজ্জাল আলসেশিয়ান কুকুর। ওর মনে যদি সন্দেহ হয় তোমার কোনো কুমৎলব আছে, তবে বড় বিপদ হবে।'

কথাটা আমার জানা ছিল, কিন্তু স্মরণ ছিল না। বললুম, 'অনেক ধন্যবাদ।'

॥ ৪ ॥

ইউরোপ তখনো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধকল কাটিয়ে উঠতে পারে নি। এর বর্ণনা সে মহাদেশের কবি, চিত্রকার, বস্তুত চিন্তাশীল তথা দরদী ব্যক্তি মাত্রেরই দেওয়া সত্ত্বেও বলতে হয়, না দেখলে তার আংশিক জ্ঞানও হয় না। তুলনা দিয়ে এদেশের ভাষায় বলা যেতে পারে, বন্যা ও ভূমিকম্পের মার যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন এর জের দেশকে কতদিন ধরে টানতে হয়।

মোড় নিতেই দেখি, বাঁ দিকের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে নাসপাতি-ভর্তি ঠেলা গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে রাজ-আল ধরে আসছে একটি বয়স্ক লোক। সর্ব প্রথমই চোখে পড়ল, তার ডান হাতখানা কনুই অবধি নেই। হাতের আস্তিন ভাঁজ করে ঘাড়ের সঙ্গে পিন করা। বড় রাস্তায় সে উঠলো ঠিক আমি যেখানে পেঁচেছি সেখানেই। আমি প্রথমটায় 'গ্রুস্ গট্' বলে তার অনুমতির অপেক্ষা না করেই গাড়িটায় এক হাত দিয়ে ঠেলতে লাগলুম। এ অভিবাদনে লোকটি প্রথম চাষার মত মোটেই হকচকালো না, এবং প্রত্যুত্তরে 'গ্রুস্ গট্' বলে আর পাঁচজনেরই মত 'গুটেনটাখ'—'সুদিবস' জানালে। তারপর বলল, 'ও গাড়ি আমি একাই ঠেলতে পারি। নাসপাতিগুলোর প্রতি তোমার যদি লোভ হয়ে থাকে তবে অত হ্যাঙ্গামা পোহাতে হবে না—যত ইচ্ছে তুলে নাও।' আমি এই অন্যায় অপবাদে চটি নি—পেলুম গভীর লজ্জা। কী যে বলব ঠিক করার পূর্বেই সে বললে, 'হাত না দিলেও দিতুম।'

আমি তখন মোকা পেয়ে বললুম, 'নাসপাতি খেতে আমি ভালোবাসি

নিশ্চয়ই, এবং তোমারগুলো যে অসাধারণ সরেস সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু ঠেলা দেবার সময় আমার মনে কোনো মতলব ছিল না, এবং তুমিও যে স্বচ্ছন্দে ছোট রাস্তা থেকে বড় রাস্তার উঁচুতে গাড়িটাকে ঠেলে তুললে সেও আমি লক্ষ্য করেছি। আমি হাত দিয়েছিলুম এমনি। পাশাপাশি যাচ্ছি, কথা বলতে বলতে যাবো, তখন দুজনাই যে একই কাজ করতে করতে যাবো সেই তো স্বাভাবিক—এতে সাহায্য লোভ কোনো কিছুরই কথা ওঠে না।'

চাষা হেসে বললে, 'তোমার রসবোধ নেই। আর তুমি জানো না, এবারে নাসপাতি এত অজস্র একই সঙ্গে পেকেছে যে এখন বাজারে এর দর অতি অল্পই। এই সামনের গ্রামগুলোর ভিতর দিয়ে যখন যাবে তখন দেখতে পাবে গাছতলায় নাসপাতি পড়ে আছে—কুড়িয়ে নিয়ে যাবার লোক নেই। যত ইচ্ছে খাও, কেউ কিছু বলবে না।'

আমি বললুম, 'আমাদের দেশেও এই রেওয়াজ।'

কোথায়, কোন দেশ, ইণ্ডিয়ান আর রেড-ইণ্ডিয়ানে পুনরায় সেই গুবলেট, আরপর আশ-কথা পাশ-কথা সেরে সর্বশেষে নিজেই বললে, তার হাতখানা গেছে গত যুদ্ধে। হেসে বললে, 'লোকে বলে, তারা করুণার পাত্র হতে চায় না; আমার কিন্তু তাতে কোনো আপত্তি নেই। হাত গিয়ে কত সুবিধে হয়েছে বলবো! গেরস্তালীর কোনো কিছু করতে গেলে বউ বেটি হা হা করে ঠেকায়, যদিও আমি এক হাত দিয়েই দুনিয়ার চোদ্দ আনা কাজ করতে পারি। চাষবাস, ফলের ব্যবসা, বাড়ি মেরামতী সবই তো করে যাচ্ছি—যদিও মেয়ে-জামাই ঠ্যাকাবার চেষ্টা করেছিল এবং শেষটায় করতে দিলে, হয়তো এই ভেবে যে কিছু না করতে পেলে আমি হন্যে হয়ে যাব।'

আমি বললুম, 'তোমরা তো খৃষ্টান; তোমাদের না রববারে কাজ করা মানা।'

লোকটা উত্তর না দিয়ে হকচকিয়ে শুধালে, 'তুমি খৃষ্টান নও?'

'না।'

'তবে কি?'

'হীদেন।'

আমি জানতুম, পৃথিবীর খৃষ্টানদের নিরানব্বই নয়া পয়সা বিশ্বাস করে, অখৃষ্টান মাত্রই হীদেন। তা সে মুসলমান হোক আর বণ্টুই হোক। নিতান্ত ইহুদীদের বেলা হয়তো কিঞ্চিৎ ব্যত্যয়, অবশ্য সেটা পুষিয়ে নেয় তাদের বেধড়ক ঠেঙিয়ে। তাই ইচ্ছে করেই বললুম, হীদেন।

লোকটা অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করে বললে, 'আমি গত যুদ্ধে ঈশ্বরকে হারিয়েছি। তবে কি আমিও হীদেন?' নিজের মনে যেন নিজেকেই শুধোলে।

আমি বললুম, 'আমি তো পরমেশ্বরে বিশ্বাস করি।'

এবারে সে স্তম্ভিত। এবং শব্দার্থে। কারণ গাড়ি ঠেলা বন্ধ করে আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালে। শেষটায় বললে, 'এটা কিন্তু আমাকে সোজা করে দিতে হবে। আমাদের পাদ্রী তো বলে, তোমরা নাকি গাছ, জল এই সব

পুজো করো, পাথরের সামনে মানুষ বলি দাও।'

আমি বললুম, 'কোনো কোনো হীদেন দেয়, আমরা দিই নে। আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বরকে ভক্তি দিলেই যথেষ্ট।'

বোকার মত তাকিয়ে বললে, 'তবে তো তুমি খৃষ্টান! আমাকে সব-কিছু বুঝিয়ে বলো।'

আমি বললুম, 'থাক। ফেরার সময় দেখা হলে হবে।'

তাড়াতাড়ি বললে, 'সরি, সরি। তুমি বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। ঐ তো সামনে গ্রাম। আমার বাড়িতে একটু জিরিয়ে যাবে?'

আমি টেরমেরের স্মরণে শুধালুম, 'তোমার বউ বুঝি টেরমেরের বউয়ের মত খাণ্ডার নয়?'

সে তো অবাক। শুধালে 'ওকে তুমি চিনলে কি করে?' সব কিছু খুলে বললুম। ভারী ফুর্তি অনুভব করে বলল, 'টেরমের একটু দিলদরিয়া গোছ লোক আর তার বউ একটু হিসেবী—এই যা। আর এ-সব ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করলেই চিন্তা বাড়ে। যুদ্ধের সময়, আমার এক জর্মনের সঙ্গে আলাপ হয়—সে বুলগেরিয়াতে বিয়ে করে বসবাস করছিল। তিন বছর সুখে কাটাবার পর একদিন তার স্ত্রীর এক বান্ধবী তাকে নির্জনে পেয়ে শুধোলে, "তুমি তোমার বউকে ভালোবাসো না কেন—অমন লক্ষ্মী মেয়ে।" সে তো অবাক! শুধোলে "কে বললে? কি করে জানলে?" বান্ধবী বললে "তোমার বউ বলেছে, তুমি তাকে তিন বছরের ভিতর একদিনও ঠ্যাঙাও নি!" শোনো কথা!'

আমি অবাক হয়ে শুধালুম, 'আমি তো বুঝতে পারছি নে।'

সে বললে, 'আমিও বুঝতে পারি নি, প্রথমটায় ঐ জর্মন স্বামীও বুঝতে পারে নি। পরে জানা গেল, মেয়েটা বলতে চায়, এই তিন বছর নিশ্চয়ই সে কোনো না কোনো পর-পুরুষের সঙ্গে দু'একটি হাসিঠাট্টা করেছে, স্বামী দেখেছে, কিন্তু পরে ঠ্যাঙায় নি। তার অর্থ, স্বামী তাকে কোনো মূল্যই দেয় না। সে যদি কাল কোনো পর-পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যায়, তবে স্বামী কোনো শোক করবে না, নিশ্চিন্ত মনে আরেকটা নয়া শাদী করবে। ভালবাসলে ওকে হারাবার ভয়ে নিশ্চয়ই ওকে ঠেঙিয়ে সোজা রাখতো।'

আমি বললুম, 'এ তো বড় অদ্ভুত যুক্তি!'

'আমিও তাই বলি। কিন্তু ঐ করে বুলগেরিয়া চলছে। আর এদেশের বউকে কড়া কথা বলেছ কি সে চললো ডিভোর্সের জন্য। তাই তো তোমায় বললুম, ওসব নিয়ে বড্ড বেশী ভাবতে নেই। লড়াইয়ে বহু দেশের জাত-বেজাতের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। অনেক দেখেছি। অনেক শিখেছি।'

আমার মনে পড়ল ওরই দেশবাসী রেমার্কের 'পশ্চিম রণাঙ্গন নিশ্চুপ' বই-খানার কথা। সেখানে তো সব কটা সেপাই বাড়ি ফিরেছিল—অর্থাৎ যে কটা আদপেই ফিরেছিল—সর্বসত্তা তিক্ততায় নিমজ্জিত করে। আদর্শবাদ গেছে, ন্যায়-অন্যায়-বোধ গেছে; যেটুকু আছে সে শুধু যাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অহরহ মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে তাদের জন্য। দেশের জন্যে আত্মদান, জাতির

উন্নতির জন্য সর্বস্ব ত্যাগ, ফ্রান্সকে পরাজিত করার জন্য জীবন-দান—এসব বললে মারমুখো হয়ে বেআইনী পিস্তল নিয়ে তাড়া লাগায়।

নাসপাতিওলাকে শুধোতে সে বললে সে বইটই পড়ে না। খবরের কাগজ পড়ে বাজার দর জানবার জন্য, আর নিতান্তই যদি কোনো রগরগে খুন কিংবা কেলেঙ্কারি কেচ্ছার বয়ান থাকে। তবে হ্যাঁ, ওর মনে পড়ছে ফিল্মটা নাকি জর্মনীতে বারণ করে দেওয়া হয়েছিল—ওর মেয়ের মুখে শোনা। আমি শুধালুম, 'ছবিটা দেখে ছেলেছোকরাদের লড়াইয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা হবে বলে?' বললে, 'না, ওতে নাকি জর্মনদের বড় বর্বররূপে দেখানো হয়েছে বলে।' তখন আমার মনে পড়ল, ফ্রান্সেও দেখাবার সময় যে অংশে ফরাসী নারীরা ক্ষুধার তাড়ায় জর্মন সেপাইদের কাছে রুটির জন্য দেহ বিক্রয় করার ইঙ্গিত আছে সেটা কেটে দেওয়া হয়।

অনেকক্ষণ দুজনাই চুপচাপ। নাসপাতিওলা ভাবছে। হঠাৎ বললে, 'পিছন পানে তাকিয়ে আর লাভ কি? যারা মরেছে তারা গেছে। যারা পাগল হয়ে গিয়েছে, যাদের মুখ এমনই বিকৃত হয়েছে যে দেখলে মানুষ ভয় পায়, যাদের হাত পা গিয়ে অচল হয়ে আছে নিছক মাংসপিণ্ডবৎ, তাদের বড় বড় হাসপাতালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে; আর আত্মীয়স্বজনদের বলা হয়েছে তারা মারা গিয়েছে—এরাও নাকি ফিরে যেতে চায় না। আর আমার হাল তো দেখছই।

আমাদের গ্রামের সব কিছু থিতিয়ে যাওয়ার পর একটা ট্র্যাজেডির দিকে সকলেরই নজর গেল। একটা ছেলে গ্রাম থেকে ফিরে এসে শোনে, তার অবর্তমানে তার বাগদত্তা মেয়েটি পরপুরুষের সঙ্গে প্রণয় করেছিল। এতে আর নূতন কি? লড়াইয়ের সময় সব দেশেই হয়েছে এবং হবে। মেয়েটা তবু পদে আছে—জারজ সন্তান জন্মায় নি। আর সেই দু'দিনের প্রেমিক কবে কোথায় চলে গেছে কে জানে!

এ অবস্থায় আর পাঁচটা ছেলে অন্য মেয়ে নেয়, কিংবা ক্ষেমাঘেন্না করে আগের-টাকেই বিয়ে করে। এ হয়ে গেল মনমরা। সমস্ত দিন ছন্নের মত ঘুরে বেড়ায়, কারো সঙ্গে কথাবার্তা কয় না, আমাদের পীড়াপীড়িতেও বিয়ার খেতে আসে না। মেয়েটা নাকি একাধিকবার তার পায়ে ধরে কেঁদেছে। সে কিছু বলে না।

ছোট গাঁ, বোঝ অবস্থাটা। গির্জেয়, রাস্তায়, মুদির দোকানে প্রতিদিন আমাদের একে অন্যের সঙ্গে যে কতবার কথা হয় ঠিকঠিকানা নেই। মেয়েটা করুণ নয়নে তাকায়, ছেলেটা ঘাড় ফিরিয়ে নেয়। আমরা যারা তখন সামনে পড়ি, বোঝো আমাদের অবস্থাটা। ছেলেটা সামনে পড়লে আমাদের মুখ গম্ভীর, মেয়েটা সামনে পড়লে অন্যদিকে তাকাই, আর দুজনা সামনে পড়লে তো চরম। ছেলেটা যখন মুরুব্বী, পুরনো দিনের ইয়ার-বক্সী ইস্তেক পাদ্রী সায়েব কারো কথায় কান দিলে না, তখন মেয়েটাকে বলা হল সে যেন অন্য একটা বেছে নেয়। যদিও বরের অভাব তবু সুন্দর এবং পয়সাওয়ালার মেয়ে বলে

পেয়েও যেতে পারে। দেখা গেল, সেও নারাজ।'

নাসপাতিওলা রাস্তায় থেমে বলল, 'এই যে বাড়ি পেঁছে গিয়েছি। চলো ভিতরে।'

আমি বললুম, 'না ভাই, মাফ করো।'

'তবে ফেরার সময় খবর নিয়ো। বাড়ি চেনা রইল।'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়। কিন্তু ওদের কি হল?'

'কাদের? হ্যাঁ, ঐ দুটোর। একদিন ঐ হোথাকার (আঙুল তুলে দেখালে) ডোবায় পাওয়া গেল লাশ।'

আমি শুধালুম, 'ছেলেটার?'

'না মেয়েটার।'

'আর ছেলেটা?'

'এখনো ছন্নের মত ঘুরে বেড়ায়। এক্ষুনি আসবে। থাকো না—আলাপ করিয়ে দেব।' আমি পা চালিয়ে মনে মনে বললুম, এ গ্রাম বিষবৎ পরিত্যজ্য।

॥ ৫ ॥

সিনেমার কল্যাণে আজকাল বহু নৈসর্গিক দৃশ্য, শহর-বাড়ি, পশুপক্ষী বিনা মেহন্নতে দেখা যায়। এমন কি বাস্তবের চেয়েও অনেক সময় সিনেমা ভালো। বাস্তবে বেলকনি থেকে রানীকে আর কতখানি দেখতে পেলুম? সিনেমায় তাঁর আংটি, জুতোর বকলস, হ্যাটের সিল্কটি পর্যন্ত বাদ গেল না। আলীপুরে গিয়ে বাঘ-সিঙি না দেখে সিনেমাতে দেখাই ভালো—ক্যামেরামেন যতখানি প্রাণ হাতে করে ক্লোজ-আপ নেয় অতখানি ঝুঁকি নিতে আপনি আমি নারাজ।

বিলিতি ছবির মারফতে তাই ওদের শহর, বার্, রেস্টুরেন্ট, নাচ, রাস্তা-বাড়ি, দালান-কোঠা আমাদের বিস্তর দেখা হয়ে গিয়েছে কিন্তু গ্রামের ছবি এরা দেখায় অল্পই। গ্রামে বৈচিত্র্যই বা কি, সেখানে রোমান্সই বা কোথায়? অন্তত সিনেমাওলাদের চোখে সেটা ধরা পড়ে না—ধরা পড়ে এখনো আর্টিস্টদের কাছে। ইউরোপীয় গ্রাম্যজীবনের ছবি এখনো তাঁরা এঁকে যাচ্ছেন আর পুরনো দিনের মিলে, ভান গগের তো কথাই নেই।

আমাদের গ্রামে সাধারণত সদর রাস্তা থাকে না। প্রত্যেক চাষা আপন খড়ের ঘরের চতুর্দিকে ঘিরে রেখেছে আম-কাঁঠাল-সুপুরি-জাম গাছ দিয়ে—কিছুটা অবশ্য ঝড় থেকে কুঁড়েগুলোকে বাঁচাবার জন্য। এখানে সে ভাবনা নেই বলে গ্রামে সদর রাস্তা থাকে, তার দুদিকে চাষাভুষো, মুদী, দর্জি, কসাই, জুতোওলা সবাই বাড়ি বেঁধেছে। আর আছে ইস্কুল, গির্জে আর পাব্—জর্মনে 'লোকাল' (অর্থাৎ 'স্থানীয় মিলনভূমি')। এইটেকেই গ্রামের কেন্দ্র বললে ভুল বলা হয় না।

রাস্তাটা যে খুব বাহারে তা বলা যায় না। শীতকালে অনেক সময় এত

বরফ জমে ওঠে যে চলাফেরাও কয়েকদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যেতে পারে—আমাদের দেশে বর্ষাকালে যে রকম হয়। শুধু বাচ্চাদেরই দেখতে পাওয়া যায় তারই উপর লাফালাফি করছে, পেঁজা বরফের গুঁড়ো দিয়ে বল বানিয়ে একে অন্যকে ছুঁড়ে মারছে।

অনেক কট্টর প্রোটেস্টাণ্ট দেশে—স্কটল্যাণ্ড না কোথায় যেন—রববার দিন কাচ্চাবাচ্চাদেরও খেলতে দেওয়া হয় না! এখানে দেখি, ছেলে এবং মেয়েরাও রাস্তার উপর একটা নিম-চুবসে-যাওয়া ফুটবলে ধপাধপ কিক্ লাগাচ্ছে। এদের একটা মস্ত সুবিধে যে জাতিভেদ এদের মধ্যে নেই। দর্জীর ছেলে মুচির মেয়েকে বিয়ে করতে পারে, ইস্কুল মাস্টারের মেয়ে শুঁড়ির ছেলেকেও পারে। পাদ্রির ছেলেকেও পারতো—কিন্তু ক্যাথলিক পাদ্রির বিয়ে বারণ। আফগানিস্থানে যে-রকম মেয়েদের মোল্লা হওয়া বারণ—দাড়ি নেই বলে।

একে ট্র্যাম্প তায় বিদেশী, খেলা বন্ধ করে আমার দিকে যে প্যাট প্যাট করে তাকাবে তাতে আর আশ্চর্য কি! এমন কি ওদের মা-বাপরাও। ওদের অনেকেই রবির সকালটা কাটায় জানলার উপর কুশন্ রেখে তাতে দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে, বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। প্রথম প্রথম আমার অস্বস্তি বোধ হত, শেষটায় অভ্যেস হয়ে গেল। সেটা অবশ্য পরের কথা।

ছবিতে দেখেছিলুম ছোঁড়াদের একজন চার্লির পিছন থেকে এসে একটানে তাঁর ছেঁড়া শার্ট ফর-ফর করে একদম দু-টুকরো করে দিলে—সেটা অবশ্য শহরে। এবং আমার শার্টটা শক্ত চামড়ার তৈরী, ওটা ছেঁড়া ছোঁড়াদের কর্ম নয়! কিন্তু তবু দেখি গোটাপাঁচেক ছেলেমেয়ে এক জায়গায় জটলা পাকিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে আর ফন্দি-ফিকির আঁটছে। একটি দশ-বারো বছরের মেয়েই দেখলুম ওদের হণ্টরওয়ালী, ফিয়ারলেস নাদিয়া, মিস্ ফ্রণ্টিয়ার মেল, ডাকুকী দিলরুবা, জম্বুকী বেটী যা খুশী বলতে পারেন। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই সে দল ছেড়ে গট্‌গট করে এসে প্রায় আমার রাস্তা বন্ধ করে মধুর হাসি হেসে বললে, 'সুপ্রভাত।' সঙ্গে সঙ্গে একটি মোলায়েম কার্টসিও করলে—অর্থাৎ বাঁ পা-টি সোজা সটান পেছিয়ে দিয়ে, ডান হাঁটু ইঞ্চি তিনেক নিচু করে দু হাতে দু পাশের স্কার্ট আলতো ভাবে একটু উপরের দিকে তুলে নিয়ে বাও করলে। এই কার্টসি করাটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শহরে লোপ পেয়েছে, গ্রামাঞ্চলে তখনো ছিল, এখনো বোধ করি আছে।

এরা 'গ্র্যাস গট্' হয়তো জীবনে কখনো শোনেই নি। এদের জন্ম প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর। তাই 'গুটেন্ মার্গেন' বলার পূর্বে প্রথম ছাড়লুম একখানা মৃদু হাস্য—একান ওকান ছোঁয়া। আমার মুখখানাও বোম্বাই সাইজের। কলাটা আড়াআড়ি খেতে পারি। স্যাণ্ডউইচ খাবার সময় রুটির মাখম আকছারই দু' ক্যানের ড্যালায় লেগে যায়।

ইতিমধ্যে মেয়েটি অতিশয় বিশুদ্ধ ব্যাকরণে আমাকে যা শুধালো তার যদি শব্দে শব্দে অনুবাদ করা হয় তবে সেটা বাইবেলের ভাষার মতই শোনাবে। 'আপনি ইচ্ছে করলে বললে হয়তো বলতেও পারেন এখন কটা বেজেছে।'

পশ্চিম ইউরোপীয় ভাষাগুলোকে সব্‌জনক্টিভ মুড তথা কণ্ডিশনাল প্রচুরতম মেকদারে লাগালে প্রভূততম ভদ্রতা দেখানো হয়। বাঙলায় আমরা অতীত কাল লাগিয়ে ভদ্রতা দেখাই। শ্বশুরমশাই যখন শুধোন, 'বাবাজী তাহলে আবার কবে আসছ?' আমরা বলি, 'আজ্ঞে, আমি তো ভেবেছিলুম—' অর্থাৎ আমি যা ভেবেছিলুম কথাটা আপনার সম্মতি পাবে না বলে প্রায় নাকচ করে বসে আছি। তবু আপনি নিতান্ত জিজ্ঞেস করলেন বলে বললুম।

তা সে যাক্ গে। মেয়েটি তো দুনিয়ার কুল্লে সব্‌জন্‌ক্টিভ একেবারে কপি বুক স্টাইলে, ক্লাস-টীচারকে খুশী করার মত ডবল হেল্‌পিং দিয়ে প্রশ্নটি শুধোলে। আমিও কটা সব্‌জন্‌ক্টিভ লাগাবো মনে মনে যখন চিন্তা করেছি এমন সময় গির্জার ঘড়িতে ঢং করে বাজল একটা। আমার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলল। কোনো কথা না বলে ডান হাত কানের পেছনে রেখে যেদিক থেকে শব্দ আসছিল সেই দিকে কান পাতলুম।

ইতিমধ্যে দু'চারটে ছোঁড়া রাস্তা ক্রস্ করে মেয়েটার চতুর্দিকে দাঁড়িয়েছে। সে আস্তে আস্তে ফিসফিস করে ওদের বললে, 'বোধ হয় জর্মন বোঝেন, কিন্তু বলতে পারেন না।'

আমি বললুম, 'বোধ হয় তুমি জর্মন বলতে পারো, কিন্তু শুনতে পাও না।'

অবাক হয়ে শুধোলে, 'কি রকম?'

আমি বললুম, 'গির্জার ঘড়িতে ঢং করে বাজল একটা—বন্ধ কালাও শুনতে পায়। আর তুমি আমায় শুধোলে, কটা বেজেছে। গির্জার ঘণ্টা যে শুনতে পায় না, সে আমার গলা শুনতে পাবে কি করে? তাই তো উত্তর দিই নি।' তারপর ছোঁড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে বললুম, কি বলো ভাইরা সব।'ও নিশ্চয়ই লড়াইয়ে গিয়েছিল। সেখানে শেল্‌শকে কালা হয়ে গিয়েছে—আহা বেচারী!'

সবাই তো হেসে লুটোপুটি। ইস্তেক মেয়েটি নিজে। একাধিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল: 'মেয়েছেলে আবার লড়াইয়ে যায় নাকি? তা-ও এইটুকু মেয়ে!' আমি গোবেচারীর মত মুখ করে বললুম, 'তা কি করে জানবো ভাই। আমি তো বিদেশী। কোন দেশে কি কায়দা, কি করে জানবো, বলো। এই তো তোমরা যখন ঠাহর করতে চাইলে, আমি জর্মন জানি কি না, তখন পাঠালে মেয়েটাকে। আমাদের দেশ হলে মেয়েটা বুদ্ধি যোগাতো, কোনো একটা ছেলে ঠেলা সামলাবার জন্য এগোতো।'

একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন, 'আপনার দেশ কোথায়? যাবেন কোথায়?' ইত্যাদি।

আমার মাথায় তখন কলি ঢুকেছে। সংস্কৃতে বললুম, 'অহং বৈদেশিকঃ। মম কোঽপি নিবাসো নাস্তি। সর্বদা পরিভ্রমণমেব করোমি।'

কী উল্লাস! কী আনন্দ তাদের!

আমি ইণ্ডিয়ান, আমি রেড্ ইণ্ডিয়ান, আমি চীনেম্যান এমন কি আমি নিগ্রো ইস্তেক। যে যার মত বলে গেল একই সঙ্গে চীৎকার করে।

আমি আশ্চর্য হলুম, কেউ একবারের তরে শুধোলে না, আমি কোন্ ভাষায়

কি বললুম সেটা অনুবাদ করে দিতে। তখন মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তাঁর বাল্য বয়সে শিশুসাহিত্য নামক কোনো জিনিস প্রায় ছিল না বলে তিনি বয়স্কদের জন্য লেখা বই পড়ে যেতেন এবং বলেছেন, তাতে সব-কিছু যে বুঝতে পারতেন তা নয়, কিন্তু নিতান্ত আবছায়া-গোছের কি একটা মনের মধ্যে তৈরী করে সেই আপন মনের নানা রঙের ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থি বেঁধে তাতে ছবি-গেঁথেছিলেন—বইখানাতে অনেকগুলো ছবি ছিল বলে তিনি নিজেই না বোঝার অভাবটা পুষিয়ে নিয়েছিলেন। কথাটা খুবই খাঁটি। বাচ্চারা যে কতখানি কল্পনাশক্তি দিয়ে না-বোঝার ফাঁকা অংশগুলো ভরে নিতে জানে, তা যাঁরা বাচ্চাদের পড়িয়েছেন তাঁদের কাছেই সুস্পষ্ট। অনেক স্থলেই হয়তো ভুল সিদ্ধান্তে পেঁছিয় কিন্তু তাতে কি এসে যায়। আমি চীনেম্যান না নিগ্রো তাতে কার ক্ষতি-বৃদ্ধি! তারা বিদেশী, অজানা নূতন কিছু একটা পেয়েই খুশি। আর আমি খুশী যে বিনা মেহন্নৎ বিনা কসরৎ আমি এতগুলো বাচ্চাকে খুশী করতে পেরেছি—কারণ আমি বিলক্ষণ জানি, আমি সোনার মোহরটি নই যে দেখা মাত্রই সবাই উদ্বাহু হয়ে উল্লাসে উল্লম্ফন দেবে।

তা সে যাই হোক, শেষ পর্যন্ত স্থির হল আমি রেড্ ইণ্ডিয়ান। তার কারণটা একটু পরেই আমার কাছে পরিষ্কার হল। এরা কয়েকদিন পর ইস্কুলের শো-তে একটা রেড্-ইণ্ডিয়ান নাচ, তীর ছোঁড়া এবং 'শান্তির পাইপ খাবার' অভিনয় করবে—আমি যখন স্বয়ং রেড্ ইণ্ডিয়ান উপস্থিত, তখন আমি রিহার্সেলটি তদারক করে দিলে পাশের গ্রামের ছেলেমেয়েরা একেবারে থ মেরে যাবে। ওঃ! তাদের কী সৌভাগ্য!

আমি নৃতত্ত্বের কিছুই জানি নে। রেড ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নির্জলা নিল্। তাদের 'শান্তির পাইপ' কি, সে সম্বন্ধে আমার কণামাত্র জ্ঞান নেই। বুশ-মেনের বেশ-পোশাক আর রেড-ইণ্ডিয়ানের ঐ বস্ত্রতে কি তফাত তাও বলতে পারবো না।

অথচ ওদের নিরাশ করি কি প্রকারে?

যাক্। দেখেই নি ওরা কতদূর এগিয়েছে।

তখন দেখি, ইয়াল্লা, এরা জানে আমার চেয়েও কম! ছোট্ট ইস্কুল-বাড়ির একটা ঘর থেকে বেঞ্চি ডেস্ক সরিয়ে সেখানে রিহার্সেল আরম্ভ হল। রেড-ইণ্ডিয়ান মাথায় পালক দিয়েছে বটে কিন্তু বাদবাকি তার সাকুল্য পোশাক কাওবয়দের মত। আরো যে কত 'অনাছিষ্টি' সে বলে শেষ করা যায় না।

তখন আবার বুঝলুম রবীন্দ্রনাথের সেই কথাই আপ্তবাক্য। অল্পবয়স্করা কল্পনা দিয়েই সব-কিছু পুষিয়ে নেয়। তদুপরি এদের প্রাণশক্তি অফুরন্ত। এরা পেট ভরে খেতে পায়। জামা-কাপড়ে এদের মধ্যেও কিছু কিছু দামী সস্তা ছিল বটে কিন্তু ছেঁড়া জামা-জুতো কারোরই নয়। আট বছর হতে-না-হতে এরা ক্ষেতখামারের কাজে ঢোকে না। কোথায় এদের গ্রামের কাচ্চা-বাচ্চারা আর কোথায় আমার গ্রামের কাচ্চা-বাচ্চারা! এই বাচ্চাদের হাসিখুশী দেখে এদের যে কোন একটির মাথায় হাত রেখে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা যায়;—

তুমি একটি ফুলের মত মণি
এমনই মিষ্টি এমনই সুন্দর
মুখের পানে তাকাই যখনি
ব্যথায় কেন কাঁদায় অন্তর !

শিরে তোমার হস্ত দুটি রাখি
পড়ি এই আশিস মন্তর,
বিধি তোরে রাখুন চিরকাল
এমনই মিষ্টি এমনই সুন্দর !

ডু বিস্‌ট্‌ ভী আইনে ব্লুমে
জো হোল্ট, উন্‌ট্‌ শ্যোন উন্‌ট্‌ রাইন.;
ইষ শাও' ডিষ আন, উন্‌ট্‌ ভেমুট
শ্লাইষ্‌ট্‌ মীর ইন্‌স্‌ হের্‌ৎস্‌ হিনাইন।

মীর ইস্ট্‌ আল্‌স্‌ অপ ইষ ডি হ্যান্‌ডে
আউফ্‌স্‌ হাউপ্‌ট্‌ ডীর লেগেন জলট,'
বেটেন্ড, দাস্‌ গট্‌ ডীর এরহাল্টে
জো রাইন উন্‌ট্‌ শ্যোন উন্‌ট্‌ হোল্ট্‌।

এই গ্রামের পাশে বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হাইন্‌রিষ হাইনে যাঁর ছোট্ট কবিতার বইটি, 'বুখ ড্যার লীডার' পকেটে নিয়ে বন্‌ থেকে বেরিয়েছি এই কবিতাটি তার থেকে নেওয়া।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পরম বিস্ময়বোধ হয় এই কথা স্মরণ করে যে তিনিই প্রথম বাঙলাতে অনুবাদ করেন—এবং খুব সম্ভব ভারতের সব ভাষা নিলে বাঙলাতেই প্রথম—হাইনের কবিতা। এবং তাও হাইনের মৃত্যুর পর চল্লিশ বছর যেতে না যেতেই ! এবং মূল জর্মন থেকে—ইংরিজী অনুবাদ মারফতে নয় ! পরবর্তী কবিদের অধিকাংশই অনুবাদ করেছেন ইংরিজী থেকে। মাত্র সত্যেন দত্ত ও যতীন্দ্র বাগচীরই অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের কিছুটা কাছে আসতে পারে। রবীন্দ্রনাথই যে প্রথম হাইনের বাঙলা অনুবাদ করেছিলেন সেদিকে হালে শ্রীযুক্ত অরুণ সরকার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন, কারণ রবীন্দ্রনাথের চলিত অচলিত কোনো রচনাবলীতেই এ অনুবাদের উল্লেখ পর্যন্ত নেই।

হাইনের সঙ্গে চণ্ডীদাসের তুলনা করা যায়। দুজনাই হৃদয়বেদনা নিবেদন করেছেন অতি সরল ভাষায়। দরদী বাঙালী তাই সহজেই এঁর সঙ্গে একাত্ম অনুভব করে।

গ্যোটে যে সংস্কৃতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার অন্যতম কারণ সংস্কৃত এবং গ্যোটের দেশ ও জাতের ভাষা দুটোই আর্য ভাষা। কিন্তু হাইনে জাতে

ইহুদী। আর্য-সভ্যতা এবং ইহুদীদের সেমিতি সভ্যতা আলাদা। তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন নিছক ভারতবর্ষের নৈসর্গিক দৃশ্যের বর্ণনা পড়ে এবং শুনে।

তাঁর যে গুরু ফন্ শ্লেগেল তাঁর মাথায় সর্বপ্রথম কবির মুকুট পরিয়ে দেন যিনি তিনি ছিলেন বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক।

॥ ৬ ॥

গেরো বাঁধলো 'শান্তির পাইপ খাওয়া' নিয়ে। এটা বোধ হয় ড্রেস রিহার্সেল। তাই এই প্রথম সত্যকার পাইপে করে সত্যকার তামাক খাওয়া হবে। যে ছেলেটি রেড-ইণ্ডিয়ানদের দলপতি সে বোধ হয় একটু অতিরিক্ত মাত্রায় গোবেচারী—নিতান্ত দিক-ধেড়েঙ্গে ঢ্যাঙা বলে তাকে দলপতি বানানো হয়েছে এবং জীবনে কখনো রান্নাঘরের পিছনে, ওদের ভাষায় চিলেকোঠায় (এ্যাটিকে) কিংবা খড় রাখার ঘরে গোপনে আধ-পোড়া সিগারেটও টেনে দেখে নি। না হলে আগেভাগেই জানা থাকতো ভস্‌ভস্ করে পাইপ ফোঁকা চাট্টিখানি কথা নয়।

দিয়েছে আবার ব্রহ্ম টান! মাটির ছিলিম হলে ফাটার কথা!

ভিরমি যায়-যায়। হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড। একটা ছোট ছেলে তো ভ্যাঁক করে কেঁদেই ফেললে। ওদিকে আমিই ওদের মধ্যে মুরুব্বী। আমাকে কিছু একটা করতে হয়। একজনকে ছুটে গিয়ে মিনরেল-ওয়াটার আনতে বললুম—ও জিনিস এ-অঞ্চলে পাওয়া যায় সহজেই—টাই-কালার খুলে দিয়ে শির-দাঁড়া ঘষতে লাগলুম। এসব মুষ্টিযোগে কিছু হয় কি না জানি নে—শুনেছি মৃত্যুর দু' একদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথের হিক্কা থামাবার জন্য ময়ূরের পালক-পোড়া না কি যেন খাওয়ানো হয়েছিল—তবে সাইকলজিকাল কিছু একটা হবে নিশ্চয়ই। আমি যখন রেড-ইণ্ডিয়ান তখন ওদের পাইপের পাপ কি করে ঠেকাতে হয় আমারই জানার কথা।

ফাঁড়া কেটে যাওয়ার পর দুর্ভাবনা জাগলো, শোঁর দিনে পাইপ টানা হবে কি প্রকারে? হায়, হায়, এত সব বখেড়া পোওয়াবার পর, এমন কি জলজ্যান্ত রেড-ইণ্ডিয়ান পাওয়ার পর তীরে এসে ভরাডুবি!

আমি বললুম, 'কুচ পরোয়া নেই। সব ঠিক হো যায়েগা। কয়েক ফোঁটা ইউকেলিপ্‌টাস তেল নিয়ে এস'—অজ পাড়াগাঁ হলে কি হয়, এ যে জর্মনি।

তারই কয়েক ফোঁটা তামাকে ফেলে আগুন ধরাতেই প্রথমটায় দপ্ করে জ্বলে উঠলো। সেটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ফের ধরালুম। তারপর ভস্ ভস্ করে কয়েক টান দিয়ে বললুম, 'এইবারে তোমরা খাও। কাশি, নাকের জল, বমি কিছুই হবে না।' কেউ সাহস করে না। শেষটায় ঐ মারিয়ানা, ফিয়ারলেস্ নাদিয়াই দিলে দম! সঙ্গে সঙ্গে খুশীতে মুখচোখ ভরে নিয়ে বললে, 'খাসা! হচ্ছে ইউকেলিপটাসের ধুঁয়োয় নাক-গলা ভর্তি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কেমন

যেন শুকনো শুকনো।'

আমি বললুম, 'মাদাম ক্যুরিকে হার মানালি। ধরেছিস ঠিকই। শুকনো শুকনো ভাব বলেই খুব ভিজে সর্দি হলে ডাক্তাররা এই প্রক্রিয়ায় ইউকেলিপটাস ব্যবহার করতে বলে।'

শুধালে, 'আর তামাকের কি হল? তার স্বাদ তো আদপেই পাচ্ছি নে।'

সাক্ষাৎ মা দুগ্‌গা! দশ হাতে একসঙ্গে পাঁচ ছিলিম গাঁজা সেজে—কুলোকে বলে নিতান্ত ঐ গাঁজার স্টেডি সাপ্লাইয়ের জন্যই শিব দশভুজাকে বিয়ে করেছিলেন—বাবার হাতে তুলে দেবার পূর্বে মা নিশ্চয়ই তাঁর বখরার পূর্ব-প্রসাদ নিয়ে নিতেন। এ মেয়ে শিব পাবার পূর্বেই নেশাটা মক্‌সো করে রেখেছে—বেঁচে থাকলে শিবতুল্য বর হবে।

আমি বললুম, 'তামাক কর্পূর—মায় নিকোটিন।'

এমন সময় স্পষ্ট শোনা গেল গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে বাজলো দুটো। সঙ্গে সঙ্গে এদের সক্কলের মুখ গেল শুকিয়ে। কি ব্যাপার? দু'টোর সময় সব্বাইয়ের বাড়ি ফেরার হুকুম। মধ্যাহ্ন-ভোজন।

জর্মনি কড়া আইন, ডিসিপ্লিনের দেশ। বাচ্চাদের ডিসিপ্লিন আরম্ভ হয়, জন্মের প্রথম দিন থেকেই—সে কথা আরেকদিন হবে। সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, বিপদে পড়েছে আমাকে নিয়ে। ছেলেমানুষ হোক আর যাই হোক একটা লোককে হুট করে বিদায় দেয় কি করে? ওদিকে আমিও যে এগোতে পারলে বাঁচি সেটা বোঝাতে গেলে ওরা যদি কষ্ট পায়!

গোবেচারী মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন দেখলুম, যার দলপতি সাজবার কথা সে ছেলেটা অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে শুধালে, 'তুমি লাঞ্চ খেয়েছো!'

আমার সত্য ধর্ম ছিল মিথ্যা বলার, অর্থাৎ হ্যাঁ, কিন্তু আমার ভিতরকার শয়তান আমাকে বিপদে ফেলার জন্য হামেহাল তৈরী। সে-ই সত্যভাষণ করে বললে, 'না, কিন্তু—'

কয়েকজন ছেলেমেয়ে একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললে, 'আমার বাড়ি চলো।'

মেলা হট্টগোল। আমি বললুম, 'অনেক ধন্যবাদ, বাছারা, কিন্তু তোমাদের বাপ-মা একটা ট্র্যাম্পকে—?'

মারিয়ানা মেয়েটা একদিন জর্মনীর রানী হবে যদি কৈলাস থেকে হুলিয়া বেরোয়। বলা-নেই-কওয়া-নেই খপ করে তার ছোট্ট হাত দিয়ে আমার হাতখানা ধরে বললে, 'চলো আমার বাড়ি। আমাতে ঠাকুমাতে থাকি। কেউ কিছু বলবে না। ঠাকুমা আমায় বড্ড ভালবাসে।' তারপর ফিস্‌-ফিস্‌ করে কানে কানে বললে—যদিও আমার বিশ্বাস সবাই শুনতে পেলে, 'ঠাকুমা চোখে দেখতে পায় না।'

ইস্কুল থেকে বেরিয়ে বিস্তর হ্যান্ড-শেক, বিস্তর চকলেট বদলাবদলি হল। মারিয়ানা বললে, 'চলো। আমাদের বাড়ি গ্রামের সর্বশেষে। তুমি যেদিকে চলছিলে সেই দিকেই। খামোখা উল্টো পথে যেতে হবে না।'

আজ স্বীকার করছি, তখনো আমি উজবুক ছিলুম। কাকে কি জিজ্ঞেস

করতে হয়, না হয়, জানতুম না ; কিংবা হয়তো, কিছুদিন পূর্বেই কাবুলে ছিলুম বলে সেখানকার রেওয়াজের জের টানছিলুম—সেখানে অনেকক্ষণ ধরে ইনিয়ে বিনিয়ে হরেক রকমের ব্যক্তিগত প্রশ্ন শোধানো হল ভদ্রতার প্রথম চিহ্ন। জিজ্ঞেস করে বসেছি, 'তোমার বাপ মা ?'

অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে উত্তর দিলে, 'বাবা ? তাকে আমি কখনো দেখি নি। আমার জন্মের পূর্বেই লড়াইয়ে মারা যায়। আর মা ? তাকেও দেখি নি। দেখেছি নিশ্চয়, কিন্তু কোনো স্মরণ নেই। সে গেল, আমার যখন বয়েস এক মাস।'

ইচ্ছে করে এরকম প্রশ্ন শুধিয়ে বিপদে পড়া আহাম্মুখিই। লড়াই, লড়াই, লড়াই ! হে ভগবান ! তুমি সব পারো, শুধু এইটে বন্ধ করতে পারো না ?

ভাবলুম, কোন্ ব্যামোতে মা মারা গেল সেইটে শুধোলে হয় তো আলাপটা অন্য মোড় নেবে। শুধালুম, 'মা গেল কিসে ?'

বারো, জোর তেরো বছরের মেয়ে। কিন্তু যা উত্তর দিলে তাতে আমি বুঝলুম, আহাম্মুখের মত এক প্রশ্ন শুধিয়ে বিপদ এড়াবার জন্য অন্য প্রশ্ন শুধোতে নেই। বললে, 'আমাদের গাঁয়ে ডাক্তার নেই। বন্ শহরের ডাক্তার বলে, মা গেছে হার্টে। ঠাকুমা বলে, অন্য হার্টে। মা নাকি বাবাকে বড্ড ভালো-বাসতো। সবে নাকি তাদের বিয়ে হয়েছিল।'

* * *

নির্জন পথ চিত্রিতবৎ সাড়া নেই সারা দেশে।
রাজার দুয়ারে দুইটি প্রহরী ঢুলিছে নিদ্রাবেশে॥

তার বদলে একটি সিঁড়ির উপর পাশাপাশি বসে দুটি বুড়ী ঢুলছে।

আর খোলা জানালা দিয়ে আসছে ক্যানারি পাখীর গিটকিরিওল হুইসেলের মিষ্টিমধুর সঙ্গীত। ম্যারিয়ানা বললে, 'দুই দুই বুড়ীর ঐ এক সঙ্গী—পাখিটি।'

॥ ৭ ॥

গ্রামের ঐ একটিমাত্র সদর-রাস্তা পেরিয়ে যাওয়ার পর দু'দিকের বাড়িগুলো রাস্তা থেকে বেশ একটুখানি দূরে—অর্থাৎ গেট খুলে বাগান পেরিয়ে গিয়ে ঘরে উঠতে হয়।

'বাগান' বললুম বটে, কিন্তু সেটাকে ঠিক কি নাম দিলে পাঠকের চোখের সামনে ছবিটি ফুটে উঠবে ভেবে পাচ্ছি নে।

ঢুকতেই কম্পাউণ্ডের বাঁ দিকে একটা ডোবাতে অনেকগুলো রাজহাঁস প্যাঁক-প্যাঁক করছে। টলটল স্বচ্ছ সরোবরে তরতর করে রাজহাঁস মরাল-সন্তরণে ভেসে যাওয়ার শৌখিন ছবি নয়—এ নিছক ডোবা, এদিকে-ওদিকে ভাঙা, ধসে-যাওয়া পাড়, জল ঘোলা এবং কিছু কিছু শুকনো পাতা এদিক-ওদিক ভাসছে। সোজা বাঙলায়, এখানে রাজহাঁসের চাষ হচ্ছে, বাগানের নয়নাভিরাম দৃশ্য হিসেবে এটাকে তৈরী করা হয় নি।

মারিয়ানার গন্ধ পেয়েই রাজহাঁসগুলো একজোট ডোবা ছেড়ে তার চতুর্দিকে জড়ো হল। আমি লাফ দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালুম। রাজহাঁস, ময়ূর এরা মোটেই নিরীহ প্রাণী নয়—যে যাই বলুন! মারিয়ানাও ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শুধু বলল, 'বাপ রে বাপ, জানোয়ারগুলোর কি খাঁই! এই সকালবেলা উঠেই গাদাগুচ্ছের খাইয়ে গিয়েছি, ডোবাতেও এতক্ষণ এটা-সেটা খেয়েছে, আবার দেখো, কি রকম লেগেছে! এদের পুষে যে কী লাভ, ভগবান জানেন।

ইতিমধ্যে দেখি আরেক দল মোর্গামুর্গী এসে জুটেছে।

ঘরে ঢোকার আগে দেখি বাড়ির পিছনে এক কোণে জালের বেড়ার ভিতর গোটাতিনেক শুয়োর।

আমি অবাক হয়ে মারিয়ানাকে শুধালুম, 'এই সব-কিছুর দেখ-ভাল তুমিই করো? তোমার ঠাকুমা না—?'

ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, 'আমি করি কোথায়? করে তো কার্ল!'

আমি শুধালুম, 'সে আবার কে? তুমি না বললে, তোমরা মাত্র দু'জনা?'

ইতিমধ্যে কার্ল এসে জুটেছে। মাঝারি সাইজের এলসেশিয়ান হলেও এলসেশিয়ান তো বটে—জর্মনরা বলে শেপার্ড ডগ, অর্থাৎ রাখাল কুকুর—কাজেই একদিকে রাজহাঁস, অন্যদিকে কুকুর, এ নিয়ে বিব্রত হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু দেখলুম, কার্ল স্যানা ছেলে, আমাকে একবার শুঁকেই মনস্থির করে ফেলেছে, আমি মিত্রপক্ষ।

মারিয়ানা বললে, 'আমি ওদের খাওয়াই-টাওয়াই। কার্লই দেখা শোনা করে। তোমার মত ট্র্যাম্প কিংবা জিপসি সুযোগ পেলেই কপ্ করে একটা মুরগী ইস্তেক হাঁসের গলা মটকে পকেটে পুরে হাওয়া হয়ে যাবে।'

আমি বললাম, 'মনে রইল। এবারে সুযোগ পেলে ছাড়ব না।'

ভয় পেয়ে বললে, 'এমন কর্মটি করতে যেয়ো না, লক্ষ্মীটি। অনেকেরই কার্লের চেয়েও বিরাট দু-আঁসলা শেপার্ড ডগ রয়েছে। সেগুলো বড্ড বদ্ হয়।'

আমি অবাক হয়ে ভাবছি, এই বারো বছরের মেয়ে দু-আঁসলা, এক-আঁসলা ক্রস-ব্রীডের কি বোঝে?

মারিয়ানাই বুঝিয়ে বললে, 'খাঁটি আলসেশিয়ান কার্লের চেয়ে বড় সাইজের হয় না। আলসেশিয়ানকে আরো তাগড়াই করার জন্য কোনো কোনো আহাম্মুক আরো বড় কুকুরের সঙ্গে ক্রস করায়। সেগুলো সত্যিকার দু-আঁসলা, বদমেজাজী আর খায়ও কয়লার ইঞ্জিনের মত।'

এর অনেক পরে এক ডাক্তার আমায় বুঝিয়ে বলেছিলেন, গরু-ভেড়া-ছাগল-মুরগী নিয়ে গ্রামের সকলেরই কারবার বলে কাচ্চাবাচ্চারা অল্পবয়সেই ব্রীডিং বুঝে, 'বীচি'র মোরগ কি বুঝে যায়। তাই শহুরেদের তুলনায় এ-বিষয়ে ওদের সুস্থ স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি জন্মায়, এবং পরিণত বয়সে যৌন-জীবনে শহুরেদের তুলনায় এদের আচরণ অনেক বেশী স্বাভাবিক ও বেহাঙ্গামা হয়।

থাক্ সে কথা। তবে এইবেলা এ কথাটি বলে রাখি, এই গ্রামাঞ্চলে ঘোরাঘুরির ফলে মানুষের জীবনধারা সম্বন্ধে যে জ্ঞান সঞ্চয় করেছি, শহরের বহু ড্রয়িংরুম, বার-রেস্তোরাঁর পাকা জউরি হয়েও তার সিকির সিকিও হয় নি।

* * *

'ঠাকুমা, আমি অতিথি নিয়ে এসেছি।'

আমি বললুম, 'গ্র্যাস্ গট্ ঠাকুমা। আমি বিদেশী।'

ঠাকুমা সেই প্রাচীন যুগের লোক। গ্র্যাস গট্ বলাটাই হয়তো এখনো তাঁর অভ্যাস। তাই বলে বসলেন, 'বসো।' মারিয়ানাকে বললেন, 'এত দেরি করলি যে! খেতে বস্। আর সানডে সেট বের কর। আর শোন, চীজ, চেরি-ব্রাণ্ডি ভুলিস নি।'

'হ্যাঁ, ঠাকুমা নিশ্চয়ই ঠাকুমা—' বলতে বলতে আমার দিকে তাকিয়ে একটুখানি চোখ টিপে হাসলে। বিশেষ করে দেরাজের উপরের থাকের চেরি-ব্র্যাণ্ডির বোতল দেখিয়ে। অর্থাৎ অতিথি-সৎকার হচ্ছে। সচরাচর এগুলো তোলাই থাকে।

এবং এটাও বোঝা গেল, নিতান্ত ঠাকুমা নাতনী ছাড়া আর কেউ নেই বলে রবিবার দিনও সানডে সেটের কাপ-প্লেট বের করা হয় না।

মারিয়ানা টেবিল সাজাচ্ছে। আমি ঠাকুমাকে শুধালুম, 'আপনার স্বাস্থ্য কি রকম যাচ্ছে?'

ঠাকুমা উত্তর না দিয়ে বললেন, 'তুমি তো আমার মত কথা বলো, আমার নাতনীর মত বলো না!'

আমি শুধালুম, 'একটু বুঝিয়ে বলুন।'

ঠাকুমা বললেন, 'আমি হানোফারের মেয়ে। সেই ভাষাতেই কথা বলি। সে-ভাষা বড় মিষ্টি। আমি ছাড়বো কেন? আর নাতনীর বাপ-ঠাকুর্দা রাইনল্যাণ্ডের লোক। এরা সবই রাইনিশ বলে। তুমি তো হানোফারের কথা বলছো!'

মারিয়ানা বলে উঠলো, 'ওঃ, কত না মিষ্টি! শ্পৎসে, শ্টাইন বলতে পারে না; বলে স্পিৎসে, স্টাইন।'

(অর্থাৎ 'শ, স'-এ তফাত করতে পারে না; আমরা যে রকম 'সামবাজারের সসিবাবুর সসা খেয়ে খেয়ে সগ্গারোন' নিয়ে ঠাট্টা করি।)

ঠাকুমা কণামাত্র বিচলিত না হয়ে বললেন, 'আর তোরা ত কির্শে, কির্ষেতে তফাত করতে পারিস নে।'

(এ দুটো উচ্চারণের পার্থক্য বাঙলা হরফ দিয়ে বোঝানো অসম্ভব। তবে এক উচ্চারণ করলে ফলে দাঁড়ায় 'আমি গির্জেটা (কির্ষে) খেলুম (!), এবং তারপর চেরি ফলে (কির্শে) ঢুকলুম (!)'—যেখানে উচ্চারণে ঠিক ঠিক পার্থক্য করলে সত্যকার বক্তব্য প্রকাশ হবে, 'আমি চেরিফল খেয়ে গির্জের ঢুকলুম।')

আমি বাঙাল-ঘটি যে-রকম উচ্চারণ নিয়ে তর্ক করে, সে ধরনের কাজিয়ার বাড়াবাড়ি থামাবার জন্য বললুম, 'আমার গুরু ছিলেন ছানোকারের লোক।'

॥ ৮ ॥

"ধন্য হে জননী মেরী, তুমি মা করুণাময়ী। তুমি প্রভুর সান্নিধ্যলাভ করেছ। রমণীজাতির মধ্যে তুমিই ধন্য, আর ধন্য তোমার দেহজাত সন্তান যীশু। মহিমাময়ী মা মেরি, এই পাপীতাপীদের তুমি দয়া করো, আর দয়া করো যেদিন মরণের ছায়া আমাদের চতুর্দিকে ঘনিয়ে আসবে।"

এই 'আভে মারিয়া' বা 'মেরি-আবাহন-মন্ত্র' উচ্চারণ না করে সাধারণত ক্যাথলিকরা খেতে বসে না—আর গ্রামাঞ্চলে তো কথাই নেই। অনেকটা হিন্দুদের গণ্ডুষের মত। আর প্রটেস্টাণ্টরা সাধারণত 'হে আমাদের দ্যুলোকের পিতা' (পাতের নস্তের) মন্ত্র পাঠ করে। কোনো কোনো পরিবারের উপাসনাটা অতি ক্ষুদ্র:

'এস হে যীশু!
আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করো।
আমাদের যা দিয়েছো তার উপর
তোমার আশীর্বাদ রাখো।
'কমে য়েজু, জাই উনজের গাস্ট্
উনট্ জেগনে ভাস ডু
উন্স্ রেশেরট্ হাস্ট্ ॥[১]

মুসলমানদের উপাসনাটিও ক্ষুদ্র: 'আমি সেই খুদার নামে আরম্ভ করি যিনি দয়াময়, করুণাময়।'

১ বিলাতের কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোজনগৃহে এই মন্ত্রপাঠ করার সময় জনৈক ভারতীয় ভোজনালয় ত্যাগ করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি সেটি ফলাও করে তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে বর্ণনা দেন। নাস্তিকের এই 'সৎসাহসের' কর্মটি তিনি যদি ইন্‌কুইজিশন যুগে করতেন তবু না হয় তার অর্থ বোঝা যেত। কিন্তু তাঁর এই আচরণ থেকে ধরে নিতে হবে, হয় ভারতীয়রা পরধর্ম সম্বন্ধে অসহিষ্ণু, অথবা ঐ লেখক ভারতীয় নন। জানি একজন ভারতীয়ের আচরণ থেকে তাবৎ ভারতীয় সম্বন্ধে কোনো অভিমত নির্মাণ করা অযৌক্তিক কিন্তু দেশ-বিদেশে সর্বত্রই তাই করা হয়।

পক্ষান্তরে খাঁটি নাস্তিক আনাতোল ফ্রাঁস যখন একবার শুনতে পান, ফরাসী সরকার যে পুস্তকে ভগবানের নাম উল্লেখ থাকে সে-পুস্তক স্কুল লাইব্রেরীর জন্য কিনতে দেয় না, তখন তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন, 'তাহলে ফরাসী বিদ্রোহে এত রক্তপাত করে পেলুম আমরা কী সে স্বাধীনতা—যে স্বাধীনতা আস্তিককে তার ধর্মবিশ্বাস প্রচার করতে দেয় না।

এদের এই মন্ত্রপাঠে একটি আচার আমার ভালো লাগে ; পরিবারের সর্ব-কনিষ্ঠ—যে সবে আধো আধো মন্ত্রোচ্চারণ করতে শিখেছে—তাকেই সর্বজ্যেষ্ঠ আদেশ দেন, উপাসনা আরম্ভ করতে।

ঠাকুমা আদেশ করলেন, 'মারিয়ানা, ফাঙেমাল্ আন—আরম্ভ কর।'

প্রাগুক্ত শুদ্ধ-বুদ্ধ-বিবেকমণ্ডিত 'নাস্তিক' ভ্রমণকাহিনী লেখক আমি নই। (ভ্রমণকাহিনী যদিও লিখেছি তবু তাঁর মত খ্যাতিলাভ করতে পারি নি।) তাই আমি হস্তী দ্বারা তাড্যমানের ন্যায় খৃষ্টানের গৃহ ত্যাগ করলুম না।

মারিয়ানার কিন্তু তখনো খাবার সাজানো হয় নি—রোববারের বাসন-কোশন বের করতে একটু সময় লেগেছে বই কি, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। সুপ্ স্যালাড আনতে আনতেই, সেই সদাপ্রসন্ন তরুণ মুখটিতে কণামাত্র গাম্ভীর্য না এনে সহজ সরল কণ্ঠে বলে উঠলো,

'ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা
করুণাময়।—'

বাচ্চাদের উপাসনা আমার সব সময়েই বড় ভালো লাগে। বড়দের কথায় বিশ্বাস করে তারা সরল চিত্তে ধরে নিয়েছে ভগবান সামনেই রয়েছেন। ফলে তাদের মন্ত্রোচ্চারণের সময় মনে হয় তারা যেন তাঁর সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে কথা কইছে—যেন ঠাকুরমার সঙ্গে কথা না বলে ভগবানের সঙ্গে কথা বলছে। আর আমরা, বয়স্করা, কখনো উপরের দিকে, কখনো মাথা নিচু করে 'উপাসনা করি'—তাঁর সঙ্গে কথা বলি নে।

গ্রামের লোক হাতী ঘোড়া খায় না। শহুরেদের মত আটপদী নিরতিশয় ব্যালানস্ড্ ফুড—ফলে স্বভাবতই আন-ব্যালান্স্ড্!—খায় না বলেই শুনেছি তাদের নাকি থ্রম্বোসিস কম হয়।

সুপ।

আপনারা সায়েবী রেস্তোরাঁয় যে আড়াই ফোঁটা পোশাকী সুপ খেয়ে ন্যাপকিন দিয়ে তার দেড় ফোঁটা ঠোঁট থেকে ব্লট করেন এ সে বস্তু নয়। তার থাকে তনু, এর আছে বপু।

হেন বস্তু নেই যা এ সুপে পাবেন না।

মাংস, মজ্জা সুদ্ধ হাড়, চর্বি সেদ্ধ করা আরম্ভ হয়েছে কাল সন্ধ্যা থেকে, না আজ সকাল থেকে বলতে পারবো না। তারপর তাতে এসেছে, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রাসেল স্প্রাউটস্, দু'এক টুকরো আলু, এবং প্রচুর পরিমাণে মটর-শুঁটি। মাংসের টুকরো তো আছেই—তার কিছুটা গলে গিয়ে ক্বাথ হয়ে গিয়েছে, বাকিটা অর্ধ-বিগলিতালিঙ্গনে তরকারির টুকরোগুলোকে জড়িয়ে ধরেছে। এবং সর্বোপরি হেথা হোথা হাবুডুবু খাচ্ছে অতিশয় মোলায়েম চাক্তি চাক্তি ফ্রাঙ্কফুর্টার সসিজ। চর্বিঘন-মাংসবহুল-তরকারি সম্বলিত মজ্জামণ্ডিত এই সুপের পৌরুষ-দার্ঢ্যের সঙ্গে ফেনাস রেস্তোরাঁর নমনীয় কমনীয় কাঁচসংসেদ ভোজ্য সুপ নামে পরিচিত তরল পদার্থের কোনো তুলনাই হয় না।

এর সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে এদেশের ভাষায় বলতে গেলে বলবো, মা মাসীদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোনো গতিকে পিকনিকে নিয়ে যেতে পারলে তাঁরা সাড়ে বত্রিশ উপকরণ দিয়ে যে খিচুড়ী রাঁধেন, ধর্মে-গোত্রে এ যেন তাই। খেয়েই যাচ্ছি, খেয়েই যাচ্ছি, শুধুমাত্র খিচুড়িই খেয়ে যাচ্ছি—শেষটায় দেখি, ওমা, বেগুনভাজা মামলেটে হাত পর্যন্ত দেওয়া হয় নি।

জর্মনির জনপদবাসী ঠিক সেই রকম সচরাচর ঐ একটিমাত্র সুপই খায়। তার সঙ্গে কেউ কেউ রুটি পর্যন্ত খায় না।

আজ রোববার, তাই ভিন্ন ব্যবস্থা। অতএব আছে, দ্বিতীয়ত, স্যালাড।

আবার বলছি, আপনাদের সেই 'ফিনসি' রেস্তোরাঁর উন্নাসিক 'সালাদ রুস' 'সালাদ আলা মায়োনেজ', 'সালাদ ভারিয়ে ও-পোয়াসোঁ' ওসব মাল বেবাক ভুলে যান।

সুপে যেমন ছিল দুনিয়ার সাকুল্যে সর্বকিছু, স্যালাডে ঠিক তার উল্টোটি। আছে মাত্র তিনটি বস্তু: লেটিসের পাতা, টমাটোর টুকরো, প্যাঁজের চাক্তি—ব্যস!

এগুলো মেশানো হয়েছে আরো তিনটি বস্তু দিয়ে। ভিনিগার, অলিভ ওয়েল এবং জলে-মিশিয়ে-নেওয়া সরষেবাটা। অবশ্য নুন আছে এবং গোলমরিচের গুঁড়ো থাকলে থাকতেও পারে। কিন্তু ঐ যে সিরকা, তেল, সর্ষে সেই তিন বস্তুর কতটা কতখানি দিতে হবে, কতক্ষণ মাখতে হবে—বেশী মাখলে স্যালাড জবুথবু হয়ে নেতিয়ে যাবে, কম মাখলে সর্বাঙ্গে সর্ব জিনিসের পরশন শিহরণ জাগবে না—সেই হল গিয়ে স্যালাডের তমসাবৃত, সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য।

দম্ভভরে বলছি, আমি শংকর কপিল পড়েছি, কাণ্ট হেগেল আমার কাছে অজানা নন। অলংকার নব্যন্যায় খুঁচিয়ে দেখেছি, ভয় পাই নি। উপনিষদ, সুফীতত্ত্বও আমার কাছে বিভিষিকা নয়। আমার পরীক্ষা নিয়ে সত্যেন বোসের এক সহকর্মী আমাকে বলেছিলেন, তিনি বছরে তিনি আমায় রিলেটিভিটি কলকাতার দুগ্ধবত্তরলম্ করে দিতে পারবেন। পুনরপি দম্ভ ভরে বলছি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের হেন বস্তু নেই যার সামনে দাঁড়িয়ে হকচকিয়ে বলেছি, এ জিনিস? না, এ জিনিস আমাদ্বারা কক্‌খনো হবে না। আপ্রাণ চেষ্টা করলেও হবে না।

কিন্তু ভগ্নদূতের মত নতমস্তকে বার বার স্বীকার করছি ঐ স্যালাড মেশানোর বিদ্যেটা আমি আজো রপ্ত করে উঠতে পারি নি। অথচ বন্ধুমহলে—বেম্বাইয়ের শচীন চৌধুরী থেকে আরম্ভ করে কলকাতার ডাক্তার ঘোষ পর্যন্ত—স্যালাড মেশানো ব্যাপারে আমার রীতিমত খ্যাতি আছে। তাঁরা যখন আমার তৈরী স্যালাড খেয়ে 'আ মরি', 'আ মরি' করেন, আমি তখন ঠাকুমার সেই স্যালাডের স্মরণে জানলা দিয়ে হঠাৎ কখনো বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে থাকি, কখনো বা মাথা নীচু করে বসে থাকি।

বাঙলা কথায় তুলনা দিয়ে বলতে হলে, শুধোই, তেলমুড়ি আপনি মাখতে পারেন, আম্মো পারি, কিন্তু পারেন ঠাকুমার মত? ধনেপাতার চাটনিতে

কীই বা এমন কেরদানী ! কিন্তু পারেন পদি পিসি পারা পিষতে ?

* * *

'গুটেন্ আপেটিট' '—গুড্ এপিটাইট !

এর ঠিক বাংলা নেই। উপাসনার পর একে অন্যের দিকে তাকিয়ে সবাই বলে, 'আশা করি তোমার যেন বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হয়, আর তুমি তৃপ্তির সঙ্গে খেতে পারো।' ইংরিজীর মত জর্মনেও 'হাঙার' (হুঙার) ও 'এপিটাইট' ('আপেটিট') দুটো শব্দ আছে। 'এপিটাইটে'র ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ নেই। 'খাওয়ার রুচি, বাসনা' অনেক কিছু দিয়ে মোটামুটি বোঝানো চলে কিন্তু ঠিক অর্থটি বেরোয় না'। যেমন ইংরিজিতে বলা চলে, 'আই এম্ হাঙরি বাট হ্যাভ নো এপিটাইট'—'আমার ক্ষুধা আছে কিন্তু খাবার প্রবৃত্তি নেই,' কিংবা 'মুখে রুচছে না'। আবার পেটুক ছেলে যখন খাই-খাই করে তখন অনেকেই বলে, 'দি বয় হ্যাজ এপিটাইট বাট হি ইজ নট হাঙরি এট অল।' এস্থলে 'এপিটাইট' তাহলে দাঁড়ায় 'চোখের ক্ষিধে'। আমার অবশ্য, দুইই ছিল।

আইনানুযায়ী আমার মাঝখানে বসার কথা, কিন্তু আমি একরকম জোর করে মারিয়ানাকে মাঝখানে বসিয়ে দিলুম। ঠাকুমার কখন কি দরকার হয় আমি তো জানি নে। মারিয়ানা কাছে থাকলে ওঁকে সাহায্য করতে পারবে।

বিরাট গোল এক চামচ দিয়ে সুপের বড় বোল্ থেকে আমার গভীর সুপ-প্লেটে মারিয়ানা চালান করতে লাগল লিটার লিটার সুপ। আমি যতই বাধা দিই কোন কথা শোনে না। তবু মাঝে মাঝে পাকা গিন্নীর মত বলে, 'মান্ জল্ অর্ডনুটলিষ এসেন—ভালো করে খেতে হয়, ভালো করে খেতে হয় !'

ঠাকুমা দেখি তখনো কি যেন বিড়বিড় করছেন। হয়তো নিত্য মন্ত্রের উপর তাঁর কোন ইষ্টমন্ত্র আছে—সেইটেই জপ করছেন।

আমার মা বলতো, আমাকে দেখলে যতটা বোকা বলে মনে হয়, আমি ততটা বোকা নই ; আর বড়দা বলতো, আমাকে দেখলে যতটা বুদ্ধিমান বলে মনে হয়, আমি ততটা বুদ্ধিমান নই। কোন্‌টা ঠিক জানি নে, তবে আমার স্মৃতি-শক্তিটি ভালো সে-কথাটা উভয়েই স্বীকার করতেন। আমার মনে পড়ে গেল, আমার শহুরে বন্ধু পাউল একবার আমাকে 'উপাসনার অত্যাচারে'র কথা শুনিয়েছিল। সমস্ত দিন খেটে খিদেয় হন্যে হয়ে চাষারা তাকিয়ে আছে সুপ-প্লেটের দিকে—ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপর—আর পাদ্রীসায়েব, তিনি সমস্তদিন 'প্রভুকে স্মরণ করেছেন বলে' তাঁর হাঙার এপিটাইট কিছুই নেই—পাদ্রী সায়েবের উপাসনার আর অন্ত নেই।

আমি অনুমান করলুম, আমি বিদেশী বলে হয়তো মারিয়ানা মন্ত্রোচ্চারণে কিছু কিছু কাট-ছাঁট করেছে। ফিস্ ফিস্ করে সে কথা শোধাতে তার সর্ব মুখ শুধু নয়, যেন ব্লণ্ড চুলের গোড়াগুলো পর্যন্ত লাল হয়ে গেল। অপরাধ স্বীকার করে বললে, খাওয়ার পরের উপাসনা পুরোপুরি করে দেবে।

ঠাকুমার প্লেটে মারিয়ানা সুপ ঢেলেছিল অল্পই। তিনি প্রথম চামচ মুখে দেওয়ার পর আমরাও খেতে আরম্ভ করলুম। সঙ্গে সঙ্গে মারিয়ানা আমার

দিকে তাকিয়ে শুধোলে, 'শ্মেক্‌ট্‌ এস্‌ ?' অর্থাৎ 'খেতে ভালো লাগছে তো ?' এটা হল এদেশের দু নম্বরের টেবিল এটিকেট। আমি বললুম, 'ধন্যবাদ ! অপূর্ব ! রাজসিক !' জর্মনে কথাটা 'হ্যারলিষ'—তার বাঙলা 'রাজকীয়' 'রাজসিক'।

আমি বললুম, 'ঠাকুমা, আপনাদের এই রবিবারের সেটটি ভারী চমৎকার।'

ঠাকুমা বললেন, 'এ বাড়িতে কিন্তু মোটেই খাপ খায় না। তা কি করবো বলো। আমার মামা কাজ করতেন এক পর্সেলিন কারখানায়। তিনি আমাকে এটা দেন। সে কতকালের কথা—এস্‌ ইস্‌ট্‌ সো লাঙে হের।'

মারিয়ানা বললে, 'চেপে যেও না, ঠাকুমা ! তোমার বিয়ের সময় উপহার পেয়েছিলে সেটা বললে কোন অপরাধ হবে না। ফের "এস্‌ ইস্‌ট্‌ সো লাঙে হের" বলে আরম্ভ করো না।'

আমি শুধালুম, 'এস্‌ ইস্‌ট্‌ সো লাঙে হের—সে আবার কি ?'

উৎসাহের সঙ্গে মারিয়ানা বললে, 'বুঝিয়ে বলছি, শোনো। ঠাকুমা যখনই আমাকে ধমক দিতে চায়, তখন হঠাৎ তাঁর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠে। "তোর বাপ এ-পরবের সময় এরকম ধারা করতো না, তুই কেন করছিস ? তোর মা তার সাম্বৎসরিক পরবের দিনে (নামেনস্‌টাখ্‌) ভোরবেলা চার্চে গিয়েছিল, আর তুই ন'টা অবধি ভস্‌ভস্‌ করে নাক ডাকালি।" কে কবে হেসেছিল, কে কবে কেশেছিল টায়-টায় মনে গাঁথা আছে। আবার দেখো শীতকালে. যখন দিনভর রাতভর দিনের পর দিন বরফ পড়ে, বাড়ি থেকে বেরনো যায় না, তখন যদি সময় কাটাবার জন্য ঠাকুরমাকে জিজ্ঞেস করি, 'হ্যাঁ, ঠাকুমা বলো তো ভাই, লক্ষ্মীটি, ঠাকুরদা কি ভাবে তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পেড়েছিল। এক হাঁটু গেড়ে আরক হাঁটু মুড়ে, ফুলের তোড়া বাঁ-হাতে নিয়ে এগিয়ে দিয়ে, ডান হাত বুকের উপর চেপে নিয়ে—।'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'অবাক করলি ! তুই এসব শিখলি কোথায় ? তোর কাছে কেউ বিয়ের প্রস্তাব পেড়েছিল নাকি ?'

এইবারে ঠাকুমা ঠোঁট খুলল। বললেন, 'বেশ হয়েছে।'

মারিয়ানা মুখ আবার লাল করে বললে, 'দ্যৎ ! সিনেমাতে দেখেছি। উইল-হেলম বুশের আঁকা ছবিতে দেখেছি।[১] তা সে যাক গে, আমার কথা শোনো। ঐসব বিয়ের প্রস্তাব, বিয়ের পর পয়লা ঝগড়া, ঠাকুরদা যখন লড়াইয়ে চলে গেল তখনকার কথা, এসব কথা জিজ্ঞেস করলে হঠাৎ ঠাকুরমার স্মৃতিশক্তি একদম লোপ পায়। আমাদের ঐ কার্ল কুকুরটা যেরকম পূর্ণচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে ডুকরে ডুকরে আর্তরব ছাড়ে ঠিক সেই গলায় ককিয়ে ককিয়ে বলে, সেই এক কথা—"এস্‌ ইস্ট্‌ সো লাঙে হের", "সে কত প্রাচীন দিনের কথা, সে সব কি

১ জর্মনদের সুকুমার রায়। ওঁরই মত নিজের কবিতার ছবি নিজেই আঁকতেন। তবে সুকুমারের মত 'প্যোর ননসেন্স' লেখেন নি। ওঁর বেশীর ভাগই ইলাসট্রেটেড গল্প।

আর আমার মনে আছে।" ধমকের বেলা সব মনে থাকে—তখন আর "লাঙে হের, লাঙে হের" নয়।'

আমি বললুম, 'আলবাৎ, আলবাৎ।'

তার থেকে অবশ্য বোঝা গেল না আমি কোন্ পক্ষ নিলুম। পরে বিপদে পড়লে যেদিকে খুশী ঘুরিয়ে নেব। অবশ্য আমি কালো, কৃষ্ণপক্ষ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেই থাকার চেষ্টা করি।

ইতিমধ্যে আমি মারিয়ানার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছি।

ঘরের উত্তর-পুব কোণে দুই দেওয়ালের সঙ্গে মিলে সিন্‌ক্—জর্মনে বলে শ্‌পুল-স্টাইন।

দেয়ালে গাঁথা ওয়াশস্টেণ্ডের মত, ছোট্ট চৌবাচ্চা-পানা—দেয়ালে গাঁথা বলে যেন হাওয়ায় দুলছে—মাটি পর্যন্ত নেবে আসে নি। সেখানে ট্যাপে বাসন কোশণ মাজা হয়, মাছ-মাংস ধোওয়া হয়—তাই রান্নাঘরে, কিংবা দাওয়ায় (অবশ্য এই শীতের দেশে দাওয়া জিনিসটাই নেই) ঘড়াঘড়া জল রাখতে হয় না। খাওয়া-দাওয়ার পর তাবৎ বাসন-বর্তন, হাঁড়ি-কুড়ি ঐটেতে রেখে সেটাকে জলভর্তি করা হয়। তারই উপরে বাঁদিকের দেয়ালে কয়েকটা হুকে ঝুলছে ধুঁদুলের জালের পরিবর্তে ওয়েস্ট কটন, অতি সূক্ষ্ম তারের জালের স্পঞ্জ, খান দুই ঝাড়ন। আর তার নীচে দেয়ালে গাঁথা শেল্‌ফের উপর ভিমজাতীয় (ওদের বোধ হয় 'পের্জিল') গুঁড়োর চোঙা, সাবান, আর দু-একটা টুকিটাকি যেগুলো আমি চিনি নে। আমি তো আর জর্মন রান্নাঘরে ছেলেবেলা কাটাই নি। ডান দিকের দেয়ালে গাঁথা, কিংবা ঝোলানো একটা বেশ বড় খোলা শেল্‌ফ। সিন্‌কে হয়তো দুচার কাৎলি গরম জলও ঢেলে দেওয়া হয়েছে—রান্না শেষ হওয়ার পর যেটুকু আগুন বেঁচে থাকে, সেটা যাতে করে খামকা নষ্ট না হয়, তাই তখন তার উপর কাৎলি চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই গরম জলে বাসন-কোশনের চর্বি গলাবার জন্যে সিন্‌কে ঢেলে দেওয়া হয়, আর ইতিমধ্যে কেউ কফি বা চা খেতে চাইলে তো কথাই নেই। সিন্‌কের সামনে দেয়ালমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে উপর থেকে ভিম্, স্পঞ্জ পেড়ে নিয়ে এক একটা করে হাঁড়ি মাজবে, ঝাড়ন দিয়ে সেটা শুকোবে, তারপর ডান দিকের শেল্‌ফে রাখবে। ভাল হয় যদি একজন মাজে আর অন্যজন ঝাড়ন দিয়ে পেঁছে।

সিন্‌কের ডান দিকে পুবের দেয়ালের সঙ্গে গা ঘেঁষে একটি প্রমাণ সাইজের মোক্ষম টেবিল। উপরের তক্তাখানা অন্তত দু ইঞ্চি পুরু হবে। এর উপরেই মাছমাংস-তরকারি কাটাকুটি হয়। তাই তার সর্ব-পৃষ্ঠে ক্রিস্ ক্রস্ ছোট-বড় সব রকম কাটার দাগ। পোয়া ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা বেরোবে না যেখানে কোনো দাগ নেই। টেবিলের এক পাশে মাংস কোফ্‌তা করার জন্য একটা কল লাগানো আছে। টেবিলের সামনে একটি টুল—কিন্তু জর্মন মেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রান্নার কাজ করতে ভালোবাসে।

সিন্‌কের বাঁদিকে উত্তরের দেয়ালের সঙ্গে গা ঘেঁষে হার্থ, উনুন, যা খুশী

বলতে পারেন। প্রায় টেবিল সাইজের একটা লোহার বাক্স। উপরে চারটে উনুনের মুখ। নিচের দরজা খুলে কয়লা পোরা হয়। ভাঙা টুকরো টুকরো পাথুরে কয়লা ছাড়া এরা ব্যবহার করে ব্রিকেট। কয়লা গুঁড়ো করে ইঁটের (ব্রিক) সাইজে বানানো হয় বলে এগুলোর নাম ব্রিকেট। হাত ময়লা না করে সাঁড়াশি দিয়ে তোলা যায়, আগুনও ধরে খুব তাড়াতাড়ি আর ধুঁয়োও দেয় অত্যল্প। উনুনের পাশে একটা বালতিতে কয়লা, অন্য বালতিতে চিমটেসুদ্ধ একগাদা ব্রিকেট। উনুন থেকে ধুঁয়ো নিকাশের চোঙা বেরিয়ে যেখানে দেয়ালে গিয়ে ঢুকেছে তারই ডান পাশে দেয়ালে গাঁথা আরেকটা শেল্‌ফ্‌ তাতে বড় বড় জার্‌। কোনোটাতে লেখা 'মেল'—ময়দা, কোনোটাতে 'ৎসুকার'—চিনি, কোনোটাতে 'জাল্‌ৎস্‌—নুন। তামচীনির (স্টোন-ওয়েয়ার) জারগুলো পোড়াবার আগেই কথাগুলো লেখা হয়েছিলো বলে ওগুলো কখনো মুছে যাবে না।[২] তারপর বোতল বোতল তেল, সিরকা ইত্যাদি তরল পদার্থ। সর্বশেষে মার্গারীন, মাখন আরো কি সব।

ঘরের মাঝখানে খাবার টেবিল।

ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে—অর্থাৎ সিনুকের তির্যক কোণে—একখানা পুরনো নিচু আর্ম-চেয়ার। দক্ষিণ থেকে ঘরে ঢুকতেই বাঁদিকে পড়ে। এ-চেয়ারে ঠাকুমা বসে বসে ঢোলেন। সামনের ছোট ফুটস্টুল বা পাদপীঠের উপর পা রেখে।

এদের ড্রইংরুম-কম্‌-ডাইনিংরুম আছে। কিন্তু তার ব্যবহার বড় একটা হয় না। সেটা যেন বড্ড পোশাকী। বসে সুখ পাওয়া যায় না, কথাবার্তা কেমন যেন জমে না। বন্ধ ঘরের কেমন যেন একটা ভ্যাপসা গন্ধ।

আর এ-ঘরে কেমন যেন একটা হৃদ্যতা, খোলাখুলি ভাব। কেউ যেন [illegible]া পর নয়।

॥ ৯ ॥

কুকু-কুকু, কুকু-কুকু, কুকু-কুকু!

এ কি?

এত যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রান্নাঘরের বর্ণনা দিলুম, ঘড়িটা গিয়েছি বিলকুল ভুলে। লক্ষ্যই করি নি। পর্যবেক্ষণ-শক্তি আমার বিলক্ষণ অক্ষম বলে ছেলেবেলায়ই আমার গুরুমশাই আমাকে 'রাত্র্যন্ধ, দিবান্ধ' ইত্যাদি উত্তম উত্তম

২ 'স্টোন-ওয়েয়ার' শব্দ বাংলা অভিধানে 'পাথরের বাসন' বলা হয়। আসলে ওটা সব চেয়ে নিরেস পর্সেলিন বা 'গ্লেজড্‌ পটারি' বলা যেতে পারে। তাম্রবর্ণের চীনেমাটি বলে এ সব জারকে পূববাঙলায় তাম্র-চীনি বলে। উত্তর বাঙলায়ই এগুলো ব্যবহার হয় প্রধানত আচার রাখার জন্য।

খেতাবে বিভূষিত করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, আমাদ্বারা আর যা হোক সাহিত্যিক হওয়া হবে না। আমার দোষের মধ্যে, লাটসায়েবের কুকুরের যে একটা ঠ্যাঙ নেই, সেটা আমি লক্ষ্য করি নি। এবার সেটা পুনরায় সপ্রমাণ হল। অবশ্য আমার একমাত্র সান্ত্বনা, মারিয়ানা আমায় চেয়ে একমাথা খাটো বলে দেয়াল ঘড়িটা ঠিক আই-লেভেলে ঝোলানো হয় নি।

এসব ঘড়ি সস্তা হলেও এদেশে বড় একটা আসে না। ছোট্ট একটি বাক্সের উপর ডায়েল লাগানো কিন্তু কাঁচের আবরণ নেই। বাক্সের উপর ছোট্ট একটি কুটিরের মডেল—ব্ল্যাক ফরেস্ট (শুয়াৎসর্ ভাল্ট—কালো বন) অঞ্চলে যে-রকম সচরাচর হয়ে থাকে, এবং কুটিরটি দেখা যাচ্ছে যেন তার পাশ থেকে, কারণ কোনো দরজা সেখানে নেই, আছে একটি হলদে রঙের জানালা—কুটিরটি সবুজ রঙের। প্রতি ঘণ্টায় ফটাস্ করে জানলার দুটি পাট খুলে যায় আর ভিতর থেকে লাফ দিয়ে তার চৌকাঠে বসে একটি ছোট্ট পাখী মাথা দোলাতে দোলাতে কু-কু করে জানিয়ে দেয় কটা বেজেছে। তারপর সে ভিতরে ডুব মারে আর সঙ্গে সঙ্গে জানলার দুটি পাট কটাস করে বন্ধ হয়ে যায়।

ব্ল্যাক ফরেস্টের কুটিরশিল্প। এ দেশে রপ্তানি হতে শুনিনি। হলেও বেকার হবে। এতটুকু কাঁচের আবরণ যে ঘড়ির কোথাও নেই সে ঘড়ি এই ধুলো-বালির দেশে দু দিনেই ধূলিশয্যা গ্রহণ করবে।

আমি চমকে উঠে বললুম, সর্বনাশ! তিনটে বেজে গেছে। আমাকে যে এগুতে হবে।'

আমাদের তখন সবেমাত্র সুপ-পর্ব সমাধান হয়েছে। ঠাকুমা সুপ শেষ করে চুপচাপ বসে আছেন।

মারিয়ানা বললে, 'এগুতে হবে মানে? খাবার শেষ করে তো যাবে। আজ যে রোববারের লাঞ্চ—তার উপর রয়েছে রে রাগু।'

'রাগু' কথাটা ফরাসী। অর্থাৎ কোফ্তা-কাটা মাংস। আর 'রে' মানে হরিণ।

তার সঙ্গে টুকরো টুকরো করে কাটা থাকে ব্যাঙের ছাতা (এ দেশে মেদিনী-পুর বাঁকুড়ার লোক এর তত্ত্ব কিছু কিছু জানে, কাশ্মীরীরা ভালো করেই জানে এবং টিনে করে রপ্তানি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে), প্যাজ আর ট্রাফ্‌ল—অবশ্য যদি এই শেষোক্ত বস্তুটি পাওয়া যায়।[১] রীতিমত রাজভোগ!

১ ট্রাফ্‌ল নামক সবজিটি জন্মায় মাটির কয়েক ইঞ্চি নীচে, প্রধানত ফ্রান্সেই। একমাত্র কুকুর আর শুয়োরই মাটির উপর থেকে গন্ধ পেয়ে এটা খুঁড়ে বের করতে পারে—যদিও ট্রাফ্‌ল কুকুরের খাদ্য নয়। এ জিনিস বের করার জন্য মাংসের টুকরোর লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে কুকুরকে ট্রেন করতে হয়। বেচারী কুকুরগুলোকে স্বার্থপর মানুষ অত্যন্ত কম খাইয়ে খাইয়ে রাখে—না হলে তারা ট্রাফ্‌লের সন্ধান করে না। আর কুকুরগুলোকে ট্রাফ্‌ল শিকারী খোঁজবার সময় যে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে সে শোনবার মত—'ও যাদু, ও বাছা, ও আমার

আমি শুধালুম, 'হরিণের মাংস পেলে কোথায় ?'

বললে, 'দাঁড়াও, রাগুটা নিয়ে আসি।'

আমার আর মারিয়ানার সুপ প্লেটের নীচে আগের থেকেই মারিয়ানা প্রধান খাদ্যের প্লেট সাজিয়ে রেখেছিল। এখন শুধু সুপ প্লেটই উপর থেকে সরাতে হল। শুনেছি রাশাতে চার পদের লাঞ্চ ডিনার হলে এরকম ধারা চার চারখানা প্লেট একটার উপর আরেকটা সাজানো হয়। যেমন যেমন এক এক পদ খাওয়া শেষ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে সেই প্লেট সরানো হয়—প্রতিবারে নূতন করে পরের পদের জন্যে প্লেট সাজাতে হয় না। এ কথা আমি শুনেছি, কারণ একাধিক রাশানের বাড়িতে আমি খেয়েছি—বলশী এবং জারিস্ট দুই সম্প্রদায়েরই কিন্তু এ-ব্যবস্থা দেখি নি। একখানা প্লেটের উপর সুপ প্লেট রাখলে উচ্চতায় বিশেষ কিছু হের-ফের হয় না, কিন্তু চারখানা প্লেটের উপর সুপ প্লেট রাখলে সে তো নাকের ডগায় পেঁছে যাবে।

আভ্‌ন্‌ খুলে মারিয়ানা রে রাগু নিয়ে এল।

আমি ঠাকুমার দিকে তাকিয়ে মারিয়ানাকে চোখের ইশারা করলুম।

মারিয়ানা বললে, 'ঠাকুমা এক সুপ ভিন্ন অন্য কিছু খায় না। আমিও না। কিন্তু ঐ না জিজ্ঞেস করলে হরিণের মাংস কোথায় পেলুম ? আমাদের গ্রাম থেকে বেরুলে দূরে দক্ষিণে দেখতে পাবে আরেকটা গ্রাম—তার নাম মুফেন্‌-ডর্ফ। তারপর-পুরো একটা ক্ষেত পেরিয়ে রুঙেস্‌ ডর্ফ। তার শেষে নাম-করা হোটেল ড্রেজেন—রাইনের পাড়ে। সেখানে কিন্তু ওপারে যাবার খেয়া নেই। তাই কিছুটা দক্ষিণে গিয়ে মেলেম্‌ খেয়াঘাট। ওপারে ক্যোনিগ্‌ সভিন্টার। সেটা সীবেন-গেবির্গের (সপ্তকুলাচলের) অংশ। তার আরো অনেক দক্ষিণে গিয়ে লরেলাই। ঐ যে তোমার পকেটে রয়েছে হাইনের কবিতার বই তাতে আছে লরেলাই সম্বন্ধে কবিতা'।[২]

মারিয়ানা ইস্কুল-মাস্টারের মত আমাকে বেশ কিছুটা ভূগোল-জ্ঞান দান করে বললে, 'হ্যাঁ, হরিণের মাংসের কথা হচ্ছিল। ঐ যে মুফেন্‌ ডর্ফ (ডর্ফ=গ্রাম) সেটা এমনি অজ যে আমরা ওটাকে ডাকি মুফ্রিকা—আফ্রিকার মত সভ্যতা থেকে অনেক দূরে আছে বলে আফ্রিকার 'ফ্রিকা'টি জুড়ে নিয়ে। আর আফ্রিকাবাসীকে যেমন জর্মনে বলা হয় 'আফ্রিকানার' ঠিক তেমনি ওদের আমরা ডাকি 'মুফ্রিকানার'।

আমি হেসে বললুম, 'তোমাদের রসবোধ আছে।'

সোনার খনি ! এগো না বাবা, খোঁজ না ধন !'—আরো কত কী ! শেষের দিকে বেচারী কুকুরকে মাংসের পরিবর্তে বাসী রুটির ছোট ছোট টুকরো দিয়ে ভোলানো হয় ! ট্রাফ্‌লের নাকি এফ্রোডিসিয়াক গুণ আছে। ফ্রান্স ঐ দিয়ে বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা কামায়।

২ অধুনা প্রকাশিত 'হাইনের শ্রেষ্ঠ কবিতা' ('দীপায়ন প্রকাশনা'। 'দেশ' ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮ সংখ্যা, পৃ ৪১৮ দ্রঃ : পুস্তিকার ৮৬ ও ৮৭ পৃ পশ্য।

মারিয়ানা বললে, 'ঐ মুক্রিকার কাকা হান্‌স্‌ বাবার বন্ধু। আসলে অবশ্য বাবার বন্ধু বলেই ওঁকে ডাকি অঙ্‌কল্‌ হান্স। দুজনাতে প্রতি শনিবারে শিকারে যেত। যতদিন বাবা বেঁচেছিল। এখন একা যায়। যেদিন ভালো শিকার জোটে সেদিন মাংসের খানিকটে আমায় দিয়ে যায়। ব্যাঙের ছাতা আমি নিজে বন থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আসি আর প্যাঁজ তো ঘরে আছেই।'

আমি বললুম, 'মারিয়ানা, লক্ষ্মী মেয়ে, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

ঠাকুমার সুপ প্লেট সরানোর পর তিনি হাত দুটি একজোড়া করে অতি শান্তভাবে আমাদের কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে অল্প মৃদু হাস্য করলে গাল দুটি টুকটুকে লাল হয়ে যাচ্ছিল। যেন সর্ব শরীরের রক্ত ছুটে গিয়ে গাল দুটিতে আশ্রয় নিচ্ছিল—হায়, বুড়ীদের গায়ে ক' ফোঁটা রক্তই বা থাকে!

এবার তিনি মুখ খুলে বললেন, 'মারিয়ানা না বললো তুমি পায়ে হেঁটে হাইকিঙে বেরিয়েছো, তবে তোমার তাড়া কিসের? এ গ্রাম যা, সামনের গ্রামও তা। গ্রামে গ্রামে তফাত কোথায়? শহরে শহরে থাকে। কারণ ভগবান বানিয়েছেন গ্রাম, আর মানুষ বানিয়েছে শহর।'

এক লম্ফে চেয়ার ছেড়ে মারিয়ানা ঠাকুমার কাছে গিয়ে দু হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে তার গালে ঝপাঝপ গণ্ডা তিনেক চুমো খেলে। আর সঙ্গে সঙ্গে 'ওঃ! তুমি কি লক্ষ্মীটি ঠাকুমা! তোমার মত মেয়ে হয় না ঠাকুমা! আমার কথা শুনতে যাবে কেন ঐ ভবঘুরেটা। দেখা হয়েছে অবধি শুধু পালাই পালাই করছে।'

ঠাকুমা ব্যতিব্যস্ত না হয়ে বললেন, 'হয়েছে, হয়েছে। তুই খাওয়া শেষ কর।'

রে রাগুর সঙ্গে নোনা জলে সেদ্ধ করা আলু আর জাওয়ার ক্রাউট।

ঠাকুমা ব্যতিব্যস্ত না হয়ে বললেন, 'ক্রাউট খেতে ভালোবাসো? আমি তো শুনেছি, বিদেশীরা ও জিনিসটা বড় একটা পছন্দ করে না।'

আমি বললুম, 'জিনিসটা যে বাঁধাকপির টক আচার। সত্যি বলতে কি, প্রথম দিন আমার ভালো লাগে নি। এখন সপ্তাহে নিদেন তিন দিন আমার চাই-ই চাই। জানেন, ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী পিয়েল লাভাল যখন একবার বার্লিনে আসেন তখন তাঁর দেশবাসী কে যেন তাঁকে বলেছিল জর্মনদের মত জাওয়ার ক্রাউট কেউ বানাতে পারে না। সে কথা তাঁর মনে পড়ল যেদিন ভোরে তিনি চলে যাবেন তার আগের রাত্রে আড়াইটার সময়। রেস্তোরাঁ তখন বন্ধ; হলে কি হয় ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী, তিনি খাবেন ফ্রান্সের জাওয়ার ক্রাউট—যোগাড় করতেই হল।

সেই রাত সাড়ে চৌদ্দটার সময় ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী সোল্লাসে খেলেন জাওয়ার ক্রাউট।'

আমি যে এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা পছন্দ করি না তার প্রধান কারণ ঐ খাদ্যটি সম্বন্ধে তিনি অচেতন।

* * *

জাওয়ার ক্রাউট নিয়ে বড্ড বেশী বাগাড়ম্বর করার বাসনা নেই। আমাদের কাসুন্দোর মত ওতে বড্ড বায়নাক্কার খটিনটি। তার কারণ সমস্যা দু'জনারই এক। তেল, নুন, সিরকা, চিনি এসব কোনো সংরক্ষণকারী বস্তু অর্থাৎ প্রিজার-ভেটিভ ব্যবহার না করে কিংবা যতদূর সম্ভব অল্প ব্যবহার করে কি প্রকারে খাদ্যবস্তু বহুকাল ধরে আহারোপযোগী করে রাখা যায়, কাসুন্দো ও জাওয়ার ক্রাউটের এই নিয়ে একই শিরঃপীড়া। সেই কারণেই বোধ হয় কাসুন্দো বানাবার 'আস্য' পুব বাঙলার বেশী পরিবারে নেই। মুসলমানরা আদপেই কাসুন্দো বানাতে পারে না বলে কাসুন্দো বানাবার সময় অক্ষয় তৃতীয়ায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বড্ড বেড়ে যায়। বানাবার 'আস্য' না থাকলেও সহাস্য বদনে খাবার 'আস্য' সকলেরই আছে।

পশ্চিমের উপর খুদাতালার মেহেরবানিও অত্যধিক। ওদের তরি-তরকারি ফলমূল বেবাক তৈরী হয়ে ওঠে গ্রীষ্মের শেষে। তার পরেই শীত এসে খাদ্য-বস্তু সংরক্ষণে সাহায্য করে। আমাদের উত্তম উত্তম তরি-তরকারি তৈরী হয় শীতের শেষে—তার পরই আসে গ্রীষ্মকাল—সংরক্ষণকর্মে প্রকৃতির কোনোই সহায়তা পাই নে। ফল পাকে গ্রীষ্মকালে—তার পরই এসে যায় ভ্যাপসা বর্ষা—মসনে-ছাতি পড়ে সব-কুছ বরবাদ। পচা বর্ষার শেষের দিকে দুই নয়া পয়সার রোদ্দুর ওঠা মাত্রই গিন্নীমা'রা আচারের বোয়াম নিয়ে টাট্টু ঘোড়ার বেগে বেরোন ঘর থেকে। ফের পইণ্ট জিরো ইলশে গুঁড়ি নাবামাত্র তাঁরা 'ঐযুযা, গেল গেল, ধর ধর' বলে বেরোন রকেট-পারা। আর বাইবেলী ভাষায় 'ধন্য যাহারা সরল হৃদয়'—অর্থাৎ ভোলা-মন, তাদের তো সর্বনাশ।

জানি, তেলে টইটম্বুর করে রাখলে মসনে পড়ে না, কিন্তু বড্ড বেশী তেল চিটচিটে আচার খেয়ে সুখ নেই। তদুপরি ভেজাল তেলের ঠেলায় এ গ্রীষ্মে মোক্ষম মার খেয়ে আমি আচারের মাথায় ঘোল ঢেলে দিয়ে বিদায় দিয়েছি। এখন রইলেন শুধু জারক নেবু, আর বাজারের ওঁচা আচার!

আমি বললুম, 'মারিয়ানা, ঠাকুমার সেই "লাঙে হের, লাঙে হের"—পুরনো দিনের গল্প বলো না?'

অপরাহ্নের ট্যারচা সোনালী রোদ এসে পড়েছে ঠাকুরমার নীল সাদা সেটের উপর আর মারিয়ানার ব্লণ্ড চুলের উপর। চেরী ব্রাণ্ডির বেগনী রঙের সঙ্গে সে আলো মিশে গিয়ে ধরেছে এক অদ্ভুত নূতন রঙ। ডাবরের সুপের ফোঁটা ফোঁটা চর্বির উপর আলো যেন স্থান না পেয়ে ঠিকরে পড়ছে। সে রোদে ঠাকুমার বরফের মত সাদা চুল যেন সোনালী হয়ে উঠলো। তার পিঠের কালো জামার উপর সে আলো যেন আদর করে হাত বুলোচ্ছে। জানলার পরদা যেমন যেমন হাওয়ায় দুলছে সঙ্গে সঙ্গে আলোর নাচ আরম্ভ হয় ঝকঝকে বাসন-কোশনের উপর, গেলাসের তরল দ্রব্যের উপর আর ঠাকুমা-নাতনীর চুলের উপর।

অনেককাল পর গ্রামাঞ্চলে এসেছি বলে খেতে খেতে শুনছি, রকম-বেরকম

পাখির মধুর কূজন। এদের সময় ঘনিয়ে এসেছে। এরা আর বেশীদিন এখানে থাকবে না। শীত এলে দক্ষিণের দিকে পাড়ি দেবে। তখন গ্রাম শহরের তফাৎ ঘুচে যাবে।

আসবার সময় এক সারি পপলার গাছের নিচু দিয়ে ছায়ায় ছায়ায় বাড়ি পেঁছেছিলুম। রবিবারের অপরাহ্ণ বলে এখনো সমস্ত গ্রাম সুষুপ্ত—শুধু ঐ চিনারের মগডালের ভিতর দিয়ে বাতাস চলার সামান্য গুঞ্জরণ ধ্বনি কানে আসছে, কিংবা কি এদেরই ডোবার পাড়ে যে নুয়ে পড়া উইপিং উইলো দেখেছি তারই ভিতর দিয়ে বাতাস ঘুরে ফিরে বেরোবার পথ পাচ্ছে না? এ গাছের জলের উপর লুটিয়ে-পড়া, মাথার সমস্ত চুল এলোমেলো করে দিয়ে সদ্য-বিধবার মত গুমরে গুমরে যেন কান্নার ক্ষীণ রব ছাড়া—এগুলো আমার মনকে বড় বেদনায় ভরে দেয়। দেশের শিউলি ফুলের কথা মনে পড়ে। তার নামও কেউ কেউ ইংরিজীতে দিয়েছে 'সরো ফ্লাওয়ার' বিষাদ-কুসুম।

ঠাকুমা ঢুলতে ঢুলতে হঠাৎ জেগে উঠলেন। জানি নে, বোধ হয় 'লাঙে হেরে'র ফাঁড়া কাটাবার জন্য মারিয়ানাকে শুধোলেন, 'কাল হের হানসের সঙ্গে কি কথাবার্তা হল?'

মারিয়ানা আমার দিকে তাকিয়ে দুষ্টু হাসি হেসে বললে, 'দেখলে? তা সে যাক্। কিন্তু জানো, হানস্ কাকা বড় মজার লোক। যত সব অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলে—কোন্‌টা যে সত্যি, কোন্‌টা যে তার বানানো কিছুটি বোঝার উপায় নেই। কাল বলছিল, একবার হানস্ কাকা আর বাবা নাকি লড়াইয়ের ছুটি পেয়ে দুজনা শিকারে গেছে—তখন লড়াইয়ের সময় বলে বন্দুকের লাইসেন্স নিয়ে বড্ড কড়াকড়ি। হঠাৎ একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়েছে পুলিস, দেখতে চেয়েছে লাইসেন্স। পুলিসকে যেই না দেখা অমনি হানস্ কাকা বাবাকে ফেলে দিয়ে চোঁ-চাঁ ছুট। পুলিসও ধরবে বলে ছুটেছে পিছনে। ওদিকে হানস্ কাকা মোটা-সোটা গাব্দা-গোব্দা মানুষ। আধ মাইল যেতে না যেতেই পুলিস তাকে ধরে ফেলেছে। কাকা বললে, পুলিস নাকি হুঙ্কার দিয়ে লাইসেন্স চাইলে। কাকাও নাকি ভাল মানুষের মত গোবেচারী মুখ করে পকেট থেকে লাইসেন্স বের করে দেখালে।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'লাইসেন্স যদি ছিল তবে ওরকম পাগলের মত ছুটলো কেন?'

মারিয়ানা বললে, 'আহ্, শোনোই না। তোমার কিছুতেই সবুর সয় না। পুলিসও তোমারই মত বেকুব বনে ঐ প্রশ্নই শুধালে। তখন হানস্ কাকা নাকি হাসতে হাসতে গড়াগড়ি দিয়ে বললে, আমার লাইসেন্স আছে, কিন্তু আমার বন্ধুর নেই। সে এতক্ষণে হাওয়া হয়ে গিয়েছে।' পুলিস নাকি প্রায় তাকে মারতে তাড়া করেছিল।'

আমি হাসতে হাসতে বললুম, 'খাসা গল্প। পুলিসের তখনকার মুখের ভাবটা দেখবার আমার বড় ইচ্ছে হচ্ছে। জানো, আমাকেও একবার পুলিস তাড়া করেছিল। ওরে বাপ রে বাপ! সে কী ছুট, কী ছুট, কিন্তু ধরতে পারেনি।'

মারিয়ানার কচি মুখ ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছে। হোঁচট খেতে খেতে শুধোলে, 'কেন, কি হয়েছিলো ?'

আমি বললুম, 'কি আর হবে, যা আকছারই হয়ে থাকে। পুলিসে স্টুডেন্টে পাল্লা।'

মারিয়ানা নির্বাক ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি শুধোলুম, 'কি হল ? আমার মাথার পিছনে ভূত এসে দাঁড়িয়েছে নাকি ?'

তোৎলাতে তোৎলাতে শুধোলে, 'তুমি য়ুনিভার্সিটির স্টুডেন্ট !'

আমার তখনো জানা ছিল না, এ দেশের গ্রামাঞ্চলের লোক বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় একটা যায় না। কাজেই এখানে তাদের বড় সম্মান, রীতিমত সমীহ করে চলা হয়। তাই আমি আমার সফরের শেষের দিকে কথাটা বেবাক চেপে যেতুম। আমি ট্র্যাম্প, ট্র্যাম্পই সই। কী হবে ভদ্রলোক সেজে !

মারিয়ানা বললে, 'তাই বলো। আমিও ভাবছি, ট্র্যাম্পই যদি হবে তবে নখের ভিতর দু'ইঞ্চি ময়লা নেই কেন ? ট্র্যাম্পই যদি হবে তবে গোগ্রাসে গিলছে না কেন ? খেতে খেতে অন্তত বার তিনেক ছুরিটা মুখে পুরলো কেন ?'

আমি অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে বললুম, 'ভুলগুলো মেরামত করে নেব।'

'ধ্যাৎ ! ওগুলো নোংরামি। শিখতে হয় নাকি ?'

আমি বললুম, কোথায় স্টুডেন্ট বলে পরিচয় দিলে লাভ, আর কোথায় ট্র্যাম্প সাজলে লাভ এখনো ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারি নি। যখন যেটা কাজে লাগে সেইটে করতে হবে তো। এই তো যেমন তুমি। মনে হচ্ছে ট্র্যাম্পের কদরই তোমার কাছে বেশী।'

এইটুকু মেয়ে। কি বা জানে, কীই বা বোঝে। তবু তার মুখে বেদনার ছায়া পড়লো। বড় বড় দুই চোখ মেলে নিঃসঙ্কোচে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমাকে আমার ভালো লাগে, তা তুমি ট্র্যাম্পই হও, আর স্টুডেন্টই হও।'

পঞ্চদশীর স্মরণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'অকারণ বেদনার ছায়া ঘনায় মনের দিগন্তে, ছল ছল জল এনে দেয় নয়নপাতে।' এ মেয়ে একদিন বড় হবে। ভালোবাসতে শিখবে। সেইদিনের আগমনী আজকের দিনের এই 'ক্বচিৎ জাগরিত বিহঙ্গ-কাকলীতে।'

॥ ১০ ॥

এবারে কিন্তু মারিয়ানা সেয়ানা। আহারান্তে উপাসনা আরম্ভ করলে, 'তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাই, হে প্রভু সর্বশক্তিমান' দিয়ে এবং শেষ করলো পরলোকগত খৃস্টাত্মাদের স্মরণে।

এসব প্রার্থনার সুন্দর অনুবাদ করা প্রায় অসম্ভব। সর্ব ভাষার সর্ব

প্রার্থনার বেলাই তাই। প্রণব কিংবা 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণম্ মুখম তেন মাং পাহি নিত্যম্'-এর বাঙলা অনুবাদ হয় না। আমি বহু বৎসর ধরে মুসলমানের প্রধান উপাসনা, 'ফাতিহা' অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। আজ পর্যন্ত কোনো অনুবাদই মনকে প্রসন্ন করতে পারে নি। 'আভে মারিয়া' মন্ত্রটি অতি ক্ষুদ্র। ট্রামে-বাসে ঘরে-বাইরে বার বার মনে মনে এটির অনুবাদ করেছি—আঠারো বছর ধরে, এবং এখনো করছি—কোনোটাই মনঃপূত হয় না। দেশের ট্রেনে আমার পরিচিত এক ক্যাথলিক পাদ্রী সাহেবের সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ ধরে ঐ 'আভে মারিয়া'র দুটি শব্দ নিয়ে আলোচনা হয়। ঐ মন্ত্রে মা-মেরির বিশেষণে লাতিনে আছে, 'গ্রাৎসিয়া প্লেনা', ইংরিজীতে 'ফুল অব গ্রেস', জর্মনে 'ফল্ ডের গ্নাডে'। আমি বাংলা করেছিলুম 'করুণাময়ী'। পাদ্রী সাহেবের সেটা জানা ছিল। শব্দটা আমার মনঃপূত হয় নি, কিন্তু দুজনাতে বহু চেষ্টা করেও পছন্দসই শব্দ বের করতে পারলুম না।

কাজেই মারিয়ানার প্রার্থনাগুলোর বাংলা অনুবাদ উপস্থিত মুলতুবী থাক।

মারিয়ানা বাসনকোশন হাঁড়িবর্তন সিনকে ফেলেছে।

আমি উঠে গিয়ে সিনকের সামনে দাঁড়িয়ে বললুম, 'আমি মাজি : তুমি পোঁছো।'

জুতো দিয়ে কাঠের মেঝেতে ঠোক্কর মেরে মারিয়ানা বললে, 'একদম অসম্ভব! তার চেয়ে তুমি ঐ টুলটার উপর বসে আমাকে ইণ্ডিয়ার গল্প বলো।'

এস্থলে আমার পাঠকদের বলে রাখা ভালো যে এ-কাহিনীতে অনেক কিছু কাট-ছাঁট বাদ-সাদ দিয়েই আমি লিখছি। কারণ ভারতবর্ষ কত বড় দেশ, পাহাড় নদী আছে কি না, লোকে কি খায়, মেয়েদের বিয়ে ক'বছর বয়সে হয়, এসব জানবার কৌতূহল বাঙালী পাঠকের হাওয়ার কথা নয়, আর হলেও জর্মনির গ্রামাঞ্চলে হাইকিঙের বর্ণনায় সেগুলো নিশ্চয়ই অবান্তর ঠেকবে। অথচ জর্মনরা ঐ সব প্রশ্নই বার বার জিজ্ঞেস করে বলে কথাবার্তার বারো আনা পরিমাণই ভারতবর্ষ নিয়ে। তাই পাঠক ভাববেন না, জর্মন জনপদবাসী আমার সামনে আপন দেশ নিয়েই বড়ফাট্টাই করেছে, আর-কিছু শুনতে চায় নি।

আমি বললুম, 'দেখো মারিয়ানা, তুমি যে বললে, আমাকে তোমার ভালো লাগে, সেটা নিছক মুখের কথা। আমাকে খাইয়েছো ব'লে আমাকে দিয়ে বাসন মাজিয়ে নিতে চাও না—কারণ তা হলে খাওয়ানোটা মজুরি হয়ে দাঁড়ায়। এসব হিসেব লোকে করে, যে-জন আপন নয়, তার সঙ্গে। আপনজনকে মানুষ সব কর্ম অকর্মের অংশীদার করে। এইটুকু বলে, রাস্তার নাসপাতিওলা যে আমাকে শেষ পর্যন্ত তার গাড়ি ঠেলতে দিয়েছিল সে-কথাও বললুম।

এ-কথাটা বলা হয়তো আমার উচিত হয় নি। টম্-বয় হোক, আর হুন্টরওয়ালীই হোক, মেয়েছেলে তো মেয়েছেলে। দেখি, মারিয়ানার চোখ টলটল করছে। আমাদের দেশে মানুষের নীল চোখ হয় না, আকাশের হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন : 'জল ভরেছে ঐ গগনের নীল-নয়নের কোণে—।' দেশে যে জিনিস আকাশে দেখেছি, এখানে সেটা মানুষের চোখে

দেখলুম। অবশ্য এদেশের আকাশ কিন্তু আমাদের আকশের মত ঘন নীল, ফিরোজা নীল হয় না।

আমি তাড়াতাড়ি এই সজল সংকট কাটাবার জন্যে ঝাড়ন নিয়ে মারিয়ানার পাশে দাঁড়ালুম। সে কিছু না বলে একখানা প্লেট আমার দিকে এগিয়ে দিলে।

আমি সংকটের সম্পূর্ণ অবসান করার জন্য মাজার গুঁড়ো একটা হাঁড়ির উপর ছড়াতে ছড়াতে শুধালুম, 'ঠাকুমা দুপুরবেলা ঘুমোয় না?'

'ঐ চেয়ারেই। দিন-রাতের আঠেরো ঘণ্টা ওরই উপরে কাটায়, রাত্রেও অনেক বলে-কয়ে তাকে শোবার ঘরে নিয়ে যাই। মাঝে মাঝে কার্ল অবশ্য ওকে বেড়াতে নিয়ে যায়।'

আমি শুধালুম, 'কার্ল? কুকুরটা? তুমি নিয়ে যাও না?'

'ঠাকুমা কার্লের সঙ্গে যেতেই পছন্দ করে। লীশে ঢিল পড়লেই ঠাকুমা থেমে যায়, টান পড়তেই আস্তে আস্তে এগোয়। ঠাকুমা বলে, ওতেই নাকি তার সুবিধা বেশী। জানো, লোকে আমার কথা বিশ্বাস করে না, যখন বলি কার্ল ঠিক বুঝতে পারে কখন বৃষ্টি নামবে। তার সম্ভাবনা দেখতে পেলেই সে ঠাকুমাকে বাড়ি ফেরত নিয়ে আসে।'

হঠাৎ কার্লের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'ঠাকুমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবি নে?'

সঙ্গে সঙ্গে কার্ল পাশের ঘরে গিয়ে তার কলার লীশ মুখে করে নিয়ে এসে ঠাকুমার কোলে রাখল। তিনি চমকে উঠে বললেন—হয়তো বা ইতিমধ্যে তাঁর তন্দ্রা এসে গিয়েছিল—'আমি এখন বেড়াতে যাবো কি করে?'

মারিয়ানা হেসে বললে, 'না ঠাকুমা, আমি শুধু ওকে দেখাচ্ছিলুম কার্ল কি রকম চালাক।' তারপর কার্লকে বললে, 'যাও কার্ল! আজ ঠাকুমা বেরোবে না। স্পষ্ট বোঝা গেল, কার্ল অতিশয় ক্ষুন্ন মনে লীশ কলার মুখে তুলে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। এবং খুব সম্ভব, অভিমান করে ফিরে এল না।

আমি শুধালুম, 'ঠাকুমা কারো বাড়িতে যায়?'

মারিয়ানা বললে, 'রোববার দিন গির্জেয়। অন্যদিন হলে পাদ্রী সায়েবের বাড়ি। আর মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে গোরস্তান যায়। আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে না। বাবা তো সেখানেই নেই, শুধু মা আছে। তাকেও চিনি নে।'

ওর বলার ধরণটা এমনই সরল আর স্বাভাবিক যে আমার চোখে জল এসে গেছে। পাছে সে সেটা দেখে ফেলে তাই শেলফটার কাছে গিয়ে শুকনো বাসনগুলো এক পাশে সরাতে লাগলুম। তাতেও দেখলুম, কোন কাজ হয় না। তখন বুঝলুম, এ বোঝা নামিয়ে ফেলাই ভালো।

ফের মারিয়ানার কাছে এসে বললুম, 'আমাদের দেশের কবির একটি কবিতা শুনবে?'

উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'নিশ্চয়ই!'

আমি বললুম, 'অনুবাদে কিন্তু অনেকখানি রস মারা যায়। তবু শোনো:

"মনে পড়া মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু কখন খেলতে গিয়ে
হঠাৎ অকারণে
একটা কী সুর গুনগুনিয়ে
কানে আমার বাজে,
মায়ের কথা মিলায় যেন
আমার খেলার মাঝে।
মা বুঝি গান গাইত, আমার
দোলনা ঠেলে ঠেলে;
মা গিয়েছে, যেতে যেতে
গানটি গেছে ফেলে।
মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন বসি গিয়ে
শোবার ঘরের কোণে,
জানলা থেকে তাকাই দূরে
নীল আকাশের দিকে
মনে হয়, মা আমার পানে
চাইছে অনিমিখে।
কোলের 'পরে ধরে কবে
দেখতো আমায় চেয়ে,
সেই চাউনি রেখে গেছে
সারা আকাশ ছেয়ে!!"

এ কবিতার অনুবাদ যত কাঁচা জর্মনে যে কেউ করুক না কেন, মা-হারা কচি হৃদয়কে নাড়া দেবেই দেবে। হয়তো এ কবিতাটি মারিয়ানাকে শোনানো আমার উচিত হয় নি, কিন্তু ইয়োরোপীয় সাহিত্যে মাকে নিয়ে কবিতা এত কম, এবং আমার দেশের কবির এত সুন্দর একটি কবিতা—এ প্রলোভন আমি সংবরণ করতে পারি নি বললে ভুল বলা হবে—আমি কেমন যেন আপন অজানাতেই কবিতাটি আবৃত্তি করে ফেলেছি।

রবীন্দ্রনাথ 'পলাতকা' লেখার পর প্রায় চার বছর কোনো কবিতাই লেখেননি কিংবা অতি অল্পই লিখেছিলেন। তারপর কয়েকদিনের ভিতর অনেকগুলি কবিতা লিখে আমাদের ডেকে পাঠিয়ে সেগুলি পড়ে শোনালেন। 'মাকে আমার পড়ে না মনে' তারই একটি। এ কবিতাটি শুনে আমরা সবাই যেন অবশ হয়ে গিয়েছিলুম। শেষটায় কে একজন যেন গুরুদেবকে শুধালে, ঠিক এই ধরনের কবিতা তিনি আরো রচনা করেন না কেন? তিনি বললেন, মা-হারা শিশু তাঁর কাছে এমনই ট্রাজেডি বলে মনে হয় যে, ঐ নিয়ে কবিতা লিখতে তাঁর মন যায় না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ যদি সেদিন মারিয়ানার মুখচ্ছবি দেখতেন তবে তিনি এ-কবিতাটি তাঁর কাব্য থেকে সরিয়ে ফেলতেন, এবং আমাদের উপর হুকুম করতেন, আমরা যেন কখনো আর এটি আবৃত্তি না করি।

ভেজা চোখেই মারিয়ানা শুধালো, 'তোমার নিশ্চয়ই মা আছে, আর তুমি তাকে খুব ভালবাসো ?'

আমি আশ্চর্য হয়ে শুধালুম, 'তুমি কি করে জানলে ?'

বললে, 'এ কবিতাটি তারই হৃদয় খুব স্পর্শ করবে যার মা নেই, আর যে মাকে খুব ভালোবাসে। আর আমার মনে হচ্ছিল, তোমার মা না থাকলে তুমি এ কবিতাটি আমাকে শোনাতে না।'

আমি বিস্ময়ে হতবাক। এইটুকু মেয়ে কি করে এতখানি বুঝলো! এতখানি হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারলো! তখন আবার নূতন করে আমি সচেতন হলুম, ছোটদের আমরা যতখানি ছোট মনে করি ওরা অতখানি ছোট নয়। বিশেষ করে অনুভূতির ক্ষেত্রে। এবং সেখানেও যদি বাচ্চাটি মা-হারা হয় তবে তার বেদনা-কাতরতা এতই বৃদ্ধি পায় যে তার সঙ্গে কইতে হয় বেশ ভেবে-চিন্তে।

এবারে শুধালো শেষ মোক্ষম প্রশ্ন : 'তুমি যে এতদূর বিদেশে চলে এসেছো তাই নিয়ে তোমার মা কিছু বললে না ? এই যে ঠাকুমা সমস্ত দিনরাত ঐ দোরের পাশের চেয়ারটায় বসে থাকতে চায় কেন জানো ? বাবা ঠিক সেটারই পাশের দরজা দিয়ে সব সময় বাড়ি ঢুকত—সদর দরজা দিয়ে নয়—অবশ্য আমার শোনা কথা। বাবা যেন সর্বপ্রথম ঠাকুমাকে দেখতে পায়, ঠাকুমাই যেন বাবাকে দেখতে পায়। লড়াইয়ের সময়েই সেটা আরম্ভ হল। বাবা যে কখন ছুটি পাবে, কখন বাড়ি পেঁছবে তার ঠিক-ঠিকানা ছিল না বলে ঠাকুমা দিবা-রাত্তির ঐ চেয়ারটার উপর কাটাতো। এখনো সে অভ্যাস ছাড়তে পারে না।'

আমি মিনতি করে বললুম, 'আর থাক, মারিয়ানা।'

কান্না-হাসি হেসে বললে, 'আচ্ছা, তবে এ দিকটা থাক। এখন আমার কথার উত্তর দাও। তোমার মা কি বলে ?'

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললুম, 'মাকে ফেলে দূরে চলে আসাটাই আমার জীবনের সব চেয়ে বড় পাপ। কিন্তু কি করবো বলো। ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়া করেছি, তার ইস্কুল-কলেজে পড়বো না—অবশ্য গাঁধীর আদেশে। বিদেশে না গিয়ে উপায় কি ? কিন্তু মা কি সেটা বোঝে ?'

এবার মারিয়ানা হেসে উঠলো। বললে, 'তুমি ভারী বোকা। মা-রা সব বোঝে, সব মাপ করে দেয়।'

এর কথাই ঠিক। এ তো একদিন মা হবে।

আবার বললে, 'তোমার কিছুটি ভাববার নেই। দাঁড়াও, তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই হল শেষ প্লেট। এটা পুঁছে নিয়ে বেশ করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নাও। এই যে বোতলে তরল সাবান আছে তাতে নেবুর খুশবাই মাখানো আছে। তোমাকে একটা কবিতা পড়ে শোনাবো—তুমি তোমারটা

শোনালে না ?'

আমি হাত ধুয়ে ঠাকুমার মুখোমুখি দেয়ালের চেয়ারে এসে বসলুম।

রবারের এপ্রন্ খুলতে খুলতে মারিয়ানা বললে, 'কই, দাও তোমার বইখানা! ঐ যাতে হাইনের কবিতা আছে। আশ্চর্য এই যোগাযোগ! মাত্র কয়েক দিন আগে আমরা ক্লাসে কবিতাটি পড়েছি।'

এক ঝটকায় কবিতাটি বের করে বেশ সুন্দর গলায়, সুস্পষ্ট উচ্চারণে পড়তে আরম্ভ করলো,

"আন্ মাইনে মুটার"—মাতার উদ্দেশে

'ইষ বিন্স্ গেভোন্ট্—'

সমস্ত কবিতাটি পড়ে শেষের কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করলে একাধিক বার ঃ—

'আজ ফিরিয়াছে মন ভবনে আপন,
যেথা মা গো, তুমি মোরে ডাকিছ সদাই।
আজ দেখিলাম যাহা দৃষ্টিতে তোমার,
সেই তো মমতা, চির আরাধ্য আমার।'[১]

আমি অস্বীকার করবো না, কবিতাটি আমার মনে অপূর্ব শান্তি এনে দিল। অন্য পরিবেশে হয়তো কবিতাটি আমার হৃদয়ের এতটা গভীরে প্রবেশ করতো না। বিশেষ করে ছাপাতে পড়া এক জিনিস আর একটি বারো-তেরো বছরের মেয়ে—অবশ্য তার কবিতা পাঠ, তার রসবোধ দেখে তার হৃদয়-মনের বয়েস ষোল সতেরো বলতে কোনো আপত্তি নেই—তার 'মায়ের উদ্দেশে' কবিতা সুন্দর উচ্চারণে, দরদ দিয়ে পড়ে শোনাচ্ছে, সে একেবারে ভিন্ন জিনিস।

ঠাকুমার গলা শোনা গেল। ক্ষীণ কণ্ঠে আমার উদ্দেশে বলছেন, 'তুমি কোনো চিন্তা করো না। তুমি তো কোনো অন্যায় করো নি। আর অন্যায় করলেও মা সব সময়ই মাপ করে দেয়। ছেলের অন্যায় করার শক্তি যতখানি, মায়ের মাপ করার শক্তি তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী। আর তুমি তোমার মাকে ভালোবাসো সেইটেই সব চেয়ে বড় কথা। কাছে থেকে না-ভালোবাসার চেয়ে কি দূরে থেকে ভালোবাসা বেশী কাম্য নয়? এই যে মারিয়ানার বাপ আমার আগে চলে গেল! আমার একটি মাত্র ছেলে। কিন্তু আমি জানি, সে মা-মেরির চরণতলে আশ্রয় পেয়েও এই মায়ের জন্য প্রতীক্ষা করছে। আমিও অনেক আগেই চলে যেতুম, কিন্তু এই তো রয়েছে আমার মারিয়ানা। আমি কি তার ঠাকুমা? আমি তার মা। এ প্রথম মা হোক, তারপর আমি হেসে হেসে চলে যাবো। তুমি কোনো চিন্তা করো না। আপন কর্তব্য করে যাও।'

---

১ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ। পূর্বোল্লিখিত 'হাইনের শ্রেষ্ঠ কবিতা', পৃ ১৬ দ্রষ্টব্য।

জর্মন ভাষায় নবীন সাধকদের এস্থলে একটু সাবধান করে দিই। ১৭ পৃষ্ঠায় মূল জর্মনে পঞ্চম ছত্র হবে চতুর্থ ছত্র, আর চতুর্থ ছত্র হবে পঞ্চম ছত্র।

ঠাকুমা কথাগুলি বললেন অতিশয় ক্ষীণ কণ্ঠে কিন্তু তাঁর বাক্যে বিশ্বাসের কী কঠিন দার্ঢ্য।

আমি উঠে গিয়ে ঠাকুমার হাত দুটিতে চুমো খেলুম। ফিরে এসে মারিয়ানার মস্তকাঘ্রাণ করলুম।

॥ ১১ ॥

বিদায় নেওয়াটা খুব সহজ হয় নি। অল্পক্ষণের পরিচয়ের বন্ধু আর বহুকালের পরিচিত বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নেবার ভিতর পার্থক্য আছে সত্য, কিন্তু অনেক সময় অল্প পরিচয়ের লোকও সেই স্বল্প সময়ের মধ্যেই এতখানি মোহাচ্ছন্ন করে দেয় যে, তার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় মনে ক্ষোভ থেকে যায় যে, এর সঙ্গে দীর্ঘতর পরিচয় হলে কত না নূতন নূতন বাঁকে বাঁকে নূতন নূতন ভুবন দেখতে পেতুম।

দু বছরের বাচ্চা মারা গেলে মার যে শোক হয় সে কি পঞ্চাশ বছরের ছেলে মরে যাওয়ার চেয়ে কম? আমার একটি ভাই দুই বছর বয়সে চলে যায়, কিন্তু থাক সে কথা—

* * *

এ-দেশে গ্রীষ্মের দিন যে কত দীর্ঘ হতে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের মনে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকলেও তার অভিজ্ঞতা না হওয়া পর্যন্ত সে-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয় না। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, পূর্ণচন্দ্র অমাবস্যায় কি পার্থক্য সেটা গ্রামের লোক যতখানি জানে চৌরঙ্গীর লোক কি ততখানি বোঝে? আমিও এ-দেশের শহুরে; গ্রামে এসে এই প্রথম 'নিদাঘের দীর্ঘদিন' কি সেটা প্রত্যক্ষ হৃদয়ঙ্গম হল।

সূর্য তখনো অস্ত যায় নি। হঠাৎ বেখেয়ালে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখি রাত আটটা! কিন্তু 'রাত আটটা' কি ঠিক বলা হল? আটটার সময় যদি দিবালোক থাকে তবে তো সেটা এ-দেশে সকালের আটটা, দিনের আটটা। তা সে যাক্। সেক্সপীয়র ঠিকই বলেছেন, 'নামেতে কি করে? সুবেশে যে নামে ডাকো আলোক বিতরে!'

মধুময় সে আলো। অনেকটা আমাদের কনে দেখার আলোর মত। কোনো-কোনো গাছে, ক্ষেতে ইতিমধ্যেই পাক ধরেছে। তাদের পাতা দেখে মনে হয়, সমস্ত দিনের সোনালী রোদ খেয়ে খেয়ে সোনালী হয়ে গিয়ে এখন তারাও যেন সোনালী আলো বিকিরণ করছে। কীট্স না কার যেন কবিতায় পড়েছিলুম, পাকা আঙুরগুলো সূর্যরশ্মির স্বর্ণসুধা পান করে করে টইটম্বুর হয়েই যাচ্ছে, হয়েই যাচ্ছে, আর তাদের মনে হচ্ছে এই নিদাঘ রৌদ্রের যেন আর অবসান নেই। আমিও এগোচ্ছি আর ভাবছি, এ-দিনের বুঝি আর শেষ নেই। এতক্ষণে বুঝতে পারলুম মারিয়ানা যখন আমাকে তাদের বাড়িতে রাতটা কাটাবার জন্য অনু-

রোধ করছিল তখন নানা আপত্তি দেখানো সত্ত্বেও এটা কেন বলে নি, রাতের অন্ধকারে আমি যাবো কি করে ? আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলেও যেমন অতিথি-কে ঠেকাবার জন্য শরৎ-পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় এ অজুহাত তোলা চলে না, রাতের অন্ধকারে পথ দেখবেন কি করে ?

গ্রামের শেষ বাড়িটার চেহারা দেখে আমার কেমন যেন মনে হল এ-বাড়িটার বর্ণনা কে যেন আমায় দিয়েছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আমার যাত্রারম্ভের সেই প্রথম পরিচয়ের—কি যেন নাম, হ্যাঁ, টেরমের, হ্যাঁ, এটা সেই টেরমের, যার বউ নাকি খাণ্ডার, এটা তারই বাড়ি বটে নিশ্চয়।

সাদা রঙের বুক অবধি উঁচু ফালি ফালি কাঠের গেটের উপর দুই কনুই রেখে আবার একটি রমণী। কই, খাণ্ডারের মত চেহারা তো ঠিক নয়। আর এই অসময়ে এখানে দাঁড়িয়েই বা কেন ? তবে কি টেরমের এখনো বাড়ি ফেরে নি ?

আমার মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি খেলল। দেখিই না পরখ করে। সত্যি খাণ্ডার, না, পথে যে সেই লড়াই-ফেরতা বলেছিল, একটু হিসিবী এই যা। খাণ্ডার হোক্ আর যাই হোক্, আমাকে তো আর চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারবে না। আর খেলেও হজম করতে হবে না। এ-দেশে ভেজাল নেই। আমি নির্ভেজাল ভেজাল। ফুড-পইজনিঙে যা কাৎরাতে কাৎরাতে মরবে সে আর দেখতে হবে না। সখা টেরমেরও নয়া শাদি করে সুখী হবেন, কিংবা—কিংবা আকছারই যা হয়, যাদু টেরটি পাবেন, পয়লা বউটি কত না লক্ষ্মী মেয়ে ছিল—খাণ্ডার তো নয়, ছিল যেন গ্রীষ্মের তৃষ্ণায় কচি শশাটি। অবশ্য ইতিমধ্যে যদি আমার ভ্রাতা ইব্বল এখানে এসে ডাক ছাড়ে, "হে বাতাপে ! তুমি নিষ্ক্রান্ত হও।" তা হলে তো আর কথাই নেই। আমিও—মহাভারতের ভাষাতেই বলি—খাণ্ডারি-নীর "পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ করে সহাস্য-আস্যে নিষ্ক্রান্ত হব।"

ইতিমধ্যে আমি আমার লাইন অব্ অ্যাক্শন্ অর্থাৎ ব্যূহ নির্মাণ করে ফেলেছি।

কাছে এসে আমার সেই ছাতা হ্যাট হাতে নিয়ে প্রায় মাটি ছুঁইয়ে, বাঁ হাত বুকের উপর রেখে, কোমরে দু ভাঁজ হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে অর্থাৎ গভীরতম 'বাও' করে মধ্যযুগীয় কায়দায় বিশুদ্ধতম উচ্চারণে বললুম, 'গুট্‌ন আবেন্ড, মেডিগে ফ্রাউ' অর্থাৎ আপনার সন্ধ্যা শুভ হোক, সম্মানিতা মহিলা।'

এই 'সম্মানিতা মহিলা' বলাটা কবে উঠে গিয়েছে ভগবান জানেন। আজ যদি আমি কলকাতা শহরে কোনো মহিলাকে 'ভদ্রে' বলে সম্বোধন করি, কিংবা গৃহিণীকে 'মুগ্ধে' বলে কোনো কথা বোঝাতে যাই তা হলে যে রকম শোনাবে অনেকটা সেই রকমই শোনালো।

তাঁর গলা থেকে কি একটা শব্দ বেরুতে না বেরুতেই আমি শুধালুম, 'আপনি কি দয়া করে বলতে পারেন মেলেম গ্রামটি কোথায় ?'

অবাক হয়ে বললে, 'সে তো অন্তত ছ মাইল !'

আমি বললুম, 'তাই তো ! তবে আমি নিশ্চয়ই পথ ভুল করে বসে আছি।

তা সে যাক গে। আমি ম্যাপটা বের করে একটুখানি দেখে নিই। এই হাই-কিঙের কমে' আজ সকালে মাত্র হাতেখড়ি কিনা।'

আমি ইচ্ছে করেই বাচালের মত হেসে হেসে কথাই কয়ে যেতে লাগলুম, 'থাকি বন্ শহরে। গরমের কলেজের ছুটিতে যে যার গেছে আপন বাড়ি। আমি কি করে যাই সেই দূর-দরাজের ইণ্ডিয়ায়? এই তো ম্যাপটা পেয়েছি। ঐষুধা টর্চটা আনি নি! বললুম তো হাতেখড়ি। তা সে—'

এতক্ষণে রমণী অবাক হয়ে সেই পুরনো—এই নিয়ে চারবারের বার—ইণ্ডার-ইণ্ডিয়ানার গুবলেট পাকালে। সেটার আর পুনরাবৃত্তি করে কোন লাভ নেই।

আমি বললুম, 'তা হলে আসি, মাদাম (যেন আমার পালাবার কতই না তাড়া!)। আপনি শুধু মোটামুটি দিকটা বাৎলে দিন।'

কিন্তু ইতিমধ্যে দাওয়াই ধরেছে। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'চলুন। ঘরের আলোতে ম্যাপটা ভালো করে দেখে নেবেন।'

আমি আমতা আমতা করে বললুম, 'হ্যাঁ, মাদাম, তা মাদাম, কিন্তু মাদাম—'

অথচ ওদিকে দিব্য খোলা গেট দিয়ে তাঁর পিছন পিছন মারিয়ানার কার্লের মত নির্ভয়ে এগিয়ে চললুম। মনে মনে এক গাল হেসে বললুম, 'ট্রয়ের ঘোড়া ঢুকেছে, হুঁশিয়ার।'

তবু বলতে হবে সাবধানী মেয়ে। রান্নাঘরে না নিয়ে গিয়ে গেল ড্রইংরুমে।

পাঠক আমাকে বোকা ঠাউরে বলবেন, ঐতেই তো আমাকে সম্মান দেখানো হলো বেশী; কিন্তু আমি তা পূর্বেই নিবেদন করেছি এ-দেশের গ্রামাঞ্চলে হৃদ্যতা দেখাতে হলে কিচেন, লৌকিকতা করতে হলে ড্রইংরুম।

আমাদের পূর্ব বাঙলায় যে রকম 'আত্তি' করতে হলে রাত্রিবেলা লুচি, আপন জন হলে ভাত।

॥ ১২ ॥

হিটলারের পিতা যখন তাঁর মাতাকে বিয়ে করতে চান, তখন বিশেষ কোনো কারণে চার্চের অনুমতির প্রয়োজন হয়েছিল। দরখাস্তে বিবাহের পক্ষে নানা সদ্যুক্তি দেখানোর পর সর্বশেষে বলা হয়, 'তদুপরি বধূ অর্থ-সামর্থ্যহীন; অতএব সে যে এ-রকম উত্তম বিবাহের সুযোগ পুনরায় এ-জীবনে পাবে সে আশা করা যায় না।'[১]

পণ-প্রথা তোলার চেষ্টা করুন আর না-ই করুন, এ জিনিসটা সমাজের

---

১ আউগুস্ট কুবিৎসেক কর্তৃক 'ইয়াং হিটলার', ১৯৫৪, পৃঃ ২৮। হিটলারের বাল্যজীবন সম্বন্ধে এ রকম উপাদেয় গ্রন্থ আর নেই।

বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে আমি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দেখেছি। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ে।

চাষার বাড়ির ড্রইংরুম প্রায় একই প্যাটার্নের। এই বাড়িতে কিন্তু দেখি, শেলফে বইয়ের সংখ্যা সচরাচর যা হয় তার চেয়ে অনেক বেশী, অপ্রত্যাশিত রকমের বেশী। তদুপরি দেখি, দেয়ালে বেশ কিছু অত্যুত্তম ছবির ভালো ভালো প্রিন্ট, সুন্দর সুন্দর ফ্রেমে বাঁধা। আমার মুখে বোধ হয় বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। মাদামই বললেন, 'বিয়ের পূর্বে আমি কিছুদিন বন্ শহরে এক প্রকাশকের ওখানে কাজ করেছিলুম।'

অ। সেই কথা। অর্থাৎ এ-দেশে যা আকছারই হয়ে থাকে। কনের বিত্ত-সামর্থ্য না থাকলে সে চাকরি করে পয়সা কামিয়ে 'যৌতুক' কেনে। 'যৌতুক' কথাটা ঠিক হল না। 'স্ত্রী-ধন' কথাটার সঙ্গে তাল রেখে ওটাকে 'বর-ধন' বলা যেতে পারে।

এ-দেশের নিয়ম কনেকে রান্নাঘরের বাসন-বর্তন, হাঁড়িকুড়ি, মায় সিন্‌ক্—রান্নাঘরের তাবৎ সাজ-সরঞ্জাম, যার বর্ণনা পূর্বের এক অনুচ্ছেদে দিয়েছি—শোবার ঘরের খাট-গদি-বালিশ-চাদর-ওয়াড়-আলমারি, বসবার ঘরের সোফা-চেয়ার ইত্যাদি সব কিছু সঙ্গে নিয়ে আসতে হয়। শহরাঞ্চলে বর শুধু একখানি ফ্ল্যাট ভাড়া করেই খালাস। বিয়ের কয়েকদিন আগে তিনি শুধু ফ্ল্যাটের চাবিটি কনের হাতে গুঁজে দেন। কনে বেচারী সতেরো-আঠারো বছর বয়েস থেকে গা-গতর খাটিয়ে যে পয়সা কামিয়েছে তাই দিয়ে এ-মাসে কিনেছে এটা, ও-মাসে কিনেছে সেটা—বছরখানেক ধরে, দাঁও বুঝে—এখন কয়েকদিন ধরে আস্তে আস্তে সেগুলো সরানো হবে, বরের ফ্ল্যাটে। বিয়ের পর বরকনে কখনো বা সোজা চলে যায় হানিমুনে, আর কখনো বা ফ্ল্যাটে দু'চার দিন কাটিয়ে। কিন্তু একটা কথা খাঁটি ; এর পর আর মেয়েকে ঘর-কন্না চালাবার জন্য অন্য-কিছু দিতে হয় না—জামাই ষষ্ঠীর তত্ত্ব ফত্ত এ-দেশে নেই।

আর 'ট্রুসোর' কথাটা পাঠিকারা নিশ্চয়ই এঁচে নিয়েছেন। সেও আরম্ভ হয়ে যায় ঐ ষোল-সতেরো বছর বয়স থেকে। জামা-কাপড় ফ্রক-গাউনের এমব্রয়ডারি আরম্ভ হয়ে যায় ঐ সময়েই থেকেই—মায়ের সাহায্যে—এবং পরে কোনো পরিবারে চাকুরি নিলে সে বাড়ির গিন্নীমা অবসর সময়ে কখনো বা এমব্রডারির কাজ দেখিয়ে দেন, কখনো বা নিজেই খানিকটা করে দেন। শুনেছি, বাড়ন্ত মেয়েরা টাইট-ফিটের জামা গাউনগুলোর সব কিছু তৈরী করে রাখে—বিয়ের কয়েকদিন আগে দরজীর দোকানে গিয়ে কিংবা মা-মাসী সাহসিনী হলে তাঁদের সাহায্যে নিজেই কেটে সেলাই করে নেয়।

ব্যাপারটা দীর্ঘদিন ধরে চলে বলে এতে একটা আনন্দও আছে। আমার এক বন্ধু পরীক্ষা পাস করে চলে যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিল তার ফিয়াঁসেকে যেন মাঝে মাঝে একটুখানি বেড়াতে নিয়ে যাই। বেচারী নিতান্ত একা পড়ে যাবে বলে, এবং আমার কোনো ফিয়াঁসে এমন কি বান্ধবী পর্যন্ত নেই বলে।

রাস্তায় নেমে আমি হয়তো বললুম, 'বাসন-কোশনের আলমারি হয়েছে,

উনুন হয়েছে, এইবার সিনক্—না ?'

বললে, 'হ্যাঁ, গোটা তিনেক এদিক ওদিক দেখেছি। আমার একটা ভারী পছন্দ হয়েছে। শহরের ঐ প্রান্তে।'

আমি বললুম, 'আহা, চলই না, দেখে আসা যাক্ কি রকম।'

'তুমি না বলেছিলে, রাইনের ওপারে যাবে ?'

'কি জ্বালা ! রাইন তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।'

ছোট্ট শহর বন্। ডাইনে ম্যুনস্টার গির্জে রেখে, রেমিগিউস স্ট্রীট ধরে, ফের ডাইনেই য়ুনিভার্সিটি পেরিয়ে ঢুকলুম মার্কেট প্লেসে। বাঁ দিকে কাফে মনোপোল, ডান দিকে ম্যুনিসিপ্যাল আপিস। মার্গারেট বললে, 'দাঁড়াও। এদিকেই যদি এলে তবে চলো ঐ গলিটার ভিতর। রীডিং ল্যাম্পের সেল হচ্ছে —সস্তায় পাওয়া যাবে—আমার যদিও খুব পচ্ছন্দ হয় নি।'

দেখেই আমি বললুম, 'ছ্যাঃ !'

মার্গারেট হেসে বললে, 'আমিও তাই বলছিলুম।'

ক'রে ক'রে, অনেকক্ষণ সেটা দেখে দেখে—সবই রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, দোকানে ঢোকা নদারদ, এখনো পাকাপাকি কেনার কোনো কথাই ওঠে না, মার্গারেটের মা দেখবে, পিসি দেখবে, তবে তো—পেঁছিলুম সেই সিনকের সামনে। আমি পাকা জউরির মত অনেকক্ষণ ধরে ডাইনে ঘাড় নাড়ালুম, বাঁয়ে ঘাড় নাড়ালুম, তার পর বাঁ হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে ডান কানের উপরটা চুলকোতে চুলকোতে বললুম, 'হ্যাঁ, উত্তমই বটে। শেপটি চমৎকার, সাইজটিও বড়িয়া—দুজন লোকের বাসনকোশনই বা ক'খানা, তবে হ্যাঁ, পরিবার বাড়লে—'মার্গারেট কি একটা বলছিল ; আমি কান না দিয়ে বললুম, 'তবে কি না বড্ড ধবধবে সাদা। এটিকে পরিষ্কার রাখতে জান বেরিয়ে যাবে। একটুখানি নীল ঘেঁষা হলে কিংবা ক্রেজি চাইনার মত হলে—' মার্গারেট বললে, 'সেই ঘষে ঘষে সাফ যদি করতে হয় তবে ধবধবে সাদাই ভালো। মেহনত করবো, উনি নীলচেই থেকে যাবেন, লোকে ভাববে হাড়-আলসে বলে নীল রঙের কিনেছি—কী দরকার !'

আহা, সে-সব শ্লো টেম্পোর ঢিমে তেতালার দিনগুলো সব গেল কোথায় ? এখন সকালে বিয়ে ঠিক, সন্ধ্যের ভিতরই ডেকরেটররা এসে সব কিছু ছিমছাম ফিটফাট করে দিলে। তবে হ্যাঁ, তখন বাড়ি পাওয়া যেত সহজেই ; এখন আর সে সুখটি নেই। কিছুদিন পূর্বেই ইয়োরোপের কোন্ এক দেশে নাকি কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল :—

পাত্রী চাই ! পাত্রী চাই ! পাত্রী চাই !!! আপন নিজস্ব সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত বাড়ি যার আছে এমন পাত্রী চাই। বাড়ির ফোটোগ্রাফ পাঠান।

* * *

কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম ! ট্র্যাম্পকে নিয়ে এই তো বিপদ। সে যে রকম সোজা রাস্তায় নাক-বরাবর চলতে জানে না, তার কাহিনীও তেমনই পারলেই সদর রাস্তা ছেড়ে এর খিড়কির দরজা দিয়ে তাকায়, ঝোপের আড়াল থেকে ওর

পিছনের পুকুরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

আমি আমার ম্যাপ খুলে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার ভান করলুম। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, 'অনেক ধন্যবাদ, মাদাম। আপনাকে অযথা বিরক্ত করলুম।'

এইবারে 'মাদামে'র অগ্নিপরীক্ষা। ...মাদাম পাস! টেরমের ফেল্।

অবশ্য কিছুটা কিন্তু-কিন্তু করেই বলেছিল—কিন্তু বলেছিল তো ঠিকই—'এখন তো রাত ন'টা। ভিন গাঁয়ে পেঁছিতে—'

আমি বাধা দিয়ে এক গাল হেসে বললুম, 'আদপেই না, মাদাম! আপনাকে সব কিছু খুলে কই।'

'বসুন না।' মাদাম শুধু পাস না; একেবারে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।

'আমি শুনেছি, আপনাদের দেশে গরমের সময়ে দিনগুলো এত লম্বা হয় যে একটা দিনের আলো নাকি পরের দিনের ভোরকে 'গুড্ মর্নিং' বলার সুযোগ পায়। ঠিক মত অন্ধকার নাকি আদপেই হয় না। এখানে আমি থাকি শহরে। ছ'টা সাতটা বাজতে না বাজতেই সব কড়া কড়া বিজলি বাতি দেয় জ্বালিয়ে। কিচ্ছুটি বোঝবার উপায় নেই, আলো, না অন্ধকার। ফিকে অন্ধকার, তরল অন্ধকার, ঘোরঘুট্টি অন্ধকার—শুনেছি মিড্-সামারে নাকি গ্রামাঞ্চলে এর সব ক'টাই দেখা যায়। আমি হাঁটতে হাঁটতে দিব্য এগুতে থাকব আর অন্ধকারের গোড়াপত্তন থেকে তার নিকুচি পর্যন্ত রসিয়ে রসিয়ে চেখে চেখে যাবো। এবং—'

'কিন্তু আপনার আহারাদি?'

কে বলে এ রমণী খাণ্ডার!

মারিয়ানার ঠাকুমাই তাকে বলেছিল, 'দেখ দিকিনি, ও যে হাইকিঙে বেরিয়েছে, সঙ্গে স্যাণ্ডউইচ আছে কিনা।' আমার কোন আপত্তি না শুনে মারিয়ানা আমার আধা-বাসী সাদামাটা স্যাণ্ডউইচগুলো তুলে নিয়ে আমার ব্যাগটা ভরতি করে দিয়েছিল গাদা-গাদা রকম-বেরকমের স্যাণ্ডউইচে। সঙ্গে আবার টুথপেস্ট ট্যুবের মত একটা ট্যুবও দিয়েছিল। ওর ভিতরে নাকি মাস্টার্ড আছে। বলেছিল, 'স্যাণ্ডউইচে মাস্টার্ড মাখিয়ে দিলে ওগুলো খুব তাড়াতাড়ি মিইয়ে যায়। যখন খাবে, তখন রাইটা মাখিয়ে নিয়ো।' আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, 'তোমারগুলো কাল সকালে আমি খাব।'

তাই আমার ব্যাগটাকে আদর করতে করতে তাড়াতাড়ি বললুম, 'কি আর বলবো, মাদাম, আমার সঙ্গে যা স্যাণ্ডউইচ আছে, তার জোরে আমি আপনাকে পর্যন্ত রুপালী বোর্ডারওয়ালা সোনালী চিঠি ছাপিয়ে নিমন্ত্রণ করতে পারি। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। আমি খাই অনেক দেরিতে। রাত এগারোটার সময়।'

বললে, 'সে তো ঠাণ্ডা। গরম সুপ আছে।'

আমি অনেক-কিছু এক ঝটকায় বুঝে গেলুম। সখা টেরমের প্রতি রাত্রে

না হোক রোববার রাত্রে ইয়ার-দোস্তের সঙ্গে 'পাবে' (মদের দোকান, ক্লাব এবং আড্ডার সমন্বয়) গুলতানী করে বাড়ি ফেরেন অনেক রাত্রিতে। পৃথিবীর কোনো জায়গাতেই গিন্নীমারা এ অভ্যাসটি নেকনজরে দেখেন না। তাই সৃষ্টির আদিম যুগ থেকে একটা ভীষণ লড়াই চলেছে খরবেগে। এক দিকে 'পাব'-ওয়ালা, অন্য দিকে গৃহিণীর দল। গ্রামের কোনো কোনো 'পাবে' তাই দেখেছি, পাব-ওয়ালা বেশ পয়সা খর্চা করে বড় বড় হরফে দেয়ালে নিম্নোক্ত কবিতাটি পেন্ট করে নিয়েছে,

ফ্রাগে নিষট্ ডী উর ভী স্পেট এস সাই
ডাইনে ফ্রাউ শিমফট্ উমৎসেন

গেনাও ভী উম ড্রাই !

ঘড়িটাকে শুধিয়ো না, কটা বেজেছে।

তোমার বউ তোমাকে দশটার সময় সেই বকাই বকবে, যেটা তিনটের সময় বকে।

মানুষ করেই বা কি ? জর্মনরা কারো বাড়িতে বসে আড্ডা জমানোটা আদপেই পছন্দ করে না। ডিনার লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করলে অবশ্য অন্য কথা—কিন্তু সে তো সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। এ-দেশেও একরকম লোক আছে, যাদের পেতে হলে চায়ের দোকানে যেতে হয়। পরের বাড়িতে যায় না, নিজের বাড়িতেও থাকে না।

এ অবস্থায় মেয়েরা কি করে ?

কাচ্চা-বাচ্চা সামলায়। খামকা তিনবার বাচ্চাটার ফ্রক বদলিয়ে দেয়, চার বার পাউডার মাখায়, হাতের কাজ ক্ষান্ত দিয়ে ঘড়ি ঘড়ি ঢুঁ মেরে যায় - বাচ্চা ঠিকমত ঘুমুচ্ছে কিনা।

সেইখানে, যেখানে থাকবার কথা, ভরা গাঙ্গের তরতর স্রোত, যার উপর দিয়ে কলরব করে ধেয়ে চলবে ভরা পাল তুলে টেরমের গিন্নীর যৌবনতরী—হায়, সেখানে বালুচড়া। নৌকাটি যে মোক্ষম আটকা আটকেছে, তার থেকে আর নিষ্কৃতি নেই—কি করে জানি নে, কথায় কথায় বেরিয়ে গিয়েছে, বেচারী সন্তানহীনা।

সমস্ত পৃথিবীটা নিষ্ফল সাহারায় পরিণত হোক, কিন্তু একটি রমণীও যেন সন্তানহীনা না হয়, মা হওয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হয়।

তাই কি এ রমণীর হৃদয় থেকে সর্বরস বাষ্প হয়ে নক্ষত্রলোকে চলে গিয়েছে। —কেউ বলে খাণ্ডার, কেউ বলে হিসেবী ? কিন্তু কই, ঠিক জায়গার সামান্যতম খোঁচা লাগা মাত্রই তো তার নৌকা চলুক আর না চলুক, পালে তো হাওয়া লাগল—স্বামীর জন্য তৈরী সুপ বাউণ্ডুলের সামনে তুলে ধরতে চায়।

আমি এসেছিলুম মজা করতে, বাজিয়ে দেখতে খাণ্ডার কিনা, এখন কেঁচো খুঁড়তে সাপ।

ঘরের আসবাবপত্র, ছবি, বই—এসব টেরমের-বউ যোগাড় করেছিল যৌতুকের টাকা জমাবার সময়—কেমন যেন আমার কাছে হঠাৎ অত্যন্ত নিরা-

নন্দ, নিঃসঙ্গ, নীরস বলে মনে হতে লাগল। এরই ভিতর একা-একা দিন কাটায় এ রমণী। টেরমের লোক নিশ্চয়ই খারাপ নয়—যে দু-চারটে কথা বলেছিলুম, তার থেকে আমার মনে অতি দৃঢ় ঐ প্রত্যয় হয়েছিল—এবং আমার মনে হল, দুজনার ভিতরে ভালবাসাও আছে যথেষ্ট, কিন্তু একজনকে ভালবাসা দেওয়া এক জিনিস, আর সঙ্গ দেওয়া অন্য জিনিস। এ-মেয়ে শান্ত গম্ভীর। খুব সম্ভব, স্বামী বাচ্চা নিয়ে নির্জনে থাকতে চায়, আর ওদিকে টেরমের ইয়ার-দোস্তের সঙ্গে বসে পাঁচজনের পাঁচ রকমের সুখ-দুঃখের কথা না শুনলে, না বললে, তার মনে হয় তার জীবনটা যেন সর্বক্ষণ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

এসব বলা বৃথা, টেরমের গিন্নী কি অন্য কিছু দিয়ে জীবন ভরে তুলতে পারে না? কেউ কেউ পারে, কিন্তু অনেকেই পারে না। এ মেয়ে যেন গ্রামোফোন রেকর্ডের কাটা লাইনের ভিতরে পড়ে গিয়েছে সাউন্ড বক্সটা—আছে ঠায় দাঁড়িয়ে, রেকর্ড ঘুরেই যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে, সে কিন্তু আর এগুতে পারছে না। আমার অনেক সময় মনে হয়, এই একঘেয়ে নীরস জীবনের চেয়ে অনটনের জীবন, সংকটের জীবন কাম্যতর। সেখানে অন্তত সেই অনটন, সেই সংকটের দিকে সর্বক্ষণ মনঃসংযোগ করতে হয় বলে মনটা কিছু-না-কিছু একটা নিয়ে থাকে। বেদনার শেষ আছে, কিন্তু শূন্যতার তো নেই।

আমার বড় লজ্জা বোধ হল। ঠাট্টাছলে মস্করা করতে এখানে এসেছিলুম বলে। স্থির করলুম, সব কথা খুলে বলবো, নিদেন এটা বলবো যে, তার স্বামীকে আমি চিনি, সে আমাকে নিমন্ত্রণ করতে চেয়েছিল।

আমি ভয়ে ভয়ে আরম্ভ করলুম, 'আপনার স্বামী—'

আমার কথা আর শেষ করতে হল না। এই শান্ত—এমন কি গুরুগম্ভীরও বলা যেতে পারে—মেয়ে হঠাৎ হো-হো করে অট্টহাস্যে হেসে উঠলো। কিন্তু ভারী মধুর। বিশেষ করে ঝকঝকে সাদা দু'পাটি দাঁত আর চোখ দুটি যা জ্বলজ্বল করে উঠলো সে যেন অন্ধকার রাত্রে আকাশের কোণে বিদ্যুল্লেখা! কতদিন পরে এ-রমণী এভাবে প্রাণ খুলে হাসলে কে জানে! কত তপ্ত নিদাঘ দিনের পর নামলো এ-বারিধারা! তাই হঠাৎ যেন চতুর্দিকের শুষ্কভূমি হয়ে গেল সবুজ। দেয়ালের ছবিগুলোর গুমড়ো কাচের মুখের উপর দিয়ে যেন খেলে গেল এক পশলা আলোর ঝলমলানি।

'আমার স্বামী—' বার বার হাসে আর বলে, আমার 'স্বামী—'। শেষটায় কোনো গতিকে হাসি চেপে বললে, 'আমার স্বামী আপনাকে পেলে হাল্লেলুইয়া রব ছেড়ে আপনাকে ধরে নাচতে আরম্ভ করতো। এ-গ্রামের যে-কোনো এক-জনকে পেলেই তার ক্রিসমাস। আপনি কত দূরে দেশের লোক। আপনাকে পেলে এখুখুনি নিয়ে যেত 'পাবে'।' আবার হাসতে হাসতে বললে, 'আপনি বুঝি ভয় পেয়েছেন, ও যদি হঠাৎ বাড়ি ফিরে দেখে আমি একটা ট্র্যাম্পকে—অবশ্য আপনি ট্র্যাম্প নন্—যত্ন করে সুপ খাওয়াচ্ছি তা হলে সে চটে গিয়ে তুলকালাম কান্ড করবে! হোলি মেরি! যান আপনি একবার 'পাবে'। ও গিয়েছিল শহরে। এতক্ষণে ফিরেছে নিশ্চয়ই, এবং বাড়ি না এসে গেছে সোজা

'পাবে'। শহরে কি কি দেখে এল তার গরমাগরম একটা রগরগে বর্ণনা তো দেওয়া চাই। যান না একবার সেখানে। নরক গুলজার।' তারপর আবার হাসি। শেষটায় বললে, 'আমি যদি ওকে বলি যে, সে যখন শহরে কিংবা 'পাবে', তখন এক বিদেশী—তাও সেই সুদূর ইণ্ডিয়া থেকে, ফ্রান্স কিংবা পর্তুগাল থেকে নয়—আমাদের বাড়িতে এসেছিল তা হলে সে দুঃখে ক্ষোভে বোধ হয় দেয়ালে মাথা ঠুকবে। তাই বলছি, যান একবার 'পাবে'। খর্চার কথা ভাবছেন? আমার স্বামী যতক্ষণ ওখানে রয়েছে—!'

আমি ইচ্ছে করেই বেশ শান্ত কণ্ঠে বললুম, 'আমি তো শুনেছি, আপনি চান না, আপনার স্বামী বেশী লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা করুক।'

হঠাৎ তার মুখের হাসি শুকিয়ে গেল। আমার মনে দুঃখ হল। কিন্তু যখন মনঃস্থির করেছি সব কথা বলবোই তখন আর উপায় কি? গোড়ার থেকে সব কিছু বলে গেলুম, অবশ্য তাঁর স্বামীর ভাষাটাকে একটু মোলায়েম করে এবং লড়াই-ফেরতা চাষা কি বলেছিল তার অভিমতও।

নাঃ! বিধাতা আমার প্রতি সুপ্রসন্ন। টেরমেরিনীর মুখে ফের মৃদু হাস্য দেখা দিল। তা হলে বোধ হয়, একবার গাম্ভীর্যের বাঁধন ভাঙলে সেটাকে আর চট করে মেরামত করা যায় না। হাসিমুখেই বললে, 'সে এক দীর্ঘ কাহিনী। আপনি বরঞ্চ 'পাবে' যান।' আমি বললুম, 'আপনি যদি সঙ্গে চলেন, তবে যেতে রাজী আছি।' স্তম্ভিত হয়ে বললে, 'আমি? আমি যাবো 'পাবে'?' আমি বললুম, 'দোষটা কি?' আপনার স্বামী যখন সেখানে রয়েছেন।' তাড়াতাড়ি বললে, 'না, না। সে হয় না।' তারপর আমাকে যেন খুশী করার জন্য বললে, 'আরেকদিন যাব।'

আমি বললুম, 'সেই ভালো, মাদাম। ফেরার মুখে যখন এ গাঁ দিয়ে যাবো তখন তিনজনাতে একসঙ্গে যাব।'

রাস্তায় নেমে শেষ কথা বললুম, 'ঐ কথায় রইল।'

॥ ১৩ ॥

বিচক্ষণ লোক ঠিক জানে, এই শেষবার, এরপর দোকানী আর ধার দেবে না। হুঁশিয়ার লোক দোকানীর সামান্যতম চোখের পাতার কাঁপন কিংবা তার নিঃশ্বাসের গতিবেগ থেকে এই তত্ত্বটি জেনে যায়, এবং তারপর আর ও-পাড়া মাড়ায় না। নৈসর্গিক পরিবর্তন সম্বন্ধেও সে কিছু কম ওয়াকিফহাল নয়। মাঠ দিয়ে যেতে যেতে দিব্য আপনার সঙ্গে নিবিষ্ট মনে কথা বলে যাচ্ছে, যেন অন্য কোনো দিকে তার কোন খেয়াল নেই, অথচ আকাশের কোন্ কোণে কখন সামান্য এক রত্তি মেঘ জমেছে, কখন একটুখানি হাওয়া কোন্ দিক থেকে এসে তার টাকের উপর মোলায়েমসে হাত বুলিয়ে গিয়েছে সেটা লক্ষ্য করেছে ঠিকই, এবং হঠাৎ কথা বন্ধ করে বলবে, 'চল দাদা, একটু পা চালিয়ে। ঐ

মুদির দোকানে একটুখানি মুড়ি খাবো।' দোকানে ঢোকা মাত্রই কড়কড় করে বাজ আর টিনের ছাতের উপর চচ্চড় করে গামলা-ঢালা বৃষ্টি। তখন আপনার কানেও জল গেল, আপনার হুঁশিয়ার ইয়ার কোন্ মুদির সন্ধানে মুড়ির দোকানে ঢুকেছিলেন।

ট্র্যাম্প মাত্রেরই এ-দুটির কিছু কিছু দরকার। তালেবর ট্র্যাম্পরা তো—কাণ্টের ভাষায় বলি—মানুষের হৃদয় থেকে আরম্ভ করে আকাশের তারার গতিবিধি নখাগ্র-দর্পণে ধরে। তারই একজনের সঙ্গে আমার একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল ; অনুকূল লগ্নে সে-সব কথা হবে।

ওয়াকিফহাল তো নই-ই, দু ব্যাপারেই আমি বে-খেয়াল। কাজেই কখন যে শান্তাকাশের আস্যদেশে ভ্রূকুটির কটা ফেটে উঠেছে সেটা মোটেই লক্ষ্য করি নি। হঠাৎ ঘোরঘুট্টি অন্ধকার হয়ে গেল—আশ্চর্য! এরকম তো হওয়ার কথা ছিল না—এবং সঙ্গে সঙ্গে

কণ্ঠের বরণ যাঁর
শ্যাম-জলধরোপম,
গৌরী-ভুজলতা যাহে
রাজে বিদ্যুল্লতা সম
নীলকণ্ঠ প্রভু সেই
করুন সবে রক্ষণ—

আমাকে 'রক্ষণ' না করে রুদ্রের অট্টহাস্য হেসে বৃষ্টি নামলেন আমার মস্তকে মুষলধারে। এরকম হঠাৎ, আচম্‌কা, ঘনধার বৃষ্টি আমি আমার আপন দেশেও কখনো দেখি নি।

তবে এটা ঠিক—কালো মেঘের উপর সাদা বিদ্যুৎ খেললে কেন সেটা নীল-কণ্ঠের নীল-গলার উপর গৌরীর গোরা হাতের জড়িয়ে ধরার মত দেখায় সেটা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হল। বিস্তর বিদ্যুৎ চমকালো বটে।

আর সে কী অসম্ভব কনকনে সূচীভেদ্য ঠাণ্ডা!

এতদিনে বুঝতে পারলুম, ইয়োরোপীয় লেখকরা ভারত, মালয়, বর্মায় মৌসুমী বৃষ্টিতে ভিজে কেন লিখেছেন, ওয়োর্ম ট্রপিকাল রেন্‌স্। জ্যৈষ্ঠের খরদাহের পর আষাঢ়ের নবধারা নামলে আমরা শীতল হই, সে-বৃষ্টি হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দেয় না। তাই ইংরেজের কাছে এ বৃষ্টি ওয়োর্ম এবং আনন্দদায়ক। কারণ একে অন্যকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানালে সায়েব বলে, আমি তার কাছ থেকে ওয়োর্ম রিসেপশন পেলুম। আর আমরা যদি বলি, আমাকে দেখেই উনি গরম হয়ে উঠলেন তবে অন্য মানে হয়।

যাক্ এসব আত্মচিন্তা। বাঙলা দেশে মানুষ বহুকাল ধরে তর্ক করেছে, মিষ্টি কথা দিয়ে কোনো জিনিস ভেজানো যায় কি না? কিন্তু উল্টোটা কখনো ভাবে নি—অর্থাৎ মিষ্টি কথা, এস্থলে আত্মচিন্তা দিয়ে 'সেলিকাজেলের' মত ভিজে জিনিস শুকনো করা যায় কি না? আবার এ বৃষ্টি আসছে চতুর্দিক থেকে, নাগাড়ে এবং ধরণী অবলুপ্ত।

অবশ্য দশ মিনিট যেতে না যেতেই আমার ভিজে যাওয়ার ভাবনা লোপ পেল। অল্প ভেজা থেকে মানুষ আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করে কিন্তু ভিজে ঢোল হয়ে যাওয়ার পর তার সে উদ্বেগ কেটে যায়। মড়ার উপর এক মণও মাটি, একশ' মণও মাটি। কিংবা সেই পুরনো দোঁহা,

অল্প শোকে কাতর।
অধিক শোকে পাথর ॥

হোঁচট খেয়ে খেয়ে চলেছি। একটি গাড়ি কিংবা মানুষের সঙ্গেও দেখা হল না। গৌরী ও নীলকণ্ঠও বোধ হয় দ্যুলোকের পিকনিক সমাপন করে কৈলাসে ফিরে গিয়েছেন। বিদ্যুৎ আর চমকাচ্ছে না। ঘোরঘুট্টি অন্ধকার।

অনেকক্ষণ পরে আমার বাঁ দিকে—দিক বলতে পারবো না—অতি দূরের আকাশে একটা আলোর আভা পেলুম। প্রায় হাতড়ে হাতড়ে সামনে বাঁয়ের মোড় নিলুম। আভাটা কখনো দেখতে পাচ্ছি, কখনো না। যখন আলোটা বেশ কিছু পরিষ্কার হয়েছে, তখন সামনের কয়েকটা গাছের আড়াল থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল একটা জোরদার বাড়ির আলো! বাঁচলুম।

কই বাঁচলুম? বাড়ির সামনের সাইনবোর্ডে আলোতে আলোতে লেখা 'তিন সিংহ'! বলে কি? ঘরে ঢুকে তিনটে সিঙির মুখোমুখি হতে হবে নাকি?

নাঃ। অতখানি জর্মন ভাষা আমি জানি। এরা এদের 'বার' হোটেল 'পাব'-এর বিদঘুটে বিদঘুটে নাম দেয়। 'তিন সিংহ', 'সোনালী হাঁস'—আরো কত কী!

দরজা খুলেই দেখি, আমি একটা খাঁচা কিংবা লিফটের মত বাক্সে দাঁড়িয়ে আছি। আমি আমার ভেজা জামাকাপড় নিয়ে কি করে ঢুকবো সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলুম বলে লক্ষ্য করলুম, পায়ের তলায় জাফরির ফুটোওলা পুরো রবারের শীট। ভয়ে ভয়ে সামনের দরজা খুলে দেখি বিরাট এক নাচের ঘর প্লাস 'বার্-পাব্'। অথচ একটি মাত্র খদ্দের নেই। এক প্রান্তে 'বার'। পিছনে একটি তরুণী। সাদামাটা কাপড়েই অতি সুন্দর দেখাচ্ছে। আমি মুখ ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখে বেশ একটু চেঁচিয়ে বললে, 'ভিতরে আসুন না?' আমি আমার জামা কাপড় দেখিয়ে বললুম, 'আমি যে জলভরা বালটির মত।' বললে, 'তা হোক্।' তারপর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, একটা জাফরির রবারের পর্দা চলে গিয়েছে ঘরের অন্য প্রান্তের বাথরুম অবধি। আমি ঐটে ধরে ধরে বেবাক ঘর না ভিজিয়ে যখন প্রায় বাথরুমের কাছে পেঁছেছি তখন মেয়েটি কাউণ্টার ঘুরে পার হয়ে আমার কাছে এসে বললে, 'আপনি ভিতরে ঢুকুন। আমি আপনাকে তোয়ালে আর শুকনো কাপড় এনে দিচ্ছি।'

গ্রামাঞ্চলে এরা এসব আকছারই করে থাকে, না আমি বিদেশী বলে? কি জানি? শহরে এ রকম ঢোল আপন বাড়ি ছাড়া অন্যত্র কোথাও ঢুকতে কখনো দেখি নি।

শার্ট, সুয়েটার, প্যাণ্ট আর মোজা দিয়ে গেল। অবশ্য বাহারে নয়। বাহার! হুঁ! আমি তখন গজাসুর বা ব্যাঘ্রচর্ম পরে কৃত্তিবাস হতে রাজী আছি।

চার সাইজের বড় রাবারের জুতো টানতে টানতে 'বার'-এর নিকটতম সোফায় এসে হেলান দিয়ে এলিয়ে পড়লুম। মেয়েটি শুধালে, 'আপনি কি খাবেন?' আমি ক্লান্ত কণ্ঠে বললুম, 'যাচ্ছেতাই।'

এবারে যেন কিঞ্চিৎ দরদ-ভরা সুরে বললে, 'গরম ব্র্যান্ডি খান। আপনি যা ভিজেছেন তাতে অসুখ-বিসুখ করা বিচিত্র নয়। আমার কথা শুনুন। আমি সবাইকে ড্রিঙ্ক দিই। জানি, কখন কি খেতে হয়।'

আমি তখন ট্র্যাম্পিঙের অন্নপ্রাশনের দিনেই নিমতলাগমন ঠেকাতে ব্যস্ত। পূর্বোল্লিখিত গজাসুরের গজ-বসাও খেতে প্রস্তুত। বললুম, 'তাই দিন।'

গরম ব্র্যান্ডি টেবিলের উপর রেখে বললে, 'ৎসুম' ভোল জাইন।' এটা এরা সব সময়েই বলে থাকে। অর্থ বোধ হয় অনেকটা—'এটা দ্বারা আপনার মঙ্গল হোক্।'

আমি বললুম, 'ধন্যবাদ। আপনি কিছু একটা নিন।'

বললে, 'আমার রয়েছে।'

আমি এক চুমুক খাওয়ায় বেশ কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি 'বার'-এর পিছন থেকে শুধলো, 'আপনি যদি নিতান্ত একা বসে না থাকতে চান তবে আমি সঙ্গ দিতে পারি।'

আমি খাড়া হয়ে উঠে বসে বললুম, 'নিশ্চয় নিশ্চয়। আস্তেজ্ঞা হোক, বোস্তেজ্ঞা হোক।' মেয়েটি এসে একটি চেয়ার একটুখানি দূরে টেনে নিয়ে এক জানুর উপর আরেক জানু তুলে বসলো।

কি সুন্দর সুডৌল পা দুটি!

॥ ১৪ ॥

হিটলার যখন মস্কোর চৌকাঠে তখন তিনি তাঁর খ্যাতির মধ্যগগনে। ঐ সময় লাঞ্চ-ডিনার খাওয়ার পর তিনি যে-সব বিশ্রম্ভালাপ করতেন সেগুলো তাঁর সেক্রেটারি বরমানের আদেশে লিখে রাখা হয়। তারই একাধিক জায়গায় হিটলার রমণীদের সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা ও মতামত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, আমরা শহরে রঙ-চঙা সুন্দরীদের দেখে এতই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে, গ্রামের সুন্দরীরা আর আমাদের চোখে পড়ে না। অথচ তাঁর মতে, সিনেমা-ওলাদের সুন্দরীর সন্ধানে বেরোতে হলে যাওয়া উচিত গ্রামাঞ্চলে—সৌন্দর্যের খনি সেখানে।

লেখাটি পড়েছি আমি অনেক পরে, কিন্তু সেই অঝোরে ঝরার রাতে ক্যেটে কির্ষনারকে দেখে আমার মনে এই তত্ত্বটিই আবছা-আবছা উদয় হয়েছিল। তার দেহটি তো স্বাস্থ্যে পরিপূর্ণ ছিলই, তদুপরি চোখে ছিল একটি অবর্ণনীয় শান্ত মধুর ভাব। চুল ছিল চেসনাট ব্লন্ড এবং এমনি অদ্ভুত ঝিলিক মারতো যে মনে হত যেন তেল ঝরে পড়ছে, যদিও জানি ইয়োরোপের মেয়েরা চুলে তেল মাখে না।

আমার টেবিলে আসার সময় সে তার অর্ধসমাপ্ত বিয়ারের গেলাস সঙ্গে এনেছিল। ঢাউস হাফ লিটারের পুরু কাঁচের মগ। ক্যোটের চোখ দুটি ঈষৎ রক্তাভ। সেটা বিয়ার খেয়ে হয়েছে, না, চোখের জল ফেলে হয়েছে বুঝতে পারলুম না। আবার এটাও তো হতে পারে যে কেঁদে কেঁদে যখন সান্ত্বনা পায় নি তখন শোক ভোলার জন্য বিয়ার খেয়েছে। কিন্তু আমিই বা এত সেন্টি-মেন্টাল কেন? পৃথিবীটা কি শুধু কান্নাতেই ভরা?

ইতিমধ্যে প্রাথমিক আলাপচারি হয়ে গিয়েছে।

আমি বার দুই বিয়ার মগের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, ময়রা সন্দেশ খায় না।'

ক্যোটে হেসে বললে, 'এ-দেশেও মোটামুটি তাই। তবে আমি খাই অন্য কারণে। তাও সমস্ত দিন, এবং জালা জালা।'

এদেশে বিয়ার খাওয়াটা নিন্দনীয় নয়—বরঞ্চ সেইটেই স্বাভাবিক—কিন্তু পিপে পিপে খাওয়াটা নিন্দনীয়, আর মাতলামোটা তো রীতিমত অভদ্র, অন্যায় আচরণ বলে স্বীকৃত হয়েছে। আমাদের দেশে যে রকম একটু-আধটু তাস খেলা লোক মেনে নেয় কিন্তু জুয়ো খেলে সর্বস্ব উড়িয়ে দেওয়া পাপ বলে ধরা হয়।

ক্যোটে কেন জালা জালা খায় সেটা যখন নিজের থেকে বললে না, তখন আমিও আর খোঁচাখুঁচি করলুম না। শুধালুম, 'আমি এখানে আসার সময় আকাশে একটা আলোর আভা দেখতে পেয়েছিলুম। সেটা কিসের?'

'ও, সে তো রাইন নদীর ঘাট আর জাহাজগুলোর।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'আমি কি রাইনের পারে এসে পেঁছে গিয়েছি?

হেসে বললে, 'যা বৃষ্টি হচ্ছে তাতে আপনি যে আপন অজানাতে পায়ে হেঁটেই রাইন পেরিয়ে ওপারে চলে যান নি সেই তো আশ্চর্য! আমাদের 'পাব' থেকে রাইন তো অতি কাছে। আসলে আমাদের খদ্দেরও অধিকাংশ রাইনের মাঝি-মাল্লারা। সন্ধ্যার সময় নোঙ্গর ফেলে এখানে এসে বিয়ার খায়, নাচা-নাচি করে এবং মাঝে মাঝে মাতলামোও। সেলার কিনা! আজ জোর বৃষ্টি নেমেছে বলে 'পাব' একেবারে ফাঁকা। আমার আজ বড্ড ক্ষতি হল।'

'আপনার ক্ষতি? আমি তো ভেবেছিলুম, আপনি এখানে কাজ করেন।'

ক্ষণতরে শ্রীমতীর মুখ একটু গম্ভীর হল। মুনিবকে চাকর বললে তাঁর যে ভাব-পরিবর্তন হওয়ার কথা। তারপর ফের একটু হাসলে। বোধ হয় ভাবল, বিদেশী আর বুঝবেই বা কি? বললে, 'না। এটা আমার 'পাব'। অর্থাৎ মায়ের 'পাব'। আমরা দুই বোন। ছোট বোন ইস্কুলে যায় আর 'পাব' চালা-বার মত গায়ের জোর মা'র নেই। তাই আমি এই জোয়ালে বাঁধা। অবশ্য আমি কাজ করতে ভালোবাসি। কিন্তু সকাল আটটা ন'টা থেকে রাত একটা অবধি কাজ করা চাট্টিখানি কথা নয়। ছোট বোনটা ইস্কুল থেকে ফিরে এসে মাঝে মাঝে আমাকে জোর করে ঘরে নিয়ে শুইয়ে দেয়। অবশ্য একটা ঠিকে আছে। কিন্তু সে বেচারীর আবার শিগগির বাচ্চা হবে।'

ক্যেটে যেভাবে সব কথা নিঃসঙ্কোচে খোলাখুলি বলে যাচ্ছিল তাতে আমি ভরসা পেয়ে হেসে বললুম, 'তা আপনি একটা বিয়ে করলেই পারেন, এত বড় ব্যবসা তায় আপনি সুন্দরী—'

'চুপ করো—' হঠাৎ ক্যেটে 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে চলে এল। বললে, 'চুপ করো। আমি গাঁয়ে থাকি বলে কি গাঁইয়া? আমি কি জানি নে ইণ্ডিয়ান নর্তকীরা কি অদ্ভুত সুন্দরী হয়? বর্ণটি সুন্দর শ্যাম, মিশমিশে কুচকুচে কালো চুল, লম্বা লম্বা জোড়া চোখ, চমৎকার বাস্ট আর হিপ—'

আমি গলা খাঁকারি দিয়ে বললুম, 'তুমি অতশত জানলে কোত্থেকে?'

বললে, 'এই যে সব মাঝি-মাল্লারা এখানে বিয়ার খেতে আসে তাদের অনেকেই ভাটি রাইনে হল্যাণ্ড অবধি যায়। সেখানে সমুদ্রের জাহাজে কাজ নিয়ে কেউ কেউ তামাম দুনিয়া ঘুরে বেড়ায়। তাদেরই দু-একজন মাঝে মাঝে আমাকে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ছবির পোস্টকার্ড পাঠায়। বিশেষ করে যারা আযার সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে খানিকটে হতাশ হয়েছে তারা ইণ্ডিয়া, ইজিপ্ট, থেকে খুবসুরত মেয়েদের ছবি পাঠিয়ে জানাতে চায়, 'তুমি তো আমাকে পাত্তা দিলে না; এখন দেখ, আমি কি পেয়েছি।'

আমি রক্তের গন্ধ পেয়ে বললুম, 'সুন্দরী ক্যেটে, তুমি যে বললে, যারা তোমার সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে খানিকটে হতাশ হয়েছে—এ কথাটার প্রকৃত অর্থ আমাকে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে বলবে কি?'

ক্যেটে বললে, 'সুন্দরী! বেশ বলেছো চাঁদ। কিন্তু সে কথা থাক। রাত একটা বেজেছে। পোলিৎসাই স্টুণ্ডে—পুলিস-আওয়ার্স—অর্থাৎ 'পাব' বন্ধ করতে হবে। এই ঝড়-বৃষ্টিতে এখন তুমি যাবে কোথায়? উপরে চলো—'

আমি বাঙলা দেশের ছেলে। অন্য কারণে যা হোক তা হোক, কিন্তু বৃষ্টির ভয়ে আমি কারো বাড়িতে করুণার অতিথি হব—সেটা আমার জাত্যভিমানে জব্বর লাগে। অবশ্য এই পোড়ার দেশে বারান্দা, রক, ভিলিকিনি (ব্যাল্‌কনি) নেই বলে শুকনো নদীর পোলের তলা ছাড়া অন্য কোথাও বৃষ্টির সময় গা বাঁচানো যায় না। বললুম, 'দেখো ফ্রলাইন ক্যেটে—'

ক্যেটের অল্প নেশা হয়েছে কি না জানি নে—শুনেছি, অল্প নেশাতে নাকি মানুষের সাহস বেড়ে যায়—কিংবা সে টেরমের-গিন্নীর মত তথাকথিতা খাণ্ডারনী, কিংবা সত্যই প্রেমদায়িনী জানি নে। আমার দিকে কটকট করে তাকিয়ে বললে, 'চুপ!'

তারপর উঠে গিয়ে সব ক'টা জানলার কাঠের রেলিঙ পর্দা নামালে—এতক্ষণ শুধু শার্সিগুলোই বন্ধ ছিল—মেন দরজা আর সেই লিফটপানা খাঁচার ডবল তালার ডবল চাবি ঘোরালে, বারের পিছনে গিয়ে দু মিনিটে ক্যাশ মেলালে, সুইচ বোর্ডের কাছে গিয়ে পটপট করে সে ঘরের চোদ্দটা আলো নেবালে, উপরে যাবার আলো জ্বালিয়ে দিয়ে আমাকে বললে, 'চলো।'

উপরে গিয়ে একটা কামরার দরজা খুলে আলো জ্বালালে। সত্যি সুন্দর ঘর। চমৎকার আসবাবপত্র। এক কোণে বাহারে কটেজ পিয়ানো।

দেয়ালে নানা দেশের তীরধনুক ঝোলানো। এক প্রান্তে অতি সূক্ষ্ম ডাচ লেসের কাজওলা বেডকভার দিয়ে ঢাকা বিরাট রাজসিক কালো আবলুশ কাঠের পালঙ্ক।

বললে, 'বসো। আমি এখন দুটো গিলবো। এই ঘরেই নিয়ে আসছি। রোজ রাত্রে আমাকে একা খেতে হয়, বড় কষ্ট লাগে। তোমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়ই। তবে দাড়াও, এই সিগারেটটা খাও।' ব'লে সেণ্টার টেবিলের উপর থেকে একটি সিগারেট নিয়ে ধরালে। আমার হাতে দিয়ে বললে, 'খাও।' এ রমণী সম্পূর্ণ লৌকিকতা-বর্জিতা।

দশ মিনিট পরে এল বিরাট এক ট্রে হাতে করে। তাতে দু প্লেট সুপ, দু প্লেট সার্ডিন-সসিজ-অলিভ, গুচ্ছের রুটি-মাখন। টেবিল সাজিয়ে, দুখানা চেয়ার মুখোমুখি বসিয়ে বললে, 'আরম্ভ করো।' আমি মারিয়ানার ঠাকুমার মত আদেশ করলুম, 'ক্যেটে, ফাঙে মাল আন্—আরম্ভ করো অর্থাৎ প্রার্থনা করো।' ক্যেটের হাত থেকে ঠং করে চামচ-কাঁটা পড়ে গেল। ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকালে।

শ্রীমতী ক্যেটেকে লজ্জা দেবার জন্য যে আমি উপাসনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলুম তা নয়, আসলে আমি এ বাবদে চার্লস ল্যামের শিষ্য। তিনি বলেছেন খাবার পূর্বের এই প্রার্থনা কেমন যেন বেখাপ্পা। বরঞ্চ ভোরবেলায় শান্তমধুর পরিবেশে বেড়াতে বেরোবার পূর্বে, কিংবা চাঁদনী রাতে হেথা-হোথা চলতে চলতে আপন-ভোলা হয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে, কিংবা বন্ধুসমাগমের পূর্বমুহূর্তের প্রতীক্ষাকালে ভিন্ন ভিন্ন উপাসনার প্রয়োজন। শুধু তাই? মিলটন পঠন আরম্ভ করার সময় বিশেষ প্রার্থনা করা উচিত, শেক্সপীয়রের জন্য অন্য উপাসনা এবং 'ফেয়ারি কুইন' পড়ার পূর্বে অন্য এক বিশেষ উপাসনার প্রয়োজন। ভোজনকর্মের চেয়ে এসব জিনিসের মূল্য আমাদের জীবনে অনেক বেশী। প্রার্থনা যদি করতে হয় তবে এগুলোর জন্য আলাদা আলাদা প্রার্থনা তৈরি করে রাখার প্রয়োজন।

ল্যামকে আমি শ্রদ্ধা করি অন্য কারণে। এই কার্যারম্ভের উপাসনা সম্বন্ধে বিবৃতি দেবার সময় তিনি এক জায়গায় বলেছেন, 'হায়! শাক-সবজির জগৎ থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি—ওসব আর খেতে ভালো লাগে না, কিন্তু এখনো যখন এস্পেরেগাস সামনে আসে তখন আমার মন মধুর আত্মচিন্তায় নিমগন হয়।' আপ্তবাক্য, আপ্তবাক্য, এ একটা আপ্তবাক্য!

আমার অনুরাগী পাঠকদের বলি, আমার লেখা যে আগের চেয়েও ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছে তার প্রধান কারণ, বহুকাল ধরে এস্পেরেগাসের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই। তাজাটার কথা হচ্ছে না, তিনি মাথায় থাকুন, টিনেরটার কথাই বলছি। সরকার আমদানি বন্ধ করে দিয়েছেন। সেঁকো বিষ নাকি এখনো আসে।

খুব অল্প লোকই মুখের লাবণ্য জখম না করে চিবানো কর্মটি করতে পারে।

আমি একটি অপরূপ সুন্দরী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলাকে চিনতুম। চিবোবার সময় তাঁর দুই চোয়ালের উপরকার ছোট ছোট মাংসপেশীগুলো এমনই ছোট ছোট দড়ির মত পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতো যে বোধ করি তিনিও সেটা জানতেন, তাই যতদূর সম্ভব মাথা নিচু করে একদম প্লেটের কাছে ঝুঁকে পড়ে মাংস চিবোতেন। ক্যেটের বেলা দেখলুম, উল্টোটা। খাবার সময় তার মুখের হাসি-হাসি ভাবটা যেন আরো বেড়ে গেল। অবশ্য সে খেল অল্পই। বিয়ার পান করল প্রচুর। উপরে আসবার সময় ঢাউস এক জাগ বিয়ার সঙ্গে এনেছিল।

আমি বললুম, 'অত বিয়ার খাও কেন? দিনের শেষে না হয় এক আধ গেলাস খেলে। ঐ বিয়ার খেয়ে খেয়ে ক্ষিদেটি তো একেবারে গেছে। আমার দেশে অনেকেই চা খেয়ে খেয়ে এ রকম পিত্তি চটায়।'

আশ্চর্য হয়ে শুধালো, 'চা খেয়ে খেয়ে! একজন মানুষ দিনে ক'কাপ চা খেতে পারে?'

আমি বললুম, 'আমার দেশের লোকও ঠিক এই রকম অবাক মেনে শুধোবে, "একজন মানুষ দিনে ক'গেলাস বিয়ার খেতে পারে?"'

বিরক্তির সুরে বললে, 'থাক ওসব কথা। তুমি আর পাঁচজনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ঐ একই জিগির তুলো না। সমস্ত দিন ভুতের মত খাটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ঐ বিয়ারই আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। না হলে হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতুম।'

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললুম, 'কিন্তু এর তো একটা সরল সমাধানও আছে। তোমাদের 'পাবে' বিস্তর আমদানি, তুমি দেখতে ভালো, বিয়ে করে একটা ভালো লোক এনে তাকে কাজে ঢুকিয়ে দাও না? তোমাদের দেশে তো শুনেছি, এ ব্যবস্থাটা অনেকেরই মনঃপূত!'

ক্যেটের ঐ চড়ুই পাখীর খাওয়া ততক্ষণে শেষ হয়ে গিয়েছে। চেয়ারটা টেবিলের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে, আরেকখানা চেয়ারের উপরে দু পা লম্বা করে দিয়ে ভস্ ভস্ করে সিগারেট টানছিল। হেসে বললে, 'সে এক্সপেরিমেণ্ট হয়ে গিয়েছে।'

আমি অবাক হয়ে শুধালুম, 'এই অল্প বয়সে তোমার আবার বিয়ে হল কি করে?'

'দূর পাগলা! আমি না। মা করেছিল এক্সপেরিমেণ্টটা। সে তার বাপের একমাত্র মেয়ে। তাই বাবাকে বিয়ে করে এনে সঁপে দিয়েছিল 'পাব'টা তার হাতে।'

আমি শুধালুম, 'তারপর?'

চিন্তা করে বললে, 'সমস্তটা বলা একটু শক্ত। শুনেছি, বাবা কাজকারবার ভালোই করতো। এ ঘরের মত আর সব ঘরেও যে-সব ভালো ভালো আসবাবপত্র আছে সেগুলো ঐ সময়েই কেনা—বাবা লোকটি শৌখিন। তারপর আমার আর আমার ছোট বোনের জন্ম হল। তারপর বাবার বয়েস যখন চল্লিশ—বাবা

মা'র একই বয়েস—তখন সে মজে গেল এক চিংড়ি মেয়ের প্রেমে, বয়েস এই উনিশ-বিশ। তারপর কি হয়েছিল জানি নে, আমি কিছু কিছু দেখেছি, তবে তখনো বোঝবার মত জ্ঞান-গম্যি হয় নি। শেষটায় একদিন নাকি হঠাৎ মা নিচে এসে 'বারে'র পিছনে দাঁড়াল, 'পাবে'র হিসেবপত্র নিজেই দেখতে আরম্ভ করলো। তখন বাবা নাকি বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।'

আমি শুধালুম, 'ডিভোর্স হয়েছিল?'

বললে, 'না। মা চায় নি, বাবাও চায়নি। কেন চায় নি জানি নে।'

আমি শুধালুম, 'তারপর কি হল?'

ক্যেটে বললে, 'ঠিক ঠিক জানি নে। তবে শুনেছি, বাবাতে আর ঐ মেয়েতে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কার নেশা আগে কেটেছিল বলতে পারবো না। তারপর হয়তো বাবা-মা'তে ফের বনিবনা হতে পারতো, কিন্তু হয় নি। বোধ হয় মা-ই চায় নি, অবশ্য আমি সঠিক বলতে পারবো না, কারণ মা আমার নিদারুন আত্মাভিমানিনী—এসব যা বললুম, এর কিছুটা আমার চোখে দেখা, আর কিছুটা পাঁচজনের কাছ থেকে শোনা—মা একদিনের তরে একটি কথাও বলে নি।'

আমি শুধালুম, 'তোমার বাবা—?'

বললে, 'বুঝেছি। মাইল তিনেক দূরে ঐ র‍্যাঙ্‌স্‌ ডর্ফে থাকে। অবস্থা ভালো নয়, মন্দও নয়। আমার সঙ্গে মাসে ছ'মাসে রাস্তায় দেখা হলে, হ্যাট তুলে আগের থেকেই নমস্কার করে—যেন আমি তার পরিচিতা কতই না সম্মানিতা মহিলা—কাছে এসে কুশলাদিও শুধোয়। বাবার আদবকায়দা টিপ্‌-টপ্‌। মায়ের সঙ্গে দেখা হলেও তাই। একবার আমি মায়ের সঙ্গে ছিলুম। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দুজনাতে কথাবার্তাও হল, তারপর যে যার পথ ধরলো।' এক মগ পুরো বিয়ার শূন্য করে বললে, 'তোমার বোধ হয় ঘুম পেয়েছে?'

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললুম, 'না না, মোটেই না।' আসলে আমার তখন জ্বর-জ্বর ভাব আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, আর সে-সময় সব রক্ত মাথায় উঠে গিয়ে ঘুম দেয় চটিয়ে।

ক্যেটে উঠে বললো, 'জল ধরেছে। এবারে জানলাটা খুলে দিই। দেখবে বৃষ্টিশেষের কী অদ্ভুত সুন্দর ভেজা পাইন-বনের গন্ধ আসছে।'

আমি বললুম, 'এই বিয়ার আর সিগারেটের গন্ধে তোমার তো নাক-মুখ ভরতি, এর ভিতরও সেই অতি সামান্য পাইনের খুশবাই পাও?' ক্যেটে জানলা খুলে দিয়ে দুই কনুই কাঠের উপর রেখে নিঃশব্দে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম, যেন আমাদের দেশের কোনো সুন্দরী নারীমূর্তি পিছন থেকে দেখছি। 'আমাদের দেশের নারীমূর্তি' ইচ্ছে করেই বললুম, কারণ ইয়োরোপীয় ভাস্করা তাদের নারী-মূর্তির পিছনের দিকটা বড় অযত্নে খোদাই করে। 'নিতম্বিনী'র ইংরিজী প্রতিশব্দ নেই।

ফিরে এসে বললে, 'কিছু মনে করো না, তোমাকে জাগিয়ে রাখছি বলে। তা আমি কি করবো, বলো! কাজ শেষ করে খেতে খেতে দেড়টা বেজে যায় তখন আমি কার সঙ্গে সোসাইটি করতে যাব? আমার সঙ্গে রসালাপ করার জন্য কেই বা তখন জেগে বসে'!'

আমি বললুম, 'সে রকম প্রাণের সখা থাকলে সমস্ত রাত জানলার নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রহর গোনে। পড়ো নি বাইবেল, তরুণী শোক করছে, তার দয়িত সমস্ত রাত হিমে দাঁড়িয়ে মাথার চুল ভিজিয়ে ফেলেছে বলে! অতখানি না হোক, একটা সাদামাটা ইয়াং ম্যানই যোগাড় করো না কেন?

বুকের কালো জামায় সিগারেটের ছাই পড়েছিল। সেইটে ঠোনা দিয়ে সরাতে সরাতে বললে, 'আমার আছে। না না, দাঁড়াও, ছিল। কি জানি, ছিল না আছে, কি করে বলবো!'

আমি অবাক হয়ে শুধালুম, 'সে কি? এ আবার কি রকম কথা?'

বললে, 'প্রথম যেদিন তাকে ভালোবেসেছিলুম সেদিনকার কথার স্মরণে আজও আমার মনপ্রাণ গভীর শান্তিতে ভরে যায়। আজও যদি তাই থাকতো, তবে এতক্ষণে ছুটে যেতুম না তার বাড়িতে? তাকে ধরে নিয়ে এসে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতাম এই রাত তিনটেতেও!

॥ ১৫ ॥

ছেলেবেলায় শরৎচাটুজ্যের আত্মজীবনী-মূলক ভ্রমণ-কাহিনীতে পড়েছিলুম, একদা গভীর রাতে হৃদয়-তাপের ভাপে ভরা একখানা চিঠি লিখে সেই গভীর রাতেই সেখানা পোস্ট করতে যান, কারণ মনে মনে বিলক্ষণ জানতেন, ভোরের আলো ফুটে ওঠার পর সাদা চোখে তিনি ও-চিঠি ডাকে ফেলতে পারবেন না। শরৎচাটুজ্যে কোনোপ্রকারের নেশা না করে শুধু নিশীথের ভূতে পেয়েই বে-এক্তোয়ার হয়েছিলেন, আর এস্থলে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এতক্ষণে বিয়ার এ-মেয়ের মাথা বেশ কিছুটা চেপেছে—কাজের জিম্মাদারিতে মগ্ন সচেতন মন ওটাকে ক্যাশ না মেলানো অবধি আমল দেয় নি—এবং জ্বরের তাড়সানিতে আমিও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নই; এখন মেয়েটি কি বলতে যে কি বলে ফেলবে আর পরে নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হবে সেই ভেবে আমি একটু শঙ্কিত হলুম।

হঠাৎ চেয়ারটা কাছে টেনে এনে আমার দিকে ঝুঁকে বললে, 'তুমি ভাবছো, আমি আমার হৃদয়টাকে জামার আস্তিনে বয়ে বয়ে বেড়াই—না? আর যে কেউ একজনকে পেলেই তার কাঁধে মাথা রেখে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তার কোটের পিছন দিকটা ভিজিয়ে দিই—না?'

আমি অনিচ্ছায় বললুম, 'আর বললেই বা কি? আমরা প্রায় একবয়েসী, তায় আমি বিদেশী, কাল চলে যাবো আপন পথে—'

'কি বললে? কাল চলে যাবে? কি করে যাবে শুনি? আমি কি লক্ষ্য

করি নি যে তোমার জ্বর চড়ছে ? এখন তোমাকে শুতে দেওয়াই আমার উচিত। কিন্তু তাতে কোনো লাভ নেই। জ্বর তার চরমে না ওঠা পর্যন্ত এখন তুমি শুধু এপাশ-ওপাশ করবে, আর মাথা বনবন করে ঘুরবে। তাই কথাবার্তাই বলি। জ্বরের পর অবসাদ যখন আসবে তখন উঠবো।'

আমি এতক্ষণ একটা সুযোগ খুঁজছিলুম আমার এখানে থাকা-খাওয়ার দক্ষিণার কথাটা তুলতে। মোকা পেয়ে বললুম, 'দেখো, ফ্লাইন ক্যেটে—'

'ফ্লাইন বলতে হবে না।'

আমি বললুম, 'সুন্দরী ক্যেটে, কাটেরিনা অর্থাৎ ক্যাৎরীন, আমি বেরিয়েছি হাইকিঙে। তুমি আমার কাছ থেকে যত কমই নাও না কেন, 'ইন্', হোটেল 'ক্লাইপে'তে থাকবার মত রেস্ত আমার পকেটে নেই। কালই আমাকে যেতে হবে।'

ক্যেটে আপন মনে একটু হাসলে। তারপর বললে, 'তুমি বিদেশী, তদুপরি গ্রামাঞ্চলে কখনো বেরোও নি। না হলে বুঝতে এটা হোটেল নয়, এখানে রাত্রিবাসের কোনো ব্যবস্থা নেই। এ ঘরটা আমাদের আপন আত্মীয়স্বজনদের জন্য গেস্ট-রুম, এরকম আরো দু'-তিনটে আছে। প্রায় সংবৎসরই ফাঁকা পড়ে থাকে। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, তুমি ভাবছো আমরা 'পাব' চালাই বলে আমাদের আর কোনো লৌকিকতা, সামাজিকতা নেই—দয়া-মায়া, দোস্তি-মহব্বতের কথা না হয় বাদই দিলুম। ভালোই হল। এবার থেকে যখন আমার গড্‌ফাদার এ ঘরটায় শোবে, তখন সকালবেলা ব্রেকফাস্টের সঙ্গে তাঁকে একটা বিল দেব!'

আমি আর ঘাঁটালুম না। আমি অপরিচিত, অনাত্মীয় এসব কথা রাত তিনটের সময় সুন্দরী তরুণীর সামনে—তাও নির্জন ঘরে—তুলে কোনো লাভ নেই। আমার শুধু আবছা-আবছা মনে পড়লো, আফ্রিকা না কোথায়, মার্কো পোলো গাছতলায় বসে ভিজছেন আর একটি নিগ্রো তরুণী গম না ভুট্টা কি যেন পিষতে পিষতে মা'কে গান গেয়ে গেয়ে বলছে, 'মা, ঐ বিদেশীকে বাড়ি ডেকে এনে আশ্রয় দিই।' সত্যেন দত্ত গানটির অনুবাদ করেছেন। এবং এ-কথাটাও এ-প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত, খাস নিগ্রোরা সাদা চামড়ার লোককে বড় 'তাচ্ছিল্যে'র দৃষ্টিতে দেখে—আমাদের মত সাদা-পাগলা নয়।

নিগ্রো তরুণীর মায়ের কথায় আমাদের কথার মোড় ঘোরাবার সুযোগ পেলুম। বললুম, 'হোটেল যদি না হয়, তবে এরকম অপরিচিতকে ঘরে আনাতে তোমার মা কি ভাববে ?

পাছে বাড়ির লোক ডিস্টার্বড্ হয় তাই রুমাল দিয়ে মুখ চেপে ক্যেটে তার খল খলানি হাসি থামাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু হাসি আর থামতেই চায় না। আমি বেকুবের মত দাঁড়িয়ে রইলুম।

অনেকক্ষণ পরে গুমরানো হাসি চেপে-ছেড়ে চেপে-ছেড়ে বললে, 'তোমার মত সরল লোক আমি সত্যই কখনো দেখি নি। তোমার কল্পনাশক্তিও একেবারেই নেই। আচ্ছা ভাবো তো, রাত বারোটার সময় তিনটে আধ-মাতাল

মাল্লা যদি আমার 'পাবে' ঢুকে বিয়ার চায়, তখন কি আমি তাদের তাড়িয়ে দিই ? 'সেলার' মানে বাপের সুপুত্তুর নয়। আমিও দেখতে মন্দ না। 'পাব'ও নির্জন। ওরা 'বারে' দাঁড়িয়ে গাল-গল্প এমন কি ফষ্টি-নষ্টির কথা বলবেই বলবে। তখন কি মা এসে আমার চরিত্ররক্ষা করে ?'

আমি আমতা আমতা করে বললুম, 'তা বটে, তা বটেই তো। কিন্তু বল তো, ওরা যদি বিয়ার খেয়ে পয়সা না দিয়ে চলে যেতে চায় তখন তুমি কি করো ?'

হেসে বললে, 'দেখবে ?' তারপর উঠে গিয়ে ঘরের দরজা একটুখানি ফাঁক করে আস্তে আস্তে মাত্র একবার শিস দিলে। অমনি কাঠের সিঁড়িতে কিসের যেন শব্দ শুনতে পেলুম। আর সঙ্গে সঙ্গে দরজা ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকলো ভীষণদর্শন বিকটের চেয়েও বিকট ইয়া লাশ এক আলসেশিয়ান। আমার দিকে যে ভাবে তাকালে তাতে আমি লাফ দিয়ে জুতোসুদ্ধ উঠে দাঁড়িয়েছি খাটের উপর। ভয়ে আমার মুখ দিয়ে কথা ফুটছে না যে বলবো, ওকে দয়া করে বের করো। ক্যেটের তবু দয়া হল। কুকুরটাকে আদর করতে করতে বললে, 'না, ব্রুনো ইনি আমাদের আত্মীয়। বুঝলি ?' এবারে আরো বিপদ। ব্রুনো ন্যাজ নাড়তে নাড়তে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন আমার 'প্যার' নেবার জন্য। আমি হাতজোড় করে বললুম, 'রক্ষে করো, নিষ্কৃতি দাও।'

ক্যেটে বললে, 'কিচ্ছু না। শুধু ব্রুনোকে বলতে হয়, ঐ তিনটে লোককে ঠেকা তো। ব্যাস্! সে তখন দরজায় দাঁড়িয়ে তিনটে বেহেড সেলারকে ঠেকাতে পারে। অবশ্য এরকম ঘটনা অতিশয় কালে-কস্মিনে ঘটে। বাপের সুপুত্তুররা তখন সুড়সুড় করে পয়সা দিয়ে পালাবার পথ পায় না। অবশ্য রাইন নদীর প্রায় সব সেলারই পুরুষানুক্রমে এ 'পাব' চেনে। নিতান্ত ডাচ-ম্যান কিংবা ঐ ধরনের বিদেশী হলে পরে আলাদা কথা—তাও তখন 'পাবে' অন্য খদ্দের থাকলে কেউ ওসব করতে যায় না।'

তারপর বললে, 'তুমি এখন একটু ঘুমুবার চেষ্টা করো। আমি তোমাকে একটা নাইট-শার্ট দিচ্ছি।' ঘরের আলমারিতেই ছিল। বললে, 'আমি এখুনি আসছি।' আমি আর লৌকিকতা না করে কোট-পাতলুন ছেড়ে সেই শেমিজ-পারা নাইট শার্ট পরে লেপের ভিতর গা-ঢাকা দিলুম।

হে মা মেরি ! এ কি ? ক্যেটে আরেক জাগ্ বিয়ার নিয়ে এসেছে !

আমি করুণ কণ্ঠে বললুম, 'আর কত খাবে ?'

বিরক্তির সুরে বললে, 'তুমিও ওর সঙ্গে ভিড়লে নাকি ?'

আমি বললুম, 'না, বাপু, আমি আর কিছু বলবো না। একদিন, না হয় দুদিনের চিড়িয়া, আমার কোথায় বা সুযোগ কীই বা শক্তি ! কিন্তু এবারে তুমি ওর সঙ্গে ভিড়লে নাকি' বললে—সেই ও-টি কে ?'

'অটো। যাকে ভালোবাসি, না বাসি নে বুঝতে পারছি নে। তাই বলেছিলুম, সে আছে কি নেই জানি নে।'

আমি বললুম, 'তুমি বড় হেঁয়ালিতে হেঁয়ালিতে কথা বলো।'

'আদপেই না। আসলে তুমি বিদেশী বলে আমাদের আচার-ব্যবহার সামাজিকতা-লৌকিকতা জানো না। তাই তোমার অনেক জিনিস বুঝতে অসুবিধে হয়, যেগুলো আমাদের দশ বছরের বাচ্চার কাছেও জলের মত তরল। যেমন তুমি হয়তো মনে করেছ আমি 'বার'-এর পিছনে দাঁড়িয়ে বিয়ার বিক্রি করি বলে আমি 'বার-মেড্'। এবং 'বার-মেড'রা যে সচরাচর খদ্দেরকে একাধিক প্রকারে তুষ্ট করতে চায়—প্রধানত অর্থের বিনিময়ে—সেটাও কিছু গোপন কথা নয়। বিশেষত শহরে। গ্রামে ঠিক ততখানি নয়। আমি যদি এখানে কাজের সাহায্যের জন্য ঠিকে নিই, তবে সে আমাদের চেনাশোনারই ভিতরে বলে অতখানি বে-এক্তেয়ার হতে সাহস পাবে না। আর আমি, আমার মা-বোন, দাদা-মশাই আমরা 'পাব'-এর মালিক। আমরা যদি মুদি, দরজী বা গারাজের মালিক হতুম তা হলে আমাদের সমাজ আমার কাছ থেকে যতখানি সংযম আশা করতো এখনো তাই করে। অবশ্য বাড়িতে ব্যাটাছেলে থাকলে সে-ই 'বার'-এর কাজ করতো, ভিড়ের সময় মা-বোনেরা একটু-আধটু সাহায্য করতো। মুদি কিংবা কসাইকে যেমন তার বউ-বেটি সাহায্য করে থাকে।' তারপর হঠাই এক ঝলক হেসে নিয়ে বললে, 'তুমি ভাবছো, আমি স্নব,—না? জাতের দেমাক করছি! আমি 'বার-মেডের' মত ফ্যালনা নই—রীতিমত খানদানী মনিষ্যি, না?'

॥ ১৬ ॥

আমি চুপ। যে-মেয়ে মাতাল সেলারদের সামলায় আমি তার সঙ্গে পারবো কেন?

ক্যেটে বললো, 'তবে শোনো,—

আচ্ছা বলো তো, তোমার কখনো এমনধারা হয়েছে, যে-জিনিস দেখে দেখে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলে সে হঠাৎ একদিন দেখা দিল অপরূপ নবরূপ নিয়ে? এই যে দিক্‌ধেড়েঙ্গে অটো-টা, চুল ছাঁটা যেন পিনকুশনের মাথাটা, হাত দু'খানা যেমন বেঢপ বেঁটে—থাক গে, বর্ণনা দিয়ে কি হবে—একে দেখে আসছি যবে থেকে জ্ঞান হয়েছে, ইস্কুলে গিয়েছি ফিরেছি একসঙ্গে, কখনো মনে হয় নি পাড়ার আর পাঁচটা বাঁদর আর এ বাঁদরে কোনো তফাত আছে, অথচ হঠাৎ একদিন তার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, এ কাকে দেখছি? সে সুন্দর কিনা, কুশ্রী কিনা, কিছুই মনে হল না, শুধু মনটা যেন মধুতে ভরে উঠলো আর মনে হল, এ আমার অটো, একে আরো আমার করতে হবে।

তুমি বিশ্বাস করবে না, ঠিক সেই মুহূর্তেই সেও আমার দিকে এমন ভাবে তাকালে যে আমি নিঃসন্দেহে বুঝতে পারলুম, সেও ঠিক ঐ কথাটিই ভেবেছে।

আর এমন এক নতুন ভাবে তাকালো যে আমার লজ্জা পেল। আমার মনে

হল, পুলওভারটার উপর কোটটা থাকলে ভাল হত।

আচ্ছা, বলো তো, এ কি একটা রহস্য নয়! যেমন মনে করো, তুমি আমার একখানা বই দেখে মুগ্ধ হয়ে বললে, 'চমৎকার বই!' আমি কি তখন তোমাকে সেটি এগিয়ে দেব না, যাতে করে তুমি আরো ভালো করে দেখতে পার?'

চুপ করে উত্তরের প্রতীক্ষা করছে বলে বললুম, 'আমি কি করে বলবো? আমি তো ব্যাটাছেলে।'

বললে, 'অন্য দিন ইস্কুল থেকে ফিরে বাড়ির কাজে লেগে যাই, আজ বারবার মনে হতে লাগল, যাই একবার অটোকে দেখে আসি। যাওয়া অত্যন্ত সোজা। কোনো অছিলারও প্রয়োজন নেই। তার দু দিন আগেই তো এক বিকেলের ভিতর মা আমায় অটোদের বাড়িতে পাঠিয়েছে তিন-তিনবার—এটা আনতে, সেটা দিতে। তা ছাড়া ইস্কুলের লেখাপড়া নিয়ে যাওয়া-আসা তো আছেই। কিন্তু তবু কেন, জানো, যেতে পারলুম না। প্রতিবারে পা বাড়িয়েই লজ্জা পেল। খুব ভাল করেই জানি মা কিছু জিজ্ঞেস করবে না, তবু মনে হল, মা বুঝি শুধোবে, 'এই! কোথা যাচ্ছিস?' আর জিজ্ঞেস করলেই বা কি? কতবার বেরোবার সময় নিজের থেকেই তো বলেছি, 'মা, আমি ঝপ করে এই অটোদের বাড়ি একটুখানি হয়ে আসছি।' মা হয়তো শুনতেই পেত না।

তবু যেতে পারলুম না। আর সর্বক্ষণ মনে হল, মা যেন কেমন এক অদ্ভুত নূতন ধরনে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

অন্য দিন বালিশে মাথা দিতে না দিতে আমার ঘুম বেঘোর। আজ প্রহরের পর প্রহর গির্জে-ঘড়ির ঘণ্টা শুনে যেতে লাগলুম রাত বারোটা পর্যন্ত। আর মনে হল সুস্থ মানুষ বিনিদ্রদের কথা চিন্তা করে ঘড়ির ঘণ্টা বানায় নি। সন্ধ্যাটা ছ'টা ঘণ্টা দিয়ে শুরু না করে যদি একটা ঘণ্টা দিয়ে শুরু করতো তবে রাত বারোটায় তাকে শুনতে হত মাত্র ছ'টা ঘণ্টা। এখন পৃথিবীতে যা ব্যবস্থা তাতে যাদের চোখে ঘুম নেই তাদের সেই ঠ্যাং-ঠ্যাং করে বারোটার ঘণ্টা না শোনা অবধি নিষ্কৃতি নেই।

তারপর আরম্ভ হল জোর ঝড়-বৃষ্টি। ঝড়ের শোঁ-শোঁ আওয়াজ আর খড়-খড়ি জানলার ঝড়ঝড়ানি আমার শুয়ে শুয়ে শুনতে বড় ভালো লাগে, কিন্তু আজ হল ভয়, কাল যদি এরকম ঝড় থাকে তবে মা তো আমাকে ইস্কুলে যেতে দেবে না। অটোকে দেখতে পাবো না। পরখ করে নিতে পারবো না, সে আবার তার পুরনো চেহারায় ফিরে গিয়েছে, না আজ যে-রকম দেখতে পেলুম সেই রকমই আছে।

সব মনে আছে, সব মনে আছে, প্রত্যেকটি কথা আমার মনে আছে।'

ক্যেটে বোধ হয় আমার মুখে কোনো অবিশ্বাসের চিহ্ন দেখতে পেয়েছিল তাই এ-কথা বললো। আমি ভাবছিলুম, বেশী বিয়ার খেলে মানুষের স্মৃতি-শক্তি তো দুর্বল হয়ে যায়, এর বেলা উল্টোটা হল কি করে? হবেও বা। পায়ে কাঁটা ফুটলে বড্ড লাগে, কিন্তু পাকা ফোড়াতে সেই কাঁটা ফুটিয়ে দিয়েই তো মানুষ আরাম পায়। বললুম, 'তুমি বলে যাও। প্রেম বড় অদ্ভুত জিনিস!'

ক্যেটে অনেকক্ষণ ধরে বিয়ারে চুমুক দেয় নি, সিগারেটও ধরায় নি। প্রেমে তো নেশা আছে বটেই, প্রেমের স্মরণেও নেশা—অন্য নেশার প্রয়োজন হয় না!

ক্যেটে বললে, 'আশ্চর্য, এবং তুমিও বিশ্বাস করবে না, আমি তখনো বুঝতে পারি নি, কবিরা একেই নাম দিয়েছেন প্রেম। প্রেমের যা বর্ণনা কবিরা দিয়েছেন তাতে আছে, মানুষের সর্বসত্তা নাকি তখন বিরাটতর চৈতন্যলোকে নিমজ্জিত হয় এবং পরমুহূর্তেই সে নাকি নভোমণ্ডলে উড্ডীয়মান হতে হতে দ্যুলোক সুরলোক হয়ে হয়ে ব্রহ্মাণ্ডাতীত লোকে লীন হয়ে যায়; আর আমি ভাবছি, কাল যদি ঝড় হয় তবে আমি ইস্কুল যাব কী করে? দুটো যে একই জিনিস জানবো কি করে?

পরদিন দেখি, আকাশ বাতাস সুপ্রসন্ন। আসন্ন বর্ষণেরও কোনো আভাস নেই।

অন্যদিন মায়ের তাড়া খেতে খেতে হন্ত-দন্ত হয়ে শেষ মুহূর্তে বাড়ি থেকে বেরোতুম, ইস্কুল যাবার জন্যে ছোট বোন বিরক্ত হয়ে আগে বেরিয়ে যেত, আজ আমি এক ঘণ্টা আগে থেকে তৈরী। অন্য দিন জুতোতে কালি-বুরুশ লাগাবার ফুরসৎ কোথায়? আজ ফিটফাট। আমি জামা-কাপড় সম্বন্ধে চিরকালই একটু উদাসীন—অন্য মেয়েদের মত নই—আর ওয়ার্ডরোবের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল এ যেন সার্কাসের সঙের ওয়ার্ডরোব খুলেছি।'

আমি বললুম, 'তোমাকে সাদা-মাটা কাপড়েই এত সুন্দর দেখায় যে বাহারে জামা-কাপড় পরলে যে আরো শ্রীবৃদ্ধি হবে তা আমার মনে হয় না। এক লিটার বিয়ারের মগে এক লিটারই ধরে। সস্তা বিয়ার দিয়ে না ভরে দামী শ্যাম্পেন দিয়ে ভরলেও তাই।'

ক্যেটে বললে, 'থ্যাংকস্।' সুন্দরী বলাতে ইতিমধ্যে দুবার তাড়া খেয়েছি। এবার দেখি, সে মোলায়েম হয়ে গিয়েছে।

বললে, 'অটোও এখন বলে আমাকে সাদা-মাটাতেই ভালো দেখায়।' একটু করুণ হাসি হাসলে।

ক্যেটে যে 'এখন' কথাটাতে বেশ জোর দিয়েছে সেটা আমায় এড়িয়ে যায় নি। তাই শুধালুম, 'অটো 'এখন' বলে, কিন্তু আগে কি অন্য কথা বলতো?'

'সেই 'তখন' আর 'এখনের' কথাই তো হচ্ছে। সেটাই প্রায় শেষ কথা। একটু সবুর করো। না, তাড়াতাড়ি শেষ করে দেব?'

আমি বললুম, 'দোহাই তোমার সেটি ক'রো না। পরের দিন সকালবেলা কি হল, তাই বলো।'

'এক ঘণ্টা আগের থেকে তৈরী অথচ বেরোবার সময় যতই এগিয়ে আসতে লাগল, আমার পা যেন আর নড়তে চায় না। এদিকে বোন খুশী হয়েছিল, আজ আমার সঙ্গ পাবে বলে। সে বার বার বলে, "চলো, চলো," আর আমি তখন বুঝতে পেরেছি, কি ভুলটাই না করেছি! বোন সঙ্গে থাকবে—ওদিকে অটোকে একা পেলেই ভালো হত না? অত সাততাড়াতাড়িতে তৈরী না হলে বোন বেরিয়ে গেলে অটোতে আমাতে, শুধু আমরা দুজনাতে একসঙ্গে যেতে

পারতুম। অবশ্য এমনটাও আগে হয়েছে যে আমার দেরি দেখে বোন বেরিয়ে গিয়েছে, এবং তারপর আরো দেরি হওয়াতে অটোও আমার জন্য অপেক্ষা করে নি। কিন্তু তখন তো আমি অটোর জন্য থোড়াই পরোয়া করতুম!

শেষটায় বোনের সঙ্গেই বেরুতে হল। ঘরে বসে থাকবার তো আর কোনো অছিলা নেই। ওদিকে আবার ভয়, বেশী দেরি দেখে অটো যদি একা চলে যায়।

দূর থেকে দেখি, অটো রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

এবং আশ্চর্য! পরেছে রবিবারে গির্জে যাবার তার ব্লু সার্জের পোশাকী স্যুট। এটা এতই অস্বাভাবিক যে বোন পর্যন্ত চেঁচিয়ে শুধোলে, 'এ কি অটো, রবিবারের স্যুট কেন?'

'অটোর রবিবারের স্যুট পরা নিয়ে সেদিন কী হাসাহাসি! অটোটাও আকাট। কাউকে বলে ইস্কুলে ছুটির সঙ্গে সঙ্গে সোজা মামাবাড়ি যাবে, কাউকে বলে পাদ্রী সায়েবের কাছে যাবে। আরে বাপু, যা বলবি একবার ভেবে-চিন্তে বলে নে না।

আমি কিন্তু হাসি নি। অটো রাজবেশে সেজেছিল, তার রাজরানীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে—আর আমি রাজরানী সেজেছিলুম, আমার রাজার সঙ্গে দেখা হবে বলে।'

আমি বললুম, 'ক্যেটে, এটা ভারী সুন্দর বলেছ।'

ক্যেটে বললে, 'শীতকালে যখন দিনের পর দিন অনবরত বরফ পড়ে, রাইনেও জাহাজ আঁধা-বোটের চলাচল কমে যায়, খদ্দের প্রায় থাকেই না, তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন কাটে 'পাবে'র কাউণ্টারের পিছনে বসে বসে। তখন মন যে কত আকাশ-পাতাল হাতড়ায়, কত অসম্ভব অসম্ভব স্বপ্ন দেখে, অটোকে বলার জন্য সুন্দর সুন্দর নূতন নূতন তুলনা ছলনা খোঁজে, সেটা বলতে গেলে দশ মিনিটের ভিতরেই শেষ হয়ে যাবে, অথচ আমি ভেবেছি, দুই আড়াই তিন বছর ধরে।'

আমি বললুম,

'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা
আকাশ কুসুম চয়নে
সব পথে এসে মিলে গেল শেষে
তোমার দু'খানি নয়নে॥'

ক্যেটে পড়াশুনোয় বোধ হয় এককালে ভালোই ছিল, অন্তত লিরিকে যে তার স্পর্শকাতরতা আছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর এ-জিনিসটা তো লেখাপড়া শেখার উপর খুব একটা নির্ভর করে না। রাগরাগিনী-বোধ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সাড়া দেওয়া এসব তো ইস্কুল শিখিয়ে দিতে পারে না, যার গোড়া থেকে কিছু আছে তারই খানিকটে মেজেঘষে দিতে পারে মাত্র।

সব চেয়ে তার ভাল লাগল এ আকাশ-কুসুম-চয়ন ব্যাপারটা।

আমি বললুম, 'জানো, ঐ সমাসটা আমার মাতৃভাষায় এমনই চালু যে

ওটা দিয়েও নূতন করে রসসৃষ্টি করা যায়, এ রকম আকাশ-কুসুম-চয়ন মহৎ কবিই করতে পারেন। এই যে রকম সকলের কাছে সাদা-মাটা অটো হঠাৎ একদিন তোমার কাছে নবরূপে এসে ধরা দিল।

'তারপর ?'

'ইস্কুল ছাড়ি আমি দুজনাতে একসঙ্গেই। আমি পাবে ঢুকলুম। অটো রেমাগেনে এপ্রেন্টিসিতে।

সময় পেলেই 'পাবে' ঢুঁ মেরে আমাকে দেখে যেত। আর শনির সন্ধ্যা থেকে সোমের সকাল অবধি ছিল আমাদের ছুটি—মা তখনো 'পাবে'র কাজ সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয় নি। সে সময় পায়ে হেঁটে, বাইসিক্লে, ট্রেনে বাসে আমরা এদেশটা ইঞ্চি ইঞ্চি করে চষেছি। শেষটায় অটো কিনলো একটা ক্যাম্বিসের পোর্টেবল, কলাপসিবল্ নৌকো। তাতে চড়ে উজানে লিন্‌ৎস থেকে ভাটিতে কলোন পর্যন্ত কত বারই না আসা-যাওয়া করেছি। শুধু আমরা দুজনা, আর কেউ না। গরমের দুপুরে ননেন্‌বের্ট দ্বীপে—ঐ তো রাইন দিয়ে একটু ভাটার দিকে—গাছতলায় শুয়ে শুয়ে, পোকার উৎপাতে মুখ রুমাল দিয়ে ঢেকে, জ্যোৎস্নারাতে নৌকো স্রোতের হাতে ছেড়ে দিয়ে, বরফের ঝড়ে আটকা পড়ে গ্রামের ঘরোয়া 'পাব' বা 'ইনে' কাটিয়েছি রাত। দুজনাতে নিয়েছি দুটি ছোট কামরা। শেষরাতে ঘুম ভাঙলে মাঝখানের দেয়ালে টোকা দিয়ে অটোকে জাগিয়েছি, কিংবা সে আমাকে জাগিয়েছি। জেলের কয়েদীরা যে রকম দেয়ালে টোকা দিয়ে সাংকেতিক কথা কয়, আমরাও সেই রকম একটা কোড্ আবিষ্কার করেছিলুম। আর সমস্তক্ষণ মনে মনে হাসতুম, সে অনায়াসে আমার ঘরে আসতে পারে, আমি তার ঘরে যেতে পারি—তবু বড় ভালো লাগত এই লুকোচুরি।

ইস্কুলে থাকতে অটো কালেকস্মিনে একটু-আধটু বিয়ার খেত—সে কিছু ধর্তব্যের মধ্যে নয়। চাকরি পেয়ে সে আস্তে আস্তে মাত্রা বাড়ালো। আমিও সঙ্গে সঙ্গে খেতে লাগলুম। তারপর একদিন তার মাত্রা এমন জায়গায় গিয়ে পেঁছিল যার তুলনায় আমার আজকের বিয়ার খাওয়া নিতান্ত 'জলযোগ'ই বলা যেতে পারে। অর্থাৎ শনির সন্ধ্যা থেকে সোমের সকাল অবধি সর্বদাই ঢুলুঢুলু নয়ন।

আমি মন্তব্য করি নি, বাধাও দিই নি। যতখানি পারি তাকে সঙ্গ দিতুম।

তারপর একদিন হল এক অদ্ভুত কাণ্ড। পড়ল কোন্ এক টেম্পারেন্স না কিসের যেন পাদ্রীর পাল্লায়। তাদের নাকি সব রকম মাদক দ্রব্য বর্জন করা ধর্মেরই অঙ্গ। আমরা ক্যাথলিক। মদ খাই—বাড়াবাড়ি না করলেই হল। আর ফ্রান্‌ৎসিস্‌কানর, বেনেডিক্‌টিনার এসব ভালো ভালো লিক্যোর তো আবিষ্কার করেছে পাদ্রী সায়েবরাই। আমাদের গাঁয়ের পাদ্রী সায়েবের 'সেলারে' যে মাল আছে তা আমার 'পাবে'র চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

অটো দুম্ করে মদ ছেড়ে দিল। আমি খেলে আমার দিকে আড়নয়নে তাকায়। এ আবার কী!

মদ সিগরেট কোন-কিছু একটা হঠাৎ ছেড়ে দিলে মানুষ খিটখিটে হয়ে যায়। অটো আমাকে ভালোবাসতো বলে সেটা যতদূর সম্ভব চাপবার চেষ্টা করতো। আমি টের পেতুম।

জানি নে পুরোনো অভ্যাসবশত, না কর্তব্যজ্ঞানে সে তখনো আমার সঙ্গে শনি রবি বাইরে যায়, কিন্তু কেমন যেন আর জমতে চায় না। একদিন তো বলেই ফেললে, আমার মুখে বিয়ারের গন্ধ।

শোন কথা! দুদিন আগেও দু'দণ্ড চলতো না তোমার যে বিয়ার না খেয়ে, সেই বিয়ারে তুমি পাও এখন গন্ধ!

তখন—এখন না—তখন ইচ্ছে করলে আমি বোধ হয় বিয়ার ছাড়তে পারতুম, কিন্তু আমার মনে হল, এ তো বড় এক অদ্ভুত ন্যাকরা। আমাকে তুমিই খেতে শেখালে বিয়ার, আর এখন তুমি হঠাৎ বনে গেলে বাপের সুপুত্তুর! এখন বিয়ারের গন্ধে তোমার বাইবেল অশুদ্ধ হয়!'

আমি বললুম,

'জাতে ছিল কুমোরের ঝি,
সরা দেখে বলে "এটা কি"?'

কোটেকে প্রবাদটা বোঝাতে বেশীক্ষণ লাগে নি।

কোটে বললে, 'ভুল করলুম না ঠিক করলুম জানি নে—আমি ভাবলুম, এ রকম ন্যাকামোকে আমি যদি এখন লাই দিই, তবে ভবিষ্যতে কত-কিছুই না হতে পারে! একদিন সে ন্যুডিস্ট কলোনিতে মেম্বার হতে চেয়েছিল, আমি বাধা দিয়েছিলুম—কেমন যেন ও জিনিসটা আমার বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়—পরে সে বলেছিল, আমি বাধা দিয়ে ভালোই করেছিলুম। এখন যে তাই হবে না, কে জানে?

ইতিমধ্যে এল আরেক গেরো।

বলা-নেই, কওয়া-নেই হঠাৎ একদিন এসে বলে, সে পাদ্রী হবে, সে নাকি ভগবানের ডাক শুনতে পেয়েছে। আমি তো গলাভর্তি বিয়ারে হাসির চোটে বিষম খেয়ে উঠেছিলুম। শেষটায় ঠাট্টা করে শুধিয়েছিলুম, 'পৃথিবীতে কত শত অটো আছে। তুমি কি করে জানলে, আকাশবাণী তোমার জন্যই হয়েছে!'

রাগে গরগর করতে করতে অটো চলে গেল।

অর্থাৎ তা হলে আমাদের আর বিয়ে হতে পারে না।

সেই থেকে এই তিন মাস ধরে চলেছে টানপোড়েন। পর পর দুই শনি যখন এটা ওটা অছিলা করে আমার সঙ্গে এক্সকার্শনে বেরলো না, তখন আমিও আর চাপ দিলুম না। এখন মাঝে মাঝে রাত দশটা-এগারোটাই 'পাবে' এসে এক কোণে বসে, আর বিশ্বাস করবে না, লেমনেড—হ্যাঁ হ্যাঁ, লেমনেড খায়! আমি বিয়ার হাতে তার পাশে গিয়ে বসি।

ধর্ম আমি মানি। খৃষ্টে আমার বিশ্বাস আছে। কিন্তু ধর্মের এ কী উৎপাত আমার উপর! আমি 'পাব'-ওয়ালীর মেয়ে। আমার ধর্ম বিয়ারে ফাঁকি না দেওয়া, যে বানচাল হবার উপক্রম করছে তাকে আর মদ না বেচে বাড়িতে

পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা, মা-বোনের দেখ-ভাল করা—আমি নান্ হতে যাব কোন দুঃখে !

তবু জানো, এখনো আমি তার পদধ্বনির প্রতীক্ষা করি।'

ক্যেটের গলায় কি রকম কি যেন একটা জমে গেছে। 'তুমি ঘুমোও' বলে আলো নিবিয়ে দিয়ে হুট্ করে চলে গেল।

॥ ১৭ ॥

পড়ল পড়ল বড় ভয়
পড়ে গেলেই সব সয়।

ভোরের দিকে ভয় হয়েছিল, বৃষ্টিতে ভেজার ফলে যদি আরো জ্বর চড়ে ! চড়লোও। তখন সর্ব দুর্ভাবনা কেটে গেল। এবার যা হবার হবে। আমার কিছু করবার নেই।

সকালে ঘুম ভাঙতেই কিন্তু সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেছিলুম, খাটের পাশের চেয়ারে আমার সব জামা-কাপড় পরিপাটি ইস্ত্রি করে সাজনো, ড্রাইক্লিনিঙেরও পরশ আছে বোঝা গেল। ধন্যি মেয়ে ! কখনই বা শুতে গেল, আর কখনই বা সময় পেল এ-সব করবার ?

কিন্তু আমার টেম্পারেচার দেখে সে যায় ভিরমি। আমি অতি কষ্টে তাকে বোঝালুম, এ-টেম্পারেচার জর্মানিতে অজানা, কারণ এটা খুব সম্ভব আমার বাল্য-সখা ম্যালেরিয়ার পুনরাগমন।

এবারে ক্যেটে সত্যই একদম ফ্যাকাশে হয়ে গেল। 'ম্যা—লে—রি—য়া ? ওতে শুনি পুবের দেশে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক মরে !'

আমি ক্যেটের হাত আমার বুকের উপর রেখে বললুম, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, আমি মরবো না। তদুপরি, আমাদের এতে কিছু করবার নেই। বন, কলোন্ কোথাও কুইনিন পাওয়া যায় না। বন্-এ আমার এক ভারতীয় বন্ধুর ম্যালেরিয়া হয়েছিল ; তখন হলাণ্ড থেকে কুইনিন আনাতে হয়েছিল, কারণ ডাচদের কাজকারবার আছে জ্বরে-ভর্তি ইণ্ডোনেসিয়ার সঙ্গে।'

ক্যেটে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'তাহলে হলাণ্ডে লোক পাঠাই !'

আমার দেখি নিষ্কৃতি নেই। বললুম, 'শোনো, ক্যেটে, আমার ডার্লিং, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আজ না হোক, কাল সকালেই আমার জ্বর নেবে যাবে। তখন তুমি যাবে সত্যসত্যই ভিরমি। কারণ টেম্পারেচার অতখানি নামেও না এদেশে কখনো—৩৬ সেণ্টিগ্রেড। যদি না নামে তবে কথা দিচ্ছি, তুমি হলাণ্ডে লোক পাঠাতে পারো।'

'তাহলে ওঠো, ব্রেক-ফাস্ট খাও।'

এই জর্মনদের নিয়ে মহা বিপদ। প্রথমত, এদের অসুখ বিসুখ হয় কম। পেটের অসুখ তো প্রায় সম্পূর্ণ অজানা—যেটা কি না প্রত্যেক বাঙালীর বার্থ-

রাইট—! আর যদি বা অসুখ করলো, তখন তারা খায় আরো গোগ্রাসে। ডায়েটিং বলে কোন প্রক্রিয়া ওদেশে নেই, উপোস করার কল্পনা ওদের স্বপ্নেও আসে না। ওদের দৃঢ়তম বিশ্বাস, অসুখের সময় আরো ঠেসে খেতে হয় যাতে করে রোগা গায়ে গত্তি লাগে!

একেই কোনো মেয়ে ছলছল নয়নে তাকালে আমি অস্বস্তি বোধ করি, তদুপরি এ মেয়ে অপরিচিতা, বিদেশিনী! এবং সব চেয়ে বড় আশ্চর্য লাগলো, যে মেয়ে রায়বাঘিনীর মত মাতাল 'সেলার'-দের ভেড়ার বাচ্চার মত গণনা করে, তার এই এত সুকোমল দিকটা এল কোত্থেকে? তখন মনে পড়ল, কে যেন বলেছিল, 'ফাঁসুড়ের ছেলের পায়ে কাঁটা ফুটলে সে কি বিচলিত হয় না?'

ক্যেটেকে বললুম, 'তুমি দয়া করে তোমার 'পাব্' সামলাও গে। আর শোনো, যাবার পূর্বে আমাকে একটি চুমো খাও তো!'

এবারে ক্যেটের মুখে হাসি ফুটলো। আমার দুই গালে দুটি বম্-শেল ফাটাবার মত শব্দ করে দুটি চুমো খেয়ে যেন নাচতে নাচতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রুচিবাগীশ পাঠকদের বলে রাখা ভালো, এদেশে গালে চুমো খাওয়াটা স্নেহ হৃদ্যতার প্রতীক। ঠোঁটের ব্যাপার প্রেম-ট্রেম নিয়ে। যস্মিন্ দেশাচার। ক্যেটে নিশ্চিন্ত হয়ে কাজে গেল—আমি বিদেশী নই, আমি ওদেরই একজন। এই যে-রকম কোনো সায়েব যদি আমাদের বাড়িতে খেতে খেতে হঠাৎ বলে ওঠে, 'দুটো কাঁচা লংকা দাও তো, ঠাকুর'—তা হলে আমরা যেরকম নিশ্চিন্ত হই।

* * *

জ্বর কমেছে। পাবে এসে বসেছি। জামাকাপড় ইস্ত্রি করা ছিল বলে ভদ্রলোকের মতই দেখাচ্ছিল। ক্যেটে 'পাব্-কীপারের' মত কেতা-দুরুস্ত কায়দায় আমাকে শুধোলে, 'আপনার আনন্দ কিসে!' সঙ্গে আবার মৃদু হাস্য—'আপন-প্রিয়' বান্ধবীর মত।

আমি বললুম, 'বুইয়োঁ—বুইয়োঁ' ঘনচর্বির শুরুয়া। ওতে আর কিছু থাকে না। ক্যেটে আরো পুরো-পাক্কা নিশ্চিন্ত হল—আমি খাঁটি জর্মন হয়ে গিয়েছি। আশ্চর্য, সর্বত্রই মানুষের এই ইচ্ছা—বিদেশীকে ভালো লাগে, কিন্তু তার আচার-ব্যবহার যেন দিশীর মত হয়।

বুইয়োঁ দিতে দিতে বললে, 'অটোকে খবর দিয়েছি।'

খানিকক্ষণ পরেই অটো এল।

স্বীকার করছি, প্রথম দর্শনেই ওকে আমার ভাল লাগে নি। জর্মনে যাকে বলে 'উন-আপেটীটলিষ্—অর্থাৎ 'আন-এপিটাইজিং'। পাঠক চট করে বলবেন, 'তা তো বটেই। এখন তুমি ক্যেটেতে মজেছ! সপত্নীকে আনএপিটাইজিং মনে হবে বইকি।' আমি সাফাই গাইব না, কিন্তু তবু বলি, এটুকু ছোকরার মুখে 'ধর্ম-ধর্ম' ভাব আমার বেখাপ্পা বেমানান, এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিফ ভণ্ডামি বলে মনে হয়। অটো ফ্রণ্টাল এটাক করলে। পাদ্রীরা যা আকছারই করে থাক। খুব সম্ভব, আমিই তার পয়লা শিকার। অন্য জর্মন যেখানে

ব্যক্তিগত প্রশ্ন শুধোয় না, সেখানে পাদ্রীদের চক্ষুলজ্জা অল্পই। পরে অবশ্য অনেকেই পোড় খেয়ে শেখে। শুধালে, 'আপনি খৃষ্টান নন?'

বললুম, 'আমি খৃষ্টান নই, কিন্তু খৃষ্টে বিশ্বাস করি।'

সাত হাত পানিমে"। শুধালে, 'সে কি করে হয়?'

আমি বললুম, 'কেন হবে না? খৃষ্টান বিশ্বাস করে, প্রভু যীশুই একমাত্র ত্রাণকর্তা। সেই একমাত্র ত্রাণকর্তাকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ না করলে মানুষ অনন্তকাল নরকের আগুনে জ্বলবে। আমি বিশ্বাস করি, প্রভু বুদ্ধ, হজরৎ মহম্মদে বিশ্বাস করেও ত্রাণ পাওয়া যায়। এমন কি কাউকে বিশ্বাস না করে আপন চেষ্টাতেও ত্রাণ পাওয়া যায়।'

গিলতে তার সময় লাগলো। বললে, 'প্রভু যীশুই একমাত্র ত্রাণকর্তা।'

আমি চুপ করে রইলুম। এটা একটা বিশ্বাসের কথা। আমার আপত্তি করার কি আছে।

কিন্তু এর পর যা আরম্ভ করলো সেটা পীড়াদায়ক। সর্ব ধর্মের মিশনারিই একটুখানি অসহিষ্ণু হয়। তাদের লেখা বইয়ে পরধর্মের প্রচুর নিন্দা থাকে। মিস মেয়োর বইয়ের মত। অতি সামান্য অংশ সত্য, বেশীর ভাগ বিকৃত সত্য, কেরিকেচার। গোড়ার দিকে আমি এ-সব জানতুম না। আমি বন্-এ যে পাড়াতে থাকি তারই গির্জাতে প্রতি রববারে যেতুম বলে গির্জার পাদ্রী আমাকে একখানা ধর্মগ্রন্থ দেন। তাতে পরধর্ম নিন্দা এতই বেশী যে মনে হয় মিস মেয়ো এ-বইখানাও লিখেছেন। অবশ্য এ-কথাও সত্য মানুষের ভদ্রতা জ্ঞান যত বাড়ছে এ-সব লেখা ততই কমে আসছে। একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি; ষাট সত্তর বছর আগে আমাদের দেশের খবরের কাগজে, মাসিকে তর্কাতর্কির সময় যে সৌজন্য দেখানো হত আজ আমরা তার চেয়ে অনেক বেশী দেখাই। এবং এ-কথাও বলে রাখা ভালো যে এ-সংসারে হাজার হাজার মিশনারি আছেন, যাঁরা কখনো পরনিন্দা করেন না। শত শত মিশনারি পরধর্মের উত্তম উত্তম গ্রন্থ আপন মাতৃভাষায় অনুবাদ করে আপন আপন ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছেন, দুই ধর্মকে একে অন্যের কাছে টেনে এনেছেন।

কিন্তু এই গ্রামের ছেলে অটো এসব জানবে কোথা থেকে? সে কখনো নিগ্রোদের নিন্দা করে, কখনো পলিনেশিয়াবাসীর, কখনো, বা হিন্দু-মুসলমানের। এ সবই তার কাছে বরাবর।

আমি এক জায়গায় বাধা দিয়ে বললুম, হ্যের অটো! অন্যের পিতার নিন্দা না করে কি আপন পিতার সুখ্যাতি গাওয়া যায় না?'

বেশ গরম সুরে বললে, 'আমি অসত্যের নিন্দা করছি।'

আমি বিনীত কণ্ঠে বললুম, 'প্রভু যীশু বলছেন, ভালোবাসা দিয়ে পাপী-তাপীর চিত্ত জয় করবে।'

ক্যেটে লম্বা এক ঢোক বিয়ার গিলে, গেলাসটা ঠক করে টেবিলে রেখে বললে, 'হক্ কথা।'

'স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে ঘটেছে সংগ্রাম'—কিন্তু যখন সংগ্রামটা স্বার্থে স্বার্থে না হয়ে আদর্শে আদর্শে হয় তখন সেটা হয় আরো দীর্ঘস্থায়ী এবং প্রাণঘাতী। কারণ খাঁটি মানুষ অনায়াসে স্বার্থ ত্যাগ করতে রাজী হয় কিন্তু আদর্শ বর্জন করতে রাজী হয় না।

অটোকে যদিও প্রথম দর্শনে আমার ভালো লাগে নি, তবু তর্ক করতে করতে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, সে খাঁটি। সে স্থির করেছে, সর্বস্ব ত্যাগ করে ধর্মপ্রচার করবে। সেটা যে ক্যেটের স্বার্থের সঙ্গে সংঘাতে এসেছে তা নয়—ক্যেটেও খাঁটি মেয়ে, স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত—ক্যেটে দেখছে, তার মার বয়েস হয়েছে, তার ছোট বোনকে ভালো যৌতুক দিয়ে বিয়ে দিতে হবে, পরিবারের মঙ্গল কামনা তার আদর্শ। দুই আদর্শ-সংঘাত! এ সংগ্রামে সন্ধি নেই, কম্প্রমাইস হতেই পারে না।

অটোকে বোঝানো অসম্ভব, খৃষ্টধর্মের প্রতি তার যে রকম অবিচল নিষ্ঠা, দৃঢ় বিশ্বাস ঠিক তেমনি বৌদ্ধ শ্রমণ রয়েছেন, মুসলমান মিশনারি আছেন—আপন আপন ধর্মের প্রতি এঁদের নিষ্ঠা, এঁদের বিশ্বাস কিছুমাত্র কম নয়। অটোর কেমন যেন একটা আবছা-আবছা বিশ্বাস, এরা সব কেমন যেন একটা মোহাচ্ছন্ন অবস্থায়, একটা মায়ার ঘোরে আছে—খৃষ্টের বাণী তাদের সামনে একবার ভালো করে তুলে ধরতে পারলেই ওরা তৎক্ষণাৎ সত্য ধর্মে আশ্রয় নেবে।

ততক্ষণে আমি বিলক্ষণ বুঝে গিয়েছি, অটোর সঙ্গে তর্কাতর্কি বা আলোচনা করা নিষ্ফল। সে তার পথ ভালো করেই ঠিক করে নিয়েছে। এবং সেটা যখন খৃষ্টের পথ, তবে চলুক না সে সেই পথে।

আমি বললুম, 'হ্যার অটো! আমার একটি নিবেদন শুনুন। আমি ছেলেবেলায় গিয়েছি পাদ্রী ইস্কুলে, আমার প্রতিবেশীরা ছিল সব হিন্দু। ভিন্ন ধর্মের খুব কাছে আপনি কখনো আসেন নি—কাজেই আমার মনের ভাব আপনি বুঝতে পারবেন না আপনারটাও আমি বুঝতে পারবো না। আমার শুধু একটি অনুরোধ—যেখানেই ধর্মপ্রচার করতে যান না কেন, প্রথম বেশ কিছুদিন সে দেশবাসীর শাস্ত্র, আচার-ব্যবহার, সামাজিক প্যাটার্ন ভালো করে দেখে নেবেন, শিখে নেবেন, তার পর যা করবার হয় করবেন।'

অটোর চোখ-মুখের ভাব থেকে অনুমান করতে পারলুম না, আমার পরামর্শটা তার মনে গিঁথেছে কি না। এতক্ষণ আমি তক্কে তক্কে ছিলুম, কি করে এ-আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে অন্য দিকে চলে যাওয়া যায়। তাই শুধালুম, 'আপনি কোন্ দেশে ধর্মপ্রচার করতে যাবেন?'

অটো বললে, 'এখনো ঠিক করি নি।'

আমি তৎক্ষণাৎ আলোচনার মোড় নেবার সুযোগ পেয়ে গেলুম—বললুম, 'ভারতবর্ষ, ইরান, আরব এ সবের কোনো একটা দেশে যাবেন। অর্থাৎ যেখানকার লোকের রঙ আমার মত বাদামী। এরাই ভগবানের সর্বোত্তম সৃষ্টি।'

অটো বুঝতে না পেরে বললে, 'কেন ?'

ক্যেটে বলল, 'আমরা জর্মনরা চামড়ার বাদামী রঙ পছন্দ করি বলে ?' অটো কেমন যেন একটু ঈর্ষার নয়নে আমার দিকে তাকালে। বাঁচালে ! ক্যেটের প্রতি তার সর্ব দুর্বলতা তা হলে এখনো যায় নি।

আমি বললুম, 'বুঝিয়ে বলি। সৃষ্টিকর্তা যখন মানুষ গড়তে প্রথম বসলেন, তখন এ বাবদে তাঁর বিলকুল কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। প্রথম সেট্ বানানোর পর সেটা 'বেক' করার জন্য ঢোকালেন "বেকিং বক্সে"। যতখানি সময় বেক করার প্রয়োজন তার আগেই বাক্স খোলার ফলে সেগুলো বেরোল 'আণ্ডার-বেক্ট্' সাদা সাদা। অর্থাৎ তোমরা, ইয়োরোপের লোক। পরের বার করলেন ফের ভুল। এবারে রাখলেন অনেক বেশী সময়। ফলে বেরোল পুড়ে-যাওয়া কালো কালো। এরা নিগ্রো। ততক্ষণে তিনি টাইমিংটি ঠিক বুঝে গেছেন। এবারে বেরুল উত্তম 'বেক্'-করা সুন্দর ব্রাউন-ব্রেড। অর্থাৎ আমরা, ইরানী, আরব জাত।'

ক্যেটে হাসতে হাসতে তখন পুনরায় আরম্ভ করলো ভারতীয় নর্তকী-সৌন্দর্য-কীর্তন। এবারে অটোর হিংসা করার কিছু নেই—কারণ প্রশংসাটা হচ্ছে মেয়েদের। কিন্তু মানব-সৃষ্টিরহস্যের গল্পটা শুনে সে প্রাণভরে হাসলে না। নিছক ভদ্রতা রক্ষা করার জন্য কেমন যেন শুকনো শুকনো।

আমি বললুম, 'আর প্রভু খৃষ্টও তো ছিলেন বাদামী। তাঁর আমলের কিছু কিছু ইহুদী এখনো প্যালেস্টাইনে আছে। তাদের বর্ণসংকর দোষ নেই। এখনো ঠিক সেই সুন্দর বাদামী রঙ, মিশমিশে কালো-নীল চুল। ইণ্ডিয়া যাবার পথে প্যালেস্টাইনে দেখে নেবেন।'

ক্যেটে অভিমান-ভরা সুরে বললে, 'তুমি দেখি অটোকে দেশছাড়া করার জন্য সাত-তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে লেগেছো !'

আমি সপ্রতিভ কণ্ঠে উত্তর দিলুম, 'কেন, তুমি কি ওর সঙ্গে যাচ্ছো না ?'

অটো বললে, 'ওর অভাব কি ? সৌন্দর্যদানে তো ভগবান ওর প্রতি কার্পণ্য করেন নি।'

ক্যেটে রোষ-কষায়িত লোচনে অটোর দিকে তাকালো। মন্তব্যটা আমারও মনে বিরক্তির সঞ্চার করলো। এতক্ষণ ধর্ম নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল বলে ওকে কোনো প্রকারের আঘাত না দেবার জন্য টাপে-টোপে কথা বলছিলুম, এখন আর সে পরোয়া নেই। বাঁকা হাসিটাকে প্রায় চক্রাকারে পরিবর্তিত করে বললুম, 'আপনি বুঝি ধরে নিয়েছেন, প্রত্যেক পরিবর্তনই প্রগতি, এবং পরিবর্তনটা করা হবে ঝটপট ! আজ আছ মুসলমান, কাল হয়ে যাও খৃষ্টান ; আজ ভালবাসো অটোকে, কাল ভালবেসে ফেলো ডাভিড্ কিংবা ফ্রীডরিষকে ! যেমন এখন খাচ্ছো বিয়ার, পরে গেলাস ভরে নাও লেমনেড দিয়ে ! না ?'

অটোর আঁতে খানিকটে লেগেছে। তাই শুষ্ককণ্ঠে বললে, 'মিথ্যা প্রতিমা (ফল্স্ আইডল্স্) যতদূর সম্ভব শীঘ্র বর্জন করে সত্যধর্মে আশ্রয় নেওয়া উচিত।'

আমি রীতিমত রাগত কণ্ঠে বললুম, 'মিথ্যা প্রতিমা! নরনারীর প্রেম মিথ্যা, আর কোথায় কোন্ আফ্রিকার জঙ্গলে পড়ে আছে নিগ্রো তার মাম্বো জাম্বো নিয়ে—হয়তো সুখেই আছে, শান্তিতেই আছে—তাকে তার 'অজ্ঞতা', 'কুসংস্কার', 'পাপ' সম্বন্ধে সচেতন করাই সব চেয়ে বড় সত্য!

শুনুন হ্যার অটো। আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, যে লোক ঐশীবাণীর স্পন্দন তার হৃদপিণ্ডে অনুভব করেছে তার 'কিছু বাকি থাকে না'—আমাদের দেশের গ্রাম্য সাধক পর্যন্ত গেয়েছে, 'যে জন ডুবলো সখী তার কি আছে বাকি গো'?

কিন্তু ধর্মের দোহাই, নরনারীর প্রেম অবহেলার জিনিস নয়। আপনি রাগ করবেন না, আমি জিজ্ঞেস করি, আজ যে আপনি প্রভু যীশুকে ভালবাসতে শিখেছেন, তার গোড়াপত্তন কি ক্যেটের প্রতি আপনার প্রথম প্রেমের উপর নয়?

টায়-টায় মিলবে না, তবু একটি উদাহরণ দিই। আমার একজন আত্মীয়া উনিশ-বিশ বৎসর অবধি তার মাকে বড্ড অবহেলা এমনকি তাচ্ছিল্য করতো। তার-পর তার বিয়ে হল, বাচ্চা হল। তখন সে জীবনে প্রথম বুঝতে পারলো বাচ্চার প্রতি মা'র ভালোবাসা কি বস্তু। তখন সে ভালোবাসতে শিখল আপন মাকে।

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে আপনার ধর্মের অনেকখানি মিল আছে। সংসারাশ্রম ত্যাগ করে, সন্ন্যাসী হয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করাই সে ধর্মের অনুশাসন। অথচ জানেন, সে ধর্মেও মায়ের আসন অতি উচ্চ। বুদ্ধদেব যখন তাঁর প্রধান প্রধান শিষ্যদের নিয়ে ধর্মালোচনা করতেন তখন তাঁর একমাত্র কিশোর পুত্র রাহুল অত্যন্ত বিমর্ষ বদনে এক কোণে বসে থাকতো—সে তো শ্রমণ নয়, তার তো কোনো আসন নেই সেখানে। আপন পিতা বুদ্ধদেব পর্যন্ত শিষ্য মহামৌদ্গল্যায়ন, সারিপুত্তের সঙ্গে যে রকম সানন্দে কথা বলেন, তার সঙ্গে সে রকম ব্যবহার করেন না। তখন রাহুল স্থির করলেন, সন্ন্যাস নেবেন বলে। সে-কথা শুনতে পেয়ে রাহুল-জননী যশোধারা নিরাশকণ্ঠে বলেছিলেন, 'আর্য-পুত্র আমাকে বর্জন করেছেন, আমি তাঁকে পেলুম না। তিনি সিংহাসন গ্রহণ করলেন না, আমিও পট্ট-মহিষী হওয়ার গৌরব থেকে বঞ্চিত হলুম। এখন বুঝি তিনি আমার শেষ-আশ্রয়ের স্থল যুবরাজ রাহুলকেও আমার কোল থেকে কেড়ে নিতে চান!" একথা শুনতে পেয়ে বুদ্ধদেব অনুশাসন করেন, "মাতার অনুমতি ভিন্ন কেউ শ্রমণ হতে পারবে না।" আড়াই হাজার বছর হয়ে গেছে—এখনও সে অনুশাসন বলবৎ। আমার আশ্চর্য বোধ হয়, হ্যার অটো! মাতা হয়তো নিরক্ষরা, কুসংস্কারাচ্ছন্না। কিন্তু তারই উপর নির্ভর করছে, পুত্রের আদর্শবাদ, সদ্ধর্ম গ্রহণ, সব কিছু। সেই মূর্খা মাতা অনুমতি দিলে সে সব চেয়ে মহৎ কর্ম প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারবে না—আজ আপনি যে রকম করতে পারছেন। আর এ তো আবার প্রেম।

"ভগবান কোথায়?"—নাস্তিক জিজ্ঞেস করেছিল সাধুকে, আমার যতদূর মনে পড়ছে খৃষ্টান সাধুকেই। কৃচ্ছ্রসাধনাসক্ত, দীর্ঘ তপস্যারত চিরকুমার সাধু বলেছিলেন, "তরুণ-তরুণীর চুম্বনের মাঝখানে থাকেন ভগবান"।

আমি বললুম, 'শ্রীমতী ক্যেটে, কাল ভোরে আমি বেরবো।'

ইতিমধ্যে তিনটি দিন কেটে গিয়েছে। ফিল্ম-স্টারের আদরে কদরে। শরীর একটু সুস্থ বোধ হলেই নিচের পাবে এসে বসেছি, ক্যেটের কাউণ্টারের নিকটতম সোফায়। তারও বোধ হয় মনে রঙ ধরেছে। কিংবা তার কপাল ভালো,—কি করে যেন 'বারে'র একটা ঠিকে জুটে গিয়েছে বলে অধিকাংশ সময় তার বিয়ারের মগসহ আমার সামনে বসে। আর যখন মৌজে ওঠে তখন সোফায় এসে আমার গা ঘেঁষে। অটোও প্রতি রাত্রে এসেছে। আমাদের যতখানি ভাব জমেছে ক্যেটে সেটা অটোর কাছ থেকে লুকোবার চেষ্টা করে নি। অটোর হাব-ভাব দেখে অনুমান করলুম, সে পড়েছে ধন্দে। অস্কার ওয়াইল্ড্ বলেছেন, 'আমাদের প্রত্যেকের কাছে এমন একাধিক জিনিস আছে যেগুলো আমরা স্বচ্ছন্দে পথের ধুলোয় ছুঁড়ে ফেলে দিতুম, যদি না জানতুম, অন্য লোকে সেগুলো তৎক্ষণাৎ কুড়িয়ে নেবে।' অটো ভাবছে সে ক্যেটেকে কবুল জবাব দেওয়া মাত্রই আমি তাকে লুফে নিয়ে বটন-হোলে বসরাই গোলাপের মত গুঁজে নেব।

একবার শুধু অটোকে বলেছিলুম, 'আপনাদের কবি গ্যেটে অতুলনীয়। সুদূর ভারতের আমরা যে হীদেন, আমরাও তাঁকে সম্মান করি। তিনি বলেছেন,

'দূরে দূরে তুমি কেন খুঁজে মরো
হেরো প্রেম সে তো হাতের কাছে,
শিখে নাও শুধু তারে ধরিবারে
সে তো নিশিদিন হেথায় আছে।'

'Willst du immer weiter schweifen ?
Sieh, das Gute liegt so nah.
Lerne nur das Glueck ergreifen,
Denn das Glueck ist immer da.'

অটো এর উত্তরে কিছু না বলে শুধু অন্য কথা পেড়ে আমাকে বলেছিল, 'আপনি এখানে আরো কিছুদিন থাকুন। আস্তে আস্তে সব কথাই বুঝতে পারবেন।'

এ আরেক প্রহেলিকা !

ক্যেটে চালাক মেয়ে। আমার উড়ুক্কু ভাব বুঝতে পেরে আমাকে কিছুতেই বিদায় নেবার প্রস্তাব পাড়তে দেয় না। কী করে যে বুঝে যায়, কথার গতি ঐদিকে মোড় নিচ্ছে আর অমনি দুম্ করে ভারতবর্ষের ফকীরদের কাহিনী শুনতে চায়, আমার মা বছরে ক'বার তার বাপের বাড়ি যায়—অতিশয় ধূর্ত মেয়ে, কি করে যে বুঝে গেছে আমি আমার মায়ের গল্প বলতে সব সময়ই ভালোবাসি, আমিও একবার মূর্খের মত বলেছিলুম, মায়ের গল্প সব গল্পের মা—মা চলে গেলে বাড়ি চালায় কে, আরো কত কী ?

আর আমিও তো অতটা নিমক-হারাম নই যে এতখানি স্নেহ-ভালবাসা পাওয়ার পর হঠাৎ বলে বসবো, 'আমি চললুম।' যেন পচা ডিমের ভাঙা খোসাটা জানালা দিয়ে ফেলে দেবার মত ওদের বাড়ি বর্জন করি।

শেষটায় মরীয়া হয়েই প্রস্তাবটা পাড়লুম।

ক্যেটে বললে, 'কেন? এখানে আরো কয়েকটা দিন থাকতে আপত্তি কি? তুমি যে ঘরটায় আছো সেটা সাড়ে এগারো মাস ফাঁকা থাকে, খদ্দেরদের জন্য এখানে প্রতিদিন রান্না হয় অন্তত তিরিশটা লাঞ্চ-ডিনার। একটা লোকে বেশী খেল কি কম খেল তাতে কি যায় আসে?'

আমি বললুম, 'আমি আর তিনদিন থাকলেই তোমার প্রেমে পড়ে যাব।'

আমি ভেবেছিলুম, ক্যেটে বলবে, 'তাতে ক্ষেতিটা কি?' সে কিন্তু বললে অন্য কথা। এবং অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে। বললে, 'কোনো ভয় নেই তোমার। তোমার স্বভাব প্রেমের লক্ষণে দীন (যেন, হুবহু রবীন্দ্রনাথের ভাষা)। মানুষ হঠাৎ একদিন প্রেমিক হয় না। যে প্রেমিক, সে প্রেমিক হয়েই জন্মায়। কিংবা যেমন কেউ বাঁকা নাক নিয়ে। যাদের কপালে প্রেমের দুর্ভোগ আছে তাদের জন্ম থেকেই আছে। তোমার সে ভয় নেই।'

আমি চুপ করে রইলুম।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'অটো যত দূরে চলে যাচ্ছে আমার জীবনটা ততই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। এই যে তোমার প্রিয় কবি হাইনরিষ হাইনে তাঁরই একটি কবিতা আছে—

গোলাপ, কমল, কপোত, প্রভাত রবি—
ভালবাসিতাম কত যে এসব আগে,
সে সব গিয়েছে, এখন কেবল তুমি,
তোমারি মূর্তি পরাণে কেবল জাগে!
নিখিল প্রেমের নির্ঝর—তুমি, সে সবি—
তুমিই গোলাপ, কমল, কপোত, রবি।[১]

কবি একদিন তাঁর প্রিয়াতেই গোলাপ, কমল, কপোত সবই পেয়ে গেলেন। কিন্তু তারপর আরেকদিন যখন তাঁর প্রিয়া তাঁকে ছেড়ে চলে গেল তখন কি তিনি সঙ্গে সঙ্গে আবার গোলাপ কমলকে ভালোবেসে সে অভাব পূর্ণ করতে পারলেন? আমার হয়েছে তাই। এ তো আর চটিজুতো নয় যে, যখন খুশী পরলে যখন খুশী ছুঁড়ে ফেলে দিলে। এ যেন নির্জন দ্বীপে পেঁছে নৌকো-টাকে পুড়িয়ে দেওয়া। তারপর একদিন যখন ভূমিকম্পে দ্বীপটি সমুদ্রে বিলীন হয়ে গেল তখন তুমি যাবে কোথা?'

এর উত্তর আমার ঘটে নেই। তাই অন্য পন্থা ধরে বললুম, 'তোমার বয়স আর কতটুকু? এত শিগগির নিরাশ হয়ে গেলে চলবে কেন?'

ইতিমধ্যে অটো এসে পড়াতে আমাদের এ আলোচনা বন্ধ হল। অটোকে-

১ যতীন্দ্রমোহন বাগচীর অনুবাদ।

অশেষ ধন্যবাদ। তাকে বললুমও, 'অটো, আপনি অনেক লোকের বহু উপকার করবেন।'

অটো বুঝতে না পেরে বললে, 'কি রকম?'

আমি বললুম, 'পরে বলবো। আমি কাল চললুম।'

অটো কিছু বলার পূর্বেই ক্যেটে আমাকে বললে, 'কিন্তু তুমি তো এখনো আমার গান শোনো নি।'

অটো বললে, 'ও সত্যি খুব ভাল গাইতে পারে।'

আমি বললুম, 'ক্যেটে, ডার্লিং, একটা গাও না।'

'পাবে'র এক প্রান্তে গ্র্যান্ড পিয়ানো। প্রায়ই দেখেছি, সেলারদের একজন কিংবা ক্যেটে স্বয়ং সেটা বাজায়, আর বাকিরা নাচে।

ক্যেটে স্টুলে বসে মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করে বাজাতে আরম্ভ করলে। তার পরেই গান,

তুমি তো আমার
আমি তো তোমার
এই কথা জেনো,
দ্বিধা নাহি আর।
হিয়ার ভিতরে
তালা চাবি দিয়ে
রাখিনু তোমারে
থাকো মোরে নিয়ে
হারায়ে গিয়েছে
চাবিটি তালার
নিষ্কৃতি তব
নাই নাই আর।[১]

গান শেষ হলে ক্যেটে দৃপ্তপদে ফিরে এসে অটোর মুখোমুখি হয়ে তাকে শুধালে, 'অটো, এ গানটা তুমিই আমাকে শিখিয়েছিলে না?'

---

১ Du bist min, ich bin din :
des solt du gewis sin.
du bist beslozzen
in minem herzen :
verlorn its daz sluezzelin :
du most immer drinne sin.
(দ্বাদশ শতাব্দীর লোকসঙ্গীত)

'বলা বাহুল্য' যে কতখানি বলা বাহুল্য এই প্রথম টের পেলুম। ক্যেটের কাছ থেকে বিদায় নেওয়াটা যে উভয়ের পক্ষেই বেদনাদায়ক হয়েছিল সেটা বলা বাহুল্য, না বলাও বাহুল্য।

ধোপার কালি দিয়ে সে আমার শার্টটার ঘাড়ের ভিতরের দিকে তাদের বাড়ির ফোন নম্বর ভালো করে লিখে দিয়ে বলল, 'দরকার হলে আমাকে ফোন করো।'

আমি শুধালুম, 'আর দরকার না হলে?' এটা ইডিয়টের প্রশ্ন। কিন্তু আমি তখন আর কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। ক্যেটে কোনো উত্তর দিলে না। ইতিমধ্যে ক্যেটের মা বোন এসে পড়াতে আমি যেন বেঁচে গেলুম।

ক্যেটের মা আমার গলায় একটি ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ক্ষুদ্র মূর্তি ঝুলিয়ে দিলেন। চমৎকার সূক্ষ্ম, সুন্দর কাজ করা। এখনো আছে।

* * *

প্রথমটায় রাইনের পাড়ে পাড়ে সদর রাস্তা দিয়েই এগিয়ে চললুম।

এদেশের লোক বিদেশীর প্রতি সত্যই অত্যধিক সদয়। পিছন থেকে যে সব গাড়ি আসছে তাদের ড্রাইভার সোওয়ার আমার ক্ষুদ্রাকৃতি, চামড়ার রঙ আর বিশেষ করে চলার ধরন দেখে বুঝে যায় আমি বিদেশী আর অনেকেই—কেউ হাত নেড়ে, কেউ গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করে লিফট চাই কিনা। আমি মৃদু হাসির ধন্যবাদ জানিয়ে হাত নেড়ে ওদের এগোতে বলি।

মনে মনে বলি, এও তো উৎপাত। আচ্ছা, এবারে তা হলে গাঁয়ের রাস্তা পাওয়া মাত্রই মোড় নেব। এমন সময় একখানা ঝাঁ-চকচকে মোটর আমার পাশে এসে দাঁড়াল। ওনার ড্রাইভার। দরজা খুলে দিয়ে আমার দিকে তাকালে। আমি যতই আপত্তি জানাই সে ততই একগুঁয়েমির ভাব দেখায়। শেষটায় ভাবলুম, 'ভালোই, ক্যেটের থেকে যত তাড়াতাড়ি দূরে যাওয়া যায় ততই ভালো।' গাড়ীতে বসে বললুম, 'ধন্যবাদ।'

ভদ্রলোক বললেন, 'মোটেই না। এই হল বুদ্ধিমানের কাজ।' তারপর শুধোলে, 'ইণ্ডার?'

এই প্রথম একটা বিচক্ষণ লোক পেলুম যে প্রথম দর্শনেই ধরে ফেলেছে, আমি কোন্ দেশের লোক। এস্কিমো বা মঙ্গলগ্রহবাসী কিনা, শুধলো না।

বললে, 'কোথা যাবে।' ভদ্রতার খুব বেশী ধার ধারে না।

'ইণ্ডিয়া।'

আদপেই বিচলিত না হয়ে বললে, 'তাহলে তো অনেকখানি পেট্রল নিতে হবে। ঠিক আছে। সামনের স্টেশনেই নিয়ে নেব। তা আপনি বন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়েন—না?'

শার্লক হোম্‌সের জর্মন মামা ছিল নাকি? পরিষ্কার ভাষায় সেটা শুধালুমও।

হেসে বললে, 'না। শুনুন। আচ্ছা, আপনি লেফারকুজেন ফার্বেন

ইনডুস্ট্রির নাম শুনেছেন ? দুনিয়ার সব চেয়ে বড় না হোক—দুসরা কিংবা তেসরা, রঙ আর ওষুধ বানায় ?

আমি অজ্ঞতা স্বীকার করলুম।

বললে, 'আমি সেখানে কাজ করি। এখন হয়েছে কি, আমরা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই বহুত কিছু বেচি। ইণ্ডিয়াও আমাদের বড় মার্কেট। একটা ওষুধের বিজ্ঞাপন ছাপতে গিয়ে দেখি তাতে ইণ্ডিয়ার যা খরচা পড়বে তার চেয়ে অনেক কম খরচায় হবে এখানে। ইণ্ডিয়া থেকে ছবি ক্যাপশন আনিয়ে এখানে জোড়াতালি লাগিয়ে ছাপতে গিয়ে হঠাৎ মনে হল, এ জোড়াতালি লাগানোতে যদি উল্টো-পাল্টা হয়ে গিয়ে থাকে তবেই তো সর্বনাশ। ছাপা হবে তিন লক্ষখানা—তদুপরি মেলা রঙ-বেরঙের ছবি। খরচাটা কিছু কম হবে না—যদিও ঐ যা বললুম, ইণ্ডিয়ার চেয়ে অনেক কম। তাই ভাবলুম, ওটা কোন ইণ্ডিয়ানকে দেখিয়ে চেক আপ করে নিই। আমাদের লেফারকুজেন শহরে কোনো ভারতীয় নেই। কাছেই কলোন বিশ্ববিদ্যালয়। গেলুম সেখানে। তারা তাদের নথিপত্র ঘেঁটে বললে, ভারতীয় ছাত্র তাদের নেই, তবে পাশের বন্ শহরে থাকলে থাকতেও পারে—সেখানে নাকি বিদেশীদের ঝামেলা। কি আর করি, গেলুম সেখানে। সেখানেও গরমের ছুটির বাজার। সবাই নাকে কানে ক্লোরোফর্ম—আমাদের কোম্পানীরই হবে—ঢেলে ঘুমুচ্ছে। অনেক কষ্ট করে একজন ইণ্ডারের নাম বাড়ির ঠিকানা বের করা গেল। তার বাড়ি গিয়ে খবর নিতে জানা গেল সে মহাত্মাও বেরিয়েছেন হাইকিঙে। লাও! বোঝো ঠ্যালা! এসেছিস তো বাবা তিন হাজার না পাঁচ হাজার মাইল দূরের থেকে! তাতেও মন ভরলো না। এবার বেরিয়েছেন পায়ে হেঁটে আরো এগিয়ে যেতে। আমার আরো কাজ ছিল মানহাইমে। ভাবলুম রাস্তায় যেতে যেতে নজর রাখবো ইণ্ডারপানা কেউ চোখে পড়ে কি না। তারপর এই আপনি।'

আমি বললুম, 'আমি ইণ্ডার নিশ্চয়ই, কিন্তু তাতে আপনার সমস্যার সমাধান হবে কি না বলা কঠিন। ইণ্ডিয়াতে খান তেরো-চোদ্দ ভাষা। তার সব কটা তো আর আমি জানি নে।'

বললে, 'সর্বনাশ! তা হলে উপায় ? সেই জোড়াতালির মাল ইণ্ডিয়া পাঠাব, সেটা ফিরে আসবে, তবে ছাপা হবে, ওতে করে যে মেলা দেরি হয়ে যাবে।'

আমি শুধালুম, 'ইণ্ডিয়ার কোন্ জায়গাতে সেটা তৈরি করা হয়েছে মনে পড়ছে কি ?

বললে, 'বিলক্ষণ! কালকুট্টা।'

আমি বললুম, 'তা হলে বোধ হয় আপনার মুশকিল আসান হয়ে যাবে। অবশ্য জোর করে কিছু বলা যায় না। কারণ কলকাতার শহরেও সাড়ে বত্রিশ রকম ভাষায় কাগজপত্র ছাপা হয়।'

বেশ সপ্রতিভ কণ্ঠেই বললে, 'আর শুনুন। আমরা কোনো কাজই কী করাই নে। আপনি বললেও না।'

আমি বললুম, 'আপনি কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনাদের মহাকবি হাইনরিষ হাইনের আমি অন্ধ ভক্ত। তাঁর সর্বক্ষণই লেগে থাকতো টাকার অভাব। পেলেই খরচা করতেন দেদার এবং বে-এক্তেয়ার। তিনি বলেছেন, "কে বলে আমি টাকার মূল্য বুঝি নে? যখনই ফুরিয়ে গিয়েছে, তখনই বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছি।" আমার বেলাও তাই। আপনি নির্ভয়ে আপনার মাল বের করুন।'

জর্মন বললে, 'ঐ তো ডবল সর্বনাশ! আমি সেটা সঙ্গে আনি নি। মোটরে তেল-মেলের ব্যাপার, জিনিসটা জখম হয়ে যেতে পারে সেই ভয়ে। তার জন্য কোনো চিন্তা নেই। সামনের কোব্‌লেন্‌ৎস্‌ শহরে সব চেয়ে দামী হোটেলের ম্যানেজার আমার বন্ধু, অতিশয় পণ্ডিত এবং সজ্জন। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তার সঙ্গে দু' দণ্ড রসালাপ করে সত্যিই আপনি আনন্দ পাবেন। আপনার হোটেল খরচা অতি অবশ্য আমাদের কোম্পানিই দেবে। আমিও প্রতিবার মানহাইম যাবার সময় সেখানে দু রাত্তিরই কাটিয়ে যাই। আপনাকে তার কাছে বসিয়ে আমি লেফারকুজেন যাবো আর আসবো।'

মোটর থামলো।

বাপস! রাজসিক হোটেল। ম্যানেজারটির চেহারাও যেন রাজপুত্তুর।

আরামসে বসেছি। হোটেল খরচা দিতে হবে না। পকেটে একশ মার্ক।

ম্যানেজারের সঙ্গে গালগল্প করলুম। রাত এগারোটায় সেই জর্মন ফিরে এল। কাজকর্ম হল। আরো একশ টাকা পেলুম।

কিন্তু বাধ সাধল পাশের ঐ টেলিফোনটা। বার বার লোভ হচ্ছিল ক্যেটেকে একটা ফোন করি।

মুসাফির

কৈফিয়ৎ

এ পুস্তকের একটি ক্ষুদ্র মুখবন্ধের প্রয়োজন আছে।

একাধিক খ্যাতনামা ভূপর্যটক পরিণত বয়সে নাকেখৎ দিয়ে অসঙ্কোচে স্বীকার করেছেন, উঠান-সমুদ্র পেরিয়ে বাড়ির বাইরে বেরনোটাই মূর্খামির চূড়ান্ত নিদর্শন। খ্যাতনামা লেখক না হয়েও আমি এ-সব প্রাতঃস্মরণীয়দের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলছেন কি, ভ্রমণ-কাহিনী লিখে সে মূর্খামির চূড়ান্ত পরিচয়টি তাঁরা দিতে গেলেন কেন?

১৯২৭ থেকে আপনাদের বংশবদ এ-লেখক ঘরছাড়া। মাঝে-মধ্যে দু'চার বছরের জন্য হেথা হোথা সে আশ্রয় পেয়েছিল বটে কিন্তু গৃহনির্মাণ করার সুযোগ সে কখনো পায় নি। ফের পথে নামতে হয়েছে। সে নিয়ে ফরিয়াদ করি নে। একদা নাবিকজনের অধিকাংশই সমুদ্রে মারা যেত। তাদের যে-সব ভীতু ছেলে ভাইপো সমুদ্রযাত্রা করতো না তারা মরতো বাড়িতে। ফল তো একই। আমার বেলা আরো একটা ভয় আছে। উঠান-সমুদ্র পেরিয়ে অপকর্ম করেছি সে পাপ তো এইমাত্র স্বীকার করলুম, কিন্তু বাড়ি থেকে না বেরুলে যে আরো মেলা জব্বর জব্বর ব্রহ্মহত্যা করতুম না সে ভরসা দেবেন কোন গোসাঁই? অর্বাচীন জনই মন্তব্য করে, হিটলার যদি অমুক ভুলটা না করতেন তবে তিনি আখেরে বিজয়ী হতেন—ঐ ভুলটা না করলে তিনি যে পরে গণ্ডা দশেক ততোধিক মহামারাত্মক ভুল করতেন না সে আশ্বাস দেবেন কোন বিধানরাজ!

তবে এ-সত্য আমি বারবার বলবো, আমি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছি অতিশয় অনিচ্ছায়—গত্যন্তর ছিল না বলে। প্রতি আশ্রয় লাভের পর ফের যে বেরিয়েছি সেটা আরো বেশী অনিচ্ছায়—নিতান্ত বাধ্য হয়ে।

এবং শেষ মোক্ষম পাপাচার স্বীকার করছি, যে-পাপ কৃতী পর্যটককে আদৌ স্বীকার করতে হয় নি, কারণ তাঁরা আপন আপন সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে পুনরায় অপাপবিদ্ধ হতে পেরেছিলেন, আমার তরে সে-দুয়ার বন্ধ। আমার মোক্ষমতম গুরুপাপ—আমি ভ্রমণকাহিনী (তথা অন্যান্য সর্ববিধ রচনা) লিখেছি সর্বাধিক অনিচ্ছায়।

অসহিষ্ণু পাঠক শুধোবেন, আমরা ক্যাথলিক পাদ্রী নাকি যে বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ তুমি আপন পাপ কনফেস্ করতে আরম্ভ করলে?

না, আপনারা অতি অবশ্যই পাদ্রী নন। কারণ শুধু পাদ্রী কেন, সর্ব সম্প্রদায়ের আচার্যগণকেই ধর্মাদর্শ অক্ষত রাখবার জন্য প্রায়ই কঠোর কঠিন হতে হয়। পক্ষান্তরে, যে-সব পাঠক এতদিন ধরে আমার রচনা বরদাস্ত করে এসেছেন তাঁরা অকরুণ হবেন কি প্রকারে? আর আমি মোল্লা পুরুত পাবই বা কোথায়? এবং অতিশয় শ্লাঘাভরে উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করছি আমার পাঠকই আমার মোল্লা, আমার পুরুৎ। একমাত্র তার কাছেই আমার সর্ব অক্ষমতার ভার নামানো যায়।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, ১৯২৭-এ আমি গৃহহারা হই। প্রথম দু'বৎসরের কাহিনী আমি সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় কীর্তন করি নি। সে-ইচ্ছাটার পিছনে যে ছিল সে বহুকাল হল জিন্নৎবাসিনী। সে করুণ কাহিনী থাক্।

তার পরের দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর বৎসরের প্রতিবেদন আমারই মত ছন্নছাড়া দেশকালপাত্র মেনে নিয়ে সেটা মিষ্ট এবং সংস্কারিত হয় নি কারণ, চিরাচরিত আপ্ত বাক্য আছে "যাহা অল্প তাহাই মিষ্ট"—কাজেই সংক্ষিপ্ত না হয়ে সে হয়েছে ক্ষিপ্ত।

সে সম্বন্ধে অল্পবিস্তর সবিস্তর আলোচনা করেছি—এ-পুস্তকের ত্রেতাপর্বে যাঁরা আমার নতিস্বীকার, অর্ধসিদ্ধ কনফেশন সম্বন্ধে উদাসীন তাঁরা সে যুগটি অবহেলাভরে বর্জন করলে ধূলিপরিমাণও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। আর যাঁরা ক্ষিপ্তের তাণ্ডবে কোনো সঙ্গতি আছে কিনা (মেথড্ ইন্ ম্যাড্নেস্) সেটা নিজের মুখে ঝাল খেয়ে রগড় দেখতে চান, কিম্বা যারা আমার অসংলগ্ন খণ্ড-প্রতিবেদন সমষ্টিকে শ্রেণীবদ্ধ করার বন্ধ্যাগমনসুলভ নিষ্ফল প্রয়াস লক্ষ্য করে তথাকথিত রূঢ় কণ্ঠে, ন্যায়সঙ্গত কটুবাক্য শুনিয়ে পত্রাঘাত করেছেন, অপরঞ্চ যাঁরা বার্লিনী দ্বিরদরদস্তম্ভোপরি সিংহাসন থেকে কিংবা যাঁরা নেটিভ বিদ্যা-লয়ের গো-অন্বেষণ কর্মে লিপ্তাবস্থায় গলদগর্ম কলেবরে অশেষ ক্লেশস্বীকার করে আমা হেন দীনহীনজনোপরি মহামূল্যবান উপদেশ অকৃপণভাবে বর্ষণ করেছেন, তাঁরা এ পুস্তকের দ্বিতীয় উল্লাসে আমার অকৃপণতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভূরিভূরি স্বর্ণোজ্জ্বল নিদর্শন পাবেন।

ভগবৎকৃপায় অব্যবহিত প্রত্যাদেশ লাভ করেছি, আমার ভবলীলা সংহরণ প্রত্যাসন্ন। ঈদৃশ মুখবন্ধের প্রতি রুদ্রের দক্ষিণ মুখ পুনর্বার প্রসন্ন হবেন সে-আশা দুরাশা।

কিমধিকমিতি

সৈয়দ মুজতবা আলী

প্লেন যখন ইংলিশ চ্যানেলের উপর দিয়ে যাচ্ছে তখন ছোকরা মুখুজ্যে শুধালে, 'চাচা, লণ্ডনে গিয়ে উঠবো কোথায়, চিন্তা করেছেন কি ?' ছোকরা এই প্রথম বিলেত যাচ্ছে, প্রশ্নটা অতিশয় স্বাভাবিক। আমি বললুম, 'বাবাজী, কিচ্ছুটি ভাবতে হবে না। রসুই বামুন না হলেও তুমি তো ব্রাহ্মণসন্তান বটে। হাটে গিয়ে চাল-ডাল কিনে নিয়ে আসবে ; আমি ততক্ষণে বটগাছতলায় ইঁটের উনুন জ্বালিয়ে রাখবো। শুনেছি লণ্ডনের উপর বিস্তর বোমা পড়েছিল, ইঁট পেতে অসুবিধে হবে না।'

এ্যার পোর্ট থেকে বেরিয়ে বিস্তর খোঁজাখুঁজির পরও যখন বটগাছ পাওয়া গেল না, তখন বাধ্য হয়ে হোটেলে উঠতে হল।

রসিকতা নয়, একটুখানি সবুর করুন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায়ই মুখুজ্যের বয়েসীই তার এক ইংরেজ বন্ধু এসে উপস্থিত। ছোকরা খাঁটি ইংরেজ, লড়াইয়ের সময় ভারতবর্ষে এসেছিল, এ-দেশটাকে এতই ভালোবেসে ফেললে যে শেষ পর্যন্ত দিশী মেম নিয়ে বিলেত গেল। বললে, 'এদেশের লোক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এমনি অগা যে, সেদিন এক গবেট বিবিসিতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললে, "ভারতবর্ষের এক-তৃতীয়াংশ লোক বাইরে শোয়।" আমি ভয়ংকর চটে গিয়ে বিবিসিতে কড়া চিঠি লিখেছি।'

আমি বললুম, 'এতে চটবার কি আছে ? কথাটা তো সত্যি। গরমের দেশের লোক ১১৪ ডিগ্রীতে সর্বাঙ্গে কম্বল জড়িয়ে ঘরের ভেতর শোবে নাকি ? তোমাদের দেশের লোক মাইনাস দশ ডিগ্রীতে যদি বাইরে শোয় তবে মরে যাবে। আমাদের দেশের লোক গরমে ঘরের ভিতর দমবন্ধ হয়ে মারা যাবে না বটে, কিন্তু সারারাত এপাশ ওপাশ করে কাটাতে হবে। হীট হার্টস্, কোল্ড কিল্স্।'

এই কোল্ড কিল্স্ নিয়ে প্রাচ্য-প্রতীচ্য সভ্যতার পার্থক্য। বটগাছতলা আর হোটেলের পার্থক্য।

গরমের দেশে জীবনধারণের জন্য অত্যধিক সাজ-সরঞ্জাম আসবাবপত্রের প্রয়োজন হয় না ; পক্ষান্তরে শীতের দেশে পাকা-পোক্ত ঘর-বাড়ি চাই, মেঝেতে শোওয়া যায় না ; লেপ-কম্বল গদি-বালিশ চাই। শীতের ছ'মাস শাক-সব্জী ফলমূল কিছুই ফলে না, ছ'মাসের তরে মাংসের শুঁটকি জমিয়ে রাখতে হয় ; আমরা দিন আনি দিন খাই, ছ'মাসের খাবার-দাবার জমিয়ে রাখার কথা শুনলে নাভিশ্বাস ওঠে। ছ'মাসের খাবার কিনতে গেলে বেশ কিছু রেস্তোর প্রয়োজন।

তাই বোধ হয় ইয়োরোপীয়রা একদিন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ডাকাতি করতে প্রাচ্য দেশে এসেছিল। আজ ডেনমার্ক, জর্মনি, নরওয়ে, সুইডেনের খাবার-দাবার ব্যবসা-বাণিজ্য করেই চলে। ডাকাতিতে জিতেছিল ইংরেজ। আজ সে-সব লুণ্ঠন-ভূমি কব্জা থেকে খসে পড়ে যাচ্ছে। চার্চিল ব্রিটিশ রাজত্বের লিকুইডেটর হতে চান নি ; আজকের শাসনকর্তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় হতে হচ্ছে। ওদিকে খাওয়া-দাওয়া থাকা-পরার মান অনেকখানি উঁচু হয়ে গিয়েছে—

সেটাকে বজায় রাখা যায় কি প্রকারে ? আজ না হয় রইল, ভবিষ্যতে হবে কি ? সেকুরিটি কোথায় ?

এই সেকুরিটি নিয়েই যত শিরঃপীড়া।

সমসাময়িক ইংরিজী সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় অল্প। তবে সমঝাদার-দের মুখে শুনেছি, সেখানেও নাকি গুণীজ্ঞানীরা প্রাণপণ সেকুরিটি খুঁজছেন। ধর্মে বিশ্বাস নেই, আদর্শবাদ গেছে, চরম মূল্য পরম সম্পদ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আদৌ আছে কি না তাই নিয়ে গভীর সন্দেহ—সেই প্রাচীন 'ওয়েস্টল্যান্ড' নাকি আরো বিস্তীর্ণ হয়ে সর্বব্যাপী সর্বগ্রাসী হয়ে উঠছে।

তবে কি কার্ল মার্কসের নীতিই ঠিক ? দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অভাব-অনটন উপস্থিত হলে সাহিত্যে সেটা প্রতিবিম্বিত হবেই হবে ?

তা সে যা হয় হোক, কিন্তু এই সেকুরিটির ব্যাপার আরেক সূত্রে উঠলো।

৺বিদ্যাসাগরকে যে ইংরেজ মহিলা স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার প্রসারে প্রচুর সাহায্য করেন, তাঁরই এক নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে আমাদের আবার দেখা হল লন্ডনে। নাম কার্পেন্টার। ইনি জীবনের অধিকাংশ ভাগ কাটিয়েছেন ভারতবর্ষে। আমি তাঁকে যখন একবার কলকাতাতে শুধাই তিনি কি মিস কার্পেন্টারের কোনো আত্মীয় হন, তখন উত্তরে তিনি বলেন, 'আমার ঠাকুরদার বোন।' তারপর হেসে বলেছিলেন, 'আমি কিন্তু তাঁর মত টাকা ছড়াতে আসি নি ; তারই কিছুটা কুড়িয়ে নিতে এসেছি।'

তিনি নিমন্ত্রণ করে স্প্যানিশ রেস্তোরাঁয় মুর পদ্ধতিতে তৈরী বিরয়ানী (সে কথা পরে হবে) খাওয়াচ্ছিলেন। কথায় কথায় তাঁকে শুধালুম, 'এই যে সাদায় কালোয় দ্বন্দ্ব লেগেছে এদেশে, তার মূল কারণ কি ?'

তিনি এক কথায় বললেন, 'গার্লস।'

আমি অন্যত্র শুনেছিলুম চীপ লেবার অর্থাৎ কালারা কম মজুরীতে কাজ করতে তৈরী। ম্যানেজাররা তাই তাদের চায়। ইংরেজ মজুর তাই চটে গেছে।

তাহলে 'গার্লস' এল কোত্থেকে ?

আসলে দুটোই এক জিনিস।

নিগ্রোদের কথা বলতে পারবো না—সিলেট-নোয়াখালির খালাসীদের কথা জানি। তাদের অনেকেই লন্ডনে এসে অন্য খালাসীদের জন্য রাইস-কারির দোকান খোলে। বাঙালী ছাত্রেরাও সেখানে মাঝে মাঝে গোয়ালন্দ-চাঁদপুরী জাহাজের রাইস-কারি খাবার জন্য যায়।

গিয়ে দেখবেন মিশকালো খালাসীর ইংরেজ বউ। দু'জনাই খদ্দেরকে খাবার দিচ্ছে। মাঝে মাঝে সেই সিলেটি আছমৎ উল্লা বউকে ডেকে খাস সিলেটিতে বলছে, 'ওগো ডুরা (ডোরা), সাবরে আরক কট্টা মুর্গীর সালন দে (সায়েবকে আরেক কটোরা-বাটি মুর্গীর ঝোল দে)!'

মেমসাহেব সিলেটি শিখে নিয়েছে! কারণ আছমৎ উল্লা ইংরিজিটা রপ্ত করতে পারেন নি।

এখন প্রশ্ন, এই মেমটি আছমৎ উল্লাকে বিয়ে করলো কেন ?

সেকুরিটি।

আছমৎ উল্লা মদ খায় না। তাই মাতাল হয়ে বউকে মারপিট করে না—এবং তার চেয়েও বড় কথা মদ খেয়ে টাকা ওড়ায় না। রেসে যায় না, তিন পাত্তি তাস খেলেও সর্বস্বান্ত হয় না। সন্ধ্যার পর বাড়িতেই থাকে। এই হল এক নম্বর।

দুই নম্বর—বিয়ের পর (আগেও ডোরা ছাড়া) অন্য রমণীর দিকে প্রেমের বাণ হানে না।

এই দুটি সেকুরিটি রমণী মাত্রই খোঁজে। অন্যান্য ছোটোখাটো কারণের উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই—বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করে, কান্নাকাটি করলে বউকে ধমকে দিয়ে ড্রইংরুমে লেপকম্বল নিয়ে শুতে চলে যায় না। আছমৎ উল্লার দেশের কুঁড়েঘরে তারা দশজন শুতো,—তার দাদার কাচ্চা-বাচ্চা সে সামলেছে, পরিবার বেসামাল বড় ছিল বলেই তো দু'মুঠো ভাতের জন্য সে এদেশে এসেছে।

যদি বলেন, কালচারল লেভেল কি এক ? নিশ্চয়ই। ডোরা খানদানী ডিউকের মেয়ে নয়, সে এগজিজটেনশিয়ালিজম নিয়ে মাথা ঘামায় না, আর আমাদের আছমৎ উল্লাও জমিদারবাড়ির ছেলে নয়, সে 'যোগাযোগ' পড়ে নি।

যদি বলেন, 'সাদা মেয়ে কি কালোকে পছন্দ করে ?' উত্তরে বলি, 'আমাদের ভিতরে যে যত কালা সে-ই তো তত ফর্সা বউ খোঁজে।' (এই সাদার তরে পাগলামি এদেশে খুব বেশী দিন হল আসে নি। দুশ' বছর আগেকার লেখা বইয়ে ইয়োরোপীয় পর্যটকরা লিখেছেন, 'ভারতীয়রা আমাদের ফর্সা রঙ দেখে বেদনা ভরা কণ্ঠে শুধোয়, "হায়, ভগবান এদের সবাইকে ধবলকুষ্ঠ দিয়েছেন কেন ?" কথাটা ঠিক। এদেশের দুই মহাপুরুষ কৃষ্ণ এবং রামের একজন কালো, অন্যজন নবজলধরশ্যাম।)

সেই সেকুরিটির অভাবই মদ্যপানের অন্যতম কারণ।

ইংলণ্ডে যে মদ্যপান বেড়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কোনো দেশের জ্ঞাণীগুনীরা কি ভাবেন, কি চিন্তা করেন, সে-কথা জানবার জন্য সে-দেশে যাবার কোনো প্রয়োজন আমি বড় একটা দেখি নে! আপন দেশে বসে বসে সে দেশের উত্তম অধম পুস্তক, মাসিক, খবরের কাগজ পড়লেই সে সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা জন্মে! কিন্তু সে দেশের টাঙ্গাওলা বিড়িওলা ড্রাইভার কারখানার মজুর কি ভাবে, কি চিন্তা করে সেটা জানতে হলে সে দেশে না গিয়ে উপায় নেই। কারণ তারা বই লেখে না, খবরের কাগজে সম্পাদককে চিঠি লিখে নালিশ ফরিয়াদ জানায় না। তাদের কান্নাকাটি গালমন্দ যা-কিছু করার সব কিছুই তারা করে এদেশে চায়ের দোকানে, ওদেশে 'পাবে' অর্থাৎ শরাবখানায়। আর শরাবখানায় মস্ত বড় একটা সুবিধা—আমাদের চায়ের দোকানেও তাই—করো সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ করতে চাইলে সে খেঁকিয়ে ওঠে না, গুণীজ্ঞানীদের সঙ্গে দেখা করতে হলে বিস্তর বয়নাক্কা, আত্মাবমাননাও

তাতে কিঞ্চিৎ আছে কিংবা এ-চিন্তাও মনে উদয় হওয়া অসম্ভব নয়, 'আমি কে যে তার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে যাব ?'

কেন্‌সিংটন গির্জার পাশে ছোট্ট একটি শরাবখানাতে এক কোণে বসেছি। প্রচণ্ড ভিড়। এমন সময় একটি বুড়ী বার থেকে এক গেলাস জিন কিনে এনে আমার পাশে বসতে গেলে তাঁর হ্যাণ্ডব্যাগটি মাটিতে পড়ে গেল। সেটি কুড়িয়ে টেবিলের উপর রাখলুম। বুড়ী গলে গিয়ে 'থ্যাংকয়্যু, থ্যাংকয়ু' বলে চেয়ারে বসে খানিকটে আমাকে শুনিয়ে খানিকটে আপন মনে বিড়বিড় করতে লাগলেন, 'আজকালকার ছোঁড়াদের ভদ্রতা বলে কোন জিনিস নেই, তবু—' বাকিটা তিনি আর শেষ করলেন না। আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না তিনি কি বলতে চান। ছোঁড়াদের ভদ্রতা নেই কিন্তু আমার আছে, এ কি করে হয়, কারণ আমি ছোঁড়া নই। তবে বোধ হয় বলতে চান ছোঁড়াদের নেই, কিন্তু এ বুড়োর (অর্থাৎ আমার) আছে। সেটা অনুমান করেও উল্লাস বোধ করি কি প্রকারে ? আমি বুড়ো বটি কিন্তু থুত্থুড়ে বুড়ীর কাছ থেকে সে তত্ত্ব শুনে তো আনন্দিত হওয়ার কথা নয়।

তা সে যাক্ গে। আমি তখন অবাক হয়ে 'বারে'র দিকে তাকিয়ে বার বার তাজ্জব মানছি। হরেক রকম চিড়িয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝপাঝপ বিয়ার, 'এল', জিন খাচ্ছে এ কিছু নয়া তসবীর নয়, কিন্তু আশ্চর্য, চব্বিশ-ছাব্বিশ বছরের মেয়েরা পর্যন্ত 'বারে' কটাশ্ করে শিলিঙ রেখে অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে ঢকাঢক বিয়ার খেয়ে হুট করে বেরিয়ে যায়। যৌবনে যখন লণ্ডন গিয়েছি, তখন দুপুরবেলা 'বারে' একা একা খাওয়া মাথায় থাকুন রাত্রে ডিনারের সময়ও কোনো ভদ্র মেয়ে তার বন্ধু বা আত্মীয়ের সঙ্গেও এসব জায়গায় আসতে ইতস্তত করতো। নিতান্ত যেতে হলে যেত রেস্তোরাঁয় অর্থাৎ খাবারের জায়গায় যেখানে মদ্যপান করা হয় খাদ্যের অত্যাবশ্যক অঙ্গরূপে—আমাদের গ্রামাঞ্চলে যে রকম শুধু জল খেতে দেয় না, সঙ্গে দুটি বাতাসা দেয়।

বুড়ো-বুড়ীদের দৃষ্টিশক্তি কমে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে এ তত্ত্বটাও সত্য যে, যা দেখে তার থেকে অর্থ বের করতে পারে সেই অনুপাতে অনেক বেশী। তাই সেই বুড়ী এক ঢোক জিন খেয়ে আমাকে শুধালে—(এ সব জায়গায় ইংরেজ লৌকিকতার বজ্রবাঁধন কিঞ্চিৎ ঢিলে হয়ে যায়) 'বাবাজী কি এদেশে এই প্রথম এলে ?'

বুঝলুম, বাঙালের হাইকোর্ট-দর্শন দর্শন করে ঘটি যে রকম পত্রপাঠ ঠাহর করে নেয়, লোকটা বাঙাল ; আর আমি তো আসলে বাঙাল ; কলকাতায় যে-রকম প্রথম হাইকোর্ট দেখেছিলুম এখানেও ঠিক তেমনি ক্যাবলাকান্তের মত সব কিছু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছি। যতই পলস্তরা লাগাই না কেন সে বাঙালত্ব যাবে কোথায়। প্রতিজ্ঞা করলুম সাবধান হতে হবে। শহুরেদের মত সব কিছু দেখব আড়নয়নে শিব্রামদার মত 'বাঁকা চোখে'।

অপরাধীর সুরে বললুম,'তা ম্যাডাম, প্রায় তাই। ত্রিশ বছর পূর্বে এসেছিলুম, আর এই। লণ্ডন ইতিমধ্যে পুনর্জন্ম না হোক অর্ধজন্ম তো লাভ

করেছে !'

বুড়ী মহা উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বলে কি ? ত্রিশ বছর পরে ! তাহলে তো এর কাছ থেকে অনেক-কিছু শোনা যাবে। অবশ্য উত্তেজনার কারণ জিন্‌ও হতে পারে।

'সবে দাড়ি-গোঁপ-কামাতে-শিখেছে এক স্কচ ছোকরা বাড়ি থেকে পালিয়ে মার্কিন মুল্লুকে উধাও হয়।

বহু পয়সা কামিয়ে ত্রিশ বছর পরে সে ফিরছে দেশে। বাড়ি ফেরার সময় এত দিন বাদে এই সে প্রথম চিঠি লিখেছে। স্টেশনে বাপ-চাচা-দাদা সবাই উপস্থিত, সবাই খুশী, প্রচুর পয়সা কামিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসছে।

চুমোচুমি আলিঙ্গনের পর ছোকরা শুধোলে, "তোমরা সবাই এ-রকম লম্বা লম্বা দাড়ি রেখেছ কেন ? এই বুঝি ফ্যাশান !"

জ্যাঠা বিড়বিড় করে বললেন, "ফ্যাশান না কচু ! তুই যে পালাবার সময় রেডখানা সঙ্গে নিয়ে গেলি !"

বুড়ী আরেক ঢোক জিন্ খেয়ে হেসে বললেন, "আমার পিতৃভূমি স্কট-ল্যাণ্ডে ; কাজেই আমার অজানা নয় যে সেখানে কুল্লে পরিবার এক রেডে দাড়ি কামায়। কিন্তু ত্রিশ বছর—?

আমি বললুম, 'ঠিক বলেছেন, ম্যাডাম। আমি ত্রিশ বছর পূর্বে লণ্ডন ছাড়ার সময় আমার রেডখানা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম কিন্তু তাই বলে লণ্ডনের লোক দাড়ি কামানো বন্ধ করে দেয় নি। ইস্তেক গোঁফ পর্যন্ত কামিয়ে ফেলেছে।'

'মানে ?'

'মানে মেয়েদের রাজত্ব। আমার ভাইপো এই প্রথম লণ্ডনে এসেছে। তার কাছে সব কিছুই নূতন ঠেকছে। সে আজ সকালে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর বলল, "ফোর টু ওয়ান" অর্থাৎ রাস্তা দিয়ে যদি চারটে মেয়ে চলে যায়, তবে একটা ছেলে। আমি অবশ্য বললুম, "এখন আপিস, আদালত, দোকানপাট খোলা, সেখানে পুরুষেরা কাজ করছে। অন্য সময় গুনলে হয়তো অন্য রেশিয়ো বেরোবে।" সে বলল, "ওসব জায়গায়ও তো মেয়েরাই বেশী। নিতান্ত বাস আর ট্যাক্সি মেয়েরা চালাচ্ছে না।" (পরে অবশ্য ফ্রান্স না জর্মনি কোথায় যেন তাও দেখেছি)।'

তারপর বললুম, 'এক একটা লড়াই লাগে আর মেয়েদের পায়ের শিকলি খোলার সঙ্গে সঙ্গে মনের শিকলিও খুলে যায়।'

'মানে ?'

আমি বললুম, বেশী দূরে যাবার কি প্রয়োজন ? ঐ 'বারে'র দিকে তাকিয়ে দেখুন না। ত্রিশ বছর আগে উড়ুক্কু বয়সের মেয়েদের দুপুরবেলা 'বারে' মাল গিলতে দেখেছেন ?

বুড়ী একটু লজ্জিত নয়নে আমার দিকে তাকালেন।

আমি তাতে পেলুম আরো লজ্জা। আবার বাঙাল-পনা করে ফেলেছি।

তাড়াতাড়ি বললুম, 'না, না, এতে আমার কোন আপত্তি নেই।' তারপর অস্বস্তির কুয়াশা কাটাবার জন্য হাসির রোদ ফুটিয়ে বললুম, 'সবাই কি ত্রিশ বছরের দাড়ি নিয়ে বসে থাকবে? সময়ের সঙ্গে কদম কদম এগিয়ে যেতে হয়।'

বুড়ি যেন আমার কথায় কান না দিয়ে বললেন, 'এর জন্য আমরাই দায়ী। তবে শুনুন।'

'এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে লণ্ডনের উপর কি রকম বোমা পড়েছে তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। কয়েক বছর আগে এলেও দেখতে পেতেন লণ্ডনের সর্বাঙ্গে তার জখমের দাগ। এখনো কোন কোন জায়গায় আছে—নিশ্চয়ই দেখেছেন। কিন্তু ওসব বাইরের জিনিস। আজ যদি ভূমিকম্পে লণ্ডনের আধখানা তলিয়ে যায় তবে তাই নিয়ে বাকী জীবন মাথা থাবড়াবো নাকি?'

'কিন্তু মাটির তলার ঘর "সেলারে" বসে প্রতি বোমা পড়ার সময় ভয়ে-আতঙ্কে যে রকম কেঁপেছি সেটা হাড়গুলোকে নরম করে দিয়ে গিয়েছে,—সে আর সারবার নয়। বম্বিং-এর পর রাস্তায় বেরিয়ে মড়া দেখেছি, জখমীদের কাতর আর্তনাদ শুনেছি—বুকের উপর তার দাগ সেও কখনো মুছে যাবে না। আমার ফ্ল্যাটটা বহুদিন টিঁকে ছিল—অনেককে তাতে আশ্রয় দেবার সুযোগ পেয়েছি, দু'চার দিন থেকে তারা অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে, কেউ বা বেশী দিন থেকেছে। একদিন এক মর-মর বুড়োকে আশ্রয় দিলুম। তাকে নিয়ে কি করবো সেই কথা ভাবতে ভাবতে যখন বাড়ি ফিরছি তখন জর্মন 'বমারে'র বাঁশী বাজলো। ঘণ্টাখানেক মাটির নিচের আশ্রয়ে কাটিয়ে যখন বাড়ি ফিরলুম তখন দেখি স্বয়ং ভগবান আমার সমস্যাটির শেষ সমাধান করে দিয়েছেন। বাড়িটি নেই। সঙ্গে সঙ্গে বুড়োও গেছে।' একটুখানি থেমে বললেন, 'পরে অবশ্য লাশটা পাওয়া গিয়েছিল।'

বুড়ীর জিন ততক্ষণে ফুরিয়ে গিয়েছে। কাপড়-চোপড় দেখে মনে হল অবস্থাও খুব ভালো নয়। ফ্রকে হাঁটুর কাছটায় আনাড়ি কিম্বা বুড়ো হাতের একটুখানি রিপুও দেখতে পেলুম। এবার কিন্তু বাঁকা চোখে।

'এখখুনি আসছি' বলে বারে গিয়ে একটা জিন নিয়ে এলুম।

মনে মনে বললুম, সদাশয় ভারত সরকার যে কটি পাউণ্ড ভারতীয় মুদ্রা মারফৎ কিনতে দিয়েছেন তা দিয়ে এ রকম করলে আর কদিন চলবে? কিন্তু তাই বলে তো আর ছোটলোকমী করা যায় না। আমার ক্যাশিয়ার মুখুজ্যেও পই পই করে বলেছে, 'কিপ্টেমি করা চলবে না; পাউণ্ড যদি ফুরিয়ে যায় তবে তদ্দণ্ডেই দেশে ফিরে যাবো—ফিরতি টিকিট তো কাটাই আছে।'

বুড়ী বললেন, 'না, না। আপনি আবার কেন—? আমি এমনিতেই অনেকগুলো খাই।'

আমি হেসে বললুম, 'ত্রিশ বছর পরে এসেছি; একটুখানি পরব করবো না। যদিও স্কচ ছোঁড়ার মত মিলিয়ন নিয়ে আসি নি।'

বুড়ী বললেন, 'তখনই আমার নার্ভস যায়। অনেকেরই যায়।' তারপর ফিসফিস করে বললেন, 'চারদিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখুন না, আমার

বয়েসী ক'গণ্ডা বুড়ী মদ গিলছে !

'খাবার জোটে না, অহরহ বোমা পড়ছে, কানের পর্দা শব্দের হাতুড়ী পেটা খেয়ে খেয়ে যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে—লক্ষ্য করেন নি, অনেকেরই কান খারাপ হয়ে গিয়েছে, সবাই একটুখানি চেঁচিয়ে কথা কয় (আমি অবশ্য করি নি—তবে কথাটা সম্পূর্ণ ভুল নাও হতে পারে)—দিনরাত কেটে যাচ্ছে, চোখের পাতায় ঘুম নেই, এমন সময় পাশের বাড়ি উড়ে যাওয়ার পর তাদের "সেলার" থেকে বেরুলো এক গুদোম মদ।

'আগের থেকেই নার্ভস ঠাণ্ডা করার জন্য ধরেছিলুম সিগারেট, এখন পেলুম স্ত্রী মদ। মদ খেলে আরেকটা সুবিধে। খিদেটা ভুলে থাকা যায়, আর নেশাটা ভালো করে চড়লে দিব্য ঘুমনোও যায়—বোমা ফাটার শব্দ সত্ত্বেও।

'খাবার নষ্ট হয়ে যায় সহজেই, কিন্তু মদ একবার বোতলে পুরলেই হল। তাই খাবারের চেয়ে মদ জুটতো সহজে—অন্তত আমার বেলা তাই হয়েছে। সেই যে অভ্যাসটা হয়ে গেল সেটি আর গেল না। এই দেখুন হাত কাঁপছে। গণ্ডখানেক খাওয়ার পর হাত দড়ো হবে। আর নাই বা হলো দড়ো। কদিনই বা বাঁচার আর বাকি আছে !

'কিন্তু যে কথা বলছিলুম। আমাদের মত বুড়ীদের দেখে দেখে ছুঁড়ীরাও মদ খেতে শিখেছে। দোষটা তো আমাদেরই।'

বুড়ী থামলেন। খোলা দরজা দিয়ে চোখে পড়ল বৃষ্টি নেমেছে। দেশের মত গামলা-ঢালা বর্ষণ নয়—সে-বস্তু এদেশে কখনো দেখি নি। ঝিরঝিরে ফিন-ফিনে। তারই ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আরো যেন ঠাণ্ডা হয়ে 'পাবে' ঢুকে আমার হাড়ের ভিতর সেঁধিয়ে গিয়ে কাঁপন ধরিয়ে দিল। ওদের অভ্যাস আছে, বুড়ী পর্যন্ত বিচলিত হল না, কেউ দরজা বন্ধ করে দেবার কথা চিন্তাও করলে না।

পূর্বেই বলেছি বুড়ীরা দেখে কম, বোঝে বেশী। বললেন, 'বাবাজী' এদেশে এলেন অক্টোবর মাসে, যেটা কিনা ইংলণ্ডের ওয়েটেস্ট্ মনথ্, বৃষ্টি হয় সব চেয়ে বেশী। অবশ্য এ বছর আবহাওয়ার কোনো জমা-খরচ পাওয়া গেল না—তেষট্টি বছরের ভিতর এ-রকম ধারা কখনো হতে দেখি নি! যখন বৃষ্টি হওয়ার কথা, তখন ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর, আর যখন রোদ্দুর হওয়ার কথা, ফসল কাটার সময়, তখন হল বৃষ্টি। এ-রকম হলে এদেশ থেকে চাষবাসের যেটুকু আছে তাও উঠে যাবে।'

আমি বললুম, 'এই অনিশ্চয়তার জন্যই গত একশ' বছর ধরে এদেশে গমের চাষ কমে গিয়েছে—কোথায় যেন পড়েছি।'

বুড়ী বললেন, 'এবারের সঙ্গে কিন্তু আদপেই তার তুলনা হয় না। সবাই বলে এটম বম নিয়ে মাতামাতি করার ফলে। হবেও বা। আপনাদের দেশেও তো শুনেছি একেবারে তুলকালাম কাণ্ড হয়েছিল—বিস্তর গর্মী, অল্প বৃষ্টি।'

একটু আরাম বোধ করলুম। তাহলে বুড়ী এখনো খবরের কাগজটা অন্তত পড়ে। জীবনে আঁকড়ে ধরার মত অন্তত কিছু একটা আছে। বললুম,

'সেকথা আর তুলবেন না, ম্যাডাম। দিনের পর দিন ঝাড়া দুটি মাস ধরে ১১৪ ডিগ্রীর ১১৪ ন্যজাওলা ক্যাট অ নাইন টেলসের চাবুক খেয়ে পিঠে ঘা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখন ঠাণ্ডায় সে-কথা ভাবতে চিত্তে পুলক লাগে, দেহ কদম ফুলের মত—'

'সে আবার কি ফুল?'

খাইছে! এ যেন লণ্ডন শহরে মুখুজ্যের বটগাছ সন্ধান করার মতো। বললুম, 'ম্যাডাম, সে তো বোঝানো অসম্ভব। এদেশের কোনো ফুল তার কাছ ঘেঁষেও যায় না। বোঝাতে গেলে সেই অন্ধের বক খাওয়ার মতো হবে। অন্ধকে শুধালে "দুধ খাবে?" "দুধ কি রকম?" "সাদা।" "সাদা কি রকম?" "বকের মতো।" "বক কি রকম?" লোকটা তার কনুই থেকে বক-দেখানোর বাঁকানো হাতের আঙুল পর্যন্ত অন্ধের হাতে বুলিয়ে দিল। অন্ধ ভয় পেয়ে বললে, "বাপ্‌স্‌! ও আমি খেতে পারবো না—আমার গলা দিয়ে ঢুকবে না।"

তারপর বললুম, 'কিন্তু ম্যাডাম, আপনি যে বললেন, ছুঁড়ীরা আপনাদের অনুকরণে মদ খেতে শিখেছে এ কথাটা আমার মনকে সাড়া দিচ্ছে না। আমার মনে হয়, যারা মদ খায় তাদের অধিকাংশই দুরন্ত দৌড়ঝাপটার কাজ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই ঐ কর্ম করে। চাষাবাদের কাজ ঢিমেতেতালা; তারা মদ খায় কম। কারখানার কাজ জলদ তেতাল; তারা খায় বেশী। আগে শুধু পুরুষেরা যে-সব ধুন্দুমারের কাজ করতো এখন মেয়েরাও সে সব কাজ করছে বলে তাদেরও একটু-আধটু পান করতে হচ্ছে। কিন্তু এটাও বলে রাখছি এ রেওয়াজ বেশীদিন থাকবে না।'

'কেন?'

আমি বিজ্ঞের ন্যায় বললুম, 'পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও পড়িনি, আমি নিজে কোথাও দেখিনি মদ নিয়ে মেয়েদের বাড়াবাড়ি করতে—ও বস্তু যেখানে জলের মত সস্তা সেখানেও। তার কারণ মেয়েদের বাচ্চা প্রসব করতে হয়। প্রকৃতি চায় না মদের বাড়াবাড়ি করে মেয়েরা স্বাস্থ্য নষ্ট করুক। এবং শেষ কথা পুরুষের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের আবার ঘরকন্নার দিকে ফিরে যেতে হবে।'

বুড়ী বললেন, 'কি জানি! প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তাই হয়েছিল বটে, কিন্তু এবার কি তারা যে স্বাধীনতা পেয়েছে সেটা আর ছেড়ে দেবে? সেবারে শুধু তারা পুরুষের কাজ করার অধিকার পেয়েছিল, এবারে তার টাকা ওড়াবার অধিকারও তারা পেয়েছে যে। এই যে তারা "পাবে" আসে, সেটা কেন? পুরুষের মত আড্ডা জমাতে তারাও শিখে গিয়েছে।'

আমি শুধালুম, 'বাড়িতে মদ খাওয়া অনেক সস্তা!'

বুড়ী আনমনে বললেন, 'অনেক। কিন্তু বাড়িতে আমার আর কে আছে? কর্তা তো আগেই গেছেন। ছেলেটাও ফ্রান্সের আণ্ডার গ্রাউণ্ডে কাজ করতে গিয়ে নিখোঁজ হল।'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—গলায় নেশার চিহ্নমাত্র নেই—"কিন্তু জানেন, আমি তার আশা এখনো ছাড়তে পারি নি। হঠাৎ পেছন থেকে ডাক শুনতে পাবো—"মা"।'

শেষে ঘুম ভাঙতেই শুনি, পাশের বাড়ির লক্ষ্মীছাড়া রেডিয়োটা 'ধর্ম-সঙ্গীত' গাইছে।

মনে করো শেষের সে দিন ভয়ংকর
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।

কোথায় ব্রাহ্মমুহূর্তে প্রসন্নমনে জানলা দিয়ে সবুজ গাছটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সবুজ প্রাণশক্তি আহরণ করব, তা না, তখন স্মরণ করিয়ে দিলে শেষের দিনের কথা। ঘুম তো এক রকমের মৃত্যু, সেই মৃত্যুর থেকে উঠে শুনতে হয় ধিভিষীকাময় আরেক মৃত্যুর কথা—তাও বিট্‌কেল 'গানে গানে'!

এখানে সকালবেলা খাটের পাশে রেডিয়োটা চালিয়ে দিই আবহাওয়ার ভবিষ্যৎবাণী শোনার জন্য। এ-দেশে সেটা জানার বড্ডই প্রয়োজন। বৃষ্টি হলেই গেছি—বুড়ো হাড় নিয়ে রাস্তাঘাটে ফ্লু, নিউমোনিয়া কুড়োতে ভয় করে। রোদের সামান্যতম আশা পেলে মনটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

এ-দেশের আলিপুর কতখানি নির্ভরযোগ্য! দেশে থাকতে আবহাওয়ার বিলিতি এক ওঝার এক বিবৃতি পড়েছিলুম। তিনি কলকাতায় এসে বেশ মুরু-ব্বিয়ানার সুরে বললেন, 'তোমাদের দেশে এখনও আবহাওয়া যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ করার মত ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে দফতর নেই বলে প্রায়ই ভবিষ্যৎবাণী করতে পার না। আমরা কিন্তু এখন বিলেতে মোটামুটি পারি।'

এর পরীক্ষা হাতেনাতে হয়ে গেল।

একদিন ঘুম দেরীতে ভাঙায় বেতার-রিপোর্টটা শুনতে পাই নি। সিঁড়ি দিয়ে নামাবার সময় বাড়ির বুড়ী ঝিয়ের সঙ্গে দেখা—তার এক হাতে ভ্যাকুয়াম ক্লীনার অন্য হাতে বালতি। শুধালাম, 'বেতারে আবহাওয়ার বাণী কিছু শুনেছ?'

একগাল হেসে বললে, 'এবারে যা আবহাওয়া—' বলে সেই 'পাবে'র বুড়ীর মতো অনেক কথাই বললে—ইস্তেক এটম বম্ যে এ-সব গড়বড়ের প্রধান কারণ সেটা বলতেও ভুলল না।

সর্বশেষে বললে, 'যেন সব কিছু যথেষ্ট বরবাদ হয় নি বলে শেষমেষ এলেন ঝড়, 'গেল্'! ওঃ, তার কী দাপট!'

আমি শুধালাম, 'আবহাওয়া দফতর সতর্ক করে নি, ওয়ার্নিং দেয় নি?'

গম্ভীরভাবে বললে, 'ইয়েস, সার, আফটারওয়ার্ডস, ঝড়ের পরে দিয়েছিল।'

রসবোধ আছে বৈকি।

কিন্তু মোদ্দা কথায় ফিরে যাই। আবহাওয়ার ভবিষ্যৎবাণী করার পূর্বে বেতারে হয় ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা উপাসনা। সাতসকালে ওটাও সেই 'অন্যলোকে কবে কথা তুমি রবে নিরুত্তর' গোছ। কিন্তু পাছে আবহাওয়া মিস্ করি তাই সেটা শুনতে হত।

সর্বপ্রথম যেটা কানে ঠেকে সেটা পাদরী সায়েবের ভাষা।

একদা ধর্ম প্রভাব করতো সাহিত্য, কলা, সঙ্গীত তাবৎ রসপ্রকাশ-প্রচেষ্টাকে —এখনোও করে। এ কথা ফলাও করে বোঝাবার কিছুমাত্র দরকার নেই— কারণ বহু শতাব্দী ধরে রিলিজিয়াস আর্টের সাধনা করার পর মানুষ এই সবে সেকুলার আর্ট আরম্ভ করেছে।

এখন আরম্ভ হয়েছে উল্টো টান। এখন ধর্মযাজকরা আপন-আপন ভাষা সরল, প্রাঞ্জল, ওজস্বিনী, মর্মস্পর্শী করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য থেকে বচনভঙ্গী ধার নিচ্ছেন। আজকের দিনের জীবন যে চরম মূল্যে বিশ্বাস হারিয়ে দেউলে হয়ে গিয়েছে তারই বর্ণনা দিতে গিয়ে এক পাদরী সায়েব যখন ভোরবেলা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন আমার কেমন যেন আবছা-আবছা মনে পড়তে লাগল, কোথায় যেন এটা পড়েছি। তারই সন্ধানে যখন আমার মন আর স্মৃতিশক্তি লুকোচুরি খেলছে তখন, ও হরি, পাদরী সায়েবই মাইকের উপর হাঁড়ি ফাটালেন। বললেন, আজকের দিনের দুনিয়া দেউলে ; সর্বভুবন এখন এক বিরাট 'ওয়েস্টল্যান্ড'।

কবিতাটি আমি মাত্র একবার পড়েছি, তাও বহু বৎসর পূর্বে এবং সেও থামচে থামচে, অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে স্কিপ্ করে করে, কারণ ও-কবিতায় একাধিক ভাষার যে জগা-খিচুড়ি পাকিয়ে ভাষা-শেখাতে-অগা এক-ভাষা-নিষ্ঠ (মনোগ্লাট্) ইংরেজকে তাক লাগাবার কিশোরসুলভ প্রচেষ্টা আছে, তা দেখে আমি বে-এক্তোয়ার হব কেন—আমি তো এ সব কটা ভাষা এলিয়টের মতই বিলক্ষণ মিসান্ডারস্টেন্ড করতে পারি।[১] কাজেই কবিতাটি স্মরণ করতে যদি সময় লেগে থাকে তাহলে আশা করি, যাঁদের কাছে ঐ 'কবিতা' রামায়ণ-মহাভারতের চেয়েও প্রণম্য তাঁরা অপরাধ নেবেন না।

ইংলন্ডের প্রার্থনার কথা ওঠাতে যদি ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে এস্থলে কিঞ্চিৎ বাক্যবিন্যাস করি, তবে বিবেচনা করি, সেটা নিতান্ত বেখাপ্পা শোনাবে না, এবং সে-বাসনা যে আমার কিঞ্চিৎ আছেও, সেটা অস্বীকার করব না, কিন্তু তাহলে মূল বক্তব্য থেকে অনেকখানি দূরে চলে যাব বলে পাঠক হয়ত ঈষৎ অসহিষ্ণু হয়ে উঠবেন। তাই শুধু এই প্রশ্নই শুধাই, ভোরবেলায় পাদরী সায়েব বেছে বেছে আমাদের এলিয়ট সায়েবকেই স্মরণ করলেন কেন ?

মার্কিন মুল্লুকের লেখককে ইংরেজ সহজে কল্কে দেয় না কাজেই এই কল্কে পাওয়ার জন্য এলিয়টকে বিস্তর কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বহু জায়গায় বিস্তর কল্কে পাওয়ার পর ইংলন্ডের

১। "…they are simply the kind of thing that goes on in the head of a troubled man who has drunk at the best universities and is half-drugged with literature, who has studied a little Sanskrit at Harvard and done a certain amount of travelling in Europe……"—E. Wilson.

কনসারভেটিভ পার্টিতেও তো জাতে ওঠবার জন্য তিনি লিখলেন "দি লিটারেচার অব পলিটিক্স" —"টিএস্ এলিয়ট ও এম কর্তৃক লিখিত; রাইট অনরেবল স্যার এন্টনি ঈডন, কে জি; এম সি; এম্ পি কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত"। এরকম ব্যাপার যে ইংলণ্ডে হতে পারে আমি জানতুম না। আজ যদি শ্রদ্ধেয় পরশুরাম "শ্রীরাজশেখর বসু রায়সায়েব কর্তৃক লিখিত এবং শ্রীযুত ভূতনাথ ভড় রায়বাহাদুর, বিধানসভারসদস্য, কাইসার-ই-হিন্দ দ্বিতীয় শ্রেণী মেডলপ্রাপ্ত কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত" পুস্তক প্রকাশ করেন তবে যে-রকম বিস্মিত এবং বিরক্ত হব। সাহিত্যজগতে (এলিয়ট যে পলিটিশিয়ান নন, সে সবাই জানে) তিনি তার ও. এম উপাধিটি উল্লেখ করতে ভুলবেন না, আর ঈডন তো সালংকার থাকবেনই। মুসলমান বলে আমি ঠিক বলতে পারবো না, তবে অনুমান করি চাঁড়াল যদি পৈতে পেয়ে যায়, (স্বগুণেই বলছি) তবে বোধ হয় সে সেটা সর্বক্ষণ মাথায় জড়িয়ে পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়! আশা করি, এর পর যখন বাঙলার সাহিত্যিকরা রাজনীতিকদের দাওয়াত করে সভাপতি বানিয়ে, তাদের দিয়ে সাহিত্য অথবা সাহিত্যিকদের চরিত্রের আনাড়ি সমালোচনা করাবেন, তখন শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ অনাদৃত খাঁটি সাহিত্যিকরা অহেতুক উষ্ণ-গোস্সা প্রদর্শন করবেন না। এঁদের গুরুঠাকুর মহামান্যবর এলিয়ট সাহেব—এঁরা তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন মাত্র।

সাহিত্যজগতে কল্কে পেয়েই এলিয়ট সন্তুষ্ট নন। তিনি আরও বহু কল্কে বহু জায়গায় পেয়েছেন।[১] কিন্তু ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ এবং সর্বশেষ কল্কে ধর্মচক্রে —কে না জানে সে দেশের রাজা এবং রানীর অন্যতম জাঁদরেল উপাধি 'ডিফেণ্ডার অব ফেৎ'? স্বয়ং পোপ ইটি অষ্টম হেনরিকে দিয়েছিলেন। সেখানে কল্কে পাওয়া চাই-ই-চাই।

এলিয়ট তাঁর ধর্মবিশ্বাস পরিষ্কার ভাষাতেই প্রকাশ করেছেন—সেটা তাঁর কবিতার মত তেষট্টি রকমে বোঝা এবং বোঝানো যায় না, এই রক্ষে। পাস্কাল সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'ধর্মগুলোর ভিতর খ্রীষ্টধর্ম', এবং তার ভিতরে ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্মই জগৎ এবং বিশেষ করে অধ্যাত্মজগতের সমস্যা এবং কার্যকারণ সর্বোত্তমভাবে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে ('টু অ্যাকাউণ্ট মোস্ট্ সেটিসফেকটরিলি ফর দি ওয়ার্লড অ্যাণ্ড স্পেশালি দি

১ "Who is who"-তে আছে D. Litt of Oxford, a Litt. D. of Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Bristol, Leeds and Washington; an LLD. of Edinburgh and St. Andrews, a D. es L. of Paris: Aix-Marseille, and Rennes, a D. Phil of Munich; an Honorary Fellow of Merton College and of Magdalene College, an offer de la Legion d' Honneur, and a foreign Member of the Accademia dei Lincei of Rome.

এ ছাড়া নোবেল প্রাইজ তো আছেই।

মরাল ওয়ান্ড' উইদিন')। যীশুখ্রীষ্ট যে জলকে মদ্যরূপে পরিবর্তিত করেছিলেন, 'মৃতজনে প্রাণ' দিয়েছিলেন এসব অলৌকিক কার্যকলাপে তিনি বিশ্বাস করেন।[২] তিনি অ্যাংলো ক্যাথলিক গির্জায় (বিলাতের সরকারী, রাজরানীর প্রতিষ্ঠান) গিয়ে পুজোপাট করেন, মন্ত্রপূত রুটি এবং মদের মাধ্যমে খ্রীষ্টের সঙ্গে অশরীরী ভাবে 'হরিহরাত্মা' হন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাতে কারও কোনও আপত্তি থাকার নয়। আমাদের মডার্ন কবিরাও হয়ত ইতু ঘেঁচুর পুজো করেন, নজরুল ইসলাম আজ যদি মোল্লার কাছ থেকে পানি-পড়া তাবিজ-কবজ নিয়ে ব্যামো সারাতে চান তবে আমরা উল্লাস অনুভব করব—ডাক্তার-কবরেজ তো হার মেনেছেন—কিন্তু এ-বাবদে একটা প্রশ্ন স্বভাবতই উদয় হয়।

গোঁড়া ক্যাথলিকরা বিশ্বাস করেন, অ-খ্রীষ্টানরা অন্তত নরকের আগুনে জ্বলবে। গোঁড়া মুসলমানরা অতখানি ঠিক করেন না—তাঁদের মতে কোনও অনৈসলামিক ধর্মের মূলতত্ত্ব (ফাণ্ডামেণ্টলস্) যদি ইসলামের সঙ্গে মেলে তবে সে-ধর্মের লোক স্বর্গে না গেলেও অনন্ত নরকে জ্বলবে না। এখন প্রশ্ন এলিয়ট কি বিশ্বাস করেন, তাঁর বাঙালী হিন্দু-মুসলমান চেলারা অনন্ত নরকের আগুনে রোস্ট মটন্ কিংবা তন্দুরী মুর্গীভাজা হবে? যাঁরা তাঁর সঙ্গরস পেয়েছেন তাঁরা যদি বাৎলে দেন, তবে উপকৃত হব।

কিন্তু ইহুদীদের সম্বন্ধে এলিয়ট তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। পাঠক স্মরণ রাখবেন, ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ 'প্রাচীন নিয়ম' (ওল্ড টেস্টামেণ্ট) খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থও বটে এবং খ্রীষ্টানদের একেশ্বরবাদ, প্রতিমাবর্জন, স্বর্গ-নরক, শেষ বিচার, গির্জার প্রার্থনা-পদ্ধতি ইহুদীদের কাছ থেকে নেওয়া, এবং সব চেয়ে বড় কথা স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট ইহুদী-সন্তান—মথিলিখিত সুসমাচারে আরম্ভই যীশুর কুলজি নিয়ে; তিনি ইহুদীদের বংশপিতা আব্রাহামের (ইব্রাহিমের) বংশধর।

এলিয়ট আদর্শ সমাজব্যবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'যে সে আদর্শ সমাজে 'রক্ত ও ধর্ম' এই দুয়ে মিলে মুক্তচিন্তাশীল ইহুদীদের (আদর্শ সমাজে) বেশী সংখ্যায় থাকা অবাঞ্ছনীয়।'

(Reasons of race and religion combine to make any large number of free-thinking Jews undesirable)

সোজা বাঙলায় প্রকাশ করতে গেলে দাঁড়ায়ঃ—যেমন মনে করুন রবীন্দ্রনাথ যদি বলে যেতেন, 'পার্সীদের ধর্ম এবং রক্ত আলাদা (এবং এটাও লক্ষণীয় যে, ইহুদী ও পার্সী উভয় সম্প্রদায়ই বিত্তশালী) এ দু'য়ে মিলে গিয়ে এমনই

---

২ এ বাবদে বার্নার্ড শ'র ধারণা (ব্লাক গার্ল) তুলনীয়। তিনি খ্রীষ্টকে 'ক্লেভার কনজিয়োরার' বা 'ঘড়েল ম্যাজিশিয়ান' বলে উল্লেখ করেছেন। রামমোহন রায় খ্রীষ্টের মহত্ত্ব স্বীকার করেও তাঁর অলৌকিক কার্যকলাপে (মিরাকল্) বিশ্বাস করতেন না বলে পাদরী বন্ধুগণ কর্তৃক বর্জিত হন।

এক বিপর্যয় ঘটেছে যে এদের থেকে বেশী লোক ভারতীয় সমাজে থাকুক এটা বাঞ্ছনীয় নয়।' !!!

অ্যাণ্টনি ঈডনের ভূমিকাসম্বলিত এলিয়টের যে 'লিটরেচার অব্ পলিটিক্স্' বইয়ের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি তাতে এলিয়ট চারজন কনসারভেটিভ সাহিত্যিকের উল্লেখ করেন ; বলিংব্রুক্, বার্ক, কোল্রিজ্ এবং ডিজ্রেলি। ডিজ্রেলির কথা বলতে গিয়ে এলিয়ট বলেছেন, 'হ্যাঁ, ইনি (এখানে বোধ হয় এলিয়ট একটু থেমে গিয়ে মৃদু গলাখাঁকারি দিয়েছিলেন) একটা সাদামাটা পাস পেতে পারেন মাত্র ; আমি অবশ্য গির্জার সদস্য গ্ল্যাডস্টনকেই পছন্দ করি বেশী।'

সমালোচক উইলসন কাণ্ঠহাসি হেসে এস্থলে বলেছেন, 'হ্যাঁ, একজন মুক্ত-চিন্তাশীল ইহুদী চললেও চলতে পারে, অবশ্য তিনি যদি কনসারভেটিভের স্বার্থে কাজ করেন।'

অনেকটা রবি ঠাকুর যেন বলেছেন, 'নৌরজী চললেও চলতে পারেন ; আমি কিন্তু গোঁড়া টিলককেই পছন্দ করি।'

এ-আলোচনা উঠেছিল যখন বিবিসি দর্শনে যাই—হাজার হোক এ-জীবনের চারটি বছর দিশী বেতারে নষ্ট করেছি তো !

পারস্যে প্রখ্যাত কবি মুশর্‌রফ্ উদ্দীন বিন্ মুস্লিহ উদ্দিন শেখ সাদীকে একদিন দেখা গেল ভরসন্ধ্যেবেলা গোরস্তানের দেউড়ির সামনে। এ সময়টা মৃতের সদগতি-প্রত্যাশাকামী উপাসনার জন্য প্রশস্ত নয় ; তাই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কবির এক বন্ধু তাঁকে দেখতে পেয়ে শুধালেন, 'অবেলায় এখানে কি করছেন, শেখসাহেব ?'

দীর্ঘ দাড়ি দুলিয়ে, দীর্ঘতর নিঃশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ বললেন, 'আর বলো না ভাই, গেরো গেরো। জানো তো অমুককে। আমার কাছ থেকে একশ' তুমান ধার নিয়েছিল বছরটাক হয়ে গেল। ফেরৎ পাই নে। পাড়ায় পাড়ায় খেদিয়ে বেড়িয়েও তাকে ধরতে পাই নে। তখন আমার এক গুরুভাই আমাকে পরামর্শ দিয়েছে এখানে এসে অপেক্ষা করতে। গোরস্তানে নাকি সবাইকে একদিন আসতে হয়।'

বিবিসি লণ্ডন তথা ইংলণ্ড, এমন কি লণ্ডনাগত বিদেশী গুণী-জ্ঞানীরা জ্যান্ত গোরস্তান। গাইয়ে, বাজিয়ে, নাট্যকার, বক্তৃতাবাজ, পাহাড়-চড়নে-ওলা, চোরের সেরা, ডাকাতের-বাড়া (এরাও ইণ্টারভু দেয়) হেন প্রাণী নেই যে সেখানে একদিন না একদিন না-আসে।

আমার জন্মভূমি সোনার দেশ ভারতবর্ষে অবশ্য ভিন্ন ব্যবস্থা। তার সম্বন্ধে অন্য গল্প আছে। সেটা কিন্তু বাজারে চালু হয় নি। 'আকাশবাণী'তে সামান্য যেটুকু প্রোগ্রামে পায় তাও কাটা যাবার ভয়ে সে গল্পই কেউ বলতে চায় না, শুনলেও ভুলে যেতে চায়।

এটম্ বম্ পড়লে কি কি কাণ্ড হতে পারে তারই রগরগে বর্ণনা শুনে এক নিরীহ বঙ্গসন্তান তার বৈজ্ঞানিক বন্ধুকে শুধালে, 'এ সব কি সত্যি ?'

'এক দম্ ! বরঞ্চ কমিয়ে সমিয়ে বলেছে।'

'তা হলে উপায় ? দুরদুরান্তে, লড়াইয়ের আওতার বাইরে কোনো নির্জন দ্বীপে চলে গেলে হয় না ?'

'হয়। কিন্তু এদেশের সরকার এটম বমের বিরুদ্ধে উত্তম ব্যবস্থা করেছেন। বম ফাটার সম্ভাবনা দেখলেই, আকাশবাণীর কোনো স্টুডিয়োতে ঢুকে পড়ো। সেখানে কোনো রেডিও-এ্যাক্টিভিটি নেই।'

আমি অবশ্য মৌলানা সাদীর মতো দেনাদারকে পাকড়াবার জন্য বিবিসেতে যাইনি। আমি গিয়েছিলুম আপন ঋণ শোধ করতে। পূর্বেই বলেছি, একদা আমি বেতারে বাঁধা ছিলুম। সে সুবাদে দু'একজন কর্মীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এমন কি দহরম-মহরম হয়। দেশে নিষ্কর্মা বিবেচিত হওয়ার পর বিবিসি এদের লুফে নিয়েছে—পাড়ার মেধো ওপাড়ার মধুসূদন তুচ্ছার্থে বলা হয়, এখানে কিন্তু সত্যই।

জর্মনির জন্য বিবিসি যে জর্মন প্রোগ্রাম করে তারই বড় কর্তা আসলে ভিয়েনাবাসী জর্মনভাষী ডঃ ভল্‌ফের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে আমাদের সিন্‌হা (আসলে সাদামাটা কায়েতের পো 'সিঙ্গি', নিতান্ত সম্মানার্থে 'সিংহ', কিন্তু ছোকরা হামেশাই একটু সায়েবী ঘেঁষা ছিল বলে আমরা বাঙলাতে কথা কইবার সময়ও সিন্‌হা' বলতুম)। লোকটি অসাধারণ পণ্ডিত এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর দৈনন্দিন সর্ব সমস্যা সম্বন্ধে অহরহ সচেতন। এ সমন্বয় সচরাচর চোখে পড়ে না।

আশ কথা পাশ কথার পর আমিই বললুম, বিবিসির জর্মন কর্মচারীদের উচ্চারণ জর্মনি থেকে সম্প্রসারিত খাস জর্মন বেতার বাণীর চেয়ে ভালো। প্রিয় অসত্য আমি যে একেবারেই বলি নে তা নয়, কিন্তু প্রিয় সত্য বলবার সুযোগ পেলে আত্মপ্রসাদ হয় ঢের ঢের বেশী।

হিটলার বরিশালের লোক। অর্থাৎ বরিশালের লোক কলকাতার ভাষা বলতে গেলে যে রকম তার কথায় আড় থেকে যায়, হিটলারের পোশাকী জর্মনে তেমনি শুধু আড় নয়, তাঁর জন্মভূমি অস্ট্রীয় উপভাষার বোঁটকা গন্ধ পাওয়া যেত। হিটলার কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনো যান নি, শিক্ষিত আচার্য পণ্ডিতদের তিনি দু'চোক্ষে দেখতে পারতেন না, তদুপরি নূতন ভাষা শেখা বাবদে তিনি ছিলেন ষোল আনা অগা। (মুসসোলীনি চমৎকার জর্মন বলতে পারতেন এবং একমাত্র তাঁর সঙ্গেই কথা কইতে তাঁর দোভাষীর প্রয়োজন হত না। ওদিকে আবার স্তালিনের রুশ উচ্চারণে ককেসাসের গুরুভার ছিল বলে তিনি লেকচর বাজী করতে ভালবাসতেন না কিন্তু ট্রটস্কি ছিলেন বহু ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত। কাজেই এসব উল্টোপাল্টা নমুনা থেকে আমি কোনো সূত্র আবিষ্কার করতে পারি নি।) হিটলার যখন রাজ-রাজেশ্বর হয়ে গেলেন তখন যে তাঁর চেলাচামুণ্ডারা শুধু তাঁর উচ্চারণ নকল করতে আরম্ভ করলেন তাই নয়, তাঁরই

মত কর্কশ গলায় (হিটলার টনসিলে ভুগতেন) দাবড়ে দাবড়ে কথা বলতে আরম্ভ করলেন—এক গ্যোবেল্‌স্‌ ছাড়া। জর্মনির খানদানী শিক্ষিত পরিবারে যে ঋজু, স্বচ্ছ, চাঁচাছোলা উচ্চারণ প্রচলিত ছিল, অধ্যাপকরা যে ভাষায় কথা বলতেন, থিয়েটার অপেরাতে যে উচ্চারণ আদর্শ বলে ধরা হত, সেটা প্রায় লোপ পাবার উপক্রম করলো। যুদ্ধ লাগার পূর্বে এবং পরে যারা লণ্ডনে পালিয়ে গিয়ে বিবিসির জর্মন সেকশনের ভার নিলো তারা প্রধানতঃ ঐ সব শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী। আজকের দিনে যারা বিবিসিতে জর্মন বলে তারা ওদেরই ঐতিহ্যে চলে। ওদিকে যদিও জর্মনরা হিটলারী রাজত্বের বারো বৎসরের দুঃস্বপ্ন যত তাড়াতাড়ি পারে ভুলে যেতে চায় তবু পুরনো দিনের অভ্যেস অত সহজে যাবে কেন?

তাই বিবিসির জর্মন উচ্চারণ এমন খাস জর্মনীর থেকে খানদানী।

অভ্যাস যে সহজে যেতে চায় না তার উদাহরণ যত্রতত্র সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। বাঙলা দেশ থেকেই তার একটা অতি সাধারণ উদাহরণ দিয়ে আরম্ভ করি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এদেশে কাপড়ের কি অনটন পড়েছিল সে-কথা আমরা ভুলি নি। তারই ফলে পাঞ্জাবির ঝুল কমে কমে প্রায় গেঞ্জির মতো কোমরে উঠে গিয়েছিল! তারপর লড়াই শেষ হওয়ার পর যখন বাজারে আর আদ্দির অভাব রইল না, তখনো কিন্তু ঝুল আর নামে না। ইতিমধ্যে ঐটেই হয়ে গিয়েছে ফ্যাশান!

ইংলণ্ডেও তাই। সেই যে যুদ্ধের সময় কাপড়ের অভাবে মেয়েরা অল্প ঘেরের স্কার্ট বানাতে বাধ্য হয়েছিল আজ সেটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং তার ঘের এতই মারাত্মক রকমের অল্প যে বাসের পাদানিতে পা তোলা যায় না। বাসের হ্যাণ্ডিল ধরে মেমসায়েবদের লাফ দিয়ে একসঙ্গে দু'পা তুলে বাসে উঠতে হয়। আমারই চোখের সামনের একদিন একটা কেলেঙ্কারি হয়ে গেল। একটি 'ফুল্‌ স্লিম' (আজকাল 'মোটা' বলা অসভ্যতা—সেটা সংস্কৃত পদ্ধতিতে 'ফুল-স্লিম' বলাটা যে আইনস্টাইন আবিষ্কার করেছেন তাঁকে বার বার নমস্কার!) মহিলা বাসে উঠতে গিয়ে লাফ না দিয়ে পুরুষদের মতো পা তুলতেই চড় চড় করে স্কার্টটি প্রায় ইস-পার উস্‌-পার!

যাদের কম ঘেরের লুঙ্গি পরার অভ্যাস আছে তাদের নিশ্চয়ই এ অভিজ্ঞতাটি একাধিকবার হয়েছে—প্রধানত লুঙ্গীর বার্ধক্যে।

ঘটনাটা নিত্য নিত্য এ-দেশে হয় কি না বলতে পারবো না, কারণ যে কটি লোক কাণ্ডটা দেখলে তারা মৃদু হাস্য করা দূরে থাক, তাদের নয়নের উদাস দৃষ্টি যেন সঙ্গে সঙ্গে উদাসতর হয়ে গেল। আমিও ইতিমধ্যে কিঞ্চিৎ শহুরে হয়ে গিয়েছি। মাথা নিচু করে গভীর মনোযোগ সহকারে খবরের কাগজে বভরিলের বিজ্ঞাপন—বিজ্ঞাপন তো বিজ্ঞাপনই সই—পড়তে লাগলুম।

ঘটনাটি প্রচুর 'ধ্বনি' ও ব্যঞ্জনা সহকারে এক ইংরেজ বন্ধুকে যখন বাখানিয়া বললুম, তখন তিনি বললেন, 'কেন, এ ব্যাপার তো এখন ক্লাসিক্‌সের পর্যায়ে উঠে গেছে! শোনো। এক কক্‌নি আর এক কক্‌নিতে উপদেশ দিচ্ছে, মিলের

শেয়ার না কিনতে। "কি হবে কিনে? কাপড়ের এখন আর কতখানি প্রয়োজন? এই দেখ না, আমি আমার স্ত্রীর গেল বছরের স্কার্ট দিয়ে নেকটাই বানিয়েছি, আর তিনি আমার গেল বছরের টাই দিয়ে এ বছরের স্কার্ট বানিয়েছেন।'

কিন্তু এহ বাহ্য। এসব জিনিস দিয়ে ইংরেজ চরিত্রের অদল-বদল হয়েছে কি না সে-কথা বলা অসম্ভব না হলেও কঠিন। এক মার্কিন সেপাই যুদ্ধের সময় দেশের ভিতর দিয়ে যাবার সময় দেখে, যেখানেই পুকুর কাটা হয়েছে সেখানেই পুকুরের মাঝখানে মাটির কোনিকাল থাম রাখা হয়েছে—আসলে এটা কতখানি মাটি কাটা হয়েছে তার মাপ রাখার জন্য এবং মাটি-কাটাদের মজুরী চুকিয়ে দেবার পর এ থামগুলোও কেটে ফেলা হয়—কিন্তু মার্কিন ত র ভ্রমনকাহিনীতে লিখলে, 'বাঙলা দেশের লোকই সব চেয়ে বেশী শিবলিঙ্গ পুজো করে। এস্তের পয়সা খরচ করে বিরাট বিরাট পুকুর খুঁড়ে মাঝখানে শিবলিঙ্গ স্থাপন করে।'

এটা শুনে আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েছে। না হলে ক্লিয়োপাত্রার নীড্‌ল্‌ (অবিলিস্ক) ইয়োরোপের যে সম্মানের সঙ্গে রাখা হয়েছে তার থেকে মীমাংসা করে আমিও বলে দিতাম, ইয়োরোপেও লিঙ্গ-পুজা হয়।

যতই খবরের কাগজ পড়ি, রেডিয়ো শুনি, টেলিভিজন্‌ দেখি, 'পাবে' কথা-বার্তা কই, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে লঞ্চ-ডিনার খাই, মোটরে করে গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে যাই, ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সঙ্গে অবরেসবরে রসালাপ করি (তার সুযোগ বিস্তর, কারণ ট্রাফিক জামের ঠেলায় ঘাটে ঘাটে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়) বাঁকা নয়নে সব কিছু দেখি, খাড়া কানে অর্ধমাচরণে অন্য লোকের কথা-বার্তা শুনি ততই মনে হয়, সেই পুরনো ফরাসী প্রবাদ, প্ল্যু সা শাঁজ, প্ল্যু সে লা মেম্‌ শোজ (দি মোর ইট চেঞ্জেস, দি মোর ইট ইজ দি সেম্‌ থিং) খোলনলচে বদলেও সেই পুরনো হুঁকো।

এই যে জর্মনির হাতে ইংরেজ বেধড়ক বম্‌ খেল, কই, কথায় কথায় তো জর্মনকে কটুকাটব্য করে না; দু'এক জায়গায় যে কালোয়-ধলায় মারামারি হচ্ছে, কই সাধারণ ইংরেজ তো সাদার পিছনে দাঁড়ায় নি, উল্টে প্রতিবাদ জানাচ্ছে, এমন কি শুনতে পেলুম পার্লিমেণ্টে নাকি কে যেন বিল আনবেন, যে সব হোটেলওলা কালো-ধলায় ফারাক করে তাদের সায়েস্তা করবার জন্য; নানা প্রকার আমদানি রপ্তানির উপর যদিও বাধ্য হয়ে কিছু কিছু আইন-কানুন জারি করতে হচ্ছে তবু তো ইংরেজ আরো কয়েকটা জাত নিয়ে একটা 'খোলা বাজার' তৈরী করার চেষ্টায় উঠেপড়ে লেগেছে। ত্রিশ বছর আগেও মনে হয়েছে, এখনো মনে হলো, ইংলণ্ডে কনসারভেটিভও লিব্‌রেল লেবারও লিব্‌-রেল হয়ে গিয়েছে। তাই বোধ হয় খাস লিব্‌রেল দলের জেল্লাই সেখানে কমে গিয়েছে। যে দেশের সবাই ভাত খায় সেখানে তো আর ভাতখেকোদের আলাদা হোটেল হয় না।

তাই তাজ্জব মানি, এলিয়ট এত অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন কি করে ?

সিনহা না ভলফ্ শুধিয়েছিলেন সে কথাটা মনে নেই।

আজ যখন এ্যারোপ্লেনে করে অষ্টপ্রহরই অষ্টপ্রহরে কলকাতা থেকে লণ্ডনে যেতে পারি, প্যারিসের লোক আর কয়েকদিনের ভিতরেই দেশে খাবে ব্রেকফাস্ট —নিউ ইয়র্কে খাবে লাঞ্চ, সর্বদেশের ভৌগোলিক গণ্ডি যায়-যায়, শঙ্কর-দর্শন আলোচনা করতে হলে প্লাতোর উল্লেখ না করলে সমালোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, ক্রোচের সমালেচেনায় অভিনব গুপ্তের নামোল্লেখ অভিনব বলে মনে হয় না, লণ্ডন পৌণ্ডের দাম কমালে আর পাঁচটা দেশ পড়িমরি হয়ে সেই কর্ম করে, জর্মনিতে নতুন দাওয়াই বেরোলে সেটা কলকাতার কালোবাজারে ঢোকে সাত দিনের ভিতর, বিলিতি ফিল্মের 'মরমিয়া' কেঁই কেঁই সুরের দিশী ভেজাল 'হণ্টরওয়ালীতে' শোনা যায় পক্ষাধিক কালে, তখন শুনতে হবে খৃষ্টধর্মের, একমাত্র খৃষ্টধর্মের, তাও চর্চ অব ইংলণ্ডের খৃষ্টধর্মের জয়গান ? সেইটে বরণ না করলে পৃথিবীর আদর্শ সমাজে আমাদের স্থান নেই ? কারণ এলিয়ট অতি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'আমাকে যদি ধর্মান্ধ বলা হয় তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। যদি খৃষ্টীয় সমাজই চাও তবে তাতে মেলা স্বাধীন পন্থা, স্বাধীন মতবাদের ঝামেলা লাগলে চলবে না (ইউ ক্যানোট এলাও কনজেরীজ অব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সেক্টস্)। ইংলণ্ডের নৈতিক পন্থা এবং বৈদেশিক নীতি ঠিক করে দেবে চার্চই।' আর তার আদর্শ রাষ্ট্রে ইহুদীদের সংখ্যা যে অতিশয় সীমাবদ্ধ থাকবে সে-কথা তো পূর্বেই নিবেদন করেছি। (এখানে বলে দেওয়া ভালো আমি পাপী, সে আদর্শ সমাজে স্থান চাই নে, আমি শুধু তাঁর বাঙালী শিষ্যদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলুম।)

আমি তো আশা করেছিলুম, ভৌগোলিক গণ্ডি যখন জেরিকোর দেয়ালের মত ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে তখন শিক্ষিত মানুষ সেই ধর্মেরই অনুসন্ধান করবে যে ধর্ম তার 'বিরাট বাহু মেলে' সবাইকে আলিঙ্গন করতে চায়। আমার তো মনে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ যখন ইংলণ্ডে 'মানবধর্মের' জয়গান গেয়েছিলেন তখন তিনি বলদের সামনে বেদপাঠ কিম্বা মোষের সামনে বীণা বাজান নি।

'ইংরেজের বাড়ি, হিন্দুর শাড়ি, মুসলমানের হাঁড়ি'—অর্থাৎ ইংরেজ বাড়ি-ঘর ছিমছাম রাখে, হিন্দু মেয়েরা জামাকাপড় (বিশেষ করে গয়নাগাঁটি) পরে ভালো, আর মুসলমানের কুল্লে পয়লা যায় তার হাঁড়িতে, উত্তম আহারাদি করে তার দিন কাটে। তাই শিব্রামদা একদিন আপন মনে প্রশ্ন শুধিয়েছিলেন, 'মুসলমানদের ভিতর এত শিক্ষাভাব কেন ?' তারপর আপন মনেই উত্তর দিয়েছেন, 'যেখানে শিক্-কাবাব বেশী সেখানে শিক্ষাভাব তো হবেই।'

বিবিসির অন্যতম বাঙালী মুসলমান কর্মী আমাকে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের দর্শন সম্বন্ধে প্রশ্ন শোধান নি, জর্মন প্রেসিডেণ্ট হয়েসের আসন্ন লণ্ডনাগমনের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমার সুপক্ক মতামত জানতে চান নি, এমন কি

ইংরেজ নারীর নমনীয়তা কমনীয়তা সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন। আমাকে শুধোলেন, 'আহারাদি ?'

আমি বললুম, 'ইংরেজের তো বাড়ি, দুনিয়ার "হাঁড়ির খবর" রেখেও তার হাঁড়ি শূন্যই থেকে গেছে।'

তারপর বিজ্ঞভাবে মাথা নেড়ে জর্মন অধ্যাপকদের বক্তৃতা দেওয়ার ভঙ্গীতে আরম্ভ করলুম, 'নরমানরা আলবিয়ন ভূমি জয় করার ফলে ধর্ম, রাজনীতি তথা সাহিত্যজগতে যে সব বহুবিধ ঘূর্ণিবার্তা, ভূমিকম্প, প্লাবনান্দোলন আরম্ভ হয়েছিল তদ্বিষয়ে বহুতর পুস্তক, সংখ্যাতীত প্রবন্ধ এবং ভূরি ভূরি গবেষণামূলক কোষ লিপিবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু ওহো হতোস্মি, ইহলোক পরলোক উভয় লোকের সঙ্গমভূমি এই যে উদর (পিতৃলোকের একমাত্র কাম্য পিণ্ড, এ তথ্য কুলাঙ্গারও স্মরণ রাখে!) তদ্বিষয়ে অতিশয় যৎসামান্য স্মৃতিশ্রুতি বর্তমান। পরম মনস্তাপের বিষয় অদ্যাবধি আলবিয়ন ভূমির শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় এই সর্বোত্তম সনাতন মার্গ সম্বন্ধে সম্যক সংবিদিত হয় নি।'

কর্মী বললেন, 'বাংলা অভিধান হাতের কাছে নেই।'

ত্রিতাল থেকে একতালে যাওয়া অশাস্ত্রীয়। কিন্তু শাস্ত্র মেনে কি হবে? পূর্বেই নিবেদন করেছি, রবীন্দ্রনাথের সর্বশাস্ত্রসম্মত 'মানবধর্ম' শ্বেতভূমিতে অনাদৃত।

আমি বললুম, 'নরমানরা আসার পূর্বে এদেশের লোক বোধ হয় কাঁচা মাংস খেত। এই দেখুন জ্যান্ত ভেড়ার নাম ইংরিজীতে 'শীপ', তার মাংস রান্না করে খেতে হলে সেটা হয়ে যায় 'মটন'। 'শীপ' শব্দ খাস ইংরিজী, 'মটন' শব্দ ফরাসী, নরমান যা খুশী বলতে পারেন; 'কাউ' ইংরিজী কিন্তু খেতে হলে (তোবা, তোবা!) ফরসী শব্দ বীফ; 'কাফ' ইংরিজী কিন্তু খেতে হলে ফরাসী শব্দ 'ভীল'; ঠিক সেইরকম 'সুয়াইন' ইংরিজী কিন্তু খেতে হলে (রাম রাম!) ফরাসী শব্দ 'পোর্ক'; ইংরিজী 'ডয়ার' ফরাসী 'ভেনজন' ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন কি যে সব রসবস্তু দিয়ে এগুলোকে সুস্বাদু করা হয়, যথা 'সস', সেভারি', ভিনিগার', 'মায়োনেজ', সেগুলোও ফরাসী শব্দ। খাবার 'মেনু' ফরাসী; তার প্রধান প্রধান ভাগ 'অরদ্যভ্র' (অবতরণিকা) 'কঁসমে-পতাজ' (শুরুয়া বিভাগ), আঁত্রে (প্রবেশ), পিয়েস দ্য রেজিসতাঁস (পীস্ অব রেজিসটেনস্ অর্থাৎ প্রধান খাদ্য, যা দিয়ে পেট ভরাবে), 'স্যালাড', 'ডেসের' (ফলমূল, মিষ্টি), 'সেভরি' (শেষ চাট) সবই ফরাসী। আর পদগুলোর নাম, 'কঁসমে জুলেয়্যন', 'পটাজ ও ফেরমিয়ে' (চাষাদের (!) সুপ), 'অমলেট ওর্জেব' (পেঁয়াজ পুদিনার অমলেট) এখানেও দেখুন 'এগ' ইংরিজী শব্দ কিন্তু 'অমলেট' ফরাসী। এসব আরম্ভ করলে তো রাত কাবার হয়ে যাবে। (আশু ইংলণ্ডগামী এর কাটিঙটা রাখলে উপকৃত হবেন; আমাকে নিমন্ত্রণ করে সঙ্গে নিয়ে গেলে আরো বেশী উপকৃত হবেন। কারণ যেগুলোর নাম করলুম এগুলো ভোজনতীর্থের বিখ্যাত কাশী বৃন্দাবন—'হিংলাজ'। 'গোটাটিকরে' নিয়ে যেতে হয় হাতে ধরে)।

এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। মহানগরী কলকাতার হিন্দুসন্তান যখন পোশাকী মাংস খায় তখন সে 'ভাত খায়' না, সে তখন বেরোয় 'খানা খেতে' এবং 'যবনের হাতে' কিন্তু স্বেচ্ছায়। কোর্মা, কালিয়া, বিরয়ানি, কাবাব, দোলমা এ সব কটি শব্দই বিদেশী ; বাঙলা প্রতিশব্দ নেই। চপ, কাটলেট, মমলেটও বিদেশী শব্দ। তফাত এই যে ইংরিজীগুলো হিন্দু হেঁসেলে ঢুকেছে, মুসলমানীগুলো ঢুকতে পারে নি। তার কারণ, মুসলমানীগুলোর রান্না একটু বেশী শক্ত।

শেষোক্তগুলো কলকাতার মুসলমানরাও খেতে শিখেছেন।

এক মুসলমান গেছেন হোটেলে। 'বয়, এক কাটলেস লে আও।'

'হুজুর আজ মীট-লেস।'

সায়েব বললেন, 'কুছ পরোয়া নাহী ; সো হী লাও।'

সায়েব ভেবেছেন 'মীট-লেস' (দিন) বুঝি কাটলেসের এক নবীন সংস্করণ।

মূল কথায় ফিরে যাই।

নরমান জয়ের পর ক্রমে ক্রমে যেসব বিদেশী খাদ্যরাজি বিলাতে প্রবর্তিত হল, তার ইতিহাস এখনো আমার চোখে পড়ে নি—পক্ষান্তরে ফরাসী খাদ্যের সর্বাঙ্গসুন্দর উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে উত্তম উত্তম পুস্তক দেখেছি। শুনেছি, মহামান্যবর স্বর্গীয় আগা খান এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভোজনরসিক ছিলেন। তাঁর নাকি একখানি বিশাল বিরাট এটলাস ছিল—তাতে পৃথিবীর কোন্ জায়গায় কোন্ সময় কোন্ খাদ্য উত্তমরূপে প্রস্তুত হয় সেগুলো চিহ্নিত ছিল। এ পৃথিবীর সব খাদ্যই যখন তিনি একাধিকবার খেয়ে পরিতৃপ্ত হলেন তখন নূতন রসের সন্ধানে অন্যলোকে চলে গেলেন। আমার হাজার আপসোস তাঁর সঙ্গে কখনো দেখা হয় নি বলে।

তা সে যাই হোক, এ কথা মোটামুটি বলা যেতে পারে বর্বর ইংরেজী রান্নার প্রতীক ছিল 'ক্রুয়েট স্ট্যাণ্ড' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবধি। এতে থাকতো সিরকা, অলিভতেল, উস্টার সস আর সরষে। নুন গোলমরিচ তো আছেই। বস্তুত এর কোনো একটা কিংবা একাধিক বস্তু না মিশিয়ে অধিকাংশই খাওয়া যেত না। নিতান্ত খরগোশ গোত্রজাতরাই ইংরেজের স্যালাড কচর কচর করে চিবুতে পারতো। পার্ক সার্কাসের রদ্দিতম ধনে কিংবা পুদিনা স্যালাড এর তুলনায় অমৃতগন্ধী মধুমঞ্জরী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সেপাইরা ট্রেঞ্চে শুয়ে শুয়ে অখাদ্য খেয়ে খেয়ে স্বপ্ন দেখতো, ছুটিতে প্যারিসে ছিমছাম রেস্তোরাঁয় করকরে টেবিলক্লথওলা ছোট্ট টেবিলের উপর 'মেডফুড'—অর্থাৎ তৈরী খাবারের ; ইংরিজী ধরনে নুন লঙ্কা তেল সস মিশিয়ে খেতে হয় না, ফরাসী শেফ্ এসব বস্তু রান্নাঘরেই পরিপাটিরূপে 'তৈরী' করে দিয়েছে—আমাদের মা-মাসীরা যেরকম মাছের ঝোল কিংবা চালতের অম্বল করে দেন। তারই ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরিজী রান্নার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন হয়। সেইটে আমি চোখে দেখি ১৯৩০ সনে। অখাদ্য লেগেছিল কারণ, সদ্য গিয়েছি লণ্ডনে—প্যারিস থেকে।

ইন্‌ভেশনের জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশ্বসংসারের জাত-বেজাত জড়ো করা হল ইংলণ্ডে—আলেকজাণ্ডারের সময় মেসিডোনিয়ায় কিংবা রোমের মধ্যাহ্ন দীপ্তির সময়ও ঐ শহরে বোধ হয় এরকম সাড়ে বত্রিশ ভাজা কখনো হয় নি। ফলে লণ্ডনের রান্না আপাদমস্তক বদলে গিয়েছে।

সেইটে চাখলুম '৫৮-এ।

সব কিছু বেবাক বদলে গিয়েছে। ইস্তেক ক্রুয়েট তার মালমসলাসুদ্ধ গায়েব। যেদিন নুন-লঙ্কার শিশিও যাবে, সেদিনই ইংরিজী রান্না তার চরম মোক্ষে পেঁছবে। কে না জানে, ভালো রাঁধুনী কাউকে ফালতো নুন নিতে দেখলে বেদনা পায়। প্যারিসে শোনা যায়, ভোজরাজ সম্রাট আর্গা খান এক বিখ্যাত রেস্তোরাঁয় মনের ভুলে একটু ফালতো নুন নিয়েছিল বলে রেস্তোরাঁর রাঁধুনী মনের দুঃখে আত্মহত্যা করে। ইংলণ্ডে এখন পাচকই রান্নাঘরে আহারাদি তৈরী করে। গাহককে ডাইনিং হলে টেবিলের উপর পি সি সরকারের মত নিপুণ যাদুকরী হস্তে সিরকা সস ঢেলে কাঁচা-সেদ্ধ মালকে সুস্বাদ করতে হয় না। পৃথিবীর আর পাঁচটা জাত—মায় বাণ্টু হটেনটট—এতকাল যা করে আসছে।

এবং জাত-বেজাতের নূতন নূতন পদও তার রান্নাঘরে ঢুকতে দিয়েছে।

ত্রিশ বছর আগে রাইস-কারি খেতে হলে আপনাকে লিভিংস্টোনের মতো ছ'মাসের চালাচ'ড়ে পুরনো ধুতিতে বেঁধে বেরোতে হত তারই আবিষ্কারে। বহু বাজে লোক কর্তৃক বেপথে চালিত হয়ে, বহু পুলিসমেনের 'সক্রিয় সহযোগিতা'র ফলে, 'অশেষ ক্লেশ ভুঞ্জিয়া' আপনি যখন মোকামে পেঁছিতেন তখন রাইস-কারি খতম! সেই লক্ষ্মীছাড়া বীফস্টেক খেয়ে বাড়ি ফিরতেন। মনে পড়তো সেই গরীব মোল্লার কাহিনী। চেয়েচিন্তে অতি কষ্টে খেয়ার একটি পয়সা যোগাড় করে সে যখন ওপারে ফাতেহার (শ্রাদ্ধের) ভোজে পেঁছিল তখন সব কিছু ফুরিয়ে গিয়েছে। মেহ্‌মানকে তো আর অভুক্ত ফেরানো যায় না—তাড়াতাড়ি ভাত আর মুসুর ডাল সেদ্ধ করে তাকে খাওয়ানো হল। মনের দুঃখে সে বললো, 'ওরে ডাল, আমি না হয় খেয়ার পয়সা ধার করে যোগাড় করলুম; তুই পেলি কোথায়?' আপনিও স্টেককে শুধাবেন, 'এ পথ তুই পেলি কোন্ পুলিসকে শুধিয়ে?

একদম পয়লা নম্বরী হোটেলে—অর্থাৎ যেখানে গ্লস্টারের ড্যুক্, কেন্টের ডাচেস খেতে যান—আমি যাই নি। তার অধিকাংশই দামের ঠেলায় ফাঁকা। বিরাট হলের এখানে দু'জন ওখানে চারজন লোক খাচ্ছে, আর বেকার ওয়েটার-গুলো ঈভনিং ড্রেস পরে হেথা-হোথা জটলা পাকাচ্ছে, বাড়িটা যেন খাঁ খাঁ করছে—এমন জায়গায় খেয়ে সুখ নেই। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল চ্যারিটি ম্যাচে যদি গিয়ে দেখেন মাত্র আপনি আর ওপাড়ার গোবর্ধন উপস্থিত, আর কেউ নেই, তখন কি খেলা দেখাটা জমে? অবশ্য যেখানে এমন ভিড় যে পলায়মান বয়ের কাছাতে হ্যাঁচকা টান না দেওয়া পর্যন্ত একটা হাফ-সিঙ্গল চা জোটে না সেখানেও 'গবুযন্ত্রণা'। বাচ্চা এবং চা আসি-আসি করে না এলে কি পীড়া

তা শুধু পোয়াতী আর গাহকরাই জানে।

অতএব যেতে হয় দুই নম্বরী হোটেলে। এবং সেখানে আপনি হরবকৎ রাইস-কারি পাবেন—পয়লা নম্বরীতে পান আর না-ই পান। আর কোনো কোনো রেস্তোরাঁয় লেখা আছে 'পাটনা রাইস'! পাটনা রাইসের প্রতি এ দুর্বলতা কেন? রাষ্ট্রপতির শহর বলে?

আর যারা খাচ্ছে তারা বাঙালী নয়, ভারতীয় নয়—দুনিয়ার চিড়িয়া।

এই সব খাস বিলিতি রেস্তোরাঁতেই যদি রাইস-কারি জামাইয়ের কদর পাচ্ছে তবে তার আপন বাড়িতে অবস্থাটা কি রকম?

সে এক অভিজ্ঞতা।

লণ্ডনের বুকের উপর তবে ঠিক বড় রাস্তায় নয়। ভালোই। হট্টগোল কম। এই আমাদের বড়বাজারে যতখানি। তবে বড় রাস্তায় গোলমাল কত? মুখুয্যেকে শোধাবেন। সে বেচারী ঘুমুতে পারতো না।

ইয়া লম্বা, উর্দী পরা, মাথায় পাঠানী পাগড়ী, ছ'ফুটি দরোয়ান। যেখানে হ্যাট রেনকোট ছাড়তে হয় সেখানেও তদ্বৎ। ঢুকেই লাউঞ্জ—ককটেলটা-আসটা খাবার জন্য, ভাগ্যিস ওটা মুরারজী ভাই চালান না। সাজসজ্জা পুরো ভারতীয়। হেথায় নটরাজের ব্রোঞ্জ, হোথায় পেতলের ভারতীয় অ্যাসট্রে, আরো এটা সেটা, ধূপকাঠিও জ্বলছে।

এগিয়ে এলেন এক খাপসুরৎ শ্যামাঙ্গী, পরনে মুর্শিদাবাদী, চুলে তেল পড়েছে—মেমেদের শন-পাটের মত স্নেহহীন নয়—খোঁপাটিও ন'সিকে বাঙালোরী, ব্লাউজ ব্লাউজেরই কাজ করছে—চোলীর প্রক্সি দিচ্ছে না—চোখে-মুখে খুশী, ভারি চটপটে। একটা 'নমস্তে' ভী পেশ করলে।

বাঃ, এ তো বেড়ে ব্যবস্থা!

গাছে না উঠতেই এক কাঁদি!

তাহলে উত্তম আহারাদি হবে।

ফরাসী গুণী রশফুকোল বলেছেন, 'আহার প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু রসিক-জনের মত আহার করা আর্ট।' ভোভানার্গ বলেছেন, 'মহৎ চিন্তা পেটের ভিতর থেকে আসে।' গ্রীক দার্শনিক এপিকুর বলেছেন, 'প্রকৃতিদত্ত বুদ্ধিবৃত্তি উত্তম কর্মে নিযুক্ত করবে এবং সুবুদ্ধিমানের মত পরিপাটি আহার করবে।' এবং ইকলেসিয়াসটের মাধ্যমে নমস্য বাইবেল গ্রন্থ অনুশাসন দিয়েছেন, 'পান, আহার ও আনন্দ করার (ইট, ড্রিংক অ্যাণ্ড বি মেরি) চেয়ে মহত্তম কর্ম ত্রিভুবনে নেই।'

আর মলিয়ের যখন বলেন, 'আমরা বাঁচার জন্য খাই; খাওয়ায় জন্য বাঁচি নে', তখন তিনি বর্বরজনসুলভ প্রলাপ বাক্য ব্যবহার করেছেন। 'আমরা খাওয়ার জন্য বাঁচি, বাঁচার জন্য খাই না।'

ভোজনাদি সম্বন্ধে আমি আলোচনা আরম্ভ করলেই কোন কোন উন্নাসিক পাঠক বিরক্ত হন, আবার কেউ কেউ বলেন, এ-সব কথা তো আগেও যেন শুনেছি বলে মনে হচ্ছে। উত্তরে নিবেদন, সব কথা শোনেন নি; আর শুনে

থাকলেই বা কি ? পুরনো জিনিসের পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে নীচুশে একদা লিখেছেন, 'এ কথা আমি পূর্বেও বলেছি, কিন্তু মানুষ শোনা কথাই শুনতে চায়, জানা কথাই বিশ্বাস করে।' একদম খাঁটি কথা। আমাদের মোহর বীবী, কণিকা ব্যানার্জিকে যখন শুধাই, 'সেই রেকর্ডে দেওয়া তোমার গান "ওগো তুমি পঞ্চদশী" ফের বেতারে গাইলে কেন ? ওটা তো ইচ্ছা করলেই রেকর্ড বাজিয়ে আবার শোনা যায়', তখন সে বলে, 'কি করবো, সৈয়দদা, লোকে যে পুরনো গানই শুনতে চায় ?' বুঝলুম, বাচ্চাদের কাছে নূতন গল্প বলতে চাইলে তারা যে রকম চেঁচিয়ে ওঠে, 'না মামা, কালকের সেই বাঘের গল্পটা বলো।'

দ্বিতীয়ত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার রচনা বাঙলা দেশে অজরামর হয়ে থাকবে না, আমার রসনির্মাণপ্রচেষ্টা বাণী-সরস্বতীর অঙ্গদে কুণ্ডলে মাল্যরূপে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে না, কিন্তু এ-কথা স্থিরনিশ্চয় জানি, এই বঙ্গসন্তানদের যেদিন কাণ্ডজ্ঞান সম্যক্ প্রস্ফুরিত হবে, যেদিন তারা 'ভরতনাট্যম', 'পিকাস্সো', 'সিংহেন্দ্র মাধ্যম' কিংবা 'ভাল্লুকপঞ্চমীর', পশ্চাদ্ধাবন কর্ম' বর্বরস্য শক্তিক্ষয় বলে সুষ্ঠুরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে সেদিন সে উদরমার্গের সন্ধানে নব নব অভিযানের পথে নিষ্ক্রান্ত হবেই হবে। আজ যে রকম ক্বচিৎ-জাগরিত বিহঙ্গ-কাকলীর ন্যায় কোন কোন বিদ্বজ্জন চৈতন্যচরিতামৃতের ভোজনামৃত খাদ্য-নিঘণ্টু অধ্যয়ন করতে করতে বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন উত্থাপন করেন 'কিমাশ্চর্যম্ ! ছানার সন্দেশের উল্লেখ তো কুত্রাপি নেই ?'—ঠিক সেইরূপে অস্মদ্দেশে যেদিন রাজবর্ত্মে রাজবর্ত্মে চিৎকার প্রতিধ্বনিত হবে, 'আমাদের দাবি মানতে হবে ! ভোজনমার্গের গীতা রচনা করো ! ইন্‌কিলাব-জিন্দাবাদ ; পেট-কিল্লাব-ঝাণ্ডা তোল্ !' সেদিন, বলতে লজ্জা করছে, বিনয়ে বাধছে, সেদিন এই অধমের, হ্যাঁ এই অধমের বইয়ের সন্ধানেই বেরোতে হবে বঙ্গের ম্যাক্সমুলার মমজেনকে। আফগানিস্থানের সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস নির্মাণে মল্লিখিত 'দেশে-বিদেশে' ব্যবহৃত হবে কি না জানি না, কিন্তু এ বিষয়ের সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেণ সন্দেহ নেই যে আজ আমরা যে রকম আমাদের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস রচনার সময় নিরপেক্ষ পর্যটক পরিদর্শক হিউয়েন সাঙের শরণাপন্ন হই, ঠিক সেই রকম ইংলণ্ড-সন্তান যেদিন সভ্য হয়ে তার দেশের ভোজনেতিহাস লিপিবদ্ধ করবে সেদিন তাকে বেরোতে হবে—পুনরায় ব্রীড়িত হচ্ছি—এই আমারই বইয়ের সন্ধানে, রাখাল বাঁড়ুয্যেকে যে রকম মোন্-জো-দড়োর সন্ধানে একদা বেরোতে হয়েছিল ; আপনাদের রবি ঠাকুরের 'চাঁদ উঠেছিল গগনে'র সন্ধানে সন্ধানে দেশে কেউ আসবে না। রায়গুণাকর অন্নদাশঙ্করের 'রত্ন ও শ্রীমতী'র জন্য তাঁর প্রকাশক মাত্র ইয়োরোপকে চেলেঞ্জ করছে, আমার প্রকাশক বিশ্বভুবনকে ক্রৌঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করবে, কাজী সাহেবের ভাষায় (আল্লা তাঁর বিমারী বরবাদ করে জিন্দেগী দরাজ করুন !) ত্রিভুবনেশ্বরের সিংহাসন নিয়ে আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ আরম্ভ করবে।

সেই রত্নসমা শ্রীমতী তো ফরাসিস পানীয়ের কথা ওঠাতে আরেকবার 'বিলক্ষণ' বলে অন্তর্ধান করলেন ; আমি ভাবলুম, ঐ যা যা। ব্যাকরণে বুঝি গলতি হয়ে গেল। এ যে সম্ভ্রান্ত ভারতীয় ভোজনালয় ! এ সব বিদগ্ধ পানীয় বোধ হয় এখানে নিষিদ্ধ। আবার বাঙাল বনে গেলুম নাকি ?

নাঃ ! কোনো ভয় নেই। ভাতিজা, চ্যাংড়া মুখুয্যে ঘটিস্য ঘটি। সে দেখি দিব্যি তার টুথব্রাশ-গোঁফে আঙুল বুলোতে বুলোতে নিশ্চিন্ত মনে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে—চোখ দুটো যেন ব্লটিং পেপার—সব কিছু শুষে নিচ্ছে।

পুরীর সমুদ্রপারে ঢেউ দেখে অবন ঠাকুর ভীত হয়ে যখন পালাবার পথ খুঁজছিলেন, তখন তাঁর এক স্যানা বন্ধু তাঁকে বলেন, 'ভয় কিসের ? সায়েব-সুবোরা তো চতুর্দিকে রয়েছেন।' অর্থাৎ তেমন কিছু বিপজ্জনক পরিস্থিতি হলে পুলিস আগেই তাঁদের খবর দিতেন, তাঁরাও কাটতেন।

যাক্। এদেশে আনকোরা আগত মুখুয্যে যখন নিশ্চিন্ত তবে আর আমার ভয় কি ?—তখন কি আর ছাই জানতুম, সে আমারই ভরসায় নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে !

কিন্তু, সায়েব-সুবোরা তো রয়েছেনই। তেনারা তো 'পানীয়' বেগর ভোজন করতে পারেন না।

এবং সাতিশয় উল্লাসের সঙ্গে লক্ষ্য করলুম, কোনো ভারতীয় লাউঞ্জে নেই। তারা নিশ্চয়ই মনুনিষিদ্ধ এই পানে লিপ্ত হয়ে পাপবিদ্ধ হয় না। সোজা ডাই-নিংরুমে ভোজন করতে গিয়েছে। তাদের চরিত্রবল দেখে উল্লাস বোধ করলুম।

ওদিকে দেখি শ্রীমতী অন্য খদ্দেরকে স্বাগত জানাচ্ছেন। ভারী বিরক্তিবোধ হল। এ যে দেখি হুবহু বাঙালী দোকানের মতো। আপনাকে জিনিস দেখাতে দেখাতে হঠাৎ অন্য খদ্দের ঢুকছে দেখে দিল ছুট তার দিকে—আপনাকে ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলিয়ে রেখে, কিংবা যে রকম নির্মল সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত জানান যে আপনার পরীক্ষার ফল পরে বেরুবে।

নাঃ। আমারই ভুল ! দেখি হেলেদুলে একটি মোটাসোটা ভারিক্কি ধরনের লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এর গলায় গলাবন্ধ কোটের উপর ঝোলানো মসীকৃষ্ণ উপবীত ও তৎসংলগ্ন কুঞ্চিকা দেখে এর জাতগোত্র বুঝতে আমার কণামাত্র সময় লাগলো না, যাঁরা সংস্কৃতে লেখা 'প্রতিমালক্ষণ' সংক্রান্ত অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন করেছেন তাঁরাই জানেন, প্রতিমা দেখে কোন্‌টা কোন্ দেব না দেবীর জানতে হলে স্মরণ রাখতে হয়, কোন্ দেবীর দক্ষিণ হস্তে কুবলয় বলয়, কার বাম হস্তে চক্র, কার মস্তকে উষ্ণীষ, কার পদে নূপুর।

কুঞ্চিকাসমন্বিত কৃষ্ণোপবীত 'ওয়াইন মাস্টারে'র লক্ষণ।

আপনি যদি চাষাড়ে হুইস্কি বিয়ার রাম্ জিন না খেয়ে উত্তম বিদগ্ধ ফরাসী কিংবা জর্মন অথবা ইতালীয় 'ওয়াইন' খেতে চান, তবে এই ভদ্রসন্তান আপনাকে পরম বান্ধবের ন্যায় তাবৎ সন্ধিসুড়ুক বাতলে দেবেন। চাণক্য বলেছেন, 'ব্যসনে (এবং মদ্যপান ব্যসন-বিশেষ) যে সঙ্গে থাকে সে বান্ধব।' ইনি তাই করে থাকেন। তবে চাণক্যের বান্ধব আপনাকে কোনগতিকে ঠেকিয়ে

বাড়ি নিয়ে যাবার চেষ্টা করে ; ইনি মোকা পেলে ওস্কাবার চেষ্টা করেন—এই যা তফাত।

মৃত্যুঞ্জয় যে রকম কৈলাসে বিহার করেন, রাশান ডিকটেটর যে রকম ক্রেমলিনে বাস করেন, ভেজাল যে রকম খাদ্যে বিরাজ করেন, এই 'ওয়াইন মাস্টারটি' ঠিক তেমনি বিচরণ করেন অতিশয় পয়লানম্বরী খানদানী 'ভয়াঙ্কুর' রেস্তোরাঁতে। 'ভয়াঙ্কুর' বললুম ইচ্ছে করেই। এখানে অংকুর পর্যন্ত বিনষ্ট হয়। ইনি আপনার সর্বস্ব অপহরণ করেন। পাতলুন বন্ধক দিয়ে বিল শোধ করতে হয়।

ভীতকণ্ঠে ভাতিজাকে শুধালাম, 'ওরে, রেস্ত আছে তো ?'

ভিতরের বুক-পকেটের উপর থাবড়া মারার মুদ্রা দেখিয়ে বললে, 'কুছ পরোয়া নেই ; আপনি চালান।'

সোনার চাঁদ ছেলে। একেই বলে বান্ধব। ব্যসনে সঙ্গে থাকে।

এ-জীবনে আর যদি কখনো চাকরি নিই তবে উমেদার হব এই 'ওয়াইন মাস্টারে'র চাকরির জন্য—বেতারের কাজ হয়ে গিয়েছে, সেখানে শুধু খাপসুরৎ কলাবতীর ঝামেলা ; তারা আমাকে যথেষ্ট 'কল্‌চরড্‌' বলে বিবেচনা করেন না।

খানদানী রেস্তোরাঁর চার ইঞ্চি পুরু মহামূল্যবান ইরানী গালচের উপর মৃদু পদসঞ্চরণ করে কাটবে আপনার জীবন—ভ্রমর যে রকম তন্বঙ্গীর বিম্বাধরে পদক্ষেপ করে ঠিক সেই রকম (বিশ্বাস না হলে কালিদাস পশ্য) এক জোড়া চার আউন্স ওজনের ঈভনিং শুতে কেটে যাবে ঝাড়া দশটি বছর—হাপসোল পর্যন্ত বদলাতে হবে না। এ টেবিলে গিয়ে কাউকে বলবেন, 'তিপান্নের "নীরেনস্টাইনার" —সে একটি স্বপ্ন, স্বপ্ন। ১৯৫৩-এ সেখানকার আঙ্গুর মোলায়েম রৌদ্রে যা রসে টইটম্বুর হয়েছিল, সেরকম ধারা আর কখনো হয়নি। তাই দিয়ে এ সুধা নির্মিত হয়েছে। কখনো না অন্য টেবিলে গিয়ে ফিস্‌ ফিস্‌ করবেন 'মাদাম, দেখুন, দেখুন, এই শ্যাম্পেনের বুদ্বুদ কি রকম লক্ষ লক্ষ পরীর মত সলোমনের বোতল-বন্ধ জিনের ন্যায় নিষ্কৃতি পেয়ে লক্ষ লক্ষ হাওয়ার ডানা মেলে ঊর্ধ্বপানে উড়ে যাচ্ছে। এ বস্তু গলা দিয়ে নাবার সঙ্গে সঙ্গে আপনিও ইহলোকের সর্ববন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে নীলাম্বরের মর্মমাঝে উধাও হয়ে যাবেন।' তারপর একটু মৃদু হাসি হেসে বলবেন, 'তাই, মাদাম, এ শ্যাম্পেন যিনি অর্ডার দেন তাঁর কাছ থেকে আমরা আগেভাগেই বিলটা আদায় করে নিই অবশ্য, আপনাদের বেলা সে কথাই উঠছে না।'

এ তো হল। তারপর আপনি ঘড়ি ঘড়ি 'বারে' সেলারে গিয়ে তদারক করবেন, সর্ববস্তু রাজসিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত রয়েছে কি না। রাঁধুনীকে যে রকম সে-সব জিনিস মাঝে মাঝে চেখে দেখতে হয় আপনাকেও 'নিতান্ত বাধ্য হয়ে', 'অতিশয় অনিচ্ছায়'—আমাদের বরকর্তারা যে রকম পণ নেন · অল্পস্বল্প মাঝে-মধ্যে চেখে দেখতে হবে বইকি ?

তাও হল। ওদিকে আপনাকে প্রতি শরতে ফ্রান্স যেতে হবে, সেখান থেকে

নিলামে পানীয় কিনে সেলার পূর্ণ করার জন্য। আপনার কমিশনটা-আসটা ঠেকায় কে? আপনার ভারী ভারী গাহক খদ্দেরের বাড়ির জন্য তাদের প্রাইভেট অর্ডারও সাপ্লাই করবেন। তাতেই বা কম কি? ওনরা হাত উপুড় করলেই আমাদের পর্বত-প্রমাণ!

আমাদের 'ওয়াইন মাস্টারটি' এসে নমস্তে জানালেন। চমৎকার চেহারা। নেয়াপতি ভুঁড়ি, চোখ দুটি জবাকুসুমসংকাশং যা হওয়ার কথা।

আমি সবিনয়ে বললুম, 'ত্রিশ বছর পরে এসেছি। ইতিমধ্যে একটা লড়াই হয়ে গিয়েছে। জর্মনরা ফ্রান্স ছাড়ার সময় প্যারিসের 'নত্র দাম্' গির্জে সঙ্গে নিয়ে যায় নি বটে, কিন্তু ফ্রান্সের সেলারে সেলারে ঢুকে তার উত্তম-অধম সর্ব-পানীয় খতম করে যায়। এখন যা ফ্রান্স ইংলন্ডে পাওয়া যাচ্ছে, তার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। আপনি পথপ্রদর্শন করুন। তবে এইটুকু বলতে পারি, বর্দো এবং শান্ত।'

'শান্ত' মানে যে বস্তু সোডার মত বুজ্‌বুজ্ করে না, তেলের মতো শুয়ে থাকে।

চাকুরে যে রকম পেন্‌সন্‌ধারীকে খাতির করে, 'মাস্টার' আমাকে সেই রকম কদর করলে। আহা এককালে লোকটা সব কিছু জানতো। এখন না হয় আউট অব্ ডেট্।

ম্যাক্‌স্‌ম্যুলার নাকি আমাদের সংস্কৃত শিখে ভশচাষদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন, হরিনাথ দে নাকি গ্রীক শিখে গ্রীকদের চিত্তহরণ করেন—এসব শোনা যায়, কিন্তু আমাদের এই 'পানের প্রভু' দেখলুম সত্যিই পেটে এলেম ধরে। দেখলুম হেন পানীয় নেই, যার ঠিকুজি-কুলজি তাঁর বিদ্যাচৌহদ্দীর বাইরে পড়ে। কবে কোন্ বৎসরে কোন্ গাঁয়ের আঙ্গুরে এ জিনিস তৈরী, সে বৎসর আঙ্গুর পাকার সময় সেখানে বৃষ্টি হয়েছিল না মেঘ ও রৌদ্র না মোলায়েম মোলায়েম মিঠে রোদ্দুর ছিল, কার চাপযন্ত্রে তার রস বের করা হয়, তাই দিয়ে সবসুদ্ধ ক' বোতল তৈরী হয়েছিল, তার কটা গেল মার্কিন মুল্লুকে কটা এল এ দেশে, এর 'বডি' কি রকম, 'বুকে' (bouquet)-টাই বা রমণীয় কিনা—সব কিছু জিহ্বাগ্র-দর্পণে এবং উভয়ার্থে।

'নগণ্য' ভারতীয় যে এই বিলিতি বিদ্যে এতখানি হাসিল করেছে তার কাছে মাক্‌সম্যুলারের সংস্কৃতজ্ঞান শিশু।

শুধালুম, 'ভদ্রে, এ কর্মে কতদিন ধরে আছেন?'

সবিনয়ে বললে, 'আজ্ঞে, পঞ্চাশ বছর পূর্বে যখন এ রেস্তোরাঁ খোলা হয় তখন থেকে। সে আমলের আর কেউ নেই।'

তবে কি এসব জিনিস খেলে মানুষ দীর্ঘজীবী হয়? অর্থাৎ ওয়াইন—যে বস্তু আঙ্গুরের রস দিয়ে তৈরী হয়েছে, হুইস্কি বিয়ারের কথা উঠছে না।

জানি রসভঙ্গ হবে, তবু হুইস্কি ওয়াইন কোনো জিনিসই ভালো নয়। অতিশয় শীতের দেশে, কিংবা ডাক্তারের হুকুমে খাওয়া উচিত কিনা, সেকথা আমি বলতে পারবো না। অতখানি শীতের দেশে আমি কখনো যাই নি—

বিলেতে গরম দুধ, চা, কফি খেলেই চলে—আর অতখানি অসুস্থও আমি জীবনে কখনো হই নি। মদ্যপান করলে ভালো লেখা বেরোয় এ কথা আমি বিশ্বাস করি নে। মেঘনাদ কাব্য রচনার সময় মাইকেল ক্লান্তি দূর করার জন্য অল্প খেতেন, শেষের দিকে যখন মাত্রা বেড়ে গেল, তখন দু'চার পাতা লেখার পরেই বেএক্কেয়ার হয়ে ঢলে পড়তেন—তাঁর গ্রন্থাবলী সে সব অসমাপ্ত লেখায় ভর্তি। এবং তার চেয়েও বড় কথা, আপনি আমি মাইকেল নই। একখানা মেঘনাদ লিখুন; তারপর না হয় মদ খেয়ে লিভার পচান—কেউ আপত্তি করবে না।

এবং সব চেয়ে মারাত্মক তত্ত্ব শুনেছি কোনো কোনো কলেজের ছোকরার কাছে। বিয়ার নাকি মদ নয়, ওতে নাকি নেশা হয় না, ও বস্তু খেলে নাকি পরীক্ষার পড়া করার সুবিধে!

বটে! বিয়ারে নেশা হয় না? লণ্ডন প্যারিসে রাস্তায় যারা মাতলামো করে তারা কি খায়? কোকা কোলা? অগা আর কারে কয়! ওদের পনেরো আনা বিয়ার খেয়েই মাতাল হয়। আমাকে ওসব বলো না; ঠাকুমাকে ডিম চোষা শেখাতে হবে না।

মূল ফার্সীতে আছে,

গর্ দস্ত দহদ্ জ্ মগ্জ্-ই-গন্দুম্
নানি,
ওয়াজ ময় দো মনী জ্ গোসফন্দী
রানি,
ওয়ানগাহ্ মন্ ওয়া তো নিশস্তে
দর ওয়েরানি
আয়েশী বোদ্ অন্ ন্ হদ্ হর্
সুলতানি

এর ইংরিজী—

Here with a loaf of bread
beneath the bough,
A flask of wine, a book of
verse—and Thou
Beside me singing in the
Wilderness—
And Wilderness is Paradise
enow.

(ফিট্স্জেরাল্ড্)

তার বাঙলা—

সেই নিরালা পাতায় ঘেরা বনের ধারে
শীতল ছায়,

খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে, ছন্দ গেঁথে
দিনটা যায় !
মৌন ভাণ্ডি তার পাশেতে গুঞ্জে
তব মঞ্জু সুর—
সেই তো, সখি, স্বপ্ন আমার,
সেই বনানী স্বর্গপুর।
(কান্তি ঘোষ)

কিংবা

বনচ্ছায়ায় কবিতার পুঁথি
পাই যদি একখানি
পাই যদি এক পাত্র মদিরা আর
যদি তুমি রানী
সে বিজনে মোর পার্শ্বে বসিয়া
গাহো গো মধুর গান
বিজন হইবে স্বর্গ আমার
তৃপ্তি লভিবে প্রাণ।
(সত্যেন দত্ত)

যার প্রাণে যা চায় তিনি সেই ভাবে অনুবাদ করেছেন। খৈয়ামের খড়বাঁশের কাঠামোর উপর যে যার আপন মানসমূর্তি স্বপ্নপ্রতিমা গড়েছেন ; আসলে কিন্তু আছে,

উত্তম ময়দার তৈরি রুটি যদি
হাতে থাকে,
আর যদি থাকে দু'মণ মদ এবং
বাচ্চা ভেড়ার আস্ত একখানা ঠ্যাং (রান),
ঘুঘু-চরা পোড়ো বাড়িতে কাছাকাছি বসে
তুমি আমি দু'জনা
সে আনন্দ বহু সুলতানেরও ভাগ্যে
জোটে না।

খৈয়াম এ কবিতায় 'কবিত্ব' করেন নি। তিনি সাদামাটা ভাষায় বলছেন, তাঁর কি কি চাই। মোলায়েম কবিতায় বিলকুল অচল হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভেড়ার একখানা আস্ত ঠ্যাং (রান্ কথাটা আসলে ফার্সী এবং তিনি ইটি এস্থলে নির্ভয়ে ব্যবহার করেছেন) অর্ডার দিয়েছেন এবং পাছে নেশা জমাবার আগে মদ ফুরিয়ে যায় তাই পাক্কা দু'মণ খাঁটি চেয়েছেন। এবং লক্ষ্য করার বিষয় তিনি কবিতার বই আদপেই চান নি। সে জিনিস যে পারে সেটা সে চায় না। মাটি থেকে পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে যে দড়ির উপর নাচতে পারে। সে প্রিয়াকে নিয়ে বোট-নিক্‌সে পিক্‌নিক করতে যাওয়ার সময় ডাণ্ডা দড়ি বগলে করে নিয়ে যায় না। এবং আসল কথাটা দুই বাঙালী অনুবাদকই ঘুলিয়ে ফেলেছেন। খৈয়াম

বলেছেন, 'যা সব চাইলুম তা পেলে আমি জাহান্নমেও যেতে রাজী আছি, ওরকম 'জাহান্নম' রাজা-বাদশার কপালেও জোটে না।'

যে ইরান-সন্তান চতুষ্পদীটির ফরাসী অনুবাদ করেছেন তিনি মূল তত্ত্বটি ধরতে পেরেছেন বলে খৈয়ামের প্রতি অবিচার করেন নি।[১]

Pour celui qui possede un
morceau de bon pain.
Un gigot de mouton, un grand
flacon de vin,
Vivre avec une belle au milieu
des ruines,
Vaut mieux que d'un Empire
etre le souverain.

(এতেস্‌সাম-জাদে)

কিন্তু আমার মূল বক্তব্য এখানে তা নয়।

আমি বলতে চাই, কবিতা বা অন্য কোনো বস্তু অনুবাদ করার সময় এ শুচিবাই কেন? কেন লোকে ধরে নেয় যে কাব্যে ভেড়ার ঠ্যাং চলতে পারে না? ইংরেজ এ শুচিবাই শিখেছে গ্রীকদের কাছে। তাদের 'ভিনাস' মূর্তি দেখে এক সরলা নিগ্রো রমণী শুধিয়েছিল, 'শরীরের নিচের আধা সম্বন্ধে মেয়েটার অত লজ্জা কেন? ওটা ছালা দিয়ে ঢেকেছে কেন?'

যুগে যুগে রুচি বদলায়। অনুবাদ করার সময় যদি আপন যুগের রুচি দিয়ে পূর্ববর্তী যুগের রুচির উপর সেনসর চালাই তবে কবির প্রতি তো অবিচার করা হয়ই, পরবর্তী যুগের রসিকজনের প্রতিও অমর্যাদা দেখানো হয়। কোনারকের মন্দির বহু সায়েবসুবোর রুচিতে বাধে। তাই বলে আমরা তো আর মূর্তিগুলোর মুণ্ডু বাইরে রেখে বাকি ধড় কম্বল চাপা দিয়ে রাখি নে।

ওমরের স্মরণে আমি একখানা পুরো রানই অর্ডার করতে চেয়েছিলুম, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল, পরশু রাতের শিক্ষা।

১ স্বরাজ লাভের পর দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল বেড়েছে। বিশেষ করে ইরান, আরব ভূখণ্ড যখন নানা রকম আন্দোলন-আলোড়নের সৃষ্টি করে তখন এদেশের বহুলোক জানতে চান, এর পিছনে তত্ত্ব কতটুকু। এমন কি এদেশের চিত্রকররা পর্যন্ত জানতে চান, ইরান তুরানে ছবি কিভাবে আঁকা হচ্ছে?—সেই পুরানো পদ্ধতি, না মডার্ন প্রভাব তার উপর এসেছে। আমার কাছে তেহরানে প্রকাশিত যে সচিত্র খৈয়াম আছে তার ছবি দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, এর কলাকার প্রাক্‌ রবি বর্মা (আমাদের হিসাবে) যুগের। চিত্রকর ফিট্‌স্‌জেরাল্‌ডের স্মরণে খৈয়ামের হাতে একখানা কবিতার বই দিয়েছেন, পুরো রান্‌ না দিয়ে পেলেটে একখানা ছোট্ট মটন চপ রেখেছেন, এবং মদের বোতলটি খড়ে মোড়া—ইতালিয়ান কিরান্‌টি বোতলের মত।

তখন সন্ধ্যে আটটা। দেশের হিসেবে রাত দেড়টা। সবে এদেশে এসেছি; শরীরটা এদেশের টাইমে ধাতস্থ হয় নি। ভাতিজাকে বললুম, 'বাবাজী, আমি আর বেরুচ্ছিনি। তুমি আলুসেদ্ধ-ফেদ্দ কিছু একটা নিয়ে এস—রুটি-মাখন ঘরেই আছে। তাই দিয়ে দিব্য চলে যাবে।'

মুখুজ্যে মশাই যখন ফিরে এলেন তখন দেখি তাঁর হাতে এক ঢাউজ থলতে—বাঙাল দেশে বলে ঢোঙ্কা।

মিনির মত সরল চিত্তে শুধালুম, 'এর ভিতর কি হাতি?'

বললে,'সর্বনাশ হয়েছে, স্যার!'

এস্থলে বলে রাখা ভালো, মুখুজ্যের 'সর্বনাশ'টা খাস কলকাত্তাই। মোকামে পেঁছে যখন দেখলে তার বহু পয়সার মাল শান্তিনিকেতনের একটা ডকুমেন্টরি ফিলম বেমালুম গায়েব হয়ে গিয়েছে, তখন 'টুথব্রাশমুস্টাশে' হাত বুলিয়ে বলে, 'যাক গে' আবার যখন পাতলুনের পকেট খুঁজে পায় না তখন বলে সর্বনাশ হয়েছে।

আমি তার সর্বনাশে বিলক্ষণ অভ্যস্ত বলে হাই তুলতে তুলতে নিশ্চিন্ত মনে শুধালুম, 'কি সর্বনাশ হয়েছে? দেশলাই খুঁজে পাচ্ছো না?'

'কি করে জানবো বলুন, এদেশে মুর্গীর সাইজ হয় দেশের খাসির? আপনি তো আলুসেদ্ধ চেয়েছিলেন,—রেস্তোরাঁওলা বললে, 'কাবার'। আমি বললুম, 'আলুসেদ্ধ নেই তো নেই—চিকেনসেদ্ধ দাও।' ভাগ্যিস 'হ্যাফ-এ-চিকেন' বলেছিলুম, তাই রক্ষে। দেখুন।'

সেই চিকেন আমরা দুই পুরুণ্টু পাঁঠায় দেড়-বেলায় শেষ করি!

তারই স্মরণে অতখানি অর্ডার না করে যৎসামান্যের হুকুম দিলুম।

চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখি, সবাই গোরার পাল। একটি মাত্র ভারতীয়ও নেই। মেনুর দিকে নজর যেতেই কারণটা বুঝতে পারলুম। এক-একটি পদের যা দাম তাই দিয়ে যে কোন লণ্ডনবাসী ভারতীয় ছাত্রের আড়াইখানা পুরো লাঞ্চ হয়! মুদ্রার মত পিস্টন না থাকলে এরা এখানে আসতে পারে না।

বিলেতফের্তা বাঙালীদের নিয়ে দেশে বহু আলোচনা হয়ে গিয়েছে। এক-কালে এদের অনেকেই আর দিশী ডালভাত ধুতিচাদরে ফিরতেন না। তারপর বিশেষ করে চিত্তরঞ্জন দাস যে ভেল্কিবাজি দেখালেন তা দেখে আর বিলিতিয়ানা করার সাহস অল্প 'সায়েবের'ই রইল। কিন্তু যে সব ইংরেজ এদেশে বহু বছর কাটিয়ে বিলেত ফিরে যায় তাদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু জানা নেই। তবে শুনেছি, ড্রাইভার রাখার মত পয়সা ছিল না বলে লর্ড রোনাল্ড্ শেকে ট্রামেবাসে দেখা যেত। এদের সম্বন্ধে সবচেয়ে ভালো লিখেছেন উড্হাউস্। তাঁর ধারণা এদের মাথায় ছিট ধরে। কেউ কেউ নাকি ডিনার আরম্ভ করে পুডিং দিয়ে ও শেষ করে সুপ দিয়ে!

তবে এ কথা বিলক্ষণ জানি এ দেশ থেকে তারা দুটো অভ্যাস নিয়ে যায়। স্নান করা ও মশলাদার খাদ্য খাওয়া। এই যে আজ ইংলণ্ড-জর্মনিতে বাথ-রুমের ছড়াছড়ি না হোক, ব্যবস্থাটা অন্তত আছে (জর্মনিতে ম্যুনিসিপালিটির

আইন হয়েছে, কটা শোবার ঘর হলে কটা বাথরুম অবশ্য তৈরী করতে হবে) তার প্রধান বাহক চা-বাগানের ইংরেজ। আমার এক বন্ধুর কাছে শোনা, তাঁর সময়ে অর্থাৎ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সমস্ত অক্‌স্‌ফর্ডে নাকি মাত্র দুটি বাথরুম ছিল। তাই নিয়ে এক বাগিচার সায়েবের ছেলে কর্তৃপক্ষকে ফরিয়াদ জানালে তাঁদের একজন বলেন, 'তোমরা তো এখানে একনাগাড়ে থাকো ছ' হপ্তা (তখন বোধ হয় এক টার্ম বলতে ঐ সময়ই বোঝাতো); ছুটিতে বাড়ি ফিরে চান করলেই পারো।'

অর্থাৎ ছ' সপ্তাহে একটা স্নানই ইংরেজ বাচ্চার জন্য যথেষ্ট। ধেড়েদের জন্য বোধ হয় ছ' বছরে একটা। ফরাসীরা তো শুনেছি চান করে নদীতে আত্মহত্যা করার সময়।

কেন? তারা তাদের কলনি ইন্দোচীনে চান করতে শিখল না কেন? এখনো তা ফ্রান্সের চোদ্দ আনা বাড়িতে চানের ঘর নেই। বলতে পারবো না। তবে শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের কাছে শুনেছি, তিনি চীন দেশের বিরাট নদী দিয়ে জাহাজে করে গিয়েছেন কিন্তু কোনো চীনাকে নদীর জলে স্নান করতে দেখেন নি।

আর এদেশের মশলামাখা রান্না খেয়ে ইংরেজের স্বভাব এমনই বিগড়ে যায় যে, দেশে ফিরে তাকে যেতে হয় ভারতীয় রেস্তোরাঁতে। এদের পয়সাও প্রচুর; তাই বোধ হয় খাস করে এদেরই জন্য এই তালু-পোড়া দামের রেস্তোরাঁ!

ইংরেজের যে কটি প্যারা সস্—যথা উস্টার, এইচ বি—এগুলো নাকি সর্ব-প্রথম ভারতবর্ষেই তৈরী হয়েছিল। এগুলো বানাতে যে সব মশলার প্রয়োজন হয়, সেগুলো যে ইয়োরোপে গজায় না সেকথা ভালো করেই জানি। এমন কি আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে যে সব তরকারি গজায় সেগুলো আপন দেশে গজাতে পারে না সাউথ অ্যামেরিকা থেকে আনিয়ে খায়। ঠিক বলতে পারবো না, তবে বেগুন খেতে শিখেছে বোধ হয় মাত্র ত্রিশ বৎসর।

আবার বলছি, এসব তত্ত্বের মাহাত্ম্য আমার বহু পাঠক দেবেন না। কিন্তু আমি সাধারণ জিনিসের খেই ধরে তত্ত্বচিন্তা করতে ভালোবাসি। যেমন ইংরেজ বেগুন খেতে শিখেছে বটে, কিন্তু সেটা খায় সেদ্ধ করে যতদূর সম্ভব বিস্বাদ বানিয়ে। বেগুন-পোড়া যে তার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি, সে তত্ত্ব এখনো আবিষ্কার করতে পারে নি। ঠিক তেমনি মার্কিন জাত রেড্ ইণ্ডিয়ানের কাছ থেকে মুড়ি খেতে শিখেছে বটে, কিন্তু তেল, পেঁয়াজকুচি (পাঁপরভাজা বাদ দিন) দিয়ে খেতে শেখে নি।

আমি শুধু ভাবি ওসব 'সামান্য' জিনিস আবিষ্কার করতে মানুষের কত শত বৎসর লাগে।

ফার্পোতে যখন কেউ বাঁ হাতে ছুরি নেয় তখন তার কাবেল বন্ধুরা ফিস্-ফিস্ করে ভুল বাৎলে দেয়। এখানে দেখি 'উল্ট-পুরাণ'। পোলাও খেয়ে যাচ্ছে তো খেয়েই যাচ্ছে। মাংসের কারিটা পাশে পড়ে আছে। মেশাবার কথা মাথায় আসে নি। কাবাব খাচ্ছে তো খাচ্ছেই—পাশে চাপাতি পড়ে পড়ে

জুড়িয়ে হিম হয়ে গেল। ওকিব-হালরা তখন ফিস্ ফিস্ করে অ্যামেচারদের তালিম দিয়ে দুরুস্ত করার চেষ্টা করছেন।

এইবারে রসভঙ্গ করতে হল। আর চেপে রাখতে পারলুম না।

রান্না পছন্দ হল না।

মাদ্রাজী মশলা দিয়ে মোগলাই খানা এই আমি প্রথম খেলুম। এ যেন সেমেণ্ট দিয়ে তাজমহল বানানো, কিম্বা মাইকেলি অমিত্রাক্ষরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া, অথবা মাদ্রাজী মোগলাই মালমশলাই থাক—দক্ষিণের রাজগোপাল-আচারীকে উত্তরের চোগাচাপকান পরানো।

কিন্তু তবু খেতে মন্দ না। এ তো হাঙ্গিসার মুর্গী ভেজাল দালদা দিয়ে রান্না নয়। মুর্গীটা যেন চর্বিওলা খাসী আর যে মাখন দিয়ে রান্না করা হয়েছে সেটা এদেশে সত্যযুগে পাওয়া যেত। দেশে থাকতে আমি তো একবার প্রস্তাব করেছিলুম, কোনোগতিকে একটুখানি খাঁটি গাওয়া ঘি যোগাড় করে মিউজিয়ামে রাখার জন্য—যাতে করে ভবিষ্যদ্বংশীয়রা জানতে পারে এককালে বাঙলা দেশের লোকে কি খেত।

তখন প্রায় রাত দুপুর। রাস্তায় বেরিয়ে পিকাডেলি। সচরাচর যাকে পৃথিবীর সব চেয়ে পুরনো ব্যবসা বলা হয়, তার সঙ্গে সেখানে মুখোমুখি মোলাকাৎ।

এ ব্যবসা সম্বন্ধে লিখবো কি না মনঃস্থির করতে পারছি নে।

শ্যামবাজারের মামা নাকি হেদো না পেরিয়ে দু'বছরে তিন লাখ টাকা ফুঁকে দেওয়ার পর বিলেতগামী ভাগনেকে সদুপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'কোথায় যাবি বাবা, সেই জল, সেই ঘাস, সেই গাছ। ওগুলো দেখবার জন্য আবার বিদেশ যাবি কেন?'

আমাদের গ্রামের ভিতর যখন প্রথম ইঞ্জিন এসে রাতের বাসা বাঁধলো, তখন ছেলেবুড়ো সবাই হন্দমুন্দ হয়ে সেই কলের গাড়ি দেখতে গেল। ফিরে এসে সবাই যখন ইঞ্জিনের প্রশংসায় অষ্টপ্রহর পঞ্চমুখ তখন মুরুব্বী কলীমুল্লা বলেছিলেন, 'যা বলো যা কও, উই আমাদের আগুন উই আমাদের জল ছাড়া বাবুদের চলে না। আকাশটা পবনের নৌকোই বানাও, আর চিল্লীমারা "ইঞ্জিলই" বানাও সেই আগুন, সেই জল।'

এ তো সাধারণ লোকের কথা। স্বয়ং বাইবেল বলেছেন, সেই ঋষির মুখ দিয়েই, যিনি 'ইট, ড্রিংক অ্যাণ্ড বি মেরি' হতে সদুপদেশ দিয়েছেন 'যা ছিল তাই হবে, যা করা হয়ে গিয়েছে তাই আবার করা হবে; এ সংসারে নূতন কিছু নেই।'

বেশীর ভাগ লোক দেশভ্রমণে যায় নূতন কিছু দেখবার জন্য। এবং গিয়ে দেখি সেই জল, সেই ঘাস। আবার অন্য অনেক লোক বিদেশ গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দেশের সন্ধানে লেগে যায়। প্যারিস গিয়ে খবর নেয়, সেখানে আপন দেশের

কেউ আছে কি না। তাকে খুঁজে বের করে শুধায়, 'রাইস-কারি' কোথায় পাওয়া যায়? সেই খেয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরোতে বেরোতে বলে, 'চলো, দাদা, চট করে মোড়ের যদুর দোকান হয়ে যাই।'—পাড়ার যদুর পান বিখ্যাত!

আমি দেশভ্রমণে উপকারিতার চেয়ে অপকারিতাই দেখতে পাই বেশী। সে বিষয়ে অন্যত্র সবিস্তর আলোচনা করেছি। তবে এ বাবদে বলতে পারি, ভালো করে তাকিয়ে দেখলে বোঝা যায়, সব কিছু পুরাতন হলেও নূতন। বিলেতের ঘাস ঘাস, কিন্তু সে ঘাস আমাদের ঘাসের মত ঘন সবুজ নয়, একটু-খানি ফিকে, কেমন যেন হলদে ভাগটা বেশী। গাছপালার তো কথাই নেই। জলের স্বাদও অন্য রকম। একমাত্র আগুনে আগুনে কোনো পার্থক্য দেখি নি! তাই বোধ হয় পৃথিবীতে অগ্নি-উপাসকের সংখ্যা এখনো প্রচুর।

সেটা অবশ্য প্রথম যৌবনের প্রথম সফরে লক্ষ্য করি নি।

প্রথমবারের কথা বলছি।

একটানা জর্মনিতে থাকার পর অচেনা জিনিস দেখে দেখে যখন মন ক্লান্ত তখন গিয়েছি নেপল্‌সে—জাহাজে করে দেশে ফিরবো বলে। জাহাজ লেট্। দু'দিনের তরে সেই নির্বান্ধব বন্দরে আটকা পড়ে গেলুম। নিতান্ত কোনো কিছু করবার ছিল না বলে গেলুম পম্পেই দেখতে। (এস্থলে কিঞ্চিৎ অবান্তর এবং নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও বলি, আমি স্বেচ্ছায় কেবলমাত্র ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কখনো বাড়ি থেকে বেরোই নি—বেরিয়েছি প্রয়োজনের তাগিদে। মাত্র একবার আমি কাইরো থেকে স্বেচ্ছায় পুণ্যভূমি প্যালেস্টাইন দেখতে গিয়েছিলুম। সেখানে ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলমানের সঙ্গম। ধর্মচর্চাতে (আচরণে নয়) আমার চিরকালের শখ।)

পম্পেই মধ্য কিম্বা দক্ষিণ ইতালিতেও বলতে পারেন। আবহাওয়া একটু-খানি গরম।

পম্পের টিলার নীচে বাস থামতে হঠাৎ দেখি সামনে একবন করবীগাছ।

ওঃ! সে কী আনন্দ হয়েছিল! এ-জীবনে প্রথম যে গাছ চিনতে শিখি সেটি করবী। আমাদের দেশ বলে ঘণ্টা ফুল। মা আমায় চিনিয়ে দিয়েছিল। তারপর যখন তিনখানা বই পড়া শেষ হয়ে গিয়েছে, তখন চাচা বললেন, 'করব' আর 'কবরী'তে যেন গোবলেট না পাকাই! তারপর নিজের থেকেই শিখলুম, করবী পাঁচ রকমের হয়;—শ্বেত, পীত, রক্ত, কৃষ্ণ এবং পাটল—কৃষ্ণকরবী এখনো দেখি নি। সর্বশেষে শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবস্থায় রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনলাম 'যক্ষপুরী'। পরে তার নাম হল 'রক্তকরবী'। এখন শিখলুম, ইতালির ভাষাতে ওলে-আন্দ্রো।

এ ফুলটি তাই কত স্মৃতি-বিস্মৃতিতে বিজড়িত। 'বিস্মৃতি' বলার কারণ সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলুম, ছেলেবেলায় নান্নুরে চণ্ডীদাসের ভিটে দেখতে গিয়ে পেলুম ডাক-বাঙলোর একপাশে অজস্র করবীগাছ—এই শুকনো খোয়াই-ভাঙার দেশ বীরভূমে।

কিন্তু করবীর সঙ্গে আমার পরিচয়ের দীর্ঘ ফিরিস্তিতে কার কোন্

কৌতূহল? কৌতূহল তখনই হয় যখন কেউ সেই পম্পেইতে হঠাৎ দেখা করবীকে নৈর্ব্যক্তিক স্তরে তুলে রস-স্বরূপে প্রকাশ করতে পারে। যেমন রবীন্দ্রনাথ দেশে বসেই গাইলেন,—

'আবেশ লাগে বনে
শ্বেত-করবীর অকাল জাগরণে—' [১]

সঙ্গে সঙ্গে রসের মাধ্যমে করবী এসে আমাদের হৃদয় দখল করে বসে। সার্থক ভ্রমণকাহিনী-লেখক তাই নতুন পুরাতন উভয় অভিজ্ঞতাকে সমাহিত চিত্তে স্মরণ করে রসস্বরূপে প্রকাশ করেন। ভ্রমণ উপলক্ষ মাত্র।

কিম্বা হয়তো তথ্য পরিবেশন করেন। সেটা যদি রসরূপে প্রকাশিত হয়, তবে আরো ভালো। কিন্তু রস নেই, এবং তদুপরি যদি সে তথ্য কারো কোনো কাজে না লাগে তবে সেটা বলে কি লাভ আমি ঠিক বুঝতে পারি নে। কাবুলের অনৈসর্গিক যৌন সম্পর্কের কাহিনী এদেশে কেউ কেউ শুনেছেন, সেখানে অল্পবিস্তর গণিকাবৃত্তিও আছে, কিন্তু সে-সব তথ্য কারো কোনো কাজে লাগবে বলে আমার মনে হয় নি। এই নিয়ে আমার চারবার ইয়োরোপ যাওয়া হল। গণিকাবৃত্তি চোখে পড়ার কথা। এ নিয়ে সে-দেশের ছাত্রসমাজে নানা আলোচনাও হয়ে থাকে। বিশেষ করে যারা আইন ও ডাক্তারি পড়ে। সেগুলো অনেক সময় শুনতে হয়। সতীর্থরা হয়তো বা জিজ্ঞেস করে বসে, 'তোমাদের দেশে কি রকম?'

তবু এ সম্বন্ধে আমি কোন কিছু লেখার প্রয়োজন বোধ করি নি। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে, যার পর হয়তো অল্প কিছু বলার সময় এসেছে।

গত বৎসর হঠাৎ খবর এল সরকার সোনাগাছির (কথাটা আসলে 'সোনা-গাজী'—হুতোমে আছে) গণিকাদের প্রতি আদেশ করেছেন, তারা যেন ওপাড়া ছেড়ে চলে যায়।

তাহলে প্রথম প্রশ্ন, তারা যাবে কোথায়? তারা যদি ভদ্রপাড়াতে একজন কিংবা দু'জনে মিলে ঘর ভাড়া নেয়, তবে সরকার কোন আইনে তাদের ধরবেন কিংবা যে বাড়ি ভাড়া দিয়েছে তার বিরুদ্ধে সরকার কোন মোকদ্দমা আনবেন কি না, এসব কথা খবরের কাগজে ভালো করে বেরোয় নি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এরা উদ্বাস্তু হয়ে বেশী ভাড়া দিতে রাজী হবে, এবং কলকাতাতেও লোভী বাড়িওলার অভাব নেই। প্রায় ঠিক এই ধরনের একটা ব্যাপার ঘটে কিছুদিন পূর্বে দিল্লী শহরে। সরকার আইন করে রেস্তোরাঁ এবং মদের দোকানে মদ, অর্থাৎ প্রকাশ্যে মদ্যপান বারণ করে দিলেন, কিন্তু দোকানে মদ কিনে বাড়িতে গিয়ে খাওয়া নিষিদ্ধ করলেন না। ফলে যে পাপকর্ম সে বাইরে করতো, পুত্র

---

১ হেমন্ত ছাড়া অন্য কোনো সময় গাইতে হলে রবীন্দ্রনাথ এ-গানের 'হেমন্তে'র বদলে 'নিকুঞ্জে' ও 'অকালে'র বদলে 'হঠাৎ' করে গাইতেন। তথ্যটি অন্য কোথাও ছাপাতে দেখি নি বলে উল্লেখ করলুম।

কন্যা জানতে পারতো না, সেইটে অনেক বাড়ির ভিতরে আরম্ভ হয়ে গেল। ফলে পুত্র এবং কোনো কোনো স্থলে কন্যাও যদি মদ খেতে শেখে, তবে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আমি সমাজ-সংস্কারক নই তবু তখন কাগজে লিখেছিলুম মদ্যপান এদেশে এখনো এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে নি, যার জন্য জুজুর ভয় দেখাতে হবে। আসল প্রয়োজন, যেন নতুন কনভার্ট না হয়, অর্থাৎ আজকের ছেলেছোকরারা যেন মদ খেতে না শেখে। যে রকম আফিঙের বেলায় নতুন পারমিট না দেওয়ার ফলে আসাম থেকে আফিঙ খাওয়া উঠে যাচ্ছে। দোকানে মদ না খেতে পেয়ে কর্তা যদি বাড়িতে মদ খেতে আরম্ভ করেন, তবে তো কন-ভার্টের সংখ্যা বাড়বে! এ বাবদে বিধানবাবু সাউথ ক্লাব থেকে মদ তুলে দিয়ে অতি উত্তম কর্ম করেছেন। ছেলে-ছোকরারা সেখানে যেত টেনিস খেলতে। 'বারে' যেতো শরবৎ খেতে। শরবৎ থেকে শরাব প্রয়াণ কঠিন কর্ম নয়—দুটো শব্দই আরবী 'শারাবা'—'পান করা' থেকে এসেছে।

এসব অবান্তর নয়। সরকার যদি মনে করে থাকেন যে, সোনাগাছি-বাসিন্দাদের ভিটে ছাড়া করতে পারলেই সর্ব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, তবে তাঁরা মারাত্মক ভুল করছেন। ভদ্র গৃহস্থ উদ্বাস্তুদের নিয়েই আমরা কি রকম হিমসিম খাচ্ছি—সেটা শেয়ালদাতে না নেমেও স্পষ্ট বোঝা যায়। এত সহজে এ সমস্যার সমাধান হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, 'দীর্ঘতম পন্থা অনু-সরণ করলেই স্বল্পতম সময়ে পেঁছানো যায়।' এটা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না বলা কঠিন, কারণ গোল্ডেন রুল ইজ দ্যাট দেয়ার ইজ নো গোল্ডেন রুল, কিন্তু সচরাচর যে ব্যবসাকে সংসারের প্রাচীনতম ব্যবসা বলে বহু পণ্ডিত স্বীকার করে নিয়েছেন তার ওষুধ একটি বড়িতেই হয়ে যাবে এ-কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

আসলে আমরা বিলেতের অনুকরণ করছি। বিলেত ব্রথেল বা গণিকালয় তুলে দিয়েছে, আমরাও দিয়েছি। ফলে লণ্ডনের গণিকারা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে—আমাদের ছড়ায় নি। বোঝা গেল, ওষুধ না ধরাতেই আমরা উপকৃত হয়েছি বেশী।

এস্থলে একটি কথা না বললে কলকাতার প্রতি অবিচার করা হবে।

কলকাতার আপন জন না হয়েও আমি তার শত দোষ স্বীকার করি। কলকাতার শিশুরা সস্তায় খাঁটি দুধ পায় না, রুগীরা হাসপাতালে স্থান পান না, ওষুধ কালাবাজারে ঢুকেছে ভেজালের অন্ত নেই, এরকম অবর্ণনীয় নোংরা শহর ত্রিভুবনে নেই, ট্রামে বাসে পালোয়ানরাই শুধু উঠতে পারে, শেয়ালদা-হাওড়াতে ট্রেন যা লেট হয়, তাও পানকচুয়ালি হয় না—অবস্থা অবর্ণনীয়।

কিন্তু এই যে কলকাতা শহরে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত—এত বেশী পুরুষ এবং এত কম মেয়ে—এ অনুপাত পৃথিবীর কোনো বড় শহরই দেখাতে পারবে না। এটা কিছু গর্বের বিষয় নয়, কিন্তু আমি বিদেশ থেকে ফিরে বার বার গর্ব অনুভব করেছি যে, এ শহরের লোক যৌন-ক্ষুধা সম্বন্ধে কতখানি অচেতন, কিম্বা তারা সুযোগ পায় নি, সেটা কেন তৈরী করে নি, তা জানি নে।

ইয়োরোপে যখনই যুদ্ধের ফলে বা কোনো কারণে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায় এবং বিদেশী সৈন্যের মিত্র বা শত্রুভাবে আগমন হয়, সঙ্গে সঙ্গে জারজ সন্তানের সংখ্যা যে কী অসম্ভব রকম বেড়ে যায়, তা দেখে সমাজসেবীরা আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এবারে সে সংখ্যা এমনই হিসেবের বাইরে চলে গেল যে শেষটায় পাদ্রীসায়েবরাই প্রস্তাব করলেন জারজ শিশুদের যেন সমাজ ও ধর্মপ্রতিষ্ঠান আইনত ন্যায্য বলে স্বীকার করে নেয়।

শান্তির সময়েও এরকম ধারা হয়। উত্তর ইয়োরোপের কোনো একটি দেশে অনুপাত অস্বাভাবিক হয়ে যাওয়ায় দেখা গেল বহু পুরুষ একটি স্ত্রী এবং একটি করে 'রক্ষিতা' পুষছে। 'রক্ষিতা' বলা ভুল, কারণ এ রমণী ভদ্রঘরের মেয়ে, বেশ্যাবৃত্তি কখনো করে নি, তার প্রতিপালকের সঙ্গে তার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, তার পুত্র-কন্যা আছে, সমাজে সে অপমানিত নয়। অনেক স্থলে তার আসল স্ত্রী এ রমণীর খবর জানেন, এবং কোনো স্থলে পালা-পরবে দুই পরিবার একত্র হয়ে আনন্দোল্লাস করেন। বস্তুত আমাদের দেশে কোনো পুরুষের যদি দুই স্ত্রী থাকে এবং তারা যদি ভিন্ন ভিন্ন বাড়িতে থাকে তাহলে সচরাচর যা হয়ে থাকে।

কোনো কোনো বুদ্ধিমান সমাজসেবী তাই প্রস্তাব করেছেন, এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থার চেয়ে ঢের ভালো হয়, এই সব লোকদের আইনত দুটি বিয়ে করার অধিকার দেওয়া। কিন্তু খৃষ্টধর্মে এক স্ত্রীর জীবিতাবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহ বেআইনী—তাকে তালাক না দিয়ে। ক্যাথলিক ধর্মে আবার ঠিক তালাকের ব্যবস্থাও নেই—সেখানে প্রমাণ করতে হয়, বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানের ত্রুটি থাকায় বিয়েটা আদপেই হয় নি। ধর্মের অনুশাসন এড়াবার জন্যে কেউ কেউ তার সুবিধেও নিয়ে থাকেন।

অথচ ইয়োরোপে আমাদের বদনামের অন্ত নেই—আমরা বহুবিবাহ বিশ্বাস করি, আমরা হারেম পুষি!

দুশমন সকলেরই থাকে। খৃষ্টের ছিল, সক্রাতেসের ছিল। আমাদেরও আছে। ইয়োরোপেও আছে।

তাদেরই কেউ কেউ আপনাকে অপ্রস্তুত করার জন্যে পাঁচজনের সামনে শুধাবে, 'আপনাদের দেশে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে—না?'

আমি কোথায় না লজ্জা পাবো, উল্টে একগাল হাসি। যেন বঙ্গ দু'কান কাটা। বলি, 'বিলক্ষণ! একটা, দুটো, চারটে—মুসলমান হলে—যত খুশী। আর হিন্দু হলে তো কথাই নেই। এক মুখুয্যের ছিল আটশ', বাঁড়ুয্যের ছ'শ', চাটুয্যের চারশ', বেচারী গাঙ্গুলীর মাত্র আশী—ঘোষালের ফর্দটা জানা নেই।[১] কায়েতরা অতখানি না, তবে তাঁরাও ছেড়ে কথা কন নি। বার্নার্ড শ এ-ব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

১ বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বিধবা বিবাহ বইয়ে পুরো হিসেব আছে। আমি স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে বলছি। তবে হিসেবটা মোটামুটি এই।

তারপর হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলি, 'এ-ব্যবস্থা অতি অল্পকাল স্থায়ী ছিল। আসলে ভারতের শতকরা নিরানব্বুইজন লোক একটি মাত্র স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসে। যদিও একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অধিকার আইনত তার ষোল আনা আছে।'[২]

তারপর ধীরে ধীরে রসকসহীন অতি শুকনো গলায় বলি, 'এবারে আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, আপনাদের দেশে ক'জন লোক একদারনিষ্ঠ হয়ে, অর্থাৎ বিবাহের পূর্বে বা পরে অন্য কোনো কুমারী বা বিবাহিতের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে না এসে জীবন কাটায়? যদিও একাধিক স্ত্রীগমনের অধিকার আইনত আপনাদের নেই।'

যেন ফতেহ্‌পুর সিক্রির বুলন্দ্‌ দরওয়াজার নিচে দিয়ে যাচ্ছি। এই বিশাল উন্নতশির দেউড়ি যেন স্থপতি ইচ্ছে করেই এমন ভাবে বানিয়েছেন যে, নীচে দিয়ে যাবার সময় মানুষ বুঝতে পারে সে কত নগণ্য।

কেন্‌সিংটন গার্ডেনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। গাছগুলো এমনি বিরাট, এমনি উঁচু যে, যেতে যেতে আমার মনে পড়ল বুলন্দ্‌ দরওয়াজার কথা। সেখানেও শীতের প্রভাতে কাঁপতে কাঁপতে ঢুকেছিলাম; এখানেও হেমন্তের শীতে জবুথবু হয়ে সামনের দিকে এগোচ্ছি।

আকাশে একরত্তি মেঘ নেই, বাতাসে এক ফোঁটা হিম নেই—সূর্যদেব তাঁর ভাণ্ডার উজাড় করে স্বর্ণরৌদ্র ঢেলে দিয়েছেন কিন্তু শীতের দাপট কমাতে পারেন নি। পার্ক থেকেই দেখতে পাচ্ছি, বয়স্করা ওভারকোট পরেছে। কাল বৃষ্টি নেমেছিল—তখন জোয়ানরা পর্যন্ত কাঁধ কুঁচিয়ে, মাথা নীচু করে, হ্যাট সামনের দিকে নামিয়ে দিয়ে হন হন করে চলেছিল গায়ের গরম বাড়াবার জন্য। মেয়েরা কী করে হাঁটু পর্যন্ত ঐটুকু সিল্কের মোজা পরে শীত ভাঙায় সে এক সমস্যা। প্যারিসে দেখেছি, পেভমেণ্টে যারা পুরনো বই বিক্রি করে তাদের কোনও প্রকারের আশ্রয় নেই বলে দোকানের সামনে ঘন ঘন পাইচারি করে, আর দুই বাহু প্রসারিত, ডান হাত শরীরের বাঁ দিকে আর বাঁ হাত ডান দিকে থাবড়ায়। মাঝে মাঝে হাতের তেলো গরম করার জন্য দু'হাত আঁজলা করে মুখ দিয়ে জোর ফুঁ দেয়।

কাল রাতের বৃষ্টি না আজ ভোরের হিমে গাছের পাতা সব ভেজা। সেগুন-গাছের পাতার মত তারা ওজনে ভারী—সারা গ্রীষ্মকাল রোদ আর জল খেয়ে খেয়ে তারা যেন পেটের অসুখ করে কেউ হলদে, কেউ ফিকে, কেউ বা কালো হয়ে গিয়েছে। আর কেউ টকটকে লাল—শুনেছি, ঠিক মরার সময় কোনও কোনও মানুষের সব রক্ত এসে মুখে জড়ো হয়। টুপ করে কখনও এক ফোঁটা জল এসে নাকের উপর পড়ে, কখনও বা হাতের উপর। কী ঠাণ্ডা! সঙ্গে

১ এখন অবশ্য আইন বদলেছে।

সঙ্গে অতি নিঃশব্দে দুটি লাল পাতা।

দু' দিকে সবুজ ঘাসের লন। ঠিক সবুজ বলা চলে না। নীলের ভাগটা কম, হলদেটাই বেশী। এখন না হয় হেমন্তের প্রথম শীতে তারা ফিকে হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ভরগ্রীষ্মকালেও আমি ইউরোপে কখনও দেশের কালো-সবুজ দেখি নি। আর ঘাসগুলোই বা কী অভদ্র রকমের লম্বা আর মোটা! একে তো তাদের যত্ন নেওয়া হয় প্রচুর, তার উপর বোধ হয় এদের মাড়িয়ে পাইচারি করা বারণ বলে কী রকম উদ্ধত ভাবে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। এরাও ভেজা। গায়ে হাত বুলোতে ইচ্ছে করে না। দেশে শীতের সকালে নৌকো দিয়ে যাবার সময় যে রকম ভিজে সাপলা পাতায় হাত দিতে গা কির কির করে।

দু'দিকের সবুজ লনের মাঝখানে কালো পিচের রাস্তা। ছোট্ট, এক ফালি। এঁকেবেঁকে একটুখানি এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে চলে গিয়েছে বিরাট হাইড্ পার্কে, বাঁ দিকে গিয়েছে এ-বাগানেরই 'গোলদিঘি'র দিকে। সেই ফালি রাস্তা-টুকু আবার নিয়েছে নানা রঙের মোজায়িক, কেটেছে ঝরা পাতার আলপনা। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য আলপনা এক রকমের থাকে না। মুখে পাইপ, হলদে গোঁপওলা বুড়ো মালী এসে ঝাঁট দিয়ে সাফ করে যায়। সঙ্গে সঙ্গে দমকা বাতাসে আরেক প্রস্থ রঙীন পাতা ঝরে পড়ে—আবার নূতন আলপনা আঁকা হয়।

বেলা এগারোটা। সমস্ত পার্কে মেরে কেটে দশ-বারো জন লোক হয় কি না-হয়। শুনেছি আরও সকালে, ছুটির দিনে এবং গ্রীষ্মকালে বেশী ভিড় হয়। লণ্ডন শহরের লোক যে কাজ করে, ছুটির দিন ছাড়া আলসেমি করে না, এ-তত্ত্বটা এদের ফাঁকা পার্ক দেখলেই বোঝা যায়। ইতালিতে অন্য ব্যবস্থা। তাদের পার্ক সব সময়েই ভর্তি—অবশ্য সে-দেশে টুরিস্টও যায় বেশী—এবং তাদের 'পাব'ও সব সময়েই গুলজার। সকাল দশটাই হোক আর বিকেল চারটাই হোক—জোয়ান মদ্দেরা কাজকর্ম ছেড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সস্তা লাল মদ খায় আর 'ব্যাক্-গ্যামন্' খেলে। এ-খেলাটা আমি দেশে কখনও দেখি নি, অথচ ভূমধ্যসাগরের পারে পারে, ইতালি গ্রীস তুর্কি লেবানন প্যালেস্টাইন মিশর সর্বত্র প্রচলিত। তাই বোধ হয় এরা কেউ দাবা খেলাতে নাম কিনতে পারে নি।

'ব্যাক্-গ্যামনের' সুবাদে একটা কথা বলে নিই। মিশরে ঐ খেলাতে পয়েন্ট গোনা হয় ফার্সীতে—আরবীতে নয়। আমরা যে রকম টেনিস খেলার সময় 'থার্টি ফর্টি', 'লাভ ফিফ্টিন, 'থার্টি অল্' বলি—'ত্রিশ-চল্লিশ, 'ভালো-বাসার পনেরো' বা 'ত্রিশ সমস্ত' বলি নে। ফার্সীতে নম্বর গোনা থেকে বোঝা যায় খেলাটা আসলে ইরান থেকে মিশরে গিয়েছে। ঠিক তেমনি বাঙলা দেশের একাধিক গ্রাম্য খেলাতে দেখেছি, নম্বর গোনা হয় কিছু-জানা-কিছু-অজানা ভাষায়—পুরোপুরি বাঙলায় নয়। এগুলো তবে কোন্ ভাষা থেকে এসেছে? আমার বিশ্বাস, সত্যকার রিসার্চ করলে তার থেকে বেরোবে আর্যরা

বাঙলা দেশে এসে কোনো জাতি-উপজাতির সংস্পর্শে এসেছিল। অনেক পণ্ডিত বলেন, সিঁথির সিঁদুর আমরা সাঁওতালদের কাছ থেকে নিয়েছি। আমার বিশ্বাস, খেলার নম্বরের অনুসন্ধান করলে আরও বেশী তথ্য এবং তত্ত্ব বেরোবে। মমাগ্রজ গ্রামের অবাঙলা নাম নিয়ে বহু বৎসর খেটে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন আর্যভাষীরা কোন্ কোন্ উপজাতির সংস্রবে এসেছিল। তাঁর ওসব লেখা কেউ পড়ে না। গবেষণা বলতে বাঙলা দেশে বোঝায়, তিনখানা বই পড়ে চতুর্থ বই লেখা। অর্থাৎ একখানা বই থেকে গাপ্-মারা চুরি; তিনখানা বই থেকে চুরি-করা গবেষণা।

বেশী হাঁটাহাঁটি করলে পাছে ভগবান আসছে জন্মে-ডাকহরকরা বানিয়ে দেয় তাই গোলদিঘির কাছে এসে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লুম। পুকুরের জল স্বচ্ছ কালো। চতুর্দিকে অনেকখানি খোলা বলে জোর বাতাস শুকনো পাতা পুকুরের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে নিজেই ঢেউয়ে ঢেউয়ে এক পাড়ে জড়ো করছে। মালী সেখানে দাঁড়িয়ে লম্বা আঁকশি দিয়ে টেনে এনে পুকুর সাফ রাখছে। একপাল পাতিহাঁস ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলছে। বাতাস হাড়ে হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে, স্বচ্ছ কালো জলের দিকে তাকিয়ে সে শীত যেন তার চরমে পৌঁছচ্ছে আর আহাম্মুকের মত ভাবছি, হাঁসগুলো ঐ হিমে থাকে কী করে? উত্তর সরল; হিমালয়ের সরোবরে যখন থাকতে পারে তখন এখানেই বা থাকতে পারবে না কেন? কিন্তু চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।

হঠাৎ একটা ধেড়ে রাজহাঁস বিরাট দুটো পাখা এলোপাতাড়ি থাবড়াথাবড়ি করে পড়ি-পড়ি হয়ে ধপ্ করে নামল পাতিগুলোর মাঝখানে। তারা ভয় পেয়ে প্যাঁক প্যাঁক। এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। কী দরকার ছিল এদের এই শান্তিভঙ্গ করার? রাজহাঁসটা ভেবেছে, পাতিগুলো এতক্ষণ ধরে ঐ কোণে যখন জটলা পাকাচ্ছে তখন নিশ্চয়ই ভাল খাবারের সন্ধান পেয়েছে।

তাই হবে। নিশ্চয়ই তাই। ইয়োরোপের পাতিজাতগুলো যখন এশিয়া আফ্রিকায় খাবার পেয়ে জটলা পাকাল তখন ধেড়ে ইংরেজ তাদের তাড়িয়ে দিয়ে রাজ্য বিস্তার করল। সাধে কি আর বিষ্ণুশর্মা এসপ্ বলেছেন, পশুপক্ষীর কাছ থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করতে হয়। কিন্তু তাই করে কতকগুলো জাত যে পশুর মত আচরণ করলে, এবং এখনো করছে, তার কী?

আচ্ছা, যদি খুব শীত পড়ে আর পুকুরের জল জমে যায়—আমি স্বচক্ষে রাইনের মত নদী পর্যন্ত জমে যেতে দেখেছি—তাহলে এ হাঁসগুলো যায় কোথায়? কোথায় যেন পড়েছি, কবি দুঃখ করে বলেছেন, 'আমি মানস সরোবরের যেন ডানা-ভাঙা রাজহাঁস। চতুর্দিকে জল জমে গিয়ে বরফ হয়ে হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে, শেষটায় আমাকে পিষে মারবে। আমার সঙ্গী-সাথীরা অনেকদিন হল দক্ষিণে চলে গিয়েছে। আমার যাবার উপায় নেই।' হায়, আমাদের সকলেরই তাই। কারও পা খোঁড়া, কারও ডানা ভাঙা, কারও প্রিয়া পালিয়ে গিয়েছে, কাউকে বা সরকার জেলে পুরে দিয়েছে—সবাই যেন বলছে, 'পিছিয়ে পড়েছি আমি, যাব যে কী করে!

এদের জন্য নিশ্চয়ই কোনও ব্যবস্থা আছে। লণ্ডন তো আর দেশ্দেড়ে গ্রাম নয় যে, হাঁসগুলো গোলাবাড়ির খামারঘরে গিয়ে আশ্রয় নেবে। পশুপ্রীতি ইংরেজের যথেষ্ট আছে। মিশর পরাধীন থাকাকালীন এক ইংরেজ হাকিম যখন এক মিশরী খচ্চরওলাকে জরিমানা করে জন্তুটাকে পিটিয়ে আধ-মরা করে দেওয়ার জন্য—তখন সে মনের দুঃখে বলেছিল, 'আমি তো জানতুম না রে খচ্চর, আদালতে তোর এক দরদী ভাই রয়েছে!'

সামনে দিয়ে একটি মেমসায়েব চলে গেল। লম্বা লম্বা পা ফেলে—দেশের মা-মাসীরা দেখতে পেলে বলতেন, 'হুনোমুখো'। না পরনে সে স্কার্ট নয় যা পরে বাসে উঠতে গেলে ছিঁড়ে যায়। এর পরনে হুবহু চীনা পাতলুন। ক্লাইভ স্ট্রীটে বিস্তর দেখেছি। তবে চামড়ার সঙ্গে সেঁটে টাইট, মেরে-কেটে পায়ের ডিম ছাড়ায় কি না-ছাড়ায়, আর লাল সবুজের মারাত্মক চেক্। শিল-ওয়ার বুঝি, বড়ী মোরী—অর্থাৎ ঢিলে পায়জামা বুঝি, চীনে পাজামা বোঝাও অসম্ভব নয়, কিন্তু এই সৃষ্টিছাড়া পাজামা পরলে রমণীদেহের কোন্ সৌন্দর্যের কী যে খোলতাই হয় সেটা আদপেই বুঝতে পারলুম না। আর শরীরটাই না কী বাহারে! বার তিনেক না ঘোরালে বোঝা যায় না কোন্টা সামনের দিক, কোন্টা পিছন। যেন 'মডার্ণ পেণ্টিং'! গ্যালারিতে দেখে আমাদের মত বেকুবদের মনে সন্দ জাগে উল্টো টাঙায় নি তো?

যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা। যুবতী কখনও কুৎসিতা হয় না। তবে যার যেটা মানায় তাকে সেটা পরতে হয়। আজকাল তো আরও কত সব কল বেরিয়েছে শুনতে পাই। তা না হয় নাই বা হল। একটু ফোলা-ফাঁপার জামাকাপড়ও তো আছে। সাড়েবাইশ-গজী শিলওয়ার না-ই বা হল।

পিছনে আবার একটা কুকুর। মনিবের সেই মেলগাড়ির তেজে চলার সঙ্গে পাল্লা রাখতে গিয়ে এই শীতে হাঁপিয়ে উঠেছে। অতিশয় অপ্রিয়দর্শন। 'ডাক্স্হুণ্ট' না কী যেন নাম। পিপের মত দেহ। মনে হয় যেন দুটো কুকুর জুড়ে একটা বানানো হয়েছে। অথচ আস্তে আস্তে চললে একেও হয়ত মন্দ দেখাত না।

সবসুদ্ধ জড়িয়ে মড়িয়ে যাকে বলে 'কাল্ট্ অব দি আগ্লি' অর্থাৎ 'কুৎসিত ধর্ম'। মডার্ণ কবিতা। যার বিষয়বস্তু, ডাস্টবিন, পচা ইঁদুর, মরা ব্যাঙ।

বিরক্তি হয় নি, দুঃখ হয়েছিল। আসলে এরা তো কুৎসিত নয়। এসব গায়ে পড়ে করা। দেশকালপাত্র।

বাঁচালে। হাওয়াটা বন্ধ হয়েছে। ঐ হাওয়াটাই যত অনর্থের মূল। উনি বন্ধ হলে বেশ ওম-ওম ভাবটা জমে আসে। বেঞ্চির হেলানে মাথাটা চিত করে আকাশমুখো করলুম। ধুপ করে হ্যাটটা পড়ে গেল। তা পড়ুক। বন্ধ চোখে লাগল রোদের কুসুম কুসুম পরশ। দেশে গরমের দিনে চোখে ঠাণ্ডা জল দিলে যে রকম আরাম বোধ হয়। হাওয়া বন্ধ হয়েছে বলে পোড়া পেট্রলের গন্ধও নাকে আসছে না। এদেশের লোকের বোধ হয় অভ্যেস হয়ে গিয়েছে।

আমি তো সর্বক্ষণ হাতে গোঁফে চামেলী ঘষি। ভাগ্যিস খানিকটে আতর সুটকেসের পকেটে করে অজান্তে চলে এসেছে। এদেশের ও দ্য কলোন লেভেণ্ডার ছিটোলে শীতটা যেন আরও ছমছম করে ওঠে।

এবারে হেমন্তটা এই পোড়া লণ্ডনেও হেমন্ত বলেই ঠেকছে। কাল গিয়েছিলুম মোটরে করে লণ্ডনের উত্তরে, গ্রামাঞ্চলে মাইল বিশেক দূরে। তখন চোখে পড়েছিল সত্যকার হেমন্ত।

হেমন্ত নিয়ে এ-সংসারের সব কবিই বিপদগ্রস্ত হয়েছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় শ'দেড়েক গান রচেছেন বর্ষা নিয়ে। হেমন্ত নিয়ে পাঁচটি হয় কি না-হয়। কবিগুরু কালিদাস পর্যন্ত ঋতুসংহারে হেমন্তের বর্ণনা করতে গিয়ে যা রচেছেন তার তুলনায় তাঁর বর্ষা-বর্ণন শতগুণে শ্রেয়ঃ। তবু তাঁর কলম জোর-দার। হেমন্ত ঋতুতে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন তিনি মানসযাত্রী হংস ক্রৌঞ্চমিথুন আর মাটির দিকে দেখেছেন পরিপক্ক শস্যে গ্রামের প্রত্যন্ত প্রদেশ পরিপূর্ণ। হেমন্তের সেই সফল শান্তির পূর্ণতা দেখে প্রার্থনা করেছেন ;—

বহুগুণরমণীয়ো যোষিতাং চিত্তহারী
পরিণতবহুশালিব্যাকুলগ্রামসীমা।
সততমতিমনোজ্ঞঃ ক্রৌঞ্চমালাপরীতঃ
প্রদিশতু হিমযুক্তঃ কাল এব সুখং বঃ॥

হঠাৎ শুনি ধমকের শব্দ। রমনীকণ্ঠে।

শিক্ষিত ভদ্রোলোকের ইংরিজীই ভাল করে বুঝি নে, কক্‌নি বোঝা আমার কর্ম নয়। তাকিয়ে দেখি, আমার সামনে ডান দিকে একটি পেরেম্বুলেটর। তার পিছনে একটি ছোট্ট বাচ্চা। চলি-চলি পা-পা করে গোলদিঘিতে ক্ষুদে একটি রবারের নৌকা ভাসাবার চেষ্টা করছে। ঢেউয়ের ধাক্কায় সেটা বার বার কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে। ওদিকে তার আয়া অসহিষ্ণু হয়ে লাগিয়েছে তাকে এক বিকট ধমক। সে-ধমকের ধাক্কায় রাজ-পাতি সব হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে পালাচ্ছে, নৌকোটা পর্যন্ত ডুবুডুবু।

শুনেছিলুম, এ-দেশে বাচ্চাদের ধমক দেওয়া হয় না। দেশের এক অতি আধুনিক পরিবারে। সেখানে অতিথি এলে এক ছেলে পিঠে পিন ফুটাত, অন্য ছেলে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে কাঁচি দিয়ে তার টাইটি কাটতে আরম্ভ করত। ধমক দিতে গেলে বাপ-মা অতিথিকে বিলেতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন।

ফের ঘাড় ঝুলিয়ে দিলুম বেঞ্চির হেলানে, মুখ তুলে দিলুম আকাশের দিকে। অস্ফুট কণ্ঠে বললুম, 'হায় পেস্তালৎসি, হায় রে ফ্রোবেল্, কোথায় তুমি ফ্রয়েট! এই কক্‌নি রমণীকে পর্যন্ত তালিম দিয়ে শাবুদ করতে পারো নি!'

এবারে শুনি বাঁ দিক থেকে 'বেগি পান্'। মানে? ওঃ—'বেগ ইয়োর পার্ডন'! হকচকিয়ে চোখ খুলে দেখি, আমার অজানতে এক ভদ্রলোক বেঞ্চির অন্য প্রান্তে আসন নিয়েছেন।

সুন্দর চেহারা। ঢেউ-খেলানো সোনালী ব্লন্ড চুল—হাওয়াতে অল্প উস্কো-খুস্কো। নাকটি খাঁটি রোমান, ব্রিজের চিহ্নমাত্র নেই। মুখের রঙ পুরানো হাতির দাঁতের মত। শুধু গাল দুটিতে অতি অল্প গোলাপীর ছোঁয়াচ লেগেছে। একটুখানি গোঁপ—মাথার চুলের চেয়ে এক পোঁচ বেশী সোনালী।

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'আজ্ঞে না। আমি কিছু বলি নি।' তারপর আমতা আমতা করে বললুম, 'আমি শুধু পেস্তালৎসির কথা স্মরণ করছিলুম।'

হাত দু'খানি জানুর উপর ভারী শান্তভাবে রাখা, যেন রেমব্রান্টের ছবিতে আঁকা। সরু লম্বা লম্বা। নখে লালের আভাস। চমৎকার মেনিকোর করা। বয়স ৩০।৩৫। ঠিক বলতে পারব না। সায়েব-সুবোদের বয়েস আমি অনুমান করতে পারি নে।

এবারে আমার পালা। সায়েব কী যেন বললে। বুঝতে না পেরে বললুম, 'বেগি পান্।' সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বুঝে গেলুম বলেছে, 'থ্যাংক গড্' ধরনের কিছু একটা। কিন্তু তখন তো আর 'বেগ্ ইয়োর পার্ডন'টা ফের বেগ্ করে ফেরত নেওয়া যায় না।

পাশে বেঞ্চির উপর অত্যুৎকৃষ্ট শোলার হ্যাট, তার ভিতরে দু'খানা দস্তানা। পরনে হেরিং মাছের কাঁটার নক্সা-কাটা নূতন সুট। শক্ত কলার, ডোরা কাটা টাই—কোনো পাবলিক স্কুলের নিশান-মারা হতেও পারে—কাফের বোতাম ঝিনুকের, মাঝখানে কী একটা ঝক্‌ঝক্ করছে। পায়ে ছুঁচলো কালো জুতো। এবং বিশ্বাস করবেন না, তার উপর স্প্যাট!

ত্রিশ বৎসর পূর্বে এ-রকম বেশভূষা মাঝে-মধ্যে দেখেছি। বইয়ে বর্ণনা পড়েছি। এ কি বিংশ শতাব্দীর রিপ্ ভান্ উইন্‌ক্‌ল্?

তখন মনে পড়ল কেনসিংটন গার্ডেনের আশেপাশে থাকেন এদেশের খান-দানীরা। কাশ্মীরের বর্ণনা দিতে গিয়ে হিন্দী কবি গেয়েছেন,

'য়হী স্বর্গ সুরলোক
য়হী সুরকানন সুন্দর।
য়হাঁ অমরোকা ওক,
য়হাঁ ক'হী বসত পুরন্দর॥'

এইটেই স্বর্গসুরলোক, এইখানেই কোথাও পুরন্দর বাস করেন।

শুনেছি, এরই আশেপাশে চার্চিল থাকেন, এপস্টাইন বাস করেন।

তবে ইনি খানদানী লোক। কাজকর্ম নেই। অবেলায় পার্কে রোদ মারতে বেরিয়েছেন।

ছিঃ! তখন দেখি তাঁর বাঁ দিকে একটা ক্রাচ—খোঁড়ারা যার উপর ভর করে হাঁটে। নিজের মনকে কষে কান মলে দিলুম—উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ না করে মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য।

বললেন, 'পেস্তালৎসি কিন্তু শেষ বয়সে আপন মত অনেকখানি পরিবর্তন করেছিলেন। বলতেন, বাচ্চাদের বড্ড বেশী যা-তা করতে দিতে নেই।'

আমি অবাক। আমি তো শুনেছি ইংরেজ অচেনার সঙ্গে কথা কয় না। ইনি আবার খানদানী।

ভদ্রলোক কিন্তু পাঁচসিকে সপ্রতিভ। কঞ্জুস যে রকম চুনের কৌটো থেকে খুঁটে খুঁটে শেষ রত্তি বের করে, ইনি ঠিক তেমনি দুটি নীল চোখ দিয়ে আমার চোখ দুটি খুঁটে খুঁটে শেষ চিন্তা বের করে নিচ্ছেন।

বললেন, 'সে আমি বেশ জানি, প্রাচ্যদেশীয়দের সঙ্গে বিনা পরিচয়েই কথা আরম্ভ করা যায়।' মুখে অল্প অল্প হাসি-খুশির ভাব।

আমি শুধালুম, 'আপনি কি অনেক প্রাচ্যদেশীয়দের চেনেন?'

বললেন, 'আদপেই না। আপনিই প্রথম।'

আমি বললুম, 'সে কী? এখন তো লণ্ডনে বিদেশীই বেশী বলে মনে হয়। আমি তো ভেবেছিলুম পাছে এদের ঠেলায় খাস লণ্ডনবাসীরা শহরছাড়া হয় তাই ম্যাক্‌মিলানকে প্রস্তাব করে পাঠাব কাঁটার তার দিয়ে দিয়ে লণ্ডনের আদিবাসীদের জন্য (আমি 'এবরোজিনালস্‌' শব্দটি প্রয়োগ করেছিলুম) আলাদা মহল্লা করে দেবার জন্য। সাইনবোর্ডে লেখা থাকবে, "প্রাণীদের খাবার দেওয়া বারণ। হুকুম অমান্য করলে এক পৌণ্ড জরিমানা।" কী বলেন!'

বললেন, 'খাঁটি কথা। আমাদের পাড়া তো যায়-যায়।'

ইচ্ছে যাচ্ছিল শুধাই কোন্‌ পাড়া। কিন্তু ইনি যখন প্রাচ্য কায়দায় বিনা পরিচয়ে আলাপ আরম্ভ করেছেন, তখন আমার উচিত প্রতীচ্য কায়দা অনুসরণ করা।

বললুম, 'কলকাতায় তো তাই হয়েছে! আমরা কলকাতার আদিবাসীদের কোণ-ঠাসা করে এনেছি।'

তিনি শুধালেন, '"আমরা" মানে কারা?'

এ তো তোফা ব্যবস্থা। উনি প্রাচ্য পদ্ধতিতে দিব্য প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুধিয়ে যাচ্ছেন, আর আমি নেটিভ ছুরি-কাঁটা নিয়ে আনাড়ীর মত কিছুই মুখে তুলতে পারছি নে। ঠিকই তো। সেই কথামালার গল্প। বক তার লম্বা ঠোঁট চালিয়ে কুঁজো থেকে টপাটপ খাবার তুলে নিচ্ছে আর আমি খেঁকশেয়ালটার মত শুধু কুঁজোটার গা চাটছি। আর ব্যবস্থাটা করেছে বকই।

কিন্তু হলে কি হয়? ইংরেজের বাচ্চা। বেশীক্ষণ প্রশ্ন শুধোবে কী করে? অনভ্যাসের ফোঁটা নয়, অনভ্যাসের লাল লংকা। খাবে কতক্ষণ!

আমি বললুম, 'আমি শিক্ষাবিদ্‌ নই, তবু জানতে ইচ্ছা করে এ দেশের শিক্ষিত পরিবারে বাচ্চারা কতটুকু যাচ্ছেতাই করার সুযোগ পেয়েছে!'

এবারে ইংরেজের ইংরিজীপনা আরম্ভ হল। অনেকগুলো সব্‌জন্‌ক্‌টিভ মুড ব্যবহার করতে পেরে ভদ্রলোক যেন বেঁচে গেলেন। ঐ মুডটাই ইংরিজীতে সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করা হয়, কারণ এতে প্রকাশ পায় অনিশ্চয়তা। 'শুড' 'উডে'র ছড়াছড়ি—'আই শুড সে', 'ইট উড্‌ অ্যাপিয়ার', 'ওয়ান মাইট থিন্‌ক্‌' থাকলেই বুঝতে হবে ইংরেজ পাকাপাকি কিছু বলতে

চায় না, কিংবা ভদ্রতা প্রকাশ করতে চায়—ফাউলার যা বলুন, বলুন। আমরা এ-জিনিসটেই প্রকাশ করি অতীতকাল দিয়ে। শ্বশুরমশাই যখন জিজ্ঞেস করেন, 'তা হলে বাবাজী আসছ কবে?' আমরা ঘাড় নীচু করে বলি, 'আজ্ঞে আমি তো ভেবেছিলুম ভাদ্র মাসে এলেই ভাল হয়।' আসলে কিন্তু বলতে চাই, 'আমি ভাবছি…।' তা বলি নে; অতীতে ফেললে বিনয় প্রকাশ হয়, অনিশ্চয়তাও বোঝানো হয়, অর্থাৎ শ্বশুরমশাই ইচ্ছে করলেই আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা নাকচ করে দিতে পারেন।

ইংরেজ বললেন, 'অন্য লোকে যে আমাদের "দ্বীপবাসী" বলে সেটা কিছু মিথ্যে নয়! ঐ পেস্তালৎসি, ফ্রোবেলের কথা বলছিলেন না? এদের তত্ত্বকথা সর্বজনমান্য হয়ে গেলেও আমরা সেগুলো গ্রহণ করি সক্কলের পরে। চ্যানেলের ওপার থেকে যা-কিছু আসে তাই যেন আমরা একটু সন্দেহের চোখে দেখি। আর গ্রহণ করলেও সমাজের সব শ্রেণী একই সময়ে নেয় না। আমাদের বাড়িতে—কিছু মনে করবেন না, একটু ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে—'

আমি বললুম, 'প্রাচ্য পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত হওয়াটাই রেওয়াজ।'

'ধন্যবাদ। আমাদের বাড়িতে এখনও প্রাচীন পন্থা চালু। দুনিয়ার আর সর্বত্র সেণ্ট্রাল হীটিঙ কিংবা ইলেকট্রিক দিয়ে ঘর গরম করা হয়, আমাদের বাড়িতে এখনও "লগ্ ফাইয়ার"—কাঠের আগুন। ওঃ! একটা ঘটনা মনে পড়ল। আপনি জাওয়ারব্রুখ্ ডাক্তারের কথা শুনেছেন?'

যদিও লোকটি অতিশয় ভদ্র, মাত্রাধিক ভদ্র বললেও ভুল বলা হবে না, তবু একটু বিরক্ত হলুম। এই ইংরেজরা কি আমাদের এতই অগা মনে করে? বললুম, 'সেই যিনি সর্বপ্রথম ফুসফুসের অপারেশন আরম্ভ করেন?'

ইংরেজের তারিফ করতে হয়—মানুষের গলা থেকে মনের ভাব চট করে বুঝে নেয়। ভদ্রলোক বার বার মাফ চাইতে আরম্ভ করলেন। আমিও একটু লজ্জা পেলুম।

বললেন, 'হাজারটা ইংরেজের একটা ইংরেজও ও'র নাম জানে না। তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম।'

আমিও ভদ্রতা করে বললুম, 'আমিও জানতুম না—যদি না এক জর্মন ডাক্তারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না হত। তারপর কী বলছিলেন, বলুন?'

'১৯২৮-এ যখন পঞ্চম জর্জের শক্ত ব্যামো হয়, তখন তাঁর কাছে ইংরেজ ডাক্তাররা পাঠালে রাজার এক্স-রে ছবি। ও'র মতামত জানতে চাইলে—বুকে অপারেশন করা হবে, না শুধু ফুটো করলেই হবে, না ড্রেন করতে হবে, না কি? এবং এ-কথাও জাওয়ারব্রুখ বুঝে গেলেন যে, আর যা হয় হোক, কোনও বিদেশী সার্জনকে দিয়ে রাজার অপারেশন করা চলবে না। ইংরেজ ডাক্তার-গোষ্ঠী তা হলে আপন দেশে মুখ দেখাতে পারবে না।'

আমি বললুম, 'আশ্চর্য! আমাদের গাঁধীকে তো ইংরেজ ডাক্তারই অপারেশন করেছিল।'

একটু চুপ থেকে বললেন, 'গল্পটা এখানেই শেষ নয়। কয়েকদিন পর

ডাচেস অব কনোট না কেন্ট, কার জানি শক্ত ব্যামো হয়েছে। জাওয়ারব্রুখকে প্লেনে করে—এখন তো প্লেন ডাল-ভাত—লন্ডন আনানো হল। অর্থাৎ ডাচেসের বেলা জর্মন ডাক্তার চললে চলতেও পারে, রাজার বেলা নয়।'

আমি বললুম, 'বা রে!'

বললেন, 'এখানেও শেষ নয়। জাওয়ারব্রুখ তো রুগীর ঘরে ঢুকে রেগে কাঁই। এ রুগী তো ভয়ে কাঁপছে না, কাঁপছে শীতে। রুগীর লেপ তো লেপ নয়, ভিজে কাঁথা। বললেন, এ-ঘরে রুগীর চিকিৎসা চলবে না। বেশ চড়া গলাইতেই নাকি বলেছিলেন, মানুষ থাকার উপযোগী এবং ভদ্র (রিজনেব্‌ল) ঘরে ও'কে নাকি নিয়ে যেতে হবে। একে জর্মন, তায় ডাক্তার—চড়া গলাতে বলবেই তো। তখন আরম্ভ হল তুলকালাম কান্ড। বহু হট্টগোলের পর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল অন্য ঘরে—সেখানে একটি ইলেকট্রিক হীটার কোনও গতিকে লাগানো হল।

'ডাক্তার কী বললেন জানেন? বললেন, "কিছু হয় নি; কালই সেরে যাবেন।" এবং সেরে গেলেনও।'

আমি বললুম, 'আশ্চর্য!

তিনি বললেন, 'এও শেষ নয়। পরদিন ড্যুক দিলেন ডাক্তারকে বিরাট ভোজ। তাঁর পরিচিত লাট-বেলাট সবাইকে নেমন্তন্ন করা হল। স্বয়ং ডাচেস সেরে উঠে ব্যানকুয়েটে বসলেন। চার্চিলও ছিলেন। তারপর কী কান্ড হল জানেন?'

'ভোজ খেয়ে হোটেলে ফিরে এসে জাওয়ারব্রুখ দেখেন সেখানে আরেক কান্ড। চেনা আধা-চেনা যে তাকে দেখে সেই মাথা নিচু করে বাও করে! ওয়েটার, ম্যানেজার সবাই তাঁর পিছনে পিছনে ছুটছে! "হুজুরের কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো, হুজুরের কী চাই?" ডাক্তার তো অবাক! ডাচেসের জন্য গরম ঘরের ব্যবস্থা করেই এতখানি?

'আসলে তা নয়। শোবার ঘরে গিয়ে ডাক্তার দেখেন, তাঁর টেবিলের উপর সন্ধ্যেবেলাকার কাগজ। তাতে মোটা মোটা হরফে লেখা: "জর্মনির ডাক্তার জাওয়ারব্রুখ রাজাকে আজ সন্ধ্যায় অপারেশন করলেন।" খবরের কাগজ সব কিছু জানে কি না! জাওয়ারব্রুখ্ লন্ডনে, ঐ সময়ে, টায়টায়।'

আমি আবার বললুম, 'আশ্চর্য! জাওয়ারব্রুখ প্রতিবাদ করলেন না?'

তিনি বললেন, 'পরের দিন ভোরেই তাঁকে প্লেনে তুলে দেওয়া হল—এ্যারপোর্টে ড্যুক ডাচেস সবাই উপস্থিত। হৈহৈ-রৈরৈ। দেশে গিয়ে দেখেন, ইতিমধ্যে মার্কিন কাগজগুলো বলতে আরম্ভ করেছে, জাওয়ারব্রুখ্ অস্তর করার জন্য এক মিলিয়ন পৌন্ড পেয়েছেন! জর্মন কাগজরা আত্মম্ভরিতায় ফেটে যাবার উপক্রম। জাওয়ারব্রুখ্ এ'কে ও'কে জিজ্ঞেস করলেন, কী করা উচিত? সবাই বলে এই ডামাডোলের বাজারে কেউ তোমার প্রতিবাদ (দেমাতি) শুনবে না চেপে যাও।'

'তারপর?'

ঠিক সেই সময়ে এক তাগড়া লম্বাচৌড়া নার্স এসে উপস্থিত, তাঁকে তুলে ধরল। তিনি ক্রাচ তুলে নিয়ে এক দিকে ধরলেন, অন্য দিকে ভর করলেন নার্স। সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম বারোটার ঘণ্টা। বললেন, 'ও রেভোয়া'—অর্থাৎ 'আবার দেখা হবে'। গুড্ বাই নয়। তার অর্থ অন্য।

কিন্তু আমার মনে প্রশ্ন জাগল, জাওয়ারব্রুখ্ কি জানতেন তাঁকে ডাচেসের বাড়িতে আনা হয়েছিল তাঁর অসুখের ভান করে! ঐ সময় তিনি যেন লণ্ডনের হাতের কাছে থাকেন। অপারেশনে যদি গণ্ডোগোল হয়, তাঁকে তখ্খুনি ডেকে পাঠাবার জন্য।

যাগ্ গে। কালই তো জর্মনি যাচ্ছি। আমার বন্ধু পাউলকে শুধাব। সে গুণী, সব জানে।

বহু চেষ্টা করেও লণ্ডনের সঙ্গে দোস্তী জমাতে পারলুম না। পূর্বেও পারি নি। কারণ অনুসন্ধান করে আশ্চর্য বোধ হয়েছে, যে শহরকে দশ-এগারো বছর বয়স থেকে ইংরিজী ভাষা ও সাহিত্যের মারফতে চিনতে শিখেছি তার সঙ্গে হৃদ্যতা হয় না কেন? বোধ হয় ইংরেজ এদেশে রাজত্ব করেছে বলে। বোধ হয় বহুকাল ইংরেজের গোলামী করেছি বলে তার প্রতি রাগটা যেন যেতে চায় না। তার সর্বগুণ দেখলে রাগটা আরো যেন বেড়ে যায়। তখন মনে হয়, এর সঙ্গে দোস্তীটা জমাতে পারলে জীবনটা আরো মধুময় হতে পারতো।

কিন্তু আমি তো এ ফরিয়াদে একা নই। ফরাসীরা তো ইংরেজকে সোজা-সুজি অনেক কথা বলে। মাদাম টাবউই বই লিখেছিলেন—'পারফিডিয়াস এলবিয়ন অর আঁতাঁৎ কর্দিয়াল।' জর্মন, হাঙ্গেরিয়ান এবং অন্যান্য জাত অত কড়া ভাবে কথাটা বলে নি বটে, কিন্তু ইংরেজের প্রকৃতি যে আর পাঁচটা জাতের মত নয় সেকথা সবাই স্বীকার করে নেয়। কেউ ব্যঙ্গ করেছে, কেউ সহিষ্ণুতার সদয় হাসি হেসেছে। এ শুধু টুরিস্টদের সাধারণ অভিজ্ঞতা নয়, হাইনে, ভলতেয়ার, জোলার মত বিচক্ষণ মহাজনরা যা বলে গেছেন সে তো কিছু ঝেড়ে ফেলে দেবার মত নয়।

কিন্তু একটি কথা সবাই স্বীকার করেছেন। সেকস্পীয়রের মত কবি হয় না, ইস্কিলাস, দান্তে, গ্যোটে এদের কারো চেয়ে ইনি কম নন। আর এঁর মহত্ব এমনই বিরাট যে, তাঁকে নকল পর্যন্ত করার সাহস কারো হয় না।

কিন্তু এ তত্ত্ব নিয়ে অত্যধিক বাক্যব্যয় আমি করতে যাবো কেন?

আমাকে যে জিনিস সব চেয়ে মুগ্ধ করেছে সেইটে বলে প্লেনে উঠি।

ব্রিটিশ মিউজিয়মের পাঠাগার। অনেক দেশে বিস্তর পুস্তকাগারে ঢুকেছি। থানাতেও দু'একবার গিয়েছি। দুটোতে কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করতে পারি নি। আমি যেন চোর। বই সরাবার মতলব ভিন্ন আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে এটা কেউই যেন বিশ্বাস করতে চায় না। কার্ড দেখানো থেকে আরম্ভ করে বই ফেরত দিয়ে বেরোবার পরও মনে হয় পিঠের উপর ওদের চোখ-

গুলো যেন সার্জেনের তুরপুনের মত কুরে কুরে ঢুকছে।

এর জন্য কে দায়ী বলা কঠিন। কিন্তু যেই হোক্, কিংবা যাঁরাই হোন্, এ বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই যে, চোর-পুলিসের বাতাবরণে আর যা হয় হোক, জ্ঞানসঞ্চয় বিদ্যার্জন হয় না। তবে এর ব্যত্যয় আছে। এবং আমার বিশ্বাস, আমরা উন্নতির দিকেই চলেছি।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে কাউকে যে সন্দেহের চোখে দেখা হয় না তার প্রধান কারণ প্রায় সবাই বয়স্ক, অনেকেই পণ্ডিতরূপে বিশ্ববরেণ্য। এখানে কাজ করতে হলে সহজে অনুমতি পাওয়া যায় না। ব্রিটিশ মিউজিয়মের কর্তারা যে 'ডগ অ্যাণ্ড দি ম্যানেজার', অর্থাৎ আমি খাবো না, তোকেও খেতে দেব না নীতি অবলম্বন করেন তা নয়। তাঁদের বক্তব্য, সাধারণ রিসার্চ, যেমন মনে করুন, ডক্টরেটের কাজ করার জন্য লণ্ডনে আরো বিস্তর লাইব্রেরী রয়েছে। সেখানে ভিড় কম, ও রিসার্চ একটি বিশেষ বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে আপনি আপনার বই পেয়ে যাবেন তাড়াতাড়ি। যেমন মনে করুন, আপনি সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতেই আপনি আপনার প্রয়োজনীয় বই পেয়ে যাবেন। কিন্তু যেখানে গবেষণা একাধিক বিষয়বস্তু ছাড়িয়ে যায় সেখানে স্পেশালাইজড লাইব্রেরী কুলিয়ে উঠতে পারে না—তখন ব্রিটিশ মিউজিয়ম আপনাকে স্বাগতম জানায়।

এবং সব চেয়ে বড় কথা—পৃথিবীর সর্ব জায়গা থেকে এত সব নামকরা পণ্ডিত এখানে আসেন যে, মিউজিয়ম তাঁদের নিরাশ করে অপেক্ষাকৃত, কিংবা সম্পূর্ণ অজানা গবেষককে স্থান দিতে চায় না—কারণ পাঠাগারের সাইজ দশ ডবল করে দিলেও সে তার মোহাকৃষ্ট গবেষকদের স্থানকুলান করতে পারবে না।

মিউজিয়মের চায়ের স্টলে একটি পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ হয়।

তিনি বললেন, 'রীডিং রুমে ঢুকেই একটি নিগ্রো ভদ্রলোককে লক্ষ্য করেছেন কি? আবলুশের মত রঙ আর বরফের মত সাদা চুল? নাগাড়ে বিশ বছর ধরে ঐ আসনে বসে কাজ করে যাচ্ছেন।'

আমি বললুম, 'আপনি ক' বছর ধরে?'

তিনি যেন একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, 'সামান্য। পনেরো হবে। আমার চেয়ে যাঁরা ঢের প্রবীণ তাঁদের কাছে শোনা।'

আমি শুধালুম, 'ইনি কি কাজ করছেন?'

'হাবশী মুল্লুকে খৃষ্টধর্মের অভ্যুদয় কিংবা ওরই কাছাকাছি কিছু একটা। হীব্রু, আরাহময়িক, আহমরিক, সিরিয়াক এসব তাবৎ ভাষায় লেখা বই ঘাঁটতে হলে এখানে না এসে তো উপায় নেই।

আমি সামান্য যে ক'দিন কাজ করেছিলুম সে ক'দিন নিগ্রো ভদ্রলোকের নিষ্ঠা দেখে স্তম্ভিত হয়েছি। ন'টার সময় কাঁটায় কাঁটায় তাঁকে আসন নিতে দেখেছি, এবং উঠতেন ছ'টার সময়। এর ভিতরে আসন ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকলে আমার অজানতে। আর দেড়টা থেকে দুটো অবধি চেয়ারের হেলানে মাথা দিয়ে একটুখানি ঘুমিয়ে নিতেন।

লিখতেন অল্পই। পড়তেন বেশী। চিন্তা করতেন তারো বেশী। দু' একবার চোখাচুখি হয়েছে। তিনি যেন আমাকে দেখতেই পান নি। চোখ দুটি কোন্ অসীম ভাবনার গভীর অতলে ডুবে আছে আমি জানবো কি করে? কিংবা তিনি হয়তো ছবি দেখছেন, সেই আদিম আবিসিনিয়ান সমাজের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন খৃষ্টের দূত, শান্তির বাণী বহন করে। তখন তাঁদের সভ্যতা সংস্কৃতি কোন্ স্তরে ছিল, খৃষ্টের বাণী তাঁরা কি ভাবে গ্রহণ করেছিলেন—তারই ছবি দেখছেন। যেখানে ছবি অসম্পূর্ণ কিংবা ঝাপ্সা সেটাকে সম্পূর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য এই সাধনা।

তাঁর বই লেখা শেষ হয়েছিল কি না, প্রকাশিত হলে ক'জন লোক সেটি পড়েছিল, বোঝবার মত শক্তি ক' জন পাঠকের ছিল তাও জানি নে। কারণ এরকম নিষ্ঠাবান সাধক পাঠাগারের অনেকেই।

এস্থলে পাঠক হয়তো ভাবছেন, আমি সেখানে ঠাঁই পেলুম কি করে? কারণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, আমি পণ্ডিত নই।

জর্মনিতে পড়াশোনা করার সময় আমার কয়েকখানা বইয়ের প্রয়োজন হয়। সেদেশে সেগুলো পাওয়া যাচ্ছিল না বলে অধ্যাপক বললেন, 'ব্রিটিশ মিউজিয়মে যাও; সেই সুযোগে লণ্ডনও দেখা হয়ে যাবে।'

তিনি নিজে প্রায়ই লণ্ডনে এসে কাজ করে যেতেন। মিউজিয়মের কর্তারা ভালো করেই জানতেন, পণ্ডিতসমাজে তাঁর স্থান কতখানি উঁচুতে। তিনি যখন পরিচয়পত্র দিয়ে পাঠালেন তখন এঁরা আর কোনো প্রশ্ন শুধালেন না।

কিন্তু বার বার লজ্জা অনুভব করেছি।

প্রথম মুশকিল আসন নিয়ে। কোনো আসনে কেউ বসছেন বিশ বছর ধরে, কেউ ত্রিশ বছর ধরে। ঠিক সেদিনটাই হয়তো তিনি তখনো আসেন নি। আপনি না জেনে বসে গেলেন তাঁরই আসনে—কারণ কোনো চেয়ার কারো জন্য রিজার্ভ করা হয় না। তিনি খানিকক্ষণ পরে এসে আপনাকে ঐ চেয়ারে দেখে চলে গেলেন কিছু না বলে। অন্য জায়গায় বসে তিনি ঠিক আরাম পেলেন না। আপনি কিন্তু জানতেই পেলেন না।

পরের দিন গিয়ে দেখলেন, অন্য কে একজন—তিনিই হবেন—ঐ আসনে বসে আছেন। আপনি নূতন আসনের সন্ধানে বেরোলেন।

এসব বুঝতে বুঝতে কেটে যায় বেশ কয়েকদিন। যখন বুঝলুম, তখন শরণাপন্ন হলুম এক কর্মচারীর। তিনি অনেক ঘাড় চুলকে আমাকে একটি আসন দেখিয়ে বললেন, 'এ চেয়ারটায় এক ভদ্রলোক বসছেন দশ বৎসর ধরে।'

আমি বললুম, 'থাক্ থাক্।'

তিনি বললেন, 'তবে মাসখানেক ধরে তিনি আসছেন না।'

আমি বললুম, 'তা হলে উপস্থিত এখানেই বসি। কিন্তু তিনি এলে আমায় বলে দেবেন কি?'

বিরাট গোল ঘর। মাঝখানে চক্রাকারে সাজানো ক্যাটলগ। আর একেবারে কেন্দ্র বসে কয়েকজন কর্মচারী। এঁদের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন বড়

একটা হয় না। বই আসে যায় কলের মত।

কেন্দ্র থেকে সারি সারি হয়ে দেয়াল অবধি বেরিয়েছে পাঠকদের আসন-পঙ্‌ক্তি। উপরের কাঁচ দিয়ে যে আলো আসছে সেটুকু যথেষ্ট নয় বলে টেবিলে টেবিলে ল্যাম্প। পাঠকদের অনেকেই পরেছেন কপালের উপরে রবারে বাঁধা 'শেড্‌'—টেনিস খেলোয়াড়দের মত। সামান্য পাতা উল্টোনোর শব্দ, পাশের ভদ্রলোকের কলমের অতি অল্প খসখস। আর কোনো শব্দ কোনো দিক দিয়ে আসছে না। অখণ্ড মনোযোগের পরিপূর্ণ অবকাশ।

এ-জায়গা মানুষকে কাজ করতে শেখায়। আপনি হয়তো এলেন ন'টা পনেরো মিনিটে। এসে দেখেন আপনার পাশের ভদ্রলোক যেভাবে কাজ করছেন তার থেকে মনে হয়, তিনি অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। তারপর দশটা এগারোটা বারোটা একটা অবধি তিনি আর ঘাড় তোলেন না। আপনার ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছে। তাঁর পায় নি। আপনারও রোখ চেপে গেল। উনি না উঠলে আপনিও উঠবেন না। ইতোমধ্যে বাইরে গিয়ে বার বার সিগরেট খাবার ইচ্ছে হয়েছে—সেটাও চেপে গিয়েছেন। দুটোর সময় উনি উঠলেন। আপনি যখন সাততাড়াতাড়িতে চা-রুটি খেয়ে ফিরলেন, তিনি তখন ঘাড় গুঁজে ফের কাজে ডুব মেরেছেন। বোঝা গেল, বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি সঙ্গে-আনা দুখানা স্যাণ্ডউইচ খেয়েই কাজ সেরেছেন। তারপর তিনি উঠলেন পাঠাগার বন্ধ হওয়ার সময়।

এরকম যদি একটা লোক পাশে বসে কাজ করে তবে কার না মাথায় খুন চাপে! কিছুদিনের ভিতর দেখতে পাবেন, আপনিও দিব্য ন'টা ছ'টা করে যাচ্ছেন। কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, কোনো ক্লান্তি আসছে না।

একেবারে কেন্দ্রে বসতেন একটি অতিশয় ছোটখাটো বৃদ্ধ। পরনে মর্নিং সুট। লম্বা দাড়ি। আবার মাথায় টপ হ্যাট। ঘরের ভিতরে ইংরাজ হ্যাট পরে না। এঁকে কিন্তু কখনো হ্যাটটি নামাতে দেখি নি। বোধ হয় হ্যাটের সামনের দিকটা দিয়ে তিনি শেডের কাজ চালিয়ে নিতেন।

সিন্ধী গুজরাতীতে মেশানো কয়েকখানি ধর্মগ্রন্থের সন্ধান না পেয়ে তাঁর কাছে গেলুম। তিন মিনিটের ভিতর তিনি ক্যাটলগের ঠিক জায়গা বের করে দিলেন, এবং এটাও বললেন, 'বোধ হয় ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে এ সম্বন্ধে আরো বই আছে।'

পরে এক ভারতীয়ের মুখে শুনলুম, হেন বই লাইব্রেরীতে নেই যার হদিস তাঁর অজানা। মিউজিয়ামের চায়ের ঘরে কথা হচ্ছিল। লাইব্রেরীতে দেশ-বিদেশের পাকা গাহক কয়েকজন ঘাড় নাড়িয়ে সায় দিলেন।

এই অশান্ত অজস্র পরিশ্রম আর নিষ্ঠার শেষ কোথায়, ফল কি? এঁদের সকলের বই কি জনসমাজে সম্মান পায়? বহু পরিশ্রমের পর যখন বই সম্মান পায় না তখন লেখকের মনে কি চিন্তার উদয় হয়? তিনি কি আবার নূতন করে কাজ আরম্ভ করেন, না ভগ্নহৃদয়ে শয্যাগ্রহণ করেন?

এর উত্তর দেবে কে ?

শুধু এইটুকু জানি, মিউজিয়ম এ নিয়ে মাথা ঘামাক আর নাই ঘামাক সে সাদরে বংশপরম্পরাকে জ্ঞানের সন্ধানে সাহায্য করছে, আর পাঠাগারের কেন্দ্রটি বিশ্বের সর্বজ্ঞানের কেন্দ্র না হোক, অন্যতম কেন্দ্র।

ইংরেজকে এখানে নমস্কার।

বিশ্বজনের কাছে ভারতবর্ষ অপরিচিত দেশ নয়। প্রাচীন যুগে সে অপরিচিত ছিল না, এ যুগেও নয়। মাঝখানে কিছুদিনের জন্য অল্পসংখ্যক স্বার্থান্বেষী সাম্রাজ্যবাদী ভারতবর্ষের সম্বন্ধে প্রচার করেন যে, যদিও এ দেশ একদা সভ্যতা-সংস্কৃতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল আজ তার সর্বস্ব লোপ পেয়েছে এবং বৈদেশিক শাসন ভিন্ন এর পুনর্জীবন লাভের অন্য কোনও পন্থা নেই। এ-কুৎসা প্রচারের ফলে প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয় মহাদেশেই বিস্তর কুফল ফলেছিল, এখনও কিছু কিছু ফলছে। এর জন্য সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই স্বল্প-সংখ্যক সাম্রাজ্যবাদীদের দেশই। কিন্তু এ-স্থলে স্মরণ রাখা কর্তব্য সে-দেশের মনীষীগণও তাই নিয়ে প্রচুর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

মাত্র একটি দেশ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কখনও তার ভক্তিশ্রদ্ধা হারায় নি। সে-দেশ জর্মনি। এদেশের গুণীজ্ঞানীরা সে তত্ত্ব অবগত আছেন। আমাদের কবি মধুসূদন একশ' বছর পূর্বে লণ্ডনে থাকাকালীন জর্মনপণ্ডিত গল্টস্ট্যুকারের সঙ্গে দেখা করতে যান; এমন কি যে স্বল্প-সংখ্যক জর্মনপণ্ডিতের মতবাদ আমাদের সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমাত্মক বলে মনে করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি আপন যুক্তিতর্ক উত্থাপন করেছেন। পরবর্তী যুগে আমাদের শিক্ষাচার্য রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় শাস্ত্র গবেষণার জন্য জর্মনপণ্ডিত উইন্টারনিৎসকে নিমন্ত্রণ করে বিশ্বভারতীতে নিয়ে আসেন; তখনই অপরিচিতা শ্রীমতী ক্লামরিশ তাঁরই সৌজন্যে বিশ্বভারতীতে ভারতীয় কলাচর্চার সুযোগ পান।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এদেশের জনসাধারণ জর্মনির খবর পেল দুই অশুভ যোগাযোগের ফলে। দুই বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে ভারতবাসী জর্মনি সম্বন্ধে নানা অতিরঞ্জিত কাহিনী শুনে ঈষৎ পথভ্রান্ত হয়েছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। এদেশের পণ্ডিতসমাজেও জর্মন ভাষা সুপ্রচলিত নয় বলে ভারতবর্ষীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা জর্মনিতে কি ভাবে হয়, তার কতখানি উন্নতি হয়েছে, সে বিষয় বাঙলায় অনূদিত হওয়ার সুযোগ পায় নি। যে-সব বাঙালী বিপ্লবী জর্মনিতে আশ্রয় পেয়েছিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতাও সুস্পষ্ট কারণবশত এদেশে প্রসারলাভ করতে পারে নি।

ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান কলা-দর্শন সভ্যতা-সংস্কৃতি চর্চার জন্য ইয়োরোপে যে শব্দটি প্রচলিত তার নাম ইণ্ডলজি—জর্মন উচ্চারণ ইণ্ডলগী। শব্দটি অর্বাচীন ও গ্রীক-গোত্রীয় (অবশ্য এর প্রথমাংশ 'ইন্দস' শব্দটি মূলে ভারতীয়) এবং জর্মনির শিক্ষিতজন মাত্রই এটির বহুল প্রয়োগ করে থাকেন; ইংলণ্ডের পণ্ডিতসমাজে এটি কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়—এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায়

শব্দটি নেই, জর্মন সাইক্লোপিডিয়ায় নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ আছে।

জর্মনিতে ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ইত্যাদির চর্চা অর্থাৎ ইণ্ডলজি কতখানি প্রচার এবং প্রসার লাভ করেছে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা বাঙলাতে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ভ্রমণকাহিনী তার জন্য প্রশস্ত স্থান নয়, কিন্তু এ সম্বন্ধে যৎ-কিঞ্চিৎ জ্ঞান না থাকলে জর্মন দেশ-বৃত্তান্তের একটা বিরাট মহৎ দিক অবহেলিত হয়, এবং দ্বিতীয়ত আমার ছাত্রজীবনের প্রায় চার বৎসর সেখানে কাটিয়েছি বলে একাধিক জর্মন-সংস্কৃতজ্ঞের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হয় এবং ভ্রমণ কাহিনীতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ইচ্ছা-অনিচ্ছায় প্রকাশিত হবে বলেই এ-সব পণ্ডিত এবং তাঁদের সাধনা সম্বন্ধে এই সুযোগে যা না বললে নিতান্তই চলে না সেইটুকু বলে রাখি। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি, ভবিষ্যতে আমি এ প্রলোভন সম্বরণ করব।

ইণ্ডলজি আরম্ভ করেন ইংরেজরাই—অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে। জোন্‌স্‌, কোলব্রুক্‌, উইল্‌স্‌ন্‌-এর প্রতিষ্ঠাতা। এর পরই ফ্রান্সে সিলভেসংর দ্য সাসি এ চর্চা আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে জর্মনিতে সেটা ব্যাপকতর ভাবে আরম্ভ হয়। জর্মনপণ্ডিত শ্লেগেলই সর্বপ্রথম এ চর্চার ব্যাপকতা এবং কী ভাবে এতে অগ্রসর হতে হবে তার কর্মসূচী তাঁর পুস্তক 'য়্যুবার ডি স্প্রাখে উন্‌ট ভাইজ্‌ হাইট্‌ডের ইণ্ডার-' ('ভারতীয় ভাষা ও মনীষা') ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। এর কয়েক বৎসর পরেই জর্মনপণ্ডিত বপ্‌ সংস্কৃত ধাতুরূপের সঙ্গে গ্রীক, লাতিন এবং প্রাচীন জর্মন ধাতুর তুলনা করে সপ্রমাণ করেন যে, ভবিষ্যতে আর্যগোষ্ঠীর যে-কোন ভাষার মূলে পেঁছিতে হলে সংস্কৃত ভাষা অপরিহার্য। বস্তুত তিনিই প্রথম তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বের কেন্দ্রভূমিতে যে সংস্কৃতকে স্থাপনা করলেন এখনও সে সেখানেই আছে। তারই দু' বৎসর পরে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে জর্মনির বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হয় এবং ঐ কর্মে নিয়োজিত হন পূর্বোল্লিখিত ফ্রীড্‌রিষ শ্লেগেলের ভ্রাতা ভিল্‌হেল্‌ম্‌ শ্লেগেল। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে বপ্‌ বার্লিনে নিযুক্ত হলেন।

ভারতবর্ষে তখন সংস্কৃত চর্চার কী দুর্দিন!

শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয়, বপ্‌ যে শুধু ভারতীয় ব্যাকরণ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন তাই নয়, তাঁরা তখন সংস্কৃত সাহিত্যের রসের দিক অনুবাদের মাধ্যমে জর্মনিতে পরিবেষণ করতে আরম্ভ করেছেন। ফলে তার প্রভাব গিয়ে পড়ল জর্মন সাহিত্যে। কবিগুরু গ্যোটে শকুন্তলার অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ। তিনি তখন যা বলেছিলেন তাই নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন প্রায় একশ' বছর পরে। তিনি লিখলেন:

'য়্যুরোপের কবিগুরু গ্যোটে একটিমাত্র শ্লোকে শকুন্তলার সমালোচনা লিখিয়াছেন, তিনি কাব্যকে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন করেন নাই। তাঁহার শ্লোকটি একটি দীপবর্তিকার শিখার ন্যায় ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা দীপশিখার মতোই সমগ্র শকুন্তলাকে এক মুহূর্তে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইবার উপায়।' তিনি এক কথায় বলিয়াছিলেন, 'কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল, কেহ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্র

দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।'

এবং প্রবন্ধ শেষ করতে গিয়ে লিখলেন ঃ

'গ্যোটের সমালোচনার অনুসরণ করিয়া পুনর্বার বলি, শকুন্তলায় আরম্ভের তরুণ সৌন্দর্য মঙ্গলময় পরম পরিণতিতে সফলতা লাভ করিয়া মর্ত্যকে স্বর্গের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিয়াছে।'

গ্যোটের মত কবি যখন সংস্কৃত নাটক পড়ে উচ্ছ্বসিত তখন অন্যান্য কবিরা যে উৎসাহিত হবেন সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। গীতিকাব্যের রাজা হাইনে তখন দুঃখ-বেদনায় কাতর বলেই স্বপ্ন দেখতে লাগতেন সেই আনন্দ-নিকেতন, সেই স্বপ্নের ভুবন ভারতবর্ষ—শেলি কীট্‌স বায়রন যে অবস্থায় স্বপ্ন দেখতেন গ্রীসের।

'গঙ্গার পার—মধুর গন্ধ ত্রিভুবন আলো ভরা—
কত না বিরাট বনস্পতিরে ধরে
পুরুষ রমণী সুন্দর আর শান্ত প্রকৃতিধরা
নতজানু হয়ে শতদলে পূজা করে।'

আম্‌ গাঙেস্‌ ডুফটেট্‌স লয়েস্টট্‌স
উন্‌ট্‌ রীজেন্‌বয়মে ব্লুয়েন,
উন্‌ট্‌ শ্যোনে স্টিলে মেনশেন্‌
ফর্‌ লটসব্লুমেন ক্লীয়েন।

গঙ্গানদীতে আমি পদ্মফুল ফুটতে দেখি নি। কিন্তু এ তো স্বপ্নরাজ্য। এর কিছুটা সত্য কিছুটা কল্পনা। তাই পূব-বাঙলার কবিও মধ্য আরবের মরু-ভূমির ভিতর দিয়ে তার নায়িকা লায়লাকে যখন মজনুর কাছে নিয়ে যাচ্ছেন তখন তিনি যাচ্ছেন নৌকোয় চড়ে! এবং শুধু কি তাই? তিনি বিলের জল থেকে—সেই আরব দেশে—কুমুদকহ্লার তুলে তুলে খোঁপায় গুঁজছেন!

হাইনে জাত-ধর্মে ইহুদী। তাঁর ধমনীতে আর্যরক্ত নেই। কিন্তু আর্য-জর্মনিতে তখন ভারতীয় আর্যের প্রতি যে সমবেদনা, গৌরবানুভূতির প্লাবন আরম্ভ হয়েছে তাতে তিনিও নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন। তাঁর বহু কবিতায় কখনও প্রচ্ছন্ন কভু বা প্রকাশ্যে ভারতের প্রতি আকুল ব্যাকুল হৃদয়াবেগ (জর্মন ভাষায় এই 'হৃদয়াবেগে'র নাম 'শ্বয়েমর্‌রাই'।)

ঐ সময়ে ভারতের প্রতি জর্মনির কতখানি শ্বয়েমের্‌রাই (ইংরিজীতেও এর প্রতিশব্দ নেই—'ফেনাটিক এন্‌থুসিয়েজম'-এর অনেকটা কাছাকাছি) তার আরেকটি উদাহরণ দিই।

ভারতবর্ষে যখন কেউ জর্মন ভাষা শিখতে আরম্ভ করে তখন সাধারণত তাকে যে প্রথম ক্ষুদ্র উপন্যাস পড়তে দেওয়া হয় তার নাম 'ইমেন্‌জে'। আমিও এই বই পূর্বোল্লিখিতা শ্রীযুক্তা ক্রাম্‌রিষের কাছে পড়ি। তাতে জর্মন বাচ্চা-দের খেলাধুলোর একটি বর্ণনা আছে। তারা সবাই মিলে একটা ঠেলাগাড়ি তৈরি করে তার উপর কেউ বা চাপছে, কেউ বা দিচ্ছে ঠেলা। আর সবাই মিলে

এক সঙ্গে প্রাণপণ চেঁচাচ্ছে ঃ

"নাখ্ ইণ্ডিয়েন, নাখ্ ইণ্ডিয়েন্।"

"ভারত চলো, ভারত চলো।"

ঠেলাগাড়ি চড়ে-চড়েই তারা ভারতবর্ষে পেঁছিবে!

কবিরা শিশুপ্রকৃতি ধরেন, এবং শিশুরাও কবিপ্রকৃতি ধরে। দুজনারই বাস কল্পনারাজ্যে।

কিন্তু প্রশ্ন, তারা 'নাখ্ ইণ্ডিয়েন, নাখ্ ইণ্ডিয়েনই' করছে কেন, 'নাখ্ আমেরিকা' কিংবা 'নাখ্ চীনা' চেঁচাচ্ছে না কেন? জর্মনির কাচ্চাবাচ্চাদের ভিতরও তখন এই শুয়েমেঁরাই ছড়িয়ে পড়েছে। এ বইয়ের প্রকাশ ১৮৪৯খ্রীষ্টাব্দে।

ঐ সময় ইয়োরোপে যে সব পণ্ডিত বেদচর্চায় মত্ত তাদের তিনজনই জর্মন ঃ বেন্‌ফাই, ম্যাক্‌স্‌ম্যুলার এবং ভেবার। ম্যাক্‌স্‌ম্যুলারকে সবাই চেনেন, ভেবারের লেখার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সুপরিচিত ছিলেন, কিন্তু বেন্‌ফাই সামবেদের অনুবাদ করেছিলেন বলেই বোধ হয় অতখানি খ্যাতি পান নি। তবে জর্মনির শিশুসাহিত্যে তিনি সম্রাট। তাঁর 'পঞ্চতন্ত্রের'র অনুবাদ প্রাতঃস্মরণীয়।

কাজ তখন এত এগিয়ে গিয়েছে যে একখানা সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্কৃত-জর্মন অভিধান না হলে আর চলে না। দুই জর্মনপণ্ডিত ব্যোট্‌লিঙ্ক ও রোট তখন যে অভিধান প্রস্তুত করলেন সেটি প্রকাশিত হল রুশ সম্রাটের অর্থসাহায্যে সাত ভলুমে, ১৮৫২-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে।

এ অভিধান অতুলনীয়। কিয়দ্দিন পূর্বে পরলোকগত পণ্ডিতবর হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই আমার জানামতে একমাত্র বাঙলা আভিধানিক যিনি তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' রচনাকালে এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন।

"ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি
কাঁদিছে ক্রন্দসী"

এস্থলে 'ক্রন্দসী' শব্দের অর্থ কি? ভাসা-ভাসা ভাবে অনেকেই ভাবেন, ঐ চতুর্দিকে "কান্নাকাটি" হচ্ছে, আর কি?' অন্যায়টাই বা কি? স্বয়ং নজরুল ইসলাম লিখেছেন, 'কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে।' জ্ঞানেন্দ্রমোহনের কোষ অনবদ্য। তাতেও দেখবেন, 'সংস্কৃত অভিধানে পাই নাই, কিন্তু "রোদসী" পাইয়াছি। তার অনুকরণে অনুপ্রাসানুরোধে (!) 'ক্রন্দসী'। কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক উদ্ভাবিত (!) এবং বাংলায় প্রথম ব্যবহৃত। কিন্তু এতখানি বলার পর জ্ঞানেন্দ্রমোহন প্রকৃত কোষকারের ন্যায় অর্থটি দিয়েছেন ঠিক। 'আকাশ ও পৃথিবী; স্বর্গমর্ত্য।'

ব্যোট্‌লিঙ্ক-রোটের সংস্কৃত-জর্মন অভিধানখানার প্রসঙ্গ উঠেছে বলেই এ উদাহরণটি প্রয়োজন হল। এ অভিধান জর্মন দেশ ও বাঙলার যোগসেতু।

একটু ব্যক্তিগত হয়ে গেলে পাঠক অপরাধ নেবেন না।

ছেলেবেলায় আমার মনে ধোঁকা লাগে 'ক্রন্দসী' শব্দ নিয়ে। সবে শান্তিনিকেতনে এসেছি। দূর থেকে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখেছি। শুনে

ভয় পেয়েছি, তিনি নাকি বিশ বছর ধরে একখানা বাঙলা অভিধান লিখছেন। বিশ বছর ধরে বাঙলা—সংস্কৃত নয়, গ্রীক নয়, বাঙলা অভিধান—বি···শ বছর ধরে। তখনো জানতুম না তারপরও তিনি আরো প্রায় বিশ বছর খাটবেন।

তাঁকে গিয়ে শুধাতে তিনি বড় আনন্দিত হলেন—আমি ভয় পেয়েছিলুম, তিনি বিরক্ত হতে পারেন। একাধিক বাঙলা অভিধান দেখালেন যাতে শব্দটা নেই। তারপর ব্যোট্‌লিঙ্ক-রোট পাড়তে পাড়তে বললেন, 'এইবারে দেখো, জর্মনরা কি বলে।' তাতে দেখি, ডি টোবেণ্ডেন শ্লাখট্‌রাইয়েন, অর্থাৎ 'যে দুই সৈন্যবাহিনী হুঙ্কার করছে।' হরিবাবু বললেন, 'ঠিক, অর্থাৎ "দুই পক্ষ" —তার মানে উর্বশীর জন্য দু'পক্ষই কাঁদছে। কিন্তু তার পরেও এগোতে হয়। ঋগ্বেদের এই ২, ১২, ৮-এর টীকা দিতে গিয়ে সায়নাচার্য "ক্রন্দসী" শব্দের অর্থ করেছেন "স্বর্গমর্ত্য"।

উর্বশী কবিতায় রবীন্দ্রনাথও ক্রন্দসী শব্দ 'স্বর্গ ও মর্ত্য' এই মর্মে ব্যবহার করেছেন। কারণ স্বর্গের দেবতা এবং মর্ত্যের মানব দুই-ই যে তাঁর প্রেমাকাঙ্ক্ষী, তার বর্ণনা তিনি এ কবিতায় দিয়েছেন।

এস্থলে আর এগোবার দরকার নেই। জর্মনিতে ফিরে যাবার পূর্বে উল্লেখ করি হরিচরণ তাঁর সকল শব্দকোষ ব্যোট্‌লিঙ্ক-রোট কৃত অভিধানের প্যাটার্নে নির্মাণ করেছেন।

এ অভিধান জর্মনিতে প্রসারলাভ করার ফলে সে-দেশে ভারতীয় জ্ঞান-চর্চা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চললো এবং তারই ফলে তার পরিমাণ এমনই বিরাট রূপ ধরলো যে, ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতদের হাতে সমর্পণ করতে হল। জর্মন পণ্ডিত ব্যুলার তখন এক বিরাট পুস্তকের পরিকল্পনা করলেন। 'আর্যপ্রাচ্যতত্ত্বের পরিকল্পনা'—গ্রুণ্ডরিস্‌ ডের ইণ্ডো-আরিশেন ফিললগি উল্ট্‌ আলটেরটুমস্‌কুণ্ডে নামে এ-বই পরিচিত। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এর প্রথম ভলুম বেরোয়; এযাবৎ কুড়ি ভলুম বেরিয়েছে। প্রধানত কীলহর্ন, ল্যুডার্স, ভাকের-নাগেল এবং আরও অসংখ্য পণ্ডিত এতে সাহায্য করেন।

এর পর আর হিসেব রাখা যায় না।

কারণ এতদিনছিল ব্যাকরণ, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন নিয়ে চর্চা, তারপর আরম্ভ হল ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্র, নাট্য, নৃত্য, হস্তশিল্প, সঙ্গীত—আরো কত কী নিয়ে আলোচনা। স্মিট সায়েব তো একটা জীবন কাটিয়ে দিলেন কামসূত্র নিয়ে। ব্যোটলিঙ্কের অভিধানে কামসূত্রের টেকনিকাল শব্দ বাদ পড়ে গিয়েছিল —স্মিট সে অভিধানের প্রযোজন খণ্ড প্রণয়নকালে এত বেশী কামসূত্রীয় শব্দ প্রবেশ করিয়ে দিলেন যে, তাই নিয়ে পণ্ডিতমহলে নানা রকমের 'শ্রুতিমধুর' মন্তব্য শোনা গেল। কৌটিল্য নিয়ে কী মাতামাতি! আর, আমি দেখেছি আমারই চোখের সামনে এক জর্মন মহিলা সপ্তাহে তিন দিন করে তিনটি বচ্ছর এলেন অধ্যাপক কির্ফেলের কাছে অষ্টাঙ্গের জর্মন অনুবাদে সাহায্যের জন্যে। তার পূর্বে তিনি মেডিকেল কলেজ পাস করে ঐ বিষয়ে বোধ হয় ডক্টরেটও নিয়েছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত ক' বছর খেটেছিলেন বলতে পারবো না। যে

ডক্টর জাওয়ারব্রুখের কাহিনী পঞ্চম জর্জের অপারেশন প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি, তিনি পর্যন্ত ক্যানসারের গবেষণা আরম্ভ করার পূর্বে জর্মন ইণ্ডলজিস্টের কাছ থেকে শুনে নিয়েছিলেন, ভারতীয় বৈদ্যরাজগণ এই মারাত্মক ব্যাধি সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, কোন্ চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছে।

ভারতীয় সঙ্গীত ও জর্মন সঙ্গীত ভিন্ন ভিন্ন মার্গে চলে। তৎসত্ত্বেও ভারতীয় বিষয়বস্তু একাধিক সঙ্গীতকারকে ভারতীয় 'লাইট-মোতীফ' জুটিয়েছে, তুলনাত্মক আলোচনা প্রচুর হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জনৈক মজুমদার এ সম্বন্ধে একখানি উচ্চাঙ্গের পুস্তক লিখে ডক্টরেট পান। পরম পরিতাপের বিষয় ঐ যুদ্ধে তিনি তরুণ বয়সে প্রাণ হারান। বইখানির পাণ্ডুলিপি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। এযাবৎ সে বই কেন যে কোনো ভারতীয় বা ইংরিজী ভাষাতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয় নি সে এক বিস্ময়।

মৃচ্ছকটিক জর্মনদের প্রিয় নাট্য। তার একাধিক প্রাঞ্জল এবং মধুর জর্মন অনুবাদ আমি দেখেছি। এ নাট্যের ঘটনাপরম্পরার বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত যে রকম জর্মন মনকে চঞ্চলিত করে, ঠিক তেমনি তার গীতিরস—বিশেষ করে অকাল বর্ষায় বসন্তসেনার অভিসার ও দয়িত 'দরিদ্র-চারুদত্তে'র সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর উভয়ের সে বর্ষণবর্ণন জর্মন-হৃদয়কে নাট্যগৃহে বহুবার উল্লসিত উদ্বেলিত করেছে। জর্মন ভাষা ইংরিজীর তুলনায় অনেক বেশি গম্ভীর ও প্রাচীনত্ব (আরকাইক) ধরে বলে সে ভাষায় মূল সংস্কৃতের অনেকখানি স্বাদগন্ধ রক্ষা পায় এবং কাব্যরসাশ্রিত নাট্যরস সহজেই সে ভাষায় সঞ্চারিত হয়।

জর্মন সাহিত্যদর্শন তথা জাতীয়জীবন—এ দুইয়ের উপর ভারতীয় সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্যের প্রভাব কতখানি হয়েছে তার সিংহাবলোকন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ জর্মনিতে যান। জর্মনি তখন মিত্রশক্তির পদদলিত, শব্দার্থে মর্মাহত। সেখানে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন, 'পরাজিতের সঙ্গীত'। তখন তিনি জর্মনিতে যেরূপ হার্দিক অভিনন্দন পেয়েছিলেন সেরকম অন্যত্র কোথাও পান নি। সে-কথার উল্লেখ তিনি নিজেই করে গিয়েছেন। আমি অন্যত্র একাধিকবার তাঁর প্রতি জর্মনপ্রীতির নিদর্শন বর্ণন করার চেষ্টা করেছি। এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

এতদিন জর্মনদের বিশ্বাস ছিল, ভারতবর্ষ একদা সভ্যতা-সংস্কৃতির উচ্চ শিখরে উঠেছিল বটে, কিন্তু বর্তমান যুগে সে দেশে শুধু ম্যালেরিয়া, গোখরো এবং ইংরেজ। (যদিও অবান্তর তবু বলে ফেলি; শেষের দুটোর মধ্যে কোন্‌টা বেশী বেইমান সেটা পশুবিদ্‌রা এযাবৎ স্থির করে উঠতে পারেন নি।) রবীন্দ্রনাথের আগমনে এবং দু' তিন মাসের ভিতর তাঁর লক্ষাধিক পুস্তক জনসমাজে প্রচারিত হওয়ার ফলে তথা 'ডাকঘর' নাট্যরূপে দেখে তাদের এ ভুল ভাঙলো। নবীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাদের মনে কৌতূহল জাগলো। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা শেখানোর ব্যবস্থা হল। প্রথম অধ্যাপক ভাগনার অবশ্য বাঙলা শিখেছিলেন নিজের চেষ্টাতেই। জর্মনিতে অনূদিত তাঁর 'বাঙলা-গল্প-চয়নিকা' 'বেঙ্গালিষে এরৎসেলুঙ্গেন' সম্বন্ধে আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি। বাঙলা

ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা এবং প্রগাঢ় প্রীতি সম্বন্ধে বার্লিনে প্রবাসী বাঙালী মাত্রই সচেতন ছিলেন। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর দরদটি কেমন যেন ভীতি-ভরা বলে আমার মনে হত। আমার মনে হত, বিশ্ব-সাহিত্যের অপরিচিত এই সাহিত্যের প্রতি তাঁর মাত্রাতিরিক্ত প্রীতি (প্রায় 'শুয়ে-মেরাই' বলা চলে) পাছে লোকে ভুল বোঝে, সেই ছলে পাছে সেটিকেও অনাদর করে ফেলে—এই ছিল তাঁর ভয়। দুঃখিনী মা লাজুক ছেলেকে যে রকম পরের বাড়িতে নিয়ে যেতে ভয় পায়। শোকের বিষয় এই নিরীহ ভাবুকটিও মজুমদারের মত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ হারান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং তার পরও জর্মনি অনেক ভারতীয় রাজদ্রোহীকে আশ্রয় দিয়েছে। এ সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি নে। তার কারণ এর সব কিছুটাই ঘটতো লোকচক্ষুর অগোচরে। তবে শুনেছি ইংরেজ যখন জর্মনির উপর চাপ আনতো কোনো ভারতীয় বিদ্রোহীকে সে-দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য, তখন জর্মন পুলিস তাকে কাতর কণ্ঠে বলতো, 'কেন বাপু একই ঠিকানায় বেশী দিন ধরে থাকো? ইংরেজ খবর জেনে আমাদের উপর চোটপাট করে তোমাকে তাড়িয়ে দেবার জন্য। আজই বাড়ি বদলাও। আমরা বলবো, তোমার ঠিকানা জানি নে।' এ কথাটি আমি শুনেছি, নেতা লালা হরকিষণ লালের ছেলে মনো মোহনলাল গাওবার কাছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কিম্বা দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে আমার চেনার মধ্যে জর্মনিতে ছিলেন শ্রীযুক্ত সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও বীরেন সেন (এঁর পুরো নাম ও পদবী আমার ঠিক মনে নেই)। এ সম্বন্ধে এঁরা সবিস্তর বলতে পারবেন এবং কিছু কিছু বলেছেনও। আর ছিলেন পরলোকগত মানবেন্দ্র রায়।

ভারতের প্রতি হিটলারের শ্রদ্ধাভক্তি ছিল না। তদুপরি জাপানকে হাতে আনবার জন্য তিনি চীন ভারত তাকে ('প্রভাবভূমি' বা স্ফিয়ার অব্ ইনফ্লুয়েন্স রূপে) দান করে বসেছিলেন বলে সুভাষচন্দ্রকে বাইরে আদর দেখিয়েও ঠিক মত সাহায্য করেন নি। সুভাষচন্দ্র যে অতিশয় তেজস্বী মহাবীর এবং সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ বিচক্ষণ কুটনৈতিক ছিলেন সে-কথা আমার মত সামান্য প্রাণীর প্রশস্তি গেয়ে বলার প্রয়োজন নেই। তিনি হিটলারের মনোভাব বুঝতে পেরে জাপান চলে যান। জাপানই যখন শেষমেষ ভারত আক্রমণ করবে, তখন জর্মনিতে বসে না থেকে জাপান চলে যাওয়াই তো বিচক্ষণের কর্ম। এ সম্বন্ধে বাকি কথা প্রসঙ্গ এলে হবে।

জর্মন সাহিত্যদর্শন তথা তার জাতীয়জীবন—এ দুয়েরই উপর ভারতীয় সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্যের প্রভাব কতখানি হয়েছে, এ সম্বন্ধে আলোচনা করার অধিকার আমার নেই। আশা করি শাস্ত্রাধিকারী ভবিষ্যতে এ নিয়ে প্রামাণিক পুস্তক লিখবেন। উপস্থিত আমি মাত্র একটি উদাহরণ দিয়ে এ-স্থলে ক্ষান্ত হই—

ইংরিজী এনসাইক্লোপিডিয়ায় টেগোর শব্দ খুললে পাবেন, মাত্র রবীন্দ্রনাথের

একটি অতি ক্ষুদ্র জীবনী। এবং তাঁর জীবনীকার হিসেবে একমাত্র টমসনের নাম।

জর্মন এনসাইক্লোপিডিয়া সাইজে তার ইংরিজী অগ্রজের অর্ধেক মাত্র। তবু তার প্রথমেই পাবেন, টেগোর অব্দের অর্থ। অনুবাদ দিচ্ছি—

'টীগোরে', আসলে ঠাকুর (Thakur) [সংস্কৃত ঠাকুর, 'প্রভু', সম্মতির প্রভু], পদবী (অষ্টাদশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকে', বর্তমানে পারিবারিক নাম। এ পরিবার দ্বাদশ শতাব্দীতে অযোধ্যা হতে বঙ্গে আগত ব্রাহ্মণদের বাড়ুয্যে পদবীধারী। পূর্বপুরুষ সংস্কৃত নাট্যকার ভট্টনারায়ণ (অষ্টম শতাব্দী)।'

এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য তারপর একখানি পুস্তকের উল্লেখ আছে। নাম 'আর্কিভ ফ্যুর রাসেন উনট্ গেজেলশাফটস্-বিয়োলগী' অর্থাৎ 'আর্কাইভ ফর রেস এণ্ড বায়োলজি অব্ সোসাইটি'—'জাতি এবং সামাজিক জীববিদ্যার দলিলদস্তাবেজ।'

এর পর আছে অবনীন্দ্রনাথের জীবনী, তার পর দেবেন্দ্রনাথের এবং বিস্তৃত বিবরণের জন্য তাঁর আত্মজীবনীর উল্লেখ আছে।

বর্ণানুক্রমে সাজানো বলে সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের জীবনী। অন্যান্য বিষয় উল্লেখ করে লেখক বলছেন, "১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁকে যে 'স্যর' উপাধি দেওয়া হয়, সেটা তিনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে অমৃতসরে রক্তগঙ্গা (জর্মনে ব্লুট-বাট =ব্লাড্-বাথ) প্রবাহিত হওয়ার পর বর্জন করেন।"[১]

এবং সর্বশেষে যে জীবনীগুলোর উল্লেখ আছে সেটি লক্ষণীয়।

(1) H. Meyer-Benfey ; Rabindranath Tagore (1921) ; (2) P. Natorp ; Stunden mit Rabindranath Tagore (1921) ; (3) W. Graefe ; Die Weltanschauung Rabindranath Tagores (1930) ; (4) R. Otto : Rabindranath Tagores Bekenntnis (1931) ; (5) M. Winternitz ; Rabindranath Togore, Religion und Weltanschauung des Dichters (Prag 1936) অতি উৎকৃষ্ট ; এর বাংলা অনুবাদ হওয়া উচিত (লেখক) ; (6) Marjorie Sykes : Rabindranath Tagore (1943) ; (7) E. J. Thompson : Rabindranath Tagore, Poet aud dramatist (1948) ; (8) J. C. Ghosh ; Bengali Literature (1948).

১। Encyclopaediaতে আছে : 'He accepted a knighthood in 1915, but in 1919 resigned it as a protest against the methods adopted for the repression of disturbances in the Punjab. in later years, however, he offered no objection to the use of this title.'

কী দুষ্ট বুদ্ধিতে শেষ বাক্যটি লেখা! কবি যথেষ্ট আপত্তি জানিয়েছিলেন, কিন্তু তখন আদালতে মোকদ্দমা করা ছাড়া অন্য কোনো পন্থা ছিল না।

পাঠশালে গুরুমহাশয়ের কাছে প্রথম যে চড় খেয়েছিলুম সেটা আজও ভুলি নি। স্পষ্ট চোখের সামনে ভাসছে সে দৃশ্যটা—কিন্তু তার কথা এখন ভাবতে গেলে কেমন যেন সদয় হাসি পায়। অথচ বার্লিনে নেমে যে চড় খেয়েছিলুম সেটা তো ভুলি নি বটেই, তদুপরি এখনও সেটা স্বপ্নে দেখি এবং এক গা ঘেমে জেগে উঠি। প্রত্যেকটি ঘটনা ঠাস ঠাস করে টাইপরাইটারের মত গালে চড় মেরে যায়—এবং তার প্রত্যেকটি যেন মনের সাদা কাগজের উপর লাল রিবনের কালিতে এখনও জ্বলজ্বল করছে?

প্রথমবারের অভিজ্ঞতা। কাবুল থেকে দেশ হয়ে বার্লিন পেঁাছেছি। কাবুলে অনেক মার খেয়ে অনেক কিছু শিখেছি, কিন্তু সেগুলো তো এখানে কোনও কাজে লাগবে না। বার্লিন মারাত্মক মর্ডান শহর। এখানে চলাফেরার কায়দাকেতা একদম অজানা।

প্ল্যাটফর্মে অসহায় আমি দাঁড়িয়ে। রবিনসন ক্রুশো নিশ্চয়ই এতখানি অসহায় অনুভব করেন নি। তিনি যে ভুলই করুন না কেন, তার জন্য তাঁকে কারও কাছ থেকে চড় খেতে হবে না, জেলে যেতে হবে না। তিনি উদোম হয়ে ঘুরে বেড়ালেও কেউ কিছু বলবে না। আমি মার্সেলেস বন্দরে রাস্তার বাঁ দিকে চলতে গিয়ে প্রথম ধমক খেয়েছি। ফরাসী মাস্টার বলে দিয়েছিলেন বটে, কন্টিনেন্টে 'কীপ টু দি রাইট'—আমাদের দেশে খাল-বিলেও মাঝিরা চিৎকার করে একে অন্যকে তম্বী করে 'আপন ডা-ই-ন!'—কিন্তু বন্দরের ধুন্দুমারের ভিতর কি অতশত মনে থাকে?

স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যাঁকে মার্সেলেস থেকে তার করেছিলুম, তিনি সে তার পান নি কিম্বা—সেগুলো আর বলে দরকার নেই। ভুক্তভোগীই জানেন, তখন সম্ভব অসম্ভব কত কারণই মনে আসে। আমি আসছি জেনে সে আত্মহত্যা করে নি তো ইস্তেক।

পোর্টারটি কিন্তু দেখলুম আমাদের কুলির মত ঘড়ি ঘড়ি তাড়া লাগালে না। আমার সেই বিরাট মাল-বহর—পরে দেখলুম বার্লিনে তার পনেরো আনাই কাজে লাগে না—ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে নির্বিকার চিত্তে পাইপ টানছে।

জর্মন ভাষা যে একেবারে জানি নে তা নয়। ঝাড়া পাঁচটি বচ্ছর উত্তম উত্তম গুরুর কাছে শান্তিনিকেতনে সে-ভাষার ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করেছি। কিন্তু বার্লিনের এই জীর্ণ শীতের সাঁঝে কোন্ জর্মন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বিদেশীর মুখে তারই মাতৃভাষার শব্দরূপ—তাও ভুল উচ্চারণে—শুনতে যাবে? হাওড়া স্টেশনে যদি কাবুলিওলা কোন বঙ্গসন্তানকে দাঁড় করিয়ে তার খাস কাবুলী উরুচ্চারণ সহযোগে লিট্, লুঙ, আশীর্লিঙ শোনাতে চায় তবে অবস্থাটা হয় কী রকম?

বুদ্ধি করে ট্রেনে একটি ফরাসী-জাননেওলী মহিলাকে শুধিয়ে নিয়েছিলুম, স্টেশনে মালপত্র রাখার জায়গাটাকে জর্মনে কী বলে? তিনি বলেছিলেন,

Gepaeckaufbewahrungsstelle

!!!

প্রথম ভেবেছিলুম তিনি মস্করা করছেন। তাই আমি সেটা টুকে নিয়েছিলুম। মাসখানেক পরে বার্লিনে গোছগাছ করে বসার পর শব্দটিকে হামানদিস্তে দিয়ে টুকরো টুকরো করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তার অর্থ বের করেছিলুম। উপস্থিত সেই চিরকুটটুকুন পোর্টারের হাতে দিলুম। সে একটা 'হুম' শব্দ করে গুম গুম করে ঠেলাগাড়ি চালিয়ে এগোল। আমি মেরির লিটল্ ল্যামের মত পিছনে পিছনে চললুম!

মাল সঁপে দিয়ে রাস্তায় নামলুম।

দেখি নি, কিছুই দেখি নি। রাস্তা, বাড়ি, দোকান, গাড়ি কিছুই দেখি নি। আমি ভাবছি, যাই কোথায়?

হুদো-হুদো কড়ি থাকলে কিচ্ছুটি ভাবনা নেই। 'ট্যাক্সি' এবং 'হোটেল' এ দুটি শব্দের প্রসাদাৎ স্পুটনিক-সহযোগে চন্দ্রলোকে নেমেও আশ্রয় মেলে। কিন্তু আমার বটুয়াতে তখন ছুঁচোর কেত্তন। স্কলারশিপের প্রথম কিস্তি না-পাওয়া পর্যন্ত মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। তখনও অবশ্য জানতুম না, মাটি পেতে হলে পাথর-ঢাকা বার্লিন থেকে অন্তত বারো মাইল দূরে যেতে হয়।

হঠাৎ শুনি, 'গুটেন্ আবেন্ট!' তারপর 'গুড্ ঈভনিং', তারপর 'বঁ সোয়ার'। তাকিয়ে দেখি, আমার চেয়ে দু'-মাথা উঁচু এক পুলিসম্যান, কিংবা সেপাইও হতে পারে।

পরিষ্কার ইংরিজীতে শুধালে, 'আপনার কি কোনও সাহায্যের প্রয়োজন?'

ম্যাট্রিক ফেল বঙ্গসন্তান দু'শ টাকার চাকরি পেলেও বোধ হয় অতখানি খুশী হয় না।

আমি ক্ষীণকণ্ঠে বললুম, 'হোটেল।'

লোকটা আমুদে। চলতে চলতে বললে, 'এ শব্দটা তো ইন্টারন্যাশনাল। আপনি অত অসহায় বোধ করছিলেন কেন?'

সত্যি কথা বলে দেব? প্রথম পরিচয়ের প্রথম জর্মনকে? বলেই ফেলি।

লোকটি দরদীও বটে। দাঁড়িয়ে বললে, 'সে তো অত্যন্ত স্বাভাবিক। স্টুডেন্ট মানুষ। পয়সা থাকার তো কথা নয়। তা হলে হসপিৎসে চলুন।'

আমি শুধালুম, 'সে আবার কী?'

'ও! হস্পিস্। ওটা তো ইংরিজীতেও চলে।'

হায় রে কপাল! শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রনাথ, অ্যান্ড্রুজ, কলিন্সের কাছ থেকে পাঁচ বছর ইংরিজী শিখেও যা জানি নে, জর্মন পুলিস সেটাও জানে। কলকাতার ভোজপুরী পুলিস তা হলে একদিন আমাকে আরবী শেখাবে!

'হোটেলেরই মত। তবে 'বার', 'ব্যুফে', 'ডান্স হল', 'কাবারে' নেই। খাবার-দাবার সাদাসিধে। ঘণ্টি বাজালেই ওয়েটার আসে না। তাই সস্তা পড়ে।'

অর্থাৎ হোটেল জিনিসটি 'দ্য লুক্স'—হস্পিস্ তারই গার্হস্থ্য সংস্করণ। ডাকবাঙলো আর চট্টিতে যে তফাৎ তাই।

এতদিন পরও আমার স্পষ্ট মনে আছে লোকটি সঙ্গে যেতে যেতে তার মনের দুঃখ আমাকে বলেছিল। তার ছেলেটি ম্যাট্রিক পাস করেছে, কিন্তু পয়সার অভাব বলে কলেজে ঢুকতে পারে নি।

আমি তো অবাক। তিন-তিনটে ভাষা জানে। শিক্ষিত লোক বলেই মনে হচ্ছে। ফিটফাট য়্যুনিফর্ম না হয় সরকারই দিয়েছে, কিন্তু তেমন কিছু গরিব বলে তো মনে হচ্ছে না। তবে কি এদেশেও গরিব লোক আছে?

বাকী কথা পরে হয়েছিল। হস্‌পিস্‌ কাছেই। পেঁছে গিয়েছি।

পুলিস মোকামে পেঁছে দিল এই তো বিস্তর। কিন্তু এ-লোকটি শত্রু মিত্রে তফাত করে না। শত্রুর শেষ করতে হয়—শাস্ত্রে বলে—এ-লোকটি মিত্রেরও শেষ ব্যবস্থা দেখে যেতে চায়। হোটেলওলার সঙ্গে আলাপচারী করে সুব্যবস্থা করে দিল। আমি ভাবলুম, এবারে বোধ হয় আমার খাটের পাশে বসে ঘুমপাড়ানিয়া গান গাইবে।

যাবার সময় আমি বললুম, 'আপনার নাম কি?'

একখানা ভিজিটিং কার্ড বের করে দিলে।

পুলিসম্যানেরও ভিজিটিং কার্ড!

আমি শুধালুম, 'এদেশের সব পুলিসই কি ইংরিজী ফরাসী বলতে পারে?'

বললে, 'আদপেই না।' তারপর একটা ব্যাজ দেখিয়ে বললে, 'যাদের গায়ে এই ব্যাজ থাকে তারা একাধিক ভাষা বলতে পারে। যার ব্যাজে যটা ফুটকি, সে ততটা ভাষা জানে। আমার ব্যাজে তিনটে।'

ধন্যবাদ দেবার মত ভাষা খুঁজে পাই নি।

পরে জানলুম, একাধিক ভাষা জাননেওলা পুলিস বিরল—আমার কপাল ভাল যে প্রথম ধাক্কাতেই তারই একজন জুটে গিয়েছিল।

চাটুয্যে অতিশয় সুদর্শন পুরুষ। সুন্দর ঢেউ-খেলানো চুল। বর্ণটি উজ্জ্বল শ্যাম। চোখ দুটি স্বপ্নালু—ঘন আঁখিপল্লব যেন অরণ্যানীর স্নিগ্ধচ্ছায়া নির্মাণ করেছে। সাধারণ বাঙালীর চেয়ে কাঁধ অনেক বেশী চওড়া—বুকের পাটা রীতিমত জোরদার। কোমরটি সরু—প্রায় মেয়েদের মত। পা দুটি সেই মাপে। তাই চলনটি ছিল চড়ুই পাখির মত। সেই চওড়া বুক নিয়ে চড়ুই পাখির চলনের মধ্যে যে একটা দ্বন্দ্ব থাকত তাকে দ্বন্দ্বমধুর বলা যেতে পারে।

কিন্তু বার্লিনের ভারতীয়-মহল এবং তার রায়ত-প্রজাদের ভিতর সব চেয়ে বিখ্যাত ছিল তার আহনুলম্বিত দুটি মোলায়েম আকুঞ্চিত জুলপি—খ্যাতিতে হিণ্ডেনবুর্গের গোঁপের সঙ্গে এরা তাবৎ বার্লিনে পাল্লা দিত। জর্মন ভাষায় জুলপিকে বলে 'কাট্‌লেট্‌'। 'হিন্দুস্থান হোস্‌' রেস্তোরাঁয় চাটুয্যে খাবার কটলেটের অর্ডার দিলে আমাদের ঠিকে 'বামুনী' রঙ্গ করে বলত, 'দুটো কাটলেটের জন্য একটা কাটলেট, প্লীজ!' সেই বামুনী থেকে আরম্ভ করে বার্লিন সমাজের মশাইমোড়ল সবাই তাঁর নামে অজ্ঞান। চেহারা ছাড়া তার

আরও দুটো কারণ ছিল। অতিশয় নম্র এবং স্বল্পভাষী। হাঙ্গাম হুজ্জত অপছন্দ করতেন বলে দিনযামিনীর অধিকাংশ তাঁর কাটত 'হিন্দুস্থান হৌসের' সুদূরতম কোণের বৃহত্তম সোফার নিবিড়তম আশ্রয়ে। ব্যসনের মধ্যে ছিল অবরে-সবরে বিপ্লবী ৺নলিনী গুপ্তের সঙ্গে এক গেলাস অতি পানসে বিয়ার পান। এস্থলে বলে রাখা ভাল যে, বিয়ার পান বার্লিনে ব্যসন নয়। খাঁটি খানদানী বার্লিনবাসী ভিরমি গেলেও তার গলা দিয়ে জল গলানো যায় না, এবং মৃতজনের মুখে বিয়ার পাত্র ধরলে সে চুকুস চুকুস করে দিব্য চাঙ্গা হয়ে ওঠে। আর চাটুয্যে ছিলেন মিঃ বার্লিন নম্বর ওয়ান।

খুব যে বিত্তশালী ছিলেন তা নয়, কিন্তু পরনে সব সময়ই সুরুচিসম্মত সুট টাই। ফরাসী মহিলাদের সঙ্গে সেদিক দিয়ে তাঁর মিল ছিল। শুনেছি ইংরেজ রমণীর নাকি ক্ষোভ, ফরাসিনী কী করে এত অল্প খরচে এত সুন্দর জামাকাপড় পরে। কাঁচা বউ যে রকম পাকা শাশুড়ীর মত কম তেল-ঘিয়ে রান্না করা দেখে অবাক হয়।

তিনি ছিলেন ভারতীয় সমাজের বেসরকারী অনারারি পাবলিক রিলেশনস্ অফিসার। তাঁর অতিশয় অনিচ্ছাতে এ-কর্ম তাঁর স্কন্ধে এসে পড়েছিল বলে হিন্দুস্থান হৌসের টেলিফোন বাজলে তিনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাত নেড়ে যে ফোনের কাছে বসে আছে তাকে বোঝাতেন যে তিনি অনুপস্থিত। অবশ্য বামাকণ্ঠ হলে শিভালরির খাতিরে মাঝে-মধ্যে ব্যত্যয় করা হত।

সোফার হাতায় ডান হাত ঠেস দিয়ে তারই উপর গাল রেখে দিনরাত চিন্তা করতেন। কী চিন্তা করতেন জানি নে—খোঁচাখুঁচি করেও বের করতে পারি নি।

হোটেল বায়স-নিদ্রায় যামিনী-যাপন করে পরদিন বেরোলুম বন্ধুর সন্ধানে। সে ঠিকানায় তিনি নেই। তারপর কলকাতার হিসেবে বলতে গেলে কখনও শেয়ালদা, কখনও আলিপুর, কখনও হাতিবাগান, কখনও টালিগঞ্জ করে করে বুঝলুম, বন্ধুর যে-ঠিকানা আমার কাছে ছিল, সেটা অন্তত এক বছরের পুরনো এবং ইতিমধ্যে তিনি প্রায় প্রতি মাসে বাড়ি বদল করেছেন। পাওনা-দারের ভীতি তাঁর নেই, তবে যে কেন তিনি এই বার্লিন প্রদেশটার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি চষেছেন পরে তাঁকে জিজ্ঞেস করেও সেটা জানতে পাই নি। ইতিমধ্যে আমি ভুল বাসে উঠে, ভুল জায়গায় নেমে, ট্রামের নম্বরের সঙ্গে বাসের নম্বর ঘুলিয়ে ফেলে, বিরাট বিরাট বাড়ির আগাপাস্তলা ঠ্যাঙাতে ঠ্যাঙাতে শীতে জবু-থবু হয়ে ককাতে ককাতে যখন নিতান্তই একটা বাড়ির সিঁড়িতে ভেঙে পড়লুম, তখন সন্ধান পেলুম সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায়ের। তিনি নিয়ে গেলেন চাটুয্যের কাছে।

সেই শীতে আমি যেন মাঘের পানাপুকুরে চুবুনি খেয়ে দেখি সমুখের আঙিনায় খড়ের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। এক লহমায় সর্বাঙ্গ ওমে এলিয়ে পড়ল। দু' লহমায় কুল্লে সমস্যার সমাধান হল। সাধে কি রাঢ়ভূমি বলে, 'মুখুয্যে কুটিল অতি, বন্দ্যো বটে সাদা, তার মাঝে বসে আছে চট্টো মহারাজা!'

পাঠান্তর প্রক্ষিপ্ত।[১]

আমাদের 'বটতলা'তে বই বিক্রি হয়, কলকাতা-মাদ্রাসা অঞ্চলের নাম তাল-তলা। সেখানে আরবী, ফার্সী, উর্দু বই বিক্রি হয়। এখানে 'লিণ্ডেনতলা'তে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়। লিণ্ডেন মানে ইংরিজীতে 'লাইম', কিন্তু সে 'লাইম' আমাদের নেবু নয়, তাহলে ওটাকে স্বচ্ছন্দে নেবুতলা বলা যেত। বাঙ্গালীরা তৎসত্ত্বেও বলত।

আমাদের দেশ গরম। সেখানে না হয় পণ্ডিতমশাই অক্লেশে ক্লাস বসান। তারও বহু পূর্বে আরণ্যক হয়ে গিয়েছে। অরণ্যে পাঠ্য ব্রাহ্মণের অংশবিশেষ। কিন্তু এই শীতের দেশে গাছতলাতে ক্লাস বসবে কী করে? নেবুতলা নাম তাহলে নিতান্তই কাকতালীয়। যেমন বেনেরা বটগাছতলায় বসত বলে ফিরিঙ্গিরা বট গাছের নাম দিল 'বানয়ান ট্রি'।

হিটলার যখন তাঁর 'হাজার বছরের জন্য রাষ্ট্র' গড়তে গিয়ে তার রাজধানী বার্লিন শহরের সংস্কার করতে আরম্ভ করলেন, তখন প্রথমেই হুকুম দিলেন লিণ্ডেন বা লাইম গাছগুলো কেটে ফেলতে। শত্রুপক্ষ রটালে, 'ইনি আবার আর্টিস্ট!' আসলে কিন্তু তাঁর দোষ নেই; গাছগুলো তখন অত্যন্ত বৃদ্ধ জরাজীর্ণ। সেগুলো কাটার ফলে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টগুলো বড্ড ক্যাটক্যাট করে চোখে পড়ল—শত্রু-মিত্র-নিরপেক্ষ সবাই মিলে রাস্তাটার নূতন নামকরণ করলে 'উনটার ডেন্ ল্যাটেনেন্' অর্থাৎ 'লণ্ঠনতলা'! পরে অবশ্য হিটলার তামাম জর্মনি খুঁজে সব চেয়ে সেরা লিণ্ডেন চারা সেখানে পুঁতেছিলেন।

দুশ বছরের পুরনো খানদানী রাজপথ। রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রায় এক মাইল অবধি গিয়ে ব্রাণ্ডেনবুর্গ গেট। বিরাট সুউচ্চ সেই তোরণের উপর রথাশ্ব সহ 'বিজয়িনী' বা 'ভিক্টোরিয়া'র (ইংলণ্ডের রানী না) ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্তি। হিটলার এ রাস্তা বাড়িয়ে দিয়ে শার্লটেনবুর্গ পেরিয়ে বহুদূর অবধি টেনে নিয়ে তার নাম দিয়েছিলেন 'ইস্ট-ওয়েস্ট এক্সিস'। তাঁর আত্মহত্যা করার কয়েক দিন পূর্বে এ-রাস্তায় যান চলাচল যখন প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ তখন তাঁকে সাহায্য করার জন্য এখানে উড়োজাহাজ পর্যন্ত একাধিকবার ওঠা-নামা করেছিল। এ্যার-পোর্টগুলো তখন মিত্রশক্তির কব্জাতে চলে গিয়েছে বলে যাঁরা বিশ্বাস করেন—হিটলারের পালাবার কোনও উপায় ছিল না, তাঁদের বিরুদ্ধে অন্যপক্ষ এই ইস্ট-ওয়েস্ট একসিস্ দেখিয়ে দেন। আজ অর্থাৎ ১৯৫৯ সনে এ রাস্তার পূর্বার্ধ রাশার হাতে, পশ্চিমার্ধ মিত্রশক্তির। কিন্তু সে-সব অনেক পরের কথা।

এ-রাস্তায় দ্রুত জীবনের চরম গতিবেগের সঙ্গে শান্ত গ্রাম্য-জীবনের সুষুপ্তির অদ্ভুত সমন্বয়। দুদিকে যান-চলাচলের রাস্তা; মাঝখানে লাইম গাছের বিস্তীর্ণ এভিন্যু—চলেছে ত চলেছে, তার যেন শেষ নেই। এদিকে পেভমেণ্টের উপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে একাধিক লোক, বাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, স্টপেজে

১। তুলনার জন্য সুশীল দের 'বাংলা প্রবাদ' নং ২৮৬০ ও ৬৮২৩ দ্রষ্টব্য।

ওটাতে চাপবে বলে, আর এদিকে এভিনুর উপর দিয়ে মা চলেছেন পেরাম্বুলেটর ঠেলে ঠেলে সপ্তপদী চলার গতিতে। দশ কদম যেতে না যেতে বসে পড়ছেন হেলানদার বেঞ্চিতে। সেখানে পেনশনার চোখ বন্ধ করে পাইপ টানছেন, যুদ্ধে বিকলাঙ্গ বেঞ্চির গায়ে ক্রাচ খাড়া করে দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে, এ-বাড়ির আয়া ও-পাড়ার রুটিওলার সঙ্গে রসালাপ করছে, আর বেঞ্চির হেলানে মাথা দিয়ে হেথাহোথা সর্বত্র ঘুমুচ্ছে অনেক লোক। এক বেঞ্চিতে দুটি কলেজের ছোকরা মৃদুকণ্ঠে আলোচনা করছে। আরেক বেঞ্চে একজন আরেকজনের পড়া নিচ্ছে।

দুই সারি বেঞ্চির মাঝখান দিয়ে স্কিপ করতে করতে চলে যাচ্ছে একটি মেয়ে। পেছনে ঠাকুরদা চলেছেন 'প্র্যাম'টার চেয়েও মন্দগতিতে। মেয়েটি উই—ওখানে—এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্কিপ করছে ; ঠাকুরদা গতিবেগ বাড়াবার প্রয়োজন বোধ করছেন না।

এরই এক পাশে দাঁড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়।

বেশী পুরনো দিনের নয়। একশ' বছরের একটু বেশী। এর চেয়ে ঢের পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় জর্মনিতে আছে। আসলে বার্লিন খুব সম্ভ্রান্ত শহর নয়। সে বাবদে রোম, প্যারিস, ভিয়েনা—এমন কি প্রাগ ;—যাঁরা দেখেছেন তাঁরা ইস্তাম্বুলেরও নাম করেন। বার্লিন অনেকটা লণ্ডনের মত ; বেশীর ভাগ জিনিসই নকল। সঙ্গীতের জন্য ভিয়েনা, চিত্রের জন্য প্যারিস, ভাস্কর্যের জন্য রোম। তবে কিনা বিজ্ঞান এ-যুগের কামনার ধন। সেখানে বার্লিনের নাম আছে, আর আছে জর্মনীর রাজধানীরূপে। তারই প্রায় কেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত বলে ব্যবসাবাণিজ্য এখানে প্রচুর। টোকিও না ওঠা পর্যন্ত বার্লিন পৃথিবীর তৃতীয় নগরী ছিল।

য়ুনিভার্সিটির সামনেই প্রতিষ্ঠাতা ভিল্‌হেলম ফন্‌ হুম্‌বল্টের প্রতিমূর্তি। গ্যোটের বিশিষ্ট বন্ধু।

হায়, সে সত্যযুগ গিয়েছে।

ভারতবর্ষ, গ্রীস, আরব ভূখণ্ডে একদা জ্ঞানী বললে বোঝাত সর্বজ্ঞানে জ্ঞানী। সর্ববিষয়ে সমান জ্ঞান থাকবে এমন কোনও কথা ছিল না, কিন্তু সর্ব জ্ঞানভাণ্ডার থেকে অল্পবিস্তর সঞ্চয় করে যিনি অখণ্ড সর্বাঙ্গসুন্দর বিশ্বদর্শনে উপনীত হতে পারতেন তাঁকেই বলা হত পণ্ডিত। এ তিন ভূখণ্ডের পাঠ্যনির্ঘণ্ট দেখলেই বোঝা যায়, আদর্শ ছিল মানবজীবনে পরিপূর্ণতায় পৌঁছনোর জন্য পরিপূর্ণ জ্ঞানের সন্ধান। এক দিকে আয়ুর্বেদ অন্য দিকে যোগশাস্ত্র, এক দিকে ব্যাকরণ অন্য দিকে অলঙ্কার, একদিকে রসায়ন অন্য দিকে দর্শন, সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের প্রতি স্পর্শকাতরতা, নাট্যে প্রীতি, কৌটিল্যের কুটিলতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়, বসন্তসেনার নৃত্যগীতসঙ্গীতের সম্মুখে সহৃদয় বিস্ময়।

বস্তুত, এ সবই বাহ্য। কিন্তু এদের সন্নিবেশের মাধ্যমে কোন কোন গুণী হঠাৎ পেয়ে যান অনির্বচনীয়ের সন্ধান। সে সন্ধান ভূয়োদর্শনের, ভূমানন্দের।

সবাই পেত তা নয়, কিন্তু না পেলেও তাঁরা সাধকসমাজে সম্মানিত হতেন। সর্ববিষয়ে তাঁদের সহানুভূতি থাকত বলে তাঁরা প্রাজ্ঞসমাজের পৃষ্ঠপোষক বলে খ্যাত হতেন।

জর্মনিতে এ স্বর্ণযুগ আসে অষ্টাদশ শতকের শেষে ও উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে। তার অন্যতম প্রতীক ভিল্‌হেল্‌ম্‌ ফন্‌ হুম্‌বল্ট।

আসলে ইনি কবি এবং আলঙ্কারিক। রসশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রামাণিক পুস্তক এবং গ্যোটের কাব্যালোচনা নিয়ে তিনি নামলেন আসরে। কিন্তু অল্পকাল যেতে না যেতেই তাঁর রাজনৈতিক প্রাখর্য ধরা পড়তেই তাঁকে ডাকা হল রাজ-সভায়। ওদিকে তিনি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করতেন—সর্বোচ্চ আদর্শ বলে ধরে তুলেছিলেন মানবচরিত্রের স্বাধীন এবং সর্বাঙ্গীন বিকাশ। সেই আদর্শ যাতে ক্ষুন্ন না হয় তাই তিনি আজ ভিয়েনা কাল লণ্ডনের রাজ-দরবারে যেতেন, কিংবা পরশু বার্লিনের শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে কাজ করে গেলেন। ঐ সময়েই তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে স্পেনের বাস্‌ক্‌দের ভাষা নিয়ে আলোচনা করে দেখিয়ে দিলেন যে ভাষার মূলে ব্যাকরণ আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু ভাষার কাঠামো ভাল করে পরীক্ষা করলে পাওয়া যায় সে-ভাষাভাষীর পরিপূর্ণ পরিহাস। যে-কোন সমাজের সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস লুকনো থাকে তার ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের মাঝখানে। তাই এক সমাজ যেমন অন্য সমাজ থেকে ভিন্ন, ঠিক তেমনি এক ভাষা অন্য ভাষা থেকে। মূলে এক সমাজ হলেও তারা যদি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়, তবে তাদের ভিন্ন ভিন্ন বিবর্তন তাদের আপন আপন ভাষাতে প্রতিবিম্বিত হয়।

সেই সূত্রে তিনি উপনীত হলেন চরম মীমাংসায়—মানুষের মননবৃত্তির শ্রেষ্ঠতম বিকাশ হয়েছে আর্য ভাষায়। মানব দেবতাত্মার পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় তার বাঙ্ময় ভুবনে।

ভিল্‌হেল্‌ম্‌ ফন হুম্‌বল্ট ভাষাতত্ত্বের সর্বপ্রথম দার্শনিক।

তাঁর অনুজ আলেক্সান্ডার ফন হুম্‌বল্টের পরিচয় দেওয়া আরও কঠিন। সেযুগের গুণীরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন, নেপোলিয়নের পরেই খ্যাতিতে এঁর স্থান। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন শাখা-প্রশাখা ছিল না যাতে তিনি বিচরণ করেন নি। এদিকে ভূতত্ত্ব উদ্ভিদতত্ত্ব, ওদিকে উত্তর মেরু থেকে আরম্ভ করে বিষুবরেখা অবধি চুম্বকের আকর্ষণশক্তি-বিবর্তন, মহাকাশে উল্কাপিণ্ডের বিশেষ দিনে প্রবলতর বর্ষণ—বিজ্ঞানের একাধিক নবীন ক্ষেত্র তিনি আবিষ্কার করলেন। মহাপুরুষ মুহম্মদ বলেছিলেন, জ্ঞানের সন্ধানে যদি বেরুতে হয় তবে চীনেও যেয়ো। আরবীদের কাছে চীনই সব চেয়ে দূরের দেশ। এ মনীষী জর্মনি থেকে চীন, ওদিকে দক্ষিণ আমেরিকার সর্বোচ্চ পর্বত কিছুই বাদ দেন নি। ষাট বছর বয়সে মানুষ যখন খ্যাতির মুকুটপরে সহাস্যবদনে জনগণের করতালিধ্বনি শোনে, তখন হঠাৎ অর্থানুকূল্য পেয়ে বেরোলেন রাশিয়া ভ্রমণে—আবিষ্কার করলেন উরালে হীরকচিহ্ন। অথচ প্রথম যৌবনে প্রকাশিত তাঁর দার্শনিক

রহস্যতত্ত্ব ও মাংসপেশীর স্নায়ু সম্বন্ধে রচনা তখনই পণ্ডিতমণ্ডলীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল।

তাঁর 'কস্‌মস্‌' বা সৃষ্টি এখনও আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে পড়া যায়। এ-ধরনের বই আজকাল আর লেখা হয় না। প্রাচীন দার্শনিক জ্ঞান ও সনাতন রসতত্ত্ব তিনি মিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন সে-যুগের নববিকশিত বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে এমন এক সংমিশ্রণে যাতে করে বিজ্ঞানের ক্ষুদ্রতম বিচ্ছিন্ন জ্ঞানবিন্দু ভূয়োদর্শনের অসীম সিন্ধুতে স্থান পায়। পক্ষান্তরে দার্শনিকের কল্পনা-বিলাসের ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা যেন বাস্তবের ধূলিকণাকে অবহেলা না করে।

তাই বোধ হয় নগণ্যজনের দৈন্য-দুর্দশা সম্বন্ধে তিনি যৌবন-প্রারম্ভেই সচেতন হন। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি দেখে উদ্ধত ভাষায় তার প্রতিবাদ জানিয়ে যে সংস্কার কর্ম আরম্ভ করলেন সে-কথা আজও জর্মনি ভোলে নি। পরবর্তীকালে দাস-প্রথার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়। তিনি তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন, এই যুগধর্মসম্মত প্রথার বিরুদ্ধে। এবং আজীবন তাঁর প্রচেষ্টা ছিল, বিত্তহীন জ্ঞানার্থী দুঃস্থ পণ্ডিত যেন সংসারের তাড়নায় তার সাধনার মার্গ বর্জন না করে।

তাই যখন কৃতজ্ঞ জর্মনগণ বিত্তহীন জ্ঞানার্থীর জন্য 'ব্রহ্মোত্তর' বা 'ওয়াক্‌ফ্‌' অর্থাৎ 'ট্রাস্‌ট্‌' নির্মাণ করল তখন সেটিকে উৎসর্গ করা হল তাঁরই নামে—'আলেকজাণ্ডার ফন্‌ হুম্‌বল্ট স্টিফ্‌টুঙ্‌'। দেশে-বিদেশে এটি সুপরিচিত।

এদেশে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে এই ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ইনি এঁদের জীবনী ও কার্যকলাপের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন।

সে সত্যযুগ গেছে। মহাকবি গ্যোটেকে গুরুত্বে বরণ করে তাঁর চতুর্দিকে যে কেন্দ্র সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এমন আর কোথাও হয় নি। শ্লেগেল, ফিষটে, শিলার, হুম্‌বল্ট-ভ্রাতৃদ্বয়, একেরমান ইত্যাদি ইত্যাদি বহু পণ্ডিত, গবেষক, কবি তাঁদের জীবন-বাতায়ন উন্মুক্ত করে পূর্ব-পশ্চিমের জ্ঞান-দর্শন, ঊর্ধ্ব-অধঃর বিজ্ঞান-বিশ্লেষণকে যে আবাহন করেছিলেন, তারই ফলে জর্মনির যে সর্বমুখী বিকাশ হল আজও সে বিশ্বজনের বিস্ময়।

লোকে শুধায়, যে জর্মনি ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পদদলিত, নিঃস্ব, আজ সে বিশ্বের উত্তমর্ণ হল কী প্রকারে?

এর বুনিয়াদ বড় দড়।

জীবনের সেই তিনটি সপ্তাহ কী করে কেটেছে তার বর্ণনা দেবার শক্তি আমার নেই। যেন পাহাড়ের চূড়ায় হঠাৎ কুয়াশা নামল। হাতড়ে হাতড়ে আমি এদিকে যাচ্ছি ওদিকে যাচ্ছি আর দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা দেখছি; হঠাৎ পায়ের তলার শক্ত জমি খসে পড়েছে আর আমি সর্বনাশের অতল গভীরে বিলীন হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছি। এবারে 'ভাষা-পরীক্ষা'র শক্ত জমিতে পড়ার সঙ্গে সব কটা হাড়হাড্ডি গুঁড়িয়ে যাবে।

'ভাষা-পরীক্ষা'টা কী?

চাটুয্যে নিয়ে গেছেন ডঃ গ্যোপেলের কাছে। বলে রাখা ভাল, ইনি হিট-লারের প্রোপাগাণ্ডা-মাস্টার ডঃ গ্যোবেল্‌স্‌ নন। হুম্‌বল্ট ফাউণ্ডেশনের সেক্রেটারি। অতিশয় নিরীহ লোক। ততোধিক সাদাসিধে জামাকাপড়—যত দূর সস্তা হতে পারে। মোটাসোটা মানুষ এবং হাসি-হাসি মুখ। মিষ্টি সুরে এত নিচু গলায় কথা কন যে, টেবিলের এপারে এসে পেঁছিয় না। দেশে থাকতে এঁর সঙ্গেই পত্রালাপ ছিল। ইনিই প্রাঞ্জল জর্মনে জানিয়েছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সীট তৈরী; আমি এলেই হল। এখন বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ সেই মিষ্টি গলাতেই বললেন, 'অবশ্য একটা অত্যন্ত সরল মামুলী পরীক্ষা দিতে হবে যে, কলেজের লেকচার বোঝার মত জর্মন ভাষায় ক খ গ ঘ আপনি জানেন।'

বলে কী! পরীক্ষা দেব কী করে? ফেল মারব নিশ্চিত। পড়তে পারি—খানিকটা। কিন্তু কেউ কথা বললে সেটা বুঝতে তো পারি নে। না হলে চাটুয্যেকে, দোভাষী বানিয়ে আনব কেন?

আর এ তো বড় বিদকুটে ব্যবস্থা। পড়াশুনোর পর পরীক্ষা দিতে রাজী আছি, কিন্তু এখানে বুঝি আগে পরীক্ষা, তারপর লেখাপড়ি? আগে ফাঁসি তারপর বিচার! হটেনটটের রাজত্বেও তো এ-রকম ধারা হয় না। হ্যাঁ, দার্শ-নিক শোপেনহাওয়ার নামকরা জর্মন লেখকদের ভাষাতে ব্যাকরণের ভুল দেখে একবার বলেছিলেন, 'শুধু জর্মন আর হটেন্‌টটরাই আপন মাতৃভাষা নিয়ে এরকম ছিনিমিনি খেলে।'

আমাদের রঙ কালো বলে মুখের ভাব-পরিবর্তন ইয়োরোপীয়রা চট করে ধরতে পারে না। তাই তারা বলে, আমরা দুর্জ্ঞেয়, অবোধ্য। আমার চেহারা কিন্তু তখনি এমনি ফ্যাকাশে মেরে গিয়েছে, শুকনো গলা-তালু থেকে এমনি চেরা বাঁশের শব্দে আওয়াজ বেরুচ্ছে যে, ভালমানুষ ডঃ গ্যোপেল পর্যন্ত সেটা লক্ষ্য করে আমাকে দিলাশা-সান্ত্বনা দিতে আরম্ভ করেছেন। পরীক্ষাটা নাকি একেবারে কিসসুটি নয়, ছেলেখেলা, এলিমেণ্টারী, ছ'মাসের কোর্স, এখনও তিন সপ্তাহ রয়েছে, এস্তের সময় পড়ে আছে।

'মানে?'

'অর্থাৎ বিদেশীদের জন্য জর্মন ভাষার ক্লাস হয়। ছ'মাসের কোর্স। আর তিন সপ্তাহ বাদে পরীক্ষা। আপনি কাল থেকে ঢুকে যান—সব ঠিক হয়ে যাবে।'

অর্থাৎ ছ'মাসের কোর্স আমাকে তিন হপ্তায় শেষ করতে হবে। ওঃ! কী সুখবর!

কিন্তু আমি আপত্তি জানাই কি করে? বৃত্তির জন্য দরখাস্ত পেশ করার সময় কবুল জানিয়েছি যে, আমি জর্মন জানি, প্রোফেসারের সার্টিফিকেটও সঙ্গে ছিল। এখন সেগুলো রদবদল করি কি প্রকারে?

গ্যোপেল মিষ্টি গলায় হাসিমুখে আমাকে আরও অনেক সান্ত্বনা দিলেন—তার অল্প অল্প বুঝলুম। বাকিটা চাটুয্যে অনুবাদ করে দিলেন।

তাঁর প্রত্যেকটি সান্ত্বনা-বচন আমার সর্বাঙ্গ কণ্টকিত করল। এ যেন ফাঁসির

আসামীকে বলা হচ্ছে, দড়িটাকে মাখন মাখিয়ে মোলায়েম করা হয়েছে, যে-টুলে দাঁড়াবে সেটা মখমলে মোড়া!

সায়েবের কথার ফাঁকে এটাও বেরিয়ে গেল যে, পরীক্ষায় ফেল মারলে ভর্তি হতে পারব না। আবার ভর্তি হওয়ার পালা ছ'মাস পরে। অর্থাৎ আমার জর্মন-বাসের শেষের ছ'মাস কাটবে বিনা বৃত্তিতে—অনাহারী। সায়েব সেটা অবশ্য বলেন নি। তিনি পই পই করে বোঝাচ্ছিলেন ও-পরীক্ষাতে ফেল মারে শতকরা একজন। কিন্তু সে একজন যে আমি হব না, তিনি জানেন কী করে? লটারিতে হই না, সে আমি জানি।

আরবী ভাষায় বলে, আকাশে দু'খানা চাপাতি। একটি ঠাণ্ডা, আরেকটি গরম। চন্দ্র আর সূর্য।

রাস্তায় যখন বেরোলুম তখন দুপুর। সূর্যটিও তখন আমার কাছে ঠাণ্ডা চাপাতি বলে মনে হল।

তাই বলছিলুম, 'ভাষা-পরীক্ষা'র শক্ত জমিতে পড়ে হাড়-হাড্ডি চুরমার না হওয়া পর্যন্ত এখন শুধু হুশ্ হুশ্ করে নীচের দিকে পতন।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডরের ক্রসিঙে ক্রসিঙে ট্রাফিক পুলিসম্যান রাখা উচিত। আমি ঢুকেছিলুম দু' পিরিয়ডের মাঝখানে ক্লাস-বদলাবদলির সময়। করিডরে করিডরে 'আপন ডাইন' রেখে তরুণ-তরুণীর জনস্রোত উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম পানে যাচ্ছে, কিন্তু ক্রসিঙে এসে লেগে যাচ্ছে ধুন্দুমার। ঠিক ঐ সময়ই হয়ত খুলে গেল তারই পাশের বিরাট হলের দরজা। তার থেকে বেরোবার চেষ্টা করছে আরও শ' দুই ছাত্র-ছাত্রী। তখন লেগে যায় সত্যিকার হরিলুট। সবাই আবার চলতে চলতে ধাক্কা খেয়ে এদিক ওদিক ঠিকরে পড়ে তর্ক চালাচ্ছে নিজেদের মধ্যে—এখুনি ক্লাসে অধ্যাপক যা পড়িয়েছেন তাই বিষয়বস্তু।

কিন্তু এত তাড়া কিসের? পরে শুনলুম এবং দেখলুমও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা এবং তার অনুপাতেরও বেশী ছাত্রসংখ্যা এত মারাত্মক রকমের বেড়ে গিয়েছে যে, এখন আর ক্লাসে জায়গা হয় না। আগে না গেলে রক্ষে নেই।

রোল কল্ এদেশে নেই। শুনে বঙ্গসন্তান আমি বড়ই উল্লাস বোধ করেছিলুম। গাইড-বুক নিশ্চয়ই আছে। তাই মুখস্থ করে ঠিক পরীক্ষা পাস করে যাব—অবশ্য 'ভাষা-পরীক্ষা' নয়, ফাইনালটার কথা হচ্ছে। তখন শুনলুম, গাইড বুক নেই, অধ্যাপকরা বই লেখেন, সেগুলো পড়তে হয়। তাহলে ক্লাসে যাবার কী প্রয়োজন? বিস্তর বই প্রকাশিত হওয়ার পরও অধ্যাপক সে-সব গবেষণা করেছেন সেগুলো বলেন ক্লাস-লেকচারে। পরীক্ষার সময় প্রশ্ন করেন তার থেকে। তার উত্তর দিতে না পারলে নম্বর পাওয়া যায় না—শুধু মাত্র বইয়ের জোরে মেরেকেটে পাস-নম্বর পাওয়া যায় মাত্র।

এসব পরের কথা।

এ-জলতরঙ্গ ভেদ করে গন্তব্যস্থলে পেঁছানো সম্পূর্ণ অসম্ভব বুঝতে পেরে আমি মোকা পেয়ে একটা ফাঁকা ক্লাসে ঢুকে পড়লুম। খানিকক্ষণ পরে ঘণ্টা

পড়ল, নেক্সট্ পিরিয়েডের। করিডরগুলো মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করতে লাগল।

দেশে থাকতে কত রকম কথাই না শুনেছিলুম—জর্মন পণ্ডিতদের দেশ, সেখানকার সবাই ইংরিজি জানে। রাস্তা সোনা মোড়া। গাঁয়ের লোক যে রকম ভাবে শ্যালদায় পেঁছিলেই তার জন্যে হুদো হুদো চাকরি 'অপিক্ষে' করে বসে আছে।

অনেক কষ্টে 'বিদেশীদের প্রতিষ্ঠানটি' আবিষ্কার করলুম। আশা করেছিলুম, বিদেশীদের নিয়ে এদের যখন কারবার তখন অন্তত এরা ইংরিজী বলতে পারবে। পারে। তবে আমি যতখানি জর্মন পারি তার চেয়েও কম।

বুঝলুম, বিদেশী রাজত্ব না হওয়া পর্যন্ত কোনও দেশের লোক ব্যাপকভাবে বিদেশী ভাষা শেখে না। আমরা এককালে ফার্সী শিখেছিলুম; তারপর ইংরিজী শিখলুম।

মনকে সান্ত্বনা দিলুম, এরা সবাই ইংরিজী বলতে পারলে আমার আর জর্মন শেখা হত না।

ইতিমধ্যে এক সুপুরুষ কাউণ্টারে এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। ওঁকে দেখেই যে-মহিলাটি আমার তদারক করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি খুশিভরা মুখে অনর্গল জর্মন বলে যেতে লাগলেন। বার বার 'প্রফেসর' কথাটি আসছিল বলে অনুমান করলুম, ইনি আমাকে জর্মন শেখাবেন। আমিও খুশিমনে ভাবলুম, এবারে আমার ভাঙা-নৌকা কূল পেল। একে আমার হৃদয়-বেদনা সমুচিত ভাষায় বুঝিয়ে বলতে পারব।

ইয়াল্লা! ইনিও তদ্বৎ। পরে জানলুম, পাছে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই আপন আপন মাতৃভাষায় তাঁর সঙ্গে কথা বলে বলে জর্মন অবহেলা করে তাই তিনি একাধিক ভাষা জানা সত্ত্বেও জর্মন ভিন্ন অন্য ভাষা বলেন না।

নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ভাঙা নৌকোটা দ'য়ের দিকে ঠেলে দিয়ে অতল জলে ডুব দিলুম। মা গঙ্গাই জানেন, বস্ত্র নেই—গামছাখানা পর্যন্ত গেছে। মনকে ধমক দিয়ে বললুম, 'ইংরিজীর প্রতি তোমার এত দরদ কেন? ওটা কি তোমার বোনপোর ভাষা? জর্মন কি সতীনের ভাষা? ব্যস, হয়েছে, আর মুক্তোবনে বেনা বোনবার প্রয়োজন নেই।'

প্রফেসর আদর করে প্রায় হাতে ধরে ক্লাসের দিকে নিয়ে চললেন। আবার চতুর্দিকে জনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ। এবারে কিন্তু ভয় নেই। প্রফেসর কাণ্ডারী। ইনি যদি এ দরিয়ায় আমাকে না বাঁচাতে পারেন তবে ব্যাকরণ পারাবারের কুমীর-হাঙ্গর কৃৎ-তদ্ধিতের পুচ্ছ-দন্ত থেকে পরিত্রাণ করে ভাষা-পরীক্ষার ওপারে নিয়ে যাবেন কি করে? সেই পাদ্রী সায়েবের গল্প মনে পড়ল। বদলি হয়ে এসে অচেনা গ্রামে নেমেছেন। রাস্তায় দুটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন গাঁয়ের গির্জের পথ।

তারা বাতলে দিলে তিনি খুশি হয়ে বললেন, 'আজ তোমরা আমাকে গাঁয়ের পথ বাতলে দিলে; আসছে রববারে যদি গির্জেয় আস তবে স্বর্গে যাবার

পথ আমি তোমাদের বাতলে দেব।'

তখন একটা ছেলে অন্য ছেলেটার পাঁজরে খোঁচা মেরে বললে, 'শুনলি? গাঁয়ের পথ জানে না—সে বাতলে দেবে স্বর্গে যাবার পথ!'

উপস্থিত দেখলুম, জর্মনি দেশের আমার প্রথম গুরু অন্তত গাঁয়ের পথটা জানেন।

সে কী ক্লাস! চীনেম্যান থেকে আরম্ভ করে নিগ্রো পর্যন্ত! ঢের ঢের চিড়িয়াখানা দেখেছি, কিন্তু এ-রকম তাজ্জব চিড়িয়াখানা পূর্বে দেখি নি পরেও দেখি নি। এরা যদি কোট-পাতলুন না পরে আপন আপন দেশের পোশাক পরত তাহলে অনায়াসে পৃথিবীর যে-কোন ফ্যান্সি ড্রেস, কস্ট্যুম্ বল্‌কে হারাতে পারত। দুনিয়ার চিড়িয়া জড়ো হয়েছে জর্মন বুলি শিখে, এদেশের এলেম রপ্ত করে দেশে ফিরে নয়ী তালিমের ছয়লাপ বইয়ে দেবার জন্য। আর বয়েসেরই বা কত রকমফের! আঠার থেকে চল্লিশ অবধি ছেলেবুড়ো, মেয়ে-মদ্দ।

আমরা যখন ক্লাসে ঢুকলুম তখন একটি আঠার-উনিশের খাপসুরৎ চিংড়ি প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশের রগে-পাক-ধরা চুলের চীনা ভদ্রলোককে ব্লাকবোর্ডের উপর কী একটা ধাঁধা বোঝাতে গিয়ে খিল-খিল করে হাসছে, আর চীনা প্রৌঢ়টি গাম্ভীর্যের স্মিতহাস্যের সঙ্গে বোকা-বনে-যাওয়ার ভাবটা মিশিয়ে ঘন ঘন সামনে পিছনে দুলে দুলে দু' ভাঁজ হচ্ছেন—ভদ্রতা আর ধন্যবাদ জানাতে হলে চীনারা যে রকম 'কাওটাও' করে।

প্রফেসর হেসে বললেন, 'চলুক। আমি বাধা দিতে চাই নে। ধাঁধাটা কী?'

চিংড়ি আড়াই লম্ফে ডেস্‌কে পেঁছে তারই উপর মোলায়েমসে বাঁ হাত রেখে অর্ধ লম্ফের আধা চক্কর খেয়ে ডেস্‌ক্ টপকে গুপ্‌স করে বসে পড়ল আপন সীটে। আমি শুধু দেখতে পেলুম, একগাদা বাদামী-সোনালী মেশা ঢেউ-খেলানো চুল আর বেগুনি হলদেতে ডোরা-কাটা ঘাঘরার ঘূর্ণি।

ক্লাসের লটবর—পরে জানলুম গ্রীক—বললে, 'শাবাশ!'

ত্রেতা

সেই যে সুন্দরী মেয়েটি এক লম্ফে ডেস্‌ক্‌ ডিঙিয়ে আসন নিয়েছিল তারপর ঝাড়া বিয়াল্লিশটি বছর কি করে যে হুশ করে মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল তার জমা খরচ আমি কখনো নিই নি। এই চল্লিশ বৎসরের ইতিহাস লেখা আমার শক্তির বাইরে। তবে মনে মনে আশা পোষণ করেছিলুম ল্যানগুইজ পরীক্ষায় পাস করে আমি যে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছিলুম তার বয়স, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপদ্ধতি, সেখানকার ছাত্রজীবন, তারপর বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন, এদিকে বন্‌ শহর ওদিকে সপ্তকুলাচল, মাঝখানে বিশাল প্রশস্ত রাইন নদ, গোডেসবের্গে জীবন-যাপন, হিটলারের অভ্যুদয়, তার একচ্ছত্রাধিপত্য, ইতিমধ্যে হাজার হাজার বৎসরের প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মিশরে বৎসরাধিক কাল বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, (ঐ সময়টাই আমি অবশ্য জর্মনিতে ছিলুম না কিন্তু হিটলারের তাবৎ বক্তৃতা এবং গ্যোবেল্‌স্‌-এর অনেকগুলো বেতার মারফৎ শুনেছিলুম) হিটলারের পতন, যুদ্ধশেষের কয়েক বৎসর পর পুনরায়—একাধিকবার—জর্মন-ভ্রমণ, বন্ধুমিলন এবং যারা যুদ্ধ থেকে ফেরে নি তাদের বিধবা, পুত্র-কন্যার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ—আরো কত কি—এসবের বর্ণনা দফে দফে দেব। কিন্তু বিধাতা বোধ হয় সেটা চান নি। আমি যাতে অকরুণ অকারণে নিরীহ বঙ্গ-পাঠকের মস্তকোপরি অষ্টাদশ ভল্লুম নিক্ষেপ না করি তাই তিনি এই চল্লিশ বৎসর আমাকে ননস্টপ তুর্কীনাচন নাচিয়েছেন এবং তার ডান্‌স্‌ফর কন্যাকুমারী থেকে সিমলে, মসৌরী, পিণ্ডিদাদনখান থেকে কামাখ্যা! আর সব বাদ দিন—অষ্টাদশপদী এ খট্টাঙ্গ পুরাণ রচনা করার জন্য নিদেন যেটুকু দেশকালপাত্রের তথা অবকাশের প্রয়োজন তার একরত্তিও তিনি আমাকে দেন নি। তাঁকে বার বার নমস্কার।

"পাগলা" রাজা মুহম্মদ তুগলক সর্বদাই তাঁর প্রজাদের মঙ্গল কামনা করতেন। কিন্তু অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন বলে মাত্রাবোধ ছিল তাঁর কম এবং প্রায়ই লঘু অপরাধে মারাত্মক গুরু দণ্ড দিয়ে বসতেন—অনেক স্থলে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পিতা যে রকম পুত্রকে তস্য উপকারার্থে মাত্রাধিক লাঠ্যৌষধি সেবন করান। তাই পরলোক গমনের কিয়দ্দিন পূর্বে তিনি আপসোস করেছিলেন, "আমি প্রজাদের কল্যাণার্থে যে-সব আদেশ দিতুম তারা সেগুলো অমান্য তো করতই, তদুপরি আমার পুণ্য উদ্দেশ্যও তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো না।" তাঁর মৃত্যুর পর রাজ-ঐতিহাসিক জিয়াউদ্‌দীন লিখলেন, প্রজা-সাধারণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মহারাজ আনন্দিত হলেন ও প্রজাসাধারণও হুজুরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল!

অষ্টাদশী খট্টাঙ্গ পুরাণ লোপ্ট্র চিরসহিষ্ণু বঙ্গীয় পাঠকের শীর্ষদেশে নিক্ষেপ না করতে পেরে আমি হর্ষোদ্বেলিত কণ্ঠে শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ আমেন আমেন জপ করছি এবং আচণ্ডাল গৌড়জনও সেই বিকট মধুচক্র পান না করতে পেরে ঘন ঘন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছেন।

কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আপ্তবাক্য রূপে বলেছেন, "যে-লোক মুলো খেয়েছে তার ঢেকুরে মুলোর গন্ধ থাকবেই।" তাই এই চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা যে আমার লেখাতে কিছু না কিছু বেরিয়ে যাবেই যাবে এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু যে-ইঙ্গিত পূর্বেই দিয়েছি তারই পূর্ণার্থ প্রকাশ করে বলি, সে-সব অভিজ্ঞতা সুসংলগ্ন ভাবে কালানুক্রমে লিখে উঠতে পারি নি। কিন্তু আমি ভরসা রাখি যে সুচতুর পাঠক আমার প্রকাশিত পুস্তক থেকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত টুকিটাকি ছিঁটেফোঁটা জুড়ে নিয়ে একটি জিগশো পাজল্ সমাধান করতে পারবেন—অর্থাৎ একটি মোজাইক[১] নির্মাণ করতে পারবেন, তদর্থঃ মোটা-মুটি একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি পেয়ে যাবেন। যদিও তার আউট লাইনগুলো সূক্ষ্ম শার্প হবে না, বহু ডীটেল বাদ পড়ে যাবে কিন্তু তাতে করে কিছু আসে যায় না। তদুপরি ভারতের প্রায় সর্বশেষ আলংকারিক বলেছেন, সব কিছু সবিস্তর বর্ণনা ক'রো না; পাঠককে ইঙ্গিত দেবে ব্যঞ্জনা দেবে মাত্র যাতে করে সে তার কল্পনাশক্তির সদ্ব্যবহার করার সুযোগ পায়। তাই কবিগুরুও আপ্তবাক্য বলে গেছেন ঃ

"একাকী গায়কের নহে তো গান,
মিলিত হবে দুইজনে;
গাইবে একজন খুলিয়া গলা
আরেকজন গাবে মনে।"

যে দেশে বার বার গিয়েছি তারই এক গুণী বলেছেন, "যে সব কথা সবিস্তর বলতে চায়, তার কোনো কথাই বলা হয় না।" "অনেক কথা যাও যে বলি কোনো কথা না বলি। (তাই) তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি॥"

বলেছেন পুনরপি ভাষার জহুরী বিশ্বকবি।

মোদ্দা কথা ঃ কোনো পুস্তকের সব ছত্রই যদি আণ্ডার-লাইন করো তবে কোনো ছত্রই আণ্ডার-লাইন করা হয় না।

শ্রদ্ধেয় সুনীতি চট্টোপাধ্যায় একখানা বিরাটাকার বাংলা ব্যাকরণ লেখার

১ অধুনা বঙ্গীয় পাঠক লেখক মোজাইক বলতে হাইলি পলিশট্, অতিশয় মসৃণ এবং সচরাচর একরঙা মেঝেকেই বোঝেন, বোঝান। আমি শব্দটি মূলার্থে ব্যবহার করেছি। পাথরের ছোট ছোট রঙবেরঙের টুকরো এমনভাবে সাজানো হয় যে তার থেকে একটি ছবি ফুটে ওঠে। মোজাইক তাই চিক্কণ মসৃণ তো হয়ই না বরঞ্চ তার বৈশিষ্ট্য ঠিক বিপরীত। যে কোনো দুটি পাথরের টুকরো বা কুচি ঠায় ঠাঠ অঙ্গাঙ্গি একজোড় হতে পারে না বলে সে অসমতল। তাই অতিশয় মসৃণ মেঝেতে (যাকে আজকের দিনে মোজাইক বলা হয়) মানুষের পা হড়কায় মোজাইকে সেটা প্রায় ১০০% অসম্ভব; অনেকে মনে করেন যে পা যেন না হড়কায় এই নিতান্ত প্র্যাকটিকাল উদ্দেশ্য নিয়েই মোজাইকের গোড়া পত্তন হয়।

পর অনুভব করলেন, "হয়ত বড্ড বেশী বলা হয়ে গেছে।"[২] তাই রচনা করলেন একটি ক্ষুদ্র ব্যাকরণ। পথে দেখা হতে বললেন, "এবারে একটা সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ লিখেছি; আগেরটা ছিল ক্ষিপ্ত ব্যাকরণ!" আমার এ-লেখাটাতে তাঁর ইরশাদ-নির্দেশ মস্তকাভরণ হয়ে রইল।

আরেক গুণী আরেকটি সরেস উপদেশ দিয়েছেন: "স্বেচ্ছায়. সজ্ঞানে লেখাতে কিছু কিছু ভুল রেখে দিয়ো। পাঠক সেগুলো ধরতে পারলে বিমলানন্দ অপিচ আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। মনে মনে বলে, "আমিই বা কম যাই কিসে! ব্যাটা লেখক যতই বড়ফাট্টাই করুক না কেন আমি, হ্যাঁ, আমি তার সব কটা বমাল ধরতে পারি।" হয়তো বা কাগজে "ভ্রম" সংশোধন করে চিঠি লিখবে। ছাপা হলে তারে আর পায় কেডা? পাড়ার সবাইকে সেটা দেখাবে। সে শংকরের কান মলতে পারে, অবধূতের নাসিকা কর্তন-কর্মে সিদ্ধহস্ত। আপনার বইয়ের আরো তিন কপি সে কিনবে। সে যে কেরামতি মেরামতি করেছে সেগুলো সহ বিয়ে-সাদীতে প্রেজেন্ট করবে। আপনার অন্যান্য তাবৎ বই গ্যাটের কড়ি খর্চা করে বাড়িতে তুলবে—ভুলের সন্ধানে, আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য।

আমাকে অবশ্য সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় ভুলের কলঙ্ক লেখার উপর ছিটোতে হয় না। সদাপ্রভু আমার হাত দিয়ে নিত্য নিত্য তামাক খান আর আমি খাই পাঠক পণ্ডিতের কানমলা।

ঈশ্বর সদ্‌গুরু জগদ্‌গুরু মন্নাহ জগন্নাথ আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন পরলোক গমনের দিন দুই পূর্বে তাঁরই সম্মুখে তাঁর চিকিৎসক তাঁর সহধর্মিণীকে বলেন, "আর দুধটাতে একটু জল দিয়ে সেটা পেতলে নেবেন—উনি তাহলে সহজেই হজম করতে পারবেন।" ক্ষিতিমোহন জানতেন তাঁর মৃত্যু আসন্ন। কিন্তু যে লোক আজীবন রসিকতা করেছে মৃত্যুভয় তাকে স্বধর্মচ্যুত করতে অক্ষম। মৃদু কণ্ঠে বললেন, "সিডা আর হাসপাতালে[২] করন লাগবো না। গয়লাই আপন বাড়িতে কইরা লয়।"

বিধাতা বলুন, নলরাজের অন্তরে প্রবিষ্ট কলিই বলুন, তিনি ঐ গয়লার মত আমার রচনাতে অনবরত জল মেশাচ্ছেন। অধম এ লেখককে আমার গুর্বীর মত আর জল মেশাতে হয় না।

আগাতা ক্রিস্টি বিয়ে করেন এক আর্কিয়োলজিস্ট্ বা প্রত্নতাত্ত্বিককে। ক্রিস্টি যখন বার্ধক্যে উপনীত হলেন তখন এক দরদী যুবতী তাঁকে শুধোন, "আপনি বুড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার স্বামী আপনাকে অবহেলা করছেন না তো! আফটার অল—পুরুষের মন।"

মাদাম শ্যানা হাসির ঝিলিক খেলিয়ে বললেন, "তোমরা তো বিয়ে করার

---

২ ঘটিরা কেন "হাঁস" পাতাল লেখেন, এ- বাঙালবুদ্ধির সেটা অগম্য। ইংরিজীতে তো "Hos" (pital)-এ কোন অনুনাসিক নেই। ঠিক সেরকম "হুঁশ"। ফার্সীতে অনুনাসিক নেই।

সময় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে দুম্ করে ঝুলে পড়ো! আম্মো প্রথম বারে তাই করেছিলুম। দ্বিতীয় বারে নির্বাচনটি হৃদয়ের হাতে ছেড়ে না দিয়ে দিলুম হেডাপিস অর্থাৎ ধুরন্ধর ব্রেন বক্স্‌টিকে। সে ফরমান দিলে বিয়ের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করাটাই শ্রেয়তর প্রস্তাব। কিন্তু নিতান্তই যদি করতে হয়, তবে কোনো প্রত্নতাত্ত্বিককে।"...খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর মাদাম শেষ তত্ত্ব, গভীরতম তত্ত্ব প্রকাশ করে বললেন, "জানো তো, যে জিনিস যত বেশী প্রাচীন হয়, প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে তার মূল্য তত বেশী। 'কজিটো এর্গো সুমে'র ছকে ফেলে অতএব আমি যত বুড়োচ্ছি ততই ও'র কাছে আমার মূল্য বাড়ছে।"

বিধাতা গয়লা আমার লেখাতে যেমন যেমন শনৈঃ শনৈঃ ব্যাকরণের ভুল বাড়াচ্ছেন, শৈলীর শিরদাঁড়া আর ভাষার পাঁজর কটা মট মট করে ভাঙছেন, আমার বইয়ের কাটতি তেমন তেমন হুশ্ হুশ্ করে বেড়ে যাচ্ছে। পূর্বে যে-স্থলে আড়াই শ' বইয়ের এক সংস্করণ কাটতে ঝাড়া কুড়িটি বছর কেটে যেত এখন মাত্র উনিশটি বৎসর!

হরি হে তুমিই সত্য।

এই যে হনুমানী লম্ফ দিয়ে আমি মবলগ চল্লিশটি বছর অতিক্রম করলুম নানাবিধ প্রবন্ধ গল্পমারফৎ, এ-চল্লিশ বৎসরের একটা সাদামাটা বোঁচাভোঁতা মোজায়িক গড়ে তুলেছি, যার উল্লেখ পূর্বেই করেছি, এবং এটাকে দু'যুগের সেতুবন্ধ স্বরূপ বিবেচনা করা যেতে পারে সে-সম্বন্ধে এবং বর্তমান লিখন সম্বন্ধে একটি সাবধান বাণী আমাকে চতুর্থ বা পঞ্চম বারের মত পাঠকের দরবারে পেশ না করলে আমি গুরুহীন তথা ধর্মভ্রষ্ট হব।

সেই এই ঃ

১৯৪৪ সালে যখন স্বরাজ কোন্ শুভাশুভ লগ্নে অবতীর্ণ হবেন, কি রূপ নিয়ে অবতীর্ণ হবেন, বামন অবতার না এক আজব নয়া ক্লীব শিখণ্ডি অবতার —এবং সেও অতিশয় ক্ষুদ্রস্য ক্ষুদ্র ধূলি পরিমাণ অংশাবতার হয়ে (আজ তো অহরহ চতুর্দিকে সেই নপুংসকাবতারই দেখতে পাচ্ছি) এই দিলীপ ভগীরথের (একদা) প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হবেন—সে যুগে আমাদের মনে স্বরাজ সম্বন্ধে স্পষ্টাস্পষ্ট কোন ধারণাই ছিল না। ১৯২০।২১-এ গাঁধীজী এক বৎসরের ভিতর (ভাগ্যিস দশ মাস দশ দিন বলেন নি) স্বরাজ আনবেন বলে দিলাশা দেন। কবিগুরু তখন তাঁকে মুখোমুখি বলেন, এক বৎসরের ভিতর যদি না আসে তবে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জনগণমনে যে নৈরাশ্যজনিত কর্মবিমুখ জড়ত্ব এনে দেবে সেকথা ভেবেছেন কি? মহাত্মাজী বলেন, আমি মরালি স্থিরনিশ্চয় যে প্রত্যেক ভারতীয় যদি আমার কর্মসূচী গ্রহণ করে তবে এক বৎসরের ভিতর আমরা স্বরাজ লাভ করবই করবো। (এর মাত্র আঠারো বৎসর পর হিটলারও রণশঙ্খে ফুৎকার দেবার পূর্বে বলেন, প্রত্যেক জর্মন সৈন্য যদি সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন ভিদ্যতে যা চ মেদিনী পরিত্যাগ করে পশ্চাৎপদ না হয় অপিচ শত্রুকে নিধন করতে করতে প্রকৃত বীরের ন্যায় সে ভূমিতে দণ্ডায়-

মান সেখানেই মৃত্যুবরণ করে তবে আমার জয়লাভ অনিবার্য। অতিশয় হক কথা—সাধু, সাধু। উত্তম, উত্তম। কিন্তু জিজ্ঞাস্য ঃ আমাদের যখন অজানা নয় যে প্রত্যেক মানুষেরই কর্মক্ষমতা, আত্মোৎসর্গপ্রবৃত্তি, শৌর্যবীর্য পরিচয়-দানের একটা সীমা আছে তখন প্রত্যেকটি লোক শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করে করে ধূলিশয্যা গ্রহণ করবে এহেন আশা করাটা পূর্বাভিজ্ঞতাসম্মত নয়—এটাকে বরঞ্চ ধর্মরাজের দ্যূতক্রীড়ার সময় "এবারে আমি জিতব, এবারে আমি জিতবই জিতব" দুরাশা দুরাশায় গড়া পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করে যেতে পারে। তদুত্তরে হিটলার অবশ্যই বলতে পারতেন, নিয়তি (হিটলার ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন না, কট্টর নাস্তিকও না, কিন্তু নিয়তির অদৃশ্য লিখনে দৃঢ় বিশ্বাস ধরতেন) কখনোই কোন মানুষের স্কন্ধে সে বোঝা চাপান না যেটা সে বইতে পারবে না।

তা সে যাই হোক যাই থাক, কর্মক্ষেত্রে দেখা গেল গাঁধীজীর প্রতিশ্রুত এক বৎসর অতি সরেস রবারের মত—বড্ডই ইলাস্টিক, বিলম্বিত—উভয়ার্থে—হওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা ধারণ করে। যতই মারিবে টান ততই যাবে বেড়ে।

এস্থলে আমাকে বাধ্য হয়ে কিছুটা জীবনস্মৃতি মন্থন করতে হবে। পাঠক, অসংখ্যবার আমার অপরাধ মার্জনা করেছো। আরেকবার করলে হয়তো এক-শতে পেঁাছে তুমি রত্নাকরের মত মোক্ষলাভ করে যাবে। আর কথায় বলে যাহা বাহান্ন তাহা তিরনব্বুই (হায় হায় পাঠক, দ্যাখ তো না দ্যাখ, বিধাতা গয়লা আমার হাত দিয়ে কি কৌশলে তামাক খেয়ে নিলেন, অতি সাধারণ একটি প্রবাদ গুবলেট করে দিলেন)। কিন্তু আমার জীবনস্মৃতি লিপিবদ্ধ করার মত দুর্মতি আমার কখনো হবে না সে আমি জানি। ওদিকে আবার আমার চেয়েও পাপিষ্ঠজন ইহসংসারে আছে। তারা সর্বক্ষণ আমাকে টুইয়ে টুইয়ে অনুযোগ বিনয় করে, আমি যেন আমার আত্মজীবনী লিখি, কারণ আপনার মত বিচিত্র অভিজ্ঞতা ক'জনের আছে (অর্থাৎ খুনখারাবী করে পৃথিবীতে কোন্ দীনতম দেশের কারাগারের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন আমি করি নি ?), পৃথিবীর কোন্ দেশ আমি চষি নি (অর্থাৎ কোন্ দেশের পুলিস আমাকে "গুণ্ডা আইনে" ফেলে—যে আইনানুযায়ী নগরপাল যেকোন গুণ্ডাকে চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর শহর ছেড়ে অন্যত্র যাবার মোক্ষম আদেশ দিতে পারেন—সেদেশ থেকে বের করে দেয় নি ?)। মোদ্দা কথা আমি অকপটে সত্যবর্ণন করলে তেনারা বগল বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে বলবেন, "বলেছিলুম তখনই বলেছিলুম।" হয়তো বা একটি ছড়াও সঙ্গে জুড়বেন ঃ

বাইরে তোমার লম্বা কোঁচা
ঘরেতে চড়ে না হাঁড়ি,
খেতে মাখতে তেল জোটে না,
কেরোসিনে বাগাও তেড়ি।

যাও হে, যাও হে, কালাচাঁদ
আর এসো না আমার বাড়ি
এবার এলে আমার বাড়ি
দেব তোমায় খ্যাঙরার বাড়ি ॥

পক্ষান্তরে এবার আমার জীবন সম্বন্ধে নির্বিকার উদাসীন পাঠক বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই, কোন্ দুষ্ট, পরশ্রীকাতর, বিঘ্নসন্তোষী জুগুপ্সা দ্বারা তাড্যমান হয়ে এনারা আমাকে জীবনস্মৃতি লিখতে বলেন।

কিন্তু ভবদীয় সেবককে তার কিছুটা, সামান্যতম অংশটা এস্থলে নিবেদন করতেই হবে। নইলে (১) সে-পটভূমি নির্মিত হবে না যার সাহায্য বিনা পাঠক আমার তাবৎ বক্তব্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

অপরঞ্চ (২) পূর্বলিখিত চল্লিশ বৎসর যে মুষ্টিযোগ প্রসাদাৎ আমি ডুবসাঁতার মেরে মোজায়িক নির্মাণ করেছিলুম এস্থলেও তদ্বৎ। সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করবো।

১৯৪৪-এর কাছাকাছি আমি বে-car (বে-কার) তো বটিই, এবং নির্জলা বেকার। শ্যামপেন বরগণ্ডী মাথায় থাকুন জল এস্তেক জোটে না। মাথার উপরে ছাতখানাও যদি না থাকে তবে ট্যাপই বা কোথায় কুঁজোই বা কই? কাজেই রাস্তার কল থেকে আঁজলা আঁজলা জল খেতুম। তদভাবে পার্কের পুকুর কিংবা মাগঙ্গার স্তন্যরসই ছিল আমার সম্বল।

অবস্থা যখন চরমে তখন শ্রীমান কানাই (ভজু-কানাই) সরকারের সঙ্গে দেখা। তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, (আমি যখন শান্তিনিকেতন কলেজে পড়তুম সে তখন ইস্কুলে) যে আমি তখন ইস্কুলের সাহিত্যসভায় বেনামীতে কয়েকটি রচনা পেশ করি। সেগুলি এমনই ওঁচা যে আমি স্বয়ং পড়লে "সাধু-স্ সাধু-সাধু" রব ওঠার পরিবর্তে "দুয়ো দুয়ো দুয়ো" ধ্বনি সভাস্থলের চতুর্দিকে মুখরিত হত। ওদিকে মহারাজ শ্রীমান ভজু-কানাই সাহিত্যসভার সেক্রেটারি (আমরা আড়ালে বলতুম "স্যাঁকা রুটি"), তারে মারে কেডা।[৩]

সেই কানাইয়ের সঙ্গে দেখা কলকাতায়। ছেলেবেলায় বিস্তর কচিকাঁচারা একটুখানি সিনিয়র ছাত্রদের হীরো ওয়ারশিপ করে। আমার রচনা পড়ে সে যে বিস্তর "সাধু-স-সাধু" কুড়িয়েছিল তার থেকে তার একটা অন্ধ ধারণা হয়ে গিয়েছিল আমি কালে রীতিমত ডাকসাইটে কেউকেডা লেখক হব। তাই দেখা

৩ শ্রীমান কানাই যখন শান্তিনিকেতনে এলেন তখন অন্য এক কানাই সেখানে বর্তমান। গুবলেট এড়াবার জন্য তখন তার দাদা 'ভজুর" সঙ্গে তার নাম জুড়ে দিয়ে "ভজু-কানাই" নাম রাখা হল। আরেকটি উদাহরণ চমৎকার; একটি এমনি ছোটখাটো একমুঠো ছেলে এল যে সবাই তার নাম দিল "সিকি"। ওমা, পরের বৎসর সে তার ছোট ভাইকে নিয়ে এল—সে আরো ক্ষুদে, একদম মাটির সঙ্গে কথা কয়। তার নাম রাখা হল "দুয়ানী"।

হওয়া মাত্রই আমাকে পকড়কে নিয়ে গেল স্বর্গত সুরেশ মজুমদার মহাশয়ের সমীপে।

আহা! এ-রকম আরেকটি সংবাদপত্র কর্ণধার আমি ত্রিভুবন চষেও পাই নি! কিন্তু আজ না, মোকা পেলে আরেকদিন তাঁর দেহ, মন ও সর্বোপরি তাঁর হৃদয়ের সবিস্তর বর্ণন দেব। তিনি আড়নয়নে আমার দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই কানাইয়ের দিকে তাকিয়ে কি যেন একটা মুদ্রা দেখালেন। এরকম বিনা মেহনতে আমি কোনো পরীক্ষা পাস করি নি।

"সত্যপীর" ছদ্মনামে সপ্তাহে দুবার দুই কলম, আফটার এডিট লিখতুম। সে কাহিনী দীর্ঘ। শুধু দুঃখের সঙ্গে বলি সে-আমলে যাঁরা সবে সাবালক হতে যাচ্ছেন সেই আমি আজ হয়ে গেলুম তাঁদের পেট্ রাইটার, অর্থাৎ আমি তাঁদের ফ্যান। হায়, আজ তাঁদের দরবারে কল্কে পেতে হলে আমাকে রীতিমত কসরৎ করতে হয়। সব সময় পাই নে। এখন যদি সেই প্রায় ত্রিশ বৎসরের পুরনো 'সত্যপীর' নাম দিয়ে কিছু লিখি—অতিশয় সভয়ে বৃদ্ধ বরজলালের মত ক্ষীণকণ্ঠে অর্থাৎ শ্লথ অক্ষম হস্তে লিখিত যৎকিঞ্চিৎ পাঠাই তবে সেটা ছাপা হয়—ইংরেজীতে যাকে বলে অন্ এ রেনি ডে। রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বয়সে একটি কবিতা নিম্নের কটি ছত্র দিয়ে আরম্ভ করেন ঃ—

"ডাক্তারেতে বলে যখন মরেছে এই লোক
তাহার তরে বৃথাই করা শোক।
কিন্তু যখন বলে জীবন্মৃত
তখন শোনায় তিতো
আমার হ'ল তাই—"

পরে কবি বুঝলেন, গৌড়ীয় পাঠক মাত্রই তাঁর এ-বিনয় অট্টহাস্যসহ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে। তাই পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় এ-ছত্র কটি তিনি নাকচ করে দিলেন।

আর আমার বেলা?

জীবন্মৃত না। "খাবি-খেকো, গঙ্গাযাত্রার আস্ত জীবন্মৃত।"

সে-কথা থাক্।

ঐ সময় অন্যান্য যাবতীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে আমার একটি বক্তব্যে আমি বার বার ফিরে আসতুম। বলতুম, "স্বরাজ আমাদের দিগ্বলয় চক্রের মতই নিয়ে বা ঊর্ধ্বে দৃষ্টির বাইরে থাকুন না কেন এই বেলাই তার জন্য কিছু কিছু প্রস্তুতির প্রয়োজন। ২। স্বরাজলাভের সঙ্গে সঙ্গেই ভারত পৃথিবীর সর্বদেশের এম্বেসি, লিগেশন, কনসুলেট, ট্রেড কমিশন নিযুক্ত করবে। ৩। সে-সব দফতরের জন্য বিদেশী ভাষা জাননেওলা লোকের প্রয়োজন হবে। ৪। বাঙালী ভাষা শেখার জন্য বিশেষ বুদ্ধি ধরে। অতএব এইবেলাই সাততাড়াতাড়ি কলকাতা-তেই ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শিখবার ব্যবস্থা করা অতীব প্রয়োজনীয় জরুরী কাজ। কারণ প্রথম ধাক্কাতেই যাঁরা ফরেন সার্ভিসে ঢুকতে পারবেন তাঁরা দেশদেশান্তরে

ঘুরে বেড়াবেন এবং ফলে তাঁদের ছেলে এমনকি মেয়েরাও একাধিক ভাষা ইচ্ছা অনিচ্ছায় শিখে নেবে। তখন আমাদের কলকাতার মেধাবী ছেলেরাও এদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। ফলে ভালো ভালো চাকরি, যারা প্রথম ধাক্কায় ঢুকেছিল, বংশানুক্রমে তাদের গোষ্ঠীপরিবারের একচেটে সম্পত্তি হয়ে যাবে। এ-কিছু আজগুবী নয়া হাল নয়। বিসমার্ক এমনি কি তাঁর পূর্বেও যেসব খানদানী পরিবার ফরেন অফিসে প্রথম ধাক্কাতেই প্রবেশ করেছিল তাদের বংশধরগণকে গণতান্ত্রিক ভাইমার রিপাবলিক কমিয়ে দিয়ে মেধাবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোককে ঢোকাতে পারেন নি। এমন কি হিটলারও এঁদের বিশেষ কাবু করতে পারেন নি। এঁরা মস্করা করে বলতেন, নাৎসীদের দিয়ে এসব কাজকর্ম করানো যায় না; আমাদের মত স্পেৎসি (স্পেৎসিয়ালিস্ট্=স্পেশালিস্ট=ওয়াকিফহাল) না থাকলে তাবৎ ফরেন আপিস এবং সঙ্গে সঙ্গে ওদের নিযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন দেশের দূতাবাসগুলো তছনছ বানচাল হয়ে যাবে।"

আমার এসব সাবধান বাণীতে খুব কম লোকই তখন কান দিয়েছিলেন। একাধিকজন আমাকে বলেন, "আরে মশাই, আগে স্বরাজ ফলটি পেকে মাটিতে পড়ুক!"

আমার পেটেণ্ট উত্তর ছিল, "রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না?"

আজ আমাদের কানে জল গেছে। আজ ম্যাক্স্‌মুলার ভবনে, রুশ পাঠচক্রে ভিড়—এমন কি কোনো কোনো বাড়ির বৌ-ঝি-রা এদের মধ্যে আছেন। শ্রীযুক্ত মনোজ বসুর ধর্মপত্নী ও পুত্রবধূ কয়েক বৎসর আগে একই রুশ ক্লাসে পড়াশুনো করতেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে ঘোড়া পালিয়েছে। আস্তাবলে এখন চাবি মারাটা বন্ধ্যাগমনের ন্যায় নিষ্ফল। সংস্কৃত সুভাষিত কয়, প্রদীপ নির্বাপিত হয়ে যাওয়ার পর তেল দিয়ে কি লাভ, যৌবনান্তে বিবাহ করে কি ফল পাবে!

সেই ১৯৪৪ থেকে কানমলা খেয়ে খেয়ে—অর্থাৎ এ-সব বাবদে লেখা সাধারণ জনের কৌতূহল উদ্রেক না করাতে—আমি অন্য সব বিষয়ে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করলুম। যাঁরা "দেশ" পত্রিকায় (এ পত্রিকাতে ১৯৪৮।৪৯-এ আমার সর্বপ্রথম পুস্তক "দেশে-বিদেশে" ধারাবাহিকরূপে বেরোয় এবং সে-সম্বন্ধে "দেশ" পত্রিকার সুযোগ্য একনিষ্ঠ সম্পাদক শ্রীমান সাগরময় ঘোষ তাঁর অনবদ্য "সম্পাদকের বৈঠক" পুস্তকে কীর্তন করেছেন।[৪] সে যুগ থেকে—বস্তুত ১৯৪৪ থেকে—

৪ "দেশে-বিদেশে"ই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা, এটা প্রায় সর্বজনসম্মত অভিমত। আমাকে যখন কেউ প্রশ্ন করেন, আমার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা কি? আমি উত্তরে বলি, বার বার চেষ্টা দিয়েছি, কিন্তু এখনো "সর্বশ্রেষ্ঠ" রচনা লিখতে সক্ষম হই নি। জনৈক ফরাসী লেখককে একই প্রশ্ন শুধোলে পর তিনি দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে (শ্রাগ্ করে) বলেন "লা, লা! আপনি কি জানেন না, আমার প্রত্যেকটি রচনাই সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা।" স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বিনয় প্রকাশ বাবদে এই মহাত্মাকে ভৃগুপদলাঞ্ছিত কৃষ্ণবাসুদেবের সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

আমি কয়েক মাস, কখনো বা দু'এক বৎসর বাদ দিয়ে—ঢাকের বাদ্যি থেমে গেলেই ভালো শোনায়—'দেশ' পত্রিকায় প্রধানত "পঞ্চতন্ত্র"ই লিখে আসছি) আমার এই "পঞ্চতন্ত্র" মাঝেমধ্যে পড়েছেন তাঁরাই জানেন আমি এখন প্রধানত "অজগর আসছে তেড়ে। /আমটি আমি খাব পেড়ে।" কিংবা ঔষ্ণ পদ্ধতিতে "ক'-রে কমললোচন শ্রীহরি /। করেন শংখচক্রধারী" ধরনের নির্বিষ অজাতশত্রু রচনাতে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখি।

কিন্তু ইতিমধ্যে মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গিয়েছে। আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে। স্বরাজ লাভের সঙ্গে (১) ভারতীয় রাষ্ট্রদূতেরা মদন-ভস্মের মত বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়লেন। তাঁরা যে-সব দেশে অবস্থান করছেন তাদের সমস্যা, ভারতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ইত্যাদি ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় সম্বন্ধে বিবৃতি দিতে লাগলেন; কখনো স্বেচ্ছায় কখনো পার্লিমেণ্টে তাড়া খেয়ে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মারফৎ। তাদের দারাপুত্রপরিবারও এ-সব দেশকে কেন্দ্র করে সাহিত্য নিম-সাহিত্য প্রকাশ করলেন। (২) দলে দলে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, জর্নলিস্ট, সাহিত্যিক, ছাত্রছাত্রী, টুরিস্ট, সরকারী কর্মচারী গয়রহ নিত্যি নিত্যি দুনিয়াটা চষে ফেলতে লাগলেন। তাঁদের অনেকেই গানা থেকে অল্-আলেমীন সীদী অল-বররাণী, পানামা থেকে তাশকেন্দ ভ্রাদিভস্তক সম্বন্ধে এস্তের এস্তের প্রবন্ধ কেতাব লিখলেন। অনেক সময় অগ্রপশ্চাৎ সম্যক বিবেচনা না করে। পরে সে-বইয়ের কিয়দংশ সানুষ্ঠানে ভস্মীভূত করা হল। চার্বাক বলেছেন ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ? কিন্তু এস্থলে পুনরা-গমন আদৌ অসম্ভব নয়। বিশাখাপট্টনমে যখন জাপানী বোমা পড়ে তখন সরকারের হুকুমে ট্রেজারি অফিসার জমায়েৎ কারেনসি নোট পুড়িয়ে দিল্লীতে খবর দিলেন তিনি সাকুল্যে তাবৎ নোট ভস্মীভূত করেছেন। উত্তম। দু'বৎসর যেতে না যেতে তার কিয়দংশ গুড়ি শুড়ি কি করে যে হাটবাজারে মদ্যালয়ে ক্লাবে আত্মপ্রকাশ করল কেউ জানে না।...এবং সব চেয়ে মোক্ষম তত্ত্ব (৩) ইংরেজ আমলে আমাদের বৈদেশিক নীতি কি হবে সে নিয়ে আমাদের কোনো শিরঃ-পীড়া ছিল না।।এখন ঐ বিষয় কানু ভিন্ন গীত নেই। অধুনা ডিহি পোঁদালিয়া ২/১ক/ক নং থার্ড বাইলেন শালপাতা ঠোঙা-বিতরণীর সহ-শাখা-কমিটির রক থেকে আরম্ভ করে টাটা-বিড়লা-লীভার ব্রাদারজের গোপনতম আলোচনা কক্ষে ঐ এক কানুর গীত। যেমন মনে করুন এই যে ইংরেজ কমন মার্কেটে ঢোকার জন্য বেহায়া বেশরম হ্যাংলামোর চূড়ান্তে পেঁচেছে, টা-পেনি হে-পেনি লুক-সুমবের্গ বেলজিয়ামের মত দেশের পা চাটছে সর্ব ইজ্জৎ সর্ব ইমান আব্রু বাকিংহাম প্রাসাদস্থ স্কেটিং করার পুকুরে গলায় পাথর বেঁধে বিসু হাথ পানীমে ডুবিয়ে দিয়ে—দ্য গলের প্রেতাত্মারূপী বর্তমান সরকার তাদের পশ্চাদ্দেশে দু-চার-খানা সবুট সরেস কিক্ কসাবে না তো—গোষ্ঠ-সমদ যে রকম পেনালটি পেলে, কালী (মোলা) আলী ফোকটে বেমক্কা নাহক্কো পেনালটি পেলে যে-রকম কালী আলীর (কালীঘাট মোলা আলী) কাছে পুজো শিরণী মানৎ করে।

এই সব এবং অন্যান্য নানাবিধ কারণে—ট্রেনজিসটারের সুলভতা ভুলবেন না—দেশের লোক, রকের রকফেলার এস্তেক পাড়ার পদিপিসি পর্যন্ত নানা বিষয়ে এমনই ওয়াকিবহাল হয়ে গিয়েছেন যে ১৯৪৪ সনে যা ছিল কঠিন বিষয়-বস্তু, স্পেশালাইজড তত্ত্বতথ্য, আজ তার অনেক কিছু হয়ে গিয়েছে ক ম ন ন-লে জ। যেমন ধরুন ১৯৪৪—চুয়াল্লিশ কেন প্রায় ১৯৫২।১৯৫৩ অর্থাৎ যত দিন না নাপাক সরকার উভয় বঙ্গের যাতায়াতের জন্য "ভিজা"-প্রথা প্রচলন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসন্তান চোখের জলে নাকের জলে শিখলো, ভিজা কারে কয় এবং প্রথম আপন সরকার—ভারতীয় হলে ভারত সরকার পাকিস্তানী হয়ে পাক সরকারের কাছ থেকে যে সর্বপ্রথম দশ টাকা না পনেরো টাকা খর্চা করে একখানি পাসপর্ট যোগাড় করতে হয়। তার জন্যে কিউয়ে দাঁড়াও, ফর্ম বের করো এবং বিরাটতম চার পৃষ্ঠাব্যাপী তিন দফে (ইন্ ট্রিপলিকেট !) সেগুলো ফিল আপ করো। পাক্কা দেড়ঘণ্টা থেকে দু'ঘণ্টা লাগে, মশয়।

এই ফর্ম যদি আপনি স্বয়ং ফিল আপ করেন তবে আন্তর্জাতিক প্রাথমিক আইনকানুন সম্বন্ধে আপনার বেশ খানিকটে জ্ঞান হয়ে যাবে।

কিন্তু দোহাই ধর্মের, আপনার নিরাপত্তার জন্যে তথা পাসপর্ট আপনি আখেরে যেন পান তার জন্য আপনি সে-ফর্ম স্বয়ং ফিল আপ না করে করাবেন ঐ আপিসের আশেপাশে যে সব প্রফেশনাল ফর্ম ফিল আপ করেনওলারা আছে। অপরাধ নেবেন না ; বেহারী ভাইয়ারা যে রকম ইটালিয়ান ব্যুরোতে, অর্থাৎ ইঁটের উপর বসে প্রফেশনালকে দিয়ে মনিঅর্ডার ফর্ম ফিল আপ করায়। হুবহু সেই রকম। অ। আপনি বুঝি ইংরিজীতে এম এ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, পি এচ ডি, ডি লিট। তাই আপনার দেমাক। কোন্‌খানে ব্লক ক্যাপিটেল হরফে লিখবেন আর কোন্‌খানে সাদামাটা হরফে, যে সব জায়গা দফতর ফিল আপ করবে, করে ফেললেন আপনি, যে জায়গাটা সুদ্দুমাত্র খালাসীদের (যারা একদা পাকিস্তানী ছিল কিন্তু অধুনা ইণ্ডিয়ান, আবার কখন রঙ বদলাবে তার স্থিরতা নেই এবং ইতিমধ্যে বেআইনী কায়দায়—যার জন্য তিন মাসের তরে শ্রীঘর শ্বশুরালয়—যে যোগাড় করেছে তিন-তিনখানা পাসপর্ট ঃ প্রথমটাতে সে ভারতীয় নাগরিক, দ্বিতীয়টাতে সে পাক্কা ব্রিটিশ, তৃতীয়টাতে সে পাকিস্তানী। পুলিস সন্দেহ করে শুধোলে সে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলবে সে ভারতীয় এবং ভারতীয় পাসপর্ট তার ছিল কিন্তু সেটা খোয়া গেছে ঃ তার মতলব আরেকখানা পাবার। পেলে এটা বা আগেরটা বিক্রী করে দেবে। এই কলকাতাতেই যারা নোট জাল করে তারা স্পেয়ার টাইমে করে পাসপর্ট জাল। এরা সে পাসপর্ট কিনে নিয়ে অত্যুৎকৃষ্ট কেমিকাল দিয়ে খালাসীর ফোটোগ্রাফ সেই পাসপর্ট থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। যে ব্যক্তি গুণ্ডা বা ফেরার বলে পাসপর্ট যোগাড় করতে পারে নি তার ফোটো ছাপা হবে সেখানে—জায়গাটায় নতুন ফোটো কেমিকাল লাগিয়ে।...এতে বেশ কাঁচা দু-পয়সা আমদানি হয়। খিদিরপুর অঞ্চলে নাকি একটা "(প্রাইভেট) লিমিটেড" কোম্পানী হয়েছে—ভাবছি কিছু শেয়ার কিনবো) সেটা ফিল আপ করে

বসলেন আপনি। সে ভুলটা ধরিয়ে দেবে আপনারই এক ভাগ্নে—"উনিশটিবার ম্যাট্রিক সে/ঘায়েল করে থামলো শেষে।" তখন ছিঁড়ে ফেলুন সেই তিনপ্রস্থ ফর্ম, ফের দাঁড়ান কিউয়ে—ফের, ফিনসে। আর সব চেয়ে মারাত্মক অদৃশ্য ফাঁদ যেটি সদাশয় সরকার, অবশ্য অতিশয় অনিচ্ছায় কিন্তু সরকারী পয়সার যাতে অপচয় না হয় সেই শুভ ব্রত গ্রহণ করে আপনার জন্য পেতেছেন। "অদৃশ্য" কেন বললুম এখুনি বুঝতে পারবেন। আমরা তথা পাকিস্তানীরা বিলেত ফ্রান্সের তুলনায় তো সবে স্বরাজ পেয়েছি। আমাদের সরকারকে কোন্ কোন্ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হয় সে-সম্বন্ধে খুব একটা স্পষ্ট ধারণা নেই। ইংরেজ একদা যে সব প্রশ্ন শুধোত তার বেশ-কিছু বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে—মহারাণীর রাজত্ব যেন হিটলারের "সহস্রবর্ষের রাইখ"-এর মত অজরামর হয়ে থাকে। মহারাণীর রাজত্বে যেন কস্মিনকালেও—মহাপ্রলয়ে তাবৎ মণ্ডলসমূহ তথা অগণিত নক্ষত্ররাজি লোপ পাওয়ার পরও সূর্য কখনো অস্তমিত না হয়।[৫]···তা সে যাক গে। এখানে পাসপর্ট ফরম তৈরী করার সময় ভারতীয় হুজুরদেরই স্থির করতে হয় আমরা কোন কোন প্রশ্ন শুধবো। পয়লা ঝটকাতেই সব প্রশ্ন হুজুরদের মনে আসে না। পরে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন, "ঐয্যা! অমুক প্রশ্নটা তো শুধনো হয় নি।" কিন্তু হায় তখন তো আর তাবৎ ছাপা ফর্ম বাতিল করে দেওয়া যায় না। তাই বের করলেন এক নয়া কৌশল। নূতন প্রশ্ন রবর স্ট্যাম্পে বানিয়ে নিয়ে চাপরাসীকে দিলেন হুকুম,"প্রত্যেক ফর্মে মারো এই ইস্টাম্পো।" চাপরাসী ভটাভট সেই কর্ম করতে লাগলো ফর্মের এক সংকীর্ণ কোণে। এখন হয়েছে কি, আপনি পেলেন ৩৭৩৮৫ নম্বরের ফর্ম। ততক্ষণে রবর স্ট্যাম্পের হরফগুলো সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে সেটি হয়ে গিয়েছে নখের মত পালিশ। তখন ফর্মে একটা ঝাপসা ঝাপসা ফিকে বেগনী রঙের কুয়াশা-কুয়াশা মাত্র দেখা যায় —অবশ্য আপনি যদি সেটি সাতিশয় মনোযোগসহ নিরীক্ষণ করেন। সেটা দেখে আপনার মনে কিছুতেই সন্দেহ হবে না যে এটা খয়ে যাওয়া রবর স্ট্যাম্পের অবদান—আপনি যতই সন্দেহ-পিচেশ হোন না কেন? অ! ভুলে গিয়েছিলুম আপনি ইংরিজীতে ডি. লিট কিংবা যাই হোন না কেন, যেখানে কোনো অক্ষরের চিহ্নমাত্র নেই তার পাঠোদ্ধার করবেন কি করে? তাই আপনি নিশ্চন্ত মনে ফর্ম পাঠিয়ে দিলেন হেড আপিসে। এক মাস পরে সেটি এল ফেরত। এবং সঙ্গে লেখা আছে "আপনি অমুক নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেন

৫ এই বেত্তমীজ বড়ফাট্টাই শুনে এক ফরাসী বলেছিল, "কিছু ভয় কোরো না, মিঞা। করুণাময় পরমেশ্বর তোমাদের কসাইসুলোভ "করুণ" হস্তে ভারতীয় তথা অন্যান্য "কালা আদমী"দের তুলে দিয়ে ডাইনীর হাতে পুত্র তুলে দেওয়ার মত জবরদস্ত গুণা করার পর হুজুরের হুশ হল। তিনি তোমাদের হাতে অন্ধকারে কালা-পীলা আদমীদের কোন ভরসায় এখন ছাড়েন। তাই তিনি সূর্যাস্ত একদম বন্ধ করে দিয়েছেন।

নি কেন?" আপনি খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে যাবেন সে প্রশ্নটা কোথায়? শেষটায় হার মেনে যাবেন সেই প্রফেশনালের ইঁটের পাঁজাতে। সে লেটেস্ট খবর রাখে। সে সেই বেগনী কুয়াশার মধ্যিখানে সঠিক জায়গায় উত্তরটি লিখে দেবে। শুধু কি তাই! আপনি যে সব উত্তর দিয়েছেন আপনার জ্ঞান আপনার বিবেক অনুযায়ী সেগুলো চেক্ অপ্ করতে করতে সে বিষম খাবে, আঁতকে উঠবে আর গোঙরাতে গোঙরাতে বলবে, "এসব কি উত্তর দিয়েছেন। বরঞ্চ আপনার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হলেও হতে পারে কিন্তু এসব উত্তর দিলে পাসপর্ট-প্রাপ্তি হবে না।" সে জানে, হুজুররা কি উত্তর শুনতে চান এবং শুধু তাই নয়, আজ কি উত্তর শুনতে চান, মত পালটে পরশু দিন ফের কোন্ উত্তর শুনতে চান। সে নূতন ফর্ম তার বাক্স থেকে বের করবে—আপনাকে ফের কিউয়েতে ধন্না দেবার 'গব্বযন্তনা' থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে—এবং এমন সব আকাশকুসুম, সোনার পাথরবাটি উত্তর লিখবে যে এবারে আপনার বিষম খাবার, আঁতকে ওঠবার পালা।

কিন্তু আপনি পাসপর্ট পেয়ে যাবেন। যদিস্যাৎ না পান তবে জানবেন অন্য কোনো ব্যাপারে আপনার জীবন "নিষ্কলঙ্ক" নয়। পুলিস আপনার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে, কিংবা আপন ফাইল (দসিয়ে) থেকে আবিষ্কার করেছে, আপনি ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রুশ লেখক গর্কির "মাদার" পড়েছিলেন, কিংবা—ওয়েল নেভার মাইন্ড—"কিছু একটা" আছে।

এমন সময় আপনার এক উকীল বন্ধু আপনাকে বললে, "সংবিধানে প্রত্যেক ভারতীয়কে জন্মগত অধিকার দিয়েছে, যত্রতত্র গমনাগমনের স্বাধীনতা। ঠোকো মোকদ্দমা। পেত্যয় যাবেন না, আপনার চেয়েও শতগুণে তালেবর এক খলিফে ব্যক্তি সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত লড়ে বিদেশ যাবার পাসপর্ট পেয়েছিলেন। তিনি বগল বাজিয়ে প্লেনের টিকিট কাটতে ধাওয়া করেছিলেন কি না জানি নে, আমরা হুঁশিয়ার করছি,

ঘুঘু দেখেই নাচতে শুরু
ফাঁদ তো বাবা দেখোনি।

কিংবা "না আঁচিয়ে" ভরসা কই! কিংবা সুকুমার রায়ী ভাষায়

কেই বা শোনে কাহার কথা
কই যে দফে দফে।
গাছের পরে কাঁঠাল দেখে
তেল দিয়ো না গোঁফে॥

পাসপর্ট পাওয়ার পর একটি

বৈষ্ণব হইতে মনে গেল বড় সাধ।
তৃণাদপি শোলোকেতে ঘটালো পরমাদ॥

সে তৃণটি এস্থলে 'পী ফরম্'। বিদেশের হোটেলে তো আপনাকে মুফতে থাকতে দেবে না, রেস্তোরাঁতে মাগনা খেতে দেবে না, অতএব আপনার বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন। সে মুদ্রা ক্রয় করার তরে আপনি দিশী মুদ্রা দিতে প্রস্তুত,

কিন্তু "পী ফর্মের" পীঠস্থান রিজার্ভ ব্যাংক সবিনয় বলবে, "এদানীর বিদেশী অর্থের বড়ই অনটন। সরি!" কথাটা খুবই সত্য, সে-কথা আমি কোনো ব্রাহ্মণ বন্ধুর কাছ থেকে পৈতে ধার করে সেইটে ছুঁয়ে কসম খেতে রাজী আছি।

সবই জানি। শুধু জানি নে, পাসপর্ট না পেলে যে-রকম মোকদ্দমা করা যায় রিজার্ভ ব্যাংক বিদেশী কড়ি না দিলে তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা যায় কি না।

এ পর্যায়ে কিন্তু একটি শেষ কথা না বললে অন্যায় হবে। কর্তারা যে যাকে তাকে চট করে বিদেশ যেতে দেন, তার প্রচুর কারণ আছে! কিন্তু সেকথা আরেক দিন হবে।

মোদ্দা কথায় ফিরে যাই।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই সব বহুবিধ যাবতীয়, হরেকরকম্বা সমস্যা সম্বন্ধে সবাই ছিল উদাসীন। মার খেয়ে খেয়ে, এবং তার চেয়েও নির্মমতর অভিজ্ঞতা —পয়সাওয়ালা কি করে সর্ববাধা অতিক্রম করে সর্বত্র যাতায়াত করেন বিজনেস-মেন দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বিদেশে যাবার তরে সর্ব ছাড়পত্র সংগ্রহ করে ড্যাংড্যাং করে রওয়ানা দিলেন, আপনি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন, সে তো বুঝি, কিন্তু সঙ্গে তাঁর বিরাটকলেবরা ভামিনী গোটাদুত্তিন বালক পুত্র এবং কন্যা—এনারা যাচ্ছেন দেশের কোন্ "সম্পদ বৃদ্ধি" করতে, এবং এনাদেরই একজন

উনিশটিবার ম্যাট্রিকে সে
ঘায়েল করে চললো হেসে
বিলেত কিংবা ওয়াশিংটন
মুদ্রা মেলা, হাজার টন।

এ তো বিদেশের কথা। কটা লোকই বা বিদেশে যাবার মত রেস্ত ধরে! দেশের ভিতরকার সমস্যাই বা কিছু ছেড়ে কথা কয় নাকি? একদা, ভূমিকম্প হলে, যথেষ্ট বৃষ্টিপাত না হলে, টাইগার হিল থেকে কুয়াশার দরুন কাঞ্চনজঙ্ঘার দর্শন না পেলে, বাঁজী পাঁঠি বাচ্চা না বিয়োলে অন্যথা বউ সাত নম্বরের বাচ্চা বিয়োলে, পর্যাপ্ত পরিমাণে কচ চুকুস চুকুস করে না চাখতে পারলে, গণ্ডায় গণ্ডায় রামমোহন রবি ঠাকুর না জন্মালে আমরা "বণিকের মানদণ্ড"-র উত্তরাধিকারিণী মহারাণীর (পাড়ার ঘোষাল বলতো, ব্যাটাদের ঘিনপিতও নেই —বেনের এঁটো গরগর করে খেল রাজার বেটা-বেটি) বাজার সরকার বড়লাটের খুলিতে ডবল বম্ ফাটাবার চেষ্টা করতুম—অবশ্য সঙ্গোপনে মনে মনে।

সুস্থাবস্থায় কিন্তু সেই মনেই অতিশয় বেয়াদব প্রশ্ন শুধতো এসব বর্গীদের "খাজনা দেব কিসে?"

গুরু বড় দুঃখে বলেছিলেন, "শ্মশান থেকে শ্মশান থেকে ঝোড়ো-হাওয়ায় হা হা করে উত্তর আসে আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে—বুকের রক্ত দিয়ে।"

একই নিঃশ্বাসে গুরুর সেই ভবিষ্যৎ বাণীর সঙ্গে আমার পরবর্তী যুগের অক্ষম সাবধান বাণীর কথা তুলি কোন পাপমুখে ? কিন্তু পাঠক ক্ষণতরে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন, এটা আমার দম্ভ নয়। ঝাড়া তিনটি মাস মেসের ভাত না খেলে (কিংবা উপস্থিত আমি যে নার্সিং হোমের ঘুঁটে খাচ্ছি যে বস্তুর অভিজ্ঞতা না থাকলে) মায়ের রান্নার প্রকৃত মূল্য কে কখন বুঝতে পেরেছে ? যুধিষ্ঠিরকে যে নরক দর্শন করানো হয়েছিল সেটা বিধাতার কোন উটকো খামখেয়ালী নয়। নইলে স্বর্গপুরীর অপ্সরাদের সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ বিশ্রম্ভালাপ করার পূর্ণানন্দটা তিনি তারিয়ে তারিয়ে চাখতেন কি প্রকারে ? গব গব করে গিলতেন, আমরা যে-রকম মেসের রান্না হড় হড় করে গিলে রেকর্ড টাইমে পাপ বিদেয় করি। ··এইবারে শ্যানা পাঠক নিশ্চয় বুঝে ফেলেছেন, আমার প্রবন্ধ সাতিশয় মনোযোগ সহকারে পঠন কেন অবশ্য কর্তব্য, একান্ত অবর্জনীয়। তার চেয়েও ইম্পর্টেন্ট প্রবন্ধ : তার চেয়ে আরো ইমপরটেনট কর্তব্য. আমার বই কিনুন —চাই পড়ুন, চাই না বা পড়ুন।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমি পুনঃ পুনঃ বলেছিলুম, "আরো কঠোরতর, আরো নির্মমতর খাজনা দিতে হবে স্বরাজ লাভের পর ? এইবেলাই যদি সে-খাজনার সন্ধান না নাও তবে তোমার কপালে বিস্তর গর্দিশ আছে। এই দেখুন না আজ পূর্ব বাঙলার হাল। কাল যে পশ্চিম বাঙলায় হবে না তার আশ্বাস দেবেন কোন্ পলিটিকাল গোঁসাই ?—আমি অবশ্য এসব দুর্যোগের ভবিষ্যৎ বাণী আপ্তবাক্য রূপে প্রকাশ করি নি। কিন্তু যা-কিছু নিবেদন করেছিলুম সেটা কেউ কান পেতে শোনে নি। (বলতে ইচ্ছে করছে এখন তবে খাও কানমলা, "কান টানলে মাথা আসে" সেটা যেমন সত্যি, ঠিক তেমনি সত্যি "কান না পাতলে কানমলা খেতে হয় ")।

ও'রা বলতেন বা ভাবতেন, আমার বক্তব্য স্পেশালাইজ্‌ড নলেজ ; এসব এখন তকলীফ বরদাস্ত করে আমরা পড়বোই বা কেন, বুঝতে যাবোই বা কেন ? আগে স্বরাজ আসুক তারপর অন্য কথা। আমি সবিনয় বলেছিলুম, "রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না ?"

মার খেয়ে অপমান সয়ে সয়ে আমরা এখন অনেক কিছু শিখে ফেলেছি—এই যেমন খানিকক্ষণ আগে পাসপর্ট কি প্রকারে পেতে হয়, সেটা পাওয়ার পরও আপনার কপালে আর কোন্ কোন্ গর্দিশ আছে সে সম্বন্ধে অতিশয় যৎকিঞ্চিৎ সাতিশয় সংক্ষেপে নিবেদন করেছি।

তারই ফলে একদা যে সব তথ্য নিয়ে শুধু স্পেশালিস্টরা আলোচনা করতেন, যেগুলো নিছক "স্পেশালাইজ্‌ড্ নলেজ" ছিল—এখন সেগুলো হয়ে গিয়েছে ডাল-ভাত "কমন নলেজ"। একদা যেমন বিশেষজ্ঞরাই শুধু মাথা ঘামাতেন, পৃথিবী ঘোরে না সূর্য ঘোরে, পরবর্তী যুগে সেই সমস্যার সমাধান কমন নলেজ হয়ে দাঁড়াল !

চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বঙ্গসন্তান "আমার য়ুরোপ ভ্রমণ", "লণ্ডনে বঙ্গ মহিলার ঘরকন্না", "নরওয়েতে প্রথম বঙ্গরমণী" উৎসাহ ও কৌতূহল সহকারে

পড়তো। এখন এত শত লোক নিত্য নিত্য বঙ্গো ইন্ কঙ্গোতে উইক এণ্ড্ কাটাতে যায়, জব্‌ল্ অল্ অল্‌বীয়াতে হানিমুনের প্রথমার্ধ চুষে আসে যে "ক্রাস্প ভ্রমণ" কিংবা "মস্তে কার্লা দর্শন" শিরোনামা এখন সে অবজ্ঞার চোখে দেখে, লেখক পরিচিতজন হলে গেরেমভারি মুরুব্বীর মত তাকে পেট্রোনাইজ করে পিঠ চাপড়ে বলে, "লেগে থাকো ছোকরা; এখনো হাদ্রামুৎ অঞ্চলে অমুসলমানকে ঢুকতে দেয় না বটে কিন্তু তুমিই হয়তো একদিন সেখানকার সেই বিরাট প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ যেখানে একদা শেবা'র রানী বাস করতেন সেইটে সকলের পয়লা দেখে এসে তাবৎ গোড়জনকে তাক লাগিয়ে দেবে।"

একদা আমি "দেশে-বিদেশে" নাম দিয়ে কাবুল সম্বন্ধে একখানা পুস্তক রচনা করি। প্রকাশকালে বইখানা কিছু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শুনেছি, এখনো নাকি কেউ কেউ বইখানা পড়ে। আমি জানি, কেন? তার একমাত্র কারণ যদিও কাবুল পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে অবস্থিত নয়, এবং উত্তর মেরুতে অভিযান করার মত বিপজ্জনকও নয়, তবু একাধিক কারণে—প্রধানতম কারণ অবশ্য এই যে আফগান সরকার চট করে সম্বাইকে ও-দেশে যাবার অনুমতি-লাঞ্ছন ভিজা-পারমিট মঞ্জুর করে না, এবং এই একটি কারণই পূর্বে উদ্ধৃত "তৃণাদপি শোলকের" মত কাবুলগামীর সম্মুখে অলঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধন; কাবুলী প্রবাদও বলে—"সিংহের এক বাচ্চাই ব্যস (যথেষ্ট)।" বইখানি তাই এখনো লিক্‌লিক্ করে টিকে আছে।

গোড়জনের কমন নলেজ এ-কালে এতই সুদূরবিস্তৃত—ভয়ে ভয়ে বলি, কুলোকে বলে শুদু বিস্তারই আছে—গভীরতা আদৌ নেই এবং সে-বিস্তারও নাকি বড্ড পল্লবগ্রাহী—যে তাদের মন পাওয়া প্রতিদিন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শুনতে পাই, বিকৃত যৌনজীবন, এবনরমাল সেক্‌স্, সমকাম, সাদিজ্‌ম্, মাসোখিজ্‌ম্, পিকচার পোস্টকার্ড, ব্লু ফিলম ইত্যাদি ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়বস্তু বেহদ্দ রগরগে ভাষায়, সর্ববিধ অসম্ভব অসম্ভব ফোটোগ্রাফ-সহ পরিবেশন করলেও তাঁরা যে শুধু নাসিকা কুঞ্চিত করেন তাই নয়, বাঁ দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে, ডান ভুরু ইঞ্চিটাক উত্তোলন করে বলেন, "ছোঃ! চাঃ!! পুঃ!!! এগুলো আবার কি? ক-অ-অ-বে কোন আদ্যিকালে এ-সব তো কমন নলেজেরও নিচের স্তরে নেমে গিয়েছে। পুলিসের নাকের সামনে পেভমেণ্টে বিক্রী হয়, জলের দরে। শোনো নি বুঝি—'থাকো কোন্ ভবে কোন্ দুনিয়ায়?'—যবে থেকে ডেনমার্কে এসব মালের উপর থেকে ব্যান তুলে দেওয়া হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তার বিক্রি দশ আনা পরিমাণ কমে গিয়েছে! তাবৎ বস্তু, সাকুল্যে বিষয় ব্যান তুলে দেওয়ার ফলে যখন তিন দিনের ভিতর কমন নলেজ হয়ে গেল, তখন আর ওসব মাল কানা কড়ি দিয়েও কিনবে কে? শুনেছ, এখন নাকি দিনেমার প্রকাশক ওসব মাল তালাক দিয়ে ধর্মগ্রন্থ ছাপবে! সেক্‌স্ যখন স্পিরিচুয়াল লেভেলে উঠে গিয়েছে তখন স্পিরিচুয়াল বই অর্থাৎ গ্রন্থ ছাপানোই প্রশস্ততর।"

হ্যাঁ, তদুপরি আরেকটি খবর আমি কাগজে পড়েছি। তদ্বাটি আমি বাল্য-

কালেই শুনেছিলুম। "পরিপূর্ণ স্বাদ পেতে হলে চুম্বনটি চুরি করে নিতে হয়।" "এ কিস টু বী দি সুইটেস্ট্ হ্যাজ টু বি স্টোলেন।" সম্মানিত মার্কিন কাগজে পড়লুম, নাম ছিল "লেডি চ্যাটারলিজ লয়ারজ"—"লাভারজ" নয়—অর্থাৎ কি না মার্কিন মুল্লুকে যখন লেডি চ্যাটারলি কেতাবখানা অশ্লীল কিংবা কাব্য-রসের অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ কি না ঐ নিয়ে মোকদ্দমা উঠলো তখন এক বাঘা উকিল বিচারগৃহ প্রকম্পিত করে ওজস্বিনী ভাষায় তাঁর সুদীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করে আবেগোচ্ছল কণ্ঠে বললেন, "ধর্মাবতার তথা সম্মানিত জুরি মহোদয়গণ। লেডি চ্যাটারলি পুস্তকে গ্রন্থকার যে অপূর্ব কলানৈপুণ্য ও সত্য শাশ্বত সাহিত্যরস সৃষ্টি করেছেন তাই নয়, যৌনজীবনকে তিনি স্পিরিচুয়াল লেভেলে (আধ্যাত্মিক স্তরে, তুলে নিয়েছেন, তুলে ধরেছেন।"

এই শেষ অভিমতটি শুনে এক পরিপক্কা সমাজে সম্মানিতা ফরাসী নাগরী মৃদু দুষ্টু মেয়ের স্মিত হাস্য হেসে বললেন, "সর্বনাশ! আমি তো এ্যাদ্দিন জানতুম যৌন সম্পর্কটা নিষিদ্ধ পাপাচার। এখন থেকে ঐ আনন্দের অর্ধেকটাই মাঠে মারা গেল।"

নিষিদ্ধ হোক্, কিংবা পুলিসসিদ্ধ তথা শাস্ত্রসম্মত হোক আর নাই হোক বিদগ্ধ গৌড়ীয় পাঠক এখন চান কড়াপাকের মাল, তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত—একদা যে রকম "নৃত্যসম্বলিত" গ্রামফোন রেকর্ড সাদামাটা রেকর্ডের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল। অর্থাৎ পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে আমি যে সওগাৎ পরিবেশন করেছিলুম তাঁরা অধুনা সেই বস্তু চান।

কিন্তু আমি পোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরাই।

ইতিমধ্যে আবার অন্য দিক থেকে আরেক বিপরীত বায়ু বইতে আরম্ভ করেছে। জীবনসংগ্রাম কঠোরতর হয়েছে, পাপাচারের উত্তাল তরঙ্গ গিরিচূড়া লঙ্ঘন করে ঊর্ধ্বমুখে উৎক্ষিপ্ত, দিনান্তে বলীবর্দের ন্যায় কর্মক্লান্তজন স্বগৃহে পৌঁছবে না টিয়ার গ্যাসে অন্ধ হবে এবং/কিংবা গুলি খেয়ে পঞ্চভূতে লীন হবে সেই দুশ্চিন্তায় সে ম্রিয়মাণ মোহ্যমান।

ঠিক এই একই অবস্থাতে ফরাসী সাহিত্যের তদানীন্তন গ্রাঁ মেৎর্ (গ্র্যান্ড মাস্টার) কি উপদেশ দিয়েছিলেন সেটি অবহিত চিত্তে শ্রবণ ক'রে কর্ণ সার্থক তথা পুণ্যার্জন করুন।

প্যারিসের এক অসহিষ্ণু "গবি" অর্থাৎ যিনি অবোধ্য মডার্নস্য মডার্ন গবিতা লেখেন আনাতোল ফ্রাঁসকে প্রায় শাসিয়ে হুঁশিয়ার করে তালিম দেন, "কবিতা পড়াটা কিছু ছেলেখেলা নয়, যে ছ্যাবলামো এ্যাদ্দিন ধরে চলে আসছে। "মডার্ন" কবিতা আগাপাস্তলা সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু।[৬] এ "কবিতা"-বেটলের প্রতি

৬ পঞ্চাশাধিক বৎসর পূর্বে যখন মডার্ন কবিতা (গবিতা) তার বিজয়া-ভিযানের উত্তুঙ্গ শিখরে তাণ্ডব নৃত্যে নিমগন তখন কতিপয় গুণীজ্ঞানী লণ্ডনে একটি বিতর্ক সভা আহ্বান করেন। বিষয়বস্তু "আধুনিক কবিতা বনাম প্রাচীন ("রোমান্টিক, 'সাবেকী) কবিতা। দুই পক্ষ আপন আপন বক্তৃতা শেষ করায়

পাঠককে তীর্থযাত্রীর ন্যায় অবনত মস্তকে অগ্রসর হতে হয়। ভক্তিশ্রদ্ধা তথা (সুচাগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেণ) একাগ্রতা সহ মডার্ন পোয়েট্রির দ্বারস্থ হতে হয়।" ("মডার্ন পোয়েট্রি শুড্ বি এপ্রোচট উইদ ডিভোশন অ্যান্ড কনসানট্রেশন")

এ-উদ্ধৃতি দেওয়ার পর ফ্রাঁস যেন দিবাদ্বিপ্রহরে সাক্ষাৎ যমদূতের দর্শন পেয়ে সাতঙ্কে ভগবানকে স্মরণ করছেন—যে ফ্রাঁস আযৌবন প্রকাশ্যে একাধিক-বার তাঁর নাস্তিকতা প্রচার করেছিলেন; এর থেকেই সর্ব আস্তিক সর্ব নাস্তিক অনায়াসে বুঝে যাবেন সেই 'গবির আপ্তবাক্য' শুনে তাঁর হৃদয়ে কী মারাত্মক গগনচুম্বী পাতালস্পর্শী ভীতির সৃষ্টি হয়েছিল। উচ্চকণ্ঠে সৃষ্টিকর্তাকে আবাহন জানিয়ে প্রার্থনা করছেন:

"হেভ্ন্ ফর্বিড্!" দেবভাষায় বলা হয় "ঈশ্বর রক্ষতু", মুসলমান বলে "লা হাওলা কুয়োতি ইল্লা বিল্লা।" বাঙলায় এস্থলে ঠিক কি বলা হয় জানি নে। ভূত দেখলে লোকে রাম নাম স্মরণ করে অবশ্য। কিন্তু এস্থলে প্রার্থনা রয়েছে, নাস্তিক ফ্রাঁস বলছেন, "ঈশ্বরাদেশে এ-হেন অপকর্মে যেন বিরত হয়।"

এর পরই ফ্রাঁস বলেছেন, "আমি জানি বেচারী (সাধারণ) ফরাসীকে সমস্ত দিন সামান্য রুটি-মাখমের জন্য কী রকম মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়।"

এস্থলে এগোবার পূর্বে পাঠককে ফের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, "ত্রেতা" যুগটি আমি লিখছি ("দ্বাপরের" পরে। কেন, সেটা যাঁরা তাপসী অহল্যার কাহিনী পড়েছেন তাঁরাই জানেন) হাসপাতালে। (যদিও খানদানী ভাষায় এটি "নার্সিং হোম" বা "মেডিকাল সেণ্টার" নামে সগৌরবে প্রচারিত, তথাপি আমার সামান্য অভিজ্ঞতা প্রতিবাদ জানিয়ে অজ্ঞজনকে হুঁশিয়ার করে বলে, এটা 'হোম' তো নয়ই, এবং আচার আচরণ, প্রাচীন যুগীয় সাজসরঞ্জাম দেখে মনে হয়, 'মেডিকাল সেণ্টার'-এর নাম পালটে এটাকে 'মেডীঈভাল—মধ্যযুগীয়—কান্তার' নাম দিলেই এর প্রতি সত্য বিচার করা হয়, কিংবা 'মেডীঈভাল হাণ্টার'ও বলতে পারেন,

---

পর সভাপতি গ্র্যান্ড মাস্টার এড্মাণ্ড গস্ (ইনিই বোধ করি তরু দত্তের ইংরিজী কবিতা পুস্তকের অবতরণিকা বা এবং শ্রীমতীর পরিচিত পত্রিকা লিখে দেন। ইনি সাহিত্যরস আস্বাদনে এবং তার মূল্যায়নে অদ্বিতীয় ছিলেন) বলেন, "কবিতা মাত্র দু'রকমের হয়; উত্তম কবিতা ও নিকৃষ্ট কবিতা। মডার্ন (অর্বাচীন) কবিতা ও ওল্ড (প্রাচীন) কবিতা এ রকম কোনো ভাগাভাগি বা শ্রেণীবিভাগ করা যায় না।

৭ এ তত্ত্বও এমন কিছু "আমরি আমরি মার্কা শিক্ (chic), দের্নিয়ে ক্রী (dernier cri), আ লা মদ্ (a la mode) অভিনয় নয়। চার্লস ল্যাম্ (lamb) বহু পূর্বেই বলেছেন, আহার আরম্ভের পূর্বে আমরা যে রকম প্রার্থনা করি (গ্রেস পড়ি) উত্তম কাব্য পাঠের পূর্বেও সে-রকম উপাসনা করা কর্তব্য। এবং ভিন্ন ভিন্ন কাব্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা। ল্যাম্ অবশ্য সুপ্রতিষ্ঠিত যশলব্ধ কাব্যের জন্যই—যে-সব কাব্য সেঞ্চুরি এগজামি-নিশেন পাস করেছেন (শতাব্দী বিজয়ী কাব্য)—এই নবীন ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন।

এবং এখানে কি 'শিকার' হয় তার আলোচনা করে অসুস্থ শরীর নিয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে চাই নে)। সবসুদ্ধ মিলিয়ে এখানকার কর্তৃপক্ষই স্মৃতিভ্রষ্ট হন, আমি যে আনাতোল ফ্রাঁসকে উদ্ধৃত করার সময় পর্বতপ্রমাণ ভুলভ্রান্তি করবো সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিকএবং "কার্সিং" (প্রুফরীডার মশাই, আমি 'কার্সিং' 'অভিসম্পাত' 'অভিশপ্ত'-ই লিখেছি—সজ্ঞানে ; "নার্সিং" লিখি নি) "বম্" বাবদে যাঁদের সমান্যতম অভিজ্ঞতা আছে, অর্থাৎ এ-পুরী থেকে সুস্থ অস্থি নিয়ে নিতান্তই ভগবদ্কৃপায় বেরুতে পেরেছেন তাঁরা যে আমাকে ক্ষমাসুন্দর চক্ষে দেখবেন সেটা ততোধিক স্বাভাবিক।

ফ্রাঁস বলেছেন, "বেচারী ফরাসী যখন ক্লান্ত দেহে শ্লথ পদে বাড়ি পেঁছে একখানা পুস্তক হাতে তুলে নেয় (অর্থাৎ, অত্যধিক মদ্যপান করে বউকে না ঠেঙিয়ে, কিংবা ঝটপট জুয়ো খেলতে বসে বউ বাচ্চার জন্য দু'মুঠো অন্ন কেনার রেস্ত উড়িয়ে না দিয়ে—লেখক) তখন, ঈশ্বর রক্ষতু, আমি তার কাছ থেকে 'সশ্রদ্ধ একাগ্রতা' (ডিভোশন অ্যান্ড কনসানট্রেশন) মোটেই কামনা করি নে—" বলছেন ফ্রাঁস। তারপর তিনি যেন নিবেদন করছেন : "আমি যা দিতে চাই, এবং সেই আমার উজোড় করে দেওয়া, (অল্ আই উয়োন্ট টু গিভ) তার যেন একটুখানি শ্রান্তি বিনোদন হয়, তার যেন একটুখানি ফুর্তি জাগে (রিলেকসেশন, এনটারটেনমেনট্, এম্যুজমেন্ট হয়)। এবং যেদিন ঐ সবের ফাঁকে ফাঁকে ঐ বেচারী ফরাসীকে কোনো প্রকারের কোনো ইনফরমেশন দিতে পারি, সেদিন আমার আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকে না (মাই জএ নোজ নো বাউন্ড্জ)।"

দম্ভী মসিয়ো মরিসকে,—আমার পাঠকদের মধ্যে দম্ভী কেউ নেই, কিন্তু যদিস্যাৎ কোনো উটকো দম্ভী মাল ছিটকে এসে গোলে হরিবোল দিয়ে থাকেন তবে তাঁকে বলছি, অবহিতচিত্তে প্রণিধান করো, যে-ফ্রাঁসকে ফরাসীদেশের লোক গ্রাঁ মেৎর্, গ্র্যান্ড মাস্টার, গুরুদেব বলে একবাক্যে স্বীকার করে সাহিত্যের ময়ূর সিংহাসনে বসিয়েছিল তিনি কতখানি বিনয় সহকারে বলছেন, তাঁর "নগণ্য" অর্ঘ্য কি ? এবং সেটা এমনি যৎসামান্য অকিঞ্চিৎকর যে তার জন্য কোনো পাঠকের কাছ থেকে কোনো প্রকারের ডিভোশন বা কনসানট্রেশন তিনি চান না।

এবং সর্বশেষে মসিয়ো মরিসকে একটুখানি ধূলি পরিমাণ উপদেশ দিচ্ছেন : "তদুপরি সর্বোপরি, হে মসিয়ো মরিস, তুমি যদি শতাব্দীর পর শতাব্দী ভ্রমণ করতে করতে পেরিয়ে যেতে চাও তবে হাল্কা হয়ে ভ্রমণ করো।" (ইফ্ ইউ উয়োন্ট টু ট্র্যাভেল থ সেঞ্চুরিজ, ট্র্যাভেল লাইট !)

কী মহান আপ্তবাক্য ! মরিস, তুমি যদি চাও যে তোমার রচনা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লোকে পড়ুক, তবু সে-রচনার ঘাড়ে বিস্তরে বিস্তর ভারি মাল চাপিয়ো না। অর্থাৎ যে-মাল কনসানট্রেশন চায়, ডিভোশন চায়।

ব্যাসদেব এ-তত্ত্বটির প্রথম আবিষ্কারক। গণপতিকে যখন তিনি মহাভারতের ডিকটেশন নেবার জন্য মনোনীত করেন তখন তাঁর মাত্র একটি শর্ত ছিল, তুমি নিজে না বুঝে কোনো বাক্য লিখতে পারবে না।" গণপতি 'গণে'র অর্থাৎ সাধারণজনের, mass-এর প্রতিভূ। অতএব তিনি লিখবেন সব কিছু নিজে

প্রথমটায় বুঝে নিয়ে যাতে করে জনগণও সব কিছু বুঝতে পারে। তাই বোধ হয় কাব্যতত্ত্ববিশারদ তলস্তয় মন্তব্য করেছিলেন, মহাভারতের মত কাব্য ইহসংসারে আর নেই।

আনাতোল ফ্রাঁস হুবহু এই আদর্শটিই শ্রীমান মরিসের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

অবনত মস্তকে, করজোড়ে, দাঁতে দাঁতে কুটো কেটে স্বীকার করছি, প্রাগুক্ত তত্ত্বটি আবিষ্কার করতে এবং সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে আমার অনেকখানি সময় লেগেছিল। অবশ্য মসিয়ো মরিসের মত "সশ্রদ্ধ একাগ্রতার" প্রত্যাশা করার মত হিমালয় বিনিন্দিত উত্তুঙ্গ দম্ভ আমার কস্মিনকালেও ছিল না। আমি ভুল করেছিলুম অন্য ক্ষেত্রে। আমি মনে করেছিলুম দেশবিদেশ ঘুরে আমি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, একাধিক ভিন্ দেশে বাধ্য হয়ে যে দু'একটি ভাষা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, বহুবিধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ এবং তার নির্যাস গলাধঃকরণ করেছি, নানান ধরনের নানান চিড়িয়ার সঙ্গে মোলাকাৎ-সহবাসের ফলে যে আদর-অনাদর, দাগা-মহব্বৎ পেয়েছি, প্রবাসের নিরানন্দ দিনে, নির্জন ত্রিযামা শর্বরীতে আকাশকুসুম চয়ন করেছি, দীর্ঘ, দীর্ঘকাল ধরে মাতৃবিরহের অসহ কাতরতা এবং তার চেয়েও নিষ্ঠুর উপলব্ধি যে পুত্রবিরহিণী আমার মা-জননী আমার চেয়ে কত লক্ষ গুণে কাতর নিরানন্দ নিরালোক দিনযামিনী যাপন করছেন আমার প্রত্যাগমন প্রত্যাশা করে—এর মধ্যে অসাধারণ অলৌকিক এমন কোনো সৃষ্টিছাড়া উপাদান-উপকরণ নেই যেটা আমার মত নিতান্ত সাধারণজনসুলভ সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করলে গৌড়ীয় পাঠকের বোধগম্য হবে না, তাঁর দিকচক্রবাল অতিক্রম করে মহাশূন্যে বিলীন হবে না।

আমি জানতুম, এবং এখনো দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করি যে, হাড় আলসে, রক-বাজীতে দিগ্বিজয়ী ফোকটে টু পাইস কামাবার তরে বাপের কামানো ফোর পাইস ঝট্‌সে ঝেড়ে দিতে প্রস্তুত, এবং পাড়ায় একটি সর্বজনসেবী পাঠাগার নির্মাণের জন্য হোক কিংবা নির্মাণান্তে দলাদলি বশতঃ সেটিকে বীরদর্পে ভস্মীভূত করাই হোক, উভয় মহৎ কর্মের জন্য, তদাভাবে সর্বকর্মের জন্য, তদাভাবে কর্মহীন "কর্মে"র জন্যই হোক, চাঁদা তোলাতে যে বাঙালী অদ্বিতীয়, অপরাজেয়, যে বাঙালী গত বিশ্বযুদ্ধের সময় ঐ মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য হিটলার স্তালিনের চাঁদা তোলার প্রয়াস পদ্ধতি বর্ণনা শুনে "শিশু! শিশু!!" বলে অট্টহাস্য দ্বারা গোরশয্যাশয়ী ঐ দুই মহাপ্রভুকে লজ্জা, আত্মজুগুপ্সায় ঘন ঘন ঘূর্ণায়মান করাতে ভানুমতী বিশারদ, সেই বাঙালী, আবার বলছি, সেই বাঙালী—অন্য জাত যারা ভ্রমণব্যপদেশে কলকাতাতে এসে সভয়ে, আমাদের রঙ্গভূমি থেকে সম্মানিত ব্যবধান রক্ষা করে, আমাদের কীর্তিকলাপের খুশবাইটুকু মাত্র পেয়েছে তারা কিছুতেই প্রত্যয় যাবে না যে বাঙালী বই পড়ে।

হ্যাঁ বই পড়ে। অধিকাংশ স্থলেই অবৈধ কিন্তু মার্জনীয় পদ্ধতিতে। কিন্তু পড়ে।

তাই আমি হয়েদরে ধরে নিয়েছিলুম, আমার বক্তব্য বস্তু যতই হ য ব র ল মার্কা হোক না কেন সেটা তার কাছে কিছুতেই সম্পূর্ণ অপরিচিত হতে পারে না—নিতান্ত দু' একটি উৎকট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া। কারণ প্রকৃত পাঠকের কাছে কোনো বিষয়ই সম্পূর্ণ অজানা নয়, আবার কোনো বিষয়ই সম্পূর্ণ জানা নয়। তাই এক আরব গুণী বলেছেন, "পুস্তক, সে যেন একটি ছোট্ট বাগান, যেটি তুমি অনায়াসে পকেটে পুরে সর্বত্র নিয়ে যেতে পারো।" যখন খুশি তাতে ডুব মেরে ভ্রমরগুঞ্জন কোকিলের কণ্ঠ, বসরাই গোলাপের খুশবাই, সারা দিনমান ঝরণার গান সব কিছুই পেতে পারো। তেমন বই যদি বেছে নাও তবে সে বাগিচায় মিশরের পিরামিড, হিমালয়ের গিরিশ্রেণী, পাভলোভা—পাভলোভাই বা কেন—উর্বশী মেনকার নৃত্যও দেখতে পাবে। এমন কি এমন বই অর্থাৎ এমন বাগিচাতেও তুমি প্রবেশ করতে পারো যে বাগিচা তোমাকে আরো লক্ষ লক্ষ বাগিচার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে। যেমন ধরো, প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে একখানি প্রামাণিক পুস্তক। কত লক্ষ বাগবাগিচার সঙ্গে সে যে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবে সেটা নির্ভর করে শুধু তোমার কৌতূহলের উপর।

আরেক জ্ঞানী বলেছেন, "একখানা পুস্তক যেন একখানা ম্যাজিক কার্পেট; তারই উপর আরামসে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে তুমি যত্রতত্র যেতে পারো, যা ইচ্ছা তাই এমন কি তোমার সেরকম 'রুচি' হলে 'যাচ্ছেতাই' দেখতে পারো।"

তবে হ্যাঁ, আমার মনে ধারণা ছিল, ম্যাজিক কার্পেট রাজারাজড়ার মিনার, অধুনা মার্কিন মুল্লুকের চন্দ্রস্পর্শী প্রাসাদাদির থেকে গা বাঁচিয়ে বহু উর্ধ্বলোক দিয়ে উড্ডীয়মান হয় বলে পাঠক সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পায় না। আমার রচনা হবে যুগ-মানানসই হেলিকপ্টার,—অনেক নিচু দিয়ে যায় বলে, অনেক মন্থরে চলে বলে পাঠক হয়তো অনেক আধ-চেনা জিনিসের চোদ্দ আনা চিনে নেবে।

কিংবা বলি, ম্যাজিক কার্পেটের সন্ধানে অতদূরে যাই কেন? এই কাছেই তো "বাঙলাদেশ", নিত্য নিত্য যার ক্রন্দনধ্বনি আমাদের কানে আসছে, কিন্তু সে-কথা থাক। সেই বাঙলাদেশের ঢাকায় এক কুট্টি ফেরিওয়ালা আম বেচতে এসে বাড়ির সামনের লন্-এর উপর ঝুড়িটা রেখেছে। বাবু উপরের বারান্দা থেকে আমগুলোর দিকে চোখ বুলিয়ে ঈষৎ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, "কি আম আনছো, মিয়া, বড় যে ছোড়ু ছোড়ু (ছোট ছোট)।" কুট্টি এক গাল হেসে উপরবাগে তাকিয়ে বললে, "ছোড তো লাগবই, কর্তা—উচা থনে ছোড় তো লাগবোই। লাম্যা আহেন মহারাজ, তখন দেখবাইন অনে, বরো বরো।"

কিন্তু হায়, আমার পাঠক মহারাজা নেমে এলেন না। আমগুলোর সত্য রূপ তাঁরা নিকটে এসে দেখতে রাজী হলেন না।[৮] সেটা হয়ে যেত "স্পেশা-

৮ উন্নাসিক দার্শনিক বলেন, কাছের থেকে দেখাটাই সব চেয়ে সত্য দেখা তার তো কোনো প্রমাণ নেই। হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়োর উচ্চতা সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান উপলব্ধি করতে হলে তার ডগার উপর বসে সেটাকে দেখতে হয়, এমন নির্দেশ দেয় কোন্ অর্বাচীন! বরঞ্চ সুদূরে দার্জিলিঙ থেকে সেটাকে দেখলে

লাইজড নলেজ"। তখন তাঁরা চাইতেন "কমন নলেজ"। এখন তাঁরা চান "স্পেশালাইজড নলেজ"।

কিন্তু অধম এ-খেলাটি, ইন্দ্রলুপ্তজন আর দ্বিতীয়বার বিলবৃক্ষনিম্নে গমনাগমন "করিবেক" না।

এখন থেকে আমি সুদ্ধুমাত্র অতিশয় সাদামাটা, সাতিশয় নির্জলা "কমন নলেজ" পরিবেশন করবো।

কিন্তু না, পুনরপি না। যদ্যপি উন্নাসিক সম্প্রদায় উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বারংবার বলছেন সেক্স্ "কমন নলেজ" হয়ে গিয়েছে, এবং আমিও এইমাত্র যে প্রতিজ্ঞাপাঠ লিপিবদ্ধ করলুম তার কালি একনো শুকোয় নি,এবং যার অর্থ, আমি এখন থেকে শুধু "কমন নলেজ" নিয়ে লিখব তার অর্থ এই নয় যে আমি ইহসংসারের তাবৎ "কমন নলেজ"-এর বিশ্বকোষ রচনা করতে বসে যাবো। সংসারের বিস্তর পোড়-খাওয়া এক ধনী বাপ মৃত্যুকালে অন্যান্য উপদেশ দিতে দিতে বলেছিল, "আর হ্যাঁ, প্রতি গ্রাসে পাঁচটা করে মাছের মুড়ো খাবি।" পয়সা-ওলা সে বাড়িতে পাকা রুই বাঘা কাৎলা গোত্রের বড় মাছের মুড়ো ভিন্ন অন্য কোন মাছের মুড়ো কস্মিনকালেই প্রবেশলাভ করে নি। ছেলে বেচারী একই গ্রাসে পাঁচটা রুই মাছের মুড়ো খেতে গিয়ে দমবন্ধ হয়ে মৃত পিতার "অনুজ" হওয়ার উপক্রম। বাবা বলতে চেয়েছিল চুনোপুঁটি কেঁচকি পোনার মুণ্ডু খেয়ে সন্তায় আহারাদি সমাপন করবি। আমি কমন নলেজের চুনোপুঁটির মুণ্ডু গিলতে রাজী আছি কিন্তু রাঘব বোয়ালের বাঘা মুণ্ডু এক গরাসে গেলবার চেষ্টা করতে রাজী নই। যদিও মুণ্ডু তো দুটোই। সেক্স্ কমন নলেজ আবার পুরাতন ভৃত্যও কমন নলেজ।

দ্বিতীয়ত, "এ যৌবন জলতরঙ্গ রুধিবে কে রে? হরে মুরারে হরে মুরারে" আর্তনাদ করেছিলেন কবি আকুল কণ্ঠে। এখন "এ যৌন বটতলা প্লাবন রুধিবে কে রে? আই জি রে, পি সি রে?" আমি বাস করি একতলায়। খুব বেশী দিনের কথা নয়, তেড়ে নেমেছে কলকাতার বর্ষা। গৃহিণী দুরু দুরু বুকে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দেখছেন, রাস্তা থেকে পেভমেণ্টে জল উঠেছে। এইবারে পেভ-মেণ্ট ছাড়িয়ে ঘরের ভিতরে জল ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার আবর্জনা ময়লাও অপর্যাপ্ত পরিমাণে। (পৌর পিতারা নিশ্চয়ই উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করেছিলেন এবং মার্কিন টুরিস্টদের দাওয়াৎ করেছিলেন দেখে যেতে, আমাদের কলকাতা কী সুন্দর, কী সাফ, কী সুৎরো) এবং তার পর কেলেঙ্কারি কাণ্ড। ডারু সি-তে জল ঢুকে, না জানি কোন্ বৈজ্ঞানিক কারণে উজান বাইতে আরম্ভ করল কোথা

তার সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান জন্মায়। বিস্তৃত ফ্রেস্কো পেনটিং সম্বন্ধে সেটা আরো বেশী প্রযোজ্য। আর কে বললে আপনি আম দেখছেন! এটা স্বপ্ন, মায়া, মতিভ্রম অনেক কিছুই হতে পারে। এবং সর্বশেষে শুধোবেন, ফেরিওলাই বা কে, বাবুই বা কে? উত্তরে শঙ্করাচার্য কপচে বলবেন, "নত্বং নাহমু নায়ম লোকঃ। তুমি নেই, আমিও নেই, এই পৃথিবীও নেই। আমি তেন্ নাহম্ ছার!

থেকে নানাবিধ স্রোত, ভেসে আসতে লাগল নানাবিধ "অবদান"। বীভৎস রস এস্থলেই সমাপ্ত হোক।

হুবহু একদম সে-ই প্রক্রিয়ারই পুনরাবৃত্তি হল যৌন-'সাহিত্য' মারফৎ। প্রথম ছেয়ে গেল পেভমেণ্ট, তারপর হুড় হুড় করে ঢুকলো ঘরের ভিতরে। কিন্তু সত্যিকার রগড় তো শুরু হল তার পর। যৌন জীবনের যে-সব আবর্জনা আমরা ডারু সি দিয়ে, স্যুয়ারেজ দিয়ে বাড়ি থেকে নগর থেকে বের করে দিয়েছি সেগুলোকে কোন্ এক পিচেশ মার্কা উচাটন মন্ত্রে আবাহন জানালো বাইরের সেই আবর্জনা, সেই বিদেশ থেকে আমদানি যৌন-বটতলীয় 'মাল' যা ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলেছিল কুল্লে পেভমেণ্ট, তাবৎ ফুটপাথ—পুলিসের নাকের ডগায় সুড়সুড়ি দিতে দিতে) আমি পুলিসের ঘাড়ে কুল্লে বেলেল্লাপনার বালাই চাপাতে চাই নে ; দেশের লোক যদি এ-মাল চায় তবে পুলিস আর কতখানি ঠেকাবে ? (দেশ-বিদেশের একাধিক ডাঙর ডাঙর কর্ণধার কখনো সোল্লাসে, কখনো বা মুচকি হেসে, কখনো বা বক্রোক্তি করে 'আপ্তবাক্য' ঝেড়েছেন, "এ নেশন (কানুট্) বি রং।"

এই হৈ-হুল্লোড়, জগঝম্প বাদ্যির মধ্যিখানে কে কান দেবে, মশাই, আপনার গুণগুনানি প্যানপ্যানিতে। আপনার বক্তব্য যতই অসুস্থতাই হোক না কেন তাকে দেখতে হবে সুস্থ মাথায়, অধ্যয়ন করতে হবে শান্তচিত্তে অযথা উত্তেজিত না হয়ে। কিন্তু তাতে কোনো ফায়দা হবে না, এখন থেকে বলে দিচ্ছি। এই যে সেদিন শ্যামাপুজোর সাঁঝ থেকে ভোর অবধি বেধড়ক, আচমকা, নানাবিধ কর্ণপটহ বিদারক বাজী ফাটালে কলকাত্তাইয়া,—সে অন্তে আপনি পাকা সুরেলা হাতে বীণাযন্ত্রে দরবারি কানাড়া বাজালে কান দিত না যেদো-মেধো কেউই। তাই কবি শাবাশ শাবাশ রব ছেড়ে বলেছেন

ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিল জলদাগমে

বর্ষাকাল এসেছে। এখন মত্ত দাদুরী পাগলা কোলা ব্যাঙের পালা। কোকিল যে মৌনতা অবলম্বন করলো সেটা অতিশয় 'ভদ্র' কর্ম (বিচক্ষণেরও বটে)। জন্ম-অভিজাত জাতভদ্রই এ-আচরণ ভিন্ন অন্য আচরণ কল্পনা করতে পারে না।

তা আমি যতই কমন নলেজ নিয়ে পড়ে থাকতে চাইনে কেন, আমার একদল হাউফম্যাসিক (হাফ-গেরস্ত তুলনীয় নয়, থুড়ি থুড়ি, এই দেখুন, ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যতই সন্তর্পণে আপনি যৌনের প্রতি সামান্যতম ইঙ্গিত দিয়েছেন কি, না, অমনি দ্যাখ্-তো-না-দ্যাখ্ ঐ খাটালের বোটকা গন্ধের অর্ধ্যান্যায্য বখরাটি আপনি পেয়ে যাবেনই যাবেন) - হ্যাঁ, কি বলছিলুম, এক দল অর্ধ-উন্মাসিক পাঠক আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন বহু বৎসর ধরে। কেন, বলতে পারবো না। কখনো ভেবেছি, অনুকম্পা বশতঃ। লক্ষ্য করেন নি এই তত্ত্বটি, পথে যেতে যেতে দেখলেন দুই অজানা টীমে ফুটবল খেলা হচ্ছে, তার একটি স্পষ্টত দুর্বল ; আপন অজানতে দেখবেন, আপনার দরদখানি আ—স্তে আ—স্তে ঐ দুবলা টীমের পাল্লার উপর ভর দিচ্ছেন। কখনো ভেবেছি, হয়তো আমার "মুসলমানী চিন্তাধারা, ভাষার যাবনিক কায়দা-কেতা" তার নূতনত্বের জন্য

কোনো কোনো একঘেয়েমি-ক্লান্ত পাঠককে আকৃষ্ট করেছে। আমি অবশ্য সে-সম্বন্ধে অল্পই সচেতন ছিলুম ; আমি জ্ঞানত এমন কোনো বিষয় এমন কোনো ভাষা ব্যবহার করি নি যা সুগন্ধমাত্র যাবনিকতা দ্বারা 'নিত্যনবীনে'র সন্ধানী-জনের পাঁজরে কাতুকুতু দিয়েছে, জড় রসনায় চুলবুল জাগাবার চেষ্টা করেছে। যাবনিক জিনিস আমি আলিঙ্গন করেছি, পাঠকের সম্মুখে পেশ করেছি তখনই, যখন অনুভব করেছি সে যাবনিকতার মধ্যে বিশ্বজনীন ভাব সঞ্চারিত আছে, যে যাবনিকতা দেশকালপাত্র উত্তীর্ণ হয়ে শাশ্বত হবার অধিকার লাভ করেছে। "কোণের প্রদীপ মিলায় যথা জ্যোতিঃ সমুদ্রেই।" বলা বাহুল্য খৃষ্টীয়, অখৃষ্টীয়, জনপদসুলভ ভাবধারা, আমার আবাল্য পরিচয়ের খাসিয়া সাঁওতাল সভ্যতার প্যাটার্ন আমি ঠিক সেই ভাবেই গ্রহণ করেছি যে ভাবে আমি যাবনিক চিন্তামণিকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছি।...এই পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা অতিক্রম করার সময় কিছু পাঠক সর্বদাই আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন, বিশেষ করে দুর্দিনে

দুর্দিনে বলো, কোথা সে সুজন যে তোমার সাথী হয় ?
আঁধার ঘনালে আপন ছায়াটি সেও, হায়, হয় লয় ॥

তঙ্গদস্তীমে কৌন কিসকা সাথ দেতা হৈ ?
কি ছায়া ভী জুদা হোতা হৈ ইনসাঁসে তারীকীমে" ॥

এঁদের বয়েস হয়েছে। এঁদের অনেকেই এখন গভীরে প্রবেশ করতে চান।

আমি তাই একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করবো। দয়া করে আমার সহৃদয় পাঠক সমুদয় তাঁদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ এই অধম লেখককে তার মধ্যপন্থা অবলম্বনের প্রদোষে, তার ধূসর জীবনের গোধূলিতে তাকে আশীর্বাদ করবেন।

আমার অনুরোধ, আমার মূল লেখাটি পড়ার সময় যদি কৃপালু পাঠক অল্পাধিক নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লহরীতে দোলা খেতে খেতে এগিয়ে যান, সে-রস-স্রোতে (যদি আদৌ রসসৃষ্টিতে আমি কথঞ্চিৎ সক্ষম হই) ভেসে ভেসে সমুখপানে চলতে থাকেন তবে হঠাৎ সে-স্রোত থেকে সরে গিয়ে ফুটনোটের গভীরে ডুব দেবেন না।

আর যাঁরা ফুটনোটের গভীরে গিয়ে কিছুক্ষণ সে-গভীরে অবগাহন করার পর ডুবসাঁতার দিয়ে পুনরায় ভেসে উঠে স্রোতোপরি অন্যান্য পাঠকদের সঙ্গে সম্মিলিত হন তাঁরা তখন নিশ্চয়ই আমাকে সস্নেহ আশীর্বাদ জানাবেন।

দ্বাপর

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে রাতদুপুরেই হোক আর দিনদুপুরেই হোক চট করে বলতে পারবেন না, আপনি যে হোটেলে শুয়ে আছেন সেটা কোন্ শহরে। টোকিও ব্যাংকক, কলকাতা, কাবুল, রোম, কোপেনহাগেন যে কোনো শহর হতে পারে। আসবাবপত্র, জানালার পর্দা, টেবিল ল্যাম্প যাবতীয় বস্তু এমনই এক ছাঁচে ঢালা

যে স্বয়ং শার্লক হোমস্‌কে পর্যন্ত তাঁরা সব কটা পুরু পুরু আতসী কাচ মায় তার জোরদার মাইক্রোস্কোপ্‌টি বের করে ওয়াটসনকে কার্পেটের উপর ঘোড়া বানিয়ে, নিজে তার পিঠে দাঁড়িয়ে, ছাতের উপর তাঁর স্বহস্তে নির্মিত আলা হেমস্‌ স্প্রে ছড়িয়ে—বাকিটা থাক্‌, ব্যোমকেশ ফেলুদার কল্যাণে আজ 'ইস্কুল বায়'ও সেগুলো জানে—তবে বলবেন, "হয় মস্তে কার্লোর রেজিনা হোটেল নয় য়োহানেসবর্গের অল হোয়াইট হোটেল।" দূর-পাল্লার এ্যারোপ্লেনের বেলাও আজকের দিনে তাই। একবার তার গর্ভে ঢুকলে ঠাহর করতে পারবেন না, এটা সুইস এ্যার, লুফ্‌ট্‌ হান্‌জা, এ্যার ইণ্ডিয়া না কে এল এম। তিমির পেটে ঢুকে নোয়া কি আর আমেজ-আন্দেশা করতে পেরেছিলেন এটা কোন্‌ জাতের কোন্‌ মুল্লুকের তিমি?

ইণ্ডিয়ান মানেই নেটিভ, মানে রদ্দী। আস্তে আস্তে এ ধারণা কমছে। নইলে জর্মনি এ-দেশের সেলাইয়ের কল, রুশ কলকাতার জুতো কিনবে কেন?

অতএব এ্যার ইণ্ডিয়া কোম্পানির এ্যারোপ্লেনকে একটা চান্‌স্‌ দিতেই বা আপত্তিটা কি? অন্য কোম্পানিগুলো তো প্রায় সব চেনা হয়ে গিয়েছে। অবশ্য আরেকটা কথা আছে। ঐ কোম্পানির এক ভদ্রলোক বুদ্ধি খাটিয়ে তদ্বিরতদারক করে আমার সুখ-সুবিধার যাবতীয় ব্যবস্থা না করে দিলে হয়তো আমার যাওয়াই হত না। তাঁর নাম বলবো না। উপরওলা খবর পেলে হয়তো কৈফিয়ৎ তলব করে বসবেন, কোনো একজন ভি আই পিকে সাহায্য না করে একটা থাড্ডো কেলাস 'নেটিভ' রাইটারের পিছনে তিনি অপিসের মহামূল্যবান সময় নষ্ট করলেন কেন? তবে কি না তাঁর এক ভি আই পি মিত্রও আমাকে প্রচুরতম সাহায্য করেছিলেন। তাঁকে না হয় শিখণ্ডীরূপে খাড়া করবেন।

ভাবছিলুম চুঙ্গী ঘরের (কাসটম্‌সের) উৎপাত থেকে এই দুই দোস্তো কতখানি বাঁচাতে পারবেন। ইতিমধ্যে এক কাস্টমিয়া আমার কাগজপত্র পড়ে আমার দিকে মিটমিটিয়ে তাকিয়ে শুধোলে "আপনিই তো আপনার বইয়ে চুঙ্গী ঘরের কর্মচারীদের এক হাত নিয়েছেন, না?"

খাইছে। এযাত্রায় আমি হাজতবাস না করে মানে মানে কলকাতা ফিরতে পারলে নিতান্তই পঞ্চপিতার আশীর্বাদেই সম্ভবে। কে জানে, এই কাস্টমিয়াই হয়তো হালে কয়েকজন ডাঙর ভি আই পি কাম সরকারী কর্মচারীকে বেআইনীতে মাল আনার জন্য নাজেহাল করেছিলেন।... এত দিন কলকাতা করপরশনের অত্যুৎসাহ ও মাত্রাধিক কর্মতৎপরতা বশতঃ জলের কল খুললে যে রকম জল না বেরিয়ে শব্দ বেরতো সেই রকম আমার রাইটিং পেপারের লাইনিংওলা গলা দিয়ে কথা না বেরিয়ে বেরোল ঘস ঘস খস খস চোঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ ধরনের কি যেন একটা বদখৎ আওয়াজ।

নাঃ। এ-লোকটির রসবোধ আছে কিংবা এঁর বাড়িতে মাসে একদিন করপরেশনের কলের জল আসে বলে ঐ ভাষা বাবদে তিনি সুনীতি চাটুয্যে মশাইকে তাক লাগিয়ে উত্তম ধ্বনিতত্ত্ববাদের কেতাব লিখতে পারবেন। বললেন, "নিশ্চিন্ত মনে ঐ আরাম চেয়ারটায় বসুন। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।" তারপর ডাইনে

বাঁয়ে তাকিয়ে কী এক অশ্রুত টরেটক্কার সংকেত করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে জনাচারেক বাঙালী কাস্টমিয়া আমাকে ঘিরে যা আদর-আপ্যায়ন অদারম্ভ করলেন যে হৃদয়ঙ্গম করলুম, দেবীর প্রসাদে মূক যে-রকম বাচাল হয়, আমি কেন, হরবোলাও মূক হতে পারে।

প্রতিজ্ঞা করলুম, চুঙ্গীঘর লেখাটি আমিই ব্যান্ করে দেব। কার যেন দুশো টাকা ফাইন হয়েছে। অবশ্য অন্য অকারণে, কিন্তু জরিমানা ইজ্ জরিমানা! আপনার কারণ ভিন্ন বলে আপনি তো আর মেকি টাকা দিয়ে শোধবোধ করতে পারবেন না।

কিন্তু এত সব বাখানিয়া বলছি কেন?

শুনুন। জীবনে ঐ একদিন উপলব্ধি করলুম, সাহিত্যিক—তা সে আমার মত আটপৌরে সাহিত্যিক হওয়ার মধ্যেও একটা মর্যাদা আছে।

* * *

এসব যে বাখানিয়া বলছি তার আরো একটা কারণ আছে।

আমার নিজের বিশ্বাস, প্লেনের-পটের ভিতরকার তুলনায় এ্যায়পোর্টের আজব আজব তাজ্জব চিঁড়িয়া দেখতে পাওয়া যায় ঢের বেশী। পাসপর্ট, কাস্টমস, হেলথ অফিসে, রেস্তরাঁয় তাদের আচরণে কেউ বা সংকোচের বিহ্বলতায় অতীব ম্রিয়মাণ, কারো বা গড্ ড্যাম্ ডোন্টো কেয়ার ভাব—ওদিকে একটি বিগতযৌবনা মার্কিন মহিলা এ্যারোপ্লেনে অর্ধনিদ্র যামিনী কাটিয়ে আলুথালু-কেশ, হৃত-পাউডার-রুজ, এঞ্জিনের পিস্টন বেগে পলস্তারা পলস্তরা ক্রীম-পাউডার-রুজ মাখছেন, এদিকে তাঁর কর্তা প্লেনে সস্তায় কেনা স্কচ স্যাঁট স্যাঁট করছেন; আর ঐ সুদূরতম প্রান্তে দেখুন,—দেখুন বললুম বটে, কিন্তু দেখার উপায় নেই—কালো বোরকাপরা জড়োসড়ো গন্ডা দুই মক্কাতীর্থে হজ যাত্রিনীর গোঠ। এঁরা নিশ্চয়ই চলতি ফ্যাশানের ধার ধরেন না। বেশীর ভাগ আঁকড়ে ধরে আছেন পুঁটুলি—হ্যাঁ বেনের পুঁটুলি। গোরুর গাড়িতে গয়নার নৌকোয় ওঠার সময় যে পুঁটুলি সঙ্গে নেন। ওঁরা ভাড়া বাবদ কয়েক হাজার টাকা দিয়েছেন নিশ্চয়ই। অনায়াসে হাল্কা স্যুটকেস কিনতে পারতেন। দু-একজনের ছিলও বটে। কিন্তু ওদের কাছে গোরুর গাড়ি যা, হাওয়াই জাহাজও তা—এদের মক্কা পেঁছিলেই হল। হায়, এঁরা জানেন না, প্লেনে ভ্রমণ—তা সে যে কোনো কোম্পানিই হোক না কেন—গোরুর গাড়িতে মুসাফিরী করার তুলনায় ঢের বেশী তকলীফদায়ক। এমন কি প্লেনে এঁদের পক্ষে হায়া-শরম বাঁচিয়ে চলাও কঠিন। কলকাতার বস্তিতে কি হয় জানি নে, কিন্তু এঁদের যখন প্লেনে করে যাবার রেস্ত আছে তখন এঁরা নিশ্চয়ই সেখানকার নন। আর গ্রামাঞ্চলে কেউ কখনো প্রাতঃকৃত্যের জন্য কিউ দেয় না। অথচ প্লেনে প্রাতঃকৃত্যে জন্য এঁদের কিউয়ে দাঁড়াতে হবে—মেয়েমদ্দে লাইন বেঁধে। সে-কথা পরে হবে। তবে হজ যাত্রীদের জন্য স্পেশাল প্লেনে যদি স্পেশাল ব্যবস্থা থাকে তার তথ্য জানি নে। কোনো কোম্পানী অপরাধ নেবেন না।

* * *

"শুভক্ষণে দুর্গা স্মরি প্লেন দিল ছাড়ি
দাঁড়িয়ে রহিল পোর্টে সব বেরাদরই শুষ্ক চোখে।"

পূর্বেই নিবেদন করেছি প্লেনের ভিতরে দেখবার মত কিছুটি নেই। খেয়া-পারে রেলগাড়িতে যা দেখতে পাওয়া যায় তার চেয়েও কম। আর সর্বক্ষণ আপনার চোখের তিন ফুট সামনে, সমুখের দুটো সীটে দুটো লোকের ঘাড়। তারো সামনে সারি সারি ঘাড়। দোস্ত আমার এ প্লেনের 'মালিক'। অতএব আমার জন্য উইণ্ডো সীটের ব্যবস্থা করেছেন—অর্থাৎ বাঁদিকে তাকালে বাইরের আকাশ দেখা যায় মাত্র, বলতে গেলে পৃথিবীর কিছুই না। একে রাত্রি, তদুপরি আল্লায় মালুম, বিশ হাজার না পঁচিশ হাজার ফুট উপর দিয়ে প্লেন যাচ্ছে। কিছু দেখতে চাইলে ত্রিনয়নের প্রয়োজন। উপরেরটা হয়তো কিছু বা দেখতে পায়। তবে ভারতীয় প্লেনে একটা বড় আরাম আছে। যদিও অধিকাংশ যাত্রী ভারতীয় নয়—বিদেশী, এবং প্রধানতঃ ইয়োরোপীয়। তারা জানে, ইণ্ডিয়ানরা বেলেল্লাপনা পছন্দ করে না। কাজেই অতিরিক্ত কলরোল, এবং ছাগলের দরে হাতি কেনার মত স্কেচ ভোদকা সেবনজনিত মাঝে-মধ্যে তদতিরিক্ত কলহরোল থেকে নিশ্চিন্ত মনে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

এ-বাবদে এখানেই থাক। কারণ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর, সম্মানীয় শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব, ভদ্র প্রবোধ ও অন্যান্য অনেকেই প্লেনের ভিতরকার হাল সবিস্তর লিখেছেন।

জাগরণ, তন্দ্রা, ঘুম সবই ভালো। কিন্তু তিনটিতে যখন গুবলেট পাকিয়ে যায় তখনই চিত্তির। এ-যেন জ্বরের ঘোরে দুদিন না তিনদিন কেটে গেল বোঝ-বার কোনো উপায় নেই।

চিৎকার চেঁচামেচি। রোম! রোম!! রোম!!!

২

ক্যাতলিকদের তো কথাই নেই। প্রটেসটান্‌ট্‌দের ঈষৎ সংযত কৌতূহল। বিশেষ করে মার্কিনদের। দেশে ফিরে বড়ফাট্টাই করতে হবে, হ্যাঁ তেমন কিছু না, তবে কি না, হ্যাঁ, দেয়ালের আর গম্বুজের ছবিগুলো ভালো। কী যেন নাম (ভামিনীর দিকে তাকিয়ে) মাইকেল-রাফাএল, না, হল না। লেওনার্দো দা বিঞ্চিচেল্লি। ও! সেটা বুঝি মোনালিসার লীনিং টাওয়ার?"

বললে পেত্যয় যাবেন না, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, তাজমহলের সামনে বসে একই বেঞ্চে-বসা এক মার্কিনকে তার মিসিসের উদ্দেশে শুধোতে শুনেছি, "কিন্তু আশ্চর্য, এই ইণ্ডিয়ানরা এ-সব তৈরী করলো কি করে—ফরেন সাহায্য বিনা, অর্থাৎ আমাদের সাহায্য না নিয়ে।"

রোমে নামতেই হল। সেখানে আমার এক বন্ধু বাস করেন। কিন্তু তার

ফোন নম্বর জানা ছিল না বলে যোগসূত্র স্থাপনা করা গেল না। একখানা পত্রাঘাত, তদ্বরুণ স্ট্যাম্প যোগাড় করতে না করতেই এ্যার কোম্পানির লোক রাখাল ছেলে যেরকম গোরু খেদিয়ে খেদিয়ে জড়ো করে গোয়ালে তোলে সেই কায়দায় প্যাসেঞ্জারদের প্লেনের গর্ভে ঢোকালে। প্যাসেঞ্জারদের গরুর সঙ্গে তুলনা করাটা কিছুমাত্র বেয়াদবী নয়। মোটা, পাল্টা ঠিক বয়স্ক গরুরই মত লাউঞ্জের মধ্যিখানে একজোট হয়ে বসেছে বটে কিন্তু বাছুরের পাল, অর্থাৎ চ্যাংড়া চিংড়িরা যে কে কোন্ দিকে ছিটকে পড়েছে তার জন্য হুলিয়া শমন বের করেও রত্তিভর ফায়দা নেই। কেউ গেছেন কিওরিওর দোকানে। কাইরোর মত এখানেও খাঁটি ভেজাল দুই বস্তুই সুলভ—এন্তের পড়ে আছে—কিন্তু দুর্লভ, কলকাতার মাছের বাজার-কেও হার মানায় গাহকের কান কাটতে। কেউ বা গেছেন বিনমাশুলের (ট্যাক্স ফ্রী) দোকানে। হয়তো ইতালীর নামকরা একখানা আস্ত ফিয়াৎ (মোটামুটি, ফা (F) ব্রিকাদুসিয়োনে ; ই (i) ইতালিয়ানা ; আ (a) ওতোমোবিলে ; তু (T) রিনো—এই চার আদ্যাক্ষর নিয়ে FIAT, একুনে, ফ্যাব্রিকেশন (মেড ইন) ইতালিয়ানা (of Italy) অটোমবীল (of) তুরীনো। তুরীনো সেই শহরের নাম যেখানে এই স্বতশ্চলশকট নির্মিত হয়, ফিয়াৎ শব্দ আবার আরেক প্রাচীন অর্থ ধরে—"ফরমান", "তাই হোক"।) গাড়ি কিনে নিয়ে আসেন ! একটি হাফাহাফি আধা-আধি, অর্থাৎ পাতে দেওয়া চলে মার্কিন চিংড়ি ঐ হোথা বহু দূরে বার-এ বসে চুটিয়ে প্রেম করছেন একটি খাবসুরৎ ইতালিয়ান চ্যাংড়ার সঙ্গে। খাবসুরৎ বলতেই হবে—এই রোম শহরে ছবি এঁকে মূর্তি গড়ে যিনি নাম করেছেন সেই মাইকেল এঞ্জেলো যেন এই সদ্য একে গড়ে 'চরে খাওগে, বাছা' বলে ছেড়ে দিয়েছেন। আর ইতালিয়ান যুবক-যুবতীর প্রতি মার্কিনিংরেজের যে-পীরিতি সেটা প্রায় বেহায়ামীর শামিল। চিংড়িটা চরে খাবে না কেন ? সর্বশেষে বলতে হয়, ইতালির কিয়ান্তি মদ্য দুনিয়ার কুল্লে সুধার সঙ্গে পাল্লা দেয়। সেটা ও মেয়েটা পাওয়া যাচ্ছে ফ্রী, গ্রেটিস অ্যান্ড ফর নাথিং। মুফৎ মে।

প্লেনে ঢুকে দেখি, সত্যি সেটা গোয়ালঘর। মশা খেদাবার তরে গাঁয়ের চাচার বাড়িতে যে-রকম স্যাঁতসেতে খড়ে আগুন ধরানো হত এখানেও সেই প্রতিষ্ঠান। তবে হ্যাঁ, এটা বিজ্ঞানের যুগ। নানা প্রকারের ডিসিনফেকটেনট, ডি অডরেনট স্প্রে করা হয়েছে প্রেমসে। সায়েবদের যা বী ও—বডি ওডার—গায়ের বোটকা দুর্গন্ধ !!

সকালবেলার আলো দিব্য ফুটে উঠেছে। ইতিমধ্যে প্লেনে পাক্কা সাড়ে পনেরো ঘণ্টা কেটেছে। দমদমা ছেড়েছি রাত ন'টায় ; এখন সকাল আটটা। হওয়ার কথা তো এগারো ঘণ্টা ! কি করে হলো ? বাড়ির কাচ্চাবাচ্চাদের শুধোন।

প্লেন যখন রোম ছাড়ল তখন অপ্রশস্ত দিবালোক।

দিবালোকের সঙ্গে সময়ের সম্পর্ক আছে। যে-দেশে যাচ্ছি, সেই জর্মনির বাঘা দার্শনিক কাণ্ট নাকি বলেছেন কাল এবং স্থান ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না। (টাইম অ্যান্ড স্পেস আর আ প্রিয়রি কনসেপশন)।

কাজের বেলা কিন্তু দেখলুম, তত্ত্বটা আদৌ সরল সহজ নয়।

বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি, যেন দেশের সকালবেলার সাতটা-আটটা। কিন্তু হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে নজর পড়াতে দেখি, সেটি দেখাচ্ছে সাড়ে বারোটা! কি করে হয়? আমার ঘড়িটি তো পয়লা নম্বরী এবং অটোমেটিক। অবশ্য এ-কথা আমার অজানা নয়, অটোমেটিক বেশী সময় কোনো প্রকারের কাকুনি না খেলে মাঝে-মধ্যে থেমে গিয়ে সময় চুরি করে। কিন্তু কাল রাতভর যা এ-পাশ ও-পাশ করেছি তার ফলে ওর তো দম খাওয়া হয়ে গেছে নিদেন দুদিনের তরে। আমার পাশের সীটে একটি চার-পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে। তার পরের সীটে এক বর্ষীয়সী —বাচ্চাটার ঠাকুরমা দিদিমার বয়সী। তাঁর দিকে ঝুঁকে শুধালুম, "মাদাম, বেজেছে কটা, প্লীজ?" মাদামের উস্কোখুস্কো চুল, সকালবেলার 'ওয়াশ', মুখের চুনকাম, ঠোঁটের উপর উষার লালবাতি জ্বালানো হয়নি। শুকনো মুখে যতখানি পারেন ম্লান হাসি হেসে বললেন, "পারদোঁ, মসিয়ো, জ্ন্ পার্ল পা নেদুস্তানি।" অর্থাৎ তিনি 'হিন্দুস্থানী' বলতে পারেন না। ইয়াল্লা। সরলা ফরাসিনী ভেবেছেন, প্লেনটা যখন হিন্দুস্থানী, আমি হিন্দুস্থানের কলকাতাতে প্লেনে উঠেছি, চেহারাও তদ্বৎ, অতএব আমি নিশ্চয়ই হিন্দুস্থানীতে কথা বলেছি। আমি অবশ্য প্রশ্নটি শুধিয়েছিলুম আমার সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত অতিশয় নিজস্ব 'বাঙাল' ইংরিজীতে। ওদিকে এ-তত্ত্বও আমার সবিশেষ বিদিত যে ফরাসীরা নটোরিয়াস একভাষী—ফরাসী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা শিখতে চায় না। তাদের উহ্য বক্তব্য, তাবল্লোক যখন হুদমুদ হয়ে ফ্রান্সে আসছে, বিশেষ করে কড়ির দেমাক, বন্দুক-কামানের দেমাক, চন্দ্রজয়ের দেমাকে ফাটো ফাটো মার্কিন জাত এস্তেক প্যারিসে এসে ফরাসীর মত নাজুক জবান্ শেখবার ব্যর্থ চেষ্টায় হরহামেশা হাবুডুবু খাচ্ছে তখন ওদের আপন দেশে আপোসে তারা যে কিচির-মিচির করে সেগুলো শেখার জন্য খামোখা উত্তম ফরাসী ওয়াইনে সুনির্মিত নেশাটি চটাবে কেন? তবু মহিলাটির উক্তি শুনে আমারো ঈষৎ ন্যাজ মোটা হল। দুর-দুনিয়ার ভারতীয় প্লেন সার্ভিস না থাকলে মহিলাটি কি কল্পনাও করতে পারতেন যে হিন্দুস্থানীও আন্তর্জাতিক ভাষা হতে চলেছে—খলিফে মুসাফির যে-রকম এ্যার ফ্রান্সে ফরাসী, কে এল এমে ডাচ্, বি ও এ সি-তে ইংরিজীর জন্য তৈরী থাকে।

তখন পুনরপি আপন ঔন অরিজিনাল ফরাসীতে প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করলুম। "আ—আ! বুঝেছি, বুঝেছি। কিন্তু এই সময়-সমস্যাটি ভারি 'কঁপ্লিকে' অর্থাৎ কম্প্লিকেটিড, জটিল। আমি ওটা নিয়ে মাথা ঘামাই নে।"

"তবু?"

"সব দেশ তো আর এক টাইম মেনে চলে না। ভোয়ালা!—নয় কি? প্যারিসে যখন বেলা বারোটা তখন রেঙ্গুনে—আমি সেখানে বাস করি—বিকেল পাঁচটা-ছটা। কিন্তু আপনাকে ফের বলছি, ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি টাইম কত জেনে যাই আমার অতিশয় বিশ্বাসী মিনিস্ত্রে দ্য লেতেঁরিয়র'কে (হোম সেক্রেটারি, অর্থাৎ ভিতরকার 'ইন্টেরিয়রে' 'এঁতেরিয়র'কে) শুধিয়ে।

সোজা কথায় পেটটিকে। ওখানে যখন লামার্সে ইয়েজ সঙ্গীত (বাঙলায় 'পেটে যখন হলুধ্বনি') বেজে ওঠে তখন সেটা লাঞ্চের বা ডিনারের সময়। উপস্থিত আমার 'এতেরিয়রেতে' সে-সঙ্গীত ক্রেসেন্ডতে (তার সপ্তকের পঞ্চমে)। তাই এখন রেঙ্গুনে নিশ্চয়ই দেড়টা-দুটো।"

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, "তা এখনুনি বোধ হয় লাঞ্চ দেবে।"

মাদাম যদিও বলেছেন তিনি টাইম নিয়ে মাথা ঘামান না, কিন্তু দেখলুম তার প্র্যাকটিকাল দিকটা খাসা বোঝেন। আপত্তি জানিয়ে বললেন, "রেঙ্গুনে যখন লাঞ্চ তখন এই মিত্রোপাতে (মিৎ=মিড্‌ল্‌ ;—রোপা, ইয়োরোপা-র শেষাংশ অর্থাৎ মধ্য-ইয়োরোপে) ব্রেকফাস্ট। জাপানে যারা এ প্লেনে উঠেছে তাদের তো এখন ডিনারের সময় হয় হয়। সুতরাং কোন্‌ যাত্রী কোথায় উঠেছে, কার পেট কখন ব্রেকফাস্ট/লাঞ্চ/ডিনারের জন্য কান্নাকাটি শুরু করে সে-হিসেব রেখে তো আর কোম্পানি ঘড়িঘড়ি কাউকে লাঞ্চ, কাউকে সাপার, কাউকে স্যানউইচসহ বিকেলের চা দিতে পারে না। তবে কিনা, এরা ব্রেকফাস্টে যে পরিমাণ খেতে দেয় সেটা কলেবরে প্রায় লাঞ্চের সমান। তাই বলছি, এসব টাইমফাইম নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। ট্রেনেও যদি ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িটার দিকে তাকান তবে সে জর্নি দীর্ঘতর মনে হয় না ? আমি তো প্যারিসে পেঁছিতে পারলে বাঁচি। 'ব' দিয়ো' (দয়ালু ঈশ্বর) ঘণ্টা দেড়েকের ভিতর পেঁছিয়ে দেবেন। নাতনীটা নেতিয়ে গিয়েছে।"

মহিলাটি যে-ভাবে সবিস্তর গুছিয়ে বললেন সেটা ধোপে টেঁকে কি না বলতে পারবো না, কারণ আমি যতবার এসেছি গিয়েছি, আহারাদি পেয়েছি, তখন ঘড়ি মিলিয়ে দেখি নি কোন্‌টি লাঞ্চ কোন্‌টা কি ? এবং আজকের দিনে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন টাইমের সালঙ্কার সটীক ফিরিস্তি দেবার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে করি নে। রেডিয়ো ট্রানজিস্টারের কল্যাণে এখন বাড়ির খুকু-মণি পর্যন্ত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দেয়, বুঝিয়ে বলে গ্রীনিচ মীন টাইম, ব্রিটিশ সামার টাইম, সেন্ট্রাল ইয়োরোপীয়ান টাইম, কোন্‌টা কি ? তবু যে এতখানি লিখলুম, তার কারণ ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন টাইম যে কি ভাবে কসরৎ বিনা মেহনৎ আয়ত্ত করতে হয় সেটা ফরাসী মহিলাটি আমাকে শিখিয়ে দিলেন অতি প্র্যাকটিকাল পদ্ধতিতে। সেটা কি ? রাজা সলমন যেটা গুরুগম্ভীর ভাবে, ধর্মনীতি হিসেবে আপ্তবাক্যরূপে হাজার তিনেক বছর পূর্বে প্রকাশ করে গিয়েছেন—'নো দাইসেলফ্‌' 'নিজেকে চেনো (চিনতে শেখো)'! শ'বছর আগে লালন ফকিরও বলেছেন, 'আপন চিনলে খুদা চেনা যায়।' ফরাসী মহিলাটিও সেই তত্ত্বটিই, অতিশয় সরল ভাষায় প্রকাশ করলেন 'আপন পেটটিকে বিশ্বাস করো। তার থেকেই লোকাল টাইম, স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম, সর্ব টাইম জানা হয়ে যাবে। ঐটেই মোক্ষমতম ক্রনোমিটার। বরঞ্চ ক্রনোমিটার মাঝে-মধ্যে বিগড়োয়। আলবৎ, পেটও বিগড়োয়। কিন্তু বিগড়নো অবস্থাতেও সে লাঞ্চ ডিনারের সময়টায় নিগেটিভ খবর দিয়ে জানিয়ে দেয়, তার ক্ষিদে নেই।

ইতিমধ্যে ব্রেকফাস্ট না কি যেন এসে গেছে। মাদাম বলেছিলেন, "সেটা কলেবর" আমি মনে মনে বললুম "বপু"। এ্যাবড়া বড়া ভাজা, সসিজ,

পর্বতপ্রমাণ ম্যাশ্‌ট্‌ পটাটো, টোস্ট-মাখম, মার্মলেড্‌, টমাটো ইত্যাদি কাঁচা জিনিস, আরো যেন কি কি। তখন দেখি, বেশ খাচ্ছি। অতএব পেটের ক্রনোমিটার বলছে এটা কলকাতার লাঞ্চ, অর্থাৎ বেলা একটা-দুটো। ঘড়ি মিথ্যেবাদী, বলছে ন'টা!

৩

অজগাঁইয়া যে রকম ওয়াকিফ হবার চেষ্টা না দিয়েই ধরে নেয় দিল্লী মেলও তার ধেধ্‌ধেড়ে গোবিন্দপুর ফ্ল্যাগ ইস্‌টিশানে দাঁড়াবে এবং চেপে বসে নিশ্চিন্দি মনে তামুক টানে, আমার বেলাও হয়েছিল তাই। আমার অপরাধ আরো বেশী। আমি জেনেশুনেই অপকর্মটি করেছিলুম। আমি ভালো করেই জানতুম, যে প্লেনে যাচ্ছি সেটা যদিও জর্মনির উপর দিয়ে উড়ে যাবে, তবু সে দেশের কোনো জায়গায় দানাপানির জন্যও নামবে না। অবশ্য এ্যার-ইণ্ডিয়ার মুরুব্বী আমার এক গাল হেসে আমায় বলেছিলেন, "এ প্লেনটা কিন্তু প্যারিসে নামে। আপনি সেখানে চলে যান। দু'চারদিন ফুর্তিফার্তি করে চলে যাবেন জর্মনি। খর্চা একই। আর প্যারিস—হেঁহেঁহেঁহে—" সঙ্গে যে মিঠটি ছিলেন তিনিও মৃদু হেসে সায় দিলেন। দুজনারই বয়স এই তিরিশ-পঁয়ত্রিশ। মনে মনে বললুম, ক্লাব কাবারে তার চেয়ে বেশী আর কি ভেল্কিবাজি দেখাবে? তদুপরি বানপ্রস্থে যাবার বয়সও আমার বহুকাল হল তামাদি হয়ে গিয়েছে। এ বয়সে 'নির্বাণদীপে কিমু তৈলদানং?' তাই আখেরে স্থির হল আমি এ্যার-ইণ্ডিয়া প্লেন থেকে সুইটজারলেণ্ডের জুরিচে (স্থানীয় ভাষায় ৎসুরিষ্‌) নামবো। হোথায় চেঞ্জ করে ভিন্ন প্লেনে মোকামে পেঁছিব—অর্থাৎ জর্মনির কলোন শহরে। তাই সই। ফরাসিনীকে বিস্তর বঁ ভোয়াইয়াজ (গুড জর্নি, গুড ফ্লাইট) বলে জুরিচের এ্যার পোর্টে নেমে পাসপর্ট দেখালুম। তারপর গেলুম খবর নিতে কলোনে যাবার প্লেন কখন পাবো। উত্তরে শুনে আমি স্তব্ধ, জড়। দেশে বলে,

"অল্প শোকে কাতর।
অধিক শোকে পাথর।"

তখন বেজেছে সকাল ন'টা। রামপণ্টক বলে না, কলোন যাবার প্লেন দ্বিপ্রহরে। বিগলিতার্থ আমাকে নিরেট তিনটি ঘণ্টা এখানে বসে বসে আঙুল চুষতে হবে।

শুনেছি, যে-রুগী দশ বৎসর ধরে পক্ষাঘাতে অসাড় অবশ সে নাকি মৃত্যুর সময় অকস্মাৎ বিকট মুখভঙ্গি করে, তার সর্বাঙ্গ খিঁচোতে থাকে, হঠাৎ দশ বৎসরের টান-টান-হাঁটু যেন ইলেক্‌ট্রিক শক খেয়ে খাড়া হয়ে থুতনির দিকে গোঁত্তা মারতে চায় এবং মুখ দিয়ে অনর্গল কথা বেরোতে থাকে।

আমার হল তাই। আমি হয়ে গিয়েছিলুম অচল অসাড়। 'স্তম্ভিত' বললুম না, কারণ আজকের দিনের পয়লা নম্বরী এ্যার পোর্টে স্তম্ভ আদৌ থাকে

না। যাই হোক যাই থাক্, আমার মুখ দিয়ে বেরুতে লাগল আতশবাজির ঝটকা, তুবড়ির পর তুবড়ির হিংস্র হিস্ হিস্ আর পটকা, বোমার দুদ্দাড় বোম্‌বাম্। আর হবেই বা না কেন? যে জুরিচের কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে কর্ণপটহবিদারক তথা নয়নান্ধকারক আতশবাজি ছাড়ছি সেই আতশবাজিকেই আপন জর্মন ভাষায় বলে 'বেঙ্গালিশে বেলোয়েষ্টুঙ' অর্থাৎ 'বেঙ্গল রোশনী'; এবং এ-দেশের ফরাসী অংশে বলে 'ফ্য দ্য বাঙাল' অর্থাৎ 'ফায়ার অব বেঙ্গল'।[১] তদুপরি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, ফরাসী ভাষায় বঙ্গদেশকে 'বাঙাল' রূপে উচ্চারণ করে। আমি বাঙাল বঙ্গসন্তান। আমি আমার 'জর্ম্মনি, জর্ম্মনি' অধিকার অর্থাৎ বার্থরাইট ছাড়বো কেন? ফায়ার ওয়ার্কস চালাবার যদি কারো হক থাকে তবে সে আমার। হুহুঙ্কার ছাড়লুম:

"কি বললে? ঝাড়া তিনটি ঘণ্টা আমাকে এই এ্যার পর্টে বসে কলোনের প্লেনের জন্য তাঙ্গিজম-মাঙ্গিজম করতে হবে? আমার দেশ যে-ভারতবর্ষকে তোমরা অন্ডর ডিভালাপ্‌ট্ কান্ট্রি—সাদামাটা ভাষায় অসভ্য দেশ—বলো সেখানেও তো তিন-তিনটি ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় না, কনেকশনের জন্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি রেলগাড়ির কথাই বলছি। আমি যদি আজ ভারতের যে-কোনো ডাকগাড়িতে করে যে-কোনো জংশনে পেঁছুই তবে আধ ঘণ্টার ভিতর কনেকশন পেয়ে যাই। না পেলে—সেটাও সাতিশয় কালে-কস্মিনে—খবরের কাগজে জোর চেল্লাচেল্লি করি (মনে মনে বললুম—অস্মদ্দেশীয় রেলের কর্তারা তার থোড়াই কেয়ার করেন), এ্যারোপ্লেনের তো কথাই নেই। সে তো আরো তড়িঘড়ি কনেকশন দেয়। আমাকে যত তাড়াহুড়ো করে মোকামে পেঁছে দিতে পারে, ততই তার লাভ। অন্যত্র অন্য প্যাসেঞ্জারের সেবার্থে যেতে পারলে তার আরো দু'পয়সা হয়।...অ! তোমাদের বিস্তর ধনদৌলৎ হয়ে গিয়েছে বলে তোমরা আর পয়স কামাতে চাও না? আর শোনো, ব্রাদার, এ তো হল ট্রেন প্লেনের কাহিনী। গোরুর গাড়ির নাম শুনেছ? বুলক কার্ট? সেই গোরুর গাড়িতে করে যদি আমি দশ-বিশ মাইল যাই তবে সেখানে পেঁছেও সঙ্গে সঙ্গে কনেকশন পাই। বোলপুর থেকে ইলামবাজার গিয়ে নদীর ওপারে তদ্দণ্ডেই অন্য গোরুর গাড়ির কনেকশন হামেহাল তৈরী। বস্তুত তখন ওপারের গাড়োয়ানরা গাহককে পাকড়াও করার জন্য যা হৈ-হুল্লোড় লাগায় তার সামনে আন্তর্জাতিক পাণ্ডা

১ আমার এক সুপণ্ডিত মিত্র বহু গবেষণার পর স্থির করেছেন: এদেশে গুড় তৈরী হত বলে এর নাম গৌড় (এবং গুড় থেকে 'রাম' মদ তৈরী হত বলে তার নাম গৌড়ী—মহাভারতেও এর উল্লেখ আছে—যেমন মধু থেকে মাধ্বী মদ)। এবং এই গুড় সর্বপ্রথম চীনদেশে রিফাইনড হয়েছিল বলে এর নাম চিনি (পরে মিশরে তৈরী চিনির নাম হল মিস্‌রি বা মিশ্রী)। তাঁর মতে বারুদ প্রথম আবিষ্কৃত হয় বাঙলা দেশে—আতশবাজীর জন্য। চীনদেশে সেটা সর্বপ্রথম আগ্নেয়াস্ত্রে ব্যবহৃত হয় বলে চীনদেশকে বারুদের আবিষ্কারক বলা হয়—এবং সেটা ভুল।

প্রতিষ্ঠানের জেরুজালেম-পান্ডারা পর্যন্ত নতমস্তক হন। এ-নিয়ে আমি অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত—খুড়ি, পাঁচখানা ইলিয়াড দশখানা ফাউস্ট লিখতে পারি। কিন্তু উপস্থিত সেটা স্থগিত থাক। আমার শেষ কথা এইবারে শুনে নাও। এই যে আমি কন্টিনেনটে এসেছি তার রিটার্ন টিকিটের জন্য কত ঝেড়েছি জানো? এক-একটা টাকা যেন নাক ফুটো করে কুরে কুরে বেরিয়েছে—তোমরা যাকে বলো, পেইং থ্রু দি নোজ্। রোক্কা ছ' হাজার পাঁচশটি টাকা। তারপর ফরেন এক্সচেন্জ্ গয়রহ হিসেবে নিলে দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে সাত হাজারের মত। এ ভূখণ্ডে থাকবো মাত্র তিনটি মাস। এইবারে হিসেব করো তো বসে, তবে বুঝি তোমার পেটে কত এলেম, এই যে কনেকশনের জন্য আমার তিনটি ঘণ্টা বরবাদ করলে তার মূল্যটা কি? সে না হয় গেল। কিন্তু সে-সময়টা যে বন্ধুবান্ধবীর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করলে তার জন্য তোমার হৃদয়বনে কোনো সন্তপানল প্রজ্জলিত হচ্ছে না? তারা—"

ইতিমধ্যে আমার চতুর্দিকে একটা মিনি মাক্সির মধ্যিখানের মিডি সাইজের ভিড় জমে গিয়েছে। ফ্রী এনটারটেনমেন্ট। আমার সোক্রোতেস-পারা, কিংবা দ্রৌপদী যে-রকম রাজসভায় আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন সেই ধরনের যুক্তিজাল বিস্তার এদের হৃদয়-মনে যেন মলয়বাতাসের হিল্লোল, দে দোল দোল খেলিয়ে গেল। এদের বেশীর ভাগই আমার বেদনাটা সহানুভূতি সহ প্রকাশ করছে। "য়া য়া", "উই উই", "সি সি" যাবতীয় ভাষায় আমাকে মিডিসমর্থন জানাচ্ছে। আমি ফের তেড়ে এগুতে যাচ্ছি এমন সময়—

এমন সময় সর্বনাশ! একটি কুড়ি-একুশ বয়সের কিশোরী, আমি যাকে কেচে-মুছে ইস্ত্রি মেরে ভাঁজ করে পকেটে ঢোকাতে যাচ্ছি, কাউণ্টারের পিছনের কুঠরি থেকে বেরিয়ে এসে তাকে বললে, "আপনার টেলিফোন।" তন্মুহূর্তেই সেই মহাপ্রভু তিলব্যাজ না করে, যেন সসেমিরে দে ছুট দে ছুট। লোকটা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের "আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে" গানটি জানে।

কিশোরী এক গাল হেসে আমাকে শুধোলে, "আপনার জন্য কি করতে পারি, স্যর?"

দুত্তোর ছাই! আধ-ফোঁটা এই চিংড়ির সঙ্গে কি লড়াই দেব আমি?

"নাথিং বাট্ ইয়োর লভ্।" বলে দুম্‌দুম্ করে লাউঞ্জের সুদূরতম প্রান্তে আসন নিলুম।

সোফাটা মোলায়েম। সামনে ছোট্ট একটি টেবিল।

বেজার মুখে বসে আছি। এমন সময় দেখি একজন বয়স্ক ভদ্রলোক দু'হাতে দুটি ভর্তি ওয়াইনগ্লাস নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঠিক যতখানি নিচু হয়ে অপরিচিত জনকে বাও করাটা কেতাদুরস্ত তাই করে শুধোলেন, "ভু পেরমেতে, মসিয়ো"—অর্থাৎ "আপনার অনুমতি আছে, স্যর?" "নিশ্চয়, নিশ্চয়।" যদিও সোফাটির যা সাইজ তাতে পাঁচজন কিংকং অনায়াসে বসতে পারে তবু ভদ্রতা দেখাবার জন্য ইঞ্চিটাক সরে বসলুম। ভদ্রলোক ফের কায়দা-

মাফিক বললেন "ন ভু দেরাঁজে পা, জ ভু প্রী"। এর বাঙলা অনুবাদ ঠিক কি যে হবে, অতখানি ফরাসী জানি নে, বাঙলাও না। মোটামুটি "না, না, ব্যস্ত হবেন না। ঠিক আছে, ঠিক আছে।" উর্দুতে বরঞ্চ খানিকটে বলা যায় তকল্লুফ ন্ কীজীয়ে" ঐ ধরনের কিছু একটা। 'তকল্লুফ' কথাটা 'তকলীফ' (বাঙলায় কিছুটা চালু) অর্থাৎ 'কষ্ট'! মোদ্দা: "আপনাকে কোনো কষ্ট দিতে চাইনে।"

সেই দুটো গ্লাস টেবিলে রেখে একটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আরেকটা নিজে তুলে নিয়ে বললেন, "আপনার স্বাস্থ্যের মঙ্গলের জন্য।"

চেনাশোনা কিছুই নেই। খোদার খামোখা এ-লোকটা ড্রিংক দিচ্ছে কেন? তবে কি লোকটা কনফিডেন্স ট্রিকস্টার? আমাদের হাওড়া শ্যালদাতে যার অভাব নেই! ভাবসাব (কনফিডেন্স) জমিয়ে বলবে, "দাদা, তা হলে আপনি টিকিট দুটো কিনে আনুন। এই নিন আমার লিলুয়ার পয়সা, আমি মালগুলো সামলাই।"...টিকিট কেটে ফিরে এসে দেখলেন, ভোঁ ভাঁ। আপনার মালপত্র হাওয়া।

কিন্তু এ-লোকটা আমার নেবে কি? ৺সুকুমার রায় (?) একদা একটি ব্যঙ্গচিত্র আঁকেন। বিরাট ভুঁড়িওলা জমিদার টিঙটিঙে দারওয়ানকে শাসিয়ে শুধোচ্ছেন, "চোর ভাগা কিঁও?" দারওয়ান বললে "মেরা এক হাতমে তলওয়ার দুসরেমে ঢাল। পকড়ে কৈসে?"—আমার এক হাতে তলওয়ার, অন্য হাতে ঢাল। ধরি কি করে?

আমার এক পাশে আমার মিত্রের দেওয়া এটাচি, অন্যদিকে এ্যার ইণ্ডিয়ার দেওয়া ছোট্ট একটি বাক্সো। দুটোই তো বগলদাবা করে বসে আছি। লোকটাকে দেখে তো মনেও হচ্ছে না, ও স্বর্গত পি সি সরকার (এ স্থলে বলে রাখা ভালো সরকার কখনো এহেন অপকর্ম করতেন না) যে আমার দুটি বাক্স সরিয়ে ফেলবে। এবং সব চেয়ে বড় কথা, এ-রকম রুচিসম্মত পোশাক-আশাক আমি একমাত্র ডিউক অব উইণ্ডসরকে (উচ্চারণ নাকি উইনজার) পরতে দেখেছি জীবনে একবার। ডিউকের জীবনে একবার নয়, আমার জীবনে একবার। সে বেশের বর্ণনা অন্যত্র দেব।

একখানা কার্ড এগিয়ে দিলেন। তাঁর নাম আঁদ্রে দ্যুপোঁ। তারপর এক গাল হেসে শুধোলেন, "যদি অপরাধ না নেন তবে একটি প্রশ্ন শুধোই, আপনি কি কস্‌টিঙে বিশেষজ্ঞ?"

আমি থতমত খেয়ে শুধোলুম, "কস্‌টিঙ? সে আবার কি?"

ভদ্রলোক আরো থতমত খেয়ে কিন্তু চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "সে কি মশাই! এই মাত্র আপনার অনবদ্য লেকচারটি শুনলুম, আপনি ক' হাজার টাকা ঝেড়ে কলকাতা থেকে এ-দেশে আসার রিটরন টিকিট কেটেছেন, এবং কনেকশন না পেয়ে তিন ঘণ্টাতে আপনার কি পরিমাণ অর্থক্ষয় হল তার পুরোপাক্কা, করেক্‌ট্ টু দি লাস্ট সাঁতিম, ব্যালানস শীট। একেই তো বলে কস্‌টিঙ। আমি ব্যবসাবাণিজ্য করি। ঐ নিয়ে নিত্যি নিত্যি আমার ভাবনা

চিন্তার অন্ত নেই। কিন্তু সে কথা থাক। আমি আপনার কাছে এসেছি একটি প্রস্তাব নিয়ে। আপনার যখন তিন ঘণ্টা বরবাদ যাচ্ছে তখন এক কাজ করুন না! মিনিট পনেরো পরে এখান থেকে একটা প্লেন যাচ্ছে জিনীভা : আমি সে প্লেনে যাচ্ছি। আপনি চলুন আমার সঙ্গে জিনীভায়। আমার সামান্য একটি বাড়ি আছে সেখানে। আপনার খুব একটা অসুবিধে হবে না। বেডরুম, বাথরুম, ডাইনিংরুম, স্টাডি সব নিজস্ব পাবেন। (আমি মনে মনে মনকে শুধালুম, একেই কি বলে 'সামান্য একটি বাড়ি'?) আমাদের সঙ্গে আহারাদি, দু' দণ্ড রসালাপ করে জিরিয়ে জুরিয়ে নেবেন। তারপর আপনাকে আপনার মোকাম, কলোনগামী প্লেনে তুলে দেব।" তারপর একটু ইতিউতি করে বললেন, "কিছু মনে করবেন না। আমি এ-প্রস্তাবটা নিজের স্বার্থেই পাড়ছি। আমার একটি ছেলে আর দুটি মেয়ে। ষোল, চোদ্দ, দশ। আপনার সঙ্গে আলাপচারী করে তারা সত্যই উপকৃত হবে। এদেশে চট করে একজন ইণ্ডিয়ান পাওয়া যায় না। পেলেও তিনি ফরাসী জানেন না। আর আমার বীবী খাসা রাঁধতে পারেন—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "কিন্তু এই দশ মিনিটের ভিতর আপনি আমার জন্য জিনীভার টিকিট পাবেন কি করে?"

মসিয়ো দ্যুপোঁ মুচকি হেসে বললেন, "সেই ফরমুলা, ন ভু দেরাঁজে পা'— আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। এটা ওটা ম্যানেজ করার কিঞ্চিৎ এলেম আমার পেটে আছে; নইলে ব্যবসা করি কি করে! কাচ্চা-বাচ্চারা বড় আনন্দ পাবে। প্লেনের ভাড়াটার কথা আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না—"

আমি ফের বাধা দিয়ে বললুম, "আপনি ও-বাবদে চিন্তা করবেন না। এ্যার-ইণ্ডিয়ার আমার টিকিটটি অমনিবাস, অর্থাৎ যেখানে খুশী সেখানেই যেতে পারি; তার জন্য আমাকে ফালতো কড়ি ঢালতে হবে না।" (পাঠক, এ ধরনের মোটর অমনিবাসকে কবিগুরু নাম দিয়েছেন বিশ্ববহ। এবং তদীয় অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ মোটর গাড়ি, অটমবিলকে, যেটা আপন শক্তিতে চলে, তার নাম দিয়েছিলেন স্বতশ্চলশকট। অতএব এ স্থলে আমার যানবাহন প্লেনের টিকিটকে 'স্বতশ্চল বিশ্ববহ মূল্য পত্রিকা' অনায়াসে বলা যেতে পারে)।

একটু থেকে বললুম, 'আমি এখখুনি আসছি।" অর্থাৎ যে-স্থলে যাচ্ছি, যেখানে রাজাধিরাজও ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারেন না, অর্থাৎ শৌচাগার।

সেদিকে যাইনি। যাচ্ছিলুম অন্য পথে। এ্যাটাচি বাক্সো সোফাতেই রেখে এসেছি। এরকম সহৃদয় সজ্জনকে বিশ্বাস করে আমি বরঞ্চ ও দুটো হারাবো, অবিশ্বাস করতে ঘেন্না ধরে। গেলুম 'বার'-এ। সেখানে মসিয়ো যে ওয়াইন এনেছিলেন তারই দু' গ্লাশ কিনে ফিরে এলুম সোফায়। একটা গ্লাস তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য কামনা করে বললুম, "আপনার আন্তরিক আমন্ত্রণের জন্য আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমার একটা বড়ই অসুবিধে আছে। কলোন এ্যারপর্টে আমার বন্ধুবান্ধবরা অপেক্ষা করছে। তারা খবর নিয়ে নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছে, আমি তিন ঘণ্টা পরে কনেকশন পাবো। আমি আপনার সঙ্গে জিনীভা গেলে দেরি হয়ে যাবে। তারা বড় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে।"

আর মনে মনে ভাবছি, ইহ সংসারে, এমনকি ইয়োরোপেও, সেই বাগদাদের আবু হোসেনও আছে যারা রাস্তায় অতিথির সন্ধানে দাঁড়িয়ে থাকে। সে একা একা খেতে পারে না।

মসিয়ো বড্ডই দুঃখিত হয়ে প্রথম বললেন, "কিন্তু আপনি আবার আমার জন্য ড্রিংক আনলেন কেন? এ কি দেনা-পাওনা!"

আমি মাথা নিচু করলুম। দ্যুপোঁ বললেন, "তা হলে দেশে ফিরে যাবার সময়ে আমার ওখানে আসবেন?"

তারপর একটি পকেট-বই বের করে বললেন, "কিছু একটা লিখে দিন। ছেলেমেয়েরা খুশী হবে।" আমি তৎক্ষণাৎ লিখলুম:

"কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।"

হায়! ফেরার পথেও দ্যুপোঁর বাড়িতে যেতে পারি নি।

৪

জুরিকের মত বিরাট এ্যারপর্টে কী করে মানুষ একে অন্যকে খুঁজে পায় সেটা বোঝবার চেষ্টা করে ফেল মেরেছি। তাহলে নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে এখানকার কর্মচারীদের পেটেপিঠে এলম আছে। তাদেরই একজন আমার সামনে এসে বললে, "আপনার জন্য একটা মেসেজ আছে, স্যার।" আমি সত্যই বিস্মিত হলুম। আমাকে এই সাহারা ভূমিতে চেনে কে? বললুম, "ভুল করেন নি তো?" "এজ্ঞে না। আমি জানি।" সঙ্গে সঙ্গে ছোকরা আমার পুরো নামটি বলে দিল। যদিও সে এদেশেরই লোক তবু আমার মনে হল সে 'দেশ' পত্রিকার 'পঞ্চতন্ত্র' নিত্য সপ্তাহে পড়ে এবং তারই মারফত আমার তোলা নামটি পুরো পাক্কা রপতো করে নিয়েছে। হয়তো ডাকনামটাও জানে। হয়তো 'ভোম্বল' 'কাবলা' জাতীয় আমার সেই বিদকুটে ডাকনামটা যে পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনিতে প্রকাশ করতে চায় না কিন্তু এসব ভাববার চেয়ে ঢের বেশী জানতে চাই, কে আমাকে স্মরণ করলেন!

অ। ফ্লাইন ফ্রিডি বাওমান! কিন্তু ইনি জানলেন কি প্রকারে যে আমি আজ সকালে এখানে পেঁাচচ্ছি? তাঁর মেসেজ খুলে জিনিসটে পরিষ্কার হল। কলকাতা ছাড়ার পূর্বে এ্যার ইণ্ডিয়ার ইয়াররা শুধিয়েছিলেন, জুরিকে আমার কোনো পরিচিতজন আছেন কিনা, কেননা ওখানে আমাকে কনেকশনের জন্যে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। খবর পাঠালে ও'রা হয়তো এ্যারপর্টে এসে আমাকে সঙ্গসুখ দেবেন। আমি উত্তরে বলেছিলুম, জুরিকে নেই, তবে সেখান থেকে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে লুৎসেন শহরে একটি পরিচিতা মহিলা আছেন এবং

তাঁর নামঠিকানা দিয়েছিলুম। এ কথাটা ভুলে গিয়েছিলুম বেবাক। "দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি" "গুড়ের পাটালি; কিছু ঝুনো নারিকেল;/দুই ভাণ্ড সরিষার তেল;/আমসত্ত্ব আমচুর—" এর মাঝখানে কবিগুরু যদি তাঁর প্রিয় কন্যাকে ভুলে যান তবে সাতান্নটা হাবিজাবির মাঝখানে আমি যে এটা মনে রাখি নি তার জন্য সদয় পাঠক রাগত হবেন না।

কিন্তু এই সুবাদে সেই খাঁটি জাত সুইস মহিলাটির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করে দিতে চাই। ফ্রিডি বাওমান। ১৯৪২/৪৩-এ ইনি সেই মহারাজা সয়াজী রাওয়ের বরোদা প্রাসাদে প্রবেশ করেন। আজকের দিনে ক্রিকেট কিংবা/এবং পলিটিকসের সঙ্গে যাঁদেরই সামান্যতম পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন বরোদার শ্রীযুত ফতেহ সিংরাও গায়কোয়াড়কে। এই ফ্রিডির হাতেই তিনি পৃথিবীতে পদার্পণ করেন। অথবা মস্তকাবতীর্ণ করেন। কিন্তু তার উপর আমি 'জোর'দিচ্ছি নে। রাজা মহারাজা ভিখিরি আতুর পৃথিবীতে সবাই নামেন একই পদ্ধতিতে।

আসল কথা, ফতেহ সিং রাও মানুষ হন ফ্রিডির হাতে। তিনি অসাধারণ শিক্ষিতা রমণী—সেই ছাব্বিশ বছর বয়সেই। জর্মন, ফরাসী, স্প্যানিশ, ইংরাজী সব কটাই বড় সুন্দর জানতেন। এ-দেশে এসেছিলেন বেকারীর জন্য নয়। রোমাণ্টিক হৃদয়ঃ ইণ্ডিয়াটা দেখতে চেয়েছিলেন। গ্যোটে তাঁর প্রিয় কবি। গ্যোটের ভারতপূজা তাঁর মনে গভীর দাগ কেটেছিল। ওদিকে তাঁর উত্তম উত্তম পুস্তক পড়ার অভ্যেস চিরকালের। রাজপ্রাসাদের কাজকর্মও গুরুভার নয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যে কি করে তাঁর প্রিয়সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বাণীর মর্মস্থলে পেঁছে গেলেন সেটা বুঝলুম যেদিন তিনি আমাকে বললেন যে ছেলেবেলা থেকেই তিনি সেণ্ট ফ্রানসিস আসিসির ভক্ত। এবং সকলেই জানেন, এই সন্তটির সঙ্গেই ভারতীয় শ্রমণ, সন্ন্যাসী, সাধুসন্তের সব চেয়ে বেশী সাদৃশ্য। একদিকে যেমন দরিদ্রনারায়ণের সেবা,অন্যদিকে ঠিক তেমনি পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন হয়ে প্রভু খৃষ্টের সঙ্গে একাত্ম বোধ করতে তিনি এদেশের মরমীয়া সাধক, ইরাণ-আরব-ভারতের সুফীদের সঙ্গে এমনই হরিহরআত্মা যে অনেক সময় বোঝা কঠিন কার জীবনবৃত্তান্ত পড়ছি। খৃষ্টানের, ভক্তের না সুফীর?

কিন্তু আমার কী প্রগলভতা যে আমি তাঁর জীবনীর সংক্ষিপ্ততম ইতিহাসও লিখতে পারি! 'দেশ' পত্রিকার প্রিয়তম লেখক শ্রীযুত ফাদার দ্যতিয়েন যদি বাঙলায় তাঁর জীবনী লেখেন তবে গৌড়জন তাহা আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

* * *

কুমারী ফ্রিডীর কথা পুনরায় লিখব। কনটিনেণ্ট সেরে, দেশে ফেরার পথে, লুৎসেনে শ্রীমতীর বাড়িতে সপ্তাহাধিককাল ছিলুম—সেই সুবাদে। উপস্থিত ফ্রিডি লিখেছেন, তিনি আমার (এ্যার-ইণ্ডিয়া মারফত) টেলেক্স পেলেন কাল রাত্রে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জুরিকের এ্যারপর্টে ট্রাঙ্ক-কল করে জানালেন, আমি জুরিকে নেবেই যেন তাঁকে ট্রাঙ্ককল করি। বরাবর তিনি বাড়িতেই থাকবেন।

মনে হয় কত সোজা। কিন্তু যাঁরা দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াতে চান তাঁদের

উপকারার্থে এস্থলে কিঞ্চিৎ নিবেদন করে রাখি।

প্রথমত আপনাকে টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করতে হবে। সে বুথ আবার সদ্ ব্রাহ্মণ। আপন দেশজ খাদ্য ভিন্ন অন্য খাদ্য পান না। অর্থাৎ তাঁর বাক্সে আপনাকে ছাড়তে হবে এদেশের আপন সুইস মুদ্রা। অতএব গো-খোঁজা করুন, সে সাহারাতে, কোথায় সে পুণ্যভূমি যেখানে আপনার ডলার বা পৌণ্ডের বদলে সুইস মুদ্রা দেবে। সবাই তো ইংরিজী বোঝে না। ভুল বোঝে অনেকেই। তারা কেউ বলে ঐ তো হোথায়, কেউ বলবে তার জন্য তো শহরে যেতে হবে। শেষটায় পেলেন সেই কাউণ্টার পুণ্যভূমি—আমি অতি, অতি সংক্ষেপে সারছি। পেলেন সুইস বস্তু। তখন আবার ভুল করে যেন শুধু কাগজের নোট না নেন। কারণ ফোন বুথ কাগজার্থযাশী নন; তিনি চান মুদ্রা। সেই মুদ্রা আবার ঐ সাইজের হওয়া চাই। ঠ্যাঙস ঠ্যাঙস করে চলুন ফের ঐ পুণ্যভূমিতে। আরো বহুবিধ ফাঁড়া-গর্দিশ আছে। বাদ দিচ্ছি।

আহ্! কী আনন্দ!! কী আনন্দ!!!

"কে বলছেন? আমি ফ্রিডি।"

"আমি সৈয়দ।"

ঐ যা যা! ট্রাঙ্ক লাইন কেটে গেল। পাবলিক বুথ থেকে ট্রাঙ্ক-কল করা এক গন্ধযন্ত্রণা। আমি যে দুটি মুদ্রা মেসিনে ফেলে লুৎসের্ন পেয়েছিলুম, তার ম্যাদ ফুরিয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আর দুটো না ফেলার দরুন লাইন কাট অফ্ফ। ফের ঢালো কড়ি।

অতি অবশ্য সত্য, ফোন্ যন্ত্রের বাকসে সুইটজারল্যাণ্ডে প্রচলিত তিন তিনটি ভাষা—ফরাসী, জর্মন এবং ইতালীয়—লেখা আছে কোন গুহ্য সরল পদ্ধতিতে যন্ত্রটি ব্যবহার করতে হয়। লেখা তো অনেক কিছুই থাকে। ধর্মগ্রন্থে তো অনেক কিছুই লেখা থাকে। সেগুলো পড়লেই বুঝি মোক্ষলাভ হয়? জিম-নাস্টিকের কেতাব পড়লেই বুঝি কিঙ্কড় সিঙ-এর মত মাস্‌ল্ গজায়? প্র্যাকটিস করতে হয়। এবং তার জন্য খেসারতিও দিতে হয়। উপযুক্ত গুরু বিনা যোগাভ্যাস করতে গিয়ে বিস্তর লোক পাগল হয়ে যায়। আমি ইতিমধ্যে প্রায় দেড় টাকার মত খেসারতি দিয়ে "হ্যালো হ্যালো" করছি। আর, এ খেসারতির কোনো আন্তর্জাতিক মূল্য নেই। কারণ জর্মনি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রায় প্রত্যেক দেশই আপন আপন কায়দায় আপন আপন মেসিন চালায়। আর সেখানেই কি শেষ? তিন মাস পরে যখন ফের সুইটজারল্যাণ্ডে আসবো, তখন দেখব, বাবুরা এ-ব্যবস্থা পালটে দিয়েছেন। নূতন কোন্ এক আবিষ্কারের ফলে যন্ত্রটার ব্যবহার নাকি 'সরলতর' করেছেন। 'সরলতর' না কচু! তাই যাঁরা এসব ব্যাপারে ওয়াকিফ-হাল নন, যাঁরা এই হয়তো পয়লাবারের মত কণ্টিনেণ্ট যাচ্ছেন, তাঁদের প্রতি আমার 'সরলতম' উপদেশ, বিনগুরু এসব যন্ত্রপাতি ঘাঁটাতে যাবেন না। অবশ্য গুরু পাওয়া সর্বত্রই কঠিন; এখানে আরো কঠিন। যে যার ধান্দা নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে হন্তদন্ত। কে আপনাকে নিয়ে যাবে সেই বুথ-গুহায়, শিখিয়ে দেবে সে-গুহায় নিহিতং ধর্মস্য তত্ত্বং।

যাক্! ফের পাওয়া গিয়েছে লাইন।

"তুমি লুৎসেনে কখন আসছো?"

"অপরাধ নিয়ো না। আমি উপস্থিত যাচ্ছি কলোন। তারপর হামবুর্গ ইত্যাদি। তারপর লণ্ডন, নটিংহাম—সেখান থেকে ফেরার পথে লুৎসেন। তুমি খেদিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তোমার বাড়িতে।"

"দ্যাৎ। কিন্তু তদ্দিনে এখানে যে বড্ড শীত জমে যাবে। গরম জামাকাপড় এনেছো তো? মাখ্‌ট্‌ নিষ্‌টস্‌ (নেভার মাইণ্ড—আসে যায় না), আমার কাছে আছে।"

"তুমি এখনো ফ্রানসিস আসিসীরই শিষ্যা রয়ে গিয়েছ—কী করে কাতর জনকে মদৎ করতে হয়, সে-ই তোমার প্রধান চিন্তা। আমি কি তোমার স্কার্ট ব্লাউজ পরে রাস্তায় বেরবো? সে-কথা থাক্। আমাকে এ্যারপর্টে আরো তিন ঘণ্টাটাক বসে থাকতে হবে। চলে এসো না এখানে। আজ তো রববার। তোমাকে আফিস দফতর করতে হবে না।"

"রববার। সেই তো বিপদ। বাড়ি থেকে যেতে হবে লুৎসেন স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেনে করে জুরিক। পঁয়ত্রিশ মাইল। সেখান থেকে বাস-এ করে তোমার এ্যারপর্টে। রববার বলে আজ ঢের কম সার্ভিস। সব কটা উঠতি নাবতিতে টায়-টায়, কোথায় পাবো কনেকশন—"

আমি মনে মনে বললুম, হুঁ। ফের সেই কনেকশন! ইলামবাজার রামপুরহাট॥

"ফ্রিডি বললে, "আচ্ছা দেখি।"

আমি বললুম, "কতকাল তোমাকে দেখি নি।"

* * *

ফ্রিডি যদি এখানে আসে-ই তবে তার বাস্ দাঁড়ায় কোথায়? আমি বসে আছি ট্রানজিট প্যাসেঞ্জারের খোঁয়াড়ে। এখানে তো ফ্রিডির প্রবেশ নিষেধ। অবশ্য সে এদেশের রীতিমত সম্মানিতা নাগরিকা (সংস্কৃত অর্থে নয়) সিট্‌জেন্। কাজেই সে স্পেশাল পারমিট যোগাড় করতে পারবে। তবে সেটা যোগাড় করতে কতক্ষণ লাগবে, কে জানে? আম আনতে দুধ না ফুরিয়ে যায়। ততক্ষণে হয়তো আমার কলোন-গামী প্লেনের সময় হয়ে যাবে।

বাসস্টাণ্ডে যেতে হলে আমাকে খোঁয়াড় থেকে বেরোতে হয়। কিন্তু আমাকে বেরুতে দেবে কি? খোঁয়াড়ের বাইরেই স্বাধীন, মুক্ত সুইটজারল্যাণ্ড। তার জন্য ভিজার প্রয়োজন। আমার সেটা নেই। তবু চেষ্টা করে দেখাই যাক না, কি হয় না হয়। সুকুমার রায় বলেছেন, "উৎসাহে কি না হয়, কি না হয় চেষ্টায়।" সেইটে পড়ে আমার এক সখা ডাকপিয়নকে বলেছিল, "আমার কোনো চিঠি নেই? কি যে বলছো? ফের খুঁজে দেখো। উৎসাহে কি না হয়, কি না হয় চেষ্টায়।"

খোঁয়াড়ের গেটে গিয়ে সেখানকার উর্দীপরা তদারকদারকে অতিশয় সবিনয় নিবেদন করলুম, "স্যার! আমি কি একটু বাইরে ঐ বাসস্ট্যাণ্ডে যেতে পারি?"

"আপনি তো ট্র্যানজিট। না ?"

আমি সরাসরি উত্তর না দিয়ে বললুম, "বাস্-এ করে লুৎসেন থেকে আমার একটি বান্ধবী—"

হায় পাঠক, তুমি সেই তদারকদারের প্রতিক্রিয়া যদি তখন দেখতে। "বান্ধবী ! বান্ধবী !! সেরতেন্মা (সার্টনলি) চের্‌ৎমান্তে (ইতালিয়ানে, সার্টন্‌লি)" এবং তার পর জর্মনে "জিযার জিযার" (শিওর, শিওর) এবং সর্বশেষে, যদি না ভুল পায়, মার্কিন ভাষায় "শিঁয়োর, শিঁয়োঁ।"

আমি জানতুম, আমি যদি বলতুম, আমার বন্ধু আসছেন, সে বলতো, "নো।" যদি বলতুম আমার বীবী, উত্তর হত তদ্বৎ। যদি বলতুম, বৃদ্ধা মাতা তখনো হত, "না"—হয়তো কিঞ্চিৎ থতমত করে। কিন্তু বান্ধবী ! আমার সাতখুন মাফ !

৫

কলোনের নাম কে না শুনেছে ? বিশেষ করে হেন ফ্যাশনেবল মহিলা আছেন কি যিনি কস্মিনকালেও প্রসাধনার্থে ও-দ্য-কলোন—জর্মনের ক্যলনিশ ভাসার—কলনের জল ব্যবহার করেন নি। বিশ্বজোড়া খ্যাতি এই তরল সুগন্ধটির। '৪৭১১' এবং 'মারিয়া ফারীনা' এই দুইটিকেই সব চেয়ে সেরা বলে ধরা হয়। এ-দেশেও কলোন জল তৈরি হয় কিন্তু ওটা বানাতে হলে যে সাত-আট রকমের সুগন্ধি ফুলের প্রয়োজন, তার কয়েকটি এদেশে পাওয়া যায় না—সর্বোপরি 'প্রাক প্রণালী' তো আছেই। বিলেতেও কলোন জলের এতই আদর যে, হিটলারের সঙ্গে দেখা করার জন্য চেম্বারলেন যখন সপরিষদ কলোন থেকে মাইল বিশেক দূরে গোডেসবের্গ-এর মুখোমুখি, রাইন নদীর ওপারে যে বাড়িতে ওঠেন, তার প্রতি ঘরে কলোন জল, কলোন জলের সুগন্ধ দিয়ে নির্মিত গায়ে মাখার সাবান, দাড়ি কামাবার সাবান, ক্রীম, পাউডার—বস্তুত প্রসাধনের তাবৎ জিনিস—রাখা হয়েছিল হিটলারে আদেশে। চেম্বারলেন এই সূক্ষ্ম বিদগ্ধ আতিথেয়তা লক্ষ্য করেছিলেন কি না জানি নে। কারণ তখন তাঁর শিরঃপীড়া তাঁর এ-অভিসার তাঁর দেশবাসী কি চোখে দেখবে। তাঁর আপন ফরেন অফিস যে সেটা নেকনজরে দেখছে না, সেটা তিনি জানতেন, কারণ ইতিমধ্যেই তারা একটা প্যারডি নির্মাণ করে ফেলেছে ঃ

"ইফ অ্যাট ফার্স্ট ইউ কানট সাকসীড
ফ্লাই ফ্লাই ফ্লাই এগেন।"

বলা বাহুল্য, চেম্বারলেন ফ্লাই করে গিয়েছিলেন। আর আমি তো সেই গোডেসবের্গ-এর উপর দিয়ে কলোন-পানে ফ্লাই করে যাচ্ছিই। সেই সুবাদে প্যারডিটি মনে পড়ল।

জুরিখে ফ্রিডির সঙ্গে মাত্র কুড়ি মিনিট কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলুম। মনটা খারাপ হয়ে আছে।

কলোন শহরের সঙ্গে আমার চল্লিশ বছরের পরিচয়।

এখান থেকে প্রায় চৌদ্দ মাইল দূরে বন। সেখানে প্রথম যৌবনে পড়াশুনা করেছিলুম। ট্রামে, বাস্-এ, ট্রেনে, জাহাজে করে এখানে আসা অতি সহজ। আমার একাধিক সতীর্থ কলোন থেকে বন ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করতো। তাদের সঙ্গে বিস্তর উইকএন্ড করেছি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শহরটাকে দেখেছি।

সে-সব সবিস্তর লিখতে গেলে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হবে। আর লিখতে যাবোই বা কেন? জর্মন টুরিস্ট ব্যুরো যদি আমাকে কিঞ্চিৎ 'ব্রাহ্মণ-বিদায়' করতো তবে না হয়—

যদি নিতান্তই কিছু বলতে হয়, তবে প্রথম নম্বর সম্বন্ধে বলি যে, সেটি আপনি চান কি না চান, কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। কলোনের বিরাট গগনস্পর্শী গির্জা। প্যারিসে যে-রকম যেখানেই যান না কেন, এ্যাফ্যাল টাওয়ারটা এড়াতে পারবেন না, কলোনের এই কেথিড্রেলটির বেলাও তাই। তবে এ্যাফ্যাল স্তম্ভ বদখদ, কিন্তু কলোনের গির্জাচূড়ো তন্বঙ্গী সুন্দরী। যেন মা-ধরণী ঊর্ধ্বপানে দু বাহু বাড়ায়ে পরমেশ্বরকে তাঁর অনন্ত অবিচ্ছিন্ন নমস্কার জানাচ্ছেন।

এ গির্জা আবার আমাদের কাছে নবীন এক গৌরব নিয়ে ধরা দিয়েছে।

বছর দুত্তিন পূর্বে কলোনবাসী প্রায় শ' দুই তুর্কী ও অন্যান্য মুসলমান ঐ গির্জার প্রধান বিশপকে গিয়ে আবেদন জানায়, "এ-বছরে ঈদের নামাজ শীতকালে পড়েছে। বাইরে বরফ; সেখানে নামাজ পড়ার উপায় নেই। হুজুর যদি আপনাদের এই গির্জের ভিতরে আমাদের নামাজ পড়তে দেন, তবে আল্লা আপনাকে আশীর্বাদ করবেন।" বিশপের হৃদয়কন্দরে কণামাত্র আপত্তি ছিল না —কিন্তু ··? এ শহরের লোক খৃশ্চান। তাদেরই বিত্ত দিয়ে, গরিবের কড়ি দিয়ে এ-গির্জা সাতশ' বছর আগে গড়া হয়েছে। এখনো ওদেরই পয়সাতে এ-মন্দিরের তদারকি দেখভাল চলে। সেও কিছু কম নয়। এরা যদি আপত্তি করে? কিন্তু এই বিশপটি ছিলেন বড়ই সন্তপ্রকৃতির সজ্জন। এবং তার চেয়েও বড় কথা: সাহসী। তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। মা-মেরী মালিক। তিনি সর্বসন্তানের মাতা।

কিমাশ্চর্যমতঃপরম। তাঁর কাছে কোনো প্রতিবাদপত্র এল না। খবরের কাগজেও এই অভাবনীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ বেরুলো না। অবিশ্বাস্য! অবিশ্বাস্য!! অবিশ্বাস্য!!!

কিন্তু মার্কিন 'টাইম' কাগজে বেরিয়েছে ও বিলেতেও বেরিয়েছে। তারপর সন্দ করে কোন্ পিচেশ!

* * *

কলোন এ্যারপর্টে নেমে দেখি, দুটো স্যুটকেসের একটা আমার নেই। ছুট ছুট দে ছুট,—সেই ঘরের দিকে যেখানে 'হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ' সম্বন্ধে তড়িঘড়ি ফরিয়াদ জানাতে হয়। নইলে চিত্তির। অবশ্য এরা নিজের থেকেই হয়তো দু-পাঁচ দিনের ভিতরই আমার বেওয়ারিশ জাদুকে খুঁজে পাবেন, কিন্তু

আমি কোন মোকামে আস্তানা গাড়বো, তার ঠিকানাটা এদের না দিলে মাল হস্তগত হবে কি করে? সেটা তখন তার মালিককে হারাবে! কোনো এক গ্রীক দার্শনিক নাকি বলেছেন, "একই নদীতে তুমি দুবার আঙুল ডোবাতে পারবে না একই শিখায় দুবার আঙুল পোড়াতে পারবে না। কারণ প্রত্যেকটি বস্তু প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে।" মানলুম। কিন্তু একই স্যুটকেস নিশ্চয়ই দুবার, দুবার কেন দুশ' বার হারাতে কোন বাধা নেই। অতি অবশ্য কবিগুরু বলেছেন, "তোমায় নতুন করে পাব বলেই হারাই ক্ষণেক্ষণ/ও মোর ভালবাসার ধন!!" কিন্তু প্রশ্ন, এটা কি হারানো বাক্সের বেলাও খাটে?

আপিস ঘরটি প্রমাণ সাইজের চেয়েও বৃহদায়তন। ভিতরে ফুটফুটে মেমসায়েব বসে আছেন। আমার লাগেজ টিকিট দেখাতেই তিনি মুচকি হেসে বললেন, "নিশ্চিন্ত থাকুন, ওটা খোওয়া যাবে না। কিন্তু বলুন তো, ওটার ভিতর কি কি আছে?"

সর্বনাশ! সে কি আমি জানি? প্যাকিং করছে আমার এক তালেবর ভাতিজা মুখুয্যে। তার বাপ প্রতি বৎসর নিদেন তিনবার ইয়রোপ-আমেরিকা যেতেন। সে নিখুঁত প্যাকিং করে দিত। আমার বেলা এ-বারে করেছে—নিখুঁততর। কোন্ বাক্সে কি মাল রেখেছে কি করে জানবো!

কিন্তু মিসি বাবা সদয়া। পীড়াপিড়ি করলেন না। আমার ঠিকানাটি টুকে নিলেন। আর ইতিমধ্যে বার বার বলছেন, "এ্যার ইণ্ডিয়া বলুন, লুফট-হানজা বলুন, সুইসএ্যার বলুন কোনো লাইনেই কোন লাগেজ খোওয়া যায় না। আপনি পেয়ে যাবেনই যাবেন।"

আমি মনে মনে বললুম, "বট্টে!" বেরোবার সময় তাকে বিস্তর ধন্যবাদ জানিয়ে সবিনয়ে বললুম, "গ্লেডিগেস ফ্লাইন (সদয়া কুমারী)! একটি প্রশ্ন শুধোতে পারি কি?"

সুমধুর হাস্যসহ, "নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

আমি বললুম, "তাবৎ হারানো মালই যদি ফিরে পাওয়া যায়, তবে এ-হেন বিরাট আপিস আপনারা করেছেন কেন? আমি তো শুনেছি, কলোন এ্যার পোর্টের প্রতিটি ইঞ্চির জন্য দশ-বিশ হাজার টাকা ছাড়তে হয়।"

প্রত্যুত্তরে প্রতীক্ষা না করেই এক লম্ফে দফতর থেকে বেরিয়ে মালসামান নিয়ে উঠলুম বিরাট এক বাস্-এ।

* * *

বাঁচলুম, বাবা, বাঁচলুম। প্লেনের গর্ভ থেকে বেরিয়ে খোলা মেলায় এসে বাঁচলুম। বাসটি যদিও পর্বতপ্রমাণ, সাগর করিবে গ্রাস হয় অনুমান, তবু চলছে যেন রোলস রইল—রইম খানদানী গতিতে, মৃদু মধুরে। কবিগুরু গেয়েছিলেন, 'কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসার ঘায়ে'—আমি গাইলুম, 'বাঁচালে তুমি মোরে ভালো বাস্-এর ছায়ে।'

আহা কী মধুর অপরাহ্নের সূর্যরশ্মি। কখনো মেঘমায়ায় কখনো আলো-ছায়ায়। দু-দিকের গাছপাতার উপর সে-রশ্মি কভু বা মেঘের ভিতর দিয়ে

আলতো আলতো হাত বুলিয়ে যায়, কভু বা রুদ্রদীপ্ত হয়ে প্রচণ্ড আলিঙ্গন করে। ঐ হোথায় দেখছি, বুড়ো চাষা ঘাসের উপর শুয়ে আছে, চোখের উপর টুপি ঢেকে। তার সবুজ পাতলুন যেন ঘাসের ঝিলিমিলির সঙ্গে 'একতালে যায় মিলি'। এদেশের নবান্ন হতে এখনো বেশ কিছুদিন বাকি আছে। চতুর্দিকে অল্পবিস্তর ফসল কাটা হচ্ছে। আজ রববার। রাইনল্যাণ্ডের লোক বেশির ভাগই ক্যাথলিক। তাদের অধিকাংই সেদিন সর্বকর্ম ক্ষান্ত দেয়। তাই ক্ষেত-খামারে তেমন ভিড় নেই।···আমিও মোকামে পৌঁছুতে পারলে বাঁচি। ইংরিজীতে প্রবাদ 'এ সিনার হ্যাজ নো সনডে।' 'পাপীর রববার নেই।' আমি তো তেমন পাপিষ্ঠ নই !!

বাস মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রামের ভিতর দিয়ে যায়। সেখানেও রাস্তা নির্জন। বাচ্চাকাচ্চারা কোথায় ? তারা তো স্কাইপে বা সুধালয়ে যায় না—সেখানে অবশ্যই আজ জোর কারবার, বেজায় ভিড়। আমার পাশের সীটে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বললুম, "স্যর, ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে আমি এসব গ্রামের ভিতর দিয়ে গিয়েছি। তখন তো ছেলে-মেয়েরা রাস্তার উপর রোল-স্কেটিং করতো, দড়ি নিয়ে নাচতো, এমন কি ফুটবলও খেলতো। ওরা সব গেল কোথায় ?"

বৃদ্ধ বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "একাধিক উত্তর হয়তো আছে। চট করে যেটা মনে আসছে সেটা বলতে গেলে বলি ; বন্ধ ঘরে টেলিভিশন দেখছে।"

আমি একটু ঘাড় চুলকে বললুম, "কিছু যদি অপরাধ না নেন, স্যর, তবে শুধবো, এটা কি সর্বাংশে ভালো ? ফার্সীতে একটি দোহা আছে ঃ—

হর্ চে কুনী, বু খুদ্ কুনী
খা খুব্ কুনী, খা বদ্ কুনী ॥
যা করবে স্বয়ং করবে
ভালো করো কিংবা মন্দই করো।

এই যে প্যাসিভভাবে বসে বসে টেলি দেখা, তার চেয়ে রাস্তায় অ্যাকটিভভাবে খেলাধুলো করা কি অনেক বেশী কাম্য নয় ?"

গুণী এবারে চিন্তা-না করেই বললেন, "নিশ্চয়ই। অবশ্য ব্যত্যয়ও আছে। যেমন মনে করুন, আমরা যখন মোৎসার্ট বা শপাঁ শুনি তখন তো আমরা প্যাসিভ। আর তাই বা বলি কি করে ? বেটোফেনকে গ্রহণ করা তো প্যাসিভ নয়। ভেরি ভেরি অ্যাকটিভ কর্ম। কী পরিমাণ কনসানট্রেশন তখন করতে হয়, চিন্তা করুন তো। কিন্তু বাচ্চাদের কথা বাদ দিন—কটা বয়স্ক লোকই বা সে জিনিস করে ?"

বুঝলুম লোকটি চিন্তাশীল। এঁকে খুঁচিয়ে আরো অনেক তত্ত্বকথা জেনে নিই। বললুম, "তা টেলিতে প্রোগ্রাম কিছুই দেয় না ?"

"তা হলে শুনুন, আপনাকে পুরো ফিরিস্তি দিচ্ছি। যদিও আমি ঐ যন্ত্রটির পুজোরী নই। পুরনো ফিল্ম, নয়া থিয়েটার, গর্ভপাতের সেমিনার আলোচনা, পাদ্রিদের বক্তৃতা (এ দুটো তিনি ঠিক পর পর বলেছিলেন সেটা আমার এখনো

স্পষ্ট মনে আছে), রাজনৈতিকদের সঙ্গে ইণ্টারভ্যু, খেলা, কাবারে, ইটালী ভ্রমণ, চন্দ্রাভিযান, ভিয়েটনাম থেকে প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন, পার্লামেণ্টে হ্যারি ভিলি ব্রাণ্ট ও হ্যারি শেলের বক্তৃতা—এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ঐ একই কেচ্ছা, একই অন্তরীণ খাড়াবড়িথোড়থোড়বড়িখাড়া (তিনি জরমনে বলেছিলেন 'একই ইতিহাস'—ডী জেল্‌বে গেশিষ্‌টে—)। সর্ববস্তু কুচি কুচি করে পরিবেশন। পরের দিনই ভুলে যাবেন, আগের দিন কি দেখেছিলেন—মনের উপর কোনো দাগা কাটে না। পক্ষান্তরে দেখুন, বই পড়ার ব্যাপারে আপনি আপনার রুচিমত বই বেছে নিচ্ছেন।"

ইতিমধ্যে আমাদের বাস কতবার যে কত ট্রাফিক জামে কত মিনিট দাঁড়িয়েছে তার হিসেব আমি রাখি নি। অথচ এদেশে রিকশা, ঠ্যালা, গোরুরগাড়ি এমন কোনো কিছুই নেই যে-সব হযবরল আমাদের কলকাতাতে নিত্য নিত্য ট্র্যাফিক জ্যাম জমাতে কখনো স্বেচ্ছায় কখনো অনিচ্ছায়—বিশ্ববিজয়ী প্রতিষ্ঠান।

ভদ্রলোক বাইরের দিকে আঙুল তুলে বললেন, "ঐ দেখুন, আরেক উৎকট নেশা। মোটর, মোটর, মোটর। প্রত্যেক জরমনের একখানা মোটরগাড়ি চাই। জরমন মাত্রই মোটরের পূজারী।"

আমার কেমন যেন মনে হল, আমরা বোধ হয় বন্‌ শহরের উপকণ্ঠে পেঁছে গিয়েছি। কিছুটা চেনা-চেনা ঠেকছে, আবার অচেনাও বটে। অথচ একদা এ শহর আমি আমার হাতের তেলোর চেয়ে বেশী চিনতুম। আমি ভদ্রলোককে আমার সমস্যা সমাধান করতে অনুরোধ জানালে তিনি বললেন, "এটা বনই বটে। তবে এ অঞ্চলটা গত যুদ্ধে এমনই বোমারু-মার খেয়েছিল যে এটাকে নতুন করে গড়া হয়েছে। তবে শহরের মধ্যিখানটা প্রায় পূর্বেরই মত মেরামত করে বানানো। আসল কথা কি জানেন, বমিঙের ফলে ঘিঞ্জি পাড়াগুলো যে নষ্ট হয়ে গেল সেগুলোকে ভালো করে, নতুন করে প্ল্যান মাফিক বানাবার চান্‌সটা আমরা মিস করেছি। তবে এই যে বললুম, শহরের মাঝখানটা মোটামুটি আগেরই মত—হার্ট অব দি সিটি—আর জানেন তো পুরানো হার্টের জায়গায় নতুন হার্ট বসানো মুশকিল। এই ধরুন লুটভিষ্‌ ফান বেটোফেন—"

আমি বললুম, "ওই নামটার ঠিক উচ্চারণটা আমি আজো জানিনে।"

হেসে বললেন, "ঐ তো ফেললেন বিপদে। মাঝখানের Vanটা যে খাঁটি জর্মন নয় তা তো বুঝতেই পারছেন। ওঁরা প্রাচীন দিনের ফ্যাশিশ। তখন তারা 'ভান' না 'ফান' উচ্চারণ করতো কে জানে—অন্তত আমি জানি নে—"

আমি বললুম, "থাক, থাক। এবারে যা বলছিলেন তাই বলুন।"

"সেই বেটোফেনের বাড়ি যদি বোমাতে চুরমার হয়ে যেত তবে সেখানে তো একটা পিরামিড গড়া যেত না।"

"এমন কি তাজমহলও না।"

* * *

দুম্‌ করে গাড়ি থেমে গেল। এ কি? ও! মোকামে পেঁছে গিয়েছি। অর্থাৎ বন্‌ শহরে। এবং সব চেয়ে প্রাণাভিরাম নয়নানন্দদান দৃশ্য—যে পরিবারে

উঠবো তারই একটি জোয়ান ছেলে ভিটরিষ্ উলানোফস্কি প্রবলবেগে হাত নাড়াচ্ছে। মুখে তিন গাল হাসি। পাশে দাঁড়িয়ে তার ফুটফুটে বউ। সে রুমাল দুলোচ্ছে।

৬

লক্ষ্মী ছেলে ভীটরিষ। তার মাঝারি সাইজের মোটরখানা এনেছে। আমার কোনো আপত্তি না শুনে বললে, "আমি মালপত্রগুলো তুলে নিচ্ছি। তুমি ততক্ষণ বউয়ের সঙ্গে দুটি কথা কয়ে নাও। ও তো আপনাকে চেনে না।" মেয়েটিকে বাড়ির কুশলাদি শুধোলুম। কিন্তু বড় লাজুক মেয়ে—কয়েকদিন আগে 'দেশ' পত্রিকায় যে সিগারেট-মুখী 'মর্ডান মেয়ে'র ছবি বেরিয়েছে তার ঠিক উল্টোটি। কোনো প্রশ্ন শুধোয় না। শুধু উত্তর দেয়। শেষটায় বোধ হয় সেটা আবছা-আবছা অনুভব করে একটিমাত্র প্রশ্ন শুধোলে, "বন্ কি খুব বদলে গেছে? আমি অবশ্য প্রাচীন দিনের বন্ চিনি নে। আমার বাড়ি ছিল ক্যোনিষবের্গে।"

সর্বনাশ। এবং পাঠক সাবধান।

ক্যোনিষবের্গ শহরটি এখন বোধ হয় পোলাণ্ডের অধীনে। ঐসব অঞ্চল থেকে লক্ষ লক্ষ নরনারী বাস্তুহারা সর্বহারা হয়ে পশ্চিম জর্মনিতে এসেছে। তাদের বেশীর ভাগই সে-সব দুঃখের কাহিনী ভুলে যেতে চায়। কাজেই সাবধান! ওসব বাবদে ওদের কিছু জিজ্ঞেস করো না।

তবে এ তত্ত্বও অতিশয় সত্য যে মৌকামাফিক দরদ-দিলে যদি আপনি কিছু শুনতে চান তখন অনেক লোকেই, বিশেষ করে রমণীরা অনর্গল অবাধ গতিতে সব কিছু বলে ফেলে যেন মনের বোঝা নামাতে চায়। বিশেষ করে বিদেশীর সামনে। সে দুদিন বাদেই আপন দেশে চলে যাবে। ও যা বলেছিল সেটা নিয়ে খামোখা কোনো ঘোটলার সৃষ্টি হবে না। আমি তাই বেমালুম চেপে গিয়ে বললুম, "ও ক্যোনিষবের্গ! যেখানে এ-যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কান্ট্ জন্মেছিলেন? এবং শুনেছি তিনি নাকি ঐ শহরের বারো না চোদ্দ মাইলের বাইরে কখনো বেরোন নি! শহরটাকে এতই ভালোবাসতেন!"···

ইতিমধ্যে ভীটরিষ স্টিয়ারিঙে বসে গেছে এবং আমার শেষ মন্তব্যটা শুনেছে। বললে, "ভালোবাসতেন না কচু! আসলে সব দার্শনিকই হাড়-আলসে।"

আমি বললুম, "সে-কথা থাক। তোর বউ শুধোচ্ছিল, বন্ শহরটা কি খুব বদলে গেছে? তারই উত্তরটা দি? বদলেছে, বদলায়ও নি—"

"তুমি, মামা, চিরকালই হেঁয়ালিতে কথা কও—"

আমি বললুম, "থাক্, বাবা থাক্। বাস্-এ এক বৃদ্ধ বিষয়টির অবতারণা করতে না করতেই মোকামে পেঁছে গেলাম। আর এ-তাবৎ দেখেছিই বা কি?"

বন্ শহরের নাম করলেই দেশী-বিদেশী সবাই বেটোফেনের নাম সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করে বটে, কিন্তু এ বৎসরে বিশেষ করে। কারণ তাঁর দ্বিশত জন্মশত-বার্ষিকী সম্মুখেই। ডিসেম্বর ১৯৭০-এ। এ-শহর তাঁকে এতই সম্মান করে যে তাঁর সুন্দর প্রতিমূর্তিটি তুলেছে তাদের বিরাটতম চত্বরে, তাদের বৃহত্তম এবং প্রাচীনতম না হলেও তারই কাছাকাছি প্রাচীন মুনসটার গির্জার পাশে। হয়তো তার অন্যতম কারণ, বেটোফেন ছিলেন সর্বান্তরকরণে ঈশ্বরবিশ্বাসী। শুধু তাঁর সঙ্গীত নয়, তাঁর বাক্যালাপে চিঠিপত্রে সর্বত্রই তাঁর ঈশ্বরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস, প্রভুর পদপ্রান্তে তাঁর ঐকান্তিক আত্মনিবেদন বার বার স্বপ্রকাশ।

সেখান থেকে কয়েক মিনিটের রাস্তা—ছোট্ট গলির ছোট্ট একটি বাড়ির ছোট্ট একটি কামরায় যেখানে তাঁর জন্ম হয়। বাড়ির নিচের তলায় বেটোফেন মিউজিয়ম। সেখানে তাঁর ব্যবহৃত অনেক কিছুই আছে, যেমন ইয়াসনা পলিয়ানাতে তলস্তয়ের—হত্তর, সম্পূর্ণতর, কারণ সেটা দেড়শ বছর পরের কথা এবং অসম্পূর্ণতম রবীন্দ্রনাথের উত্তরায়ণে, যদ্যপি সেটা তলস্তয়ের প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে।

কিন্তু সেখানে সব চেয়ে মর্মস্পর্শী বেটোফেনের কানের চোঙাগুলো। বত্রিশ বৎসর বয়স থেকেই তিনি ক্রমে ক্রমে কালা হতে আরম্ভ করলেন। বিধাতার এ কী লীলা! বীণাপাণির এই অংশাবতার আর তাঁর বীণা শুনতে পান না। তখন তিনি আরম্ভ করলেন ঐ সব কানের চোঙা ব্যবহার করতে। পাঠক, দেখতে পাবে, তাঁর বধিরতা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বাড়তে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোঙার সাইজও বাড়তে লাগলো। তাতে করে তাঁর কোনো লাভ হয়েছিল কি না বলা কঠিন। তবে এটা জানি, তার কিছুকাল পরে, যখন তাঁর সঙ্গীতপ্রেমী কোনো সহচর বলতেন, 'বাঃ! কী মধুর সুরেলা বাঁশী বাজিয়ে যাচ্ছে রাখাল ছেলেটি', আর তিনি কিছুই শুনতে পেতেন না তখন বেটোফেন বলতেন, তিনি তন্মুহূর্তেই আত্মহত্যা করতেন যদি না তাঁর বিশ্বাস থাকতো যে সঙ্গীতে এখনো তাঁর বহু কিছু দেবার আছে। আমাদের শ্রীরাধা যে রকম উদ্ধবকে বলেছিলেন, 'যদি না আমার 'বিশ্বাস' থাকতো, প্রভু একদিন আমার কাছে ফিরে আসবেন, তাহলে বহু পূর্বেই আমার মৃত্যু হয়ে যেতো।' এবং সকলেই জানেন, বধ্ব কালা হয়ে যাওয়ার পরও বেটোফেন মনে মনে সঙ্গীতের রূপটি ধারণ করে বহুবিধ স্বর্গীয় রচনা করে গেছেন, যেগুলো তিনি স্বকর্ণে শুনে যেতে পান নি। আমি যেন কোথায় পড়েছি, তিনি সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে করুণ আবেদন জানাচ্ছেন, প্রভু যেন তাঁকে একবারের মত তাঁর শ্রুতিশক্তি ফিরিয়ে দেন যাতে করে তিনি মাত্র একবারের তরে আপন সৃষ্ট সঙ্গীত শুনে যেতে পান। তারপর তিনি সধন্যান্তঃকরণে পরলোকে যেতে প্রস্তুত।

চিন্তাস্রোতে বাধা পড়লো। ডীটরিষ শুধলো, "মামা, কথা কইছ না যে!"

বললুম, "আমি ভাবছিলুম বেটোফেনের কানের চোঙাগুলোর কথা। ওগুলো সত্যি কি তাঁর কোনো কাজে লেগেছিল?"

ডীটরিষ বললে, "বলা শক্ত। কোনো কোনো আধাকালা একখানা কাগজের

টুকরো দু'পাটি দাঁত দিয়ে চেপে ধরে কাগজের বেশীর ভাগটা মুখের বাইরে রাখে। ভাবে, ধ্বনিতরঙ্গ ঐ কাগজকে ভাইব্রেট করে দাঁত হয়ে মগজে পেঁছোয়, কিংবা কান হয়ে। কেউ বা সামনের দু'পাটির চারটে দাঁত দিয়ে লম্বা একটা পেনসিল কামড়ে ধরে থাকে। কি ফল হয় না হয় কে বলবে? আচ্ছা, মামু, তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, কী রকম অদ্ভুত, প্রিমিটিভ মিনি সাইজের যন্ত্র দিয়ে তিনি তাঁর বিচিত্র সঙ্গীত রচনা করেছিলেন? আমার কাছে ভারি আশ্চর্য লাগে!"

আমি বললুম, "কেন বৎস, ঐ যে তোমার ছোট পিসি, যার সঙ্গে আমার চল্লিশ বছরের বন্ধুত্ব, লীজেল—দেখেছো, ঝড়তি-পড়তি কয়েক টুকরো লেটিসের পাতা, আড়াই ফোঁটা লেবুর রস আর তিন ফোঁটা তেল দিয়ে কি রকম সরেস স্যালাড তৈরী করতে পারে? মুখে দিলে যেন মাখম!!···আর তোর আমার মত আনাড়ীকে যাবতীয় মশলাসহ একটা মোলায়েম মুর্গী দিলেও আমরা যা রাঁধবো সেটা তুইও খেতে পারবি নি, আমিও না। পিসি লীজেল কি বলবে, জানি নে। অথচ জানিস, ঐ অভুক্ত মুর্গীটি তাঁকে তখন দিয়ে দে। তিনি সেটাকে ছোট ছোট টুকরো করে যাকে ফরাসীরা বলে রাগু ফ্যাঁ, রা ফ্রিকাস্ অর্থাৎ লম্বা লম্বা ফালি-ফালি করে কেটে, মুর্গীটাতে আমরা যে-সব বদ-রান্নার ব্যামো চাপিয়েছিলুম সেগুলো রাইনের ওপারে পাঠিয়ে এ্যামন একটি রান্না করে দেবেন যে, প্যারিসের শ্যাফতক্ আমরি আমরি বলতে বলতে তারিয়ে তারিয়ে খাবে।··· প্রকৃত গুণীজন যা-কিছুর মাধ্যমে যা-কিছু সৃষ্টি করতে পারেন। আমাদের দেশে একরকম বাদ্যযন্ত্র আছে। 'একতারা' তার নাম। তাতে একটি মাত্র তার। তার দুদিকে দুটি ফ্লেক্সিবল বাঁশের কৌশল আছে। সে দুটোতে কখনো জোর কখনো হাল্কা চাপ দিয়ে তার মাঝখানের তারটাকে প্লাক করে নাকি বিয়াল্লিশ না বাহান্নোটা নোট বের করা যায়। তবেই দ্যাখ। বেটোফেনের মত কটা লোক পৃথিবীতে আসে—আমাদের দেশেও গণ্ডায় গণ্ডায় তানসেন জন্মায় না। যদিও আমাদের দেশ তোদের দেশের চেয়ে বিস্তর বিরাটতর, এবং সেখানে কলাচর্চা আরম্ভ হয়েছিল অন্তত চার হাজার বছর পূর্বে। এবং আমাদের কলাজগতে অমরা এখন সাহারাতে। এবং—"

ডীটরিষ বললে, "তুমি আমাদের পার্লামেণ্ট হাউসটা দেখবে না? রাইনের পারে। আমি একটু ঘোরপথে যাচ্ছি। সোজা পথে গেলে দু-পাঁচ মিনিট আগে বাড়ি পেঁছিতুম।

"দ্যাখ ডীটরিষ, তোর পিসি নিশ্চয়ই বিস্তর কেক-পেসট্রি আমাদের জন্য বানিয়ে বসে আছে—"

ডীটরিষের বউ বললে, "মামা, শুধু কেক-পেসট্রি বললেন। ওদিকে পিসি কি কি বানিয়ে বসে আছেন, জানেন? কোনিৎসবের্গের রূপসে (ক্যানিসগবের্গ শহরের একরকম কোফ্তা), ফ্রাংকফুর্টের সসিজ, হানোফারের ষাঁড়ের ন্যাজের শুরুয়া—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "সে তো জানি। কিন্তু লীজের পিসি আমার

জন্যে কি ক্যাঙারু ন্যাজের শুরুয়া তৈরী করেছে ?"...

দুজনাই তাজ্জব। আমি বললুম, "ষাঁড়ের ন্যাজের ভিতর থাকে চর্বি এবং মাংস। তার একটা বিশেষ স্বাদ থাকে। কিন্তু ষাঁড়ের ন্যাজ আর কতটুকু লম্বা ? তার চেয়ে ক্যাঙারুর ন্যাজ ঢের ঢের বেশী। ওটা যদি পাঁচজনকে খাওয়ানো যায় তবে বিস্তর কড়ি সাশ্রয় হয়।"

ব্যাচ করে গাড়ি থামলো।

"এটা কি রে ? মনে হয়, গোটা আন্টেক বিরাট বিস্কুটের টিন একটার উপর আরেকটা বসিয়ে দিয়েছে। বললুম আমি।

ডীটরিষ বললে, "এটাই আমাদের পার্লামেন্ট।"

৭

যাকে বলে মর্ডান আর্ট, পিকাসসো উপস্থিত যার পোপস্য পোপ,সেই পদ্ধতিটি জর্মনরা কখনো খুব পছন্দ করে নি। কাইজার দ্বিতীয় ভিলহেলম যাকে এখনো মার্কিনিংরেজ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী করে তিনি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আর্ট এবং আর্টের আদর্শ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তব্য ছিল : আর্ট হবে সুন্দর, আর্ট হবে সমাজসেবক, রাষ্ট্রসেবক, আর্ট মানুষের দুঃখদৈন্যের ছবি না এঁকে আঁকবে এমন ছবি, কম্পোজ করবে এমন সঙ্গীত, রচনা করবে এমন সাহিত্য যাতে মানুষ আপন পীড়াদায়ক পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে আনন্দসায়রে নিমজ্জিত হবে। আজকের দিনে আমরা এটাকে নাম দিয়েছি এসকেপিজম—পলায়ন-মনোবৃত্তি। বলা বাহুল্য জর্মন আর্টিস্ট—সাহিত্যিক সঙ্গীতস্রষ্টা—কাইজারের এই পথনির্দেশ খবরের কাগজে পড়ে স্তম্ভিত হন। তাহলে আর্টিস্টের কোনো স্বাধীন সত্তা নেই। সে তার আপন সুখদুঃখ, আপন বিচিত্র অভিজ্ঞতা, আপন হৃদয়ে উপলব্ধ ভবিষ্যতের আশাবাদী চিত্র অঙ্কন করতে পারবে না ! সে তাহলে রাষ্ট্রের ভাঁড়, ক্লাউন ! তার একমাত্র কর্তব্য হল জনসাধারণকে কাতুকুতো দিয়ে হাসানো !

কিন্তু জর্মন জনসাধারণ কাইজারের কথাই মেনে নিল। এটা আমার ব্যক্তিগত মত নয়। এই পরিস্থিতিটা বোঝাতে গিয়ে প্রখ্যাত জর্মন সাংবাদিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক শ্রীযুক্ত য়োখিম বেসার বলেছেন, জর্মন মাত্রই উপরের দিকে তাকায় ; রাজা কি হুকুম দিলেন সেই অনুযায়ী কাব্যে চিত্রে সঙ্গীতে আপন রুচি নির্মাণ করে।

১৯১৮-এ কাইজার যুদ্ধে হেরে হল্যাণ্ডে পলায়ন করলেন।

তখন সত্য সত্য আরম্ভ হল 'মডার্ন আর্টের' যুগ। যেন কাইজারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করার জন্য আর্টিস্টরা আরম্ভ করলেন রঙ নিয়ে নিত্য নব উন্মাদ নৃত্য, ধ্বনি নিয়ে সঙ্গীতে তাণ্ডব একসপেরিমেন্ট, ভাস্কর্যে বিকট বিকট মূর্তি যার প্রত্যেকটাতেই থাকত একটা ফুটো (তার অর্থ বোঝাতে গেলে পুলিস

আমাকে জেলে পুরবে)। আমি ঐ সময়ে জর্মনিতে ছিলুম। মডার্নদের পাল্লায় পড়ে একদিন একটা চারুকলা প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে এক লম্ফে পুনরপি বেরিয়ে এসেছিলুম। একদা যে-রকম কোন এক জু-তে বোকা পাঁঠার খাঁচার সামনে থেকে বিদ্যুৎ গতিতে পলায়ন করেছিলুম। বোঁটকা গন্ধে।

তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে সেখানে উত্তম দ্রষ্টব্য কিছুই ছিল না। নিশ্চয়ই ছিল। রাস্তার ডাস্টবিন খুঁজলে কি আর খান দুই লুচি, একটা আলুর চপ পাওয়া যায় না? কিন্তু আমার এমন কি দায় পড়েছে!

এরপর ১৯৩৩-এ এলেন হিটলার। তাঁর কাহিনী সবাই জানেন। কিন্তু আর্ট সম্বন্ধে তাঁর অভিমত সবাই হয়তো জানেন না; তাই সংক্ষেপে নিবেদন করছি। হিটলার সর্বক্ষণ কাইজারকে অভিসম্পাত দিতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, কাইজার যদি কাপুরুষের মত হার না মেনে লড়ে যেতেন তবে জর্মনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করতোই করতো।...অথচ আর্ট সম্বন্ধে দেখা গেল হিটলার কাইজার সম্পূর্ণ একমত পোষণ করেন। তিনি কঠিনতর কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে বারংবার বলে যেতে লাগলেন, 'আর্ট হবে সমাজের দাস অর্থাৎ নাৎসীদের দাস। সূর্যনিম্নে এই পৃথিবীতলে তারা যে ন্যায়সম্মত আসন খুঁজছে তারই সেবা করবে আর্টিস্টরা।'

কাইজারের চরম শত্রুও বলবে না তিনি অসহিষ্ণু লোক ছিলেন। তাঁর আমলে তাঁর নির্দেশ সত্ত্বেও যাঁরা মডার্ন ছবি আঁকতেন তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি কোনো প্রকারেরই কোনো কিছু করেন নি।

কিন্তু হিটলার চ্যানসেলার হওয়ার পর আরম্ভ হল এঁদের উপর নির্যাতন। উত্তম উত্তম ছবি, নব নব সঙ্গীত ব্যান করা হল। সেরা সেরা পুস্তক পোড়ানো হল—কারণ এগুলো নাৎসী সঙ্গীতের সঙ্গে এক সুরে এক গান গায় না। আমি দূরে থেকে এরকম একটা অগ্নিযজ্ঞ দেখেছিলুম। কাছে যাই নি। পাছে প্রভুরা আমার রঙ দেখে আমাকে ইহুদী ঠাউরে আমার নাকটা না কেটে দেন। যদিও আমার নাকটি খাঁটি মঙ্গোলীয়ন। খাটো, বেঁটে, হ্রস্ব। কিন্তু বলা তো যায় না।

হিটলার তাঁর সাধনোচিত ধামে গেছেন। এখন জর্মনরা উঠে পড়ে লেগেছেন 'মডার্ন' হতে। চোদ্দতলা বাড়ি ভিন্ন অন্য কথা কয় না।

তাই এই বিস্কুটটিনপারা পার্লিমেন্ট।

* * *

ডীটরিষকে বললুম, "জানো, ভাগিনা, আমাদের দেশেও এ ধরনের স্থাপত্য হুশ হুশ করে আকাশপানে উঠছে। তারই এক আর্কিটেক্ট্ এসেছেন আমাদের সঙ্গে তাস খেলতে। ভদ্রলোক সিগার খান। বর্ষাকাল। সিগার গেছে মিইয়ে। ঘন ঘন নিভে যায়। ভদ্রলোক দেশলাই খোঁজেন।...খেলা শেষ হল। তখন কেন জানি নে তিনি তাঁর দেশলাই আর খুঁজে পান না। আমাদের এক রসিক বন্ধু বসে বসে খেলা দেখছিল। সে দরদী কণ্ঠে বললে, 'দাদাদের কাছে আমার অনুরোধ, আর্কিটেক্ট্ মশায়ের মডেলটি তোমরা কেউ গাপ্ মেরো না। দেশলাইটির মডেল থেকেই তো তিনি হেথাহোথা সর্বত্র বিয়াল্লিশতলার বিলডিং

হাঁকাচ্ছেন ! ওটা গায়েব হলে ও'য়ার রুটি মারা যাবে যে।"

ডীটরিষ বললে, "জানো, মামু, আমাদের বিশ্বাস প্রাচ্যদেশীয়রা বড্ডই সীরিয়াস। সর্বক্ষণ গুমড়ো মুখ করে, লর্ড বুদ্ধের মত আসন নিয়ে শুধু আত্মচিন্তা মোক্ষানুসন্ধান করে। তারাও যে রসিকতা করে এ কথা ৯৯.৯% জর্মন কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। অথচ তোমার এই বন্ধুটির রসিকতাটি শুধু যে রসিকতা তাই নয়। ওতে গভীর দর্শনও রয়েছে। মডার্ন আর্কিটেকচর সম্বন্ধে মাত্র ঐ একটি দেশলাই দিয়ে তিনি তাঁর তাচ্ছিল্য সিনিসিজমসহ প্রকাশ করলেন কী সাতিশয় সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে! ভদ্রলোক কি তোমার মত লেখেন-টেখেন—লিতেরাত্যোর ?"

আমি বললুম, "তওবা, তওবা ! ভদ্রলোক ছিলেন আমাদের ফরেন অফিসের ডেপুটি মিনিস্টার ; পণ্ডিত নেহরুর সহকর্মী। খুব বেশী দিন কাজ করেন নি। ঐ সব দার্শনিক সিনিক্ রসিকতা তিনি সর্বজনসমক্ষে প্রকাশ করতেন তাঁর ভিন্ন ভিন্ন সহকর্মী মন্ত্রীদের সম্বন্ধে। ঠিক পপুলার হওয়ার পন্থা এটা নয়—কি বলো ?. কাজেই তিনি যখন ফরেন অফিস থেকে বিদায় নিলেন তখন আমি বলেছিলুম. তিনি মন্ত্রিমণ্ডলী থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বিদায় নেবার সময় উল্লাসে নৃত্য করলেন এবং মন্ত্রীমণ্ডলীও তাঁর থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে উল্লাসে নৃত্য করলেন।"

ডীটরিষ চুপ। আমি একটু অবাক হলুম। সে তো সব সময়ই জুৎমাফিক উত্তর দিতে পারে।

সে বললে, "আমার অবস্থাও তাই। যে আফিসে আমি কাজ করি সেটা থেকে বেরুতে পারলে আমিও খুশি হই ; ওরাও খুশি হয়।"

৮

ঐ তো সামনে গোডেস্‌বের্গ। ডীটরিষ শুধোলে, "মামু, পিসি বলছিল তুমি নাকি এই টাউনটাকে জর্মনির সর্ব জায়গার চেয়ে বেশী ভালোবাসো ? কেন, বলো তো ?"

আমি মুচকি হেসে কইলুম, "যদি বলি তোর পিসির সঙ্গে হেথায় আমার 'প্রথম প্রণয়' হয়েছিল বলে ?"

ডী। "ধ্যত ! আমি ছেলেবেলা থেকেই লক্ষ্য করেছি, লীজেল পিসির ধ্যানধর্ম শুধু কাজ আর কাজ। ফাঁকে ফাঁকে বই পড়া। এবং সে-বইগুলোও দারুণ সিরিয়স। বড় পিসি বরঞ্চ মাঝে মাঝে হালকা জিনিস পড়তো। কিন্তু ছোট পিসি ওসবের ধার ধারতো না। সে যেতো প্রতি প্রভাতে ট্রামে চড়ে বন্ শহরে—যেখানে সে চাকরি করতো—"

আমি। "সেই সূত্রেই তো আমাদের পরিচয়। আম্মো ঐ সকাল আটটা পনেরোর ট্রামে বন্ যেতুম। আমরা আর সবাই দু'তিনটে সিঁড়ি বেয়ে ট্রামে

উঠতুম। আর লীজেল পিসি ডান হাতে একখানা বই আর বাঁ হাতে ট্রামের গায়ে সামান্যতম ভর করে সিঁড়িগুলোকে 'তাচ্ছিলি' করে এক লম্ফে উঠতো ট্রামের পাটাতনে। উঠেই এক গাল হেসে ডাইনে বাঁয়ে সমুখপানে তাকিয়ে বলতো, 'গুটেন্ মরগেন্' "সুপ্রভাত"। ওর ঐ লম্ফ মেরে ওঠার কৈশল দেখে আমি মনে মনে বলতুম একদম 'টম বয়'! ওর উচিত ছিল মার্কিন মুল্লুকে 'কাউ বয়' হয়ে জন্ম নেবার। অথবা 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুঈন'—গুরুদেবের ভাষায়।"

গোডেসবের্গ তখন অতি ক্ষুদ্র শহর। সবাই সবাইকে চেনে। কিন্তু আসল কথা, ঐ আটটা পনেরোর ট্রামে থাকতো পোনেরো আনা কাচ্চাবাচ্চা। ইস্কুলে যাচ্ছে বন্ শহরে। এরা সবাই জানতো যে লীজেল পিসির, অবশ্য তখনো তিনি 'পিসি' খেতাব পান নি, কাছে আছে লেবেনচুস্, দু'একটা আপেল, হয়তো নবাগত মার্কিন চুঈংগাম, মাঝে-মধ্যে চকলেট। কাজেই বাচ্চারা সমস্বরে, কোরাস কণ্ঠে বলতো, অন্তত বারতিনেক "সুপ্রভাত—"। তার পর সবাই তার চার পাশে ঘিরে দাঁড়াত। সবাই বলতো, "প্লীজ, এস্তে, এস্তে, এই এখানে বসুন।"

আমি বললুম, "বুঝলি ডীটরিষ, তোর পিসি লীজেল ছিল আমাদের হীরইন অব্ দ প্লে। তবে তুই ঠিকই বলেছিস ও কখনো প্রেম-ফ্রেমের ধার ধারতো না। আমি দু'একবার তার সঙ্গে হাফাহাফি ফ্লার্ট করতে গিয়ে চড় খেয়েছি। অথচ আমাদের মধ্যে প্রীতিবন্ধুত্ব ছিল গভীর। আমাকে কত কী না খাইয়েছে—ঐ অল্প বয়সেই বেশ দু'পয়সা কামাতো বলে। তখনকার দিনে ছিল—এখনো নিশ্চয়ই আছে—একরকমের বেশ মোটা সাইজের চকলেট—ভিতরে কন্যাক্। বড্ড আক্রা। কিন্তু খেতে—ওঃ! কী বলবো—মুখে ফেলে সামান্য একটু চাপ দাও। ব্যস হয়ে গেল। ভিজে ভিজে চকলেট আর তরল কন্যাকে মিশে গিয়ে, দ্যাখ তো না দ্যাখ, চলে গেল একদম পেটের পাতালে। কিন্তু যাবার সময় ঐ যে কন্যাক্—তোরা যাকে বলিস ব্র্যানট্ভাইন, ইংরিজীতে ব্র্যান্ডি, নাড়িভুঁড়ির প্রতিটি মিলিমিটার মধুর মধুর চুলবুলিয়ে বুঝিয়ে দিতো, যাচ্ছেন কোন মহারাজ!···আর মনের মিলের কথা যদি তুলিস তবে বলবো, লীজেল ছিল বড্ডই লিবরেল। তাই যদিও নাৎসীরা তখনো ক্ষমতা পায় নি কিন্তু রাস্তাঘাটে দাবড়াতে আরম্ভ করেছে—পিসি সেটা আদৌ পছন্দ করতো না। আমিও না। কিন্তু সত্যি বলতে কি, ইংরেজ যে ইতিমধ্যেই হিটলার বাবদে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে সেটা আমার চিত্তে পুলক জাগাতো। পিসিও সেটা জানতো। ভারতবর্ষের পরাধীনতার কথা উঠলেই সে ব্যথা পেত। বলতো, 'ও কথা থাক না।' ওরকম দরদী মেয়ে চিনতে পারার সৌভাগ্য আমি ইহসংসারে অতি অল্পই পেয়েছি।"

হঠাৎ লক্ষ্য করলুম, ভাগিনা ডীটরিষ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছে। শুধোলুম, "কি হল রে? তুই কি পরশুদিনের হাওয়া খেতে চলে গিয়েছিস?"

কেমন যেন বিষন্ন কণ্ঠে ভেজা-ভেজা গলায় সে বললে, "মামা, তুমি বোধ হয় জানো না, আমার বাবা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে ওপারে চলে গেল কি করে।"

ডীটরিষের এখন যৌবনকাল। তার বাপ কেন, ঠাকুদ্দাও বেঁচে থাকলে আশ্চর্য হবার মত কিছু ছিল না। বললুম, "আমি তো জানি নে ভাই। কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, আবার হচ্ছেও না। কারণ তোর গলাটা কি রকম যেন ভারী-ভারী শোনাচ্ছে—"

"তুমি এইমাত্র বললে না, তুমি পিসি দুজনাই নাৎসীদের পছন্দ করতে না। বস্তুত পিসি-পরিবারের কেউই নাৎসী ছিল না। যদিও আমি তোমার বান্ধবীকে পিসি বলে পরিচয় দিয়েছি, আসলে তিনি আমার মাসি। তাঁরা তিন বোন। আমার মা সকলের ছোট। তিনি বিয়ে করলেন এক নাৎসীকে—কট্টর নাৎসীকে। কেন করলেন জানি নে। প্রেমের ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিল। বাড়ি গিয়ে তোমাকে তার ডাইরিটি দেখাবো। আর চেহারাটি ছিল সুন্দর—"

বাধা দিয়ে বললুম, "সে তোর চেহারা থেকেই বোঝা যায়।"

"থ্যাংকউ। আর বাবা ছিল বড্ডই সদয়-হৃদয়—"

"ভাগিনা, কিছু মনে করো না। আমি মোটেই অবিশ্বাস করি না যে তোর পিতা অতিশয় করুণ হৃদয়, শান্ত স্বভাব ধরতেন—তোর দুই মাসিই সে-কথা আমাকে বারংবার বলেচে। কিন্তু আবার বলছি কিছু মনে করো না, তাহলে তিনি নাৎসীদের কনসানট্রেশন ক্যামপ সয়ে নিলেন কি করে?"

ডীটরিষ চুপ মেরে গেল। কোন উত্তর দেয় না। আমি এবার, বহুবারের পর আবার, বুঝলুম যে আমি একটা আস্ত গাড়োল। এরকম একটা প্রশ্ন করাটা আমার মোটেই উচিত হয় নি। বললুম, "ভাগিনা, আমি মাফ চাইছি। আমি আমার প্রশ্নটার কোনো জবাব চাই নে। ওটা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি।"

ডীটরিষ বললে, "না, মামু। তুমি যা ভেবেছো তা নয়। আমি ভাবছিলুম, সত্যই তো, বাবা এগুলো বরদাস্ত করতো কি করে? এবং আরো লক্ষ লক্ষ জর্মন? এই নিয়ে আমি অনেকবার বহু চিন্তা করেছি। তুমি জানো, মার্কিন-ইংরেজ রুশ-ফরাসী ন্যুরেনবের্গ মোকদ্দমায় বার বার নাৎসীদের প্রশ্ন করেছে, 'তোমরা কি জানতে না যে হিটলার কনসানট্রেশন ক্যামপে লক্ষ লক্ষ ইহুদীকে খুন করছে?' উত্তরে সবাই গাঁইগুঁই করছে। সোজা উত্তর কেউই দেয় নি। জানো তো যুদ্ধের সময় কত সেনসর কত কড়াকড়ি! কে জানবে কি হচ্ছে না হচ্ছে! আমার মনে হয়, আবার বলছি জানি নে, বাবার কানে কিছু কিছু পেঁচেছিল। কিন্তু বাবা তখন উন্মত্ত। তিনি চান জর্মনির সর্বাধিকার। তাঁর ডাইরিতে বার বার বহুবার লেখা আছে, ইংরেজ কে? সে যে বিরাট বিশ্ব শুষে খেতে চায় তাতে তার হক্কো কি? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মানি, তারা যদি আমাদের কিংবা ফরাসীদের মত কলচরড জাত হত তবে আমরা এ-নিয়ে কলহ করতুম না। কিন্তু ইংরেজ জাতটাই তো বেনের জাত। তারা কালচারের কি বোঝে? ওদের না আছে মাইকেল-এঞ্জেলো, না আছে বেটোফেন। আছে মাত্র শেকসপীয়র। ওদের না আছে স্থাপত্য, না আছে ভাস্কর্য, না আছে—" হঠাৎ বললো, "ঐ তো বাড়ি পেঁছে গিয়েছি।"

৯

"ডু হালুঙ্কে"—সোল্লাসে হুহুঙ্কারে রব ছাড়লো শ্রীমতী লীজেল। "তুই গুণ্ডা—"

আমরা যেরকম কোনো দুরন্ত ছোট বাচ্চাকে আদর করে 'গুণ্ডা' বলে থাকি 'হালুঙ্কে' তাই। শব্দটা চেক ভাষাতে জর্মনে প্রবেশলাভ করেছে। গত চল্লিশ বছর ধরে দেখা হলেই লীজেল এইভাবেই আমাকে 'অভ্যর্থনা' জানিয়েছে।

তারপর আমাকে জাবড়ে ধরে দু'গালে দুটো চুমো খেল।

ডীটরিষ মারফত পাঠককে পূর্বেই বলেছি লীজেল ছিল ন'-সিকে 'টম-বয়'। এবং দু'একবার তার সঙ্গে হাফাহাফি ফ্লার্ট করতে গিয়ে চড় খেয়েছি। তবে এটা হল কি প্রকারে? শুচিবায়ুগ্রস্ত পদীপিসীরা ক্ষণতরে ধৈর্য ধরুন। বুঝিয়ে বলছি। এই ষাট বছর বয়সে তার কি আর 'টমবয়ত্ব' আছে? এখন আমাকে জাবড়ে ধরে আলিঙ্গন করাতে সে শুধু তার অন্তরতম অভ্যর্থনা জানালো।

আমি মনে মনে বললুম, চল্লিশ বছর ল্যাটে, চল্লিশ বছর ল্যাটে। এই আলিঙ্গন-চুম্বন চল্লিশ বছর পূর্বে দিলেই পারতে, সুন্দরী। পরে তাকে খুলেও বলেছিলুম।

ইতিমধ্যে ডীটরিষ আমতা আমতা করে বললে, "আমরা তা হলে আসি। রাত্রের পার্টিতে দেখা হবে।"

ওরা পাশেই থাকে। তিন মিনিটের রাস্তা। ওদের ভাব থেকে বুঝলুম, ওরা মনে করছে বিদ্যা ও সুন্দর যখন বহু বৎসর পর সম্মিলিত হয়ে গেছেন তখন ওদের কেটে পড়াই ভালো। আমাদের প্রেমটি যে চিরকালই নির্জলা জল ছিল সেটি হয়তো তারা গলা দিয়ে নাবাতে পারে নি—হজম করা তো দূরের কথা।

লীজেল আমাকে হাতে ধরে ড্রইংরুমের দিকে নিয়ে চললো। আমি বললুম, "এ কি আদিখেত্তা! চল্লিশ বছর ধরে যখনই এ বাড়িতে এসেছি তখনই আমরা বসেছি বাবা, মা, বড়দি, তুমি, ছোড়দি রান্নাঘরে। অবিশ্যি মা রান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আজ কেন এ ব্যত্যয়? তদুপরি ঐ বিরাট ড্রইংরুম! বাপ্‌স্! তুই যদি এক কোণে বসিস আর আমি অন্য কোণে, তা হলে একে অন্যকে দেখবার তরে জোরদার প্রাশান মিলিটারি দূরবীনের দরকার হবে; কথা কইতে হলে আমাদের দেশের ডাকহরকরা, নিদেন একটা ট্রাংককল-ফোন্ ব্যবস্থা, আর—"

লীজেল সেই প্রাচীন দিনের মত বললে, "চোক্‌কোর চোক্‌কোর। তুই চিরকালই বড্ড বেশী বকর বকর করিস্।"

গতি পরিবর্তিত হল। আমরা শেষ পর্যন্ত রান্নাঘরেই গেলুম।

কিচেনের এক প্রান্তে টেবিল, চতুর্দিকে খান ছয় চেয়ার। অন্য প্রান্তে দুটো গ্যাসউনুন, তৃতীয়টা কয়লার (সেটা খুব সম্ভব প্রাচীন দিনের ঐতিহ্য রক্ষার্থে)। দুই প্রান্তের মাঝখানে অন্তত দশ কদম ফাঁক। অর্থাৎ কিচেনটি তৈরী করা

হয়েছে দরাজ হাতে। বস্তুত লীজেলের মা যখন রাঁধতেন তখন এ-প্রান্ত থেকে আমাকে কিছু বলতে হলে বেশ গলা উঁচিয়ে কথা কইতে হত।

লীজেল একটা চেয়ার দেখিয়ে বললে, "এটায় ব'স্।"

সত্য বলছি, আমার চোখে জল এল। কি করে লীজেল মনে রেখেছে যে, চল্লিশ বৎসর পূর্বে (তিনি গত হয়েছেন বছর আটত্রিশেক হবে) তার পিতা আমাকে ঐ চেয়ারটায় বসতে বলতেন। আমি জানতুম, কেন। জানলা দিয়ে, ঐ চেয়ারটার থেকে দূর-দূরান্তের দৃশ্য সব চেয়ে ভালো দেখা যায়। পরে জানতে পেরেছিলুম, তিনি স্বয়ং ঐ চেয়ারটিতে বসে আপন ক্ষেতখামারের দিকে এবং বিশেষ করে তাঁর বিরাট আপেলবাগানের দিকে নজর রাখতেন—(মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে আমাদের যে রকম আমবাগান)। অবশ্যই তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে ভালোবাসতেন। নইলে আমাকে তাঁর আপন আসন ত্যাগ করে, আপন অভ্যস্ত আসন ছেড়ে দিয়ে ওখানে বসতে বলবেন কেন? আমি তো সেখান থেকে তাঁর ক্ষেতখামার, আপেলবাগান তদারকি করতে পারবো না—যারা ঘোরাঘুরি করছে তারা তাঁর আপন 'মুনিষ' না ভিন্-জন আমি ঠাহর করবো কি প্রকারে? আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ? সেদিকে আমার কোনো চিত্তাকর্ষণ নেই। একদিন ঐ শেষ কথাটি তাঁকে আস্তে আস্তে ক্ষীণ কণ্ঠে বলতে—যাতে অন্যেরা শুনতে না পায়—তিনি বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে অতিশয় সুন্দর স্মিতহাস্যে বললেন, "তোমরা ইণ্ডিয়ান। তোমাদের দেশে এখনো কল-কারখানা হয় নি। তোমরা এখনো আছো প্রকৃতির শিশু। শিশু কি মায়ের সৌন্দর্য বোঝে? না। সে শুধু তার মায়ের স্তনরস চায়—সেই স্তনদ্বয়ের সৌন্দর্য কি সে বোঝে? যেমন তার বাপ বোঝে? ঠিক ঐরকম তোমরা তোমাদের মা-জননী জন্মভূমিতে ক্ষেতখামার করে খাদ্যরস আহারাদি করো। তোমরা এখনো কি করে বুঝবে, নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বলতে কি বোঝায়? সেটা শুধু হয় যখন মানুষ কলকারখানার গোলাম হয়ে হয়। অর্থাৎ মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর, বড় হয়ে সে তার মাতৃদুগ্ধের মূল্য বুঝতে শেখে—"

আমি বললুম, "মানছি, কিন্তু দেখুন গ্রীস, রোম এবং আমার দেশ ভারতবর্ষেও তো কলকারখানা নির্মিত হওয়ার বহু পূর্বে উত্তমোত্তম কাব্য রচিত হয়েছিল এবং সেগুলোতেও বিস্তর প্রাকৃতিক নৈসর্গিক বর্ণনা আছে। তবে কেন—?"...

এসব কথাবার্তা যেন ঐ চেয়ারে বসে কানে শুনতে পাচ্ছি। কত বৎসর হয়ে গেছে। এমন সময় লীজেল আমার মাথায় মারলো একটা গাঁট্টা। আমার স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। বিশেষ করে তার ঠাকুরমার ছবিটি।

"কি খাবে বলছিলে?"

আমি আশ্চর্য হয়ে উত্তর দিলুম, "আমি তো কিছুই বলি নি।"

"তুমি চলো, তুমি যে সুপ পছন্দ করতে সেই সুপই করেছি—অর্থাৎ পী সুপ (বলাইশুঁটির সুপ)—এবারে বলো তুমি কি খাবে? তুমি যা খেতে চাও

তার জন্য মাছ, মাংস, ক্রীম আছে।"

আমি বললুম, "দিদি, সুপ ছাড়া আমার অন্য কোনো জিনিসের প্রয়োজন নেই। আর এই জর্নিতে আমার সর্বাঙ্গ অসাড়।...তবে কিনা আমি বঙ্গসন্তান। হেথায় ডান পাশে রাইন নদী। সে নদীর উত্তম উত্তম মাছ খেয়েছি কত বৎসর ধরে। তারই যদি একটা কিছু—"

বেচারী লীজেল!

শুকনো মুখে বললে, "রাইনে তো আজকাল আর সে মাছ নেই।"

আমি শুধোলুম, "কেন?"

বললে, "রাইন নদের জাহাজের সংখ্যা বড্ড বেশী বেড়ে গিয়েছে। তাদের পোড়ানো তেল তারা ঐ নদীতে ছাড়ে। ফলে নদীর জল এমনই বিষে মেশা হয়ে গিয়েছে যে, মাছগুলো প্রায় আর নেই। আমার কাছে যে সব মাছ আছে সেগুলো টিনের মাছ।"

আমি বললুম, "তা হলে থাক।"

১০

বিনু যখন সোয়ামীর সঙ্গে ট্রেনে করে যাচ্ছিল তখন বললে, "আহা ওরা কেমন সুখে আছে।" আমরাও ভাবি ইংরেজ ফরাসী জর্মন জাত কি রকম সুখে আছে। কিন্তু ওদের দুঃখও আছে। তবে আমাদের মতো ওদের দুঃখ ঠিক একই প্রকারের নয়। ওরা খেতে পায়, আশ্রয় আছে। তৎসত্ত্বেও ওদের দুঃখ আছে।

লীজেলদের বাড়ি প্রায় দুশো বছরের পুরনো। সে আমলে স্টীল সিমেন্টের ব্যাপার ছিল না। বাড়িটা মোটামুটি কাঠের তৈরী। দুশো বছর পরে ছাদটা নেমে আসছে। এটাকে খাড়া রাখা যায় কি প্রকারে!

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "লীজেল, এটাকে কি মেরামত করা যায় না?"

লীজেল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, "শুধু ছাদ নয়, দেওয়ালগুলো ঝুরঝুরে হয়ে এসেছে। এ বাড়ি মেরামত করতে হলে কুড়ি হাজার মার্ক (আমাদের হিসাবে চল্লিশ হাজার টাকারও বেশী) লাগবে। বাবা গেছেন, আমার কোনো ভাইও নেই। ক্ষেতখামার দেখবে কে? আপেলবাগানটা পর্যন্ত বেচে দিয়েছি। তাই স্থির করেছি বাড়িটা সরকারকে দিয়ে দেবো। ওরা সব পুরোনো বাড়ির কিছু কিছু বাঁচিয়ে রাখতে চায়। কারণ এ বাড়িটির স্টাইল একেবারে খাঁটি রাইনল্যান্ডের।"

আমি বললুম, "এটা মর্টগেজ করে টাকাটা তোলো না কেন?"

লীজেল বললে, "যে টাকাটা কখনো শোধ করতে পারবো না সে টাকা ধার করবো কি করে!"

আমার মনে গভীর দুঃখ হলো। বাড়িটি সত্যিই ভারী সুন্দর। শুধু বাড়িটি নয়, তার পেছনে রয়েছে ফল-ফুলের বাগান, তরি-তরকারির ব্যবস্থা,

কুয়ো, হ্যান্ডপাম্প দিয়ে জল তোলার ব্যবস্থা—গ্রামাঞ্চলে উত্তম ব্যবস্থা। ক্ষেত-খামার গেছে যাক। ওদের আপেলবাগান এই অঞ্চলে বৃহত্তম এবং শ্রেষ্ঠতমও ছিল। সেও গেছে যাক। কিন্তু এই সুন্দর বাড়িটা সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে, এটা আমার মন কিছুতেই মেনে নিতে চাইল না।

ইতিমধ্যে লীজেলের ছোট বোন মারিয়ানা এল। তিন বোনের ঐ একমাত্র যার বিয়ে হয়েছিল। যে-ডীটরিষ আমাকে নিয়ে যাবার জন্য বন্-এ এসেছিল তার মা। ছেলের বাড়ি দু মিনিটের রাস্তা। সেখানে বউ নিয়ে থাকে।

মারিয়ানা বিধবা। প্রায় সাতাশ বছর পূর্বে তার বিয়ে হয়। বরটি ছিল খাসা ছোকরা—কিন্তু···

এ বাড়ির তিন বোনের কেউই নাৎসী ছিল না। এরা সবাই ধর্মভীরু ক্যাথলিক। ইহুদীরা প্রভু খৃষ্টকে হয়তো ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, হয়তো করে নি। যাই হোক, যাই থাক্—তাই বলে দীর্ঘ, সুদীর্ঘ সেই ঘটনার দু হাজার বছর পর ওদের দোকানপাট, ভজনালয়, ওদের লেখা বইপত্র পুড়িয়ে দেবে (মহাকবি হাইনরিষ হাইনের কবিতাও বাদ যায় নি), ইহুদী ডাক্তার, উকীল প্র্যাকটিস করতে পারবে না—এটা ওরা গ্রহণ করতে পারে নি। এটা ১৯৩৪ সালের কথা। তখনো কনসানট্রেশন ক্যাম্প আরম্ভ হয় নি। যখন আরম্ভ হল তখন আমি দেশে। যুদ্ধ পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। চিটি-চাপাটির[১] গমনাগমন সম্পূর্ণ রুদ্ধ। কিন্তু আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ ছিল না যে লীজেলদের পরিবার এ-প্রকারের নিষ্ঠুর নরহত্যা শুধু যে ঘৃণার চোখে দেখবে তাই নয়, এরা যে এর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারছে না সেটা তাদের মনকে বিকল করে দেবে।···এ সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমি যখন জর্মনি যাই তখন লীজেল আমাকে বলেছিল, "ডু হালুঙ্কে, তুই তো ভালো করেই চিনিস, আমাদের এই মুফেনডার্ফ গ্রাম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের না হোক, জর্মনির ক্ষুদ্রতম গ্রাম। সেই হিসেবে আমরা প্রখ্যাততম গ্রাম। এখানে মাত্র একটা দুটো ইহুদী পরিবার ছিল। দিদি সময়মত ওদেরকে সুইটজারল্যাণ্ডে পাচার করে দিয়েছিল।

এবারে আরম্ভ হবে ট্রাজেডি।

মারিয়ানা বড় সরলা। এ-সব ব্যাপার নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাতো না। অবশ্য সেও ছিল আর দুই দিদির মত পরদুঃখকাতর।

বিয়ে করে বসলো এক প্রচণ্ড পাঁড় নাৎসীকে। কেন করলো, এ মূর্খকে শুধোবেন না। মেয়েরা কেন কার প্রেমে পড়ে, কেন কাকে বিয়ে করে এ-নিগূঢ়

১ আমার এক গুণী সখা আমাকে একদা বলেন, 'সিপাহী বিদ্রোহে'র সময় চাপাটিরুটির মারফৎ 'বিদ্রোহী'রা একে অন্যকে খবর পাঠাতো বলে 'চিঠিচাপাটি' সমাসটি নির্মিত হয়। কোনো এবং কিংবা একাধিক বিদ্বজ্জন যদি এ-বিষয়ে 'দেশ' পত্রিকায় সবিস্তর আলোচনা করেন তবে এ-অজ্ঞজন উপকৃত হবে। কিন্তু দয়া করে আমাকে সরাসরি লিখবেন না। এটা পাঞ্চজন্য। আমি ছাড়াও পাঁচ-জনের উপকারার্থে।

তত্ত্ব দেবতারাও আবিষ্কার করতে পারেন নি।

তারপর যুদ্ধ লাগল। সেটা শেষ হল।

* * *

এইবারে মার্কিন ইংরেজদের কৃপায় দেশের শাসনভার পেলেন নাৎসীবৈরীরা। এঁরা খুঁজে খুঁজে বের করলেন নাৎসীদের। তখন আরম্ভ হল তাদের উপর নির্যাতন। আজ ধরে নিয়ে যায়। তিন দিন তিন রাত্তির গারদে নির্জন কারাবাসের পর আপনাকে ছেড়ে দিল। আপনি ভাবলেন, যাক বাঁচা গেল। দশ দিন যেতে না যেতে আবার ভোর চারটেয় আপনাকে গ্রেফতার করে ঠাসলো গারদে। (এই যে আপনাকে ছেড়ে দিয়েছিল সেটা শুধু আপনার পিছনে গোয়েন্দা রেখে ধরবার জন্য কারা কারা আপনার সহকর্মী ছিল; কারণ স্বভাবতই আপনি তাদেরই সন্ধানে বেরোবেন। দ্বিতীয়ত এরা আপনার দরদী বন্ধু। আপনার দৈন্য-দুর্দিনে—একমাত্র তারাই আপনাকে সাহায্য করবে—অবশ্য যদি তাদের দু' পয়সা থাকে।...এটা কিছু নবীন ইতিহাস নয়। আমাদের এই স্বদেশী আন্দোলনের সময়, পরবর্তী যুগে 'মহামান্য' টেগার্ট সাহেবের আমলে—

বারে বারে সহস্র বার হয়েছে এই খেলা।
দারুণ রাহু ভাবে তবু হবে না মোর বেলা॥)

সর্বশেষে মারিয়ানার স্বামীর তিন বছরের জেল হল। সেখানে যক্ষ্মা। বেরিয়ে এসে ছ মাসের পরই ওপারে চলে গেল।

পাঠক ভাববেন না,

আমি নাৎসীবৈরীদের দোষ দিচ্ছি।

বার বার শুধু আমার মনে আসছে ঃ—

এদেশের লোক সবাই কৃশ্চান।

এদেশের প্রভু, প্রভু খৃষ্ট আদেশ দিয়েছেন, ক্ষমা, ক্ষমা, ক্ষমা।

জানি মানুষ এত উঁচুতে উঠতে পারে না।

কিন্তু সেই চেষ্টাতেই তো তার খৃষ্টত্ব, তার মানুষ্যত্ব।

১১

হুর্‌রে হুর্‌রে, হুর্‌রে।

কৈশোরে অবশ্য আমরা বলতাম, হিপ্‌স্‌ হিপ্‌স্‌ হুর্‌রে।

পুরোপাক্কা ক্রেডিট নিশ্চয়ই এ্যার ইণ্ডিয়া কোম্পানির।...দীর্ঘ হাওয়াই মুসাফিরির পর অঘোরে ঘুমিয়েছিলাম সকাল আটটা অবধি। নীচে নাবতেই লীজেল চেঁচিয়ে বললে, "ভু হালুঙ্কে! তোর হারানো সুটকেস ফিরে পাওয়া গিয়েছে।"

"কি করে জানলি?"

"আমাদের তো টেলিফোন নেই। চল্লিশ বছর আগে এই গোডেসবের্গের যে

বাড়িতে তুই বাস করতিস তার টেলিফোন নম্বরটি তুই কলোনের 'হারানো প্রাপ্তি'র দফতরে সুবুদ্ধিমানের মত দিয়ে এসেছিলি। আশ্চর্য! সে নম্বর তুই পুতুপুতু করে এত বৎসর ধরে পুষে রেখেছিলি কি করে আর সেটা যে কলোনের সেই 'হারানো প্রাপ্তি'র দফতরে আপন স্মরণে এনে ওদের দিয়েছিলি সেটা আরো বিস্ময়জনক। তোর পেটে যে এত এলেম তা তো জানতুম না। আমি তো জানতুম তোর পশ্চাৎদেশে টাইম বম রাখতে হয় (আমরা বাঙলায় বলি, 'পেটে বোমা না মারলে কথা বেরোয় না'), ফিউজের হিস্‌হিস্‌ শুনে তবে তোর বুদ্ধি খোলে! সে-কথা থাক। কালোনের দফতর সেই নম্বরে ফোন করে, আর তোর সেই প্রাচীন দিনের ল্যান্ডলেডির মেয়ে 'আনা'সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেল তুই আমাদের বাড়িতে উঠেছিস। তা ছাড়া যাবি আর কোন্‌ চুলোয়! আনা'র বিয়ে হয়েছে এক যুগ আগে। ভাতার আর বাচ্চা দুটো রয়েছে। তাই সেখানে না উঠে আমাকে আপ্যায়িত করতে এসেছিস। ফের বলছি সে-কথা থাক। আনা কিন্তু বুদ্ধিমতী মেয়ে—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "হবে না কেন? আমি ওদের বাড়িতে ঝাড়া একটি বছর ছিলুম। আমার সঙ্গ পেয়েছে বিস্তর।"

লীজেল আমার দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে কোনো মন্তব্য না করে বললে, "সে জানে আমাদের টেলিফোন নেই। কিন্তু আমাদের পাশের বাড়ির মহিলার আছে। তাকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে যে তার সুটকেসটি পাওয়া গিয়েছে এবং কলোন দফতরে জমা পড়েছে।"

আমি বললুম, "সর্বনাশ! আমাকে এখন ঠ্যাঙস ঠ্যাঙস করে যেতে হবে সেই ধেড়ধেড়ে-গোবিন্দপুর কলোনে? আধখানা দিন তাতেই কেটে যাবে। হেথায় এসেছি ক'দিনের তরে? তারও নিরেট চারটি ঘণ্টা মেরে দিয়েছে জুরিক। কনেকশন ছিল না বলে। আমি—"

লীজেল বাধা দিয়ে বললে, "চল্লিশ বৎসর পূর্বে প্রাথমিক পরিচয়ে তোকে যে একটা আকাট মূর্খ ঠাউরেছিলুম সেটা কিছু ভুল নয়; কলোনের দফতরে তোর প্র্যাকটিকাল বুদ্ধি ব্যত্যয়। অবশ্য আমি কখনো বলি নে এক্‌সেপ্‌শন্‌ প্রুভজ দি রুল, আমি বলি রুল প্রুভজ দি এক্‌সেপ্‌শন্‌। তো সুটকেস তারাই এখানে পেঁছে দেবে।"

* * *

ওঃ! কী আনন্দ, কী আনন্দ! কাল রাত্রে ভয়ে ভয়ে আমি আমার হারিয়ে না যাওয়া বড় সুটকেসটি খুলি নি। যদি দেখি, এদের এবং আমার অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবের জন্য ছোটখাটো যে-সব সওগাৎ এনেছি সেগুলো এই বড় সুট-কেসটিতে নেই। এটাকেই নাকি বিদেশী ভাষায় বলে অসট্রিচ মনোবৃত্তি।

ইতিমধ্যে বাড়ির সদর দরজাতে ঘা পড়লো। লীজেল সেথায় গিয়ে কি যেন কথাবার্তা কইলে। মিনিট দুই পরে সেই হারিয়ে-যাওয়া-ফিরে-পাওয়া সুটকেসটি নিয়ে এসে আমার সামনে রেখে বললে, "তোদের এ্যার-কোমপানি তো বেশ স্মার্ট: কম্‌পিটেন্‌ট্‌। এত তড়িঘড়ি হুলিয়া ছেড়ে বাক্সটাকে ঠিক ঠিক পকড়

কর্ তোর কাছে পেঁছে দিলে।" আমার ছাতি সুশীল পাঠক, ইঞ্চি ছয়—মাফ করবেন, আজকাল নাকি তাবৎ মাপ সেণ্টিমীটার মিলিমীটারে বলতে হয়—অর্থাৎ ১৫ মিলিমীটার (কিংবা সেণ্টিমীটারও হতে পারে—আমার প্রিন্‌স্ অব ওয়েলস্ অর্থাৎ বড় বাবাজী যে ইস্‌কেলখানা রেখে দিয়ে ঢাকা চলে গিয়েছেন সেটাতে তার হদিস মেলে না) ফুলে উঠলো।

* * *

বাকসোটা খুলে দেখি, আমার মিত্র মিত্র যে-সব বস্তু খাদি প্রতিষ্ঠান থেকে কিনে দিয়েছিল তার সবই রয়েছে (১) বারোখানা মুর্শিদাবাদী রেশমের স্কার্ফ, (২) উড়িষ্যার মোষের শিঙে তৈরী ছ'টি হাতি, (৩) পূর্ববং ঐ দেশেরই তৈরী পিঠ চুলকানোর জন্য ইয়া লম্বা হাতল, (৪) দশ বাণ্ডিল বিড়ি (এগুলো অবশ্য লীজেল পরিবারের জন্য নয়; এগুলো আমার বন্ধুর জন্য), (৫) ভিন্ন ভিন্ন গরমমশলা এবং আচার, (৬) বর্ধমানের রাজপরিবারের আমার একটি প্রিয় বান্ধবীর দেওয়া একখানি মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম স্কার্ফ (তাঁর শর্ত ছিল সেটি যেন আমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠা বান্ধবীকে দিই), (৭) তিনটি ফার্স্ট ক্লাস বেনারসী রেশমের টাই, কাশ্মীরের ম্যাংগো ডিজাইনের শালের মত ওগুলো বর্ধমানেরই দেওয়া, (৮) দুই পৌণ্ড দক্ষিণ ভারতের কফি ও পূর্ববং ওজনে দার্জিলিঙের চা।...এবং একখানা বই ঠাকুর রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে—তাঁর এক বিশেষ পূজারিণীর জন্য, তিনি বাস করেন সুইটজারল্যাণ্ডে। আর কি কি ছিল ঠিক ঠিক মনে পড়ছে না। বেশ কিছু কাসুন্দোও ছিল। এই ইয়োরোপীয়ানদের বড্ডই দেমাক, তাদের মাস্‌টার্ড নিয়ে। দম্ভজনিত আমার উদ্দেশ্য ছিল এদেরকে দেখানো যে আমাদের বাঙলাদেশের কাসুন্দো এ-লাইনে অনির্বচনীয়, অতুলনীয়। পাউডার দিয়ে তৈরী ওদের মাস্‌টার্ড দু'দিন যেতে না যেতেই মসনে ধরে সবুজ হয়ে অখাদ্যে পরিবর্তিত হয়। আর আমাদের কাসুন্দো? মাসের পর মাস নির্বিকার ব্রহ্মের মত অপরিবর্তনশীল।

লীজেলকে বললুম, "দিদি, এসব জিনিস ঐ বড় টেবিলটার উপর সাজিয়ে রাখ্। আর খবর দে ডীটরিষ ও তার বউকে। মারিয়ানা আর তুই তো আছিসই। যার যা পছন্দ তুলে নেবে।"

লীজেল বললে, "এটা কি ঠিক হচ্ছে? এখান থেকে তুই যাবি ড্যুলসডর্ফে—সেখানে তোর বন্ধু পাউল আর তার বউ রয়েছে। তারপর যাবি হামবুর্গে; সেখানে তোর বান্ধবীর (তিনি গত হয়েছেন) তিনটি মেয়ে রয়েছেন। তারপর যাবি স্টুটগার্ট-এ। সেখানে রয়েছেন তোর ফার্স্ট লভ। এখানেই যদি ভালো ভালো সওগাৎ বিলিয়ে দিস তবে ওরা পাবে কি?"

একেই বঙ্গভাষায় বলে পাকা গৃহিণী। কোন্ গয়না কে পাবে কে জানে।

১২

গডেসবের্গ সত্যই বড় সুন্দর। এ শহরের সৌন্দর্য আমাকে বার বার আহ্বান করেছে। রাস্তাগুলো খুবই নির্জন। এতই নির্জন যে পথে কারো সঙ্গে দেখা হলে সে সম্পূর্ণ অচেনা হলেও আপনাকে অভিবাদন জানিয়ে বলবে, 'গুটেন টাহ্'। আপনিও তাই বলবেন। রাস্তার দুপাশে ছোট ছোট গেরস্তবাড়ি। সবাই বাড়ির সামনে যেটুকু ফাঁকা জায়গা আছে তাতে ফুল ফুটিয়েছে। যদি কোন বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আপনি ফুলগুলোর দিকে মুগ্ধনয়নে তাকিয়ে থাকেন তবে প্রায়ই বাড়ির কর্তা, কিংবা গিন্নী, কিংবা তাদের ছেলেমেয়ের একজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আপনার সঙ্গে কথা জুড়ে বসবে। শেষটায় বলবে, "আপনিও আমাদেরই একজন ; কিছু ফুলটুল চাই ? বলুন না, কোন্‌গুলো পছন্দ হয়েছে।" তারপর একগাল হেসে হয়ত বলবে, "প্রেমে পড়েছেন নাকি ? তাহলে লাল ফুল। হাসপাতালে রুগী দেখতে যাচ্ছেন নাকি ? তাহলে সাদা ফুল।" আমি একবার শুধিয়েছিলুম, "আর যদি আমার প্রিয়ার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে থাকে, তাহলে কি ফুল পাঠাব ?" যাকে শুধিয়েছিলুম তিনি তখন দু'গাল হেসে বলেছিলেন, "সবুজ ফুল। সবুজ ঈর্ষার রঙ।" আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, "সবুজ ফুল এদেশে দেখি নি কখনো। আমাদের দেশেও সবুজ ফুল একেবারেই বিরল।" ভদ্রলোক বললেন, "আমাদের দেশেও। কিন্তু আমাদের এক প্রতিবেশীর বাড়িতে সবুজ ফুল আছে। আমি এখুনি এনে দিচ্ছি।"

"ও মশাই, দাঁড়ান দাঁড়ান, আমার সবুজ ফুলের তেমন কোনো প্রয়োজন নেই—ও মশাই—"

কিন্তু কে বা শোনে কার কথা !

মিনিট দুই যেতে না যেতেই সেই মহাত্মার পুনরাবির্ভাব। হাতে একটি সবুজ গোলাপ। চোখেমুখে যে আনন্দ তার থেকে মনে হলো তিনি যেন বাকিংহাম প্রাসাদ কিংবা কুতুবমিনার কিংবা উভয়ই কুড়িয়ে এনেছেন। আমি বিস্তর "ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ডাঙ্কে শ্যোন, ডাঙ্কে রেষট শ্যোন্" বলে অজস্র ধন্যবাদ জানালুম।

ইতিমধ্যে বাড়ির দরজা খুলে গেল। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের একটি মহিলা ডেকে বললেন, "ওগো, তোমার কফি—"

হঠাৎ আমাকে দেখে কেমন যেন চুপসে গেলেন।

ভদ্রলোক বললেন, "চলুন না। এক পাত্র কফি—হঁ হেঁ—"

আমি বললুম, "কিন্তু আপনার গৃহিণী—?"

"না, না, না—আপনি চিন্তা করবেন না। আমার গৃহিণী খাণ্ডারিণী নয়। অবশ্য সে আপনাকে কখনো দেখে নি। চলুন চলুন।"

বসার ঘরে ঢুকে ভদ্রলোক আমাকে কফি টেবিলের পাশে সযত্নে বসিয়ে বললেন, "আপনাকে চল্লিশ বৎসর পূর্বে কত না দেখেছি। আমার বয়েস তখন চোদ্দ-পনেরো। কিন্তু ভয়ে আপনার সঙ্গে পরিচয় করতে পারি নি—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "সে কি ?"

"এজ্ঞে, আমি জানতুম, আপনি ইণ্ডিয়ান। আর ইণ্ডিয়ানরা সব ফিলসফার! তারা যতত্র যার তার সঙ্গে কথা কয় না। তাই। আপনি ধীরে ধীরে পা ফেলে যেতেন রাইন নদের পারে। আমি কত না দিন আপনার পিছন পিছন গিয়েছি। আপনি একটি বেঞ্চিতে বসে রাইনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন ভাবতেন। তখন কি আর বিরক্ত করা যায় ?"

আমি বললুম, "ব্রাদার, এটা বড় ভুল করেছ। তখন আমার সঙ্গে কথা কইলে বড়ই খুশী হতুম।"

ইতিমধ্যে বাড়ির গৃহিণী কেক ইত্যাদি নিয়ে এসে আমাদের টেবিলে রাখলেন। তাঁর গাল দুটো আরো লাল হয়ে গিয়েছে, ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরছে এবং তিনি হাঁপাচ্ছেন। অর্থাৎ এ পাড়ায় কোনো কেকের দোকান নেই বলে তিনি কুড়ি মিনিটের রাস্তা ঠেঙিয়ে কেক টার্ট নিয়ে এসেছেন।

এ স্থলে যে কোনো ভদ্রসন্তান ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মাফ চাইতো। বলতো, 'এ সবের কি প্রয়োজন ছিল ?' কিন্তু আমি চাই নি। আমাকে বেয়াদব মূর্খ যা খুশী বলতে পারেন।

আমি শুধু আমার পকেট থেকে একটি রুমাল বের করে তাঁর কপালটি মুছে দিলুম।

১৩

ভ্রমণকাহিনী লিখতে লিখতে মানুষ আশকথা পাশকথার উত্থাপন করে। গুণীরা বলেন এটা কিছু দুষ্কর্ম নয়। সদর রাস্তা ছেড়ে পথিক যদি পথের ভুলে আশপথ পাশপথ না যায় তবে অচেনা ফুলের নয়া নয়া পাখির সঙ্গে তার পরিচয় হবে কি প্রকারে ? কবিগুরুও বলেছেন,

"যে পথিক পথের ভুলে,
এল মোর প্রাণের কুলে—"

অর্থাৎ প্রণয় পর্যন্ত হতে পারে। তাই আমি যদি মাঝে মধ্যে এদিক ওদিক ছিটকে পড়ি তবে সহৃদয় পাঠক অপরাধ নেবেন না।

* * *

আলেক্‌জান্ডার ফন্‌ হুম্‌বল্‌টের নাম কে না শুনেছে ? নেপোলিয়ন, গ্যোটে, শিলারের সমসাময়িক। দুই কবির সঙ্গে তাঁর ভাবের আদান প্রদান হত। এবং অনেকেই বলেন, ঐ সময়ে পাশ্চাত্ত্য মহাদেশগুলোতে নেপোলিয়নের পরেই ছিল হুম্‌বল্‌টের সুখ্যাতি। আসলে তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক এবং পর্যটক—ওদিকে কাব্য দর্শন অলঙ্কার শাস্ত্রের সঙ্গেও সুপরিচিত।

কিন্তু তাঁর পরিপূর্ণ পরিচয় দেওয়া আমার শক্তির বাইরে এবং সে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এ-লেখাটি আরম্ভও করি নি।

হুম্‌বল্‌ট্‌ গত হন ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে। যেহেতু তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক যোগাযোগের জন্য (দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ককেশাস সাইবীরিয়া পর্যন্ত) অতিশয় সযত্নবান ছিলেন তাই ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বার্লিনের জর্মন পররাষ্ট্র দফতরের উৎসাহে ঐ দেশে জনসাধারণ একটি প্রতিষ্ঠান—এন্‌ডাওমেণ্ট দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর, ওয়াকফ্‌, যা খুশী বলতে পারেন—নির্মাণ করলো, নাম : আলেকজাণ্ডার ফন্‌ হুম্‌বল্‌ট্‌ স্টিফটুঙ্‌। তাদের একমাত্র কর্ম তখন ছিল বিদেশী ছাত্রদের বৃত্তি দিয়ে জর্মনিতে পড়াশুনো করার ব্যবস্থা করে দেওয়া। আমার বড়ই বিস্ময় বোধ হয়, জর্মনির ঐ দুর্দিনে (ইনফ্লেশন সবে শেষ হয়েছে ; তার খোঁয়ারি তখনও কাটে নি) সে কি করে এ-প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করলো ? আমরা বলি 'আপনি পায় না খেতে—।' অনেক চিন্তা করে বুঝেছিলুম, দয়াদাক্ষিণ্য আর্থিক সচ্ছলতার উপর নির্ভর করে না। লক্ষপতি একটা কানাকড়ি ভিখিরিকে দেয় না, অথচ আমি আপন চোখে দেখেছি এক চক্ষুষ্মান ভিখারি এক অন্ধ ভিখিরিকে আপন ভিক্ষালব্ধ দু'চার আনা থেকে দু'পয়সা দিচ্ছে। আমার এক চেলা ইদানিং আমাকে জানালে গঙ্গাস্বরূপা ইন্দিরাজীও নাকি বলেছেন, গরীবই গরীবকে মদৎ দেয়।

সে আমলে ইণ্ডিয়া পেত মাত্র একটি স্কলারশিপ—আজ অনেক বেশী পায়।[১] সেটি পেলেন আমার বন্ধু সতীর্থ বাসুদেব বিশ্বনাথ গোখলে।[২] ইনি সর্বজনপূজ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বর গোখলের ভ্রাতুষ্পুত্র। তার চার বৎসর পর পেলুম আমি। সে-কথা থাক। মাঝে মাঝে গাধাও রাজমুকুট পেয়ে যায়।...

গোডেস-বের্গ শহরের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দেখি, একটি বাড়ির সম্মুখে মোটা মোটা হরফে লেখা।

আলেকজাণ্ডার ফন হুম্‌বল্‌ট স্টিফটুঙ্‌

আমারে তখন আর পায় কে ? লম্বা লম্বা পা ফেলে তদ্দণ্ডেই সে বাড়িতে উঠলুম।

আমি অবশ্যই আশা করি নি যে সেই চল্লিশ বৎসর পূর্বেকার লোক এ আপিস চালাবেন।

কিন্তু এনারাও ভদ্রলোক। অতিশয় ভদ্রভাবে শুধোলেন,

"আপনি কোন্‌ সালে হুম্‌বল্‌ট বৃত্তি পেয়েছিলেন ?"

"১৯২৯।"

---

১ দয়া করে আমাকে প্রশ্ন শুধিয়ে চিঠি লিখবেন না, কি কৌশলে এ স্কলারশিপ পাওয়া যায়।

২ দয়া করে "গোখলে" উচ্চারণ করবেন না।

ভদ্রলোক যেন সাপের ছোবল খেয়ে লম্ফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। আমিও তাজ্জব বনে গিয়ে বললুম,

"কি হল ?"

"কী ! চল্লিশ বছর পূর্বে !"

"এজ্ঞে হাঁ !"

"মাইন গট্ (মাই গড্) এত প্রাচীন দিনের কোনো স্কলারশিপ হোল্ডারকে আমি তো কখনো দেখি নি !"

আমি একটুখানি সাহস পেয়ে বললুম, "ব্রাদার, ইহসংসারে তুমিও অনেককিছু দেখো নি, আম্মো দেখি নি। তুমি কি আপন পিঠ কখনো দেখেছ ? তাই কি সেটা নেই ?"

* * * *

যেহেতু আমি এ-বাড়িতে ঢোকার সময় আমার ভিজিটিং কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছিলুম, তাই তারা ইতিমধ্যে চেক-অপ ক'রে নিয়েছে, আমি সত্য সত্যই ১৯২৯-এ স্কলারশিপ পেয়ে এ-দেশে এসেছিলুম।

হঠাৎ ভদ্রলোকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

"অ—অ—অ। জানেন, আপনি আমাদের প্রাচীনতম স্কলারশিপ হোলডার ?"

আমি সবিনয়ে বললুম,

"তা হলে আমাকে আপনাদের প্রাচ্যদেশীয় যাদুঘরে পাঠিয়ে দিন। টুটেন-খামেনের মমির পাশে কিংবা রানী নফেটাট্টির পাশে আমাকে শুইয়ে দাও।"

১৪

সুইটজারল্যান্ড, জর্মনি, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেনে টাকাকড়ির এমনই ছড়াছড়ি, সে কড়ি কি করে খরচ করবে যেন সেটা ভেবেই পায় না। বিশ্বময় (সঠিক বলতে পারবো না, তবে বোধ হয় চীন এবং লৌহ-যবনিকার অন্তরালের দেশগুলো এখনো অপাংক্তেয়) গণ্ডায় গণ্ডায় স্কলারশিপ ছড়ানোর পরও হুম্‌বল্‌ট ওয়াক্‌ফের হাতে বেশ-কিছু টাকা বেঁচে যায়।

তাই তারা প্রতি বৎসর একটা জম্বর পরব করে। তিন দিন ধরে জর্মনিতে যে শত শত হুম্‌বল্‌ট স্কলার ছড়িয়ে আছে এবং যারা একদা স্কলার ছিল, উপস্থিত জর্মনিতেই কাজকর্ম করে পয়সা কামাচ্ছে, তাদের সবাইকে তিন দিনের তরে বাড্ গডেসবের্গে নেমন্তন্ন জানায়। যারা বিবাহিত, তাদের বউ কাচ্চা বাচ্চা সহ ;—বলা বাহুল্য ঐ উপরোক্ত সম্প্রদায়, যারা কাজকর্ম করে পয়সা কামায়। আসা-যাওয়ার ট্রেন ভাড়া, হোটেলের খাইখর্চা, তিনদিন ধরে নানা-বিধ মীটিং পরব নৃত্যগীত, অনুষ্ঠানে যাবার জন্য মোটরগাড়ি—এক কথায় সব —সব। প্রাচীন দিনে আমাদের দেশে যে-রকম জমিদারবাড়িতে বিয়ের সময়

দশখানা গাঁয়ের বাড়িতে তিন দিন ধরে উনুন জ্বালানো হত না।

হ্যার পাপেনফুস্ স্টিফটুঙের অন্যতম কর্তাব্যক্তি। আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে বললেন, "আপনার তুলনায় জর্মনিতে উপস্থিত যে-সব প্রাক্তন স্কলার আছেন তাঁরা নিতান্তই শিশু—"

আমি বললুম, "আমার হেঁটোর বয়স।"

পাপেনফুস ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন। অর্থাৎ বুঝতে পারেন নি। সব দেশের ইডিয়ম, প্রবাদ তো একই ছাঁচে তৈরী হয় না। আমি বুঝিয়ে দেওয়ার পর বললুম, "আমাকে যে আপনাদের পরবে নিমন্ত্রণ করেছেন তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আপনাদের পরব আসছে সপ্তাহ তিনেক পরে। ওদিকে আমাকে যেতে হবে কলোন, ড্যুস্‌লেডর্ফ, হামবুর্গ, স্টুটগার্ট—এবং সর্বশেষ স্টুটগার্ট থেকে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ মাইল দূরে পাড়াগাঁয়ে আমার প্রাচীন দিনের এক বিধবা বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে। আমরা একসঙ্গে পড়াশুনো করেছি। তার অর্থ আমার স্কলারশিপের মত তিনিও চল্লিশ বছরের পুরনো—প্লাস তাঁর বয়স।"

লক্ষ্য করলুম, যে তৃতীয় ব্যক্তি 'সভাস্থলে' উপস্থিত ছিলেন তাঁর চোখে ঠোঁটে কেমন যেন একটুখানি মৃদু হাসি খেলে গেল। এর অর্থ হতে পারে ঃ—

(১) এ তো বড় আশ্চর্য! ষাট বছর বয়সের প্রাচীনা প্রিয়ার অভিসারে যাচ্ছে এই নাগর!

কিংবা

(২) এর এক-প্রিয়া-নিষ্ঠতাকে তো ধন্যি মানতে হয়!

(রামচন্দ্রকে বলা হয় একদারনিষ্ঠ।)

ইতিমধ্যে কর্তা বললেন, "সে কি কথা! আপনি আসবেন না, সে তো হতেই পারে না। আপনার ভাষায়ই বলি আপনার মত 'মিউজিয়ম পীস' আমাদের কর্তাব্যক্তিদের গুণীজ্ঞানীদের দেখাতে পারবো না, সে কি একটা কাজের কথা হল? ওনাদের অনেকেই ভাবেন, আমাদের আলেকজাণ্ডার ফন্ হুম্‌বল্‌ট স্টিফ্‌টুঙ বুঝি পরশু দিনের বাচ্চা। অথচ আমাদের প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন কবে সেই ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে—অবশ্য যুদ্ধের ফলস্বরূপ জর্মনি যখন তছনছ হয়ে গেল তখন কয়েক বৎসর প্রতিষ্ঠান দেউলে হয়ে রইল। এঁদের আমি দোষ দিই নে—সব জর্মনই তো ঐতিহাসিক মমজেন হয় না। অতএব চল্লিশ বছরের পূর্বেকার জলজ্যান্ত একজন বৃত্তিধারীকে যদি ওদের সামনে তুলে ধরতে পারি, তখন হুজুরদের পেত্যয় যাবে—"

আমি মনে মনে বললুম, ঈশ্বর রক্ষতু। যাদুঘরে যে-রকম পেডেস্টালের উপর গ্রীক মূর্তি খাড়া করে রাখে, সে রকম নয় তো! তা করুক, কিন্তু জামা-কাপড় কেড়ে নিয়ে লজ্জা নিবারণার্থে কুল্লে একখানা ডুমুরপাতা পরিয়ে দিলেই তো চিত্তির—'

কর্তা বলে যেতে লাগলেন, "আপনি পরবের সময় কন্টিনেন্টে যেখানেই থাকুন না কেন, আমরা সানন্দে আপনাকে একখানা রিটার্ন টিকিট পাঠিয়ে দেব।

এখানে হোটেলের ব্যবস্থা যানবাহন সবই তো আমরা করে থাকি। তারপর আপনি ফিরে যাবেন আপন মোকামে।" বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, "আপনি কি মাত্র তিনটি দিনও স্পেয়ার করতে পারবেন না?···আচ্ছা, তবে এখন চলুন আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে।"

বড্ডই নেমকহারামী হয়। তদুপরি এরা আমাকে আবার দুই যুগ পরে আবার নেমক দিতে চায়। একদা যে প্রতিষ্ঠান যে জর্মন জাত এই তরুণকে স্কলারশিপ-নেমক দিয়েছিল, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে, তাদেরকে নিরাশ করি কি প্রকারে?

আমি সকৃতজ্ঞ পরিপূর্ণ সম্মতি জানালুম।

* * *

রেস্তোরাঁটি সাদামাটা, নিরিবিলি, ছোটখাটো, ঘরোয়া। ব্যাণ্ড-বাদ্যি, জ্যাজ-ম্যাজিক, খাপসুরৎ তরুণীদের ঝামেলা, কোনো উৎপাতই নেই। বুঝতে কোনো অসুবিধা হল না যে এ রেস্তোরাঁতে আসেন নিকটস্থ আপিস-দফতরের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা! তার অন্যতম প্রধান কারণ 'মেনু' (খাদ্যনির্ঘণ্ট দেখেই আমার চক্ষুস্থির। তড়িতেই হিসেব করে দেখলুম এখানে অতি সাধারণ লাঞ্চ খেতে হলেও নিদেন পনেরো মার্ক লাগার কথা। আমাদের হিসেবে তিনখানা করকরে দশ টাকার নোট। অবশ্য গচ্চাটা আমাকে দিতে হবে না। কারণ ওঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন। এবং এ-দেশের রেস্তোরাঁতে যে ব্যক্তি অর্ডার দিল সে-ই পেমেন্ট করবে—যে খেলো তার কোনো দায় নেই।

কিন্তু এ-স্থলে সেটা তো কোনো কাজের কথা নয়।

যাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন তাঁরা আমাকে মেনু এগিয়ে দিয়ে বলেছেন, "কি খাবেন, বলুন।" আমি কি তখন তাঁদের ঘাড় মটকাবো?

আমি শুধোলুম, "আপনারা কি এই রেস্তোরাঁতেই প্রতিদিন লাঞ্চ খেতে আসেন?"

"এজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কি খান, মানে, কোন্ কোন্ পদ।"

"সুপ, মাংস আর পুডিং। কখনও বা আইসক্রীম—তবে সেটা বেশীর ভাগ গ্রীষ্মকালে। মাঝে মাঝে শীতকালেও।"

আমি অবাক হয়ে শুধোলুম, "শীতকালে আইসক্রীম!"

তখন আমার মনে পড়লো আমরাও তো দারুণ গরমের দিনে গরমেতর চা খাই। তবে এরাই বা শীতকালে আইসক্রীম খাবে না কেন?

আমি অতিশয় সাদামাঠা লাঞ্চ অর্ডার দিলুম। যে হাঁস সোনার ডিম পাড়ে তার গলা মটকাতে নেই।

॥ ১৫ ॥

আহারাদির কেচ্ছা শুরু হলেই আমি যে বে-এক্তেয়ার হয়ে যাই আমা সম্বন্ধে সে বদনাম এতই দীর্ঘকালের যে তার সাফাই এখন বেবাক তামাদি—ইংরিজী আইনের ভাষায় 'টাইম-বার' না কি যেন বলে—হয়ে গিয়েছে। তাই পাঠক 'ধর্মাবতারের' সমুখে করজোড়ে স্বীকার করে নিচ্ছি "আমি দোষী, অপরাধ করেছি।"

কিন্তু আমি জাত-ক্রিমিনাল। আমার মিত্র এবং পৃষ্ঠপোষক জেল সুপারিনটেনডেনট তাঁর একাধিক প্রামাণিক পুস্তকে লিখেছেন, এই বঙ্গদেশে 'জাত-ক্রিমিনাল' হয় না! হুঁ! আমি জাত-ক্রিমিনাল সেটা জানার পূর্বেই তিনি এসব দায়িত্বহীন 'বাক্যবিন্যাস' করেছেন। তাই আমি আবার সেই লাঞ্ছের বর্ণনা পুনরায় দেব।

সুপ আমি বড্ড বেশী একটা ভালোবাসি নে।

এ বাবদে কিন্তু আমি সমুদ্রের বেলাভূমিতে সম্পূর্ণ একাকী নুড়ি নই। ডাচেস অব উইন্ডসর (উচ্চারণ নাকি 'উইনজার') অতি উত্তম রান্নাবান্না করতে পারেন। তা সে অনেকেই পারেন। কিন্তু তিনি আরেকটি ব্যাপারে অসাধারণ হুনুরি। ভোজনটি কি প্রকারে 'কম্পোজ' করতে হবে—এ-তত্ত্বটি তিনি খুব ভালো করে জানেন।

অপরাধ নেবেন না। আমরা বাঙলী মাত্রই ভাবি ভোজনে যত বেশী পদ দেওয়া হয় ততই তার খানদানিত্ব বেড়ে যায়। তিন রকমের ডাল, পাঁচ রকমের চচ্চড়ি, তিন রকমের মাছ, দু-তিন রকমের মাংস, চিনিপাতা দই আর কত হরেক রকমের মিষ্টি—তার হিসেব নাই বা দিলুম।

আর প্রায় সব-কটাই অখাদ্য! কারণ, এতগুলো পদের জন্য তো এতগুলো উনুন করা যায় না, গোটা দশেক পাচক ডাকা যায় না। অতএব বেগুনভাজা মেগনোলিয়ার আইসক্রীমের মত হিম, চিনি-পাতা দই পাঞ্জাব মেলের এনজিনের মত গরম, লুচি কুকুরের জিভের মত চ্যাপ্টা, লম্বা,—খেতে গেলে রবারের মত। আজকাল আবার ফ্যাশন হয়েছে ঘি-ভাত বা পোলাউয়ের বদলে চীনা ফ্রাইড রাইস। চীনারা 'র' উচ্চারণ করতে পারে না। অতএব বলে 'ফ্লাইড লাইস' —অর্থাৎ 'ভাজা উকুন'! তা সে যে উচ্চারণই করুক আমার তাতে কানাকড়ি মাত্র আপত্তি নেই। শুনেছি মহাকবি শেকসপীয়র বলেছেন, 'গোলাপ যে-নামে ডাকো গন্ধ বিতরে'। তাই 'ফ্রাইড্ রাইস' বলুন বা 'ফ্লাইড লাইস'ই বলুন—সোওয়াদটি উত্তম হলেই হল। কিন্তু আজকালকার কেটারাররা (হে ভগবান, এই সম্প্রদায়কে বিনষ্ট করার জন্য আমি চেঙ্গিস খান হতে রাজী আছি) নেটিভ পাচক দিয়ে 'ফ্লাইড্ লাইস' নির্মাণ করেন। সত্য সত্য তিন সত্য বলছি, সে মহামূল্য সম্পদ জিহ্বাগ্র স্পর্শ করার পূর্বেই আপনি বুঝে যাবেন এই অভূতপূর্ব বস্তু 'উকুন ভাজা'। আলবৎ, আমি নতমস্তকে স্বীকার করছি, 'উকুন ভাজা' আমি কেটারার-সম্প্রদায়ের অবদান—মেহেরবাণীর পূর্বে কখনো খাই নি। তাই

গোড়াতেই বলেছি, আমরা মেনু কম্পোজ করতে জানি নে।

তা সে থাক, তা সে যাক্। পরনিন্দা মহাপাপ। এখানেই ক্ষান্ত দিই। বয়স যত বাড়ে মানুষ ততই খিটখিটে হয়ে যায়।

পুরনো কথায় ফিরে যাই। ডাচেস অব উইনজার নাকি তাঁর লাঞ্চ ডিনারে নিমন্ত্রিতজনকে কখনো সুপ পরিবেশন করেন না। অতিশয় অভিজ্ঞতালব্ধ তাঁর বক্তব্য : এই যে বাবুরা এখন ডিনার খেতে যাবেন তার আগে তেনারা গিলেছেন গ্যালন গ্যালন ককটেল হুইস্কি। জালা জালা শেরি, পোর্ট। সকলেরই পেট তরল বস্তুতে টইটম্বুর—ছয়লাপও বলতে পারেন। ডাচেসের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা-প্রসূত সুচিন্তিত অভিমত : এর পরও যদি হুজুররা তরল দ্রব্য সুপ পেটে ঢোকান, তবে, তার পর আর রোস্ট ইত্যাদি নিরেট সলিড দ্রব্য খাবেন কি প্রকারে? তাই তাঁর ডিনারে 'নো সুপ!' অবশ্য ডাচেস সহৃদয়া মহিলা। কাজেই যাঁরা নিতান্তই সুপাসক্ত তাঁদের জন্য সুপ আসে। ওদেরকে সঙ্গে দেওয়ার জন্য তিনিও মাঝে মাঝে দু-চার চামচ সুপ গলাতে ঢালেন।

অতএব আমাকেও নিতান্ত সঙ্গ দেওয়ার জন্য হুম্‌বল্‌ট স্টিফ্‌টুঙ প্রদত্ত লাঞ্চে কিঞ্চিৎ সুপ সেবন করতে হল।

বাঃ! উত্তম সুপ। ব্যাপারটা তাহলে ভালো করে বুঝিয়ে বলি।

যে সব দেশের কলোনি নেই—বিশেষ ভারত, সিংহল কিংবা ইন্ডোনেশিয়ায়—তারা গরম মশলা পাবে কোত্থেকে? কেনার জন্য অত রেস্ত কোথায়? শত শত বৎসর ধরে তাদের ছোঁকছোঁকানি শুধু গোলমরিচের জন্য! শুনেছি, ভাস্কো দা গামা ঐ গোলমরিচের জন্য অশেষ ক্লেশ করে দক্ষিণ ভারতে এসেছিলেন। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন, কলম্‌বস্‌ও নাকি ঐ একই মতলব নিয়ে সাপ খুঁজতে গিয়ে কেঁচো পেয়ে গেলেন—অর্থাৎ ভারতবর্ষ আবিষ্কার করতে গিয়ে আমেরিকায় পেঁছে গেলেন। এর পর ইয়োরোপীয়রা দক্ষিণ আমেরিকায় ঝাল লাল লংকা আবিষ্কার করলো, কিন্তু ওটা ওদের ঠিক পছন্দ হল না! যদ্যপি আমরা ভারতীয়রা সেটি পরমানন্দে আলিঙ্গন করে গ্রহণ করলুম।

ইতিহাস দীর্ঘতর করবো না।

ইতিমধ্যে জর্মনির এতই ধনদৌলত বেড়ে গিয়েছে যে, এখন সে শুধু কালা মরিচ কিনেই পরিতৃপ্ত নয়—এখন সে কেনে দুনিয়ার যত মশলা। বিশেষ করে 'কারি পাউডার' আর লবঙ্গ, এলাচি, ধনে ইত্যাদির তো কথাই নেই। তবে কি না আমি কন্টিনেন্টের কুত্রাপি কাঁচা সবুজ ধনেপাতা দেখি নি। কিন্তু ভয় নেই, কিংবা ভয় হয়তো সেখানেই। যেদিন কন্টিনেন্টের কুবের-সন্তানরা ধনেপাতা-লংকা-তেঁতুল-তেলের চাটনির সোয়াদটি বুঝে যাবেন সেদিন হবে আমাদের সর্বনাশ। হাওয়াই-জাহাজের কল্যাণে কুল্লে ধনেপাতা হিল্লি-দিল্লী হয়ে চলে যাবেন কাঁহা কাঁহা মুল্লুকে। এটা তো এমন-কিছু নয়া অভিজ্ঞতা নয়। ভারত বাঙলাদেশের বহু জায়গাতেই আজ আপনি আর চিংড়ি মাছ পাবেন না। টিনে ভর্তি হয়ে তাঁরা আপনার উদরে না এসে সাধনোচিতধামে (অর্থাৎ কন্টিনেন্টে—যেখানে চিংড়ি মাছ কেন সর্বভারতীয় যুবকই যেতে চান) প্রস্থান করেন। একমাত্র

কোলা ব্যাঙ সম্বন্ধেই আমাদের কোন দুঃখ নেই। যাক্ যত খুশী যাক্। ওটা ফরাসীদের বড়ই প্রিয় খাদ্য। তবে কিনা বাঙালোর থেকে তারস্বরে এক ভদ্রলোক প্রতিবাদ করেছেন : পাইকিরি হিসেবে এ-ভাবে কোলা ব্যাঙ বিদেশে রফ্তানী করায় ঐ-অঞ্চলে মশার উৎপাত দুর্দান্তরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে ; কারণ ঐ কোলা ব্যাঙরাই মশার ডিম খেয়ে তাদের বংশবৃদ্ধিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতো।

এটা অবশ্যই একটা সমস্যা—দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু আমার ভাবনা কি ? আমার তো একটা মশারি আছে।

"গুরুমে" ভোজনরসিকরা বলেন সুইটজারল্যাণ্ডের জর্মনভাষী অঞ্চলের খাদ্যই সবচেয়ে ভোঁতা। অথচ নেপলিয়ন না কে যেন বলেছেন, "ইংরেজ এ-নেশন অব্ শপকীপারজ্" (অবশ্য ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে 'সাকী' নামক ছদ্মনামের এক অতিশয় সুরসিক ইংরেজ লেখক বলেন "আমরা এখন এ নেশন অব শপ্লিফ্টারজ্" অর্থাৎ আমরা এখন দোকানের ভিড়ে চটসে এটা-ওটা-সেটা চুরি করতে ওস্তাদ) এবং "সুইসরা এ নেশন অব্ হোটেলকীপারজ্"। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে তাবৎ ইয়োরোপে সুইসরাই পরিচ্ছন্নতম হোটেল রাখে। কিন্তু প্রশ্ন : তোমার হোটেল-রেস্তোরাঁ যতই সাফসুৎরো রাখো না কেন, তোমার রেস্তোরাঁর সুপে ব্লণ্ড, ব্রুনেট, কালো চুল না পাওয়া গেলেও (দিনের পর দিন তিন রঙের চুল আবিষ্কার করতে করতে আমার এক মিত্র—সুইটজারল্যাণ্ডে নয়, অন্য এক নোংরা দেশের হোটেলে—একদিন মেনেজারকে শুধোলেন "আপনার রান্নাঘরে তিনটি পাচিকা আছেন ; না ? একজনের চুল ব্লণ্ড, অন্যজনের ব্রুনেট এবং তেসরা জনের কালো। নয় কি ?" মেনেজার তো থ ! এই ভদ্রলোকই কি তবে শার্লক হোম্সের বড় ভাই মাইক্রফ্ট্ হোম্স্ ? সবিনয়ে তথ্যটা স্বীকার করে শুধোলে, "স্যর, আপনি জানালেন কি করে ? আপনি তো আমাদের রসুই-খানায় কখনো পদার্পণ করেন নি !" বন্ধু বললেন, "সুপে কোনো দিন ব্লণ্ড, কখনো বা ব্রুনেট এবং প্রায়ই কালো চুল পাই—কালোটাই পাতলা সুপে চোখে পড়ে বেশী। এ তত্ত্বে পৌঁছবার জন্য তো দেকার্ত কাণ্ট-এর দর্শন প্রয়োজন হয় না। আমি বলছি ঐ কালো চুলউলীকে যদি দয়া করে বলে দেন, সে যেন আর পাঁচটা হোটেলের পাঁচজন পাচকের মাথায় যে রকম টাইট সাদা টুপি পরা থাকে ঐরকম কোনো একটা ব্যবহার করে। আমার মনে হয় ওর মাথায় দুর্দান্ত খুসকি" —পাঠক অপরাধ নেবেন না,এ-কেচ্ছাটা বলার প্রলোভন কিছুতেই সম্বরণ করতে পারলুম না।) সুধুমাত্র সুইস হোটেলের সুপমধ্যে হরেকরকম্বা চুল নেই বলেই যে দুনিয়ার লোক হুদ্মুদ্ধ হয়ে সে-দেশে আসবে এও কি কখনো সম্ভব ? আমার সোনার দেশ পূব্ পশ্চিমওতর বাঙলায় সুপ তৈরী হয় না। অতএব প্লাটিনাম ব্লণ্ড, সাদামাটা ব্লণ্ড, চেশনাট ব্রাউন, মোলায়েম ব্রাউন, কালো, মিশ-কালো কোনো রঙের কোনো চুলের কথাই ওঠে না। 'মোটেই মা রাঁধে না, তার তপ্ত আর পান্তা।' কিংবা বলতে পারেন, 'হাওয়ার গোড়ায় রশি বাঁধার মত।' তাই বলে কি মার্কিন সুইস টুরিস্ট এ-দেশে আসে না !

'বিজনেস ইজ বিজনেস'—তাই সুইসরা পর্যন্ত তাদের রান্নাতে প্রাচ্যদেশীয় মশলা ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে।

আমার কাছে একখানা সুইস সাপ্তাহিক আসে। তার কলেবর প্রায় ষাট পৃষ্ঠা। একদা কেউ ল্যাটে এলে আমরা ঠাট্টা করে বলতুম 'কি বেরাদর, কেপ অব গুড হোপ হয়ে এলে নাকি ?'—সুয়েজ কানাল যখন রয়েছে। এখন কিন্তু এটা আর মস্করা নয়। এ্যার মেলের কথা অবশ্য ভিন্ন। কিন্তু ষাটপৃষ্ঠা বপু-ধারী পত্রিকা তো আর এ্যার মেলে পাঠানো যায় না। খর্চা যা পড়বে সেটা সাপ্তাহিকের দাম ছাড়িয়ে যাবে। হিন্দীতে বলে 'লড়কে সে লড়কার গু ভারি'—বাচ্চাটার ওজনের চাইতে তার মলের ওজন বেশী।

সেই পত্রিকার একটি প্রশ্নোত্তর বিভাগ-আছে। কেউ শুধোল "মাংস আলু তরকারি সহ নির্মিত ভোজনের মেন ডিশ (পিয়েস দ্য রেজিস্তাঁস) খাওয়ার পর যেটুকু তলানি সস্ (শুকনো শুকনো ঝোল, কলকাত্তাইয়ারা কাইও বলে থাকে) পড়ে থাকে তার উপর পাঁউরুটি টুকরো টুকরো করে ফেলে দিয়ে কাঁটা দিয়ে সেগুলো নাড়িয়ে চাড়িয়ে চেটেপুটে খাওয়াটা কি প্রতোকোলসম্মত—এটিকেট মাফিক, বেয়াদবী 'অভদ্রস্থতা' নয় তো ?"

উত্তর : "পৃথিবীতে এখন এমনই নিদারুণ খাদ্যাভাব যে ঐ সসটুকু ফেলে দেওয়ার কোন যুক্তি নেই।" (অবশ্য তার সঙ্গে রুটির টুকরোগুলোও যে গেল সে বাবদে বিচক্ষণ উত্তরদাতা কোনো উচ্চবাচ্য করেন নি। কারণ রুটিটি পরের ভোজনেও কাজে লাগতো কিংবা গরীব-দুঃখীকেও বিলিয়ে দেওয়া যেত—এঁটো প্লেটের তলানি সস তো পরবর্তী ভোজনের জন্য বাঁচিয়ে রাখা যায় না, কিংবা গরীব-দুঃখীকেও বিলোনো যায় না—লেখক) তারপর তিনি বলছেন, "কিন্তু আপনি যদি নিমন্ত্রিত হয়ে কোথাও যান তবে এই কার্পণ্যটি করবেন না।" তার মানে আপনার বাড়ির বাইরের এটিকেট যেন বাড়ির ভিতরের চেয়ে ভালো হয়। আমি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন মত ধরি। আমার মতে বাড়ির এটিকেট, আদবকায়দা যেন বাইরের চাইতে ঢের ঢের ভালো হয়।

প্রশ্ন : "কোহিনুর প্রস্তর কোন ভাষার শব্দ ?"

উত্তর : "ফার্সী।"

: সম্পূর্ণ ভুল নয়। 'কোহ্' = পাহাড়—ফার্সতে। যেমন কাবুলের উত্তর দিকে কোহীস্তান রয়েছে [আমার সখা আব্দার রহমান ঐ কোহীস্তানের লোক]। কিন্তু কোহ্-ই-নুরের 'নুর' শব্দটি 'ন' সিকি আরবী। খাঁটি ফার্সীতে যদি বলতেই হয় তবে 'নুর'-এর বদলে 'রওশন' বা 'রোশনী' [বাঙলায় 'রোশনাই'] ব্যবহার করে বলতে হয় কোহ্-ই-রওশন্। শুদ্ধ আরবীতে বলতে হলে 'জবলুন (পাহাড়) নুর।'...কিন্তু এ রকম বর্ণসংকর সমাস সর্বত্রই হয়ে থাকে। 'দিল্লীশ্বর' ইত্যাদি।)

প্রশ্ন : "আমার বয়স বত্রিশ ; আমি বিধবা। আমার ষোলো বছরের ছেলের একটি সতেরো বছরের ভেরি ডিয়ার ক্লাস ফ্রেন্ড প্রায়ই আমাদের এখানে আসে। কিন্তু কিছুদিন ধরে সে আমার সঙ্গে ভাবভালোবাসা জমাবার চেষ্টা করছে। আমি করি কি ?"

উত্তর ঃ "আপনি ওকে সঙ্গোপনে নিয়ে গিয়ে বলুন,'তুমি তোমার অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গে প্রেমট্রেম করো। আমি তোমার মায়ের বয়সী। তোমার বয়সী মেয়ের তো কোনো অভাব নেই'। কিন্তু, আমার মনে হয়, ছেলেটার বোধ হয় মাদার কমপ্লেকস্ আছে—অতি অল্প বয়সেই তার মা গত হন। কাজেই সে একটি মায়ের সন্ধানে আছে"—তার পর আরো নানাপ্রকার হাবিজাবি ছিল।

এ-উত্তর যে-কোনো গোগর্দভ দিতে পারতো।

কিন্তু এই প্রশ্নোত্তরমালা নিতান্তই অবতরণিকা মাত্র।

* * *

কয়েক মাস পূর্বে—মনে হল—একটি প্রাচীনপন্থী মহিলা—প্রশ্ন শুধোলেনঃ "আজকালকার ছেলে-ছোকরারা এমন কি মেয়েরাও বড্ড বেশী মশলাদার খানা খাচ্ছে। আমি গ্রামাঞ্চলে থাকি। সেদিন বাধ্য হয়ে আমাকে শহরে যেতে হয়। যদি জানতুম, শহরের 'মাই লর্ড' রেস্তোরাঁওলারা কি জঘন্য ঝাল, মাস্টার্ড (আমাদের কাসুন্দো—লেখক) আর মা মেরিই জানেন কি সব বিদকুটে বিদকুটে বিজাতীয় মশলা দিয়ে যাবতীয় রান্না করেন, তবে কি আমি সে রেস্তোরাঁয় যেতুম! এক চামচে সুপ মুখে ঢালা মাত্রই আমার সর্বাঙ্গ শিহরিত হতে লাগলো। আমার কপালে সেই শীতকালে, ঘাম জমতে লাগলো। মনে হলো, আমার জিভে যেন কেউ আগুন ঠেলে দিয়েছে। আমার চোখ থেকে যা জল বেরুতে আরম্ভ করলো সেটা দেখে আমার কাছেরই একটি সহৃদয় প্রাইভিট শুধলো—'মাদাম, আমি বহু দেশ-বিদেশ দেখেছি—যেখানে টিয়ার গ্যাস্ ছাড়া হয়; কিন্তু আমাদের এই সুইটজারল্যাণ্ডে তো কখনো দেখি নি। শোকাতুরা হয়ে কান্না করলে রমণীর চোখে যে অশ্রুজল বেরোয় এটা তো তা নয়।

একদা সুইস কাগজে প্রশ্ন বেরলো ঃ "এই যে আমরা প্রতিদিন আমাদের রান্নাতে মশলার পর মশলা বাড়িয়েই চলেছি এটা কি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো?"

সেই 'সবজান্তা' উত্তরিলা ঃ

'মাত্রা মেনে খেলে কোনো আপত্তি নেই। কোনো বস্তুরই বাড়াবাড়ি করতে নেই।" (মরে যাই! এই ধরনের মহামূল্যবান উপদেশ পাড়ার পদীপিসি, ইস্কুল বয় সবাই দিতে পারে!—লেখক)। তার পর সবজান্তা বলছেন "ডাক্তারদেরও আধুনিক অভিমত, 'মেকদার-মাফিক মশলাদার খাদ্য ভোজনস্পৃহা আহাররুচি বৃদ্ধি করে।' তদুপরি আরেকটা গুরুত্বব্যঞ্জক তত্ত্ব আছে। আপনি যদি আপনার ভোজন ব্যাপারে সর্বক্ষণ 'এটা খাবো না ওটা ছোঁব না' এ রকম পুতপুত করে আপনার ভোজন-যন্ত্রটিতে ন'সিকে মোলায়েম করে তোলেন (ইংরিজীতে একেই বলে 'মলিকড্‌ল্' করেন) তবে কি হবে? আপনি যতই চেষ্টা দিন না কেন, আপন বাড়িতে তৈরী মশলা বিবর্জিত রান্না-মাত্রই খাবো তথাপি ইহসংসারে বহুবিধ ফাঁড়া-গর্দিশ আছে যার কারণে আপনাকে হয়তো কোনো রেস্তোরাঁতে এক বেলা খেতে হল। কিংবা মনে করুন, আপনি নিমন্ত্রিত হলেন। শক্তসমর্থ জোয়ান আপনি। কি করে বলবেন আপনি ডায়েটে আছেন? ওদিকে রেস্তোরাঁ বলুন, ইয়ার বখশীর বাড়িই বলুন সর্বত্রই সর্বজন শনৈঃ শনৈঃ গরম মশলার মাত্রা

বাড়িয়ে যাচ্ছেন তো যাচ্ছেনই। পরের দিন আপনি কাৎ। অতএব"—আমাদের সবজান্তা বলছেন, "কিছু কিছু মশলা খেয়ে নেওয়ার অভ্যাসটা করে ফেলাই ভালো।"

কিন্তু মশলাপুরাণ এখানেই সমাপ্ত নয়। সেটা পরে হবে।

ইতিমধ্যে আমি দুম্ করে প্রেমে পড়ে গেলুম।

কবিগুরু গেয়েছেন ঃ

যদি পুরাতন প্রেম
ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেম জালে
তবু মনে রেখো।

কিন্তু এ-আশা রাখেন নি, সেই প্রথম প্রিয়াই পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে আসবে। আমার কপাল ভালো।

লাঞ্চ সেরে মুদুমন্থরে যখন বাড়ি ফিরছি তখন বাস্‌স্ট্যাণ্ডের বেঞ্চিতে বসেই দেখি বেঞ্চির অন্য প্রান্তে যে-মেয়েটি বসেছিল সে জলজল করে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমার দুশমনরা তো জানেনই, এস্তেক দোস্তরাও জানেন, আমি কন্দর্পকিউপিডের সৌন্দর্য নিয়ে জন্মাই নি। তদুপরি বয়স যা হয়েছে তার হিসেব নিতে গেলে কাঠাকালি বিঘেকালি বিস্তর আঁক কষাকষি করতে হয়। সর্বশেষে সেটা ভগ্নাংশে না ত্রৈরাশিকে দিতে হবে তার জন্য প্র্যাশেৎ মারফৎ ঈশ্বর সুকুমার রায়কে নন্দনকানন থেকে এই য ব ন ভূমিতে নামতে হবে!

অবশ্য লক্ষ্য করেছিলুম, আমি ওর দিকে তাকালেই সে ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে নেয়।

রোমাণ্টিক হবার চেষ্টাতে বলেছিলুম, "মেয়েটি।" কিন্তু তার বয়স হবে নিদেন চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ এমন কি পঞ্চাশও হতে পারে। কিন্তু তাতে কি যায় আসে। বিদগ্ধ পাঠকের অতি অবশ্যই স্মরণে আসবে, বৃদ্ধ চাটুয্যে মশাই যখন প্রেমের গল্প অবতারণা করতে যাচ্ছেন তখন এক চ্যাংড়া বক্রোক্তি করে বলেছিল[১] চাটুয্যে মশাই প্রেমের কী-ই বা জানেন। মুখে আর যে-কটা দাঁত যাবোযাচ্ছি যাবোযাচ্ছি করছে তাই নিয়ে প্রেম।

চাটুয্যে মশাই দারুণ চটিতং হয়ে যা বলেছিলেন তার মোদ্দা ঃ ওরে মূর্খ প্রেম কি চিবিয়ে খাবার বস্তু যে দাঁতের খবর নিচ্ছিস! প্রেম হয় হৃদয়ে।... একদম খাঁটি কথা। ভলতের, গ্যোটে, আনাতোল ফ্রাঁস, হাইনে আমৃত্যু বিস্তরে বিস্তর বার ফট ফট করে নয়া নয়া হুরী পরীর সঙ্গে প্রেমে পড়েছেন। এই সোনার বাঙলাতেও দু'একটি উত্তম দৃষ্টান্ত আছে। তা হলে আমিই বা এমন কি ব্রহ্মহত্যা করেছি যে ফুট করে প্রেমে পড়বো না।

বললে পেত্যয় যাবেন না, অকস্মাৎ একই মুহূর্তে একে অন্যকে চিনে গেলুম। যেন 'আকাশে বিদ্যুৎ-বহ্নি পরিচয় গেল লেখি।'

১ বইখানা আমার চুরি গেছে। কাজেই উল্টোসুল্টো হয়ে গেলে পাঠক অপরাধ নেবেন না।

একসঙ্গে আমি চেঁচালুম "লটে।"

সে চেঁচালে "হ্যার সায়েড।"

তারপর চরম নির্লজ্জার মত সেই প্রশস্ত দিবালোকে সর্বজন সমক্ষে আমাকে জাবড়ে ধরে দুই গালে ঝপাঝপ এক হৃদ্দর বা দুই টন চুমো খেল।

সুশীল পাঠক, সচ্চরিত্রা পাঠিকা, মায় দেশের মরালিটি-রক্ষিণী বিধবা পদীপিসি এতক্ষণে একবাক্যে নিশ্চয়ই নাসিকা কুঞ্চিত করে "ছ্যা ছ্যা" বলতে আরম্ভ করেছেন। আমি দোষ দিচ্ছি নে। এস্থলে আমো তাই করতুম—যদি না নাটকের হেরোঈন আমার প্রিয়া লটে (তোলা নাম 'শাল ট') হত। বাকিটা খুলে কই।

ওর বয়স যখন নয়-দশ আমার বয়স ছাব্বিশ। আমি বাস করতুম ছোট গোডেসবের্গ টাউনের উত্তরতম প্রান্তে লটেদের বাড়ির ঠিক মুখোমুখি। ওদের পাশে থাকতো দুই বোন গ্রেটে ক্যাটে। আরো গোটা পাঁচেক মেয়ে—তাদের বাড়ির পরে। কারোরই বারো-তেরোর বেশী নয়।

লটে ছিল সবচেয়ে ছোট।

আমার জীবনের প্রথমা প্রিয়া।

আর সব কটা মেয়ে এ তথ্যটা জানতো এবং হয়তো অতি সামান্য কিছুটা হিংসে হিংসে ভাব পোষণ করতো। ওদের আশ্চর্য বোধ হত হয়তো, যে লটে তো ওদের তুলনায় এমন-কিছু গুলেবাকাওলী নয় যে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে এসে আমি এরই 'প্রেমে মজে যাবো'। এটা অবশ্য আমি বাড়িয়ে বলছি। 'প্রেমে মজার' কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমার বয়স ছাব্বিশ, ওর নয় কি দশ।

আসলে ব্যাপারটি কি জানেন? জর্মনদের ভিতর যে-চুল অতিশয় বিরল, লটের ছিল সেই চুল। দাঁড়কাকের মত মিশমিশে কালো একমাথা চুল। ঠিক আমার মা-বোনদের চুলের মত। ওর চুলের দিকে তাকালেই আমার মা-বোনদের কথা, দেশের কথা মনে পড়তো। আর লটে ছিল আমার বোনেদের মত সত্যই বড় লাজুক। সকলের সামনে, নিজের থেকে, আমার সঙ্গে ককখনো কথা বলতো না।

আমাদের বাড়ির সামনে ছিল একচিলতে গলি। সেখানে রোজ দুপুর একটা দুটোয় আমরা ফুটবল খেলতুম। আমার বিশ্বাস তুমি পাঠক, আমাদের সে টিমের নাম জানো না। আমিও অপরাধ নেবো না। আমরা যে আই এফ এ শীল্ডে লড়াই দেবার জন্য সে আমলে ভারতবর্ষে আসি নি তার মাত্র দুটি কারণ ছিল। পয়লা: অতখানি জাহাজ ভাড়ার রেস্ত আমাদের ছিল না, এবং দোসরা: আমাদের 'কাইজার টীমে' পুরো এগারো জন মেম্বার ছিলেন না। আমরা ছিলুম মাত্র আষ্টো জন। তৃতীয়ত, যেটা অবশ্য আমাদের ফেভারেই যায়, আমাদের ফুটবলটি ছিল অনেকটা বাতাবী নেবুর মত। ওরকম ফুটবল দিয়ে কি সমদ, কি জুম্মা খান কক্‌খনো প্যাটার্ন-উইভিং ড্রিবলিং ডজিং ডাকিঙের সুযোগ পান নি।

হায়, হায়! এ-জীবনটা শুধু সুযোগের অবহেলা করে করেই কেটে যায়।

এসব আত্মচিন্তা যে তখন করেছিলুম তা নয়।

চল্লিশ বছর পর পুনরায় এই প্রথম আমাদের পুনর্মিলন। লটে হঠাৎ শুধুলো, "হ্যার সায়েড! তুমি বিয়ে করেছো?"

শুনেছি ইহুদীরা নিতান্ত গঙ্গাযাত্রার জ্যান্ত মড়া না হলে কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন শুধিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা দেয়। আমি শুধলুম, "তুই?"

খল খল করে হেসে উঠলো।

"কেন? আমার আঙুলে এনগেজমেণ্ট রিং বিয়ের আংটি দুটোই এখনো তোমার চোখে পড়ে নি! আমি তো দিদিমা হয়ে গিয়েছি। চলো আমাদের বাড়ি।"

আমি সাক্ষাৎ যমদর্শনের ন্যায় ভীত চকিত সন্ত্রাসগত হয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলুম, "সে যদি আমায় ঠ্যাঙায়।"

দুটি মিষ্টি মধুর ঠোঁটের উপর অতিশয় নির্মল মৃদু হাসি এঁকে নিয়ে বললে, "বটে! আমার জীবনের প্রথম প্রিয়কে সে প্যাঁদাবে? তা হলে সেই হালুকেটাকে আমি ডিভোর্স করবো না!"

তওবা, তওবা!

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী

নবম খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ (৩৩০০), ১৩৬৪

সম্পাদক

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সুমথনাথ ঘোষ

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

চুনী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ মুদ্রণ

সিল্ক স্ক্রীন ও

চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩ হইতে এস এন রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলি-৯ হইতে পি কে পাল কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা	জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৵০
দেশে বিদেশে (প্রথম খণ্ড)		১
চাচা কাহিনী (প্রথম খণ্ড)		১৫৯
সত্যপীরের কলমে		২৩৩
বিবিধ		৩৪১
গ্রন্থ-পরিচয়		৩৮১

ভূমিকা

॥ ১ ॥

স্বর্গত সৈয়দ মুজতবা আলীর সঙ্গে আমার সামান্যমাত্র ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। সেইটুকু পুঁজির উপর নির্ভর করে কোন শিল্পীর বা সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনার চেষ্টা মূর্খতার নামান্তর বলে গণ্য হওয়াই স্বাভাবিক।

তথাপি আমি দাবী করতে পারি যে মুজতবা আলীর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমার মোটামুটি একটা সুস্পষ্ট ধারণা আছে, এবং সে ধারণাটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা নয়। এমন দাবী আমি কেন করছি সেটা একটু বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন।

ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁরা প্রায়ই একটা প্রবচনের উল্লেখ করে থাকেন যাতে বলা হয়েছে যে সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব তাঁর স্টাইলের মধ্য দিয়েই সবচেয়ে ভাল ভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে—সাহিত্যিককে চিনতে হলে তাঁর রচনারীতির বৈশিষ্ট্যটি আগে বোঝা দরকার।

সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে কোনপ্রকার আপ্তবাক্য কখনও সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত হতে পারে না—আলোচ্য প্রবচনটিও আংশিক সত্য মাত্র। দেশে-বিদেশে আমরা এমন বহু লেখকের সন্ধান পাই যাঁদের ব্যক্তিসত্তা ও রচনাশৈলীর মধ্যে বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য বা সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার এমন সাহিত্যিকেরও অভাব নেই যাঁদের বেলায় উল্লিখিত উক্তিটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য, যাঁদের রচনার স্টাইলের মধ্যে আত্মপ্রক্ষেপ বা ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। একটুও চিন্তা না করেই দুজনের কথা মনে পড়ছে—ইংরেজ কবি শেলী ও বাঙালী কথাসাহিত্যিক বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

সৈয়দ মুজতবা আলীকে এই শেষোক্ত সাহিত্যশিল্পিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করতে কারও কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়। বস্তুতঃ তাঁর ভাষাভঙ্গির এমন একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে যা বাংলা সাহিত্যের অন্য কোন লেখকের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না—এবং এই বৈশিষ্ট্যটি হল তাঁর ব্যক্তিমানসের প্রতিধ্বনি, যাকে আমি একটু আগেই ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন বলে বর্ণনা করেছি।

এই শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য বা রচনাশৈলী বা স্টাইলের পথ ধরেই আমি তাঁর ব্যক্তিত্বের দুয়ারে গিয়ে পৌঁছতে পেরেছি—তাঁর সঙ্গে আমার সত্যকার পরিচয় এই পথেই সম্ভব হয়েছে।

তাই আমি মনে করি, মুজতবা আলীর ভাষাভঙ্গি বা রচনাশৈলীর একটা

যথাযথ বিশ্লেষণ তাঁর অনুরাগী পাঠকদের সামনে তুলে ধরাই আমার, সর্বপ্রধান না হলেও, সর্বপ্রথম কর্তব্য। অবশ্য আমার অক্ষম লেখনী এই কর্তব্য সম্পাদনে কতটা সার্থকতা লাভ করতে পারবে সে সম্বন্ধে আমার নিজেরই গুরুতর সন্দেহ আছে।

মুজতবা আলীর যে-কোন রচনা, তা সে দীর্ঘায়িত উপন্যাস বা ভ্রমণকথাই হোক বা হ্রস্বকায় গল্প প্রবন্ধ বা রম্যরচনাই হোক, পড়তে গেলে প্রথমেই পাঠকের মনে হবে, এ-লেখা ঠিক আর পাঁচজন সাহিত্যিকের লেখার মত নয়—এ-লেখার ঢঙ্ আলাদা, আর বোধ হয় সেইজন্যই এর রসও একটু স্বতন্ত্র ধরনের।

সত্যই তাঁর লেখার ঢঙ্ একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব—এ ঢঙ্ বৈঠকী আলাপের ঢঙ্, লিখিত সাহিত্যের রচনারীতিতে এ বস্তু নিতান্তই দুর্লভ। মৌলিক বিচারে মুজতবা আলী প্রধানতঃ একজন শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের আলাপন-শিল্পী—নেহাৎই দৈবক্রমে এবং আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ এই আলাপনের মাধ্যম হিসাবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন তাঁর লেখনীকে।

বহু পাশ্চাত্ত্য মনীষী বলেন, ইউরোপ-আমেরিকা থেকে আজকাল আলাপন-শিল্প সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে—পাঁচজনে একত্র সমবেত হয়ে কেবলমাত্র মানসিক আনন্দ লাভের জন্য কথাবার্তা বলার অভ্যাস ও-সব দেশের মানুষ বর্জন করেছে; এখন মানুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলে শুধু ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে।—আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থাও ঠিক একই রকম। বাঙালী নাকি জাতি-হিসাবে বিষম আড্ডাবাজ! কিন্তু আধুনিক বাঙালী আর আড্ডা দেয় না—আড্ডাবাজের পরিবর্তে সে আজ হয়ে উঠেছে ধান্দাবাজ। কথা বলার আর্ট এবং পরের কথা মন দিয়ে শোনার মত বুদ্ধির ঔদার্য দুইই সে হারিয়ে ফেলেছে।

যে-আড্ডা বাঙালীর জীবনে আজ নেই মুজতবা আলীর রচনায় তারই বিশিষ্ট আস্বাদ ও সৌগন্ধ্য আমরা পেয়ে থাকি। প্রমথ চৌধুরীর (বিশেষতঃ বীরবলের) গল্প-প্রবন্ধাদিতে এই বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পেয়ে একদা আমরা সচকিত ও পুলকিত হয়ে উঠেছিলাম—তাঁর মৃত্যুর পর থেকে আলী সাহেবের আবির্ভাব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের কোন রচনায় আমরা এই অনবদ্য ঢঙ্টির চিহ্নমাত্র দেখতে পাইনি।

সত্যই মুজতবা আলীর রচনারীতির সঙ্গে আড্ডায় সমাদৃত ভাষণভঙ্গির বিস্ময়কর সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এ আড্ডা কি জাতীয় আড্ডা?—নির্দোষ তাস-খেলার ছদ্মবেশে জুয়ার আড্ডা নয়, সংস্কৃতির মুখোশ-পরা সস্তা নাচগান বা

থিয়েটারি রিহার্সালের আড্ডা নয়, পার্কের বেঞ্চে বসে পাড়া-প্রতিবেশীর কুৎসা-কীর্তনের আড্ডাও নয়—এ আড্ডা সুপণ্ডিত বিদগ্ধজনের আড্ডা ; এ আড্ডায় যে-সব আলোচনা হয় তার মধ্যে বিদ্যার কৌলীন্য আছে কিন্তু আস্ফালন নেই, জ্ঞানের গৌরব আছে কিন্তু পেচক-গাম্ভীর্য নেই, সমালোচনা আছে কিন্তু ঈর্ষা বা অসূয়া নেই, রস ও রসিকতা আছে কিন্তু অশ্লীলতা নেই। অর্থাৎ পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বে কলকাতায় তথা বাংলাদেশে যে আড্ডা ছিল কিন্তু এখন আর নেই—সেই আড্ডা।

যে আড্ডাধারীটির ভাষাভঙ্গি নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করতে বসেছি, এইবার দেখা যাক কি ভাবে তাঁর রচনায় প্রায় সর্বত্র সত্যকার আড্ডাসুলভ মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

বর্ণনাত্মক কাহিনীমূলক অথবা চিন্তাশীল—রচনা যে-জাতীয়ই হোক না কেন, মুজতবা আলী কখনও নিজেকে তাঁর পাঠকদের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন না। তিনি শিক্ষক-সাহিত্যিক নন, প্রচারক-সাহিত্যিকও নন—তাঁর কাছে আমরা যত কিছুই পাই না কেন, একথা আমাদের তিনি কখনই ভুলতে দেন না যে তিনি আমাদেরই একজন। বেদীর উপর বা বক্তৃতামঞ্চে তাঁর আসন নয়, তিনি নেমে এসে আমাদের সঙ্গে একই ফরাশে বসতে চান।—নইলে আড্ডা জমবে কেমন করে ?

তাঁর বক্তব্য কখনও রেলগাড়ির মত একই লাইন ধরে সিধা পথে এগিয়ে চলে না—ডাইনে-বাঁয়ে বাঁকের পর বাঁক ঘুরে, প্যাঁচের পর প্যাঁচ রচনা করে, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে 'মণ্ডুক-প্লুত' গতিতে, স্বেচ্ছা-সুখে হেলে-দুলে স্বীয় গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছয়। হয়তো বলতে বসেছেন বিদেশে তাঁর ছাত্রজীবনের কথা, কিন্তু কথায় কথায় এসে গেল একটু ইতিহাস, ভাষাতত্ত্বের একটা জটিল সমস্যা, রবীন্দ্রকাব্যের তত্ত্ববিশ্লেষণ, দেশী-বিদেশী কিছু রঙ্গরস, হিন্দু বা ইস্‌লামী ধর্মকথার মর্মার্থ, জার্মান বা ফরাসী গ্রন্থাদি থেকে উদ্ধৃতি, পুরাণকাহিনীর অন্তর্নিহিত রূপকের ব্যাখ্যা, হাফিজ বা সাদীর দুটো-চারটে বয়েৎ, এবং আরও কত কি। এই হল সত্যকার বৈঠকী মেজাজের বাগ্‌ভঙ্গি, খাঁটি আড্ডাবাজির ভাষা। এই হল সৈয়দ মুজতবা আলীর স্টাইলের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। তাঁর লেখা পড়লেই মনে হয় যেন তিনি অখণ্ড অবসর যাপন করছেন, তাই তাঁর বিশ্রম্ভালাপ বিলম্বিতলয়ের আলাপ। যে সব পাঠক সময়ের মূল্য সম্বন্ধে সর্বদাই অতি-অবহিত আলী সাহেব তাদের জন্য লেখেন না।

মুজতবা আলী ছিলেন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। এই পাণ্ডিত্য কিছু পরিমাণে তাঁর বংশগত ঐতিহ্য থেকে প্রাপ্ত, প্রধানতঃ স্বোপার্জিত। পৃথিবীতে পণ্ডিত ব্যক্তির অভাব নেই, এবং তাঁরা লিখেছেনও প্রচুর। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশ রচনাই বংশদণ্ডের সঙ্গে তুলনীয়, ইক্ষুদণ্ডের সঙ্গে নয়—প্রাণপণ চিবিয়েও তা থেকে এক ফোঁটা মিষ্টরস নিষ্কাশিত করা যায় না। মুজতবা আলীর লেখায় তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু পাণ্ডিত্য তাঁর রচনামাধুর্যকে কখনও বিন্দুমাত্র ব্যাহত করে না, তাঁর রচনার প্রাঞ্জলতাকে ঘোলা করে তোলে না—তাঁর লেখার জনপ্রিয়তাই তার প্রমাণ। তাঁর পাণ্ডিত্যের মধ্যে একই সঙ্গে স্বচ্ছতা বিস্তৃতি ও গভীরতা এই তিন গুণের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়।

শেক্‌স্‌পীয়ার সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে তিনি শ্লেষালঙ্কার (Pun) ব্যবহারের সুযোগ কখনও ছাড়তে পারতেন না—আলী সাহেবও রসিকতা করার প্রলোভন সংবরণ করতে পারেন না। মূল বিষয়বস্তু যতই গম্ভীর বা করুণ হোক না কেন, বর্ণনাপ্রসঙ্গে তার মধ্যে কিছু রঙ্গরসের ফোড়ন দিতে না পারলে তাঁর তৃপ্তি হত না—নিজে না হেসে এবং পাঠকদের না হাসিয়ে তিনি থাকতে পারেন না। তাঁর এই সদাপ্রসন্ন 'আমুদে' স্বভাবের জন্যই তাঁর আড্ডায় যোগদান করে আমরা এত আনন্দ পাই।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে যে ভাষাভঙ্গির প্রবর্তন করেছিলেন তৎকালীন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা সেটা আদৌ পছন্দ করেননি—তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সঙ্গে দেশজ শব্দের ও কথ্য ভাষার প্রয়োগ-পদ্ধতির সংমিশ্রণের ফলে ভাষায় যে একটা পেশল বলিষ্ঠতার ও নূতন প্রাণশক্তির সঞ্চার হয় তা তাঁরা সেদিন কিছুই বুঝতে পারেন নি। তাঁদের মতে এই 'গুরুচণ্ডালী' সংমিশ্রণ ভাষার একটা মস্ত বড় ত্রুটি। তাই তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অনুবর্তী লেখকদের 'শবপোড়া মড়াদাহের দল' বলে বিদ্রূপ করতেন। জানি না, মুজতবা আলীর ভাষার সঙ্গে পরিচয় হলে তাঁরা কি বলতেন বা কি ভাবতেন—বোধ হয় কিছুই বলার বা ভাবার সুযোগ পেতেন না, তার আগেই 'ভির্মি' যেতেন। কারণ তাঁর ভাষায় এই জাতীয় সংমিশ্রণের অজস্রতা সত্যই বিস্ময়কর। শুধু সাধু ও দেশী শব্দ নয়, আরবী ফার্সী, উর্দু-হিন্দি, সংস্কৃত-লাতিন, জার্মান-ফরাসী-ইংরেজী, রেঢ়ো-বাঙাল, প্রভৃতি নানা আকর থেকে শব্দ আহরণ করে একসঙ্গে মিশিয়ে তিনি ভাষার এক অভূতপূর্ব ভুনিখিচুড়ি তৈরি করেছিলেন যার মধ্যে আমরা গুরুচণ্ডালীর apotheosis বা চরম রূপটি দেখতে পাই। তাঁর ভাষার চমকপ্রদ অভিনবত্ব এই বৈশিষ্ট্য থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। ইচ্ছামত ভাষার সুর-বদল তাল-ফের্তা

অথবা রস-পরিবর্তনের ক্ষমতাও তিনি লাভ করেছেন এই উপাদান-বৈচিত্র্য থেকে।

কোন কোন সমালোচক মুজতবা আলীর রচনায় অসংখ্য ভাষাঘটিত অসঙ্গতি, স্ববিরোধ, এমন কি অশুদ্ধি পর্যন্ত দেখতে পেয়েছেন—বানানে, ব্যাকরণে, উচ্চারণে, প্রতিবর্ণীকরণে (transliteration-এ), বিশিষ্টার্থক বাগ্বিধি (idiom) প্রয়োগে এবং আরও বহু ক্ষেত্রে। তাঁদের অভিযোগটা অবশ্যই সত্য, কিন্তু এর ফলে লেখক হিসাবে আলী সাহেবের মর্যাদা বা উৎকর্ষ কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি না, বরং আমার বিশ্বাস তাঁর রচনার এই 'ত্রুটি'-টুকু তাঁর চরিত্রের একটা বিশেষ দিককে বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। তাঁর মনের মধ্যে কোথায় যেন ধৈর্যের একটু অভাব ছিল। লিখতে বসে নিজের বক্তব্য এবং সেই বক্তব্যের সুবিস্তৃত রস-সম্ভাবনা নিয়ে তিনি এমনই মশগুল হয়ে যেতেন যে ছোটখাটো ত্রুটিবিচ্যুতিকে তিনি হিসাবের মধ্যে ধরতেন না—পিছন ফিরে অশুদ্ধি-সংশোধনের কথা ভাবতেই পারতেন না, যেন একটু মুচকি হেসে বলতেন, 'ক্ষ্যামা দেও ভাই, ও-সব ছোট কথা নিয়ে মগজ ঘামাতে নেই।'—দুবার হাত নেড়ে সব ব্যাপারটা হাওয়ায় উড়িয়ে দিতেন। তুচ্ছ বস্তুর প্রতি এই হালকা অবজ্ঞার মনোভাবকেই বোধ হয় একজন ইংরেজ লেখক 'utter neglect of the non-essential' নামে অভিহিত করেছেন।

এই ছিল যাঁর রচনা-রীতির বিশেষত্ব তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটা যুক্তিসিদ্ধ ধারণা গড়ে তোলা আমার পক্ষে অন্ততঃ খুব কষ্টসাধ্য হয় নি।

ঈষৎ খেয়ালী মজলিসী মেজাজের মানুষটি; কথা বলতে ভালোবাসেন, তবে কথা বলেন প্রধানতঃ কলম দিয়ে; নানা বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী, কিন্তু সে পাণ্ডিত্য খোস-পাঁচড়ার মত সর্বাঙ্গে ফুটে বেরোয় না, আলাপচারির গোলাপবাগে ফুল হয়ে সৌগন্ধ্য ছড়ায়; কথায় কথায় হাসতে জানেন—নিজে হেসে ও পরকে হাসিয়ে আনন্দ পান; নিজেকে নিয়েও অনায়াসে ব্যঙ্গ-কৌতুক করতে পারেন; শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞেয়কে অবজ্ঞা করতে কখনও দ্বিধা করেন না। মুজতবা আলীর রচনায় আপাতদৃষ্ট তিক্ত ব্যঙ্গ-প্রবণতার নিচে আছে মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসা, পাণ্ডিত্যের গাম্ভীর্যের নিচে আছে অকৃত্রিম সরলতা, এবং স্বর্গত পরিমল গোস্বামীর ভাষায়, 'হাল্কা মেজাজের নিচের স্তরে আছে একটি গভীর সংবেদনশীল মন।'

সর্বপ্রকার গোঁড়ামি-বর্জিত এই মানুষটিকে 'মনের মানুষ' হিসাবে পেতে

সকলেরই ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক, এবং আমার বদ্ধমূল ধারণা, পাঠকদের মনের এই ইচ্ছাই সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তার মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করেছে।

। ২ ।

সৈয়দ মুজতবা আলীর অনুরাগী পাঠকদের মধ্যে অনেককে আমি বলতে শুনেছি যে 'কত না অশ্রুজল', 'পঞ্চতন্ত্র', 'বড়বাবু' প্রভৃতি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রম্যরচনাধর্মী প্রবন্ধগুলিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এঁদের মতে আলী সাহেবের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য নাকি এই যে ক্ষুদ্র আধারেই তার দীপ্তি উজ্জ্বলতম রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে।—আমার নিজেরও তাঁর প্রবন্ধাবলী খুবই উপভোগ্য সাহিত্যসৃষ্টি বলে মনে হয়, কিন্তু তাই বলে এইগুলিই তাঁর রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন একথা আমি কিছুতেই মেনে নিতে রাজি নই।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর প্রথমতম প্রকাশিত গ্রন্থ 'দেশে বিদেশে'-ই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতি। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়। প্রকাশের পর প্রথম চৌদ্দ বছরে গ্রন্থের আঠারোটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়—তার পরেও অনেকবার ছাপা হয়েছে। বস্তুতঃ তখনকার দিনে খুব কম পুস্তকই এত অধিকসংখ্যক পাঠকের প্রিয়তম পুস্তকরূপে গণ্য হবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছিল।—সেই জনপ্রিয়তার জোয়ারে এখনও ভাঁটা লাগে নি। এখনও যে-সব নূতন নূতন পাঠক-সম্প্রদায় আমাদের দেশে আবির্ভূত হচ্ছেন তাঁরা এ-বই পড়ে নূতন করে চমৎকৃত ও উল্লসিত হবার সুযোগ পাচ্ছেন।

'দেশে বিদেশে' সম্বন্ধে এর আগে অনেকে অনেক কথা বলে গেছেন—আমি যে নূতন কথা কিছু আপনাদের শোনাতে পারব সে ভরসা রাখি না। আমি শুধু চেষ্টা করব, বইখানির যে-যে অংশ ও যে-যে বৈশিষ্ট্য আমাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দান করে সেগুলি খুঁজে বের করতে এবং তাদের সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করতে—যাতে আপনারাও আমার আনন্দের অংশীদার হতে পারেন।

গ্রীক চিন্তানায়ক অ্যারিস্টট্‌ল্ তাঁর 'Poetics' গ্রন্থে বলেছেন যে শিল্পসৃষ্টি হিসাবে সার্থক প্রতিটি নাটক অথবা কাব্য তিনটি সুনির্দিষ্ট পর্বে বিভক্ত হওয়া অবশ্য-প্রয়োজন—আদিপর্ব মধ্যপর্ব ও অন্ত্যপর্ব। 'দেশে বিদেশে' কাব্যও নয় নাটকও নয়, এমন কি উপন্যাসও নয়। তথাপি সতর্কদৃষ্টি পাঠকের পক্ষে এ গ্রন্থেও উল্লিখিত পর্বত্রয়ের সন্ধান পাওয়া মোটেই দুরূহ হবে না—এর আদিপর্বে আছে

পথের কথা, রেলগাড়িতে করে হাওড়া থেকে পেশাওয়ার এবং তারপর মোটর-বাসে পেশাওয়ার থেকে কাবুল ; মধ্যপর্বে আছে প্রবাস-জীবনের কাহিনী, প্রথমে শহর থেকে আড়াই মাইল দূরে গ্রামাঞ্চলে, তার পরে খাস কাবুল শহরে বসবাসের বর্ণনা ; অন্ত্যপর্বে আছে শিনওয়ারীদের বিদ্রোহ, বাচ্চায়ে শকাও-এর কাবুল আক্রমণ, আফগানিস্থানের নিদারুণ শীতে অনাহারক্লিষ্ট গ্রন্থকার ও মৌলানা জিয়াউদ্দিনের অপরিসীম দুর্দশা, এবং তাঁদের প্রাণ নিয়ে ভারতবর্ষে পলায়নের রোমাঞ্চকর কাহিনী। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে আছে entracte বা বিষ্কম্ভক জাতীয় একটি অধ্যায় ; এতে আছে আফ্‌গানিস্থানের প্রাচীনতম যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত একটা ঐতিহাসিক বিবরণ—অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক।

এই নাটকীয় গঠন-পারিপাট্যের ফলে বইখানি একটা বিচিত্র ধরনের শিল্প-কৃতিত্বে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। গ্রন্থকারের নিজস্ব কল্পনার বা পরিকল্পনার ফলে এটা হয় নি, হয়েছে ইতিহাসের নির্দেশে—মহাকাল যেন নিজের হাতে ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে গ্রন্থের বিষয়বস্তুটিকে শিল্পসঙ্গত রূপ দিয়ে গড়ে তুলেছেন। পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে যে গ্রন্থকার নিজেও বোধ হয় লেখা শেষ হবার আগে গ্রন্থের এই স্বয়ংসৃষ্ট গঠন-সৌষ্ঠব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠার সুযোগ পান নি।

'দেশে বিদেশে'-র বহিরঙ্গ বিচারে সকলের আগে যে-কথাটা বলা আমার উচিত বলে মনে হয়েছে সেই architectonics বা গঠন-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হল। এর পরেই যা বলতে চাই সেটা আসলে মক্ষিকাবৃত্তি মাত্র—একটা খুঁত অনেকদিন আগেই আমার নজরে পড়েছে বইখানাতে ; সামান্য ত্রুটি হলেও এখানে তার উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

'দেশে বিদেশে' কথা দুটোর বাংলা বাগ্বিধি-সঙ্গত অর্থ হল 'স্বদেশের ও বিদেশের নানাস্থানে।' এই রকম 'নানা স্থানে' ভ্রমণের বিবরণ যে বই-এ থাকে একমাত্র সেই বই-এরই নামকরণ করা চলে 'দেশে বিদেশে'। মুজতবা আলীর বইখানি আদৌ ভ্রমণ-বৃত্তান্তই নয়—কোথাও কোন রকম মুসাফিরি তিনি করেন নি। (তৎকালীন) স্বদেশের একটিমাত্র শহরে অর্থাৎ পেশাওয়ারে তিনি ছিলেন মাত্র সাত আট দিন, আর বিদেশে অর্থাৎ আফগানিস্থানে বাস করেছিলেন সামান্য কয়েকটি বছর—তাও একমাত্র রাজধানী কাবুল শহর ও তার প্রান্তবর্তী একটি গ্রাম ছাড়া অন্য কোথাও পদার্পণ করেন নি। এ বই-এর নাম 'কাবুল-প্রবাস' বা ঐরকম একটা কিছু হলে বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত হত। কিন্তু

আলীসাহেবের কাছে এ-সব ছিল তুচ্ছ কথা। 'বই-এর একটা নাম দেওয়া নিয়ে কথা, তার আবার সঙ্গত আর অসঙ্গত! ও একটা হলেই হল।'—এই ছিল তাঁর মনোভাব, যাকে আমি পূর্বে 'neglect of the non-essential' বলে বর্ণনা করেছি।

মুজতবা আলীর বর্ণনাশক্তিকে যদি 'অনন্যসাধারণ' বলে অভিহিত করি, অনুগ্রহ করে তাকে অতিকথনের নমুনা মাত্র মনে করবেন না। সব ভাল লেখকই দৃশ্য বা ঘটনাকে বর্ণনার সাহায্যে জীবন্ত করে তুলতে পারেন, মুজতবা আলীও পারেন, কিন্তু তাঁর বর্ণনার চঙ্‌টি অত্যন্ত হালকা—মনে হয় যেন ফাঁকি দিয়ে মনের মধ্যে ছবিটাকে এঁকে দিলেন চিরস্থায়ী কালির আঁচড়ে। এত সহজে এত গভীর ছাপ খুব কম লেখকই রেখে যেতে পারেন। বিদ্যাসাগর মশাই-এর 'জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরি'-র বর্ণনার সঙ্গে পাঠানবাড়ীর দাওয়াতে দস্তরখানের দুপাশে বসে নিমন্ত্রণ খাওয়ার বর্ণনার পার্থক্য বুঝতে পারলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কাবুল নদীর পাশে দক্কা দুর্গ, জালালাবাদের পথের পাশে আফগান সরাই-এ রাত্রিযাপন, কাবুলের বাজার, আফগানিস্থানের শীতঋতু এবং শীতান্তে বসন্তের আবির্ভাব, বৃদ্ধ ওস্তাদের গাওয়া ফার্সী গজল, আফগান রাজপরিবারের সঙ্গে মুহম্মদ তর্জীর ও তস্য তিন কন্যার তাৎপর্যময় সম্পর্ক, আমীর আমানুল্লার সদিচ্ছা-প্রণোদিত দ্রুত সমাজ-সংস্কারের ও কুসংস্কার-স্খালনের অকপট কিন্তু মাঝে মাঝে হাস্যকর প্রচেষ্টা এবং তার শোচনীয় পরিণাম, বাচ্চায়ে শকাও-এর কাবুল আক্রমণ ও অধিকার—একের পর এক প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি দৃশ্য আমাদের মনশ্চক্ষুর সামনে অপূর্ব প্রাণশক্তির আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ভেসে উঠেছে।—এ বর্ণনার জাত আলাদা।

শুধু বর্ণনায় নয়, চরিত্র-চিত্রাঙ্কনেও মুজতবা আলীর শিল্পপদ্ধতি স্বতন্ত্র। বইখানিকে একটা বিরাট চরিত্র-চিত্রশালা নাম দিলে একটুও অত্যুক্তি করা হয় না—কিন্তু আর দশজন সাহিত্যিক যে পথে চলেন এ-চিত্রশালার চিত্রী সে-পথের পথিক নন। ইনি রঙ-তুলি দিয়ে বড় বড় পটের উপর, তৈলচিত্র আঁকেন না, এঁর আঁকা ছবিতে কয়েকটা সরু-মোটা দ্রুত-টানের রেখার খেলা ছাড়া আর বড় একটা কিছুই থাকে না—অথচ ছবিগুলো ফুটে ওঠে অবিস্মরণীয় রূপ নিয়ে। মানুষের ছবি আঁকার বেলায় মুজতবা আলীর আর্ট পুরোপুরি etching.

সামান্যমাত্র রসিকতায় মুগ্ধ পেশাওয়ারের আহমদ আলী আর কাবুলের

আধ-পাগলা দোস্ত মুহম্মদকে মনে করুন, আর মনে করুন বিদগ্ধভাষাভাষী সংস্কৃত ও আরবীতে সমান পণ্ডিত মীর আস্‌লমের কথা। রাশিয়ান এম্ব্যাসির সাহিত্য-রসিক তোভারিশ দেমিদফ্‌কেও কি সহজে ভুলতে পারবেন? তা ছাড়া আছেন মোটরবাসের ড্রাইভার সর্দারজী, দক্কা দুর্গের ভারপ্রাপ্ত সরকারী অফিসারটি, রাজনীতির হতভাগ্য শিকার মুইন-উস্‌-সুলতানে ইনায়েত উল্লা, সেই আফগান চাষীটি নিজের গোপন আভিজাত্য ফাঁস হয়ে যাওয়া মাত্র যার সঙ্গে লেখকের বন্ধুত্ব বন্ধন টুটে গেল, কোমলহৃদয় দানবাকৃতি বল্‌শফ, রাজনীতি জগতের নেপথ্য-চারিণী বুদ্ধিমতী রাণীমা ও বুদ্ধিহীনা সুরাইয়া, জাত্যভিমানের মূর্ত প্রতীক কালা-আদমি-বিদ্বেষী বৃটিশ এম্ব্যাসির স্যার ফ্রান্‌সিস হাম্‌ফ্রিস, শান্তিনিকেতন থেকে আমদানী-হয়ে-আসা তিন বন্ধু, অধ্যাপক বগদানফ, অধ্যাপক বেন্‌ওয়া ও মৌলানা জিয়াউদ্দিন, মায় সেই অজ্ঞাতনামা অতি-অবাধ্য ছাত্রটি যে পরবর্তী কালে বাচ্চায়ে শকাও-এর সৈন্যদলে কর্নেল হয়েছিল এবং যার সাহায্যের ফলেই শীতে ও অনাহারে মৃতপ্রায় মুয়াল্লিম মুজতবা আলীর প্রাণরক্ষা হয়েছিল—কাকে ছেড়ে কার কথা বলব? প্রত্যেকটি চরিত্রই হালকা হাতের আঁকা রেখাচিত্র এবং প্রতিটি চিত্রই মনের উপর গভীর ও চিরস্থায়ী ছাপ রেখে যায়।

উপরের সাপ্‌টা চরিত্র-বর্ণনের মধ্যে ইচ্ছা করেই একটা চরিত্রের উল্লেখ করি নি, কারণ আমি বিশ্বাস করি, আবদুর রহমানের নাম ঐ ফর্দের অন্তর্ভুক্ত করলে শুধু যে অমার্জনীয় অপরাধ হত তাই নয়, এমন পাপাচরণ করা হত যার উপযুক্ত কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। সে শুধু লেখকের পাচক ও ভৃত্য ছিল না, সে ছিল তাঁর শুভানুধ্যায়ী অভিভাবক, অন্তরঙ্গ বন্ধু; উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্র-বিপ্লবে অবিচ্ছেদ্য সাথী, সব আত্মীয়ের চেয়ে পরমাত্মীয়। শেষ বিদায়ের দিন এরোপ্লেন থেকে নিচের দিকে চেয়ে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, দিগন্ত-বিস্তৃত শুভ্র তুষারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আবদুর রহমান তার ময়লা পাগড়ির ন্যাজটি মাথার উপর তুলে দুলিয়ে দুলিয়ে তাঁকে বিদায় জানাচ্ছে—তখন তাঁর মনে হয়েছিল, 'চতুর্দিকের বরফের চেয়ে শুভ্রতর আবদুর রহমানের পাগড়ি, আর শুভ্রতম আবদুর রহমানের হৃদয়।' এর চেয়ে বড় সত্যকথা তিনি বই-এর আর কোথাও বলেন নি।

'দেশে বিদেশে' বই-এর কি কোন নায়ক আছে? যদি থাকে তো সে আবদুর রহমান ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

'দেশে বিদেশে'-র গ্রন্থকার যে কত বিভিন্ন বিষয়ে বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন তা আমার মত নিতান্ত অপণ্ডিত পাঠকের পক্ষেও বোঝা খুব

দুষ্কর নয়। এখানে একটা অসম্পূর্ণ তালিকা দাখিল করেই আমাকে ক্ষান্ত হতে হবে—কোন রকম গভীরতর আলোচনা করার মত বিদ্যা আমার নেই।

ঋগ্বেদ, মহাভারত, গীতা, কুরান, বাইবেল, আবেস্তা, কালিদাস, সাদী, হাফিজ, ওমর খায়াম, শেক্‌স্‌পীয়র, গোটে, হাইনে, দাদু, কবীর, ভারতচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও সুকুমার রায় পর্যন্ত কত শাস্ত্রগ্রন্থ ও কত কবির রচনাবলী থেকে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে অথবা তাঁদের উল্লেখ করা হয়েছে এই বই-এর মধ্যে তার আর লেখাজোখা নেই। বিশেষ করে রবীন্দ্রকাব্য তো আলী সাহেবের অস্থিমজ্জায় মিশ্রিত বস্তু—তার উল্লেখ বা তা থেকে উদ্ধৃতি তাঁর কাছে পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক নয়, নিভৃততম অনুভূতির প্রকাশ মাত্র।

এ ছাড়া প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, ভাষা-বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, লোকবিশ্বাস, লোকসঙ্গীত প্রভৃতি নানা বিদ্যা তিনি অধিগত করেছিলেন, অন্ততঃপক্ষে অধিগত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই সদা-জাগ্রত, সদাজিজ্ঞাসু মনের পরিচয় তাঁর সমস্ত রচনার ন্যায় 'দেশে বিদেশে' গ্রন্থেও সুপ্রকট।

তাঁর পাণ্ডিত্যের তবু কিছু পরিচয় দেওয়া গেল পাণ্ডিত্যের বিষয়-ও-ক্ষেত্র-বৈচিত্র্যের সংক্ষিপ্ত উল্লেখের সাহায্যে। কিন্তু তাঁর রসবোধ ও রসিকতার বেলায় সে চেষ্টাও করব না, পুঁথি বেড়ে যাবার ভয়ে। তাছাড়া এ জাতীয় চেষ্টার কোন প্রয়োজনও নেই। বই পড়তে পড়তে পাঠক বহু জায়গায় নিজে না হেসে থাকতে পারবেন না এবং প্রিয়জনকে পড়ে শোনাবার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠবেন। গ্রন্থ-কার যে সত্যই রসিক ব্যক্তি তা বোঝার জন্য এর চেয়ে বড় আর কি প্রমাণের প্রয়োজন হতে পারে? পুডিং খেতে কেমন হয়েছে যদি বুঝতে চান, নিজে পুডিংটা চেখে দেখুন।

কিন্তু আলোচনার কচ্‌কচি এখন থাক। আসুন—সৈয়দ সাহেবের আঙিনায় পরিপাটি করে দস্তরখান পাতা হয়েছে, চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় সর্ববিধ খানা তৈয়ার—এইবার আপনারা সব বসে পড়ুন; হলপ করে বলতে পারি, কেউ হতাশ হবেন না।

॥ ৩ ॥

'দেশে বিদেশে'-র একচল্লিশ নম্বর অধ্যায়ে কাবুলের জার্মান রাজদূতের সঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলীর একটা সাক্ষাৎকারের বর্ণনা আছে। তা থেকে জানতে পারা যায়, উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য জার্মানীতে যাবার উদ্দেশ্যে জার্মান সরকারের প্রদত্ত কোন একটা বৃত্তি তাঁর পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না, আলী সাহেব এই

প্রশ্ন করলে রাজদূত জবাব দেন, 'জার্মান সরকার যদি একটি মাত্র বৃত্তি একজন বিদেশীকেও দেন তবে আপনি সেটি পাবেন, আমি কথা দিচ্ছি।'

জার্মান রাজদূত তাঁর কথা রেখেছিলেন, এবং জার্মানীর সরকারী বৃত্তি পেয়ে মুজতবা আলী যথাকালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছিলেন।

পূর্বে যে-সব কথা বলেছি তা থেকে আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে আলী সাহেব বিষম আড্ডাবাজ মানুষ ছিলেন। অতি সত্বর তিনি বার্লিনেও একটা মনের মত আড্ডা খুঁজে পেলেন। এটি একটি রেস্তোরাঁ, নাম 'হিন্দুস্থান হাউস'। এখানে বার্লিন-প্রবাসী বাঙালীরা দল বেঁধে এসে জড়ো হত স্বদেশী 'ভাত ডাল মাছ তরকারি মিষ্টি' খেতে—এবং জমিয়ে আড্ডা দিতে।

'চাচা-কাহিনী'র চাচা ছিলেন এই ভোজনালয়-তথা-আড্ডাখানার মালিক ও ম্যানেজার। শোনা-কথার সত্যতা সম্বন্ধে কোন গ্যারান্টি দিতে পারি না, তবে শুনেছি বার্লিনে এই রেস্তোরাঁটা সত্যই ছিল এবং এই বাঙালী চাচাটিও নাকি লেখকের কল্পনা-সৃষ্ট মানুষ মাত্র নন। অধ্যাপক বিনয় সরকার মশাই নাকি বার্লিনে অবস্থানকালে মাঝে মাঝে আড্ডা দিতে এখানে আসতেন, এবং অবাঙালী হলেও স্বর্গত রামমনোহর লোহিয়া নিয়মিত হাজিরা দিতেন। আরও শুনেছি, চাচা ছিলেন ভারতবর্ষের কোন এক অতি-পরিচিত ও অতি-সম্মানিত পরিবারের ছেলে—হিট্‌লারের অভ্যুদয়ের পর নাৎসি প্রতিবিপ্লব-প্লাবনের মধ্যে জোয়ারের-স্রোতে-ভেসে-যাওয়া তৃণখণ্ডের মত তিনি কোথায় হারিয়ে যান, আর তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি।

এই আড্ডার 'সবচেয়ে চ্যাংড়া' অর্থাৎ সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন গোলাম মৌলা ওরফে মুজতবা আলী স্বয়ং।

মুজতবা আলী চারখানি উপন্যাস রচনা করেছেন এবং কয়েকটি ছোটগল্পও লিখেছেন—সবগুলিই সুরচিত ও সুখপাঠ্য। তবু আমার মনে হয়, বিশুদ্ধ কল্পনা-ভিত্তিক রচনা তাঁর তেমন খোলতাই হয় না। সত্য কাহিনীর বীজ থেকে অঙ্কুরিত অথবা স্বচক্ষে দেখা মানুষকে ঘিরে আবর্তিত ঘটনাবলী আখ্যানসূত্রে গেঁথে তোলেন তিনি যে-সব রচনায় সেইগুলিই আমার কাছে সবচেয়ে উপভোগ্য বলে মনে হয়। তার অন্যতম কারণ বোধ হয় এই যে, এই জাতীয় রচনাতেই তাঁর বিশিষ্ট ধরনের ভাষাভঙ্গিটি সর্বাপেক্ষা সুপ্রযুক্ত হতে পারে।

'চাচা-কাহিনী'র সব কটি কাহিনীই এইভাবে সত্যকার ঘটনা বা মানুষকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে—অন্ততঃ এই আমার ধারণা।

কিন্তু এ-বইএর এগারোটি কাহিনীর মধ্যে প্রথম পাঁচটিকেই মাত্র সত্য সত্য 'চাচা-কাহিনী' বলে বর্ণনা করা চলে, কারণ এই পাঁচটিই শুধু চাচা নিজের মুখে বলেছেন—এবং এদের সব কটিই জার্মানির ঘটনা। বাকি ছটির বক্তা চাচা নন, লেখক। তাদের মধ্যে মাত্র একটির ঘটনাস্থল জার্মানির ম্যুনিক শহর ; দুটি ঘটেছিল প্যারিসে, এবং তিনটি ভারতবর্ষে।—শেষের ছটি কাহিনীর শিল্পমান অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের ; প্রথম পাঁচটি, অর্থাৎ যে-কাহিনীগুলির 'আমি' চাচা নিজে এবং যেগুলিকে অবলম্বন করে বই-এর নামকরণ করা হয়েছে, সেগুলি প্রায় সবই শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের রচনা।

আলোচনার প্রথমাংশে মুজতবা আলীর ভাষাশৈলী ও সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যে-সব কথা বলা হয়েছে সেগুলো আবার একবার পড়ে নিলেই 'চাচা-কাহিনী'-র আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সব কথাই জানা হয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে মনে রাখা প্রয়োজন যে এ-বইএর সবচেয়ে ভাল কাহিনীগুলি একটি বিশিষ্ট আড্ডার প্রধান আড্ডাধারীর মুখ দিয়ে মুজতবা আলীর নিজস্ব আড্ডার ভাষাতেই বলানো হয়েছে।

অতঃপর কয়েকটি কাহিনী বেছে নিয়ে সেগুলি সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য মন্তব্যাকারে আপনাদের কাছে পেশ করতে পারলেই আমার 'চাচা-কাহিনী'-সংক্রান্ত আলোচনা শেষ হয়ে যাবে বলে মনে করি।—

আট নম্বর কাহিনীটি ('রাক্ষসী') মূলতঃ একটা রোমাঞ্চকর বিভীষিকার কাহিনী—বিস্ময় ও আতঙ্কের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে ওঠার পর মন জুগুপ্সায় শিউরে ওঠে। এ-জাতীয় গল্পের সমঝদারের সংখ্যা খুব কম হওয়াই স্বাভাবিক। —উপক্রমণিকা-পর্বে বর্ণিত পার্শীদের আনন্দ উৎসব ও সামাজিক প্রথা-পদ্ধতির বিবরণটি উপভোগ্য।

দশ নম্বর কাহিনী ('পুনশ্চ') প্যারিসের দুটি সান্ধ্য অভিজ্ঞতার বর্ণনা। প্রথমাংশে লেখক যে-তরুণীটির সাহচর্য লাভ করেছিলেন সে অতি সুনিপুণা gold-digger—ছেড়ে যাবার সময় তাঁকে প্রায় সর্বস্বান্ত করে রেখে গিয়েছিল। এই অংশের বর্ণনাভঙ্গি হাস্যরসাত্মক। দ্বিতীয়াংশে আর একটি অপরূপ সুন্দরী তরুণীর কথা বলা হয়েছে। এও এসে লেখকের ঘাড়ে চেপেছিল—কিন্তু এ ছিল পেশাদার পথচারিণী স্বৈরিণী। এর 'ঘৃণ্য' জীবনের দুঃখ-দুর্দশার সকরুণ আখ্যানেই এ-কাহিনীর উপসংহার।—রস ভাল না জমলেও মনকে বেশ নাড়া দিয়ে যায়।

এক নম্বর কাহিনীতে ('স্বয়ংবরা') একটি দারুণ মতলববাজ মেয়ে-জুয়াচোর

কি ভাবে ফাঁকি দিয়ে চাচাকে বিয়ের ফাঁদে ফেলে স্বকার্য উদ্ধারের আয়োজন করেছিল এবং একটি হকি-খেলোয়াড় মদ্দা-মেয়ের সাহায্যে তিনি শেষ পর্যন্ত কিভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।—বিশেষ কিছু শিল্পমূল্য না থাকলেও রচনাটি পড়ে আনন্দ পাওয়া যায়।

পাঁচ নম্বর কাহিনীটি ('বেলতলাতে দু-দুবার') প্রধানতঃ হাস্যরসাত্মক। তার প্রথমার্ধে অস্কার নামক একটি পাঁড় নাৎসি গুণ্ডাপ্রকৃতির তরুণের যে চরিত্র-চিত্র আঁকা হয়েছে তার অপূর্ব মুন্সিয়ানার তারিফ না করে উপায় নেই। ছোকরা এদিকে খুবই পরোপকারী, তাদের বাড়ীর 'ভাড়াটে অতিথি' (Paying guest) ভারতীয় কালা-আদ্‌মি ('Inder') চাচার সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়েছে—তাঁকে ভালও বাসে; কিন্তু হঠাৎ একদিন চাচার কথার মধ্যে কাল্পনিক নাৎসি-অবমাননা আবিষ্কার করে ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে এমন মারমূর্তি ধারণ করল যে তাঁকে বাধ্য হয়ে তাদের বাড়ী ছাড়তে হল। অথচ এর পর একদিন এক মেলার মধ্যে চাচা যখন অন্য এক নাৎসি গুণ্ডার হাতে লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হতে চলেছেন তখন এই অস্কারই—মদের নেশায় টং হয়ে থাকা সত্ত্বেও—গায়ে পড়ে এসে তাঁকে বাঁচিয়ে দিল।– পরম উপভোগ্য রচনা।

তৃতীয় কাহিনীর ('মা-জননী') নায়িকা নার্স সিবিলা অবিবাহিতা অবস্থায় সন্তানের মা হয়েছে। সে যে-পরিবারে কাজ করে তার কর্তা-গিন্নি দুজনেই তাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, তাই অনেক চেষ্টা করে ব্যবস্থা করেছেন যাতে শিশুটি কোন ভদ্র পরিবারে পালিত হতে পারে—কিন্তু এই শর্তে যে তার মা আর তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে পারবে না। সিবিলা প্রথমে রাজী হয়ে শিশুর জন্য গাদা গাদা পোষাক ও খেলনা কিনে নিজের ছ-মাসের মাইনে নিঃশেষ করে দিল, তারপর শেষ পর্যন্ত আত্মসংবরণ করতে না পেরে শিশুটিকে ছিনিয়ে কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গেল।—কানীন সন্তানের মায়ের তীব্র অপত্যস্নেহের এই করুণ কাহিনীটি লেখক অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। সহজে ভুলে যাওয়ার মত রচনা নয়।

চতুর্থ কাহিনীটি ('তীর্থহীনা') অতিমাত্রায় অশ্রুসজল হলেও মর্মস্পর্শী। নায়িকা নেহাৎই ছেলেমানুষ—স্বামী-পরিত্যক্তা ও যক্ষারোগে আক্রান্ত। তারা রোমান ক্যাথলিক—তার মা বিশ্বাস করেন, রাইন নদীর ওপারে সেণ্ট যুডাস টাডেয়াসের গির্জায় তীর্থযাত্রা করলে তাঁর মেয়ে নীরোগ হয়ে উঠবে। পথে নিদারুণ ঝড়বৃষ্টির ফলে তীর্থযাত্রীর দল গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পারল না, মাঝপথ থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হল। মেয়েটি কিছুদিন পরে মারা গেল।—অতি সরল কাহিনী, কিন্তু তার কারুণ্য অবিস্মরণীয়। তীর্থযাত্রার শ্রদ্ধাপূত বর্ণনাটি

চমৎকার—কিন্তু তার সঙ্গে অর্ধপথে আটকে-পড়া তীর্থযাত্রীদের পান-ও-নৃত্যোৎসবের বৈসাদৃশ্য অত্যন্ত বিস্ময়কর, প্রায় বীভৎসও বলা চলে।

আমার মতে 'চাচা-কাহিনী'-র শ্রেষ্ঠ রচনা দ্বিতীয় কাহিনীটি ('কর্নেল')। কাহিনীর চুম্বকমাত্র দিয়ে তার রসের পূর্ণ স্বরূপ বোঝানো এ-ক্ষেত্রে অসম্ভব, কারণ রচনাটির একমাত্র বিষয়বস্তু একটি চরিত্র। নায়ক অভিজাত প্রাশিয়ান বংশোদ্ভূত, জার্মান সেনাবাহিনীর প্রাক্তন কর্নেল—কিন্তু জার্মানীর চরম আর্থিক অবসারের (deflation) ফলে দরিদ্র হয়ে পড়েছেন, এত দরিদ্র যে প্রায় আক্ষরিক অর্থে অনশন এড়াবার জন্য চাচাকে ভাড়াটে অতিথি (Paying guest) হিসাবে গৃহে স্থান দিতে বাধ্য হয়েছেন। মহাপণ্ডিত মানুষ, চাচাকে প্রত্যহ গ্যেটে পড়ান—তাছাড়া শুধু সাহিত্য নয়, তাঁর পড়াশুনার পরিধি অতি-বিস্তৃত; নৃতত্ত্ব, ধর্মনীতি, সমাজবিদ্যা সবই পড়েন, মায় সংস্কৃত মনুসংহিতা গৃহ্যসূত্র ও শ্রৌতসূত্রের জার্মান অনুবাদ পর্যন্ত।—কিন্তু জার্মান-জাতিবিশুদ্ধি রক্ষা সম্বন্ধে এবং রক্ত-সংমিশ্রণ ও বর্ণসংকর সৃষ্টির বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাব অনমনীয়, কুলিশ-কঠোর। অথচ পরিশীলিত ভাষণে ভদ্রতায় ও নম্রতায় এই স্বল্পভাষী মানুষটির তুলনা নেই। একটি মাত্র ছেলে যুদ্ধে মারা গেছে, আর আছে একটি মাত্র মেয়ে। সেই মেয়ে একদিন বাপের বাড়ীর দরজায় এল নিজের শিশুসন্তানটিকে সঙ্গে নিয়ে। বাপ তাকে সদর থেকেই ফিরিয়ে দিলেন—কঠোর ভাষায় নিষেধ করে দিলেন, আর যেন সে কোনদিন এ বাড়ীতে না আসে। তার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে-ছিলেন বলে চাচাকেও বাড়ী থেকে বিদায় করে দিলেন। মেয়ের অপরাধ সে একজন ফরাসী অধ্যাপককে বিয়ে করেছে, অভিজাত প্রাশিয়ান পরিবারে বর্ণসংকর আমদানি করেছে।—যে-কৌলীন্য ও জাত্যাভিমান শুধু পরের অবমাননা ও পরপীড়ন মাত্র করে না, যার শতকরা আশি ভাগই হল আত্ম-নিগ্রহ ও কৃচ্ছ্রসাধন, তার মধ্যে এক ধরনের heroism বা বীরত্ব আছে—কর্নেলের চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক এই কথাটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

দেশে বিদেশে

প্রথম খণ্ড

জিন্নতবাসিনী জাহান-আরার স্মরণে

চাঁদনী থেকে ন'সিকে দিয়ে একটা শর্ট কিনে নিয়েছিলুম। তখনকার দিনে বিচক্ষণ বাঙালীর জন্য ইয়োরোপীয়ন থার্ড নামক একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ভারতের সর্বত্র আনাগোনা করত।

হাওড়া স্টেশনে সেই থার্ডে উঠতে যেতেই এক ফিরিঙ্গী হেঁকে বলল, 'এটা ইয়োরোপীয়নদের জন্য।'

আমি গাঁক গাঁক করে বললুম, 'ইয়োরোপীয়ন তো কেউ নেই। চল, তোমাতে আমাতে ফাঁকা গাড়িটা কাজে লাগাই।'

এক তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বের বইয়ে পড়েছিলুম, 'বাঙলা শব্দের অন্ত্যদেশে অনুস্বার যোগ করিলে সংস্কৃত হয়; ইংরিজী শব্দের প্রাগ্দেশে জোর দিয়া কথা বলিলে সায়েবী ইংরিজী হয়।' অর্থাৎ পয়লা সিলেব্‌লে অ্যাকসেণ্ট দেওয়া খারাপ রান্নায় লঙ্কা ঠেসে দেওয়ার মত—সব পাপ ঢাকা পড়ে যায়। সোজা বাঙলায় এরি নাম গাঁক গাঁক করে ইংরিজী বলা। ফিরিঙ্গী তালতলার নেটিব, কাজেই আমার ইংরিজী শুনে ভারি খুশী হয়ে জিনিসপত্র গোছাতে সাহায্য করল। কুলিকে ধমক দেবার ভার ওরি কাঁধে ছেড়ে দিলুম। ওদের বাপখুড়ো মাসীপিসী রেলে কাজ করে—কুলি শায়েস্তায় ওরা ওয়াকিফহাল।

কিন্তু এদিকে আমার ভ্রমণের উৎসাহ ক্রমেই চুবসে আসছিল। এতদিন পাস-পোর্ট জামাকাপড় যোগাড় করতে ব্যস্ত ছিলুম, অন্য কিছু ভাববার ফুরসৎ পাইনি। গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম যে ভাবনা আমার মনে উদয় হল সেটা অত্যন্ত কাপুরুষজনোচিত—মনে হল, আমি একা।

ফিরিঙ্গীটি লোক ভাল। আমাকে গুম হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বলল, 'এত মনমরা হলে কেন? গোয়িঙ ফার?'

দেখলুম বিলিতি কায়দা জানে। 'হোয়ার আর ইউ গোয়িঙ?' বলল না। আমি যেটুকু বিলিতি ভদ্রস্থতা শিখেছি তার চোদ্দ আনা এক পাদরী সায়েবের কাছ থেকে। সায়েব বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, 'গোয়িঙ ফার?' বললে বাধে না, কারণ উত্তর দেবার ইচ্ছা না থাকলে 'ইয়েস' 'নো' যা খুশী বলতে পার—দুটোর যে কোনো একটাতেই উত্তর দেওয়া হয়ে যায়, আর ইচ্ছে থাকলে তো কথাই নেই। কিন্তু 'হোয়ার আর ইউ গোয়িঙ' যেন ইলিসিয়াম রো'র প্রশ্ন—ফাঁকি দেবার জো নেই। তাই তাতে বাইবেল অশুদ্ধ হয়ে যায়।

তা সে যাই হোক, সায়েবের সঙ্গে আলাপচারি আরম্ভ হল। তাতে লাভও হল। সন্ধ্যা হতে না হতেই সে প্রকাণ্ড এক চুবড়ি খুলে বলল, তার 'ফিয়াঁসে'

নাকি উৎকৃষ্ট ডিনার তৈরী করে সঙ্গে দিয়েছে এবং তাতে নাকি একটা পুরাদস্তুর পল্টন পোষা যায়। আমি আপত্তি জানিয়ে বললুম যে আমিও কিছু কিছু সঙ্গে এনেছি, তবে সে নিতান্ত নেটিব বস্তু, হয়ত বড্ড বেশী ঝাল। খানিকক্ষণ তর্কাতর্কির পর স্থির হল সব কিছু মিলিয়ে দিয়ে ব্রাদারলি ডিভিশন করে আ লা কার্ত ভোজন, যার যা খুশী খাবে।

সায়েব যেমন যেমন তার সব খাবার বের করতে লাগল আমার চোখ দুটো সঙ্গে সঙ্গে জমে যেতে লাগল। সেই শিককাবাব, সেই ঢাকাই পরোটা, মুরগী-মুসল্লম, আলু-গোস্ত। আমিও তাই নিয়ে এসেছি জাকারিয়া স্ট্রীট থেকে। এবার সায়েবের চক্ষুস্থির হওয়ার পালা। ফিরিস্তি মিলিয়ে একই মাল বেরতে লাগল। এমন কি শিককাবাবের জায়গায় শামীকাবাব নয়, আলু-গোস্তের বদলে কপি-গোস্ত পর্যন্ত নয়। আমি বললুম, 'ব্রাদার, আমার ফিয়াঁসে নেই, এসব জাকারিয়া স্ট্রীট থেকে কেনা।'

একদম হুবহু একই স্বাদ। সায়েব খায় আর আনমনে বাইরের দিকে তাকায়। আমারও আবছা আবছা মনে পড়ল, যখন সওদা করছিলুম তখন যেন এক গাব্দাগোব্দা ফিরিঙ্গী মেমকে হোটেলে যা পাওয়া যায় তাই কিনতে দেখেছি। ফিরিঙ্গীকে বলতে যাচ্ছিলুম তার ফিয়াঁসের একটা বর্ণনা দিতে কিন্তু থেমে গেলুম। কি আর হবে বেচারীর সন্দেহ বাড়িয়ে—তার উপর দোখ বোতল থেকে কড়া গন্ধের কি একটা ঢকঢক করে মাঝে মাঝে গিলছে। বলা তো যায় না, ফিরিঙ্গীর বাচ্চা—কখন রঙ বদলায়।

রাত ঘনিয়ে এল। ক্ষিদে ছিল না বলে পেট ভরে খাইনি, তাই ঘুম পাচ্ছিল না। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি কাকজ্যোৎস্না। তবুও পষ্ট চোখে পড়ে এ বাঙলা দেশ নয়। সুপারি গাছ নেই, আম-জামে ঘেরা ঠাসবুনুনির গ্রাম নেই, আছে শুধু ছেঁড়া ছেঁড়া ঘরবাড়ি এখানে সেখানে। উঁচু পাড়িওয়ালা ইঁদারা থেকে তখনো জল তোলা চলছে—পুকুরের সন্ধান নেই। বাঙলা দেশের সোঁদা সোঁদা গন্ধ অনেকক্ষণ হল বন্ধ—দমকা হাওয়ায় পোড়া ধুলো মাঝে মাঝে চড়াৎ করে যেন থাবড়া মেরে যায়। এই আধা আলো অন্ধকারে যদি এদেশ এত কর্কশ তবে দিনের বেলা এর চেহারা না জানি কি রকম হবে। এই পশ্চিম, এই সুজলা সুফলা ভারতবর্ষ? না, তা তো নয়। বঙ্কিম যখন সপ্তকোটি কণ্ঠের উল্লেখ করেছেন তখন সুজলা-সুফলা শুধু বাঙলা দেশের জন্যই। ত্রিংশ কোটি বলে শুকনো পশ্চিমকে ঠাট্টামস্করা করা কাষ্ঠরসিকতা। হঠাৎ দেখি পাড়ার হরেন ঘোষ দাঁড়িয়ে। এঁ্যা? হাঁ! হরেনই তো! কি করে? মানে? আবার

গাইছে 'ত্রিংশ কোটি, ত্রিংশ কোটি, কোটি, কোটি—'

নাঃ, এ তো চেকার সায়েব। টিকিট চেক করতে এসেছে। 'কোটি কোটি' নয়, 'টিকিট টিকিট' বলে চেঁচাচ্ছে। থার্ড ক্লাস—ইয়োরোপীয়ন হলে কি হবে। রাত তেরটার সময় ঘুম ভাঙিয়ে টিকিট চেক না করলে ও যে নিজেই ঘুমিয়ে পড়বে। ধড়মড় করে জেগে দেখি গাড়ির চেহারা বদলে গিয়েছে। 'ইয়োরোপীয়ন কম্পার্টমেণ্ট' দিশী বেশ ধারণ করেছে—বাক্স তোরঙ্গ প্যাটরা চাঙারি চতুর্দিকে ছড়ানো। ফিরিঙ্গী কখন কোথায় নেবে গিয়েছে টের পাইনি। তার খাবারের চাঙারিটা রেখে গিয়েছে—এক টুকরো চিরকুট লাগানো, তাতে লেখা 'গুড লাক ফর দি লঙ জার্নি।'

ফিরিঙ্গী হোক, সায়েব হোক, তবু তো কলকাতার লোক তালতলার লোক—ঐ তালতলাতেই ইরানী হোটেলে কতদিন খেয়েছি, হিন্দু বন্ধুদের মোগলাই খানার কায়দাকানুন শিখিয়েছি, স্কোয়ারের পুকুরপাড়ে বসে সাঁতার কাটা দেখেছি, গোরা সেপাই আর ফিরিঙ্গীতে মেম সায়েব নিয়ে হাতাহাতিতে হাততালি দিয়েছি।

আর বাড়িয়ে বলব না। এই তালতলারই আমার এক দার্শনিক বন্ধু একদিন বলেছিলেন যে এমেটিন ইনজেকশন নিলে মানুষ নাকি হঠাৎ অত্যন্ত স্যাঁৎসেঁতে হয়ে যায়, ইংরিজীতে যাকে বলে 'মডলিন'—তখন নাকি পাশের বাড়ির বিড়াল মারা গেলে মানুষ বালিশে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। বিদেশে যাওয়া আর এমেটিন ইনজেকশন নেওয়া প্রায় একই জিনিস। কিন্তু উপস্থিত সে গবেষণা থাক—ভবিষ্যতে যে তার বিস্তর যোগাযোগ হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ভোর কোথায় হল মনে নেই। জুন মাসের গরম পশ্চিমে গৌরচন্দ্রিকা করে নামে না। সাতটা বাজতে না বাজতেই চড়চড় করে টেরচা হয়ে গাড়িতে ঢোকে আর বাকি দিনটা কি রকম করে কাটবে তার আভাস তখনই দিয়ে দেয়। শুনেছি পশ্চিমের ওস্তাদরা নাকি বিলম্বিত একতালে বেশীক্ষণ গান গাওয়া পছন্দ করেন না, দ্রুত তেতালেই তাঁদের কালোয়াতি দেখানোর শখ। আরো শুনেছি যে আমাদের দেশের রাগরাগিণী নাকি প্রহর আর ঋতুর বাছবিচার করে গাওয়া হয়। সেদিন সন্ধ্যায় আমার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না যে পশ্চিমের সকাল বেলাকার রোদ্দুর বিলম্বিত আর বাদবাকি দিন দ্রুত।

গাড়ি যেন কালোয়াৎ। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে, কোনো গতিকে রোদ্দুরের তবলচীকে হার মানিয়ে যেন কোথাও গিয়ে ঠাণ্ডায় জিরোবে। আর রোদ্দুরও চলেছে সঙ্গে সঙ্গে ততোধিক উর্ধ্বশ্বাসে। সে পাল্লায় প্যাসেঞ্জারদের প্রাণ যায়।

ইস্টিশানে ইস্টিশানে সম। কিন্তু গাড়ি থেকেই দেখতে পাই রোদ্দুর প্লাটফর্মের ছাওয়ার বাইরে আড়নয়নে গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে—বাঘা তবলচী যে রকম দুই গানের মাঝখানে বাঁয়া-তবলার পিছনে ঘাপটি মেরে চাটিম চাটিম বোল তোলে আর বাঁকা নয়নে ওস্তাদের পানে তাকায়।

কখন খেয়েছি, কখন ঘুমিয়েছি, কোন্ কোন্ ইস্টিশান গেল, কে গেল না তার হিসেব রাখিনি। সে গরমে নেশা ছিল, তা না হলে কবিতা লিখব কেন? বিবেচনা করুন—

দেখিলাম পোড়া মাঠ। যতদূর দিগন্তের পানে
দৃষ্টি যায়—দগ্ধ, ক্ষুব্ধ ব্যাকুলতা। শান্তি নাহি প্রাণে
ধরিত্রীর কোনোখানে। সবিতার ক্রুদ্ধ অগ্নিদৃষ্টি
বর্ষিছে নির্মম বেগে। গুমরি উঠিছে সর্বসৃষ্টি
অরণ্য পর্বত জনপদে। যমুনার শুষ্ক বক্ষ
এ তীর ও তীর ব্যাপী—শুষিয়াছে কোন ক্রূর যক্ষ
তার স্নিগ্ধ মাতৃরস। হাহাকার উঠে সর্বনাশা
চরাচরে। মনে হয় নাই নাই নাই কোনো আশা
এ মরুরে প্রাণ দিতে সুধা-সিক্ত শ্যামলিম ধারে।
বৃত্রের জিঘাংসা আজ পর্জন্যের সর্বশক্তি কাড়ে
বাসব আসবরিক্ত। ধরণীর শুষ্ক স্তনতৃণে
প্রেতযোনি গাভী, বৎস হৃত-আশ ক্লান্ত টেনে টেনে।

কী কবিতা! পশ্চিমের মাঠের চেয়েও নীরস কর্কশ। গুরুদেব যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন এ-পদ্য ছাপানো হয় নি। গুরুশাপ ব্রহ্মশাপ।

দুই

গাঁয়ের পাঠশালার বুড়ো পণ্ডিতমশাই হাই তুললেই তুড়ি দিয়ে করুণ কণ্ঠে বলতেন, 'রাধে গো, ব্রজসুন্দরী, পার করো, পার করো।' বড় হয়ে মেলা হিন্দী উর্দু পড়েছি, নানা দেশের নানা লোকের সঙ্গে আলাপচারি হয়েছে কিন্তু 'পার করো, পার করো' বলে ঠাকুরদেবতাকে স্মরণ করতে কাউকে শুনিনি।

শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা পার হয়ে এতদিন বাদে তত্ত্বটা বুঝতে পারলুম। নামগুলো ছেলেবেলায় মুখস্থ করেছি, ম্যাপে ভালো করে চিনে নিয়েছি আর কল্পনায় দেখেছি তাদের বিরাট তরঙ্গ, খরতর স্রোত। ভেবেছি

আমাদের গঙ্গা পদ্মা মেঘনা বুড়ীগঙ্গা এনাদের কাছে ধূলিপরিমাণ। গাড়ি থেকে তাকিয়ে দেখে বিশ্বাস হয় না, এঁরাই ইতিহাস ভূগোলে নামকরা মহাপুরুষের দল। কোথায় তরঙ্গ আর কোথায় তীরের মত স্রোত! এপার ওপার জুড়ে শুকনো খাঁ-খাঁ বালুচর, জল যে কোথায় তার পাত্তাই নেই, দেখতে হলে মাইক্রোস্কোপ টেলিস্কোপ দুইয়েরই প্রয়োজন। তখন বুঝতে পারলুম, ভবযন্ত্রণা পশ্চিমাদের মনে নদী পার হবার ছবি কেন এঁকে দেয় না। এসব নদীর বেশীর ভাগ পার হবার জন্য ঠাকুরদেবতার তো দরকার নেই, মাঝি না হলেও চলে। বর্ষাকালে কি অবস্থা হয় জানিনে, কিন্তু ঠাকুরদেবতাদের তো আর কিস্তিবন্দি করে মৌসুম-মাফিক ডাকা যায় না ; তিন দিনের বর্ষা, তার জন্য বারো মাস চেল্লাচিল্লি করাও ধর্মের খাতে বেজায় বাজে খর্চা।

গাড়ি এর মাঝে আবার ভোল ফিরিয়ে নিয়েছে। দাড়ি লম্বা হয়েছে, টিকি খাটো হয়েছে, নাদুসনুদুস লালাজীদের মিষ্টি মিষ্টি 'আইয়ে বৈঠিয়ে' আর শোনা যায় না। এখন ছ'ফুট লম্বা পাঠানদের 'দাগা, দাগা, দিলতা, রাওড়া', পাঞ্জাবীদের 'তুসি, অসি', আর শিখ সর্দারজীদের জালবন্ধ দাড়ির হরেক রকম বাহার। পুরুষ যে রকম মেয়েদের কেশ নিয়ে কবিতা লেখে এদেশের মেয়েরা বোধ করি সর্দার-জীদের দাড়ি সম্বন্ধে তেমনি গজল গায় ; সে দাড়িতে পাক ধরলে মরসিয়া-জারী গানে বার্ধক্যকে বেইজ্জৎ করে। তাতে আশ্চর্য হবারই বা কি? তেয়োফিল গতিয়েরের এক উপন্যাসে পড়েছি, ফরাসীদেশে যখন প্রথম দাড়িকামানো আরম্ভ হয় তখন এক বিদগ্ধা মহিলা গভীর মনোবেদনা প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'চুম্বনের আনন্দ ফরাসী দেশ থেকে লোপ পেল। শ্মশ্রুঘর্ষণের ভিতর দিয়ে প্রেমিকের দুর্বার পৌরুষের যে আনন্দঘন আস্বাদন পেতুম ফরাসী স্ত্রীজাতি তার থেকে চিরতরে বঞ্চিত হল। এখন থেকে ক্লীবের রাজত্ব। কল্পনা করতেও 'ঘেন্নায়' সর্বাঙ্গ রী রী করে ওঠে।'

ভাবলুম, কোনো সর্দারজীকে এ বিষয়ে রায় জাহির করতে বলি। ফরাসী দাড়ি তার গৌরবের মধ্যাহ্নগগনেও সর্দারজীর দাড়িকে যখন হার মানাতে পারেনি তখন এদেশের মহিলামহলে নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে অনেক প্রশস্তি-তারিফ গাওয়া হয়েছে। কিন্তু ভাবগতিক দেখে সাহস পেলুম না। এদেশে কোন্ কথায় কখন যে কার 'সখ্‌ৎ বেইজ্জতী' হয়ে যায়, আর 'খুনসে' তার 'বদলাঈ' নিতে হয়, তার হদীস তো জানিনে—তুলনাত্মক দাড়িতত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে প্রাণটা কুরবানি দেব নাকি? এরা যখন বেণীর সঙ্গে মাথা দিতে জানে তখন আলবৎ দাড়িবিহীন মুণ্ডও নিতে জানে।

সামনের বুড়ো সর্দারজীই প্রথম আলাপ আরম্ভ করলেন। 'গোয়িঙ ফার ?' নয়, সোজাসুজি 'কহাঁ জাইয়েগা ?' আমি ডবল তসলীম করে সবিনয় উত্তর দিলুম—ভদ্রলোক ঠাকুরদার বয়সী আর জবরজঙ্গ দাড়ি-গোঁফের ভিতর অতিমিষ্ট মোলায়েম হাসি। বিচক্ষণ লোকও বটেন, বুঝে নিলেন নিরীহ বাঙালী কৃপাণ বন্দুকের মাঝখানে খুব আরাম বোধ করছে না। জিজ্ঞাসা করলেন পেশাওয়ারে কাউকে চিনি, না, হোটেলে উঠব। বললুম, 'বন্ধুর বন্ধু স্টেশনে আসবেন, তবে তাঁকে কখনো দেখিনি, তিনি যে আমাকে কি করে চিনবেন সে সম্বন্ধে ঈষৎ উদ্বেগ আছে।'

সর্দারজী হেসে বললেন, 'কিছু ভয় নেই, পেশাওয়ার স্টেশনে এক গাড়ি বাঙালী নামে না, আপনি দু'মিনিট সবুর করলেই তিনি আপনাকে ঠিক খুঁজে নেবেন।'

আমি সাহস পেয়ে বললুম, 'তা তো বটেই, তবে কিনা শর্ট পরে এসেছি—'

সর্দারজী এবার অট্টহাস্য করে বললেন, 'শর্টে যে এক ফুট জায়গা ঢাকা পড়ে তাই দিয়ে মানুষ মানুষকে চেনে নাকি ?'

আমি আমতা আমতা করে বললুম, 'তা নয়, তবে কিনা ধুতি-পাঞ্জাবী পরলে হয়ত ভালো হত।'

সর্দারজীকে হারাবার উপায় নেই। বললেন, 'এও তো তাজ্জবকী বাৎ—'পাঞ্জাবী' পরলে বাঙ্গালীকে চেনা যায় ?'

আমি আর এগলুম না। বাঙালী 'পাঞ্জাবী' ও পাঞ্জাবী কুর্তায় কি তফাৎ সে সম্বন্ধে সর্দারজীকে কিছু বলতে গেলে তিনি হয়ত আমাকে আরো বোকা বানিয়ে দেবেন। তার চেয়ে বরঞ্চ উনিই কথা বলুন, আমি শুনে যাই। জিজ্ঞাসা করলুম, 'সর্দারজী শিলওয়ার বানাতে ক'গজ কাপড় লাগে ?'

বললেন, দিল্লীতে সাড়ে তিন, জলন্ধরে সাড়ে চার, লাহোরে সাড়ে পাঁচ, লালামুসায় সাড়ে ছয়, রাওলপিণ্ডিতে সাড়ে সাত, তারপর পেশাওয়ারে এক লম্ফে সাড়ে দশ, খাস পাঠানমুল্লুক কোহাট থাইবারে পুরো থান।'

'বিশ গজ!'

'হ্যাঁ, তাও আবার খাকী শার্টিঙ দিয়ে বানানো।'

আমি বললুম, 'এ রকম একবস্তা কাপড় গায়ে জড়িয়ে চলাফেরা করে কি করে ? মারপিট, খুনরাহাজানির কথা বাদ দিন।'

সর্দারজী বললেন, 'আপনি বুঝি কখনো বায়স্কোপ যান না ? আমি এই বুড়োবয়সেও মাঝে মাঝে যাই। না গেলে ছেলে-ছোকরাদের মতিগতি বোঝবার

উপায় নেই—আমার আবার একপাল নাতি-নাত্নী। এই সেদিন দেখলুম, দু'শো বছরের পুরোনো গল্পে এক মেমসায়েব ফ্রকের পর ফ্রক পরেই যাচ্ছেন, পরেই যাচ্ছেন—মনে নেই, দশখানা না বারোখানা। তাতে নিদেনপক্ষে চল্লিশ গজ কাপড় লাগার কথা। সেই পরে যদি মেমরা নেচেকুঁদে থাকতে পারেন, তবে মদ্দা পাঠান বিশগজী শিলওয়ার পরে মারপিট করতে পারবে না কেন?'

আমি খানিকটা ভেবে বললুম, 'হক কথা; তবে কিনা বাজে খর্চা।'

সর্দারজী তাতেও খুশী নন। বললেন, 'সে হল উনিশবিশের কথা। মাদ্রাজী ধুতি সাত হাত, জোড় আট; অথচ আপনারা দশ হাত পরেন।'

আমি বললুম, 'দশ হাত টেকে বেশী দিন, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরা যায়।'

সর্দারজী বললেন, 'শিলওয়ারের বেলাতেও তাই। আপনি বুঝি ভেবেছেন, পাঠান প্রতি ঈদে নূতন শিলওয়ার তৈরী করায়? মোটেই না। ছোকরা পাঠান বিয়ের দিন শ্বশুরের কাছ থেকে বিশগজী একটা শিলওয়ার পায়। বিস্তর কাপড়ের ঝামেলা—এক জায়গায় চাপ পড়ে না বলে বহুদিন তাতে জোড়াতালি দিতে হয় না। ছিঁড়তে আরম্ভ করলেই পাঠান সে শিলওয়ার ফেলে দেয় না, গোড়ার দিকে সেলাই করে, পরে তালি লাগাতে আরম্ভ করে—সে যে-কোনো রঙের কাপড় দিয়েই হোক, পাঠানের তাতে বাছবিচার নেই। বাকী জীবন সে ঐ শিলওয়ার পরেই কাটায়। মরার সময় ছেলেকে দিয়ে যায়—ছেলে বিয়ে হলে পর তার শ্বশুরের কাছ থেকে নূতন শিলওয়ার পায়, ততদিন বাপের শিল-ওয়ার দিয়ে চালায়।'

সর্দারজী আমাকে বোকা পেয়ে মস্করা করছেন, না সত্যি কথা বলছেন বুঝতে না পেরে বললুম, 'আপনি সত্যি সত্যি জানেন, না আপনাকে কেউ বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলেছে?'

সর্দারজী বললেন, 'গভীর বনে রাজপুত্তুরের সঙ্গে বাঘের দেখা—বাঘ বললে 'তোমাকে আমি খাব।' এ হল গল্প, তাই বলে বাঘ মানুষ খায় সেও কি মিথ্যে কথা?'

অকাট্য যুক্তি। পিছনে রয়েছে আবার সত্তর বৎসরের অভিজ্ঞতা, কাজেই রণে ভঙ্গ দিয়ে বললুম, 'আমরা বাঙালী, পাজামার মর্ম আমরা জানব কি করে? আমাদের হল বিষ্টিবাদলার দেশ, থালবিল পেরতে হয়। ধুতিলুঙ্গী যে রকম টেনে টেনে তোলা যায়, পাজামাতে তো তা হয় না।'

মনে হয় এতক্ষণে যেন সর্দারজীর মন পেলুম। তিনি বললেন, 'হাঁ, বর্মা মালয়েও তাই। আমি ঐ সব দেশে ত্রিশ বৎসর কাটিয়েছি।'

তারপর তিনি ঝাড় বেঁধে নানা রকম গল্প বলে যেতে লাগলেন। তার কতটা সত্য কতটা বানিয়ে বলা সে কথা পরখ করার মত পরশ পাথর আমার কাছে ছিল না, তবে মনে হল ঐ বাঘের গল্পের মতই। দু'চারজন পাঠান ততক্ষণে সর্দারজীর কাছে এসে তাঁর গল্প শুনতে আরম্ভ করেছে—পরে জানলুম এদের সবাই দু'দশ বছর বর্মা মালয়ে কাটিয়ে এসেছে—এদের সামনে সর্দারজী ঠিক তেমনি-ধারা গল্প করে যেতে লাগলেন। তাতেই বুঝলুম, ফাঁকির অংশটা কমই হবে।

আড্ডা জমে উঠল। দেখলুম, পাঠানের বাইরের দিকটা যতই রসকষহীন হোক না কেন, গল্প শোনাতে আর গল্প বলাতে তাদের উৎসাহের সীমা নেই। তর্কাতর্কি করে না, গল্প জমাবার জন্য বর্ণনার রঙতুলিও বড একটা ব্যবহার করে না। সব যেন উড্‌কাটের ব্যাপার—সাদামাটা কাঠখোট্টা বটে, কিন্তু ঐ নীরস নিরলঙ্কার বলার ধরনে কেমন যেন একটা গোপন কায়দা রয়েছে যার জন্য মনের উপর বেশ জোর দাগ কেটে যায়। বেশীর ভাগই মিলিটারী গল্প, মাঝে মাঝে ঘরোয়া অথবা গোষ্ঠী-সংঘর্ষণের ইতিহাস। অনেকগুলো গোষ্ঠীর নামই সেদিন শেখা হয়ে গেল—আফ্রিদী, শিনওয়ারী, খুগিয়ানী আরো কত কি। সর্দারজী দেখলুম এদের হাড়হদ্দ সবকিছুই জানেন, আমার সুবিধের জন্য মাঝে মাঝে টীকাটিপ্পনী কেটে আমাকে যেন আস্তে আস্তে ওয়াকিফহাল করে তুলছিলেন। ফুরসৎমাফিক আমাকে একবার বললেনও, 'ইংরেজ-ফরাসীর কেচ্ছা পড়ে পড়ে তো পরীক্ষা পাস করেছেন, অন্য কোনো কাজে সেগুলো লাগবে না। তার চেয়ে পাঠানদের নামবুনিয়াদ শিখে নিন, পেশাওয়ার খাইবারপাসে কাজে লাগবে।'

সর্দারজী হক কথা বলেছিলেন।

পাঠানদের গল্প আবার শেষ হয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে। ভাঙা ভাঙা পশতু উর্দু পাঞ্জাবী মিশিয়ে গল্প শেষ করে বলবে, 'তখন তো আমার কুছ মালুমই হল না, আমি যেন শরাবীর বেহুশীতে মশগুল। পরে সব যখন সাফসফা, বিলকুল ঠাণ্ডা, তখন দেখি বাঁ হাতের দুটো আঙুল উড়ে গিয়েছে। এই দেখুন।' বলে বাইশগজী শিলওয়ারের ভাঁজ থেকে বাঁ হাতখানা তুলে ধরল।

আমি দরদ দেখাবার জন্য জিজ্ঞাসা করলুম, 'হাসপাতালে কতদিন ছিলেন?'

সুবে পাঠানিস্থান একসঙ্গে হেসে উঠল; বাবুজীর অজ্ঞতা দেখে ভারি খুশী।

পাঠান বলল, 'হাসপাতাল আর বিলায়তী ডাগ্‌দর কহাঁ, বাবুজী? বিবি পট্টি বেঁধে দিলেন, দাদীমা কুচকুচ হলদভী লাগিয়ে দিলেন, মোল্লাজী ফুঁ-ফুঁকার করলেন। অব্ দেখিয়ে, মালুম হয় যেন আমি তিন আঙুল নিয়েই জন্মেছি।'

পাঠানের ভগিনীপতিও গাড়িতে ছিল; বলল, 'যে-তিনজনের কথা বললে তাদের ভয়ে অজরঈল (যমদূত) তোমাদের গাঁয়ে ঢোকে না—তোমাকে মারে কে?' সবাই হাসল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওর দাদীজানের কেচ্ছা ওকে বলতে বলুন না। পাহাড়ের উপর থেকে পাথরের পর পাথর গড়িয়ে ফেলে কি রকম করে একটা পুরাদস্তুর গোরা পল্টনকে তিন ঘণ্টা কাবু করে রেখেছিলেন।'

সেদিন গল্পের প্লাবনে রৌদ্র আর গ্রীষ্ম দুই-ই ডুবে গিয়েছিল। আর কী খানাপিনা! প্রতি স্টেশনে আড্ডার কেউ না কেউ কিছু না কিছু কিনবেই। চা, শরবৎ, বরফজল, কাবাব রুটি, কোনো জিনিসই বাদ পড়ল না। কে দাম দেয়, কে খায় কিচ্ছু বোঝবার উপায় নেই। আমি দু'একবার আমার হিস্যা দেবার চেষ্টা করে হার মানলুম। বারোজন তাগড়া পাঠানের তির্যকব্যূহ ভেদ করে দরজায় পৌঁছবার বহু পূর্বেই কেউ না কেউ পয়সা দিয়ে ফেলেছে। আপত্তি জানালে শোনে না, বলে, 'বাবুজী এই পয়লা দফা পাঠানমুল্লুকে যাচ্ছেন, না হয় আমরা একটু মেহমানদারী করলুমই। আপনি পেশাওয়ারে আড্ডা গাড়ুন, আমরা সবাই এসে একদিন আচ্ছা করে খানাপিনা করে যাবো। আমি বললুম, 'আমি পেশাওয়ারে বেশী দিন থাকব না।' কিন্তু কার গোয়াল, কে দেয় ধুঁয়ো। সর্দারজী বললেন, 'কেন বৃথা চেষ্টা করেন? আমি বুড়ামানুষ, আমাকে পর্যন্ত একবার পয়সা দিতে দিল না। যদি পাঠানের আত্মীয়তা-মেহমানদারী বাদ দিয়ে এদেশে ভ্রমণ করতে চান, তবে তার একমাত্র উপায় কোনো পাঠানের সঙ্গে একদম একটি কথাও না বলা। তাতেও সব সময় ফল হয় না।'

পাঠানের দল আপত্তি জানিয়ে বলল, 'আমরা গরীব, পেটের ধান্দায় তামাম দুনিয়া ঘুরে বেড়াই, আমরা মেহমানদারী করব কি দিয়ে?'

সর্দারজী আমার কানে কানে বললেন, 'দেখলেন বুদ্ধির বহর? মেহমানদারী করার ইচ্ছাটা যেন টাকা থাকা না-থাকার উপর নির্ভর করে।'

তিন

সর্দারজী যখন চুল বাঁধতে, দাড়ি সাজাতে আর পাগড়ি পাকাতে আরম্ভ করলেন তখনই বুঝতে পারলুম যে পেশাওয়ার পৌঁছতে আর মাত্র ঘণ্টাখানেক বাকি। গরমে, ধুলোয়, কয়লার গুঁড়োয়, কাবাবরুটিতে আর স্নানাভাবে আমার গায়ে তখন আর একরত্তি শক্তি নেই যে বিছানা গুটিয়ে হোল্ডল বন্ধ করি। কিন্তু

পাঠানের সঙ্গে ভ্রমণ করাতে সুখ এই যে, আমাদের কাছে যে কাজ কঠিন বলে বোধ হয় পাঠান সেটা গায়ে পড়ে করে দেয়। গাড়ির ঝাঁকুনির তাল সামলে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, উপরের বাঙ্কের বিছানা বাঁধা আর দেশলাইটি এগিয়ে দেওয়ার মধ্যে পাঠান কোনো তফাৎ দেখতে পায় না। বাক্স তোরঙ্গ নাড়াচাড়া করে যেন অ্যাটাচি কেস।

ইতিমধ্যে গল্পের ভিতর দিয়ে খবর পেয়ে গিয়েছি যে পাঠান-মুল্লুকের প্রবাদ, 'দিনের বেলা পেশাওয়ার ইংরেজের, রাত্রে পাঠানের।' শুনে গর্ব অনুভব করেছি বটে যে বন্দুকধারী পাঠান কামানধারী ইংরেজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে কিন্তু বিন্দুমাত্র আরাম বোধ করিনি। গাড়ি পেশাওয়ার পৌঁছবে রাত ন'টায়। তখন যে কার রাজত্বে গিয়ে পৌঁছব তাই মনে মনে নানা ভাবনা ভাবছি এমন সময় দেখি গাড়ি এসে পেশাওয়ারেই দাঁড়াল। বাইরে ঠা ঠা আলো, ন'টা বাজল কি করে, আর পেশাওয়ারে পৌঁছলুমই বা কি করে? একটানা মুসাফিরির ধাক্কায় মন তখন এমনি বিকল হয়ে গিয়েছিল যে শেষের দিকে ঘড়ির পানে তাকানো পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলুম। এখন চেয়ে দেখি সত্যি ন'টা বেজেছে। তখন অবশ্য এসব ছোটখাটো সমস্যা নিয়ে হায়রান হবার ফুরসৎ ছিল না, পরে বুঝতে পারলুম পেশাওয়ার এলাহাবাদের ঘড়িমাফিক চলে বলে কাণ্ডটা খুবই স্বাভাবিক ও বৈজ্ঞানিক—তখন আবার জুন মাস।

প্ল্যাটফরমে বেশী ভিড় নেই। জিনিসপত্র নামাবার ফাঁকে লক্ষ্য করলুম যে ছ'ফুটী পাঠানদের চেয়েও একমাথা উঁচু এক ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। কাতর নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে যতদূর সম্ভব নিজের বাঙালিত্ব জাহির করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এসে উত্তম উর্দুতে আমাকে বললেন, তাঁর নাম শেখ আহমদ আলী। আমি নিজের নাম বলে এক হাত এগিয়ে দিতেই তিনি তাঁর দু'হাতে সেটি লুফে নিয়ে দিলেন এক চাপ—পরম উৎসাহে, গরম সম্বর্ধনায়। সে চাপে আমার হাতের পাঁচ আঙুল তাঁর দুই থাবার ভিতর তখন লুকোচুরি খেলছে। চিৎকার করে যে লাফ দিয়ে উঠিনি তার একমাত্র কারণ বোধ হয় এই যে তখনো গাড়ির পাঠানের দুটো আঙুল উড়ে যাওয়ার গল্প অবচেতন মনে বাসা বেঁধে অর্ধচেতন সহিষ্ণুতায় আমাকে উৎসাহিত করছিল। তাই সেদিন পাঠানমুল্লুকের পয়লা কেলেঙ্কারি থেকে বাঙালী নিজের ইজ্জৎ বাঁচাতে পারল। কিন্তু হাতখানা কোন্ শুভলগ্নে ফেরৎ পাব সে কথা যখন ভাবছি তখন তিনি হঠাৎ আমাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে খাস পাঠানী কায়দায় আলিঙ্গন করতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর সমানে সমান উঁচু হলে সেদিন কি হত বলতে পারিনে

কিন্তু আমার মাথা তাঁর বুক অবধি পৌঁছয়নি বলে তিনি তাঁর এক কড়া জোরও আমার গায়ে চাপাতে পারছিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উর্দু পশতুতে মিলিয়ে যা বলে যাচ্ছিলেন তার অনুবাদ করলে অনেকটা দাঁড়ায়—'ভালো আছেন তো, মঙ্গল তো, সব ঠিক তো, বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েননি তো?' আমি 'জী হাঁ, জী না' করেই যাচ্ছি আর ভাবছি গাড়িতে পাঠানদের কাছ থেকে তাদের আদব-কায়দা কিছুটা শিখে নিলে ভালো করতুম। পরে ওয়াকিফহাল হয়ে জানলুম, বন্ধুদর্শনে এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে নেই, দেওয়া কায়দা নয়। উভয় পক্ষ একসঙ্গে প্রশ্নের ফিরিস্তি আউড়ে যাবেন অন্ততঃ দু'মিনিট ধরে। তারপর হাত মিলানা, বুক-মিলানা শেষ হলে একজন একটি প্রশ্ন শুধাবেন, 'কি রকম আছেন?' আপনি তখন বলবেন, 'শুকুর, অলহম্‌দুলিল্লা' অর্থাৎ 'খুদাতালাকে ধন্যবাদ, আপনি কি রকম?' তিনি বলবেন, 'শুকুর, অল্‌হম্‌দুলিল্লা।' সর্দিকাশির কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে হলে তখন বলতে পারেন—কিন্তু মিলনের প্রথম ধাক্কায় প্রশ্নতরঙ্গের উত্তর নানা ভঙ্গিতে দিতে যাওয়া 'সখ্‌ৎ বেয়াদবী'!

খানিকটা কোলে-পিঠে, খানিকটা টেনে-হিঁচড়ে তিনি আমাকে স্টেশনের বাইরে এনে একটা টাঙ্গায় বসালেন। আমি তখন শুধু ভাবছি ভদ্রলোক আমাকে চেনেন না জানেন না, আমি বাঙালী তিনি পাঠান, তবে যে এত সম্বর্ধনা করছেন তার মানে কি? এর কতটা আন্তরিক, আর কতটা লৌকিকতা?

আজ বলতে পারি পাঠানের অভ্যর্থনা সম্পূর্ণ নির্জলা আন্তরিক। অতিথিকে বাড়িতে ডেকে নেওয়ার মত আনন্দ পাঠান অন্য কোনো জিনিসে পায় না—আর সে অতিথি যদি বিদেশী হয় তা হলে তো আর কথাই নেই। তারো বাড়া, যদি সে অতিথি পাঠানের তুলনায় রোগাদুব্‌লা সাড়েপাঁচফুটী হয়। ভদ্রলোক পাঠানের মারপিট করা মানা। তাই সে তার শরীরের অফুরন্ত শক্তি নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না। রোগাদুব্‌লা লোক হাতে পেলে আর্তকে রক্ষা করার কৈবল্যানন্দ সে তখন উপভোগ করে—যদিও জানে যে কাজের বেলায় তার গায়ের জোরের কোনো প্রয়োজনই হবে না।

টাঙ্গা তো চলেছে পাঠানী কায়দায়। আমাদের দেশে সাধারণত লোকজন রাস্তা সাফ করে দেয়—গাড়ি সোজা চলে। পাঠানমুল্লুকে লোকজন যার যে রকম খুশী চলে, গাড়ি এঁকে-বেঁকে রাস্তা করে নেয়। ঘণ্টা বাজানো, চিৎকার করা বৃথা। খাস পাঠান কখনো কারো জন্যে রাস্তা ছেড়ে দেয় না। সে 'স্বাধীন', রাস্তা ছেড়ে দিতে হলে তার 'স্বাধীনতা' রইল কোথায়? কিন্তু ঐ স্বাধীনতার

দাম দিতেও সে কসুর করে না। ঘোড়ার নালের চাট লেগে যদি তার পায়ের এক খাবলা মাংস উড়ে যায় তাহলে সে রেগে গালাগালি, মারামারি বা পুলিস ডাকাডাকি করে না। পরম অশ্রদ্ধা ও বিরক্তি সহকারে ঘাড় বাঁকিয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করে, 'দেখতে পাস না?' গাড়োয়ানও স্বাধীন পাঠান—ততোধিক অবজ্ঞা প্রকাশ করে বলে, 'তোর চোখ নেই?' ব্যস্। যে যার পথে চলল।

দেখলুম পেশাওয়ারের বারো আনা লোক আহমদ আলীকে চেনে, আহমদ আলী বোধ হয় দশ আনা চেনেন। দু'মিনিট অন্তর অন্তর গাড়ি থামান আর পশতু জবানে কি একটা বলেন; তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হেসে জানান, 'আপনার সঙ্গে খেতে বললুম। আপত্তি নেই তো?'

আহমদ আলীর স্ত্রীর সৌভাগ্য বলতে হবে—কারণ তিনিই রাঁধেন পর্দা বলে বাড়েন না—যে তাঁদের বাড়ি স্টেশনের কাছে, না হলে সে রাত্রে আহমদ আলীর বাড়িতে পাঠানমুল্লুকের জিরগা বসে যেত।

সরল পাঠান ও সুচতুর ইংরেজে একটা জায়গায় মিল আছে। পাঠানমাত্রই ভাবে বাঙালী বোমা মারে, ইংরেজেরও ধারণা অনেকটা তাই। আহমদ আলী সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টর। আমি তাঁর বাড়ি পৌঁছবার ঘণ্টাখানেকের ভিতর এক পুলিস এসে আহমদ আলীকে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। তিনি সেটা পড়েন আর হাসেন। তারপর তিনি রিপোর্টখানা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। তাতে রয়েছে আমার একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, এবং বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে যে লোকটা বাঙালী—আহমদ আলী যেন উক্ত লোকটার অনুসন্ধান করে সদাশয় সরকারকে তার হাল-হকিকৎ বাৎলান।

আহমদ আলী কাগজের তলায় লিখলেন, 'ভদ্রলোক আমার অতিথি'।

আমি বললুম, 'নাম-ধাম মৎলবটাও লিখে দিন—জানতে চেয়েছে যে।'

আহমদ আলী বলেন, 'কী আশ্চর্য, অতিথির পিছনেও গোয়েন্দাগিরি করব নাকি?'

আমি ভাবলুম পাঠানমুল্লুকে কিঞ্চিৎ বিদ্যা ফলাই। বললুম, 'কর্ম করে যাবেন নিরাসক্ত ভাবে, তাতে অতিথির লাভলোকসানের কথা উঠবে না, এই হল গীতার আদেশ।'

আহমদ আলী বললেন, 'হিন্দুধর্মে শুনতে পাই অনেক কেতাব আছে। তবে আপনি বেছে বেছে একখানা গীতের বই থেকে উপদেশটা ছাড়লেন কেন? তা সে কথা থাক। আমি বিশ্বাস করি কোনো কর্ম না করাতে, সে আসক্তই হোক আর নিরাসক্তই হোক। আমার ধর্ম হচ্ছে উবুড় হয়ে শুয়ে থাকা।'

'উবুড় হয়ে শুয়ে থাকা' কথাটায় আমার মনে একটু ধোঁকা লাগল। আমরা বলি চিৎ হয়ে শুয়ে থাকব এবং এই রকম চিৎ হয়ে শুয়ে থাকাটা ইংরেজ পছন্দ করে না বলে 'লাইঙ স্যাপাইন' কর্মটি প্রভুদের পক্ষে অপকর্ম বলে গণ্য হয়। পাঠানে ইংরেজে মিল আছে পূর্বেই বলেছি, ভাবলুম তাই বোধ হয় পাপটা এড়াবার ও আরামটি বজায় রাখার জন্য পাঠান উবুড় হয়ে শুয়ে থাকার কথাটা আবিষ্কার করেছে।

আমার মনে তখন কি দ্বিধা আহমদ আলী আন্দাজ করতে পেরেছিলেন কি না জানিনে। নিজের থেকেই বললেন, তা না হলে এদেশে রক্ষা আছে! এই তো মাত্র সেদিনের কথা। রাত্রে বেরিয়েছি রোঁদে—মশহুর নাচনেওয়ালী জান্‌কী বাঈ কয়েক দিন ধরে গুম, যদি কোনো পাত্তা মেলে। আমি তো আপন মনে হেঁটে যাচ্ছি—আমার প্রায় পঞ্চাশ গজ সামনে জন আষ্টেক গোরা সেপাই কাঁধ মিলিয়ে রাস্তিরের টহলে কদম কদম এগিয়ে যাচ্ছে—হঠাৎ একসঙ্গে এক লহমায় অনেকগুলো রাইফেলের কড়াক্‌-পিঙ্‌। আমিও তড়াক করে লম্বা হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লুম, তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে পাশের নর্দমায়। সেখানে উবুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে মাথা তুলে দেখি, গোরার বাচ্চারা সব মাটিতে লুটিয়ে, জন দশেক আফ্রিদী চটপট্‌ গোরাদের রাইফেলগুলো তুলে নিয়ে অন্তর্ধান। আফ্রিদীর নিশান সাক্ষাৎ যমদূতের ফরমান, মকমল ডিক্রি, কিস্তি বরখেলাপের কথাই ওঠে না।

'তাই বলি, উবুড় হয়ে শুয়ে থাকতে না জানলে কখন যে কোন্‌ আফ্রিদীর নজরে পড়ে যাবেন বলা যায় না। জান বাঁচাবার এই হল পয়লা নম্বরের তালিম।'

আমি বললুম, 'চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলেই বা দোষ কি?'

আহমদ আলী বললেন, 'উঁহু, চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে দেখতে পাবেন খুদা-তালার আসমান—সে বড় খাবসুরৎ। কিন্তু মানুষের বদমায়েশীর উপর নজর রাখবেন কি করে? কি করে জানবেন যে ডেরা ভাঙবার সময় হল, আর এখানে শুয়ে থাকলে নয়া ফ্যাসাদে বাঁধা পড়ার সম্ভাবনা? মিলিটারি আসবে, তদারকতদন্ত হবে, আপনাকে পাকড়ে নিয়ে যাবে—তার চেয়ে আফ্রিদীর গুলী ভালো।'

আমি বললুম, 'সে না হয় আমার বেলা হতে পারত। কিন্তু আপনাকে তো রিপোর্ট দিতেই হত।'

আহমদ আলী বললেন, 'তওবা, তওবা। আমি রিপোর্ট করতে যাব কেন? আমার কি দায়? গোরার রাইফেল, আফ্রিদীর তার উপর নজর। যে-জিনিসে

মানুষের জান পোঁতা, তার জন্য মানুষ জান দিতে পারে, নিতেও পারে। আমি সে ফ্যাসাদে কেন ঢুকি? বাঙালী বোমা মারে—কেন মারে খোদায় মালুম, রাইফেলে তো তার শখ নেই—ইংরেজ বোমা খেতে পছন্দ করে না কিন্তু বাঙালীর গোঁ সে খাওয়াবেই। তার জন্য সে জান দিতে কবুল, নিতেও কবুল। আমি কেন ইংরেজকে আপনার হাড়হদ্দের খবর দেব? জান লেনদেনের ব্যাপারে তৃতীয় পক্ষের দূরে থাকা উচিত।'

আমি বললুম, 'হক কথা বলেছেন। রাসেলেরও ঐ মত। ভ্যালুজ নিয়ে নাকি তর্ক হয় না। ইংরেজ পাঠানে বিস্তর মিল দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বাঙালী কেন বোমা মারে সে তো অত্যন্ত সোজা প্রশ্ন। স্বাধীনতার জন্য। স্বাধীনতা পেয়ে গেলে সেটা বাঁচিয়ে রাখার জন্য রাইফেলের প্রয়োজন হয়। তাই বোধ করি স্বাধীন আফ্রিদীর কাছে রাইফেল এত প্রিয়বস্তু।'

আহমদ আলী অনেকক্ষণ আপন মনে কি যেন ভাবলেন। বললেন, 'কি জানি, স্বাধীনতা কিসের জোরে টিকে থাকে? রাইফেলের জোরে না বুকের জোরে। আমি এই পরশু দিনের এক দাঙ্গার কথা ভাবছিলুম। জানেন বোধ হয়, পেশাওয়ারের প্রায় প্রতি পাড়ায় একজন করে গুণ্ডার সর্দার থাকে। দুই পাড়ার গুণ্ডার দলে সেদিন লাগল লড়াই। গোলাগুলির ব্যাপার নয়। হাতাহাতি, জোর ছোরাছুরি। একদল মিনিট দশেক পরে মার সইতে না পেরে দিল ছুট। কিন্তু তাদের সর্দার রইলো দাঁড়িয়ে। সমস্ত দল তখন পড়ল গিয়ে তার ঘাড়ে—মেরে গুঁতিয়ে থেঁৎলে যখন ভাবল সে মরে গিয়েছে, তখন তাকে ফেলে সবাই চলে গেল। কাল তাকে হাসপাতালে দেখে এলুম। অন্তত ছ'মাস লাগবে সারতে—যদি ফাঁড়াটা কাটে। ক'খানা পাঁজর ভেঙেছে, আঁতে ক'টা ফুটো হয়েছে তার হিসেবনিকেশ এখনো শেষ হয়নি।

'কিন্তু আশ্চর্য হলুম দেখে যে লোকটা অতি রোগা টিঙটিঙে, সাড়ে পাঁচফুট হয় কি না হয়। ছোরাও নাকি সে চালাতে জানে না, রাইফেলও সে রাখে না। ব্যস্—ঐ এক চীজ আছে, হিম্মৎ। বিস্তর মার খেয়েছে, অনেকবার। মেরেছে অল্প, মারিয়েছে অনেক, পালায়নি কক্‌খনো। আসামী হয়ে আদালতে এসেছে বহুবার, কখনো ফরিয়াদী হয়নি। বলে, 'পাঁচজনের বিপদ-আপদের ফৈসালা করে দিই আমি, আর আমি যাব আদালতে আমার বিপদ-আপদে কান্নাকাটি শোনাতে!

'আরও আশ্চর্য হলুম দেখে, হাসপাতালে তার ওয়ার্ডে যেন পেশাওয়ারের ফলের বাজার বসে গিয়েছে। কাবুলের আঙুর, কান্দাহারের চেরী, মজার-ই-

শরীফের আখরোট-খোবানী সব মজুদ। ছ'জন পালোয়ান দিনরাত তার খাটের চতুর্দিকে মাটিতে বসে—কি জানি হুজুরের কখন কি দরকার হয়। হুজুর অবশ্যি উপস্থিত জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে সঙ্কটসঙ্কুল খাইবারপাসে।

'কিন্তু আসল কথা, সে এখনো দলের সর্দার। তার ইজ্জৎ বেড়েছে; তার খুশনামে পেশাওয়ারের গুণ্ডামহল গমগম করছে।'

আমি চুপ করে ভাবছি, এমন সময় দেখি আহমদ আলী মুচকি মুচকি হাসছেন। বললেন, 'লোকটার হিম্মৎ ছাড়া নাকি আরো একটা গুণ আছে। যাকে বলে হাজির-জবাব। সব কথার চটপট উত্তর দিতে পারে। শুনলুম চারবার প্রমাণ অভাবে খালাস পেয়ে পাঁচবারের বার যখন হাকিম ইজাজ হুসেন খানের আদালতে উপস্থিত হল, তখন তিনি নাকি চটে গিয়ে বলেছিলেন, 'এই নিয়ে তুই পাঁচবার আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিস; তোর লজ্জা-শরম নেই?'

'সর্দার নাকি মুচকি হেসে বলেছিল, 'হুজুর প্রমোশন না পেলে আমি কি করব?'

সে রাতে শুতে যাবার আগে মটরুদাকে চিঠিতে লিখলুম, 'চিৎ হয়ে শোবে না, উবুড় হয়ে শোবে। পাঠানমুল্লুকের এই আইন। শিব ঠাকুরের আপন দেশেও এই খবরটি পাঠিয়ে দিয়ো।'

চার

যতই বলি, 'ভাই আহমদ আলী, খুদা আপনার মঙ্গল করবেন, আখেরে আপনি বেহেশ্‌তে যাবেন, আমার যাওয়ার একটা বন্দোবস্ত করে দিন,' আহমদ আলী ততই বলেন, 'বরাদরে আজীজে মন্ (হে আমার প্রিয় ভ্রাতা), ফার্সীতে প্রবাদ আছে, 'দের আয়দ্ দুরুস্ত আয়দ্' অর্থাৎ 'যা কিছু ধীরেসুস্থে আসে তাহাই মঙ্গল-দায়ক'; আরবীতেও আছে, 'অল অজলু মিনা শয়তান' অর্থাৎ কিনা 'হন্তদন্ত হওয়ার মানে শয়তানের পন্থায় চলা'; ইংরেজীতেও আছে—'

আমি বললুম, 'সব বুঝেছি, কিন্তু আপনার পায়ে পড়ি এই পাঠানের চালে আমার চলবে না। শুনেছি এখান থেকে লাণ্ডিকোটাল যেতে তাদের পনরো দিন লাগে—বাইশ মাইল রাস্তা।'

আহমদ আলী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে বলেছে?'

আমি বললুম, 'কেন, কাল রাত্তিরের দাওয়াতে, রমজান খান, সেই যে বাবরী-চুলওয়ালা, মিষ্টি মিষ্টি মুখ।'

আহমদ আলী বললেন, 'রমজান খান পাঠানদের কি জানে? তার ঠাকুরমা পাঞ্জাবী, আর সে নিজে লাহোরে তিন মাস কাটিয়ে এসেছে। খাস পাঠান কখনো আটক (সিন্ধু নদ) পেরোয় না। তার লাণ্ডিকোটাল থেকে পেশাওয়ার পৌঁছতে অন্তত দু'মাস লাগার কথা। না হলে বুঝতে হবে লোকটা রাস্তার ইয়ার-দোস্তের বাড়ি কাট্ করে এসেছে। পাঠানমুল্লুকের রেওয়াজ প্রত্যেক আত্মীয়ের বাড়িতে তেরাত্তির কাটানো, আর, সব পাঠান সব পাঠানের ভাই-বেরাদর। হিসেব করে নিন।'

কাগজ পেন্সিল ছিল না। বললুম, 'রক্ষে দিন, আমার যে কন্ট্রাক্ট সই করা হয়ে গিয়েছে, আমাকে যেতেই হবে।'

আহমদ আলী বললেন, 'বাস্ না পেলে আমি কি করব?'

'আপনি চেষ্টা করেছেন?'

আহমদ আলী আমাকে হুঁশিয়ার হতে বলে জানালেন, তিনি পুলিসের ইন্সপেক্টর, নানা রকমের উকিল মোক্তার তাঁকে নিত্যি নিত্যি জেরা করে, আমি ও-লাইনে কাজ করে সুবিধা করতে পারব না।

তারপর বললেন, 'পেশাওয়ার ভালো করে দেখে নিন। অনেক দেখবার আছে, অনেক শেখবার আছে। বোখারা সমরকন্দ থেকে সদাগরেরা এসেছে পুস্তীন নিয়ে, তাশকন্দ থেকে এসেছে সামোভার নিয়ে—'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'সামোভার কি?'

'রাশান গল্প পড়েন নি? সামোভার হচ্ছে ধাতুর পাত্র—টেবিলে রেখে তাতে চায়ের জল গরম করা হয়। আপনারা যে রকম মিঙ বংশের ভাস্ নিয়ে মাতামাতি করেন, পেশাওয়ার কান্দাহার তাশকন্দ তুল্লা সামোভার নিয়ে সেই-রকম লড়ালড়ি করে, কে কত দাম দিতে পারে। সে কথা আরেক দিন হবে। তারপর শুনুন, মজার-ই-শরীফ থেকে কার্পেট এসেছে, বদখশান থেকে 'লাল' রুবি, মেশেদ থেকে তসবী, আজরবাইজান থেকে—'

আমি বললুম, 'থাক্ থাক্।'

'আরো কত কি। তারা উঠেছে সব সরাইয়ে। সন্ধ্যাবেলায় গরম ব্যবসা করে, রাত্তিরে জোর খানাপিনা, গানবাজনা। কত হৈ-হল্লা, খুনখারাবী, কত রকম-বেরকমের পাপ। শোনেননি বুঝি, পেশাওয়ার হাজার পাপের শহর। মাসখানেক ঘোরাঘুরি করুন যে-কোনো সরাইয়ে—ডজনখানেক ভাষা বিনা কসরতে বিনা মেহনতে শেখা হয়ে যাবে। পশতু নিয়ে আরম্ভ করুন, চট করে চলে যাবেন ফার্সীতে, তারপর জগতাইতুর্কী, মঙ্গোল, উসমানলী, রাশান, কুর্দী—

বাকিগুলো আপনার থেকেই হয়ে যাবে। গানবাজনায় আপনার বুঝি শখ নেই —সে কি কথা? আপনি বাঙালী, টাগোর সাহেবের গীতাঞ্জলি, গার্ডেনার আমি পড়েছি। আহা, কি উম্‌দা বয়েৎ, আমি ফার্সী তর্জমায় পড়েছি। আপনার তো এ সব জিনিসে শখ থাকার কথা। নাই বা থাকল, কিন্তু ইদনজানের গান না শুনে আপনি পেশাওয়ার ছাড়বেন কি করে? পেশাওয়ারী হুরী, বারোটা ভাষায় গান গাইতে পারে। তার গাহক দিল্লী থেকে বাগদাদ অবধি। আপনি গেলে লড়কী বহুৎ খুশ হবে—তার রাজত্ব বাগদাদ থেকে বাঙ্গাল্ অবধি ছড়িয়ে পড়বে।'

আমি আর কি করি। বললুম, 'হবে, হবে। সব হবে। কিন্তু টাগোর সাহেবের কোন্ কবিতা আপনার বিশেষ পছন্দ হয়?'

আহমদ আলী একটু ভেবে বললেন, 'আয় মাদর, শাহজাদা ইমরোজ—'

বুঝলুম, এ হচ্ছে,

'ওগো মা, রাজার দুলাল যাবে আজি মোর—'

বললুম, 'সে কি কথা, খান সাহেব? এ কবিতা তো আপনার ভালো লাগার কথা নয়। আপনারা পাঠান, আপনারা প্রেমে জখম হলে তো বাঘের মত রুখে দাঁড়াবেন। ঘোড়া চড়ে আসবেন বিদ্যুৎগতিতে, প্রিয়াকে একটানে তুলে নিয়ে কোলে বসিয়ে চলে যাবেন দূরদূরান্তরে। সেখানে পর্বতগুহার নির্জনে আরম্ভ হবে প্রথম মানঅভিমানের পালা, আপনি মাথা পেতে দেবেন তাঁর পায়ের মখমলের চটির নিচে—'

আমাকেই থামতে হল কারণ আহমদ আলী অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির লোক, কারো কথা মাঝখানে কাটেন না। আমি আটকে গেলে পর বললেন, 'থামলেন কেন, বলুন।'

আমি বললুম, 'আপনারা কোন্ দুঃখে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদবেন ম্যা ম্যা, মা মা করে।'

আহমদ আলী বললেন, 'হুঁ, এক জর্মন দার্শনিকও নাকি বলেছেন স্ত্রীলোকের কাছে যেতে হলে চাবুকটি নিয়ে যেতে ভুলো না।'

আমি বললুম, 'তওবা তওবা, অত বাড়াবাড়ির কথা হচ্ছে না।'

আহমদ আলী বললেন, 'না, দাদা, প্রেমের ব্যাপারে হয় ইস্‌পার না হয় উস্‌পার। প্রেম হচ্ছে শহরের বড় রাস্তা, বিস্তর লোকজন। সেখানে 'গোল্ডেন মীন' বা 'সোনালী মাঝারি' বলে কোনো উপায় নেই। হয় 'কীপ টু দি রাইট' অর্থাৎ ম্যা ম্যা করে হৃদয়বেদন নিবেদন, না হয়, 'লেফট' অর্থাৎ বজ্রমুষ্টি দিয়ে নীটশে যা বলেছেন। কিন্তু থাক্ না এসব কথা।'

বুঝলুম প্রেমের ব্যাপারে পাঠান নীরব কর্মী। আমরা বাঙালী, দুপুররাত্রে পাড়ার লোককে না জাগিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ করতে পারিনে। আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরে আমাকে যেন খুশী করার জন্য আহমদ আলী বললেন, 'পেশাওয়ারের বাজারে কিন্তু কোনো গানেওয়ালী নাচনেওয়ালী ছ'মাসের বেশী টিকতে পারে না। কোনো ছোকরা পাঠান প্রেমে পড়বেই। তারপর বিয়ে করে আপন গাঁয়ে নিয়ে সংসার পাতে।'

'সমাজ আপত্তি করে না? মেয়েটা দুদিন বাদে শহরের জন্য কান্নাকাটি করে না?'

'সমাজ আপত্তি করবে কেন? ইসলামে তো কোনো মানা নেই। তবে দুদিন বাদে কান্নাকাটি করে কি না বলা কঠিন। পাঠান গাঁয়ের কান্না শহরে এসে পৌঁছবে এত জোর গলা ইদনজানেরও নেই। জানকী বাঈয়ের থাকলে আমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হতে হত না। হলপ করে কিছু বলতে পারব না, তবে আমার নিজের বিশ্বাস, বেশীর ভাগ মেয়েই বাজারের হট্টগোলের চেয়ে গ্রামের শান্তিই পছন্দ করে। তার উপর যদি ভালোবাসা পায়, তা হলে তো আর কথাই নেই।'

আমি বললুম, 'আমাদের এক বিখ্যাত ঔপন্যাসিকও ঐ রকম ধরনের অভিমত দিয়েছেন, মেয়েদের বাজারে বহু খোঁজখবর নিয়ে।'

এমন সময় আহমদ আলীর এক বন্ধু মুহম্মদ জান বাইসিকেল ঠেলে ঠেলে এসে হাজির। আহম্মদ আলী জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাইসিকেল আবার খোঁড়া হল কি করে?'

মুহম্মদ জান পাঞ্জাবী। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কেন যে আপনি এদেশে এসেছেন বুঝতে পারিনে। এই পাঠানরা যে কি রকম পাব্লিক নুইসেন্স তার খবর জানতে পারতেন যদি একদিনও আধ ঘণ্টার তরে এ শহরে বাইসিকেল চড়তেন। এক মাইল যেতে না যেতে তিনটে পাংকচার। সব ছোট ছোট লোহার।'

ভদ্রলোক দম নিচ্ছিলেন। আমি দরদ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এত লোহা আসে কোথা থেকে?'

মুহম্মদ জান আরো চটে গিয়ে বললেন, 'আমাকে কেন শুধচ্ছেন? জিজ্ঞেস করুন আপনার দিলজানের দোস্ত শেখ আহমদ আলী খান পাঠানকে।'

আহমদ আলী বললেন, 'জানেন তো পাঠানরা বড্ড আড্ডাবাজ। গল্পগুজব না করে সে এক মাইল পথও চলতে পারে না। কাউকে না পেলে সে বসে

যাবে রাস্তার পাশে। মুচীকে বলবে, 'দাও তো ভায়া, আমার পয়জারে গোটা কয়েক পেরেক ঠুকে।' মুচী তখন ঢিলে লোহাগুলো পিটিয়ে দেয়, গোটা দশেক নূতনও লাগিয়ে দেয়। এই রকম শ'খানেক লোহা লাগালে জুতোর চামড়া আর মাটিতে লাগে না, লোহার উপর দিয়েই রাস্তার পাথরের চোট যায়। হাফসোল লাগানোর খরচাকে পাঠান বড্ড ভয় করে কিনা। সেই পেরেক আবার হরেক রকম সাইজের হয়। পাঠানের জুতো তাই লোহার মোজায়িক। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, লোহা ঠোকানো না-ঠোকানো অবান্তর—মুচীর সঙ্গে আড্ডা দেবার জন্য ঐ তার অজুহাত।'

মুহম্মদ খান বললেন, 'আর সেই লোহা ঢিলে হয়ে গিয়ে শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।'

আমি বললুম, 'এতদিন আমার বিশ্বাস ছিল আড্ডা মানুষকে অপকর্ম থেকে ঠেকিয়ে রাখে। এখন দেখতে পাচ্ছি ভুল করেছি।'

আহমদ আলী কাতরস্বরে বললেন, 'আড্ডার নিন্দা করবেন না। বাইসিকেল চড়ার নিন্দা করুন। আপনাকে বলিনি, 'অল অজলু মিনা শয়তান' অর্থাৎ হস্তদন্ত হওয়ার মানে শয়তানের পন্থায় চলা। তাই তো বাইসিকেলের আরেক নাম শয়তানের গাড়ি।'

সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেশাওয়ার দিনের ১১৪ ডিগ্রী ভুলে গিয়ে মোলায়েম বাতাস দিয়ে সর্বাঙ্গের গ্লানি খেদ ঘুচিয়ে দেয়। রাস্তাঘাট যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে হাই তুলে ঘোড়ার গাড়ির খটখটানি দিয়ে তুড়ি দিতে থাকে। পাঠান বাবুরা তখন সাজগোজ করে হাওয়া খেতে বেরোন। পায়ে জরীর পয়জার, পরনে পপলিনের শিলওয়ার—তার ভাঁজ ধারালো ছুরির মত ক্রীজের দুদিক বেয়ে কেতায় কেতায় নেমে এসেছে; মুড়ির ভিতরে লাল সুতোর গোলাপী আভা। গায়ে রঙীন সিল্কের লম্বা শার্ট আর মাথায় যে পাগড়ি তার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোনো শিরাভরণের সঙ্গে হয় না। বাঙালীর শিরাভরণ দেখে অভ্যাস নেই; টুপি বলুন, হ্যাট বলুন, সবই যেন তার কাছে অবান্তর ঠেকে, মনে হয় বাইরে থেকে জোর করে চাপানো, কিন্তু মধ্যবিত্ত ও ধনী পাঠানের পাগড়ি দেখে মনে হয় ভগবান মানুষকে মাথাটা দিয়েছেন নিতান্ত ঐ পাগড়ি জড়াবার উপলক্ষ্য হিসাবে।

কামিয়ে-জুমিয়ে গোঁফে আতর মেখে আর সেই ভুবনমোহন পাগড়ি বেঁধে খানসাহেব যখন সাঁঝের ঝোঁকে পেশাওয়ারের রাস্তায় বেরোন, তখন কে বলবে তিনি জাকারিয়া স্ট্রীটের পাঠানের জাতভাই; কোথায় লাগে তাঁর কাছে তখন

হলিউডের ঈভনিঙ ড্রেসপরা হীমেনদের দল ?

ফুরফুরে হাওয়া গাছের মাথায় চিরুনি চালিয়ে, খানসায়েবদের পাগড়ির চুড়ো দুলিয়ে, ফুলের দোকানে ঝোলানো মালাতে কাঁপন লাগিয়ে আর সর্বশেষে আহমদ আলীর দু'কান-ছোঁয়া গোঁফে হাত বুলিয়ে নামল আমার শ্রান্ত ভালে—তপ্ত গ্রীষ্মের দগ্ধ দিনান্তের সন্ধ্যাকালে। এ যেন বাঙলা দেশের জ্যৈষ্ঠশেষের নববর্ষণ—শীতল জলধারার পরিবর্তে এ যেন মাতৃহস্তের স্নিগ্ধমন্দ মলয়ব্যজন। কোন্ এক নৃশংস ফারাওয়ের অত্যাচারে দিবাভাগে দেশের জনমানব প্রাণীপতঙ্গ দলে দলে ভূগর্ভে আশ্রয় নিয়ে প্রহর গুনছিল, পশ্চিম-পিরামিডে তার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর বাতাস যেন মোজেসের অভয়বাণী দিয়ে গেল—দিকে দিকে নতুন প্রাণের সাড়া—ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর।

কিন্তু জেগে উঠেই মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজন কি আহারের ? রুটি আর কাবাবওয়ালার দোকানের সামনে কী অসম্ভব ভিড়। বোরকাপরা মেয়ে, সবে-হাঁটতে শিখেছে ছেলে, বাঁ হাত মরণের দিকে ডান হাত রুটিওয়ালার দিকে বাড়িয়ে বুড়ো, সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে আহারের সন্ধানে। রুটিওয়ালা সেই ক্ষুধার্তদের শান্ত করার জন্য কাউকে কাতরকণ্ঠে ডাকে 'ভাই' কাউকে 'বরাদর' কাউকে 'জানে মন্' (আমার জান্), কাউকে 'আগা-জান্'—পশতু, পাঞ্জাবী, ফারসী, উর্দু চারটে ভাষায় সে একসঙ্গে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। ওদিকে তন্দুরের ভিতর লম্বা লোহার আঁকশি চালিয়ে রুটি টেনে টেনে ওঠাচ্ছে রুটি-ওয়ালার ছোকরারা। গনগনে আগুনের টকটকে লাল আভা পড়েছে তাদের কপালে গালে। বড় বড় বাবরীচুলের জুলফি থেকে থেকে চোখমুখ ঢেকে ফেলছে—দুহাত দিয়ে রুটি তুলছে, সরাবার ফুরসৎ নেই। বুড়ো রুটিওয়ালার দাড়ি হাওয়ায় দুলছে, কাজের হিড়িকে তার বজ্রবাঁধন পাগড়ি পর্যন্ত টেরচা হয়ে এক-দিকে নেমে এসেছে—ছোকরাদের কখনও তম্বী করে 'জুদ্ কুন্, জুদ্ কুন্', 'জলদি করো, জলদি করো', খদ্দেরদের কখনও কাকুতি-মিনতি 'হে ভ্রাতঃ, হে বন্ধু, হে আমার প্রাণ, হে আমার দিলজান, সবুর করো, সবুর করো, তাজা গরম রুটি দি বলেই তো এত হাঙ্গাম হুজ্জৎ। বাসী দিলে কি এতক্ষণ তোমাদের দাঁড় করিয়ে রাখতুম ?'

বোরকার আড়াল থেকে কে যেন বলল—বয়স বোঝার জো নেই—'তোর তাজা রুটি খেয়ে খেয়েই তো পাড়ার তিনপুরুষ মরল। তুই বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে বাসী খাস। তাই দে না।'

বোরকা পরে, ঐ যা। তা না হলে পাঠান মেয়েও স্বাধীন।

রুটির পর ফুল কিংবা আতর। মনে পড়ল মহাপুরুষ মুহম্মদের একটি বচন—সত্যেন দত্তের তর্জমা—

জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিয়ো ক্ষুধার লাগি।
জুটে যায় যদি দুইটি পয়সা
ফুল কিনে নিয়ো, হে অনুরাগী।

পাঁচ

পাঠান অত্যন্ত অলস এবং আড্ডাবাজ, কিন্তু আরামপ্রয়াসী নয় এবং যেটুকু সামান্য তার বিলাস, তার খরচাও ভয়ঙ্কর বেশী কিছু নয়। দেশভ্রমণকারী গুণীদের মুখে শোনা যে, যাদের গায়ের জোর যেমন বেশী, তাদের স্বভাবও হয় তেমনি শান্ত। পাঠানদের বেলায়ও দেখলুম কথাটা খাঁটি। কাগজে আমরা হামেশাই পাঠানদের লুটতরাজের কথা পড়ি—তার কারণও আছে। অনুর্বর দেশ, ব্যবসাবাণিজ্য করতে জানে না, পল্টনে তো আর তামাম দেশটা ঢুকতে পারে না, কাজেই লুটতরাজ ছাড়া অন্য উপায় কোথায়? কিন্তু পেটের দায়ে যে অপকর্ম সে করে, মেজাজ দেখাবার জন্য তা করে না। তার আসল কারণ অবশ্য পাঠানের মেজাজ সহজে গরম হয় না—পাঞ্জাবীদের কথা স্বতন্ত্র। এবং হলেও সে চট করে বন্দুকের সন্ধান করে না। তবে সব জিনিসেরই দুটো একটা ব্যত্যয় আছে—পাঠান তো আর খুদ খুদাতালার আপন হাতে বানানো ফিরিস্তা নয়। বেইমান বললে পাঠানের রক্ত খাইবার পাসের টেম্পারেচার ছাড়িয়ে যায়, আর ভাইকে বাঁচাবার জন্য সে অত্যন্ত শান্তমনে যোগাসনে বসে আঙুল গোনে, নিদেন-পক্ষে তাকে ক'টা খুন করতে হবে। কিন্তু হিসেবনিকেশে সাক্ষাৎ বিদ্যেসাগর বলে প্রায়ই ভুল হয় আর দুটো-চারটে লোক বেঘোরে প্রাণ দেয়। তাই নিয়ে তম্বীতম্বা করলে পাঠান সকাতর নিবেদন করে, 'কিন্তু আমার যে চার-চারটে বুলেটের বাজে খরচা হল তার কি? তাদের গুষ্টি-কুটুম কান্নাকাটি করছে, কিন্তু একজনও একবারের তরে আমার বাজে খরচার খেসারতির কথা ভাবছে না। ইনসান বড়ই খুদপরস্ত—সংসার বড়ই স্বার্থপর।

পরশু রাতের দাওয়াতে এ রকম নানা গল্প শুনলুম। এসব গল্প বলার অধিকার নিমন্ত্রিত ও রবাহূতদের ছিল। একটা জিনিসে বুঝতে পারলুম যে, এঁদের সকলেই খাঁটি পাঠান।

সে হল তাদের খাবার কায়দা। কার্পেটের উপর চওড়ায় দুহাত, লম্বায় বিশ-ত্রিশহাত—প্রয়োজন মত—একখানা কাপড় বিছিয়ে দেয়। সেই দস্তরখানের দুদিকে সারি বেঁধে এক সারি অন্য সারির মুখোমুখি হয়ে বসে। তারপর সব খাবার মাঝারি সাইজের প্লেটে করে সেই দস্তরখানে সাজিয়ে দেয়; তিন থালা আলু-গোস্ত, তিন থালা শিক-কাবাব, তিন থালা মুর্গী-রোস্ট, তিন থালা সিনা-কলিজা, তিন থালা পোলাও, এই রকম ধারা সব জিনিস একখানা দস্তরখানের মাঝখানে, দুখানা দুই প্রান্তে। বাঙালী আপন আপন থালা নিয়ে বসে; রান্না-ঘরের সব জিনিসই কিছু না কিছু পায়। পাঠানদের বেলা তা নয়। যার সামনে যা পড়ল, তাই নিয়ে সে সন্তুষ্ট। প্রাণ গেলেও কেউ কখনো বলবে না, আমাকে একটু মুর্গী এগিয়ে দাও, কিম্বা আমার শিক-কাবাব খাবার বাসনা হয়েছে। মাঝে মাঝে অবশ্যি হঠাৎ কেউ দরদ দেখিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'আরে হোথায় দেখো গোলাম মুহম্মদ চ্যাঁড়শ চিবোচ্ছে, ওকে একটু পোলাও এগিয়ে দাও না'—সবাই তখন হাঁ-হাঁ করে সব ক'টা পোলাওয়ের থালা ওর দিকে এগিয়ে দেয়। তারপর মজলিস গালগল্পে ফের মশগুল। ওদিকে গোলাম মুহম্মদ শুকনো পোলাওয়ের মরুভূমিতে তৃষ্ণায় মারা গেল, না মাংসের থৈ-থৈ ঝোলে ডুবে গিয়ে প্রাণ দিল, তার খবর ঘণ্টাখানেক ধরে আর কেউ রাখে না। এবং লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে, পাঠান আড্ডা জমাবার খাতিরে অনেক রকম আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত। গল্পের নেশায় বে-খেয়ালে অন্ততঃ আধ ডজন অতিথি সুদ্ধু শুকনো রুটি চিবিয়েই যাচ্ছে, চিবিয়েই যাচ্ছে। অবচেতন ভাবটা এই, পোলাও-মাংস বাছতে হয়, দেখতে হয়, বহুৎ বয়নাক্কা, তাহলে লোকের মুখের দিকে তাকাব কি করে, আর না তাকালে গল্প জমবেই বা কি করে।

অথচ এঁরা সবাই ভদ্রসন্তান, দু' পয়সা কামায়ও বটে। বাড়িতে নিশ্চয়ই পছন্দমাফিক পোলাও-কালিয়া খায়। কিন্তু পাঠান-জীবনের প্রধান আইন, একলা বসে নবাবী খানা খাওয়ার চেয়ে ইয়ারবক্সীর সঙ্গে শুকনো রুটি চিবনো ভালো। ওমর খৈয়ামও বলেছেন,

তব সাথী হয়ে দগ্ধ মরুতে
পথ ভুলে তবু মরি
তোমারে ছাড়িয়ে মসজিদে গিয়া
কী হবে মন্ত্র স্মরি?

কিন্তু ওমর বুর্জুয়া কবির বিদগ্ধ পদ্ধতিতে আপন বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। পাঠান ভাঙা ভাঙা উর্দুতে ঐ একই আপ্তবাক্য প্রলেতারিয়া কায়দায় জানায়—

'দোস্ত!
তুমহারী রোটি, হমারা গোস্ত!'

অর্থাৎ 'নেমন্তন্ন করেছ সেই আমার পরম সৌভাগ্য। শুধু শুকনো রুটি? কুছ পরোয়া নাহী। আমি আমার মাংস কেটে দেব।'

কাব্যজগতে যে হাওয়া বইছে, তাতে মনে হয়, ওমরের শরাবের চেয়ে মজুরের ধেনোর কদর বেশী।

তবে একটা কথা বলে দেওয়া ভালো। পাঠানের ভিতর বুর্জুয়া প্রলেতারিয়ায় যে তফাৎ, সেটুকু সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক। অনুভূতির জগতে তারা একই মাটির আসনে বসে, আর চিন্তাধারায় যে পার্থক্য সে শুধু কেউ খবর রাখে বেশী, কেউ কম। কেউ সেক্সপীয়র পড়েছে, কেউ পড়েনি। ভালমন্দ বিচার করার সময় দুই দলে যে বিশেষ প্রভেদ আছে, মনে হয়নি। আচার-ব্যবহারে এখনো তারা গুষ্টির ঐতিহ্যগত সনাতন জান-দেওয়া-নেওয়ার পন্থা অনুসরণ করে।

এসব তত্ত্ব আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন ইসলামিয়া কলেজের এক অধ্যাপক। অনেকক্ষণ ধরে নানা রঙ, নানা দাগ কেটে সমাজতাত্ত্বিক পটভূমি নির্মাণ করে বললেন—

'এই ধরুন আমার সহকর্মী অধ্যাপক খুদাবখ্‌শের কথা। ইতিহাসে অগাধ পণ্ডিত। ইহসংসারে সব কিছু তিনি অর্থনীতি দিয়ে জলের মত তরল করে এই তৃষ্ণার দেশে অহরহ ছেলেদের গলায় ঢালছেন। ধর্ম পর্যন্ত বাদ দেন না। যীশু-খ্রীষ্ট তাঁর ধর্ম আরম্ভ করেছিলেন ধনের নবীন ভাগবণ্টনপদ্ধতি নির্মাণ করে; তাতে লাভ হওয়ার কথা গরীবেরই বেশী—তাই সবচেয়ে দুঃখী জেলেরা এসে জুটেছিল তাঁর চতুর্দিকে। মহাপুরুষ মুহম্মদও নাকি সুদ তুলে দিয়ে অর্থবণ্টনের জমিকে আরবের মরুভূমির মত সমতল করে দিয়েছিলেন। এসব তো ইহলোকের কথা—পরলোক পর্যন্ত খুদাবখ্‌শ অর্থনৈতিক র‍্যাঁদা চালিয়ে চিক্কণ মসৃণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু থাক এসব কচকচানি—মোদ্দা কথা হচ্ছে ভদ্রলোক ইতিহাসের দুরবীনে আপন চোখটি এমনি চেপে ধরে আছেন যে অন্য কিছু তার নজরে পড়ে কিনা সে বিষয়ে আমাদের সকলের মনে গভীর সন্দেহ ছিল।

'মাসখানেক পূর্বে তাঁর বড় ছেলে মারা গেল। ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ত, মেধাবী ছেলে, বাপেরই মত পড়াশুনায় মশগুল থাকত। বড় ছেলে মারা গিয়েছে, চোট লাগার কথা, কিন্তু খুদাবখ্‌শ নির্বিকার। সময়মত কলেজে হাজিরা দিলেন। চায়ের সময় আমরা সন্তর্পণে শোক নিবেদন করতে গিয়ে আরেক প্রস্থ লেকচর শুনলুম, জরথুস্ত্র কোন্ অর্থনৈতিক কারণে রাজা গুশ্‌ৎআস্‌প্‌কে তাঁর নূতন ধর্মে

দীক্ষিত করেছিলেন। তিন দিন বাদে দুসরা ছেলে টাইফয়েডে মারা গেল—খুদাবখ্‌শ বৌদ্ধ ধর্মের কি এক পিটক, না খোদায় মালুম কি, তাই নিয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য। এক মাস যেতে না যেতে স্ত্রী মারা গেলেন পিত্রালয়ে—খুদাবখ্‌শ তখন সিন্ধুর পারে পারে সিকন্দর শাহের বিজয়পন্থার অর্থনৈতিক কারণ অনুসন্ধানে নাক-কান বন্ধ করে তুরীয়ভাব অবলম্বন করেছেন।

'আমরা ততদিনে খুদাবখ্‌শের আশা ছেড়ে দিয়েছি। লোকটা ইতিহাস করে করে অমানুষ হয়ে গিয়েছে এই তখন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আর পাঠান-সমাজ যখন মনুষ্যজাতির সর্বোচ্চ গৌরবস্থল তখন আর কি সন্দেহ যে খুদাবখ্‌শের পাঠানত্ব সম্পূর্ণ কর্পূর হয়ে গিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক টেলিস্কোপের পাল্লারও বহু ঊর্ধ্বে দূরদূরান্তরে পঞ্চেন্দ্রিয়াতীত কোন্ সূক্ষ্মলোকে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

'এমন সময় মারা গেল তাঁর ছোট ভাই—পল্টনে কাজ করত। খুদাবখ্‌শের আর কলেজে পাত্তা নেই। আমরা সবাই ছুটে গেলুম খবর নিতে। গিয়ে দেখি এক প্রাগৈতিহাসিক ছেঁড়া গালচের উপর খুদাবখ্‌শ গড়াগড়ি দিচ্ছেন। পুঁথিপত্র, ম্যাপ, কম্পাস চতুর্দিকে ছড়ানো। গড়াগড়িতে চশমার একটা পরকলা ভেঙে গিয়েছে। খুদাবখ্‌শের বুড়া মামা বললেন, দু'দিন ধরে জল স্পর্শ করেননি।

'হাউ হাউ করে কাঁদেন আর বলেন, 'আমার ভাই মরে গিয়েছে।' শোকে যে মানুষ এমন বিকল হতে পারে পূর্বে আর কখনো দেখিনি। আমরা সবাই নানা রকমের সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু খুদাবখ্‌শের মুখে ঐ এক কথা, 'আমার ভাই মরে গিয়েছে।'

'শেষটায় থাকতে না পেরে আমি বললুম, 'আপনি পণ্ডিত মানুষ, শোকে এত বিচলিত হচ্ছেন কেন? আর আপনার সহ্য করবার ক্ষমতা যে কত অগাধ সে তো আমরা সবাই দেখেছি—দুটি ছেলে, স্ত্রী মারা গেলেন, আপনাকে তো এতটুকু কাতর হতে দেখিনি।'

'খুদাবখ্‌শ আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন আমি বদ্ধ উন্মাদ। কিন্তু মুখে কথা ফুটল। বললেন, 'আপনি পর্যন্ত এই কথা বললেন? ছেলে মরেছিল তো কি? আবার ছেলে হবে। বিবি মরেছেন তো কি? নূতন শাদী করব। কিন্তু ভাই পাব কোথায়?' তারপর আবার হাউ হাউ করে কাঁদেন আর বলেন, 'আমার ভাই মরে গিয়েছে'।'

অধ্যাপক বলা শেষ করলে আমি বললুম, 'লক্ষ্মণের মৃত্যুশোকে রামচন্দ্রও ঐ বিলাপ করেছিলেন।'

আহমদ আলী বললেন, 'লছ্‌মন্? রামচন্দরজী? হিন্দুদের কি একটা গল্প

আছে না? সেইটে আমাদের শুনিয়ে দিন। আপনি কখনো গল্প বলেন না, শুধু শোনেনই।'

ইয়া আল্লা! আদি কবি বাল্মীকি যে গল্প বলেছেন আমাকে সে গল্প নূতন করে আমার টোটাফুটা উর্দু দিয়ে বলতে হবে! নিবেদন করলুম, 'অধ্যাপক খুদাবখ্‌শকে অনুরোধ করবেন। রামায়ণের নাকি অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও আছে।'

অধ্যাপক শুধালেন, 'কিন্তু রামচন্দরজী জবরদস্ত লড়নেওয়ালা ছিলেন, নয় কি?'

আমি বললুম, 'আলবৎ।'

অধ্যাপক বললেন, 'ঐ তো হল আসল তত্ত্বকথা। বীরপুরুষ আর বীরের জাতমাত্রই ভাইকে অত্যন্ত গভীর ভাবে ভালবাসে। পাঠানদের মত বীরের জাত কোথায় পাবেন বলুন?'

আমি বললুম, 'কিন্তু অধ্যাপক খুদাবখ্‌শ তো বীরপুরুষ ছিলেন না।'

অধ্যাপক পরম পরিতৃপ্তি সহকারে বললেন, 'সেই তো গুহ্যতর তত্ত্ব। অধ্যাপকি করো আর যাই করো, পাঠানত্ব যাবে কোত্থেকে? অর্থনৈতিক কারণ-ফারণ সব কিছুই অত্যন্ত পাতলা ফিলিম—একটু খোঁচা লাগলেই আসল পেলেট্ বেরিয়ে পড়ে।'

মেজর মুহম্মদ খান বললেন, 'ভাইকে ভালোবাসার জন্য পাঠান হওয়ার কি প্রয়োজন? ইউসুফও (জোসেফ) তো বেনয়ামিনকে (বেনজামিন) ভয়ঙ্কর ভালবাসতেন।'

অধ্যাপক বললেন, 'ইহুদিদের কথা বাদ দিন। আদমের এক ছেলে আরেক ছেলেকে খুন করেনি?'

আমি বললুম, 'কিন্তু পাঠানরা ইহুদিদের হারিয়ে-যাওয়া বারো উপজাতির একটা নয়? কোথায় যেন ঐ রকম একটা থিয়োরি শুনেছি যে সেই উপজাতি যখন দেখল তাদের কপালে শুকনো, মরা আফগানিস্থান পড়েছে তখন হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল—অর্থাৎ ফারসীতে যাকে বলে "ফগান" করেছিল—তাই তো তাদের নাম "আফগান"। আর আপনারা তো আসলে আফগান, এদেশে বসবাস করে হিন্দুস্থানী হয়েছেন।'

অধ্যাপক পণ্ডিতের হাসি হেসে বললেন, 'ত্রিশ বৎসর আগে এ কথা বললে আপনাকে আমরা সাবাসী দিতুম, এখন ওসব বদলে গিয়েছে। তখনো আমরা জানতুম না যে, দুনিয়ার বড় বড় জাতেরা নিজেদের 'আর্য' বলে গৌরব অনুভব করছে। তখনো রেওয়াজ ছিল খানদানী হতে হলে বাইবেলের ইহুদি চিড়িয়া-

খানায় কোনো না কোনো খাঁচায় সিংহ বাঁদর কিছু না কিছু একটা হতেই হবে। এখন সে সব দিন গিয়েছে—এখন আমরা সব্বাই 'আর্য'। বেদফেদ কি সব আছে না?—সেগুলো সব আমরাই আউড়েছি। সিকন্দর শাহকে লড়াইয়ে আমরাই হারিয়েছি আর গান্ধার ভাস্কর্য আমাদেরই কাঁচা বয়সের হাত মক্সোর নমুনা। 'গান্ধার' আর 'কান্দাহার' একই শব্দ। আরবী ভাষায় 'গ' অক্ষর নেই বলে আরব ভৌগোলিকেরা 'ক' ব্যবহার করেছেন।'

পাণ্ডিত্যের অগাধ সাগরে তখন আমার প্রাণ যায়-যায়। কিন্তু বিপদ-আপদে মুস্কিল-আসান হামেশাই পুলিস। আহমদ আলী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'প্রফেসরের ওসব কথা গায়ে মাখবেন না। ইসলামিয়া কলেজের চায়ের ঘরে যে আড্ডা জমে তারি খানিকটে পেতলে নিয়ে তিনি সুন্দর ভাষায় রঙীন গেলাসে আপনাকে ঢেলে দিচ্ছেন। কিন্তু আসল পাঠান এসব জিনিস নিয়ে কক্‌খনো মাথা ঘামিয়ে পাগড়ির প্যাঁচ ঢিলে করে না। আফ্রিদী ভাবে, আফ্রিদী হল দুনিয়ার সেরা জাত; মোমন্দ বলে, বাজে কথা, খুদাতালার খাস পেয়ারা কোনো জাত যদি দুনিয়ায় থাকে তবে সে হচ্ছে মোমন্দ জাত। এমন কি তারা নিজেদের আফগান বলেও স্বীকার করে না।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তাই বুঝি আপনারা স্বাধীন আফগানিস্থানের অংশ হতে চান না? ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে স্বাধীন পাঠান হয়ে থাকবেন বলে?'

সব পাঠান একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললেন, 'আলবৎ না; আমরা স্বাধীন ফ্রন্টিয়ার হয়ে থাকব—সে মুল্লুকের নাম হবে পাঠানমুল্লুক।'

অধ্যাপক বললেন, 'পাঠানের সোপবক্স লেকচার শোনেননি বুঝি কখনো। সে বলে, 'ভাই পাঠানসব, এস আমরা সব উড়িয়ে দি; ডিমোক্রেসি, অটোক্রেসি, বুরোক্রেসি, কমুনিজম, ডিক্‌টেটরশিপ—সব সব।' আরেক পাঠান তখন চেঁচিয়ে বলল, 'তুই বুঝি অ্যানার্কিস্ট?' পাঠান বলল, 'না, আমরা অ্যানার্কিও উড়িয়ে দেব।'

অধ্যাপক বললেন, 'বুঝতে পেরেছেন?'

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ, রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, 'একেবারে বুঁদ হয়ে যাবে, ঝিম হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে, তারপর 'না' হয়ে যাবে।' এই তো?'

অধ্যাপক বললেন, 'ঠিক ধরেছেন।'

আমি বললুম, ভারতবর্ষের অংশ যখন হবেন না, তখন দয়া করে রাশানদের আপনারাই ঠেকিয়ে রাখবেন।'

সবাই সমস্বরে বললেন, 'আলবৎ!'

ছয়

পৃথিবীর আর সব দেশে যেতে হলে একখানা পাসপোর্ট যোগাড় করে যে কোনো বন্দরে গিয়ে হাজির হলেই হল। আফগানিস্থান যেতে হলে সেটি হবার যো নেই। পেশাওয়ার পৌঁছে আবার নূতন স্ট্যাম্পের প্রয়োজন। সে-ও আবার তিন দিন পরে নাকচ হয়ে যায়। খাইবারপাসের আশেপাশে কখন যে দাঙ্গাহাঙ্গামা লেগে যায় তার স্থিরতা নেই বলেই এই বন্দোবস্ত। আবার এই তিন দিনের মিয়াদি স্ট্যাম্প সত্ত্বেও হয়ত খাইবারের মুখ থেকে মোটর ফিরিয়ে দিতে পারে—যদি ইতিমধ্যে কোনো বখেড়া লেগে গিয়ে থাকে।

সেই স্ট্যাম্প নিয়ে বাড়ি ফিরছি এমন সময় দেখি হরেক রকম বিদেশী লোকে ভর্তি কতকগুলো বাস্ পশ্চিম দিকে যাচ্ছে। আহমদ আলীকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এগুলো কোথায় যাচ্ছে?'

তিনি ধমক দিয়ে বললেন, 'এগুলো কাবুল যায় না।' তারপর অন্য কথা পাড়বার জন্য বললেন, 'বাঙলা দেশের একটা গল্প বলুন না।'

আমি মনে মনে বললুম, আচ্ছা তবে শোন। বাইরে বললুম, 'গল্প বলা আমার আসে না, তবে একটা জিনিসে পাঠানে বাঙালীতে মিল দেখতে পেয়েছি সেইটে আপনাকে বলছি, শুনুন—

'এখানে যে রকম সব কারবার পাঞ্জাবী আর শিখদের হাতে, কলকাতায়ও কারবার বেশীর ভাগ অ-বাঙালীর হাতে। আর বাঙালী যখন ব্যবসা করে তখন তার কায়দাও আজব।

'আমি তখন ইলিয়ট রোডে থাকতুম, সেখানে দোকানপাট ফিরিঙ্গীদের। মুসলমানদের কিছু কিছু দর্জীর দোকান আর লণ্ড্রি, ব্যস্। তার মাঝখানে এক বাঙালী মুসলমান ঝা চকচকে ফ্যান্সি দোকান খুলল। লোকটির বেশভূষা দেখে মনে হল, শিক্ষিত, ভদ্রলোকের ছেলে। স্থির করলুম, সাহস করে দোকান যখন খুলেছে তখন তাকে পেট্রনাইজ করতে হবে।

'জোর গরম পড়েছে—বেলা দুটো। শহরে চকিবাজীর মত ঘুরতে হয়েছে—দেদার সাবান চোখে পড়েছে কিন্তু কিনিনি—ভদ্রলোকের ছেলেকে পেট্রনাইজ করতে হবে।

'ট্রাম থেকে নেমে দোকানের সামনে এসে দেখি ভদ্রলোক নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছেন, পাখিটা খাঁচায় ঘুমচ্ছে, ঘড়িটা পর্যন্ত সেই যে বারোটায় ঘুমিয়ে

পড়েছিল, এখনো জাগেনি।

'আমি মোলায়েম সুরে বললুম, 'ও মশাই, মশাই।'

'ফের ডাকলুম, 'ও সায়েব, সায়েব।'

'কোনো সাড়াশব্দ নেই। বেজায় গরম, আমারও মেজাজ একটু একটু উষ্ণ হতে আরম্ভ করেছে। এবার চেঁচিয়ে বললুম, ও মশাই, ও সায়েব।'

'ভদ্রলোক আস্তে আস্তে বোয়াল মাছের মত দুই রাঙা টকটকে চোখ সিকিটাক খুলে বললেন, 'আজ্ঞে?' তারপর ফের চোখ বন্ধ করলেন।

'আমি বললুম, 'সাবান আছে? পামওলিভ সাবান?'

'চোখ বন্ধ রেখেই উত্তর দিলেন 'না'।'

'আমি বললুম, 'সে কি কথা, ঐ তো রয়েছে শো-কেসে'।

' 'ও বিক্‌কিরির না'।—'

তারপর আহমদ আলীকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'পাঠানরাও বুঝি এই রকম ব্যবসা করে?' তিনি তো খুব খানিকক্ষণ ধরে হাসলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন বলুন তো?'

আমি উত্তর দিলুম, 'ঐ যে বললেন এসব বাস্ কাবুল যায় না।'

এবার আহমদ আলী থমকে দাঁড়ালেন। দেয়ালের দিকে ঘুরে, কোমরে দু'হাত দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঠাঠা করে হাসলেন। সে তো হাসি নয়—হাসির ধমক। আমি ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি কখন তাঁর হাসি থামবে। উত্তর দিলেন ভালো। বললেন, 'এসব বাস্ খাইবারপাস অবধি গিয়েই ব্যস্।'

আমি শুধালুম, 'এই সামান্য রসিকতায় আপনি এত প্রচুর হাসতে পারেন কি করে?'

'কেন পারব না? হাসি কি আর গল্পে ঠাসা থাকে, হাসি থাকে খুশ-দিলে। আপনাকে বলিনি স্বাধীনতা কোথায় বাসা বেঁধে থাকে? রাইফেলে নয়, বুকের খুনে। একটা গল্প শুনবেন? ঐ দেখছেন, হোথায় চায়ের দোকানী বটতলায় বেঞ্চি পেতে দিয়েছে। চলুন না।'

পাঠান মাত্রই মারাত্মক ডিমোক্র্যাট। নির্জলা টাঙাওয়ালা বিড়িওয়ালার চায়ের দোকান।

আহমদ আলী তাঁর বিশাল বপুখানার ওজন সম্বন্ধে সচেতন বলে খুঁটির উপর ভর দিয়ে বসলেন, আমি আমার তনুখানা, যেখানে খুশী রাখলুম। বললেন—

'ওমর খৈয়ামের এক রাত্রে বড্ড নেশা পেয়েছে কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন পাঁচখানা রুবাইয়াৎ শেষ না করে উঠবেন না। জানেন তো কি রকম ঠাসবুনুনির

কবিতা—শেষ করতে করতে রাত প্রায় কাবার হয়ে এল। মদের দোকানে যখন পৌঁছলেন তখন ভোর হব-হব। হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'নিয়ে এস তো হে, এক পাত্তর উৎকৃষ্ট শিরাজী!' মদওয়ালা কাচুমাচু হয়ে বলল, 'হুজুর এত দেরিতে এসেছেন, রাত কাবারের সঙ্গে সঙ্গে মদও কাবার হয়ে গিয়েছে।' ওমর নরম হয়ে বললেন, 'শিরাজী নেই তো অন্য কোনো মাল দাও না।' মদওয়ালা বলল, 'শরম কী বাৎ। কিচ্ছু নেই হুজুর।' ওমর বললেন, 'পরোয়া নদারদ, ঐ যে সব এঁটো পেয়ালাগুলো গড়াগড়ি যাচ্ছে সেগুলো ধুয়ে তাই দাও দিকিনি—নেশার জিম্মাদারি আমার'।'

হিম্মতের জিম্মাদারি, হাসির জিম্মাদারি, নেশার জিম্মাদারি কিসে, কার, সে সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বেই দেখতে পেলুম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন সেই ভেজাল পাঠান—তাঁর ব্রাত্য-দোষ, তিনি তিন মাস লাহোরে কাটিয়েছিলেন—রমজান খান। আমি আহমদ আলীকে আঙুল দিয়ে দেখালুম। আর যায় কোথায়? 'ও রমজান খান, জানে মন্, বরাদরে মন্, এদিকে এসো।' আমাকে তম্বি করে বললেন, 'আশ্চর্য লোক, আমি না ডাকলে আপনি ওকে যেতে দিতেন? এই গরমে? লোকটা সদিগর্মি হয়ে মারা যেত না? আল্লা রসুলের ডর-ভয় নেই?'

রমজান খান এসে বললেন, 'ভগিনীপতির অসুখ, তার করতে যাচ্ছি।' বলেই ঝুপ করে বেঞ্চিতে বসে পড়লেন। আহমদ আলী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'হবে, হবে, সব হবে। টেলিগ্রাফের তার শক্ত মালে তৈরী—দু'চার ঘণ্টায় ক্ষয়ে যাবে না। সুখবর শোনো। সৈয়দ সাহেব একখানা বহুৎ উম্‌দা গল্প পেশ করেছেন।' বলে তিনি আমার কাঁচাসিদ্ধ গল্পে বিস্তর টমাটো-রস আর উস্টার সস্ ঢেলে রমজান খানকে পরিবেশন করলেন। বারে বারে বলেন, 'ও সাবান বিক্‌কিরির না—এ বাস্ কাবুল যায় না। এ যেন বাঙলা দেশের পুব আকাশে সূর্যোদয় আর পেশাওয়ারের পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে গেল। হুবহু একই রঙ।'

রমজান খান বললেন, 'তা তো বুঝলুম। কিন্তু বাঙালী আর পাঠানে একটা জায়গায় সখ্‌ৎ গরমিল আছে।'

আমি শুধালুম, 'কিসে?'

রমজান খান বললেন, 'আমি সিন্ধুনদ পেরিয়ে আহমদ আলীর পাক নজরে যে মহাপাপ করেছি এটা সেই সিন্ধুপারের কাহিনী। তবে আটকের কাছে নয়, অনেক দক্ষিণে—সেখানে সিন্ধু বেশ চওড়া। তারি বালুচরে বসে দুপুর রোদে আটজন পাঠান ঘামছে। উট ভাড়া দিয়ে তারা ছিয়ানব্বুই টাকা পেয়েছে, কিন্তু

কিছুতেই সমানেসমান ভাগ বাঁটোয়ারা করতে পারছে না। কখনো কারো হিস্যায় কম পড়ে যায়, কখনো কিছু টাকা উপরি থেকে যায়। ক্রমাগত নূতন করে ভাগ হচ্ছে, হিসেব মিলছে না, ঘাম ঝরছে আর মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গলাও চড়ছে। এমন সময় তারা দেখতে পেল, অন্য পার দিয়ে এক বেনে তার পুঁটলি হাতে করে যাচ্ছে। সব পাঠান একসঙ্গে চেঁচিয়ে বেনেকে ডাকল, এপারে এসে তাদের টাকার ফৈশালা করে দিয়ে যেতে। বেনে হাত-পা নেড়ে বোঝালো অত মেহন্নত তার সইবে না, আর কত টাকা ক'জন লোক তাই জানতে চাইল। চার কুড়ি দশ ও তার উপরে ছয় টাকা আর হিস্যেদার আটজন। বেনে বলল, 'বারো টাকা করে নাও।' পাঠানরা চেঁচিয়ে বলল, 'তুই একটু সবুর কর, আমরা দেখে নিচ্ছি। বখরা ঠিক ঠিক মেলে কি না।' মিলে গেল—সবাই অবাক। তখন তাদের সর্দার চোখ পাকিয়ে বলল, 'এতক্ষণ ধরে আমরা চেষ্টা করলুম, হিসেব মিলল না; এখন মিলল কি করে? ব্যাটা নিশ্চয়ই কিছু টাকা সরিয়ে নিয়ে হিসেব মিলিয়ে দিয়েছে। ওপার থেকে সে যখন হিসেব মেলাতে পারে তখন নিশ্চয়ই কিছু টাকা সরাতেও পারে। পাকড়ো শালাকো!'

রমজান খান বললেন, 'বুঝতেই পারছেন, পরোপকার করতে গিয়ে বেনের পো'র অবস্থা। ভাগ্যিস সিন্ধু সেখানে চওড়া এবং বেনেরা আর কিছু পারুক না-পারুক ছুটতে পারে আরবী ঘোড়ার চেয়েও তেজে। সে-যাত্রা বেনে বেঁচে গেল।'

আমি বললুম, 'গল্পটি উপাদেয়, কিন্তু বাঙালীর সঙ্গে মিল-গরমিলের এতে আছে কোন্ চীজ?'

রমজান খান বললেন, 'বাঙালী আপন দেশে ব'সে, এভারেস্টের গায়ে ফিতে না লাগিয়ে, চূড়োয় চড়তে গিয়ে খামখা জান না দিয়ে ইংরেজকে বাৎলে দেয়নি, ঐ দুনিয়ার সবচেয়ে উঁচু পাহাড়?'

আমি বললুম, 'হাঁ, কিন্তু নাম হয়েছে ইংরেজের।'

আহমদ আলী শুধালেন, 'তাই বুঝি বাঙালী চটে গিয়ে ইংরেজকে বোমা মারে?'

আমি অনেকক্ষণ ধরে ঘাড় চুলকে বললুম, 'সেও একটা অতি সূক্ষ্ম কারণ বটে, তবে কিনা শিকদার এভারেস্ট সায়েবকে বোমা মারেননি।'

রমজান খান উষ্মা দেখিয়ে বললেন, 'কিন্তু মারা উচিত ছিল।'

আমি বললুম, 'হুঁ, কিন্তু একটু সামান্য টেকনিকল মুশকিল ছিল। নামকরণ যখন হয় শিকদার তখন কলকাতায় আর মহামান্য স্যার জর্জ লণ্ডনে পেনসন টানছেন। পাল্লাটা—'

পুরো পাঠান এবং নিমপাঠান একসঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠলেন। শুধালেন, 'তার মানে? তবে কি ও লোকটার তদারকিতেও এভারেস্ট মাপা হয়নি?'

আমি বললুম, 'না। কিন্তু আপনারা এত বিচলিত হচ্ছেন কেন? এই আপনাদের ভাইবেরাদরই কতবার কাবুল দখল করেছেন আমার ঠিক স্মরণ নেই, কিন্তু এই কথাটা মনে গাঁথা আছে যে, নাম হয়েছে প্রতিবারেই ইংরেজের। আর আপনারা যখনই হাত গুটিয়ে বসেছিলেন তখনই হয় ইংরেজ কচুকাটা হয়ে মরেছে, নয় আপনাদের বদনাম দিয়ে নিজের অপমান জ্বালার মত মোটা মোটা মেডেল পরে ঢেকেছে। এই গেলবারে যখন দু'খানা আকবরশাহী কামান আর তিনখানা জাহাঙ্গিরী বন্দুক দিয়ে আমান উল্লা ইংরেজকে তুলোধোনা করে ছাড়লেন, তখন ইংরেজ তামাম দুনিয়াকে ঢাক পিটিয়ে শোনায়নি যে, পাঠানের ফেরেব্বাজিতেই তারা লড়াই হারল?'

রমজান খান বললেন, 'বাঙালী এত খবর রাখে কেন?'

আমি বললুম, 'কিছু যদি মনে না করেন, আর গোস্তাকি বেয়াদবি মাফ করেন, তবে সবিনয় নিবেদন, আপনারা যদি একটু বেশী খবর রাখেন তা হলে আমরা নিষ্কৃতি পাই।'

দু'জনেই চুপ করে শুনলেন। তারপর আহমদ আলী বললেন, 'সৈয়দ সাহেব, কিছু মনে করবেন না। আপনারা বোমা মারেন, রাজনৈতিক আন্দোলন চালান, ইংরেজ আপনাদের ভয়ও করে। এসব তো আরম্ভ হয়েছে মাত্র সেদিন। কিন্তু বলুন তো, যেদিন দুনিয়ার কেউ জানত না ফ্রন্টিয়ার বলে এক ফালি পাথরভর্তি শুকনো জমিতে একদল পাহাড়ী থাকে সেদিন ইংরেজ তাদের মেরে শেষ করে দিত না, যদি পারত? ফসল ফলে না, মাটি খুঁড়লে সোনা চাঁদি কয়লা তেল কিছুই বেরোয় না, এক ফোঁটা জলের জন্য ভোর হবার তিন ঘণ্টা আগে মেয়েরা দল বেঁধে বাড়ি থেকে বেরোয়, এই দেশ কামড়ে ধরে পড়ে আছে মূর্খ পাঠান, কত যুগ ধরে, কত শতাব্দী ধরে কে জানে? সিন্ধুর ওপারে যখন বর্ষায় বাতাস পর্যন্ত সবুজ হয়ে যায় তখন তার হাতছানি পাঠান দেখেনি? পুরবৈয়া ভেজা ভেজা হাওয়া অদ্ভুত মিঠে মিঠে গন্ধ নিয়ে আসে, আজ পর্যন্ত কত জাত তার নেশায় পাগল হয়ে পুব দেশে চলে গিয়েছে—যায়নি শুধু মূর্খ আফ্রিদী মোমন্দ।

'লড়াই করে যখন ইংরেজ এদেশকে উচ্ছন্ন করতে পারল না তখন সে প্রলোভন দেখায়নি? লাখ লাখ লোক পল্টনে ঢুকল। ইংরেজের ঝাণ্ডা এদেশে উড়ল বটে, কিন্তু তার রাজত্ব ঐ ঝাণ্ডা যতদূর থেকে দেখা যায় তার চেয়েও কম। আর পল্টনে না ঢুকে পাঠান করতই বা কি? পাঠানমোগল আমলে তাদের

ভাবনা ছিল না। পল্টনের দরওয়াজা খোলা, অথচ মোগলপাঠান এই গরীব দেশের গাঁয়ে গাঁয়ে ঢুকে বুড়ার রুটি কাড়তে চায়নি, বউঝিকে বিদেশী হারাম কাপড় পরাতে চায়নি। শাহানশাহ বাদশাহ দীনদুনিয়ার মালিক দিল্লীর তখৎনশীন সরকার-ই-আলা যখন হিন্দুস্থানের গরম বরদাস্ত না করতে পেরে এদেশ হয়ে ঠাণ্ডা সবুজ মোলায়েম কাবুল শহর যেতেন পাঠান তখন তাঁকে একবার তসলীম দিতে আসত। শাহানশাহ খুশ, পাঠান তর্। বাদশাহের মীর-বখশী পিছনের তাঞ্জাম থেকে মুঠা মুঠা আশরফী রাস্তার দুদিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতেন। 'জিন্দাবাদ শাহানশাহ জহানপনা' চিৎকার খাইবারের দুদিকের পাহাড়ে টক্কর খেয়ে খেয়ে আকাশ বিদীর্ণ করে খুদাতালার পা-দানে গিয়ে যখন পৌঁছত তখন সে প্রশংসাধ্বনি লক্ষ কণ্ঠের নয়, কোটি কোটি কণ্ঠের। সে আশরফী আজ নেই, পর্বতগাত্রে প্রশংসারব প্রতিধ্বনিত হয় না, কিন্তু ঐ পাথরের টুকরোগুলো পাষাণ পাঠান আপন ছাতির খুন দিয়ে এখনো স্বাধীন রেখেছে। তাই তার নাম এখনো 'নো ম্যান্‌স্ ল্যাণ্ড'। পাঠান আর কি করতে পারত, বলুন।'

আমি অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে বার বার আপত্তি জানিয়ে বললুম, 'আমি সে অর্থে কথাটা বলিনি। আমি ভদ্রসন্তানদের কথা ভাবছিলুম এবং তাঁরাও কিছু কম করেননি। তাঁরা অসন্তোষ প্রকাশ না করলে পাঠান সেপাই হয়তো আমান-উল্লার বিরুদ্ধে লড়ত।'

আহমদ আলী বললেন, 'ভদ্রসন্তানদের কথা বাদ দিন। এই অপদার্থ শ্রেণী যত শীঘ্র মরে ভূত হয়ে অজরঈলের দফতরে গিয়ে হাজিরা দেয় ততই মঙ্গল।'

রমজান খান আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'ভদ্রসন্তানদের লড়ার কায়দা আর পাঠান সিপাহির লড়ার কায়দা তো আর এক ধরনের হয় না। সময় যেদিন আসবে তখন দেখতে পাবেন আমাদের 'অপদার্থ' আহমদ আলী কোন্ দলে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।'

আমি আহমদ আলীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালুম। আহমদ আলী বললেন, 'আমি সব কথা ভালো করে শুনতে পাইনে। একটু কালা—খুদাতালাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

সাত

আরবী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে 'ইয়োম্ উস্ সফ্‌র, নিস্‌ফ্ উস্ সফ্‌র্'—অর্থাৎ কিনা 'যাত্রার দিনই অর্ধেক ভ্রমণ।' পূর্ব বাঙলায়ও একই প্রবাদ প্রচলিত

আছে। সেখানে বলা হয়, 'উঠোন সমুদ্র পেরলেই আধেক মুশকিল আসান।' আহমদ আলীর উঠোন পেরতে গিয়ে আমার পাকা সাতদিন কেটে গেল। আট-দিনের দিন সকালবেলা আহমদ আলী স্বয়ং আমাকে একখানা বাসে ড্রাইভারের পাশে বসিয়ে তাকে আমার জান-মাল বাঁচাবার জন্য বিস্তর দিব্যদিলাশা দিয়ে বিদায় নিলেন। হাওড়া স্টেশনে মনে হয়েছিল 'আমি একা', এখন মনে হল 'আমি ভয়ঙ্কর একা'। 'ভয়ঙ্কর একা' এই অর্থে যে 'নো ম্যান্‌স্‌ ল্যাণ্ড'ই বলুন আর খাস আফগানিস্থানই বলুন এসব জায়গায় মানুষ আপন আপন প্রাণ নিয়েই ব্যস্ত। শুনেছি, কাবুলের বাইরেও নাকি পুলিস আছে, কিন্তু আফগান আইনে খুন পর্যন্ত এখনো ঠিক 'কগনিজেবল অফেন্‌স' নয়। রাহাজানির সময় যদি আপনি পাঠানী কায়দায় চটপট উবুড় হয়ে শুয়ে না পড়েন তাহলে সে ভুল অথবা গোঁয়ার্তুমির খেসারতি দেবেন আপনি। রাস্তাঘাটে কি করে চলতে হয় তার তালিম দেওয়া তো আর আফগান সরকারের জিম্মায় নয়। 'কীপ টু দি লেফ্‌ট' তো আর ইংরেজ সরকার আপনাকে ইস্কুলে নিয়ে গিয়ে শেখায় না। এবং সর্বশেষ বক্তব্য, আপনি যদি প্রাণটা নিতান্তই দিয়ে দেন তবে আপনার আত্মীয়স্বজন তো রয়েছেন—তাঁরা খুনের বদলাই নিলেই তো পারেন। একটা বুলেটের জন্য তো আর তালুকমুলুক বেচতে হয় না, পারমিটও লাগে না।

সাধারণ লোকের বিবেকবুদ্ধি এসব দেশে এরকম কথাই কয়। তবু আফগানি-স্থান স্বাধীন সভ্য দেশ ; আর পাঁচটা দেশ যখন খুন-খারাবির প্রতি এত বেমালুম উদাসীন নয় তখন তাঁদেরও তো কিছু একটা করবার আছে এই ভেবে দু'চারটে পুলিস দু'-একদিন অকুস্থলে ঘোরাঘুরি করে যায়। যদি দেখে আপনার আত্মীয়-স্বজন 'কা তব কান্তা' দর্শনে বুঁদ হয়ে আছেন অথবা শোনে যে খুনী কিম্বা তার সুচতুর আত্মীয়স্বজন আপনার আত্মীয়স্বজনকে চাকচিক্যময় বিশেষ বিরল ধাতু দ্বারা নাক কান চোখ মুখ বন্ধ করে দিয়েছে, আপনার জীবনের এই তিনদিনের মুসাফিরীতে কে দু' ঘণ্টা আগে গেল, কে দু' ঘণ্টা পরে গেল, কে বিছানায় আল্লা রসুলের নাম শুনে শুনে গেল, কে রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে খাবি খেয়ে খেয়ে পাড়ি দিল এসব তাবৎ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না, তবে বিবেচনা করুন, মহাশয়, পুলিস কেন মিছে আপনাদের তথা খুনী এবং তস্য আত্মীয়-স্বজনদের মামেলায় আরো ঝামেলা বাড়িয়ে সবাইকে থামকা, বেফায়দা তঙ্গ করবে? নির্বিকল্প বৈরাগ্য তো আর আপনাদের একচেটিয়া কারবার নয়, পুলিসও এই সার্বজনীন সার্বভৌমিক দর্শনে অংশীদার। তবে হাঁ, আলবৎ, এই নশ্বর সংসারে মাঝে মাঝে রুটি-গোস্তেরও প্রয়োজন হয়, সরকার যা দেন

তাতে সব সময় কুলিয়ে ওঠে না, খুনীর আত্মীয়স্বজনকে যখন মেহেরবান খুদাতালা ধনদৌলত দিয়েছেন তখন—? তখন আফগান পুলিসকে আর দোষ দিয়ে কি হবে!

কিন্তু একটা বিষয়ে আফগান সরকার সচেতন—রাহাজানির যেন বাড়াবাড়ি না হয়। বুখারা সমরকন্দ শিরাজ তেহেরানে যদি খবর রটে যায় যে, আফগানিস্থানের রাজবর্ত্ম অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল তাহলে ব্যবসাবাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে ও আফগান সরকারের শুল্ক-হংস স্বর্ণডিম্ব প্রসব করা বন্ধ করে দেবে।

ডানদিকে ড্রাইভার শিখ সর্দারজী। বয়স ষাটের কাছাকাছি। কাঁচাপাকা দীর্ঘ দাড়ি ও পরে জানতে পারলুম রাতকানা। বাঁ দিকে আফগান সরকারের এক কর্মচারী। পেশাওয়ার গিয়েছিলেন কাবুল বেতারকেন্দ্রের মালসরঞ্জাম ছাড়িয়ে আনবার জন্য। সব ভাষাই জানেন অথচ বলতে গেলে এক ফরাসী ছাড়া অন্য কোনো ভাষাই জানেন না। অর্থাৎ আপনি যদি তাঁর ইংরিজী না বোঝেন তবে তিনি ভাবখানা করেন যেন আপনিই যথেষ্ট ইংরিজী জানেন না, তখন তিনি ফরাসীর যে ছয়টি শব্দ জানেন সেগুলো ছাড়েন। তখনো যদি আপনি তাঁর বক্তব্য না বোঝেন তবে তিনি উর্দু ঝাড়েন। শেষটায় এমন ভাব দেখান যে অশিক্ষিত বর্বরদের সঙ্গে কথা বলবার ঝকমারি আর তিনি কত পোহাবেন? অথচ পরে দেখলুম ভদ্রলোক অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, বিপন্নের সহায়। তারো পরে বুঝতে পারলুম ভাষা বাবতে ভদ্রলোকের এ দুর্বলতা কেন যখন শুনতে পেলুম যে তিনি অনেক ভাষায় পাণ্ডিত্যের দাবি করে বেতারে চাকরি পেয়েছেন। আমার সঙ্গে দু'দিন একাসনে কাটাবেন—আমি যদি কাবুলে গিয়ে রটাই যে, তিনি গণ্ডূষজলের সফরী তাহলে বিপদআপদের সম্ভাবনা। কিন্তু তাঁর এ ভয় সম্পূর্ণ অমূলক ছিল—তাঁর অজানতে বড়কর্তাদের সবাই জানতেন, ভাষার খাতে তাঁর জ্ঞানের জমা কতটুকু। তবু যে তিনি চাকরিতে বহাল ছিলেন তার সরল কারণ, অন্য সবাই ভাষা জানতেন তাঁর চেয়েও কম। এ তত্ত্বটি কিন্তু তিনি নিজে বুঝতে পারেননি। সরল প্রকৃতির লোক, নিজের অজ্ঞতা ঢাকতে এতই ব্যস্ত যে পরের অজ্ঞতা তাঁর চোখে পড়ত না। গুণীরা বলেন, 'চোখের সামনে ধরা আপন বদ্ধমুষ্টি দূরের হিমালয়কে ঢেকে ফেলে।'

বাসের পেটে একপাল কাবুলী ব্যবসায়ী। পেশাওয়ার থেকে সিগারেট, গ্রামোফোন, রেকর্ড, পেলেট-বাসন, ঝাড়-লণ্ঠন, ফুটবল, বিজলি-বাতির সাজসরঞ্জাম, কেতাব-পুঁথি, এক কথায় দুনিয়ার সব জিনিস কিনে নিয়ে যাচ্ছে। আফগান শিল্প প্রস্তুত করে মাত্র তিন বস্তু—বন্দুক, গোলাগুলি আর শীতের

কাপড়। বাদবাকি প্রায় সব কিছুই আমদানি করতে হয় হিন্দুস্থান থেকে, কিছুটা রুশ থেকে। এসব তথ্য জানবার জন্য আফগান সরকারের বাণিজ্য-প্রতিবেদন পড়তে হয় না, কাবুল শহরে একটা চক্কর মারলেই হয়।

সে সব পরের কথা।

আগের দিন পেশাওয়ারে ১১৪ ডিগ্রী গরম পড়েছিল—ছায়াতে। এখন বাস্ যাচ্ছে যেখান দিয়ে সেখান থেকে দূরবীন দিয়ে তাকালেও একটি পাতা পর্যন্ত চোখে পড়ে না। থাকার মধ্যে আছে এখানে ওখানে পাথরের গায়ে হলদে ঘাসের পোঁচ।

হস্টেলে স্টোভ ধরাতে গিয়ে এক আনাড়ী ছোকরা একবার জ্বলন্ত স্পিরিটে আরো স্পিরিট ঢালতে গিয়েছিল। ধপ করে বোতলে স্টোভে সর্বত্র আগুন লেগে ছোকরার ভুরু, চোখের লোম, মোলায়েম গোঁপ পুড়ে গিয়ে কুঁকড়ে-মুকড়ে এক অপরূপ রূপ ধারণ করেছিল। এখানে যেন ঠিক তাই। মা ধরণী কখন যেন হঠাৎ তাঁর মুখখানা সূর্যদেবের অত্যন্ত কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন—সেখানে আগুনের এক থাবড়ায় তাঁর চুল ভুরু সব পুড়ে গিয়ে মাটির চামড়া আর ঘাসের চুলের সেই অবস্থা হয়েছে।

এরকম ঝলসে-যাওয়া দেশ আর কখনো দেখিনি। মরুভূমির কথা আলাদা। সেখানে যা কিছু পোড়বার মত সে সব আমাদের জন্মের বহুপূর্বে পুড়ে গিয়ে ছাই হয়ে উড়ে চলে গিয়েছে মরুভূমি ছেড়ে—সার হয়ে নূতন ঘাসপাতা জন্মাবার চেষ্টা আর করেনি। সূর্যদেব সেখানে একচ্ছত্রাধিপতি। এখানে নগ্ন বীভৎস দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব বলা ভুল—এখানে নির্মম কঠোর অত্যাচার। ধরণী এদেশকে শস্য-শ্যামল করার চেষ্টা এখনো সম্পূর্ণ ছাড়তে পারেননি—প্রতি ক্ষীণ চেষ্টা বারে বারে নির্দয় প্রহারে ব্যর্থ হচ্ছে। পূর্ববঙ্গের বিদ্রোহী প্রজার কথা মনে পড়ল। বার বার তারা চরের উপর খড়ের ঘর বাঁধে, বার বার জমিদারের লেঠেল সব কিছু পুড়িয়ে দিয়ে ছারখার করে চলে যায়।

পেশাওয়ার থেকে জমরুদ দুর্গ সাড়ে দশ মাইল সমতল ভূমি। সেখানে একদফা পাসপোর্ট দেখাতে হল। তারপর খাইবার গিরিসঙ্কট।

তার বর্ণনা আমি দিতে পারব না, করজোড়ে স্বীকার করে নিচ্ছি। কারণ আমি যে অবস্থায় ঐ সঙ্কট অতিক্রম করেছি সে অবস্থায় পড়লে স্বয়ং পিয়ের লোতি কি করতেন জানিনে। লোতির কথা বিশেষ করে বললুম কারণ তাঁর মত অজানা অচিন দেশের আবহাওয়া শুদ্ধমাত্র শব্দের জোরে গড়ে তোলার মত অসাধারণ ক্ষমতা অন্য কোনো লেখকের রচনায় চোখে পড়ে না। স্বয়ং কবিগুরু

বাঙালীর অচেনা জিনিস বর্ণনা করতে ভালোবাসতেন না। পাহাড় বাঙলা দেশে নেই—তাঁর আড়াই হাজার গানের কোথাও পাহাড়ের বর্ণনা শুনেছি বলে মনে পড়ে না। সমুদ্র বাঙলা দেশের কোল ঘেঁষে আছে বটে কিন্তু সাধারণ বাঙালী সমুদ্র দেখে জগন্নাথের রথ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে কলা বেচার মত করে—পুরীতে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও তাই 'পুরীর সমুদ্র দর্শনে', অথচ তিনি যে লোতির চেয়ে খুব কম সমুদ্র দেখেছিলেন তাও তো নয়। তবু এ সব হল বাঙালীর কিছু কিছু দেখা—সম্পূর্ণ অচেনা জিনিস নয়। কিন্তু শীতের দেশের সবচেয়ে অপূর্ব দর্শনীয় জিনিস বরফপাত, রবীন্দ্রনাথ নিদেনপক্ষে সে সৌন্দর্য পাঁচশ' বার দেখেছেন, একবারও বর্ণনা করেননি।

তবু যদি কেউ বার দশেক সেই গরম সহ্য করে খাইবারপাসের ভিতর দিয়ে আনাগোনা করে তাহলে আলাদা কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, সংসারের সুখদুঃখ অনুভব করা যেন উটের কাঁটাগাছ খাওয়ার মত। ক্ষুধানিবৃত্তির আনন্দ সে তাতে পায় বটে কিন্তু ওদিকে কাঁটার খোঁচায় ঠোঁট দিয়ে দরদর করে রক্তও পড়ে। তাই অনুমান করা বিচিত্র নয় খাইবারের গরম কাঁটা সয়ে গেলে তার থেকে কাব্যতৃষ্ণা নিবৃত্তি করার মত রসও কিঞ্চিৎ বেরতে পারে।

আমি যে বাসে গিয়েছিলুম তাতে কোনোপ্রকারের রস থাকার কথা নয়। সিকন্দরশাহী, বাবুরশাহী রাস্তা দিয়ে তাকে যেতে হবে বলে তার উপযুক্ত মিলিটারী বন্দোবস্ত করেই সে বেরিয়েছে। তার আপাদমস্তক পুরু করোগেটেড টিন দিয়ে ঢাকা এবং নশ্বর ভঙ্গুর কাঁচ সে তার উইণ্ড-স্ক্রীন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। একটা হেড-লাইট কানা, কাঁচের অবগুণ্ঠন নেই। তখনই বুঝতে পারলুম বাইবেলের Song of the Song-এ বর্ণিত এক চোখের মহিমা—

"Thou hast ravished my heart, my spouse, thou hast ravished my heart with one of thine eyes."

যে সমস্যার সমাধান বহুদিন বহু কন্‌কর্ড বহু টীকাটিপ্পনী ঘেঁটেও করতে পারেনি, আজ এক মুহূর্তে সদ্‌গুরুর কৃপায় আর খাইবারী বাসের নিমিত্তে তার সমাধান হয়ে গেল।

দুদিকে হাজার ফুট উঁচু পাথরের নেড়া পাহাড়। মাঝখানে খাইবারপাস। এক জোড়া রাস্তা এঁকেবেঁকে একে অন্যের গা ঘেঁষে চলেছে কাবুলের দিকে। এক রাস্তা মোটরের জন্য, অন্য রাস্তা উট খচ্চর গাধা ঘোড়ার পণ্যবাহিনী বা ক্যারাভানের জন্য। সঙ্কীর্ণতম স্থলে দুই রাস্তায় মিলে ত্রিশ হাতও হবে না। সে রাস্তা আবার মাতালের মত টলতে টলতে এতই এঁকেবেঁকে গিয়েছে যে,

যে-কোনো জায়গায় দাঁড়ালে চোখে পড়ে ডাইনে বাঁয়ে পাহাড়, সামনে পিছনে পাহাড়।

দ্বিপ্রহর সূর্য সেই নরককুণ্ডে সোজা নেমে এসেছে—তাই নিয়ে চতুর্দিকের পাহাড় যেন লোফালুফি খেলছে। এই গিরিসঙ্কটে আফগানের লক্ষ কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়ে কোটিকণ্ঠে পরিবর্তিত হত—এই গিরিসঙ্কটে এক মার্তণ্ড ক্ষণে ক্ষণে লক্ষ মার্তণ্ডে পরিণত হন। তাঁদের কোটি কোটি অগ্নিজিহ্বা আমাদের সর্বাঙ্গ লেহন করে পরিতুষ্ট হন না, চক্ষুর চর্ম পর্যন্ত অগ্নিশলাকা দিয়ে বিদ্ধ করে দিয়ে যাচ্ছেন। চেয়ে দেখি সর্দারজীর চোখ সন্ধ্যাসব স্পর্শ না করেই সন্ধ্যাকাশের মত লাল হয়ে উঠেছে। কাবুলী রুমাল দিয়ে ফেটা মেরে চোখ বন্ধ করেছে। নগ্নচোখে ক'জন লোক ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে পারে?

এই গরমেই কি কান্দাহারের বধূ গান্ধারী অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন? কান্দাহার থেকে দিল্লী যেতে হলে তো খাইবারপাস ছাড়া গত্যন্তর নেই। কে জানে, ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দেবার জন্য, অন্ধ বধূর দুর্দৈব দহন প্রশমিত করার জন্য মহাভারতকার গান্ধারীর অন্ধত্ব বরণের উপাখ্যান নির্মাণ করেননি?

অবাক হয়ে দেখছি সেই গরমে বুখারার পুস্তিন (ফার) ব্যবসায়ীরা দুই ইঞ্চি পুরু লোমওয়ালা চামড়ার ওভারকোট গায়ে দিয়ে খচ্চর খেদিয়ে খেদিয়ে ভারতবর্ষের দিকে চলেছে। সর্দারজীকে রহস্য সমাধানের অনুরোধ জানালে তিনি বললেন, 'যাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে তাদের পক্ষে সত্যই এরকম পুরু জামা এই গরমে আরামদায়ক। বাইরের গরম ঢুকতে পারে না, শরীর ঠাণ্ডা রাখে। ঘাম তো আর এদেশে হয় না, আর হলেই বা কি? এরা তার থোড়াই পরোয়া করে।' এটুকু বলতে বলতেই দেখলুম গরমের হল্কা মুখে ঢুকে সর্দারজীর গলা শুকিয়ে দিল। গল্প জমাবার চেষ্টা বৃথা।

কত দেশের কত রকমের লোক পণ্যবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। কত ঢঙের টুপি, কত রঙের পাগড়ি, কত যুগের অস্ত্র—গাদাবন্দুক থেকে আরম্ভ করে আধুনিকতম জর্মন মাউজার। দমস্কের বিখ্যাত সুদর্শন তরবারি, সুপারি কাটার জাঁতির মত 'জামধর' মোগল ছবিতে দেখেছিলুম, বাস্তবে দেখলুম হুবহু সেই রকম—গোলাপী সিল্কের কোমরবন্ধে গোঁজা। কারো হাতে কানজোথা পেতলে বাঁধানো লাঠি, কারো হাতে লম্বা ঝকঝকে বর্শা। উটের পিঠে পশমে রেশমে বোনা কত রঙের কার্পেট, কত আকারের সামোভার। বস্তা বস্তা পেস্তা বাদাম আখরোট কিসমিস আলুবুখারা চলেছে হিন্দুস্থানের বিরয়ানি-পোলাওয়ের জৌলুস বাড়াবার জন্য। আরো চলেছে, শুনতে পেলুম, কোমরবন্ধের নিচে, ইজেরের

ভাঁজে, পুস্তিনের লাইনিঙের ভিতরে আফিঙ আর হশীশ, না ককেনই, না আরো কিছু।

সবাই চলেছে অতি ধীরে অতি মন্থরে। মনে পড়ল মানস সরোবর-ফের্তা আমার এক বন্ধু বলেছিলেন যে, কঠোর শীতে উঁচু পাহাড়ে যখন মানুষ কাতর হয়ে পড়ে তখন তার পক্ষে প্রশস্ততম পন্থা অতি ধীর পদক্ষেপে চলা, তড়িৎগতিতে সে যন্ত্রণা এড়াতে চেষ্টা করার অর্থ সজ্ঞানে যমদূতের হস্তে এগিয়ে গিয়ে প্রাণ সমর্পণ করা। এও দেখি সেই অভিজ্ঞতার উষ্ণ সমর্থন। সেখানে প্রচণ্ড শীত, এখানে দুর্দান্ত গরম। পাঠান দু'বার বলেছিলেন, আমি তৃতীয়বার সেই প্রবাদ শপথরূপে গ্রহণ করলুম। 'হস্তদন্ত হওয়ার মানে শয়তানের পন্থায় চলা।'

রবীন্দ্রনাথও ঐ রকম কি একটা কথা বলেছেন না, দুঃখ না পেলে দুঃখ ঘুচবে কি করে? তবে কি এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন যে, তাড়াতাড়ি করে দুঃখ এড়াবার চেষ্টা করা বৃথা? মেয়াদ পূর্ণ হতে যে সময় লাগবার কথা তা লাগবেই।

খ্রীষ্টও তো বলেছেন—

'Verily I say unto thee, thou shalt by no means come out thence [prison] till thou hast paid the uttermost farthing.'

কে বলে বিংশ শতাব্দীতে অলৌকিক ঘটনা ঘটে না? আমার সকল সমস্যা সমাধান করেই যেন ধড়াম করে শব্দ হল। কাবুলী তড়িৎগতিতে চোখের ফেটা খুলে আমার দিকে বিবর্ণ মুখে তাকাল, আমি সর্দারজীর দিকে তাকালুম। তিনি দেখি অতি শান্তভাবে গাড়িখানা এক পাশে নিয়ে দাঁড় করালেন। বললেন, 'টায়ার ফেঁসেছে। প্রতিবারেই হয়। এই গরমে না হওয়াই বিচিত্র।'

হৃদয়ঙ্গম করলুম, সৃষ্টি যখন তার রুদ্রতম রূপ ধারণ করেন তখন তাড়াতাড়ি করতে নেই। কিন্তু এই গ্রীষ্মে রুদ্র তাঁর প্রসন্ন-কল্যাণ দক্ষিণ মুখ দেখালেই ভক্তের হৃদয় আকৃষ্ট হত বেশী।

প্রয়োজন ছিল না, তবু সর্দারজী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, খাইবার-পাসের রাস্তা দুটো সরকারের বটে, কিন্তু দুদিকের জমি পাঠানের। সেখানে নেমেছ কি মরেছ। আড়ালে আবডালে পাঠান সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসে আছে। নামলেই কড়াক-পিঙ্। তারপর কি কায়দায় সব কিছু হরণ করে তার বর্ণনা দেবার আর প্রয়োজন নেই। শিকারী হরিণ নিয়ে কি করে না-করে সকলেরই জানা কথা—চামড়াটুকুও বাদ দেয় না। এ স্থলে শুনলুম, শুধু যে

হাসিটুকু গুলি খাওয়ার পূর্বে মুখে লেগেছিল সেইটুকু হাওয়ায় ভাসতে থাকে—বাদবাকি উবে যায়।

পাঠান যাতে ঠিক রাস্তার বুকের উপর রাহাজানি না করে তার জন্য খাইবার-পাসের দুদিকে যেখানে বসতি আছে সেখানকার পাঠানদের ইংরেজ দু'টাকা করে বছরে খাজনা দেয়। পরে আরেকটি শর্ত অতি কষ্টে আদায় করেছে। আফ্রিদী আফ্রিদীতে ঝগড়া বাধলে রাস্তার এপারে ওপারে যেন বন্দুক না মারা হয়।

মোটর মেরামত করতে কতক্ষণ লেগেছিল মনে নেই। শুনেছি ভয়ঙ্কর জ্বর হলে রোগীর সময়ের আন্দাজ একেবারে চলে যায়। পরের দিনে যখন সর্দারজীকে জিজ্ঞাসা করলুম চাকা বদলাতে দু'ঘণ্টা লাগল কি করে, তখন সর্দারজী বলেছিলেন, সময় নাকি লেগেছিল মাত্র আধ ঘণ্টা।

মোটর আবার চলল। কাবুলীর গলা ভেঙে গিয়েছে। তবু বিড়বিড় করে যা বলছিলেন, তার নির্যাস—

'কিচ্ছু ভয় নেই সায়েব—কালই কাবুল পৌঁছে যাচ্ছি। সেখানে পৌঁছে কব্ করে কাবুল নদীতে ডুব দেব। বরফগলা হিমজল পাহাড় থেকে নেমে এসেছে, দিল জান কলিজা সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। নেয়ে উঠে বরফে ঘষে ঘষে আঙুর খাব তামাম জুলাই আগস্ট। সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি নয়ানজুলিতে জল জমতে আরম্ভ করবে। অক্টোবরে শীতের হাওয়ায় ঝরা-পাতা কাবুল শহরে হাজারো রঙের গালিচা পেতে দেবে। নবেম্বরে পুস্তিনের জোব্বা বের করব। ডিসেম্বরে বরফ পড়তে শুরু করবে। সেই বরফের ভিতর দিয়ে বেড়াতে বেরব। উঃ! সে কী শীত, সে কী আরাম!'

আমি বললুম, 'আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।'

হঠাৎ দেখি সামনে এ কি! মরীচিকা? সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে গেট কেন? মোটর থামল। পাসপোর্ট দেখাতে হল। গেট খুলে গেল। আফগানিস্থানে ঢুকলুম। বড় বড় হরফে সাইনবোর্ডে লেখা—

It is absolutely forbidden to cross this border into Afghan territory.

কাবুলী বললেন, 'দুনিয়ার সব পরীক্ষা পাস করার চেয়ে বড় পরীক্ষা খাইবার-

পাস পাস করা। অল্‌হম্‌দুলিল্লা (খুদাকে ধন্যবাদ)।'

আমি বললুম, 'আমেন।'

আট

খাইবারপাস তো দুঃখে-সুখে পেরলুম এবং মনে মনে আশা করলুম এইবার গরম কমবে। কমল বটে, কিন্তু পাসের ভিতর পিচ-ঢালা রাস্তা ছিল—তা সে সঙ্কীর্ণই হোক আর বিস্তীর্ণই হোক। এখন আর রাস্তা বলে কোনো বালাই নেই। হাজারো বৎসরের লোক-চলাচলের ফলে পাথর এবং অতি সামান্য মাটির উপর যে দাগ পড়েছে তারই উপর দিয়ে মোটর চলল। এ দাগের উপর দিয়ে পণ্যবাহিনীর যেতে আসতে কোনো অসুবিধা হয় না কিন্তু মোটর-আরোহীর পক্ষে যে কতদূর পীড়াদায়ক হতে পারে তার খানিকটা তুলনা হয় বীরভূম-বাঁকুড়ায় ডাঙ্গা ও খোয়াইয়ে রাত্রিকালে গোরুর গাড়ি চড়ার সঙ্গে—যদি সে গাড়ি কুড়ি মাইল বেগে চলে, ভিতরে খড়ের পুরু তোষক না থাকে, এবং ছোটবড় নুড়ি দিয়ে ডাঙ্গা-খোয়াই ছেয়ে ফেলা হয়।

আহমদ আলী যাত্রাকলে আমার মাথায় একটা দশগজী বিরাট পাগড়ি বেঁধে দিয়েছিলেন। খাইবারপাসের মাঝখানে সে পাগড়ি আমাকে সর্দিগর্মি থেকে বাঁচিয়েছিল; এখন সেই পাগড়ি আমার মাথা এবং গাড়ির ছাতের মাঝখানে বাফার-স্টেট হয়ে উভয় পক্ষকে গুরুতর লড়াই-জখম থেকে বাঁচল।

সর্দারজীকে জিজ্ঞাসা করলুম, পাগড়ি আর কোনো কাজে লাগে কি না। তিনি বললেন, 'আরো বহু কাজে লাগে কিন্তু উপস্থিত একটার কথা মনে পড়ছে। বিশেষ অবস্থাতে শুধু কলসীতেই চলে; দড়ি কেনার দরকার হয় না।'

বুঝলুম, রাস্তার অবস্থা, গ্রীষ্মের আতিশয্য আর দ্বিপ্রহরের অনাহার এ-পথের ফুল-টাইম গাহক সর্দারজীকে পর্যন্ত কাবু করে ফেলেছে—তা না হলে এ রকম বীভৎস প্রয়োজনের কথা তাঁর মনে পড়বে কেন?

দুঃখ হল। ষাট বৎসর বয়স হতে চলল, কোথায় না সর্দারজী দেশের গাঁয়ে তেঁতুলের ছায়ায় নাতি-নাতনীর হাতে হাওয়া খেতে খেতে পল্টনের গল্প বলবেন আর কোথায় আজ এই একটানা আগুনের ভিতর পেশাওয়ার কাবুলে মাকু মারা। কেন এমন অবস্থা কে জানে, কিন্তু দেশ, কাল এবং বিশেষ করে পাত্রের অবস্থা বিবেচনা করে আড্ডা জমাবার রৌদ্রাতুর ক্ষীণাঙ্কুর উপড়ে ফেলতে বেশী টানাহেঁচড়া করতে হল না।

কী দেশ! দুদিকে মাইলের পর মাইল জুড়ে নুড়ি আর নুড়ি। যেখানে নুড়ি আর নেই সেখান থেকে চোখে পড়ে বহুদূরে আবছায়া আবছায়া পাহাড়। দূর থেকে বলা শক্ত, কিন্তু অনুমান করলুম লক্ষ বৎসরের রৌদ্রবর্ষণে তাতেও সজীব কোনো কিছু না থাকারই কথা। রেডিয়েটারে জল ঢালার জন্য মোটর একবার দাঁড়িয়েছিল; তখন লক্ষ্য করলুম এক কণা ঘাসও দুই পাথরের ফাঁকে কোথাও জন্মায়নি। পোকামাকড়, কোনো প্রকারের প্রাণের চিহ্ন কোথাও নেই—খাবে কি, বাঁচবে কি দিয়ে? মা ধরণীর বুকের দুধ এদেশে যেন সম্পূর্ণ শুকিয়ে গিয়েছে; কোনো ফাটল দিয়ে কোনো বাঁধন ছিঁড়ে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত বেরোয়নি। দিকদিগন্তব্যাপী বিশাল শ্মশানভূমির মাঝখান দিয়ে প্রেতযোনি বর্মধারিণী ফোর্ড গাড়ি চলেছে ছায়াময় সন্তানসন্ততি নিয়ে। ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়, চক্রবালপরিপূর্ণ মহানির্জনতার অদৃশ্য প্রহরীরা হঠাৎ কখন যন্ত্রস্তনিত ধূম্রপুচ্ছ এই স্বতশ্চলশকট শূন্যে তুলে নিয়ে বিরাট নৈস্তব্ধ্যের যোগভূমি পুনরায় নিরঙ্কুশ করে দেবে।

তারপর দেখি মৃত্যুর বিভীষিকা। প্রকৃতি এই মরুপ্রান্তরে প্রাণ সৃষ্টি করেন না বটে কিন্তু প্রাণ গ্রহণে তিনি বিমুখ নন। রাস্তার ঠিক উপরেই পড়ে আছে উটের এক বিরাট কঙ্কাল। গৃধিনী শকুনি অনাহারে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুভয়ে এখানে আসে না বলে কঙ্কাল এখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়েনি। রৌদ্রের প্রকোপে ধীরে ধীরে মাংস শুকিয়ে গিয়ে ধুলো হয়ে ঝরে পড়েছে। মসৃণ শুভ্র সম্পূর্ণ কঙ্কাল যেন যাদুঘরে সাজানো বৈজ্ঞানিকের কৌতূহল সামগ্রী হয়ে পড়ে আছে।

লাণ্ডিকোটাল থেকে দক্কা দশ মাইল।

সেই মরুপ্রান্তরে দক্কাদুর্গ অত্যন্ত অবান্তর বলে মনে হল। মাটি আর খড় মিশিয়ে পিটে পিটে উঁচু দেয়াল গড়ে তোলা হয়েছে আশপাশের রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে—ফ্যাকাশে, ময়লা, ঘিনঘিনে হলদে রঙ। দেয়ালের উপরের দিকে এক সারি গর্ত; দুর্গের লোক তারি ভিতর দিয়ে বন্দুকের নল গলিয়ে নিরাপদে বাইরের শত্রুকে গুলী করতে পারে। দূর থেকে সেই কালো কালো গর্ত দেখে মনে হয় যেন অন্ধের উপড়ে-নেওয়া চোখের শূন্য কোটর।

কিন্তু দুর্গের সামনে এসে বাঁ দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। ছলছল করে কাবুল নদী বাঁক নিয়ে এক পাশ দিয়ে চলে গিয়েছেন—ডান দিকে এক ফালি সবুজ আঁচল লুটিয়ে পড়েছে। পলিমাটি জমে গিয়ে যেটুকু মেঠো রসের সৃষ্টি হয়েছে তারি উপরে ভুখা দেশ ফসল ফলিয়েছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম; মনে হল ভিজে সবুজ নেকড়া দিয়ে কাবুল নদী আমার চোখের জ্বালা ঘুচিয়ে দিলেন। মনে হল ঐ সবুজটুকুর কল্যাণে সে-যাত্রা আমার চোখ দুটি বেঁচে

গেল। না হলে দক্কা দুর্গপ্রাকারের অন্ধ কোটর নিয়ে আমাকেও দিশেহারা হয়ে ঐ দেয়ালেরই মত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হত।

কাবুলী বললেন, 'চলুন, দুর্গের ভিতরে যাই। পাসপোর্ট দেখাতে হবে। আমরা সরকারী কর্মচারী। তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবে। তা হলে সন্ধ্যার আগেই জলালাবাদ পৌঁছতে পারব।'

দুর্গের অফিসার আমাকে বিদেশী দেখে প্রচুর খাতির-যত্ন করলেন। দক্কার মত জায়গায় বরফের কল থাকার কথা নয়, কিন্তু যে শরবৎ খেলুম তার জন্য ঠাণ্ডা জল কুঁজোতে কি করে তৈরী করা সম্ভব হল বুঝতে পারলুম না।

অফিসারটি সত্যি অত্যন্ত ভদ্রলোক। আমার কাতর অবস্থা দেখে বললেন, 'আজ রাতটা এখানেই জিরিয়ে যান। কাল অন্য মোটরে আপনাকে সোজা কাবুল পাঠিয়ে দেব।' আমি অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বললুম যে, আর পাঁচজনের যা গতি আমারও তাই হবে।

অফিসারটি শিক্ষিত লোক। একলা পড়েছেন, কথা কইবার লোক নেই। আমাকে পেয়ে নির্জনে জমানো তাঁর চিন্তাধারা যেন উপচে পড়ল। হাফিজ-সাদীর অনেক বয়েৎ আওড়ালেন এবং মরুপ্রান্তরে একা একা আপন মনে সেগুলো থেকে নিংড়ে নিংড়ে যে রস বের করেছেন তার খানিকটা আমায় পরিবেষণ করলেন। আমি আমার ভাঙা ভাঙা ফারসীতে জিজ্ঞাসা করলুম, সঙ্গীহীন জীবন কি কঠিন বোধ হয় না? বললেন, 'আমার চাকরি পল্টনের, ইস্তফা দেবার উপায় নেই। কাজেই বাইরের কাবুল নদীটি নিয়ে পড়ে আছি। রোজ সন্ধ্যায় তার পাড়ে গিয়ে বসি আর ভাবি যেন একমাত্র নিতান্ত আমার জন্য সে এই দুর্গের দেয়ালে আঁচল বুলিয়ে চলে গিয়েছে। অন্যায় কথাও নয়। আর দু'চারজন যারা নদীর পারে যায়, তাদের মতলব ঠাণ্ডা হওয়ার। আমিও ঠাণ্ডা হই, কিন্তু শীতকালেও কামাই দিইনে। গোড়ার দিকে আমিও স্বার্থপর ছিলুম, কাবুল নদী আমার কাছে সৌন্দর্য উপভোগের বস্তু ছিল। তার গান শুনতুম, তার নাচ দেখতুম, তার লুটিয়ে-পড়া সবুজ আঁচলের এক প্রান্তে আসন পেতে বসতুম। এখন আমাদের অন্য সম্পর্ক। আচ্ছা বলুন তো, অমাবস্যার অন্ধকারে যখন কিছুই দেখা যায় না, তখন আপনি কখনো নদীর পারে কান পেতে শুয়েছেন?'

আমি বললুম, 'নৌকোতে শুয়ে অনেক রাত কাটিয়েছি।'

তিনি উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'তা হলে আপনি বুঝতে পারবেন। মনে হয় না কুলকুল শুনে, যেন আর দু'দিন কাটলেই আরেকটু, আর সামান্য একটু অভ্যাস হয়ে গেলেই হঠাৎ কখন এই রহস্যময়ী ভাষার অর্থ সরল হয়ে যাবে? আপনি

ভাবছেন আমি কবিত্ব করছি। আদপেই না। আমার মনে হয় মেঘের ডাক যেমন জনপ্রাণীকে বিদ্যুতের ভয় জানিয়ে দেয়, জলের ভাষাও তেমনি কোনো এক আশার বাণী জানাতে চায়। দূর সিন্ধুপার থেকে সে বাণী উজিয়ে উজিয়ে এসেছে, না কাবুল পাহাড়ের শিখর থেকে বরফের বুকের ভিতর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এখানে এসে গান গেয়ে জেগে উঠেছে, জানিনে।

'এখন বড্ড গরম। শীতকালে যখন আপনার ছুটি হবে তখন এখানে আসবেন। এই নদীর অনেক গোপন খবর আপনাকে বাৎলে দেব। আহারাদি? কিচ্ছু ভাবনা নেই। মুরগী, দুম্বা যা চাই। শাকসব্জী? সে গুড়ে পাথর।'

অফিসার যখন কথা বলছিলেন; তখন আমার এক একবার সন্দেহ হচ্ছিল, একা থেকে থেকে বোধ হয় ভদ্রলোকের মাথা, কেমন জানি, একটুখানি—। কিন্তু কাবুল নদীর সবুজ আঁচল ছেড়ে তিনি যখন অক্লেশে দুম্বার পিঠে সোওয়ার হলেন, তখনই বুঝলুম ভদ্রলোক সুস্থই আছেন। বললেন, 'আমার কাজ পাসপোর্ট সই করা আর কি মাল আসছে-যাচ্ছে তার উপর নজর রাখা। কিছু কঠিন কর্ম নয়, বুঝতেই পারছেন। ওদিকে নূতন বাদশা উঠে পড়ে লেগেছেন আফগানিস্থানকে সজীব সবল করে তোলবার জন্য। অনেক লোক তার চারদিকে জড়ো হয়েছেন। শুনতে পাই কাবুলে নাকি সর্বত্র নূতন প্রাণের সবুজ ঘাস জেগে উঠেছে। কিন্তু এদিকে ইংরেজ দুম্বা, ওদিকে রুশী বকরী। সুযোগ পেলেই কাঁচা ঘাস সাফ করে দিয়ে কাবুলের নেড়া পাহাড়কে ফের নেড়া করে দেবে। ভাগ্যিস, চতুর্দিকে খোদায় দেওয়া পাথরের বেড়া রয়েছে, তাই রক্ষে। আর রক্ষে এই, দুম্বা আর বকরীতে কোনোদিন মনের মিল হয় না। দুম্বা যদি ঘাসের দিকে নজর দেয় তো বকরী শিঙ উঁচিয়ে লাফ দিয়ে আমুদরিয়া পার হতে চায়। বকরী যদি তেড়িমেড়ি করে, তবে দুম্বা ম্যা ম্যা করে আর সবাইকে জানিয়ে দেয় যে, বকরীর নজর শুধু কাবুলের চাট্টিখানি ঘাসের উপর নয়—তার আসল নজর হিন্দুস্থান, চীন, ইরান সবকটা বড় বড় ধানক্ষেতের উপর।

আমি শুধালুম, 'দুম্বাটা শুধু শুধু ম্যা ম্যা করবে কেন? তারো তো একজোড়া খাসা শিঙ আছে।'

'ছিল। হিন্দুস্থান ভাবে, এখনো আছে, কিন্তু এদেশের পাথরে খামকা গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে ভোঁতা করে ফেলেছে। তাই বোধ হয় সেটা ঢাকবার জন্য সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়েছে—গোরা সেপাইয়ের খানাপিনার জমক-জৌলুস দেখেছেন তো? হিন্দুস্থান সেই সোনালী শিঙের ঝলমলানি দেখে আরো বেশি ভয় পায়। ওদিকে মিশরে সা'দ জগলুল পাশা, তুর্কীতে মুস্তফা কামাল পাশা,

হিজ্‌জাজে ইবনে সউদ, আফগানিস্থানে আমান উল্লা খান দুম্বার পিঠে কয়েকটা আচ্ছা ভাণ্ডা বুলিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কোনো জানোয়ারই সহজে ঘায়েল হয় না। জানোয়ার তো?'

আমি আঁৎকে উঠলুম। কী ভয়ঙ্কর সিডিশন! নাঃ, তা তো নয়। মনেই ছিল না যে স্বাধীন আফগানিস্থানে বসে কথা কইছি।

অফিসার বলে যেতে লাগলেন, 'তাই আজ হিন্দুস্থান আফগানিস্থানে মিলে মিশে যে কাজ করতে যাচ্ছে সে বড় খুশীর কথা। কিন্তু আপনাকে বহুত তকলিফ বরদাস্ত করতে হবে। কাবুল শক্ত জায়গা। শহরের চারিদিকে পাথর, মানুষের দিলের ভিতর আরো শক্ত পাথর। শাহানশা বাদশা সেই পাথরের ফাটলে ঘাস গজাচ্ছেন, আপনাকে পানি ঢালতে ডেকেছেন।'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'লজ্জা দেবেন না। আমার কাজ অতি নগণ্য।'

অফিসার বললেন, 'তার হিসেবনিকেশ আর-একদিন হবে। আজ আমি খুশী যে এতদিন শুধু পেশাওয়ার পাঞ্জাবের লোক আফগানিস্থানে আসত, এখন দূর বাঙলা মুল্লুকেও আফগানিস্থানের ডাক পৌঁচেছে।'

দেখি সর্দারজী দূর থেকে ইশারায় জানাচ্ছেন, সব তৈরী—আমি এলেই মোটর ছাড়ে।

অফিসার সর্দারজীকে দেখে বললেন, 'অমর সিং বুলানীর গাড়িতে যাচ্ছেন বুঝি? ওর মত হুঁশিয়ার আর কলকব্জায় ওস্তাদ ড্রাইভার এ রাস্তায় আর কেউ নেই। এমন গাড়িও নেই যার গায়ে অমর সিংয়ের দুটো ঠোক্কর, দুটো চারটে কদরের চাঁটি পড়েনি। কোনো বেয়াড়া গাড়ি যদি বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করে তবে শেষ দাওয়াই তার ঘোমটা খুলে কানের কাছে বলা, 'ওঝা অমর সিংকে খবর দেওয়া হয়েছে।' আর দেখতে হবে না। সেলফ্‌-স্টার্টার না, হ্যাণ্ডিল না, হঠাৎ গাড়ি পাঁই পাঁই করে ছুটতে থাকে। ড্রাইভার কোনো গতিকে যদি পিছন দিকে ঝুলে পড়তে পারে তবেই রক্ষা।

'কিন্তু হামেশাই দেখবেন লাইনের সবচেয়ে লজ্‌ঝড় গাড়ি চালাচ্ছে অমর সিং। একটা মজা দেখবেন?' বলে তিনি অমর সিংকে ডেকে বললেন, 'সর্দারজী, আমি একখানা নয়া গাড়ি কিনেছি। সিধা আমেরিকা থেকে আসছে। তুমি চালাবে? তন্‌থা এখন যা পাচ্ছ তাই পাবে।'

অফিসারের নজরে পড়াতে সর্দারজী তো হাসিমুখে এসে সালাম করে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু কথা শুনে মুখ গম্ভীর হল। পাগড়ির ন্যাজটা দুহাতে নিয়ে সর্দারজী ভাঁজ করেন আর ভাঁজ খোলেন—নজর ঐদিকে ফেরানো। তারপর

বললেন, 'হুজুরের গাড়ি চালানো বড়ী ইজ্জৎকী বাৎ কিন্তু আমার পুরোনো চুক্তির মিয়াদ এখনো ফুরোয়নি।'

অফিসার বললেন, 'তাই নাকি? বড় আফসোসের কথা। তা সে চুক্তি শেষ হলে আমায় খবর দিয়ো। আচ্ছা তুমি এখন যাও, আমি ক্ষুদে আগাকে (অর্থাৎ আমাকে) পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'দেখলেন তো? নতুন গাড়ি সে চালাতে চায় না। চুক্তি-ফুক্তি সব বাজে কথা। আমার ড্রাইভারের দরকার শুনলে এ লাইনের কোন্ মোটরের গোঁসাই চুক্তির ফপরদালালি করতে পারে বলুন তো! তা নয়। অমর সিং নূতন গাড়ি চালিয়ে সুখ পায় না। পদে পদে যদি টায়ার না ফাটল, এঞ্জিন না বিগড়ল, ছাতখানা উড়ে না গেল, তবে সে মোটর চালিয়ে কি কেরামতি? সে গাড়ি তো বোরকা-পরা মেয়েই চালাতে পারে।

'আমার কি মনে হয় জানেন? বুড়ী মরে গিয়েছে। মোটরের বনেট খুলতে পেলে সে এখন বউয়ের ঘোমটা খোলার আনন্দ পায়। নূতন গাড়িতে তার অজুহাত কোথায়?'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'বউয়ের ঘোমটা খোলার জন্য আবার অজুহাতের প্রয়োজন হয় নাকি?'

অফিসার বললেন, 'হয়, হয়। রাজাধিরাজের বেলাও হয়। শুনুন, কাবুল-বদখশান আধা হিন্দুস্থানের মালিক হুমায়ুন বাদশা জুবেদীকে কি বলেছেন—

তবু যদি সাধি তোমা' ভিখারীর মত
দেখা মোরে দিতে করুণায়;
বল তুমি, 'রহি অবগুণ্ঠনের মাঝে
এ-রূপ দেখাতে নারি হায়!'
তৃষা আর তৃপ্তি মাঝে র'বে ব্যবধান
অর্থহীন এ অবগুণ্ঠন?
আমার আনন্দ হতে সৌন্দর্য তোমার
দূরে রাখে কোন্ আবরণ।
একি গো সমরলীলা তোমায় আমায়?
ক্ষমা দাও, মাগি পরিহার;
মরমের মর্ম যাহা তাই তুমি মোর
জীবনের জীবন আমার!

—সত্যেন দত্তের অনুবাদ

নয়

আফগানিস্থানের অফিসার যদি কবি হতে পারেন, তবে তাঁর পক্ষে পীর হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তিন-তিনবার চাকা ফাটল, আর এঞ্জিন সর্দারজীর উপর গোসা করে দুবার গুম হলেন। চাকা সারাল হ্যাণ্ডিম্যান —তদারক করলেন সর্দারজী। প্রচুর মেহদি-প্রলেপের সলুশন লাগিয়ে বিবি-জানের কদম মবারক মেরামত করা হল, কিন্তু তাঁর মুখ ফোটাবার জন্য স্বয়ং সর্দারজীকে ওড়না তুলে অনেক কাকুতিমিনতি করতে হল। একবার চটে গিয়ে তিনি হ্যাণ্ডিল মারার ভয়ও দেখিয়েছিলেন—শেষটায় কোন্ শর্তে রফারফি হল, তার খবর আমরা পাইনি বটে, কিন্তু হরেকরকম আওয়াজ থেকে আমেজ পেলুম, বিবিজান অনিচ্ছায় শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন।

জলালাবাদ পৌঁছবার কয়েক মাইল আগে তাঁর কোমরবন্ধ অথবা নীবিবন্ধ, কিম্বা বেল্ট—যাই বলুন, ছিঁড়ে দু'টুকরো হল। তখন খবর পেলুম সর্দারজীও রাতকানা। রেডিয়োর কর্মচারী আমার কানটাকে মাইক্রোফোন ভেবে ফিস ফিস করে প্রচার করে দিলেন, 'অদ্যকার মত আমাদের অনুষ্ঠান এইখানেই সমাপ্ত হল। কাল সকালে সাতটায় আমরা আবার উপস্থিত হব।'

আধ মাইলটাক দূরে আফগান সরাই। বেতারের সায়েব ও আমি আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে চললুম। বাদবাকি আর সকলে হৈ-হল্লা করে করে গাড়ি ঠেলে নিয়ে চলল। বুঝলুম, এদেশেও বাস চড়ার পূর্বে সাদা কালিতে কাবিন-নামায় লিখে দিতে হয়, 'বিবিজানের খুশীগমীতে তাঁহাকে স্বহস্তে স্বস্কন্ধে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে গররাজি হইব না।'

সর্দারজী তম্বী করে বললেন, 'একটু পা চালিয়ে। সন্ধ্যা হয়ে গেলে সরাইয়ের দরজা বন্ধ করে দেবে।'

সরাই তো নয়, ভীষণ দুশমনের মত দাঁড়িয়ে এক চৌকো দুর্গ। 'কর্মঅন্তে নিভৃত পান্থশালাতে' বলতে আমাদের চোখে যে স্নিগ্ধতার ছবি ফুটে ওঠে এর সঙ্গে তার কোনো সংস্রব নেই। ত্রিশ ফুট উঁচু হলদে মাটির নিরেট চারখানা দেয়াল, সামনের খানাতে এক বিরাট দরজা—তার ভিতর দিয়ে উট, বাস্, ডবল-ডেকার পর্যন্ত অনায়াসে ঢুকতে পারে, কিন্তু ভিতরে যাবার সময় মনে হয়, এই শেষ ঢোকা, এ দানবের পেট থেকে আর বেরতে হবে না।

ঢুকেই থমকে দাঁড়ালুম। কত শত শতাব্দীর পুঞ্জীভূত দুর্গন্ধ আমাকে ধাক্কা

মেরেছিল বলতে পারিনে, কিন্তু মনে হল আমি যেন সে ধাক্কায় তিন গজ পিছিয়ে গেলুম। ব্যাপারটা কি বুঝতে অবশ্য বেশী সময় লাগল না! এলাকাটা মৌসুমী হাওয়ার বাইরে, তাই এখানে কখনো বৃষ্টি হয় না—যথেষ্ট উঁচু নয় বলে বরফও পড়ে না। আশেপাশে নদী বা ঝরনা নেই বলে ধোয়ামোছার জন্য জলের বাজে খরচার কথাও ওঠে না। অতএব সিকন্দরশাহী বাজীরাজ থেকে আরম্ভ করে পরশুদিনের আস্ত ভেড়ার পাল যে সব 'অবদান' রেখে গিয়েছে, তার স্থূলভাগ মাঝে মাঝে সাফ করা হয়েছে বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম গন্ধ সর্বত্র এমনি স্তরীভূত হয়ে আছে যে, ভয় হয় ধাক্কা দিয়ে না সরালে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব; ইচ্ছে করলে চামচ দিয়ে কুরে কুরে তোলা যায়। চতুর্দিকে উঁচু দেয়াল, মাত্র একদিকে একখানা দরজা। বাইরের হাওয়া তারি সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়, অন্যদিকে বেরবার পথ নেই দেখে ঐ জালিয়ানওয়ালাবাগে আর ঢোকে না। সূচীভেদ্য অন্ধকার দেখেছি, এই প্রথম সূচীভেদ্য দুর্গন্ধ শুঁকলুম।

দুর্গপ্রাকারকে পিছনের দেয়ালস্বরূপ ব্যবহার করে চার সারি কুঠরি নয়—খোপ। শুধু দরজার জায়গাটা ফাঁকা। খোপগুলোর তিন দিক বন্ধ—সামনের চত্বরের দিক খোলা। বেতারওয়ালা সরাইয়ের মালিকের সঙ্গে দর-কষাকষি করে আমাদের জন্য একটা খোপ ভাড়া নিলেন—আমার জন্য একখানা দড়ির চারপাইও যোগাড় করা হল। খোপের সামনের দিকে একটু বারান্দা, চারপাই সেখানে পাতা হল। খোপের ভিতর একবার এক লহমার তরে ঢুকেছিলুম—মানুষের কত কুবুদ্ধিই না হয়। ধর্ম সাক্ষী, স্মেলিং সল্টে যার ভিরমি কাটে না, তাকে আধ মিনিট সেখানে রাখলে আর দেখতে হবে না।

কেরোসিন কুপির ক্ষীণ আলোকে যাত্রীরা আপন আপন জানোয়ারের তদারক করছে। উট যদি তাড়া খেয়ে পিছু হটতে আরম্ভ করল, তবে খচ্চরের পাল চিৎকার করে রুটিওয়ালার বারান্দায় ওঠে আর কি। মোটর যদি হেড-লাইট জ্বালিয়ে রাত্রিবাসের স্থান অনুসন্ধান করে, তবে বাদবাকি জানোয়ার ভয় পেয়ে সব দিকে ছুটোছুটি আরম্ভ করে। মালিকেরা তখন আবার চিৎকার করে আপন আপন জানোয়ার খুঁজতে বেরোয়। বিচুলি নিয়ে টানাটানি, রুটির দোকানে দর-কষাকষি, মোটর মেরামতের হাতুড়ি পেটা, মোরগ-জবাইয়ের ঘড়ঘড়ানি, আর পাশের খোপের বারান্দায় খান সায়েবের নাক-ডাকানি। তার নাসিকা আর আমার নাকের মাঝখানে তফাত ছয় ইঞ্চি। শিথান বদল করার উপায় নেই—পা তাহলে পশ্চিম দিকে পড়ে ও মুখ উটের নেজের চামর ব্যজন পায়। আর উট যদি পিছু হটতে আরম্ভ করে, তবে কি হয় না-হয় বলা কিছু

কঠিন নয়। গোমূত্রের মত পবিত্র জিনিসেও প্রপাতস্নানের ব্যবস্থা নেই।

তবে একথা ঠিক, দুর্গন্ধ ও নোংরামি সহ্য করে কেউ যদি সরাইয়ে জ্ঞান অন্বেষণ অথবা আড্ডার সন্ধানে একটা চক্কর লাগায়, তবে তাকে নিরাশ হতে হবে না। আহমদ আলীর ফিরিস্তিমাফিক সব জাত সব ভাষা তো আছেই, তার উপরে গুটিকয়েক সাধুসজ্জন, দু'-একজন হজ-যাত্রী—পায়ে চলে মক্কা পৌঁছবার জন্য তাঁরা ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়েছেন। এঁদের চোখেমুখে কোনো ক্লান্তির চিহ্ন নেই; কারণ এঁরা চলেন অতি মন্দগতিতে এবং নোংরামি থেকে গা বাঁচাবার কায়দাটা এঁরা ফ্রন্টিয়ারেই রপ্ত করে নিয়েছেন। সম্বল-সামর্থ্য এঁদের কিছুই নেই—উপরে আল্লার মরজি ও নিচে মানুষের দাক্ষিণ্য এই দুই-ই তাঁদের নির্ভর।

অনৈসর্গিক পাপের আভাস-ইঙ্গিতও আছে—কিন্তু সেগুলো হির্শফেল্ট্ সায়েবের জিম্মাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

সেই সাত-সকালে পেশাওয়ারে আণ্ডা-রুটি খেয়ে বেরিয়েছিলুম, তারপর পেটে আর কিছু পড়েনি। দক্কার শরবৎ পেট পর্যন্ত পৌঁছয়নি, শুকনো তালু-গলাই তাকে শুষে নিয়েছিল। কিন্তু চতুর্দিকের নোংরামিতে এমনি গা ঘিন ঘিন করছিল যে, কোনো কিছু গিলবার প্রবৃত্তি ছিল না। নিজের আধিক্যেতায় নিজের উপর বিরক্তিও ধরেছিল—'আরে বাপু, আর পাঁচজন যখন দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে খাচ্ছে-দাচ্ছে-ঘুমোচ্ছে, তখন তুমিই বা এমন কোন্ নবাব খাঞ্জা খাঁর নাতি যে, তোমার স্নান না হলে চলে না, মাত্র দু'হাজার বছরের জমানো গন্ধে তুমি ভিরমি যাও। তবু তো জানোয়ারগুলো চত্বরে, তুমি বারান্দায় শুয়ে। মা জননী মেরী সরাইয়েও জায়গা পাননি বলে শেষটায় গাধা-খচ্চরের মাঝখানে প্রভু যীশুর জন্ম দেননি? ছবিতে অবশ্য সায়েবসুবোরা যতদূর সম্ভব সাফসুতরো করে সব কিছু এঁকেছেন, কিন্তু শাকে ঢাকা পড়ে ক'টা মাছ?

'বেৎলেহেমের সরাইয়ে আর আফগানিস্থানের সরাইয়ে কি তফাত? বেৎলেহেমেও বৃষ্টি হয় তিন ফোঁটা আর বরফ পড়ে আড়াই তোলা। কে বললে তোমায় ইহুদি আফগানের চেয়ে পরিষ্কার? আফগানিস্থানের গন্ধে তোমার গা বিড়োচ্ছে, কিন্তু ইহুদির গায়ের গন্ধে বোকা পাঁঠা পর্যন্ত লাফ দিয়ে দরমা ফুটো করে প্রাণ বাঁচায়।'

এ সব হল তত্ত্বজ্ঞানের কথা। কিন্তু মানুষের মনের ভিতর যে রকম গীতাপাঠ হয়, সে রকম বেয়াড়া দুর্যোধনও সেখানে ব'সে। তার শুধু এক উত্তর, 'জানামি ধর্মং, ন চ মে প্রবৃত্তি', অর্থাৎ 'তত্ত্বকথা আর নূতন শোনাচ্ছ কি, কিন্তু ওসবে

আমার প্রবৃত্তি নেই।' তার উপর আমার বেয়াড়া মনের হাতে আরেকখানা খাসা উত্তরও ছিল। 'সর্দারজী ও বনেটবাসিনীতে যদি সাঁঝের ঝোঁকে চলাচলি আরম্ভ না হ'ত তবে অনেক আগেই জলালাবাদের সরকারী ডাকবাঙলোয় পৌঁছে সেখানে তোমাতে-আমাতে স্নানাহার করে এতক্ষণে নরগিস ফুলের বিছানায়, চিনার গাছের দোদুল হাওয়ায় মনের হরিষে নিদ্রা যেতুম না?'

বেয়াড়া মন কিছু কিছু তত্ত্বজ্ঞানেরও সন্ধান রাখে—না হলে বিবেকবুদ্ধির সঙ্গে এক ঘরে সারাজীবন কাটায় কি করে? ফিস ফিস করে তর্কও জুড়ে দিয়ে বলল, 'মা মেরী ও যীশুর যে গল্প বললে সে হ'ল বাইবেলি কেচ্ছা। মুসলমান শাস্ত্রে আছে, বিবি মরিয়ম (মেরী) খেজুরগাছের তলায় ইসা-মসীহকে প্রসব করেছিলেন।'

বিবেকবুদ্ধি—'সে কি কথা! ডিসেম্বরের শীতে মা মেরী গেলেন গাছতলায়?'

বেয়াড়া মন—'কেন বাপু, তোমার বাইবেলেই তো রয়েছে, প্রভু জন্মগ্রহণ করলে পর দেবদূতেরা সেই সুসমাচার মাঠের মাঝখানে গিয়ে রাখাল ছেলেদের জানালেন। গয়লার ছেলে যদি শীতের রাত মাঠে কাটাতে পারে, তবে ছুতোরের বউই পারবে না কেন, শুনি? তার উপর গর্ভযন্ত্রণা—সর্বাঙ্গে তখন গল গল করে ঘাম ছোটে!'

ধর্ম নিয়ে তর্কাতর্কি আমি আদপেই পছন্দ করিনে। দু'জনকে দুই ধমক দিয়ে চোখ বন্ধ করলুম।

চত্বরের ঠিক মাঝখানে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত উঁচু একটা প্রহরী শিখর। সেখান থেকে হঠাৎ এক হুঙ্কারধ্বনি নির্গত হয়ে আমার তন্দ্রাভঙ্গ করল। শিখরের চূড়ো থেকে সরাইওয়ালা চেঁচিয়ে বলছিল, 'সরাই যদি রাত্রিকালে দস্যুদ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে হে যাত্রীদল, আপন আপন মাল-জান বাঁচাবার জিম্মাদারি তোমাদের নিজের।'

ঐটুকুই বাকি ছিল। সরাইয়ের সব কষ্ট চাঁদপানা মুখ করে সয়ে নিয়েছিলুম ঐ জানটুকু বাঁচাবার আশায়। সরাইওয়ালা সেই জিম্মাদারিটুকুও আমার হাতে ছেড়ে দেওয়ায় যখন আর কোনো ভরসা কোনো দিকে রইল না, তখন আমার মনে এক অদ্ভুত শান্তি আর সাহস দেখা দিল। উর্দুতে বলে, 'নঙ্গেসে খুদাভী ডরতে হ্যায়' অর্থাৎ 'উলঙ্গকে ভগবান পর্যন্ত সমঝে চলেন।' সোজা বাঙলায় প্রবাদটা সামান্য অন্যরূপ নিয়ে অল্প একটু গীতিরসে ভেজা হয়ে বেরিয়েছে, 'সমুদ্রে শয়ন যার শিশিরে কি ভয় তার?'

ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আমার মনে তখন আরও একটা খটকা লাগল। রেডিয়ো-ওয়ালার চোস্ত ফার্সী জানার কথা। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ঐ যে সরাইওয়ালা বলল, ' 'মাল-জানের' তদারকি আপন কাঁধে এ কথাটা আমার কানে কেমনতরো নূতন ঠেকলো। সমাসটা কি 'জান-মাল' নয়?'

অন্ধকারে রেডিয়োওয়ালার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। তাই তাঁর কথা অনেকটা বেতারবার্তার মত কানে এসে পৌঁছল। বললেন, 'ইরানদেশের ফার্সীতে বলে 'জান-মাল', কিন্তু আফগানিস্থানে জান সস্তা, মালের দাম ঢের বেশী। তাই বলে 'মাল-জান'।'

আমি বললুম, 'তাই বোধ করি হবে। ভারতবর্ষেও প্রাণ বেজায় সস্তা—তাই আমরাও বলি, 'ধনে-প্রাণে' মেরো না। 'প্রাণে-ধনে' মেরো না কথাটা কখনো শুনিনি।'

আমাতে বেতারওয়ালাতে তখন একটা ছোটখাটো 'ব্রেন্‌স্‌-ট্রাস্ট্‌' বানিয়ে বসেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফ্রন্টিয়ারের ওপারে তো শুনেছি জীবন পদে পদে বিশেষ বিপন্ন হয় না। তবে আপনার মুখে এরকম কথা কেন?'

আমি বললুম, 'বুলেট ছাড়া অন্য নানা কায়দায়ও তো মানুষ মরতে পারে। জ্বর আছে, কলেরা আছে, সান্নিপাতিক আছে, আর না খেয়ে মরার রাজকীয় পন্থা তো বারো মাসই খোলা রয়েছে। সে পথ ধরলে দু-দণ্ড জিরোবার তরে সরাই-ই বলুন আর হাসপাতালই বলুন, কোনো কিছুরই বালাই নেই।'

বেতারবাণী হ'ল, 'না খেয়ে মরতে পারাটা তামাম প্রাচ্যভূমির অনবদ্য প্রতিষ্ঠান। একে অজরামর করে রাখার নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার নামান্তর 'হোয়াইট মেনস বার্ডেন'। কিন্তু আফগানরা প্রাচ্যভূমির ছোটজাত বলে নিজের মোট নিজেই বইবার চেষ্টা করে। সাধারণত এই মোট নিয়ে প্রথম কাড়াকাড়ি লাগায় 'ধর্মপ্রাণ' মিশনরীরা, তাই আফগানিস্থানে তাদের ঢোকা কড়া বারণ। কোনো অবস্থাতেই কোনো মিশনরীকে পাসপোর্ট দেওয়া হয় না। মিশনরীর পরে আসে ইংরেজ। তাদেরও আমরা পারতপক্ষে ঢুকতে দিই না—ব্রিটিশ রাজদূতাবাসের জন্য যে ক'জন ইংরেজের নিতান্ত প্রয়োজন তাদেরি আমরা বড় অনিচ্ছায় বরদাস্ত করেছি।'

এই দুটি খবর আমার কর্ণকুহরে মথি ও মার্ক লিখিত দুই সুসমাচারের ন্যায় মধুসিঞ্চন করল। গুলিস্তান, বোস্তানের খুশবাই হয়ে সকল দুর্গন্ধ মেরে ফেলে আমার চোখে গোলাপী ঘুমের মোলায়েম তন্দ্রা এনে দিল।

'জিন্দাবাদ আফগানিস্থান!'—না হয় থাকলই বা লক্ষ লক্ষ ছারপোকা সে

দেশের চারপাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে জিন্দা হয়ে।

দশ

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল আজান শুনে। নমাজ পড়ালেন বুখারার এক পুস্তিন সদাগর। উৎকৃষ্ট আরবী উচ্চারণ শুনে বিস্ময় মানলুম যে তুর্কীস্থানে এত ভালো উচ্চারণ টিকে রইল কি করে। বেতারওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, 'আপনি নিজেই জিজ্ঞেস করুন না।' আমি বললুম, 'কিছু যদি মনে করেন?' আমার এই সঙ্কোচে তিনি এত আশ্চর্য হলেন যে বুঝতে পারলুম, খাস প্রাচ্য দেশে অচেনা অজানা লোককে যে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বাধা নেই। পরে জানলুম, যার সম্বন্ধে কৌতূহল দেখানো হয় সে তাতে বরঞ্চ খুশীই হয়।

মোটরে বসে তারি খেই তুলে নিয়ে আগের রাতের অভিজ্ঞতার জমাখরচা নিতে লাগলুম।

গ্রেট ইস্টার্ন পান্থশালা, আফগান সরাইও পান্থশালা। সরাইয়ের আরাম-ব্যারাম তো দেখা হল—গ্রেট ইস্টার্ন, গ্র্যাণ্ডেরও খবর কিছু কিছু জানা আছে।

মার্ক্‌স্‌ না পড়েও চোখে পড়ে যে সরাই গরীব, হোটেল ধনী। কিন্তু প্রশ্ন তাই দিয়ে কি সব পার্থক্যের অর্থ করা যায়? সরাইয়েও জন আষ্টেক এমন সদাগর ছিলেন যাঁরা অনায়াসে গ্রেট ইস্টার্নের সুইট নিতে পারেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপচারি হয়েছে। গ্রেট ইস্টার্নের বড়সায়েবদেরও কিছু কিছু চিনি।

কিন্তু আচারব্যবহারে কী ভয়ঙ্কর তফাত। এই আটজন ধনী সদাগর ইচ্ছে করলেই একত্র হয়ে উত্তম খানাপিনা করে জুয়োয় দু'শ' চারশ' টাকা এদিক ওদিকে ছড়িয়ে দিয়ে রাত কাটাতে পারতেন। চাকরবাকর সন্ত্রস্ত হয়ে হুজুরদের হুকুম তামিল করত—সরাইয়ের ভিখিরি ফকিরদের তো ঠেকিয়ে রাখতই, সাধু-সজ্জনদের সঙ্গেও এঁদের কোনো যোগাযোগ হত না।

পৃথক হয়ে আপন আপন দ্বিরদরদস্তম্ভে এঁরা তো বসে থাকলেনই না—আটজনে মিলে 'খানদানী' গোঠও এঁরা পাকালেন না। নিজ নিজ পণ্যবাহিনীর ধনী গরীব আর পাঁচজনের সঙ্গে এঁদের দহরম-মহরম আগের থেকে তো ছিলই, তার উপরে সরাইয়ে আসন পেতে জিরিয়েজুরিয়ে নেওয়ার পর তাঁরা আরো পাঁচজনের তত্ত্বতাবাশ করতে আরম্ভ করলেন। তার ফলে হরেক রকমের আড্ডা জমে উঠল; ধনী গরীবের পার্থক্য জামা কাপড়ে টিকে থাকল বটে কিন্তু কথাবার্তায় সে সব তফাত রইল না। দু-চারটে মোসাহেব 'ইয়েস্‌মেন' ছিল

সন্দেহ নেই, তা সে গরীব আড্ডা-সর্দারেরও থাকে। ব্যবসাবাণিজ্য, তত্ত্বকথা, দেশ-বিদেশের রাস্তাঘাট-গিরিসঙ্কট, ইংরেজ-রুশের মন-কষাকষি, পাগলা উট কামড়ালে তার দাওয়াই, সর্দারজীর মাথার ছিট, সব জিনিস নিয়েই আলোচনা হল। গরীব ধনী সকলেরই সকল রকম সমস্যা আড্ডার দয়ে মজে কখনো ডুবল কখনো ভাসল; কিন্তু বাকচতুর গরীবও ধনীর পোলাও-কালিয়ার আশায় বেশরম বাঁদরনাচ নাচল না।

ঝগড়া-কাজিয়াও আড্ডার চোখের সামনের চাতালে হচ্ছে। কথাবার্তার খোঁচাখুঁচিতে যতক্ষণ উভয়পক্ষ সন্তুষ্ট ততক্ষণ আড্ডা সে সব দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না, কিন্তু মারামারির পূর্বাভাস দেখা দিলেই কেউ-না-কেউ মধ্যস্থ হয়ে বখেড়া ফৈসালা করে দেয়। মনে পড়ল বায়স্কোপের ছবি: সেখানে দুই সায়েবে ঝগড়া লাগে, আর পাঁচজন হটে গিয়ে জায়গা করে দিয়ে গোল হয়ে দাঁড়ায়। দুই সায়েব তখন কোট খুলে ছুঁড়ে ফেলেন, আর সক্কলের দয়ার শরীর, কোটটাকে ধুলোয় গড়াতে দেন না, লুফে নেন। তারপর শুরু হয় ঘুষোঘুষি রক্তারক্তি। পাঁচজন বিনা টিকিটে তামাসা দেখে আর সমস্ত বর্বরতাটাকে 'অন্য লোকের নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার' নাম দিয়ে ক্ষীণ বিবেকদংশনে প্রলেপ লাগায়।

সরাইয়ে কারো কোনো নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার নেই। তাই পার্সোনাল ইডিয়সিংক্রেসি বা খেয়ালখুশীর ছিট নিয়ে কেউ সরাইয়ে আশ্রয় নেয় না। অথবা বলতে পারেন, সক্কলেই যে যার খুশীমত কাজ করে যাচ্ছে, আপনি আপত্তি জানাতে পারবেন না, আর আপনি আপনার পছন্দমত যা খুশী করে যাবেন, কেউ বাধা দেবে না। হাতাহাতি না হলেই হল।

তাতে করে ভালো মন্দ দুই-ই হয়। একদিকে যেমন গরম, ধুলো, তৃষ্ণা সত্ত্বেও মানুষ একে অন্যকে প্রচুর বরদাস্ত করতে পারে, অন্যদিকে তেমনি সকলেই সরাইয়ের কুঠরি-চত্বর নির্মমভাবে নোংরা করে।

একদিকে নিবিড় সামাজিক জীবনযাত্রা, অন্যদিকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার চূড়ান্ত বিকাশ। অর্থাৎ 'কমুনিটি সেন্স' আছে কিন্তু 'সিভিক সেন্স' নেই।

ভাবতে ভাবতে দেখি সরাইয়ে এক রাত্রি বাস করেই আমি আফগান তুর্কোমান সম্বন্ধে নানারকম মতবাদ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছি। হুঁশিয়ার হয়ে ভিতরের দিকে তাকানো বন্ধ করলুম। কিন্তু বাইরের দিকে তাকিয়েই দেখব আর কি? সেই আগের দিনকার জনপদ বা জনশূন্য শিলাপর্বত।

সর্দারজীকে বললুম, 'রাত্তিরে যখন গা বিড়োচ্ছিল তখন একটু সুপুরি পেলে বড় উপকার হত। কিন্তু সরাইয়ে পানের দোকান তো দেখলুম না।'

সর্দারজী বললেন, 'পান কোথায় পাবেন, বাবুসায়েব? পেশাওয়ারেই শেষ পানের দোকান। তার পশ্চিমে আফগানিস্থান, ইরান, ইরাকের কোথাও পান দেখিনি—পল্টনে ড্রাইভারি করার সময় এসব দেশ আমার ঘোরা হয়ে গিয়েছে। পাঠানও তো পান খায় না। পেশাওয়ারের পানের দোকানের গ্রাহক সব পাঞ্জাবী।'

তাই তো। মনে পড়ল, কলুটোলা জাকারিয়া স্ট্রীটে হোটেলের গাড়ি-বারান্দার বেঞ্চে বসে কাবুলীরা শহর রাঙা করে না বটে। আরো মনে পড়ল, দক্ষিণ-ভারতে বর্মা মালয়ে এমন কি থাসিয়া পাহাড়েও প্রচুর পান খাওয়া হয়—যদিও এদের কেউই কাশী-লক্ষ্ণৌয়ের মত তরিবৎ করে জিনিসটার রস উপভোগ করতে জানে না। তবে কি পান অনার্য জিনিস? 'পান' কথাটা তো আর্য—'কর্ণ' থেকে 'কান', 'পর্ণ' থেকে 'পান'। তবে 'সুপারি'? উঁহু, কথাটা তো সংস্কৃত নয়। লক্ষ্ণৌয়ে বলে 'ডলি' অথবা 'ছালিয়া'—সেগুলোও তো সংস্কৃত থেকে আসেনি। কিন্তু পূর্ববঙ্গে 'গুয়া' কথাটার 'গুবাক' না 'গূবাক' কি একটা সংস্কৃত রূপ আছে না? কিন্তু তাহলেও তো কোনো কিছুর সমাধান হয় না, কারণ পাঞ্জাব দোয়াব এসব উন্নাসিক আর্যভূমি ত্যাগ করে খাঁটি গুবাক হঠাৎ পূর্ববঙ্গে গিয়ে গাছের ডগায় আশ্রয় নেবেন কেন? আজকের দিনে হিন্দু-মুসলমানের সব মাঙ্গলিকেই সুপারির প্রয়োজন হয়, কিন্তু গৃহ্যসূত্রের ফিরিস্তিতে গুবাক—গুবাক? নাঃ। মনে তো পড়ে না। তবে কি এ নিতান্তই অনার্যজনসুলভ সামগ্রী? পূর্বপ্রাচ্য থেকে উজিয়ে উজিয়ে পেশাওয়ার অবধি পৌঁচেছে? সাধে বলি, ভারত-বর্ষ তাবৎ প্রাচ্য সভ্যতার মিলনভূমি।

ডিমোক্রেসি ডিমোক্রেসি জিগির তুলে বড্ড বেশী চেঁচামেচি করাতে দক্ষিণ-ভারতের এক সাধক বলেছিলেন, 'তাহলে সবাই ঘুমিয়ে পড়। ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষে মানুষে ভেদ থাকে না, সবাই সমান।' সেই গরমে বসে বসে তত্ত্বটি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করলুম। ঝাঁকুনি, ধুলো, কঠিন আসন, ক্ষুধাতৃষ্ণা সত্ত্বেও বেতারকর্তা ও আমার দুজনেরই ঘুম পাচ্ছিল। মাঝে মাঝে তাঁর মাথা আমার কাঁধে ঢলে পড়ছিল, আমি তখন শক্ত হয়ে বসে তাঁর ঘুমে তা দিচ্ছিলুম। তারপর হঠাৎ একটা জোর ঝাঁকুনি খেয়ে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে তিনি আমার কাছে মাফ চেয়ে শক্ত হয়ে বসেছিলেন। তখন আমার পালা। শত চেষ্টা সত্ত্বেও ভদ্রতার বেড়া ভেঙে আমার মাথা তাঁর কাঁধে জিরিয়ে নিচ্ছিল।

চোখ বন্ধ অবস্থায়ই ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রথম পরশ পেলুম; খুলে দেখি সামনে সবুজ উপত্যকা—রাস্তার দুদিকে ফসল ক্ষেত। সর্দারজী পরিচয় করিয়ে দিয়ে

বললেন, 'জলালাবাদ।'

দক্কার পাশেই সেই কাবুল নদীর কৃপায় এই জলালাবাদ শস্যশস্পশ্যামল। এখানে জমি বোধ হয় দক্কার মত পাথরে ভর্তি নয় বলে উপত্যকা রীতিমত চওড়া —একটু নিচু জমিতে বাস্ নামার পর আর তার প্রসারের আন্দাজ করা যায় না। তখন দুদিকেই সবুজ, আর লোকজনের ঘরবাড়ি। সামান্য একটি নদী ক্ষুদ্রতম সুযোগ পেলে যে কি মোহন সবুজের লীলাখেলা দেখাতে পারে জলালাবাদে তার অতি মধুর তসবির। এমন কি যে দুটো-চারটে পাঠান রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তাদের চেহারাও যেন সীমান্তের পাঠানের চেয়ে মোলায়েম বলে মনে হল। লক্ষ্য করলুম, যে পাঠান শহরে গিয়ে সেখানকার মেয়েদের 'বেপর্দামি'র নিন্দা করে, তারি বউ-ঝি ক্ষেতে কাজ করছে অন্য দেশের মেয়েদেরই মত। মুখ তুলে বাসের দিকে তাকাতেও তাদের আপত্তি নেই। বেতারকর্তাকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি গম্ভীর ভাবে বললেন, 'আমার যতদূর জানা, কোনো দেশের গরীব মেয়েই পর্দা মানে না, অন্ততঃ আপন গাঁয়ে মানে না। শহরে গিয়ে মধ্যবিত্তের অনুকরণে কখনো পর্দা মেনে 'ভদ্রলোক' হবার চেষ্টা করে, কখনো কাজ-কর্মের অসুবিধা হয় বলে গাঁয়ের রেওয়াজই বজায় রাখে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'আরবের বেদুইন মেয়েরা?'

তিনি বললেন, 'আমি ইরাকে তাদের বিনা পর্দায় ছাগল চরাতে দেখেছি।'

থাক্ উপস্থিত এ সব আলোচনা। গোটা দেশটা প্রথম দেখে নিই, তারপর রীতি-রেওয়াজ ভালো-মন্দের বিচার করা যাবে।

গাড়ি সদর রাস্তা ছেড়ে জলালাবাদ শহরে ঢুকল। কাবুলীরা সব বাসের পেট থেকে বেরিয়ে এক মিনিটের ভিতর অন্তর্ধান। কেউ একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করল না, বাস ফের ছাড়বে কখন। আমার তো এই প্রথম যাত্রা, তাই সর্দারজীকে শুধালুম, 'বাস্ আবার ছাড়বে কখন?' সর্দারজী বললেন, 'আবার যখন সবাই জড়ো হবে।' জিজ্ঞেস করলুম, 'সে কবে?' সর্দারজী যেন একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমি তার কি জানি? সবাই খেয়েদেয়ে ফিরে আসবে যখন তখন।'

বেতারকর্তা বললেন, 'ঠায় দাঁড়িয়ে করছেন কি? আসুন আমার সঙ্গে।'

আমি শুধালুম, 'আর সব গেল কোথায়? ফিরবেই বা কখন?'

তিনি বললেন, 'ওদের জন্য আপনি এত উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন? আপনি তো ওদের মালজানের জিম্মাদার নন।'

আমি বললুম, 'তা তো নই-ই। কিন্তু যেরকম ভাবে হুট্ করে সবাই নিরুদ্দেশ

হল তাতে তো মনে হল না যে ওরা শিগগির ফিরবে। আজ সন্ধ্যায় তা হলে কাবুল পৌঁছব কি করে?'

বেতারকর্তা বললেন, 'সে আশা শিকেয় তুলে রাখুন। এদের তো কাবুল পৌঁছবার কোনো তাড়া নেই। বাস্ যখন ছিল না, তখন ওরা কাবুল পৌঁছত পনেরো দিনে, এখন চার দিন লাগলেও তাদের আপত্তি নেই। ওরা খুশী, ওদের হেঁটে যেতে হচ্ছে না, মালপত্র তদারক করে গাধা-খচ্চরের পিঠে চাপাতে-নামাতে হচ্ছে না, তাদের জন্য বিচুলির সন্ধান করতে হচ্ছে না। জলালাবাদে পৌঁচেছে, এখানে সক্কলেরই কাকা-মামা-শালা, কেউ না কেউ আছে, তাদের তত্ত্বতাবাশ করবে, খাবেদাবে, তারপর ফিরে আসবে।'

আমি চুপ করে গেলুম। দক্কাতে অফিসারকে বলেছিলুম, 'আর পাঁচজনের যা গতি আমারও তাই হবে,' এখন বুঝতে পারলুম সব মানুষই কিছু-না-কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। তফাৎ শুধু এইটুকু কেউ করে জেনে, কেউ না জেনে।

আফগানিস্থানের বড় শহর পাঁচটি। কাবুল, হিরাত, গজনী, জলালাবাদ, কান্দাহার। জলালাবাদ আফগানিস্থানের শীতকালের রাজধানী। তাই এখানে রাজপ্রাসাদ আছে, সরকারী কর্মচারীদের জন্য খাস পান্থনিবাস আছে।

বেতারবাণী যখন বলেছেন তখন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু উপস্থিত জলালাবাদের বাজার দেখে আফগানিস্থানের অন্যতম প্রধান নগর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পেলুম না। সেই নোংরা মাটির দেয়াল, অত্যন্ত গরীব দোকানপাট—সস্তা জাপানী মালে ভর্তি—বিস্তর চায়ের দোকান, আর অসংখ্য মাছি। হিমালয়ের চট্টিতে মানুষ যে রকম মাছি সম্বন্ধে নির্বিকার, এখানেও ঠিক তাই।

হঠাৎ আখ দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। চৌকো চৌকো করে কেটে দোকানের সামনে সাজিয়ে রেখেছে এবং তার উপরে দুনিয়ার সব মাছি বসাতে চেহারাটা চালে-তিলের মত হয়ে গিয়েছে। ঘিনপিত ঝেড়ে ফেলে কিনলুম এবং খেয়ে দেখলুম, দেশের আখের চেয়েও মিষ্টি। সাধে কি বাবুর বাদশা এই আখ খেয়ে খুশী হয়ে তার নমুনা বদখশান-বুখারায় পাঠিয়েছিলেন! তারপর দেখি, নোনা ফুটি শশা তরমুজ। ঘন সবুজ আর সোনালী হলদেতে ফলের দোকানে রঙের অপূর্ব খোলতাই হয়েছে—খুশবাই চতুর্দিক মাত করে রেখেছে। দরদস্তুর না করে কিনলেও ঠকবার ভয় নেই। রপ্তানি করার সুবিধে নেই বলে সব ফলই বেজায় সস্তা। বেতারবার্তা জ্ঞান বিতরণ করে বললেন, 'যারা সত্যিকার ফলের

রসিক তারা এখানে সমস্ত গ্রীষ্মকালটা ফল খেয়েই কাটায় আর যারা পাঁড় মেওয়া-খোর তারা শীতকালেও কিসমিস আখরোট পেস্তা বাদামের উপর নির্ভর করে। মাঝে মাঝে রুটি-পনির আর ক্বচিৎ কখনো একটুকরো মাংস। এরাই সব চাইতে দীর্ঘজীবী হয়।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'এদের গায়ে বুলেট লাগেনি বুঝি? জলালাবাদের ফল তা হলে মন্ত্রপূত বলতে হয়।'

বেতারবার্তা বললেন, 'জলালাবাদের লোক গুলী খেতে যাবে কেন? তারা শহরে থাকে, আইনকানুন মানে, হানাহানির কিবা জানে?'

কিন্তু জলালাবাদের যথার্থ মাহাত্ম্য শহরের বাইরে। আপনি যদি ভূবিদ্যার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে চান তবে কিঞ্চিৎ খোঁড়াখুঁড়ি করলেই আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। আপনি যদি নৃতত্ত্বের অনুসন্ধান করতে চান তবে চারিদিকের নানা-প্রকারের অনুন্নত উপজাতি আপনাকে দেদার মালমশলা যোগাড় করে দেবে। যদি মার্কস্‌বাদের প্রাচ্যদেশীয় পটভূমি তৈরী করতে চান তবে মাত্র এঙেল্‌সের 'অরিজিন অব দি ফ্যামিলি'খানা সঙ্গে নিয়ে আসুন, বাদবাকি সব এখানে পাবেন—জলালাবাদের গ্রামাঞ্চলে পরিবার-পত্তনের ভিৎ, আর একশ' মাইল দূরে কাবুলে রাষ্ট্রনির্মাণের গম্বুজশিখর বিরাজমান। যদি ঐতিহাসিক হন তবে গান্ধারী, সিকন্দর, বাবুর, নাদিরের বিজয় অভিযান বর্ণনার কতটা খাঁটি কতটা ঝুটা নিজের হাতে যাচাই করে নিতে পারবেন। যদি ভূগোল অর্থনীতির সমন্বয় প্রমাণ করতে চান যে তিন ফোঁটা নদীর জল কি করে নব নব মন্বন্তরের কারণ হতে পারে, তাহলে জলালাবাদে আস্তানা গেড়ে কাবুল নদীর উজান ভাঁটা করুন। আর যদি গ্রীক-ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রয়াগভূমির অনুসন্ধান করেন তবে তার রঙ্গ-ভূমি তো জলালাবাদের কয়েক মাইল দূরে হাদ্দা গ্রামে। ধ্যানী বুদ্ধ, কঙ্কাল-সার বুদ্ধ, অমিতাভ বুদ্ধ—যত রকমের মূর্তি চান, গান্ধার-শৈলীর যত উদাহরণ চান সব উপস্থিত। মাটির উপরে কিঞ্চিৎ, ভিতরে প্রচুর। ঢিপিঢাপা দেখামাত্র অজ্ঞ লোকেও বলতে পারে।

আর যদি আপনি পাণ্ডিত্যের বাজারে সত্যিকার দাঁও মারতে চান, তবে দেখুন সিন্ধুর পারে মোন্‌-জো-দড়ো বেরল, ইউফ্রেটিস টাইগ্রিসের পারে আসিরীয় বেবিলনীয় সভ্যতা বেরল, নীলের পারে মিশরীয় সভ্যতা বেরল—এর সব ক'টাই পৃথিবীর প্রাকআর্য প্রাচীন সভ্যতা। শুনতে পাই, নর্মদার পারে ঐরকম একটা দাঁও মারার জন্য একপাল পণ্ডিত মাথায় গামছা বেঁধে শাবল নিয়ে লেগে গিয়েছেন। সেখানে গিয়ে বাজার কোণঠাসা করতে পারবেন না, উল্টে দেউলে

হবার সম্ভাবনাই বেশী। আর যদি নিতান্তই বরাতজোরে কিছু একটা পেয়ে যান তবে হবেন না হয় রাখাল বাঁড়ুজ্যে। একপাল মার্শাল উড়োউড়ি করছে, ছোঁ মেরে আপনারি কাঁচামাল বিলেত নিয়ে গিয়ে তিনভলুম চামড়ায় বেঁধে আপনারি মাথায় ছুঁড়ে মারবে। শোনেননি, গুণী বলেছেন, 'একবার ঠকলে ঠকের দোষ, দুবার ঠকলে তোমার দোষ।' তাই বলি, জলালাবাদ যান, মোন্-জো-দড়োর কনিষ্ঠ ভ্রাতার উদ্ধার করুন, তাতে ভারতের গর্ব বারো আনা, আফগানিস্থানের চার আনা। বিশেষতঃ যখন আফগানিস্থানে কাক চিল নেই—আপনার মেহন্নতের মাল নিয়ে তারা চুরিচামারি করবে না।

জানি, পণ্ডিত মাত্রই সন্দেহপিশাচ। আপনিও বলবেন, 'না হয় মানলুম, জলালাবাদের জমির শুধু উপরেই নয়, নিচেও বিস্তর সোনার ফসল ফলে আছে, কিন্তু প্রশ্ন, চতুর্দিক থেকে অ্যাদ্দিন ধরে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলবুলির পাল সেখানে ঝামেলা লাগায়নি কেন?'

তার কারণ তো বেতারবাণী বহু পূর্বেই বলে দিয়েছেন। ইংরেজ এবং অন্য হরেক রকম সাদা বুলবুলিকে আফগান পছন্দ করে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পাণ্ডিত্যাম্বরে উপস্থিত যে কয়টি পক্ষী উড্ডীয়মান, তাদের সর্বাঙ্গে শ্বেতকুষ্ঠ, এখানে তাদের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু আপনার রঙ দিব্য বাদামী, আপনি প্রতিবেশী, আফগান আপনাকে বহু শতাব্দী ধরে চেনে—আপনি না হয় তাকে ভুলে গিয়েছেন, আপনারি জাতভাই বহু ভারতীয় এখনো আফগানিস্থানে ছোটখাটো নানা ধান্দায় ঘোরাঘুরি এমন কি বসবাসও করে, আপনাকে আনাচেকানাচে ঘুরতে দেখলে কাবুলীওয়ালা আর যা করে করুক, আঁৎকে উঠে কোঁৎকা খুঁজবে না।

তবু শুনবেন না? সাধে বলি, সব কিছু পণ্ড না হলে পণ্ডিত হয় না!

এগারো

মোটর ছাড়ল অনেক বেলায়। কাজেই বেলাবেলি কাবুল পৌঁছবার আর কোনো ভরসাই রইল না।

পেশাওয়ার থেকে জলালাবাদ একশ' মাইল, জলালাবাদ থেকে কাবুল আরো একশ' মাইল। শাস্ত্রে লেখে সকালে পেশাওয়ার ছেড়ে সন্ধ্যায় জলালাবাদ পৌঁছবে। পরদিন ভোরবেলা জলালাবাদ ছেড়ে সন্ধ্যায় কাবুল। তখনই বোঝা উচিত ছিল যে, শাস্ত্র মানে অল্প লোকেই। পরে জানলুম একমাত্র মেল বাস্ ছাড়া আর কেউ শাস্ত্রনির্দিষ্ট বেগে চলে না।

জলালাবাদের আশেপাশে গাঁয়ের ছেলেরা রাস্তায় খেলাধুলো করছে। তারি এক খেলা মোটরের জন্য রাস্তায় গোলকধাঁধা বানিয়ে দেওয়া। কায়দাটা নূতন। কাবুলীরা যে আণ্ডার মত শক্ত টুপির চতুর্দিকে পাগড়ি জড়ায়, ছোঁড়ারা সেই টুপি এমনভাবে রাস্তায় সাজিয়ে রাখে যে হুঁশিয়ার হয়ে গাড়ি না চালালে দুটো-চারটে থেঁৎলে দেবার সম্ভাবনা। দূর থেকে সেগুলো দেখতে পেলেই সর্দারজী দাড়িগোঁফের ভিতরে বিড়বিড় করে কি একটা গালাগাল দিয়ে মোটরের বেগ কমান। কয়েকবার এ রকম লক্ষ্য করার পর বললুম, 'দিন না দুটো-চারটে থেঁৎলে। ছোঁড়াদের তাহলে আক্কেল হয়।' সর্দারজী বললেন, 'খুদা পনাহ্। এমন কর্ম করতে নেই। আর টায়ার ফাঁসাতে চাইনে।' আমি বুঝতে না পেরে বললুম, 'সে কি কথা, এই টুপিগুলো আপনার টায়ার ছ্যাঁদা করে দেবে?' তিনি বললেন, 'আপনি খেলাটার আসল মর্মই ধরতে পারেননি। টুপির ভিতরে রয়েছে মাটিতে শক্ত করে পোঁতা লম্বা লোহা। যদি টুপি বাঁচিয়ে চলি তবে গাড়ি বাঁচানো হল, যদি টুপি থেঁৎলাই, তবে সঙ্গে সঙ্গে নিজের পায়েও কুড়োল মারা হল।'

আমি বললুম, 'অর্থাৎ ছোকরারা মোটরওয়ালাদের শেখাতে চায়, 'পরের অপকার করিলে নিজের অপকার হয়'।'

সর্দারজী বললেন, 'ওঃ, আপনার কি পরিষ্কার মাথা!'

বেতারবাণী বললেন, 'কিন্তু প্রশ্ন, এই মহান শিক্ষা এল কোথা হতে?'

আমি নিবেদন করলুম, 'আপনিই বলুন।'

তিনি বললেন, 'ছোঁড়াদের খেলাতে রয়েছে, বৌদ্ধধর্মের মহান আদর্শের ভগ্নাবশেষ। জানেন, এককালে এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রচুর প্রসার-প্রতিপত্তি ছিল।'

আমি বললুম, 'তাই তো শুনেছি।'

তিনি বললেন, 'শুনেছি মানে? একটুখানি ডাইনে হটলেই পৌঁছবেন হাদ্দায়। সেখানে গিয়ে স্বচক্ষে দেখতে পাবেন কত বৌদ্ধমূর্তি বেরিয়েছে মাটির তলা থেকে। আপনি কি ভাবছেন, সে আমলের লোক নানা রকম মূর্তি জড়ো করে যাদুঘর বানাত?'

এ যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্ন, 'কণিষ্কের আমলে গান্ধারবাসীরা যাদুঘর নির্মাণ করিত কি না?'

ফেল মারলুম। কিন্তু বাঙালী আর কিছু পারুক না-পারুক, বাজে তর্কে খুব মজবুত। বললুম, 'কিন্তু কাল রাত্রে সরাইয়ে নিজের 'জান-মাল',—খুড়ি, 'মাল-

জান' সম্বন্ধে যে সতর্কতার হুঙ্কার শুনতে পেলুম তা থেকে তো মনে হ'ল না প্রভু তথাগতের সাম্যমৈত্রীর বাণী শুনছি।'

বেতারবার্তা বললেন, 'ঠিক ধরেছেন। অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম হচ্ছে অহিংস শিশুশাবক ও স্ত্রীলোকের ধর্ম। পূর্ণবয়স্ক, প্রাণবন্ত দুর্ধর্ষ পুরুষের ধর্ম হচ্ছে ইসলাম।'

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ।'

সর্দারজী খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে বললেন, 'আমি তো গ্রন্থসাহেব মানি কিন্তু একথা বার বার স্বীকার করব যে, এই আধা-ইনসান পাঠান জাতকে কেউ যদি ধর্মের পথে নিয়ে যেতে পারে তবে সে ইসলাম।'

আমি তো ভয় পেয়ে গেলুম। এইবার লাগে বুঝি। 'আধা-ইনসান' অর্থাৎ 'অর্ধ-মনুষ্য' বললে কার রক্ত গরম না হয়। কিন্তু বেতারবাণী অত্যন্ত সৌম্য বৌদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'আপনি বিদেশী এবং আমাদের সকলের চেয়ে বেশী লোক-জনের সংস্রবে এসেছেন, তার উপর আপনি বয়সে প্রবীণ। আপনার এই মত শুনে ভারী খুশী হলুম।'

আমি আরো আশ্চর্য হয়ে গেলুম। কৌতূহল দমন করতে না পেরে গাড়ির ঝড়ঝড়ানির সঙ্গে গলা মিলিয়ে সর্দারজীকে আস্তে আস্তে উর্দুতে শুধালুম, 'এ কি কাণ্ড? আপনি এঁর জাত তুলে এঁকে আধা-ইনসান বললেন আর ইনি খুশী হয়ে আপনাকে তসলীম করলেন!'

সর্দারজী আরো আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'ইনি চটবেন কেন? ইনি তো কাবুলী।'

আমি আরো সাত হাত জলে। ফের শুধালুম, 'কাবুলী পাঠান নয়?'

সর্দারজী তখন আমার অজ্ঞতা ধরতে পেরে বুঝিয়ে বললেন, 'আফগানিস্থানের অধিবাসী পাঠান। কিন্তু খাস কাবুলের লোক ইরান দেশ থেকে এসে সেখানে বাড়িঘরদোর বেঁধে শহর জমিয়েছে। তাদের মাতৃভাষা ফার্সী। পাঠানের মাতৃভাষা পশতু। বেতারের সায়েব পশতু ভাষার এক বর্ণও বোঝেন না।

আমি বললুম, 'তা না হয় বুঝলুম, কিন্তু কলকাতার কাবুলীওয়ালারা তো ফার্সী বোঝে না।'

'তার কারণ কলকাতার কাবুলীরা কাবুলের লোক নয়। তারা সীমান্ত, খাইবার, বড় জোর চমন কান্দাহারের বাসিন্দা। খাস কাবুলী পারতপক্ষে কাবুল শহরের সীমানার বাইরে যায় না। যে দু'দশজন যায় তারা সদাগর। তাদেরও পাল্লা ঐ পেশাওয়ার অবধি।'

এত জ্ঞান দান করেও সর্দারজীর আশ মিটল না। আমাকে শুধালেন, 'আপনি 'কাবুলীওয়ালা', 'কাবুলীওয়ালা' বলেন কেন? কাবুলের লোক হয় হবে 'কাবুলী', নয় 'কাবুলওয়ালা' ' 'কাবুলীওয়ালা' হয় কি করে?'

হকচকিয়ে গেলুম। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'কাবুলীওয়ালা'। গুরুকে বাঁচাই কি করে? আর বাঁচাতে তো হবেই, কারণ—

যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি-বাড়ি যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥

সামলে নিয়ে বললুম, 'এই আপনি যে রকম 'জওয়াহিরাত' বলেন। 'জওহর' হল এক বচন; 'জওয়াহির' বহুবচন। 'জওয়াহিরে' ফের 'আত' লাগিয়ে আরো বহুবচন হয় কি প্রকারে?'

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় কিন্তু মাছ দিয়ে মাছ ঢাকা যায় কি না সে প্রশ্ন অন্য যে কোনো দেশে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কিন্তু পাঠানমুল্লুকের আইন, এক খুনের বদলে আরেক খুন। তাই সেযাত্রা সর্দারজীর সামনে ইজ্জত বজায় রেখে ফাঁড়া কাটাতে পারলুম।

অবশ্য দরকার ছিল না। সর্দারজী তখন মোড় নিতে ব্যস্ত। আমি ভাবলুম, ম্যাপে দেখেছি জলালাবাদ থেকে কাবুল সোজা নাকবরাবর রাস্তা—গাড়ি আবার মোড় নিচ্ছে কেন?

বেতারবাণী হল, 'সেই ভালো, আজ যখন কিছুতেই কাবুল পৌঁছনো যাবে না, তখন নিমলার বাগানেই রাত কাটানো যাক।'

দূরে থেকেই সারি সারি চিনার গাছ চোখে পড়ল। সুপারির চেয়ে উঁচু—সোজা আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে। বুক অবধি ডালপাতা নেই, বাকিটুকু মসৃণ ঘন পল্লবে আন্দোলিত। আমাদের বাঁশপাতার সঙ্গে কচি অশথপাতার সৌন্দর্য মিলিয়ে দিয়ে দীর্ঘ বিনুনির মত যদি কোনো পল্লবের কল্পনা করা যায় তবে তাই হয় চিনারের পাতা। কিন্তু তার দেহটির সঙ্গে অন্য কোনো গাছের তুলনা হয় না। ইরানী কবিরা উচ্ছ্বসিত হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তন্বঙ্গী তরুণীর রূপভঙ্গিমা রাগরঙ্গিমার সঙ্গে চিনারের দেহসৌষ্ঠবের তুলনা করে এখনো তৃপ্ত হননি। মৃদুমন্দ বাতাসে চিনার যখন তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ধীরে মন্থরে আন্দোলিত করে, তখন রসকষহীন পাঠান পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে বারে বারে তার দিকে তাকায়। সুপারির দোলের সঙ্গে এর খানিকটা মিল আছে কিন্তু সুপারির রঙ শ্যামলিমাহীন কর্কশ, আর সমস্তক্ষণ ভয় হয়, এই বুঝি ভেঙে পড়ল।

মনে হয়, মানুষ ছাড়া অন্য যে-কোনো প্রাণী চিনারের দেহচ্ছন্দকে তরুণীর

চেয়ে মধুর বলে স্বীকার করবে।

বেতারওয়ালা ভারতবর্ষের ইতিহাসের কোনো খবরই রাখেন না। সর্দারজীর কাছ থেকে বেশী আশা করাও অন্যায়, কিন্তু তিনিই বললেন নিমলার বাগান আর তাজমহলের বাগান নাকি একই সময়কার। নিমলার বাগানে যে প্রাসাদ ছিল, সেটি অভিযান আক্রমণ সহ্য না করতে পেরে অদৃশ্য হয়েছে কিন্তু সারিবাঁধানো রমণীয় চিনারগুলো নাকি শাহজাহানের হুকুমে পোঁতা। সর্দারজীর ঐতিহাসিক সত্যতা এখানে অবশ্য উদ্ভিদবিদ্যা দিয়ে পরখ করে নেবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু এই অজানা অচেনা দেশে শাহজাহানের তৈরী তাজের কনিষ্ঠ উদ্যানে ঢুকছি কল্পনা করাতে যে সুখ, উদ্ভিদতত্ত্বের মোহমুদ্গর দিয়ে সে মায়াজাল ছিন্ন করে কি এমন চরম মোক্ষলাভ! বাগানে আর এমন কিছু চারুশিল্পও নেই যার কৃতিত্ব শাহজাহানকে দিয়ে দিলে অন্য কারো ভয়ঙ্কর ক্ষতি হবে। আর এ কথাও তো সত্য যে, শাহজাহানের আসন উঁচু করার জন্য নিমলার বাগানের প্রয়োজন হয় না —এক তাজই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট।

তবু স্বীকার করতে হবে, অতি অল্প আয়াসের মধ্যে উদ্যানটি প্রাণাভিরাম। চিনারের সারি, জল দিয়ে বাগান তাজা রাখবার জন্য মাঝখানে নালা আর অসংখ্য নরগিস্ ফুলের চারা। নরগিস্ ফুল দেখতে অনেকটা রজনীগন্ধার মত, চারা হুবহু একই রকম অর্থাৎ ট্যুব্‌রোজ জাতীয়। গ্রীক দেবতা নারসিসাস্ নাকি আপন রূপে মুগ্ধ হয়ে সমস্ত দিন নদীর জলে আপন চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। দেবতারা বিরক্ত হয়ে শেষটায় তাঁকে নদীর পারের ফুলগাছে পরিবর্তিত করে দিলেন। এখনো নারসিসাস্ ফুল—ফার্সীতে নরগিস্—ঠিক তেমনি নদীর জলে আপন ছায়ার দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকে।

সন্ধ্যা কাটল নালার পারে, নরগিস্ বনের এক পাশে, চিনার মর্মরের মাঝখানে। সূর্যাস্তের শেষ আভাটুকু চিনার-পল্লব থেকে মুছে যাওয়ার পর ডাক-বাঙলোর খানসামা আহার দিয়ে গেল। খেয়েদেয়ে সেখানেই চারপাই আনিয়ে শুয়ে পড়লুম।

শেষরাত্রে ঘুম ভাঙল অপূর্ব মাধুরীর মাঝখানে। হঠাৎ শুনি নিতান্ত কানের পাশে জলের কুলুকুলু শব্দ আর আমার সর্বদেহ জড়িয়ে, নাকমুখ ছাপিয়ে কোন্ অজানা সৌরভ সুন্দরীর মধুর নিশ্বাস।

শেষরাত্রে নৌকা যখন বিল ছেড়ে নদীতে নামে তখন যেমন নদীর কুলকুল শব্দে ঘুম ভেঙে যায়, জানলার পাশে শিউলি গাছ থাকলে শরতের অতি ভোরে যে রকম তন্দ্রা টুটে যায়, এখানে তাই হল কিন্তু দুয়ে মিলে গিয়ে। এ সঙ্গীত

বহুবার শুনেছি, কিন্তু তার সঙ্গে এহেন সৌরভসোহাগ জীবনে আর কখনো পাইনি।

সেই আধা-আলো-অন্ধকারে চেয়ে দেখি দিনের বেলার শুকনো নালা জলে ভরে গিয়ে দুই কূল ছাপিয়ে নরগিসের পা ধুয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। বুঝলুম নালার উজানে দিনের বেলায় বাঁধ দিয়ে জল বন্ধ করা হয়েছিল—ভোরের আজানের সময় নিমলার বাগানের পালা ; বাঁধ খুলে দিতেই নালা ছাপিয়ে জল ছুটেছে—তারি পরশে নরগিস্ নয়ন মেলে তাকিয়েছে। এর গান ওর সৌরভে মিশে গিয়েছে।

আর যে-চিনারের পদপ্রান্তে উভয়ের সঙ্গীতসৌরভ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, সে তার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে প্রভাতসূর্যের প্রথম রশ্মির নবীন অভিষেকের জন্য। দেখতে-না-দেখতে চিনার সোনার মুকুট পরে নিল—পদপ্রান্তে পুষ্পবনের গন্ধধূপে বৈতালিক মুখরিত হয়ে উঠল।

'এদিন আজি কোন ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার,
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা
সফল হল কার ?'

বারো

ভোরের নমাজ শেষ হতেই সর্দারজী ভেঁপু বাজাতে আরম্ভ করলেন। ভাবগতিক দেখে মনে হল তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন, আজ সন্ধ্যেয় যে করেই হোক কাবুল পৌঁছবেন।

বেতার-সায়েবের দিলও খুব চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। সর্দারজীর সঙ্গে নানা রকম গল্প জুড়ে দিলেন ও আমাকেও আফগানিস্থান সম্বন্ধে নানা কাজের খবর নানা রঙীন গুজব বলে যেতে লাগলেন। তার কতটা সত্য, কতটা কল্পনা কতটা ডাহা মিথ্যে বুঝবার মত তথ্য আমার কাছে ছিল না, কাজেই একতরফা গল্প জমে উঠল ভালোই। তারই একটা বলতে গিয়ে ভূমিকা দিলেন, 'সামান্য জিনিস মানুষের সমস্ত জীবনের ধারা কি রকম অন্য পথে নিয়ে ফেলতে পারে শুনুন !

'প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই নিমলার বাগানেই জন চল্লিশ কয়েদী আর তাদের পাহারাওয়ালারা রাত কাটিয়ে সকালবেলা দেখে একজন কি করে পালিয়েছে। পাহারাওয়ালাদের মস্তকে বজ্রাঘাত। কাবুল থেকে যতগুলো কয়েদী নিয়ে

বেরিয়েছিল জলালাবাদে যদি সেই সংখ্যা না দেখাতে পারে তবে তাদের যে কি শাস্তি হতে পারে সে সম্বন্ধে তাদের আইনজ্ঞান বা পূর্ব অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না। কেউ বলল, ফাঁসি দেবে, কেউ বলল, গুলী করে মারবে, কেউ বলল, জ্যান্ত শরীর থেকে টেনে টেনে চামড়া তুলে ফেলবে। জেল যে হবে সে বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ ছিল না, আর আফগান জেলের অবস্থা আর কেউ জানুক না-জানুক তারা বিলক্ষণ জানত। একবার সে-জেলে ঢুকলে সাধারণত কেউ আর বেরিয়ে আসে না—যদি আসে তবে সে ফায়ারিঙ স্কোয়াডের মুখোমুখি হতে অথবা অন্যের স্কন্ধের উপর সোয়ার হয়ে কফিনের ভিতর শুয়ে শুয়ে। আফগান জেল সম্বন্ধে তাই যেসব কথা শুনতে পাবেন তার বেশীর ভাগই কল্পনা—মরা লোকে তো আর কথা কয় না।

'তা সে যাই হোক, পাহারাওয়ালারা তো ভয়ে আধমরা। শেষটায় একজন বুদ্ধি বাৎলাল যে, রাস্তায় যে-কোনো একটা লোককে ধরে নিয়ে হিসেবে গোঁজা-মিল দিতে।

'পাছে অন্য লোক জানতে পেরে যায় তাই তারা সাততাড়াতাড়ি নিমলার বাগান ছেড়ে রাস্তায় বেরল। চতুর্দিকে নজর, কাউকে যদি একাএকি পায় তবে তাকে দিয়ে কাজ হাসিল করবে। ভোরের অন্ধকার তখনো কাটেনি। এক হতভাগা গ্রামের রাস্তার পাশের প্রয়োজনীয় কর্ম করতে এসেছিল। তাকে ধরে শিকলি পরিয়ে নিয়ে চলল আর সক্কলের সঙ্গে জলালাবাদের দিকে।

'সমস্ত রাস্তা ধরে তাকে ইহলোক পরলোক সকল লোকের সকল রকম ভয় দেখিয়ে পাহারাওয়ালারা শাসিয়ে বলল, জলালাবাদের জেলর তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে যেন শুধু বলে, 'মা খু চিহ্‌ল্ ও পঞ্জম্ হস্তম্' অর্থাৎ 'আমি পঁয়তাল্লিশ নম্বরের'। ব্যাস্, আর কিচ্ছু না।

'লোকটা হয় আকাট মূর্খ ছিল, না হয় ভয় পেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল, অথবা এও হতে পারে যে সে ভেবে নিয়েছিল যে যদি কোনো কয়েদী পালিয়ে যায়, সক্কলের পয়লা রাস্তায় যে সামনে পড়ে তাকেই সরকারী নম্বর পুরিয়ে দিতে হয়। অথবা হয়ত ভেবে নিয়েছিল, রাস্তার যে-কোনো লোককে রাজার হাতী যখন মাথায় তুলে নিয়ে সিংহাসনে বসাতে পারে তখন তাকে জেলখানায়ই বা নিয়ে যেতে পারবে না কেন?'

বেতারবাণী বললেন, 'গল্পটা আমি কম করে জন পাঁচেকের মুখে শুনেছি। ঘটনাগুলোর বর্ণনায় বিশেষ ফেরফার হয় না কিন্তু ঐ হতভাগা কেন যে জলালা-বাদের জেলরের সামনে সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলবার চেষ্টা একবারও করল না

সেই বিচিত্র।'

সর্দারজী শুধালেন, 'অন্য কয়েদীরাও চুপ করে রইল?'

বেতারওয়ালা বললেন, 'তাদের চুপ করে থাকার প্রচুর কারণ ছিল। সব ক'টা কয়েদীই ছিল একই ডাকাত দলের। তাদেরই একজন পালিয়েছে—অন্য সকলের ভরসা সে যদি বাইরে থেকে তাদের জন্য কিছু করতে পারে। তার পালানোতে অন্য সকলের যখন ষড় ছিল তখন তারা কিছু বললে তো তাকে ধরিয়ে দেবারই সুবিধে করে দেওয়া হত।

'তা সে যাই হোক, সেই হতভাগা তো জলালাবাদের জাহান্নমে গিয়ে ঢুকল। কিছুদিন যাওয়ার পর আর পাঁচজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝতে পারল কি বোকামিই সে করেছে। তখন একে ওকে বলে কয়ে আলা হজরত বাদশার কাছে সমস্ত ব্যাপারের বর্ণনা দিয়ে সে দরখাস্ত পাঠাবার চেষ্টা করল। কিন্তু জলালাবাদের জেলের দরখাস্ত সহজে হুজুরের কাছে পৌঁছয় না। জেলরও ভয় পেয়ে গিয়েছে, ভালো করে সনাক্ত না করে বেকসুর লোককে জেলে পোরার সাজাও হয়ত তার কপালে আছে। অথবা হয়ত ভেবেছে, সমস্তটাই গাঁজা, কিম্বা ভেবেছে, জেলের আর পাঁচজনের মত এরও মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

'জলালাবাদের জেলের ভিতরে কাগজ-কলমের ছড়াছড়ি নয়। অনেক ঝুলোঝুলি করে সে দরখাস্ত লেখায়, তারপর সে দরখাস্তের কি গতি হয় তার খবর পর্যন্ত বেচারীর কানে এসে পৌঁছয় না।

'বিশ্বাস করবেন না, এই করে করে এক মাস নয় দু' মাস নয়, এক বৎসর নয় দু' বৎসর নয়—ঝাড়া ষোলটি বৎসর কেটে গিয়েছে। তার তখন মনের অবস্থা কি হয়েছে বলা কঠিন, তবে আন্দাজ করা বোধ করি অন্যায় নয় যে, সে তখন দরখাস্ত পাঠানোর চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে।

'এমন সময় তামাম আফগানিস্থান জুড়ে খুব বড় একটা খুশীর জশন (পরব) উপস্থিত হল—মুইন-উস-সুলতানের (যুবরাজের) শাদী অথবা তাঁর প্রথম ছেলে জন্মেছে। আমীর হবীব উল্লা খুশীর জোশে অনেক দান-খয়রাত করলেন ও সে খয়রাতির বরসাত রুখাসুখা জেলগুলোতেও পৌঁছল। শীতকাল; আমীর তখন জলালাবাদে। ফরমান বেরল, জলালাবাদের জেলর যেন তাবৎ কয়েদীকে হুজুরের সামনে হাজির করে। হুজুর তাঁর বেহদ মেহেরবানি ও মহব্বতের তোড়ে বে-এখতেয়ার হয়ে হুকুম দিয়ে ফেলেছেন যে খুদ তিনি হরেক কয়েদীর ফরিয়াদ-তকলিফের খানাতল্লাশি করবেন।

'বিস্তর কয়েদী খালাস পেল, তারো বেশী কয়েদীর মিয়াদ কমিয়ে দেওয়া

হল। করে করে শেষটায় নিমলার সেই হতভাগা হুজুরের সামনে এসে দাঁড়াল।

'হুজুর শুধালেন, 'তু কৌন্তা', 'তুই কে ?'

'সে বলল, 'মা খু চিহ্‌ল্ ও পঞ্জম্ হস্তম্' অর্থাৎ 'আমি তো পঁয়তাল্লিশ নম্বরের'।

'হুজুর যতই তার নামধাম কসুরসাজার কথা জিজ্ঞাসা করেন সে ততই বলে সে শুধু পঁয়তাল্লিশ নম্বরের। ঐ এক বুলি, এক জিগির। হুজুরের সন্দেহ হল, লোকটা বুঝি পাগল। ঠাহর করবার জন্য অন্য নানা রকমের কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হল, সূর্য কোন্ দিকে ওঠে, কোন্ দিকে অস্ত যায়, মা ছেলেকে দুধ খাওয়ায়, না ছেলে মাকে। সব কথার ঠিক ঠিক উত্তর দেয় কিন্তু তার নিজের কথা জিজ্ঞেস করলেই বলে, 'আমি তো পঁয়তাল্লিশ নম্বরের'।

'ষোল বছর ঐ মন্ত্র জপ করে করে তার বিশ্বাস হয়ে গিয়েছে, তার নাম নেই ধাম নেই, সাকিনঠিকানা নেই, তার পাপ নেই পুণ্য নেই, জেলের ভিতরের বন্ধন নেই, বাইরের মুক্তিও নেই—তার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব তার সর্বৈব সত্তা ঐ এক মন্ত্রে, 'আমি পঁয়তাল্লিশ নম্বরের'।

'শত দোষ থাকলেও আমীর হবীব উল্লার একটা গুণ ছিল; কোনো জিনিসের খেই ধরলে তিনি জট না ছাড়িয়ে সন্তুষ্ট হতেন না। শেষটায় সেই ডাকাতদের যে দু'-একজন তখনো বেঁচে ছিল তারাই রহস্যের সমাধান করে দিল।

'শুনতে পাই খালাস পাওয়ার পরও, বাকী জীবন সে ঐ পঁয়তাল্লিশ নম্বরের ভানুমতী কখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।'

গল্প শুনে আমার সবশরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। পরিপক্ক বৃদ্ধ সর্দারজীর মুখে শুধু 'আল্লা মালিক', 'খুদা বাঁচানেওয়ালা'।

ততক্ষণে চড়াই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। কাবুল যেতে হলে যে সাত-আট হাজার ফুট পাহাড় চড়তে হয় নিমলার কিছুক্ষণ পরেই তার আরম্ভ।

শিলেট থেকে যারা শিলঙ গিয়েছেন, দেরাদুন থেকে মুসৌরী, কিম্বা মহাবলেশ্বরের কাছে পশ্চিম ঘাট উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁদের পক্ষে এ রকম রাস্তার চুলের কাঁটার বাঁক, হাঁসুলি চাকের মোড় কিছু নূতন নয়—নূতনত্বটা হচ্ছে যে, এ রাস্তা কেউ মেরামত করে দেয় না, এখানে কেউ রেলিঙ বানিয়ে দেয় না, হরেক রকম সাইনবোর্ড দুদিকের পাহাড়ে সেঁটে দেয় না, বিশেষ সংকীর্ণ সংকট পেরবার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দু'দিকের মোটর আটকানো হয় না। মাটি ধসে রাস্তা যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে যতক্ষণ না জন আষ্টেক ড্রাইভার আটকা পড়ে আপন আপন

শাবল দিয়ে রাস্তা সাফ করে নেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতমশায়ের 'রাধে গো ব্রজ-সুন্দরী, পার করো' বলা ছাড়া অন্য কিছু করবার নেই। যাঁরা শীতকালে এ রাস্তা দিয়ে গিয়েছেন তাঁদের মুখে শুনেছি যে রাস্তার বরফও নিজেদের সাফ করতে হয়। অবশ্য বরফ সাফ করাতে আভিজাত্য আছে—শুনেছি স্বয়ং হুমায়ুন বাদশাহ নাকি শের শাহের তাড়া খেয়ে কাবুল না কান্দাহার যাবার পথে নিজ হাতে বরফ সাফ করেছিলেন।

শিলঙ-নৈনিতাল যাবার সময় গাড়ির ড্রাইভার অন্ততঃ এই সান্ত্বনা দেয় যে, দুর্ঘটনা বড় একটা ঘটে না। এখানে যদি কোনো ড্রাইভার এ রকম কথা বলে তবে আপনাকে শুধু দেখিয়ে দিতে হবে, রাস্তার যে-কোনো এক পাশে, হাজার ফুট গভীর খাদে দুর্ঘটনায় অপমৃত দুটো-একটা মোটরগাড়ির কঙ্কাল। মনে পড়ছে কোন্ এক হিল-স্টেশনের চড়াইয়ের মুখে দেখেছিলুম, ড্রাইভারদের বুকে যমদূতের ভয় জাগাবার জন্য রাস্তার কর্তাব্যক্তিরা একখানা ভাঙা মোটর ঝুলিয়ে রেখেছেন—নিচে বড় বড় হরপে লেখা, 'সাবধানে না চললে এই অবস্থা তোমারও হতে পারে'। কাবুলের রাস্তার মুখে সেরকম ব্যাপক কোনো বন্দোবস্তের প্রয়োজন হয় না—চোখ খোলা রাখলে দুদিকে বিস্তর প্রাঞ্জল উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়।

সবচেয়ে চিত্তির যখন হঠাৎ বাঁক নিয়ে সামনে দেখতে পাবেন আধ মাইল লম্বা উটের লাইন। একদিকে পাহাড়ের গা, আর একদিকে হাজার ফুট গভীর খাদ, মাঝখানে গাড়ি বাদ দিয়ে রাস্তার ক্লিয়ারিঙ এক হাত। তার ভিতর দিয়ে নড়বড়ে উট দূরের কথা, শান্ত গাধাও পেরতে পারে না। চওড়া রাস্তার আশায় আধ মাইল লম্বা উটের সারিকে পিছু ঠেলে নিয়ে যাওয়াও অসম্ভব। তখন গাড়িই ব্যাক করে চলে উল্টো দিকে। সে অবস্থায় পিছনের দিকে তাকাতে পারেন এমন স্থিতপ্রজ্ঞ, এমন স্নায়ুবিহীন 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা' স্থিতধী মুনিপ্রবর আমি কখনো দেখিনি। সবাই তখন চোখ বন্ধ করে কলমা পড়ে আর মোটর না-থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকে। তারপর চোখ খুলে যা দেখে সেও পিলে-চমকানিয়া। আস্তে আস্তে একটা একটা করে উট সেই ফাঁকা দিয়ে যাচ্ছে, তারপর বলা নেই কওয়া নেই, একটা উট হঠাৎ আধপাক নিয়ে ফাঁকাটুকু চওড়া-চওড়ি বন্ধ করে দেয়। পিছনের উটগুলো সঙ্গে সঙ্গে না থেমে সমস্ত রাস্তা জুড়ে ঝামেলা লাগায়—স্রোতের জলে বাঁধ দিলে যে রকম জল চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যে উটটা রাস্তা বন্ধ করেছে তাকে তখন সোজা করে ফের এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য জন পাঁচেক লোক সামনে থেকে টানাটানি করে, আর জন বিশেক পিছন

থেকে চেঁচামেচি হৈ-হল্লা লাগায়। অবস্থাটা তখন অনেকটা ছোট গলির ভিতর আনাড়ি ড্রাইভার মোটর ঘোরাতে গিয়ে আটকা পড়ে গেলে যে রকম হয়। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে সেখানে হাজার ফুট গভীর খাদের ভয় নেই, আর আপনি হয়ত রকে বসে বিড়ি হাতে আণ্ডা-বাচ্চা নিয়ে গুষ্ঠীসুখ অনুভব করছেন।

এই অবস্থায় যদি পিছন থেকে আর এক সার উট এসে উপস্থিত হয় তবে দ'টার সম্পূর্ণ খোলতাই হয়। আধ মাইল ধরে, সমস্ত রাস্তা জুড়ে তখন ঢাকা-দক্ষিণের মেলার গোরুর হাট বসে যায়।

বুখারা-সমরকন্দ, শিরাজ-বদখশান সেই দ'য়ে মজে গিয়ে চিৎকার করে, গালাগাল দেয়, জট খোলে, ফের পাকায়, অস্ত্র সম্বরণ করে, দু'দণ্ড জিরিয়ে নেয়, ঢেলে সেজে ফের গোড়া থেকে ঔড্র কায়দায় আরম্ভ করে—

'ক' রে কমললোচন শ্রীহরি

'খ' রে খগ-আসনে মুরারি

'গ' রে গরুড়—

স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করাই যদি সত্য নিরূপণের একমাত্র উপায় হয়, তবে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে আমি আজও সেই রাস্তার মাঝখানে মোটরের ভিতর কনুয়ের উপর ভর করে দু' হাতে মাথা চেপে ধরে বসে আছি। জট-পাকানো স্পষ্ট মনে আছে কিন্তু সেটা কি করে খুলল, মোটর আবার কি করে চলল, একদম মনে নেই।

তেরো

ফ্রান্সের বেতারবাণী আরম্ভ হয় 'ইসি পারি' অর্থাৎ 'হেথায় প্যারিস' দিয়ে। কাবুল ইয়োরোপীয় কোনো জিনিস নকল করতে গেলে ফ্রান্সকে আদর্শরূপে মেনে নেয় বলে কাবুল রেডিয়ো দুই সন্ধ্যা আপন অভিজ্ঞান-বাণী প্রচারিত করে 'ইন্ জা কাবুল' অর্থাৎ 'হেথায় কাবুল' বলে।

মোটরেও বেতারবাণী হল 'ইন্ জা কাবুল'। কিন্তু তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে বলে বেতারযোগে প্যারিস অথবা কাবুলের যতটা দেখবার সুবিধা হয়, আমার প্রায় ততটাই হল।

হেডলাইটের জোরে কিছু যে দেখব তারও উপায় ছিল না। পূর্বেই বলেছি বাস্‌খানার মাত্র একটি চোখ—সাঁঝের পিদিম দেখাতে গিয়ে সর্দারজী তার উপর আবিষ্কার করলেন যে, সে চোখটিও খাইবারের রৌদ্রদাহনে গান্ধারীর চোখের

মত কানা হয়ে গিয়েছে। সর্দারজীর নিজের জন্য অবশ্য বাসের কোনো চোখেরই প্রয়োজন ছিল না, কারণ তিনি রাতকানা। কিন্তু রাস্তার পঁয়তাল্লিশ নম্বরীদের উপকারের জন্য প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে একটা হারিকেন যোগাড় করা হল। হ্যাণ্ডিম্যান সেইটে নিয়ে একটা মাড-গার্ডের উপর বসল।

আমি সভয়ে সর্দারজীকে জিজ্ঞেস করলুম, 'হারিকেনের সামান্য আলোতে আপনার মোটর চালাতে অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

সর্দারজী বললেন, 'হচ্ছে বই কি, আলোটা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ওটা না থাকলে গাড়ি জোর চালাতে পারতুম।' মনে পড়ল, দেশের মাঝিরাও অন্ধকার রাত্রে নৌকার সম্মুখে আলো রাখতে দেয় না।

কিন্তু 'ভাগ্য-বিধাতা' অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তো কবি তাঁরই হাতে গোটা দেশটার ভার ছেড়ে দিয়ে গেয়েছেন—

পতনঅভ্যুদয়বন্ধুর পন্থা
যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী,
হে চির-সারথি, তব রথচক্রে
মুখরিত পথ দিনরাত্রি।

কিন্তু কবির তুলনায় দার্শনিক ঢের বেশী হুঁশিয়ার হয়। তাই বোধ হয় কবির হাতে রাষ্ট্রের কি দুরবস্থা হতে পারে, তারই কল্পনা করে প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র থেকে ভালো-মন্দ সব কবিকেই অবিচারে নির্বাসন দিয়েছিলেন।

এ সব তত্ত্বচিন্তা না করা ছাড়া তখন অন্য কোনো উপায় ছিল না। যদিও কাবুল উপত্যকার সমতল ভূমি দিয়ে তখন গাড়ি চলেছে, তবু দুটো-একটা মোড় সব সময়েই থাকার কথা। সে-সব মোড় নেবার সময় আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করছিলুম এবং সেই খবরটি সর্দারজীকে দেওয়াতে তিনি যা বললেন, তাতে আমার সব ডর-ভয় কেটে গেল। তিনি বললেন, 'আম্মো চোখ বন্ধ করি।' শুনে আমি যা চোখ বন্ধ করলুম তার সঙ্গে গান্ধারীর চোখ বন্ধ করার তুলনা করা যায়।

সেযাত্রা যে কাবুল পৌঁছতে পেরেছিলুম তার একমাত্র কারণ বোধ হয় এই যে, রগরগে উপন্যাসের গোয়েন্দা শত বিপদেও মরে না—ভ্রমণকাহিনী-লেখকের জীবনেও সেই সূত্র প্রযোজ্য।

'গুমরুক' বা কাস্টম-হাউস তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে—বিছানাখানা পর্যন্ত ছাড়ল না। টাঙ্গা নিয়ে ফরাসী রাজদূতাবাসের দিকে রওয়ানা হলুম—কাবুল শহরে আমার একমাত্র পরিচিত ব্যক্তি সেখানেই থাকতেন। শান্তিনিকেতনে তিনি আমার ফার্সীর অধ্যাপক ছিলেন ও তখন ফরাসী রাজদূতাবাসে কর্ম করতেন।

টাঙ্গা তিন মিনিট চলার পরেই বুঝতে পারলুম মস্কো রেডিয়ো কোন্ ভরসায় তাবৎ দুনিয়ার প্রলেতারিয়াকে সম্মিলিত হওয়ার জন্য ফতোয়া জারি করে। দেখলুম, কাবুল শহরে আমার প্রথম পরিচয়ের প্রলেতারিয়ার প্রতীক টাঙ্গাওয়ালা আর কলকাতার গাড়িওয়ালায় কোনো তফাত নেই। আমাকে উজবুক পেয়ে সে তার কর্তব্য শেয়ালদার কাপ্তেনদের মত তখনি স্থির করে নিয়েছে।

বেতারওয়ালা তাকে পই পই করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ফরাসী দূতাবাস কি করে যেতে হয়, সেও বার বার 'চশ্‌ম', 'বসর্ ও চশ্‌ম্' অর্থাৎ 'আমার মাথার দিব্যি, আপনার তালিম এবং হুকুম আমার চোখের জ্যোতির ন্যায় মূল্যবান' ইত্যাদি শপথ-কসম খেয়েছিল, কিন্তু কাজের বেলায় দু'মিনিট যেতে না যেতেই সে গাড়ি দাঁড় করায়, বেছে বেছে কাবুল শহরের সবচেয়ে আকাট মূর্খকে জিজ্ঞাসা করে, ফরাসী দূতাবাস কি করে যেতে হয়।

অনেকে অনেক উপদেশ দিলেন। এক গুণী শেষটায় বললেন—'ফরাসী রাজদূতাবাস? সে তো প্যারিসে। যেতে হলে—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'বোম্বাই গিয়ে জাহাজ ধরতে হয়। চল হে টাঙ্গাওয়ালা, পেশোয়ার অথবা কান্দাহার—যেটা কাছে পড়ে। সেখান থেকে বোম্বাই।'

টাঙ্গাওয়ালা ঘড়েল। বুঝল,

'বাঙাল বলিয়া করিয়ো না হেলা,
আমি ঢাকার বাঙাল নহি গো'

তখন সে লব-ই-দরিয়া, দেহ-আফগানান, শহর-আরা হয়ে ফরাসী রাজদূতাবাস পৌঁছল। কাবুল শহর ছোট—কম করে তিনবার সে আমাকে ঐ রাস্তা দিয়ে আগেই নিয়ে গিয়েছে। চতুর্দিকে পাহাড়—এর চেয়ে প্যাঁচালো কেপ অব্ গুড হোপ চেষ্টা করলেও হয় না।

আমি কিছু বললে এতক্ষণ ধরে সে এমন ভাব দেখাচ্ছিল যে আমার কাঁচা ফার্সী সে বুঝতে পারে না। এবার আমার পালা। ভাড়া দেবার সময় সে যতই নানা রকম যুক্তিতর্ক উত্থাপন করে আমি ততই বোকার মত তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাই আর একঘেয়ে আলোচনায় নূতনত্ব আনবার জন্য তার খোলা হাত থেকে আমারই দেওয়া দু'চার আনা কমিয়ে নিই। সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাঙা ফার্সীকে একদম ক্ষুদ বানিয়ে দিয়ে, মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলি, 'বুঝেছি, বুঝেছি, তুমি ইমানদার লোক, বিদেশী বলে না জেনে বেশী দিয়ে ফেলেছি, অত বেশী নিতে চাও না। মা শা আল্লা, সোবান আল্লা, খুদা তোমার জিন্দেগী দরাজ

করুন, তোমার বেটাবেটির—'

পয়সা সরালেই সে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠে, আল্লা রসুলের দোহাই কাড়ে, আর ইমান-ইনসাফ সম্বন্ধে সাদী-রুমীর বয়েৎ আওড়ায়। এমন সময় অধ্যাপক বগদানফ এসে সব কিছু রফারফি করে দিলেন।

যাবার সময় সে আমাকে আর এক দফা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত মেপে নিয়ে অত্যন্ত মোলায়েম ভাষায় শুধাল, 'আপনার দেশ কোথায়?'

বুঝলুম, গয়ার পাণ্ডার মত। ভবিষ্যৎ সতর্কতার জন্য।

কে বলে বাঙালী হীন? আমরা হেলায় লঙ্কা করিনি জয়?

রাতের বেলাই বগদানফ সায়েবের সঙ্গে আলাপ করার সুবিধা। সমস্ত রাত ধরে পড়াশোনা করেন, আর দিনের বেলা যতটা পারেন ঘুমিয়ে নেন। সেই কারণেই বোধ হয় তিনি ভারতবর্ষের সব পাখির মধ্যে পেঁচাকে পছন্দ করতেন বেশী। শান্তিনিকেতনে তিনি যে ঘরটায় ক্লাস নিতেন, নন্দবাবু তারই দেয়ালে একটা পেঁচা এঁকে দিয়েছিলেন। বগদানফ সায়েব তাতে ভারি খুশী হয়ে নন্দবাবুর মেলা তারিফ করেছিলেন।

বগদানফ জাতে রুশ, মস্কোর বাসিন্দা ও কট্টর জারপন্থী। ১৯১৭ সালে বিপ্লবের সময় মস্কো থেকে পালিয়ে আজরবাইজান হয়ে তেহরান পৌঁছান। সেখান থেকে বসরা হয়ে বোম্বাই এসে বাসা বাঁধেন। ভালো পেহলেভী বা পহ্লবী জানতেন বলে বোম্বাইয়ের জরথুস্ত্রী কামা-প্রতিষ্ঠান তাঁকে দিয়ে সেখানে অনেক পুঁথিপত্রের অনুবাদ করিয়ে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সে সময়ে রুশ পণ্ডিতদের দুরবস্থায় সাহায্য করবার জন্য এক আন্তর্জাতিক আহ্বানে ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে সাড়া দেন এবং বোম্বাইয়ে বগদানফের সঙ্গে দেখা হলে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই তাঁকে ফার্সীর অধ্যাপকরূপে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন।

১৯১৭ সালের পূর্বে বগদানফ রুশের পররাষ্ট্রবিভাগে কাজ করতেন ও সেই উপলক্ষ্যে তেহরানে আট বৎসর কাটিয়ে অতি উৎকৃষ্ট ফার্সী শিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন পরবর্তীকালে ইরান যান, তখন সেখানে ফার্সীর জন্য অধ্যাপক অনুসন্ধান করলে পণ্ডিতেরা বলেন যে, ফার্সী পড়বার জন্য বগদানফের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত পাওয়া অসম্ভব। কাবুলের অন্য জহুরীদের মুখেও আমি শুনেছি যে, আধুনিক ফার্সী সাহিত্যে বগদানফের লিখনশৈলী আপন বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে বিদগ্ধ-

জনের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছে।

ইউরোপীয় বহু ভাষা তো জানতেনই—তাছাড়া জগতাই, উসমানলী প্রভৃতি কতকগুলো অজানা অচেনা তুর্কী ভাষা উপভাষায় 'জবরদস্ত মৌলবী'ও ছিলেন। কাবুলের মত জগাখিচুড়ি শহরের দেশী-বিদেশী সকলের সঙ্গেই তিনি তাদের মাতৃভাষায় দিব্য স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারতেন।

একদিকে অগাধ পাণ্ডিত্য, অন্যদিকে কুসংস্কারে ভর্তি। বাঁ দিকে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের চাঁদ দেখতে পেয়েছেন, না তো গোখরোর ফণায় যেন পা দিয়েছেন। সেই 'দুর্ঘটনা'র তিন মাস পরেও যদি তাঁর পেয়ারা বেরাল বমি করে, তবে ঐ বাঁ কাঁধের উপর দিয়ে অপয়া চাঁদ দেখাই তার জন্য দায়ী। মইয়ের তলা দিয়ে গিয়েছ, হাত থেকে পড়ে আরশি ভেঙে গিয়েছে, চাবির গোছা ভুলে মেজের উপর রেখে-ছিলে—আর যাবে কোথায়, সেরাত্রে বগদানফ সাহেব তোমার জন্য এক ঘণ্টা ধরে আইকনের সামনে বিড়বিড় করে নানা মন্ত্র পড়বেন, গ্রীক অর্থডক্স চার্চের তাবৎ সেণ্টদের কাছে কান্নাকাটি করে ধন্না দেবেন, পরদিন ভোরবেলা তোমার চোখেমুখে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দিয়ে তিন বৎসর ধরে অপেক্ষা করবেন তোমার কাছ থেকে কোনো দুঃসংবাদ পাবার জন্য। তিন বছর দীর্ঘ মিয়াদ, কিছু-না-কিছু একটা ঘটবেই। তখন বাড়ি বয়ে এসে বগদানফ সায়েব তোমার সামনে মাথা নিচু করে জানুতে হাত রেখে বসবেন, মুখে ঐ এক কথা 'বলিনি, তখনি বলিনি?'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'বড় বড় সাধক মহাপুরুষ যেন এক-একটা কাঠের গুঁড়ি হয়ে ভেসে যাচ্ছেন। শত শত কাক তারই উপরে বসে বিনা মেহন্নতে ভবনদী পার হয়ে যায়।'

বগদানফের পাল্লায় পড়লে তিন দিনে দুনিয়ার কুল্লে কুসংস্কারের সম্পূর্ণ তালিকা আপনার মুখস্থ হয়ে যাবে, এক মাসের ভিতর সেগুলো মানতে আরম্ভ করবেন, দু' মাসের ভিতর দেখতে পাবেন, বগদানফ-কাঠের গুঁড়িতে আপনি একা নন, আপনার এবং সায়েবের পরিচিত প্রায় সবাই তার উপরে বসে বসে ঝিমোচ্ছেন। ঘোর বেলেল্লা দু'-একটা নাস্তিকের কথা অবিশ্যি আলাদা। তারা প্রেম দিলেও কলসীর কানা মারে।

দয়ালু বন্ধুবৎসল ও সদানন্দ পুরুষ। তার মুক্ত হস্তের বর্ণনা করতে গিয়ে ফরাসী অধ্যাপক বেনওয়া বলেছিলেন, 'ইল্ আশেৎ লে মাশিন আ পেসে লে মাকারনি।' অর্থাৎ 'মাকারনি' ফুটো করার জন্য তিনি মেশিন কেনেন।' সোজা বাঙলায় 'কাকের ছানা কেনেন'।

কাবুলের বিদেশী দুনিয়ার কেন্দ্রস্থল ছিলেন বগদানফ সায়েব—একটি আস্ত প্রতিষ্ঠান বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাই তাঁর সম্বন্ধে এত কথা বলতে হল।

চোদ্দ

এক বৃদ্ধা দুঃখ করে বলেছিলেন, 'পালা-পরবে নেমন্তন্ন পেলে অরক্ষণীয়া মেয়ে থাকলে মায়ের মহা বিপদ উপস্থিত হয়। রেখে গেলে গলার আল, নিয়ে গেলে লোকের গাল।' তারপর বুঝিয়ে বলেছিলেন, বাড়িতে যদি মেয়েকে রেখে যাও তাহলে সমস্তক্ষণ দুর্ভাবনা, ভালো করলুম না মন্দ করলুম; সঙ্গে যদি নিয়ে যাও তবে সক্কলের কাছ থেকে একই গালাগাল, এতদিন ধরে বিয়ে দাওনি কেন?'

দেশভ্রমণে দেখলুম একই অবস্থা। মোকামে পৌঁছেই প্রশ্ন, দেশটার ঐতিহাসিক পটভূমিকা দেব, কি দেব না। যদি না দাও তবে সমস্তক্ষণ দুর্ভাবনা, ভালো করলুম, না, মন্দ করলুম। যদি দাও তবে লোকের গালাগাল নিশ্চিত খেতে হবে। বিশেষ করে আফগানিস্থানের বেলা, কারণ অরক্ষণীয়া কন্যার যে রকম বিয়ে হয়নি, আফগানিস্থানেরও ইতিহাস তেমনি লেখা হয়নি। আফগানিস্থানের প্রাচীন ইতিহাস পোঁতা আছে সে দেশের মাটির তলায়, আর ভারতবর্ষের পুরাণ-মহাভারতে। আফগানিস্থান গরীব দেশ, ইতিহাস গড়ার জন্য মাটি ভাঙবার ফুরসৎ আফগানের নেই, মাটি যদি সে নিতান্তই খোঁড়ে তবে সে কাবুলী মোন্-জো-দড়ো বের করার জন্য নয়—কয়লার খনি পাবার আশায়। পুরাণ ঘাঁটাঘাঁটি করার মত পাণ্ডিত্য কাবুলীর এখনো হয়নি—আমাদেরই কতটা হয়েছে কে জানে? পুরাণের কতটা সত্যিকার ইতিহাস আর কতটা ইতিহাস-পাগলাদের বোকা বানাবার জন্য পুরাণকারের নির্মম অট্টহাস তারই মীমাংসা করতে অর্ধেক জীবন কেটে যায়।

আফগানিস্থানের অর্বাচীন ইতিহাস নানা ফার্সী পাণ্ডুলিপিতে এদেশে ওদেশে, অন্ততঃ চারখানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে আছে। এদেশের মাল নিয়ে পণ্ডিতেরা নাড়াচাড়া করেছেন—মাহমুদ, বাবুরের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষের পাঠান-তুর্কী-মোগল যুগের ইতিহাস লেখার জন্য। কিন্তু বাবুরের আত্মজীবনী সঙ্গে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় পণ্ডিত—আফগানের কথাই ওঠে না—কাবুল হিন্দুকুশ, বদখশান্ বল্খ, মৈমানা হিরাতে ঘোরাঘুরি করেননি কারণ আফগান ইতিহাস লেখার শিরঃপীড়া নিয়ে ভারতীয় পণ্ডিত এখনও উদ্ব্যস্ত হননি। অথচ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আফগানিস্থানের ইতিহাস না লিখে ভারত-ইতিহাস

লেখবার জো নেই, আফগান রাজনীতি না জেনে ভারতের সীমান্ত প্রদেশ ঠাণ্ডা রাখবার কোনো মধ্যমনারায়ণ নেই।

গোদের উপর আরেক বিষ-ফোঁড়া—আফগানিস্থানের উত্তর ভাগ অর্থাৎ বল্‌খ্‌-বদখশানের ইতিহাস তার সীমান্ত নদী আমুদরিয়ার (গ্রীক অক্সুস, সংস্কৃত বক্ষু) ওপারের তুর্কীস্থানের সঙ্গে, পশ্চিমভাগ অর্থাৎ হিরাত অঞ্চল ইরানের সঙ্গে, পূর্বভাগ অর্থাৎ কাবুল জলালাবাদ খাস ভারতবর্ষ ও কাশ্মীরের ইতিহাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে নানা যুগে নানা রঙ ধরেছে। আফগানিস্থানের তুলনায় সুইটজার-ল্যাণ্ডের ইতিহাস লেখা ঢের সোজা—যদিও সেখানে তিনটে ভিন্ন জাত আর চারটে ভাষা নিয়ে কারবার।

আর শেষ বিপদ, যে দু'চারখানা কেতাবপত্র আছে সেগুলো খুললেই দেখতে পাবেন, পণ্ডিতেরা সব রামদা উঁচিয়ে আছেন। 'গান্ধার' লিখেই সেই রামদা—'?'—উঁচিয়েছেন অর্থাৎ 'গান্ধার কোথায়'? 'কাম্বোজ' বলেই সেই খড়্গ—'?'—অর্থাৎ 'কাম্বোজ বলতে কি বোঝো'? 'কম্বুকণ্ঠী' বা 'কম্বুগ্রীব' বলতে বোঝায় যার গলায় শাঁখের গায়ের তিনটে দাগ কাটা রয়েছে—যেমনতর বুদ্ধের গলায়। কম্বোজ দেশ কি তবে গিরি উপত্যকার কণ্ঠী-ঝোলানো দেশ আফগানিস্থান, অথবা কম্বু যেখানে পাওয়া যায় অর্থাৎ সমুদ্র-পারের দেশ বেলুচিস্থান? এমন কি দেশ-গুলোর নামের পর্যন্ত ঠিক ঠিক বানান নেই, যেমন ধরুন বল্‌খ্‌—কখনো বল্‌হিকা, কখনো বাল্‌হিকা, কখনো বালহীকা। সে কি তবে ফেরদৌসী উল্লিখিত বল্‌খ্‌—যেখানে জরথুস্ত্র রাজা গুশ্‌ৎআস্‌প্‌কে আবেস্তা মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন? সেখান থেকেই কি আজকের দিনের কাবুলীরা জাফরান আর হিঙ নিয়ে আসে? কারণ ঐ দুয়ের নামই তো সংস্কৃতে বাল্‌হিকম্‌।

রাসেল বলেছেন, 'পণ্ডিতজন যে স্থলে মতানৈক্য প্রকাশ করেন, মূর্খ যেন তথায় ভাষণ না করে।'

আমার ঠিক উল্টো বিশ্বাস—আমার মনে হয় ঠিক ঐ জায়গায়ই তার কিছু বলার সুযোগ—পণ্ডিতরা তখন একজোট হতে পারেন না বলে সে বারোয়ারি কিল থেকে নিষ্কৃতি পায়।

পণ্ডিতে মূর্খে মিলে আফগানিস্থান সম্বন্ধে যে সব তথ্য আবিষ্কার করেছেন তার মোটামুটি তত্ত্ব এই—

আর্যজাতি আফগানিস্থান, খাইবার পাস হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিল—পামির, দার্দিস্থান বা পৈশাচভূমি কাশ্মীর হয়ে নয়। বোগাজ কো-ই বর্ণিত মিতানি রাজ্য ধ্বংসের পরে যদি এসে থাকে তবে প্রচলিত আফগান কিংবদন্তী যে আফগানরা

ইহুদীদের অন্যতম পথভ্রষ্ট উপজাতি সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। অর্থাৎ কিংবদন্তী দেশ ঠিক রেখেছে কিন্তু পাত্র নিয়ে গোলমাল করে ফেলেছে।

গান্ধারী কান্দাহার থেকে এসেছিলেন। পাঠান মেয়ের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ দেখেই বোধ করি মহাভারতকার তাকে শতপুত্রবতীরূপে কল্পনা করেছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের ইতিহাস স্পষ্টতর রূপ নিতে আরম্ভ করে। উত্তর-ভারতের ষোলটি রাজ্যের নির্ঘণ্টে গান্ধার ও কাম্বোজের উল্লেখ পাই। তাদের বিস্তৃতি প্রসার সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে পণ্ডিতেরা সেই রামদা দেখান।

এ-যুগে এবং তারপরও বহুযুগ ধরে ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যে যেরকম কোনো সীমান্তরেখা ছিল না, ঠিক তেমনি আফগান ও ইন্দো-ইরানিয়ান ভূমি পারস্যের মধ্যে কোনো সীমান্তভূমি ছিল না। বক্ষু বা আমুদরিয়ার উভয় পারের দেশকে সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতের অংশরূপে ধরা হয়েছে, প্রাচীন ইরানী সাহিত্যে তাকে আবার ইরানের অংশরূপে গণ্য করা হয়েছে।

তারপর ইরানী রাজা সায়েরাস (কুরশ) সম্পূর্ণ আফগানিস্থান দখল করে ভারতবর্ষের সিন্ধুনদ পর্যন্ত অগ্রসর হন। সিকন্দর শাহের সিন্ধুদেশ জয় পর্যন্ত আফগানিস্থান ও পশ্চিম-সিন্ধু ইরানের অধীনে থাকে।

সিকন্দর উত্তর-আফগানিস্থান হয়ে ভারতবর্ষে ঢোকেন কিন্তু তাঁর প্রধান সৈন্য-দল খাইবারপাস হয়ে পেশাওয়ারে পৌছয়। খাইবার পেরোবার সময় সীমান্তের পার্বত্য জাতি পাহাড়ের চূড়াতে বসে সিকন্দরী সৈন্যদলকে এতই উদ্ব্যস্ত করেছিল যে গ্রীক সেনাপতি তাদের শহর গ্রাম জ্বালিয়ে তার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। সিকন্দরের সিন্ধুজয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে রকম জোর দাগ কেটে গিয়েছে, তেমনি গ্রীক অধিকারের ফলে আফগানিস্থানও ভৌগোলিক আরিয়া, আরা-খোসিয়া, গেদ্রোসিয়া, পারোপানিসোদাই ও দ্রাঙ্গিয়ানা অর্থাৎ হিরাত, বল্‌খ্‌, কাবুল, গজনী ও কান্দাহার প্রদেশে বিভক্ত হয়ে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক রূপ নিতে আরম্ভ করে।

সিকন্দর শাহের মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সমস্ত উত্তর-ভারতবর্ষ দখল করে গ্রীকদের মুখোমুখি হন—ফলে হিন্দুকুশের উত্তরের বাল্‌হিক প্রদেশ ছাড়া সমস্ত আফগানিস্থান তাঁর অধীনে আসে। মৌর্যবংশের পতন ও শুঙ্গবংশের অভ্যুদয় পর্যন্ত আফগানিস্থান ভারতবর্ষের অংশ হয়ে থাকে।

ভারতীয় আর্যদের চতুর্বেদ ও ইরানী আর্যদের আবেস্তা একই সভ্যতার বিকাশ। কিন্তু মৌর্যযুগে এক দিকে যেমন বেদবিরোধী বৌদ্ধধর্মের প্রসার হয়,

অন্যদিকে তেমনি ইরানী ও গ্রীক ভাস্কর শিল্প ভারতীয় কলাকে প্রায় সম্পূর্ণ অভিভূত করে ফেলে। অশোকের বিজয়স্তম্ভের মসৃণতা ইরানী ও তার রসবস্তু গ্রীক। সে-যুগের বিশুদ্ধ ভারতীয় কলার যে নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তার আকার রূঢ়, গতি পঙ্কিল কিন্তু সে ভবিষ্যৎ বিকাশের আশায় পূর্ণগর্ভ।

অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য মাধ্যন্তিক নামক শ্রমণকে আফগানিস্থানে পাঠান। সমস্ত দেশ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল কিনা বলবার উপায় নেই কিন্তু মনে হয় আফগানিস্থানের অনুর্বরতা বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্তরায় ছিল বলে আফগান জনসাধারণের পক্ষে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল। দুই শতাব্দীর ভিতরেই আফগানিস্থানের বহু গ্রীক সিথিয়ান ও তুর্ক বুদ্ধের শরণ নিয়ে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে বেদ-আবেস্তার ঐতিহ্য বৌদ্ধধর্মের ভিতর দিয়ে কিছুটা বাঁচিয়ে রাখে।

উত্তর-আফগানিস্থানের বল্‌খ্‌ প্রদেশ মৌর্য সম্রাটদের যুগে গ্রীক সাম্রাজ্যের অংশীভূত ছিল। মৌর্যবংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বল্‌খ্‌ অঞ্চলে গ্রীকদের ভিতর অন্তঃকলহ সৃষ্টি হয় ও বল্‌খের গ্রীকগণ হিন্দুকুশ অতিক্রম করে কাবুল উপত্যকা দখল করে। তারপর পাঞ্জাবে ঢুকে গিয়ে আরো পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে। এদের একজন রাজা মেনান্দের (পালি ধর্মগ্রন্থ 'মিলিন্দপঞ্‌হো'র রাজা মিলিন্দ) নাকি পূর্বে পাটলিপুত্র ও দক্ষিণে (আধুনিক) করাচী পর্যন্ত আক্রমণ করেন।

মধ্য ও দক্ষিণ-আফগানিস্থান তথা পশ্চিম-ভারতের গ্রীক রাজাদের কোনো ভালো বর্ণনা পাবার উপায় নেই। শুধু এক বিষয়ে ঐতিহাসিকের তৃষ্ণা তাঁরা মেটাতে জানেন। কাবুল থেকে ত্রিশ মাইল দূরে বেগ্রাম উপত্যকায় এঁদের তৈরী হাজার হাজার মুদ্রা প্রতি বৎসর মাটির তলা থেকে বেরোয়। খ্রীষ্টপূর্ব ২৬০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১২০ রাজ্যকালের ভিতর অন্তত উনত্রিশজন রাজা ও তিনজন রানীর নামচিহ্নিত মুদ্রা এ-যাবৎ পাওয়া গিয়েছে। এগুলোর উপরে গ্রীক ও খরোষ্ঠি এবং শেষের দিকের মুদ্রাগুলোর উপরে গ্রীক ও ব্রাহ্মী হরফে লেখা রাজা রানীর নাম পাওয়া যায়।

এ যুগে রাজায় রাজায় বিস্তর যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছিল কিন্তু আফগানিস্থান ও পশ্চিম ভারতের যোগসূত্র অটুট ছিল।

আবার দুর্যোগ উপস্থিত হল। আমুদরিয়ার উত্তরের শক জাতি ইউয়েচিদের হাতে পরাজিত হয়ে আফগানিস্থান ছেয়ে ফেলল। কাবুল দখল করে তারা দক্ষিণ-পশ্চিম দু'দিকেই ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ-আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ও সিন্ধুদেশে তাদের বসতি পাকাপাকি হলে পর এই অঞ্চলের নাম সংস্কৃতে

শকদ্বীপ ও ইরানীতে সকস্তান হয়। বর্বর শকেরা ইরানী, গ্রীক ও ভারতীয়দের সংস্রবে এসে কিছুটা সভ্য হয়েছিল বটে কিন্তু আফগানিস্থানের ইতিহাসে তারা কিছু দিয়ে যেতে পারেনি।

শকদের হারায় ইন্দো-পার্থিয়ানরা। এদের শেষ রাজা গন্ধফারনেস্ নাকি যীশুখ্রীষ্টের শিষ্য সেণ্ট টমাসের হাতে খ্রীষ্টান হন। কিন্তু এই সেণ্ট টমাসের হাতেই নাকি আবিসিনিয়াবাসী হাবশীরাও খ্রীষ্টান হয় ও এঁরই কাছে মালাবার ও তামিলনাড়ের হিন্দুরাও নাকি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। মাদ্রাজের কয়েক মাইল দূরে এক পাহাড়ের উপর সেণ্ট টমাসের কবর দেখানো হয়। কাজেই আফগানিস্থানে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার বোধ করি বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

কুষণ সম্রাটদের ইতিহাস ভারতে অজানা নয়। কুষণ-বংশের দ্বিতীয় রাজা বিম শক এবং ইরানী পার্থিয়ানদের হারিয়ে আফগানিস্থান দখল করেন। কণিষ্ক পশ্চিমে ইরান-সীমান্ত ও উত্তরে কাশগড় খোটান, ইয়ারকন্দ পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। পেশাওয়ারের বাইরে কণিষ্ক যে স্তূপ নির্মাণ করিয়ে বুদ্ধের দেহাস্থি রক্ষা করেন, তার জন্য তিনি গ্রীক শিল্পী নিযুক্ত করেন। সে-শিল্পী ভারতীয় গ্রীক না আফগান গ্রীক বলা কঠিন—দরকারও নেই—কারণ পশ্চিম-ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যে তখনো সংস্কৃতিগত কোনো পার্থক্য ছিল না।

যে-স্তূপে কণিষ্ক শেষ বৌদ্ধ অধিবেশনের প্রতিবেদন তাম্রফলকে খোদাই করে রেখেছিলেন তার সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি। জলালাবাদে যে অসংখ্য স্তূপ এখনো খোলা হয়নি তারই একটার ভিতরে যদি সে প্রতিবেদন পাওয়া যায় তাহলে আফগান ঐতিহাসিকেরা (?) আশ্চর্য হবেন না। কণিষ্ককে যদি ভারতীয় রাজা বলা হয়, তাহলে তাঁকে আফগান রাজা বলতেও কোনো আপত্তি নেই। ধর্মের কথা এখানে অবান্তর—কণিষ্ক বৌদ্ধ হওয়ার বহুপূর্বেই আফগানিস্থান তথাগতের শরণ নিয়েছিল।

ভারতবর্ষে কুষণ-রাজ্য পতনের পরও আফগানিস্থানে কিদার কুষণগণ দু'শ' বছর রাজত্ব করেন।

এ যুগের সবচেয়ে মহৎ বাণী গান্ধার শিল্পে প্রকাশ পায়। ভারতীয় ও গ্রীক শিল্পীর যুগ্ম প্রচেষ্টায় যে কলা বৌদ্ধধর্মকে রূপায়িত করে তার শেষ নিদর্শন দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। তার যৌবনমধ্যাহ্ন আফগানিস্থান ও পূর্ব-তুর্কীস্থানের ষষ্ঠ শতকের শিল্পে স্বপ্রকাশ। গুপ্তযুগের শিল্পপ্রচেষ্টা গান্ধারের কাছে কতটা ঋণী তার ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি। ভারতবর্ষের সংকীর্ণ জাতীয়তা-বোধ কখনো কখনো গান্ধার শিল্পের নিন্দা করেছে—যেদিন বৃহত্তর দৃষ্টি দিয়ে

দেখতে শিখব সেদিন জানব যে, ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানকে পৃথক করে দেখা পরবর্তী যুগের কুসংস্কার। বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রেরণায় ভারত অনুভূতির ক্ষেত্রে যে সার্বভৌমিকত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল, পরবর্তী যুগে তা আর কখনো সম্ভবপর হয়নি। আফগানিস্থানের ভূগর্ভ থেকে যেমন যেমন গান্ধার শিল্পের নিদর্শন বেরোবে, সঙ্গে সঙ্গে সে দেশের চারুকলার ইতিহাস লেখা হয়ে ভারতবর্ষকে তার ঋণ স্বীকার করাতে বাধ্য করবে।

ভারতবর্ষে যখন গুপ্ত-সম্রাটদের সুশাসনে সনাতনধর্ম বৈষ্ণব রূপ নিয়ে প্রকাশ পেল, আফগানিস্থান তখনো বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করেনি। মৌর্যদের মত গুপ্তরা আফগানিস্থান জয় করার চেষ্টা করেননি, কিন্তু আফগানিস্থানে পরবর্তী যুগের শক শাসনপতিগণ হীনবল। পঞ্চম শতকের চীন পর্যটক ফা-হিয়েন কাবুল খাইবার হয়ে ভারতবর্ষে আসবার সাহস করেননি, খুব সম্ভব আফগান সীমান্তের অরাজকতা থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে অনেক দূরের অনেক কঠিন রাস্তা পামির কাশ্মীর হয়ে ভারতবর্ষ পৌছান।

তারপর বর্বর হূণ অভিযান ঠেকাতে গিয়ে ইরানের রাজা ফিরোজ প্রাণ দেন। হূণ অভিযান আফগানিস্থানের বহু মঠ ধ্বংস করে ভারতবর্ষে পৌছয়—গুপ্ত সম্রাটদের সঙ্গে তাদের যে সব লড়াই হয় সেগুলো ভারতবর্ষের ইতিহাসে লেখা আছে। এই হূণ এবং আফগানদের সংমিশ্রণের ফলে পরবর্তী যুগে রাজপুত বংশের সূত্রপাত।

সপ্তম শতকে হিউয়েন-সাঙ তাশকন্দ সমরকন্দ হয়ে, আমুদরিয়া অতিক্রম করে কাবুল পৌছন। কাবুল তখন কিছু হিন্দু, কিছু বৌদ্ধ। ততদিন ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের নবজীবন লাভের স্পন্দন কাবুল পর্যন্ত পৌছেছিল। শান্ত ভারতবাসীই যখন বেশীদিন বৌদ্ধধর্ম সইতে পারল না তখন দুর্ধর্ষ আফগানের পক্ষে যে জীবে দয়ার বাণী বলে মেনে চলতে কষ্ট হয়েছিল তাতে বিশেষ সন্দেহ করার কারণ নেই। হিউয়েন-সাঙ কান্দাহার গজনী কাবুলকে ভারতবর্ষের অংশরূপে গণ্য করেছেন।

এখন আরব ঐতিহাসিকদের যুগ। তাঁদের মতে আরবরা যখন প্রথম আফগানিস্থানে এসে পৌছয় তখন সে-দেশ কণিষ্কের বংশধর তুর্কী রাজার অধীনে ছিল। কিন্তু পরে তার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী সিংহাসন দখল করে ব্রহ্মণ্য রাজ্য স্থাপন করেন। ৮৭১ সনে ইয়াকুব-বিন-লয়েস কাবুল দখল করেন। শাহিয়া বংশ তখন পাঞ্জাবে এসে আশ্রয় নেন—শেষ রাজা ত্রিলোচন পাল গজনীর সুলতান মাহমুদের হাতে ১০২১ সনে পরাজিত হন। আফগানিস্থানের শেষ হিন্দু রাজবংশের বাকি

ইতিহাস কাশ্মীরে। কহ্লনের রাজতরঙ্গিণীতে তাঁদের বর্ণনা আছে।

এখানে এসে ভারতীয় পণ্ডিতগণ এক প্রকাণ্ড ঢেরা কাটেন। আমি পণ্ডিত নই, আমার মনে হয় তার কোনোই কারণ নেই। প্রথম আর্য অভিযানের সময়—কিম্বা তারও পূর্ব থেকে—আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষ নানা যুদ্ধবিগ্রহের ভিতর দিয়ে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত একই ঐতিহ্য নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখবার চেষ্টা করেছে। যদি বলা হয় আফগানরা মুসলমান হয়ে গেল বলে তাদের অন্য ইতিহাস, তাহলে বলি, তারা একদিন অগ্নি-উপাসনা করেছিল, গ্রীক দেবদেবীর পূজা করেছিল, বেদবিরোধী বৌদ্ধধর্মও গ্রহণ করেছিল। তবুও যখন দুই দেশের ইতিহাস পৃথক করা যায় না, তখন তাদের মুসলমান হওয়াতেই হঠাৎ কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল? বুদ্ধের শরণ নিয়ে কাবুলী যখন মগধ-বাসী হয়নি, তখন ইসলাম গ্রহণ করে সে আরবও হয়ে যায়নি। ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে মুসলিম আফগানিস্থান—বিশেষ করে কান্দাহার, গজনী, কাবুল, জলালাবাদ বাদ দিলে ফ্রন্টিয়ার, বান্নু, কোহাট এমন কি পাঞ্জাবও বাদ দিতে হয়।

পার্থক্য তবে কোথায়? যদি কোনো পার্থক্য থাকে, তবে সে শুধু এইটুকু যে, মাহমুদ-গজনীর পূর্বে ভারতবর্ষের লিখিত ইতিহাস নেই, মাহমুদের পরে প্রতি যুগে নানা ভূগোল, নানা ইতিহাস লেখা হয়েছে। কিন্তু আমাদের জ্ঞান-অজ্ঞানের শক্ত জমি চোরাবালির উপর তো আর ইতিহাসের তাজমহল খাড়া করা হয় না।

মাহমুদের ইতিহাস নূতন করে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁর সভাপণ্ডিত অল-বীরুনীর কথা বাদ দেবার উপায় নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে ছয়জন পণ্ডিতের নাম করলে অল-বীরুনীর নাম করতে হয়। সংস্কৃত-আরবী অভিধান ব্যাকরণ সে যুগে ছিল না (এখনো নেই), অল-বীরুনী ও ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কোনো মাধ্যম ভাষা ছিল না। তৎসত্ত্বেও এই মহাপুরুষ কি করে সংস্কৃত শিখে, হিন্দুর জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, কাব্য, অলঙ্কার, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন সম্বন্ধে 'তহকীক-ই-হিন্দ' নামক বিরাট গ্রন্থ লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন সে এক অবিশাস্য প্রহেলিকা।

একাদশ শতাব্দীতে অল-বীরুনী ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ লিখেছিলেন—প্রত্যুত্তরে আজ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় আফগানিস্থান সম্বন্ধে পুস্তক লেখেননি। এক দারশীকুহ ছাড়া আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কেউ আরবী ও সংস্কৃতে এরকম অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখাতে পারেননি। এই বিংশ শতকেই ক'টি লোক সংস্কৃত আরবী দুই-ই জানেন আঙুলে গুনে বলা যায়।

ভারতবর্ষের পাঠান তুর্কী সম্রাটেরা আফগানিস্থানের দিকে ফিরে তাকাননি, কিন্তু আফগানিস্থানের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংস্কৃতিগত সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয়নি। একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। আলাউদ্দীন খিলজীর সভাকবি আমীর খুসরু ফার্সীতে কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর নাম ইরানে কেউ শোনেননি, কিন্তু কাবুল-কান্দাহারে আজকের দিনেও তাঁর প্রতিপত্তি হাফিজ-সাদীর চেয়ে কম নয়। 'ইশকিয়া' কাব্যে দেবলা দেবী ও খিজর খানের প্রেমের কাহিনী পড়েননি এমন শিক্ষিত মৌলবী আফগানিস্থানে আজও বিরল।

আফগানিস্থান—বিশেষ করে গজনীর—দৌত্যে উত্তর-ভারতবর্ষে ফার্সী ভাষা তার সাহিত্যসম্পদ, বাইজনটাইন সেরাসীন ইরানী স্থাপত্য, ইতিহাস-লিখনপদ্ধতি, ইউনানী ভেষজবিজ্ঞান, আরবী-ফার্সী শাস্ত্রচর্চা ইত্যাদি প্রচলিত হয়ে, নূতন নূতন ধারা বয়ে নব নব বিকাশের পথে এগিয়ে চলল। একদিন আফগানিস্থান গ্রীক ও ভারতবাসীকে মিলিয়ে দিয়ে গান্ধার-কলার সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল, পাঠান-তুর্কী যুগে সেই আফগানিস্থান আরব-ইরানের সঙ্গে ভারতবর্ষের হাত মিলিয়ে দিল।

তারপর তৈমুরের অভিযান।

তৈমুরের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরগণ সমরকন্দ ও হিরাতে নূতন শিল্পপ্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু আফগানিস্থানের হিরাত অতি সহজেই তুর্কী-স্থানের সমরকন্দকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তৈমুরের পুত্র শাহ্-রুখ চীন দেশ থেকে শিল্পী আনিয়ে ইরানীদের সঙ্গে মিলিয়ে হিরাতে নবীন চারুকলার পত্তন করেন। তৈমুরের পুত্রবধূ গৌহর শাদ শিক্ষাদীক্ষায় রানী এলিজাবেথ, ক্যাথরিনের চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন ছিলেন না। তাঁর আপন অর্থে তৈরী মসজিদ-মাদ্রাসা দেখে তৈমুরের প্রপৌত্র বাবুর বাদশাহ চোখ ফেরাতে পারেনি। এখনো আফগানি-স্থানে যেটুকু দেখবার আছে, সে ঐ হিরাতে—যে কয়টি মিনার ইংরেজের বর্বরতা সত্ত্বেও এখনো বেঁচে আছে, সেগুলো দেখে বোঝা যায় মধ্য-এশিয়ার সর্বকলা-শিল্প কী আশ্চর্য প্রাণবলে সম্মিলিত হয়ে এই অনুর্বর দেশে কী অপূর্ব মরূদ্যান সৃষ্টি করেছিল।

অল-বীরুনীর পর গৌহর শাদ, তারপর বাবুর বাদশাহ।

শ্বেতাঙ্গ পণ্ডিতের নির্লজ্জ জাত্যভিমানের চূড়ান্ত প্রকাশ হয় যখন সে বাবরের আত্মজীবনী অপেক্ষা জুলিয়াস সীজারের আত্মজীবনীর বেশী প্রশংসা করে। কিন্তু সে আলোচনা উপস্থিত মুলতুবী থাক।

আফগানিস্থান ভ্রমণে যাবার সময় একখানা বই সঙ্গে নিয়ে গেলেই যথেষ্ট—

সে-বই বাবুরের আত্মজীবনী। বাবুর কান্দাহার গজনী কাবুল হিরাতের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে আজকের আফগানিস্থানের বিশেষ তফাত নেই।

বাবুর ফরগনার রাজা নন, আফগানিস্থানের শাহানশাহ নন, দিল্লীর সম্রাটও নন। আত্মজীবনীর অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশ পায়, বাবুর এসবের অতীত অত্যন্ত সাধারণ মাটির-গড়া মানুষ। হিন্দুস্থানের নববর্ষার প্রথম দিনে তিনি আনন্দে অধীর, জলালাবাদের আখ খেয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ—সেই আখ আপন দেশ ফরগনায় পোঁতবার জন্য টবে করে হিন্দুকুশের ভিতর দিয়ে চালান করেছেন, আর ঠিক তেমনি হিরাত থেকে গৌহর শাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পকলা টবে করে নিয়ে এসে দিল্লীতে পুঁতে ভাবছেন এর ভবিষ্যৎ কি, এ তরু মঞ্জরিত হবে তো?

হয়েছিল। তাজমহল।

বাবুর ভারতবর্ষ ভালবাসেননি। কিন্তু গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল বলে বুঝতে পেরেছিলেন, ফরগনা কাবুলের লোভে যে বিজয়ী বীর দিল্লীর তখ্‌ৎ ত্যাগ করে সে মূর্খ। দিল্লীতে নূতন সাম্রাজ্য স্থাপনা করলেন তিনি আপন প্রাণ দিয়ে, কিন্তু দেহ কাবুলে পাঠাবার হুকুম দিলেন মরবার সময়।

সমস্ত কাবুল শহরে যদি দেখবার মত কিছু থাকে, তবে সে বাবুরের কবর।

হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আওরঙ্গজেব। নব মৌর্য সাম্রাজ্য।

নাদির উত্তর-ভারতবর্ষ লণ্ডভণ্ড করে ফেরার পথে আফগানিস্থানে নিহত হন। লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য আফগান আহমদ শাহ আবদালীর (সাদদোজাই দুররানী) হস্তগত হয়। ১৭৪৭ গালের সমস্ত আফগানিস্থান নিয়ে সর্বপ্রথম নিজস্ব রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হল। ১৭৬১ সালে পানিপথ। ১৭৯৩ সালে শিখদের নবজীবন।

ইতিমধ্যে মহাকাল শ্বেতবর্ণ ধারণ করে ভারতবর্ষে তাণ্ডবলীলা আরম্ভ করেছেন। ভারত-আফগানের ইতিহাসে এই প্রথম এক জাতের মানুষ দেখা দিল যে এই দুই দেশের কোনো দেশকেই আপন বলে স্বীকার করল না। এ যেন চিরস্থায়ী তৈমুর-নাদির।

উনবিংশ এবং বিংশ শতকে ইংরেজ হয় আফগানিস্থান জয় করে রাজ্য স্থাপনা করার চেষ্টা করেছে, নয় আফগান সিংহাসনে আপন পুতুল বসিয়ে রুশের মোকাবেলা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আফগানিস্থান জয় করা কঠিন না হলেও দখল করা অসম্ভব। বিশেষত 'কাফির' ইংরেজের পক্ষে। আফগান মোল্লার অজ্ঞতা তার পাহাড়েরই মত উঁচু, কিন্তু ইংরেজকে সে বিলক্ষণ চেনে।

ইংরেজের পরম সৌভাগ্য যে, ১৮৫৭ সালে আমীর দোস্ত মুহম্মদ ইংরেজকে দোস্তী দেখিয়েছিলেন। তার চরম সৌভাগ্য যে, ১৯১৫ সালে রাজা মহেন্দ্র-

প্রতাপ আমীর হবীব উল্লাকে ভারত আক্রমণে উৎসাহিত করতে পারেননি।

কিন্তু তিন বারের বার বেল টাকে পড়ল। আমান উল্লা ইংরেজকে সামান্য উত্তম-মধ্যম দিয়েই স্বাধীনতা পেয়ে গেলেন। তাই বোধ হয় কাবুলীরা বলে 'খুদা-দাদ' আফগানিস্থান অর্থাৎ 'বিধিদত্ত' আফগানিস্থান।

জিন্দাবাদ খুদা-দাদ আফগানিস্থান!

পনর

বাসা পেলুম কাবুল থেকে আড়াই মাইল দূরে খাজামোল্লা গ্রামে। বাসার সঙ্গে সঙ্গে চাকরও পেলুম।

অধ্যক্ষ জিরার জাতে ফরাসী। কাজেই কায়দামাফিক আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এর নাম আবদুর রহমান। আপনার সব কাজ করে দেবে—জুতো বুরুশ থেকে খুনখারাবি।' অর্থাৎ ইনি 'হরফন-মৌলা' বা 'সকল কাজের কাজী'।

জিরার সায়েব কাজের লোক, অর্থাৎ সমস্ত দিন কোনো না কোনো মন্ত্রীর দপ্তরে ঝগড়া-বচসা করে কাটান। কাবুলে এরই নাম কাজ। 'ও রভোয়া, বিকেলে দেখা হবে' বলে চলে গেলেন।

কাবুল শহরে আমি দুটি নরদানব দেখেছি। তার একটি আবদুর রহমান—দ্বিতীয়টির কথা সময় এলে হবে।

পরে ফিতে দিয়ে মেপে দেখেছিলুম—ছ'ফুট চার ইঞ্চি। উপস্থিত লক্ষ্য করলুম লম্বাই মিলিয়ে চওড়াই। দুখানা হাত হাঁটু পর্যন্ত নেমে এসে আঙুলগুলো দু'কাঁদি মর্তমান কলা হয়ে ঝুলছে। পা দুখানা ডিঙি নৌকার সাইজ। কাঁধ দেখে মনে হল, আমার বাবুর্চি আবদুর রহমান না হয়ে সে যদি আমীর আবদুর রহমান হত, তবে অনায়াসে গোটা আফগানিস্থানের ভার বইতে পারত। এ কান ও কান জোড়া মুখ—হাঁ করলে চওড়াচওড়ি কলা গিলতে পারে। এবড়ো-থেবড়ো নাক—কপাল নেই। পাগড়ি থাকায় মাথার আকার-প্রকার ঠাহর হল না, তবে আন্দাজ করলুম বেবি সাইজের হ্যাটও কান অবধি পৌঁছবে।

রঙ ফর্সা, তবে শীতে গ্রীষ্মে চামড়া চিরে ফেঁড়ে গিয়ে আফগানিস্থানের রিলিফ ম্যাপের চেহারা ধরেছে। দুই গাল কে যেন থাবড়া মেরে লাল করে দিয়েছে—কিন্তু কার এমন বুকের পাটা? রক্তও তো মাখবার কথা নয়।

পরনে শিলওয়ার, কুর্তা আর ওয়াস্‌কিট্‌।

চোখ দুটি দেখতে পেলুম না। সেই যে প্রথম দিন ঘরে ঢুকে কার্পেটের দিকে নজর রেখে দাঁড়িয়েছিল, শেষ দিন পর্যন্ত ঐ কার্পেটের অপরূপ রূপ থেকে তাকে বড় একটা চোখ ফেরাতে দেখিনি। গুরুজনদের দিকে তাকাতে নেই, আফগানিস্থানেও নাকি এই ধরনের একটা সংস্কার আছে।

তবে তার নয়নের ভাবের খেলা গোপনে দেখেছি। দুটো চিনেমাটির ডাবরে যেন দুটো পান্তুয়া ভেসে উঠেছে।

জরিপ করে ভরসা পেলুম, ভয়ও হল। এ লোকটা ভীমসেনের মত রান্না তো করবেই, বিপদে-আপদে ভীমসেনেরই মত আমার মুশকিল-আসান হয়ে থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন, এ যদি কোনোদিন বিগড়ে যায়? তবে? কোনো একটা হদিসের সন্ধানে মগজ আতিপাতি করে খুঁজতে আরম্ভ করলুম। হঠাৎ মনে পড়ল দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথকে কুইনিন খেতে অনুরোধ করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'কুইনিন জ্বর সারাবে বটে, কিন্তু কুইনিন সারাবে কে? কুইনিন সরাবে কে?'

তিনি কুইনিন খাননি। কিন্তু আমি মুসলমান—হিন্দু যা করে, তার উল্টো করতে হয়। তদ্দণ্ডেই আবদুর রহমান আমার মেজর ডোমো, শেফ্ দ্য কুইজিন, ফাই-ফরমাশ-বরদার তিনেক্কেতিন হয়ে একরারনামা পেয়ে বিড়বিড় করে যা বলল, তার অর্থ 'আমার চশম্, শির ও জান দিয়ে হুজুরকে খুশ করার চেষ্টা করব।'

জিজ্ঞেস করলুম, 'পূর্বে কোথায় কাজ করেছ?'

উত্তর দিল, 'কোথাও না, পল্টনে ছিলুম, মেসের চার্জে। এক মাস হল খালাস পেয়েছি।'

'রাইফেল চালাতে পার?'

একগাল হাসল।

'কি কি রাঁধতে জানো?'

'পোলাও, কুর্মা, কাবাব, ফালুদা—।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ফালুদা বানাতে বরফ লাগে। এখানে বরফ তৈরী করার কল আছে?'

'কিসের কল?'

আমি বললুম, 'তাহলে বরফ আসে কোত্থেকে?'

বলল, 'কেন, ঐ পাগমানের পাহাড় থেকে।' বলে জানলা দিয়ে পাহাড়ের বরফ দেখিয়ে দিল। তাকিয়ে দেখলুম, যদিও গ্রীষ্মকাল, তবু সবচেয়ে উঁচু নীল পাহাড়ের গায়ে সাদা সাদা বরফ দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'বরফ আনতে ঐ উঁচুতে চড়তে হয়?'

বলল, 'না সায়েব, এর অনেক নিচে বড় বড় গর্তে শীতকালে বরফ ভর্তি করে রাখা হয়। এখন তাই খুঁড়ে তুলে গাধা বোঝাই করে নিয়ে আসা হয়।'

বুঝলুম, খবর-টবরও রাখে। বললুম, 'তা আমার হাঁড়িকুড়ি, বাসনকোসন তো কিছু নেই। বাজার থেকে সব কিছু কিনে নিয়ে এসো। রাত্তিরের রান্না আজ আর বোধ হয় হয়ে উঠবে না। কাল দুপুরের রান্না কোরো। সকালবেলা চা দিয়ো।'

টাকা নিয়ে চলে গেল।

বেলা থাকতেই কাবুল রওনা দিলুম। আড়াই মাইল রাস্তা—মৃদুমধুর ঠাণ্ডায় গড়িয়ে গড়িয়ে পৌঁছব। পথে দেখি এক পর্বতপ্রমাণ বোঝা নিয়ে আবদুর রহমান ফিরে আসছে। জিজ্ঞেস করলুম, 'এত বোঝা বইবার কি দরকার ছিল—একটা মুটে ভাড়া করলেই তো হত।'

যা বলল, তার অর্থ এই, সে যে-মোট বইতে পারে না, সে-মোট কাবুলে বইতে যাবে কে?

আমি বললুম, 'দুজনে ভাগাভাগি করে নিয়ে আসতে।'

ভাব দেখে বুঝলুম, অতটা তার মাথায় খেলেনি, অথবা ভাববার প্রয়োজন বোধ করেনি।

বোঝাটা নিয়ে আসছিল জালের প্রকাণ্ড থলেতে করে। তার ভিতর তেল-নুন-লকড়ি সবই দেখতে পেলুম। আমি ফের চলতে আরম্ভ করলে বলল, 'সায়েব রাত্রে বাড়িতেই খাবেন।' যেভাবে বলল, তাতে অচিন দেশের নির্জন রাস্তায় গাঁইগুঁই করা যুক্তিযুক্ত মনে করলুম না। 'হাঁ হাঁ, হবে হবে' বলে কি হবে ভালো করে না বুঝিয়ে হনহন করে কাবুলের দিকে চললুম।

খুব বেশী দূরে যেতে হল না। লব-ই-দরিয়া অর্থাৎ কাবুল নদীর পারে পৌঁছতে না পৌঁছতেই দেখি মসিয়ে জিরার টাঙ্গা হাঁকিয়ে টগবগাবগ করে বাড়ি ফিরছেন।

কলেজের বড়কর্তা বা বস্ হিসাবে আমাকে তিনি বেশ দু'-এক প্রস্থ ধমক দিয়ে বললেন, 'কাবুল শহরে নিশাচর হতে হলে যে তাগদ ও হাতিয়ারের প্রয়োজন, সে দুটোর একটাও তোমার নেই।'

বস্‌কে খুশী করবার জন্য যার ঘটে ফন্দি-ফিকিরের অভাব, তার পক্ষে কোম্পানির কাগজ হচ্ছে তর্ক না করা। বিশেষ করে যখন বসের উত্তমার্ধ তাঁরই পাশে বসে 'উই, সার্তেনমাঁ, এভিদামাঁ, অর্থাৎ অতি অবশ্য, সার্টেনলি, এভিডেন্টলি, বলে তাঁর কথায় সায় দেন। ইংলণ্ডে মাত্র একবার ভিক্টোরিয়া আলবার্ট আঁতাৎ

হয়েছিল ; শুনতে পাই ফ্রান্সে নাকি নিত্যি-নিত্যি, ঘরে ঘরে।

বাড়ি ফিরে এসে বসবার ঘরে ঢুকতেই আবদুর রহমান একটা দর্শন দিয়ে গেল এবং আমি যে তার তম্বীতেই ফিরে এসেছি, সে সম্বন্ধে আশ্বস্ত হয়ে হুট করে বেরিয়ে গেল।

তখন রোজার মাস নয়, তবু আন্দাজ করলুম সেহরির সময় অর্থাৎ রাত দুটোয় খাবার জুটলে জুটতেও পারে।

তন্দ্রা লেগে গিয়েছিল। শব্দ শুনে ঘুম ভাঙল। আবদুর রহমান মোগল তসবিরের গাড়ু-বদনার সমন্বয় আফতাবে বা ধারাযন্ত্র নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। মুখ ধুতে গিয়ে বুঝলুম, যদিও গ্রীষ্মকাল, তবু কাবুল নদীর বরফ-গলা জলে মুখ কিছুদিন ধরে ধুলে আমার মুখও আফগানিস্থানের রিলিফ ম্যাপের উঁচুনিচুর টক্করের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারবে।

খানা-টেবিলের সামনে গিয়ে যা দেখলুম, তাতে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না যে, আমার ভৃত্য আগা আবদুর রহমান খান এককালে মিলিটারি মেসের চার্জে ছিলেন।

ডাবর নয়, ছোটখাটো একটা গামলা ভর্তি মাংসের কোরমা বা পেঁয়াজ-ঘিয়ের ঘন ক্বাথে সেরখানেক দুম্বার মাংস—তার মাঝে মাঝে কিছু বাদাম কিসমিস লুকোচুরি খেলছে, এক কোণে একটি আলু অপাংক্তেয় হওয়ার দুঃখে ডুবে মরার চেষ্টা করছে। আরেক প্লেটে গোটা আষ্টেক ফুল বোম্বাই সাইজের শামী কাবাব। বারকোশ পরিমাণ থালায় এক ঝুড়ি কোফতা-পোলাও আর তার উপরে বসে আছে একটি আস্ত মুর্গী-রোস্ট।

আমাকে থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবদুর রহমান তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে অভয়বাণী দিল—রান্নাঘরে আরো আছে।

একজনের রান্না না করে কেউ যদি তিনজনের রান্না করে, তবে তাকে ধমক দেওয়া যায়, কিন্তু সে যদি ছ'জনের রান্না পরিবেষণ করে বলে রান্নাঘরে আরো আছে তখন আর কি করার থাকে ? অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর।

রান্না ভালো, আমার ক্ষুধাও ছিল, কাজেই গড়পড়তা বাঙালীর চেয়ে কিছু কম খাইনি। তার উপর অন্য রজনী প্রথম রজনী এবং আবদুর রহমানও ডাক্তারী কলেজের ছাত্র যে রকম তন্ময় হয়ে মড়া কাটা দেখে, সেই রকম আমার খাওয়ার রকম-বহর দুই-ই তার ডাবর-চোখ ভরে দেখে নিচ্ছিল।

আমি বললুম, 'ব্যস্! উৎকৃষ্ট রেঁধেছ আবদুর রহমান—।'

আবদুর রহমান অন্তর্ধান। ফিরে এল হাতে এক থালা ফালুদা নিয়ে। আমি

সবিনয় জানালুম যে, আমি মিষ্টি পছন্দ করি না।

আবদুর রহমান পুনরপি অন্তর্ধান। আবার ফিরে এল এক ডাবর নিয়ে—পেঁজা বরফের গুঁড়ায় ভর্তি। আমি বোকা বনে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এ আবার কি?'

আবদুর রহমান উপরের বরফ সরিয়ে দেখাল নীচে আঙুর। মুখে বলল, 'বাগেবালার বরকী আঙুর—তামাম আফগানিস্থানে মশহুর।' বলেই একখানা সসারে কিছু বরফ আর গোটা কয়েক আঙুর নিয়ে বসল। আমি আঙুর খাচ্ছি, ও ততক্ষণে এক-একটা করে হাতে নিয়ে সেই বরফের টুকরোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অতি সন্তর্পণে ঘষে—মেয়েরা যে রকম আচারের জন্য কাগজী নেবু পাথরের শিলে ঘষেন। বুঝলুম, বরফ-ঢাকা থাকা সত্ত্বেও আঙুর যথেষ্ট হিম হয়নি বলে এই মোলায়েম কায়দা। ওদিকে তালু আর জিবের মাঝখানে একটা আঙুরে চাপ দিতেই আমার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ঝিনঝিম করে উঠছে। কিন্তু পাছে আবদুর রহমান ভাবে তার মনিব নিতান্ত জংলী তাই খাইবারপাসের হিম্মৎ বুকে সঞ্চয় করে গোটা আষ্টেক গিললুম। কিন্তু বেশীক্ষণ চালাতে পারলুম না; ক্ষান্ত দিয়ে বললুম, 'যথেষ্ট হয়েছে আবদুর রহমান, এবারে তুমি গিয়ে ভালো করে খাও।'

কার গোয়াল, কে দেয় ধুঁয়ো। এবারে আবদুর রহমান এলেন চায়ের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে। কাবুলী সবুজ চা। পেয়ালায় ঢাললে অতি ফিকে হলদে রঙ দেখা যায়। সে চায়ে দুধ দেওয়া হয় না। প্রথম পেয়ালায় চিনি দেওয়া হয়, দ্বিতীয় পেয়ালায় তাও না। তারপর ঐ রকম তৃতীয়, চতুর্থ—কাবুলীরা পেয়ালা ছয়েক খায়, অবিশ্যি পেয়ালা সাইজে খুব ছোট, কফির পাত্রের মত।

চা খাওয়া শেষ হলে আবদুর রহমান দশ মিনিটের জন্য বেরিয়ে গেল। ভাবলুম এই বেলা দরজা বন্ধ করে দি, না হলে আবার হয়ত কিছু একটা নিয়ে আসবে। আস্ত উটের রোস্টটা হয়ত দিতে ভুলে গিয়েছে।

ততক্ষণে আবদুর রহমান পুনরায় হাজির। এবার এক হাতে থলে-ভর্তি বাদাম আর আখরোট, অন্য হাতে হাতুড়ি। ধীরে সুস্থে ঘরের এককোণে পা মুড়ে বসে বাদাম আখরোটের খোসা ছাড়াতে লাগল।

এক মুঠো আমার কাছে নিয়ে এসে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে বলল, 'আমার রান্না হুজুরের পছন্দ হয়নি।'

'কে বলল, পছন্দ হয়নি?'

'তবে ভালো করে খেলেন না কেন?'

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'কী আশ্চর্য, তোমার বপুটার সঙ্গে আমার তনুটা

মিলিয়ে দেখো দিকিনি—তার থেকে আন্দাজ করতে পারো না, আমার পক্ষে কি পরিমাণ খাওয়া সম্ভবপর ?'

আবদুর রহমান তর্কাতর্কি না করে ফের সেই কোণে গিয়ে আখরোট বাদামের খোসা ছাড়াতে লাগল।

তারপর আপন মনে বলল, 'কাবুলের আবহাওয়া বড়ই খারাপ। পানি তো পানি নয়, সে যেন গালানো পাথর। পেটে গিয়ে এক কোণে যদি বসল তবে ভরসা হয় না আর কোনো দিন বেরবে। কাবুলের হাওয়া তো হাওয়া নয়—আতসবাজির হল্কা। মানুষের ক্ষিদে হবেই বা কি করে।'

আমার দিকে না তাকিয়েই তারপর জিজ্ঞেস করল, 'হুজুর কখনো পানশির গিয়েছেন ?'

'সে আবার কোথায় ?'

'উত্তর-আফগানিস্থান। আমার দেশ—সে কী জায়গা! একটা আস্ত দুম্বা খেয়ে এক ঢোক পানি খান, আবার খিদে পাবে। আকাশের দিকে মুখ করে একটা লম্বা দম নিন, মনে হবে তাজী ঘোড়ার সঙ্গে বাজী রেখে ছুটতে পারি। পানশিরের মানুষ তো পায়ে হেঁটে চলে না, বাতাসের উপর ভর করে যেন উড়ে চলে যায়।

'শীতকালে সে কী বরফ পড়ে! মাঠ পথ পাহাড় নদী গাছপালা সব ঢাকা পড়ে যায়, ক্ষেত খামারের কাজ বন্ধ, বরফের তলায় রাস্তা চাপা পড়ে গেছে। কোনো কাজ নেই, কর্ম নেই, বাড়ি থেকে বেরনোর কথাই ওঠে না। আহা সে কি আরাম! লোহার বারকোশে আঙার জ্বালিয়ে তার উপর ছাই ঢাকা দিয়ে কম্বলের তলায় চাপা দিয়ে বসবেন গিয়ে জানলার ধারে। বাইরে দেখবেন বরফ পড়ছে, বরফ পড়ছে, পড়ছে, পড়ছে—দু দিন, তিন দিন, পাঁচ দিন, সাত দিন ধরে। আপনি বসেই আছেন, বসেই আছেন, আর দেখছেন চে তৌর বর্ফ ববারদ—কি রকম বরফ পড়ে।'

আমি বললুম, 'সাত দিন ধরে জানলার কাছে বসে থাকব ?'

আবদুর রহমান আমার দিকে এমন করুণ ভাবে তাকালো যে, মনে হল এ রকম বেরসিকের পাল্লায় সে জীবনে আর কখনো এতটা অপদস্থ হয়নি। ম্লান হেসে বলল, 'একবার আসুন, জানলার পাশে বসুন, দেখুন। পছন্দ না হয়, আবদুর রহমানের গর্দান তো রয়েছে।'

খেই তুলে নিয়ে বলল, 'সে কত রকমের বরফ পড়ে। কখনো সোজা, ছেঁড়া ছেঁড়া পেঁজা তুলোর মত, তারি ফাঁকে ফাঁকে আসমান জমিন কিছু কিছু দেখা

যায়। কখনো ঘুরঘুট্টি ঘন,—চাদরের মত নেবে এসে চোখের সামনে পর্দা টেনে দেয়। কখনো বয় জোর বাতাস,—প্রচণ্ড ঝড়। বরফের পাঁজে যেন সে-বাতাস ডাল গলাবার চর্কি চালিয়ে দিয়েছে। বরফের গুঁড়ো ডাইনে বাঁয়ে উপর নিচে এলোপাতাড়ি ছুটোছুটি লাগায়—হু হু করে কখনো একমুখো হয়ে তাজী ঘোড়াকে হার মানিয়ে ছুটে চলে। কখনো সব ঘুটঘুটে অন্ধকার, শুধু শুনতে পাবেন সোঁ—ওঁ—ওঁ—তার সঙ্গে আবার মাঝে মাঝে যেন দারুল আমানের এঞ্জিনের শিটির শব্দ। সেই ঝড়ে ধরা পড়লে রক্ষে নেই, কোথা থেকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে, না হয় বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাবেন বরফের বিছানায়, তারই উপর জমে উঠবে ছ'হাত উঁচু বরফের কম্বল—গাদা গাদা, পাঁজা পাঁজা। কিন্তু তখন সে বরফের পাঁজা সত্যিকার কম্বলের মত ওম্ দেয়। তার তলায় মানুষকে দু'দিন পরেও জ্যান্ত পাওয়া গিয়েছে।

'একদিন সকালে ঘুম ভাঙলে দেখবেন বরফ পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সূর্য উঠেছে—সাদা বরফের উপর সে রোশনির দিকে চোখ মেলে তাকানো যায় না। কাবুলের বাজারে কালো চশমা পাওয়া যায়, তাই পরে তখন বেড়াতে বেরোবেন। যে হাওয়া দম নিয়ে বুকে ভরবেন তাতে একরত্তি ধুলো নেই, বালু নেই, ময়লা নেই। ছুরির মত ধারালো ঠাণ্ডা হাওয়া নাক মগজ গলা বুক চিরে ঢুকবে, আবার বেরিয়ে আসবে ভিতরকার সব ময়লা ঝেঁটিয়ে নিয়ে। দম নেবেন, ছাতি এক বিঘৎ ফুলে উঠবে—দম ফেলবেন এক বিঘৎ নেমে যাবে। এক এক দম নেওয়াতে এক এক বছর আয়ু বাড়বে—এক একবার দম ফেলাতে একশ'টা বেমারি বেরিয়ে যাবে।

'তখন ফিরে এসে, হুজুর একটা আস্ত দুম্বা যদি না খেতে পারেন তবে আমি আমার গোঁপ কামিয়ে ফেলব। আজ যা রান্না করেছিলুম তার ডবল দিলেও আপনি ক্ষিদের চোটে আমায় কতল করবেন।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, আবদুর রহমান তোমার কথাই সই। শীতকালটা আমি পানশিরেই কাটাব।'

আবদুর রহমান গদগদ হয়ে বলল, 'সে বড় খুশীর বাৎ হবে হুজুর।'

আমি বললুম, 'তোমার খুশীর জন্য নয়, আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য।'

আবদুর রহমান ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকালো।

আমি বুঝিয়ে বললুম, 'তুমি যদি সমস্ত শীতকালটা জানলার পাশে বসে কাটাও তবে আমার রান্না করবে কে?'

ষোল

শো' কেসে রবারের দস্তানা দেখে এক আইরিশম্যান আরেক আইরিশম্যানকে জিজ্ঞেস করেছিল, জিনিসটা কোন্ কাজে লাগে। দ্বিতীয় আইরিশম্যানও সেই রকম, বলল, 'জানিসনে, এ দস্তানা পরে হাত ধোয়ার ভারী সুবিধে। হাত জলে ভেজে না, অথচ হাত ধোওয়া হল।'

কুঁড়ে লোকের যদি কখনো শখ হয় যে সে ভ্রমণ করবে অথচ ভ্রমণ করার ঝুঁকি নিতে সে নারাজ হয় তবে তার পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত পন্থা কাবুলের সংকীর্ণ উপত্যকায়। কারণ কাবুলে দেখবার মত কোনো বালাই নেই।

তিন বছর কাবুলে কাটিয়ে দেশে ফেরবার পর যদি কোনো সবজান্তা আপনাকে প্রশ্ন করেন, 'দেহ্-আফগানান যেখানে শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে মিশেছে তার পিছনের ভাঙা মসজিদের মেহরাবের বাঁ দিকে চেনমতিফে ঝোলানো মেডালিয়োনেতে আপনি পদ্মফুলের প্রভাব দেখেছেন?' তা হলে আপনি অম্লান বদনে বলতে পারেন 'না', কারণ ওরকম পুরোনো কোনো মসজিদ কাবুলে নেই।

তবু যদি সেই সবজান্তা ফের প্রশ্ন করেন, 'বুখারার আমীর পালিয়ে আসার সময় জে ইরানী তসবিরের বাণ্ডিল সঙ্গে এনেছিলেন, তাতে হিরাতের জরীন-কলম ওস্তাদ বিহজাদের আঁকা সমরকন্দের পোলো খেলার ছবি দেখেছেন?' আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন 'না' কারণ কাবুল শহরে ওরকম কোনো তসবিরের বাণ্ডিল নেই।

পণ্ডিতদের কথা হচ্ছে না। যে আস্তাবলে সিকন্দর শাহের ঘোড়া বাঁধা ছিল, সেখানে এখন হয়ত বেগুন ফলছে। পণ্ডিতরা কম্পাস নিয়ে তার নিশানা লাগাতে পারলে আনন্দে বিহ্বল। কোথায় এক টুকরো পাথরে বুদ্ধের কোঁকড়া চুলের আড়াই গাছা ঘষে ক্ষয়ে প্রায় হাতের তেলোর মত পালিশ হয়ে গিয়েছে; তাই পেয়ে পণ্ডিত পঞ্চমুখ—পাড়া অতিষ্ঠ করে তোলেন। এঁদের কথা হচ্ছে না। আমি সাধারণ পাঁচজনের কথা বলছি, যারা দিল্লী আগ্রা সেকেন্দ্রার জেল্লাই দেখেছে। তাদের চোখে চটক, বুকে চমক লাগাবার মত রসবস্তু কাবুলে নেই।

কাজেই কাবুলে পৌঁছে কাউকে তুর্কীনাচের চকিবাজি খেতে হয় না। পাথর-ফাটা রোদ্দুরে শুধু পায়ে শান বাঁধানো ছ'ফার্লাঙী চত্বর ঘষ্টাতে হয় না, নাকে মুখে চামচিকে বাদুড়ের থাবড়া খেয়ে খেয়ে পচা বোঁটকা গন্ধে আধা ভিরমি গিয়ে মিনার-শিখর চড়তে হয় না।

আইরিশম্যানের মত দিব্যি হাত ধোওয়া হল, অথচ হাত ভিজল না।

তাই কাবুল মনোরম জায়গা। এবং সবচেয়ে আরামের কথা হচ্ছে যে, যা কিছু দেখবার তা বিনা মেহন্নতে দেখা যায়। বন্ধু-বান্ধবের কেউ না কেউ কোনো একটা বাগানে সমস্ত দিন কাটাবার জন্য একদিন ধরে নিয়ে যাবেই।

গুলবাগ কাবুলের কাছেই—হেঁটে, টাঙ্গায়, মোটরে যে কোনো কৌশলে যাওয়া যায়।

তিনদিকে উঁচু দেওয়াল, একদিকে কাবুল নদী; তাতে বাঁধ দিয়ে বেশ খানিকটা জায়গা পুকুরের মত শান্ত স্বচ্ছ করা হয়েছে। বাগানে অজস্র আপেল-নাসপাতির গাছ, নরগিস্ ফুলের চারা, আর ঘন সবুজ ঘাস। কার্পেট বানাবার অনুপ্রেরণা মানুষ নিশ্চয় এই ঘাসের থেকেই পেয়েছে। সেই নরম তুলতুলে ঘাসের উপর ইয়ার-বক্সী ভালো ভালো কার্পেট পেতে গাব্দাগোব্দা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসবেন। পাঁচ মিনিট যেতে না-যেতে সবাই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়বেন।

দীর্ঘ তন্বঙ্গী চিনারের ঘন-পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে দেখবেন আস্বচ্ছ ফিরোজা আকাশ। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখবেন কাবুল পাহাড়ের গায়ে সাদা মেঘের হুটোপুটি। কিম্বা দেখবেন হুটোপুটি নয়, একপাল সাদা মেঘ যেন গৌরীশঙ্কর জয় করতে উঠে পড়ে লেগেছে। কোমর বেঁধে প্ল্যানমাফিক একজন আরেকজনের পিছনে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে চূড়ো পেরিয়ে ওদিকে চলে যাবার তাদের মতলব। ধীরে সুস্থে গড়িয়ে গড়িয়ে খানিকটে চড়ার পর কোন্ এক অদৃশ্য নন্দীর ত্রিশূলে ঘা খেয়ে নেমে আসছে, আবার এগচ্ছে, আবার ধাক্কা খাচ্ছে। তারপর আলাদা ট্যাকটিক চালাবার জন্য দু'তিনজন একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে বিলকুল এক হয়ে গিয়ে নূতন করে পাহাড় বাইতে শুরু করবে। হঠাৎ কখন পাহাড়ের আড়াল থেকে আরেক দল মেঘের চূড়োয় পৌঁছতে পেরে খানিকটা মাথা দেখিয়ে এদের যেন লজ্জা দিয়ে আড়ালে ডুব মারবে।

উপরের দিকে তাকিয়ে দেখবেন চিনারপল্লব, পাহাড় সব কিছু ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে অতি ঊর্ধ্বে আপনারই মত নীল গালচেয় শুয়ে একখানা টুকরো মেঘ অতি শান্ত নয়নে নিচের মেঘের গৌরীশঙ্কর-অভিযান দেখছে—আপনারই মত। ওকে 'মেঘদূত' করে হিন্দুস্থান পাঠাবার যো নেই। ভাবগতিক দেখে মনে হয় যেন বাবুরশাহের আমল থেকে সে ঐখানে শুয়ে আছে, আর কোথাও যাবার মতলব নেই। পানশিরের আবদুর রহমান এরই কাছ থেকে চুপ করে বসে থাকার কায়দাটা রপ্ত করেছে।

নাকে আসবে নানা অজানা ফুলের মেশা গন্ধ। যদি গ্রীষ্মের অন্তিম নিঃশ্বাস হয়, তবে তাতে আরো মেশানো আছে পাকা আপেল, অ্যাপ্রিকটের বাসী বাসী

গন্ধ। তিন পাঁচিলের বন্ধ হাওয়াতে সে গন্ধ পচে গিয়ে মিষ্টি মিষ্টি নেশার আমেজ লাগায়। চোখ বন্ধ হয়ে আসে—তখন শুনতে পাবেন উপরের হাওয়ার দোলে তরুপল্লবের মর্মর আর নাম-না-জানা পাখির জান-হানা-দেওয়া ক্লান্ত কূজন।

সব গন্ধ ডুবিয়ে দিয়ে অতি ধীরে ধীরে ভেসে আসবে বাগানের এক কোণ থেকে কোর্মা-পোলাও রান্নার ভারী খুশবাই। চোখে তন্দ্রা, জিভে জল। দ্বন্দ্বের সমাধান হবে হঠাৎ গুড়ুম শব্দে, আর পাহাড়ে পাহাড়ে মিনিটখানেক ধরে তার প্রতিধ্বনি শুনে।

কাবুলের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় থেকে বেলা বারোটার কামান দাগার শব্দ। সবাই আপন আপন ট্যাকঘড়ি খুলে দেখবেন—হাতঘড়ির রেওয়াজ কম—ঘড়ি ঠিক চলছে কিনা। কাবুলে এ রেওয়াজ অলঙ্ঘনীয়। ঘড়ি না-বের-করা স্নবের লক্ষণ.—'আহা যেন একমাত্র ওঁয়ার ঘড়িরই চেক-আপের দরকার নেই—'

যাঁদের ঘড়ি কাঁটায় কাঁটায় বারোটা দেখালো না, তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন। কাবুলের কামান নাকি ইহজন্মে কখনো ঠিক বারোটার সময় বাজেনি। কারো ঘড়ি যদি ঠিক বারোটা দেখাল তার তবে রক্ষে নেই। সকলেই তখন নিঃসন্দেহ যে, সে ঘড়িটা দাগী-খুনী—ওঁদের ঘড়ির মত বেনিফিট অব ডাউট পেতে পারে না। গান্ধার শিল্পের বুদ্ধমূর্তির চোখেমুখে যে অপার তিতিক্ষা, তাই নিয়ে সবাই তখন সে ঘড়িটার দিকে করুণ নয়নে তাকাবেন।

মীর আসলম আরবী ছন্দে ফার্সী বলতেন অর্থাৎ আমাদের দেশে ভটচাযরা যে রকম সংস্কৃতের তেলে ডোবানো সপসপে বাঙলা বলে থাকেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভ্রাতঃ, 'চহার-মগজ্-শিকন' কি বস্তু তস্য সন্ধান করিয়াছ কি?'

আমি বললুম, ' 'চহার' মানে 'চার' আর 'মগ্জ্' মানে 'মগজ', 'শিকস্তন' মানে 'টুকরো টুকরো করা'। অর্থাৎ যা দিয়ে চারটে মগজ ভাঙা যায়, এই আরবী ব্যাকরণ-ট্যাকরণ কিছু হবে আর কি?'

মীর আসলম বললেন, ' 'চহার-মগজ' মানে 'চতুর্মস্তিষ্ক' অতি অবশ্য সত্য, কিন্তু যোগরূঢ়ার্থে ঐ বস্তু আক্কোট অথবা আখরোট। অতএব 'চহার-মগ্জ্-শিকন' বলতে শক্ত লোহার হাতুড়ি বোঝায়।' তারপর দাগীঘড়িওয়ালা প্যারিসফের্তা সইফুল আলমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আয় বরাদরে আজীজে মন্, হে আমার প্রিয় ভ্রাতঃ, যোগরূঢ়ার্থে ঘটিকাযন্ত্র অথচ ধর্মত কার্যত যে দ্রব্য 'চহার-মগ্জ্-শিকন' সে বস্তু তুমি তোমার যাবনিক অঙ্গরক্ষার আস্তরণ মধ্যে পরম প্রিয়তমার ন্যায় বক্ষ-সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছ কেন? অপিচ পশ্য, পশ্য, অদূরে উদ্যানপ্রান্তে

পরিচারকবৃন্দ উপর্যুক্ত যন্ত্রাভাবে উপলখণ্ড দ্বারা অক্ষরোট ভগ্ন করিবার চেষ্টায় গলদ্ঘর্ম হইতেছে। তোমার হৃদয় কি ঐ উপলখণ্ডের ন্যায় কঠিন অথবা বজ্রাদপি কঠোর?'

দাগী ঘড়ি রাখা এমনি ভয়ঙ্কর পাপ যে, প্যারিসফের্তা বাকচতুর সইফুল আলম পর্যন্ত একটা জুতসই উত্তর দিতে পারলেন না। সাদামাটা কি একটা বিড় বিড় করলেন যার অর্থ 'এক মাঘে শীত যায় না'।

মীর আসলম বললেন, 'ঐ সহস্র হস্ত উচ্চ পর্বতশিখর হইতে তথাকথিত দ্বাদশ ঘটিকার সময় এক সনাতন কামান ধূম্র উদ্‌গিরণ করে—কথনো কথনো তজ্জনিত শব্দও কাবুল নাগরিকরাজির কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। শুনিয়াছি, একদা দ্বিপ্রহরে তোপচী লক্ষ্য করিল যে, বিস্ফোরকচূর্ণের অনটন। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আদেশ করিল সে যেন নগরপ্রান্তের অস্ত্রশালা হইতে প্রয়োজনীয় চূর্ণ আহরণ করিয়া লইয়া আইসে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই সহস্র হস্ত পরিমাণ পর্বত অবতরণ করিল, শ্রান্তি দূরার্থে বিপণি মধ্যে প্রবেশ করত অষ্টাধিক পাত্র চৈনিক যূষ পান করিল প্রয়োজনীয় ধূম্রচূর্ণ আহরণ করত পুনরায় সহস্রাধিক হস্ত পর্বতশিখরে আরোহণ করিয়া কামানে অগ্নিসংযোগ করিল। স্বীকার করি, অপ্রশস্ত দিবালোকেই সেইদিন নাগরিকবৃন্দ কামানধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিল, কিন্তু ভ্রাতঃ সইফুল আলম, সেইদিনও কি তোমার 'চহার-মগজ্-শিকন' কণ্টকে কণ্টকে দ্বাদশ ঘটিকার লাঞ্ছন অঙ্কন করিয়াছিল?'

আমি বললুম, 'এ রকম ঘড়ি আমাদের দেশেও আছে—তাকে বলা হয়, আঁব-পাড়ার ঘড়ি।'

সইফুল আলম আর মীর আসলম ছাড়া সবাই জিজ্ঞেস করলেন, 'আঁব' কি? সইফুল আলম বোম্বাই হয়ে প্যারিস যাওয়া-আসা করেছেন। কিন্তু মীর আসলম?

তিনিই বললেন, 'আম্র অতীব সুরসাল ভারতীয় ফলবিশেষ। দ্রাক্ষা আম্রের মধ্যে কাহাকে রাজমুকুট দিব সেই সমস্যা এযাবৎ সমাধান করিতে পারি নাই।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কিন্তু আপনি আম খেলেন কোথায়?'

মীর আসলম বললেন, 'চতুর্দশ বৎসর হিন্দুস্থানের দেওবন্দ রামপুরে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া অদ্য তোমার নিকট হইতে এই প্রশ্ন শুনিতে হইল? কিন্তু শোকাতুর হইব না, লক্ষ্য করিয়াছি তোমার জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবলা। শুভলগ্নে একদিন তোমাকে ভারত-আফগানিস্থানের সংস্কৃতিগত যোগাযোগ সম্বন্ধে জ্ঞানদান করিব। উপস্থিত পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে তোমার অনুগত ভৃত্য আবদুর

রহমান খান তোমার মুখারবিন্দ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া দণ্ডায়মান।'

কী আপদ, এ আবার জুটল কোত্থেকে ?

দেখি হাতে লুঙ্গি তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে। বলল, 'খানা তৈরী হতে দেরি নেই, যদি গোসল করে নেন।'

ইয়ারদোস্তের দু'চারজন ততক্ষণে বাঁধে নেমেছে। সবাই কাবুল-বাসিন্দা, সাঁতার জানেন না, জলে নামলেই পাথরবাটি। মাত্র একজন চতুর্দিকে হাত-পা ছুঁড়ে, বারিমন্থনে গোয়ালন্দী জাহাজকে হার মানিয়ে বিপুল কলরবে ওপারে পৌঁছে হাঁপাচ্ছেন। এপারে অফুরন্ত প্রশংসাধ্বনি, ওপারে বিরাট আত্মপ্রসাদ। কাবুল নদী সেখানটায় চওড়ায় কুড়ি গজও হবে না।

কিন্তু সেদিন গুলবাগে কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছিল। কাবুলীরা কখনো ডুব-সাঁতার দেখেনি।

ঐ একটিবারই এপার-ওপার সাঁতার কেটেছিলুম। ও রকম ঠাণ্ডা জল আমাদের দেশের শীতকালের রাতদুপুরে পানাঠাসা এঁদো পুকুরেও হয় না। সেই দু'মিনিট সাঁতার কাটায় খেসারতি দিয়েছিলুম ঝাড়া এক ঘণ্টা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে, দাঁতে দাঁতে কত্তাল বাজিয়ে, সর্বাঙ্গে অশথপাতার কাঁপন জাগিয়ে।

মীর আসলম অভয় দিয়ে বললেন, 'বরফগলা জলে নাইলে নিওমোনিয়ার ভয় নেই।'

আমি সায় দিয়ে বললুম, 'মানসসরোবরে ডুব দিয়ে যখন মানুষ মরে না, তখন আর ভয় কিসের ?' কিন্তু বুঝতে পারলুম বন্ধু বিনায়ক রাও মসোজী মানস-সরোবরে ডুব দেবার পর কেন তিন ঘণ্টা ধরে রোদ্দুরে ছুটোছুটি করেছিলেন। মানস বিশ হাজার ফুটের কাছাকাছি, কাবুল সাত হাজারও হবে না।

কিন্তু সেদিন মীর আসলম আর সইফুল আলম ছাড়া সকলেরই দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছিল যে, আমি মরতে মরতে বেঁচে যাওয়ায় তখনো প্রাণের ভয়ে কাঁপছি। শেষটায় বিরক্ত হয়ে বললুম, 'আবার না হয় ডুব-সাঁতার দেখাচ্ছি।'

সবাই 'হাঁ হাঁ, কর কি, কর কি,' বলে ঠেকালেন। অবশ্যমৃত্যুর হাত থেকে এক মুসলমানকে আরেক মুসলমানের জান বাঁচানো অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য।

তিন টুকরো পাথর, বাগান থেকেই কুড়ানো শুকনো ডাল-পাতা আর দু'-চারটে হাঁড়িবাসন দিয়ে উত্তম রান্না করার কায়দায় ভারতীয় আর কাবুলী রাঁধুনীতে কোনো তফাত নেই। বিশেষত মীর আসলম উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহ্যে গড়ে-ওঠা পণ্ডিত। অর্থাৎ গুরুগৃহে থাকার সময় ইনি রান্না করতে শিখেছিলেন। তাঁর তদারকিতে সেদিনের রান্না হয়েছিল যেন হাফিজের একখানা উৎকৃষ্ট গজল।

যখন ঘুম ভাঙলো, তখন দেখি সমস্ত বাগান নাক ডাকাচ্ছে—একমাত্র হুঁকোটা ছাড়া। তা আমরা যতক্ষণ জেগেছিলুম, সে এক লহমার তরেও নাক ডাকানোতে কামাই দেয়নি। কিন্তু কাবুলী তামাক ভয়ংকর তামাক—সাক্ষাৎ পেল্লাদ মারা গুলী। প্রহ্লাদকে হাতীর পায়ের তলায়, পাহাড় থেকে ফেলে, পাষাণ চাপা দিয়ে মারা যায়নি, কিন্তু এ তামাকে তিনি দুটি দম দিলে আর দেখতে হত না। এ তামাক লোকে যত না খায়, তার চেয়ে বেশী কাশে। ঠাণ্ডা দেশ বলে আফগানিস্থানের তামাক জাতে ভালো, কিন্তু সে তামাককে মোলায়েম করার জন্য চিটে-গুড়ের ব্যবহার কাবুলীরা জানে না, আর মিষ্টি-গরম ধিকিধিকি আগুনের জন্য টিকে বানাবার কায়দা তারা এখনো আবিষ্কার করতে পারেনি।

পড়ন্ত রোদে দীর্ঘ তরুর দীর্ঘতর ছায়া বাগান জুড়ে ফালি ফালি দাগ কেটেছে। সবুজ কালোর ডোরাকাটা নাদুসনুদুস জেব্রার মত বাগানখানা নিশ্চিন্দি মনে ঘুমোচ্ছে। নরগিস্ ফুল ফোটার তখনো অনেক দেরি, কিন্তু চারা-ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে দেখি, তারা যেন রোদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঙা হয়ে উঠেছে। কল্পনা না সত্যি বলতে পারব না, কিন্তু মনে হল যেন অল্প অল্প গন্ধ সেদিক থেকে ভেসে আসছে। রাত্তিরে যে খুশবাইয়ের মজলিশ বসবে, তারি মোহড়ার সেতারে যেন অল্প অল্প পিড়িং পিড়িং মিঠা বোল ফুটে উঠেছে। জলে ছাওয়ায়, মিঠে হাওয়ায় সমস্ত বাগান সুধাশ্যামলিম, অথচ এই বাগানের গা ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে রয়েছে হাজার ফুট উঁচু কালো নেড়া পাথরের খাড়া পাহাড়। তাতে এক ফোঁটা জল নেই, এক মুঠো ঘাস নেই। বুকে একরত্তি দয়ামায়ার চিহ্ন নেই—যেন উলঙ্গ সাধক মাথায় মেঘের জটা বেঁধে কোনো এক মন্বন্তরব্যাপী কঠোর সাধনায় মগ্ন।

পদপ্রান্তে গুলবাগের সবুজপরী কেঁদে কেঁদে কাবুল নদী ভরে দিয়েছে।

ফকীরের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

বাড়ি ফিরে কোনো কাজে মন গেল না। বিছানায় শুয়ে আবদুর রহমানকে বললুম, জানলা খুলে দিতে। দেখি পাহাড়ের চূড়ায় সপ্তর্ষি। 'আঃ' বলে চোখ বন্ধ করলুম। সমস্ত দিন দেখেছি অজানা ফুল, অজানা গাছ, আধাচেনা মানুষ, আর অচেনার চেয়েও পীড়াদায়ক অপ্রিয়দর্শন শুষ্ক কঠিন পর্বত। হঠাৎ চেনা সপ্তর্ষি দেখে সমস্ত দেহমন জুড়ে দেশের চেনা ঘর-বাড়ির জন্য কি এক আকুল আগ্রহের আঁকুবাঁকু ছড়িয়ে পড়ল।

স্বপ্নে দেখলুম, মা এবার নমাজ পড়ে উত্তরের দাওয়ায় বসে সপ্তর্ষির দিকে তাকিয়ে আছেন।

সত্তর

কাবুলে দুই নম্বরের দ্রষ্টব্য তার বাজার। অমৃতসর, আগ্রা, কাশীর পুরোনো বাজার যাঁরা দেখেছেন, এ বাজারের গঠন তাঁদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। সরু রাস্তা, দুদিকে বুক-উঁচু ছোট ছোট খোপ। পানের দোকানের দুই বা তিন-ডবল সাইজ। দোকানের সামনের দিকটা খোলা বাক্সের ঢাকনার মত এগিয়ে এসে রাস্তার খানিকটা দখল করেছে। কোনো কোনো দোকানে বাক্সের ডালার মত কব্জা লাগানো, রাত্রে তুলে দিয়ে দোকানের নিচের আধখানা বন্ধ করা যায় —অনেকটা ইংরিজীতে যাকে বলে 'পুটিঙ আপ দি শাটার'।

বুকের নিচ থেকে রাস্তা অবধি কিংবা তারো কিছু নিচে দোকানেরই একতলা গুদাম-ঘর, অথবা মুচির দোকান। কাবুলের যে কোনো বাজারে শতকরা ত্রিশটি দোকান মুচির। পেশাওয়ারে পাঠানরা যদি হপ্তায় একদিন জুতোতে লোহা পোঁতায়, তবে কাবুলে তিন দিন। বেশীরভাগ লোকেরই কাজ-কর্ম নেই—কোনো একটা দোকানে লাফ দিয়ে উঠে বসে দোকানীর সঙ্গে আড্ডা জমায়, ততক্ষণ নিচের অথবা সামনের দোকানের একতলায় মুচি পয়জারে গোটাকয়েক লোহা ঠুকে দেয়।

আপনি হয়ত ভাবছেন যে, দোকানে বসলে কিছু একটা কিনতে হয়। আদপেই না। জিনিসপত্র বেচার জন্য কাবুলী দোকানদার মোটেই ব্যস্ত নয়। কুইক টার্নওভার নামক পাগলা রেসের রেওয়াজ প্রাচ্যদেশীয় কোনো দোকানে নেই। এমন কি কলকাতা থেকেও এই গদাইলস্করী চাল সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। চিৎপুরের শালওয়ালা, বড়বাজারের আতরওয়ালা এখনও এই আরামদায়ক ঐতিহ্যটি বজায় রেখেছে।

সুখদুঃখের নানা কথা হবে—কিন্তু পলিটিক্স ছাড়া। তাও হবে, তবে তার জন্য দোস্তি ভালো করে জমিয়ে নিতে হয়। কাবুলের বাজার ভয়ঙ্কর ধূর্ত—তিন দিন যেতে না যেতেই তামাম বাজার জেনে যাবে আপনি ব্রিটিশ লিগেশনে ঘন ঘন গতায়াত করেন কিনা—ভারতবাসীর পক্ষে রাশিয়ান দূতাবাস অথবা আফগান ফরেন আপিসের গোয়েন্দা হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। যখন দোকানী জানতে পারে যে, আপনি হাই-পলিটিক্স নিয়ে বিপজ্জনক জায়গায় খেলাধুলো করেন না, তখন আপনাকে 'বাজার গপ্' বলতে তার আর বাধবে না। আর সে অপূর্ব গপ্—বলশেভিক তুর্কীস্থানের স্ত্রীস্বাধীনতা থেকে আরম্ভ করে, পেশাওয়ারের জানকীবাঈকে ছাড়িয়ে দিল্লীর বড়লাটের বিবিসায়েবের বিনে পয়সায় হীরা-পান্না

বিদেশী কার্পেট। আপনি উঠি উঠি করছিলেন, দোকানদার কিছুতেই ছাড়বে না। হয়ত মোটা রকমের ব্যবসা হবে, খুদা মেহেরবান, ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর রসুলেরও আশীর্বাদ রয়েছে, আপনারও যখন ভয়ঙ্কর তাড়া নেই, তখন দাওয়াতটা খেয়ে গেলেই পারেন।

রাস্তায় অনেক অকেজো ছেলে-ছোকরা ঘোরাঘুরি করছে—তাদেরই একটাকে ডেকে বলবে, 'ও বাচ্চা, চাওয়ালাকে বল তো আরেকপ্রস্থ চা দিয়ে যেতে।'

তারপর সেই সব কার্পেটের বস্তা খোলা হবে। কত রঙ, কত চিত্রবিচিত্র নক্সা, কী মোলায়েম স্পর্শসুখ। কার্পেট-শাস্ত্র অগাধ শাস্ত্র—তার কূল-কিনারাও নেই। কাবুলের বাজারে অন্তত ত্রিশ জাতের কার্পেট বিক্রি হয়, তাদের আবার নিজের জাতের ভিতরে বহু গোত্র, বহু বর্ণ। জন্মভূমি, রঙ, নক্সা, মিলিয়ে সরেস নিরেস মালের বাছবিচার হয়। বিশেষ রঙের নক্সা বিশেষ উৎকৃষ্ট পশম দিয়ে তৈরী হয়—সে মালের সস্তা জিনিস হয় না। এককালে বেনারসী শাড়িতে এই ঐতিহ্য ছিল—আড়িবেল শাড়ির বিশেষ নক্সা বিশেষ উৎকৃষ্ট রেশমেই হত—সে নক্সায় নিরেস মাল দিয়ে ঠকাবার চেষ্টা ছিল না।

আজকের দিনে কাবুলের বাজারে কেনবার মত তিনটে ভালো জিনিস আছে—কার্পেট, পুস্তিন আর সিল্ক। ছোটখাটো জিনিসের ভিতর ধাতুর সামোভার আর জড়োয়া পয়জার। বাদবাকি বিলাতী আর জাপানী কলের তৈরী সস্তা মাল, ভারতবর্ষ হয়ে আফগানিস্থানে ঢুকেছে।

কাবুলের বাজার ক্রমেই গরীব হয়ে আসছে। তার প্রধান কারণ ইরান ও রুশের নবজাগরণ। আমুদরিয়ার ওপারের মালে বাঁধ দিয়ে রাশানরা তার স্রোত মস্কোর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে, ইরানীরা তাদের মাল সোজাসুজি ইংরেজ অথবা রাশানকে বিক্রি করে। কাবুলের পয়সা কমে গিয়েছে বলে সে ভারতের মাল আর সে পরিমাণে কিনতে পারে না—আমাদের রেশম মলমল মসলিন শিল্পেরও কিছু মরমর, বেশীর ভাগ ইংরেজ সাত হাত মাটির নিচে কবর দিয়ে শ্রাদ্ধশান্তি করে চুকিয়ে দিয়েছে।

বাবুর বাদশা কাবুলের বাজার দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বহু জাতের ভিড়ে কান পেতে যে-সব ভাষা শুনেছিলেন, তার একটা ফিরিস্তিও তাঁর আত্মজীবনীতে দিয়েছেন ;—

আরবী, ফার্সী, তুর্কী, মোগলী, হিন্দী, আফগানী, পশাঈ, প্রাচী, গেবেরী, বেরেকী ও লাগমানী।

'প্রাচী' হল পূর্ব-ভারতবর্ষের ভাষা, অযোধ্যা অঞ্চলের পূরবীয়া—বাঙলা ভাষা তারই আওতায় পড়ে।

সে সব দিন গেছে; তামাম কাবুলে এখন যুক্তপ্রদেশের তিনজন লোকও আছে কিনা সন্দেহ।

তবু প্রাণ আছে, আনন্দ আছে। বাজারের শেষ প্রান্তে প্রকাণ্ড সরাই। সেখানে সন্ধ্যার নমাজের পর সমস্ত মধ্যপ্রাচ্য কাজকর্মে ইস্তফা দিয়ে বেঁচে থাকার মূল চৈতন্যবোধকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের রসগ্রহণ দিয়ে চাঙ্গা করে তোলে। মঙ্গোলরা পিঠে বন্দুক ঝুলিয়ে, ভারী রাইডিং বুট পরে, বাবরী চুলে ঢেউ খেলিয়ে গোল হয়ে সরাই-চত্বরে নাচতে আরম্ভ করে। বুটের ধমক, তালে তালে হাততালি আর সঙ্গে সঙ্গে কাবুল শহরের চতুর্দিকের পাহাড় প্রতিধ্বনিত করে তীব্র কণ্ঠে আমুদরিয়া পারের মঙ্গোল সঙ্গীত। থেকে থেকে নাচের তালের সঙ্গে ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা নিচু করে দেয়, আর কানের দু'পাশের বাবরী চুল সমস্ত মুখ ঢেকে ফেলে। লাফ দিয়ে তিন হাত উপরে উঠে শূন্যে দু'পা দিয়ে ঘন ঘন ঢেরা কাটে, আর দু'হাত মেলে দিয়ে বুক চেতিয়ে মাথা পিছনের দিকে ঠেলে বাবরী চুল দিয়ে সবুজ জামা ঢেকে দেয়। কখনো কোমর দু'ভাঁজ করে নিচু হয়ে বিলম্বিত তালে আস্তে আস্তে হাততালি, কখনো দু'হাত শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করে ঘূর্ণি হাওয়ার চর্কিবাজি। সমস্তক্ষণ চক্কর ঘুরেই যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে।

আবার এই সমস্ত হট্টগোল উপেক্ষা করে দেখবেন, সরাইয়ের এক কোণে কোনো ইরাণী কানের কাছে সেতার রেখে মোলায়েম বাজনার সঙ্গে হাফিজের গজল গাইছে। আর পাঁচজন চোখ বন্ধ করে বুঁদ হয়ে দূর ইরানের গুল বুলবুল আর নিঠুরা নিদয়া প্রিয়ার ছবি মনে মনে এঁকে নিচ্ছে।

আরেক কোণে পীর-দরবেশ চায়ের মজলিসের মাঝখানে দেশ-বিদেশের ভ্রমণ-কাহিনী, মেশেদ-কারবালা, মক্কা-মদিনার তীর্থের গল্প বলে যাচ্ছেন। কান পেতে সবাই শুনছে, বুড়োরা ভাবছে কবে তাদের উপর আল্লার করুণা হবে, মৌলা কবে তাদের মদিনায় ডেকে নিয়ে যাবেন, প্রাণ তো ওষ্ঠাগত,—

লবোঁ পর হৈ দম আয় মুহম্মদ সমহালো,
মেরে মৌলা মুঝে মদিনে বোলা লো!

ঠোঁটের উপর দম এসে গেছে বাঁচাও মুহম্মদ,
হে প্রভু আমায় ডাকো মদিনায়, ধরেছি তোমার পদ।

কেনা পর্যন্ত। সে সব গল্পের কতটা গাঁজা কতটা নীট ঠাহর হবে কিছুদিন পরে, যদি নাক-কান খোলা রাখেন। তখন বাদ দরকসর টাকায় বারো আনা, চোদ্দ আনা ঠিক ঠিক ধরতে পারবেন।

যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তাদের পক্ষে এই 'বাজার গপ্' অতীব অপরিহার্য। মোগল ইতিহাসে পড়েছি, দিল্লীকে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র করে এক কালে সমস্ত ভারতবর্ষ এমন কি ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে তুর্কীস্থান ইরান পর্যন্ত ভারতীয় হুণ্ডির তাঁবেতে ছিল। গুণীদের মুখে শুনেছি বাঙলার রাজা জগৎশেঠের হুণ্ডি দেখলে বুখারার খান পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে কাঁচা টাকা ঢেলে দিতেন। কিন্তু এই বিস্তীর্ণ ব্যবসা চালু রাখার জন্য ভারতীয় বণিকদের আপন আপন ডাক পাঠাবার বন্দোবস্ত ছিল। তার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল। হয়ত দিল্লীর শাহানশাহ আহমদাবাদের সুবেদারের (গভর্নর) উপর বীতরাগ হয়ে তাকে ডিসমিসের ফরমান জারী করলেন—সে ফরমান আহমদাবাদ পৌঁছতে অন্তত দিন সাতেক লাগার কথা। ওদিকে সুবেদার হয়ত দু'হাজার ঘোড়া কেনার জন্যে আহমদাবাদী বেনেদের কাছ থেকে টাকা ধার করেছেন—ফরমান পৌঁছলে সুবেদার পত্রপাঠ দিল্লী রওনা দেবেন। সে টাকাটা বের করতে বেনেদের তখন ভয়ঙ্কর বেগ পেতে হত—সুবেদার বাদশাহকে খুশী করে নূতন সুবা, নিদেনপক্ষে নূতন জায়গীর না পেলে সে টাকাটা একেবারেই মারা যেত।

তাই যে সন্ধ্যায় বাদশা ফরমানে মোহর বসালেন, সেই সন্ধ্যায়ই বেনেদের দিল্লীর হৌস থেকে আপন ডাকের ঘোড়সওয়ার ছুটত আহমদাবাদে। সেখানকার বিচক্ষণ বেনে বাদশাহী ফরমান পৌঁছবার পূর্বেই সুবেদারের হিসেবে ঢেরা কেটে দিত—পাওনা টাকা যতটা পারত উশুল করত—নূতন ওভারড্রাফ্‌ট্ কিছুতেই দিত না ও দরকার হলে দেবার দায় এড়াবার জন্য হঠাৎ পালিতাণায় 'তীর্থভ্রমণে' চলে যেত। তিনদিন পর ফরমান পৌঁছুলে পর সুবেদারের চোখ খুলত। তখন বুঝতে পারতেন বেনে ধর্মানুরাগী হয়ে পালিতাণার কোন্ তীর্থ করতে চলে গিয়েছিল।

আফগানিস্থানে এখনো সেই অবস্থা। বাদশা কাবুলে বসে কখন হিরাত অথবা বদখশান সুবার কোন্ কর্ণধারের কর্ণ কর্তন করলেন, তার খবর না জেনে বড় ব্যবসা করার উপায় নেই। তাই 'বাজার গপে'র ধারা কখন কোন্‌দিকে চলে, তার দিকে কড়া নজর রাখতে হয়, আর তীক্ষ্ণবুদ্ধির ফিলটার যদি আপনার থাকে, তবে সেই ঘোলাটে 'গপ্' থেকে খাঁটি-তত্ত্ব বের করে আর দশজনের চেয়ে বেশী মুনাফা করতে পারবেন।

আফগানিস্থানের ব্যাঙ্কিং এখনো বেশীর ভাগ ভারতীয় হিন্দুদের হাতে। ভারতীয় বলা হয়ত ভুল, কারণ এদের প্রায় সকলেই আফগানিস্থানের প্রজা। এদের জীবনযাত্রার প্রণালী, সামাজিক সংগঠন, পালাপরব সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কেউ কোনো গবেষণা করেননি।

আশ্চর্য বোধ হয়। মরা বোরোবোদুর নিয়ে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ পড়ে, একই ফোটোগ্রাফের বিশখানা হাজা-ভোঁতা প্রিন্ট দেখে দেখে সহ্যের সীমা পেরিয়ে যায়, কিন্তু এই জ্যান্ত ভারতীয় উপনিবেশ সম্বন্ধে 'বৃহত্তর ভারতে'র পাণ্ডাদের কোনো অনুসন্ধিৎসা কোনো আত্মীয়তাবোধ নেই।

মৃত বোরোবোদুর গোত্রভুক্ত, জীবন্ত ভারতীয় উপনিবেশ অপাংক্তেয়, ব্রাত্য। ভারতবর্ষের সধবারা তাজা মাছ না খেয়ে শুঁটকি মাছের কাঁটা দাঁতে লাগিয়ে একাদশীর দিনে সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় রাখেন।

কাবুলের বাজার পেশাওয়ারের চেয়ে অনেক গরীব, কিন্তু অনেক বেশী রঙীন। কম করে অন্তত পঁচিশটা জাতের লোক আপন আপন বেশভূষা চালচলন বজায় রেখে কাবুলের বাজারে বেচাকেনা করে। হাজারা, উজবেগ (বাঙলা উজবুক), কাফিরিস্থানী, কিজিলবাশ (ভারতচন্দ্রে কিজিলবাশের উল্লেখ আছে, আর টীকাকার তার অর্থ করেছেন 'একরকম পর্দা' !), মঙ্গোল, কুর্দ—এদের পাগড়ি, টুপি, পুস্তিনের জোব্বা, রাইডিং বুট দেখে কাবুলের দোকানদার এক মুহূর্তে এদের দেশ, ব্যবসা, মুনাফার হার, কঞ্জুশ না দরাজ-হাত চট করে বলে দিতে পারে।

এই সব পার্থক্য স্বীকার করে নিয়ে তারা নির্বিকার চিত্তে রাস্তা দিয়ে চলে। আমরা মারোয়াড়ী কিংবা পাঞ্জাবীর সঙ্গে লেনদেন করার সময় কিছুতেই ভুলতে পারি না যে, তারা বাঙালী নয়—দু'পয়সা লাভ করার পর কোনো পক্ষই অন্য পক্ষকে নেমন্তন্ন করে বাড়িতে নিয়ে খাওয়ানো তো দূরের কথা, হোটেলে ডেকে নেওয়ার রেওয়াজ পর্যন্ত নেই। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ অঙ্গাঙ্গি বিজড়িত।

স্বপ্নসম লোকযাত্রা। খাস কাবুলের বাসিন্দারা চিৎকার করে একে অন্যকে আল্লারসুলের ভরভয় দেখিয়ে সওদা করছে, বিদেশীরা খচ্চর গাধা ঘোড়ার পিঠে বসে ভাঙা ভাঙা ফার্সীতে দরকসর করছে, বুখারার বড় কারবারি ধীরে গম্ভীরে দোকানে ঢুকে এমনভাবে আসন নিচ্ছেন যে, মনে হয় বাকী দিনটা ঐখানেই বেচাকেনা, চা-তামাক-পান আর আহারাদি করে রাত্রে সরাইয়ে ফিরবেন—তাঁর পিছনে চাকর হুঁকো-কল্কি সঙ্গে নিয়ে ঢুকছে। তারও পিছনে খচ্চর-বোঝাই

একদিন হয় খাইবারপাসে, নয় হিন্দুকুশে লাগবেই লাগবে। তাই দু'দলের পাঁয়তারা কষার খবর সরজমিনে রাখার জন্য একগাদা রাজদূতাবাস।

তবু পয়লা শরিক আর দুসরা শরিকে দেখা-সাক্ষাৎ, কথাবার্তা হয়। দুসরা শরিকের অধিকাংশই হয় কারবারি, নয় মাস্টার প্রোফেসর। দু'দলের সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থাকা অসম্ভব। কিন্তু পয়লা ও তেসরা ও দুসরা-তেসরাতে কখনো কোনো অবস্থাতেই যোগাযোগ হতে পারে না।

যদি কেউ করার চেষ্টা করে, তবে সে স্পাই।

মাত্র একটি লোক নির্ভয়ে কাবুলের সব সমাজে অবাধে গতায়াত করতেন। বগদানফ সায়েবের বৈঠকখানায় তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। নাম দোস্ত মুহম্মদ খান—জাতে খাস পাঠান।

প্রথম দিনের পরিচয়ে শেকহ্যাণ্ড করে ইংরেজী কায়দায় জিজ্ঞেস করলেন, 'হাও ডু ইয়ু ডু?'

দ্বিতীয় সাক্ষাৎ রাস্তায়। দূরের থেকে কাবুলী কায়দায় সেই প্রশ্নের ফিরিস্তি আউড়ে গেলেন, 'খুব হাস্তী, জোর হাস্তী' ইত্যাদি, অর্থাৎ 'ভালো আছেন তো, মঙ্গল তো, সব ঠিক তো, বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েননি তো?'

তৃতীয় সাক্ষাৎ তাঁর বাড়িরই সামনে। আমাকে দেখা মাত্র চিৎকার করে বললেন, 'বফরমাইদ, বফরমাইদ (আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক), কদমে তান মবারক (আপনার পদদ্বয় পূতপবিত্র হোক), চশমে তান রওশন (আপনার চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বলতর হোক), শানায়ে তান দরাজ (আপনার বক্ষস্কন্ধ বিশালতর হোক)—'

তারপর আমার জন্য যা প্রার্থনা করলেন সেটা ছাপালে এদেশের পুলিস আমাকে জেলে দেবে।

আমি একটু থতমত খেয়ে বললুম, 'কি যা তা সব বলছেন?'

দোস্ত মুহম্মদ চোখ পাকিয়ে তম্বী লাগালেন, 'কেন বলব না? আলবত বলব, একশ' বার বলব। আমি কি কাবুলের ইরানী যে ভদ্রতা করে সব কিছু বলব, সত্যি কথাটি ছাড়া? আমি পাঠান—আমার ঘোড়ার লাগাম নেই, আমার জিভেরও লাগাম নেই।'

ঘরে বসিয়ে কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বললেন, 'বাড়িঘরদোর গুছিয়ে নিয়েছেন তো? চাকরবাকর? রুটি-গোস্ত? কিছু যদি দরকার হয় আমাকে বলবেন। সব যোগাড় করে দিতে পারি—কাবুলের তখ্‌ৎটি ছাড়া। তাও পারি—কিন্তু মাত্র একটা কিনা, খোঁজ খোঁজ পড়ে যাবে। কিন্তু ওটায়

নজর দিয়ে কোনো লাভ নেই। বড্ড শক্ত; আমি বসে দেখেছি।'

আমি বললুম, 'কাবুলের সিংহাসনে বসা যে শক্ত, সে তো আর গোপন কথা নয়।'

দোস্ত মুহম্মদ আমার কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমি ভয় পেয়ে ভাবলুম বোধ হয় বেফাঁস রসিকতা করে ফেলেছি। কিন্তু দোস্ত মুহম্মদের উত্তর শুনে অভয় পেলুম। বললেন, 'আহা-হা-হা। বাঁচালে দাদা। তোমার তা হলে রসকষ আছে। তোমার দেশের লোকগুলোর সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি, বড্ড বেহুল্লোড়, বে-আড্ডা, বেরসিক। কী গম্ভীর মুখ! দেখে মনে হয় হিন্দুস্থান স্বাধীন করার দুর্ভাবনা যেন একমাত্র ওদেরই ঘাড়ে।'

অদ্ভুত লোক! অশ্লীল কথা বললেন রাস্তায় চেঁচিয়ে, চাকরবাকর বন্দোবস্ত করে দেবেন বললেন ঘরের ভিতর বসিয়ে ফিসফিস করে, রসিকতা শুনে যখন খুশী তখন মুখ হল গম্ভীর। ভাবলুম এবার যদি দুটো একটা কটুবাক্য বলি তবে বোধ হয় অট্টহাস্য করে উঠবেন।

ততক্ষণে তিনি একটা কুশনে মাথা দিয়ে কার্পেটের উপর শুয়ে পড়েছেন। চোখ বন্ধ করে বললেন, 'কি খাবে? চা-রুটি, পোলাও-গোস্ত, আঙুর-নাসপতি? যা খুশী। বাজারে সব পাওয়া যায়। বাড়িতে কিছু নেই।'

আমি উত্তর দেওয়ার আগেই লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'না, না, আছে, আছে। সিগরেট আছে। দাঁড়াও।'

বলে দরজার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে গভীর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকালেন। তারপর আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে পা টিপে টিপে সোফার পিছনে হাঁটু গেড়ে সোফা আর দেয়ালের মাঝখানের কার্পেট তুলে এক প্যাকেট সিগারেট বের করলেন।

আমি তো অবাক। সামান্য সিগারেট; মদের বোতল নয়, প্যারিসের ছবি নয় যে, এত লুকিয়ে রাখবেন। আর কার কাছ থেকেই বা এত লুকোনো?

শুনি দোস্ত মুহম্মদ করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠেছেন, 'ওরে ও হারামজাদা আগা আহমদ, তোকে আমি আজ খুন করব। রাইফেলটা সঙ্গে নিয়ে আয় ব্যাটা। ওরে নেমকহারাম, তোকে খুন করে, আজ আমি গাজী হব, ফাঁসি গিয়ে শহিদ হব।'

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওঃ! কী পাষণ্ড! দরজা বন্ধ করে, হুড়কো মেরে সিগরেট বের করি, লুকিয়ে রাখি যেন আলাউদ্দীনের পিদিম। তবু ব্যাটা সন্ধান পেয়েছে। আর কী বেহায়া বেশরম! দশটা সিগরেটই মেরে

পুস্তিন ব্যবসায়ীর কুঠরিতে কবির মজলিস। অজাতশ্মশ্রু সুনীলগুম্ফ, কাজল-চোখ, তরুণ কবি মোমবাতির সামনে হাঁটু মুড়ে বসে তুলোট কাগজে লেখা কবিতা পড়ে শোনাচ্ছেন। তাঁর এক পদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তামাম মজলিস এক-গলায় পদের পুনরাবৃত্তি করছে—মাঝে মাঝে উৎসাহিত হয়ে মরহাবা, আফরীন, শাবাশ বলে উচ্চকণ্ঠে কবির তারিফ করছে।

চার সর্দারজীতে মিলে একটা পুরানো গ্রামোফোনে নখের মতো পালিশ তিন-খানা রেকর্ড ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাজাচ্ছে—

হরদি বোতল।
ভরদি বোতল।
পাঞ্জাবী বোতল।
লাল বোতল।

হায়, কাবুলে বোতল বারণ। কে জানত, শ্রবণেও অর্ধপান!

আর আসল মজলিস বসেছে কুহিস্থানের তাজিকদের আড্ডায়। হেঁড়ে গলায় আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে, দেয়াল-পাথর ফাটিয়ে কোরাস গান,

আয় ফতু, জানে মা—
ফতুজান,
ফতুজান,
বর তু শওম কুরবা—া—া—ন।

কুরবানের 'আ' দীর্ঘ অথবা হ্রস্ব, অবস্থা ভেদে—সম মেলাবার জন্য। উচ্চাঙ্গের কাব্যসৃষ্টি নয়, তবু দরদ আছে,

ওগো ফতুজান,
তুঁহারি লাগিয়া দিল-জান দিয়া
হব আমি কুরবান!

উত্তরে ফতুজান যেন অবিশ্বাসের সুরে বলেছেন,

—চেরা রফতী
হীচ ন্ গুফতী
দূর হিন্দুস্থান?

অর্থাৎ—

কেন গেলে
আমায় ফেলে
দূর হিন্দুস্থান ?

সহস্রপাদ বৈষ্ণব পদাবলীতে যখন এ-প্রশ্নের উত্তর নেই, তখন তাজিক ছোকরার লোক-সঙ্গীতে তার উত্তরের আশা করেন কোন্ অভিনব মস্কট ? মথুরার সিংহাসন জয় হিন্দুস্থানে রাইফেল ক্রয়, দুটোই বদখদ বেতালা উত্তর। হাজারো যুক্তি দিয়ে গীতা বানিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, কিন্তু মথুরাজয়ের যুক্তির হাল যমুনায় পানি পাবে না বলেই তিনি সেটা ব্রজসুন্দরী শ্রীরাধার দরবারে পেশ করেননি।

বল্‌হীকের বল্লভও তাই নীরব।

আঠার

কাবুলের সামাজিক জীবন তিন হিস্যায় বিভক্ত। তিন শরিকে মুখ দেখা-দেখি নেই।

পয়লা শরিক খাস কাবুলী ; সে-ও আবার দু'ভাগে বিভক্ত—জনানা, মর্দনা। কাবুলী মেয়েরা কট্টর পর্দার আড়ালে থাকেন, তাঁদের সঙ্গে নিকট আত্মীয় ছাড়া, দেশী-বিদেশী কারো আলাপ হওয়ার জো নেই। পুরুষের ভিতরে আবার দু'ভাগ। একদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের মোল্লা সম্প্রদায়, আর অন্যদিকে প্যারিস-বার্লিন-মস্কো ফের্তা এবং তাদের ইয়ারবক্সীতে মেশানো ইয়োরোপীয় ছাঁচে ঢালা তরুণ সম্প্রদায়। একে অন্যকে অবজ্ঞা করেন, কিন্তু মুখ দেখাদেখি বন্ধ নয়। কারণ অনেক পরিবারেই বাপ মশাই, বেটা মসিয়ো।

দুসরা শরিক ভারতীয় অর্থাৎ পাঞ্জাব, ফ্রন্টিয়ারের মুসলমান ও ১৯২১ সনের খেলাফৎ আন্দোলনের ভারতত্যাগী মুহাজিরগণ। এঁদের কেউ কেউ কাবুলী মেয়ে বিয়ে করেছেন বলে শ্বশুরবাড়ির সমাজের সঙ্গে এঁরা কিছু কিছু যোগাযোগ বাঁচিয়ে রেখেছেন।

তিসরা শরিক ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন, রুশ ইত্যাদি রাজদূতাবাস। আফগানিস্থান ক্ষুদে গরীব দেশ। সেখানে এতগুলো রাজদূতের ভিড় লাগাবার কোনো অর্থনৈতিক কারণ নেই, কিন্তু রাজনৈতিক কারণ বিস্তর। ফরাসী জর্মন ইতালী তুর্ক সব সরকারের দৃঢ়বিশ্বাস, ইংরেজ-রুশের মোষের লড়াই একদিন না

সরল বাঙলায় তর্জমা করলে অর্থ দাঁড়ায়, 'তোর কোমর ভেঙে দু'টুকরো হোক, খুদা তোর দু'চোখ কানা করে দিন, তুই ফুলে উঠে ঢাকের মত হয়ে যা, তারপর টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে যা।'

আমি কোনো গতিকে সামলে নিয়ে বললুম, 'দোস্ত মুহম্মদ, কি সব আবোল-তাবোল বকছেন ?'

দোস্ত মুহম্মদ আমাকে আলিঙ্গন করে দু'গালে দুটো বম্‌শেল চুমো লাগালেন। বললেন, 'আমি কক্ষনো আবোল-তাবোল বকিনে।'

আমি বললুম, 'তবে এসব কি ?'

বললেন, 'এসব তোর বালাই কাটাবার জন্য। লক্ষ্য করিসনি, এদেশে বাচ্চাদের সাজিয়ে-গুজিয়ে কপালের একপাশে খানিকটে ভুসো মাখিয়ে দেয়। তোর কপালে তো আর ভুসো মাখাতে পারিনে—তাই কথা দিয়ে সেরে নিলুম। যাকে এত গালাগাল দিচ্ছি, যম তাকে নেবে কেন ? পরমায়ু বেড়ে যাবে। বুঝলি ?'

লক্ষ্য করলুম গেলবার দোস্ত মুহম্মদ আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছিলেন, এবারে সেটা 'তুই'য়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

ফার্সী ভাষায় 'আপনি, তুমি, তুই' তিন বাক্য নেই—আছে শুধু 'শোমা' আর 'তো'। কিন্তু ঐ 'তো' দিয়ে 'তুমি, তুই' দুই-ই বোঝানো যায়—যে রকম ইংরিজীতে যখন বলি, 'ড্যাম ইউ,' তখন তার অর্থ 'আপনি চুলোয় যান,' নয়, অর্থ তখন 'তুই চুলোয় যা'। খাঁটি পাঠান আবার 'শোমা' কথাটাও ব্যবহার করে না, ইংরেজের মত শুধু ঐ এক 'ইউ'ই জানে। বেদুইনের আরবীতেও মাত্র এক 'আনতা'। বোধ হয় পাঠান, ইংরেজ, বেদুইনের ডিমোক্র্যাসি তার সম্বোধনের সমতায় প্রকাশ পেয়েছে।

দোস্ত মুহম্মদ স্মরণ করিয়ে দিলেন প্যারিসফের্তা সইফুল আলমের ছোট ভাইয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন। সইফুল আলম তাঁকে পাঠিয়েছেন আমাকে নিয়ে যেতে। গাড়ি তৈরী।

সিগারেট দিয়ে বললুম, 'খান।'

বললেন, 'না। আবদুর রহমানকে বলো তামাক দিতে।'

আমি বললুম, 'আবদুর রহমানকে চেনেন তা হলে!'

বললেন, 'তোমাকে কে চেনে বাপু, তুমি তো দু'দিনের চিড়িয়া। আমাকে কে চেনে বাপু, আমিও তিনদিনের পাখি—যে-পাহাড় থেকে নেমে এসেছি, সে-পাহাড়ের গর্ভে আবার ঢুকে যাব, আগা আহমদের টাকাটা মেরে। আমি কে ?

মকতবে আমানিয়ার অধ্যাপক অবশ্যি বটি, কিন্তু ক'টা লোকে জানে। অথচ বাজারে গিয়ে পুছো, দেখবে সবাই জানে, আমি হচ্ছি সেই মূর্খ, যার কাঁধে বন্দুক রেখে আগা আহমদ শিকার করে; অর্থাৎ আগা আহমদের মনিব। তুমি কে? যার কাঁধে আবদুর রহমান বন্দুক রেখেছে—শিকার করে কি না-করে পরে দেখা যাবে। চাকর দিয়ে মনিব চিনতে হয়।'

আমি বললুম, 'বেশক্, বেশক্।' তারপর বাঙলায় বললুম, 'গোঁপের আমি, গোঁপের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।'

বললেন, 'বুঝিয়ে বল।'

তর্জমা শুনে দোস্ত মুহম্মদ আনন্দে আত্মহারা। শুধু বলেন 'আফরীন, আফরীন, সাবাস, সাবাস, উম্‌দা কবিতা, জরির কলম।' তারপর মুখে মুখে শেষ লাইনের একটা অনুবাদও করে ফেললেন,—

'মনে বুরুৎ, তনে বুরুৎ, বরুৎ সনাক্তদার।'

তারপর বললেন, 'আমি আরবী, ফার্সী আর তুর্কী নিয়ে কিছু কিছু নাড়াচাড়া করেছি, কিন্তু ভাল রসিকতা কোথাও বিশেষ দেখিনি। পদ্যে তো প্রায় নেই-ই। বাঙলায় বুঝি এরকম অনেক মাল আছে?'

আমি বললুম, 'না, মাত্র দুখানা কি আড়াইখানা বই।'

দোস্ত মুহম্মদ নিরাশ হয়ে বললেন, 'তাহলে আর বাঙলা শিখে কি হবে?'

পেশাওয়ারের আহমদ আলী আর কাবুলের দোস্ত মুহম্মদে একটা মিল দেখতে পেলুম—দুজনই অল্প রসিকতায় খুব মুগ্ধ হন। তফাতের মধ্যে এইটুকু যে, আহমদ আলীর জীবনের ধারা বয়ে চলেছে আর পাঁচজনের মত, আর দোস্ত মুহম্মদের জীবন যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। এক পাথর থেকে আরেক পাথরে লাফ দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছে, মাঝখানে রসিকতার সূর্যকিরণ পড়লেই রামধনুর রঙ মেখে নিচ্ছে। দু'-একবার মামুলী দুঃখকষ্টের কথা বলতে গিয়ে দেখলুম, সে সব কথা তার কানে যেন পৌঁচচ্ছেই না। বিলাসব্যসনেও শখ নেই। তিনি যেন সমস্তক্ষণ বোম্বাগড়ের সন্ধানে যেখানে রাজার পিসি পাঁউরুটিতে পেরেক ঠোকেন, যেখানে পণ্ডিতেরা টাকের উপর ডাকের টিকিট আঁটেন।

তাই যখন আমরা বিয়ের মজলিসে গিয়ে কাবুল শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাঝখানে আসন পেলুম, তখন দোস্ত মুহম্মদের জন্য দুঃখ হল। খানিকক্ষণ পরে দেখি, তিনি চোখ বন্ধ করে বিড় বিড় করে কি যেন আপন মনে বলে যাচ্ছেন। তাঁর দিকে একটু ঝুঁকতেই তিনি বললেন, 'ফয়েজ মুহম্মদের গুণে শিক্ষামন্ত্রীর নাম, না শিক্ষামন্ত্রীর পদের জোরে ফয়েজ মুহম্মদের নাম—মুহম্মদ তর্জার গুণে বিদেশী

দিয়েছে। ওঃ!'

ততক্ষণে আগা আহমদ দরজা খুলে ঘরে ঢুকেছে। কারো দিকে না তাকিয়ে, দোস্ত মুহম্মদের কোনো কথায় সাড়া না দিয়ে সোজা সোফার পিছনে গিয়ে কার্পেটের তলায় আরো বেশীদূর হাত চালিয়ে আরেক প্যাকেট পুরো সিগরেট বের করে আমার হাতে দিল।

বেরবার সময় দোরের গোড়ায় একবার দাঁড়াল। এক ঝলকের তরে দোস্ত মুহম্মদের দিকে তাকিয়ে বলল,—'খালি প্যাকেটটা আমার। লুকিয়ে রেখেছিলুম।'

দোস্ত মুহম্মদের চোখের পাতা পড়ছে না। অনেকক্ষণ পরে বললেন, 'কী অসম্ভব বদমায়েশ! আর আমাকে বেকুব বানাবার কায়দাটা দেখলেন গর্ভ-স্রাবটার! শুধু তাই, নিত্য নিত্য আমাকে বেকুব বানায়!'

তারপর মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে আপন মনেই বললেন, 'কিন্তু দাঁড়াও বাচ্চা, স্যাকরার ঠুক্‌ঠাক্, কামারের এক ঘা।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওর পাঁচ বছরের মাইনে তিনশ' টাকা আমার কাছে জমা আছে। সেই টাকাটা লোপাট মেরে রাইফেল কাঁধে করে একদিন পাহাড়ে উধাও হয়ে যাব; তখন যাদু টেরটি পাবেন।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনি কলেজ যাবার সময় ঘরে তালা লাগান?'

তিনি বললেন, 'একদিন লাগিয়েছিলুম। কলেজ থেকে ফিরে দেখি সে তালা নেই, আরেকটা পর্বতপ্রমাণ তালা তার জায়গায় লাগানো। ভাঙবার চেষ্টা করে হার মানলুম। ততক্ষণে পাড়ার লোক জমে গিয়েছে—আগা আহমদের দর্শন নেই। কি আর করি, বসে রইলুম হী-হী শীতে বারান্দায়। হেলে দুলে আগা আহমদ এলেন ঘণ্টাখানেক পরে। পাষণ্ড কি বলল জানো? 'ও তালাটা ভালো নয় বলে একটা ভালো দেখে তালা লাগিয়েছি।' আমি যখন মার মার করে ছুটে গেলুম তখন শুধু বললো, 'কারো উপকার করতে গেলেই মার খেতে হয়।'

আমি বললুম, 'তালা তা হলে আর লাগাচ্ছেন না বলুন।'

'কি হবে? আগা আহমদ আফ্রিদী, ওরা সব তালা খুলতে পারে। জানো, এক আফ্রিদী বাজী ফেলে আমীর হবীব উল্লার নিচের থেকে বিছানার চাদর চুরি করেছিল।'

আমি বললুম, 'তালা যদি না লাগান তবে একদিন দেখবেন আগা আহমদ আপনার দামী রাইফেল নিয়ে পালিয়েছে।'

দোস্ত মুহম্মদ খুশী হয়ে বললেন, 'তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি আছে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি তত কাঁচা ছেলে নই। আগা আহমদের দাদা আমাকে আর বছরে ছ'শ' টাকা দিয়েছিল, ওর জন্য দাঁওমত একটা ভালো রাইফেল কেনার জন্য। এটা সেই টাকায় কেনা কিন্তু আগা আহমদ জানে না। ও যদি রাইফেল নিয়ে উবে যায় তবে আমি তার ভাইকে তক্ষুনি চিঠি লিখে পাঠাব, 'তোমার ভ্রাতৃহস্তে রাইফেল পাঠাইলাম ; প্রাপ্তি-সংবাদ অতি অবশ্য জানাইবা।' তারপর দুই ভায়েতে—'

আমি বললুম, 'সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই।'

দোস্ত মুহম্মদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাইফেলের জন্য তারা লড়েছিল ?'

আমি বললুম, 'না, সুন্দরীর জন্য।'

দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তওবা! তওবা! স্ত্রীলোকের জন্য কখনো জব্বর লড়াই হয় ? মোক্ষম লড়াই হয় রাইফেলের জন্য। রাইফেল থাকলে সুন্দরীর স্বামীকে খুন করে তার বিধবাকে বিয়ে করা যায়। উত্তম বন্দোবস্ত। সে বেহেস্তে গিয়ে হুরী পেল তুমিও সুন্দরী পেলে।'

রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'ভেবো না, লক্ষ্য করিনি যে, তুমি আমাকে 'আপনি' বলছো আর আমি 'তুমি' বলে যাচ্ছি। কিন্তু বেশী দিন চালাতে পারবে না। সমস্ত আফগানিস্থানে আমাকে কেউ 'আপনি' বলে না, ইস্তেক আগা আহমদ পর্যন্ত না।'

টাঙ্গায় চড়বার সময় 'দাঁড়াও' বলে ছুটে গিয়ে একখানা বই নিয়ে এসে আমার হাতে গুঁজে দিলেন। মন্তব্য প্রকাশ করলেন, 'ভালো বই, কর্সিকা আর আফগানিস্থানে একই রকম প্রতিশোধের ব্যবস্থা।' চেয়ে দেখি 'কলঁবা'।*

উনিশ

দিন দশেক পরে একদিন জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, দোস্ত মুহম্মদ। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে কাবুলী কায়দায় 'ভালো আছেন তো, মঙ্গল তো, সব ঠিক তো', বলতে আরম্ভ করলুম। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলুম, দোস্ত মুহম্মদ কোনো সাড়া-শব্দ না দিয়ে আপন মনে কি সব বিড়-বিড় করে বলে যাচ্ছেন। কাছে এসে কান পেতে যা শুনলুম, তাতে আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম। বলছেন, 'কমরত ব শিকনদ, খুদা তোরা কোর সাজদ, ব পুন্দী, ব তরকী ইত্যাদি।'

* 'আগুনের ফুলকি' নাম দিয়ে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদ করেছেন।

কিছুটা পাথর আঁকড়ে ধরে ধরে। দুটো খচ্চর ভেসে গেল জলের তোড়ে, সঙ্গে নিয়ে গেল খাবার-দাবার সব কিছু। দলের সাতজনের মধ্যে দুজন অনাহারে মারা যান।

এসব বর্ণনা আমি যে জীবনে প্রথম শুনলুম তা নয়, কিন্তু এর বর্ণনাতে কোনো রোমান্স মাখানো ছিল না, পর্যটকদের গতানুগতিক দম্ভ ছিল না আর আফগান সরকারের নিরর্থক অসময়ে ট্র্যান্সফার করার বাতিকের বিরুদ্ধে কণামাত্র নালিশ-ফরিয়াদ ছিল না। ভাবখানা অনেকটা 'ছাতা ছিল না তাই বিষ্টিতে ভিজে বাড়ি ফিরলুম। কাল আবার বেরতে পারি দরকার হলে—ছাতা যে সঙ্গে নেবই সে রকম কথাও দিচ্ছিনে।' অর্থাৎ আগামী বসন্তে যদি তাকে ফের বদখশান যেতে হয় তবে সে আপত্তি জানাবে না।

অথচ যখন বার্লিনে পড়াশুনা করত তখন তিন বছর ধরে মাসে চারশ' মার্ক খর্চা করে আরামে দিন কাটিয়েছে।

অনেক রাতে খাবার ডাক পড়ল। গরম বাঙলা দেশেই যখন বিয়ের রান্না ঠাণ্ডা হয় তখন ঠাণ্ডা কাবুলে যে বেশীর ভাগ জিনিসই হিম হবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

মীর আসলম তাই খানিকটে মাংস এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কিঞ্চিৎ শূল্যপক্ক অজমাংস ভক্ষণ কর। আভ্যন্তরিক উষ্মার জন্য ইহাই প্রশস্ততম।'

তারপর দোস্ত মুহম্মদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনো জিনিসের অপ্রাচুর্য হয় নাই তো?' দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তা ব্ গুলুয়েম রসীদ—গলা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে—গরগরা শুদম—আমার ফাঁসি হয়ে গিয়েছে।'

কোনো জিনিসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হওয়ার এই হল ফার্সী সংস্করণ।

আফগান বিয়ের ভোজে যে বিস্তর লোক প্রচুর পরিমাণে খাবে সে কথা কাবুলে না এসেও বলা যায়, কিন্তু তারো চেয়ে বড় তত্ত্বকথা এই যে, যত খাবে তার চেয়ে বেশী ফেলবে, বাঙলা দেশের এই সুসভ্য বর্বরতার সন্ধান আফগানরা এখনো পায়নি।

খাওয়া-দাওয়ার পর গালগল্প জমলো ভালো করে। শুধু দোস্ত মুহম্মদ কাউকে কিছু না বলে তিনটে কুশনে মাথা দিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমার বাড়ি ফিরবার ইচ্ছে করছিল, কিন্তু আবহাওয়া থেকে অনুমান করলুম যে রেওয়াজ হচ্ছে, হয় মজলিসের পাঁচজনের সঙ্গে গুষ্ঠিসুখ অনুভব করা, নয় নির্বিকারচিত্তে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়া। বিয়েবাড়ির হৈ-হল্লা, কড়া বিজলি বাতি আফগানের ঘুমের কোনো ব্যাঘাত জন্মাতে পারে না।

রাত ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একজন একজন করে প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। সইফুল আলম আমাদের আরেক প্রস্থ চা দিয়ে গেলেন। মীর আসলমের ভাষা বিদগ্ধ হতে বিদগ্ধতর হয়ে যখন প্রায় যজ্ঞভস্মের মত পূতপবিত্র হবার উপক্রম করছে, তখন তিনি হঠাৎ চুপ করে গেলেন। চেয়ে দেখি, সেই বৃদ্ধ সেতারখানা কোলে তুলে নিয়েছেন।

মীর আসলম আমাকে কানে কানে বললেন, 'তোমার অদৃষ্ট অদ্য রজনীর তৃতীয় যামে সুপ্রসন্ন হইল।'

সমস্ত সন্ধ্যা বৃদ্ধ কারো সঙ্গে একটি কথাও বলেননি। 'পিড়িং' করে প্রথম আওয়াজ বেরতেই মনে হল, এঁর কিন্তু বলবার মত অনেক কিছু আছে।

প্রথম মৃদু টঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই দোস্ত মুহম্মদও সোজা হয়ে উঠে বসলেন—যেন এতক্ষণ তারই অপেক্ষায় শুয়ে শুয়ে প্রহর গুনছিলেন।

সেতারের আওয়াজ মিলিয়ে যাবার পূর্বেই বুড়ার গলা থেকে গুঞ্জরণ ধ্বনি বেরল—কিন্তু ভুল করলুম—গলা থেকে নয়, বুক, কলিজা থেকে, তার প্রতি লোম-কূপ ছিন্ন করে যেন সে শব্দ বেরল। সেতার বাঁধা হয়েছিল কোন্ সন্ধ্যায় জানিনে কিন্তু তাঁর গলার আওয়াজ শুনে মনে হল, এঁর সর্বশরীর যেন আর কোনো ওস্তাদের ওস্তাদ বহুকাল ধরে বেঁধে বেঁধে আজ যামিনীর শেষযামে এই প্রথম পরি-পূর্ণতায় পৌঁছালেন।

ওস্তাদী বাজনা নয়—বুড়ার গলা থেকে যে পরী হঠাৎ ডানা মেলে বেরল, সেতারের আওয়াজ যেন তার ছায়া হয়ে গিয়ে তারই নাচে যোগ দিল।

ফার্সী গজল। বুড়ার চোখ বন্ধ; শান্ত-প্রশান্ত মুখচ্ছবি, চোখের পাতাটি পর্যন্ত কাঁপছে না, ওষ্ঠ-অধরের মৃদু স্ফুরণের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে গম্ভীর নিষ্কম্প গুঞ্জরণ। বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে সে আওয়াজ যেন বন্ধনমুক্ত আতরের মত সভাস্থল ভরে দিল।

গানের কথা শুনব কি, সেতারের গলায় মিশে গিয়েছে, যেন সন্ধ্যাবেলাকার নীল আকাশ সূর্যাস্তের লাল আবির মেখে নিয়ে ঘন বেগুনী থেকে আস্তে আস্তে গোলাপীর দিকে এগিয়ে চলেছে। আর পাঁচজনের কথা বলতে পারিনে—এ রকমের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম। জন্মান্ধ যেন চোখ মেলল সূর্যাস্তের মাঝখানে। আমি তখন রঙের মাঝখানে ডুবে গিয়েছি— সমুদ্র, বেলাভূমি, তরু-পল্লব কিছুই চোখে পড়ছে না।

ধ্বনির ইন্দ্রজালে মোহাচ্ছন্ন করে বৃদ্ধ যেন একমাত্র আমারই কানে কানে তাঁর গোপন মন্ত্র পড়তে লাগলেন,

সচিবের নাম, না বিদেশী সচিবের পদের জোরে মুহম্মদ তর্জীর নাম? বাঙালী কবি লাখ কথার এক কথা বলেছে,

'গোঁপের আমি, গোঁপের তুমি তাই দিয়ে যায় চেনা।'

আমি বললুম, 'চুপ, মন্ত্রীরা সব আপনার দিকে তাকিয়ে আছেন, শুনতে পেলে আপনাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন।'

বললেন, 'হ্যাঁ', তা বটে, বিশেষ করে ঐ ফয়েজটা।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ফয়েজ মুহম্মদ খান, মিনিস্টার অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন?'

উত্তর দিলেন, 'না, সিনিস্টার অব পাবলিক ডিস্ট্রাকশন। কত ছেলের মগজ ডেস্ট্রয় করছে। আমাকে মারবে তার আর নূতন কি?'

আমি ভয় পেয়ে 'চুপ চুপ' বলে উজীর সায়েবদের 'জ্ঞানগর্ভ' কথাবার্তায় কান দেবার চেষ্টা করলুম।

দোস্ত মুহম্মদকে দোষ দেওয়া অন্যায়। অনেক ভেবেও কূলকিনারা পাওয়া যায় না যে, এঁরা সব কোন্ গুণে মন্ত্রী হয়েছেন। লেখাপড়ায় এক-একজন যেন বিদ্যাসাগর। দুনিয়ার কোনো খবর রাখার চাড়ও কারো নেই। বেশীর ভাগই একবার দু'বার ইয়োরোপ হয়ে এসেছেন, কিন্তু সেখান থেকে দু'-একটা শক্ত ব্যাধি ছাড়া যে কিছু সঙ্গে এনেছেন, তা তো কথাবার্তা থেকে ধরা পড়ে না। ছোকরা-দের মধ্যে যারা গালগল্পে যোগ দিল, তারা তবু দু'-একটা পাস দিয়ে এসেছে, বুড়োদের যাঁরা অবজ্ঞা অবহেলা সত্ত্বেও মুখ খুললেন, তাঁদের কথাবার্তা থেকে ধরা পড়ে যে, আর কিছু না হোক তাঁদের অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু এই উজীরদের দল না পারে উড়তে, না পারে সাঁতার কাটতে—চলন যেন ব্যাঙের মত, এলোপাতাড়ি, থপথপ। কাবুলের বহু জিনিস, বহু প্রতিষ্ঠান দেখে মনে দুঃখ হয়, কিন্তু এই মন্ত্রি-মণ্ডলীকে দেখে কনফুৎসিয়সের মত বলতে হয়,

'আমি লইলাম ভিক্ষাপাত্র, সংসারে প্রণিপাত।'

সইফুল আলম এসে কানে কানে বললেন, 'একটু বাদে দক্ষিণের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসবেন; আমি দোরের গোড়ায় আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।' দোস্ত মুহম্মদ না শুনেও মাথা নাড়িয়ে প্রকাশ করলেন যে, তিনিও আসছেন।

মজলিস থেকে বেরিয়ে যেন দম ফেলে বাঁচলুম। দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তা ব্ গুলুয়েম রসীদ—গলা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে, গরগরা শুদম—আমার ফাঁসি হয়ে গিয়েছে।'

সত্যিকারের বিয়ের মজলিসে তখন প্রবেশ পেলুম। সেখানে দেখি, জন-

বিশেক ছোকরা, কেউ বসে, কেউ শুয়ে, কেউ গড়াগড়ি দিয়ে আড্ডা জমাচ্ছে। একজন গামছা দিয়ে গ্রামোফোনটার মুখ গুঁজে সাউণ্ড-বক্সের পাশে কান পেতে গান শুনছে। জনতিনেক তাস খেলছে। বিদগ্ধ মোল্লা মীর আসলম এক কোণে কি একখানা বই পড়ছেন। আরেক কোণে এক বুড়ো দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন, অথবা ঘুমোচ্ছেন—মাথায় প্রকাণ্ড সাদা পাগড়ি, বরফের মত সাদা দাড়ি আর কালো মিশমিশে জোব্বা। শান্ত মুখচ্ছবি—এক পাশে ছোট একখানা সেতার। সব ছেলে-ছোকরার পাল, ঐ মীর আসলম আর সেতারওয়ালা বৃদ্ধ ছাড়া। মজলিসে আসবাবপত্র কিছু নেই, শুধু দামী গালচে আর রঙীন তাকিয়া।

কেউ কেউ 'বফরমাইদ, আসতে আজ্ঞা হোক' বলে অভ্যর্থনা করলেন।

আমি দোস্ত মুহম্মদকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এইখানে সোজা এলেই তো হত।'

তিনি বললেন, 'সেটি হবার জো নেই, আসল মজলিসে বসে নাভিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত এখানে প্রোমোশন নদারদ। তা তুমি তো বাপু বেশ চাঁদপানা মুখ করে বসেছিলে। তোমাকে সেখানে উসখুস না করে বসে থাকতে দেখে আমার মনে তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড় ভয় জেগেছে। এদেশে উজীর হবার আসল গুণ তোমার আছে—To sit among bores without being bored. কিন্তু খবরদার, সাবধানে পা ফেলে চলো দাদা, নইলে রক্ষে নেই—দেখবে এক-দিন বলা নেই কওয়া নেই ক্যাঁক করে ধরে নিয়ে উজীর বানিয়ে দিয়েছে।'

সইফুল আলম আমাকে আদর করে বসালেন।

তরুণদের আড্ডা যে উজীরদের মজলিসের চেয়ে অনেক বেশী মনোরঞ্জক তা নয়, তবে এখানে লৌকিকতার তর্জনী নেই বলে যা খুশী করবার অনুমতি আছে। এরা নির্ভয়ে পলিটিক্স পর্যন্ত আলোচনা করে এবং যৌবনের প্রধান ধর্ম সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে কারো মুখে আর কোনো লাগাম থাকে না। কথাবার্তায় ভারতীয় তরুণদের সঙ্গে এদের আসল তফাত এই যে, এদের জীবনে নৈরাশ্যের কোনো চিহ্ন নেই, বর্তমান থেকে পালিয়ে গিয়ে অতীতে আশ্রয় তো এরা খোঁজেই না, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যা আশা-ভরসা, তাও স্বপ্নেগড়া পরীস্থান নয়। শারীরিক ক্লেশ সম্বন্ধে অচেতন এরকম জোয়ান আমি আর কোথাও দেখিনি। এদেরই একজন আর বসন্তে কি করে ট্রান্সফার হয়ে বদখশান থেকে হিন্দুকুশ পার হয়ে কাবুল এসেছিল তার বর্ণনা দিচ্ছিল। সমস্ত দিন হেঁটে মাত্র তিন মাইল রাস্তা এগোতে পেরেছিল, কারণ একই নদীকে ছ'বার পার হতে হয়েছিল, কিছুটা সাঁতরে,

'শবি আগর, শবি আগর, শবি আগর—'

'যদি এক রাত্রের তরে, মাত্র এক রাত্রের তরে, একবারের তরে—'

আমি যেন চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি, 'কি? কি? কি? এক রাতের তরে, একবারের তরে কি?' কিন্তু বলার উপায় নেই—দরকারও নেই, গুণী কি জানেন না?

'আজ লবে ইয়ার বোসয়ে তলবম্'

'প্রিয়ার অধর থেকে একটি চুম্বন পাই।'

প্রথমবার বললেন অতি শান্তকণ্ঠে, কিন্তু যেন নৈরাশ্য-ভরা সুরে, তারপর নৈরাশ্য যেন কেটে যেতে লাগল, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব আরম্ভ হল, সাহস বাড়তে লাগল, সবশেষে রইল দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ভাষা, 'পাবোই পাবো, নিশ্চয় পাবো।'

গুণী গাইছেন 'লবে ইয়ার', 'প্রিয়ার অধর' আর আমার বন্ধ চোখের সামনে কালোর মাঝখানে ফুটে ওঠে টকটকে লাল দুটি ঠোঁট, যখন শুনি 'বোসয়ে তলবম্', 'যদি একটি চুম্বন পাই', তখন চোখের সামনে থেকে সব কিছু মুছে যায়, বুকের মাঝখানে যেন তখন শুনতে পাই সেই আশানিরাশার দ্বন্দ্ব, আতুর হিয়ার আকুলি-বিকুলি, আত্মবিশ্বাসের দৃঢ় প্রত্যয়।

হুঙ্কার দিয়ে গেয়ে উঠলেন, 'জোয়ান শওম।'

'তাহলে আমি জোয়ান হব—একটি মাত্র চুম্বন পেলে লুপ্ত যৌবন ফিরে পাব।'

সভাস্থল যেন তাণ্ডব নৃত্যে ভরে উঠল—দেখি শঙ্কর যেন তপস্যাশেষে পার্বতীকে নিয়ে উন্মত্ত নৃত্যে মেতে উঠেছেন। হুঙ্কারের পর হুঙ্কার—'জোয়ান শওম', 'জোয়ান শওম'। কোথায় বৃদ্ধ সেতারের ওস্তাদ—দেখি সেই জোয়ান মঙ্গোল। লাফ দিয়ে তিন হাত উপরে উঠে শূন্যে দু'-পা দিয়ে ঘন ঘন ঢেরা কাটছে, আর দু'-হাত মেলে বুক চেতিয়ে মাথা পিছনে ছুঁড়ে কালো বাবরী চুলের আবর্তের ঘূর্ণি লাগিয়েছে।

দেখি তাজমহলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন শাহজাহান আর মমতাজ। হাত ধরাধরি করে। নবীন প্রাণ, নূতন যৌবন ফিরে পেয়েছেন, শতাব্দীর বিচ্ছেদ শেষ হয়েছে।

শুনি সঙ্গীত তরঙ্গের কলকল্লোল জাহ্নবী। সগররাজের সহস্র সন্তান নবীন প্রাণ নবীন যৌবন ফিরে পেয়ে উল্লাসধ্বনি করে উঠেছে।

কিন্তু গুণী, যৌবন পেয়েছে, প্রিয়ার প্রসাদ পেয়েছে, চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়েছে—অথচ কবিতার পদ যে এখনো অগ্রগামী—

'শবি আগর, আজ লবে ইয়ার বোসয়ে তলবম
জোয়ান শওম—'
আজি এ নিশীথে প্রিয়া-অধরেতে চুম্বন যদি পাই
জোয়ান হইব—

তারপর, তারপর কি ?

শুনি অবিচল দৃঢ়কণ্ঠে অদ্ভুত শপথ গ্রহণ,—

'জসেরো জিন্দেগী দুবারা কুনম'

'এই জীবন তাহলে আবার দোহরাতে, দু'বার করতে রাজী আছি। একটি চুম্বন দাও, তাহলে আবার সেই অসীম বিরহের তপ্ত দীর্ঘ অন্তবিহীন পথ ক্ষত-বিক্ষত রক্তসিক্ত পদে অতিক্রম করবার শক্তি পাব। আসুক না আবার সেই দীর্ঘ বিচ্ছেদ, তোমার অবহেলার কঠোর কঠিন দাহ!

'আমি প্রস্তুত, আমি শপথ করছি,

—'জসেরো জিন্দেগী দুবারা কুনম!'

'গোড়া হতে তবে এ-জীবন দোহরাই।' '

আমি মনে মনে মাথা নিচু করে বললুম, 'ক্ষমা করো গুণী, ক্ষমা করো কবি। শিখরে পৌঁছে উদ্ধত প্রশ্ন করেছিলুম, পদ এখনো অগ্রগামী, যাবো কোথায়। তুমি যে আমাকে হঠাৎ সেখান থেকে শূন্যে তুলে নিতে পারো, তোমার গানের পরী যে আমাকেও নীলাম্বরের মর্মমাঝে উধাও করে নিয়ে যেতে পারে, তার কল্পনাও যে করতে পারিনি।'

বারে বারে ঘুরে ফিরে গুণীর আকুতি-কাকুতি 'শবি আগর', 'যদি এক রাতের তরে', আর সেই দৃঢ় শপথ 'জিন্দেগী দুবারা কুনম', 'এ-জীবন দোহরাই'—গানের বাদবাকি এই দুই বাক্যেই বারে বারে সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে স্বপ্রকাশ হচ্ছে। কখনো শুনি 'শবি আগর' কখনো শুধু 'দুবারা কুনম'—'শবি আগর', 'দুবারা কুনম'।

পশ্চিমের সূর্য ডুবে যাওয়ার পরও পুবের আকাশ অনেকক্ষণ ধরে লাল রঙ ছাড়ে না—কখন গান বন্ধ হয়েছিল বলতে পারিনে। হঠাৎ ভোরের আজান কানে গেল, 'আল্লাহু আকবর', 'খুদাতালা মহান' মাভৈ, মাভৈ, ভয় নেই, ভয় নেই, তোমার সব কামনা পূর্ণ হবে।

'ওয়া লাল আখিরাতু খাইরুন লাকা মিনাল্ উলা'
'অতীতের চেয়ে নিশ্চয় ভালো হবে তো ভবিষ্যৎ।'*

* কুরান শরীফ ৯৩, ৪।

চোখ মেলে দেখি কবি নেই। মোল্লা মীর আসলম পাথরের মত বসে আছেন, আর দোস্ত মুহম্মদ দু'-হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেছেন।

বিশ

দরজা খাঁখাঁ করছে। ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালুম। আসবাবপত্র সব অন্তর্ধান। কার্পেটের উপর অ্যাটাচিকেসে মাথা রেখে দোস্ত মুহম্মদ শুয়ে। আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে বললেন, 'বোরো, গুমশো'—'বেরিয়ে যা, পালা এখান থেকে।'

দোস্ত মুহম্মদের রকমারি অভ্যর্থনা সম্ভাষণে ততদিনে আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। কাছে গিয়ে বললুম, 'জিনিসপত্র সব কি হল? আগা আহমদ যে ভারী ভারী টেবিল চেয়ার, কোচ সোফা পর্যন্ত সরাবে ততটা আঁচ করতে পারিনি।'

দোস্ত মুহম্মদ বিড়বিড় করে বললেন, 'সব ব্যাটা চোর, সব শালা চোর, কোনো ব্যাটাকে বিশ্বাস নেই, কাবুল থেকে প্যারিস পর্যন্ত।'

আমি বললুম, 'বড় অন্যায় কথা। চুরি করল আগা আহমদ, দোষ ছড়ালো প্যারিস পর্যন্ত।'

বললেন, 'কী মুশকিল, আগা আহমদ চুরি করলে তার পিছনে আমি রাইফেল কাঁধে করে বেরতুম না? না বেরলে আফ্রিদী সমাজে আমার জাত-ইজ্জত থাকত? নিয়েছে ব্যাটা লাফোঁ?'

'সে আবার কে?'

'পর্শু এসে পৌঁচেছে, ফরাসীর অধ্যাপক। লব্-ই-দরিয়ায় বাসা বেঁধেছে—বেশ বাড়িখানা। আফগান সরকারের যত আদিখ্যেতা-আত্তি সব বিদেশীদের জন্য।'

আমি বললুম, 'চোর কে, তার সাকিন-ঠিকানা সব যখন জানেন তখন মাল উদ্ধার—'

বললেন, 'আইনে দেয় না—বেচারী দুঃখ করছিল কোথাও আসবাবপত্র পাচ্ছে না। আমি বললুম আমার বাড়িতে বিস্তর আছে—ফরাসী জানো তো, বুক দ্য ম্যোবল, ফুল দ্য ম্যোবল, তা দ্য ম্যোবল, ব্যাটাকে দেখিয়ে দিলুম 'বিস্তর মাল' কত বিচিত্র কায়দায় ফরাসীতে বলা যায়। শুনে ব্যাটা দুসরা আফগান লড়াইয়ের গোরা সেপাইয়ের মত কচুকাটা হয়ে শুয়ে পড়ল।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'শুয়ে পড়ল কোথায়, এসে তো দিব্যি সব কিছু ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেল।'

দোস্ত মুহম্মদ আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'তওবা তওবা, নিজে এলে কি আর সব নিয়ে যেত—দেখত না ভিটেতে কবুতর চরার মত অবস্থা হয়ে উঠেছে। আমিই সব পাঠিয়ে দিলুম।'

আমি চটে গিয়ে বললুম, 'বেশ করেছ, এখন মরো হিমে শুয়ে—'

এক লাফ দিয়ে দোস্ত মুহম্মদ আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বলিনি বলিনি, তখন বলিনি, পারবিনি রে, পারবিনি—তোকে 'আপনি' বলা ছাড়তেই হবে। কিন্তু তুই ভাই রেকর্ড ব্রেক করেছিস—ঝাড়া পনরো দিন 'আপনি' চালিয়েছিস।'

আমি বললুম, 'বেশ বেশ। কিন্তু স্বেচ্ছায় যখন সব কিছু বিলিয়ে দিয়েছ তখন দুনিয়াসুদ্ধ লোককে 'চোর চামার' বলে কটুকাটব্য করছিলে কেন?'

'কাউকে বলবিনে, শুনেই ভুলে যাবি? তবে বলি শোন। তুই যখন ঘরে ঢুকলি তখন দেখলুম তোর মুখ বড্ড ভার। হয়ত দেশের কথা ভাবছিলি, নয় কাল রাত্তিরের গানের খোয়ারি কাটিয়ে উঠতে পারিসনি—কেন যে ক্ষ্যাপারা এরকম ভূতুড়ে গান গায়? তা সে যাক্‌গে। কিন্তু তোর মুখ দেখে মনে হল তুই বড্ড বেজার। তাই যা-তা সব বানিয়ে, তোকে চটিয়ে সব কথা ভুলিয়ে দিলুম। দেখলি কায়দাখানা!'

আমি বললুম, 'খুব দেখলুম, আমাকে বেকুব বানালে। তোমাকে বেকুব বানায় আগা আহমদ, আর তুমি বেকুব বানালে আমাকে। তা নূতন কিছু নয়—আমাদের দেশে একটা দোহা আছে—

শমনদমন রাবণ আর রাবণদমন রাম,
শ্বশুরদমন শাশুড়ী আর শাশুড়ীদমন হাম্।'

ঢিলে গল্প, কাঁচা রসিকতা। কিন্তু দোস্ত মুহম্মদ নবীনের মত, 'যাহা পায় তাহাই খায়,' মুখে হাসি লেগেই আছে।

আমি বললুম, 'সব বুঝেছি, কিন্তু একটা খাট তো অন্তত কেনো, মাটিতে শোবে নাকি?'

দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তবে আসল কথাটা এই বেলা শোনো; বিলিতী আসবাবপত্রে আমি কখনো আরাম বোধ করিনি—দশ বৎসর চেষ্টা করার পরও। অথচ পয়সা দিয়ে কিনেছি, ফেলতে গেলে লাগে। এতদিনে যখন সুযোগ মিলল তখন নূতন করে জঞ্জাল জুটোব কেন? এইবার আরাম করে পাঠানী কায়দায়

ঘরময় মই চষে বেড়াব—খাট থেকে পড়ে গিয়ে কোমর ভাঙবার আর ভয় নেই।'

আমি বললুম, 'কর্মরত ন শিকনদ', তোমার কোমর ভেঙে দু' টুকরো না হোক।'

কথা ছিল দু'জনে একসঙ্গে বগদানফ সাহেবের বাড়ি যাব।

পূর্বেই বলেছি ফরাসী দূতাবাসে বগদানফ সায়েবের বৈঠকখানা ছিল বিদেশী মহলের কেন্দ্রভূমি। বাগান থেকেই শব্দ শুনে তার আভাস পেলুম। ঘরে ঢুকে দেখি একপাল সায়েব মেম।

আমাকে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে বগদানফ সায়েব চোস্ত ফরাসী ভাষায় দুরুস্ত ফরাসী কায়দায় বললেন, 'পেরমেতে মওয়া ল্য প্লেজির দ্য ভু প্রেজাঁতে—অনুমতি যদি দেন তবে আপনাদের সামনে অমুককে নিবেদন করে বিমলানন্দ উপভোগ করি।'

তারপর এক-একজন করে সকলের নাম বলে যেতে লাগলেন। আমি বলি, 'হাডুডু', তাঁদের কেউ বলেন, 'আঁশাতে', কেউ বলেন, 'শার্মে', কেউ বলেন, 'রাভি'। অর্থাৎ আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে কেউ হয়েছেন enchanted, কেউ charmed, কেউ বা ravished। একেই বলে ফরাসী ভদ্রতা। এঁরা যখন গ্রেতা গার্বো বা মার্লেনে দীতরিশের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সত্যি সত্যি enchanted হন তখন কি বলেন তার সন্ধান এখনো পাইনি।

মসিয়ো লার্ফো গল্পের ছেঁড়া সুতোর খেই তুলে নিয়ে বললেন, 'তারপর বাদশা আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ফরাসী শিখতে ছ'মাসের বেশী সময় লাগার কথা নয়।' আমি বললুম, 'না হুজুর, অন্তত দু'বছর লাগার কথা।'

বগদানফ সায়েব বললেন, 'করেছেন কি? বাদশাহের কোনো কথায় না বলতে আছে? দিবা-দ্বিপ্রহরে, প্রখর রৌদ্রালোকে যদি হুজুর বলেন 'পশ্য, পশ্য, নীলাম্বরের ললাটদেশে চন্দ্রমা কি প্রকারে শ্বেতচন্দন প্রলেপ করেছেন।' আপনি তখন প্রথম বলবেন, 'হুজুরের যে পূতপবিত্র পদদ্বয় অনাদি কাল থেকে অসীম কাল পর্যন্ত মণি-মাণিক্যবিজড়িত সিংহাসনে বিরাজমান এ-গোলাম সেই পদরজস্পর্শ লাভের আশায় কুরবানী হতে প্রস্তুত।' তারপর বলবেন—'

বাধা দিয়ে মাদাম লার্ফো বললেন, 'সম্পূর্ণ মন্ত্রোচ্চারণে যদি ভুলচুক হয়ে যায়? দৈর্ঘ্য তো কিছু কম নয়।'

বগদানফ সায়েব সদয় হাসি হেসে বললেন, 'অল্প-স্বল্প রদবদল হলে আপত্তি নেই। 'মণি-মাণিক্যের' বদলে 'হীরা-জওহর' বলতে পারেন, 'পদরজে'র পরিবর্তে 'পদধূলি' বললেও বাধবে না।'

'তারপর বলবেন, 'হুজুরের কী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি,—চন্দ্রমা সত্যই কি অপূর্ব বেশ ধারণ করেছেন এবং নক্ষত্রমণ্ডলী কতই না নয়নাভিরাম।' '

ইতালির সিন্নোরা দিগাদো জিজ্ঞেস করলেন, 'তবে কি ভদ্রতা বজায় রেখে হুজুরকে সত্যি কথা জানাবার কোনো উপায়ই নেই? এই মনে করুন মসিয়ো লাফোঁ যদি সত্যি সত্যি জানাতে চান যে, ফরাসী শিখতে দু'বছর লাগে?'

বগদানফ বললেন, 'নিশ্চয়ই আছে, বাদশা যখন বলবেন ছ'মাস আপনি তখন বলবেন, 'নিশ্চয়ই, হুজুর, ছ'মাসেই হয়। দু'বছরে আরো ভালো হয়।' হুজুরেরও তো কাণ্ডজ্ঞান আছে। আপনার ভদ্রতাসৌজন্যের আতর তিনি শুঁকবেন, গায়ে মাখবেন, তাই বলে তো আর গিলবেন না।'

মসিয়ো লাফোঁ বললেন, 'এ সব বাড়াবাড়ি।'

বগদানফ বললেন, 'নিশ্চয়ই; বাড়াবাড়িরই আরেক নাম superfluity। আর পোয়েট টেগোর—আমাদের তিনি গুরুদেব—' বলেই তিনি প্রফেসর বেনওয়া ও আমার দিকে একবার বাও করলেন—'তিনি বলেন, 'আর্টের সৃষ্টি হয়েছে সুপার-ফ্লুয়িটি থেকে।' আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'কথাটা বোঝাতে গিয়ে তিনি শাস্ত্রী মশায়কে কি একটা চমৎকার তুলনা দিয়েছিলেন না?'

আমি বললুম, 'কাঠের ডাণ্ডা লাগানো টিনের কেনেস্তারায় করে রাধু মালীর নাইবার জল আনার মধ্যে আর নন্দলাল কর্তৃক চিত্রবিচিত্রিত মৃৎপাত্র ভরে ষোড়শী তন্বঙ্গী সুন্দরীর জল আনার মধ্যে যে সুপারফ্লুয়িটির তফাত তাই আর্ট।'

বগদানফ সায়েব উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'শুধু আর্ট? দর্শন, বিজ্ঞান, সব কিছু—কলচর বলতে যা কিছু বুঝি। সবই সুপারফ্লুয়িটি থেকে, বাড়াবাড়ি থেকে।'

অধ্যাপক ভ্যাসাঁ বললেন, 'কিন্তু এই কলচর যখন চরমে পৌঁছয় তখন গুরু-চণ্ডালে এত পার্থক্য হয়ে যায় যে, বাইরের শত্রু এসে যখন আক্রমণ করে তখন সে দেশের সব শ্রেণী এক হয়ে দাঁড়াতে পারে না বলে স্বাধীনতা হারায়। যেমন ইরান।'

আমি বললুম, 'ভারতবর্ষ।'

পোলিশ মহিলা মাদাম ভরভচিয়েভিচি বললেন, 'কিন্তু ইংরেজ? তারা তো সভ্য, তাদের গুরুচণ্ডালেও তফাত অনেক, কিন্তু তারা তো সব সময় এক হয়ে লড়তে পারে।'

বগদানফ জিজ্ঞেস করলেন, 'কাদের কথা বললেন, মাদাম?'

'ইংরেজের।'

'ঐ যারা ইয়োরোপের পশ্চিমে একটা ছোট দ্বীপে থাকে?'

মজলিসে ইংরেজ কেউ ছিল না। সবাই ভারী খুশী। আমি মনে মনে বললুম, 'আমাদের দেশেও বলে 'চরুয়া'।'

অধ্যাপক ভ্যাঁসাঁ বললেন, 'বগদানফ ঠিকই অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন। ইংরেজদের ভিতর অনেক খানদানী বংশ আছে সত্যি কিন্তু গুরুচণ্ডালে যে বৈদগ্ধ্যের পার্থক্য হবে, সে কোথায়? ওদের তো থাকার মধ্যে আছে এক সাহিত্য। সঙ্গীত নেই, চিত্রকলা নেই, ভাস্কর্য নেই, স্থপতি নেই। শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে পার্থক্য হবে তার অনুভূতিগত উপকরণ কোথায়? অথচ ফ্রান্সে এসব উপকরণ প্রচুর; তাই দেখুন ফরাসীরা এক হয়ে লড়তে জানে না, শান্তির সময় রাজ্য পর্যন্ত চালাতে পারে না। যে দেশে আছি তার নিন্দে করতে নেই, কিন্তু দেখুন, এক ফোঁটা দেশ অথচ স্বাধীন।'

মাদাম ভরভচিয়েভিচি বললেন, 'এ দেশেও তো মোল্লা আছে।'

দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'কিছু ভয় নেই মাদাম। মোল্লাদের আমি বিলক্ষণ চিনি। ওদের বেশীর ভাগ যেটুকু শাস্ত্র জানে আপনাকে সেটুকু আমি তিন দিনেই শিখিয়ে দিতে পারব। কিন্তু মেয়েদের মোল্লা হওয়ার রেওয়াজ নেই।'

মাদাম চটে গিয়ে বললেন, 'কেন নেই?'

দোস্ত মুহম্মদ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'দাড়ি গজায় না বলে।'

ভ্যাঁসাঁ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'মোল্লাই হন আর যাই হন, এ দেশের মেয়ে হয়ে জন্মালে যে আপনাকে বোরকার আড়ালে থাকত হত। আমাদের ক্ষেতিটা বিবেচনা করুন।'

সবাই একবাক্যে

'Oui, Madame,

Si, si, Madame,

Certainement, Madame.'

কোরাস সমাপ্ত হলে দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'কিন্তু পর্দা-প্রথা ভালো।'

যেন আটখানা অদৃশ্য তলোয়ার খোলার শব্দ শুনতে পেলুম; চোখ বন্ধ করে দেখি দোস্ত মুহম্মদের মুণ্ডটা গড়িয়ে গড়িয়ে আফ্রিদী মুল্লুকের দিকে চলেছে।

নাঃ! কল্পনা। শুনি দোস্ত মুহম্মদ বলছেন, 'ধর্মত বলুন তো মশায়রা, মাদাম ভরভচিয়েভিচি, মাদাম লাফোঁ, সিন্নোরা দিগাদোর মত সুন্দরী সংসারে কয়টি? বেশীর ভাগই তো কুচ্ছিত। পাইকারী পর্দা চালালে তাহলে ক্ষতির

চেয়ে লাভ বেশী নয় কি ?'

মহিলারা কথঞ্চিৎ শান্ত হলেন।

কিন্তু মাদাম ভরভচিয়েভিচি পোলিশ,—উষ্ণ রক্ত। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর পুরুষদের সবাই বুঝি খাপসুরত এ্যাডনিস ? তারাই বা বোরকা পরে না কেন, শুনি।'

দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তাই তো পুরুষদের দিকে মেয়েদের তাকানো বারণ।'

মজলিসে হট্টগোল পড়ে গেল। মেয়েরা খুশী হলেন, না ব্যাজার হলেন ঠিক বোঝা গেল না। কুয়াশা কাটিয়ে সিন্নোরা দিগাদো দোস্ত মুহম্মদকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুন্দরীর অপ্রাচুর্য বলেই কি আপনি বিয়ে করেননি ?'

দোস্ত মুহম্মদ একটুখানি হাঁ করে বাঁ হাত দিয়ে ডান দিকের গাল চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'তা নয়। আসল কথা হচ্ছে, কোনো একটি সুন্দরীকে বেছে নিয়ে যদি তাকে বিয়ে করি তবে তার মানে কি এই নয় যে, আমার মতে দুনিয়ার আর সব মেয়ে তার তুলনায় কুচ্ছিত ! একটি সুন্দরীর জন্য দুনিয়ার সব মেয়েকে এ রকম বে-ইজ্জৎ করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।'

সবাই খুশী। আমি বিশেষ করে। পাহাড়ী আফগান বিদগ্ধ ভ্যাঁসাঁকে শিভালরিতে ঘায়েল করে দিল বলে।

ইরানী রাজদূতাবাসের আগা আদিব এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন, বললেন, 'তবেই আফগানিস্থানের হয়েছে। ইরানী কায়দার নকল করে আফগানিস্থানেরও কপাল ভাঙবে। ইরান কিন্তু ইতিমধ্যে হুঁশিয়ার হয়ে গিয়েছে। শাহ-বাদশাহের সঙ্গে কথা বলবার যে সব কায়দা বগদানফ সায়েব বললেন সেগুলো তিনি দশ বছর আগে ইরানে শিখেছিলেন। এখন আর সেদিন নেই। সব রকম এটিকেটের বিরুদ্ধে সেখানে এখন জোর আন্দোলন আর ঠাট্টামস্করা চলছে। ঘরে ঢোকার সময় যে সামান্য ভদ্রতা একে অন্যকে দেখায় তার বিরুদ্ধে পর্যন্ত এখন কবিতা লেখা হয়। শুনে শুনে একটা তো আমারই মুখস্থ হয়ে গিয়েছে ; আপনারা শোনেন তো বলি।'

সবাই উৎসাহের সঙ্গে রাজী হলেন।

আগা আদিব বেশ রসিয়ে রসিয়ে আবৃত্তি করে গেলেন—

'খুদা তুমি দিলে বহুৎ জ্ঞান,
শেষ রহস্য এই বারেতে কর সমাধান।
ইরান দেশের লোক

কসম খেয়ে বলতে পারি নয় এরা উজবোক্।
বিদ্যে আছে, বুদ্ধি আছে, সাহস আছে ঢের
সিঙি লড়ে, মোকাবেলা করে ইংরেজের।
তবে কেন ঢুকতে গেলেই ঘরে
সবাই এমন ঠেলাঠেলি করে?
দোরের গোড়ায় থমকে দাঁড়ায় ভিতর পানে চায়,
'আপনি চলুন', 'আপনি ঢুকুন', দাঁড়িয়ে কিন্তু ঠায়।
হাসি-খুশী বন্ধ হঠাৎ গল্প যে যায় থেমে
ঠেলাঠেলির মধ্যিখানে উঠছে সবাই ঘেমে।
অবাক হয়ে ভাবি সবাই কেন এমন করে,
দিবা-দ্বিপ্রহরে
কি করে হয় ঘরের মাঝে ভূত?
তবে কি যমদূত?
সলমনের জিন্?
কিম্বা গিলটিন?
ঢুকলে পরেই কপাৎ করে কেটে দেবে গলা,
তাই দেখে কি দোরে এসে বন্ধ সবার চলা?'

একুশ

কাবুলের রাস্তাঘাট, বাজারহাট, উজীরনাজির, গুরুচণ্ডালের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হ'ল বটে, কিন্তু গোটা দেশের সঙ্গে মোলাকাত হওয়ার আশা দেখলুম কম, আর নগর জনপদ উভয় ক্ষেত্রে যে-সব অদৃশ্য শক্তি শান্তির সময় মন্দ গতিতে এবং বিদ্রোহবিপ্লবের সময় দুর্বার বেগে এগিয়ে চলে সেগুলোর তাল ধরা বুঝলুম আরো শক্ত, প্রায় অসম্ভব।

আফগানিস্থানের মেরুদণ্ড তৈরী হয়েছে জনপদবাসী আফগান উপজাতিদের নিয়ে, অথচ তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা, আভ্যন্তরীণ শাসনপ্রণালী, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোনো কেতাব লেখা হয়নি; কাবুলে এমন কোনো গুণীরও সন্ধান পাইনি যিনি সে সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করুন আর নাই করুন অন্তত একটা মোটামুটি বর্ণনাও দিতে পারেন। ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে কাবুলীরা প্রায়ই বলেন, 'তারপর শিনওয়ারীরা বিদ্রোহ করল', কিন্তু যদি

তখন প্রশ্ন করেন, বিদ্রোহ করল কেন, তবে উত্তর পাবেন, 'মোল্লারা তাদের খ্যাপালো বলে', কিন্তু তারপরও যদি প্রশ্ন শুধান যে, উপজাতিদের ভিতরে এমন কোন্ অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক উষ্ণ বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছিল যে, মোল্লাদের ফুলকি দেশময় আগুন ধরাতে পারল তা'হলে আর কোনো উত্তর পাবেন না। মাত্র একজন লোক—তিনিও ভারতীয়—আমাকে বলেছিলেন, 'মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, বিদেশের পণ্যবাহিনীকে লুটতরাজ না করলে গরীব আফগানের চলে না বলে সভ্যদেশের ট্রেড-সাইক্লের মত তাদেরও বিপ্লব আর শান্তির চড়াই-ওতরাই নিয়ে জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ করতে হয়।'

গ্রামের অবস্থা যেটুকু শুনতে পেলুম তার থেকে মনে হল শান্তির সময় গ্রামবাসীর সঙ্গে সহরবাসীর মাত্র এইটুকু যোগাযোগ যে, গ্রামের লোক শহরে এসে তাদের ফসল, তরকারি, দুম্বা, ভেড়া বিক্রয় করে সস্তা দরে, আর সামান্য যে দু'-একটি অত্যাবশ্যক দ্রব্য না কিনলেই নয়, তাই কেনে আক্রা দরে। সভ্যদেশের শহরবাসীরা বাদবাকির বদলে গ্রামের জন্য ইস্কুল, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট বানিয়ে দেয়। কাবুলের গ্রামে সরকারী কোনো প্রতিষ্ঠান নেই বললেই হয়। কতকগুলো ছেলে সকালবেলা গাঁয়ের মসজিদে জড়ো হয়ে গলা ফাটিয়ে আমপারা (কোরানের শেষ অধ্যায়) মুখস্থ করে—এই হল বিদ্যাচর্চা। তাদের তদারক করনেওয়ালা মোল্লাই গাঁয়ের ডাক্তার। অসুখ-বিসুখে তাবিজ-কবচ তিনিই লিখে দেন। ব্যামো শক্ত হলে পানি-পড়ার বন্দোবস্ত, আর মরে গেলে তিনিই তাকে নাইয়ে ধুইয়ে গোর দেন। মোল্লাকে পোষে গাঁয়ের লোক।

খাজনা দিয়ে তার বদলে আফগান গ্রাম যখন কিছুই ফেরত পায় না তখন যে সে বড় অনিচ্ছায় সরকারকে টাকাটা দেয় এ কথাটা সকলেই আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে বললেন, যদিও তার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

দেশময় অশান্তি হলে আফগান-গাঁয়ের সিকি পয়সার ক্ষতি হয় না—বরঞ্চ তার লাভ। রাইফেল কাঁধে করে জোয়ানরা তখন লুটে বেরোয়—'বিধিদত্ত' আফগানিস্থানের অশান্তিও বিধিদত্ত, সেই ছিড়িকে দু'পয়সা কামাতে আপত্তি কি? ফ্রান্স-জর্মনিতে লড়াই লাগলে যে রকম জর্মনরা মার্চ করার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে বলে, 'নাখ্ পারিজ, নাখ্ পারিজ,' 'প্যারিস চলো, প্যারিস চলো', আফগানরা তেমনি বলে, 'বিআ ব্ কাবুল, ব্ রওম্ ব্ কাবুল,' 'কাবুল চলো, কাবুল চলো।'

শহরে বসে আছেন বাদশা। তাঁর প্রধান কর্ম আফগান উপজাতির লুণ্ঠনলিপ্সাকে দমন করে রাখা। তার জন্য সৈন্য দরকার, সৈন্যকে মাইনে দিতে হয়,

গোলাগুলীর খর্চা তো আছেই। শহরের লোক তার খানিকটা যোগায় বটে কিন্তু মোটা টাকাটা আসে গাঁ থেকে।

তাই এক অদ্ভুত অচ্ছেদ্য চক্রের সৃষ্টি হয়। খাজনা তোলার জন্য সেপাই দরকার, সেপাই পোষার জন্য খাজনার দরকার। এ-চক্র যিনি ভেদ করতে পারেন তিনিই যোগীবর, তিনিই আফগানিস্থানের বাদশা। তিনি মহাপুরুষ সন্দেহ নেই; যে আফগানের দাঁতের গোড়া ভাঙবার জন্য তিনি শিলনোড়া কিনতে চান সেই আফগানের কাছ থেকেই তিনি সে পয়সা আদায় করে নেন।

ঘানি থেকে যে তেল বেরোয়, ঘানি সচল রাখার জন্য সেটুকু ঐ ঘানিতেই ঢেলে দিতে হয়।

সামান্য যেটুকু বাঁচে তাই দিয়ে কাবুল শহরের জৌলুশ।

কিন্তু সে এতই কম যে, তা দিয়ে নূতন নূতন শিল্প গড়ে তোলা যায় না, শিক্ষা-দীক্ষার জন্য ব্যাপক কোনো প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা যায় না। কাজেই কাবুলে শিক্ষিত সম্প্রদায় নেই বললেও চলে।

কিন্তু তাই বলে কাবুল সম্পূর্ণ অশিক্ষিত বর্বর একথা বলা ভুল। কাবুলের মোল্লা সম্প্রদায় ভারতবর্ষ-আফগানিস্থানের যোগাযোগের ভগ্নাবশেষ।

কথাটা বুঝিয়ে বলতে হয়।

কাবুলের দরবারী ভাষা ফার্সী, কাজেই সাধারণ বিদেশীর মনে এই বিশ্বাস হওয়াই স্বাভাবিক যে, কাবুলের সংস্কৃতিগত সম্পর্ক ইরানের সঙ্গে। কিন্তু ইরান শীয়া মতবাদের অনুরাগী হয়ে পড়ায় সুন্নী আফগানিস্থান শিক্ষা দীক্ষা পাওয়ার জন্য ইরান যাওয়া বন্ধ করে দিল। অথচ দেশ গরীব, আপন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার মত সামর্থ্যও তার কোনো কালে ছিল না।

এদিকে পাঠান, বিশেষ করে মোগল যুগে ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য দিল্লী লাহোরে ইসলাম ধর্মের সুন্নী শাখার নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলল। শিক্ষাদানের মাধ্যম ফার্সী; কাজেই দলে দলে কাবুল-কান্দাহারের ধর্মজ্ঞানপিপাসু ছাত্র ভারতবর্ষে এসে এই সব প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করল। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই; পূর্ববর্তী যুগে কাবুলীরা বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য তক্ষশিলায় আসত—আফগানিস্থানে যে-সব প্রাচীন প্রাচীর-চিত্র পাওয়া গিয়েছে সেগুলো অজন্তার ঐতিহ্যে আঁকা, চীন বা ইরানের প্রভাব তাতে নগণ্য।

এই ঐতিহ্য এখনো লোপ পায়নি। কাবুলের উচ্চশিক্ষিত মৌলবীমাত্রই ভারতে শিক্ষিত ও যদিও ছাত্রাবস্থায় ফার্সীর মাধ্যমে এদেশে জ্ঞানচর্চা করে গিয়ে-

ছেন, তবু সঙ্গে সঙ্গে দেশজ উর্দু ভাষাও শিখে নিয়ে গিয়েছেন। গ্রামের অর্ধ-শিক্ষিত মোল্লাদের উপর এঁদের প্রভাব অসীম এবং গ্রামের মোল্লাই আফগান জাতির দৈনন্দিন জীবনের চক্রবর্তী।

বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত জগৎ ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের নিন্দায় পঞ্চমুখ। এঁরা নাকি সর্বপ্রকার প্রগতির শত্রু, এঁদের দৃষ্টি নাকি সব সময় অতীতের দিকে ফেরানো এবং সে অতীতও নাকি মানুষের সুখদুঃখে মেশানো, পতন-অভ্যুদয়ে গড়া অতীত নয়, সে অতীত নাকি আকাশকুসুমজাত সত্যযুগের শাস্ত্রীয় অচলায়তনের অন্ধ প্রাচীর নিরুদ্ধ।

তুলনাত্মক ধর্মশাস্ত্রের পুস্তক লিখতে বসিনি, কাজেই পৃথিবীর সর্ব ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের নিন্দা বা প্রশংসা করা আমার কর্ম নয়। কিন্তু আফগান মোল্লার একটি সাফাই না গাইলে অন্যায় করা হবে।

সে-সাফাই তুলনা দিয়ে পেশ করলে আমার বক্তব্য খোলসা হবে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে কর্ণধার ছিলেন মৌলবী-মোল্লা, শাস্ত্রী-ভটচায। কিন্তু এঁরা দেশের লোককে উত্তেজিত করে ইংরেজের উচ্ছেদ সাধন করতে পারেন নি অথচ আফগান মোল্লার কট্টর দুশমনও স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, ইংরেজকে তিন-তিনবার আফগানিস্থান থেকে কান ধরে বের করবার জন্য প্রধানত দায়ী আফগান মোল্লা।

আহা, আহা! এর পর আর কি বলা যেতে পারে আমি তো ভেবেই পাই না। এর পর আর আফগান মোল্লার কোন্ দোষ ক্ষমা না করে থাকা যায়? কমজোর কলম আফগান মোল্লার তারিফ গাইবার মত ভাষা খুঁজে পায় না।

পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়েছেন এমন লোক আফগানিস্থানে দু'ডজন হবেন কিনা সন্দেহ। দেশে যখন শান্তি থাকে তখন এঁদের দেখে মনে হয়, এঁরাই বুঝি সমস্ত দেশটা চালাচ্ছেন; অশান্তি দেখা গেলেই এঁদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এঁদের সঙ্গে আলাপচারি হল; দেখলুম প্যারিসে তিন বৎসর কাটিয়ে এসে এঁরা মার্সেল প্রুস্ত্ আঁদ্রে জিদের বই পড়েননি, বার্লিন-ফের্তা ড্যারারের নাম শোনেননি, রিলকের কবিতা পড়েননি। মিল্টন বাল্মীকি মিলিয়ে মধুসূদন যে কাব্য সৃষ্টি করেছেন তারই মত গ্যোটে ফিরদৌসী মিলিয়ে কাব্য রচনা করার মত লোক কাবুলে জন্মাতে এখনো ঢের বাকি।

তাহলে দাঁড়ালো এই:—বিদেশফের্তাদের জ্ঞান পল্লবগ্রাহী, এবং দেশের নাড়ীর সঙ্গে এদের যোগ নেই। মোল্লাদের অধিকাংশ অশিক্ষিত,—যাঁরা পণ্ডিত তাঁদের সাতখুন মাফ করলেও প্রশ্ন থেকে যায়,—ইংরেজ রুশকে ঠেকিয়ে রাখাই

কি আফগানিস্থানের চরম মোক্ষ? দেশের ধনদৌলত বাড়িয়ে শিক্ষাসভ্যতার জন্ম যে প্রচেষ্টা, যে আন্দোলনের প্রয়োজন মৌলবী-সম্প্রদায় কি কোনো দিন তার অনুপ্রেরণা যোগাতে পারবেন? মনে তো হয় না। তবে কি বাধা দেবেন? বলা যায় না।

পৃথিবীর সব জাত বিশ্বাস করে যে, তার মত ভুবনবরেণ্য জাত আর দুটো নেই; গরীব জাতের তার উপর আরেকটা বিশ্বাস যে, তার দেশের মাটি খুঁড়লে সোনা রুপো তেল যা বেরবে তার জোরে সে বাকি দুনিয়া, ইস্তেক চন্দ্রসূর্য কিনে ফেলতে পারবে। নিরপেক্ষ বিচারে জোর করে কিছু বলা শক্ত কিন্তু একটা বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, যদি কিছু না বেরোয় তবে আফগানিস্থানের পক্ষে ধনী হয়ে শিক্ষা-দীক্ষা বিস্তার করার অন্য কোনো সামর্থ্য নেই।

সত্যযুগে মহাপুরুষরা ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, কলিযুগে গণৎকাররা করে। পাকা-পাকি ভবিষ্যদ্বাণী করার সাহস আমার নেই তবু অনুমান করি, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করে শক্তিশালী হওয়া মাত্র আবার আফগানিস্থান-ভারতবর্ষে হার্দিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে। কাবুল-কান্দাহারের বিদ্যার্থীরা আবার লাহোর দিল্লীতে পড়াশুনা করতে আসবে।

প্রমাণ? প্রমাণ আর কি? প্যারিস-বাসিন্দা ইংরিজী বলে না, ভিয়েনার লোক ফরাসী বলে না, কিন্তু বুডাপেস্টের শিক্ষিত সম্প্রদায় এখনো জর্মন বলেন, জ্ঞানান্বেষণে এখনো ভিয়েনা যান—ভিন্ন রাষ্ট্র নির্মিত হলেই তো আর ঐতিহ্য-সংস্কৃতির যোগসূত্র ছিন্ন করে ফেলা যায় না। কাবুলের মৌলবী-সম্প্রদায় এখনো উর্দু বলেন, ভারতবর্ষ বর্জন করে এঁদের উপায় নেই। ঝগড়া যদি করেন তবে সে তিনদিনের তরে।

উর্দু যে এদেশে একদিন কতটা ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ পেলুম হাতে-নাতে।

বাইশ

আগেই বলেছি, আমার বাসা ছিল কাবুল থেকে আড়াই মাইল দূরে—সেখান থেকে আরো মাইল দুই দূরে নূতন শহরের পত্তন হচ্ছিল। সেখানে যাবার চওড়া রাস্তা আমার বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে। অনেক পয়সা খরচ করে অতি যত্নে তৈরী রাস্তা। দু'দিকে সারি-বাঁধা সাইপ্রেস গাছ, স্বচ্ছ জলের নালা, পায়ে চলার আলাদা পথ, ঘোড়সোয়ারদের জন্যও পৃথক বন্দোবস্ত।

এ রাস্তা কাবুলীদের বুলভার। বিকেল হতে না হতেই মোটর, ঘোড়ার গাড়ি, বাইসিকেল, ঘোড়া চড়ে বিস্তর লোক এ রাস্তা ধরে নূতন শহরে হাওয়া খেতে যায়। হেঁটে বেড়ানো কাবুলীরা পছন্দ করে না। প্রথম বিদেশী ডাক্তার যখন এক কাবুলী রোগীকে হজমের জন্য বেড়াবার উপদেশ দিয়েছিলেন তখন কাবুলী নাকি প্রশ্ন করেছিল যে, পায়ের পেশীকে হায়রান করে পেটের অন্ন হজম হবে কি করে?

বিকেলবেলা কাবুল না গেলে আমি সাইপ্রেস সারির গা ঘেঁষে ঘেঁষে পায়চারি করতুম। এসব জায়গা সন্ধ্যার পর নিরাপদ নয় বলে রাস্তায় লোক চলাচল তখন প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেত।

এক সন্ধ্যায় যখন বাড়ি ফিরছি তখন একখানা দামী মোটর ঠিক আমার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। স্টিয়ারিঙে এক বিরাট-বপু কাবুলী ভদ্রলোক, তাঁর পাশে মেমসায়েবের পোশাকে এক ভদ্রমহিলা—হ্যাটের সামনে ঝুলানো পাতলা পর্দার ভিতর দিয়ে যেটুকু দেখা গেল তার থেকে অনুমান করলুম, ভদ্রমহিলা সাধারণ সুন্দরী নন।

নমস্কার অভিবাদন কিছু না, ভদ্রলোক সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফার্সী বলতে পারেন?'

আমি বললুম, 'অল্প স্বল্প।'

'দেশ কোথায়?'

'হিন্দুস্থান।'

তখন ফার্সী ছেড়ে ভদ্রলোক ভুল উর্দুতে, কিন্তু বেশ স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রায়ই আপনাকে অবেলায় এখানে দেখতে পাই। আপনি বিদেশী বলে হয়ত জানেন না যে, এ জায়গায় সন্ধ্যার পর চলাফেরা করতে বিপদ আছে।'

আমি বললুম, 'আমার বাসা কাছেই।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কি করে হয়? এখানে তো অজ পাড়াগাঁ—চাষাভুষোরা থাকে।'

আমি বললুম, 'বাদশা এখানে কৃষিবিভাগ খুলেছেন—আমরা জনতিনেক বিদেশী একসঙ্গে এখানেই থাকি।'

আমার কথা ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে ফার্সীতে তর্জমা করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি হাঁ-না, কিছুই বলছিলেন না।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কাবুল শহরে দোস্ত-আশনা নেই? একা একা বেড়ানোতে দিল হায়রান হয় না? আমার বিবি বলছিলেন, 'বাচ্চা গম্ মীখুরদ

—ছেলেটার মনে সুখ নেই।' তাইতে আপনার সঙ্গে আলাপ করলুম।' বুঝলুম, ভদ্রমহিলার সৌন্দর্য মাতৃত্বের সৌন্দর্য। নিচু হয়ে আদাবতসলিমাত জানালুম।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'টেনিস খেলতে পারেন?'

'হ্যাঁ।'

'তবে কাবুলে এলেই আমার সঙ্গে টেনিস খেলে যাবেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'অনেক ধন্যবাদ—কিন্তু আপনার কোর্ট কোথায়, আপনার পরিচয়ও তো পেলুম না।'

ভদ্রলোক প্রথম একটু অবাক হলেন। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, 'আমি? ওঃ, আমি? আমি মুইন-উস্-সুলতানে। আমার টেনিস-কোর্ট ফরেন অফিসের কাছে। কাল আসবেন।' বলে আমাকে ভালো করে ধন্যবাদ দেবার ফুর্সৎ না দিয়েই মোটর হাঁকিয়ে চলে গেলেন।

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, মোটরের প্রায় বিশ গজ পিছনে দাঁড়িয়ে আমার ভৃত্য আবদুর রহমান অ্যারোপ্লেনের প্রপেলারের বেগে দু'হাত নেড়ে আমাকে কি বোঝাবার চেষ্টা করছে। মোটর চলে যেতেই এঞ্জিনের মত ছুটে এসে বলল, 'মুইন-উস্-সুলতানে, মুইন-উস্-সুলতানে!'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'লোকটি কে বটেন?'

আবদুর রহমান উত্তেজনায় ফেটে চৌচির হয় আর কি। আমি যতই জিজ্ঞাসা করি মুইন-উস্-সুলতানে কে, সে ততই মন্ত্রোচ্চারণের মত শুধু বলে, মুইন-উস্-সুলতানে, মুইন-উস্-সুলতানে। শেষটায় নৈরাশ্য, অনুযোগ, ভর্ৎসনা মিশিয়ে বলল, 'চেনেন না, বরাদরে-আলা-হজরত, বাদশার ভাই,—বড় ভাই। আপনি করেছেন কি? রাজবাড়ির সকলের হাতে চুমো খেতে হয়!'

আমি বললুম, 'রাজবাড়িতে লোক সবসুদ্ধ ক'জন না জেনে তো আর চুমো খেতে আরম্ভ করতে পারিনে। সকলের পোষাবার আগে আমার ঠোঁট ক্ষয়ে যাবে না তো?'

আবদুর রহমান শুধু বলে, 'ইয়া আল্লা, ইয়া রসুল, করেছেন কি, করেছেন কি?'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'তা উনি যদি রাজার বড় ভাই-ই হবেন তবে উনি রাজা হলেন না কেন?'

আবদুর রহমান প্রথম মুখ বন্ধ করে তার উপর হাত রাখল, তারপর ফিসফিস করে বলল, 'আমি গরীব তার কি জানি; কিন্তু এসব কথা শুধোতে নেই।'

সে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর আবদুর রহমান যখন ঘরের এক কোণে বাদামের খোসা ছাড়াতে বসল তখন তার মুখে ঐ এক মুইন-উস্-সুলতানের কথা ছাড়া অন্য কিছু নেই। দু'তিনবার ধমক দিয়ে হার মানলুম। বুঝলুম, সরল আবদুর রহমান মনে করেছে, আফগানিস্থান যখন কাকামামাশালার দেশ, অর্থাৎ বড়লোকের নেকনজর পেলে সব কিছু হাঁসিল হয়ে যায় তখন আমি রাতারাতি উজীরনাজির কেউ-কেটা, কিছু-না-কিছু একটা, হয়ে যাবই যাব।

ততক্ষণে অভিধান খুলে দেখে নিয়েছি মুইন-উস্-সুলতানে সমাসের অর্থ 'যুবরাজ'।

যুবরাজ রাজা হলেন না, হলেন ছোট ভাই। সমস্যাটার সমাধান করতে হয়।

তেইশ

মুইন-উস্-সুলতানে বা যুবরাজ রাজা না হয়ে ছোট ছেলে কেন রাজা হলেন সে-সমস্যার সমাধান করতে হলে খানিকটা পিছিয়ে এ-শতকের গোড়ায় পৌঁছতে হয়।

বাঙালী পাঠক এখানে একটু বিপদগ্রস্ত হবেন। আমি জানি, বাঙালী—তা তিনি হিন্দুই হোন আর মুসলমানই হোন—আরবী ফার্সী মুসলমানী নাম মনে রাখতে বা বানান করতে অল্পবিস্তর কাতর হয়ে পড়েন। একথা জানি বলেই এতক্ষণ যতদূর সম্ভব কম নাম নিয়েই নাড়াচাড়া করেছি—বিশেষতঃ আনাতোল ফ্রাঁসের মত গুণী যখন বলেছেন, 'পাঠকের কাছ থেকে বড্ড বেশী মনোযোগ আশা করো না, আর যদি মনস্কামনা এই হয় যে, তোমার লেখা শত শত বৎসর পেরিয়ে পরবর্তী যুগে পৌঁছুক তা হলে হাল্কা হয়ে ভ্রমণ করো।' আমার সে-বাসনা নেই, কারণ ভাষা এবং শৈলী বাবদে আমার অক্ষমতা সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট সচেতন। কাজেই যখন ক্ষমতা নেই, বাসনাও নেই তখন পাঠকের নিকট ঈষৎ মনোযোগ প্রত্যাশা করতে পারি। মৌসুমী ফুলই মনোযোগ চায় বেশী ; দু'দিনের অতিথিকে তোয়াজ করতে মহা কঞ্জুসও রাজী হয়।

যে সময়ের কথা হচ্ছে তখন আফগানিস্থানের কর্তা বা আমীর ছিলেন হবীব উল্লা। তাঁর ভাই নসর উল্লা মোল্লাদের এমনি খাস-পেয়ারা ছিলেন যে, বড় ছেলে মুইন-উস্-সুলতানে তাঁর মরার পর আমীর হবেন এ-ঘোষণা হবীব উল্লা বুকে হিম্মৎ বেঁধে করতে পারেননি। বরঞ্চ দুই ভায়ে এই নিষ্পত্তিই হয়েছিল যে

হবীব উল্লা মরার পর নসর উল্লা আমীর হবেন, আর তিনি মরে গেলে আমীর হবেন মুইন-উস্-সুলতানে। এই নিষ্পত্তি পাকা-পোক্ত করার মতলবে হবীব উল্লা

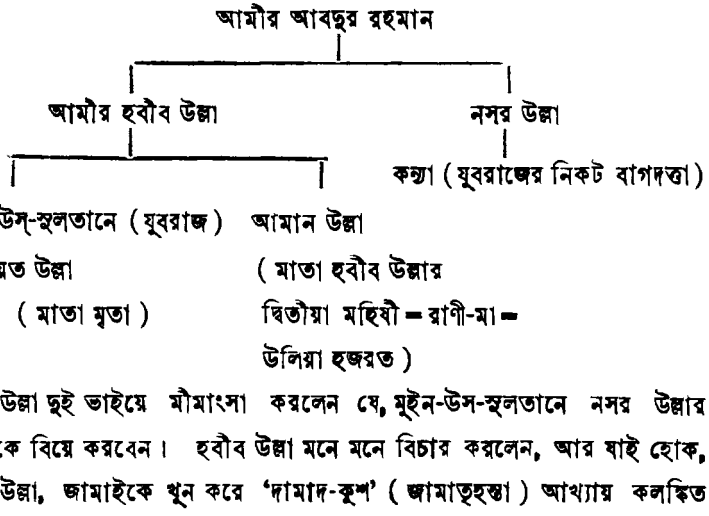

নসর উল্লা দুই ভাইয়ে মীমাংসা করলেন যে, মুইন-উস-সুলতানে নসর উল্লার মেয়েকে বিয়ে করবেন। হবীব উল্লা মনে মনে বিচার করলেন, আর যাই হোক, নসর উল্লা, জামাইকে খুন করে 'দামাদ-কুশ' (জামাতৃহন্তা) আখ্যায় কলঙ্কিত হতে চাইবেন না। ঐতিহাসিকদের স্মরণ থাকতে পারে যোধপুরের রাজা অজিত সিং যখন সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে একজোট হয়ে জামাই দিল্লীর বাদশাহ ফরুখ-সিয়ারকে নিহত করেন তখন দিল্লীর ছেলে-বুড়োর 'দামাদ-কুশ', 'দামাদ-কুশ' চিৎকারে অতিষ্ঠ হয়ে শেষটায় তিনি দিল্লী ছাড়তে বাধ্য হন। রাস্তার ডেঁপো ছোঁড়ারা পর্যন্ত নির্ভয়ে অজিত সিং-এর পাল্কির দু'পাশে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলত আর সেপাই-বরকন্দাজের তম্বী-তম্বাকে বিলকুল পরোয়া না করে তারস্বরে একতানে 'দামাদ-কুশ', 'দামাদ-কুশ', বলে অজিত সিংহকে ক্ষেপিয়ে তুলত।

হবীব উল্লা, নসর উল্লা, মুইন-উস্-সুলতানে তিনজনই এই চুক্তিতে অল্প-বিস্তর সন্তুষ্ট হলেন। একদম নারাজ হলেন, মাতৃহীন মুইন-উস্-সুলতানের বিমাতা। ইনি আমান উল্লার মা, হবীব উল্লার দ্বিতীয়া মহিষী। আফগানি-স্থানের লোক এঁকে রানী-মা বা উলিয়া হজরত নামে চিনত। এঁর দাপটে আমীর হবীব উল্লার মত খাণ্ডারও কুরবানির বকরি অর্থাৎ বলির পাঁঠার মত কাঁপতেন। একবার গোসা করে রানী-মা যখন নদীর ওপারে গিয়ে তাঁবু খাটান তখন হবীব উল্লা কোনো কৌশলে তাঁর কিনারা না লাগাতে পেরে শেষটায় এপারে বসে পাগলের মত সর্বাঙ্গে ধুলো-কাদা মেখে তাঁর সংগ্-দিল্ বা পাষাণ হৃদয় গলাতে সমর্থ হয়েছিলেন। রানী-মা স্থির করলেন, এই সংসারকে যখন ওমর খৈয়াম দাবাখেলার ছকের সঙ্গে তুলনা করেছেন তখন নসর উল্লা এবং মুইন-উস্-

সুলতানের মত দুই জব্বর ঘুঁটিকে ঘায়েল করা আমান উল্লার মত নগণ্য বড়ের পক্ষে অসম্ভব নাও হতে পারে। তাঁর পক্ষেই বা রাজা হওয়া অসম্ভব হবে কেন?

এমন সময় কাবুলের সেরা খানদানী বংশের মুহম্মদ তর্জী সিরিয়া নির্বাসন থেকে দেশে ফিরলেন। সঙ্গে পরীর মত তিন কন্যা, কাওকাব, সুরাইয়া আর বিবি খুর্দ। এঁরা দেশবিদেশ দেখেছেন, লেখাপড়া জানেন, রুজ-পাউডার ব্যবহারে ওকিবহাল; এঁদের উদয়ে কাবুল কুমারীদের চেহারা অত্যন্ত ম্লান, বেজৌলুশ, 'অমার্জিত' বা 'অনকলচরড্' (আজ্ জঙ্গল বর আমদেহ = যেন জঙ্গলী) মনে হতে লাগল।

হবীব উল্লা রাজধানীতে ছিলেন না। আমান উল্লার মা—যদিও আসলে দ্বিতীয়া মহিষী কিন্তু মুইন-উস-সুলতানের মাতার মৃত্যুতে প্রধান মহিষী হয়েছেন—এক বিরাট ভোজের বন্দোবস্ত করলেন। অন্তরঙ্গ আত্মীয়স্বজনকে পই পই করে বুঝিয়ে দিলেন, যে করেই হোক মুইন-উস্-সুলতানেকে তর্জীর বড় মেয়ে কাওকাবের দিকে আকৃষ্ট করাতেই হবে। বিপুল রাজপ্রাসাদের আনাচে কানাচে দু'-একটা কামরা বিশেষ করে খালি রাখা হল। সেখানে কেউ যেন হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত না হয়।

খানাপিনা চলল, গানবাজনায় রাজবাড়ি সরগরম। রানী-মা নিজে মুইন-উস্-সুলতানেকে কাওকাবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন আর কাওকাবকে ফিস ফিস করে কানে কানে বললেন, 'ইনিই যুবরাজ, আফগানিস্থানের তখ্‌ৎ একদিন এঁরই হবে।' কাওকাব বুদ্ধিমতী মেয়ে, ক'সের গমে ক'সের ময়দা হয় জানতেন, আর না জানলেই বা কি, শঙ্করাচার্য তরুণতরুণীর প্রধান বৃত্তি সম্বন্ধে যে মোক্ষম তত্ত্ব বলেছেন সেটা রাজপ্রাসাদেও খাটে।

প্ল্যানটা ঠিক উতরে গেল। বিশাল রাজপ্রাসাদে ঘুরতে ঘুরতে মুইন্-উস্-সুলতানে কাওকাবের সঙ্গে পুরীর এক নিভৃত কক্ষে বিশ্রম্ভালাপে মশগুল হলেন। মুইন ভাবলেন, খুশ-এখতেয়ারে নিভৃত কক্ষে ঢুকেছেন (ধর্মশাস্ত্রে যাকে বলে ফ্রীডম অব্ উইল), রানী-মা জানতেন, শিকার জালে পড়েছে (ধর্মশাস্ত্রে যাকে বলে প্ল্যান্ড্ ডেসটিনি)।

প্ল্যানমাফিকই রানী-মা হঠাৎ যেন বেখেয়ালে সেই কামরায় ঢুকে পড়লেন। তরুণতরুণী একটু লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে উঠে দাঁড়ালেন। রানী-মা সোহাগ মেখে অমিয়া ছেনে সতীনপোকে বললেন, 'বাচ্চা তোমার মা নেই, আমিই তোমার মা। তোমার সুখদুঃখের কথা আমাকে বলবে না তো কাকে বলবে?

তোমার বিয়ের ভার তো আমার কাঁধেই। কাওকাবকে যদি তোমার পছন্দ হয়ে থাকে তবে এত লজ্জা পাচ্ছ কেন? তর্জীর মেয়ের কাছে দাঁড়াতে পারে এমন মেয়ে তো কাবুলে আর নেই। তোমার দিল কি বলে?'

দিল আর কি বলবে? মুইন তখন ফাটা বাঁশের মাঝখানে।

দিল যা বলে বলুক। মুখে কি বলেছিলেন সে সম্বন্ধে কাবুল চারণরা পঞ্চমুখ। কেউ বলেন, নীরবতা দিয়ে সম্মতি দেখিয়েছিলেন; কেউ বলেন, মৃদু আপত্তি জানিয়েছিলেন, কারণ, জানতেন, নসর উল্লার মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে; কেউ বলেন, মিনমিন করে সম্মতি জানিয়েছিলেন, কারণ ঠিক তার এক লহমা আগে ভালোমন্দ না ভেবে কাওকাবকে প্রেম-নিবেদন করে বসেছিলেন—হয়ত ভেবেছিলেন, প্রেম আর বিয়ে ভিন্ন ভিন্ন শিরঃপীড়া—এখন এড়াবেন কি করে? কেউ বলেন, শুধু 'হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ' করেছিলেন, তার থেকে হস্ত-নীস্ত ('হাঁ-না',—যে কথা থেকে বাঙলা 'হেস্তনেস্ত' বেরিয়েছে) কিছুই বোঝবার উপায় ছিল না; কেউ বলেন, তিনি রামগঙ্গা ভালো করে কিছু প্রকাশ করার আগেই রানী-মা কামরা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

অর্থাৎ কাবুল চারণদের পঞ্চমুখ পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী বলে।

মোদ্দা কথা এই, সে অবস্থায় আমীর হোক, ফকীর হোক, ঘুঘু হোক, কবুতর হোক, আর পাঁচজন গুরুজনের সামনে পড়লে যা করে থাকে বা বলে থাকে মুইন-উস্-সুলতানে তাই করেছিলেন।

কিন্তু কি করে বলেছিলেন সে কথা জানার যত না দরকার, তার চেয়ে ঢের বেশী জানা দরকার রানী-মা মজলিসে ফিরে গিয়ে সে-বলা বা না-বলার কি অর্থ প্রকাশ করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্সট্-বুক কি-বলে না-বলে সেটা অবান্তর, জীবনে কাজে লাগে বাজারের গাইড-বুক।

রানী-মা পর্দার আড়ালে থাকা সত্ত্বেও যখন তামাম আফগানিস্থান তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেত তখন মজলিসের হর্ষোল্লাস যে তাঁর গলার নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল তাতে আর কি সন্দেহ? রানী-মা বললেন, 'আজ বড় আনন্দের দিন। আমার চোখের জ্যোতি (নূর-ই-চশ্‌ম্) ইনায়েত উল্লা খান, মুইন-উস্-সুলতানে তর্জীকন্যা কাওকাবকে বিয়ে করবেন বলে মনস্থির করেছেন। খানা-মজলিস দুটোর সময় ভাঙবার কথা ছিল, সে বন্দোবস্ত বাতিল। ফজরের নমাজ (সূর্যোদয়) পর্যন্ত আজকের উৎসব চলবে। আজ রাত্রেই আমি কন্যাপক্ষকে প্রস্তাব পাঠাচ্ছি।'

মজলিসের ঝাড়বাতি দ্বিগুণ আভায় জ্বলে উঠল। চতুর্দিকে আনন্দোচ্ছ্বাস,

হর্ষধ্বনি। দাসদাসী ছুটলো বিয়ের তত্ত্বের তত্ত্বতাবাস করতে। সব কিছু সেই দুপুর রাতে রাজবাড়িতেই পাওয়া গেল। আশ্চর্য হওয়ার সাহস কার?

তর্জী হাতে স্বর্গ পেলেন। কাওকাব হৃদয়ে স্বর্গ পেয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে রানী-মা হবীব উল্লার কাছে 'সুসংবাদ' জানিয়ে দূত পাঠালেন। মা ও রাজমহিষীরূপে তিনি মুইন-উস্-সুলতানের হৃদয়ের গতি কোন্ দিকে জানতে পেরে তর্জী-কন্যা কাওকাবের সঙ্গে তাঁর বিয়ে স্থির করেছেন। 'প্রগতিশীল' আফগানিস্থানের ভাবী রাজমহিষী সুশিক্ষিতা হওয়ার নিতান্ত প্রয়োজন। কাবুলে এমন কুমারী নেই যিনি কাওকাবের কাছে দাঁড়াতে পারেন। প্রাথমিক মঙ্গলানুষ্ঠান খুদাতালার মেহেরবানীতে সুসম্পন্ন হয়েছে। মহারাজ অতিসত্বর রাজধানীতে ফিরে এসে 'আকদ্-রসুমাতের' (আইনতঃ পূর্ণ বিবাহ) দিন ঠিক করে পৌরজনের হর্ষবর্ধন করুন।

হবীব উল্লা তো রেগে টং। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান হারালেন না। আর কেউ বুঝুক না-বুঝুক, তিনি বিলক্ষণ টের পেলেন যে, মূর্খ মুইন-উস্-সুলতানে কাওকাবের প্রেমে পড়ে নসর উল্লার মেয়েকে হারায়নি, হারাতে বসেছে রাজসিংহাসন। কিন্তু হবীব উল্লা যদিও সাধারণত পঞ্চ ম'কার নিয়ে মত্ত থাকতেন তবুও তাঁর বুঝতে বিলম্ব হল না যে, সমস্ত ষড়যন্ত্রের পিছনে রয়েছেন মহিষী। সৎমার এত প্রেম তো সহজে বিশ্বাস হয় না।

সতীন মা'র কথাগুলি
মধুরসের বাণী
তলা দিয়ে গুঁড়ি কাটেন
উপর থেকে পানি।

পানি-ঢালা দেখেই হবীব উল্লা বুঝতে পারলেন, গুঁড়িটি নিশ্চয়ই কাটা হয়েছে।

রাগ সামলে নিয়ে হবীব উল্লা অতি কমনীয় নমনীয় উত্তর দিলেন,—

'খুদাতালাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, মহিষী শুভবুদ্ধি-প্রণোদিতা হয়ে এই বিয়ে স্থির করেছেন। তর্জীকন্যা কাওকাব যে সব দিক দিয়ে মুইন-উস্-সুলতানের উপযুক্ত তাতে আর কি সন্দেহ? কিন্তু শুধু কাওকাব কেন, তর্জীর মেজো মেয়ে সুরাইয়াও তো সুশিক্ষিতা সুরূপা সুমার্জিতা। দ্বিতীয় পুত্র আমান উল্লাই বা খাস কাবুলী জংলী মেয়ে বিয়ে করবেন কেন? তাই তিনি মহিষীর মহান দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সুরাইয়ার সঙ্গে আমান উল্লার বিয়ে স্থির করে এই চিঠি লেখার সঙ্গে সঙ্গে তর্জীর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠাচ্ছেন। সত্বর রাজধানীতে

ফিরে এসে তিনি স্বয়ং' ইত্যাদি।

হবীব উল্লা বুঝতে পেরেছিলেন, রানী-মার মতলব মুইন-উস্-সুলতানের স্কন্ধে কাওকাবকে চাপিয়ে দিয়ে, আপন ছেলে আমান উল্লার সঙ্গে নসর উল্লার মেয়ের বিয়ে দেবার। তাহলে নসর উল্লার মরার পর আমান উল্লার আমীর হওয়ার সম্ভাবনা অনেকখানি বেড়ে যায়। হবীব উল্লা সে পথ বন্ধ করার জন্য আমান উল্লার স্কন্ধে সুরাইয়াকে চাপিয়ে দিলেন। যে রানী-মা কাওকাবের বিদেশী শিক্ষাদীক্ষার প্রশংসায় পঞ্চমুখ তিনি সুরাইয়াকে ঠেকিয়ে রাখবেন কোন লজ্জায়? বিশেষ করে যখন চিহ্‌লসতুন থেকে বাগ্-ই-বালা পর্যন্ত সুবে কাবুল জানে, সুরাইয়া কাওকাবের চেয়ে দেখতে শুনতে পড়াশোনায় অনেক ভালো।

রানী-মার মস্তকে বজ্রাঘাত। বড়ের কিস্তিতে রাজাকে মাত করতে গিয়ে তিনি যে প্রায় চাল-মাতের কাছাকাছি। হবীব উল্লাকে প্রাণভরে অভিসম্পাত দিলেন, 'নসর উল্লার মেয়েকে তুই পেলিনি, আমিও পেলুম না। তবু মন্দের ভালো; নসর উল্লার কাছে এখন মুইন-উস্-সুলতানে আর আমান উল্লা দু'জনই বরাবর। মুইন-উস্-সুলতানের পাশা এখন আর নসর-কন্যার সীসায় ভারী হবে না তো।—সেই মন্দের ভালো।'

দাবা খেলায় ইংরিজীতে যাকে বলে, 'ওয়েটিঙ মুভ্' রানী-মা সেই পন্থা অবলম্বন করলেন।

চব্বিশ

এর পরের অধ্যায় আরম্ভ হয় ভারতবর্ষের রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে নিয়ে।

১৯১৫ সালের মাঝামাঝি জর্মন পররাষ্ট্র বিভাগ রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের উপদেশ মত স্থির করলেন যে, কোনো গতিকে যদি আমীর হবীব উল্লাকে দিয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করানো যায় তাহলে ইংরেজের এক ঠ্যাং খোঁড়া করার মতই হবে। ভারতবর্ষ তখন স্বাধীনতা পাবার লোভে বিদ্রোহ করুক আর নাই করুক, ইংরেজকে অন্তত একটা পুরো বাহিনী পাঞ্জাবে রাখতে হবে—তাহলে তুর্করা মধ্য-প্রাচ্যে ইংরেজকে কাবু করে আনতে পারবে। ফলে যদি সুয়েজ বন্ধ হয়ে যায় তা হলে ইংরেজের দু'পা-ই খোঁড়া হয়ে যাবে।

মহেন্দ্রপ্রতাপ অবশ্য আশা করেছিলেন যে, আর কিছু হোক না হোক ভারতবর্ষ যদি ফাঁকতালে স্বাধীনতা পেয়ে যায় তা হলেই যথেষ্ট।

কাইজার রাজাকে প্রচুর খাতির-যত্ন করে, স্বর্ণ-ঈগল মেডেল পরিয়ে একদল

জর্মন কূটনৈতিকের সঙ্গে আফগানিস্থান রওয়ানা করিয়ে দিলেন। পথে রাজা তুর্কীর সুলতানের কাছ থেকেও অনেক আদর-আপ্যায়ন পেলেন।

কিন্তু পূর্ব-ইরান ও পশ্চিম-আফগানিস্থানের রাজা ও জর্মনদলকে নানা বিপদ-আপদ, ফাঁড়া-গর্দিশ কাটিয়ে এগতে হল। ইংরেজ ও রুশ উভয়েই রাজার দৌত্যের খবর পেয়ে উত্তর দক্ষিণ দু'দিক থেকে হানা দেয়। অসম্ভব দুঃখকষ্ট সহ্য করে, বেশীর ভাগ জিনিসপত্র পথে ফেলে দিয়ে তাঁরা ১৯১৫ সালের শীতের শুরুতে কাবুল পৌঁছান।

আমীর হবীব উল্লা বাদশাহী কায়দায় রাজাকে অভ্যর্থনা করলেন—তামাম কাবুল শহর রাস্তার দু'পাশে ভিড় লাগিয়ে রাজাকে তাঁদের আনন্দ-অভিবাদন জানালো! বাবুর বাদশাহের কবরের কাছে রাজাকে হবীব উল্লার এক খাস প্রাসাদে রাখা হল।

কাবুলের লোক সহজে কাউকে অভিনন্দন করে না। রাজার জন্য তারা যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল তার প্রথম কারণ, কাবুলের জনসাধারণ ইংরেজের নষ্টামি ও হবীব উল্লার ইংরেজ-প্রীতিতে বিরক্ত হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল; নব্য-তুর্কী নব্য-মিশরের জাতীয়তাবাদের ক্বচিৎ-জাগরিত বিহঙ্গকাকলী কাবুলের গুলিস্তান-বোস্তানেকেও চঞ্চল করে তুলেছিল। দ্বিতীয় কারণ, রাজা ভারতবর্ষের লোক, জর্মনীর শেষ মতলব কি সে সম্বন্ধে কাবুলীদের মনে নানা সন্দেহ থাকলেও ভারতবর্ষের নিঃস্বার্থপরতা সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। এ-অনুমান কাইজার বার্লিনে বসে করতে পেরেছিলেন বলেই ভারতীয় মহেন্দ্রকে জর্মন কূটনৈতিকদের মাঝখানে ইন্দ্রের আসনে বসিয়ে পাঠিয়েছিলেন।

ইংরেজ অবশ্য হবীব উল্লাকে তম্বী করে হুকুম দিল, পত্রপাঠ যেন রাজা আর তার দলকে আফগানিস্থান থেকে বের করে দেওয়া হয়। কিন্তু ধূর্ত হবীব উল্লা ইংরেজকে নানা রকম টালবাহানা দিয়ে ঠাণ্ডা করে রাখলেন। একথাও অবশ্য তাঁর অজানা ছিল না যে, ইংরেজের তখন দু'হাত ভর্তি, আফগানিস্থান আক্রমণ করবার মত সৈন্যবলও তার কোমরে নেই।

কিন্তু হবীব উল্লা রাজার প্রস্তাবে রাজী হলেন না। কেন হলেন না এবং না হয়ে ভালো করেছিলেন কি মন্দ করেছিলেন সে সম্বন্ধে আমি অনেক লোকের মুখ থেকে অনেক কারণ, অনেক আলোচনা শুনেছি। সে-সব কারণের ক'টা খাঁটি, ক'টা ঝুটা বলা অসম্ভব কিন্তু এ-বিষয়ে দেখলুম কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই যে, হবীব উল্লা তখন ভারত আক্রমণ করলে সমস্ত আফগানিস্থান তাতে সাড়া

দিত। অর্থাৎ আমীর জনমত উপেক্ষা করলেন ; জর্মনি, তুর্কী, ভারতবর্ষকেও নিরাশ করলেন।

জর্মনরা, এক বৎসর চেষ্টা করে দেশে ফিরে গেল কিন্তু রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ তখনকার মত আশা ছেড়ে দিলেও ভবিষ্যতের জন্য জমি আবাদ করতে কসুর করলেন না। রাজা জানতেন, হবীব উল্লার মৃত্যুর পর আমীর হবেন নসর উল্লা নয় মুইন-উস্-সুলতানে। কিন্তু দুটো টাকাই যে মেকি রাজা দু'চারবার বাজিয়ে বেশ বুঝে নিয়েছিলেন। আমান উল্লার কথা কেউ তখন হিসেবে নিত না কিন্তু রাজা যে তাকে বেশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকবার পরখ করে নিয়েছিলেন সে কথা কাবুলের সকলেই জানে। কিন্তু তাঁকে কি কানমন্ত্র দিয়েছিলেন সে কথা কেউ জানে না ; রাজাও মুখ ফুটে কিছু বলেন নি।

১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে রাজা কাবুল ছাড়েন। তারপর যুদ্ধ শেষ হল।

শেষ আশায় নিরাশ হয়ে কাবুলের প্রগতিপন্থীরা নির্জীব হয়ে পড়লেন। পর্দার আড়াল থেকে তখন এক অদৃশ্য হাত আফগানিস্থানের ঘুঁটি চালাতে লাগলো। সে হাত আমান উল্লার মাতা রানী-মা উলিয়া হজরতের।

বহু বৎসর ধরে রানী-মা প্রহর গুনছিলেন এই সুযোগের প্রত্যাশায়। তিনি জানতেন প্রগতিপন্থীরা হবীব উল্লা, নসর উল্লা, মুইন-উস্-সুলতানে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ না হওয়া পর্যন্ত আমান উল্লার কথা হিসেবেই আনবেন না। পর্দার আড়াল থেকেই রানী-মা প্রগতিপন্থী যুবকদের বুঝিয়ে দিলেন যে, হবীব উল্লা কাবুলের বুকের উপর জগদ্দল পাথর, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপও যখন সে পাথরে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি তখন তাঁরা বসে আছেন কিসের আশায় ? নসর উল্লা, মুইন-উস্-সুলতানে দু'জনই ভাবেন সিংহাসন তাঁদের হক্কের মাল—সে-মালের জন্য তাঁরা কোনো দাম দিতে নারাজ।

কিন্তু আমান উল্লা দাম দিতে তৈরী। সে দাম কি ? বুকের খুন দিয়ে তিনি ইংরেজের সঙ্গে লড়ে দেশকে স্বাধীন করতে প্রস্তুত।

কিন্তু আমান উল্লাকে আমীর করা যায় কি প্রকারে ? রানী-মা বোরকার ভিতর থেকে তারও নীলছাপ বের করলেন। আসছে শীতে হবীব উল্লা যখন নসর উল্লা আর মুইন-উস্-সুলতানেকে সঙ্গে নিয়ে জলালাবাদ যাবেন তখন আমান উল্লা কাবুলের গভর্নর হবেন। তখন যদি হবীব উল্লা জলালাবাদে মারা যান তবে কাবুলের অস্ত্রশালা আর কোষাধ্যক্ষের জিম্মাদার গভর্নর আমান উল্লা তার ঠিক ঠিক ব্যবহার করতে পারবেন। রাজা হতে হলে এই দুটো জিনিসই যথেষ্ট।

কিন্তু মানুষ মরে ভগবানের ইচ্ছায়। নীলছাপের সঙ্গে দাগ মিলিয়ে যে হবীব উল্লা ঠিক তখনই মরবেন তার কি স্থিরতা? অসহিষ্ণু রানী-মা বুঝিয়ে দিলেন যে, ভগবানের ইচ্ছা মানুষের হাত দিয়েই সফল হয়—বিশেষত যদি তার হাতে তখন একটি নগণ্য পিস্তল মাত্র থাকে।

স্বামী হত্যা? এঁ্যা? হ্যাঁ। কিন্তু এখানে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা হচ্ছে না—যেখানে সমস্ত দেশের আশাভরসা, ভবিষ্যৎ মঙ্গল-অমঙ্গল ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন সেখানে কে স্বামী, স্ত্রীই বা কে?

শঙ্করাচার্য বলেছেন, 'কা তব কান্তা?' কিন্তু ঠিক তার পরেই 'সংসার অতীব বিচিত্র' কেন বলেছেন সে তত্ত্বটা এতদিন পর আমার কাছে খোলসা হল।

অর্বাচীনরা তবু শুধালো, 'কিন্তু আমীর হবীব উল্লার সৈন্যদল আর জলালাবাদ অঞ্চলের লোকজন নসর উল্লা বা মুইন-উস্-সুলতানের পক্ষ নেবে না?'

রাগে দুঃখে রানী-মার নাকি কণ্ঠরোধ হবার উপক্রম হয়েছিল। উষ্মা চেপে শেষটায় বলেছিলেন, 'ওরে মূর্খের দল, জলালাবাদে যে-ই রাজা হোক না কেন, আমরা রটাব না যে, সিংহাসনের লোভে অসহিষ্ণু হয়ে সেই গৃহ্নুই নিরীহ হবীব উল্লাকে খুন করেছে? মূর্খেরা এতক্ষণে বুঝল, এস্থলে 'রানীর কি মত?' নয়। এখানে 'রানীর মতই সকল মতের রানী'।

এসব আমার শোনা কথা—কতটা ঠিক কতটা ভুল হলপ করে বলতে পারব না; তবে এরকমেরই কিছু একটা যে হয়েছিল সে বিষয়ে কাবুল-চারণদের মনে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু কথামালার গল্প ভুল। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার জন্য লোকও জুটল।

আপন অলসতাই হবীব উল্লার মৃত্যুর আরেক কারণ। জলালাবাদে একদিন সন্ধ্যাবেলা শিকার থেকে ফিরে আসতেই তাঁর এক গুপ্তচর নিবেদন করল যে, গোপনে হুজুরের সঙ্গে সে অত্যন্ত জরুরী বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চায়। সে নাকি কি করে শেষ মুহূর্তে এই ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে গিয়েছিল। 'কাল হবে, কাল হবে' বলে নাকি হবীব উল্লা প্রাসাদের ভিতরে ঢুকে গেলেন। সকলের সামনে গুপ্তচর কিছু খুলে বলতে পারল না—আমীরও শুধু বললেন, 'কাল হবে, কাল হবে।'

সে কাল আর কখনো হয় নি। সে-রাত্রেই গুপ্তঘাতকের হাতে হবীব উল্লা প্রাণ দেন।

সকালবেলা জলালাবাদে যে কী তুমুল কাণ্ড হয়েছিল তার বর্ণনার আশা করা অন্যায়। কেউ শুধায়, 'আমীরকে মারল কে?' কেউ শুধায়, 'রাজা হবেন কে?' একদল বলল, 'শহীদ আমীরের ইচ্ছা ছিল নসর উল্লা রাজা হবেন,' আরেকদল বলল, 'মৃত আমীরের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই; রাজা হবেন বড় ছেলে, যুবরাজ মুইন-উস্-সুলতানে ইনায়েত উল্লা। তখ্‌তের হক তাঁরই।'

বেশীর ভাগ গিয়েছিল ইনায়েত উল্লার কাছে। তিনি কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছেন। লোকজন যতই জিজ্ঞেস করে রাজা হবেন কে? তিনি হয় উত্তর দেন না, না হয় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলেন, 'ব কাকায়েম বোরো' অর্থাৎ 'খুড়োর কাছে যাও, আমি কি জানি।' কেন সিংহাসনের লোভ করেননি বলা শক্ত; হয়ত পিতৃশোকে অত্যধিক কাতর হয়ে পড়েছিলেন, হয়ত পিতার ইচ্ছার সম্মান রাখতে চেয়েছিলেন, হয়ত আন্দাজ করেছিলেন যে, যারা তাঁর পিতাকে খুন করেছে তাদের লোকই শেষ পর্যন্ত তখ্‌ৎ দখল করবে। তিনি যদি সে-পথে কাঁটা হয়ে মাথা খাড়া করেন তবে সে-মাথা বেশীদিন ঘাড়ে থাকবে না। অত্যন্ত কাঁচা, কাঁচা-লঙ্কাও পাঁঠার বলি দেখে খুশী হয় না। জানে এবার তাকে পেষায় লগ্ন আসন্ন। নসর উল্লা আমীর হলেন।

এদিকে রানী-মা কাবুলে বসে তড়িৎ গতিতে কাবুল কান্দাহার জলালাবাদ হিরাতে খবর রটালেন, রাজ্যগৃধ্নু অসহিষ্ণু নসর উল্লা ভ্রাতা হবীব উল্লাকে খুন করেছেন। তাঁর আমীর হওয়ার এমনিতেই কোনো হক্ ছিল না—এখন তো আর কোনো কথাই উঠতে পারে না। হক্ ছিল জ্যেষ্ঠ পুত্র, যুবরাজ মুইন-উস্-সুলতানের। তিনি যখন স্বেচ্ছায়, খুশ-এখতেয়ারে নসর উল্লার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন অর্থাৎ সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করেছেন, তখন হক্ বর্তালো আমান উল্লার উপর।

অকাট্য যুক্তি। তবু কাবুল চীৎকার করলো, 'জিন্দাবাদ আমান উল্লা খান' —ক্ষীণকণ্ঠে।

সঙ্গে সঙ্গে রানী-মা আমান উল্লার তখ্‌ৎ লাভে খুশী হয়ে সেপাইদের বিস্তর বখশিশ দিলেন; নূতন বাদশা আমান উল্লা সেপাইদের তনখা অত্যন্ত কম বলে নিতান্ত 'কর্তব্য পালনার্থে' সে তনখা ডবল করে দিলেন। উভয় টাকাই রাজ-কোষ থেকে বেরলো। কাবুল হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'জিন্দাবাদ আমান উল্লা খান।'

তলতেয়ারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মন্ত্রোচ্চারণ করে একপাল ভেড়া মারা যায় কিনা। তলতেয়ার বলেছিলেন, 'যায়, কিন্তু গোড়ায় প্রচুর পরিমাণে সেঁকো

বিষ খাইয়ে দিলে আর কোনো সন্দেহই থাকবে না।'

আফগান সেপাইয়ের কাছে যুক্তিতর্ক মন্ত্রোচ্চারণের ন্যায়—টাকাটাই সেঁকো।

আমান উল্লা কাবুল বাজারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পিতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করলেন। সজল নয়নে, বলদৃপ্ত কণ্ঠে পিতৃঘাতকের রক্তপাত করবেন বলে শপথ গ্রহণ করলেন, 'যে পাষণ্ড আমার জান্-দিলের পিতাকে হত্যা করেছে তার রক্ত না দেখা পর্যন্ত আমার কাছে জল পর্যন্ত শরাবের মত হারাম, তার মাংস টুকরো টুকরো না করা পর্যন্ত সব মাংস আমার কাছে শূকরের মাংসের মত হারাম।'

আমান উল্লার শত্রুপক্ষ বলে, আমান উল্লা থিয়েটারে ঢুকলে নাম করতে পারতেন; মিত্রপক্ষ বলে, সমস্ত ষড়যন্ত্রটা রানী-মা সর্দারদের সঙ্গে তৈরী করেছিলেন—আমান উল্লাকে বাইরে রেখে। হাজার হোক 'পিদর-কুশ' বা পিতৃহন্তার হস্ত চুম্বন করতে অনেক লোকই ঘৃণা বোধ করতে পারে। বিশেষত রানী-মা যখন একাই একলক্ষ তখন তরুণ আমান উল্লাকে নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে নামিয়ে লাভ কি? আফগানিস্থানে স্ত্রীলোকের আমীর হওয়ার রেওয়াজ থাকলে তাঁকে হয়ত সারাজীবনই যবনিকা-অন্তরালে থাকতে হত।

আমান উল্লার সৈন্যদল জলালাবাদ পৌঁছল। নসর উল্লা, ইনায়েত উল্লা দু'জনই বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করলেন। নসর উল্লা মোল্লাদের কুতুব-মিনার স্বরূপ ছিলেন; সে মিনার থেকে যাজক সম্প্রদায়ের গম্ভীর নিনাদ বহির্গত হয়ে কেন যে সেপাই-সান্ত্রী জড়ো করতে পারল না সেও এক সমস্যা।

কাবুল ফেরার পথে যুবরাজ নাকি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কেঁদে ফেলেছিলেন। জলালাবাদের যেসব সেপাই তাঁকে আমীরের তখ্‌তে বসাবার জন্য তাঁর কাছে গিয়েছিল তারা ততক্ষণে আমান উল্লার দলে যোগ দিয়ে কাবুল যাচ্ছে। কান্না দেখে তারা নাকি মুইন-উস্-সুলতানের কাছে এসে বারবার বিদ্রূপ করে বলেছিল, 'বলো না এখন, 'ব কাকায়েম বোরো – খুড়োর কাছে যাও, তিনি সব জানেন।' যাও এখন খুড়োর কাছে? এখন দেখি, কাবুল পৌঁছলে খুড়ো তোমাকে বাঁচান কি করে!'

কাবুলের আর্ক দুর্গে দু'জনকেই বন্দী করে রাখা হ'ল। কিছুদিন পর নসর উল্লা 'কলেরায়' মারা যান। কফি খেয়ে নাকি তাঁর কলেরা হয়েছিল। কফিতে অন্য কিছু মেশানো ছিল কিনা সে বিষয়ে দেখলুম অধিকাংশ কাবুল-চারণের স্মৃতিশক্তি বড়ই ক্ষীণ।

এর পর মুইন-উস্-সুলতানের মনের অবস্থা কি হয়েছিল ভাবতে গেলে আমার

মত নিরীহ বাঙালীর মাথা ঘুরে যায়। কল্পনা সেখানে পৌঁছয় না, মৃত্যুভয়ের তুলনাও নাকি নেই।

এখানে পৌঁছে সমস্ত দুনিয়ার উচিত আমান উল্লাকে বারবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করা। প্রাচ্যের ইতিহাসে যা কখনো হয়নি আমান উল্লা তাই করলেন। মাতার হাত থেকে যেটুকু ক্ষমতা তিনি ততদিনে অধিকার করতে পেরেছিলেন তারই জোরে, বিচক্ষণ কূটনৈতিকদের শত উপদেশ গ্রাহ্য না করে তিনি বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে মুক্তি দিলেন।

এ যে কত বড় সাহসের পরিচয় তা শুধু তাঁরাই বুঝতে পারবেন যাঁরা মোগল-পাঠানের ইতিহাস পড়েছেন। এত বড় দরাজ-দিল আর হিম্মৎ-জিগরের নিশান আফগানিস্থানের ইতিহাসে আর নেই।

পঁচিশ

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ কানমন্ত্র দিয়ে গিয়েছিলেন, ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করে আমান উল্লা আরো ভালো রকমেই বুঝতে পারলেন যে, চোরের যদি তিন দিন হয় তবে সাধুর মাত্র এক দিন। সেই এক দিনের হক্কের জোরে তিনি লড়াই জিতেছেন—এখন আবার দুশমনের পালা। আমান উল্লা তার জন্য তৈরী হতে লাগলেন।

জমাখরচের খাতা খুলে দেখলেন, জমায় লেখা, আমান উল্লা খান দেশের স্বাধীনতা অর্জন করে জনসাধারণের হৃদয় জয় করেছেন, তিনি আর 'আমীর' আমান উল্লা নন—তিনি 'গাজী' 'বাদশাহ' আমান উল্লা খান।

খরচে লেখা, নসর উল্লার মোল্লার দল যদিও আসর থেকে সরে গিয়েছে তবু তাদের বিশ্বাস নেই। আমান উল্লা ফরাসী জানতেন—'রেক্যালের পূর মিয়ো সোতের,' অর্থাৎ 'ভালো করে লাফ দেওয়ার জন্য পিছিয়ে যাওয়া' প্রবাদটা তাঁর অজানা ছিল না।

কিন্তু আমান উল্লা মনে মনে স্থির করলেন, মোল্লারা সরকারী রাস্তার কোন্ খানে খানাখন্দ বানিয়ে রাখবে সে ভয় অহরহ বুকের ভিতর পুষে রাখলে দেশ-সংস্কারের মোটর টপ্ গিয়ারে চালানো অসম্ভব। অথচ পুরা স্পীডে মোটর না চালিয়ে উপায় নেই—সাধুর মাত্র এক দিন।

কাবুলে পৌঁছে যে দিকে তাকাই সেখানেই দেখি হরেকরকম সরকারি উর্দীপরা স্কুল-কলেজের ছেলেছোকরারা ঘোরাঘুরি করছে। খবর নিয়ে শুনি

কোনোটা উর্দী ফরাসী স্কুলের, কোনোটা জর্মন, কোনোটা ইংরিজী আর কোনোটা মিলিটারী স্কুলের। শুধু তাই নয়, গাঁয়ের পাঠশালা পাশ করে যারা শহরে এসেছে তাদের জন্য ফ্রি বোর্ডিং, লজিং, জামাকাপড়, কেতাবপত্র, ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট-বক্স, ডিক্‌সনরি, ছুটিতে বাড়ি যাবার জন্য খচ্চরের ভাড়া, এক কথায় 'অল ফাউণ্ড'।

ভারতবর্ষের হয়ে আমি বললুম, 'নাথিং লস্ট'।

প্যারিসফের্তা সইফুল আলম বুঝিয়ে বললেন, 'আপনি ভেবেছেন 'অল ফাউণ্ড' হলে বিদ্যেও বুঝি সঙ্গে সঙ্গে জুটে যায়। মোটেই না। হস্টেল থেকে ছেলেরা প্রায়ই পালায়।'

আমি বললুম, 'ধরে আনার বন্দোবস্ত নেই?'

সইফুল আলম বললেন, 'গাঁয়ের ছেলেরা শক্ত হাড়ে তৈরী। পালিয়ে বাড়ি না গিয়ে যেখানে সেখানে দিন কাটাতে পারে। তারও দাওয়াই আমান উল্লা বের করেছেন। হস্টেল থেকে পালানো মাত্রই আমরা সরকারকে খবর দিই। সরকারের তরফ থেকে তখন দু'জন সেপাই ছোকরার গাঁয়ের বাড়িতে গিয়ে আসর জমিয়ে বসে, তিন বেলা খায় দায় এবং যদিও হুকুম নেই তবু সকলের জানা কথা যে, কোর্মা-কালিয়া না পেলে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ছেলের বাপকে তিন বেলা মার লাগায়। বাপ তখন ছেলেকে খুঁজতে বেরোয়। সে এসে হস্টেলে হাজিরা দেবে, হেডমাস্টারের চিঠি গাঁয়ে পৌছবে যে আসামী ধরা দিয়েছে তখন সেপাইরা বাপের ভালো দুম্বাটি কেটে বিদায়-ভোজ খেয়ে তাকে হুঁশিয়ার না করে শহরে ফিরবে। পরিস্থিতিটার পুনরাবৃত্তিতে তাদের কোনো আপত্তি নেই।'

আমি বললুম, 'কিন্তু পড়াশোনায় যদি কেউ নিতান্তই গর্দভ হয় তবে?'

'পর পর তিনবার যদি ফেল মারে তবে হেডমাস্টার বিবেচনা করে দেখবেন তাকে ডিসমিস করা যায় কি না। বুদ্ধিশুদ্ধি আছে অথচ পড়াশোনায় ঢিলেমি করছে জানলে তার তখনো ছুটি নেই।'

এর পর কোন্ দেশের রাজা আর কি করতে পারেন?

মিলিটারি স্কুলের ভার তুর্কদের হাতে। তুর্কী জেনারেলদের ঐতিহ্য বার্লিনের পৎস্‌দাম সমরবিদ্যায়তনের সঙ্গে জড়ানো; তাই শুনলুম স্কুলটি জর্মন কায়দায় গড়া। সেখানে কি রকম উন্নতি হচ্ছে তার খবর কেউ দিতে পারলেন না। শুধু অধ্যাপক বেনওয়া বললেন, 'ইস্কুলটা তুলে দিলে আফগানিস্থানের কিছু ক্ষতি হবে না।'

মেয়েদের শিক্ষার জন্য আমান উল্লা আর তাঁর বেগম বিবি সুরাইয়া উঠে পড়ে লেগেছেন। বোরকা পরে এক কাবুল শহরেই প্রায় দু'হাজার মেয়ে ইস্কুলে যায়,

উঁচু পাঁচিলঘেরা আঙিনায় বাস্কেট-বল, ভলি-বল খেলে। সইফুল আলম বললেন, 'লিখতে পড়তে, আঁক কষতে শেখে, সেই যথেষ্ট। আর তাও যদি না শেখে আমার অন্তত কোনো আপত্তি নেই। হারেমের বন্ধ হাওয়ার বাইরে এসে লাফালাফি করছে এই কি যথেষ্ট নয়?'

আমি সর্বান্তঃকরণে সায় দিলুম। সইফুল আলম কানে কানে বললেন, 'কিন্তু একজন লোক একদম সায় দিচ্ছেন না। রানী-মা।'

শুনে একটু ঘাবড়ে গেলুম। দুই শত্রু নিপাত করে, তৃতীয় শত্রুকে ঠাণ্ডা রেখে যিনি আমান উল্লাকে বাদশা বানাতে পেরেছেন তাঁর রায়ের একটা মূল্য আছে বই কি? তার মতে নাকি এত শিক্ষার খোরাক আফগানিস্থান হজম করতে পারবে না। এই নিয়ে নাকি মাতাপুত্রে মনোমালিন্যও হয়েছে—মাতা অভিমানভরে পুত্রকে উপদেশ দেওয়া বন্ধ করেছেন। বধূ সুরাইয়াও নাকি শাশুড়ীকে অবজ্ঞা করেন।

কিন্তু কাবুল শহর তখন আমান উল্লার চাবুক খেয়ে পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে চলেছে—'দেরেশি' পরে। 'দেরেশি' কথাটা ইংরিজী 'ড্রেস' থেকে এসেছে—অর্থাৎ হ্যাট, কোট, টাই, পাতলুন। খবর নিয়ে জানতে পারলুম, সরকারী কর্মচারী হলেই তাকে দেরেশি পরতে হয় তা সে বিশ টাকার কেরানীই হোক, আর দশ টাকার সিপাই-ই হোক। শুধু তাই নয়, দেরেশি পরা না থাকলে কাবুল নাগরিক সরকারী বাগানে পর্যন্ত ঢুকতে পায় না। একদিকে সরকারী চাপ, অন্যদিকে বাইরের চাকচিক্যের প্রতি অনুন্নত জাতির মোহ, মাঝখানে সিনেমার উস্কানি, তিনে মিলে কাবুল দেরেশি-পাগল হয়ে উঠেছে।

ইস্তেক আবদুর রহমানের মনে ছোঁয়াচ লেগেছে। আমি বাড়িতে শিলওয়ার পরে বসে থাকলে সে খুঁতখুঁত করে; আটপৌরে সুট পরে বেরতে গেলে নীলকৃষ্ণ দেরেশি পরার উপদেশ দেয়।

মেয়েরাও তাল রেখে চলেছেন। আমীর হবীব উল্লা হারেমের মেয়েদের ফ্রক ব্লাউজ পরাতেন। আমান উল্লার আমলে দেখি ভদ্রমহিলা মাত্রেই উঁচু হিলের জুতো, হাঁটু পর্যন্ত ফ্রক, আস্বচ্ছ সিল্কের মোজা, লম্বাহাতার আঁটসাঁট ব্লাউজ, দস্তানা আর হ্যাট পরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। হ্যাটের সামনে একখানা অতি পাতলা নেট ঝুলছে বলে চেহারাখানা পষ্টাপষ্টি দেখা যায় না। যে মহিলার যত সাহস তাঁর নেটের বুহুনি তত ঢিলে।

Figure কথাটার ফরাসী উচ্চারণ ফিগুর, অর্থ—মুখের চেহারা। ফরাসী অধ্যাপক বেনওয়া বলতেন, 'কাবুলী মেয়েদের ফিগার বোঝা যায় বটে, কিন্তু

ফিগুর দেখবার উপায় নেই।'

কিন্তু দেশের ধনদৌলত না বাড়িয়ে তো নিত্য নিত্য নূতন স্কুল-কলেজ খোলা যায় না, দেরেশি দেখানো যায় না, ফিগার ফলানো যায় না। ধনদৌলত বাড়াতে হলে আজকের দিনে কলকারখানা বানিয়ে শিল্পবাণিজ্যের প্রসার করতে হয়। তার জন্য প্রচুর পুঁজির দরকার। আফগানিস্থানের গাঁটে সে কড়ি নেই—বিদেশীদের হাতে দেশের শিল্পবাণিজ্য ছেড়ে দিতেও বাদশা নারাজ। আমান উল্লার পিতামহ দোর্দণ্ডপ্রতাপ আবদুর রহমান বলতেন, 'আফগানিস্থান সেদিনই রেলগাড়ি চালাবে যেদিন সে নিজের হাতে রেলগাড়ি তৈরী করতে পারবে।' পিতা হবীব উল্লা সে আইন ঠিক ঠিক মেনে চলেননি—তবে কাবুলের বিজলী বাতির জন্য যে কলকব্জা কিনেছিলেন সেটা কাবুলী টাকায়। আমান উল্লা কি করবেন ঠিক মনস্থির করতে পারছিলেন না—ন্যাশন্যাল লোন তোলার উপদেশ কেউ কেউ তাঁকে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাহলে সবাইকে সুদ দিতে হয় এবং সুদ দেওয়া-নেওয়া ইসলামে বারণ।

হয়ত আমান উল্লা ভেবেছিলেন যে, দেশের গুরুভারের খানিকটে নিজের কাঁধ থেকে সরিয়ে দেশের আর পাঁচজনের কাঁধে যদি ভাগবাঁটোয়ারা করে দেওয়া যায় তাহলে প্রগতির পথে চলার সুবিধে হবে। আমান উল্লা বললেন, পার্লিমেণ্ট তৈরী করো।

সে পার্লিমেণ্টের স্বরূপ দেখতে পেলুম পাগমান গিয়ে।

কাবুল থেকে পাগমান কুড়িমাইল রাস্তা। বাস চলাচল আছে। সমস্ত শহরটা গড়ে তোলা হয়েছে পাহাড়ের থাকে থাকে। দূর থেকে মনে হয় যেন একটা শাঁখ কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার ভাঁজে ভাঁজে ছোট বাঙলো; অনেকটা হতালিয়ান ভিলার মত। সমস্ত পাগমান শহর জুড়ে আপেল নাসপাতির গাছ বাঙলোগুলোকে ঘিরে রেখেছে আর চূড়ার বরফগলা ঝরণা রাস্তার এক পাশের নালা দিয়ে থাকে থাকে নেমে এসেছে। পিচ ঢালা পরিষ্কার রাস্তা দিয়ে উঠছি আর দেখছি দুদিকে ঘন সবুজের নিবিড় স্তব্ধ সুষুপ্তি। কোনো দিকে কোনো প্রকার জীবনযাত্রার চঞ্চলতা নেই, কঠিন পাথরের খাড়া দেয়াল নেই, ঘিন-ঘিনে হলদে রঙের বাড়িঘরদোর নেই। কিছুতেই মনে হয় না যে, নীরস কর্কশ আফগানিস্থানের ভিতর দিয়ে চলেছি, থেকে থেকে ভুল লাগে আর চোখ চেয়ে থাকে সামনের মোড় ফিরতেই নেবুর ঝুড়ি-কাঁধে খাসিয়া মেয়েগুলোকে দেখবে বলে।

বাদশা আমীর-ওমরাহ নিয়ে গ্রীষ্মকালটা এখানে কাটান। এক সপ্তাহের

জন্য তামাম আফগানিস্থান এখানে জড়ো হয় 'জশন' বা স্বাধীনতা দিবসের আমোদ আহ্লাদ করার জন্য। দল বেঁধে আপন আপন তাঁবু সঙ্গে নিয়ে এসে তারা রাস্তার দু'দিকে যেখানে সেখানে সেগুলো খাটায়। সমস্ত দিন কাটায় চাঁদমারি, মঙ্গোল নাচ, পল্টনের কুচকাওয়াজ দেখে, না হয় চায়ের দোকানে আড্ডা জমিয়ে; রাত্রে তাঁবুতে তাঁবুতে শুরু হয় গানের মজলিস। "আজি এ নিশীথে প্রিয়া অধরেতে চুম্বন যদি পাই; জোয়ান হইব গোড়া হতে তবে এ জীবন দোহরাই"—ধরনের ওস্তাদী গানের রেওয়াজ প্রায় নেই, হরেকরকম "ফতুজানকে" অনেকরকম সাধ্য-সাধনা করে ডাকাডাকি করা হচ্ছে এ-সব গানের আসল ঝোঁক। মাঝে মাঝে একজন অতিরিক্ত উৎসাহে লাফ দিয়ে উঠে দু'চার চক্কর নাচ ভী দেখিয়ে দেয়। আর সবাই গানের ফাঁকে ফাঁকে 'সাবাস সাবাস' বলে নাচনেওয়ালাকে উৎসাহ দেয়।

এ-রকম মজলিসে বেশীক্ষণ বসা কঠিন। বন্ধ ঘরে যদি সবাই সিগারেট ফোঁকে তবে নিজেকেও সিগারেট ধরাতে হয়—না হলে চোখ জ্বালা করে, গলা খুসখুস করতে থাকে। এ-সব মজলিসে আপনিও যদি মনের ভিতর কোনো "ফতুজান" বা কদম্ববনবিহারিণীর ছবি এঁকে গলা মিলিয়ে—না মিললেও আপত্তি নেই—চিৎকার করে গান না জোড়েন তবে দেখবেন ক্রমেই কানে তালা লেগে আসছে, শেষটায় ফাটার উপক্রম। রাগবি খেলার সঙ্গে এ-সব গানের অনেক দিক দিয়ে মিল আছে—তাই এর রসভোগ করতে হয় বেশ একটু তফাতে আল-গোছে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু আমার বার বার মনে হ'ল পাগমান হৈ-হল্লার জায়গা নয়। নির্ঝরের ঝরঝর, পত্র-পল্লবের মৃদু মর্মর, অচেনা পাখির একটানা কূজন, পচা পাইনের সোঁদা সোঁদা গন্ধ, সবসুদ্ধ মিলে গিয়ে এখানে বেলা দ্বিপ্রহরেও মানুষের চোখে তন্দ্রা আসে। ভর গ্রীষ্মকাল, গাছের তলায় বসলে তবু শীত শীত করে—কোটের কলারটা তুলে দিতে ইচ্ছে করে, মনে হয় পেয়ালা, প্রিয়া, কবিতার বই কিছুরই প্রয়োজন নেই, একখানা র‍্যাপার পেলে ওমটা ঠিক জমত।

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। চোখ মেলে দেখি এক অপরূপ মূর্তি। কাঁচাপাকা লম্বা দাড়িওয়ালা, ঘামে-ভেজা, আজন্ম অস্নাত অধৌত, পীত দন্তকৌমুদী বিকশিত এক আফগান সামনে দাঁড়িয়ে। এরূপ আফগান অনেক দেখেছি, কিন্তু এর পরনে ধারালো ক্রীজওয়ালা সদ্য নূতন কালো পাতলুন, কালো ওয়েস্টকোট, স্টার্চ করা শক্ত শার্ট, কোণ-ভাঙা স্টিফ কলার, কালো টাই, দু'বোতামওয়ালা নব্যতম কাটের মর্নিং-কোট আর একমাথা বাবরি চুলের উপর দেড়ফুট উঁচু চকচকে সিল্কের

অপেরা-হ্যাট! সব কিছু আনকোরা ঝা-চকচকে নূতন; দেখে মনে হল যেন এই মাত্র দর্জির কার্ডবোর্ডের বাক্স থেকে বের করে গাছতলায় দাঁড়িয়ে পরা হয়েছে। যা তা 'দেরেশি' নয়, ষোল আনা মর্নিং-স্যুট। প্যারেডের দিনে লাট-বেলাট এই রকম স্যুট পরে সেলুট নেন।

বেল্টের অভাবে পাজামার নোংরা নেওয়ার দিয়ে পাতলুন বাঁধা, কালো ওয়েস্টকোট আর পাতলুনের সঙ্গমস্থল থেকে একমুঠো ধবধবে সাদা শার্ট বেরিয়ে এসেছে, টাইটাও ওয়েস্টকোটের উপরে ঝুলছে।

বাঁ হাতে পাগড়ির কাপড় দিয়ে বানানো বোঁচকা, ডান হাতে ফিতেয় বাঁধা একজোড়া নূতন কালো বুট। তখন ভালো করে তাকিয়ে দেখি পায়ে জুতো মোজা নেই!

আমাকে পশতু ভাষায় অভিবাদন করে বোঁচকাটা কাঁধে ফেলে, লম্বা হাতে বুট জোড়া দোলাতে দোলাতে ওরাঙওটাঙের মত বড় রাস্তার দিকে রওয়ানা হল।

আমি তো ভেবে ভেবে কোনো কূলকিনারা পেলুম না যে. এ রকমের আফগান এ-ধরনের স্যুট পেলেই বা কোথায়, আর এর প্রয়োজনই বা তার কি। কিন্তু ঐ এক মূর্তি নয়। বন থেকে বেরবার আগে হুবহু এক দ্বিতীয় মূর্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ। সে দেখি এক মুচির সামনে উবু হয়ে বসে গল্প জুড়েছে আর মুচি তার বুটের তলায় লোহা ঠুকে ঠুকে আল্পনা এঁকে দিচ্ছে।

পরের দিন আমান উল্লার বক্তৃতা। সভায় যাবার পথে এ-রকম আরো ডজনখানেক মূর্তির সঙ্গে দেখা হল। সেখানে গিয়ে দেখি সভার সবচেয়ে ভালো জায়গায়, প্ল্যাটফর্মের মুখোমুখি প্রায় শ'দেড়েক লোক এ-রকম মর্নিং-স্যুটের ইউনিফর্ম পরে বসে আছে। এরাই প্রথম আফগান পার্লামেন্টের সদস্য।

যে তাজিক, হাজারা, মঙ্গোল, পাঠান আপন আপন জাতীয় পোষাক পরে এতকাল স্বচ্ছন্দে ঘরে-বাইরে ঘোরাফেরা করেছে, বিদেশীর মুগ্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, আজ তারা বিকট বিজাতীয় বেশভূষা ধারণ করে সভাস্থলে কাঠের মত বসে আছে। শুনেছি অনভ্যাসের ফোঁটা চড়চড় করে, কিন্তু এদের তো শুধু কপালে ফোঁটা দেওয়া হয়নি, সর্বাঙ্গে যেন কৃষ্ণচন্দন লেপে দেওয়া হয়েছে!

আমান উল্লা দেশের ভূতভবিষ্যৎবর্তমান সম্বন্ধে অনেক খাঁটী কথা বললেন। কাবুলের লোক হাততালি দিল। সদস্যদের তালিম দেওয়া হয়েছিল কিনা জানিনে, তারা এলোপাতাড়ি হাততালি দিয়ে লজ্জা পেয়ে এদিক ওদিক তাকায়; ফরেন অফিসের কর্তারা আরো বেশী লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করেন। বিদেশী

রাজদূতেরা অপলক দৃষ্টিতে আমান উল্লার দিকে তাকিয়ে—সেদিন বুঝতে পারলুম রাজদূত হতে হলে কতদূর আত্মসংযম, কত জোর চিত্তজয়ের প্রয়োজন।

জানি, সুট ভালো করে পরতে পারা না-পারার উপর কিছুই নির্ভর করে না কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়, কি প্রয়োজন ছিল লেফাফাদুরস্ত হওয়ার লোভে দেড়শ' জন গাঁওবুড়াকে লাঞ্ছিত করে নিজে বিড়ম্বিত হওয়ার ?

আমান উল্লার বক্তৃতা এরা কতদূর বুঝতে পেরেছিল জানিনে—ভাষা এক হলেই তো আর ভাবের বাজারের বেচাকেনা সহজ সরল হয়ে ওঠে না। শুনেছি, পুরানো বোতলও নাকি নয়া মদ সইতে পারে না।

ছাব্বিশ

গ্রীষ্মকালটা কাটল ক্ষেত-খামারের কাজ দেখে দেখে। আমাদের দেশে সে সুবিধে নেই; ঠাঠা রোদ্দুর, ঝমাঝ্‌ঝম বৃষ্টি, তলতলে কাদা আর লিকলিকে জোঁকের সঙ্গে একটা রফারফি না করে আমাদের দেশের ক্ষেত-খামারের পয়লা দিকটা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করার উপায় নেই। এদেশের চাষবাসের বেশীর ভাগ শুকনো-শুকনিতে। শীতের গোড়ার দিকে বেশ ভালো করে একদফা হাল চালিয়ে দেয়; তারপর সমস্ত শীতকাল ধরে চাষীর আশা যেন বেশ ভালো রকম বরফ পড়ে। অদৃষ্ট প্রসন্ন হলে বার কয়েক ক্ষেতের উপর বরফ জমে আর গলে; জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে অনেক নিচে ঢোকে আর সমস্ত ক্ষেতটাকে বেশ নরম করে দেয়। বসন্তের শুরুতে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়, কিন্তু মাঠঘাট ডুবে যায় না। আধা-ভেজা আধা-শুকনোতে তখন ক্ষেতের কাজ চলে—নালার ধারে গাছতলায় একটুখানি শুকনো জায়গা বেছে নিয়ে বেশ আরাম করে বসে ক্ষেতের কাজ দেখতে কোনো অসুবিধা হয় না। তারপর গ্রীষ্মকালে চতুর্দিকে পাহাড়ের উপরকার জমা-বরফ গলে কাবুল উপত্যকায় নেমে এসে খাল-নালা ভরে দেয়। চাষীরা তখন নালার বাঁধ দিয়ে দু'পাশের ক্ষেতকে নাইয়ে দেয়। ধান ক্ষেতের মত আল বেঁধে বেবাক জমি টৈটম্বুর করে দিতে হয় না।

কোন্ চাষীর কখন নালায় বাঁধ দেবার অধিকার সে সম্বন্ধে বেশ কড়াকড়ি আইন আছে। শুধু তাই নয়, নালার উজান ভাঁটির গাঁয়ে গাঁয়ে জলের ভাগ-বাঁটোয়ারার কি বন্দোবস্ত তারও পাকাপাকি শর্ত সরকারের দফতরে লেখা থাকে। মাঝে মাঝে মারামারি মাথা-ফাটাফাটি হয়, কিন্তু কাবুল উপত্যকার চাষারা দেখলুম বাঙালী চাষার মতই নিরীহ—মারামারির চেয়ে গালাগালিই বেশী পছন্দ

করে। তার কারণ বোধহয় এই যে, কাবুল উপত্যকা বাংলা দেশের জমির চেয়েও উর্বরা। তার উপর তাদের আরেকটা মস্ত সুবিধা এই যে, তারা শুধু বৃষ্টির উপর নির্ভর করে না। শীতকালে যদি যথেষ্ট পরিমাণে বরফ পড়ে তাদের ক্ষেত ভরে যায়, অথবা যদি পাহাড়ের বরফ প্রচুর পরিমাণে গলে নেমে আসে, তাহলে তারা আর বৃষ্টির তোয়াক্কা করে না। কাবুলের লোক তাই বলে, 'কাবুল বেজর্ শওদ লাকিন বে-বর্ফ্‌ন্ বাশদ'—কাবুল স্বর্ণহীন হোক আপত্তি নেই, কিন্তু বরফহীন যেন না হয়।

আমার বাড়ির সামনে দিয়ে প্রায় দশ হাত চওড়া একটি নালা বয়ে যায়। তার দু'দিকে দু'সারি উঁচু চিনার গাছ, তারই নিচে দিয়ে পায়ে চলার পথ। আমি সেই পথ দিয়ে নালা উজিয়ে উজিয়ে অনেক দূরে গিয়ে একটা পঞ্চবটির মত পাঁচচিনারের মাঝখানে বরসাতি পেতে আরাম করে বসতুম। একটু উজানে নালায় বাঁধ দিয়ে আরেক চাষা তার ক্ষেত নাওয়াচ্ছে। আমি যে ক্ষেতের পাশে বসে আছি তার চাষা আমার সঙ্গে নানারকম সুখদুঃখের কথা কইছে। এ দু'জনের কান মসজিদের দিকে—কখন আসরের (অপরাহ্ণ) নমাজের আজান পড়বে। তখন আমার চাষার পালা। আজান পড়া মাত্রই সে উপরের বাঁধের পাথর-কাদা সরিয়ে দেয়—সঙ্গে সঙ্গে কুলকুল করে নীচের বাঁধের জল ভর্তি হতে শুরু করে; চাষা তার বাঁধ আগের থেকেই তৈরী করে রেখেছে। ব্যস্তসমস্ত হয়ে সে তখন বাঁধের তদারক করে বেড়ায়, কাঠের শাবল দিয়ে মাঝে মাঝে কাদা তুলে সেটাকে আরো শক্ত করে দেয়, ক্ষেতের ঢেলা মাটি এদিকে ওদিকে সরিয়ে দিয়ে বানের জলের পথ করে দেয়। শিলওয়ারটা হাঁটুর উপরে তুলে কোমরে গুঁজে নিয়েছে, জামাটা খুলে গাছতলায় পাথরচাপা দিয়ে রেখেছে, আর পাগড়ির লেজ দিয়ে মাঝে মাঝে কপালের ঘাম মুছছে। আমি ততক্ষণে তার হুঁকোটার তদারক করছি। সে মাঝে মাঝে এসে দু'একটা দম দেয় আর পাগড়ির লেজ দিয়ে হাওয়া খায়। আমাদের চাষার গামছা আর কাবুলী চাষার পাগড়ি দুই-ই একবস্তু। হেন কর্ম নেই যা গামছা আর পাগড়ি দিয়ে করা যায় না—ইস্তেক মাছ ধরা পর্যন্ত। যদিও আমাদের নালায় সব সময়ই দেখেছি অতি নগণ্য পোনা মাছ।

বেশ বেলা থাকতে মেয়েরা কলসী মাথায় 'জলকে' আসত। গোড়ার দিকে আমাকে দেখে তারা মুখের উপর ওড়না টেনে দিত, আমাদের দেশের চাষীর বউ যে রকম 'ভদ্দর নোককে' দেখলে 'নজ্জা' পায়। তবে এদের 'নজ্জা' একটু কম। ডানহাত দিয়ে বুকের উপর ওড়না টেনে বাঁহাত দিয়ে হাঁটুর উপরে পাজামা তুলে

এরা প্রথম দর্শনে আরবী ঘোড়ার মত ছুট দেয়নি আর অল্প কয়েকদিনের ভিতরই তারা আমার সামনে স্বচ্ছন্দে আমার চাষা বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল।

কিন্তু চাষা বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব বেশীদিন টিকলো না। তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী মুইন-উস্-সুলতানে। চাষাই বলল, সে প্রথমটায় তার চোখকে বিশ্বাস করেনি যখন দেখতে পেল তারি আগা (ভদ্রলোক) বন্ধু মুইন-উস-সুলতানের সঙ্গে তোপবাজি (টেনিস) খেলছেন। আমি তাকে অনেক করে বোঝালুম যে, তাতে কিছুমাত্র এসে যায় না, সেও সায় দিল, কিন্তু কাজের বেলা দেখলুম সে আর আমাকে তামাক সাজতে দেয় না, আগের মত প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে না, 'তো'র বদলে হঠাৎ 'শুমা' বলতে আরম্ভ করেছে আর সম্মানার্থে বহুবচন যদি বা সর্বনামে ঠিক রাখে তবু ক্রিয়াতে একবচন ব্যবহার করে নিজের ভুলে নিজেই লজ্জা পায়। ভাষা শুধরাতে গিয়ে গল্পের খেই হারিয়ে ফেলে, আর কিছুতেই ভুলতে পারে না যে, আমি মুইন-উস্-সুলতানের সঙ্গে তোপবাজি খেলি। আমাদের তেলতেলে বন্ধুত্ব কেমন যেন করকরে হয়ে গেল।

কিন্তু লেনদেন বন্ধ হয়নি, যতদিন গাঁয়ে ছিলুম প্রায়ই মুরগীটা আণ্ডাটা দিয়ে যেত। দাম নিতে চাইত না, কেবল আবদুর রহমানের খাবার ভয়ে যা নিতান্ত না নিলে চলে না তাই নিতে স্বীকার করত।

হেমন্তের শেষের দিকে ফসলকাটা যখন শেষ হয়ে গেল তখন চাষা কাঠুরে হয়ে গেল। আমাকে আগের থেকেই বলে রেখেছিল—একদিন দেখি পাঁচ গাধা-বোঝাই শীতের জ্বালানি কাঠ নিয়ে উপস্থিত। আবদুর রহমানের মত খুঁতখুঁতে লোকও উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করল যে, এ রকম পয়লা নম্বরের নিম-তর্ নিম-খুশ্ক্ (আধা-ভেজা) কাঠ কাবুল বাজারের কোথাও পাওয়া যায় না। আবদুর রহমান আমাকে বুঝিয়ে বলল যে, সম্পূর্ণ শুকনো হলে কাঠ তাড়াতাড়ি জ্বলে গিয়ে ঘর বড্ড বেশী গরম করে তোলে, তাতে আবার খর্চাও হয় বেশী। আর যদি সম্পূর্ণ ভেজা হয় তাহলে গরমের চেয়ে ধুঁয়োই বেরোয় বেশী, যদিও খর্চা তাতে কম।

এবার দাম দেবার বেলায় প্রায় হাতাহাতির উপক্রম। আমি তাকে কাবুলের বাজার দর দিতে গেলে সে শুধু বলে যে, কাবুলের বাজারে সে অত দাম পায় না। অনেক তর্কাতর্কির পর বুঝলুম যে, বাজারের দরের বেশ খানিকটা পুলিশ ও তাদের ইয়ার-বক্সীকে দিয়ে দিতে হয়। শেষটায় গোলমাল শুনে মাদাম জিয়ার এসে মিটমাট করে দিয়ে গেলেন।

আমাদের দিলখোলা বন্ধুত্ব প্রায় লোপ পাবার মত অবস্থা হল যেদিন সে শুনতে পেল আমি 'সৈয়দ'। তারপর দেখা হলেই সে তার মাথার পাগড়ি ঠিক করে বসায় আর আমার হাতে চুমো খেতে চায়। আমি যতই বাধা দিই, সে ততই কাতর নয়নে তাকায়, আর পাগড়ি বাঁধে আর খোলে।

তামাক-সাজার সত্যযুগের কথা ভেবে নিশ্বাস ফেললুম।

ডিমোক্রেসি বড় ঠুনকো জিনিস ; কখন যে কার অভিসম্পাতে ফেটে চৌচির হয়ে যায়, কেউ বলতে পারে না। তারপর আর কিছুতেই জোড়া লাগে না।

সাতাশ

হেমন্তের গোড়ার দিকে শান্তিনিকেতন থেকে মৌলানা জিয়াউদ্দীন এসে কাবুলে পৌঁছলেন। বগদানফ, বেনওয়া, মৌলানা আমাতে মিলে তখন 'চারইয়ারী' জমে উঠল।

জিয়াউদ্দীন অমৃতসরের লোক। ১৯২১ সালের খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে কলেজ ছাড়েন। ১৯২২ সালে শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথের শিষ্য হন এবং পরে ভালো বাঙলা শিখেছিলেন। বেশ গান গাইতে পারতেন আর রবীন্দ্রনাথের অনেক গান পাঞ্জাবীতে অনুবাদ করে মূল সুরে গেয়ে শান্তিনিকেতনের সাহিত্যসভায় আসর জমাতেন। এখানে এসে সে সব গান খুব কাজে লেগে গেল, কাবুলের পাঞ্জাবী সমাজ তাঁকে লুফে নিল। মৌলানা ভালো ফার্সী জানতেন বলে কাবুলীরাও তাঁকে খুব সম্মান করত।

কিন্তু 'চারইয়ারি' সভাতে ভাঙন ধরল। বগদানফের শরীর ভালো যাচ্ছিল না। তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে শান্তিনিকেতন চলে গেলেন। বেনওয়া সায়েব তখন বড্ড মনমরা হয়ে গেলেন। কাবুলে তিনি কখনো খুব আরাম বোধ করেন নি। এণ্ড্রুজ, পিয়ার্সনকে বাদ দিলে বেনওয়া ছিলেন রবীন্দ্রনাথের খাঁটি সমজদার। শান্তিনিকেতনের কথা ভেবে ভেবে ভদ্রলোক প্রায়ই উদাস হয়ে যেতেন আর খামকা কাবুলের নিন্দা করতে আরম্ভ করতেন।

বেনওয়া সায়েবই আমাকে একদিন রাশান এম্বেসিতে নিয়ে গেলেন।

প্রথম দর্শনেই তাভারিশ দেমিদফকে আমার বড় ভালো লাগলো। রোগা চেহারা, সাধারণ বাঙালীর মতন উঁচু, সোনালী চুল, চোখের লোম পর্যন্ত সোনালী, শীর্ণ মুখ আর দুটি উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ নীল চোখ। বেনওয়া যখন আলাপ করিয়ে দিচ্ছিলেন তখন তিনি মুখ খোলার আগেই যেন চোখ দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা

করে নিচ্ছিলেন। সাধারণ কন্টিনেন্টালের চেয়ে একটু বেশী ঝুঁকে তিনি হ্যাণ্ডশেক করলেন, আর হাতের চাপ দেওয়ার মাঝ দিয়ে অতি সহজ অভ্যর্থনার সহৃদয়তা প্রকাশ করলেন।

তাঁর স্ত্রীরও রেশমী চুল, তবে তিনি বেশ মোটাসোটা আর হাসিখুশী মুখ। কোথাও কোনো অলঙ্কার পরেননি, লিপস্টিক রুজ তো নয়ই। হাত দুখানা দেখে মনে হল ঘরের কাজকর্মও বেশ খানিকটা করেন। সাধারণ মেয়েদের কপালের চেয়ে অনেক চওড়া কপাল, মাথার মাঝখানে সিঁথি আর বাঙালী মেয়েদের মত অযত্নে বাঁধা এলোখোঁপা।

কর্তা কথা বললেন ইংরিজীতে, গিন্নী ফরাসীতে।

অভিজ্ঞান শেষ হতে না হতেই তাভারিশা দেমিদভা বললেন, 'চা, অন্য পানীয়, কি খাবেন বলুন।'

ইতিমধ্যে দেমিদফ পাপিরসি (রাশান সিগারেট) বাড়িয়ে দিয়ে দেশলাই ধরিয়ে তৈরী।

আমি বাঙালী, বেনওয়া সায়েব শান্তিনিকেতনে থেকে থেকে আধা বাঙালী হয়ে গিয়েছেন আর রাশানরা যে চা খাওয়াতে বাঙালীকেও হার মানায় সে তো জানা কথা।

তবে খাওয়ার কায়দাটা আলাদা। টেবিলের মাঝখানে সামোভার ; তার জল টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। এদিকে টি-পটে সকাল বেলা মুঠো পাঁচেক চা আর গরম জল দিয়ে একটা ঘন মিশকালো লিকার তৈরী করা হয়েছে—সেটা অবশ্য ততক্ষণে জুড়িয়ে হিম হয়ে গিয়েছে। টি-পট হাতে করে প্রত্যেকের পেয়ালা নিয়ে মাদাম শুধান, 'কতটা দেব বলুন।' পোয়াটাক নিলেই যথেষ্ট ; সামোভারের চাবি খুলে টগ্‌বগে গরম জল তাতে মিশিয়ে নিলে দু'য়ে মিলে তখন বাঙালী চায়ের রঙ ধরে। কায়দাটা মন্দ নয়, একই লিকার দিয়ে কখনো কড়া, কখনো ফিকে যা খুশী খাওয়া যায়। দুধের রেওয়াজ নেই, দুধ গরম করার হাঙ্গামাও নেই। সকাল বেলাকার তৈরী লিকারে সমস্ত দিন চলে।

সামোভারটি দেখে মুগ্ধ হলুম। রূপোর তৈরী। দু'দিকের হ্যাণ্ডেল, উপরের মুকুট, জল খোলার চাবি, দাঁড়াবার পা সব কিছুতেই পাকা হাতের সুন্দর, সুদক্ষ, সূক্ষ্ম কাজ করা।

তারিফ করে বললুম, 'আপনাদের রূপোর তাজমহলটি ভারি চমৎকার।'

দেমিদফের মুখের উপর মিষ্টি লাজুক হাসি খেলে গেল—ছোট ছেলেদের প্রশংসা করলে যে রকম হয়। মাদাম উচ্ছ্বসিত হয়ে বেনওয়া সায়েবকে বললেন,

'আপনার ভারতীয় বন্ধু ভালো কমপ্লিমেণ্ট দিতে জানেন।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাজমহল ছাড়া ভারতীয় আর কোনো ইমারতের সঙ্গে তুলনা দিলে কিন্তু চলত না মসিয়ো ; আমি ঐ একটির নাম জানি, ছবি দেখেছি।'

তখন দেমিদফ বললেন, 'সামোভারটি তুলা শহরে তৈরী।'

আমার মাথার ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। বললুম, 'কোথায় যেন চেখফ না গর্কির লেখাতে একটা রাশান প্রবাদ পড়েছি, 'তুলাতে সামোভার নিয়ে যাওয়ার মত।' আমরা বাঙলাতে বলি, 'তেলা মাথায় তেল ঢালা'।'

'কেরিইং কোল টু নিউ কাস্‌ল,' 'বরেলি মে বাঁস লে জানা' ইত্যাদি সব ক'টাই আলোচিত হল। আমার ফরাসী প্রবাদটিও মনে পড়ছিল, 'প্যারিসে আপন স্ত্রী নিয়ে যাওয়া' কিন্তু অবস্থা বিবেচনা করে সেটা চেপে রাখলুম। হাফিজও যখন বলেছেন, 'আমি কাজী নই মোল্লাও নই, আমি কোন দুঃখে 'তওবা' (অনুতাপ) করতে যাব,' আমি ভাবলুম, 'আমি ফরাসী নই, আমার কি দায় রসাল প্রবাদটা দাখিল করবার।'

দেমিদফ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভারতবর্ষের লোক রাশান কথাসাহিত্য পড়ে কি না।'

আমি বললুম, 'গোটা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনো মত দেওয়া কঠিন কিন্তু বাঙলা দেশ সম্বন্ধে বলতে পারি সেখানে এককালে ফরাসী সাহিত্য যে আসন নিয়েছিল সেটা কয়েক বৎসর হল রুশকে ছেড়ে দিয়েছে। বাঙলা দেশের অনেক গুণী বলেন, চেখফ মপাসাঁর চেয়ে অনেক উঁচু দরের স্রষ্টা।'

বাংলা দেশ কেন সমস্ত ভারতবর্ষই যে ক্রমে ক্রমে রুশ সাহিত্যের দিকে ঝুঁকে পড়বে সে সম্বন্ধে বেনওয়া সায়েব তখন অনেক আলোচনা করলেন। ভারতবাসীর সঙ্গে রুশের কোন্ জায়গায় মনের মিল, অনুভূতির ঐক্য, বাতাবরণের সাদৃশ্য, সে সম্বন্ধে নিরপেক্ষ বেনওয়া অনেকক্ষণ ধরে আপন পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা সুন্দর ভাষায় মজলিসী কায়দায় পরিবেষণ করলেন। শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীতে যে প্রচুর রাশান নভেল, ছোট গল্পের বই মজুদ আছে সে কথাও বলতে ভুললেন না।

দেমিদফ বললেন, 'রাশানরা প্রাচ্য না পাশ্চাত্যের লোক তার স্থিরবিচার এখনো হয়নি। সামান্য একটা উদাহরণ নিন না। খাঁটি পশ্চিমের লোক শার্ট পাতলুনের নিচে গুঁজে দেয়, খাঁটি প্রাচ্যের লোক, তা সে আফগানই হোক আর ভারতীয়ই হোক, কুর্তাটা ঝুলিয়ে দেয় পাজামার উপরে। রাশানরা এ দু'দলের মাঝখানে—শার্ট পরলে সেটা পাতলুনের নিচে গোঁজে, রাশান কুর্তা পরলে সেটা

পাতলুনের উপর ঝুলিয়ে দেয়—সে কুর্তাও আবার প্রাচ্য কায়দায় তৈরী, তাতে অনেক রঙ অনেক নক্সা।'

দেমিদফের মত অত শান্ত ও ধীর কথা বলতে আমি কম লোককেই শুনেছি। ইংরিজী যে খুব বেশী জানতেন তা নয় তবু যেটুকু জানতেন তার ব্যবহার করতেন বেশ ভেবেচিন্তে, সযত্নে শব্দ বাছাই করে করে।

রাশান সাহিত্যে আমার শখ দেখে তিনি টলস্টয়, গর্কি ও চেখফ ইয়াসনা পলিয়ানাতে যে সব আলাপ আলোচনা করেছিলেন তার অনেক কিছু বর্ণনা করে বললেন, 'জারের আমলে তার সব কিছু প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি—কারণ টলস্টয় আপন মতামত প্রকাশ করার সময় জারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যেতেন। জারের পতনের পর নতুন সরকার এতদিন নানা জরুরী কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল —এখন আস্তে আস্তে কিছু কিছু ছাপা হচ্ছে ও সঙ্গে সঙ্গে নানা রহস্যের সমাধান হচ্ছে।'

আমি বললুম, 'সে কি কথা, আমি তো শুনেছি আপনারা আপনাদের প্রাক-বলশেভিক সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহিত নন।'

মাদামের মুখ লাল হয়ে উঠল। একটু উত্তেজনার সঙ্গে বললেন, 'নিশ্চয় ইংরেজের প্রোপাগাণ্ডা।'

আমি আমার ভুল খবরের জন্য হন্তদন্ত হয়ে মাপ চেয়ে বললুম, 'আমরা রাশান জানিনে, আমরা চেখফ পড়ি ইংরিজীতে, লাল রুশের নিন্দাও পড়ি ইংরিজীতে।'

দেমিদফ চুপ করে ছিলেন। ভাব দেখে বুঝলুম তিনি ইংরেজ কি করে না-করে, কি বলে না-বলে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। আপন বক্তব্য পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলে যে অসত্য আপনার থেকে বিলোপ পাবে সে বিষয়ে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর মূল বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে বারে বারে প্রকাশ পাচ্ছিল।

আমরা এসেছিলুম চারটের সময় ; তখন বাজে প্রায় সাতটা। এর মাঝে যে কত পাপিরসি পুড়ল, কত চা চলল গল্পের তোড়ে আমি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিনি। এক কাপ শেষ হতেই মাদাম সেটা তুলে নিয়ে এঁটো চা একটা বড় পাত্রে ঢেলে ফেলেন, লিকার ঢেলে গরম জল মিশিয়ে চিনি দিয়ে আমার অজানাতেই আরেক কাপ সামনে রেখে দেন। জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করেন না কতটা লিকারের প্রয়োজন, দু'-একবার দেখেই আমার পরিমাণটা শিখে নিয়েছেন। আমি কখনো ধন্যবাদ দিয়েছি, কখনো টলস্টয় গর্কির তর্কের ভিতরে ডুবে যাওয়ায় লক্ষ্য করিনি বলে পরে অনুতাপ প্রকাশ করেছি।

কথার ফাঁকে মাদাম বললেন, 'আপনারা এখানেই খেয়ে যান।' আমি অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বললুম, 'আরেক দিন হবে।' বেনওয়া সায়েব তো ছিলেছেঁড়া ধনুকের মত লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'অনেক অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু আজ উঠি, বড্ড বেশীক্ষণ ধরে আমরা বসে আছি।'

আমি একটু বোকা বনে গেলুম। পরে বুঝতে পারলুম বেনওয়া সায়েব খাওয়ার নেমন্তন্নটা অন্য অর্থে ধরে নিয়ে লজ্জা পেয়েছেন। মাদামও দেখি আস্তে আস্তে বেনওয়ার মনের গতি ধরতে পেরেছেন। তখন লজ্জায় টকটকে লাল হয়ে বললেন, 'না মসিয়ো, আমি সে অর্থে বলিনি ; আমি সত্যিই আপনাদের গালগল্পে ভারী খুশী হয়ে ভাবলুম দু'মুঠো খাবার জন্য কেন আপনাদের আড্ডাটা ভঙ্গ হয়।'

দেমিদফ চুপ করে ছিলেন। ভালো করে কুয়াশাটা কাটাবার জন্য বললেন, 'পশ্চিম ইয়োরোপীয় এটিকেটে এ-রকম খেতে বলার অর্থ হয়ত 'তোমরা এবার ওঠো, আমরা খেতে বসব।' আমার স্ত্রী সে ইঙ্গিত করেননি। জানেন তো খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে আমরা এখনো আমাদের কুর্তা পাতলুনের উপরে পরে থাকি—অর্থাৎ আমরা প্রাচ্যদেশীয়।'

সকলেই আরাম বোধ করলুম। কিন্তু সে যাত্রা ডিনার হ'ল না। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় দেমিদফ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি রাশান শেখেন না কেন ?'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনি শেখাবেন ?' তিনি বললেন, 'নিশ্চয়। With pleasure !'

বেনওয়া বললেন, 'No, not with pleasure' বলে আমার দিকে চোখ ঠার দিলেন।

মাদাম বললেন, 'ঠিক বুঝতে পারলুম না।'

বেনওয়া বললেন, 'এক ফরাসী লণ্ডনের হোটেলে ঢুকে বলল, 'Waiter, bring me a cotlette, please !' ওয়েটার বলল, 'With pleasure, Sir.' ফরাসী ভয় পেয়ে বলল, 'No, no, not with pleasure, with potatoes, please !'

বেনওয়া বিদগ্ধ ফরাসী। একটুখানি হাল্কা রসিকতা দিয়ে শেষ পাতলা মেঘ-টুকু কেটে দিয়ে টুক করে বেরিয়ে এলেন।

মাদামও কিছু কম না। শেষ কথা শুনতে পেলুম 'But I shall give you cotlettes with both pleasure and potatoes'.

রাস্তায় বেরিয়ে বেনওয়াকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বললুম, 'এ দুটি যথার্থ খাঁটি লোক।'

আটাশ

হেমন্তের কাবুল 'মধ্যযুগীয় সম্প্রসারণে ফুলে ওঠে,' ইংরিজীতে যাকে বলে 'মিড্‌ল্ এজ্ স্প্রেড্।' অর্থাৎ ভুঁড়িটা মোটা হয়, চাল-চলন ভারিক্কীভরা।

যবগমের দানা ফুলে উঠল, আপেল ফেটে পড়ার উপক্রম, গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত গ্রীষ্ম-ভর রোদ বাতাস বৃষ্টি খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে গিয়েছে, হাওয়া বইলে ডাইনে বাঁয়ে নাচন তোলে না, ঠায় দাঁড়িয়ে অল্প অল্প কাঁপে, না হয় থপ করে ডাল ছেড়ে গাছতলায় শুয়ে পড়ে। প্রথম নবান্ন হয়ে গিয়েছে, চাষীরাও খেয়েদেয়ে মোটা হয়েছে। শীতকাতুরেরা দুটো একটা ফালতো জামা পরে ফেঁপেছে, গাধা-গুলো ঘাস খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে উঠেছে, খড়-চাপানো গাড়ির পেট ফেটে গিয়ে এদিক ওদিক কুটোর নাড়ী ছড়িয়ে পড়ছে।

আর সফল হয়ে ফেঁপে ওঠার আসল গরমি দেখা যায় সকাল বেলার শিশিরে। বেহায়া বড়লোকের মত কাবুল উপত্যকা কেবলি হীরের আংটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখায়,—ঝলমলানিতে চোখে ধাঁধা লেগে যায়।

কিন্তু এ সব জেল্লাই কাবুল নদীর রক্তশোষণ করে। সাপের খোলসের মত সে নদী এখন শুকিয়ে গিয়েছে, বাতাস বইলে বুক চিরে বালু ওড়ে। মার্কস্ তো আর ভুল বলেননি, 'শোষণ করেই সবাই ফাঁপে।'

যে পাগমান পাহাড়ের বরফের প্রসাদে কাবুল নদীর জৌলুশ সে তার নীল চূড়োগুলো থেকে এক একটা করে সব ক'টা বরফের সাদা টুপি খসিয়ে ফেলেছে। আকাশ যেন মাটির তুলনায় বড্ড বেশী বুড়িয়ে গেল—নীল চোখে ঘোলাটে ছানি পড়েছে।

পাকা, পচা ফলের গন্ধে মাথা ধরে ; আফগানিস্থানের সরাইয়ের চতুর্দিক বন্ধ বলে দুর্গন্ধ যে রকম বেরতে পারে না, কাবুল উপত্যকার চারিদিকে পাহাড় বলে তেমনি পাকা ফল ফসলের গন্ধ সহজে নিষ্কৃতি পায় না। বাড়ির সামনে যে ঘূর্ণি-বায়ু খড়কুটো পাতা নিয়ে বাইরে যাবে বলে রওয়ানা দেয় সেও দেখি খানিকক্ষণ পরে ঘুরে ফিরে কোনোদিকে রাস্তা না পেয়ে সেই মাঠে ফিরে এসে সবসুদ্ধ নিয়ে থপ করে বসে পড়ে।

তারপর একদিন সন্ধ্যের সময় এল ঝড়! প্রথম ধাক্কায় চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলুম, মেলে দেখি শেলির 'ওয়েস্ট্ উইণ্ড' কীটসের 'অটামকে' ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলেছে,—সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ'। খড়কুটো, জমে-ওঠা পাতা, ফেলে-

দেয়া কুলো সবাই চলল দেশ ছেড়ে মুহাজরিন হয়ে। কেউ চলে সার্কাসের সঙের মত ডিগবাজি খেয়ে, কেউ হনুমানের মত লাফ দিয়ে আকাশে উঠে পক্ষীরাজের মত ডানা মেলে দিয়ে আর বাদবাকি যেন ধনপতির দল—প্রলেতারিয়ার আক্রমণের ভয়ে একে ওকে জড়িয়ে ধরে।

আধ ঘণ্টার ভিতর সব গাছ বিলকুল সাফ।

সে কী বীভৎস দৃশ্য!

আমাদের দেশে বন্যার জল কেটে যাওয়ার পর কখনো কখনো দেখেছি কোনো গাছের শিকড় পচে যাওয়ায় তার পাতা ঝরে পড়েছে—সমস্ত গাছ ধবল-কুষ্ঠ রোগীর মত ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।

এখানে সব গাছ তেমনি দাঁড়িয়ে, নেঙ্গা সঙ্গীন আকাশের দিকে উঁচিয়ে।

দু'-একদিন অন্তর অন্তর দেখতে পাই গোর দিতে মড়া নিয়ে যাচ্ছে। আবদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করলুম কোথাও মড়ক লেগেছে কি না।

আবদুর রহমান বলল, 'না হুজুর, পাতা ঝরার সঙ্গে সঙ্গে বুড়োরাও ঝরে পরে। এই সময়েই তারা মরে বেশী।'

খবর নিয়ে দেখলুম, শুধু আবদুর রহমান নয় সব কাবুলীরই এই বিশ্বাস।

ইতিমধ্যে আবদুর রহমানের সঙ্গে আমার রীতিমত হার্দিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গিয়েছে। তার জন্য দায়ী অবশ্য আবদুর রহমানই।

আমাকে খাইয়ে দাইয়ে সে রোজ রাত্রেই কোনো একটা কাজ নিয়ে আমার পড়ার ঘরের এক কোণে আসন পেতে বসে,—কখনো বাদাম আখরোটের খোসা ছাড়ায়, কখনো চাল ডাল বাছে, কখনো কাঁকুড়ের আচার বানায় আর নিতান্ত কিছু না থাকলে সব ক'জোড়া জুতো নিয়ে রঙ লাগাতে বসে।

আবদুর রহমানের জুতো বুরুশ করার কায়দা মামুলী সায়াল নয়, অতি উচ্চাঙ্গের আর্ট। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার অর্ধেক মেহনতে মোনা লিসার ছবি আঁকা যায়।

প্রথম খবরের কাগজ মেলে তার মাঝখানে জুতো জোড়াটি রেখে অনেকক্ষণ ধরে দেখবে। তারপর দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে যদি কোথাও শুকনো কাদা লেগে থাকে তাই ছাড়াবে। তারপর লাগাবে এঞ্জিনের পিস্টনের গতিতে বুরুশ। তারপর মেথিলেটেড স্পিরিটে নেকড়া ভিজিয়ে বেছে বেছে যে সব জায়গায় পুরানো রঙ জমে গিয়েছে সেগুলো অতি সন্তর্পণে ওঠাবে। তারপর কাপড় ধোয়ার সাবানের উপর ভেজা নেকড়া চালিয়ে তাই দিয়ে জুতোর উপর থেকে আগের দিনের রঙ সরাবে। তারপর নির্বিকার চিত্তে আধঘণ্টাটাক বসে থাকবে জুতো

শুকোবার প্রতীক্ষায়—'ওয়াশের' আর্টিস্টরা যে রকম ছবি শুকোবার জন্য সবুর করে থাকেন। তারপর তার রঙ লাগানো দেখে মনে হবে প্যারিস-সুন্দরীও বুঝি এত যত্নে লিপস্টিক লাগান না—তখন আবদুর রহমানের ক্রিটিক্যাল মোমেন্ট, প্রশ্ন শুধোলে সাড়া পাবেন না। তারপর বাঁ হাত জুতোর ভিতর ঢুকিয়ে ডান হাতে বুরুশ নিয়ে কানের কাছে তুলে ধরে মাথা নিচু করে যখন ফের বুরুশ চালাবে তখন মনে হবে বেহালার ডাকসাইটে কলাবৎ সমে পৌঁছবার পূর্বে যেন দ'য়ে মজে গিয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছেন। তখন কথা বলার প্রশ্নই ওঠে না, 'সাবাস' বললেও ওস্তাদ তেড়ে আসবেন।

সর্বশেষে মোলায়েম সিল্ক দিয়ে অতি যত্নের সঙ্গে সর্বাঙ্গ বুলিয়ে দেবে, মনে হবে দীর্ঘ অদর্শনের পরে প্রেমিক যেন প্রিয়ার চোখে মুখে কপালে চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

প্রথম দিন আমি আপন অজানাতে বলে ফেলেছিলুম 'সাবাস'।

একটি আট ন' বছরের মেয়েকে তারই সামনে আমরা একদিন কয়েকজন মিলে অনেকক্ষণ ধরে তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছিলুম—সে চুপ করে শুনে যাচ্ছিল। যখন সকলের বলা কওয়া শেষ হল তখন সে শুধু আস্তে আস্তে বলেছিল, 'তবু তো আজ তেল মাখিনি।'

আবদুর রহমানের মুখে ঠিক সেই ভাব।

গোড়ার দিকে প্রায়ই ভেবেছি ওকে বলি যে সে ঘরে বসে থাকলে আমার অস্বস্তি বোধ হয়, কিন্তু প্রতিবারেই তার স্বচ্ছন্দ সরল ব্যবহার দেখে আটকে গিয়েছি। শেষটায় স্থির করলুম, ফার্সীতে যখন বলেছে এই দুনিয়া মাত্র কয়েকদিনের মুসাফিরী ছাড়া আর কিছুই নয় তখন আমার ঘরে আর সরাইয়ের মধ্যে তফাত কোথায়? এবং আফগান সরাই যখন সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতায় প্যারিসকেও হার মানায় তখন কমরেড আবদুর রহমানকে এঘর থেকে ঠেকিয়ে রাখি কোন্ হকের জোরে? বিশেষতঃ সে যখন আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বাদামের খোসা ছাড়াতে পারে, তবে আমিই বা তার সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে রাশান ব্যাকরণ মুখস্থ করতে পারব না কেন?

আবদুর রহমান ফরিয়াদ করে বলল, আমি যে মুইন-উস্-সুলতানের সঙ্গে টেনিস খেলা কমিয়ে দিয়ে রাশান রাজদূতাবাসে খেলতে আরম্ভ করেছি সেটা ভালো কথা নয়।

আমি তাকে বুঝিয়ে বললুম যে, মুইন-উস্-সুলতানের কোর্টে টেনিসের বল যে রকম শক্ত, এক মুইন-উস্-সুলতানেকে বাদ দিলে আর সকলের হৃদয়ও সে

রকম শক্ত—রাশান রাজদূতাবাসের বল যে রকম নরম, হৃদয়ও সে রকম নরম।

আবদুর রহমান ফিসফিস করে বলল, 'আপনি জানেন না হুজুর, ওরা সব 'বেদীন, বেমজহব'।' অর্থাৎ ওদের সব কিছু 'ন দেবায়, ন ধর্মায়'।

আমি ধমক দিয়ে বললুম, 'তোমাকে ওসব বাজে কথা কে বলেছে?'

সে বলল, 'সবাই জানে, হুজুর; ওদেশে মেয়েদের পর্যন্ত হায়া-শরম নেই, বিয়ে-শাদী পর্যন্ত উঠে গিয়েছে।'

আমি বললুম, 'তাই যদি হবে তবে বাদশা আমান উল্লা তাদের এদেশে ডেকে এনেছেন কেন?' ভাবলুম এই যুক্তিটাই তার মনে দাগ কাটবে সব চেয়ে বেশী।

আবদুর রহমান বলল, 'বাদশা আমান উল্লা তো—।' বলে থেমে গিয়ে চুপ করে রইল।

পরদিন টেনিস খেলার দু'সেটের ফাঁকে দেমিদফকে জানালুম, প্রলেতারিয়া আবদুর রহমান ইউ. এস. এস. আর. সম্বন্ধে কি মতামত পোষণ করে। দেমিদফ বললেন, 'আফগানিস্থান সম্বন্ধে আমরা বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নই। তবে তুর্কীস্থান অঞ্চলে আমাদের একটু আস্তে আস্তে এগোতে হচ্ছে বলে আমাদের চিন্তাপদ্ধতি কর্মধারা একটু অতিরিক্ত ঘোলাটে হয়ে আফগানিস্থানে পৌঁচচ্ছে। আমরা উপর থেকে তুর্কীস্থানের কাঁধে জোর করে নানা রকম সংস্কার চাপাতে চাইনে; আমরা চাই তুর্কীস্থান যেন নিজের থেকে আপন মঙ্গলের পথ বেছে নিয়ে বাকি রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।'

দেমিদফের স্ত্রী বললেন, 'বুখারার আমীর আর তার সাঙ্গোপাঙ্গ শোষক-সম্প্রদায় বলশেভিক রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যহারা হয়ে পালিয়ে এসে এখানে বাসা বেঁধেছে। তারা যে নানা রকম প্রোপাগাণ্ডা চালাতে কসুর করছে না, তা তো জানেনই।'

আমি কম্যুনিজমের কিছুই জানিনে, কিন্তু এঁদের কথা বলার ধরন, অবিশ্বাসী এবং অজ্ঞের প্রতি সহিষ্ণুতা, আপন আদর্শে দৃঢ়-বিশ্বাস আমাকে সত্যই মুগ্ধ করল।

কিন্তু সবচেয়ে মুগ্ধ করল রাজদূতাবাসের ভিতর এঁদের সামাজিক জীবন। অন্যান্য রাজদূতাবাসে বড়কর্তা, মেজকর্তা ও ভদ্রেতরজনে তফাত যেন গৌরীশঙ্কর, দুমকা পাহাড় আর উইয়ের ঢিপিতে। এখানে যে কোনো তফাত নেই, সে কথা বলার উদ্দেশ্য আমার নয়, কিন্তু সে পার্থক্য কখনো রূঢ় কর্কশরূপে আমার চোখে ধরা দেয়নি।

কত অপরাহ্ণ, কত সন্ধ্যা কাটিয়েছি দেমিদফের বসবার ঘরে। তখন এখেসির

কত লোক এখানে এসেছেন, পাপিরসি টেনেছেন, গল্প-গুজব করেছেন। তাঁদের কেউ সেক্রেটারি, কেউ ডাক্তার, কেউ কেরানী, কেউ আফগান এয়ার ফোর্সের পাইলট—দেমিদফ স্বয়ং রাজদূতাবাসের কোষাধ্যক্ষ। সকলেই সমান খাতির-যত্ন পেয়েছেন; জিজ্ঞেস না করে জানবার কোনো উপায় ছিল না যে, কে সেক্রেটারি আর কে কেরানী।

খোদ অ্যামবেসডর অর্থাৎ রুশ রাষ্ট্রপতির নিজস্ব প্রতিভূ তাভারিশ স্ট্রেঙ পর্যন্ত সেখানে আসতেন। প্রথম দর্শনে তো আমি বগদানফ সায়েবের তালিম মত খুব নিচু হয়ে ঝুঁকে শেকহ্যাণ্ড করে বললুম, 'I am honoured to meet Your Excellency!' কিন্তু আমার চোস্ত ভদ্রতায় একসেলেন্সি কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে আমাকে জোরে হাত ঝাঁকুনি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতখানা তলোয়ারের মত এমনি ধারা চালালেন যে, আমার সমস্ত 'ভদ্রস্থতা' যেন দু'টুকরো হয়ে কার্পেটে লুটিয়ে পড়ল।

মাদাম দেমিদফ বললেন, 'ইনি রুশ সাহিত্যের দরদী।'

কোনো ইংরেজ বড়কর্তা হলে বলতেন, 'রিয়েলি? হাউ ইণ্টারেস্টিঙ!' তারপর আবহাওয়ার কথাবার্তা পাড়তেন।

স্ট্রেঙ বললেন, 'তাই নাকি, তা হলে বসুন আমার পাশে, আপনার সঙ্গে সাহিত্যালোচনা হবে।' আর সকলে তখন আপন আপন গল্পে ফিরে গিয়েছেন। স্ট্রেঙ প্রথমেই অসঙ্কোচে গোটাকয়েক চোখা চোখা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আমার বিদ্যের চৌহদ্দি জরিপ করে নিলেন, তারপর পুশকিনের গীতিকাব্য-রস আমাকে মূল থেকে আবৃত্তি করে শোনাতে লাগলেন। যে অংশ বেছে নিলেন সে-ও ভারী মরমিয়া। ওনিয়েগিন সংসারে নানা দুঃখ, নানা আঘাত পেয়ে তাঁর প্রথমা প্রিয়ার কাছে ফিরে এসে প্রেম নিবেদন করছেন; উত্তরে প্রিয়া প্রথম যৌবনের নষ্ট দিবসের কথা ভেবে বলছেন, 'ওনিয়েগিন, হে আমার বন্ধু, আমি তখন তরুণী ছিলুম, হয়ত সুন্দরীও ছিলুম—'

আমাদের দেশের রাধা যে রকম একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন, 'দেখা হইল না রে শ্যাম, আমার এই নতুন বয়সের কালে'।

আমি তন্ময় হয়ে শুনলুম। আবৃত্তি শেষ হলে ভাবলুম, বরঞ্চ একদিন শুনতে পাব স্বয়ং চার্চিল হেদোর পারে লঙ্কা-ঠাসা চীনেবাদাম খেয়ে সশব্দে ডাইনে-বাঁয়ে নাক ঝাড়ছেন, কিন্তু মহামান্য বৃটিশ রাজদূত প্রথমদর্শনে অভ্যাগতকে কীটসের 'ইসাবেলা' শোনাচ্ছেন, এ যেন 'বানরে সঙ্গীত গায়, শিলা জলে ভাসি যায়, দেখিলেও না করো প্রত্যয়'।

ব্রিটিশ রাজদূতকে হামেশাই দেখেছি স্ট্রাইপ্ট ট্রাউজার আর স্প্যাট-পরা। ভাবগতিক দেখে মনে হয়েছে যেন স্বয়ং পঞ্চম জর্জের মামাতো ভাই। নিতান্ত দৈবদুর্বিপাকে এক দুশমনের পুরীতে বড় অনিচ্ছায় কাল কাটাচ্ছেন। 'কীটস কে, অথবা কারা?—পিছনে যখন বহুবচনের 'এস্' রয়েছে? পাসপোর্ট চায় নাকি? বলে দাও, ওসব হবে-টবে না।'

এমন কি, ফরাসী রাজদূতকেও কখনো বগদানফের ঘরে আসতে দেখিনি। বেনওয়া তাঁর কথা উঠলেই বলতেন, 'কার কথা বলছেন? মিনিস্টার অব দি ফ্রেঞ্চ নিগেশন ইন মাবুল—'

'মাবুল' অর্থ অভিধানে লেখে, Loony, off his nut!

স্ট্রেঙ বললেন, 'তিনি রাজদূতাবাসের সাহিত্যসভাতে চেখফ সম্বন্ধে একখানা প্রবন্ধ পাঠ করেছেন। শুনে তো আমার চোখের তারা ছিটকে পড়ার উপক্রম। আরেকটা লিগেশনের কথা জানি, সেখানে চড়ুই পাখি শিকার সম্বন্ধে প্রবন্ধ চললেও চলতে পারে, কিন্তু চেখফ, বাই গ্যাড্, স্যার!'

আমি বললুম, 'রাশান শেখা হলে আপনার প্রবন্ধটি অনুবাদ করার বাসনা রাখি।'

স্ট্রেঙ বললেন, 'বিলক্ষণ! আপনাকে একটা কপি পাঠিয়ে দেব। কোনো স্বত্ব সংরক্ষিত নয়।'

আমরা যতক্ষণ কথা বলছিলুম আর পাঁচজন তখন বড়কর্তার মুখের কথা লুফে নেবার জন্য চতুর্দিকে ঝুলে থাকেননি। ছোট্ট ছোট্ট দল পাকিয়ে সবাই আপন আপন গল্প নিয়ে মশগুল ছিলেন। আর সকলে কি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, ঠিক ঠিক বলতে পারিনে, তবে একটা কথা নিশ্চয় জানি যে, তাঁরা ড্রইংরুমে বসে চাকরের মাইনে, ধোপার গাফিলি আর মাখনের অভাব নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা চালাতে পারেন না!

নিতান্ত ছোট জাত! আর শুধু কি তাই; এমনি বজ্জাত যে, সে কথাটা ঢাকবার পর্যন্ত চেষ্টা করে না!

সাধে কি আর ইংরেজের সঙ্গে এদের মুখ-দেখা পর্যন্ত বন্ধ!

ইংরেজ তখন মস্কো-বাগে দুরবীন লাগিয়ে স্তালিন আর ত্রৎস্কি দলের মোষের লড়াই দেখছে, আর দিন গুনছে ইউ. এস. এস. আর.-এর তেরটা বাজবে কখন।

এ সব হচ্ছে ১৯২৭ সালের কথা।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

চাচা কাহিনী

প্রথম খণ্ড

স্বয়ংবরা

বার্লিনের বড় রাস্তা কুরফুর্স্টেন্‌-ডাম্‌ যেখানে উলাণ্ড-স্ট্রাসের সঙ্গে মিশেছে সেখান থেকে উলাণ্ড-স্ট্রাসে উজিয়ে দু-তিনখানা বাড়ি ছাড়ার পরই "Hindusthan Haus" অর্থাৎ "Hindusthan House" অর্থাৎ "ভারতীয় ভবন"। আসলে রেস্তোরাঁ, দা-ঠাকুরের হোটেল বললেই ঠিক হয়। জর্মনি শূয়ারের দেশ, অর্থাৎ জর্মনির প্রধান খাদ্য শূকর মাংস, হিন্দুস্থান হাউসে সে-মাংসের প্রবেশ নিষেধ। সেই যে তার প্রধান গুণ তা নয়, তার আসল গুণ, সেখানে ভাত ডাল মাছ তরকারি মিষ্টি খেতে পাওয়া যায় আর যেদিন ঢাকার ফণি গুপ্ত বা চাটগাঁর আব্দুল্লা মিয়া রসুইয়ের ভার নিতেন সেদিন আমাদের পোয়াবারো কিন্তু উলাণ্ড-স্ট্রাসেতে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে যেত। জর্মনিতে লাল লঙ্কার রেওয়াজ নেই ('পাপ্রিকা' নামক যে লাল আবীর লঙ্কার পদ পেতে চায় তার স্বাদ আবীরেরই মত), কাজেই হিন্দুস্থান হৌসে লঙ্কা-ফোঁড়ন চড়লে তার চতুর্দিকে সিকি মাইল জুড়ে হাঁচি-কাশি ঘণ্টা খানেক ধরে চলত। পাড়াপড়শীরা নাকি দু-চারবার পুলিশে খবর দিয়েছিল কিন্তু জর্মন পুলিশ তদারক-তদন্ত করতে হলে খবর দিয়ে আসত বলে আমরা সেদিনকার মত লঙ্কার হাঁড়িটা 'ডয়েটশে বাঙ্কে' জমা দিয়ে আসতুম। শুনেছি শেষটায় নাকি প্রতিবেশীদের কেউ কেউ লঙ্কা-ফোঁড়ন চড়লে গ্যাস-মাস্ক্‌ পরত। জর্মনি বৈজ্ঞানিকদের দেশ।

ঢুকেই রেস্তোরাঁ। গোটা আষ্টেক ছোট ছোট টেবিল। এক একটা টেবিলে চারজন লোক খেতে পারে। একপাশে লম্বা কাউণ্টার, তার পিছনে হয় ফণি নয় আব্দুল্লা লটবুচটর্‌ করত, অর্থাৎ অচেনা খদ্দের ঢুকলে তার সামনে ব্যস্ত-সমস্ততার ভান করত। কাউণ্টারের পাশ দিয়ে ঢুকে পিছনে রান্নাঘর। রেস্তোরাঁর যে দিকে কাউণ্টার তার আড়াআড়ি ঘরের অন্য কোণে কয়েকখানা আরাম কেদারা আর চৌকি কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। এ কুণ্ডলীর চক্রবর্তী চাচা, উজীর-নাজীর গুটি ছয় বাঙালী।

অবাঙালীরা আমাদের আড্ডায় সাধারণতঃ যোগ দিত না। তার জন্য দায়ী চাচা। তিনি কথা বলতেন বাঙলায়, আর অবাঙালী থাকলে জর্মনে। এবং সে এমনি তুখোড় জর্মন যে তার রস উপভোগ করবার মত ক্ষমতা খুব কম ভারতীয়েরই ছিল। ফলে অবাঙালীরা দুদিনের ভিতরই ছিটকে পড়ত। বাঙালীরা জানত যে তারা খসে পড়লেই চাচা ফের বাঙলায় ফিরে আসবেন; তাই তারা

তাঁর কট্‌মটে জর্মন দুদণ্ডের মত বরদাস্ত করে নিত।

জব্বলপুরের ঔপনিবেশিক বাঙালী শ্রীধর মুখুয্যে তাই নিয়ে একদিন ফরিয়াদ করে বলেছিল, 'বাঙালী বড্ড বেশী প্রাদেশিক। আর পাঁচজন ভারতবাসীর সঙ্গে মিলে মিশে তারা ভারতীয় নেশন গড়ে তুলতে চায় না।'

চাচা বলেছিলেন, 'প্রাদেশিক নয়, বাঙালী বড্ড বেশী নেশনাল। বাঙলাদেশ প্রদেশ নয়, বাঙলা-দেশ দেশ। ভারতবর্ষের আর সব প্রদেশ সত্যকার প্রদেশ। তাদের এক একজনের আয়তন, লোকসংখ্যা, সংস্কৃতি এত কম যে পাঁচটা প্রদেশের সঙ্গে জড়াজড়ি করে তারা যদি 'ইণ্ডিয়ান নেশন, ইণ্ডিয়ান নেশন' বলে চেল্লাচেল্লি না করে তবে দুনিয়ার সামনে তারা মুখ দেখাতে পারে না। এই বার্লিন শহরেই দেখ; আমরা জন চল্লিশ ভারতীয় এখানে আছি। তার অর্ধেকের বেশী বাঙালী। মারাঠি, গুজরাতি কটা এক হাতের এক আঙুল, জোর দু আঙুলে গোনা যায়। ত্রিশটা লোক যদি বিদেশের কোনো জায়গায় বসবাস করে তবে অন্ততঃ তার পাঁচটা এক জায়গায় জড় হয়ে আড্ডা দেবে না? মারাঠি, গুজরাতিরা আড্ডা দেবার জন্য লোক পাবে কোথায়?'

আড্ডার পয়লা নম্বরের আড্ডাবাজ পুলিন সরকার বলল, 'লোক বেশী হ'লেও তারা আর যা করে করুক আড্ডা দিতে পারত না। আড্ডা জমাবার বুনিয়াদ হচ্ছে চণ্ডীমণ্ডপ, কাছারি-বাড়ি, টঙ্গি-ঘর, বৈঠকখানা—এককথায় জমিদারী প্রথা।'

চাচা জিজ্ঞেস করলেন, 'তাই বুঝি তুই কলেজ পালিয়ে আড্ডা মারিস? তোদের জমিদারীর সদর-খাজনা কত রে?'

সরকার বলল, 'কানাকড়িও না। জমিদারী গেছে, আড্ডাটি বাঁচিয়ে রেখেছি। আমার ঠাকুরদাকে এক সায়েব আদালতে জিজ্ঞেস করেছিল তাঁর ব্যবসা কি? বুড়ো বলেছিলো "সেলিং"।'

মুখুয্যে জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে?'

'তার মানে, তিনি জমিদারী বিক্রি করে করে জীবনটা কাটিয়েছেন। তাই বাবাকে কোনো সদর-খাজনা দিতে হয় নি।'

হিন্দুস্থান হৌসে মদ বিক্রি হত না। কিন্তু বিয়ার বারণ ছিল না। সূর্য রায় বেশীর ভাগ সময়ই বিয়ারে গলা ডুবিয়ে চোখ বন্ধ করে নাক দিয়ে ধুঁয়ো ছাড়তেন। চাচার পরেই জ্ঞানগম্যিতে তাঁর প্রাধান্য আড্ডায় ছিল বেশী। চাচার জর্মনজ্ঞান ছিল পাণ্ডিত্যের জ্ঞান, আর রায়ের জ্ঞান ছিল বহুমুখী। বার্লিনের মত শহরের বুকের উপর বসে তিনি কাগজে জর্মন কলাম লিখে পয়সা কামাতেন: ফোনে কথা শুনে শব্দতাত্ত্বিক হের মেনজেরাট্ পর্যন্ত ধরতে পারেনি যে জর্মন

রায়ের মাতৃভাষা নয়।

চোখবন্ধ রেখেই বললেন, 'হক কথা কয়েছ সরকার। সবই বিক্রি, সব বেচে ফেলতে হয়। খাই তো দু ফোঁটা বিয়ার কিন্তু বিক্রি করে দিতে হয়েছে বেবাক লিভারখানা।'

আড্ডার সবচেয়ে চ্যাংড়া ছিল গোলাম মৌলা। রায়ের 'প্রতেজে' বা 'দেশের ছেলে'। সে সব সময় ভয়ে ভয়ে মরত পাছে রায় বিয়ারে বানচাল হয়ে যান। চুপে চুপে বলল, 'মামা, বাড়ি চলুন।'

রায় চোখ মেললেন। একদম সাদা। বললেন, 'তুই বুঝি ভয় পেয়েছিস আমি মাতাল হয়ে গিয়েছি। ইশ্ বিন্ ইন্ মাইনেম্ নরমালেন্‌ৎস্টান্ট, ডাস্ হাইস্ট, আইন বিস্‌শেন্ ব্লাউ। আমি আমার সাধারণ (নর্মাল) অবস্থায় আছি, অর্থাৎ ঈষৎ নীল।' তার মানে মনে একটু রঙ লেগেছে, এবং ঐ রঙ লাগানো অবস্থাই ছিল তাঁর নর্মাল অবস্থা। মদ্যসংক্রান্ত বিষয় রায় কখনো বাংলায় বলতেন না। তাঁর মতে বাংলায় তার কোনো পরিভাষা নেই। 'পান্তা ভাতে কাঁচা লঙ্কা চটকে এক সানক গিলে এলুম' যেমন জর্মনে বলা যায় না, তেমনি মদ্যসংক্রান্ত ব্লাও (নীল), বেসফেন্ (টে-টম্বুর), ফল্ (সম্পূর্ণ), বেট্রুঙ্কেন (ডুবে-মরা) কথার বাংলা করলেও বাংলা হয় না।

চাচা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার এবনরমাল অবস্থাটা দেখবার বাসনা আমার মাঝে মাঝে হয়।'

রায় আঁৎকে উঠে বললেন, 'ষাট্, ষাট্। আমি মরব, আপনিও মরবেন। গেল সাত বছরে একদিন এক ঘণ্টার তরে বিয়ার না খেয়ে আমি এবনরমাল অবস্থায় ছিলুম। গিয়েছিলুম ফেরবেল্লিনার প্লাৎসের মসজিদে—ঈদের পরবে।* মদ খেয়ে মসজিদে যাওয়ার সাহস ওমর খাইয়ামেরও ছিল না, আমি তো নস্তি।' বলে ওস্তাদরা যে রকম মিয়া (তানসেন) কী তোড়ী গাইবার সময় কানে হাত ছোঁয়ান সেইরকম কান মলা খেয়ে নিলেন। বললেন,

'ফল? ফেরার পথে মিস জমিতফকে বিয়ের কথা দিয়ে ফেলেছি। এবনরমাল—'

কিন্তু তারপর রায় কি বলেছিলেন, সে কথা শোনে কে? রায়ের পক্ষে খুন করা অসম্ভব নয়, অবস্থাভেদে গাঁটও হয়ত তিনি কাটতে পারেন কিন্তু তিনি যে একদিন বিয়ের ফাঁদে পা দেবেন এত বড় অসম্ভব অবস্থার কল্পনা আমরা কোনো

---

* ফেরবেল্লিনার প্লাৎসের মসজিদে ঈদ-পর্ব উপলক্ষে বার্লিনের আরব, ইরানী, ভারতীয় সব মুসলমান জড় হয়। অমুসলমানের মধ্যে প্রধানতঃ রায় বাঙালী হিন্দু।

দিন করতে পারি নি। স্বয়ং হিণ্ডেনবুর্গ যদি তখন গোঁফ কামিয়ে আমাদের আড্ডায় এসে উপস্থিত হতেন তাহলেও আমরা এতদূর আশ্চর্য হতুম না।

রায় তখন লড়াইয়ে-জেতা বীরের গর্জনে হুঙ্কার দিয়ে বলেছেন,

'দেখতে চান আমার এবনরমাল অবস্থা আরো দু-চারবার? সরকারী লাইব্রেরী পোড়ানো, আইনস্টাইনকে খুন, কিছুই বাদ যাবে না। তবু যদি—'

চাচা বললেন, 'বড় ভাবিয়ে তুললে হে রায় সাহেব।'

আমরা তখন সবাই কলরব করে রায়কে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কেউ বলছে, 'এমন সুন্দরী সহজে জোটে না', কেউ বলছে, 'ম্যাথম্যাটিক্স্ যা জানে', কেউ বা বলে, 'কী মিষ্টি স্বভাব।'

সরকার বলল, 'ওহে গোলাম মৌলা, রাধা কেষ্টর কে হয় জানো?'

চাচা বললেন, 'বড় ভাবিয়ে তুললে হে রায় সাহেব।'

দু' দুবার চাচা যে কেন 'ভাবিত' হলেন আমরা ঠিক ধরতে পারলুম না। রায় যে বিয়ে করতে যাচ্ছেন তা নিয়ে আশ্চর্য হওয়া যেতে পারে কিন্তু তাতে দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত হওয়ার কি আছে?

চাচার সবচেয়ে ন্যাওটা ভক্ত গোঁসাই বলল, 'আপনি তো বিয়ে করেন নি, কখনো এন্‌গেজ্‌ডও হন নি। তাই আপনার ভয়, ভাবনা—'

চাচা বললেন, 'আমার ফাঁসি হয় নি সত্যি, কিন্তু তাই বলে আসামী হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াইনি তুই কি করে জানলি?'

ঠেলাঠেলির ভিতর বাসের হ্যাণ্ডেল ধরতে পেলে মানুষ যে রকম ঝুলে পড়ে, রায় ঠিক তেমনি চাচার জবানবন্দির হ্যাণ্ডেল পেয়ে বললেন, 'উকিলের নাম বলুন চাচা, যে আপনায় বাঁচালে।'

রায়ের বিয়ের খবর শুনে আমরা আশ্চর্য হয়েছিলুম কিন্তু স্তম্ভিত হই নি। কারণ রায় স্ত্রীজাতিকে অতি সন্তর্পণে দূরে ঠেলে রাখতেন, তাই শেষ পর্যন্ত ধরা দিলেন। কিন্তু চাচা এ সব বাবদে স্ত্রীপুরুষে কোনো তফাৎ রাখতেন না। বার্লিনের মেয়ে মহলে তিনি ছিলেন বেসরকারী পাদ্রী। বরঞ্চ পাদ্রীদের সম্বন্ধে ফষ্টিনষ্টির কাহিনী মাঝে মাঝে শোনা যায় কিন্তু চাচার হৃদয় জয় করতে যাবে কে? সে-হৃদয় তিনি বহু পূর্বেই আত্মজনের মাঝে ভাগ বাঁটোয়ারা করে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। অতো হিস্যেদারের সম্পত্তি নিলামে উঠলেও তো কেউ কেনে না। আমরা সবাই করুণ নয়নে চাচার দিকে তাকালুম, তিনি যেন কাহিনীটা চেপে না যান।

চাচা বললেন, 'ওরকম ধারা তাকাচ্ছিস কেন? তোরা কাউকে চিনবি নে।

১৯১৯-এর কথা। আমি তখন সবে বার্লিনে এসেছি। বয়স আঠারো পেরয় নি ; মাকুন্দ বলে বিনা রেডে গোঁফ কামাতুম—ল্যাণ্ডলেডি যাতে ঘর গোছাবার সময় ক্ষেউরির জিনিসপত্র না দেখে ভাবে আমি নিতান্ত চ্যাংড়া। তার থেকেই বুঝতে পারছিস আমি কতটা অজ পাড়াগেঁয়ে, আনাড়ি ছিলুম। এক গাদা ভারতীয়ও ছিল না যে আমাকে সলা-পরামর্শ দিয়ে ওয়াকিফহাল করে তুলবে। যে দু-চারজন ছিলেন তাঁরা তখন আপন আপন ধান্দায় মশগুল—জর্মনির তখন বড দুর্দিন।

ভাগ্যিস দু-চারটে গুঁত্তাগাঁত্তা খাওয়ার পরই হিম্মৎ সিংয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল!

সাইনবোর্ডে গেট্রেঙ্কে (পানীয়) শব্দ দেখে আমি বিয়ারখানায় ঢুকে দুধ চেয়ে বসেছি। কি করে জানবো বল পানীয়গুলো রূঢ়ার্থে বিয়ার ব্রাণ্ডি বোঝায়। ওয়েট্রেসগুলো পাঁজরে হাত দিয়ে দু ভাঁজ হয়ে এমনি খিল্ খিল্ করে হাসছিল যে শব্দ শুনে হিম্মৎ সিং রাস্তা থেকে তাড়িখানার ভিতরে তাকালেন। আমার চেহারা দেখে তাঁর দয়ার উদয় হয়েছিল—তোদের মত পাষণ্ডগুলোরও হ'ত। গটগট করে ঘরে ঢুকলেন। আমার পাশে বসে ওয়েট্রেসকে বললেন, 'এক লিটার বিয়ার, বিটে (প্লীজ)!'

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিহার নহী পিতে?'

আমি মাথা নাড়িয়ে বললুম, 'না।'

'ওয়াইন?'

ভের মাথা নাড়ালুম।

'কিসি কিস্‌মকী শরাব?'

আমি বললুম যে আমি দুধের অর্ডার দিয়েছি।

দাড়ি-গোঁপের ভিতর যেন সামান্য একটু হাসির আভাস দেখতে পেলুম। বললেন, 'অব সমঝা।' তারপর আমাকে বসে থাকতে আদেশ দিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন এক গেলাস দুধ হাতে নিয়ে। সমস্ত বিয়ার-খানার লোক যে অবাক হয়ে তার কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করেছে সেদিকে কণামাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। তারপর, সেই যে বসলেন গেঁট হয়ে, আর আরম্ভ করলেন জালা জালা বিয়ার-পান। সে-পান দেখলে গোলাম মৌলা আর কক্‌খনো রায়ের পানকে ভয় করবে না।

শিখের বাচ্চা, রক্তে তার তিন পুরুষ ধরে আগুন-মার্কা ধেনো, আর মোলায়েমের মধ্যে নির্জলা হুইস্কি ; বিয়ার তাঁর কি করতে পারে?

লিটার আষ্টেক খেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পয়সা দিয়ে বেরোবার সময়ও কোনো দিকে একবারের তরে তাকালেন না। আমি কিন্তু বুঝলুম, বিয়ার-খানার হাসি ততক্ষণে শুকিয়ে গিয়েছে। সবাই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে হিম্মৎ সিংয়ের দিকে তাকাচ্ছে, আর ফিস্‌ফিস্ প্রশংসাধ্বনি বেরুচ্ছে।

বাইরে এসে শুধু বললেন, 'অব ইনলোগোঁকো পতা চল্ গিয়া কি হিন্দুস্থানী শরাব ভী পি সক্তা।'

তারপর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমাকে একখানা চেয়ারে বসালেন। নিজে খাটে শুলেন। কান পেতে আমার দুঃখ-বেদনার কাহিনী শুনলেন। তারপর বাড়ির কর্ত্রী ফ্রাউ (মিসেস) রুবেন্‌সের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। মহিলাটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের বিধবা। খানদানী ঘরের মেয়ে এবং হিম্মৎ সিংয়ের সঙ্গে যে ভাবে কথা কইলেন তার থেকে বুঝলুম যে হিম্মৎ সিং সে-বাড়িতে রাজ-পুত্রের খাতির-যত্ন পাচ্ছেন।

তারপর এক মাসের ভিতর তিনি বার্লিন শহরের কত সব হোমরাচোমরা পরিবারের সঙ্গে আমায় আলাপ করিয়ে দিলেন এতদিন পর সে-সব পরিবারের বেশীর ভাগের নামও আমার মনে নেই। কূটনৈতিক সমাজ, খানদানী গোষ্ঠী, অধ্যাপক মণ্ডলী, ফৌজী আড্ডা সর্বত্রই হিম্মৎ সিংয়ের অবাধ গতায়াত ছিল। হিম্মৎ সিং এককালে ভারতীয় ফৌজের বড়দরের অফিসার ছিলেন। ১৯১৪-১৮-এর যুদ্ধে বন্দী হয়ে জর্মনিতে থাকার সময় তিনি জর্মনদের যুদ্ধপরামর্শদাতা ছিলেন। এবং সেই সূত্রে বার্লিনের সকল সমাজের দ্বার তাঁর জন্য খুলে যায়। হিম্মৎ সিং আমাকে কখনো তাঁর জীবনী সবিস্তারে বলেন নি, কাজেই জর্মনরা কেন যে ১৯১৭-১৮ সালে তাঁকে মস্কো যেতে দিয়েছিল ঠিক জানিনে। সেখান থেকে কেন যে আবার ১৯১৯ সালে বার্লিন ফিরে এলেন তাও জানিনে। তবে তাঁকে বহুবার রুশ-পলাতক হোমরাচোমরাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করতে দেখেছি। সে-সব রুশদের কাছ থেকে একথাও শুনেছি যে হিম্মৎ সিং মস্কোতে যে খাতির যত্ন পেয়েছিলেন তার সঙ্গে তাঁর বার্লিনের প্রতিপত্তিরও তুলনা হয় না। কম্যুনিস্ট বড়কর্তাদের সঙ্গে মতের মিল না হওয়াতে তিনি নাকি মস্কো ত্যাগ করেন। আশ্চর্য নয়, কারণ হিম্মৎ সিংয়ের মত জেদী আর একরোখা লোক আমি আমার জীবনে দুটি দেখি নি।

আর আমায় লাই যা দিয়েছিলেন। ভালোমন্দ কিছুমাত্র বিবেচনা না করে আমাকে যেখানে খুশী সেখানে নিয়ে যেতেন, আমি বেজার হয়ে বসে রইলে রাই-স্টাক্ ভাড়া করে নাচের বন্দোবস্ত করবার তালে লেগে যেতেন। আমার সর্দি

হলে বার্লিন মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালকে ডেকে পাঠাতেন, শরীর ভালো থাকলে নিজের হাতে কাবাব রুটি বানিয়ে খাওয়াতেন।

তিন মাস ধরে কেউ কখনো সুখ-স্বপ্ন দেখেছে? ফ্রয়েড নাকি বলেন, স্বপ্নের পরমায়ু মাত্র দু-তিন মিনিট। এ তত্ত্বটা জেনেও মনকে কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পারলুম না, যে-দিন হিম্মৎ সিং হঠাৎ কিছু না বলে কয়ে নিরুদ্দেশ হলেন। ফ্রাউ রুবেন্‌সও কিছুই জানেন না, বললেন, যে-স্যুট পরে বেরিয়েছিলেন তাই নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। কয়েকদিন পরে মার্সেলস থেকে চিঠি, তাঁর জিনিসপত্র ভিখিরি-আতুরকে বিলিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে।

বহু বৎসর পরে জানতে পেরেছিলুম, আন্‌হাল্‌টার স্টেশনে তাঁর এক প্রাচীন রাজনৈতিক দুশমনকে হঠাৎ আবিষ্কার করতে পেয়ে তাকে ধরবার জন্য পিছু নিয়ে তিনি একবস্ত্রে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন।

হিম্মৎ সিংয়ের সঙ্গে আর কখনো দেখা হয় নি। তাঁর কাছ থেকে কোনো দিন কোনো চিঠিও পাই নি।

তারপর আরো তিন মাস কেটে গিয়েছে। বার্লিনে যে সমাজে আমাকে চড়িয়ে দিয়ে হিম্মৎ সিং মই নিয়ে চলে গিয়েছিলেন সেখান থেকে আমি লাফ দিয়ে নামতে গিয়ে জখমও হলুম।

এমন সময় ফ্রাউ রুবেন্‌স একদিন টেলিফোন করে অনুরোধ জানালেন আমি যেন তাঁর সঙ্গে ক্যোনিক কাফেতে বেলা পাঁচটায় দেখা করি। বিশেষ প্রয়োজন। হিম্মৎ সিং চলে যাওয়ার পর ফ্রাউ রুবেন্‌সের সঙ্গে আমার মাত্র একদিন দেখা হয়েছিল। টেলিফোনে মাঝে মাঝে হিম্মৎ সিংয়ের খবর নিয়েছি—যদিও জানতুম তাতে কোনো ফল হবে না—কিন্তু ও-বাড়িতে যাবার মত মনের জোর আমার ছিল না। গোঁসাইয়ের মত লুকিয়ে লুকিয়ে বার্লিনে শরৎ চাটুয্যের উপন্যাস পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতুম না বটে, কিন্তু বাঙালী তো বটি।

পাঁচটার সময় কাফে ক্যোনিকে গিয়ে দেখি কাফের গভীরতম আর নির্জনতম কোণে ফ্রাউ রুবেন্‌স বসে, আর তাঁর পাশে—একঝলক যা দেখতে পেলুম—এক বিপজ্জনক সুন্দরী।

ফ্রাউ রুবেন্‌স পরিচয় দিয়ে নাম বললেন, "ফ্রলাইন ভেরা গিব্রিয়াডফ"।

লেডি-কিলার অর্থাৎ নটবর পুলিন সরকার জিজ্ঞেস করল, 'বিপজ্জনক সুন্দরী বলতে কি বোঝাতে চাইলেন আমার ঠিক অনুমান হল না। বার্লিনের আর পাঁচজনের জন্য বিপজ্জনক না আপনার নিজের ধর্মরক্ষায় বিপজ্জনক?'

চাচা বললেন, 'আমার এবং আর পাঁচজনের জন্য বিপজ্জনক। তোর কথা বলতে পারিনে। তুই তো বার্লিনের সব বিপদ, সব ভয় জয় করতে উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিস।'

শ্রীধর মুখুয্যে আবৃত্তি করল,

"মাইন হের্ৎস্ ইস্ট বি আইন বীনেন হাউস
ডী মেডেলস সিণ্ট ডী বীনেন—
হৃদয় আমার মধুচক্রের সম
মেয়েগুলো যেন মৌমাছিদের মত
কত আসে যায় কে রাখে হিসাব বল
ঠেকাতে, তাড়াতে মন মোর নয় রত।"

রায় বললেন, 'কী মুশকিল! এরা যে আবার কবিত্ব আরম্ভ করল।'

চাচা বললেন, 'ফ্রাউ রুবেন্স ফ্রলাইন ভেরার পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বিশেষ করে জোর দিয়ে বললেন যে হিম্মৎ সিং যখন মস্কোতে ছিলেন তখন বসবাস করেছিলেন গিব্রিয়াডফদের সঙ্গে। আমি তখন ভেরার দিকে তাকাতে তিনিও ভালো করে তাকালেন।

ছ'মাস ধরে প্রতিদিন যে লোকটির কথা উঠতে বসতে মনে পড়েছে তিনি এঁদের বাড়িতে ছিলেন, এই মেয়েটির চোখে তার ছায়া কত শত বার পড়েছে, আমি আমার অজানাতে তাঁর চোখে যেন হিম্মৎ সিংয়ের ছবি দেখতে পাবার আশা করে ভালো করে তাকালুম।

হিম্মৎ সিংয়ের ছবি দেখতে পাই নি, কিন্তু ভেরার চোখ থেকে বুঝতে পারলুম হিম্মৎ সিং আমার জীবনের কতখানি জায়গা দখল করে বসে আছেন সে-কথা ভেরাও জানেন। তাঁর চোখে আমার জন্য সহানুভূতি টলটল করছিল।

ফ্রাউ রুবেন্স বললেন, 'আপনি হিম্মৎ সিংকে অত্যন্ত ভালোবাসেন।'

এর উত্তর দেবার আমি প্রয়োজন বোধ করলুম না।

ফ্রাউ রুবেন্স তখন বললেন, 'আপনাকে একটি বিশেষ অনুরোধ করার জন্য আমরা দু'জন আজ আপনাকে ডেকেছি। হিম্মৎ সিং আজ বার্লিনে নেই—যেখানেই হোন্ ভগবান তাঁকে কুশলে রাখুন—আমি ধরে নিচ্ছি তিনি যেন এখন আমাদের মাঝখানেই বসে আছেন। তাই আপনাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করছি, আজ যদি হিম্মৎ সিংয়ের কোনো প্রিয় কাজ করতে আপনাকে অনুরোধ করি আপনি সেটা করবার চেষ্টা করবেন কি?'

আমি বললুম, 'আপনার মনে কি সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ আছে?'

ফ্রাউ রুবেন্‌স তখন বললেন, 'আমার মনে নেই। ফ্রলাইন ভেরার জন্য শুধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করছিলুম।' ভেরা মাথা নাড়িয়ে বোঝালেন, তাঁরও কোনো প্রয়োজন ছিল না। ফ্রাউ রুবেন্‌স বললেন, 'ভেরা অত্যন্ত বিপদে পড়ে মস্কো থেকে বার্লিন পালিয়ে এসেছেন। রাজনৈতিক দলাদলিতে ধরা পড়ে তাঁর বাপ মা, দু'ভাই সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয়েছেন। এক ভাই তখন অডেসায় ছিলেন। তিনি কোনো গতিকে প্যারিসে পৌঁচেছেন। ভেরা যদি তাঁর ভাইয়ের কাছে পৌঁছে যেতে পারেন তবে তাঁর বিপদের শেষ হয়। কিন্তু তাঁর কাছে রাশান পাসপোর্ট তো নেইই, অন্য কোনো পাসপোর্টও তিনি যোগাড় করতে পারেন নি। জর্মন পাসপোর্ট পেলেও কোনো বিশেষ লাভ নেই ; কারণ জর্মনদের ফ্রান্সে ঢুকতে দিচ্ছে না। তবে সেটা যোগাড় করতে পারলে তিনি অন্ততঃ কিছুদিন বার্লিনে থাকতে পারতেন। এখন অবস্থা এই যে বার্লিন পুলিশ খবর পেলে ভেরাকে জেলে পুরবে। রাশাতেও ফেরৎ পাঠাতে পারে।'

আমরা সবাই একসঙ্গে আঁৎকে উঠলুম!

চাচা বললেন, 'এতদিন পরও ঘটনাটা শুনে তোরা আঁৎকে উঠছিস। আমি শুনেছিলুম ফ্রলাইন ভেরার সামনাসামনি। আমার অবস্থাটা ভেবে দেখ।'

ফ্রাউ রুবেন্‌স বললেন, 'এখন কি করা যায় বলুন?'

হিম্মৎ সিংয়ের কথা মনে পড়ল। আমাদের কাছে যে বাধা হিমালয়ের মত উঁচু হয়ে দেখা দিয়েছে, তিনি তার উপর দিয়ে স্কেটিং করে চলে যেতেন। পাস-পোর্ট যোগাড় করার চেয়ে দেশলাই কেনা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল—শিখধর্মের 'সিগরেট নিষেধ' তিনি মানতেন।

ফ্রাউ রুবেন্‌স বললেন, 'ভেরার জন্য পাসপোর্ট যোগাড় করা তাঁর পক্ষেও কঠিন, হয়ত অসম্ভব হত। কিন্তু একথাও জানি যে শেষ পর্যন্ত তিনি একটা পথ বের করতেনই করতেন।'

এ বিষয়ে আমার মনেও কোনো সন্দেহ ছিল না।

ফ্রাউ রুবেন্‌স অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ফ্রলাইন ভেরাকে বিয়ে করতে আপনার কোনো আপত্তি আছে কি?'

ধর্মত বলছি, আমি ভাবলুম, ফ্রাউ রুবেন্‌স রসিকতা করছেন। সব দেশেরই আপন আপন বিদঘুটে রসিকতা থাকে, তাই এক এক ভাষার রসিকতা অন্য ভাষায় অনুবাদ করা যায় না। হয়ত জর্মন রসিকতাটির ঠিক রস ধরতে পারি নি ভেবে ক্যাবলার মত আমি তখন একটুখানি 'হে হে' করেছিলুম।

ফ্রাউ রুবেন্‌স আমার কাষ্ঠরসময় 'হে হে'-তে বিচলিত না হয়ে বললেন,

'নিতান্ত দলিলসংক্রান্ত বিয়ে। আপনি যদি ফ্রলাইন ভেরাকে বিয়ে করেন তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় অর্থাৎ ব্রিটিশ ন্যাশানালিটি পেয়ে যাবেন এবং অনায়াসে প্যারিস যেতে পারবেন। মাস তিনেক পর আপনি ভেরার বিরুদ্ধে ডেজারশনের (পতিবর্জনের) মোকদ্দমা এনে ডিভোর্স (তালাক) পেয়ে যাবেন।' তারপর একটু কেশে বললেন, 'আপনাকে স্বামীর কোনো কর্তব্যই সমাধান করতে হবে না।' একটুখানি থেমে বললেন, 'খাওয়ানো পরানো, কিছুই না।'

লজ্জায় আমার কান লাল হয়ে গিয়েছিল, না ভয়ে আমার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, না আশ্চর্য হয়ে আমার চুল খাড়া হয়ে গিয়েছিল আজ এতদিন বাদে বলতে পারব না। এমন কি ক্যাবলাকান্তের মত 'হে হে' করাও তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

রায়ের বিয়ার ফুরিয়ে গিয়েছে বলে কথা বলার ফুর্সৎ পেলেন, বললেন, 'বিলক্ষণ! আমারও সেই অবস্থা হয়েছে।'

চাচা বললেন, 'ছাই হয়েছে, হাতী হয়েছে। আমার বিপদের সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না। সব কথা পয়লা শুনে নাও, তারপর যা খুশি বলো।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ফ্রাউ রুবেন্‌স যা বললেন তার থেকে বুঝতে পারলুম যে তিনি ভাত ঠাণ্ডা হতে দেন না, তার উপরই গরম ঘি ছাড়েন। বললেন, 'আমার দৃঢ় প্রত্যয়, হিম্মৎ সিংকে এ পথটা দেখিয়ে দিতে হত না। তিনি দু'মিনিটের ভিতর সব কিছু ফিক্‌স্‌ উণ্ড ফেতিস (পাকা পোক্ত) করে দিতেন।'

চাচা বললেন, 'ইয়োরোপে cold blooded খুন হয়, ভারতবর্ষে কোল্ড-ব্লাডেড্‌ বিয়ে হয়। এবং দুটোই ভেবে-চিন্তে, প্ল্যান মাফিক, প্রিমেডিটেটেড্‌ কিন্তু এখানে আমাকে অনুরোধ করা হচ্ছিল কোল্ড-ব্লাডেড্‌ বিয়ে করতে কিন্তু না ভেবে-চিন্তে, অর্থাৎ রোমান্টিক কায়দায়। প্রথম দর্শনে প্রেম হয় শুনেছি, কিন্তু প্রথম দর্শনেই বিয়ে, এরকমধারা ব্যাপার আমি ইয়োরোপে দেখিও নি, শুনিও নি। অবশ্য আমার এ সব তাবৎ ব্যাপারে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু বলির পাঁঠা আমি হতে যাব কেন?

অপরূপ সুন্দরী; দেখে চিত্তচাঞ্চল্য হয়েছিল অস্বীকার করব না কিন্তু বিয়ে—!'

ফ্রাউ রুবেন্‌স গম্ভীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কি কোনো আপত্তি আছে?'

আমি চুপ।

তখন ফ্রাউ রুবেন্‌স এমন একখানা অস্ত্র ছাড়লেন যাতে আমার আর কোনো পথ খোলা রইল না। বললেন, 'আপনি কি সত্যি হিম্মৎ সিংকে ভালোবাসতেন ?'

চাচা বললেন, 'অন্য যে-কোনো অবস্থায় হলে আমি ফ্রাউ রুবেন্‌সকে একটা ঠিক উত্তর দেবার চেষ্টা করতুম কিন্তু তখন কোনো উত্তরই দিতে পারলুম না। তোরা জানিস আমি স্নেহ-প্রেম-দয়ামায়াকে বুদ্ধিবৃত্তি-আত্মজয়ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশী দাম দি। কাজেই ফ্রাউ রুবেন্‌সের আঘাতটা আমার কতখানি বেজেছিল তার খানিকটে অনুমান তোরা করতে পারবি। কোনো চোখা উত্তর যে দিই নি তার কারণ, ততখানি চোখা জর্মন আমি তখন জানতুম না।

ঘড়েল মাস্টারগুলো জানে যে ছাত্র যখন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না, তখন তাকে ভালো করে নির্যাতন করার উপায় হচ্ছে চুপ করে উত্তরের প্রতীক্ষা করা। ফ্রাউ রুবেন্‌স সেটা চরমে পৌঁছিয়ে দিয়ে পরে বললেন, 'আপনি তা হলে হিম্মৎ সিংয়ের ঋণ শোধ করতে চান না ?'

রায়ের বিয়ার এসে গিয়েছে। চুমুক দিয়ে বললেন, 'চাচা মাপ করুন। আপনার কেস্ অনেক বেশী মারাত্মক।'

চাচা রায়ের কথায় কান না দিয়ে বললেন, 'সেই বে-ইজ্জতিরও যখন আমি কোনো উত্তর দিলুম না তখন ফ্রলাইন গিব্রিয়াডফ হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। কুণ্ডুলী-পাকানো গোখরো সাপকে আমি এরকমধারা হঠাৎ খাড়া হতে দেখেছি। গিব্রিয়াডফের মুখ লাল, কালো চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে, সে আগুনের আঁচ ব্লণ্ড চুলে লেগে চুলও যেন লাল হয়ে গিয়েছে।'

ফ্রাউ রুবেন্‌স তাঁকে বললেন, 'আপনি শান্ত হোন। বারন ফন্ ফাক্লেনডর্ফ যখন আপনাকে বিয়ে করার জন্য পায়ের তলায় বসেন, তখন এর প্রত্যাখ্যানে অপমান বোধ করছেন কেন ?'

ভেরা বসে পড়লেন।

আমি তখন দিগ্বিদিকশূন্য। অতিকষ্টে বললুম, 'আমাকে দুদিন সময় দিন।'

ফ্রাউ রুবেন্‌স কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, ভেরা বাধা দিয়ে বললেন, 'সেই ভালো।' দু'জনাই উঠে দাঁড়ালেন ; ফ্রাউ রুবেন্‌স বললেন, 'পরশু দিন পাঁচটায় তাহলে এখানে আবার দেখা হবে।'

হ্যাণ্ডশেক না করেই দু'জনা বেরিয়ে গেলেন। ফ্রাউ রুবেন্‌স কাঁচা রেল লাইনের উপর বিরাট এঞ্জিনের মত হেলেদুলে গেলেন, আর ভেরার চেয়ার ছেড়ে ওঠা আর চলে যাওয়ার ধরন দেখে মনে হল যেন টব ছেড়ে রজনীগন্ধাটি হঠাৎ

দু'খানা পা বের করে ঘরের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলে গেল। সর্বাঙ্গে হিল্লোল, কিন্তু মাথাটি স্থির, নিষ্কম্প প্রদীপ-শিখার মতো। যেন রাজপুত মেয়ে কলসী-মাথায় চলে গেল। ক্যোনিক কাফের আন্তর্জাতিক খদ্দের-গোষ্ঠী সে-চলন মুগ্ধ নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখল।'

লেডি-কিলার সরকার বলল, 'মাইরি চাচা, আপনার সৌন্দর্যবোধ আর কবিত্বশক্তি দুইই আছে। অমনতরো বিপাকের মধ্যিখানে আপনি সবকিছু লক্ষ্য করলেন।'

চাচা বললেন, 'কবিত্বশক্তি না ষাঁড়ের গোবর। আমি লক্ষ্য করেছিলুম জ্বরের ঘোরে মানুষ যে রকম শেতলপাটির ফুলের পেটার্ন মুখস্থ করে সেই রকম।'

তারপরে দুদিন আমার কি করে কেটেছিল সে-কথা আর বুঝিয়ে বলতে পারব না। এক রকম হাবা হয় দেখেছিস, মুখে যা দেওয়া গেল তাই পড়ে পড়ে চিবোয় আর চিবোয়,—বলে দিলেও গিলতে পারে না। আমি ঠিক তেমনি দুদিন ধরে একটি কথার দুটো দিক মনে মনে কত লক্ষবার যে চিবিয়েছিলুম বলতে পারব না। হিম্মৎ সিংয়ের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার একমাত্র পন্থা যদি ফ্রলাইন ভেরাকে বিয়ে করাই হয় তবে আমি সে কর্তব্য এড়াই কি করে—আর চেনা নেই, পরিচয় নেই, একটা মেয়েকে হুশ্ করে বিয়ে করিই বা কি প্রকারে? সমস্যাটা চিবুচ্ছি আর চিবুচ্ছি, গিলে ফেলে ভালো মন্দ যাই হোক, একটা সমাধান যে করব সে ক্ষমতা যেন সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিলুম।

মুরুব্বি নেই, বন্ধু নেই, সলা-পরামর্শ করিই বা কার সঙ্গে। হিম্মৎ সিং যাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন তাদের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা জন্মাবার কথা নয়, নিজের থেকেও কোনো বন্ধু জোটাতে পারি নি কারণ আমার জর্মন তখনো গল্প জমাবার মত মিশ্রির দানা বাঁধে নি। যাই কোথায়, করি কি?

য়ুনিভার্সিটির কাছে একটা দুধের দোকানে বসে মাথায় হাত দিয়ে ভাবছি—আমার মেয়াদের তখন আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা বাকি—এমন সময় জুতোর শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি সামনে ফ্রলাইন ক্লারা ফন্ ব্রাখেল। বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ-শাস্ত্রের ছাত্রী, বার্লিনের মেয়েদের হকি টিমের কাপ্তান। ছ'ফুটের মত লম্বা; হঠাৎ রাস্তায় দেখলে মনে হত মাইকেল এঞ্জেলোর মার্বেল মূর্তি স্কার্ট-ব্লাউজ পরে বেড়াতে বেরিয়েছে। আমার সঙ্গে সামান্য আলাপ ছিল।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে আপনার?'

মাথা নাড়িয়ে জানালুম কিচ্ছু হয় নি।

ধমক দিয়ে বললেন, 'আলবৎ হয়েছে। খুলে বলুন।'

বয়সে আমার চেয়ে ছয় বছরের বড় হয় কি না হয় ; কথার রকম দেখে মনে হয় যেন জ্যাঠাইমা। বললুম, 'বলছি, কিছুই হয় নি।'

ফন্ ব্রাখেল আমার পাশে বসলেন। আমার কোটের আস্তিনে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'বলুনই না কি হয়েছে।'

তখন চেখফের একটা গল্প মনে পড়ল। এক বুড়ো গাড়োয়ান তার ছেলে মরে যাওয়ার দুঃখের কাহিনী কাউকে বলতে না পেয়ে শেষটায় নিজের ঘোড়াকে বলেছিল। ঘোড়ার সঙ্গে ফন্ ব্রাখেলের অন্তত একটা মিল ছিল। হকিতে তাঁর ছুট যেমন তেমন ঘোড়ার চেয়ে কম ছিল না। আমি তখন মরিয়া। ভাবলুম, দুগ্‌গা বলে ঝুলে পড়ি।

সমস্ত কাহিনী শুনে ফন্ ব্রাখেল পাঁচটি মিনিট ধরে ঠাঠা করে হাসলেন। হাসির ফাঁকে ফাঁকে কখনো বলেন, 'ডু লীবার হের গট্' (হে মা কালী), কখনো বলেন, 'বী ক্যোস্‌ট্‌লিষ্' (কি মজার ব্যাপার), কখনো বলেন, 'লাখেন ডি গ্যোটার' (দেবতারা শুনলে হাসবেন)।

আমি বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালুম। ফন্ ব্রাখেল আমার কাঁধে দিলেন এক গুঁত্তা। ঝপ্ করে ফের বসে পড়লুম। বললেন, 'ডু ক্লাইনের ইডিয়ট্ (হাবাগঙ্গারাম), এখ্‌খুনি তোমার ফোন করে বলে দেওয়া উচিত, তোমার দ্বারা ওসব হবে-টবে না।'

আমি বললুম, 'হিম্মৎ সিং থাকলে যা করতেন, আমার তাই করা উচিত।'

ফন্ ব্রাখেল বললেন, 'ঈসপের গল্প পড়নি। ব্যাঙ ফুলে ফুলে হাতী হবার চেষ্টা করেছিল। হিম্মৎ সিংয়ের পক্ষে যা সরল তোমার পক্ষে তা অসম্ভব। তাঁকে আমি বেশ ভালো করেই চিনি—হকি খেলায় তিনি আমাদের তালিম দিতেন। তাঁর দাড়ি গোঁফ নিয়ে তিনি পঁচিশখানা বিয়ে করতে পারতেন, দুটো হারেম পুষতে পারতেন। পারো তুমি ?'

আমি বললুম, 'গিব্রিয়াডফ বড় বিপদে পড়েছেন। আমার তো কর্তব্যজ্ঞান আছে।'

ফন্ ব্রাখেল বললেন, 'যে মেয়ে মস্কো থেকে পালিয়ে বার্লিন আসতে পারে, তার পক্ষে বার্লিন থেকে প্যারিস যাওয়া ছেলে-খেলা। রুশ সীমান্তের পুলিশের হাতে থাকে মেশিনগান, জর্মন সীমান্তের পুলিশের হাতে রবরের ডাণ্ডা।'

আমি যতই যুক্তিতর্ক উত্থাপন করি তিনি ততই হাসেন আর এমন চোখা চোখা উত্তর দেন যে আমার তাতে রাগ চড়ে যায়। শেষটায় বললুম, 'আপনি পুরুষ হলে বুঝতে পারতেন, যুক্তিতর্কের উপরেও পুরুষের কর্তব্যজ্ঞান নামক ধর্মবুদ্ধি থাকে।'

ফন্ ব্রাখেল গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি যে পুরুষ তাতে আর কি সন্দেহ। সোজা বলে ফেল না কেন সুন্দরী দেখে সেই পুরুষের চিত্তচাঞ্চল্য হয়েছে।'

আমি আর ধৈর্যধারণ করতে পারলুম না। বেরবার সময় শুনতে পেলুম, ফন্ ব্রাখেল বলছেন, 'বিয়ের কেক্ শ্যাম্পেন অর্ডার দিয়ো না কিন্তু। বিয়ে হবে না।'

একেই তো আমার দুর্ভাবনার কূলকিনারা ছিল না, তার উপর ফন্ ব্রাখেলের ব্যঙ্গ। মনটা একেবারে তেতো হয়ে গেল। শরৎ চাটুয্যের নায়করাই শুধু যত্র-তত্র 'দিদি' পেয়ে যায়, আমার কপালে ঢুঢু।

সোজা বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়লুম। অন্ধকারে শিস দিয়ে মানুষ যেরকম ভূতের ভয় কাটায় আমি তেমনি হিম্মৎ সিংয়ের প্রিয় দোহাটি আবৃত্তি করতে লাগলুম ;—

"এহসান নাখুদাকা উঠায় মেরী বলা
কিস্তি খুদা পর ছোড় দুঁ লঙ্গরকো তোড় দুঁ।"

'মাঝি আমায় সব বিপদ-আপদ থেকে বাঁচাবে এই আমার ভরসা? নৌকো খুদার নামে ভাসালুম, নোঙ্গর ভেঙে ফেলে দিয়েছি।'

পরদিন পাঁচটার সময় কাফে ক্যোনিকে গিয়ে বসলুম। জানা ছিল, ফাঁসীর পূর্বে খুনীকে সাহস দেবার জন্য মদ খাইয়ে দেওয়া হয়। হিম্মৎ সিং আমাকে কখনো মদ খেতে দেন নি। ভাবলুম তাঁর ফাঁসীতে যখন চড়ছি তখন খেতে আর আপত্তি কি?'

গোলাম মৌলা অবাক হয়ে শুধাল, 'মদ খেলেন?'

চাচা বললেন, 'কেনা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খাওয়া হয় নি।'

সোয়া পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা, ছ'টা বাজল। ফ্রাউ রুবেন্স, ফ্রলাইন গিব্রিয়াডফ কারো দেখা নেই। এর অর্থ কি? জর্মনরা তো কখনো এরকম লেট্ হয় না। নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। যাই হয়ে থাকুক না কেন, আমি পালাই।

বাড়ি ফিরে ভয়ে ভয়ে ল্যাণ্ডলেডিকে জিজ্ঞেস করলুম, ফ্রাউ রুবেন্স ফোন করেছিলেন কি না? না। আমার উচিত তখন ফোন করা, অনুসন্ধান করা, কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নি তো; কিন্তু চেপে গেলুম। নোঙ্গর যখন ভেঙে ফেলে দিয়েছি তখন আমি হালই বা ধরতে যাব কেন?

সাতদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছিলুম। রাত্রে শুতে যাবার সময় একবার ল্যাণ্ডলেডিকে চিঁচিঁ করে জিজ্ঞেস করতুম, কোনো ফোন ছিল কি

না? ল্যাণ্ডলেডি নিশ্চয় ভেবেছিল আমি কারো প্রেমে পড়েছি। প্রেমের দ্বিতীয় অঙ্কে নাকি মানুষ এরকম করে থাকে।

কোনো ফোনও না।

করে করে তিন মাস কেটে গেল; আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কাজকর্মে মন দিলুম।

নটে গাছটি মুড়িয়ে দিয়ে চাচা চেয়ারে হেলান দিলেন।

ভোজের শেষে সন্দেশ-মিষ্টি না দিলে বরযাত্রীদের যে রকম হন্যে হয়ে ওঠার কথা আমরা ঠিক সেইরকম একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম। মুখুয্যে বলল, 'কিন্তু ওনারা সব এলেন না কেন, তার তো কোনো হদীস পাওয়া গেল না।'

সরকার বলল, 'আপনার শেষ রক্ষা হল বটে, কিন্তু গল্পটির শেষ রক্ষা হল না।'

রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন, 'নোঙ্গর-ভাঙা নৌকোতে আমাকে ফেলে আপনি কেটে পড়লেন চাচা? আমার উদ্ধারের উপায় বলুন।'

চাচা বললেন, 'মাস তিনেক পরে দস্তানা কিনতে গিয়েছি 'তীৎসে'। জর্মনদের হাতের তুলনায় আমাদের হাত ছোট বলে লেডিজ ডিপার্টমেণ্টে আমাদের দস্তানা কিনতে হয়। সেখানে ফন্ ব্রাখেলের সঙ্গে দেখা। কানে কানে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হে পুরুষ-পুঙ্গব, এখানে কেন? নিজের জন্য দস্তানা কিনছ না বউয়ের জন্য? কিন্তু বউ কোথায়?' আমি উষ্মাভরে গটগট করে চলে যাচ্ছিলুম,—ফন্ ব্রাখেল আমার হাতটি চেপে ধরলেন—'বুলি'র সময় হকিস্টিক যে রকম চেপে ধরেন।

সেই কাফে ক্যোনিকেই নিয়ে বসালেন।

বললেন, 'আমি সে দিন পাঁচটার সময় কাফের উপরের গ্যালারিতে বসে তোমাকে লক্ষ্য করছিলুম।'

আমি তো অবাক।

বললেন, 'ওরা কেউ এল না বলে তোমার সঙ্গে কথা না বলে চলে গেলুম। কিন্তু তারা এল না কেন জান? তবে শোনো। তোমার মত মূর্খকে বাঁচানো আমার কর্তব্য মনে করে আমি তাদের সঙ্গে লড়েছিলুম। হিম্মৎ সিং আমার বন্ধু, আমার পিতারও বন্ধু। তাঁর প্রতি এবং তাঁর 'প্রতেজে', তোমার প্রতি আমারও কর্তব্য আছে।

'তোমার কাছ থেকে সব কথা শুনে আমি সোজা চলে যাই ফ্রাউ রুবেন্সের ওখানে। তাঁকে রাজী করাই আমাকে গিব্রিয়াডফের ওখানে নিয়ে যাবার জন্য। সময় অল্প ছিল বলে, এবং ইচ্ছে করেই ফোন করে যাই নি। গিয়ে দেখি সেখানে

একপাল ষাঁড়ের সঙ্গে সুন্দরী শ্যাম্পেন খাচ্ছেন, হৈহল্লা চলছে। ফাউ রুবেন্‌সের চক্ষুস্থির। তিনি গিব্রিয়াডফ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্য ধারণা করেছিলেন—ইংরেজিতে যাকে বলে ডেমজেল্ ইন্ ডিস্‌ট্রেস্ (বিপন্না)। সে কথা থাক্—আমি দু'জনকে সামনে বসিয়ে পষ্টাপষ্টি বললুম যে তোমাতে আমাতে প্রেম, বিয়ে স্থির—আমি অন্য কোনো মেয়ের নোন্‌সেন্স সহ্য করব না।'

আমি বললুম, 'একি পাগলামি! আপনি এসব মিথ্যে কথা বলতে গেলেন কেন?'

ফন্ ব্রাখেল বললেন, 'চুপ করে শোনো। আমি বাজে বকা পছন্দ করিনে। এ ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। গিব্রিয়াডফ কিন্তু কামড় ছাড়ে না—আমি তখন ভয় দেখিয়ে বললুম যে, আমি পুলিশে খবর দেব তার পাসপোর্ট নেই, আর পাসপোর্ট যোগাড়ের জন্য তোমাকে মেকি বিয়ে করছে। আমি অবশ্য সমস্তক্ষণ ভান করছিলুম যে আমি তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি—তোমার মত অজমূর্খের। প্রেমে হাবুডুবু, শুনলে মুরগীগুলো পর্যন্ত হেসে উঠবে!—আর তোমাকে বিয়ে করার জন্য এম'ন হন্যে হয়ে আছি যে, পুলিশ লেলানো, খুনখারাবী সব কিছুই করতে প্রস্তুত।

'গিব্রিয়াডফ হার মানলেন। ফ্রাউ রুবেন্‌স ততক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। গিব্রিয়াডফ যে তাঁকে কতদূর বোকা বানিয়েছে বুঝতে পেরে বড় লজ্জা পেলেন। বাড়ি ফেরার পথে গিব্রিয়াডফ তাঁর সঙ্গে কি করে বন্ধুত্ব জমিয়েছিল সে-ব্যাপার আগাগোড়া খুলে বললেন। তখন আরো অনুসন্ধান করে জানলুম, মস্কোতে এ গিব্রিয়াডফের বাড়িতে হিম্মৎ সিং কখনো বসবাস করেন নি—এরা ওঁদের দূর সম্পর্কে আত্মীয় মাত্র।'

চাচা বললেন, 'ফন্ ব্রাখেল উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আমার তাড়া আছে, হকি ম্যাচে চললুম।' '

আমি বললুম, 'কিন্তু একটা কথার উত্তর দিন। গিব্রিয়াডফ বিয়ের জন্য আমাকেই বাছলেন কেন? বারন ফন্ ফাক্লেনডর্ফের মত বর তো ছিল।'

ফন্ ব্রাখেল বললেন, 'লীবার ইডিয়ট (প্রিয় মূর্খ), গিব্রিয়াডফ তো বর খুঁজছিল না, খুঁজছিল শিখণ্ডী। ফাক্লেনডর্ফ বা অন্য কাউকে বিয়ে করলে সে-স্বামী তার হক্ চাইত না? তা হলে পঁচিশটে ষাঁড়ের সঙ্গে দিবারাত্তির শ্যাম্পেন চলত কি করে? ফাক্লেনডর্ফ প্রাশান মোষ। নীটশের উপদেশে বিশ্বাস করে—স্ত্রীলোকের কাছে যেতে হলে চাবুকটি নিয়ে যেতে ভুলো না—হল? বুঝলে হে নরর্ষভ?'

চাচা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'জীবনে এরকম বোকা বনিনি, অপমানিত

বোধ করিনি। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা গিলে ফেলা ছাড়া আর কোনো গতি ছিল না।'

গোলাম মৌলা বলল, 'একটা বাজতে তিন মিনিট। শেষ ট্রেন একটা দশে।'

আমরা হন্তদন্ত হয়ে ছুট দিলুম সাভিগ্নিপ্লাৎস স্টেশনের দিকে। রায় চেঁচিয়ে বললেন, 'চাচা, ফন্ ব্রাখেলের ঠিকানা কি?'

চাচাও তখন তার গলাবন্ধ কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে ছুট দিয়েছেন। বললেন, 'সে-বিয়ারে ছাই। তোমার ফিয়াঁসে শ্রীমতী জমিতফের সঙ্গে ফন্ ব্রাখেলের গলাগলি। তাই তো বলেছিলুম, বড় ভাবিয়ে তুলেছ।'

কর্ণেল

কুরফুর্স্টেন্-ডাম্ বার্লিন শহরের বুকের উপরকার যজ্ঞোপবীত বললে কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হয় না। ওরকম নৈকষ্য-কুলীন রাস্তা বার্লিনে কেন, ইয়োরোপেই কম পাওয়া যায়। চাচার মেহেরবানীতে 'হিন্দুস্থান হৌস' যখন গুলজার তখন কিন্তু বার্লিনের বড় দুরবস্থা; ১৯১৪-১৮-এর শ্মশান ফেরতা বার্লিন ১৯২৯-এও পৈতে উল্টো কাঁধে পরছে, এবং তাই গরীব ভারতীয়দের পক্ষেও সম্ভবপর হয়েছিল কুরফুর্স্টেন্-ডামের গা ঘেঁষে উলাণ্ডস্ট্রাসের উপর আপন রেস্তোরাঁ 'হিন্দুস্থান হৌস' পত্তন করার।

বহু জর্মন অজর্মন 'হিন্দুস্থান হৌসে' আসত। জর্মনরা আসত নূতনত্বের সন্ধানে —কলকাতার লোক যে রকম 'চাইনীজ' বা 'আমজদিয়ায়' খেতে যায়। ভারতীয়েরা নিয়ে আসত জর্মন, অজর্মন বান্ধবীদের—মাছ-ভাত বা ডাল-রুটির স্বাদ বাৎলাবার জন্য, আর বুলগেরিয়ান, রুমানিয়ান, হাঙ্গেরিয়ানরা আসত জর্মনদের সঙ্গে নিয়ে, তাদের কাছে সপ্রমাণ করার জন্য যে তাদের আপন আপন দেশের রান্না ভারতীয় রান্নার চেয়ে ভালো। কিন্তু ভারতীয় রান্না এমনি উচ্চশ্রেণীর সত্তা যে তার সঙ্গে শুধু ভগবানের তুলনা করা যেতে পারে। ভগবানের অস্তিত্ব যে রকম প্রমাণ করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না, ভারতীয় রান্নাও জর্মনদের কাছে ঠিক তেমনিতর প্রমাণ বা বাতিল কিছুই করা যায় না। কারণ ভারতীয় রান্নার বর্ণনাতে আছে :—

তিন্তিড়ী পলাণ্ডু লঙ্কা সঙ্গে সযতনে
উচ্ছে আর ইক্ষুগুড় করি বিড়ম্বিত
অপূর্ব ব্যঞ্জন, মরি, রান্ধিয়া সুমতি
প্র-পঞ্চ-ফোড়ন দিলা মহা আড়ম্বরে।

এবং সে গ্রাম্যারী রান্না কেন, মামুলী রান্নায় সামান্যতম মশলা দিলেও জর্মনরা সে-খাদ্য গলাধঃকরণ করতে পারে না। আর মশলা না দিলে আমাদের ঝোল হয়ে যায় আইরিশ স্টু, ডাল হয় লেন্টিল স্যুপ, তরকারি হয় বয়েল্ড ভেজ, মাছভাজা হয় ফ্রাইড্ ফিশ্। আমাদের চতুর্বর্ণ তখন শুধু বর্ণ নয়, রস-গন্ধ-স্বাদ সব কিছু হারিয়ে একই বিস্বাদের আসনে বসেন বলে চণ্ডালের মত হয়ে যান। কাজেই আমাদের রান্না জর্মনদের কাছে এখনো ভগবানেরই ন্যায় সিদ্ধাসিদ্ধ কিছু নন। দাবাখেলায় এই অবস্থাকেই বলে চালমাত।

তবে হাঁ, আমাদের ছানার সন্দেশ ছিল কাণ্টের কাটেগরিশে ইম্পেরাটিফের মত অলঙ্ঘ্য ধর্ম। তার সামনে জর্মন অজর্মন সকলেই মাথা নিচু করতেন। ছানা-তত্ত্বে অবাঙালীর অবদান অনায়াসে অবহেলা করা যেতে পারে।

'হিন্দুস্থান হৌসে'র সবচেয়ে বড় আড়কাঠি ছিলেন চাচা। হিণ্ডেনবুর্গের গোঁপের পরেই বার্লিনের সবচেয়ে পরিচিত বস্তু ছিল চাচার বেশ—তার সঙ্গে 'ভূষা' শব্দ জুড়লে চাচার প্রতি অন্যায় করা হবে। সে বেশ ছিল সম্পূর্ণ বাহুল্য বর্জিত।

কারখানার চোঙার মত গোলগাল পাতলুন, গলা-বন্ধ হাঁটু-জোকা কোট আর ভারী-ভারী এক জোড়া মিলিটারি বুট। লোকে সন্দেহ করত, তাঁর কোটের তলায় কামিজ-কুর্তা নাকি নেই। তবে এ-কথা ঠিক কোট, পাতলুন, বুট ছাড়া অন্য কোনো তৃতীয় আবরণ বা আভরণ তাঁর শ্যামাঙ্গে কেউ কখনো বিরাজ করতে দেখে নি। বার্লিনের মত পাথর-ফাটা শীতেও তিনি কখনো হ্যাট, টুপি, ওভারকোট বা দস্তানা পরেন নি। খুব সম্ভব শীতের প্রকোপেই তাঁর মাথার ঘন বাবরী চুল পাতলা হয়ে আসছিল কিন্তু চাচা সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

সেই অপরূপ পাতলুন, গণ্ডারের চামড়ার মত পুরু গলাবন্ধ কোট, আর একমাথা বাবরী নিয়ে চাচা হঠাৎ থমকে দাঁড়াতেন কুরফুর্স্টেন্-ডামের ফুটপাতে। পেছনের দিকে মাথা ঠেলে, উপরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন উড়ন্ত মেঘের পানে। কেন, কে জানে? হয়ত বিদেশের অচেনা-অজানা দালান-কোঠা, রাস্তা-ঘাটের মাঝখানে একমাত্র আকাশ আর মেঘই তাঁকে দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিত। দেশ ছেড়েছেন বহুকাল হল, কবে ফিরবেন জিজ্ঞাসা করলে হাঁ, না, কিছু কবুল না করে কলকাতার উড়িষ্যাবাসীদের মত শুধু বলতেন 'ললাটঙ্ক লিখন'।

বার্লিনের লোক শহরের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে মেঘের দিকে তাকিয়ে কাব্যি করে না। দু'মিনিট যেতে না যেতেই চাচার চতুর্দিকে ভিড় জমে যেত। তাঁর অদ্ভুত বেশ, বাবরী চুল, ঘনশ্যাম দেহরুচি আর বেপরোয়া ভাব লক্ষ্য না করে থাকবার যো ছিল না।

ফিসফিস শুনেই চাচার ঘুম ভাঙত। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে 'বাও' করে একটু মৃদু হাসির মেহেরবানী দেখাতেন। ভিড় তখন ফাঁক হয়ে রাস্তা করে দিত। চাচা আবার 'বাও' করে 'হিন্দুস্থান হৌস' রওয়ানা দিতেন। কেউ 'গুটেন মর্গেন' (সুপ্রভাত) ধরনের কিছু বললে বা পরিচয় করবার চেষ্টা দেখালে চাচা গলাবন্ধ কোটের ভিতর হাত চালিয়ে তাঁর একখানা ভিজিটিং কার্ড বের করে এগিয়ে ধরে ফের 'বাও' করতেন—যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী নবাব কাউকে ডুয়েলে আহ্বান করছেন। সে-কার্ডে চাচার ঠিকানা থাকত 'হিন্দুস্থান হৌসে'র। জর্মনরা চালাক ; বুঝত, চাচা রাস্তার মাঝখানে নীরব কাব্য করেন বলে কথা বলতে চান না। কাজেই তারা চাচার আড্ডায় এসে উপস্থিত হত।

মেঘ দেখবার জন্য অন্য জায়গা এবং অন্য কায়দা থাকতে পারে কিন্তু 'হিন্দুস্থান হৌসে'র রান্নার খুশবাই ছড়াবার জন্য এর চেয়ে ভালো গ্যোবেল্‌স্‌ আর কি হতে পারে ?

শ্রীধর মুখুয্যে বলছিল, 'সংস্কৃতের নূতন ছোকরা প্রফেসর এসেছে য়ুনিভার্সিটিতে। পড়াচ্ছে গীতা। আজ সকালে প্রথম অধ্যায় পড়াবার সময় বলল, 'কুলক্ষয়-ফুলক্ষয় সব আবোল-তাবোল কথা। বর্ণসঙ্কর না হলে কোনো জাতের উন্নতি হয় না।' তার থেকে আবার প্রমাণ করার চেষ্টা করল যে গীতার প্রথম অধ্যায়টা গুপ্তযুগে লেখা। বর্ণসঙ্করের জুজু নাকি বৌদ্ধ যুগের পূর্বে ছিল না।'

চাচা বললেন, 'কি করে বর্ণসঙ্কর হয়, আর তার ফল কি, সেটা প্রথম অধ্যায়ে বেশ ধাপে ধাপে বাৎলানো হয়েছে না রে ? বল তো, ধাপগুলো কি ?'

শ্রীধর খাবি খাচ্ছে দেখে আড্ডার পয়লা নম্বরের আড্ডাবাজ পুলিন সরকার বলল, 'কুলক্ষয় থেকে কুলধর্মনষ্ট, কুলধর্মনষ্ট থেকে অধর্ম, অধর্ম থেকে স্ত্রীলোকদের ভিতর নষ্টামি, নষ্টামি থেকে বর্ণসঙ্কর হলে পিতৃপুরুষের পিণ্ডলোপ—'

মুখুয্যে বাধা দিয়ে বলল, 'হাঁ, হাঁ, প্রফেসর বলছিল, "পিণ্ডির পরোয়া করে কোন সুস্থবুদ্ধির লোক" ?'

বিয়ারের ভিতর থেকে সুধ্যি রায়ের গলা বুদ্‌বুদের মত বেরলো, 'ছোকরা প্রফেসর ঠিক বলেছে। বর্ণসঙ্কর ভালো জিনিস। মুখুয্যে বামুনের ছেলে, এদিকে গীতার পয়লা পাঠ মুখস্থ নেই ; সরকার কায়েতের ছেলে, পুরো চেনটা বাৎলে দিলে। মুখুয্যের উচিত সরকারের মেয়েকে বিয়ে করে কুলধর্ম বাঁচানো।'

চাচা বললেন, 'ঠিক বলেছ, রায়। তাহলে তুমি এক কাজ কর। তোমার

বিয়ারে একটু জল মিশিয়ে ওটাকে বর্ণসঙ্কর করে ফেলো।'

রায় রীতিমত শক্‌ট্‌ হয়ে বললেন, 'পানশাস্ত্রে এর চেয়ে বড় নাস্তিকতা আর কিছুই হতে পারে না। বিয়ারে জল!'

চাচা মুখুয্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোদের নয়া প্রফেসরটা নিশ্চয়ই ইহুদি। ওরা যেমন প্রাণপণ চেষ্টা করে আপন জাতটাকে খাঁটি রাখবার জন্য, ঠিক তেমনি আর পাঁচজনকে উপদেশ দেয় বর্ণসঙ্কর ডেকে আনবার জন্য। ওদিকে খাঁটি জর্মন এ সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করে না একদম, কিন্তু কাজের বেলায় না খেয়ে মরবে তবু বর্ণসঙ্কর হতে দেবে না।'

সরকার জিজ্ঞেস করল, 'এদেশেও নিরম্বু-উপবাস আছে নাকি?'

চাচা বললেন, 'আলবাৎ, শোন। আমি এ-বিষয়ে ওকীব-হাল।

পয়লা বিশ্বযুদ্ধের পর হেথায় অবস্থা হয়েছিল 'জর্মনির সর্বনাশ, বিদেশীর পৌষ মাস।' ইনফ্লেশনের গ্যাসে ভর্তি জর্মন কারেন্সির বেলুন তখন বেহেশ্‌তে গিয়ে পৌঁচেছে—বেহেশ্‌তটা অবশ্যি বিদেশীদের জন্য, জর্মনরা কেউ পাঁচহাজার, কেউ দশহাজারে বেলুন থেকে পড়ে গিয়ে প্রাণ দিচ্ছে। আত্মহত্যার খবর তখন আর কোনো কাগজ ছাপাত না, নারী-হৃদয় ইকনমিক্সের কমডিটি, এক 'বার্‌' চকলেট দিয়ে একসার ব্লণ্ড কেনা যেত, পাঁচটাকায় 'ফার' কোট, পাঁচশ' টাকায় কুর্‌ফুর্স্টেন্‌-ডামে বাড়ি, একটাকায় গ্যোটের কম্‌প্লীট ওয়ার্কস।'

আড্ডার সবাই সেই সর্বনাশী পৌষ মাসের কথা ভেবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

চাচা বললেন, 'সেই ঝড়ে তখনো যে সব বাড়ি দড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিল তাদের প্রত্যেকের ভিতরে ছিল বিদেশী পেয়িং-গেস্ট। যে-সব জর্মন-পরিবারে বিদেশীরা পেয়িং-গেস্ট হয়ে বসবাস করছিল তাদের প্রায় সকলেই খেয়ে পরে জান বাঁচাতে পেরেছিল, কারণ যত নির্লজ্জ, কঞ্জুস, সুবিধাবাদী, পৌষ-মাসীই হও না কেন তামাম মাসের ঘড়ভাড়া, খাইখর্চার জন্য অন্ততঃ পঞ্চাশটি টাকা তো দিতে হয়। বিদেশী টাকার তখন এমনি গরমী যে সেই পঞ্চাশ টাকায় তোমাকে নিয়ে একটা পরিবারের কায়ক্লেশে দিনগুজরান হয়ে যেত।'

গোঁসাই গুন গুন করে গান ধরলেন, 'দেখা হইল না রে শ্যাম, তোমার সেই নতুন বয়সের কালে।'

চাচা বললেন, 'কিন্তু একটা দেশের দুদিনে এক সের ধান দিয়ে পাঁচ সের চাল নিতে আমার বাধত। তাই যখন আমার বুড়ো ল্যাণ্ডলেডি একদিন হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেল তখন আমাকে লুফে নেবার জন্য পাড়ায় কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। এমন সময় আমার বাড়িতে একদিন এসে হাজির ফ্রলাইন্‌ ক্লারা ফন্‌ ব্রাখেল।'

আড্ডা এক গলায় শুধাল, 'হকি-টিমের কাপ্তান ?'

চাচা বললেন, 'আমার জান-বাঁচানে-ওয়ালী।' বললেন, 'ক্লাইনার ইডিয়ট (হাবাগঙ্গারাম), তুমি যদি অন্যত্র কোথাও না গিয়ে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে ওঠো তা হলে আমি বড় খুশী হই। প্রাশান ওবেস্টের (কর্নেলের) বাড়ি, একটু সাবধানে চলতে হবে। এককালে খুব বড় লোক ছিলেন, এখন 'উন্‌জর টেগ্‌লিশেস্‌ ব্রট্‌ গিব্‌উন্‌স্‌ হয়টে' (Give us this day our daily bread)। অথচ এমন দম্ভী যে পেয়িং-গেস্টের কথা তোলাতে আমাকে কোর্ট মার্শাল করতে চায়! শেষটায় যখন বললুম যে তুমি প্রাশান কারো কাছ থেকে উচ্চাঙ্গের জর্মন শেখার জন্য সুদূর ভারতবর্ষ থেকে বার্লিন এসেছ তখন ভদ্রলোক মোলায়েম হল। এখন বুঝতে পারছ, কেন তোমাকে সাবধানে পা ফেলতে বললুম। তুমি ভাবটা দেখাবে যেন তাঁর বাড়িতে উঠতে পেরে কৃতার্থম্মন্য হয়েছ; তুমি যে কোনো উপকার করছ সেটা যেন ধরতে না পারেন। তার বউ সম্বন্ধে কোনো দুর্ভাবনা ক'রো না, তিনি সব বোঝেন, জানেন।'

চাচা বললেন, 'প্রাশান অফিসারদের আমি চিরকাল এড়িয়ে গিয়েছি। দূর থেকে ব্যাটাদের ধোপদুরস্ত ইস্ত্রি-করা স্টিফ ইউনিফর্ম আর স্টিফ ভাবসাব দেখে আমার সব সময় মনে হয়েছে এরা যেন হাসপাতালের এপ্রন-পরা সার্জেনদের দল। সার্জেনরা কাটে নির্বিকার চিত্তে রোগীর পেট, এরা কাটে পরমানন্দে ফ্রান্সের গলা।'

চাচা বললেন, 'কিন্তু ফন্‌ ব্রাখেলের প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা ছিল তার দৌলতে আমি অনেক কিছুই করতে প্রস্তুত ছিলুম। এবং মনে মনে ভাবলুম বেশীর ভাগ ভারতীয়ই বসবাস করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে, দেখাই যাক না খানদানীরা থাকে কি কায়দায়।

ফন্‌ ব্রাখেল আমাকে নিয়ে যান নি। খবর দিয়ে আমি একাই একদিন সুটকেস নিয়ে কর্নেল ডুটেন্‌হফারের বাড়ি পৌঁছলুম।

ট্যাক্সিওলা যে বাড়ির সামনে দাঁড়াল তার চেহারা আগের দেখা থাকলে ফন্‌ ব্রাখেলের প্রস্তাবে আমি রাজী হতুম কি না সন্দেহ। বাড়ি তো নয় সে এক রাজপ্রাসাদ। এ বাড়িতে তো অন্ততঃ শ'খানেক লোকের থাকার কথা কিন্তু তাকিয়ে দেখি দোতলার মাত্র দু'তিনখানা ঘরের জানালা খোলা, বাদবাকি যেন সিল মেরে আঁটা। সামনে প্রকাণ্ড লন্‌। পেরিয়ে গিয়ে দরজার ঘণ্টা বাজালুম। মিনিট তিনেক পরে যখন ভাবছি আবার ঘণ্টা বাজাবো কি না তখন দরজা আস্তে আস্তে খুলে গেল।

গহরজান যখন পানের পিক গিলতেন তখন নাকি গলার চামড়ার ভিতর দিয়ে তার লাল রঙ দেখা যেত। যে-রমণীকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম তাঁর চামড়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মুখচ্ছবি দেখে মনে হল তিনি যেন সকাল বেলাকার শিশির দিয়ে গড়া। জর্মনিতে পান পাওয়া যায় না, কিন্তু আমার মনে হল ইনি পান খেলে নিশ্চয়ই পিকের রঙ এঁর গলার চামড়ায় ছোপ লাগাবে। চুল যেন রেশমের সুতো, ঠোঁট দু'খানি যেন প্রজাপতির পাখা, ভুরু যেন উড়ে-যাওয়া পাখী, সবসুদ্ধ মিলিয়ে মনে সন্দেহ হয় ইনি দাঁড়িয়ে আছেন না হাওয়ায় ভাসছেন। প্রথম দিনেই যে এ-সব কিছু লক্ষ্য করেছিলুম তা নয়; কিন্তু আজ যখন পিছন পানে তাকাই তখন তাঁর ঐ চেহারাই মনে পড়ে।

ইংরিজিতে বোধহয় একেই বলে ডায়াফনাস্; 'আস্বচ্ছ' বললে ঠিক মানে ধরা পড়ে না।

কতক্ষণ ধরে হাবার মত তাকিয়েছিলুম জানিনে, হঠাৎ শুনলুম 'গুটেন মর্গেন' (সুপ্রভাত), আপনার আগমন শুভ হোক্। আমি ফ্রাউ (মিসেস) ডুটেন্‌হফার।'

ভাগ্যিস ভারী মালপত্র ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানির হাতে আগেই সমঝে দেওয়া হয়ে গিয়েছিল তা না হলে মাল নিয়ে আমি বিপদে পড়তুম। এ রকম অবস্থায় চাকর দাসী কেউ না কেউ আসে কিন্তু কেউ যখন এল না তখন বুঝতে পারলুম ডুটেন্‌হফারদের দুরবস্থা কতটা চরমে পৌঁচেছে।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডজন খানেক হল পেরলুম—কোথাও একরত্তি ফর্নিচার নেই, দোর জানালায় পর্দা পর্যন্ত নেই। দেয়ালের সারি সারি হুক দেখে বুঝলুম, এককালে নিশ্চয় বিস্তর ছবি ঝোলানো ছিল, মেঝের অবস্থা দেখে বুঝলুম এ-মেঝের উপর কখনো কোনো জুতোর চাট পড়ে নি—জন্মের প্রথম দিন থেকে এর সর্বাঙ্গ গালচেতে ঢাকা ছিল। কঙ্কাল থেকে পূর্ণাবয়ব মানুষের যতখানি ধারণা করা যায় দেয়ালের হুকের সার, ছাতের শেকলের গোছা, দরজা-জানালার গায়ে-লাগানো পরদা-ঝোলানোর ডাণ্ডা থেকে আমি নাচের ঘর, মজলিসখানা, বাজি-ঘরের ততখানি আন্দাজ করলুম।

শূন্য শ্মশান ভয়ঙ্কর, কিন্তু কঙ্কালের ব্যঞ্জনা বীভৎস।

এ-বাড়িতে থাকব কি করে? চুলোয় যাক প্রাশান জর্মন শেখা।

আন্দাজে বুঝলুম যে আমার জন্য যে-ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা বাড়ির প্রায় ঠিক মাঝখানে। ফ্রাউ ডুটেন্‌হফার আমাকে সে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

বজরার মত খাট, কিন্তু ঘরখানাও বিলের মত। নৌকোয় চড়া অভ্যাস না হওয়া পর্যন্ত বিলের মাঝখানে নৌকোয় ঘুমুতে যে-রকম অসহায় অসহায়, ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে সে-খাটে শুয়ে আমারো সেই অবস্থা হয়েছিল।

দুপুরে খাবার ঘরে গিয়ে দেখি বেনকুয়েট টেবিলে তিনজনের জায়গা। টেবিলের এক মাথায় কর্তা, অন্য মাথায় গিন্নী, মাঝখানে আমি। একে অন্যকে কোনো জিনিস হাত বাড়িয়ে দেবার উপায় নেই বলে তিনজনের সামনেই আপন আপন নিমক-দান। মাস্টার্ড, সস মাথায় থাকুন, গোলমরিচেরও সন্ধান নেই। বুঝলুম পাড় প্রাশানের বাড়ি বটে; আড়ম্বরহীনতায় এদের রান্নার সামনে আমাদের বালবিধবার হবিষ্যান্নও লজ্জায় ঘোমটা টানে। কিন্তু ওসব কথা থাক, এ রকম ধারা মশলার বিরুদ্ধে জেহাদ আমি অন্য জায়গায়ও দেখেছি।

ভেবেছিলুম বাড়ির কর্তাকে দেখতে পাব শূয়ারের মত হোঁৎকা, টমাটোর মত লাল, অসুরের মত চেহারা, দুশমনের মত এই-মারি-কি-তেই-মারি অর্থাৎ সবসুদ্ধ জড়িয়ে মড়িয়ে প্রাশান বিভীষিকা, কিন্তু যা দেখলুম তার সঙ্গে তুলনা হয় তেমন কিছু ইয়োরোপে নেই।

এ যেন নর্মদা-পারের সন্ন্যাসী বিলিতি কাপড় পরে পদ্মাসনে না বসে চেয়ারে বসেছেন। দেহের উত্তমার্ধ কিন্তু যোগাসনে—শিরদাঁড়া খাড়া, চেয়ারে হেলান দেন নি।

শীর্ণ দীর্ঘ দেহ, শুষ্কমুখ, আর সেই শুকনো মুখ আরো পাংশু করে দিয়েছে দু'খানি বেগুনি ঠোঁট। কপাল থেকে নাক নেমে এসেছে সোজা, চশমার ব্রিজের জায়গায় এতটুকু খাঁজ খায় নি আর গালের হাড় বেরিয়ে এসে চোখের কোটর দুটোকে করে দিয়েছে গভীর গুহার মত। কিন্তু কী চোখ! আমার মনে হল উঁচু পাহাড় থেকে তাকিয়ে দেখছি নীচে, চতুর্দিকে পাথরে ঘেরা, নীল সরোবর। কী গভীর, কী তরল। সে-চোখে যেন এতটুকু লুকোনো জিনিস নেই। যত বড় অবিশ্বাস্য কথাই এ লোকটা বলুক না কেন, এর চোখের দিকে তাকিয়ে সে কথা অবিশ্বাস করার জো নেই।

খেতে খেতে সমস্তক্ষণ আড়-নয়নে সেই ধ্যানমগ্ন চোখের দিকে, সেই বিষণ্ণ ঠোঁটের দিকে আর চিন্তাপীড়িত ললাটের দিকে বার বার তাকিয়ে দেখছি। তখন চোখে পড়ল তাঁর খাবার ধরন। চোয়াল নড়ছে না, ঠোঁট নড়ছে না, খাবার গেলার সময় গলায় সামান্যতম কম্পনের চিহ্ন নেই।

পরনে প্রাশান অফিসারদের য়ুনিফর্ম তো নয়ই, মাথার চুলও কদম-ছাঁট নয়। ব্যাকব্রাশ করা চকচকে প্ল্যাটিনামরঙ চুল।

কিন্তু সবচেয়ে রহস্যময় মনে হল এঁর বয়স। চল্লিশ, পঞ্চাশ, সত্তর হতেও বাধা নেই। বয়সের আন্দাজ করতে গিয়েই বুঝলুম নর্মদা পারের সন্ন্যাসীর সঙ্গে এঁর আসল মিল কোনখানে।

এত অল্প খেয়ে মানুষ বাঁচে কি করে, তাও আবার শীতের দেশে? সুপ খেলেন না, পুডিং খেলেন না, খাবার মধ্যে খেলেন এক টুকরো মাংস—শ্যামবাজারের মামুলী মটন-কট্‌লেটের সাইজ—দুটো সেদ্ধ আলু, তিনখানা বাঁধা-কপির পাতা আর এক স্লাইস রুটি। সঙ্গে ওয়াইন, বিয়ার, জল পর্যন্ত না।

আহারে যত না বিরাগ তার চেয়েও তাঁর বেশী বিরাগ দেখলুম বাক্যালাপে। নূতন বাড়িতে উঠলে প্রথম লাঞ্চের সময় যে-সব গতানুগতিক সম্বর্ধনা, হাসিঠাট্টা, গ্যাস সম্বন্ধে সতর্কতা, সিঁড়ির পিচ্ছিলতা সম্বন্ধে খবরদারি সে-সব তো কিছুই হল না—আমি আশাও করিনি—আবহাওয়া সম্বন্ধে মন্তব্য, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভদ্রতা-দুরস্ত কৌতূহল, এ সব কোনো মন্তব্য বা প্রশ্নের দিক দিয়ে হের ওবের্স্ট (কর্নেল মহাশয়) গেলেন না। আমিও চুপ করে ছিলুম, কারণ আমি বয়সে সকলের ছোট।

খাওয়ার শেষের দিকে যখন আমি প্রায় মনস্থির করে ফেলেছি যে, ডুটেন্‌হফারদের জিভে হয় ফোস্কা নয় বাত, তখন হের ওবের্স্ট হঠাৎ পরিষ্কার ইংরিজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেক্সপীয়ারের কোন্ নাট্য আপনার সবচেয়ে ভাল লাগে?'

আমার পড়া ছিল কুল্লে একখানাই। নির্ভয়ে বললুম, 'হ্যামলেট।'

'গ্যোটে পড়েছেন?'

আমি বললুম, 'অতি অল্প।'

'একসঙ্গে গ্যোটে পড়ব?'

আমি আনন্দের সঙ্গে, অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে সম্মতি জানালুম। মনে মনে বললুম, 'দেখাই যাক্ না প্রাশান রাজপুত কি রকম কালিদাস পড়ায়। হের ওবের্স্টের চেহারাটি যদিও ভাবুকের মত, তবু কুলোপানা চক্কর হলেই তো আর দাঁতে কালবিষ থাকে না।

ফ্রাউ ডুটেন্‌হফার বললেন, 'ভদ্রলোক জর্মন বলতে পারেন।'

'তাই নাকি?' বলে সেই যে ইংরিজি বলা বন্ধ করলেন তারপর আমি আর কখনো তাঁকে ইংরিজি বলতে শুনি নি।

লাঞ্চ শেষ হতেই হের ওবের্স্ট উঠে দাঁড়ালেন। জুতোর হিলে হিলে ক্লিক্ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম স্ত্রীকে, তারপর আমাকে 'বাও' করে আপন ঘরের দিকে চলে গেলেন। বাপের বয়সী লোক, বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ এরকম 'বাও'

করে বসবে কি করে জানব বলো। আমি হন্তদন্ত হয়ে উঠে বার বার 'বাও' করে তার খেসারতি দেবার চেষ্টা করলুম কিন্তু মনে মনে মাদামের সামনে বড় লজ্জা পেলুম। পাছে তিনিও আবার কোনো একটা নূতন এটিকেট চালান সেই ভয়ে —যদিও আমার কোনো তাড়া ছিল না—আমি দু'মিনিট যেতে না যেতেই উঠে দাঁড়ালুম, মাদামকে কোমরে দু'ভাঁজ হয়ে 'বাও' করে নিজের ঘরের দিকে রওয়ানা হলুম—হিলে হিলে ক্লিক্‌টা আর করলুম না, জুতোর হিল্‌ রবরের ছিল বলে।

চারটের সময় কাফ খেতে এসে দেখি হের ওবের্স্ট নেই। মাদাম বললেন, তিনি অপরাহ্নে আর কিছু খান না। মনে মনে বললুম, বাব্বা, ইনি পওহারী বাবার কাছে পৌঁছে যাবার তালে আছেন।

ডিনারে ওবের্স্ট খেলেন তিনখানা সেনউইজ্‌ আর এক কাপ চা—তাও আর পাঁচজন জর্মনের মত—'বিনদুধে'।

চাচা থামলেন। তারপর গুনগুন করে অনুষ্টুপ ধরলেন,

'এবমুক্তো হৃষিকেশ গুড়াকেশেন ভারত।'

তারপর বললেন, 'আমি গুড়াকেশ নই, নিদ্রা আমি জয় করি নি, নিদ্রাই আমাকে জয় করেছেন, অর্থাৎ আমি ইন্‌সমনিয়ায় কাতর। কাজেই সংযমী না হয়েও 'যা নিশা সর্বভূতানাং' তার বেশীর ভাগ আমি জেগে কাটাই। রাত তিনটের সময় শুতে যাবার আগে জানালার কাছে গিয়ে দেখি কর্তার পড়ার ঘরে তখনো আলো জলছে।

দেরিতে উঠি। ব্রেকফাস্ট খেতে গিয়ে দেখি কর্তার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। লজ্জা পেলুম, কিন্তু সেটা পুষিয়ে নিলুম লোহার নালে নালে এমনি বম্‌শেল্‌ ক্লিক্‌ করে যে, মাদাম আঁৎকে উঠলেন। মনে মনে বললুম, 'হিন্দুস্থানীকী তমিজ ভী দেখ লীজীয়ে।'

ওবের্স্টকে জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনি কি অনিদ্রায় ভোগেন?' বললেন, 'না তো।' আমি কেন প্রশ্নটা শুধালুম সে সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল না দেখিয়ে শুধু স্মরণ করিয়ে দিলেন যে দশটায় গ্যোটে-পাঠ।

পূর্ণ এক বৎসর তিনি আমায় গ্যোটে পড়িয়েছিলেন, দুটি শর্ত প্রথম দিনই আমার কাছ থেকে আদায় করে নিয়ে। তিনি কোনো পারিতোষিক নেবেন না, আর আমার পড়া তৈরী হোক আর না হোক, ক্লাস কামাই দিতে পারব না।

মিলিটারি কায়দায় লেখাপড়া শেখা কাকে বলে জানো? বুঝিয়ে বলছি। আমরা দেশকালপাত্রে বিশ্বাস করি; গুরুর যদি শরীর অসুস্থ থাকে, ছাত্রের যদি পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত হয়, পালা-পরবে যদি কোথাও যেতে হয়, পাঠ্যপুস্তকের যদি

অনটন হয়, শিক্ষক অথবা ছাত্রের যদি পড়া তৈরী না থাকে, গুর্বীর যদি ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্ধন সংক্রান্ত কোনো বিশেষ প্রয়োজন হয়—এবং তখনকার গম-বরাদ্দের (রেশনিঙের) দিনে তার নিত্য নিত্য প্রয়োজন হত—তাহলে অনধ্যায়। কিন্তু প্রাশান মিলিটারি-মার্গ অঘটনঘটনপটিয়সী দৈবদুর্বিপাকে বিশ্বাস করে না; আমি বুকে কফ নিয়ে এক ঘণ্টা কেশেছি, ক্লাস কামাই যায় নি, হিণ্ডেনবুর্গ হের ওবের্স্ট'কে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, ক্লাস কামাই যায় নি। একটি বৎসর একটানা গ্যোটে, আবার গ্যোটে এবং পুনরপি গ্যোটে। তার অর্ধেক পরিশ্রমে পাণিনি কণ্ঠস্থ হয়, সিকি মেহন্নতে ফিরদৌসীকে ঘায়েল করা যায়।

অথচ পড়ানোর কায়দাটা ন' সিকে ভটচাযি। গ্যোটের খেই ধরে বাইমার, বাইমার থেকে ট্যুরিঙেন্, ট্যুরিঙেন্ থেকে পূর্ণ জর্মনির ইতিহাস; গ্যোটের সঙ্গে বেটোফোনের দেখা হয়েছিল কার্লসবাডে—সেই খেই ধরে বেটোফোনের সঙ্গীত, বাগনারে তার পরিণতি, আমেরিকায় তার বিনাশ; গ্যোটে শেষ বয়সে সরকারি গেহাইমরাট্ খেতাব পেয়েছিলেন, সেই খেই ধরে জর্মনির তাবৎ খেতাব, তাবৎ মিলিটারি মেডেল, গণতন্ত্রে খেতাব তুলে দেওয়াটা ভালো না মন্দ সে সব বিচার, এক কথায় জর্মন দৃষ্টিবিন্দু থেকে তামাম ইয়োরোপের সংস্কৃতি-সভ্যতার সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস। পূর্ণ এক বৎসর ধরে গ্যোটের গোষ্পদে ইয়োরোপের শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে-ওঠা ইতিহাস-ঐতিহ্য বিম্বিত হল।

আর এ সব কিছু ছাড়িয়ে যেত তাঁর আবৃত্তি করার অদ্ভুত ইন্দ্রজাল। সে ইন্দ্রজালের মোহ বোধহয় আমার এখনো কাটে নি; আমি এখনো বিশ্বাস করি, মন্ত্র যদি ঠিক ঠিক উচ্চারণ করা যায়—যে-শ্রদ্ধা, যে-অনুভূতি, যে-সংজ্ঞা নিয়ে ডুটেন্‌হফার গ্যোটে আবৃত্তি করতেন—তাহলে ঈপ্সিত ফললাভ হবেই হবে।

পূর্ণ এক বৎসর রোজ দু'ঘণ্টা করে এই গুণীর সাহচর্য পেলুম কিন্তু আশ্চর্য, তাঁর নিজের জীবন অথবা তাঁর পরিবার সম্বন্ধে তিনি কখনো একটি কথাও বলেন নি। কেন তিনি মিলিটারি ছাড়লেন, লুডেনডর্ফের আহ্বানে জর্মনিতে নূতন দল গড়াতে কেন তিনি সাড়া দিলেন না (কাগজে এ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা হত), পেন্সন্ কেন তিনি ত্যাগ করলেন, না করে পারিবারিক তৈলাক্ষন তৈজসপত্র বাঁচানো কি অধিকতর কাম্য হত না,—এ-সব কথা বাদ দাও, একদিনের তরে ঠাট্টাচ্ছলেও তাঁকে বলতে শুনি নি প্রথম যৌবনে তিনি সোয়া দু'বার না আড়াই-বার প্রেমে পড়েছিলেন অথবা ছাত্রাবস্থায় মাতাল হয়ে ল্যাম্প-পোস্টকে জড়িয়ে ধরে 'ভাই, এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি' বলে কান্নাকাটি করেছিলেন কি না।

পূর্ণ এক বৎসর ধরে এই লোকটির সাহচর্য পেয়েছি, তাঁর সংযম দেখে মুগ্ধ

হয়েছি—মদ না, সিগরেট না, কফি না ; বার্লিনের মেরুমুক্ত হিমে মুক্ত-বাতায়ন নিরিক্ষন গৃহে ত্রি-যামা-যামিনী বিদ্যাচর্চা, আত্মসম্মান রক্ষার্থে পিতৃপিতামহসঞ্চিত আশৈশব শ্রদ্ধাবিজড়িত প্রিয়বস্তু অকাতরে বিসর্জন, আহারে বিরাগ, ভাষণে অরুচি, দম্ভহীন, দৈন্যে নীলকণ্ঠ, গুড়াকেশ—সব কিছু নিয়ে এঁর ব্যক্তিত্ব আমাকে এমনি অভিভূত করে ফেলেছিল যে আমি নিজের অজানায় তাঁকে অনুকরণ করতে আরম্ভ করেছিলুম। ডুটেন্‌হফারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আমি যে দস্তানা, ওভারকোট, টাই কলার ছাড়লুম, আজো তা গ্রহণ করার প্রয়োজন বোধ করি নে। কিন্তু কিসে আর কিসে তুলনা করছি !'

চাচা বললেন, 'শুধু একটা জিনিসে হের ওবের্স্টের চিত্তগতি আমি ধরতে পেরেছিলুম। আমাদের আলাপের দ্বিতীয় দিনে জিনিয়স সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে জাতিভেদের কথা ওঠে। আমি মুসলমান, তার উপর ছেলেবেলায় দু' হাত তফাতে দাঁড়িয়ে বামুন পণ্ডিতকে স্লেট দেখিয়েছি, কৈশোরে হিন্দুহস্টেলে বেড়াতে গিয়ে ঢুকতে পাই নি, জাতিভেদ সম্বন্ধে আমার অত্যধিক উৎফুল্ল হওয়ার কথা নয়। তার-ই প্রকাশ দিতে হের ওবের্স্ট জাতিভেদের ইতিহাস, তার বিশ্লেষণ, বর্তমান পরিস্থিতি, ভিন্ন ভিন্ন দেশে তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ সম্বন্ধে এমনি তথ্য এবং তত্ত্বে ঠাসা কতকগুলো কথা বললেন যে আমার উষ্মার চোদ্দ আনা তখনি উবে গেল। দেখলুম, শুধু যে তিনি মনুসংহিতার জর্মন অনুবাদ ভালো করে পড়েছেন তা নয়, গৃহ্য ও শ্রৌতসূত্রের তাবৎ আচার অনুষ্ঠান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করেছেন—অবশ্য সংস্কৃতে নয়, হিলেব্রান্টের জর্মন অনুবাদে। এসব আচার-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কি, বৈজ্ঞানিক পরশ পাথর দিয়ে বিচার করলে তার কতটা গ্রহণীয় কতটা বর্জনীয়, বিজ্ঞান যেখানে নীরব সেখানে কিংকর্তব্য এসব তো বললেনই, এবং যে সব সমস্যায় তিনি স্বয়ং কিংকর্তব্যবিমূঢ় সে-সবগুলোও বিশেষ উৎসাহে আমার সামনে উপস্থিত করলেন।

অথচ কি বিনয়ের সঙ্গে দিনের পর দিন এই কথাটি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন —প্রাশান কৌলীন্য যেন দম্ভপ্রসূত না হয়। প্রাশান কৌলীন্য জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দাবী করে না, তার দাবী শুধু এইটুকু যে তার বিশেষত্ব আছে, সে-বিশেষত্ব-টুকুও যদি পৃথিবী স্বীকার না করে তাতেও আপত্তি নেই কিন্তু অন্ততপক্ষে পার্থক্যটুকু যেন স্বীকার করে নেয়। হের ওবের্স্ট তাতেই সন্তুষ্ট। তিনি সেইটুকুই বাঁচিয়ে রাখতে চান। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, সে-পার্থক্যের জন্য 'উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ' রয়েছে।

এবং সেই পার্থক্যটুকু বাঁচিয়ে রাখবার জন্য দেখতে হবে রক্তসংমিশ্রণ যেন না হয়।

নীটশের সুপারম্যান ?

না, না। শুধু বড় হওয়ার জন্য বড় হওয়া নয়, শুধু 'সুপার' হওয়ার জন্য 'সুপার' হওয়া নয়। প্রাশান আদর্শ হবে ত্যাগের ভিতর দিয়ে, আত্মজয়ের ভিতর দিয়ে ইয়োরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ সেবক হওয়ার।

এবং যদি দরকার হয়, তার জন্য সংগ্রাম পর্যন্ত করা। সেবা করার জন্য যদি দরকার হয় তবে যে-সব অজ্ঞ, মূর্খ, অন্ধ তার অন্তরায় হয় তাদের বিনাশ করা।

আমার কাছে বড় আশ্চর্য ঠেকল। সেবার জন্য সংগ্রাম, বাঁচবার জন্য বিনাশ ?

হের ওবের্স্ট বলতেন, 'শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কেন যুদ্ধ করতে বলেছিলেন ? সেইটে বার বার পড়তে হয়, বুঝতে হয়। ভুললে চলবে না, জীবনের সমস্ত চিন্তাধারা কর্মপদ্ধতি লোকসেবায় যেন নিয়োজিত হয়।'

আমি প্রথম দিনের আলোচনার পরই বুঝতে পেরেছিলুম হের ওবের্স্টের সঙ্গে তর্ক করা আমার ক্ষমতার বহু, বহু উর্ধ্বে কিন্তু এই 'সেবার জন্য সংগ্রাম' বাক্যটা আমার কাছে বড়ই আত্মঘাতী, পরস্পরবিরোধী বলে মনে হল। রক্তসংমিশ্রণ ঠেকাবার জন্য প্রাণ বসর্জন, এও যেন আমার কাছে বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি মনে হল। আমার কোন্ কোন্ জায়গায় বাধছে হের ওবের্স্টের কাছে সেগুলোও অজানা ছিল না।

লক্ষ্য করলুম, এঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বল্পভাষণে। কিন্তু স্বল্প হলে কি হয়, শব্দের বাছাই, কল্পনার ব্যঞ্জনা, যুক্তির ধাপ এমনি নিরেট ঠাসবুনুনিতে বক্তব্যগুলোকে ভরে রাখত যে সেখানে সূচ্যগ্র ঢোকাবার মত ক্ষমতা আমার ছিল না। এবং আরো লক্ষ্য করলুম যে একমাত্র রক্তসংমিশ্রণের ব্যাপারেই তিনি যেন ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

বিষয়টি যে তাঁর জীবনের কত বিরাট অংশ দখল করে বসে আছে সেটা বুঝতে পারলুম একদিন রাত প্রায় দুটোর সময় যখন তিনি আমার ঘরে এসে বললেন, 'এত রাতে এলুম, কিছু মনে করবেন না ; আমাদের আলোচনার সময় একটি কথা আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, সেটি হচ্ছে, 'সুখদুঃখ, জয়পরাজয়, লাভক্ষতি যিনি সমদৃষ্টিতে দেখতে পারেন, একমাত্র তাঁরই অধিকার সেবার ভার গ্রহণ করার, সেবার জন্য সংগ্রাম করার।'

কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করে হিল্-ক্লিকের সঙ্গে 'বাও' করে বেরিয়ে গেলেন।

এত রাত্রে এসে এইটুকু বলার এমন কি ভয়ঙ্কর প্রয়োজন ছিল ?

হের ওবের্স্টের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি, বাড়ির লনে পাইচারি করেছি, পৎস্‌দাম পেরিয়ে ছোট ছোট গ্রামে গিয়ে চাষাদের বাড়িতে খেয়েছি, পুরোনো বইয়ের দোকানে প্রাচীন মাসিক ঘাঁটাঘাঁটি করেছি, অধিকাংশ সময় তিনি চুপ, আমিও চুপ। তাঁকে কথা বলাতে হলে প্রাশান ঐতিহ্যের প্রস্তাবনা করাই ছিল প্রশস্ততম পন্থা। একদিন শুধালুম, 'ফ্রান্সের সঙ্গে আপনাদের বনে না কেন?'

হের ওবের্স্ট বললেন, 'না বনাই ভালো। এ রকম ধ্বংসমুখ দেশ পৃথিবীতে আর দুটো নেই। প্যারিসের উন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল বিলাস দেখেছেন? কোন্ সুস্থ জাতির পক্ষে এরকম নির্লজ্জ কাণ্ডজ্ঞানহীনতা সম্ভব?'

আমি বললুম, 'বার্লিনেও 'কাবারে' আছে।'

হের ওবের্স্ট বললেন, 'বার্লিন জর্মনি নয়, প্রাশার প্রতীক নয়, কিন্তু প্যারিস ফ্রান্স এবং ফ্রান্স প্যারিস।'

আমি চুপ করে ভাবতে লাগলুম। হঠাৎ আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগল। যে-সমস্যা মানুষের মনকে অহরহ আন্দোলিত করে শেষ পর্যন্ত সে-সমস্যা নিজের জীবনে, নিজের পরিবারের জীবনে কতটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তাই নিয়ে মানুষ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় একদিন না একদিন আলোচনা করে। হের ওবের্স্টকে কখনো আলোচনার সে দিকটা মাড়াতে দেখি নি।

ফ্রাউ ডুটেন্‌হফারকে আমি অধিকাংশ সময় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গল্প-কাহিনী বলতুম। হের ওবের্স্টের তুলনায় যদি তাঁর সঙ্গে দেখা হত কম, তবু তাঁর সঙ্গে হৃদ্যতা হয়েছিল বেশী। একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'হের ওবের্স্টের সঙ্গে নানা আলোচনা হয়, কিন্তু আমার মাঝে মাঝে ভয় হয়, না জেনে হয়ত আমি এমন বিষয়ের কথা পাড়ব যাতে তাঁর আঘাত লাগতে পারে। আমার বিশ্বাস তিনি অনেক কষ্ট পেয়েছেন—তাই এ-প্রশ্ন শুধালুম।'

ফ্রাউ ওবের্স্ট অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। মুখের ভাব থেকে মনে হল তিনি মনে মনে 'বলি কি বলি না' করছেন। শেষটায় ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'আমাদের পরিবারের কথা কখনো পাড়বেন না। আমাদের ষোল বছরের ছেলেটি ফ্রান্সের লড়াইয়ে গেছে, আমাদের মেয়ে—'

কথার মাঝখানে ফ্রাউ ডুটেন্‌হফার হঠাৎ দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠলেন। এই বেকুব গোমূর্খামির জন্য আমি মনে মনে নিজেকে খুব জুতো-পেটা করলুম। অতটা বুদ্ধি কিন্তু তখনো ছিল যে এ সব অবস্থায় সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে বিপদ বাড়িয়ে তোলা হয় মাত্র। পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। প্রাশানরা হয়ত তখনো হিল্ ক্লিক করে।

বড় ছেলে মরে যাওয়াতে বয়স্ক চাষাকে একদম ভেঙে পড়তে দেখেছি। তার তখন দুঃখ সে মরে গেলে তার খেত-খামার দেখবে কে। সভ্যতা কুলটুরের পয়লা কাতারের শহরে তারি পুনরাবৃত্তি দেখলুম ডুটেন্‌হফার পরিবারে। এত ঐতিহ্য, এত সাধনা, এত ভবিষ্যতের স্বপ্ন সব এসে শেষ হবে এই ডুটেন্‌হফারে?

তাই কি এত কৃচ্ছ্রসাধন, রক্তসংমিশ্রণের বিরুদ্ধে এত তীব্র হুঙ্কার? যে বর্ষায় সফল বৃষ্টি হয় না সেই বর্ষাতেই কি দামিনীর ধমক, বিদ্যুতের চমক বেশী?

তাই হের ওবের্স্টের পড়াশুনোরও শেষ নেই। সভ্য অসভ্য বর্বর বিদগ্ধ দুনিয়ার তাবৎ জাতির নৃতত্ত্ব, সমাজগঠন, ধর্মনীতি পড়েই যাচ্ছেন, পড়েই যাচ্ছেন। শীতের রাতে আগুন না জ্বালিয়ে ঘরের ভিতর ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাইচারি, বসন্তে বেখেয়ালে বৃষ্টিতে জবজবে হয়ে বাড়ি ফেরা, গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ দিবস বিদেশী মুসলমানকে প্রাশান ধর্মের মূল তত্ত্বে ওকীবহাল করার অন্তহীন প্রয়াস, হেমন্তের পাতা-ঝরার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে না জানি কোন্ নিষ্ফল বৃক্ষের কথা ভেবে ভেবে চিত্তের লুকানো কোণে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ।

কিন্তু আমার সামনে তিনি কখনো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন নি। এসব আমার নিছক কল্পনাই হবে।

এক বৎসর ঘুরে এল। আমি ততদিনে পুরো পাকা প্রাশান হয়ে গিয়েছি। চেয়ারে হেলান না দিয়ে বসি, সুপে গোলমরিচের গন্ধ পেলে ঝাড়া পনরো মিনিট হাঁচি, একটানা বারো ঘণ্টা কাজ করতে পারি, তিন দিন না ঘুমুলেও চলে—যদিও কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে আমার নিদ্রাকৃচ্ছ্রতা তখন অনেকটা সেরে গিয়েছে—কাঠের পুতুলের মত খট খট করে হাঁটা রপ্ত হয়ে গিয়েছে, আর আমার জর্মন উচ্চারণ শুনে কে বলবে আমি ভাত-খেকো, নেটিব, কালা-আদমী। সঙ্গে সঙ্গে এ-বিশ্বাসও খানিকটে হল যে হের ওবের্স্টের হৃদয় বলে যদি কোনো রক্তমাংসে গড়া বস্তু থাকে তবে তার খানিকটে আমি জয় করতে পেরেছি।

এমন সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে আমার জীবনের প্রাশান-পর্বকে তার কুরুক্ষেত্রে পৌঁছিয়ে দিল।

কলেজ থেকে ফিরেছি। দোরের গোড়ায় দেখি একটি যুবতী পেরেম-বুলেটরের হ্যাণ্ডেলে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছে। চেহারাটি ভারী সুন্দর, হুবহু হের ওবের্স্টের মত। তিনিও সামনে দাঁড়িয়ে। মুখে কথা নেই। আমিও দাঁড়ালুম, প্রাশান এটিকেট যদিও সে-অবস্থায় কাউকে সেখানে দাঁড়াতে কড়া বারণ করে। তবুও যদি কেউ দাঁড়ায় তবে সেই প্রাশান এটিকেটেরই অলঙ্ঘ্য আদেশ, হের ওবের্স্ট তাকে মহিলাটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে

দেবেন। তিনি এটিকেট লঙ্ঘন করলেন,—সেই প্রথম আর সেই শেষ।

আমি তখন আর প্রাশান না। আমার মুখোস খসে পড়েছে। আমি ফের কালা-আদমী হয়ে গিয়েছি। আমি নড়ব না।

মেয়েটি কি বললেন বুঝতে পারলুম না।

হের ওবের্স্ট বললেন, 'তোমাকে আমি একবার বলেছি, আমার সঙ্গে যোগ-সূত্র স্থাপনা করার চেষ্টা করবে না। তাই আর বার, শেষবারের মত বলছি, তুমি যদি আবার এরকম চেষ্টা করো, তবে আমাকে বাধ্য হয়ে তোমার সন্ধানের বাইরে যেতে হবে।'

আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না। ছুটে গেলুম ফ্রাউ ডুটেন্‌হফারের কাছে। বললুম, 'আপনার মেয়ে দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে। আপনার স্বামী তাঁকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন।'

তিনি পাথরের মতো বসে রইলেন। আমি তাঁকে হাত ধরে তুলে সদর দরজার দিকে চললুম। করিডরে শুনি দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ, দেখি, হের ওবের্স্ট ফিরে আসছেন। আমি তখন ফ্রাউ ডুটেন্‌হফারের হাত ছেড়ে দিয়ে ছুটলুম মেয়েটির সন্ধানে। তাঁকে পেলুম বাড়ির সামনের রাস্তায়। তখনো কাঁদছেন। তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এলুম, তাঁর ঠিকানা টুকে নিয়ে এলুম।

বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে ঢুকে দেখি টেবিলের উপর আমার নামে একখানা চিঠি। ঋজু, শক্ত, প্রাশান হাতে হের ওবের্স্টের লেখা। আমার বুক কেঁপে উঠল। খুলে পড়লুম ;—

'আপনার কর্তব্যবুদ্ধি আপনাকে যে-আদেশ দিয়েছিল আপনি তাই পালন করেছেন। আমি তাতে আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু এর পর আপনার সঙ্গে আমার আর কোনো যোগসূত্র থাকতে পারে না।

আপনার বাড়ি পেতে কোনো কষ্ট হবে না জেনেই বৃথা সময় নষ্ট না করে আপনাকে আমার বক্তব্য জানালুম।'

হের ওবের্স্টকে ততদিনে এতটা চিনতে পেরেছিলুম যে, তাঁর হৃদয় থাক আর নাই থাক, তাঁর প্রতিজ্ঞার নড়চড় হয় না। পরদিন সকাল বেলা ডুটেন্‌হফারদের বাড়ি ছাড়লুম। হের ওবের্স্টের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করি নি। ফ্রাউ কপালে চুমো খেয়ে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

আড্ডা এতক্ষণ চুপ করে শুনে যাচ্ছিল। কে যেন জিজ্ঞেস করল—সকলের হয়ে—'কিন্তু মেয়েটির দোষ কি ছিল?'

চাচা বললেন, 'হের ওবের্স্টের গোর দিতে যাই তার প্রায় বৎসর খানেক

পরে। সেখানে শুনলুম, তাঁর মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপককে বিয়ে করেছিলেন, এবং তিনি জাতে ফরাসী।'

মুখুয্যের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোর অধ্যাপক কি বলছিল রে? বর্ণসঙ্কর-ফঙ্কর আবোল-তাবোল কথা? বর্ণসঙ্করের প্রতি দরদ দেখিয়েছিলুম বলে হের ওবের্স্ট তাঁর জীবনের শেষ সঙ্গীকে অকাতরে অপাঙক্তেয় করলেন।

এবং নিজে? অর্ধ-অনশনে তাঁর মৃত্যু হয়। আমাকে না তাড়ালে হয়ত তিনি আরো বহুদিন বাঁচতেন। তিনি আর কোনো পেয়িং গেস্ট নিতে রাজী হন নি। একে নিরম্বু উপবাসে মৃত্যু বলা চলে না সত্যি, কিন্তু এরো একটি পদবী থাকা উচিত। কি বলো গোঁসাই?'

আড্ডার চ্যাংড়া সদস্য গোলাম মৌলা বলল, 'শেষ ট্রেন মিস করেছি।'

চাচা বললেন, 'চ, প্রাশান কায়দায় পাঁচ মাইল ডবলমার্চ করা দেখিয়ে দি।'

মা-জননী

যুদ্ধের পূর্বে লণ্ডনে অগুনতি ভারতীয় নানা ধান্দায় ঘোরাঘুরি করত। তাদের জন্য হোটেল, বোর্ডিং হৌস তো ছিলই, ডাল-রুটি, মাছ-ভাত খাওয়ার জন্য রেস্তোরাঁও ছিল প্রয়োজনের চেয়ে অধিক।

বাদবাকি সমস্ত কন্টিনেন্টে ছিল মাত্র দুটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। প্যারিসের রু দ্য সমোরারের 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' ও বার্লিনের 'হিন্দুস্থান হৌস'।

লণ্ডন ভারতীয় ছাত্রদের সম্বন্ধে উদাসীন কিন্তু বার্লিন ভারতীয়দের খাতির করত। তাই অর্থাভাব সত্ত্বেও 'হিন্দুস্থান হৌস' কায়ক্লেশে যুদ্ধ লাগা পর্যন্ত টিকে থাকতে পেরেছিল। একদিক থেকে দেখতে গেলে 'হিন্দুস্থান হৌস' নাৎসি আন্দোলনের চেয়েও প্রাচীন কারণ ১৯২৯-এ হৌসের যখন পত্তন হয় তখনো হিটলার বার্লিনে কল্কে পান নি।

সেই 'হিন্দুস্থান হৌসে'র এক কোণে বাঙালীদের একটা আড্ডা বসত। সে-আড্ডার ভাষাবিদ সূর্য্য রায়, লেডি-কিলার পুলিন সরকার, বেটোফেনজ্ঞ মদন-মোহন গোস্বামী বার্লিন সমাজের অশোক-স্তম্ভ কুতুব মিনার হয়ে বিরাজ করতেন। আড্ডার চক্রবর্তী ছিলেন চাচা। 'হিন্দুস্থান হৌসে'র ভিতরে বাহিরে তাঁর প্রতিপত্তি কতটা তা নিয়ে আমরা কখনো আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করি নি কারণ চাচা ছিলেন বয়সে সকলের চেয়ে বড়, দানে খয়রাতে হাতিম-তাই আর সলা-পরামর্শে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।

এঁদের সকলকেই লুকে নেবার জন্য বার্লিনের বিস্তর ড্রইং-রুম খোলা থাকা সত্ত্বেও এঁরা সুবিধে পেলেই 'হিন্দুস্থান হৌসে' এসে আড্ডা জমাতেন। এ-স্বভাবটাকে বাঙালীর দোষ এবং গুণ দুইই বলা যেতে পারে।

আড্ডা জমেছে। সুষ্যি রায় চুক্‌চুক্ করে বিয়ার খাচ্ছেন। লেডি-কিলার পুলিন সরকার চেস্টনাট্ ব্রাউন আর ব্রুনেট্ চুলের তফাৎটা ঠিক কোন্ জায়গায় তাই নিয়ে একখানা থিসিস ছাড়ছে, চাচা গলাবন্ধ কোটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে চোখ বন্ধ করে আপন ভাবনা ভেবে যাচ্ছেন এমন সময় আড্ডার সবচেয়ে চ্যাংড়া সদস্য, রায়ের 'প্রতেজে' বা 'দেশের ছেলে', গ্রাম-সম্পর্কে ভাগ্নে গোলাম মৌলা এসে তার মামার পাশে বসল। তার চোখে মুখে অদ্ভুত বিহ্বলতা—লাস্ট ট্রেন মিস্ করলে কয়েক মিনিটের তরে মানুষ যে-ভাব নিয়ে বোকার মত প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকটা সেই রকম।

রায় শুধালেন, 'কি রে, কি হয়েছে? প্রেমে পড়েছিস?'

গোলাম মৌলা বড্ড লাজুক ছেলে। বয়স সতর হয় কি না হয়, বাপ কট্টর খেলাফতি, ছেলেকে কি দেশে কি বিলেতে ইংরেজের আওতায় আসতে দেবেন না বলে সেই অল্প বয়সেই বার্লিন পাঠিয়েছেন। 'সুষ্যিমামা' না থাকলে সে বহুকাল আগেই বার্লিন ছেড়ে পালাত। কথা কয় কম, আর বড়দের ফাইফরমাস করে দেয় অনুরোধ বা আদেশ করার আগেই।

বলল, 'আমার ল্যাণ্ডলেডি আর তার মেয়েতে কি ঝগড়াটাই না লেগেছে যদি দেখতেন। মা নাচে যাচ্ছে, কিছুতেই মেয়েকে নিয়ে যাবে না। মেয়ে বলছে যাবেই।'

রায় জিজ্ঞেস করলেন, 'মায়ের বয়স কত রে?'

'চল্লিশ হয় নি বোধ হয়।'

'মেয়ের?'

'আঠারো হবে।'

রায় বললেন, 'তাই বল। এতে তোর এত বেকুব বনার কি আছে রে? মা মেয়ে যদি এক সঙ্গে নাচে যায় তবে মায়ের বয়স ভাঁড়াতে অসুবিধা হবে না?'

মৌলা বলল, 'কি ঘেন্না! মেয়েটাও দেমাক করে বলছিল, সে থাকলে নাকি মায়ের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। আমি ভাবলুম, রাগের মাথায় বলছে, কিন্তু কী ঘেন্না, মায়ে মেয়ে এই নিয়ে লড়াই! মৌলার বিহ্বলতা কেটে গিয়েছে আর তার জায়গায় দেখা দিয়েছে তেতো-তেতো ভাব।

আড্ডা তর্কাতর্কির বিষয় পেয়ে যেন রথের নারকোলের উপর লাফিয়ে পড়ল।

একদল বলে বাচ্চার জন্য মায়ের ভালোবাসা অনুন্নত সমাজেই পাওয়া যায় বেশী, অন্য দল বলে ভারতের একান্ন পরিবার সভ্যতার পরাকাষ্ঠা আর একান্ন পরিবার খাড়া আছে মা-জননীদের দয়ামায়ার উপর। লেডি-কিলার সরকারকে জর্মনরা বলত 'Schuerzenjaeger' অর্থাৎ 'এপ্রন-শিকারী', কাজেই সে যে মা মেয়ে সকলের পক্ষ নিয়ে লড়বে তাতে আর আশ্চর্য কি, আর গোঁসাই বিশ্বাস করেন যে, আমাদের মা যশোদার কাছে মা-মেরির মাদন্নারূপ নিতান্ত পানসে।

রায় তর্কে যোগ দেন নি। কথা কাটাকাটি কমলে পরে বললেন, 'অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? হবে হবে, কলকাতা বোম্বাই সর্বত্রই আস্তে আস্তে মায়ে মেয়ে রেষারেষি আরম্ভ হবে।'

তখন চাচা চোখ মেললেন। বললেন, 'সে কি হে রায় সায়েব? তুমিও একথা বললে? তার চেয়ে কথাটা পাল্টে দিয়ে বলো না কেন, জর্মনিতেও এক-দিন আর এ-লড়াই থাকবে না। এখনকার অবস্থা তো আর স্বাভাবিক নয়। বেশীর ভাগ ল্যাণ্ডলেডিই বিধবা, আর যাদের বয়স ষোলর উপরে তারাই বা বর জোটাবে কোত্থেকে? আরো বহুদিন ধরে চলবে কুরুক্ষেত্রের শত বিধবার রোদন। ১৪—১৮টা কুরুক্ষেত্রের চেয়ে কম কোন্ হিসেবে?'

গোঁসাই বললেন, 'কিন্তু—'

চাচা বললেন, 'তবে শোনো।'

কর্নেল ডুটেন্‌হফারের বাড়ি ছাড়ার বৎসর খানেক পরে হঠাৎ আমাকে টাকা-পয়সা বাবদে বিপদগ্রস্ত হতে হয়। তখনকার দিনে বার্লিনে পয়সা কামানো আজকের চেয়েও অনেক বেশী শক্ত ছিল। মনে মনে যখন ভাবছি ধন্নাটা কোন্ চাকরি নিয়ে শুরু করব, অর্থাৎ ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিট্যুটে অনুবাদকের, খবরের কাগজে কলামনিস্টের, না ইংরিজি ভাষার প্রাইভেট ট্যুটরের এমন সময়ে ফ্রলাইন ক্লারা ফন্ ব্রাথেলের সঙ্গে দেখা। আমি একটা অত্যন্ত নচ্ছার রেস্তোরাঁ থেকে বেরুচ্ছি, তিনি তাঁর মের্সেডেজ্ হাঁকিয়ে যাচ্ছেন। গাড়িতে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ক্লাইনার ইডিয়ট, কম্যুনিস্ট হয়ে গিয়েছ নাকি, এরকম প্রলেতারিয়া রেস্তোরাঁয় লবাব-পুত্তুর কি ভেবে?'

তোমরা জানো, আমাকে 'ক্লাইনার ইডিয়ট' অর্থাৎ 'হাবাগঙ্গারাম' বলার অধিকার ক্লারার আছে।'

আড্ডা ঘাড় নাড়িয়ে যা জানাতে চাইল তার অনুবাদ এককথায়,—'বিলক্ষণ।'

চাচা বললেন, 'ততদিনে আমার জর্মন শেখা হয়ে গিয়েছে। উত্তর দিলুম ডাকসাঁইটে কবিতায়,

'কাইনেন্ ট্রোপ্‌ফ্‌যেন্ ইন্ বেযার্ মেব্,
উন্‌ট্ ডাস্ বয়টেল্ শ্লাপ্ উন্‌ট্ লেব্ ॥

গেলাসেতে নেই এক ফোঁটা মাল আর।
ট্যাক ফাঁকা মাঠ, বেবাক পরিষ্কার ॥'

ক্লারা বললেন, 'পয়সা যদি কামাতে চাও তবে তার বন্দোবস্ত আমি করে দিতে পারি। আমার পরিচিত এক 'হঠাৎ-নবাবের' ছেলের যক্ষ্মা হয়েছে। একজন সঙ্গীর দরকার। খাওয়া-থাকা তো পাবেই, মাইনেও দেবে ভালো। ওরা থাকে রাইন-ল্যাণ্ডে। বার্লিনের তুলনায় গরমে সাহারা।'

আমি রাজী হলুম। দু'দিন বাদ টেলিফোনে চাকরি হয়ে গেল। হানোফার হয়ে কলন পৌঁছলুম।

মৌলা শুধাল, 'যেখান থেকে 'ও দ্য কলন' আসে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু দাম এখানে যা, কলনেও তা। তারপর কলনে গাড়ি বদল করে বন্ন্, বন্ন্ থেকে গোডেসবের্গ্। রাইন নদীর পারে। স্টেশনের চেহারাটা দেখেই জানটা তর্ হয়ে গেল। ভারী ঘরোয়া ঘরোয়া ভাব। ছোট্ট শহরখানির সঙ্গে জড়িয়ে মড়িয়ে এক হয়ে আছে। গাছপালায় ভর্তি—বার্লিনের তুলনায় সোঁদর বন।'

'হঠাৎ-নবাবই' বটে। না হলে জর্মনির আপন খাসা মের্সেডেজ থাকতে রোল্‌স্ কিনবে কেন? ড্রাইভার ব্যাটাও উর্দি পরেছে মানওয়ারি জাহাজের এ্যাডমিরালের।

কিন্তু কর্তা-গিন্নীকে দেখে বড় ভালো লাগল। 'হঠাৎ-নবাব' হোক আর যাই হোক আমাকে এগিয়ে নেবার জন্য দেখি দেউড়ির কাছে লনে বসে আছেন। খাতির যত্নটা যা করলেন, আমি যেন কাইজারের বড় ব্যাটা। দু'জনাই ইয়া লাশ—কর্তা বিয়ার খেয়ে খেয়ে, গিন্নী হুইপট্ ক্রীম গিলে গিলে। কর্তার মাথায় বিপর্যয় টাক আর গিন্নীর পা দু'খানা ফাইলেরিয়ায় ফুলে গিয়ে আগাগোড়া কোল-বালিশের মত একাকার। দু'জনেই কথায় কথায় মুচকি হাসেন—ছোট্ট মুখ দু'খানা তখন চতুর্দিকে গাদা গাদা মাংসের সঙ্গে যেন হাতাহাতি করে কোনো

গতিকে আত্মপ্রকাশ করে, এবং সে এতই কম যে তার ভিতর দিয়ে দাঁতের দর্শন মেলে না।

জিরিয়ে জুরিয়ে নেওয়ার পর আমি বললুম, 'এইবার চলুন, আপনাদের ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়ে যাক।' তখন কর্তা গিন্নীকে ঠেলেন, গিন্নী কর্তাকে। বুঝতে পারলুম ছেলের অসুখে তাঁরা এতই বিহ্বল হয়ে গিয়েছেন যে সামান্যতম কর্তব্যের সামনে দু'জনেই ঘাবড়ে যান—পাছে কোনো ভুল হয়ে যায়, পাছে তাতে করে ছেলের রোগ বেড়ে যায়।

যদি জানা না থাকত যে যক্ষ্মায় ভুগছে তাহলে আমি কার্লকে ওলিম্পিকের জন্য তৈরী হতে উপদেশ দিতুম। কী সুন্দর সুগঠিত দেহ—যেন গ্রীক ভাস্কর শাস্ত্র মিলিয়ে মেপেজুপে প্রত্যেকটি অঙ্গ নির্মাণ করেছেন, কোনো জায়গায় এতটুকু খুঁত ধরা পড়ে না আর সানবাথ নিয়ে নিয়ে গায়ের রঙটি আমাদের দেশের হেমন্তের পাকাধানের রঙ ধরেছে, চোখ দুটি আমাদেরি শরতের আকাশের মত গভীর আসমানি।

ঘরে আরেকটি প্রাণী উপস্থিত ছিল, নিতান্ত সাদামাটা চেহারা, কিন্তু স্বাস্থ্যবতী—রোগীর নার্স। গিন্নী আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমাদেরি শহর স্টুটগার্টের মেয়ে, সঙ্গে নিয়ে এসেছি। কার্লের সেবার ভাবনা আমাদের এতটুকুও ভাবতে হয় না। আপনি নিজেই দেখতে পাবেন।'

একে নিয়েই আমার অভিজ্ঞতা।'

লেডি-কিলার সরকার বলল, 'কিন্তু বললেন যে নিতান্ত সাদামাটা।'

রায় বললেন, 'চোপ।'

চাচা কোনো কথায় কান না দিয়ে বললেন, 'অভিজ্ঞতাটা এমনি মর্মন্তুদ যে সেটা আমি চটপট বলে ফেলি। এ জিনিস ফেনিয়ে বলার নয়।

মেয়েটির নাম সিবিলা। প্রথম দর্শনে নার্সদের কায়দামাফিক গম্ভীর সরকারি চেহারা নিয়ে টেম্পারেচারের চার্টের দিকে এমনি ভাবে তাকিয়েছিল যেন চার্টখানা হঠাৎ ডানা মেলে উড়ে যাবার চেষ্টা করলে সে সেটাকে খপ করে ধরে ফেলবে। কিন্তু দু'দিনের মধ্যেই টের পেলুম, সে কার্লকে যত না নিখুঁত সেবা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে তার চেয়ে ঢের বেশী প্রাণরস যোগাচ্ছে হাসিখুশী, গালগল্প দিয়ে। সাদামাটা চেহারা—কিন্তু সেটা যতক্ষণ সে অন্যের প্রতি উদাসীন ততক্ষণই—একবার কথা বলতে আরম্ভ করলে চোখমুখ যেন নাচতে থাকে, ড্যাবডেবে পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যে-রকম ধারা হয়। কারো কথা শোনার সময়ও এমন ভাবে তাকায়, মনে হয় যেন চোখ দিয়ে কথা গিলছে। তার উপর গানের

ফোয়ারা তার ছিল অন্তহীন ;—গ্যোটে, হাইনে, ম্যোরিকে, ক্ল্যকের্টের কথা, বেটোফেন, ব্রামস, শুমান, মেণ্ডেলজোনের সুর দিয়ে গড়া যে-সব গান সে কখনো কার্লের জন্য চেঁচিয়ে, কখনো আপন মনে গুনগুনিয়ে গেয়েছে তার অর্ধেক ভাণ্ডারও আমি অন্য কোনো এমেচারের গলায় শুনিনি।

কিন্তু কয়েক দিনের ভিতরেই লক্ষ্য করলুম, কথা বলার মাঝখানে সিবিলা আচমকা কেমন ধারা আনমনা হয়ে যায়, খানার টেবিলে হঠাৎ ছুরি কাঁটা রেখে দিয়ে দেয়ালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, আর প্রায়ই দেখি অবসর সময়ে রাইনের পারে একা একা বসে ভাবছে। দু-একবার নিতান্ত পাশ ঘেঁষে চলে গিয়েছি—সিবিলা কিন্তু দেখতে পায়নি। ভাবলুম নিশ্চয় প্রেমে পড়েছে। কিন্তু কখন, আর কার সঙ্গে ?

এমন সময় একদিন গিন্নী আমায় খাঁটি খবরটা দিলেন। ভদ্রমহিলা নিতান্ত বিপদগ্রস্ত হয়েই আমাকে সব কিছু বললেন, কারণ তাঁর স্বামী কার্লের অসুখের ব্যাপারে এমনি কাহিল হয়ে পড়েছিলেন যে গিন্নী খবরটা তাঁর কাছে ভাঙতে সাহস পাচ্ছিলেন না।

সিবিলা অন্তঃসত্ত্বা এবং অবিবাহিতা! পাঁচ মাস। আর বেশীদিন চলবে না। পাড়ায় কেলেঙ্কারি রটে যাবে।

আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হয় নি। আমি গিন্নীকে বললুম, 'সিবিলা চলে গেলেই পারে।'

গিন্নী বললেন, 'যাবে কোথায়, খাবে কি ? এ-অবস্থায় চাকরি তো অসম্ভব, মাঝখান থেকে নার্সের সার্টিফিকেটটি যাবে।'

আমি বললুম, 'তা হলে কর্তাকে না জানিয়ে উপায় নেই।'

গিন্নীর আন্দাজ ভুল ; কর্তা খবরটা শুনে দু'হাত দিয়ে মাথার চুল ছেঁড়েন নি, রেগেমেগে চেল্লাচেল্লিও করেন নি। প্রথম ডেকে পাঠালেন আমাকে। বললেন, 'সিবিলার সঙ্গে খোলাখুলি কথাবার্তা না বলে উপায় নেই। কিন্তু আমি মনিব, সে কর্মচারী এবং ব্যাপারটা সঙ্গিন। আপনার মত কেউ যদি মধ্যস্থ থাকে তবে বড় উপকার হয়। অথচ জিনিসটা আপনার কাছে অত্যন্ত অরুচিকর হবে বলে আপনাকে অনুরোধ করতে সাহস পাচ্ছি না।'

আমি রাজী হলুম।

সিবিলা টেবিলের উপর মাথা রেখে অঝোরে কাঁদল। কর্তা-গিন্নী দু'জনই খাঁটি লোক, সিবিলাকে এ বিপদ থেকে কি করে উদ্ধার করা যায় তার উপায় অনুসন্ধান করলেন অনেক কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হল না। তার কারণটাও আমি

বুঝতে পারলুম। এদিকে বিচক্ষণ সংসারী লোক পরিস্থিতিটা ঠাণ্ডা মাথায় কাবুতে আনার চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে গ্যোটে-হাইনের স্নেহ-প্রেমের কবিতায় ভরা, অনুভূতির ভাপে ঠাসা জালে-পড়া সবৎসা সচকিতা হরিণী। ইনি বলছেন 'পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে জাল ছেঁড়ো' ; ও বলছে 'ছোঁড়াছুঁড়ি করলে বাচ্চা হয়ত জখম হবে।' —ইনি জিজ্ঞেস করছেন, 'বাচ্চার বাপ কে ?' ও মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বোঝাচ্ছে, 'তাতে কোনো লাভ নেই, সে বিবাহিত ও অত্যন্ত গরীব।'

বুঝলুম, সিবিলার মনস্থির, সে মা হবেই।

কেঁদে কেঁদে টেবিলের একটা দিক ভিজিয়ে ফেলেছে।'

চাচা স্পর্শকাতর বাঙালী কাজেই তাঁর গলায় বেদনার আভাস পেয়ে আড্ডার কেউই আশ্চর্য হল না।

চাচা বললেন, 'দেশে আমার বোন অন্তঃসত্ত্বা হয়ে বাড়ি ফিরেছে। মা খুশী, বাবা খুশী। দু'দিন আগে নির্মম ভাবে যে-বোনের চুল ছিঁড়েছি তার জন্যে তখন কাঁচা পেয়ারার সন্ধানে সারা দুপুর পাড়া চষি। তার শরীরের বিশেষ যত্ন নেওয়ার কথা উঠলে সে মিষ্টি হাসে—কি রকম লজ্জা, খুশী আর গর্বে মেশানো। ছোট বোনরা কাঁথা সেলাই করে, আর বাবার বন্ধু বুড়ো কবরেজ মশায় দু'বেলা গলা খাঁকারি দিয়ে বাড়িতে ঢোকেন।

আর এ-মেয়েও তো মা হবে।

থাক সে-সব কথা। শেষটায় স্থির হল যে কিছুই স্থির করবার উপায় নেই। উপস্থিত সিবিলা কাজ করে যাক, যখন নিতান্তই অচল হয়ে পড়বে তখন তাকে নার্সিঙ-হোমে পাঠানো হবে। আমি পরে কর্তাকে বললুম, 'কিন্তু বাচ্চাটার কি গতি হবে সে কথাটা তো কিছু ভাবলেন না।' কর্তা বললেন, 'এখন ভেবে কোনো লাভ নেই। বিপদআপদ কাটুক, তখন বাচ্চার প্রতি সিবিলার কি মনোভাব সেইটে দেখে ব্যবস্থা করা যাবে।'

প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সিবিলা কাজ করেছিল। কিন্তু শেষের দিকে তার গান-গাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমার বোন এমনিতে গান গাইত না। সে শেষের দিকে গুন্ গুন্ করতে আরম্ভ করেছিল!

বাচ্চা হল। আহা, যেন একমুঠো জুঁই ফুল।

কিন্তু তখন আরম্ভ হল আসল বিপদ। বাচ্চাকে অনাথ আশ্রমে দিতে সিবিলা কিছুতেই রাজী হয় না। বলে, কোনো পরিবারে যেন সে আশ্রয় পায়। কিন্তু এরকম পরিবার পাওয়া যায় কোথায়? অনুসন্ধান করলে যে পাওয়া একেবারে অসম্ভব তা নয় কিন্তু জর্মনির সে দুর্দিনে, ইনফ্লেশনের গরমিতে মানুষের

বাৎসল্যরস শুকিয়ে গিয়েছে—আর তার চেয়েও বড় কথা, অতটা সময় আমাদের হাতে কই!

রোজ হয় ফোন, নয় চিঠি। নার্সিঙ-হোম্ বলে, সিবিলাকে নিয়ে যাও। এখানে বেড্ দখল করে সে শুধু আসন্ন-প্রসবাদের ঠেকিয়ে রেখেছে।

এদিকে কর্তা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন, পয়সা দিয়ে এজেন্সির লোককে লাগানো, আপন বন্ধুবান্ধবদের কাছে অনুসন্ধান কিছুই বাদ দেন নি। আমাকে পর্যন্ত দু'তিনবার কলন, ড্যুসেলডর্ফ হয়ে আসতে হল। নার্সিঙ-হোমের তাড়া খেয়ে কর্তার ভুঁড়ি গিয়ে আষ্টেক কমে গেল। কী মুশকিল!

সব কিছু জানতে পেয়ে তখন সিবিলাই এক আজব প্যাঁচ খেলে আমাদের দম ফেলার ফুর্সৎ করে দিল। নার্স তো বটে, এমনি এক বিদঘুটে ব্যামোর খাসা ভান করলে যে পাঠশালার মিটমিটে শয়তান আর হলিউডের ভ্যাম্পে মিললেও ফল এর চেয়ে ভালো ওতরাতো না। ক্লুট হামসুন বলেছেন, 'প্রেমে পড়লে বোকা বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে, বুদ্ধিমান বোকা হয়ে যায়'। সিবিলার মত ভিতরে বাইরে সাদামাটা মেয়ে বাচ্চার মঙ্গলের জন্য ফন্দিবাজ হয়ে উঠলো।

এমন সময় কর্তা—কারবারে যাকে বলে ভালো 'পার্টি'র খবর পেলেন। অগাধ পয়সা, সমাজে উঁচু, শিক্ষিত পরিবার কিন্তু আমাদের এজেন্ট বলল 'পার্টি' —অর্থাৎ ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী—কড়া শর্ত দিয়েছেন যে সিবিলা এবং আমাদের অন্য কেউ ঘুণাক্ষরে জানতে পাবে না, এবং কথা দিতে হবে যে জানবার চেষ্টা করবে না, যে কারা সিবিলার বাচ্চাকে গ্রহণ করলেন। এ শর্ত কিছু নূতন নয়, কারণ কল্পনা করা কিছু অসঙ্গত নয় যে সিবিলা যদি একদিন হঠাৎ তার বাচ্চাকে ফেরত চেয়ে বসে তখন নানা বিপত্তি সৃষ্টি হতে পারে। আর কিছু না হোক বাচ্চাটা যদি জানতে পেরে যায় তার আসল মা কে তাহলেই তো উৎকট সঙ্কট।

কর্তার মত ব্যবসায়ের পাঁজে পোড়-খাওয়া ঝামাও এ-প্রস্তাব নিয়ে নার্সিঙ-হোমে যান নি। সব কিছু চিঠিতে লিখে জানিয়েছিলেন। দু'দিন পরে উত্তর এল, সিবিলা রাজী।

মনস্থির করতে সিবিলার দু'দিন লেগেছিল। সে আটচল্লিশ ঘণ্টা তার কি করে কেটেছিল, জানি না। বাড়িতে আমরা তিনজন নিঃশব্দে লাঞ্চ-ডিনার খেয়েছি, একে অন্যে চোখাচোখি হলেই একসঙ্গে সিবিলার দ্বিতীয় প্রসব বেদনার কথা ভেবেছি। আইন মানুষকে এক পাপের জন্য সাজা দেয় একবার, সমাজ কতবার, কত বৎসর ধরে দেয় তার সন্ধান কোনো কেতাবে লেখা নেই, কোনো

বৃহস্পতিও জানেন না।

ট্রাঙ্ক কলে ট্রাঙ্ক কলে সব বন্দোবস্ত পাকাপাকি করা হল। কর্তা সিবিলাকে নিয়ে স্টেশনে যাবেন। 'পার্টি'র ওয়েট নার্স (ধাই) বাচ্চার জন্য ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করবে। সিবিলা স্টুটগার্টের ট্রেন ধরলে পর কর্তা বাচ্চাটিকে সেই ধাইয়ের হাতে সঁপে দেবেন। 'পার্টি' কড়াক্কড় জানিয়েছেন, সিবিলা যেন ওয়েট নার্সকেও না দেখতে পায়।

যে দিন সিবিলাকে নিয়ে স্টেশনে যাবার কথা সে-দিন দুপুর বেলা কার্লের গলা দিয়ে এক ঝলক রক্ত উঠল। ছ'মাস ধরে টেম্পারেচর, স্প্যুটাম কাবুতে এসে গিয়েছিল, এ-পি বন্ধ ছিল, তারপর হঠাৎ সাদা দাঁতের উপর কাঁচা রক্তের নিষ্ঠুর ঝিলিমিলি। আমরা তিনজনাই সামনে ছিলাম। কর্তারই কি একটা রসিকতায় হাসতে গিয়ে ব্যাপারটা ঘটল। ছেলের মন ভালো রাখবার জন্য ভদ্রলোক অনেক ভেবেচিন্তে রসিকতাখানা তৈরী করেছিলেন। অবস্থাটা বোঝো। আমি তাঁকে হাত ধরে নিজের ঘরে শুইয়ে দিয়ে ডাক্তারকে ফোন করতে ছুটলুম।

আমাকে কর্তা গিন্নী এতদিন ধরে যে-আদর আপ্যায়ন করেছেন তার বদলে যদি সে-সন্ধ্যায় আমি কর্তার বদলে সিবিলাকে নিয়ে স্টেশনে না যেতুম তাহলে নিছক নিমক-হারামি হত। হার্ট নিয়ে কর্তা আচ্ছন্নের মত পড়ে আছেন। আমি নার্সিঙ-হোম যাচ্ছি শুনে আমার হাতে সিবিলার ছ'মাসের জমানো মাইনে দিলেন। গিন্নী নিজের থেকে আরো কিছু, আর আপন হাতে বোনা বাচ্চার জন্য একজোড়া মোজা দিলেন।

গোডেসবের্গ ছোট শহর। কিন্তু নার্সিঙ-হোম থেকে স্টেশন যেতে হলে দুটি বড় রাস্তার উপর দিয়ে যেতে হয়। আমি স্টিয়ারিঙে, সিবিলা বাচ্চাকে নিয়ে পিছনে। ইচ্ছে করেই ড্রাইভারকে সঙ্গে নিই নি, এবং ট্রেনটাও বাছা হয়েছে রাত্রের, যাতে করে খামকা বেশী জানাজানি না হয়। তার মাইনে তাকে দিয়েছি ; মোজার মোড়ক যখন সে খুলল তখন আমি সে দিকে তাকাই নি।

আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছি—ঝাঁকুনিতে কাঁচা বাচ্চার অনিষ্ট হয় কি না হয় তা তো জানিনে। থেকে থেকে সিবিলা আমার কাঁধের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করছে, 'আপনি ঠিক জানেন যাঁদের বাড়িতে আমার বুবি যাচ্ছে তাঁরা ভালো লোক ?' আমি আমার সাধ্যমত তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছি আর ভাবছি কর্তা এলেই ভালো হত। তিনি সমস্ত জিনিসটা নিশ্চয়ই আরো গুছিয়ে করতে পারতেন।

সিবিলা একই প্রশ্ন বারে বারে শুধায়, তাঁরা লোক ভালো তো? আমি ভাবছি যদি শুধায় তাঁরা ভালো আমি কি করে জানলুম তা হলেই তো গেছি। আমার কেন কর্তারও তো সে-সম্বন্ধে কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। কিন্তু যখন সিবিলা সে প্রশ্ন একবারও শুধালো না তখন বুঝতে পারলুম, তার কাছে অজানার অন্ধকার আধা-আলোর দ্বন্দ্বের চেয়ে অনেক বেশী কাম্য হয়ে উঠেছে। জেরা করলে যদি ধরা পড়ে যায়—যদি ধরা পড়ে যায় যে আমার উত্তরে রয়েছে শুধু ফাঁকি? তখন? তখন সে মুখ ফেরাবে কোন্ দিকে, কোথায় তার সান্ত্বনা?

সিবিলা বলল, 'গাড়ি থামান একটু দয়া করে। ঐ তো খেলনার দোকান। আমার বুবির তো কোনো খেলনা নেই।' তাই তো, কর্তা, আমি দু'জনেই এদিকে একদম খেয়াল করি নি। কিন্তু এক মাসের শিশু কি খেলনা বোঝে?

এক গাদা খেলনা নিয়ে সিবিলা গাড়িতে ঢুকল।

দশ পা যেতে না যেতেই সিবিলা বলল, 'ঐ তো জামা কাপড়ের দোকান। বুবির তো ভালো জামা নেই। গাড়ি থামান।' থামালুম। এবার বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে সে দোকানে ঢুকলো, জিনিস বয়ে আনতে অসুবিধে হতে পারে ভেবে আমিও সঙ্গে গেলুম।

দোকানি যেটা দেখায় সেটাই কেনে। কোনো বাছবিচার না, দাম জিজ্ঞেস করা না। দোকানি পর্যন্ত কেনার বহর দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'বুবির এখন বাড়ন্ত বয়স, জামাগুলো দু'দিনেই ছোট হয়ে যাবে না?'

বলে করলুম পাপ। সিবিলা বলল, 'ঠিক তো,' আর কিনতে আরম্ভ করল সব সাইজের জামা, পাতলুন, মোজা, টুপি। আমি হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে শেষটায় বললুম, 'ফ্রলাইন সিবিলা, ট্রেনের বেশী দেরি নেই।' সিবিলা বলল, 'চলুন।'

আরো দশ পা। সিবিলা হুকুম করল, 'থামান।'

এবারে কি কিনল ভগবানই জানেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। দোকানপাট একটা একটা করে বন্ধ হতে আরম্ভ করেছে। সিবিলা বলে, 'থামান,' সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত গাড়ি থেকে নেবে পড়ে আর ছুটে গিয়ে দোকানিকে দরজা বন্ধ করতে বারণ করে। যে-দোকান দেখে বন্ধ হচ্ছে, ছুটে যায় সে-দোকানেরই দিকে। ছুটোছুটিতে চুল এলোথেলো হয়ে গিয়েছে, পাগলিনীর মত এদিক ওদিক তাকায়—সে একাই লড়বে সব দোকানির সঙ্গে। কেন? একদিনের তরে তারা দোকানগুলো দু'মিনিট বেশী খোলা রাখতে

পারে না? আমি বার বার অনুনয় করছি, 'ফ্রলাইন সিবিলা, বিট্টে বিট্টে, প্লীজ, প্লীজ, জায়েন জী ফেরনুন্‌ফ্‌টিষ্‌, এ কি করেছেন? গাড়ি ধরব কি করে?' সিবিলা কোনো কথায় কান দেয় না। আমার মাথায় কুবুদ্ধি চাপল, ভাবলুম একটু জোরজার করি। বললুম, 'এত সব জিনিসের কি প্রয়োজন?'

চকিতের জন্য সিবিলা বাঘিনীর ন্যায় রুখে দাঁড়াল। হুঙ্কার দিয়ে 'কী?' বলেই থেমে গেল। তারপর হঠাৎ ঝরঝর করে চোখের জল বেরিয়ে এল।'

চাচা বললেন, 'আমি ভগবানে বিশ্বাস করি। খোদার কাছে মনে মনে প্রার্থনা করলুম সিবিলার পরীক্ষা সহজ করে দেবার জন্য।'

তারপর আমি আর বাধা দিই নি। যায় যাক্ দুনিয়ার বেবাক ট্রেন মিস্ হয়ে। বিশ্বসংসার যদি তার জন্য আটকা পড়ে যায় তবে পড়ুক। আমি বাধা দেব না।

বোধ হয় টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে। সিবিলা আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের কাছে আমার আর কোনো পাওনা আছে?' আমি বললুম, 'না, কিন্তু আপনার যদি প্রয়োজন হয় তবে আমি দিতে পারি।' বলল, 'পাঁচটা মার্ক দিন, একখানা আ-বে-ৎসের বই কিনব।'

এক মাসের শিশু বই পড়বে।

গাড়ির পিছনটা জিনিসে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। সিবিলা বাচ্চাকে নিয়ে আমার পাশে বসল। তার হাতের বেলুন উড়ে এসে আমার স্টিয়ারিঙে বাধা দিচ্ছে। সিবিলার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

স্টেশনে যখন পৌঁছলুম তখন গাড়ি আসতে কয়েক মিনিট বাকি। গোডেসবের্গ ছোট স্টেশন, ডাকগাড়ি দু'মিনিটের বেশী দাঁড়ায় না। আমি বাচ্চাটাকে নেবার জন্য হাত বাড়ালুম, কোনো কথা না বলে। সিবিলা বলল, 'প্ল্যাটফর্মে চলুন, গাড়ি ছাড়লে পর—'। আমি কোনো কথা না বলে এগিয়ে চললুম।

পোর্টারই দেখিয়ে দিল কোন্ জায়গায় দাঁড়ালে সেকেণ্ড ক্লাস ঠিক সামনে পড়বে। আমি সিবিলাকে আরো পঞ্চাশটি মার্ক দিলুম।

সিবিলা সিগনেলের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। দূরের অন্ধকারের মাঝখানে তার দৃষ্টি ডুবে গিয়েছে। তার কোলে বুবি। ভগবানের জুঁই একরাতেই শুকিয়ে যায়, সিবিলার জুঁই যেন অক্ষয় জীবনের আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঘুমুচ্ছে।

সিবিলা আমার হাতে বাচ্চাকে তুলে দিল। এক মুহূর্তের তরে সব কিছু ভুলে গিয়ে বলল, 'আপনি তো বেশ বাচ্চা কোলে নিতে জানেন; আমাদের পুরুষরা তো পারে না।'

আমি আরাম বোধ করলুম। গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। পোর্টার সিবিলার সুটকেশ তুলে দিয়েছে।

হঠাৎ সিবিলা সেই পাথরের প্ল্যাটফর্মে হাঁটু গেড়ে আমার দু' হাঁটু জড়িয়ে হাহা করে কেঁদে উঠল। সে কান্নায় জল নেই, বাষ্প নেই। বিকৃত কণ্ঠে বলল—

'আমায় কথা দিন, ঈশ্বরের শপথ, কথা দিন আপনি বুবির খবর নেবেন সে ভালো আছে কি না। মা মেরির শপথ,—না, না, মা মেরির না—আপনার মায়ের শপথ, কথা দিন।'

আমি আমার মায়ের নামে শপথ করলুম। 'পার্টি' যা বলে বলুক, যা করে করুক।

পোর্টার হয়ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। সিবিলাকে আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে গাড়িতে তুলে দিল।

গাড়ির গায়ে চলার পূর্বের কাঁপন লেগেছে। এমন সময় আমার আর সিবিলার কামরার মাঝখান দিয়ে একটি মহিলা ধীরে সুস্থে ছোট্ট একটি ছেলের হাত ধরে ধরে চলে গেলেন। সিবিলা দোরে দাঁড়িয়েছিল, তাদের লক্ষ্য করল কি না বলতে পারি নে, হঠাৎ দরজা খুলে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল।

আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাচ্চা কেড়ে নিয়ে গাড়িতে উঠল।

আমি বাধা দিলুম না।'

তীর্থহীনা

ভারতবর্ষের লোক এককালে লেখাপড়া শেখবার জন্য যেত কাশী তক্ষশিলা। মুসলমান আমলেও কাশী-মাহাত্ম্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি, ছাত্রের অভাবও হয় নি। তবে সঙ্গে সঙ্গে আরবী-ফারসী শিক্ষারও দুটি কেন্দ্র দেওবন্দ আর রামপুরে গড়ে উঠল। ইংরেজ আমলে সব ক'টাই নাকচ হয়ে গিয়ে শিক্ষা-দীক্ষার মক্কা-মদিনা হয়ে দাঁড়াল অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ। ভটচায-মৌলবী কোন্ দুঃখে কাশী-দেওবন্দ উপেক্ষা করে ছেলে—এমন কি মেয়েদেরও—বিলেত পাঠাতে আরম্ভ করলেন তার আলোচনা করে আজ আর লাভ নেই।

কিন্তু ১৯২৯-এর অসহযোগ আন্দোলনের ফলে উল্টো হাওয়া বইতে শুরু করল। 'অসহযোগী' ছাত্রদের কেউ কেউ বিলেতে না গিয়ে গেল বার্লিন। এদের সংখ্যা বেড়ে বেড়ে শেষটায় ১৯২৯-এ এমন এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল যার উপর ভর করে একটা রেস্তোরাঁ চালান সম্ভবপর হয়ে উঠল। তাই বার্লিনে

'হিন্দুস্থান হৌসে'র পত্তন।

সেদিন 'হিন্দুস্থান হৌসে'র আড্ডা ভালো করে জমছিল না। কোত্থেকে এক পাদ্রীসায়েব এসে হাজির। খোদায় মালুম কে তাকে বলেছে, এখানে একগাদা হিদেন ঝামেলা লাগায়। প্রভু খ্রীষ্টের সুসমাচার শুনতে না শুনতেই এরা ঝাঁকে ঝাঁকে প্রভুর স্মরণ নেবে ও সুবে বালিনিস্থানে পাদ্রীসায়েবের জয়জয়কার পড়ে যাবে। অবশ্যি তাঁর ভুল ভাঙতে খুব বেশী সময় লাগে নি। গোঁসাই সঙ্গীতরসজ্ঞ, আর এ-দুনিয়ার তাবৎ সঙ্গীতই গড়ে উঠেছে ধর্মকে কেন্দ্র করে। কাজেই ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তিনি ধর্মবাবদে খানিকটা ওকিবহাল। বললেন, 'সায়েব, খ্রীষ্টধর্ম যে উত্তম ধর্ম তাতে আর কি সন্দেহ কিন্তু আমাদের কাছে তো শুধু এই ধর্মটাই ভোট চাইছে না, হিন্দু মুসলমান আরো দুটো ডাঙর কেণ্ডিডেট রয়েছে যে। গীতা পড়েছ?'

তখন দেখা গেল পাদ্রী কুরান পড়ে নি, গীতার নাম শোনে নি, আর ত্রিপিটক উচ্চারণ করতে গিয়ে তিনবার হোঁচট খেল।

ঘণ্টাখানেক তর্কাতর্কি চলেছিল। ততক্ষণে ওয়েট্রেস পাশের একটা বড় টেবিলে আড্ডার ডাল-ভাত-চচ্চড়ি সাজিয়ে ফেলেছে। চাচা পাদ্রীকে দাওয়াত করলেন হিদেন্-খানা চেখে দেখতে। সায়েব বিজাতীয় আহারের দিকে একটি-বার নজর বুলিয়েই অনেক ধন্যবাদ দিয়ে কেটে পড়ল।

চাচা বললেন, 'দেখলি, অচেনা রান্না পরখ করে দেখবার কৌতূহল যার নেই সে যাবে অজানা ধর্মের সন্ধানে! গোঁসাই, তুমি বৃথাই শক্তিব্যয় করছিলে।'

সুখ্যি রায় মাস্টার্ড পেতলে নিয়ে কাসুন্দীর মত করে লুচির সঙ্গে খেতে খেতে বললেন, 'ব্যাটা গ্যোটেও পড়ে নি নিশ্চয়। গ্যোটে বলেছেন, 'যে বিদেশ যায় নি সে কখন স্বদেশের স্বরূপ চিনতে পায় নি। ধর্মের বেলাও তাই।'

চাচা বললেন, 'কিন্তু অনেক কঠিন। ধর্মের গতি সূক্ষ্ম, কিন্তু বিদেশে যাওয়ার জন্য স্থূল ট্রেন রয়েছে, স্থূলতর জাহাজ রয়েছে, আর টমাস কুক্‌রা তো আছেই। বিদেশে নিয়ে যাবার জন্য ওরাই সবচেয়ে বড় আড়কাঠি অর্থাৎ মিশনরি। আর এতই পাকা মিশনরি যে ওরা সঙ্কলের পকেটে হাত বুলিয়ে দু' পয়সা কামায়ও বটে। কিন্তু ধর্মের মিশনরিদের হ'ল সব চেয়ে বড় দেউলে প্রতিষ্ঠান।'

লেডি-কিলার পুলিন সরকার বলল, 'কিন্তু কি দরকার বাওয়া এসব বখেড়ার? বালিন শহরটা তো ধর্ম বাদ দিয়েও দিব্যি চলছে।'

চাচা বললেন, 'বাদ দিতে চাইলেই তো আর বাদ দেওয়া যায় না। শোন।

আমি যখন রাইনল্যাণ্ডের গোডেস্‌বের্গ শহরে ছিলুম তখন ক্যাথলিক ধর্মের সঙ্গে আমার অল্প অল্প পরিচয় হতে আরম্ভ হ'ল। না হয়ে উপায়ও নেই। বার্লিনের হৈ-হুল্লোড় গির্জেগুলোকে ধামা চাপা দিয়ে রেখেছে আর রাইনল্যাণ্ডের গির্জার সঙ্গীত তামাম দেশটাকে বন্যায় ভাসিয়ে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

'দাঁড়ায়ে বাহির দ্বারে মোরা নরনারী
উৎসুক শ্রবণ পাতি শুনি যদি তারি
দু'য়েকটি তান—'

এ তো তাও নয়। এখানে সমস্ত দেশব্যাপী সঙ্গীতবন্যা আর তার মাঝখানে আমি ক্যাথলিক নই বলে শাখামৃগের মত একটা গাছের ডগায় আঁকড়ে ধরে বসে প্রাণ বাঁচাব এ ব্যবস্থা আমার কিছুতেই মনঃপূত হল না,—তার চাইতে বাউলের উপদেশই ভালো, 'যে জন ডুবলো সখী, তার কি আছে বাকি গো?'

সমস্ত সপ্তাহের অফুরন্ত কাজ, অস্বাভাবিক উত্তেজনা, বার্লিনের লোক খানিকটে ঠাণ্ডা করে সারা রবির সকাল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। কিন্তু রাইনের জীবন বিলম্বিত একতালে। তাই রবির সকাল রাইনের দ্রষ্টব্য বস্তু।

কাচ্চা-বাচ্চারা চলেছে রঙ-বেরঙের জামা কাপড় পরে, কতকগুলো করছে কিচির-মিচির, কতকগুলো বা মা-বাপের কথামত গির্জার গাম্ভীর্য জোর করে মুখে মাখবার চেষ্টা করছে, মেয়েরা যেতে যেতে দোকানের শার্সীতে চট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে হ্যাটটা আধ ইঞ্চি এ-দিক ও-দিক করে নিচ্ছে, গ্রামভারী গাঁও-বুড়োরা রবিবারের নেভিব্লু স্যুট পরে চলেছেন গিন্নীদের সঙ্গে ধীরে মন্থরে, আর যে সব অথর্ব বুড়ো-বুড়ী সপ্তাহের ছ'দিন ঘরে বসে কাটান তাঁরা পর্যন্ত চলেছেন লাঠিতে ভর করে নাতি-নাত্নীদের সঙ্গে, অথবা হুইল-চেয়ারে বসে ছেলে-ভাইপোর মোলায়েম ঠেলা খেয়ে খেয়ে—বাচ্চারা যেরকম-ধারা পেরেম্বুলেটরে করে হাওয়া খেতে বেরোয়। জোয়ানদের ভিতর গির্জায় যায় অপেক্ষাকৃত কম কিন্তু যারা যায় তাদের মুখে ফুটে উঠেছে প্রশান্ত ভাব—এরা গির্জার কাছ থেকে এখনো অনেক কিছু আশা করে, ধর্ম এখনো তাদের কাছে লোকাচার হয়ে যায় নি।

দোকান-পাট বন্ধ। রাস্তার কারবারি ভিড় নেই। শহর গ্রাম শান্ত, নিস্তব্ধ। তাই শোনা যাচ্ছে গির্জার ঘণ্টা—জনপদ, হাটবাট, তরুলতা, ঘরবাড়ি সবই যেন গির্জার চূড়ো থেকে ঢেলে-দেওয়া শান্তির বারিতে অভিষিক্ত হয়ে যাচ্ছে।'

চাচা থামলেন। বোধ করি বার্লিনের কলরবের মাঝখানে রাইনের সে ছবির বর্ণনা তাঁর নিজের কাছেই অদ্ভুত শোনাল। খানিকটে ভেবে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু এহ বাহ্য। ক্যাথলিক ধর্ম ক্রিশ্চানের দৈনন্দিন জীবনে কতটুকু ঠাঁই পেয়েছে

জানিনে, কিন্তু গির্জার ভিতরে তার যে রূপ সে না দেখলে, না শুনলে বর্ণনা দিয়ে সে-জিনিস বোঝাবার উপায় নেই।

মানুষ তার হৃদয়, তার চিন্তাশক্তি, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার শোকনৈরাশ্য দিয়ে বিরাট ব্রহ্মকে আপন করে নিয়ে কত রূপে দেখেছে তার কি সীমা-সংখ্যা আছে? ইহুদিরা দেখেছে য়েহোভাকে তাঁর রুদ্ররূপে, পারসিক দেখেছে আলো-আঁধারের দ্বন্দ্বের প্রতীকরূপে, ইরানি সুফী তাঁকে দেখেছে প্রিয়ারূপে, মরমিয়া বৈষ্ণব তাঁকে দেখেছে কখনও কৃষ্ণরূপে কখনও রাধারূপে আর ক্যাথলিক তাঁকে দেখেছে মা-মেরির জননীরূপে।

তাই মা-মেরির দেবী-মূর্তি লক্ষ লক্ষ নরনারীর চোখের জল দিয়ে গড়া। আর্ত পিপাসার্ত বেদনাতুর হিয়া যখন পৃথিবীর কোনোখানে আর কোনো সান্ত্বনার সন্ধান পায় না, তখন তার শেষ ভরসা মা-মেরির শুভ্র কোল। যে মা-মেরি আপন দেহজাত সন্তান কণ্টকমুকুটশির যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় পলে পলে মরতে দেখলেন তাঁর চোখের সামনে, তিনি কি এই হতভাগ্য কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়বেদনা বুঝতে পারবেন না? নশ্বর দেহ ত্যাগ করে তিনি আজ বসে আছেন দিব্য সিংহাসনে—তাঁর অদেয় কিছুই নেই, মানুষের অশ্রুবারি সপ্তসিন্ধু হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে হানা দিলেও তিনি সে-সপ্তসিন্ধু মুহূর্তের ভিতরেই করাঙ্গুলি নির্দেশে শুকিয়ে দিতে পারেন। তাই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ক্যাথলিক গির্জায় গির্জায়,

'ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা করুণাময়ী। তুমি প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করেছ। রমণী জাতির মধ্যে তুমিই ধন্য, আর ধন্য তোমার দেহজাত সন্তান যীশু। মহিমাময়ী মা-মেরি, এই পাপীতাপীদের তুমি দয়া কর, আর দয়া কর যেদিন মরণের ছায়া আমাদের চতুর্দিকে ঘনিয়ে আসবে।'

কত হাজার বার শুনেছি আমি এই প্রার্থনা। এই 'আভে-মারিয়া' উপাসনা-মন্ত্র খ্রীষ্টবৈরী ইহুদী সম্প্রদায়ের মেণ্ডেল্‌জোনকে পর্যন্ত যে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল তারই ফলে মেণ্ডেল্‌জোন সুর দিয়েছেন মেরিমন্ত্রকে। ক্যাথলিকরা সেই সুরে মেরিমন্ত্র গেয়ে বিশ্বজননীকে আবাহন করে অষ্টকুলাচলশিরে, সপ্তসমুদ্রের পারে পারে।

কত লক্ষবার শুনেছি আমি এই প্রার্থনা। পুরুষের সবলকণ্ঠে, বৃদ্ধার অর্ধস্ফুট অনুনয়ে, শিশুর সরল উপাসনায় মিলে গিয়ে যে মন্ত্র উচ্চারিত হয় সে মন্ত্র তখন আর শুধু ক্যাথলিকদের নিজস্ব প্রার্থনা নয়, সে প্রার্থনায় সাড়া দেয় সর্ব আস্তিক, সর্ব নাস্তিক।

হঠাৎ মন্ত্রোচ্চারণ ছাপিয়ে সমস্ত গির্জা ভরে ওঠে যন্ত্রধ্বনিতে। বিরাট অর্গান

সুরের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছে গির্জার শেষ কোণ, ভিজিয়ে দিয়েছে পাপীর শুষ্কতম হৃদয়। উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে উপরের দিকে সে-গম্ভীর যন্ত্ররব, আর তার সঙ্গে গেয়ে ওঠে সমস্ত গির্জা সম্মিলিত কণ্ঠে,

'ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা করুণাময়ী।'

সেই ঊর্ধ্বদিকে উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত সঙ্গীতের প্রতীক ঊর্ধ্বশির ক্যাথলিক গির্জা। মানুষের যে-প্রার্থনা যে-বন্দনা অহরহ মা-মেরির শুভ্রকোলের সন্ধানে ঊর্ধ্বপানে ধায় তারই প্রতীক হয়ে গির্জাঘর তার মাথা তুলেছে ঊর্ধ্বদিকে। লক্ষ লক্ষ গির্জার লক্ষ লক্ষ শিখর মা-মেরির দিব্যসিংহাসনের পার্থিব স্তম্ভ।'

চাচা চোখ বন্ধ করে কি যেন ভাবলেন। তার পর চোখ মেলে গোঁসাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গোঁসাই, রবিঠাকুরের সেই গানটা গাও তো,

'বরিষ ধরার মাঝে শান্তির বারি
শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে
ঊর্ধ্বমুখে নরনারী'।'

গোঁসাই গুন্‌গুন্ করে গান গাইলেন। গাওয়া শেষ হলে চাচা বললেন, 'গির্জার ক্যাথলিক ধর্মসঙ্গীত তোমরাও শুনেছ কিন্তু তার করুণ দিকটা কখন লক্ষ্য করেছ কি না জানিনে।

একদিন যখন আমি এই 'আভে মারিয়া' সঙ্গীতে গা ভাসিয়ে দিয়ে চিলের মত উপরের দিকে উঠে যাচ্ছি—বাহ্যজ্ঞান প্রায় নেই—তখন হঠাৎ শুনি আমার পাশে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। চেয়ে দেখি একটি মেয়ে চোখের জলে প্রেয়ার-বুক্ রাখার হাইবেঞ্চ আর তার পায়ের কাছে খানিকটে জায়গা ভিজিয়ে দিয়েছে। অর্গান আর পাঁচশ' গলার তলায় লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েটি আপন কান্না কেঁদে নিচ্ছে।

পূব-বাঙ্গলার ভাটিয়ালি গানে আছে রাধা ভেজাকাঠ জ্বালিয়ে ধুঁয়ো বানিয়ে কৃষ্ণ-বিরহের কান্না কাঁদতেন। শাশুড়ী ননদী জিজ্ঞেস করলে বলতেন, ধুঁয়ো চোখে ঢুকেছে বলে চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে। শুনেছি বাঙ্গালী মেয়েও নাকি নির্জনে কাঁদবার ঠাঁই না পেলে স্নানের ঘরে কল ছেড়ে দিয়ে তার সঙ্গে হাউ হাউ করে কাঁদে।

গির্জায় মেয়েটির কান্না দেখে আমি জীবনে প্রথম বুঝতে পারলুম, রাধার কান্না, বাঙ্গালী মেয়ের কান্না কত নিরন্ধ্র অসহায়তা থেকে ফেটে বেরোয়।

তখন বুঝতে পারলুম, গির্জা থেকে বেরবার সময় যে অনেক সময় দেখেছি এখানে ওখানে জলের পোঁচ সে ছাতার জল নয়, মেঝে ধোওয়ার জলও নয়, সে জল চোখের জল।

কুরান শরীফে আছে কুমারী মরীয়ম (মেরি) যখন গর্ভযন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়লেন তখন লোকচক্ষুর অগোচরে গিয়ে খেজুর গাছ জড়িয়ে ধরে তিনি লজ্জায় দুঃখে আর্তনাদ করেছিলেন, 'ইয়া লায়তানি, মিত্তু কবলা হাজা—হায়, এর আগে আমি মরে গেলুম না কেন ? মানুষের চোখের থেকে মন থেকে তাহলে আমি নিস্তার পেতুম।'

লোকচক্ষুর অগোচরে যাবারও যাদের স্থান নেই তাদের জন্য ভিজে কাঠের ধুঁয়ো আর স্নানের ঘরের কল খুলে দেওয়া।

তাই সর্ব অসহায় সর্ব বিপন্না নরনারীর চোখের জল মুক্তার হার হয়ে দুলছে মা-মেরির গলায়, তারই নাম 'আভে মারিয়া' মন্ত্র—'ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা করুণাময়ী'।'

গোঁসাই ভাল কীর্তন গাইতে পারেন ; সহজেই কাতর হয়ে পড়েন। বললেন, 'চাচা, আর না।'

চাচা বললেন, 'মেয়েটিকে চিনতে পারলুম। কার্লকে এক্স্‌রে করাতে গিয়ে ডাক্তারের ওয়েটিং-রুমে মেয়েটির মায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ভদ্রমহিলা মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলেন একই উদ্দেশ্যে। এরও যক্ষ্মা। তবে কি নিরাময় হবার জন্য কাঁদছিল ? কে জানে ?'

চাচা বললেন, 'তারপর এক মাস হয়ে গিয়েছে, এমন সময় নাস্তিক উইলির সঙ্গে রাস্তায় দেখা। আমার গির্জা যাওয়া নিয়ে সে হামেশাই হাসি-মস্করা করত, কিন্তু ক্যাথলিক ধর্মের মূল তত্ত্ব তার অজানা ছিল না। উইলি 'মুক্তপুরুষ' কিন্তু আর পাঁচজনের জন্য যে ধর্মের প্রয়োজন সে কথা সে মানত। আমায় জিজ্ঞেস করল আমি য়ুডাস টাডেয়াসের তীর্থে যাবার সময় তার মাসীমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব কি না ? আমি শুধালুম য়ুডাস টাডেয়াস তীর্থ সাপ না ব্যাঙ তার কোনো খবরই যখন আমার জানা নেই তখন সে তীর্থে আমার যাবার কোনো কথাই ওঠে না। শুনে উইলি যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল, 'সে কি হে, টাডেয়াস তীর্থের নাম শোনো নি আর ক্যাথলিকদের সঙ্গে তোমার দহরম-মহরম।'

তারপর উইলি আমায় সালঙ্কারে বুঝিয়ে দিল, রাইন-নদীর ওপারে হাইস্টার-বাথার রোট। সেখান থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে টাডেয়াস তীর্থ। সে তীর্থের দেবতা বল, পীর বল, বড়কর্তা হচ্ছেন সেণ্ট য়ুডাস টাডেয়াস। বড় জাগ্রত পীর। ভক্তিভরে ডাকলে পরীক্ষা তো নিশ্চিত পাস হবে, যথেষ্ট ভক্তি থাকলে জলপানিও পেতে পার। আর যদি মেয়েছেলে ঠাকুরকে ডাকে তবে সে নির্ঘাত বর পাবে—

আশী বছরের বুড়ীর পক্ষে বাইশ বছরের বর পাওয়াও নাকি ঠাকুরের কৃপায় সসিজ্-বিয়ার (অর্থাৎ ডালভাত)।

বুঝলুম ঠাকুর খাসা বন্দোবস্ত করেছেন। নদীর এ-পারের বন্ন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোকরারা যাবে তাঁর কাছে পরীক্ষা পাসের লোভে, মেয়েরা যাবে বরের লোভে —দু'দলে তীর্থে দেখা হবে। তার পর কন্দর্প ঠাকুর তো রয়েছেনই টাডেয়াস্ ঠাকুরের সহকর্মী হয়ে স্বর্গের একসিকিউটিভ কমিটিতে। অর্থাৎ এ তীর্থে যে মেয়ে পশ্চাৎপদ নয় তার কপালে সপ্তপদী আছেই আছে।

উইলি পইপই করে বুঝিয়ে দিল, তীর্থ না করে ক্যাথলিক ধর্মের মূলতত্ত্বে কেউ কখনো প্রবেশ করতে পারেনি—উইলির নিজস্ব ভাষায় বলতে গেলে, ক্যাথলিক ধর্ম যে কতটা কুসংস্কারে নিমজ্জিত তা তীর্থে না গিয়ে বোঝা যায় না। যীশুর ক্রস নিয়ে মাতামাতি, পোপকে বাবাঠাকুর বলে কলুর বলদের মত ঠুলি পরে তাঁর চতুর্দিকে ঘোরা তীর্থযাত্রার কুসংস্কারের কাছে নস্যি।

তাহলে তো যেতে হয়।

পাড়ার পাদ্রীসায়েবকে যখন আমার সুমতির খবর দিলুম তখন তিনি কিছু-মাত্র আশ্চর্য হলেন না। মনে হল, আমার যখন ধর্মে এত অচলা ভক্তি তখন যে আমি জব্বর পরবটাতে গরহাজির থাকব না তা তিনি আগের থেকেই ধরে নিয়ে-ছিলেন।

গোডেসবের্গ থেকে আমরা জন তিরিশেক দল বেঁধে পাদ্রীসায়েবের নেতৃত্বে ট্রাম ধরে বন্ন্ পৌঁছলুম। বেরবার সময় কার্লের মা আমার হাতে তুলে দিলেন প্রেয়ার-বুক্ বা উপাসনা-পুস্তিকা আর এক গাছা রোজারি বা জপ-মালা। বন্ন্ পৌঁছে দেখি সেখানেই তীর্থের ঝামেলা লেগে গিয়েছে। এক গোডেসবের্গেরই বিস্তর চেনা-অচেনা লোককে দেখতে পেলুম। এক আশী বছরের বুড়ীকে দেখে আমি ভয়ে আঁতকে উঠলুম—আমার বয়স তখন বাইশ। হয়ত উইলি ভুল বলে নি। পালাই পালাই করছি এমন সময় পাদ্রীসায়েব আমাকে জোর করে বসিয়ে দিলেন সেই যক্ষ্মারোগিণী আর তার মায়ের কাছে। মেয়েটির সঙ্গে আলাপও হল—ভুল বললুম, পরিচয় হল, কারণ সামান্যতম সৌজন্যের মৃদুহাস্য বা অভ্যর্থনা পর্যন্ত সে করল না।

উইলির মাসী ইতিমধ্যে না-পাত্তা। খবর নিয়ে শুনলুম, পীরের দর্গায় জ্বালাবার জন্য মোমবাতি কিনতে গিয়েছেন। সে কি কথা? বিলিতী পীরের খাসা ইলিকটিরি রয়েছে, মোমবাতির কি প্রয়োজন? আমাদের না হয় সাপের দেশ, বিজলি-বাতিও নেই—পিদিম মশাল না হ'লে পীরের অসুবিধা হয়। উইলি

ঠিকই বলেছে, ধর্ম মাত্রই মোমবাতির আধা-আলোর কুসংস্কারে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পছন্দ করে, বিজলির কড়া আলোতে আত্মপ্রকাশ করতে চায় না।

মাসীর আবার কড়া নজর। মোমবাতি কেনার ঠেলাঠেলিতেও আমার উপর চোখ রেখেছেন। জিজ্ঞেস করলেন, গ্রেটের সঙ্গে কি করে পরিচয় হল। তার পর মাসী যা বললেন তার থেকে গ্রেটের কান্নার অর্থ পরিষ্কার হল। গোসাঁইয়ের পদাবলীতে খণ্ডিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, বিপ্রলব্ধা নামের নানা নায়িকার পরিচয় আছে, এ বেচারী তার একটাতেও পড়ে না। এ মেয়ে বালবিধবার চেয়েও হত-ভাগিনী, এর বল্লভ হঠাৎ এক দিন উধাও হয়ে যায়। পরে খবর পাওয়া গেল পয়সার লোভে অন্যত্র বিয়ে করার জন্য গ্রেটেকে সে বর্জন করেছে। বালবিধবার অন্তত এটুকু সান্ত্বনা থাকে, তার প্রেম অবমানিত হয়নি।

মাসী বললেন, 'কিন্তু আশ্চর্য, পুরো দু'বৎসর আমরা কেউ বুঝতে পারিনি গ্রেটের প্রাণে কতটা বেজেছে। মেয়েটা চিরকালই হাসি-তামাশা করে সময় কাটাত—দু'বছর তাতে কোনো হেরফের হ'ল না। তারপর হ'ল যক্ষ্মা। তখন বোঝা গেল, যে-আপেলের ভিতরে পোকা সে আপেলটারই বাইরের রঙের বাহার বেশী।'

চাচা বললেন, 'আমি বাঙাল দেশের লোক। যা-তা নদী আমার চোখে চটক লাগাতে পারে না। তবু স্বীকার করি, রাইন নদী কিছু ফেলনা নয়। দু'দিকে পাহাড়, আর মাঝখান দিয়ে রাইন সুন্দরী নেচে নেচে চলে যাবার সময় দু'পাড়ে যেন দু'খানা সবুজ শাড়ি শুকোবার জন্য বিছিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। সে শাড়ি দু'-খানা আবার খাঁটি বেনারসী। হেথায় লাল ফুলের কেয়ারী হোথায় নীল সরো-বরের ঝলমলানি, যেন পাকা হাতের জরির কাজ।

আর সেই শাড়ির উপর দিয়ে আমাদের ট্রাম যেন দুষ্টু ছেলেটার মত কারো মানা না শুনে ছুটে চলেছে। মেঘলা দিনের আলোছায়া সবুজ শাড়িতে সাদা-কালোর আল্পনা এঁকে দিচ্ছে আর তার ভিতর চাঁপা রঙের ট্রামের আসা-যাওয়া —সমস্ত ব্যাপারটা যেন বাস্তব বলে মনে হয় না; মনে হয় হঠাৎ কখন রাইন সুন্দরীর ধমকে দুষ্টু ছেলেগুলো পালাবে, আর সুন্দরী তাঁর শাড়িখানা গুটিয়ে নিয়ে সবুজের লীলাখেলা ঘুচিয়ে দেবেন।

কিন্তু সবচেয়ে মুগ্ধ হলুম মোকামে পৌঁছে, ট্রাম থেকে নেমে সেখানে রাইনের দিকে তাকিয়ে। দেখি রাইনের বুকের উপর ফুটে উঠেছে দুটি ছোট ছোট পল্লব-ঘন দ্বীপ। তার পেলব সৌন্দর্য আমার মনে যে তুলনাটি এনে দিল, নিতান্ত বেরসিকের মনেও সেই তুলনাটাই আসত। তাই সেটা আর বলছি না—সর্বজন-

গ্রাহ্য তুলনা রসিয়ে বলতে পারেন যিনি যথার্থ গুণী—শিপ্রাবল্লভ কালিদাস এ রকম একজোড়া দ্বীপ দেখতে পেলে মেঘদূতকে আর অলকায় পাঠাতেন না, এইখানেই শেষবর্ষণ করতে উপদেশ দিতেন।'

লেডি-কিলার পুলিন সরকার কি একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সুষ্যি রায়ের ধমক খেয়ে চুপ করে গেল।

চাচা বললেন, 'হাইস্টারবাখার রোট থেকে টাডেয়াস্ তীর্থ আধ মাইল দূরে। এই পথটুকু নির্মাণ করা হয়েছে জেরুজালেমের 'ভিয়া ডলোরেসা' বা 'বেদনা-পথের' অনুকরণে। খ্রীষ্টের প্রাণদণ্ডের আদেশ জেরুজালেমের যে-ঘরে হয় সেখান থেকে তাঁর কাঁধে ভারি ক্রস চাপিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তাঁকে ক্রসের সঙ্গে পেরেক পুঁতে মারা হয়। এ পথটুকুর নাম 'ভিয়া ডলোরেসা'। ক্যাথলিক মাত্রেরই আশা, জীবনে যেন অন্তত একবার সে ঐ পথ বেয়ে ক্রুসভূমিতে উপস্থিত হতে পারে—যেখানে প্রভু যীশু সর্বযুগের বিশ্বমানবের সর্বপাপ স্কন্ধে নিয়ে কণ্টক-মুকুটশিরে আপন রক্তমোক্ষণ নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

কিন্তু জেরুজালেম যাওয়ার সৌভাগ্য বেশী ক্যাথলিকের হবে না বলেই তার অনুকরণে ক্যাথলিক জগতের সর্বত্র 'বেদনা-পথ' বানানো হয়। জেরুজালেমে এ পথের যেখানে শুরু তাকে বলা হয় প্রথম স্টেশন (পুণ্যভূমি) আর ক্রুসভূমিতে চতুর্দশ স্টেশন। এখানে তারই অনুকরণে চৌদ্দটি স্টেশনের প্রথমটি হাইস্টার-বাখার রোটের কাছে আর শেষটি টাডেয়াস্ তীর্থের গির্জার ভিতরে।'

চাচা বললেন, 'হাইস্টারবাখার রোটে সেদিন রাইনল্যাণ্ডের বহু দূরের জায়গা থেকে বিস্তর লোক এসে জড় হয়েছে, এখান থেকে পায়ে হেঁটে টাডেয়াস্ তীর্থে যাবে বলে। ছোট রেস্তোরাঁখানাতে বসবার জায়গা নেই দেখে আমি গাছ-তলায় বসে পড়েছি—গ্রেটে আর তার মা কোনো গতিকে দুটো চেয়ার পেয়ে বেঁচে গেছেন। হঠাৎ দেখি আমাদের পাদ্রীসায়েব গোডেসবের্গের যাত্রীদলের তদারক করতে করতে আমার কাছে এসে হাজির। ভদ্রলোক একটু নার্ভাস টাইপের—অর্থাৎ সমস্তক্ষণ হন্তদন্ত, কিছু একটা উনিশ-বিশ হলেই কপাল দিয়ে ঘাম বেরিয়ে যায়।

ধপ করে আমার পাশে বসে পড়লেন। আমি খানিকক্ষণ বাদে জিজ্ঞেস করলুম, 'এই দুর্বল শরীর নিয়ে গ্রেটের তীর্থযাত্রায় বেরনো কি ঠিক হল?'

পাদ্রীসায়েবের মাথায় ঘাম দেখা দিল। রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে বললেন, 'জানেন মা-মেরি; গ্রেটের মায়ের শেষ আশা যদি টাডেয়াসের দয়া হয় আর তার বর জোটে। ঐ তো একমাত্র পন্থা পুরোনো প্রেম ভোলবার। তা না হলে ও

মেয়ে তো বাঁচবে না।' পাদ্রীসায়েব চোখ বন্ধ করে মা-মেরির স্মরণে উপাসনা করলেন, 'ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা করুণাময়ী'!

জিরিয়েজুরিয়ে আমরাও শেষটায় রওয়ানা দিলুম তীর্থের দিকে। লম্বা লাইন—সকলের হাতে উপাসনাপুস্তিকা আর জপমালা। পাদ্রীসায়েব চেঁচিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন, 'ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা করুণাময়ী' আর যাত্রীদল বারবার ঘুরে ফিরে সেই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে সর্বশেষে ভক্তিভরে বলে,

'এই পাপীতাপীদের দয়া কর, আর দয়া কর যেদিন মরণের ছায়া আমাদের চতুর্দিক ঘনিয়ে আসবে।'

তারপর আমরা এক একটা করে সেই সব স্টেশন (পুণ্যভূমি) পেরতে লাগলুম। কোনটাতে পাদ্রীসায়েব চেঁচিয়ে বলেন, 'হে প্রভু, এখানে এসে ক্রসের ভার সইতে না পেরে তুমি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলে,' আর সমস্ত তীর্থযাত্রী করুণ কণ্ঠে বলে ওঠে, 'হে প্রভু, তোমার লুটিয়ে পড়াতেই আমাদের পরিত্রাণ হল।' কোনো পুণ্যভূমির সামনে পাদ্রীসায়েব বলেন, 'এখানে এসে তোমার সঙ্গে দেখা হল তোমার জননী মা-মেরির। দূর থেকে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছেন তোমার মৃত্যুদণ্ডাদেশ। এবার তিনি তোমার কাছে আসতে পেরেছেন কিন্তু কথা কইবার অনুমতি পাননি। তোমার দিকে তিনি তাকালেন—সে তাকানোতে কী পুঞ্জীভূত বেদনা কী নিদারুণ আতুরতা!' যাত্রীদল এককণ্ঠে বলে উঠল, 'মৃত্যুর চেয়েও ভালবাসা অসীম শক্তির আধার—স্টার্ক্ বী ডের টোট্ ইস্ট্ ডী লীবে।' কোনো পুণ্যভূমিতে পাদ্রীসায়েব বলেন, 'এখানে তাপসী ভেরোনিকা তাঁকে বস্ত্রখণ্ড এগিয়ে দিলেন, যীশু মুখ মুছলেন, আর কাপড়ে তাঁর মুখের ছবি ফুটে উঠল।' যাত্রীদল বলে, 'আমাদের হৃদয়ের উপর, হে প্রভু, তুমি সেই রকম ছবি এঁকে দাও।'

যাত্রীদল ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে আর প্রতি পুণ্যভূমির সামনে সবাই হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করে। পাদ্রীসায়েব পুণ্যভূমির স্মরণে চিৎকার করে তার বর্ণনা পড়েন, যাত্রীদল নম্রকণ্ঠে সেই ঘটনাকে প্রতীক করে প্রাণের ভিতর তার গভীর অর্থ ভরে নেবার চেষ্টা করে।

বনের ভিতর ঢুকলাম। দু'দিকে উঁচু পাইন গাছ ঠায় দাঁড়িয়ে। আমরা যেন মহাভাগ্যবান নাগরিকদল চলেছি রাজরাজেন্দ্র দর্শনে, আর এরা হতভাগ্যের দল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পল্লব দুলিয়ে কপালে করাঘাত করছে, না এরা চামরব্যজন করে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে? প্রার্থনার মৃদু গুঞ্জরণ মিশে গিয়েছে পাইন পল্লবের মর্মরের সঙ্গে আর জমে-ওঠা শুকনো পাইন পাতার গন্ধ মিশে গিয়েছে

যাত্রীদলের হাতের ধূপাধারের গন্ধের সঙ্গে।

খ্রীষ্ট আর মা-মেরির বেদনাকে কেন্দ্র করে এই যাত্রীদল, বিশ্বসংসারের তাবৎ ক্যাথলিক আপন দুঃখ-কষ্টের সান্ত্বনা খোঁজে, দুর্বলতার আশ্রয় খোঁজে, আপন নির্ভরের সন্ধান করে। রাধার বিরহবেদনায় বৈষ্ণব সাধু ভগবানকে না-পাওয়ার হাহাকার শুনতে পায়; সুফী সাধকের কান্নার গানও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে প্রিয়াবিরহের বেদনাকে কেন্দ্র করে।'

চাচা বললেন, 'গ্রেটের দিকে আমি মাত্র একবার তাকিয়েছিলুম অতি কষ্টে, সাহস সঞ্চয় করে। দেখি, সে চোখ বন্ধ করে মন্ত্রমুগ্ধের মত চলেছে, তার মা তার হাত ধরে তাকে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। তার দু'চোখ দিয়ে জল পড়ছে।'

চাচা বললেন, 'আমার ভক্তি কম। তাই বোধ হয় আড়নয়নে মাঝে মাঝে দেখে নিচ্ছিলুম দুপুর বেলাকার সাদা মেঘ অপরাহ্ণের শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন কালো কালো ওভার-কোট পরতে আরম্ভ করেছে। দশম কি একাদশ পুণ্য-ভূমির সামনে হঠাৎ জোর হাওয়া বইতে আরম্ভ করল আর সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি—জর্মনে যাকে বলে 'বল্কেনব্রুখ' অর্থাৎ মেঘ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল। ছাতা-বরসাতী অল্প লোকেই সঙ্গে এনেছিল—এবার প্রাণ যায় আর কি? ভাগ্যিস সেখান থেকেই তীর্থযাত্রীদের জন্য যে-সব রেস্তোরাঁ তার প্রথমটা অতি কাছে পড়েছিল। তবু রেস্তোরাঁতে গিয়ে যখন ঢুকলুম তখন আমাদের অধিকাংশই জবুথবু। পাদ্রীসায়েব গ্রেটেকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন দু'খানা বরসাতী দিয়ে। তার মা ছাতা ধরেছিলেন আর পাদ্রীসায়েব গ্রেটেকে বুকের ভিতরে যেন গুঁজে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকলেন। পাদ্রীদের শরীর তাগড়া—যীশুখ্রীষ্টের এত বড় গির্জা যখন তাঁদের কাঁধের উপর থেকে পড়ে ভেঙে যায়নি তখন গ্রেটে তো তার কাছে চরকাকাটা বুড়ীর সুতো।

'রথ দেখা আর কলা-বেচা' না কচু। তাতে হয় ধর্ম আর অর্থ। কিন্তু যদি বলা হত 'রথ দেখা আর প্রিয়ার কণ্ঠালিঙ্গন' তাহলে হয় ধর্ম আর কাম, আর তাতেই আছে আসল মোক্ষ। রেস্তোরাঁয় ঢুকে তত্ত্বটা মালুম হল।

রেস্তোরাঁ এতই বিশাল যে সেটাকে নৃত্যশালা বলাই উচিত। দেখি শ'-খানেক ছোঁড়াছুঁড়ি, বুড়োবুড়ী ধেই ধেই করে নাচছে, বিয়ারের ফোয়ারা বইছে আর শ্যাম্পেনে শ্যাম্পেনে ছয়লাপ। আর সবাই তখন এমনই মৌজে যে আমাদের দল ভিজে কাকের মত ঢুকতেই চিৎকার করে সবাই অভিনন্দন জানাল। ধাক্কা-ধাক্কি ঠাসাঠাসি করে আমাদের জন্য জায়গা করে দেওয়া হল, গায়ে পড়ে আমাদের জন্য পানীয় কেনা হল, আহা, আমরা যেন সব লঙ লস্ট ব্রাদার্স—

বহুদিনের হারিয়ে-যাওয়া ফিরিয়ে-পাওয়া ভাই।

এতে চটবার কি আছে, বল? ধর্মকর্ম করতে গেলেই যে মুখ গুমশো করে সব কিছু করতে হবে সে কথা লেখে ধর্মবিধির কোন্ ধারায়? এমন কি আদালতেও দেখোনি যেখানে খুনের মোকদ্দমা হচ্ছে সেখানেও জজ-ব্যারিস্টাররা ঠাট্টামস্করা করেন।

গ্রেটের মা, গ্রেটে, পাদ্রীসায়েব আর আমি একখানা টেবিল পেয়ে গেলুম জানালার কাছে। বাইরে তখন বৃষ্টি আর ঝড়, আর জানালার খড়খড়ানি থেকে বুঝতে পারছি ঝড় বেড়েই যাচ্ছে, বিদ্যুতের আলোতে দেখলুম রাস্তা জনমানবহীন, এক হাঁটু জল জমে গিয়েছে।

তাতে কার কি এসে যায়। গান ফুর্তি তো চলছে। 'ট্রিঙ্ক, ট্রিঙ্ক, ট্রিঙ্ক ক্র্যাডারলাইন—পিয়ো, পিয়ো বঁধুয়া, পিয়ো আরবার' শতকণ্ঠে গান উঠছে, পিয়ো পিয়ো বঁধুয়া। এরা সব গান গাইতে পারে ভালো,—গির্জেয় এদের ধর্মসঙ্গীত গাওয়ার অভ্যাস আছে। যে শিবলিঙ পুজোর জন্য দেবতা হন তাঁকে দিয়ে মশারির পেরেক ঠুকলে তিনি কি আর গোসা করে বাড়িঘরদোর পুড়িয়ে দেন? রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, আমাদেরই বাগানের ফুল 'কেহ দেয় দেবতারে, কেহ প্রিয়জনে।' দু'জনকে দিতেও তিনি আপত্তি করতেন না নিশ্চয়ই।

পাদ্রীসায়েব আমাকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে যেতে লাগলেন। আমাদের তিনমাসের পরিচয়ের মধ্যে একদিন একবারের তরেও তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল দেখাননি। আজ এই শরাব-খানায় হঠাৎ যে কেন তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা বেড়ে গেল বুঝতে পারলুম। দরদী মানুষ; গ্রেটের মন ভোলাবার জন্য সব কিছু করতেই রাজী আছেন। আমিও কলকাতাতে যে হাতী-ট্যাক্সি পাওয়া যায় এবং তার ভাড়া দিতে হয় হাতীকে কলা খাইয়ে, সে-কথা বলতে ভুললুম না। বোধ করি গ্রেটেও ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমার সম্মান রাখার জন্য দু'একবার হেসেছিল। একবার আমায় জিজ্ঞেসও করল আমি বুদ্ধদেব সম্বন্ধে কি কি পড়েছি? আমি অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলুম সে কিছু পড়েছে কিনা। ততক্ষণে তার মন আবার অন্য কোন দিকে চলে গিয়েছে। দু'বার জিজ্ঞেস করার পর শুধু বলল 'হুঁ'। বুঝলুম হতভাগিনী শান্তির সন্ধানে অনেক দুয়ারেই মাথা কুটেছে।

সেখানেই ডিনার খাওয়া হল। এ জলঝড়ে তীর্থ মাথায় থাকুন, বাড়ি ফেরার কথাই কেউ তুললো না। শেষ ট্রাম ছাড়ে দশটায়। রাত তখন এগারোটা।

হঠাৎ গ্রেটে পাদ্রীসায়েবকে শুধাল, 'ক'টা বেজেছে?'

পাদ্রীসায়েব একেই নার্ভাস লোক তার উপর এই জলঝড়ে তাঁর সব কিছু ঘুলিয়ে গিয়েছিল। দশ মিনিট পর পর জানালা দিয়ে দেখছিলেন বৃষ্টি কমবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কিনা—আমি প্রতিবারেই ভেবেছি তীর্থযাত্রীর শেষরক্ষা করার জন্য সায়েবের এই ছটফটানি।

গ্রেটের প্রশ্ন শুনে তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে দরজা খুলে সেই ঝড়ের মাঝখানে বেরিয়ে পড়লেন। আমি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বিদ্যুতের আলোকে দেখলুম, বাতাসের ঠেলায় পাইন গাছগুলো কাত হয়ে এ ওর গায়ে মাথা কুটছে, আর পাদ্রীসায়েব কোমরে দু'ভাঁজ হয়ে কোনো অজানার সন্ধানে চলেছেন।

আমি ফের টেবিলে এসে বসলুম। মা মেয়ে দু'জনই চুপ। আমার মুখ দিয়েও কোনো কথা বেরুচ্ছিল না।

এ ভাবে কতক্ষণ কাটল জানিনে। ঘণ্টা খানেক হতে পারে—অল্পবিস্তর এদিক ওদিক। পাদ্রীসায়েব ফিরে এসে আমাদের কাছে দাঁড়ালেন। তাঁর গায়ের একটি লোম পর্যন্ত শুকনো নয়। বললেন, 'জলঝড়ের জন্য কাউকে খুঁজে পেলুম না, গির্জে বন্ধ করে সবাই চলে গিয়েছে। আর এ জলে তুমি যেতেই বা কি করে?'

পাদ্রীসায়েব আরো কি যেন বলছিলেন, টাডেয়াসকে সব জায়গা থেকেই স্মরণ করা যায়, তিনি অন্তর্যামী এরকম ধারা কিছু, কিন্তু তাঁর কথার মাঝখানে হঠাৎ গ্রেটে উঠে দাঁড়াল। জলঝড়ের ভিতর দিয়েও শব্দ এল গির্জার বারোটার ঘণ্টা। গ্রেটে শুনতে পেয়েছে, মন দিয়ে শুনেছে। মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মা, তোমাকে তখনই বলেছিলুম, আমি আসব না। তবু তুমি আমায় জোর করে নিয়ে এলে। ঐ শুনলে বারোটা বাজার ঘণ্টা? পরব শেষ হল। যুডাস টাডেয়াস্ আমাকে তাঁর তীর্থে যেতে দিলেন না। তিনি তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। আমি জানতুম, আমি জানতুম, এ রকমই হবে। এখন আমি কোথায় যাবো গো, মাগো, হে মা-মেরি—'

গ্রেটের গলা থেকে ঘড়ঘড় করে কি রকম একটা অদ্ভুত শব্দ বেরল। পাদ্রীসায়েব জড়িয়ে না ধরলে সে পড়ে যেত।'

চাচা থামলে পর অনেকক্ষণ ধরে কেউ কিছু বলল না। শেষটায় বয়সে সকলের ছোট গোলাম মৌলা জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটার আর কোনো খবর নেন নি?'

চাচা বললেন, 'না, তবে মাস দুই পরে আরেকদিন গির্জায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি গ্রেটের মা। পরনে কালো পোশাক।'

বেল-তলাতে দু-দু'বার

বার্লিন শহরে 'হিন্দুস্থান হৌসের' আড্ডা সেদিন জমিজমি করে জমছিল না। নাৎসিদের প্রতাপ দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে। আড্ডার তাতে কোনো আপত্তি নেই, বরঞ্চ খুশী হবারই কথা। নাৎসিরা যদি একদিন ইংরেজের পিঠে দু'চার ঘা লাগাতে পারে তাতে অন্তত এ-আড্ডার কেউ বেজার হবে না। বেদনাটা সেখানে নয়, বেদনাটা হচ্ছে দু'একটা মূর্খ নাৎসি নিয়ে। ফর্সা ভারতীয়কে তারা মাঝে মাঝে ইহুদি ভেবে কড়া কথা বলে, আর এক নাক-বাঁকা নীল-চোখো কাশ্মীরীকে তারা নাকি দু'একটা ঘুষিঘাষাও মেরেছে।

আড্ডার চ্যাংড়া সদস্য গোলাম মৌলা এ-সব বাবদে নাৎসিদের চেয়েও অসহিষ্ণু। বলল, 'আমরা যে পরাধীন সে-কথা সবাই জানে। তবে কেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া? এক ব্যাটা নাৎসি সেদিন আমার সঙ্গে তর্কে হেরে গিয়ে চটেমটে বলল, 'তোমরা তো পরাধীন, তোমরা এসব নিয়ে ফপরদালালি কর কেন?' নাৎসিদের তর্ক করার কায়দা অদ্ভুত।'

পুলিন সরকার বলল, 'তা তুই বললি না কেন, পরাধীন বলেই তো বাওয়া, ভারতবর্ষে কলকব্জা বেচে আর ইনসিওরেন্স কোম্পানী খুলে দু'পয়সা কামিয়ে নিচ্ছো। ভারতবর্ষের লোক তো আর হটেনটট্ নয় যে, স্বরাজ পেলেও কল-কব্জা বানাতে পারবে না? জানিস, সুইটজারল্যাণ্ডে এখন জাপানী ঘড়ি বিক্কিরি হয়।'

বিয়ারের ভিতর থেকে সূর্য্যি রায় বললেন,

' 'নাই তাই খাচ্ছো,
থাকলে কোথা পেতে?'
কহেন কবি কালিদাস
পথে যেতে যেতে।'

কাটা-ন্যাজের ঘাতে যে মাছিগুলো পেট ভরে খেয়ে নিচ্ছিল তারাও তাই নিয়ে গরুটাকে কটু-কাটব্য করেনি। নাৎসিদের বুদ্ধি ঐ রকমেরই। যে হাত খাবার দিচ্ছে সেইটেকেই কামড়ায়। নাৎসিদের তুলনায় ইংরেজ সম্বন্ধীরা ঘুঘু—ভারতবর্ষের পরাধীনতাটার সঙ্গে ব্যবহার করে যেন বাড়ির ছোট বউ। মাঝে মাঝে গলা খাঁকারি দেয় বটে কিন্তু তিনি যে আছেন সে-কথাটা কথাবার্তায় চাল-চলনে আকসারই অস্বীকার ক'রে যায়।'

চাচা গলাবন্ধ কোটের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে ছিলেন। তাঁর ন্যাওটা ভক্ত গোসাঁই জিজ্ঞেস করল, 'চাচা যে রা কাড়ছেন না?'

চাচা চোখ না খুলেই বললেন, 'আমি ওসবেতে নেই। আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েছে।'

সবাই অবাক। গোসাঁই জিজ্ঞেস করল, 'সে কি কথা? নাৎসিরা তো দাবড়াতে আরম্ভ করেছে মাত্র সেদিন। এর মাঝে কিছু একটা হলে তো আমরা খবর পেতুম।'

কথাটা সত্য। চাচার গলাবন্ধ কোট, শ্যামবর্ণ চেহারা, আর রবিঠাকুরী বাবরী বার্লিন শহরের হাই-কোর্ট। যে দেখেনি তার বাড়ি পদ্মার হে-পারে। চাচার উপর চোটপাট হলে একটা আন্তর্জাতিক না হোক আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

চাচা বললেন, 'তোরা তো দেখছিস নাৎসিদের দ্বিজত্ব। তাদের পয়লা জনম হয়েছিল মিউনিকে। আমি তখন—'

জব্বলপুরের শ্রীধর মুখুয্যে অভিমানভরে বলল, 'চাচা, আপনি কি আমাদের এতই বাঙাল ঠাওরালেন যে আমরা পুচ্‌শের (Putsch) খবরটা পর্যন্ত জানিনে?'

চাচা বললেন, 'এহ বাহ্য, আমি তারও আগেকার কথা বলছি। এই ভুশুণ্ডি সুয্যি রায় আর আমি তখন মিউনিকে পাশাপাশি বাড়িতে থাকতুম। মিউনিক বললে ঠিক কথা বলা হ'ল না। আমরা থাকতুম মিউনিক থেকে মাইল পনরো দূরে, ছোট্ট একটা গ্রামে—ডেলি প্যাসেঞ্জরি করলে সব দেশেই পয়সা বাঁচে। আমি থাকতুম এক মুদির বাড়িতে। নিচের তলায় দোকান, উপরে তিন ছেলে, এক মেয়ে, আর আমাকে নিয়ে মুদির সংসার।

মুদির সংসারটির দুটি মহৎ গুণ ছিল—কাচ্চা বাচ্চা বাপ মা সকলেরই ঠাট্টা-মস্করার রসবোধ ছিল প্রচুর আর ওস্তাদী সঙ্গীতের নামে তারা অজ্ঞান। বড় ছেলে অস্কার বাজাত বেয়ালা, মেয়ে করতাল-ঢোল, বাপ পিয়ানো আর মেজো ছেলে হুবের্ট চেল্লো। কাজকর্ম সেরে দু'দণ্ড ফুরসৎ পেলেই কনসার্ট—কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঠাট্টা-মস্করা।

কিন্তু এদের মধ্যে আসল গুণী ছিল অস্কার। তবে তার গুণের সন্ধান পেতে আমার বেশ কিছুদিন লেগে গিয়েছিল—কারণ অস্কারকে পাওয়া যেত দুই অবস্থায়। হয় টং মাতাল, নয় মাথায় ভিজে পট্টি বাঁধা। তখন সে প্রধানতঃ আমাকে লক্ষ্য করেই বলত,

'ডু ইণ্ডার, ওরে ভারতবাসী কালা শয়তান, তোরা যে মদ খাস্‌নে সেইটেই তোদের একমাত্র গুণ। তোর সঙ্গে থেকে থেকে আর কাল রাত্রির বাইশ গেলাসের পর—'

মেয়ে মারিয়া আমাকে বলল, 'বাইশ না বিয়াল্লিশ জানল কি করে? পনরোর পর তো ও আর হিসেব রাখতে পারে না।'

মা বলল, 'তাই হবে। কাল রাত্রে চারটের সময় অস্কার বাড়ি ফিরে তো হড় হড় করে সব বিয়ার গলাতে আঙুল দিয়ে বের করে নিচ্ছিল। বোধ হয় সন্দেহ হয়েছিল মদওয়ালা যে বাইশ গ্লাসের দাম নিল তাতে কোনো ফাঁকি নেই তো! বমি করছিল বোধ হয় মেপে দেখবার জন্য।'

অস্কার বলল, 'ওসব কথায় কান দিয়ো না হে ইণ্ডার (ভারতীয়)। দরকারও আর নেই। আমি এই সর্বজনসমক্ষে মা-মেরির দিব্যি কেটে বললুম, আর কক্‌খনো মদ স্পর্শ করব না। মদ মানুষকে পরের দিন কি রকম বেকাবু করে ফেলে এই ভিজে পট্টিই তার লেবেল। বাপ রে বাপ, মাথাটা যেন ফেটে যাচ্ছে।'

ভিজে পট্টিতেও আর কুলোল না। অস্কার কল খুলে মাথাটি নিচে ধরল।

সেখান থেকেই জলের শব্দ ডুবিয়ে অস্কার হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'কিন্তু আমাকে বিয়ারে ফাঁকি দিয়ে পয়সা মারবে কে শুনি? হুঁঃ। বক্সিং-এর পয়লা প্রাইজের কথা কি মদওয়ালা ভুলে গিয়েছে? তার হোটেলের বাগানেই তো, বাবা, ফাইনালটা হলো। ব্যাটার নাকটা এমনিতেই থ্যাবড়া, আমার বাঁ'হাতের একখানা সরেস আণ্ডার-কাট খেলে সে-নাক মিউনিক-বার্লিন সদর রাস্তার মত ফেলেট্ হয়ে যাবে না?'

কথাটা ঠিক। বিয়ারওয়ালা বরঞ্চ ইনকামটেক্স অফিসারকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করতে পারে—'আভেমারিয়া' মন্ত্র কমিয়ে সমিয়ে ভগবানকে ফাঁকি প্রতি রবিবারে গির্জেঘরে সে দেয়ই, না হলে সময় মত দোকান খুলবে কি করে?—কিন্তু বিয়ার নিয়ে অস্কারের সঙ্গে মস্করা ফস করে কেউ করতে যাবে না।

ঢক ঢক করে এক গেলাস নেবুর সরবৎ খেয়ে অস্কার বলল, 'মাথার ভিতর যেন এ্যারোপ্লানের প্রপেলার চলছে, চোখের সামনে দেখছি গোলাপী হাতী সারে সারে চলছে, জিবখানা যেন তালুর সঙ্গে ইস্ক্রু মারা হয়ে গিয়েছে, কানে শুনছি মা যেন বাবাকে ঠ্যাঙাচ্ছে।'

মুদি বলল, 'ভাল হোক মন্দ হোক, আমার তো একটা আছে, তুই তো তাও

জোটাতে পারলি নে।'

অস্কার কান না দিয়ে বলল, 'কিন্তু আর বিয়ার না। মা-মেরি সাক্ষী, পীর রেমিগিয়ুস সাক্ষী, কালা শয়তান ইণ্ডার সাক্ষী, আর বিয়ার না।'

অস্কারকে সকাল বেলা যে কোনো মদ্য নিবারণী সভার বড়কর্তা বানিয়ে দেওয়া যায়। সন্ধ্যের সময় বিয়ারের জন্য সে আলকাপোনের ডাকাতদলের সর্দারী করতে প্রস্তুত। আমি পকেট-ডায়েরি খুলে পড়ে বললুম, 'অস্কার, এই নিয়ে তুমি সাতাশী বার মদ ছাড়ার প্রতিজ্ঞা করেছ।'

অস্কার বলল, 'যাঃ! তুই সাতাশী পর্যন্ত গুনতেই পারিসনে। ভারতবর্ষে অশিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা সাতাশী। তুই তো তাদেরি একজন। ওখানে পাঠশালা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে বলেই তো এদেশে এসেছিস। তুই সাতাশীতে ঘুলিয়ে ফেলেছিস।'

মুদির মা বলল, 'অস্কার চাকরি পেয়েছে আঠারো বছর বয়সে। সেই থেকে প্রতি রাত্রেই বিয়ার, ফি সকাল মদ ছাড়ার শপথ। এখন তার বয়স বাইশ। সাতাশীবার ভুল বলা হল।'

অস্কার বলল, 'ঐ যাঃ! বেবাক ভুলে গিয়েছিলুম আজ আমাদের কারখানায় সালতামামী পরব—বিয়ার পার্টি। চাকরির কথায় মনে পড়ল। কিন্তু না, না, না, আর বিয়ার না। দেখো, ইণ্ডার, আজ যদি পার্টির কোনো ব্যাটা আসে তবে তুমি ভারতীয় কায়দায় তাকে নরবলি দেবে।' '

চাচা বললেন, 'আমি আজও বুঝতে পারিনে অস্কার এই পট্টিবাঁধা মাথা নিয়ে কি করে প্রেসিশন মেশিনারির কাজ করত। মদ খেলে তো লোকের হাত কাঁপে, চোখের সামনে গোলাপী হাতী দেখে। অস্কার এক ইঞ্চির হাজার ভাগের এক ভাগ তা হলে দেখতই বা কি করে আর বানাতোই বা কি কৌশলে? এত সূক্ষ্ম কাজ করতে পারত বলে তাকে মাত্র দু'ঘণ্টা কারখানায় খাটতে হত। মাইনেও পেত কয়েক তাড়া নোট। তাই দিয়ে খেত বিয়ার আর করত দান খয়রাত। দ্বিতীয়টা হরবকত। মৌজে থাকলে তো কথাই নেই, পট্টিবাঁধা অবস্থায় ও মোটর সাইকেল থেকে নেবে বুড়ী দেশলাইওয়ালীর কাছ থেকে একটা দেশলাই কিনে এক ডজনের পয়সা দিত।

অস্কার ছিল পাড় নাৎসি। আমাকে বলত, 'এ সব ভিখিরি আতুরকে কেন যে সরকার গুলি করে মারে না একথাটা এখনো আমি বুঝে উঠতে পারিনে। সমস্ত দেশের কপালে আছে তো কুল্লে তিন মুঠো গম। তারই অর্ধেক খেয়ে ফেললে এ বুড়ী, ও কানী, সে খোঁড়া। সোমত্থ জোয়ানরা থাকে

কি, দেশ গড়বে কি দিয়ে? শ্লেজকে যখন নেকড়ে তাড়া করে তখন দুটো দুব্‌লা বাচ্চা ফেলে দিয়ে বাঁচাতে হয় তিনটে তাগড়াকে। সব কটাকে বাঁচাতে গেলে একটাকেও বাঁচানো যায় না। কথাটা এত সোজা যে কেউ স্বীকার করবে না, পাছে লোকে ভাবে লোকটা যখন এত সোজা কথা কয় তখন সে নিশ্চয়ই হাবা।'

আমি বললুম, 'তিনটেকে বাঁচাতে গিয়ে দুটোকে নেকড়ের মুখে দিয়ে যদি অমানুষ হতে হয় তবে নাই বাঁচল একটাও।'

অস্কার যেন ভয়ঙ্কর বেদনা পেয়েছে সে রকম মুখ করে বললে, 'বললি? তুইও বললি? তুই না এসেছিস এদেশে পড়াশোনা করতে। এদেশের পণ্ডিতদের জুড়ি পৃথিবীতে আর কোথাও নেই বলেই তুই এখানে এসেছিস। এ পণ্ডিতের জাতটা মরে যাক্ এই বুঝি তোর ইচ্ছে? বল দিকিনি বুকে হাত দিয়ে, এই জর্মন জাতটা মরে গেলে পৃথিবীটা চালাবে কে? পণ্ডিত, কবি, বীর এ জাতে যেমন জন্মেছে—'

আমি বললুম, 'থাক্ থাক্। তোমার ওসব লেকচার আমি ঢেরঢের শুনেছি।'

অস্কার মোটর সাইকেল থামিয়ে বলল, 'যা বলেছিস। তোকে এসব শুনিয়ে কোনো লাভ নেই। তুই মুসলমান, তোরা কখনো ধর্ম বদলাসনে, যা আছে তাই নিয়ে আঁকড়ে পড়ে থাকিস। চ, একটা বিয়ার খাবি?'

আমি পিনিয়ন থেকে নেমে বললুম, 'গুড বাই। আর দেখো তুমি সোজা বাড়ি যেয়ো। আমি লোকাল ধরব।'

অস্কার বলল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। তোমাকে তো আর নিত্যি নিত্যি আমি লিফ্‌ট্ দিতে পারিনে। কারখানায় পরীরা সব ভয়ঙ্কর চটে গিয়েছে আমার উপর, কাউকে লিফ্‌ট্ দিইনে বলে। প্রেমট্রেম সব বন্ধ।'

আমি রাগ করে বললুম, 'এ কথাটা এত দিন বলো নি কেন? আমি তোমাকে পই পই করে বারণ করিনি আমার কখন ক্লাস শেষ হয় না হয় তার ঠিক নেই, তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে না।'

অস্কার বলল, 'তোমার জন্য আমি আর অপেক্ষা করলুম কবে? সামনের শরাবখানায় ঢুকি এক গেলাস বিয়ারের তরে। জানালা দিয়ে যদি দেখা যায় তুমি বেরিয়ে আসছ তাহলে কি তোমার দিকে তাকানোটাও বারণ? বেড়ালটাও তো কাইজারের দিকে তাকায়, তাই বলে কি কাইজার তার গর্দান নেন নাকি?'

চাচা বললেন, 'অস্কারের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। আর ঐ ছিল তার অদ্ভুত

পরোপকার করার পদ্ধতি। 'ভিখিরিটাকে তিনটে মার্ক দিলে কেন?' অস্কার বলবে, 'ব্যাটা বেহেড মাতাল, তিন মার্কে টং নেশা করে গাড়ি চাপা হয়ে মরবে এই আশায়।' 'আমাকে নিত্যি নিত্যি লিফ্‌ট্‌ দেবার জন্য তুমি অপেক্ষা করো কেন?' 'সে কি কথা? আমি তো বিয়ার খেতে শরাবখানায় ঢুকেছিলুম!' 'নাৎসি পার্টিতে টাকা ঢালছো কেন?' 'তাই দিয়ে বন্দুক পিস্তল কিনে বিদ্রোহ করবে, তারপর ফাঁসিতে ঝুলবে বলে।' আমি একদিন বলেছিলুম, 'মিশনারিরা যে আফ্রিকায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে যায় সেটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত।' অস্কার বলল, 'তাহলে দুর্ভিক্ষের সময় বেচারী নিগ্রোরা খাবে কি? মিশনারির মাংস উপাদেয় খাদ্য!'

চাচা বললেন, 'কিন্তু এসব হাইজাম্প লঙ্‌জাম্প শুধু মুখে মুখে। অস্কার নাৎসি আন্দোলনের বেশ বড় ধরনের কর্তা আর নাৎসিদের নিজে যতই রসিকতা করুক না কেন, আর কেউ কিছু বললে তাকে মার মার করে তাড়া লাগাত। আমার সঙ্গে এক বৎসর ধরে যে এত বন্ধুত্ব জমে উঠেছিল সেইটি পর্যন্ত সে একদিন অকাতরে বিসর্জন দিল ঐ নাৎসিদের সম্বন্ধে আমি আমার রায় জাহির করেছিলুম বলে।

রান্নাঘরে সকাল বেলা সবাই জমায়েত। সেদিন ছিল রবিবার—সপ্তাহে ঐ একটি মাত্র দিন আমরা সবাই রান্নাঘরে বসে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেতুম, আর ছ'দিন যে যার সুবিধে মত।

মেয়ে মারিয়া পাঁচজনের উপকারার্থে চেঁচিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল। অস্কার মাথায় ভিজে পট্টি বাঁধছিল আর আপন মনে মাথা নেড়ে নেড়ে নিজকে বোঝাচ্ছিল, বিয়ার খাওয়া বড় খারাপ। মারিয়া হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'এ খবরটা মন দিয়ে শুনুন, হের ডক্টর। 'পাটেনকির্ষেনে হৈ হৈ রৈ রৈ, নাৎসি গুণ্ডা কর্তৃক ইহুদিনী আক্রান্ত। প্রকাশ, ইহুদিনী রাস্তায় নাৎসি পতাকা দেখে ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে আপন বিরক্তি প্রকাশ করেছিল। নাৎসিরা তখন তাকে ধরে নিয়ে এসে পতাকার সামনে মাথা নিচু করতে আদেশ করে। সে তখনো নারাজী প্রকাশ করাতে নাৎসিরা তাকে মার লাগায়। পুলিস এসে পড়ায় নাৎসিরা পালিয়ে যায়। তদন্ত চলছে।' '

চাচা বললেন, 'আমি বিরক্তি প্রকাশ করে বললুম, নাৎসি গুণ্ডারা কি করে না-করে আমার তাতে কি?'

অস্কার আমার দিকে না তাকিয়ে বলল, 'জাতির পতাকার সম্মান যারা বাঁচাতে চায় তারা গুণ্ডা?'

আমি কিছু বলার আগেই বুড়ো বাপ বলল, 'ওটা জাতির পতাকা হল কি করে? ওটা তো নাৎসি পার্টির পতাকা।'

আমি বললুম, 'ঠিক,—এবং জাতীয় পতাকাকে কেউ অবহেলা করলে তাকে সাজা দেবার জন্য পুলিস রয়েছে, আইন আদালত রয়েছে। বিশেষ করে একটা মেয়েকে ধরে যখন পাঁচটা ষাঁড়ে মিলে ঠ্যাঙ্গায় তখন সেটা গুণ্ডামি না হলে গুণ্ডামি আর কাকে বলে?'

অস্কার আমার দিকে ঘুরে হঠাৎ 'আপনি' বলে সম্বোধন করে বলল, 'আপনি তা হলে ইহুদিদের পক্ষে?'

আমি বললুম, 'অস্কার, অত সিরিয়স হচ্ছ কেন? আমি ইহুদিদের পক্ষে না বিপক্ষে সে প্রশ্ন তো অবান্তর।'

অস্কার বলল, 'প্রশ্নটা মোটেই অবান্তর নয়। ইহুদিরা যতদিন এদেশে থাকবে ততদিনই বর্ণসঙ্করের সম্ভাবনা থাকবে। জর্মনির নর্ডিক জাতের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।'

চাচা বললেন, 'এর পর আমার আর কোনো কথা না বললেও চলত। কিন্তু মানুষ তো আর সব সময় শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে ওঠা-বসা করে না, আর হয় তো অস্কার আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিল যে আমার মনে হয়েছিল, কোনো একটা যুৎসই উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। আমি বললুম, 'ভারতবর্ষেও তো আর্য জাতি রয়েছে এবং তারা জর্মনদের চেয়ে ঢের বেশী খানদানী এবং কুলীন। আর্যদের প্রাচীনতম সৃষ্টি চতুর্বেদ ভারতবর্ষেই বেঁচে আছে। গ্রীস রোমে যা আছে তার বয়স বেদের হাঁটুর বয়সেরও কম। জর্মনির ফ্রান্সের তো কথাই ওঠে না—পরশু দিনের সব চ্যাংড়ার পাল। কিন্তু তার চেয়েও বড় তত্ত্বকথা হচ্ছে এই, ভারতবর্ষের যা কিছু প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতি নিয়ে তোমরা আমরা সবাই গর্ব করি সেটা গড়ে উঠেছে আর্য অনার্য সভ্যতার সংমিশ্রণ অর্থাৎ বর্ণসঙ্করের ফলে। আমাদের দেশে বর্ণসঙ্কর সবচেয়ে কম হয়েছে কাশ্মীরে—আর ভারতীয় সভ্যতায় কাশ্মীরীদের দান ট্যাঁকে গুঁজে রাখা যায়। এবং আমার বিশ্বাস যে সব গুণী জর্মনিকে বড় করে তুলেছেন তাঁদের অনেকেই খাঁটি আর্য নন।'

আমাকে কথা শেষ না করতে দিয়ে অস্কার হুঙ্কার তুলে বলল, 'আপনি বলতে চান, আমাদের সুপারম্যানরা সব বাস্টার্ড?' '

চাচা বললেন, 'আমি তো অবাক। কিন্তু ততক্ষণে আমার সৎবুদ্ধির উদয় হয়েছে। কিছু না বলে চুপ করে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলুম।'

চাচা কফিতে চুমুক দিলেন। সেই অবসরে গোলাম মৌলা বলল, 'আমার

সঙ্গেও ঠিক এইরকম ধারাই তর্ক হয়েছিল কিন্তু আমি তো ভারতীয় সভ্যতার অতশত জানিনে তাই ওরকম টায় টায় তুলনা দিয়ে তর্ক করতে পারিনি। কিন্তু নাৎসিরা রাগ দেখায় একই ধরনের।'

চাচা বললেন, 'কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে গেল। কি প্রয়োজন ছিল তর্ক করার? বিশেষ করে যখন জানি, যত বড় সত্য কথাই হোক মানুষ আপন কৌলীন্য বজায় রাখার জন্য সেটাকেও বিসর্জন দেয়। তার উপর অস্কার জানেই বা কি, বোঝেই বা কি? মানুষটা ভালো, তর্ক করে আনাড়ির মত, আর আগেও তো বলেছি তার হাইজাম্প, লঙ্‌জাম্প তো শুধু মুখেই।'

আমি আর অস্কার বাড়ির সকলের পয়লা ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরতুম। পর দিন খেতে বসে দেখি অস্কার নেই। র‍্যাকে তার বরসাতি আর হ্যাটও নেই। বুঝলুম আগেই বেরিয়ে গিয়েছে। মনে কি রকম খটকা লাগল। দু'দিনের ভিতরই কিন্তু ব্যাপারটা খোলসা হয়ে গেল—অস্কার আমাকে এড়িয়ে বেড়াচ্ছে। শুনলুম মুদি আর তার মা আমার পক্ষ নিয়ে অস্কারকে ধমক দিয়েছেন। অস্কার কোনো উত্তর দেয়নি কিন্তু আমি রান্নাঘরে থাকলে সেখানে আসে না।

মহা বিপদগ্রস্ত হলুম। বাড়ির বড় ছেলে আমার সঙ্গে মন কষাকষি করে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, আর-সবাই সে সম্বন্ধে সচেতন, অষ্টপ্রহর অস্বস্তিভাব, বুড়োবুড়ী আমার দিকে সব সময় কি রকম যেন মাপ-চাই ভাবে তাকান—মরুক গে, কি হবে এখানে থেকে।

বুড়োবুড়ী তো কেঁদেই ফেললেন। মারিয়া আমার কাছে ইংরিজী পড়ত। সে দেখি জিনিসপত্র প্যাক করছে; বলল, 'চললুম কিছুদিনের জন্য মাসীর বাড়ি।' দুসরা ছেলে হুবের্ট কথা কইত কম। আমাকে ম্যুনিকে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেবার সময় বলল, 'আশ্চর্য, অস্কারের মত সহৃদয় লোক নাৎসিদের পাল্লায় পড়ে কি রকম অদ্ভুত হয়ে গেল দেখলেন?' আমি আর কি বলব।'

চাচা বললেন, 'তারপর ছ'মাস কেটে গিয়েছে। বান্ধব বর্জন সব সময়ই পীড়াদায়ক—সে বর্জন ইচ্ছায় করো আর অনিচ্ছায়ই ঘটুক। তার উপর বড় শহরে মানুষ যে রকম নিঃসঙ্গ অনুভব করে তার সঙ্গে গ্রামের নির্জনতার তুলনা হয় না। গ্রামের নিত্যিকার ডালভাত অরুচি এনে দেয় সত্যি, তবু সেটা শহরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর পাঁচজনের শেরি-শ্যাম্পেন খাওয়া দেখার চেয়ে অনেক ভালো। দিনের ভিতর তাই অন্ততঃ পঞ্চাশবার 'দুত্তোর ছাই' বলতুম আর বুড়োবুড়ীর কাছে ফিরে যাওয়া যায় কি না ভাবতুম। কিন্তু জানো তো, বড় শহরে স্থান যোগাড় করা যেমন কঠিন, সেখান থেকে বেরনো তার চেয়েও কঠিন।

করে করে প্রায় এক বৎসর কেটে গিয়েছে। একদিন বাসায় ফিরে দেখি বুড়োবুড়ী আর মারিয়া আমার বসার ঘরে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। কি ব্যাপার? র‍্যোনডর্ফের সাম্বৎসরিক মেলা। আমাদের যেমন ঈদ দুর্গোৎসবের সময় আত্মীয়স্বজন দেশের বাড়িতে জড়ো হয় এদের বাৎসরিক মেলার সময়ও ঐ রেওয়াজ। বুড়োবুড়ী, মারিয়া তাই আমাকে নেমন্তন্ন করতে এসেছেন।

আমার মনের ভিতর কি খেলে গেল সেইটে যেন বুঝতে পেরেই মারিয়া বলল, 'অস্কারের সঙ্গে এ ক'দিন আপনার দেখা হবার সম্ভাবনা নেই বললেও চলে। ছুটি নিয়ে এ ক'দিন সে অষ্টপ্রহর বিয়ার খায়। আপনাকে দেখলে ও চিনতে পারবে না।'

বুড়ী বললেন, 'অস্কারকে একটা সুযোগ দিন আপনার কাছে ক্ষমা চাইবার। মেলার সময় তাই তো আত্মীয়স্বজন জড়ো হয়।'

মেলার পরব সব দেশে একই রকম। তিন মিনিট নাগরদোলায় চক্কর খেয়ে নিলে, ঝপ্ করে দুটো পানের খিলি মুখে পুরলে (দেশভেদে চকলেট), দুটো সস্তা পুতুল কিনলে, গণৎকারের সামনে হাত পাতলে, না হয় ইয়ারদের সঙ্গে গোট পাকিয়ে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মিটমিটিয়ে হাসলে (দেশভেদে ফষ্টিনষ্টি করলে)। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে যে ঘন ঘন পট পরিবর্তন সম্ভব হয় না সেইটে মেলার সময় সুদে আসলে তুলে নেওয়া। যে মেলা যত বেশী মনের ভোল ফেরাবার পাঁচমেশালী দিতে পারে সে-মেলার জৌলুশ তত বেশী। তাই বুঝতে পারছ, বড় শহরে কেন মেলা জমে না। যেখানে মানুষ বারো মাস মুখোস পরে থাকে সেখানে বহুরূপী কল্কে পাবে কেন?

তবে দেশের মেলার সঙ্গে এদেশের মেলার একটা বড় তফাত রয়েছে। রাত ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মেলা যখন ঝিমিয়ে আসে তখন দেশে শুরু হয়, যাত্রা-গান কিম্বা কবির লড়াই। এদেশে শুরু হয় মদ আর নাচ। ছোটখাটো গ্রামে তো প্রায় অলঙ্ঘ্য রেওয়াজ প্রত্যেক মদের আড্ডায় অন্ততঃ একবার ঢুকে এক গেলাস বিয়ার খাওয়ার। কারো দোকান কট্ করা চলবে না, তা ততক্ষণে তুমি টং হয়ে গিয়ে থাকো আর নাই থাকো।

আমরা যেরকম উচ্ছৃঙ্খলতায় সুখ পাই, জর্মনরা তেমনি আইন মেনে সুখ পায়। মুদি মুদিবউ তাই আমাকে নিয়ে এই নিয়ম প্রতিপালন করে করে শেষ-টায় ঢুকলেন তাঁদেরই বাড়ির পাশের গ্রামের সব চেয়ে বড় শরাবখানায়। রাত তখন এগারোটা হবে। ডান্স হলের যা সাইজ তাতে দু'পাঁচখানা চণ্ডীমণ্ডপ সেখানে অনায়াসে লুকোচুরি খেলতে পারে। আশপাশের দশখানা গ্রামের

ছোঁড়াছুঁড়ি বুড়োবুড়ী ধেই ধেই করে নাচছে, আর শ্যাম্পেন-ওয়াইন যা বইছে তাতে সমস্ত গ্রামখানাকে সম্বৎসর মজিয়ে রেখে আচার বানানো যায়। দেশলাই ঠুকতে ভয় হয় পাছে হাওয়ার এলকহলে আগুন ধরে যায়, সিগার সিগারেটের ধুঁয়ো দেখে মনে হয়, দেশের গোয়ালঘরের মশা তাড়ানো হচ্ছে।

বুড়োবুড়ী পাড়ার মুরুব্বী। কাজেই তাঁদের জন্য টেবিল রিজার্ভ করা ছিল।

বুড়োবুড়ী আইন মেনে এক চক্কর নেচে নিলেন। বয়স হয়েছে, অল্পেই হাঁপিয়ে পড়েন। তবু পায়ের চিকন কাজ থেকে অনায়াসে বুঝতে পারলুম, এঁদের যৌবনে এঁরা আজকের দিনের ছোঁড়াছুঁড়ির চেয়ে ঢের ভালো নেচেছেন। আর মারিয়ার তো পো' বারো। সুন্দরী মেয়ে। তাকে নিয়ে যে লোফালুফি লেগে যাবে, সে-কথা নাচের মজলিসে না এসেই বলা যায়।

ঘণ্টাখানেক কেটে গিয়েছে। মজলিস গুলজার। সবাই মৌজে। তখনো লোকজন আসছে—এত লোকের যে কোথায় জায়গা হচ্ছে খোদায় মালুম, আল্লাই জানেন। এমন সময় একজোড়া কপোত-কপোতী আমাদেরই টেবিলের পাশে এসে জায়গার সন্ধানে চারদিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু তখন আর সত্যি একখানা চেয়ারও খালি নেই। বুড়োবুড়ী তাদের ডেকে বললেন, 'আমরা বাড়ি যাচ্ছি। আপনারা আমাদের জায়গায় বসতে পারেন।' আমি উঠে দাঁড়ালুম। বুড়ী বললেন, 'সে কি কথা? আপনি থাকবেন। না হলে মারিয়াকে বাড়ি নিয়ে আসবে কে?' আমার বাড়ি যাবার ইচ্ছে করছিল, কিন্তু এরপর তো আর আপত্তি জানানো যায় না। জর্মনি মধ্যযুগের প্রায় সব বর্বরতা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে কিন্তু শক্তসমর্থ মেয়েরও রাত্রে রাস্তায় একা বেরতে নেই এ বর্বরতাটা কেন ছাড়তে পারে না বুঝে ওঠা ভার।

কপোত-কপোতী চেয়ার দুটো পেয়ে বেঁচে গেল। কপোতীটি দেখতে ভালোই, মারিয়ার সঙ্গে বেশ যেন খাপ খেয়ে গেল। আমি তাদের মধ্যিখানে বসেছিলুম—আহা, যেন দুটি গোলাপের মাঝখানে কাঁটাটি।'

চাচার কথায় বাধা দিয়ে গোসাঁই বললেন, 'চাচা, আত্মনিন্দা করবেন না। বরঞ্চ বলুন, দুটো কাঁটার মাঝখানে গোলাপটি। আর কিছু না হোক সেই অজ-পাড়াগাঁয়ে ইণ্ডার হিসেবে নিশ্চয়ই আপনাকে মাইডিয়ার-মাইডিয়ার দেখাচ্ছিল।'

চাচা বললেন, 'ঠিক ধরেছিস। ঐ বিদেশী চেহারার যে চটক থাকে তাই নিয়ে বাধল ফ্যাসাদ।

নাচের মজলিসে, বিশেষ করে একই টেবিলে তো আর ব্যাকরণসম্মত

পদ্ধতিতে ইনট্রডাকশন্ করে দেবার রেওয়াজ নেই। কপোতীটি বিনা আড়ম্বরে শুধালো, 'আপনি কোন্ দেশের লোক?' উত্তর দিলুম। তারপর এটা, ওটা, সেটা এমন কি ফষ্টিটা-নষ্টিটা, অবশ্যি সন্তর্পণে, যেন ফুলদানির ফুলের ভিতর দিয়ে—থ্রু দ্য ফ্লাওয়ার্স।

ওদিকে দেখি কপোতটি এ জিনিসটা আদপেই পছন্দ করছে না।

আমি ভাবলুম, কাজ কি হ্যাঙ্গামা বাড়িয়ে। দু'একটা প্রশ্নের উত্তর দিলুম না, যেন শুনতে পাইনি। কিন্তু মারিয়াটা ঘড়েল মেয়ে। ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে চট করে আর নষ্টামির ভূত চেপেছে তার ঘাড়ে, হয়ত শ্যাম্পেনও তার জন্য খানিকটা দায়ী। সে আরম্ভ করল মেয়েটাকে উসকাতে। বলল, 'জানেন, ইনি আমার দাদা হন।'

মেয়েটি বললে, 'তা কি করে হয়। ওঁর রঙ বাদামী, চুল কালো, উনি তো ইণ্ডার।'

মারিয়া গম্ভীর মুখে বলল, 'ঐ তো! উনি যখন জন্মান মা-বাবা তখন কলকাতার জর্মন কনসুলেটে কর্ম করতেন। কলকাতার লোক বাঙলা ভাষায় কথা কয়। দাদাকে জিজ্ঞেস করুন উনি বাঙলা জানেন কি না।'

মেয়েটি হেসে কুটি কুটি। বললে, 'হ্যাঁ, ওঁর জর্মন বলাতে কেমন যেন একটু বিদেশী গোলাপের খুশবাই রয়েছে।' মেরেছে! বিদেশী ওঁচা এ্যাকসেণ্ট হয়ে দাঁড়ালো, 'গোলাপী খুশবাই'!'

চাচা বললেন, 'আমি মারিয়াকে দিলুম ধমক। দিয়ে করলুম ভুল। বোঝা উচিত ছিল মারিয়ার স্কন্ধে তখন শ্যাম্পেনের ভূত ড্যাং ড্যাং করে নাচছে। শ্যাম্পেনকে ঝাঁকুনি দিলে তার বজ্ বজ্ বাড়ে বই কমে না। মারিয়া মরমিয়া সুরে কপোতীর কাছে মাথা নিয়ে গিয়ে বলল, 'আর উনি এ্যাসা খাসা নাচতে পারেন। আমাদেরই ওয়ালট্স্ নাচ—আর তার উপর থাকে ভারতীয় জরির কাজ। আইন, ৎসুয়াই, দ্রাই—আইন, ৎসুয়াই, দ্রাই,—তার সঙ্গে ধা, ধিন, না; ধা, তিন, না; ডাডরা? না?' '

চাচা বললেন, 'পাঁচপীরের কসম, আমার বাপ-ঠাকুর্দা চতুর্দশ পুরুষের কেউ কখনো নাচেনি। মুখে গরম আলু পড়াতে হয়তো নেচেছে কিন্তু সে তো ওয়ালট্স্ নয়। মেয়েটাও বেহায়ার একশেষ। মারিয়াকে বলল, 'তা উনি যে নাচতে পারবেন তাতে আর বিচিত্র কি? কি রকম যেন সাপের মত শরীর।' বলে চোখ দিয়ে যেন আমার গায়ে এক দফা হাত বুলিয়ে নিল।'

চাচা বললেন, 'ওঃ! এখনো ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। ওদিকে ছেলেটাও চটে উঠেছে। আর চটবে নাই বা কেন? বান্ধবীকে নিয়ে এসেছে নাচের মজলিসে ফুর্তি করতে। সে যদি আরেকটা মদ্দার সঙ্গে জমে যায় তবে কার না রাগ হয়? কপোত দেখি বাজপাখীর মূর্তি ধরতে আরম্ভ করছে। তখন তাকিয়ে দেখি তার কোটে লাগানো রয়েছে নাৎসি পার্টির মেম্বারশিপের নিশান। ভারী অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলুম।

মারিয়া তখন তার-সপ্তকের পঞ্চমে। শেষ বাণ হানলো, 'একটু নাচুন না, হের ডক্টর!'

আমাদের দেশে যেমন বাচ্চা মেয়ের নাম 'পেঁচির মা', 'ঘেঁচির মা' হয়, আপন বাচ্চা জন্মাবার বহু পূর্বে, ম্যুনিক অঞ্চলে তেমনি ডক্টরেট প্রসব করার পূর্বেই পোয়াতী অবস্থাতেই আত্মীয়স্বজন ডাকতে আরম্ভ করে, 'হের ডক্টর'। আমার তখনো ডক্টরেট পাওয়ার ঢের বাকি কিন্তু আত্মজনের নেকনজরে আমি য়ুনি-ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হার্ড-বয়ল্‌ড্‌ হের ডক্টর হয়ে গিয়েছিলুম। মারিয়ার অবশ্য এই বেমোকায় 'হের ডক্টর' বলার উদ্দেশ্য ছিল মেয়েটিকে ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া যে অজ পাড়াগাঁয়ের মেলাতে বসে থাকলেই মানুষ কিছু কামার চামার হতে বাধ্য নয়—আমি রীতিমত খানদানী মনিষ্যি, 'হের ডক্টর'! বাঙলা কথা।

মেয়েটি তখন কাতর হয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে বলল, 'হে—র—ড—ক্‌—টৃ—র!' '

চাচা বললেন, 'আমি মনে মনে বললুম, 'দুত্তোর তোর হের ডক্টর, আর দুত্তোর তোর এই মারিয়াটা।' মুখে বললুম, 'মারিয়া, আমি এখখুনি আসছি।' বলে, দিলুম চম্পট।'

চাচা বললেন, 'তোরা তো ম্যুনিকে যাসনি কাজেই জানিসনে মানুষ সেখানে কি পরিমাণ বিয়ার খায়। তাই সবাইকে যেতে হয় ঘনঘন বিশেষ স্থলে। আমি এসব জিনিস খাইনে, কিন্তু তাই নিয়ে তো মারিয়া আর তর্কাতর্কি জুড়তে পারে না।'

চাচা বললেন, 'বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। কষে ঠাণ্ডা বাতাস বুকের ভিতর নিয়ে সিগার-সিগরেটের ধুঁয়ো যতটা পারি ঝেঁটিয়ে বের করলুম। মারিয়াটা যে এত মিটমিটে শয়তান কি করে জানব বল। কিন্তু মারিয়ার কথায় মনে পড়ল, ওকে ফেলে তো বাড়ি যাওয়া যাবে না। বুড়োবুড়ী তা হলে সত্যই দুঃখিত হবেন। ভাববেন, এই সামান্য দায়টুকু আমি এড়িয়ে গেলুম। কিন্তু

ততক্ষণে একটা দাওয়াই বের করে ফেলেছি। শরাবখানার ঠিক মুখোমুখি ছিল আরেকটি ছোটাসে ছোটা বিয়ার ঘর। সেখানে কফিও পাওয়া যায়। অধিকাংশ খদ্দের ওখানে ঢুকে 'বারে' দাঁড়িয়েই ঝপ করে একটা বিয়ার খেয়ে চলে যায়, আর যারা নিতান্ত নিরামিষ তারা বসে বসে কফিতে চুমুক দেয়। স্থির করলুম, সেখানে বসে কফি খাব, আর জানালা দিয়ে বাইরের দিকে নজর রাখব। যদি মারিয়া বেরয় তবে তক্ষুণি তাকে ক্যাঁক করে ধরে বাড়ি নিয়ে যাব। যদি না বেরয় তবে ঘণ্টাখানেক বাদে মারিয়ার তত্ত্বতাবাশ করব। শ্যেনও ততক্ষণে ফের কবুতর হয়ে যাবে আশা করাটা অন্যায় নয়।'

চাচা শিউরে উঠে বললেন, 'বাপস্! কি মারাত্মক ভুলই না করেছিলুম সেই বিয়ার-খানায় ঢুকে। পাঁচ মিনিট যেতে না যেতে দেখি সেই কপোতী শরাবখানা থেকে বেরিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। তারপর ঢুকল সেই বিয়ারখানাতে। আমার তখন আর লুকোবার বা পালাবার পথ নেই। আমাকে দেখে মেয়েটির মুখে বিদ্যুৎ-চমকানো-গোছ হাসির ঝিলিক মেরে উঠল। ঝুপ করে পাশের চেয়ারে বসে বলল, 'একটু দেরি হলো। কিছু মনে করোনি তো!' বলে দিল আমার হাতে হাত, পায়রার বাচ্চা যে রকম মায়ের বুকে মুখ গোঁজে।

বলে কি! ছন্ন না মাথা খারাপ। আপন মাথা ঠাণ্ডা করে বুঝলুম, এরকম ধারা চলে এসে অন্য জায়গায় বসাটা হচ্ছে এদেশের প্রচলিত সঙ্কেত। অর্থটা 'সপত্ন' (অর্থাৎ পুং-সতীন) ব্যাটাকে এড়িয়ে চলে এস বাইরে। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।' তাই সে এসেছে।

মেয়েটা আমার হাতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'কিন্তু, ভাই, তুমি কায়দাটা জানো ভালো। টেবিলে তো ভাবখানা দেখালে আমাকে যেন কেয়ারই করো না।' বলে আমার গালে দিল একটি মিষ্টি ঠোনা।'

চাচা বললেন, 'আমি তখন মরমর। ক্ষীণ কণ্ঠে বললুম, 'আপনি ভুল করেছেন। আমায় মাপ করুন।' মেয়েটা তখন একটু যেন বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোমার এই প্রাচ্যদেশীয় টানা-ঠ্যালা, টানা-ঠ্যালা কায়দা থামাও। আমার সময় নেই। হয়ত এতক্ষণে আমার বন্ধুর সন্দেহ হয়েছে আর হঠাৎ এখানে এসে পড়বে। তাহলে আর রক্ষে নেই। তোমার ফোন নম্বর কত বলো। আমি পরে কন্ট্রাক্ট করবো। তখন তোমার সব রকম খেলার জন্য আমি তৈরী হয়ে থাকব।'

বাঁচালে। নম্বরটা দিলেই যদি মেয়েটা চলে যায় তাহলে আমিও নিষ্কৃতি

পাই। পরের কথা পরে হবে। নম্বর বলতেই মেয়েটা দেশলাইয়ের পোড়াকাঠি দিয়ে চট করে সিগারেটের প্যাকেটে নম্বরটা টুকে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে সেই দুশমন এসে ঘরে ঢুকল।

তার চেহারা তখন কপোতের মত তো নয়ই, বাজপাখীর মতও নয়, মুখ দিয়ে আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে, যেন চীনা ড্রাগন।

আর সে কী চীৎকার আর গালাগালি! আমি তার বান্ধবীকে বদমায়েশি করে, ধড়িবাজের ফেরেব্বাজি দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি। একই টেবিলে ওয়াইন খেয়ে, বন্ধুত্ব জমিয়ে এরকম ব্ল্যাকমেলিং, ব্যাক্‌স্ট্যাবিং—আল্লা জানেন, আরো কত রকম কথা সে বলে যাচ্ছিল। সমস্ত বিয়ারখানার লোক তার চতুর্দিকে জড়ো হয়ে গিয়েছে। আমি হতভম্বের মত ঠায় দাঁড়িয়ে। মেয়েটা তার আস্তিন ধরে টানাটানি করে বার বার বলছে, 'হান্‌স্‌, হান্‌স্‌, চুপ করো। এখানে সীন করো না। ওঁর কোনো দোষ নেই—আমিই—'

কনুই দিয়ে মেয়েটার পেটে দিল এক গুঁত্তা। চেঁচিয়ে বললে, 'হটে যা মাগী' —অথবা তার চেয়েও অভদ্র কি একটা শব্দ ব্যবহার করেছিল আমার ঠিক মনে নেই। চটলে নাৎসিরা মেয়েদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করে সেটা না দেখলে বোঝবার উপায় নেই। হারেমে বুখারার আমীর তাদের তুলনায় কলসী-কানার বোষ্টম। গুঁতো খেয়ে মেয়েটা কোঁক্‌ করে, অদ্ভুত ধরনের শব্দ করে একটা চেয়ারে নেতিয়ে পড়ল।

এই বকাবকি আর চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ড্র্যাগন আস্তিন গুটোয় আর বলে, 'আয়, এর একটা রফারফি হওয়া দরকার। বেরিয়ে আয় রাস্তার বাইরে।' '

চাচা বললেন, 'আমি তো মহা বিপদে পড়লুম। অসুরদের মত এই দুশমনের হাতে দুটো ঘুষি খেলেই তো আমি উসপার্‌। ক্ষীণ কণ্ঠে যতই প্রতিবাদ করে বোঝাবার চেষ্টা করি যে ফ্রলাইনের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র অনুরাগ নেই, আমার মনে কোনো রকম মতলব নেই, ছিল না, হওয়ার কথাও নয়, সে ততই চেঁচায় আর 'কাপুরুষ' বলে গালাগাল দেয়।'

আড্ডার চ্যাংড়া সদস্য গোলাম মৌলা শুধাল, 'আর কেউ মুখটাকে বোঝাবার চেষ্টা করল না যে, আপনি নির্দোষ?'

চাচা বললেন, 'তুই এদেশে নূতন এসেছিস তাই এ-সব ব্যাপারের মরাল অথবা ইমরাল কোডের খবর জানিসনে। এদেশে এসব বর্বরতাকে বলা হয়, 'অন্যলোকের ঘরোয়া মামেলা' Personal matter. এরা আসলে থাকে বিন্‌-টিকিটে মজা দেখবে বলে।'

চাচা বললেন, 'ততক্ষণে অসুরটা আবার নাৎসি বক্তৃতা জুড়ে দিয়েছে। 'যত সব ইহুদি আর বাদ-বাকী কালা আদমি নেটিভরা এসে এদেশের মানইজ্জৎ নষ্ট করে ফেললো, এই করেই বর্ণসঙ্কর (অবশ্য একটা অশ্লীল শব্দে ব্যবহার করেছিল) হয়, এই করেই দেশটা অধঃপাতে যাচ্ছে, অথচ জর্মনির আজ এমন দুরবস্থা যে এরকম অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে পারছে না।' বিশ্বাস করবে না, দু'একজন ততক্ষণে তার কথায় সায় দিতে আরম্ভ করেছে আর আমার দিকে এমন ভাবে তাকাচ্ছে যেন আমি দুনিয়ার সব চেয়ে মিটমিটে শয়তান, আর কাপুরুষস্য কাপুরুষ।

মাপ চেয়ে নিলে কি হত বলতে পারিনে কিন্তু মাপ চাইতে যাব কেন? আমি দোষ করিনি এক ফোঁটা, আর আমি চাইতে যাব মাপ। ভয় পাই আর নাই পাই, আমিও তো বাঙাল। আমার গায়ের রক্ত গরম হয় না? দুনিয়ার তাবৎ বাঙালদের মানইজ্জৎ বাঁচাবার ভার আমার উপর নয় জানি, কিন্তু এই বাঙালটাই বা এমন কি দোষ করল যে লোকে তাকে কাপুরুষ ভাববে?'

চাচা বললেন, 'আমি বললুম, 'এসো তবে, যখন নিতান্তই মারামারি করবে বলে মনস্থির করেছ, তবে তাই হোক্।' মনে মনে বললুম, দুটো ঘুষি সইতে পারলেই চলবে, তারপর নির্ঘাৎ অজ্ঞান হয়ে যাব।'

এমন সময় হুঙ্কার শুনতে পেলুম, 'এই যে! সব ব্যাটা মাতাল এসে একত্তর হয়েছে হেথায়। এসো, এসো, আরেক পাত্তর হয়ে যাক্, মেলার পরবে—'

চাচা বললেন, 'তাকিয়ে দেখি অস্কার। একদম টং। এক বগলে খালি বোতল, আরেক বগলে ডানা-কাটা পরী। পরীটিও যেন শ্যাম্পেনের বুদ্বুদে ভর করে উড়ে চলেছেন। সেই উৎকট সঙ্কটের মাঝখানেও না ভেবে থাকতে পারলুম না, মানিয়েছে ভালো।

অস্কারকে দুনিয়ার কুল্লে মাতাল চেনে। আমার কথা ভুলে গিয়ে সবাই তাকে উদ্বাহু হয়ে 'আসতে আজ্ঞা হোক, 'বার'-এ দাঁড়াতে আজ্ঞা হোক' বলে অকৃপণ অভ্যর্থনা জানালো।

ওদিকে আমার মোষটা বাধা পড়ায় চটে গিয়ে আরো হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'তবে আয় বেরিয়ে।'

তখন অস্কারের নজর পড়ল আমার দিকে। আমাকে যে কি করে সে-অবস্থায় চিনতে পারল তার সন্ধান সুস্থ লোক দিতে পারবে না। পারবেন দিতে অস্কারের মত সেই গুণী যিনি মৌজের গৌরীশঙ্কর চড়ে জাগরণসুষুপ্তিস্বপ্নতুরীয় ছেড়ে পঞ্চমে পৌঁছতে পারেন। কাইজারের জন্মদিনের কামানদাগার মত

আওয়াজ ছেড়ে বললে, 'ঐ রেঃ। ঐ ব্যাটা কালা ইণ্ডার, মিশ্ শয়তানও এসে জুটেছে। যেখানেই যাও, শয়তানের মত সব জায়গায় উপস্থিত। বিয়ার ধরেছিস নাকি? এক পাত্তর হয়ে যাক্। আজ তোকে খেতেই হবে। মেলার পরব।'

ষাঁড় আবার হুঙ্কার ছেড়েছে। অস্কার তার দিকে তাকিয়ে আর তার আস্তিন-টানা মারমুখো তসবির দেখে আমাকে শুধালো, 'ইনি কিনি বটেন?'

আমি হামেহাল 'জেন্টিলম্যান'। শাস্ত্রসম্মত কায়দায় পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিলুম কিন্তু দুশমন অস্কারকে চেঁচিয়ে বললে, 'তুমি বাইরে থাকো, ছোকরা। ওর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।'

অস্কার প্রথমটায় এরকম মোগলাই মেজাজ দেখে একটুখানি থতমত খেয়ে গেল। খালি বোতলটায় একটা টান দিয়ে অতি ধীরে ধীরে মিনিটে একটা শব্দ উচ্চারণ করে বলল, 'এর—সঙ্গে—আমার—বোঝাপড়া—আছে? কেন বাবা, এত রাগ কিসের? এই পরবের বাজারে? তা ইণ্ডারটা ঝগড়াটে বটে। হলেই বা। এস, বেবাক ভুলে যাও। খেয়ে নাও এক পাত্তর। মনে রঙ লাগবে সব ঝগড়া কপ্পূর হয়ে যাবে।'

বলে জুড়ে দিল গান। অনেকটা রবিঠাকুরের 'রঙ যেন মোর মর্মে লাগে' গোছের।

দুশমন ততক্ষণে আমার দিকে ঘুষি বাড়িয়ে তেড়ে এসেছে।

'হাঁ হাঁ করো কি, করো কি?' বলে অস্কার তাকে ঠেকালো। অস্কার আমার সপত্নের চেয়ে দু'মাথা উঁচু। আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে? নাৎসিদের ফের গালাগাল দিয়েছিস বুঝি?'

আমি যতটা পারি বোঝালুম। শেষ করলুম, 'কী মুশকিল!' বলে।

অস্কার বলল, 'তা আমি কি তোর মুশকিল-আসান নাকি, না তোর ফ্যুরার। আর দেখছিস না ও আমার পার্টির লোক।' আমি হাল ছেড়ে দিলুম।'

কিন্তু অস্কারকে বোঝা ভার।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে সেই ষাঁড়কে জিজ্ঞেস করল, 'ইণ্ডারটা তোমার বান্ধবীকে জড়িয়ে ধরেছিল?' আমি বললুম, 'ছিঃ অস্কার!' সপত্ন বলল, 'চোপ্!'

অস্কার শুধাল, 'চুমো খেয়েছিল?' আমি বললুম, 'অস্কার!' সপত্ন বলল, 'শাট আপ্!'

তখন অস্কার সেই সম্পূর্ণ অপরিচিত মেয়েটিকে দু'হাত দিয়ে চেয়ার থেকে দাঁড় করাল। বললে, 'খাসা মেয়ে।' তারপর বলা নেই কওয়া নেই তাকে জড়িয়ে

ধরে বমশেলের মত শব্দ করে খেল চুমো।

সবাই অবাক! আমিও। কারণ অস্কারকে ওরকম বেহেড মাতাল হতে আমিও কখনো দেখিনি। কিন্তু আমারই ভুল।

আমাকে ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে ফেলে সে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল সেই ছোকরার। একদম সাদা গলায় বলল, 'দেখো বাপু, আমার বন্ধু ইণ্ডারটি তোমার বান্ধবীকে জড়িয়ে ধরেনি, চুমোও খায়নি। তবু তুমি অপমানিত বোধ করে তাকে ঠ্যাঙ্গাতে যাচ্ছিলে। ও রোগা টিঙটিঙে কিনা। ওঃ, কী সাহস! কিন্তু আমি তোমার বান্ধবীকে চুমো খেয়েছি। এতে তোমার জরুর অপমান বোধ হওয়া উচিত। আমিও সেই মতলবেই চুমোটা খেলুম। তাই এসো, পয়লা আমাকে ঠ্যাঙাও তারপর না হয় ইণ্ডারটাকে দেখে নেবে।'

হুলুস্থুল পড়ে গেল। সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে কথা কয়, কিছু বোঝবার উপায় নেই। ছোকরা পড়ে গেল মহা বিপদে। অস্কারের সঙ্গে বক্সিং লড়া তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। গেল বছরই এ অঞ্চলের চেম্পিয়ন হয়েছে ঐ সামনের শরাব-খানাতেই। ছোকরা পালাতে পারলে বাঁচে কিন্তু অস্কার না-ছোড়-বান্দা। আর পাঁচজনও কথা কয় না—এরকম রগড় তো পয়সা দিয়েও কেনা যায় না। সব পার্সনাল ম্যাটার কি না!

কিন্তু আমি বাপু ইণ্ডার, কালা আদমী। আমি ছুটে গিয়ে ডাকলুম পুলিস। ফিরে দেখি ছোকরা মুখ বাঁচাবার জন্য মুখ চুন করে কোট খুলছে আর শার্টের আস্তিন গুটোচ্ছে। অস্কার যেন খাসা ভোজের প্রত্যাশায় জিভ দিয়ে চ্যাটাস্ চ্যাটাস্ শব্দ করছে।

পুলিস নিতান্ত অনিচ্ছায় বাধা দিল। ট্যাক্সি ডেকে কপোত-কপোতীকে বিদেয় করে দিল।

অস্কার বলল, 'ওরে কালা শয়তান, কোথায় গেলি? আমার বান্ধবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি।'

বান্ধবী সোহাগ ঢেলে শুধালেন, 'আপনি কোন্ দেশের লোক।' পয়লা কপোতীও ঠিক এই প্রশ্ন দিয়ে আরম্ভ করেছিল।

আমি দিলুম চম্পট। অস্কার চেঁচিয়ে শুধালো, 'যাচ্ছিস কোথায়?' আমি বললুম, 'আর না বাবা। এক রাত্তিরে দু'দুবার না।'

সত্যপীরের কলমে

এই অংশে অন্তর্ভুক্ত লেখাগুলি সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯৪৫ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় সত্যপীর ছদ্মনামে লিখেছিলেন। এগুলি এতাবৎকাল কোন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে জানা যায় নি। 'সত্যপীর' ছদ্মনামে লিখিত হয়েছিল বলেই এই অংশ 'সতপীরের কলমে' নাম অভিহিত হল। —সম্পাদক

লাক্ষাদ্বীপ

বহু বৎসর পূর্বে আমি মাদ্রাজ শহরে এক বন্ধুর বাড়িতে বাস করতুম। তখন চিনি বড্ড রেশনড্ ছিল। যে-ঘরের বারান্দায় বসেছিলুম সেখানে বন্ধুপত্নী কাগজে মোড়া চিনি একটা বোয়ামে রেখে কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন। সেই কাগজের টুকরোটা হাওয়ায় ভেসে ভেসে এসে আমার পায়ের কাছে ঠেকল। আমার চোখ গেল যে, কাগজটাতে আরবী হরফে কী যেন লেখা। আশ্চর্য। এই মাদ্রাজ শহরে চিনির দোকানে আরবী কাগজ এল কোথা থেকে? কৌতূহল হল। কাগজটি তুলে ধরে পড়বার চেষ্টা দিলুম। তখন দেখি আরবী হরফে যেসব ভাষা লেখা হয় এটা তার কোনোটাই নয়। আরবী নয়, ফারসী নয়, উর্দু নয়, সিন্ধী নয় (সিন্ধী আরবী হরফে লেখা হয়), কিছুই নয়। তুর্কী ভাষা আমি জানি না। কিন্তু তুর্কী ভাষা এই মাদ্রাজে এসে পৌঁছবে কী প্রকারে? একটি পাতার তো ব্যাপার; ধৈর্য সহকারে পড়ে যেতে লাগলাম এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষ শব্দটি দেখি "মুদরায়ে" অর্থাৎ মদুরা। তাহলে ইটি ভারতীয় ভাষা। তখন ছিন্ন পত্রখানা ফের সযত্নে পড়ে দেখি, খাস আরবী শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মিশে আছে মালায়লাম ও তামিল শব্দও। হঠাৎ মাথায় খেলল, এটি তাহলে মপলাদের ভাষা। এরা আরব ও মালায়লমের বর্ণসঙ্কর। পরের দিন বন্ধু যখন কর্মস্থলে গেলেন তখন ছিন্ন পত্রটি তাঁর হাতে দিয়ে আমার অনুমানটি কনফার্ম করিয়ে নিলুম। এবং অনুসন্ধান করে আরো জানলুম, লাক্ষা-দ্বীপকে নিয়ে যে দ্বীপপুঞ্জ গঠিত সেগুলোর ভাষাও নাক মোটামুটি ঐ একই।

হালে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধী এই দ্বীপপুঞ্জটির সফরে গিয়েছিলেন। আমি আশা করেছিলুম, এই সুবাদে আমাদের দেশের ঐ অংশটি সম্বন্ধে অনেক-কিছু জানতে পাবো। তা জেনেছি নিশ্চয়—এঁদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অনেক সাংবাদিক সবিস্তর বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু আমার কৌতূহল ছিল এঁদের প্রাচীন ইতিহাস জানবার। সে-বাবদে "যে তিমিরে সে তিমিরেই" রয়ে গেলুম।

প্রথম প্রশ্ন লাক্ষাদ্বীপ কথাটার অর্থ কি? ইংরিজিতে বানান করা হয় Laccadive এবং এর শেষাংশ "দীব" যে দ্বীপ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আরবী ভাষায় "প" অক্ষরটি নেই বলে সে স্থলে "ব" বা "ওয়া" (অর্থাৎ ইংরিজি V অক্ষর) ব্যবহৃত হয়: তাই "দীব" বা "দীও" নিশ্চয়ই দ্বীপ। কিন্তু প্রশ্ন "লাক্ষা" শব্দের অর্থ কি? পণ্ডিতেরা বলেন, ওটা সংস্কৃত লক্ষ (১,০০,০০০)

থেকে এসেছে। অথচ লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জে দ্বীপের সংখ্যা মাত্র চোদ্দটি। এমন কি এই দ্বীপপুঞ্জের সংলগ্ন, মাত্র আশী মাইল দূরে অবস্থিত মালদ্বীপের (এ-এলাকা ভারতের অংশ নয়) চতুর্দিকে যে দ্বীপপুঞ্জ আছে তার সংখ্যাও তিন শত (এর মধ্যে মাত্র সতেরোটিতে লোকাবাস আছে এবং এদের ভাষা আরবী মিশ্রিত সিংহলী)। এই তিনশ এবং লাক্ষাদ্বীপের চৌদ্দটি (বসতি আছে সাকুল্যে তাহলে বাইশটি দ্বীপে) নিলেও তাকে লক্ষ সংখ্যায় পরিবর্তিত করতে হলে এদেরকে হাজার হাজার ডবল প্রমোশন দিতে হয়। তবে কি না, কী হিন্দু পুরাণকার কী মুসলমান পর্যটক ঐতিহাসিক গণনা করার (শুমার করার) সময় বেশ-কিছুটা কল্পনাশক্তির আশ্রয় নিয়ে ১০০ বা ১০০০-র পিছনে গোটা তিনেক শূন্য বসিয়ে দিতে কার্পণ্য করতেন না। এরই একটি উদাহরণ পাওয়া যায় বাঙলা দেশের কেচ্ছাসাহিত্যে: "লোক মরে লক্ষ লক্ষ, কাতারে কাতার।/ শুমার করিয়া দেখি আড়াই হাজার॥" তবু এ কবিটির কিঞ্চিৎ বিবেক-বুদ্ধি ছিল। উৎসাহের তোড়ে প্রথম ছত্রে "লক্ষ লক্ষ" বলে শেষটায় মাথা ঠাণ্ডা করে বললেন, "না, পরে গুনে দেখি, আড়াই হাজার।" অতএব আড়াই হাজার যদি লক্ষ লক্ষ হতে পারে তবে তিনশো দ্বীপকে মাত্র এক লক্ষে পরিণত করতে আর তেমন কি "ভয়াঙ্কর অসুবিস্তে"! তদুপরি মূল পাণ্ডুলিপির কপি করার সময় নকলনবীসরা শূন্য সংখ্যা বাড়াতে ছিলেন বড়ই উদারচিত্ত।

এতসব "যুক্তি" থাকা সত্ত্বেও আমি অতিশয় সভয়ে একটি নিতান্ত এমেচারি (ফোক ইটিমলজি) শব্দতাত্ত্বিক "গবেষণা" পেশ করি।

লাক্ষা শব্দের অর্থ গালা। "পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষের শাখায় পুঞ্জীভূত কীট-বিশেষের দেহজ রস হইতে ইহা উৎপন্ন হয়" (হরিচরণ)। এর রঙ লাল। হিন্দীতে এর নাম লাক এবং ইংরিজি ল্যাক এর থেকে এসেছে।...লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ নির্মিত হয়েছে এক প্রকারের কীটের রস থেকে। এর নাম প্রবাল এবং এর রঙ লাল, গোলাপি, সাদা ইত্যাদি হয়। কিন্তু প্রবাল বলতে সংস্কৃতে সর্বপ্রথম অর্থ: অঙ্কুর, কিসলয়, নবপল্লব—অতএব বৃক্ষের সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে।

তাই আমার মনে সন্দেহ জাগে সেই প্রাচীন যুগে যখন লাক্ষাদ্বীপের নাম-করণ হয় (এবং আর্যরা ঐ প্রথম প্রবালদ্বীপ, কোরাল্ আইল্যাণ্ড-এর সংস্পর্শে আসেন) তখন তাঁরা হয়তো "লক্ষ" সংখ্যার কথা ভাবেননি, তাঁরা এর নাম-করণ করেছিলেন লাক্ষার সঙ্গে এর জন্মগত, বর্ণগত, রসাগত রূপ দেখে॥

সিন্ধুপারে

লাক্ষা দ্বীপ নিয়ে বড্ড বেশী তুলকালাম করার কোনই প্রয়োজন থাকত না, যদি না তার সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস বিজড়িত থাকতো।

প্রথম প্রশ্ন : পশ্চিমদিকে ভারতীয়রা কতখানি রাজত্ব বিস্তার করেছিল ? কোন্ কোন্ জায়গায় তারা কলোনি নির্মাণ করেছিল ?

আমার সীমাবদ্ধ ইতিহাস ভূগোল জ্ঞান বলে, পশ্চিম দিকে, ভারতের দক্ষিণতম প্রান্ত কন্যাকুমারী থেকে প্রায় দু' হাজার মাইল দূরে, আদন বন্দরের প্রায় ছ' শ মাইল পুব দিকে সোকোত্রা দ্বীপে। ম্যাপ খুললেই দেখা যায়, এ-দ্বীপ যার অধিকারে থাকে সে তাবৎ লোহিত সাগর, আরব সমুদ্র এবং পার্শিয়ান গাল্‌ফের উপরও আধিপত্য করতে পারে।

এই সোকোত্রা দ্বীপের গ্রীক নাম 'দিয়োস্‌করিদেস্' এবং পণ্ডিতেরা বলেন এ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'দ্বীপ-সুখাধার' থেকে। মনে হয়, ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্ত থেকে নৌকোয় বেরিয়ে, দু' হাজার মাইল ঝড়ঝঞ্ঝার সঙ্গে লড়াই করতে করতে যে-কোনো জায়গায় পৌঁছলেই মানুষ সেটাকে 'সুখাধার' বলবেই বলবে। কিন্তু এ-দ্বীপের পরিষ্কার ইতিহাস জানবার তো উপায় নেই। প্রাচীন গ্রীক ভৌগোলিকরা বলছেন, এ দ্বীপে বাস করতো ভারতীয়, গ্রীক ও আরব বণিকরা। পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিকরা বলছেন, এটা তখন ভারতীয় বম্বেটেদের থানা। তারা তখন আরব ব্যবসায়ী জাহাজ লুটপাট করতো।

মনে বড় আনন্দ হল। এদানির 'অহিংসা' 'অহিংসা' শুনে শুনে প্রাণ অতিষ্ঠ। আমরাও যে একদা বম্বেটে ছিলুম সেটা শুনে চিত্তে পুলক জাগলো। বম্বেটেগিরি হয়তো পুণ্যপন্থা নয়, কিন্তু এ-কথা তো সত্য যে-দিন থেকে আমরা সমুদ্র-যাত্রা বন্ধ করে দিলুম সেইদিন থেকেই ভারতের দুঃখ দৈন্য, অভাব দারিদ্র্য আরম্ভ হল।

সোকোত্রা দ্বীপকে মিশরীরা নাম দিয়েছিল 'সুগন্ধের সারিভূমি'—অর্থাৎ সারি কেটে কেটে যেখানে সুগন্ধ দ্রব্যের চাষ হয়। এবং এখনো সেখানে ঘৃতকুমারী (মুসব্বর), মস্তকি (myrrh), গুগ্‌গুল এবং আরো কি একটা উৎপাদিত হয়। মামি তৈরী করার জন্য মিশরীয়দের অনেক-কিছুর প্রয়োজন হত। এবং খুশ-বাইয়ের প্রতি ওদের এখনো খুবই শখ। খৃষ্টপূর্ব হাজার বৎসর আগে রচিত রাজা 'সুলেমানের গীতে' বিস্তর সুগন্ধের উল্লেখ আছে। এদের অধিকাংশই

যেত ভারত, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া এবং সোকোত্রা থেকে। এবং এই সোকোত্রাই ছিল ভারত ও আরব বণিকদের পণ্যদ্রব্য বিনিময়ের মিলনভূমি। আরবদের মারফতে সে-সব গন্ধদ্রব্য বিলেত পর্যন্ত পৌঁছত। তাই শেকসপীয়র ভেবেছিলেন এ-সব গন্ধদ্রব্য বুঝি আরব দেশেই জন্মায়—লেডি মেকবেথ বলছেন, "অল দি পারফিউমজ অব আরাবিয়া উইল নট সুইটেন দিস লিটিল হ্যাণ্ড"। এই গন্ধের ব্যবসা তখন খুবই লাভজনক ছিল। এবং কাঠিয়াওয়াড়ের গন্ধবণিকরা এর একটা বড় হিস্যা পেতেন। মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবার্ষিকীতে এই সুবাদে স্মরণ যেতে পারে যে তিনি জাতে গন্ধবণিক—সেই 'গন্ধ' থেকে তাঁর পরিবারের নাম গাঁধী।

ভারতীয় বণিকরা লাক্ষাদ্বীপ বা মালদ্বীপ থেকে তাদের শেষ রসদ—এবং সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস জল—নিয়ে এখান থেকে পাগের নৌকায় করে দু হাজার মাইলের পাড়ি দিতেন।

* * *

সচরাচর বলা হয়, আরব নাবিকরাই প্রথম মৌসুমী বায়ু আবিষ্কার করে। আমি কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করি। আমার ধারণা ভারতীয়রাই প্রথম লক্ষ্য করে যে শীতকালে বাতাস পশ্চিমবাগে বয়। তারই সুবিধে নিয়ে পাল তুলে দিয়ে পণ্যসম্ভার নিয়ে তারা যেত সোকোত্রা। ফিরে আসত গ্রীষ্মারম্ভে—যখন সোকোত্রা থেকে পূব বাগে বাতাস বয়। ভারতীয় নাবিক যদি কোস্টাল সেলিংই (পাড় ঘেঁষে ঘেঁষে) করবে তবে তো তারা সিন্ধুদেশ, বেলুচিস্থান, ইরানের পাড় ঘেঁষে ঘেঁষে দক্ষিণ আরবিস্থানে পৌঁছে যেত। অর্থাৎ আদন বন্দরের কাছাকাছি। সেখান থেকে আবার ছ' শ মাইল পূব বাগে সোকোত্রা আসবে কেন?

তারপর কর্তারা সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করে দিলেন।

সে-কথা আরেকদিন হবে।

প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদ

সঠিক বাঙলা অনুবাদ হল কিনা তাই নিয়ে অনেকেরই মনে ন্যায্য সন্দেহ হতে পারে। ইংরিজিতে একে বলে "অল্ ইনডিয়া অরিএনটাল কনফারেন্স।" আমার এতদিন বিশ্বাস ছিল এর নাম "অল্ ইনডিয়া অরিএনটালিসটস কনফারেন্স"। দুটো নামই আমার কাছে কেমন যেন সামান্য বেখাপ্পা ঠেকে। "অল্ ইনডিয়াই"

যদি হবে তবে তার সঙ্গে "অরিএনটাল" জোড়া যায় কী প্রকারে? পক্ষান্তরে দ্বিতীয় নাম "অল্ ইনডিয়া অরিএনটালিসটস"ও কেমন যেন মনে সাড়া জাগায় না। অরিএনটালিসট বলতে বোঝায়, অরিএনট সম্বন্ধে যিনি বিজ্ঞ পণ্ডিত। কিন্তু রূঢ়ার্থে বোঝায়, যে সব ইয়োরোপীয় পণ্ডিত অরিএনট নিয়ে চর্চা করেন। এই নিয়ে যখন আমি আমার এক দর্শনে সুপণ্ডিতা বান্ধবীর সঙ্গে আলোচনা করছি তখন তিনি বললেন, "হ্যাঁ। কেমন যেন ঠিক মনে হয় না। মাকসম্যুলার অরিএনটালিসট আবার রাধাকৃষ্ণনও অরিএনটালিসট?" আমার মনে হল, তাঁর মনে ধোঁকা জেগেছে, দুজনার মাহাত্ম্য কি একই? রাধাকৃষ্ণন তাঁর আপন দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানদর্শনের চর্চা করেছেন, সে তো স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ যে সাত সমুদ্রের ওপারের মাকসম্যুলার ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞানদর্শনের চর্চা করলেন—এ দুজনাতে তো একটা পার্থক্য আছে। তুলনা দিয়ে বলি, আপনি ভারতীয়, তাই আপনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিলেন। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু সাতসমুদ্রের ওপারের পুণ্যশ্লোকা এ্যানি বেসানত, দীনবন্ধু এ্যানড্রুজ যখন এ-আন্দোলনে যোগ দিলেন, সে দুটো কি একই?

যদ্যপি জরমন ভাষা কাঠখোট্টা তবু প্রাচী = অরিএনট এবং প্রতীচী = অকসিডেনট নিয়ে কথা বলতে গেলে ওরা ঐ দু ভূখণ্ডের জন্য দুটি বড়ই সুন্দর নাম দেয়। এই প্রাচ্যভূমিকে বলে "মরগেন লানট" = "ভোরের দেশ" "সূর্যোদয়ের দেশ"—জরমন ভাষায় "মরগেন" শব্দের অর্থ "সকাল" "ভোর"। তাই তারা সকালবেলা কারো সঙ্গে দেখা হয়ে বলে "গুটেন মরগেন" = গুড মরনিং। পক্ষান্তরে তাদের নিজের দেশ তথা ইয়োরোপকে বলে "আবেনট লানট" অর্থাৎ "সূর্যাস্তের দেশ"। তাই বিকেল বেলা সন্ধ্যে বেলা, এমন কি রাত্রেও দেখা হলে বলে "গুটেন আবেনট"।

খুব সম্ভব এই কারণেই ভারতবর্ষের প্রতি জরমন পণ্ডিতদের একটা বিনয়নম্র ভাব-শ্রদ্ধা আছে। ইংরেজ ফরাসী ডাচদের সে শ্রদ্ধা নেই। কারণ তারা প্রাচ্যভূমি এশিয়াতে রাজত্ব করতো। তাই এনারা যখন ইয়োরোপের কোনো "অরিএনটালিসটস কনফারএনসে" যান তখন কেমন যেন মুরুব্বিয়ানা করেন। ভাবটা এই, তাঁরা যে ভারতের ব্যাপারে ইনটরেসট দেখাচ্ছেন সেটা যেন, অনেকটা মুনিব তার চাকরের বউবাচ্চার সম্বন্ধে পলাইট বাট ডিসটেনট খবর নিচ্ছেন (পাছে না দু' টাকা খসাতে হয়)।

এই মুরুব্বীয়ানাটা আমাকে ঈষৎ পীড়িত করে। হপ্তা তিনেক পরে পূর্বে আমি বলেছিলাম আমি অত সহজে অপমানিত হই না। ইতিমধ্যে খান আবদুল গফফার বাদশা মিঞা বলেছেন, ভারত যে রাবাতে গিয়েছিল সেটা অনুচিত

হয়নি। কিন্তু পত্রান্তরে জনৈক সম্পাদক অতিশয় ভদ্র ভাষায় সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, "কিন্তু সকলেই এ মত পোষণ নাও করতে পারেন" (নট এভরিবডি শেয়ারজ ইট) এবং এই আনন্দবাজারেই জনৈক পত্রলেখক আমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কঠোর আপত্তি জানান। ধর্ম সাক্ষী করে বলছি, এঁদের বিরুদ্ধে আমার কোনো ফরিয়াদ নেই। কে কোন আচরণে অপমানিত হবেন না হবেন সেটা তাঁর স্পর্শ-কাতরতার উপর নির্ভর করে। এঁরা স্পর্শকাতর। কিন্তু আমার গায়ে গণ্ডারের চামড়া। মরক্কো লেদার তার তুলনায় ধূলিপরিমাণ—লম্বি লম্বি।

মূল বক্তব্যে ফিরে আসি।

ইওরোপীয়রা বিশেষ করে ইংরেজ ফরাসী ডাচ যদি আমাদের প্রতি মেহের-বাণী দেখায় তবে আমরাই বা তাদের প্রতি মেহেরবাণী দেখাবো না কেন?

অতএব আমি প্রস্তাব করি এই ভারতবর্ষে যেন "অকসিডেনটালিসট কন-ফারেন্স্ নির্মিত হয়। ইয়োরোপের ইংরেজ ফরাসী ডাচ অরিএনটালিসটরা যে রকম আমাদের সতীদাহ, বহুবিবাহ নিয়ে আলোচনা করেন আমরা ঐ কনফারেনসে সাহেবদের কল গার্ল, কীলার প্রফুমো ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করবো। কিন্তু বিপদ এই: আমাদের ভারতীয় সভ্যতা যায় নিদেন খৃ. পূ. দু' হাজার বছর পূর্বে। ইয়োরোপীয়দের সভ্যতা মেরে কেটে ছ'শ বছর পূর্বে। যতই প্রাচীন সভ্যতা হয়, ততই তাকেই আঘাত করা যায় বেশী। বুড়ো-ঠাকুরদাকে গাঁট্টা মারা খুবই সহজ।

এই প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করার জন্য আমি সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীরদ সি চৌধুরীর নাম প্রস্তাব করি। ইয়োরোপীয় কাণ্ডকারখানা উনি বিলক্ষণ বিচক্ষণরূপে জানেন। তদুপরি তিনি সংস্কৃত ভাষা এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে উত্তমতমরূপে সুপরিচিত। শেয়ানা পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন তিনি সপ্তাহের পর সপ্তাহ শুদ্ধমাত্র ইয়োরোপীয় গুণীজ্ঞানীরই উদ্ধৃতি দেন।

পুনরপি প্রাচ্য

না আর রসিকতা না। এবারে আমাকে সিরিয়স হতে হবে। স্বর্গত প্রমথ চৌধুরীও প্রতি বৎসরে এই শপথ নিতেন এবং সে-লিখিত শপথের কালি শুকোতে-না-শুকোতেই সেটি পরমানন্দে ভঙ্গ করতেন। আমি সেই মহাজনপন্থাই অবলম্বন করছি।

প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে কি-সব সমস্যা কি-সব বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হয়েছে

তার কিছু কিছু বিবরণ খবরের কাগজে বেরিয়েছে এবং কয়েকদিন পূর্বে হিন্দুস্থান স্ট্যানডারডের সম্পাদক মহাশয় সে সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত তথা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। কিন্তু যে-সব বিষয়বস্তু কনফারেনসে আলোচিত হয়নি সে-সংবাদ জানবো কি প্রকারে? তাই আমার মনে দুটি সমস্যা জেগেছে। এ-দুটি নূতন নয়। আমার জীবনে প্রথম এবং শেষ প্রাচ্যবিদ্যাসম্মেলনে আমি যাই তিরু অনন্তপুরমে বরদা সরকারের প্রতিভূরূপে ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি। সেই থেকে।

প্রথম: এই যে গত কয়েক শতাব্দী ধরে ইয়োরোপীয়রা এশিয়াতে রাজ্য বিস্তার করতে চেয়েছিলেন—ইংরেজ ফরাসী অস্ট্রিয়ান ডাচ পর্তুগীজ ইত্যাদি ইত্যাদি—এদের মহাফেজখানাতে (আর্কাইভে) বিস্তর দলিলপত্র রয়েছে। এগুলোর সাহায্য বিনা ভারতের গত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না। কিন্তু এসব দলিলদস্তাবেজ নিয়ে গবেষণা করে সেগুলোকে প্রকাশিত করাতে স্বভাবতই আজ এদের আর কোনো ইনটরেস্ট্ নেই। যতদূর মনে পড়ে, একমাত্র ডাচ সরকারই বছর কয়েক পূর্বে এ-কর্ম করার জন্য ভারতীয়দের আমন্ত্রণ জানান এবং দুটি ভালো স্কলারশিপ দিতে চান। এর ফল কি হয়েছে জানিনে। অতএব এ-সব ভিন্ন ভিন্ন দেশের মহাফেজখানার অমূল্য দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে গবেষণা করার দায়িত্ব আমাদেরই—ভারতীয়দের।...এ-ছাড়া এদের আরকাইভে আছে, ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান, পাঠ্যপুস্তক, অনুবাদ ইত্যাদি। সেগুলোও মহামূল্যবান। "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ"—না কি যেন নাম—অনেকেই জানেন।

দ্বিতীয়: এবং এইটেই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা। নমস্য প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবরা তো অগাধ গবেষণা করেছেন, যথা মহাভারত রামায়ণের প্রামাণিক পাঠ প্রকাশ করেছেন, করছেন এবং অন্যান্য শাস্ত্রাদির জন্যও ঐ পদ্ধতিতে তৎপর। এ-কর্মের প্রশংসা অজ্ঞ বিজ্ঞ তাবজ্জন করবেন। কিন্তু প্রশ্ন, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যে প্রতিদিন ভারতীয়দের ইনটরেস্ট্ কমে যাচ্ছে, সেটা ঠেকানো যায় কি প্রকারে? অর্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্যের উত্তম উত্তম ধন মূল সংস্কৃতে যত না হোক, অনুবাদ মারফৎ কোন্ পদ্ধতিতে সাধারণজনের সামনে আকর্ষণীয়রূপে দিতে পারি? এক কথায় সংস্কৃত, অর্ধমাগধী, পালি, প্রাকৃত, সান্ধ্য ইত্যাদিতে লিখিত প্রকৃত হীরাজওহর পপুলারাইজ করি কি প্রকারে? তারা যে কলচরড পারল, প্ল্যাসটিক চায়। এবং এটা না করতে পারলে যে প্রাচ্যবিদ্যা তথা প্রাচ্যবিদ্বজ্জনের মহতী বিনষ্টি হবে সে-বিষয়ে অন্তত আমার মনে

কণামাত্র সন্দেহ নেই। কারণ, তুলনা দিয়ে বলি; জনগণ যেন দেশ-গাছের শিকড়, বিদ্বজ্জন ফুল। শিকড় যদি শুকিয়ে যায় তবে ফুলের, ফলের তো কথাই নেই, মরণ অনিবার্য।...যেমন আমাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের নাভিশ্বাসের সময়ে আমাদের চৈতন্য হল এবং আমরা এখন সেটিকে পপুলারাইজ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা দিচ্ছি।

ইয়োরোপীয়দের ঐ একই সমস্যা। আমরা যেমন সংস্কৃতাদি একাধিক সাহিত্যের উপর এতকাল নির্ভর করে এসেছি, তারা করে দুটি সাহিত্যের উপর —গ্রীক এবং লাতিন। এবং চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এ-ভাষাগুলোর পড়ুয়া দিন দিন কমে যাচ্ছে। বিলেতের কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক লাতিন শেখার জন্য প্রতি বৎসর পাঁচটি এমনই দিলদরাজ বৃত্তি দেয় যে, যে-কোনো বৃত্তি-ধারী সে-অর্থে হস্টেলের খাইখরচা দিয়ে উত্তম বেশাদি পুস্তকাদি ক্রয় করার পর একাংশ দরিদ্র পিতামাতাকে পাঠাতে পারে। তথাপি, কাগজে পড়েছি, বছর তিনেক পূর্বে সেই পাঁচটি বৃত্তির জন্য মাত্র তিনটি ছাত্র দরখাস্ত পাঠায়!! বছর পঞ্চাশেক পূর্বে আসতো দুশো!!

এবং এহ বাহ্য। জনসাধারণও গ্রীক লাতিন সাহিত্যের অমূল্য অমূল্য সম্পদও ইংরিজি ফরাসী জর্মন অনুবাদে—যথা যার দেশ—পড়তে চায় না। তাই ইয়োরোপের বিদ্বজ্জন এসব সম্পদের নবীন নবীন অনুবাদ করছেন—দেশোপ-যোগী কালোপযোগী করে। এমন কি বাইবেলেরও।

আমাদের প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবরা এ-বিষয়ে কি করছেন?

আমার মনে হয় কবি কালিদাস বাঙালী। প্রমাণ? একমাত্র বাঙালীই যে-ডালে বসে আছে সেটা কাটে। কালিদাসও তাই করতেন। অতঃ কালিদাস বাঙালী। প্রাচ্যজ্ঞরা ডালটা কাটছেন না বটে কিন্তু ডালটা যে শিকড়োত্থিত রসাভাবে শুষ্ক হয়ে ভেঙে পড়ছে সেদিকে খেয়াল নেই।

সিলেটী সাগা

১

অ ডুরা! কুনার সাব্‌রে আরক্ কট্‌রা ছালন দেও।

অতিশয় বিশুদ্ধ সিলেটী উচ্চারণে বাক্যটি উচ্চারিত হল। আমি অবশ্য তার জন্য প্রস্তুত ছিলুম। যজ্ঞপিদেশ: লণ্ডনের টিলবারি ডক; কাল: ১৯৩১; পাত্র:

রেস্তোরাঁর মালিক। সে আমলে খাঁটি বিলিতি হোটেল-রেস্তোরাঁতে যে অখাদ্য নির্মিত হত সেটা হটেনটটীয় পর্যায়ের। কথায় বলে, ওট নামক বস্তুটি স্কটল্যাণ্ডে খায় মানুষ, ইংলণ্ডে খায় ঘোড়া। কিন্তু ঐ আমলে লণ্ডনের পোশাকী খানাও স্কটল্যাণ্ডের ঘোড়া পর্যন্ত খেতে রাজী হত না—এই আমার বিশ্বাস। তাই আমি লণ্ডনের 'লাঞ্চকে' বলতুম 'লাঞ্ছনা' আর সাপারকে বলতুম 'suffer'।

রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে এসেছেন শুনে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে যখন রাস্তায় নেমেছি তখন হঠাৎ এক সিলেটী দোস্তের সঙ্গে মোলাকাৎ। আলিঙ্গন কুশলাদির পর দোস্ত শুধালে, "অত রোগা কেন?" "একে দুর্দান্ত শীত, তদুপরি লণ্ডনের গুষ্টির-পিণ্ডি-চটকানো রান্না।" সংক্ষেপে বললে, "চলো"। এতদিন পরে সব ঘটনা আর মনে নেই—তবে বাসে করে যে অনেক অনেকখানি পথ যেতে হয়েছিল, সেটা স্পষ্ট মনে আছে। মোকামে পৌঁছে ভালো করে বেয়ারিং পাবার পূর্বেই দেখি, একটি ছোটখাটো রেস্তোরাঁর মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে এবং কানে গেল পূর্বোক্ত "অ ডুরা—ইত্যাদি", যার অর্থ, "ও ডোরা, কোণের সাহেবকে আরেক বাটি ঝোল দাও।"

হালে কাগজে পড়লুম, বিলেতে যে সব পাক ভারতের রেস্তোরাঁ আছে তার শতকরা ৮০ ভাগ সিলেটীরা চালায়। অবশ্য ঐ চল্লিশ বৎসর পূর্বে বিলেতে অত ঝাঁকে ঝাঁকে পাক ভারতীয় রেস্তোরাঁ ছিল না; তবে সে-রাত্রেই জানতে পাই, যে-কয়টি আছে তার পনেরো আনা সিলেটীদের। এমন কি লণ্ডনের নাম-করা হতচ্ছাড়া তালু-পোড়া দামের এক ভারতীয় রেস্তোরাঁর শেফ্‌ও সিলেটী।

ইতিমধ্যে দোস্ত শশাঙ্কমোহন "অটলালার" (হোটেলওয়ালার) সঙ্গে বে-এক্তেয়ার গালগল্প জুড়ে দিয়েছেন—আহা, যেন বহু যুগের ওপার হতে লঙ লস্ট্‌ ভ্রাতৃদ্বয়ের পুনর্মিলন। শশাঙ্ক আমাকে অটলালার পাশের একটা টেবিলের কাছে বসবার ইঙ্গিত দিয়ে আবার তার ভ্যাচর ভ্যাচরে ফিরে গেল। একটা দরজা খুলে যেতে দেখি, বেরিয়ে এল একটি প্রাপ্তবয়স্কা মেম। হাতের ট্রের উপর রাইস, কারি, ডাল, ভাজাভুজি। আমাদের দিকে নজর যেতেই মৃদুহাস্য করে গুড ঈভনিং বলে বয়সের তুলনায় অতি স্মার্ট পদক্ষেপে গট-গট করে প্রথম অন্যান্য খদ্দেরদের রাইসকার্যাদি দিয়ে সর্বশেষে "কোণের সাহেবের" টেবিলের উপর তার "ছালনের কট্রা" রাখলো। ইনিই তা হলে ডোরা।...জনা আষ্টেক খালাসী পরম পরিতৃপ্তি সহকারে সশব্দে, ছুরি কাঁটার তোয়াক্কা না করে খেয়ে চলেছে। আর দুজন গোরা একান্তে বসে ঐ খাদ্যই রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করছে। ডোরা ফিরে আসতে অটলালা তার ক্যাশ ছেড়ে এল। আমরা চার-

জন এক টেবিলে বসলুম। অটলালা সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'আমরা তো বেশী পদ রাঁধি না—আমাদের গাহক তো সবই খালাসী, দু'একজন গোরা মাঝে মধ্যে। কিন্তু আপনারা অতদূর থেকে মেহেরবাণী করে এসেছেন। ভালোমন্দ কিছু করতে হয়।" আমাদের আপত্তি না শুনে দুজনা রান্নাঘরে চলে গেল। শশাঙ্ক বললে, "আশ্চর্য, কুড়ি বছর হয়ে গেল এই আম্বরউল্লা এ-দেশে আছে, তবু এক বর্ণ ইংরিজি শিখতে পারেনি। ওদিকে ওর বউ ডোরা দিব্য সিলেটী বলতে পারে। খালাসী গোরা সব খদ্দের ও-ই সামলায়। তবে ওর ইংরিজি বোঝাটাও চাট্টিখানি কথা নয়। একদম খাস খানদানী ককনি।" আমি শুধালুম, "বিয়েটা —মানে সিলেটী খালাসী আর লণ্ডনী মেমেতে হল কি প্রকারে?" "কেন হবে না? তুমি কি ভেবেছ ডোরা কোনো অক্সফর্ড ডন-এর মেয়ে এবং কেমব্রিজের রেঙলার? আর হক্ কথাই যদি কই, তবে বলি, সামাজিক পদমর্যাদায় আম্বর মিয়া তাঁর মাদামের চেয়ে ঢের ঢের সরেস। মিয়া চাষীর ছেলে আর ডোরা মুচির মেয়ে। অবশ্য ডোরার মত লক্ষ্মী মেয়ে শতেকে গোটেক। আমাদের যে কী আদর করে, পরে দেখতে পাবে। আর—" এমন সময় আম্বর মিয়া সহাস্য আস্তে প্রত্যাবর্তন করে বললে, "আমাদের সুখদুঃখের কথাতে মাঝে মাঝে বাধা পড়বে, স্যর। ডোরাই খদ্দেরদের কাছ থেকে হিসেবের কড়ি তোলে। এখন রাঁধছে। ওটা আমাকে সামলাতে হবে।" আমি ভয় পেয়ে মনে মনে বললুম, মেমের হাতের রান্নায় আবার সেই "লাঞ্চনা", আবার সেই "সাফার"! আমরা তো গাঁটের রোক্কা সিক্কা ঝেড়ে হেথায় পৌঁছলুম, আর ঐ হতভাগা লণ্ডনী লাঞ্চনা-সাফার কোত্থেকে বাস-ভাড়া যোগাড় করে আমাদের পিছনে ধাওয়া করলে? প্রকাশ্যে "রোস্টোমোস্টো রাঁধবে নাকি?"

হেসে বললে, "তাও কি কখনো হয়, স্যর! রাঁধবে খাঁটি সিলেটী রান্না।"

"শিখলো কার কাছ থেকে?"

"আমার কাছ থেকেই সামান্যই।" কিন্তু আমার গাহক খালাসী-ভাইদের ভিতর প্রায়ই বাড়িয়া বাড়িয়া বাবুর্চী থাকেন। তাঁদের কাছ থেকে সিলেটের পোশাকী খানা থেকে মামুলী ঝোল-ভাত সব-কিছু শিখে নিয়েছে—"। এমন সময় কোণের গোরা রান্নাঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে সামান্য গলা চড়িয়ে বললে, "ও মিসিস উল্লা, আজকের কারিটাতে একদম ঝাল নেই। দুটো গ্রীন চিলি—সরি—সে তো এই গড ড্যাম দেশে নেই। তা হলে একটু টাবাস্কো চিলি সস্ দাও না।" বলে কি ব্যাটা! ডোরা যখন রাইস-কারি নিয়ে যাচ্ছিল, তখন সে-কারির কটকটে লাল রঙ দেখে আঁৎকে উঠে আমার মত খাস সিলট্যাও মনস্থির করেছিল

ঐ বস্তু কম মেকদারে খেতেহবে—চাটনির মত, আ লা চাটনি। আর এ-গোরা হট, হট, ডবল হট মাদ্রাজী আচার দিয়ে তার ঝোলের ঝাল বাড়ালে।... একে একে, দুয়ে তিনে সব খদ্দের কড়ি গুনে চলে গেল। আমার চোখে একটুখানি ধাঁধাঁর ভাব দেখে বললে, "ঠিক ধরেছেন, স্যর। সক্কলের জেবে কি আর রেস্ত থাকে? ইনশাল্লা, দিয়ে দেবে কোনো এক খেপে। আর নাই বা দিলে।"

আমরা খেয়েছিলুম, বেগুন-ভাজা, মুড়িঘণ্ট, মটরপোলাও, মাছ ভাজা, মুর্গী কারি—বাকি মনে নেই। অসম্ভব সুন্দর রান্না। কিন্তু আর শুধোবেন না। আহারাদির আলোচনা আরম্ভ হলে আমার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। রাতও তখন অনেক। মোকা পেয়ে শশাঙ্ককে কানে কানে বললুম, "বিল?"

"চোক্কোরো। ও-কথা তুললে আম্বর-উল্লা ভ্যাক করে কেঁদে ফেলবে।"

শুধু কি তাই। বিদায় নেবার সময় ডোরা দোস্ত শশাঙ্কের হাতে তুলে দিলে একটা বাস্কেট। পথে নেমে সেটাকে প্রিয়ার গণ্ডদেশে হাত বুলোবার মত আদর করতে করতে বললে, "তিন দিনের দু-বেলার আহারাদি হে দোস্তো দুজনার —তিনজনারও হতে পারে॥"

২

ঠিক কোন্ সময়ে হিন্দুরা সমুদ্রযাত্রা বন্ধ করেন ঠিক বলা যায় না। তবে এর ফল যে বিষময় হয়েছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই চট্টগ্রাম এবং সিলেটের (সিলেট সমুদ্রতীরবর্তী নয়, কিন্তু সিলেটে বিরাট বিরাট হাওর থাকায় মাঝিরা অন্ধকারে তারা দেখে নৌকা চালাতে পারে—লিণ্ডসে সাহেব গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে কম্পাসের সাহায্যে একাধিক হাওর পেরিয়ে চাল-ভর্তি মহাজনী নৌকা মাদ্রাজ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন—এবং সী-সিকনেস তাদের হয় না) লক্ষ লক্ষ ব্যবসায়ী মাঝিমাল্লা অন্নহীন হয়ে যায়। এরপর আরব বণিকরা সমুদ্রপথে চট্টগ্রামে ব্যবসা করতে এলে এরা প্রধানত পেটের দায়ে মুসলমান হয়ে গোড়ার দিকে আরব জাহাজে খালাসীর চাকরি নিয়ে পূর্বে ইন্দোনেসিয়া ও পশ্চিমে জেদ্দা, সুয়েজ বন্দর অবধি পাড়ি দেয়। কিছু দিনের মধ্যেই চট্টগ্রামের সদাগর সম্প্রদায় আপন আপন পালের জাহাজ নির্মাণ করে বর্মা মালয়ের সঙ্গে ব্যবসা চালাতে থাকে এবং এ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত ইংরেজের কলের জাহাজের সঙ্গে পাল্লা দেয়।

প্রধানত সিলেট, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালির মাঝিমাল্লা চাষাভুষোই গোড়ার দিকে ইয়োরোপীয় জাহাজে কাজ নেয় এবং এদের খালাসী বলা হত (এ স্থলেই

উল্লেখ করি সংখ্যায় প্রায় আশী হাজারের মত যে-সব সিলেটি বর্তমানে ইংলণ্ডে কলকারখানায় কাজ করে—শুনেছি সিলেটিদের তুলনায় পুব পাকের অন্যান্য জেলার লোকসংখ্যা নগণ্য—দেশের সিলেটবাসীরা এদের নাম দিয়েছেন 'লণ্ডনী', যদিও এদের বড় আড্ডা বোধ হয় নটিংহামে)। বহু বৎসর ধরে খালাসীরা ডাঙায় বাসা বেঁধে কলকারখানায় ঢোকেনি। কিন্তু বেশ-কিছু সংখ্যক সিলেটি ক্যানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রে কলকারখানায় ঢুকে প্রচুর পয়সা কামিয়ে দেশে ফিরতো—ওখানে চিরতরে বাসভূমি নির্মাণ করতো না।

খালাসীবৃত্তি থেকে কবে কি করে এরা দক্ষিণ ও মধ্য ইংলণ্ডের কলকারখানায় ঢুকে পড়ে 'লণ্ডনী' খেতাব পায় তার কোনো লিখিত বিবরণ আমি পড়িনি। তবে আমার মনে হয়, ১৯২৯-৩৩-এর পূর্বে নয়, কারণ ঐ সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার কারখানাকর্মীদের ভিতর প্রচুরতম বেকারি। এরপরে, প্রধানতঃ যুদ্ধের সময় বিস্তর সস্তা লেবারের প্রয়োজন হল। আজ যে আপনি আমি লণ্ডন নটিংহামের যে-কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরিজি রেস্তোরাঁতেও 'পাটনা রাইস এবং কারি' পাচ্ছি তার গোড়াপত্তন হয় ঐ সময় ('পাটনা রাইস' বলে বটে, কিন্তু সেটা দেরাদুন, বাসমতী সব-কিছুই হতে পারে। বহু গবেষণা করে সন্ধান পেলুম কোম্পানির আমলে এ-দেশ থেকে যে-চাল বিলেত যেত সেটা প্রধানত সংগ্রহ করা হত পাটনার আড়তে যে-হরেক প্রদেশের চাল জড়ো হয়েছে তার থেকে ; তাই এর অমনিবাস নাম হয়ে যায় 'পাটনা রাইস') সৈন্যদের এবং 'লণ্ডনীদের' ক্ষুধা নিবারণের জন্য। আজ এদেশ থেকে প্রতিদিন মণ মণ চাল, ডাল, শুঁটকি, মসলা ইত্যাদি তো যাচ্ছেই, তার উপর হাজার হাজার বোতল আম, নেবু, জলপাইয়ের আচার। গত বৎসর সিলেটে এক বিরাট আচার ফ্যাকটরি দেখে আমি স্তম্ভিত। পরে সে কারখানার অমায়িক মালিকের সঙ্গে দেখা হলে তিনি বললেন, 'যা তৈরী হয় তার প্রায় বেবাক মাল চলে যায় লণ্ডনীদের খেদমতে। চাহিদাও বেড়ে চলেছে। আমি পেরে উঠছি না।' অবশ্য আমি জানতুম, মালদার ম্যাংগো স্লাইজ এবং মিষ্টি-টক (সুঈট-সাওয়ার) আমের আচারের এক বৃহৎ অংশ লণ্ডনী-দের তরেই যায়। কারণ সিলেটের আম জঘন্য। তার থেকে ভালো আচার হয় না—স্লাইস মাথায় থাকুন অবশ্য সিলেট থেকে সর্বোৎকৃষ্ট আনারস-স্লাইস বিলেত যায়। মার্কিন হাইনৎস ফিফটি সেভনের (বা অন্য সংখ্যাও হতে পারে) মত সিলেটি আচার কারখানা ৪৭ রকমের আচার, স্লাইস ইত্যাদি তৈরী করে। বুঝুন যে সিলেটি দেশে ভাত, লাল লঙ্কা পেশা, আর কিঞ্চিৎ নিতান্তই মেহেরবান হলে একটি কাঁচা প্যাঁজ খেত—তাও দু বেলা নয় এবং সে-ও পেট ভরে নয়—সে কি না

আজ সিলেটের জমিদার-ছেলেরও যা জোটে না বিলেতে বসে তাই খায়। এস্তেক পান তক। পান যায় প্লেনে। তাই নাকি একটা খিলির দাম সিক্স্ পেন্স্ থেকে এক শিলিং!

সিলেটীরা বিলেতে চাকরি পায় কেন? কাগজে নিশ্চয়ই পড়েছেন, সাদা আর কালো মজুরে সেখানে নিত্য লড়াই। আমি এ-বিষয়ে সরজমিনে তদন্ত-তাবাশ করিনি। যা শুনেছি, তাই বলছি: (১) কালোরা—বিশেষ করে সিলেটীরা—কম মাইনেতে কাজ করতে রাজী; নিগ্রোরা মদ খায়, জুয়া খেলে বলে তাদের খাঁই বেশী। (২) দুই শিফটে এবং রবিবারেও কাজ করতে রাজী—নিগ্রোরা খৃষ্টান, রবিবারে সাবাৎ মানে। (৩) ট্রেড ইউনিয়ন এড়িয়ে চলে, স্ট্রাইক করতে চায় না। (৪) রাত ভর মদ খেয়ে পরের দিন বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে না বলে কাজকর্মে কামাই দেয় কম।

এই সিলেটীরা অনেকেই মেম বিয়ে করে ওদের একটা দু-আঁসলা সমাজ গড়ে তুলেছে এবং ঘটকালি করে এই মেমেরা নবাগত সিলেটীকে তাদের বোন ভাগ্নী বিয়ে দেবার জন্য। বোন ভাগ্নীও "লণ্ডনী"র বউয়ের কাছ থেকে জেনে গিয়েছে (১) সিলেটী মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বউকে ঠ্যাঙায় না (২) ঘোড়ার রেস, কুকুরের রেস, এমন কি কড়ি খর্চা করে ফুটবল খেলা দেখতেও যায় না, মদে পয়সা ওড়ায় না এবং কোনো প্রকারের জুয়োও খেলে না বলে বউ স্বচ্ছন্দে সংসার চালাবার জন্য স্বামীর মাইনের একটা বড় হিস্যে পায়। বিয়ের পূর্বে বা পরে সে অন্য মেয়ের সঙ্গে পরকীয়া করে না—সে তো ধলা মেম পেয়েই খুশ! এ দুটো সেকুরিটি পৃথিবীর সর্বত্রই রমণীমাত্রই খোঁজে। এবং কেউ কেউ তৃতীয় সেকুরিটিও দিতে পারে—আপন পরসায় কেনা নিজস্ব কটেজ। আমার পরিচিত এক চৌধুরীর ছেলে তো নটিংহামে তিনখানা চেন্ হোটেল-রেস্তোরাঁর মালিক (আজকাল সিলেটী মুসলমানদের উচ্চশ্রেণীর লোকও নানা ধান্দায় "লণ্ডনী" হচ্ছেন)। তিনি তো অনায়াসে তৃতীয় সেকুরিটি দিতে পারেন। এছাড়া ছোট-খাটো আরো অনেক আরাম আয়েস আছে। বাচ্চা রাত্রে কেঁদে খাস-সায়েব মজুরের ঘুম ভাঙালে সে ধমক দিয়ে বউকে বাচ্চাসহ রান্নাঘরে খেদায়; "লণ্ডনী" গায়ে পড়ে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে ঠাণ্ডা করে। দেশে ছেলেবেলা থেকেই সে কত ভাতিজা-ভাতিজী ঠাণ্ডা করেছে।...পাব-এ যায় না বলে প্রায়ই তার ফুরসৎ থাকে এবং বউকে প্রেম করে বলে প্র্যাম-এ করে বাচ্চাকে হাওয়াভী খাওয়ায়।

৩

"অ ভাই, জলদি আও, বেটিয়ে ডাকে।"

একদম ন'সিকে খাঁটি সিলেটী উচ্চারণ। অবশ্য আমি খুব-একটা হকচকিয়ে উঠিনি, কারণ ঢাকার এ্যার-পর্‌টে হরহামেশাই সিলেটী উচ্চারণ শোনা যায়। কিন্তু যে প্রৌঢ় লোকটি এই মধুর আহ্বান শোনালেন, তাঁর পরনে দেখি উত্তম বিলিতি কাট্‌-এ অত্যুত্তম ১০০% বিলিতি উলের নেভি ব্লু স্যুট। ওদিকে গল-কম্বল মানমুনিয়া চাপ দাড়ি। যাকে ডাকছিলেন তারও ঐ বেশ, তবে বয়সে যুবক। কিন্তু ঐ "বেটিয়ে ডাকে" অর্থাৎ "মেয়েছেলে ডাকছে"—এর বিগলিতার্থটা কি? তখন এ্যার-পর্‌টের প্রধান লাউনজে ঢুকে দেখি একপাল লোক: প্রায় সকলেরই পরনে একই ধরনের নেভি ব্লু স্যুট। বুঝে গেলুম এরা "লনডনী"। বাড়িতে এসে দাদাকে তাবৎ হাৎ বয়ান করলুম। দাদা বললে, লনডনীরা ঈদের পরবে প্লেন চার্‌টার করে দেশে যায়। সে চাউস প্লেন সিলেটে নামতে পারে না বলে ঢাকা অবধি এসে থেমে যায়। তারপর সাধারণ সারভিসে আপন আপন মোকামে যায়। শ্রীমঙ্গল, শমসের নগরের মত ছোট ছোট জায়গায়ও প্রধানত এদেরই জন্য এ্যার স্ট্রিপ করা হয়েছে। আর ঐ যে চাপ দাড়ি-ওলা লোকটাকে দেখলি সে খুব সম্ভব লনডনীদের বিলেতের মসজিদের ইমাম। এ-ই এদের বিলেত থেকে আপন আপন মোকাম অবধি দেখ-ভাল করে পৌঁছিয়ে দেয়। এদেরই একজন বোধ হয় ছিটকে পড়েছিল, ইতিমধ্যে তরুণী এনাউনসার মাইকে বলেছে সিলেটীগামী প্লেন এখ্‌খুনি ছাড়বে। তাই ইমাম হাঁকছিল, "বেটিয়ে ডাকে, জলদি আও"। সিলেটী মাত্রই জানেন, সে-ভাষায় "বেটী" ঠিক "দুহিতা" বা "মেয়েছেলে" নয়। বরঞ্চ "মেয়েমানুষ" এমন কি "মাগী" অর্থেও ধরে। পশ্চিমবঙ্গে যখন কেউ বলে "বেটির কাণ্ড দেখ!" তখন যে অর্থ ধরে। এখন পাঠক বুঝুন, সেই খাবসুরৎ তরুণীকে "বেটি" বললে কোন্ রস সৃষ্ট হয়!

লনডনীরা প্রতি বৎসর সিলেটে কত টাকা পাঠায় তার হিসেব কেউ দিতে পারে না। কারণ এরা কালোবাজারে খুব ভালো রেট পায় বলে এদের পাঠানো টাকার খুব বড়-একটা হিস্তের কোনো সন্ধানই কেউ জানে না। শুনেছি কোনো এক বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক কালোবাজারে লনডনীদের কাছ থেকে পাউন্‌ড কিনে তাদের নারায়ণগঞ্জস্থ আপন পাট গুদোম জুট মিলকে কোড-এ হুকুম দেয়। অমুক সিলেটীকে অত টাকা পাঠাবে। আরো শুনেছি, তার পর ঐ পাউন্‌ড দিয়ে বিলিতি জিনিস কিনে, কিছুটা আইনত, বেশীর ভাগ কালোয় প্রাচ্যে পাচার করে।

কত টাকা লনডনীরা পাঠায় তার হিসেব না-জানা থাকলেও সিলেট জেলাতে সে টাকার সুদূরপ্রসারী গভীর প্রভাব সর্বসিলেটীর চোখে যেন ঘুষি মেরে আপন মাহাত্ম্য অহরহ প্রচার করে। সস্তা সেকেনহ্যানড বিদেশী ট্র্যানজিসটার, পারকার কলম, ক্যামেরা ইত্যাদির কথা বাদ দিচ্ছি—একমাত্র সিলেট শহরেই নাকি গণ্ডা দুই সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ট্র্যাভেল এজেনসি আছে—কল্পনা করতে পারেন এ-জিনিস বর্ধমানে? মহকুমা শহরের কথা বাদ দিন, বড় বড় থানায়—বিশেষত যে-সব পকেটে লনডনীদের আদি নিবাস—পর্যন্ত বড় বড় ব্যাঙ্কের ব্রানচ আপিস খোলা হয়েছে। আর ডাকঘরের তো কথাই নেই। যে-ডাকঘরে দিনে তিন-খানা চিঠিও আসে কি না, সেখানে আসে পাঁচশ', হাজার টাকার মনিঅরডার। কিন্তু এহ বাহ্য। যে-সিলেট শহরের বন্দর-বাজারে মাছের কখনো অভাব হয়নি সেই বাজারে দর আগুন এবং শৌখিন মাছ বিরল। আমার এক মুরুব্বি বললেন, "আসবে কোত্থেকে? লনডনীর পাঠানো টাকাতে এখন গাঁয়ের লোক মাছ খায়। জেলে তকলীফ বরদাস্ত করে শহরে আসবে কেন? বললে প্রত্যয় যাবে কি, পাঁচখানা গাঁয়ের মাঝখানে যে-হাট, সেটা এই কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত বসতো সপ্তাহে এক দিন এক বেলা। এখন বসে রোজ, প্রতিদিন, দু'বেলা।"

এটা আবার কনফারম করলো আমার এক বোন। গাঁয়ের জমিদার বাড়িতে তার বিয়ে হয়েছে এবং লনডনীরা যখন দেশে আসে তখন প্রায়ই ব্যাঙ্কের চিঠি-পত্রাদি পড়াবার জন্য জমিদার বাড়িতে আসে। বোন বললে, "এক লনডনী দেশে এসেছে ঈদ করতে। মাছ কিনতে গেছে ভিন গাঁয়ের হাটে। একটা ভাল মাছ দেখে দাম শুধোলে। জেলে বললে ওটা বিক্রি হয়ে গিয়েছে। সেটা কিনেছে ঐ গাঁয়েরই এক লনডনী, এবং দুই গাঁয়ে দারুণ আড়াআড়ি। ভিন গাঁয়ের লনডনীর এক দোস্ত প্রথম লনডনীকে খোঁচা দিয়ে যা বললে তার অর্থ তোমাদের গাঁয়ে এ-মাছ খাবার মত রেস্ত আছে কার? প্রথম লনডনী বড় নিরীহ, কোনো উত্তর দিল না। কিন্তু তার গাঁয়ের সঙ্গী-সাথীরা চটে গিয়ে তাকে বললে, "আল্লার কসম, এই, এই মাছটাই তোকে কিনতে হবে।" তখন মাছ চড়লো নিলামে। দশ, বিশ, শ', দু'শ চড়চড় করে চড়ে গেল। কবিগুরুর ভাষা একটু বদলালে দাঁড়ায়,

"দশ মাষা দিব আমি"
কহিলা লনডন-ধামী,
"বিশ মাষা" অন্য জনে কয়।
দোঁহে কহে "দেহো দেহো",

হার নাহি মানে কেহ—
মূল্য বেড়ে ওঠে ক্রমাগত।

আমার বোনটি অতিরঞ্জনে অভ্যস্ত নয়। শেষটায় বললে, "আখেরে মাছটা বিক্রি হল এক হাজার এক টাকা মূল্যে। কিনলো প্রথম লনডনী। এবং আশ্চর্য নগদ টাকা তার ওয়াস্‌কিটের পকেট থেকেই বের করল। তার পর বিজয়ী গ্রাম মাছটাকে নিয়ে প্রসেশন করে গ্রামে এসে আপন গাঁ প্রদক্ষিণ করলো। বিস্তর জিন্দাবাদ জিগিরের পর মাছটাকে ব্লেড দিয়ে প্রায় ডাকটিকিটের সাইজে টুকরো টুকরো করে গাঁয়ের সব্বাইকে বিলোলো। এখন এরা হাটে গিয়ে দেমাক করে, 'আজার টেকি (হাজার টাকা দামের) মাছ খাই আমরা'।"

কিন্তু এহ বাহ্য। সমাজবিদ্‌দের কান খাড়া হবে শেষ তত্ত্ব এবং তথ্যটি শুনে। লনডনী যত টাকা নিয়েই গ্রামে ফিরুক না কেন, জমিদার মিরাশদারের (যদ্যপি এখন আর জমিদারী নেই) বৈঠকখানায় শব্দার্থে এখনো তারা কলকে পায় না। অথচ তারা "জাতে উঠতে" চায়। তাই তারা হন্তে হয়ে উঠেছে সদরে, মহকুমা টাউনে বাড়ি কিনতে। সেখানে কে কার খোঁজ নেয়? এক বা দু'পুরুষে সবাই ভুলে যাবে তাদের উৎপত্তি, পেশা, জন্মস্থল। ফলে সিলেট শহরে যে-বাড়ির দাম পাঁচ বছর আগে ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা, এখন লনডনী দেড় লাখ হাঁকছে। একাধিক পেনশনার ভাবছেন সিলেটের বাড়ি বিক্রি করে ঐ টাকা দিয়ে ঢাকাতে ঐরকম বাড়িই যখন পাবো (সিলেট জেলার বাইরে লনডনী বাড়ি চায় না) তখন ছেলে-নাতির পড়াশুনোর সুবিধের জন্য—ক্যাপিটালে বাস করার আরও সুবিধে—সেখানেই যাই না কেন? যিনি আমাকে এ-ব্যাপারটির কথা বললেন, তিনি প্রাগুক্ত ঐ "মছলী-কহানীও" জানতেন। শেষ করলেন এই বলে—"আগে প্রবাদ ছিল 'মাছ খাবি তো ইলিশ, লাং ধরবি তো পুলিশ', এখন হয়েছে 'মাছ খাবি ন'মণী, লাং ধরবি লনডনী'। কিন্তু এটা চালু হবে না। লনডনীরা সচ্চরিত্র।"

৪

এই পর্যায়ের কীর্তনকাহিনী (সাগা)-র কালি ভালো করে শুকোবার পূর্বেই দেখি হঠাৎ আমি সিলেটীদের মাঝখানে। তবে খাস সিলেটে নয়, লণ্ডনে। এবং বিরাট লণ্ডনের সব কটা সিলেটী রেস্তরাঁ চষতে হলে পুরো পাক্কা ছটি মাস লাগার কথা।

প্রথম যেটিতে গেলুম, সেটা নিতান্তই যোগাযোগের ফলে। লণ্ডনে যে এ্যারপর্টে নাবলুম সেখান থেকে খাস লণ্ডন নিদেন ত্রিশ মাইল দূরে। তিনজন পরিচিতের ঠিকানা নোটবুকে টোকা ছিল। এক সহৃদয় ইংরেজকে সে-তিনটে

দেখিয়ে শুধোলুম, সবচেয়ে কাছে পড়ে কোন্‌টা। এক ঝলক দিঠি হেনেই বললে, "গঙ্গা" রেস্তরাঁ। তাই সই। গেল বছরে যখন ওর মালিক পঁচিশ বছর লণ্ডনে কাটিয়ে বাপ-মাকে দেখতে দেশে আসে তখন আমাকে জোর নিমন্ত্রণ জানিয়ে বলে, তার রেস্তরাঁ আছে, ফ্ল্যাট আছে ; আমি যদি দয়া করে পদধূলি—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ।

কোথায় কি ? আমি ভেবেছিলুম, সেই যে চল্লিশ বছর পূর্বেকার টিলবারি ডকের সিলেটী রেস্তরাঁ—যার কাহিনী আপনাদের শুনিয়েছি—সেই ধরনের গরীবগুরবোর "অটল"ই (হোটেলের সিলেটী উচ্চারণ ; তবে সিলেটীতে এ্যাক্‌সেন্‌ট্‌ আছে বলে সেটা পড়বে "অ"-র উপর) হবে। তবে কি না, নিতান্ত মহারানীর আপন নগরের মধ্যিখানে থানা গেড়েছে যখন, তবে হয়তো দেয়াল ছাদে দু'এক পলস্তরা পাউডার-রুজ মাখিয়ে নিয়েছে।

কোথায় কি ? পরিপাটি ছিমছাম পশ্‌, শিক্‌। বাদবাকি সব-কিছু পর্যবেক্ষণ করার পূর্বেই দূর থেকে মালিক ("অটলালা" = হোটেলওয়ালা) আমাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এসেছে। "আউকা, আউকা ; বউকা বউকা" (আসুন, আসুন ; বসুন, বসুন)। তারপর দিলে ছুট রেস্তরাঁর গর্ভগৃহের দিকে—পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য বউকে নিয়ে আসতে।

টেবিল-ক্লথ, ন্যাপকিন মুরমুরে পয়লা নম্বরী আইরিশ লিনেনের, ফুলদানীতে যেন বাগান থেকে সদ্য তোলা, শিশির-ভেজা গোলাপ, ছুরি-কাঁটা তথা যাবতীয় কাটলারি যেন মোগল আমলের খাঁটি রূপোর, আর গেলাস-বৌল এমনই স্বচ্ছ যে ভয় হল যে দুর্যোধনের মত স্ফটিককে জল ভেবে, আমিও এ-গুলোর দু'একটা দেখতে না পেয়ে ভেঙে ফেলি !

ডান দিকে কাঁচে ঘেরা একটি চৌকো কুঠরি। ভিতরে সারি সারি শেলফে সাজানো দুনিয়ার খাসা খাসা মদ্যাদি। বোতলের আকার-প্রকার রঙ-লেবেল দেখেই বোঝা যায়। কুঠরির মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটি খাপসুরৎ জোয়ান ছোকরা ন্যাপকিন দিয়ে ওয়াইন শ্যাম্‌পেন ; বিয়ার-মাগ্‌ সাফসুৎরো করছিল এবং মাঝে মাঝে আমার দিকে আড়নয়নে তাকাচ্ছিল। ছোকরার মুখের আদল দেহের গঠন সিলেটীর মত। কিন্তু রঙটা ? গোরাদের মত ফর্সা নয়, আবার সিলেটীর মত শ্যাম-হলদেও নয়। সমাধান কিন্তু সহজ। গলা বাড়িয়ে সিলেটীতে শুধোলুম, "ভাই সাহেব, আপনার দেশ কোথায় ?"

গোটা কয়েক গেলাস ভেঙে ফেলে ছিল আর কি ! গলার আওয়াজ হোঁচট খেতে খেতে, খাবি খেয়ে খেয়ে, পড়িমরি হয়ে বললে, 'জী, জী, জী ; আমি সিলেটের, ফেচুগঞ্জের।.....এখানে যারা কাজ-কাম করে সবাই সিলেটী।"

(আমরা মারওয়াড়িদের দোষ দি ; তারা শুধু দেশের ভাইয়াদেরই চাকরি দেয়। সমস্যাটার সমাধান এখনো করতে পারিনি।)

ইতিমধ্যে মালিক এসে গেছেন। তাঁর গৃহিণীর—মেমসাহেবার—প্রথম কথা কটি শুনেই আমার মনে সন্দেহ হল, যদিও এঁর ইংরিজি উচ্চারণ উত্তম—অন্তত আমার চেয়ে ভালো—তবু ইনি বোধ হয় কন্টিনেনটাল। ভারী মিষ্টি স্বভাবের, লাজুক, স্বল্পভাষী রমণী। মালিকের মাথায় হঠাৎ কি যেন আচমকা ভাবোদয় হল। বললে, "আপনি তো একদা জরমনিতে পড়াশুনো করেছিলেন ; এখনো নাকি ঐ দেশের ভাষা বলতে পারেন। ইনি (বউয়ের দিকে তাকিয়ে) খাঁটি জরমন।"

এ্যাতক্ষ্যাণ ব্যাললেই হত। মেমও সঙ্গে সঙ্গে জরমন বলতে আরম্ভ করলো। ওর উচ্চারণ থেকে মনে হল সে ভ্যুর্‌টেম্‌বের্গ প্রদেশের মেয়ে।

সোমদেবের চরম কৃপাই বলতে হবে! যে-প্লেনে জরমনি থেকে লণ্ডন এসেছিলুম সেটাতে ঐ ভ্যুর্‌টেম্‌বের্গ প্রদেশের মোলায়েম ওয়াইন সস্তায় বিক্রী হচ্ছিল। লণ্ডনে পৌঁছে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ডেরা পাবো, তা তো জানিনে। যদি-স্যাৎ কাজে লেগে যায়। তাই এক বোতল কিনে নিয়েছিলুম। আর যাবে কোথা! এক কোণে ডাঁই করে রাখা লাগেজ থেকে বোতলটি বের করে ম্যাডামের সামনে রেখে বললুম, "এই নিন। ৎস্বম ভোল জাইন, আ ভৎর্‌ সাঁতে-হিয়ার ইজ্‌ টু ইউ'—এসব তান্ত্রিক মন্ত্রের অর্থ আমি এখনো সঠিক জানিনে। তবে মোটামুটি দাঁড়ায় "ইটি পান করে আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হোক, "আপনার সর্বমঙ্গল হোক" ইত্যাদি। উভয় পক্ষ উভয়ের একই মঙ্গল কামনা করেন। মদ্য পান করে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় কি না জানিনে—শুনেছি গত যুদ্ধে ফ্রান্‌স্‌ হেরে যাওয়ার পর প্রেসিডেন্ট পেতাঁ যখন প্রথম বক্তৃতা দেন, তখন তিনি বলেন, "অত্যধিক মদ্য পান হেতু ফরাসী সেপাই ঠিকমত লড়তে পারেনি"—কিন্তু এটাই রেওয়াজ এবং ম্যাডামের চোখ ছল ছল করে উঠলো। কোথাকার কোন্‌ ইণ্ডিয়ান—তার দেশের জিনিস, এ স্থলে প্রতীক বলতে হবে, এনেছে। এটা কি কম কথা। ভাবুন, আপনি নিউজীল্যাণ্ড বা ওসলোতে। সেখানে কেউ নিয়ে এল আপনার জন্য পাটিসাপটা ক্ষীরের মালপো দেদো সন্দেশ! তদুপরি সে বাঙালী নয়।

ইতিমধ্যে দুটি একটি করে খদ্দের আসতে আরম্ভ করেছে। তার থেকে বুঝলুম, রাত হয়ে আসছে। আমার কাছে আশ্চর্য বোধ হয় যে আমরা সূর্যচন্দ্র দেখে সময়টা কি এবং তার চেয়েও বড় কথা মানুষের আচরণ তার কাজ-কারবার

স্থির করি। যেমন সূর্য অস্ত যাচ্ছেন; অতএব এখন রাস্তার ভিড় কমতির দিকে। আর বিলেতে জানলার পর্দা সরিয়ে দেখলেন রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড়। নিশ্চয়ই লাঞ্চের সময়, অতএব দুপুর।

ক্রমে ক্রমে রেস্তরাঁ ভর্তি হয়ে গেল। কি কি আশ্চর্য। সব গোরার পাল। একটি মাত্র ইণ্ডিয়ান নেই। চল্লিশ বছর পূর্বে টিলবারির রেস্তরাঁয় দেখেছিলুম বেশীর ভাগ সিলেটী খদ্দের; মাত্র দু'একটি গোরা। এখানে দেখি "সব্ লাল হো গিয়া।"

মালিক ওয়ার্ল্ড এট্লাসের মত বিরাট একখানা মেনু এগিয়ে দিয়ে বললে, "কি খাবেন, হুকুম দিন।" আমি বললুম, "প্লেনে বিস্তর ঝাঁকুনি খেয়েছি আর কি খাবো, কণ্ড। বমি করেছে বেশ কয়েকজন। তুমি আমি নিতান্ত সিলেটের লোক। জন্ম থেকে হাওর-বিলে নৌকর ভিতরে-বাইরে নাগর-দোলার দোল খেয়ে শিলঙ যাবার সময় আচমকা পাহাড়ী মোড়, হেয়ার-পিন টার্ন হজম করে করে সী সিক এ্যার সিক, ল্যাণ্ড সিক হইনে। কিন্তু এবারে আম্মো কাবু। গা গুলোচ্ছে, বমি না করলেই রক্ষে। প্লেনে ওঠার আগে যা-সব খেয়েছিলুম সেগুলো যেন রিটার্ন টিকিট নিয়ে গিয়েছিল; এখন ফিরি ফিরি করছে। উপস্থিত থাক। বরঞ্চ খাটের পাশে দু'খানা স্যানউইচ রেখে দিয়ো। ক্ষিধে পেলে খেয়ে নেব।"

মেনুটার উপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলুম, খেয়াল না করে, মালিককে ভদ্রতা দেখাবার জন্য, আলতো আলতো ভাবে। বিরয়ানি, কোর্মা, কালিয়া, কাবাব, কোফতা, চিকেনকারি গয়রহ গয়রহ। এ তো ডালভাত কিন্তু শব্দার্থে বলছি না। আই মীন, এগুলো তো এ-রকম ফেশনেবল রেস্তোরাঁতে থাকবেই। ইংরিজিতে যাকে বলে, "মাস্টস্"। কিন্তু কি একটা মামুলী আইটেমের দাম দেখতে গিয়ে আমি যেন আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। বলে কি? দশ শিলিং! মানে? দশ টাকা। তখন মেনুর ডান দিকে তাকিয়ে দেখি, সব মালেরই প্রায় ঐ দাম। অর্থাৎ, দু'পদী আহারাদির জন্য আপনার খসে যাবে পৌণ্ড খানিক। পনরো, বিশ, পঁচিশ টাকা! ও! তাই ইণ্ডিয়ানরা আসেনি। ওদের বেশীর ভাগই তো ছাত্রসম্প্রদায়। ওদের জেবে অত রেস্ত কোথায়?.....মনে পড়ল, চল্লিশ বছর পূর্বে ছ' পেনিতে (পাঁচ আনাতে) রাইসকারি পাওয়া যেত টিলবারি ডক্-এ!

পরে খবর নিয়ে শুনলুম, "গঙ্গার" ভাও মোটেই আক্রা নয়। এটাই নর্মাল। এমন কি, ঐ পাড়ার চীনা, হাঙ্গেরিয়ান, স্প্যানিশ রেস্তোরাঁতে আহারাদি আরো

আক্রা। আর, এরপর, খাস বিলিতি ডাঙর ডাঙর রেস্তোরাঁতে কি ভাও, সেটা শুধোবার মত হিম্মৎ আমার জিগর কলিজায় ছিল না, সেটা আমার হাফ-সিঙ্গল-চা, দুটো-ফল্‌স্‌ পীনেওলা বেরাদর পাঠক নিশ্চয়ই দিব্য-দৃষ্টিতে দেখে ফেলেছেন।

কিন্তু এহ বাহ্য। কোন্‌ দেশে কোন্‌ বস্তুর কি দর, "বিভিন্ন দেশের রেস্তোরাঁর তুলনাত্মক দরদাম" সম্বন্ধে ডকটেরেট থিসিস লিখে ধৈর্যশীল পাঠককে, এ-অধম নিপীড়িত করতে সাতিশয় অনিচ্ছুক। তবে কেন?

সেটা পরে হবে।

নটিংহাম

আমাদের ছেলেবেলায় ঘটি বাঙালে রেষারেষি ঠাট্টা-মস্করা ছিল ঢের ঢের বেশী। একটা মস্করা আমার মনে পড়ল নটিংহাম যাবার ট্রেনে বসে। বাঙালের সঙ্গে (বাঙাল "সাথে" বলে এবং গদ্যেও লেখে "সাথে"; রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে সেটা কিঞ্চিৎ অনিচ্ছায় স্বীকার করে নেন) লিলুয়া স্টেশনে দেখা এক ঘটির। বাঙাল শুধোলে, "কোথায় চললেন. দাদা?" ঘটি বললে, "চললুম, দাদা, পশ্চিমে। গায়ে এট্টুখানি গত্তি লাগিয়ে আসি।" বাঙাল আমেজ করলে, দাদা বুঝি হিল্লী দিল্লী বিজয় করতে চললেন। কারণ সে যখন প্রথম দেশ ছেড়ে শেয়ালদায় নামে তখন গান রচেছিল,

"লাম্যা ইশ্‌টিশানে
গাড়ির থনে
মনে মনে আমেজ করি
আইলাম বুঝি আলী মিয়ার রঙ-মহলে
ঢাহা (ঢাকা) জেলায় বশ্যাল (বরিশাল) ছাড়ি॥"

তার তরে বরিশাল ছেড়ে ঢাকা যাওয়াটাই একটা মস্ত কসরত। এবং শেয়ালদা আসাটা তো রীতিমত গামার সঙ্গে লড়াই দেওয়া!...অবশেষে ধরা পড়লো ঘটি দাদা যাচ্ছেন লিলুয়া।

সবই পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপার। লণ্ডন থেকে নটিংহাম সোয়া শ' মাইল হয় কি না হয়। আমাদের কাছে লম্বি। অথচ লণ্ডনের ইংরেজ দোস্তেরা যে ভাবে আমাকে ওখানে যেতে নিরুৎসাহ করছিলেন তার থেকে মনে হল ওরা ও-মুল্লুককে প্রায় দুশ্‌মনের পুরী বলে ধরে নিয়েছেন। একাধিক জন বললেন,

"ওখানে—অপরাধ নিয়ো না এই এই, অর্থাৎ সেখানে ইণ্ডিয়ানদের ঠ্যাঙানো হচ্ছে।" আমি বললুম, "যেতে যখন হবেই তখন অত ভেবে কি হবে। তদুপরি আমাদের পোয়েট টেগোর বলছেন,

মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে॥"

ট্রেনে বসে চিন্তা করে দেখি, আমি নটিংহাম সম্বন্ধে যা জানি সে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। (১) আমার একজন আত্মীয় সেখানে আছেন। আমার আপন আত্মীয় হলে না গেলেও চলতো কিন্তু তিনি আমার ছোট বোনের দেবর। তিনি আবার তালেবর লোক। আমি যখন হামবুর্গে তখন কি করে কোথায় থেকে খবর পেয়ে তিনি নটিংহাম থেকে আমাকে ট্রাঙ্ক কল্ করে সাতিশয় অনুরোধ জানালেন, আমি যদিস্যাৎ ইংলণ্ডে যাই তবে অতি অবশ্য আমাকে নটিংহাম যেতেই হবে, যেতেই হবে—তিন সত্যি। (২) ছেলেবেলায় রবিনহুডের কেচ্ছা পড়েছিলুম। তাঁর কর্মস্থল ছিল নটিংহাম। পাশে ছিল শারউড বন। সেইটেই ছিল তাঁর স্থায়ী আস্তানা।...এদানির কলকাতার ছেলেছোকরারা আর রবিনহুডের কাহিনী তেমন একটা পড়ে না। কলকাতার গলিতে গলিতে এস্তের রবিনহুড। তবে অতি সামান্য একটা তফাৎ রয়েছে। রবিনহুড নাকি ডাকাতি করে যে-কড়ি কামাতো সেটা গরীব-দুঃখীদের বিলিয়ে দিতো। অদ্যকার কলকাতার রবিনহুডরা চাঁদার নামে, হ্যানাত্যানার নামে যে-টাকা, প্রায়-ডাকাতি করে কামান, সেটা ঠিক ঠিক কোন্ জায়গায় যায়, এ-মূর্খ সে-বাবদে বিশেষজ্ঞ নয়। ঈশ্বর সুকুমার রায় তাঁর একটি কবিতাতে, "উপবেশন" কি করে করতে হয়, সে সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন,

"তবে দেখো, খাদ্য দিতে অতিথির থালে
দৈবাৎ না পড়ে যেন কভু নিজ গালে।"

বাকিটা বলার কোন প্রয়োজন নেই। চালাক মাত্রই মূর্খকে কথা বলতে দেয়। আমি বিশ্বাস করি, "যদল্পং তন্মিষ্টং"। (৩) আমাদের যে-রকম বিদ্রোহী কবি শ্রীযুত নজরুল ইসলাম, ইংরেজের বিদ্রোহী কবি বায়রন। এবং তাঁর বাস্তুভিটে নটিংহামের অতি কাছে। ইংরেজ সরকার তাঁর মৃতদেহ বড় বড় মহৎ মহৎ কবির সঙ্গে লণ্ডনে গোর দিতে চায়নি বলে তাঁকে গোর দেওয়া হয় তাঁর বাস্তুভিটের গোরস্থানে।

"নটিঙম্! নটিঙম্!! নটিঙম্!!!" কলরব চিৎকার।

আরেকটু হলেই পৌঁছে যেতুম নর্থ পোলে। প্রফেটরা বার বার বলেছেন,

"নিজেকে চিনতে শেখো। আত্মচিন্তা করো।" তা আপনারা যত খুশী আত্মচিন্তা করুন। কিন্তু রেলগাড়িতে না। কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে পৌঁছে, দু' ডবল ভাড়া, জরিমানা দিয়ে, মোকামে ফিরবেন বরঞ্চ সেইটেই চিন্তা করুন।

২

তনু, দেহ, শরীর, বপু, কলেবর কোন্‌টা ঠিক মধ্যিখানে বলা ভার। আমার আত্মীয় যিনি আমাকে নটিঙাম স্টেশনে রিসীভ করতে এলেন তিনি ঐ মধ্যিখানে। বাইরে বেরিয়ে দেখি, তাঁর ঢাউস মোটরগাড়ি। বাড়ি যাবার সময় অলস-নয়নে এদিক-ওদিক তাকালুম। ইংরেজ বিদেশে যদি বিশেষ কোনো নতুন চীজ না দেখতে পায় তবে বলে "নাথিং টু রাইট হোম এবাউট।" অর্থাৎ এমন কিছু দেখিনি যা চিঠিতে লিখে বাড়ির লোককে তাক লাগানো যায়। আমার হল তাই। এক জায়গায় লক্ষ্য করলুম, পর পর দুটো দোকানে যেন কিছু ভারতীয় সামান-আসবাব আছে। শুধোলুম, "এ দোকানগুলো কাদের?" চৌধুরী বললেন, "এক শিখ ভদ্রলোকের। বেশ দু পয়সা কামান। বড়লোক বলা যেতে পারে।" চৌধুরীর বাড়ি পৌঁছে দেখি তিনিও কিছু কম যান না। তেতলা বাড়িতে বাস করেন। তিনটেই তাঁর। তার পর গেলুম তাঁর রেস্তোরাঁ দেখতে। সেও এলাহি ব্যাপার। উপরের তলা নিচের তলা দু' তলা নিয়ে পেল্লাই কাণ্ড।

কিন্তু এ সব কথা অন্য দিন হবে।...খবরের কাগজে পাঠক হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন যে ইংলণ্ডের বর্তমান সরকার আইন পাশ করতে যাচ্ছেন, এখন থেকে ওঁদের দেশে যেতে হলে কমনওয়েলথ নাগরিক—যেমন ভারতীয় পাকিস্তানী—এবং পাক্কা বিদেশী—যেমন ফরাসী জরমান—আর কোনো তফাৎ রইল না। বিগলিতার্থ: ভারত-পাকিস্তানীর পক্ষে এখন ও-দেশে গিয়ে দু পয়সা কামানো প্রায় অসম্ভব হয়ে যাবে। আত্মাভিমানী পাঠক হয়তো ঈষৎ রাগত কণ্ঠে শুধোবেন, "কী দরকার রে বাপু, বিদেশে গিয়ে এরকম হ্যাংলামো করার? কিন্তু আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, আজ ঐ বাংলা দেশেই হাজার হাজার ছেলে—এবং মেয়েও আছে যারা বিলেত, বিলেত কেন হটেনটটের মুল্লুকেও যেতে রাজী আছে পেটের ভাতের তরে। এতে অভিমান করার কী আছে?...কিন্তু সেই কথায় ফিরে যাই। নটিঙামে গিয়েছিলুম গেল বছরের সেপ্টেমবর মাসে। সেখানে গিয়ে শুনি, ওরা ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছে, নতুন কনজারভেটিভ সরকার কোন্ তালে আছেন। বিশেষ করে সিলেটিরা আমাকে তাদের দুশ্চিন্তার কথা

শোনাতে গিয়ে বললে, "দেশ থেকে নতুন লোক যে আর আসতে পারবে না, শুধু তাই নয়, হুজুর। দেশে যাওয়া-আসা যে প্রায় অসম্ভব হয়ে যাবে। আমাদের বেশীর ভাগেরই বউ-বাচ্চা তো ওখানে।" আমি বললুম, "আচ্ছা, এখানে তো ভারতের লোকও রয়েছে। তাদের সঙ্গে 'পরামিশ-সুপারিশ' করে দেখেছ? উভয় পক্ষের বিপদ তো একই।" উত্তরে যা বললে সেটা, পাঠক, একটু মন দিয়ে শুনুন। বললে, "হুজুর ওদের সঙ্গে আমাদের ঠিক বনে না। ওদের বেশীর ভাগই শিখ। ওরা হিন্দুস্থানী বলেই যে আমাদের সঙ্গে বনে না সেটা ঠিক না—বিশ্বাস করুন হুজুর। আপনিও তো হিন্দুস্থানী। আপনাকে তা হলে এ সব দরদ জানাই কেন? ছুটিছাটায় যখন লণ্ডন যাই, তখন পূব-পচ্ছিম দুই বাংলার লোকের সঙ্গেই দেখ-ভাল মোলাকাৎ-মহব্বৎ হয়—হিন্দু-মুসলমান দুইই। তারার লগে কথা কইতে কুনু অসুবিস্তা অয় না, তারা আমরার দুশকো (দুঃখ) বুঝে, আমরাও তারার দুশকো বুঝি। আর এই শিখদের সঙ্গে আমাদের আরেকটা ডাঙর ফারাক আছে। ওরা এদেশেই বসতি গাড়তে চায়, দেশে ফিরে যেতে চায় না। তাই তারা দেশের গাঁয়ে টাকাকড়ি পাঠায় না। আর আমাদের পনরো আনা দেশে ফিরে যেতে চায়। তাই আমরা দেশে টাকা পাঠাই—যাতে করে দেশের ভাই-বেরাদর সুখে থাকে, পুরানো বাড়ি-ঘরদোর মেরামতীতে রাখে, নয়া উমদা বাড়ি বানায়। আর দেশে টাকা পাঠানোতেও বিস্তর মুশকিল। ব্যাঙ্কের মারফতে পাঠালে দেশের লোক পাবে কম, কালো বাজারে—"

বাকিটা আমি শুনিনি।...আমি মনে মনে ভাবছিলুম (১) বাঙালী বাঙালীতে কী প্রণয়! (২) বাঙালী দেশকে বড্ডই ভালবাসে। এই নটিঙামের বাঙালী মুসলমান—তার প্রাণ-জিগর-কলীজা পড়ে আছে সিলেটে।

হাওর

বাংলাদেশের প্রথম ইতিহাস লেখেন জনৈক মোল্লা নাথন, নাথতু। বইখানার নাম বহার-ই-স্তান-ই-গায়েবী অর্থাৎ 'অজানা চির বসন্ত ভূমি'—ফার্সীতে লেখা। নাথু মিঞা দিল্লীর লোক। ভাগীরথী পার না হওয়া পর্যন্ত তিনি এমন কোন 'ঘাশ' দেখেননি যেখানে ঘোরতর গ্রীষ্মকালেও ঘাস সবুজ থাকে। তাই কেতাবের নাম দিয়েছিলেন "চির বসন্ত ভূমি"। মিঞা সাহেব এসেছিলেন 'বাংলা দেশে' জাহাঙ্গীরের রাজ সেনানীর সঙ্গে শেষ পাঠান রাজা ওসমানকে

পরাজিত করার জন্যে। জাহাঙ্গীরের পিতা আকবর বাদশাহ পুরো বাংলা দেশ জয় করতে পারেননি। তার একমাত্র কারণ মোগলরা শুকনো দেশের লোক; নৌযুদ্ধ কারে কয় জানে না। জাহাঙ্গীরের প্রধান সেনাপতি বেশীর ভাগ ভয় দেখিয়ে কিছুটা ঘুষ দিয়ে কয়েকটি মীরজাফর যোগাড় করে নৌযুদ্ধ খানিকটা শিখল। তার পর তারা ওসমানের পিছনে ধাওয়া করল। ওসমানের প্রধান দুর্বলতা ছিল যে তার কাছে যে সব কামান বন্দুক ছিল, সেগুলো মোগলদের তুলনায় নিকৃষ্টতর। তদুপরি জাহাঙ্গীরের সেনাপতি যে প্রচুর সৈন্যদল নিয়ে এসেছিলেন তার সামনে দাঁড়ানো ওসমানের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল।

ঐ সময়ে বাদশাহ জাহাঙ্গীর চিঠি লিখলেন ওসমানকে: আত্মসমর্পণ করো। ওসমান অতি সংযত ভদ্র ভাষায় উত্তর দিলেন, যার মর্মার্থ, আপনি দিল্লীশ্বর, আপনার দেশ-দেশব্যাপী বিরাট রাজত্ব। আমি তো তার তুলনায় সামান্য একটি চিড়িয়া। কিন্তু সামান্যতম পাখিটিও স্বাধীন ভাবে থাকতে চায়।-- ওসমান জানতেন মোগলরা এতদিনে বেশ কিছুটা নৌ-যুদ্ধ শিখে নিয়েছে। তদুপরি সেটা শীতকাল (ইয়াহিয়া খানের কপাল ভালো যে শেখ মুজিবের সঙ্গে তার ঝগড়াটা চরমে পৌঁছায় মার্চ মাসে; বর্ষা নামলেই চিত্তির। তাই তিনি তিলব্যাজ না সয়ে মারলেন তাঁর হাতুড়ি ঐ মোকাতেই)। তাই তিনি স্থির করলেন মোগলদের নিয়ে যেতে হবে সিলেটে। সেখানে যে সব হাওর আছে তার প্রধান ভাগ শীতকালেও শুকোয় না। কারণ বৃষ্টির জন্য প্রসিদ্ধতম স্থল চেরাপুন্‌জী। তার কুল্লে পানি নেবে আসে সিলেট জেলায়, ডাউকি হয়ে জইন্তা হয়ে—অসংখ্য নদনদী খাল নালা দিয়ে। এই সব হাওরে সামান্যতম ঝড় উঠলে ঐ দেশেরই বহু কিশোর তরুণ তক বমি করতে থাকে—অর্থাৎ বাংলা কথায় সী-সিক হয় (পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে 'ডীডে' ল্যাণ্ডিঙের সময় প্রচুর সৈন্য নরমাণ্ডির বেলাভূমিতে নেমে সেখানে শুয়ে পড়ে। বমি করতে করতে তাদের পেটে তখন আর কিছু ছিল না যে লড়াই করে করে জরমনদের ঘাঁটি দখল করে। নেপোলিয়ন বলেছিলেন, এন আমি মার্চেজ অন ইটস স্টমাক। অন্যার্থে। কিন্তু এস্থলে এটা প্রযোজ্য)। এবং ঢাকা থেকে সিলেটের হাওর অবধি একেবারে ফ্ল্যাট। সিলেট পৌঁছলেই আরম্ভ হয় টিলা, কোনো কোনো টিলাকে পাহাড়ও বলা যেতে পারে। ঘন বন জঙ্গল এবং প্রচুর সুপুরি গাছ।...ওসমান তাই পৌঁছলেন সিলেটে। 'রিয়ার গার্ড একশন' করতে করতে। অর্থাৎ তিনটে সুপুরি গাছ জড়িয়ে বেঁধে তার সর্বোচ্চতম প্রান্তে একটা কাঠের প্ল্যাটফর্ম তৈরী করে সেখানে কামান তুলে নিয়ে দুশমনের উপর কামান দাগতে দাগতে। মিয়াদের তখন তাজ্জব নয়া অভিজ্ঞতা

হল। করে করে ওসমান সিলেট জেলার প্রায় আধখানা পেরিয়ে মিয়াদের নিয়ে গেলেন, আজ ম্যাপে যেখানে মৌলবী বাজার, তার তিন মাইল দূরে দুল্লভমপুরে (অধুনা নাম দুর্লভপুর)। তারই পরে হাইল হাওর। ওসমান ও তাঁর সৈন্যদল হাওরের হাঁটুজলে পায়ে হেঁটে ওপারে চলে গেলেন। তিনি জানতেন, মোগলরা এ অঞ্চল কখনো আসেনি। তারা জানে না, কোন জায়গায় হাঁটুজল আর কোন্ কোন্ জায়গায় অথৈ জল। মোগলরা এপারে দাঁড়িয়ে।...তারপর শুভ লগ্নে ওসমান ওপার থেকে হাওর পেরিয়ে আক্রমণ করলেন—মোগল সৈন্যদের। তারা লড়েছিল প্রাণপণ। কিন্তু পরাজয় অনিবার্য বুঝতে পেরে তারা পালাতে আরম্ভ করলো। এমন সময় হাতির-পিঠে-বসা অগ্রগামী ওসমানের চোখে এসে ঢুকলো একটা উটকো তীর। মাহুত ভয় পেয়ে হাতি ঘোরালো। ওসমান বুঝতে পেরে চেঁচাচ্ছেন, এগিয়ে চলো চলো। ওদিকে মোগল সৈন্যদের ভিতর বিজয়ধ্বনি আরম্ভ হয়েছে—'ওসমান পালাচ্ছে, ওসমান পালাচ্ছে।' মোগলরাই জয়ী হল। সে এক করুণ কাহিনী। সুযোগ পেলে আরেকদিন সবিস্তর বলব।

কিন্তু আমি জালা জালা পুরনো কাসুন্দী ঘাঁটছি কেন? যারা বাংলা দেশ থকে আসছেন, তাঁরাই বলছেন গেল সাড়ে দুই মাস ধরে সব চেয়ে মোক্ষম লড়াই দিয়েছে—সিলেটের লোক। তাদের কি সুবিধে—টিলাবন হাওর—অর্থাৎ 'তেরাঁ'—পূর্বেই বলেছি।

ওসমান যুদ্ধে হারেন শীতকালে মার্চ মাসে। এবারে দেখি ঘন বরষায় তারা হাওরের কি সুযোগ নেয়।

এপিলোগ: আকবর বাদশা মারা যান আমাশাতে। বাংলা বিজয় অভিযানে বেহারে। সে আবার আমাশা! ঢাকার আমাশা অলিম্পিক। পিণ্ডির জাঁদরেল যে এই বর্ষায় ঢাকায় আসছেন, তাঁর যদি ভালো মন্দ কিছু একটা হয়ে যায়! সম্পাদক মহাশয়, আপনি সহৃদয় লোক। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, পিণ্ডির খান সাহেবকে জানিয়ে দিতে, প্রতিদিন দুটো এনটেরো ভায়োফর্ম এবং এক বড়ি ত্রিফলাকস, তদভাবে ইসপগুল তিনি যেন সেবন করেন। যদি তিনি এ যাত্রায় নিস্তার পান তবে ইতিহাস হয়ত আপনার প্রতি কটুকাটব্য করবে। সাধু সাবধান।

মহাভারত

পয়লা ফেব্রুয়ারি দিবস, কলকাতার এশিয়্যাটিক সোসায়েটির বার্ষিক সম্মেলনে লাটসাহেব শ্রীযুত শান্তিস্বরূপ ধাওন যা বলেন তার বিগলিতার্থ—আমি তিনখানা খবরের কাগজের রিপর্টের উপর নির্ভর করে আমার নিবেদন জানাচ্ছি—এতাবৎ ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা মহাভারতের তথা ভারতীয় সভ্যতার ব্যাখ্যা (ইণ্টারপ্রিট) করেছেন তাঁদের পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গি দৃষ্টিকোণ দৃষ্টিবিন্দু ("উয়েসটার্ণ আইজ") দিয়ে। এখন আমাদের—ভারতীয়দের—উচিত, ভারতীয় সভ্যতা (শ্রীযুত ধাওন "সভ্যতার"—সিভলিজেশন-এর সঙ্গে 'কালচার' বলেছিলেন কি না সেটা খবরের কাগজ উল্লেখ করেনি। এটা গুরুত্বব্যঞ্জক। কারণ যে কোনো একটা জাতি, দেশ, নেশন অতিশয় সিভিলাইজড না হয়েও কালচার, বৈদগ্ধ্যের উচ্চাসন গ্রহণ করতে পারে। আমি ধরে নিচ্ছি শ্রীযুত ধাওন দুটোই বলতে চেয়েছেন) ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করা।

এ অতি উত্তম প্রস্তাব সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের অজানা নয় যে, যবে থেকে ইংরেজ আপন স্বার্থের জন্য ভারতবর্ষে এসেছে সেই থেকেই এ দেশের নিন্দাবাদ করেছে। গোড়ার দিকে মৃদুকণ্ঠে, মোলায়েম মোলায়েম ভাবে। পরে যখন বণিকের মানদণ্ড পুরোপাক্কা রাজদণ্ডে পরিণত হল তখন ভারত বাবদে তার অন্যতম প্রধান "কর্তব্য" হয়ে দাঁড়ালো বিশ্বজনের সামনে সপ্রমাণ করা: ভারতবর্ষ অতিশয় অশিক্ষিত, অসভ্য, অনকলচরড দেশ এবং এ দেশকে সভ্য ভদ্র সত্যধর্মে-খৃষ্টধর্মে-দীক্ষিত করার জন্য ইংরেজ নিতান্ত পরোপকারার্থে, প্রতি খৃষ্টজনের যা কর্তব্য, অর্থাৎ বর্বরদের সভ্য করার জন্য এ দেশে এসেছে, এবং এই পাষণ্ড, নেমকহারাম দুশমনের কলকাতা শহরের জলাভূমির আমাশা, নানাবিধ জ্বর রোগে সাতিশয় ক্লেশ "ভুঞ্জিয়া" সদাপ্রভুর পদপ্রান্তে আপন আত্মা নিবেদন করছে, সেক্রিফাইস করছে, এক কথায় মার্টার বা শহীদ হয়েছে। এই যে ইংরেজের দম্ভোলিদম্ভ—এরই ঘৃণ্য ভণ্ডনাম "হোয়াইট মেনস বার্ডেন"। তদর্থ, গড ধবলাঙ্গদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন, সে যেন শ্যামাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, রক্তাঙ্গ (রেড ইণ্ডিয়ান), পীতাঙ্গ পৃথিবীর কুল্লে জাতকে "শিক্ষিত সভ্য" করার গুরুভার (বার্ডেন) আপন স্কন্ধে তুলে নেয়। এ বার্ডেন বইতে গিয়ে ইংরেজাদি শ্বেতাঙ্গদের কি পরিমাণ মুনাফা হয়েছে সে তত্ত্ব আমরা হাড়ে হাড়ে জানি। "থী মেন ইন এ বোট"-এর প্রখ্যাত রসাচার্য ভারতপ্রেমী লেখক জরৌম কে জরৌম এই বার্ডেন

ভণ্ডামিকে তীব্রতম ভাষায় ব্যঙ্গ করে এই শতকের গোড়ায় একটি প্রবন্ধ লেখেন: "হোয়াইট মেনস বার্ডেন—হোয়াই শুড ইট বী সো হেভি?"—কিংবা ঐ ধরনের। তিনি নানা প্রকারের ঠাট্টামসকরা ব্যঙ্গবিদ্রূপ সারার পর বক্রোক্তি করেন, হোয়াইট মেনস বার্ডেন বইতে গিয়ে আমরা যে আত্মত্যাগ, পরার্থে প্রাণ দান করলুম তাতে করে আমাদের কি ফায়দা হয়েছে? এই নেমকহারাম ইণ্ডিয়ানরা (বলা বাহুল্য, ইংরেজের "আত্মত্যাগ", ভারতীয়ের 'নেমকহারামী' জরৌম আগাপাশতলা উল্টো বুঝলি রামার্থে নিয়েছেন) যদি আমাদের বার্ডেন বওয়ার মূল্য না বুঝে এখন নিজের বার্ডেন নিজেই বইতে চায় (ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তখন জোরদার—জরৌম তার প্রতি অনুরাগী) তবে ফেলে দে না, বাবা, ঐ মূর্খদের স্কন্ধে ওদের আপন বার্ডেন। চলে আয় না ওদেশ ছেড়ে। বয়ে গেছে আমাদের!

এ তো গেল। ওদিকে আরেক শিরঃপীড়া। ইংরেজের বাক্যরীতিতেই বলি, সে একাই তো বেলাভূমিতে একমাত্র উপলখণ্ড নয়। আরো মেলা চিড়িয়া রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "কেবল অতি সামান্য একটা কারণে একটু মুশকিল বাধল। সেটা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর অন্য দেশগুলোকে ভূতে পায়নি।"'

এস্থলে দেখা গেল ইতিমধ্যে ইয়োরোপের অন্যান্য জাত ভারতের অনেক অনেক উত্তম উত্তম গ্রন্থ—অবশ্য অধিকাংশ অনুবাদে—পড়ে ফেলেছে। দারাশীকুহ-কৃত উপনিষদের ফার্সী অনুবাদ কিংবা তাঁর আদেশে কৃত অনুবাদ ('মুজমা'-ই-বহরেন'—'দ্বিসিন্ধু মিলন') লাতিনে অনূদিত হয়েছে। ইংরেজ পড়লো বিপদে। উপনিষদ হিন্দু ধর্মগ্রন্থ। তার ফার্সী অনুবাদ করলো এক মুসলমান। তার লাতিন অনুবাদ করলো এক খৃষ্টান পাদ্রি এবং তার উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি গাইলো সেদিনকার—সর্বোত্তম বললেও অত্যুক্তি করা হয় না—সর্বসংস্কারমুক্ত, ধর্মনিরপেক্ষ দার্শনিক শোপেনহাওয়ার।

ইতিমধ্যে, শেক্‌সপীয়রের সঙ্গে সঙ্গে যাঁর নাম অনেকেই করে থাকেন সেই কবি গ্যোটে শকুন্তলা নাট্যকে প্রশংসা প্রশংসায় স্বর্গে তুলে দিয়েছেন—না, ভুল বললুম,—তিনি বললেন, এই নাট্যেই স্বর্গ এবং পৃথিবী সম্মিলিত হয়েছে।

ইংরেজ জাত ঘড়েলস্য ঘড়েল। সে সুর পালটালে। অবশ্য আমার বক্তব্য এ-নয়, যে নিরপেক্ষ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কোনো ইংরেজ কস্মিনকালেই ছিল না। কিন্তু কে পরোয়া করে তাদের?

তাই আজ যখন প্রশ্ন উঠেছে, মহাভারত কাল্পনিক না ঐতিহাসিক তখন ইংরেজ পণ্ডিতেরই বরাত দেওয়া প্রকৃষ্টতম পন্থা। উওশবর্ন হপকিনস তাঁর

একাধিক প্রামাণিক গ্রন্থে বলেছেন (যে কারণে, অধমের জানা মতে, ধর্ম বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট এনসাইক্লোপীডিয়ায় তিনি মহাভারত সম্বন্ধে প্রামাণিক প্রবন্ধ রচনা করার জন্য সম্মানিত আমন্ত্রণ পান), "নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে মহাভারত কাব্যে কোনো সত্যকার সংঘর্ষ প্রতিবিম্বিত হয়েছে—"ইট্ (মহাভারত) অনডাউটেডলি রিফলেক্ট্স সম্ রিয়েল কনটেসট"। পুনরপি তিনি বলছেন, সত্য ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে আমরা যদি পুরাণে উল্লিখিত রাজবংশসমূহের তালিকা (লিস্টস্) মহাভারতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি তবে পাই যে মহাভারতের নানা প্রকারের কিংবদন্তির পশ্চাতে সত্য ইতিহাস বিম্বিত হয়েছে। স্বর্গত গিরীন্দ্রশেখর ঠিক এই মতটিই তাঁর প্রামাণিক গ্রন্থে সপ্রমাণ করেছেন ; এ-পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে তার উল্লেখ হয়েছে।

সব থাক্, সব যাক্। পাঠক, তোমার কমনসেনস কি বলে ? কোনো কিছু ঘটেনি, কোনো কিছু হয়নি, এ যেন হাওয়ার-কোমরে দড়ি বাঁধা !

ঠিক তেমনি, খোঁড়াখুঁড়ি করে কিছু পাওয়া যায়নি বলে সব ঝুট হ্যায় ? তবে একটি "ছোটাসী চুটকিলা" পেশ করি। এক রেড ইণ্ডিয়ান বললে তার দেশে খোঁড়াখুঁড়ির ফলে বেরিয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের টেলিগ্রাফের তার। অতএব সে-যুগেই তারা টেলিগ্রাফি জানতো। উত্তরে এসকিমো বললে, তার দেশে খোঁড়াখুঁড়ি করে কোনো প্রকারের তার পাওয়া যায়নি। অতএব তারা বেতার ওয়্যারলেস ব্যবহার করতো।

কিন্তু আমার শিরঃপীড়া ভিন্ন। মহাভারতের মত কোনো গ্রন্থই বারবার পুনর্বার আমি পড়িনি। অথচ প্রতিবার নব নব সমস্যা দেখা দেয়। সে কথা আর এক দিন হবে।

৫৭০-১৯৭০/১৪০০ বৎসর

হজরৎ মুহম্মদ (দ)-এর চতুর্দশ জন্মশতবার্ষিকী

হজরতের জন্মদিন নিয়ে বিস্তর আলোচনা, সবিস্তর তর্কাতর্কি মোটামুটি এই চোদ্দশ' বছর ধরে চলছে, এবং চলবেও।

আজ ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৮ই মে, শুক্লপক্ষের দ্বাদশী। আরবী চান্দ্র মাসের গণনায় আজ রবীউল্ আউওল মাসের ১২ তারিখ। দ্বাদশ শব্দের ফার্সী : দোওয়াজ-দহম্। দো = দ্ব = দুই ; দহম্ = দশম্ = দশ। অর্থাৎ দ্বিদশ। বলা হয়, হজরৎ মুহম্মদ এইদিন জন্মগ্রহণ করেন। তাই চান্দ্রমাস রবীউল্ আউয়ল্-এর বারো

তারিখকে বলা হয়, ফৎহ্-ই-দো ওয়াজ্‌দহম্। দোওয়াজ্‌দহম্ শব্দের অর্থ এই মাত্র নিবেদন করেছি। ফৎহ্ শব্দের অর্থ জয়। এই আরবী শব্দটি আমাদের সম্পূর্ণ অজানা নয়। শিখেরা "গুরুজীকী ফতেহ্" জয়ধ্বনি করেন; বাদশা আকবর নির্মিত ফতেহ্‌পুর সীক্রী অনেকেই দেখেছেন।

কবি মরহুম গোলাম মোস্তফা তাঁর "বিশ্বনবী" গ্রন্থে এই মত পোষণ করেছেন।

পক্ষান্তরে সুপণ্ডিত মরহুম মওলানা মোহম্মদ আকরম খান তাঁর "মোস্তফা-চরিত" গ্রন্থে বিস্তর গবেষণার পর সিদ্ধান্ত করেছেন, হজরতের জন্ম হয়, ৯ই রবীউল আউওল; ১২ই নয়।

কিন্তু বাঙলা দেশের জনসাধারণ, তথা উভয় বাঙলার সরকার মেনে নিয়েছেন যে হজরতের জন্ম হয় ১২ তারিখে। কিন্তু সেটা চাঁদ দৃশ্যমান হবার উপর নির্ভর করছে। কাজেই কেউ কেউ ১৮ই মে, অন্যেরা ১৯ মে হজরতের জন্মদিবস (ঈদ্-ইদ-মিলাদ্-উন্-নবী; ঈদ্ = আনন্দদিবস, মিলাদ = জন্মক্ষণ—ও-ল-দ ধাতুর অর্থ "জন্ম দেওয়া", তার থেকে মওলিদ্, মিলাদ্, মওলুদ্ অনেক শব্দই প্রায় একই অর্থে এসেছে, এমন কি আরবের খৃষ্টানরা বড়দিনকে বলেন "ঈদ্ উল্ মিলাদ্"—তাই পাঠক নির্ভয়ে আজকের পরবকে "মিলাদ্ শরীফ"—শরীফ = উচ্চ, সম্মানিত, ভদ্র—"মওলুদ শরীফ", "ঈদ্-ই মিলাদ" যা খুশী বলতে পারেন। কিংবা পূর্বোল্লিখিত আরবী ফার্সীর সংমিশ্রণে ফৎহ্-ই-দোওয়াজ্‌দহম্‌ও বলতে পারেন।

নবী, পয়গম্বর, রসুল ইত্যাদি শব্দ একই ব্যক্তি, অর্থাৎ হজরৎকে বোঝায়।

হজরতের জন্মদিন নিয়ে দেশের জনসাধারণ যা মেনে নিয়েছেন আমরাও তাই মেনে নিলুম। এখন প্রশ্ন তাঁর জন্ম কোন্ বৎসরে?

কেউ বলেন ৫৬০ খৃষ্টাব্দ, কেউ বলেন ৫৬২ খৃষ্টাব্দ, কেউ বলেন ৫৭০ খৃষ্টাব্দ।

মোদ্দা কথা এই;—যখন কোনো মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন তখন তো মানুষ জানে না, তিনি একদিন মহাপুরুষ রূপে আত্মপ্রকাশ করবেন। তদুপরি হজরৎ জন্মগ্রহণ করেন বিত্তহীন অনাথের গৃহে। সে-কালে মক্কা শহরে লেখাপড়ার খুব একটা চর্চা ছিল না (হজরৎকে লেখাপড়া শেখবার কোনো চেষ্টা তাঁর বাল্যবয়সে করা হয়নি; বস্তুত তিনি নিরক্ষর ছিলেন)—কে লিখে রাখবে তাঁর জন্মদিন?

এটা শুধু হজরতের বেলায়ই নয়। বুদ্ধদেব, মহাবীর, জরথুস্ত্র, খৃষ্ট এঁদের সকলেরই জন্মদিবস এমন কি জন্মবৎসর নিয়েও পণ্ডিতেরা আদৌ একমত নন।

হজরতের পরলোকগমন দিবস সম্বন্ধে কোনো মতানৈক্য নেই। তিনি মরধাম

ত্যাগ করেন ৭ই জুন, ৬৩২ খৃষ্টাব্দে। এবং হিজরী তারিখ অনুযায়ী ১২ই রবী উল্-আউওল। অর্থাৎ তাঁর জন্মদিন এবং মৃত্যুদিন একই দিবসে। এতে ভক্ত মুসলমান মাত্রই আল্লাতালার অদৃশ্য অঙ্গুলি সংকেত দেখতে পান।

পূর্বেই নিবেদন করেছি হজরতের জন্মবৎসর ৫৬০, ৫৬৯, ৫৭০ বলা হয়। আমরা ছেলেবেলা থেকেই ইস্কুলে পড়েছি ৫৭০ খৃষ্টাব্দে। সেই জনমতই আমরা আবার মেনে নিলুম। এখন যাচ্ছে ১৯৭০। তাহলে এই বৎসর, এই মাসে, এই দিনে হজরতের ১৪০০ জন্মদিন। তাই বহু মুসলমান এদিনটিকে বিশেষ সম্মান দেখাচ্ছেন। কিন্তু এখানে কিঞ্চিৎ মতভেদের সম্ভাবনা রয়ে গিয়েছে। মুসলমানদের বৎসর গণনা চন্দ্র নিয়ে। চান্দ্র বৎসর সৌর বৎসরের চেয়ে হ্রস্বতর। তদুপরি গণনাতে আরেকটা অসুবিধা আছে। মুসলমানের বৎসর হিজরী, গণনা আরম্ভ হয় জুলাই ১৬, ৬২২ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু তার পূর্বে আরবরা বৎসর গণনা করতো সৌর বৎসরে। হিসেব তাই কঠিনতর হয়ে যায়। এবং সর্বশেষ বিপদ, যে খৃষ্টান ক্যালেনডার নিয়ে আমরা সন তারিখ গণনা করি তারও পরিবর্তন সংস্কার একাধিকবার হয়েছে।

অতএব এ-সব হিসেব আপনার আমার মত সাধারণ জনের কর্ম নয়। আমরা সরল বিশ্বাসী। ইস্কুলে পড়েছি ৫৭০ খৃষ্টাব্দে হজরৎ মহম্মদের জন্ম হয়। আজ তাঁর জন্মদিন। এবং উপস্থিত ১৯৭০। অতএব আজ তাঁর ১৪০০ বৎসরের জন্মদিন। আজ আনন্দের দিন। ঈদের দিন। মুসলমান হিন্দু, খৃষ্টান, জৈন, (মারওয়াড়ি) সকলকে মিষ্টান্ন বিতরণ করতে হয়।*

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ভারতবর্ষের সর্বত্র যে রূপে প্রকাশ পায়, বাংলাদেশে সে রূপ গ্রহণ করে না। উত্তর ভারতের অন্যত্র হিন্দুরা হিন্দী বলেন পড়েন, মুসলমানরা উর্দুর সঙ্গে যুক্ত। তেজবাহাদুর সপ্রু ও পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু জাতীয় উর্দু ভাষাভাষী হিন্দুর সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। এককালে বিহারে বহু মুসলমান হিন্দী শিখিতেন; শুনিতে পাই, তাঁহারাও নাকি হিন্দী বর্জন আরম্ভ করিয়াছেন।

---

* এই সামান্য লেখনটি লেখার উদ্দেশ্য: বহু হিন্দু এবং অনেক মুসলমান হজরতের জন্মদিন, পরলোকদিবস সম্বন্ধে ওয়াকিফ-হাল নন বলে মনে মনে সঙ্কোচ বোধ করেন। পণ্ডিতরাই যে-বিষয়ে মনস্থির করতে পারেননি, সে-স্থলে আমাদের অযথা কুণ্ঠিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

কিন্তু বাংলাদেশের অধিবাসী—তিনি হিন্দুই হউন আর মুসলমান হউন বাংলা বলেন ও পড়েন। কাজেই ভাষার কল্যাণে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান একে অন্যকে চিনিবার সুযোগ পায়। মিশরে কপ্ট-রা ক্রীশ্চান ও বাদবাকী বাসিন্দা আরব মুসলমান। কিন্তু উভয়ের ভাষা এক বলিয়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মিলনের সুবিধা হইয়াছে। প্যালেস্টাইনে নবাগত ইহুদীরা হয় ইউরোপীয় কোন ভাষা বলে নতুবা মৃতপ্রায় ইয়েডিশ ভাষাতে। কলহ লাগিয়াই আছে।

বাঙালী মুসলমান বাঙালী হিন্দুর কৃষ্টি-সভ্যতা সাধারণ বাঙালী হিন্দু যতটুকু (পরিতাপের বিষয় সে ধূলপরিমাণে) জানেন ইচ্ছা করিলেই ততটুকু অক্লেশে জানিতে পারেন ও অনেকেই জানেন। সাধারণ বাঙালী হিন্দু যেটুকু বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ-ভাগবত, ষড়দর্শন, কাব্য-নাটক পড়েন, তাহা বাঙলা অনুবাদে ও বাদবাকী বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব, রামপ্রসাদী, পরমহংসদেবের রচনামৃত তো মূল বাঙলাতেই আছে। ফলিত-গলিত জ্যোতিষের জন্য বিরাট পঞ্জিকা আছে। বলিতে কি, গ্রামাঞ্চলে পঞ্জিকা বেদ-উপনিষদ গীতাকে হার মানাইয়াছে। আশ্চর্য হইবারই বা কি আছে? ভবানীকে যখন মহাকাল এক বৎসরকালের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করিয়া শুধু ঐ বৎসরেরই ফলাফল নিবেদন করেন, তখন তাঁহাকে উপেক্ষা করিবে কোন্ নাস্তিক? আমরাও করি না। বস্তুতঃ সরকারী আবহাওয়া দপ্তরের ভবিষ্যদ্বাণী অপেক্ষা ক্ষণা দেবীর উপর অন্ততঃ আমার বিশ্বাস ভরসা বেশী।

সে যাহাই হউক। আসল কথা এই যে, অনুবাদ সাহিত্যে বাঙলা এখন এতটা সমৃদ্ধ হইয়াছে যে, তাহা দ্বারা সাধারণ বাঙালী নিজেকে দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত রাখিতে পারেন। বাঙালী মুসলমানও এই সাহিত্য হইতে অনেক কিছু পারেন। উপায় নাই। এই সব অনুবাদ, মূল বৈষ্ণব পদাবলী, মেঘনাদ বধ কাব্য, কৃষ্ণচরিত্র ইত্যাদি বাদ দিলে প্রাক্ রবীন্দ্র-সাহিত্যে রইল কি?

এখন প্রশ্ন, বাঙালী হিন্দু-মুসলমানদের অথবা হিন্দুর দ্বারা লিখিত মুসলমানী সাহিত্যের কতটা খবর রাখিয়াছেন ও রাখিতেছেন?

বাঙালী হিন্দু মুসলমানদের দ্বারা লিখিত পুস্তক যে পড়েন না বা কম পড়েন, তাহার জন্য তাঁহাকে সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। কারণ মুসলমানদের ভিতর শক্তিমান লেখক বড় কম। একবার ভাবিয়া দেখিলেই হয় যে, আজ যদি কোন মুসলমান শরৎবাবুর মত সরল ভাষায় মুসলমান চাষী ও মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি আঁকেন, তবে কোন্ হিন্দু না পড়িয়া থাকিতে পারিবেন। আরব্যোপন্যাসের বাঙলা তর্জমা এখনও হাজার হাজার বিক্রয় হয়—যদিও তর্জমাগুলি অতি জঘন্য

ও মূল আরবী হইতে একখানাও এযাবৎ হয় নাই। আবু সঈদ আইয়ুবের লেখা কোন্ বিদগ্ধ বাঙালী অবহেলা করেন? কিন্তু তিনি সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন; মুসলমান জীবন অঙ্কিত করা বা মুসলমানী কৃষ্টি বা সভ্যতার আলোচনা তিনি করেন না। বাঙালী কবীরকে কে না চিনে?

মুসলমানদের উচিত কোরাণ, হদীস, ফিকাহ, মহাপুরুষ মুহম্মদের জীবনী (ইবনে হিশামের উপর প্রতিষ্ঠিত) মুসলিম স্থপতি শিল্পকলা ইতিহাস (বিশেষ করিয়া ইবনে খলুদন), দর্শন কালাম ইত্যাদি ইত্যাদি কত বলিব—সম্বন্ধে প্রামাণিক, উৎকৃষ্ট সরল সস্তা কেতাব লেখা। লজ্জার বিষয় যে, ফার্সীতে লিখা বাঙলার ভূগোল ইতিহাস বাহার-ই-স্তানে গাঈবীর বাঙলা তর্জমা এখনও কেহ করেন নাই।

শুনিতে পাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'ইসলামিক কালচর' বিভাগ আছে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু অধ্যাপকেরা নানা রকম পুস্তক প্রবন্ধ বাঙলায় লিখিয়া 'বিশ্ব বিদ্যালয়' নাম সার্থক করেন। মুসলমান অধ্যাপকেরা কি লেখেন? লিখিলে কি উজবেকীস্থানের ভাষায় লেখেন?

মুসলমানদের গাফিলি ও হিন্দুদের উপেক্ষা আমাদের সম্মিলিত সাহিত্য-সৃষ্টির অন্তরায় হইয়াছে। দুইজন একই ভাষায় বলেন; কিন্তু একই বই পড়েন না। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্!

গুরুজনদের মুখে শুনিয়াছি গিরিশবাবুর কোরানের তর্জমা এককালে নাকি বহু হিন্দু পড়িতেন এবং তখন নাকি সে তর্জমার কদর হিন্দুদের মধ্যেই বেশী ছিল; কারণ মুসলমানরা তখনও মনস্থির করিতে পারেন নাই যে, কোরানের বাংলা অনুবাদ করা শাস্ত্রসম্মত কি না।

পরবর্তী যুগে মীর মশারফ হুসেন সাহেবের বিষাদসিন্ধু বহু হিন্দু পড়িয়া চোখের জল ফেলিয়াছেন (পুস্তকখানা প্রামাণিক ধর্মগ্রন্থ নহে; অনেকটা পুরাণ জাতীয়, বিস্তর অবিশ্বাস্য অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ)। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ লালন ফকীরের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন। পরবর্তী যুগে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি গঙ্গোপাধ্যায় আরবী-ফারসী শব্দযোগে তাঁহাদের লেখায় কিঞ্চিৎ মুসলমানী আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারা লোকপ্রিয়তা হারাইলেন। তারপর আসিলেন নজরুল ইসলাম। সাধারণ বাঙালী হিন্দু তখন প্রথম জানিতে পারিলেন যে, মুসলমানও কবিতা লিখিতে পারেন; এমন কি উৎকৃষ্ট কবিতাও লিখিতে পারেন। কাজী সাহেবের কবিতার ব্যঞ্জন বুঝিবার জন্য প্রচুর হিন্দু তখন মুসলমান বন্ধুদের 'শহীদ' কথার অর্থ, 'ইউসুফ' কে, "কানান" কোথায় জিজ্ঞাসা

করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কাজী সাহেব তাঁহার ধূমকেতু কাগজে মুসলমান সমাজের পঙ্কিল দিকটা যত না আক্রমণ করিলেন, তাহার অপেক্ষা বহু কম করিলেন ইসলামের সুন্দর ও মঙ্গলের দিকের বর্ণনা। ইতিমধ্যে মৌলানা আকরম খান প্রমুখ মুসলমান লেখকেরা ইসলাম ও তৎসম্বন্ধীয় নানা পুস্তক লিখিলেন। খুব কম হিন্দুই সেগুলি পড়িয়াছেন। এখনও মাসিক মোহাম্মদীতে ভালো ভালো প্রবন্ধ বাহির হয়, কিন্তু সাধারণ হিন্দু মোহাম্মদী কিনেন না; বিশেষতঃ পদ্মার এপারে। সুখের বিষয়, মৌলবী মনসুরউদ্দীনের 'হারামণিতে' সংগৃহীত মুসলমানী আউল-বাউল-মুরশিদিয়া গীত হিন্দু-মুসলমান গুণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ লইয়া সঞ্চয়নখানি প্রকাশিত হয়।

২

সর্বজাতি-ধর্মবর্ণ মিলিত হইয়া ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করিবে ও সেই সম্মিলিত শক্তি পৃথিবীর মধ্যে স্থায়ী আসন লইয়া সত্য ও ধর্মের পথে চলিবে, কংগ্রেসের ইহাই মূলমন্ত্র। এ মন্ত্রে কংগ্রেস কখনও বিশ্বাস হারাইবে না, ও আজ যদি কোনো বিশেষ বর্ণকে নির্যাতন করিয়া অথবা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বার্থকে বলি দিয়া কংগ্রেস স্বরাজ পাইবার সম্ভাবনা দেখিতে পান, তবুও তাহা গ্রহণীয় মনে করিবে না।

উপস্থিত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করিয়াছে। 'রাজনৈতিক চিন্তাধারায়' বলিতেছি, কারণ আপামর জনসাধারণ এই সমস্যা দ্বারা কতটা বিক্ষুব্ধ হইয়াছে তাহার পরিমাণ দ্বিধাহীনরূপে আমাদের কাছে এখনও প্রকাশ পায় নাই।

মুসলমানদের কোন কোন নেতা বলেন, 'আমাদের ধর্ম পৃথক, আমাদের আদর্শ পৃথক, আমাদের অনুভূতির জগৎ পৃথক, আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা সব কিছুই পৃথক, এক কথায় আমরা আলাদা জাতি বা নেশান।'

কংগ্রেস ইহা স্বীকার করেন না; বহু মুসলমানও করেন না। প্রায় সকল বিদেশী মুসলমানও ইহা অস্বীকার করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া তুর্কী মুসলমানেরা। তাবৎ প্রাচ্য শক্তিরই বাসনা যে, ভারতবর্ষের সর্বজাতি মিলনের ফলে উপজাতি মহতী শক্তিই প্রাচ্য তথা বিশ্বের মঙ্গল আনয়ন করিবে।

হিন্দু মুসলমান দুই পৃথক নেশন কি না তাহা দুই দৃষ্টিবিন্দু হইতে দেখা যাইতে পারে। এক, হিন্দু-মুসলমানের উপস্থিত চিন্তা অনুভূতি ও জীবনীধারার পার্থক্যের হিসাবনিকাশ করিয়া মীমাংসা করা, তাহারা দুই পৃথক নেশন কি না;

অথবা (দুই) ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়া সিংহাবলোকন করা,—অর্থাৎ ইতিহাস কি এই সাক্ষ্য দেয় যে অতীতে ভারতবর্ষের মুসলমানরা হিন্দু ও অন্যান্য জাতির সাহায্য-বর্জিত স্বকীয় বিশেষ কৃষ্টি, ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়া আপন নেশনত্ব উপভোগ করিতে-ছিলেন ; আপন ভুবনে বাস করিতেছিলেন ? ইংরাজ যে রকম আজ এই দেশে দুই শত বৎসর কাটাইয়াও আপন ভাষায় কথা বলে ; আপন আহার করে ও করি-বার সময় দেশের 'হ্যাম-বেকনের' স্মরণে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ; আপন সঙ্গীত দেশের লোকের কর্ণকুহর প্রপীড়িত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গায়, এ দেশের প্রখর আলো উপেক্ষা করিয়া নির্বিকার চিত্তে তাহার অন্ধকার দেশের মানানসই তীব্র বর্ণযুক্ত ওয়েলপেন্টিং দ্বারা এদেশের প্রাচীর প্রলেপন করে, অবকাশ পাইলেই উর্ধ্বশ্বাসে কালবিলম্ব না করিয়া 'হোম' ছোটে, নয়াদিল্লীতে শিরঃপীড়া ও হৃদিত্রাস সঞ্চার স্থাপিত সৃষ্টি করে ; নগরীর যত্রতত্র বেমক্কা মানুষকে ঘোড়ায় বসাইয়া 'প্রতিমূর্তি' নির্মাণ করে ; যতদূর সম্ভব আপন 'কাস্ট ক্লব' করিয়া দেশের সামাজিক জীবন হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখে ; ও বিশেষ প্রাত্যহিক নিত্যকর্ম এমন ভাবে করে যে, তদ্দর্শনে তাবৎ ভারতবাসী, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি শিখ সকলেই সচকিত হয়। নিন্দা করিতেছি না—পার্থক্য দেখাইতেছি মাত্র।

স্বীয় উক্তিতে মুসলমানরা নিজেকে যত পৃথকই ভাবেন না কেন, স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, তাঁহারা সায়েবদের মত 'পাণ্ডববর্জিত' পার্থক্য ধরেন না।

পার্থক্য আছে এবং অঙ্গাঙ্গি বিজড়িত সম্মিলিত সাহিত্য-কাব্য-ধর্ম প্রচেষ্টাও আছে। প্রথম ঐতিহাসিক দৃষ্টি দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই দুইটির বিচার করা কর্তব্য। তৎপর দ্রষ্টব্য, ইতিহাস আমাদের ভবিষ্যৎ সর্বাঙ্গীণ মিলনের জন্য কোন্ আনন্দলোকের দিকে দিঙনির্ণয় করে।

ধর্মে দেখা যায় হিন্দু-মুসলমানে পার্থক্য আছে—অনৈক্য আছে কি না, তাহা পরে বিচার্য। ধর্মবিশ্বাসে হিন্দুর মত উদার জাতি পৃথিবীতে আর নাই। হিন্দু বহু দেবতা মানিতে পারে, নাও মানিতে পারে ; উপনিষদের আত্মন ব্রহ্ম একাত্মা-নুভূমিতে তাহার মোক্ষের সাধন করিতে পারে, নাও পারে, গীতার পরমপুরুষকে উপেক্ষা করিয়া বৃন্দাবনের রসরাজকে হৃদয়আসনে বসাইতে পারে, নাও পারে ; সর্বভূতে দেবীকে শান্তিরূপে দেখিতে পারে, নাও পারে ; পূর্বজন্ম পরজন্ম মানিতে পারে নতুবা স্বর্গনরকে বিশ্বাস করিতে পারে অথবা উভয়ের সম্মিলনও করিতে পারে। এক কথায় হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস কয়েকটি বিশেষ সঙ্গবদ্ধ সংকীর্ণ তত্ত্ব বা তথ্যে গণ্ডীবদ্ধ নহে। কিন্তু তবু আমরা অনায়াসে দৈনন্দিন জীবনে জানি—কাহার ধর্মবিশ্বাস হিন্দুর ন্যায়, কাহার নহে।

মুসলমানরা ধর্মবিশ্বাসে কঠোর নিয়মের বশবর্তী। আল্লা এক কি বহু সে সম্বন্ধে কোন মুসলমান আলোচনা করিতে সম্মত হইবেন না, মহাপুরুষ মুহম্মদ যে সর্বশেষ নবী (prophet) সে বিষয়ে কোন মুসলমানের সন্দেহ করিবার উপায় নাই। মৃত্যুর পর বিচার ও স্বর্গ অথবা নরক, এই তাহার নিঃসন্দেহ বিচার। ইহার যে কোন একটি সিদ্ধান্তে বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করিলে সে ধর্মচ্যুত বা কাফির হইয়া যায়।

ফল এই দাঁড়ায় যে, ধর্মসিদ্ধান্ত লইয়া পণ্ডিত যখন জ্ঞান সঞ্চয়ার্থে মৌলানার সঙ্গে তর্ক করিতে চাহেন, তখন তিনি কবুল জবাব দেন। (মৌলানার ঔদার্য অন্য স্থলে—তাহার আলোচনা অন্য প্রসঙ্গে হইবে।)

ইহাই একমাত্র কারণ, কেন মুসলমান আগমনের পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমান ধর্ম-দর্শনের প্রভাব, চিহ্ন-নিশানা কিঞ্চিৎ মাত্র নাই। প্রক্ষিপ্ত অল্লোপ-নিষদ শুধু সাধারণ নিয়মের দিকে রূঢ় অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমাদের পরিতাপ বাড়াইয়া দেয়। অন্যদিকে মুসলমানদের ধর্মদর্শন আলোচনা এই ষড়দর্শনের দেশে এই—মধুর ধর্মের দেশে নির্বিকার চিত্তে আপনার ঐতিহ্যানুসরণ করিল, অবহেলা করিয়া কি বিত্ত হারাইল বুঝিল না।

দুনিয়ার এই দুই বিরাট ধর্ম সাতশত বৎসর পাশাপাশি কালযাপন করিল অথচ একে অন্যকে সমৃদ্ধ করিল না—এ যেন জলের মধ্যে মীন তৃষ্ণায় কাতর রহিল!

কিন্তু পার্থক্য সত্ত্বেও ঐক্য আছে। খ্রীষ্টধর্ম তাহার নাম দিয়াই খ্রীষ্টের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। ইসলাম তাহার অত্যন্ত সরল অর্থের দিকে পুনঃ পুনঃ অঙ্গুলি নির্দেশ করে। সে অর্থ সকলেই জানেন। তাঁহাকে স্বীকার করিয়া স্পেন হইতে জাভা পর্যন্ত বহু মানব যুগে যুগে আত্মার শান্তি পাইয়াছে—ইসলাম অর্থাৎ শান্তির ধর্ম।

হিন্দুরাও সর্ব তর্ক, সর্ব আলোচনা, সর্ব পূজা, সর্ব উপাসনার পর বলেন শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। নতমস্তকে বলেন, পৃথিবীতে শান্তি হউক, অন্তরীক্ষে শান্তি হউক ; মুসলমানেরা বলেন ইহলোকে (দুনিয়া) শান্তি হউক, পরলোকে (আখিরা) শান্তি হউক।

তরবারীর জোরে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছিল এই হিংস্র নিন্দা ভারতবর্ষে প্রচার করে একদল দুষ্ট স্বার্থান্বেষীরা। সে আলোচনা অবান্তর বলিয়াই বারান্তরে।

হিন্দু-মুসলমানে সম্পূর্ণ, অখণ্ড মিলন হইয়াছিল অন্যান্য বহু প্রচেষ্টায় ; সেগুলি

ধর্ম ও দর্শন অপেক্ষা হীন তো নহে। বরঞ্চ কেহ কেহ বলেন, মানব সমাজে অধিকতর প্রয়োজনীয় বিশেষতঃ অদ্যকার যুগে। ভাষা নির্মাণ, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থপতি, নৃত্য, বাদ্যযন্ত্র রাজনীতি অর্থনীতি বসনভূষণ, উদ্যাননির্মাণ, আমোদ-আহ্লাদ, কত বলিব। এই সব প্রচেষ্টার পুণ্য, পূর্ণ ইতিহাস কেন, আংশিক ইতিবৃত্তও হয় নাহ। যেদিন হইবে সেদিন সেই সুদর্শন পূর্ণাঙ্গ দেব-শিশুকে হিন্দু-মুসলমান কর্তন করিতে চাহিবে এ বিশ্বাস আমাদের কিছুতেই হয় না।

আসল কথাটির পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন। সেটি এই : হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস কয়েকটি বিশেষ সংজ্ঞাবদ্ধ সংকীর্ণ তত্ত্ব বা তথ্যে গণ্ডিবদ্ধ নহে বলিয়া তিনি সে বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রস্তুত। মুসলমানের দ্বিধাহীন একমত বলিয়া তিনি অসম্মত। ফলে উভয় ধর্মের শাস্ত্রীয় সংমিশ্রণ হয় নাই।

তবুও হয়ত কিঞ্চিৎ হইত যদি সামাজিক ক্ষেত্রে উভয়ে মিলিত হইতে পারিতেন। সামাজিক ব্যাপারে মুসলমান উদার। হিন্দুর সঙ্গে এক গৃহে বসবাস করিতে মুসলমানের কোন আপত্তি নাই, একই পাকের ভাত, ডাল, মাছ, কাসুন্দা সকাল সন্ধ্যা পরমানন্দে খায়—প্রশ্ন করে না কে রন্ধন করিয়াছে—একই সরোবরে স্নান করে, একই যানে ভ্রমণ করে এবং রুগ্ন হইলে বৈদ্যরাজকে ডাকা সম্পর্কে তাহার সম্পূর্ণ স্বরাজ। মৃত্যুর পর তাহাকে শ্মশানে গোর দিলেও তাহার ধর্মচ্যুতি হয় না।

অর্থাৎ মুসলমান বলে, 'শাস্ত্রচর্চা করিতে অসম্মত বটি, কিন্তু আইস একসঙ্গে বসবাস করি। হিন্দু বলে, 'বসবাস করিতে পারিব না, কিন্তু শাস্ত্রালোচনা করিতে প্রস্তুত।' এক কথায় হিন্দু যেখানে উদার মুসলমান সেখানে সঙ্কীর্ণ ও মুসলমান যেখানে উদার হিন্দু সেখানে সঙ্কীর্ণ। অর্থাৎ উভয়ের জন্য বারোয়ারী চাঁদোয়া অথবা সর্বজনীন চন্দ্রাতপ নাই।

(দোষাদুষির কথা হইতেছে না। আমরা ইতিহাসের যে শিখরে দাঁড়াইয়া দিকনির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছি, সেখানে হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ এমনি বিজড়িত যে, একে অন্যকে ধাক্কাধাক্কি করিলে উভয়েরই পতন ও অস্থিভঙ্গের সমূহ বিপদ অবশ্যম্ভাবী।)

উপরোল্লিখিত রোগনির্ণয় সাধারণ মোটামুটি ভাবে করা হইল। কিন্তু ইহার ব্যত্যয়ও আছে ও সেই সম্পর্কে প্রথম বক্তব্য যে, উপরোল্লিখিত রোগ মৌলানা ও শাস্ত্রীমণ্ডলীর। দেশের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ শাস্ত্র লইয়া অত্যধিক শিরঃপীড়ায় ব্যতিব্যস্ত হয় না ; পক্ষান্তরে অর্থনৈতিক চাপে পড়িয়া একে অন্যের

সঙ্গে মিলিতে ও এমন কি বসবাস করিতেও বাধ্য হয়—কিন্তু সে-প্রসঙ্গ এখনও উত্থাপিত করিবার সময় হয় নাই। দ্বিতীয় এই যে, শাস্ত্রালোচনা করিবার ঔদার্য শাস্ত্রীর আছে সন্দেহ নাই কিন্তু ভারতবর্ষে ট্রেড সিক্রেট জাতীয় একটি নিন্দনীয় ঐতিহ্য অর্ধ-পণ্ডিতদের ভিতরে আছে। যোগ ও তন্ত্র শিক্ষা করিতে যাঁহারাই চেষ্টা করিয়াছেন—হিন্দু-মুসলমান যিনিই হউন—তাঁহারাই জানেন যে, গুণীরা জ্ঞানদানে কি পরিমাণ পরাঙ্মুখ। ফলিত-জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, প্রতিমা-নির্মাণ, সঙ্গীত জাতীয় অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও প্রয়োজনীয় বিদ্যার কথা বাদই দিলাম। অবশ্য একটি কারণও আছে, তাহাকে শাস্ত্রাধিকার বলে। অপক্ক পাত্রে যোগের ন্যায় অত্যুষ্ণ ঘৃত রাখিলে যে সে সহ্য করিতে পারিবে না তাহাতে আর কি সন্দেহ? কিন্তু ভুক্তভোগী মাত্রই অকপটচিত্তে স্বীকার করিবেন যে এই শাস্ত্রাধিকার লইয়া অর্ধদগ্ধ পণ্ডিতেরা—সত্যকার বিদগ্ধেরা নহেন—অনেক সময় মাত্রাজ্ঞান হারাইয়াছেন ও যোগ্য ব্যক্তিকেও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

গজনীর বিখ্যাত মহমুদের সভাপণ্ডিত গুণিজন দ্বারা মহমুদ অপেক্ষা অধিক সমাদৃত অল-বীরুণী তাঁহার ভারতবর্ষ পুস্তকে এই লইয়া পুনঃ পুনঃ পরিতাপ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ধৈর্য ও জ্ঞানতৃষ্ণার প্রশংসা করিতে হয় ও যে-সব পণ্ডিতের সঙ্গে তাহার যোগাযোগ হইয়াছিল, তাঁহাদের কয়েকজনকে তসলীম করিতে হয় যে, তাঁহারা অকৃপণ ভাবে জ্ঞানদান করিয়াছিলেন। না হইলে অল-বীরুণী ষড়দর্শন, রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ জ্যোতিষ ইত্যাদি নানা বিষয়ে লিখিতেন কি প্রকারে? (এই প্রসঙ্গ হয়ত পুনর্বার উত্থাপিত হইবে না, তাই একটি জিনিসের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না; অল-বীরুণী তাঁহার পুস্তকে মহাভারতের যে পর্ববিভাগ ও তাহাদের শিরোনামা দিয়াছেন, সেগুলির সঙ্গে অদ্যকার প্রচলিত মহাভারতের বিস্তর অনৈক্য দৃষ্ট হয়। এ বিষয় লইয়া কোন গবেষণা এযাবৎ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই বলিয়া গুণিজনের সহৃদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। Sachau-এর India নামক ইংরাজি অনুবাদ দ্রষ্টব্য।)

দুই ধর্মের চরম নিষ্পত্তি সম্মিলিত করিয়া হিন্দু-মুসলমানকে উচ্চাঙ্গ সাধনার ক্ষেত্রে মিলিত করিবার আর একটি প্রক্ষিপ্ত উদাহরণ দৃষ্ট হয়। সে উদাহরণটি এমনি ছন্নছাড়া, যূথভ্রষ্ট যে, বিশ্বাস হয় না এমন সাধনা সে-যুগে কি করিয়া সম্ভব হইল।

প্রাতঃস্মরণীয় রাজকুমার দারাশীকুহ'র কথা স্মরণ করিতেছি। কী অপূর্ব পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ উপলব্ধির সম্মেলনে তাঁহার 'মুজম'-ই বহরেন' বা দ্বিসিন্ধু-

মিলন সৃষ্ট হইল। ১৮২০-৩০-এর সময় রাজা রামমোহন উপনিষদকে লোকচক্ষুর সম্মুখে আনিয়া ভারতে প্রখ্যাত হইলেন। তিনি ব্রাহ্মণসন্তান—কার্যটি তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু তাঁহার প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে পৃথিবীর সর্বাধিক বিলাসব্যসান মুগল রাজপরিবারের ফারসী-ভাষাভাষী সুকুমার রাজকুমার যৌবনের প্রারম্ভে কি করিয়া সংস্কৃতের বিরাট ভাণ্ডার হইতে এই অক্ষয়, অনাদৃত খনিটি কোন যোগবলে আবিষ্কার করিলেন? ব্রাহ্মণপণ্ডিত রাখিয়া তাহার অনুবাদ ফারসীতে করাইলেন—পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে শুনিয়াছি মূল পাণ্ডুলিপিতে নাকি দারার স্বহস্তে কৃত শুদ্ধি সম্মার্জন মার্জিনে আছে। সেই ফরাসী তর্জমা জেসুইয়ট দ্য পেরোঁ লাতিনে অনুবাদ করেন এবং সেই অনুবাদ জানি না কি করিয়া জর্মন দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাণ্টের দেশের লোক, প্লেটোর ঐতিহ্যে সঞ্জীবিত, হেগেলের সমসাময়িক এই দর্শনার্ণবের জর্মন কর্ণধার বলিলেন, উপনিষদ আমার জীবনে শান্তি আনয়ন করিয়াছে। তারপর জর্মনী ও পরে ইউরোপে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। উপনিষদের খেই ধরিয়া নানা পণ্ডিত নানা সংস্কৃত জর্মনে তর্জমা করিলেন—সর্বত্র ভারতীয় বিদ্যা ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু সে কথা আজ থাক অনুসন্ধিৎসু এই লোমহর্ষক, লুপ্তগৌরব প্রত্যর্পণকারিণী কাহিনী জর্মন পণ্ডিত বিণ্টারনিৎস (Winternitz) ও শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণনের 'ঈস্টার্ণ আইডিয়ালিজম্ ও বেস্টার্ণ থট' পুস্তকে পাইবেন।

দারাশীকুহ'র দ্বিসিন্ধুমিলনে তিনি ইসলামের সাধনামণি সুফীতত্ত্ব ও হিন্দু দর্শনের চিন্তামণি বেদান্ত তাঁহার জ্ঞানকাঞ্চনাঙ্গুরীয়তে একাসনে বসিয়া যে রশ্মি-ধারার সম্মেলন করিলেন, হায়, তাহা দেশের তমসান্ধকারকে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না।

কিয়ৎকাল পরেই 'প্রলয় প্রদোষে মোগলের উষ্ণীষশীর্ষ প্রস্ফুরিত' হইতে লাগিল, শবলুব্ধ গৃধ্রীদের বীভৎস চিৎকারের মধ্যে সেই যোগাঙ্গুরীয় কোন্ অন্ধকারে বিস্মৃত বিলুপ্ত হইল।

পুনর্বার ক্ষীণচেষ্টা দেখা গেল—সুভাষচন্দ্র তাঁহার পুস্তকে সে প্রচেষ্টার উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তখন বিদেশী আসিয়াছে। সেই কথার উল্লেখ করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম।

তারপর? তারপর লজ্জা ঘৃণা পাপ
অপমান; প্রকাশিল অন্তহীন শাপ

হিন্দু-মুসলমান ক্ষত্রিয়েরা যখন ১৮৫৭ সালে পুনরায় সম্মিলিত হইয়া সফল হইলেন না তখন তাহাই উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছিলাম।

যুগ্ম ক্ষাত্রতেজে তার পাপ প্রক্ষালন
চেষ্টা হল ব্যর্থ যবে। করিল বরণ
ভেদমন্ত্র ছিদ্রান্বেষী পরস্পরাঘাত
হইল বিজয়টিকা সে অভিসম্পাত॥

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই
না
ভাই ভাই এক ঠাঁই ?

ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা সবপ্রথম করেন অল-বীরুণী ও পরবর্তী যুগে হিন্দু-মুসলিম উভয় সাধনার যে চরম উৎকর্ষ বেদান্ত ও সুফী মতবাদে বিদ্যমান, তাহাদের মিলন ঘটাইবার চেষ্টা করেন রাজকুমার দারাশীকুহ। আমরা বারান্তরে তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

এক্ষণে যে স্থলে উপস্থিত হইয়াছি সেখানে প্রশ্ন ওঠে, আর কি 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' বলা চলে, না এখন বরঞ্চ বলিব 'ভাই ভাই এক ঠাঁই' ?

এই সম্পর্কে একটি উদাহরণ নিবেদন করি।

খৃষ্টানরা যে রকম এদেশে সিরিয়ন ক্যাথলিকবাদ, রোমান ক্যাথলিকবাদ এবং প্রোটেস্টান্ট ধর্মের নানা চার্চ বা মতবাদ স্ব স্ব ধর্মবিশ্বাসানুয়ায়ী প্রচলিত করিবার চেষ্টা করেন, মুসলমানরাও সেইরূপ সুন্নি, শীয়া ও অন্যান্য নানা রকম মজহব (Seeds) প্রচলন করার চেষ্টা করেন। ভারতবর্ষে পাঠান রাজত্ব সর্বত্র পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্বে মুসলিম অবৈতনিক মিশনারীরা এদেশে স্ব স্ব ধর্মমত প্রচার করিবার প্রয়াস করেন ও বেশীর ভাগ সমুদ্রযোগে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে, অর্থাৎ সিন্ধু দেশ হইতে কেপ কমরিণ পর্যন্ত কর্মস্থল বিস্তৃত করেন।

যাঁহারা ফিটজিরাল্ড কৃত ওমর খৈয়ামের ইংরাজী অনুবাদের উপক্রমণিকাটি মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছেন তাঁহাদের স্মরণ থাকিবে যে, ওমর খৈয়ামের বন্ধু হিসাবে আরেকটি লোকের নাম তাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে—সে নাম হাসন বিন্ সব্বার। এই হাসন সব্বা স্বধর্ম ও স্বাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে পারস্যে এক ভয়ঙ্কর গুপ্তঘাতকদের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন ; সেই ঘাতকদের নাম হশীশিয়ুন এবং হশীশিয়ুনরা ক্রুসেডের নাইটদের মধ্যে এমনই আতঙ্কের সৃষ্টি করে যে, সেই হশীশিয়ুন শব্দ ল্যাটিনের ভিতর দিয়া ইতালীর assassino হইয়া, ফরাসী assassin-এ রূপান্তরিত হইয়া ইংরিজিতে সেই বানানেই প্রচলিত

আছে। হানন সব্বা পারস্তে আপন কর্মভূমি সীমাবদ্ধ করেন নাই। বিদেশে স্বমত সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার বাসনায় গুজরাটে তিনি মিশনরী প্রেরণ করেন। তাঁহাদেরই একজন লোহানা রাজপুতদিগের মধ্যে অ্যাসাসিনদের শীয়া ধর্ম প্রচার করেন। ইঁহারা বর্তমানে পশ্চিম ভারতে 'খোজা' সম্প্রদায় নামে সুপরিচিত। কলিকাতার রাধাবাজারে ইহাদের কাহারো কাহারো কাপড়ের দোকান আছে।

এস্থলে শীয়া-সুন্নি মতবাদ লইয়া আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। ততোধিক নিষ্প্রয়োজন শীয়াদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও তাহাদের পার্থক্য লইয়া বাক্যব্যয় করা। শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন যে, হাসন সব্বার মতবাদী খোজা মুসলমানরা উত্তর ভারতের শীয়া হইতে ভিন্ন; উত্তর ভারতের শীয়ারা ইসনা আশারী অর্থাৎ বারোজন গুরুতে বিশ্বাস করেন, 'খোজারা' ইসমাঈলি অর্থাৎ ইসমাঈলকে শেষ প্রধান গুরু হিসাবে বিশ্বাস করেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই সব বিভিন্ন মতবাদের আংশিক ইতিহাস এনসাইক্লোপীডিয়া অব রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড এথিকস এবং পূর্ব ইতিহাস এনসাইক্লোপীডিয়া অব ইসলামে পাইবেন।

লোহানা রাজপুতরা বৈষ্ণব ধর্মে বিশ্বাস করিতেন ও সম্ভবতঃ পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন (Schrader-এর আজিয়ার হইতে প্রকাশিত পাঞ্চরাত্র সিস্টেম দ্রষ্টব্য)। কিন্তু বৈষ্ণব যে ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—কারণ তাঁহারা বিষ্ণুর দশ অবতারে বিশ্বাস করিতেন।

অদ্যকার খোজাদের মধ্যে কুরাণ শরীফের প্রচলন নাই। তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থগুলি আংশিক কচ্ছের উপভাষায় ও আংশিক গুজরাতিতে লেখা। সেগুলি 'গিনান' (সংস্কৃত 'জ্ঞান') নামে প্রচলিত ও তাহাদের মধ্যে 'দশাবতার' পুস্তক বা 'গিনান' সর্বাধিক সম্মান পায়। লোহানা রাজপুতদিগকে যে মিশনরী ইসমাঈলি শীয়া মতবাদে দীক্ষিত করেন সেই নূর-সৎ-গুর ('নূর' আরবী শব্দ 'রশ্মি' অর্থে ও 'সৎগুর' 'সৎগুরু' হইতে) দশাবতারের প্রণেতা। খোজারা সাধারণ মুসলমানদের মসজিদে যান না, তাঁহাদের স্বতন্ত্র 'জমাতখানা' বা 'সম্মেলন গৃহে' জমায়েত হন। বিশেষ পর্ব উপলক্ষে 'দশাবতার' পঠন হয়, প্রথম নয় অবতার মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি তাঁহারা উপবিষ্ট হইয়া শ্রবণ করেন; কিন্তু দশমাবতারের কাহিনী আরম্ভ হইলে তাঁহারা দণ্ডায়মান হন।

এই দশমাবতার লইয়া বৈষ্ণবে ও খোজায় পার্থক্য। বৈষ্ণবমতে দশমাবতার কল্কি, খোজামতে দশমাবতার বহুকাল হইল মক্কায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—তিনি মহাপুরুষ মুহম্মদের জামাতা হজরত আলী। (পাঠককে এইস্থলে স্মরণ করাইয়া

দেই যে, গোঁড়া শীয়ারা আলীকে মহাপুরুষ মুহম্মদ অপেক্ষা সম্মান প্রদর্শন করে ও আদালুসের ইবনে হাজমের মতে এমন শীয়াও আছেন যাঁহারা বলেন, "দেবদূত = ফিরিস্তা জিবরঈল = Gabriel 'ভ্রমবশতঃ' কুরাণ শরীফ হজরত আলীকে না দিয়া হজরত মুহম্মদকে দিয়া ফেলেন"!!! এবং আরও বিশ্বাস করেন যে, হজরত আলীর মৃত্যুর পর তাঁহার আত্মা তাঁহার পুত্র হাসন তৎপর তাঁহার ভ্রাতা হুসেন, তৎপর জয়ন উল-আবেদীন তৎপর তাঁহার পুত্র হইয়া বংশানুক্রমে চলিতে চলিতে বর্তমান জীবিত ইমাম বা গুরুতে বিরাজমান—বর্তমান গুরুর নাম পরে উল্লেখ করিব।

খোজারা অর্ধ-কচ্ছী-উপভাষা ও অর্ধ-গুজরাতিতে উপাসনা করেন—তাহাকে 'নামাজ' বলিলে ভুল বোঝানো হইবে। রমজান মাসে খোজারা উপবাস করেন না। হজ করিতে মক্কায় যান না—বর্তমান ইমাম বা গুরুদর্শনে হজের পুণ্যসঞ্চয় বলিয়া বিশ্বাস করেন। গরীব দুঃখীকে 'জকাত' বা ধর্মাদেশানুযায়ী 'ভিক্ষা' দেন না, সে অর্থ গুরু দ্বারা প্রচলিত প্রতিষ্ঠানকে দেন। খোজারা পাঁচবারের পরিবর্তে তিনবার উপাসনা করেন এবং সুন্নি ও শীয়া মত হইতে তাঁহাদের ধর্মবিশ্বাসে অন্যান্য বহু অনৈক্য দৃষ্ট হয়।

খোজাদের 'গিনান' বা ধর্মগ্রন্থগুলি পড়িলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এ্যাসাসিন মিশনারিরা হিন্দু এবং শীয়া মতবাদের সম্মেলনে এক নূতন ধর্ম সৃষ্টি করিয়া তাহাতে তাবৎ ভারতীয়দিগকে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করেন। এই দৃষ্টান্তটি বিশেষ উল্লেখ করিলাম কারণ ইহা শীয়াদের পক্ষ হইতে করা হইয়াছিল। ইহার পর ভাষা নির্মাণে কাব্য সৃষ্টিতে বিভিন্ন রসবস্তু সম্মেলনে যে সব প্রচেষ্টা হইয়াছিল তাহা অধিকাংশ সুন্নিদের দ্বারা।

গুজরাতে 'মতিয়া' সম্প্রদায়ও বিবাহের সম্বন্ধে ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করেন; কিন্তু মৃত্যুর পর শব কবরস্থ করিবার জন্য মোল্লার কাছে আরজী পেশ করেন। পশ্চিম উপকূলে এইরূপ নানা সংমিশ্রণের চিহ্ন সর্বত্র পাওয়া যায়।

এইসব চেষ্টার ফলেই ১৭৫০ সালে লিখিত গুজরাতের ফারসী ইতিহাস মিরাত-ই অহমদীতে দেখা যায় যে, হিন্দু-মুসলমানে সাম্প্রদায়িক কলহ তখন প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। লেখক আলী মুহম্মদ খান তাঁহার হাজার পাতার (মুদ্রিত) পুস্তকে যে দুই একটি কলহের উদাহরণ দিয়াছেন সেগুলি তিনি সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় রূপেই উদ্ধৃত করিয়াছেন।

খোজাদের বর্তমান গুরু হিজ হাইনেস দি আগা খান।

ভাই ভাই এক ঠাঁই

১

বারান্তরে হিন্দু-মুসলিম শাস্ত্রীয় মিলনের ফলে উপজাত 'খোজা' মতবাদের উল্লেখ করিয়াছিলাম। এক্ষণে যেস্থলে উপস্থিত হইয়াছি, তাহার সম্মুখে মিলনের সুধা-শ্যামলিমদিগ্‌দিগন্ত বিস্তৃত—তাহার পুণ্য পরিক্রমা আরম্ভ করিব, এমন সময় একটি অতি আধুনিক ঘটনার দিকে আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে। কালানুপূর্বের ধারাবাহিকতার প্রতি অত্যধিক নিষ্ঠা প্রদর্শন না করিয়া অসময়ে প্রসঙ্গটির অবতারণা করিব, কারণ বিষয়টি আমাদের দৃষ্টিবিন্দু হইতে অসাময়িক হইলেও অবান্তর নহে।

গত মঙ্গল-শুক্রবারে* যখন কলিকাতার ছাত্রসমাজ ও বহু বাঙালী-অবাঙালী স্বৈরতন্ত্রের প্রতিবাদ করিয়া আন্তরিক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন, তখন অনেকেই হয়ত আশা করিবার সাহস রাখেন নাই যে, মুসলমানেরা, বিশেষতঃ মুসলমান ছাত্রসমাজ ইহাতে যোগদান করিবেন। আমরা নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় স্তম্ভটি পাঠকের গোচর করিতেছি।

A large number of Muslim students participated in the recent disorders in Calcutta. One of them lost his life, and many received injuries, serious and light. The student of the Islamia College went on strike in sympathy with their Hindu fellow students and in protest against the firing and lathi charge by the police. The vice-president of the College Union presided over a huge meeting which passed appropriate resolutions. Large numbers of Mulims, other than students, also took part in the demonstrations. Many non-Muslims wonder why these Muslims have taken this attitude. The answer is not difficutt to find. It is the Muslim way, the result of over 13 centuries of teaching expressed in the practice of the precepts laid down in the holy Qur'an and the traditions of the prophet Muhammad: Love your neighbours, side with him that is weak, oppressed

* ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ

or ill-used, serve Allah by serving his creatures ; the true Muslim is represented in his two little things, his heart and his tongue.

এতদিন ধরিয়া আমরা ঠিক এই কথাটিই বলিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। সর্ব ধর্মের মূলতত্ত্ব সমান, আমরা সকলে একথা স্বীকার করি ; কিন্তু আচার-ব্যবহারে অশন-বসনে সেই তত্ত্বগুলি যখন প্রকাশ পায়, তখন অনেক সময় এমন বিকৃত রূপ ধারণ করিয়া পীড়াদায়ক হইয়া ওঠে যে, তখন মানুষ শুধু সেই মানুষগুলির আচরণের নহে তাঁহাদের ধর্মের উপরও দোষারোগ করিতে থাকে। সবিস্তর নিবেদন করি :—

ইংরেজরা এদেশে খ্রীষ্টধর্ম আনয়ন করেন। খ্রীষ্টধর্ম মৈত্রী ও ক্ষমার ধর্ম। কিন্তু দেড়শত বৎসর খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পরও এদেশে দেখি, দিশি খ্রীষ্টানের স্বতন্ত্র ধর্মালয়, শ্বেত খ্রীষ্টানের স্বতন্ত্র ধর্মালয়, আহার-বিহার সামাজিক গণ্ডি স্বতন্ত্র, এমন কি মৃত্যুর পাণ্ডুহস্ত স্পর্শেও কৃষ্ণ-খ্রীষ্ট ধবল হয় না ;—তাহার জন্য স্বতন্ত্র গোরস্তান। ইংরেজ শাসকের স্বৈরতন্ত্র মুসলমান শাসকের 'এখতেয়ারী' অপেক্ষা সর্বাংশে অধিক চর্মদাহে মর্মদাহে তাহা বার বার অনুভব করিয়াছি ও করিতেছি। কিন্তু তাঁহাদের সর্বপ্রকার সাহায্য সত্ত্বেও খ্রীষ্টধর্মের ন্যায় উদার ধর্ম, এদেশে সসম্মানে বরিত ও নন্দিত হইল না। ধর্মপিপাসু মন বার বার শুধায়, ত্রুটি কোন্-খানে ? হয়ত যাঁহারা বাহকরূপে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ধর্মের সত্য সেবক ছিলেন না।

তাই বলি এদেশের মুসলমান ধার্মিক। ব্যাপক অর্থে ধার্মিক। তিনি আরব-তুর্ক-মোগল বিজেতাদের জন্য স্বতন্ত্র ধর্মাগার, ভোজনাগার, অনন্ত-শয্যাগার নির্মাণ করেন নাই। তিনি স্বধর্ম পালন করিয়া হিন্দুর প্রতিবাসী হইয়াছেন। বিদেশী-শকট-যুগ্ম যখন হিন্দু-মুসলিমের যুগ্ম-স্কন্ধকে চরম মর্দনে প্রপীড়িত করিল, তখন বর্ণ-ধর্ম ভুলিয়া দুই নিরীহ বলীবর্দ যুগ্ম-পদাঘাতে শকটারোহীকে সচেতন করিয়া দিল।

উপরোদ্ধৃত সম্পাদকীয় স্তম্ভের লেখক ইসলামের মূলনীতি হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছেন, সজোর লেখনী সঞ্চালনে প্রকাশ করিয়াছেন।

"We do not blame the action of the students, for that matter, the action of the other Muslims who took part in the demonstrations ; but it is the students in particular whom we are addressing. We commend their action and

admire it. Furthermore, we thoroughly understand the noble motives which have actuated them."

এ সত্য মুসলমানের কথা! এ সত্য মানুষের কথা! ধর্মের কথা ন্যায়ের কথা! এই ভাই কোন ভিন্ন ঠাঁই যাইবে?

কিন্তু,

The Muslim students know fully well that their life and future are in jeopardy in a country where though a hundred million, the Muslim are in a minority. They realise the designs against them as Muslims.

মুসলমানদের ভীত হইবার কারণ আছে কিনা সে প্রশ্ন আমরা কেন জিজ্ঞাসা করিব? কারণ লেখক নিজেই ভীত হন নাই—ভীত হইয়া স্বধর্মীয়দিগকে গণ অভিযান হইতে পশ্চাৎপদ হইতে বলেন নাই; নিজেই বলিতেছেন:

Still they have not hesitated to plunge into the fury, why? It is the Muslim way. Their hearts told them the I. N. A. trial was unjust. The lathi charges were brutal, the firing absolutely unjustified. It was their bounden duty to sympathise. Their hearts, brimful with the sublime teachings of Islam made them translate their sympathy into action. Some of them fell, side by side, with those who, perhaps not in person, represented the terrible menace to Islam and Muslim in India.

It was the Muslim way, most nobly expressed.

আমেন। তথাস্তু!

আমাদের তো বলিবার আর কিছুই নাই। সাহস পাইলাম, ভরসা পাইলাম, যে দিন স্বাধীনতা সংগ্রামের শঙ্খধ্বনি ভারতবর্ষ প্রকম্পিত করিবে, সেদিন তাহার রুদ্রদমন-চেষ্টা পুনর্বার ক্রূর বুধ-শুক্র রূপ ধারণ করিবে, সেই শুভদিনে প্রতিবাসী যখন প্রতিবাসীর দিকে হস্ত প্রসারণ করিবে সেদিন তরুণ মুসলিম, প্রবীণ মুসলিম 'মুসলিম-ওয়ে' মুসলিম-পন্থায় দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইবে—তাহার বিরুদ্ধে কি 'design', কি 'menace' ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিবে না।

এতদিন যাবৎ হিন্দু-মুসলমান কৃষ্টির যে সব স্থলে যোগ হয় নাই তাহারই উল্লেখ করিতেছিলাম। দেখিলাম সাতশত বৎসর ধরিয়া ভট্টাচার্য টোলে সংস্কৃত ঐতিহ্য সঞ্জীবিত রাখিলেন, কিন্তু ইসলামের নিকট হইতে কোনো ঋণ গ্রহণ করিলেন না; মৌলানা আরবী-ফারসী জ্ঞানচর্চা করিলেন, কিন্তু ভট্টাচার্যের দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না।

অর্থাৎ শাস্ত্রীয় হিন্দুধর্ম, মুসলমান ধর্ম, হিন্দু দর্শন, মুসলমান দর্শন একে অন্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া জীবিত রহিল।

কিন্তু ইহাই কি শেষ কথা? ভারতবর্ষের কোটি কোটি হিন্দু-মুসলমান চাষা মজুর শতকরা কয়জন ইহাদের মুখের দিকে চাহিয়া জীবনযাপন করিয়াছে, তাহাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আদর্শ একে অন্যের সাহায্য লইয়া তাহারা কি পণ্ডিত মৌলবীকে উপেক্ষা করিয়া প্রকাশ করে নাই? ভট্টাচার্য তাঁহার দেবোত্তর জমি ও মৌলানা ওয়াকফদত্ত সম্পত্তি উপভোগ করিতেন, উভয়ের উপর এমন কোনো অর্থনৈতিক চাপ ছিল না যে বাধ্য হইয়া একে অন্যের দ্বারস্থ হন। কিন্তু মুসলমান চাষা তো এ দম্ভ করিতে পারে নাই যে হিন্দু জেলেকে সে ধান বেচিবে না, হিন্দু জোলা তো এ অহংকার করিতে পারে নাই যে মুসলমানকে কাপড় না বেচিয়াও তাহার দিন গুজরান হইবে।

শাস্ত্রী ও মৌলানা যে সব কারণবশতঃ সর্বজনীন চন্দ্রাতপতলে একত্র হইতে পারিলেন না, সে সব কারণ তো চাষামজুরের জীবনে প্রযোজ্য নহে। ব্রহ্ম এক কি বহু, সগুণ কি নির্গুণ—তাহা লইয়া সে হয়ত অবসর সময়ে কিছু কিছু চিন্তা করে, কিন্তু এসব তো তাহার কাছে জীবনমরণ সমস্যা নহে—এমন নহে যে, ঐ সম্পর্কে কলহ করিয়া একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিবে না। তাহার উপর অর্থনৈতিক চাপ নির্মম চাপ, যাহাকে বলে অন্নচিন্তা চমৎকারা। তাই দেখিতে পাই মোল্লা-মৌলবীর বারণ সত্ত্বেও মুসলমান চাষা জানিয়াশুনিয়া হিন্দুকে বলির জন্য পাঁঠা বিক্রয় করে, পয়সা রোজগারের জন্য বিসর্জনে ঢোল বাজায়; হিন্দু গয়লা মুসলমান কসাইকে এঁড়ে বাছুর বিক্রয় করে। এই কোটি কোটি হিন্দু-মুসলমান শব্দার্থে পাশাপাশি বাস করিয়াছে। একে অন্যের সুখ-দুঃখের ভাগ লইয়াছে। আশা-আকাঙ্ক্ষার সন্ধান পাইয়াছে। সে-সব কি তাহারা ধর্মে, লোকসাহিত্যে, গানে, ছবিতে প্রকাশ করে নাই? যদি করিয়া থাকে তবে তাহা পুস্তকাবদ্ধ নস্যসিক্ত শাস্ত্রালোচনা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধর্ম ও দর্শনালোচনা অপেক্ষা অনেক সত্য, অনেক জীবন্ত। লক্ষ কণ্ঠে গীত কবীরের ধর্মসংগীত, ষড়দর্শন ও ইলমুলকালাম

হইতে লক্ষগুণে নমস্য।

হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের যুগ্ম চেষ্টায় ভারতবর্ষে গত সাতশত-আটশত বৎসর ধরিয়া যে-কৃষ্টি যে-সভ্যতা নির্মিত হইয়াছে তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে অপূর্ব। কি ধর্মে, কি ভাষা-নির্মাণে, কি সাহিত্য-সৃষ্টিতে, কি সংগীতে, কি নৃত্যে, কি বিলাস-সামগ্রী নির্মাণে, তৈজসপত্রে—কত বলিব? ইহারা যে প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়াছে, দানে-গ্রহণে যে অকৃপণতা দেখাইয়াছে তাহা—আবার বিশেষ জোর দিয়া বলি—সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে অপূর্ব, সমগ্র জগতের কল্পনার অতীত। ভারতের হিন্দু-মুসলমান যাহা করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহা পৃথিবীর কোন দুই ধর্ম কস্মিন্‌কালেও করিতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত কথা তোলা অনুচিত, কিন্তু যে-বিষয়ে অধম গত পঁচিশ বৎসর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছে তাহার সম্যক্ মূল্য বুঝিবার জন্য সে দেশে-বিদেশে সর্বত্র—সর্বপ্রকার লোকসংগীত ও অন্যান্য জনপদকলা আকণ্ঠ পান করিয়াছে, আকর্ণ-বিস্ফারিত চক্ষে দেখিয়াছে। সহৃদয় পাঠক ক্ষমা করিবেন, কিন্তু অধর্মের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-জনিত দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের দেশের লোকসংগীতের কাছে ইউরোপের তথা অন্যান্য প্রাচ্যদেশের (চীনের কথা বলিতে পারি না) কোনো লোক-সংগীত দাঁড়াইতে পারে না, না, না।

অতএব আমাদের কর্তব্য এই আটশত বৎসরের সর্বপ্রকারের জনপদ-প্রচেষ্টা খুঁটিয়া খুঁটিয়া চিরিয়া চিরিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করা, লিপিবদ্ধ করা, কলের গানে রেকর্ড করা, ইতিহাস লেখা ও সর্বশেষে তাহাকে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক দৃষ্টিবিন্দু হইতে পর্যবেক্ষণ করিয়া ইস্কুল-কলেজে পড়ানো।

আবার বলিতেছি ইস্কুল-কলেজে পড়ানো। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্থপতি যদি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তবে ইহাই হইবে তাহার সুদৃঢ়, অচল-অটল ভিত্তি। শিখর, মিনার কে নির্মাণ করিবেন, কোন্ দর্শন, কোন্ শাস্ত্রীয় ধর্ম দিয়া—সে আলোচনা পরে হইবে।

কিন্তু যে কর্মটির প্রতি সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম তাহা তো একজন, শতজন, হাজারজনের অক্লান্ত পরিশ্রমেরও বাহিরে। এত লোকসংগীত, স্থপতি, চিত্র, সংগীত, নৃত্য ভারতের গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে সর্বত্র হকজ্যোতি হইয়া মৃতপ্রায়, তাহাকে সংগ্রহ করিবার জন্য নেতৃত্ব করিবেন কে?

আমাদের পরম সৌভাগ্য, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। বিশ্বের সর্বত্র রাজাধিরাজের সম্মান পাইয়াও এই কবি লালন ফকীরকে উপেক্ষা করেন নাই, হাসন রাজার গান গাহিয়া বিদগ্ধ দার্শনিকমণ্ডলীর সম্মুখে

অবতরণ করিলেন।

মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন,
কানেতে করিল পয়দা মুসলমানী দীন
নাকে পয়দা করিয়াছে খুশবয় বদবয়
আমা হইতে সব উৎপত্তি হাসন রাজায় কয়।

(কাশীতে প্রদত্ত দার্শনিক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ দ্রষ্টব্য)।

পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের দৃষ্টি এদিকে পূর্বে আকৃষ্ট হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সহৃদয় উৎসাহে তিনি এই কর্মে আরও মনোযোগ করিলেন, বহু অমূল্য লুপ্তধন সঞ্চয় করিলেন। দেশের লোক তাহা প্রকাশের অপেক্ষায় রহিয়াছে। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবন দান করুন।

ভারতবর্ষের লোকসংগীত লইয়া চর্চা করিতে হইলে উত্তর-ভারতীয় অনেকগুলি ভাষা-উপভাষার পণ্ডিত হইতে হয় ও এই সব সংগীতের পশ্চাতে যে সংস্কৃত ও ফারসীতে লিখিত ও গীত ভক্তি-সুফী-বেদান্ত-যোগবাদ রহিয়াছে তাহার সম্যক জ্ঞানের প্রয়োজন।

অধমের নাই। বাহির হইতে যেটুকু সামান্য দেখিয়াছি তাহাই নিবেদন করিবার চেষ্টা করিব। সহৃদয় পাঠককে সাবধান করিয়া দিতেছি, আলোচনা অতি অসম্পূর্ণ ও দোষত্রুটিতে কণ্টকিত থাকিবে। এবং ইতিমধ্যে অন্য কেহ যদি আলোচনাটি আরম্ভ করেন তবে অধম তাঁহাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করিয়া পরমানন্দে শ্রোতার আসনে গিয়া বসিবে।

৩

পূর্বের প্রবন্ধে সামান্য আভাস দিয়াছিলাম যে, ভারতবর্ষীয় লোকসংগীতের মূল্য ও তাৎপর্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে বেদান্ত, যোগ, ভক্তিবাদ ও সুফীতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকার প্রয়োজন।

সুফীবাদ (ভক্তি, যোগ ও mysticism-এর সমন্বয়) ভারতবর্ষে আসে পারস্য হইতে ও এদেশের দর্শন ও ভক্তিরস ইহাকে পরিপুষ্ট করে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে আরেকটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্য আকর্ষণ করিব।

১৯১৮-র যুদ্ধে যখন ফ্রান্স ও জর্মনী ক্লান্ত, তখন পণ্ডিত-মহলে দ্বিতীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সে যুদ্ধ সুফীবাদ লইয়া। একদিকে ফ্রান্সের বিখ্যাত পণ্ডিত মাসিন্নো, অন্যদিকে জর্মনীর তদপেক্ষা বিখ্যাত পণ্ডিত গল্‌ড্‌ৎসীহার ও তস্য শিষ্য

হর্তেন। মাসিন্নো পক্ষ বলিলেন, ইরানের সুফীবাদের উপর ভারতবর্ষীয় কোন প্রভাব পড়ে নাই, যেটুকু পড়িয়াছে তাহা সুফীবাদ ভারতবর্ষে আসিবার পর। অন্যপক্ষ নানা প্রকার যুক্তিতর্ক দলিলদস্তাবেজ দ্বারা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলেন যে, ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বেই অর্থাৎ ইরানের বর্ধিষ্ণু সুফীবাদ বেদান্ত ও যোগরস পুনঃ পুনঃ পান করিয়াছে।

তর্কটি পাত্রাধার তৈলজাতীয় আপেক্ষিক, নিরর্থক নহে। সুফীবাদ অনুসন্ধান করিলে যদি সপ্রমাণ হয় যে, ভারতবর্ষীয় দর্শনের লাঞ্ছন তাহার উপর রহিয়াছে তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি গম্ভীর ঐতিহাসিক তত্ত্ব সপ্রমাণ হয়, সেটি এই যে, ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন এককালে ইরান পর্যন্ত ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল।

এ সন্দেহ বহু পূর্বেই কোন কোন পণ্ডিত করিয়াছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মদর্শন যে ইরান নহে, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, সে সন্দেহ প্রথম জাগে পণ্ডিতমণ্ডলীর মনে, যখন তাঁহারা বাইবেলের প্রাচীন ও নবীন মাঙ্গলিকের (Old and New Testaments) তুলনাত্মক আলোচনা আরম্ভ করেন। ইহুদিদের প্রাচীন মাঙ্গলিকের যে হিংস্র নীতি ক্ষণে ক্ষণে আমাদিগকে পীড়া দেয়, সেইরূপ খ্রীষ্টের ক্ষমা ও দয়ার নীতি নবীন মাঙ্গলিকে আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ আনন্দ ও সাহস দেয় (একদিকে An eye for an eye, and a tooth for a tooth ও অন্যদিকে Love thy neighbour, offer the left cheek ইত্যাদি তুলনা করুন)। পণ্ডিতমণ্ডলী জিজ্ঞাসা করিলেন, খ্রীষ্ট কি করিয়া শান্তি ও মৈত্রীর বাণী ঐ হিংস্র পরিবেষ্টনীর মধ্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন ও প্রচার করিবার দুঃসাহস সঞ্চয় করিলেন ? তবে কী কোনো বৌদ্ধশ্রমণের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ হইয়াছিল ? বিশেষতঃ তাঁহার যৌবন কোথায় কি প্রকারে যাপিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে বাইবেল যখন নীরব।

এ প্রশ্নের সমাধান অদ্যাপি হয় নাই, কখনো হইবে এ আশাও আমার নাই। কিন্তু সে সমস্যা উপস্থিত তুলিবার প্রয়োজন আমার নাই—সে বড় জটিল ও এস্থলে অবান্তর।

তবে একথা আমরা জানি যে, বৌদ্ধশ্রমণেরা ইরান, আরব পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন ও সেই তত্ত্ব জানি বলিয়া যখন সুফীবাদে মাঝে মাঝে এমন চিন্তাধারার সন্ধান পাই, যাহা অবিমিশ্র সনাতন ইসলামে নাই, অথচ শূন্যবাদের অত্যন্ত পাশ দিয়া বহিতেছে, তখন মন স্বতঃই প্রশ্ন করে, তবে কি উভয়ের কোথাও যোগ আছে ?

মাসিন্নো ও হর্তেনে এই তর্ক চলিয়াছিল বহু বৎসর ধরিয়া। পৃথিবীর বিদগ্ধ-জন সে তর্ক অনুসরণ করিয়া যে কী আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা কখনো বিস্মৃত হইবেন না। হর্তেন স্বীয় মত সমর্থন করিবার জন্য শেষ পর্যন্ত একখানা পূর্ণাঙ্গ অভিধান লিখিলেন, তাহাতে সূফীবাদের সঙ্গে বেদান্ত শব্দে শব্দে মিলাইয়া বলিলেন, এ রকম সাদৃশ্য যেস্থলে বর্তমান, সেখানে প্রভাব মানিতেই হইবে।

এ তর্কও কখনো শেষ হইবে না। কারণ এ কথা ভুলিলে চলিবে না, মানবাত্মা যখন কর্ম ও জ্ঞানযোগে তাহার তৃষ্ণা নিবৃত্ত করিতে পারে না, তখন সে ভক্তির সন্ধান করে। মানব যখন দুঃখ-যন্ত্রণায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়, তখন অকস্মাৎ তাহারই গভীর অন্তস্তল হইতে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁহাকে রহস্যময় ইঙ্গিত করেন। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া মানুষ তখন সেই জ্যোতির্ময় পুরুষে সর্বচৈতন্য সংযোগ করে। তাহাই যোগ।

বহু ক্যাথলিক সাধু যোগী ছিলেন অথচ তাঁহারা ভারতের যোগশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। যুগে যুগে পৃথিবীর সর্বত্র উপযুক্ত সোপান আরোহণ দৃষ্ট হয়। কর্ম জ্ঞান ও তৎপর ভক্তি। আর যোগ তো অহরহ রহিয়াছে। ঘোর সংসারীও যখন অর্থশোক ভুলিবার চেষ্টা করে, তখন সে যোগের প্রথম সোপানে আরোহণ করিয়াছে। শুধু দ্বিতীয় সোপানে সে যাইবার চেষ্টা করে না—হিরণ্ময় পাত্র দেখিয়াই সে সন্তুষ্ট—তাহাকে উন্মোচন করিয়া চরম সত্য দর্শন করিবার প্রয়াস তাহার নাই।

যোগ পৃথিবীর সর্বত্রই ছিল ও এখনও আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে যোগকে বিশ্লেষণ করিয়া যেরূপ সর্বজনগম্য করা হইয়াছে, তাহাকে যুক্তিতর্ক ও অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ দর্শন করা হইয়াছে, সে রকম আর কোথাও করা হয় নাই—একমাত্র ইরান ছাড়া। সূফীরা ভারতবর্ষীয় যোগীর ন্যায় অন্তর্লোকে সোপানের পর সোপান অধিরোহণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এক সূফী অন্য সূফীর অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন।

ফলে কখনো নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মবোধে বিলীন হইয়াছেন (ফানা), কখনো ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া সেই একাত্মবোধ রসস্বরূপে প্রকাশ করিয়াছেন :—

"মন্ তু শুদম, তু মন্ শুদি,
মন তন্ শুদম, তু জাঁ শুদি।
তা কসি ন গোয়েদ বাদ আজ ইন
মন দিগরম তু দিগরী॥"

"আমি তুমি হইলাম, তুমি আমি হইলে,
আমি দেহ হইলাম, তুমি প্রাণ,
ইহার পর আর যেন কেহ না বলে,
আমি ভিন্ন এবং তুমি ভিন্ন।"

ইহাই তো সত্য ধর্ম। এ মন্ত্র ব্রহ্মে বিলুপ্তির মন্ত্র এবং এ মন্ত্র বিবাহের মন্ত্র। খ্রীষ্টসাধু যীশুকে বিবাহ করে, চার্চকে বিবাহ করে, শ্রমণ সঙ্ঘকে বিবাহ করে আর আমাদের মত সাধারণ মানুষ প্রিয়াকে এই মন্ত্রে বরণ করিয়া সংসারপথে চলিবার শক্তি পায়।

৪

মুসলমান ধর্মপ্রচারকগণ এদেশে সূফী বা ইরানী ভক্তিমার্গ প্রচার করিলে পর হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের সম্মিলিত আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে যে সব সাধক মধুরকণ্ঠে আত্মার রহস্য-লোকের অভিজ্ঞতার গান গাহিলেন তাহার সঙ্গে আমাদের সকলেরই অল্পাধিক পরিচয় আছে। কবীরের নাম শোনেন নাই এমন লোক কম ও যাঁহারাই ভারতীয় কৃষ্টির সত্য, বহুমুখী প্রতিভার প্রতি সিংহাবলোকন করিয়াছেন, তাঁহারাই অন্যান্য নানা সাধকের ভজন দোহার সঙ্গে সুপরিচিত।

উত্তর ভারতে যে-সব সাধক জনগণের হৃদয়মন ভক্তিরসে প্লাবিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের আংশিক পরিচয় মাত্র দিতে হইলেও বহু বৃহৎ গ্রন্থের প্রয়োজন। সংবাদপত্রের বিক্ষিপ্ত স্তম্ভের উপর সে বিপুল সৌধনির্মাণ করা সম্ভবপর নহে। অনুসন্ধিৎসু ও রসজ্ঞ পাঠক সে সৌধের সন্ধান পাইবেন শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের 'দাদু' পুস্তকের ভূমিকায়, পুস্তকাকারে প্রকাশিত তাঁহার স্টেফানস নির্মলেন্দু বক্তৃতায়।

উত্তর ভারতে এই সাধনার দ্বারা পূর্ব ভারতে সপ্রকাশ হয় আউল, বাউল, মুর্শিদিয়া, সাঁই, জারীগানের ভিতর দিয়া। সে-সব গীতের সঙ্কলন এযাবৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে করা হয় নাই। দুইজন গুণী এই কর্মে লিপ্ত আছেন ও রসিক-জনের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক মৌলবী মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ও শ্রীহট্টের মৌলবী আশরফ হোসেন বহু পরিশ্রম করিয়া নানা সঙ্কলন প্রকাশ করিয়াছেন। (এই মহান্ ব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়া দ্বিতীয়োক্ত মহাশয় কয়েক মাস পূর্বে আসাম সরকারের নিকট হইতে যে কি উৎকট প্রতিদান পাইয়াছেন সে সম্বন্ধে আরেক দিন আলোচনা করিবার বাসনা রহিল)।

লালন ফকীর, শীতালং শাহ, রাধারমণ, গোলাম হুসেন শাহ, হাসন রাজা,

ভেলা শাহ, সৈয়দ জহরুল হোসেন, সৈয়দ শাহ নূর প্রভৃতি সাধকমণ্ডলীর পরিচয় এই সব সঙ্কলনে পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক জগতে ইঁহাদের অধিকার দৈনন্দিন জীবনের নিম্নতম কঠিন কঠোর অভিজ্ঞতা হইতে আত্মার উচ্চতম রহস্যলোকের প্রতি ইঁহাদের অভিযান যে কি পরম বিস্ময়জনক, লোমহর্ষক তাহা বর্ণনা করিবার মত অভিজ্ঞতা তো আমার নাই। গ্রহচন্দ্রে, তারায় তারায় অনন্তের যে সুগম্ভীর বীণাধ্বনি প্লাবন মন্ত্রে মুখরিত, রুদ্রের ত্রিকাল ত্রিকোলস্পর্শী দক্ষিণ হস্তে যে রুদ্রাক্ষ জন্মমৃত্যু সৃষ্টিপ্রলয়ের অন্তহীন চক্রে ঘূর্ণায়মান তাহারই স্পন্দন নমস্য সাধকেরা অনাবিল চৈতন্যগোষ্পদে শতরাগে বিম্বিত করিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন। পুনরাবৃত্তি করি, প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন, উপনিষদের ঋষি যে প্রকারে দর্শন করিয়াছিলেন, মু'তাজিলা সুফী পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত যে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যোগে পরমাত্মাকে দর্শন করিয়াছিলেন।

সে রহস্যলোকের ব্যঞ্জনা সাধকেরা দিয়াছেন মধুর কণ্ঠে, ছন্দগানে। রসিকজন শ্রবণমাত্র ভাবরসে আপ্লুত হইয়াছেন। নীরস গদ্যে অরসিকজন তাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কেন বিড়ম্বিত হইবে?

আমাদের পক্ষে শুধু সম্ভব সাধকগণের রসস্রোতধারার ভৌগোলিক উৎপত্তি-স্থলের অনুসন্ধান করা। কোন্ পর্বত-কন্দরে তাহার উৎপত্তি, কোন দেশে-প্রদেশের উপর দিয়া তাহার গতি, কোন মহাসমুদ্রে তাহার নিবৃত্তি সে অনুসন্ধান ভূগোল আলোচনার ন্যায়; তাহাতে জ্ঞানবৃদ্ধি হয়, রসাস্বাদনের প্রত্যক্ষ আনন্দ তাহাতে হয় না। গঙ্গার উৎপত্তি নিলয় জানিয়া তাপিত দেহে গঙ্গাবগাহন-জনিত স্নেহসিক্ত শান্তিলাভ হয় না, পুণ্যলাভ তো সুদূরপরাহত।

রসিকজন এই অন্ধের হস্তিদর্শনের ন্যায় বিড়ম্বনাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন,

ফুলের বনে কে ঢুকেছে সোনার জহুরী
নিকষে ঘষয়ে কমল, আ মরি, আ মরি।

স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, তৎসত্ত্বেও মনে পড়িতেছে, পরমহংসদেবও বলিয়াছেন, মদ শুঁকিলেই নেশা হয় না, চাখিলে নেশা হয় না, এমন কি সর্বাঙ্গে মাখিলেও নেশা হয় না, নেশা করিতে হইলে মদ খাইতে হয়। অর্থাৎ সে রসসায়রে নিমজ্জিত হইতে হয়, পারে দাঁড়াইয়া সে অমৃতের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা পণ্ডিতের পণ্ডশ্রম। তাই বাউল বলিয়াছেন,

যে জন ডুবল, সখি, তার কি আছে বাকি গো?

তখন তো তাহার আর দুঃখ-যন্ত্রণা নাই, সে তো জন্ম-মৃত্যুর অতীত। রাজসিক কবি শ্রীমধুসূদন পর্যন্ত বলিয়াছেন:

মক্ষিকাও গলে না গো সে অমৃত হ্রদে

সৈয়দ শাহনুর গাহিয়াছেন :

রসিক দেখে প্রেম করিয়ো যার দিলেতে ফানা,
অরসিকে প্রেম করিলে চোখ থাকিতে কানা।
ওজুদে মজুদ করি লীলার কারখানা,
সৈয়দ শাহনুর কইন দেখলে তনু ফানা॥

যিনি ব্রহ্মানন্দে আত্মনিলয় (ফানা) করিতে সমর্থ হইয়াছেন, একমাত্র সেই রসিকের সঙ্গে প্রেম করিবে। তদভাবে তুমি চক্ষুষ্মান অন্ধ। এই দেহেই (ওজুদ) লীলার কারখানা মজুদ। তাহা যদি দেখিতে পারো তবেই তুমি দেহের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ (ফানা) করিবে।

(শব্দতাত্ত্বিক লক্ষ করিবেন ভাষার দিক দিয়াও এই চৌপদী 'রুবাইয়াৎ'টি হিন্দু-মুসলীম আধ্যাত্মিক সাধনার কি অপূর্ব সংমিশ্রণে গঠিত—রসিক, প্রেম, লীলা শুদ্ধ সংস্কৃত, চোখ, কানা বাঙলা; ফানা ওজুদ মজুদ শুদ্ধ আরবী; কারখানা ফারসী কইন বাঙাল।)

অরসিক, অপ্রেমিককে এইসব সাধক কখনো করজোড়ে নিবেদন করিয়াছেন যেন ভৌগোলিক শব্দতাত্ত্বিক তর্কবিতর্ক করিয়া রসভঙ্গ না করেন, কখনো নিরুপায় হইয়া কাতরকণ্ঠে দিব্যিদিলাসা দিয়াছেন। তাই ক্ষমাভিক্ষা করিয়া অদ্যকার সভার 'রসভঙ্গ' করি, কবিগুরু কর্তৃক নন্দিত সেই হাসন রাজার গীতি সংকলন 'হাসন-উদাসের' সর্বপ্রথম গীতিটি উদ্ধৃত করিয়া এবং তৎপূর্বে এই মাত্র নিবেদন করি যে, সাধারণতঃ বাউলরা পরমাত্মা মহাপুরুষ ও গুরুর বন্দনা সমাপ্ত করিয়া রস সৃষ্টি আরম্ভ করেন। কিন্তু হাসন রাজা অপ্রেমিক, রবাহূতের আগমন ভয়ে আল্লা-রসুল বন্দনার পূর্বেই বলিতেছেন,

"আমি করিয়ে মানা, অপ্রেমিকে গান আমার শুনবে না।
কিরা দেই, কসম দেই, আমার বই হাতে নিবে না॥
বারে বারে করি মানা বই আমার পড়বে না।
প্রেমের প্রেমিক যে জনা এ সংসারে হবে না॥
অপ্রেমিকে গান শুনলে কিছুমাত্র বুঝবে না।
কানার হাতে সোনা দিলে লাল-ধলা চিনবে না॥
হাসনরাজায় কসম দেয়, আর দেয় মানা
আমার গান শুনবে না, যার প্রেম নাই জানা॥

সাক্ষরকে নিরক্ষরতা হইতে রক্ষা করিবার পন্থা

১

জনসাধারণের শিক্ষাবিস্তার সমস্যা লইয়া যাঁহারা তথ্য সংগ্রহ করেন তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে, উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতবর্ষে শতকরা দশজন লিখিতে পড়িতে পারিত ও আজ নাকি দশের পরিবর্তে বারোয় দাঁড়াইয়াছে। স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, শিক্ষাবিস্তারের কর্মটি সদাশয় সরকার সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদেরও কর্তব্য রহিয়াছে। স্বরাজপ্রাপ্তি আমরা যেমন সদাশয় সরকারের হাতে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দেই নাই, ঠিক সেইরূপে শিক্ষাবিস্তার সমস্যায় আমাদেরও ভাবিবার ও করিবার আছে। শিক্ষানবীশরাও বলেন যে, আমাদের মত অর্ধশিক্ষিত লোকের সাহায্য পাইলেও নাকি নিরক্ষর দেশকে সাক্ষর করার পথ সুগম হইবে।

সমস্যার জটিল গ্রন্থি এই যে যদিও প্রতি বৎসর বহু বালক পাঠশালা-পাস করিয়া বাহির হয়, অর্থাৎ সাক্ষর হইয়া সামান্য লেখা-পড়া করিতে শিখে, তবুও কয়েক বৎসর পরেই দেখা যায় যে, ইহারা সম্পূর্ণ নিরক্ষর হইয়া গিয়াছে। কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, পাঠশালা-পাসের পর পড়িবার মত কোনই পুস্তক তাহারা পায় না। আমার এক স্কুল সাব-ইন্সপেক্টর বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি যে কৈবর্ত, নমঃশূদ্র ও মুসলমান জেলেদের ছেলেরা যত শীঘ্র পুনরায় নিরক্ষর হয়, অপেক্ষাকৃত ভদ্রশ্রেণীতে ততটা নয়। তাঁহার মতে কারণ বোধ হয় এই যে, তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর বাড়ীতে রামায়ণ-মহাভারতের প্রচলন কম ও মুসলমানদের জন্য বাঙলায় সরল কোন ধর্মপুস্তক নাই।

মধ্য ইউরোপের তুলনায় বল্কান শিক্ষায় পশ্চাৎপদ। বল্কানের গ্রামাঞ্চলে অনুসন্ধান করিয়া আমিও ঠিক এই তত্ত্বই আবিষ্কার করি। বল্কানের গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের লেখাপড়ার সঙ্গে যোগ তাহাদের "উপাসনা পুস্তিকা"র মধ্যবর্তিতায়। পাঠকের অবগতির জন্য নিবেদন করি যে, ক্যাথলিক ক্রীশ্চানরা শাস্ত্রাধিকারে বিশ্বাস করেন। গ্রামের পাদ্রী সাহেবের অনুমতি বিনা যে কেহ বাইবেল পড়িতে পারে না, তাহাদের জন্য বরাদ্দ 'উপাসনা পুস্তিকা' বা "প্রেয়ার বুক", যেমন শূদ্র স্ত্রীলোককে বেদাভ্যাস করিতে আমাদের দেশেও নিষেধ ছিল। তাহাদের জন্য রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত পদাবলী।

প্রত্যেক ক্যাথলিকের একখানা উপাসনা পুস্তিকা অতি অবশ্য থাকে। গ্রামের

বুড়ী উপন্যাস পড়ে না, খবরের কাগজ পড়ে না, এমন কি চিঠিপত্র লিখিবার প্রয়োজনও তাহার হয় না। কিন্তু প্রতিদিন সে উপাসনা পুস্তিকা হইতে কিছু না কিছু পড়ে ও রবিবারে গীর্জায় বেশ খানিকটা অধ্যয়ন করে।

প্রোটেসট্যাণ্ট দেশগুলিতে বাইবেল পড়া হয়। এই উপাসনা পুস্তিকা ও বাইবেল ইউরোপের কোটি কোটি লোককে পুনরায় নিরক্ষর হইবার পথে জোড়াকাঁটা।

আমাদের উচিত রামায়ণ-মহাভারতের আরও সস্তা সংস্করণ প্রকাশ করা ও সম্ভব হইলে পাঠশালা-পাস করার সঙ্গে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর প্রত্যেক বালককে একখণ্ড রামায়ণ অথবা মহাভারত বিনামূল্যে দেওয়া। আমি কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারতের প্রতিই ইঙ্গিত করিতেছি।

কিন্তু প্রশ্ন, তাহাতে লাভ কি? ধর্মচর্চা (?) তো আমরা বিস্তর করিয়াছি, আর না হয় নাই করিলাম। তবে কি দেশের লোককে নিরক্ষরতা হইতে আটকাইবার অন্য কোন উপায় নাই, অথবা ধর্মপুস্তকের উপর আরও কিছু দেওয়া যায় না?

যায়। এবং সেই উদ্দেশ্যেই খবরের কাগজের শরণাপন্ন হইয়াছি। এই খবরের কাগজই তাহার উপায়।

রামায়ণ-মহাভারত সস্তায় অথবা বিনামূল্যে বিতরণ করিবার মত অর্থ কোন গৌরী সেনই দিতে রাজী হইবেন না। কিন্তু তিনদিনের বাসি খবরের কাগজ বিলাইয়া দিতে অনেকেই সম্মত হইবেন। আমাদের কল্পনাটি এইরূপ—প্রথমতঃ, বড় ও ছোট শহরে যুবক ও বালক লইয়া একটি প্রতিষ্ঠান করিতে হইবে। ইহাদের কাজ হইবে বাসি দৈনিক সাপ্তাহিক (ও পরে মাসিক) কাগজ জড়ো করা। পরে সেগুলি ডাকযোগে প্রতি পাঠশালায় পাঠানো। যে সব ছেলেরা পাঠশালা-পাস করিয়াছে, বিশেষ তাহাদেরই নিজের নামে দৈনিক ও সাপ্তাহিক পাঠাইতে হইবে। ইহাতে ডাকখরচা লাগিবে। উপস্থিত সে পয়সা তুলিতে হইবে, কিন্তু আমার বিশ্বাস অন্ধরা যে রকম বিনা ডাকখরচায় পড়িবার জিনিস পান, ঠিক সেই রকম যথারীতি আন্দোলন করিলে ও বিশেষতঃ যদি প্রথম দিকে পয়সা খরচ করিয়া কাগজ বিতরণ করিয়া সপ্রমাণ করা যায় যে, পরিকল্পনা বিশেষ প্রাথমিক কেন্দ্রে সফল হইয়াছে, তাহা হইলে ডাকখরচও লাগিবে না।

রোজই যে কাগজ পাঠাইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। প্রথম দিকে সপ্তাহে একবার অথবা দুইবার পাঠাইলেই চলিবে।

কিন্তু সংবাদপত্র ইহারা পড়িবে কি? এইখানেই আসল মুস্কিল। কাজেই—

দ্বিতীয়তঃ, পাঠশালার শেষ শ্রেণীতে ছেলেদের পত্রিকা পাঠ শিখাইতে হইবে। গোড়ার দিকে শিক্ষক তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া ছেলেদের জন্য যে সব লেখা বাহির হয়, তাহা পড়াইবেন। পরে নানারকম দেশী খবর, খেলার বর্ণনা, জিনিসপত্রের বাজার দর, আইন-আদালতের চাঞ্চল্যকর মামলা, সাহিত্যিক প্রবন্ধ, যুদ্ধের খবর, সম্পাদকীয়, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাঁহারা নৈশ ইস্কুল চালান প্রথম দিকে তাঁহারা এই প্রচেষ্টা করিলে ভাল হয় পরে—

তৃতীয়তঃ, গুরু ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষকদের শিখাইতে হইবে কি করিয়া খবরের কাগজ পড়িতে ও পড়াইতে হয়। ইহার জন্যও আন্দোলনের প্রয়োজন হইবে।

আমি অতি সংক্ষেপে খসড়াটি নিবেদন করিলাম। আমার বিশ্বাস, খবরের কাগজ পড়বার সখ সৃষ্টি করা কঠিন কাজ নহে। আর কিছুটা সুখ পাইলেই বালক সপ্তাহে দুইবার দুইখানা কাগজ স্বনামে পাইবার গর্বে নিশ্চয় পড়িবে।

আমাদের সবচেয়ে বড় লাভ হইবে যে, গণ আন্দোলনের জন্য আমরা গ্রামবাসীকে প্রস্তুত করিতে পারিব।

পরিকল্পনাটির স্বপক্ষে বিপক্ষে নানা যুক্তিতর্ক আমরা অনেকদিন যাবৎ ভাবিয়াছি ও আমি নিজে বাড়ীর চাকরদের কাগজ পড়িতে শিখাইবার চেষ্টা করিয়া সফল হইয়াছি। পাঠকবর্গ এ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করিলে পরিকল্পনাটি আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে পারিব।

২

বিপদ এই যে, চতুর্দিক হইতে রাশি রাশি খবর রোজ খবরের কাগজের আপিসে উপস্থিত হইতেছে, অথচ কাগজের অনটন। অর্থাৎ খবর আছে, কাগজ নাই। কাজেই খবর-কাগজ সমাসটি সিদ্ধ হয় কি প্রকারে? এদিকে আবার দেশহিতৈষীরা নিরক্ষরতা দূর করিবার অন্যান্য উপায় জানিতে চাহিতেছেন। বিষয়টি গভীর—আলোচনার দিক দিয়া দেখিতে গেলে ত্রৈমাসিকের উপযুক্ত; অথচ খবরের কাগজের ভিতর দিয়া হাজার হাজার লোককে সমস্যাটি না জানাইলে প্রতিকারের সম্ভাবনাও নাই।

পণ্ডিতেরা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, চীন যে জনসাধারণের শিক্ষাপ্রসার ব্যাপারে এত পশ্চাৎপদ তাহার প্রধান কারণ চীনভাষার কাঠিন্য। সে ভাষায় বর্ণমালা নাই। প্রত্যেকটি শব্দ একটি বর্ণ। শব্দটি যদি না জানা থাকে তবে উচ্চারণ পর্যন্ত করিবার উপায় নাই; কারণ উচ্চারণ তো করি বর্ণে বর্ণ জুড়িয়া।

প্রত্যেকটি শব্দই যখন বর্ণ তখন হাজার হাজার বর্ণ না শিখিয়া চীনা পড়িবার বা লিখিবার উপায় নাই। ৪৭টি স্বরব্যঞ্জন শিখিতে ও শিখাইতে গিয়া আমরা হিমসিম খাইয়া যাই। চীনা সাক্ষররা কি করিয়া হাজার হাজার ও পণ্ডিতেরা কি করিয়া লক্ষ লক্ষ বর্ণ শিখেন সে এক সমস্যার বিষয়। শুনিয়াছি চৌদ্দ বছরের বাঙালী ছেলে যে পরিমাণ বাঙলা জানে ততটুকু চীনা শিখিতে গিয়া নাকি সাধারণ চৈনিকের বয়স ত্রিশে গিয়া দাঁড়ায়। শুধু একটি কথা নিশ্চয়তার সঙ্গে উল্লেখ করিতে পারি। পুনা ফার্গুসন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত বাসুদেব গোখলে (বিখ্যাত গোখলের আত্মীয়) শান্তিনিকেতনে ১৯২৪ সালে চীনা শিখতে আরম্ভ করেন; পরে জর্মনীতে ডক্টরেট পান। ভদ্রলোক এখনও চীনা ভাষার অক্টোপাস-পাশ হইতে বাহির হইতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে তাঁহার সতীর্থরা ফরাসী, জর্মন, ইতালিয়ন নানা ভাষা শিখিয়া বসিয়াছেন। শ্রীযুত গোখলের পাণ্ডিত্যে সন্দেহ করিবার কারণ অবশ্য নাই; চীনা ছাত্র এদেশে আসিয়া তাঁহাকে গুরু স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট চীনা বৌদ্ধশাস্ত্র পালিশাস্ত্রের সঙ্গে মিলাইয়া পড়িতে শিখে।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, নূতন বর্ণমালা না চালাইলে চীনের জনসাধারণ কখনও সাক্ষর হইতে পারিবে না। জাপানীদের বর্ণমালা আছে।

বাঙলা বর্ণমালা সংস্কৃত নিয়মে চলে বলিয়া তাহার শ্রেণী বিভাগ সরল ও যুক্তিযুক্ত। ইংরাজী ও অন্যান্য সেমিটিক বর্ণমালার সঙ্গে তুলনা করিলেই তথ্যটি স্পষ্ট হইবে। কিন্তু, এইখানেই সমস্যার জগদ্দল 'কিন্তু' উপস্থিত—লেখা ও পড়ার সময় বাঙলা বর্ণমালা যে কি অপূর্ব কাঠিন্য সৃষ্টি করে তাহা আমরা ভাবিয়াও দেখি না। দুইটি 'ই'কার কেন, দুইটি 'উ'কার কেন—উচ্চারণে যখন কোন প্রভেদ নাই তখন মনে রাখি কি করিয়া, 'কই' যখন লেখা যায় তখন 'কৈ'র কি প্রয়োজন? 'বউ' যখন লেখা যায় তখন 'বৌ'কে বরণ করিবার কি দরকার? 'গিআ', 'গিএ'র পরিবর্তে কেন 'গিয়া' 'গিয়ে'? এই সব প্রশ্ন শিশুমনকে বিক্ষুব্ধ করে ও সে সমস্ত ব্যাপারটার কোন হদিস পায় না—কারণ সংস্কৃতে তার হদিস আছে, বাঙলা লিখন-পঠনে নাই। দ্বিতীয়ত অযৌক্তিকতা; 'কা' লিখিতে 'আ'কার জুড়ি পশ্চাতে, কিন্তু 'ই'কার জুড়ি অগ্রভাগে, আর 'ঈ'কার জুড়ি পশ্চাতে, দুইটি 'উ'কার জুড়ি নীচে। সর্বাপেক্ষা মারাত্মক 'ও'কার ও 'ঔ'কার। প্রথম 'ে' লাগাই, তারপর লাগাই 'া'। ছোট ছেলেকে নিশ্চয়ই পড়িতে শুনিয়াছেন 'ঘ' একারে ঘে; উহুঁ ঘ আকারে আ, উহুঁ ঘে? ঘা? তখন তাহার মনে পড়ে 'ও'কারের কথা; বলে 'ঘো'—'ঘোড়া'। 'ঔ'কার তো

আরো চমৎকার। 'আ'কার 'ই'কার 'উ'কার, 'ঋ'কার সব কয়টি হয় আগে, নয় পশ্চাতে লাগাইলে যে কি আপত্তি ছিল, তাহা আমি বহু গবেষণা করিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। শিশুর পক্ষে সরল হইত, বয়স্ককে পুনর্নিরক্ষরতা হইতে রক্ষা করিত। ইংরাজিতে ব্যাপারটা কানুনমাফিক ও সরল।

তবুও শিশুরা সাধারণতঃ সামলাইয়া লয়, কিন্তু যুক্তাক্ষরে আসিয়া তাহাদের বানচাল হয়।

আমার সবইনসপেকটর বন্ধুটি বলিয়াছেন যে, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় কৈবর্ত জেলের ছেলে বেশীর ভাগ পাঠশালা পালায় যুক্তাক্ষরের যুগে, দ্বিতীয় ভাগ পড়িবার সময়। যুক্তাক্ষর হইয়াছিল সংস্কৃত বানানের অনুসরণে। নিয়ম এই, কোনো ব্যঞ্জন যদি একা দাঁড়ায় তবে ধরিয়া লইতে হইবে তাহার সঙ্গে 'অ' স্বর যুক্ত আছে। তাই 'কর-ভ'তে তিনটি 'অ' যোগ দিয়া পড়ি। কিন্তু যদি কোনো ব্যঞ্জন স্বরের সাহায্য ছাড়া দাঁড়াইতে চাহে, তবে তাহাকে পরের ব্যঞ্জনের সঙ্গে জুড়িয়া দিতে হইবে—অন্যথায় পূর্ব নিয়মানুসারে 'অ'কার লাগিয়া যাইবে। তাই 'সন্তপ্ত' বলিতে তাহার 'ন' আধা অর্থাৎ হসন্ত, 'প' আধা অর্থাৎ হসন্ত। উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু বিপদ এই যে, যুক্তাক্ষর হওয়া মাত্রই অনেকেই এমন চেহারা বদলায় যে, তাহাদিগকে চিনে তখন কার সাধ্য—লাইনো টাইপের অর্থাৎ 'আনন্দবাজারে'র ছাপার কথা হইতেছে না, প্রচলিত ছাপা ও লেখার কথাই বলিতেছি। দ্বিতীয় বিপদ, এই আইন সংস্কৃতে অতি প্রাঞ্জলভাবে চলে বটে, বাঙলায় চলে না। লিখিতেছি 'রামকে' অর্থাৎ রা+ম+অ+কে অর্থাৎ 'রামোকে' (কারণ ব্যঞ্জন একা দাঁড়াইলে 'অ' বর্ণ যুক্ত হইবে—'অ' ছাপায় আলাদা বুঝাইবার উপায় নাই বলিয়া ও' কার ব্যবহার করিয়াছি), অথচ পড়িতেছি এমনভাবে যে 'ম' ও 'ক' যুক্তাক্ষরে লেখা উচিত; যথা 'রাম্‌কে'। 'সরব না'র যে উচ্চারণ করি তাহাতে তো লেখা উচিত 'সর্ব না'; 'যাক সে'র যে উচ্চারণ করি তাহাতে লেখা উচিত 'যাক্ষে' অথবা 'যাক্সে'। 'কখন জাগলি' = 'কখন জাগ্লি'; 'কাঁপলেই' = 'কাঁপ্লেই' ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু সবাপেক্ষা মারাত্মক ব্যাপার এই যে, লিখিতেছি 'সূক্ষ্ম', বলিতেছি 'শুকখ্ম'; লিখিতেছি 'আত্মা' বলিতেছি 'আত্তা'; লিখিতেছি 'ঊর্দ্ধ', বলিতেছি 'ঊর্দো' বা 'ঊর্ধো'—'দ' 'ব' অথবা 'ধ' 'ব' বৃথাই লেখা হইতেছে। শিশু যখন পড়ে স+উ+ক+ষ+ম, সে উচ্চারণ করিতে চাহে—শুদ্ধ সংস্কৃতে যে রকম করা হয় —সুকষম। কিন্তু বেচারাকে চোখের জলে নাকের জলে 'শুদ্ধ' উচ্চারণ শিখিতে হয়। সংস্কৃতে যাহা যুক্তিযুক্ত, বাঙলাতে তাহা খামখেয়ালি।

তাই দেখা গিয়াছে, দ্বিতীয় ভাগ হইতে বেশীর ভাগ ছেলে যুক্তাক্ষরের ধাক্কা সহিতে না পারিয়া অক্কা পায়। তাই দেখা গিয়াছে, বয়স্ক সাক্ষর বহুদিন লেখাপড়া চর্চা না করিয়া যদি পুনরায় পড়িতে বা লিখিতে যায়, তখন সেই এককালীন সাক্ষর টক্কর খায় যুক্তাক্ষরে।

আমাদের লিখন ও উচ্চারণের বৈষম্য এত বিকট যে, ইহাই নিরক্ষরতা ও সাক্ষরের নিরক্ষরতায় পুনরায় ফিরিয়া যাওয়ার দ্বিতীয় প্রধান কারণ।

কিন্তু উপায় কি?

অদ্যকার লেখা শেষ করিবার পূর্বে একটি কথা না বলিয়া শান্তি পাইতেছি না। যখন গড়িমসী করিতেছিলাম, এ বিষয় লইয়া আর আলোচনা করিব কি না, তখন হঠাৎ দেখি সোমবারের 'আনন্দমেলা'য় একটি বালক—বালক মাত্র—বলিতেছে যে, সে 'নিরক্ষরকে সাক্ষর করা' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছে।

ভগবানকে অজস্র ধন্যবাদ, আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে। বালকটিকে আমার আশীর্বাদ, সে আমাকে মনের জোর দিয়াছে।

৩

গত আগস্ট* মাসে উপর্যুক্ত শিরোনামায় দুইটি রচনা নিবেদন করিয়াছিলাম। সত্যপীরের বয়স তখন অতি অল্প; তাহার বালসুলভ চপলতা কেহই লক্ষ্য করিবে না, এই ভরসায় উপযুক্ত বিষয় লইয়া তখন অত্যধিক বাক্যাড়ম্বর করি নাই। কিন্তু বাংলা দেশে সহৃদয় পাঠকের অভাব নাই। তাঁহারা লেখা দুইটি পড়িয়া এযাবৎ অধমকে বহু পত্রাঘাত করিয়াছেন। তুলসীদাসের চৌপদীটি মনে পড়িল :—

জো বালক কহে তোতরী বাতা
সুনত মুদিত নেন পিতু অরু মাতা
হসিহহি কুর কুটিল কুবিচারী
জো পরদোষভূষণধারী

"বালক যখন আধ আধ কথা বলে, তখন পিতা এবং মাতা মুদ্রিত নয়নে (সন্তোষ সহকারে) সে বাক্য শ্রবণ করেন, কিন্তু ক্রূরকুটিল কুবিচারীরা শুনিয়া হাসে—তাহারা তো পরদোষ ভূষণধারী"।

---

* ১৯৪৬-এর আগস্ট মাস।

(তুলসীজীর রামায়ণখানা হাতের কাছে নাই; সদাশয় সরকারের ন্যায় দুর্ভিক্ষের সময় সঞ্চিত পচা চাউল অর্থাৎ আমার ক্ষীণ স্মৃতিভাণ্ডার হইতে চৌপদীটি ছাড়িলাম—হাজরা লেনের শ্রীমতী—ঘোষের সহযোগের উপর নির্ভর করিয়া)।

সহৃদয় পাঠকেরা 'মুদিত নেন' শুনিয়া এখন মুক্তকণ্ঠে আমাকে বহুতর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

আমি বলিয়াছিলাম ;—

প্রথমতঃ বড় ও ছোট শহরের যুবক ও বালক লইয়া একটি প্রতিষ্ঠান করিতে হইবে। ইহাদের কাজ হইবে বাসি দৈনিক, সাপ্তাহিক (ও পরে) মাসিক কাগজ জড়ো করা। পরে সেগুলি ডাকযোগে প্রতি পাঠশালায় পাঠানো। যে সব ছেলেরা পাঠশালা পাস করিয়াছে, বিশেষ করিয়া তাহাদেই নিজের নামে দৈনিক ও সাপ্তাহিক পাঠাইতে হইবে। ইহাতে ডাক-খরচা লাগিবে। উপস্থিত সে-পয়সা তুলিতে হইবে কিন্তু আমার বিশ্বাস, অন্ধেরা যে রকম বিনা ডাক-খরচায় পড়িবার জিনিস পান, ঠিক সেই রকমই—যথারীতি আন্দোলন করিলে, ও বিশেষতঃ যদি প্রথম দিকে পয়সা খরচ করিয়া কাগজ বিতরণ করিয়া সপ্রমাণ করা যায় যে, পরিকল্পনাটি বিশেষ প্রাথমিক কেন্দ্রে সফল হইয়াছে—ডাক-খরচাও লাগিবে না।

দ্বিতীয়তঃ, পাঠশালার শেষ শ্রেণীতে ছেলেদিগকে পত্রিকা পাঠ শিখাইতে হইবে। গোড়ার দিকে শিক্ষক তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া ছেলেদের জন্য যে-সব লেখা বাহির হয় ('আনন্দমেলা' জাতীয়) তাহা পড়াইবেন। পরে নানা রকম দেশী খবর ইত্যাদি ইত্যাদি।

খবরের কাগজের মাধুকরী করা ও তৎপর বণ্টনকর্ম সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা কেহ কেহ চাহিয়াছেন।

প্রথমেই নিবেদন করি যে, এই প্রকার সম্পূর্ণ নবীন প্রচেষ্টা আরম্ভ করিবার পূর্বে আটঘাট বাঁধিয়া ফুলপ্রুফ কোন স্কীম বা প্ল্যান করা ঠিক হইবে না। শহর ও গ্রামের বাতাবরণ বিভিন্ন, কাজেই একই প্ল্যান দুই জায়গায় বলবৎ হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রথম প্রচেষ্টা ডিনেমিক, চলিষ্ণু বা প্রাণবন্ত হইবে অর্থাৎ কাজ করিতে করিতে ভুলত্রুটি সংশোধন করিয়া, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া, উনিশ-বিশ ফেরফার করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সহৃদয় পাঠক যদি কিছু মনে না করেন, তবে বলি যে, আমাদের দেশে সর্বপ্রচেষ্টায় আমরা বিলাতি ফিটফাট তৈয়ারী মডেল খুঁজিয়া তাহার অনুকরণ চেষ্টা করি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের ট্রেন-জাহাজ,

আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন, আমাদের নৃত্যগীতের পুনরুজ্জীবন-প্রচেষ্টা ইস্তেক জাতীয় সংগীত শুনিবার সময় দণ্ডায়মান হওয়া সর্বত্রই অনুকরণ-প্রচেষ্টা, মডেল খোঁজা—বাতাবরণের সঙ্গে মিলাইয়া দেশের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া চলিষ্ণু ক্রমবর্ধমান শিশু-প্রচেষ্টাকে বলিষ্ণু করিতে শিখি না। আমাকে দোষ দিবেন না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের কি রকম অন্ধানুকরণ করে, তাহা দর্শাইয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই মর্মে অনেকগুলি মর্মন্তুদ সত্য বলিয়াছিলেন।

আমার মনে হয়, উপর্যুক্ত বাক্যটি স্মরণ রাখিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করা প্রশস্ত।

প্রথমতঃ, কর্মী যুবকগণ মিলিত হইবেন ও কে কে বাসি কাগজ দিতে সম্মত হইবেন তাহার ফর্দ প্রস্তুত করিয়া যে খবরের কাগজ সরবরাহ করে তাহারই দ্বারা তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া কাগজ জমায়েত করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, স্কুল সব-ইনস্পেক্টর মহোদয়কে আক্রমণ করা। অতি সবিনয়ে তাঁহার সম্মুখে প্ল্যানটি উপস্থিত করিতে হইবে—অতি সবিনয় অতি সভয়। তিনি সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলে অর্ধেক কেল্লা ফতেহ। তাঁহার সহযোগিতায় যে যে পাঠশালায় প্রধান শিক্ষক শুধু বেতন কমাইয়াই (সে কত অল্প আমি জানি, কাজেই ব্যঙ্গ করিতেছি না) সন্তুষ্ট নহেন তাহার ফর্দ করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া শহরে একটি সভা করিয়া বিষয়টি আলোচনা করিতে হইবে।

তখন যে কর্মপদ্ধতি স্থির করা হইবে তাহাতে যত ভুলচুকই থাকুক তাহাই ঠিক। অধমের পদ্ধতির প্রতি তখন যেন কোনো অহেতুক করুণা না দেখানো হয়।

সন্তর্পণে 'ঝোপ দেখিয়া কোপ' মারিতে হইবে, অর্থাৎ তীক্ষ্ণ ট্যাক্ট সহযোগে মাস্টার মহাশয়দের সদয় সহযোগ না পাইলে সব গুড় মাটি হইয়া যাইবে।

যদি সব-ইন্‌স্পেক্টর মহোদয়ের সাহায্য না পাওয়া যায়, তবে বোর্ডের চেয়ার-ভাইস-চেয়ারম্যান তদভাবে কোনো মুরুব্বী মেম্বরের সাহায্য লইয়া কাজ করা যাইতে পারে; কিন্তু আমি নিজে সব-ইন্‌স্পেক্টর মহোদয়গণের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা রাখি। যে সব-ইন্‌স্পেক্টর মহোদয়কে স্মরণ করিয়া প্রথম প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, এ বিষয়ে আপ্রাণ সাহায্য করিবেন ও আমার অন্ধ বিশ্বাস, তাঁহার মত জীবন্ত কর্মী বাঙলা দেশে আরও আছেন।

কাহারো সাহায্য না পাইলেও কাজ আরম্ভ করা যায় শুদ্ধ গুরুমহাশয়কে

যদি দলে টানা সম্ভবপর হয়। তিনি রাজী হইলে বাকী সব কিছুই সরল।

যাঁহারা নৈশ বিদ্যালয় চালান তাঁহাদের পক্ষে কর্মটি তো সরলই।

এতটা কাজ আগাইলে পর কর্মীরা যদি আমাকে পত্র লিখিয়া সুবিধা অসুবিধার কথা জানান, তবে আমি তাঁহাদিগকে সোজা উত্তর দিব ও সম্ভব হইলে দুর্বল শরীর সত্ত্বেও সরজমিনে উপস্থিত হইয়া যেটুকু সামান্য সাহায্য সম্ভব তাহা নিবেদন করিব।

কি পড়াইতে হইবে, কোন্ কায়দা পড়াইতে হইবে, সে আলোচনা বারান্তরে করিব। ইতোমধ্যে এই শীতকালই কাজ আরম্ভ করার পক্ষে প্রশস্ত।

সর্বশেষে আমাদের কাগজের 'আনন্দমেলা' হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

"কামাখ্যাচরণ ভট্টাচার্য (১৪৪১৬) দর্শনা মণিমেলা, নদীয়া—গত ১৭ই অগস্টের আনন্দবাজারে 'সত্যপীরে'র লেখা নিরক্ষরদের অক্ষর পরিচয় করানোর যে প্রবন্ধ বেরিয়েছিল—তা তুমি পড়েছ জেনে খুশী হলাম। 'মণিমেলা'র অন্যান্য বন্ধুরা ঐ লেখাটি পড়ে এদেশের নিরক্ষরতা দূর করবার সহজ কতকগুলি পন্থা ধরে কাজ করার চেষ্টা করবে, এ বিশ্বাস আমি রাখি।"

বালক কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িল, তবে আমরা অতশত দুর্ভাবনা করি কেন।

উচ্চারণ

প্রবাদ আছে, বঙ্গদেশে সংস্কৃত উচ্চারণ এককালে এমনই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, মহারাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ (কেহ কেহ বলেন ক্ষিতীশ, মেধাতিথি) ইত্যাদি পাঁচজন ব্রাহ্মণকে এদেশে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করেন। তাঁহারা এদেশের লোককে শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ কতটা শিখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন জানিবার উপায় নাই। ইহার পর আমাদের জানামতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এদেশে আবার সেই চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

ইতিমধ্যে শত শত বৎসর ধরিয়া বহু বাঙালী বিদ্যার্থী কাশীতে সংস্কৃত শিখিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের উচ্চারণও এদেশে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। এমন কি কাশী প্রত্যাবৃত্ত কোনো কোনো বাঙালী পণ্ডিতকে আমরা খাঁটি বাংলা উচ্চারণে সংস্কৃত পড়িতে শুনিয়াছি। সন্দেহ হইতেছে খাস কাশীতেও বাঙালী চালিত টোলে বাংলা কায়দায় সংস্কৃত উচ্চারণ শিখানো হয়।

বাংলা কায়দায় সংস্কৃত উচ্চারণ ব্যাপারটা যে কতদূর মারাত্মক তাহা একটি সামান্য উদাহরণ হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে

ইতালির খ্যাতনামা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক তুচ্চি কলিকাতার তৎকালীন এক বিখ্যাত পণ্ডিতের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করিতেছিলেন। কথায় কথায় পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের নাম উচ্চারণ করেন। বাঙালী যে কায়দায় করে, সেই কায়দায়ই করিলেন, অনেকটা 'জাগেগাঁবোল্কোর' ন্যায়। তুচ্চি তো কিছুতেই বুঝিতে পারেন না কাহার কথা হইতেছে। পণ্ডিতের চক্ষুস্থির যে তুচ্চির মত লোক যাজ্ঞবল্ক্যের নাম শোনেন নাই। তুচ্চি প্রত্যাশা করিতেছেন যাজ্ঞবল্ক্যের শুদ্ধ উচ্চারণ. অনেকটা Yajnyavalkya-র ন্যায়, শুনিতেছেন Jaggonbolko, বুঝিবেন কি প্রকারে যে একই ব্যক্তি!

বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণ এতই কর্ণপীড়াদায়ক যে, আমাদের পরিচিত দুইটি পশ্চিম-ভারতীয় ছাত্রকে বাধ্য হইয়া কলিকাতা কলেজে সংস্কৃত অধ্যয়ন ত্যাগ করিতে হইল। 'পরশুরামে'র 'গণ্ডেরীজী' মেঘনাদবধকাব্য উচ্চারণ করিলে আমাদের কর্ণে যে পীড়ার সঞ্চার হইবে, আমাদের সংস্কৃত উচ্চারণ পশ্চিম ও উত্তর ভারতীয়দের সেই রকমই পীড়া দেয়।

বাঙালী সংস্কৃত ব্যঞ্জনের ঞ, ণ, ষ, অন্তস্থ ব, ষ, স উচ্চারণ করিতে পারে না ও যুক্তাক্ষরের (আত্মা, যক্ষ ইত্যাদি) উচ্চারণে অনেকগুলি ভুল করে। স্বরবর্ণের অ, ঐ, ঔ ভুল উচ্চারণ করে ও সর্বাপেক্ষা মারাত্মক এই যে স্বরের উচ্চারণে দীর্ঘস্বরের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না। তাহাতে বিশেষ করিয়া 'মন্দাক্রান্তা' পড়িলে মনে হয় ভগবানের অপার করুণা যে, কালিদাস জীবিত নাই।

বাঙালী যখন আরবী উচ্চারণ করে, তখন এই মারাত্মক অবস্থার পুনরাবৃত্তি হয়। বাঙালী (কি হিন্দু কি মুসলমান) আরবী বর্ণমালার সে, হে, জাল, স্বাদ, দ্বাদ, ত্বয়, জয়, আইন, গাইন, কাফ, হামজা, অর্থাৎ বর্ণমালার ৪, ৬, ৯, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২১ ও ২৯ ভুল উচ্চারণ করে ও সংস্কৃতে হ্রস্ব দীর্ঘ যেমন অবহেলা করিত, সেই রকমই আরবীতেও স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘের কোন পার্থক্য করে না। কিন্তু শুধু কোরান পাঠের জন্য এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ আছেন। তাঁহাদিগকে 'কারী' বলে; দ্রাবিড়ে যেমন সামবেদ গাহিবার জন্য এক শ্রেণীর বিশেষ আইয়ার—আয়ঙ্গার ব্রাহ্মণ আছেন। বাঙালী কারীরা দীর্ঘ-হ্রস্ব মানেন ও ব্যঞ্জনে শুধু ৪, ৯, ১৫-তে ভুল করেন।

আমরা সংস্কৃত উচ্চারণে ভুল করি তাহার প্রধান কারণ, আমরা আর্য-সভ্যতার শেষ সীমা-প্রান্তে বাস করি। (আর্য-সভ্যতা বাংলা ছাড়াইয়া বর্মায় যাইতে পারে নাই ও বালী জাভায় বিকশিত হইল বটে, কিন্তু প্রাণধারণ করিতে পারিল না)। আমাদের ধমনীতে আর্য-রক্ত অতি কম বলিয়াই আর্য উচ্চারণ

করিতে অক্ষম হই। আমরা যে আরবী উচ্চারণ করিতে পারি না, তাহাও ঠিক সেই কারণেই। আরবী সেমিতি ভাষা, তাহার যে সব কঠিন উচ্চারণ মুখের নানা গোপন কোণ হইতে বহির্গত হয়, তাহা বাল্যকাল হইতে না শুনিলে আয়ত্ত করা প্রায় অসম্ভব।

গত শুক্রবারে রেডিয়োতে কুরান পাঠ ও শনিবারে সংস্কৃত শাস্ত্র পাঠ ও উভয়ের বাঙলা অনুবাদ ও টিপ্পনী শুনিয়া উপরোল্লিখিত চিন্তাধারা মনের ভিতর তরঙ্গ খেলিয়া গেল। রেডিয়োর কুরান পাঠ মুসলমানদের কাছে আদর পাইয়াছে কিনা জানি না, কিন্তু তাঁহারা যে কান দিয়া শুনেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এক বৃহৎ মুসলমান পরিবারে লক্ষ্য করিয়াছি, বুড়া কর্তারা রেডিয়োটা দুই চক্ষে দেখিতে পারেন না, দুই কানে শুনিতে পারেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস ইসলামে সংগীত অসিদ্ধ ও ঐ যন্ত্রটি সেই সব শয়তানী জিনিস লইয়া কারবার করে, ছোকরাদের বিগড়াইয়া দেয়। অথচ শুক্রবার সকালবেলা দেখি গুড়িগুড়ি রেডিয়োঘরের দিকে চলিয়াছেন তাবৎ বুড়া-বুড়ীরা। আধ ঘণ্টা পূর্ব হইতে কলিকাতা ছাড়া অন্য কোন বেতারকেন্দ্রে রেডিয়ো জুড়িবার উপায় নাই। তারপর মুদ্রিত চক্ষে ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হৃদয়ে অতি নীরবে কোরান পাঠ শ্রবণ করেন। অনুবাদ ও টিপ্পনী কেহ শোনেন, কেহ শোনেন না।

এই সব বৃদ্ধ-বৃদ্ধার প্রতি কলিকাতা কেন্দ্রের কর্তব্য আছে।

যে-কারী সাহেব কুরান পাঠ করিলেন, তাঁহার উচ্চারণ সাধারণ বাঙালী কারী অপেক্ষা ভালো সন্দেহ নাই। তাঁহার দীর্ঘ হ্রস্ব দুরস্ত, তাঁহার 'আইন কাফ হে' ঠিক, কিন্তু তাঁর 'সে' 'জাল' ও 'দ্বাদ' (৭, ৯, ১৫) বারে বারে দুঃখ দেয়, বিশেষ করিয়া 'সে' ও 'জাল', কারণ 'ইজা' (যখন) ও 'সুম্মা' (তৎপর) দুইটি কথা আরবীতে এবং সর্বভাষাতেই ঘন ঘন আসে।

কারী সাহেবের বাঙলা উচ্চারণে আরবীর গন্ধ পাওয়া যায়—পাদ্রী-সাহেবের বাঙলাতে যে রকম ইংরিজি গন্ধ আমাদিগকে পীড়িত করে আমরা বাঙলায় বলি 'যখন' (যখোন), কারী সাহেব বলেন 'য্যখ্যন' যেন 'য' ও 'খ'-র ভিতরে আরবী আকার বা জবর রহিয়াছে।

শাস্ত্র যিনি পাঠ করিলেন তাঁহার উচ্চারণ সাধারণ বাঙালী অপেক্ষা শতগুণে ভালো সন্দেহ নাই কিন্তু কোনো মারাঠী বা যুক্তপ্রদেশীয় পণ্ডিত সে উচ্চারণের প্রশংসা করিবেন না। তাহার প্রধান কারণ যে শাস্ত্র-পাঠকের হ্রস্ব-দীর্ঘ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রস্ব ও যথেষ্ট পরিমাণে দীর্ঘ নহে। হ্রস্ব দীর্ঘে তিনি এত সামান্য পৃথক করেন যে, যানান জানা সত্ত্বেও কানে ঠিকঠিক বাজে না। তাঁহার বাঙলা

উচ্চারণও পণ্ডিতী অনেকটা কথক-ঠাকুরদের মত।

দুইজনেরই অনুবাদ ও টীকা নৈরাশ্যজনক। প্রভু ইসা (খৃষ্ট) ও হাওয়ারি-গণের বর্ণনা বাঙলার মুসলমান কি প্রকারে বুঝিবে, তাহাকে যদি বেশ কিছুদিন ধরিয়া প্যালেস্টাইনের ইতিহাস ও ভূগোল না শোনানো হয়। সকলেই তো শূন্যে ঝুলিতে থাকিবেন ও শাস্ত্র শোনা হইবে বটে, কিন্তু বোঝা বা আলোচনা তো হইবে না।

শাস্ত্র-পাঠক যে উর্ধ্বশ্বাসে অনুবাদ ও টীকা করিয়া গেলেন তাহাতে আমার মত মূর্খ কিছুই বুঝিতে পারিল না। টোলে কৃতবিদ্য ছাত্রকে যে ধরনে দ্রুত-গতিতে টীকা শোনানো হয়, ইহার অনেকটা তাই। সাধারণ বাঙালী ধর্মতৃষিতকে আরো সরল, আরো সহজ করিয়া না বুঝাইলে টীকাদান পণ্ডশ্রম হইবে।

কারী সাহেব ও শাস্ত্রী মহাশয়ের নিন্দা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে ; আমরা জানি তাঁহারা যে কোনো মসজিদ-মাদ্রাসা, যে কোন টোল-চতুষ্পাঠীতে সম্মান ও আদর পাইবেন—আমরাও দিব। কিন্তু অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর উচিত আরো ভালো আরো উত্তম, এক কথায় সর্বোত্তম কারী সর্বোত্তম শাস্ত্র পাঠক আনয়ন করা। ইংরাজিতে বলে, 'সর্বোত্তম উত্তমের শত্রু'।

তাবৎ বাঙলা ও কিছু কিছু বিহার উড়িষ্যা আসামকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ যে উচ্চারণ পরিবেশন করা হয় তাহার জন্য রেডিয়ো কর্তাব দায়িত্বজ্ঞান ও বিবেকবুদ্ধি অনেক বেশী হওয়া উচিত ও তাঁহাদিগের অনেক পরিশ্রম করিয়া সর্বোত্তম কারী-শাস্ত্রী সন্ধান করা উচিত। অথবা অর্থব্যয় করিয়া উপযুক্ত লোক প্রস্তুত করা উচিত।

শুনিয়াছি মিশরের কারী রেফাৎ রমজান মাসে কুরান পাঠের জন্য ১৩০০ টাকা পারিশ্রমিক পান ; কাইরো কলিকাতা অপেক্ষা ধর্মপ্রাণ একথা কে বলিবে ?

সর্বশেষে বক্তব্য, পাঠক যেন না ভাবেন, মন্দ উচ্চারণে আমরাই একা। আর্যসভ্যতার অন্য প্রান্ত অর্থাৎ ইংলণ্ডের অবস্থাও তাই। সেখানে বড় বড় পণ্ডিতদের লাতিন উচ্চারণ শুনিলে কানে আঙ্গুল দিতে হয়। তবে ইংলণ্ডে উচ্চারণ শুদ্ধ করিবার জন্য জোর আন্দোলন চলিতেছে, এদেশে—থাক্ সে কথা।

২

উচ্চারণ সম্বন্ধে আলোচনায় যোগ দিয়াছেন শ্রীযুত—মুখোপাধ্যায়, কাব্য-ব্যাকরণস্মৃতিতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, ভূতপূর্ব অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ। পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন, এহেন পণ্ডিতের সঙ্গে উচ্চারণ সম্বন্ধে আমি আলোচনা

করিতে পারি, কিন্তু তর্ক করিবার মত যুগ্ম মস্তক স্কন্ধে নাই। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শাস্ত্রী মহাশয়ের শেষ বাক্য আমাদের মতের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে বলিয়া তর্কাতর্কির বিশেষ প্রয়োজন হইবে না। তাঁহার শেষ বাক্য "সকল কথার পর তবুও স্বীকার্য যে, বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণ ত্রুটিপূর্ণ", কিন্তু তাহার পূর্বে 'সকল কথার' মাঝখানে শাস্ত্রী মহাশয় এমন কথাও তুলিয়াছেন যেখানে অধম কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিবে। শাস্ত্রী মহাশয় (এবং অন্যান্য সহৃদয় পত্র-প্রেরকও দর্শাইয়াছেন যে, অবাঙালী সংস্কৃত পণ্ডিত 'ষ' ও 'খ' তে পার্থক্য রাখেন না। কিন্তু তাহা হইতে কি সপ্রমাণ হয় ঠিক পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া বলেন নাই। ব্যঞ্জনায় বুঝিতেছি শাস্ত্রী মহাশয়ের বলার উদ্দেশ্য যে, যেহেতুক অবাঙালী পণ্ডিতও ঠিক ঠিক উচ্চারণ করিতে পারেন না, তবে বাঙালীরই বা দোষ কি?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, মারাঠী, দ্রাবিড় ও কাশীর পণ্ডিত যখন সংস্কৃত উচ্চারণ করেন, তখন প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যবশতঃ কিছু কিছু পার্থক্য তাঁহাদের উচ্চারণের মধ্যে থাকে। ঐ সব পণ্ডিতের একে অন্যের উচ্চারণে যে পার্থক্য তাহা যেন একইরঙের পৃথক পৃথক ফিকা ভাব অথবা গাঢ়। বাঙালীর উচ্চারণ যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন রঙ। দক্ষিণের আইয়ার হয়ত যতটা দীর্ঘ করিলেন, উত্তরে কাশীবাসী হয়ত ততটা করিলেন না। এবং শেষ পর্যন্ত বাঙালী যে অত্যন্ত পৃথক কিছু উচ্চারণ করে তাহা এই তথ্য হইতে সপ্রমাণ হয় যে আইয়ার, নম্বুদ্রী, চিতপাবন, দেশস্থ, করাঢ় (এমন কি মহারাষ্ট্রের 'দেশস্থ' ও ঔপনিবেশিক 'দ্রাবিড়স্থ'), উদীচী, ভার্গব, নাগর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়গণ ও তাঁহাদের শিষ্য অব্রাহ্মণগণও একে অন্যের উচ্চারণের পার্থক্য লইয়া ঈষৎ আলোচনা করিয়া একটি সাধারণ রূপ বা নর্ম (norm) স্বীকার করেন, কিন্তু বাঙালীর উচ্চারণ যে সম্পূর্ণ পৃথক এবং পরস্পর-বিরোধিতায় কণ্টকাকীর্ণ সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন না।

(ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে উচ্চারণের পার্থক্য হয় প্রধানতঃ দীর্ঘস্বরের দৈর্ঘ্য, হ্রস্বস্বরের হ্রস্বতা, 'ঋ', 'ঌ', ও 'ষ' লইয়া। সব কয়টির আলোচনা এক কলমে ধরাইবার মত কলমের জোর অধমের নাই। উপস্থিত 'ষ' লইয়া আলোচনা করিব, পরে প্রয়োজন হইলে অন্যান্যগুলির হইবে। 'ষ' যে 'খ' নয় সে বিষয়ে তর্ক করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু 'ষ'-এর উচ্চারণ কেন 'খ' হইল তাহার আলোচনা করিলে মূল 'ষ'-এর কিঞ্চিৎ নির্দেশ পাওয়া যায়। প্রথম দ্রষ্টব্য 'ষ' স্থলে বিদেশী পণ্ডিত যখন 'খ' বলেন, তখন তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত; কেহ কেহ উচ্চারণ করেন পরিষ্কার 'খ' অর্থাৎ 'ক' বর্গের মহাপ্রাণ 'খ' এবং কেহ কেহ উচ্চারণ করেন ঘর্ষণজাত আরবীর 'খ'—কাবুলীরা যে রকম 'খবর' বলে, স্কচরা

যে রকম 'লখ' 'LOCH' বলে, জর্মনরা যে রকম 'BACH' বলে। এই দ্বিতীয় 'খ' উচ্চারিত হয় পণ্ডিত যখন 'ষ'-কে 'শ' হইতে পৃথক করিবার জন্য অত্যধিক উৎকণ্ঠিত হইয়া জিহ্বা মূর্ধা হইতে সরাইয়া আরও পশ্চাৎ দিকে ঠেলেন। এই কারণেই আর্যভাষা পশতুতেও তাহা দেখা যায়—কেহ বলে 'পশতু', কেহ বলে 'পখতু', কেহ বলে 'পেশাওয়ার', কেহ বলে 'পেখাওয়ার'। এই কারণে জর্মনে Becher-এর 'ch' 'ষ'-এর মত, অথচ Bach-এর 'ch' আরবী 'খ'-এর ন্যায়। 'ষ'-কে এই জাতীয় 'খ' করা অবশ্য ভুল, আমি মাত্র কারণটি ও নজীরগুলি দেখাইলাম। কিন্তু 'ষ'-এর আসল শুদ্ধ উচ্চারণ সম্বন্ধে মতানৈক্য হওয়া অনুচিত। অত্যধিক উৎকণ্ঠিত (উভয়ার্থে) না হইয়া মুখগহ্বরের যে স্থল অর্থাৎ মূর্ধা হইতে ট, ঠ, ড, ঢ ও পরে ঐ স্থলেই 'ষ' বলিলে মূর্ধণ্য 'ষ' বাহির হইবে।)

বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণের কৈফিয়ৎ দিয়াছেন হিন্দুস্থান পার্ক হইতে শ্রীআচার্য। তাঁহার বক্তব্য "কোনও ভাষা আয়ত্ত করিতে হইলে তাহার সাহিত্য, ব্যাকরণ এবং ধ্বনিতত্ত্বে পারদর্শী হওয়া বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই"। আমাদের মতের সঙ্গে আচার্য মহাশয়ের মত মিলিল কিন্তু তিনি বলিতেছেন—

"কিন্তু জাতীয় অভ্যাসের প্রতিকূলতা নিবন্ধন যদি সেই ভাষার উচ্চারণে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়, তাহাতে কোনও পণ্ডিত ব্যক্তির লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ আছে বলিয়া মনে করি না।"

আচার্য মহাশয় তাঁহার চিঠিতে নিজের কোনও উপাধির উল্লেখ করেন নাই, অথচ পত্রখানি গভীর পাণ্ডিত্যে পূর্ণ। তাই প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইতেছি না, অথচ উপরের নীতিটি এতই বিপজ্জনক যে, নিতান্ত অনিচ্ছায় করিতেছি। কারণ যদি এই নীতিই অনুসরণ করিতে হয়, তবে বলিতে হইবে যেহেতু আমরা বাঙালী, আমাদের জাতীয় অভ্যাসের 'প্রতিকূল' হয় তাই আমরা F ও 'ফ'য়ের তফাৎ করিব না, th-এর শুদ্ধ উচ্চারণ শিখিব না, কুরান বঙ্গীয় ইসলামী কায়দায় পড়িব, মন্দাক্রান্তার হ্রস্বদীর্ঘ না মানিয়া উদয়াস্ত কালিদাসকে জবাই করিব। এই নীতি আরো অনুসরণ করিয়া বলিব, আমরা বাঙালী বাঙলা ভাষার লিঙ্গ নাই, সংস্কৃত লিখিবার সময় লিঙ্গভেদ করিব না, দ্বিবচন মানিব না; হিন্দী বলিবার সময় 'একঠো', 'দুইঠো' করিব, 'গাড়ী আতা হৈ' বলিব—এক কথায় 'জাতীয় অভ্যাসের' দোহাই দিয়া বিজাতীয় কোনও ভাষাই তাহার স্বরূপে গ্রহণ করিব না; সুকুমার রায়ের—হ য ব র ল-য়ের দর্জীর ৩২ ইঞ্চি ফিতা দিয়া মাপিলে যেমন সব কিছু ৩২ ইঞ্চি হইয়া যাইত। আমাদের 'জাতীয় অভ্যাসের' বকযন্ত্রে চোলাই করা সর্ব উচ্চারণ শুদ্ধ এল্‌কহল হইয়া বাহির হইবে তাহার বর্ণগন্ধ

থাকিবে না।

'লজ্জা' বা শ্লাঘার কথা হইতেছে না ; অভ্যাসটি বাঞ্ছনীয়। বেদমন্ত্র ঠিক কি প্রকারে উচ্চারিত হইত জানি না, কিন্তু চেষ্টা তো করিতে হইবে জানিবার জন্য। সেই চেষ্টাতেই তো পণ্ডিতে ও আমাদের মত সাধারণ লোকের তফাৎ। যুক্ত-প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মদ্র, গুর্জর পার্থক্য সত্ত্বেও একটি (norm) মানিয়া লইয়াছেন, নিরপেক্ষ ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণও সেটি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—তবে আমাদের কর্তব্য কি ?

আচার্য মহাশয় ভুল উচ্চারণ চাহেন না, কিন্তু তাঁহার মত পণ্ডিত যদি সে উচ্চারণের সপক্ষে এককাঁড়ি অজুহাত দেন, তবে আমাদের মত সরল লোক 'জাতীয় অভ্যাসের' তাকিয়ায় ঠেসান দিয়া আরামে নিদ্রা যাইব—এই আমার ভয়।

এস্থলে বলিয়া রাখা ভালো যে, যদিচ জাভার মুসলমান ও মক্কার মুসলমান এক রকম উচ্চারণে কুরান পড়েন না, তবু জাভার মুসলমান হামেশাল চেষ্টা করেন নর্মের (norm) দিকে অগ্রসর হইবার। পূর্ব বাঙলার মুসলমানদের আরবী উচ্চারণ খারাপ, কিন্তু জাতীয় অভ্যাসের বিরুদ্ধে জেহাদ হামেসা চালু রাখেন বলিয়া তাহাদের আরবী উচ্চারণ বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণ অপেক্ষা নর্মের (norm-এর) অনেক কাছে।

আচার্য মহাশয় দূরদৃষ্টি ও অভিজ্ঞতাজাত অন্যান্য মনোরম তথ্যও বলিয়াছেন। সেগুলি পণ্ডিত অপণ্ডিত সকলেরই জানা উচিত। সুবিধামত সেগুলি পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

অন্যান্য চিঠিও পাইয়াছি, লেখকদের ধন্যবাদ। এ মূর্খকে জ্ঞানদান করিবার জন্য তাঁহাদের প্রচেষ্টা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বার বার স্বীকার করি।

পরাজিত জর্মনী

জর্মনী হারিয়া গিয়াছে। দুঃস্বপ্ন কাটিয়াছে। সমর-নেতারা যুদ্ধের দুশ্চিন্তা ত্যাগ করিয়া আবার কুচকাওয়াজের সত্যযুগে ফিরিয়া যাইবার তালে পা ফেলিবার চেষ্টায় আছেন।

কিন্তু রাজনৈতিকদের দুশ্চিন্তার অবসান হইল না। বরঞ্চ এতদিন যে মাথা-ব্যথা শুদ্ধ সামরিক মাথাকে গরম করিয়া রাখিয়াছিল সে আজ রাজনৈতিকদের আহার ও নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাইতেছে। সমস্যাটা এই, পরাজিত জর্মনীকে লইয়া কি করা যায়।

১৯১৮ সালে এ সমস্যা ছিল না। নিবীর্য রুশ তখন নিজের গৃহসমস্যা লইয়া ব্যস্ত। জর্মনী সম্বন্ধে সে তখন সম্পূর্ণ উদাসীন। ১৯৪৫ সালে অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। রুশ জর্মনীকে লইয়া কি ভেল্কিবাজী খেলবে, তাহা মিত্রশক্তির কর্তারা ঠিক আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অথচ দাবা খেলায় অন্য পক্ষের চালের জন্য যে রকম অবিচলিত চিত্তে বসিয়া থাকা যায় এস্থলে তাহা সম্ভবপর নয়।

জর্মনীকে মিত্রপক্ষের কোন্ চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে বলি দিবেন আর রুশরা কোন্ দগায় শিন্নি চড়াইবেন সে বিষয়ে আমাদের দুর্ভাবনা নাই। কারণ প্রসাদ আমরা পাইব না, পাইবার ইচ্ছাও রাখি না। কিন্তু ঠিক এই কারণেই আমাদের এ বিষয়ে কিছু বলা নিতান্ত অশোভনীয় হইবে না। জর্মনী সম্বন্ধেই এযাবৎ যে কেতাবপত্র বাহির হইয়াছে ও হইতেছে, খবরের কাগজে যে বাত্রিশভাজার পরিবেশন হইতেছে তাহা হইতে ইহাই প্রমাণ হয়—সকলেরই কিছু-না-কিছু স্বার্থ আছে। আমরা নিঃস্বার্থ, আমাদের মতামতে তাই কিঞ্চিৎ নিরপেক্ষতা থাকিবে, আর কিছু না থাকুক।

গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভালো যে, জর্মনী বিশেষ করিয়া পরাজিত জর্মনী আমাদের শত্রু নয়, মিত্রও নয়। তবে নাৎসীদের আমরা চিরকালই অপছন্দ করিয়াছি। তাহার অন্যতম কারণ নাৎসীরা গায়ে পড়িয়া বহুবার ভারতবর্ষ ও তাহার সভ্যতার প্রতি কটূক্তি করিয়াছে। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রজেনবের্গ সাহেবের 'বিংশ শতাব্দীর মিথ' নামক কেতাবে বিস্তর পাওয়া যায়। রজেনবের্গ সাহেবের পরিচয় বিশদভাবে দিবার প্রয়োজন নাই। হিটলার তাঁহাকে জর্মনীর 'আধ্যাত্মিক গুরু' (গাইসটস ফ্যুরার) বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

রজেনবের্গ সাহেব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, পৃথিবীর সভ্যতা ও কৃষ্টিতে বৃহত্তম দান করিয়াছে, (ক) আর্যরা, (খ) আর্যদের মধ্যে আর্যতম আর্য হইলেন নীল চোখওয়ালা, সোনালী চুলওয়ালা নর্দিক জর্মনরা।

প্রথম তথ্য সম্বন্ধে রজেনবের্গ সাহেবের মনে কোনো সন্দেহ নাই, কারণ রজেনবের্গের বহু পূর্বে ভিয়েনার খ্যাতনামা পণ্ডিত লেওপল্ড ফন শ্রোডার বহু যুক্তি-তর্ক দ্বারা প্রায় সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, আর্যরা সেমাইট (ইহুদী ও আরব) ও মঙ্গলীয়দের চেয়ে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু নর্দিক জর্মনরাই যে সর্বোৎকৃষ্ট আর্য এ বিষয়ে রজেনবের্গের মনে ধোঁকা ছিল। কারণ আর্যসভ্যতা লইয়া যাঁহারা লম্ফঝম্প করেন তাঁহাদের প্রথমেই খবর লইতে হয় আর্যের ইতিহাস কোথায় পাওয়া যায়। আর সে অনুসন্ধান

করিতে গেলেই স্বেচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক ভারতবর্ষের আর্যদের দ্বারস্থ হইতে হয়। কারণ ইউরোপীয় আর্যদের মাথার মণি গ্রীক সভ্যতার গোড়াপত্তনের পূর্বেই অন্ততঃ তিনখানা বেদের মন্ত্র রচনা শেষ হইয়া গিয়াছে, উপনিষদের ঋষি সক্রেটিসের পরম বৃদ্ধ পিতামহের ন্যায় বয়সে ও জ্ঞানে। কাজেই ভারতবর্ষীয় আর্যরা যদি আর্য জাতির ঠিকুজিকুষ্ঠি লইয়া বসিয়া থাকে তবে নর্দিকদের কি গতি হয়? রজেনবের্গ বলিলেন যে, ভারতবর্ষীয় আর্যদের এই বিষয়ে কৌলীন্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু অদ্যকার ভারতবর্ষীয়রা সে আর্য নয়। "ইহারা জারজ, এখনও গঙ্গাস্নান করিয়া ইহারা নিজেদের বর্ণসংকর পাপের ক্ষালন করিবার চেষ্টায় সর্বদাই রত।" গঙ্গাস্নানের কি অপূর্ব অর্থ নিরূপণ ও সঙ্গে সঙ্গে নর্দিক কৌলীন্যের কি আশ্চর্য কুতুবমিনার নির্মাণ!

একথা আমরা আজ আর তুলিব না যে নর্দিক আর্যে বর্ণসংকর আছে কি না ও থাকিলে কি পরিমাণ। আমাদের বক্তব্য যে, রজেনবের্গ প্রমুখ নাৎসীরা যে আর্যামির বন্যায় জর্মন জাতকে ভাসাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা আমাদের অজানা নহে। এ বন্যা আমাদের দেশেও এককালে বহিয়াছিল ও পরবর্তী যুগে আমাদের রাজনীতিকে গণ্ডিভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এ বিষয়ে পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৯৭ সালে কি বলিয়াছিলেন উদ্ধৃত করিতেছি। রজেনবের্গের তখনও জন্ম হয় নাই।

"ম্যাকসমূলার ভট্টের অভ্যুদয়ের পূর্বে আর্য বলিয়া যে একটি শব্দ অভিধানে আছে তাহা তাঁহারা (অর্থাৎ আর্যামির পাণ্ডারা) জানিতেন কি না সন্দেহ। তাহার পর ম্যাকসমূলার যখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া পৃথিবীময় আর্যমন্ত্রের বীজ ছড়াইতে আরম্ভ করিলেন তখন তাহার দুই-এক রত্তি ছিটা তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা-মাত্র সেই মুহূর্ত হইতে তাঁহাদের মানসক্ষেত্রে আর্যামির অঙ্কুর গজাইতে আরম্ভ করিল। বিলাত হইতে আর্যমন্ত্রের আমদানী হইল—আর আমাদের দেশশুদ্ধ সমস্ত কৃতবিদ্য যুবক আর্য আর্য বলিয়া ক্ষেপিয়া উঠিলেন; তাঁহাদের সহস্র কণ্ঠে উদ্গীত আর্য নামের চীৎকার-ধ্বনিতে ইয়ং বেঙ্গলের গাত্রে থর থর কম্প উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণদেব দানোয়া-পাওয়া শবদেহের ন্যায় মৃত্যুশয্যা হইতে সহসা গাত্রোত্থান করিয়া পৈতা মাজিতে বসিয়া গেলেন এবং ফিরে-ফিতি কোমর বাঁধিয়া সন্ধ্যাগায়ত্রী মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিলেন।"

আমরা যেরূপ একদিন পৈতা মাজিতে ও সন্ধ্যা-গায়ত্রী মুখস্থ করিতে বসিয়া গিয়াছিলাম, রজেনবের্গ সাহেবও সেই রকম নর্দিক নীল চোখকে নীলতর ও সোনালী চুলকে সোনালিতর করার চেষ্টায় মশগুল হইলেন। আমরা যে রকম

ভুলিয়াছিলাম যে—

কর্ত্তব্যমাচরন্ কার্যমকর্তব্যমনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে স বা আর্য ইতি স্মৃতঃ।

অর্থাৎ কর্তব্য আচরণ করিয়া এবং অকর্তব্য অনাচরণ করিয়া যিনি প্রকৃত আচারে দৃঢ়নিষ্ঠ হন তিনি আর্য শব্দের বাচ্য।

রজেনবের্গ প্রমুখ নাৎসীরাও এই মহাবাক্য ভুলিলেন।

আমরা একদিন ভুলিয়াছিলাম বলিয়া আমাদের রাজনীতি সেদিন সম্প্রদায়-মুক্ত হইতে পারে নাই। পরবর্তী যুগে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন 'আর্যামির' হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়। এই আবহাওয়ায় আমাদের নাভিশ্বাস উঠে বলিয়াই জিন্না সাহেব যখন বলেন, 'কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান', তখন আমরা আপত্তি জানাই। সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি স্ব স্ব 'আর্যামি' লইয়া থাকুন; কিন্তু সাম্প্রদায়িক দম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত নাৎসী আন্দোলনের ভাগ্যচক্রগতি দেখিয়া যেন পদক্ষেপ করেন।

নাৎসীদের এই দম্ভের চরম প্রকাশ হইল পৃথিবী জয়ের বাসনায়। তাহার পূর্বে জর্মনী জয়ের কার্যে তাহারা নিযুক্ত হইলেন। ইহুদীদের নির্যাতন; নাৎসী সাম্প্রদায়িকতায় যাঁহারা বিশ্বাস করেন না তাঁহাদের উৎপীড়ন, এমন কি জ্ঞান-বিজ্ঞানের মন্দির হইতে হাইনে, আইনস্টাইন, মানী প্রভৃতি মৃত, জীবিত মনস্বীদের বহিষ্করণ।

বিচক্ষণ জর্মনরা যে ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলে নাই এমন নহে। শুধু বিচক্ষণেরাই যে নাৎসী-দর্শনের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাহা নহে, জর্মনীর জন-সাধারণও তাহাদের ব্যঙ্গোক্তি আড়ালে অন্তরালে অনেকখানি প্রকাশ করিয়া-ছিল। একটি ধাঁধাঁর ভিতর দিয়া সে ব্যঙ্গোক্তি তাহারা বিদেশীদের কাছে প্রকাশ করিত ও তাহাদের নাৎসী তত্ত্বজ্ঞানের পরীক্ষা লইত।

ধাঁধাঁটি এই—

প্রশ্ন: আদর্শ আর্য কে?

উত্তর: তাহার জন্ম হইবে ফ্যুরারের দেশে, সে বীর প্রসূ হইবেন গ্যোরিঙের ন্যায়, দৈর্ঘ্যে গ্যোবেলসের ন্যায়, নামে রজেনবের্গের ন্যায়, কার্যক্ষেত্রে ফন রিবেনট্রপের ন্যায়। (সকলেই জানেন হিটলারের জন্মভূমি জর্মনী নয়, গ্যোরিঙ ও গ্যোবেলসের একজন মোটা একজন বেঁটে; রজেনবের্গের নামে আছে ইহুদী নামের বোটকা গন্ধ ও রিবেনট্রপ শৌণ্ডিক।)

তবু স্বীকার করিতে হইবে যে, আর্যামি জর্মনীতে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া

পড়িয়াছিল ; পরে সে আর্যামির দম্ভ চেকোশ্লোভাকিয়া, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি বিজিত দেশে, এমন কি ইতালীর ন্যায় মিত্ররাজ্যে (কাউন্ট চানোর অধুনা-প্রকাশিত রোজনামচা দ্রষ্টব্য) তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল। আজ যে রুশেরা বল্কানে অনেকটা সুবিধা পাইতেছে, তাহার কারণ এই নহে যে বল্কানরা সকলেই ভাবে যে, রুশ তাহাদের পরম মিত্র, বরঞ্চ যুক্তিধারা অনেকটা এই রকম : শত্রুর শত্রু মিত্র নাও হইতে পারে, কিন্তু মিত্রবৎ।

জর্মনীর নাৎসী কর্তারা কি রাজরাজেশ্বরের হালে দিন কাটাইতেন, সে সকলেই জানেন। গাঁজার নেশাটা করিলেন কর্তারা, মাথাধরাটা পাইল জন-সাধারণ। তাহারা প্রাণ দিল রুশিয়ার দুস্তর প্রান্তরে ক্ষুধায় শীতকষ্টে অথবা রুশনগরদ্বারে, রাস্তায় গলিতে গুলিতে বিস্ফোটকে ; অথবা নরমাংদিতে সামনে মিত্রশক্তির ট্যাঙ্ক, কামান, উপরে বোমারু, পিছনে ফরাসী গেরিল্লা—মাতা বসুন্ধরা তাহাদের আবেদন শুনিবার পূর্বেই বোমারু জাহাজ মাতার বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া দিতেছিল, কিন্তু হায়রে, সেখানেও আশ্রয় কোথায় ?

দেশের কথায় বলে, 'খেলেন দই রমাকান্ত বিকারের বেলা গোবর্ধন'। আজ সমস্ত জর্মনী জুড়িয়া যে বিকার ও ভবিষ্যতে যে কি সান্নিপাতিক জ্বর হইবে, তাহার কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে শক্ত। ইংরাজ, আমেরিকান, রুশ ত্রিদোষ হইয়া জর্মনীর 'গোবর্ধন'গুলিকে কোন্ শ্মশানযাত্রায় লইয়া যাইতেছেন, তাহার খবর কে রাখে।

এতদিন খবর পাইতেছিলাম যে, রমাকান্তগুলিকে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা হইতেছে ও তাহারা যে বিকার হইতে নিষ্কৃতি পাইবে এমন নহে। তাহাদের জন্য বিশেষ গারদ, বিশেষ বিচার, এমন কি বিশেষ হাড়িকাঠও নির্মিত হইতেছে। ফাঁসী অথবা গুলির কর্ম নয়, খাস জর্মন কায়দায় তাহাদিগকে গিলোটিনে গলা দিতে হইবে। আমরা শোক প্রকাশ করিতেছি না, আনন্দিতও হইতেছি না। আমরা ভারতবাসী ; কর্মফলে বিশ্বাস করি। দই খাইলে বিকার হইবেই। কিন্তু ইতোমধ্যে হঠাৎ একটি খবর পাইয়া আমরা স্তম্ভিত হইলাম। খবরটি এই—শ্লেজবীক-হলস্টাইনে নাকি প্রায় সোয়ালক্ষ জর্মন সৈন্য ও অফিসারকে জিয়াইয়া রাখা হইয়াছে। তাহাদের নিরস্ত্র করা হয় নাই। পাছে বিশ্বসুদ্ধ লোক খবর পাইয়া আঁতকাইয়া উঠে, তাই অত্যন্ত সান্ত্বনাপূর্ণ এই খবরটিও সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাদের কাছে রসদ মাত্র দশ রোঁদ চালাইবার মত। যে অঞ্চলে এই নোনা ইলিশরা বিরাজ করিতেছেন, সেখানে তাঁহারা সর্বময় কর্তা, এমন কি সে অঞ্চলে যদি তাঁহাদের থানাপিনার অসুবিধা হয়, তবে পার্শ্ববর্তী জর্মনী ও

সম্ভবতঃ ডেনমার্ক হইতে আহারাদি যোগাড় করিতে পারিবেন। হেমলেটি ভাষায় বলি, 'ইহারা যে পাঁড় নাৎসী, সেকথা জানাইবার জন্য দৈববাণীর প্রয়োজন নাই।'

সঙ্গে সঙ্গে এই খবরও পাইলাম যে, প্রায় ৪৫ মিলিয়ন পাউণ্ড খরচা করিয়া (প্রতি বৎসরে না প্রতি তিন বৎসরে এ কথাটা রয়টার কাজের হিড়িকে ঘুলাইয়া ফেলিয়াছেন) একটি পাকাপোক্ত পোলিশ বাহিনী ইংলণ্ডে মজুদ রাখা হইয়াছে। ইহারাও জনবুল মার্কা ষাঁড় লাল রঙের কট্টর দুশমন।

এই যে ইংলণ্ডের হাঁড়িতে জিয়ানো যশোরে কই শ্লেজবীক হলস্টাইনে জমানো পদ্মার নোনা ইলিশ, ইহারা লাগিবেন কোন্ কর্মে কোন্ পরবে? নূতন রাজনীতির জন্মদিনের দাওয়াতে, না ইয়োরোপের দ্বিতীয় কাপালিক শ্রাদ্ধ-বাসরের ভোজে?

২

পেটুক ছেলেকে যা কিছু করিতে বলা হউক না কেন, সে আহারাদির আলোচনায় ঠিক পৌঁছিবে। এমন কি একং দশঙের মত রসকসহীন জিনিস মুখস্থ করিতে বলিলেও সে ঠিক লুচি মণ্ডায় পৌঁছিবে। কায়দাটা দেখার মত: একং, দশং, শতং, সহস্র, অযুত; লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক, অগ্রায়ণ, পৌষ, মাগ (মাঘ) ছেলেপিলে, জ্বর, সর্দি, কাশি; গয়া, বৃন্দাবন, পুরী, রসগোল্লা, সন্দেশ, মিহি-দানা, লেডিকিনী ইত্যাদি ইত্যাদি।

গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াছে, তাহাকে সেখান হইতে নড়ায় কাহার সাধ্য।

ইংরাজ, ফরাসীর দৃঢ় বিশ্বাস যে জর্মনী পেটুক ছেলের মত। তাহাকে যে কোন কায়দার সরকার দাও না কেন, সে রাজতন্ত্রই হউক আর গণতন্ত্রই হউক, জর্মনরা ঠিক স্বৈরতন্ত্র ও কুচকাওয়াজতন্ত্রে পৌঁছিবেই। যুঙকার ও রূঢ়ের ধন-পতিরা মিলিয়া পৃথিবী জয়ের প্ল্যান আঁটিবেই। ফন পাপেন ও ট্যুসেনে বন্ধুত্ব হইবেই ও পৃথিবী জয়ের জন্য বিদেশী, টুথব্রাস-গোঁপওয়ালা, নিরক্ষর উজবুকেরও যদি প্রয়োজন হয় তাহাও সই—যদি সে উজবুক ঠিক ঠিক বক্তৃতা ঝাড়িয়া টেবিল ফাটাইতে পারে ও শান্তিপ্রিয় দেশী-বিদেশীর মাথাও এলোপাতাড়ি ফাটাইতে পারে। ইংরেজ ফরাসী বলে, "দেখো না, ১৯১৮-১৯ সালে আমরা জর্মনীকে কি রকম সরেস একখানা বাইমার রিপাবলিক দিয়াছিলাম; কিন্তু সেই একং দশং পড়িতে গিয়া তাহারা ঠিক নাৎসী গুণ্ডামিতে পৌঁছিল। ইহাদের বিশ্বাস নাই, ইহাদের "রোম রোম মে বদমায়েশী"।

পরাজিত জর্মনীকে লইয়া সমস্যাটা তাহা হইলে এই, তাহাকে স্বাধীন ভাবে ছাড়িয়া দেওয়া যায় কিনা। যদি না দেওয়া যায় তবে পিটুনি পুলিস দিয়া তাহাকে আদবকায়দা শিখাইতে হইবে।

১৯৩৯ সালে আমার এক জর্মন বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন: 'লড়াই শীঘ্রই লাগিবে। আমরা যদি জিতি, তবে দুনিয়ার রাজত্ব আমাদের হাতে আসিবে আর যদি হারি তাহা হইলেও। কারণ আমাদের পরাজয় অর্থই রাশিয়ার জয়। আমরা তখন লাল হইয়া যাইব। আমাদের প্রতিনিধিরা মস্কোতে যাইবে, সেখানে ভোঁতা রাশিয়ানদের তিন দিনে কাবু করিয়া তামাম ইউ এস এস আর আমাদের প্রতিনিধিরাই চালাইবে। রাশিয়ানরা বর্ণবিচার করেন না, তাহাদের বীজমন্ত্র 'সর্বোত্তম ব্যক্তি বড়কর্তা হইবে হউক না সে জর্জিয়ন'। যে রকম মুসলমানরা একদিন বলিত, 'সর্বোত্তম ব্যক্তি খলিফা হইবে, হউক না সে হাবসী'। কাজেই কিছুদিনের ভিতরই দেখিতে পাইবে এক জর্মন ক্রেমলিনে বসিয়া দুনিয়া চালাইতেছে। হাঁ তামাম দুনিয়াটা, কারণ জর্মনী ইউ এস এস আরের গুষ্টিতে যদি ঢোকে, তবে বাদবাকী ইউরোপ তিন দিনেই তার খপ্পরে পড়িবে। ইংরেজ, মার্কিন কেউ ঠেকাইতে পারিবে না। তারপর পটপট করিয়া চীন, ভারতবর্ষ, ইরাণ, ইরাক, মিশর। তারপর? তারপর আর কি? এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এক অখণ্ড রাজ্য হইলে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়াকে একঘরে করিয়া তিন দিনের ভিতর সমাজের সামনে নাকে খত দেওয়াইব"। দেখিবে 'সব লাল হো জায়েগা', তবে রঞ্জিতি মর্মে নহে।'

শুনিয়া বলিয়াছিলাম, 'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তোমার কথাই যদি ফলে, তবে আমরা ভারতবাসীরাই দুনিয়ার রাজত্ব করিব। ভারতবাসীও না, আমরা বাঙালীরাই ক্রেমলিনে বসিয়া নিয়েভা নদীর ইলিশ মাছ খাইব ও দুনিয়ার রাজত্ব করিব।'

বন্ধু বলিলেন, 'সে কি কথা? তোমরা বাঙালীরা এমন কী গুণে গুণবান?'

আমি বলিলাম, 'বিলক্ষণ, আমরা লড়াই করিয়া দেশের স্বাধীনতা জিতিতে না পারি, কিন্তু মস্কোর কৌন্সিল-ঘরে আমাদের বক্তৃতা জলতরঙ্গ রুধিবে কে, হরে মুরারে।'

কিন্তু সে কথা উপস্থিত ধামাচাপা থাকুক; গোঁফে তেল দিবার সময় এখনও হয় নাই।

আমার জর্মন বন্ধুর যুক্তিতে মার্কিনিংরাজ বিশ্বাস করে। তাহাদের মাথায় ঢুকিয়াছে যে, জর্মন জিঙ্গো যে রকম পাগলা হিটলারকে কার্য উদ্ধারের জন্য দলে

নিয়াছিল, জাতধর্ম, কৌলীন্য আভিজাত্য বিসর্জন দিয়া, ঠিক সেই রকম তাহারা লাল হইয়া স্টালিনকে হিটলারের তখতে বসাইয়া দুনিয়ার বাদশাহী করিবে। অর্থাৎ নাৎসী গুণ্ডামির বদলে স্টালিনি গুণ্ডামি চালাইবে। দুই গুণ্ডামিই মার্কিনিংরাজের পক্ষে মারাত্মক, মহতী বিনষ্টি। সেই মহাপ্রলয় হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় জর্মন জিঙ্গোকে বোঝানো যে, তাহারা লাল হইয়া কেন মস্কো দরবারে কুর্নিশ দিতে যাইবে। মার্কিনিংরাজ সাহায্য করিতে প্রস্তুত, জিঙ্গোরা লাল রক্তস্রোতের উপর ভরাপালে মস্কো পৌঁছিবে রাজবেশে। উপস্থিত কোনগতিকে রুশকে ঠেকাইয়া রাখ; জর্মনী যেন মনের দুঃখে লাল গেরুয়া পরিয়া বিবাগী হইয়া মস্কো তপোবনে চলিয়া না যায়। অর্থাৎ সেই অতি প্রাচীন চেম্বেরলিন নীতি "যতক্ষণ রুশে জর্মনে লড়াই চলে আমাদের পৌষ মাস, দুই দুশমনে মিলিলেই আমাদের সর্বনাশ"।

যদি বলা হয়, এক কাজ করো না কেন, নাৎসীদের শক্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিয়া রাজ্যশাসন দেশের জনগণের হাতে ছাড়িয়া দাও। তাহারা যে লাল হইয়া যাইবেই, এ স্বতঃসিদ্ধ পাইলে কোথায়?

মার্কিনিংরাজ বিজ্ঞের ন্যায় মৃদুহাস্য করিয়া বলে, 'ইতিহাস পড়ো। বাইমার রিপাবলিক যখন জর্মন জনগণকে ভেট দেওয়া হইল তখন তাহারা করিল কি? কোথায় না বাদশাহী মসলন্দে বসিয়া শাহেনশাহীগিরি করিবে তাহা নয়, সেই কাইজারকে তাহার জমিদারীর আমদানি কিস্তি খিলাপ না করিয়া হামেহাল পাঠাইল—এদিকে নিজে খাইতে পায় না। মুচি-মেথরকে বলা হইল, রাজা তো হইতে পারিবে না, সিংহাসন নাই, প্রেসিডেন্ট হ', তা নয় ডাকিয়া আনিল সেই যুঙ্কার পালের গোদা হিণ্ডেনবুর্গটাকে। তারপর সেই পাগলা জগাইকে। সে ব্যাটা কালাপাহাড় জাতে অস্ট্রিয়ান হইল জার্মান। মোদ্দা কথা এই, জর্মন আপামর জনসাধারণ যা, যুঙ্কারও তা, নাৎসীও তা। সব শিয়ালের এক রা। বরঞ্চ কট্টর নাৎসীরা ভালো। শক্তির উপাসক। জাতবর্ণহীন স্টালিনি নেড়া-নেড়িদের বিরুদ্ধে ইহাদের কোনো না কোনো দিন শভিনিজম-কারণ খাওয়াইয়া লড়ানো যাইবে। আপামর জনসাধারণ তো কাছাখোলা, লাল গেরুয়া পরিয়া ধেই ধেই করিয়া স্টালিনি সংকীর্তন নাচিবার গাইবার জন্য তৈয়ার হইয়া আছে। তাই শ্লেজবীক-হলস্টাইনে নাৎসী জিয়াও আর গোরাদের কড়া বারণ করিয়া দাও যেন জর্মন জনগণের সঙ্গে রাখী না বাঁধে (নন-ফ্রেটারনাইজেশন)। গোরাদেরই বা বিশ্বাস কি? দুষ্টলোকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদেরও নাকি গোলাপী আমেজ লাগিয়াছে।

ঠিক এইখানটায় মার্কিনিংরাজের সঙ্গে আমার মত মিলে না। আমার বিশ্বাস, জর্মন জনসাধারণ আপন মুক্তি আপন ঐতিহ্যের ভিতর দিয়া খুঁজিয়া পাইতে চায়। স্টালিন-দত্ত গুরুমন্ত্র জপিয়া নয়। আমার মনে আছে ১৯৩২ সালে যখন জর্মনীতে নাৎসী-কম্যুনিস্টে জোর ষাঁড়ের লড়াই চলিতেছিল তখন নাৎসীরা পথেঘাটে একে অন্যকে অভিবাদন করিত 'হাইল হিট্‌লার' বলিয়া, কম্যুনিস্টরা 'হাইল মস্কো' বলিয়া। গুণীদের বলিতে শুনিয়াছি এই মস্কোমার্কা বিদেশী ভদকা জর্মন বিয়ার ঐতিহ্য-গর্বিত জনসাধারণ আদপেই পছন্দ করিত না। কে জানে হয়ত এই কথা স্মরণ করিয়াই রুশরা আজ বার্লিনাঞ্চলে জোর করিয়া জর্মনদের 'হাইল মস্কো' বলাইতেছে না। অবান্তর হইলেও একটি কথা বলিবার লোভ হইতেছে। আমাদের দেশী কম্যুনিস্টরা কিন্তু মস্কোবাগে না তাকাইয়া কোনো কর্মই করেন না, কোনো বাক্যই বলেন না। স্টালিন যদি জর্মনীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন তাও ভালো, যদি লড়েন তাও ভালো, যদি ফিনল্যাণ্ডের কান মলেন তাও ভালো, যদি ফিন্ কম্যুনিস্টদের তত্ত্বতাবাশ না করিয়া পাসিকিভির সঙ্গে দোস্তি করেন তাও ভালো, ইরাণ তেল দিল না বলিয়া যদি তাকে ধমক দেন তবে তাও ভাল, গ্রীক দেশসেবীদের গাছে চড়াইয়া যদি মই কাড়িয়া লন তবে তাও ভালো। কারণ বাতুশ্‌কা (ছোট বাপা) স্টালিন সর্ববিশারদ, ভগবানের (রাম রাম!) ন্যায় সর্বজ্ঞ। বিরিঞ্চিবাবার ন্যায় তিনি চন্দ্রসূর্য ওয়েল না করিলে আকাশ পাতালের বন্দোবস্ত ভণ্ডুল হইয়া যাইবার নিদারুণ সম্ভাবনা। অতএব 'হাইল মস্কো'। আমাদের এ ধর্ম পছন্দ হয় না। আতাতুর্ক পছন্দ করিতেন না বলিয়াই নব্যতুর্কের স্কন্ধ মস্কাবাগ হইতে ফিরাইয়া আঙ্কারাবাগে ইস্ক্রু টাইট করিয়া দিয়াছিলেন।

কথা হইতেছিল যে, জর্মন জনসাধারণ আপন মুক্তি আপন ঐতিহ্যের ভিতর দিয়া খুঁজিয়া লইতে চায়। তাই যদি হয় তবে বাইমার রিপাবলিকের বানচাল হইল কি করিয়া?

৩

সোশাল ডিমোক্রেটদের হাতে রাজ্য চালনার ভার সমর্পণ করাই যে প্রশস্ত ইহা বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন। তাহার কারণ আমরা পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি। বাইমার রিপাবলিককে সাফল্যমণ্ডিত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন সোশাল ডিমোক্রেটরা। জর্মনীর খ্যাতনামা পণ্ডিত, অধ্যাপক, গুণীজ্ঞানী—এক কথায় যাঁহারা জর্মনীর গর্বস্বরূপ, তাঁহারা প্রায়

সকলেই ছিলেন বাইমারের পিছনে, সোশাল ডিমোক্রেটরূপে। আমরা বিশেষ করিয়া ইঁহাদের চিনিতাম, কারণ ইঁহাদের ভিতর আর্যামি গোঁড়ামি ভণ্ডামি ছিল না।

জর্মনীর দুর্দিনে সোশাল ডেমোক্রেটরা আপামর জনসাধারণকে এক পতাকার নীচে সম্মেলিত করিয়া ইন্‌ফ্লেশন, বেকারী, নাস্তিক্য, উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পৃথিবী জয় করার উদ্দেশ্যে নূতন সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করার স্বপ্ন তাঁহারা দেখেন নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "মানব সংসারে ভালো লোকের দেয়ালি উৎসব চলিতেছে, প্রত্যেক জাতি আপন প্রদীপ উঁচু করিয়া তুলিলে তবে সে উৎসব সমাধা হইবে"। পৃথিবীর শান্তি ও মঙ্গল তাঁহারা কামনা করিয়াছিলেন বলিয়া ঠিক ঐ সময়ে (১৯২০) রবীন্দ্রনাথকে তাঁহারা বিপুল সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন। জর্মন জনসাধারণ তখন রবীন্দ্রনাথের বাণীতে নিজের মূক আদর্শ প্রকাশ করিয়াছিল। কে না জানে ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বপ্রেমের কবি, শান্তির প্রতীক, পদদলিতের পরিত্রাণ।

তথাপি ইংরাজ ফরাসীর ভয় ছিল যে সময়কালে সোশাল ডিমোক্রেটরা বলশিদের সঙ্গে যোগদান করিবে। তাই যখন দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উদ্ধার করিবার জন্য সোশাল ডিমোক্রেটরা ইংরাজ-ফরাসী ধনপতিদের সাহায্য চাহিল তাহারা সাফ জবাব দিল। ফলে বেকারি বাড়িল, ব্রনিভ হাল সামলাইতে পারিলেন না। তারপর ফন পাপেন; শ্লাইশার গর্তাঙ্কের ভিতর দিয়া নাৎসী যবনিকা পতন। ইংরাজের কথা ফলিল না, সোশাল ডিমোক্রেটরা কম্যুনিস্টদের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও নাৎসী অবিচারের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করিতে রাজী হইলেন না।

* * *

সোশাল ডিমোক্রেটরাই যে দেশের মেরুদণ্ড তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, রুশেরা তাহাদের অধিকৃত অঞ্চলে ইঁহাদেরই প্রধান শক্তি স্বীকার করিয়া নিয়াছে। ইঁহাদেরই সঙ্গে আছেন ক্রিশ্চান ডেমোক্রেটিক পার্টি ও লিবারেল ডিমোক্রেটিক পার্টি। কম্যুনিস্টরাও আছেন, ও বেশ জোর আছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং ভিতরে ভিতরে রুশ সরকার যে তাহাদেরই সব চেয়ে বেশী সাহায্য করিবে তাহাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু রুশরা জানে যে, সোশাল ডেমোক্রেটরা যদি বাঁকিয়া বসিয়া থাকে, তবে কম্যুনিস্টরা শুধু গায়ের জোরে তাহাদের প্রোগ্রাম চালু করিতে পারিবে না। স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, রুশের চাল হইল সোশাল ডেমোক্রেটদের নটমঞ্চের সম্মুখে রাখিয়া দেশের প্রথম দুর্দিনের

ধাক্কা তাহাদের দিয়া সহানো। রুশদের যথেষ্ট সাহায্য না পাইয়া যখন ব্যানিভ সরকারের মত তাহাদের পার্টি-নৌকা বানচাল হইবে তখন কম্যুনিস্টরা আসরে নামিয়া "দেশোদ্ধার" করিবেন, অর্থাৎ গোটা রুশাধিকৃত অঞ্চলকে ইউ এস এস আরের অঙ্গীভূত করিবেন। সে বিপদকালে সোশাল ডিমোক্রেটরা যে কোনো কট্টর লাল-বিরোধী দর্গায় ধর্ণা দিবে তাহার উপায় নেই, কারণ রুশরা কট্টরদের নির্মমভাবে বিলোপ করিয়াছে ও করিতেছে। রুশরা জানে যে, উপস্থিত সোশাল ডিমোক্রেটদের লোকচক্ষে অপমানিত করার প্রয়োজন তাই তাহাদের সভামঞ্চে আনিবার পূর্বে বেশ করিয়া মুসোলিনী-কায়দায় জোলাপ দেওয়া হইতেছে।

অস্ট্রিয়ায় রুশরা যে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে তাহাতেও ঐ চাল। বিস্তর সোশাল ডিমোক্রেটদের হরেক রঙের পোর্টফোলিও দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু পুলিস অর্থ প্রোপাগাণ্ডা আভ্যন্তরীন মন্ত্রীর হাতে ও তিনি কম্যুনিস্ট। অর্থনৈতিক দিক দিয়াও রুশের বালাই কম। যে অঞ্চল দখল করিয়া বসিয়াছে সেখানে খানা-পিনা আছে, তাহার উপর উক্রাইন আছে। সে অঞ্চলের সমস্ত কলকারখানা সরাইয়া রাশিয়ায় লইয়া গেলেও ইহাদের অন্ততঃ অস্থিচর্মসার করিয়া রাখিতে কোনো বিশেষ অসুবিধা হইবে না।

* * *

মার্কিন-ইংরাজ কিন্তু কিছুতেই মনস্থির করিতে পারিতেছেন না। কর্তাদের বুদ্ধির বহর কতটুকু তাহা নিম্ন খবরটুকু হইতে বিলক্ষণ বোঝা গেল।

"জর্মনীর কলকব্জা যদি কাড়িয়া লই (অর্থাৎ ডিসইনতাসট্রিয়ালাইজ) তবে তাহারা না খাইয়া মরিবে, আর যদি না কাড়ি তবে চর্বচোষ্য লালিত হইয়া পুনর্বার মস্তকোত্তলন করিয়া আমাদিগকে প্রহার করিবে।"

এই তথ্যটুকু কি বিজ্ঞের ন্যায় প্রচার করা হইল! ঘোড়াকে দানাপানি না দিলে সে মরিবে, তাহাতে আর নূতন কথা কি? আর দিলে সে গাড়ী টানিতে পারিবে (অর্থাৎ গায়ের জোরে রুশকে ঠেকাইতে পারিবে), কিন্তু মাঝে মাঝে তোমাকে লাথিও মারিবে। গাড়ী যদি চালাইতে চাও, তবে তেজী ঘোড়া কিঞ্চিৎ দুরন্তপনা তো করিবেই। তুমি ভালো লাগাম কেনো না কেন?

দ্বিতীয় উদাহরণ পণ্য!

"কাঠের অভাব হইয়াছে বলিয়া বার্লিনের যে সব অঞ্চলে ইংরাজ-মার্কিন প্রবেশ করিয়াছে, সেখান হইতে স্টালিনি সাইনবোর্ড সরানো হইয়াছে।" খদ্দের যখন অশ্ব-বিক্রেতাকে বলিল, "বাড়ী গিয়া দেখিলাম, তোমার ঘোড়া খোঁড়া", তখন সে বলিল, "আপনার বাড়ী তো বাজারের উত্তর দিকে, ওদিকে চলিলে

আমার ঘোড়া খোঁড়া হয়ই।" খদ্দের বলিল, "তোমার যুক্তিটা তোমার ঘোড়ার মতই খোঁড়া।"

তৃতীয় উদাহরণ,

'কোনো কোনো জর্মন মেয়ে ইংরাজ সিপাহীদের নিকট হইতে চকলেট লইয়াই চম্পট দেয়।' আশ্চর্য! কিন্তু আমাদের এতদিন বিশ্বাস ছিল যে, সবদেশের মেয়েরাই এ রকম করে। আর মেয়েদেরই বা দোষ দেই কেন? তোমাদের সন্তুষ্টিকরণ (এপিজমেণ্ট) অস্ট্রিয়া চেকোশ্লোভাকিয়া চকলেট পকেটস্থ করিয়া হিটলার তো এই সেদিন তোমাদের বিশেষ অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়াছিল। রাজনৈতিক স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হয়, কিন্তু এতটা ক্ষীণ!

অধিকৃত জর্মনী চালনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত খবর হইতে বোঝা যায়, বরঞ্চ বলা উচিত বোঝা যায় না ইংরাজ-মার্কিনের নীতি কি।

'কম্যুনিস্টরা রাজ্যশাসনে কোথাও নাই। বেভেরিয়া ও নিম্নরাইনে দক্ষিণ-পন্থী ক্যাথলিকরা সর্বময় কর্তা। হামবুর্গ ও হানোফারে পার্টিমতামতহীন বণিক ও দক্ষিণপন্থী আমলারা গুছাইয়া লইতেছেন, যদিও অন্য কেউ কেউ বখরা পাইতেছেন। হেস্সে ও মধ্য রাইনে সোশাল ডেমোক্রেটরা রাজ্য-চালনার পুরোভাগে ও উত্তরপন্থী ক্যাথলিকদের আওতায় বেস্টফালিয়েন ও ওল্ডেনবুর্গে কিছুটা রাজত্ব করিতেছেন। তদুপরি বড় বড় নগরে ইঁহারাই মেয়ার হইয়া বসিয়াছেন।

উৎকৃষ্ট প্রস্তাব। এ রকম পঁচিশ জায়গায় বত্রিশভাজা করিবার কি প্রয়োজন? এরকম দো-আঁসলা, তিন-আঁসলা জানোয়ার পয়দা করিবার এক্সপেরিমেণ্ট কেন? ইংলণ্ডে একবার টার্কি ও হেন্ (মুরগী) পক্ষীতে সংমিশ্রণ করাইয়া যখন টার্কিন পাখী পয়দা করা হয়, তখন ফ্রান্স বলিয়াছিল, "আমেরিকার এক আস্তাবলে গাধা ও একখানা ভাঙা বাইসিক্ল একসঙ্গে রাখার ফলে ফোর্ড গাড়ীর জন্ম হয়েছিল। সাধু সাবধান!"

তাই বলিতেছি যে, প্রকৃষ্টতম পন্থা, সোশাল ডেমোক্রেটদের শুধু রাজ্য সমর্পণ করাই নয়, তাঁহাদের সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন সাহায্যদান। রুশরা যেমন তাহাদের অধিকৃত অঞ্চলে সোশাল ডেমোক্রেটদের বোকা বানাইতে চাহে, তোমরা তেমনি তাঁহাদের সফলতার পথে লইয়া চল। জর্মন বড় জাত্যাভিমানী, পারতপক্ষে সে কখনও তাহার জাতীয়তাবোধ ত্যাগ করিতে চাহে না। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার মুক্তির পথ তাহারই ঐতিহ্যের তাহারই বৈদগ্ধ্যের ভিতর দিয়া। সে বলশির ধামাধরা হইতে চাহে না, তোমাদের গোলাম হইতে চাহে না। তাহাকে

যদি স্বাধীনভাবে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিতে দাও তবে সে সকল শত্রুকে রোধ করিয়া শান্ত জীবনযাপন করিবেই। সোশাল ডেমোক্রেটরা শান্তি চায়।

আর শেষ কথা তো এই যে, স্বায়ত্তশাসনে সর্বজাতির অধিকার। সোশাল ডেমোক্রেটরা জর্মনজাতির যাহা শ্রেষ্ঠ, যাহা বরণীয় তাহারই প্রতীক।

প্যালেস্টাইন

গোড়ার দিকে ইহুদি-আরবে প্যালেস্টাইন সম্পর্কে তর্ক উপস্থিত হইলেই প্রথম প্রশ্ন এই উঠিত, সে দেশটা কাহার। ইহুদিরা বলিত, 'এই পবিত্র দেশ আমাদের পিতৃভূমি, মূসা (মোজেস) আমাদিগকে এই দেশে পথ দেখাইয়া আনেন; আমাদের গর্বস্থল রাজা সুলেমন (সলমন), দায়ুদ (ডেভিড) এই দেশে রাজত্ব করিয়াছেন, আমাদের প্রপিতামহ ইব্রাহীমের (আব্রাহামের) কবর এই মাটিতে। এই দেশ আমাদের পুণ্যভূমি, এখন এ দেশকে আমাদের কর্মভূমিতে পরিণত করিতে চাহি।' (সত্যেন দত্তের 'তীর্থসলিলে' রাজা সুলেমন ও দায়ুদের গীতি দ্রষ্টব্য)।

উত্তরে আরব বলে, 'তোমাদের মত আমরাও সেমিটি, যে সব মহাপুরুষদের নাম করিলে তাঁহারা আমাদেরও পূর্বপুরুষ। তাঁহাদের গোর আমাদের তীর্থস্থল-দরগাহ। ইহাদের মহৎ কার্যকলাপ কুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। উপরন্তু জেরুজালেম (বয়ত উল-মুকদ্দস পবিত্রালয়) আমাদিগের কাছে মক্কার পরেই সম্মানিত। কিন্তু এসব ধর্ম-সম্বন্ধীয় হার্দিক আলোচনা উপস্থিত স্থগিত রাখো। আসল কথাটা এই, তোমাদের স্বাধীনতা লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই (খৃষ্টের বহুপূর্বে) তোমরা এ দেশ ত্যাগ করিতে আরম্ভ করো; খৃষ্টের পর তোমাদের অধিকাংশ জাতভাই খৃষ্টান হইয়া যায়—তাহারা আজ আমাদের দলে, পরবর্তী যুগে তাহাদিগের অধিকাংশ আবার মুসলমান হইয়া যায়—এবং সর্বশেষে ক্রুসেডের আমলে যখন যুদ্ধ, অরাজকতা, ও অনাকৃষ্টির ফলে দেশটা উচ্ছন্ন গেল, তখন তোমরা সকলেই 'পোড়া' দেশকে ছাড়িয়া কারবারে পয়সা করিবার জন্য পৃথিবীর সবত্র ছড়াইয়া পড়িলে। আমরা এই দেশের মাটিকে ভালোবাসিতাম —সেই মাটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আটশত বৎসর কাটাইলাম, এখন পয়সার জোর হইয়াছে বলিয়া আমাদিগকে ভিটা-ছাড়া করিতে চাও? তোমাদের বেশভূষা বিজাতীয়, তোমাদের আচার-ব্যবহার এদেশের প্রাচীন ইহুদি পন্থানুযায়ী নহে (অর্থাৎ যে কয়টি ইহুদি দুর্দিনে এদেশ ত্যাগ করিয়া যান নাই, তাঁহাদের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে আমাদের আজ মিলে বেশী), তোমরা বার্লিন প্যারিসের

নৈতিক চরিত্র ও দুষ্ট রোগ সঙ্গে আনিয়াছ, আর সর্বশেষ কথা, আমাদের দুশমন ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে তোমরা বন্ধুত্ব করিয়াছ।'

এই তর্কাতর্কি আমি ছয় মাসকাল উদয়াস্ত শুনিয়াছি—লিখিতে গেলে একখানা ছোটখাটো বই লেখা যায়। কিন্তু এসব তর্ক আজকাল কম হয়।

১৪-১৮ যুদ্ধের সময় ইংরাজ প্যালেস্টাইনের আরবকে কথা দেয়—তখন যেখানে ইহুদির সংখ্যা নগণ্য—যে, তোমরা যদি তুর্কীর হইয়া না লড়ো তবে যুদ্ধের পর তোমাদিগকে স্বরাজ (সেলফ ডিটারমিনেশন) দিব। সঙ্গে সঙ্গে আরবদের অজানাতে, প্রধানতঃ মার্কিন ইহুদিদিগকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল যে, তাহারা যদি কাইজারকে অর্থ সাহায্য করা বন্ধ করিয়া সেই অর্থ ইংরাজকে দেয় ও বিশ্ব-ইহুদি (ওয়ালর্ড জিউয়ারী) অন্যান্য সাহায্য প্রদান করে, তবে যুদ্ধের পর ইহুদিদিগকে প্যালেস্টাইনে 'ন্যাশান্যাল হোম' নির্মাণ করিতে দেওয়া হইবে। ('ন্যাশান্যাল হোম' কথাটার বাঙলা আর করিলাম না, ইংরাজিতেই তাহার অর্থ কি, সে লইয়া বাগবিতণ্ডার অন্ত নাই। নিরক্ষর আরব ইংরাজীর এক বর্ণ বোঝে না, কিন্তু 'ন্যাশান্যাল হোম' যে 'ন্যাশান্যাল স্টেট' নয় সে কথা বুঝাইতে তাহার তৎপরতার অন্ত নাই। বারে বারে আরবী কথাতে শুধু চারিটি ইংরিজি শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, 'ন্যাশান্যাল হোম' আর 'ন্যাশান্যাল স্টেট'। আমি যদি 'ন্যাশান্যাল হোমের' অনুবাদ 'জাতীয় ভবন' বা 'জাতীয় সদন' দিয়া করি, তদে ইহুদিরা আমাকে খুন করবে, আরবরা আমাকে খয়রাতি দিবে।)

যুদ্ধের পর যখন 'ন্যাশান্যাল হোমের' খবরটা বাহির হইল, তখন আরবরা হুঙ্কার দিয়া উঠিল। অতিকষ্টে তাহাদিগকে বুঝানো হইল যে, ঐ বস্তুটি অত্যন্ত নিরীহ ঢোঁড়া সাপ। জনকয়েক ইহুদি প্যালেস্টাইনে বসবাস করিবার জন্য আসিতেছে, বিস্তর পয়সা সঙ্গে আনিবে, নিজের খাইবে পরিবে, ধর্মচর্চা করিবে, 'কলচর' করিবে, আরবের আপত্তি করিবার কি আছে। ২৬ সেপ্টেম্বরে (৫৫) প্রকাশিত বাইৎসমান্ সাহেবের এই মর্মে বুলি যে, ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে 'জুইশ মেজরিটি' ও 'জুইশ স্টেট' চায়। সেকথা তখনকার দিনের ইংরাজ সরকার মানেন নাই—লেবার পার্টি লাস্‌কি প্রভৃতি ইহুদিদের প্রতাপে আজ মানেন।

সে যাহাই হউক, যুদ্ধাবসানে যখন এই সব আলোচনা হইতেছে, তখন হঠাৎ দেখা গেল যে, যে-সব ইংরাজ সৈন্য আরবদের সহায়তায়, লরেন্সের ধূর্তামিতে, জেরুজালেমে একটি বুলেটমাত্র খরচ না করিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা সেখানে থাকিবার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিতেছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা এক স্মরণীয় ও অভিনব বস্তু। ১৯১৪ সালের

পূর্বে কোন রাজা গায়ের জোরে বা অন্য কোনো কায়দায় কোনো দেশ জয় করিলে সে-রাজা দুনিয়ার লোককে ডাকিয়া বলিতেন না যে, তোমরা সকলে আমাকে আশীর্বাদ করিয়া রাজ্যটি সোনার থালাতে করিয়া তুলিয়া দাও, আমি গ্রহণ করিয়া তোমাদিগকে কৃতার্থম্মন্য করিব। এ কায়দাটা আবিষ্কার করিলেন ইংরাজ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা। লীগ অব নেশনস গড়িয়া তামাম দুনিয়ার দেশপতিদের ডাকিয়া বলা হইল যে, তাহারা যেন ইংরাজকে রাজনৈতিক পূতজলে বাপ্তিস্ম করিয়া প্যালেস্টাইন, ইরাক, মিশরের 'মেনডেটরী' প্রভু বা 'অছি' নিযুক্ত করে। বিশ্বজন যেন স্বস্তিবচন ঝাড়িয়া বলে, তুমি ন্যায়তঃ ধর্মতঃ আইনতঃ দেশটা পাইলে। পৃথিবীর নৈতিক ইতিহাসের ক্রমবিকাশ লইয়া যাঁহারা নাড়াচাড়া করেন, তাঁহারা যেন এই পর্যায়ে নূতন পরিচ্ছেদ পাড়েন।

'অছি' কথাটি শুনিলে আমাদের মত প্রাচীনপন্থীদের 'ধর্মপিতা' সমাসটি মনে পড়ে। তুর্কী ভাষায় 'অছি' অর্থ জ্যেষ্ঠভ্রাতা। নাবালক শিশুর জন্য যখন অছি নিযুক্ত করা হয় তখন এই কথা অছিকে মানিয়া লইতে হয় যে, সে নিঃস্বার্থ-ভাবে শিশুর তত্ত্বাবধান করিবে। আইনকানুন ভালো জানি না, তবে শুনিয়াছি যে, অছি নিয়োগের পূর্বে দেখিতে হয় যে, ঐ শিশুর স্বার্থে যেন অছির লোভ না না থাকে—থাকিলে অছিত্ব রদ-বাতিল। 'লীগে'র কর্তারা সকায়দায় এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিতে বিস্মৃত হইলেন। ইংরাজ তখন বলেন নাই। কিন্তু হালে পরিষ্কার বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, প্যালেস্টাইন আইসাক্ পাক আর রহিম নিক, সেখানে ইংরাজ স্বার্থ বরাবর অচল-অটুট থাকিবে—সেখানে বিমানঘাঁটি, পল্টন-গোয়াল থাকিবেই। লীগ-কর্তারা শুধু তম্বি করিয়া অছিদের বলিয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর শাসিত দেশের কার্য-প্রতিবেদন পেশ করিতে হইবে। সে ব্যঙ্গ-নাট্যের কথা আরেক দিন স্মরণ করাইয়া দিবেন। আসল কথা, বিশেষ লক্ষমান প্রাণীকে ষোড়শোপচারে কদলীবৃক্ষের অছি নিযুক্ত করা হইল।

সেই অছিত্বের আওতায় তারপর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে ইহুদি বুলবুলির পাল আসিয়া আরবের গমক্ষেতে পড়িল। কিন্তু ছেলে ঘুমাইল না, পাড়া জুড়াইল না। আরবরা এক হাতে ঠেকায় ইংরাজকে, আরেক হাতে মারে ইহুদিকে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রশ্ন ঠেকাইতে পারিল না। 'খাজনা দেব কিসে?' শ্মশান হইতে মশান হইতে ঝোড়ো হাওয়ায় হা হা করিয়া তখন উত্তর আসিল, 'আব্রু দিয়া, ইজ্জত দিয়া, ইমান দিয়া, বুকের রক্ত দিয়া।' (কর্তার ভূত, লিপিকা, রবীন্দ্রনাথ)

কিন্তু সে সমস্যা অর্থনৈতিক। বুলবুলিরা কি সঙ্গে কিছুই আনে নাই? তাহার আলোচনা আরেক দিন হইবে।

২

ইহুদিদের পক্ষে যাঁহারা যুক্তিতর্ক উপস্থিত করেন, তাঁহাদের প্রধান সাফাই এই যে, ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে আসিবার সময় প্রচুর অর্থ সঙ্গে আনিয়াছে ও এখনো মাসে মাসে সমস্ত পৃথিবীর ইহুদি ধনপতিরা সে দেশে টাকা পয়সা ও অন্যান্য নানা তৈজসপত্র পাঠাইতেছেন।

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু তলাইয়া দেখিবার মত। উপনিষদের ঋষি বলেন, 'হিরণ্ময় পাত্র মধ্যে সত্য লুক্কায়িত আছেন'। অধিকাংশ লোক সেই পাত্র দেখিয়াই আনন্দে আত্মহারা হয়, বলে না, 'হে পূষণ, পাত্রটি উন্মোচন করিয়া দেখাও ভিতরে কি আছে।'

শ্রীহট্ট বা উত্তর আসামের ভিতর দিয়া যাইবার সময় দেখিবেন, দুই দিকে ঘন সবুজ টিলার গায়ে গায়ে সারি সারি. কাটাছাঁটা, সযত্নে বর্ধিত চায়ের গাছ। মাঝে মাঝে সরস সতেজ গোলমোহরের গাছ, শ্যামাঙ্গী কুলী মেয়েরা কাজ করিতেছে, দূরে ছবির মত সুন্দর কলকারখানা, ঝকঝকে তকতকে সায়েবদের বাঙলো, ক্লব হৌস, গলফ লিনকস্। এমন কি দূর হইতে কুলীদের ব্যারাকগুলি পর্যন্ত সুন্দর দেখায়।

ইংরাজ আমাদের চোখে আঙুল দিয়া বলে, 'দেখো, দেশের ধনদৌলত কি রকম বাড়াইয়াছি।'

ইহুদিরা যে অর্থ আনিল, তাহা দিয়া চাষের অনুপযুক্ত কোন কোন জলাভূমির জলকর্দম নিকাশ করিয়া সোনা ফলাইয়াছে। কিন্তু আসামের চা-বাগিচায় ও এই সব 'স্বর্ণভূমি'তে পার্থক্য এই যে, যদিবা আসামের চা-বাগানে কুলীরা এক বেলা খাইবার মত পয়সা রোজগার করিতে পারে, প্যালেস্টাইনের 'স্বর্ণভূমি'তে আরব চাষা-মজুরকে কাজ করিতে দেওয়া হয় না। ট্রাক্টর পাঠাইয়াছে মার্কিন ইহুদিরা, চালাইতেছে জর্মন ইহুদিরা, ফসল কাটিতেছে পোল ইহুদিরা, বাজারে লইয়া যাইতেছে অস্ট্রিয়ান ইহুদিরা। আরব অপাংক্তেয়। কিন্তু তাহারা আপত্তি ওজর জানায় না, বলে, 'নিষ্কর্মা জমি যদি কাজে লাগাইতে পারো, তাহাতে আমার আপত্তি কি?'

কিন্তু মার খায় যখন ইহুদি সেই ফসল, সেই জাফা কমলালেবু বাজারে ছাড়ে। ইহুদি ক্ষেতখামার করিয়াছে, জাতভাই মার্কিন ধনপতিদের অফুরন্ত পয়সায়।

জায়োনিস্টদের চাপে ও কিছুটা স্বেচ্ছায় তাহারা আরো পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া পুঁজি ঢালিতে প্রস্তুত। সে টাকার প্রতি প্যালেস্টাইনী ইহুদির বিশেষ দয়া-মায়া নাই—টাকাটা তো দিতেছেন গৌরী সেন। কাজেই ফসল নেবু বিক্রয় করিয়া যাহাই উঠে তাহাই তাহার লাভ। প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া যে জমি প্রস্তুত করা হইয়াছে, ফ্যাশেনবল ইহুদি মজুরকে বিস্তর অর্থ দিয়া যে ফসল ফলানো হইয়াছে, তাহা দিয়া লাভ করিতে হইলে বাজারের দর অপেক্ষা তাহার দর হইবে চারিগুণ, ছয়গুণ বেশী। সে দর তো ইহুদি কখনো পাইবে না, কাজেই বাজার দর অপেক্ষা আরো দুই পয়সা সস্তা করিয়া আরব চাষীকে ঘায়েল করিতে ক্ষতি কি?

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে অর্থের অপব্যয়, কিন্তু দূরদৃষ্টি দ্বারা জায়োনিস্ট দল হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, ইহাই প্রশস্ততম পন্থা। বাজারে যদি আরব চাষীকে ক্রমাগত বৎসরের পর বৎসর ফসল কম দরে বেচিয়া কাবু করা যায়, তবে সে আর জমি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে কয়াদন? পেট ভরিতে হইবে তো? বাবু যখন মনস্থির করিয়াছেন জমিটা লইবেনই, তখন উপেন ঘ্যান ঘ্যান করিয়া বাবুর পয়সা নষ্ট করেন ক্যান!

নিরুপায় হইয়া আরব জলের দরে ইহুদিকে জমি বেচিয়া আণ্ডাবাচ্চাসহ জেরুজালেম শহরে উপস্থিত হয়—দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত নরনারী যেমন কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছিল—ভাবে সেখানে গেলে রোজগারের ধান্দা জুটিবে। সেখানেও সেই অবস্থা। মার্কিন পুঁজির জোরে ইহুদি দোকানীরা আরব ব্যবসায়ীকে ঘায়েল করিতেছে আরো অল্পায়াসে, আরো কম খরচায়।

ইহুদিরা বলে, আরব চাষীরা জমি বেচে স্বেচ্ছায়, আপন খুশীতে, জমির বাজার দর কি তাহার তত্ত্ব-তাবাশ, তদ্বির-তদন্ত করিয়া। সত্যই তো আমরাও পাট বেচি স্বেচ্ছায় বাজার দর জানিয়া শুনিয়া, আমরাও ৩২-৩৩ সালে অধিকাংশ স্থলে ধান বেচিয়াছিলাম বহাল তবিয়তে খুশমর্জিতে। দুনিয়ার তাবৎ পাট আমাদের, তবু পাটের চাষী না খাইয়া মরে! ৩২-৩৩ সালে আঠারো আনা ফসল ফলাইয়াও চাষী না খাইয়া মরিল!

আরেক বিপদ, প্যালেস্টাইনে প্রজাস্বত্ব আইন নাই। আরব, তথা তুর্কী জমিদার মহাপ্রভুরা কাইরো, প্যারিসের বিলাস-বাসরের সর্দার। তালুকের পর তালুক বিক্রয় করিতেছেন পরমানন্দে, দুই পয়সা বেশী পাইয়া। যে জমিদার দেশে থাকে না, গরীব চাষার বেদনা সে বুঝিবে কি করিয়া, দরদ আসিবে কোথা হইতে? তারপর আরবদিগকে পুলিসের জোরে ভিটাজমি ছাড়া করা হয়, যে

মাটি তাহারা চাষ করিয়াছে বারো শত বৎসর ধরিয়া।

এতদ্দেশীয় সদাশয় সরকারও ব্যাপকভাবে এমন কর্মটি করেন নাই। তবু সাঁওতাল প্রজা-বিদ্রোহের করুণ কাহিনী যাঁহারা জানেন তাঁহাদের কাছে অবস্থাটা সরলই প্রতীয়মাণ হইবে।

তাই আরব লীগ, পিপলস্ পার্টি সকলেই একবাক্যে কাতর ক্রন্দন অনুনয়-বিনয় করিতেছে, আইন করা হউক ইহুদি যেন আরবের জমি কিনিতে না পারে। সর্বশেষে ভয় দেখাইয়াছে।

ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে এক অদ্ভুত অভিনব অর্থনৈতিক করদোঁ সানিতের (আরব ঠেকাইয়া রাখিবার বেড়া) সৃষ্টি করিয়াছে। আরব মজুরকে ডাকে নিতান্ত কালেভদ্রে, অত্যন্ত মুশকিলে পড়িলে, জিনিসপত্র কিনে ছয়গুণ মূল্যে জাতিভাইয়ের কাছ থেকে, বেচে আরবকে, আরবের হোটেলে যায় না, আরব কোম্পানীর বাসে চড়ে না, সমস্ত টেল আভিভ শহরে (প্যালেস্টাইনের ইহুদিদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রীয় শহর) দশটি আরব খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অর্থাৎ বিদেশ হইতে যে লক্ষ লক্ষ পৌণ্ড ডলার মাসে মাসে অকৃপণভাবে প্যালেস্টাইনে ঢুকিতেছে, সে অর্থ ইহুদিদিগের ভিতরই চক্রবৎ পরিবর্তন্তে। যেটুকু বাহিরে যায়, সে আরবের জমি কিনিতে ও গলা-কাটা কারবারে আরবের ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট করিতে। সেই টাকাটাও সূচ হইয়া ঢোকে, মুষল হইয়া বাহির হয়। আরবরা প্রায়ই ইহুদিদিগকে বলে, "বিদেশের পুঁজি না লইয়া আসো না একবার পাল্লা দিতে। আমরা যে রকম গরীব অবস্থায় সস্তায় কমলালেবু ফলাইতে পারি, তোমরা বাবুরা পারিবে? শুধু রুটি আর পেঁয়াজ খাইয়া কতদিন বাঁচবে?"

অথচ যে অজস্র অর্থ আসিতেছে তাহা দিয়া ব্যাপকভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠান করিবার উপায় নাই—কাঁচা মালের অভাবে। ভারতবর্ষে কাঁচা মাল আছে, তাহার বহু পুঁজি লণ্ডন, নিউইয়র্কে পড়িয়া আছে, তবুও দুর্বোধ্য কারণে আমরা কারখানা-কারবার করিতে পারিতেছি না। ঠিক সেই দুর্বোধ্য কারণেই ইহুদিদিগকে প্যালেস্টাইনে ব্যাপকভাবে কলকারখানা করিতে যাহারা দিতে চায় না, মধ্যপ্রাচ্যে আজ তাহাদেরই প্রতাপ।

প্যালেস্টাইনে ধন বাড়িয়াছে, কিন্তু সে-ধন আরবের শ্যাম নহে, তাহার শূল।

বারান্তরে অদ্যকার পরিস্থিতি লইয়া আলোচনা করিব।

নেটিভ স্টেট

স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে 'নেটিভ' শব্দটা ব্যবহার করিয়াছি, 'লেটিব' বলিলে আরো ভালো হইত। কারণ 'নেটিভ' বলিতে যাহা কিছু মন্দ, যাহা কিছু বীভৎস, যাহা কিছু পাশবিক ইঙ্গ-বঙ্গে বোঝায় ও বোঝানো উচিত তাহা বেশির ভাগ নেটিভ স্টেটে বর্তমান।

বাঙালীর উপর বিধাতার বহু অভিসম্পাত বর্ষিয়াছে; একমাত্র নেটিভ স্টেটরূপী গোদের উপর বিষফোঁড়া হইতে আমরা রক্ষা পাইয়াছি। যে দুইটি স্টেট আমরা চিনি তাহাদের সঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধার প্রীতির বন্ধন আছে। কবিগুরুকে যখন বাংলাদেশও চিনিত না, তখন ত্রিপুরার মহারাজ বিশেষ দূত পাঠাইয়া কিশোর কবিকে জয়মাল্যে বিভূষিত করিয়াছিলেন ও পরবর্তী যুগে তিনিও তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণ শান্তিনিকেতন—ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিশ্বভারতীকে বহু প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, রাজপুত্র রাজপরিজন শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর পদপ্রান্তে শিক্ষালাভ করিয়াছেন ও দেশে বিদেশে কবিকে সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

কুচবিহারও প্রাতঃস্মরণীয় কেশবচন্দ্রের আত্মীয়তা লাভ করিয়া কৌলীন্য-প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইদানীং কুচবিহারে যে গুণ্ডামি হইয়া গেল তাহা লইয়া দেশে আন্দোলন হইয়াছে ও হওয়া উচিত কিন্তু পশ্চিম ভারতে নিত্য নিত্য যে কাণ্ড হয় তাহা শুনিলে বাঙালীর চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে।

প্রথমতঃ কোনো নেটিভ স্টেটে কোনো প্রকার স্বায়ত্তশাসন নেই। কোনো কোনো অত্যন্ত "প্রগতিশীল' রাজ্যে 'ধারা' সভা থাকে। সে সভার প্রধান কর্ম রাজাকে সদুপদেশ দেওয়া। সে 'ধারাসভার' সভাপতি স্টেটের দেওয়ান বা প্রধানমন্ত্রী। রাজা সাধারণতঃ স্টেটের বাহিরে দেশের কোনো বড় শহরে বা ইয়োরোপে বিলাস-ব্যসনে মগ্ন—আমাদের জমিদাররা যেরূপ কলিকাতায় নানা 'সৎ'কর্মে লিপ্ত থাকেন—প্রধানমন্ত্রী সর্বেসর্বা। তিনি সভাপতি। তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাঁহারই নিন্দা করিবার বুকের পাটা থাকে কয়জনের? রসিক-জনেরা তাই 'ধারাসভা'র নাম দিয়াছেন 'রাধা' সভা। রাধা যে রকম শাশুড়ী-ননদীর ভয়ে চোখের জল ফেলিতেও সাহস করিতেন না, ইঁহাদের সেই অবস্থা।

আমাদের জমিদারেরা যেরকম নায়েব-ডাকিনীর হাতে প্রজাপুত্র সমর্পণ করিয়া আরামে দূরে থাকেন, নেটিভ স্টেটেও তাই। শুধু নায়েবের অত্যাচারের সীমা আছে, কারণ হাজার হউক পুলিস আছে, ম্যাজিস্ট্রেট আছে। তাহাদিগকে

সব সময় রীতিমত 'ওয়েলিং' না করার ফলে মাঝে মাঝে কল বিগড়াইয়া যায়। নেটিফ স্টেটে সে ভয় নাই। পুলিস, ম্যাজিস্ট্রেট দেওয়ানের অতিভক্ত বাহন।

দেওয়ান যত বেশী টাকা তুলিতে পারেন, মহারাজ তত খুশী। তিনি দেশে বিদেশে যে ভূতের খর্পরে তেল ঢালিতেছেন সে ভূতের তৃষ্ণার শেষ নাই। দরিদ্র প্রজার রক্ত চুষিয়া, হাড় পিষিয়া, মেরুদণ্ড চূর্ণ করিয়া তৈল বাহির করিতেছেন দেওয়ান। আত্মীয়-স্বজন ইয়ার-বক্সী হুঙ্কার দিয়া বিদ্রোহীকে কাবু করিতেছেন; কণ্ট্রাক্টে, একচেটিয়া কারবারে অন্যান্য শত উপায়ে উদরপূর্তি করিতেছেন। সিংহাসনে উপবিষ্ট মহারাজা সিংহের অংশ পাইতেছেন। যে দেওয়ান যত বেশী শোষণ করিতে পারে সেই তত 'কর্মদক্ষ'।

প্রজার নৈতিক চরিত্র যে তাহাতে কি পরিমাণ অধঃপাতে যায় বুঝানো অসম্ভব। যেখানে প্রভু স্বৈরাচারী, স্বাধিকারপ্রমত্ত সেখানে মানুষের বাঁচিবার উপায় কি থাকিতে পারে? একমাত্র পদলেহন ছাড়া তাহার অন্য কোনো পন্থা তো জানা নাই। বোম্বাই শহরে যদি দেখেন কেহ অতিরিক্ত বিনয় ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রকাশ করিতেছে তবে প্রশ্ন করিলে খুব সম্ভব জানিবেন যে, ভদ্রলোক নেটিভ স্টেটের লোক।

ধর্মসাক্ষী, আমরা কাহারো মনে আঘাত দিতে চাহি না কিন্তু সত্য নিরূপণে অপ্রিয় কথাও বলিতে হয়—আমরা নাচার।

আর যদি মহারাজা দেশে থাকেন তবে ব্যাপার আরও পেল্লাই। দেশী বিদেশী সায়েবসুবোতে সরকারী অতিথিশালা গমগম করিতেছে। নর্তক আসিয়াছে, নর্তকী আসিয়াছে, বাঈজী আসিয়াছে, গণিকা আসিয়াছে। হাজার মুর্গী—বাড়াইয়া বলিতেছি না—হাজার মুর্গী কাটিয়া তাহারি নির্যাস দিয়া বিশেষ জুষ তৈয়ারী হইতেছে,—বহুতর ডাক্তার কবিরাজ হাকিম ডাকা হইয়াছে, তাহারা বহুতর ইনজেকসন-টনিক, অরিষ্ট-আসব-প্রাশ-মোদক, হালুয়াতরওগণ লইয়া উপস্থিত। বর্দোবার্গেন্তি হইতে আরম্ভ করিয়া জাহাঙ্গীর-বাদশাহী ডবল ডেস্টিলড আরক, আফিঙ সব কিছু প্রস্তুত। সে কী বীভৎস শিবহীন দক্ষযজ্ঞ! দেশের অন্যান্য সরকারী কাজকর্ম বন্ধ। 'উদয়াস্ত' বলিব না, 'অস্তোদয়' দেওয়ান সাহেব প্রাসাদে চর্কীবাজীর মত তুর্কীনাচ নাচিতেছেন।

কোনো কোনো মহারাজা স্বরাজ্যে ফিরিলেই অরাজকতা আরম্ভ হয়। কলির কি বিচিত্র গতি! যে সব কাণ্ড তখন হয় তাহার বিবরণ খবরের কাগজে ছাপানো অসম্ভব। শুধু ডাক্তারী পুস্তকে তাহার বর্ণনা দেওয়া চলে। লজ্জাহীন উচ্ছৃঙ্খল তাণ্ডব নৃত্য তখন যে কী চরমে উঠিতে পারে তাহার বর্ণনা 'সত্যপীর'

যতই সত্যপ্রিয় হউন না কেন দিতে অক্ষম। সদাশয় সরকার বাহাদুরের কাছে এ-সব কীর্তি অজানা নহে।

এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, কোনো কোনো স্টেটে সর্ব-সাকুল্য আয়ের অর্ধাপেক্ষা বেশী ব্যয় হয় 'মেহমানদারী খাতায়' অর্থাৎ এই সব ভূতের যজ্ঞে।

আমার একটি রাজপুত শিষ্যের বিবাহ উৎসবে আমাকে যাইতে হইয়াছিল; যাহা দেখিয়াছিলাম ও শুনিয়াছিলাম তাহা অবর্ণনীয়।

দেশের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে অবশ্য এহসব অশ্লীলতার যোগ বিশেষ নাই। কিন্তু আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করিয়া আমি সর্বদা মর্মাহত হইয়াছি। নেটিভ স্টেটের বালক-বালিকা ছাত্রছাত্রীদের দাস্যভাব।

এক অতি সম্ভ্রান্ত স্টেটে দেওয়ানের নাতি ইস্কুলের ছাত্র-মাস্টারের উপর ঠাকুর-দাদার অপেক্ষাও কঠিন ডাণ্ডা চালাইত। মাস্টারদের ঘরের পাশে তাহার জন্য বিশেষ বসিবার জায়গা, সেইখানে সেই শাখামৃগ তাহার ইয়ার-বক্সীদের লইয়া অঙ্গদের রায়বার বসাইত। আর কী দাপট! হেডমাস্টারকে শাসায় ঠাকুর-দাদাকে বলিয়া তাহাকে আন্দামান অর্থাৎ রাজধানী হইতে দূরে গণ্ডগ্রামে বদলি করাইবে। মাস্টার বৃদ্ধ—পেনসন-পেয়ালায় চুম্বন দিব-দিব করিতেছেন, ফস্কাইলেই সর্বনাশ। সব কিছু নীরবে সহিয়া যাইতেন।

ইস্কুল হইতে ছেলেমেয়ে বাছাই করিয়া রাজবাড়িতে রাজপুত্র রাজকন্যাগণের সঙ্গে পড়িবার জন্য লইয়া যাওয়ার রীতি কোনো কোনো স্টেটে আছে।

রাজা বিদেশে, কাজেই সে ইস্কুলের বড়া শয়তান যুবরাজের সেখানে সপত্নহীন রাজত্ব। কারণ রাজা ছাড়া যুবরাজকে তম্বী কে করিতে পারে? আর সকলেই দিন গুনিতেছেন, যুবরাজ কবে রাজা হইয়া তাহাদিগকে বড় বড় তঙ্কার নোকরি দিবেন। কাজেই যুবরাজের শিক্ষা অগ্রসর হইতেছে না, অন্য ছেলেমেয়েদের কি সাহস যে, যে-পাঠ যুবরাজ পড়িতে পারেন না তাহা তাহারা পড়িতে পারার দম্ভ করিবে। বাপ-মা ছেলেদের বিশেষ করিয়া বলিয়া দেন যেন তাহারা ঐ সব লেখা-পড়ার মত অবান্তর বাহ্যবস্তুর প্রতি মনোযোগ না করে—সারবস্তু, যেন যুবরাজকে খুশী রাখা হয়। তিনি বড় হইয়া তাহাদের প্রতি নেকনজর দিলে তাহাদের তখন ভূগোল ইতিহাসের কি প্রয়োজন? আর লেখাপড়ায় ফপরদালালি করিয়া যদি এখন তাঁহাকে চটায় তবে পরে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে কোন্ জ্যামিতি কোন্ ব্যাকরণ? স্মরণ তো রাখিতে হইবে এযুগে চাণক্য প্রবচনের প্রথমার্ধ 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা' খাটে কিন্তু 'বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে' আর খাটে না।

যুবরাজ বড় হইলে এই সব অকাল-কুষ্মাণ্ডেরা উজীর নাজীর কোটাল হয়।

তাহাদের না আছে শিক্ষা, না আছে শীল। কুলীনের যে নবধা কুললক্ষণ, সে সব তাবৎ কয়টির সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি যদি কোনো ব্যক্তিতে পান, তবে বুঝিবেন, তিনি 'নেটিভ' স্টেটের রাজার বাঁদর-নাচের পুচ্ছহীন মর্কট, অর্থাৎ সেখানকার হোমরা-চোমরা অথবা বড় কর্মচারী।

কোনো কোনো খবরের কাগজে দেখিলাম, নেটিভ স্টেটগুলিকে মধ্য-যুগের সামন্ত রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করিয়াছে। তাহাতে মধ্যযুগের সামন্ত রাজ্যের প্রজাদের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। আমি পশ্চিম ভারতের যেটুকু ইতিহাস পড়িয়াছি তাহাতে দেখিয়াছি যে, মধ্যযুগে কোনো রাজা কাণ্ডজ্ঞানহীন উচ্ছৃঙ্খল-তায় মত্ত হইলে প্রজা বিদ্রোহী হইয়া রাজাকে তাড়াইয়াছে, অথবা অন্য সামন্ত রাজা প্রজাদের অসন্তোষের খবর পাইয়া সে রাজ্য আক্রমণ করিয়া নিজ রাজ্য বৃদ্ধি করিয়াছেন অথবা দিগ্বিজয়ী বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। এখন প্রজা-বিদ্রোহেরও উপায় নাই। নানা রকম ট্রিটির জোরে মহারাজ বহিঃশক্তি আহ্বান করিয়া দুই মিনিটেই সব বিদ্রোহ ঠাণ্ডা করিয়া দিতে পারেন। প্রজারা কর্মে মগ্ন বলদের মত একদিকে খায় রাজার মার, অন্যদিকে খায় 'ট্রিটি'র মার।

তবু মাঝে মাঝে যখন অত্যাচার অসহ্য হয় তখন অনেক সুবিধাবাদী মকুবির জয়জয়কার আরম্ভ হয়। তাহারই একজনের সঙ্গে আমার বোম্বায়ে আলাপ হয়। তাঁহার পেশা নাকি জর্নালিজম। শুধাইলাম, 'মহাশয় কোন্ কাগজে লেখেন?' বলিলেন, 'আজ্ঞে, কোনো কাগজেই লিখি না, না লিখিয়া পয়সা কামাই।' আমি বলিলাম, 'সে কি মহাশয়, কালিদাসের 'নাই তাই খাচ্ছ' ব্যাপার নাকি?' বলিলেন, 'অনেকটা তাই; নেটিভ স্টেটে ফ্রেস কেলেঙ্কারির খবর পাওয়া মাত্রই সেখানে উপস্থিত হইয়া নানা তদ্বির-তদন্ত করিয়া রাজা বা দেওয়ানের বিপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করি। তারপর দেওয়ানকে বলি, 'কত ওগরাবে কও।' দেওয়ান বেশ টু পাইস দেয়—অবশ্য অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা। তাই আর কেচ্ছাটা লেখার প্রয়োজন হয় না। আর লিখিয়াই বা হইবে কি? ফি কলম কুড়ি টাকা তো? তাহাতে আমার এক সন্ধ্যার ইয়ের খরচটাই উঠিবে না।' জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কিন্তু যাহাদের নানা ভরসা দিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করিলেন, সে প্রমাণ দেওয়ানকে যে সমঝাইয়া দিলেন, তাহাদের কি?' পাষণ্ড কি বলিল জানেন? 'আণ্ডা না ভাঙিয়া কি আর মামলেট হয়!'

কোনো কোনো নেটিভ স্টেটে প্রজামণ্ডল আছে,—শুনিলাম কুচবিহারে নাই। প্রজামণ্ডল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হইয়া স্টেটের প্রজাবর্গের উন্নতির চেষ্টা করেন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন, 'ধারা সভায়' প্রবেশ করেন ও ব্রিটিশ

ভারতে ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হইলে যোগদান করেন। লক্ষ্য করিয়াছি, যে স্টেটে অবিচার কম সেখানে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দেওয়া আন্দোলনে জোশ কম থাকে। ব্রিটিশ ভারতে আমরা বিদেশী রাজের বিরুদ্ধে যে জোর পাই, ভালো স্টেটে প্রজারা সে জোর পাইবে কোথা হইতে? মন্দ স্টেটে আন্দোলন ভালো চলে, কারণ রাজা বা দেওয়ান তখন বিদেশী শাসনের প্রতীক হইয়া দাঁড়ান।

পশ্চিম ভারতের কংগ্রেস কর্মীরা প্রজামণ্ডলগুলির সঙ্গে সর্বদা যোগসূত্র রক্ষা করেন। পূর্ব ভারতে আমাদের অন্ততঃ খবর রাখা উচিত—না হইলে অখণ্ড সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের প্রতি রাজনৈতিক সিংহাবলোকন চক্রবালে পরিব্যাপ্ত হয় না।

কোনো কোনো স্টেটে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানও আছেন; কর্মীরা মুসলিম স্বার্থ রক্ষা করিবার প্রয়াস করেন। খুব দরকার হয় না, কারণ দেশী স্টেটে হিন্দু-মুসলমানের দলাদলি কম।

এই একটিমাত্র গুণ দেশী রাজ্যে আছে। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সেখানে হয় না। কারণ হিন্দু-মুসলমানকে লড়াইয়া সেখানে রাজার কোনো ফায়দা নাই। কোনো কোনো স্টেটে হিন্দু-মুসলমানের হৃদ্যতা দেখিয়া ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ লইয়া মনে মনে সুখস্বর্গ গড়িয়াছি।

উত্তম রাজা যে দেশী রাজ্যে কুত্রাচ নাই, এমন নহে। বরদার ভূতপূর্ব মহারাজ স্বর্গীয় সয়াজী রাওয়ের মত প্রজাপালক দেশে-বিদেশে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন। কিন্তু তিনিও তো বাল্যকাল কাটাইয়াছিলেন রাখাল ছেলেদের সঙ্গে। তিনি রাজা ছিলেন, কিন্তু কখনও যুবরাজ ছিলেন না—দত্তক পুত্ররূপে রাজা হন। দুই-একটি জনপ্রিয় রাজা যদি বা স্টেটে জন্মান তবু তাঁহাদের জন্য নেটিভ স্টেট রূপ জঞ্জাল রাখিবার প্রয়োজন নাই।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত দৃঢ় বিশ্বাস, স্বাধীন ভারতে দেশী রাজ্যের স্থান নাই।

ধবলদন্ত

'জর্জিক জাহাজে সেদিন ভারতীয়দের প্রতি যে অদ্ভুত ব্যবহার করা হইল তাহা ধবলদন্তের, স্বাধিকার প্রমত্ততার বিকৃত রূপ। এই সম্পর্কে আমার আরেকটি ঘটনার কথা মনে পড়িল। সে অনেক দিনের কথা; কিন্তু বহু ভারতীয় বিদেশে যান, ঘটনাটি মনে রাখিলে তাঁহারা উপকৃত হইবেন।

১৯২৮ সালের প্রচণ্ড শীত কাবুলে প্রচণ্ডতর হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময় আমানউল্লা বাচ্চা-ই-সকাওর হস্তে পরাজিত হইয়া রাতারাতি কাবুল ত্যাগ করিয়া কান্দাহার চলিয়া যান। বাচ্চা তখনও শহরে প্রবেশ করেন নাই। সেখানে তখন নির্মম বীভৎস অরাজকতা চলিয়াছে। রাজা নাই; পুলিস, মিলিটারি প্রাণরক্ষার্থে উর্দি ছাড়িয়া আত্মগোপন করিয়াছে। শহরে রাস্তায় রাস্তায় প্রকাশ্য লুটতরাজ, খুন-খারাবী চলিয়াছে। বাচ্চার অগ্রগামী সৈন্যরাই প্রধান দস্যু, তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ অত্যাচার রুদ্ধ করিবার মত কোন প্রতিষ্ঠান তখন কাবুলে ছিল না।

দোকান-পাট বন্ধ। রাস্তায় বাহির হইবার উপায় নাই। ওভারকোটের লোভে যে কোনো দস্যু আপনাকে গুলি করিতে প্রস্তুত। চাহিলে পর দিলে গুলি করার রেওয়াজ আফগান দস্যুদের মধ্যে প্রচলিত নাই।

খাস কাবুলীরা এরকম বিদ্রোহ ও লুটতরাজ ব্যাপারে অভ্যস্ত। বিশৃঙ্খলতার গন্ধ পাইবা মাত্রই তাহারা বছর দুইয়ের খোরাক বাড়ীতে যোগাড় করিয়া রাখে। বিপদে পড়িলেন বিদেশী অধ্যাপক ও শিক্ষকেরা। ইঁহারা সকলেই কাবুলে নবাগত—কাবুলী কায়দা জানেন না। আহারাদি সঞ্চয় করিয়া রাখেন নাই। পক্ষাধিককাল যাইতে না যাইতেই তাঁহাদের নিরম্বু একাদশী আরম্ভ হইল—কারণ কলের জল পর্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

বাচ্চা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রথম 'সৎকর্ম' করিলেন—অধ্যাপক শিক্ষকদের বরখাস্ত করিয়া। প্রাপ্য বেতনও তাঁহাদিগে দেওয়া হইল না। সে-যুগে কাবুলে কোনো ব্যাঙ্ক ছিল না বলিয়া অধ্যাপক-শিক্ষকেরা সঞ্চিত অর্থ পেশাওয়ার বা লাহোরের ব্যাঙ্কে রাখিতেন। তাঁহারা তখন কপর্দকহীন; সে দুর্দিনে ধারই বা দিবে কে? কাবুলের সঙ্গে তখন বহির্জগতের কোনো যোগাযোগ নাই।

পরিস্থিতি আলোচনা করিবার জন্য ফরাসী, জর্মন ও ভারতীয় শিক্ষকেরা একত্র হইয়া জিরগা করিলেন। তখন প্রথম অসুবিধা হইল ভাষা লইয়া। সকলে জানেন এমন কোনো ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সে সভায় মাত্র একজন বাঙালী ছিলেন। তিনি ফারসী ফরাসী জর্মন তিনটি ভাষাই জানিতেন বলিয়া তাঁহাকেই সভাপতি করা হইল। সভায় স্থির হইল যে, যেহেতু অধ্যাপকেরাই সর্বাধিক বিপদে পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগের জন্য যদি সদাশয় ব্রিটিশ লিগেশন কোনো উপায় অনুসন্ধান করিয়া দেন, তবে তাঁহারা কৃতার্থম্মন্য হইবেন। এই মর্মে ডেপুটেশন পাঠানো স্থির হইল।

লিগেশন হইতে উত্তর আসিল ফরাসী-জর্মনরা যেন স্ব স্ব লিগেশনের দৌত্যে

নিজ নিজ অসুবিধা পেশ করেন। ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা করিতে লিগেশন-কর্তা হিজ এক্সেলেন্সি লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্নেল শ্রীযুক্ত সর ফ্রান্সিস হমফ্রিস রাজী আছেন।

ইতোমধ্যে সর ফ্রান্সিস বাচ্চার সঙ্গে আলাপ করিয়া পেশাওয়ার হইতে কাবুলে রোজ একখানা, দুইখানা হাওয়াই জাহাজ আনাইবার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। ফরাসী জর্মন ইতালিয়দের সেই জাহাজগুলিতে করিয়া ভারতে পাঠানো আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

ডেপুটেশন নিবেদন করিল যে, ভারতীয় শিক্ষকেরা উপবাসে প্রায় মরিবার উপক্রম। ভারতে যাইবার অন্য সব পন্থা যখন রুদ্ধ তখন সায়েব যদি তাহাদিগকে হিন্দুস্থান পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন ইত্যাদি ইত্যাদি। সায়েব বলিলেন, "দেখুন কাবুলের ব্রিটিশ লিগেশন লণ্ডনস্থ ব্রিটিশ সরকারের সিন জেমস (অথবা ঐ জাতীয় অন্য কিছু বিজাতীয়) কোর্টের মুখপাত্র (Representative)। ভারতীয়েরা হক্কের জোরে (as a matter of right) আমাদিগের নিকট হইতে কোনো সাহায্য দাবী করিতে পারেন না। মেহেরবানি-রূপে (as a matter of favour) চাহিতে পারেন।"

ডেপুটেশনের বাঙালী মুখপাত্রটি বলিলেন, "সে কি কথা সায়েব, এই যে হাওয়াই জাহাজ আসিতেছে সেগুলি তো ইণ্ডিয়ান আর্মির পয়সায় কেনা, পাইলট মেকানিক ভারতীয় তনখা খায়, যে জায়গায় গিয়া জাহাজখানা লইবে সেও তো ভারতের জমি।" "তুমি আবার পরের ধনে পোদ্দারী না হউক, পরের জাহাজে কাপ্তেনী কেন করিতেছ!" অবশ্য একথা তিনি জিজ্ঞাসা করেন নাই।

চোর বরঞ্চ ধর্মের কাহিনী শোনে—না হইলে বাল্মীকি উদ্ধার পাইতেন না—কিন্তু ধবলদন্ত হম্বড়াঙ্গির দ্বিরদরদস্তম্ভে গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। বাঙালীটি তখন লক্ষ্য করিলেন যে, ডেপুটেশনের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তখন তিনি গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "সায়েব, এই যে হক্ আর মেহেরবানি লইয়া কথা বলিলাম, তাহা নিতান্ত আমার ব্যক্তিগত মতামত। এখন জীবনমরণ সমস্যা। ডেপুটেশনের অন্যান্য সদস্যগণের সঙ্গে আলোচনা করিয়া কর্তব্য স্থির করুন।" সদস্যগণ একবাক্যে সায় দিলেন যে, হক্ মেহেরবানি লইয়া কথা-কাটাকাটি করা বাতুলতা। আত্মানাং সততং রক্ষেদ্ দারৈরপি ধনৈরপি।

বাঙালীটি বলিলেন, "বিলক্ষণ, কিন্তু সায়েব, আমি ভারতে, স্বদেশে মেহের-বানিরূপে যাইব না, যদি যাই, যাইব হক্কের জোরে। বন্ধুগণ, নমস্কার, সায়েব, সেলাম।"

সন্ধ্যাকালেই ভদ্রলোক খবর পাইলেন যে, তাঁহার নাম ভারত প্রত্যাগমন-কামীদের নির্ঘণ্ট হইতে নাকচ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। খবরটি দিলেন ভদ্র-লোকটির বন্ধু, ব্রিটিশ লিগেশনের অরিয়েন্টল সেক্রেটারী, খান বাহাদুর শেখ মহবুব আলী খান, বন্ধুভাবে, সরকারী খবর হিসাবে নয়। তারপর সেই সব জাহাজে করিয়া ফরাসী গেল, জর্মন গেল, ইতালিয় গেল, তুর্ক গেল, ইরানি গেল, ব্রিটিশ লিগেশনের মেয়েরা গেলেন। তারপর সর্বশেষে ভারতীয় মেয়েদের খোঁজ পড়িল। তাঁহাদের অনেকেই পুরুষ অভিভাবক ছাড়া হাওয়াই জাহাজে চড়িয়া পেশোয়ার যাইবার হিম্মৎ পান না—কেহ কেহ গেলেন, কেহ কেহ রহিলেন। ভদ্রলোকটি রীতিমত জোর-জবরদস্তি করিয়া রবীন্দ্রনাথের শিষ্য, (পরে) শান্তি-নিকেতনের অধ্যাপক, স্বর্গীয় মৌলানা জিয়াউদ্দিনের স্ত্রীকে হাওয়াই জাহাজে তুলিয়া দিয়া আসিলেন। তারপর অতি সর্বশেষে ভারতীয় পুরুষদের পালা আসিল। কিন্তু ভদ্রলোকটির নামে তো ঢেরা পড়িয়াছে; তিনি পেটে কিল মারিয়া কাবুলের মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া রহিলেন।

এদিকে ভারতবর্ষে ভদ্রলোকের পিতা পুত্রের কোনো খবর না পাইয়া আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন ও টেলিগ্রাফ আফিসে থানা বাঁধিয়াছেন। দিল্লী সিমলা যেখানে যাহাকে চিনিতেন, অহরহ তার করিতেছেন, আমার পুত্রের কি খবর! আসামের বর্তমান রাজস্বসচিব (?) মৌলবী আবদুল মতীন চৌধুরীও এক-খানা তার পাইলেন। সেইদিনই সর ডেনিস ব্রের সঙ্গে তাঁহার দেখা। ভোট সংক্রান্ত কি একটা ব্যাপারে সর ডেনিস মতীন সাহেবের কাছে যান। তিনি বলিলেন, "তোমরা যে কাগজে ছাপাইতেছে ভারতীয়দের আনা হইতেছে, অমুকের খবর কি?"

সর ডেনিস কাবুলে বেতার পাঠাইলেন সর ফ্রান্সিসকে, "অমুককে তার-পাঠ পাঠাও।" সাইমন কমিশন তখন আসিব-আসিব করিতেছে অথবা আসিয়াছে। সর ডেনিস সেন্ট্রাল এসেমব্লির সদস্যকে সস্তায় খুশ করিতে কেন নারাজ হইবেন। কোনো ভারতীয়কে বাঁচাইবার জন্য ঐ একটিমাত্র বেতার সেই সময় ভারতবর্ষ হইতে কাবুল যায়। পেশাওয়ার সরকার ও কাবুলের ব্রিটিশ লিগেশনে বেতার চলিত, বলা বাহুল্য যে, সে-বেতারের সুবিধা ভারতীয়দের দেওয়া হয় নাই। কাবুলে বসিয়া ভদ্রলোক অবশ্য এসব খবর পান নাই।

সে-বেতার লিগেশনে কি অলৌকিক কাণ্ড বা তিলিসমাত করিল তাহা স্থানা-ভাবে বাদ দিলাম। পরদিন ভদ্রলোক খবর পাইলেন, তাঁহার জন্য আগামী-কল্যের হাওয়াই জাহাজে একটি স্থান রিজার্ভ করা হইয়াছে। 'ফেবার' না

'রাইট' তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আর হইল না।

সর্বস্ব কাবুল দস্যুদের জিম্মায় ফেলিয়া মাত্র দশ সের (অথবা পৌণ্ড) লগেজ লইয়া ভদ্রলোক হাওয়াই জাহাজে করিয়া পেশাওয়ার ফিরিলেন। বিমান-ঘাঁটিতে সর ফ্রান্সিস করমর্দন করিয়া বলিলেন, "আমরা ভারতীয়দের যথাসাধ্য সাহায্য করিবার চেষ্টা করিয়াছি, আশা করি, আপনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া সব কথা বলিবেন।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "নিশ্চয়ই সব কথাই বলিব।" দেশে ফিরিয়া তিনি জমিয়ত-উল-উলেমার নেতা মৌলানা হুসেন আহমদ মদনীকে আদ্যোপান্ত বলেন। আন্দোলনও হইয়াছিল কিন্তু কোনো ফল হয় নাই। লিগেশন-কর্তা প্রমোশন পাইয়া ইরাক না কোথায় চলিয়া গেলেন।

বর্ণনা শেষ করিয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন, কিন্তু আমার চরম শিক্ষা হইয়া গেল। কাবুল গিয়াছিলাম টাকা রোজগার করিয়া ইউরোপে পড়িতে যাইবার জন্য। কোন্ দেশে যাইব বহুদিন মনস্থির করিতে পারি নাই। এই ঘটনার পর নির্দ্বন্দ্ব মনে ইংলণ্ড বর্জন করিলাম। পড়িতে গেলাম অন্য দেশে—ও ফরাসী জাহাজে।

চতুরঙ্গ

পূব বাংলা যখন পাকিস্তানের অংশরূপে "স্বাধীন" হল তখন ঐ অঞ্চলের লোক সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারেন নি, তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টি কৃষ্টি গবেষণা কোন্ পথে চলবে। "অখণ্ড পাকিস্তান" নির্মাণের সহায়তা করার জন্য তাঁরা উর্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হবেন, না, যে বাংলা ঐতিহ্য উভয় বাংলা অনুকরণ করছে সেই পন্থা অবলম্বন করবেন? একটু সময় লাগলো।

(১) ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকার "বর্ধমান হাউসে"—"বাংলা অ্যাকাডেমি"। কিছুদিন পরেই তাঁদের প্রথম ত্রৈমাসিক বেরলো। দুই বাংলাতে তখনও পুস্তকাদি অনায়াসে গমনাগমন করতো। প্রথম সংখ্যা এ-বাংলায় পৌঁছনো মাত্রই তার আলোচনা "দেশ" পত্রিকায় বেরোয়। এ-বাংলা তাকে সানন্দ অভিনন্দন জানায়। আজ যদি দুষ্টজন বলে, পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিকরা "বাংলাদেশের" লোকজনকে অখণ্ড পাকিস্তান ধ্বংস করার জন্য যাবতীয় কারসাজি করছে, তবে অকুণ্ঠ ভাষায় বলবো,—যখন আমরা "দেশ" মারফৎ ঐ ত্রৈমাসিককে স্বাগত জানাই তখন আমাদের ভিতর কেউই রাজনৈতিক ছিলেন না। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার তাঁদের পেটুয়া কিছু কিছু বাঙালী মোল্লা মুন্সীকে অ্যাকাডেমিতে ছলে-

বলে ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁরা বললেন, "পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র। কিন্তু বাংলা ভাষায় ইসলামের উত্তম উত্তম আরবী ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ নেই। অতএব আমাদের প্রথম কর্ম কুরান-শরীফের বাংলা অনুবাদ করা।" সভাপতি বললেন, "সে কি? আমারই জানা-মতে অন্তত পাঁচখানা বাঙলা অনুবাদ রয়েছে।" মোল্লারা: "তা হলে হদীসের (কুরানশরীফের পরেই হদীস আসে) অনুবাদ করা যাক।" আসলে মোল্লারা চান ঐ মোকায় বেশ দু পয়সা কামাতে। আর এদিকে বেচারী অ্যাকাডেমি সবে জন্ম নিয়েছে। অজাতশত্রু হতে চায়। স্বীকার করে নিল। সে কর্ম এখনও সমাপ্ত হয় নি। কারণ সমাপ্ত হলেই তো কড়ি বন্ধ হয়ে যাবে। (এ টেক্‌নিক আমাদের এ দেশের ডাঙর ডাঙর আপিসাররাও জানেন।) বাঙলা অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান আমাকে বললেন, "এ যাবৎ তেনারা আশি হাজার টাকা গ্যাটস্থ করেছেন।" এই মোল্লাদের অনেকেই এখন খানকে সাহায্য করছেন —মীরজাফররূপে।

(২) কেন্দ্র বাংলা উন্নয়ন বোর্ড।

আপনারা বাঙালদের যত মূর্খ ভাবেন তারা অতখানি মূর্খ নয়। তারা তখন অন্য প্যাঁচ কষলে। তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানালে, "আমাদের পাঠশালা ইস্কুলে যে-সব টেকস্‌ট বই পড়ানো হচ্ছে সেগুলো বড়ই "অনৈসলামিক ভাবাপন্ন"। অতএব সেগুলো নাকচ করে দিয়ে নয়া নয়া কেতাব লেখা হোক।" গাড়োল রাওলপিণ্ডী সে ফাঁদে পা দিল। তখন সৃষ্ট হল "কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড।" কিন্তু ইয়া আল্লা ইয়া রসুল। কোথায় না তারা প্রস্তাবিত কর্মে লিপ্ত হবে, না তারা লেগে গেল বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের পরিপূর্ণ পদ্য-গদ্য রচনা সম্পূর্ণাকারে প্রকাশ করতে। আমার মনে হয়, তখনই তারা ভিতরে ভিতরে আপন অজান্তে জেনে গেছে, ঝঞ্ঝা আসন্ন, পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে একটা দফারফা করতেই হবে। অতএব বিদ্রোহী কবি কাজীই আমাদের ভরসা। কী সুন্দর তিন ভল্যুম এযাবৎ বেরিয়েছে। যিনি সম্পাদনা করেছেন তাঁর নাম বলবো না। পাছে না টিক্কা খানের লোক তাকে গুলি করে মারে। (টিক্কা অর্থ "টুকরো"— ফারসীতে বলে "টিক্কা টিক্কা মী কুনস্‌"—"তোকে টুকরো টুকরো করবো"। আমরা যে রকম "তিনকড়ি", "এককড়ি", "ফকীর" "নফর" নাম দিই যাতে করে যম তাকে না নেয়।)

(৩) এসিয়াটিক সোসাইটি অব্‌ ঈস্‌ট্‌ পাকিস্তান স্থাপিত হল। (ঠিক কি নাম বলতে পারছিনে।) এতেও পশ্চিম পাকের খানরা চটে গেলেন। কারণ বাঙালরা তখন বগুড়ার মহাস্থান গড়, কুমিল্লার ময়নামতী-লালমাই (এই

ময়নামতী অঞ্চলেই এখন লড়াই চলছে)—যে সব স্থলে বৌদ্ধ বিহার স্থাপিত ছিল, যে সবের বর্ণনা চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সং দিয়েছেন, সেই নিয়ে তারা লেকচর দিচ্ছে, সেমিনার করছে। "তোবা, তোবা" !

(৪) এবং এসবের বহু পূর্বেই আবদুল হাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ও সংস্কৃতির প্রধানতম অধ্যাপক, তাঁর সাংস্কৃতিক ত্রৈমাসিক বের করে যাচ্ছেন। এবং তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর ঐ পত্রিকায় আমাদের পশ্চিম বাংলার হরেন পাল মহাশয়ের অভিধান।

এই চতুরঙ্গে বাঙলা দেশ তার আপন পথে এগিয়ে যাচ্ছিল রাজনীতিকে উপেক্ষা করে। এমন সময় ইয়াহিয়া খান মারলেন ঐ প্রগতির উপর থাপ্পড়। এর উত্তরে আমরা শুধু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারি।

"রাহুর দন্ত, রাহুর মতো,
একটু সময় পেলে
নিত্যকালের সূর্যকে
সে এক-গরাসে গেলে।
নিমেষ পরেই উগরে দিয়ে
মেলায় ছায়ার মতো,
সূর্যদেবের গায়ে কোথাও
রয় না কোন ক্ষত।
বারে বারে সহস্রবার হয়েছে এই খেলা,
নতুন রাহু ভাবে
তবু হবে না মোর বেলা।
কাণ্ড দেখে পশুপক্ষী
ফুকরে ওঠে ভয়ে,
অনন্তদেব শান্ত থাকেন
ক্ষণিক অপচয়ে।"

হ য ব র ল

১

তথাকথিত পণ্ডিতেরা বলেন, "আসাম দেশ অসমান বলিয়া ইহার নাম আসাম।" অথচ আদি বাসিন্দাদের নাম 'অহম'। ইহাদের নামেই দেশের নাম হওয়া উচিত 'অহম' দেশ। প্রকৃত তত্ত্ব এই যে, 'আসাম' হইতে 'অহম' হয় নাই,

'অহম' হইতে 'আসাম' হইয়াছে। ফোক্ ফিললজিস্ট অর্থাৎ গাঁওবুড়ো শব্দ-তাত্ত্বিক মনে মনে তর্ক করিয়াছেন যে, যেহেতু শুদ্ধ বাঙলার 'সেপার' পূর্ববঙ্গে 'হেপার', 'সাগর' 'হাওর', 'সরিষা' 'হইরা' হয়, অতএব উল্টা হিসাবও চলে—অর্থাৎ 'স' যখন 'হ' হইতে পারে তখন 'হ'-ও 'স' হইতে পারে। এই নীতি চালাইলে যে 'হাসানো' আর 'শাসানো' একই ক্রিয়া হইয়া দাঁড়ায়, গাঁওবুড়ারা তাহা খেয়াল করিলেন না। স্থির করিলেন 'অহম'ই 'অসম'; তারপর 'অসম' হইতে 'আসাম' হইল। তখন তথাকথিত পণ্ডিতেরা আসিয়া সমাধান করিলেন, "এই দেশ অসমান বলিয়া ইহার নাম আসাম।"

গাঁওবুড়াদের মূর্খ বলিলে আমাদের অন্যায় হইবে। 'উল্টাপুরাণ' যে সর্বত্র চলে না—এ জ্ঞান এখনও বহু নাগরিকের হয় নাই। 'সায়েবরা হ্যাটকোট পরেন' অতএব 'হ্যাটকোট পরিলেই সায়েব হইয়া যাইব' 'গায়িকা সুন্দরী কাননবালা লম্বা হাতা জামা পরেন' অতএব 'লম্বা হাতা জামা পরিলে গায়িকা ও সুন্দরী হওয়া যায়' এই ভুলযুক্তিজনিত আচার তো হাটে-ঘাটে ট্রামে-বাসে সর্বত্র দেখা যায়।

* * *

এই আসাম হইতে প্রত্যাগত এক বন্ধু বলিলেন যে, এতদিন আসামে যে তিন দলে রাজনৈতিক রেষারেষি চলিত তাহার সঙ্গে এখন চতুর্থ দল আসিয়া জুটিয়াছে। এই তিন দলের প্রথম দল 'আসামী' বা 'অসমিয়া' (উচ্চারণ 'অহমিয়া'); ইঁহারা আসামী ভাষায় কথাবার্তা বলেন। আসামী ভাষা ও বাংলায় পার্থক্য ওড়িয়া বাঙলা অপেক্ষাও কম; আসামীদের গাত্রে আর্য ও অহম রক্তের সংমিশ্রণ, যেরকম বাঙালীর ধমনীতে আর্য ও মঙ্গোল-দ্রাবিড় রক্তের সংমিশ্রণ। দ্বিতীয় দল শ্রীহট্ট, কাছাড়, গোয়ালপাড়ার অধিবাসী বাঙালী। ইঁহারা মূলতঃ বাংলা দেশেরই লোক, ইঁহাদের বাসভূমি বাঙলাদেশ হইতে কর্তন করিয়া আসামে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ইঁহাদের অনেকেই চাহেন যে, ঐ সব জিলাগুলি যেন পুনর্বার বাঙলাদেশে ফিরাইয়া লওয়া হয়। তৃতীয় দল বিশুদ্ধ 'অহম'। ইঁহারা আসামের আদিম বাসিন্দা, ইঁহাদের অনেকেই আর্যরক্ত দ্বারা 'অশুদ্ধ' বা 'শুদ্ধ'—যাহাই বলুন—না হইয়া আপন আভিজাত্য রক্ষা করিয়াছেন। চতুর্থ দল নূতন আসিয়া জায়গা চাহিতেছেন, ইঁহারা গারো, লুসাই, কুকী নাগা, আবর মিশমি ইত্যাদি পার্বত্য জাতি। ইঁহারা আসামের আদিমতম বাসিন্দা এবং আসামের রাজনৈতিক যজ্ঞশালায় ইঁহারা এতদিন অপাংক্তেয় ছিলেন।

* * *

যতদূর মনে পড়িতেছে ১৮৩২ সালে কাছাড় লর্ড বেনটিঙ্কের সময় ইংরাজ কর্তৃক অধিকৃত হয়। তাহার পর একশত বৎসর কাটিয়াছে। ধীরে ধীরে ইংরাজ গারো, লুসাই, নাগা অঞ্চলে আপন ডেরা ফেলিয়া ফেলিয়া দখল বাড়াইয়া চলিয়াছেন। ইঁহাদের জন্য ইংরাজ সরকার কি উপকার করিয়াছেন তাহার ইতিহাস লিখিবার সময় আজও হয় নাই। মোগল পাঠানরা ইঁহাদের রাজত্ব দখল করেন নাই, ইঁহাদের প্রতি কোন দায়িত্ব তাঁহাদের ছিল না। কিন্তু ইংরাজ সরকারকে একদিন উভয়ার্থে 'আসামী' ঐতিহাসিক গবেষণার কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া স্বপক্ষ সমর্থন করিতে হইবে।

মধ্য আফ্রিকার বনেজঙ্গলে হস্তিদন্ত-ব্যবসায়ী মুসলমান ইসলাম প্রচার করেন, বেতনভোগী ইউরোপীয় মিশনরীরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন। নিগ্রো মুসলমানদের কথা আজ থাক, কিন্তু খ্রীষ্টান নিগ্রোদের কি অবস্থা হইয়াছে তাহা বার্নার্ড শ'র 'কৃষ্ণার ব্রহ্মান্বেষণ' পুস্তকে পাইবেন। অসভ্য সুরা-অনভ্যস্ত জনগণের ভিতর মদ্য চালাইলে কি নিদারুণ কুফল হয় ও সেই সুযোগ লইয়া বিবেকধর্মহীন পুঁজিপতিরা তাহাদের কি অনিষ্ট না করে, তাহা আঁদ্রে জিদের 'বেলজিয়স কঙ্গো' পুস্তকে পাঠক পাইবেন। ও অন্যান্য নিরপেক্ষ লেখকের অধুনা-খ্যাতিপ্রাপ্ত ফরাসী ডাকার অঞ্চলের বর্ণনায় পাইবেন।

* * *

খ্রীষ্টান মিশনরীরা লুসাই, গারো, খাসিয়া ও নাগা অঞ্চলে প্রবেশ করেন। সরকারের কতটা সাহায্য পান ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু অনুমান করি ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর অন্যত্র মিশনরীরা সচরাচর যে সাহায্য লাভ করেন, তাহাই পাইয়াছিলেন। অধুনা মুসলমানরা খাসিয়া পাহাড়ে ইসলাম প্রচারে লিপ্ত হইয়াছেন ও ব্রাহ্মরা কিয়ৎকাল ঐ স্থলে ধর্মপ্রচারের পর কয়েকটি পরিবারকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করেন। তুলনামূলক ধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা বারান্তরে হইবে; উপস্থিত শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, যে কোনো মানুষ যে কোনো ধর্ম গ্রহণ করুক আপত্তি নাই, কিন্তু যে ধর্মান্তর গ্রহণে সাহায্য করে সে যেন ঠিক এইটুকু বোঝে যে, ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে সে অর্থনৈতিক, সামাজিক, বেশভূষা, আহার-বিহার সংক্রান্ত, দেশের অবস্থার সঙ্গে খাপ না খাওয়া, ছন্নছাড়া কোনো নূতন ক্ষতিকর পরিবেষ্টনীতে যেন টানিয়া লইয়া না যায়।

বাঙালী মুসলমান আরব বেদুইনের ন্যায় কাবাব-গোস্ত খায় না, রাইফেল লইয়া দল বাঁধিয়া হানাহানি করে না, কিন্তু এক জর্মন নৃতত্ত্ববিদ খ্রীষ্টান নাগাদের নূতন সামাজিক জীবনের সঙ্গে বসবাস করিয়া তাহাদের প্রচুর নিন্দা করিয়াছেন।

কোনো কোনো পার্বত্য অঞ্চলে স্বচক্ষে কড়া মদের মাতলামি দেখিয়াছি ও বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি কোনো কোনো অঞ্চলে গোপন বেশ্যাবৃত্তি আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভয়, এই সব খ্রীষ্টানরা যেন আসামের চা-বাগিচার খ্রীষ্টান ম্যানেজারদের সঙ্গে জুটিয়া এক নূতন ক্রিশ্চান লীগ নির্মাণ না করে। ট্রাইবেল লীগ হউক, আমরা তাহার মঙ্গল কামনা করিব, কিন্তু ক্রিশ্চান লীগ করিলে পার্বত্য জাতিরা আখেরে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

২

উচ্চারণ সম্বন্ধে আর বাক্যবিন্যাস করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিলাম। কিন্তু তৎপূর্বে শেষবারের মত একখানি চিঠি হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব। হাজরা লেন হইতে শ্রীমতী ঘোষ লিখিতেছেন ;—

'আমার ধারণা, অল্প একটু চেষ্টা করলেই বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণ বিশুদ্ধতায় যে কোন ভারতীয় পণ্ডিতের সমকক্ষ হতে পারবে। প্রমাণস্বরূপ একটা উদাহরণ দিতে পারি,—যদিও সেটি এত তুচ্ছ যে বলতে সংকুচিত হচ্ছি। পাঞ্জাবী অধ্যাপকটির ক্লাসে আমরা যে কয়টি ছাত্রী ছিলাম, তাহাদের মধ্যে তিনি বাঙালীর উচ্চারণে কখনো কোনো ভুল তো ধরেনই নি ; এমন কি সময়ে সময়ে একটু বেশী প্রশংসা করতেন।' (লেখিকা দিল্লী কলেজ পড়িতেন।)

সর্বশেষ লেখিকার বক্তব্য—

"যদি কলকাতার স্কুলগুলির সংস্কৃত শিক্ষকেরা এ বিষয়ে একটু অবহিত হন, তাহলে বোধ হয় কিছু সুফল পাওয়া যেতে পারে।"

সবিস্তার মন্তব্য অনাবশ্যক। শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা যদি সত্যই কঠিন না হয়, তাহা হ'লে এই স্থলেই উচ্চারণ সম্বন্ধে আলোচনা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বন্ধ করা যাইতে পারে।

* * *

আমরা যখন সংস্কৃত শিখি, আরবী ফারসী শিখি, তখন আমাদের উদ্দেশ্য এই নহে যে, সংস্কৃত অথবা আরবীতে সাহিত্য সৃষ্টি করিব। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য উৎকৃষ্ট সাহিত্য পড়িয়া হৃদয়মনকে সংস্কৃত ও ধনবন্ত করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ঐ সব সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, উহাদের পরশমণি দ্বারা যাচাই করিয়া করিয়া মাতৃভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করা। উদাহরণরূপে বলিতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত না জানিলে 'যৌবন বেদনা রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি' কবিতাটি লিখিতে পারিতেন না, প্রথম চৌধুরী উত্তম ফরাসী ও বিশেষতঃ

আনাতোল ফ্রাঁস না পড়িলে কখনো বাংলাতে নূতন শৈলী প্রবর্তন করিতে পারিতেন না।

ইংরাজী, ফরাসী, জর্মন সাহিত্য আজ এত সমৃদ্ধ যে গ্রীক লাতিনের জ্ঞান না থাকিলেও ইহাদের যে কোনো ভাষাভাষী মাতৃভাষার সাতজন ভালো লেখকের শৈলী মিশ্রণ করিয়া নূতন সৃষ্টি করিতে পারে; বিষয়বস্তু অনুসারে গড়িয়া পিটিয়া নূতন ঢং তৈয়ারী করিতে পারে। কিন্তু বাঙলাভাষা এখনো অত্যন্ত অপক্ক, সাহিত্য বড়ই দরিদ্র।

সংস্কৃতই যে জানিতে হইবে এমন কোনো কথা নহে। ইংরিজি ফরাসী বা আরবী যে কোনো সাহিত্যের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ যোগ থাকিলেই ভাষা ও সাহিত্যের মাপকাঠি পাওয়া যায়।

আধুনিক বঙ্গসাহিত্য না পড়িলে মনে হয় অধিকাংশ লেখকেরা যেন শুধু বাঙলার পুঁজিই ভাঙাইয়া খাইতেছেন। কিন্তু এককালে তো এ রকম ছিল না। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, সকলেই যে শুধু সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে, তাঁহারা সকলেই ইংরিজি বেশ ভাল করিয়া জানিতেন।

ভারতচন্দ্র ফারসী ও সংস্কৃত দুই ভাষাই জানিতেন, এবং কী প্রচুর আরবী ফারসী শব্দ যে তাঁহার আয়ত্তাধীন ছিল ও মোগল বিলাসের যে কী সন্ধান তিনি রাখিতেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড ১৮৭-৮ পৃষ্ঠা পশ্য।

(এস্থলে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, সাধারণ বাঙালী পাঠক এই দুই পৃষ্ঠায় উল্লিখিত তাবৎ আরবী ফারসী শব্দ বুঝেন? না ইহাদের অর্থ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইবে—আমার কাছে দ্বিতীয় খণ্ড নাই।)

যে কবি অত্যন্ত সহজ সরল অনুভূতি গীতিকাব্যে প্রকাশ করিতে চাহেন তাঁহার জন্য হয়ত সংস্কৃতের প্রয়োজন নাই। চণ্ডীদাসের সংস্কৃত জানিবার প্রয়োজন নাই; জসীমউদ্দীন চসার সেক্সপীয়র পড়িয়াছেন কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর।

যাঁহারা জটিল নভেল লেখেন ও উপন্যাস রচনা করেন তাঁহাদের সম্বন্ধেই উপরের মন্তব্যগুলি করিলাম।

৩

আমরা সাধারণতঃ যখন ইয়োরোপে বা ইয়োরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করি, তখন প্রায়ই ভুলিয়া যাই যে ইয়োরোপ সম্বন্ধে আমাদের প্রায়

সকল জ্ঞান ইংরিজি পুস্তক হইতে সঙ্কলিত এবং ইংরিজিতে যে সব ফরাসী জর্মন ইত্যাদি গ্রন্থ অনূদিত হয়, সেগুলি প্রায়শঃ ইংরেজ মনকে দোলা দিয়াছে বলিয়াই ঐ ভাষাতে রূপান্তরিত হইয়াছে। অর্থাৎ বহুস্থলে সেগুলি খাস ফরাসী জর্মন নহে, ইংরাজকে খুশী করিতে পারিয়াছে, ঈষৎ ইংরাজ-ভাবাপন্ন বলিয়া।

অথচ ইংরেজ ও ফরাসী সে কী ভীষণ দুই পৃথক জাত সে সম্বন্ধে অন্তহীন আলোচনা চলিতে পারে। সাহিত্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে নির্ভয়ে বলা যায় ফরাসী সাহিত্য ইংরাজি হইতে বিশেষ কিছু গ্রহণ করে নাই, কিন্তু ইংরাজি পদে পদে ফরাসীর হাত ধরিয়া চলিয়াছে। তামাম ফরাসী ভাষাতে একশতটি ইংরাজি শব্দ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না; ইংরাজিতে শুধু ফরাসী শব্দ নহে, গোটা বাক্য বিস্তরে বিস্তরে আছে। ইংরাজের পোশাকী রান্না বলিয়া কোনো বস্তু নাই —ভদ্র খাবারের "মেনু" মাত্রই আগাগোড়া ফরাসীতে লেখা। এমন কি ভিয়েনার "ভিনার স্নিৎসেল" পর্যন্ত ইংরাজি "মেনু"তে ফরাসীর মধ্যস্থতায় "এস্‌কেলপ দ্য ভ্য আ লা ভিয়েনেয়াজ" রূপে পৌঁছিয়াছে।

ইংরিজি সঙ্গীত বলিয়া কোনো বস্তু নাই—যাহা কিছু তাহার শতকরা ৯৯ ভাগ জর্মন-ফরাসী-ইতালীয়-রুশ। তামাম বৎসর চালু থাকে এ রকম অপেরা গৃহ একটিও লণ্ডনে নাই; উত্তম অপেরা শুনিতে হইলে ড্রেসডেন যাও, ম্যুনিক যাও, বন্ যাও, ভিয়েনা যাও, প্যারিস যাও।

ইংরেজ মেয়ে ফ্রক ব্লাউজ কিনিতে প্যারিস যায়, ছবি আঁকা শিখিতে প্যারিস যায়, ভাষা শিখিতে প্যারিস যায়, উৎকৃষ্ট খাদ্য ও মদ্য আস্বাদ করিতে প্যারিস যায়, বোতল বোতল বর্দো-বার্গণ্ডী শ্যেম্পেন খরিদ করিয়া নৌকা বোঝাই করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া যায়—ফরাসী স্কচ-হুইস্কি খাইতেছে আর মারোয়াড়ী পাঁঠার কালিয়া খাইতেছে—একই কথা।

ফরাসী ইংরাজকে বলে "চরুয়া" অর্থাৎ চরের বাসিন্দা অর্থাৎ খানদানহীন ঔপনিবেশিক। পদ্মার পারের জমিদার পদ্মার চর-বাসিন্দাকে যে রকম অবহেলা করে, ভাবে—চর আজ আছে কাল নাই—খানদানের বনিয়াদ গড়িবে কি প্রকারে, ফরাসী ইংরাজ সম্বন্ধে সেই রকম ভাবে। চ্যানেল পার হইয়া তাহাকে লণ্ডন যাইতে হইলে, তাহার মস্তকে সহস্র বজ্রাঘাত হয়।

উপর্যুক্ত মন্তব্যগুলি করার উদ্দেশ্য এই যে আমরা যেন ইয়োরোপের তাবৎ কর্মকীর্তি ইংরেজের জমার খাতায় লিখিয়া তাহাকে অহেতুক ভক্তি না দেখাই। দ্বিতীয়তঃ ফরাসী ও জর্মন পড়াইবার ব্যাপক ব্যবস্থা যেন এদেশের স্কুল-কলেজে করা হয়। আমাদের মনে হয় কলিকাতার ছেলেরা এককালে যেটুকু ফরাসী-

জর্মন শিখিত এখন যেন সেইটুকুও শিখিতেছে না।

আমাদের ইস্কুল-কলেজে কি বিকট আনাড়ি কায়দায় ভাষা শিখানো হয় তাহার বিস্তৃত আলোচনা আরেকদিন করিবার বাসনা রহিল। উপস্থিত শুধু বলি চারি বৎসর ইস্কুলে ও চারি বৎসর কলেজে সংস্কৃত অথবা ফারসী পড়ার পরও ছাত্র ঐ সব ভাষাতে সড়গড় হয় না এমন অদ্ভুত ব্যাপার আমি কোনো সভ্য দেশে দেখি নাই—শুনি নাই।

৪

এক প্রসিদ্ধ আরব লেখকের 'স্বগতঃ' পড়িতেছিলাম।

"ধনীরা বলে, 'অর্থোপার্জন করা কঠিন, জ্ঞানার্জনের অপেক্ষাও কঠিন।' পণ্ডিতেরা বলেন, 'জ্ঞানার্জন অর্থোপার্জনের অপেক্ষা কঠিন; অতএব জ্ঞানীরা ধনীর চেয়ে শক্তিমান ও মহৎ।' আমি বিস্তর বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, "আমরা—অর্থাৎ জ্ঞানীরা—যদি কখনও অর্থ পাই, তবে সে অর্থ ব্যয় করিতে সক্ষম এবং অনেক সময় ধনীদের চেয়েও সৎপথে অর্থ ব্যয় করি, কিন্তু ধনীরা যখন আমাদের সম্পদ অর্থাৎ পুস্তকরাজি পায়, তখন সেগুলির ব্যবহার বিলকুল করিতে পারে না। অতএব সপ্রমাণ হইল জ্ঞানীরা ধনীর চেয়ে শক্তিমান।"

বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, আরব লেখকের কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

গত শনি, রবি, সোমবারে বোম্বাই বাজারে যে তুমুল কাণ্ড দেখিলাম, তাহাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ আর রহিল না।

একশত হইতে উপরের নোট আর যত্রতত্র ভাঙানো যাইবে না খবর প্রকাশ হওয়া মাত্র কালাবাজারীদের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। ফালতু ট্যাক্স হইতে আত্মত্রাণ করিবার জন্য ব্যবসায়ীরা বিস্তরে বিস্তরে একশত, এক হাজার টাকার নোট গৃহে লোহার সিন্দুকে জমায়েত করিয়া রাখিয়াছিল, সে টাকা লইয়া তাহারা করিবে কি?

তখন কালাবাজারীরা ছুটিল ব্যাঙ্কারদের কাছে। 'দয়া করিয়া, ঘুষ লইয়া নোটগুলি লও, হিসাবে দেখাও যে বহুদিন ধরিয়া এই নোটগুলি তোমাদের ব্যাঙ্কে জমা ছিল। আমরা বাঁচি।' ব্যাঙ্কারদের জেলের ভয় আছে; কাজেই পন্থা বন্ধ।

কেহ ছুটিল সোনার বাজারে। সে বাজারে এমনি হিড়িক লাগিল যে, দাম হুশ হুশ করিয়া গগনস্পর্শী হইতে লাগিল। কর্তারা সোনার বাজার বন্ধ

করিয়া দিলেন।

কেহ ছুটিল তাড়া তাড়া নোট পকেটে করিয়া শরাবের দোকানে। এক টাকার মদ খাইয়া একশত টাকার নোট ভাঙাইবার চেষ্টা করে। আমি গিয়াছিলাম এক বোতল সোডা খাইতে, দোকানী সোডা দিবার পূর্বে সন্তর্পণে কানে কানে প্রশ্নবাণে প্রাণ হানে, 'একশত টাকার নোট নয় তো স্যার? ভাঙানি নাই।'

বিস্ময় মানিলাম। প্রায় ছয় মাস হইল আমার মত কারবারী-বুদ্ধি-বিবর্জিত মূর্খও বিলাতি মাসিকে পড়িয়াছিল যে, ইংলণ্ডে কালাবাজারের ফাঁপানো পয়সাকে কাবুতে আনিবার জন্য দশ পৌণ্ড নোটের উপর কড়া আইন চালানো হইয়াছে। সেই মাসিক কি এদেশের কারবারীরা পড়ে নাই? পড়িয়া থাকিলে ছোট নোটে ভাঙাইয়া রাখিলেই পারিত।

আরব ঠিকই বলিয়াছিলেন, ধনীরা পুস্তক (এমন কি মাসিক কাগজও) পড়িতে জানে না।

৫

বাঙলা ভাষায় একখানা অতি উপাদেয় গ্রন্থ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্রে'র কথা স্মরণ করিতেছি। কি অসাধারণ পরিশ্রম, কি অপূর্ব বিশ্লেষণ, অবিমিশ্র যুক্তিতর্কের কি অদ্ভুত ক্রমবিকাশ এই পুস্তকে আছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ভাষা ও শৈলী সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যুক্তিতর্কপূর্ণ রচনায় এই ভাষাকেই আজ পর্যন্ত কেহই পরাজিত করিতে পারেন নাই। অনেকের মতে বাংলা গদ্য রচনায় 'কৃষ্ণচরিত্রে'র পর উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি হয় নাই।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া বিস্ময় মানিতে হয়। বঙ্কিম কয়েকজন জর্মন পণ্ডিতের নাম এই পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই যুগে প্রত্যেকের নামের শুদ্ধ উচ্চারণ জর্মনে কি সে খবর লইয়া বাঙলায় বানান করিয়াছেন। আমরা নির্বিকার চিত্তে নিত্য নিত্য 'জওহরলাল', 'প্যাটেল', 'মালব্য' লিখি, 'পটোডি'র নওয়াব ও 'ভিমু মনকদে'র কথা আর তুলিলাম না।

সে কথা থাকুক। কিন্তু বঙ্কিমের পুস্তকখানা বাঙলায় লেখা, বাঙলা লিপিতে। যদি পুস্তকখানা দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হইত, তবে বহু অবাঙালী অনায়াসে ইহা পড়িয়া উপকৃত হইতে পারিতেন।

পাঠক পত্রপাঠ শুধাইবেন বাঙলা, হিন্দী, গুজরাতি; মরাঠিতে কি এতই

সাদৃশ্য যে শুধু ভিন্ন লিপি বলিয়া, এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের রচনা পড়িতে পারে না ?

দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নলিখিত রচনাটি পাঠ করুন।

'ব্যায়ামচর্চা ভারতত অতি পুরনি কালরে পরা প্রচলিত ; অসমতো নতুন নহয়। অহোম রজা সকলর দিনত অসমত ব্যায়ামর খুব আদর আছিল। বিশেষকৈ মহারাজ রুদ্রসিংহর দিনত ইয়ার প্রসার বেচী হয়। তেঁও অসমর জাতীয় উৎসব আদিত ব্যায়ামর দৃশ্য দেখুবার নিয়ম করিছিল।'

একখানা আসামি পুস্তিকা হইতে এই কয়টি পংক্তি তুলিয়া দিলাম ; ইহার বাংলা অনুবাদ করিয়া সহৃদয় সরল পাঠককে অপমানিত করিতে চাহি না। যে লিপিতে লেখা হইয়াছে অক্ষরে অক্ষরে সেই রকম তুলিয়া দিলাম ; কেবলমাত্র বক্তব্য যে 'র' অক্ষর আসামিতে 'ব' অক্ষরের পেট কাটিয়া করা হয় এবং 'ওয়া' উচ্চারণ প্রকাশ করিতে হইলে 'ব' অক্ষরের উপরে একটি হসন্ত জাতীয় চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

এই কয়টি পংক্তিই যদি কোনো বিজাতীয় লিপিতে লেখা হইত, তবে এ ভাষা যে না শিখিয়াও পড়া যায়, সে তত্ত্বটুকু শিখিতে আমাদের মত অনভিজ্ঞের এক যুগ কাটিয়া যাইত।

পুনরায় দেখুন :

'ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতি রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপর নির্ভর করে' বাক্যটি হিন্দীতে 'ভারতবর্ষকী অর্থ-নৈতিক উন্নতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা পর নির্ভর করতী হৈ', এবং গুজরাতিতে 'ভারতবর্ষনী অর্থনৈতিক উন্নতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা পর নির্ভর করে ছে' বলিলে বিশেষ ভুল হয় না কিন্তু যেহেতু গুজরাতি ও হিন্দী ভিন্ন লিপিতে লেখা হয়, আমরা এই সব ভাষা দূরে রাখি ; ঐ সব ভাষা-ভাষীরাও একে অন্যের মধ্যে তাহাই করেন।

এই বাক্যটিই ফরাসীতে বলি :

Ie progres economique de I' Indedepend sur son Independance politique.

লিপি একই, অর্থাৎ ইংরাজি ; কাজেই ভাষাশিক্ষা ব্যাপারে অতি অথর্ব ইংরাজও তাড়াতাড়িতে ফরাসী শিখিতে পারে।

তাহা হইলেই প্রশ্ন, তাবৎ ভারতবর্ষে একই লিপি প্রচলিত হইলে ভালো হয় কি না ?

তাহা হইলে পুনরায় প্রশ্ন—শান্তিনিকেতন হইতে শ্রীযুত—সেন মহোদয়

জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাবৎ পৃথিবীর জন্য একই লিপি হইলে ভালো হয় কি না? অর্থাৎ লাতিন লিপি—যে লিপিতে লাতিন, ইংরাজি, ফরাসী, ইতালিয়, স্পেনীয়, পর্তুগীজ, তুর্কী ও অধিকাংশ জর্মন পুস্তক লেখা হয়।

* * *

এই সম্পর্কে আরেকটি কথা মনে পড়িল। প্রথম যৌবনে এক গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করার চেষ্টা করি। সেই প্রাতঃস্মরণীয় গুরু অন্ততঃপক্ষে একশতটি ভাষা জানিতেন ও খুব সম্ভব একশত হইতে দুই শতের মধ্যেই ঠিক হিসাব পড়ে। এবং প্রত্যেকটি ভাষাই সাধারণ গ্র্যাডুয়েট যতটা সংস্কৃত বা ফারসী জানেন তাহা অপেক্ষা বেশী জানিতেন। সাধারণ গ্র্যাডুয়েট আট বৎসর সংস্কৃত অধ্যয়ন করে। সেই হিসাবে গুরুর বয়স অন্ততঃপক্ষে ১৫০ × ৮ = ১২০০ বৎসর হওয়া উচিত ছিল; যদি তিন-তিনটি ভাষা একসঙ্গে শিখিয়া থাকেন, তবে তাঁহার বয়স ৪০০ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু গুরু 'বিরিঞ্চি বাবা' নহেন ও ৬০ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন এবং শেষের দশ বৎসর খুব সম্ভব কোনো নূতন ভাষা শিখেন নাই।

তবেই প্রশ্ন এই অলৌকিক কাণ্ড কি প্রকারে সম্ভবপর হইল?

স্বীকার করি গুরু ভাষার জহুরী ছিলেন ও ভাষা শিখিতে তাঁহার উৎসাহের অন্ত ছিল না। কিন্তু তবু আমার বিশ্বাস ভালো গুরু পাইলে, অর্থাৎ শিক্ষাপদ্ধতি উত্তম হইলে অল্পায়াসে এক ডজন ভাষা দশ বৎসরে শিখা যায়। শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে আরেকটি জিনিসের প্রয়োজন, তাহা নিষ্ঠা। এবং তৃতীয়তঃ কণ্ঠস্থ করা অপ্রয়োজনীয়—এই অদ্ভুত বিজাতীয় অনৈসর্গিক পাণ্ডববর্জিত ধারণা মস্তিষ্ক হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাষণ করা।

* * *

আরেকটি প্রশ্ন। 'প্যারিস' লিখিব, না 'পারি'? 'ফরাসিস' লিখিব, না 'ফরাসী', না 'ফ্রেঞ্চ'; 'বেলিন' না 'বার্লিন'; 'এ্যাক্সলা শাপেল' না 'আখেন' (প্রথমটি ফরাসী উচ্চারণ ও আন্তর্জাতিক ভাষায় ইহাই চলে, কিন্তু দ্বিতীয়টি জর্মন ও শহরটি জর্মনীতে অবস্থিত)? 'মস্কভা', না 'মস্কৌ', না 'মস্কো'; 'শ্যাম' না 'সিরিয়া', 'যীশু', না 'য়েশু', না 'জীসস'? ১৮৭০-৮০ খৃষ্টাব্দে এই সব সমস্যা সমাধান করিবার জন্য কলিকাতায় একটি কমিটি নির্মিত হয়, তাহার রিপোর্ট এ যাবৎ দেখি নাই। কোনো পাঠক দেখিয়াছেন কি?

ভর্তৃহরি বলিয়াছেন, প্রিয়ভাষীজনকে ধনহীন মনে করা দুর্জনের লক্ষণ। কিন্তু প্রিয়ভাষণেরও তো একটি সীমা থাকার প্রয়োজন। আমরা স্থির করিয়াছি বিলাতি কমিশন না আসা পর্যন্ত টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করিয়া রাজনৈতিক আবহাওয়া অহেতুক উষ্ণ করিব না, বিলাতি কর্তাদের গরমে কষ্ট হইতে পারে। কিন্তু এই সুযোগে এ্যাটলি সাহেবের প্রিয়ভাষণ যে অলঙ্কারের উপর অলঙ্কার পরিধান করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ হইতেছে—বধূটি খুব সম্ভব কুরূপা। তবু গুরুজনেরা বলিতেছেন, বিশ্বাসে কৃষ্ণ মিলয়। হইতে পারে; কিন্তু কন্যাকর্তাকে বিশ্বাস করিয়া সুরূপা বধূলাভের আশা নগণ্য বলিয়াই 'কনে দেখার' প্রথা এদেশে প্রচলিত।

সে যাহাই হউক, সর্বশেষ উপমা শুনিলাম নিউ ইয়র্কের কোনো এক খবরের কাগজের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতার নিকট হইতে। তিনি মনে মনে এক নদীর ছবি আঁকিয়াছেন, তাহার একপারে এ্যাটলি সাহেব, হাতে নাকি বহুমূল্য স্বরাজ; অন্য পারে তাবৎ ভারতীয়। সংবাদদাতা বলিতেছেন, শুধু কংগ্রেস, শুধু লীগ, শুধু রাজসংঘ, শুধু হরিজন সন্তরণ করিয়া উত্তীর্ণ হইলেই হইবে না; সকলকে এক যোগে একসঙ্গে সে বৈতরণী পার হইতে হইবে।

বাল্যবয়সে বিস্তর ভারতীয় বিস্তর নদী সাঁতরাইয়া পার হয়, এবারেও চেষ্টা করিবে; কিন্তু প্রশ্ন—কে কে জলে নামিবেন? কংগ্রেস তো নামিবেনই, সায়েবের হাতে যখন স্বরাজ রহিয়াছে, লীগ নামিবেন কি? কারণ সংবাদদাতা বলিয়াছেন, সায়েবের হাতে স্বরাজ, পাকিস্তান আছে কি না বলেন নাই। না হয় লীগও নামিলেন; কিন্তু রাজারা তো কখনো সাঁতার কাটেন না। প্রজাদের পৃষ্ঠে বসিয়া যে যাইবেন তাহারও কোনো উপায় নাই; কারণ প্রথমতঃ প্রজাদের সে-সন্তরণে যোগ দিবার কোনো প্রস্তাবই হয় নাই, দ্বিতীয়তঃ তাহারা সরজমিনে উপস্থিত থাকিলে মণিটির হিস্যা পাইবার জন্য চেল্লাচেল্লি করিবে, হয়ত বা সাকুল্য মণিলাভের তালে থাকিবে। কাজেই মনে হইতেছে রাজারা দুইশত বৎসরের প্রাচীন খানদানি বাতরোগের অর্থাৎ সরকারের সঙ্গে কৃত সনাতন সন্ধিশর্তের দোহাই দিয়া পাড়ে দাঁড়াইয়া রহিবেন অথবা শূন্যে হাত-পা ছুঁড়িয়া সাঁতারের ভান করিবেন। হরিজন নামিতে পারেন, কারণ কূপ অপবিত্র হইতে পারে, মা-গঙ্গার সে ভয় নাই।

কিন্তু একযোগে সাঁতার কাটিতে হইবে। বয়নাক্কাটা বিবেচনা করুন। রুশ

বাদ দিলে তামাম ইয়োরোপ ভারতের চেয়ে ক্ষুদ্র, তবু তথাকার কর্তারা সাঁতার কাটিবার সময় একে অন্যের গলা এমনি টিপিয়া ধরেন, যাহাকে বলে মহাযুদ্ধ। আর শুধু তাহাই নহে। পৃথিবীর আপামর জনসাধারণকে সেই নদীতে নামানো চাই, কি অস্ট্রেলিয়া, কি আমেরিকা, কি ভারত—কাহারও রেহাই নাই। এই এক জন্মেই দুইটি দক্ষযজ্ঞ দেখিলাম। তাহারই এক ছাগ-মুণ্ড তম্বি করিয়া বলিতেছেন, একযোগে সাঁতরাও।

না হয় সাঁতরাইলাম, কিন্তু তথাপি প্রশ্ন ক্রীপস-নদীতে যে হাঙর-কুমীর আমাদের পা কামড়াইয়া সব কিছু ভণ্ডুল করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহারা ইতোমধ্যে বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছেন কি?

সর্বশেষ প্রশ্ন, সায়েবের হস্ত মুষ্টিবদ্ধ। এ যেন 'ফোকা' 'ধোকা' খেলা। আমরা সকলে এক যোগে হাঙর-কুমীর এড়াইয়া নদী পার হইয়া এক বাক্যে চীৎকার করিয়া বলিব, 'আমরা ফোকা চাই' অথবা 'ধোকা চাই', তখন সায়েব হস্তোন্মোচন করিবেন।

তখন আমাকে দোষ দিবেন না।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

দশম খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ (৩৩০০), ১৩৬৫

সম্পাদক

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সুমথনাথ ঘোষ

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

চুনী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ মুদ্রণ

সিল্ক স্ক্রীন ও

চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩ হইতে এস এন রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও বাণী মুদ্রণ, ১২ নরেন সেন স্কোয়ার, কলি-৯ হইতে বংশীধর সিংহ কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

দেশে বিদেশে (দ্বিতীয় খণ্ড)	...	১
চাচা কাহিনী (দ্বিতীয় খণ্ড)	...	১১১
পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা	...	১৬৯
অপ্রকাশিত রচনা	...	২১৩
দিনলিপি	...	৩২১
পত্রাবলী	...	৩৮৫
পাঠকের নিবেদন	...	৪২৯

পরিশিষ্ট

বংশপরিচয় ও জীবনের ঘটনাপঞ্জী	...	[১]
গ্রন্থপঞ্জী	...	[৪]
সমগ্র রচনাবলীর বর্ণানুক্রমিক সূচী	...	[৭]

মুখবন্ধ

অবশেষে বহু অসুবিধা পার হইয়া সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলীর শেষ ও দশম খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে দেশে বিদেশের শেষার্ধ, চাচা কাহিনীর বাকী অংশ, পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, অপ্রকাশিত বিভিন্ন রচনা, দিনলিপি ও পত্রাবলী সংকলিত হইয়াছে।

'দেশে বিদেশে' নাম লইয়া পাঠকমহলের কোন কোন অংশে ভ্রান্তি আছে। কেহ কেহ দ্রুত উল্লেখ করিয়া যাইবার সময়ে 'দেশ-বিদেশে' বলিয়া থাকেন—এবিষয়ে স্বয়ং মুজতবা আলীই মন্তব্য করিয়াছেন, বইটির শুরু বলা চলিতে পারে অবিভক্ত ভারতের পেশোয়ার শহর বা সীমান্ত প্রদেশ হইতে, শেষ হইয়াছে আফগানিস্থানে বাস সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। কাহিনীর খানিকটা দেশে, বাকিটা বিদেশে—এই জন্যই নাম 'দেশে বদেশে'। প্রথমের অংশটা গিয়াছে নবম খণ্ডে, দ্বিতীয় অংশটা বক্ষ্যমাণ খণ্ডে। অবশ্য দেশের অংশ ও বিদেশের অংশ চুলচেরা ভাগ করা হয় নাই। 'চাচা কাহিনী' গল্পগ্রন্থেরও প্রথম দিকের গল্পগুলি নবম খণ্ডে ও বাকী গল্পগুলি দশম খণ্ডে স্থান পাইয়াছে, দুইটি খণ্ডই যাহাতে সম-গুরুত্বপূর্ণ হয় সেইজন্যই এই ব্যবস্থা, অন্য উদ্দেশ্য নাই। 'দেশে বিদেশে' সম্পূর্ণ গ্রন্থ ও 'চাচা কাহিনী'র সব কটি গল্প লইয়াই বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন নবম খণ্ডে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম রসজ্ঞ সমালোচক অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনই বর্তমান বাংলাদেশের প্রাণবীজ-স্বরূপ একথা বলিলে অন্যায় হইবে না। পাকিস্তানের তথা পশ্চিম-পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ যখন পূর্ববঙ্গের তাবৎ অধিবাসীর উপর জোর করিয়া উর্দু চাপাইবার চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, তখন যে সব বুদ্ধিজীবী ইহার প্রতিবাদ করেন, সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁহাদের অন্যতম। 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' মুজতবা আলীর প্রতিবাদের বাস্তব নিদর্শন। তবে এই বইটিকে কেবল রাজনৈতিক প্রতিবাদ বা দলিল আখ্যা দিলে লঘু করা হইবে। ইহার প্রতিপৃষ্ঠায় যে তত্ত্ব ও তথ্য পাওয়া যায় তাহা লেখকের দীর্ঘকালব্যাপী সুগভীর চিন্তা-সঞ্জাত। যে ভাষা আন্দোলনে

পূর্ববঙ্গের অগণিত তরুণ-তরুণী ছাত্র-ছাত্রী আত্মাহুতি দেন, যে আন্দোলন ক্রমে পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) জনসাধারণের স্বাধিকার আন্দোলন ও ক্রমে স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণত হয়, তাহার পিছনে এই গ্রন্থটির অবদান একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

মুজতবা আলী সাংসারিক জীবনে আদর্শ গৃহস্থ মানুষ বলিতে যাহা বোঝায় তাহা ছিলেন না। বস্তুত শিল্পীসত্তা তাঁহার ব্যক্তিসত্তাকে এমন ভাবেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা কাটাইয়া উঠিয়া গৃহস্থ সাজা তাঁহার মত শিল্পী বা সাহিত্যিকের পক্ষে অসম্ভব। এই গৃহস্থপনার অভাবই দেখা যায় তাঁহার নিজের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত রচনাগুলির রক্ষণাবেক্ষণে। নিজ সৃষ্টি সম্বন্ধে এই ধরনের অনাসক্তি অবশ্য খুব কম শিল্পী-সাহিত্যিকের জীবনেই চোখে পড়ে। মুজতবা আলী নিজে পাতঞ্জল, লাওৎ-সে ও সুফী সাধনার বিষয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন করিতেন। এই দর্শন-চর্চাই তাঁহাকে পার্থিব বিষয়ে নিরাসক্ত করিয়া তোলে কিনা কে বলিতে পারে। তাঁহার তিরোধানের পর দেখা যায়, স্বনামে ও ছদ্ম নামে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিস্তর রচনা পড়িয়া রহিয়াছে যাহা গ্রন্থাকারে এ যাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। এই রচনাগুলির একটি বড় অংশ অষ্টম খণ্ডে ও নবম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তাহার পরেও যাহা ছিল তাহা 'অপ্রকাশিত রচনা' শিরোনামায় দশম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হইল। তবে আশংকা— আরও বেশ কিছু রচনা ইতস্তত আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকিয়া গেল, হয়তো সেগুলি দিয়া ভবিষ্যতে রচনাবলীর একটি অতিরিক্ত খণ্ডও গ্রন্থিত করা যাইতে পারে।

অপ্রকাশিত রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল কয়েকটি কবিতা, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলী, ভাষা রাষ্ট্র ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ক নানা প্রবন্ধ। মুজতবা আলীর কবিতার সহিত পাঠকদের পরিচয় বহুদিনকার। অবধূত লিখিত 'নীলকণ্ঠ হিমালয়ে'র একটি অনবদ্য ভূমিকাও মুজতবা আলী লিখিয়াছিলেন। তাহাও গ্রন্থশেষে সংযোজিত হইল। এই সকল রচনা হইতে বঞ্চিত হইলে পাঠক-পাঠিকারা একটি মূল্যবান সম্পত্তি হারাইতেন।

অনেকে বলিয়া থাকেন, কথাশিল্পীরা সৃষ্টির মধ্যেই নিজেকে প্রতিফলিত করেন। উক্তিটির মধ্যে হয়তো আংশিক সত্যতা আছে। কিন্তু মুজতবা আলী যে বিভিন্ন ধরনের রচনা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্য হইতে আসল মানুষটিকে খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নয়। তবে আমাদের সৌভাগ্য, মুজতবা আলী মাঝে মধ্যে

দিনলিপি রাখিতেন, যদিও খুব নিয়মিত নয়। আবার এমনও হইতে পারে, দিনলিপি লেখার পর স্বভাব-ঔদাসীন্যে সেগুলির প্রতি যত্ন লন নাই। ফলে সম্পূর্ণ কোন দিনলিপি পাওয়া যায় নাই। তবে দিনলিপির যে-সব অংশ মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে গোটা শিল্পী মানুষটাকে না পাওয়া যাক, তাঁহার ব্যক্তি-মানসের একটা দিক যে ফুটিয়া উঠিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই মানুষটি প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখিয়া পাগল হন, বন্ধুর চিকিৎসার জন্য কাজকর্ম ফেলিয়া বন্ধুর সহিত দূর বিদেশে যাইতে দ্বিধা করেন না, আবার বেশি কায়িক পরিশ্রমও পছন্দ করেন না, পারিবারিক স্নেহ-আবেষ্টনীর মধ্যে বাস করিয়া নিরতিশয় তৃপ্তি পান, তাঁহার চিত্ত সর্বদাই পুত্রদ্বয়ের জন্য বাৎসল্য-রসে টল্‌টল করে, অথচ এই মানুষই আবার যখন সাহিত্যকর্মে মনোনিবেশ করেন তখন জগৎসংসার বিস্মৃত হয়, পুত্র-পত্নী সমগ্র পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘকালীন বিরহও তাঁহাকে শিল্পকর্ম হইতে বিরত করিতে পারে না। দিনলিপির মধ্যে খেয়াল-খুশির রচনা—কিছু গান ও কবিতাও দেখা যায়। একটি গান এক ভারত প্রসিদ্ধ গায়ক কর্তৃক সুরারোপিত বলিয়া উল্লিখিত।

মুজতবা আলী বহু সময়েই অনেককে দীর্ঘ পত্র লিখিতেন। এই সব পত্র ভাষা, ধ্বনি, বানান, ইতিহাস, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে বহু সুচিন্তিত আলোচনা ও তত্ত্ব-তথ্যে পূর্ণ। এইগুলি লেখক গুছাইয়া ব্যবহার করিলেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধ হইয়া যাইত। স্থানাভাবে সব পত্র সংকলিত করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু যেগুলি পাঠকরা হাতে পাইতেছেন, তাহার মূল্যও অনেক। এই পত্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক সম্ভবত পুত্রদ্বয়কে লিখিত পত্রগুলি। মুজতবা আলী যখন এই পত্রগুলি লেখেন তখন পুত্রেরা নিতান্তই শিশু। নিশ্চয় সে সময়ে তাহাদের পড়িবার বা রসগ্রহণের ক্ষমতা আদৌ হয় নাই। কিন্তু লেখক তাহাদের পর্যাপ্ত বয়স্ক ধরিয়াই পত্রগুলি লিখিয়াছেন। নিছক লেখার আনন্দেই এ লেখা। এই পত্রগুলি লেখকের ঐকান্তিক পুত্রস্নেহ, দেখিবার ও দেখাইবার, জানিবার ও জানাইবার আগ্রহ এবং সর্বোপরি লেখকের মনের এক অনাবিল আনন্দময়তার উজ্জ্বল নিদর্শন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিত, এই পত্রগুলি লেখকের দিনলিপিতেই লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়।

গ্রন্থশেষে সৈয়দ মুজতবা আলীর সংক্ষিপ্ত বংশপরিচয় ও জীবনী, গ্রন্থপঞ্জী এবং সমগ্র রচনার একটি যথাসম্ভব বর্ণানুক্রমিক সূচী সংযোজিত হইল। কোন উৎসুক পাঠকের কাজে লাগিলেও লাগিতে পারে।

পরিশেষে নিবেদন, এত বড় একটি কর্ম সম্পাদনা আমাদের সীমিত ক্ষমতায় ত্রুটিহীন হইবে এ অহংকার বা দুরাকাঙ্ক্ষা আমাদের নাই। এ বিষয়ে সহানুভূতিশীল সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার উপদেশ ও পরামর্শাদি আমরা সাদরে গ্রহণ করিব।

সবিতেন্দ্রনাথ রায়
সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে

দেশে বিদেশে

দ্বিতীয় খণ্ড

উনত্রিশ

কবি বলেছেন, 'দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে রাজেন্দ্র সঙ্গমে।' আমান উল্লা ইয়োরোপ ভ্রমণে বেরলেন, আমিও শীতের দু'মাসের ছুটি পেয়ে বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু সত্যযুগ নয় বলে প্রবাদের মাত্র আধখানা ফলল—আমি ইয়োরোপ গেলুম না, গেলুম দেশ।

উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটল না কিন্তু ভারতবর্ষে দেখি আমান উল্লার ইয়োরোপ ভ্রমণ নিয়ে সবাই ক্ষেপে উঠেছে। আমান উল্লার সম্মানে প্রাচ্য ভারতবাসী যেন নিজের সম্মান অনুভব করছে।

আমাকে ধরল হাওড়া স্টেশনে কাবুলী পাজামা আর পেশাওয়ারের টিকিট দেখে—হয়ত লাণ্ডিকোটাল থেকে খবরও পেয়েছিল। তন্ন তন্ন করে সার্চ করলো অনেকক্ষণ ধরে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল তারও বেশীক্ষণ ধরে—যেন আমি মেকি সিকিটা। কিন্তু আমি যখন কাবুলের কাস্টম হৌসে তালিম পেয়েছি, তখন ধৈর্যে আমাকে হারাতে পারে কোন্ বাঙালী অফিসার। খালাস পেয়ে অজানাতে তবু বেরিয়ে গেল, 'আচ্ছা গেরো রে বাবা।'

বাঙালী অফিসার চমকে উঠলেন, বললেন, 'দাঁড়ান, আপনি বাঙালী, তাহলে আরো ভালো করে সার্চ করি।'

বললুম, 'করুন, আমার নাম কমলাকান্ত।'

দেশে পৌঁছে মাকে দিলুম এক স্যুটকেসভর্তি বাদাম, পেস্তা—অষ্ট গণ্ডা পয়সা খরচ করে কাবুল শহরে কেনা। মা পরমানন্দে পাড়ার সবাইকে বিলোলেন। পাড়াগাঁয়ে যে বোনটির বিয়ে হয়েছিল, সে-ও বাদ পড়ল না।

কিন্তু থাক। সাত মাস কাবুলে কাটিয়ে একটা তথ্য আবিষ্কার করেছি যে, বাঙালী কাবুলীর চেয়ে ঢের বেশী হুঁশিয়ার। তারা যে আমার এ-বই পয়সা খরচ করে কিনবে, সে আশা কম। তাই ভাবছি, এ দু'মাসের গর্ভাঙ্কটা 'সফর-ই হিন্দ' নাম দিয়ে ফার্সীতে ছাপাবো। তাই দিয়ে যদি দু'পয়সা হয়। কাবুলী কিনুক আর না-ই কিনুক, উদ্যমটার প্রশংসা নিশ্চয়ই করবে। কারণ ফার্সীতেই প্রবাদ আছে—

'খর বাশ ও থুক বাশ ও ইয়া সগে মুরদার বাশ।
হরচে বাশী বাশ আম্মা আন্দকী জরদার বাশ ॥'

'হও না গাধা, হও না শুয়র, হও না মরা কুকুর।
যা ইচ্ছে হও কিন্তু রেখো রত্তি সোনা টুকুর ॥'

ত্রিশ

ফিরে দেখি সর্বত্র বরফ, দোরের গোড়ায় আবদুর রহমান আর ঘরের ভিতর গনগনে আগুন। আমি তখন শীতে জমে গিয়েছি।

আবদুর রহমান হাসিমুখে আমার হাতে চুমো খেল, কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। 'দাঁড়ান হুজুর' বলে আমাকে কোলে করে এক লাফে উঠানে নেবে গেল। এক মুঠো পেঁজা বরফ হাতে নিয়ে আমার নাক আর কানের ডগা সেই বরফ দিয়ে ঘন ঘন ঘষে আর ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে 'চিন্ চিন্' করছে কিনা। আমি ভাবলুম, এও বুঝি পানশিরের কোনো জঙ্গলী অভ্যর্থনার আদিখ্যেতা। বিরক্ত হয়ে বললুম, 'চল, চল, ঘরের ভিতর চল, শীতে আমার হাড়মাস জমে গিয়েছে।' আবদুর রহমান কিন্তু তখন তার শালপ্রাংশু মহাবাহু দিয়ে আমাকে এমনি জড়িয়ে ধরে দু'কানে বরফ ঘষছে যে, আমি কেন, কিক্কড় সিংয়েরও সাধ্যি নেই যে, সে-ব্যূহ ছিন্ন করে বেরতে পারে। আবদুর রহমান শুধু বরফ ঘষে আর একটানা মন্ত্রোচ্চারণের মত শুধায়, 'চিন্ চিন্ করছে, চিন্ চিন্ করছে?' শেষটায় অনুভব করলুম সত্যই নাক আর কানের ডগায় ঝিঁ ঝিঁ ছাড়ার সময় যে রকম চিন্ চিন্ করে সে রকম হতে আরম্ভ করেছে। আবদুর রহমানকে সে খবরটা দেওয়া মাত্রই সে আমাকে কোলে করে আরেক লাফে ঘরে ঢুকল, কিন্তু বসাল আগুন থেকে দূরে ঘরের আরেক কোণে। রোদে-পোড়া মোষ যে রকম কাদার দিকে ধায়, আমিও সেই রকম আগুনের দিকে যতই ধাওয়া করি, আবদুর রহমান ততই আমাকে ঠেকিয়ে রেখে বলে, 'সর্বাঙ্গে রক্ত চলাচল শুরু হোক, হুজুর, তারপর যত খুশি আগুন পোয়াবেন!'

ততক্ষণে সে আমার জুতো খুলে পায়ের আঙুলগুলো পরখ করে দেখছে সেগুলোর রঙ কতটা নীল। আবদুর রহমানের চেহারা থেকে আন্দাজ করলুম

নীল রঙের প্রতি তার গভীর বিতৃষ্ণা। ঘষে ঘষে আঙুলগুলোকে যখন বেশ বেগুনী করে ফেলল তখন সে চেয়ারসুদ্ধ আমাকে আগুনের পাশে এনে বসাল। আমি ততক্ষণে দস্তানা খুলতে গিয়ে দেখি কমলী ছোড়তে চায় না,—আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গিয়েছে। দুষ্টু ছেলে যেরকম খাওয়ার সময় মাকে পেট কামড়ানোর খবর দেয় না আমিও ঠিক সেই রকম আঙুল ফোলার খবরটা চেপে গেলুম। সরল আবদুর রহমান ওদিকে আমার পায়ের তদারক করছে আমি এদিকে আগুনের সামনে হাত বাড়িয়ে আরাম করে দেখি, কলাগাছ বটগাছ হতে চলেছে। ততক্ষণে আবদুর রহমান লক্ষ্য করে ফেলেছে যে, আমার হাত তখনো দস্তানা-পরা। টমাটোর মত লাল মুখ করে আমাকে শুধাল, 'হাতের আঙুলও যে জমে গিয়েছে সে কথাটা আমায় বললেন না কেন?' এই তার প্রথম রাগ দেখলুম। ভৃত্য আবদুর রহমানের গলায় আমীর আবদুর রহমানের গলা শুনতে পেলুম। আমি চিঁ চিঁ করে কি একটা বলতে যাচ্ছিলুম। আমার দিকে কান না দিয়ে বলল, 'চা খাওয়ার পরও যদি দস্তানা না খোলে তবে আমি কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলব!'

আমি শুধালুম, 'কি কাটবে? হাত না দস্তানা?'

আবদুর রহমান অত্যন্ত বেরসিক। আমি আরো ঘাবড়ে গেলুম।

কিন্তু শুধু আমিই ঘাবড়াইনি। দস্তানা পর্যন্ত আবদুর রহমানের গলা শুনে বুঝতে পেরেছে যে, সে চটে গেলে দস্তানা, দস্ত কাউকে আস্ত রাখবে না। চায়ের পেয়ালায় হাত দেবার পূর্বেই অক্টোপাশের পঞ্চপাশ খসে গেল।

সে রাত্রে আবদুর রহমান আমাকে সাত-তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিয়ে আপন হাতে বিছানায় শুইয়ে দিল। লেপের তলায় আগেই গরম জলের বোতল ফ্ল্যানেলে পেঁচিয়ে রেখে দিয়েছিল। সেটাতে পা ঠেকিয়ে আমি মুনি-ঋষিদের সিংহাসনে পদাঘাত করার সুখ অনুভব করলুম। পেটের ভিতরে চর্বির ঘন গুরুয়া, লেপে-চাপা গরম বোতলের ওম, আর আবদুর রহমানের বাঘের থাবার ডলাই-মলাই তিনে মিলে এক পলকেই চোখের পলক বন্ধ করে ফেলেছিলুম।

সমস্ত কাহিনীটি যে এত বাখানিয়া বললুম তার প্রধান কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ বই কোনো দিন কারো কোনো কাজে লাগবে না। আর আজকের দিনের ভারতদণ্ডিন কম্যুনিস্টরা বলেন, যে-আর্ট কাজে লাগে না সে-আর্ট আর্টই নয়। অর্থাৎ শিবলিঙ্গ দিয়ে যদি দেয়ালে মশারির পেরেক পোঁতা না যায় তবে সে শিবলিঙ্গের 'কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।'

তবু যদি কোনো দিন পাকচক্রে ফ্রস্টবিট্‌ন্ হন তবে প্রলেতারিয়ার প্রতীক ওঝা আবদুর রহমানকে স্মরণ করে তার দাওয়াই চালাবেন। সেরে উঠবেন নিশ্চয়ই, এবং তখন যেন আপনার কৃতজ্ঞতা আবদুর রহমানের দিকে ধায়। আবদুর রহমানের প্রাপ্য প্রশংসা আমি কেতাবের মালিকরূপে কেড়ে নিয়ে 'শোষক', 'বুর্জুয়া' নামে পরিচিত হতে চাইনে।

পরদিন সকাল বেলা দেখি, তিন মাইল বরফ ভেঙ্গে বৃদ্ধ মীর আসলম এসে উপস্থিত ; বললেন, 'আত্মজনের বাচনিক অবগত হইলাম তুমি কল্য রজনীর প্রথম যামে প্রত্যাবর্তন করিয়াছ। কুশল-সন্দেশ কহ। শৈত্যাধিক্যে পথমধ্যে অত্যধিক ক্লেশ হয় নাই তো ?'

আমি আবদুর রহমানের কবিরাজির সালঙ্কার বর্ণনা দিলে মীর আসলম বললেন, 'নাতিদীর্ঘদিবস তথা শর্বরীর প্রথম যামই স্বতশ্চলশকটারোহীকে শিশির-বিদ্ধ করিতে সক্ষম। কৃশানুসংশ্রব হইতে রক্ষা করিয়া তোমার পরিচারক বিচক্ষণের কর্ম করিয়াছে। অপিচ লক্ষ্য করো নাই, স্বদেশে আতপতাপে দগ্ধ হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন মাত্রই সুশীলা জননী তদ্দণ্ডেই শীতল জল পান করিতে নিষেধ করেন, আবগাহনকক্ষ উন্মোচন করেন না ? সঙ্কটদ্বয় আয়ুর্বেদের একই সূত্রে গ্রথিত।'

হক্ কথা।

বললুম, 'ইয়োরোপে আমান উল্লার সম্বর্ধনা নিয়ে হিন্দুস্থানের হিন্দু-মুসলমান বড়ই গর্ব অনুভব করছে।'

মীর আসলম গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'বিদেশে সম্মান-প্রাপ্ত নৃপতির সম্মান স্বদেশে লাঘব হয়।'

এ যেন চাণক্য শ্লোকের তৃতীয় ছত্র। ভাবলুম, জিজ্ঞেস করি, মহাশয় ভারতবর্ষে কোন্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, মুসলমানী না হিন্দুয়ানী, কিন্তু চেপে গিয়ে বললুম, 'আমান উল্লা বিদেশে সম্মান পাওয়াতে স্বদেশে সংস্কার কর্ম করবার সুবিধা পাবেন না ?'

মীর আসলম বললেন, 'সংস্কার-পঙ্কে যে নৃপতি কণ্ঠমগ্ন, বৈদেশিক সম্মানমুকুটের গুরুভার তাঁহাকে অধিকতর নিমজ্জিত করিবে।'

আমি বললুম, 'রানী সুরাইয়াকে দেখবার জন্য প্যারিসের ছেলে-বুড়ো পর্যন্ত রাস্তায় ভিড় করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

মীর আসলম বললেন, 'ভদ্র, অদ্য যদি তুমি তোমার পদদ্বয়ের ব্যবহার পরিত্যাগপূর্বক মস্তকোপরি দণ্ডায়মান হও, তবে তোমার মত স্বল্পপরিচিত মনুষ্যেরও

এবম্বিধ বাতুলতা নিরীক্ষণ করিবার জন্য কাবুলহট্ট সম্মিলিত হইবে।'

আমি বললুম, 'কী মুশকিল, তুলনাটা আদপেই ঠিক হল না ; রানী তো আর কোনোরকম পাগলামি করছেন না।'

মীর আসলম বললেন, 'মুসলমান রমণীর পক্ষে তুমি অন্য কোন্ বাতুলতা প্রত্যাশা করো ? অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া প্রশস্ত রাজবর্ত্মে কোন্ মুসলমান রমণী এবম্বিধ অশাস্ত্রীয় কর্ম করিতে পারে ?'

আমি বললুম, 'আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশী কুরান-হদীস পড়েছেন ; মুখ দেখানো তো আর কুরান-হদীসে বারণ নেই।'

মীর আসলম বললেন, 'আমার ব্যক্তিগত শাস্ত্রজ্ঞান এস্থলে অবান্তর। পার্বত্য উপজাতির শাস্ত্রজ্ঞান এস্থলে প্রযোজ্য। তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে।'

আমি আলোচনাটা হাল্কা করবার জন্য বললুম, 'জানেন, ফরাসী ভাষায় 'সুরীর' শব্দের অর্থ 'মৃদু হাস্য'। রানী সুরাইয়ার নাম তাই প্যারিসের সকলের মুখে হাসি ফুটিয়েছে।'

মীর আসলম বললেন, 'আমীর হবীব উল্লার নামের অর্থ 'প্রিয়তম বান্ধব' ; ইংরেজ শতবার এই শব্দার্থের প্রতি আমীরের দৃষ্টি আকর্ষণ করত শপথ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু যখন শত্রুহস্তের লৌহকীলক তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল, তখন হবীব উল্লার কোন 'হবীব' তাঁহাকে স্মরণ করিল ? অপিচ, হবীব উল্লার হবীববর্গই তাঁহাকে পুলসিরাতের (বৈতরণীর) প্রান্তদেশে অকারণে, অসময়ে দণ্ডায়মান করাইয়া দিল।'

আমি বললুম, 'ও তো পুরোনো কাসুন্দি। কিন্তু ঠিক করে বলুন তো আপনি কি আমান উল্লার সংস্কার পছন্দ করেন না ?'

বললেন, 'বৎস, গুরুর পদসেবা করিয়া আমি শিক্ষালাভ করিয়াছি, আমি শিক্ষাসংস্কারের বিরুদ্ধে কেন দণ্ডায়মান হইব ? কিন্তু আমান উল্লা যে ফিরিঙ্গী-শিক্ষা প্রবর্তনাভিলাষী আমি তাহা ভারতবর্ষে দর্শন করিয়া ঘৃণাবোধ করিয়াছি। কিন্তু ভদ্র, তোমার সুমিষ্ট চৈনিক যুষ পরিত্যাগ করিয়া এই তিক্ত বিষয়ের আলোচনায় কি লভ্য ? যুষপত্র কি তুমি স্বদেশ হইতে আনয়ন করিয়াছ ? গুরুগৃহের সুগন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে।'

আমি বললুম, 'আপনার জন্যও এক প্যাকেট এনেছি।'

মীর আসলম সন্দিগ্ধ নয়নে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু ভদ্র, শুষ্কদ্বরণিকের ন্যায্য প্রাপ্য অর্পণ করিয়াছ সত্য ?'

আমি বললুম, 'আপনার কোনো ভয় নেই। কাবুল কাস্টম হৌসকে ফাঁকি দেবার মত এলেম আমার পেটে নেই। বিছানার ছারপোকাকে পর্যন্ত সেখানে পাসপোর্ট দেখাতে হয়, মাশুল দিতে হয়। আমি তাদের সব অন্যায্য দাবীদাওয়া কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করেছি। আপনাকে হারাম খাইয়ে আমি কি আখেরে জাহান্নমে যাব?'

মীর আসলম আমাকে শীতকালে কোন্ কোন্ বিষয়ে সাবধান হতে হয় সে সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন, আবদুর রহমানকে ডেকে ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্ধন সম্বন্ধে নানা সুযুক্তি দিয়ে বিদায় নিলেন।

খবর পেয়ে তারপর এলেন মৌলানা। আমি আমান উল্লার বিদেশে সম্মান পাওয়া, আর সে সম্বন্ধে মীর আসলমের মন্তব্য তাঁকে বললুম। মৌলানা বললেন, 'আমান উল্লা যাদের কথায় চলেন, তারা তো বাদশাহের সম্মানে নিজেদের সম্মানিত মনে করছে। তারা বলছে, 'মুস্তফা কামাল যদি তুর্কীকে, রেজা শাহ যদি ইরানকে প্রগতির পথে চালাতে পারেন, তবে আমান উল্লাই বা পারবেন না কেন?' এই হল তাদের মনের ভাব; কথাটা খুলে বলার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করে না। কারণ কোনো রকম বাধাও তো কেউ দিচ্ছে না।'

আমি বললুম, 'কিন্তু মৌলানা, কতকগুলো সংস্কারের প্রয়োজন আমি মোটেই বুঝে উঠতে পারিনে। এই ধরো না শুক্রবারের বদলে বৃহস্পতিবার ছুটির দিন করা।'

মৌলানা বললেন, 'শুক্রবার ছুটির দিন করলে জুম্মার নমাজের হিড়িকে সমস্ত দিনটা কেটে যায়, ফালতো কাজ-কর্ম করার ফুরসত পাওয়া যায় না। তাই আমান উল্লা দিয়েছেন সমস্ত বৃহস্পতিবার দিন ছুটি, আর শুক্রবারে জুম্মার নমাজের জন্য আধ ঘণ্টার বদলে এক ঘণ্টার ছুটি। কিন্তু জানো, আমি আরেকটা কারণ বের করেছি। এই দেখ না অ্যারোপ্লেনে করে যদি তুমি শান্তিনিকেতনের ছুটির দিন বুধবারে বেরোও, এখানে পৌঁছবে ছুটির দিন বৃহস্পতিবারে, তারপর ইরাক পৌঁছবে শুক্রবারে সেও ছুটির দিন, তারপরের দিন প্যালেস্টাইনে—সেখানে ইহুদীদের জন্য শনিবারে ছুটি, তারপরের দিন রবিবারে ইয়োরোপ, তারপরের দিন সাউথ-সী-আয়লেণ্ডে, সেখানে তো তামাম হপ্তা ছুটি।'

আমি বললুম, 'উত্তম আবিষ্কার করেছ, কিন্তু বেশ কিছুদিনের ছুটি নিয়ে এখানে এসেছ তো? না হলে বরফ ভেঙে কাবুলে ফিরবে কি করে?'

মৌলানা বললেন, 'দু'-একদিনের মধ্যেই বরফের উপর পায়ে-চলার পথ পড়ে

যাবে ; আসতে যেতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু আমি চললুম দেশে, বউকে নিয়ে আসতে। বেনওয়া সায়েব মত দিয়েছেন, তুমি কি বল ?'

আমি শুধালুম, 'বউ রাজী আছেন ?'

মৌলানা বললেন, 'হাঁ'।

আমি বললুম, 'তবে আর কাবুল-অমৃতসরে প্লেবিসিট্ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন ? তোমাদেরই ভাষায় তো রয়েছে বাপু,—

'মিয়া বিবি রাজী
কিয়া করে কাজী ?' '

মনে মনে বললুম, 'বগদানফ গেছেন, তোমার দাড়িটির দর্শনও এখন আর কিছু দিনের তরে পাব না। নতুন বউয়ের 'কা তব কান্তা' হতে অন্তত ছ'টি মাস লাগার কথা।'

মৌলানা চলে যাওয়ার পর আবদুর রহমানকে ডেকে বললুম, 'দাও তো হে কুর্সিখানা জানালার কাছে বসিয়ে ; বাকি শীতটা তোমার ঐ বরফ দেখেই কাটাব।'

আবদুর রহমানের বর্ণনামাফিক সব রকমেরই বরফ পড়ল। কখনো পেঁজা পেঁজা, কখনো গাদা গাদা, কখনো ঘূর্ণিবায়ুর চক্কর খেয়ে দশদিক অন্ধকার করে, কখনো আস্বচ্ছ যবনিকার মত গিরি-প্রান্তর ঝাপসা করে দিয়ে ; কখনো অতি কাছে আমারই বাতায়ন পাশে, কখনো বহুদূরে সানুশ্লিষ্ট হয়ে, শিখর চুম্বন করে। আস্তে আস্তে সব কিছু ঢাকা পড়ে গেল, শুধু পত্রবিবর্জিত চিনার গাছের সারি দেখে মনে হয় দাঁত-ভাঙা পুরোনো চিরুনিখানা ঠাকুরমা যেন দেয়ালের গায়ে খাড়া করে রেখে বরফের পাকা চুল এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

কিন্তু আবদুর রহমান মর্মাহত। আমাকে প্রতিবার চা দেবার সময় একবার করে বাইরের দিকে তাকায় আর আর্তস্বরে বলে, 'না হুজুর, এ বরফ ঠিক বরফ নয়। এ শহুরে বরফ, বাবুয়ানী বরফ। সত্যিকার খাঁটি বরফ পড়ে পানশিরে। চেয়ে দেখুন বরফের চাপে এখনো গেট বন্ধ হয়নি। মানুষ এখনো দিব্যি চলাফেরা করছে, ফেঁসে যাচ্ছে না।'

আবদুর রহমানের ভয়, পাছে আমাকে বোকা পেয়ে কাবুল উপত্যকা তার ভেজাল বরফ গছিয়ে দেয়। নিতান্তই যদি কিনতে হয় তবে যেন আমি কিনি আসল, খাঁটি মাল 'মেড্ ইন পানশির'।

একত্রিশ

শীত আর বসন্ত ঘরে বসে, ডুব সাঁতার দিয়ে কাটাতে হল।

এদেশে বসন্তের সঙ্গে আমাদের বর্ষার তুলনা হয়। সেখানে গ্রীষ্মকালে ধরণী তপ্তশয়নে পিপাসার্তা হয়ে পড়ে থাকেন, আষাঢ়স্য যে কোনো দিবসেই হোক্ ইন্দ্রপুরীর নববর্ষণ বারতা পেয়ে নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত হন। এখানে শীতকালে ধরিত্রী প্রাণহীন স্পন্দন-বিহীন মহানিদ্রায় লুটিয়ে পড়েন, তার পর নববসন্তের প্রথম রৌদ্রে চোখ মেলে তাকান। সে তাকানো প্রথম ফুটে ওঠে গাছে গাছে।

দূর থেকে মনে হল ফ্যাকাশে সাদা গাছগুলোতে বুঝি কোনোরকম সবুজ পোকা লেগেছে। কাছে গিয়ে দেখি গাছে গাছে অগুন্তি ছোট্ট ছোট্ট পাতার কুঁড়ি; জন্মের সময় কুকুরছানার বন্ধ চোখের মত। তারপর কয়েকদিন লক্ষ্য করিনি, হঠাৎ একদিন সকালবেলা দেখি সেগুলো ফুটেছে আর দুটি দুটি করে পাতা ফুটে বেরিয়েছে—গাছগুলো যেন সমস্ত শীতকাল বকপাখির মত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ ডানা মেলে ওড়বার উপক্রম করেছে। সহস্র সহস্র সবুজ বলাকা যেন মেলে ধরেছে লক্ষ লক্ষ অঙ্কুরের পাখা।

ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর।

গাছে গাছে দেখন-হাসি, পাতায় পাতায় আড়াআড়ি—কে কাকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি গজিয়ে উঠবে। কোনো গাছ গোড়ার দিকে সাড়া দেয়নি, হঠাৎ একদিন একসঙ্গে অনেকগুলো চোখ মেলে দেখে আর সবাই ঢের এগিয়ে গেছে, সে তখন এমনি জোর ছুট লাগাল যে, দেখতে না দেখতে আর সবাইকে পিছনে ফেলে, বাজী জিতে, মাথায় আইভি মুকুট পরে সগর্বে দুলতে লাগল। কেউ সারা গায়ে কিছু না পরে শুধু মাথায় সবুজ মুকুট পরল, কেউ ধীরে সুস্থে সর্বাঙ্গে যেন সবুজ চন্দনের ফোঁটা পরতে লাগল। এতদিন বাতাস শুকনো ডালের ভিতর দিয়ে হুহু করে ছুটে চলে যেত, এখন দেখি কী আদরে পাতাগুলোর গায়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে।

কাবুল নদীর বুকের উপর জমে-যাওয়া বরফের জগদ্দল-পাথর ফেটে চৌচির হল। পাহাড় থেকে নেমে এল গম্ভীর গর্জনে শত শত নব জলধারা—সঙ্গে নেমে আসছে লক্ষ লক্ষ পাথরের নুড়ি আর বরফের টুকরো। নদীর উপরে কাঠের পুলগুলো কাঁপতে আরম্ভ করেছে—সিকন্দর শাহের আমল থেকে তারা হাঁটু ভেঙে কতবার নুয়ে পড়েছে, ভেসে গিয়েছে, ফের দাঁড়িয়ে উঠেছে তার হিসেব কেউ

কখনো রাখতে পারেনি।

উপরে তাকিয়ে দেখি গভীর নীলাম্বুজের মত নবীন নীলাকাশ হংসশুভ্র মেঘের ঝালর ঝুলিয়ে চন্দ্রাতপ সাজিয়েছে।

উপত্যকার দিকে তাকিয়ে দেখি সবুজের বন্যায় জনপদ অরণ্য ডুবে গিয়েছে। এ রকম সবুজ দেখেই পূর্ববঙ্গের কবি প্রিয়ার শ্যামল রঙের স্মরণে বলেছিলেন।

ও বন্ধুয়া, কোন্ বন-ধোওয়া ছাঁওলা নীলা পানি,
গোসল করি হইলা তুমি সকল রঙের রানী।

কিন্তু এ-উপত্যকা এ-বনরাজি এ-রকম সবুজ পেল কোথা থেকে?

নীলাকাশের নীল আর সোনালী রোদের হলদে মিশিয়ে।

কিন্তু আমাদের বর্ষা আর এদেশের বসন্তে একটা গভীর পার্থক্য রয়েছে। বর্ষায় আমাদের মন ঘরমুখো হয়, এদেশের জনপ্রাণীর মন বাহিরমুখো হয়। গাছপালার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যে সুপ্তোত্থিত নব যৌবনের স্পন্দন অনুভব করে তারই স্মরণে কবি বলেছেন—

শপথ করিনু রাত্রে পাপ পথে আর যেন নাহি ধায়,
প্রভাতে দ্বারেতে দেখি শপথঘ্ন মধুঋতু কি করি উপায়!

শুধু ওমর খৈয়াম দোটানার ভিতর থাকা পছন্দ করেন না। তিনি গর্জন করে বললেন,—

বিধিবিধানের শীতপরিধান
ফাগুন আগুনে দহন করো।
আয়ুবিহঙ্গ উড়ে চলে যায়
হে সাকি, পেয়ালা অধরে ধরো।*

কাবুলীরা তাই বেরিয়ে পড়েছে, না বেরিয়ে উপায়ও নেই—শীতের জ্বালানী কাঠ ফুরিয়ে এসেছে, দুম্বা ভেড়ার জাবনা তলায় এসে ঠেকেছে, শুঁটকি মাংসের পোকা কিলবিল করছে। এখন আতপ্ত বসন্তের রোদে শরীরকে কিঞ্চিৎ তাতানো যায়, দুম্বা ভেড়া কচি ঘাসে চরানো যায় আর আধখেঁচড়া শিকারের জন্য দু'চার দল পাখিও আস্তে আস্তে ফিরে আসছে। আবদুর রহমান বললো, পানশির অঞ্চলে ভাঙা বরফের তলায় কি এক রকমের মাছও নাকি এখন ধরা যায়। অনুমান করলুম, কোন রকমের স্প্রিং ট্রাউটই হবে।

* অনুবাদকের নাম মনে নেই বলে দুঃখিত।

রথ দেখার সময় যাঁরা কলা বেচার দিকেও মাঝে মাঝে নজর দেন তাঁদের মুখে শুনেছি কুবের যে যক্ষকে ঠিক একটি বৎসরের জন্যই নির্বাসন দিয়েছিলেন তার একটা গভীর কারণ আছে। ছয় ঋতুতে ছয় রকম করে প্রিয়ার বিরহযন্ত্রণা ভোগ না করা পর্যন্ত মানুষ নাকি পরিপূর্ণ বিচ্ছেদবেদনার স্বরূপ চিনতে পারে না; আর বিদগ্ধ জনকে এক বছরের বেশী শাস্তি দেওয়াতেও নাকি কোনো সূক্ষ্ম চতুরতা নেই—সোজা বাঙলায় তখন তাকে বলে মরার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া মাত্র।

আফগান-সরকার অযথা বিঘ্ন-সন্তোষী নন বলে ছয়টি ঋতু পূর্ণ হওয়া মাত্রই আমাকে পাণ্ডববর্জিত গণ্ডগ্রামের নির্বাসন থেকে মুক্তি দিয়ে শহরে চাকরি দিলেন। এবারে বাসা পেলুম লব-ই-দরিয়ায় অর্থাৎ কাবুল নদীর পারে, রাশান দূতাবাসের গা ঘেঁষে, বেনওয়া সায়েবের সঙ্গে একই বাড়িতে।

প্রকাণ্ড সে বাড়ি। ছোটখাটো দুর্গ বললেও ভুল হয় না। চারদিকে উঁচু দেয়াল, ভিতরে চকমেলানো একতলা দোতলা নিয়ে ছাব্বিশখানা বড় বড় কামরা। মাঝখানের চত্বরে ফুলের বাগান, জলের ফোয়ারাটা পর্যন্ত বাদ যায়নি। বড়লোকের বাড়ি সরকারকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে—বেনওয়া সায়েব ফন্দি-ফিকির করে বাড়িটা বাগিয়েছিলেন।

আমি নিলুম এক কোণে চারটে ঘর আর বেনওয়া সায়েব রইলেন আরেক কোণে আর চারটে ঘর নিয়ে। বাকি বাড়িটা খাঁ খাঁ করে, আর সে এতই প্রকাণ্ড যে আবদুর রহমানের সঙ্গীত-রবও কায়ক্লেশে আঙ্গিনা পাড়ি দিয়ে ওপারে পৌঁছয়।

শহরে এসে গুষ্টিসুখ অনুভব করার সুবিধে হল। রাশান রাজদূতাবাসে রোজই যাই—দু'দিন না গেলে দেমিদফ এসে দেখা দেন।—সইফুল আলম মাঝে মাঝে ঢুঁ মেরে যান, সোমথ বউ সম্বন্ধে অহরহ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মৌলানার দাড়ির দর্শনও মাঝে মাঝে পাই, দোস্ত মুহম্মদ ঘূর্ণিবায়ুর মত বেলা-অবেলায় চক্কর মেরে বেরবার সময় 'কলাডা মুলাডা' ফেলে যান, বিদগ্ধ মীর আসলম সুসিদ্ধ চৈনিক যুষ পান করে যান, তা ছাড়া ইনি উনি তিনি তো আছেনই আর নিতান্ত বান্ধব বাড়ন্ত হলে বিরহী যক্ষ বেনওয়া তো হাতের নাগাল।

রাশান রাজদূতাবাসে আরো অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল; দেমিদফকে বাদ দিলে সকলের পয়লা নাম করতে হয় বলশফের। নামের সঙ্গে অর্থ মিলিয়ে তাঁর দেহ—ব্যূঢ়োরস্ক, বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশুমহাবাহু বললে আবদুর রহমান বরঞ্চ অপাংক্তেয় হতে পারে, ইনি সে বর্ণনা গলাধঃকরণ করে অনায়াসে সেকেণ্ড হেল্‌পিঙ চাইতে পারেন।

আবদুর রহমানের সঙ্গে পরিচয় করে দেবার সময় যে দ্বিতীয় নরদানবের কথা বলেছিলুম ইনিই সে-বিভীষিকা।

বহুবার এঁর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি—কাবুল বাজারের মত পপুলার লীগ অব নেশনসে আজ পর্যন্ত এমন দেশী বিদেশী চোখে পড়েনি যে তাঁকে দেখে হকচকিয়ে যায়নি।

হুঁশিয়ার সোয়ার হলে তক্ষুনি ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেছে—বহু ঘোড়াকে ঘাবড়ে গিয়ে সামনের পা দুটো আকাশে তুলতে দেখেছি।

টেনিস-কোর্টে রেকেট নিয়ে নামলে শত্রুপক্ষ বেজ-লাইনের দশ হাত দূরে তারের জালের গা ঘেঁষে দাঁড়াত। বলশফ বেজে দাঁড়ালে তাঁর কোনো পার্টনার নেটে দাঁড়াতে রাজী হত না, শত্রুপক্ষের তো কথাই ওঠে না। তাঁতের রেকেট ঘন ঘন ছিঁড়ে যেত বলে অ্যালুমিনিয়ম জাতীয় ধাতুর রেকেট নিয়ে তিনি তাড়ু হাঁকড়াতেন, স্বচ্ছন্দে নেট ডিঙোতে পারতেন—লাফ দেবার প্রয়োজন হত না—আর ঝোলা নেট টাইট করার জন্য এক হাতে হ্যাণ্ডেল ঘোরাতেন মেয়েরা যেরকম সেলাই কলের হাতল ঘোরায়।

শুনেছি বিলেতে কোনো কোনো ফিল্‌ম্ নাকি ষোলো বছরের কম বয়স হলে দেখতে দেয় না—চরিত্র দোষ হবে বলে; যাদের ওজন একশ' ষাট পৌণ্ডের কম তাদের ঠিক তেমনি বলশফের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করা বারণ ছিল, পাছে হাতের নড়া কাঁধ থেকে খসে যায়। মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা।

বীরপুরুষ হিসেবে রাশান রাজদূতাবাসে বলশফের খাতির ছিল। ১৯১৬ সাল থেকে বলশেভিক বিদ্রোহের শেষ পর্যন্ত তিনি দেশে বিদেশে বিস্তর লড়াই লড়েছেন। ১৯১৬-১৭ সালের শীতকালে যখন রুশবাহিনী পোল্যাণ্ডে লড়াই হেরে পালায় তখন বলশফ রাশান ক্যাভাল্‌রিতে ছোকরা অফিসার। সেবারে ঘোড়ায় চড়ে পালাবার সময় তার পিটের চোদ্দ জায়গায় জখম হয়েছিল—বিস্তর ঝুলোঝুলির পর একদিন শার্ট খুলে তিনি আমায় দাগগুলো দেখিয়েছিলেন। কোনো কোনোটা তখনো আধ ইঞ্চি পরিমাণ গভীর। আমি ঠাট্টা করে বলেছিলুম, 'পৃষ্ঠে তব অস্ত্র-লেখা।'

বলশফকে কেউ কখনো চটাতে পারেনি বলেই রসিকতাটা করেছিলুম। তিনি ভারতবর্ষের ক্ষাত্র বীরত্বের 'কোড্' শুনে বললেন, 'যদি সেদিন না পালাতুম তবে ত্রৎস্কির আমলে পোলদের বেধড়ক পাল্টা মার দেবার সুখ থেকে যে বঞ্চিত হতুম, তার কি?'

মাদাম দেমিদফ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আর জানেন তো, মসিয়ো, ঐ লড়াইতেই সোভিয়েট রাশার অনেক পথ সুরাহা হয়ে যায়।'

বলশফের একটা মস্ত দোষ দুদণ্ড চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। হাত দুখানা নিয়ে যে কি করবেন ঠিক করতে পারেন না বলে এটা সেটা নিয়ে সব সময় নাড়াচাড়া করেন, বেখেয়ালে একটু বেশী চাপ দিতেই কর্কস্ক্রুটা পর্যন্ত ভেঙে যায়। তিনি ঘরে ঢুকলেই আমরা টুকিটাকি সব জিনিস তাঁর হাতের নাগাল থেকে সরিয়ে ফেলতুম। আমার ঘরে ঢুকলে আমি তৎক্ষণাৎ তাকে একথালা আস্ত আখরোট খেতে দিতুম।

দুটো একটা খেতেন মাঝে মাঝে—যাওয়ার পর দেখা যেত সব ক'টি আখরোটের খোসা ছাড়িয়ে ফেলেছেন, চহারমগজশিকন (হাতুড়ি) না দেওয়া সত্ত্বেও।

এ রকম অজাতশত্রু লোক সমস্ত কাবুল শহরে আমি দুটি দেখিনি। একদিন তাই যখন দেমিদফের ঘরে আলোচনা হচ্ছিল তখন বলশফের সব চেয়ে দিলী-দোস্ত রোগাপটকা স্নিয়েশকফ বললেন, 'বলশফের সঙ্গে সকলের বন্ধুত্ব তার গায়ের জোরের ভয়ে।'

বলশফ বললেন, 'তা হলে তো তোমার সব চেয়ে বেশী শত্রু থাকার কথা।'

স্নিয়েশকফ যা বললেন, পদাবলীর ভাষায় প্রকাশ করলে তার রূপ হয়—

'বঁধু তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তুঁহারি রূপে—'

বাকিটা তিনি আর প্রাণের ভয়ে বলেননি।

বলশফ বললেন, 'রোগা লোকের ঐ এক মস্ত দোষ। খামকা বাজে তর্ক করে। বলে কি না 'ভয়ে বন্ধুত্ব!' যত সব পরস্পরদ্রোহী, আত্মঘাতী বাক্যাড়ম্বর!'

বলশফ সম্বন্ধে এত কথা বললুম তার কারণ তিনি তখন আমান উল্লার অ্যার-ফোর্সের ডাঙর পাইলট। বলশেভিক-বিদ্রোহ জুড়িয়ে গিয়ে থিতিয়ে যাওয়ায় তাঁর সঙ্কটাকাঙ্ক্ষী মন কাবুলে এসে নূতন বিপদের সন্ধানে আমান উল্লার চাকরি নিয়েছিল।

শেষদিন পর্যন্ত তিনি আমান উল্লার সেবা করেছিলেন।

বত্রিশ

আমান উল্লা ইউরোপ থেকে নিয়ে এলেন একগাদা দামী আসবাবপত্র, অগুনতি মোটর গাড়ি আর বক্তৃতা দেবার বদ অভ্যাস। প্রাচ্যদেশের লোক খেয়েদেয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে আরামে গা এলিয়ে দেয়, পশ্চিমে ডিনারের পর স্পীচ, লাঞ্চের পর অরেটরি—তাও আবার যত সব শিরঃপীড়াদায়ক পোলিটিক্যাল বিষয় নিয়ে।

সায়েবরা বিলেতে লাঞ্চে ডিনারে আমান উল্লাকে যে নেশার পয়লা পাত্র খাইয়ে দিয়েছিল তার খোয়ারি তিনি চালালেন কাবুলে ফিরে এসে, মাত্রা বাড়িয়ে, লম্বা লম্বা লেকচার ঝেড়ে। পর পর তিন দিনে নাকি তিনি একুনে ত্রিশ ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

কিন্তু কারো কথায় তো আর গায়ে ফোস্কা পড়ে না, কাবুলে চিঁড়ের প্রচলন নেই—কাজেই শ্রোতারা কেউ ঘুমলো, কেউ শুনলো, দু'-একজন মনে মনে ইউরোপে তাঁর বাজে খর্চার আঁক কষলো।

তারপর আরম্ভ হল সংস্কারের পালা। একদিন সকালবেলা মৌলানার বাড়ি যেতে গিয়ে দেখি পনরো আনা দোকানপাট বন্ধ। বড় দোকানের ভিতর গ্রামোফোন-ফোটোগ্রাফের দোকানটা খোলা ছিল। দোকানদার পাঞ্জাবী, অমৃতসরের লোক; আমাদের সঙ্গে ভাব ছিল।

খবর শুনে বিশ্বাস হল না। আমান উল্লার হুকুম, 'কার্পেটের উপর পদ্মাসনে বসে দোকান চালাবার কায়দা বেআইনী করা হল; সব দোকানে বিলিতী কায়দায় চেয়ার টেবিল চাই।'

আমি বললুম, 'সে কি কথা? ছুতোর কামার, কালাইগর, মুচী?'

'সব, সব।'

'ছোট ছোট খোপের ভিতর চেয়ার টেবিল ঢোকাবে কি করে, পাবেই বা কোথায়?'

নিরুত্তর।

'যারা পয়সাওয়ালা, যাদের দোকানে জায়গা আছে?'

'রাতারাতি মেজ-কুর্সি পাবে কোথায়? ছুতোরও ভয়ে দোকান বন্ধ করেছে। বলে, চেয়ারে বসে টেবিলে তক্তা রেখে সে নাকি র‍্যাঁদা চালাতে শেখেনি।'

'আগের থেকে নোটিশ দিয়ে হুঁশিয়ার করা হয়নি ?'

'না। জানেন তো, আমান উল্লা বাদশার সব-কুছ ঝটপট্।'

পাক্কা তিন সপ্তাহ চোদ্দ আনা দোকানপাট বন্ধ রইল। গম ডাল অবশ্যি পিছনের দরজা দিয়ে আড়ালে আবডালে বিক্রি হল, তাদের উপরে চোটপাট করে পুলিশ দু'পয়সা কামিয়ে নিল।

আমান উল্লা হার মানলেন কিনা জানিনে তবে তিন সপ্তাহ পরে একে একে সব দোকানই খুলল—পূর্ববৎ, অর্থাৎ বিন্ চেয়ার-টেবিল। কাবুলের সবাই এই ব্যাপারে চটে গিয়েছিল সন্দেহ নেই কিন্তু রাজার খামখেয়ালিতে তারা অভ্যস্ত বলে অত্যধিক উষ্মাবোধ করেনি। কাবুলীদের এ মনোভাবটা আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনি, কারণ আমরা ভারতবর্ষে অত্যাচার-অবিচারে অভ্যস্ত বটে, কিন্তু খাম-খেয়ালি বড় একটা দেখতে পাইনে।

আমার মনে খটকা লাগল। পাগমানের পাগলামির কথা মনে পড়ল—গাঁয়ের লোককে শহরে ডেকে এনে মর্নিংস্যুট পরাবার বিড়ম্বনা। এ যে তারি পুনরাবৃত্তি; এ যে আরো পীড়াদায়ক, মূল্যহীন, অর্থহীন, ইয়োরোপের অন্ধানুকরণ।

মীর আসলমের সঙ্গে দেখা হলে পর তিনি আমাকে সবিস্তর আলোচনা না করতে দিয়ে যেটুকু বললেন বাঙলা ছন্দে তার অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—

কয়লাওয়ালার দোস্তী ? তওবা !
ময়লা হতে রেহাই নাই
আতরওয়ালার বাক্স বন্ধ
দিলখুশ তবু পাই খুশবাই।

আমি বললুম, 'এ তো হল সূত্র, ব্যাখ্যা করুন !'

মীর আসলম বললেন, 'পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ইংরেজ ফরাসী প্রভৃতি ফিরিঙ্গী সম্প্রদায়ের সঙ্গে গাত্র ঘর্ষণ করতঃ আমান উল্লা যে কৃষ্ণ-প্রস্তর চূর্ণ সর্বাঙ্গে লেপন করিয়া আসিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি কাবুল-হট্ট মসীলিপ্ত করিবার বাসনা প্রকাশ করিতেছেন।

'তথাপি অস্মদ্দেশীয় বিদগ্ধজনের শোক কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইত যদি নৃপতি প্রস্তরচূর্ণের সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ প্রস্তরখণ্ডও আনয়ন করিতেন। তদ্দ্বারা ইন্ধন প্রজ্বলিত করিলে দীন দেশের শৈত্য নিবারিত হইত।'

আমি বললুম, 'চেয়ারটেবিল চালানো যদি মসীলেপন মাত্রই হয় তবে তা নিয়ে এমন ভয়ঙ্কর দুঃখ করবার কি আছে বলুন।'

মীর আসলম বললেন, 'অযথা শক্তিক্ষয়। নৃপতির অবমাননা। ভবিষ্যৎ অন্ধকার।'

কিন্তু আর পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে দেখলুম যে, তাঁরা মীর আসলমের মত কালো চশমা পরে ভবিষ্যৎ এত কালো করে দেখছেন না। ছোকরাদের চোখে তো গোলাপী চশমা; গোলাপী বললেও ভুল বলা হয়,—সে চশমা লাল টকটকে, রক্ত-মাখানো। তারা বলে, 'যেসব বদমায়েশরা এখনো কার্পেটে বসে দোকান চালাচ্ছে তাদের ধরে ধরে কামানের মুখে বেঁধে হাজারো টুকরো করে উড়িয়ে দেওয়া উচিত। আমান উল্লা নিতান্ত ঠাণ্ডা বাদশা বলেই তাদের রেহাই দিয়েছেন।'

ভেবে চিন্তে আমি গোলাপী চশমাই পরলুম।

তার কিছুদিন পরে আরেক নয়া সংস্কারের খবর আনলেন মৌলানা। আফগান সেপাইদের মানা করা হয়েছে, তারা যেন কোনো মোল্লাকে মুরশীদ না বানায় অর্থাৎ গুরু স্বীকার করে যেন মন্ত্র না নেয়।

খাঁটি ইসলামে গুরু ধরার রেওয়াজ নেই। পণ্ডিতেরা বলেন, 'কুরান শরীফ 'কিতাবুম্মুবীন' অর্থাৎ 'খোলা কিতাব'; তাতেই জীবনযাত্রার প্রণালী আর পরলোকের জন্য পুণ্য সঞ্চয়ের পন্থা সোজা ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে; গুরু মেনে নিয়ে তার অন্ধানুসরণ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

অন্য দল বলেন, 'একথা আরবদের জন্য খাটতে পারে, কারণ তারা আরবীতে কুরান পড়তে পারে। কিন্তু ইরানী, কাবুলীরা আরবী জানে না; গুরু না নিলে কি উপায়?'

এ-তর্কের শেষ কখনো হবে না।

কিন্তু বিষয়টা যদি ধর্মের গণ্ডির ভিতরেই বদ্ধ থাকত, তবে আমান উল্লা গুরু-ধরা বারণ করতেন না। কারণ, যদিও মানুষ গুরু স্বীকার করে ধর্মের জন্য, তবু দেখা যায় যে, শেষ পর্যন্ত গুরু দুনিয়াদারীর সব ব্যাপারেও উপদেশ দিতে আরম্ভ করেছেন এবং গুরুর উপদেশ সাক্ষাৎ আদেশ।

তাহলে দাঁড়ালো এই যে, আমান উল্লার আদেশের বিরুদ্ধে মোল্লা যদি তাঁর শিষ্য কোনো সেপাইকে পাল্টা আদেশ দেন, তবে সে সেপাই মোল্লার আদেশই যে মেনে নেবে তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

চার্চ বনাম স্টেট।

গোলাপী চশমাটা কপালে তুলে অনুসন্ধান করলুম, দেয়ালে কোনো লেখা

ফুটে উঠেছে কিনা, আমান উল্লা কেন হঠাৎ এ আদেশ জারী করলেন। তবে কি কোনো অবাধ্যতা, কোনো বিদ্রোহ, কোনো—? কিন্তু এসব সন্দেহ কাবুলে মুখ ফুটে বলা দূরের কথা, ভাবতে পর্যন্ত ভয় হয়।

আমার শেষ ভরসা মীর আসলম। তিনি দেখি কালো চশমায় আরেক পোঁচ ভুসো মাখিয়ে রাজনৈতিক আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। খবরটা দেখলুম তিনি বহু পূর্বেই জেনে গিয়েছেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'ইহলোক পরলোক সর্বলোকের জন্যই গুরু নিষ্প্রয়োজন। তৎসত্ত্বেও যদি কেহ অনুসন্ধান করে, তবে তাহাকে প্রতিরোধ করাও ততোধিক নিষ্প্রয়োজন।

আমি বললুম, 'কিন্তু আপনি যখন আপনার ভারতীয় গুরুর কথা স্মরণ করেন, তখনই তো দেখেছি তাঁর প্রশংসায় আপনি পঞ্চমুখ।'

মীর আসলম বললেন, 'গুরু দ্বিবিধ; যে গুরুগৃহে প্রবেশ করার দিন তোমার মনে হইবে, গুরু ভিন্ন পদমাত্র অগ্রসর হইতে পারো না এবং ত্যাগ করার দিন মনে হইবে, গুরুতে তোমার প্রয়োজন নাই, তিনিই যথার্থ গুরু—গুরুর আদর্শ তিনি যেন একদিন শিষ্যের জন্য সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন হইতে পারেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর গুরু শিষ্যকে প্রতিদিন পরাধীন হইতে পরাধীনতর করেন। অবশেষে গুরুবিনা সে-শিষ্যও নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস কর্ম পর্যন্ত সুসম্পন্ন করিতে পারে না। আমার গুরু প্রথম শ্রেণীর। আফগান সৈন্যের গুরু দ্বিতীয় শ্রেণীর।'

আমি বললুম, 'অর্থাৎ আপনার গুরু আপনাকে স্বাধীন করলেন; আফগান সেপাইয়ের গুরু তাকে পরাধীন করেন। পরাধীনতা ভালো জিনিস নয়, তবে কেন বলেন, গুরু নিষ্প্রয়োজন? বরঞ্চ বলুন, গুরুগ্রহণ সেখানে অপকর্ম।'

মীর আসলম বললেন, 'ভদ্র, সত্য কথা বলিয়াছ, কিন্তু প্রশ্ন, সংসারে কয়জন লোক স্বাধীন হইয়া চলিতে ভালোবাসে বা চলিতে পারে। যাহারা পারে না, তাহাদের জন্য অন্য কি উপায়?'

আমি বললুম, 'খুদায় মালুম। কিন্তু উপস্থিত বলুন, সৈন্যদের বিদ্রোহ করার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা?'

মীর আসলম বললেন, 'নৃপতির সন্নিকটস্থ সেনাবাহিনী কখনো বিদ্রোহ করে না, যতক্ষণ না সিংহাসনের জন্য অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত হন।'

আমি ভারী খুশী হয়ে বিদায় নিতে গিয়ে বললুম, 'কয়েক দিন হল লক্ষ্য করছি, আপনার ভাষা থেকে আপনি কঠিন আরবী শব্দ কমিয়ে আনছেন। সেটা কি সজ্ঞানে?'

মীর আসলম পরম পরিতোষ সহকারে মাথা দোলাতে দোলাতে হঠাৎ অত্যন্ত গ্রাম্য কাবুলী ফার্সীতে বললেন, 'এ্যাদ্দিনে বুঝতে পারলে চাঁদ? তবে হক কথা শুনে নাও। আর বছর যখন হেথায় এলে তখন ফার্সী জানতে ঢু-ঢু। তাইতে তোমায় তালিম দেবার জন্ত আরবী শব্দের বেড়া বানাতুম, তুমি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পেরোতে; গোড়ার দিকে ঠ্যাঙগুলো জখম-টখমও হয়েছে। এখন দিব্যি আরবী ঘোড়ার মত আরবী বেড়া ডিঙোচ্ছো বলে খামকা বখেড়া বাঁধার কম্ম বন্ধ করে দিলুম। গুরু এখন ফালতো। মাথার ভসভসে ঘিলুতে তুরপুন সিঁধোলো?'

আমি বাড়ি ফেরার সময় ভাবলুম, 'লোকটি সত্যিকার পণ্ডিত। গুরু কি করে নিজেকে নিষ্প্রয়োজন করে তোলেন, সেটা হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলেন।'

তারপর বেশী দিন যায়নি, এমন সময় একদিন নোটিশ পেলুম, একদল আফগান মেয়েকে উচ্চ শিক্ষার জন্য তুর্কীতে পাঠানো হবে; স্বয়ং বাদশা উপস্থিত থেকে তাদের বিদায়-আশীর্বাদ দেবেন।

আমি যাইনি। বৃটিশ রাজদূতাবাসের এক উচ্চপদস্থ ভারতীয় কর্মচারীর মুখ থেকে বর্ণনাটা শুনলুম। তার নাম বলব না, সে নাম এখনো মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের খবরের কাগজে ধূমকেতুর মত দেখা দেয়। বললেন, 'গিয়ে দেখি, জনকুড়ি কাবুলী মেয়ে গার্ল গাইডের ড্রেস পরে দাঁড়িয়ে। আমান উল্লা স্বয়ং উপস্থিত, অনেক সরকারী কর্মচারী, বিদেশী রাজদূতাবাসের গণ্যমান্য সভ্যগণ, আর একপাশে মহিলারা। রানী সুরাইয়াও আছেন, হ্যাটের সামনে পাতলা নেটের পরদা।

'আমান উল্লা উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক খাঁটি এবং পুরানো কথা দিয়ে অবতরণিকা শেষ করে বললেন, "আমি পর্দা-প্রথার পক্ষপাতী নই, তাই আমি এই মেয়েদের বিনা বোরকায় তুর্কী পাঠাচ্ছি। কিন্তু আমি স্বাধীনতাপ্রয়াসী; তাই কাবুলের কোনো মেয়ে যদি মুখের সামনের পর্দা ফেলে দিয়ে রাস্তায় বেরোতে চায়, তবে আমি তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। আবার আমি কাউকে জোর করতেও চাইনে, এমন কি, মহিষী সুরাইয়াও যদি বোরকা পরাই পছন্দ করেন, তাতেও আমার আপত্তি নেই।"

কর্মচারিটি বললেন, 'এতটা ভালোয়-ভালোয় চলল। কিন্তু আমান উল্লার বক্তৃতা শেষ হতেই রানী সুরাইয়া এগিয়ে এসে নাটকি ঢঙে হ্যাটের সামনের পর্দা ছিঁড়ে ফেললেন। কাবুল শহরের লোক সভাস্থলে আফগানিস্থানের রাজমহিষীর

মুখ দেখতে পেল।'

কর্মচারিটির রসবোধ অত্যন্ত কম, তাই বর্ণনাটা দিলেন নিতান্ত নীরস-নির্জলা। কিন্তু খুঁটিয়ে খুটিয়ে যে জিজ্ঞেস করব, তারও উপায় নেই। হয়ত ঘুঘু এসেছেন রিপোর্ট তৈরি করবার মতলব নিয়ে—ঘটনাটা ভারতবাসীর মনে কি রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাই হবে রিপোর্টের মশলা। আমিও 'পোকার' খেলার জুয়াড়ীর মত মুখ করে বসে রইলুম।

যাবার সময় বললেন, 'এরকমধারা ড্রামাটিক কায়দায় পর্দা ছেঁড়ার কি প্রয়োজন ছিল? রয়েসয়ে করলেই ভালো হত না?'

আমি মনে মনে বললুম, 'ইংরেজের সনাতন পন্থা। সব কিছু রয়েসয়ে। সব কিছু টাপেটোপে। তা সে ইংরিজী লেখাপড়া চালানোই হোক, আর ঢাকাই মসলিনের বুক ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করাই হোক। ছুঁচ হয়ে ঢুকবে, মুষল হয়ে বেরবে।'

কিছু একটা বলতে হয়। নিবেদন করলুম, 'এসব বিষয়ে এককালে ভারতবাসী মাত্রই কোনো না কোনো মত পোষণ করত। কারণ তখনকার দিনে আফগানিস্থান ভারতবর্ষের মুখের দিকে না তাকিয়ে কোনো কাজ করত না, কিন্তু এখন আমান উল্লা নিজের চোখে সমস্ত পশ্চিম দেখে এসেছেন, রাস্তা তাঁর চেনা হয়ে গিয়েছে; আমরা একপাশে দাঁড়িয়ে শুধু দেখব, মঙ্গল কামনা করব, ব্যস।'

কর্মচারী চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে ভাবলুম।

কিন্তু একটা কথা এখানে আমি আমার পাঠকদের বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দিতে চাই যে, আমি এবং কাবুলের আর পাঁচজন তখন আমান উল্লার এসব সংস্কার নিয়ে দিনরাত মাথা ঘামাইনি। মানুষের স্বভাব আপন ব্যক্তিগত সুখদুঃখকে বড় করে দেখা—হাতের সামনের আপন মুঠি হিমালয় পাহাড় ঢেকে রাখে। দ্বিতীয়ত যে-সব সংস্কার করা হচ্ছিল তার একটাও আমার মত পাঁচজনের স্বার্থকে স্পর্শ করেনি। সুট সঙ্গে নিয়েই আমরা কাবুল গিয়েছি, কাজেই সুট পরার আইন আমাদের বিচলিত করবে কেন; আর আমরা পাতলা নেটের ব্যবসাও করিনে যে, মহারানী তাঁর হ্যাটের নেট ছিঁড়ে ফেললে আমাদের দেউলে হতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, ইরান-আফগানিস্থানের বাদশা দেশের লোকের মাল-জানের মালিক। আর সকলেই জানে এই দুই বস্তুই অত্যন্ত 'ফানী'—নশ্বর। নশ্বর জিনিস এমনি যাবে অমনিও যাবে—বাদশাহের খামখেয়ালি নিমিত্তের ভাগী মাত্র। রাজা বাদশা তো আর গাধাখচ্চর নন যে, শুধু দেশের

মোট পিঠে করে বইবেন আর জাবর কাটবেন—তাঁরা হলেন গিয়ে তাজী ঘোড়ার জাত। দেশটাকে পিঠে নিয়ে যেমন হঠাৎ প্রগতির দিকে খামকা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটবেন, তেমনি কারণে অকারণে সোয়ারকে দুটো চারটে লাথি-চাটও মারবেন। তাই বলে তো আর ঘোড়ার দানাপানি বন্ধ করে দেওয়া যায় না।

কাজেই কাবুল শহরের লোকজন খাচ্ছে-দাচ্ছে ঘুমুচ্ছে, বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

এমন সময় আমান উল্লার প্রতিজ্ঞা যে—তিনি সব মেয়েদের বেপর্দায় বেরবার সাহায্য করবেন এক ভিন্নরূপ নিয়ে প্রকাশ পেল—শোনা গেল বাদশার হুকুম, কোনো স্ত্রীলোক যদি বেপর্দা বেরতে চায় তবে তার স্বামী যেন কোনো ওজর-আপত্তি না করে। যাদের আপত্তি আছে, তারা যেন বউদের তালাক দিয়ে দেয়। আর তারা যদি সরকারী চাকরী করে, তবে আমান উল্লা দেখে নেবেন। কি দেখে নেবেন? সেটা পষ্টাপষ্টি বলা হয়নি, তবে চাকরীটাও হয়ত বউয়ের সঙ্গে সঙ্গে একই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। সাধে কি আর বাঙলায় বলি, 'বিবিজান চলে যান লবে-জান করে।' শুধু বিবিজান চলে গেলে সুস্থ মানুষ—প্রেমিকদের কথা আলাদা—'লবে-জান' হবে কেন? সঙ্গে সঙ্গে চাকরীটা গেলে পর মানুষ অনাহারে 'লবে-জান' হয়।

মীর আসলম বললেন, 'গিন্নীকে গিয়ে বল্লু, 'ওগো চোখে সুরমা লাগিয়ে বে-বোরকায় কাবুল শহরে এট্টা রোঁদ মেরে এস।' বিশ্বাস করবে না ভায়া, বদনা ছুঁড়ে মারলে। তা জানো তো, মোল্লার পাগড়ি, বদনাটাই খেল টোল। আম্মো অবশ্যি টাল খেয়ে খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।'

আমি বললুম, 'হাঁ হাঁ জানি, পাগড়ি অনেক কাজে লাগে।'

মীর আসলম বললেন, 'ছাই জানো, বে করলে জানতে। বেয়াড়া বউকে তোমার তো আর বেঁধে রাখতে হয় না।'

আমি বললুম, 'বাজে কথা। বাঁধন আমান উল্লা ক্যাঁচ করে কেটে দিয়েছেন। আর ভালোই করেছেন, বউকে বেঁধে রাখতে হয় মনের শিকল দিয়ে, হৃদয়ের জিঞ্জির দিয়ে।'

মীর আসলম বললেন, 'হৃদয়মনের কথা ওঠে যেখানে তরুণ-তরুণীর ব্যাপার। ষাট বছরের বুড়ো ষোল বছরের বউকে কোন্ মনের শেকল দিয়ে বাঁধতে পারে বলো? সেখানে কাবিন-নামা, সর্বাঙ্গ-ঢাকাবোরকা, আর পাগড়ির ন্যাজ।'

আমি বললুম, 'তাতো বটেই।'

মীর আসলম বললেন, 'আমান উল্লা যে পর্দা ছেঁড়ার জন্য তম্বী লাগিয়েছেন,

তাতে জোয়ানদের কি? বেদনাটা সেখানে নয়। বুড়া সর্দারদের ভিতর চিংড়ি বউদের ঠেকাবার জন্য সামাল সামাল রব পড়ে গিয়েছে।'

আমি শুধালুম, 'তরুণীরা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন নাকি?'

তিনি বললেন, 'ভ্যালা রে বিপদ, আমাকে তুমি নওরোজের আকবর বাদশা ঠাওরালে নাকি? চিংড়িদের আমি চিনব কোত্থেকে? ইস্তক মেয়ে নেই, ছেলের বউও নেই। গিন্নীর বয়স পঞ্চাশ, কিন্তু বয়স ভাঁড়িয়ে হাফ-টিকিট কেটেছেন, দেখলে বোঝা যায় শ' খানেক হবে।'

আমি বললুম, 'তবে কি বুড়োরা খামকা ভয় পেয়েছেন?'

মীর আসলম বললেন, 'শোনো। খুলে বলি। আমান উল্লার হুকুম শোনা মাত্র চিংড়িরা যদি লাফ দিয়ে উঠত, তবে বুড়োরাও না হয় তার একটা দাওয়াই বের করত; এই মনে করো তুমি যদি হঠাৎ তলোয়ার নিয়ে কাউকে হামলা করো, সেও কিছু একটা করবে। বীর হলে লড়বে, বকরীর কলিজা হলে ন্যাজ দেখাবে। কিন্তু এ তো বাপু তা নয়, এ হল মাথার ওপর ঝোলানো নাঙা তলোয়ার। চিংড়িরা হয়ত সব চুপ করে বসে আছে—রাস্তায় তো এখনো চাঁদের হাট বসেনি—কিন্তু এক একজন এক এক শ' খানা তলোয়ার হয়ে চাঁদির ওপর ঝুলে আছেন। চোখ দুটি বন্ধ করে একটিবার দেখে নাও, বাপু।'

শিউরে উঠলুম!

তেত্রিশ

একদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙতে দেখি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে এক অপরূপ মূর্তি। চেনা চেনা মনে হল অথচ যেন অচেনা। তার হাতের ট্রের দিকে নজর যেতে দেখি সেটা সম্পূর্ণ চেনা। তার উপরকার রুটি, মাখন, মামলেট, বাসি কাবাবও নিত্যিকার চেহারা নিয়ে উপস্থিত। ধূম দেখলে বহ্নির উপস্থিতি স্বীকার করতেই হয়; সকালবেলা আমার ঘরে এ রকমের ট্রে হাওয়ায় দুলতে পারে না, বাহক আবদুর রহমানের উপস্থিতি স্বীকার করতে হয়।

কিন্তু কী বেশভূষা! পাজামা পরেনি, পরেছে পাতলুন। কয়েদীদের পাতলুনের মত সেটা নেমে এসেছে হাঁটুর ইঞ্চি তিনেক নিচে; উরুতে আবার সে পাতলুন এমনি টাইট যে, মনে হয় সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী নাইট সাটিনের

ব্রিচেস্ পরেছেন। শার্ট, কিন্তু কলার নেই। খোলা গলার উপর একটা টাই বাঁধা। গলা বন্ধ কোট, কিন্তু এত ছোট সাইজের যে, বোতাম লাগানোর প্রশ্নই ওঠে না—তাই ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে শার্ট আর টাই। দু'কান ছোঁয়া হ্যাট, ভুরু পর্যন্ত গিলে ফেলেছে। দোকানে যে রকম হ্যাট-স্ট্যাণ্ডের উপর খাড়া করানো থাকে!

পায়ে নাগরাই, চোখে হাসি, মুখে খুশী।

আবদুর রহমানের সঙ্গে এক বছর ঘর করেছি। চটে গিয়ে মাঝে মাঝে তাকে হস্তীর সঙ্গে নানাদিক দিয়ে তুলনা করেছি, কিন্তু সে যে সম্পূর্ণ সুস্থ, তার মাথায় যে ছিট নেই সে বিষয়ে আমার মনে দৃঢ়প্রত্যয় ছিল। তাই চোখ বন্ধ করে বললুম, 'বুঝিয়ে বল।'

আমার যে খটকা লাগবে সে বিষয়ে সে সচেতন ছিল বলে বলল, 'দেরেশি পুশিদম'—অর্থাৎ 'স্যুট পরেছি।'

আমি শুধালুম, 'সরকারী চাকরী পেলে লোকে দেরেশি পরে; আমার চাকরী ছেড়ে দিচ্ছ নাকি?'

আবদুর রহমান বলল, 'তওবা তওবা, আপনি সায়েব আমার সরকার, আমার রুটি দেনেওয়ালা।'

'তবে?'

'সকালবেলা রুটি কিনতে গেলে পর পুলিশ ধরলো। বলল, "বাদশার হুকুম আজ থেকে কাবুলের রাস্তায় পাজামা, কুর্তা, জোব্বা পরে বেরোনো বারণ—সবাইকে দেরেশি পরতে হবে।" আমার কাছ থেকে এক পাই জরিমানাও আদায় করল। রুটি কিনে ফেরাবার পথে আর দু'তিনটে পুলিশ ধরল। আপনার দোহাই পেড়ে কোনো গতিকে বাড়ি ফিরেছি। বাড়ির সামনে আমাদের পড়শী কর্নেল সায়েবের সঙ্গে দেখা, তিনি ডেকে নিয়ে এই দেরেশি দিলেন, আমাকে তিনি বড্ড স্নেহ করেন কিনা, আমিও তাঁর ফাইফরমাশ খেটে দিই।'

গুম্ হয়ে শুনলুম। শেষটায় বললুম, "দর্জির দোকানে তো এখন ভিড় হওয়ার কথা। দু'দিন বাদে গিয়ে তোমার পছন্দমত একটা দেরেশি করিয়ে নিয়ো।'

আবদুর রহমান হিসেবী লোক; বলল, 'এই তো বেশ।'

আমি বললুম, 'চুপ। আর দুপুরবেলা এক জোড়া বুট কিনে নিয়ো।'

আবদুর রহমান কলরব করে বলল, 'না হুজুর তার দরকার নেই। পুলিশের ফিরিস্তিতে বুটের নাম নেই।'

প্রথমটায় অবাক হলুম। পরে বুঝলুম ঠিকই তো ; লক্ষ্মণ না হয় সীতাদেবীর পায়ের দিকে তাকাতে পারেন—রাজাপ্রজায় তো সে সম্পর্ক নয় !

বললুম, 'চুপ। দুপুর বেলা কিনবে। আর দেখো, এবার হ্যাটটা খুলে ফেলো।'

আবদুর রহমান চুপ।

বললুম, 'খুলে ফেলো।'

আবদুর রহমান আস্তে আস্তে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'হুজুরের সামনে ?' তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ মনে পড়ল উত্তর আফগানিস্থান তুর্কিস্থানে মানুষ শয়তানের ভয় পেলে পাগড়ি খুলে ফেলে। শুধু-মাথা দেখলে নাকি শয়তান পালায়। তাই আবদুর রহমান ফাঁপরে পড়েছে। তখন মনে পড়ল যে, হৌস অব কমন্সে হ্যাট না পরা থাকলে কথা কইতে দেয় না। বললুম, 'থাক তাহলে তোমার মাথায় হ্যাট।'

রাস্তায় বেরিয়ে দেখি শহর অন্যদিনের তুলনায় ফাঁকা। দেরেশির অভাবে লোকজন বাড়ি থেকে বেরতে পারেনি। পর্দা তুলে দেওয়াতে যেমন রাস্তাঘাটে মেয়েদের ভিড় বাড়ার কথা ছিল তেমনি দেরেশির রেওয়াজ এক নূতন ধরনের পর্দা হয়ে পুরুষদের হারেমবন্ধ করল।

যারা বেরিয়েছে তাদের দেরেশির বর্ণনা দেওয়া আমার সাধ্যের বাইরে। যত রকম ছেঁড়া নোংরা, শরীরের তুলনায় হয় ছোট নয় বড়, কোট-পাতলুন, প্লাস-ফোর, ব্রিচেস্ দিয়ে যত রকমের সম্ভব অসম্ভব খিচুড়ি পাকানো যেতে পারে তাই পরে কাবুল শহর রাস্তায় বেরিয়েছে—গোটা দশেক পাগলা গারদকে হলিউডের গ্রীনরুমে ছেড়ে দিলেও এর চেয়ে বিপর্যয় কাণ্ড সম্ভবপর হত না।

ইয়োরোপীয়রা বেরিয়েছে তামাশা দেখতে। আমার লজ্জায় মাথা কাটা গেল। আফগানিস্থানকে আমি কখনো পর ভাবিনি।

শহরতলী দিয়ে আমাকে কাজে যেতে হয়। সেখানে দেখি আরো কঠোর দৃশ্য। গ্রামের লাকড়ীওলা, সব্জীওলা, আণ্ডাওলা যেই শহরের চৌহদ্দির ভিতরে পা দেয় অমনি পুলিশ তাদের ধরে ধরে এক এক পাই করে জরিমানা করে। বেচারীদের কোনো রসিদ দেওয়া হয় না ; কাজেই দশ পা যেতে না যেতে তাদের কাছ থেকে অন্য পুলিশ এসে আবার নূতন করে জরিমানা আদায় করে। দুনিয়ার যত পুলিশ সেদিন কাবুলের শহরতলীতে জড়ো হয়েছে। খবর নিয়ে শুনলুম যারা এ সময়ে অফ্-ডিউটি তারাও উর্দি পরে পয়সা রোজকার করতে লেগে গিয়েছে—

জরিমানার পয়সা নাকি সরকারী তহবিলে জমা দেওয়ার কোনো বন্দোবস্ত করা হয়নি।

দিবাদ্বিপ্রহরে যে কাবুলী পুলিশ রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমনোতে রেকর্ড ব্রেক করতে পারে, তার ব্যস্ততা দেখে মনে হল, যেন তার বাস্তুবাড়িতে আগুন লেগেছে।

এ অত্যাচার ক'দিন ধরে চলেছিল বলতে পারিনে।

দুই সপ্তাহ ধরে দেশের খবরের কাগজ চিঠিপত্র পাইনি। খবর নিয়ে শুনলুম জলালাবাদ-কাবুলের রাস্তা বরফে ঢাকা পড়ায় মেল-বাস্ আসতে পারেনি; দু'-একজন ফিস্‌ফিস্ করে বলল, রাস্তায় নাকি লুটতরাজও হচ্ছে। মীর আসলম সাবধান করে গেলেন যেন যেখানে সেখানে যা-তা প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করি।

অন্য কাজ শেষ হলে মেয়েদের ইস্কুলের হেডমিস্ট্রেস ও সেকেণ্ড মিস্ট্রেসকে আমি ইংরিজী পড়াতুম। আফগান মেয়েরা চালাক; জানে যে ধনীর কাছ থেকে টাকা বের করা শক্ত, কিন্তু গরীবের দরাজ-হাত। জ্ঞানের বেলাতেও এই নীতি খাটবে ভেবে এই দুই মহিলা আমাকেই বেছে নিয়েছিলেন।

হেড মিস্ট্রেসের বয়স পঞ্চাশের উপর; মাতৃভাষা বাদ দিলে জীবনে তিনি এই প্রথম ভাষা শিখছেন। কাজেই কাবুলের পাথরফাটা শীতেও তাঁকে আমি ইংরেজী বানান শেখাতে গিয়ে ঘেমে উঠতুম। ইংরিজী ভাষা শিখতে বসেছেন, কিন্তু ঐ এক বিষয় ছাড়া দুনিয়ার আর সব জিনিসে তাঁর কৌতূহলের সীমা ছিল না। বিশেষ করে মাস্টার মশায়ের বয়স কত, দেশ কোথায়, দেশের জন্য মন খারাপ হয় কিনা কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেই তাঁর বাধতো না। তবে খুব সম্ভব আমার এপেনডিক্সের সাইজ ও এ-জগতে আমার জন্মাবার কি প্রয়োজন ছিল, এ দুটো প্রশ্ন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেননি। আমার উত্তর দেবার কায়দাও ছিল বিচিত্র। আমার দেশ? আমার দেশ হল Bengal বানানটা শিখে নিন, বি ই এন জি এ এল। উচ্চারণটাও শিখে নিন; কেউ বলে বেন্‌গোল, আবার কেউ বলে বেঙোল। ঠিক তেমনি France—এফ আর—।' তিনি বলতেন, 'বুঝেছি, বুঝেছি, তা বলুন তো, বাঙালী মেয়েরা দেখতে কি রকম? শুনেছি তাদের খুব বড় চুল হয়, 'জুলফেবাঙাল' বলে একরকম তেল এদেশে পাওয়া যায়। আপনি কী তেল মাখেন?' আমাদের দু'জনার এই চাপান-উতোরের মাঝখানে পড়ে ইংরেজী ভাষা

বেশী এগতে পারতো না, বিশেষ করে তিনি যখন আমাকে আমার মায়ের কথা জিজ্ঞেস করতেন। মায়ের কথা বলার ফাঁকে ফাঁকি দিয়ে শট্‌কে শেখাবার এলেম আমার পেটে নেই।

সেকেণ্ড মিস্ট্রেসের বয়স কম—ত্রিশ হয় না হয়। দুটি বাচ্চার মা, থলথলে দেহ, খাঁদা নাক, মুখে এক গাদা হাসি, পরনে বারো মাস শ্লিপওভার, লম্বা-হাতা ব্লাউজ আর নেভি ব্লু স্কর্ট। কর্নেলের বউ, বুদ্ধিসুদ্ধি আছে আর আমি যখন কর্ত্রীর প্রশ্নের চাপে নাজেহাল হতুম, তখন তিনি মিটমিটিয়ে হাসতেন আর নিতান্ত বেয়াড়া প্রশ্নে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলে মাঝে মাঝে উদ্ধার করে দিতেন।

জোর শীত কিন্তু তখনো বরফ পড়েনি এমন সময় একদিন পড়াতে গিয়ে ঘরে ঢুকে দেখি কর্নেলের বউ বইয়ের উপর মুখ গুঁজে টেবিলে ঝুঁকে পড়েছেন আর কর্ত্রী তার পিঠে হাত বুলোচ্ছেন। আমার পায়ের শব্দ শুনে কর্নেলের বউ ধড়মড় করে উঠে বসলেন। দেখি আর দিনের মত মুখের হাসির স্বাগতসম্ভাষণ নেই। চোখ দুটো লাল, নাকের ডগায় চামড়া যেন ছড়ে গিয়েছে।

এসব জিনিস লক্ষ্য করতে নেই। আমি বই খুলে পড়াতে আরম্ভ করলুম। দু'মিনিটও যায়নি হঠাৎ আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মাঝখানে কর্নেলের বউ দু'হাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন। আমি চমকে উঠলুম। কর্ত্রী শান্তভাবে তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে বলতে থাকলেন, 'অধীর হয়ো না, অধীর হয়ো না। খুদাতালা মেহেরবান। বিশ্বাস হারিয়ো না, শান্ত হও।'

আমি চোখের ঠারে কর্ত্রীকে শুধালুম, 'আমি তাহলে উঠি?'

তিনি ঘাড় নেড়ে যেতে বারণ করলেন। দু'মিনিট যেতে না যেতে আবার কান্না, আবার সান্ত্বনা; আমি যে সে অবস্থায় কি করব ভেবেই পাচ্ছিলুম না। কান্নার সঙ্গে মিশিয়ে যা বলছিলেন তার থেকে গোড়ার দিকে মাত্র এইটুকু বুঝলুম যে, তিনি তাঁর স্বামীর অমঙ্গল চিন্তা করে দিশেহারা হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু ভালো করে কিছু বলতে গেলেই কর্ত্রী বাধা দিয়ে তাঁকে ওসব কথা তুলতে বারণ করছিলেন। বুঝলুম যে, অমঙ্গল চিন্তা সম্পূর্ণ অমূলক নয় এবং এমন সব কারণও তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে, সেগুলো প্রকাশ্যে বলা বাঞ্ছনীয় নয়।

কিন্তু তিনি তখন এমনি আত্মকর্তৃত্ব হারিয়ে বসেছেন যে, তাঁকে ঠেকানো মুশকিল। কখনও বলেন, 'শিনওয়ারীরা বর্বর জানোয়ার' কখনো বলেন, 'সাত দিন ধরে সরকারী কোনো খবর পাওয়া যায়নি', কখনো বলেন, 'শিনওয়ারীরা শহরে পৌঁছলে কোনো অফিসার পরিবারের রক্ষা নেই।'

জলালাবাদ অঞ্চলে লুঠতরাজ হচ্ছে আগেই গুজব হিসেবে শুনেছিলুম ; তার সঙ্গে এসব ছেঁড়াছেঁড়া খবর জুড়ে দিয়ে বুঝতে পারলুম যে, সে অঞ্চলে শিনওয়ারীরা বিদ্রোহ করে কাবুলের দিকে রওয়ানা হয়েছে, আমান উল্লা তাদের ঠেকাবার জন্য যে ফৌজ পাঠিয়েছিলেন সাতদিন ধরে তাদের সম্বন্ধে কোনো বিশ্বাস্য খবর পাওয়া যায়নি, আর কাবুলের অফিসার-মহলে গুজব, সে বাহিনীর অফিসাররা শিনওয়ারীদের হাতে ধরা পড়েছেন।

এত বড় দুঃসংবাদ ইংরিজী পড়ার চেষ্টা দিয়ে দমন করা অসম্ভব। আর আমি এসব সংবাদ জেনে ফেলেছি সেটাও কর্ত্রী আদপেই পছন্দ করছিলেন না। কিন্তু কর্নেলের বউকে তিনি কিছুতেই ঠেকাতেও পারছিলেন না। শেষটায় আমি এক রকম জোর করে ওঠবার চেষ্টা করলে কর্নেলের বউ হঠাৎ চোখ মুছে বললেন, 'না, মুআল্লিম সাহেব, আপনি যাবেন না, আমি পড়াতে মন দিচ্ছি।'

এ রকম পড়া আমাকে যেন জীবনে আর না পড়াতে হয়। এবার যখন ভেঙে পড়লেন, তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললেন, 'বাদশা আমান উল্লার মত যারা গোঁপ রেখেছে তাদের ধরে ধরে উপরের ঠোঁট কেটে ফেলছে।' আমান উল্লা ঠিক নাকের তলায় একটুখানি গোঁফ রাখেন—সেই টুথ-ব্রাশ মুস্টাশ ফ্যাশান ফৌজী অফিসারদের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছিল।

এবারে আমি একটু সান্ত্বনা দেবার সুযোগ পেলুম। বললুম, 'লড়াইয়ের সময় কত রকম গুজব রটে সে সব কি বিশ্বাস করতে আছে? আপনি অধীর হয়ে পড়েছেন তাই অমঙ্গল সংবাদ মাত্রই বিশ্বাস করছেন।'

আবার চোখ মুছে উঠে বসলেন। আমি যে পর-পুরুষ সে কথা ভুলে গিয়ে হঠাৎ আমার দু'হাত চেপে ধরে বললেন, 'মুআল্লিম সায়েব, সত্যি বলুন, আপনি কয় সপ্তাহ ধরে হিন্দুস্থানের চিঠি পাননি?'

হিন্দুস্থানের ডাক শিনওয়ারী অঞ্চল হয়ে কাবুলে আসে। তিন সপ্তাহ ধরে সে ডাক বন্ধ ছিল।

আমি উঠে দাঁড়ালুম। তাঁর চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বললুম, 'আমি এ সপ্তাহেই দেশের চিঠি পেয়েছি।'

তিনি কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছেন দেখে আমি বললুম, 'আপনি তো আর পাঁচজন পুরুষের সঙ্গে মেশেন না যে, হক খবর পাবেন। মেয়েরা স্বভাবতই একটুখানি বেশী ভয় পায়, আর নানারকম গুজব রটায়, তাই তো বাদশাহ আমান উল্লা পরদা পছন্দ করেন না।'

কর্ত্রী আমার সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এসে বললেন, 'যে সব খবর শুনলেন সেগুলো আর কাউকে বলবেন না।'

আমি বললুম, 'এসব খবর নয়, গুজব। গুজব রটালে শুধু কি আপনাদের বিপদ? আমি বিদেশী, আমাকে আরো বেশী সাবধান থাকতে হয়।'

রাস্তায় বেরিয়ে একা হতেই বুঝলুম, মিথ্যা সান্ত্বনা দেবার বিড়ম্বনাটা কি। সেটা কাটাবার জন্য পাঞ্জাবী গ্রামোফোনওলার দোকানে ঢুকলুম। আমার গ্রামোফোন নেই, আমি রেকর্ড কিনিনে তবু 'দেশের ভাই শুকুর মুহম্মদ' বলে দোকানদার আমাকে সব সময় আদর-আপ্যায়ন করত। জিজ্ঞেস করলুম, 'মৌলানার বাঙলা রেকর্ডগুলো কলকাতা থেকে এসেছে?'

দোকানদার বলল 'না', এবং ভাবগতিক দেখে বুঝলুম খোঁচাখুঁচি করলে কারণটা বলতেও তার বাধবে না। আমি কিন্তু তাকে না ঘাঁটিয়েই খানকয়েক রেকর্ড শুনে বাড়ি চলে এলুম।

কিন্তু ঘাঁটাঘাঁটি খোঁচাখুঁচি কিছুই করতে হল না। স্তরে স্তরে বরফ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানারকম গুজব এসে কাবুলের বাজারে স্তূপীকৃত হতে লাগল। সে-বাজার অন্ন বিক্রয় করে অর্থের পরিবর্তে, কিন্তু সন্দেশ দেয় বিনামূল্যে এবং বিনামূল্যের জিনিস যে ভেজাল হবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? খবরের চেয়ে গুজব রটল বেশী।

কিন্তু এ-বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ রইল না যে, আমান উল্লা অস্ত্রবলে বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হননি, এখন যদি অর্থবলে কিছু করতে পারেন।

পূর্বেই বলেছি আফগানিস্থানের উপজাতি উপজাতিতে খুনোখুনি লড়াই প্রায় বারোমাস লেগে থাকে। সন্ধির ফলে কখনো কখনো অস্ত্রসংবরণ হলেও মিত্রতাহৃদ্যতার অবকাশ সেখানে নেই। কাজেই আফগান কূটনীতির প্রথম সূত্র: কোনো উপজাতি যদি কখনো রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তবে তৎক্ষণাৎ সেই উপজাতির শত্রুপক্ষকে অর্থ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে। যদি অর্থে বশ না হয়, তবে রাইফেল দেবে। রাইফেল পেলে আফগান পরমোৎসাহে শত্রুকে আক্রমণ করবে—কাষ্ঠ-রসিকেরা বলেন সে আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য বন্দুকগুলোর তাগ পরীক্ষা করা।

কিন্তু এস্থলে দেখা গেল, বিদ্রোহের নীল-ছাপটা তৈরী করেছেন মোল্লারা এবং তাঁরা একথাটা সব উপজাতিকে বেশ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যদি কোনো উপজাতি 'কাফির' আমান উল্লার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তবে তারা তখন

দীন ইসলামের রক্ষাকর্তা। রাইফেল কিম্বা টাকার লোভে অথবা ঐতিহ্যগত সনাতন শত্রুতার স্মরণে তখন যারা আমান উল্লার পক্ষ নিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়বে, তারাও তখন আমান উল্লার মতই কাফির। শুধু যে তারাই তখন দোজখে যাবে তা নয়, তাদের পূর্বতন অধস্তন চতুর্দশ পুরুষ যেন স্বর্গদ্বার দর্শন করবার আশা মনে পোষণ না করে।

এ বড় ভয়ঙ্কর অভিসম্পাত। ইহলোকে বক্ষলগ্ন থাকবে রাইফেল, পরলোকে হুরী, এই পুরুষ-প্রকৃতির উপর আফগান-দর্শন সংস্থাপিত। কোনোটাতেই চোট লাগলে চলবে না। কিন্তু প্রশ্ন আমান উল্লা কি সত্যই কাফির ?

এবারে মোল্লারা যে মোক্ষম যুক্তি দেখাল তার বিরুদ্ধে কোনো শিনওয়ারী কোনো খুগিয়ানী একটি কথাও বলতে পারল না। মোল্লারা বলল, 'নিজের চোখে দেখিসনি আমান উল্লা গণ্ডা পাঁচেক কাবুলী মেয়ে মুস্তফা কামালকে ভেট পাঠিয়েছে ; তারা যে একরাত জলালাবাদ কাটিয়ে গেল, তখন দেখিসনি, তারা বেপর্দা বেহায়ার মতন বাজারের মাঝখানে গট্‌গট্‌ করে মোটর থেকে উঠল নামল ?'

কথা সত্যি যে, বিস্তর শিনওয়ারী খুগিয়ানী সেদিনকার হাটবারে জলালাবাদে এসেছিল ও সেখানে বেপর্দা কাবুলী মেয়েদের দেখেছিল। আরো সত্যি যে, গাজী মুস্তফা কামাল পাশা আফগান মোল্লাদের কাছ থেকে কখনো গুড কণ্ডাক্টের প্রাইজ পাননি।

তবু নাকি এক 'মূর্খ' বলেছিল যে, মেয়েরা তুর্কী যাচ্ছে ডাক্তারি শিখতে। শুনে নাকি শিনওয়ারীরা অট্টহাস্য করেছিল—'মেয়ে ডাক্তার ! কে কবে শুনেছে মেয়েছেলে ডাক্তার হয় ! তার চেয়ে বললেই হয়, মেয়েগুলো তুর্কীতে যাচ্ছে গোঁপ গজাবার জন্য !'

কে তখন চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবে যে, শিনওয়ারী মেয়েরাই বিনা পর্দায় ক্ষেতে-খামারে কাজ করে, কে বোঝাবে যে, বুড়ীদাদীমা যখন হলুদ-পট্টী বাঁধতে, কপালে জোঁক লাগাতে পুরুষের চেয়েও পাকাপোক্ত, তখন কাবুলী মেয়েরাই বা ডাক্তার হতে পারবে না কেন ? কিন্তু এ সব বাজে তর্ক, নিষ্ফল আলোচনা। আসল একটা কারণের উল্লেখ কেউ কেউ করেছিলেন। কিন্তু সেটা কতদূর সত্য, অনুসন্ধান করেও জানতে পারিনি। আমান উল্লা নাকি রাজকোষের অর্থ বাড়াবার জন্য প্রতি আফগানের উপর পাঁচ মুদ্রা ট্যাক্স বসিয়েছিলেন।

আমান উল্লা এ সব কথাই আস্তে আস্তে জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু আর পাঁচজনের মত তিনিও সেই ফার্সী বয়েৎটী জানতেন, সোনার রত্তিটুকু থাকলে

মানুষ মরা কুকুরকেও আদর করে। আমান উল্লা সব উজিরদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, উপজাতিকে ঘুষ দেওয়ার ব্যাপারে কে কি জানেন?

আমার বন্ধু আধ-পাগলা দোস্ত মুহম্মদ ভুল বলেননি; দেখা গেল অনেকেই অনেক কিছু জানেন, শুধু জানেন না, কোন্ উপজাতির সঙ্গে কোন্ উপজাতির শত্রুতা, কোন উপজাতির বড় বড় সর্দার উপস্থিত কারা, কাদের মধ্যস্থতায় তাদের কাছে গোপনে ঘুষ পাঠানো যায়, কোন্ মোল্লার কোন্ খুড়ো উপস্থিত কাবুলে যে তার উপর চোটপাট করলে দেশের ভাইপো শায়েস্তা হবেন—অর্থাৎ জানবার মত কিছুই জানেন না।

তখন অনাদৃত উপেক্ষিত প্রাচীন ঐতিহ্যপন্থী বৃদ্ধদের ডাকা হল—তাঁরা বললেন যে, গত দশ বৎসর ধরে তাঁরা কোনো প্রকার কাজকর্মে লিপ্ত ছিলেন না বলে আফগান উপজাতিদের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। রাজানুকম্পা বিগলিত হয়ে যে অর্থবারি তাঁদের পয়ঃপ্রণালী দিয়ে উপজাতিদের কাছে পৌঁছত, সে-সব পয়ঃপ্রণালী দশ বৎসরের অনাদরে জঞ্জালাবদ্ধ। এখন বন্যা ভিন্ন অন্য উপায় নেই।

অনেক ভেবে-চিন্তে আমান উল্লা তাঁর ভগিনীপতি আলী আহমদ খানকে জলালাবাদে পাঠালেন। শিনওয়ারীদের টাকার বানে ভাসিয়ে নেবার জন্য সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, কেউ বলে দশ লাখ, কেউ বলে বিশ লাখ।

শাস্ত্রের তর্কে, দর্শনের লড়াইয়ে দিশেহারা হলে ওমর খৈয়াম মৃৎপাত্র ভরে সুরা পান করতেন। সেই মাটির ভাঁড়ই নাকি তখন তাঁকে গভীরতম সত্যের সন্ধান দিত।

আমার মৃৎপাত্র আবদুর রহমান। তাকে সব খুলে বলে তার মতামত জানতে চাইলুম। গোড়ার দিকে সে আমাকে রাজনৈতিক আলোচনা করতে বারণ করত, কিন্তু শিনওয়ারী বিদ্রোহের পাকাপাকি খবর শহরে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজার গল্প গল্পের রাজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবদুর রহমান বরফের জহুরী, আর সেই বরফই তার মাপকাঠি। সে বলল, 'নানা লোকে নানা কথা কয়, তার হিসেব-নিকেশ আমি করব কি করে? কিন্তু একটা কথা ভুলবেন না, হুজুর, এই বরফ ভেঙে শিনওয়ারীরা কিছুতেই কাবুল পৌঁছতে পারবে না। ওদের শীতের জামা নেই। বরফ গলুক, তারপর দেখা যাবে।' আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'তাই বুঝি প্রবাদ, কাবুল স্বর্ণহীন হোক আপত্তি নেই, কিন্তু বরফহীন যেন না হয়!'

ভেবে দেখলুম আবদুর রহমান কিছু অন্যায় বলেনি। ইতিহাসে দেখেছি,

বর্ষা নামার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা দেশের বিদ্রোহবিপ্লবও ছেঁড়া কাঁথা গায়ে টেনে দিয়ে 'নিদ্রা যায় মনের হরিষে'!

চৌত্রিশ

এমন সময় যা ঘটল তার জন্য কেউ তৈরী ছিলেন না; প্রবীণ অর্বাচীন কারো কোনো আলোচনায় আমি এ ব্যাপারে কোনো আভাস ইঙ্গিত পাইনি।

বেলা তখন চারটে হবে। দোস্ত মুহম্মদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখি রাস্তায় তুমুল কাণ্ড। দোকানীরা দুদ্দাড় করে দরজাজানলা বন্ধ করছে, লোকজন দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটোছুটি করছে, চতুর্দিকে চিৎকার, 'ও ভাই কোথায় গেলি', 'ও মামা শিগগির এসো'। লোকজনের ভিড়ের উপর দিয়ে টাঙ্গাওয়ালারা খালি গাড়ি, বোঝাই গাড়ি এমনি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে চালিয়েছে যে, আমার চোখের সামনে একখানা গাড়ি হুড়মুড়িয়ে কাবুল নদীর বরফের ওপর গিয়ে পড়ল, কেউ ফিরে পর্যন্ত তাকাল না।

সব কিছু ছাপিয়ে মাঝে মাঝে কানে চিৎকার পেঁছিয়, 'বাচ্চায়ে সকাও আসছে, বাচ্চায়ে সকাও এসে পড়ল।' এমন সময় গুড়ুম করে রাইফেলের শব্দ হল। লক্ষ্য করলুম শব্দটা শহরের উত্তর দিক থেকে এল। সঙ্গে সঙ্গে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য জনতা যেন বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল। যাদের হাতে কাঁধে বোঁচকা-বুঁচকি ছিল তারা সেগুলো ফেলে দিয়ে ছুটলো, একদল রাস্তার পাশে নয়ানজুলিতে নেমে গেছে, অন্য দল কাবুল নদীতে জমে-যাওয়া জলের উপর ছুটতে গিয়ে বারে বারে পিছলে পড়ছে। রাস্তার পাশে যে অন্ধ ভিখারী বসতো সে দেখি উঠে দাঁড়িয়েছে, ভিড়ের ঠেলায় এদিক ওদিক টাল খাচ্ছে আর দু'হাত শূন্যে তুলে সেখানে যেন পথ খুঁজছে।

আমি কোনো গতিকে রাস্তা থেকে নেমে, নয়ানজুলি পেরিয়ে এক দোকানের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালুম। স্থির করলুম, বিদ্রোহ বিপ্লবের সময় পাগলা ঘোড়ার চাট খেয়ে অথবা ভিড়ের চাপে দম বন্ধ হয়ে মরব না; মরতে হয় মরব আমার হিস্যার গুলী খেয়ে।

এক মিনিট যেতে না যেতে আরেক ব্যক্তি এসে জুটলেন। ইনি ইটালিয়ান 'কলোনেল্লো' অর্থাৎ কর্নেল। বয়স ষাটের কাছাকাছি, লম্বা করোগেটেড দাড়ি।

এই প্রথম লোক পেলুম যাকে ধীরেসুস্থে কিছু জিজ্ঞাসা করা যায়। বললুম,

'আমি তো শুনেছিলুম, ডাকাত-সর্দার বাচ্চায়ে সকাও আসবে আমান উল্লার হয়ে শিনওয়ারীদের সঙ্গে লড়বার জন্য। কিন্তু এ কী কাণ্ড?'

কলোনেল্লো বললেন, 'মনে হচ্ছে ভুল খবর। এ তো আসছে শহর দখল করবার জন্য।'

তাই যদি হয় তবে আমান উল্লার সৈন্যেরা এখনো শহরের উত্তর দিকে যাচ্ছে না কেন, এ রকম অতর্কিতে বাচ্চায়ে সকাও এসে পৌঁছলই বা কি করে, তার দলে কি পরিমাণ লোকজন, শুধু বন্দুক না কামান-টামান তাদের সঙ্গে আছে —এ সব অন্য কোনো প্রশ্নের উত্তর কলোনেল্লো দিতে পারলেন না। মাঝে মাঝে শুধু বলেন, 'কী অদ্ভুত অভিজ্ঞতা!'

আমি বললুম, 'সাধারণ কাবুলী যে ভয় পেয়েছে সে তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু ইয়োরোপীয়ানরা এদের সঙ্গে জুটল কেন? এরা যাচ্ছে কোথায়?'

কলোনেল্লো বললেন, 'আপন আপন রাজদূতাবাসে আশ্রয়ের সন্ধানে।'

ততক্ষণে বন্দুকের আওয়াজ বেশ গরম হয়ে উঠেছে—ভিড়ও দেখলুম ঢেউয়ে ঢেউয়ে যাচ্ছে, একটানা স্রোতের মত নয়। দুই ঢেউয়ের মাঝখানে আমি কলোনেল্লোকে বললুম, 'চলুন বাড়ি যাই।' তিনি বললেন যে, শেষ পর্যন্ত না দেখে তিনি বাড়ি যাবেন না। মিলিটারি খেয়াল, তর্ক করা বৃথা।

বাড়ির দোরের গোড়ায় দেখি আবদুর রহমান। আমাকে দেখে তার দুশ্চিন্তা কেটে গেল। বাড়ি ঢুকতেই সে সদর দরজা বন্ধ করে তার গায়ে এক গাদা ভারী ভারী পাথর চাপাল। বিচক্ষণ লোক, ইতিমধ্যে দুর্গ রক্ষা করার যে বন্দোবস্তের প্রয়োজন সেটুকু সে করে নিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'বেনওয়া সাহেব কোথায়?' বললো, তিনি মাত্র একটি সুটকেস নিয়ে টাঙ্গায় করে ফ্রেঞ্চ লিগেশনে চলে গিয়েছেন।

ততক্ষণে বন্দুকের শব্দের সঙ্গে মেশিনগানের একটানা ক্যাট্‌ক্যাট্‌ যোগ দিয়েছে। আবদুর রহমান চা নিয়ে এসেছিল। কান পেতে শুনে বলল, 'বাদশার সৈন্যেরা গুলি আরম্ভ করেছে। বাচ্চা মেশিনগান পাবে কোথায়?'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'বাদশার সৈন্যেরা কি এতক্ষণে বাচ্চার মুখোমুখি হল? তবে কি সে বিনা বাধায় কাবুলে পৌঁছল?'

আবদুর রহমান বলল, 'দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে অনেককেই তো জিজ্ঞেস করলুম, কেউ কিছু বলতে পারল না। বোধ হচ্ছে বাচ্চা বিনা বাধায়ই এসেছে। ওর দেশ হল কাবুলের উত্তর দিকে, আমার দেশ পানশির—তারও উত্তরে।

ওদিকে কোনো বাদশাহী সৈন্যের আনাগোনা হলে আমি দেশের লোকের কাছে থেকে বাজারে খবর পেতুম। বাদশাহী সৈন্যের সবাই তো এখন পুব দিকে শিনওয়ারীদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়েছে—আলী আহমদ খানের তাঁবেতে।

গোলাগুলি চলল। সন্ধ্যা হল। আবদুর রহমান আমাকে তাড়াতাড়ি খাইয়েদাইয়ে আগুনের তদারকিতে বসল। তার চোখমুখ থেকে আন্দাজ করলুম, সে কাবুলীদের মত ভয় পায়নি। কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারলুম, বাচ্চা যদি জেতে তবে লুটতরাজ নিশ্চয় হবে এবং তাই নিয়ে আমার মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে সে ঈষৎ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কিন্তু এ সব ছাপিয়ে উঠছে তার কৌতূহল আর উত্তেজনা—শহরে সার্কাস ঢুকলে ছেলেপিলেদের যে রকম হয়।

কিন্তু এই বাচ্চায়ে সকাওটি কে? আবদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করতে হল না, সে নিজের থেকেই অনেক কিছু বলল এবং তার থেকে বুঝলুম যে, আবদুর রহমান বরফের জহুরী, ফ্রস্ট-বাইটের ওঝা, রন্ধনে ভীমসেন, ইন্ধনে নলরাজ, সব কিছুই হতে পারেন, কিন্তু বসওয়েল হতে এখনো তার ঢের দেরি। বাচ্চায়ে সকাও সম্বন্ধে সে যা বলল তার উপরে উত্তম রবিনহুড খাড়া করা যায়, কিন্তু সে বস্তু জলজ্যান্ত মানুষের জীবনী বলে চালানো অসম্ভব।

চোদ্দ আনা বাদ দেওয়ার পরও যেটুকু রইল তার থেকে বাচ্চার জীবনের এইটুকু পরিচয় পাওয়া গেল যে, সে প্রায় শ'তিনেক ডাকাতের সর্দার, বাসস্থান কাবুলের উত্তরদিকে কুহিস্তানে, ধনীকে লুটে গরীবকে পয়সা বিলোয়, আমান উল্লা যখন ইউরোপে ছিলেন তার পরাক্রম তখন এমনি বেড়ে গিয়েছিল যে, কাবুল-কুহিস্তানের পণ্য-বাহিনীর কাছ থেকে সে রীতিমত ট্যাক্স আদায় করত। আমান উল্লা ফিরে এসে কুহিস্তানের হাটে-বাজারে নোটিশ লাগান, "ডাকাত বাচ্চায়ে সকাওয়ের মাথা চাই, পুরস্কার পাঁচশ' টাকা"; বাচ্চা সেগুলো সরিয়ে পাল্টা নোটিশ লাগায়, "কাফির আমান উল্লার মাথা চাই, পুরস্কার এক হাজার টাকা।"

আবদুর রহমান জিজ্ঞেস করল, 'কর্নেলের ছেলে আমাকে শুধালো যে, আমি যদি আমান উল্লার মুণ্ডুটা কাটি, আর আমার ভাই যদি বাচ্চায়ে সকাওয়ের মুণ্ডুটা কাটে তবে আমরা দু'জনে মিলে কত টাকা পাব। আমি বললুম, দেড় হাজার টাকা। সে হেসে লুটোপুটি; বলল, এক পয়সাও নাকি পাব না। বুঝিয়ে বলুন তো, হুজুর, কেন পাব না?'

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, 'কেউ জ্যান্ত নেই বলে তোমাদের টাকাটা মারা যাবে বটে, কিন্তু কর্নেলের ছেলেকে বলো যে, তখন আফগানিস্থানের তখৎ

তোমাদের পরিবারে যাবে।'

আরো শুনলুম, বাচ্চায়ে সকাও নাকি দিন দশেক আগে হঠাৎ জবলুস্-সিরাজের সরকারী বড় কর্তার কাছে উপস্থিত হয়ে কোরান ছুঁয়ে কসম খেয়েছিল যে, সে আমান উল্লার হয়ে শিনওয়ারীদের সঙ্গে লড়বে এবং সেই কসমের জোরে, শ'খানেক রাইফেল তাঁর কাছ থেকে বাগিয়ে নিয়ে ফের উধাও হয়ে গিয়েছিল।

তবে কি সেই বন্দুকগুলো নিয়েই বাচ্চার দল আমান উল্লাকে আক্রমণ করেছে? আশ্চর্য হবার কি আছে? আমান উল্লা যখন উপজাতিদের কাছ থেকে তোলা ট্যাক্সের পয়সায় ফৌজ পুষে তাদের কাবুতে রাখেন তখন বাচ্চাই বা আমান উল্লার কাছ থেকে বন্দুক বাগিয়ে তাঁকে আক্রমণ করবে না কেন?

রাত তখন বারোটা। আবদুর রহমান বলল, 'আজ আমি আপনার বসবার ঘরে শোব।'

আমি বললুম, 'তুমি তো ঠাণ্ডা ঘর না হলে ঘুমোতে পারো না। আমার প্রাণ রক্ষার জন্য তোমাকে এত দুর্ভাবনা করতে হবে না।'

আবদুর রহমান বলল, 'কিন্তু আমি অন্য ঘরে শুলে আমার বিপদ-আপদের খবর আপনি পাবেন কি করে? আমার জান বাবা আপনার হাতে সঁপে দিয়ে যাননি?'

কথাটা সত্যি। আবদুর রহমান আমার চাকরিতে ঢুকেছে খবর পেয়ে তার বুড়ো বাপ গাঁ থেকে এসে আমাকে তার জানের মালিক, স্বভাবচরিত্রের তদারকদার এবং চটে গেলে খুন করবার হক দিয়ে গিয়েছিল। আমি বুড়োকে খুশি করবার জন্য 'সিংহ ও মূষিকের' গল্প বলেছিলুম।

কিন্তু আবদুর রহমানের ফন্দিটা দেখে অবাক হলুম। সাক্ষাৎ নিউটন। এদিকে বাক্সে দুটো ফুটো করে দুটো বেরালের জন্য, অন্য দিকে মাধ্যাকর্ষণতত্ত্বও আবিষ্কার করতে পারে—একদিকে কর্নেলের ছেলের ধাঁধায় বোকা বনে যায়, অন্য দিকে তর্কে বাঙালীকেও কাবু করে আনে।

আবদুর রহমান শুয়ে শুয়ে 'কতলে-আম্' অর্থাৎ পাইকারী খুনখারাবি লুটতরাজের যে বর্ণনা দিল তার থেকে বুঝলুম বাচ্চায়ে সকাও যদি শহর দখল করতে পারে তবে তার কোনোটাই বাদ যাবে না। চেঙ্গিস, নাদির রাজা-বাদশা হয়ে যখন এ পব করতে পেরেছেন তখন বাচ্চা ডাকাত হয়ে এ সব করবে না সে আশা দিদিমার রূপকথাতেও করা যায় না।

ইরান আফগানিস্থান চীন প্রভৃতি সভ্য দেশে সাজা দেওয়ার নানারকম বিদগ্ধ

পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কামানের মুখে বেঁধে উড়িয়ে দেওয়া, কোমর অবধি মাটিতে পুঁতে চতুর্দিক থেকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ক্ষতবিক্ষত করে মারা, পেট কেটে চোখের সামনে নাড়িভুঁড়ি বের করে করে মারা, জ্যান্ত অবস্থায় চামড়া তুলে মারা ইত্যাদি বহুতর কায়দার অনেক চাক্ষুষ বর্ণনা আমি শুনেছি। তার মধ্যে একটা হচ্ছে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে লম্বা পেরেক দিয়ে দু'কান দেওয়ালের সঙ্গে গেঁথে দেওয়া। আবদুর রহমানের কাছ থেকে শোনা, সে অবস্থায়ও নাকি মানুষের ঘুম পায় আর মাথা বার বার ঝুলে পড়ে। তার তুলনায় রাইফেল-মেশিনগানের শব্দ, আর চেঙ্গিস নাদিরের কাহিনীস্মরণ ধূলি-পরিমাণ। কাজেই সেই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়াটা বীর অথবা কাপুরুষ কোনো কিছুরই লক্ষণ নয়।

সকাল বেলা দেউড়ি খুলে দেখি শহরে মেলার ভিড়। কাবুল শহরের আশে-পাশের গাঁ থেকে নানা রকম লোক এসে জড়ো হয়েছে, সুযোগসুবিধে পেলে লুটে যোগ দেবে বলে। অনেকের কাঁধেই বন্দুক, শীতের ভারী ভারী জামার ভিতর যে ছোরা-পিস্তলও আছে সেটাও অনায়াসে বোঝা গেল। আবদুর রহমানের বাধা সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়লুম ব্যাপারটার তদারকতদন্ত করবার জন্য।

আর্ক কাবুল শহরের ভিতরকার বড় দুর্গ—হুমায়ুনের জন্ম এই আর্কের ভিতরেই হয়েছিল। আর্ক থেকে বড় রাস্তা বেরিয়ে এসে কাবুল নদীর পারে ঠেকেছে তাকেই কাবুলের চৌরঙ্গী বলা যেতে পারে। সেখানে দেখি একটা বড় রকমের ভিড় জমেছে। কাছে গিয়ে বুঝলুম কোনো এক বড় রাজকর্মচারী—অফিসারও হতে পারেন—কাবুল শহরের লোকজনকে বাচ্চার বিরুদ্ধে লড়বার জন্য সলা-মন্ত্রণা দিচ্ছেন।

"ওজার্ম সিতোআইয়াঁ"—"ধরো হাতিয়ার, ফ্রান্সের লোক, বাঁধো দল, বাঁধো দল" ধরনের ওজস্বিনী ফরাসিনী বক্তৃতা নয়—ভদ্রলোকের মুখ শুকনো, ফ্যাকাশে ঠোঁট কাঁপছে আর বিড় বিড় করে যা বলছেন দশ হাত দূর থেকে তা শোনা যাচ্ছে না।

টিমের কাপ্তান যে রকম প্র্যাকটিসের পূর্বে আঁটা আঁটা হকিস্টিক বিলোয় তেমনি গাদা গাদা দামী ঝকঝকে রাইফেল বিলোনো হচ্ছে। বলা নেই কওয়া নেই, যার যা ইচ্ছে এক-একখানা রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে। শুধু লক্ষ্য করলুম উত্তর দিকে কেউই গেল না—অথচ লড়াই হচ্ছে সেই দিকেই।

রাইফেল বিলোনো শেষ হতেই ভদ্রলোক তড়িৎ গতিতে চলে গেলেন। বিপজ্জনক অবশ্য-কর্তব্য-কর্ম অর্ধসমাধান করে মানুষ যে রকম তড়িঘড়ি অকুস্থান

থেকে সরে পড়ে। তখন চোখে পড়ল তার পরনে পাজামা-কুর্তা-জুব্বা-পাগড়ি—দেরেশি নয়। তারপর চারদিকে তাকিয়ে দেখি কারো পরনেই দেরেশি নয়, আর সক্কলের মাথায়ই পাগড়ি। আমার পরনে স্যুট, মাথায় হ্যাট—অস্বস্তি বোধ হতে লাগল।

এমন সময় দেখি ভিড় ঠেলে হন্ হন্ করে এগিয়ে আসছেন মীর আসলম। কোনো কথা না কয়ে আমার কাঁধে হাত দিয়ে আমাকে বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে চললেন—আমার কোনো প্রশ্নের উত্তরে মুখ না খুলে, কোনো কথায় কান না দিয়ে। বাড়ি পৌঁছতেই আমাদের দুজনকে দেখে আবদুর রহমান কি একটা বলে তিন লম্ফে বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরোল।

মীর আসলম আমাকে বলতে আরম্ভ করলেন। এ কি তামাশা দেখার সময়, না, ইয়ার্কি করে ঘুরে বেড়াবার মোকা। তাও আবার দেরেশি পরে।

আমি শুধু বললুম, 'কি করে জানব বলুন যে, দেরেশি পরার আইন মকুব হয়ে গিয়েছে।'

মীরা আসলম বললেন, 'মকুব বাতিলের প্রশ্ন এখন কে শুধায় বাপু! যে কোনো মুহূর্তে বাচ্চায়ে সকাও শহরে ঢুকতে পারে। কাবুলীরা তাই দেরেশি ফেলে ফের 'মুসলমান' হয়েছে। দেখলে না ইস্তক সর্দার—খান জোব্বা পরে রাইফেল বিলোলেন?'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'সে কি কথা, রাজপরিবার পর্যন্ত ভয় পেয়ে দেশেরি ছেড়েছেন?'

মীর আসলম বললেন, 'উপায় কি বলো? বাদশাহী ফৌজ থেকে সৈন্যেরা সব পালিয়েছে। এখন আমান উল্লার একমাত্র ভরসা যদি কাবুল শহরের লোক রাইফেল বন্দুক নিয়ে বাচ্চাকে ঠেকাতে পারে। তাদের খুশী করার জন্য দেরেশি বর্জন করা হয়েছে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কিন্তু আপনিই তো বলেছিলেন রাজধানীর সৈন্যেরা কখনো বিদ্রোহ করে না।'

'বিদ্রোহ তারা করেনি। তারা সব পালিয়েছে। যাদের বাড়ি বহু দূরে, বরফ ভেঙে এখন যে সব জায়গায় পৌঁছনো যায় না, তারা এখনো শহরে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। যারা নিতান্ত গা-ঢাকাও দিতে পারেনি, তারাই লড়তে গেছে, অন্ততঃ আমান উল্লার বিশ্বাস তাই। আসলে তারা দেহ্-আফগানানের পাহাড়ের গায়ে বসে চন্দ্রসূর্য তাগ করে গুলি ছুঁড়ছে। বাচ্চাকে এখনো ঠেকিয়ে রেখেছে

আমান উল্লার দেহরক্ষী খাস সৈন্যদল।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'কিন্তু মৌলানার বাসা তো দেহ্-আফগানানের পাহাড়ের গায়ে। চলুন, তাঁর খবর নিয়ে আসি।'

মীর আসলম বললেন, 'শান্ত হও। আমি সকালে সেদিকেই গিয়েছিলুম, কিন্তু মৌলানার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পারিনি। সেখানে লড়াই হচ্ছে। আমি মোল্লা মানুষ—কাবুল শহর আমাকে চেনে। আমি যখন সেখানে পৌঁছতে পারিনি, তুমি যাবে কি করে?'

এ সংবাদ শুনে আমার মন থেকে অন্য সব প্রশ্ন মুছে গেল। চুপ করে বসে বসে ভাবতে লাগলুম, কিছু করার উপায় আছে কি না। মীর আসলম আমাকে বাড়ি থেকে বেরতে পই পই করে বারণ করে চলে গেলেন। ইতিমধ্যে আবদুর রহমান একখানা নূতন রাইফেল নিয়ে উপস্থিত। চোখে মুখে খুশি উপছে পড়ছে। বলল, 'হুজুর, চট করে একখানা কাগজে লিখে দিন আপনার রাইফেল নেই। আমি আরেকটা নিয়ে আসি।' আমি তখন মৌলানার কথা ভাবছি—আমার কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে আবদুর রহমান চলে গেল।

লুটপাট আরম্ভ হয়নি সত্য, কিন্তু হতে কতক্ষণ? সকাল বেলা যখন বেরিয়েছিলুম তখন কোথাও কোনো পুলিশ দেখতে পাইনি। রাজার দেহরক্ষীরা পর্যন্ত বাচ্চাকে ঠেকাতে গিয়েছে, এখন শহর রক্ষা করবে কে? আর এ-পরিস্থিতি আফগান ইতিহাসে কিছু অভিনব বস্তু নয়। বাবুর বাদশাহ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, কাবুল শহরে কোনো প্রকার অশান্তির উদ্ভব হলেই আশপাশের চোর-ডাকাত শহরের আনাচেকানাচে শিকারের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করত। মীর আসলম আবার আরেকটা সুখবর দিলেন যে, বাবুরের আমলে কাবুল আজকের চেয়ে অনেক বেশী সভ্য ছিল। অসম্ভব নয়, কারণ বাবুর লিখেছেন অশান্তির পূর্বাভাস দেখতে পেলেই তিনি রাস্তায় রাস্তায় সেপাই মোতায়েন করতেন; আমান উল্লা যে পারেননি সে তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

অবশ্য একটা সান্ত্বনার কথা হচ্ছে এই যে, কাবুলের বসতবাড়ি লুট করা সহজ ব্যাপার নয়। প্রত্যেক বাড়ি দুর্গের মত করে বানানো—চারিদিকে উঁচু পাঁচিল, সেও আবার খানিকটা উঠে ভিতরের দিকে বেঁকে গিয়েছে—তাতে সুবিধে এই যে, মই লাগিয়ে ভিতরে লাফিয়ে পড়ার উপায় নেই। দেয়ালের গায়ে আবার এক সারি ছেঁদা; বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে দেয়ালের আড়াল থেকে সে ছেঁদা দিয়ে রাইফেল গলিয়ে নির্বিঘ্নে বাইরে গুলি চালানো যায়। বাড়িতে ঢোকার জন্য মাত্র একখানা

বড় দরজা—সে দরজা আবার শক্ত ঝুনো কাঠে তৈরী, তার গায়ে আবার ফালি ফালি লোহার পাত পেরেক দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে।

মোক্ষম বন্দোবস্ত। দুখানা রাইফেল দিয়ে পঞ্চাশজন ডাকাতকে অনায়াসে ঠেকিয়ে রাখা যায়। কারণ যারা রাস্তা থেকে হামলা করবে তাদের কোনো আচ্ছাদন আবরণ নেই যার তলা থেকে রাইফেলের গুলি বাঁচিয়ে দেওয়াল ভাঙবার বা দরজা পোড়াবার চেষ্টা করতে পারে।

কিন্তু প্রশ্ন, এই ডিসেম্বরের শীতে সমস্ত রাত ছাদের উপর টহল দিয়ে নজর রাখবে কে? বড় পরিবার হলে কথা নেই; পালা দিয়ে পাহারা দেওয়া যায়, কিন্তু এস্থলে সেই প্রাচীন সমস্যা 'কাকা আর আমি একা, চোর আর লাঠি দু'জন'। বরঞ্চ তার চেয়েও খারাপ। চোর না হয়ে এরা হবে ডাকাত, হাতে লাঠি নয় বন্দুক—আর সংখ্যায় এদের নারায়ণী সেনা হতেও আপত্তি নেই।

এ অবস্থায় মৌলানা আর তাঁর তরুণী ভার্যাকে ডেকে আনি কোন্ বুদ্ধিতে? কিন্তু ওদিকে তাঁরা হয়তো রয়েছেন 'আণ্ডার দি ফায়ার' দুই ফৌজের মাঝখানে। স্থির করলুম, বেশী ভেবে কোনো লাভ নেই। মৌলানার পাড়ায় ঢুকবার সুযোগ পেলেই তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলে নির্বাচনের ভারটা তাঁরই হাতে ছেড়ে দেব।

আবদুর রহমান খবর দিল, বাচ্চার ডাকুরা অ্যারোড্রাম দখল করে ফেলেছে বলে আমান উল্লার হাওয়াই জাহাজ উঠতে পারছে না।

আমি শুধালুম, 'কিন্তু আমান উল্লা বিদেশ থেকে যে সব ট্যাঙ্ক সাঁজোয়া গাড়ি এনেছিলেন সে সব কি হল?'

নিরুত্তর।

'কাবুল বাসিন্দাদের যে রাইফেল দেওয়া হল তারা লড়তে যায়নি?'

আবদুর রহমান যা বললো তার হুবহু তর্জমা বাঙলা প্রবাদে আছে। শুধু এ স্থলে উলুখড়ের দুখানা পা আছে বলে দু' রাজার মাঝখানে সে যেতে রাজী হচ্ছে না। আমি বললুম, 'তাজ্জবের কথা বলছ আবদুর রহমান, বাচ্চায়ে সকাও ডাকাত, সে আবার রাজা হল কি করে?' আবদুর রহমান যা বললো তার অর্থ, বাচ্চা শুক্রবার দিন মোল্লাদের হাত থেকে তাজ পেয়েছে, খুতবায় (আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে) তার নাম বাদশা হিসেবে পড়া হয়েছে, আমান উল্লা কাফির সে ফতোয়া প্রচারিত হয়েছে ও বাচ্চায়ে সকাও বাদশাহ হবীব উল্লা খান নাম ধারণ করে কাবুল শহর থেকে 'কাফির' আমান উল্লাকে বিতাড়িত করবার জন্য জিহাদ ঘোষণা করেছেন।

অদৃষ্টের পরিহাস! আমান উল্লার পিতার নাম হবীব উল্লা। আততায়ীর হস্তে নিহত হবীব উল্লার অতৃপ্ত প্রেতাত্মা কি স্বীয় নামেই প্রতিহিংসার রক্ত অনুসন্ধান করছে!

সন্ধ্যার দিকে আবদুর রহমান তার শেষ বুলেটিন দিয়ে গেল; আমান উল্লার হাওয়াই জাহাজ কোনো গতিকে উঠতে পারায় বোমা ফেলেছে। বাচ্চার দল পালিয়ে গিয়ে মাইলখানেক দূরে থানা গেড়েছে।

পঁয়ত্রিশ

জনমানবহীন রাস্তা। অথচ শান্তির সময় এ-রাস্তা গমগম করে। আমার গা ছমছম করতে লাগল।

দুদিকের দোকান-পাট বন্ধ। বসত-বাড়ীর দেউড়ি বন্ধ। বাসিন্দারা সব পালিয়েছে না ঘুপটি মেরে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, বোঝবার উপায় নেই। যে-কুকুর-বেড়াল বাদ দিয়ে কাবুলের রাস্তার কল্পনা করা যায় না, তারা সব গেল কোথায়? যেখানে গলি এসে বড় রাস্তায় মিশেছে, সেখানে ডাইনে-বাঁয়ে উঁকি মেরে দেখি একই নির্জনতা। এসব গলি শীতের দিনেও কাচ্চাবাচ্চার চিৎকারে গরম থাকে, মানুষের কানের তো কথাই নেই, বরফের গাদা পর্যন্ত ফুটো হয়ে যায়। এখন সব নিঝ্‌ঝুম, নীরব। গলিগুলোর চেহারা এমনিতেই নোংরা থাকে, এখন জনমানবের আবরণ উঠে যাওয়াতে যেন সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সর্বাঙ্গের ঘা-পাঁচড়া দেখাতে আরম্ভ করেছে।

শহরের উত্তরপ্রান্ত। পর্বতের সানুদেশ। মৌলানার বাড়ী এখনো বেশ দূরে। বাচ্চার একদল ডাকাত এদিকে আক্রমণ করেছিল। তারা সব পালিয়েছে, না আড়ালে বসে শিকারের অপেক্ষা করছে, কে জানে?

হঠাৎ দেখি দূরে এক রাইফেলধারী। আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ডাইনে-বাঁয়ে গলি নেই যে ঢুকে পড়ব। দাঁড়িয়ে অথবা পিছন ফিরে লাভ নেই—আমি তখন মামুলী পাখী-মারা বন্দুকের পাল্লার ভিতরে। এগিয়ে চললুম। মনে হল রাইফেলধারীও আমাকে দেখতে পেয়েছে, কিন্তু আমাকে হাতিয়ারহীন দেখে কাঁধে ঝোলানো রাইফেল হাতে তোলার প্রয়োজন বোধ করেনি। দু'জনে মুখোমুখি হলুম, সে একবার আমার মুখের দিকে তাকালোও না। চেহারা দেখে

বুঝলুম, সে গভীর চিন্তায় মগ্ন। তবে কি আমারই মত কারো সন্ধানে গিয়েছিল, নিরাশ হয়ে ফিরছে? কে জানে, কি?

মৌলানার বাড়ী গলির ভিতরে। সেখানে পৌঁছনো পর্যন্ত দ্বিতীয় প্রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না। কিন্তু এবারে নতুন বিপদ; দরজার কড়া নেড়ে নেড়ে হাতে কড়া পড়ে গেল—কোনো সাড়াশব্দ নেই। তবে কি মৌলানারা কেউ নেই? অথবা সে শীতে দরজা-জানলা সব কিছু বন্ধ বলে কড়া নাড়া, আমার চিৎকার, কিছুই তাঁদের কানে পৌঁচচ্ছে না। কতক্ষণ ধরে চেঁচামেচি করেছিলুম বলতে পারব না, হঠাৎ আমার মনে আরেক চিন্তার উদয় হল। মৌলানা যদি গুম হয়ে গিয়ে থাকেন, আর তার বউ বাড়ীতে খিল দিয়ে বসে আছেন, স্বামীর গলা না শুনলে দরজা খুলবে না; অথবা একা থেকে থেকে ভয়ে মূর্ছা গেছেন? আমার গলা থেকে বিকৃত চিৎকার বেরতে লাগল। নিজের নাম ধরে পরিচয় দিয়ে চেঁচাচ্ছি, মনে হচ্ছে, এ আমার গলা নয়, আমার নাম নয়।

হঠাৎ শুনি মেঁয়াও; জিয়াউদ্দীনের বেড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। মৌলানা। চোখ ফোলা, গাল এমনিতে ভাঙা—আরো বসে গিয়েছে। দুদিনে দশ বছর বুড়িয়ে গিয়েছেন।

বললেন, পরশুদিন প্রথম গোলমাল শুরু হতেই চাকরকে টাঙা আনতে পাঠিয়েছিলেন, সে এখনো ফেরেনি। পাড়ার আর সবাই পালিয়েছে। ইতিমধ্যে বাচ্চার সেপাই দুবার এ-রাস্তা দিয়ে নেমে এসে দুবার হটে গিয়েছে। স্বামী-স্ত্রী আল্লার হাতে জান সঁপে দিয়ে ডাকাতের হানার অপেক্ষা করছিলেন।

সে তো হল। কিন্তু এখন চল। এই নির্জন ভূতুড়ে পাড়ায় আর এক মুহূর্ত থাকা নয়। তখন মৌলানা যা বললেন, তা শুনে বুঝলুম, এ সহজ বিপদ নয়। তাঁর স্ত্রী আসন্নপ্রসবা। আমার বাড়ী পর্যন্ত হেঁটে যাবার মত অবস্থা হলে তিনি বহু পূর্বেই চলে আসতেন।

বললুম, 'তাহলে আর বসব না। টাঙার সন্ধানে চললুম।'

শহরে ফিরে এসে পাক্কা দু'ঘণ্টা এ-আস্তাবল, সে-বাগগীখানা অনুসন্ধান করলুম। একটা ঘোড়া দেখতে পেলুল না; শুনলুম, ডাকাত এবং রেকুইজিশনের ভয়ে সবাই গাড়ী ফেলে ঘোড়া নিয়ে পালিয়েছে।

এখন উপায়? একমাত্র উপায় আবদুর রহমানের গায়ের জোর। সে মৌলানার বউকে কোলে-কাঁধে করে বাড়ী নিয়ে আসতে পারবে নিশ্চয়ই কিন্তু—। নাঃ, এতে কোনো কিন্তু নেই। রাজী করাতেই হবে।

কিন্তু বাড়ী ফিরে যে নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখলুম, তেমনটা জীবনে আর কখনো দেখিনি। আমার আঙ্গিনা যেন শান্তিনিকেতন লাইব্রেরির সামনের গৌর-প্রাঙ্গণ; বেনওয়া সায়েব আর মৌলানা নিত্যিকার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন। আবদুর রহমানও সসম্ভ্রম গলা-খাঁকারি দিয়ে বোঝালো, 'পুরা বাঁধকে,—জনানা হ্যায়।'

জিয়াউদ্দীন বললেন যে, আমি চলে আসার ঘণ্টাখানেক পরেই নাকি তাঁর চাকর টাঙা নিয়ে উপস্থিত হয়। আনন্দের আতিশয্যে প্রশ্ন পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলুম না, এ-দুর্দিনে সে টাঙা পেল কোথায়।

তারপর তাকিয়ে দেখি, বেনওয়া সায়েবের গালে দু'দিনের দাড়ি, কোট-পাঁতলুন দুমড়ানো, চেহারা অধৌত। ভদ্রলোক ফরাসী, হামেশাই ফিটফাট থাকেন—শান্তিনিকেতনের সবাই জানে যে, বিদেশীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বাঙালী ফিটবাবুর মত ধুতি কুঁচিয়ে পরতে জানতেন, শুধু তাই নয়, বাঁ-হাত দিয়ে কোঁচাটি ডানদিকে টেনে নিয়ে খানিকটা উঁচুতে তুলে দরকার হলে হনহন করে হাঁটতেও পারতেন।

বললেন, পরশু দিন টাঙা ফরাসী লিগেশনে পৌঁছতে পারেনি—লিগেশন শহরের উত্তর দিকে বলে পাগলা জনতা উজিয়ে গাড়ী খানিকটে চলার পর গাড়ী-গাড়োয়ান দু'জনেই দিশেহারা হয়ে যায়; শেষটায় গাড়োয়ান সায়েবের কথায় কান না দিয়ে সোজা গ্রামের রাস্তা ধরে পুবদিকে তিন মাইল দূরে নিজের গাঁয়ে উপস্থিত হয়। সায়েব দু'রাত্তির একদিন গরীব চাষার গোয়াল-ঘরে না আর কোথাও লুকিয়ে কাটিয়েছেন। দু'চার ঘণ্টা অন্তর অন্তর নাকি গাড়োয়ান আর তার ভাই-বেরাদর গলার উপর হাত চালিয়ে সাহেবকে বুঝিয়েছে যে, কাবুল শহরের সব ফিরিঙ্গীকে জবাই করা হচ্ছে। বেনওয়া সায়েব ভালো সাহিত্যিক, কাজেই বর্ণনাটা দিলেন বেশ রসিয়ে রসিয়ে, আপন দুশ্চিন্তা-উদ্বেগটা ঢেকে-চেপে, কিন্তু চেহারা দেখে বুঝতে পারলুম যে, ১৯১৪-১৮ সালের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতার তুলনায় এ-অভিজ্ঞতার মূল্য তিনি কিছু কম দেননি।

মৌলানা বললেন, 'সায়েব, বড় বেঁচে গেছেন; গাঁয়ের লোক যে আপনার গলা কেটে 'গাজী' হবার লোভ সম্বরণ করতে পেরেছে, সেই আমাদের পরম সৌভাগ্য।'

বেনওয়া বললেন, 'চেষ্টা হয়নি কি না বলতে পারব না। যখনই দেখেছি দু'তিনজন মিলে ফিসফাস করছে, তখনই সন্দেহ করেছি, আমাকে নিয়েই বুঝি

কথাবার্তা হচ্ছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস বাড়ীওয়ালা আমাকে অতিথি হিসেবে ধরে নিয়ে আমার প্রাণ বাঁচানো নিজের কর্তব্য বিবেচনা করে আর পাঁচজনকে ঠেকিয়ে রেখেছিল।'

আমি বললুম, 'আমি কাবুলের গাঁয়ে এক বছর কাটিয়েছি, আমার বিশ্বাস, কাবুল উপত্যকার সাধারণ চাষা অত্যন্ত নিরীহ। পারতপক্ষে খুন-খারাবি করতে চায় না।'

বেনওয়া সায়েব বেশভূষা পরিবর্তন করে আপন লিগেশনে চলে গেলেন।

আমি মৌলানাকে বললুম, 'দেখলে? ফরাসী, জর্মন, রুশ, তুর্ক, ইরানী, ইতালী সবাই আপন আপন লিগেশনে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। শুধু তোমার আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই।'

মৌলানা বললেন, 'বৃটিশ লিগেশন বৃটিশের জন্য—বাঙলা কথা। যদিও লিগেশন তৈরী ভারতীয় অর্থে, চলে ভারতের পয়সায়, ইস্তেক হিজ ব্রিটানিক ম্যাজেস্টিস মিনিস্টার লেফটেনাণ্ট কর্নেল স্যার ফ্রান্সিস হামফ্রিস নুন খান ভারত সরকারের।'

আমি বললুম, 'বিস্তর নুন; মাসে তিন চার হাজার টাকার।'

দু'জনেই একবাক্যে স্বীকার করলুম যে, পরাধীন দেশের অবমাননা লাঞ্ছনা বিদেশ না গেলে সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয় না।

জর্মন কবি গ্যোটে বলেছেন, যে বিদেশ যায়নি, সে স্বদেশের স্বরূপ চিনতে পারেনি।

ছত্রিশ

চারদিন অরাজকতার ভিতর দিয়ে কাটল। কনফুৎসিয় বলেছেন, 'বাঘ হতে ভয়ঙ্কর অরাজক দেশ', আমি মনে মনে বললুম, 'তারও বাড়া হবে ডাকু পরে রাজবেশ।'

আমান উল্লা বসে আছেন আর্কের ভিতরে। তাঁর চেলা-চামুণ্ডারা শহরের লোককে সাধ্য-সাধনা করছে বাচ্চার সঙ্গে লড়াই করবার জন্য। কেউ কান দিচ্ছে না। শহর চোরডাকাতে ভর্তি। যেসব বাড়ী পাকাপোক্ত মাল দিয়ে তৈরি নয়,

সেগুলো লুট হচ্ছে। একটুখানি নির্জন রাস্তায় যাবার জো নেই—ওভারকোটের লোভে শীত-কাতুরে ফিচকে ডাকাত সব কিছু করতে প্রস্তুত। টাকার চেয়েও ডাকাতের লোভ ঐ জিনিসের উপর—কারণ টাকা দিয়েও কোনো কিছু কেনার উপায় নেই। হাট বসছে না বলে দুধ, মাংস, আলু, পেঁয়াজ কিছুই কেনা যাচ্ছে না। গম-ডালের মুদীও গ্যাঁট হয়ে বসে আছে, দাম চড়বার আশায়—কাবুল শহর বাকি দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

শ্বেতাঙ্গরা রাস্তায় বেরচ্ছে না; একমাত্র রুশ পাইলটরা নির্ভয়ে শহরের মাঝখান দিয়ে ভিড় ঠেলে বিমানঘাঁটিতে যাওয়া-আসা করছে। হাতে রাইফেল পর্যন্ত নেই, কোমরে মাত্র একটি পিস্তল।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হলুম খাস কাবুল বাসিন্দাদের ব্যবহার দেখে। রাইফেল ঝুলিয়েছে কাঁধে, বুলেটের বেল্ট বেঁধেছে কোমরে, কেউ পরেছে আড়াআড়ি করে পৈতের মত বুকের উপরে, কেউ বা বাজুবন্ধ বানিয়ে বাহুতে, কেউ কাঁকন করে কব্জীতে, দু'একজন মল করে পায়ে!

যে অস্ত্র বিদ্রোহী, নরঘাতক, দস্যুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য দীন আফগানিস্থান নিরন্ন থেকে ক্রয় করেছিল, সে আজ অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হল!

কিন্তু আশ্চর্য, নগরী রক্ষা করাতে এদের কোনো উৎসাহ নেই? দস্যু জয়লাভ করলে লুণ্ঠিত হবার ভয় নেই, প্রিয়জনের অপমৃত্যুর আশঙ্কা সম্বন্ধে এরা সম্পূর্ণ উদাসীন, সর্বব্যাপী অনিশ্চয়তা এদের বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি?

মীর আসলম কানে কানে বললেন, তিনি খবর পেয়েছেন, কাবুলের বড় বড় মহল্লার সর্দার আর বাচ্চার ভিতরে গোপনে বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে যে, কাবুলীরা যদি আমান উল্লার হয়ে না লড়ে, তবে বাচ্চা শহর লুট করবে না।

কথাগুলো যীশুখ্রীষ্টের করাঙ্গুলি হয়ে আমার অন্ধত্ব ঘুচিয়ে দিল। মীর আসলমের খবর সত্য বলে ধরে নিলে কাবুলবাসীর নির্বিকল্প সমাধির চূড়ান্ত সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু হায়, অস্ত্রবলে হীন, অর্থ-সামর্থ্যে দীন যে রাজা সুদ্ধ সাহসের বলে বিশ্বরাজ ইংরেজকে পরাজিত করে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করলেন, অনুর্বর অনুন্নত দেশকে যে রাজা প্রগতিপথে চালিত করবার জন্য আপন সুখ-শান্তি বিসর্জন দিলেন, বিশ্বের সম্মুখে যে নরপতি আপন দেশের মুখোজ্জ্বল করলেন তাঁকে বর্জন করে কাবুলের লোক বরণ করল ঘৃণ্য নীচ দস্যুকে? একেই কি বলে কৃতজ্ঞতা, নিমকহালালি?

তবে কি আমান উল্লা 'কাফির'?

মীর আসলম গর্জন করে বললেন, 'আলবৎ না; যে-রাজা প্রজার ধর্মকর্মে হস্তক্ষেপ করেন না, নমাজ, রোজা যিনি বারণ করেননি, হজে যেতে জকাত দিতে যিনি বাধা দেননি, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মহাপাপ, তাঁর শত্রুর সঙ্গে যোগ দেওয়া তেমনি পাপ। পক্ষান্তরে বাচ্চায়ে সকাও খুনী ডাকাত—ওয়াজিবউল-কৎল্, কতলের উপযুক্ত। সে কস্মিন্‌কালেও আমীর-উল-মুমিনীন (বাদশা) হতে পারে না।'

মীর আসলম বহু শাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত। আমার বিবেকবুদ্ধিও তাঁর কথায় সায় দিল। তবু বললুম, 'কিন্তু আপনি আবার কবে থেকে আমান উল্লার খয়ের খাঁ হলেন?'

মীর আসলম আরো জোর হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'আমি যা বলেছি, তা সম্পূর্ণ নেতিবাচক। আমি বলি, আমান উল্লা কাফির নয়। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না-জায়িজ—অশাস্ত্রীয়।'

নাস্তিক রাশান রাজদূতাবাসে গিয়ে শুনি সেখানেও ঐ মত। দেমিদফকে বললুম, 'রেভলিউশন আরম্ভ হয়েছে।' তিনি বললেন, 'না, রেবেলিয়ন।' আমি শুধালুম, 'তফাৎটা কি?' বললেন 'রেভলিউশন প্রগতিকামী, রেবেলিয়ন প্রগতিপরিপন্থী।'

ভাবলুম মীর আসলমকে এ-খবরটা দিলে তিনি খুশী হবেন। বুড়ো উল্টে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'সমরকন্দ বুখারার মুসলিমদের উচিত রুশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। রুশ সরকার তাদের মক্কায় হজ করতে যেতে দেয় না।'

খামখেয়ালি ছোটলাটের আশু আগমন সংবাদ শুনে যে রকম গাঁয়ের পণ্ডিত হতবুদ্ধি হয়ে যান, মৌলানা আর আমি সেই রকম একে অন্যের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাই। মৌলানার বউ যে-বড়লাটকে নিমন্ত্রণ করে বসে আছেন, তিনি কোন্ দিন কোন্ গাড়ীতে কি কায়দায় আসবেন, তাঁকে কে অভ্যর্থনা করবেন, তিনি এলে তাঁকে কোথায় রাখতে হবে, কি খাওয়াতে পরাতে হবে, সে সম্বন্ধে কোনো প্রকারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার সুযোগ আমাদের কারো হয়নি—মৌলানার বউও কিছুই জানেন না; তাঁর এই প্রথম বাচ্চা হচ্ছে।

শুনেছি আফগান মেয়েরা ক্ষেতের কাজ খানিকক্ষণের জন্য ক্ষান্ত দিয়ে গাছের আড়ালে গিয়ে সন্তান প্রসব করে—আসন্নপ্রসবার জন্য আফগান পণ্যবাহিনীও নাকি প্রতীক্ষা করে না। সে নাকি বাচ্চা কোলে করে একটু পা চালিয়ে

পণ্যবাহিনীতে আবার যোগ দেয়। মৌলানার বউ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, তাঁর কাছ থেকে এরকম কসরৎ আশা করা অন্যায়। লক্ষণ দেখেও আমরা ঘাবড়ে গেলুম। কিছু খেতে পারেন না, রাত্তিরে ঘুম হয় না, সমস্ত দিন ঢুলুঢুলু চোখ, মৌলানাকে এক মিনিটের তরে সেই ঢুলুঢুলু চোখের আড়াল হতে দেন না।

অন্যের প্রাণহরণ করা ব্যবসা হলেও নিজের প্রাণ দেবার বেলা সব মানুষের একই আচরণ। ডাক্তার কিছুতেই বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় বেরতে রাজী হল না। সেদিন তাকে যা সাধ্য-সাধনা করেছিলুম, তার অর্ধেক তোষামোদে কালো ভঙ্গজ মেয়ের জন্য বিনাপণে নিকষ্যি নটবর বর মেলে। বাড়ী ফেরার সময় সেদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে, মৌলানার যদি ছেলে হয়, তবে তাকে ডাক্তারি পড়াব। শ্মশান-বৈরাগ্যের মত এ হল শ্মশান-প্রতিজ্ঞা।

সিভিল সার্জন যে রকম গরীব রোগীর অর্থ-সামর্থ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে আড়াই গজী প্রেস্‌ক্রিপশন ঝেড়ে যান, কাবুলী ডাক্তার তেমনি পথ্যির ফিরিস্তি আউড়ে গেলেন। শুনে ভয় পেয়ে মৌলানা আর আমি খাটের তলায় আশ্রয় নিলুম। চারদিন ধবে খাচ্ছি রুটি, দাল আর বিন-দুধ চা—এ দুর্দিনে স্বয়ং আমান উল্লা ওসব ফেন্সি পথ্যি যোগাড় করতে পারবেন না। দুধ! আঙুর!! ডিম!!! বলে কি? পাগল, না মাথা খারাপ?

আবদুর রহমান সবিনয় নিবেদন করল, সন্ধ্যার সময় তাকে একটা রাইফেল আর দু'ঘণ্টার ছুটি দিলে সে চেষ্টা করে দেখতে রাজী আছে। ডাকাতিতে আমার মরাল অবজেকশন নেই—যস্মিন দেশাচার, তদুপরি প্রবাসে নিয়ম নাস্তি—কিন্তু সব সময় সব ডাকাত তো আর বাড়ী ফেরে না। যদি আবদুর রহমান বাড়ী না ফেরে? তবে যে বাড়ী অচল হয়ে যাবে।

এখনও মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি বাচ্চায়ে সকাও যেন ডাক্তারের বেশ পরে স্টেথসস্কোপ গলায় ঝুলিয়ে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে করে আমাকে বলছে, 'হয় দাও আঙুর, না হয় নেব মাথা।'

সাঁইত্রিশ

চারদিনের দিন আবদুর রহমান তার দৈনিক বুলেটিনের এক বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করে খবর জানালো, বাচ্চা মাইল দশেক হটে গিয়েছে। দিন দশেকের ভিতর শহরের ইস্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত খুলল।

আমান উল্লা দম ফেলবার ফুরসৎ পেলেন।

কিন্তু বাচ্চাকে তাড়াতে পেরেও তিনি ভিতরে ভিতরে হার মেনেছেন। দেরেশির আইন নাকচ করে দেওয়া হয়েছে, মেয়ে স্কুল বন্ধ করা হয়েছে আর রাস্তা-ঘাট থেকে ফ্রক-ব্লাউজ সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। যে সব মেয়েরা এখন রাস্তায় বেরোন তারা পরেন সেই তাম্বু ধরণের বোরকা। হ্যাট পরার সাহস আর পুরুষ স্ত্রীলোক কারো নেই—হয় পাগড়ি, নয় পশমের টুপি। যেসব স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা এই ডামাডোলের বাজারে পালিয়েছিল তাদের ধরে আনবার কোনো চেষ্টা করা হল না—করার উপায়ও ছিল না, কারণ পুলিশের দল তখনো 'ফেরার', আসামী ধরবে কে?

মৌলানা বললেন, 'সবসুদ্ধ মিলিয়ে দেখলে বলতে হবে ভালোই হয়েছে। আমান উল্লা যদি এ যাত্রা বেঁচে যান তবে বুঝতে পারবেন যে দেরেশি চাপানো, পর্দা তুলে দেওয়া আর বৃহস্পতিবারে ছুটির দিন করা এই অনুন্নত দেশের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার নয়। বাকি রইল শিক্ষাবিস্তার আর শিল্পবাণিজ্যের প্রসার—এবং এ দুটোর বিরুদ্ধে কখনো কেউ কোনো আপত্তি তোলেনি। বিপদ কাটার পর আমান উল্লা যদি এই দুটো নিয়ে লেগে যান তবে আর সব আপনার থেকেই হয়ে যাবে।'

মীর আসলম এসে বললেন, 'অবস্থা দেখে বিশেষ ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না। শিনওয়ারীরা এখনো মারমুখো হয়ে আছে। আমান উল্লার সঙ্গে তাঁদের সন্ধির কথাবার্তা চলছে। তার ভিতরে দুটো শর্ত হচ্ছে, তুর্কী থেকে কাবুলী মেয়ে ফিরিয়ে আনা আর রানী সুরাইয়াকে তালাক দেওয়া। রানী নাকি বিদেশে পর-পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করে মানইজ্জত খুইয়ে এসেছেন।'

আমরা বললুম, 'সে কি কথা? সমস্ত পৃথিবীর কোথাও তো রানী সুরাইয়া সম্বন্ধে এ রকম বদনাম রটেনি। ভারতবর্ষের লোক পর্দা মানে, তারা পর্যন্ত রানী সুরাইয়ার প্রশংসা ভিন্ন নিন্দা করেনি। শিনওয়ারীরা এ আজগুবী খবর-পেলে কোত্থেকে আর রটাচ্ছে কোন্ লজ্জায়।'

মীর আসলম বললেন, 'শিনওয়ারী মেয়েরা বিনা পর্দায় খেতের কাজ করে বটে কিন্তু পরপুরুষের দিকে আড়নয়নে তাকালেও তাদের কি অবস্থা হয় সে কথা সকলেই জানে—আমান উল্লাও জানেন। তবে বল দেখি, তিনি কোন্ বুদ্ধিতে সুরাইয়াকে বল্ নাচে নিয়ে গেলেন? জালালাবাদের মত জংলী শহরেও দু'এক-খানা বিদেশী খবরের কাগজ আসে—তাতে ছবি বেরিয়েছে রানী পরপুরুষের গলা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। সমস্ত ব্যাপারটা যে কতদূর মারাত্মক, আমান উল্লা এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি—তাঁর মা পেরেছেন, তিনি আমান উল্লাকে পীড়াপীড়ি করছেন সুরাইয়াকে তালাক দেবার জন্যে।'

রানী-মার প্রতি আমার অগাধ ভক্তি। উল্লসিত হয়ে বললুম, 'রানী-মা ফের আসরে নেমেছেন? তাহলে আর ভাবনা নেই; শিনওয়ারী, খুগিয়ানী, বাচ্চা, কাচ্চা সবাইকে তিনি তিন দিনের ভিতর চাটনি বানিয়ে দেবেন।'

মীর আসলম বললেন, 'কিন্তু আমান উল্লা তাঁর উপদেশে কান দিচ্ছেন না।'

শুনে অত্যন্ত নিরাশ হলুম। মীর আসলম যাবার সময় বললেন, 'তোমাকে একটা প্রাচীন ফার্সী প্রবাদ শিখিয়ে যাই। রাজ্য চালনা হচ্ছে, সিংহের পিঠে সওয়ার হয়ে জীবন কাটানো। ভেবে চিন্তেই বললুম 'জীবন কাটানো'—অর্থাৎ সে-সিংহের পিঠ থেকে এক মুহূর্তের জন্য নামবার উপায় নেই। যতক্ষণ উপরে আছ, সিংহ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, কিন্তু তোমাকেও অহরহ সজাগ থাকতে হবে। আমান উল্লা সন্ধির কথাবার্তা তুলেছেন, অর্থাৎ সিংহের পিঠ থেকে নেবে দু'দণ্ড জিরোতে চান—সেটি হবার জো নেই। শিনওয়ারী-সিংহ এইবার আমান উল্লাকে গিলে ফেলবে।'

আমি চুপ করে কিছুক্ষণ ভেবে বললুম, 'কিন্তু আমার মনে হয় প্রবাদটার জন্মভূমি এদেশ নয়। ভারতবর্ষেই তখৎকে 'সিংহাসন' বলা হয়। আফগানিস্থানে কি সিংহ জানোয়ারটা আছে?'

এমন সময় আবদুর রহমান এসে খবর দিল পাশের বাড়ীর কর্নেল এসেছেন দেখা করতে। যদিও প্রতিবেশী তবু তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়নি। খাতির যত্ন করে বসাতেই তিনি বললেন যে লড়াইয়ে যাবার পূর্বে আমাদের আশীর্বাদ মঙ্গল-কামনা ভিক্ষা করতে এসেছেন। মীর আসলম তৎক্ষণাৎ হাত তুলে দোয়া (আশীর্বাদ-কামনা) পড়তে আরম্ভ করলেন, আমরাও দুহাত তুলে 'আমেন, আমেন' (তথাস্তু, তথাস্তু) বললুম। আবদুর রহমান তামাক নিয়ে এসেছিল, সেও মাটিতে বসে প্রার্থনায় যোগ দিল।

কর্নেল চলে গেলেন। মীর আসলম বললেন, 'পাড়া প্রতিবেশীর আশীর্বাদ ও ক্ষমা ভিক্ষা করে যুদ্ধযাত্রা করা আফগানিস্থানের রেওয়াজ!'

আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় বাচ্চা কাবুল শহরের উত্তর প্রান্তে শহর-আরায় ঢুকতে পেরেছিল। সেখানে হবীবিয়া ইস্কুল। ডাকাতদলের অগ্রভাগ—বাঙলা 'আগডোম বাগডোম' ছড়ার তারাই 'অগ্রডোম' বা ভ্যানগার্ড—ইস্কুলের হস্টেলে প্রথম রাত কাটায়। বেশীর ভাগ ছেলেই ভয়ে পালিয়েছিল, শুধু বাচ্চার জন্মস্থান কুহিস্তানের ছেলেরা 'দেশের ভাই, শুকুর মুহম্মদের' প্রতীক্ষায় আগুন জেলে তৈরী হয়ে বসেছিল। ডাকাতরা হস্টেলের চাল চর্বি দিয়ে পোলাও রাঁধে, ইস্কুলের বেঞ্চি টেবিল, স্টাইনগাস ভলাস্টনের মোটা মোটা অভিধান, ছেলেদের ক্লাসের পাঠ্য বই খাতাপত্র দিয়ে উনুন জ্বালায়। তবে সব চেয়ে তারা নাকি পছন্দ করেছিল ক্যাম্বিস আর কাঠের তৈরী রোল করা মানচিত্র।

আমান উল্লা 'কাফির', পুঁথিপত্র 'কাফিরী', চেয়ার টেবিল 'কাফিরীর' সরঞ্জাম—এসব পুড়িয়ে নাকি তাদের পুণ্যসঞ্চয় হয়েছিল।

ডাকাতেরও ধর্মজ্ঞান আছে। হস্টেলের ছেলেরা যদিও 'কাফির' আমান উল্লার তালিম পেয়ে 'কাফির' হয়ে গিয়েছে তবু তারা তাদের অভুক্ত রাখেনি। শুধু খাওয়ার সময় একটু অতিরিক্ত উৎসাহের চোটে তাদের পিঠে দু'চারটে লাথি চাঁটি মেরেছিল। বাচ্চার দূর সম্পর্কের এক ভাগ্নে নাকি হস্টেল-বাসিন্দা ছিল; সে মামার হয়ে ফপরদালালি করেছে; তবে বাচ্চার পলায়নের সময় অবস্থাটা বিবেচনা করে 'কাফিরী তালিম' ত্যাগ করে পালিয়ে গিয়ে 'গাজীত্ব' লাভ করেছে।

বাড়ী ফেরায় সময় দেখলুম ছোট ছোট ছেলেরা রাস্তা থেকে বুলেটের খোসা কুড়োচ্ছে।

খবর পেলুম, ব্রিটিশ রাজদূত স্যার ফ্রান্সিস হামফ্রিসের মতে কাবুল আর বিদেশীদের জন্য নিরাপদ নয়। তাই তিনি আমান উল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের এদেশ থেকে সরিয়ে ফেলবার বন্দোবস্ত করেছেন। আমান উল্লা সহজেই সম্মতি দিয়েছেন, কারণ তিনিও চাননি যে বিদেশীরা আফগানিস্থানের এই ঘরোয়া ব্যাপারে অনর্থক প্রাণ দেয়। কাবুল বাকি পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বলে অ্যারোপ্লেনের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

অ্যারোপ্লেন এল। প্রথম মেয়েদের পালা। ফরাসী গেল, জর্মন গেল, পোল গেল, এককথায় দুনিয়ার অনেক জাতের অনেক স্ত্রীলোক গেল, শুধু ভারতীয়

মেয়েদের কথা কেউ শুধালো না। অ্যারোপ্লেনগুলো ভারতীয় অর্থে কেনা, পাইলটরা ভারতীয় তনখা খায়। অথচ সব চেয়ে বিপদাপন্ন ভারতীয় মেয়েরাই—অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা আপন আপন লিগেশনের আশ্রয়ে ছিল, কিন্তু ভারতীয়দের দেখে কে? প্রফেসর, দোকানদার, ড্রাইভারের বউকে ব্রিটিশ লিগেশনে স্থান দিলে স্যার ফ্রান্সিস বিদেশী সমাজে মুখ দেখাবেন কি করে? বামুনের জাত গেলে প্রায়শ্চিত্ত আছে, আর মুসলমানের তো জাত যায় না। কিন্তু ইংরেজের জাতিভেদ বড় ভয়ঙ্কর জিনিস। তার দেশের যেরকম কাগজে কলমে লেখা, আইনে বাঁধা কনসটিটুশন নেই—ঠিক তেমনি তার জাতিভেদ প্রথা কোনো বাইবেল-প্রেয়ার বুকে আপ্তবাক্য হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। অথচ সে জাতিভেদ রবীন্দ্রনাথের ভূতের কানমলার মত। 'সে কানমলা না যায় ছাড়ানো, তার থেকে না যায় পালানো, তার বিরুদ্ধে না চলে নালিশ, তার সম্বন্ধে না আছে বিচার'। দর্শন, অঙ্ক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হোন, মার্কসিজমের দিগ্বিজয়ী কৌটিল্যই হোন, অথবা কয়লার খনির মজুরই হোন, এই কানমলা স্বীকার কবে করে হৌস অব লর্ডসে না পৌঁছানো পর্যন্ত দর্শন মিথ্যা, মার্ক্‌সিজ্‌ম্‌ ভুল, শ্রমিকসঙ্ঘের দেওয়া সম্মান ভণ্ডুল। যে এই কানমলা স্বীকার করে না ইংরেজের কাছে সে আধপাগল। তার নাম বার্নার্ড শ।

বাড়াবাড়ি করছি? মোটেই না। ধান ভানতে শিবের গীত? তাও নয়। বিপ্লব-বিদ্রোহ রক্তপাত-রাহাজানি মাত্রই রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য—এতক্ষণ সে কথাই হচ্ছিল, এখন তাঁর নন্দীভৃঙ্গী-সম্বাদের পালা।

ইংরেজের এই 'আভিজাত্য', এই 'স্নবারি' ছাড়া অন্য কোনো কিছু দিয়ে ব্রিটিশ রাজদূতের মনোবৃত্তির যুক্তিযুক্ত অর্থ করা যায় না। ব্রিটিশ লিগেশনের যা আকার তাতে কাবুলের বাদবাকি সব ক'টা রাজদূতাবাস অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে। একখানা ছোটখাটো শহর বললেও অত্যুক্তি হয় না—নিজের জলের কল, ইলেকট্রিক পাওয়ার-হৌস, এমন কি ফায়ার-ব্রিগেড পর্যন্ত মৌজুদ। শীতকালে সায়েব-সুবোদের খেলাধুলোর জন্য চা-বাগানের পাতা শুকোবার ঘরের মত যে প্রকাণ্ড বাড়ি থাকে তারই ভিতরে সমস্ত ভারতীয় আশ্রয়প্রার্থিনীর জায়গা হতে পারত। আহারাদি? ব্রিটিশ লিগেশন কাবুল থেকে পালিয়ে আসার সময় যে [illegible] খাদ্য ফেলে এসেছিল তাই দিয়ে মেয়েদের পাকা ছ'মাস চলতে পারত।

ফ্রেঞ্চ লিগেশনের যে মিনিস্টারকে বেনওয়া সায়েব রসিকতা করে 'সিনিস্টার অব দি ফ্রেঞ্চ নিগেশন' বলতেন, তিনি পর্যন্ত আশ্রয়-প্রার্থী ফরাসীদের মন চাঙ্গা

করার জন্য ভাণ্ডার উজাড় করে শ্যাম্পেন খাইয়েছিলেন।

ডাক্তার আসে না, অন্ন জুটছে না, পথ্যের অভাব, দাই নেই, আসন্নপ্রসবার আশ্রয় জুটছে না; তাকে ফেলে রেখে ভারতীয় পয়সায় কেনা হাওয়াই জাহাজ ভারতবর্ষে যাচ্ছে ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন, সকল জাতের মেম সায়েবদের নিয়ে! হে দ্রৌপদী-শরণ, চক্রধারণ, এ দ্রৌপদী যে অন্তঃসত্ত্বা!

উত্তরদিকে থেকে কাবুল শহর আক্রমণ করতে হলে ব্রিটিশ রাজদূতাবাস অতিক্রম করে আরো এক মাইল ফাঁকা জায়গা পেরতে হয়। বাচ্চা তাই করে শহর-আরা হস্টেলে পৌঁচেছিল। সুবে আফগানিস্থান জানে সে সময় পাকা চারদিন ব্রিটিশ রাজদূতাবাস তথা মহামান্য স্যার ফ্রান্সিসের জীবন বাচ্চার হাতের তেলোয় পুঁটি মাছের মত এক গণ্ডুষ জলে খাবি খাচ্ছিল। বাচ্চা ইচ্ছে করলেই যে কোনো মুহূর্তে সমস্ত লিগেশনকে কচু-কাটা করতে পারত—একটা ঔদাসীন্য দেখালেই তার উদ্‌গ্রীব সঙ্গীরা সবাইকে কতল করে বাদশাহী লুট পেত, কিন্তু জলকরঙ্কবাহীর তস্করপুত্র অভিজাততনয়ের প্রাণ দান করল। তবু দস্যুদত্ত করুণালব্ধ সে-প্রাণ বিপন্না নারীর দুঃখে বিগলিত হল না।

গল্প শুনেছি, জর্জ ওয়াশিংটন তাঁর নাতিকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। পথে এক নিগ্রো হ্যাট তুলে দু'জনকে নমস্কার করল। ওয়াশিংটন হ্যাট তুলে প্রতিনমস্কার করলেন, কিন্তু নাতি নিগ্রোকে তাচ্ছিল্য করে নমস্কার গ্রহণ করল না। জর্জ ওয়াশিংটন নাতিকে বললেন, 'নগণ্য নিগ্রো তোমাকে ভদ্রতায় হার মানালো।'

দয়া-দাক্ষিণ্যে, করুণা-ধর্মে মহামান্য সম্রাটের অতিমান্য প্রতিভূ হিজ একসেলেন্সি লেফটেনেণ্ট কর্নেল স্যার ফ্রান্সিসকে হার মানালো ডাকুর বাচ্চা!

চিরকুট পেলুম, দেমিদফ লিখেছেন রাশান এম্বেসিতে যেতে। এ রকম চিঠি আর কখনো পাইনি, কারণ কোনো কিছুর দরকার হলে তিনি নিজেই আমার বাড়িতে উপস্থিত হতেন।

চেহারা দেখেই বুঝলুম কিছু একটা হয়েছে। দোরের গোড়াতেই বললুম, 'কি হয়েছে, বলুন।' দেমিদফ কোনো উত্তর না দিয়ে আমাকে ঘরে এনে বসালেন। মুখোমুখি হয়ে বসে দু'হাত দু'জানুর উপর রেখে সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলশফ মারা গিয়েছেন।'

আমি বললুম, 'কি?'

দেমিদফ বললেন, 'আপনি জানতেন যে, বিদ্রোহ আরম্ভ হতেই বলশফ নিজের থেকে আমান উল্লার কাছে উপস্থিত হয়ে বাচ্চায়ে সকাওয়ের দলের উপর অ্যারোপ্লেন থেকে বোমা ফেলার প্রস্তাব করেন। কাল বিকেলে—'

আমি ভাবছি, বলশফ কিছুতেই মরতে পারে না, অবিশ্বাস্য।

'—কাল বিকেলে অন্য দিনের মত বোমা ফেলে এসে এম্বেসির ক্লাব ঘরে দাবা খেলতে বসেছিলেন। ব্রিচেসের পকেটে ছোট্ট একটি পিস্তল ছিল; বাঁ হাত দিয়ে ঘুঁটি চালাচ্ছিলেন, ডান হাত পকেটে রেখে পিস্তলের ঘোড়াটা নিয়ে খেলা করছিলেন,—জানেন তো, বলশফের স্বভাব, কিছু একটা নাড়াচাড়া না করে বসতে পারতেন না। হঠাৎ ট্রিগারে একটু বেশী চাপ পড়াতেই গুলি পেটের ভিতর দিয়ে হৃৎপিণ্ডের কাছ পর্যন্ত চলে যায়। ঘণ্টা ছয়েক বেঁচে ছিলেন, ডাক্তার কিছু করতে পারলেন না।'

আমার তখনও কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না বলশফের মত বটগাছ কি করে বিনা ঝড়ে পড়ে যেতে পারে। এত লড়াই লড়ে, এত জখম কাটিয়ে উঠে শেষে নিজের হাতে—?

দেমিদফ বললেন, 'আপনার খুব লাগবে আমি জানতুম তাই সংক্ষেপে বললুম; আর যদি কিছু জানতে চান—?'

আমি বললুম, 'না।'

'চলুন, দেখতে যাবেন।'

আমি বললুম, 'না।' বাড়ি যাবার জন্য উঠলুম।

মাদাম তাড়াতাড়ি আমার সামনে পথ বন্ধ করে বললেন, 'এখানে খেয়ে যান।'

আমি বললুম, 'না।'

টেনিস কোর্টের পাশ দিয়ে বেরবার সময় হঠাৎ যেন শুনতে পেলুম বলশফের গলা, 'জদ্রাস্‌ভুইয়িতে, মই প্রিয়াতেল—এই যে বন্ধু, কি রকম?' চমকে উঠলুম। আমার মন তখনো বিশ্বাস করছে না, বলশফ নেই। এই টেনিস কোর্টেই তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল আর এই যে দেউড়ি দিয়ে বেরচ্ছি এরই ভিতর দিয়ে কতবার তাঁর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছি।

বাড়ি এসে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম। সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি আমার অজানাতে মন সমস্ত রাত বলশফের কথা ভেবেছে। ঘুম ভাঙতে যেন শুধু সচেতন হলুম। মনে পড়ল তাঁর সঙ্গে শেষ কথাবার্তা। ঠাট্টা করে বলেছিলুম, 'বলশফ, তুমি আমান উল্লার হয়ে লড়ছ কেন? আমান উল্লা রাজা, বাচ্চার দল

প্রলেতারিয়েস্ট অব দি প্রলেতারিয়া। তোমার উচিত বাচ্চার দলে যোগ দিয়ে লড়া।'

বলশফ বলেছিল, 'বাচ্চা কি করে প্রলেতারিয়া হল? সেও তো রাজার মুকুট পরে এসেছে। রাজায় রাজায় লড়াই। এক রাজা প্রগতিপন্থী, আরেক রাজা প্রগতির শত্রু। চিরকাল প্রগতির জন্য লড়েছি, এখনো লড়ছি, তা সে ত্রৎস্কির নেতৃত্বেই হোক আর আমান উল্লার আদেশেই হোক।'

আমান উল্লার সেই চরম দুর্দিনে সব বিদেশীর মধ্যে একমাত্র বলশফের কর্তৃত্বে রাশান পাইলটরাই তাঁকে সাহায্য করেছিল। বাচ্চা জিতলে তাদের কি অবস্থা হবে সে সম্বন্ধে একদম পরোয়া না করে।

দিন পনেরো পরে খবর পেলুম, অ্যারোপ্লেন কাবুল থেকে বিদেশী সব স্ত্রীলোক কাচ্চা-বাচ্চা ঝেঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছে; বিদেশী বলতে এখন বাকি শুধু ভারতীয়। তিন লম্ফে ব্রিটিশ লিগেশনে উপস্থিত হয়ে মৌলানার বউয়ের কথাটা সকাতর সবিনয় নিবেদন করলুম। ব্রিটিশের দয়া অসীম। ভারতবাসিনী-লাদাই উড়ো-জাহাজের প্রথম ক্ষেপেই তিনি স্থান পেলেন। পুনরপি তিন লম্ফে বাড়ি পৌঁছে আঙিনা থেকেই চিৎকার করে বললুম, 'মৌলানা, কেল্লা ফতেহ, সীট পেয়ে গিয়েছি। বউকে বলো তৈরী হতে। এখন ওজন করাতে নিয়ে যেতে হবে,—কর্তারা ওজন জানতে চান।'

মৌলানা নিরুত্তর। আমি অবাক। শেষটায় বললেন যে, তাঁর বউ নাকি একা যেতে রাজী নন, বলছেন, মরবার হলে এদেশে স্বামীর সঙ্গেই মরবেন। আমি শুধালুম, 'তুমি কি বলছ?' মৌলানা নিরুত্তর। আমি বললুম, 'দেখ মৌলানা, তুমি পাঞ্জাবী, কিন্তু শান্তিনিকেতনে থেকে থেকে আর গুরুদেবের মোলায়েম গান গেয়ে গেয়ে তুমি বাঙালীর মত মোলায়েম হয়ে গিয়েছ। 'বাঁধিনু যে রাখি-টাখি' এখন বাদ দাও।' মৌলানা তবু নিরুত্তর। চটে গিয়ে বললুম, 'তুমি হিন্দু হয়ে গিয়েছ, তাও আবার ১৮১০ সালের—সতীদাহে বিশ্বাস করো। কিন্তু জানো, যে গুরুদেবের নাম শুনে অজ্ঞান হও, তাঁরই ঠাকুর্দা দ্বারকানাথ ঠাকুর টাকা দিয়ে সতীদাহের বিরুদ্ধে বিলেতে মোকদ্দমা লড়িয়েছিলেন।' মৌলানা নিরুত্তর। এবারে বললুম, 'শোনো ব্রাদার, এখন ঠাট্টামস্করার সময় নয়, কিন্তু ভেবে দেখো, তোমার বউয়ের কবে বাচ্চা হবে, তার হিসেব-টিসেব রাখোনি—না হয় বন্দি পেলুম, ধাই পেলুম, কিন্তু যদি বাচ্চা হওয়ার পর তোমার বউয়ের—' বার তিনেক গলা-

খাঁকারি দিয়ে বললুম—'তাহলে আমি দুধ যোগাড় করব কোথা থেকে? বাজারে ফের কবে দুধ উঠবে, তার তো কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।'

মৌলানা বউয়ের কাছে গেলেন। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে অল্প অল্প কান্নার শব্দ শুনতে পেলুম। মৌলানা বেরিয়ে এসে বললেন, 'রাজী হচ্ছেন না।'

তখন মৌলানাকে বাইরে রেখে ভিতরে গেলুম। বললুম, 'আপনি যে মৌলানাকে ছেড়ে যেতে চাইছেন না, তার কারণ যে আমি বুঝতে পারছিনে তা নয়; কিন্তু ভেবে দেখুন তো, আপনার না যাওয়াতে তাঁর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো? আপনি যদি চলে যান, তবে তিনি যেখানে খুশী কোনো ভাল জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিতে পারবেন; শুধু তাই নয়, অবস্থা যদি আরো খারাপ হয়, তবে হয়ত তাঁকেও এদেশ ছাড়তে হবে। আপনি না থাকলে তখন তাঁর পক্ষে সব কিছুই অনেক সহজ হয়ে যাবে। এসব কথা তিনি আপনাকে কিছুই বলেননি, কারণ এখন তিনি নিজের কথা আদপেই ভাবছেন না, ভাবছেন শুধু আপনার মঙ্গলের কথা। আপনি তাঁর স্ত্রী, আপনার কি এদিকে খেয়াল করা উচিত নয়?'

ওকালতি করছি আর ভাবছি মৌলানার যদি ছেলে হয়, তবে তাকে ব্যারিস্টারি পড়াব। মেয়ে হলে আমান উল্লার মায়ের হাতে সঁপে দেব।

ওষুধ ধরল। ভারত নারীর শ্মশানচিকিৎসা স্বামীর স্বার্থের দোহাই পাড়া।

পরদিন সকাল বেলা মৌলানা বউকে নিয়ে অ্যারোড্রোমে গেলেন। বিপদ-আপদ হলে আবদুর রহমানের কাঁধ কাজে লাগবে বলে সেও সঙ্গে গেল। আমি রইলুম বাড়ি পাহারা দিতে। দিন পরিষ্কার ছিল বলে ছাতে দাঁড়িয়ে দেখলুম, পুব থেকে প্রকাণ্ড ভিকার্স্ বমার এল, নামল, ফের পুব দিকে চলে গেল। মাটিতে আধ ঘণ্টার বেশী দাঁড়ায়নি—কাবুল নিরাপদ স্থান নয়।

জিয়াউদ্দীন ফিরে এসে মুখ ঝামর করে উপরে চলে গেলেন। আবদুর রহমান বলল, 'মৌলানা সাহেবের বিবির জামা-কাপড় দেখে পাইলট বলল যে, অ্যারোপ্লেন যখন আসমানে অনেক উপরে উঠবে, তখন ঠাণ্ডায় তাঁর পা জমে যাবে। তাই বোধ হয় তারা সঙ্গে খড় এনেছিল—মৌলানা সাহেব সেই খড় দিয়ে তাঁর বিবির দু'পা বেশ করে পেঁচিয়ে দিলেন—দেখে মনে হল যেন খড়ে জড়ানো বিলিতী সিরকার বোতল। সব মেয়েদেরই পা এরকম কায়দায় সফর-দুরস্ত করতে হল।'

আমরা দেউড়িতে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিলুম। এমন সময় আমাদের সামনে দিয়ে একটা মড়া নিয়ে কয়েকজন লোক চলে যাচ্ছে দেখে আবদুর রহমান হঠাৎ কথাবার্তা বন্ধ করে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। ভারবাহীরা আমার প্রতিবেশী

কর্নেলের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আবদুর রহমান কড়া নাড়ল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ, আর্ত ক্রন্দনধ্বনি যেন তীরের মত বাতাস ছিঁড়ে আমার কানে এসে পৌঁছল—মড়া দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢোকাতে যতক্ষণ সময় লাগল, ততক্ষণ গলার পর গলা সে আর্তনাদে যোগ দিতে লাগল। চিৎকারে চিৎকারে মানুষের বেদনা যেন সপ্তম স্বর্গে ভগবানের পায়ের কাছে পৌঁছতে চাইছে।

কান্না যেন হঠাৎ কেউ গলা টিপে বন্ধ করে দিল—মড়া বাড়িতে ঢোকানো হয়েছে, দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেই নিস্তব্ধতা তখন যেন আমাকে কান্নার চেয়ে আরো বেশী অভিভূত করে ফেলল। আমি ছুটে গিয়ে মৌলানার ঘরে ঢুকলুম। আবদুর রহমান এসে খবর দিল, 'কর্নেল লড়াইয়ে মারা গিয়েছেন।'

মৌলানা দু'হাত তুলে দোয়া পড়তে আরম্ভ করলেন। আবদুর রহমান আর আমি যোগ দিলুম। দোয়া শেষে মৌলানা বললেন, 'লড়াইয়ে যাওয়ার আগে কর্নেল আমাদের দোয়া মাঙতে এসেছিলেন, আমাদের উপর এখন তাঁর হক্ আছে!' তারপর মৌলানা ওজু করে কুরান শরীফ পড়তে আরম্ভ করলেন।

দুপুরবেলা মৌলানার ঘরে গিয়ে দেখি, কুরান পড়ে পড়ে তাঁর চেহারা অনেকটা শান্ত হয়ে গিয়েছে। আসন্নপ্রসবা স্ত্রীর বিরহ ও তাঁর সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা মন থেকে কেটে গিয়েছে।

কর্নেলের প্রতি আমার মনে শ্রদ্ধা জাগল। কোনো কোনো মানুষ মরে গিয়েও অন্যের মনে শান্তির উপলক্ষ্য হয়ে যান।

কিন্তু আমার মনে খেদও জেগে রইল। যে-মানুষটিকে পাঁচ মিনিটের জন্য চিনেছিলুম তাঁর মৃত্যুতে মনে হল যেন একটি শিশু-সন্তান অকালে মারা গেল। আমাদের পরিচয় তার পরিপূর্ণতা পেল না।

আটত্রিশ

আফগান প্রবাদ 'বাপ-মা যখন গদগদ হয়ে বলেন, 'আমাদের ছেলে বড় হচ্ছে' তখন একথা ভাবেন না যে, ছেলের বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও গোরের দিকে এগিয়ে চলেছেন।' আমান উল্লা শুধু তাঁর প্রিয় সংস্কার-কর্মের দিকেই নজর রেখেছিলেন, লক্ষ্য করেননি যে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাজত্বের দিনও ফুরিয়ে আসছে। কিন্তু শুধু আমান উল্লাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই—তাঁর উজির-নাজির সঙ্গী-সাথী ও রাস্তার আর পাঁচজন বাচ্চার পালিয়ে যাওয়াতে অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে দৈনন্দিন জীবনে ফিরে যাবার চেষ্টাতে ছিল।

বাচ্চার আক্রমণের ঠিক এক মাস পরে—জানুয়ারীর কঠোর শীতের মাঝামাঝি—একদিন শরীর খারাপ ছিল বলে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি, এমন সময় এক পাঞ্জাবী অধ্যাপক দেখা করতে এলেন। শহর তখন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, দিনের বেলা চলাফেরা করাতে বিশেষ বিপদ নেই।

জিজ্ঞেস করলেন, 'খবর শুনেছেন ?'

আমি শুধালুম, 'কি খবর ?'

বললেন, 'তাহলে জানেন না, শুনুন। এরকম খবর আফগানিস্থানের মত দেশেও রোজ রোজ শোনা যায় না।

'ভোরবেলা চাকর বলল, রাজপ্রাসাদে কিছু একটা হচ্ছে, শহরের বহুলোক সেদিকে যাচ্ছে। গিয়ে দেখি প্রাসাদে আফগানিস্থানের সব উজির, তাঁদের সহকারী, ফৌজের বড় কড় অফিসার এবং শহরের কয়েকজন মাতব্বর ব্যক্তিও উপস্থিত। সক্কলের মাঝখানে মুইন-উস্-সুলতানে ইনায়েত উল্লা খান ও তাঁর বড় ছেলে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখি যে, শহরের এত বড় মজলিসের মাঝখানে আমান উল্লা নেই। কাউকে জিজ্ঞেস করার আগেই এক ভদ্রলোক—খুব সম্ভব রইস-ই-শুরাই (প্রেসিডেন্ট অব দি কৌন্সিল) হবেন—একখানা ফরমান পড়তে আরম্ভ করলেন। দূরে ছিলুম বলে সব কথা স্পষ্ট শুনতে পাইনি; কিন্তু শেষের কথাগুলো পাঠক বেশ জোর দিয়ে চেঁচিয়ে পড়লেন বলে সন্দেহের কোনো অবকাশ রইল না। আমান উল্লা সিংহাসন ত্যাগ করেছেন ও বড় ভাই মুইন-উস্-সুলতানে ইনায়েত উল্লাকে সিংহাসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছেন।'

আমি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'হঠাৎ ? কেন ? কি হয়েছে ?'

'শুনুন, ফরমান পড়া শেষ হলে কাবুলের এক মাতব্বর ব্যাক্তি আফগানিস্থানের পক্ষ থেকে ইনায়েত উল্লাকে সিংহাসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। তখন ইনায়েত উল্লা অত্যন্ত শান্ত এবং নির্জীব কণ্ঠে যা বললেন, তার অর্থ মোটামুটি এই দাঁড়ায় যে, তিনি কখনও সিংহাসনের লোভ করেননি—দশ বৎসর পূর্বে যখন নসর উল্লা আমান উল্লায় রাজ্য নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, তখনও তিনি অযথা রক্তক্ষয়ের সম্ভাবনা দেখে আপন অধিকার ত্যাগ করেছিলেন।'

অধ্যাপক দম নিয়ে বললেন, 'তারপর ইনায়েত উল্লা যা বললেন সে অত্যন্ত খাঁটি কথা। বললেন, 'দেশের লোকের মঙ্গলচিন্তা করেই আমি একদিন ন্যায্য সিংহাসন গ্রহণ করিনি ; আজ যদি দেশের লোক মনে করেন যে, আমি সিংহাসন গ্রহণ করলে দেশের মঙ্গল হবে তবে আমি শুধু সেই কারণেই সিংহাসন গ্রহণ করতে রাজী আছি।'

আমি বললুম, 'কিন্তু আমান উল্লা ?'

অধ্যাপক বললেন, 'তখন খবর নিয়ে শুনলুম, আমান উল্লার ফৌজ কাল রাত্রে লড়াই হেরে গিয়ে পালিয়েছে। খবর ভোরের দিকে আমান উল্লার কাছে পৌঁছয় ; তিনি তৎক্ষণাৎ ইনায়েত উল্লাকে ডেকে সিংহাসন নিতে আদেশ করেন। ইনায়েত নাকি অবস্থাটা বুঝে প্রথমটায় রাজী হননি—তখন নাকি আমান উল্লা তাঁকে পিস্তল তুলে ভয় দেখালে পর তিনি রাজী হন।

'আমান উল্লা ভোরের দিকে মোটরে করে কান্দাহার রওয়ানা হয়েছেন। যাবার সময় ইনায়েত উল্লাকে আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন, পিতৃপিতামহের দুররানী ভূমি কান্দাহার তাকে নিরাশ করবে না। তিনি শীঘ্রই ইনায়েত উল্লাকে সাহায্য করার জন্য সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হবেন।'

আমান উল্লা তাহলে শেষ পর্যন্ত পালালেন। চুপ করে অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করতে লাগলুম।

অধ্যাপক হেসে বললেন, 'আপনি তো টেনিস খেলায় ইনায়েত উল্লার পার্টনার হন। শুনেছি, তিনি তাঁর বিরাট বপু নাড়াচাড়া করতে পারেন না বলে আপনি কোর্টের বারোআনা জমি সামলান—এইবার আপনি আফগানিস্থানের বারোআনা না হোক অন্তত দু'চারআনা নিন।'

আমি বললুম, 'তা তো বটেই। কিন্তু বাচ্চার বুলেটের অন্তত দু'চারআনা ঠেকাবার ভার তাহলে আমার উপর পড়বে না তো ?'

অধ্যাপক বললেন, 'তওবা, তওবা। বাচ্চা এখন আর লড়বে কেন, বলুন।

তার কাছে ইত্যবসরে শোরবাজারের হজরত আর সর্দার ওসমান খান ইনায়েত উল্লার পক্ষ থেকে খবর নিয়ে গিয়েছেন যে, 'কাফির' আমান উল্লা যখন সিংহাসন ত্যাগ করে পালিয়েছে তখন আর যুদ্ধবিগ্রহ করার কোনো অর্থ হয় না। বাচ্চা যেন বাড়ি ফিরে যান—তাঁর সঙ্গে ইনায়েত উল্লার কোনো শত্রুতা নেই।'

অধ্যাপক চলে গেলে পর আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর্কের দিকে চললুম।

এবারে শহরের দৃশ্য আরো অদ্ভুত। বাচ্চার প্রথম ধাক্কার পর তবু কাবুল শহরে রাজা ছিলেন, তিনি দুর্বল না সবল সাধারণ লোকে জানত না বলে রাজদণ্ডের মর্যাদা তখনো কিছু কিছু ছিল কিন্তু এখন যেন আকাশেবাতাসে অরাজকতার বিজয়লাঞ্ছনা অঙ্কিত। যারা রাস্তা দিয়ে চলেছে তারা স্পষ্টত কাবুলবাসিন্দা নয়। তাদের চোখে মুখে হত্যালুণ্ঠনের প্রতীক্ষা আর লুক্কায়িত নয়। এরা সব দল বেঁধে চলেছে—কেউ কোথাও একবার আরম্ভ করলে এদের আর ঠেকানো যাবে না।

ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরি করলুম কিন্তু একটিমাত্রও পরিচিত লোককে দেখতে পেলুম না। তখন ভালো করে লক্ষ্য করলুম যে, প্রায় সবাই দল বেঁধে চলছে, ভিখারী-আতুর ছাড়া একলাএকলি আর কেউ বেরোয়নি।

খাঁটি খবর দিতে পারে এমন একটি লোক পেলুম না। আভাসে আন্দাজে বুঝলুম, ইনায়েত উল্লা আর্কের ভিতর আশ্রয় নিয়ে দুর্গ বন্ধ করেছেন। আমান উল্লার কি পরিমাণ সৈন্য ইনায়েত উল্লার বশ্যতা স্বীকার করে দুর্গের ভিতরে আছে তার কোনো সন্ধান পেলুম না।

দোস্ত মুহম্মদ আমান উল্লার হয়ে লড়তে গিয়েছেন জানতুম, তাই একমাস ধরে তাঁর বাড়ি বন্ধ ছিল। ভাবলুম এবার হয়ত ফিরেছেন, কিন্তু সেখানে গিয়েও নিরাশ হতে হল। বাড়ি ফিরে দেখি মৌলানা তখনো আসেননি, তাই পাকাপাকি খবরের সন্ধানে মীর আসলমের বাড়ি গেলুম।

বুড়ো আবার সেই পুরোনো কথা দিয়ে অরম্ভ করলেন, যখন কোনো দরকার নেই তখন এই বিপজ্জনক অবস্থায় ঘোরাঘুরি করি কেন?

আমি বললুম, 'সামলে কথা বলবেন, স্যার। জানেন বাদশা আমার পার্টনার। চাট্টিখানি কথা নয়। আপনার কি চাই বলুন, যা দরকার বাদশাকে বলে করিয়ে দেব।'

মীর আসলম অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন। তারপর বললেন, 'ফার্সীতে একটা প্রবাদ আছে, জানো,

'রাজত্ববধূরে যেই করে আলিঙ্গন
তীক্ষ্ণ-ধার অসি পরে সে দেয় চুম্বন!'

'কিন্তু তোমার বাদশাহ অদ্ভুত! সাধারণ বাদশাহ কামানবন্দুক চালিয়ে অন্ততঃপক্ষে পিস্তলের ভয় দেখিয়ে সিংহাসন দখল করে, তোমার বাদশাহ ইনায়েত উল্লা পিস্তলের ভয় পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে সিংহাসনের উপরে গিয়ে বসলেন!'

আমি বললুম, 'কিন্তু দেখুন, শেষ পর্যন্ত সিংহাসনে যার হক ছিল তিনিই বাদশাহ হলেন। কাবুলের লোকজন তো আর ভুলে যায়নি যে, ইনায়ত উল্লা শহীদ বাদশাহ হবীব উল্লার বড় ছেলে।'

মীর আসলম বললেন, 'সে কথা ঠিক কিন্তু হক্কের মাল এত দেরিতে পৌঁচেছে যে, এখন সে মালের উপর আরো পাঁচজনের নজর পড়ে গিয়েছে। শুনেছ বোধ হয় শোরবাজারের হজরত বাচ্চাকে ফেরাতে গিয়েছেন। তোমার কি মনে হয়?'

আমি বললুম, 'ইনায়েত উল্লা তো আর 'কাফির' নন। বাচ্চা ফিরে যাবে।'

মীর আসলম বললেন, 'শোরবাজারের হজরতকে চেন না—তাই এ কথাটা বললে। তিনি আফগানিস্থানের সবচেয়ে বড় মোল্লা, আমান উল্লা বিদ্রোহের গোড়ার দিকেই তাঁকে জেলে পুরেছিলেন, সাহস সঞ্চয় করে ফাঁসী দিতে পারেননি। আজ শোরবাজার স্বাধীন, কিন্তু ইনায়েত উল্লা বাদশাহ হলে তাঁর কি লাভ? আজ না হয় তিনি বিপদে পড়ে শোরবাজারের হাতে-পায়ে ধরে তাঁকে দূত করে পাঠিয়েছেন। কিন্তু বাচ্চা যদি ফিরে যায় তবে দু'দিন বাদে তাঁর শক্তি বাড়বে; সিংহাসনে কায়েম হয়ে বসার পর তিনি আর শোরবাজারের দিকে ফিরে তাকাবেন না। রাজার ছেলে রাজা হলেন, তিনি রাজত্ব চালাতে জানেন, শোরবাজারকে তাঁর কি প্রয়োজন?

'পক্ষান্তরে বাচ্চা যদি ইনায়েত উল্লাকে তাড়িয়ে দিয়ে রাজা হতে পারে তবে তাতে শোরবাজারের লাভ। বাচ্চা ডাকাত, সে রাজ্যচালনার কি জানে? যে মোল্লাদের উৎসাহে বাচ্চা আজ লড়ছে সেই মোল্লাদের মুকুটমণি শোরবাজার তখন রাজ্যের কর্ণধার হবেন।

'কিন্তু তারো চেয়ে বড় কারণ রয়েছে, বাচ্চা কেন ফিরে যাবে না। তার যে-সব সঙ্গী-সাথীরা এই এক মাস ধরে বরফের উপর কখনো দাঁড়িয়ে কখনো শুয়ে লড়ল, বাচ্চা তাদের শুধু-হাতে বাড়ি ফেরাবে কি করে? কাবুল লুটের লালস দেখিয়েই তো বাচ্চা তাদের আপন ঝাণ্ডার তলায় জড়ো করেছে।'

আমি বললুম, 'বাঃ! আপনিই তো সেদিন বললেন, বাচ্চা মহল্লা-সর্দারদের কথা দিয়েছে যে, কাবুলীরা যদি আমান উল্লার হয়ে না লড়ে তবে সে কাবুল লুট করবে না।'

মীর আসলম বললেন, 'এরই নাম রাজনীতি। ইংরেজ যেরকম লড়াইয়ের সময় আরবদের বলল তাদের প্যালেস্টাইন দেবে, ইহুদীদের বলল তাদেরও দেবে।'

বাড়ি ফিরে এসে দেখি পাঞ্জাবী অধ্যাপকরা দল বেঁধে মৌলানাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে এসে আড্ডা জমিয়েছেন। আমাকে নিয়ে অনেক হাসি-ঠাট্টা করলেন, কেউ বললেন, 'দাদা, আমার ছ'মাসের ছুটির প্রয়োজন', কেউ বললেন, 'পাঁচ বছর ধরে প্রোমোশন পাইনি, বাদশাহকে সেই কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবেন।' মৌলানা আমার হয়ে উত্তর দিয়ে বললেন, 'স্বপ্নেই যদি পোলাও খাবেন তবে ঘি ঢালতে কঞ্জুসি করছেন কেন? যা চাইবার দরাজ-দিলে চেয়ে নিন।'

দেখলুম, এদের সকলেরই বিশ্বাস বাচ্চা শুধু-হাতে বাড়ি ফিরে যাবে আর কাবুলে ফের হারুন-অর্-রশীদের রাজত্ব কায়েম হবে।

সন্ধ্যার দিকে আবদুর রহমান বুলেটিন ঝেড়ে গেল, বাচ্চা ফিরতে নারাজ, বলছে, 'যে-তাজ পাঁচজন আমাকে পরিয়েছেন, সে তাজ আমার শিরোধার্য।' বুঝলুম মীর আসলম ঠিকই বলেছেন, 'রাজা হওয়ার অর্থ সিংহের পিঠে সওয়ার হওয়া—একবার চড়লে আর নামবার উপায় নেই।'

সে রাত্রে বাড়িতে ডাকু হানা দিল। আবদুর রহমান তার রাইফেল ব্যবহার করতে পেয়ে যত না গুলি ছুঁড়ল তার চেয়ে আনন্দে লাফাল বেশী। ফিচকে ডাকাতই হবে, আবদুর রহমানের রণনাদ শুনে পালাল।

আবদুর রহমান তার বুলেটিনের মাল-মসলা সংগ্রহ করে দেউড়িতে দাঁড়িয়ে। রাস্তা দিয়ে যে যায় তাকেই ডেকে পই পই করে নানা রকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে—আমান উল্লা চলে যাওয়ায় তার শেষ ডর ভয় কেটে গিয়েছে। তবে এখন বাচ্চায়ে সকাও না বলে সম্মানভরে হবীব উল্লা খান বলে।

দুপুরবেলার বুলেটিনের খবর 'ইনায়েত উল্লা খান আর্ক দুর্গের ভিতর বসে আমান উল্লার কাছ থেকে সাহায্যের প্রতীক্ষা করেছেন। বাচ্চা তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে আদেশ দিয়েছে। না হলে সে কাবুল শহরের কাউকে জ্যান্ত রাখবে না—ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেবে। ইনায়েত উল্লা উত্তর দিয়েছেন, 'কাবুলবাসীদের প্রচুর রাইফেল আর অপর্যাপ্ত বুলেট আছে, তাই দিয়ে তারা যদি আত্মরক্ষা না করতে পারে তবে এসব ভেড়ার পালের মরাই ভালো'।'

মৌলানা বললেন, 'বাচ্চা এখন আর কাবুলের মহল্লা-সর্দারদের কেয়ার করে না।' তারপর আবদুর রহমানকে পার্লিমেন্ট কায়দায় সপ্লিমেন্টরি শুধালেন, 'আর্কে কি পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আছে? সৈন্যরা টিকতে পারবে কতদিন?' আবদুর রহমান

কাঁচা ডিপ্লোমেট—নোটিসের হুমকি দিল না। বলল, 'অন্তত ছয় মাস।'

তৃতীয় দিনের বুলেটিন : 'বাচ্চা বলেছে, ইনায়েতউল্লা যদি আত্মসমর্পণ না করেন তবে যে-সব আমীর-ওমরাহ সেপাই-শান্ত্রী তাঁর সঙ্গে আর্কে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁদের স্ত্রীপুত্রপরিবারকে সে খুন করবে। ইনায়েত উল্লা উত্তর দিয়েছেন, 'কুছ পরোয়া নেই'।'

ফালতো প্রশ্ন, 'বাচ্চা দুর্গ আক্রমণ করছে না কেন?'

অবজ্ঞাসূচক উত্তর, 'রাইফেলের গুলি দিয়ে পাথরের দেয়াল ভাঙা যায় না।'

সে সন্ধ্যায় ব্রিটিশ লিগেশনের এক কেরানী প্রাণের ভয়ে আমার বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। শহরে এসেছিলেন কি কাজে; বাচ্চার ফৌজ দলে দলে শহরে ঢুকছিল বলে লিগেশনে ফিরে যেতে পারেননি। রাত্রে তাঁর মুখে শুনলুম যে, দুর্গের ভিতরে বন্ধ আমীর-ওমরাহদের স্ত্রীপুত্রপরিবার দুর্গের বাইরে। ইনায়েত উল্লার পরিবার দুর্গের ভিতরে। আমীরগণ ও বাদশাহের স্বার্থ এখন আর সম্পূর্ণ এক নয়। আমীরগণ তাঁদের পরিবার বাঁচাবার জন্য আত্মসমর্পণ করতে চান। ইনায়েত উল্লা নাকি নিরাশ হয়ে বলেছেন, যে-সব আমীর-ওমরাহদের অনুরোধে তিনি অনিচ্ছায় রাজা হয়েছিলেন, তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখন তিনি আর দুর্গ রক্ষা করতে রাজী নন।

আবদুর রহমান সভাস্থলে উপস্থিত ছিল। বলল, 'আমি শুনেছি, সেপাইরা দুর্গ রক্ষা করতে রাজী, যদিও তাদের পরিবার দুর্গের বাইরে। তারা বলছে, 'বউবাচ্চার জান আমানত দিয়ে তো আর ফৌজে ঢুকিনি।' ভয় পেয়েছেন অফিসার আর আমীর-ওমরাহদের দল।'

কেরানী বললেন, 'আমিও শুনেছি, কিন্তু কোনটা খাঁটি কোনটা ঝুটা বুঝবার উপায় নেই। মোদ্দা কথা, ইনায়েত উল্লা সিংহাসন ত্যাগ করতে তৈরি, তবে তাঁর শর্ত : কোনো তৃতীয়পক্ষ যেন তাঁকে আর তাঁর পরিবারকে নিরাপদে আফগানিস্থানের বাইরে নিয়ে যাবার জিম্মাদারি নেন। স্যার ফ্রান্সিস রাজী হয়েছেন।'

আমরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'স্যার ফ্রান্সিসের কাছে প্রস্তাবটা পাড়ল কে?'

'বলা শক্ত। শোরবাজার, ইনায়েত উল্লা, বাচ্চা—খুড়ি হবীব উল্লা খান—তিনজনের একজন, অথবা সকলে মিলে। এখন সেই কথাবার্তা চলছে।'

সেরাত্রে অনেকক্ষণ অবধি মৌলানা আর কেরানী সায়েবেতে আফগান রাজ-

নীতি নিয়ে আলোচনা, তর্কবিতর্ক হল।

সকালবেলা আবদুর রহমান হাতে-সেঁকা রুটি, নুন আর বিনা দুধ-চিনিতে চা দিয়ে গেল। আমাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে কিন্তু ভদ্রলোক কিছুই স্পর্শ করতে পারলেন না। প্রবাদ আছে, 'কাজীর বাড়ির বাঁদীও তিন কলম লিখতে পারে।' বুঝতে পারলুম, 'ব্রিটিশ রাজদূতাবাসের কেরানীও রাজভোগ খায়—এই দুর্ভিক্ষেও।'

দুপুরের দিকে কেরানী সায়েবের সঙ্গে শহরে বেরলুম। বাচ্চার সেপাইয়ে সমস্ত শহর ভরে গিয়েছে। আর্কের পাশের বড় রাস্তায় তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি—তিনি লিগেশনে যাবেন, আমি বাড়ি ফিরব—এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই একসঙ্গে শ'খানেক রাইফেল আমাদের চারপাশে গর্জন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দেখি, রাস্তার লোকজন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে যে যেদিকে পারে সেদিকে ছুটছে। আশ্রয়ের সন্ধানে নিশ্চয়ই, কিন্তু কে কোন্ দিকে যাচ্ছে তার প্রতি লক্ষ্য না করে। চতুর্দিকে বাচ্চার ডাকাত, তাই সবাই ছুটেছে দিশেহারা হয়ে।

বাচ্চার প্রথম আক্রমণের দিনে শহরে যা দেখেছিলুম তার সঙ্গে এর তুলনা হয় না। সেদিনকার কাবুলী ভয় পেয়েছিল যেন বাঘের ডাক শুনে, এবারকার ত্রাস হঠাৎ বাঘের থাবার সামনে পড়ে যাবার। কেরানী সায়েব পেশাওয়ারের পাঠান। সাহসী বলে খ্যাতি আছে। তিনি পর্যন্ত আমাকে টেনে নিয়ে ছুটে চলেছেন—মুশকিল-আসানই জানেন কোন দিক দিয়ে। পাশ দিয়ে গা ঘেঁষে একটা ঘোড়া চলে গেল। নয়ানজুলিতে পড়তে পড়তে তাকিয়ে দেখি, ঘোড়-সওয়ারের পা জিনের পাদানে বেঁধে গিয়ে মাথা নিচের দিকে ঝুলছে আর ঘোড়ার প্রতি গ্যালপের সঙ্গে সঙ্গে মাথা রাস্তার শানে ঠোক্কর খাচ্ছে।

ততক্ষণে রাস্তার সুর-রিয়ালিস্টিক ছবিটার এলোপাতাড়ি দাগ আমার মনে কেমন যেন একটা আবছা আবছা অর্থ এনে দিয়েছে। কেরানী সায়েবের হাত থেকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে নিজেকে খালাস করে দাঁড়িয়ে গেলুম। ছবিটার যে জিনিস আমার অবচেতন মন ততক্ষণে লক্ষ্য করে একটা অর্থ খাড়া করেছে, সে হচ্ছে যে ডাকুরা কাউকে মারার মতলবে, কোনো 'কৎলে আম্' বা পাইকারি কচু-কাটার তালে নয়—তারা গুলি ছুঁড়ছে আকাশের দিকে। কেরানী সায়েবের দৃষ্টিও সেদিকে আকর্ষণ করলুম।

ততক্ষণে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে শুধু বাচ্চার ডাকাত দল, কেরানী সায়েব আর আমি; বাদবাকি নয়ানজুলিতে, দোকানের বারান্দায়, না হয় কাবুল নদীর শক্ত বরফের উপর উঁচু পাড়ির গা ঘেঁষে।

তিন-চার মিনিট ধরে গুলি চলল—আমরা কানে আঙুল দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর আবার সবাই এক-একজন করে আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে এল। ডাকাতের দল ততক্ষণে হা-হা করে হাসতে আরম্ভ করেছে—'তাদের 'শাদীয়ানা' শুনে কাবুলের লোক এরকমধারা ভয় পেয়ে গেল!' 'কিসের 'শাদীয়ানা'?' 'জানো না খবর, ইনায়েত উল্লা তখ্‌ৎ ছেড়ে দিয়ে হাওয়াই জাহাজে করে হিন্দুস্থান চলে গিয়েছেন। তাই—বাচ্চা—খুড়ি—বাদশাহ হবীব উল্লা খান হুকুম দিয়েছেন রাইফেল চালিয়ে 'শাদীয়ানা' বা বিজয়োল্লাস প্রকাশ করার জন্য।'

জিন্দাবাদ 'বাদশাহ' 'গাজী' হবীব উল্লা খান!

বর্বরদেশে নতুন দলপতি উদ্‌খলে বসলে নরবলি করার প্রথা আছে। আফগানিস্থানে এরকম প্রথা থাকার কথা নয়, তবু অনিচ্ছায় গোটা পাঁচেক নরবলি হয়ে গেল। 'শাদীয়ানা'র হাজার হাজার বুলেট আকাশ থেকে নামার সময় যাদের মাথায় পড়ল তাদের কেউ কেউ মরল—পুরু মীর-আসলমী পাগড়ি মাথায় প্যাঁচানো ছিল না বলে।

পাগড়ি নিয়ে হেলাফেলা করতে নেই। গরীব আফগানের মামুলী পাগড়ি নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করতে গিয়ে আমান উল্লার রাজমুকুট খসে পড়ল।

উনচল্লিশ

ডাকাত সেটা কুড়িয়ে নিয়ে মাথায় পরল।

মোল্লারা আশীর্বাদ করলেন।

পরদিন ফরমান বেরলো। তার মূল বক্তব্য, আমান উল্লা কাফির, কারণ সে ছেলেদের এলজেব্রা শেখাত, ভূগোল পড়াত, বলত পৃথিবী গোল। বিংশ শতাব্দীতে এ রকম ফরমান বেরতে পারে সেকথা কেউ সহজে বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু বাচ্চার মত ডাকাত যখন তখ্‌ৎ-নশীন হতে পারে তখন এরকম ফরমান আর অবিশ্বাস করার কোনো উপায় থাকে না। শুধু তাই নয়, ফরমানের তলায় মোল্লাদের সই ছাড়াও দেখতে পেলুম সই রয়েছে আমান উল্লার মন্ত্রীদের।

মীর আসলম বললেন, 'পেটের উপর সঙ্গীন ঠেকিয়ে সইগুলো আদায় করা হয়েছে। না হলে, বলো কোন্ সুস্থ লোক বাচ্চাকে বাদশাহী দেবার ফরমানে নাম সই করতে পারে?' রাগের চোটে তাঁর চোখ-মুখ তখন লাল হয়ে গিয়েছে, দাড়ি ডাইনে-বাঁয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। গর্জন করে বললেন, 'ওয়াজিব্-উল-কৎল—

প্রত্যেক মুসলমানের উচিত যাকে দেখা মাত্র কতল করা সে কি না বাদশাহ হল!'

আমি বললুম, 'আপনি যা বলেছেন তা খুবই ঠিক কিন্তু আশা করি এসব কথা যেখানে সেখানে বলে বেড়াচ্ছেন না।'

মীর আসলম বললেন, 'শোনো সৈয়দ মুজতবা আলী, আমান উল্লার নিন্দা যখন আমি করেছি তখন সকলের সামনেই করেছি; বাচ্চায়ে সকাওয়ের বিরুদ্ধে যা বলবার তাও আমি প্রকাশ্যে বলি। তুমি কি ভাবছ কাবুল শহরের মোল্লারা আমাকে চেনে না, ফরমানের তলায় আমার সই লাগাতে পারলে ওরা খুশী হয় না? কিন্তু ওরা ভালো করেই জানে যে, আমার বাঁ হাত কেটে ফেললেও আমার ডান হাত সই করবে না। ওরা ভালো করেই জানে যে, আমি ফতোয়া দিয়ে বসে আছি, "বাচ্চায়ে সকাও ওয়াজিব্-উল্-কৎল্—অবশ্য বধ্য"।'

মীর আসলম চলে যাওয়ার পর মৌলানা বললেন, 'যতদিন আফগানিস্থানে মীর আসলমের মত একটি লোকও বেঁচে থাকবেন ততদিন এ দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই।'

আমি সায় দিয়ে বললুম, 'হক কথা, কিন্তু আমাদের ভবিষ্যতের ভাবনা এই বেলা একটু ভেবে নিলে ভালো হয় না?'

দু'জনে অনেকক্ষণ ধরে ভাবলুম; কখনো মুখ ফুটে কখনো যার যার আপন মনে। বিষয়ঃ বাচ্চা তার ফরমানে আমান উল্লা যে কাফির সে কথা সপ্রমাণ করে বলেছে, "এবং যেসব দেশী-বিদেশী মাস্টার প্রফেসর আমান উল্লাকে এ সব কর্মে সাহায্য করতো, তাদের ডিসমিস করা হল; স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হল।"

শেষটায় মৌলানা বললেন, 'অত ভেবে কদ্দু হবে। আমরা ছাড়া আরো লোকও তো ডিসমিস হয়েছে—দেখাই যাক না তারা কি করে।' মৌলানার বিশ্বাস দশটা গাধা মিললে একটা ঘোড়া হয়।

কিন্তু এসব নিতান্ত ব্যক্তিগত কথা।

আবু হোসেন নাটক যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা হয়ত ভাবছেন যে কাবুলে তখন জোর রগড়। কিন্তু ভবিষ্যতের ভাবনায় তখন আমীর ফকির সকলেরই রসকষ কাবুল নদীর জলের মত জমে গিয়ে বরফ হয়ে গিয়েছে। বাচ্চাও শহরবাসীকে সন্দেহের দোদুলদোলায় বেশীক্ষণ দোলালো না। হুকুম হলো, আমান উল্লার মন্ত্রীদের ধরে নিয়ে এসো, আর তাদের বাড়ি লুঠ করো।

সে লুঠ কিস্তিতে কিস্তিতে হল। বাচ্চার খাস-পেয়ারারা প্রথম খবর পেয়েছিল বলে তারা প্রথম কিস্তিতে টাকা-পয়সা, গয়নাগাঁটি, দামী টুকিটাকি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। দ্বিতীয় কিস্তিতে সাধারণ ডাকাতরা আসবাবপত্র, কার্পেট, বাসন-কোসন, জামা-কাপড় বেছে বেছে নিয়ে গেল, তৃতীয় কিস্তিতে আর সব ঝড়ের মুখে উড়ে গেল—শেষটায় রাস্তার লোক কাঠের দরজা-জানালা পর্যন্ত ভেঙে নিয়ে গিয়ে শীত ভাঙালো।

মন্ত্রীদের খালি পায়ে বরফের উপর দাঁড় করিয়ে হরেক রকম সম্ভব অসম্ভব অত্যাচার করা হল গুপ্তধন বের করবার আশায়। তার বর্ণনা শুনে কাবুলের লোক পর্যন্ত শিউরে উঠেছিল—মৌলানা আর আমি শুধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছিলুম।

তারপর আমান উল্লার ইয়ারবক্সি, ফৌজের অফিসারদের পালা। বন্ধ দোর-জানালা ভেদ করে গভীর রাত্রে চিৎকার আসত—ডাকু পড়েছে। সে আবার সরকারী ডাকু—তার সঙ্গে লড়াই করার উপায় নেই, তার হাত থেকে পালাবার পথ নেই।

কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেল—রাস্তায় উপর শীতে জমে-যাওয়া রক্ত, উলঙ্গ মড়া, রাত্রে ভীত নরনারীর আর্ত চিৎকার—সবই সহ্য হয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য, অভ্যাস হল না শুধু শুকনো রুটি, নুন আর বিনা দুধচিনিতে চা খাওয়ার। মায়ের কথা মনে পড়ল; তিনি একদিন বলেছিলেন, চা-বাগানের কুলীরা যে প্রচুর পরিমাণে বিনা দুধ চিনিতে লিকার খায় সে পানের তৃপ্তির জন্য নয়, ক্ষুধা মারবার জন্য। দেখলুম অতি সত্যি কথা, কিন্তু শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। কাবুলে ম্যালেরিয়া নেই, থাকলে তারপর চা-বাগানের কুলীর যা হয় আমারও তাই হত এবং তার পরমা গতি কোথায়, বাঙালীকে বুঝিয়ে বলতে হয় না। মৌলানাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'না খেতে পেয়ে, বুলেট খেয়ে, ম্যালেরিয়ায় ভুগে, এ-তিন মার্গের ভিতর মরার পক্ষে কোনটা প্রশস্ততম বলো তো।'

মৌলানা কবিতা আওড়ালেন আরেক মৌলানার—কবি সাদীর—

চুন আহঙ্গে রফ্‌তন্ কুনদ্ জানে পাক্,
চি বর তখ্‌ৎ মুরদন্ চি বর্ সরে খাক্?

পরমায়ু যবে প্রস্তুত হয় মহাপ্রস্থান তরে
একই মৃত্যু—সিংহাসনেতে অথবা ধুলির পরে।

বাচ্চার ফরমান জারির দিন সাতেক পরে ভারতীয়, ফরাসী, জর্মন শিক্ষক-অধ্যাপকেরা এক ঘরোয়া সভায় স্থির করলেন, স্যার ফ্রান্সিসকে তাঁদের দুরবস্থা নিবেদন করে হাওয়াই জাহাজে ভারতবর্ষে যাওয়ার বন্দোবস্ত ভিক্ষা করা।

অধ্যাপকেরা বললেন, কাবুল থেকে বেরবার রাস্তা চতুর্দিকে বন্ধ ; স্যার ফ্রান্সিস বললেন, হাঁ ; অধ্যাপকেরা নিবেদন করলেন, কাবুলে কোনো ব্যাঙ্ক নেই বলে তাঁদের জমানো যা কিছু সম্বল তা পেশাওয়ারে এবং সে পয়সা আনাবার কোনো উপায় নেই ; স্যার ফ্রান্সিস বললেন, হুঁ ; অধ্যাপকেরা কাতর অনুনয়ে জানালেন, স্ত্রী-পরিবার নিয়ে তাঁরা অনাহারে আছেন ; সায়েব বললেন, অ ; অধ্যাপকেরা মরীয়া হয়ে বললেন, এখানে থাকলে তিলে তিলে মৃত্যু ; সায়েব বললেন, আ।

একদিকে ফুল্লরার বারমাসী, অন্যদিকে সায়েবের অ, আ করে বর্ণমালা পাঠ। ক্লাস সিক্সের ছেলে আর প্রথম ভাগের খোকাবাবু যেন একই ঘরে পড়াশোনা করছেন।

বর্ণমালা যখন নিতান্তই শেষ হয়ে গেল তখন সায়েব বললেন, 'এখানকার ব্রিটিশ লিগেশন ইংলণ্ডের ব্রিটিশ সরকারের মুখপাত্র। ভারতবাসীদের সুখ-সুবিধা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ব্রিটিশ লিগেশনের কর্তব্য নয়। আমি যদি কিছু করতে পারি, তবে সেটা 'ফেবার' হিসেবে করব, আপনাদের কোনো রাইট নেই।'

যাত্রাগানে বিস্তর দুর্যোধন দেখেছি। সায়েবের চেহারার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখি, না, কিছু কিছু গরমিল রয়েছে। দুর্যোধন 'ফেবার, রাইট' কোনো হিসেবেই পাঁচখানা গাঁ দিতে রাজী হননি, ইনি 'ফেবারেবল কনসিডারেশন' করতে রাজী আছেন।

এ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ হলে হয়ত তিনি বগল বাজিয়ে সুখবর দেবার জন্য পাণ্ডব-শিবিরে ছুটে যেতেন, কিন্তু আমার মনে পড়ল যুধিষ্ঠিরের কথা। একটি মিথ্যে কথা বলবার জন্যে তাঁকে নরক দর্শন করতে হয়েছিল। ভাবলুম, এদিকে দুর্যোধন, ওদিকে বাচ্চায়ে সকাও, এর মাঝখানে যদি সাহস সঞ্চয় করে একটিবারের মত এই জীবনে সত্যি কথা বলে ফেলতে পারি তবে অন্তত একবারের মত স্বর্গ দর্শন লাভ হলে হতেও পারে। বললুম, 'হাওয়াই জাহাজগুলো ভারতীয় পয়সায় কেনা, পাইলটরা ভারতীয় তনখা খায়, পেশাওয়ারের বিমানঘাঁটি ভারতের নিজস্ব—এ অবস্থায় আমাদের কি কোনো হক্ নেই?' ব্রিটিশ লিগেশন যে ভারতীয় অর্থে তৈরি, সায়েব যে ভারতীয় নিমক খান, সেকথা আর ভদ্রতা করে বললুম না।

সায়েব ভয়ঙ্কর চটে গেলেন, অধ্যাপকরাও ভয় পেয়ে গেলেন। বুঝলুম,

জীবনমরণের ব্যাপার—ভারতীয়েরা কোনো গতিকে দেশে ফিরে যেতে পেলে রক্ষা পান—'মেহেরবানী, হক' নিয়ে নাহক তর্ক করে কোনো লাভ নেই। বললুম, 'আমি যা বলেছি, সে আমার ব্যক্তিগত মত। আমি নিজে কোনো 'ফেবার' চাইনে, কিন্তু আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা যেন আর পাঁচজনের স্বার্থে আঘাত না করে।'

এর পর কথা কাটাকাটি করে আর কোনো লাভ নেই। আমার যা বক্তব্য সায়েব পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন, আর সায়েবের বক্তব্য ভারতবাসীর কাছে কিছু নূতন নয়—'ফেবার' শব্দ দরখাস্তে যিনি যত ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখতে পারেন, তাঁকেই আমরা ভারতবর্ষে গেল একশ' বছর ধরে ইংরিজীতে সুপণ্ডিত বলে সেলাম করে আসছি।

সেই সন্ধ্যায়ই খবর পেলুম, যে সব ভারতবাসী স্বদেশে ফিরে যেতে চান, তাঁদের একটা ফিরিস্তি তৈরি করা হয়েছে। সায়েব স্বহস্তে আমার নামে ঢ্যারা কেটে দিয়েছেন।

আবদুর রহমান এখন শুধু আগুনের তদারকি করে। বাদাম নেই যে খোসা ছাড়াবে, কালি নেই যে জুতো পালিশ করবে। না খেয়ে খেয়ে রোগা হয়ে গিয়েছে, দেখলে দুঃখ হয়।

মৌলানা শুতে গিয়েছেন। আবদুর রহমান ঘরে ঢুকল। আমি বললুম, 'আবদুর রহমান, সব দিকে তো ডাকাতের পাল রাস্তা বন্ধ করে আছে। পানশিরে যাবার উপায় আছে?'

আবদুর রহমান আমার দু'হাত আপন হাতে তুলে নিয়ে শুধু চুমো খায় আর চোখে চেপে ধরে; বলে, 'সেই ভালো হুজুর, সেই ভালো। চলুন আমার দেশে। এরকম শুকনো রুটি আর নুন খেলে দু'দিন বাদে আপনি আর বিছানা থেকে উঠতে পারবেন না। তার চেয়ে ভালো খাওয়ার জিনিস আমাদেরই বাড়িতে আছে। কিছু না হোক, বাদাম, কিসমিস, পেস্তা, আঞ্জীর, মোলায়েম পনীর, আর হুজুর, আমার নিজের তিনটে দুম্বা আছে। আর একটি মাস, জোর দেড় মাস, তারপর বরফ গলতে আরম্ভ করলেই আপনাকে নদী থেকে মাছ ধরে এনে খাওয়াব। ভেজে, সেঁকে, পুড়িয়ে যে-রকম আপনার ভালো লাগে। আপনি আমাকে মাছের কত গল্প বলেছেন, আমি আপনাকে খাইয়ে দেখাব। আরামে শোবেন ঘুমোবেন, জানলা দিয়ে দেখবেন—'

আবদুর রহমানকে বাধা দিতে কষ্টবোধ হল। বেচারী অনেকদিন পরে

আবার প্রাণ খুলে কথা বলতে আরম্ভ করেছে, পানশিরের পুরানো স্বপ্নে নূতন রঙ লাগিয়ে আমার চোখে চটক লাগাবার চেষ্টা করছে ; তার মাঝখানে ভোরের কাকের মত কর্কশ কা-কা করে তার সুখ-স্বপ্ন কেটে ফেলতে অত্যন্ত বাধো বাধো ঠেকল। বললুম, 'না, আবদুর রহমান, আমি যাব না, আমি বলছি, তুমি চলে যাও। জানো তো আমার চাকরি গেছে, তোমাকে মাইনে দেবার টাকা আমার নেই। ডাল চাল ফুরিয়ে গিয়ে গমে এসে ঠেকেছে, তাও তো আর বেশী দিন চলবে না। তুমি বাড়ি চলে যাও, খুদা যদি ফের সুদিন করেন, তবে আবার দেখা হবে।'

ব্যাপারটা বুঝতে আবদুর রহমানের একটু সময় লাগল। যখন বুঝল, তখন চুপ করে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমারও মন খারাপ হয়ে গেল, কিন্তু করিই বা কি? আবদুর রহমানের সঙ্গে বহু সন্ধ্যা, বহু যামিনী কাটিয়ে বুঝতে পেরেছি যে, সে যদি নিজের থেকে কোনো জিনিস না বোঝে, তবে আমার যুক্তি-তর্ক তার মনের কোনো কোণে ঠাঁই পায় না। আমার ব্যবস্থাটা যে তার আদপেই পছন্দ হয়নি, সেটা বুঝতে পারলুম, কিন্তু আমি আশা করেছিলুম, সে আপত্তি জানাবে, আমি তাহলে তর্কাতর্কি করে তাকে খানিকটা শায়েস্তা করে নিয়ে আসব। দেখলুম তা নয়, সরল লোক আর সোজা সুপারি গাছে মিল রয়েছে ; একবার পা হড়কালে আপত্তি-অজুহাতের শাখা-প্রশাখা নেই বলে সোজা ভূমিতলে অবতরণ।

খানিকক্ষণ পরে নিজের থেকেই ঘরে ফিরে এল। মাথা নিচু করে বলল, 'আপনি নিজের হাতে মেপে সকালবেলা দু'মুঠো আটা দেবেন। আমার তাইতেই চলবে।'

কি করে লোকটাকে বোঝাই যে, আমার অজানা নয় সে মাসখানেক ধরে দু'মুঠো আটা দিয়েই দুবেলা চালাচ্ছে। আর খাবারের কথাই তো আসল কথা নয়—আমার প্রস্তাবে যে সে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করেছে, সেটা লাঘব করি কি করে? যুক্তিতর্ক তো বৃথা—পূর্বেই বলেছি, ভাবলুম মৌলানাকে ডাকি। কিন্তু ডাকতে হল না। আবদুর রহমান বলল, 'যখন সব কিছু পাওয়া যেত, তখন আমি এখানে যা খেয়েছি, আমার বাবা তার শ্বশুরবাড়িতেও সেরকম খায়নি।' তারপর বেশ একটু গলা চড়িয়ে বলল, 'আর আজ কিছু জুটছে না বলে আমাকে খেদিয়ে দিতে চান? আমি কি এতই নিমকহারাম?'

অনেক কিছু বলল। কিছুটা যুক্তি, বেশীর ভাগ জীবনস্মৃতি, অল্পবিস্তর ভৎর্সনা, সব কিছু ছাপিয়ে অভিমান। কখনো বলে, 'দেরেশি করিয়ে দেননি', কখনো বলে, 'নূতন লেপ কিনে দেননি—কাবুলের ক'টা সর্দারের ওরকম লেপ আছে', 'আমি

গেলে বাড়ি পাহারা দেবে কে' 'আমাকে তাড়িয়ে দেবার হক্ আপনার সম্পূর্ণ আছে—আপনার আমি কি খেদমত করতে পেরেছি ?'

যেন পানশিরের বরফপাত। গাদা-গাদা, পাঁজা-পাঁজা। আমি যেন রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি, আর আমার উপর সে বরফ জমে উঠছে। আবদুর রহমানই আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিন বলেছিল, তখন নাকি সেই বরফ-আস্তরণের ভিতর বেশ ওম বোধ হয়। আমিও আরাম বোধ করলুম।

কিন্তু না খেতে পেয়ে আবদুর রহমানের পানশিরী তাগদ মিইয়ে গিয়েছে। সাত দিন ধরে বরফ পড়ল না—মিনিট খানেক বর্ষণ করেই আবদুর রহমান থেমে গেল। আমি বললুম, 'তা তো বটেই, তুমি চলে গেলে আমাকে বাঁচাবে কে ? অতটা ভেবে দেখিনি।'

আবদুর রহমান তদ্দণ্ডেই খুশ। সরল লোককে নিয়ে এই হল মস্ত সুবিধে। তক্ষুনি হাসিমুখে আগুনের তদারকিতে বসে গেল।

তার মন থেকে যে শেষ গ্লানিটুকু কেটে গিয়েছে সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারলুম শুতে যাবার সময়। তোষকের তলায় লেপ গুঁজে দিতে দিতে বলল, 'জানেন, সায়েব, আমি যদি বাড়ি চলে যাই তবে বাবা কি করবে ? প্রথম আমার কাছ থেকে একটা বুলেটের দাম চেয়ে নেবে ; তারপর আমাকে গুলি করে মারবে। কতবার আমাকে বলেছে, 'তোর মত হতভাগাকে মারবার জন্য যে গাঁটের পয়সায় বুলেট কেনে সে তোর চেয়ে হতভাগা'।'

আমি বললুম, 'ও, তাই বুঝি তুমি পানশির যেতে চাও না ? প্রাণের ভয়ে ?'

আবদুর রহমান প্রথমটায় থতমত খেয়ে গেল। তারপর হাসল। আমারও হাসি পেল—যে আবদুর রহমান এতদিন ধরে 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে' রূপ ধারণ করে বিরাজ করত, আমার আলবাল-সিঞ্চনে সে যে একদিন রসবোধকিশলয়ে মুকুলিত হয়ে সরসতরুবর হবে সে আশা করিনি।

আবদুর রহমান একখানা খোলা-চিঠি দিয়ে গেল ; উপরে আমান উল্লার পলায়নের তারিখ।

'কমরত ব্ শিকনদ—

এতদিন বাদে মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। আগা আহমদের মাইনের পাঁচবছরের জমানো তিনশ' টাকা আর তার ভাইয়ের রাইফেল লোপাট মেরে আফ্রিদী মুল্লুকে চললুম। সেখানে গিয়ে পিতৃপিতামহের ব্যবসা ফাঁদব। শুনতে পাই খাইবারপাসের ইংরেজ অফিসার পাকড়ে পাকড়ে খালাসীর পয়সা আদায় করার

প্রাচীন ব্যবসা উপযুক্ত লোকের অভাবে অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়েছে।

কিন্তু আচ্ছা ইংরিজী জাননেওয়ালা একজন দোভাষীর আমার প্রয়োজন—আমার ইংরিজী বিদ্যে তো জান! তোমার যদি কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকে তবে পত্রপাঠ জলালাবাদের বাজারে এসে আমার অনুসন্ধান করো। মাইনে? কাবুলে এক বছরে যা কামাও, আমি এক মাসে তোমাকে তাই দেব। কাবুলের ডাকাতের চাকর হওয়ার চেয়ে আমার বেরাদর হয়ে ইমান-ইনসাফে কামানো পয়সার বখরাদার হওয়া ঢের ভালো।

আমান উল্লা নেই—তবু ফী আমানিল্লা। * দোস্ত মুহম্মদ

পুঃ। আগা আহমদ সঙ্গে আছে। কাঁধে আমান উল্লার বিলি করা একখানা উৎকৃষ্ট মাউজার রাইফেল।'

রাজা হয়ে ভিস্তিওয়ালার ডাকাত ছেলে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় রাজপ্রাসাদে কি রঙ্গরস করল তার গল্প আস্তে আস্তে বাজারময় ছড়াতে আরম্ভ করল। আধুনিক উপন্যাসে বালিগঞ্জের কাল্পনিক ডাইনিঙরুমে পাড়াগেঁয়ে ছেলে যা করে তারই রাজসংস্করণ। নূতনত্ব কিছু নেই—তবে একটা গল্প আমার বড় ভালো লাগল। মৌলানার কপি-রাইট।

আমান উল্লা লণ্ডনে পঞ্চম জর্জের সঙ্গে যে রোল্‌স্‌ রয়েস চড়ে কুচ-কাওয়াজ পালাপরবে যেতেন রাজা জর্জ সেই বজরার মত মোটর আমান উল্লাকে বিদায়-ভেট দেন। সে গাড়ি রাক্ষসের মত তেল খেত বলে আমান উল্লা পালাবার সময় সেখানা কাবুলে ফেলে যান।

বাচ্চা রাজা হয়ে বিশেষ করে সেই মোটরই পাঠাল বাস্তুগাঁয়ে বউকে নিয়ে আসবার জন্য। বউ নাকি তখন বাচ্চার বাচ্চার মাথার উকুন বাছছিল। সারা গাঁয়ের হুলুস্থুলের মাঝখানে বাচ্চার বউ নাকি ড্রাইভারকে বলল, 'তোমার মনিবকে গিয়ে বলো, নিজে এসে আমাকে খচ্চরে বসিয়ে যেন নিয়ে যায়।'

দিগ্বিজয় করে বুদ্ধদেব যখন কপিলবস্তু ফিরেছিলেন তখন যশোধরা এমনি ধারা অভিমান করেছিলেন।

---

* 'আমান উল্লা' কথার অর্থ 'আল্লার আমানত' এবং 'ফী আমান ইল্লা' কথার অর্থ (তোমাকে) 'আল্লার আমানতে রাখলুম।'

চল্লিশ

ফরাসডাঙার জরিপেড়ে ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি আর ফুরফুরে রেশমী উড়ুনি পরে বসে আছি। কব্জিতে গোড়ে, গোঁফে আতর। চাকর ট্যাক্সি আনতে গিয়েছে—বায়স্কোপে যাব।

সত্যি নয়, তুলনা দিয়ে বলছি।

তখন যেমন ট্যাক্সির অপেক্ষা করা ভিন্ন অন্য কোনো কাজে মন দেওয়া যায় না, আমাদের অবস্থা হল তখন তাই। তফাত শুধু এই, স্যার ফ্রান্সিসের হাতে হাওয়াই ট্যাক্সি রয়েছে—কিন্তু সাঁঝের বেলা শিখ ড্রাইভার যে রকম মদমত্ত হয়ে 'চক্ষু দুইডা রাঙা কইরা, এড্ডা চিক্কের দিয়া' বলে 'নহী জায়েঙ্গে', সাহেব তেমনি স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে বলছেন—চুলোয় যাকগে কি বলছেন।

অপেক্ষা করে করে এক মাস কাটিয়ে দিয়েছি।

চা ফুরিয়ে গিয়েছে—ক্ষুধা মারবার আর কোনো দাওয়াই নেই। এখন শুধু রুটি আর নুন—নুন আর রুটি। রুটিতে প্রচুর পরিমাণ নুন দিলে শুধু রুটিতেই চলে কিন্তু ভোজনের পদ বাড়াবার জন্য আবদুর রহমান নুন রুটি আলাদা আলাদা করে পরিবেষণ করত।

সপ্তাহ তিনেক হল বেনওয়া সাহেব অ্যারোপ্লেন করে হিন্দুস্থান চলে গিয়েছেন। পূর্বেই বলেছি, তিনি শান্তিনিকেতনে থেকে থেকে বাঙালী হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা হলে কি হয়। পাসপোর্টখানা তো ফরাসী দেশের—এবং তাঁর রংটা তো সাদা। তাই ভারতীয় বিমানে তিনি জায়গা পেলেন বিনা মেহন্নতে। আমাদের তাতে বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই কিন্তু সব ফরাসীর জন্য তো আর এ রকম দরাজদিল হতে পারব না।

যাবার আগের দিন বেনওয়া বাড়িতে এসে মৌলানা আর আমাকে গোপনে এক টিন ফরাসী তরকারী দিয়ে যান—সার্ডিন টিনের সাইজ। বহুকাল ধরে রুটি ভিন্ন অন্য কোনো বস্তু পেটে পড়েনি ; মৌলানাতে আমাতে সেই তরকারী গো-গ্রাসে গোস্ত-গেলার পদ্ধতিতে খেয়ে পেটের অসুখে সপ্তাহ খানেক ভুগলুম। আমাদের ভুগন্তি অনেকটা গরীব চাষীর ম্যালেরিয়ায় ভোগার মত হল। চাষী যে রকম ভোগার সময় বিলক্ষণ বুঝতে পারে কুইনিন-ফুইনিন কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই, সাত দিন পেট ভরে খেতে পেলে দুনিয়ার কুল্লে জ্বর ঝেড়ে ফেলে উঠতে পারবে, আমরা তেমনি ঠিক জানতুম, তিন দিন পেট ভরে খেতে পেলে

আমাদেরও পেটের অসুখ আমান উল্লার সৈন্যবাহিনীর মত কর্পূর হয়ে উবে যাবে।

সেই অনাহার আর অসুখের দরুন মৌলানা আর আমার মেজাজ তখন এমনি তিরিক্ষি হয়ে গিয়েছে যে, বেরালটা কার্পেটের উপর দিয়ে হেঁটে গেলে তার শব্দে লাফ দিয়ে উঠি (অথচ স্নায়ু জিনিসটা এমনি অদ্ভুত যে, বন্দুকগুলির শব্দে আমাদের নিদ্রা ভঙ্গ হয় না), কথায় কথায় দু'জনাতে তর্ক লাগে, মৌলানার দিকে তাকালেই আমার মনে হয়, ওরকম জঙলী দাড়ি মানুষ রাখে কেন, মৌলানা আমার চেহারা সম্বন্ধে কি ভাবতেন জানিনে, তবে প্রকাশ করলে খুব সম্ভব খুনোখুনি হয়ে যেত। মৌলানা পাঞ্জাবী কিন্তু আমিও তো বাঙাল।

মৌলানা লোকটা ভারী কুতর্ক করে। আমি যা বললুম সে কথা তাবৎ দুনিয়া সৃষ্টির আদিম কাল থেকে স্বীকার করে আসছে। আমি বললুম, 'সরু চালের ভাত আর ইলিশ মাছ ভাজার চেয়ে উপাদেয় খাদ্য আর কিছুই হতে পারে না।' মূর্খ বলে কি না বিরয়ানি-কুর্মা তার চেয় অনেক ভালো। পাঞ্জাবীদের সঙ্কীর্ণমনা প্রাদেশিকতার আর কি উদাহরণ দিই বলুন। শান্তিনিকেতনে থেকেও লোকটা মানুষ হল না। যে নরাধম ইলিশ মাছের অপমান করে তার মুখদর্শন করা মহা পাপ, অথচ দেখুন, বাঙালীর চরিত্র কী উদার, কী মহান ;—আমি মৌলানার সঙ্গে মাত্র তিন দিন কথা বন্ধ করে ছিলুম।

আর শীতটা যা পড়েছিল। বায়স্কোপে জব্বর গরমের ছ'হাজার ফুটী বর্ণনা দেখা যায়, কিন্তু মারাত্মক শীতের বয়ান তার তুলনায় বহুৎ কম। কারণ বায়স্কোপ বানানো হয় প্রধানতঃ সায়েবসুবোদের জন্য আর তেনারা শীতের তক্‌লিফ বাবতে ওকিবহাল, কাজেই সে-জিনিস তাঁদের দেখিয়ে বক্স-আপিস ভরবে কেন ? আর যদি বা দেখানো হয় তবে শীতের সঙ্গে হামেশাই ঝড় ব্লিজার্ড জুড়ে দেওয়া যায়। কিন্তু আসলে যেমন কালবৈশাখী বিপজ্জনক হলেও তার সঙ্গে দিনের পর দিনের ১১২ ডিগ্রীর অত্যাচারের তুলনা হয় না, তেমনি বরফের ঝড়ের চেয়েও মারাত্মক দিনের পর-দিনের ১০ ডিগ্রীর অত্যাচার।

জামা ধুয়ে রোদ্দুরে শুকোতে দিলেন। জামার জল জমে বরফ হল, রোদ্দুরে সে জল শুকোনো দূরের কথা বরফ পর্যন্ত গলল না। রোদ থাকলেই টেম্পারেচার ফ্রিজিঙের উপরে ওঠে না। জামাটা জমে তখন এমনি শক্ত হয়ে গিয়েছে যে, এক কোণে ধরে রাখলে সমস্ত জামাটা খাড়া হয়ে থাকে। ঘরের ভিতরে এনে আগুনের কাছে ধরলে পর জামা চুবসে গিয়ে জবুথবু হয়।

বলবেন বানিয়ে বলছি, কিন্তু দেশ ভ্রমণের হলপ, দোতলা থেকে থুথু ফেললে সে-থুথু মাটি পৌঁছবার পূর্বেই জমে গিয়ে পেঁজা বরফের মত হয়ে যায়। আবদুর রহমান একদিন দুটো পেঁয়াজ যোগাড় করে এনেছিল—খুদায় মালুম চুরি না ডাকাতি করে—কেটে দেখি পেঁয়াজের রস জমে গিয়ে পরতে পরতে বরফের গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে।

সেই শীতে জ্বালানী কাঠ ফুরোলো।

খবরটা আবদুর রহমান দিল বেলা বারোটার সময়। বাইরের কড়া রৌদ্র তখন বরফের উপর পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে, আমরা কিন্তু সে-সংবাদ শুনে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখলুম। রোদ সত্ত্বেও টেম্পারেচার তখন ফ্রিজিঙ পয়েন্টের বহু নিচে।

সে রাত্রে গরম বানিয়ান, ফ্লানেলের শার্ট, পুল-ওভার, কোট, ইন্তেক ওভার-কোট পরে শুলুম। উপরে দুখানা লেপ ও একখানা কার্পেট। মৌলানা তাঁর প্রিয়তম গান ধরলেন,

'দারুণ অগ্নিবাণে
হৃদয় তৃষায় হানে—'

আমি সাধারণতঃ বেসুরা পোঁ ধরি। সেরাত্রে পারলুম না, আমার দাঁতে দাঁতে করতাল বাজছে।

জানালার ফাঁক দিয়ে বাতাস ঢুকে পর্দা সরিয়ে দিল। আকাশ তারায় তারায় ভরা। রবীন্দ্রনাথ উপমা দিয়ে বলেছেন।

'আমার প্রিয়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
সন্ধ্যা তারায় লুকিয়ে দেখে কাকে,
সন্ধ্যাদীপের লুপ্ত আলো স্মরণে তার ভাসে।'

ফরাসী কবি অন্য তুলনা দিয়েছেন; আকাশের ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল জমে গিয়ে তারা হয়ে গিয়েছে। আরেক নাম-না-জানা বিদেশী কবি বলেছেন, মৃতা ধরণীর কফিনের উপর সাজানো মোমবাতির গলে-যাওয়া জমে-ওঠা ফোঁটা ফোঁটা মোম তারা হয়ে গিয়েছে।

সব বাজে বাজে তুলনা, বাজে বাজে কাব্যি।

হে দিগম্বর ব্যোমকেশ, তোমার নীলাম্বরের নীলকম্বল যে লক্ষ লক্ষ তারার ফুটোয় ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে। তাই কি তুমিও আমারই মতন শীতে কাঁপছ? কাবুলে যে শ্মশান জ্বালিয়েছ তার আগুন পোয়াতে পারো না?

তিন দিন তিন রাত্তির লেপের তলা থেকে পারতপক্ষে বেরইনি। চতুর্থ

দিনে আবদুর রহমান অনুনয় করে বলল, 'ওরকম একটানা শুয়ে থাকলে শরীর ভেঙে পড়বে সায়েব ; একটু চলাফেরা করুন, গা গরম হবে।'

আমাদের দেশের গরীব কেরানীকে যেরকম ডাক্তার প্রাতর্ভ্রমণ করবার উপদেশ দেয়। গরীব কেরানীরই মতন আমি চিঁ চিঁ করে বললুম, 'বড্ড ক্ষিদে পায় যে। শুয়ে থাকলে ক্ষিদে কম পায়।'

ডাকাতি করলে আমি তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব এ কথা আবদুর রহমান জানত বলেই সে তখনো রাইফেল নিয়ে রাজভোগের সন্ধানে বেরোয়নি। আবদুর রহমান মাথা নিচু করে চুপ করে গেল।

বেরাল পারতপক্ষে বাস্তুভিটা ছাড়ে না। তিন দিন ধরে আমার বেরাল দুটো না-পাত্তা। তার থেকে বুঝলুম, আমার প্রতিবেশীরা নিশ্চয়ই আমার চেয়ে ভালো খাওয়া-দাওয়া করছে। তারা বিচক্ষণ, রাষ্ট্রবিপ্লবে ওয়াকিবহাল। গোলমালের গোড়ার দিকেই সব কিছু কিনে রেখেছিল।

শীতের দেশে নাকি হাতী বেশীদিন বাঁচে না। তবু আমান উল্লা শখ করে একটা হাতী পুষেছিলেন। কাবুলে কলাগাছ আনারস গাছ, বনবাদাড় নেই বলে সে কালো হাতীকে পুষতে প্রায় সাদা হাতী পোষার খর্চাই লাগত। কাবুলে তখন কাঠের অভাব ; তাই হাতী-ঘরে আর আগুন জ্বালানো হত না। বাচ্চার ডাকাত ভাই-বেরাদরের শখ চেপেছে হাতী চাপার। সেই দুর্দান্ত শীতে তারা হাতীকে বের করেছে চড়ে নগর প্রদক্ষিণ করার জন্য। তাকিয়ে দেখি হাতীর চোখের কোণ থেকে লম্বা লম্বা আইসিক্‌ল্ বা বরফের ছুঁচ ঝুলছে—হাতীর চোখের আর্দ্রতা জমে গিয়ে।

আমি জানতুম, হাতীটা ত্রিপুরা থেকে কেনা হয়েছিল। ত্রিপুরার সঙ্গে সিলেটের বিয়ে-সাদী লেন-দেন বহুকালের—সিলেটের জমিদার খুন করে ফেরারী হলে চিরকালই ত্রিপুরার পাহাড়ে টিপরাদের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে।

হাতীটার কষ্ট আমার বুকে বাজলো। তখন মনে পড়ল রেমার্কের চাষা বন্দুকগুলি অগ্রাহ্য করে ট্রেঞ্চের ভিতর থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল, জখমি ঘোড়াকে গুলি করে মেরে তাকে তার যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি দেবার জন্য।

কুকুরের চোখেমুখে বেদনা সহজেই ধরা পড়ে। হাতীকে কাতর হতে কেউ কখনো দেখেনি, তাই তার বেদনাবোধ যখন প্রকাশ পায় তখন সে দৃশ্য বড় নিদারুণ।

আমান উল্লার বিস্তর মোটরগাড়ী ছিল। বাচ্চার সঙ্গীসাথীরা সেই মোটরগুলো চড়ে চড়ে তিন দিনের ভেতর সব পেট্রল শেষ করে দিল। শহরের সর্বত্র এখন দামী দামী মোটর পড়ে আছে—যেখানে যে-গাড়ীর পেট্রল্ শেষ হয়েছে বাচ্চার ইয়াররা সেখানেই সে-গাড়ী ফেলে চলে গিয়েছে। জানালার কাঁচ পর্যন্ত তুলে দিয়ে যায়নি বলে গাড়ীতে বৃষ্টি বরফ ঢুকছে; পাড়ার ছেলেপিলেরা গাড়ী নিয়ে ধাক্কাধাক্কি করাতে দু'একটা নর্দমায় কাত হয়ে পড়ে আছে।

আমাদের বাড়ীর সামনে একখানা আনকোরা বীয়ুইক্ ঝল্‌মল্ করছে। আবদুর রহমানের ভারী শখ গাড়ীখানা বাড়ীর ভিতরে টেনে আনার। বিদ্রোহ শেষ হলে চড়বার ভরসা সে রাখে।

আমান উল্লা তো সেই কোন্ ফরাসী রাজার মত 'আপ্রে মওয়া ল্য দেলুজ' (হম্ গয়া তো জগ গয়া) বলে কান্দাহার পালালেন,—আবদুর রহমান বলে, 'আপ্রে ল্য দেলুজ, অতমবিল্' (বন্যার পর পলিমাটি)।

আমাদের কাছে যেমন সব ব্যাটা গোরার মুখ একরকম মনে হয়, আবদুর রহমানের কাছে তেমনি সব মোটরের এক চেহারা। কিছুতেই স্বীকার করবে না যে, 'দেলুজের' পর রাজবাড়ীর লোক চোরাই-গাড়ীর সন্ধানে বেরিয়ে গাড়ীখানা চিনে নিয়ে সেখানা পুরবে গারাজে আর তাকে পুরবে জেলে।

অপ্‌টিমিস্ট।

কাবুলে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। অনেকটা শিলঙের মত। হলে সবাই ছুটে ঘর থেকে বেরোয়।

দুপুরবেলা জোর ভূমিকম্প হল। আমি আর মৌলানা দুই খাটে শুয়ে ধুঁকছি। কেউ খাট ছেড়ে বেরলুম না।

একচল্লিশ

যেন অন্তহীন মহাকাল ভ্যাজর ভ্যাজর করার পর এক ভাষণ-বিলাসী আপন বক্তৃতা শেষ করে বললেন, 'আপনাদের অনেক মূল্যবান সময় অজানাতে নষ্ট করে ফেলেছি বলে মাপ চাইছি। আমার সামনে ঘড়ি ছিল না বলে সময়ের আন্দাজ রাখতে পারিনি।' শ্রোতাদের একজন চটে গিয়ে বলল, 'কিন্তু সামনের দেয়ালে যে ক্যালেণ্ডার ছিল, তার কি? সেদিকে তাকালে না কেন?'

মৌলানা আর আমি বহুদিন হল ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকানো বন্ধ করে দিয়েছি। তবু জমে-যাওয়া হাড় ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করিয়ে দেয় যে এখনো শীতকাল।

ইতিমধ্যে ফরাসী জর্মন প্রভৃতি বিদেশী পুরুষেরা ভারতীয় প্লেনে কাবুল ত্যাগ করেছেন—স্ত্রীলোকেরা তো আগেই চলে গিয়েছিলেন। শেষটায় শুনলুম ভারতীয় পুরুষদের কেউ কেউ স্যার ফ্রান্সিসের ফেবারে স্বদেশ চলে যেতে পেরেছেন। আমার নামে তো ঢ্যারা, কাজেই মৌলানাকে বললুম, তিনি যদি প্লেনে চাপবার মোকা পান তবে যেন পিছন পানে না তাকিয়ে যুধিষ্ঠিরের মত সোজা পিতৃলোক চলে যান। অনুজ যদি অনুগ হবার সুবিধে না পায় তবে তার জন্য অপেক্ষা করলে ফল পিতৃলোকে প্রত্যাগমন না হয়ে পিতৃলোকে মহাপ্রয়াণই হবে। চাণক্য বলেছেন, উৎসবে, ব্যসনে এবং রাষ্ট্রবিপ্লবে যে কাছে দাঁড়ায় সে বান্ধব। এস্থলে সে-নীতি প্রযোজ্য নয়, কারণ, চাণক্য স্বদেশের রাষ্ট্রবিপ্লবের কথাই ভাবছিলেন, বিদেশের চক্রব্যূহের খাঁচায় ইঁদুরের মত না খেয়ে মরবার উপদেশ দেননি।

অল্প অল্প জ্বরের অবচেতন অবস্থায় দেখি দরজা দিয়ে উর্দিপরা এক বিরাট মূর্তি ঘরে ঢুকছে। দুর্বল শরীর, মনও দুর্বল হয়ে গিয়েছে। ভাবলুম, বাচ্চায়ে সকাওয়ের জল্লাদই হবে; আমার সন্ধানে এখন আর আসবে কে?

নাঃ। জর্মন রাজদূতাবাসের পিয়ন। কিন্তু আমার কাছে কেন? ওদের সঙ্গে তো আমার কোনো দহরম-মহরম নেই। জর্মন রাজদূত আমাকে এই দুর্দিনে নিমন্ত্রণই বা করবেন কেন? আবার পইপই করে লিখেছেন, বড্ড জরুরী এবং পত্রপাঠ যেন আসি।

দু'মাইল বরফ ভেঙে জর্মন রাজদূতাবাস। যাই কি করে, আর গিয়ে হবেই বা কি? কোনো ক্ষতি যে হতে পারে না সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত, কারণ আমি বসে আছি সিঁড়ির শেষ ধাপে, আমাকে লাথি মারলেও এর নিচে আমি নামতে পারি না।

শেষটায় মৌলানার ধাক্কাধাক্কিতে রওয়ানা হলুম। জর্মন রাজদূতাবাস যাবার পথ সুদিনে অভিসারিকাদের পক্ষে বড়ই প্রশস্ত—নির্জন, এবং বনবীথিকার ঘনপল্লবে মর্মরিত। রাস্তার একপাশ দিয়ে কাবুল নদী এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছেন; তারই রসে সিক্ত হয়ে হেথায় কুঞ্জ, হোথায় পঞ্চ-চিনার। নিতান্ত অরসিক জনও কল্পনা করে নিতে পারে যে লুকোচুরি, রসকেলির জন্য এর চেয়ে উত্তম বন্দোবস্ত মানুষ চেষ্টা করেও করতে পারত না।

কিন্তু এ-দুর্দিনে সে-রাস্তা চোরডাকাতের বেহেস্‌ৎ, পদাতিকের গোরস্তান।

আবদুর রহমান বেরবার সময় ছোট পিস্তলটা জোর করে ওভারকোটের পকেটে পুরে দিয়েছিল। নিতান্ত ফিচেল চোর হলে ওটা কাজে লেগে যেতেও পারে।

এসব রাস্তায় হাঁটতে হয় সগর্বে, সদম্ভে, ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে, মাথা খাড়া করে। কিন্তু আমার সে তাগদ কোথায়? তাই শিষ দিয়ে দিয়ে চললুম এমনি কায়দায় যেন আমি নিত্যিনিত্যি এ-পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করি।

পথের শেষে পাহাড়। বেশ উঁচুতে রাজদূতাবাস। সে-চড়াই ভেঙে যখন শেষটায় রাজদূতের ঘরে গিয়ে ঢুকলুম তখন আমি ভিজে ন্যাকড়ার মত নেতিয়ে পড়েছি। রাজদূত মুখের কাছে ব্র্যাণ্ডির গেলাশ ধরলেন। এত দুঃখেও আমার হাসি পেল; মুসলমান মরার পূর্বে মদ খাওয়া ছাড়ে, আমি মরার আগে মদ ধরব নাকি? মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি জানালুম।

জর্মনরা কাজের লোক। ভণিতা না করেই বললেন, 'বেনওয়া সায়েবের মুখে শোনা, আপনি নাকি জর্মনিতে পড়তে যাবার জন্য টাকা কামাতে এদেশে এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার সব টাকা নাকি এক ভারতীয় মহাজনের কাছে জমা ছিল, এবং সে নাকি বিপ্লবে মারা যাওয়ায় আপনার সব টাকা খোয়া গিয়েছে?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

রাজদূত খানিকক্ষণ ভাবলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি বিশেষ করে কেন জর্মনিতেই যেতে চেয়েছিলেন, বলুন তো?'

আমি বললুম, 'শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীতে কাজ করে ও বিশ্বভারতীর বিদেশী পণ্ডিতদের সংসর্গে এসে আমার বিশ্বাস হয়েছে যে উচ্চশিক্ষার জন্য আমার পক্ষে জর্মনিই সব চেয়ে ভালো হবে।'

এ ছাড়া আরো একটা কারণ ছিল, সেটা বললুম না।

রাজদূতেরা কখন খুশী, কখন বেজার হন সেটা বোঝা গেলে নাকি তাঁদের চাকরি যায়। কাজেই আমি তাঁর প্রশ্নের কারণের তাল ধরতে না পেরে, বাঁয়াতবলা কোলে নিয়ে বসে রইলুম।

বললেন, 'আপনি ভাববেন না এই কটি খবর সঠিক জানবার জন্যই আপনাকে কষ্ট দিয়ে এখানে আনিয়েছি। আমি শুধু আপনাকে জানাতে চাই, আমা দ্বারা

যদি আপনার জর্মনি যাওয়ার কোনো সুবিধা হয় তবে আমি আপনাকে সে সাহায্য আনন্দের সঙ্গে করতে প্রস্তুত। আপনি বলুন, আমি কি প্রকারে আপনার সাহায্য করতে পারি?'

আমি অনেক ধন্যবাদ জানালুম। রাজদূত উত্তরের অপেক্ষায় বসে আছেন, কিন্তু আমার চোখে কোনো পন্থাই ধরা দিচ্ছে না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল—খোদা আছেন, গুরু আছেন—বললুম, 'জর্মন সরকার প্রতি বৎসর দু'একটি ভারতীয়কে জর্মনিতে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি দেন। তারই একটা যদি যোগাড় করে দিতে পারেন তবে—'

বাধা দিয়ে রাজদূত বললেন, 'জর্মন সরকার যদি একটি মাত্র বৃত্তি একজন বিদেশীকেও দেন তবে আপনি সেটি পাবেন, আমি কথা দিচ্ছি।'

আমি অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বললুম, 'পোয়েট টেগোরের কলেজে আমি পড়েছি, তিনি খুব সম্ভব আমাকে সার্টিফিকেট দিতে রাজী হবেন।'

রাজদূত বললেন, 'তাহলে আপনি এত কষ্ট করে কাবুল এলেন কেন? টেগোরকে জর্মনিতে কে না চেনে।'

আমি বললুম, 'কিন্তু পোয়েট সবাইকে অকাতরে সার্টিফিকেট দেন। এমন কি এক তেল-কোম্পানীকে পর্যন্ত সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে তাদের তেল ব্যবহার করলে নাকি টাকে নূতন চুল গজায়।'

রাজদূত মৃদুহাস্য করে বললেন, 'টেগোর বড় কবি জানতুম, কিন্তু সহৃদয় লোক সে-কথা জানতুম না।'

অন্য সময় হলে হয়ত এই খেই ধরে 'জর্মনিতে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের মালমশলা যোগাড় করে নিতুম, কিন্তু আমার দেহ তখন বাড়ী ফিরে খাটে শোবার জন্য আঁকুবাঁকু লাগিয়েছে।

উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, 'এ দুর্দিনে যে আপনি নিজের থেকে আমার অনুসন্ধান করেছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দেবার মত ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছিনে। বৃত্তি হলে ভালো, না হলেও আমি সয়ে নিতে পারব। কিন্তু আপনার সৌজন্যের কথা কখনো ভুলতে পারব না।'

রাজদূতও উঠে দাঁড়ালেন। শেকহ্যাণ্ডের সময় হাতে সহৃদয়তার চাপ দিয়ে বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই বৃত্তিটা পাবেন। নিশ্চিন্ত থাকুন।'

দূতাবাস থেকে বেরিয়ে বাড়ীটার দিকে আরেকবার ভালো করে তাকালুম। সমস্ত বাড়ীটা আমার কাছে যেন মধুময় বলে মনে হল। তীর্থের উৎপত্তি কি

করে হয় সে-সম্বন্ধে আমি কখনো কোনো গবেষণা করিনি ; আজ মনে হল, সহৃদয়তা, করুণা, মৈত্রীর সন্ধান যখন এক মানুষ অন্য মানুষের ভিতর পায় তখন তাঁকে কখনো মহাপুরুষ কখনো 'অবতার' কখনো 'দেবতা' বলে ডাকে এবং তাঁর পাদপীঠকে জড় জেনেও পুণ্যতীর্থ নাম দিয়ে অজরামর করে তুলতে চায়। এবং সে-বিচারের সময় মানুষ উপকারের মাত্রা দিয়ে কে 'মহাপুরুষ' কে 'দেবতা' সে-কথা যাচাই করে না, তার স্পর্শকাতর হৃদয় তখন কৃতজ্ঞতার বন্যায় সব তর্ক সব যুক্তি সব পরিপ্রেক্ষিত, সব পরিমাণজ্ঞান ভাসিয়ে দেয়

শুধু একটি পরিমাণজ্ঞান আমার মন থেকে তখনো ভেসে যায়নি এবং কস্মিন কালেও যাবে না—

যে ভদ্রলোক আমাকে এই দুর্দিনে স্মরণ করলেন তিনি রাজদূত, স্যার ফ্রান্সিস হামফ্রিসও রাজদূত।

কিন্তু আর না। ভাবপ্রবণ বাঙালী একবার অনুভূতিগত বিষয়-বস্তুর সন্ধান পেলে মূল বক্তব্য বেবাক ভুলে যায়।

তিতিক্ষু পাঠক, এস্থলে আমি করজোড়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। জর্মন রাজদূতের সঙ্গে আমার যোগাযোগের কাহিনীটা নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং তার বয়ান ভ্রমণ-কাহিনীতে চাপানো যুক্তিযুক্ত কি না সে-বিষয়ে আমার মনে বড় দ্বিধা রয়ে গিয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যে-হিরন্ময় পাত্রে সত্যস্বরূপ রস লুক্কায়িত আছেন তাঁর ব্যক্তি-হিরণ আপন চাকচিক্য দিয়ে আমার চোখ এমনি ধাঁধিয়ে দিয়েছে যে তাই দেখে আমি মুগ্ধ, সে-পূষণ কোথায় যিনি পাত্রখানি উন্মোচন করে আমার সামনে নৈর্ব্যক্তিক, আনন্দঘন, চিরন্তন রসসত্তা তুলে ধরবেন ?

বিপ্লবের একাদশী, ইংরেজ রাজদূতের বিদগ্ধ বর্বরতা, জর্মন রাজদূতের অযাচিত অনুগ্রহ অনাত্মীয় বৈরাগ্যে নিরীক্ষণ করা তো আমার কর্ম নয় !

জর্মন রাজদূতাবাস থেকে বেরিয়ে মনে পড়ল, বারো বৎসর পূর্বে আফগানিস্থান যখন পরাধীন ছিল তখন আমীর হবীব উল্লা রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে এই বাড়ীতে রেখে অতিথি সৎকার করেছিলেন। এই বাড়ীর পাশেই হিন্দুস্থানের সম্রাট বাবুর বাদশার কবর। সে-কবর দেখতে আমি বহুবার গিয়েছি, আজ যাবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কেন জানিনে, পা দুখানা আমাকে সেই দিকেই টেনে নিয়ে গেল।

খোলা আকাশের নিচে কয়েকফালি পাথর দিয়ে বানানো অত্যন্ত সাদাসিদে কবর। মোগল সরকারের নগণ্যতম মুহুরিরের কবরও হিন্দুস্থানে এর চেয়ে বেশী জৌলুস ধরে। এ কবরের তুলনায় পুত্র হুমায়ুনের কবর তাজমহলেরও বাড়া। আর আকবর জাহাঙ্গীর যে-সব স্থপতি রেখে গিয়েছেন সেসব তো বাবুরের স্বপ্নও ছাড়িয়ে যায়।

বাবুরের আত্মজীবনী যাঁরা পড়েছেন তাঁরা এই কবরের পাশে দাঁড়ালে যে অনুভূতি পাবেন সে-অনুভূতি হুমায়ুন বা শাহজাহানের কবরের কাছে পাবেন না। বাবুর মোগল বংশের পত্তন করে গিয়েছেন এবং আরো বহু বহু বীর বহু বহু বংশের পত্তন করে গিয়েছেন কিন্তু বাবুরের মত সুসাহিত্যিক রাজা-রাজড়াদের ভিতর তো নেই-ই সাধারণ লোকের মধ্যেও কম। এবং সাহিত্যিক হিসেবে বাবুর ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ মাটির মানুষ এবং সেই তত্ত্বটি তাঁর আত্মজীবনীর পাতায় পাতায় বার বার ধরা পড়ে। কবরের কাছে দাঁড়িয়ে মনে হয় আমি আমারই মত মাটির মানুষ, যেন এক আত্মজনের সমাধির কাছে এসে দাঁড়িয়েছি।

আমাদের দেশের একজন ঐতিহাসিক সীজারের আত্মজীবনীর সঙ্গে বাবুরের আত্মজীবনীর তুলনা করতে গিয়ে প্রথমটির প্রশংসা করেছেন বেশী। তাঁর মতে বাবুরের আত্মজীবনী এ-শ্রেণীর লেখাতে দ্বিতীয় স্থান পায়। আমি ভিন্ন মত পোষণ করি। কিন্তু এখানে সে তর্ক জুড়ে পাঠককে আর হায়রান করতে চাইনে। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু: দুটি আত্মজীবনীই সাহিত্যসৃষ্টি, নীরস ইতিহাস নয়। এর মধ্যে ভালো মন্দ বিচার করতে হলে ঐতিহাসিক হবার কোনো প্রয়োজন নেই। যে-কোনো রসজ্ঞ পাঠক নিজের মুখেই ঝাল খেয়ে নিতে পারবেন। তবে আপসোস শুধু এইটুকু, বাবুর তাঁর কেতাব জগতাই-তুর্কীতে ও সীজার লাতিনে লিখেছেন বলে বই দুখানি মূলে পড়া আমাদের পক্ষে সোজা নয়। সান্ত্বনা এইটুকু যে, আমাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকও কেতাব দু'খানা অনুবাদে পড়েছেন।

পূর্বেই বলেছি কবরটি অত্যন্ত সাদামাটা এবং এতই অলঙ্কারবর্জিত যে তার বর্ণনা দিতে পারেন শুধু জবরদস্ত আলঙ্কারিকই। কারণ, বাবুর তাঁর দেহাস্থি কিভাবে রাখা হবে সে সম্বন্ধে এতই উদাসীন ছিলেন যে, নূর-ই-জহানের মত

'গরীব-গোরে দীপ জ্বেল না ফুল দিও না
কেউ ভুলে—

শামা পোকার না পোড়ে পাখ, দাগা না পায়
বুলবুলে।'

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

কবিত্ব করেন নি, বা জহান-আরার মত

বহুমূল্য আভরণে করিয়ো না সুসজ্জিত
কবর আমার
তৃণ-শ্রেষ্ঠ আভরণ দীনা আত্মা জহান-আরা
সম্রাট-কন্যার।*

বলে পাঁচজনকে সাবধানে করে দেবার প্রয়োজনও বোধ করেননি। তবে একথা ঠিক, তিনি তাঁর শেষ শয্যা যেমন কর্মভূমি ভারতবর্ষে গ্রহণ করতে চাননি ঠিক তেমনি জন্মভূমি ফরগনাকেও মৃত্যুকালে স্মরণ করেননি।

যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন—

"The foxes have holes and the birds of the air have nests : but the Son of the man hath not where to lay his head."

রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিল
কে মোর আত্মপর ?
আমার বিধাতা আমাতে জাগিল
কোথায় আমার ঘর ?

জীবিতাবস্থায়ই যখন মহাপুরুষের আশ্রয়স্থল নেই তখন মৃত্যুর পর তার জন্মভূমিই বা কি আর মৃত্যুস্থলই বা কি ?

ইংরেজী 'সার্ভে' কথাটা গুজরাতীতে অনুবাদ করা হয় 'সিংহাবলোকন' দিয়ে। 'বাবুর' শব্দের অর্থ সিংহ। আমার মনে হল এই উঁচু পাহাড়ের উপর বাবুরের গোর দেওয়া সার্থক হয়েছে। এখান থেকে সমস্ত কাবুল উপত্যকা, পূর্বে ভারতমুখী গিরিশ্রেণী, উত্তরে ফরগনা যাবার পথের হিন্দুকুশ, সব কিছু ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে সিংহাবলোকনে দেখছেন সিংহরাজ বাবুর।

নেপোলিয়নের সমাধি-আস্তরণ নির্মাণ করা হয়েছে মাটিতে গর্ত করে সমতলভূমির বেশ খানিকটা নিচে। স্থপতিকে এরকম পরিকল্পনা করার অর্থ

* অনুবাদকের নাম ভুলে যাওয়ায় তাঁর কাছে লজ্জিত আছি।

বোঝাতে অনুরোধ করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'যে-সম্রাটের জীবিতাবস্থায় তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালে সকলকেই মাথা হেঁট করতে হত, মৃত্যুর পরও তাঁর সামনে এলে সব জাতিকে যেন মাথা নিচু করে তাঁর শেষ-শয্যা দেখতে হয়।'

ফরগনার গিরিশিখরে দাঁড়িয়ে যে-বাবুর সিংহাবলোকন দিয়ে জীবনযাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, যে-সিংহাবলোকনদক্ষতা বাবুরের শিরে হিন্দুস্থানের রাজমুকুট পরিয়েছিল, সেই বাবুর মৃত্যুর পরও কি সিংহাবলোকন করতে চেয়েছিলেন ?

জীবনমরণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাই কি বাবুর কাবুলের গিরিশিখরে দেহাস্থি রক্ষা করার শেষ আদেশ দিয়েছিলেন ?

কিন্তু কি পরস্পর-বিরোধী প্রলাপ বকছি আমি ! একবার বলছি বাবুর তাঁর শেষ-শয্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন আর তার পরক্ষণেই ভাবছি মৃত্যুর পরও তিনি তাঁর বিহারস্থলের সম্মোহন কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তবে কি মানুষের চিন্তা করার কল মগজে নয়, সেটা কি পেটে ? না-খেতে পেয়ে সে যন্ত্র স্টিয়ারিঙ-ভাঙা মোটরের মত চতুর্দিকে এলোপাতাড়ি ছুটোছুটি লাগিয়েছে ?

পিছন ফিরে শেষ বারের মত কবরের দিকে তাকাতে আমার মনের সব দ্বন্দ্বের অবসান হল। বরফের শুভ্র কম্বলে ঢাকা ফকীর বাবুর খোদাতালার সামনে সজদা (ভূমিষ্ঠ প্রণাম) নিয়ে যেন অন্তরের শেষ কামনা জানাচ্ছেন। কি সে কামনা ?

ইংরেজ-ধর্ষিত ভারতের জন্য মুক্তি-মোক্ষ-নজাত কামনা করছেন।

শিবাজী-উৎসবে গুরুদেব গেয়েছিলেন,

'মৃত্যু-সিংহাসনে আজি বসিয়াছ অমর মূরতি
সমুন্নত ভালে
যে রাজ কীরিট শোভে তার দিব্যজ্যোতি লুকাবে না
কভু কোনো কালে।
তোমারে চিনেছি আজি হে রাজন, চিনেছি চিনেছি
তুমি মহারাজ
তব রাজকর লয়ে আট কোটি বঙ্গের নন্দন
দাঁড়াইবে আজ ॥'

প্রথম সেটি আবৃত্তি করলুম ; তারপর কুরান শরীফের আয়াত পড়ে, পরলোকগত আত্মার সদ্গতির জন্য মোনাজাত করে পাহাড় থেকে নেমে 'বাবুর-শাহ' গ্রামে এলুম।

শুনেছি মানস-সরোবর যাবার পথে নাকি তীর্থযাত্রীরা অসহ্য কষ্ট সত্ত্বেও মরে না,—মরে ফেরার পথে—শীত, বরফ, পাহাড়ের চড়াই ওৎরাই সহ্য হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও। তখন নাকি তাদের সম্মুখে আর কোনো কাম্যবস্তু থাকে না বলে সব মনের জোর একদম লোপ পেয়ে যায়। ফিরে তো যেতে হবে সেই আপন বাস-ভূমে, দৈনন্দিন দুঃখযন্ত্রণা, আশা-নিরাশার একটানা জীবনস্রোতে। এ-বিরাট অভিজ্ঞতার পর সে-পতন এতই ভয়াবহ বলে মনে হয় যে তখন সামান্যতম সঙ্কটের সামনে তীর্থযাত্রী ভেঙে পড়ে আর বরফের বিছানায় সেই যে শুয়ে পড়ে তার থেকে আর কখনো ওঠে না।

আমার পা আর চলে না। কোমর ভেঙে পড়ছে। মাথা ঘুরছে।

শীতে হাত পায়ের আঙুলের ডগা জমে আসছে। কান আর নাক অনেকক্ষণ হল সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে গিয়েছে। জোরে হেঁটে যে গা গরম করব সে শক্তি আমার শরীরে আর নেই।

নির্জন রাস্তা। হঠাৎ মোড় ঘুরতেই সামনে দেখি উল্টো দিক থেকে আসছে গোটা আষ্টেক উর্দীপরা সেপাই। ভালো করে না তাকিয়েই বুঝতে পারলুম, এরা বাচ্চায়ে সকাওয়ের দলের ডাকাত—আমান উল্লার পলাতক সৈন্যদের ফেলে-দেওয়া উর্দী পরে নয়া শাহানশাহ বাদশার ভুঁইফোঁড় ফৌজের গণ্যমান্য সদস্য হয়েছেন। পিঠে চকচকে রাইফেল ঝোলানো, কোমরে বুলেটের বেল্ট আর চোখে মুখে যে ক্রূর, লোলুপ ভাব তার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি এমন চেহারা আমি জেলের বাইরে ভিতরে কোথাও দেখিনি। জীবনের বেশীর ভাগ এরা কাটিয়েছে লোকচক্ষুর অন্তরালে, হয় গোরস্তানে নয় পর্বতগুহার আধা-আলো-অন্ধকারে। পুঞ্জীভূত আশুষ্ক পুরীষস্তূপকে শূকর উল্টেপাল্টে দিলে যে বীভৎস দুর্গন্ধ বেরোয় রাষ্ট্রবিপ্লবের উৎক্ষিপ্ত এই দস্যুদল আমার সামনে সেই রূপ সেই গন্ধ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল।

ডাকাতগুলোর গায়ে ওভারকোট নেই। সেই লোভেতেই তো তারা আমাকে খুন করতে পারে। নির্জন রাস্তায় নিরীহ পথিককে খুন করে তার সব কিছু লুটে নেওয়া তো এদের কাছে কোনো নূতন পুণ্যসঞ্চয় নয়।

আমার পালাবার শক্তি নেই, পথও নেই। তার উপরে আমি গাঁয়ের ছেলে। বাঘ দেখলে পালাই, কিন্তু বুনো শূয়োরের সামনে থেকে পালাতে কেমন যেন ঘেন্না বোধ হয়। পালাই অবশ্য দুই অবস্থাতেই।

আমার থেকে ডাকাতরা যখন প্রায় দশ গজ দূরে তখন তাদের সর্দার হঠাৎ

হুকুম দিল 'দাঁড়া'! সঙ্গে সঙ্গে আটজন লোক ডেড্ হল্ট্ করলো। দলপতি বলল, 'নিশান কর্'। সঙ্গে সঙ্গে আটখানা রাইফেলের গোল ছ্যাঁদা আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালো।

ততক্ষণে আমিও থমকে দাঁড়িয়েছি কিন্তু তারপর কি হয়েছিল আমার আর ঠিক ঠিক মনে নেই।

আমার স্মরণশক্তির ফিল্ম পরে বিস্তর ডেভালাপ করেও তার থেকে এতটুকু আঁচড় বের করতে পারিনি। আমার চৈতন্যের শাটার তখন বিলকুল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে মনের সুপার ডবল এক্সও কোনো ছবি তুলতে পারেনি।

আটখানা রাইফেলের অন্ধকোটর আমার দিকে তাকিয়ে আর আমি ঠায় দাঁড়িয়ে, এ দৃশ্যটা আমি তারপর বারকয়েক স্বপ্নেও দেখেছি, কাজেই আজ আর হলপ করে বলতে পারব না কোন্ ঘটনা কোন্ চিন্তাটা সত্যি 'বাবুর শাহ' গ্রামের কাছে বাস্তবে ঘটেছিল আর কোন্টা স্বপ্নের কল্পনা মাত্র।

আবছা আবছা শুধু একটি কথা মনে পড়ছে, কিন্তু আবার বলছি হলপ করতে পারব না।

আমার ডান হাত ছিল ওভারকোটের পকেটে ও তাতে ছিল আবদুর রহমানের গুঁজে দেওয়া ছোট্ট পিস্তলটি। একবার বোধ করি লোভ হয়েছিল সেই পিস্তল বের করে অন্ততঃ এক ব্যাটা বদমাইশকে খুন করার। মনে হয়েছিল, মরব যখন নিশ্চয়ই তখন স্বর্গে যাবার পুণ্যটাও জীবনের শেষ মুহূর্তে সঞ্চয় করে নিই।

আজ আমার আর দুঃখের সীমা নেই, কেন সেদিন গুলি করলুম না।

'পাগলা' বাদশা মুহম্মদ তুগলুক তাঁর প্রজাদের ব্যবহারে, এবং প্রজারা তাঁর ব্যবহারে এতই তিতবিরক্ত হয়ে উঠেছিল যে তিনি যখন মারা গেলেন তখন তুগলুকের সহচর ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরনী বলেছিলেন, 'মৃত্যুর ভিতর দিয়ে বাদশা তাঁর প্রজাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেন, প্রজারা বাদশার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল।'

সেদিন পুণ্যসঞ্চয়ের লোভে যদি গুলি চালাতুম তা হলে সংসারের পাঁচজন আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতেন, আমিও তাঁদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতুম।

হঠাৎ শুনি অট্টহাস্য। 'তরসীদ', 'তরসীদ', সবাই চেঁচিয়ে বলছে, 'তরসীদ'— অর্থাৎ 'ভয় পেয়েছে, ভয় পেয়েছে, লোকটা ভয় পেয়েছে রে।' আর সঙ্গে সঙ্গে সবাই হেসে কুটিকুটি। কেউ মোটা গলায় থক্ থক্ করে কেউ বন্দুকটা বগলদাবায়

চেপে খ্যাক খ্যাক করে, কেউ ড্রইংরুমবিহারিণীদের মত দু'হাত তুলে কলরব করে, আর দু-একজন আমার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে মিটমিটিয়ে।

একজন হেঁড়ে গলায় বলল, 'এই মুরগীটাকে মারার জন্য আটটা বুলেটের বাজে খর্চা! ইয়া আল্লা!'

আমার দৈর্ঘ্য প্রস্থের বর্ণনা দেব না, কারণ গড়পরতা বাঙালীকে 'মুরগী' বলার হক্ এদের আছে।

'মুরগী' হই আর মোরগই হই, আমি কসাইয়ের হাত থেকে খালাস পাওয়া মুরগীর মত পালাতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু পেটের ভিতর কি রকম একটা অদ্ভুত ব্যথা আরম্ভ হয়ে যাওয়াতে অতি আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে চলতে আরম্ভ করলুম।

আফগান রসিকতা হাস্যরস না রুদ্ররসের পর্যায়ে পড়ে সে বিচার আলঙ্কারিকেরা করবেন। আমার মনে হয় রসটা বীভৎসতাপ্রধান বলে 'মহামাংসে'র ওজনে এটাকে 'মহারস' বলা যেতে পারে।

কিন্তু এই আমার শেষ পরীক্ষা নয়।

বাড়ী থেকে ফার্লংখানেক দূরে আরেকদল ডাকাতের সঙ্গে দেখা; কিন্তু এদের সঙ্গে নূতন ঝকমকে য়ুনিফর্ম-পরা একটি ছোকরা অফিসার ছিল বলে বিশেষ দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত হলুম না। দলটা যখন কাছে এসেছে, তখন অফিসারের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে যেন চেনা-চেনা বলে মনে হল। আরে! এ তো দুদিন আগেও আমার ছাত্র ছিল। আর পড়াশোনায় এতই ডডনং এবং আকাটমূর্খ ছিল যে, তাকেই আমি আমার মাস্টারি জীবনে বকাঝকা করেছি সবচেয়ে বেশী।

সেই কথাটা মনে হতেই আমি আবার আটটা রাইফেলের চোঙা চোখের সামনে দেখতে পেলুম। ডাইনে গলি ছিল; বেয়াড়া ঘুড়ির মত গোত্তা খেয়ে সেদিকে ঢুঁ দিলুম। ছেলেটা যদি দাদ তোলার তাতে থাকে, তবে অক্কা না হোক কপালে বেইজ্জতি তো নিশ্চয়ই। হে মুরশিদ, কি কুক্ষণেই না এই দুশমনের পুরীতে এসেছিলুম। হে মৌলা আলী মেহেরবান, আমি জোড়া বকরী—।

পিছনে শুনি মিলিটারি বুটের ছুটে আসার শব্দ। তবেই হয়েছে। মুরশিদ, মৌলা সকলেই আমাকে ত্যাগ করেছেন। ইংরিজী প্রবাদেরই তবে আশ্রয় নিই—'ইভ্‌ন দি ওয়ার্ম টার্নস।' ঘুরে দাঁড়ালুম। ছেলেটা চেঁচাচ্ছে, 'মুআল্লিম সায়েব, মুআল্লিম সায়েব।' কাছে এসে আবদুর রহমানী কায়দায় সে আমার হাত-দু'খানা তুলে ধরে বার বার চুমো খেল, কুশল জিজ্ঞেস করল এবং শেষটায় বেমক্কা ঘোরাঘুরির জন্য মুরুব্বির মত ঈষৎ তম্বীও করল। আমি 'হেঁ হেঁ, বিলক্ষণ, বিলক্ষণ,

তা আর বলতে, অল্‌হম্‌দুলিল্লা, অল্‌হম্‌দুলিল্লা, তওবা তওবা' বলে গেলুম—কখনো তাগ-মাফিক ঠিক জায়গায়, কখনো ভয়ের ধকল কাটাতে গিয়ে উল্টো-পাল্টা।

ফাঁড়া কেটে যাওয়ায় আমারও সাহস বেড়ে গিয়েছে। জিজ্ঞেস করলুম, 'এ বেশ কোথায় পেলে, বৎস ?'

বাবুর-শাহ পাহাড়ের মত বুক উঁচু করে বৎস বলল, 'কর্নাইল শুদ্‌ম' অর্থাৎ আমি কর্নেল হয়ে গিয়েছি।

ইয়া আল্লা! উনিশ বছর বয়সে রাতারাতি কর্নেল। আমাদের সুরেশ বিশ্বাসও—চেনার মধ্যে তো উনিই আমাদের নীলমণি—তো এত বড় কসরৎ দেখাতে পারেননি। আমার লোভ বেড়ে গেল। শুধালুম, 'জেনরাইল হবার দিল্লী কতদূর ?'

গম্ভীরভাবে বলল, 'দূর নীস্ত্‌।'

খুদাতালা মেহেরবান, বিপ্লবটা বড়ই পয়মন্ত।

কর্নেল সাহেব বুঝিয়ে বললেন, 'আমীর হবীব উল্লা খান আমার পিসির দেবরের মামাশ্বশুর।'

সম্পর্কটা ঠিক কি বলেছিল, আমার মনে নেই, তবে এর চেয়ে ঘনিষ্ঠতার নয়। আমি অত্যন্ত গর্ব বোধ করলুম ; ধন্য আমার মাস্টারি, ধন্য আমার শিষ্য, ধন্য এ বিপ্লব, ধন্য এ উপবাস। আমার শিষ্য রাতারাতি কর্নেল হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথও ঠিক এই অবস্থায়ই গেয়েছিলেন—

'এতদিনে জানলেম, যে কাঁদনে কাঁদলেম
সে কাহার জন্য
ধন্য এ-জাগরণ, ধন্য এ-ক্রন্দন, ধন্য রে ধন্য !'

স্থির করলুম, ফুরসৎ পাওয়া মাত্রই 'প্রবাসী'তে 'বঙ্গের বাহিরে বাঙালী' পর্যায়ে আমার কীর্তির খবরটা পাঠাতে হবে। এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজের বাঙালী দারোয়ান মারা গেলে যখন সাড়ম্বর খবর বেরতে পারে, তখন আমার এ-কীর্তি উড়ে বলে কি বামুন নয় ? পরের বাড়ী জ্বলছে সত্যি, তাই বলে সে আগুনে আমি সিগারেট ধরাবো না ? আব্বার ?

বললুম, 'তাহলে বৎস, যদি অনুমতি দাও তবে বাড়ী যাই।'

মিলিটারি কণ্ঠে বলল, 'আপনাকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিচ্ছি। রাস্তায় অনেক ভাকু।' বলে অজানায় সে আপন সঙ্গীদের দিকেই তাকালো। তাই সই। দান

উল্টে গিয়েছে। এখন তুমি গুরু, আমি শিষ্য।

আমাকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আমার বসবার ঘরে কর্নেল দু'দণ্ড রসালাপ করলেন, আমান উল্লাকে শাপমন্যি দিলেন ও মৌলানাকে মিলিটারি স্ট্র্যাটেজি সম্বন্ধে তালিম দিলেন।

আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাবার সময় কর্নেল আবদুর রহমানের খাস কামরায় ঢুকল। কাবুলে ছাত্রেরা গুরুগৃহে ভৃত্যের সঙ্গে ধূমপান করে। কিন্তু আবদুর রহমান তো বিপদে পড়ল, বহুকাল থেকে তার তামাক বাড়ন্ত। লোকটা আবার ধাপ্পা দিতে জানে না,—আমার সঙ্গে এতদিন থেকেও। কিন্তু তাতে আশ্চর্য হবারই বা কি? বনমালীও গুরুদেবের সঙ্গে বাস করে কবিতা লিখতে শেখেনি।

মৌলানা বললেন, 'সমস্ত সকাল কাটালুম ব্রিটিশ লিগেশন আর বাচ্চার পররাষ্ট্র দফতরে। কান্নাকাটিও কম করিনি। দাড়িতে হাত রেখে শপথ করে বললুম, 'দু'মাস হল শুকনো রুটি ছাড়া আর কিছু পেটে পড়েনি। আসছে পরশু থেকে সে-রুটিও আর জুটবে না।' ব্রিটিশ লিগেশনে বললুম, 'কাবুলের পিঁজরা থেকে মুক্তি দাও। 'পররাষ্ট্র দফতরে বললুম, দু'মুঠো অন্ন দাও'।'

আমি বললুম, 'পররাষ্ট্র দফতর আর মুদির দোকান এক প্রতিষ্ঠান নাকি? তোমার উচিত ছিল বলা—

'মুরগে সইয়াদ তু অম্ ইফতাদে অম্ দর দামে ইশ্‌ক্।
ইয়া ব্ কুশ্, ইয়া দানা দেহ্ ইয়া অজ কফস আজাদ কুন॥'

'পাখির মতন বাঁধা পড়ে গেছি কঠিন প্রেমের ফাঁদ।
হয় মেরে ফেলো, নয় দানা দাও, নয় খোলো এই বাঁধ॥'

তুমি তো মাত্র দুটো পন্থা বাৎলালে, হয় দানা দাও, নয় খোলো বাঁধ। তৃতীয়টা বললে না কেন? নয় মেরে ফেলো। আপ্তবাক্যের বিকলাঙ্গ উদ্ধৃতি গোবধের ন্যায় মহাপাপ।'

মৌলানা বললেন, 'তাই সই। শিক-কাবাব করে খাবো।'

শীতে ধুঁকছি, যেন কম্প দিয়ে ম্যালেরিয়া জ্বর। মাঝে মাঝে তন্দ্রা লাগছে। কখনো মনে হয় খাট থেকে পড়ে যাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে পা দুটো ঝাঁকুনি দিয়ে হঠাৎ মটান লম্বা হয়ে যায়। কখনো চিৎকার করে উঠি, 'আবদুর রহমান,

আবদুর রহমান।' কেউ আসে না। কখনো দেখি আবদুর রহমান খাটের বাজুতে হাত দিয়ে মাথা নিচু করে বসে ; কিন্তু কই, তাকে তো ডাকিনি। শুনি, যে দু'-চারটে সামান্য মন্ত্র সে জানে তাই বিড় বিড় করে পড়ছে।

তার সঙ্গে দুঃস্বপ্ন ; অ্যারোপ্লেনে বসে আছি, বাচ্চার ডাকাতদল আটটা রাইফেল বাগিয়ে ছুটে আসছে, অ্যারোপ্লেন থামাবার জন্য, এঞ্জিন স্টার্ট নিচ্ছে না। একসঙ্গে আটটা রাইফেলের শব্দ। ঘুম ভেঙে যায়। শুনি সত্যিকার রাইফেলের আওয়াজ আর চিৎকার। পাড়ায় ডাকু পড়েছে।

আর দেখি মা ইলিশ মাছ ভাজছেন।

মাগো।

অন্ধকার হয়ে আসছে। আবদুর রহমান সাঁঝের পিদিম দেখাচ্ছে না কেন ? ওঃ, ভুলেই গিয়েছিলুম, কেরোসিন ফুরিয়ে গিয়েছে। আর কী-ই বা হবে তেল দিয়ে, জীবনপ্রদীপ যখন—। চুলোয় যাক্‌গে কবিত্ব।

কিন্তু সামনে এ কি ? প্রকাণ্ড এক ঝুড়ি। তার ভিতরে আটা, রওগন, মটন, আলু, পেঁয়াজ, মুর্গী আরো কত কি ? তার সামনে বসে ভুঁইফোঁড় কর্নেল ; মিটমিটিয়ে হাসছে। ভারী বেয়াদব। আবার আবদুর রহমানের মুখ এত পাঙাশ কেন ? আমার ঘুম ভাঙছে না দেখে ভয় পেয়েছে ? নাঃ, এ তো ঘুম নয়, স্বপ্নও নয়।

আবদুর রহমান বলল, 'হুজুর, কর্নাইল সায়েব সওগাত এনেছেন।'

একদিনে মানুষ কত উত্তেজনা সইতে পারে ?

আবদুর রহমান আবার তাড়াতাড়ি বলল, 'হুজুর আমাকে দোষ দেবেন না ; আমি কিছু বলিনি।'

কর্নেল বলল, 'হুজুর যে কত কষ্ট পেয়েছেন তা আপনার চেহারা থেকেই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সবই খুদাতালার মরজি। এখন খুদাতালার মরজিতেই আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। আপনি যে আমাকে কত স্নেহ করতেন, সে-কথা কি আমি ভুলে গিয়েছি ?'

আমি বললুম, 'সে কি কথা। তোমাকেই তো আমি সবচেয়ে বেশী বকেছি।'

কর্নেল ভারী খুশী। 'হাঁ, হাঁ, হুজুর সেই কথাই তো হচ্ছে। আপনারও তা হলে মনে আছে। আমাকে সবচেয়ে বেশী স্নেহ না করলে সবচেয়ে বেশী বকলেন কেন ?' তারপর মৌলানার দিকে তাকিয়ে খুশীতে গদগদ হয়ে বলল, 'জানেন

সায়েব, একদিন মুআল্লিম সায়েব আমার উপর এমনি চটে গেলেন যে, আমাকে বললেন একটা বেত নিয়ে আসতে। ক্লাসের সবাই তাজ্জব হয়ে গেল। আমাদের দেশের মাস্টার বেত আনায় কাপ্তেনকে দিয়ে, না হয় দুষ্ট ছেলের দুশমনকে দিয়ে। সে তখন বেছে বেছে তেজ বেত নিয়ে আসে। আমি তখন কি করলুম জানেন? ভাবলুম, মুআল্লিম সায়েব যখন আর কাউকে কখনো চাবুক মারেননি, তখন তাঁর বউনিতে ফাঁকি দিলে আমার অমঙ্গল হবে। নিয়ে এলুম একখানা পয়লা নম্বরের বেত।' তারপর কর্নেল মৌলানার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে বলল, 'মুআল্লিম সায়েব তখন কি করলেন, জানেন? বেতখানা হাতে নিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বেতের কাঁটাগুলো কেটে ফেলিস নি কেন?' ছেলেরা সবাই বলল, 'তাহলে লাগবে কি করে?'

মৌলানা বললেন, 'সেদিন মার খেয়েছিলে বলেই তো আজ কর্নেল হয়েছ।'

কর্নেল আপশোষ করে বলল, 'না, মুআল্লিম সায়েব মারেননি। আমি তো তৈরী ছিলুম। আমার হাতে বেত লাগে না।' বলে তার হাত দু'খানা মৌলানার সামনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাল।

চাষার ছেলে হাত। অল্পবয়স থেকে কুহিস্তানের (কুহপর্বত) শক্ত জমিতে হাল ধরে ধরে দু'খানা হাতে কড়া পড়ে গিয়ে চেহারা হয়েছে মোষের কাঁধের মত। নখে চামড়ায় কোনো তফাৎ নেই, আর হাতের রেখা দেখে জ্যোতিষ শাস্ত্রে আমার ভক্তি বেড়ে গেল। লাঙলের ঘষায় হাতে অবশিষ্ট রয়েছে কুল্লে দেড়খানা রেখা। আয়ুরেখা তেলোর ইস্‌পার উস্‌পার, হেডলাইন নেই, আর হার্ট লাইন তেলোর মধ্যিখানে এসে আচম্বিতে 'মরুপথে হারালো ধারা।' ব্যস্। এই দেড়খানা লাইন নিয়ে সে সংসার চালাচ্ছে,—জুপিটার, ভিনাস, সলমনের মাউন্ট, রেখা কোনো কিচ্ছুর বালাই নেই। আর আঙুলগুলো এমনি কুষ্ঠরোগীর মত এবড়ো-খেবড়ো যে, হাতের আকার জ্যোতিষ-শাস্ত্রের কোনো পর্যায়েই পড়ে না। না পড়ারই কথা, কারণ ডাকাত-গুষ্ঠীর ছেলে কর্নেল হয়েছে সবসুদ্ধ ক'টা, আর তাদের সংস্পর্শে এসেছেন ক'জন বরাহমিহির ক'জন কেইরো?

আবদুর রহমান ঝুড়ির সামনে মাথা নিচু করে বসে আছে।

মৌলানা কর্নেলকে ধন্যবাদ দিয়ে আবদুর রহমানকে ঝুড়ি রান্নাঘরে নিয়ে যেতে বললেন। সে ঝুড়ি নিয়ে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু ঘর থেকে বেরল না। আমি নিরুপায় হয়ে কর্নেলকে বললুম, 'রাত্রে এখানেই খেয়ে যাও।'

আবদুর রহমান তৎক্ষণাৎ রান্নাঘরে চলে গেল।

কর্নেল বলল, 'আমাকে মাফ করতে হবে হুজুর। বাদশার সঙ্গে আমার রাত্রে খানা খাওয়ার হুকুম।'

মৌলানা শুধালেন, 'বাদশা কি খান?'

কর্নেল বললেন, 'সেই রুটি পনির আর কিসমিস। ক্বচিৎ কখনো দু'মুঠো পোলাও। বলেন, 'যে-খানা খেয়ে আমান উল্লা কাপুরুষের মত পালাল, আমি সে-খানা খেয়ে কাপুরুষ হয়ে যাব না?' তারপর দুষ্টুহাসি হেসে বলল, 'আমি ওসব কথায় কান দিই না। আমান উল্লার বাবুর্চিই এখনো রাজবাড়ীতে রাঁধে। আমি তাই পেট ভরে খাই।'

কর্নেল যাবার সময় বলে গেল, আমি যেন আহারাদি সম্বন্ধে আর দুশ্চিন্তা না করি।

দশ মিনিটের ভিতর আবদুর রহমান কর্নেলের আনা কাঠ দিয়ে আগুন জেলে দিল।

আমি সে-আগুনের সামনে বসে সর্বাঙ্গে, মাংসে, রক্তে, হাড়ে, মজ্জায়, স্নায়ুতে স্নায়ুতে যে সঞ্জীবনী বহ্নির অভিযান অনুভব করলুম, তার তুলনা বা বর্ণনা দিতে পারি এমনতরো শারীরিক অভিজ্ঞতা বা আলঙ্কারিক ক্ষমতা আমার নেই। রোদে-ফাটা জমি যে রকম সেচের জল ফাটলে ফাটলে ছিদ্রে ছিদ্রে, কণায়-কণায় শুষে নেয়, আমার শরীরের অণু-পরমাণু যেন ঠিক তেমনি আগুনের গরম শুষে নিল। আমার মনে হল, ভগীরথ যে রকম জহ্নুধারা নিয়ে সগররাজের সহস্র সন্তানের প্রাণদান করার বিজয় অভিযানে বেরিয়েছিলেন স্বয়ং ধন্বন্তরি ঠিক সেইরকম সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে বহ্নিধারা সঙ্গে নিয়ে আমার অঙ্গে প্রবেশ করলেন।

মুদ্রিত নয়নে শিহরণে শিহরণে অনুভব করলুম প্রতি ভস্মকণায় জহ্নুকণার স্পর্শ, আমার শিশির-বিদ্ধ অচেতন অণুতে অণুতে কৃশাণুর দীপ্ত স্পর্শের প্রাণপ্রতিষ্ঠার অভিষেক।

সমস্ত দেহমন দিয়ে বুঝলুম আর্য ঐতিহ্য, ভারতীয় সভ্যতা, সনাতনধর্মের প্রথম শব্দব্রহ্ম ঋগ্বেদের প্রথম পদে কেন

'আগ্নিমীড়ে পুরোহিতম'

রূপে প্রকাশিত হয়েছেন।

এবং সেমিতি ধর্মজগতেও তো তাই। ইহুদী, খ্রীষ্ট, ইসলাম তিন ধর্মই সম্মিলিত কণ্ঠে স্বীকার করে, একমাত্র মানুষ যিনি পরমেশ্বরের সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি মুসা (মোজেস) এবং তখন পরমেশ্বর তাঁর প্রকাশের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন রুদ্ররূপে

বা 'তজল্লিতে'। মুসা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, যখন জ্ঞান ফিরে পেলেন, তখন দেখলেন তাঁর সামনের সব কিছু ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে।

গ্রীক দেবতা প্রমিথিয়ুস ও দেবরাজ জুপিটারে কলহ হয়েছিল অগ্নি নিয়ে। মানব-সভ্যতা আরম্ভ হয় প্রমিথিয়ুসের কাছ থেকে পাওয়া সেই অগ্নি দিয়ে। নলরাজ ইন্ধন প্রজ্বালনে সুচতুর ছিলেন বলেই কি তিনি দেবতাদের ঈর্ষাভাজন হলেন? 'নল' শব্দের অর্থ 'চোঙা', প্রমিথিয়ুসও আগুন চুরি করেছিলেন চোঙার ভিতরে করে।

ভারতীয় আর্য, গ্রীক আর্য দুই গোষ্ঠী, এবং তৃতীয় গোষ্ঠী ইরানী আর্য জরথুস্ত্রী —সকলেই অগ্নিকে সম্মান করেছেন। হয়ত এঁরা সকলেই এককালে শীতের দেশে ছিলেন এবং অগ্নির মূল্য এঁরা জানতেন, কিন্তু সেমিতি ভূমি উষ্ণপ্রধান, সেখানে অগ্নিমাহাত্ম্য কেন? তবে কি মরুভূমির মানুষ সূর্যের একচ্ছত্রাধিপত্য সম্বন্ধে এতই সচেতন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একচ্ছত্রাধিপতির রুদ্ররূপ বা 'তজল্লিতে' অগ্নিরই আভাস পায়?

আগুনের পরশমণির ছোঁয়া লেগে শরীর ক্ষণে ক্ষণে শিহরিত হচ্ছে আর ওদিকে মগজে হুশ হুশ করে থিয়োরির পর থিয়োরি গড়ে উঠছে; নিজের পাণ্ডিত্যের প্রতি এতই গভীর শ্রদ্ধা হল যে, 'সাধু, সাধু' বলে নিজের পিঠ নিজেই চাপড়াতে গিয়ে হাতটা মচকে গেল। এমন সময় হঠাৎ মনে পড়ে গেল, শয়তান, ডেভিল, বিয়ালজিবাব, লুসিফার সবাই আগুনের তৈরী; তাঁরা আগুনের রাজা। নরকের আবহাওয়া আগুন দিয়ে ঠাসা, এঁদের শরীর আগুনে গড়া না হলে এঁরা সেখানে থাকবেন কি প্রকারে?

হায়, হায়, আমার বহু মূল্যবান থিয়োরিখানা শয়তানের পাল্লায় পড়ে নরকের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল!

কোথায় লাগে নরগিস্, রজনীগন্ধাকে বাখানিয়া কবিতা লেখে কোন্ মূর্খ! বিরয়ানি—কোর্মা—কাবাব—মুসল্লম থেকে যে খুশবাই বেরোয় তার কাছে সব ফুল হার তো মানেই, প্রিয়ার চিকুরসুবাসও তার কাছে নস্যি।

চোখ মেলে দেখি, আবদুর রহমান বেনকুয়েট সাজিয়েছে। মৌলানা ফশরঙ্গালালি করছেন আর আমার বেরাল দুটো এক মাস অজ্ঞাতবাস করে ফের খানা-কামরায় এসে উন্নাসিক হয়ে মাইভিয়ার মাইভিয়ার আওয়াজ বের করেছে।

আবদুর রহমান আমাদের পরিচয়ের পয়লা রাত্তিরে যে ডিনার ছেড়েছিল এ ডিনার সে মালেরই সিল্কে বাঁধানো, প্রিয়জনের উপহারোপযোগী, পুজোর বাজারের রাজ-সংস্করণ। জানটা তর হয়ে গেল। মৌলানা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন,

'জিন্দাবাদ গাজী আবদুর রহমান খান!'

আমি গলা এক পর্দা চড়িয়ে দোস্ত-মুহম্মদী কায়দায় বললুম,

'কমরৎ ব্ শিকনদ, খুদা তোরা কোর সাজদ্, ব্ পুন্দী, ব্ তরকী' (তোর কোমর ভেঙে দু' টুকরো হোক, খুদা তোর দু' চোখ কানা করে দিন, তুই ফুলে উঠে ঢাকের মত হয়ে যা, তারপর টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে যা)।'

মৌলানা বজ্রাহত। গুণী লোক, এসব কটু-কাটব্যের সন্ধান তিনি পাবেন কি করে? কিন্তু বালাই দূর করবার এই জনপদ-পন্থা আবদুর রহমান বিলক্ষণ জানে।* অদৃশ্য সাবানে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'হাত ধুয়ে নিন সায়েব, গরম জল আছে।'

কি বললে? গরম জল! আ-হা-হা। কতদিন বাদে গরম জলের সুখস্পর্শ পাব! কোথায় লাগে তার কাছে নববর্ষণে স্তনান্ধয়া বসন্তসেনার জলাভিষেক, কোথায় লাগে তার কাছে মুগ্ধ চারুদত্তের বিহ্বল প্রশস্তি। বললুম, 'বরাদর আবদুর রহমান, এই গরম জল দিয়ে তুমি যেন তোমার ডিনারখানা সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে দিলে।'

আবদুর রহমানের খুশির অন্ত নেই। আমার কোনো কথার উত্তর দেয় না, আর বেশী প্রশংসা করলে শুধু বলে, 'আলহামদুলিল্লা' অর্থাৎ 'খুদাতালাকে ধন্যবাদ'। যতক্ষণ এটা ওটা গুছোচ্ছিল আমার বার বার নজর পড়ছিল তার হাত দু'খানা কি রকম শুকিয়ে গিয়েছে, আর বাসন-বর্তন নাড়াচাড়া করার সময় অল্প অল্প কাঁপছে।

মৌলানা আমাকে সাবধান করে দিলেন, প্রতি গ্রাস যেন বত্রিশবার চিবিয়ে খাই। কাজের বেলা দেখা গেল, ডাকগাড়ী থেকে নেমে গোরারা যে-রকম রিফ্রেশমেণ্টরুমে খানা খায় আমরা সেই তালেই খাচ্ছি। পেটের এক কোণ ভর্তি হতেই আমি আবদুর রহমানকে লক্ষ্য করে বললুম, 'এরকম রান্না পেলে আমি আরো কিছুদিন কাবুলে থাকতে রাজী আছি।' সে-দুর্দিনে এর চেয়ে বড় প্রশংসা আর কি করা যায়!

---

* ঊনবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কিন্তু মৌলানা প্রোষিত-ভার্যা। পেট খানিকটা ভরে যাওয়ায় তাঁর বিরহ-যন্ত্রণাটা যেন মাথা খাড়া করে দাঁড়াল। বললেন, 'না,

সন্‌গে ওতন্ অজ্ তখতে সুলেমান বেশতর,
খারে ওতন্ অজ্ গুলে রেহান বেহতর,
ইউসুফ কি দর মিস্‌র্ পাদশাহী মীকরদ
মীগুফ্‌ৎ 'গদা বুদনে কিনান খুশতর।'

দেশের পাথর সুলেমান শার
তখতের চেয়ে সেরা
বিদেশের ফুল হার মেনে যায়
দিশী কাঁটা প্রাণ কাড়া।
মিশর দেশের সিংহাসনেতে
বসিয়া ইসুফ রাজা
কহিত, 'হায়রে এর চেয়ে ভালো
কিনানে ভিখারী সাজা।'

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম,

'ইউসুফে গুম্ গশ্‌তে বাজ্ আয়দ ব্ কনান,
গম্ ম্ খুর্।
কুলবয়ে ইহজান্ শওদ রুজি গুলিস্তান,
গম্ ম্ খুর্॥

দুঃখ করো না হারানো ইসুফ
কিনানে আবার আসিবে ফিরে।
দলিত শুষ্ক এ মরু পুনঃ
হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।' (কাজী নজরুল ইসলাম)

কিন্তু বয়েত-বাজী বা কবির লড়াই বেশীক্ষণ চলল না। সাঁতারের সময় পয়লা দম ফুরিয়ে যাবার খানিকক্ষণ পরে মানুষ যে রকম দুসরা দম পায়, আমরা ঠিক সেই রকম খানিকক্ষণ ক্ষান্ত দিয়ে আবার মাথায় গামছা বেঁধে খেতে লেগেছি।

এদিকে দেখি সব কিছু ফুরিয়ে আসছে—প্রথম পরিবেষণে কম মেকদারে দেওয়ার তালিম আবদুর রহমান আমার কাছ থেকেই পেয়েছে—কিন্তু আর কিছু আনছে না। থাকতে না পেরে বললুম, 'আরো নিয়ে এস।'

আবদুর রহমান চুপ। আমি বললুম, 'আরো নিয়ে এস।' তখন বলে কি না সব কিছু ফুরিয়ে গিয়েছে। মৌলানা আর আমি তখন যেন রক্তের স্বাদ পেয়ে হন্যে হয়ে উঠেছি। আমি ভয়ঙ্কর চটে গিয়ে বললুম, 'তোমার উপযুক্ত শিক্ষা হওয়ার প্রয়োজন। যাও তোমার নিজের জন্য যা রেখেছ তাই নিয়ে এস।' আবদুর রহমান যায় না। শেষটায় বললে, সে সব কিছুই পরিবেষণ করে দিয়েছে, নিজে রুটি পনির খাবে।

আমি তার কঞ্জুসি দেখে ক্ষিপ্ত-প্রায়। উন্মাদ, মূর্খ, হস্তী হেন শব্দ নেই যা আমি গালাগালে ব্যবহার করিনি। মৌলানা শান্ত প্রকৃতির লোক, কড়া কথা মুখ দিয়ে বেরোয় না। তিনি পর্যন্ত আপন বিরক্তি সুস্পষ্ট ফার্সী ভাষায় জানিয়ে দিলেন। আবদুর রহমান চুপ করে সব কিছু শুনল। হাসল না সত্যি—কিন্তু কই, মুখখানা একটু মলিনও হল না। আমি আরো চটে গিয়ে বললুম 'তোমাকে চাকর রাখার ঝকমারিটা বোঝাবার এই কি মোকা? এর চেয়ে তো শুকনো রুটি আর নুনই ভালো ছিল।' কথা যতই বলছি চটে যাচ্ছি ততই বেশী। শেষটায় বললুম, 'আমি মরে গেলে আচ্ছা করে খানা রেঁধে—আর প্রচুর পরিমাণে, বুঝলে তো?—মসজিদে নিয়ে গিয়ে আমার ফাতেহা বিলিয়ো।' অর্থাৎ আমার পিণ্ডি চটকিয়ো।

তখন মৌলানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দু'লহমা সবুর করুন, পেট আপনার থেকেই ভরে যাবে।'

মৌলানা পর্যন্ত রেগে টং। পুরুষ্টু পাঁঠার মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে পাদ্রী সাহেবরা গাঁয়ে ঢুকে ক্ষুধাতুর চাষাকে এই রকম উপদেশ দেয় বটে। 'স্বর্গরাজ্য ফর্গরাজ্য' কি সব বলে। কিন্তু আবদুর রহমান খালি পেটে উপদেশটা দিয়েছে বলে মৌলানা দাড়িতে হাত রেখে অভিসম্পাত দিতে দিতে থেমে গেলেন। আমি বললুম, 'বিদ্রোহে কতলোক গুলি খেয়ে মরল, তোমার জন্য—'

ততক্ষণে আবদুর রহমান বেরিয়ে গিয়েছে। একেই বলে কৃতজ্ঞতা। যে আবদুর রহমানকে পাঁচ মিনিট আগে সুলেমানের তখ্‌তে বসাবার জন্য লাজারুসে সিংহাসন অর্ডার দেব দেব করছিলুম সেই আবদুর রহমানকে তখন জাহান্নামে পাঠাবার জন্য টিকিট কাটবার বন্দোবস্ত করছি।

আবদুর রহমান নিশ্চয়ই ফলিত জ্যোতিষ জানে। দু' মিনিটের ভিতর ক্ষুধা গেল। পাঁচ মিনিট পরে পেটের ভিতর মহারাণীর রাজত্ব—বিলকুল ঠাণ্ডা। কিন্তু তারপর আরম্ভ হল বিপ্লব। সে কি অসম্ভব হাঁচড় পাঁচড় আর আইঢাই। খাটে শুয়ে পড়েছি, অস্বস্তিতে এপাশ ওপাশ করছি আর গরমের চোটে কপাল দিয়ে ঘাম বেরচ্ছে। মৌলানারও একই অবস্থা। তিনিই প্রথম বললেন, 'বড্ড বেশী খাওয়া হয়ে গিয়েছে।'

প্রাণ যায় আর কি। আর বেশী খেলে দেখতে হত না। 'ও, আবদুর রহমান, এদিকে আয় বাবা।'

আবদুর রহমান এসে বলল, 'আমার কাছে সুলেমানী নুন আছে, তারই খানিকটা দেব?'

এরকম গুণীর চন্নামেত্যো খেতে হয়, এর হাতের হজমী ডাঙ্গস হয়ে আমার পেটের বিপ্লব নিশ্চয়ই কাবু করে নিয়ে আসবে। বললুম, 'তাই দে, বাবা।' কিন্তু গিলতে গিয়ে দেখি, শ্রাদ্ধভোজনের পর আমাদের ব্রাহ্মণের গুলি গিলতে গিয়ে যে-অবস্থা হয়েছিল আমারও তাই। শুনেছি অত্যধিক সংযম করে মুনি-ঋষিরা উর্ধ্ব-রেতা হন, আমি অত্যধিক ভোজন করে উর্ধ্ব-ভোজা হয়ে গিয়েছি।

নুন খেয়ে আরাম বোধ করলুম। আবদুর রহমানকে আশীর্বাদ করে বললুম, 'বাবা তুমি দারোগা হও।' ইচ্ছে করেই 'রাজা হও' বললুম না—কাবুলে রাজা হওয়ার কি সুখ সে তো চোখের সামনে স্পষ্ট দেখলুম।

উত্তেজনার শেষ নাই। আবদুর রহমানের পিছনে ঢুকল উর্দি পরা এক মূর্তি। ব্রিটিশ রাজদূতাবাসের পিয়ন। দেখেই মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। মৌলানাকে বললুম, 'তদারক করো তো ব্যাপারটা কি?'

একখানা চিরকুট। তার মর্ম আগামী কল্য দশটার সময় যে প্লেন ভারতবর্ষ যাবে তাতে মৌলানা ও আমার জন্য দুটি সীট আছে। আনন্দের আতিশয্যে মৌলানা সোফার উপর শুয়ে পড়লেন। আমাদের এমনই দুরবস্থা যে, পিয়নকে বখশিশ দেবার কড়ি আমাদের গাঁটে নেই।

'ফেবার' না 'রাইট' হিসেবে জায়গা পেলুম তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হল না। আবদুর রহমান ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে—চুপ করে চলে গেল। মৌলানার আনন্দ ধরে না। বিবি সম্বন্ধে তাঁর দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। বিয়ের অল্প কিছু-দিন পরেই তিনি তাঁকে কাবুল নিয়ে এসেছিলেন বলে নূতন বউ বাড়ির আর পাঁচ

জনের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পাননি। এখন অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তিনি কি করে দিন কাটাচ্ছেন সে কথা ভেবে ভেবে ভদ্রলোক দাড়ি পাকিয়ে ফেলেছিলেন।

আমিও কম খুশী হইনি। মা বাবা নিশ্চয়ই অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। বাবা আবার 'দি স্টেটসমেন' থেকে আরম্ভ করে 'প্রিন্টেড এণ্ড পাবলিশ্‌ড্‌ বাই' পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাগজ পড়েন। অ্যারোপ্লেনে করে ব্রিটিশ লিগেশনের জন্য ভারতীয় খবরের কাগজ আসত। তারই একখানা মৌলানা কি করে যোগাড় করেছিলেন এবং তাতে আফগান রাষ্ট্রবিপ্লব ও কাবুলের বর্ণনা পড়ে বুঝলুম খবরের কাগজের রিপোর্টারের কল্পনাশক্তি সত্যকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। গাছে আর মাছে বানানো গল্প, পেশাওয়ারে বোতলের পাশে বসে লেখা। এ বর্ণনাটি বাবা পড়লেই হয়েছে আর কি। আমার খবরের আশায় ডাকঘরে থানা গাড়বেন।

মৌলানা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। মানুষ যখন ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন দেখে তখন কথা কয় কম।

ওদিকে এখনো কান্না থামেনি। পাশের বাড়ির দরজা খুললে এখনো মাঝে মাঝে কান্নার শব্দ আসে। আবদুর রহমান বলেছে, কর্নেলের বুড়ী মা কিছুতেই শান্ত হতে পারছেন না। ঐ তাঁর একমাত্র ছেলে ছিলেন।

মায়ে মায়ে তফাৎ নেই। বীরের মা যে রকম ডুকরে কাঁদছে ঠিক সেই রকমই শুনেছি দেশে, চাষা মরলে।

ঘুমিয়ে পড়ব পড়ব এমন সময় দেখি খাটের বাজুতে হাত রেখে নিচে বসে আবদুর রহমান। জিজ্ঞেস করলুম, 'কি বাচ্চা?'

আবদুর রহমান বলল, 'আমাকে সঙ্গে করে আপনার দেশে নিয়ে চলুন।'

'পাগল নাকি? তুই কোথায় বিদেশ যাবি? তোর বাপ মা, বউ?' কোনো কথা শোনে না, কোনো যুক্তি মানে না। 'অ্যারোপ্লেনে তোকে নেবে কেন? আর তারা রাজী হলেও বাচ্চার কড়া হুকুম রয়েছে কোনো আফগান যেন দেশত্যাগ না করে। তোকে নিলে বাচ্চা ইংরেজের গলা কেটে ফেলবে না? ওরে পাগল, আজ কাবুলের অনেক লোক রাজী আছে প্লেনে একটা সীটের জন্য লক্ষ টাকা দিতে।'

নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। বলে, আমি রাজী হলে সে সকলের হাতে পায়ে ধরে এক কোণে একটু জায়গা করে নেবে।

কী মুশকিল। বললুম, 'তুই মৌলানাকে ডাক। তিনি তোকে সব কিছু বুঝিয়ে দেবেন।' আবদুর রহমান যায় না। শেষটায় বলল, 'উনি আমার কে?'

তারপর ফের অনুনয়বিনয় করে। তবে কি তার খেদমতে বড্ড বেশী ত্রুটি গলদ, না আমার বাপ মা তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে চটে যাবেন? আমার বিয়ের 'শাদিয়ানাতে' বন্দুক ছুঁড়বে কে?

আবদুর রহমান পানশির আর বরফ এই দুই বস্তু ছাড়া আর কোনো জিনিস গুছিয়ে বলতে পারে না। তার উপর সে আমার কাছ থেকে কোনো দিন কোনো জিনিস, কোনো অনুগ্রহ চায়নি। আজ চাইতে গিয়ে সে যেসব অনুনয়বিনয়, কাকুতিমিনতি করল সেগুলো গুছিয়ে বললে তো ঠিক ঠিক বলা হবে না। ওদিকে তার এক একটা কথা, এক একটা অভিমান আমার মনের উপর এমনি দাগ কেটে যাচ্ছিল যে, আমিও আর কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। আর বলবই বা কি ছাই। সমস্ত জিনিসটা এমনি অসম্ভব, এমনি অবিশ্বাস্য যে, তার বিরুদ্ধে আমি যুক্তি চালাবো কোথায়? ভূতকে কি পিস্তলের গুলি দিয়ে মারা যায়?

আমি দুঃখে বেদনায় ক্লান্ত হয়ে চুপ করে গেলে আবদুর রহমান ভাবে সে বুঝি আমাকে শায়েস্তা করে এনেছে। তখন দ্বিগুণ উৎসাহে আরও আবোল-তাবোল বকে। কথার খেই হারিয়ে ফেলে এক কথা পঞ্চাশ বার বলে। আমার মা বাপকে এমনি খেদমত করবে যে, তাঁরা তাকে গ্রহণ না করে থাকতে পারবেন না। আমি যদি তখন বলতুম যে, আমার মা গরিব কাবলীওলাকেও দোর থেকে ফেরান না, তা হলে আর রক্ষে ছিল না।

আমারই বরাত। কি কুক্ষণে তাকে একদিন গুরুদেবের 'কাবুলীওয়ালা' গল্পটা ফার্সীতে তর্জমা করে শুনিয়েছিলুম, সে আজ সেই গল্প থেকে নজির তুলতে আরম্ভ করল। মিনি যখন অচেনা কাবুলীওয়ালাকে ভালবাসতে পারল, তখন আমার ভাইপো ভাইঝিরাই তাকে ভালবাসবে না কেন?

'সব হবে, কিন্তু তুমি যাবে কি করে?'

'সে আমি দেখে নেব।'

ছোট্ট শিশু মায়ের কাছে যে রকম অসম্ভব জিনিস চায়। কোনো কথা শুনতে চায় না, কোনো ওজর আপত্তিতে কান দেয় না।

এত দীর্ঘকাল ধরে আবদুর রহমান আমার সঙ্গে কখনো কথা কাটাকাটি করেনি। আমি শেষটায় নিরুপায় হয়ে বললুম, 'তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার কি রকম কষ্ট হচ্ছে তুমি জানো, তুমি সেটা আর বাড়িয়ো না। তোমাকে আমার শেষ আদেশ, তুমি এখানে থাকবে এবং যে মুহূর্তে পানশির যাবার সুযোগ পাবে, সেই মুহূর্তেই বাড়ি চলে যাবে।'

আবদুর রহমান চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'তবে কি হুজুর আর কাবুল ফিরে আসবেন না?'

আমি কি উত্তর দিয়েছিলুম, সে কথা দয়া করে আর শুধাবেন না।

বিয়াল্লিশ

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মনে পড়ল, আবদুর রহমান। সঙ্গে সঙ্গে সে এসে ঘরে ঢুকল। রুটি, মমলেট, পনির, চা। অন্যদিন খাবার দিয়ে চলে যেত, আজ সামনে দাঁড়িয়ে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইল। কী মুশকিল।

মৌলানা এসে বললেন, 'চিরকুটে লেখা আছে, মাথাপিছু দশ পৌণ্ড লগেজ নিয়ে যেতে দেবে। কি রাখি, কি নিয়ে যাই?'

আমি বললুম, 'যা রেখে যাবে তা আর কোনোদিন ফিরে পাবে না। আমি আবদুর রহমানকে বলেছি পানশির চলে যেতে। বাড়ি পাহারা দেবার জন্য কেউ থাকবে না, কাজেই সব কিছু লুট হবে।'

'কারো বাড়িতে সব কিছু সমঝিয়ে দিয়ে গেলে হয় না?'

আমি বললুম, 'এ পরিস্থিতিটা একদিন হতে পারে জেনে আমি ভিতরে ভিতরে খবর নিয়েছিলুম। শুনলুম, যখন চতুর্দিকে লুট-তরাজের ভয়, তখন কাউকে মালের জিম্মাদারি নিতে অনুরোধ করা এ দেশের রেওয়াজ নয়। কারণ কেউ যদি জিম্মাদারি নিতে রাজীও হয়, তখন তার বাড়িতে ডবল মালের আশায় লুটের ডবল সম্ভাবনা। মালপত্র যখন সদর রাস্তা দিয়ে যাবে, তখন ডাকাতেরা বেশ করে চিনে নেবে মালগুলো কোন্ বাড়িতে গিয়ে উঠল।'

বলে তো দিলুম মৌলানাকে সব কিছু প্রাঞ্জল ভাষায় কিন্তু ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যখন চারিদিকে তাকালুম, তখন মনে যে প্রশ্ন উঠল তার কোনো উত্তর নেই। নিয়ে যাব কি, আর রেখে যাব কি?

ঐ তো আমার দু'ভলুম রাশান অভিধান। এরা এসেছে মস্কো থেকে ট্রেনে করে তাশকন্দ, সেখান থেকে মোটরে করে আমুদরিয়া, তারপর খেয়া পেরিয়ে, খচ্চরের পিঠে চেপে সমস্ত উত্তর আফগানিস্থান পিছনে ফেলে, হিন্দুকুশের চড়াই-ওতরাই ভেঙে এসে পৌঁচেছে কাবুল। ওজন পৌণ্ড ছয়েক হবে।

আমি সাহিত্য সৃষ্টি করি না, কাজেই পাণ্ডুলিপির বালাই নেই—মৌলানার

থেকে সেদিক দিয়ে আমার কপাল ভালো—কিন্তু শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের ক্লাসে বলাকা, গোরা, শেলি, কীটস সম্বন্ধে যে গাদা গাদা নোট নিয়েছিলুম এবং মূর্খের মত এখানে নিয়ে এসেছিলুম, বরফবর্ষণের দীর্ঘ অবসরে সেগুলোকে যদি কোনো কাজে লাগানো যায় সেই ভরসায়, তার কি হবে? ওজন তো কিছু কম নয়।

আর সব অভিধান, ব্যাকরণ, মিনুদির দেওয়া 'পূরবী', বিনোদের দেওয়া ছবি, বন্ধুবান্ধবের ফটোগ্রাফ, আর এক বন্ধুর জন্য কাবুলে কেনা দুখানা বোখারা কার্পেট? ওজন তিন লাশ।

কাপড়চোপড়? দেরেশি-পাগল কাবুলের লৌকিকতা রক্ষার জন্য স্মোকিঙ, টেল, মর্ণিংস্যুট (কাবুলের সরকারী ভাষায় 'বঁ জুর দেরেশি'!)। এগুলোর জন্য আমার সিকি পয়সার দরদ নেই কিন্তু যদি জর্মনী যাবার সুযোগ ঘটে, তবে আবার নূতন করে বানাবার পয়সা পাব কোথায়?

ভুলেই গিয়েছিলুম। এক জোড়া চীনা 'ভাজ'। পাতিনেবুর মত রং আর চোখ বন্ধ করে হাত বুলোলে মনে হয় যেন পাতিনেবুরই গায়ে হাত বুলোচ্ছি, একটু জোরে চাপ দিলে বুঝি নখ ভিতরে ঢুকে যাবে।

কত ছোটখাটো টুকিটাকি। পৃথিবীর আর কারো কাছে এদের কোনো দাম নেই, কিন্তু আমার কাছে এদের প্রত্যেকটি আলাউদ্দীনের প্রদীপ।

সোক্রাতেসকে একদিন তাঁর শিষ্যের পাল শহরের সবচেয়ে সেরা দোকান দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। সে-দোকানে দুনিয়ার যত সব দামী দামী প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় জিনিস, অদ্ভুত অদ্ভুত বিলাসসম্ভার, মিশর বাবিলনের কলা-নিদর্শন, পাপিরসের বাণ্ডিল, আলকেমির সরঞ্জাম সব কিছুই ছিল। সোক্রাতেসের চোখের পলক পড়ে না। এটা দেখছেন, সেটা নাড়ছেন আর চোখ দুটো ছানাবড়ার সাইজ পেরিয়ে শেষটায় সসারের আকার ধারণ করেছে। শিষ্যেরা মহাখুশী—গুরু যে এত কৃচ্ছ্রসাধন আর ত্যাগের উপদেশ কপচান সে শুধু কোনো সত্যিকার ভালো জিনিস দেখেননি বলে—এইবার দেখা যাক, গুরু কি বলেন। স্বয়ং প্লাতো গুরুর বিহ্বল ভাব দেখে অস্বস্তি অনুভব করছেন।

দেখা শেষ হলে সোক্রাতেস করুণকণ্ঠে বলেন, 'হায়, হায়! দুনিয়া কত চিত্র বিচিত্র জিনিসে ভর্তি যার একটারও আমার প্রয়োজন নেই।'

আমার ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি হৃদয়ঙ্গম করলুম, সোক্রাতেসে আমাতে মাত্র একটি সামান্য তফাত—এ ঘরের প্রত্যেকটি জিনিসেরই আমার প্রয়োজন। ব্যস—ঐ একটি মাত্র পার্থক্য। ডার্বি জিতেছে ৫৩৭৮৬ নম্বরের টিকিট। আমি

কিনেছিলুম ৫৩৭৮৫ নম্বরের টিকিট। তফাতটা এমন কি হল?

মুসলমানের ছেলে, নিমতলা যাব না, যাবো একদিন গোবরা—অবশ্য যদি এই কাবুলী-গর্দিশ কাটিয়ে উঠতে পারি। সেদিন কিছু সঙ্গে নিয়ে যাব না, সেকথাও জানি; কিন্তু তারই জন্য কি আজ সব কিছু কাবুলে ফেলে দেশে যেতে হবে? মক্স করলে সব জিনিসই রপ্ত হয়, এই কি খুদাতালার মতলব?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কুষ্টিয়ার লালন ফকির বলেছেন

"মরার আগে ম'লে শমন-জ্বালা ঘুচে যায়।
জানগে সে মরা কেমন, মুরশিদ ধরে জানতে হয়।"

আবার আরো কে একজন, দাদু না কি, তিনিও তো বলেছেন,

"দাদু, মেরা বৈরী মৈ মুওয়া মুঝৈ ন্
মারে কোই।"

("হে দাদু, আমার বৈরী 'আমি' মরে গিয়েছে, আমাকে কেউ মারতে পারে না")।

কী মুশকিল। সব গুণীরই এক রা। শেয়ালকে কেন বৃথা দোষ দেওয়া। কবীরও তো বলেছের,

"তজো অভিমানা সীখো জ্ঞানা
সতগুরু সঙ্গত তরতা হৈ
কহৈঁ কবীর কোই বিরল হংস
জীবত হী জো মরতা হৈ॥"

("অভিমান ত্যাগ করে জ্ঞান শেখো, সৎগুরুর সঙ্গ নিলেই ত্রাণ। কবীর বলেন, 'জীবনেই মৃত্যুকে লাভ করেছেন সে রকম হংস-সাধক বিরল'")।

কিন্তু কবীরের বচনে বাঁচাওতা রয়ে গিয়েছে। গোবরার গোরস্তানে যাবার পূর্বেই মৃতের ন্যায় সবকিছুর মায়া কাটাতে পারেন এমন পরমহংস যখন 'বিরল' তখন সে কস্ত করার দায় তো আমার উপর নয়।

ডোম শেষ পর্যন্ত কোন্ বাঁশ বেছে নিয়েছিল আমাদের প্রবাদে তার হদিস মেলে না। বিবেচনা করি, সেটা নিতান্ত কাঁচা এবং গিঁটে ভর্তি—না হলে প্রবাদটার কোনো মানে হয় না। এ-ডোম তাই শেষ পর্যন্ত কি দিয়ে দশ পৌণ্ডের পুঁটুলি বেঁধেছিল, সেকথা ফাঁস করে দিয়ে আপন আহাম্মুখির শেষ প্রমাণ আপনাদের হাতে তুলে দেবে না।

কিন্তু সেটা পুরানো ধুতিতে বাঁধা বেনের পুঁটুলিই ছিল—'লগেজ' বা

সুটকেসের ভিতরে গোছানো মাল অন্য জিনিস—কারণ দশ পৌণ্ড মালের জন্য পাঁচ পৌণ্ডী সুটকেস ব্যবহার করলে মালের পাঁচ পৌণ্ড গিয়ে রইবে হাতে সুটকেসটা। সুকুমার রায়ের কাক যে রকম হিসেবে করতো 'সাত দুগুণে চোদ্দর নামে চার, হাতে রইল পেন্সিল।'

অবশ্য জামা-কাপড় পরে নিলুম একগাদা—একপ্রস্ত না। কর্তারাও উপদেশ পাঠিয়েছিলেন যে, প্রচুর পরিমাণে গরম জামাকাপড় না পরা থাকলে উপরে গিয়ে শীতে কষ্ট পাব এবং মৌলানার বউয়ের পা খড় দিয়ে কি রকম পেঁচিয়ে বিলিতী সিরকার বোতল বানানো হয়েছিল আবদুর রহমানের সে-বর্ণনাও মনে ছিল।

মৌলানা তাঁর এক পাঞ্জাবী বন্ধুর সঙ্গে আগেই বেরিয়ে পড়েছিলেন।

আবদুর রহমান বসবার ঘরে প্রাণভরে আগুন জ্বালিয়েছে। আমি একটা চেয়ারে বসে। আবদুর রহমান আমার পায়ের কাছে।

আমি বললুম, 'আবদুর রহমান, তোমার উপর অনেকবার খামকা রাগ করেছি, মাফ করে দিয়ো।'

আবদুর রহমান আমার দু'হাত তুলে নিয়ে আপন চোখের উপর চেপে ধরল। ভেজা।

আমি বললুম, 'ছিঃ আবদুর রহমান, এ কি করছ? আর শোনো, যা রইল সব কিছু তোমার।'

আমি জানি আমার পাঠক মাত্রই অবিশ্বাসেরই হাসি হাসবেন, কিন্তু তবু আমি জোর করে বলব, আবদুর রহমান আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যে, তার চোখে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম লেখা রয়েছে,—

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাং?

রাস্তা দিয়ে চলেছি। পিছনে পুঁটুলি-হাতে আবদুর রহমান।

দু-একবার তার সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করলুম। দেখলুম সে চুপ করে থাকাটাই পছন্দ করছে।

প্রথমেই ডানদিকে পড়ল রুশ রাজদূতাবাস। দেমিদফ পরিবারকে কখনো ভুলব না। বলশফের আত্মাকে নমস্কার জানালুম।

তারপর কাবুল নদী পেরিয়ে লব-ই-দরিয়া হয়ে আর্কের দিকে চললুম। বেশীর ভাগ দোকানপাট বন্ধ—তবু দূর থেকেই দেখতে পেলুম পাঞ্জাবীর দোকান খোলা। দোকানদার বারান্দায় দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করলুম, 'দেশে যাবেন না?' মাথা

নাড়িয়ে নীরবে জানালো 'না'। তারপর বিদায়ের সালাম জানিয়ে মাথা নিচু করে দোকানের ভিতরে চলে গেল। আমি জানতুম, কারবার ফেলে এদের কাবুল ছাড়ার উপায় নেই, সব কিছু তৎক্ষণাৎ লুট হয়ে যাবে। অথচ এর চিত্ত এমনি বিকল হয়ে গিয়েছে যে, শেষ মুহূর্তে আমার সঙ্গে দুটি কথা বলবার মত মনের জোর এর আর নেই।

বিশ কদম পরে বাঁ দিকে দোস্ত মুহম্মদের বাসা। অবস্থা দেখে বুঝতে বেগ পেতে হল না যে, বাসা লুট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাতে তাঁর কণামাত্র শোক হওয়ার কথা নয়। এ-বাবতে তিনি সোক্রাতেসের ন্যায়—সোক্রাতেস যেমন তত্ত্বচিন্তায় বুঁদ হয়ে অন্য কোনো বস্তুর প্রয়োজন অনুভব করতেন না, দোস্ত মুহম্মদ ঠিক তেমনি রসের সন্ধানে, অদ্ভুতের খোঁজে, গ্রোটেস্কের (উদ্ভটের) পিছনে এমনি লেগে থাকতেন যে, অন্য কোনো বস্তুর অভাব তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাতে পারত না। পতঞ্জলিও ঠিক এই কথাই বলেছেন। চিত্তবৃত্তিনিরোধের পন্থা বাৎলাতে গিয়ে তিনি ঈশ্বর এবং বীতরাগ মহাপুরুষদের সম্বন্ধে ধ্যান করতে উপদেশ দিয়েছেন কিন্তু সর্বশেষে বলেছেন, 'যথাভিমতধ্যানাদ্বা', 'যা খুশী তাই দিয়ে চিত্তচাঞ্চল্য ঠেকাবে।' অর্থাৎ ধ্যানটাই মুখ্য, ধ্যানের বিষয়বস্তু গৌণ। দোস্ত মুহম্মদের সাধনা রসের সাধনা।

আরো খানিকটে এগিয়ে বাঁ দিকে মেয়েদের ইস্কুল। বাচ্চার আক্রমণের কয়েক দিন পূর্বে এখানে কর্নেলের বউ তাঁর স্বামীর কথা ভেবে ডুকরে কেঁদেছিলেন। তিনি বেঁচে আছেন কিনা কে জানে। আমার পাশের বাড়ীর কর্নেলের মায়ের কান্না, ইস্কুলের কর্নেলবউয়ের কান্না, আরো কত কান্না মিশে গিয়ে অহরহ খুদাতালার তখ্‌তের দিকে চলেছে। কিন্তু কেন? কবি বলেছেন,

For men must work
And women must weep.

অর্থাৎ কোনো তর্ক নেই, যুক্তি নেই, ন্যায় অন্যায় নেই, মেয়েদের কর্ম হচ্ছে পুরুষের আকাট মূর্খতার জন্য চোখের জল ফেলে খেসারতি দেওয়া। কিন্তু আশ্চর্য, এ-বেদনাটা প্রকাশও করে আসছে পুরুষই, কবিরূপে। শুনেছি পাঁচ হাজার বৎসরের পুরোনো বাবিলনের প্রস্তরগাত্রে কবিতা পাওয়া গিয়েছে—কবি মা-জননীদের চোখের জলের উল্লেখ করে যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

ইস্কুলের পরেই একখানা ছোট বসতবাড়ি। আমান উল্লার বোনের বিয়ের সময় লক্ষ্ণৌ থেকে যেসব গানেওয়ালী নাচনেওয়ালীদের আনানো হয়েছিল তারা

উঠেছিল এই বাড়িতে। তাদের তত্ত্বতাবাশ করার জন্য আমরা কয়েকজন ভারতীয় তাদের কাছে গিয়েছিলুম। আমাদের সঙ্গে কথা কইতে পেয়ে সেই অনাত্মীয় নির্বাসনে তারা কী খুশীটাই না হয়েছিল। জানত, কাবুলে পান পাওয়া যায় না —আর পান না হলে মজলিস জমবে কি করে, ঠুংরি হয়ে যাবে ভজন—তাই তারা সঙ্গে এনেছিল বাস্-বোঝাই পান। আমাদের সেই পান দিয়েছিল অকৃপণ হস্তে, দরাজ-দিলে। লক্ষ্ণৌয়ের পান, কাশীর জর্দা, সেদ্ধ-ছাঁকা খয়ের তিন মিলে আমার মুখের জড়তা এমনি কেটে দিয়েছিল যে, আমি তখন উর্দু ছেড়েছিলুম একদম লখ্‌নওয়ী কায়দায়—বিস্তর 'মেহেরবানী', 'গরীব-পরওরী', 'বন্দা-নওয়াজী'র প্রপঞ্চ-ফোঁড়ন দিয়ে।

কাবুলের নিজস্ব উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নেই। ইরানের ঐতিহ্যও কাবুল স্বীকার করে না। কাবুলে যে দেড়জন কলাবত আছেন তাঁরা গান শিখেছেন যুক্তপ্রদেশে। বাঈজীদের মজলিসে তাই 'সম' দেনেওয়ালার অভাব হতে পারে এই ভয়ে গানের মজলিসে উপস্থিত থাকার জন্য ভারতীয়দের সাড়ম্বর নিমন্ত্রণ ও সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হয়েছিল। আমরা সামনে বসে বিস্তর মাথা নেড়েছিলুম আর ঘন ঘন 'শাবাশ, শাবাশ' চিৎকারে মজলিস গরম করে তুলেছিলুম।

বাড়ি ফিরে আহারাদির পর যখন শেষ পানটা পকেট থেকে বের করে খেয়ে জানলা দিয়ে পিক ফেললুম তখন আবদুর রহমান ভয়ে ভিরমি যায় আর কি। কাবুলে পানের পিক অজানা কিন্তু যক্ষ্মা অজানা বস্তু নয়।

তারপরই শিক্ষা-মন্ত্রীর দফতর। একসেলেন্সি ফয়েজ মুহম্মদ খানকে দোস্ত মুহম্মদ দু'চোখে দেখতে পারতেন না। আমার কিন্তু মন্দ লাগত না। অত্যন্ত অনাড়ম্বর এবং বড়ই নিরীহ প্রকৃতির লোক। আর পাঁচজনের তুলনায় তিনি লেখাপড়া কিছু কম জানতেন না, কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী হতে হলে যতটা দরকার ততটা হয়ত তাঁর ঠিক ছিল না। বাচ্চা রাজা হয়ে আর তাবৎ মন্ত্রীদের উপর অত্যাচার চালিয়ে তাঁদের কাছ থেকে গুপ্তধন বের করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীকে নাকি, 'তুই যা, তুই তো কখনো ঘুষ খাসনি' বলে নিষ্কৃতি দিয়েছিল। অথচ শিক্ষা বিভাগে টু পাইস্ কামাবার যে উপায় ছিল না তা নয়। কাবুলে নাকি ঢেউ গোনার কাজ পেলেও—অবশ্য সে-কাজ সরকারী হওয়া চাই—দু'পয়সা মারা যায়।

লোকটিকে আমার ভালো লাগতো নিতান্ত ব্যক্তিগত কারণে। এই বেলা সেটা বলে ফেলি, হাওয়াই-জাহাজ কারো জন্য দাঁড়ায় না, উড়তে পারলেই বাঁচে।

চাকরিতে উন্নতি করে মানুষ হয় বুদ্ধির জোরে, নয় ভগবানের কৃপায়।

বুদ্ধিমানকে ভগবানও যদি সাহায্য করেন তবে বোকাদের আর পৃথিবীতে বাঁচতে হত না। আমার প্রতি ভগবান সদয় ছিলেন বলেই বোধ করি শিক্ষামন্ত্রী প্রথম দিন থেকেই আমার দিকে নেকনজরে তাকিয়েছিলেন। তারপর এক বৎসর যেতে না যেতে অহেতুক একধাক্কায় মাইনে একশ' টাকা বাড়িয়ে সব ভারতীয় শিক্ষকদের উপর চড়িয়ে দিলেন।

পাঞ্জাবী শিক্ষকেরা অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর কাছে ডেপুটেশন নিয়ে গিয়ে বললেন, 'সৈয়দ মুজতবা আলীর ডিগ্রী বিশ্বভারতীর, এবং বিশ্বভারতী রেকগনাইজড্ য়ুনিভার্সিটি নয়।'

খাঁটি কথা। সদাশয় ভারতীয় সরকারের নেকনজরে আমার ডিগ্রী এখনো ব্রাত্য। আপনারা কেউ আমাকে চাকরি দিলে বিপদগ্রস্ত হবেন।

শিক্ষামন্ত্রী নাকি বলেছিলেন—আমি বয়ানটা শুনেছি অন্য লোকের কাছ থেকে —সেকথা তাঁর অজানা নয়।

পাঞ্জাবীদের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, 'আপনার সনদ-সার্টিফিকেটে রয়েছে পাঞ্জাব গবর্নরের দস্তখত। আমাদের ক্ষুদ্র আফগানিস্থানেও গবর্নরের অভাব নেই। কিন্তু আগা মুজতবা আলীর কাগজে দস্তখত রয়েছে মশহুর শাইর রবীন্দ্রনাথের। তিনি পৃথিবীর সামনে সমস্ত প্রাচ্যদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন (চশ্‌ম্ রওশন্ করদে অন্দ্)—।'

ভদ্রলোকের ভারি শখ ছিল গুরুদেবকে কাবুলে নিমন্ত্রণ করার। তাঁর শুধু ভয় ছিল যে, দু'শ' মাইলের মোটর ঝাঁকুনি খেয়ে কবি যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন আর তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে বাধা পড়ে তবে তাতে করে ক্ষতি হবে সমস্ত পৃথিবীর। কাবুল কবিকে দেখতে চায়, কিন্তু এমন দুর্ঘটনার নিমিত্তের ভাগী হতে যাবে কেন? আমি সাহস দিয়ে বলতুম, 'কবি ছ'ফুট তিন ইঞ্চি উঁচু, তাঁর দেহ সুগঠিত এবং হাড়ও মজবুত।'

শেষটায় তিনি আল্লা বলে ঝুলে পড়েছিলেন কিন্তু আমান উল্লা বিলেত যাওয়ায় সে গ্রীষ্মে কবিকে আর নিমন্ত্রণ করা গেল না। শীতে বাচ্চা এসে উপস্থিত।

যাক্‌গে এসব কথা।

বাঁদিকে মুইন-উস্-সুলতানের বাড়ি, খানিকটে এগিয়ে গিয়ে তাঁর টেনিস কোর্ট। আজ মুইন-উস্-সুলতানে ভাগ্যের হাতে টেনিস বল। কান্দাহার কাবুল তাকে নিয়ে লোফালুফি খেলছে।

এই তো মকতব-ই-হবীবিয়া। বাচ্চা আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় মকতবটা দখল

করে টেবিল চেয়ার, বই ম্যাপ পুড়িয়ে ফেলেছিল। এ শিক্ষায়তন আবার কখন খুলবে কে জানে? এখানেই আমি পড়িয়েছি। শীতে পুকুর জমে গেলে ছেলেদের সঙ্গে তার উপর স্কেটিং করেছি। গাছতলায় বসে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে আঙুর কিনে খেয়েছি। মীর আসলমের কাছ থেকে কত তত্ত্বকথা শুনেছি।

রাহুকবলিত কাবুল ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় লোক চলাচল কম। মকতব-ই-হবীবিয়ার বন্ধদ্বার যেন সমস্ত আফগানিস্থানের প্রতীক। শিক্ষাদীক্ষা, শান্তিশৃঙ্খলা, সভ্যতাসংস্কৃতি বর্জন করে আফগানিস্থান তার দ্বার বন্ধ করে দিয়েছে।

শহর ছাড়িয়ে মাঠে নামলুম। হাওয়াই জাহাজের ঘাঁটি আর বেশী দূর নয়। পিছন ফিরে আরেকবার কাবুলের দিকে তাকালুম। এই নিরস নিরানন্দ বিপদসঙ্কুল পুরী ত্যাগ করতে কোনো সুস্থ মানুষের মনে কষ্ট হওয়ার কথা নয় কিন্তু বোধ হয় এই সব কারণেই যে কয়টি লোকের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা জন্মেছিল তাঁদের প্রত্যেককে অসাধারণ আত্মজন বলে মনে হতে লাগল। এঁদের প্রত্যেকেই আমার হৃদয় এতটা দখল করে বসে আছেন যে, এঁদের সকলকে একসঙ্গে ত্যাগ করতে গিয়ে মনে হল আমার সত্তাকে যেন কেউ দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছে। ফরাসীতে বলে 'পার্তির সে তাঁ প্য মুরীর', প্রত্যেক বিদায় গ্রহণে রয়েছে খণ্ড-মৃত্যু।

হাওয়াই জাহাজ এল। আমাদের বুঁচকিগুলো সাড়ম্বর ওজন করা হল। কারো পোঁটলা দশ পৌণ্ডের বেশী হয়ে যাওয়ায় তাদের মস্তকে বজ্রাঘাত। অনেক ভেবেচিন্তে যে কয়টি সামান্য জিনিস নিয়ে মানুষ দেশত্যাগী হচ্ছে তার থেকে ফের জিনিস কমানো যে কত কঠিন সেটা সামনে দাঁড়িয়ে না দেখলে অনুমান করা অসম্ভব। একজন তো হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন।

ডোম যে কানা হয় তার শেষ প্রমাণও বিমান-ঘাঁটিতে পেলুম। এইটুকু ওজনের ভিতর আবার এক গুণী একখানা আয়না এনেছেন! লোকটির চেহারার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলুম, কই তেমন কিছু খাপসুরৎ অ্যাপলো তো নন। ঘরে আগুন লাগলে মানুষ নাকি ছুটে বেরবার সময় ঝাঁটা নিয়ে বেরিয়েছে, এ কথা তাহলে মিথ্যা নয়!

ওরে আবদুর রহমান, তুই এটা এনেছিস কেন? দশ পৌণ্ডের পুঁটুলিটা এনেছে ঠিক কিন্তু বাঁ হাতে আমার টেনিস র‍্যাকেটখানা কেন? আবদুর রহমান কি একটা বিড়বিড় করল। বুঝলুম, সে ঐ র‍্যাকেটখানাকেই আমার সব চেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি বলে ধরে নিয়েছিল, তার কারণ ও-জিনিসটা আমি তাকে কখনও ছুঁতে দিতুম না। আবদুর রহমান আমাদের দেশের ড্রাইভারদের মত। তার

বিশ্বাস হু মাত্রই এমনভাবে টাইট করতে হয় যে, সেটা যেন আর কখনো খোলা না যায়। 'অপটিমাম' শব্দটা আমি আবদুর রহমানকে বোঝাতে না পেরে শেষটায় কড়া হুকুম দিয়েছিলুম, র‍্যাকেটটা প্রেসে বাঁধা দূরে থাক, সে যেন ওটার ছায়াও না মাড়ায়।

আবদুর রহমান তাই ভেবেছে, সায়েব নিশ্চয়ই এটা সঙ্গে হিন্দুস্থানে যাবে।

দেখি স্যার ফ্রান্সিস। নিতান্ত সামনে, বয়সে বড়, তাই একটা ছোটাসে ছোটা নড্ করলুম। সায়েব এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'গুড মর্নিং, আই উইশ এ গুড জর্নি।'

আমি ধন্যবাদ জানালুম।

সায়েব বললেন, 'ভারতীয়দের সাহায্য করবার জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। প্রয়োজন হলে আশা করি, ভারতবর্ষে সে কথাটি আপনি বলবেন।'

আমি বললুম, 'আমি নিশ্চয়ই সব কথা বলবো।'

সায়েব ভোঁতা, না ঘড়েল ডিপ্লোমেট ঠিক বুঝতে পারলুম না।

বিদায় নেবার সময় আফগানিস্থানে যে চলে যাচ্ছে সে বলে 'ব্ আমানে খুদা' —'তোমাকে খোদার আমানতে রাখলুম', যে যাচ্ছে না সে বলে 'ব্ খুদা সপূর্দমৎ' —'তোমাকে খোদার হাতে সোপর্দ করলুম।'

আবদুর রহমান আমার হাতে চুমো খেল। আমি বললুম, 'ব্ আমানে খুদা, আবদুর রহমান', আবদুর রহমান মন্ত্রোচ্চারণের মত একটানা বলে যেতে লাগল 'ব্ খুদা সপূর্দমৎ, সায়েব, ব্ খুদা সপূর্দমৎ, সায়েব।'

হঠাৎ শুনি স্যার ফ্রান্সিস বলছেন, 'এ-দুর্দিনে যে টেনিস র‍্যাকেট সঙ্গে নিয়ে যেতে চায় সে নিশ্চয়ই পাকা স্পোর্টসম্যান।'

লিগেশরের এক কর্মচারী বললেন, 'ওটা দশ পৌণ্ডের বাইরে পড়েছে বলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।'

সাহেব বললেন, 'ওটা প্লেনে তুলে দাও।'

ঐ একটা গুণ না থাকলে ইংরেজকে কাক-চিলে তুলে নিয়ে যেত।

আবদুর রহমান এবার চেঁচিয়ে বলছে, 'ব্ খুদা সপূর্দমৎ, সায়েব, ব্ খুদা সপূর্দমৎ।' প্রপেলার ভীষণ শব্দ করছে।

আবদুর রহমানের তারস্বরে চীৎকার প্লেনের ভিতর থেকে শুনতে পাচ্ছি। হাওয়াই জাহাজ জিনিসটাকে আবদুর রহমান বড্ড ডরায়। তাই খোদাতালার

কাছে সে বার বার নিবেদন করছে যে, আমাকে সে তাঁরই হাতে সঁপে দিয়েছে।

প্লেন চলতে আরম্ভ করেছে। শেষ শব্দ শুনতে পেলুম, 'সপূর্দমৎ'। আফগানিস্থানে আমার প্রথম পরিচয়ের আফগান আবদুর রহমান; শেষ দিনে সেই আবদুর রহমান আমায় বিদায় দিল।

উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে এবং এই শেষ বিদায়কে যদি শ্মশান বলি তবে আবদুর রহমান শ্মশানেও আমাকে কাঁধ দিল। স্বয়ং চাণক্য যে ক'টা পরীক্ষার উল্লেখ করে আপন নির্ঘণ্ট শেষ করেছেন আবদুর রহমান সব ক'টাই উত্তীর্ণ হল। তাকে বান্ধব বলব না তো কাকে বান্ধব বলব?

বন্ধু আবদুর রহমান, জগদ্বন্ধু তোমার কল্যাণ করুন।

মৌলানা বললেন, 'জানালা দিয়ে বাইরে তাকাও' বলে আপন সীটটা আমায় ছেড়ে দিলেন।

তাকিয়ে দেখি দিকদিগন্ত বিস্তৃত শুভ্র বরফ। আর অ্যারফিল্ডের মাঝখানে, আবদুর রহমানই হবে, তার পাগড়ির ন্যাজ মাথার উপর তুলে দুলিয়ে দুলিয়ে আমাকে বিদায় জানাচ্ছে।

বহুদিন ধরে সাবান ছিল না বলে আবদুর রহমানের পাগড়ি ময়লা। কিন্তু আমার মনে হল চতুর্দিকের বরফের চেয়ে শুভ্রতর আবদুর রহমানের পাগড়ি আর শুভ্রতম আবদুর রহমানের হৃদয়।

পরিশিষ্ট

আমান উল্লা হৃতসিংহাসন উদ্ধার না করতে পেরে আফগানিস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ইতালির রাজা তাঁকে স্বরাজ্যে আশ্রয় দেন। মুইন-উস্-সুলতানে ইরানে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

আমান উল্লার হয়ে যে সেনাপতি ইংরেজের সঙ্গে আফগান স্বাধীনতার জন্য লড়েছিলেন তাঁর নাম নাদির শাহ। তিনি বিপ্লবের সময় ফ্রান্সে ছিলেন। পরে পেশাওয়ার এসে সেখানকার ভারতীয় বণিকদের অর্থ সাহায্যে এবং আপন শৌর্য-বীর্য দ্বারা কাবুল দখল করে বাদশাহ হন। বাচ্চাকে সঙ্গীন দিয়ে মারা হয়—পরে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হয়।

এ সব আমি খবরের কাগজে পড়েছি।

দেশে এসে জানতে পেলুম, আমার আত্মীয় কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য মরহুম মৌলবী আবদুল মতিন চৌধুরীর উষ্মা দর্শনে ভারত সরকার স্যার ফ্রান্সিসকে আদেশ (বা অনুরোধ) করেন আমাকে দেশে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দেবার জন্য।

আমি কাবুল ছাড়ার কয়েক দিন পরেই ব্রিটিশ লিগেশন বহু অসহায় ভারতীয়কে কাবুলে ফেলে ভারতবর্ষে চলে আসেন।

এই 'বীরত্বের' জন্য স্যার ফ্রান্সিস অল্পদিন পরেই খেতাব ও প্রমোশন পেয়ে ইরাক বদলি হন!

মৌলানা জিয়াউদ্দিন ভারতবর্ষে ফিরে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপকের কর্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন (ফার্সীতে লেখা ব্রজভাষার একখানা প্রাচীন ব্যাকরণ প্রকাশ তার অন্যতম) এবং গুরুদেবের অনেক কবিতা উত্তম ফার্সীতে অনুবাদ করেন।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় তিনি অল্পবয়সে মারা যান। তাঁর অকালমৃত্যু উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে শোকসভায় গুরুদেব আচার্যরূপে যা বলেন তার অনুলিপি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র রচনাবলীর চতুর্বিংশ খণ্ডে অনুলিপিটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। গুরুদেব রচিত 'মৌলানা জিয়াউদ্দিন' কবিতাটি এখানে বিশ্বভারতীর অনুমতি অনুসারে ছাপানোটা যুক্তিযুক্ত মনে করলুম ;—

মৌলানা জিয়াউদ্দিন

কখনো কখনো কোনো অবসরে
নিকটে দাঁড়াতে এসে ;

'এই যে' বলেই তাকাতেম মুখে
'বোসো' বলিতাম হেসে।
দু-চারটে হত সামান্য কথা
ঘরের প্রশ্ন কিছু,
গভীর হৃদয় নীরবে রহিত
হাসিতামাসার পিছু।
কত সে গভীর প্রেম সুনিবিড়
অকথিত কত বাণী,
চিরকাল-তরে গিয়েছ যখন
আজিকে সে-কথা জানি।
প্রতি দিবসের তুচ্ছ খেয়ালে
সামান্য যাওয়া-আসা,
সেটুকু হারালে কতখানি যায়
খুঁজে নাহি পাই ভাষা।
তব জীবনের বহু সাধনার
যে পণ্য-ভার ভরি
মধ্যদিনের বাতাসে ভাসালে
তোমার নবীন তরী
যেমনি তা হোক মনে জানি তার
এতটা মূল্য নাই
যার বিনিময়ে পাবে তব স্মৃতি
আপন নিত্য ঠাঁই—
সেই কথা স্মরি বার বার আজ
লাগে ধিক্কার প্রাণে—
অজানা জনের পরম মূল্য
নাই কি গো কোনো খানে।
এ অবহেলার বেদনা বোঝাতে
কোথা হতে খুঁজে আনি
ছুরির আঘাত যেমন সহজ
তেমন সহজ বাণী।

কারো কবিত্ব, কারো বীরত্ব,
কারো অর্থের খ্যাতি—
কেহ-বা প্রজার সুহৃদ্ সহায়,
কেহ-বা রাজার জ্ঞাতি—
তুমি আপনার বন্ধুজনেরে
মাধুর্যে দিতে সাড়া,
ফুরাতে ফুরাতে রবে তবু তাহা
সকল খ্যাতির বাড়া।
ভরা আষাঢ়ের যে মালতীগুলি
আনন্দ মহিমায়
আপনার দান নিঃশেষ করি
ধূলায় মিলায়ে যায়—
আকাশে আকাশে বাতাসে তাহারা
আমাদের চারি পাশে
তোমার বিরহ ছড়ায়ে চলেছে
সৌরভ নিঃশ্বাসে।

(নবজাতক)

তামাম শুদ

দেশে বিদেশে দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

চাচা কাহিনী

দ্বিতীয় খণ্ড

কাফে-দে-জেনি

রাত বারোটায় প্যারিসে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে ভাবলুম যাই কোথায়? হোটেল? তাও কি হয়! খাস প্যারিসের বাসিন্দা ছাড়া আর তো কেউ কখনো তিনটের আগে শুতে যায় না। আমার এক রুশ বন্ধুকে প্যারিসে সকাল হওয়ার আগে কখনও বাড়ি ফিরতে দেখিনি। রাত তিনটে-চারটের সময় যদি বলতুম, "রবের, চল, বাড়ি যাই" সে বেড়ালছানার মত আমার কোটের আস্তিন আঁকড়ে ধরে বলত, 'এই অন্ধকারে? তার চেয়ে ঘণ্টাতিনেক সবুর করো, উজ্জ্বল দিবালোকে প্রশস্ত রাজবর্ত্ম দিয়ে বাড়ি ফিরব। আমি কি নিশাচর, চৌর, না অভিসারিকা? অত সাহস আমার নেই।'

জানতুম মঁ পার্নাস বা আভেন্যু রশোস্যুয়ারের কোনো একটা কাফেতে তাকে পাবোই। না পেলেও ক্ষতি নেই, একটু কফি খেয়ে, এদিক-ওদিকে আঁখ মেরে 'নিশার প্যারিসের' হাতখানা চোখের পাতার উপর বুলিয়ে নিয়ে আধা-ঘুমো আধা-জাগা অবস্থায় হোটেলে ফিরে শুয়ে পড়ব।

জুনের রাত্রি। না-গরম, না-ঠাণ্ডা। প্লাস দ্য লা মাদ্‌লেন দিয়ে থিয়েটারের গানের শেষ রেশের নেশায় এগিয়ে চললুম। গুন্ গুন্ করছি:

'তাজা হাওয়া বয়—
খুঁজিয়া দেশের ভুঁই।
ও মোর বিদেশী যাদু
কোথায় রহিলি তুই?'*

ভাবছি রাধার চেয়ে কৃষ্ণের প্রেম ছিল ঢের বেশি ফিকে। অথচ ত্রিস্তানের প্রেম কি ইজল্‌দের চেয়ে কম ছিল? না, জর্মনরা অপেরা লিখতে পারে বটে, ইতালিয়েরা গাইতে পারে বটে ও ফরাসীরা রস চাখতে জানে বটে। বলেও, 'খাবার তৈরী করা তো রাঁধুনীর কর্ম, খাবেন গুণীরা। আমরা অপেরা লিখতে যাব কোন দুঃখে?'

---

* কবিতাটির এ ক'টি ছত্র ইলিয়টের 'ওয়েস্টল্যাণ্ড' কবিতায় আছে,—

'Frisch weht der Wind
Der Heimat zu
Mein iriches Kind
Wo weilst Du?'

দেখি, হঠাৎ কখন এক অজানা রাস্তায় এসে পড়েছি। লোকজনের চলাচল কম। মোটরের ভেঁপু প্রায় বাজেই না। চঞ্চল দ্রুত জীবনস্পন্দন থেকে জনহীন রাস্তায় এসে কেমন যেন ক্লান্তি অনুভব করলুম। একটু জিরোলে হত। তার ভাবনা আর যেখানেই থাক প্যারিসে নেই। কলকাতায় যে রকম পদে পদে না হোক বাঁকে বাঁকে পানের দোকান, প্যারিসেও তাই। সর্বত্র কাফে। প্রথম যেটা চোখে পড়ল সেটাতেই ঢুকে পড়লুম।

মাঝারি রকমের ভিড়। নাচের জায়গা নয়। ক্যানেস্তারা ব্যাণ্ড বা রেডিওর বাদ্যি-বাজনা নেই দেখে সোয়াস্তি অনুভব করলুম। একটা টেবিলে জায়গা খালি ছিল; শুধু একজন খবরের কাগজের ফেরিওয়ালা, কালো টুপীতে সোনালি হরফে 'ল্য মাতাঁ' লেখা—চোখ বন্ধ করে সিগারেটে দম দিচ্ছেন, সামনে অর্ধশূন্য কফির পেয়ালা। আমি একটু মোলায়েম সুরে বললুম, 'মসিয়ো যদি অনুমতি করেন—'। 'তবে এই টেবিলে কি অল্পক্ষণের জন্য বসতে পারি?' এই অংশটুকু কেউ আর বলে না। গোড়ার দিকটা শেষ না হতেই সবাই বলে, 'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ!' কিন্তু ল্য মাতাঁর হরকরা দেখলুম সে দলের নন। আমার বাক্যের প্রথমার্ধ শেষ করে যখন 'বিলক্ষণ বিলক্ষণ' শোনবার প্রত্যাশায় থেমেছি, তিনি তখন চোখ মেলে মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আমার অনুরোধ শব্দে শব্দে ধীরে ধীরে পুনরাবৃত্তি করলেন, 'মসিয়ো যদি অনুমতি করেন তবে?—তবে কি?' এ হেন অপ্রয়োজনীয় অবান্তর প্রশ্ন আমি হিল্লি-দিল্লি-কলোন্-বুলোন্ কোথাও শুনিনি। কি আর করি, বললুম, 'তবে এই টেবিলে অল্পক্ষণের জন্য বসি।' ল্য মাতাঁ বললেন, 'তাই বলুন। তা না হলে আপনি যে আমার গলাকাটার অনুমতি চাইছিলেন না কি করে জানব? যারা সকল্পন বাক্যের পূর্বার্ধ বলে উত্তরার্ধ নির্ণয় করে না, তারা ভাষার কোমর কাটে। মানুষের গলা কাটতে তাদের কতক্ষণ? বসুন।' বলে 'ল্য মাতাঁ' চোখ বন্ধ করে সিগারেটে আরেক-প্রস্ত দীর্ঘ দম নিলেন। অনেকক্ষণ পরে চোখ না মেলেই আস্তে আস্তে বললেন, যেন কোনো ভীষণ প্রাণ-হরণ উচাটন মন্ত্র জপে যাচ্ছেন, 'ভাষার উচ্ছৃঙ্খলতা, তাও আবার আমার সামনে।'

আমি বে-বাক অবাক! এ আবার কোন্ রায়বাঘা সাহিত্যরথী রে বাবা। কিন্তু রা কাড়তে হিম্মৎ হল না, পাছে ভাষা নিয়ে ভদ্রলোক আরেক দফা, এক-তরফা রফারফি করে ফেলেন। আধঘণ্টা-টাক কেটে যাওয়ার পর ল্য মাতাঁ মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে যেন ঘুম ভাঙালেন। ঠাণ্ডা কফিতে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

'ফরাসী জানেন বলে মনে হচ্ছে।' কথাটা ঠিক প্রশ্ন নয়, তথ্য নিরূপণও নয়। আমি তাই বিনীতভাবে শুধু 'ওয়াঁও ওয়াঁও' গোছ একটা শব্দ বের করলুম। অত্যন্ত শান্তস্বরে ল্য মার্তাঁ বললেন, 'ভাষা সৃষ্টি কি করে হল তার সমাধান-সাধনা নিষ্ফল। এ জ্ঞানটা প্যারিসের ফিলোলজিস্ট এসোসিয়েশনের ছিল বলেই তাদের পয়লা নম্বর আইন, তাদের কোনও বৈঠকে ভাষার সৃষ্টিতত্ত্ব, গোড়াপত্তন নিয়ে কোনও আলোচনা হবে না। তবু অনায়াসে এ কথা বলা যেতে পারে যে, সৃষ্টির আদিম প্রভাতে মানুষের ভাষা ছিল না, পশুপক্ষীর যেমন আজও নেই। আজও পশুপক্ষীরা কিচির-মিচির করে ভাব প্রকাশ করে। মানুষ কিন্তু 'ওয়াঁও, ওয়াঁও' করে না!'

লোকটার বেআদবী দেখে আমি থ' হয়ে গেলুম। ল্য মার্তাঁ জিজ্ঞেস করলেন, 'ফের্না রুমোর নাম শুনেছেন?' গোস্‌সা হয়ে বেশ উষ্মার সঙ্গে বললুম, 'শুনিনি।'

'শুনিনি।' ল্য মার্তাঁ অতি বিজ্ঞের অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেন, 'জানেন না, অথচ কী গর্ব যে জানেন না। এই গর্ব যেদিন লজ্জা হয়ে সর্ব অস্তিত্বকে খর্ব করবে, সেদিন সে লজ্জার জ্বালা জুড়োবেন কোন পঙ্ক দিয়ে? ও রেভোয়া!' বলে ল্য মার্তাঁ গটগট করে বেরিয়ে গেলেন।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে লোকটার কথা খানিকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলুম। তারপর আপন মনেই বললুম, 'দুত্তোর ছাই, মরুক গে।' একটা খবরের কাগজের সন্ধানে ওয়েটারকে ডেকে বললুম, 'কোনো একটা বিকেলের কাগজ, সকালেরটা বেরিয়ে থাকলে তাই ভালো।' ওয়েটার খানিকক্ষণ হাবার মত আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি বিদেশী, মসিয়ো, তাই জানেন না, আমাদের ক্লিয়াঁতেল-গাহকরা সবাই জিনিয়স। কাফের নাম 'কাফে দে জেনি', 'প্রতিভা কাফে'। এন্‌রা কেউ খবরের কাগজ পড়েন না। তবে সবাই মিলে একটা সাপ্তাহিক বের করেন—গ্রীক ভাষায়। তার একখণ্ড এনে দেব?' আমি বললুম, 'থাক।' এসিরিয়ন কি ব্যাবিলনিয়ন যে বলেনি সেই অন্ততঃ এ পুরুষের ভাগ্যি।

ততক্ষণে দেখি আরেকটি ভদ্রলোক 'ল্য মার্তাঁ'র শূন্য চেয়ারখানা চেপে বসেছেন। বেশ মিষ্টি মিষ্টি হেসে বললেন, 'আপনি বুঝি ফের্না রুমোর বন্ধু?' আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'ফের্না রুমো কে?' ভদ্রলোকটি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কেন? এই যার সঙ্গে কথা বলছিলেন—' হালে পানি পেলুম; হাল মালুম হল। বললুম, 'না, এই প্রথম আলাপ।' 'ও, তাই বলুন। আমার নাম পল রনাঁ।

আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুশী হলুম।' 'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ, আমার নাম ইরশাদ চৌধুরী।' শুধালুম, 'মসিয়ো কি গ্রীক খবরের কাগজ পড়েন?' রনাঁ উত্তর দিলেন, 'আপনি আমাদের কাগজটার কথা বলছেন তো? না, আমি গ্রীক জানিনে। কিন্তু ওয়েটারটা জানে; আঁরিকে ডাকব? সে আপনাকে তর্জমা করে শুনিয়ে দেবে। তবে তার ফরাসী বোঝাও এক কর্ম।'

গোলকধাঁধাটি আমার কাছে আরো পেঁচিয়ে যেতে লাগল। জিজ্ঞেস করলুম, 'মসিয়ো রুমো কি 'ল্য মার্তাঁ'য় কাজ করেন?' রনাঁ বললেন, 'পেটের দায়ে। এক কাপ কফি মেরে সে তিন দিন কাটাতে পারে। কিন্তু চার দিনের দিন? বছর দশেক পূর্বে তার একটা কবিতা বিক্রি হয়েছিল। পয়সাটা পেলে ভালো করে এক পেট খাবে। হালে যে কবিতাটা 'ল্য মেরক্যুরে' পাঠিয়েছিল, তারা সেটার কোঠ ঠিক না করতে পেরে বিজ্ঞাপন ভেবে মলাটে ছাপিয়েছে। কিন্তু টাকার দুঃখ এইবার তার ঘুচল বলে। বাস্তাইয়ের জেলে ফাঁসুড়ের চাকরিটা খালি পড়েছে। রুমো দরখাস্ত করেছে। খুব সম্ভব পাবে। ফাঁসী দেওয়াতে ওয়াকিবহাল হয়ে যখন নূতন কবিতা ঝাড়বে তখন আর সব চ্যাংড়াদের ঘায়েল করে দেবে।'

জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনি কিছু লেখেন?'

'লেখাপড়াই ভুলে গিয়েছি, তা লিখব কি করে?'

'লেখাপড়া ভুলে গিয়েছেন মানে?'

'মানে অত্যন্ত সরল। আমি ছবি আঁকি। ছবি আঁকায় নিজেকে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতিতে লোপ করে দিতে হয়। কবিতা, গান, নাচ এক কথায় আর সব কিছু তখন শুধু অবান্তর নয়, জঞ্জাল। নদী যদি তরঙ্গের কলরোল তোলে তবে কি তাতে সুন্দরী ধরার প্রতিচ্ছবি ফোটে? ঝাড়া দশটি বছর লেগেছে, মোশয়, ভাষা ভুলতে। এখন ইস্তেক রাস্তার নামও পড়তে পারিনে, নাম সইও করতে পারিনে! বেঁচে গেছি। জীবনের প্রথম প্রভাতে মানুষ কি দেখেছিল চোখ মেলে?—যুগ যুগ সঞ্চিত সভ্যতার বর্বর কলুষ-কালিমা মুক্ত জ্যোতির্দৃষ্টি দিয়ে? তাই দেখি, তাই আঁকি!'

লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। বললুম, 'সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে মানুষ তার অনুভূতির প্রকাশ কি 'ওয়াঁও ওয়াঁও' করে করে নি?' দেখলুম রনাঁ বড় মিষ্টি স্বভাবের লোক। বাধা পেয়ে বাঘা জিনিয়সের মত তেড়ে এলেন না। পুরষ্টু গালে টোল লাগিয়ে মিষ্টি হেসে বললেন, 'রুমো বলেছে তো? ও তার স্বপ্ন; আর

স্বপ্ন মানেই তো ছবি। স্পর্শ নেই, গন্ধ নেই, শব্দ নেই ; এমন কি সে ছবিতে রঙও নেই, কম্পজিশন নেই। সে বড় নবীন ছবি, সে বড় প্রাচীন ছবি। সে তো আত্মদর্শন, ভূমা দর্শন !'

জিজ্ঞেস করলুম, 'সে ছবি বুঝবে কে ? তাতে রস পাবে কে ? আমাদের চোখের উপর যে হাজার হাজার বৎসরের সভ্যতার পলস্তরা।'

রনাঁ বড় খুশী হলেন। মাথা হেলিয়ে-দুলিয়ে বললেন, 'লাখ কথার এক কথা বললেন মসিয়ো। তাই বলি প্রাচ্য দেশীয়রা আমাদের চেয়ে ঢের বেশী অসভ্য, অর্থাৎ সভ্য। চিরকাল মুক্তির সন্ধান করেছে বলে তাদের চোখ মুক্ত। চলুন, আপনাকেই আমার ছবি দেখাব। জানালার পাশে বসেছিলেন, পর্দাটা সরিয়ে বললেন 'এই আলোতেই আমার ছবি দেখার প্রশস্ততম সময়।'

বৃথা আপত্তি করলুম না। বাইরে তখন ভোরের আলো ফুটছে।

রাস্তায় চলতে চলতে রনাঁ বললেন, 'আদিম প্রভাতের সৃষ্টি দেখতে হলে প্রদোষের অর্ধনিমীলিত চেতনার প্রয়োজন।'

তেতলার একটি ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। ডাক দিলেন, 'নানেৎ।'

ঘরের চারদিকে তাকাবার পূর্বে নজর পড়ল নানেতের দিকে। শোফায় অর্ধশায়িতা কিশোরী না যুবতী ঠিক ঠাহর করতে পারলুম না। এক গাদা সোনালি চুল আর দুটি সুডৌল বাহু। রনাঁ আলাপ করিয়ে দিলেন ; 'মসিয়ো ইরশাদ ; নানেৎ—আমার মডেল, ফিয়াঁসে, বন্ধু। নানেৎ, জানালাগুলো খুলে দাও।'

চারিদিকে তাকিয়ে আমার কি মনে হয়েছিল আজ আর স্পষ্ট মনে নেই। ছাত থেকে মেঝে পর্যন্ত ছবি আর ছবি। আগাগোড়া যেন ক্যানভাসে মোড়া। শোফাতে, মেঝেতে, কৌচে, চেয়ারে সর্বত্র ছবি ছড়ানো। অদ্ভুত সামঞ্জস্যহীন অর্থবিহীন অতি নবীন না বহু প্রাচীন তালগোল পাকানো বস্তুপিণ্ড ; না জ্বরের বেঘোরে ঘোরপাকখাওয়া আধা-চেতনার বিভীষিকার সৃষ্টি ? পাঁশুটে, তামাটে, ঘোলাটে ধোঁয়াটে এ কি ?

হঠাৎ কানে গেল, রনাঁ ও নানেতে যেন আলাপ হচ্ছে।

'নানেৎ।'

'মন আমি (বন্ধু !)'

'দেখছ ?'

'তুমি ছাড়া কি কেউ কখনোও এমন সৃষ্টির কল্পনা করতে পারত ?'

'নানেৎ।'

'প্যারিস, পৃথিবী তোমাকে রাজার আসনে বসাবে।'

'না, বন্ধু, আমার আসন চিরকাল তোমার পায়ের কাছে। নানেৎ, মা শেরি (প্রিয়তমে)।'

'মন আমি।'

নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে এলুম। দেখি প্রভাতসূর্য ইফেল মিনারের কোমরে পৌঁচেছে। চোখোচোখি হতে যেন স্বপ্ন কেটে গেল।

'রবেরের মুখে তাই—

হামেশাই ;

'নিশার প্যারিসে' কভু. হাবা ওরে, বলি তোরে, কাফে ছেড়ে বাহিরিতে নাই।'

বিধবা-বিবাহ

আমাদের পুজো-সংখ্যা ইংরেজের ক্রিস্‌মাস্‌ স্পেশালের অনুকরণে জন্মলাভ করেছিল কি না সে-কথা পণ্ডিতেরা বলতে পারবেন, কিন্তু এ-কথা ঠিক যে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ইংরিজি স্পেশালের চেয়ে অনেক বেশী তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাচ্ছে। ক্রিস্‌মাস্‌ সংখ্যাগুলোতে থাকে অসংখ্য ছেলেমানুষি গল্প আর এন্তার গাঁজা—বছরের আর এগারো মাস ইংরেজ হাঁড়িপানা মুখ ক'রে থাকে ব'লে ঐ একটা মাস সে মুখের সব লাগাম ছিঁড়ে ফেলে যা-খুশী-তাই বকে নেয়। আমাদের পুজো-সংখ্যায় এ-সব পাতলামি থাকে না : তাই ভেবে পাইনে সত্যি-মিথ্যেয় মেশানো এদেশের আজগুবি গল্পগুলো ঠাঁই পাবে কোথায়, কোন্‌ মোকায় ?

এতদিন ইংরেজের নকল করতে বাধো বাধো ঠেকত। ভয় হ'ত পাছে লোকে ভাবে 'খানবাহাদুরির' তালে আছি। এখন পুজোর গাঁজায় দম দিয়ে দু'চারখানা গুল ছাড়তে আর কোনো প্রকারের বাধা না থাকারই কথা। অবশ্য সত্যি-মিথ্যের মেকদার যাচাইয়ের জন্য পাঠক জিম্মাদার।

বরোদার ভূতপূর্ব মহারাজা তৃতীয় সয়াজী রাও-এর কথা এদেশের অনেকেই জানেন। ইনি বিলেত থেকে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, মৌলানা মুহম্মদ আলীকে এবং এদেশ থেকে রমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুত আম্বেডকরকে বেছে নিয়ে বরোদার উন্নতির জন্য নিয়োগ করেন। এককালে 'প্রবাসী'তে এঁর সম্বন্ধে অনেক লেখা

বেরিয়েছিল। বরোদারাজ্যের দু'একজন বৃদ্ধের মুখে আমি শুনেছি, অরবিন্দ বাঙলাদেশে যে আন্দোলন আরম্ভ করেন তাতে নাকি সয়াজী রাও-এর গোপন সাহায্য ছিল।

ইনি আসলে রাখাল-ছেলে। বরোদার শেষ মহারাজা ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে গদিচ্যুত হলে পর, ইনি তাঁর নিকটতম আত্মীয় বলে এঁকে দূর মহারাষ্ট্রের মাঠ থেকে ধরে এনে গুজরাতের বরোদারাজ্যের গদিতে বসানো হয়। তখন তাঁর বয়স ষোলর কাছাকাছি। বরোদার তখন এমনি দুরবস্থা যে দিবা-দ্বিপ্রহরে নেকড়ে বাঘ শহরের আশপাশ থেকে মানুষের বাচ্চা ধ'রে নিয়ে যেত —সরকারী চাকুরেদের বছর তিনকের মাইনে বাকি থাকতো ব'লে দেশটা চলতো ঘুষের উপর, আর তাবৎ বরোদা স্টেটের ঋণ নাকি ছিল ত্রিশ কোটি টাকার মত।

সয়াজী রাও প্রায় বাষট্টি বৎসর রাজত্ব করেন। সারদা এ্যাক্ট পাস হবার বহু পূর্বেই তিনি নিজে জোর ক'রে আইন বানিয়ে আপন রাজ্যে বালবিবাহ বন্ধ করেন, খয়রাতি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালান, হিন্দু লগ্নচ্ছেদের (ডিভোর্স) আইন চালু করেন, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরী খোলার বন্দোবস্ত করেন ও মরার সময় স্টেটের জন্য ত্রিশ কোটি টাকা রেখে যান। বরোদা শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় কলকাতাকে হার মানায়, সে পাল্লা দেয় বোম্বাই বাঙালোরের সঙ্গে।

এই মহারাজাই দিল্লীর দরবারে ইংরেজ রাজার দিকে পিছন ফিরে, ছড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, গটগট ক'রে বেরিয়ে এসেছিলেন ব'লে তাঁর গদি যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অরবিন্দের ব্যাপারে ইংরেজ তাঁর উপর এমনিতেই চটা ছিল তার উপর এই কাণ্ড—এরকম একটা অজুহাত ইংরেজ খুঁজছিলও বটে। এ-ব্যাপার সম্বন্ধে স্বয়ং সয়াজী রাও লিখেছেন, "ইংরেজ আমাকে গদিচ্যুত করতে চেয়েছিল 'বাই গিভিং দি ডগ্ এ ব্যাড্ নেম্'।" তিনি দরবারে হিজ ম্যাজেস্টিকে কতটা অসৌজন্য দেখিয়েছিলেন সে-সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত, কিন্তু ফাঁড়াটা কাটাবার জন্য তিনি যে লাখ পনরো ঘুষ দিয়েছিলেন সে-সম্বন্ধে সব মুনিই একমত। ব্রিটিশ প্রেসেরও চাপ নাকি ভালো ক'রে তেল ঢাললে ঢিলে হয়ে যায়।

এসব কথা থেকে সাধারণ লোকের ধারণা করা কিছুমাত্র অন্যায় নয় যে সয়াজী রাও খাণ্ডার বিশেষ ছিলেন। তা তিনি ছিলেনও, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তাঁর রসবোধ ছিল অসাধারণ—শুধু রাজারাজড়াদের ভিতরেই নয় জন-সাধারণের পাঁচজন বিদগ্ধ লোককে হিসেবে নিলেও।

সার ভি. টি. কৃষ্ণমাচারীর নাম অনেকেই শুনেছেন। ইনি কিছুদিন পূর্বেও জয়পুরের দেওয়ান (প্রধান মন্ত্রী) ছিলেন ও উপস্থিত কোথায় যেন আরো ডাঙর নোকরি করেন। ইনি যখন বরোদার দেওয়ানরূপে আসেন তখন তিনি উত্তর ভারতে সম্পূর্ণ অপরিচিত, এবং আর কিছু পারুন আর নাই পারুন, একথা সত্যি, বক্তৃতা দিতে গেলে তাঁর টন্‌সিল্‌ আর জিভে প্যাঁচ খেয়ে যেত। এখনো সে উৎপাতটা সম্পূর্ণ লোপ পায়নি।

শুনেছি তিনি যখন বরোদায় এলেন তখন 'সয়াজী বিহার ক্লাব' তাঁকে একখানা যগ্যির দাওয়াত দিলে। স্বয়ং মহারাজ উপস্থিত। শহরের কুতুবমিনাররা সব বোম্বাই বোম্বাই লেকচর ঝাড়লেন, 'ভি. টি'র মত মানুষ হয় না, এক এ্যাডাম্‌ হয়েছিলেন আর তারপর ইনি, মধ্যিখানে স্রেফ সাহারা' ইত্যাদি ইত্যাদি।

কুতুবরা 'ভি. টি'কে সপ্তম-স্বর্গে চড়িয়ে দিয়ে যখন থামলেন তখন,—

কৃষ্ণমাচারী-পানে সয়াজী রাও হাসিয়া করে আঁখিপাত।
চোখের পর চোখ রাখিয়া মূক কহিল ওস্তাদ জি,
ভাষণ ঝাড়ো এবে উম্‌দা ভাষণ, ভাষণ এরে বলে ছি।'

'ভি. টি'র শত্রুরা বলে তাঁর পা নাকি তখন কাঁপতে শুরু করেছিল। অসম্ভব নয়, তবে একথা ঠিক, তিনি অতি কষ্টে, নিতান্ত যে ধন্যবাদ না-দিলেই নয়, তাই বলে ঝুপ করে চেয়ারে বসে পড়েছিলেন।

সর্বশেষে মহারাজার পালা। বুড়া বলতেন খাসা ইংরেজি। অতি সরল এবং অত্যন্ত চোস্ত—সর্বপ্রকার অপ্রয়োজনীয় অলঙ্কার বিবর্জিত।

সামান্য দু-একটা লৌকিকতা শেষ করে সয়াজী রাও বললেন, 'দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরে বরোদা রাজ্য চালনা উপলক্ষে আমি বহু মহাজনের সংস্রবে এসেছি এবং তাঁদের সকলের কাছ থেকেই আমি কিছু-না-কিছু শিখে আমার জীবন সমৃদ্ধিশালী করেছি। এই দিওয়ানের কাছ থেকে শিখলুম বাকসংযম।'

শক্তিশেল খেয়ে লক্ষ্মণ কি করেছিলেন রামায়ণে নিশ্চয়ই তার সালঙ্কার বর্ণনা আছে—পাঠক সেটি পড়ে নেবেন।

ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি সয়াজী রাও-এর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। পাভলোভা এদেশে আসার বিশ বৎসর পূর্বে তিনি ভরতনাট্যম্‌ উত্তর ভারতে চালু করবার জন্য একটা আস্ত 'ট্রুপ' নিয়ে বিস্তর জায়গায় নাচ দেখিয়েছিলেন। উত্তর ভারত তখনও তৈরী হয়নি বলে দক্ষিণ-কন্যাদের সে-নৃত্যের কথা আজ সবাই ভুলে

গিয়েছে।

বরোদার 'ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউট' দেশ-বিদেশে যে খ্যাতি অর্জন করেছে তার সঙ্গে ভারতীয় অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের তুলনা হয় না। এস্থলে ঈষৎ অবান্তর হলেও বলবার প্রলোভন সম্বরণ করতে পারলুম না যে, প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ শ্রীযুত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য। ইনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুত্র।

সয়াজী রাও-এর অনুরোধেই শিল্পী নন্দলাল বসু বরোদার 'কীর্তি মন্দিরের' চারখানি বিরাট প্রাচীর চিত্র এঁকে দিয়েছেন। নন্দলাল এত বৃহৎ কাজ আর কোথাও করেননি।

নীচের কিম্বদন্তীটি পড়ে পাছে কেউ ভাবেন সয়াজী রাও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান ছিলেন না, তাই তাঁর বহু কীর্তি থেকে এই সামান্য দু-একটি উদাহরণ দিতে বাধ্য হলুম।

গল্পটি আমাকে বলেছিলেন পুব বাঙলার এক মৌলবী সায়েব—খাস বাঙাল ভাষায় বিস্তর আরবী ফারসী শব্দের বগ্‌হার দিয়ে। সে ভাষা অনুকরণ করা আমার অসাধ্য। গ্রামোফোন রেকর্ড পর্যন্ত তার হুবহু নকল দিতে পারে না।

নস্যিতে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মত ব্রহ্মটান দিয়ে বললেন—'এই বারোদা শহরে কত আজব রকমের বেশুমার চিড়িয়া ওড়াউড়ি করছে তার মধ্যিখানে সয়াজী রাও কেন যে চিড়িয়াখানা বানিয়েছেন বলা মুশকিল। তিনি নিজে তো সিঙি, অমুক ব্যাটা গাধা, অমুক শালা শূয়োর, অমুক হারামজাদা বিচ্ছু, আর আমি নিজে তো একটা আস্ত মর্কট, না হলে এদেশে আসবো কেন?—এসব মজুদ থাকতে চিড়িয়াখানা বানাবার মতলব বোধ করি জানোয়ারগুলোকে ভয় দেখাবার জন্য, যদি বড্ড বেশী তেড়িমেড়ি করে তবে খাঁচা থেকে বের করে বড় বড় নোকরি তাদের দিয়ে দেওয়া হবে।

বাইরের জানোয়ারগুলোর জ্বালায় অস্থির হলে আমি গামেশাই চিড়িয়াখানায় যাই। খুদখেয়ালি অর্থাৎ আত্মচিন্তার জন্য জায়গাটি খুব ভালো। তা সেকথা যাক্।

সয়াজী রাও বহু জানোয়ার এনেছেন বহু দেশ ঘুরে। পৃথিবীটা তিনি ক'বার প্রদক্ষিণ করেছেন, তার হিসেব তিনি নিজেই ভুলে গিয়েছেন। একবার বিলেত যাবার সময় তাঁর পরিচয় হল হাবশী দেশের রাজা হাইলে সেলাসিসের সঙ্গে।

আমাদের দেশের লোক সাদা চামড়ার ভক্ত, যে যত কালো সাদা চামড়ার প্রতি তার মোহ তত বেশী, ইয়োরোপে নাকি কালো চামড়ার আদর ঠিক সেই অনুপাতে।

একমাত্র হাবশীরাই শুনেছি আপন চামড়ার কদর বোঝে। তাই সায়েবদের দিকে তারা তাকায় অসীম করুণা নিয়ে—আহা, বেচারীদের ও-রকম ধবলকুষ্ঠ হয় কেন?

সয়াজী রাও-এর রঙ কালো। হাবশী রাজা প্রথম দর্শনেই বুঝে ফেললেন, আমাদের মহারাজার খানদান অতিশয় শরীফ; কোনো রকমের বদ্-জাত ধলা খুন তার কুলজি-ঠিকুজিতে কভি-ভী দাখিল হতে পারেনি। এ খুনের জন্য আমীর-ওমরাহ, নোকর-খিদ্‌মৎগার আপন খুন বহাতে হামেহাল হরবকত হাজির।

হাবশী-রাজ সয়াজী রাও-এর দরাজদিলের নিশানও ঝট্‌পট্ পেয়ে গেলেন। জাহাজেই রাজার জন্মদিন পড়েছিল—সয়াজী রাও তাঁকে একখানা খাসা কাশ্মীরী শাল ভেট দিলেন। হাবশী সে-শাল পেয়ে খুশীর তোড়ে বে-এক্তেয়ার। জাহাজময় ঘুরে-ফিরে সবাইকে সে-শাল দেখালেন, লালদরিয়ার গরমিকে একদম পরোয়া না করে সেই লাল শাল গায়ে দিয়ে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করলেন। চোরচোট্টার ভয়ে শেষতক্ তিনি শালখানা কাপ্তান সায়েবের হাতে জিম্মা দিলেন।

হাবশী-রাজও কিছু নিকৃষ্ট মনুষ্য নন। সয়াজী রাও-এর দিল-তোড় মহব্বতের বদলে তিনি কি সওগাত দেবেন সে বাবতে বহুৎ আন্দিশা করেও তিনি কোনো ফৈসালা করে উঠতে পারলেন না। তাঁর রাজত্বে আছেই বা কি? দুশ্চিন্তায় হাবশী রাজার কালো মুখ আরো কালো হয়ে গেল।'

আমি বললুম, 'অসম্ভব! আমি মিশরে থাকার সময় বিস্তর হাবশী দেখেছি। তারা খানদানী নয়—তাদের মুখই আরো কালো করা যায় না, খুদ হাবশীরাজের কথা বাদ দিন।'

মৌলবী সাহেব রাগ করে বললেন, 'ঝকমারি! হাজার দফা ঝকমারি তোমাদের মত বদরসিককে গল্প বলা। পঞ্চম জর্জের রঙ তো ফর্সা তবে কি ভয় পেলে তাঁর রঙ আরো ফর্সা হয় না?'

আমি 'আলবৎ আলবৎ' বলে মাপ চাইলুম।

মৌলবী সাহেব বললেন, 'শেষটায় হাবশীরাজ মহারাজের সেক্রেটারির সঙ্গে ভাব জমিয়ে বহুৎ সওয়াল-জবাব করলেন আর মনে মনে একটা ভেট ঠিক করে নিলেন।

সে বৎসর গরম পড়েছিল বেহদ্। লু চলেছিল জাহান্নামের হাওয়া নিয়ে, আর আকাশ থেকে ঝরেছিল দোজখের আগুন। 'সয়াজী সরোবরের' বেবাক নিলুফরী পানি খুদাতালা বেহেশ্‌ত বাসিন্দাদের জন্য দুনিয়ার মাথট হিসেবে তুলে নিয়েছিলেন, আর বরোদার জৈনরা পাখীদের জন্য গাছে গাছে জল রেখেছিল

হাজারো রুপিয়া খর্চা করে। শুকনো গরমের জুলুমে আমার দাড়ি গোঁপ পর্যন্ত যখন পট পট করে ফেটে যাচ্ছিল এমন সময় শহরময় খবর রটলো, হাবশী বাদশাহ হাইলে সেলাসিস মহারাজা সয়াজী রাওকে এক জোড়া সিংহ-সিংহী তোফা পাঠিয়েছেন, —তাঁর মুল্লুকের সব চেয়ে বড় জানোয়ার। 'হিজ হাইনেস সয়াজী রাও মহারাজ সেনা-খাস-খেল বাহাদুর, ফরজন্দ-ই-দৌলত-ই-ইন্‌কলিসিয়া, শমশের জঙ্গ বাহাদুরের কদমের ধুলো হবার কিম্মৎ এদের নেই, তবু যদি মহারাজ মেহেরবাণী করে এদের গ্রহণ করেন, তবে হাবশী বাদশাহ বহুৎ, বহুৎ খুশ হবেন।'

সেই গরমের মাঝখানে খবরটা রটল আগুনের মত। আর গুজোব রটল ধুঁয়োর মত, তার চেয়েও তাড়াতাড়ি। কেউ বলে, 'ওরকম জোড়া-সিংগি লণ্ডন শহরের চিড়িয়াখানাতেও নেই', কেউ বলে, 'হাবশী বাদশা খাস ফরমান দিয়ে মানুষের মাংস খাইয়ে খাইয়ে এদের তাগড়া করিয়েছেন', কেউ বলে, 'এদের গর্জনের চোটে জাহাজের তাবৎ লস্কর-সারেঙ বদ্ধ কালা হয়ে গিয়েছে।' আরো কত আজগুবি কথা যে রটল তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

সয়াজী রাও যে খুশ হয়েছিলেন সে সংবাদটাও শহরে রটল। চিড়িয়াখানার ম্যানেজারের উপর হুকুম হল হাবশী সিংগির জন্য খাস হাবেলি তৈরী করবার। কামাররা সব লেগে গেল খাঁচা বানাতে—দিনভর দমাদ্দম লোহা পেটার শব্দ শুনি, আর শহরের ছোঁড়ারা তখন থেকেই খাঁচার চতুর্দিকে ঝামেলা লাগিয়ে মেহমানদের তসবির-সুরৎ নিয়ে খুশ-গল্প জুড়ে দিয়েছে।

ম্যানেজার বোম্বাই গেলেন সিংগিদের আদাব-তসলিমাত করে বরোদা নিয়ে আসার জন্য। সেখান থেকে তারে খবর এল মেহমানরা কোন গাড়িতে বরোদা পৌঁছবেন। সেদিন শহরের ছ'আনা লোক স্টেশনে হাজিরা দিল—হুজুরদের পয়লা নজরে দেখবার জন্য। হাবেলিতে যখন তাদের ঢোকানো হল, তখন শহরের আর বড় কেউ বাদ নেই। সয়াজী মহারাজ শুনলেও গোসা করবেন না বলে বলছি, খুদ তাঁকে দেখবার জন্যও কখনো এরকমধারা ভিড় হয়নি।

আমিও ছিলুম। আর যা দেখলুম তার সামনে দাঁড়াবার মত আর কোনো চীজ আমি কখনো দেখিনি। আমার বিশ্বাস এ-জোড়া সিংগি দেখার পর আর কেউ খুদাতালায় অবিশ্বাস করবে না। তোমরা কি সব বলো না, 'নেচার' 'নেচার' —সব কিছু নেচার বানিয়েছে—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'আমি তো কখনো বলিনি।'

মৌলবী সাহেব ট্যারচা হাসি হেসে বললেন, 'সিংগি দুটোর সামনে কাউকে

আমি বলতেও শুনিনি। তোমাদের ঐ নেচার কোন কোন জিনিস পয়দা করেছেন জানিনে কিন্তু এরকম সিংগি বানানো তাঁর বাপেরও মুরদের বাইরে।

কী চলন, কী বৈঠন, ক্যা পশম, ক্যা গর্দন! পায়ের নখ থেকে দুমের লোম পর্যন্ত সব কুছ গড়া হয়েছে, স্রেফ এক চীজ দিয়ে—তাকৎ! খুদার কেরামতি বুঝবে কে, তাই তাজ্জব মেনে বার বার তাঁকে জিজ্ঞেস করি, 'এ রকম মাতব্বরকে তুমি এ-দুনিয়ার রাজা না করে মানুষের হাতে সব কিছু ছেড়ে দিলে কেন?'

সিংগি জোড়াকে দেখবার জন্য অহমদাবাদ, আনন্দ, ভরোচ, সুরট এমন কি বোম্বাই থেকে লোক আসতে লাগল। ফুল ফুটলে কেউ লক্ষ্য করে, কেউ করে না, চাঁদ উঠলে কেউ খুশী হয়, কেউ তাকায় না, কিন্তু এ-জোড়া সিংগি দেখে মনে মনে এদের পায়ে তসলিম দেয়নি, এ রকম লোক আমি কখনো দেখিনি।

তবে আমি নিজে এদের দেখেছি সব চেয়ে বেশী। কোঁচড় ভরে ছোলাভাজা নিয়ে সামনের গাছতলায় বসে আমি দিনের পর দিন কাটিয়ে দিয়েছি এই রাজা-রাণীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। তাঁদের ভাষা বুঝিনি এ কথা সত্য, কিন্তু একটা হক বাৎ আমি তাঁদের ঘোঁতঘোঁতানি থেকে সাফ সাফ বুঝে নিয়েছিলুম, সেটা হচ্ছে এই—হিন্দুস্থান মুল্‌কটা হুজুরদের বিলকুল পছন্দ হয়নি।

তাই যেদিন ফজরের নমাজ পড়ার পর শুনতে পেলুম সিংগিটা মারা গিয়েছে তখন আশ্চর্য হলুম না বটে কিন্তু পাগলের মত ছুটে গেলুম চিড়িয়াখানায় আর পাঁচজনেরই মত। ভোরের আলো তখনো ভালো করে ফোটেনি, দেখি এর-ই মাঝে জলসা জমে গিয়েছে। সবাই মাটিতে বসে গালে হাত দিয়ে খাঁচাটার দিকে তাকিয়ে আছে, যেন এক হাট লোকের সক্কলেরই বড় ব্যাটা মারা গিয়েছে।

আর সিংহরাজ শুয়ে আছেন পুবদিকে মুখ করে। আহাহা, কী জৌলুস কী বাহার! দেখে চোখ ফেরাতে পারলুম না। জ্যান্ত অবস্থায় চলাফেরার দরুনই হোক অথবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক তার সম্পূর্ণ শরীরের পরিমাণটা যেন আমার চোখে ঠিক ধরা দেয় নি, আজ স্পষ্ট দেখতে পেলুম কতখানি জায়গা নিয়ে হুজুর শেষ-শয্যা পেতেছেন। মনে মনে বললুম, আলবৎ আলবৎ। এই শেষশয্যা দেখেই কবি ফিরদৌসী তাঁর শাহনামা কাব্যে সোহরাবের মৃত্যুশয্যার বর্ণনা করেছেন।

আর সিংগিনী! সে বোধ হয় তখনো ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি। সিংগির চতুর্দিকে চক্কর লাগাচ্ছে তার গা শুঁকছে আর আমাদের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন কোনো মহারাণী ব্যাপারটা না বুঝতে পেরে প্রধানমন্ত্রীকে সওয়াল করছেন।

বিহানের পয়লা সোনালি রোদ এসে পড়ল সিংহের কেশরে। শাহান-শাহ বাদশার সোনার তাজে যেন খুদাতালা আপন হাতে গলা-সোনা ঢেলে দিলেন। যে তসবিরে চোখ ভরে নিয়ে আমি বাড়ি ফিরলুম।

বরোদা শহর শোকে যেন নুয়ে পড়ল। যেখানে যাও, ঐ এক কথা, আমাদের সিংহ গত হয়েছেন।

সেদিন স্কুল কলেজ বসলো না, ছেলে-ছোকরারা খাঁচার সামনে বসে আছে,—চুপ করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে কারো মুখে কথাটি নেই। আপিস-আদালত পর্যন্ত সেদিন নিমকাম করলো।

সিংগির লাশ বের করতে গিয়ে ম্যানেজারের জিভ বেরিয়ে গেল। সিংগিনী খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে; খাবার লোভ দিয়ে যে তাকে পাশের খাঁচায় নিয়ে এ-খাঁচা থেকে লাশ বের করা হবে তারো উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত কি কৌশলে মুশকিল ফৈসালা হল জানিনে, আমি দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়েছিলুম।

তারপর আরম্ভ হল সিংগিনীর গর্জন আর দাবড়ানো। সমস্ত দিন খাঁচার ভিতর মতিচ্ছন্নের মত চক্কর খায় আর মাঝে মাঝে লাফ দিয়ে খাঁচার দেয়ালে দেয় ধাক্কা। এরকম খাঁচা ভাঙবার মতলব আগে কখনো সিংহ সিংহী কারো ভিতরেই দেখা যায়নি। এখন সিংগিনী খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে কিন্তু বেড়ে গেছে খাঁচাটাকে ভাঙবার চেষ্টা। সেই দুর্বল শরীর নিয়ে কখনো সমস্ত তাগদ দিয়ে খাঁচায় দেয় ধাক্কা, কখনো শিকগুলোকে খামচায়, আর কখনো লাফ দিয়ে তেড়ে এসে মারে জোর গোত্তা। সে কী নিদারুণ দৃশ্য!

সয়াজী রাও খবর পেয়ে হুকুম দিলেন, 'বাঢ়িয়া, উম্‌দা হাবশী সিংহ যোগাড় করার জন্য আদিস আব্বাবার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনা করো, কিন্তু সাবধান হাবশীরাজ যেন খবর না পান তাঁর দেওয়া সিংহ মারা গিয়েছে। আর ততদিনের জন্য কাঠিয়াওয়াড থেকে একটা দিশী সিংহ আনবার ব্যবস্থা করো। সেও যেন উম্‌দাসে উম্‌দা হয়, রুপেয়া কা কুছ পরোয়া নহী।'

সয়াজী রাও বাদশার দয়ার শরীর, তাঁর লোমে লোমে মেহেরবাণী। খুদাতালা তাঁর জিন্দেগী দরাজ করুন, হরেক মুশকিল আসান করুন—বরোদার সিংহই বুঝতে পারে হাবশী সিংগিনীর দর্দ।

এক মাস বাদে বর এলেন কাঠিয়াওয়াড় থেকে। এ-এক মাস আমি চিড়িয়াখানায় যাইনি। পাঁচজনের মুখে শুনলুম, সিংগিনীর দিকে তাকানো যায় না—তার চোখমুখ দিয়ে আগুনের হল্কা বেরচ্ছে।'

মৌলবী সায়েব গল্প বন্ধ করে জানালার দিকে কান পেতে বললেন, 'আজান পড়লো। তাড়াতাড়ি শেষ করি।

দুল্‌হাকে যখন খাঁচায় পোরা হবে তখন 'চার আঁখে' মিলবার তসবির দেখার জন্য আমি আগেভাগেই খাঁচার সামনে গিয়ে হাজির হলুম। সিংগিনীর চেহারা দেখে আমার চোখে জল এল। অসম্ভব রোগা দুর্বলা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তেজ কমেনি এক রত্তিও।

কাঠিয়াওয়াড়ের দামাদ এলেন হাতী-টানা গাড়িতে করে। তিনিও কিছু কম না। কিন্তু হাবশী সিংগির যে তসবির আমার মনের ভিতর আঁকা ছিল তাঁর তুলনায় বে-তাগদ, বে-জৌলুস, বে-রৌশন। সিংহ হিসেবে খাবসুরৎ, কিন্তু দুল্‌হা হিসাবে না-পাস্‌।

খাঁচার দরজা দিয়ে দামাদ ঢুকলেন আস্তে আস্তে। সিংগিনী এক কোণে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে এমন এক অদ্ভুত চেহারা নিয়ে যে আমি তার কোনো মানেই করতে পারলুম না।

তারপর যা ঘটলো তার জন্যে আমরা কেউ তৈরী ছিলুম না। হঠাৎ সিংগিনী এক হনুমানী লম্ফ দিয়ে, খাঁচা ইস-পার উস-পার হয়ে পড়লো এসে সিংগির ঘাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তিন কিম্বা চার-খানা বিরাশি শিক্কার থাবড়া! কঠিয়াওয়াড়ি দামাদ ফৌত! বিলকুল ঠাণ্ডা!'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'সে কি কথা?'

মৌলবী সায়েব বললেন, 'এক লহমায় কাণ্ডটা ঘটলো; কেউ দেখলো, কেউ না।'

আমি বললুম, 'একটা লড়াই পর্যন্ত দিলে না?'

মৌলবী সায়েব বললেন, 'না।'

আমি বললুম, 'তারপর?'

মৌলবী সায়েব বললেন, 'তারপর আর কিছু না। আমি এখন চললুম, গল্পে মেতে গেলে আমার আর কোনো হুঁশ থাকে না।'

দরজার কাছে গিয়ে মৌলবী সায়েব থামলেন। বললেন, 'হুঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি।

'খবরটা সয়াজী রাও-এর কাছে পৌঁছে দিতে কেউই সাহস পান না। শেষটায় তাঁর খাস পেয়ারা শহর-কাজী আর ধর্মাধিকারী নাড্‌কর্ণিকে ধরা হল। তাঁরা যখন খবরটা দিলেন তখন মহারাজ নাকি একদম কোনো রকমেরই চোটপাট

করলেন না। উল্টে নাকি মুচকি হাসি হেসে বললেন,

'আমি যখন বিধবা-বিবাহের জন্য একটা নয়া আন্দোলন আরম্ভ করতে চেয়েছিলুম তখন তোমরাই না গর্ব করে বলেছিলে, এদেশের খানদানী বিধবা—তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক—নূতন বিয়ে করতে চায় না? হাবশী সিংগিনী এদেরও হার মানালে যে!' '

রাক্ষসী

আরাম-আয়েশ ফুর্তি-ফার্তির কথা বলতে গেলেই ইংরেজকে ফরাসী শব্দ ফরাসী ব্যঞ্জনা ব্যবহার করতে হয়। 'জোয়া দ্য ভিভ্‌র' (শুদ্ধমাত্র বেঁচে থাকার আনন্দ), 'বঁ ভিভ্‌র' (আরামে আয়েশে জীবন কাটানো),'গুরমে' (পোষাকি খুশখানেওলা), 'কনেস্যুর' (সমঝদার, রসিকজন) এসব কথার ইংরিজি নেই। ভারতবর্ষে হয়ত এককালে ছিল, হয়ত কেন, নিশ্চয়ই ছিল,—মৃৎশকটিকা মালতীমাধব নাট্যে আরাম আয়েশের যে চৌকশ বর্ণনা পাওয়া যায় তার কুল্লে মাল তো আর গুল-মারা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—আজ নেই এবং তার কারণ বের করার জন্যও ঘেরণ্ড সংহিতা ঘাঁটতে হয় না। রোগশোক অভাবঅনটনের মধ্যিখানে 'গুরমে' হওয়ার সুযোগ শতকে গোটেক পায় কিনা সন্দেহ—তাই খুশ-খানা, খুশ-পিনা বাবদের বেবাক ভারতীয় কথাগুলো ভাষা থেকে লোপ পেয়ে গিয়েছে, নতুন বোল-তানের প্রশ্নই ওঠে না।

তবু এই 'বঁ ভিভ্‌রের' কায়দাটা এখনো কিছু জানে পশ্চিম ভারতের পার্সী সম্প্রদায়। খায়দায়, হৈ-হুল্লোড় করে, মাত্রা মেনে ফষ্টিনষ্টি ইয়ার্কি-দোস্তি চালায় এবং তার জন্য দরকার হলে 'ঋণং কৃত্বা' নীতি মানতেও তাদের আপত্তি নেই। 'তাজ' হেটেলে বসে মাসের মাইনে এক রাত্তিরে ফুঁকে-দেনে-ওলা বিস্তর পার্সী বোম্বাইয়ে আছে আর গোলাপী নেশায় একটুখানি বে-এক্তেয়ার হয়ে কোনো পার্সী ছোকরা যদি ল্যাম্প-পোস্টটাকে জড়িয়ে ধরে 'ভাই, এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি' বলে ঝপাঝপ গণ্ডাদশেক চুমো খেয়ে ফেলে তাহলে তার বউ হয় স্ন্যাপশট তোলে, নয় 'চ, চ, বাইরাম, তোর নেশা চড়েছে' বলে ধাক্কাধাক্কি দিয়ে বাড়ি নিয়ে যায়। পরদিন ক্লাবে বসে বউ 'পাগলা বাইরামের' কীর্তি-কাহিনীতে বেশ একটুখানি নুন-লঙ্কা লাগিয়ে মজলিস গরম করে তোলে, আর বাইরামের বাপ গল্প শুনে মিটমিটিয়ে

হাসে, ব্যাটার 'এলেম' হচ্ছে দেখে আপন ঠাকুর্দার স্মরণে খুশী হয়ে দু'ফোঁটা চোখের জলও ফেলে।

গাওনা বাজনায় ভারী শখ। একদল বেটোফেন ভাগনার নিয়ে মেতে আছে, আরেকদল বরোদার ওস্তাদ ফৈয়াজ খানের সাকরেদী করে, আর 'লাল্লা লাল্লা লা' গান গেয়ে নাকি বহু পার্সী বাচ্চা মায়ের গর্ভ থেকে নেমে এসেছে।

অন্য কোনো সম্প্রদায় সম্বন্ধে এ-সব কথা বলতে আমি সাহস পেতুম না, কিন্তু পার্সীদের ঈষৎ রসবোধ আছে, তা সে সূক্ষ্মই হোক্, আর স্থূলই হোক্। আলাপ জমাতেও ভারী ওস্তাদ। বিদেশীকে খাতির করে ঘরে নিয়ে যায়, বাড়ির আর পাঁচজনকে নতুন চিড়িয়া দেখাবে বলে; তাকে কাঠ বানিয়ে সবাই মিলে তার চতুর্দিকে চর্কিবাজির নাচন তুলবে বলে।

তাই বরোদা পৌঁছবার তিন দিনের ভিতরই রুস্তম দাদাভাই ওয়াডিয়া গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে আলাপচারী করলেন, বাড়ি নিয়ে গিয়ে বুড়ো বাপ, বউ, তিন ছেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরের দিনই পার্সী সম্প্রদায়ের ধান্‌সাক্ (আমাদের লুচিমণ্ডা) খাবার নেমন্তন্ন পেলুম। এবং সেদিনই খানা শেষে বললেন, 'আসছে রববার সন্ধ্যেয় বোমানজী নারিমানের দু'ছেলের নওজোত। আপনার নেমন্তন্ন রয়েছে। আসবেন ভো?'

আমি তো অবাক। এ দুনিয়ায় পার্সী বলতে আমি মাত্র এই ওয়াডিয়া পরিবারকেই চিনি। বোমানস্মী নারিমান লোকটি কে, এবং আমাকে নেমন্তন্ন করতে যাবেই বা কেন? আমি বললুম, 'নারিমানকে তো চিনিনে।'

ওয়াডিয়া বললেন, 'চিনে আপনার চারখানা হাত গজাবে নাকি (পার্সীরা ইয়ার্কি না করে কথা কইতে পারে না)? খাওয়ায় ভালো—সেইটে হ'ল আসল কথা। এই নিন আপনার কার্ড—ও দিয়েও আপনার চারখানা হাত গজাবে না। আপনি ভাববেন না আমি নারিমানের দোরে ধন্না দিয়ে এ কার্ড বের করেছি। আপনার সঙ্গে আমাদের জমে গিয়েছে নারিমান সেটা নিজের থেকেই জানতে পেরে কার্ডটা পাঠিয়ে দিয়েছে। না পাঠালে অবিশ্যি আমি একটুখানি নল চালাতুম, —আপনার মতো গুণীকে বাদ দিয়ে—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'আমি গুণী!'

ওয়াডিয়া বললেন, 'বাঁধা ছালার দাম পঁচিশ লাখ। দু'দিন বাদে সব শালা (পার্সীরা এই শব্দটি প্রায় সব কথার পিছনেই লাগায়) আপনাকে চিনে নেবে, কিছু ভয় নেই। তদ্দিন দু'পেট খেয়ে নিন। নারিমানের ছেলেদের নওজোতের

পরে আসছে সোরাবজীর মেয়ের বিয়ে, তার পর আসছে—'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'নওজোত পরবটা কি ?'

বললেন, 'এলেই দেখতে পাবেন। হিন্দুদের যেমন পৈতে হয়, পার্সীদের তেমনি 'নওজোত'। শুধু 'কস্তি' অর্থাৎ পৈতেটা বাঁধতে হয় কোমরে, আর সঙ্গে পরতে হয় একটি ছোট্ট ফতুয়া—তার নাম 'সদরা'। এই 'কস্তি'-'সদরা' দু'য়ে মিলে হল পার্সীদের দ্বিজত্বপ্রাপ্তি।'

ওয়াডিয়ার বউ রৌশন বললেন, 'যত সব সিলি স্যুপারস্টিশন্স্।'

রুস্তম বললেন, 'লঙ লিভ সচ্ স্যুপারস্টিশন্স্। এদেরই দৌলতে দু'মুঠো খেয়ে নিই। শালা বোমানজীর পেটে বোমা মারলেও সে এক পেট খাওয়ায় না। তার বাপ শালা (সবাই শালা !) বিয়ে করেছিলো বিলেতে, শ্যাম্পেনটা কেকটা ফাঁকি দেবার জন্য।'

পার্সীদের পাল্লায় পড়লে বুঝতেন। রববার বিকেল বেলা রুস্তম বউ, বেটাবাচ্চা নিয়ে গাড়ি করে আমার বাড়িতে উপস্থিত—পাছে আমি ফাঁকি দিই।

গাড়িতে বসে বললেন, 'পার্সীদের কি নাম দিয়েছে আর সব গুজরাতিরা জানেন ? 'কাগডা' অর্থাৎ ক্রো। তার প্রথম কারণ, আমরা কালো কোট টুপি পরি, দ্বিতীয় কারণ পাঁচটা পার্সী একত্র হলেই কাকের মত কিচির-মিচির করি, তৃতীয় কারণ কাকের মত খাদ্যাখাদ্য বিচার করিনে—জানেন তো আর সব গুজরাতিরা শাক-খেকো—, চতুর্থ কারণ আমাদের নাকটা কাকের মতো বাঁকানো আর শেষ কারণ মরে গেলে কাকে আমাদের মাংস খায়।' তার পর হো-হো করে খুব খানিকটা হেসে নিয়ে বললেন, 'গুজরাতিদের রসবোধ নেই, সবাই জানে, কিন্তু এ রসিকতাটা মোক্ষম।'

আমি বললুম, 'সব হিন্দুই একবার স্মোক্ করে, সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস থাক আর নাই থাক, সেটা জানেন ?'

বললেন, 'কি রকম ?'

'তাদের তো পোড়ানো হয়, দেন্ দে স্মোক্।'

রৌশন বললেন, 'তবু ভালো, শকুনির ছেঁড়াছেঁড়ির চেয়ে স্মোক্ করা ঢের ভালো।'

আমি বললুম, 'কেন ? চারটে শকুনি যদি এক পেট খেতে পায় তাতে আপত্তিটা আর কি ? এই আপনাদের বোমানজী যদি জ্যান্ত অবস্থায় কাউকে

খাওয়াতে না চায় তবে না হয় মরে গিয়েই খাওয়াল।'

রৌশন বললেন, 'আপনি জানেন না তাই বলছেন। বোম্বায়ে টাওয়ার অব সায়লেন্সের আশ-পাশের কোনো বাড়িতে কখনো বাসা বাঁধলে জানতেন। একটা শকুনি হয়ত একটা মরা বাচ্চার মাথাটা নিয়ে উড়ে যাচ্ছে আপনার বাড়ির উপর দিয়ে, আরেক শকুনির সঙ্গে লাগলো তখন তার লড়াই। ছিটকে পড়ল মুণ্ডুটা আপনার পায়ের কাছে, কিংবা মাথার উপরে। ভেবে দেখুন তো অবস্থাটা। তিন বছরের বাচ্চার মুণ্ডু, গলাটা ছিঁড়েছে শকুনে—'

আমি বললুম, 'থাক্, থাক্।' কিন্তু আশ্চর্য, ওয়াডিয়ার বাচ্চা দুটো শিউরে উঠলো না কিংবা মাকে এ সব বীভৎস বর্ণনা দিতে বারণ করল না। অনুমান করলুম, এরা ছেলেবেলা থেকেই এ-বিষয়ে অভ্যস্ত।

নওজোত অনুষ্ঠান হচ্ছিল একটা প্ল্যাটফর্মের উপর। সাদা জাজিমে মোড়া। দুটি আট-ন' বছরের বাচ্চা দাঁড়িয়ে, আর চারজন 'দস্তুর' (পুরোহিত) আবেস্তা, পহ্লবী ভাষায় গড়গড় করে মন্ত্র উচ্চারণ করে যাচ্ছেন। এককালে যজ্ঞোপবীত দেবার সময় পুরোহিত ছেলেটাকে মন্ত্রোচ্চারণ দিয়ে বোঝাতেন যজ্ঞোপবীতের দায়িত্ব কি, আজ যে সে উপবীত ধারণ করতে যাচ্ছে তার অর্থ ;—মায়ের কোল আর খেলাধূলো তার জন্য শেষ হল, সে আজ সমাজে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। এখন ক'টা ছেলে এ সব বোঝে তা জানিনে, কিন্তু এটা স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, 'নওজোত'ও উপনয়নের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে,—যে মন্ত্র উচ্চারণ করা হচ্ছে তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হচ্ছে।

ফিস ফিস করে কথা বলতে মানা নেই। আমি রুস্তমকে আমার গবেষণামূলক তত্ত্ব-চিন্তাটি অতিশয় গাম্ভীর্য সহকারে নিবেদন করাতে তিনি বললেন, 'আপনার তাতে কি, আমারই বা তাতে কি ? রান্নাটা ভালো হলেই হলো।'

বুঝলুম, 'ইতর জনের জন্য মিষ্টান্ন'—প্রবাদটি সর্বদেশে প্রযোজ্য।

নওজোত শেষ হয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে নামল ঝমাঝ্ঝম বৃষ্টি। অকালে এ রকম বৃষ্টির জন্য কেউ তৈরী ছিলেন না। নিমন্ত্রিত রবাহুত সবাই ছুটে গিয়ে উঠলেন বাড়ির বারান্দায়। তারপর বৃষ্টির ঝাপটা খেয়ে, একদল ড্রইং-রুমে, আরেক দল ডাইনিং-রুমে, আত্মীয় কুটুমরা বেড্-রুমে ঢুকলেন। আমাকে রুস্তম নিয়ে গেলেন ছোট্ট একটা কুঠুরিতে, বোধ হয় বাচ্চা দুটোর পড়ার ঘর।

আমরা জনা-বারো সেই কুঠুরিতে কাঁঠাল-বোঝাই হয়ে বসলুম। সকলের শেষে এসে ঢুকলেন এক বুড়ো পার্সী দু'বগলে দু'বোতল মদ নিয়ে। আমরা কয়েক

জন হিন্দু মুসলমান নিরামিষ ছিলুম, আমাদের জন্য এল আইসক্রীম, লেমনেড।

বুড়ো একটা বোতল ছেড়ে দিলেন মজলিসের জন্য। অন্য বোতলটা নিজে টানতে লাগলেন নির্জলা। বিলেতে পালাপরবে, ঘরেবাইরে সর্বত্রই মদ খাওয়া হয়, তাই এস্তার মদ খাওয়া দেখেছি কিন্তু দশ মিনিট যেতে না যেতেই বুঝলুম, এ বুড়ো তালেবর ব্যক্তি। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে পেশাদারী ব্রাহ্মণের পাইকারি বহ্বান্ন ভক্ষণের মত এঁর পাইকারি পান দ্রষ্টব্য বস্তু।

মদ খেলে কেউ হয়ে যায় ঝগড়াটে, কেউ বা আরম্ভ করে বদ রসিকতা, কেউ করে খিস্তি, আর কেউ হয়ে যায় যীশুখ্রীষ্ট,—দুনিয়ার তাবৎ দুঃখকষ্ট সে তখন আপন স্কন্ধে তুলে নিতে চায়, আর সবাইকে গায়ে পড়ে টাকা ধার দেয়; পরের দিন অবশ্য চাকরের উপর চালায় চোট-পাট, ভাবে (পার্সী হলে) ঐ শালাই মোকা পেয়ে টাকাটা লোপাট মেরেছে।

আমি গিয়েছিলুম এক কোণে, দেয়ালে হেলান দিয়ে বসব বলে। বোতলটি আধঘণ্টার ভিতর শেষ করে বুড়ো এসে বসলেন আমারই পাশে। আমি একটু সঙ্কুচিত হয়ে স্থান করে দিলুম। বুড়ো শুধোলেন, 'আপনি এ-শহরে নূতন এসেছেন?' আমি কীর্তিটা অস্বীকার করলুম না। বললেন, 'তাই ভাবছেন আমি মাতাল?'

বুঝলুম ইনি যীশুখ্রীষ্ট টাইপ নন, ইনি হচ্ছেন মেরি ম্যাগডলীন টাইপ,—অনুশোচনায় ক্ষতবিক্ষত। বললুম, 'কই আপনি তো দিব্য আর পাঁচজনের মত কথা কইছেন।'

বললেন, 'এক বোতলে আমার কিছু হয় না, পাঁচ বোতলেও কিছু হয় না, দশ বোতলেও না—যদিও অতটা কখনো খেয়ে দেখিনি।'

সত্যি, লোকটার গলা সাদা, চোখের রঙ থেকেও বিশেষ কিছু অনুমান করা যায় না—বুড়োবয়সের ঘোলাচোখে রঙের ফেরফার সহজে ধরা পড়ে না। পাকা বাঁশে তেল লাগালেও একই রঙ।

বললুম, 'তাহলে না খেলেই পারেন।'

বললেন, 'খাই না তো, হঠাৎ ও-রকম অকালে বৃষ্টি না নামলে।'

মদ খাওয়ার নানা অজুহাত বাজারে চালু আছে। এটা নতুন। বৃষ্টির জলের সঙ্গে নামল বটে কিন্তু ধোপে টিকবে না। বললুম 'হুঁ।'

'আপনিও খেতেন।'

'? ? ? ?'

'সে অবস্থায় পড়লে।'

আমি শুধালুম, 'কোন্ অবস্থায়?' তারপর বললুম, 'কিন্তু আপনি আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন কেন? বিশেষতঃ আপনার ধর্মে যখন ও জিনিস বারণ নয়।'

'আপনাকে বোঝাবার চেষ্টা করছি কারণ আর সবাই জানে—'

আমি বললুম, 'তাহ'লে বলুন।'

বললেন, 'রুস্তম বলছিল, আপনি নাকি পুব-ভারতের লোক, পার্সীদের আচার-ব্যবহার পালা-পরব সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। টাওয়ার অব সায়লেন্স কাকে বলে জানেন?'

আবার 'মৌন শিখর'! বললুম, 'আজই প্রথম শুনেছি।'

বললেন, 'কুয়োর মত গোল করে গড়া হয়। আর দেয়ালের ভিতরের দিকে বড় বড় শেলফের মত কুলুঙ্গি বা 'নিশ্' কাটা থাকে। সেগুলোর উপর মড়াকে বিবস্ত্র করে শুইয়ে দেওয়া হয়। বোম্বাই-টোম্বাই অঞ্চলে বিস্তর শকুনি ওত পেতে বসে থাকে, তিন মিনিটের ভিতর হাড্ডিগুলো ছাড়া সব কিছু সাফ করে দেয়। কিন্তু ভিতরে গিয়ে এ-সব দেখবার হুকুম নেই। একমাত্র 'শববাহক'ই ভিতরে যায়। এই যে নওজোতের সময় 'দস্তুর'দের দেখলেন তেমনি পার্সীদের ভিতরে বিশেষ 'শববাহক' সম্প্রদায় আছে। টাওয়ার অব সায়লেন্সের ভিতর যা কিছু করার তারাই সব করে। এমন কি 'দস্তুর'দেরও ভিতরে যাওয়া বারণ।

'আমার জন্ম মধুগাঁয়ে, সেখানেই প্রায় সমস্ত জীবন কাটিয়েছি। মধুগাঁও সি-পিতে। আপনি কখনো যাননি? তাহ'লে বুঝতেন গ্রীষ্মকালে সেখানে কি রকম গরম পড়ে। আর সে গরম একদম শুকনো—বোন্-ড্রাই। দেয়ালের কেলেণ্ডার বেঁকে যায়, বইয়ের মলাট বাঁকতে বাঁকতে কেতাব থেকে খসে পড়ে, টেবিলটা পর্যন্ত পিঠ বাঁকিয়ে বেরালটার মত লড়াইমুখো হয়ে ওঠে। এমন কি মানুষেরও রস-কষ শুকিয়ে যায়। হাতাহাতির ভয়ে গরমের দিনে একে অন্যে কথাবার্তা পর্যন্ত হয় নিক্তি-মেপে।

'সেই গরমে মারা গেল এক আশি বছরের হাড্ডি-সার বুড়ী। আমার ছেলেবেলায় তিনি ছিলেন যুবতী—বকা ছোঁড়ারা তখনই তাঁর নাম দিয়েছিল 'ঝরাপাতা', 'কুকুরের জিভ'। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুকোতে শুকোতে শেষ পর্যন্ত রইল চামড়ায় জড়ানো খান কয়েক হাড্ডি। আর স্বভাব ছিল এমনি খিটখিটে যে আমরা পারতপক্ষে তার বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে যেতুম না।

বিশ্বাস করবেন না, বেটি বারান্দায় বসত এক গাদা মুড়ি নিয়ে। কেউ ভুলেও তার বাড়ির সামনে দাঁড়ালে বুড়ী সেই মুড়ী ছুঁড়তে আরম্ভ করত তাগ করে। —আর সে কী মোক্ষম তাগ! 'প্র্যাক্‌টিস মেক্‌স্ পার্ফেক্ট' রচনায় এক ছোঁড়া বুড়ীর উদাহরণ নিয়ে আমার কাছ থেকে ফুলমার্ক পোয়ছিল।

'বুড়ীর ত্রি-সংসারে কেউ ছিল না, প্রকাণ্ড একটা কুকুর ছাড়া। কিন্তু কুকুরটার উপর তো আর বুড়ীর শেষ ক্রিয়ার ভার ছেড়ে দেওয়া যায় না। ভারটা পড়লো আমাদের ঘাড়েই। মহাবিপদে পড়ল মধুগাঁয়ের পার্সী সম্প্রদায়।

'এককালে মধুগাঁয়ে বিস্তর পার্সী বসবাস করতো বলে তারা শহরের মাইল খানেক দূরে ভাল টাওয়ার অব সায়লেন্স বানিয়েছিল। আপন 'শববাহক'ও জন-আষ্টেক ছিল। কিন্তু সে হল সত্তর-আশি বৎসরের কথা। ইতিমধ্যে পার্সী সংখ্যা ক্রমে ক্রমে কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র দশ বারোটি পরিবারে। তাই মৃত্যুর হার এসে দাঁড়িয়েছে বছরে এক কিংবা তার চেয়েও কম। টাওয়ার অব সায়লেন্সের শকুনগুলো পর্যন্ত পালিয়েছে না খেয়ে মর-মর হয়ে। মানুষের বুদ্ধি শকুনের চেয়ে বেশী তাই 'শববাহকে'র দল শকুনগুলোর বহুপূর্বেই মধুগাঁও ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

'তাই সমস্যা হল বুড়ীকে বয়ে নিয়ে যাবে কে? এসব ব্যাপারে পার্সীরা বামুনদের চেয়ে তিনকাঠি বেশী গোঁড়া। 'শববাহক' না হলে তো চলবে না—বরঞ্চ পার্সী সম্প্রদায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে তিন দিন কাটিয়ে দেবে তবু 'শববাহক' ভিন্ন কেউ মড়া ছুঁতে পারবে না।

'টেলিগ্রাম করা হল এক আঁটা—চতুর্দিকের পার্সীদের কাছে, পার্সী-ধর্ম লোপ পায়, পার্সী-ঐতিহ্য গেল গেল, তোমরা সব আছো কি করতে, চারটে 'শববাহক' না পেলে মধুগাঁও উচ্ছন্ন যাবে, সৃষ্টি লোপ পাবে।

'শববাহকেরা শেষটায় এল। এক ছোকরা 'দস্তুর' তখনো মিসিং লিঙ্কের ন্যাজের মত খসি-খসি করে মধুগাঁয়ের পশ্চাদ্দেশে ঝুলছিল, সে মন্তর-ফন্তরগুলো সেরে দিলে—হোলি জিসসই জানেন তার কতটা শুদ্ধ কতটা ভুল।

'সেই মার্চ মাসের আগুনের ভিতর দিয়ে চারটে শববাহক, 'দস্তুর'জী আর আমারই মত আরো দুই মূর্খ গেলুম টাওয়ার অব সায়লেন্সে। গেটের কাছে শববাহক ছাড়া আর সবাইকে দাঁড়াতে হল। একটা গাছ পর্যন্ত নেই যার ছাওয়ায় একটু কম গরম হই। সান্ত্বনা এইটুকু যে শববাহকেরা রেকর্ড টাইমের ভিতর বেরিয়ে এল। গেটে তালা মেরে আমরা সবাই ধুঁকতে ধুঁকতে শহরে ফিরে এলুম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম আর যদি কখনো ঐ হতভাগা টাওয়ারে যেতে হয় তবে যাব,

শেষবারের মত, শববাহকদের কাঁধে চেপে।

'কিন্তু খুদার কেরামতির কে ভেদ করবে বলো? তিন মাস যেতে না যেতে মরলেন আমার বিধবা পিসি—বাবা বিদেশে, মা বহুকাল পূর্বেই গত হয়েছেন। বাড়িতে সোমত্থ আর কেউ নেই। আমি পাগলের মত শববাহকের সন্ধানে দুনিয়ার চেনা অচেনা সবাইকে তার করলুম। মে মাসের অসহ্য গরম পড়েছে আকাশ ভেঙে—মধুগাঁয়ে যে ক'ফোঁটা বিষ্টি হয় সে জুলাই মাসে, তার পূর্বে ও মুল্লুকে কখনো মেঘ করেনি, বৃষ্টি ঝরেনি। ধরণী যে ঠাণ্ডা হবেন তার কোনো আশা-ভরসা নেই জুলাই মাস পর্যন্ত। 'দস্তুর'টিও ইতিমধ্যে ন্যাজটার মত খসে পড়েছেন, তারই বা সন্ধান পাই কোথায়?

'ভাগ্যিস্ আমি ইস্কুল মাস্টার। আমার ছেলেরা ছুটলো এদিক ওদিককার শহরে। তারা সব হিন্দু, দু'একটি মুসলমান—কিন্তু গুরুর দায় বুঝতে পেরে কেউ সাইকেলে চড়ে, কেউ লোকাল ধরে এমনি লাগা লাগলো যে মনে হল তারা বুঝি কুয়েশচেন পেপার লীক হওয়ার সন্ধান পেয়েছে। ভগবান তাদের মঙ্গল করুন, সব কিছুরই ব্যবস্থা হয়ে গেল।

'ছেলেদের বললুম, 'বাবারা আমায় বাঁচালে। কিন্তু আর না। তোমাদের আর সঙ্গে আসতে হবে না। আর শোনো, এই গরমে যদি টাওয়ার যেতে আসতে আমি মরি তাহলে আমাকে পুড়িয়ে ফেলো, না হয় গোর দিয়ো।'

আমি বললুম, 'সে কি কথা?'

আমার কথা যেন আদপেই শুনতে পাননি সেই রকম ভাবে বলে যেতে লাগলেন, 'যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কড়াইয়ে গরম তেল ফুটছে আর আমি তারই ভিতর সাঁতার কেটে কেটে টাওয়ারের দিকে চলেছি। এক পা ফেলি আর ভাবি এ-দুনিয়ায় এই শেষ পা ফেলা, পরের কদমেই দেখব জাহান্নমের বুকিং আপিসের সামনে 'কিউয়ে' পৌঁছে গিয়েছি— স্বর্গে যাওয়ার হলে ভগবান এই কড়াই-ভাজার প্র্যাকটিস কপালে লিখবেন কেন?

'টাওয়ার অব সায়লেন্সের সামনে এসে বসে পড়েছি। 'দস্তুর'জীর শেষ মন্ত্রোচ্চারণ আমার কানে এসে পৌঁচচ্ছে যেন কোন দূরদূরান্ত থেকে। বোঝা-না-বোঝার মাঝখানে দিয়ে যেন কিছু দেখছি, কিছু শুনছি, শাববাহকেরা ক্লান্ত শ্লথ গতিতে মড়া নিয়ে টাওয়ারের ভিতর ঢুকল।

'তার পর মুহূর্তেই আমার সমস্ত চৈতন্য ফিরে এল, টাওয়ারের ভিতর থেকে একসঙ্গে অনেকগুলো তীব্র তীক্ষ্ণ চীৎকার শুনে। সে চীৎকারে ছিল মাত্র

একটা জিনিস—ভয়। যারা চীৎকার করলো তারাই যে শুধু ভয় পেয়েছে তা নয়, সে চীৎকার যেন স্পষ্ট ভাষায় বললো, আর কারো নিস্তার নেই।

'সঙ্গে সঙ্গে চারজন শববাহকের দুজন পাগলের মত হাত পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে এদিক ওদিক টাল খেয়ে খেয়ে ছুটে বেরিয়ে এল গেট দিয়ে। একজন আমাদের দিকে তাকিয়েই একমুখ ফেনা বমি করে পড়ল 'দস্তুর'জীর পায়ের কাছে, আরেকজন দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে সেই রকম টাল খেয়ে খেয়ে যে কোন দিকে চলল সে জানে না, 'দস্তুর'জীও একবার তার দিকে তাকান আরেকবার তাকান ভিরমি-যাওয়া লোকটার দিকে। টাওয়ারের ভিতর থেকে আর কোনো শব্দ আসছে না, কিন্তু যে পাগলটা ছুটে চলেছে সে চীৎকার করে করে যেন গলা ফাটিয়ে দিচ্ছে—সে কী অমানুষিক বীভৎস কণ্ঠস্বরের বিকৃত পরিবর্তন।

'দস্তুরজী আর আমি এমনি হতভম্ব হয়ে গিয়েছি যে আমাদের মাথায় কর্তব্যাকর্তব্য কিছুই খেলছে না, পা দুটো যেন মাটিতে শেকড় গেড়ে বসে গিয়েছে। হতভম্ব হয়ে গিয়েছি বললে অল্পই বলা হল, কারণ অদ্ভুত এক ভীতি আমাকে তখন অসাড় করে ফেলেছে।

'কতক্ষণ এ রকম ধারা কাটলো আমার মনে নেই। আস্তে আস্তে মাথা সাফ হতে লাগল, কিন্তু ভয় তখনো কাটেনি। দস্তুর'জী বললেন, 'আর দুটো শববাহকের কি হল? তারা বেরুচ্ছে না কেন?' আমার মনেও সেই প্রশ্ন, উত্তর দেব কি?

'দস্তুরজী আমার দুজনেরই ভিতরে যাওয়া বারণ। দস্তুরজীর কর্তব্য বোধ হয়েছে না কি, কে জানে, বললেন 'চলুন, ভিতরে যাই।'

'আমার এখনো মনে হয়, 'দস্তুর'জী তখন সম্পূর্ণ সম্বিতে ছিলেন না; আমি জানি আমি নিশ্চয়ই ছিলুম না। তাঁর পিছনে পিছনে কোন্ সাহসে ভর করে গেলুম বলতে পারব না। আমি এ-বিষয়ে বহু বৎসর ধরে আপন মনে তোলপাড় করেছি। খুব সম্ভব যুগ যুগ ধরে 'দস্তুর'জীদের হুকুম তামিল করে করে আমরা সাধারণ গৃহী বিপদকালে মন্ত্রমুগ্ধের মত এখনো তাঁদের অনুসরণ করি।

'ভিতরে ঢুকে বাঁ দিকে মোড় নিয়েই দেখি—'

ভদ্রলোক হঠাৎ থেমে গেলেন; আমি বললুম, 'কি, কি?'

আমার দিকে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে বললেন, 'এই যেরকম আমি আপনার দিকে তাকালুম, ঠিক সেই রকম তাকিয়ে আছে টাওয়ারের দেয়ালের একটা শেলফের ভিতর পা ছাড়িয়ে বসে, ঘাড় আমাদের দিকে ফিরিয়ে সেই হাড্ডি-

সার বুড়ী—যাকে আমরা তিন মাস আগে এই টাওয়ারে রেখে গিয়েছিলুম। গায়ের চামড়া আরো শুকিয়ে গিয়েছে, আর,—আর, চোখের কোটর দুটো ফাঁকা, কালো দুই গর্ত। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম।'

হুঙ্কার দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'কেউ আমাকে একটা বোতল দেবে না নাকি রে?'

অথবা ঐ রকম কিছু একটা; আমি স্পষ্ট শুনতে পাইনি। ভয়ে আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। কি করে যে এ রকম ব্যাপার সম্ভবপর হতে পারে সে কথা জিজ্ঞেস করবার মত হিম্মৎ বুকে বেঁধে উঠতে পারছিনে, পাছে আরো ভয়ঙ্কর কোনো এক বিভীষিকা তিনি আমার চোখের সামনে তুলে ধরেন।

হঠাৎ যেন আমার প্রতি ভদ্রলোকের দয়া হল। আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'ভয় পাবেন না। আপনাকে সব কিছু বুঝিয়ে বলছি।

'যখন জ্ঞান ফিরে পেলুম তখন দেখি আমার উপর কে যেন বালতি বালতি জল ঢালছে। তারপর বুঝলুম বৃষ্টি নেমেছে। আমার চতুর্দিকে স্কুলের ছেলেরা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'সেই যে শববাহক পাগলের মত ছুটে গিয়েছিল তাকে ও রকম অবস্থায় একা দেখতে পেয়ে ছেলেরা আমাদের সন্ধানে এখানে এসে পৌঁচেছে।

'যে দুজন শববাহক ভিতরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল তারা আর কখনো জ্ঞান ফিরে পায় নি। যে বাইরে এসে ভিরমি গিয়েছিল সে সুস্থ হল বটে কিন্তু তার মাথা এখনো সম্পূর্ণ ঠিক হয়নি—আর যে পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে এসেছিল তাকে এখনো পাগলা গারদে বেঁধে রাখা হয়েছে। একমাত্র 'দস্তুর'জীই এই বিভীষিকা কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন।

'অথচ ব্যাপারটা পরে পরিষ্কার বোঝা গেল। বুড়ী ছিল হাড্ডি-সার, গায়ে একরত্তি চর্বি ছিল না, যেটুকু মাংস ছিল তা না থাকারই শামিল। তিন মাসের গরমে বুড়ী শুঁটকি হয়ে এমনি এক অদ্ভুত ধরনে বেঁকে গিয়েছিল যেন পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে উঠে বসেছে—শুধু চোখ দুটো একদম উপে গিয়েছে। সর্বশরীরের কোথাও এতটুকু আঁচড় নেই—আপনাকে আগেই বলেছি মধুগাঁও থেকে সব শকুন বহুদিন পূর্বেই পালিয়ে গিয়েছিল।

'এক সাধুর কৃপায় আমি সুস্থ হয়ে উঠলুম। কিন্তু অকালে বৃষ্টি নামলে আমাকে এখনো বোতল বোতল মদ খেয়ে ছবিটা মগজ থেকে মুছে ফেলতে হয়।'

পাদটীকা

গত শতকের শেষ আর এই শতকের গোড়ার দিকে আমাদের দেশের টোলগুলো মড়ক লেগে প্রায় সম্পূর্ণ উজাড় হয়ে যায়। পাঠান-মোগল আমলে যে দুর্দৈব ঘটেনি ইংরাজ রাজত্বে সেটা প্রায় আমাদেরই চোখের সামনে ঘটল। অর্থনৈতিক চাপে পড়ে দেশের কর্তাব্যক্তিরা ছেলেভাইপোকে টোলে না পাঠিয়ে ইংরেজি ইস্কুলে পাঠাতে আরম্ভ করলেন। চতুর্দিকে ইংরেজি শিক্ষার জয়-জয়কার পড়ে গেল—সেই ডামাডোলে বিস্তর টোল মরল, আর বিস্তর কাব্যতীর্থ বেদান্তবাগীশ না খেয়ে মারা গেলেন।

এবং তার চেয়েও হৃদয়বিদারক হল তাঁদের অবস্থা, যাঁরা কোনোগতিকে সংস্কৃত বা বাঙলার শিক্ষক হয়ে হাই-স্কুলগুলোতে স্থান পেলেন। এঁদের আপন আপন বিষয়ে অর্থাৎ কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন ইত্যাদিতে এঁদের পাণ্ডিত্য ছিল অন্যান্য শিক্ষকদের তুলনায় অনেক বেশী কিন্তু সম্মান এবং পারিশ্রমিক এঁরা পেতেন সবচেয়ে কম। শুনেছি কোনো কোনো ইস্কুলে পণ্ডিতের মাইনে চাপরাসীর চেয়েও কম ছিল।

আমাদের পণ্ডিতমশাই তর্কালঙ্কার না কাব্যবিশারদ ছিলেন আমার আর ঠিক মনে নেই কিন্তু এ কথা মনে আছে যে পণ্ডিতসমাজে তাঁর খ্যাতি ছিল প্রচুর এবং তাঁর পিতৃপিতামহ চতুর্দশ পুরুষ শুধু যে ভারতীয় সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন তা নয়, তাঁরা কখনো পরান্ন ভক্ষণ করেননি—পালপরব শ্রাদ্ধনিমন্ত্রণে পাত পাড়ার তো কথাই ওঠে না।

বাঙলা ভাষার প্রতি পণ্ডিতমশাইয়ের ছিল অবিচল, অকৃত্রিম অশ্রদ্ধা—ঘৃণা বললেও হয়ত বাড়িয়ে বলা হয় না। বাঙলাতে যেটুকু খাঁটি সংস্কৃত বস্তু আছে তিনি মাত্র সেইটুকু পড়াতে রাজী হতেন—অর্থাৎ কৃৎ, তদ্ধিত, সন্ধি এবং সমাস। তাও বাঙলা সমাস না। আমি একদিন বাঙলা রচনায় 'দোলা-লাগা', 'পাখী-জাগা' উদ্ধৃত করেছিলুম বলে তিনি আমার দিকে দোয়াত ছুঁড়ে মেরেছিলেন। ক্রিকেট ভাল খেলা—সে দিন কাজে লেগে গিয়েছিল। এবং তার পরমুহূর্তেই বি পূর্বক, আ পূর্বক, ঘ্রা ধাতু ক উত্তর দিয়ে সংস্কৃত ব্যাঘ্রকে ঘায়েল করতে পেরেছিলুম বলে তিনি আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'এই দণ্ডেই তুই স্কুল ছেড়ে চতুষ্পাঠীতে যা। সেখানে তোর সত্য বিদ্যা হবে।'

কিন্তু পণ্ডিতমশাই যত না পড়াতেন, তার চেয়ে বকতেন ঢের বেশী, এবং

টেবিলের উপর পা দু'খানা তুলে দিয়ে ঘুমুতেন সব চেয়ে বেশী। বেশ নাক ডাকিয়ে, এবং হেডমাস্টারকে একদম পরোয়া না করে। কারণ হেডমাস্টার তাঁর কাছে ছেলেবেলায় সংস্কৃত পড়েছিলেন এবং তিনি যে লেখাপড়ায় সর্বাঙ্গনিন্দনীয় হস্তীমূর্খ ছিলেন সে কথাটি পণ্ডিতমশাই বারম্বার অহরহ সর্বত্র উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতেন। আমরা সে কাহিনী শুনে বিমলানন্দ উপভোগ করতুম, আর পণ্ডিত-মশাইকে খুশী করবার পন্থা বাড়ন্ত হলে ঐ বিষয়টি নূতন করে উত্থাপনা করতুম।

আমাকে পণ্ডিতমশাই একটু বেশী স্নেহ করতেন। তার কারণ বিদ্যাসাগরী বাঙলা লেখা ছিল আমার বাই; ঐ 'দোলা-লাগা, পাখী-জাগা'ই আমার বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনে একমাত্র গোমাংস ভক্ষণ। পণ্ডিতমশাই যে আমাকে সবচেয়ে বেশী স্নেহ করতেন তার প্রমাণ তিনি দিতেন আমার উপর অহরহ নানা প্রকার কটুকাটব্য বর্ষণ করে। 'অনার্য', 'শাখা-মৃগ', 'দ্রাবিড়-সম্ভূত' কথাগুলো ব্যবহার না করে তিনি আমাকে সাধারণতঃ সম্বোধন করতেন না; তা ছাড়া এমন সব অশ্লীল কথা বলতেন যে তার সঙ্গে তুলনা দেবার মত জিনিস আমি দেশবিদেশে কোথাও শুনিনি। তবে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে পণ্ডিতমশাই শ্লীল অশ্লীল উভয় বস্তুই একই সুরে একই পরিমাণে ঝেড়ে যেতেন, সম্পূর্ণ অচেতন, বীতরাগ এবং লাভালাভের আশা বা ভয় না করে। এবং তাঁর অশ্লীলতা মার্জিত না হলেও অত্যন্ত বিদগ্ধরূপেই দেখা দিত বলে আমি বহু অভিজ্ঞতার পর এখনো মনস্থির করতে পারিনি যে সেগুলো শুনতে পেয়ে আমার লাভ না ক্ষতি, কোনটা বেশী হয়েছে।

পণ্ডিতমহাশয়ের বর্ণ ছিল শ্যাম, তিনি মাসে একদিন দাড়ি গোঁফ কামাতেন এবং পরতেন হাঁটু-জোকা ধুতি। দেহের উত্তমার্ধে একখানা দড়ি প্যাঁচানো থাকত—অজ্ঞেরা বলত সেটা নাকি দড়ি নয়, চাদর। ক্লাশে ঢুকেই তিনি সেই দড়িখানা টেবিলের উপর রাখতেন, আমাদের দিকে রোষকষায়িত লোচনে তাকাতেন, আমাদের বিদ্যালয়ে না এসে যে চাষ করতে যাওয়াটা সমধিক সমীচীন সে কথাটা দ্বিসহস্র বারের মত স্মরণ করিয়ে দিতে দিতে পা দু'খানা টেবিলের উপর লম্বমান করতেন। তারপর যে কোনো একটা অজুহাত ধরে আমাদের এক চোট বকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। নিতান্ত যে-দিন কোনো অজুহাতই পেতেন না—ধর্মসাক্ষী সে-কসুর আমাদের নয়—সেদিন দু'চারটে কৃৎ-তদ্ধিত সম্বন্ধে আপন মনে—কিন্তু বেশ জোর গলায়—আলোচনা করে উপসংহারে বলতেন, 'কিন্তু এই মূর্খদের বিদ্যাদান করার প্রচেষ্টা বন্ধ্যাগমনের মত নিষ্ফল

নয় কি ?' তারপর কখনো আপন গতাসু চতুষ্পাঠীর কথা স্মরণ করে বিড়বিড় করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অভিশাপ দিতেন, কখনো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে টানা-পাখার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঘুমিয়ে পড়তেন।

শুনেছি ঋগ্বেদে আছে, যমপত্নী যমী যখন যমের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাতুরা হয়ে পড়েন তখন দেবতারা তাঁকে কোনো প্রকারে সান্ত্বনা না দিতে পেরে শেষটায় তাঁকে ঘুম বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই আমার বিশ্বাস, পণ্ডিতমশায়ের টোল কেড়ে নিয়ে দেবতারা তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য অহরহ ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। কারণ এরকম দিনযামিনী সায়ংপ্রাতঃ শিশিরবসন্তে বেঞ্চি-চৌকিতে যত্রতত্র অকাতরে ঘুমিয়ে পড়তে পারাটা দেবতার দান—একথা অস্বীকার করার জো নেই।

বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে, সেই ইস্কুলের সামনে সুরমা নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে কিন্তু আজো যখন তাঁর কথা ব্যাকরণ সম্পর্কে মনে পড়ে তখন তাঁর যে ছবিটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেটি তাঁর জাগ্রত অবস্থার নয়; সে ছবিতে দেখি, টেবিলের উপর দু'পা-তোলা, মাথা একদিকে ঝুলে-পড়া, টিকিতে দোলা-লাগা কাষ্ঠাসন শরশয্যায় শায়িত ভারতীয় ঐতিহ্যের শেষ কুমার ভীষ্মদেব। কিন্তু ছিঃ, আবার 'দোলা-লাগা' সমাস ব্যবহার করে পণ্ডিতমশায়ের প্রেতাত্মাকে ব্যথিত করি কেন ?

সে-সময়ে আসামের চীফ-কমিশনার ছিলেন এন. ডি. বীটসন্ বেল্। সায়েবটির মাথায় একটু ছিট ছিল। প্রথম পরিচয়ে তিনি সবাইকে বুঝিয়ে বলতেন যে তাঁর নাম, আসলে 'নন্দদুলাল বাজায় ঘণ্টা'। 'এন. ডি'তে হয় 'নন্দদুলাল' আর বীটসন্ বেল্ অর্থ 'বাজায় ঘণ্টা'—দুয়ে মিলে হয় 'নন্দদুলাল বাজায় ঘণ্টা'।

সেই নন্দদুলাল এসে উপস্থিত হলেন আমাদের শহরে।

ক্লাসের জ্যাঠা ছেলে ছিল পদ্মলোচন। সে-ই একদিন খবর দিল লাট সাহেব আসছেন স্কুল পরিদর্শন করতে—পদ্মর ভগ্নিপতি লাটের টুর ক্লার্ক না কি, সে তাঁর কাছ থেকে পাকা খবর পেয়েছে।

লাটের ইস্কুল আগমন অবিমিশ্র আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা নয়। একদিক দিয়ে যেমন বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ কসুর বিন-কসুরে লাট আসার উত্তেজনায় খিটখিটে মাস্টারদের কাছ থেকে কপালে কিলটা চড়টা আছে, অন্যদিকে তেমনি লাট চলে যাওয়ার পর তিন দিনের ছুটি।

হেডমাস্টারমশায়ের মেজাজ যখন সকলের প্রাণ ভাজা ভাজা করে ছাই বানিয়ে ফেলার উপক্রম করেছে এমন সময় খবর পাওয়া গেল, শুক্রবার দিন হুজুর আসবেন।

ইস্কুল শুরু হওয়ার এক ঘণ্টা আগে আমরা সেদিন হাজিরা দিলুম। হেডমাস্টার ইস্কুলের সর্বত্র চর্কিবাজীর মতন তুর্কীনাচন নাচছেন। যে দিকে তাকাই সে দিকেই হেডমাস্টার—নিশ্চয়ই তাঁর অনেকগুলো যমজ ভাই আছেন, আর ইস্কুল সামলাবার জন্য সেদিন সব ক'জনকে রিকুইজিশন করে নিয়ে এসেছেন।

পদ্মলোচন বলল, 'কমন-রুমে গিয়ে মজাটা দেখে আয়।'

'কেন কি হয়েছে?'

'দেখেই আয় না ছাই।'

পদ্ম আর যা করে করুক কখনো বাসি খবর বিলোয় না। হেডমাস্টারের চড়ের ভয় না মেনে কমন-রুমের কাছে গিয়ে জানালা দিয়ে দেখি, অবাক কাণ্ড। আমাদের পণ্ডিতমশাই একটা লম্বা-হাতা আন্‌কোরা নূতন হলদে রঙের গেঞ্জি পরে বসে আছেন আর বাদবাকি মাস্টাররা কলরব করে সে-গেঞ্জিটার প্রংশসা করছেন। নানা মুনি নানা গুণ কীর্তন করছেন; কেউ বলছেন পণ্ডিতমশাই কি বিচক্ষণ লোক, বেজায় সস্তায় দাঁও মেরেছেন (গাঁজা, পণ্ডিতমশায়ের সাংসারিক বুদ্ধি একরত্তিও ছিল না), কেউ বলছেন আহা, যা মানিয়েছে (হাতী, পণ্ডিতমশাইকে সার্কাসের সঙের মত দেখাচ্ছিল), কেউ বললেন, যা ফিট করেছে (মরে যাই, গেঞ্জির আবার ফিট-অফিট কি?)। শেষটায় পণ্ডিতমশায়ের ইয়ার মৌলবী সায়েব দাড়ি দুলিয়ে বললেন, 'বুঝলে ভশচায, এ রকম উম্‌দা গেঞ্জি স্রেফ দু'খানা তৈরী হয়েছিল, তার-ই একটা কিনেছিল পঞ্চম জর্জ, আর দুসরাটা কিনলে তুমি। এ দুটো বানাতে গিয়ে কোম্পানী দেউলে হয়ে গিয়েছে, আর কারো কপালে এ রকম গেঞ্জি নেই।'

চাপরাসী নিত্যানন্দ দূর থেকে ইশারায় জানাল, 'বাবু আসছেন।'

তিন লম্ফে ক্লাসে ফিরে গেলুম।

সেকেণ্ড পিরিয়ডে বাঙলা। পণ্ডিতমশাই আসতেই আমরা সবাই ত্রিশ গাল হেসে গেঞ্জিটার দিকে তাকিয়ে রইলুম। ইতিমধ্যে রেবতী খবর দিল যে শাস্ত্রে সেলাই-করা কাপড় পরা বারণ বলে পণ্ডিতমশাই পাঞ্জাবী শার্ট পরেন না, কিন্তু লাট সায়েব আসছেন, শুধু গায়ে ইস্কুলে আসা চলবে না তাই গেঞ্জি পরে এসেছেন। গেঞ্জি বোনা জিনিস, সেলাই-করা কাপড়ের পাপ থেকে

পণ্ডিতমশাই এই কৌশলে নিষ্কৃতি পেয়েছেন।

গেঞ্জি দেখে আমরা এতই মুগ্ধ যে পণ্ডিতমশায়ের গালাগাল, বোয়াল-চোখ সব কিছুর জন্যই আমরা তখন তৈরী কিন্তু কেন জানিনে তিনি তাঁর রুটিন মাফিক কিছুই করলেন না। বকলেন না, চোখ লাল করলেন না, লাট আসছেন কাজেই টেবিলে ঠ্যাং তোলার কথাও উঠতে পারে না। তিনি চেয়ারের উপর অত্যন্ত বিরস বদনে বসে রইলেন।

পদ্মলোচনের ভর ভয় কম। আহ্লাদে ফেটে গিয়ে বলল, 'পণ্ডিতমশাই, গেঞ্জিটা কদ্দিয়ে কিনলেন?' আশ্চর্য, পণ্ডিত-মশাই খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন না, নির্জীব কণ্ঠে বললেন, 'পাঁচ সিকে।'

আধ মিনিট যেতে না যেতেই পণ্ডিতমশাই দু'হাত দিয়ে ক্ষণে হেথায় চুলকান ক্ষণে হোথায় চুলকান। পিঠের অসম্ভব অসম্ভব জায়গায় কখনো ডান হাত, কখনো বাঁ হাত দিয়ে চুলকানোর চেষ্টা করেন, কখনো মুখ বিকৃত করে গেঞ্জির ভিতর হাত চালান করে পাগলের মত এখানে ওখানে খ্যাঁস খ্যাঁস করে খামচান।

একে তো জীবন-ভর উত্তমাঙ্গে কিছু পরেননি, তার উপর গেঞ্জি, সেও আবার একদম নূতন কোরা গেঞ্জি।

বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে পয়লা জিন লাগালে সে যে-রকম আকাশের দিকে দু' পা তুলে তড়পায় শেষটায় পণ্ডিতমশায়ের সেই অবস্থা হল। কখনো করুণ কণ্ঠে অস্ফুট আর্তনাদ করেন, 'রাধামাধব, এ কী গব্ব-যন্তণা', কখনো এক হাত দিয়ে আরেক হাত চেপে ধরে, দাঁত কিড়িমিড়ি খেয়ে আত্মসম্বরণ করার চেষ্টা করেন—লাট সায়েবের সামনে তো সব্বাঙ্গ আঁচড়ানো যাবে না।

শেষটায় থাকতে না পেরে আমি উঠে বললুম, 'পণ্ডিতমশাই, আপনি গেঞ্জিটা খুলে ফেলুন। লাট সায়েব এলে আমি জানালা দিয়ে দেখতে পাব। তখন না হয় ফের পরে নেবেন।'

বললেন, 'ওরে জড়ভরত, গব্ব-যন্তণাটা খুলছি নে, পরার অভ্যেস হয়ে যাবার জন্য।'

আমি হাত জোড় করে বললুম, 'একদিনে অভ্যেস হবে না পণ্ডিতমশাই, ওটা আপনি খুলে ফেলুন।'

আসলে পণ্ডিতমশাইয়ের মতলব ছিল গেঞ্জিটা খুলে ফেলারই; শুধু আমাদের কারো কাছ থেকে একটু মরাল সাপোর্টের অপেক্ষায় এতক্ষণ বসেছিলেন। তবু সন্দেহ-ভরা চোখে বললেন, 'তুই তো একটা আস্ত মর্কট—শেষটায় আমাকে

ভোবাবি না তো? তুই যদি হুঁশিয়ার না করিস, আর লাট যদি এসে পড়েন?'

আমি ইহলোক পরলোক সর্বলোক তুলে দিব্যি, কিরে, কসম খেলুম ॥

পণ্ডিতমশাই গেঞ্জিটা খুলে টেবিলের উপর রেখে সেটার দিকে যে দৃষ্টি হানলেন, তাঁর টিকিটি কেউ কেটে ফেললেও তিনি তার দিকে এর চেয়ে বেশী ঘৃণা মাখিয়ে তাকাতে পারতেন না। তারপর লুপ্ত-দেহটা ফিরে পাওয়ার আনন্দে প্রাণভরে সর্বাঙ্গ খামচালেন। বুক পিঠ ততক্ষণে লাল লাল আঁজিতে ভর্তি হয়ে গিয়েছে।

এর পর আর কোনো বিপদ ঘটল না। পণ্ডিতমশাই থেকে থেকে রাধামাধবকে স্মরণ করলেন, আমি জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইলুম, আর সবাই গেঞ্জিটার নাম, ধাম, কোন্ দোকানে কেনা, সস্তা না আক্রা, তাই নিয়ে আলোচনা করল।

আমি সময়মত ওয়ার্নিং দিলুম। পণ্ডিতমশাই আবার তাঁর 'গব্ব-যন্তণাটা' উত্তমাঙ্গে মেখে নিলেন।

লাট এলেন, সঙ্গে ডেপুটি কমিশনার, ডাইরেকটর, ইনসপেকটর, হেডমাস্টার, নিত্যানন্দ—আর লাট সায়েবের এডিসি ফেডিসি না কি সব বারান্দায় জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। 'হ্যালো পান্‌ডিট্' বলে সায়েব হাত বাড়ালেন। রাজ-সম্মান পেয়ে পণ্ডিতমশারে সব যন্ত্রণা লাঘব হল। বার বার ঝুঁকে ঝুঁকে সায়েবকে সেলাম করলেন—এই অনাদৃত পণ্ডিত শ্রেণী সামান্যতম গতানুগতিক সম্মান পেয়েও যে কি রকম বিগলিত হতেন তা তাঁদের সে-সময়কার চেহারা না দেখলে অনুমান করার উপায় নেই।

হেডমাস্টার পণ্ডিতমশায়ের কৃত-তদ্ধিতের বাই জানতেন; তাই নির্ভয়ে ব্যাকরণের সর্বোচ্চ নভঃস্থলে উড্ডীয়মান হয়ে 'বিহঙ্গ' শব্দের তত্ত্বানুসন্ধান করলেন। আমরা জন দশেক একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললুম, 'বিহায়স পূর্বক গম ধাতু খ'। লাট সায়েব হেসে বললেন, 'ওয়ান এ্যাট এ টাইম, প্লীজ'। লাট সায়েব আমাদের বলল 'প্লীজ', এ কী কাণ্ড! তখন আবার আর কেউ রা কাড়ে না। হেডমাস্টার শুধালেন 'বিহঙ্গ', আমরা চুপ,—তখনো প্লীজের ধকল কাটেনি। শেষটায় ব্যাকরণে নিরেট পাঁঠা যতেটা আমাদের উত্তর আগে শুনে নিয়েছিল বলে ক্লাসে নয় দেশে নাম করে ফেললে—আমরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

লাট সায়েব ততক্ষণ হেডমাস্টারের সঙ্গে 'পণ্ডিত' শব্দের মূল নিয়ে ইংরেজিতে আলোচনা জুড়ে দিয়েছেন। হেডমাস্টার কি বলেছিলেন জানিনে তবে রবীন্দ্রনাথ নাকি পণ্ডিতদের ধর্মে জড়ণীলতার প্রতি বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, যার সব কিছু পণ্ড

হয়ে গিয়েছে সেই পণ্ডিত।

ইংরেজ শাসনের ফলে আমাদের পণ্ডিতদের সর্বনাশ, সর্বস্ব পণ্ডের ইতিহাস হয়ত রবীন্দ্রনাথ জানতেন না,—না হলে ব্যঙ্গ করার পূর্বে হয়ত একটু ভেবে দেখতেন।

সে কথা থাক। লাট সায়েব চলে গিয়েছেন, যাবার পূর্বে পণ্ডিতমশায়ের দিকে একখানা মোলায়েম নড্ করাতে তিনি গর্বে চৌচির হয়ে ফেটে যাবার উপক্রম। আনন্দের আতিশয্যে নূতন গেঞ্জির চুলকুনির কথা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছেন। আমরা দু'তিনবার স্মরণ করিয়ে দেবার পর গেঞ্জিটা তাঁর শ্রীঅঙ্গ থেকে ডিগ্রেডেড্ হল।

তিন দিন ছুটির পর ফের বাঙলা ক্লাস বসেছে। পণ্ডিতমশাই টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে ঘুমুচ্ছেন, না শুধু চোখবন্ধ করে আছেন ঠিক ঠাহর হয়নি বলে তখনো গোলমাল আরম্ভ হয়নি।

কারো দিকে না তাকিয়েই পণ্ডিতমশাই হঠাৎ ভরা মেঘের ডাক ছেড়ে বললেন, 'ওরে ও শাখামৃগ!'

নীল যাঁহার কণ্ঠ তিনি নীলকণ্ঠ—যোগারূঢ়ার্থে শিব। শাখাতে যে মৃগ বিচরণ করে সে শাখামৃগ, অর্থাৎ বাঁদর—ক্লাসরূঢ়ার্থে আমি উত্তর দিলুম, 'আজ্ঞে।'

পণ্ডিতমশাই শুধালেন, 'লাট সায়েবের সঙ্গে কে কে এসেছিল বল তো রে।'

আমি সম্পূর্ণ ফিরিস্তি দিলুম। চাপরাসী নিত্যানন্দকেও বাদ দিলুম না।

বললেন, 'হল না। আর কে ছিল?'

বললুম, 'ঐ যে বললুম, একগাদা, এডিসি না প্রাইভেট সেক্রেটারি না আর কিছু সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা তো ক্লাসে ঢোকেননি।'

পণ্ডিতমশাই ভরা মেঘের গুরু গুরু ডাক আরো গম্ভীর করে শুধালেন, 'এক কথা বাহান্ন বার বলছিস কেন রে মূঢ়? আমি কালা না তোর মত অলম্বুষ?

আমি কাতর হয়ে বললুম, 'আর তো কেউ ছিল না পণ্ডিতমশাই; জিজ্ঞেস করুন না পদ্মলোচনকে, সে তো সবাইকে চেনে।'

পণ্ডিতমশাই হঠাৎ চোখ মেলে আমার দিকে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'ওঃ, উনি আবার লেখক হবেন। চোখে দেখতে পাসনে, কানা, দিবান্ধ—রাত্র্যন্ধ হলেও না হয় বুঝতুম। কেন? লাট সায়েবের কুকুরটাকে দেখতে পাসনি? এই পর্যবেক্ষণ শক্তি নিয়ে—'

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'হাঁ, হাঁ, দেখেছি। ও তো এক সেকেণ্ডের তরে

ক্লাসে ঢুকেছিল।'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'মর্কট এবং সারমেয় কদাচ একগৃহে অবস্থান করে না। সে কথা যাক। কুকুরটার কি বৈশিষ্ট্য ছিল বল তো।'

ভাগ্যিস মনে পড়ল। বললুম, 'আজ্ঞে, একটা ঠ্যাং কম ছিল বলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল।'

'হুঁ' বলে পণ্ডিতমশাই আবার চোখ বন্ধ করলেন।

অনেকক্ষণ পর বললেন, 'শোন। শুক্রবার দিন ছুটির পর কাজ ছিল বলে অনেক দেরিতে ঘাটে গিয়ে দেখি আমার নৌকোর মাঝি এক অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ করছে। লোকটা মুসলমান, মাথায় কিস্তিটুপী। আমাকে অনেক সেলাম-টেলাম করে পরিচয় দিল, সে আমাদের গ্রামের মিম্বর উল্লার শালা; লাট সায়েবের আরদালি, সায়েবের সঙ্গে এখানে এসেছে, আজকের দিনটা ছুটি নিয়েছে তার দিদিকে দেখতে যাবে বলে। ঘাটে আর নৌকা নেই। আমি যদি মেহের-বানি করে একটু স্থান দিই।'

পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি নদীর ওপারে, বেশ খানিকটে উজিয়ে। তাই তিনি বর্ষাকালে নৌকোয় যাতায়াত করতেন আর সকলকে অকাতরে লিফ্‌ট্ দিতেন।

পণ্ডিতমশায় বললেন, 'লোকটার সঙ্গে কথাবার্তা হল। লাট সায়েবের সব খবর জানে, তোর মত কানা নয়, সব জিনিস দেখে, সব কথা মনে রাখে। লাট সাহেবের কুকুরটার একটা ঠ্যাং কি করে ট্রেনের চাকায় কাটা যায় সে-খবরটা ও বেশ গুছিয়ে বলল।'

তারপর পণ্ডিতমশাই ফের অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আপন মনে আস্তে আস্তে বললেন, 'আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধা মাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আমরা আটজনা।'

তারপর হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে ফেলে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মদনমোহন কি রকম আঁক শেখায় রে?'

মদনমোহনবাবু আমাদের অঙ্কের মাস্টার—পণ্ডিতমশায়ের ছাত্র। বললুম, 'ভালই পড়ান?'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'বেশ বেশ। তবে শোন। মিম্বর উল্লার শালা বলল, লাট সায়েবের কুত্তাটার পিছনে মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচা হয়। এইবার দেখি, তুই কি রকম আঁক শিখেছিস। বল তো দেখি, যদি একটা কুকুরের পেছনে মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচ হয়, আর সে কুকুরের তিনটে ঠ্যাং হয় তবে কি

ঠ্যাঙের জন্য কত খরচ হয় ?'

আমি ভয় করেছিলুম পণ্ডিতমশাই একটা মারাত্মক রকমের আঁক কষতে দেবেন। আরাম বোধকরে তাড়াতাড়ি বললুম, 'আজ্ঞে, পঁচিশ টাকা।' পণ্ডিত-মশাই বললেন, 'সাধু, সাধু!'

তারপর বললেন, 'উত্তম প্রস্তাব। অপিচ আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধা মাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আটজন, আমাদের সকলের জীবন ধারণের জন্য আমি মাসে পাই পঁচিশ টাকা। এখন বল তো দেখি, তবে বুঝি তোর পেটে কত বিদ্যে, এই ব্রাহ্মণ পরিবার লাট সায়েবের কুকুরের ক'টা ঠ্যাঙের সমান ?'

আমি হতবাক্।

'বল না।'

আমি মাথা নীচু করে বসে রইলুম। শুধু আমি না, সমস্ত ক্লাস নিস্তব্ধ।

পণ্ডিতমশাই হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'উত্তর দে।'

মূর্খের মত একবার পণ্ডিতমশায়ের মুখের দিকে মিটমিটিয়ে তাকিয়েছিলুম। দেখি সে মুখ লজ্জা, তিক্ততা, ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

ক্লাসের সব ছেলে বুঝতে পেরেছে—কেউ বাদ যায়নি—পণ্ডিতমশাই আত্ম-অবমাননার কি নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখছেন, আমাদের সাক্ষী রেখে।

পণ্ডিতমশাই যেন উত্তরের প্রতীক্ষায় বসেই আছেন। সেই জগদ্দল নিস্তব্ধতা ভেঙে কতক্ষণ পরে ক্লাস শেষের ঘণ্টা বেজেছিল আমার হিসেব নেই।

এই নিস্তব্ধতার নিপীড়নস্মৃতি আমার মন থেকে কখনো মুছে যাবে না।

'নিস্তব্ধতা হিরন্ময়' 'Silence is golden' যে মূর্খ বলেছে তাকে যেন মরার পূর্বে একবার একলা-একলি পাই।

পুনশ্চ

অভিজ্ঞতাটা হয়েছিল প্যারিসে। কিন্তু এ রকম ধারা ব্যাপার বার্লিন, ভিয়েনা, লণ্ডন, প্রাগ যে-কোনো জায়গায় ঘটতে পারত।

প্যারিসে আমার পরিচিত যে কয়টি লোক ছিলেন তাঁরা সবাই গ্রীষ্মের অন্তিম নিঃশ্বাসের দিনগুলো গ্রামাঞ্চল অথবা সমুদ্র-তীরে কাটাতে চলে গিয়েছেন। বড্ড একা পড়েছি।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি আর গিমে ম্যুজিয়মে সমস্ত সময় কাটানো যায় না—প্যারিসের ফুর্তিফার্তি রঙ্গরস করা হয়ে গিয়েছে, তার পুনরাবৃত্তিতে আর কোনো নূতন তত্ত্ব নেই। এসব কথা ভাবছি আর প্লাস দ্য লা মাদলেনের জনতরঙ্গে গা ভাসিয়ে দিয়ে সমুখপানে এগিয়ে চলেছি এমর সময় শুনি, 'বঁ সোয়ার মসিয়ো ল্য দক্তর।' তাকিয়ে দেখি ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ সুন্দরী যুবতীদের একজন। চেনা চেনা মনে হল কিন্তু চেষ্টা করেও নামটা স্মরণ করতে পারলুম না। অনেকখানি অভিমান মাখিয়ে সুন্দরী অনুযোগ করলেন, 'চিনতেই পারলেন না, অথচ প্যারিসের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্বেও আপনি আমাকে চিনতেন।' ঠাস করে মাস্টারমশায় চড় মারলে ছেলেবেলা যে-রকম মণ্টোনিগ্রোর রাজধানীর নাম আচম্বিতে মনে পড়ে যেত ঠিক সেই রকম এক ঝলকে মনে পড়ে গেল, দেশ থেকে মার্সেই হয়ে প্যারিস আসার সময় ট্রেনে এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। হ্যাট পূর্বেই তুলেছিলুম, এবারে বাও করে বললুম, 'হাজার অনুশোচনা, মনস্তাপ এবং ক্ষমা-ভিক্ষা, মাদমোয়াজেল শাতিন্নো।' কায়দাকানুন বাবদে প্যারিস লক্ষ্ণৌ-এ বিস্তর মিল আছে। বিপাকে যদি প্যারিসের এটিকেট সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত হন তবে নির্ভয়ে লক্ষ্ণৌ চালাবেন। পস্তাতে হবে না। ইতর ব্যাপারে 'যাহা অল্প তাহাই মিষ্ট' হতে পারে, কিন্তু ভদ্রভার ব্যাপারে 'আধিক্যে দোষ নেই।'

মাদমোয়াজেল ক্ষমাশীলা। 'আঁশাতে (enchanted),' বলে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি দস্তানা পরা হাত ঠোঁটের কাছে ধরলুম—শাস্ত্রে বলে চুমো খাবে, কিন্তু অল্প পরিচয়ে 'ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং' সূত্রই প্রযোজ্য। মাদমোয়াজেল বললেন, 'মা-হারা শিশুর মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন যে?' আমি বললুম, 'ললাটঙ্ক লিখন', তিনি বললেন, 'চলুন, আমার সঙ্গে সিনেমায়।'

খেয়েছে! একে তো সিনেমা জিনিসটার প্রতি আমার বিতৃষ্ণা, তার উপর ঈষৎ অনটনে দিন কাটাচ্ছি। একেবারে যে দরিয়ায় পড়েছি তা নয়, কিন্তু এট্টুখানি ইয়ে—অর্থাৎ কি না দুদ'ও জলে গা ভাসাতে হলে যে গামছার প্রয়োজন মা-গঙ্গাই জানেন তার অভাব কিছুদিন ধরে যাচ্ছে। আনিটা সিকিটা করব আর ফুর্তিও হবে এমন হিসিবি ব্যসনে আমি বিশ্বাস করিনে। তাই আমার গড়িমসি ভাব দেখে মাদমোয়াজেল বললেন, 'আমার কাছে দু'খানা টিকিট আছে—'পশ্চিম রণাঙ্গন নিশ্চুপ' বইখানার প্রশংসা শুনেছি।' আর এড়াবার পথ রইল না।

মাদমোয়াজেল বললেন, 'এখনো তো ঘণ্টাখানেক বাকি। চলুন একটা কাফেতে।'

'চলুন।'

ক্লের বিবি যে পানীয়ের ফরমাইস দিলেন তার নাম আমি কখনো শুনিনি, ওয়েটারটা পর্যন্ত প্রথমটায় বুঝতে পারে নি। আনতেও অনেক দেরি হল। সে পানীয় এলেনও অদ্ভুত কায়দায়। প্রকাণ্ড গম্বুজের মত গেলাসের তলাতে আধ ইঞ্চিটাক ফিকে হলদে, খোদায় মালুম কী চীজ। আমি কফির অর্ডার দিলুম।

ক্লের দশ মিনিটেই সেই খোদায়-মালুম-কি শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলুন, বড্ড গরম, এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।' তখন ওয়েটার এসে আমাকেই বলল চল্লিশ ফ্রাঁ' অর্থাৎ চার টাকার কাছাকাছি। বলে কি? ওই তিন ফোঁটা—যাকগে। ক্লের তখন ব্যাগ থেকে রুমাল বের করছিলেন; ব্যাগ বন্ধ করতে করতে বললেন, 'আপনিই দেবেন, সে কি?' আমি বললুম, 'নিশ্চয় নিশ্চয়, আনন্দের কথা, হেঁ, হেঁ।'

বেরিয়ে এসে ক্লের প্যারিসের পোড়া পেট্রলভরা বাতাসে লম্বা দম নিয়ে বললেন, 'বাঁচলুম। কিন্তু এখনো তো অনেক সময় বাকি। কোথায় যাই বলুন তো?'

দেশে থাকতে আমি ম্যালেরিয়ায় ভুগতুম। সব সময় সব কথা শুনতে পাইনে।

ক্লের বললেন, 'ঠিক, ঠিক, মনে পড়েছে। সিনেমার কাছেই খোলা হাওয়ায় একটা রেস্তোরাঁ আছে। আপনার ডিনার হয়ে যায়নি তো?'

বাঙালীর বদ অভ্যাস আমারও আছে। ডিনার দেরিতে খাই। তবু ফাঁড়া কাটাবার জন্য বললুম, 'আমি ডিনার বড একটা—'

বাধা দিয়ে ক্লের বললেন, 'আমিও ঠিক তাই। মাত্র এক কোর্স খাই। সুপ না, পুডিং না। রাত্রে বেশী খাওয়া ভারী খারাপ। অগস্টের প্যারিস ভয়ঙ্কর জায়গা।'

ততক্ষণে ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে। প্যারিসের ট্যাক্সিওলারা ফুটপাথে মেয়েদের দাঁড়ানোর ভঙ্গি থেকে গাহক কি না ঠিক ঠিক বুঝতে পারে।

জীবনে এই প্রথম বুঝতে পারলুম রবীন্দ্রনাথ কত বেদনা পেয়ে লিখেছিলেন:

'মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ।'

নিশ্চয়ই ট্যাক্সি চড়ে গিয়েছিলেন, মিটার খারাপ ছিল এবং ভাড়াও আপন ট্যাঁক থেকে দিতে হয়েছিল। না হলে গানটার কোনো মানেই হয় না। পায়ে হেঁটে গেলে দু' মাইল চলতে যা খর্চা, দু'লক্ষ মাইল চলতেও তাই।

বাহারে রেস্তোরাঁ। কুঞ্জে কুঞ্জে টেবিল। টেবিলে টেবিলে ঘন সবুজ প্রদীপ। বাদ্যিবাজনা, শ্যাম্পেন, সুন্দরী, হীরের আংটি আর উজির-নাজির-কোটাল। আমার পরনে গ্রে ব্যাগ আর ব্লু ব্লেজার। মহা অস্বস্তি অনুভব করলুম।

ক্লের ওয়েটারকে বললেন, 'কিছু না, শুদ্ধু 'অর দ্য ভর্' ।'

'অর দ্য ভর্' এল। বিরাট বারকোষে ডজন খানেক ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য খোপে-খোপে সাজানো। সামোন মাছ, রাশান স্যালাদ, টুকরো টুকরো ফ্রাঙ্কফুর্টার, টোস্ট-সওয়ার-কাভিয়ার, ইয়োগুর্ৎ (দই), চিংড়ি, স্টাফ্‌ট অলিভ, সিরকার পেঁয়াজ —এক কথায় আমাদের দেশের সাড়ে বত্রিশ ভাজা। তবে দাম হয়ত সাড়ে বত্রিশ শ' গুণেরও বেশী হতে পারে।

একেই বলে 'এক কোর্স খাওয়া!' কোথায় যেন পড়েছি মোতি-লালজী সাদাসিদে কুটির বানাতে গিয়ে লাখ টাকার বেশী খর্চা করেছিলেন। তালিমটা নিশ্চয়ই প্যারিসের 'এক কোর্স খাওয়া' থেকে পেয়েছিলেন।

ওয়েটার শুধাল, 'পানীয়?'

ক্লের ঘাড় বাঁদিকে কাত করে বললেন, 'নো', তারপর ডান দিকে কাত করে বললেন, 'উয়ি', ফের বাঁদিকে 'নো', ফের ডান দিকে 'উয়ি'—

আমার 'দোলাতে দোলে মন', ফাঁসি না কালাপানি?

কালাপানি নয়, শেষ দোলা ডান দিকে নড়ল, অর্থাৎ লাল পানি।

ক্লের দু' ফোঁটা ইংরাজিও জানেন। যে পানীয় অর্ডার দিলেন তার গুণকীর্তন করতে গিয়ে আমাকে বুঝিয়ে বললেন,—'ইৎ ইজ নৎ এ স্ত্রীন্‌ক বাৎ এ দ্রীম (স্বপ্ন) মসিয়ো, এ জিনিস ফ্রান্সের গৌরব, রসিকজনের মোক্ষ, পাপীতাপীর জর্দন-জল।'

নিশ্চয়ই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এক বাউলকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'যেজন ডুবলো, সখী, তার কি আছে বাকি গো?'

তারপর সেই এক কোর্স খাওয়া শেষ হতে না হতেই ওয়েটার এসে আমাদের বলল হঠাৎ এক চালান তাজা শুক্তি এসে পৌঁচেছে। সমস্ত রেস্তোরাঁয় আমরাই যে সবচেয়ে দামী দামী ফিন্‌সি খাদ্য খাবার জন্য এসেছি, এ তত্ত্বটা সে কি করে বুঝতে পেরেছিল, জানি নে। মৃদঙ্গের তাল পেলে নাচিয়ে বুড়াকে ঠেকানো যায় না, এ সত্যও আমি জানি, কাজেই ক্লের যখন ফরাসী শুক্তির উচ্ছ্বাসে গেয়ে তার এক ডজন অর্ডার দিলেন, তখন আমি এইটুকু আশা আঁকড়ে ধরলুম যে, যদি কোনো শুক্তির ভেতর থেকে মুক্তো বেরোয় তবে তাই দিয়ে বিল শোধ করব।

ক্লের ঢেকুর তোলেন নি। না জানি কত যুগ ধরে তপস্যা করার ফলে ফরাসী জাতি এক ডজন শুক্তি বিনা ঢেকুরে খেতে শিখেছে। ফরাসী সভ্যতাকে বারম্বার নমস্কার।

প্রায় শেষ কপর্দক দিয়ে বিল শোধ করলুম।

সে রাত্রে সিনেমায়ও গিয়েছিলুম। পাঁচ সিকের সিটে বসে 'অল কোয়াটের' বন্দুক কামানের শব্দের মাঝখানেও ক্লেরের ঘুমের শব্দ শুনতে পেয়েছিলুম। 'নাক ডাকা'টা বললুম না, গ্রাম্য শোনায় আর ফরাসী সভ্যতার দায় যতক্ষণ সে জাগ্রত জাগ্রত আছে।

রাত এগারোটায় সিনেমা শেষে যখন বাইরে এসে দাঁড়ালুম, তখন ক্লের বললেন, 'কোথায় যাই বলুন তো, আমার সর্বাঙ্গ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।'

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, 'নৎর্ দামের গির্জেয়। সেই একমাত্র জায়গা যেখানে পয়সা খর্চা না করেও বসা যায়', কিন্তু চেপে গেলুম। বললুম, 'আমাকে এই বেলা মাফ করতে হচ্ছে মাদমোয়াজেল শাতিন্নো। কাল আমার মেলা কাজ, তাড়াতাড়ি না শুলে সকালে উঠতে পারব না।'

ক্লের কি বললেন আমি শুনতে পাই নি। ভদ্রতার শেষরক্ষা করতে পারলুম না বলে একটু দুঃখ হল। ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে দশমীর বিসর্জনের মত দেবীপূজার শেষ অঙ্গ। এত খর্চার পর সব কিছু 'এটুকু বাধায় গেল ঠেকি ?' চাবুক কেনার পয়সা ছিল না বলে দামী ঘোড়াটাকে শুধু দানাপানিই খাওয়ালুম, জিনটা পর্যন্ত লাগানো গেল না!

বাস-ভাড়া দিয়ে দেখি আমার কাছে আছে তিনটে কফি, একখানা সেনউইচ, আর পাঁচটি সিগারেটের দাম।

আমার কপাল—বাসের টায়ার ফাটল। আধ মাইল পথ হাঁটতে হবে।

প্যারিসের হোটেলগুলো বেশীর ভাগ সংযমী মহল্লায় অবস্থিত। সংযমীর বর্ণনায় গীতা বলেছেন সর্বভূতের পক্ষে যাহা নিশা সংযমী তাহাতে জাগ্রত থাকেন। তারপর সংযমী সেই নিশাতে কি করেন তার বর্ণনা গীতাতে নেই। আমার ডাইনে বাঁয়ে যে জনতরঙ্গ বয়ে চলেছে, তাদের চেহারা দেখে তো মনে হল না তাঁরা পরমার্থের সন্ধানে চলেছেন। তবে হয়ত এরা অমৃতের সন্তান—অমৃতের সন্ধানে বেরিয়েছেন আর অমৃতের বর্ণনা দিতে গিয়ে এক ঋষি বলেছেন, 'অমৃতাস্তি সুরালয়েষু' অথবা 'বণিতাধরপল্লবেষু'।

ভারতবর্ষের হিন্দু মূর্খ, সে কাশী যায়, মুসলমান মূর্খ, সে মক্কা যায়। ইয়োরোপীয় সংযমী মাত্রই অমৃতের সন্ধানে প্যারিস যায়।

প্যারিসে নিশাভাগে নারীবর্জিতাবস্থায় চলনে পদে পদে বনিতাধরপল্লব থেকে আপনার কর্ণকুহরে অমৃত প্রবেশ করবে 'বঁ সোয়ার মসিয়ো—আপনার সন্ধ্যা শুভ হোক'। আপনি যদি সে ডাকে সাড়া দেন তবে—তবে কি হয় না হয় সে সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমার নেই, প্রয়োজনও নেই, এমিল জোলার মল্লিনাথও আমি হতে চাই নে। শরৎ চাটুয্যে যা লিখেছেন, তা আমার এখনও হজম হয় নি।

হোটেল আর বেশী দূরে নয়—মহল্লাটা ঈষৎ নির্জন হয়ে আসছে। হঠাৎ একটু আনমনা হয়ে গিয়েছিলুম, তাই আপন অজানাতে একটা 'বঁ সোয়ারের' উত্তর দিয়েই বুঝতে পারলুম ভুল করে ফেলেছি। এক সন্ধ্যায় দুই সুন্দরী সামলানো আমার কর্ম নয়। আমার পূর্বপুরুষগণ একসঙ্গে চার সুন্দরী সামলাতে পারতেন। হায়, আমার অধঃপাত কতই গগনচুম্বী থেকে কতই অতলস্পর্শী।

নাঃ, এঁর বেশভূষা দেখে মনে তো হচ্ছে না ইনি 'বসন্তসেনার' সহোদরা, যদিও 'দরিদ্র চারু দত্ত' আমি নিশ্চয়ই বটি। এ রকম নিখুঁত সুন্দরী রাস্তায় বেরুবে কেন? তবে হাঁ, তুলসীদাস বলেছেন, সংসার কি অদ্ভুত রীতিতে চলে দেখ, শুঁড়ি দোকানে বসে বসে মদ বিক্রয় করে, সেখানে ভিড়েরও অন্ত নেই, আর বেচারী দুধওলাকে ঘরে ঘরে ফেরি দিয়ে দিয়ে দুধ বিক্রয় করতে হয়।' কিন্তু এ নীতি তো হেথায় খাটে না।

আমি বললুম, 'অপরাধ নেবেন না; কিন্তু আপনাকে ঠিক প্লেস করতে পারছি নে।'

সুন্দরী স্মিত হাস্য করলেন, বীণার পয়লা পিড়িঙের মত একটা ধ্বনিও বেরুল। সে-হাসি এতই লাজুক আর মিঠা যে তক্‌খুনি চিনতে পারলুম যে এঁকে আমি চিনি নে। এরকম হাসি অতি বড় অরসিকও একবার দেখলে ভুলতে পারে না।

কি করি, এ যে আবার আমার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে আরম্ভ করেছে। এ-সুহাসিনী রসের হাটের বসন্তসেনা নিশ্চয়ই নয়, তবে এরকম গায়ে পড়ে আলাপ করল কেন? আর ভালো মন্দ কোনো কিছু বলছেই না কেন? এ কি রহস্য। নাঃ, কালই প্যারিস ছাড়ব। ক্রসওয়ার্ড আমি কাগজেই পছন্দ করি, জীবনে নয়।

হঠাৎ হোঁচট খেয়ে বেচারী পড়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি তাকে তুলে

ধরলুম। শুধালুম, 'কি হয়েছে।' বলল, 'রাস্তার দোষ নয়, আমি বড্ড ক্লান্ত!'

আমি জানি আমার পাঠকরা আমাকে আর ক্ষমা করবেন না, বলবেন, 'ওরে হস্তীমূর্খ এক সন্ধ্যায় দু' দু'বার ইত্যাদি।' তবু স্বীকার করছি আমি আবার সেই আহাম্মুখিই করলুম। কিন্তু এবার সোজাসুজি, প্যারিস-লক্ষ্ণৌকে তিন-তালাক দিয়ে। বললুম, 'আমার কাছে তিনটে কফি, একটা স্যানউইচ আর পাঁচটি সিগরেটের দাম। কোনো কাফেতে গিয়ে একটু জিরোবেন?'

বলল, 'আমি শুধু কফি খাব।'

কাফেতে বসিয়ে বললুম, 'কফি স্যানউইচ খেয়ে বাড়ি যান।'

কিছু বলল না, আপত্তিও জানালো না।

কাফেতে কড়া আলোতে মেয়েটির চেহারা দেখে মনে হল এর দুর্বলতা না খেতে পেয়ে।

প্রেম অন্ধ কিন্তু প্যারিস তো প্রেমিক নয়। তবে সে এ-সুন্দরীকে উপোস করতে দিচ্ছে কেন? কিন্তু সে রহস্য সমাধানের জন্য একে প্রশ্ন করা বর্বরতা তো বটেই, তাই নিয়ে আপন মনে তোলপাড় করা অনুচিত। পৃথিবীর অনাহার ঘোচাবার দাওয়াই যখন আমার হাতে নেই তখন রোগের কারণ জেনে কি হবে?

হঠাৎ মেয়েটি বলল, 'তুমি ভুল বুঝেছ, আমি বে—'

আমি বললুম, 'চুপ, আমি কিছু শুনতে চাইনে।'

বলল, 'তাই vous (আপনি) না বলে tu (তুমি) বললুম। তবে নূতন নেবেছি। কাল রাত্রে প্রথম। কিন্তু কেউ আমার কাছে ঘেঁষল না সাহস করে, আমার চেহারা তো ওরকম নয় আমি জানি। আমিও কাউকে সাহস করে 'বঁ সোয়ার' বলে নিমন্ত্রণ করতে পারিনি।'

মানুষের দম্ভের সীমা নেই। স্থির করেছিলুম, কোনো প্রশ্ন শুধাব না তবু নিজের কথা জানতে ইচ্ছে করল। বললুম, 'আজ আমাকেই কেন 'বঁ সোয়ার' বললেন?'

'বোধ হয় বিদেশী,—না, কি জানি কেন। ঠিক বলতে পারব না।'

আমি বললুম, 'থাক্, আমি সত্যি কিছু শুনতে চাইনে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু আজ রাত্রে যে করেই হোক আমাকে খদ্দের যোগাড় করতেই হবে। আজ সকালেই ল্যাণ্ডলেডি আমাকে বাড়ি থেকে তাড়াতে চেয়েছিল।'

রাত ঘনিয়ে আসছে, আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হল, 'আপনি বাড়ি যান আর নাই যান, আমার সঙ্গে বসে থাকলে তো আপনার—। জানেন তো, পুরুষের সঙ্গে বসে আছেন দেখলে কেউ আপনার কাছে আসবে না। রাতও অনেক হয়েছে। এখন মাতালের সংখ্যা বেড়েই চলবে।'

কেঁপে ওঠেনি, কিন্তু তার মুখখানি একটু বিকৃত হল।

কোনো কথা কয় না। বড় বিপদে পড়লুম, বললুম, 'আমি তা হলে উঠি?' বলল, 'কেন? আমার সঙ্গে বসতে চাও না?'

আমি তাড়াতাড়ি মাপ চেয়ে বললুম, 'না, না, তা নয়। আপনাকে সত্যি বলছি। কিন্তু আমার সঙ্গে বসে থাকলে আপনার সময় যে বৃথায় যাবে।'

বলল, 'তুমি আমাকে কফি খাওয়ালে।'

কাতর হয়ে বললুম, 'প্লীজ, জিনিসটা ওরকম ধারা নেবেন না।'

'তা হলে তুমি আমাকে কফি খাওয়ালে কেন?'

আমি বললুম, 'প্লীজ, প্লীজ, এসব কথা বাদ দিন।'

বলল, 'কেউ তো খাওয়ায় না। না, তুমি বসো। তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার সত্যি ভালো লাগছে।'

এই দুঃখ-বেদনার মাঝখানেও এর সাহচর্য, সৌন্দর্য যে আমাকে টানছিল সে-কথা অস্বীকার করে আপন দাম বাড়াতে চাইনে।

বলল, 'আর জানো, তুমি চলে গেলেই আমাকে 'বঁ সোয়ারের' পাত্র খুঁজতে বেরুতে হবে। আমি আর সাহস পাচ্ছি নে।'

হায় অরক্ষণীয়া, তুমি কি করে জানলে প্যারিস কত রূঢ় কত নিষ্ঠুর।

বললুম, 'আজ তা হলে থাক্ না। আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দি। কোথায় থাকেন বলুন তো?'

'কাছেই, লাভনীর হোটেলের পাশের গলিতে।'

খুশী হয়ে বললুম, 'তা হলে চলুন, আমি লাভনীরেই থাকি।'

রাস্তায় চলতে চলতে সে আমার বাহু চেপে ধরল। হাতের আঙুল কোনো ভাষায় কথা বলে না বলেই সে অনেক কথা বলতে পারে। তার কিছুটা বুঝলুম, কিছুটা বুঝেও বুঝতে চাইলুম না। হঠাৎ মেয়েটার কেমন যেন মুখ খুলে গেল। বোধ হয় সেরাত্রে 'বঁ সোয়ার' বলার বিভীষিকা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে বলে। বলতে লাগল, পয়সা রোজকারের কত চেষ্টা সে করেছে, কত চাকরী সে পেয়েছে, তারপর যারা চাকরি দিয়েছে তারা কি চেয়েছে, কি রকম জোর করেছে, সে

পালিয়েছে, আরো কত কি ?

আর কি অদ্ভুত সুন্দর ফরাসী ভাষা। থাকতে না পেরে বাধা দিয়ে বললুম, 'আপনি এত সুন্দর ফরাসী বলেন।'

ভারী খুশী হয়ে গর্ব করে বলল, 'বাঃ। দোদে পরিবারের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব ছিল যে।'

তাই বলো। আলফঁস দোদের মত ক'টা লোক ফরাসী লিখতে পেরেছে।

হোটেলে পৌঁছতে পৌঁছতে সে অনেক কথা বলে ফেলল।

হোটেল পেরিয়ে মেয়েটির বাড়ি যেতে হয়। দরজার সামনে সে দাঁড়াল। আমি বললুম, 'চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দি।' বলল, 'না।' আমি বললুম 'সে কি ?' উত্তর না পেয়ে বললুম, 'তা হলে বন্ স্যুই,—শুভরাত্রি—তুমি এইটুকু একাই যেতে পারবে।'

শেকহ্যাণ্ড করার জন্য তার হাত ধরেছিলুম। সে হাত ছাড়ল না। মাথা নীচু করে বলল, 'তুমি আমাকে তোমার ঘরে নিয়ে চলো।'

আমাকে বোকা বলুন, মেয়েটিকে ফন্দিবাজ বলুন, যা আপনাদের খুশী, কিন্তু আমার ধর্মসাক্ষী আমি তাকে খারাপ বলে কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারলুম না। বললুম, 'আমার সামর্থ্য নেই যে তোমাকে সত্যিকার সাহায্য করতে পারি, কিন্তু তোমাকে ভগবান যে সৌন্দর্য দিয়েছেন তাকে বাঁচাতে পারলে যে-কোনো লোক ধন্য হবে।' 'ভগবান' শব্দটা প্যারিসের পথে বড় বেখাপ্পা শোনালো।

মেয়েটি মাথা নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললুম, 'কি হবে বৃথা উপদেশ দিয়ে। তুমি বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছ।'

আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল। ডাগর ডাগর দু' চোখ আমাকে কি বলল সে কথা আজও ভুলিনি। আমার দিকে ও-রকম করে আর কেউ কখনো তাকায় নি।

তারপর আস্তে আস্তে সে আপন বাড়ির দিকে রওয়ানা হল।

আমি মুগ্ধ হয়ে অপলক দৃষ্টিতে দেখলুম, তার সমস্ত দেহটি আপন অসীম সৌন্দর্য বহন করে চলেছে রাজরাণীর মত সোজা হয়ে, আর মাথাটি ঝুঁকে পড়েছে বেদনা আর ক্লান্তির ভারে।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙতেই মনে হল, ভুল করেছি। মানুষ সাহায্য করতে

চাইলে সর্বাবস্থায়ই সাহায্য করতে পারে। নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মাল, এত সোজা কথাটা কাল রাত্রে বুঝতে পারলুম না কেন।

তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে মেয়েটির—কি মূর্খ আমি নামটি পর্যন্ত জিজ্ঞেস করিনি—সন্ধানে বেরুতে যাবার মুখে হোটেলের পোর্টার আমাকে একটি ছোট পুলিন্দা দিল।

খুলতেই একখানা চিঠি পেলুম ;

'বন্ধু, তোমার কথাই মেনে নিলুম। আজ পাঁচটার ট্রেনে আমি গ্রামে চললুম। সেখানেও আমার কেউ নেই। তবু উপবাসে মরা প্যারিসের চেয়ে সেখানেই সহজ হবে। বিনা টিকিটেই যাচ্ছি।

তোমাকে দেবার মত আমার কিছু নেই, এই স্বয়েটারটি ছাড়া। ভগবানেরই দয়া, তোমার গায়ে এটা হবে।

জ্যুলি।'

বেঁচে থাকো সর্দিকাশি'

ভয়ঙ্কর সর্দি হয়েছে। নাক দিয়ে না জল বেরচ্ছে তা সামলানো রুমালের কর্ম নয়। ডবল সাইজ বিছানার চাদর নিয়ে আগুনের কাছে বসেছি। হাঁচছি আর নাক ঝাড়ছি, নাক ঝাড়ছি, আর হাঁচছি। বিছানার চাদরের অর্ধেকখানা হয়ে এসেছে, এখন বেছে বেছে শুকনো জায়গা বের করতে হচ্ছে। শীতের দেশ, দোর জানালা বন্ধ, কিচ্ছু খোলার উপায় নেই। জানালা খুললে মনে হয় গৌরীশঙ্করের চূড়োটি যেন হিমালয় ত্যাগ করে আমার ঘরে নাক গলাবার তালে আছেন।

জানি, একই রুমালে বার বার নাক ঝাড়লে সর্দি বেড়েই চলে, কিন্তু উপায় কি ? দেশে হলে রকে বসে বাইরে গলা বাড়িয়ে দিয়ে সশব্দে নাক ঝাড়তুম, এ নোংরামির হাত থেকে রক্ষা তো পেতুমই, নাকটাও কাপড়ের ঘষায় ছড়ে যেত না।

হঠাৎ মনে পড়ল পরশু দিন এক ডাক্তারের সঙ্গে অপেরাতে আলাপ হয়েছে। ডাকসাঁইটে ডাক্তার—ম্যুনিক শহরে নাম করতে পারাটা চাট্টিখানা কথা নয়। যদিও জানি ডাক্তার করবে কচু, কারণ জর্মন ভাষাতেই প্রবাদ আছে, 'ওষুধ খেলে সর্দি সারে সাত দিনে, না খেলে এক সপ্তায়'।

তবু গেলুম তাঁর বাড়ি। আমার চেহারা দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা কি। আমি শুধালুম, 'সর্দির ওষুধ আছে? আপনার প্রথম এবং খুব সম্ভব শেষ ভারতীয় রোগীর একটা করে দিন। আমার এক নাক দিয়ে বেরচ্ছে রাইন, অন্য নাক দিয়ে ওডার।'

ডাক্তার যদিও জর্মন তবু হাত দু'খানি আকাশের দিকে তুলে ধরলেন ফরাসিস্ কায়দায়। বললেন, 'অবাক করলেন, স্যর! সর্দির ওষুধ নেই? কত চান? সর্দির ওষুধ হয় হাজারো রকমের।'

বলে আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে খুললেন লাল কেল্লার সদর দরজা পরিমাণ এক আলমারি। চৌকো, গোল, কোমর-মোটা, পেট-ভারী বাহান্ন রকমের বোতল-শিশিতে ভর্তি। নানা রঙের লেবেল আর সেগুলোর উপর লেখা রয়েছে বিকট বিকট সব লাতিন নাম।

এবারে খানদানী ভিয়েনীজ কায়দায় কোমরে দু'ভাঁজ হয়ে, বাও করে বাঁ হাত পেটের উপর রেখে ডান হাত দিয়ে তলোয়ার চালানোর কায়দায় দেরাজের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি দেখিয়ে বললেন, 'বেছে নিন, মহারাজ (কথাটা জর্মন ভাষায় চালু আছে); সব সর্দির দাওয়াই।'

আমি সন্দিগ্ধ নয়নে তাঁর দিকে তাকালুম। ডাক্তার মুখব্যাদন করে পরিতোষের ঈষৎ হাস্য দিয়ে গালের দুটি টোল খোলতাই করে দিয়েছেন—হা-টা লেগে গিয়েছে দু'কানের ডগায়।

একটা ওষুধের কটমটে লাতিন নাম অতি কষ্টে উচ্চারণ করে বললুম, 'এর মানে তো জানিনে।'

সদয় হাসি হেসে বললেন, 'আমিও জানিনে, তবে এটুকু জানি, ঠাকুরমা মার্কা কচু-ঘেঁচু মেশানো দিশী দাওয়াই মাত্রেরই লঙ্কা লম্বা লাতিন নাম হয়।'

আমি শুধালুম, 'খেলে সর্দি সারে?'

বললেন, 'গলায় একটু আরাম বোধ হয়, নাকের সুড়সুড়িটা হয়ত একটু আধটু কমে। আমি কখনো পরখ করে দেখিনি। সব পেটেণ্ট ওষুধ—নমুনা হিসেবে বিন পয়সায় পাওয়া। তবে সর্দি সারে না, এ কথা জানি।'

আমি শুধালুম, 'তবে যে বললেন, সর্দির ওষুধ আছে?'

বললেন, 'এখনো বলছি আছে কিন্তু সর্দি সারে সে কথা তো বলিনি।'

বুঝলুম, জর্মনি কাণ্ট হেগেলের দেশ। বললুম, 'অ'।

ফিস্‌ফিস্ করে ডাক্তার বললেন, 'আরেকটা তত্ত্বকথা এই বেলা শিখে নিন। যে

ব্যামোর দেখবেন সাতান্ন রকমের ওষুধ, বুঝে নেবেন সে ব্যামো ওষুধে সারে না।'

ততক্ষণে আবার আমি হাঁচ্ছো হাঁচ্ছো আরম্ভ করে দিয়েছি। নাকচোখ দিয়ে এবার আর রাইন-ওডার না, এবারে পদ্মা-মেঘনা। ডাক্তার ডজন দুই কাগজের রুমোল আর একটা ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

ধাক্কাটা সামলে উঠে প্রাণভরে জর্মন সর্দিকে অভিসম্পাত দিলুম।

দেখি, ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিটিয়ে হাসছেন।

আমার মুখে হয়ত একটু বিরক্তি ফুটে উঠেছিল। বললেন, 'সর্দি-কাশির গুণও আছে।'

আমি বললুম, 'কচু, হাতি, ঘণ্টা!'

বললেন, 'তর্জমা করে বলুন।'

আমি বললুম, 'কচুর লাতিন নাম জানিনে; 'হাতী' হল 'এলেফাণ্ট' আর 'ঘণ্টা' মানে 'গ্লকে'।'

'মানে?'

'আর বুঝে দরকার নেই; এগুলো কটুবাক্য।'

আকাশপানে হানি যুগলভুরু বললেন, 'অদ্ভুত ভাষা! হাতী আর ঘণ্টা গালাগাল হয় কি করে! একটা গল্প শুনবেন? সঙ্গে গরম ব্রাণ্ডি?'

আমি বললুম, 'প্রথমটাই চলুক। মিক্‌স্ করা ভালো নয়।'

ডাক্তার বললেন, 'আমি ডাক্তারি শিখেছি বার্লিনে। বছর তিনেক প্র্যাকটিস করার পর একদিন গিয়েছি স্টেশনে, বন্ধুকে বিদেয় দিতে। ফেরার সময় স্টেশন-রেস্তোরাঁয় ঢুকেছি একটা ব্রাণ্ডি খাব বলে।

'ঢুকেই থমকে দাঁড়ালুম। দেখি, এক কোণে এক অপরূপ সুন্দরী। অত্যন্ত সাদাসিধে বেশভূষা,—গরীব বললেও চলে—আর তাই বোধ হয় সৌন্দর্যটা পেয়েছে তার চরম খোলতাই। নর্থ সী দেখেছেন? তবে বুঝতেন হব-হব সন্ধ্যায় তার জল কি রকম নীল হয়—তারই মত সুন্দরীর চোখ। দক্ষিণ ইটালিতে কখনো গিয়েছেন? না? তবে বুঝতেন সেখানে সোনালি রোদে রূপালি প্রজাপতির কি রাগিণী। তারই মত তাঁর ব্লণ্ড চুল। ডানয়ুব নদী দেখেছেন? না। তা হলে আমার সব বর্ণনাই বৃথা।'

আমি বললুম, 'বলে যান রসগ্রহণে আমার কণামাত্র অসুবিধে হচ্ছে না।'

'না, থাক। ওরকম বেয়ারিং পোস্টের বর্ণনা দিতে আমার মন মানে না। আমরা ডাক্তার-বদ্যি মানুষ, ভাষা বাবদে মুখ্যু-সুখ্যু। অনেক মেহন্নত করে যে

একটি মাত্র বর্ণনা কব্জায় এনেছি সেইটেও যদি না বোঝেন তবে আমার শোকটা কোথায় রাখি বলুন তো।'

কাতর হয়ে বললুম, 'নিরাশ করবেন না।'

'তবে চলুক ত্রিলেগেড্ রেস্। ডানয়ুব নদীর শান্ত-প্রশান্ত ভাবখানা তাঁর মুখের উপর। অথচ জানেন, ডানয়ুব অগভীর নদী নয়। আর ডানয়ুবের উৎপত্তিস্থল দেখেছেন? না। তাহলে বুঝতেন সেখানে তন্বঙ্গী ডানয়ুব যে রকম লাজুক মেয়ের মত এঁকে বেঁকে আপন শরীর ঢাকতে ব্যস্ত, এ-মেয়ের মুখে তেমনি ছড়ানো রয়েছে লজ্জার কেমন যেন একটা আঁকুবাঁকু ভাব।

'এই লজ্জা ভাবটার উপরই আমি বিশেষ করে জোর দিতে চাই। কারণ আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, লজ্জা-শরম বলতে আমরা যা কিছু বুঝি সে সব মধ্যযুগের পুরনো গল্প থেকে। বেয়াত্রিচে দান্তেকে দেখে লাজুক হাসি হেসেছিলেন —আমরা তাই নিয়ে কল্পনার জাল বুনি, আজকের দিনে এসব তো আর বার্লিন শহরে পাওয়া যায় না। মধ্যযুগের নাইটদের শিভালরি গেছে আর যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে মেয়েদের মুখ থেকে সব লজ্জা সব ব্রীড়া।

'কিন্তু আপনাদের দেশে নিশ্চয়ই এখনো এই মধুর জিনিসটি দেখতে পাওয়া যায়, আর তার চেয়েও নিশ্চয়, আপনার দেশের লোক এখনো অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে।

'তাই আপনি বিশ্বাস করবেন, কিন্তু আমি নিজে এখনো করতে পারিনি, কি করে আমার তখন মনে হল, এ-মেয়েকে না পেলে আমার চলবে না।

'হাসলেন না যে? তার থেকেই বুঝলুম, আপনি ওকীবহাল, আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পেরেছেন; কিন্তু জর্মনরা আমার এ-অবস্থার কথা শুনে হাসে। আর হাসবে নাই বা কেন? চেনা নেই, শোনা নেই, বিদ্যাবুদ্ধিতে মেয়েটা হয়ত অফিসবয়ের চেয়েও আকাট, হয়ত মাতালদের আড্ডায় বিয়ার বিক্রি করে পয়সা কামায়, কিম্বা এও তো হতে পারে যে তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এ-সব কোনো কিছুর তত্ত্ব-তাবাশ না করে এক ঝটকায় মনস্থির করে ফেলা, এ-মেয়ে না হলে আমার চলবে না! আমি কি খামখেয়ালির চেঙ্গিসখান না হাজারো প্রেমের ডন্ জুয়ান্? • •

'ভাবছি আর মাথার চুল ছিঁড়ছি—কোন্ অজুহাতে কোন্ অছিলায় এঁর সঙ্গে আলাপ করা যায়।

'কিছুতেই কোনো হদীস পাচ্ছিনে, আমাদের মাঝখানে তিনখানা মাত্র ছোট্ট

টেবিলের যে উত্তাল সমুদ্র সেটা পেরিয়ে ওঁর কাছে পৌঁছই কি প্রকারে। প্রবাদ আছে, প্রেমে পড়লে বোকা নাকি বুদ্ধিমান হয়ে যায়—প্রিয়াকে পাওয়ার জন্য তখন তার ফন্দি-ফিকির আর আবিষ্কার কৌশল দেখে পাঁচজনের তাক লেগে যায় আর বুদ্ধিমান নাকি প্রেমে পড়লে হয়ে যায় একদম গবেট—এমন সব কাণ্ড তখন করে বসে যে দশজন তাজ্জব না মেনে যায় না, এ লোকটা এসব পাগলামি করছে কি করে।

'এ জীবনে সেই সেদিন আমি প্রথম আবিষ্কার করলুম যে আমি বুদ্ধিমান, কারণ পূর্ণ একঘণ্টা ধরে ভেবে ভেবেও আমি সামান্যতম কৌশল আবিষ্কার করতে পারলুম না, আলাপ করি কোন্ কায়দায়। কিন্তু এহেন হৃদয়াভিরাম তত্ত্ব আবিষ্কার করেও মন কিছুমাত্র উল্লসিত হল না। তখন বরঞ্চ বোকা বনতে পারলেই হয়ত কোনো একটা কৌশল বেরিয়ে যেত।

'ফ্রলাইন উঠে দাঁড়ালেন। কি আর করি। পিছু নিলুম। তিনি গিয়ে উঠলেন ম্যুনিকের গাড়িতে। আমিও ছুটে গিয়ে টিকিট কাটলুম ম্যুনিকের। কিন্তু এসে দেখি সে কামরার আটটা সীটই ভর্তি হয়ে গিয়েছে। আরো প্রমাণ হয়ে গেল, আমি বুদ্ধিমান, কারণ এ কথা সবাই জানে, বুদ্ধিমানকে ভগবান সাহায্য করলে এ-পৃথিবীতে বোকাদের আর বাঁচতে হত না। আমি ভগবানের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পেলুম না।'

আমি বললুম, 'ভগবানকে দোষ দিচ্ছেন কেন? এ তো কন্দর্প ঠাকুরের ডিপার্টমেণ্ট।'

বললেন, 'তাতেই বা কি লাভ? তিনি তো অন্ধ। মেয়েটাকে বানিয়ে দিয়েছেন তাঁরই মত অন্ধ। এই যে আমি একটা এত বড় অ্যাপলো, আমার দিকে একেবারের তরে ফিরেও তাকালো না। ওঁকে ডেকে হবে —'

আমি বললুম, 'কচু, হাতী, ঘণ্টা।'

এবার ডাক্তার বাঙলা কটুকাটব্যের কদর বুঝলেন। বললেন, 'আহা-হা-হা।' তারপর জর্মন উচ্চারণে বললেন, 'কত্ত, হাটী, গণ্টা! খাসা গালাগাল।'

আমি বললুম, 'কামরাতে আটজনের সীট ছিল তো বয়েই গেল। প্রবাসে নিয়ম নাস্তি। আপনি কোনো গতিকে ধাক্কাধাক্কি করে—'

বললেন,'তাজ্জব করালেন। এ কি আপনার ইণ্ডিয়ান ট্রেন, না সাইবেরিয়াগামী প্রিজনার-ভ্যান! চেকার পত্রপাঠ কামরা থেকে বের করে দেবে না?

'দাঁড়িয়ে রইলুম বাইরের করিডরে ঠায়। দেখি, মেয়েটি যদি খানা-কামরায়

যায়। স্টেশনে তো খেয়েছে শুধু কফি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটলো, কত লোক কত কামরা থেকে উঠলো নামলো কিন্তু আমার স্বর্গপুরী থেকে কোনো—(কটুবাক্য) নামলো না। সব ব্যাটা নিশ্চয়ই যাচ্ছে ম্যুনিক। আর কোথাও যেতে পারে না? ম্যুনিক কি পরীস্থান না ম্যুনিকের ফুট-পাথ সোনা দিয়ে গড়া? অবাক করলে এই ইডিয়টগুলো।

'প্রেমে পড়লে নাকি ক্ষুধাতৃষ্ণা লোপ পায়। একবেলার জন্য হয়ত পায়। আমি লঞ্চ খাইনি, ওদিকে ডিনারের সময় হয়ে গিয়েছে—আমার পেটের ভিতর হুলুধ্বনি জেগে উঠেছে। এমন সময় মা-মেরির করুণা হল। মেয়েটি চলল খানা-কামরার দিকে। আমিও চললুম ঠিক পিছনে পিছনে। আহা, যদি একটা হোঁচট খেয়ে আমার উপর পড়ে যায়। দুত্তোর, তারও উপায় নেই—উঁচু হিলের জুতো হলে গাড়ির কাঁপুনিতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে—এ পরেছে ক্রেপ-সোল্।

'ঠিক পিছনে পিছনে গিয়ে খানা-কামরায় ঢুকলুম। ওয়েটারটা ভাবলে স্বামী-স্ত্রী। না হলে তরুণ-তরুণী মুখ গুমসো করে খানা-কামরায় ঢুকবে কেন? বসালো নিয়ে একই টেবিলে—মুখোমুখি। হে মা-মেরি, নত্র দাম্ গির্জেয় তোমার জন্য আমি একশ'টা মোমবাতি মানত করলুম। দয়া করো, মা, একটা কিছু ফিকির বাৎলাও আলাপ করবার।

'বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমান, কোনো সন্দেহ নেই আমি বুদ্ধিমান। কোনো ফিকিরই জুটলো না, অথচ মেয়েটি বসে আছে আমার থেকে দু'হাত দূরে এবং মুখোমুখি। দু'হাত না হয়ে দু'লক্ষ যোজনও হতে পারত—কোনো ফারাক হ'ত না।

'জানালা দিয়ে এক ঝটকা কয়লার গুঁড়া এসে টেবিলের উপর পড়ল। মেয়েটি ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকাতেই আমি ঝটিতি জানালা বন্ধ করতে গিয়ে করে ফেললুম আরেক কাণ্ড। ঠাস করে জানালাটা বুড়ো আঙুলের উপর পড়ে সেটাকে দিল থেৎলে। ফিনকি দিয়ে রক্ত।

'মা-মেরির অসীম দয়া কাণ্ডটা যে ঘটলো। মেয়েটি তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বলল, 'দাঁড়ান আমি ব্যাণ্ডেজ নিয়ে আসছি।'

'আমি নিজে ডাক্তার, বিবেচনা করুন অবস্থাটা। রুমাল দিয়ে চেপে ধরলুম আঙুলটাকে। মেয়েটি ছুটে নিয়ে এল কামরা থেকে ফার্স্ট এডের ব্যাণ্ডেজ। তারপর আঙুলটার তদারকি করল শাস্ত্র-সম্মত ডাক্তারি পদ্ধতিতে। বুঝলুম মেডিকেল কলেজে পড়ে। ঝানু ডাক্তার ফার্স্ট এডের ব্যাণ্ডেজ

বয়ে বেড়ায় না আর আনাড়ি লোক এরকম ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে পারে না।

'আমি তো, 'না, না', 'আপনি কেন মিছে মিছে,' 'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ', 'উঃ, বড্ড লাগছে,' 'এতেই হবে,' 'ব্যস্ ব্যস্' করেই যাচ্ছি আর সেই লিলির মত সাদা হাতের পরশ পাচ্ছি। সে কি রকম মখমলের হাত জানেন? বলছি; আপনি কখনো রাইনল্যাণ্ড গিয়েছেন? না? থাক, ভুলেই গিয়েছিলুম, প্রতিজ্ঞা করেছি, আপনাকে কোনো বর্ণনা দেব না।

'প্রথম পরশে সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে যায়, বলে না? বড় খাঁটি কথা। আমি ডাক্তার মানুষ, আমার হাতে কোনো প্রকারের স্পর্শকাতরতা থাকার কথা নয় তবু আমার যে কী অবস্থাটা হয়েছিল আপনাকে সেটা বোঝাই কি করে? মেয়েটি বোধ হয় টের পেয়েছিল, কারণ একবার চকিতের তরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বন্ধ করে আমার দিকে মাথা তুলে তাকিয়েছিল।

'তাতে ছিল বিস্ময়, প্রশ্ন এবং হয়ত বা একটুখানি, অতি সামান্য খুশীর ঝিলিমিলি। তবে কি আমার হাতের স্পর্শ—? কোন্ সাহসে এ-বিশ্বাস মনের কোণে ঠাঁই দিই বলুন।'

আমি গুন্ গুন্ করে বললুম,

'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না,
হায় ভীরু প্রেম হায় রে'।'

ডাক্তার বললেন, 'খাসা মেলডি তো। মানেটাও বলুন।'

বললুম, 'আফ্টার ইউ। আপনি গল্পটা শেষ করুন।'

বললেন, 'গল্প নয়, স্যর; জীবনমরণের কথা হচ্ছে।'

আমি শুধালুম, 'কেন, সেপ্টিকের ভয় ছিল নাকি?'

রাগের ভাব করে বললেন, 'ইয়োরোপে এসে আপনার কি সব রসকষ শুকিয়ে গিয়েছে? আমাকে হেনেছে প্রেমের বাণ আর আপনি বলছেন অ্যান্টি-সেপ্টিক্ আন।'

আমি বললুম, 'অপরাধ নেবেন না।'

বললেন, 'তার পর আমি সুযোগ পেয়ে আরম্ভ করলুম নানা রকমের কথা কইতে। গোল গোল। আমি যে পরিচয় করার জন্য জান-কবুল সেটা ঢেকে চেপে। সঙ্গে সঙ্গে কখনো নুনটা এগিয়ে দি, কখনো ক্রুয়েটটা সরিয়ে নি, কখনো বা বলি, 'মাছটা খাসা ভেজেছে, আপনি একটা খান না; ওহে খানসামা, এদিকে—, ইত্যাদি।

'করে করে সুন্দরীর মনটা একটু মোলায়েম করতে পেরেছি বলে মনে একটু ক্ষীণ আশার সঞ্চার হল।'

'মেয়েটি লাজুক বটে কিন্তু ভারী ভদ্র। আমার ভ্যাজর ভ্যাজর কান পেতে শুনলো, দু'একবার ব্লাশ্ করলো, সে যা গোলাপি—আপনি কখনো, না, থাক।

'কিন্তু খেল মাত্র একটি অমলেট আর দু'স্লাইস রুটি। নিশ্চয়ই গরীব। ক্ষীণ আশাটার গায়ে একটু গত্তি লাগল।' এমন সময় ডাক্তারের অ্যাসিস্টাণ্ট এসে জানালো রুগী এসেছে। ডাক্তার বললেন, 'এখখুনি আসছি।'

ফিরে এসে কোনো ভূমিকা না দিয়েই বললেন, 'ম্যুনিকে নাবলুম এক বক্সে। এমন ভান করে কেটে পড়লুম যাতে মেয়েটি মনে করে আমি ভ্যান থেকে মাল নামাতে গেলুম। যখন 'গুড্ বাই' বলে হাত বাড়ালুম তখন সে একবার আমার দিকে তাকিয়েছিল। প্রেমে পড়লে নাকি মানুষের পাখা গজায়—হবেও বা, কিন্তু এ-কথা নিশ্চয় জানি মানুষ তখন চোখে মুখে এমন সব নূতন ভাষা পড়তে পারে যার জন্য কোনো শব্দরূপ ধাতুরূপ মুখস্থ করতে হয় না। তবে সে পড়াতে ভুল থাকে বিস্তর, কাকতালীয় এন্তার।

'আমি দেখলুম, লেখা রয়েছে 'বিষাদ' কিন্তু পড়লুম, 'এই কি শেষ' ?'

আমিও অবাক হয়ে শুধালুম, 'বার্লিন থেকে ম্যুনিক অবধি হামলা করে স্টেশনে খেই ছেড়ে দিলেন ?'

ডাক্তারদের বাঁকা হাসি হেসে বললেন, 'আদপেই না। কিন্তু কি আর দরকার পিছু নিয়ে ? মেডিকেল কলেজে পড়ে, ওতেই ব্যস্।

'সেদিনই গেলুম মেডিকেল কলেজের রেস্তোরাঁয়। লঞ্চ খেতে নিশ্চয়ই আসবে। এবারে মেয়েটি আর লজ্জা দিয়ে মনের ভাব ঢাকতে পারল না। আমাকে দেখা মাত্র আপন অজানাতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুখে যে খুশী ছড়িয়ে পড়ল তা দেখে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না, ভগবান মাঝে মাঝে বুদ্ধিমানকেও সাহায্য করেন।

'ততক্ষণে মেয়েটি তার আপন-হারা আচরণটাকে সামলে নিয়েছে—লজ্জা এসে আবার সমস্ত মুখ ঢেকে ফেলেছে।'

ডাক্তার খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, 'এখানেই যদি শেষ করা যেত তবে মন্দ হত না কিন্তু সর্দি-কাশির তো তা হলে কোনো হিল্লে হয় না। তাই কমিয়ে-সমিয়ে তাড়াতাড়ি শেষ করে দি।'

আমি বললুম, কমাবেন না। তালটা একটু দ্রুত করে দিন। আমাদের

দেশের ওস্তাদরা প্রথম খানিকটে গান করেন বিলম্বিত একতালে, শেষ করেন দ্রুত তেতালে।

ডাক্তার বললেন, 'দুঃখিনী মেয়ে। বাপ-মা নেই। এক খাণ্ডার পিসির বাড়িতে মানুষ হয়েছে। দু'মুঠো খেতে দেয় পরতে দেয়, ব্যস্। কলেজের ফীজটি পর্যন্ত বেচারী যোগাড় করে মাস্টারী করে।

'তাতে আমার কিছু বলার নেই কিন্তু আমার ঘোরতর আপত্তি এভাকে বুড়ী এমনি নজরবন্দ করে রেখেছে যে চকিতা হরিণীর মত সমস্তক্ষণ সে শুধু ডাইনে বাঁয়ে তাকায়, ঐ ঝি পিসি দেখে ফেললে, সে পরপুরুষের সঙ্গে কথা কইছে। আমি তো বিদ্রোহ করে বললুম,'এ কি বুখারার হারেম, না তুর্কী পাশার জেনানা? এ অত্যাচার আমি কিছুতেই সইব না।' এভা শুধু আমার হাত ধরে বলে, 'প্লীজ, প্লীজ, তুমি একটু বরদাস্ত করে নাও; আমি তোমাকে হারাতে চাইনে।' এর বেশী সে কক্‌খনো কিছু বলেনি।

'এই মোকামে পৌঁছতে আমার লেগেছিল ঝাড়া একটি মাস। বিবেচনা করুন। সাত দিন লেগেছিল প্রেম নিবেদন করতে। পনরো দিন লেগেছিল হাতখানি ছুঁতে। তারো এক সপ্তাহ পরে সে আমায় বললে কেন সে এমন ভয়ে ভয়ে ডাইনে বাঁয়ে তাকায়।

'থিয়েটার সিনেমা মাথায় থাকুন, আমার সঙ্গে রাস্তায় পর্যন্ত বেরতে রাজী হয় না—পাছে পিসি দেখে ফেলে। আমি একদিন থাকতে না পেরে বললুম, তোমার পিসির কি কুইনটুপ্লেট আছে নাকি যে তারা ম্যুনিকের সব স্ট্র্যাটেজিক পয়েণ্টে দাঁড়িয়ে তোমার উপর নজর রাখছে?' উত্তরে শুধু কাতর স্বরে বলে, 'প্লীজ, প্লীজ।'

'যা-কিছু আলাপ-পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা-আত্মীয়তা সব ঐ কলেজ-রেস্তোরাঁয় বসে। সেখানে ভিড় সার্ডিন্-টিনের ভিতর মাছের মত। চেয়ারে চেয়ারে ঠাসাঠাসি কিন্তু তার হাতে যে হাতখানা রাখব তারও উপায় নেই। কেউ যদি দেখে ফেলে।'

আমি বললুম,

'সমুখে রয়েছে সুধা পারাবার
নাগাল না পায় তবু আঁখি তার
কেমনে সরাব কুহেলিকার এই বাধা রে।'

ডাক্তার বললেন, 'মানে বলুন।'

আমি বললুম, 'আপ যাইয়ে, পরে বলবো।'

ডাক্তার বললেন, 'সেই ভিড়ের মাঝখানে, কিম্বা করিডরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

আলাপচারি। করিডরে কথা কওয়া যায় প্রাণ খুলে, কিন্তু তবু আমি রেস্তোরাঁর ভিড়ই পছন্দ করতুম বেশী কারণ সেখানে দৈবাৎ, ক্বচিৎ কখনো এভা তার ছোট্ট জুতোটি দিয়ে আমার পায়ের উপর দিত চাপ।

'তার মাধুর্য আপনাকে কি করে বোঝাই? এভাকে পরে নিবিড়তর করে চিনেছি কিন্তু সেই পায়ের চাপ যে আমাকে কত কথা বলেছে, কত আশ্বাস দিয়েছে সেটা কি করে বোঝাই?

'হয়ত তার চেনা কোনো এক ছোকরা স্টুডেন্ট এসে হাসিমুখে তাকে দুটি কথা বললে। অত্যন্ত হার্মলেস; আমি কিন্তু হিংসেয় জরজর! টেবিলের উপর রাখা আমার হাত দুটো কাঁপতে আরম্ভ করছে, আমি আর নিজেকে সামলাতে পারছিনে—

'এমন সময় সেই পায়ের মৃদু চাপ।

সব সংশয়ের অবসান, সব দুঃখ অন্তর্ধান।'

ডাক্তার বললেন, 'তাই আমার দুঃখ আর বেদনার অবধি রইল না। এই বিরাট ম্যুনিক শহরে লক্ষ লক্ষ নরনারী নিভৃতে মনের ভার নামাচ্ছে, নিষ্ঠুর সংসারে লড়বার শক্তি একে অন্যের সঙ্গসুখ স্পর্শসুখ থেকে আহরণ করে নিচ্ছে, আর আমি তারই মাঝখানে এমন কিছুই করে উঠতে পারছিনে যাতে করে এভাকে অন্তত একবারের মত কাছে টেনে আনতে পারি।

'শেষটায় আর সইতে না পেরে একদিন এভাকে কিছু না বলে ফিরে গেলুম বার্লিন। সেখান থেকে লিখে জানালুম, 'ও রকম কাছে থেকে না পাওয়ার দুঃখ আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে—আমার নার্ভস্ একদম গেছে। তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসা আমার কিছুতেই হয়ে উঠত না—তোমার মুখের কাতর ছবি আমার চলে আসার সব শক্তি নষ্ট করে ফেলত'।'

আমি বললুম, 'আপনি তো দারুণ লোক, মশাই। তবে, হাঁ, আপনাদের নীটশেই বলেছেন, 'কড়া না হলে প্রেম মেলে না'।'

ডাক্তার বললেন, 'ঠিক উল্টো। কড়া হতে পারলে আমি ম্যুনিক থেকে পালাতুম না। পলায়ন জিনিসটা কি বীরের লক্ষণ? তা সে কথা থাক।

'উত্তর পেলুম সঙ্গে সঙ্গেই। সে চিঠিটি আমি এতবার পড়েছি যে তার ফুলস্টপ, কমা পর্যন্ত আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। এবং তার চেয়েও বড় কথা, সে চিঠিটির বক্তব্য আমার কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ঠেকলো।

'আপনাদের দেশে অবিশ্বাস্য বলে কোনো জিনিস নেই—ভিখিরিকে মাথায়

তুলে নিয়ে আপনাদের দেশে হাতী হামেশাই রাজা বানায়। কিন্তু জর্মনিতে তো সে রকম ঐতিহ্য নেই। চিঠিতে লেখা ছিল :—

'বেশী লিখব না—আমারও অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাই স্থির করেছি তোমার ইচ্ছামত তোমায় আমায় একবার নিভৃতে দেখা হবে। তার পর বিদায়! যত দিন পিসি আছেন ততদিন আমি আর কোনো পন্থা খুঁজে পাচ্ছিনে। তুমি আসছে বুধবার দিন আমাদের বাড়ির সামনে ফুটপাতে অপেক্ষা করো। আমি তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে আসব।' '

ডাক্তার বললেন, 'বিশ্বাস হয় আপনার ; যে মেয়ে পিসির ভয়ে আমার সঙ্গে কলেজ রেস্তোরাঁর বাইরে পর্যন্ত যেতে রাজী হত না, সে আমাকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে আপন ঘরে ?'

আমি বললুম, 'পীরিতি-সায়রে ডোবার পূর্বে যে রাধা সাপের ছবিমাত্র দেখেই অজ্ঞান হতেন সেই রাধাই অভিসারে যাওয়ার সময় আপন হাত দিয়ে পথের পাশের সাপের ফণা চেপে ধরেছেন পাছে সাপের মাথার মণির আলোকে কেউ তাঁকে দেখে ফেলে'।

ডাক্তার বললেন, 'তাই বটে। তবে কি না আমি রাধার প্রেমকাহিনী কখনো পড়িনি। সে কথা থাক।

'আমি ম্যুনিক পৌঁছলুম, বুধবার দিন সন্ধ্যের দিকে। কয়লার গুঁড়োয় সর্বাঙ্গ ঢেকে গিয়েছিল বলে ঢুকলুম একটা পাবলিক বাথে স্নান করতে। টাবে বসে সর্ব-শরীর ডলাই-মলাই করে আর গরম জলে সেদ্ধ চিংড়িটার মত লাল হয়ে যখন বেরলুম তখন আর হাতে বেশী সময় নেই। অথচ গরম টাব থেকে ও রকম হুট করে ঠাণ্ডায় বেরলে যে সঙ্গে সঙ্গে ঝপ্ করে সর্দি হয় সে কথাও জানি। চানটা না করলেও যে হত সে তত্ত্বটা বুঝতে পারলুম রাস্তায় বেরিয়ে কিন্তু তখন আর আফসোস করে কোনো ফায়দা নেই। সেই ডিসেম্বরের শীতে চললুম এভার বাড়ির দিকে—মা-মেরির উপর ভরসা করে, যে এ যাত্রায় সর্দিটা নাও হতে পারে।'

আমি বললুম, 'আমরা বাঙলায় বলি, 'দুগ্‌গা বলে ঝুলে পড়লুম'।'

ডাক্তার বললেন, 'সাড়ে এগারোটার সময় গিয়ে দাঁড়ালুম এভার বাড়ির সামনের রাস্তায়। টেম্পারেচার তখন শূন্যেরও নীচে—আপনাদের পাগলা ফারন্‌হাইটের হিসেবে বত্রিশের ঢের নীচে। রাস্তায় এক ফুট বরফ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আর আমার চতুর্দিকে যে হিম ঘনাতে লাগলো তার সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলতে পারি আমাকে যেন কেউ একটা বিরাট ফ্রিজিডেরের ভিতর তালাবন্ধ করে

রেখে দিল।

'তিন মিনিট যেতে না যেতে নামল মুষলধারে—বৃষ্টি নয়—সর্দি। সঙ্গে সঙ্গে ডাইনামাইট ফাটার হাঁচি—হাঁচ্চো, হাঁচ্চো, হাঁচ্চো। আপনার আজকের সর্দি তার তুলনায় নস্যি, অর্থাৎ নস্যির খোঁচায় নামানো আড়াই ফোঁটা জল। হাঁচি আর জল, জল আর হাঁচি।

'কি করি, কি করি ভাবছি, এমন সময় এভা এসে নিঃশব্দে আমার হাত ধরলো —বরফের গুঁড়োর উপর পায়ের শব্দ শোনা যায় না। তার উপর সে পরেছে সেই ক্রেপ-সোলের জুতো—বেচারীর মাত্র ঐ এক জোড়াই সম্বল।

'কোনো কথা না বলে আমাকে নিয়ে চলল তার সঙ্গে। ফ্ল্যাটের দরজা খুলে, করিডরের খানিকটে পেরিয়েই তার কামরা। নিঃশব্দে আমাকে সেখানে ঢুকিয়ে দরজায় খিল দিয়ে মাথা নীচু করে আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

'এভার গোলাপি মুখ ডাচ্ পনিরের মত হলদে, টুকটুকে লাল ঠোঁট দুটি ব্লু-ডানয়ুবের মত ঘন বেগুনি-নীল—ভয়ে, উত্তেজনায়।

'আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল আবার আমার সেই ডাইনামাইট ফাটানো হাঁচ্চো, হাঁচ্চো।

'এভা আমাকে ধরে নিয়ে আমার মাথা গুঁজে দিল বিছানায়। মাথার উপর চাপালো বালিশ আর সব ক'খানা লেপ-কম্বল। বুঝতে পারলুম কেন; পাশের ঘরে পিসি যদি শুনতে পান তবেই হয়েছে। আমি প্রাণপণ হাঁচি চাপবার চেষ্টা করছি আর লেপ-কম্বলের ভিতর বম্-শেল্ ফাটাচ্ছি।

'কতক্ষণ এ রকম কেটেছিল বলতে পারব না। হাঁচির শব্দ কিছুতেই থামছে না। এভা শুধু কম্বল চাপাচ্ছে, আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম কিন্তু নিবিড় পুলকে বার বার আমার সর্বশরীর শিহরিত হচ্ছে—এভার হাতের চাপ পেয়ে।

'এমন সময় দরজায় ধাক্কা আর নারীকণ্ঠের তীব্র চিৎকার, 'দরজা খোল'।

'পিসি!

'আর লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। আমি লেপের ভিতর থেকে বেরলুম। এভা ভয়ে ভিরমি গিয়েছে, খাটের উপর নেতিয়ে পড়েছে।

আমি দরজা খুলে দিলুম। সাক্ষাৎ শকুনির মত বীভৎস এক বুড়ী ঘরে ঢুকে আমার দিকে না তাকিয়েই এভাকে বললো, 'কাল সকালেই তুই এ-বাড়ি ছাড়বি'।

'সঙ্গে সঙ্গে আর কি সব বকুনি দিয়েছিল, 'ঘেন্না', 'কেলেঙ্কারি', 'শোবার ঘরে পরপুরুষ', 'রাস্তার মেয়ের ব্যাভার', এই সব, সে আমার আর মনে নেই। বুড়ী

আমার দিকে তাকায় না, গালের উপর গাল চড়ছে যেন ছ'গজী পিয়ানোর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি কেউ আঙুল চালাচ্ছে।

'আমি আর থাকতে পারলুম না। বুড়ীর দুই বাহু দু' হাত দিয়ে চেপে ধরে বললুম,

'আমার নাম পেটার সেল্‌বাখ্‌। বার্লিনে ডাক্তারি করি। ভদ্রঘরের ছেলে। আপনার ভাইঝিকে বিয়ে করতে চাই'।'

ডাক্তার বললেন, 'মা-মেরি সাক্ষী, আমি এভাবে বিয়ে করার প্রস্তাব এত দিন করিনি পাছে সে 'না' বলে বসে। আমি অপেক্ষা করছিলুম পরিচয়টা ঘনাবার জন্য। বিয়ের প্রস্তাবটা আমার মুখ দিয়ে যে তখন কি করে বেরিয়ে গেল আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি।

'পিসি আমার দিকে হাবার মত তাকালো—এক বিঘৎ চওড়া হা করে। পাকা দু'মিনিট তার লেগেছিল ব্যাপারটা বুঝতে। তারপর ফুটে উঠল মুখের উপর খুশীর পয়লা ঝলক। সেটা দেখতে আরো বীভৎস মুখের। কুঁচকানো, এবড়ো-থেবড়ো গাল, ভাঙা-চোরা নাক-মুখ-ঠোঁট যেন আরো বিকৃত হয়ে গেল।

'আমাকে জড়িয়ে ধরে কি যেন বলল ঠিক বুঝতে পারলুম না। তারপর হঠাৎ আমাকে ছেড়ে দিয়ে ছুটল করিডরের দিকে। চিৎকার করে কাকে যেন ডাকছে।

'এভা তখনো অচৈতন্য।

'বুড়ী ফিরে এল বুড়োকে নিয়ে। বুড়ো ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে চট করে। তার চেহারার খুশীর পিছনে দেখলুম সেই ভীত ভাব—এভার মুখে যেটা অষ্টপ্রহর লেপা থাকে। বুঝলুম, পিসির দাপটে এ বাড়ির সকলেরই কণ্ঠশ্বাস।

'মনে হল বুড়ো খুশী হয়েছে এভা যে এ বাড়ির অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে তার জন্য। হায়, তার তো নিষ্কৃতি নেই।'

ডাক্তার বললেন, 'সেই দুপুর রাতে ওয়াইন এল, শ্যাম্পেন এল। হোটেল থেকে সসেজ্‌ কট্‌লেট্‌ এল। হৈহৈ রৈরৈ। এভা সম্বিতে ফিরেছে। বুড়ো শ্যাম্পেন টানছে জলের মত। বুড়ী এক গেলাসেই টং। আমাকে জড়িয়ে ধরে শুধু কাঁদে আর এভার বাপের কথা স্মরণ করে বলে, ভাই বেঁচে থাকলে আজ সে কী খুশীটাই না হ'ত।

'আর এভা? আমাকে একবার শুধু কানে কানে বলল, 'জীবনে এই প্রথম শ্যাম্পেন খাচ্ছি। তুমি আমার উপর একটু নজর রেখো।'

ডাক্তার উৎসাহিত হয়ে আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় আস্তে আস্তে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন এক সুন্দরী—হাঁ, সুন্দরী বটে।

এক লহমায় আমি নর্থ সীর ঘন নীল জল, দক্ষিণ ইটালির সোনালি রোদে রূপালি প্রজাপতি, ডানয়ুবের শান্ত-প্রশান্ত ছবি, সেই ডানয়ুবেরই লজ্জাশীল দেহচ্ছন্দ, রাইনল্যাণ্ডের শ্যামালিয়া মোহনীয়া ইন্দ্রজাল সব কিছুই দেখতে পেলুম।

আর সে কী লাজুক হাসি হেসে আমার দিকে তিনি হাত বাড়ালেন।

আমি মাথা নীচু করে ফরাসিস্ কায়দায় তাঁর চম্পক করাঙ্গুলিপ্রান্তে ওষ্ঠ স্পর্শ করে মনে মনে বললুম,

'বেঁচে থাকো সর্দি-কাশি
চিরজীবী হয়ে তুমি।'

পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা

পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষাই হবে সে সম্বন্ধে আমাদের মনে কখনো কোনো সন্দেহ ছিল না এবং এ কথাও নিঃসন্দেহে জানি যে যদিও এখনকার মত বাঙলার দাবী মেনে নেওয়া হয়েছে তবু উর্দুওয়ালারা আবার সুযোগ পেলেই মাথা খাড়া করে উঠতে পারেন। আমরা যে এতদিন এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিনি তার প্রধান কারণ বাঙলা-উর্দু-দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক রং ধরে নিয়ে দলাদলির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল; সে অবস্থায় সুস্থ মনে, শান্ত-চিত্তে বিচার করার প্রবৃত্তি কোনো পক্ষেরই ছিল না। আবহাওয়া এখন ফের অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে; এইবেলা উভয় পক্ষের যুক্তিগুলো ভালো করে তলিয়ে দেখে নিলে ভবিষ্যতের অনেক তিক্ততা এবং অর্থহীন দ্বন্দ্ব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে।

উর্দুওলাদের প্রথম ও প্রধান যুক্তি এই: পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম-পাকিস্তান অভিন্ন রাষ্ট্র। সেই রাষ্ট্রের কেন্দ্রে যে-ভাষা প্রচলিত পূর্ব-পাকিস্তানে যদি সে-ভাষা প্রচলিত না থাকে তবে রাজনৈতিক ও কৃষ্টিগত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

উত্তরে আমরা বলি, পূর্ব-পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণকে বাঙলা ভুলিয়ে উর্দু শিখিয়ে যদি কেন্দ্রের সঙ্গে এক করে দেওয়া সম্ভবপর হত তাহলে যে এ বন্দোবস্ত উত্তম হত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন, এ কাজ কি সোজা? উত্তরে আমরা বলি একাজ অসম্ভব।

কেন অসম্ভব এ প্রশ্ন যদি শোধান তবে তার উত্তর দু'রকমের হতে পারে। প্রথম রকমের উত্তর দেওয়া যায় ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দিয়ে। আমরা যদি একথা সপ্রমাণ করতে পারি যে পৃথিবীর ইতিহাসে কস্মিনকালেও এহেন কাণ্ড ঘটেনি এবং যতবার চেষ্টা করা হয়েছে ততবারই সে-চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে তবে হয়ত অনেকেই স্বীকার করে নেবেন যে, অসম্ভব কর্ম সমাধান করার চেষ্টা করে মূর্খ, বলদকে দোয়াবার চেষ্টা সেই করে যার বুদ্ধি বলদেরই ন্যায়।

ইয়োরোপ আমেরিকা থেকে উদাহরণ দেব না। উর্দুওলারা এসব জায়গার উদাহরণ মেনে নিতে স্বভাবতই গড়িমসি করবেন। তাই উদাহরণ নেব এমন সব দেশ থেকে যে সব দেশকে সাধারণতঃ 'পাক' অর্থাৎ 'পবিত্র' অর্থাৎ ইসলামী বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এসব দেশের ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতি উর্দুওলাদের জানার কথা, না জানলে জানা উচিত।

আরব ও ইরানের (পারস্যের) মানচিত্রের দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন যে এ দু'দেশের মাঝখানে কোনো তৃতীয় দেশ নেই। অর্থাৎ আরবদেশের পূর্ব সীমান্তে যেখানে আরবী ভাষা এসে শেষ হয়েছে, ঠিক সেখান থেকেই ফার্সী ভাষা আরম্ভ হয়েছে। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ও যেখানে আরবী ভাষা শেষ হয়েছে সেখান থেকেই তুর্কী ভাষা আরম্ভ হয়েছে।

সকলেই জানেন খলিফা আবু বকরের আমলে মুসলিম আরবেরা অমুসলিম ইরান দখল করে। ফলে সমস্ত ইরানের লোক আগুন-পূজা ছেড়ে দিয়ে মুসলিম হয়। মুসলিম শিক্ষাদীক্ষা মুসলিম রাজনৈতিক অনুপ্রেরণার কেন্দ্রভূমি তখন মদীনা। কেন্দ্রের ভাষা আরবী এবং সে ভাষাতে কুরান নাজিল অর্থাৎ অবতীর্ণ হয়েছেন, হজরতের বাণী হদীসরূপে সেই ভাষায়ই পরিস্ফুট হয়েছে। কাজেই আমরা অনায়াসে ধরে নিতে পারি যে কেন্দ্রের সঙ্গে যোগসূত্র দৃঢ় করার বাসনায় ইরানে আরবী ভাষা প্রবর্তিত করার ব্যাপক চেষ্টা করা হয়েছিল। আমরা জানি বহু ইরানবাসী ইসলাম গ্রহণ করে, আরবী শিখে, মুসলিম জগতে নাম রেখে গিয়েছেন। আরো জানি পরবর্তী যুগে অর্থাৎ আব্বাসীদের আমলে আরবী রাষ্ট্রকেন্দ্র ইরানের আরো কাছে চলে এসেছিল। ইরাকের বাগদাদ ইরানের অত্যন্ত কাছে ও আব্বাসী যুগে বহু ইরানী বাগদাদে বসবাস করে উচ্চাঙ্গের আরবী শিখতে সমর্থ হয়েছিলেন। সমস্ত ইরানদেশ তখন আরব গবর্ণর, রাজকর্মচারী, ব্যবসাদার, পাইকবরকন্দাজে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। ইরানের সর্বত্র তখন আরবী মক্তব-মাদ্রাসার ছড়াছড়ি, আরবীশিক্ষিত মৌলবী-মৌলনায় ইরান তখন গমগম করত।

তবে কেন তিনশত বৎসর যেতে না যেতে ফার্সীভাষা মাথা খাড়া করে উঠল ? দশম শতাব্দীর শেষভাগে দেখতে পাই, ফার্সীভাষার নবজাগরণের চাঞ্চল্য সমস্ত ইরানভূমিকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। গল্প শুনি, ফিরদৌসীকে নাকি ফরমাইশ দেওয়া হয়েছিল ইরানের প্রাকমুসলিম সভ্যতার প্রশস্তি গেয়ে যেন কাব্য রচনা করা হয়, এবং ততোধিক গুরুত্বব্যঞ্জক (মুহিম্) ফরমাইশ, সে কাব্য যেন দেশজ ফার্সী কথায় রচিত হয়, তাতে যেন আরবী শব্দ বিলকুল ঢুকতে না পারে। গল্পটি কতদূর সত্য বলা কঠিন। কারণ ফিরদৌসীর মহাকাব্যে অনেক আরবী কথা আছে কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আরবী ভাষা যে-কোনো কারণেই হোক দেশের আপামর জনসাধারণকে তৃপ্ত করতে পারে নি বলেই ফার্সীর অভ্যুত্থান হল।

তারপর একদিন ফার্সী ইরানের রাষ্ট্রভাষা হয়ে গেল।

উর্দুওলারা হয়ত উত্তরে বলবেন যে ইরান শীয়া হয়ে গেল বলেই সুন্নী আরবের সঙ্গে কলহ করে ফার্সী চালাল। এ-উত্তরে আছে লোকঠকানোর মতলব। কারণ ঐতিহাসিক মাত্রই জানেন ফিরদৌসীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন গজনীর সুলতান মাহমুদ এবং তিনি ছিলেন এতই কট্টর সুন্নী যে তিনি সিন্ধুদেশের হাজার হাজার করামিতাকে (ইসমাইলী শীয়া) কতল-ই-আমে অর্থাৎ পাইকারী হননে—ফীনারিজহান্নম বা পরলোকে পাঠিয়েছিলেন। কাজেই বোঝা গেল যে এই আরবীবিরোধী ফার্সী আন্দোলনের পশ্চাতে শীয়া-সুন্নী দুই সম্প্রদায়ই ছিলেন।

না হয় ইরান শীয়াই হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তুর্কীর বেলা কি? তুর্কীর আপামর জনসাধারণ সুন্নী এবং শুধু যে সুন্নী তাই নয় হানিফী সুন্নীও বটে। ইরাণেরই মত একদিন তুর্কীতেও আরবী চালাবার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-চেষ্টা সফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত তুর্কী-ভাষাই তুর্কের রাষ্ট্রভাষা হল। উর্দুওলাদের স্মরণ থাকতে পারে যে কয়েক বৎসর পূর্বে তুর্কী ও ইরান উভয় দেশে জোর জাতীয়তাবাদের ফলে চেষ্টা হয় তুর্কী ও ফার্সী থেকে বেবাক আরবী শব্দ তাড়িয়ে দেওয়ায়। আমরা এ ধরণের উগ্রচণ্ডা জাতীয়তাবাদ ও ভাষা 'বিশুদ্ধিকরণ' বাইয়ের পক্ষপাতী নই; তবুও যে ঘটনাটির কথা উর্দুওলাদের স্মরণ করিয়ে দিলুম তার একমাত্র কারণ, কেন্দ্রের সঙ্গে যোগসূত্র যতই মূল্যবান হোক না কেন তার জন্য মানুষ সব সময় সব কিছু বিসর্জন দিতে রাজী হয় না। (এস্থলে ঈষৎ অবান্তর হলেও একটি কথা বলে রাখা ভালো,—পাছে উর্দুওলারা আমাদের নীতি ঠিক বুঝতে না পারেন—আমরা ভাষা 'শুদ্ধিকরণে' বিশ্বাস করি না বলেই বাঙলা থেকে সংস্কৃত শব্দ তাড়াতে চাইনে। তাহলে সেই পাগলামীর পুনরাবৃত্তি করা হবে মাত্র; আজকের দিনে কে না বুঝতে পারে ফোর্ট উইলিয়ামি পণ্ডিতরা বাংলা থেকে আরবী ফার্সী শব্দ বর্জন করে কি আহাম্মুখিই না করেছিলেন।)

উর্দুওলারা হয়ত প্রশ্ন শুধাবেন, তাহলে মিশরে আরবী চলল কি করে? মুসলমান বিজয়ের পূর্বে মিশরের ভাষা তো আরবী ছিল না। তার উত্তর এই যে মিশর জয়ের পর লক্ষ লক্ষ আরব মিশরে বসবাস আরম্ভ করে ও কালক্রমে দেশের আদিম অধিবাসী ও বিদেশীতে মিলে গিয়ে যে ভাষা গড়ে ওঠে তারি নাম মিশরী আরবী। সংমিশ্রণ একটি কথা দিয়েই সপ্রমাণ করা যায়; যদিও আরবীতে 'জিম' হরফের উচ্চারণ বাঙলার 'জ'-এর মত, তবু মিশরীরা উচ্চারণ করে 'গ'য়ের মত। 'জবল' কে বলে 'গবল', 'নজীব'কে বলে 'নগীব', অল্পশিক্ষিত লোক 'ইজা জা' নসরুউল্লা' না ব'লে বলে 'ইজাগা'—ইত্যাদি। অন্য দিক দিয়ে মিশরী ফল্লাহিন

(চাষা) ও আরবী বেদুইনের মধ্যে দেহের গঠন, চামড়ার রঙ ইত্যাদিতে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই।

এতগুলো উদাহরণ দেবার পরও যদি কেউ সন্তুষ্ট না হন তবে তার সামনে একটি ঘরোয়া উদাহরণ পেশ করি। পাঠান মোগল (এমন কি ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকে) যুগে এদেশে শুধু কেন্দ্রে নয়, সুবাগুলোতে পর্যন্ত ফার্সী ছিল রাষ্ট্র ভাষা। তবু কেন সে ভাষা দেশজ হিন্দী বাঙলা প্রভৃতি ভাষাকে মেরে ফেলে নিজে অজরামর হয়ে কায়েমি খুঁটি গাড়তে পারল না? উর্দুওলারা হয়ত বলবেন, 'ইংরেজ ফার্সী উচ্ছেদ করে দিল তাই।'

কিন্তু সে উচ্ছেদের ব্যবস্থা তো পাঠান-মোগলরাই করে গিয়েছিলেন। পাঠান আমলের বিখ্যাত কবি আমির খুসরো ফার্সীতে উচ্চাঙ্গের কাব্য রচনা করে গিয়েছিলেন অথচ দূরদৃষ্টি ছিল বলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে শেষ পর্যন্ত ফার্সী এদেশে চলবে না, দেশজ ভাষা পুনরায় আপন আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। এ তত্ত্বটা ভালো করে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তিনি ফার্সী ও তখনকার দেশজ ভাষা হিন্দী মিশিয়ে কবিতা রচনার এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করে গিয়েছিলেন। নিচের উদাহরণটি উর্দুওয়ালাদের জানবার কথা:

"হিন্দুবাচ্চেরা ব্‌ নিগর্‌ আজব্‌ হুস্‌ন্‌ ধরত হৈ।
দর্‌ ওয়ক্‌তে সুখন গুফ্‌তন্‌ মুহ ফুল ঝরত হৈ॥
গুফ্‌তম্‌ বিয়া কে বর্‌ লবেতো বোসে বাগীরম্‌
গুফ্‌ৎ আরে রাম ধরম নষ্ট করত হৈ॥"

হিন্দু তরুণ কি অপূর্ব সৌন্দর্য্যই না ধারণ করে। যখন কথা বলে তখন মুখ হতে ফুল ঝরে॥ বললুম, আয় তোর ঠোঁটে একটি চুমো খাব—বললে, আরে রাম! ধর্ম নষ্ট করত হায়॥

এই এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের ফলেই দেখতে পাই শাহজহানের আমলে উর্দু ভাষা সৃষ্ট হয়েছে ও অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে দেখতে পাই ফার্সী আস্তে আস্তে হটে গিয়ে উর্দুর জন্য জায়গা করে দিচ্ছেন। আজকের দিনে পরিস্থিতিটা কি? ফার্সীর লীলাভূমি দিল্লী লক্ষ্ণৌয়ে এখন সাহিত্য সৃষ্ট হয় উর্দু ভাষাতে, ফার্সী সেখানে আরবী এবং সংস্কৃতের মত 'মৃত ভাষা' বা 'ডেড ল্যান্‌গুইজ্‌'।

হয়ত উর্দুওলারা বলবেন, উর্দুতে প্রচুর আরবী, ফার্সী শব্দ থাকায় তিনি পদে উঠে গেছেন। এর উত্তর বলি, ফার্সী যে রকম বিস্তর আরবী শব্দ গ্রহণ করেও ফার্সীই থেকে গিয়েছে উর্দুও সেই রকম বিস্তর আরবী ফার্সী শব্দ গ্রহণ করা সত্ত্বেও

উর্দু'ই থেকে গিয়েছে, সে এই দেশের দেশজ ভাষা। বিদেশী শব্দের প্রাধান্য অপ্রাচুর্য নিয়ে ভাষার বর্ণ, গোত্রের বিচার হয় না। পূর্ববঙ্গের আলিম-ফাজিলগণ যখন অকাতরে আরবী ফার্সী শব্দ প্রয়োগ করে বাংলায় 'ওয়াজ' বা 'পাবলিক-লেকচর' দেন তখন সে ভাষা আরবী, ফার্সী বা উর্দু নামে পরিচিত হয় না, সে ভাষা বাংলাই থেকে যায়।

ঘোড়াটি আমার ভালোবাসিত গো শুনিতে আমার গান
এখন হইতে সে ঘোড়াশালেতে বাঁধা রবে দিনমান।
জিনি তরঙ্গ সুন্দরী মোর তাতার বাসিনী সাকী
লীলাচঞ্চলা রঙ্গ নিপুণা শিবিরে এসেছি রাখি।
ঘোড়ার আমার জুটিবে সোয়ার ইয়ার পাইবে সাকী
শুধু মা আমার এ বুড়া বয়সে কাঁদিয়া মুদিবে আঁখি।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

শব্দের প্রাচুর্য অপ্রাচুর্য ভেদে যদি ভাষার বংশ বিচার করতে হয় তা হলে বলতে হবে এই কবিতার চতুর্থ ছত্র সংস্কৃত, পঞ্চম ছত্র আরবী-ফার্সী ও গোটা কবিতাটা খোদায় মালুম কি। কিন্তু উপস্থিত এ আলোচনা মুলতুবি থাক—উর্দু কি হিসাবে 'পাক' ও বাংলা 'না-পাক' সে আলোচনা পরে হবে।

এ প্রসঙ্গে উর্দুওলাদের কাছে আমাদের শেষ প্রশ্ন; ত্রয়োদশ শতকে মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয় থেকে আরম্ভ করে উনবিংশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত ফার্সী উর্দু এদেশে চালু ছিল। শাহজহানের আমল থেকে আজ পর্যন্ত বেশুমার মৌলবী-মৌলনা, আলিম-ফাজিল দেওবন্দ রামপুর থেকে উর্দু শিখে এসে এদেশে উর্দুতে ওয়াজ ঝেড়েছেন, উর্দুতে 'গুফ্‌তগু' করেছেন; মনে পড়েছে ছেলেবেলায় দেখেছি উদ্ধত অর্বাচীন তরুণ যখনই তর্কে মোল্লাদের কাবু করেছে তখনই তাঁরা হঠাৎ উর্দুতে কথা বলতে আরম্ভ করে (আজ জানি সে উর্দু কত ন্যক্কারজনক ভুলে পরিপূর্ণ থাকত) আপন যুক্তির অভাব অথবা দুর্বলতা ঢাকবার চেষ্টা করেছেন এবং চাষাভুষার কাছে মুখ বাঁচিয়েছেন। সে কথা থাক, কারণ এমন মৌলবী-মৌলানার সংস্পর্শেও এসেছি যাঁদের সঙ্গে তর্কে হেরেও আনন্দ পেয়েছি, কিন্তু আসল প্রশ্ন এইসব আলিম-ফাজিলগণ বাংলাদেশের শিক্ষা ও কৃষ্টি নির্মাণের সম্পূর্ণ ভার হাতে পেয়েও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চেষ্টা করা সত্ত্বেও এদেশের আপামর জনসাধারণকে 'নাপাক' বাঙলা ভুলিয়ে ফার্সী বা উর্দু চালাতে সক্ষম হলেন না কেন? ইংরেজী স্কুল তখন ছিল না, সংস্কৃত টোল তখন

অনাদৃত, আরবী-ফার্সী-উর্দু শিখলে তখন উম্‌দা উম্‌দা নোকরি মিলত, বাদশাহ-সুবাদারের মজলিসে শিরোপা মিলত, মনসব মিলত, আর আরবী ফার্সীর জরিয়ায় বেহেস্তের দ্বার তো খুলতই। ইহলোক পরলোক উভয় লোকের প্রলোভন সত্ত্বেও বাঙালী মুসলমান নাপাক বাঙলায় কেন কথাবার্তা বলল, জারীমর্সিয়া রচনা করল, ভাটিয়ালি-পীরমুর্শিদী, আউলবাউল, সাঁইদরবেশী গান গাইল, কেচ্ছা-সাহিত্য তৈরী করল, রাধার চোখের পানি নিয়ে 'বিদাত' কবিতা পর্যন্ত লিখল? এবং একথাও তো জানি যে মৌলবী-মৌলানারা এসব লোক-সাহিত্যের প্রতি উদাসীন ছিলেন না, তাঁরা বার বার ফতোয়া দিয়েছেন যে এসব সাহিত্য 'বিদাত', 'নাজাইজ', 'কুফ্‌র', 'শিরক্‌'। তৎসত্ত্বেও এগুলো এখনো খেয়াঘাটে, বাথানে, চাষার বাড়ীতে পড়া হয়, এসব বই এখনো ছাপা হয়, হাটবারে বটতলায় বিক্রয় হয়।

শুধু তাই? পাঠান বাদশাহরা পয়সা খরচ করে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দিয়ে মহাভারত, রামায়ণ বাঙলায় অনুবাদ করালেন। বাদশাহদের দরবারে বিস্তর আলিম-ফাজিল ছিলেন। তাঁরা তখন নিশ্চয়ই এই 'ফুজুল', 'বিদাত', 'ওয়াহিয়াত', 'ইসরাফের' বিরুদ্ধে তারস্বরে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো তত্ত্বকথা এই যে আজ পর্যন্ত এদেশে পরাগলখান, ছুটিখানের নাম রয়ে গিয়েছে বাঙলা ভাষার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে।

কিন্তু আমাদের আসল প্রশ্নটা যেন ধামাচাপা পড়ে না যায়। উর্দুওলাদের কাছে আমার সবিনয় প্রশ্ন: বাঙলাদেশের কৃষ্টিজগতে প্রায় ছয়শত বৎসর একাধিপত্য করেও তাঁরা যখন উর্দু চালাতে পারেন নি তখন বর্তমান যুগের নানা কৃষ্টিগত দ্বন্দ্ব, বহু নিদারুণ দারিদ্র্য, ক্রমবর্ধমান বাংলাসাহিত্য ও ভাষার সঙ্গে বিজড়িত মুসলমান-হিন্দুকে তাদের মাতৃভাষা ভুলিয়ে উর্দু চালানো কি সম্ভবপর?

আরব ইরান পাশাপাশি দেশ, এক দেশ থেকে আরেক দেশ গমনাগমনে কোনো অসুবিধা ছিল না, উর্দুর তুলনায় আরবী বহু পূতপবিত্র ভাষা ও সে ভাষা ইসলামের তাবত দৌলত ধারণ করে; তৎসত্ত্বেও যখন ইরানে আরবী চলল না তখন যে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিম-পাকিস্তান বহু শত ক্রোশ দূরে,—মাঝখানে আবার এমন রাষ্ট্র যার সঙ্গে এখনো পুরা সমঝাওতা হয়নি—যে পশ্চিম-পাকিস্তানেও আবার পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত সেই পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তান একজোট হবেই বা কি করে আর একে অন্যকে উর্দু শেখাবেই বা কি

প্রকারে? এ তো দু'পাঁচজন মাস্টারের কথা নয়, আমাদের দরকার হবে হাজার হাজার লোকের। আর হাজার হাজার নবাগতকে পোষবার ক্ষমতা যদি পূর্ব-পাকিস্তানের থাকতই তবে পূর্ব-পাঞ্জাব থেকে বিতাড়িত হতভাগ্য মুসলমানদের কি পূর্ব-পাকিস্তান এতদিনে আমন্ত্রণ করে চোখের জল মুছিয়ে দিত না, মুখে অন্ন তুলে ধরত না?

হয়ত উর্দুওলারা বলবেন যে, সমস্ত দেশকে উর্দু শেখানো তাঁদের মতলব নয়; তাঁদের মতলব প্রাইমারী স্কুলে অর্থাৎ গ্রাম্য পাঠশালায় বাংলা শেখানো এবং হাইস্কুল ও কলেজ য়ুনিভার্সিটিতে উর্দু চালানো।

তাই যদি হয় তবে ফল হবে এই যে হাইস্কুল-কলেজে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত গুণী-জ্ঞানীরা কেতাব লিখবেন উর্দুতে। তাতে ইসলামের প্রাচীন ইতিহাস থাকবে, সে ঐতিহ্যের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে পাকিস্তানের নবীন রাষ্ট্র কি করে গড়ে তুলতে হবে তার কায়দাকানুনের বয়ান থাকবে, আল্লা রসুলের বাণী সেসব কেতাবে নূতন করে প্রচারিত হবে এবং এ-সব তাবত দৌলতের ভোগী হবেন উর্দু জাননেওলারা। অথচ পূর্ব-পাকিস্তানের শতকরা ৮০।৯০ জন চাষা-মজুর; তাদের শিক্ষা সমাপ্তি যে পাঠশালা পাশের সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে যাবে সে কথাও নিশ্চয় জানি এবং তারা এ সব কেতাব পড়তে পারবে না। এই শতকরা আশিজনের উপর যে নবীন রাষ্ট্র নির্মিত হবে তার আদর্শ নূতন, আকাঙ্ক্ষা নূতন এবং সে আদর্শে পৌঁছানোর জন্য যে সব বয়ান উর্দু ভাষাতে লেখা হবে তারা সে-সব পড়তে সক্ষম হবে না। অর্থাৎ শতকরা আশিজন কোনো কিছু না জেনেশুনে আদর্শ রাষ্ট্র গড়াতে উঠে পড়ে লেগে যাবে।

এ বড় মারাত্মক ব্যবস্থা, এ বড় অনৈসলামিক কুব্যবস্থা। প্রাচীন ঐতিহ্যপন্থী মৌলবী-মৌলানাকে যত দোষ দিতে চান দিন, কিন্তু এ-দোষ তাঁদের জানী দুশমনও দিতে পারবেন না যে তাঁরা ধনী এবং গরীবের জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা করেছিলেন। ধনীর ছেলেকে তাঁরা যেমন আরবী-ফারসী-উর্দু শিখিয়েছিলেন, গরীবের ছেলেকেও ঠিক সেই কারিকুলামের ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। যদি পাকচক্রে পূর্ব-পাকিস্তানকে কোনো দিন উর্দু গ্রহণ করতেই হয় এবং স্বীকার করে নিতেও হয় যে আমাদের সাহিত্য এবং অন্যান্য সৃষ্টি উর্দুতেই হবে, তবে তাঁরা পাঠশালায়ও উর্দু চালাবেন। দেবভাষা ও গণভাষা বলে পৃথক পৃথক বস্তু স্বীকার করা ইসলাম ঐতিহ্য পরিপন্থী।

পাকিস্তান বড়লোকের জন্য নয়, গরীবের হক পাকিস্তানে বেশী।

ইংরেজও 'ভদ্রলোক' ও 'ছোটলোকে'র ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা করে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। ইংরেজ কৃষি রিপোর্ট বের করত ইংরিজি ভাষায় এবং চাষাভুষাদের শেখাত বাঙলা! বোধ হয় ভাবত বাঙালী 'মাছিমারা' কেরানী যখন ইংরেজি না জেনেও ইংরেজি দলিলপত্র নকল করতে পারে তখন ইংরেজি অনভিজ্ঞ চাষাই বা ইংরেজিতে লেখা কৃষি রিপোর্ট, আবহাওয়ার খবরাখবর পড়তে পারবে না কেন? এই পাগলামি নিয়ে যে আমরা কত ঠাট্টা-মস্করা করেছি সেকথা হয়ত উর্দুওলারা ভুলে গিয়েছেন কিন্তু আমরা ভুলিনি। তাই শুধাই, এবার কি আমাদের পালা? এখন আমরা কৃষি-রিপোর্ট, বাজার দর, আবহাওয়ার খবরাখবর বের করব উর্দুতে আর চাষীদের শেখাব বাঙলা! খবর শুনে ইংরেজ লণ্ডনে বসে যে অট্টহাসি ছাড়বে আমরা সিলেটে বসে তার শব্দ শুনতে পাব।

উর্দুওলারা বলবেন, 'ক্ষেপেছ? আমার উর্দু কৃষি রিপোর্ট বাঙলাতে অনুবাদ করে চাষার বাড়ীতে পাঠাব।'

উত্তরে আমরা শুধাই সে অনুবাদটি করবেন কে? কৃষি রিপোর্টের অনুবাদ করা তো পাঠশালা-পাসের বাঙলা বিদ্যে দিয়ে হয় না। অতএব বাঙলা শেখানোর জন্য হাইস্কুলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা পড়াতে হবে। অর্থাৎ আমাদের সকলকে স্কুল কলেজে বাংলা উর্দু দুই-ই বেশ ভালো করে শিখতে হবে (কৃষি রিপোর্ট ছাড়া উর্দুতে লেখা অন্যান্য সৎসাহিত্যও তো বাঙলাতে তর্জমা করতে হবে); ফলে দুই কুলই যাবে, যেমন ইংরেজ আমলে গিয়েছিল—না শিখেছিলুম বাঙলা লিখতে, না পেরেছিলুম ইংরাজি ঝাড়তে।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানীতে যে উচ্চশিক্ষার এত ছড়াছড়ি, সেখানেও দশ হাজারের মধ্যে একটি ছেলে পাওয়া যায় না যে দুটো ভাষায় সড়গড় লিখতে পারে। আরব, মিশরের আলিম-ফাজিলগণও এক আরবী ছাড়া দ্বিতীয় ভাষা জানেন না।

না হয় সব কিছুই হল কিন্তু তবু মনে হয়, এ বড় অদ্ভুত পরিস্থিতি—যে রিপোর্ট পড়নেওলার শতকরা ৯৯ জন জানে বাঙলা সে রিপোর্টের মূল লেখা হবে উর্দুতে! ব্যবস্থাটা কতদূর বদখত বেতালা তার একটা উপমা দিলে আমার বক্তব্য খোলসা হবে: যেহেতু পূর্ব-পাকিস্তানে উপস্থিত শ'খানেক 'রুটি-খানেওয়ালা পাঞ্জাবী আছেন অতএব তাবৎ দেশে ধানচাষ বন্ধ করে গম ফলাও! তা সে আল-বাঁধা, জলে-টৈ-টম্বুর ধানক্ষেতে গম ফলুক আর নাই ফলুক!

উর্দুওলারা তবু বলবেন, 'সব না হয় মানলুম, কিন্তু একথা তো তোমরা

অস্বীকার করতে পারবে না যে কেন্দ্রের ভাষা যে উর্দু সে সম্বন্ধে পাকাপাকি ফৈসালা হয়ে গিয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানের লোক যদি উর্দু না শেখে তবে করাচীর কেন্দ্রীয় পরিষদে তাঁরা গাঁক্‌গাঁক্ করে বক্তৃতা ঝাড়বেনই কি বা প্রকারে, এবং আমাদের ছেলেছোকরারা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ডাঙর ডাঙর নোকরিই বা করবে কি প্রকারে?'

বক্তৃতা দেওয়া সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা যত ছেলেবেলা থেকে যত উত্তম উর্দুই শিখি না কেন, উর্দু যাঁদের মাতৃভাষা তাদের সঙ্গে আমরা কস্মিন্‌কালেও পাল্লা দিয়ে পেরে উঠব না। আমাদের উচ্চারণ নিয়ে উর্দুভাষীগণ হাসিঠাট্টা করবেই এবং সকলেই জানেন উচ্চারণের মস্করা-ভেংচানি করে মানুষকে সভাস্থলে যত ঘায়েল করা যায় অন্য কিছুতেই ততটা সুবিধে হয় না। অবশ্য যাদের গুরদা-কলিজা লোহার তৈরী তাঁরা এ সব নীচ ফন্দি-ফিকিরে ঘায়েল হবেন না কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই আপন উচ্চারণের কমজোরী বেশ সচেতন থাকবেন, বিশেষতঃ যখন সকলই জানেন যে প্রথম বহু বৎসর ধরে উত্তম উচ্চারণ শেখবার জন্য ভালো শিক্ষক আমরা যোগাড় করতে পারব না, এবং একথাও বিলক্ষণ জানি যে একবার খারাপ উচ্চারণ দিয়ে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করলে অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে সে জখমী উচ্চারণ আর মেরামত করা যায় না। দৃষ্টান্তের জন্য বেশী দূর যেতে হবে না। পূর্ববঙ্গের উর্দু ভাষাভাষী মৌলবী সাহেবদের উচ্চারণের প্রতি একটু মনোযোগ দিলেই তাঁদের উচ্চারণের দৈন্য ধরা পড়ে। সে উচ্চারণ দিয়ে পূর্ব বাঙলায় 'ওয়াজ' দেওয়া চলে কিন্তু যাঁদের মাতৃভাষা উর্দু তাঁদের মজলিসে মুখ খোলা যায় না। এমন কি দেওবন্দ রামপুর ফের্তা কোনো কোনো মৌলবী সাহেবকে উচ্চারণ বাবতে শরমিন্দা হতে দেখেছি, অথচ বহুক্ষেত্রে নিশ্চয় জানি যে এঁদের শাস্ত্রজ্ঞান দেওবন্দ-রামপুরের মৌলানাদের সঙ্গে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারে। কিন্তু এঁরা নিরুপায়, ছেলেবেলা ভুল উচ্চারণ শিখেছিলেন, এখনো তার খেসারতি ঢালছেন।

কিন্তু কি প্রয়োজন জান পানি করে ছেলেবেলা থেকে উর্দু উচ্চারণে পয়লানম্বরী হওয়ায়? অন্য পন্থা কি নেই?

আছে। গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমি সুইজারল্যাণ্ডে চারটি ভাষা প্রচলিত। তাঁদের পার্লামেন্টে সকলেই আপন আপন মাতৃভাষায় বক্তৃতা দেন। সে সব বক্তৃতা অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করা হয়। উর্দুওলারা প্রশ্ন শুধাবেন এসব বক্তৃতা অনুবাদ করে কারা?

সেই তত্ত্বটা এইবেলা ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার। এই ধরুন, আপনার মাতৃভাষা বাঙলা, আপনি উর্দুও জানেন। কিন্তু উর্দুতে বক্তৃতা দিতে গেলে আপনি হিমশিম খেয়ে যান। অথচ অল্প উর্দু জানা সত্ত্বেও যদি আপনাকে কোনো উর্দু বক্তৃতা বাংলায় তর্জমা করতে হয় তবে আপনি সেটা অনায়াসে করে দিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ যখন ফ্রান্স, জর্মনী, হলাণ্ড প্রভৃতি দেশে সফর করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তখন তিনি দুনিয়ার বাহান্নটা ভাষায় বক্তৃতা দেন নি। বক্তৃতা দিয়েছিলেন হামেশাই ইংরাজিতে। এবং অনুবাদকেরা আপন আপন মাতৃভাষায় সে-সব বক্তৃতা অনুবাদ করেছিলেন।

মার্শাল বুলগানিন, আইসেনহাওয়ার, চার্চিল, মাও-সে-তুঙ, চিয়াং-কাই-শেক যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ আলোচনা করেন—আর চার্চিল তো মামুলি কথা বলতে গেলেও ওজস্বিনী বক্তৃতা ঝাড়েন—তখন সকলেই আপন আপন মাতৃ-ভাষাতেই কথা বলেন। দোভাষী তর্জুমানরা সে সব আলাপ আলোচনার অনুবাদ করেন।

এত বড় যে ইউনাইটেড নেশন্‌স্ অরগেনাইজেশন (উনো), যেখানে দুনিয়ার প্রায় তাবৎ ভাষাই শুনতে পাওয়া যায় ; সেও চলে তর্জুমানদের 'মধ্যস্ততায়'।

পাঠক হয়ত বলবেন অনূদিত হলে মূল বক্তৃতার ভাষার কারচুপি অলঙ্কারের ঝলমলানি, গলা ওঠানো-নাবানোর- লম্পঝম্প মাঠে মারা গিয়ে বক্তৃতা রসকষহীন সাদামাঠা হয়ে বেরোয়, ওজস্বিনী বক্তৃতা তখন একঘেয়ে রচনা পাঠের মত শোনায়। সে কথা ঠিক—যদিও প্রোফেশনাল এবং বিচক্ষণ তর্জুমান মূলের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ জৌলুস রাখতে সমর্থ হন—কিন্তু যখন সব বক্তারই বক্তৃতা অনূদিত হয়ে সাদামাঠা হয়ে গেল তখন সকলেই সমান লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হলেন।

গুণীরা বলেন, আলাপ-আলোচনা যেখানে ঝগড়া-কাজিয়ায় পরিবর্তিত হওয়ায় সম্ভাবনাথাকে সেখানে কদাচ বিপক্ষের মাতৃভাষায় কথা বলবে না ; তুমি একখানা কথা বলতে না বলতে সে দশখানা বলে ফেলবে। বিচক্ষণ লোক মাত্রই ষ্টেশনে লক্ষ্য করে থাকবেন যে হুঁশিয়ার-বাঙালী বিহারী মুটের সঙ্গে কদাচ উর্দুতে কথা বলে না। আর মুটে যদি তেমনি ঘুঘু হয় তবে সেও বাংলা জানা থাকলেও, আপন উর্দু চালায়। তবু তো বিহারী মুটেকে কিছুটা ভাল উর্দু জানা থাকলে ঘায়েল করা যায়, কিন্তু করাচীতে যে-সব উর্দুভাষীদের মোকাবেলা করতে হবে তাঁদের উর্দুজ্ঞান পয়লানম্বরী হবে নিশ্চয়ই। প্রেমালাপের কথা স্বতন্ত্র, সেখানে

কোনো ভাষারই প্রয়োজন হয় না, টোটিফুটি উর্দু বললেও আপত্তি নেই। তুলসী দাস কহেন,—

'জো বালক কহে তোতরি বাতা
সুনত মুদিত নেন পিতু আরু মাতা—

'বালক যখন আধা-আধা কথা বলে তখন পিতামাতা মুদ্রিত নয়নে (গদগদ হয়ে) সে কথা শোনেন'। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের সদস্যগণ শুদ্ধমাত্র রসালাপ করার জন্য করাচী যাবেন না। স্বার্থের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে, দরকার বোধ করলে তাঁদের তো বাকবিতণ্ডাও করতে হবে।

কেন্দ্রের ডাঙর ডাঙর নোকরীর বেলাও এই যুক্তি প্রযোজ্য। আমরা যত উত্তম উর্দুই শিখি না কেন প্রতিযোগিতাত্মক পরীক্ষায় উর্দু-মাতৃভাষীর সঙ্গে কখনোই টক্কর দিতে পারব না। অথচ আমরা যদি আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় পরীক্ষা দিই, এবং উর্দু-মাতৃভাষীরা তাঁদের মাতৃভাষায় পরীক্ষা দেন তবে পরীক্ষায় নিরপেক্ষতা রক্ষা করা হবে। তখন প্রশ্ন উঠবে বাঙালী ছেলেরা উর্দু না জেনে কেন্দ্রে নোকরী করবে কি করে? উত্তরে বলি, সিন্ধি বেলুচি-ছেলে যে প্রকারে কেন্দ্রে কাজ করবে ঠিক সেই প্রকারে—তাদের মাতৃভাষাও তো উর্দু নয়। পাঠানেরা পশতুর জন্য যে রকম নড়াচড়া আরম্ভ করেছেন তাঁদের ঐ একই অবস্থা হবে। অথবা বলব উর্দু মাতৃভাষীরা যে কৌশলে বাঙলা দেশে নোকরী করবেন ঠিক সেই কৌশলে। এ সম্বন্ধে বাকী বক্তব্যটুকু অন্য প্রসঙ্গে বলা হবে।

উর্দুওলারা এর পরও শুধাতে পারেন, "আমরা যদি উর্দু না শিখি তবে কেন্দ্র থেকে যে সব হুকুম, ফরমান, আইন কানুন আসবে সেগুলো পড়ব কি করে?"

উত্তরে বলি, "তার জন্যে ঢাকাতে তর্জুমানদের ব্যবস্থা করতে হবে।"

একথা শুনে উর্দুওলারা আনন্দে লাফ দিয়ে উঠবেন। বলবেন, "তবেই তো হ'ল। তর্জুমানদের যখন উর্দু শেখাতেই হবে তখন তামাম দেশকে উর্দু শেখালেই পারো।"

এ বড় অদ্ভুত যুক্তি। উদাহরণ না দিলে কথাটা খোলসা হবে না বলে নিবেদন করি, "আরব, ফ্রান্স, জর্মনী, স্পেন, রুশিয়া, চীন ইত্যাদি দেশে পাকিস্তানের লোক রাজদূত হয়ে যাবে। তাই বলে কি পাকিস্তানের লোককে আমরা দুনিয়ার তাবৎ ভাষা শেখাই?"

একটা গল্প মনে পড়ল। স্বয়ং কবিগুরু সেটি ছন্দে বেঁধেছেন; তাই যতদূর

সম্ভব তাঁর ভাষাতেই বলি—

কহিলা হবু, "শুনগো গোবু রায়
কালিকে আমি ভেবেছি সারারাত্র
মলিন ধূলা লাগিবে কেন পায়
ধরণী মাঝে চরণ ফেলা মাত্র ?
শীঘ্র এর করিবে প্রতিকার
নহিলে কারো রক্ষা নাহি আর।"

মন্ত্রী তখন,

অশ্রুজলে ভাষায়ে পাকা দাড়ি
কহিলা গোবু হবুর পাদপদ্মে
যদি না ধূলা লাগিবে তব পায়ে
পায়ের ধূলা পাইব কি উপায়ে।'

সেয়ানা উত্তর। কিন্তু রাজা মন্ত্রীর চেয়েও ঘড়েল তাই বললেন,—

"—কথাটা বটে সত্য,
কিন্তু আগে বিদায় কয়ো ধূলি
ভাবিয়ো পরে পদধূলির তত্ত্ব !

তখন নানা তরকিব নানা কৌশলে রাজার পা দুখানাকে ধূলা থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হ'ল। সাড়ে সতেরো লক্ষ ঝাঁটা দিয়ে তামাম দুনিয়া সাফ করার প্রথম চেষ্টাতে যখন কোনো ফল হ'ল না তখন 'একুশ লাখ ভিস্তি' দিয়ে জল ঢালার ব্যবস্থা করা হ'ল। তাতেও যখন কিছু হ'ল না তখন ;

কহিল, "মহী মাদুর দিয়া ঢাকো ;
ফরাশ পাতি করিব ধূলা বন্ধ।"
কহিল কেহ, "রাজারে ঘরে রাখো
কোথাও যেন না থাকে কোনো রন্ধ্র।"

রাজার কপাল ভালো বলতে হবে, কেউ যে তাঁর পা দুখানা কাটার ব্যবস্থা করলেন না। শেষটায় সমস্বরে,

কহিল সবে,"চামারে তবে ডাকি
চর্ম দিয়া মুড়িয়া দাও পৃথ্বী।"
তখন ধীরেঃচামার কুলপতি
কহিল এসে ঈষৎ হেসে বৃদ্ধ,

"বলিতে পারি করিলে অনুমতি
সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ।
নিজের দুটী চরণ ঢাকো, তবে
ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।"

এত সোজা সমাধান? তাই তো বটে! এই করেই হ'ল জুতা আবিষ্কার।

তিনকুড়ি কেন্দ্রীয় সদস্য, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে শ'দুই চাকুরে, আরো শ'দুই তর্জুমানের উর্দু জানার প্রয়োজন [হিসেবটা অত্যন্ত দরাজ হাতে করা গেল]; তার জন্য চারকোটি লোককে উর্দু কপচাতে হবে!

না হয় পাঁচশ' নয়, সাতশ' নয়, পাঁচ হাজার লোকেরই উর্দু বলার প্রয়োজন হবে। তবে তাদের পায়েই উর্দুর জুতা পরিয়ে দিই; এই ভলভলে কাদার দেশে চারকোটি লোককে জুতো পরাই কোন হস্তী-বুদ্ধির তাড়নায়?

রবীন্দ্রনাথের গল্পটি এইখানেই শেষ নয়; আমাদের কথাও এখানে ফুরোয় না। আমরা যখন এই জটিল সমস্যার সরল সমাধান বাৎলে দি তখন,

কহিলা রাজা, "এত কি হবে সিধে,
ভাবিয়া ম'ল সকল দেশসুদ্ধ।"

মন্ত্রী কহে,

"বেটারে শূলে বিঁধে
কারার মাঝে করিয়া রাখ রুদ্ধ।"

চামারের মত সরল সমাধান যারা করতে যায় তাদের জন্য শূলের হুকুম জারী হয়। তাদের তখন নামকরণ হয় "এনিমিজ অব্ দি স্টেট্," "আজাঁ প্রভোকাতর" !!

ইতিহাস দিয়ে যদি বা সপ্রমাণ করা যায় যে পূর্বপাকিস্তানের মত বিশাল দেশের বিপুল সংখ্যক লোককে কখনো তাদের মাতৃভাষা ভুলিয়ে অন্য ভাষা শেখানো সম্ভবপর হয় নি, ইরান তুর্কী প্রভৃতি দেশে এ প্রকারের চেষ্টা সর্বদাই নিষ্ফল হয়েছে, তবু এক রকমের লোক যাঁরা আপন স্বাধিকার প্রমত্ততায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে 'নাথিঙ্ ইজ্ ইমপসিবল্' বুলি কপচান, এ সম্প্রদায়ের লোক যদি দেশের দণ্ডধর না হতেন তবে আমাদের ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজই আর পাঁচ-জনকে সত্যনিরূপণ করাতে সমর্থ হত। তাই প্রশ্ন, এসব দণ্ডধরদের সামনে অন্য কোন্ যুক্তি পেশ করা যায়, কি কৌশলে বোঝানো যায় যে পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যাপক-ভাবে উর্দু চালানো সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ফার্সীতে বলে 'জান-মাল', বাংলায় বলি 'ধন-প্রাণ' মানুষ এই দুই বস্তু বড় ভালোবাসে ; ইতিহাস যা বলে বলুক, এই দুই বস্তু যদি মানুষের হাত এবং দেহ ছাড়ার উপক্রম করে তবে দণ্ডধরেরা পর্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েন ; হাতের পাখী এবং প্রাণপক্ষী বাঁচাবার জন্য তখন ঝোপের 'ইমপসিব্‌ল্‌' চিড়িয়ার তালাশী বন্ধ হয়ে যায়।

তাই প্রথম প্রশ্ন, ঝোপের উর্দু চিড়িয়া ধরতে হলে যে ফাঁদ কেনার প্রয়োজন তার খর্চার বহরটা কি ?

ধরা যাক্‌ আমরা পূর্ব-পাকিস্তানের পাঠশালা, স্কুল, কলেজ সর্বত্র উর্দু চালাতে চাই। পূর্ব-পাকিস্তানে ক'হাজার পাঠশালা, ক'জন গুরুমহাশয়, দ্বিতীয় শিক্ষক, স্কুলমাস্টার, কলেজ প্রফেসার আছেন জানি না কিন্তু একথা নিশ্চয় জানি যে কেবল-মাত্র পাঠশালাতেই যদি আজ আমরা উর্দু চালাবার চেষ্টা করি তবে আমাদের হাজার হাজার উর্দু শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। সে সব শিক্ষকরা আসবেন বিহার এবং যুক্তপ্রদেশ থেকে। তাঁরা আঠারো কুড়ি টাকার মাইনেতে পূর্ব-বাঙলার গাঁয়ে পরিবার পোষণ-করতে পারবেন না। আমাদের পাঠশালার পণ্ডিত মশাইদের কিছু কিছু জমি-জমা আছে, কেউ কেউ হালও ধরে থাকেন, এবং তৎসত্ত্বেও তাঁরা যে কি দারিদ্র্যের ভেতর দিয়ে জীবনযাপন করেন সে নিদারুণ কাহিনী বর্ণনা করার মত শৈলী এবং ভাষা আমার কলমে নেই। লেখাপড়া শিখেছেন বলে গ্রামের আর পাঁচজনের তুলনায় এঁদের সূক্ষ্মানুভূতি, স্পর্শকাতরতা এবং আত্মসম্মান জ্ঞান হয় বেশী। মহাজনের রূঢ়বাক্য, জমিদারের রক্তচক্ষু এঁদের হৃদয়-মনে আঘাত দেয় বেশী এবং উচ্চশিক্ষা কি বস্তু তার সন্ধান তাঁরা কিছুটা রাখেন বলে মেধাবী পুত্রকে অর্থাভাবে উচ্চশিক্ষা না দিতে পারাটা এঁদের জীবনের সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। 'ইত্তিহাদ', 'আজাদ' মাঝে মাঝে এঁদের হস্তগত হয় বলে এঁরা জানেন যে যক্ষ্মারোগী স্বাস্থ্যনিবাসে বহুস্থলে রোগমুক্ত হয়, হয়ত তার সবিস্তর বর্ণনাও কোনো রবিবাসরীয়তে তাঁরা পড়েছেন এবং তারপর যখন পুত্র অথবা কন্যা যক্ষ্মারোগে চোখের সামনে তিলে তিলে মরে তখন তাঁরা কি করেন, কি ভাবেন, আমাদের জানা নেই। বাইবেলি ভাষায় বলতে ইচ্ছে হয়, 'ধন্য যাহারা অজ্ঞ, কারণ তাহাদের দুঃখ কম'। পণ্ডিতের তুলনায় গাঁয়ের আর পাঁচজন যখন জানে না 'স্বাস্থ্যনিবাস' সাপ না ব্যাঙ না কি, তখন তারা যক্ষ্মা-রোগকে কিস্মতের গর্দিশ বলেই নিজকে সান্ত্বনা দিতে পারে।

সুদূর যুক্তপ্রদেশ, বিহার থেকে যাঁরা উর্দু শেখাবার জন্য বাঙলার জলেভেজা,

কাদাভরা, পানাঢাকা, জ্বরেমারা পাড়াগাঁয়ে সপরিবার আসবেন তাঁরা মাইনে চাইবেন কত? আমাদের গাঁয়ে গাঁয়ে ফালতো জমিজমা আর নেই যে চাকরি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের লা-খেরাজ বা ব-খেরাজ ভূসম্পত্তি দিয়ে দেব আর তাঁরা সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে চন্দ্ রোজের মুসাফিরী কোনো সুরতে গুজার করে নেবেন। তাই তাঁদের মাইনে অন্ততঃপক্ষে কত হওয়া উচিত, আপনারা এবং আর পাঁচজন গাঁও-বুড়ারা মাথা মিলিয়ে ধরে দিন। আমরা মেনে নেব।

যত কমই ধরুন না কেন তার দশমাংশ দেবার মত তাগদও পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রীর নেই (শুধু পূর্ব-পাকিস্তান কেন, এরকম পাগলা প্ল্যান চালাতে চাইলে ইংলেণ্ড ফ্রান্সেরও নেই)। জমির সার, হালের বলদ, কলকব্জা কেনা সব কিছুর জন্য পয়সা খরচা বন্ধ করে এই কি এডুকেশনাল এক্সপেরিমেণ্ট করার মোকা!

এতক্ষণ 'ধনের' কথা হচ্ছিল, এখন প্রাণের কথাটা তুলি।

বিহার, যুক্তপ্রদেশ থেকে শিক্ষক আনিয়ে তো আমাদের পাঠশালাগুলো ভর্তি করা হ'ল। আটার অভাবে তাঁরা মাসহারা পেয়েও অর্ধাহারী রইলেন। তা থাকুন, কিন্তু যে সব হাজার হাজার পাঠশালার বাঙলা শিক্ষককে পদচ্যুত করে বিদেশীদের জায়গা করা হ'ল তাঁরা যাবেন কোথায়? কোনো দোষ করেন নি, 'এনিমিজ অব্ দি স্টেট' এঁরা নন, এঁদের বরখাস্ত করা হবে কোন হক্কের জোরে, কোন ইসলামি কায়দায়?

পাকিস্তান সফল করেছেন কারা? গ্রামে গ্রামে পাকিস্তানের প্রোপাগাণ্ডা ছড়াল কে, সিলেটের প্লেবিসিটের সময় কুর্তা বিক্রয় করে নৌকা ভাড়া করল কারা, পোলোয় করে মরণাপন্ন ভোটারকে বয়ে নিয়ে গেল কার বেটা বাচ্চারা?

এরাই লড়েছে পাকিস্তান-বিরোধীদের সঙ্গে। এরা কুর্সীনশীন, মোটর-সওয়ার পলিটিশিয়ান নয়। এরা লড়তে জানে। দরকার হলে এরা দলে দলে ঢাকার দিকে ধাওয়া করবে, সঙ্গে যাবে তাদের বাধ্য চাষা-মজুর। তাদের সংখ্যা কি হবে অনুমান করতে পারছি নে, কিন্তু শুনেছি এক ঢাকা সহরের বাঙলাভাষী মুষ্টিমেয় ছাত্র সম্প্রদায়ের হাতেই বাঙলা-উর্দু বাবদে কোনো কোনো দণ্ডধর কর্তাব্যক্তি লাঞ্ছিত অপমানিত হয়েছেন। ছাত্ররা সহরবাসী কিন্তু এরা 'গ্রাম্য'; এরা প্রাণের ভয় দেখাতে জানে। 'ধন' তো আগেই গিয়েছিল বিদেশ থেকে শিক্ষক আনিয়ে, তখন আরম্ভ হবে 'প্রাণের' উপর হামলা।

খুদা পনাহ্। আমরা এ অবস্থার কল্পনাও করতে পারিনে। আমাদের বিশ্বাস, কর্তাব্যক্তিরা তার বহু পূর্বেই 'কিতাবুন্নুবীন' দেখে 'সিরাতুল মুস্তকীমের' সন্ধান

পাবেন ;—'ওয়া আম্মাস্‌সাইলা ফলা তনহর', অর্থাৎ 'সাইল (প্রার্থী) দের প্রত্যাখ্যান কোরো না।'[১] এস্থলে 'সাইল' শব্দ আরবী অর্থে নিতে হবে, উর্দু অর্থে নয়, এবং তাহলে কথাটা আমাদের গরীব গুরুমহাশয়দের বেলাই ঠিক ঠিক খাটে।

হিটলার কুরানের এ আদেশ মানেন নি। যে র‍্যোম ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গের কর্ম-তৎপরতার দরুন তিনি জার্মানীতে তাঁর 'তৃতীয় রাষ্ট্র' গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, দেড় বৎসর যেতে না খেতে তিনি র‍্যোম এবং তাঁর প্রধান সহকর্মীদের গুলি করে মেরেছিলেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস আমাদের কর্তাব্যক্তি কুতুবমিনাররা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন—এবং ইসলামে গণতন্ত্রের অর্থ 'হক্‌' ও 'সবর'-এর উপর নির্ভর করা (ওয়া তওাসাও বিল্‌ হক্কি, ও তওাসাও বিস্‌-সবর্‌)।

এতো গেল পাঠশালার কথা। হয় তো উর্দুওলারা বলবেন যে তাঁরা পাঠশালায় বাঙলাই চালবেন কিন্তু স্কুল-কলেজে পড়াবেন উর্দু। দু'রকম শিক্ষা-ব্যবস্থার অধর্ম ও কুফল আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি ; আপাতত শুধু এইটুকু দ্রষ্টব্য যে স্কুল-কলেজে তাবৎ বিষয়বস্তু উর্দুর মাধ্যমিকে পড়াতে হলে উপস্থিত যে সব শিক্ষকরা এসব বিষয় পড়াচ্ছেন তাঁদের সকলকে বরখাস্ত করতে হবে এবং তাঁদের স্থলে যুক্তপ্রদেশ ও বিহার থেকে হাজার হাজার শিক্ষক আনাতে হবে।

কাজেই প্রথম প্রশ্ন, এসব মাস্টাররা কি অন্ন-হারা হওয়ার দুর্দৈবটা চোখ বুজে সয়ে নেবেন ? প্রত্যেক অনুন্নত দেশের বেকার সমস্যার প্রধান অংশ সমাধান করে শিক্ষাবিভাগ, কারণ তার হাতে বিস্তর চাকরি। পূর্ব-পাকিস্তান সে সমস্যার সমাধান দূরে থাক, পূর্ব-পাকিস্তানী বাঙালী শিক্ষকদের বরখাস্ত করে এবং বাইরের থেকে লোক ডেকে সৃষ্টি করবেন বৃহৎ বেকার সমস্যা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক এবং কলেজে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, কৃষি-বিদ্যা, পূর্ত-খনিজ-বৈদ্য-শাস্ত্র পড়াবার জন্য উর্দু-ভাষী শিক্ষক পাওয়া যাবে তো ? ভুললে চলবে না যে পূর্ব-পাকিস্তান যদি উর্দু গ্রহণ করে তবে সিন্ধুপ্রদেশ

---

১ এই পদের উপর মৌলানা ইউসুফ আলীর টীকা : Then there are the people who come with Petitions,—who have to ask for something. They may be genuine beggars asking for financial help, or ignorant people asking for knowledge, or timid people ask ing for some lead or encouragement. The common attitude is to scorn them, or repulse them. The scorn may be shown even when alms or assistance is given to them, Such an atti ude is wrong·····Every petition should be examined and judged on its merits. (সুরা ৯৩ ; ১০)

এবং বেলুচিস্তানেও ঠিক আমাদের কারদারই উর্দু-মাস্টার, প্রফেসরের চাহিদা ভয়ঙ্কর বেড়ে যাবে। ফলে বখন আমরা ঢাকার স্কুল-কলেজে শিক্ষকদের যে মাইনা দিচ্ছি সে মাইনের চেয়ে দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ দিতে হবে এই সব বহিরাগতদের। অত টাকা কোথায়? এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস উর্দু'র মাধ্যমিকে উপরে লিখিত তাবৎ বিষয় পড়াবার মত শিক্ষক বিহার, যুক্তপ্রদেশে পাঞ্জাবে প্রয়োজনের দশমাংশও নেই।

তৃতীয় প্রশ্ন, তাবৎ পাঠ্যপুস্তক উর্দুতে লেখবার জন্য গ্রন্থকার কোথায়? প্রয়োজনীয় শিক্ষকের দশমাংশ যখন বাজারে নেই তখন লেখকের দশমাংশও যে পাব না সে তথ্যও অবিসংবাদিত সত্য। কিছু বই লাহোর থেকে আসবে সত্য, কিন্তু বাংলার ভূগোল, ইতিহাস, কৃষিবিদ্যা তো লাহোরে লেখা হবে না এবং পূর্ব-পাকিস্তানে এসব বিষয় লেখার লোক নেই। এবং যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করি না কেন, আমাদের পাঠ্য-পুস্তক লেখকদের রুটি বহু বৎসরের জন্য নির্ঘাত মারা যাবে।

চতুর্থ প্রশ্ন, উর্দু ছাপাখানা, কম্পজিটর, প্রুফ-রীডার কোথায়? বাংলা প্রেস, প্রুফ-রীডাররা বেকার হয়ে যাবে কোথায়?

এবং সর্বশেষ দ্রষ্টব্য: পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশের স্কুল-কলেজে এখনো উর্দু শিক্ষার মাধ্যমিক হয় নি। বিবেচনা করি, আস্তে আস্তে হবে। কিন্তু পাঞ্জাবী-দের পক্ষে এ কর্ম অপেক্ষাকৃত সরল হবে কারণ উর্দু তাঁদের মাতৃভাষা। দরকার হলে কেঁদেককিয়ে তারা উর্দুতে আপন আপন বিষয় পড়াতে পারবেন কিন্তু বাঙালী মাস্টার-প্রফেসারের পক্ষে উর্দু শিখে আপন কর্তব্য সমাধান করতে বহু বহু বৎসর লাগবে। ততদিন আমরা ত্রি-লেগেড্ রেস রাণ করি?—বিশেষ করে যখন কিনা পূর্ব-পাকিস্তানকে শক্তিশালী রাষ্ট্রাংশ করার জন্য আমাদের কর্তব্য (ফর্‌জ্ বললে ভালো হয়) ঊর্ধ্বশ্বাসে, তড়িৎগতিতে সম্মুখপানে ধাবমান হওয়া।

উর্দুওলারা যদি বলেন, "না, আমরা ইস্কুল-কলেজে উর্দু দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শেখাব, আজ যে রকম ফারসী, আরবী, সংস্কৃত অপ্‌শনাল্ সেকেণ্ড্ ল্যানগুইজ হিসেবে শেখাচ্ছি", তাহলে এ প্রস্তাবে যে আমাদের বিন্দুমাত্রও আপত্তি নেই শুধু তাই নয়, আমরা সর্বান্তঃকরণে সায় দিই। প্রসঙ্গান্তরে সে আলোচনা হবে।

এ বিষয়ে আরেকটি কথা এই বেলা বলে নেওয়া ভাল। সাধারণতঃ ওদিকে কেউ বড় একটা নজর দেন না। আমাদের প্রশ্ন, সব বিষয় পড়াবার জন্য যদি আমরা উর্দু শিক্ষক পেয়েও যাই, উর্দু শিক্ষয়িত্রী পাব কি? না পেলে আমাদের

স্ত্রীলোকদের শিক্ষার কি ব্যবস্থা হবে উর্দুওলারা ভেবে দেখবেন কি? আমাদের কাছে পাকাপাকি খবর নেই, কিন্তু শুনতে পাই বাঙলা শিক্ষয়িত্রীর অভাবেই আমরা যথেষ্ট কাহিল হয়ে পড়েছি। (এস্থানে উল্লেখ করি শ্রীহট্ট সহরের মহিলা মুসলিম লীগ তথা অন্যান্য মহিলারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য গত নভেম্বর মাস থেকে একটানা আন্দোলন করে যাচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য, 'পাকিস্তান নবজাত শিশুর ন্যায় নবজাত রাষ্ট্র। মাতৃভাষারূপ মাতৃস্তন্য ব্যতীত অন্য যে কোনো খাদ্য তার পক্ষে গুরুপাক হবে'।)

উর্দুওলারা কেউ কেউ বলে থাকেন,—"অতশত বুঝি না, আমরা চাই, বাংলা ভাষার আজ যে পদ পূর্ব-পাকিস্তানে আছে ঠিক সেই রকমই থাক, এবং ইংরিজির আসনটি উর্দু গ্রহণ করুক।" তার অর্থ এই যে উর্দু উচ্চশিক্ষার মাধ্যমিক মিডিয়ম অব্ ইনস্ট্রাকশন্) হোক।

মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা শিক্ষার মাধ্যমিক করলে যে কি প্রাণঘাতী বিষময় ফল জন্মায় তার সবিস্তর আলোচনা না করে উপায় নেই।

প্রথমতঃ পৃথিবীর কোন্ শিক্ষিত সভ্য দেশ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য মাধ্যমে শিক্ষা দিচ্ছে? ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালি, চীন, জাপান, রুশ, মিশর, ইরাক, তুর্কী, ইরান এমন কোন্ দেশ আছে যেখানকার লোক আপন মাতৃ-ভাষাকে অবমাননা করে আপন দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে? আরবী পূত পবিত্র, ঐশ্বর্যশালিনী, ওজস্বিনী ভাষা, কিন্তু কই, তুর্কী, ইরান, চীন, জাভার কোটি কোটি লোকে তো আরবীর মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে না, বিদ্যাভ্যাস শাস্ত্রচর্চা করে না। তবে বাংলার বেলা এ ব্যত্যয় কেন? বাংলা-ভাষাভাষী লোকসংখ্যা তো নগণ্য নয়। সংখ্যা দিয়ে যদি ভাষার গুরুত্ব নির্ণয় করি এবং সে নির্ণয়করণ কিছু অন্যায় নয়—তবে দেখতে পাই চীনা, ইংরিজি, হিন্দী-উর্দু, রুশ, জর্মন ও স্পেনিশের পরেই বাংলার স্থান। পৃথিবীতে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা ছয় কোটি (পূর্ব-পাকিস্তানে প্রায় সোয়া চার কোটি) এবং তার তুলনায় ভুবনবিখ্যাত ফরাসী ভাষায় কথা বলে সাড়ে চার কোটি, ইতালিয়ানে চার কোটি, ফার্সীতে এক কোটি, তুর্কিতে সত্তর লক্ষ, এমন কি আরবীতেও মাত্র আড়াই কোটি। যে ভাষায় এত লোক সাহিত্য সৃষ্টি করবার জন্য সুযোগ অনুসন্ধান করছে তাদের এতদিন চেপে রেখেছিল মৌলবী-মৌলানাদের আরবী-ফারসী-উর্দু এবং পরবর্তী যুগে ইংরেজী। বাংলার সময় কি এখনো আসেনি, সুযোগ কি সে কোনো দিনই পাবে না?

মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য মাধ্যমিকে শিক্ষাদানের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আছে এবং তার ফল কি সেকথাও ঐতিহাসিকদের অবিদিত নয়। ক্যাথলিক জগতে কেন্দ্র অর্থাৎ পোপের সঙ্গে যোগ রাখার প্রলোভনে (আজ পূর্ব-পাকিস্তান করাচীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য যে রকম প্রলুব্ধ) একদা ইয়ারোপের সর্বত্র লাতিনের মাধ্যমিকে শিক্ষাদান পদ্ধতি জনসাধারণের মাতৃভাষার উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল। এবং সে পাথর সরাবার জন্য লুথারের মত সংস্কারক ও প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মের মত নবীন সংস্কারপদ্ধতির প্রয়োজন হয়েছিল। পরবর্তী যুগে দেখতে পাই ফরাসী লাতিনের জায়গা দখল করেছে এবং তার চাপে দিশেহারা হয়ে ফ্রেডরিক দি গ্রেটের মত জর্মন সম্রাট মাতৃভাষা জর্মনকে অবহেলা করে ফরাসীতে কবিতা লিখেছেন এবং সে কবিতা মেরামত করবার জন্য ফরাসী গুণী ভলতেয়ারকে পৎসদামে নিমন্ত্রণ করেছেন। ঠিক সেই রকম রাশিয়ারও অনেক বৎসর লেগেছিল ফরাসীর নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে। আজ উর্দুওলারা বাঙলাকে যে রকম তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছেন ঠিক সেই রকম জর্মন ও রুশ আপন আপন মাতৃভাষাকে অবহেলা করে বহু বৎসর 'যশের মন্দিরে' প্রবেশ লাভ করতে পারেন নি।

এসব উদাহরণ থেকে এইটুকু স্পষ্ট বোঝা যায় যে, যতদিন পর্যন্ত মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমিক রূপে গ্রহণ না করা হয় ততদিন শিক্ষা সমাজের উচ্চস্তরের গুটি-কয়েক লোকের সংস্কৃতিবিলাসের উপকরণ হয় মাত্র এবং যেখানে পূর্বে শুধু অর্থের পার্থক্য মানুষে মানুষে বিভেদ আনত সেখানে 'উচ্চশিক্ষা' ও সংস্কৃতির পার্থক্য দুই শ্রেণীর বিরোধ কঠোরতর করে তোলে।

এ দেশে যে ইসলামি শিক্ষা কখনো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি তার প্রধান কারণ বাঙলার মাধ্যমিকে কখনো শাস্ত্রচর্চা করা হয় নি। যে বস্তু মাতৃ-ভাষায় অতি সহজ, অত্যন্ত সরল, বিদেশী ভাষায় সেই বস্তুই অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তখন আরম্ভ হয় স্কুল থেকে পালানোর পালা এবং মধ্যবিত্ত ও ধনীর গৃহের চাপের ফলেই এই দুই শ্রেণীর ছেলে তখনো লেখাপড়া শেখে, কিন্তু অনুন্নত গরীব তখন ভাবে যে পরিবারে যখন কেউ কখনো লেখাপড়া শেখে নি তখন এ ছেলেই বা পারবে কেন, বাপ-দাদার মত এরো মাথায় গোবর ঠাসা।

মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য মাধ্যমিকে শিক্ষা দিলে যে দেশের কতদূর ক্ষতি হয় তার সামান্যতম জ্ঞান এখনো আমাদের হয় নি। সে শিক্ষাবিস্তারে যে তখন শুধু অজস্র অর্থব্যয় হয় তা নয়, সে শিক্ষা ছাত্রের বুদ্ধিবৃত্তিকে অবশ করে তোলে,

কল্পনাশক্তিকে পঙ্গু করে দেয় এবং সর্বপ্রকার সৃজনী-শক্তিকে কণ্ঠরোধ করে শিক্ষার আঁতুড় ঘরেই গোরস্তান বানিয়ে দেয়।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি—আমার অভিজ্ঞতা কলেজের অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকরূপে অর্জিত—যে পশ্চিমভারতের কার্ভে স্ত্রী-মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা যদিও দু'এক দিক দিয়ে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়ে পশ্চাৎপদ তবু স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা যেমন তাদের বেশী তেমনি প্রকাশ ক্ষমতা, আত্মপরিচয় দানের নৈপুণ্য তাদের অনেক বেশী। তার একমাত্র কারণ কার্ভে স্ত্রী-মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা আপন আপন মাতৃভাষার মাধ্যমিকে লেখা-পড়া করে আর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা লেখাপড়া শেখে ইংরেজির মাধ্যমিকে। কার্ভের মেয়েরা সেই কারণে আপন মাতৃভাষায় নিঃসঙ্কোচে অবাধ-গতিতে আপন বক্তব্য বলতে পারে, বোম্বাই, কলিকাতা, ঢাকার ছেলেরা না পারে বাঙলা লিখতে, না জানে ইংরেজি পড়তে।

এ-কাহিনীর শেষ নেই কিন্তু আমাকে প্রবন্ধ শেষ করতে হবে। তাই পাঠককে সবিনয় অনুরোধ করি তিনি যেন শিক্ষাবিভাগের কোনো পদস্থ ব্যক্তিকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীহট্টের খ্যাতনামা আলিম মৌলানা সখাওতুল আম্বিয়া প্রমুখ গুণীগণ আমার সম্মুখে বহুবার স্বীকার করেছেন যে মাদ্রাসাতে যদি বাঙলাভাষা সর্বপ্রকার বিষয় শিক্ষার মাধ্যমিক হত তবে আমাদের আরবী-ফার্সীর চর্চা এতদূর পশ্চাৎপদ হত না। এবং কৌতুকের বিষয় এই যে, যে-উর্দুওলারা বাংলাকে এত ইনকার-নফরৎ, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন তাঁদেরও অনেকেই কঠিন বিষয়বস্তু যখন উর্দুতে বোঝাতে গিয়ে হিম্‌সিম্ খেয়ে যান তখন নোয়াখালি, সিলেটের গ্রাম্য উপভাষারই শরণাপন্ন হন।

এত সরল জিনিস উর্দুওলাদের কি করে বোঝাই? কি করে বোঝাই যে পারস্যের লোক যখন ফার্সীর মাধ্যমিকে আরবী (এবং অন্যান্য তাবৎ বিষয়) শেখে, তুর্কীর লোক যখন তুর্কী ভাষার মাধ্যমিকে আরবী শেখে তখন বাঙলার লোক আরবী (এবং অন্যান্য তাবৎ বিষয়) শিখবে উর্দুর মাধ্যমিকে কোন আজগুবী কাণ্ডজ্ঞানহীনতার তাড়নায়?

এ প্রসঙ্গের উপসংহারে শেষ কথা নিবেদন করি, মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমিক না করলে সে ভাষা কখনো সমৃদ্ধিশালী হবার সুযোগ পায় না।

স্বরাজ এলো পাকিস্তান হ'ল কিন্তু হায়, গোস্বামী খাসলৎ (মনোবৃত্তি ও আচার-ব্যবহার) যাবার কোনো লক্ষণ তো দেখতে পাচ্ছিনে। এতদিন কয়পুষ

ইংরেজীর গোলামী, এখন স্বেচ্ছায় বরণ করে নিচ্ছি উর্দুর গোলামী। খতম আল্লাহ অলা কুপুবিহিম ইত্যাদি। খুদাতালা তাদের বুকের উপর সীল এঁটে দিয়েছেন। (কুরান থেকে এ অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করার কোনো প্রয়োজন হ'ত না, যদি কোনো কোনো 'মৌলানা' বাঙলা ভাষার সমর্থকদের 'কাফির' হয়ে যাওয়ার ফতোয়া না দিতেন)।

এইবার দেখা যাক্, বাঙলাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয়, সরকারী ও সাংস্কৃতিক ভাষারূপে গ্রহণ করতে উর্দুওলাদের আপত্তিটা কি?

তাঁদের প্রধান আপত্তি, বাঙলা 'হেঁদুয়ানি' ভাষা। বাঙলা ভাষায় আছে হিন্দু ঐতিহ্য, হিন্দু কৃষ্টির রূপ। পূর্ব-পাকিস্তানী যদি সে ভাষা তার রাষ্ট্র ও কৃষ্টির জন্য গ্রহণ করে তবে সে হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে যাবে।

উত্তরে নিবেদন, বাঙলা ভাষা হিন্দু ঐতিহ্য ধারণ করে সত্য, কিন্তু এইটেই শেষ কথা নয়। বাঙলা ভাষার জন্ম হয়েছে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে।

বুদ্ধদেব যে রকম একদিন বৈদিক ধর্ম ও তার বাহন সংস্কৃতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তৎকালীন দেশজ ভাষায় (পরে পালি নামে পরিচিত) আপন ধর্মপ্রচার করেন, ঠিক সেই রকম বাঙলা ভাষার লিখিত রূপ আরম্ভ হয় বৌদ্ধ চর্যাপদ দিয়ে। পরবর্তী যুগে বাঙলা সাহিত্য রূপ নেয় বৈষ্ণব পদাবলীর ভেতর দিয়ে। আজ পদাবলী সাহিত্যকে হিন্দু ধর্মের অংশ হিসাবে গণ্য করা হয় কিন্তু যে যুগে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত সে যুগে তাকে বিদ্রোহের অস্ত্রধারণ করেই বেরুতে হয়েছিল। তাই শ্রীচৈতন্য প্রচলিত ধর্ম সংস্কৃতে লেখা হয় নি, লেখা হয়েছিল বাংলায়। সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণমহাভারতের যে অনুবাদ বাংলায় প্রকাশিত হয় তার পেছনে ছিলেন মুসলমান নবাবগোষ্ঠী। কেচ্ছা-সাহিত্যের সম্মান আমরা দি—হিন্দুরা দেন না—এবং সে সাহিত্য হিন্দু ঐতিহ্যে গড়া নয়। এর পর ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে বাংলা গদ্যের পত্তন হয় তার অনুপ্রেরণা খৃষ্টান সভ্যতা থেকে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নিজকে হিন্দু বলে স্বীকার করেন কি না, সে কথা অবান্তর—তাঁর অবদান যে উপনিষদ-সংস্কৃতি ও ইয়োরোপীয় প্রভাবের ফলে গঠিত সে কথা অনস্বীকার্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রচলিত নূতন ধারাকে বৈদিক কিম্বা সনাতন বলা ভুল, সে ধারা গণ উপাসনার উৎস থেকে প্রবাহিত হয়েছে এবং সে উৎসকে গোঁড়া হিন্দুরা কখনো শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন নি। স্বামী বিবেকানন্দের 'জাতীয়তাবাদের' মূল বেদ উপনিষদ নয়।

উর্দুওলারা বলবেন, 'এসব খাঁটি হিন্দু না হতে পারে, কিন্তু আর যাই হোক না কেন, ইসলামি নয়।'

আমরা বলি, 'ইসলামি নয় সত্য, কিন্তু এর ভেতরে যে ইন্‌কিলাব্‌ মনোবৃত্তি আছে সেটি যেন চোখের আড়ালে না যায়। এই বিদ্রোহ ভাব বাংলায় ছিল বলে কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম একদিন আপন 'বিদ্রোহী' দিয়ে রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত 'মরমিয়াপনার' বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পেরেছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানে যে নবীন কৃষ্টি গঠিত হবে সেটা এই বিদ্রোহ দিয়েই আপন বিজয়-অভিযান আরম্ভ করবে।

এস্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে আরেকটি কথা বলি: উত্তর ভারতের তাবৎ সংস্কৃত ভাবাপন্ন ভাষার মধ্যে (হিন্দী, মারাঠী, গুজরাতী ইত্যাদি) বাংলাই সবচেয়ে অসংস্কৃত। হিন্দী, মারাঠী পড়বার বা বলবার সময় সংস্কৃত শব্দ খাঁটি সংস্কৃত উচ্চারণে পড়া এবং বলা হয়—'পরীক্ষা' পড়া হয় 'পরীক্‌ষা', 'আত্মা' পড়া হয় 'আৎমা'—কিন্তু বাংলায় সংস্কৃত শব্দ, এমন কি সংস্কৃত ভাষা উচ্চারণ করার সময়ও, উচ্চারণ করা হয় বাঙলা পদ্ধতিতে। এ বিষয়ে বাঙালী হিন্দু পর্যন্ত উর্দুভাষী মুসলমানের চেয়ে এককাঠি বাড়া। উর্দুভাষী মুসলমান তার ভাষার সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করে খাঁটি সংস্কৃত কায়দায়, বাঙালী হিন্দু উচ্চারণ করে 'অনার্য' কায়দায়।

না হয় স্বীকার করেই নিলুম, বাঙলা 'হেঁদুয়ানী' ভাষা কিন্তু প্রশ্ন, এই ভাষা এতদিন ধরে ব্যবহার করে পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমান কি 'না-পাক', 'হিঁদু' হয়ে গিয়েছে? পাকিস্তান-স্বপ্ন সফল করাতে কি পূর্ব পাকিস্তানের 'না-পাক' মুসলমানদের কোনো কৃতিত্ব নেই? পাকিস্তান-স্বপ্ন কি সফল হল লাহোর, লক্ষ্ণৌর কৃপায়? পূর্ব-পাকিস্তানে যারা লড়ল তারা কি সবাই উর্দুর পাবন্দ আলিম-ফাজিল, মৌলানা-মৌলবীর দল? না তো। লড়ল তো তারাই যারা উর্দু জানে না, এবং বাঙলার জন্য আজ যারা পুনরায় লড়তে তৈরী আছে। এই সব লড়নেওলারা এত দিনকার ইংরেজ আধিপত্য এবং হিন্দু প্রভাবের ফলেও যখন হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে যায়নি, তখন পাকিস্তান হওয়ার পর বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করলেই তারা রাতারাতি ইসলামি জোশ হারিয়ে পাকিস্তানের শত্রু বনে যাবে? এ তো বড় তাজ্জব কথা! বাঙলা ভাষার এত তাগদ?

দ্বিতীয় বক্তব্য আমরা ইতিহাস নিয়ে আরম্ভ করি। পূর্বেই বলেছি, ফিরদৌসীর আমলে ইরানের সর্বত্র আরবী প্রচলিত ছিল—ইরানের রাষ্ট্রভাষা ছিল আরবী। তখনকার দিনে যেটুকু ফরাসী প্রচলিত ছিল সে ছিল 'কাফির', অগ্নি-উপাসক, জরথুস্ত্রীদের ভাষা। সে ভাষায় একেশ্বরবাদের নামগন্ধ তো ছিলই না,

তাতে ছিল দ্বৈতবাদের প্রচার, এক কথায় সে ভাষা ছিল ন'সিকে ইসলাম-বিরোধী, 'কাফিরী'। তবু কেন সে ভাষা চর্চা করা হল, এবং সে চর্চা করলেন কারা? কাফিরী জরথুস্ত্রীরা করেনি, করেছিলেন আরবীজাননেওলা মুসলমানেরাই। কেন?

তুর্কীতেও তাই। কেন?

এ দুটো খাঁটি ইসলামি দেশের উদাহরণ; এবার স্বদেশে সেই দৃষ্টান্তই খোঁজা যাক্। পাঠান-মোগল যুগে এ দেশে ফার্সী ব-হাল তবিয়তে রাষ্ট্র-ভাষার রাজ-সিংহাসনে বসে দিশী ভাষাগুলোর উপর রাজত্ব করত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই ফার্সীর সঙ্গে দেশজ হিন্দী মিলিয়ে উর্দু ভাষা কেন নির্মাণ করা হল? কিন্তু সেটা আসল প্রশ্ন নয়, আসল প্রশ্ন যে-হিন্দীকে নিয়ে উর্দু বানানো হল সে ভাষা কি 'পাক' ছিল?

আমরা জানি সে ভাষায় তখন তুলসীদাসের রামায়ণ সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক—এখনো তাই। সেই পুস্তকের আওতায় সমস্ত হিন্দী সাহিত্য গড়ে উঠেছে এবং তাতে আছে ইসলামদ্রোহী কট্টর মতবাদ। বাল্মীকির রামায়ণে যে ব্যক্তি মানুষ, রাজা এবং বীর, তিনি তুলসীর রামায়ণে খুদ ভগবানের আসন তসরূপ করে বসে আছেন। ইসলামে মানুষকে আল্লার আসনে তোলা সবচেয়ে মারাত্মক কুফ্‌র্।

আজকের বাংলা ভাষা সেদিনকার হিন্দীর তুলনায় বহুগুণে পাক। আজ বাঙলা সাহিত্যে যে ঈশ্বর গানে কবিতায় নন্দিত হচ্ছেন তিনি সুফীর মরমের আল্লা, হক্। তাঁর সন্ধান 'গীতাঞ্জলিতে'—সে পুস্তক তামাম পৃথিবীতে সম্মান লাভ করেছে।

এবার যে দৃষ্টান্ত পেশ করব সেটি সভয়ে এবং ঈষৎ অনিচ্ছায়। দৃষ্টান্তটি কুরাণের ভাষা নিয়ে এবং এ জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করার হক্ আলিম ফাজিলদের। কিন্তু শ্রদ্ধেয় গোলাম মোস্তফা সায়েব যখন রসুলুল্লার জীবনী থেকে নজির তুলে পূর্ব-বঙ্গবাসী মুসলমানকে 'পাঞ্জাবী প্রভুত্ব' বরদাস্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন, ('মক্কা হইতে মোহাজেরগণ যখন দলে দলে মদিনায় পৌঁছিতে লাগিলেন, তখন মদিনার আনসারগণ মক্কাবাসীদিগকে সাদরে গ্রহণ করিতেন) আজ তাহারা—পাঞ্জাবীরা—আমাদের দুয়ারে অতিথি। আমাদের কি উচিত নয় তাহাদের প্রতি একটু (!) সহানুভূতি দেখানো?'—(বিস্ময়বোধক চিহ্ন আমার) তখন আমিই বা এমন কি দোষ করলুম?

আরবী ভাষায় কুরান শরীফ যখন অবতীর্ণ হলেন তখন সে ভাষার কি রূপ ছিল? সে-ভাষা কি 'পাক' পবিত্র ছিল, না পৌত্তলিকতার গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত

ছিল ? আমরা জানি লাত, উজ্জা, মনাত প্রভৃতি দেব-দেবীর প্রশস্তিতে সে ভাষা পরিপূর্ণ ছিল এবং একেশ্বরবাদ বা অন্য কোনো সত্যধর্মের (খ্রীষ্ট অথবা ইহুদি) কণা মাত্র ঐতিহ্য সে ভাষায় ছিল না।

পক্ষান্তরে আরব দেশে বিস্তর ইহুদি ও খৃষ্টান ছিলেন। (হজরতের বহুপূর্বেই হিব্রুভাষা তওরিত 'তোরা' এবং 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট') বুকে ধরে পবিত্র ভাষারূপে গণ্য হয়েছিল, এবং হিব্রুর উপভাষা আরামমেইকের মাধ্যমে মহাপুরুষ ইসা ইঞ্জিল ('এভানজেলিয়াম' অথবা বাইবেলের 'নিউ টেস্টামেণ্ট') প্রচার করেছিলেন। কুরাণ অবতীর্ণ হবার প্রাক্কালে হিব্রুভাষা একেশ্বরবাদের চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়েছে, এবং বাইবেল ভক্ত মাত্রই জানেন সেই একেশ্বরবাদ, মৃত্যুর পরের বিচার, এর ফলস্বরূপ স্বর্গ অথবা নরক ইত্যাদি ইসলামের মূল বিশ্বাস (নবুওত ব্যতীত) প্রচারের ফলে হিব্রুভাষা সেমিতি ধর্মজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল।

তবু কেন সে ভাষায় অবতীর্ণ না হয়ে কুরাণ শরীফ পৌত্তলিকের ভাষায় নাজিল হলেন।

এ পরম বিস্ময়ের বস্তু এবং শুধু আমরাই যে আজ বিস্মিত হচ্ছি তা নয়, স্বয়ং মহাপুরুষের আমলেও এ বিস্ময় বহুমুখে সপ্রকাশ হয়েছিল।

কিন্তু সে বিস্ময়ের সমাধান স্বয়ং আল্লাতাল্লা কুরাণ শরীফে করে দিয়েছেন। পাছে বাঙলা অনুবাদে কোনো ভুল হয়ে যায় তাই মৌলানা আব্দুল্লা য়ুসুফ আলীর কুরাণ-অনুবাদ থেকে শব্দে শব্দে তুলে দিচ্ছি। আল্লা বলেন,

"Had We sent this as
A Quran (in a language)
Other than Arabic, they would
Have said : 'Why are not
It's verses explained in detail ?-
What ! (a Book) not in Arabic
And (a Messenger) an Arab ?"

অর্থাৎ "আমরা যদি আরবী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষায় কুরাণ পাঠাতুম তাহলে তারা বলত 'এর বাক্যগুলো ভালো করে বুঝিয়ে বলা হল না কেন ? সে কি ! (বই) আরবীতে নয় অথচ (পয়গম্বর) আরব !"

খুদাতালা স্পষ্ট ভাষায় বলছেন, আরব পয়গম্বর যে আরবী ভাষায় কুরাণ অবতরণের আধার হবেন সেই তো স্বাভাবিক, এবং অন্য যে-কোনো ভাষায় সে

কুরাণ পাঠানো হলে মক্কার লোক নিশ্চয়ই বলত, 'আমরা তো এর অর্থ বুঝতে পারছি নে।'

কুরাণের এই অঙ্গুলীনির্দেশ মত চললেই বুঝতে পারব ভাষার কৌলীন্য অকৌলীন্য অত্যন্ত অবান্তর প্রশ্ন, আসল উদ্দেশ্য ধর্মপুস্তক যেন আপামর জনসাধারণ বুঝতে পারে। বার বার কতবার কুরাণে বলা হয়েছে, 'এ-বই খোলা বই', 'এ-বই আরবীতে অবতীর্ণ হল' যাতে করে সর্বসাধারণের জন্য এ-বই সরল দিগ্‌দর্শক হতে পারে।

'সর্বসাধারণ সনাতন ধর্মের বাণী মাতৃভাষায় বুঝুক' এই মাহাত্ম্য যে কত গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং গুরুত্বব্যঞ্জক সে কথা আমরা এখনো সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস পূর্বাচার্যগণ এ বাণী হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং সক্ষম হয়েছিলেন বলেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, ধর্মজ্ঞান যদি মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের বিদ্যাচর্চার বিলাসবস্তু না হয়ে আপামর জনসাধারণের নিত্য অবলম্বনীয় সখারূপে সপ্রকাশ হ'তে চায় তবে সে ধর্মশিক্ষা মাতৃভাষাতেই দিতে হবে। কোনো বিদেশী ভাষা দ্বারা জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, মাতৃভাষার সাহায্যে নিতেই হবে, তা সে-মাতৃভাষা পূতপবিত্রই হোক্ আর ওছা নাপাকই হোক। এ তত্ত্বটা ইরানের মনীষীরা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই একদা ইরানে আরবীয় বহুল প্রচার থাকা সত্ত্বেও 'নাপাক' ফার্সী ভাষাকে ধর্মশিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করেছিলেন। ভারতীয় মনীষীরা ঠিক সেই কারণেই এদেশে বিদেশী ফার্সী প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও 'না-পাক' হিন্দীর সঙ্গে আরবী ফার্সী মিলিয়ে উর্দু নির্মাণ করেছিলেন।

বাঙলা দেশের মৌলবী-মওলানারা সস্তায় কিস্তিমাত করতে চেয়েছিলেন বলেই দেশজ বাঙলাকে ধর্মশিক্ষার বাহন রূপে স্বীকার করেন নি—উর্দু দিয়ে ফাঁকতালে কাজ সারিয়ে নেবার চেষ্টাতেই ছিলেন। তাই পূর্ব-পাকিস্তানকে আজ এই খেসারত দিতে হচ্ছে যে, 'নিজ বাসভূমে, পরবাসী হওয়ার' মত নিজ মাতৃভাষায় যে কোনো কিছুরই চর্চা করতে পারে নি। যুক্তপ্রদেশ তথা পাঞ্জাবের মৌলবী-মওলানাগণ যে রকম মাতৃভাষা উর্দুর সাহায্যে শাস্ত্রচর্চা করেছিলেন, বাঙালী আলিমগণও যদি বাঙলায় সে-রকম শাস্ত্রচর্চা করে রাখতেন তাহলে সেই সূত্রপাতের খেই ধরে আজ বাঙালী মুসলমান নানা সাহিত্য নির্মাণ করে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারত। এবং যখন দেখি, যে-বাঙালী আলিমগণ বাঙলায় শাস্ত্রচর্চা না করে

বাঙলাদেশের আপামর জনসাধারণকে অজ্ঞ রাখলেন তাঁরাই বাঙালী তরুণকে তার ধর্মশাস্ত্রের অজ্ঞতা নিয়ে তাচ্ছিল্য অবহেলা করেন তখন বিস্ময়ে বাক্যস্ফুরণ হয় না। আপন কর্তব্যচ্যুতি ঢাকবার এই কি সরলতম পন্থা? এবং, তাঁরা এ-কথাটাও বুঝলেন না যে, বাঙালী হিন্দু যে রকম সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে শাস্ত্রগ্রন্থ বাঙলাতে অনুবাদ ও প্রচার করার জন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়, তাঁরাও বাঙলায় ইসলামি শাস্ত্রের চর্চা করলে বাঙালী মুসলমানের কাছ থেকে সে রকম শ্রদ্ধাঞ্জলি পেতেন।

আবার বলি, এখনো সময় আছে। উর্দু বাঙলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাঁরা সরল বাঙলা (লিসানু-স্মুবীন) গ্রহণ করবেন, না আবার উর্দু দিয়ে ফোকটে কাজ সারবার তালে থাকবেন?

ধর্মজগতে পোপকে একদা এই দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁর খাস-পেয়ারা লাতিন সর্বদেশের সর্বমাতৃভাষাকে পদদলিত করে—

পাকা রাস্তা বানিয়ে বসে দুঃখীর বুক জুড়ি,—
ভগবানের ব্যথার 'পরে হাঁকায় সে চার-ঘুড়ী

—করবে, না তিনি লুথারের প্রস্তাবমত মাতৃভাষায় শাস্ত্রচর্চা করতে দেবেন? পোপ সত্যপথ দেখতে পান নি, তিনি ভুল করেছিলেন। ফলে খ্রীষ্টজগত দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল।

আজ যদি জোর করে পোপের ভ্রান্তাদর্শ অনুসরণ করে উর্দুওলারা পূর্ব-পাকিস্তানের স্কন্ধে উর্দু চাপান তবে লুথারের মত লোক পূর্ব-পাকিস্তানে খাড়া হতে পারে। যাঁরা অখণ্ড পাকিস্তান চান তাঁরা এই কথাটি ভেবে দেখবেন।

ভাষার 'পাকী' 'না-পাকী' সম্বন্ধে আমার শেষ দ্বিধাটি এইবার নিবেদন করি আমরা যে এত তর্কাতর্কি করছি, কিন্তু নিজের মনকে কি একবারও জিজ্ঞেস করেছি 'পাকিস্তান' শব্দটির জন্ম কোথায়, সে জাতে 'পাক', না 'নাপাক'? 'পাক' কথাটা তো আরবী নয়, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি 'প' (অথবা 'পে') অক্ষরটি আরবী নয়, 'প' অক্ষরটি ফার্সী অর্থাৎ প্রাচীন ইরানি, অর্থাৎ অগ্নি-উপাসক কাফিরদের শব্দ, এবং এই জেন্দা-আবেস্তার শব্দটির সঙ্গে যুক্ত আছে সংস্কৃত 'পক্ব' শব্দ ('পাক্' শব্দটি সংস্কৃত নয়, কিন্তু আবেস্তা ও সংস্কৃত যমজ-ভাষা) এবং 'স্তান' কথাটি যে সংস্কৃত 'স্থানের সঙ্গ সংশ্লিষ্ট সে কথাও সকলেই জানেন। দুটি শব্দই আরবী নয়, প্রাচীন ইরানি, এবং প্রাচীন ইরানি বাঙলা অপেক্ষা কোনো দিক দিয়ে 'পাক' নয়। ভাষার দিক দিয়ে যদি সত্যই সম্পূর্ণ "পাক্" নাম দিতে হয় তবে তো পাকিস্তানকে 'বয়তুল মুকদ্দসের' ওজনে 'মুমলকতুল মুকদ্দস' জাতীয় কোনো নাম দিতে হয়।

তাই বলি 'পাক' 'না-পাকের' প্রশ্ন শুধানো ইসলাম-ঐতিহ্য পরিপন্থী। কোনো মানুষকে না-পাক বলে যেমন তাকে কলমা থেকে বঞ্চিত করা যায় না, কোনো ভাষাকে ঠিক তেমনি 'না-পাক' নাম দিয়ে ইসলামি শিক্ষা-ঐতিহ্যের বাহক হওয়া থেকে বঞ্চিত করা যায় না। 'ছুৎ বাই' ইসলামি মার্গ নয়।

কেন্দ্রের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন, কেন্দ্রের চাকরি, কেন্দ্রীয় পরিষদে বক্তৃতাদান ইত্যাদি বিষয়ে বাংলা কতদূর প্রতিবন্ধক হবে-না-হবে সে বিষয়ে আলোচনা অন্য প্রসঙ্গে প্রবন্ধের গোড়ার দিকে করা হয়ে গিয়েছে। বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা সম্বন্ধে আর যে সব ছোটখাটো আপত্তি আছে তার অন্যতম ব্যবসাবাণিজ্য।

উর্দুওলারা বলেন, "ইংরিজি তাড়িয়ে দিলুম, উর্দু শিখলুম না, তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে ব্যবসা করব কি করে?"

এর উত্তর এতই সরল যে দেওয়াটা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। ইংলণ্ডের শতকরা ৯৯ জন ফরাসী জানে না, ফ্রান্সের ৯৯.৯ ইংরিজি জানে না, তৎসত্ত্বেও ব্যবসা চলে। তার চেয়েও সরল উদাহরণ আছে। মারোয়াড়ীরা প্রায় একশ' বৎসর ধরে বাঙলাদেশ শুষে খাচ্ছে, আমাদের কফনের কাপড় বিক্রি করে তারা মারোয়াড়ে তিনতলা বাড়ী বানায় কিন্তু সমস্ত মারোয়াড় দেশ বাঙলা পড়াবার জন্য একটা স্কুল নেই, কোনোকালে ছিলও না। এসব তো হল খুচরা ব্যবসায়ের কথা। প্রদেশে প্রদেশে, দেশে দেশে ব্যবসায়ের যোগাযোগ হয় বড় বড় কারবারী-দের মধ্যস্থতায়। দমস্কসে যে জর্মন ভদ্রলোক সীমেন শুকার্টের কলকব্জা বিক্রয় করতেন তিনি তড়তড় করে আরবী বলতে পারতেন—তাই বলে গোটা জার্মানির পাঠশালা স্কুলে তো আরবী পড়ানো হয় না।

পূর্ব-পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম-পাকিস্তানের যে বড় বড় ব্যবসা হবে, সে হবে করাচীর সঙ্গে। করাচীর ভাষা সিন্ধী—কারবারী মহলে চলে ইংরেজি, সিন্ধী এবং কিঞ্চিৎ গুজরাতী। ব্যবসায়ের জন্য ভাষা শিখতে হলে তো আমাদের সিন্ধী শিখতে হয়।

ব্যবসা যে করে ভাষার মাথা-ব্যথা তার। শিক্ষা বিভাগ এবং দেশের দায়িত্ব এইটুকু যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স বিভাগে তার জন্য সামান্যতম বন্দোবস্ত করে দেওয়া। সেটুকু কেন, তার চেয়ে ঢের বেশী উর্দু আমরা পূর্ব-পাকিস্তানে শেখাব। সে কথা পরে হবে।

এ জাতীয় খুঁটিনাটি আরো অনেক সমস্যা আছে কিন্তু তা হলে মূল বক্তব্যে

কখনই পৌঁছানো যাবে না।

উর্দু-বাঙলা দ্বন্দ্বের শেষ সমাধান করতে হলে বিচার-বিবেচনা আবশ্যক যে পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শ কি ?—আশা করি একথা কেউ বলবেন না যে একমাত্র উর্দুর সেবা করার জন্যই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পাকিস্তান তথা পূর্ব-পাকিস্তানের আদর্শ কি সে সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত মত দেবার কোন অর্থ হয় না। নানা গুণী যে নানা মত দিতেছেন তার মাঝখানে একটি সত্য কথা সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন··· সে হচ্ছে এই যে, পাকিস্তানকে সর্বপ্রথম সমৃদ্ধবান রাষ্ট্র করতে হবে।

তাহলেই প্রশ্ন উঠবে সমৃদ্ধশালী হতে হলে যে শক্তির প্রয়োজন সে শক্তি সুপ্তাবস্থায় আছে কোনখানে ?

পাকিস্তান তথা ভারত ইউনিয়নের স্বাধীনতা যে সফল হল তার প্রধান কারণ গণ-আন্দোলন। যত দিন কংগ্রেস বলতে 'স্টেটসমেনের' ভাষায় 'ভদ্রলোগ ক্লাস', যত দিন লীগ বলতে রামপুর ভূপাল খানবাহাদুর, খানসায়েবেদের বোঝাত ততদিন ইংরেজ 'স্বরাজ' এবং পাকিস্তানের' থোড়াই পরোয়া করেছে। কিন্তু যেদিন দেখা গেল যে লীগের পশ্চাতে জনসাধারণ এসে দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ লীগ আন্দোলন গণ-আন্দোলনের রূপ ধারণ করেছে সেদিন আর পাকিস্তানের দাবী কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনসাধারণের শক্তি প্রয়োগে।

জনসাধারণের সেই শক্তি সেদিন বিদ্রোহের রূপ ধারণ করেছিল। আজ সে শক্তি সুষুপ্ত, এবং সেই শক্তি যদি পাকিস্তান গঠনে নিয়োজিত না হয় তবে পাকিস্তান কখনই পূর্ণাবয়ব, প্রাণবন্ত রাষ্ট্ররূপে দুনিয়ার মজলিসে আসন নিতে পারবে না। মার্কস্‌বাদের মূল সিদ্ধান্ত ঠিক কিনা সে আলোচনা এস্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর, ইসলামের সঙ্গে যাঁদের সামান্যতম পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন, ইসলাম কোনো বিশেষ বর্ণ, জাতি বা শ্রেণীকে শ্রেষ্ঠত্বের আশীর্বাদ দিয়ে অজরামর করে তুলতে সম্পূর্ণ নারাজ।

যাঁরা ধর্মকে—তা সে ইসলামই হোক্ আর হিন্দু ধর্মই হোক্—রাজনীতি থেকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র চালাতে চান তাঁদের উদ্দেশ্যে আমার এস্থানে দু'একটি বক্তব্য আছে। ধর্মে বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, ধর্ম যে এ দুনিয়ায় এখনো প্রচণ্ড শক্তির আধার সেকথা অস্বীকার করলে আমরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতি পদে অপ্রত্যাশিত সঙ্কটের সম্মুখে উপস্থিত হব। এই যে আমরা বার বার শুনতে পাই ইয়োরোপ নাস্তিক, ইয়োরোপীয় রাজনীতি ধর্মকে উপেক্ষা করে চলে সে-কথাটা

কতদূর সত্য? ফ্রান্স-জর্মনিতে এখনো ক্রীশ্চান পার্টিগুলো কতটা শক্তি ধারণ করে সে কথা সব চেয়ে বেশী জানেন কম্যুনিস্টরা। ক্রীশ্চান ডেমোক্রেট, ক্যাথলিক সেণ্টার এদের অবহেলা করে কোনো ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলন চালানো এখনো ফ্রান্স, জর্মনি, ইতালিতে অসম্ভব। এই তো সেদিন রাজনীতিক্ষেত্রে এখনো পোপের কত ক্ষমতা সেটা ধরা পড়ল ইতালির গণভোটে। পোপ এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ যেদিন সশরীরে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে আসরে নামলেন সেদিন কম্রেড তল্লাত্তি প্রমাদ গুণলেন। শেষরক্ষার জন্য ধর্মহীন তল্লাত্তিকে পর্যন্ত বলতে হল, ভবিষ্যৎ ইতালিয় কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে ধর্মপ্রতিষ্ঠানরের সম্পত্তি, বিষয়আশয়ে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করা হবে না, এযাবৎ তাঁরা যে সব সুখ-সুবিধা উপভোগ করে আসছেন তার সব কটাই তাঁরা নিশ্চিন্ত মনে উপভোগ করতে পারেন। কিন্তু এ শ্মশান-চিকিৎসায়ও ফল হল না, তল্লাত্তির নির্মম পরাজয়ের কথা সকলেই জানেন। পোপ এই ভোট-মারে নেবে ভালো করেছিলেন কি মন্দ করেছিলেন সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর, আমাদের শুধু এইটুকুই দেখানো উদ্দেশ্য যে ধর্ম এখনো বহু শক্তি ধারণ করে।

মৃত্যুর পর বেহেশৎ বা মোক্ষ দান করাই ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। বিশেষতঃ ইসলাম সংসারের সর্বস্ব ত্যাগ করে গুহা-গহ্বরে বসে নাসিকাগ্রে মনো-নিবেশ করার ঘোরতর বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচার করে। আল্লাতা'লা কুরান-শরীফে বারম্বার বলেছেন যে এই সংসারে তিনি নানারকম জিনিস মানুষকে দিয়েছেন তার আনন্দ বর্ধনের জন্য। তাই মুসলিম মাত্রই প্রার্থনা করে, 'হে আমাদের প্রভু, ইহলোকে আমাদের শুভ হোক, পরলোকে আমাদের শুভ হোক।' এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় ইহলোকের মঙ্গল অতীব কাম্য, তাই প্রশ্ন ওঠে পার্থিব বস্তু কোন্ পদ্ধতিতে উপভোগ করব যাতে করে অমঙ্গল না হয়?

তাই বিশেষ করে ইসলামই পার্থিব বস্তুর ভাগবাঁটোয়ারা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। কুরান শরীফ বারম্বার ধনবণ্টন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন, এবং সে-বিষয়ে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেন।

মহাপুরুষ মুহম্মদের (দঃ) সঙ্গে মক্কাবাসীদের দ্বন্দ্ব হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ পার্থিব বস্তুর নবীন বণ্টনপদ্ধতি নিয়ে। 'সাইল' অর্থ ভিখারী নয়, 'সাইল' বলতে আজকাল আমরা ইংরিজিতে 'হ্যাভ্ নট্' বাক্যে যা বুঝি তাই। 'সাইলকে বিমুখ করো না' এই আদেশ মক্কার ধনপতিগণ গ্রহণ করতে কিছুতেই সম্মত হয় নি, অথচ এই নবীন পদ্ধতি দুঃস্থ নিপীড়িত বিত্তহীনদের প্রাণে নতুন আশার বাণী এনে

দিয়েছিল। ফলে দেখতে পাই মহাপুরুষের প্রথম শিষ্যদের ভেতর বিত্তহীন ও দাসের সংখ্যা বেশী।

ইহকাল পরকালের মঙ্গল আদর্শ নিয়ে এই যে আন্দোলন সৃষ্ট হল তার বিজয় অভিযান পৃথিবীর ইতিহাসে আপন স্থান করে নিয়েছে—কিন্তু সে ইতিহাস আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু এইটুকু দেখতে চাই, মহাপুরুষের চতুর্দিকে যে বিরাট আন্দোলন ক্রমে ক্রমে জাগ্রত হল সে আন্দোলন গণ-আন্দোলন। মহাপুরুষ যে নবীন আন্দোলন সফল করে তুললেন সে এই জনগণের সাহায্যে।

আজ পাকিস্তান যে বিরাট আন্দোলনের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে আন্দোলন জনগণ দিয়েই গঠিত হবে। এ আন্দোলনে থাকবে নূতন ধনবণ্টন পদ্ধতি, নূতন ধনার্জন পন্থা, শিক্ষার প্রসার, গণতান্ত্রিক নির্বাচনপন্থা, স্বাস্থ্যের উন্নতি, সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্য নির্মানপ্রচেষ্টা,—এক কথায় প্রাচীন শোষণনীতি সমূলে উৎপাটন করে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ বিকাশ।

কিন্তু যদি জনগণ এ আন্দোলনে অংশীদার না হয় তবে সমস্ত আন্দোলন ব্যর্থ হবে। জনসাধারণ যদি আন্দোলনের উদ্দেশ্য না বুঝতে পারে, এবং না বুঝতে পেরে আপন প্রচেষ্টা নিয়োগ করতে কুণ্ঠিত হয়, অথবা প্রয়োজনমত স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত না হয় কিংবা ধনপতিদের উৎকোচে বশীভূত হয়, অথবা দু'চার আনা মজুরী বৃদ্ধিতেই যদি বৃহত্তর স্বার্থকে ত্যাগ করে তবে সম্পূর্ণ আন্দোলন নিষ্ফল হবে।

এবং এস্থলে আমার কণ্ঠে যত শক্তি আছে তাই দিয়ে আমি চিৎকার করে বলতে চাই, মাতৃভাষা বাঙলার সাহায্য বিনা জনসাধারণকে এই বিরাট আন্দোলনের বিস্তৃত শাখাপ্রশাখা সম্বন্ধে সচেতন এবং ওয়াকিব-হাল করা যাবে না, যাবে না, যাবে না।

উর্দুওলারা বলবেন,—উচ্চশিক্ষা উর্দুর মাধ্যমিকে দেব বটে কিন্তু শিক্ষিতেরা কেতাব লিখবেন বাঙলায়।

আমার বক্তব্য,—ঠিক ঐ জিনিসটেই হয় না, কখনো হয় নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখাই, ইংরেজ আমাদিগকে কখনো ইংরিজি বই লিখতে বাধ্য করে নি, তবুও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গত একশত বৎসর ধরে যত উত্তম উত্তম ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, দর্শন সম্বন্ধে বই বেরিয়েছে তার শতকরা ৯৫খানা ইংরিজিতে কেন? জ্ঞানচর্চা করব এক ভাষায় আর তার ফল প্রকাশ করব অন্য ভাষায়,

এই বন্ধ্যা-প্রসব কখনো কস্মিন্‌কালেও হয় না। মানুষ যখন আপন মাতৃভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয় চিন্তা করতে শেখে তখনই সে মাতৃভাষায় লিখতে শেখে।

অর্থাৎ ইংরিজি আমলে যা হয়েছিল তারি পুনরাবৃত্তি হবে। একদল উর্দু শিক্ষিত লোক উর্দুতে লেখাপড়া শিখবেন, বড় বড় নোকরি করবেন, বহিরাগত উর্দু ভাষীদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে এক নূতন অভিজাত সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, আর বাদবাকি আমরা চাষাভূষো পাঁচজন যে তিমিরে ছিলুম সেই তিমিরেই থাকব।

তাই পুনরায় স্মরণ করিয়ে দি, হজরতের চতুর্দিকে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল, এবং পরে যে রাষ্ট্র-সংগঠন অভিযান আরম্ভ হয়েছিল তার মাধ্যমিক ছিল আপামর জনসাধারণের ভাষা,—আরবী। বিদগ্ধ হিব্রুকে তখন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছিল।

উর্দুওলারা বলবেন—বাঙলা জানলেই কি সব বাঙলা বই পড়া যায়? বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যদি বাঙলা চালাই, এবং ফলে যদি সকল রকমের বই-ই বাঙলাতে লেখা হয় তা হলেই কি আপামর জনসাধারণ সে সব বই পড়তে পারবে?

উত্তরে বলি, সকলে পারবে না, কিন্তু অসংখ্য লোক পারবে।

আমি যে শিক্ষা-ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখছি তাতে দেশের শতকরা নব্বুই জন মাইনর, ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়বে। এবং সে মাইনর, ম্যাট্রিকের শিক্ষাদান অনেক বেশী উন্নত পর্যায়ের হবে। ইংরিজি বা উর্দুর জন্য জান পানি করবে না বলে তারা অতি উত্তম বাঙলা শিখবে এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স, মিশর, ইরানে যে রকম সাধারণ শিক্ষিত লোক মাতৃভাষায় লেখা দেশের শ্রেষ্ঠ পুস্তক পড়তে পারে এরাও ঠিক তেমনি দেশের উন্নততম জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। দেশের তাবৎ লোকই যে উত্তম উত্তম পুস্তক পড়বে সেকথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়—কারণ সকলেই জানেন জ্ঞানতৃষ্ণা কোনো বিশেষ শ্রেণী বা সমাজের মধ্যে নিবদ্ধ নয়, এমন কি উচ্চশিক্ষা পাওয়া না-পাওয়ার উপরও সে জিনিস সম্পূর্ণ নির্ভর করে না, কত বি-এ, এম-এ, পরীক্ষা পাশের পর চেক্ বই ছাড়া অন্য কোনো বইয়ের সন্ধানে "সময় নষ্ট" করেন না, আর কত মাইনরের ছেলে গোগ্রাসে যা পায় তাই গেলে—কিন্তু মাতৃভাষা দেশের শিক্ষা-দীক্ষার বাহন হলে কোনো তত্ত্বানুসন্ধিৎসু অল্প চেষ্টাতেই দেশের সর্বোত্তম প্রচেষ্টার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। এর সত্যতা সপ্রমাণ হয় আরেকটি তথ্য থেকে—ইয়োরোপের বহু সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক-আবিষ্কর্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন না করেও যশস্বী সৃষ্টিকার হতে সমর্থ হয়েছেন।

তাই দেখতে হবে, মাতৃভাষার যে নির্ঝরিণী দিয়ে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ, সেই

নির্ঝরিণীই যেন বিশাল এবং বিশালতর হয়ে বিশ্ববিদ্যার অগাধ সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছয়। মাঝখানে ইংরিজি বা উর্দুর দশ হাত শুকনো জমি থাকলে চলবে না।

বিশেষ করে উর্দুওলা মৌলবী-মৌলানাদের এ কথাটি বোঝা উচিত। বাঙলাতে ধর্ম-চর্চা না করার ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ মুসলিম ধর্মের কুসংস্কারে নিমজ্জিত। ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ছাপা বই দেখলেই সে ভয়ে ভক্তিতে বিমূঢ় হয়ে যায়—তা সে গুল-ই-বাকাওলির কেচ্ছাই হোক আর দেওয়ান-ই চিরকীন্‌ই হোক্। রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করবার জন্য তাকে শেখাতে হবে :

১। ইসলামের ইতিহাস*, এবং বিশেষ করে শেখাতে হবে এই তথ্যটা যে সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করা অসম্ভব। আব্বাসী ওম্মাই যুগের ভেতর দিয়ে মুসলিম সংস্কৃতি যে-রূপ নিয়েছে সে-রূপ পূর্ব-পাকিস্তানে আবার নেবে না। অথচ ইসলামের গণতন্ত্রের খুঁটি এবং ধনবণ্টনে সমতার নোঙ্গর জোর পাকড়ে ধরে থাকতে হবে।

২। শত শত বৎসরের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা করে ইয়োরোপ যে শক্তি সঞ্চয় করেছে, মিশর দমস্ক আজ তাই শিখতে ব্যস্ত। প্রাচীন ঐতিহ্য যেরকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করে গ্রহণ করা যায় না, ইয়োরোপীয় কর্ম এবং চিন্তাপদ্ধতি ঠিক সেই রকম বিনা বিচারে গ্রহণ করা চলবে না।

৩। ইসলাম আরবের বাইরে যেখানেই গিয়েছে সেখানেই তথাকার দেশজ জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলাকে গ্রহণ করে নূতন সভ্যতা-সংস্কৃতি নির্মাণ করেছে। ইরানের সুফীতত্ত্বের যশ কোন্ দেশে পৌঁছয়নি? তাজমহল এই করেই নির্মিত হয়েছে, উর্দুভাষা এই পদ্ধতিতেই গড়ে উঠল, খেয়াল গান এই করেই গাওয়া হল, মোগল ছবি এই করেই পৃথিবীকে মুগ্ধ করেছে। পূর্ব-পাকিস্তানের ভারতীয় ঐতিহ্য নগণ্য নয়, অবহেলনীয় নয়। পূর্ব-বঙ্গের বহু হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বনামধন্য হয়েছেন, তাঁদের বংশধরগণ যেদিন নবীন রাষ্ট্রে আসন গ্রহণ করে সভ্যতা-কৃষ্টি আন্দোলনে যোগ দেবেন সেদিনই উভয় সম্প্রদায়ের অর্থহীন তিক্ততার অবসান হবে। (এস্থলে অবান্তর হলেও বলি ঠিক, তেমনি ভারতীয় ইউনিয়নের

* পাকিস্তানকে theocratic রাষ্ট্র করার কথা উঠছে না। আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, ধর্মের নামে যে রাজনৈতিক ধাপ্পা, অর্থনৈতিক শোষণ চলে তার শেষ কোনোদিনই হবে না, যতদিন না দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হন। ভারতীয় ইউনিয়ন সম্বন্ধেও এই নীতি প্রযোজ্য।

মুসলমানদের অবহেলা করেও সে রাষ্ট্র পরিপূর্ণতায় পৌঁছতে পারবে না।) এ কথা কিছুতেই ভুললে চলবে না যে মামুন, হারুনের সময় যখন আরবেরা জ্ঞান-গরিমায় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান ঠিক তখনই তারা প্রচুর অর্থব্যয় করে 'চরক' 'সুশ্রুত' 'পঞ্চতন্ত্র' আরবীতে অনুবাদ করেছিল, গজনীর মাহমুদের আমলে ঐতিহাসিক অল-বীরুনী কী বিপুল পরিশ্রম করে সংস্কৃত শিখে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ লিখেছিলেন।

আরবেরা সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে ভারতীয় সভ্যতার অনুসন্ধানে এদেশে এল, আর আজ পূর্ব-পাকিস্তানের লোক বাঙলা ভাষার গায়ে বৈষ্ণব নামাবলী দেখে ভড়কে যাচ্ছে! কিমাশ্চর্যমতঃপরম্?

কত গবেষণা, কত সৃজনীশক্তি, কত শাস্ত্রাশাস্ত্র বর্জন গ্রহণ, কত গ্রন্থ নির্মাণ, কত পুস্তিকা প্রচার, কত বড় বিরাট, সর্বব্যাপী, আপামর জনসাধারণ সংযুক্ত বিরাট অভিযানের সামনে দাঁড়িয়ে পূর্ব পাকিস্তান!

এর উৎসাহ অনুপ্রেরণা যোগাবে কে?

প্রধানতঃ সাহিত্যিকগণ। এবং আমি বিশেষ জোর দিয়ে জানাতে চাই, সে সাহিত্য-সৃষ্টি মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষাতে হতে পারে না।

আবার ইতিহাস থেকে নজীর সংগ্রহ করি।

ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে আঠারো মাইলের ব্যবধান। প্রতি বৎসর হাজার হাজার ইংরেজ প্যারিসে বেড়াতে আসে। বায়রন শেলি উত্তম ফরাসী জানতেন কিন্তু কই, আজ পর্যন্ত তো একজন ইংরেজ ফরাসী সাহিত্যে নাম অর্জন করতে পারেন নি, আজ পর্যন্ত একজন ফরাসী ইংরিজি লিখে পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন নি। অথচ বাঙলা উর্দুতে যে পার্থক্য ফরাসী ইংরিজিতে পার্থক্য তার চেয়ে ঢের কম। ফ্রেডরিক দি গ্রেটের যুগে বার্লিন এবং ভিয়েনার শিক্ষিত লোক মাত্রই ফরাসী চর্চা করত (আমরা যতটা ইংরিজি করি তার চেয়ে ঢের বেশী), কিন্তু তবুও তো একজন জর্মন ভাষাভাষী ফরাসী লিখে নাম করতে পারেন নি, তুর্গেনিয়েফ, তলস্তয়ের আমলে রুশ অভিজাত মাত্রই ফরাসী গভর্ণেসের হাতে বড় হতেন, বাল্যকাল হতে ফরাসী লিখতেন (তলস্তয়ের রুশ পুস্তকে যে পরিমাণ পাতার পর পাতা সির্ফ ফরাসী লেখা আছে সে রকম ইংরিজি-ভর্তি বাঙলা বই আমাদের দেশে এখনো বেরোয় নি) কিন্তু তৎসত্ত্বেও একজন রুশ ফরাসীতে সার্থক সৃষ্টি কার্য করতে পারেন নি।

অত দূরে যাই কেন? সাত শত বৎসর ফার্সীর সাধনা করে ভারতবর্ষের

সাহিত্যিকেরা এমন একখানা বই লিখতে পারেন নি যে বই ইরানে সম্মান লাভ করেছে। যে গালিব আপন ফার্সীর দম্ভ করতেন তাঁর ফার্সী কবিতা ইরানে অনাদৃত, অপাংক্তেয়, অথচ মাতৃভাষায় লেখা তাঁর উর্দু কবিতা অজর অমর হয়ে থাকবে।

আরো কাছে আসি। মাইকেলের মত বহু ভাষায় সুপণ্ডিত দ্বিতীয় বাঙালী এ দেশে জন্মান নি। তাঁর পূর্বে বা পরে কোনো বাঙালী তাঁর মত ইংরিজি লিখতে পারেন নি, তবু দেখি আপ্রাণ চেষ্টা করে তিনিও ইংরিজি সাহিত্যের ইতিহাসে এতটুকু আঁচড় কেটে যেতে পারেন নি। অথচ অল্পায়াসে লেখা তাঁর 'মেঘনাদ' বাঙলা সাহিত্য থেকে কখনও বিলুপ্ত হবে না।

আরো কাছে, একদম ঘরের ভেতর চলে আসি। লালন ফকীরও বলেছেন, 'ঘরের কাছে পাইনে খবর, খুঁজতে গেলেম দিল্লী শহর।' পূর্ব-পাকিস্তানের আপন ঘরের মৌলবী-মৌলানারা যে শত শত বৎসর ধরে আরবী, ফারসী এবং উর্দুর চর্চা করলেন, এ সব সাহিত্যে তাঁদের অবদান কি? গালিব, হালী, ইকবালের কথা বাদ দিন, পূর্ব-পাকিস্তান থেকে একজন দুসরা দরজার উর্দু কবি দেখাতে পারলেই আমরা সন্তুষ্ট হয়ে যাব।

মৌলবী-মৌলানাদের যে কাঠগড়ায় দাঁড় করালুম তাঁর জন্য তাঁরা যেন আমার উপর অসন্তুষ্ট না হন। নও-জোয়ানরা তাঁদের শ্রদ্ধা করুক আর নাই করুক, আমি তাঁদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখি। উত্তর এবং পশ্চিম ভারতের ('হিন্দুস্তানের') বহু মৌলবী-মৌলানার সংস্রবে এসে আমার এ বিশ্বাস আরো বদ্ধমূল হয়েছে যে, পূর্ববঙ্গের আলিম সম্প্রদায় শাস্ত্রচর্চায় তাঁদের চেয়ে কোনো অংশে কম নন। যেখানে সম্পূর্ণ বিদেশী ভাষা নিয়ে কারবার—যেমন মনে করুন আরবী—সেখানে পূর্ববঙ্গের আলিম অনেক স্থলেই 'হিন্দুস্তানের' আলিমকে হার মানিয়েছেন কিন্তু উর্দুতে সাহিত্য সৃষ্টি তো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। যে স্পর্শকাতরতা, সূক্ষ্মানুভূতি, হৃদয়াবেগ মাতৃভাষার ভেতর দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করে সে সব তাঁদের আছে কিন্তু উর্দু তাঁদের মাতৃভাষা নয় বলে তাঁদের সর্বপ্রচেষ্টা পঙ্গু, আড়ষ্ট ও রসবর্জিত হয়ে যে রূপ ধারণ করে তাকে সাহিত্য বলা চলে না। বিয়ের 'প্রীতি-উপহারেই' তার শেষ হদ্।

অথচ দেখি, অতি যৎসামান্য আরবী-ফার্সীর কল্যাণে কাজী নজ্‌রুল বাঙলা সাহিত্যে কী অক্ষয় খ্যাতি অর্জন করলেন। মুসলমানও যে বাঙলাতে সফল সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে সে তথ্য একা কাজী সাহেবই সপ্রমাণ করে দিয়েছেন।

তাই পুনরায় বলি, মাতৃভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে কেউ কখনো, কোনো দেশে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন নি। আজ যদি আমাদের সাহিত্য প্রচেষ্টা উর্দু স্বর্ণমৃগের পশ্চাতে ধাবমান হয় তবে তার চরম অবসান হবে অনুর্বর মরুভূমিতে। সমস্ত উনবিংশ ও এ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য উর্ধ্বশ্বাসে প্রগতির দিকে ছুটে চলল; অর্থাভাবে, শিক্ষার অভাবে, দুঃখের তাড়নায় বাঙালী মুসলমান সে কাফেলাকে এগিয়ে যেতে দেখল কিন্তু সঙ্গী হতে পারল না। এখনো কি সময় হয় নি যে সে তার সৃজনশক্তির সদ্ব্যবহার করার সুযোগ পায়?

অথচ দেখি, অশিক্ষিত চাষা এবং অর্ধশিক্ষিত মুন্সীমোল্লা আপন সাহিত্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন। পূর্ব-বঙ্গের লোকসাহিত্য যখন বিশ্বজনের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করল তখন দেশেবিদেশে বহু রসিকজন তার যে প্রশংসা করলেন সে প্রশংসা অন্য কোনো দেশের লোকসাহিত্যের প্রতি উচ্ছ্বসিত হয় নি। ভাষার বাজারে বহু বৎসর ধরে এ অধম বড় বড় মহাজনদের তামাক সেজে ফাই-ফর্মাস খেটে দিয়ে তাঁদের আড়তের সন্ধান নিয়েছে, এবং সে হলপ খেয়ে বলতে প্রস্তুত, লোক-সাহিত্যের ফরাসী, জর্মন, ইতালি, ইংরিজি আড়তের কোনোটিতেই পূর্ববঙ্গ লোকসাহিত্যের মত সরেস মাল নেই।

আমাদের ভাটিয়ালি মধু'র কাছে ভল্‌গার গান চিটেগুড়—হাসন রাজা, লালন ফকীর, সৈয়দ শাহ্‌নূরের মজলিসে এসে দাঁড়াতে পারেন এমন একজন গুণীও ইয়োরোপীয় লোক-সাহিত্য দেখাতে পারবে না।

অথচ কী আশ্চর্য, কি তিলিস্মাৎ, পূর্ব-বঙ্গের মুসলিম শিক্ষিত সম্প্রদায় কিছুই রচনা করতে পারলেন না! উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত পূর্ব-বঙ্গে শিক্ষিত বলতে বোঝাত উর্দুসেবীগণ, তারপরের দুঃখ-দৈন্যের ইতিহাস তো পূর্বেই নিবেদন করেছি। কাজেই যাঁরা শত শত বৎসর ফার্সী এবং উর্দুর সেবা করে কোনো সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন নি, অন্ততঃ তাঁদের মুখে এ কথা শোভা পায় না যে বাঙালী মুসলমান বাঙলা সাহিত্যের সেবা করে সে ভাষাকে আপন করে নিতে পারে নি।

কিন্তু কার দোষ বেশী, আর কার দোষ কম সে কথা নিয়ে এখানে আর আলোচনা করব না। এখানে শুধু এইটুকু নিবেদন করি: যে দেশের চাষী-মাঝি ভুবনবরেণ্য লোকসঙ্গীত রচনা করতে পারল সে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সফল সাহিত্য রচনা করতে পারবে না সে কথা কি কখনো বিশ্বাস করা

যায়? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে বাধো বাধো ঠেকে কিন্তু না বলে উপায় নেই, তাই অতি সবিনয় নিবেদন করছি, খুদাতা'লা এ অধমের জন্য বহু দেশে রুটি রেখেছিলেন। আরব, মিশর, আফগানিস্থান, ফ্রান্স, জর্মনি প্রভৃতি নানা দেশে নানা পণ্ডিত নানা সাহিত্যিকের সেবা করে এ অধমের ধ্রুব বিশ্বাস জন্মেছে পূর্ব-বঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টির যে উপাদান আছে এবং পূর্ব-বঙ্গবাসীর হৃদয়মনে যে সামান আছে তার বদৌলত একদিন সে অতি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি করবে।

সোয়া চার কোটি মানুষ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। বহুশত বৎসর ধরে তাদের আতুর হিয়া প্রকাশের জন্য আকুলি-বিকুলি করেছে, কখনো ফার্সী, কখনো উর্দুর মরু পথে তাদের ফল্গুধারা উষ্ণবাষ্পে পরিণত হয়ে গিয়েছে, আজ সে সব হৃদয় শুধু মর্মবাণীরই সন্ধানে নয়, আজ নবরাষ্ট্র নির্মাণের প্রদোষে তারা ওজস্বিনী ভাষায় দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চায়।

হাঙ্গেরীর জাতীয় সঙ্গীতে আছে:

দেশের দশের ডাক শোনো ঐ ওঠো ওঠো মাডিয়ার
এই বেলা যদি পারো তো পারিলে না হলে হ'ল না আর।

আমরা বলি;

দেশের ভাষার ডাক শোনো ঐ হে তরুণ বাঙলার
এই বেলা যদি পারো তো পারিলে না হলে হ'ল না আর।

এই বিরাট সাহিত্য নির্মাণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানী তরুণ যেন সাহস না হারায়। সে যেন না ভাবে যে উর্দু গ্রহণ করলে তার সব মুশকিল আসান হয়ে যেত। সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বাবদে ইংরিজি ঢের বেশী মুশকিল আসান। উর্দুতে আছে অল্পবিস্তর মসলা-মসাইলের কেতাব, এন্তার দোয়া-দরুদের বই। তুমি যে রাষ্ট্র নির্মাণ করতে যাচ্ছ তার মালমসলা উর্দুতে যা পেতে সে জিনিস সৃষ্টি করতে তোমার পাঁচ বছরও লাগবে না। ইরান দেশ যে রকম একদিন ইরানি সভ্যতা নির্মাণ করে ফিরদৌসী, রূমী, হাফিজ, সাদী, খৈয়ামের জন্ম দিয়েছিল সেই রকম তুমিও সম্মুখে আদর্শ রাখবে পূর্ব-পাকিস্তানে এক নূতন সভ্যতা গড়বার। ইরান আরবী এবং ফার্সী দুই মিলিয়ে তার সাহিত্য-সংস্কৃতি গড়েছিল, তুমি আরবী, বাঙলা, ফরাসী, সংস্কৃত, উর্দু, ইংরিজি মিলিয়ে ব্যাপকতর এবং মধুর সাহিত্য-সংস্কৃতি সৃষ্টি করবে।

অন্যান্য সম্প্রদায় যেন অযথা ভয় না পান। বৌদ্ধচর্যাপদের সূতিকাগৃহে যে শিশুর জন্ম, বৈষ্ণবের নামাবলী যে শিশুর অঙ্গে বিজড়িত, আরবী ফারসীর রুটি-

গোস্ত যে শিশু বিস্তর খেয়েছে, 'গীতাঞ্জলি'র একেশ্বরের বন্দনা গেয়ে গেয়ে যে শিশু যৌবনে পৌঁছল, সে যুবক ইসলামের ইতিহাস চর্চা করলে কোনো মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। রাধাকৃষ্ণন, দাশগুপ্ত যে সব দর্শনের কেতাব ইংরেজিতে লিখেছেন তাতে বিস্তর সংস্কৃত শব্দ আছে, মার্গোলিয়াত, মুইর ইসলাম সম্বন্ধে যে সব গ্রন্থ ইংরিজিতে লিখেছেন তাতেও বিস্তর আরবী শব্দ আছে, তাই বলে ইংরিজি ভাষার জাত যায় নি। ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে যে পরিমাণ আরবী ফার্সী শব্দ প্রয়োগ করেছেন সে পরিমাণ যদি পুনরায় কাজে লাগে তাহলে আপত্তি কি? 'আলালের ঘরের দুলাল'ও তো বাঙলা বই।

রামমোহন রায় বাঙলা ভাষায় যে চিন্তাধারা প্রবর্তন করেছিলেন তার বিরুদ্ধে সেযুগে গোঁড়া হিন্দুরা প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন, রামকৃষ্ণদেবকে কেন্দ্র করে বাঙলা ভাষায় যে নবচেতনার উৎপত্তি হয়েছিল তখনকার বিদগ্ধ (প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ) সমাজ সেটাকে গ্রহণ করতে চান নি, এবং রবীন্দ্রনাথ সনাতন ঐতিহ্যপন্থী নন বলে তাঁকে পর্যন্ত সুরেশ সমাজপতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। আজ এ সব সংগ্রামের কথা লোকে ভুলে গিয়েছে, এবং বাঙলা সাহিত্যে এখন যদি মুসলিম সংস্কৃতির (এবং সেইটেই যে তার একমাত্র প্রচেষ্টা হবে তাও নয়) আলোচনা হয় তাহলে বিচক্ষণ লোক বিভীষিকা দেখবেন না।

আমার মত অজ্ঞ লোককে বহু হিন্দু-মুসলমান যখন বাঙলাতে মুসলিম সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে অনুরোধ জানিয়ে থাকতে পারেন তখন যোগ্যজন এ কর্মে নিয়োজিত হলে যে বহুলোক তাঁকে আশীর্বাদ করবেন তাতে আর কি সন্দেহ?

পূর্ব-পাকিস্তানে তা হলে উর্দুর স্থান কোথায়?

প্রথমতঃ বলে রাখা ভালো যে, বর্তমানে আমাদের দেশে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে তার সঙ্গে আমাদের পরিকল্পনার শিক্ষাপদ্ধতির কোনো তুলনাই হতে পারে না। উপস্থিত দেখতে পাই, ইস্কুলে চার বৎসর এবং কলেজে চার বৎসর একুনে আট বৎসর পড়েও সাধারণ ছাত্র চলনসই আরবী বা সংস্কৃত শিখতে পারে না। কাজেই যখন বলি উর্দু অপ্‌শনাল ভাষা হিসেবে ম্যাট্রিকের শেষের চার শ্রেণীতে পড়ানো হবে তখন উর্দুওয়ালারা যেন না ভাবেন যে ছাত্রদের উর্দুজ্ঞান আমাদের গ্রাডুয়েটদের ফার্সী জ্ঞানেরই মত হবে। কলেজেও উর্দুর জন্য ব্যাপক বন্দোবস্ত থাকবে। একথা ভুললে চলবে না যে পাকিস্তানের কলেজে 'ভারতীয় মুসলিম সংস্কৃতি' নামক এক বিশেষ বিষয়বস্তু পড়ানো হবে। মোগল স্থপতি,

চিত্রকলা, সঙ্গীত যে রকম সকলেরই গর্বের বিষয় (কোনো ইংরেজ বা মার্কিন যখন তাজমহলের প্রশংসা করে তখন কোনো হিন্দু তো তাজমহল মুসলমানের সৃষ্টি বলে নিজকে সে দায় থেকে মুক্ত করেন না, রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়া সম্বন্ধে কথা উঠলে কোন বাঙালী মুসলমানকে 'রবীন্দ্রনাথ হিন্দু' বলে নতশির হতে তো দেখি নি ; অবনীন্দ্রনাথ মোগল শৈলীতে ছবি আঁকেন, তাঁর শিষ্য নন্দলাল অজন্তা শৈলীতে, তাই বলে একথা কারো মুখে শুনি নি যে নন্দলাল গুরুর চেয়ে বড় চিত্রকার) ঠিক তেমনি উর্দু ভাষা এবং সাহিত্য হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই শ্লাঘার সম্পদ। যে সব ছাত্র ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব অথবা আরবী ফারসী সাহিত্য অধ্যয়ন করবে তাদের বাধ্য হয়ে উর্দুর প্রতি মনযোগ দিতে হবে। বেশীর ভাগ রাজনৈতিক এবং কেন্দ্রীয় পরিষদে জানেওয়ালা সদস্য এই সব বিষয়ের সঙ্গে ছাত্রজীবনে সংযুক্ত থাকবেন বলে উর্দুর সঙ্গে তাদের যথেষ্ট পরিচয় হবে। যাঁরা ভাষা ব্যাপারে অসাধারণ মেধাবী তাঁরা হয়ত করাচীতে উর্দু ভাষায় বক্তৃতা দেবেন কিন্তু অধিকাংশ সদস্যকে কেন বাংলাতেই বক্তৃতা দিতে হবে এবং সে জন্য যে 'অসুবিধা' হবে সেটা কি করে সরাতে হবে তার আলোচনা প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই সবিস্তর করেছি।

কেন্দ্রের চাকরি সম্বন্ধে বক্তব্য, যেদিন পূর্ব-পশ্চিম উভয় পাকিস্তান থেকে ইংরিজি অন্তর্ধান করবে সেদিন পাঞ্জাবী মুসলমান পূর্ব-পাকিস্তানে যে প্রকার চাকরি করবে, পূর্ব-পাকিস্তানের লোক ঠিক সেই প্রকারেই কেন্দ্রে চাকরি করবে। এবং একথা তো কেউ অস্বীকার করবেন না যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বদৌলতে আমরা আরবী ফারসীর ভেতর দিয়ে উর্দুর সঙ্গে যুক্ত আছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরভেতর দিয়েও থাকব কিন্তু পাঞ্জাবী সিন্ধীর সে রকম বাঙলার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কোনো ঐতিহ্য নেই। কাজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরা হারব কেন ? কিন্তু এ বিষয়ে অতিরিক্ত বাক্য ব্যয় করার প্রয়োজন নেই। উর্দুওলারাই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, সকল অবস্থাতেই বাঙালীর জন্য করাচীতে ওয়টেজ থাকবে। অর্থাৎ স্বয়ং উর্দু-ওলারাই মেনে নিচ্ছেন যে আমরা প্রাণপণ উর্দু শিখলেও পশ্চিম পাকিস্তানী উর্দুভাষাভাষীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারব না। তাঁদের এই মেনে নেওয়াটা খুব সম্ভব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসূত। আমরাও বলি, আমাদের আলিম-ফাজিলগণ যখন উর্দুতে যুক্তপ্রদেশের মৌলবী-গণকে পরাজিত করতে পারেন নি, তখন আমাদের মত 'তিফ্‌লে মকতব্‌', 'কমসীনদের' দিয়ে কোন্ জঙ্গ-ই-জবান্ জয় সম্ভবপর ?

এ সম্পর্কে আরেকটি কথা বলে রাখা ভালো। পরাধীন এবং অনুন্নত দেশেই চাকরি নিয়ে মাথা-ফাটাফাটি খুন-রেজী। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকলা, কৃষি-খনিজ, দুগ্ধ-ঘৃত উৎপাদন করে যে-দেশ সমৃদ্ধশালী সে-দেশে চাকরি করে অল্প লোক, তাদের সম্মানও অনেক কম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অঙ্গুলি নির্দেশ করি চাটগাঁয়ের দিকে। পাকিস্তান হয়েছে মাত্র এক বছর—এর মাঝেই শুনতে পাই চাটগাঁয়ের কোনো কোনো বড় সরকারী কর্মচারী নোকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। দেশ সমৃদ্ধশালী হলে কটা লোক বিদেশ যায়, তাও আবার চাকরির সন্ধানেই? দেশের ভেতরেই দেখতে পাই, যে বৎসর খেত-খামার ভালো হয় সে বৎসরে শহরে বাসার চাকরের জন্য হাহাকার পড়ে যায়।

মুসলিম ঐতিহ্যও চাকরির প্রশংসা করে নি, প্রশংসা করেছে ব্যবসা-বাণিজ্যের। ইসলাম দেশদেশান্তরে বিস্তৃতিলাভ করেছে ধর্মপ্রচারকদের কর্মতৎপরতায় এবং সদাগরদের ধর্মানুরাগে। এখনো মধ্য আফ্রিকায় ক্রীশ্চান মিশনরিদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে হাতীর দাঁতের ব্যবসায়ী মুসলমান সদাগরেরা। ক্রীশ্চান মিশনরিরা সবাই মাইনে পায়, তারা চাকুরে। তাদের দুঃখের অন্ত নেই যে তারা সদাগরদের সঙ্গে পেরে উঠছে না।

পূর্ব-পাকিস্তানের আদর্শ কি সে সম্বন্ধে বিচার করার সময় উর্দুওলারা একটা ভয়ঙ্কর জুজুর ভয় দেখান। তাঁরা বলেন, পূর্ব-পাকিস্তান যদি উর্দু গ্রহণ না করে তবে সে পশ্চিম-পাকিস্তান তথা কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং তারি সুযোগে ভারতীয় ডোমিনিয়ন পূর্ব-পাকিস্তানটিকে বিনা নুন-লঙ্কায় কপাৎ করে গিলে ফেলবে।

ভারতীয় ইউনিয়নে এবং পাকিস্তানে লড়াই হবে কিনা, হলে কবে হবে এ আলোচনায় এত 'যদি' এবং 'কিন্তু' আছে যে সে আলোচনা যুক্তি-তর্কের বিষয়বস্তু না হয়ে ফলিত জ্যোতিষের ভবিষ্যবাণীর জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা ফলিত জ্যোতিষ জানিনে, উপস্থিত আমরা ধরে নিচ্ছি যে লড়াইটা লাগবে, কারণ সেটা ধরে না নিলে জুজুর ভয় ভাঙানো যাবে না। অন্ধকার ঘরে বাচ্চা ছেলেকে 'ভূত নেই' বললে তার ভয় যায় না, বরঞ্চ ভূত মেনে নিলেও আপত্তি নেই, যদি সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বালানো হয়। তাই আলোর সন্ধানই করা যাক।

কে মিত্র, কে শত্রু সে কি ভাষার উপরই নির্ভর করে? আমেরিকা, ফ্রান্স, রুশ, লড়ল জর্মন, ইতালির বিরুদ্ধে। আমেরিকা ফ্রান্স এবং রুশ তাই বলে কি একই ভাষায় কথাবার্তা কয়, না জর্মনি ইতালির ভাষাই বা এক? আজ বলছি

রুশের বিরুদ্ধে ধনতান্ত্রিক ফ্রান্সের একমাত্র ভরসা মার্কিন সাহায্য। আজ যদি উর্দুওয়ালাদের কায়দায় ফ্রান্সকে বলা হয়, 'তোমরা যদি ইংরেজি গ্রহণ না করো তবে তোমরা আমেরিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এবং রুশ ফ্রান্সটিকে বিনা মাস্টার্ডে কপাৎ করে গিলে ফেলবে, তাহলে কি ফ্রান্সের লোক মাতৃভাষা বর্জন করে মাথায় গামছা বেঁধে ইংরেজি শিখতে লেগে যাবে?

পক্ষান্তরে এক ভাষা হলেই তো হৃদ্যতা চরমে পৌঁছয় না। আমেরিকা যখন ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াই লড়েছিল তখনো সে ইংরেজি বলত। আইরিশমেনের মাতৃভাষা ইংরেজি, তাই বলে সে কি ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ে নি? পশতুভাষী মুসলিম পাঠানের একদল লড়ল সুভাষচন্দ্রের ঝাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে জাপানের হয়ে, আরেকদল লড়ল ইংরেজের ঝাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে তাদের হয়ে।

তার চেয়েও ভালো উদাহরণ আছে আরব দেশে। আরবের লোক কথা বলে আরবী ভাষায়, তারা সকলেই এক এক গোষ্ঠীর লোক (একবর্ণ), তারা সকলেই মুসলিম অথচ আজ সে দেশ (১) ইরাক, (২) সিরিয়া, (৪) লেবানন, (৪) ফলস্তীন, (৫) ট্রান্স-জর্ডন, (৬) সউদী-আরব, (৭) য়েমেনে খণ্ডিত বিখণ্ডিত (এগুলো ছাড়া আরবী-ভাষাভাষী মিশর, টুনিস, আলজেরিয়া, মরক্কোও রয়েছে)।

এই সাত রাষ্ট্রের মধ্যে মন-কষাকষির অন্ত নেই। ইবনে সউদ এবং মক্কার শরীফের মধ্যে যে লড়াই হয়েছিল সে তো আমাদের সকলেরই স্পষ্ট মনে আছে। তার জের এখনো চলছে আমীর আব্দুল্লা এবং ইবনে সউদের শত্রুতার মধ্যে। আজ যে ফলস্তীন অসহায় হয়ে ইহুদির হাতে মার খাচ্ছে তার প্রধান কারণ এই যে ইবনে সউদ আর আব্দুল্লার মধ্যে ঠিক ঠিক মনের মিল হচ্ছে না। আরব লীগের সর্বপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে—অথচ সকলেই জানেন যে উপর্যুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সমঝাওতা হয়ে গেলে দশ দিনের ভেতর ইহুদিদের রাজ্যলিপ্সা 'ফি নারি জাহান্নামে' পাঠানো সম্ভবপর হবে।

পক্ষান্তরে সুইজারল্যাণ্ডে তিনটি (চতুর্থটির লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম) ভাষা, বেলজিয়ামে দুইটি, চেকোশ্লোভাকিয়ায় দুইটি, যুগোশ্লোভাকিয়ায় গোটা চারেক, কানাডায় দুইটি ইত্যাদি ইত্যাদি। সুইজারল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত বিশেষ করে দ্রষ্টব্য। সে দেশের প্রধান দুই অংশ জর্মন এবং ফরাসি বলে। বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও একে অন্যের ভাষা সাধারণতঃ রপ্ত করতে পারে না (ভাষা শেখা বাবতে সুইস্‌রা বড়ই কাহিল), অথচ ফ্রান্স এবং জর্মনিতে যখন লড়াই লাগে তখন ফ্রেঞ্চ সুইস্‌রা একথা

কখনো বলে নি যে তারা ফ্রান্সের হয়ে লড়বে, জর্মন সুইস্‌রাও অনুরূপ ভয় দেখায় নি। গত যুদ্ধে দুজনে মিলে নিরপেক্ষ ছিল এবং হিটলার জানতেন যে সুইস্‌-জর্মন যদিও তাঁর জাতভাই, তবু তাদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না।

তাই বলি unity (ঐক্য) uniformity (সমতা) এক জিনিস নয়। সমতা হলেই ঐক্য হয় না। আর যারা সমতা চায় তাদের জেদ-বয়নাক্কার অন্ত নেই। আজ তারা বলবে ভাষায় সমতা চাই, পূর্ব-পাকিস্তান উর্দু নাও; কাল বলবে পোশাকের সমতা চাই, শেলওয়ার কুর্তা পাগড়ী পরো; পরশু বলবে খাদ্যের সমতা চাই, মাছ ভাত ছেড়ে গোস্ত রুটি ধরো, তার পরদিন বলবে নৌকা বদ্‌খদ্‌ জিনিস, তার বদলে গোরুর গাড়ী চালাও। তারপর যদি একদিন পূর্ব-পাকিস্তানী পাঞ্জাবীদের বলে, দৈর্ঘ্যের সমতা হলে আরো ভালো হয়, লড়াইয়ের জন্য য়ুনিফর্ম বানাতে তাহলে সুবিধে হবে, কিন্তু তোমরা বড্ড উঁচু, তোমাদের পায়ের অথবা মাথার দিকের ইঞ্চি তিনেক কেটে ফেলো, তাহলেই হয়েছে!

ঐক্য বা য়ুনিটি অন্য জিনিস। প্রত্যেকে আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে যখন সংঘবদ্ধ হয়ে মানুষ একই স্বার্থ, একই আদর্শের দিকে ধাবমান হয় তখনই তাকে বলে ঐক্য। তুলনা দিতে গিয়ে গুণীরা বলেছেন, বীণার প্রত্যেক তারের আপন আপন ধ্বনি আছে—সব তার যখন আপন আপন বিশিষ্ট ধ্বনি সপ্রকাশ করে, একই সুরের ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তখনই সৃষ্ট হয় উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত। সব কটা তারই যদি এক ধরনে বাঁধা হয় তবে বীণায় আর একতারায় কোনো তফাৎ থাকে না। সে যন্ত্র বিদগ্ধ সঙ্গীত প্রকাশ করতে অক্ষম।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে আপন আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে, কী প্রকারে এক আদর্শের রাখী বেঁধে সম্মিলিত করা যায় তার সাধনা করবেন রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ। উপস্থিত শুধু আমরা এইটুকু বলতে পারি, পূর্ব-পাকিস্তানের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি তার ঘাড়ে উর্দু চাপানো হয় তবে স্বভাবতই উর্দু-ভাষাভাষী বহু নিষ্কর্মা শুধু ভাষার জোরে পূর্ব-পাকিস্তানকে শোষণ করার চেষ্টা করবে—এ জিনিস অত্যন্ত স্বাভাবিক, তার জন্য উর্দু-ভাষাভাষীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই—এবং ফলে জনসাধারণ একদিন বিদ্রোহ করে পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। বর্ণের কৌলীন্য যেমন শোষণের কারণ হতে পারে, ভাষার কৌলীন্যও ঠিক সেই রকম শোষণপন্থা প্রশস্ততর করে দেয়।

তারি একটি মর্মন্তুদ দৃষ্টান্ত নিন: তুর্কী একদা তাবৎ আরবখণ্ডের উপর রাজত্ব

করত। তুর্কী সুলতান সর্ব আরবের খলিফাও ছিলেন বটে। তৎসত্ত্বেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সমস্ত আরব ভূখণ্ড খলিফার জিহাদ ফরমান উপেক্ষা করে নসারা ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তুর্কীকে পর্যুদস্ত করল। আমাদের কাছে এ কত বড় বিস্ময়ের কথা,—খলিফার জিহাদ হুকুমের বিরুদ্ধে লড়া মানে তো কাফির হয়ে যাওয়া। যে আরবদের ভেতর দিয়ে ইসলাম প্রথম সপ্রকাশ হলেন তারা ধর্মবুদ্ধি হারালো ?

তাই আমাদের সবিনয় নিবেদন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান যেন কোনো মহত্তর আদর্শের অনুপ্রেরণায় ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়। পূর্বেই নিবেদন করেছি, গুণীরা সে আদর্শের সন্ধান করবেন। আমার জ্ঞান-অভিজ্ঞতা অত্যল্প কিন্তু নানা দেশের গুণীদের মুখে শুনেছি, নানা সৎ গ্রন্থে পড়েছি, দীন ইসলাম বলেন, সে আদর্শ হবে রাষ্ট্রের দীনদুঃখীর সেবা করা। উভয় পাকিস্তান যদি এই আদর্শ সামনে ধরে যে তাদের রাষ্ট্রভিত্তি নির্মিত হবে চাষামজুরকে অন্ন দিয়ে, দুঃস্থকে সেবা করে, অজ্ঞকে জ্ঞানদান করে, এক কথায় 'সাইল'কে (অভাবে আতুরকে) 'গণী' (অভাবমুক্ত) করে, তাহলে আর ভয় নেই, ভাবনা নেই। উভয় প্রান্তে গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে তারা যে ঐক্যসূত্রে সম্মিলিত হবে সে সূত্র ভিন্ন হওয়ার ভয় নেই।

সেই মহান আদর্শের দিকে উদ্দীপ্ত উদ্বুদ্ধ করতে পারে সতেজ সবল সাহিত্য। সে জাতীয় সাহিত্য মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষাতে কেউ কখনো নির্মাণ করতে পারে নি। জনগণের মাতৃভাষা উপেক্ষা করে গণরাষ্ট্র কখনই নির্মিত হতে পারে না।

উপসংহারে বক্তব্য : যুদ্ধ কাম্য বস্তু নয়। অন্যের বিনাশ বাসনা সর্বথা বর্জনীয়। পাকিস্তান বিনষ্ট হলে ভারতীয় ইউনিয়নের লাভ নেই, ভারতীয় ইউনিয়ন বিনষ্ট হলে পাকিস্তানের লাভ নেই। উভয় রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে বিত্তমান হোক, এই আমাদের প্রধান কাম্য। ইয়োরোপের তাণ্ডবলীলা থেকে আমরা কি কোনো শিক্ষা গ্রহণ করব না ?

শিক্ষাগ্রহণ করি আর নাই করি, কিন্তু আক্রান্ত হওয়ার ভয় অহরহ বুকে পুষে সেই দৃষ্টিবিন্দু থেকে সর্ব সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করা মারাত্মক ভুল। বাড়ীতে আগুন লাগার ভয়ে অষ্টপ্রহর চালে জল ঢালা বুদ্ধিমানের কর্ম নয়।

আজ যদি আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় মাতৃভাষা বর্জন করি তবে কাল প্রাণ যাওয়ার ভয়ে মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হব।

অপ্রকাশিত রচনা

রচনাবলীর এই অংশে সৈয়দ মুজতবা আলীর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা সংকলিত হল। এর মধ্যে আছে ছোটদের লেখা, কবিতা, রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ ও কিছু রাজনৈতিক প্রবন্ধ। যতদূর মনে হয় এগুলি কোন গ্রন্থে এ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হয় নি। এই অংশের কবিতাগুলি শ্রীসুব্রত রুদ্রের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

প্রবাসীর চিঠি

শ্রীমান্ খসরু বাবাজীউ,

"সুবুদ্ধি গোয়ালার কুবুদ্ধি হইল,
ভাঁড়েতে রাখিয়া দুধ পীরকে ফাঁকি দিল
মানিক পীর ভবনদী পার হইবার লা—"
আমার হ'ল তাই ;—
ছিলাম সুখে সিলেট জেলায় ঢুকল মাথায় পোকা
কাণ্ড দেখে বুঝল সবাই লোকটা গবেট বোকা।
বহুত দেশ তো দেখা হ'ল খেলাম মেলাই ঘোল
চোখের জলে ভাসি এখন, খুঁজি মায়ের কোল।
চক্ষু বুজে বসে যখন ভাবি বরদায়
—দেহখানা বদ্ধ ঘরে—দেশপানে মন ধায়
মেলাই ছবি আঁকি, মনের পটে বুলাই তুলি
দুঃখ কষ্ট এই ফিকিরে অনেক কিছুই ভুলি॥
মনে হ'ল আমি যেন পেরিয়ে বছর কুড়ি
ফিরে গেছি সিলেট আবার চড়ি খেয়াল-ঘুড়ী।
বড়দিনের ছুটির সময় নাইব নদীর জলে
বালুর চড়ায় বসে আছি, গামছা নিয়ে গলে।
লাল্লুমিয়ার দোকান থেকে খানিকটা নুন নিয়ে
ডান হাতে কুল, বাঁ হাতে নুন তাই মিলিয়ে দিয়ে
মঞ্চসুধার সৃষ্টি যেন। নাই কিছুরই তাড়া
পরীক্ষা বা অন্য বালাই সামনেও নেই খাড়া।
অলস চোখে দেখছি চেয়ে এপার ওপার যাওয়া
খেয়া নায়ের চিরন্তনী ঢিমে তেতাল বাওয়া।
মহাজনী নৌকা চলে গদাই লশ্‌করি
কমলানেবু বোঝাই করা ; লোভ করে ফস্ করি
গণ্ডা দুয়েক সরিয়ে নেব, কিন্তু চাচা, শোনো

চেষ্টা কভু কোরোনাকো লাভ তাতে নেই কোনো।
ব্যাটারা সব লক্ষ্মীছাড়া খায় না কেন গুলি,
কোনো বাঙাল নেইকো বসে চোখে দিয়ে ঠুলি।
যতই কেন বাড়াও না হাত মহা সন্তর্পণে
ব্যাটারা সব চালাক অতি বৈঠার ঘা অর্পণে।
থাক্ সে কথা, গামছা কাঁধে নাওয়ার বেলা যায়
আবার বলি বন্ধ ঘরে দেশ পানে মন ধায়।
খসরু-পূর্ব[১] বছর সাতেক, বসন্ত কি শীতে,
তোমার মাইজ্‌লা ফুফুর[২] বিয়া হৈল চৌকিতে।
চৌকি আছে নবীগঞ্জের গায়ের সঙ্গে মিশে
সেখান থেকে কই পাঠালেন তোমার মেজ পিসে।
বাপ রে সে কি বিরাট বপু উদর আগুময়
মুখে দিলে মাখন যেন—জঠর ঠাণ্ডা হয়।
তোমার মা তো সেই দেশেরই যেথায় শুনি লোক
মাছ না পেলে ব্যাঙ-ভাজাতে ভোলে মাছের শোক।
শুধালে কি পাবে খবর তুমি তাঁহার কাছে
নউজ বিল্লা[৩]; সত্যি খবর তোমার বাবার আছে।
তামাম জাহান খোদার কাছে সব কিছু নেয় মাগি,
আমার পেটের আঁকুপাঁকু কই মাছেরই লাগি॥
আরো একটা জিনিস খসরু সত্যি তোমায় ব'লি।
যার লাগিয়া তৈরী আমি জানটা দিতে ব'লি।
—ভাবনা শুধু জান্‌টা খাব কেমন করে
পেট আর জান্ তো একই দেহে, আছে একই ঘরে—
তোমার মায়ের দেশের জিনিস বড়ই চমৎকার
অর্ধ জগৎ ঘুরে আমি পাইনি জুড়ি তার—
চোঙ্গা-পিঠা,[৪] আহা চাচা বোলব তোমায় কী?
যখন ভাবি ইচ্ছা হয় যে 'রেজিগ্‌নেশন' দি।
ধ'রে সোজা পয়লা গাড়ী 'দেওর আইলে'[৫] দি ছুট
চাক্‌রি-বাঁধন রাজার শাসন সব কিছু ঝুট্‌মুট।
নামটা সত্যি হলে পরে খাতির পাব মেলা

খানা-পিনা ধুম-ধামেতে কাটবে সারা বেলা।
চোঙ্গা-পিঠার সঙ্গে মলাই দেবে তোয়াজ করে
নয়ত দেবে হরিণ-শিকার হয়ত আছে ঘরে।
করিমগঞ্জের হরিণ সে যে বড়ই খান্‌দানি
খোরাক তাদের আমলকি ফল, ঝরণা-মিঠা পানি।
মহীমিয়ার বাবা ছিলেন বাঘা শিকারী
নুন আর মরিচ সঙ্গে নিয়ে—হাতীর দোয়ারী—
পাহাড় ঘেঁষে চলে যেতেন গভীর বনের পাশ
হরিণ শিকার খেতেন স্রেফ্ ঝাড়া তিনটি মাস।
সঙ্গীবিহীন অন্ধ ঘরে আসন্ন সন্ধ্যায়
সুর্মা নদীর দেশের পানে উদাসী মন ধায়॥
চটছো হয়ত মনে মনে ভাবছ একি হ'ল
চাচার যে সব কাব্যি ছিল সব কিছু আজ ম'ল।
খাবার কথা কয় যে খালি আর কিছু নেই
তাও আছে; তোমার পাতে সন্তর্পণে দেই।
সিলেটের উত্তরেতে সোজা গিয়ে চলে
চৈত্র মাসে, মিঠা রোদে, উজায়ে সুরমা,
গেয়ে সারি, গান—
ধরিয়া পালের দড়ি করিবারে বারুণী'র স্নান
মেলা দৃশ্য দেখিয়াছি।
স্তূপীকৃত ধান মণ মণ
দুই পারে
তার পরে
কী রুপালি ঝিলিমিলি সোনালী ধানের
যেন যে হীরার মালা হাজার হাজার
—কাতার কাতার
হেমাঙ্গীর স্বর্ণবক্ষে।
দীর্ঘ শর্বরীর
শিশিরে করিয়া স্নান এলায়েছে দেহ
আতপ্ত কিশোর রৌদ্রে॥

অগভীর স্বচ্ছ জল
বালুর বুলায় দেহ।
সে জলে ডুবায়ে গা
দেখিয়াছি
তালহীন শব্দহীন মাছের নাচন,
জলের নিচেতে।
উপরেতে নাচে রবিকর
হীরার নূপুর পরে।
হঠাৎ
কেন না জানি—
তলা থেকে উর্ধ্বশ্বাসে ওঠে ছোট মাছ
কটিখানি কাঁপাইয়া নটরাজ দোলে
জলের উপরে মারে ঘা—
যেন কোন্ খেয়ালী বাদশা
টাকা নিয়ে খেলে ছিনিমিনি।
কখনো বা দেখিয়াছি
দ'য়ে মজে গিয়ে
একপ'ল ছোট মাছ চক্রাকার ঘুরপাক খেয়ে
—গরবা নাচের ছাঁদে—
ইচ্ছা অনিচ্ছায়
অলখ মাদলে মেতে অজানা সে কিসের নেশায়
ক্রমে ক্রমে উঠে উপরেতে ;—
মাছরাঙা স্ট্রুকা ডাইভার
পার্ফেক্ট টাইমিঙ
পড়িল বিদ্যুৎ বেগে হ'ল বজ্রাঘাত।
হুড়মুড় করে
এ ওর ঘাড়েতে পড়ে
মুহূর্তেই হ'ল অন্তর্ধান।
হয়ত বলিতে তুমি
তাতেই বা কী ?

এসবের বর্ণনার কি বা আছে বাকি ?
হক্ কথা
তবু যতবার
বসিয়া বিদেশে
চোখ বুজে মনে করি যেন আমি সুর্মা উজিয়ে
বরদার অবিচার অত্যাচার ঝেড়ে ফেলে দিয়ে
চলিয়াছি
তখনই
বড় ব্যথা বাজে প্রাণে,
মনে হয় জানি ঠিক জানি আমার দেশের
স্নিগ্ধ শান্ত শ্যামল বনানী
পশ্চাতে তাহার নীলগিরি যবনিকা
তাহার উপরে লিখা
শুভ্রতার শিখা
রূপার ঝরনা
নীলের উপরে সে যে কি বিচিত্র মিনা।
পদমূলে
প্রস্তরে উপলে
কলকল উচ্চহাস্য
হাসিছে খাসিয়া নারী পাঁচশো সাতশো।
মধুরের ধ্যানে আমি বার বার ডুবে
যে রাগিনী দেখিয়াছি চতুর্দিকে যার স্বপ্রকাশ—
কাব্যে ছন্দে রূপ তার মূর্তি আর হ'ল না বিকাশ।
এ কি বিধাতার লীলা ?
রূপে গন্ধে রসে শ্বাসে পরিপূর্ণ এ রমণী হ'ল মূক শিলা
তাই কি শিলেট ?
কাব্যে তার মাথা হেঁট !
কিন্তু চাচা মাফ করো, আজ কাজ আছে মোর মেলা
কাব্য-সাগর যেদিক পানে যায়নি জীবন-ভেলা—
চড়ায় লেগে আটকে আছে জোয়ার নাহি আসে

পূব হাওয়াও দেয়নি ঠেলা নৌকা নাহি ভাসে।
আগাগোড়া ভুলে ভরা জগা-খিচুড়ি
বয়স হ'ল হিসেব করে দেখি যে দুই কুড়ি।
চহল্ সালে উম্‌রে আজীজম্ গুজশৎ[৬]
কালাপানির গারদ মাঝে ভালে হানি দণ্ড।[৭]
তাই বলি
সুবুদ্ধি গোয়ালার কুবুদ্ধি হইল
ভাঁড়েতে রাখিয়া দুধ পীরকে ফাঁকি দিল
মানিক পীর ভবনদী পার হইবার লা।
সেই পীরেরে স্মরণ করে তোমার ছোট চাচা॥

মৌচাক, কার্তিক ১৩৬০

---

১. খসরু-পূর্ব—খৃষ্টপূর্বের তুলনায়, অর্থাৎ খসরুর জন্মের বছর সাতেক পূর্বে।

২. মেজো পিসী।

৩. তওবা, তওবা।

৪. বাঁশের চোঙার ভিতর চাল ভরে সেই চোঙা আগুনে ঝল্‌সে তৈরী এক রকম পিঠে।

৫. 'দেওর আইল' অর্থাৎ 'দেবর এল', খসরুর মামার গ্রামের নাম।

৬. ইরানি কবি সাদীর বিখ্যাত ছত্র। 'আমার জীবনের প্রিয় চল্লিশ বৎসর গেল, কিন্তু এখনো ছেলেমানুষী গেল না।' খসরু তখন ফার্সী শিখছিল বলে ছত্রটি তোলা হয়েছে।

৭. হাত।

ক্রিকেট

হুজুগে মেতে ক্রিকেট খেলা দেখিতে যদি চাও
মাথাটি মোর খাও—
গাড়োল-পানা প্রশ্ন মেলা ঝেড়ো না খালি খালি
খেলাটা যদি না বোঝো তবে দিয়ো না হাততালি
এলোপাতাড়ি বেগার-মোকা ক্যাবলা হাবার মত।
রয়েছে শত শত।
কায়দা-কেতায় ওকীব-হাল খেলার সমঝদার
শুধিয়ো নাকো' ওদের মিছে প্রশ্ন বেশুমার।
শুধাও যদি মানা না শুনে, কি হবে ফল, বলি,
ট্যারচা-মুখো জবাব দিয়ে থামাবে চলাচলি।
যেমন ধরো, জানো না কিছু, শুধালে ভয়ে ভয়ে
যে গুণী পাশে আছে বসে—"দিন তো মোরে কয়ে,
কাঠের ঐ ডাণ্ডাগুলো, কি নাম হয় তার ?"
পাশের যিনি হইবে মনে রাগত হন যেন
ঘ্যানরঘ্যান লাগিবে ভালো কেন !
বলেন তিনি মিনিট তিন থাকিয়া নিশ্চুপ
"উকেট কয়"। গলাতে যেন রয়েছে বিদ্রূপ।
হকচকিয়ে দিলে তো তুমি অনেক ধন্যবাদ ;
খানিক পরে তবুও মনে হইল তব সাধ
এলেম নব হাসিল লাগি। কিন্তু তাতে ভয়
তেড়ে না যান এবার তিনি—গুণী তো নিশ্চয়—
থাকিয়া চুপ, ভাবিয়া খুব, গলাটি সাফ করে
চুলকে ঘাড় শুধালে মৃদু স্বরে
"উকেট কয় ? বেশক্ কথা ; লেকিন্ কন্ স্যার
ওসবগুলো হোথায় কেন কি হয় উপকার ?"

কটমটিয়ে এবার গুণী তাকান তব পানে
বাসনা যেন প্রাণটি তব হানেন আঁখি-বাণে—
হুঙ্কারিয়া হাঁকেন শেষে, "ওগুলো কার তরে ?—
খেলাড়ি সব বসবে বসে ক্লান্ত হলে পরে।"

মৌচাক, বৈশাখ ১৩৬৭

বছর দুই পূর্বে আমি যখন ঢাকাতে আমার ছোট বোনের বাড়িতে গিয়ে উঠলুম, তখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। আমার ভগ্নী আস্‌মা ঘড়িঘড়ি রেডিয়ো খুলে লেটেস্ট স্কোর শুনে নিচ্ছিল। আমি দু' একটি প্রশ্ন শুধিয়েই বুঝে গেলুম আস্‌মা ক্রিকেটতত্ত্বে একদম অগা, অর্থাৎ আমার চেয়েও কম ক্রিকেট খেলা বোঝে। এ কবিতাটি তারই উদ্দেশে ; এবং যেহেতু 'কবিতাটি' ঢাকায় রচিত তাই ঢাকাই বিদেশী শব্দ একটু বেশী রয়েছে।

প্রদীপের তলাটাই অন্ধকার কেন ?

পিলসুজ 'পরে হেরো জ্বলে দীপশিখা,
চতুর্দিকে যে আঁধার ছিল পূর্বে লিখা
মুহূর্তেই মুছে ফেলে।
কিন্তু অতি অবহেলে
'মাভৈঃ' বলিয়া তারে ছেড়ে দেয় স্থান
যে আঁধার পায়ে ধরে মাগে পরিত্রাণ।

সন্দেশ, বৈশাখ ১৩৬৯

যথা—বেগার-মোকা/বেমক্কা, খামকা, যত্রতত্র।
ওকীবহাল/বিশেষজ্ঞ, Specialist
বেশুমার/অসংখ্য
বে/Without
শুমার/Number, আদমশুমারী তুলনীয়
এলেম হাসিল/নবজ্ঞান লাভ
বেশক/দ্বিধাহীন, অসংশয়
লেকিন্/কিন্তু

উচ্ছে ভাজা সন্দেশ

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন যে, ইস্কুলের, এমন কি কলেজের গোড়ার দিকেও ছেলেমেয়েদের শেকসপীয়র পড়ানো উচিত নয়। কারণ শেকসপীয়রের ভাষা প্রাচীন দিনের। সে ভাষার অনেক শব্দ, অনেক ইডিয়ম আজকের দিনের ইংরেজিতে আর ব্যবহার করা হয় না। ছেলেমেয়েরা সেটা না বুঝতে পেরে সেগুলো আপন লেখাতে লাগিয়ে দিয়ে একটা খিচুড়ি ভাষা তৈরী করে বসে। উচিত : প্রথম আধুনিক ইংরেজিটা শিখে নেওয়া এবং তার পর শেকসপীয়র ইত্যাদি ক্লাসিকস্ পড়া। নিজের থেকেই ছেলেমেয়েরা অনুভব করবে কোন্‌টা প্রাচীন দিনের শব্দ, এখন আর চলে না।

আমার মনে হয় বাঙলার বেলায়ও এখন সেই অবস্থা। ধরে নিলুম, তোমার বয়স বারো-চোদ্দো। তুমি যদি বিস্তর বঙ্কিম পড়ো তবে বাঙলা লেখার সময় তুমি এমন ভাষা শিখবে যেটা আজকের দিনে পণ্ডিতী-পণ্ডিতী, গুরুগম্ভীর মনে হবে। তাই আমার মনে হয়, এই বয়সে, রবীন্দ্রনাথের শেষদিকের লেখা বার বার পড়ে সেটা আয়ত্ত করে নেওয়া। আয়ত্ত করার অর্থ এ নয় যে তখন তুমি তাঁর মতো লিখতে পারছো। তা হলে তো আর কোনো ভাবনাই ছিল না। আমরা সবাই গণ্ডায় গণ্ডায় নোবেল পুরস্কার পেয়ে যেতুম। তার অর্থ, তুমি মোটামুটি জেনে গেছ, কি কি শব্দ কোন্ কোন্ ইডিয়ম ব্যবহার করলে কেউ বলতে পারবে না এগুলো প্রাচীন দিনের, এখন আর চলে না। এটা হয়ে যাওয়ার পর পড়বে রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের লেখা। বিশেষ করে তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য'। কিন্তু সেটা খুব সহজ নয়। আমি একটি ছত্র তুলে দিচ্ছি : 'একবার মনে করিয়া দেখিলেই হয় দ্রৌপদীর নাম যদি উর্মিলা হ'ত, তবে সেই পঞ্চবীর-পতিগর্বিতা ক্ষত্রনারীর দীপ্ত তেজ এই তরুণ কোমল নামটির দ্বারা পদে পদে খণ্ডিত হইত।' কঠিন বাঙলা। কিন্তু কী সুন্দর! কী মধুর!!

তারপর বঙ্কিম। বিদ্যাসাগর। কালীপ্রসন্নের মহাভারত। এবং সর্বশেষে 'আলালের ঘরে দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'। তারও পরে যদি নিতান্ত কোনো-কিছু না থাকে, বৃষ্টির দিন, বাড়ির থেকে বেরনো যাচ্ছে না, তবে পড়বে—বড় অনিচ্ছায় বলছি—সৈয়দ মুজতবা আলী। কিন্তু তিন সত্য দিয়ে বলছি, পয়সা খরচ করে না। ধার করে।

এ গল্পটা তো জানো? মার্কিন লেখক মারক টুয়েনের আপন লাইব্রেরিখানা নাকি সত্যিই দেখবার মত ছিল। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত বই, বই, শুধু বই। এমন কি কার্পেটের উপরও গাদা গাদা বই স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকতো—পা ফেলা ভার। এক বন্ধু তাই মারক টুয়েনকে বললেন, 'বইগুলো নষ্ট হচ্ছে; গুটাকয়েক শেল্‌ফ যোগাড় করছো না কেন?'

মারফ টুয়েন খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে ঘাড় চুলকে বললেন, 'ভাই, বলছো ঠিকই—কিন্তু লাইব্রেরিটা যে-কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেল্‌ফ তো আর সে-কায়দায় যোগাড় করতে পারিনে? শেল্‌ফ তো আর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার চাওয়া যায় না।'

উপদেশ দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম। সেটা তেতো। উচ্ছে ভাজা। কিন্তু সন্দেশ দিয়ে শেষ করলুম তো!

ক্লাইন এর্না

ক্লাইন এর্না জরমনির ছোট্ট একটি মেয়ে। আমাদের যে-রকম গোপালভাঁড় দারুণ চালাক, এই মেয়েটি সে-রকম ভীষণ বোকা। তবে, মাঝে মাঝে সে এমন কথা কয় যে তার উত্তর মেলা ভার। যেমন ধরো, এর্নার মা বলছে, "হেই ক্লাইন এর্না! বেড়ালের ন্যাজটা মিছে মিছে টানছিস কেন?" এর্না বললে, "আমি টানছি কোথায়? কি যে বলো মা! বেড়ালটাই তো খালি খালি টানছে। আমি তো সুদ্দু ন্যাজটা ধরে আছি।"

"ক্লাইন" মানে ছোট, ক্ষুদে। কিন্তু কারো কারো নাম বড় হয়ে যাবার পরও "ছোট" থেকে যায়। আমাদের দেশেও তাই। বাড়ির বড় বড় কর্তারা সব ওপারে চলে গিয়েছেন, কিন্তু "ছোট (ক্লাইন) বাবুর" নাম "ছোট বাবুই" রইল।

ক্লাইন এর্নার বেলাও তাই। আর এ-গল্পটা আমার বিশেষ করে ভালো লাগে, কারণ গল্পটা আমাদের দেশেও চালু আছে।...ক্লাইন এর্নার তখন একটুখানি বয়স হয়েছে। ইস্কুলে "বয়-ফ্রেণ্ড" জুটেছে। সে বললে, "চলো ক্লাইন এর্না। নৌকো ভাড়া করে আমরা ঐ হোথাকার চর হেলিগোলাণ্ডে যাই। দু'তিন টাকা লাগবে। সে আমার আছে। কি বলো? লক্ষ্মীটি, না বলো না।"

আমাদের ক্লাইন এর্না সত্যি লক্ষ্মী মেয়ে। "না" বলবে কেন? তদ্দণ্ডেই রাজী হয়ে গেল।

নৌকো ভাড়া করে বন্ধু শুধোলো, "ক্লাইন এর্না, তুমি দাঁড় ধরতে পারো? আমি তা হলে বৈঠে বাই। নইলে—"

ক্লাইন এর্না বাধা দিয়ে বললে, "দাঁড় ধরতে পারবো না কেন? বাবার সঙ্গে কতবার নৌকোয় করে মাছ ধরতে গিয়েছি।"

ঘণ্টাখানেক বৈঠে ঠেলার পর ফ্রেণ্ড বললে, 'ক্লাইন এর্না, এক ঘণ্টা তো হয়ে গেল। এখনো হেলিগোলাণ্ডে পৌছলুম না কেন? ওটা তো দেখাও যাচ্ছে না।"

ক্লাইন এর্না বললে, "অ। তাই বুঝি। আম্মো তো খেয়াল করিনি। নৌকো যে পাড়ের খুঁটিতে এখনো বাঁধা। আমি খেয়ালই করিনি।"

আমাদের দেশেও বলে, "পুরা রাইত নাও বাইয়া দেখি, বাড়ির ঘাটেই আছি।" এর আসল অর্থ: মোদ্দা, সব চেয়ে যেটা প্রয়োজনীয়, সেটা আগে না করলে বাদবাকি পণ্ডশ্রম।

বিদেশী ভাষা—ক্লাইন এর্না

স্বর্গত সুকুমার রায় একদা বলেছিলেন, "কেই বা শোনে কাহার কথা, কই যে দফে দফে—গাছের পর কাঁঠাল দেখে তেল দিয়ো না গোঁফে।" অর্থাৎ মানুষ উপদেশ শুনতে মোটেই ভালোবাসে না। বিশেষ করে যারা ছেলেমানুষ। নিজের কথা যদি তুলি তবে নির্ভয়ে, কিন্তু ঈষৎ লজ্জা সহ বলবো, আমি যখন ছেলেমানুষ ছিলুম তখন কারোরই কোনো উপদেশে কান দিতুম না। একমাত্র মায়ের আদেশ উপদেশ—তা সে-কথা বাদ দাও, এখনো, এই পরিপক্ক বৃদ্ধ বয়সে আমার চোখে জল আসে। হ্যাঁ, কি বলছিলুম? বলছিলুম কি, তাই উপদেশ দিতে আমার বড়ই অনিচ্ছা। কিন্তু আজ কিছুটা দিতেই হচ্ছে। খুলে বলি। পরশু দিন আমার প্রতিবেশী একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলে আমায় শুধোলে, "স্যর, এটা কি সত্য, ইউ অ্যাণ্ডারস্টেণ্ড টুয়েনটি ল্যাঙগুজেস?" আমি সঙ্গে সঙ্গে বললুম, "সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। আই মিসআণ্ডারস্টেণ্ড মোর দেন টুয়েনটি ল্যাঙগুজেস।" এর থেকেই বোঝা যায় যে, এ-পাড়ায় আমার বদনাম আছে, আমি নাকি একাধিক ভাষা জানি। তাই ইংরেজি শেখা সম্বন্ধে দু'একটি কথা এই সুবাদে বলে নিতে চাই। মাস্টারমশাইরা সর্বদাই বলে থাকেন, যে বই পড়বে

তার কোনো শব্দ জানা না থাকলে অভিধান খুলে দেখে নেবে। এটা অবশ্যই টেকস্‌ট্‌ বই সম্বন্ধে খাটে। কিন্তু ভেবে দেখো তো, তুমি যে সব কঠিন বাঙলা শব্দ শিখেছ, তার ক'টি অভিধান দেখে? যে-সব বাঙলা গল্প উপন্যাস ভ্রমণ-কাহিনী পড়েছো তাতে বার বার কঠিন শব্দ এখানে, ওখানে, সেখানে ঘুরে ফিরে এসেছে এবং তারই ফলে শব্দগুলোর সঙ্গে মোটামুটি একটা পরিচয় হয়ে গিয়েছে। ইংরেজির বেলাও এই পদ্ধতি প্রযোজ্য।...এবং এই "রেপিড রীডিং" জিনিসটি আরম্ভ করবে শারলক হোমস, আগাথা ক্রিসটি ইত্যাদির ডিটেকটিভ নভেল দিয়ে। সেগুলো এমনই ইন্‌টরেসটিং যে, হেসেখেলে বইয়ের শেষ পাতায় পৌঁছে যাবে। যতক্ষণ অবধি গল্পটা বুঝতে পারছো, ততক্ষণ অভিধানের কোনো প্রয়োজন নেই। এ-সম্বন্ধে আরো অল্পবিস্তর বলার আছে। উপস্থিত ভাষা নিয়ে আমাদের ক্লাইন এর্নার একটা গল্প মনে এল।...ক্লাইন এর্না বিয়ে করেছে এক ইংরেজকে, কিন্তু হায়, এক বছর যেতে না যেতে তার বর হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। তারপর তার একটি বাচ্চা হল। কিন্তু হায়, হায়, ছ'দিনের দিন বাচ্চাটি মারা গেল। বেচারীর কী কান্না, কী কান্না। তার মা তাকে অনেক প্রবোধবাক্য শোনানোর পর শেষটায় বললে, "আর ছাখ, ক্লাইন এর্না, বাচ্চাটার বাপ তো ইংরেজ। মুখে কথা ফুটতেই সে ইংরেজি বলতো। আমি তো ইংরেজি জানিনে। দিদিমা হয়ে তার এক বর্ণও বুঝতে পারবো না—সেটা কি খুব ভালো হত?"

ক্লাইন এর্না

২

ক্লাইন এর্না গোয়ালঘরের সামনে বসে হোম-টাস্ক লিখছে। এমন সময় তার আদরের গাইটি পাশে এসে দাঁড়িয়ে শুধলো, কি লিখছো, ক্লাইন এর্না?

চুলোয় যাক্‌। মোটর গাড়ি সম্বন্ধে লিখতে বলছে। আমার মাথায় কিছু আসছে না।

গোগম্ভীর কণ্ঠে গাই বললে, আমি বলে যাই, তুমি লেখো। মোটরগাড়ি অবিশ্বাস্য অদ্ভুত জানোয়ার। এদের বিকট বিকট দুটো দারুণ উজ্জ্বল চোখ থাকে। কিন্তু সে-দুটো শুধু রাতের অন্ধকারেই জ্বলে ওঠে।...এরা যখন রাস্তার উপর দিয়ে হুশ হুশ করে যায় তখন সম্পূর্ণ অচেনার মত একে অন্যের দিকে কোনো খেয়াল না করে চলে যায়। কিংবা দুম করে একে অন্যকে মারে মরণ-ধাক্কা। তখন দুজনাই মারা যায়। আশ্চর্য, এদের কোনো মধ্যপন্থা বা তৃতীয় পন্থা নেই।...এরা নিজেদের

খাবার যোগাড় করতে পারে না। মানুষই এদের জল তেল আরো কি যেন খেতে দেয়। আমার আশ্চর্য লাগে, ওরা মুখ দিয়ে ও অন্য দিক দিয়ে, দু দিক দিয়েই খায় কি প্রকার!...লোকে ভাবে, ওরা খুব তীব্রগতিতে চলতে পারে। আদৌ না। ঐ সেদিন আমার এক বান্ধবী রাস্তা দিয়ে আপন গোয়ালে ফিরছিল। পিছন থেকে, অনেকক্ষণ ধরে ওদেরই একজন কোঁক-কোঁক, কোঁক-কোঁক করে চিৎকার করছিল, কিন্তু এগিয়ে যেতে পারছিল না। অবশেষে আমার বান্ধবী যখন বাঁ-দিকে মোড় নিয়ে তার বেডরুমে পৌঁছে গেল তখন বাবু এগোলেন।...ওরা রাস্তায় যা ফেলে যান সেটা ঘুঁটেকুড়োনি ঘৃণার চোখে দেখে।...শেষ প্রশ্ন ওরা কি মোটেই কোনো বন্ধু-বান্ধব চায় না? সেদিন সন্ধ্যাবেলা ওদেরই একজন রাস্তার পাশের কাঁটার বেড়া ভেঙে আমাদেরই মাঠের মধ্যিখানে এসে দাঁড়ালেন। ওর সঙ্গী-সাথী মানুষরা ওকে ফেলে চলে গেল। আমি ভাবলুম, আহা বেচারী, একা একা রাত কাটাবে। একটুখানি সঙ্গ দিই। কোনো সাড়া পেলুম না। তখন দেখি ওর চোখ দুটোও জ্বলছে না। পরদিন সকালবেলা এল তার মা। বিরাট দেহ। দড়ি দিয়ে বেঁধে তাকে নিয়ে চললো শহরপানে। আমি যখন তার মা'র সামনে দাঁড়িয়ে—নমস্কার, আসুন তবে, বললুম, তখন তিনি সুপ্রসন্ন কোঁক-কোঁক বলে উত্তর দিলেন। মা-টি মেয়ের চেয়ে ঢের ঢের ভদ্র।

গুরুদেব

প্রমথ চৌধুরীর মত মনীষী যখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা অনবদ্য ভাষায় লেখেন, তখন তা পড়ে আমরা বুঝতে পারি, রবীন্দ্রনাথের বিপুল ব্যক্তিত্বের গৌরব এবং মহিমা তিনি পরিপূর্ণ ভাবেই উপলব্ধি করেছেন। তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভাবের গভীরতা, চিন্তার ঐশ্বর্য এবং রবীন্দ্র-জীবনের বৈচিত্র্যের সঙ্গে আমরা নিবিড়ভাবে পরিচিত হতে পারি।

আমার লেখাও সফল হত যদি আমি কবি বা স্রষ্টা হতুম। কবির দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনাই হোক, আর তাঁর কাব্যালোচনাই হোক কিঞ্চিৎ সৃজনী-শক্তি না থাকলে সে-রচনা কবির বিরাট ব্যক্তিত্বের পটভূমিতে প্রক্ষিপ্ত হয়ে শুধু বৈচিত্র্য-হীনতার পরিচয়ই দেয়। তাই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু লিখতে আমার বড় সঙ্কোচ বোধ হয়। ভয় হয়, যত ভেবেচিন্তেই লিখি না কেন বিদগ্ধজনেরা পড়ে বলবেন,

দীর্ঘ পাঁচ বৎসর রবীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষালাভ করেও এই ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিত্বের যথার্থ পরিচয় পেল না। এই অভিমত যে নিদারুণ সত্য তা আমি জানি ; তাই স্থির করেছিলুম যে, কয়েক বৎসর রবীন্দ্রনাথকে যে তাঁর প্রাত্যহিক জীবনে সহজ, সরলভাবে পেয়েছিলুম, সে-কথা একেবারে অপ্রকাশিতই রাখব।

কিন্তু মুশকিল হ'ল এই যে,—কবি-প্রণামের রচনা-সংগ্রাহকগণ ও আমার নিজের দেশ 'শ্রীহট্টে'র অনেকেই জানেন যে, আমি শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভ করেছি। এই সঞ্চয়িতার মধুকর যে আমার লেখা চেয়ে আমাকে পরম সম্মানিত করেছেন, তার একমাত্র কারণ তিনি জানেন যে, আমি রবীন্দ্রনাথের শিষ্য ; তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। কিন্তু আমার দেশবাসী প্রিয়জনকে কি করে বোঝাই যে, রবীন্দ্রনাথের ঘরের দেয়াল, আসবাব তাঁকে আমার চেয়ে ঢের বেশী দেখেছে। আপনারা বলবেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তোমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা বাদ দাও, তাঁর কাব্য আলোচনা কর। উত্তরে আমি বিনীতভাবে বলতে চাই—সে তো সহজ কর্ম নয়।...তবে আর কিছু না হোক্, এ আমি নিশ্চয় করে জানি যে, আমার মনোজগৎ রবীন্দ্রনাথের গড়া। প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বলুন, দর্শন, কাব্য, ধর্মের ভিতর দিয়ে বহুর মধ্যে একের সন্ধান বলুন ; কালিদাস, শেলি, কীট্‌সের কাব্যের ভিতর দিয়ে বিশ্ব-সাহিত্যের রসাস্বাদই বলুন—আমার মনোময় জগৎ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। জানা-অজানায় পঠিত—আমার চিন্তা, অনুভূতির জগতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সব চেয়ে বেশী। জীবনের ক্রমবিকাশ-পথে নানা দিক থেকে রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। কিন্তু, সেই কাব্য-সৌন্দর্যের বিশ্লেষণ কতটুকুই বা আমি করতে পারি ? তাই এতদিন সে চেষ্টা করিনি। কিন্তু 'দেশে'র ডাকে তো নীরব থাকতে পারলাম না। তাই রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় আমার অক্ষমতা-নিবন্ধন যা আমি করতে পারিনি, আজ তাঁর জীবনান্তে সেই ব্রত উদ্‌যাপন করতে ব্রতী হয়েছি।

একথা তো ভুলতে পারিনে যে, একদিন তাঁর চরণপ্রান্তে বসে আশীর্বাদ লাভ করেছি, তাঁর অজস্র অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ধন্য হয়েছি—সেই অপরিমেয় স্নেহের ঋণ অপরিশোধ্য। তাই আজ অশ্রুসজল চিত্তে সকলের সঙ্গে কবিগুরুকে আমারও সম্মিলিত প্রণাম নিবেদন করছি।

* * *

১৯২৯ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দর্শন' পড়তে যাই। বিদ্যালয়ের বিশাল প্রাসাদে পথ ভুলে 'ফনেটিক ইনস্‌টিট্যুটে'র বক্তৃতাগৃহে উপস্থিত হই। বহু ছাত্র-

ছাত্রী ভিড় করে বসে আছে—বক্তৃতা শুরু হবার দেরি নেই। চারিদিকে তাকিয়ে দেখি দেশবাসী কেউ নেই। ভয়ে ভয়ে বসে পড়লুম। প্রোফেসার বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে বললেন, "অন্তকার বক্তৃতা ফনেটিক বিজ্ঞানের অবতরণিকা। নানা ভাষায় নানা দেশের লোকের নানা উচ্চারণ আজ শোনানো হবে।" ঘরের সব আলো নিভিয়ে দিয়ে দেয়ালে ম্যাজিক লেণ্টর্নের ছবি ফেলা হল।...রবীন্দ্রনাথ!... সঙ্গে সঙ্গে কলের গানে বেজে উঠল সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর :

Through ages India has sent her voice—অন্ধকার ঘরে রবীন্দ্রনাথের ঋজুদীর্ঘ মূর্তির আলোকোদ্ভাসিত প্রতিচ্ছবি। কণ্ঠস্বর রবীন্দ্রনাথের—না তপোবনের ঋষির—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে',—ভারতবর্ষের সেই চিরন্তন বাণী।

আবার আলো জ্বলল। অধ্যাপক বললেন, এমন গলা, ঠিক জায়গায় জোর দিয়ে অর্থ প্রকাশ করার এমন ক্ষমতা শুধু প্রাচ্যেই সম্ভব। পূর্বদেশে মানুষ এখনো "বট"কে (শব্দব্রহ্ম) বিশ্বাস করে। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে তারই পূর্ণতম অভিব্যক্তি। কণ্ঠস্বরের এমন মাধুর্য, বাক্যের এমন ওজস্বিতা পশ্চিমে কখনও হয় না।

গর্বে আমার বুক ভরে উঠল। ডাইনে তাকালুম, বাঁয়ে তাকালুম। ভাবটা এই, "আলবৎ, ঠিক কথা, ভারতবাসীই শুধু এমন ধ্বনির ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতে পারে।" ক্লাসের বহু ছাত্রছাত্রী সে সন্ধ্যায় আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। আমি মাথা উঁচু করে বসেছিলুম। আমার গুরুদেব ভারতবর্ষের, আমিও ভারতবাসী।

* * *

তার চেয়েও আশ্চর্য হয়েছিলুম ১৯২৭ সালে—জর্মনী যাওয়ার দুই বৎসর পূর্বে—কাবুলে।

ইউরোপ যাওয়ার জন্য অর্থ-সংস্থান করতে গিয়েছিলুম কাবুলে। ফরাসী ও ফারসী জানি বলে অনায়াসে চাকরি পেয়েছিলুম। তখনকার দিনে বিশ্বভারতীই ছিল একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে ফরাসী, ফারসী, জর্মন একসঙ্গে শেখা যেত।

দু'শো টাকা মাইনেতে গিয়েছিলুম; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই কাবুল সরকার আবিষ্কার করলেন যে আমি জর্মনও জানি। মাইনে ধাঁ করে একশো টাকা বেড়ে গেল। পাঞ্জাবী ভায়ারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওজীরে মওয়ারীফের (শিক্ষামন্ত্রী) কাছে ডেপুটেশন নিয়ে ধরণা দিয়ে বললেন, সৈয়দ মুজতবা এক 'অনরেকগনাইজড্' বিদ্যালয়ের ডিপ্লোমাধারী। আমরা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ; এম. এ। আমাদের মাইনে শ-দেড়শো; তার মাইনে তিনশো, এ অন্যায়।

শিক্ষামন্ত্রীর সেক্রেটারী ছিলেন আমার বন্ধু। তিনি আমার কাছে ঘটনাটা বর্ণনা করেছিলেন ফারসীতে।*—"জানো, বন্ধু, শিক্ষামন্ত্রী তখন কি বললেন?" খানিকক্ষণ চুপ করে জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বললেন—"বিলকুল ঠিক! কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই, তোমাদের ডিগ্রীতে দস্তখত রয়েছে পাঞ্জাবের লাটসাহেবের। তাঁকে আমরা চিনি না, দুনিয়াতে বিস্তর লাটবেলাট আছেন—আমাদের ক্ষুদ্র আফগানিস্তানেও গোটাপাঁচেক লাট আছেন। কিন্তু মুজতবা আলীর সনদে আছে রবীন্দ্রনাথের দস্তখত,—সেই রবীন্দ্রনাথ যিনি সমগ্র প্রাচ্যের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।"

* * *

এসব অভিজ্ঞতা যে কোনোদিন হবে সে তো স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, যখন ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে পড়তে যাই। বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগ তখনও খোলা হয়নি। ছ'মাস পরে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পৌরোহিত্যে তার ভিত্তি-পত্তন হয়। বিশ্বভারতীতে তখন জনদশেক ছাত্রছাত্রী ছিলেন; তাঁরা সবাই শান্তিনিকেতন স্কুল থেকেই কলেজে ঢুকেছেন—শ্রীহট্টবাসীরূপে আমার গর্ব এই যে বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগে আমিই প্রথম বাইরের ছাত্র।†

প্রথম সাক্ষাতে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, কি পড়তে চাও?

আমি বললুম, তা তো ঠিক জানিনে তবে কোনও একটা জিনিস খুব ভাল করে শিখতে চাই।

তিনি বললেন, নানা জিনিস শিখতে আপত্তি কি?

আমি বললুম, মনকে চারদিকে ছড়িয়ে দিলে কোনও জিনিস বোধ হয় ভাল করে শেখা যায় না।

গুরুদেব আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, একথা কে বলেছে?

আমার বয়স তখন সতেরো,—থতমত খেয়ে বললুম, কনান ডয়েল।

গুরুদেব বললেন, ইংরেজের পক্ষে এ বলা আশ্চর্য নয়।

কাজেই ঠিক করলুম, অনেক কিছু শিখতে হবে। সম্ভব অসম্ভব বহু ব্যাপারে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। গুরুদেবের সঙ্গে তখন সাক্ষাৎ হত ইংরেজি ও বাংলা ক্লাসে। তিনি শেলি, কীটস আর 'বলাকা' পড়াতেন।

---

* ("খী দানীদ আগাজান, ওজীরে মওয়ারিফ্ চি গুফতন্দ")

† রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখি ১৯১৯ ইং-এ শ্রীহট্ট শহরে। পূজ্যপাদ ৺গোবিন্দনারায়ণ সিংহের আমন্ত্রণে তিনি শ্রীহট্টের আতিথ্য স্বীকার করেছিলেন।

তারপর ১৯২২-এর কাছাকাছি শান্তিনিকেতনে টলস্টয়ের ভাবধারা হঠাৎ ছাত্রছাত্রীদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করল। আমরা বললুম, শান্তিনিকেতনে আমরা যে জীবনযাপন করছি সেটা বুর্জুয়া জীবন, বিলাসের জীবন। তাতে সরলতা নেই, সাম্য নেই, স্থৈর্য নেই। আমাদের উচিত সেই সহজ সরল জীবনকে ফিরিয়ে আনা, মাটির টানে প্রকৃতির কোলে ফিরে গিয়ে ক্ষেত করা, ফসল ফলানো। আমাদের মতবাদ যখন প্রবল হয়ে বিদ্রোহের আকার ধরেছে, তখন একদিন গুরুদেব আমাদেরে ডেকে পাঠালেন। আমাদের মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি তর্ক করলেন। নাস্তানাবুদ হয়ে আমরা আধঘণ্টার ভেতর চুপচাপ। সবশেষে তিনি বললেন, আমি জানি একতারা থেকে যে সুর বেরোয় তাতে সরলতা আছে কিন্তু সে সরলতা একঘেঁয়েমির সরলতা। বীণা বাজানো ঢের শক্ত। বীণাযন্ত্রের তার অনেক বেশী, তাতে জটিলতাও অনেক বেশী। বাজাতে না জানলে বীণা থেকে বিকট শব্দ বেরোয় কিন্তু যদি বীণাটাকে আয়ত্ত করতে পার তবে বহুর মধ্যে যে সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয় (হারমনি ইন্ মল্‌টিপ্লিসিটি) তা একতারার একঘেঁয়েমির সরলতার (মনটনস্ সিম্‌প্লিসিটি) চেয়ে ঢের বেশী উপভোগ্য। আমাদের সভ্যতা বীণার মত, কিন্তু আমরা এখনও ঠিকমত বাজাতে শিখিনি। তাই বলে সে কি বীণার দোষ, আর বলতে হবে যে একতারাটাই সব চেয়ে ভালো বাদ্য যন্ত্র।

আমার মনে হয় এইটেই ছিল রবীন্দ্রনাথের মূল সুর। চিরজীবন তিনি বহুর ভেতর একের সন্ধান করেছিলেন। তাঁর সে সাধনা আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি। সৌভাগ্যক্রমে প্রায় এক বৎসর শান্তিনিকেতনে আমি ছিলুম এক ঘরের নীচের তলায়। সেখান থেকে জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালেই দেখতে পেতুম, গুরুদেব তাঁর জানালার পাশে বসে লেখাপড়া করছেন। সকালে চারটার সময় দুঘণ্টা উপাসনা করতেন। তারপর ছটার সময় স্কুলের ছেলেদের মত লেখাপড়া করতেন। সাতটা আটটা, নটা, তারপর দশ মিনিটের ফাঁকে জলখাবার। আবার কাজ—দশটা, এগারোটা, বারোটা। তারপর খেয়েদেয়ে আধঘণ্টা বিশ্রাম। আবার কাজ—লেখাপড়া; একটা, দুটো, তিনটে, চারটা, পাঁচটা—কাজ, কাজ, কাজ। পাঁচটা থেকে সাতটা ছেলেমেয়েদের গান শেখাতেন—বা দিনুবাবুর আসরে বসে গান শুনতেন, অথবা গল্প-সল্প করতেন। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে আবার লেখাপড়া, মাঝে মাঝে গুন গুন করে গান—আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত। কী অমানুষিক কাজ করার ক্ষমতা! আর কী অপরিসীম জ্ঞানতৃষ্ণা!

আমি তখন নিতান্তই তরুণ। আমার থেকে যাঁরা প্রবীণ এবং জ্ঞানী তাঁরা

গুরুদেবের জীবনের অনেক ইতিহাস জানেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের নানা সৃষ্টির নানা আলোচনা করবেন। তাঁর সৃষ্টির অনেক কিছু অমর হয়ে থাকবে, অনেক কিছু লোপ পাবে।

কিন্তু এ বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, চিরন্তন হয়ে থাকবে রবীন্দ্রনাথের গান। জর্মনীর 'লীডর' গান য়ুরোপের গীতিকাব্যের মধ্যে সব চেয়ে সমৃদ্ধ একথা বললে অত্যুক্তি করা হয় না। এমন সব গান 'লীডরে' আছে যার কথা দিয়েছেন গ্যেটের মত কবি আর সুর দিয়েছেন বেটোফেনের মত সুনিপুণ সুর-শিল্পী। আমার মনে হয়, তার চাইতেও শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের গান। কারণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল একাধারে গীতিকার এবং সুরস্রষ্টার প্রতিভা। রবীন্দ্রনাথের গান বাঙালীর কণ্ঠে চিরকাল বেঁচে থাকবে। কেউ যদি বলেন, না, চিরস্থায়ী তা হবে না,—আমি তর্ক করব না। কারণ আর যা নিয়ে চলুক ; গান নিয়ে, গীতি-কবিতা নিয়ে তর্ক চলে না। গানের আবেদন সরাসরি একেবারে মানুষের মর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছায়। গান হৃদয়কে দোলা দেয়, অন্তরে জাগায় অনির্বচনীয় অনুভূতি ;—যুক্তিতর্কের অপেক্ষা রাখে না।

প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বললাম। সে-বিপুল সাহিত্যের খানিকটা বুঝেছি, বেশীর ভাগই বুঝি নি। কিন্তু, তাঁর সাহিত্যালোচনার দিন আজ নয়। আজ শুধু আমার স্নেহপ্রবণ গুরুদেবের সংবেদনশীল অন্তরটির পরিচয় দেবার জন্যেই আরো কয়েকটি কথা বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করব। কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, ধরা-ছোঁয়ার অতীত ; সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। কিন্তু আমাদের কাছে তিনি যে ছিলেন স্নেহাসক্ত গুরু, নিতান্তই মাটির মানুষ। কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করাও যে দুঃসাধ্য। হিমালয়ের পাদমূলে বসে বিচিত্র পুষ্প চয়নকালেও ক্ষণে ক্ষণে গৌরী-শিখরের বিরাট, বিশাল, গম্ভীর মহিমা হৃদয়কে নির্বাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিয়েছে।

শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীতে অবসর সময়ে ক্যাটালগ তৈরি করতুম। তখন প্রতিদিন দেখতুম পাঠান্তে নূতন পুরাতন বই তিনি লাইব্রেরীতে ফেরত পাঠাতেন। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, কাব্য, কত বলব। এমন বিষয় নেই যাতে তাঁর অনুসন্ধিৎসা ছিল না।

এদিক দিয়ে তিনি ছিলেন আজীবন জ্ঞান-সাধক। কিন্তু তাই বলে জীবনকে সকল দিক থেকে বঞ্চিত করে কঠোর জ্ঞানমার্গ তিনি অবলম্বন করেননি। তিনি তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় বলেছেন—"ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন সে

নহে আমার"—পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ উপভোগের আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন কঠোর সংযমী। এক হিসেবে তিনি ছিলেন প্রকৃত তপস্বী। তপস্যা;—সে তো শক্তি সঞ্চয়ের জন্যেই। তাঁর একটি কবিতায় আছে—

"জানি জানি এ তপস্যা দীর্ঘ রাত্রি
করিছে সন্ধান,
চঞ্চলের মৃত্যুস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান।"

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ জীবনে অতীন্দ্রিয় সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁর ঋষি-দৃষ্টির সমক্ষে সত্যের স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল পরিপূর্ণ মহিমায়। তারি পরিচয় তাঁর অজস্র গানে, কবিতায়, 'ধর্ম' এবং 'শান্তিনিকেতনে'র নিবন্ধগুলোতে। রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান শুধু পুঁথি-পড়া জ্ঞান নয়, তা সম্পূর্ণই অনুভূতির।

'মহুয়া' প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ নিজে চয়ন করে 'সঞ্চয়িতা' প্রকাশ করেন। তাতে 'মহুয়া'র অতি অল্প কবিতা স্থান পায়। তখন রব উঠেছে 'মহুয়া'তে কবির সৃজনী-শক্তির অপ্রাচুর্যের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। ভয় হল, রবীন্দ্রনাথও বুঝি তাই বিশ্বাস করে 'মহুয়া'র যথেষ্ট কবিতা 'সঞ্চয়িতা'য় স্থান দেন নি। কলকাতায় থাকতুম; শান্তিনিকেতনে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি 'সঞ্চয়িতা'তে 'মহুয়া'র আরো কবিতা দিলেন না কেন? আমাকে যদি 'সঞ্চয়িতা' সম্পাদন করার ভার দেওয়া হত, আমি তাহলে 'মহুয়া'র মলাট ছিঁড়ে 'সঞ্চয়িতা' নাম দিয়ে প্রকাশ করতুম। বলতুম, এতেই সব চাইতে ভালো কবিতা সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

গুরুদেব হেসে বললেন, ভাগ্যিস তোমাকে 'সঞ্চয়িতা' তৈরি করবার ভার দেওয়া হয়নি। আমি 'মহুয়া'র কবিতা 'সঞ্চয়িতা'তে যে বেশী প্রমাণে দিইনি, তার কারণ এই যে 'মহুয়া'র কাব্য-সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমি সন্দিহান। আসলে 'মহুয়া'র কবিতাগুলি মাত্র সেদিনের লেখা। কবিতার ভালোমন্দ বিচার করার জন্য যে দূরত্বের প্রয়োজন সেটা 'মহুয়া'র বেলায় এখনও যথেষ্ট হয়নি।

ঠিক সেই কারণেই, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আলোচনা করার দিন বোধ হয় এখনও আসেনি। যে পৃথিবীকে তিনি দীর্ঘকাল ধরে অতি নিবিড়ভাবে ভালোবেসেছিলেন সেই পৃথিবী ছেড়ে তিনি মাত্র সেদিন চলে গেছেন। শোকে বাংলাদেশ মুহ্যমান। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য-সমালোচনার জন্য যে পরিমাণ সময়ের ব্যবধান প্রয়োজন তা আমরা এখনও পাইনি।

১৯৩৯ সালে গুরুদেবের সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় শান্তিনিকেতনে।

তাকিয়ে বললেন, লোকটি যে বড় চেনা-চেনা ঠেকছে। তুই নাকি বরোদার মহারাজা হয়ে গেছিস ?

আমি আপত্তি জানালুম না। তর্কে তাঁর কাছে বহুবার নাজেহাল হয়েছি। আপত্তি জানালে তিনি প্রমাণ করে ছাড়তেন, আমিই বরোদার মহারাজা, নয়তো কিছু একটা জাঁদরেল গোছের।

নিজেই বললেন, না না। মহারাজা নয়, দেওয়ান-টেওয়ান কিছু একটা।

আমি তখনও চুপ। 'মহারাজা' দিয়ে যখন আরম্ভ করেছেন, কোথায় থামবেন তিনিই জানেন।

তারপর বললেন, কি রকম আছিস ? খাওয়া-দাওয়া ?

আমি বললুম, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

আরে না না, আজকালকার দিনে খাওয়া-দাওয়া যোগাড় করা সহজ কর্ম নয়। তোকে আমি একটা উপদেশ দি'। ওই যে দেখতে পাচ্ছিস 'টাটা ভবন' তাতে একটি লোক আছে, তার নাম পঞ্চা ; লোকটি রাঁধে ভাল। তার সঙ্গে তুই যদি যোগাযোগ স্থাপন করতে পারিস তবে এখানে তোর আহারের দুর্ভাবনা থাকবে না।

আমি তাঁকে আমার খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে অনুরোধ জানালাম।

তখন বললেন, তুই এখনও বরোদা কলেজে ধর্মশাস্ত্র পড়াস না ?

আমি জানতুম, তিনি ঠিক জানেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রেরা কে কি করে। তাই মহারাজা বা দেওয়ান আখ্যায় আপত্তি জানাইনি।

তারপর বললেন, জানিস, তোদের যখন রাজা মহারাজারা ডেকে নিয়ে সম্মান দেখায় তখন আমার মনে কি গর্ব হয়, আমার কী আনন্দ হয়। আমার ছেলেরা দেশে-বিদেশে কৃতী হয়েছে।

তারপর খানিকক্ষণ আপন মনে কি ভেবে বললেন, কিন্তু জানিস, আমার মনে দুঃখও হয়। তোদের আমি গড়ে তুলেছি, এখন আমার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য তোদের প্রয়োজন। গোখলে, শুক্ল, তোরা সব এখানে থেকে আমাকে সাহায্য করবি। কিন্তু তোদের আনবার সামর্থ্য আমার কোথায় ?

তা যাক্। বলতে পারিস সেই মহাপুরুষ কবে আসছেন কাঁচি হাতে করে ?

আমি অবাক। মহাপুরুষ তো আসেন ভগবানের বাণী নিয়ে, অথবা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম নিয়ে। কাঁচি হাতে করে ?

হাঁ, হাঁ কাঁচি নিয়ে। সেই কাঁচি নিয়ে সামনের দাড়ি ছেঁটে দেবেন, পেছনের টিকি কেটে দেবেন। সব চুরমার করে একাকার করে দেবেন। হিন্দু-মুসলমান আর কতদিন এরকম আলাদা হয়ে থাকবে।

তারপর আধঘণ্টা ধরে অনেক কিছু বললেন হিন্দু-মুসলমানের কলহ্ নিয়ে। তাঁকে যে এই কলহ কত বেদনা দিত সে আমি জানি। আমাকে যে বলতেন তার কারণ বোধ হয় আমি তাঁর মুসলমান ছাত্র। বোধ হয় মনে করতেন আমি তাঁকে ঠিক বুঝতে পারব।

গুরুদেব তখন বেশী কথা বললে হাঁপিয়ে উঠতেন। আমি তাই তাঁর কথা বন্ধ করার সুযোগ খুঁজছিলুম। তিনিই হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, আমার জামার পকেটে ছোট্ট ক্যামেরা। বললেন, ছবি তোলার মৎলব নিয়ে এসেছিস বুঝি। তোল, তোল। ওরে সুধাকান্ত, পর্দাগুলো সরিয়ে দে তো। কি রকম বসব বল্।

আমি বললুম, আপনি ব্যস্ত হবেন না ; আমি ঠিক তুলে নেব।

তোর বোধ হয় খুব দামী ক্যামেরা, জার্মানী থেকে নিয়ে এসেছিস, সব কায়দায় ছবি তোলা যায়। অন্যেরা বড় জ্বালাতন করে ; এরকম করে বসুন, ওরকম করে বসুন। কত কী !

ছবি তোলা শেষ হলে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি দেখে বললেন, কি রে, কিছু বলবি নাকি ?

আমি বললুম, একটা কথা বলতে চাই যদি কিছু মনে না করেন।

তিনি ক্লাসে যে-রকম উৎসাহ দিতেন ঠিক সেই রকম ভাবে বললেন, বল, বল, ভয় কি ?

আমি বললুম, এই যে আপনি বললেন, আপনার সামর্থ্য নেই আমাদের এখানে নিয়ে আসবার, সেই সম্পর্কে আমি শুধু আমার নিজের তরফ থেকে বলছি যে, বিশ্বভারতীর সেবার জন্য যদি আমাকে প্রয়োজন হয় তবে ডাকলেই আসব। যা দেবেন হাত পেতে নেব।

গুরুদেব বললেন, সে কি আমি জানিনে রে, ভালো করেই জানি। তাই তো তোদের কাছে আমার সামর্থ্যহীনতার কথা স্বীকার করতে সঙ্কোচ হয় না।

মনে হল গুরুদেব খুশী হয়েছেন।

গুরুদেব আজ নেই।

কিন্তু সেই হারানো দিনের স্মৃতি আজো আমার মনে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

রবির বিশ্বরূপ

রবীন্দ্রনাথকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করার শক্তি আমাদের নেই। গীতাতে উক্ত তিন মার্গেই একসঙ্গে একই মানুষ চলেছে এর উদাহরণ বিরল। তিনি জ্ঞানী ছিলেন; শব্দতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। তিনি কর্মী ছিলেন; গ্রামোন্নয়ন, কৃষির ঔৎকর্ষ্য, সমবায় সমিতি, শ্রীনিকেতন বিদ্যালয় তিনি নির্মাণ করেছিলেন। তিনি রসের সাধক ছিলেন—এটাকে ভক্তিমার্গ বলা যেতে পারে—তিনি তাঁর ভগবানকে প্রধানতঃ রসস্বরূপেই আরাধনা করেছিলেন এবং ইহজগতের প্রিয়া, প্রকৃতিকে সেই রসস্বরূপেই কাব্যে, নাট্যে, গানে প্রকাশ করেছেন।

অথচ কোনো স্থলেই তিনি খণ্ডিত বা বিচ্ছিন্ন নন। অর্থাৎ প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের মত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শব্দ সঞ্চয় করে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে পুস্তিকা লিখছেন তখন তাঁর ভাষা কঠিন শব্দতাত্ত্বিকের নয়, তাঁর ভাষা সরস কবির মত। এবং সেখানে তিনি কর্মযোগীর ন্যায় এ উপদেশও দিচ্ছেন, কি করে সে ভাষাতত্ত্বের পুস্তক কাজে লাগাতে হয়। পক্ষান্তরে তিনি যখন বর্ষা, বসন্তের গান লিখছেন তখন উদ্ভিদবিদ্যায় অজ্ঞ সাধারণ কবির মত একই ঋতুতে কদম্ব আম্রমঞ্জরী ফোটান না। বস্তুতঃ আমাদের দেশে যে শত শত দিশী বিদেশী ফুল ফোটে, কোন্ জায়গায় কি সার দিলে ভালো করে ফোটে, এসব খবরও রাখতেন। বিদেশী ফুলের নামকরণ করতেন, একাধিক নাম-না-জানা দিশী ফুলেরও নামকরণ করেছেন। কথিত আছে—শহরাগত এক নবীন শিক্ষক অত্যন্ত সাধারণ জাম না গাব গাছ চিনতে পারেননি বলে কবি তাঁর হাতে শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের সঁপে দিতে নারাজ হয়েছিলেন। আবার হাল চালানো, গাছ পোঁতার মত নীরস গদ্যময় ব্যাপার কি হতে পারে?—শ্রীনিকেতনে যাঁরই হলকর্ষণ বৃক্ষ-রোপণ উৎসব দেখেছেন তাঁরাই জানেন কবি কি ভাবে ঐ দুই সাধারণ কর্মকে সৌন্দর্যের পর্যায়ে তুলে নিয়েছেন। অনেকেরই বিশ্বাস—

"এস এস হে তৃষ্ণার জল"

বর্ষার গান। অন্তত সেই ঋতুতেই গাওয়া হয়। তা হলে প্রশ্ন উঠবে 'ভেদ করি[১] কঠিনের ক্রূর বক্ষতল' 'গূঢ় অন্ধকার হতে' কে আসছে? 'মরুদৈত্য কোন্ মায়াবলে তোমারে করেছে বন্দী পাষাণশৃঙ্খলে'—কে সে?

(১) আমরা 'করিই' শুনেছি। গীতবিতানে দেখছি 'করো' আছে। অর্থের অবশ্য কোনো পার্থক্য হয় না।

আসলে এটি রচিত হয় শান্তিনিকেতনে প্রথম টিউব-উয়েল খননের সময়। মাটির নিচে যে জল বন্দী হয়ে আছে তাকে বেরিয়ে আসবার জন্য কবি কর্মযোগের প্রতীক কলকব্জার বন্দনা-গীতি ধরেছেন।

সব সময়েই তিনটি জিনিস যে একই আধারে থাকবে এমন কোনো ধরা-বাঁধা নেই কিন্তু মোটামুটি বলা যেতে পারে, তিনি দুই, আড়াই, কিংবা তিন ডাইমেনশনেই চলুন, আমরা চলতে জানি শুধু এক ডাইমেনশনে এবং তাই তাঁর সমগ্র রূপ আমাদের পক্ষে ধরা কঠিন, প্রায় অসম্ভব। (তিরোধানের পূর্বে তিনি এক চতুর্থ ডাইমেনশনে চলে যান এবং সেটি এমনই রহস্যাবৃত যে, উপস্থিত সেটি উল্লেখ করবো না; কারণ ঐটে ভালো করে বোঝবার জন্য আমি এখনো হাতড়ে হাতড়ে এগোচ্ছি)।

সে অসম্ভব কি কখনো সম্ভব হবে, এবং যদি হয় তবে কি প্রকারে হবে?

এটা বোঝানো যায় শুধু তুলনা দিয়ে।

চিত্রকর বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়কে গুণী রসিকেরা চেনেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি বাল্যবয়স থেকেই ক্ষীণ। তিনি চার হাত দূরের থেকেই কোন জিনিস ভালো করে দেখতে পেতেন না।

যৌবনে তিনি একখানি বিরাট দেয়াল-ছবি বা ফ্রেস্কো আঁকতে আরম্ভ করেন। বড় বড় চিত্রকররাও সম্পূর্ণ ফ্রেস্কোর পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখার জন্য বার বার পিছনে হটে ছবিটাকে সমগ্ররূপে দেখে নেন। আমরা, দর্শকরাও ছবি শেষ হওয়ার পর যখন সেটি দেখি তখন দূরের থেকে তার পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখি—তখন খুঁটিনাটি, সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখতে পাইনে—পরে কাছে গিয়ে খুঁটিনাটি দেখি—তখন আর তার পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখতে পাইনে।

পূর্বেই বলেছি, বিনোদবিহারী দূরের থেকে কিছুই দেখতে পান না। তাই তিনি অনুমানের উপর নির্ভর করে একদিকে ছবি আঁকা আরম্ভ করে অন্য প্রান্তে এসে শেষ করতেন, কিংবা খাবলা খাবলা করে যেখানে খুশী খানিকটে এঁকে নিতেন। পরে দেখা যেত পার্সপেক্‌টিভ না দেখতে পেয়েও বিনোদবিহারীর বিরাট ফ্রেস্কোর এ-কোণের হাতী ও-কোণের প্রজাপতির চেয়ে যতখানি বড় হওয়ার কথা ততখানি বড়ই হয়েছে। তিনি অবশ্য কখনো সেটা দেখতে পেতেন না, কারণ যতখানি দূরে এলে আমরা সমগ্র ছবি দেখতে পাই ততখানি দূরে এলে তিনি সব কিছু ধোঁয়াটে দেখতেন।

একদিন তাঁর এক শিষ্য একটি ক্যামেরা নিয়ে এসে উপস্থিত। যতখানি দূরে

দাঁড়ালে পুরো ক্যামেরায় ধরা পড়ে ততখানি দূরে দাঁড়িয়ে সে ক্যামেরায় ঘষা কাচের উপর প্রতিবিম্বিত পুরো ফ্রেস্কোটি সে বিনোদবিহারীকে দেখালে। এই তিনি তাঁর আঁকা পূর্ণাঙ্গ ছবি জীবনে প্রথম দেখতে পেলেন। একসঙ্গে এক কোণের হাতী ও অন্য কোণের প্রজাপতি দেখতে পেলেন, এক চিত্রাংশ অন্য চিত্রাংশের সঙ্গে ঠিক ঠিক যেমনটি তিনি চেয়েছিলেন থাপ খেয়ে আঁকা হয়েছে কিনা দেখতে পেলেন। অবশ্য ঘষা কাচের উপর খুঁটিনাটি কারুকার্য দেখতে পাননি ; কিন্তু সে জিনিসে তাঁর প্রয়োজন ছিল না ; কারণ কাছে দাঁড়িয়ে তো তিনি সেগুলো ভাল করেই দেখতে পান।

এই ক্ষুদ্র রচনায় আমি এত দীর্ঘ একটি উপমা দিলুম কেন ? কারণ বহু বৎসর ধরে ভেবে ভেবেও আমি এযাবৎ খুঁজে পাইনি কি করে আরো সংক্ষেপে আমার বক্তব্যটা বোঝাতে পারি।

পূর্বেই বলেছি, সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথকে দেখতে হলে আমাদের যতখানি দূরে যেতে হয় ততখানি দূরে গেলে আমাদের সব কিছু ধোঁয়া লাগে। ঘষা কাচ হলে আমরা তাঁর পূর্ণ রূপ দেখতে পেতুম।

তা হলে এই ঘষা কাচ জিনিসটে কি ?

কোনো মহৎ কবির পরবর্তীকালে যখন সবাই তার বিরাট সমগ্র রূপ দেখার চেষ্টা করে নিষ্ফল হচ্ছে তখন হঠাৎ আবির্ভূত হন আরেক মহৎ ব্যক্তি—যিনি কবির সর্বাঙ্গসুন্দর সমগ্র ছবি ঘষা কাচের মত তাঁর বুকে ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর রচনায়, তাঁর কাব্যে তিনি তখন কবিকে এমনভাবে এঁকে দেন যে আমরা অক্লেশে তাঁর পূর্ণ ছবিটি দেখতে পাই। শক্তিমান জন দ্বারা কোনো দুরূহ কার্য সমাধিত হওয়ার পর সাধারণের পক্ষে তা অতি সহজ হয়ে দাঁড়ায়। তাই কালিদাস বলেছেন,

'মণৌ বজ্র-সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ'

'কঠিন মণিকে হীরক দ্বারা বিদ্ধ করিলে যেমন সেই ছিদ্র দিয়া অনায়াসে ঐ মণির মধ্যে সূত্রের প্রবেশ সম্ভব।'

কালিদাস সুবাদেই বলি, এই এ-যুগের আমাদের রবীন্দ্রনাথই তাঁর যে সর্বাঙ্গসুন্দর ছবি এঁকেছেন, ভারতীয় সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর যে বিরাট কলেবর আমাদের দেখিয়েছেন, সে তো অন্য কেউ ইতিপূর্বে করে উঠতে পারেননি।

পৃথিবীর ইতিহাসে এ যোগাযোগ বিরল নয়। এ-বিষয়ে সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান

জর্মন সাহিত্য। গ্যোটের পঞ্চমুখে পঞ্চতন্ত্র কথা একই সঙ্গে শোনবার ক্ষমতা অর্জন করার জন্য জর্মনিকে বহুকাল অপেক্ষা করতে হয়নি। তাদের সৌভাগ্য, অংশত গ্যোটেরও সৌভাগ্য যে, তাঁরই জীবদ্দশায় হাইনের মত কবি জন্মগ্রহণ করেন। দুজনাতে কয়েক মিনিটের তরে দেখাও হয়েছিল—মাত্র একবার। সে অভিজ্ঞতা কারোরই পক্ষে সুখদা হয়নি। কিন্তু পরবর্তী যুগে হাইনে যখন ঘষা কাচের মত তাঁর বুকের উপর গ্যোটের পূর্ণ ছবি প্রতিবিম্বিত করলেন তখন জর্মন মাত্রই গ্যোটের বিরাট ব্যক্তিত্ব অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো।

রবীন্দ্রনাথকে সে-ভাবে দেখাবার মত মনীষী এখনো এ জগতে আসেননি।

প্রার্থনা করি, আমাদের জীবদ্দশায়ই তিনি আসেন। বড় বাসনা ছিল, মৃত্যুর পূর্ব তাঁর বিশ্বরূপটি দেখে যাই॥

ইয়োরোপ ও রবীন্দ্রনাথ

ইয়োরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীর সঙ্গে যাঁরাই অন্তরঙ্গভাবে মিশেছেন তাঁরাই হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে, ইয়োরোপবাসী রবীন্দ্রনাথকে চেনে কত অল্পই। অথচ আমরা সকলেই জানি যে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলি যখন প্রথম বিলাতে প্রকাশিত হয় তখন তিনি সে দেশে কী অদ্ভুত সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন। তার কয়েক বৎসর পর যখন কবি কন্টিনেণ্ট ভ্রমণ করেন তখন তাঁকে দেখবার জন্য, তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য কী অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে কত লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর চতুর্দিকে সমবেত হয়েছে। এবং সর্বশেষ কথা এ জানি যে, ক্রমে ইয়োরোপে তাঁর খ্যাতি ম্লান হতে থাকে, এমন কি একাধিক সুপরিচিত সমালোচককে এ-কথাও বলতে শোনা গিয়েছে, তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হল কোন্ স্থূল বুদ্ধিতে এবং যাঁরা টমসনের রবীন্দ্রজীবনী মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরাও হতাশ হলেন এই দেখে যে তিনি পর্যন্ত কবির কাব্যরসে আদৌ নিমজ্জিত হতে পারেননি, অথচ তিনি যে খানিকটা বাঙলা ভাষা জানতেন সে-কথাও সত্য। এ বইখানা রবীন্দ্রনাথকেও কিঞ্চিৎ বিক্ষুব্ধ করেছিল এবং বোধ হয় তার প্রধান কারণ তিনিও হতাশ হলেন এই ভেবে যে, টমসনই যখন তাঁর কাব্যরস আস্বাদন করতে পারলেন না তখন ইয়োরোপের সাধারণ পাঠক করবে কি প্রকারে?

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলি নিয়ে যখন ইংরেজ কবিগণ মত্ত তখন এ-দেশে আমরা আশ্চর্য হয়েছি যে এর ভিতর ইংরেজ কি পাচ্ছে যে তার এত উচ্ছ্বসিত

প্রশংসা করছে। গীতাঞ্জলির গান বাঙলায় গাওয়া হয়—ইংরেজিতে তা নেই—বাঙলায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে এ গানগুলি—ইংরিজিতে যেন চুম্বক, এবং বাঙলা কবিতারূপে এ গানগুলির যে গীতিরস পাই (সুর বাদ দিয়েও) ইংরেজিতে তা কই! মনকে তখন এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছি যে হয়তো ইংরেজ পাঠক ইংরেজি গীতাঞ্জলিতে তার মাতৃভাষায় এমন এক ইংরেজি গীতিরস পায় যেটা আমাদের অনভ্যস্ত কান ধরতে পারে না।

হংস যেমন মানসযাত্রী তেমনি সারা দিবস রাত্রি
একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহামরণপারে।

এটিকে কবিতারূপে পড়ে আমরা যে গীতিরস পাই,

Like a flock of homesick cranes flying night & day back to their mountain nests, let all my life take, its voyage to its eternal home in one salutation to Thee :

পড়ে তো সে-রস পাইনে। তখন মনকে বুঝিয়েছি যে হয়তো এই ইংরেজি অনুবাদে শব্দগুলি এমনভাবে চয়ন ও সাজানো হয়েছে যে ইংরেজ তার ভিতর আপন গীতিরস পেয়ে মুগ্ধ হয়েছে।

গীতাঞ্জলির ফরাসী জর্মন এবং অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ ইংরেজি অনুবাদ থেকে। সে সব অনুবাদে মূলের রস আরো পরিশুষ্ক হওয়ার কথা।

রসের দিকের কিছুটা বাদ দিয়ে যখন ভাবের দিকটা দেখি তখন বরঞ্চ খানিকটা বুঝতে পারি, ইংরেজি এবং অংশত ফরাসী জর্মন তথা অন্যান্য ইয়োরোপীয় ভাষার গীতাঞ্জলি কেন গুণীজনকে মুগ্ধ করেছিল।

প্রথমত রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি অনুবাদে ব্যবহার করেছেন কিঞ্চিৎ প্রাচীন ইংরেজি। সে ভাষা কিছুটা ইংরেজি বাইবেলের ভাষা। এ দেশের তুলনা নিলে বলবো, যে বাঙালী বৈষ্ণব ভক্ত বিদ্যাপতি পড়ে আনন্দ পান তিনি ভানু সিংহের পদাবলীর ভাষা পড়েই মুগ্ধ হবেন, তার গভীরে অতখানি প্রবেশ করবেন না—বিশেষতঃ সে যদি অবাঙালী হয় এবং বৈষ্ণব না হয়ে ম্লেচ্ছ-যবন হয়।

দ্বিতীয়তঃ গীতাঞ্জলিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রভু-সখা-প্রিয়কে যে রূপ দিয়েছেন তার সঙ্গে ইংরেজ কিছুটা পরিচিত। বাইবেলের 'সং অব সংস' (সং অব সলোমোন) এবং 'সাম্‌স' গীতির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা মিলটি অনায়াসেই দেখতে পাবেন। পার্থক্য শুধু এই যে 'সং অব সলোমনে' প্রেমের দৈহিক দিকটা

অনেকখানি প্রাধান্য পেয়েছে—গীতাঞ্জলিতে তা নয়—এবং সাম্‌স্‌ গীতিতে ভগবানের প্রিয় স্বরূপ কম, তিনি সেখানে দয়াল প্রভু, তিনি সর্বশক্তিমান কর্তা, তিনি ইচ্ছে করলে এ দাসকে তাঁর করুণা থেকে বঞ্চিতও করতে পারেন। এর সঙ্গে যোগ দেওয়া যেতে পারে সান্‌ খোয়ান দে লা ক্রুসের ভগবদ প্রেমের কাব্য। এর মিল 'সং অব সংসের' সঙ্গে—কিঞ্চিৎ কায়িক প্রেম। যে ইয়েটস রবীন্দ্রনাথকে ইয়োরোপের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত করে দিয়েছিলেন তিনি সান্‌ খোয়ানের ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর রচনাতে এঁর প্রচুর উদ্ধৃতি আছে। কিছুটা এই কারণেও ইয়েটস এবং তাঁর সম্প্রদায়ের পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে বোঝা সহজ হয়েছিল।

তৃতীয়তঃ গীতাঞ্জলির প্রভু-সখা-প্রিয়া কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা ধর্মের ভগবান নহেন। ইংলণ্ডে এরকম অনেক ভাবুক আছেন যাঁরা খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন, এবং তাই সম্প্রদায়মুক্ত চিত্তে ঈশ্বরের কাছে আসতে চান। ওদিকে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু (এখানে ব্রাহ্ম হিন্দুর পার্থক্যের কথা উঠছে না—বিদেশীর কাছে এ-দেশের ব্রাহ্মণ মাত্রই যে হিন্দু সে তারা ধরে নেয়) হয়েও যে ব্রহ্মকে তাঁদের সামনে কাব্যে রসস্বরূপ প্রকাশ তা দেখে তাঁদের বিস্ময়ের অবধি রইল না। এইসব সংস্কারমুক্ত ইংরেজ দূর বিদেশীর আরাধনার ধন আপন সাধনার ধনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে—দুইই এক ভগবান। তারা আশ্বস্ত হল, তারা একা নয়। খৃষ্টধর্মে আস্থা হারিয়েও তারা দেখে ধর্ম তাদের ছাড়েনি।

অনেকটা এই সব কারণেই 'ডাকঘর' তাই জনপ্রিয় হয়েছিল।

তাই আমার মনে হয়, ইংরেজ রবীন্দ্রনাথের ভাবের দিকটাই দেখেছিল বেশী, তাঁর রস-সৃষ্টি তারা করতে পারেনি। আমরা বাঙালী কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে চিনি প্রধানতঃ রসস্রষ্টারূপে; তাই তাঁর বর্ষাবসন্তের গীতি তার বিরহ-বেদনার প্রতি প্রীতি আমাদের বেশী। রবীন্দ্রনাথ যতই অভিমান করে থাকুন না কেন, আমরা তাঁকে চিনেছি অন্য যে কোনো জাত অপেক্ষা বেশী।

তা সে যাই হোক, মূল কথায় ফিরে গিয়ে বলি, ভাবের পরিবর্তন হয় রসের পরিবর্তনের চেয়ে বেশী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বিজেতা ইংলণ্ডেই ভগবানে বিশ্বাস একসঙ্গে অনেকখানি কমে যায়। বরঞ্চ পরাজিত জর্মনি আর কিছু না পেয়ে ভগবানকে আঁকড়ে ধরলো। ইংলণ্ডে তাঁর জনপ্রিয়তা কমলো; জর্মনিতে বাড়লো। তার কয়েক বৎসরের মধ্যেই জর্মনি যখন আপন পায়ে খানিকটে দাঁড়ালো সেখানেও তাঁর জনপ্রিয়তা কমলো—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেটা লক্ষ্য করে উল্লেখ করেছেন।

এর সঙ্গে একটা অত্যন্ত স্থূল কথা বলে রাখি। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ভাবের দিক দিয়ে হয়তো বা ইয়োরোপের দু'একজন গুণীজ্ঞানী গীতাঞ্জলির ব্রহ্মকে চিনতে পারবেন, কিন্তু ঐ মহাদেশের সাধারণজন হয় তাঁকে অবহেলা করে নয় চার্চের ভগবানকে নিয়েই তারা সন্তুষ্ট। আপন চেষ্টায় রসস্বরূপ পরমেশ্বরকে পাবার চেষ্টা তাদের নেই বললেও চলে। কিছুটা আছে ক্যাথলিক মিস্টিক ফাদারদের ভিতর—কিন্তু তাঁরাও আপন ধর্মের দিগদর্শক নিয়েই সন্তুষ্ট। কাজেই এদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে ইয়োরোপে কখনো জনপ্রিয় হবেন তা আমার মনে হয় না।

তাই যখন তাঁর খ্যাতি ইয়োরোপে কমলো, আমরা আশ্চর্য হইনি।

আজ যে রবীন্দ্রনাথের স্মরণে বিশ্ববাসী তাঁকে সম্মান জানাচ্ছে, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করছে তাতে আমরা খুশী। কিন্তু কারণ অনুসন্ধান করলে জানবো, আজ পৃথিবীর সব দেশই আমাদের প্রিয় হতে চায়—তার অন্যতম কারণদ্বয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। এ উচ্ছ্বাস রবীন্দ্রনাথের সত্য পরিচয়ের উৎস থেকে উদ্বেলিত হয়নি। তাই বর্ষ শেষে আবার যদি দেখি—১৯১৯ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত যা দেখেছিলুম—সে জোয়ার কোনো চিহ্নই রেখে যায়নি তাতে যেন বিস্মিত বা মর্মাহত না হই।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার অত্যন্ত সুদৃঢ় বিশ্বাস ইয়োরোপ একদিন রবীন্দ্রনাথের সত্য পরিচয় পাবে। সেটা সম্ভব হবে যেদিন ইংরেজ ফরাসী জর্মনের বেশ কিছু লোক বাঙলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ব্যাপকভাবে আপন আপন মাতৃভাষায় তাঁর রসসৃষ্টির অনুবাদ করবে। তার কিছু কিছু লক্ষণ এদিক ওদিক দেখতে পাচ্ছি। একাধিক ক্যাথলিক ইতিমধ্যে অত্যুত্তম বাঙলা শিখে নিয়েছেন এবং একাধিক জর্মন এই নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। রাজনৈতিক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক আরো অনেক বিদেশী বাঙলা শিখবে এবং অবশেষে রবীন্দ্রনাথের রচনা উপযুক্ত লোক দ্বারা অনূদিত হবে।

আমার ভয় শুধু একটি, এ-দেশে তথা বিদেশে ক্লাসিকসের সম্মান ক্রমেই কমে যাচ্ছে। মানুষ মনোরঞ্জক দিকটাই দেখছে বেশী; ক্লাসিকদের স্থায়ী গভীর সচ্চিদানন্দ রস তারা পরিশ্রম করে আস্বাদ করতে চায় না অথচ রবীন্দ্রনাথের মূল উৎস সেইখানেই।

সেই ভয় আমি কাটাই এই ভরসা করে যে রেনেসাঁসও তো হয়। বিরক্ত হয়ে আধুনিককে বর্জন করে মানুষ এ সংসারে কত না বার অপেক্ষাকৃত প্রাচীনের সন্ধানে বেরিয়ে নিত্য নবীনের সন্ধান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিত্য নবীন।

কবিগুরু গুরুদেব

রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু প্রতিষ্ঠান নানা পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করছেন। এঁদের অন্যতম প্রতিষ্ঠান এই সম্পর্কে একটি শর্ত আরোপ করেন যে, কোনো লেখক যেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ের উপলক্ষ করে কোনো রচনা না পাঠান। এই প্রতিষ্ঠানটির মনে হয়তো শঙ্কা ছিল, রবীন্দ্রনাথের নাম করে এঁরা হয়তো নিজেদের আত্মজীবনী লিখে বসবেন। শঙ্কাটা কিছু অমূলক নয়।

কিন্তু এ-শর্তের ভিতর একটা গলদ রয়ে গেল। এই প্রথম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা উল্লেখ করা যাবে —দ্বিতীয় জন্ম-শতবার্ষিকীর সময় এত দীর্ঘায়ু কেউ থাকবেন বলে ভরসা হয় না। কাজেই এই শতবার্ষিকীতে কেউই যদি মানুষ রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে চিনেছিলেন, সে কথা না লেখেন, তবে দ্বিতীয় শতবার্ষিকীতে যাঁরা আজকের দিনের প্রকাশিত প্রবন্ধাদি পড়ে মানুষ রবীন্দ্রনাথের মূর্তিটি নির্মাণ করতে চাইবেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বিক্ষুব্ধ হবেন। অবশ্য এই নিয়ে যে অন্যত্র ভূরি ভূরি লেখা হয়নি তা নয়, কিন্তু শতবার্ষিকীর নৈমিত্তিক ধ্যান এক রকমের অন্য নিত্য-রচনা অন্য ধরনের।

* * *

কিন্তু এই মানুষ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয়, তারও বর্ণনা দেওয়া হওয়া কি সহজ? প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ আর পাঁচজন কবি কিংবা গায়কের মত আপন কবিতা বা গান রচনা করার পর চট করে ধূলার সংসারে ফিরে এসে রাম-শ্যাম-যদুর মত তাস পিটে, হুঁকো টেনে দিন কাটাতেন না। দৈনন্দিন জীবনে ফিরে আসার পরও তাঁর বেশভূষা, বাক্যালাপ, আচার-আচরণে, দুষ্টের দমনে এবং শিষ্টের পালনে (আশ্রমের ছাত্রদের কথা হচ্ছে) তিনি কবিই থেকে যেতেন। এমন কি, আশ্রমের নর্দমা সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় কবিজনোচিত কোনো বাক্য বেমানানসই মনে হলে—এবং মনে রাখা উচিত সেই বেমানানসইটাও তাঁর কবিসুলভ হৃদয়ই ধরে নিত—সেটাকে তিনি অন্তত কিছুটা হাস্যরস দিয়ে উচ্চ পর্যায়ে তুলে নিয়ে আসতেন। কিংবা সামান্য একটু অন্য ধরনের একটি উদাহরণ নিন।

তাঁর ভৃত্য বনমালী তাঁর জন্য এক গেলাস শরবৎ এনে দেখে বাইরের কে বসে আছেন। বনমালী থেমে যাওয়াতে কবি বললেন, 'ওগো বনমালী দ্বিধা

কেন ?' কবি বলেছিলেন সাধারণ ধুলো-মাটির দৈনন্দিন ভাষাকে একটু মধুরতর করার জন্যে। অথচ এ-দুটি তাঁর নিজের মনেও এমনই চাঞ্চল্য তুললো যে, তিনি সেদিনই গান রচনা করলেন,

হে মাধবী, দ্বিধা কেন,
আসিবে কি ফিরিবে কি—
আঙিনাতে বাহিরেতে
মন কেন গেল ঠেকি ॥

এমন কি কমলালেবুর সওগাৎ পেয়ে, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে যে তাঁকে সেগুলো নিবেদন করেছিল, তার স্মরণে তিনি যে-সব কবিতা লিখেছেন, সেগুলো অনেক পাঠকই তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে না চিনেও স্মরণ করতে পারবেন।

এতেও কিন্তু তাঁর এদিকটার পরিচয় অতিশয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমরা তাঁকে প্রধানত চিনেছি গুরুরূপে। সে সম্বন্ধে সুধীরঞ্জন দাশ, প্রমথনাথ বিশী প্রাঞ্জল ভাষায় সবিস্তর লিখেছেন—আমারও সংক্ষেপে লেখার সুযোগ অন্যত্র হয়েছে। কিন্তু কেমন যেন মনে হয়, আমরা যেটুকু অসম্পূর্ণভাবে দেখেছি, সেটিও যেন সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারিনি।

এমন গুরু হয় না। পড়াবার সময় তিনি কখনো বাক্য অসম্পূর্ণ রাখতেন না —প্যারেনথেসিসে, অর্থাৎ এক বাক্যের ভিতর অন্য বাক্য এনে কখনো ছাত্রদের মনে দ্বিধার সৃষ্টিও করতেন না, এবং প্রত্যেকটি বক্তব্য তাঁর পরিপূর্ণ মধুরতম ভাষায় প্রকাশ করতেন। আমার মনে কণামাত্র দ্বিধা নেই যে, তাঁর ক্লাস-পড়ানো যদি কেউ শব্দে শব্দে লিখে রাখতে পারতো তবে সে রচনা তাঁর 'পঞ্চভূত' কিংবা অন্য যে-কোনো শ্রেষ্ঠ রচনার সঙ্গে একাসনে বসতে পারতো। এমন কি একথাও অনায়াসে বলা যায়, সে হত এক অদ্ভুত তৃতীয় ধরনের রচনা। এবং আশ্চর্য, তারই মাঝে মাঝে তিনি আমাদের প্রশ্নও জিজ্ঞেস করেছেন, উত্তরগুলো শুদ্ধ করে দিয়েছেন, তার একটি-আধটি শব্দ বদলে কিংবা সামান্য এদিক-ওদিক সরিয়ে তাকে প্রায় সুষ্ঠু ভদ্র-গদ্যে পরিণত করেছেন।

ছাত্রের সব প্রশ্নের উত্তর কোনো গুরু দিতে পারেন কি না বলা কঠিন, কিন্তু এটুকু বলতে পারি, আমাদের সম্ভব-অসম্ভব সব প্রশ্নের কথা ভেবে নিয়ে প্রতিদিন তিনি অনেক মূল্যবান (মূল্যবান এই অর্থে বলছি যে, তিনি যদি ঐ সময়ে বিশ্বজনের জন্য গান কিংবা কবিতা রচনা করতেন, তবে তারা হয়ত বেশী উপকৃত

হত) সময় ব্যয় করে 'পড়া তৈরী' করে আসতেন। শেলী-কীটসের বেলা তা না হয় হল, কিন্তু একথা কি সহজে বিশ্বাস করা যায়, তিনি তার আপন রচনা 'বলাকা' পড়াবার সময়ে পূর্বে দেখে নিয়ে রেখে তৈরী হয়ে আসতেন!

এই ক্লাসেরই বৃহত্তর রূপ আমাদের সাহিত্য-সভা।

রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত নিয়মানুরাগী ছিলেন। যদিও আমাদের সাহিত্য-সভা নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার, তবু তিনি যেভাবে সে-সভা চালাতেন, তার থেকে মনে হত—অন্তত আইনের দিক দিয়ে—যেন তিনি কোনো লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডারের মিটিং পরিচালনা করছেন। কোথায় কখন সভা হবে, তার কর্মসূচী বা এজেণ্ডা নিয়মানুযায়ী হল কি না, প্রত্যেকটি জিনিস তিনি অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। একটি সামান্য উদাহরণ দিই।

সভাতে পাকাপাকিভাবে এজেণ্ডা অনুযায়ী গান, প্রতিবেদন-পাঠ (মিনিটস্ অব দি লাস্ট মিটিং), প্রতিবেদনে কোনো আপত্তি থাকলে সে সম্বন্ধে আলোচনা এবং সর্বসম্মতিক্রমে তার পরিবর্তন, প্রবন্ধ পাঠ, আবৃত্তি, সংগীত ইত্যাদির পর সাধারণের বক্তব্য (জেনারেল ডিসকাশন) শেষ হয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সভাপতির বক্তব্য বলতেন। এবং বিষয় গুরুতর হলে তাকে এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিতেও শুনেছি।

একদা প্রতিবেদন পাঠের সময় সভার সব কিছু উল্লেখ করার পর আমি পড়ে যাচ্ছি। 'সর্বশেষে গুরুদেব সভাপতির বক্তব্যে বলেন—'

এখানে এসে আমি থামলুম। কারণ গুরুদেব তাঁর পূর্ববর্তী সভাতে প্রায় এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দিয়েছিলেন, এবং আমার প্রতিবেদনে তার সারাংশ লিখতে গিয়ে সাধারণ খাতার প্রায় আট পৃষ্ঠা লেগেছিল। আমার মনে সন্দেহ জাগলো, এই দীর্ঘ আট পৃষ্ঠার প্রতিবেদন শোনার মত ধৈর্য গুরুদেবের থাকবে কিনা। কারণ যে জিনিস তিনি অতি সুন্দর ভাষায় এক ঘণ্টা ধরে বলেছেন, তারই সারাংশ লিখেছে একটি আঠারো বছরের বালক তার কাঁচা, অসংলগ্ন ভাষায়। সেটা শোনা কবির পক্ষে স্বভাবতই পীড়াদায়ক হওয়ার কথা। আমি তাই পড়া বন্ধ করে গুরুদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে দ্বিধাভরা স্বরে শুধালুম, 'এই সারাংশটি আট পৃষ্ঠার। পড়বো কি? তিনি তাঁর চিবুকে হাত রেখে আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'পড়ো।' আমাকে পড়তে হলো। লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল। কিছুদিন পরে দ্বিতীয় সভাতেও তারই পুনরাবৃত্তি। এবারেও সেই দ্বিধা প্রকাশ করলুম। একই উত্তর, 'পড়ো'।

তখন বুঝলুম, তিনি সম্পূর্ণ না শুনে প্রতিবেদন-পুস্তকে তাঁর নাম সই করবেন না। সেটা নিয়মানুযায়ী—লীগেল নয়।

কিন্তু পাঠককে চিন্তা করতে অনুরোধ করি, আঠারো বছরের ছোকরার কাঁচা বাঙলায় লেখা তারই সর্বাঙ্গসুন্দর বক্তৃতার বিকলাঙ্গ প্রতিবেদন শোনার মত পীড়াদায়ক অভিজ্ঞতাও তিনি এড়িয়ে যেতেন না। আমার শুধু মনে হত, এই অযথা কালক্ষয় না করে ঐ সময়টুকু বাঁচিয়ে তিনি তো কোনো মহৎ কাজ করতে পারতেন!

* * *

রবীন্দ্রনাথ আমাদের গুরু এবং তিনি কবি। তাই তিনি আমাদের কবিগুরু। তিনি অবশ্য তাবৎ বাঙালীর কাছেই 'কবিগুরু', কিন্তু সেটা অন্যার্থে অন্য সমাস। আমরা তাঁর কবি-রূপ দেখেছি অন্যভাবে।

তিনি দিনের পর দিন কবিতা, প্রবন্ধ, ছোট গল্প এবং বিশেষ করে গান রচনা করে যেতেন এবং প্রত্যেকটি শেষ হলেই আমাদের ডেকে শোনাতেন। এই ভিন্ন রূপটি সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই সচেতন ছিলেন।

কোনো কবিতা লেখা শেষ হলে তিনি সেটি শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবিশকে কপি করে পাঠাতেন। একবার একটি গান পাঠিয়ে সঙ্গের চিঠিতে লেখেন,—

'বলা বাহুল্য, বর্ষামঙ্গলের গানগুলি একটা-একটা করে রচনা করা হয়েছে। যারা বইয়ে পড়বে, যারা উৎসবের দিনে শুনবে, তারা সবগুলি একসঙ্গে পাবে। প্রত্যেক গান যে অবকাশের সময় আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেটাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে তারা দেখবে। আমার বিবেচনায় এতে একটা বড় জিনিসের অভাব ঘটল। আকাশের তারাগুলি ছিঁড়ে নিয়ে হার গাঁথলে সেটা বিশ্ব-বেনের বাজারে দামী জিনিস হতেও পারে, কিন্তু রসিকেরা জানে যে, ফাঁকা আকাশটাকে তৌল করা যায় না বটে কিন্তু ওটা তারাটির চেয়েও কম দামী নয়। আমার মতে যেদিন একটি গান দেখা দিলে, সেইদিনই তাকে স্বতন্ত্র অভ্যর্থনা করে অনেকখানি নীরব সময়ের বুকে একটিমাত্র কৌস্তভমণির মতো ঝুলিয়ে দেখাই ভালো। তাকে পাওয়া যায় বেশী। বিক্রমাদিত্যের সভায় কবিতা পড়া হত, দিনে দিনে, ক্রমে ক্রমে—তখন ছাপাখানার দৈত্য কবিতার চারদিকের সময়াকাশকে কালি দিয়ে লেপে দেয়নি। কবিও প্রতিদিন স্বতন্ত্র পুরস্কার পেতেন—উপভোগটা হাইড্রলিক জাঁতায় সংক্ষিপ্ত পিণ্ডাকারে এক গ্রাসের পরিমাণে গলায় তলিয়ে যেত না।

লাইব্রেরিলোকে যেদিন কবিতার নির্বাসন হয়েছে, সেদিন কানে শোনার কবিতাকে চোখে-দেখার শিকল পরানো হল, কালের আদরের ধন পাব্লিশারের হাটের ভিড়ে হলো নাকাল। উপায় নেই—নানা কারণে এটা হয়ে পড়েছে জটলা পাকানোর যুগ—কবিতাকেও অভিসারে যেতে হয় পটলডাঙার কলেজপাড়ায় অগ্নিবাসে চড়ে। আজ বাদলার দিনে আমার মন নিঃশ্বাস ফেলে বলছে, "আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে"—দুর্যোগে জন্মালুম ছাপার কালিদাস হয়ে—মাধবিকা, মালবিকারা কবিতা কিনে পড়ে—জানলার পাশে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনে না। ইতি—১৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৬" (দেশ, ১৩৬৮, পৃ ৮৩৫)।

আমরা তাঁকে পেয়েছি যেভাবে তিনি চেয়েছিলেন—তাঁরই ভাষায় বলি, 'আজকের দিনের মাধবিকা, মালবিকার মত নয়।

কিন্তু এই রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দিয়ে গঙ্গাজলে যে গঙ্গাপুজো করলুম, তারপর নিজের আর কোন্ অর্ঘ্য এনে বিড়ম্বিত হই ?

মোল্লা ফরেজ

অপেক্ষাকৃত বয়স্কদের স্মরণ থাকিবার কথা আমানউল্লা আফগানিস্তানকে রাতারাতি ফ্রান্সভূমিতে পরিবর্তন করিতে গিয়া কি দুরবস্থায় রাজত্ব হারান। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি কাবুল হইতে পলায়ন করিলে পর দস্যু-দলপতি হবীবউল্লা, তখল্লুস বাচ্চা-ই-সকাও (ভারতবর্ষে বাচ্চা-সক্কা নামে পরিচিত) কাবুল ও উত্তর আফগানিস্তানের বাদশা হন।

বাচ্চা ডাকাত। কাজেই রাজা হইয়া কাবুলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার দুরভিসন্ধি তাঁহার ছিল না। শান্তি স্থাপন করা অর্থ লুটতরাজ বন্ধ করা, আর লুটতরাজ বন্ধ করিলে তাঁহার সৈন্যেরাই বা মানিবে কেন? তাহাদিগকে তো ঐ লোভেই দলবদ্ধ করিয়া আমানউল্লার সঙ্গে লড়ানো হইল। রাজকোষ হইতে অর্থ দিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিবার কথাই উঠে না, কারণ আমানউল্লা তাহার অর্ধেক ফুঁকিয়া দিয়াছিলেন নানারকম বিবেকবুদ্ধিহীন, অর্থগৃধ্নু দলপতিদিগকে বাচ্চার সঙ্গে লড়িবার জন্য প্ররোচিত করিতে গিয়া। দলপতিরা টাকা লইয়াছিল অসঙ্কোচে ও ততোধিক অসঙ্কোচে ও তৎপরতার সঙ্গে টাকা লইয়া উধাও-ও তাহারা হইয়াছিল। কিছু দিয়া কিছু হাতে রাখিয়া, টালবাহানা দিয়া লড়ানোর হুঁশিয়ার ফেরেব্বাজী জানিতেন আমানউল্লার পিতা আমীর হবীবুল্লা ও তাঁহার

পিতামহ, পরমনমস্য আমীর আব্দুর রহমান।

'জলের মত অর্থব্যয়' আর কলিকাতা শহরে বলা চলে না কাজেই বলি ইনফ্লেশেনী অর্থব্যয় করিয়া যখন আমানউল্লা লড়াই ও অর্থ উভয়ই হারাইলেন তখন তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। সূর্যোদয়ের পূর্বেই এক কালরাত্রিতে তিনি বাকি অর্ধেক অর্থ লইয়া কান্দাহার মামার বাড়ী পলায়ন করিলেন—বিপদকালে আমীর-ফকির সকলেই মামার বাড়ীর সন্ধান লয়।

কান্দাহার ইন্তিংার মেহমনদারী করিল বটে, কিন্তু যুদ্ধে প্রাণ দিতে নারাজ এ তত্ত্বওটি বুঝাইয়া দিল। আমানউল্লা তখন দেশত্যাগ করিলেন।

এদিকে বাচ্চার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চমস্তম্ভীয় মোল্লাদের জেল্লাই বাড়িল কিন্তু অর্থাগম সরগরম হইল না। বাচ্চার সৈন্যকেই যখন লুট করিয়া জান বাঁচাইতে হয়, তখন মোল্লার তত্ত্বতালাশ করিবে কোন্ ইয়ার—ডাকুর সর্দারের তো কথাই উঠে না। তবুও বাচ্চা কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য মোল্লাদের চেল্লাচেল্লিতে কান দিলেন—তাঁহাদিগকে নানারকম ছোটখাটো চাকরি দিলেন। কিন্তু যে-দেশে বিশেষ কায়দায় পাগড়ী পরিলেই মোল্লা হওয়া যায় সেখানে মোল্লার সংখ্যা সাকুল্যে বিল্লির চেয়ে বেশী। বাচ্চা নিরুপায় হইয়া ফালতুদিগকে 'মুহতসিব' কর্মে নিযুক্ত করিয়া কাবুল বাসিন্দাদিগের পশ্চাতে লেলাইয়া দিলেন।

মুহতসিব এক অদ্ভুত কর্মচারী। ইনি একরকম 'রিলিজিয়স পুলিসম্যান'। তাঁহার কর্ম হাতে চাবুক লইয়া রাস্তাঘাটে নিরীহ প্রাণীকে নানারকমে উদ্ব্যস্ত করা। 'আজানের পর তুমি এখানে ঘোরাঘুরি করিতেছ কেন, ঈদের নামাজে কয়বার সেজদা দিতে হয়, আসরের নামাজের পর নফল পড়া মুনাসিব কিনা, ইফতারের নিয়ম কি?' ইত্যাদি নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর না পাইলে মুহতসিব নাগরিকের পৃষ্ঠদেশে নির্মম চাবুক লাগান, অথবা নাগরিক ঠিকঠিক ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া মুহতসিবের দক্ষিণহস্তে ক্ষিপ্রগতিতে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন নহে—পৃষ্ঠরক্ষা করে। মুহতসিব প্রতিষ্ঠানই খারাপ একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু অজ্ঞ মোল্লাকে বেতন না দিয়া নাগরিকের পশ্চাতে লাগাইয়া দিলে সে যে বহুদিন যাবৎ গৃহস্থের অন্ন ধ্বংস করিয়া কাননস্থ মহিষকে তাড়না করিবে না তাহাতে কি সন্দেহ? বিজ্ঞ এবং ধার্মিক মোল্লারা এই মতই পোষণ করিতেন।

১৯২৮-২৯-এর শীতকালে কাবুলের রাস্তায় একদিকে লুটতরাজ অন্যদিকে মুহতসিব।

আমাকে একদিন ঐ সময় বিশেষ কর্মোপলক্ষে বাহির হইতে হইয়াছিল। বিশেষ কি, অত্যন্ত বিশেষ কর্ম থাকিলেও তখন কেহ বাহির হইত না। কারণ যেখানে মরণ-বাঁচন সমস্যা সেখানে রাস্তায় নিশ্চয় প্রাণ দিতে বাহির হইবে কে? কিন্তু আমি নিতান্ত নিরুপায় হইয়া দুইটি প্রাণ বাঁচাইবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম —বন্ধুবরকে রাখিয়া গিয়াছিলাম তাঁহার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে সাহস দিতে ও নিজে ডাক্তারের সন্ধানে।

পথে মোল্লা আবুল ফয়েজের সঙ্গে দেখা। তিনি ছিলেন মকতব-ই-হবীবিয়ার ধর্মশাস্ত্র বা দীনিয়াতের অধ্যাপক—আমার সহকর্মী। মোল্লাজী ছিলেন পরস্পরবিরোধী আচার-বিশ্বাসের মানোয়ারী জাহাজ। দেওবন্দের টাইটল কোর্স পাস ভাষ্যকর দিগ্‌গজ মৌলানা—অথচ পরিতেন স্যুট, পাগড়ী না—কারাকুলি টুপি অথবা ফেল্ট হ্যাট, গোঁফ ছিল কিন্তু দাড়ি অতি নিয়মিত কামাইতেন! নামাজ কড়াগণ্ডায় আদায় করিতেন, রোজা ফাঁকি দিতেন না; কিন্তু অন্য কোনো ধর্মকর্ম বা ধর্মালোচনায় কখনো তাঁহাকে লিপ্ত হইতে দেখি নাই। অনুসন্ধিৎসু হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতেন, কিন্তু কলেজের অন্যান্য মোল্লাদের সঙ্গে মসলা মসাইল লইয়া কখনও বাকবিতণ্ডা করিতেন না। আমানউল্লার পক্ষ লইয়া হামেশা লড়িতেন এবং আফগানিস্তানের স্বাধীনতা রক্ষা করার একমাত্র উপায় যে ইংরেজ-রুশকে বাঁদরনাচ নাচাইয়া সে-বিষয়ে তাহার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। প্রকাশ্যে সেই রায়ই জাহির করিতেন।

তাঁহাকে রাস্তায় পাইয়া যেন জান কলবে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া আমার সেই কলব ধুকুধুকু করিতে লাগিল। বাচ্চার ভয়ে তখন বিদেশী ছাড়া কেহই স্যুট পরিবার সাহস করিত না। প্যারিস-ফের্তা পয়লা নম্বরের কাবুলী সায়েবরা তখন কুড়িগজি শেলওয়ার ও বাইশ-গজী পাগড়ী পরিতে আরম্ভ করিয়াছে। অথচ দেখি মোল্লা আবুল ফয়েজ সেই মারাত্মক চেকের কোটপাতলুন পরিয়া নির্বিকারচিত্তে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া আলিঙ্গন করিলেন ও আমার মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও আমাকে আমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিবার প্রস্তাব নিজেই করিয়া নিজেই বহাল করিলেন। আমি তাঁহাকে ঐ উৎকট সঙ্কটের সময় কেন স্যুট পরিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিতে যাইব এমন সময় কোথা হইতে এক ভীষণ-দর্শন মুহতসিব ততোধিক রোমাঞ্চন প্রজনন চাবুক হস্তে লইয়া আমাদিগকে ক্যাক্ করিয়া ধরিল।

আমার দিকে তাকাইয়া মুহতসিবজী বলিলেন, "আপনি (শুমা) বিদেশী,

আপনার উপর আমার কোনো হক নাই। আপনি যাইতে পারেন।"

বান্ধব-ত্যাগ সঙ্কটের সময় অনুচিত। বিশেষতঃ সেই বান্ধব ত্যাগ করিয়া যখন বৈদ্যরাজের বাড়ীতে একা যাওয়া ততোধিক অনুচিত অর্থাৎ প্রাণহানির সম্ভাবনা। সবিনয়ে বলিলাম, "হুজুর যদি ইজাজত দেন তবে দোস্তের আখেরী হাল কি হয় দেখিয়া যাইবার ইরাদা।" মুহতসিব বিরক্তির সঙ্গে বাঞ্ছিত ইজাজত মঞ্জুর করিলেন।

এদিকে দেখি মোল্লা আবুল ফয়েজ ঊর্ধ্বমুখে, নির্বিকারচিত্তে কাবুল পর্বত-গাত্রে চিনার পত্রে সূর্যরশ্মির ক্রীড়াজনিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অভিনিবেশ সহযোগে নিরীক্ষণ করিতেছেন। কোন্ বিপদে, কোন্ ভাবে, তাহার খেয়ালই নাই।

মুহতসিবের মুখ দিয়া তখন শিকার ভোজনের লালা পড়িতেছে। সুটপরা কাবুলী! বেদীন নিশ্চয়ই 'দীনের' 'দ'ও জানে না, ইহাকে দীনিয়াতের তর্ক-বিতর্কের দ'য়ে মজাইতে ডুবাইতে কতক্ষণ! তারপর বিলক্ষণ অর্থাগম।

হায় মুহতসিব, তোমার হাতে চাবুক থাকুক আর নাই থাকুক, জানিতে না কোন্ বাঘার খপ্পরে পড়িয়াছ!

হুঙ্কার দিয়া, শহর-আরা হইতে চিল-সকুন প্রকম্পিত করিয়া মুহতসিব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল্ তো দেখি (ফার্সীতে দুই রকম সম্বোধন আছে, 'শুমা' অর্থাৎ 'আপনি' বা 'তুমি', আর 'তু' অর্থাৎ তুই—অপরিচিত কাহাকেও 'তু' বলা অভদ্রতার চরম লক্ষণ) কোন্ ইঁদারায় ইঁদুর পড়িয়া মরিয়া গেলে, সেই ইঁদারা হইতে কয় ডোল পানি তুলিলে পর সেই পানি নামাজের জন্য পুনরায় পাক বা জাহিজ হইবে?"

প্রশ্নটি কিছু সৃষ্টিছাড়া নহে। কিন্তু সাধারণ নাগরিককে এহেন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা দুষ্টবুদ্ধির কর্ম। মুহতসিবের কর্তব্য সাধারণ নাগরিককে নিত্য অবশ্য প্রয়োজনীয় নামাজ রোজা সংক্রান্ত প্রশ্ন করা, যেগুলি না জানিলে ফর্জ কর্মগুলি আদায় করা যায় না। ইঁদারা কোন্ অবস্থায় পাক আর কোন্ অবস্থায় না-পাক এ প্রশ্নের উত্তর দিবেন অলিম মৌলবী-মৌলানারা। কারণ কাহারো ইঁদারায় ইঁদুর পড়িলে ব্যাপারটা এমন কিছু জরুরী দীন-ঘাতি নয় যে, তাহার ফৈসালা না জানিলে তদ্দণ্ডেই কাফির হইয়া যাইবার সমূহ সম্ভাবনা। সাধারণ নাগরিককে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার অর্থ আর কিছুই নহে, তাহাকে বিপদারণ্যে নিক্ষেপ করা ও তৎপরে গুলী করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করা।

দেখি মোল্লা আবুল ফয়েজ তখনো তাঁহার সঙহিট্ গুনগুন করিতেছেন,—

"শবি আগর আজ লবে ইয়ার বোসয়ে তলবম
জোয়ান শওম, জসেরো জিন্দেগী দুবারা কুনম।" *

মুহতসিব এবারে দারুল আমান হইতে খাক-ই-জব্বার পর্যন্ত বিদীর্ণ করিয়া চীৎকার করিলেন, "শুনিতে পাস নাই?"

আবুল ফয়েজ বলিলেন, "বিলক্ষণ, কিন্তু মসালা এতই প্যাঁচিদা যে মুক্ত রাজ-বর্ত্মে তাহার সমূহ আলোচনা ও সমস্যা-নিরূপণ সহজে সম্ভব হইবে না। এই তো কাওয়াখানা, চলুন চা খাইতে খাইতে শাস্ত্রালোচনা ও অন্যান্য বিবেচনা করা যাইবে।"

'অন্যান্য বিবেচনার' কথা শুনিয়া মুহতসিবের দুষ্টমুখে মিষ্টহাসি খেলিয়া গেল—যেন কাবুলি বরফে সোনালি রোদ—বাঙলায় যাহাকে বলে 'গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি!'

কাওয়াখানায় ঢুকিয়া মোল্লা আবুল ফয়েজ ছোকরাকে দুইজনের জন্য চা আনিতে বলিলেন। আমি নিজের জন্য চা'র হুকুম দিতে গেলাম—মোল্লা ফয়েজ আমাকে থামাইয়া বলিলেন, "সে কি কথা, দুইজনের চা তো তোমার আমার জন্য। মুহতসিব সাহেবকে আমরা চা খাওয়াইব কি করিয়া, সে তো রিশওদ দেওয়া হইবে; তওবা, তওবা, সে বড় অপকর্ম, কবীরা গুণাহ, ওস্তাগফিরুল্লাহি রব্বি জম্বি মিন কুল্লি, ওতুবু ইলাইহি।"

বলিয়া মুহতসিবের দিকে কটাক্ষে চাহিয়া এক গাল হাসিয়া লইলেন।

মুহতসিব রাগে সিদ্ধ-চিংড়ির রঙ ধারণ করিয়াছেন। তবে কাওয়াখানার পাবলিক অর্থাৎ আমাজুন্নাসের সম্মুখে হুংকার দিবার ঠিক হিম্মৎ না পাইয়া বলিলেন, "ফিতরতি রাখ্, সওয়ালের জবাব দে।"

মোল্লা ফয়েজ বলিলেন, খাস আরবীতে "ইস্তান্না সুগাইর", অর্থাৎ 'ধৈর্যংকুরু'; "মসালা খয়নী পেচিদা অর্থাৎ বড়ই প্যাঁচালো। ঝটপট উত্তর হয় না, প্রথম বিবেচনা করা উচিত—বায়দ দীদা শওদ—ইঁদুর কেন ইঁদারায় পড়িল? সেই সবব মজবুত পাকাপোখতা মওজুদ না হওয়া পর্যন্ত জবাব অত্যন্ত কঠিন, বসীয়ার দুশওয়ার!"

মুহতসিব চটিয়া বলিলেন, "কী বাজে বকিতেছ, ইঁদুর ইঁদারায় পড়িয়াছে সেই তো কাফী।"

---

* আজি এ নিশীথে প্রিয়া অধরেতে চুম্বন যদি পাই
যৌবন পাব, গোড়া হতে তবে এ জীবন দোহরাই।

মোল্লা ফয়েজ বারতিনেক অর্ধচক্রাকারে দক্ষিণ হইতে বাম দিকে মস্তকান্দোলন করিয়া বলিলেন, "ওয়াহ ওস্তাদ! কারণ বিনা কার্যের অনুসন্ধান—বেগয়ের ওয়াজহ তফতীশ বিলকুল বেফায়দা। প্রথম মনঃসংযোগ করিয়া দেখিতে হইবে ইঁদুর কেন ইঁদারায় পড়িল। তাই তো বলিলাম, খসালা বসীয়ার পেচিদা। তবু আপনার তকদীর ভালো—আমার মত পাক্কা ফীকাহ জাননেওয়ালা পাইয়াছেন। শুনুন, আমার মনে হয়, ইঁদুরকে কোনো বিড়াল তাড়া করিয়াছিল, তাই সে প্রাণের ভয়ে ইঁদারার দিকে পলাইয়া যায় ও জলে ডুবিয়া মরে। নয় কি?"

এই বলিয়া মোল্লা ফয়েজ আমার দিকে এমন ভাবে তাকাইলেন যেন গভীর অতল সমুদ্র হইতে অতি উজ্জ্বল বহুমূল্য খনি উত্তোলন করিয়াছেন। সে-তাকানোতে আত্মশ্লাঘা যেন ঝিলমিল করিয়া উঠিল।

আমি হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে ঠিক আন্দাজ করিতে না পারিয়া অন্ধকারেই লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া বলিলাম, "বেশক, আলবৎ, জরুর।"

মোল্লা ফয়েজ পরম পরিতোষের দিলখুস হাসি হাসিয়া বলিলেন, "দেখুন মুহতসিব সাহেব, দীনদুনিয়ার মামেলায় নাদান এই নওজোয়ানও সায় দিতেছে। আচ্ছা, আবার মোদ্দা কথায় ফিরিয়া যাই। যখন প্রমাণসবুত হইল যে প্রাণরক্ষার্থে মূষিক কূপতলস্থ হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে তখন সে তো শহীদ। কারণ, কোন্ উল্লু জানে না, জান বাঁচানা ফর্জ? ফর্জকাম করিতে গিয়া ইঁদুর শহীদ হইল। তাহার কবর হইবে বিনা দফন কাফনে। তাহাই হইল। শহীদের লাশ পানি নাপাক করিবে কেন? পানি দুরুস্ত।"

মুহতসিব দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া বলিলেন, "সে কি কথা?"

মোল্লা ফয়েজ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, "ইস্তান্না, ইস্তন্না সুগহির, সবুর, সবুর। মসলা মসাঈলের মামেলা, ধীরেসুস্থে কদম ফেলিতে হয়। ইঁদুর মরিবার আরও তো কারণ থাকিতে পারে, সবব কি আর নাই?

এও তো হইতে পারে যে, ইঁদুর জান বাঁচানার ফর্জকামে মসগুল ছিল না। সে ইঁদারার কিনারায় খেল-কূদ করিতেছিল, হঠাৎ পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়া জান কব্জ হইল। তাহা হইলে তো সে আলবত্তা শহীদ নহে। তবেই সওয়াল—আর সে সওয়াল আরও পেচিদা—ইঁদুরের দরজা কি? আমি বহুত তফতীশ করিয়া দেখিলাম, ইঁদুর যে খেল-কূদ করিতেছিল সে সম্পর্কে হদীস আছে। নও-মুসলিম ও আনসাররা মদীনা শরীফে বহুত খেল-কূদ করিতেন কাফেরের সঙ্গে লড়িবার জন্য। লেহাজা কাজে কাজেই আনসাররা যাহা কর্তব্যকর্ম বিবেচনা

করিয়া করিতেন তাহা নবীর উপদেশ মতই। অতএব ফর্জ কাজের ফায়দা না পাইলেও সে কর্ম সুন্নতুন্নবী, অর্থাৎ নব'র আদেশে-কৃত অতিশয় অনুমোদিত পুণ্য কাজ। তাহার লাশেও তো পানি না-পাক হইতে পারে না। কি বলো, আগা জান ?" শুধাইয়া মোল্লা ফয়েজ আরেক দস্ত হাসিয়া লইলেন।

মুহতসিব বেশ কড়া সুরে বলিলেন, "দেখ, ওসব ঠাট্টা মশকরার কথা নয়—"

"সবুর সবুর", মোল্লা ফয়েজ বলিলেন "সবুর করুন সরকার। বুঝিলাম, আপনার রসকস বিলকুল নাই। তবে মরুন গিয়া আপনার দশ ডোল না বারো ডোল পানি তুলিয়া,—পাড়ার যে কোন মোল্লাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে বাতলাইয়া দিবে। ভাবিয়াছিলাম, গুণীজনের সহবতে আসিয়াছেন, জখমী মসলা মসাইল দুরুস্ত করিয়া লইবেন, সে মতলব যখন নাই তখন আমি বে-চারা না-চার। চলো হে আগাজান, তুমি না হেকিমের বাড়ী যাইবে !"

বাহির হইবার সময় শুনিলাম, কাওয়াখানায় অট্টহাস্যের রোল উঠিয়াছে।

বড়লাটি লাঠি

বড়লাট ভারতবর্ষের নেতাদের ডাকিয়া তাঁহাদের হাতে লাঠি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ; যাহাতে তাঁহারা গাঁটের খাইয়া মনের আনন্দে বনের মহিষ তাড়াইতে পারেন। নেতারা সে লাঠিটা আত্মসাৎ করিবার লোভে একে অন্যের বাড়ীতে বিস্তর হাঁটাহাঁটি বিস্তর লাঠালাঠি করিয়া দেখিলেন ভাগবখরার প্রচুর বখেড়া। কেহ চায় সে লাঠির পাঁচ বিঘৎ, কেহ চায় তিন বিঘৎ, কেহ বলে লাঠিটা উদয়াস্ত বন্‌বন্‌ করিয়া ঘুরিবে, কেহ বলে, না, যখন বড়লাটি লাঠি তখন লাট সাহেব ইচ্ছা করিলেই বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন। ইত্যাকার বাক্য বিনিময় মনো-মালিন্যের পর যখন কিছুতেই কোনও প্রকার চরম নিষ্পত্তি হইল না, তখন লাট সাহেব প্রকাশ্যে অশ্রুবর্ষণ করিয়াও গোপনে সানন্দে মৌলা আলীতে মানত পূর্ণ করিয়া লাঠিখানা মাচাঙে তুলিয়া রাখিলেন। লাঠিখানি তিলোত্তমার কার্য উত্তমরূপে সমাধান করিয়াছে। ভবিষ্যতে যদি দেখা যায় আবার সুন্দ উপসুন্দ ভাই-ব্রাদার হইয়া কৌসিল রণাঙ্গণে দেবতাদের পর্যুদস্ত করিবার উপক্রম করিয়াছে, তাহা হইল শুষ্ক যষ্টিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

বড়ভাই বলিতেছেন, ছোটভাই বড়ই অর্বাচীন ; ছোট ভাই বলিতেছেন, 'ভাই

ভাই কোরো না বলছি। তুমি আমার ভাই নাকি, তুমি আমার জানি দুশমন।' তিলক-কাটা গোঁড়া ভাইকে ডাকা হয় নাই বলিয়া তিনি খণ্ডিত বিপ্রলব্ধের ন্যায় রোদন করিতেছিলেন (এমন কি এই শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে যাইবেন বলিয়া মস্কোর ফলার উপেক্ষা করিয়া অনুশোচনা করিতেছিলেন), লাঠির ভাগাভাগি হইল না দেখিয়া পরমানন্দে বগল বাজাইতেছেন।'

আমরা দুঃখিত হই নাই, আনন্দিতও হই নাই। এ যষ্টি যে আমাদের তমসাবৃত দেশকে জ্যোতিতে লইয়া যাইবে, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাইবে এমন আশা আমরা কখনও করি নাই। যুদ্ধের পর বেকারী, অর্থাভাব, পল্টনফের্তা সৈন্যের কৃষিক্ষেত্রাভাব ইত্যাদি যে গন্ধমাদন জগদ্দলন হইয়া আমাদের দেশে বুকের উপর চাপিবে, তাহা ঐ যষ্টি-লিভার দ্বারা উত্তোলন করা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। এতদ্ব্যতীত যষ্টি লোভ না করার আরও বাহান্নটা কারণ আছে তাহার নির্ঘণ্ট অথবা ফিরিস্তি উপস্থিত নিষ্প্রয়োজন। শুধু বাহান্ন নম্বরের কারণটা নিবেদন করি; যাহারা মানদণ্ডকে রাজদণ্ডে পরিণত করিতে পারে, তাহাদের সে-রাজদণ্ড হর্ষের ন্যায় সন্তোষক্ষেত্রে দান করিবার ক্ষমতা নাই।

অপিচ অকপট চিত্তে স্বীকার করি যে, বিপক্ষে বাহান্নটা কারণ থাকা সত্ত্বেও যষ্টিতে লোভ করিবার স্বপক্ষে একটি প্রকৃষ্ট যুক্তি ছিল। সে যুক্তি নিবেদন করিতে আমাদের অত্যন্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ হয়, কারণ যাঁহাদের জন্য আমাদের এই লোভ তাঁহারা হয়ত এই বৃত্তিকে ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য ভাবিয়া আমাদিগকে ধিক্কার দিবেন।

আমরা রাজবন্দীদের কথা ভাবিতেছি। '৪২ আন্দোলনের দেশসেবক, তৎপূর্ববর্তী তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী, স্টালিন-বিরোধী গণতন্ত্রী, জমিয়ত 'উল-উলমার কর্মিগণের কথা যখন ভাবি, তখন মনে হয় যে, ইঁহাদের দুঃখের অবসান যদি হিমালয়ের কলির শৈলেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়াই হয়, তবে তাহাই হউক। আত্মজন বন্ধুজন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা হইতে বৎসরের পর বৎসর বিরহ, দিনে দিনে জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার তুষানল দাহন, যৌবনের সূক্ষ্ম সুকুমার বৃত্তির নিষ্পেষণ, কারাগারে পাষাণপ্রাচীরের অন্তরালে বিপাকের বিভীষিকাময় রজনী যাপন, আশাহীন উদ্যমহীন নিঃসঙ্গ জীবন নিয়ত ঘূর্ণ্যমান তাঁহাদের অদৃষ্ট চক্রনেমিতে এইগুলিই তো তীক্ষ্ণ লৌহকীলক। স্বাধীনতা সংগ্রামে সফল হইয়া তাঁহাদের বিজয়মাল্যে বিভূষিত করিয়া হৃদয়ে টানিয়া লইবার আশা যখন দিন দিন মরীচিকার মত চক্রবাল হইতে চক্রবালান্তরে বিলীন হইয়া যাইতেছে তখন আর অত শাস্ত্র

মিলাইয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করিয়া কী-ই বা হইবে। বলিতে ইচ্ছা করে, হে গিরীশ্বর, হে গণ (পার্টি) পতিগণ, যে যাহা চাও লও। বুকের-শিরা-ছিন্ন-করা-ভীষণ পূজাই যদি আত্মজনের মুক্তি দিবার একমাত্র বিধান হয়, তবে পরাজয় স্বীকার করিতেছি। যে ইংরাজ রাজত্বকে একদিন 'শয়তানী' নাম দিয়াছিলাম আজ তাহারই প্রতীক বড়লাটকে দেশের 'প্রধান নেতা' বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলাম। মান-অপমান-বোধ আজ আর নাই। মুক্তি দাও, মুক্তি দাও, সে মুক্তি রাজকারা হইতে বাহির করিয়া নিত্য কারাগারে লইয়া যাইলেও তাহা শিরোধার্য।

বড়লাটি পরিকল্পনা গ্রহণ না করায় দেশ-বিদেশের বহু লোক বলিতেছেন, কংগ্রেস অসহযোগ করিয়া এমন অসহযোগমনা হইয়া গিয়াছেন যে, সে শুভক্ষণ শুভ যোগ চিনিতে পারিল না। গুজরাতি প্রবচন আছে যে, 'ছুৎবায়ুগ্রস্ত লোককে স্বয়ং লক্ষ্মী টিকা পরাইতে আসিলেও সে অন্ধকূপের দিকে ছুটে মুখ ধুইবার জন্য'। অর্থাৎ কংগ্রেসের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইয়াছে।

বড়লাটি পরিকল্পনা গ্রহণ করার অর্থ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যোগ দিয়া রাজ্য-চালন করা। অর্থাৎ তাহার পর দেশে যে সব আইনজারী হইবে, যে সব ক্রিয়াকর্ম হইবে তাহার জন্য ভারতবাসী দায়ী হইবে। বিদেশে যে সব ভারতীয় সৈন্য যাইবে সে মিশরেই হউক ফলস্তীনেই হউক আর মালয়েই হউক, তাহারা আইনতঃ ভারতীয়—আর শুধু ভারতীয় নহে, স্বাধীনতাকামী ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের আশীর্বাদ শিরে বহন করিয়া যাইবে; অথচ তাহাদের উপর কি আদেশ কখন হইবে তাহার নিয়ন্ত্রণাধিকার জাতীয়তাবাদীদের থাকিবে না। বিস্তর বাক্যবিন্যাস করিবার কোন প্রয়োজন নাই, একবার ভাবিয়া দেখিলেই হয় যে, যদি মিশরী সৈন্যরা একদিন কলিকাতার জনতার উপর কোন কারণে গুলী চালায়, আর যদি তখন ওয়াফদীরা মিশরের শাসনকর্তারূপে বিরাজ করেন—সে শাসন আইনত (ডি জুরে) হউক কার্যতই (ডি ফাক্টো) হউক—তাহা হইলে প্রাতঃস্মরণীয় সাইজগলুল পাশা ও তাঁহার অনুবর্তিগণের প্রতি আমাদের কতটুকু ভক্তি থাকিবে?

সে যাহাই হউক। কথাটা তুলিলাম এই কারণে যে, যদিও পরাধীন জাতির কোনো পলিটিকস্ থাকিতে পারে না, একমাত্র স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া, তবু মিশর আরব পরাধীন ভারতবর্ষের নেতাদের ক্রিয়াকলাপের খবর রাখে। মিশরী ফলস্তনীরা আমাকে প্রায় বলিতেন, "আমাদের ক্ষুদ্র দেশ, আমাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, কিন্তু তোমাদের কথা স্বতন্ত্র। তোমরা অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিবার ক্ষমতা

রাখো। আর তোমরা যদি স্বরাজ পাও, তবে মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যনীতির অবসান হইবে।" ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহাদের এই ভক্তি-উচ্ছ্বাস শুনিয়া তখন লজ্জা অনুভব করিয়াছি। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত অসহিষ্ণু তাঁহারা স্পষ্ট বলিতেন যে, আমাদের পরাধীনতাই তাঁহাদের পরাধীনতাকে অটুট করিয়া রাখিয়াছে। এমন কি কাবুলেও বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতিতে বিরক্ত আফগানদের মুখে শুনিয়াছি যে, আমাদের দৌর্বল্যই বৃটিশ রাজনীতিকে পুষ্ট করিতেছে ও আফগানিস্তানকেও তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। আমি তাঁহাদের যুক্তির সারবত্তা সব সময় মানি নাই; এস্থলে কিন্তু আমার এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করার উদ্দেশ্য এই যে কাবুল হইতে মিশর তুর্কী পর্যন্ত সব দেশের লোক আমাদের গতিবিধির পর্যালোচনা করে। আমরা সাধারণতঃ তাহাদের খবর রাখি না।

বড়লাটি পরিকল্পনা স্বীকার না করাতে যাঁহারা নিতান্ত মর্মাহত হইয়াছেন, তাঁহাদের শুধু এইটুকু আমার বলিবার ইচ্ছা যে যাঁহারা অস্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা সৃষ্টিছাড়া কিছু করেন নাই।

প্রথম ধরুন মিশর। মিশরের ওয়াফ্‌দ্‌ দল ভারতবর্ষের কংগ্রেস-লীগ অপেক্ষা অনেক বলীয়ান। সে দলকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী যদি কাজে লাগাইতে পারে তবে তাহার যে কত সুবিধা হয়, তাহার খবর ওয়াফ্‌দ্‌ জানে সাম্রাজ্যবাদীও জানে। ওয়াফ্‌দ্‌ এত ভাল করিয়া জানে যে, যে-সব বিভীষণরা সাহায্য করিতে অত্যধিক মাত্রায় প্রস্তুত তাহাদের পরিষ্কার বলিয়া দেয় চাচা যেন আপন প্রাণ বাঁচায়। পাঠকের অজানা নাই যে, কেহ কেহ নিজের প্রাণটা ঠিক রক্ষা করিতে পারে নাই। ইংরাজের প্রভুত্বহীন মিশরে ওয়াফ্‌দ্‌ সর্বদাই রাজত্ব করে ও করিতে প্রস্তুত কিন্তু রাজা যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর ক্রীড়নক হইয়া পড়েন, তখন ওয়াফ্‌দ্‌ আর সহযোগ করিতে সম্মত হয় না। তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ওয়াফ্‌দকে বলে, "তোমরা রাজত্ব চালাইতেছ না কেন? তোমাদের সঙ্গে আমাদের স্বার্থের অনেক মিল, সে কি বুঝিতে পারো না। এই ধরো না সুয়েজ খাল। তাহার কনট্রাক্ট তো প্রায় শেষ হইল, নূতন কনট্রাক্টে তোমাদিগকে অনেক কিছু দিতে হইবে, সেজন্য আমরা প্রস্তুত। তোমরা তো এখন আর দুগ্ধপোষ্য শিশু নহ, তোমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আমরা তো মানিয়া লইয়াছি। তোমরা মুরুব্বি, আইস সুয়েজখাল সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। হাঁ, আর সেই সুদানের ব্যাপারটা! হাঁ, হাঁ, সুদানও তোমাদের ফিরাইয়া দিতে হইবে বই কি। সে তো আমরা সর্বদাই বলি। তবে কিনা কোনও কোনও সুদানী (পাঠকের অবগতির

জন্য বলি এইসব সুদানী নূন মুদ্‌লেয়ার গোত্রীয়) আপত্তি জানাইয়াছেন, মিটিং করিয়াছেন, ডেপুটেশন ভেজিয়াছেন। সে কথাটাও তো বিবেচনা করিতে হয়। তাই পরিষ্কার কিছু বলিতে পারিতেছি না। আর ছাই বলিবই বা কাহাকে? তোমরা যদি দেশের রাজ্যশাসনভার গ্রহণ না করো (দিশি ভাষায় বড়লাটি লাঠি গ্রহণ না করো), তবে তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিব কি করিয়া, তোমাদের 'লুকস স্টাণ্ডি' কোথায় (অর্থাৎ মুসলমানী ভাষায় তওবা করিয়া কুফর্ ইন্‌কার করো, বৈদিক ভাষায় হে ব্রাত্য যজ্ঞোপবীত ধারণ করো)?

আরে আরে, ও শ্যামদাস পালাস কেন? শোন্-ই না। সেই যে ইংরেজ পলটন মিশরে বসিয়া আছে। সত্যি ভাই, তাতে মিশরীদের আত্মসম্মানে ঘা লাগে, আমরাও বুঝি। সে বিষয়েও একটা সমঝাওতার বড় প্রয়োজন। আহা কি মুশকিল, পালাচ্ছিস কোথায়?"

কিন্তু মুস্তফা নহ্‌হাজ্ পাশা ঘুঘু ছেলে। মুখের ভদ্রতা অন্তত উশকুরুকুম (থ্যাঙ্ক্) পর্যন্ত না বলিয়া তিনি তুর্কী টুপির ফুন্না উড়াইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে আজহর মসজিদে আশ্রয় লন। এবং নহ্‌হাজ্ পাশার পিছনে থাকে তামাম দেশ—যাহারা থাকে না, তাহাদের বিপদের কথা পূর্বেই সভয়ে পেশ করিয়াছি।

মুস্তফা ও ওয়াফ্‌দীরা যে কত বড় লোভ সম্বরণ করিয়া সর্বপ্রকার সমঝাওতা, দরকষাকষি প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা আমাদের পক্ষে অনুমান করা শক্ত। সুয়েজ খাল, সুদান, ব্রিটিশ পলটন এই তিন প্রশ্নের সমাধান তাঁহাদের কাছে বৌদ্ধদের ত্রিশরণ অপেক্ষাও কাম্য।

ফলস্তীনের (প্যালেসটাইন) মত দুর্ভাগ্য দেশ পৃথিবীতে আমি কোথাও দেখি নাই। ইহুদী পঙ্গপাল দেশটাকে ছাইয়া ফেলিবার পূর্বে (১৯১৮) আরবদের সুখে দুঃখে দিন কাটিত—আফগানিস্থান যেমন তাহার দারিদ্র্য নিয়াও বাঁচিয়া আছে। ফলস্তীন তখন তুর্কীর অধিকারে ছিল ও খলীফার অধঃপতনের যুগে তাহার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির কোনও প্রকার চেষ্টা করা হইতেছিল না বলিয়া ফলস্তীন নবীনেরা স্বরাজ্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে আন্দোলনের নেতারা সফলতা লাভ করিতেন কি না-করিতেন সে প্রশ্ন অবান্তর—মূল কথা এই যে ফলস্তীন শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চাৎপদ থাকিলেও আপামর জনসাধারণ জাফা কমলানেবুর চাষ করিয়া নিজের জমিতে নিজের কুঁড়েঘরে জীবন যাপন করিত।

কুক্ষণে তাহারা লরেনসের ধাপ্পায় ভুলিল, কুক্ষণে তাহারা খাল কাটিয়া ঘরে

কুমির আনিল। সে ইতিহাস আজ আর তুলিব না। ইহুদীরা আসিয়া তাহাদের কোটি কোটি টাকার পুঁজির জোরে আরবদের ঘরছাড়া ভিটাছাড়া করিয়া এমন অবস্থায় পৌঁছাইল যে অবস্থায় মানুষ আর কিছু না করিতে পারিয়া দাঁত দিয়া কামড়ায়, নখ দিয়া ছিঁড়ে। পৃথিবীর সহানুভূতি ফলস্তীন পায় নাই, কারণ ইহুদীরা দুনিয়ার প্রেসের মালিক। তবু মনে আছে ১৯৩৪ সালে যখন আমি ফলস্তীনে বাস করিতেছিলাম তখন ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে আমি আরবদের বলিয়াছি যে, আমাদের দেশের জাতীয়বাদীরা তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করেন। নিঃস্ব আর্ত আরবদের সেকথা শুনিয়া চক্ষে জল আসিতে আমি দেখিয়াছি। ফলস্তীনের বেদুইন চাষী হয়ত কংগ্রেস লীগ চিনে না কিন্তু আমি জানি যে সে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা খবর পাইয়াছেন যে, ভারতের নিপীড়িত জনসাধারণ কংগ্রেস ও লীগের ভিতর দিয়া আরবদের মঙ্গল কামনা করিয়াছে। দোহাই কংগ্রেস লীগের কর্তাগণ, যাহা খুশী কর কিন্তু তোমাদের আশীর্বাদ লইয়া যেন গুর্খা পাঠান শিখ মারাঠা ফলস্তীনে না যায়।

ফলস্তীন পূর্ণ স্বাধীনতা চাহিয়াছে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য আন্দোলন করিয়াছে। কিন্তু ইহুদীরা গণতন্ত্র চায় না যতদিন না দেশের লোক শতকরা ৫১ জন ইহুদী হয়। ততদিন দলে দলে ইহুদী আমদানি হইতেছে।

বয়তউল-মুকদ্দসের (জেরুজালেমের) ম্যুনিসিপ্যালিটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। তাহাতে যোগদান করিলে আরবদের অনেক ছোটখাটো সুবিধা হয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও যখনই তাঁহারা দেখিতে পান ক্ষুদ্র সহযোগের দ্বারা তাঁহাদের বৃহত্তর স্বার্থ স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা ব্যাহত হইতেছে, তখনই তদ্দণ্ডেই তাঁহারা বড়লাটি দণ্ডকে হাতে লওয়া পণ্ডশ্রম মনে করেন। অসহিষ্ণু মহা-মুফতী তো ফ্যাসিস্ট দলেই যোগদান করিলেন। কিছুদিন হইল খবর আসিয়াছে, আরবরা মুকদ্দসে ম্যুনিসিপ্যালিটি বয়কট করাতে সরকার ছয়জন সিভিল কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন।

ফলস্তীনদের বাঙাল রাগ। বিশেষ অপবিত্র তরল দ্রব্য দ্বারা বরঞ্চ চিঁড়া ভিজায় তবু জল ব্যবহার করে না।

লেবানন সিরিয়া ফরাসীকে তাড়াইবার জন্য ইংরাজের সাহায্য লইতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। ভালো করিতেছে কি মন্দ করিতেছে—ফরাসীকে তাড়ানোর কথা হইতেছে, না ইংরেজের সাহায্য লওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে—আল্লাই জানেন। কণ্টক দিয়া কণ্টক উৎপাটিত করা হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু শেষের কণ্টক যেন মুশল হইয়া বাহির না হয়। তখন যদুকুল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

তবু যেন কেহ মনে না করেন যে, লেবানন সিরিয়া আজাদ জিন্নার ব্যবহারে উষ্ণ হইয়া গোস্‌সা প্রকাশ করিবে। নিজেরাই তাহারা ফরাসী ষষ্টি বারম্বার প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। নীতি একই।

ইরাক ক্ষাত্রতেজে বলীয়ান। সেখানে সাম্রাজ্যবাদীদের ডাল বেশিদিন গলিবে না। গত যুদ্ধের পর তাহারাই সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যবাদীদের অর্ধচন্দ্র দিয়াছিল। ইরাকেও অসহিষ্ণু নেতার অভাব ছিল না, এখনও নাই।

হে মাতঃ মুক্তি দাও যাহাতে রোরুদ্যমান হইয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারি—হেন ক্রন্দনধ্বনি ইরানের ক্রন্দসী হইতে উত্থিত হইতেছে।

ইরানের স্নেহজাতীয় পদার্থের প্রতি সকলেরই লোভ। রুশ সপত্নও হুঙ্কারধ্বনি ছাড়িতেছেন। যে রুশ একদিন মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উত্তর ইরানের স্বাধিকার ত্যাগ করিয়াছিল, সেই রুশই আজ ইরানের তেল চায়—কারণ তৈল একা আসে না। ঘৃত লবণ তৈলতণ্ডুল বস্ত্র ইন্ধন একসঙ্গে যায়। আজরবই-জানের প্রতি রুশের লোভ নাই একথা এত জোরে বলা হইতেছে যে, আমরা শেক্ষপীয়রী ভাষায় বলি—"মহারাজ, মহিলা বড় বেশী প্রতিবাদ করিতেছে।" রুশিয়া যে ইরানের প্রতি রুষিয়াছেন তাহাতে কোন বাতুল সন্দেহ করিবে না। কিন্তু কহি তবু তো ইরানের ইংরাজ প্রেম সঞ্চারিত হইতেছে না। ইরান ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল, "হে কর্তারা, যুদ্ধ তো শেষ হইয়াছে, তবে পূর্ব প্রতিশ্রুতিমত বিদায় লইতেছ না কেন? তোমাদের জন্য আতর সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি, আর কেন, আমাদের অনেক শিক্ষা হইয়াছে।" কিন্তু মুজঃফর (বিজয়ী) নগরের কম্বল ছাড়িবে কেন?

শুনিয়াছি ইরাণে নাকি ভারতীয় সৈন্য আছে। যদি থাকে তবে বড় ভাগ্য মনে গণি যে, ইহাদের কপালে বিজয়তিলক কংগ্রেস-লীগ অঙ্কন করেন নাই। লাঞ্ছন শ্বেত-গৈরিক-শ্যাম নহে।

আফিগানিস্থান সম্বন্ধে আলোচনা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। আমি সমরশাস্ত্রে নিতান্তই মূর্খ, সংখ্যাতত্ত্বে ততোধিক। যত আফগানযুদ্ধ হইয়াছে তাহাতে কি পরিমাণ গোরা কি পরিমাণ পাঠান-গুর্খা-শিখ-মারাঠা ছিল জানি না।

আফগানিস্থানের ব্রিটিশ প্রীতি সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, আমি যখন কাবুলে ছিলাম তখন সমগ্র আফগানিস্থানে মাত্র কজন ইংরাজ ছিলেন এবং সকলেই ব্রিটিশ রাজদূতাবাসের কর্মচারী। আফগানিস্থানের স্কুল-কলেজে তখন ফরাসী পড়াইতেন ফরাসী গুরুরা, জর্মন পড়াইতেন জর্মন গুরুরা, কিন্তু ইংরেজী

পড়াইতেন ভারতবাসীরা। আমি যখন শিক্ষামন্ত্রীকে বলিয়াছিলাম যে ইংরাজের প্রয়োজন, তা না হইলে ছাত্রদের উচ্চারণ ভালো হইবে না, তিনি মৃদু হাস্যসহকারে বলিয়াছিলেন, "কুরাণ তো আর ইংরেজী ভাষায় লেখা হয় নাই যে উরুশ্চারণের জন্য সায়েবদের মেলা তকলীফ্ দিয়া এই পাণ্ডববর্জিত দেশে আনিতে হইবে।"

ইংরাজ তখন রুশিয়ার পাসপোর্ট বরঞ্চ পাইত, কিন্তু আফগানিস্থান! বরঞ্চ পঞ্চম মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিতে পাইত, কিন্তু ইংরাজ লাণ্ডিকোটালের ঐ পারে পা দিতে গেলে নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইত।

ইংরাজ-রুশে বন্ধুত্ব হওয়ায় আফগানিস্থান মহা বিপদে পড়িয়াছে। হায় জালালাবাদ হায়, মজার-ই-শরীফ!

বড়লাটি লাঠি আমরা হাতে লইলে বেচারী পাঠানদের দুইখানা লাঠির খর্চার ধাক্কায় পড়িতে হইবে। সে কি উত্তম প্রস্তাব? কাবুলীদের ভদ্রতা-বোধ কম। ভারতবাসীদের তাহারা গোলাম বলে। গোলামের হাতে কি লাঠি শোভে? লাঠি বাজিবে না?

হাইলে সেলাস্মি সাম্রাজ্যবাদীদের অনুনয় করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া আর আদিস-আব্বাবার মত বর্বর শহরে থাকিয়া বিস্তর কষ্টভোগ না করেন। ইতালীয়রা হাবশীদের যথেষ্ট সভ্য করিয়া গিয়াছে, ঐটুকুতেই তাহাদের কাজ চলিবে। সাম্রাজ্যবাদীরা নাকি তথাপি 'শ্বেত ভদ্রতার' নামাইতে পারিতেছেন না। হাবশীদের হৃদয়ও অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, সহযোগ যষ্টি লইবার জন্য হস্তোত্তলন করিতেছে না।

তুর্কীরা অবশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাসীদের দিলিদোস্ত! কারণ কোন্ মূর্খ বলিবে যে, তুর্কী জর্মনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা না করিলে জর্মনী পরাজিত হইত। সে যুদ্ধে কি পরিমাণ লোকক্ষয়, বলক্ষয়, অর্থক্ষয় হইয়াছে তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই তবে আশা করতে পারি ভারতবর্ষে যত পরাজিত জাপানী সমরবন্দী আছে, তুর্কীতে তাহা অপেক্ষা বেশী জর্মন বন্দী আছে। তবে সব সময়েই কি আর 'ফলেন পরিচিয়তে'। বরঞ্চ "ম ফলেষু" এইক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তৎসত্ত্বেও হায় রে তুর্কী তোমার দার্দানেলেজ যে যায়-যায়। মিত্রশক্তি যখন তোমাকে অনুনয়-বিনয় করিয়াছিল, তখন তুমি সাম্রাজ্যবাদীর যষ্টি হাতে নাও নাই, এখন তোমার সপ্ত-কৃশ-বৎসরের চক্র। কিন্তু বল তো আলেপ্পো, তোমাকে কে ভেট দিতেছে?

কিন্তু তুর্কী স্বাধীন। হিজাজের ইবনে সউদ স্বাধীন যমনের ইমাস ইয়হিয়া স্বাধীন। সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে তাঁদের সহযোগিতা অসহযোগিতা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। ট্রেনসজর্ডানও গুছাইয়া লইয়াছে।

বুঝিতে পারিতেছি পাঠকের ধৈর্যচ্যুতির উপক্রম। আর বাক্যবিন্যাস করিব না। তবে আশা করি এইটুকু বুঝিতে কাহারো অসুবিধা হইবে না যে, বড়লাটি লাঠি ভারতীয়দের হাতে না আসায় দুঃখ করিবার কিছু নাই। কংগ্রেস-লীগ ভিন্ন ভিন্ন কারণে লাঠি নেন নাই বা পান নাই, কিন্তু আর যাহাই হউক, মধ্য প্রাচ্য সেজন্য তাঁহাদের নিন্দা করিবে না। সাম্রাজ্যবাদীরা করিতেছে, তাহাতেই মনে হয় ভালো কর্মই করিয়াছি। আল্লা মেহেরবান, আমাদের অজানাতেই হয়ত আমাদিগকে শুভবুদ্ধি দিয়াছেন।

যুবরাজ-রাজা-কাহিনীর পটভূমি

তুলনাত্মক শব্দতত্ত্ব যেরূপ কোনো এক শুভদিনে আপাদমস্তক নির্মিত হয়নি ঠিক সেইরূপ তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্ব হঠাৎ একদিন জন্মগ্রহণ করেনি। গ্রীক রোমান ঐতিহাসিকরা যে-সব জাতির সংস্পর্শে আসেন, তাঁদের ধর্মের বিবরণও অল্পবিস্তর দিয়েছেন। বলা বাহুল্য এসব বিবরণের অধিকাংশই পক্ষপাতদুষ্ট। আর এঁদের ভিতর যাঁরা নাস্তিক ছিলেন তাঁরা নানা ধর্মের বিবরণ দেবার সময় সব কটাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন, নিজেরটাকেও ব্যত্যয় দেননি, অর্থাৎ প্রতিচ্ছবির স্থলে কেরিকেচার এঁকেছেন। তথাপি যে পদ্ধতির গ্রন্থই হোক না কেন, এগুলোকে বাদ দিয়ে কোনো বিশেষ ধর্মের বা একাধিক ধর্মের ইতিহাস রচনা করা অসম্ভব, এবং বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস রচিত না হওয়া পর্যন্ত তুলনাত্মক ধর্মশাস্ত্রের গোড়াপত্তনও অসম্ভব।

খৃষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসার হওয়ার ফলে গ্রীক, রোমান তথা ইউরোপীয় অন্যান্য ধর্ম লোপ পায়। শুধু তাই নয়, ভিন্ন ধর্মের বিবরণ লেখার ঐতিহ্য কয়েক শতাব্দী ধরে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা হয়। আজ যাঁরা জানতে চান, গ্রীক, রোমান, ট্যুটনদের ধর্ম প্রাথমিক খৃষ্টধর্মের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তাদের তন্ন তন্ন করে গ্রীক ও রোমানদের সর্বপ্রকারের রচনা পড়তে হয় এবং সেখান থেকে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেন সেগুলোর সন্ধান নিতে হয় প্রাথমিক খৃষ্টধর্মের

কোন্ কোন্ আচার অনুষ্ঠানে এরা নির্বিঘ্নে অনুপ্রবেশ করেছে, কিংবা খৃষ্টধর্ম গ্রন্থের অনুশাসন উপেক্ষা করে নবদীক্ষিত খৃষ্টানগণ নিজেদের প্রাক খৃষ্টীয় আচার অনুষ্ঠান নূতন ধর্মে কিভাবে এবং ইয়োরোপের কোন্ কোন্ জায়গায় প্রবর্তন তথা সংমিশ্রণ করেছে—এইসব তাবৎ তথ্য প্রভূত পরিশ্রম তথা গভীর গবেষণা দ্বারা সঞ্চয় করে তবে খৃষ্টধর্মের সম্পূর্ণ ইতিহাস লেখা সম্ভব। আজ যে-রকম ভারতীয় চার্বাক প্রভৃতির লোকায়ত দর্শন পুনর্নির্মাণ করা অতিশয় সুকঠিন কর্ম।

সপ্তম শতাব্দীতে নবজাত ইসলামের সঙ্গে খৃষ্টধর্মের সংঘর্ষের ফলে একে অন্যের ধর্মের বিরুদ্ধে রূঢ়তম কুৎসা প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু মুসলমানদের বাধ্য হয়ে অনেকখানি সংযত ভাষা ব্যবহার করতে হল কারণ পবিত্র কুরানে খৃষ্টকে আল্লার প্রেরিত-পুরুষ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, ক্রুসেডের নৃশংস যুদ্ধ সত্ত্বেও দুই ধর্মের গুণীজ্ঞানী একে অন্যের বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। আরবরা ব্যাপকভাবে গ্রীক দর্শন পদার্থবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্র আরবীতে অনুবাদ করলেন ও পরবর্তীকালে আরব দর্শনশাস্ত্রের লাতিন অনুবাদ ইয়োরোপে প্রচার ও প্রসার লাভ করলো। এবং এ-স্থলে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে আরব (ও পরবর্তীকালে ইরানের) সূফীপন্থা (ভক্তিবাদ ও রাজযোগের সমন্বয়) খৃষ্টীয় মিস্টিজিম বা রহস্যবাদের সঙ্গে বারম্বার নিবিড় সংস্পর্শে এল এবং ফলে একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তারিত করলো। কোনো কোনো ইয়োরোপীয় পণ্ডিত বিশ্বাস করেন, ইতিমধ্যে ভারতীয় রহস্যবাদ আরব সূফীতত্ত্বকে প্রভাবান্বিত করেছিল।

এ-স্থলে স্পেনবাসী আরব ধর্মপণ্ডিত ইব্‌ন্ হজ্‌ম-এর উল্লেখ করতে হয়। তিনি ইহুদি, খৃষ্ট ও ইসলাম নিয়ে অতি গভীর আলোচনা করেন, কিন্তু পুস্তকখানা যদিও বহু বহু স্থলে অমূল্য রত্ন ধারণ করে, তবু পূর্ণ পুস্তক পক্ষপাতদুষ্ট। ইব্‌ন্ হজ্‌মের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সপ্রমাণ করা: ইসলাম সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম এবং শুধু তাই নয়, ইসলামে যে শতাধিক শাখা-প্রশাখা বহুবিধ সেক্‌ট্, 'স্কুল্‌স্' আছে, তার মধ্যে তিনি নিজে যেটিতে জন্মগ্রহণ করেন সেইটিই সর্বোৎকৃষ্ট বটে ও সর্বগ্রাহ্য হওয়া উচিত।

এক হাজার বছর পূর্বেকার গজনীর বাদশা মাহমূদের সভাপণ্ডিত আলবীরুনীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—যদিও তিনি মূলত তাঁর "ভারতের বিবরণ" গ্রন্থে হিন্দু ধর্ম, তার নানা শাখা-প্রশাখা, আচার-অনুষ্ঠান, কুসংস্কার, কিংবদন্তীর বয়ান দিয়েছেন এবং যেহেতু ভারতীয় ধর্ম মাত্রই কোনো না কোনো দর্শনের দৃঢ়ভূমির

উপর নির্মিত, তিনি তাঁর প্রামাণিক গ্রন্থে ভারতীয় দর্শন সাতিশয় নৈপুণ্যসহ বিশ্লেষণ করেছেন। এবং স্থলে স্থলে ইসলামের সঙ্গে তুলনাও করেছেন। প্রতিমানাশক, কট্টরতম মুসলমান মাহমুদের সভাপণ্ডিত কোনো স্থলে হিন্দু ধর্মের বিশেষ কোনো মতবাদ বা আচারের প্রতি দৈবাৎ সহানুভূতি প্রকাশ করলে সেটা যে তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে সাতিশয় উপকারী হত না সেটা সে যুগের রাজ-জহ্লাদ ভিন্ন অন্যজনও নিঃসঙ্কোচে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতো। তৎসত্ত্বেও পরম আশ্চর্যের বিষয় তিনি ইসলামের প্রতি সরল অনুরাগ প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ধর্মের প্রশংসনীয় দিকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং কোনো কোনো নিন্দনীয় আচারের কারণ দেখিয়েছেন। পাঠক মাত্রই সহজে প্রত্যয় করবেন না, যে-মাহমুদ হিন্দুর প্রতিমা ভঙ্গ করাটা অতিশয় শ্লাঘার বিষয় বলে মনে করতেন তাঁরই সভাপণ্ডিত আভাসে ইঙ্গিতে এবং তুলনার সাহায্যে প্রতিমা পূজার পিছনে যে হেতুটি রয়েছে সেটা যে অত্যন্ত স্বাভাবিক সেটা বুঝিয়ে বলেছেন। এ-স্থলে জরাজীর্ণ স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে সংক্ষেপে সেটি নিবেদন করি : মক্কা গমনে সম্পূর্ণ অসমর্থ অথচ হজ পালন করা যখন তার একমাত্র অবশিষ্ট কাম্য, সেই অর্ধমৃতজনকে যদি কেউ মক্কার একখানা ছবি দেখায় তবে কি তার সর্বাঙ্গ শিহরিত হবে না, অশ্রুজল দুই চক্ষু সিক্ত করবে না, কম্পিত কলেবরে সে হজকামী ছবিখানাকে হয়তো বারম্বার চুম্বন দিতে আরম্ভ করবে এবং হয়তো বা যুক্তিতর্কের বিধান বিস্মৃত হয়ে সেই অতি সাধারণ জড় কাগজখণ্ডকে অলৌকিক দৈবশক্তির আধার বলে সম্মান প্রদর্শন করতে আরম্ভ করবে! অতএব যে স্থলে কলায় সুনিপুণ শিল্পী বহুমানবের ধারণা সাধনাকে মৃন্ময়রূপ দিতে সক্ষম হন, সে-প্রতিমার সম্মুখে কি সাধারণ মানুষ নতজানু হবে না? অবশ্য গোড়াতেই আলবীরুনী প্রতিমা পূজার প্রতি আপন বিরাগ প্রকাশ করেছেন। এস্থলে স্মরণীয় যে অস্মদ্দেশীয় বহু বেদান্তবাগীশ তথা ব্রহ্মসমাজ প্রতিমা-পূজা সমর্থন করেন না। অন্যান্য অনেকেই এ-মার্গকে নিম্নস্তরে স্থান দেন।

পাঠান যুগে যদিও নিজামউদ্দীন আউলিয়া প্রভৃতি চিশ্‌তী সম্প্রদায়ের সুফী ভাবাপন্ন সাধুগণ অতিশয় পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন বলে যে-কোনো ব্যক্তি আপন ধর্ম ত্যাগ না করে তাঁদের শিষ্য হতে পারতো, তথাপি ব্যাপকভাবে উভয় ধর্ম নিয়ে বিশেষ কোনো চর্চা হয়েছে বলে এ অক্ষম লেখকের জানা নেই। তবে নিজামউদ্দীনের শিষ্য ও সখা সুকবি আমীর খুসরো ভারতের প্রচলিত ভাষা, সাহিত্য ও ধর্ম সম্বন্ধে অতিশয় অনুসন্ধিৎসু ছিলেন।

পাঠান রাজবংশ ভারতে বাস করার ফলে ক্রমে ক্রমে মার্জিত রুচিসম্পন্ন হয়ে যান। তাঁদের তুলনায় সে যুগের মোগলদের বর্বর বললে অত্যুক্তি করা হয় না। বাবুর অসাধারণ মেধাবী, বহুগুণধারী পুরুষ। কিন্তু যদিও তিনি তাঁর রোজনামচায় ঘন ঘন আল্লাতালার নাম স্মরণ করেছেন, সেজন্য তাঁকে সত্য ধর্মানুরাগী মনে করাটা বোধ হয় ঠিক হবে না (ইংরেজ প্রতিদিন পাঁচশ' বার "থ্যাঙ্কু" আওড়ায় ; অতএব তার কৃতজ্ঞতাবোধ, উপকারীর প্রতি তার আনুগত্য আমাদের চেয়ে পাঁচশ' গুণে বেশী এহেন মীমাংসা বোধ হয় সমীচীন হবে না)। কারণ ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম-নিন্দিত একাধিক ব্যসনে অত্যধিক আসক্ত তিনি তো ছিলেনই, তদুপরি যুদ্ধজয়ের পর তিনি যে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে ইসলামের মূল সিদ্ধান্ত অনুশাসন লঙ্ঘন করে উৎপীড়ন, বর্বরতম পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ডাদেশ সমাপন করেছেন, সে-সব তিনি সগর্বে নিজেই আপন রোজনামচায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

বস্তুত এক কথায় বলা যেতে পারে, ইসলামে দীক্ষিত বাবুরাদি তুর্কমান (মোগল নামে এদেশে পরিচিত) ইসলাম সেভাবে গ্রহণ করেনি, বাঙলাদেশের মুসলমান যেরকম হৃদয় দিয়ে করেছে। আর মোগল রাজাদের ভিতর এক ঔরঙ্গজেব ছাড়া অন্য সকলেই ছিলেন স্বধর্ম ইসলামের প্রতি উদাসীন, একাধিকজন সিনিক্ এবং প্রায় সকলেই কি ইসলাম কি হিন্দুধর্ম সব ধর্ম ব্যবহার করেছেন অস্ত্ররূপে রাজনৈতিক সাফল্যের জন্য।

হুমায়ুনের জীবন এতই সংগ্রামবহুল যে তিনি অন্য কোনো বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করতে পারেননি। আপন যুবরাজ সম্পূর্ণ নিরক্ষর রইলেন তাঁরই চোখের সামনে।

নিরক্ষরজন যে অশিক্ষিত হবে এমন কোনো আপ্তবাক্য নেই।

নিরক্ষরজন সম্বন্ধে কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু সে সাক্ষর হয়ে প্রচলিত বিদ্যাভ্যাস করেনি তাই কোন্ পুস্তক উত্তম আর কোন্টা অধমাধম, কোন্টা সত্য আর কোন্টা নিছক বুজরুকী, এক কথায় তার মূল্যায়নবোধ বিকশিত হয় না। তারই ফলে দেখা যায় নিরক্ষরজন সাধারণত আপন স্বার্থের সামগ্রী ভিন্ন অন্য কোনো বাবদে বিশেষ কৌতূহলী নয়। পক্ষান্তরে এটাও মাঝে মাঝে দেখা যায় যে কোনো কোনো নিরক্ষরজনের বিধিদত্ত জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক সে সাক্ষর হয়ে প্রচলিত বিদ্যাভ্যাসের রীতি অনুযায়ী উত্তম অধম নানাবিধ পুস্তক অধ্যয়ন করেনি। ফলে তার মূল্যায়নবোধ যথোপযুক্ত-রূপে বিকাশলাভ করতে পারেনি।

আকবর এরই প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। সর্বোচ্চ শাসনকর্তা হিসেবে তিনি উত্তম-রূপেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, ভারতের সর্বপ্রধান সনাতন হিন্দুধর্ম, ইসলাম, দুই ধর্মের শাখাপ্রশাখা এবং হিন্দু-মুসলমান সাধুসন্ত সর্বধর্মের মিলন সাধনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন যে-সব "পন্থা" প্রচার করেছেন এগুলোর কোনো একটা সমন্বয় না করতে পারলে সাম্প্রদায়িক কলহের ফলে যে কোনো দিন মোগল বংশ সিংহাসনচ্যুত হতে পারে। অতএব আহ্বান জানালেন, সর্বধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের। এমন কি যে-জৈনদের সংখ্যা ভারতে নগণ্য এবং সে-যুগে তারা প্রধানত গুজরাত, কাঠিয়াওয়াড ও মারওয়াড় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাঁদেরও প্রধানতম জৈন ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ জানালেন। তিনি অতি সুন্দর ভাষায় জৈনধর্মের মূল সিদ্ধান্ত এবং বিশেষ করে জীবে দয়া সম্বন্ধে আম-দরবারে বক্তৃতা দিয়ে মায় আকবর সভাজনকে মুগ্ধ করলেন। ওদিকে আকবর ছিলেন ছিদ্রান্বেষী তথা "ইনসাইড স্টরি" জানবার জন্য মহা কৌতূহলী এবং তিনি জানতেন, হিন্দু এবং জৈনদের মধ্যে একটা আড়াআড়ি ভাব আছে। রাত্রে ডেকে পাঠালেন হিন্দু পণ্ডিতকে। তিনি বললেন, "জৈন গুরু যে এত লম্ফঝম্প করলেন তাঁকে শুধোবেন তো মহারাজ, এ-প্রবাদটির অর্থ কি—

"হস্তীনা তাড্যমানপি ন গচ্ছেৎ জৈন মন্দিরম্।

হস্তী কর্তৃক বিতাড়িত হলেও জৈন মন্দিরে (বা গৃহে) প্রবেশ করে না।"

আকবর পরদিন প্রশ্নটি শুধানোর পর জৈন গুরু মৃদু হাস্যসহকারে বললেন, "আমি যদি উত্তরে বলি

"হস্তীনা তাড্যমানপি ন গচ্ছেৎ (শৈব) মন্দিরম্[১]

হস্তী কর্তৃক বিতাড়িত হলেও শৈব মন্দিরে (বা শৈবের গৃহে) প্রবেশ করো না। তা হলে ছন্দপতন হয় না, অর্থও তদ্বৎ—শুধু জৈনের পরিবর্তে শৈবের কুৎসা করা হয়। বিদ্বেষপ্রসূত এ-সব প্রবাদের কোনো সত্যমূল্য নেই।"

আকবর রাজনৈতিক কারণে, নিজ স্বার্থে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের বিবরণ শোনার পর স্বয়ং একটি নবীন 'ধর্ম' প্রচার করতে চেয়েছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন, "ইসলামের হজরৎ নবী ছিলেন নিরক্ষর, আমিও নিরক্ষর। তদুপরি আমার হাতে রাজদণ্ড। আমা দ্বারা এ-কর্ম সফল হবে না কেন?" সে যা-ই হোক, তিনি

১। অধমের সংস্কৃত জ্ঞান এতই অল্প যে তার জন্য ক্ষমাভিক্ষা করতেও লজ্জা বোধ করি। বানানে নিশ্চয়ই একাধিক ভ্রম আছে। পাঠক নিজ গুণে শুধরে নেবেন। কাহিনীটিও স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে লিখেছি।

তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্বের নিরপেক্ষ সন্ধানীজন নন। তবে এ-কথা অতি সত্য যে তিনি সর্বধর্মের সর্বগুরুকে বাদশাহী নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাজদরবারে আসন দেওয়ার ফলে ধর্ম বাবদে মোগল রাজসভা অনেকখানি সঙ্কীর্ণতা-মুক্ত হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে "সর্বধর্মজিজ্ঞাসা"র পন্থাটি সুখগম্য করে তোলে।

জাহাঙ্গীর সর্ব বিষয়েই ছিলেন উদাসীন—যা অত্যধিক মদ্যাসক্তজনের প্রায়শ হয়ে থাকে।

শাহজাহানের মতিগতি বোঝা কঠিন। সুবৃহৎ লালকেল্লাতে কত না রঙমহল, কত না হাম্মাম, সম্পূর্ণ একটি হট্ট, কত না নিষ্কর্মা এমারৎ, নহবৎখানা, বন্দীশালা, এবং দুই বিরাট সভাগৃহ। অথচ বেবাক ভুলে গেলেন (?) দুর্গবাসীদের পাঁচ বেলা নামাজ পড়ার জন্য একটি ছোটাসে ছোটা মসজিদ বানাতে! দিল্লীর দারুণ গ্রীষ্ম এবং নাকেমুখে আঁধির ধুলো খেতে খেতে তাদের দ্বিপ্রহরে যেতে হত জামি মসজিদে। দিল্লীর কাঠ-ফাটা শীতের রাত্রে এশার নমাজ পড়তে।

তা সে যাই হোক, তিনি অদ্ভুত একটা একস্‌পেরিমেণ্ট করেছিলেন তাঁর চার পুত্রের শিক্ষা ব্যবস্থায়। এক পুত্রকে স্পেশালাইজ করালেন রণকৌশলে, অন্যকে সঙ্গীতাদি চারুকলায়, কনিষ্ঠ ঔরঙ্গজেবকে ছেড়ে দিলেন কট্টর মোল্লাদের হাতে এবং তাঁর সর্বাধিক প্রিয় জ্যেষ্ঠ দারা শীকূহকে শেখালেন সর্বধর্ম সর্ব সম্প্রদায়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন।

* * *

সর্বধর্ম চর্চা করার জন্য মোল্লাদের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও আকবর যে-পথ সুগম করে দিয়ে সর্বধর্মগুরুকে রাজসভায় ডেকে এনে বসিয়েছিলেন, সেই সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম দুই পুরুষ ধরে ছিল অনাবৃত অবহেলিত। দারা স্বয়ং সে পথ দিয়ে যাত্রারম্ভ করলেন। এবং শুধু তাই নয়, আকবরের কালে মৌলভী সাহেব সভাস্থলে প্রচার করতেন ইসলাম, হিন্দু পণ্ডিত প্রচার করতেন হিন্দুধর্ম, যে যার আপন ধর্ম—দারা সম্মুখে আদর্শ ধরলেন সর্বশাস্ত্র মূল ভাষাতে অধ্যয়ন করে, ব্রাহ্মণসন্তান যে রকম সংস্কৃত অধ্যয়ন করে, মুসলিম-সন্তান যে-রকম আরবী ভাষা আয়ত্তে আনে—তিনি একাই যেন সর্বধর্মের মুখপাত্র হতে পারেন। কিন্তু এস্থলে একটি বিষয়ে আমাদের মনে যেন কোনো দন্দ্ব না থাকে, দারা কোনো নবধর্ম প্রবর্তনের উদ্দেশ্য নিয়ে অধ্যয়ন, গবেষণা তথা অনুবাদকর্মে লিপ্ত হননি। আকবর যে পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়েছিলেন সেটা দারার মনঃপূত হয়নি। আকবর ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের বিবরণ শোনার পর প্রত্যেক ধর্মের কতকগুলো সিদ্ধান্ত, যেগুলো ঐ ধর্মের প্রত্যেককে বিনা

যুক্তিতর্কে মেনে নিতে হয় অর্থাৎ ডকট্রিন, শিবলেথ এবং ঐ ধর্মের অবশ্য করণীয় আচার-অনুষ্ঠান—রিচুয়াল এ-দুটি অঙ্গের উপর দিলেন প্রধান জোর ; ডকট্রিন এবং রিচুয়াল। অতঃপর আকবর সর্ব প্রধান প্রধান ধর্মের সর্ব ডকট্রিন ও রিচুয়াল সংগ্রহ করে বিচার করে দেখলেন এর কোন্-কোন্গুলো এ-দেশের জনসাধারণে প্রচলিত ও সর্বজনগ্রাহ্য হয়েই আছে, কোন্-কোন্গুলো আপন ধর্মে না থাকা সত্ত্বেও সে ধর্মের লোক ঐগুলো আপত্তিজনক বলে মনে করে না এবং কোন্ কোন্গুলো ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিদ্বেষ, কলহ এমন কি রক্তপাত পর্যন্ত ঘটিয়েছে। বিচার-বিবেচনার পর তিনি তাঁর নবীন ধর্মে এমন সব ডকট্রিন ও রিচুয়েল নিলেন যেগুলো সবধর্মগ্রাহ্য হয়েই আছে এবং যেগুলো হওয়ার সম্ভাবনা ধরে।

দারা এ-পথ নিলেন না। তিনি বিচার করে দেখলেন, প্রত্যেক ধর্মের অন্তত কয়েকজন গুণী আপন আপন ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন এবং অল্প-সংখ্যক ধর্মানুরক্তজনের ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকলেও সেগুলি প্রাণবন্ত, ডায়নেমিক। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি মুগ্ধ হলেন হিন্দুর উপনিষদের গভীরে প্রবেশ করে। তসওউফ বা সুফীতত্ত্বকে তিনি ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে দৃঢ়বিশ্বাস রাখতেন—ইসলামের সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করার পর। এবং নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়েছিলেন যে, দুই সাধনার ধারাই সম্মিলিত হয়েছে একই সিন্ধুতে। তাই তাঁর উপনিষদ-সাধনা পুস্তকের নামকরণ করেছিলেন—দ্বিসিন্ধু মিলন—মুজম্ উল্ বহ্‌রেন্। সেযুগে দুই ভিন্ন ধর্মের সাধক একান্তে বসে ধর্মালোচনা করতেন না—বস্তুত আপন ধর্মের তত্ত্বজ্ঞানের যে বিশেষ ভাষা হয় সেটা অন্যজনের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অবোধ্য।

দারার আশা ছিল, উপনিষদ সযত্নে ফার্সী ভাষাতে অনুবাদ করলে মুসলিম তত্ত্বজ্ঞানী সুফী উল্লাসে 'ইউরেকা' শব্দ দ্বারা 'আপন' আবিষ্কারজনিত হর্ষপ্রকাশ করবেন।

দারার বিশ্বাস ছিল, যদিও আপাতদৃষ্টিতে হিন্দুর পুরোহিত তথা মুসলমানের মোল্লা যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করেন, তথাপি তাঁদের মূল উৎস দুই ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী যারা তাঁরাই।

মুসলিম সুফী একবার হিন্দুর উপনিষদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর তাঁর ও হিন্দু ব্রহ্মবাদীর মাঝখানে তো কোনো অন্তরাল থাকবে না—কুৎসা-কলহের তো কথাই ওঠে না। ফলে এঁরাই পুরোহিত মোল্লাদের যে নূতন অনুপ্রেরণা দেবেন, তারই ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শাশ্বত মিলন স্থাপিত হবে।

নিয়তি দারাকে আপন কর্ম সমাপ্ত করতে দিলেন না। নইলে তিনি যে হিন্দুর বিচিত্র সব মণিমানিক্য মুসলমানের সামনে এবং মুসলিম জওহর-জওয়াহির হিন্দুর সম্মুখে ক্রমে ক্রমে তুলে ধরতেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ভারতেরই নিয়তি, বিবেকানন্দ দীর্ঘজীবী হলেন না, শঙ্করাচার্যের আয়ুষ্কাল তো মাত্র বত্রিশ, চৈতন্যের বিয়াল্লিশ। রামমোহন দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন বটে কিন্তু তিনি হাত দিলেন একই সময়ে সর্বকঠিন দুটি কর্মে, যার একটাই যে-কোনো কালের যুগশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তমকে নিঃশেষ করে দেয়—ধর্ম সংস্কার এবং সমাজ সংস্কার যুগপৎ! তদুপরি তাঁকে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় আরো বহুবিধ কর্মে লিপ্ত হতে হয়; সর্বশেষে উল্লেখ করতে হয়, পাদ্রী মোল্লাদের সঙ্গে তর্কবিতর্কে তাঁর কালক্ষয় হয় প্রচুর।

দারা ও রামমোহনের উভয়েরই শিক্ষার বাহন ফার্সী, সংস্কৃত এবং আরবী। দীক্ষা দুজনার ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু উভয়েই মিলিত হয়েছিলেন উপনিষদের একই সিন্ধুতে। অতএব দারার গ্রন্থ 'মুজম উল-বহরেন' এই উভয় সাধকের বেলাও প্রযোজ্য। অপিচ রামমোহনের ফার্সীতে লিখিত প্রথম কেতাব 'তুহাফাতুল মুওয়াহ্‌হিদীন'—'একম এবং অদ্বিতীয়মে বিশ্বাসীজনের প্রতি সওগাৎ যদি কাউকে উৎসর্গ করতে হয় তবে রাজার সঙ্গে একই তীর্থের যাত্রী রাজপুত্র দারাকে। রামমোহনের প্রথম পুস্তক ফার্সীতে এবং দারার পুস্তকও ঐ ভাষায় এবং উভয়ের পুস্তকের শিরোনাম আরবীতে। দুজনাই পুস্তক লিখেছেন মুসলমান সাধকের উদ্দেশ্যে। দারা আপন বক্তব্য বলেছেন উপনিষদ মারফৎ, রামমোহন তাঁর যুক্তিতর্ক সঞ্চয় করেছেন ইসলামের ভাণ্ডার থেকে। দুই পুস্তকই ধর্ম ও দর্শনের সংমিশ্রণ। আরো বহুক্ষেত্রে দুজনার ঐক্য, একাত্মবোধ ধরা পড়ে—শুধু লক্ষ্যবস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গীতেই নয়।

নেতির দিক দিয়ে দেখলে যে-সাদৃশ্য চোখে পড়ে সেটি বিস্ময়কর। কেউই কোনো নূতন ধর্ম প্রচার করেননি, করতে চাননি।

দারা এবং রাজা সম্বন্ধে গত ত্রিশ বৎসর ধরে যে-সব গবেষণা হয়েছে তার অধিকাংশ—অধিকাংশ কেন, শতাংশের একাংশ পড়বার সুযোগ আমার হয়নি। গ্রহচক্রে আমি সে মণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। তাই এই রচনায় বিস্তর ত্রুটিবিচ্যুতির অবকাশ অনিবার্য। তবু কেন যে বার্ধক্যে এই অর্বাচীনসুলভ অপকর্ম করলুম সে তত্ত্ব সম্পাদক মহাশয় অবগত আছেন। পাঠককে জানিয়ে কোনো লাভ নেই। লেখকের ভুলভ্রান্তি তার চক্ষুগোচর হলে সে অকৃপণ হস্তে হতভাগ্যের কর্ণমর্দন করার সময় আদৌ কর্ণপাত করে না—বেচারা লেখকের ওজুহাত-অছিল

তথা করুণকণ্ঠে তার ক্ষমাভিক্ষার প্রতি।

সৈয়দ মুজতবা আলীর এই অপ্রকাশিত প্রবন্ধ রচনার একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। প্রবন্ধটি রচনার তারিখ ১৯৭৩ সনের ৩০ জানুয়ারি। ওই বছরটি ছিল রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম দ্বিশতবার্ষিকীর বছর। ইন্দো-ইটালিয়ান সোসাইটির বর্তমান সম্পাদক শ্রীরবিউদ্দীনের (যিনি কাজী নজরুল ইসলামের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ইউরোপ যাবার সময় কবির একান্ত সচিব ছিলেন) প্রচেষ্টায় রাজা রামমোহনের জন্মস্থান রাধানগরের সন্নিকটস্থ নতিবপুর গ্রামে ওই উপলক্ষে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল রাজা রামমোহন ও যুবরাজ দারাশীকুহ্র উদার সহনশীল সমন্বয়ধর্মী কর্ম ও আদর্শ সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা। ওই সভার সভাপতি ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক ডঃ অমলেন্দু বসু। ওই আলোচনা সভার জন্য এই অবন্ধটি রচনা করেন সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর একান্ত স্নেহভাজন ডাক্তার মহম্মদ আব্দুল ওয়ালীর বিশেষ অনুরোধে এবং আলী সাহেব এই প্রবন্ধটি পড়বার দায়িত্বও ডাক্তার ওয়ালীর উপর ন্যস্ত করেন।

যোগাযোগ

নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা লাভ করার উপলক্ষে যে কোনো জাতিরই উল্লসিত হওয়ার কথা; বিশেষত যে জাতির গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে, যে জাতি অতীতে মানব-সংসারে জ্ঞানের চিরন্তন দেয়ালি উৎসবে বহু প্রদীপ জ্বালিয়েছে, তার স্বরাজ্যলাভে পৃথিবীর বিদগ্ধ সম্প্রদায়েরও নিরঙ্কুশ আনন্দ হওয়ারই কথা। যে জাতি একদিন উপনিষদের দর্শন দিল, তথাগতের অমৃতবাণী শোনালো, গীতার সর্বধর্মসংমেলন শিখালো, ত্রিমূর্তি নির্মাণ করলো, তাজমহলের মর্মর স্বপ্ন দেখালো, তার কাছ থেকে পৃথিবীর গুণীজ্ঞানীরা এখন অনেক কিছুই আশা করবেন। স্বাধীনতা লাভের পর এখন আর তাদের নিরাশ করবার কোনো ওজুহাত আমাদের রইল না। এখন আর ইংরেজের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে আমরা রেহাই পাবো না।

সাংস্কৃতিক বৈদগ্ধ্যের নবজীবন লাভ অনেকখানি নির্ভর করে দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সুসামঞ্জস্যের উপর। দারিদ্র্য যদি না ঘোচে, শক্তির সাধনায় স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে দেশের কর্তাব্যক্তিরা যদি খাদ্যের পরিবর্তে আগ্নেয়াস্ত্র সঞ্চয়ে মনোযোগ দিয়ে দেন, তাহলে যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-কলা-দর্শন এ-দেশে পুনরায় বিকশিত হবে না, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি। হিটলারের জর্মনি, স্তালিনের রুশিয়া যে বিশ্বমানবকে হতাশ করেছে, সে কথা

কারো অজানা নয়।

মহাত্মা গান্ধী যখন আততায়ীর হাতে প্রাণ দিলেন, তখন আমরা ভয় করেছিলুম যে হয়ত বা আততায়ীর শক্তি সম্প্রদায় তাবৎ দেশটাকে গ্রাস করে নব নব হিটলার, নব নব স্তালিনের দাস্যগ্রহণ করবেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য আমরা সে 'মহতী বিনষ্টে'র হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি, আমাদের চরম সান্ত্বনা যে দেশের আপামর জনসাধারণও সে নিষ্কৃতির কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হয়েছে।

পণ্ডিত নেহরু এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল যে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, আমরা শান্তি ও মৈত্রীর কামনা করি, কোনো দেশ জয় করার কামনা আমাদের নেই, হিন্দুস্থান-পাকিস্তান সংযুক্ত করার কোনো ইচ্ছা আমাদের নেই, এ বড় কম কথা নয়। কারণ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, আমাদের ভৌগোলিক অবস্থা এমন যে, একমাত্র পাকিস্তান ভিন্ন অন্য কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সশস্ত্র সংগ্রাম হবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। তাই আশা করতে পারি, আজ না হোক কাল নেতাদের সর্বপ্রচেষ্টা দেশের অভাব-অঘটন মোচন করাতে নিয়োজিত হবে।

কিন্তু তাই বলে এ-কথা বলা চলে না যে, দেশের দারিদ্র্য না ঘোচা পর্যন্ত সংস্কৃতি বৈদগ্ধ্যের ক্ষেত্রে আমাদের বীজ পোতার প্রয়োজন নেই, ফসল ফলাবার ত্বরা নেই। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক এই তিন প্রচেষ্টাই একই সঙ্গে চালাতে হয়—অবস্থার তারতম্যে বিশেষ জোর দেওয়া বিশেষ কোনো অঙ্গে, এই মাত্র।

ভারত এবং পাকিস্তানের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব যে বিকট রুদ্র রূপ নেবে না, সে সম্বন্ধে আশ্বস্ত হওয়ার পরও প্রশ্ন থেকে যায় সংস্কৃতির দিক দিয়ে এই দুই রাষ্ট্রের যোগাযোগ থাকবে কি থাকবে না, এবং যদি থাকে তবে সেটি কি প্রকারের হবে।

একটা দৃষ্টান্ত পেশ করি। সকলেই জানেন, প্যালেসটাইনের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ট্রান্সজর্ডান এবং তার প্রতিবেশী সউদী আরব যে পালেসটাইনের আরবকে ইহুদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোনো সাহায্য করতে পারল না, তার প্রধান কারণ আমীর আবদুল্লা ও ইবনে সউদের শত্রুতা। আমীর আবদুল্লার ভয় ছিল যে তিনি যদি সর্বশক্তি নিয়ে প্যালেসটাইন আক্রমণ করতে পারেন, আবদুল্লার পক্ষে উভয় রণাঙ্গনে যুদ্ধ করা অসম্ভব হবে—হিটলারও পারেননি এবং ফলে তাঁর দুই কূলই যাবে।

কিন্তু তাই বলে ট্রান্সজর্ডান ও সউদী আরবের কৃষ্টিগত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। কাবাশরীফের চতুর্দিকে ধর্ম সম্বন্ধে আরব তথা অন্য দেশবাসী শেখরা প্রতিদিন যে বক্তৃতা দেন, সেগুলোতে ট্রান্সজর্ডানের অধিবাসীরা আগেরই মত হাজিরা দিয়েছে এবং আম্মানে লেখা কেতাব মক্কাতে পূর্বেরই ন্যায় সম্মান পেয়েছে। শুধু তাই নয়, মক্কা এবং আম্মান উভয় শহরের বিদ্যার্থীরাই কাইরোর আজহরে গিয়ে আগেরই মত পড়াশোনা করেছে। ইবনে সউদ মক্কা দখল করার পর বহু বৎসর পর্যন্ত মিশর-মক্কায় মনোমালিন্য ছিল—এমন কি মিশর থেকে কাবাশরীফের বাৎসরিক গালিচা আসা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাই বলে আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের মক্কা-মদনওয়ী ছাত্রাবাস বন্ধ হয়ে যায়নি কিংবা ছাত্রেরও অপ্রাচুর্য হয়নি—মিসরে ছাপা ইমাম আবু হনিফার ফিকার কিতাব আগেরই মত মক্কার বাজারে বিক্রয় হয়েছে।

আরব-ভূমি আজ কত ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত, তবু যখন আজহরে পড়তুম, সব রাষ্ট্রের ছেলেদের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হয়েছে, তাদের আপন আপন হস্টেলে গিয়েছি, সকলে মিলে বাজার থেকে মুর্গী কিনে এনে হৈ-হুল্লোড় করে রান্না করে খেয়েছি। বিশ্বাস করবেন না, রান্নার সর্দার ছিলো মালদ্বীপের একটি ছেলে—মালদ্বীপ কোথায়, সে কথাই বহু ছাত্র জানতো না।

এইবার গোটা দুই ইয়োরোপীয় উদাহরণ পেশ করি। ভাষা এবং কৃষ্টির দিক দিয়ে দেখতে গেলে ফ্রান্সের উত্তর-পূর্বাংশ পড়েছে সুইটজারল্যাণ্ডের ভিতর। উত্তরাংশের খানিকটা পড়েছে লুক্সেম্বুর্গের ভিতর এবং আরো খানিকটা বেলজিয়ামের ভিতর। এ-সব দেশের লোকেরা আপন আপন রাষ্ট্রের প্রতি সর্বান্তঃকরণে আনুগত্য স্বীকার করে—ফ্রান্সও কখনো বলে না, এসব ফরাসী-ভাষী ভূখণ্ডগুলো লড়াই করে দখল করবো। অথচ কৃষ্টিগত আদান প্রদান এই তিন ভূমিতে হামেশাই চলেছে। প্যারিসে আঁদ্রে জিদের বই যে-দিন বেরোয় ঠিক সেই দিনই সে-বই জিনিভা, লুক্সেম্বুর্গ এবং ব্রাসেল্‌সে কিনতে পাওয়া যায়। জিনিভার বড় প্রকাশকরা প্যারিসে ব্রাঞ্চ রাখে, ব্রাসেল্‌সের প্রকাশকরা জিনিভায় আপন শাখা খুলতে পারলে খুশী হয়।

কিন্তু ঢাকার সাহিত্যামোদী এবং প্রকাশক হয়ত বলবেন, 'আমরা কলকাতার ধামাধরা হয়ে থাকতে চাইনে, কাজেই এ উদাহরণটা আমাদের মনঃপূত হল না।'

উত্তরে ভিয়েনা-বার্লিনের দৃষ্টান্ত পেশ করবো। দুই শহর দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের রাজধানী। কেউ কারো চেয়ে কম নয় এবং এককালে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির (মায়

যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া) প্রতাপ জর্মনির চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। দু'শহরের লোকই জর্মন বলে, জর্মন থিয়েটার দেখে, জর্মন অপেরা শোনে। ভিয়েনাতে কোনো নাট্য-সমঝদারের সাবাসী পেলে সঙ্গে সঙ্গেই নাট্যকার, অভিনেতা এবং নর্তক-নর্তকীদের নিমন্ত্রণ হয় বার্লিনে—বার্লিনে কোনো লেখক নাম করতে পারলে ভিয়েনা য়ুনিভার্সিটি তাঁকে অনারারি ডক্টরেট দেয়।

এই দু' শহরের দুশমনি-বর্জিত আড়াআড়িতেই বিরাট জর্মন সাহিত্য গড়ে উঠেছে, জর্মন সঙ্গীত বলতে এ কথা কেউ শুধায় না মৎসার্ট, স্ট্রাউসের জন্ম কোথায় হয়েছিল এবং একথা সকলেই জানে যে সঙ্গীতসম্রাট বেটোফেনের জন্ম হয় বন্ (উপস্থিত পশ্চিম জর্মনির রাজধানী) শহরে এবং জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি কাটান ভিয়েনাতে।

বাঙলা ভূমিতে ফিরে আসি।

বাঙলার বিদগ্ধ সাহিত্যের চর্চা আরম্ভ হয় প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে পশ্চিম-বঙ্গের কলকাতাকে কেন্দ্র করে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ (এমন কি শরৎচন্দ্র পর্যন্ত), প্রথম চৌধুরী, নজরুল ইসলাম এরা সবাই জীবনের অধিকাংশ ভাগ কাটিয়েছেন কলকাতায়। বাঙলা সাহিত্য (গদ্যসাহিত্য তো বটেই) রাজধানীর সাহিত্য,—কম্যুনিস্টরা এই সাহিত্যকেই গালাগাল দিয়ে বলেন 'বুর্জোয়া' সাহিত্য—যদিও আমাদের কর্ণে এ গালাগাল বংশীধ্বনির ন্যায় শোনায়।

মাত্র সেদিন পূব-বাঙলার লোক সাহিত্যের আসরে নামলেন। বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য, মানিককে কিন্তু বাধ্য হয়ে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়েছে। ঢাকা যে সাহিত্যের কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারেনি, তার প্রধান কারণ ঢাকা কখনো কলকাতার মত তামাম ভারত এবং বাঙলার রাজধানী হয়ে উঠতে পারেনি।

আমাদের ভয় হয়েছিল পূর্ববঙ্গ পাছে বাঙলা ভাষা বর্জন করে উর্দু গ্রহণ করে বসে। সে ভয় কেটে গিয়েছে এবং ঢাকার বাঙলা যে উরদু হরফে লেখা হবে না, সে খবরটা পেয়েও আমরা আশ্বস্ত হয়েছি।

এইবার ঢাকার পালা নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করবার। কলকাতা যে অন্তকার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা লাভের ফলে নবীন উৎসাহ, নবীন উদ্দীপনায় নূতন সাহিত্য গড়তে মন দেবে, সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই এবং কলকাতার অধি-কাংশ সাহিত্যিকই যে পূর্ববঙ্গে আপন পুস্তকের বহুলপ্রচার কামনা করেন, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মনে একটু দ্বিধা রয়ে গিয়েছে পূর্ব-বাঙলার ভবিষ্যৎ সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে। কেউ কেউ ভাবছেন পূব-বাঙলা হয়ত এমন সব শব্দ বাক্যবিন্যাস আরবী ফারসী থেকে গ্রহণ করতে আরম্ভ করবে যে, কালে কলকাতার লোক ঢাকায় প্রকাশিত বাঙলা বই পড়ে বুঝতে পারবে না। তাঁদের এ ভয় দূর করে দেবার জন্যই আজ আমার এ-প্রবন্ধ লেখা—যাতে করে পশ্চিমবঙ্গবাসীর স্বাধীনতা লাভের আনন্দ আজ সর্বপ্রকার দ্বিধাবর্জিত নিরঙ্কুশ হয়।

ইচ্ছে করলেই যে-কোনো ভাষা থেকে জাহাজ-বোঝাই শব্দ গ্রহণ করা যায় না। দৃষ্টান্তস্থলে আজকের দিনের বাঙলা ভাষাই নিন। এ ভাষা যে শব্দসম্পদে কত দীন, সে কথা যাঁরা অর্থনীতি, বিজ্ঞান এবং অন্যান্য নূতন চিন্তা নিয়ে বাঙলায় কারবার করেন তাঁরাই জানেন এবং তাঁদের অধিকাংশই ইংরেজি থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি শব্দ গ্রহণ করতে পারলে বহু মুশকিল, বহু গর্দিশ থেকে বেঁচে যেতেন। কিন্তু উপায় নেই—তাঁরা বিলক্ষণ জানেন, ইংরেজি-অনভিজ্ঞ যে পাঠকের জন্য তাঁরা বই লিখতে যাচ্ছেন, তারাই সে বই বুঝতে পারবে না। তাহলে আর লাভটা কি হল?

পূব-বাঙলায় তার চেয়েও বড় বাধা এই যে, গাদা গাদা আরবী ফারসী শব্দ ঢোকাবার মত উমদা আরবী ফারসী এবং বাঙলা জানেন কয়টি গুণী? ডঃ শহিদুল্লা তো একজন। এবং বঙ্গ বিভাগের পরও তিনি বেধড়ক, বেদরদ আরবী-ফারসী শব্দ প্রয়োগ করেননি। যদি করেনও, বুঝবে ক'টা লোক? এন্তার আরবী ফারসী মেশানো বাঙলা বোঝার মত এলেম পূর্ব-বঙালীর এবং আপনার আমার পেটে তো নেই। আর যদি বলেন ভবিষ্যতে একদিন পূর্ব-বাঙলার জনসাধারণ, চাষাভূষো সব্বাই উত্তম আরবী-ফারসী শিখে যাবে আর হুশ হুশ করে আরবী-ফারসীর বগ-হারে রান্না বাঙলা ভাষা বুঝে ফেলতে পারবে, তাহলে তো সে আনন্দের কথা। প্রত্যেক ব্যক্তি তিনটি ভাষায় (তারও একটা আরবীর মতো কঠিন ভাষা! বিবেচনা করুন) আলিম-ফাজিল, এত বড় ডাঙর সুখস্বপ্ন পূর্ব-বাঙলার নমস্য ব্যক্তিরাও দেখেন না।

আর যদি বলেন, নজরুল ইসলামের মত কোনো শক্তিশালী লেখক এসে সেই কর্মটি করে দেবেন তবে উত্তরে বলি, একদা পশ্চিম-বাঙলাতেই এবং আরবী-ফারসী-অনভিজ্ঞ রসিক সম্প্রদায়ের ভিতরই তাঁর কদর হয়েছিল প্রথম—পূর্ব-বাঙলা তাঁকে আদর করে বহু পরে। আজ যদি ঢাকায় নজরুল ইসলামের মত কবি জন্মান, তবে কলকাতা তাঁর কেতাব আগেরই মত উদ্‌গ্রীব, স্তম্ভিত-নিঃশ্বাস হয়ে পড়বে। তাতে করে তাবৎ বাঙলা সাহিত্যই শক্তিশালী হবে, শুধু পূব-বাঙলার সাহিত্যই না।

তাই এই আনন্দের দিনে নিবেদন করি, রাজনৈতিকরা উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তির বাণী প্রচার করেছেন। ভারতীয় অন্ততঃ বাঙালী সাহিত্যিক যেন সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্যের ভিতর দিয়ে সে শান্তি পরিপূর্ণতায় পৌঁছিয়ে দেয়।

'বাংলা-একাডেমী পত্রিকা'

পূর্ববঙ্গের বাঙলা-একাডেমীর ইতিহাস দিতে গিয়ে একাডেমীর মুখপত্র বলছেন :

"পূর্ব পাকিস্তানে 'ভাষা আন্দোলনে'র সহিত 'বাঙলা-একাডেমী'র ইতিহাস অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ১৯৪৮ ইংরেজীর একেবারেই গোড়ার দিকে বাঙলা-ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতিদানের জন্য যে স্বতঃস্ফূর্ত দাবী দেশের তরুণ ছাত্র-সমাজ হইতে উত্থিত হয়, নানা বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া তাহা দৈনন্দিন প্রবলতর ও ব্যাপকতর হইতে থাকে। মাত্র চারি বৎসর পার হইতে না হইতেই, ১৯৫২ ইংরেজীতে আসিয়া এই আন্দোলন চরম বেগ সঞ্চয় করে এবং তাহার ফলে এই সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাঙ্গণে ভাষা-আন্দোলনকারী ছাত্রদের উপর গুলীবর্ষণ করা হয়। এই অপ্রত্যাশিত ও অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনায় চারিটি ছাত্র নিহত এবং আরো কতিপয় ছাত্র আহত হয়। এই দুর্ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই ভাষা-আন্দোলন ছাত্র-সমাজের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশের সর্বত্র গণআন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে।.....আন্দোলনটি অচিরেই সরকারের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। এইভাবে ১৯৫৩ সাল কাটিয়ে গেলে পর, ১৯৫৪ সালে দেশে সাধারণ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য জনাব মৌলানা আব্দুল হামিদ খাঁ ভাসানী সাহেবের নেতৃত্বে আওয়ামী-মুসলিম-লীগ যে একুশ দফা কর্মসূচী লইয়া আগাইয়া আসেন, বাঙলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি দিয়া 'বর্ধমান হাউসে' একটি 'বাঙলা-একাডেমী' স্থাপনের পরিকল্পনাও ছিল তাহার মধ্যে অন্যতম।.....'নূতন যুক্তফ্রন্ট' সরকারের আমলে ১৯৫৫ ইংরেজীর ৩রা ডিসেম্বর একুশ দফার রূপায়ণরূপে ইহার অন্যতম দফা 'বাঙলা-একাডেমীর' উদ্বোধন কার্য 'বর্ধমান হাউসে' সুসম্পন্ন করা হয়।"

একাডেমীতে থাকবে (অ) গবেষণা বিভাগ : তার দুটি শাখা—(১) বাঙলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস, (২) পাণ্ডুলিপি তথা লোকগাথা, লোকসঙ্গীত ইত্যাদির সংগ্রহ ও প্রকাশ। (আ) অনুবাদ বিভাগ, (ই) সঙ্কলন

ও প্রকাশনা- বিভাগ, (ঈ) সাংস্কৃতিক-বিভাগ—পাঠাগার, সাহিত্য-সভা, পুরস্কার বিতরণ ইত্যাদি।

বক্ষ্যমান সংখ্যা 'বাঙলা-একাডেমী'[১] পত্রিকার প্রথম সংখ্যা।

পত্রিকায় ন'টি তথ্য ও তত্ত্ব সম্বলিত মূল্যবান প্রবন্ধ রয়েছে—মাত্র একটি ছাড়া আর সব কটি প্রবন্ধই একাডেমির সাহিত্যসভায় পড়া হয়েছিল।

প্রথম প্রবন্ধটি উভয় বাঙলায় সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সায়েবের রচনা—এ প্রবন্ধে তিনি 'পণ্ডিত রেয়াজ অল্-দিন আহমদ মাশহাদি' নামক একজন বাঙালী লেখকের 'সমাজ ও সংস্কারক' নামক পুস্তকখানির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তার প্রয়োজনও বিলক্ষণ ছিল, কারণ ১২৯০ সালে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ সরকার পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত করেন। কেন করেছিলেন সেটা পুস্তকের উদ্ধৃতি থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। রেয়াজ অল-দিন রাজনৈতিক নেতা জমাল্উদ্দীন আফগানীর ন্যায় ইংরেজের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার প্রয়াসী ছিলেন। এই প্রচেষ্টা করতে গিয়ে রেয়াজ অল্-দিন হৃদয়ঙ্গম করেন যে একদল হিন্দু যেরকম অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন 'সব-কিছু আমাদের শাস্ত্রেই আছে', 'ইয়োরোপীর জ্ঞান-বিজ্ঞানে এমন কিছু নেই যা আমাদের মুনি-ঋষিরা জানতেন না' ঠিক সেই রকম বেশীর ভাগ মুসলমানই বিশ্বাস করেন যে, আরবীর মাধ্যমে তাঁরা যে আরবী-ইরানী আভিচেন্না আভেরস এবং গ্রীক প্লাতো-আরিস্টট্লের দর্শন-বিজ্ঞান ৮০০। ১০০০ বৎসর পূর্বে আয়ত্ত করেছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীতেও সেই যথেষ্ট, নূতন কিছু শেখবার নেই। এ বিতর্কের সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের তেমন কোনো আন্তরিক সম্পর্ক নেই, কিন্তু রেয়াজ অল্-দিন সেদিন তাঁর পর্যবেক্ষণ, মনোবেদনা ও পথনির্দর্শন যে-ভাষায় প্রকাশ করেছেন সেটি তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও একাধিক ভাষার সঙ্গে তাঁর দৃঢ় যোগসূত্রের পরিচয় দেয়।

"হিজরি দ্বিতীয়াদি শতাব্দীতে মোসলমান পণ্ডিতেরা যে-সমস্ত দর্শন-বিজ্ঞান-গণিতবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, ইদানীন্তন শাস্ত্রকোবিদগণও সম্পূর্ণরূপে তাহারই অনুবর্তন করেন। বিশেষ যাঁহাদিগের রচনাশক্তি ও কল্পনাশক্তি সমধিক তেজস্বিনী, তাঁহারা সেই কীট নিষ্ঠুষিত প্রাচীনতম শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিবৃতি প্রকৃতি লিখিয়া আপনাদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিবেচনা অনুসারে বর্তমান চিন্তা ও নবাবিষ্কৃত সমস্তই ভ্রমপ্রদায়ে আশ্রয় ও অকিঞ্চিৎকর; কেবল

---

[১] 'একাডেমীর' ইংরিজি উচ্চারণই যখন নেওয়া হয়েছে তখন 'একাডেমী' লিখলেই বোধ হয় ভালো হত; কারণ ইংরেজিতে 'মি' হ্রস্ব।

প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতের ধ্বংসাবশেষ দ্বারা পৃথিবী এখনও চলিতেছে; অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, লৌহবর্ত্ম, তড়িতবার্তাবহ, তাপমান, বাতমান প্রভৃতি লোকসমাজের আবশ্যক ও বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত সত্যাদি সমুদায়ই হিন্দুদিগের বিশ্বকর্মার ন্যায় মুসলমানদের লোকমান-হাকিমের চর্বিত-চর্বণ মাত্র। এ সমস্তকে কল্পতরুরূপী বর্তমান বিজ্ঞান-বৃক্ষের অভিনব বিষ-অমৃত-ফল তাহা মুসলমান অর্ধ শিক্ষিত লোকেরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না, তাঁহারা আরাস্তু (আরিস্টট্‌ল), আফ্‌লাতুন্ (প্লেটো) প্রভৃতির প্রাচীন জীর্ণমত সকল গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া কৃতার্থ হয়েন বটে, কিন্তু আধুনিক নিউটন, গালিলিয়ো, কেপ্‌লার, ডারুইন, লাপ্লাস, কম্‌টির (কঁৎ) অতুল প্রতিভার দিকে তাঁহাদের অনুমাত্রও মনঃসংযোগ নাই। প্রত্যুত একপ্রকার বিদ্বেষ-বুদ্ধি দৃষ্ট হয়। প্রাচীন মোসলমান মহাপণ্ডিতগণ ভারতবর্ষ ও গ্রীসকে আপনাদের শিক্ষাগুরু বলিয়া জগতে অকুণ্ঠিত চিত্তে, মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক অজ্ঞান মোসলমান শিক্ষিত লোকেরা তাদৃশ্য প্রাধান্যের কথা মুখে আনিতেও লজ্জা বিবেচনা করেন। সুতরাং পৃথিবীর জাতি-সাধারণের পরস্পরের মধ্যে বিজ্ঞান ও বুদ্ধির আদানপ্রদানে যে কুশল ও কল্যাণ সম্ভব, মোসলমানেরা তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিদূরিত রহিয়াছেন। কিন্তু যাহা সত্য তাহা নিউটনের সত্য, কোপার্নিকস বা আর্যভট্টের সত্য বা আবু আলি সিনার (আভিচেন্না) সত্য নহে, তাহাতে প্রত্যেক বিশ্ববাসীরই তুল্য অধিকার।"

মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি মুসলমানদের ঔদাসীন্য দেখে রেয়াজ অল্‌-দিন যে কতদূর মর্মাহত হয়েছিলেন এবং কী অকুণ্ঠ ভাষায় তার প্রকাশ দিয়েছিলেন নিম্নে তার উদাহরণ দি ;—

"যাঁহারা এসলাম গ্রহণ পূর্বক মোসলমান নামে বিখ্যাত হয়েন, তাঁহাদের গভীর প্রেম, স্বপ্ন, স্নেহ ও স্বদেশবাৎসল্য সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া যায়, কেবল তৎসমুদায়ের স্থানে এক সামান্যরূপ সাম্প্রদায়িক সহানুভূতির সঞ্চারদৃষ্ট হয়। সুতরাং তাঁহাদের হস্ত সকলের বিরুদ্ধে এবং সকলের হস্ত তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। মাতৃভূমি ও জন্মভূমি ঘটিত ভাষার প্রতি তাঁহাদের মমতাজ্ঞান নাই; প্রত্যুত তৎসমস্ত পরদেশ ও পরভাষা বলিয়া অবিরত উপেক্ষিত হইতেছে। তাঁহাদের স্বদেশও নিজ ভাষা বলিয়া অপর কোনও পৃথক বস্তু দৃষ্ট হয় না, অথবা তাঁহারা অখিল মোসলমান সমাজ ও ধর্মকে এক ভাষার অধীনে স্থাপন করিতে উদ্যত।"

এই প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষকে অনায়াসে বাঙালী মুসলমানের রামমোহন বলা

যেতে পারে। কিন্তু হায়, বাঙালী মুসলমান এঁকে তখন চিনতে পারেনি। আজ যদি উভয় বাঙলার মুসলমান এঁকে চিনতে পারে, তবে পূব বাঙলার একাডেমী আমাদের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য অন্তহীন প্রশংসা অর্জন করবেন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে পূব বাঙলার জনপ্রিয় মাসিক 'মাহেনও'-এর সম্পাদক জনাব আবদুল কাদির, কবি মালিক মুহম্মদ জয়সীর 'পদুমাবৎ কাব্যে'র 'অনুবাদক' পূব বাঙলার কবি সৈয়দ আলাওলও তাঁর কাব্যের সঙ্গে আমাদের নূতন করে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। 'পদ্মাবতী'র পুঁথি সংগ্রহ করা অতি কঠিন। লেখক এই প্রবন্ধের উদ্ধৃতি এতই পাণ্ডিত্য ও রসবোধের সঙ্গে করেছেন যে মূল পড়া না থাকলেও কাব্যখানির সঙ্গে যে পরিচয় হয় তা অকৃত্রিম ও বিকৃতিহীন। তবে লেখক যে আলাওলকে 'নিঃসন্দেহে ভারতচন্দ্র হইতেও শ্রেষ্ঠ কবি' বলেছেন, সে সম্বন্ধে আমাদের মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। আশা করি কাদির সাহেব এ সম্বন্ধে দীর্ঘতর প্রবন্ধ লিখে আমাদের সন্দেহভঞ্জন করবেন।

অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী মীর মশাররফ হোসেনের কর্মজীবন ও সাহিত্য-চর্চা নিয়ে যে গভীর গবেষণাত্মক প্রবন্ধটি লিখেছেন তাতে 'বিষাদ সিন্ধু'র অনুরাগীদের প্রভূত উপকার হবে সন্দেহ নেই। মশারফ হোসেনকে বাঙালী এক 'বিষাদ-সিন্ধু'র লেখক হিসাবেই চেনে; তাঁর বহুমুখী প্রতিভার প্রচুর পরিচয় এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ থেকেই পাওয়া যায়।

সৈয়দ মোর্তাজা আলী সাহেব 'বাঙলা গদ্যের আদিযুগ' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে চারটি উদাহরণ দিয়েছেন। (১) ১৫৫৫ খৃঃ অহমরাজ চুকম্পাকে লেখা কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের চিঠি, (২) ১৬৪৭ খৃঃ শ্রীহট্টাঞ্চলে লেখা একটি 'হকীকৎ নামা', (৩) জয়ন্তিয়া বুরুঞ্জী থেকে উদ্ধৃত আসাম রাজকে লেখা জয়ন্তিপুরের রাজার একখানা চিঠি ও (৪) মনোএলদা—আসসুমের কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ থেকে। যে সমস্ত অঞ্চলের ভাষা থেকে তিনি উদাহরণ নিয়েছেন সে-সব অঞ্চলের ঐতিহ্য ও বর্তমানে প্রচলিত উপভাষাগুলির সঙ্গে তিনি সুপরিচিত এবং তাঁর 'হিসটরি অব জয়ন্তিয়া' ঐ ভূখণ্ড সম্বন্ধে ইংরেজিতে লিখিত একমাত্র গ্রন্থ (পাঠান-মোগল কেউই খাসিয়া পাহাড়ের সানুদেশে অবস্থিত 'জয়ন্তিয়া রাজত্ব' অধিকার করতে পারেনি বলে এদেশে প্রাচীন হিন্দু পলিটির প্রচুর আবিষ্কৃত নিদর্শন পাওয়া যায় ও কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'র চর্চাকারীর পক্ষে অপরিত্যাজ্য। অগ্রজের সাহিত্যচর্চার নিরপেক্ষ আলোচনা নন্দনশাস্ত্রসম্মত,

কিন্তু সংস্কার বাধা দেয়।

পাবনার সাধক কবি জহীরউদ্দীনের জীবন ও গীত সম্বন্ধে লিখেছেন মৌলবী গোলাম সাকলায়েন ও শ্রীহট্টের কবি শাহ হুসেন আলম সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন মৌলবী নিজামউদ্দীন আহম্মদ।

ইরানের সূফী মতবাদ বাঙলাদেশে এ-দেশের নিজস্ব শ্রীরাধাকেন্দ্রিক বৈষ্ণব ভক্তিবাদের সঙ্গে মিলে যাওয়াতে এইসব মারিফতী (গুহ্য তত্ত্বাত্মক) গীতের সৃষ্টি জর্মনপণ্ডিত গল্‌ড্‌ৎসিহার ও হর্টেনের বিশ্বাস ইরানে থাকাকালীনই সূফী মতবাদ বেদান্ত, যোগ ও নারদ শাণ্ডিল্যের ভক্তিবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল; ফরাসী পণ্ডিত মাসিন্নো অস্বীকার করেন কিন্তু ইরানী এবং আরব কবিদের ন্যায় এঁরা আপন জীবনকাহিনী তাঁদের সৃষ্টির ভিতর বুনে দিতেন না। আত্মগোপন করার ভারতীয় ঐতিহ্যই বরঞ্চ তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন (কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, 'চণ্ডীদাস কয়' জাতীয় ভণিতা মুসলমানদের কাছ থেকে নেওয়া)। দুই প্রবন্ধের লেখকই যেটুকু খবর পাওয়া যায় তাই নিঙড়ে নিঙড়ে তাঁদের কাব্যসৃষ্টি থেকে বের করেছেন। এই ধরনের কাজের প্রতি একাডেমী যে বিশেষ মনোযোগ দেবেন সে-কথা পূর্বেই বলেছি। ভালোই, কারণ পশ্চিমবঙ্গের লেখকেরা যথেষ্ট আরবী-ফার্সী জানেন না বলে মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্রের আরবী-ফার্সী-ভর্তি অংশগুলোর টীকাটিপ্পনী কর্মটি পর্যন্ত এড়িয়ে যান—এ-কাজ বিশেষ করে পূব বাঙলাতেই ভালো হবে।

চৌধুরী শামসুর রহমান সায়েবের 'আমাদের সাংবাদিক প্রচেষ্টা' তথ্যবহুল প্রবন্ধ—অশেষ পরিশ্রমের পরিপূর্ণ সাফল্য।

'মধুরেন সমাপয়েৎ' করেছেন একাডেমীর সুযোগ্য সম্পাদক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক্ মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের একমাত্র মুসলিম মহিলা কবি 'রহীমুন্‌নিসা' প্রবন্ধ দিয়ে। ১৭৬৩—১৮০০-র মধ্যবর্তী কালের এই মহিলা কবি সরস স্বাভাবিক বাঙলায় যে কাব্যসৃষ্টি করে গিয়েছেন তার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন হক্ সাহেব—ভবিষ্যতে আরো হবে সে আশা রাখি। উপস্থিত দু' একটি উদাহরণ পেশ করছি। স্বামীর আদেশে তিনি সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী' নকল করে দেন; সেই সম্পর্কে বলেন—

'শুন গুণিগণ হই এক মন
লেখিকার নিবেদন।

অক্ষর পড়িলে টুটাপদ হৈলে
শুধরিতা সর্বজন ॥
পদ এই রাষ্ট্র হেন মহাকষ্ট
পুঁথি সতী পদ্মাবতী।
আলাওল মণি বুদ্ধি বলে গুণী
বিরচিল এ ভারতী ॥
পদের উকতি বুঝি কি শকতি
মুই হীন তিরী জাতি।
স্বামীর আদেশ মানিয়া বিশেষ
সাহস করিনু গাঁথি ॥'

রহীমুন্নিসার পিতামহ ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে চট্টগ্রামে অজ্ঞাতবাস বরণ করেন :—

অগ্রগামী হৈয়া ইংরাজ যুদ্ধ দিল।
দৈবদশা ফিরিঙ্গীর বিজয় হইল ॥
মুখ্য মুখ্য সবের বহুল রত্নধন।
লুটিয়া করিল খয় যত পাপিগণ ॥

পিতামহের মাতৃভাষা নিশ্চয়ই হয় ফার্সী নয়, উর্দু ছিল। রহীমুন্নিসা কিন্তু খাঁটি বাঙালী। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,

স্বামী আজ্ঞা শিরে পালি লিখি এ-ভারতী।
রহিমন্নিচা নাম জান, আদৌ ছিরীমতী ॥

অর্থাৎ তাঁর নাম 'শ্রীমতী রহিমুন্নিসা'।

শোকের কবিতায় এ মহিলার অসাধারণ সরল কবিত্বরস প্রকাশ পেয়েছে। সামান্য উদাহরণ দিয়েও ভবিষ্যতে এর 'ভারতী' আরো প্রকাশিত হবে এই আশা নিয়ে এ আলোচনা শেষ করি ;—

নয়া সন নয়া মাস ফিরে বারে বার।
মোর জাদু কাল ফিরি না আসিল আর ॥
আশ্বিনেতে খোয়াময় কান্দে তরুলতাচর,
'ভাই' বলি কান্দি উভরায়।
আমার কান্দন শুনি বনে কান্দে কুরঙ্গিনী
জলে মাছ কান্দিয়া লুকায় ॥

একাডেমীর ভার যোগ্য স্কন্ধে পড়েছে, এ বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহ নেই।

একাডেমীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো না। বিদ্যুৎ আবিষ্কৃত হলে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ফ্যারাডেকে নাকি এক মহিলা এই প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি নাকি গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, "ম্যাডাম্, নবজাত শিশুর ভবিষ্যৎ কি কে বলতে পারে!"

উপস্থিত দেখতে পারছি শিশুটি বলিষ্ঠ, প্রাণবন্ত ও তার কৌতূহল অসীম। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলি, "শতং জীব, সহস্রং জীব।"

রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজ

(বগুড়া কলেজের সাহিত্য-অধিবেশনের সভাপতিরূপে অভিভাষণ)

পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন সভ্যতা এবং সমস্ত ধর্মমত ভৌগোলিক কারণে অল্পপরিসর নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের সভ্যতা এবং ধর্মমত গড়ে তুলেছে। কিন্তু যখনই সেই সভ্যতা এবং ধর্মমত নিজের গতি মুক্ত হয়ে বাইরে অন্যের সঙ্গে যোগস্থাপন করেছে তখনি তাদের মধ্যে দেশকাল পাত্রভেদে একটু পরিবর্তন হয়েছে। আমার আজকের বক্তব্য ইসলাম সম্বন্ধে এবং ইসলাম ধর্ম প্রসঙ্গে আপনাদের আমার আগের কথাটা একটু চিন্তা করতে বলি। আমি নিজে মুসলমান, কাজেই এ বিষয়ে আমার স্বাভাবিক আগ্রহ থাকা ছাড়া আমি নানা দেশ ঘুরে এবং এ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানসঞ্চয় করে আমার নিজস্ব চিন্তাধারা আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করছি।

আজ বিজ্ঞানের কৃপায় দেশে-দেশের ভৌগোলিক ব্যবধান ঘুচেছে, কাজেই এক দেশ আর এক দেশকে এক সভ্যতা আর এক সভ্যতাকে নিবিড় করে জানবার সুযোগ পাচ্ছে। এই আধুনিক যুগে সত্যিকারের ইসলামের সেবককে মানসিক জড়ত্ব ত্যাগ করে ইসলামের সঙ্গে অন্য প্রচলিত সব ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করে তার আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ করতে হবে—শুধু মৌলভী-মোল্লার অনুশাসন এবং ধর্মব্যাখ্যানের উপর নির্ভর করলে চলবে না।

ইসলাম সম্বন্ধে আপনাদের বোধ হয় একটা ধারণা আছে যে 'ইহাই একমাত্র ভগবান কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট একমাত্র সত্যধর্ম'। কিন্তু সেটা সত্যি নয়—কেননা

এর আগেও মুশা ও যীশুখৃষ্টের নিকট ভগবানের প্রত্যাদেশ সত্যধর্মরূপে প্রকাশ হয়েছিল। এক বিষয়ে ইহুদী ও খৃষ্টধর্মের সঙ্গে ইসলামের সাদৃশ্য আছে—আল্লা যুগে যুগে সত্যপুরুষ বা প্রফেটের মাধ্যমে সত্যবাণী প্রকাশ করেন, কাজেই ইসলামকে একেবারে আকস্মিক বলে ধরলে চল্‌বে না—পূর্বোক্ত দুই ধর্মমতের পরিণতি হিসাবেই জানতে হবে এবং কোরানও এ সম্বন্ধে এই এক কথাই বলেন।

নতুন কোন ধর্মপ্রচারের পশ্চাতে শুধু ধর্মের মহান বাণী ব্যতীত একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি না থাকলে তার প্রতিষ্ঠা হওয়া শক্ত। যীশুখৃষ্ট সুদখোর ইহুদী বণিক-সম্প্রদায়ের পবিত্র ধর্মস্থানকে টাকার লেনদেনের স্থান দেখে তার প্রতিবাদ করেছিলেন—ধনীশোষিত জনসাধারণ তাঁকে সমর্থন করলেও স্বার্থ-হানিভীত ধনী ইহুদীরা তাঁকে রাজদ্রোহী হিসাবে অভিযুক্ত করে তার প্রাণহানি করিয়েছিলেন। হজরত মহম্মদের নতুন ধর্ম ইসলামের প্রচারের পশ্চাতেও এই প্রকার একটা আর্থিক প্রোগ্রাম ছিল—কিনা ধনীদের আয়ের কিয়দংশ 'জাকাত' অর্থাৎ গরীবদের দান করতে হবে। এতে 'হ্যাভ-নট'রা আশ্বস্ত হ'লেও 'হ্যাভে'র দল আশঙ্কিত হয়ে তার বিরুদ্ধাচরণ করতে আরম্ভ করল। একেশ্বরবাদ প্রচারে যারা বিশেষ বিচলিত হয়নি সেই কোরেশ সম্প্রদায় তাকে মক্কা-ছাড়া করলো। কাজেই ইসলামের এই সাম্যের ভিত্তিতে ধনবণ্টন-নীতি যদি পালন না করা হয়—redistribution of weath দ্বারা যদি 'হ্যাভ-নট'দের কোন সুব্যবস্থা না হয়, তাহা হলে ইসলামের মূলনীতি মানা হবে না। সবাইকে—ধনী-দরিদ্রকে সঙ্গে নিয়ে শুধু একসঙ্গে আহার এবং বাসের সুবিধা দিলেই Islamic democracy প্রতিষ্ঠিত হবে না। ইসলামের যে অর্থ নৈতিক প্রোগ্রাম আছে তাকেও কার্যকরী করে তোলবার জন্য প্রয়াস করতে হবে।

হজরত মহম্মদ যখন মদিনা থেকে আবার মক্কায় ফিরে এলেন তখন মক্কাবাসীরা তাঁর ধর্মকে সাদরে গ্রহণ করলো—কোনো রক্তপাতের দরকার হয়নি। সেটা শুধু তাঁর মহাপুরুষত্বের জন্য, না তিনি 'হ্যাভনট'দের সহানুভূতি পেয়েছিলেন বলে? তারপর খলিফাদের আমলে পারস্যসাম্রাজ্য জয়ে ইসলামের এই অর্থবণ্টননীতি কার্যকরী হয়েছিল—পারস্যের জনগণ করভারে নিষ্পিষ্ট হচ্ছিল এবং যখনই ইসলামের অর্থনৈতিক প্রোগ্রামের কথা ছড়িয়ে পড়লো তাদের মধ্যে তখনই তারা ইসলামকে সাদরে বরণ করে নিলো—নইলে যে বিরাট পারস্যবাহিনী গ্রীকদের পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলেছিল তারা কেন ইসলামের কাছে পরাস্ত হবে! ইসলামের

ধনসাম্যের Message বা বাণী তাদের জনগণের Morale একেবারে নষ্ট করে দিয়েছিল। এই ইসলামের বাণীই তুরস্ক, মিশর, উত্তর আফ্রিকা স্পেন জয়ে সাহায্য করেছে—সুদ্ধ অস্ত্রবল এবং নতুন ধর্মের বাণীতে হয়নি। ইসলামের আদিযুগের কাহিনী হচ্ছে এই।

তারপর যখন ইসলামের ক্ষমতা বিস্তৃত হোল—দেশজয়ে যখন সম্পদে ইসলাম সাম্রাজ্য-সমৃদ্ধ হতে লাগল, তখন থেকে তাঁরা হ্যাভনটদের কথা বিস্মৃত হতে লাগল এবং ইসলামের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে পতন আরম্ভ হল। ভারতে যখন মুসলমান এলো তখন ইসলামের সেই Message আর নেই। কাজেই দেখি নবাব ওমরাহদের বংশধর ব্যতীত মধ্যভারতের কয়েকটি শহর অঞ্চল ছাড়া ইসলাম আর কোথায়ও প্রতিষ্ঠিত হলো না। বাংলায়ও মুসলমান ধর্মের প্রসার হোত না যদি আরব থেকে প্রচারকরা ইসলামের মূল নীতির বাহক ও ধারক হয়ে এখানে প্রচারে অবতীর্ণ না হতেন।

এদিকে ভারতে ঢুকেও ইসলাম নিজের ধর্মমত সম্বন্ধে একপেশে হয়ে রইল। কারণ হিন্দুধর্মের ভগবান-সম্পর্কিত দিকটা বড় উদার—তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মধ্যে যাকে খুশী যখন মেনে নিলেই হোল—তা নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু খাওয়া-ছোঁওয়া-বিবাহাদি ব্যাপারে সামাজিক অনুশাসন বেশ কড়া—বিশেষ বিশেষ পন্থী এবং নিয়মকানুনের মধ্যে আবদ্ধ করা হয়েছে—সে সব অমান্য করলেই জাত গেলো। মুসলমানদের এ বিষয়ে ঠিক হিন্দুদের বিপরীত—ভগবান 'একমেবা-দ্বিতীয়ম' এটা মানতেই হবে এবং এ সম্বন্ধে কোন ভিন্নমত পোষণ করা একেবারেই চলবে না। আর সামাজিক ব্যাপারে অর্থাৎ আহারবিহারে একেবারে উদার। কাজেই হিন্দুধর্মের সঙ্গে কোন Common Platform বা আপোস-ক্ষেত্র পাওয়া গেল না, কাজেই মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে সাত-আটশ বছর বাস করলেও হিন্দুর বিরাট দর্শনশাস্ত্র ইসলামে কোন ছায়াপাত করতে পারলো না।

এইভাবে হিন্দু এবং মুসলমান টোল এবং মাদ্রাসাতে মশগুল হয়ে রইল। ধর্মমতের মিল আর হয়ে উঠলো না। কেউ কাউকে জানার জন্য বিশেষ চেষ্টাও করলো না। ইংরাজ এসে কিন্তু 'মিরাকেল' ঘটালো—টোল মাদ্রাসা ছেড়ে হিন্দু-মুসলমান এক বিদ্যায়তনে পড়াশুনা করতে লাগল—১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী পারসীর জায়গায় রাষ্ট্রভাষা হওয়াতে মুসলমান কিছুকাল মুখ ফিরিয়ে অভিমান করে বসেছিল—হিন্দুরা আগেই এসেছে বলে শিক্ষায় মুসলমানরা একটু পেছিয়ে গেলো। কিন্তু আজকের দিনে রাষ্ট্র দুটো হলেও দু'রাষ্ট্রের মধ্যেই সকল ধর্মের লোক আছে,

কিন্তু তাতে শিক্ষার বা কালচারের অসুবিধা কেন হবে। হিন্দু-মুসলমানে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও দৃষ্টিভঙ্গীর একটা ঐক্য থাকতে পারে—সেখানে ধর্মের কোন স্থান নেই। পারস্যের কালচার যেমন পারস্য ভাষার সাহায্যে নতুন করে গড়ে উঠেছে—যদিও পারসী ভাষা আরবী অর্থাৎ পবিত্র কোরাণের ভাষা নয়—একেবারে কাফেরের ভাষা। পারসী ভাষায় রুমি, জালালুদ্দিন, সাদি হাফিজ সার্থক সাহিত্যের সৃষ্টি করলো। ভারতের উর্দুভাষা কিন্তু আরবী-পারসী-হিন্দী মন্থন করে গড়ে ওঠেনি—উর্দুর বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে তো ঢের হিন্দু রয়েছে। উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যের বহু মন্দিরের গঠনশিল্প কি হিন্দু ও ইসলামের মিলিত কালচারের চিহ্ন বহন করছে না? গজনীর সুলতান মামুদের সভাকবি আলবেরুনী এদেশে দীর্ঘকাল বাস করেছেন শুধু এদেশের সভ্যতাকে জানবার জন্য এবং সেটার যেটুকু ভাল সেটুকু আহরণ করে নিজের দেশের সভ্যতার অঙ্গবৃদ্ধি করার জন্য। এই যে Power of assimilation বা পরের ভালটুকু আত্মস্থ করে নেওয়ার ক্ষমতা সেটা একদিন ইসলামের ছিল—সেক্ষেত্রে সে ধর্ম নিরপেক্ষভাবেই চলেছিল।

আজ পূর্ব-পাকিস্তানের এই বিরাট জনসংখ্যাকে ইসলামের ঐতিহ্য মনে রাখতে হবে এবং সেই পরমতসহিষ্ণুতাকে সম্বল করে নিজের ধর্মমতকে আর একটু পরের সমালোচনার দ্বারা সহনশীল এবং তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্র করে অগ্রসর হতে হবে—তাহলে জনসংখ্যায় এবং আয়তনে পারস্যাপেক্ষা বড় এই যে পূর্ব বাংলা এ কি উন্নত হতে পারবে না! শুধু ধর্মের ঝুলির উপর নিজস্ব বিচারবুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে একটা নতুন দেশের পত্তন করা যায় না। নতুন রাষ্ট্রকে নতুন রূপে দেখতে হলে ইসলাম ধর্ম ভাল করে জানতে হবে—পড়তে হবে ইসলামের মূলনীতিগুলো যা সর্বদেশের এবং সর্বকালের জন্য। তা হলেই দেশস্বাধীন সত্যিকারের হবে। প্রাক-স্বাধীন যুগে ছিল ভাঙার কাজ—স্বাধীনোত্তর সময়ে হবে গড়ার কাজ। ভারত ডোমিনিয়নের কটা বন্দুক-কামান আছে এবং আমাদেরই বা কটা আছে এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে দেশের কোন উপকার হবে না। হিন্দুস্থান-পাকিস্তানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা নয়—নিজের দেশের কিসে ভাল হবে, দেশের লোক কিসে পেটভরে খেতে এবং পরতে পারবে সেই সব শুভঙ্করী বুদ্ধিবৃত্তির দিকে আপনাদের উৎসাহ প্রয়োগ করতে হবে। যদি এই কথা মনে রাখেন, দেশের সেবাই আপনাদের উদ্দেশ্য, তাহলে পাতঞ্জলের ভাষায় সেটাই হবে আপনাদের রাষ্ট্রের 'দৃঢ়ভিত্তি'—তার উপর প্রতিষ্ঠিত হলে এর আর অধঃপতন নেই।

বৈদেশিকী

ইংরাজ রাজত্বে আমাদের মস্ত সুবিধা এই ছিল যে দেশ-বিদেশের খবর রাখার আমাদের কোনো দায় ছিল না। জর্মনীর সঙ্গে লড়াই করার প্রয়োজন বোধ করলে ইংরেজ যে শুধু আমাদের জিজ্ঞাসা না করেই যুদ্ধ বাধাতো তা নয়, আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে হতভাগা দেশকেও সে তার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলত। কোনো সরল ইংরেজ যদি তখন শুধাত যে ভারতবাসীর এ যুদ্ধে সায় আছে কি না, তখন লণ্ডনের বড়কর্তারা অভিমানভরে বলতেন, "এ বড় তাজ্জব প্রশ্ন! এ প্রশ্নে লুকানো রয়েছে আমাদের প্রতি অন্যায় সন্দেহ। খবর নাও, দেখতে পাবে ভারতবর্ষে আমরা কস্মিনকালেও জবরদস্তি-রঙ্‌রুট (কন্‌স্‌ক্রিপশন) করিনি। ভারতের প্রত্যেকটি সেপাই আপন খুশ্‌-এক্তেয়ারে জর্মনীর বিরুদ্ধে লড়ছে।"

কাজেই এ রকম উত্তরে শুনে ভূ-ভারত ভাবতো, ভারতীয় সৈন্য অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আদর্শবাদী বীরপুরুষ। তাঁরা যে উচ্চ শিক্ষিত সে বিষয়ে আর কি সন্দেহ? তাঁরা নিশ্চয়ই হিটলারের 'মাইন কাম্‌ফ্‌', রজেনবের্গের 'মিথ্‌' পড়েছেন, কন্‌সান্‌ট্রেশন ক্যাম্প সম্বন্ধে তাঁরা ওকীব-হাল, নাৎসিদলের বর্বরতা সম্বন্ধে তাঁরা বিলক্ষণ সচেতন এবং তাই তাঁরা পৃথিবীতে সত্যসুন্দরমঙ্গল সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য জর্মনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন।

তাই যদি হত তা হলে আমাদিগকে মেহন্নত করে এই 'বৈদেশিক পর্যায়' আরম্ভ করতে হত না। আমরা জানি, ভারতবাসী আপন বিরাট দেশ নিয়েই ব্যতিব্যস্ত, এমন কি তার জাতীয় সঙ্গীতে যে পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়ের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সম্বন্ধেও তার জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

কাউকে দোষ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। পরাধীনতার সব চেয়ে মারাত্মক অভিসম্পাত সপ্রকাশ হয় তার 'শিক্ষা'-পদ্ধতিতে। আমরা এতদিন ধরে যে শিক্ষালাভ করেছি তার প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, আমরা দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে জ্ঞানসঞ্চয় করে পৃথিবীতে আপন আসন বেছে নি। আমরা যে শিক্ষা পেয়েছি তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমাদিগকে আত্মবিস্মৃত জড়ভরত করে রাখার; তাতে ইংরেজের লাভ ছিল।

তাই আশ্চর্য বোধ হয় যখন বাঙালীর ছেলে দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করে। আনন্দ বোধ হয় যে অশিক্ষা-কুশিক্ষা, দুঃখ-দৈন্যের ভিতরও তারা

তাদের মনের জানালা ক'খানা বন্ধ করে দেয় নি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এখানে তুলব না ;—দেশ-বিদেশ ভ্রমণকারী বান্ধবদের মুখে শুনেছি যে, তাঁরা বিদেশে কি শিক্ষা পেয়েছেন, সে সম্বন্ধে বাঙালী তরুণের যত না অনুসন্ধিৎসু তার চেয়ে অনেক বেশী তাদের কৌতূহল যে-দেশ তাঁরা ভ্রমণ করে এসেছেন সে-দেশের নানা খবরাখবর শুনতে। বই পড়াতেও তাদের উৎসাহ কম নয়, আর খবরের কাগজ তো তারা পড়েই।

কিন্তু খবরের কাগজে তারা বিদেশী খবরের সন্ধান পায় কতটুকু ?

আমি বাঙালী দৈনিক কাগজগুলির কথা ভাবছি। সেগুলিতে বিদেশী খবর যেটুকু পরিবেশন করা হয় সে এতই নগণ্য যে তার উপর নির্ভর করে যদি কোনো বাঙালী 'সাধারণ জ্ঞানের' পরীক্ষায় বসে, তবে তার 'অনার্স' বা সসম্মান ফেল অনিবার্য। বাঙলা দৈনিক পড়ে মনে হয়, বিদেশী খবর দেবার বরাত যেন ইংরেজি কাগজের, আবার 'দেশী' ইংরেজি কাগজ পড়লে মনে হয় তাঁরা যেন বরাত চাপিয়ে দিচ্ছেন 'স্টেটসম্যানের' ঘাড়ে। 'বিদেশী খবর ?' ওগুলো দেবে বিদেশী কাগজ—ওসব হচ্ছে 'স্টেটসম্যানের' কর্ম। যেন বাঙালী কাগজ বাঙালী বিধবার সামিল। বিলিতি বেগুনের মত বিলিতী খবর তার পক্ষে নিষিদ্ধ!

আর বিদেশী খবর যে-হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় দেন সেও আবার সর্বপ্রকার টীকা-টিপ্পনী বিবর্জিত। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সের মতও সুশিক্ষিত দেশের কাগজওলারা পর্যন্ত খবর রাখে যে সাধারণ পাঠক কতটুকু জানে না-জানে এবং সেই হিসেবে বিদেশী খবর পরিবেষণ করার সময় প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনী দিতে কসুর করে না। শুধু তাই নয় সম্পাদকীয় স্তম্ভে সে সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা হয়, রবিবারের কাগজে তার বিস্তৃত সচিত্র বিবরণ বেরোয় এবং যদি সমস্ত ব্যাপারটা দেশের সাধারণ লোকের মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে তবে রাজনৈতিক কর্তাদের আসরে নেবে আপন আপন বক্তব্য খোলসা করে বলতে হয়। শেষ পর্যন্ত হয়ত প্রধান মন্ত্রীকেই বিবৃতি দিতে হয়। দেশের লোকেরা তখন অন্ততঃ এইটুকু প্রত্যয় রাখে যে তাঁর বিবৃতি বিশেষজ্ঞের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর তৈরী করা হয়েছে। সে-বিশেষজ্ঞ রাজদূত ; যে-দেশ নিয়ে আন্দোলন আলোড়ন চলছে তিনি সে দেশে বসবাস করেন ও প্রতিদিন না হোক প্রতি সপ্তাহে সে-দেশ সম্বন্ধে একখানা গোপনীয় রিপোর্ট বা প্রতিবেদন পাঠান।

আমাদের পত্রিকাওলারা কোনো রকম মেহন্নত করতে নারাজ। পাঠক কি খবর চায় না-চায়, তাকে কি করে পৃথিবীর খবর সম্বন্ধে উৎসুক করে তোলা যায়,

সে সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন। বায়স্কোপওলারা যদি যথেষ্ট বিজ্ঞাপন দেয়, বড় বড় কোম্পানীর নেকনজর থেকে যদি তাঁরা বঞ্চিত না হন তবে কাগজ চলবেই—কেউ ঠেকাতে পারবে না। ভালো খবর পরিবেষণ করার চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায় একমাত্র নবজাত কাগজের মধ্যে। বাচ্চা হরিণের মত তাঁরা ছুটোছুটি করেন ভালো খবরের সন্ধানে কিন্তু কাগজ চালু হয়ে যাওয়ার পর তাঁরাও মেদস্ফীত হরিণের ন্যায় পাঁচতলা-গাছের ছায়ায় শুয়ে থাকাটাই জীবনের চরম মোক্ষ বলে ধরে নেন।

বক্ষ্যমান মাসিক এ-সমস্ত অভাব ঘুচিয়ে দেবার স্পর্ধা বা দম্ভ করে না। তার যদি কোনো দম্ভ থাকে তবে সেটুকু মাত্র এই যে সে চেষ্টায় কসুর করবে না। এবং তার ভরসা যে একদিন যোগ্য পাত্র এসে আমাদের আরব্ধ কর্ম সুসম্পন্ন করে দেবেন।

দেশের অত্যন্ত কাছে, যে-দেশকে বিদেশ বলা প্রায় ভুল, সেই দেশ নিয়ে আমাদের এ পর্যায় আরম্ভ হল।

আফগানী দাবী

একদা এক কান্দাহারী রাজকুমারী বহুশত যোজন অতিক্রম করে বরের সন্ধানে দিল্লীতে এসে উপস্থিত হন। ভারতবর্ষের সব চেয়ে বড় কবি তখন ভূ-ভারত দাবড়ে বেড়াচ্ছিলেন—রাজকন্যার দিকে ভালো করে এক নজর তাকিয়ে বল্লেন, 'এ কন্যার নিদেনপক্ষে একশ বাচ্চা হবেই হবে।' একশ বাচ্চা শুনে যেন আমরা আশ্চর্য না হই; কান্দাহারী পাঠান কুমারীর দৈর্ঘ্যপ্রস্থ দেখলে এরকম ভবিষ্যৎবাণী সবাই করে থাকে—গান্ধারীকে দেখে হস্তিনাপুরের ব্যাস যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিল সেটা ফলেছিল তো বটেই, এমন কি ছেলেগুলো ঠ্যাঙাবার জন্য একটা বোনও পেয়ে গিয়েছিল।

এ হল প্রায় চার হাজার বৎসরের কথা। কিন্তু আফগানিস্থান পাহাড়ী মুল্লুক, আইনকানুন জানে না, দলিল-দস্তাবেজের ধার ধারে না। সেদেশে কোনো দাবীদাওয়ার মেয়াদ ফুরোয় না, কোনো পাওনা তামাদি হয় না—'টাইমবার' নামক বাঁধাবাঁধি আফগান ঐতিহ্যে কখনো ঠাঁই পাইনি। তাই আজ চার হাজার বৎসর পর আফগানিস্থান তার কান্দাহারী মেয়ের বিয়ের যৌতুক হিসেবে পাকিস্তানের সীমান্ত-প্রদেশ চেয়ে বসেছে।

এ খবর শুনতে পেয়ে পাকিস্তানীরা ঈষৎ উদ্বিগ্ন হয়েছেন। ডমিনিয়নবাসীরা

বক্রহাসি হেসে বলছেন, 'করো পাকিস্তান, হও আলাদা। এইবারে ঠ্যালাটা সামলাও। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' বলে হুঙ্কার দিতে না এককালে ?—এইবার তাগড়া তাগড়া পাঠানদের সঙ্গে লড়ে বাঁচাও 'আপন জান্ আপন পাকিস্তান'।'

পাকিস্তানীদের মনে আবছা-আবছা ধারণা, আফগানিস্থানের ভাষা পশতু, আফগানরা জাতে পাঠান ; উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বাসিন্দারাও পশতু বলে, তারাও জাতে পাঠান। অতএব আফগানিস্থানের দাবীটা হয়ত সম্পূর্ণ কাবুলী পাওনাদারের লাঠির জবরদস্তির ভয় দেখানো নয়।

এ-ধারণা ভুল ইতিহাস পড়ার ফল।

আর্য অভিযান থেকে আরম্ভ করি। আর্যরা এদেশে এসেছিলেন আফগানিস্থান হয়ে। আজ যাঁরা আফগান-পাঠান নামে পরিচিত তাঁরা আমাদেরই এক অংশ। পশতু ভাষা আর্য ভাষা।

আফগানিস্থানের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় আমাদের মহাভারত পুরাণে—আফগানিস্থানের নিজস্ব কোনা দলিল-দস্তাবেজ নেই। বল্‌হিক দেশ (ফারসী বল্‌খ্), কাম্বোজ, বক্ষু নদী (Oxus = গ্রীক অক্ষুস্) বিধেতি পার্বত্যভূমি আজ 'আফগানিস্থান' নামে পরিচিত। আমাদের ইতিহাসে এসব অঞ্চলকে ভারতবর্ষের অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। আজও কাবুলীওলারা যে জাফরাণ ও হিঙ 'বল্‌খ্' অঞ্চল থেকে এ দেশে নিয়ে আসে তার নাম সংস্কৃতে 'বাল্‌হিকম্'।

পাকাপাকি ইতিহাস আরম্ভ হয় সিকন্দর সাহের বিজয়-অভিযানের পর থেকে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বল্‌খ্ বাদ সমস্ত আফগানিস্থান গ্রীকদের কাছে কিনে নেন।

রাজা অশোক বৌদ্ধশ্রমণ মাধ্যন্তিককে পাঠান আফগানিস্থানে। আফগানরা অগ্নি-উপাসনা (সে উপাসনাও বৈদিকধর্মের অংশবিশেষ ও জরথুস্ত্রী ধর্ম নামে পরিচিত) ছেড়ে দিয়ে খাস ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। আফগানিস্থানের পর্বতগাত্রে খোদিত বামিয়ানের বিরাট বৌদ্ধমূর্তিযুগল ভারতীয় শিল্পের নিদর্শন। গান্ধার শিল্পের যে-ভাণ্ডার আফগানিস্থানে পাওয়া গিয়াছে তাও ভারতীয় ও গ্রীক শিল্পকলার সম্মেলনে তৈরী। এসব শিল্পকলাতে আফগানরা কোন অংশ নেয় নি।

মৌর্য পতনের পর গ্রীকরা আফগানিস্থানে রাজত্ব করে। তারাও যে কতদূর ভারতীয় প্রভাবে পড়েছিল সেটা সপ্রমাণ হয় তাদের মুদ্রালাঞ্ছন থেকে। তাতে রয়েছে গ্রীক ও ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপি—পশতুর কোনো সন্ধান নেই।

কনিষ্ক ভারত-আফগানিস্থানের রাজা ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল

পেশোয়ারে—কাবুলে নয়।

গুপ্তরা আফগানিস্থান দখল করেন নি। কিন্তু গুপ্তযুগের পুনরুজ্জীবিত হিন্দুধর্ম আফগানিস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ধর্ষ পাঠানের পক্ষে তথাগতের অহিংসানীতি পালন করা যে সুকঠিন হয়ে উঠেছিল সে-তত্ত্বটা সহজেই অনুমান করতে পারি।

সপ্তম শতাব্দীর চীনা পর্যটক হিউ এন সাঙ কাবুলে এসে দেখেন আফগানিস্থানবাসীদের অর্ধেক হিন্দু, অর্ধেক বৌদ্ধ। তিনি কান্দাহার, গজনী, কাবুল অঞ্চলকে ভারতবর্ষের অংশ হিসাবে গণ্য করেছেন।

পাঠক যেন মনে না করেন যে ভারতবর্ষ যে-সব যুগে আফগানিস্থানে রাজত্ব করে নি সে-সব যুগে আফগানরা ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছে। আফগানরা লড়াই করতে জানে, কিন্তু শান্তি-স্থাপনার কর্ম অনেক কঠিন—আফগানের পেটে সে বিদ্যে নেই। আর শান্তি স্থাপন না করে রাজত্ব করা যায় কি প্রকারে?

তারপর আফগানিস্থান ও পশ্চিম ভারতবর্ষ মুসলমান হয়ে গেল। পাঠান রাজারা আফগানিস্থানে রাজত্ব করেন নি সত্য কিন্তু দিল্লী ফারসী সভ্যতার কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠল। কাবুলীরা শিক্ষাদীক্ষা অর্থাগমের জন্য ভারতবর্ষে আসতে লাগল। আলাউদ্দীন খিলজির সভাকবি আমির খুসরো ফার্সীতে যে 'ইশকিয়া' নামক কাব্য লিখেছেন তাতে 'দেবল-দেবী'র প্রেমের কাহিনী বর্ণিত আছে। কত শত বৎসর হতে চলল আজো কাবুল শহরে জনপ্রিয় কবি ভারতীয় আমির খুসরো। কোন আফগান কবির নাম তো কেউ কখনো এদেশে শোনে নি।

বাবুর আফগান নন। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি কান্দাহার, গজনী, কাবুলকে ভারতবর্ষের অংশ হিসাবে ধরেছেন ও এসব জায়গার প্রতি তার যতই দরদ থাকুক না কেন তিনি রাজধানী বসিয়েছিলেন দিল্লীতে। তাঁর দৌহিত্র জলালউদ্দীন আকবর জলালাবাদ শহরের নূতন ভিত্তি নির্মাণ করে শহরকে আপন নাম দিলেন। তাঁর দৌহিত্র শাহজাহান কাবুলে বাবুরের কবরের কাছে যে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন তামাম কাবুল শহরে সেই একমাত্র দ্রষ্টব্য স্থপতি। (বাবুর কান্দাহার, গজনী, কাবুল অঞ্চলকে তাঁর আত্মজীবনীতে ভারতের অংশ হিসাবে গণ্য করেছেন)।

কিন্তু এসব তথ্যের চেয়ে বড় তত্ত্বকথা এই যে আফগানরা এককালে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে ভারতীয় শিল্পকলা গ্রহণ করেছিল; পাঠান-মুঘল যুগে দিল্লীতে এসে আরবী-ফার্সী শিখত। ১৭৪৭ সালে আহমদ শাহ দুররাণী কর্তৃক আফগানিস্থানে স্বাধীন রাজত্ব (আফগানিস্থানের ইতিহাসে এই প্রথম স্বাধীন

আফগান রাজ্য) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও, এবং আজ পর্যন্ত আফগানরা আরবী-ফারসী এবং ধর্ম শিক্ষার জন্য আসে ভারতবর্ষের দেওবন্দ-রামপুরে। তারা পারস্যে যায় না, কারণ পারস্যবাসীরা শীয়া। শিক্ষাদীক্ষায় আফগানিস্থান যে ভারতবর্ষের কাছে কি পরিমাণ ঋণী তার সামান্যতম উদাহরণ এই যে, ভারতবর্ষের কোথাও ফার্সী মাতৃভাষারূপে প্রচলিত নয়, কাবুলবাসীদের মাতৃভাষা ফার্সী এবং কাবুলীরা আসে ফার্সী শিখতে ভারতবর্ষে। দেওবন্দ-রামপুরে ফার্সী শেখাবার জন্য যে-রকম বিদ্যালয় আছে, আফগানিস্থানের কোথাও সেরকম নেই।

শুধু ইসলাম শাস্ত্র চর্চার জন্য যে আফগান এ-দেশে আসে তা নয়, বিস্তর ভারতীয় অধ্যাপক, শিক্ষক কাবুল-জালালাবাদের স্কুল-কলেজে শিক্ষাদান করেছেন। আজ যদি এঁরা সব চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন তবে আফগানিস্থানের 'ওজারত-ই-ম' আরিফ (শিক্ষা দফতর) চোখে নরগিস্ ফুল দেখবেন! পক্ষান্তরে আজ যদি সব কাবলীওলা এ-দেশ থেকে চলে যায় তবে বহু কলের মজুর মৌলা আলীতে শিরনি চড়াবে।

এ-সব তো হল প্রাচীন অর্বাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্যের কথা। তার সব দলিল যে সবাই মেনে নেবেন সে আশা দুরাশা। কারণ শিক্ষা-দীক্ষার জগতে আজকের দিনে সব চেয়ে বড় 'কালোবাজার' চলছে ইতিহাস-পট্টিতে। হিটলার থেকে আরম্ভ করে ট্রুম্যান পর্যন্ত সে বাজারে এক্স-দিল্ দামের সাত ডবল দাম চায়! সাদা বাজারের সসেজ-থেকো ভুঁড়িওলা জর্মন সেখানে 'নর্ভিক-হীরো', ট্রুম্যান-পট্টিতে সুদখোর ইহুদি প্রিয়দর্শী অশোকের ন্যায় (প্যালেস্টাইনে) ধর্মপ্রচারাকাঙ্ক্ষী শ্রমণ!

কাজেই বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েই আলোচনা হোক্। আফগানদের যুক্তি যদি ভাষা ও জাতীয়তার (racial) ঐক্যের উপর খাড়া হয় তবে আফগানিস্থানের, —প্রথম কর্তব্য হবে আফগানিস্থানের উত্তরাঞ্চল রুশিয়াকে (অর্থাৎ উজবেগিস্থান তুর্কিস্থান) ছেড়ে দেওয়া; কারণ এ অঞ্চলের লোক জাতে এবং ভাষায় তুর্কোমান, মঙ্গল, উজবেগ।

দ্বিতীয় কর্তব্য হবে আফগানিস্থানের পশ্চিমাঞ্চল ইরানকে ছেড়ে দেওয়া; কারণ এ অঞ্চলের লোক জাতে এবং ভাষায় ইরানি।

অথবা উচিত রুশকে দাবী জানানো; রুশরা যেন তাদের উজবেগিস্থান ও তুর্কিস্থান আফগানিস্থানের হাতে সঁপে দেয় এবং ইরানকে বলা যেন তাবত ইরানভূমি আফগানিস্থানের অংশীভূত হয়ে যায়।

এ-দাবীটা যে কতদূর বেহেস্ত তার একটা তুলনা দি। সুইস জাতি গড়ে উঠেছে তার পশ্চিম অঞ্চলের ফরাসী, উত্তর অঞ্চলের জার্মান ও পূর্ব অঞ্চলের ইতালীয়কে নিয়ে। এই তিন অঞ্চল আবার শব্দার্থে অঞ্চল, কারণ এরা সবাই মূল শাড়ী ফ্রান্স, জর্মনী এবং ইতালির প্রান্ত থেকে খসে পড়ে সুইজারল্যাণ্ডে লুটোচ্ছে। আজ যদি সুইজারল্যাণ্ড ক্ষেপে গিয়ে ফ্রান্স, জর্মনী এবং ইতালিকে সুইস রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য দাবী জানায় তবেই তার তুলনা হবে আফগান দাবীর সঙ্গে।

কিন্তু যদিও এ দাবী শুধু পাগলা-গারদেই নির্ভয়ে করা চলে তবু এ ধরনের দাবী আমাদের সম্পূর্ণ অজানা নয়। কাবুলীওলাদের সুদের দাবী যে অনেক সময় আসলের বিশগুণ হয়ে দাঁড়ায় সে অনেক মজুরই জানে।

পশতুভাষী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত তো কস্মিনকালেও আফগানিস্থানের অংশরূপে পরিচিত হয় নি, বরঞ্চ কান্দাহার—গজনী—কাবুল—জলালাবাদ অঞ্চল (এবং এই অঞ্চলই খাস আফগানিস্থান—এই অঞ্চলের লোকই পশতু বলে এবং 'পাঠান' নামে পরিচিত—পূর্বেই বলেছি বাদবাকি অঞ্চল ইরাণ ও সোভিয়েট তুর্কমানিস্থানও উজবেগিস্থানের অংশরূপে পরিচিত) ভারতবর্ষের অংশ, অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল থেকে কেটে নিয়ে আফগানিস্থানে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন এই, খেয়ালী দাবীর হাওয়া বইয়ে কাবুলী পাগলকে জাগাল কে?

রুশ।

ফরাসীতে প্রবাদ বাক্য আছে, 'প্লু সা শাঁজ, প্লু সে লা মেম্ শোজ', অর্থাৎ 'যতই সে বদলায় ততই তার চেহারা বেশী করে আগের মত দেখায়।' স্তালিনী গুণীরা যতই তাঁদের বৈদেশিক নীতি বদলাতে চান ততই তাঁদের চেহারা জারের চেহারার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। রক্ত-শোষক জার প্রলেতারিয়ারক্ষক স্তালিনের বৈদেশিক নীতিতে আজ আর কোনো পার্থক্য নেই। বাংলা সাহিত্য পাটনির বরাতজোরে 'দুধে-ভাতে' বেঁচে-ওঠা সন্তান। কিন্তু এই উপযুক্ত সঙ্গীন বৈদেশিক নীতি তার ছাপ এই মোলায়েম সাহিত্যের উপরও রেখে গিয়েছে;—

"বেশ মনে আছে, আমাদের ছেলেবেলায় কোনো এক সময়ে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের চিরন্তন জুজু রাশিয়ান কর্তৃক ভারত আক্রমণের আশঙ্কা লোকের মুখে আলোচিত হইতেছিল। কোনো হিতৈষিণী আত্মীয়া আমার মায়ের কাছে সেই আসন্ন বিপ্লবের সম্ভাবনাকে মনের সাধে পল্লবিত করিয়া বলিয়াছিলেন। পিতা

তখন (ইং ১৮৬৮ মে—১৮৭০ ডিসেম্বর) পাহাড়ে ছিলেন। তিব্বত ভেদ করিয়া হিমালয়ে কোন্ একটা ছিদ্রপথ দিয়া (আসলে আফগানিস্থান দিয়ে—লেখক) যে রুশীয়েরা সহসা ধূমকেতুর মতো প্রকাশ পাইবে তাহা তো বলা যায় না। এইজন্য মা'র মনে অত্যন্ত উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছিল। বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই কেহ তাঁহার এই উৎকণ্ঠার সমর্থন করেন নাই। মা সেই কারণে পরিণত-বয়স্ক দলের সহায়তা লাভের চেষ্টায় হতাশ হইয়া শেষকালে এই বালককে আশ্রয় করিলেন। আমাকে বলিলেন, "রাশিয়ানদের খবর দিয়া কর্তাকে একখানা চিঠি লেখো তো। মাতার উদ্বেগ বহন করিয়া পিতার কাছে সেই আমার প্রথম চিঠি। কেমন করিয়া পাঠ লিখিতে হয়, কী করিতে হয় কিছুই জানি না। দফতরখানায় মহানন্দ মুনশির শরণাপন্ন হইলাম। পাঠ যথাবিহিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাষাটাতে জমিদারি সেরেস্তার সরস্বতী যে জীর্ণ কাগজের শুষ্ক পদ্মদলে বিহার করেন তাহারই গন্ধ মাখানো ছিল। এই চিঠির উত্তর পাইয়াছিলাম। তাহাতে পিতা লিখিয়াছিলেন—ভয় করিবার কোনো কারণ নাই, রাশিয়ানকে তিনি স্বয়ং তাড়াইয়া দিবেন। এই প্রবল আশ্বাসবাণীতেও মাতার রাশিয়ান-ভীতি দূর হইল বলিয়া বোধ হইল না—কিন্তু পিতার সম্বন্ধে আমার সাহস খুব বাড়িয়া উঠিল।" (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৭ খণ্ড, ৩০৫ পৃঃ)

যে জুজুর ভয়ের উল্লেখ করে কবিগুরু কাহিনীটি বললেন, আফগানিস্থান আজ সেই জুজুর ভয়ই দেখাচ্ছে। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে রুশ তখন যে ভয় দেখাত আজ সেটা প্রকাশ পাচ্ছে আফগানিস্থানের মুখভেংচিতে। এবং সঙ্গে সঙ্গে এ সত্যও জানি যে রুশ যেমন অন্তরে অন্তরে বুঝত যে আফগানিস্থান শেষ পর্যন্ত ভারত আক্রমণ করতে কখনো রাজী হবে না, আজও তেমনি আফগানিস্থান যত ভেংচিই কাটুক না কেন, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধং দেহি বলে আসরে নামবে না। দোস্ত মুহম্মদ, আব্দুর রহমান, হবিবউল্লাকে রাশা বিস্তর তোয়াজ করেছে ভারত আক্রমণের জন্য। শেষ পর্যন্ত এ-দোহাই পর্যন্ত পেড়েছে যে মুসলিম আফগানের উচিত ভারতীয় মুসলিমকে কাফির ইংরেজের অত্যাচার থেকে মুক্ত করা, কিন্তু কাবুল নদীর জলে কোনো দিব্য-দিলাশার হাল কোনো দিনই কোনো পানি পায় নি। কারণ দোস্ত, রহমান, হবীব তিনজনাই জানতেন, ভারত আক্রমণ করেছ কি সঙ্গে সঙ্গে রুশ কপ্ করে আফগানিস্থানটি গিলে ফেলবে। হিটলারের বহুপূর্বেই কাবুলী গুণীরা জানতেনঃযে একসঙ্গে দুই অঙ্গনে নাচা-কুঁদা যায় না।

অধম ঝাড়া দুটি বৎসর কাবুলে ছিল। কাবুল এমনি নীরস নিরানন্দ পুরী

যে সেখানে বেঁচে থাকতে হলে রাজনৈতিক দাবাখেলায় মনোযোগ করা ছাড়া অন্য কোনো পন্থা নেই। আফগানিস্থানের সৈন্যবল, অস্ত্রবল আমাদের যাত্রার দলের ভীমসেনের গদার মত—ফাঁপা এবং কাঁকরে ভর্তি। শব্দ করে প্রচুর।

আফগানিস্থানের আসল জোর তার পার্বত্যভূমি, তার গিরিসঙ্কটে। তাই দিয়ে সে আত্মরক্ষা করে আর আপন স্বাধীনতা বজায় রাখে। কিন্তু আফগানিস্থান ভারত আক্রমণ করলে তো আর পার্বত্যভূমি, গিরিসঙ্কট আপন কাঁধে করে নিয়ে এসে ভিন্ দেশে কাজে লাগাতে পারবে না।

কিন্তু এসব হল পাকিস্তান এবং ডমিনিয়নের বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতি। সে আলোচনা আর একদিন হবে। এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল, আফগানিস্থানের অন্তঃসারশূন্য দাবী নিয়ে আলোচনা করার।

সর্বশেষে বক্তব্য, পাকিস্তান যদি আফগানিস্থানকে নিয়ে কোনো দিন সত্যই বিপদগ্রস্ত হয় তবে ডমিনিয়নের তাতে উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ শুধু পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশ নয়, ভারতেরও বটে।

সুদিনে দুর্দিনে জর্মনী

চীনের সঙ্গে যে আমাদের হৃদ্যতা আছে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এত প্রাচীন, বিরাট, বিপুল দেশ যে একদিন আমাদের রাজাধিরাজ চক্রবর্তী বুদ্ধ তথাগতের দর্শনলাভ না করেও তাঁর পদানত হয়েছিল সে-কথা ভাবতে আমাদের হৃদয়ে গৌরবের সঞ্চার হয়। উনবিংশ শতকের শেষের দিক থেকে সেদিন পর্যন্ত আমাদের রাজনৈতিক জাত্যাভিমানকে যখনই ইংরেজ অবমানিত করেছে তখনই আমরা আমাদের অধমর্ণ চীনের কথা ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছি।

আরেকটি দেশ সে-দুর্দিনে আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে। সে দেশ জর্মনী। কবিগুরু গ্যোটে শকুন্তলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে, শোপেনহাওয়ার উপনিষদের প্রশস্তি গেয়ে জর্মনির বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি ভারতবর্ষের প্রতি আকর্ষণ করেন। ফলে জর্মন পণ্ডিতরা সংস্কৃত ও পালি নিয়ে যে-গবেষণা আরম্ভ করেন সে মণিমঞ্জুষার দশমাংশের সঙ্গেও আমরা এখনো পরিচিত হইনি। ভারতীয় বৈদগ্ধ্যানুরাগীরা কিন্তু জানেন, আচার্য মোক্ষমূলর আর্যাভিযানের বিজয়রথ কি করে

জাহ্নবীর ন্যায় অনুসরণ করেছেন, ইয়াকবি জৈনধর্মের লুপ্তপ্রায় গৌরব উতঙ্কের ন্যায় পুনরুদ্ধার করলেন, তাঁর শিষ্য কির্ফেল অগাধ পুরাণশাস্ত্রে নিমজ্জিত হয়ে মৎস্যাবতারের মত বিরাট পুস্তক 'ইণ্ডিশে কলগনি' মস্তকে তুলে ধরলেন, গেল্ডনার গণপতির ন্যায় ঋগ্বেদ জর্মন ভাষায় অনুলিখন করলেন, উইনটারনিৎস সর্বশেষে সঞ্জয়ের ন্যায় ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞ অন্ধ পৃথিবীকে সামসঙ্গীত উদাত্তকণ্ঠে শুনিয়ে দিলেন।

মৃচ্ছকটিকার জর্মন অনুবাদ অন্ততপক্ষে সাতজন লেখক করে গিয়েছেন, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের উপর থিসিস লিখে ক'জন জর্মন, অজর্মন ডক্তরত্ব পেয়েছেন সে-সম্বন্ধেও একখানা থিসিস লেখা যায়।

জর্মন ঔপন্যাসিক টেয়োডোর স্টর্মের 'ঈমেন্‌জে' পুস্তকের গোড়ার দিকে একপাল ছেলেমেয়ে ছোট্ট একখানা গাড়ী বানিয়ে তার মধ্যে গুটিকয়েক বসেছে, বাদবাকিরা গাড়ী টানছে, আর সবাই চেঁচিয়ে বলছে :—

"নাখ্‌ ইণ্ডিয়েন্‌, নাখ্‌ ইণ্ডিয়েন !"

অর্থাৎ

"ভারত চলো, ভারত চলো !"

পিরামিডের দেশ মিশর রইল, ড্রাগনের দেশ চীন রইল, আরবোপন্যাসের বাগদাদ রইল, ছেলেগুলোর মন কেন ভারতবর্ষেরই দিকে ধাওয়া করল কে জানে ? তবু যদি শকটিকাটি মাটির গড়া হত তবু বুঝতুম, কারণ মৃচ্ছকটিকার দেশ ভারতবর্ষ। তবে হাঁ, হয়ত শকটটি ক্ষুদ্র ছিল বলে সে 'হীনযান'কে শরণ করে তারা তথাগতের দেশে পৌঁছতে চেয়েছিল। কিন্তু শঙ্করাচার্য বলেছেন বালকেরা ক্রীড়া করে এবং বৃদ্ধেরা চিন্তা করেন। শকটিকাতত্ত্ব আবিষ্কার করবেন বৃদ্ধেরা চিন্তা করে, বালকের মধ্যে যদি কোনো আবিষ্কার-শক্তির সন্ধান পাওয়া যায় তবে সে জিনিস নিশ্চয়ই কল্পনাপ্রসূত।

এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জর্মনদের শিশু এবং কবি মনের কল্পনা যে নৈসর্গিকতার বেড়া কতবার ভেঙেছে তার লেখাজোখা নেই। হাইন্‌রিশ্‌ হাইনে যে শুধু সুকবি ছিলেন তা নয়, সুপণ্ডিতও ছিলেন। তিনি পর্যন্ত বলেছেন,—

"কী অপূর্ব দৃশ্য !

শ্যামাঙ্গী সুন্দরী গঙ্গাতটে নতজানু হয়ে গঙ্গাজলে প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মের উপাসনা করছে।"

পদ্মপূজা ! সে-পদ্মও ফুটেছেন গঙ্গাস্রোতে ! একেই বলে কল্পনা !

ওদিকে ভারতবর্ষও জর্মনিকে প্রচুর সম্মান দেখিয়েছে। আমরা জর্মনিকে যে সম্মান জানিয়েছি তার বেশী দেখানো আমাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষ মহাত্মা গান্ধী যখন রৌণ্ড-টেবিল কনফারেন্সে যোগদান করতে বিলেত যান তখন বহু সাংবাদিক মহাত্মাজীকে এদেশ ওদেশ বহুদেশ দেখে যাবার জন্য অনুরোধ জানান। মহাত্মাজী বলেন যে, একমাত্র গ্যোটের বাইমার দেখবার তাঁর বহুদিনের ঐকান্তিক ইচ্ছা।

শুনে জর্মনি যে আনন্দধ্বনি করেছিল তার প্রতিধ্বনি জর্মনির বেতারে বেতারে বহুদিন ধরে শোনা গিয়েছিল। জর্মনির বড়কর্তারা তৎক্ষণাৎ দূত পাঠিয়ে মহাত্মাজীকে ষোড়শোপচারে আমন্ত্রণ করেন; হামবুর্গ বেতারকেন্দ্র মহাত্মাজীকে বেতারে যৎকিঞ্চিৎ বলার জন্য তাঁর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়ে যায় এবং আর সব বেতার-কেন্দ্রের ঈর্ষা তখন যেমন যেমন বিকট হতে বিকটতর রূপ নিতে লাগল, হামবুর্গ বেতারকেন্দ্রের ঢক্কানিনাদ সেই অনুপাতে জর্মনির কর্ণপটহ ছিঁড়ে ফেলবার উপক্রম করল। আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে, যেদিন হামবুর্গ বেতারকেন্দ্র প্রথম খবর দিল যে মহাত্মাজী বেতারযন্ত্রের সামনে উপস্থিত হতে স্বীকৃত হয়েছেন তখন প্রচারকের (এনাউন্সারের) কণ্ঠে কি গদ্‌গদ ভাব; চোখের সামনে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলুম লোকটা আনন্দে গলে পড়ছে আর 'সখি, আমায় ধরো ধরো' বলে ঢলে পড়ছে; রেডিয়োর আর পাঁচজন তাকে চতুর্দিক থেকে ঠেকো দিয়ে কোন গতিকে খাড়া করে রেখেছে।

তারপর যেদিন দুঃসংবাদ দেবার কাললগ্ন এল যে মহাত্মাজী কনফারেন্সে বিফলমনোরথ হয়েছেন বলে বাইমার আসবেন না তখন সে-প্রচারকের আর সন্ধান নেই। যে দেবদূত মা-মেরীকে যীশুর শুভাগমনের 'সুসমাচার' দিয়েছিলেন তিনি এবং সঞ্জয় কি করে এক ব্যক্তি হতে পারেন?

ভেবেছিলুম অন্যান্য বেতারকেন্দ্র হামবুর্গের কান কাটাতে বগল বাজাবে কিন্তু তার পরিবর্তে শোনা গেল কেন্দ্রে কেন্দ্রে দরদী গলা এবং সবাই মিলে একজোটে কনফারেন্সের বড়কর্তা ইংরেজের পিঠে মারল কিল।

মহাত্মাজী যে বাইমার যেতে পারেননি সে-কথাটা বড় নয়। আসল কথা হচ্ছে, ভারতবর্ষের মহত্তম আদর্শবাদের প্রতীক মহাত্মাজী লণ্ডনে বসে ব্যঞ্জনায় বলেছিলেন, ইয়োরোপে যদি দেখবার মত কিছু থাকে তবে সে হচ্ছে গ্যোটের বাইমার।

* * *

পরদিন চিঠি পেলুম জর্মন সতীর্থ পাউল হর্স্টারের (Paul Horster) কাছ থেকে। জর্মনির এখন যা দুরবস্থা এবং ভারতবর্ষের মাথায় এখন যা কাজের চাপ তার মাঝখানে জর্মনির সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র ক্ষীণ হয়ে গিয়ে ঠেকেছে জর্মনির পাউল এবং 'ভারতে'র অখ্যাতনামা লেখকের সঙ্গে।

পাউল চিঠি আরম্ভ করেছে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভে আনন্দ প্রকাশ করে। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত আমরা দুজনে রাইনের পারে, ভিনাস পাহাড়ের (ভেনুস-বের্গ) উপরে, বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায়, কাফের ধুঁয়োর মাঝখানে কখনো উচ্চস্বরে, কখনো নীরবে, কখনো পত্রবিনিময়ে ভারতবর্ষের ভাবী স্বাধীনতা-লাভের সুখস্বপ্ন গড়েছি। আমি বলতাম, ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার পূর্বেই আমি মরব। পাউল বাঁকা হাসি হেসে বলত, 'আগাছা সহজে মরে না, কাঁটাতে পোকা ধরে না ; স্বরাজ না দেখার পূর্বে তোমার মত কাঁটা শুকিয়ে ঝরে পড়বে না।'

আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন, কিন্তু জর্মনি পরাধীন। সে পরাধীনতা চরমে পৌঁছে-ছিল গেল শীতে। অনাহারে পাউলের দুই শিশুকন্যার যক্ষ্মা হয়, তার স্ত্রী মৃত সন্তান প্রসব করেন। ছাত-চোঁয়ানো হিমজলে ভিজে পাউলের নিউমনিয়া হয় ; ভুগুন্তি কপালে এখনো অনেক বাকী আছে বলে পাউল এখনো পটল বা কপি কিছুই তুলতে পারে নি।

পাউল লিখেছে ;

"সুসংবাদ দিয়ে চিঠি আরম্ভ করি। আহারাদির বন্দোবস্ত আগের চেয়ে অল্প ভালো হয়েছে। তার কারণ কিন্তু এই নয় যে, মিত্রশক্তি আমাদের দুর্দশা দেখে বিগলিত করুণায় আমাদের ভিক্ষা দিতে রাজী হয়েছেন। খুব সম্ভব তুমি জানো যে মিত্রশক্তিরা লড়াই জেতার পর স্থির করেছিলেন যে, ১৯৫১ পর্যন্ত—অর্থাৎ লড়াইয়ের যে ছ' বছর আমরা তাদের ভুগিয়েছি, ঠিক সেই পরিমাণ—আমাদের না খাইয়ে মারবেন। কিন্তু কর্তাদের মত বদলে গিয়েছে, এবং তার কারণ—

১। "আমাদের কলকারখানা যদি আগুন নিবিয়ে বসে থাকে তবে হলাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, গ্রীস আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে পারবে না এবং তাহলে তাদেরো আমাদেরি মত দুরবস্থা হবে। হলাণ্ড তো গেল বৎসরও তার শাকসব্জী বিনে পয়সায় দিতে রাজী ছিল, কিন্তু ইংরেজ এতদিন অনুমতি দেয়নি (এক বৎসর পরে আজ এই পয়লা তরকারি খেলুম)।"

হলাণ্ড-ডেনমার্ক ইত্যাদি দেশের দুরবস্থা যেন জর্মনির মত না হয় সে দুশ্চিন্তা

ইংরেজের মাথায় কেন ঢুকল সে-কথা পাউল লেখে নি। অনুমান করি, মার্শাল প্ল্যান চালু করে রুশকে ঠেকাবার জন্য এসব দেশের ধনদৌলত বাড়ানো ইংরেজ ও আমেরিকার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২। "বেভিন সায়েব বিপদগ্রস্ত হয়েছেন : আমরা যদি মাল-সরঞ্জাম তৈরী এবং রপ্তানি না করি, তবে আমাদের অন্য কোনো উপার্জন নেই। ইংরেজ জনসাধারণকে তাহলে গাঁটের পয়সা খরচ করে আমাদের খাওয়াতে পরাতে হবে। আর যদি ইংরেজ আমাদের কলকারখানা চালু করতে দেয় তা হলেও বিপদ—আমাদের দুরবস্থা চরমে পৌঁছে যাওয়ার দরুন আমাদের খাইখর্চা এত তলায় এসে ঠেকেছে যে, আমাদের মাল তৈরী হবে অত্যন্ত সস্তাদরে—জাপান যে রকম একদা অত্যন্ত সস্তা মাল তৈরী করতে পারত—এবং সে সস্তা মাল ইংরেজের রপ্তানী-মালের দাম কমিয়ে দেবে। শেষটায় ইংরেজ ইয়োরোপে আর কিছুই বিক্রি করতে পারবে না।"

ইংরেজ যদি কোনোটাতেই রাজী না হয় তাহলে কি হবে সে কথাটা পাউল লেখে নি। বিবেচনা করি, না খেতে পেলে জর্মনরা হন্যে হয়ে সবাই কম্যুনিস্ট হয়ে যাবে এবং তাই রুশ ভালুককে ঠেকাবার জন্য ইংরেজ জর্মনিকে বাঘের দুধ খাওয়াতেও রাজী আছে।

৩। "আমেরিকার সমস্যা, হয় মার্কিন কলকারখানা পুরোদমে চালু রেখে পশ্চিম ইয়োরোপকে কলকব্জা, মালপত্র দাও—কিন্তু ভোলো না, বিনি পয়সায়—নয় রপ্তানি একদম্ বন্ধ করে দাও, কিন্তু ভোলো না, তাহলে রপ্তানি বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন কলকারখানাও বন্ধ হয়ে যাবে এবং বেকার সমস্যা বাড়বে।"

পাউল লেখে নি, কিন্তু বিবেচনা করি, আমেরিকা বাইরের শত্রু রুশের চেয়েও ভেতরের শত্রু বেকার-সমস্যাকে ভয় করে বেশি।

"এদিকে আমেরিকা পশ্চিম ও মধ্য ইয়োরোপে যাতে কম্যুনিজম না ঢুকতে পারে তার জন্য ধনপ্রাণ সব দিতে প্রস্তুত। এই তো সেদিন মার্কিন যখন দেখল ইতালির লোক ভোট্ দিয়ে হয়ত কম্যুনিজম ডেকে আনবে, সেদিনই সে বড় বড় জাহাজ-ভর্তি খানাদানা ইটালিতে পাঠাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিনরা আমাদের খবর পাঠালো যে আমাদেরও রেশন বাড়িয়ে দেবে।

ওদিকে রুশ রেশন বাড়াচ্ছেন জর্মনির আপন এলাকায়। এদিকে মার্কিন রুশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আপন অধিকৃত জর্মন অঞ্চলেও রেশন বাড়াচ্ছেন। এত দুঃখেও আমার হাসি পায়, এই নিলামের ডাকাডাকির দস্তুর দেখে।"

শুধু পাউলের নয়, আমাদেরও হাসি পায়। দুদিন আগে যে জর্মনিকে মার্কিন রুশ দুদিক থেকে পাইকারি কিল মেরে ধরাশায়ী করেছিলেন, আজ তাকে চাঙ্গা করে তোলবার জন্য একজন গলায় ঢালছেন ব্র্যাণ্ডি, অন্যজন নাকে ধরেছেন স্মেলিঙ-সল্টের শিশি! শুধু কি তাই, গ্যোবেল্‌স্ সাহেব মরার পূর্বে যে একখানা সাত-পৌণ্ডী টাইম-বম্ রেখে গিয়েছিলেন সেখানা কানে তালা লাগিয়ে ফেটেছে। গ্যোবেল্‌স্ মার্কিন-ইংরেজের উদ্দেশে বলেছিলেন, "আমাদের যে তোমরা বিনাশ করছ, তার জন্য তোমরা একদিন আফসোস করবে। তোমাদের শত্রু জর্মনি নয়, শত্রু তোমাদের রুশ। এবং সেই রুশের সঙ্গে লড়বার জন্য আমাদের আবার বাঁচিয়ে তুলতে হবে, তোমাদের টাকায় বিয়ার-সসিজ্ খাইয়ে, বাড়ী-ঘরদোর বানিয়ে দিয়ে।"

গ্যোবেল্‌সের সে টাইম-বম্—আমরা বলি ফলিত-জ্যোতিষ—ফেটেছে। রুশের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা করতে গিয়ে মার্শাল ট্রুম্যান যে সব বক্তৃতা ঝাড়েন সেগুলো শুনে মনে হয়, ট্রুমান যেন 'মাইন কাম্‌ফ্' পড়ে শুনাচ্ছেন, মার্শালের গলা আর গ্যোবেল্‌সের গলায় তফাৎ ধরতে পারিনে।

শুধু কি তাই, হিটলার একদিন সদম্ভে চেকোশ্লোভাকিরা দখল করেছিলেন—গণতান্ত্রিক চেম্বারলেনের গালে ঠাস্ করে চড় মেরে। ঠিক সেই কায়দায় রুশ যখন সেদিন চেকোশ্লোভাকিয়ার গণতন্ত্র গলা টিপে মেরে ফেলল (মাজারিক নাকি আত্মহত্যা করেছেন, বেনেশ্ নাকি বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেছেন !), তখন আমেরিকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। জর্মনি চেঁচিয়ে বলল, "কিছু করো না-করো, অন্তত চোখ দুটো তো রাঙা করো।" আমেরিকা চোখ-দুটি বন্ধ করেছে।

ফরাসিতে প্রবাদ আছে, 'প্লু্য সা শাঁজ, প্লু্য সে লা মেম শোজ।' অর্থাৎ 'যতই সে রঙ বদলায় ততই তাকে আগের মতন দেখায়।' অনেকটা বাঙলা দেশের 'কবিতা' লেখকদের মত। যতই তারা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ঢাকতে চান, ততই তাদের লেখাতে সে প্রভাব ধরা পড়ে।

মার্কিন, রুশ, ইংরেজ যতই তাদের রাজনীতি বদলাতে চায় ততই তাদের চেহারা আগের মতন হতে চলে।

জর্মন আবার শক্তিশালী হবে।

* * *

ভুলে গিয়েছিলুম পাউলের চিঠি শেষ হয়েছে প্রশ্ন দিয়ে, "Was fangen die Inder mit der wiedergewonnenen Freiheit an ? Sich gegen-

seitig zu erschlagen kann doch unmoeglich das einzige Ergebnis gewesen sein."

অর্থাৎ, "নবলব্ধ স্বাধীনতা দিয়ে ভারতবাসীরা কি করছে? একে অন্যকে খুন করাই তো আর সে স্বাধীনতার একমাত্র ফল হতে পারে না।"

উত্তরে কি লিখি যদি কেউ বলে দেন!

এ্যানড্রুজ সাহেব

আমরা ঐ নামেই তাঁকে চিনতুম। আমি তাঁকে গুরুরূপে পাই ১৯২১ থেকে ১৯২৬ অবধি। তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গুণী-জ্ঞানীরা তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর মহত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবেন। সে-অধিকার আমার নেই।

১৯২১-এর বর্ষায় শান্তিনিকেতনে ভরতি হওয়ার কয়েক দিন পরই জানলুম, আসাম চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য তিনি এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছেন। গুরুদেব তখন বিদেশে। ফিরে এলেন জুলাই মাসে। বোম্বাইয়ে নেমেই নাকি তিনি মহাত্মা গাঁধীর অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে একমত হতে পারেননি বলে তাঁর বিরুদ্ধে আপন বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ওদিকে আবার রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ গাঁধীজীকে তাঁর আশীর্বাদ জানিয়েছেন। শুনলাম, এ্যানডরুজ সায়েব রবীন্দ্রনাথ ও গাঁধীজী দুজনারই সখা এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের শিষ্য। এই তিনজনের সখ্য, প্রীতি, স্নেহ তিনি একসঙ্গে পান কি করে? সে যুগে যাঁরা যুবক ছিলেন তাঁরা স্মরণে আনতে পারবেন, এক দিক দিয়ে আমাদের সর্বগর্ব ছিল রবীন্দ্রনাথের গান, কাব্যাদি নিয়ে, অন্য দিক দিয়ে আমরা যোগ দিয়েছি গাঁধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে। এই দ্বন্দ্বেই আমরা দিগ্‌ভ্রান্ত। আর এ্যানডরুজ সায়েব এই তিনমুখী লড়াই সামলান কি করে?...এমন সময় শান্তিনিকেতনে খবর পৌঁছল, গুরুদেব ও গাঁধীজীতে নাকি মুখোমুখি বসে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হবে। অন্যে যা বলুন বলুন, আমার বিশ্বাস এই মোলাকাৎটির ব্যবস্থা করেন এ্যানডরুজ সায়েব। তার দু-একদিন পরেই গুরুদেব আর সায়েব আশ্রমে ফিরে এলেন। এবং আমরা আরও দিগ্‌ভ্রান্ত, ওঁদের আলোচনার কোন রিপর্ট কোনো কাগজে বেরোয় নি। এ্যানডরুজ সায়েব সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনিও কিছু বলেন নি। শুনেছি রুদ্ধদ্বারে চার ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা হয়েছিল। বিশ্বজনের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু আর্টিস্ট্‌ ঠেকায় কে?

আচার্য অবনীন্দ্রনাথ চাবির ফুটো দিয়ে ভিতরকার অবস্থাটা এক পলক দেখে নিয়ে একটি ছবি আঁকেন। সেটি এখন শান্তিনিকেতনের কলাভবনে।...আশ্রমে ফেরার দু'একদিন পরই সায়েব বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের ডেকে পাঠালেন। সায়েব সর্বপ্রথম বললেন—অর্ধশতাব্দী পরে আমার প্রতিবেদনে যদি ভুলভ্রান্তি থেকে যায় তবে সে-সভায় উপস্থিত কোনো মহাশয় সেটি সংশোধন করে দিলে অধম বড়ই কৃতজ্ঞ হবে—গুরুডেব (সায়েব 'ড' 'দ'-য়ে তফাৎ করতে পারতেন না) এবং মহাটমাজী কলকাতাতে যে আলোচনা করেছেন সেটা জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু তোমাদের জানানো দরকার। কিন্তু তোমরাও সেটি কাগজে প্রকাশ করো না।'

আহা, কী সুন্দর ইংরেজি উচ্চারণ! এতদিন যা দু-চারবার ইংরেজের মুখে ইংরেজি শুনেছি তার চৌদ্দ আনা বুঝতে পারি নি। তারা ছিল চা-বাগানের মালিক। খুব সম্ভব ককনি। আর ইনি যা বলছেন তার প্রত্যেকটি শব্দ বুঝতে পারছি। যদিও তাঁর কথাগুলো বিরাট দাড়িগোঁফের মাঝখান দিয়ে ছেঁকে ছেঁকে বেরুচ্ছিল।

পরদিন নোটিশ বেরুল সায়েব আমাদের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে ক্লাস নেবেন। অধ্যক্ষ বিধুশেখরের বারান্দায়। হায়, আজকের লোক বুঝতে পারবে না, আমাদের কী স্থানাভাব ছিল! ব্ল্যাকবর্ড ছিল না বলে সায়েব বারান্দার মেঝেয় সঙ্গে আনা চক দিয়ে বিশেষ বিশেষ বিষয়বস্তুর শিরোনামা লিখতেন। বিরাট দেহ। সমস্ত রক্ত চলে আসতো দাড়ি আর চোখের মাঝখানে।...

ঘণ্টা বাজলো। সায়েব ছুটলেন তাঁর থালা আনতে। সে-আমলে সব্বাইকে যেতে হত আপন আপন থালা নিয়ে রান্নাঘরের পাশে ডাইনিংরুমে। কিন্তু বিদেশীদের অন্য ব্যবস্থা ছিল। সায়েব সেখানে মাঝে-মধ্যে যেতেন। কিন্তু বেশীর ভাগ খেতেন আমাদের সঙ্গেই।...তারপর সায়েব পড়ালেন শেকসপীয়র এবং আমাদের অনুরোধে নিউ টেসটামেণ্ট। কিন্তু কোনো বইই তিনি শেষ করার সুযোগ পেতেন না। আজ ঐ হোথায় পাঞ্জাবে না কোথায় পুলিস মজুরদের কোথাও—ব্যাস্ হয়ে গেল। তাঁর ক্লাস বন্ধ।

কিন্তু কে শুনতে চায় আজকের দিনে এ-সব কাহিনী!

যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ ও নব রাষ্ট্র নির্মাণপ্রচেষ্টা বহু মহাপুরুষের দেশপ্রীতি এবং আত্মত্যাগ দ্বারাই সম্ভবপর হয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু সঙ্গে আরো দুটি কথা স্বীকার করতে হয় যে ঐতিহাসিক বিবর্তন এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও এর জন্য অংশত দায়ী। তাই ভারতীয় রাষ্ট্র ভবিষ্যতে কি রূপ নেবে সে আলোচনা করতে গেলে ঐ তিনটি জিনিসেরই প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

কোনো ভূখণ্ড পরাধীন হয়ে গিয়েছিল, ফের স্বাধীন হল এ পরিস্থিতি পৃথিবীতে বহুবার হয়ে গিয়েছে এবং তার নক্সা প্রতিবারেই কিছু না কিছু আলাদা হয়েছে। তাই যে সব দেশের সঙ্গে আমাদের কিছুটা মিল আছে তাদের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করলে ভবিষ্যতের ভারত সম্বন্ধে কিছুটা আবছা-আবছা ধারণা হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আরব ভূখণ্ডের এক বৃহৎ অংশ, তুর্কী, ইরান ও আফগানিস্থান স্বাধীন হয়ে যায়। এর কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা এ প্রবন্ধ যে মূল সূত্র নিয়ে আরম্ভ করছি তার-ই পুনরাবৃত্তি করতে হয়। কিন্তু উপস্থিত দ্রষ্টব্য এই সব দেশ তাদের নবলব্ধ স্বাধীনতা নিয়ে করলো কি?

মুস্তফা কামাল ধর্মে বিশ্বাস করতেন না—এ বিষয়ে তিনি যে সম্পূর্ণ একা ছিলেন তা নয়, তুর্কী পল্টনের বিস্তর আপিসার ফ্রান্স অথবা জর্মনিতে শিক্ষা লাভ করেছিলেন বলে ধর্মের প্রতি এঁদের কোন প্রকারের শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি যখন স্বাধীনতা লাভের পর দেশ নির্মাণ শুরু করলেন তখন বুনিয়াদি স্বার্থ ধর্মের মুখোশ পরে তাঁকে প্রতিপদে বাধা দিতে লাগলো। একে তো মুস্তফা কামাল জাত কালা-পাহাড় তার উপর তাঁর শক্তি ও আত্মবিশ্বাস ছিল অসীম। জীবনটাকে তিনি একটা আস্ত জুয়ো খেলা বলে ধরে নিয়েছিলেন বলেই শত্রুর সামান্যতম পণের বিপক্ষে তিনি গোটা জীবনটাকে পণ ধরে 'খেলায়' নামতেন। এ রকম লোক হয় তিন দিনেই দেউলে হয়, অর্থাৎ আততায়ীর হাতে প্রাণ দেয়, কিম্বা কোটিপতি হয় অর্থাৎ শত জীবন লাভ করে। তাই মুস্তফার কাছে প্রতি বাজীতে মোল্লাদের নির্মম হার মানতে হল। একবার ভেবে দেখলেই হয়, আজ যদি পণ্ডিতজী হুকুম দেন গায়ত্রী সংস্কৃতে উচ্চারণ না করে রাষ্ট্রভাষা হিন্দীতে পড়তে হবে তবে তাবৎ ভারতবর্ষে কি রকম বিরাট আন্দোলন সৃষ্ট হবে। অথচ মুস্তফা কামাল ঠিক ঐ হুকুমটিই জারী করেছিলেন—আজান আরবী ভাষায় না দিয়ে দিতে হবে তুর্কীতে,

নামাজের মন্ত্রোচ্চারণ করতে হবে তুর্কী ভাষায়!

আফগানিস্থানের বাদশা আমান উল্লাও আপন দেশটাকে গড়ে তুলতে গিয়ে দেখেন মোল্লারা শত্রুতা সাধছেন। তিনিও তখন রুদ্ররূপ নেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু একে তো তিনি মুস্তফার মত জোয়াড়ি ছিলেন না, দ্বিতীয়ত তাঁকে সাহায্য করবার জন্য তাঁর মত স্বাধীনচেতা জোয়ান আফগানিস্থানে ছিলেন অতি অল্পই। আরো কারণ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ দুটো কারণই তাঁর পরাজয়ের পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু আসল যুদ্ধটা লাগলো আরবে। একদিকে ইব্‌ন্ সউদ, অন্যদিকে কট্টরতম মোল্লার পাল। তুর্কী-আফগানিস্থান ইসলাম ধর্মের পীঠভূমি নয়, এ সব দেশের লোক ধর্মান্তর গ্রহণ করে ইসলাম নিয়েছে। কিন্তু আসল ইসলাম জন্ম নেয় আরব দেশে, আরবের সভ্যতা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য যা কিছু তার সবই ইসলামের চতুর্দিকে গড়ে উঠেছে, ইসলাম ছাড়া অন্য সভ্যতার সঙ্গে তারা বহু যুগ ধরে কোনো সংস্পর্শে আসে নি বলে জগতের অন্য কোনো চিন্তাধারা, অন্য কোনো জীবন-সমস্যা সমাধান যে হতে পারে সে সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। লোকমুখে তারা শুনেছে, আরবের বাইরে রমণীরা উচ্ছৃঙ্খল, পুরুষেরা নাস্তিক, ধর্মের বন্ধন সেখানে একেবারেই নেই, সেখানকার নরনারী নির্লজ্জতায় পশুরও অধম।

গোড়ার দিকে ইব্‌ন্ সউদ নিজেও ঐ দলেরই ছিলেন কিন্তু নজ্‌দ্ ও হিজজাজের রাজা হওয়ার পর তিনি যখন রাজ্য গঠন কর্মে নিযুক্ত হলেন তখন দেখেন ইউরোপীয় যন্ত্রপাতি ভিন্ন কৃষি বাণিজ্য কোনো প্রতিষ্ঠানেরই দ্রুত এবং দীর্ঘস্থায়ী উন্নতি করা অসম্ভব। এ তত্ত্বটি তিনি তখন ধীরে ধীরে মোল্লা সম্প্রদায়কেও বোঝাতে চেষ্টা করলেন—ওদিকে আবার প্রগতিশীল মিশর থেকে প্রত্যাবর্ত যুবক সম্প্রদায় দু'একখানা মোটর গাড়ী, কিছু কিছু গ্রামোফোনও সঙ্গে আনতে আরম্ভ করেছেন, মোদ্দা কথা ধর্মের দোহাই দিয়ে আজকের সংসারের আনাগোনা, যোগাযোগ কি করে সম্পূর্ণ বন্ধ করা যায়?

মোল্লারা ক্রমে ক্রমে নরম হলেন। তখন প্রশ্ন উঠল বন্দুক-কামান ডাইনামো-ট্র্যাকটর কেনবার মত কড়ি ইব্‌ন্ সউদের কোথায়—আরবের মরুভূমি এমন কি ফলায়, যার বদলে এ সব কেনা যায়? তখন দেখা গেল সউদী আরবের মাটির তলায় প্রচুর পেট্রল। ইব্‌ন্ সউদ সেটা মার্কিনদের কাছে বিক্রী করে পেলেন কোটি কোটি ডলার। তাই দিয়ে অনেক কিছু হল—এখন ইব্‌ন্ সউদের প্রাসাদে লিফট্ হয়েছে, সে প্রাসাদ এ্যার-কণ্ডিশন্‌ড্। আবার সেই টাকার জোরেই মিশর এবং ভারতবর্ষ থেকে লক্ষ লক্ষ কুরান কেনা হচ্ছে এবং আরবদের মধ্যে বিতরণ করা

হচ্ছে (সউদী আরবে ছাপাখানার ব্যবস্থা ভালো নয় বলে বোম্বাই লক্ষ্ণৌয়ে নওলকিশোর প্রেসে ছাপা কুরান সেখানে যায়, কলকাতা থেকে এখনো ঢাকায় লক্ষ লক্ষ কুরান যায়)। ওদিকে সউদী আরবের কোনো কোনো শহরে গোপনে গোপনে স্কচ্ পানও আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

আরবের 'ধর্মে' ও ইয়োরোপের 'অধর্মে' খানিকটা সমঝাওতা হয়ে গিয়ে থাকা সত্ত্বেও একথা মানতে হবে যে ইয়োরোপীয় চিন্তাধারা এখনো মক্কা-মদীনাতে প্রবেশ করতে পারে নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আরো চারটি দেশ স্বাধীন হয়ে গণতন্ত্র নির্মাণ করেছে—ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, বর্মা এবং ইন্দোনেশিয়া, মিশরও যুগধর্ম রক্ষা করে গণতন্ত্র হতে চললো এবং চীন কম্যুনিস্ট হয়ে গিয়েছে।

স্বাধীনতা-লাভের প্রথম কট্টর প্রতিক্রিয়া দেখা গেল ইন্দোনেশিয়ানদের মধ্যে। তারা রাতারাতি তাবৎ ডাচ্ রাস্তার নাম, প্রতিমূর্তি, স্মৃতিস্তম্ভ ভেঙে চুরমার করে দিল (আমাকে এদেশে আগত ইন্দোনেশিয়ানরা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে আমরা এখনো ময়দানে ব্রিটিশ প্রতিমূর্তিগুলি বরদাস্ত করি কেন, উত্তরে আমি বলি, কলা হিসেবে এগুলো এতই নিম্নশ্রেণীর যে এগুলো রেখে দিলেই ইংরেজ মাথা হেঁট করবে, অন্যান্য বিদেশী মৃদু হাস্য করবে)।

কিন্তু তাই বলে ইন্দোনেশিয়া ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে বর্জন করলো না। ওলন্দাজদের পরিবর্তে তারা এখন ইংরেজি সভ্যতার কিছুটা গ্রহণ করার চেষ্টায় আছে। সুতান শহরীরের মত আরো অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তি ইন্দোনেশিয়ায় আছেন—এঁরা পণ্ডিত নেহরু গোত্রীয়, এঁরা ইয়োরোপীয় সভ্যতার আওতায় বড় হয়েছেন এবং দেশের ঐতিহ্যকে জাতীয়তাবাদী হিসেবে শ্রদ্ধা করলেও সে ঐতিহ্যের সঙ্গে এঁদের যোগসূত্র সূক্ষ্ম এবং ক্ষীণ।

কিন্তু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সউদী আরবের মত ইন্দোনেশিয়ায়ও ধর্ম মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। নব রাষ্ট্র-নির্মাণে এঁদের বিশেষ একটা হক্কও ছিল—শহরীর সুকার্নোর বহু বহু পূর্বে এঁরা হজে যাওয়ার ফলে মক্কা-মদীনার প্ররোচনায় দেশে ফিরে স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। এঁরা যে ভূমি নির্মাণ করেছিলেন তারই উপর শহরীর সম্প্রদায় তাঁদের ফুলের বাগান সাজাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কিন্তু পূর্বেই নিবেদন করেছি, স্বদেশ-জাত ধর্মের বেলায় মানুষ যে রকম উত্তেজনা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মের পুনরুত্থানের জন্য চেষ্টা করে বিদেশাগত ধর্মের জন্য—বিশেষতঃ এই জাতীয়তাবাদের যুগে—মানুষ অতখানি করে না। তাই

ইন্দোনেশিয়ার মোল্লা সম্প্রদায় ইরানের কশানী সম্প্রদায়ের মত বহু বল ধারণ করলেও এখনো 'আধুনিক' সম্প্রদায়ীদের আসনচ্যুত করতে পারেন নি।

বর্মাতে ধর্মান্দোলন আরো কম, আর পাকিস্তানের খবর সকলেই অল্পবিস্তর রাখেন। চীন কম্যুনিস্ট, তবু চীন সম্বন্ধে একটি কথা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে —চীনে ধর্ম এবং সমাজ আলাদা আলাদা থাকে বলে ধর্ম সেখানে অনেকটা আমাদের দার্শনিক মতবাদের মত। এদেশে পিতা যদি বেদান্ত মানেন, পুত্র যদি সাংখ্যবাদী হন এবং নাতি যদি যোগশাস্ত্রের চর্চা করেন তবে তিনজনকে পৃথক পৃথক বাড়ী বানিয়ে আলাদা আলাদা বসবাস করতে হয় না। তাই চীনে একই বাড়ীতে এক ভাই বৌদ্ধ, দ্বিতীয় মুসলমান, তৃতীয় খৃষ্টান এবং এঁরা একই বাড়ীতে নির্বিবাদে গুষ্ঠিসুখ অনুভব করেন। তিন ভ্রাতাই কিন্তু চীনা ঐতিহ্যের সম্মান করেন এবং তাই আজ চীন ১৯১৭ সালের রুশ বলশেভিকদের মত আপন বৈদগ্ধ্য 'বুর্জুয়া নামে গালাগাল দিয়ে চীন-দরিয়ায় ভাসিয়ে দেয় নি। বরঞ্চ গুণীদের মুখে শুনতে পাই মাওৎসেতুঙ্ যখন কম্যুনিজম সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন তখন বিশেষ করে চোখে পড়ে তার নিজস্ব চীনা রূপ—ভাব, ব্যঞ্জনা, অলঙ্কার প্রয়োগে মাও নাকি খাঁটি চীনা ঐতিহ্য মেনে চলেন।

এ স্থলে একটি কথায় বিশেষ জোর দেওয়া দরকার। প্রাচ্যের কোনো দেশই ভারতীয়দের মত অতখানি ইংরেজি পড়ে ইয়োরোপীয় সভ্যতার আওতায় পড়ে নি —এমন কি তুর্কীও অতখানি ফরাসী শেখে নি। ইয়োরোপীয় সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস-লেখন-পদ্ধতি, অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি আমাদিগকে যতখানি প্রভাবান্বিত করেছে তার শতাংশের একাংশ অন্য কোনো প্রাচ্য দেশে হয়নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলতে পারি, আমরা সংস্কৃত, বাঙলা সব কিছু ভুলে গিয়ে প্রায় একশ' বৎসর ধরে ইংরেজির মাধ্যমে সর্বপ্রকারের জ্ঞানচর্চা করেছি—চীন কিংবা আরব একদিনের তরেও করে নি। তাই আজ আমরা বাঙলায় ফিরে গিয়ে ইংরেজি ভাবের বাঙলা অনুবাদ করার সময় শব্দের সন্ধানে মাথা কুটে মরি। চীন আরবে এ সমস্যা অনেক সরল, নেই বললেও চলে এবং ঠিক তেমনি তাদের সাহিত্য বর্তমান যুগের আন্তর্জাতিক সাহিত্য কলার সম্পদ আহরণ করে অতখানি বিত্তমান আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য, কলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মত হতে পারে নি।

এই বিত্ত এই সম্পদের বিরুদ্ধে ভারতেও একদল ওয়হ্হাবী (আরবের কট্টর), কশানী সম্প্রদায় দেখা দিয়েছেন। এরা সকলে মিলে যে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক সম্প্রদায় করেছেন তা নয়, যে কোনো রাজনৈতিক দলের ভিতর এই মতবাদের

বিস্তর লোক পাওয়া যায়। এঁদের ধারণা যে খুব স্পষ্ট তাও নয়, কিন্তু মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, এঁরা চান অতীতের কোনো 'সত্যযুগে' ফিরে যেতে, এদের বিশ্বাস ভারতের ইতিহাসে এ রকম পাপতাপহীন যুগ ছিল এবং সে যুগে ফিরে যাওয়া অসম্ভব নয়।

আমি ধর্মে বিশ্বাস করি, ঐতিহ্যে বিশ্বাস করি। কিন্তু সত্যধর্মের জন্য আমাকে পশ্চাতের কোনো বিশেষ যুগে ফিরে যেতে হবে এ কথা বিশ্বাস করি না। ধর্মে বিশ্বাস করি বলেই কায়মনোবাক্যে মানি,

"নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রুম।
পাপো নৃষদ বরো জনঃ ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখ্য॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি

চলিতে চলিতে যে শ্রান্ত তাহার আর শ্রীর অন্ত নাই, হো রোহিত, এই কথাই চিরদিন শুনিয়াছি। যে চলে দেবতা ইন্দ্রও সখা হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলেন। যে চলিতে চাহে না, সে শ্রেষ্ঠ জন হইলেও সে ক্রমে নীচ (পাপী) হইতে থাকে, অতএব, অগ্রসর হও, অগ্রসর হও।"

এবং ধর্মের চেয়েও বেশী মানি ভারতীয় বৈদগ্ধ্যকে—যে বৈদগ্ধ্যকে আমরা এতদিন অবহেলা করেছি।

যদি জানতুম যে ইয়োরোপীয়, আরব কিংবা চীনা বৈদগ্ধ্যের তুলনায় ভারতীয় বৈদগ্ধ্য বিত্তহীন তাহলে হয়ত আমি সনাতন পন্থায় সে বৈদগ্ধ্য নিয়ে আলোচনা করতুম, কোনো বিশেষ যুগের বিশেষ বৈদগ্ধ্য আঁকড়ে ধরে বসে থাকতুম, কিন্তু দেখছি দেশে দেশের মাঝখানের সর্বপ্রকার ভৌগোলিক বাধা প্রায় লোপ পেতে বসেছে, আজ যেমন ইংরেজী ফরাসী জর্মন বৈদগ্ধ্য একে অন্যের গোপনতম সম্পদের খবর রাখে ঠিক তেমনি সেদিন শীঘ্রই এসে উপস্থিত হবে যখন ভারতীয় বৈদগ্ধ্যকে আর সব বৈদগ্ধ্যের সামনে এসে দাঁড়াতে হবে। আমার সম্পদকে তখন তাদের সামনে এমনভাবে সাজিয়ে দিতে হবে, তাকে এমনি ধরণে যুগধর্মোপযোগী করতে হবে যে বিশ্বজন যেন তাকে বুঝতে পারে, এবং তারপর এগিয়ে চলতে হবে তাদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে, ইয়োরোপ, চীন, আরবের সর্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান-কলার সর্বোত্তম নিদর্শন গ্রহণ করে, ভারতীয় সম্পদ দান করে।

তাই ভারতের ভাগ্যবিধাতা নিয়ে চলেছেন,

'পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রীকে'
তারা দাঁড়িয়ে নেই—তারা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না॥

ভাষার হাটে বেইমানি

একদা এদেশে মুসলমানী সভ্যতা-সংস্কৃতি এতদূর ছড়িয়ে পড়েছিল যে বাঙলার সভ্যতা, বেশভূষা, আলাপ-আচরণে অনেকখানি মোগলাই-মোগলাই রং ধরেছিল। আমার নমস্য গুরুজন জয়রাম মুন্সী চোগা-চাপকান পরতেন আর বড় বড় মজলিসে তাঁর ফার্শী বয়েত আওড়ানো শুনে দেশবিদেশের জমায়েৎ মৌলবী-মওলানারা শাবাশ শাবাশ বলতেন। তারপর আমরা একদিন কোটপাতলুন পরে কাঁটা-চামচ দিয়ে খেতে আরম্ভ করলুম আর আমাদের ইংরেজি কপচানো শুনে দেশ-বিদেশের লোক ধন্যি ধন্যি বললে। সেদিনও গেছে—হরেদরে আমরা সব কিছু সামলে নিয়ে এখন আবার অনেকখানি সম্বিতে ফিরেছি।

আরবী-ফারসী থেকে শব্দ সঞ্চয় করার ফলে বাঙলা ভাষা গতিবেগ পেল সে কথা পূর্বেই একদিন নিবেদন করেছি। 'আলাল', 'হুতোমের' জোয়ার কেটে যাওয়ার পর বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ হয়ে বাঙলা ভাষা এমন জায়গায় এসে দাঁড়ালো যেখানে সে অনায়াসে গুরু-গম্ভীর ভাবাবেগ প্রকাশ করতে পারে, আবার চাষী বউয়ের কান্নাহাসিরও ঠিক ঠিক খবর দিতে জানে। এ ভাষা দিয়ে যে রকম 'প্রাচীন সাহিত্যের' মন্দ্ররব শোনানো যায় ঠিক তেমনি 'রামের সুমতি'র মত ভেজা ভেজা ঘরোয়া সুখ-দুঃখের কাহিনীও শোনানো যায়—শুধু শব্দ আর বাচনভঙ্গীর বেলায় একটুখানি হিসেব করে নিলেই হল।

উনবিংশ শতকের শেষ আর এ শতকের গোড়ার দিকে যে হিন্দী লেখা হত সে হিন্দীও মোটামুটি এই কায়দায়ই রচনা করা হত। শুধু তাই নয়, অধিকাংশ হিন্দীলেখক উত্তম উর্দুও জানতেন বলে তাঁদের হাতের নাগাল রইত বিস্তর আরবী-ফারসী শব্দ—কারণ বাঙলা যে রকম শব্দভাণ্ডারের জন্য প্রধানতঃ নির্ভর করে সংস্কৃতের উপর, উর্দু নির্ভর করে আরবী-ফারসীর উপর। আরবীর শব্দ-ভাণ্ডার সংস্কৃতেরই মত বিরাট (সংস্কৃতের মত আরবীও আপন ধাতু থেকে অসংখ্য শব্দ বানাতে পারে, যথা 'জালাসা'= 'বসা,' তার থেকে 'মজলিস', 'এজলাস' ইত্যাদি) এবং বাঙলায় যে রকম যে কোনো—তা সে 'ক্রন্দসী'র মত অজানা শব্দই হোক না কেন—সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করার 'শাস্ত্রাধিকার' আছে, উর্দুও ঠিক সেই রকম আরবীর লক্ষ লক্ষ শব্দের যে-কোনো শব্দ ব্যবহার করতে পারে।

তারপর হিন্দীতে এল ভাষাশুদ্ধীকরণের 'বাই'। তার ফলে সে ভাষা বিদ্যেসাগরী ভাষার রঙ না ধরে ধরলো সং। কারণ বিদ্যেসাগর মশায়ের মত ওরকম

জবরদস্ত লেখক হিন্দীতে কেউ তখন ছিলেন না। তবু সে ভাষা আরবী-ফারসী বিকটভাবে বর্জন করে নি বলে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস তখনো তর্জমা করা হত।

স্বাধীনতা পাওয়ার পর কিন্তু এ 'বাই' চরমে গিয়ে পৌঁছল। আমরা বাঙলায় বলি 'তারপর' কিম্বা 'তার বাদে' ("বাদ" শব্দটা আরবী সে কথা আমরা বেবাক ভুলে গিয়েছি) হিন্দীতে মাত্র একটি উপায়ে বলা যায় এবং সেটি হচ্ছে 'উস্‌কে বাদ'। হিন্দীওলারা তাই সেই 'বাদটুকু'কে পর্যন্ত বাদ দিয়ে বলতে আরম্ভ করেছেন 'উস্‌কে পশ্চাৎমে'!

বছর তিনেক পূর্বে শ্রীযুত অমরনাথ ঝা'র একটি ভাষণ আমি শুনি। পূর্ণ অর্ধ ঘণ্টা ভদ্রলোক অতি বিশুদ্ধ হিন্দীতে বক্তৃতা দিয়ে শেষ করলেন এই কথা বলে 'অব জো হমারী রাষ্ট্রভাষা হোগী বহ সংস্কৃতময়ী হিন্দী হোগী' অর্থাৎ আমাদের রাষ্ট্রভাষা 'সংস্কৃতময়ী' হবে।

শ্রী ঝা তাঁর অর্ধঘণ্টাব্যাপী ভাষণে একটিমাত্র আরবী কিম্বা ফার্সী শব্দ ব্যবহার করলে না।

আজ তাই হিন্দী ভাষা এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে সে অনায়াসে 'সীতার বনবাস' অনুবাদ করতে পারে, কিন্তু 'রামের সুমতি' কিম্বা 'গড্ডলিকা' করতে পারে না।

এ বড় মারাত্মক অবস্থা—সেই কথাটি আমি পাঠককে বলতে চাই। কারণ একথা ভুললে চলবে না, গণ-আন্দোলনের ফলেই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি এবং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনির্মাণের জন্য জনগণের সহযোগিতার প্রয়োজন। চাষা-ভূষোর সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা নিয়ে আমাদের বই লিখতে হবে, বক্তৃতা দিতে হবে, নাটক সিনেমা বানাতে হবে। এসব জিনিস বিদ্যেসাগরী বাঙলা দিয়ে যে রকম প্রকাশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ঠিক তেমনি আজকের দিনে হিন্দী দিয়েও প্রকাশ করা যায় না। একেবারে যায় না বলা অনুচিত, কিন্তু সে ভাষা যে সাহিত্যের পর্যায়ে ওঠে না তাই নয়, সে ভাষা অবোধ্য।

সুশীল পাঠক হয়ত অতিষ্ঠ হয়ে বলবেন, হিন্দী কি করে না-করে তা নিয়ে তোমার অত শিরঃপীড়া কেন?' কথাটা খুবই ঠিক, কারণ হিন্দী আমার মাতৃভাষা নয়, হিন্দী নিয়ে কেউ ছিনিমিনি খেললে আমার কিম্বা আপনার ব্যক্তিগত কোনো লাভক্ষতি নেই—অবশ্য যতক্ষণ হিন্দী আপন জমিদারিতেই দাবড়ে বেড়ায়, আমাদের পাকা ধানে মই না দিতে আসে।

সেইখানেই তো বিপদ। মেনে নেওয়া হয়েছে হিন্দী আমাদের রাষ্ট্রভাষা হবে

ও ক্রমে ক্রমে বাঙালী, আসামী, মাদ্রাজী সবাইকে যে শুধু হিন্দী পড়তে হবে তাই নয়, সে ভাষায় লিখতে হবে, বলতেও হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্র-নির্মাণের কর্ম অনেকখানি হিন্দীর মাধ্যমে করতে হবে। আজকের দিনের ছুঁৎবাইগ্রস্ত হিন্দী দিয়ে কি সে-কর্ম সুচারুরূপে সমাধান হবে?

রসিকতা বাদ দিন। পরশুরামের 'ছি ছি বলিয়া তৃপ্তি হয় না, তওবা, তওবা বলিতে ইচ্ছা করে'র অনুবাদ তো হয়ই না, ইংরেজকে যে খেদাতে হবে 'আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে' সেই জোরালো বাঙলা পর্যন্ত অনুবাদ করা যাবে না। কারণ 'আব্রু', 'ইজ্জৎ' ,ইমান শব্দ ফারসী-আরবী—হিন্দী এ শব্দগুলো বরদাস্ত (থুড়ি! 'সহ্য') করবেন না। 'আব্রুর' সংস্কৃত কি জানিনে, 'ইজ্জৎ' না হয় কেঁদে-কুকিয়ে 'মান' দিয়ে চালালুম, কিন্তু 'ইমান' শব্দের সংস্কৃত নেই সেকথা নিশ্চয় জানি। 'বেইমানির' জায়গায় বিশ্বাসঘাতকতা' চালাতে গেলে 'ভাষার হাটে বেইমানি' করা হয়।

যে ভাষা রাষ্ট্রভাষা হতে চায় তার শব্দভাণ্ডার হবে বিরাট। কারণ বহু প্রদেশের নানা রকম চিন্তাধারা তাকে প্রকাশ করতে হবে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজন মত নানা প্রদেশ থেকে নানারকম নূতন শব্দও তাকে গ্রহণ করতে হবে—ইংরেজি যেমন নানা দেশ থেকে নানা রকমের শব্দ নিয়ে আপন ভাষা বিত্তবতী করেছে।

যে ভাষা আপন শব্দভাণ্ডার থেকে অকাতরে খেদিয়ে দিচ্ছে বিস্তর শব্দ শুদ্ধমাত্র 'পবিত্র' হওয়ার জন্য সে ভাষা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ থেকে নানাপ্রকারের শব্দ নিতে রাজী হবে সে আশা দুরাশা।

আমার একমাত্র সান্ত্বনা যে হিন্দী সাহিত্যিকদের ভিতর এমন লোকও আছেন যাঁরা শ্রী ঝা'র সমর্থন করেন না।

ধৈর্যং কুরু! পুনঃ গচ্ছেৎ ঢাকায়

গত পঁচিশ বৎসর ধরে কী ঘটি কী বাঙাল কলকাতায় মাছের বাজার থেকে বাড়ি ফেরার সময় দিবাস্বপ্ন দেখেছে, আহা ঢাকার লোক কী সুখেই না আছে। বিশেষ করে বাঙাল ছেলেমেয়েরা বাচ্চা বয়েস থেকে মা মাসীর কাছ থেকে ঢাকা, বিক্রমপুর, গোয়ালন্দী ইস্টিমারের বিশ্বভুবনে অতুলনীয় রাইসকারির কথা শুনেছে। ঢাকার কই? সে তো ঘটিদের ইলিশের সাইজ। আর হোথাকার ইলিশ? সে তো তিমি মাছের সাইজ। গোটা পৃথিবীটা নাকি কোন্ এক প্রাণীর মাথায় বিরাজ

করছে—কিন্তু খাস ঢাকাইয়া মাত্রই জানে ঢাকার জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা। সৃষ্টির আদিম প্রভাতে ব্রহ্মাণ্ড অলিম্পিকে যে তিনটে ইলিশ হেভি-ওয়েট প্রাইজ পায় সেই তিনটির উপর ঢাকা শহর নির্মিত। এ তত্ত্ব আপনার অজানা থাকলে চেপে যাবেন —নইলে ইলশায় হাসবো।

তদুপরি ঢাকার নবাববাড়ির আওতায়, দীর্ঘ তিনশ' বৎসর ধরে নির্মিত মোগলাই খানা! মোগলাই রান্নার উৎপত্তিস্থল দিল্লী-আগ্রা। একটা শাখা গেছে লক্ষ্ণৌয়ে, অন্য শাখা যমুনা বেয়ে বেয়ে এলাহাবাদ, কাশী থেকে একটু মোড় নিয়ে মোগলসরাই, ফের গঙ্গা বেয়ে পাটনা তারপর মুর্শিদাবাদ। ওদিকে পদ্মা বেয়ে বেয়ে ছোট নদী ধরে ঢাকা। রান্নার শেষ তীর্থ সিলেট—কারণ ওটা পাঠান-মোগল উভয়েরই শেষ সীমান্ত নগরী।

বিক্রমপুর উল্লেখ করলুম কেন তবে? সে তো গ্রাম—আজ না হয় মেনে নিলুম ওটা মহকুমা সাইজ ধরে। এবং এ তো অতিশয় সুপরিচিত সত্য যে, কোনো একটি বিশেষ রন্ধনপদ্ধতি (ফরাসিতে কুইজিন—এবং এই শব্দটিই এখন আন্তর্জাতিক) গ্রামাঞ্চলে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

পাঠান-মোগলের পূর্বে বিক্রমপুর ছিল হিন্দুরাজাদের রাজধানী। এই তো কিংবদন্তী। জঙ্গীলাটরা যেরকম যুদ্ধের পর যুদ্ধের কালানুক্রমিক নির্ঘণ্ট থেকে সে-দেশের ইতিহাস নির্মাণ করেন, এ-রসনা পূজারী রন্ধনপদ্ধতির (কুইজিনের) উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ধরে ধরে সে দেশের ইতিহাস নির্মাণ করে। জনশ্রুতি যদি সেখানে আমার কুইজিন-ইতিহাসকে সায় দেয় তবে সেই জনশ্রুতিই সত্য ইতিহাস—বাঁড়ুয্যে সরকার সেস্থলে অপাংক্তেয়।

বিক্রমপুরের কুইজিন ছিল মৎস্যকেন্দ্রিক। ঢাকার মোগলাই রান্না স্পষ্টতই মাংসকেন্দ্রিক। কিন্তু তাই বলে বিক্রমপুরকে ঠেকানো যায় নি। বস্তুতঃ, এই ঢাকাতেই আপনি পাবেন মৎস্য-মাংস কুইজনের বিরলতম সমন্বয়—গঙ্গা-যমুনার সম্মেলন। এ তীর্থে যে বঙ্গজন আসে না তার পিতা নির্বংশ হোক্ (এটা বিদ্যেসাগর থেকে চুরি)। যে এ তীর্থের প্রসাদ বেক্তেয়ার হয়ে উদরে ধারণ এবং পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয় সে আখেরে যাবে বেহেশতে যেখানে বিস্তর সুদূর নিস্তরঙ্গ নহর্-তরঙ্গিণী মৌজুদ এবং বলা বাহুল্য সেগুলোতে ইলিশ আবজাব করছে, কোনো প্রকারে সীজ্‌ন্, অফ্‌ফ্ সীজনের তোয়াক্কা না করে। সৃষ্টিকর্তা ভক্তের মনোবাঞ্ছা কদাচ অপূর্ণ রাখেন না। আর সে যদি হিন্দু হয় তবে অতি অবশ্যই সে তদ্দণ্ডেই যাবে শিবলোকে, অর্থাৎ তার বাসস্থান হবে শিবশম্ভুর জটালোকে যেখান থেকে

বেরিয়েছেন,

দেবী সুরেশ্বরী / ভগবতী গঙ্গে
ত্রিভুবন তারিণী, / তরল তরঙ্গে।

আর একথা কি আমার মত যবনকে তৈলবট গ্রহণ করে বিধান দিতে হবে যে সে গঙ্গায় বিরাজ করেন ইলিশ শুধু ইলিশ, দূরদিগন্তব্যাপী ইলিশ।

* * *

কিন্তু হায়, পদ্মার ইলিশ পরিপাটিরূপে রাঁধবার জন্য সুনিপুণা বিক্রমপুরাগতা লক্ষণা সমাজ—বিশেষ করে বৈদ্য বর্ণোদ্ভবা। এ বর্ণের প্রতি আমার পক্ষপাতিত্ব পাঠক ক্ষণতরে বিস্মৃতির বুড়ীগঙ্গায় ভাসিয়ে দিন। এঁদের একেকটি যেন সাক্ষাৎ ভানুমতী। এঁদের হাতে কই ইলিশ থেকে আরম্ভ করে এন্তেক কেঁচকি চুনোপুঁটি পর্যন্ত না জানি কোন্ ইন্দ্রজালের মহিমায় এমনই এক অপরূপ সত্তায় পরিণত হন যে তখন তাঁরই রসে সিক্ত রসনা গেয়ে ওঠে :—

ইহাকে জানেন যাঁরা
জগতে অমর তাঁরা
য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥

* * *

কোথায় আজ সে নবাববাড়ি যাকে কেন্দ্র করে একদা পূর্বাচলের মোগলাই কুইজিন গড়ে উঠেছিল? কলকাতার গোড়াপত্তন থেকেই সে ভুইফোঁড় আপস্টার্ট। কাজেই সেখানে অল্পকালের মধ্যেই দেখা দিল হোটেল, রেস্তরাঁ, চায়ের দোকান, মায় পাইস হোটেল এবং এদানির কফি হৌসগুলো। যদ্যপি একশ' বছর পূর্বেও কলকাতায় প্রবাদ ছিল, বাঙাল দেশের জাত মারলে তিন সেন। উইলসেন, কেশব সেন আর ইস্টি শেন। উইলসনের হোটেল, কেশব সেনের ব্রাহ্মধর্ম আর স্টেশনে তো জাত মানার উপায়ই নেই। ঢাকাতে সে-রকম হুশ হুশ করে রেস্তোরাঁ গজাল না। বিরয়ানি, পোলাও, চতুর্ককার—কোরমা, কালিয়া, কাবাব, কোফতা—দোপেয়াজা, এবং ঢাকার অত্যুৎকৃষ্ট রেজালা বুরহানী, সাদামাটা নেহারি (এটা বরঞ্চ সহজলভ্য), ঢাকাই পরোটা (ভিতরে অষ্টগ্রামের পনীরের পুর দেওয়া পরোটা), নানাবিধ সমোসা গয়রহ গয়রহ তাই রেস্তোরাঁর মাধ্যমে ভালো করে প্রচার প্রসার লাভ করার পূর্বেই ঢাকার স্কন্ধে ভর করলো ঢাউস ঢাউস বিলিতি মার্কা হোটেল—তাদের অপেয় সুপ, অখাদ্য ইষ্টু, অকাট্য রোস্ট ইত্যাদি ট্যাঁশ যত সব গব্বযন্তনা। আর দিশী পোলাওয়ের নামে এক প্রকারের অগা খিচুড়ি (জগা নয়), কোরমার

নামে আইরিশ ইস্টুর সঙ্গে ইণ্ডিয়ান মশলার সমন্বয়—সরি,—খুনোখুনি। যা কিছু গলা দিয়ে নামে সঙ্গে নিয়ে যায় রিটার্ন টিকিট। তিন দিনের নয়, তিন মিনিটের রিটার্ন। কপাল ভালো থাকলে এবং পেটে সুইডিশ স্টীলের লাইনিং থাকলে ঘণ্টা তিনেকের ম্যাদ।

তবে হাঁ, এখনো আছে বাকির (বাখর) খানী রুটি, এবং সুখা রুটি। কথিত আছে জনৈক পশ্চিমা খানদানী মনিষ্যি এস্তের জাগীর পেয়েছিলেন বরিশালে। ঢাকা থেকে বেরুবার সময় সঙ্গে নিয়ে যেতেন এক ডাঁই সুখা রুটি (খাস উর্দুতে অবশ্য সুখী রুটি)। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি আবিষ্কার করেন এই অপূর্ব চীজ। কোথায় লাগে এর কাছে উৎকৃষ্টতম ক্রীম ক্রেকার? ঝাড়া একটি মাস থাকে মুরমুর ক্রিস্‌প্‌। জনশ্রুতি, এই বাকিরখানের নামেই হয় বরিশালের অন্য নাম বাকরগঞ্জ।

নেই নেই করে অনেক কিছুই আছে।

কিন্তু—কিন্তু—ঠিক এই সময়টায় তীর্থযাত্রাটা স্থগিত রাখুন। "ভাদ্রাশ্বিনে পূর্বাচলযাত্রা নাস্তি।" একাধিক মৌলিক দ্রব্যের অনটন। তবে কি না শিগগিরই ট্যুরিস্ট বুরো খুলবে। আসা-যাওয়ার সুখ-সুবিধে হবে। আসছে শীত নাগাদ পাসপর্ট ভিজার কড়াকড়িও কমবে।

বন্ধুবান্ধবদের যে সদুপদেশ দিয়েছি, সুশীল পাঠক, তোমাকে তো তার উল্টোটা বলতে পারি!

ঈদ-আনন্দোৎসব

ধর্মের একটা দিক চিরন্তন এবং যার পরিবর্তন হয় না। এই যে আমি পাঁচ ইন্দ্রিয় দিয়ে বিশ্বভুবনের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছি তার বাইরে যে-সত্তার কল্পনা আমি অভনুব করতে চাই, তিনি আদিঅন্তহীন, অপরিবর্তনীয়। যে-মানুষ সাধনার ক্ষেত্রে যতখানি অগ্রসর হয় সে সেই অনুপাতে তাঁর নিকটবর্তী হয়, তাঁর অনুভূতি নিবিড়তর হয়। আমাদের হজরত বলতেন তিনি সেই চরম সত্তাকে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেন তাঁর স্কন্ধের শিরার (স্পন্দনের) মত। বলা বাহুল্য আমরা মনন দ্বারা যে পরমসত্তাকে অনুভব করি তিনি চিন্ময়। শিরার স্পদন-জনিত অনুভূতি সম্পূর্ণ মৃন্ময়। চিন্তায় মারফৎ আমরা কল্পলোকে যে অনুভূতি পাই, স্পর্শলব্ধ দৃঢ় মৃত্তিকাজাত শিরার অনুভূতি তার তুলনায় অনেক বেশী নিবিড় অনেক, বেশী দৃঢ়। তাই হজরত সেই পরম সত্তাকে শারীরিক অভিজ্ঞতার ভ্রান্তিহীন সত্যের মত প্রতি

মুহূর্তে অনুভব করতেন।

পক্ষান্তরে ধর্মানুভূতির জগৎ থেকে বেরিয়ে ধর্মাচরণের কর্মভূমিতে আমরা যখন নামি, তখন সে-আচরণের অনেকখানি দেশকালপাত্রের উপর নির্ভর করে। অবশ্য অন্বেষণ বিশ্লেষণ করলে অবশেষে দেখা যাবে আমাদের প্রত্যেকটি ধর্ম-আচরণও সেই অপরিবর্তনীয় চিরন্তন সত্তাশ্রিত। কর্মজগতে তাই প্রথমত পাত্রের উপর নির্ভর করে ধর্মাচরণ—আমল। আমি পক্ষাঘাতে চলৎশক্তিহীন, অথর্ব। মক্কা শরীফ দর্শনের তরে আমার চিত্ত যতই ব্যাকুল হোক না কেন, আমার যত অর্থ-সম্পদই থাকুক না কেন, কোনো ধর্মজ্ঞজন কোনো ফকীহ আমার হজ-যাত্রার অপারগতাকে নিন্দনীয় বলে মনে করবেন না। আমি এ-অবস্থায় যে-কোনো হাজীকে, আমার হয়ে, পুনরায় হজ করার জন্য মক্কা শরীফে পাঠাতে পারি; অবশ্য তার সমস্ত খর্চা-পত্র আমাকেই দিতে হবে। এর থেকে কিন্তু এহেন মীমাংসা করা সম্পূর্ণ ভুল হবে যে, আমার উপর যে-সব ধর্মাচরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তার সব কটাই আমি অন্য লোককে দিয়ে করাতে পারি।

"পাত্রের" মত "কালও" ধর্মাচরণের সময় হিসাবে নিতে হয়। পূর্বাকাশ ঈষৎ আলোকিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে সলাৎজিক্‌র্ ধ্যানধারণার পক্ষে সর্বোত্তম সময় ইহলোকে সব ধর্মই একথা স্বীকার করেছেন।

এস্থলে বলা প্রয়োজন মনে করি যে, একশ' বছর আগেও সাধারণ ধার্মিকজন আপন ধর্মবিশ্বাস (ইমান) ও ধর্ম-আচরণ ক্রিয়াকর্ম (আমল) নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতো, প্রতিবেশীর ধর্ম সম্বন্ধে তার কোনো কৌতূহল ছিল না। থাকলেও সে-কৌতূহল নিবৃত্তি করা আদৌ সহজ ছিল না। কারণ অধিকাংশ স্বধর্মে বিশ্বাসী-জনই পরধর্মাবলম্বীর সংস্রব এড়িয়ে চলতো, তথা তাকে আপন ধর্মকাহিনী শোনাতে কোনো উৎসাহ বোধ করতো না। উপরন্তু হিন্দু, জৈন এবং পার্সীরা বহু শত বৎসর পরধর্মাবলম্বীকে আপন ধর্মে দীক্ষিত করার দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছেন। এবং আশ্চর্য বোধ হয়, আমাদের আলিমফাজিলগণ প্রতিবেশী হিন্দুকে শুদ্ধমাত্র "কাফিরা, হানূদ, মলাউন" ইত্যাদি কটুবাক্য দ্বারা বিভূষিত করেই পরম তৃপ্তি অনুভব করেন; অথচ তাঁরা সকলেই আমার মত না-দানের চেয়ে ঢের ঢের বেশী দানিশমন্দ—তাঁরা বিলক্ষণ অবগত আছেন, তাঁদের পক্ষে আপন ধর্ম প্রচার করা অবশ্য কর্তব্য। এবং তাঁরা কেন, অতিশয় আহাম্মুখও জানে, বিধর্মীর ধর্ম তুলে কটুবাক্য বললে, তাকে ইসলামের প্রতি তো আকৃষ্ট করা যায়ই না, উপরন্তু আরেকটি প্রতিবেশীকে রুষ্ট করা হয় মাত্র।...

"কাল" ও "পাত্রের" কথা হল। "দেশের" উপর ধর্মাচরণ নির্ভর করে আরো বেশী। যে-দেশে ছ'মাস ধরে সূর্যাস্ত হয় না, সেখানকার মুসলিমের এবং বাংলা-দেশের রোজা রাখার কায়দা-কানুন যে হুবহু একই রকমের হতে পারে না সেটা সহজেই অনুমান করা যায়।

ঈদের পরব, এবং অন্যান্য তাবৎ পরবই এই "দেশ" অর্থাৎ স্থানের সঙ্গে সম্পর্ক ধরে। এবং এই সুবাদে আবার পাঠকের স্মরণে এনে দি, বহুবিধ কারণে আমরা প্রতিবেশীর ধর্ম সম্বন্ধে এখন আর সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে পারিনে। মহরমের আর জগদ্ধাত্রী পূজোর মিছিল যদি একই দিনে পড়ে তবে তার হিসেব নগরপাল আগের থেকেই নেয় না তাকে আমরা বিচক্ষণ আই জি বলে মনে করবো না। তদুপরি খৃষ্টান মিশনারীরা দু'শ' বছর ধরে পাক নবীর বিরুদ্ধে এত কুৎসা রটিয়েছে যে তেসাদের ধর্ম—বিংশ শতাব্দীর প্রচলিত খৃষ্টধর্ম, যে-ধর্ম একদিকে শেখায় "কেউ ডান গালে চড় মারলে বাঁ গাল এগিয়ে দেবে", অন্য দিকে বিশ-পঁচিশ বৎসর পর পর আপোসে কেরেস্তানে কেরেস্তানে লাগায় প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ, টাকার লোভ দেখিয়ে দুই দলই টেনে আনে বিধর্মীদের, সরল নিগ্রোদের, এবং সর্বশেষে শ্মশানযজ্ঞ চালায় হিরোসীমার নিরীহ নারীশিশুদের উপর। এবং সঙ্গে সঙ্গে নতমস্তকে স্বীকার না করে উপায় নেই, ইয়েহিয়া এ-দেশে যে তাণ্ডবনৃত্য জুড়েছিলেন সেটাও ধর্মের নামে, ইসলামের দোহাই দিয়ে সেটাও "জিহাদ"! কিন্তু এই আনন্দের, ঈদের মৌসুমে হানাহানির কাহিনী সর্বৈব বর্জনীয়। আমি শুধু তুলনার জন্য কথাটা পেড়েছি, মুসলমানদের আনন্দোৎসব তার সত্য পরিপ্রেক্ষিতে দেখাবার জন্য।

ঈদ অর্থাৎ আনন্দ, আনন্দ-দিবস, পরবের দিন। ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ উদ্-দোহাতে কিন্তু ঈদে সীমাবদ্ধ নয়।

ইমানদার ধর্মনিষ্ঠ মুসলিম ঈদ-উল-ফিতরের আনন্দোৎসব করার বিশেষ একটা কারণ আছে। এক মাস ধরে সুখে-দুঃখে, মানসিক অশান্তির ভিতর দিয়েও উপবাস করাটা সহজ কাজ নয়—কঠিন শারীরিক পীড়া ইত্যাদির ব্যত্যয় অবশ্য আছে। তাই যে মুসল্লি পূর্ণ উনত্রিশ বা ত্রিশ দিন শরিয়তের আদেশমত উপবাস করতে সক্ষম হয়েছে, তার আনন্দই সর্বাধিক হয়। তার অর্থ এই নয়, যে-ব্যক্তি পূর্ণ মাস রোজা রাখতে পারে নি, সে ঈদ আনন্দোৎসবে যোগ দেবে না। অবশ্যই দেবে। যে লোক বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে যোগ দিতে পারে নি—যে কোন কারণেই হোক—তাকে স্বাধীনতা-দিবসের ঈদ-আনন্দোৎসব থেকে বঞ্চিত করার হক স্বাধীনতা-সংগ্রামে যাঁরা লিপ্ত হয়েছিলেন তাঁদের পুরুষোত্তমেরও নেই। অতিশয়

অভাজন জনও যদি আনন্দোৎসবে যোগ দিতে আসে তাকে বিমুখ করা, তার সঙ্গে তর্কাতর্কি করা ঈদের অঙ্গহানি করে। কারণ আনন্দের দিনে যে-কোন প্রকারের অপ্রিয় কর্ম করা নিরানন্দের লক্ষণ, অতএব সর্বথা বর্জনীয়।

ঈদ বা আনন্দ সম্বন্ধে সুন্নী ও শীয়া এবং শীয়াদের নানা শাখা-প্রশাখা সকলেই প্রাগুক্ত ধারণা পোষণ করেন। বাংলাদেশে একদা প্রচুর খোজা ও বোরা ছিলেন। এঁদের দু' দলই ইসমাঈলী শীয়া, পক্ষান্তরে মুর্শিদাবাদ ও সিলেটের পৃথ্বীম-পাশার শীয়োরা ইসনাআশারী শীয়া নামে পরিচিত। ঈদ সম্বন্ধে সকলেরই ধারণা মোটামুটি এক হলেও ঈদ পরব পালনের কর্ম-পদ্ধতি শীয়াদের ভিতর অতি বিভিন্ন।

সুন্নী হানিফীরা বিশুদ্ধ শরীয়তর দৃষ্টিবিন্দু থেকে ঈদ সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশ পাবেন ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর শিষ্যগণ, ইমাম আবূ ইউসুফ ইত্যাদির সাহচর্যে সংকলিত প্রামাণিক ফিকাহ্ গ্রন্থে। ঈদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গভীর আলোচনা পাবেন প্রখ্যাত দার্শনিক, ফকীহ ও সূফীহ ইমাম গজ্জালীর অজরামর কিমিয়া সা'দৎ গ্রন্থে। মরহুম ইউসুফ খানের অনুবাদ অনিন্দ্যসুন্দর। কলকাতায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

তুলনাত্মক আলোচনা করলে দেখা যায়, ঈদ বা আনন্দ মাত্রেরই অনুষ্ঠানের ব্যাপারে "দেশ" বা ভৌগোলিক অবস্থান তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। ইসলামের উদয়কালে খাস আরবদেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল না। পক্ষান্তরে ভারত বহু বহু শতাব্দী ধরে ছিল ধন-ধান্যের বিত্তবান দেশ। জনসাধারণের অবকাশও ছিল যথেষ্ট। তাই এই বঙ্গভূমিতে, বর্তমান দারিদ্র্যের দুরবস্থাতেও কী হিন্দু কী মুসলমান সকলেই বারো মাসে তের পার্বণের কথা জানে। ঐ সব পার্বণে একদা দানই ছিল প্রধান অঙ্গ—অন্নবস্ত্র, ছত্র, পাদুকা, প্রকৃতপক্ষে কুটির-শিল্পে হেন বস্তু ছিল না যেটা বিত্তবান কিনে নিয়ে দান করতো না। কিন্তু দান বাধ্যতামূলক ছিল না।

পক্ষান্তরে গরীব আরবদেশে নিত্য নিত্য নানামুখী দান কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব ছিল ; ধর্ম কখনো মানুষকে এ-ধরনের কর্ম করতে বাধ্য করে না। তদুপরি আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ইসলামের গোড়াপত্তনের সময় থেকেই সে-ধর্ম যে একদিন আরবভূমির বাইরেও ছড়িয়ে পড়বে তার সম্ভাবনাও ছিল। সে-সব দেশ আরব-ভূমির চেয়ে বেশী ধনী বা বেশী গরীবও হতে পারে। অতএব যতদূর সম্ভব অল্প সংখ্যক 'ঈদ" বা আনন্দের দিন বিধিবদ্ধ করে দেওয়া হয়। দান কিন্তু ইসলামের বিধিবদ্ধ আইন, তার অতি শৈশব অবস্থা থেকেই। ঈদ-উল-ফিতরে দান অলঙ্ঘ্য ধর্মাঙ্গ। বস্তুত ইসলামই ইনকাম ট্যাক্স—জাকাৎ—ধর্মের অঙ্গরূপে পৃথিবীতে

সর্বপ্রথম বাধ্যতামূলক করে।

সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখি, আনন্দোৎসব (ঈদ) ও বাধ্যতামূলক ধর্মাচার (নামাজ রোজা ইত্যাদি) একসঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

পাঁচ ওক্‌ৎ নামাজ বাড়িতে পড়তে পারো কিংবা মসজিদে। জুম্মার নামাজ কিন্তু অবশ্যই মসজিদে পড়তে হবে। কারণ ধর্মসাধনা ভিন্ন এর অন্য উদ্দেশ্য ছিল ; প্রত্যেক মুসলিম যেন সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন মসজিদে প্রতিবেশী সমধর্মীর সঙ্গে মিলিত হয়ে একাত্ম-বোধ-জাত শক্তি অনুভব করতে পারে।

এরপরই আসে বৎসরে দু'বার করে ঈদের নামাজ। ইমানদার মুসলিম মাত্রই চেষ্টা করে, বৃহত্তম মুসলিম জনসংঘের সঙ্গে বৃহত্তম জমাৎ-এ সে যেন নামাজ পড়তে পারে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য যত দূর-দূরান্ত থেকে যত সব নামাজার্থী ঈদ-গাহতে জমায়েৎ হয় তাদের সংখ্যা, তাদের ধর্মানুরাগ দেখে তাদের প্রত্যেকেই যেন আত্মবল, সংহতি-শক্তি অনুভব করতে পারে। ঐদিন পরিচিত জনের মাধ্যমে বিস্তর অপরিচিতের সঙ্গে তার পরিচয় হয় ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন দ্বারা। এই দূর-দূরান্ত থেকে, বৃহত্তম জমাৎ যে ঈদ-গাহে হবে, সেখানে নামাজ পড়ার পুণ্য ইচ্ছা নিয়ে ধাবমান যাত্রীদলকে আমি একাধিকবার বহুদূর অবধি তাকিয়ে দেখে দেশের জনসাধারণের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা অনুভব করেছি, বিস্ময় বোধ করেছি।

বাড়িটি ছিল একেবারে বিরাট পদ্মার পাড়ে, রাজশাহীতে। ওপারে, বহুদূরে দেখা যেত শ্যামল একটি রেখা—ভারত সীমান্ত। বারান্দায় দাঁড়িয়েছি অতি ভোরে। অন্ধকার মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেখি, কত না দূর-দূরান্ত থেকে, হেথা-হোথা ছড়ানো চরভূমি থেকে, শুনলুম পদ্মার ও-পার ভারত থেকে, কত না নামাজার্থী শীতের শুকনো বালুচরের উপর দিয়ে হেঁটে আসছে রাজশাহী শহরের দিকে। শহরের প্রায় পূর্বতম প্রান্তের বাড়িটি থেকে দেখি, যেখানে সূর্য অস্ত যায় সেই দূরে অতি পশ্চিম প্রান্ত অবধি যেন পিপীলিকার সারির মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানব সন্তান শহরের দিকে এগিয়ে আসছে—নিরবিচ্ছিন্ন ধারায়। পূর্বপ্রান্তে, যারা প্রাচীন দিনের জাহাজের খেয়াঘাট, পাশের ফুটকি পাড়ার দিকে এগিয়ে আসছে তাদের নূতন পাজামা কুর্তা, বাচ্চাদের রঙিন বেশভূষা হাসিমুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সবাই অক্লান্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে সদর রাজশাহীর ঈদগাহের দিকে।

এদের কেউই হয়ত জানে না, ঈদের নামাজের সামাজিক মেলা-মেশার তাৎপর্য। গ্রামের জুমাঘর বা শহরের জামি' মসজিদ ত্যাগ করে বৃহত্তর ঈদ-গাহে এসে বহুগুণে বিস্তৃত অঞ্চলের ঐক্যবদ্ধাবস্থায় বেশুমার নমাজরত মুসলিমের সঙ্গে

শব্দার্থে তথা ভাবার্থে কাঁধ মিলিয়ে যখন পদ্মাচরের সরল মুসলিম ঈদের নমাজ পাঠ শেষ করে তখন সে কি সচেতন যে, বর্ষার উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল পদ্মা তার চরকে তার বউবাচ্চাকে বাদ-বাকী দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেও ঈদগার মুসল্লীদের কাছ থেকে কখনো বিছিন্ন করতে পারবে না। দীন ইসলামের চিরন্তন চিন্ময় বন্ধনে প্রলয়ঙ্করী পদ্মার তাণ্ডব নর্তন কস্মিনকালেও ছিন্ন করতে পারবে না,—অনুভব করে তার অবচেতন মন।

কার্যত আমরা রোজার ঈদেই আনন্দোল্লাস করি বেশী। কিন্তু সর্ব দৃষ্টিবিন্দু থেকেই ঈদ-উল-আজহা বহুগুণে গুরুত্বব্যঞ্জক।

(১) আপন আবাসে পড়া পাঁচ ওক্ত নামাজের ক্ষুদ্রতম গণ্ডী, (২) সেটা ছাড়িয়ে জুম্মার নামাজের বৃহত্তর পরিবেশ, (৩) সে-পরিবেশ ছাড়িয়ে ঈদগার বৃহত্তম পরিবেশ—সাধারণ মুসলিমের জন্য এই ব্যবস্থা। কিন্তু আল্লা যাকে তওফীক দিয়েছে তার জন্য ব্যবস্থা, (৪) সে যেন জীবনে অন্ততঃ একবার মক্কাশরীফে গিয়ে বিশ্ব মুসলিমের সঙ্গে একত্র হয়। বিশ্ব মুসলিমের সত্তা-সংহতি-ব্যাপ্তি সে যেন দেখে, হৃদয় দিয়ে অনুভব করে, তার ক্ষুদ্র সত্তা যেন বৃহত্তম মুসলিম সত্তার সঙ্গে সম্মিলিত হয়।

সে কাহিনী দীর্ঘ, সর্ব বিশ্বে তার গুরুত্ব ছেয়ে আছে। তার জন্য আগামীতে অন্য ঈদ।

ভাষা—বাঙলা

বাঙলা ভাষা মারফত সরকারী বেসরকারী সব কাজ নিষ্পন্ন করাটা আপাত-দৃষ্টিতে যতই কঠিন মনে হোক না কেন, আমি অন্তত একটা দেশের কথা জানি, যেখানে এ সমস্যাটা সহস্রগুণে কঠিনতর ছিল এবং সে-দেশ সেটা প্রায় সমাধান করে ফেলেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে প্যালেস্টাইনে এসে জুটতে লাগলো শব্দার্থে কুলে দুনিয়া থেকে ইহুদির পাল। কত যে ভিন্ন ভিন্ন মাতৃভাষা নিয়ে তারা এসেছিল সে খতিয়ান নেবার চেষ্টা করা বৃথা। আমাদের পশ্চিম ভারত থেকে পর্যন্ত একদল খাঁটি ভারতীয় ইহুদি মারাঠী জাত তাদের কোঁকনী উপভাষা নিয়ে ইজরায়েলে উপস্থিত হয়। আপন রাষ্ট্র গড়ে তোলার আগের থেকেই ইজরায়েলের প্রধান শিরঃপীড়া ছিল—তাদের রাষ্ট্রভাষা হবে কি? শেষটায় স্থির করা হল হীব্রু—যে ভাষাতে—আমি খুব মোটামুটি আন্দাজ থেকে বলছি—অন্তত হাজার বছর ধরে কেউ কথা বলে নি, সাহিত্য সৃষ্টি করে নি—শুধু পড়েছে মাত্র, তাও সমুদ্রমাত্র ইহুদি যাজক পণ্ডিত রাব্বি সম্প্রদায়। যে-সব ইহুদি অতি প্রাচীনকাল থেকে

প্যালেস্টাইন ত্যাগ করে অন্য কোথাও যায় নি, নির্বাসিত হলেও কয়েক বৎসরের মধ্যে ফিরে এসেছে তাদের সকলেরই মাতৃভাষা আরবী—প্রায় বারোশ' বৎসর আরবদের সঙ্গে বসবাস করার ফলে। সেটাকে রাষ্ট্রভাষা করার তো প্রশ্নই ওঠে না। যে সব রাব্বি হীব্রুতে ওল্ড টেস্টামেণ্ট ও প্রধানত হীব্রুর সমগোত্রীয় আরমেয়িক ভাষায় রচিত তালমুদ্, মিদ্রাশ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ পড়তে পারেন তাদের সংখ্যা শতকরা এক হয় কি না হয়। তদুপরি হীব্রুভাষা প্রধানত শাস্ত্রগ্রন্থের ভাষা। আড়াই হাজার বছর ধরে ইয়োরোপীয় সভ্যতা সংস্কৃতি যে সব শব্দ গড়ে তুলেছে তার একটিও এ ভাষাতে নেই—'দূর-আলাপনী' বা 'অনপনেয়' কালির তো কথাই ওঠে না। সব চেয়ে বড় বিপদ, বহিরাগত ইহুদিদের মাতৃভাষা—রাশান পোলিশ, ইডিশ থেকে আরম্ভ করে ফরাসী, জর্মন, ইতালীয়, ফিনিশ বলতে গেলে য়ুরোপের তাবৎ ভাষা, আরবী, তুর্কী, ফার্সী, কুর্দী এস্তেক কোঁকনী—সে ফিরিস্তি তো আমি আগেই এড়িয়েছি। এখন সমস্যা হল, মাস্টার যে হীব্রু শেখাবে, সেটা কোন্ ভাষার মাধ্যমে? তাবৎ ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন মাতৃভাষার লোক এক বিশেষ জেলায় জড়ো করে তাদের বৈদিক ভাষা শেখানো ঢের ঢের সহজ।

অথচ ইহুদিরা এই অলৌকিক কর্মটি প্রায় সমাধান করে এনেছে। টেলিফোন, ওয়ান উয়ে ট্র্যাফিক, মোটরের যন্ত্রপাতি যত রকম সম্ভব-অসম্ভব শব্দ তৈরি তো করা হলই এবং কত না অসংখ্য ভাষায়, প্রাচীন অর্বাচীন, বর্ণশঙ্কর হীব্রু শব্দসহ এ-সব নূতন শব্দের অভিধান রচিত হল। নূতন নূতন শব্দের ফিরিস্তি, বয়ান, নিত্যি নিত্যি সাপ্তাহিক মাসিকে বেরোয়, সাপ্লিমেণ্টরূপে অভিধান যারা ক্রয় করে ফেলেছেন তাঁদের নামে পাঠানো হয়।

এ-বিষয়ে ইজরায়েল যে কতখানি কৃতকার্য হয়েছে, এবং এখনো তারা কতখানি যোগ্যতাসহ কর্মতৎপর তার একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট। আপনি ট্যুরিস্ট। রাত দুটোর সময় আপনার দরকার হয়েছে একখানা ট্যাক্সির। "অনুবাদ বিভাগকে"—নামটা আমি সঠিক জানিনে—প্রাগুক্ত সাড়ে বত্রিশভাষার যে কোনো একটিতে ফোন করে শুধোতে পারেন, "আপনারা হীব্রুতে ট্যাক্সি শব্দের কি অনুবাদ করেছেন?" পাঁচ সেকেণ্ডের ভিতর হয় হীব্রু শব্দটি পাবেন, নয় অন্য প্রান্ত বলবে, "শব্দটি এতই আন্তর্জাতিক যে আমরা এটার অনুবাদ করি নি। আপনি স্বচ্ছন্দে ট্যাক্সি, টাক্সি টাক্সে যা খুশী বলতে পারেন।" মোদ্দা কথা, যে কোনো লোক ইজরায়েলে আগত ইহুদিদের যে-কোনো ভাষায় যে-কোনো সময় যে-কোনো শব্দের হীব্রু প্রতিশব্দ শুধোতে পারেন ও সদুত্তর পাবেন। অবশ্য এ-হীব্রু যদিও বাইবেলের হীব্রুর উপর

প্রতিষ্ঠিত তবু এটাকে অভিনব হীব্রু বলাই উচিত। এ ভাষার প্রধান সম্পদ, বিদেশী ভাষা থেকে অকাতরে অসংখ্য শব্দ গ্রহণ করে নির্মিত হয়েছে।

এহেন অলৌকিক কাণ্ড অবশ্য সম্ভবপর হত না যদি ইজরায়েলে বিশেষ কোনো ভাষা-ভাষীর জোরদার সংখ্যাগুরুত্ব থাকত। ৩৮ বৎসর পূর্বে আমি যখন তেল-আভিভ যাই তখন রাস্তাঘাটে এত জর্মন শুনতে পাই, ফোন ডিরেক্টরিতে এত বেশী জর্মন নাম দেখি যে, আমার মনে ধারণা হয়েছিল শেষটায় ইজরায়েলের প্রধান ভাষা বুঝি জর্মনই হয়ে যাবে। কিন্তু ইহুদিরা এমনই মরণকামড় দিয়ে আপন ঐতিহ্য, ধর্মমূলক কিংবদন্তী আঁকড়ে ধরতে জানে, উৎপীড়ন অত্যাচার বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সে অনুরাগ এমনই দিগ্বিদিকজ্ঞানহীন ধর্মান্ধতায় পরিণত হয়, এবং যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে ইজরায়েলবাসী সার্থক রাষ্ট্রনির্মাণে প্রবৃত্ত হয়েছে, তার সম্মুখে প্রাচীনতম পূতপবিত্র হীব্রু ভাষার দুর্বার গতি রোধে কে?

কিন্তু হায়, তবু স্বীকার করতে হয় তাদের সমস্ত আদর্শ, লক্ষ্য, কর্মপন্থা, যে ভূমির উপর তারা সর্বজনগ্রাহ্য রাষ্ট্রভাষার বিরাট সৌধ নির্মাণ করতে চাইছে তার সবই কৃত্রিম, সবই এক স্বপ্নলোকের রূপকথা, মূর্তিমান করার ন দেবায় ন ধর্মায় প্রয়াস।

বার বার অসংখ্যবার নিপীড়িত এই জাতিকে যেন ইয়াহুভে নিষ্ঠুরতর হিটলারের হাত থেকে রক্ষা করেন। এক আমেরিকা ছাড়া তারা এত অসংখ্য শত্রু সৃষ্টি করেছে—বিশেষত প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোতে, যেখানে বিস্তর খৃষ্টানও ইহুদিদের প্রাচ্যভূমি থেকে বিতাড়িত হতে দেখলে প্রকাশ্যে জয়ধ্বনি করবে—যে, তাদের মনে সম্প্রতি প্রশ্ন জেগেছে মার্কিন সাহায্য বিপদকালে পুনর্বার কতখানি কার্যকরী হবে? ইয়েহিয়ার দিল্-জান্-এর প্যারা দোস্ত নিক্সন কী না করেছেন, নিরস্ত্র রাইফেল মাত্র সম্বল বাঙালকে ঘায়েল করতে, তদুপরি চীনও তো কম যাননি। উভয়ে মিলে ভারতকে জুজুর ভয় দেখিয়েছেন এবং পারলে অবশ্যই ভারত মায় বাঙলাদেশ শ্মশানে পরিণত করতেন। তাই ইহুদিরা দুশ্চিন্তায় পড়েছে, মার্কিন মদতের উপর কতখানি ভরসা করা যায়? তাদের দুসরা ভরসা ছিল, আরব রাষ্ট্রগুলো একদম ঐক্যবদ্ধ হতে জানে না। কিন্তু কে কসম খাবে, এরা কস্মিনকালেও একজোট হবে না?

আমার মনে হয়, পূর্ব বাঙলায় বাঙলাকে পরিপূর্ণ রাষ্ট্রভাষা করার যে উদ্যোগ, বিশেষ করে সরকারের ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রীদের দফতরগুলোতে যে সহযোগিতার আত্যন্তিক প্রয়োজন, জনসাধারণের যে সদাজাগ্রত, চেতনাবোধ, বাঙলা খবরের কাগজের সহযোগিতা, দিনের পর দিন নিজেদের প্রচেষ্টায় অন্তত একটি কলম জুড়ে নূতন নূতন যে সব পারিভাষিক শব্দ সরকার তথা জনগণ দ্বারা দৈনন্দিন কর্ম

সমাধানের জন্য নিত্য নিত্য নির্মিত হচ্ছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা, ভাষাবিদ্, চিকিৎসক, এঞ্জিনিয়ার, আইনবিদ ইত্যাদিদের সে-সব আলোচনায় যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো, এ-সব যথেষ্ট পরিমাণে হচ্ছে না। একদা বিশেষ করে ১লা বৈশাখের, কখনো বা ২১ ফেব্রুয়ারির রাত্রে স্কুল-কলেজের ছাত্ররা তাবৎ ঢাকা শহরের উর্দু, ইংরিজিতে লেখা নেমপ্লেট, দেয়াল থেকে উপড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে বাঙলার প্রভুত্ব বুঝিয়ে দিত। এখন তারা স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক। তারা নির্ভয়ে প্রত্যেক গৃহস্থকে অনুরোধ, প্রয়োজন হলে বাধ্য করতে পারে, বাড়ির নাম স্থির করুন, কিন্তু বাঙলাতে। (হোটেল "পূর্বানীর" কর্তৃপক্ষ ৪।৫ বৎসর পূর্বেই জানতেন, হাওয়া কোন্ দিকে বইছে তাই 'মগরীবী সরাই' বা গুলস্তান বোস্তান —'হটেল দ্য লাহোর' বা 'রেস্তোরাঁ আইয়ুবিয়েন্' স্বপ্নেও মনে স্থান দেন নি)। 'ইনডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে যে মহাজন একটা মোটা টাকা পূর্বানীতে খাটান তিনি সোল্লাসে সায় দিয়েছিলেন, কারণ এর বহু পূর্বেই তিনি তাঁর আপন ভবনটির নাম করেছিলেন 'শেফালি' এবং তাঁর মামী শিক্ষা বিভাগের এক প্রধান কর্মচারী তাঁর গৃহভালে তিলক অঙ্কন করেন সনাতন "প্রান্তিক" নাম দ্বারা। আমি জানি, এ-সব এমন কিছু ইন্‌কিলাবী দুঃসাহসী শহীদজনোচিত কঠিন কর্ম নয়, কিন্তু সে-কর্ম প্রতিটি গৃহস্থকে বহুদিন ধরে সচেতন রাখবে, কয়েক মাস পর পর লেটার-হেড ছাপবার সময় আত্মজনকে ঠিকানা দেবার সময় তার একটি বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র গড়ে উঠবে এবং দৈনন্দিন উত্তেজনাহীন কিন্তু অতিশয় বাস্তব সেই আধ-ভোলা ভাষা আন্দোলনকে প্রগতির পথে সদাজাগ্রত করে রাখবে। ওদিকে চলুক সরকারী প্রচেষ্টা। সেটা বাঙলা একাডেমি, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ —প্রয়োজন হলে নূতন বিভাগ স্থাপন—ইত্যাদি যে কোনো প্রতিষ্ঠান, এ কাজের ভার নিতে পারেন, ইজরায়েলের উদাহরণ তো এইমাত্র দিলুম। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে সর্ব রাজকার্য গুজরাতিতে সমাধান করার জন্য বরোদার মহারাজা যে কমিটি নির্মাণ করেন তার সদস্যসংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল। তবু অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে তাঁরা কর্মসমাপণ তথা মুদ্রণান্তে যে বিরাট কোষ দফতরে দফতরে পাঠালেন সে কলেবরের পুস্তক দূর থেকে দেখেই আমি সেই বিভীষিকাকে মারণাস্ত্রক অস্ত্রসমূহের নির্ঘণ্টে স্থান দেবার জন্য পুলিসকে অনুরোধ জানাই। অথচ বছর তিনেকের ভিতরই ইংরিজির স্থান গুজরাতি দখল করে নিল, অক্লেশে!

শ্রীযুক্ত শঙ্কর ক্ষোভ করেছেন, "'বাংলা ভাষা আজ ওপার বাংলাতে তেমন প্রাণোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে না।...একুশে ফেব্রুয়ারি আজ তেমনভাবে আর অনেককে

নাড়া দেয় না।" শ্রদ্ধেয়া উমা চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "কোন একটা ঘটনাকে কেউ কোলে নিয়ে তো বসে থাকতে পারে না।" দুটো কথাই ঠিক। কিন্তু শ্রীযুক্ত শঙ্কর তার সঙ্গে সঙ্গে এ-আশাও করছেন, তাঁর সুন্দর সরল ভাষায় সবিস্তর বলে না থাকলেও, একুশের প্রতি শ্রদ্ধা উভয় বঙ্গের বাঙলাপ্রেমীদের চিরন্তন অনুপ্রেরণার অফুরন্ত উৎস হয়ে থাকবে—নিত্যদিনের ব্যবহারিক ভাবচিন্তার আদান-প্রদানের জন্য তো বটেই, সেই শ্রদ্ধাপ্রসাদাৎ রবি কবি যে অক্ষয় ভাণ্ডার রেখে গেছেন তার যোগ্য ওয়ারিশানও আমরা হতে পারব। আমি আরো আশা রাখি, যোগ্যজন সে ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধিও করতে পারবেন। অবশ্যই শঙ্কর এ-কথা বলতে চান নি, একুশেকে "কোলে নিয়ে বসে থাকতে হবে" এবং নিশ্চয়ই শ্রদ্ধেয়া উমা এ কথা বলেন নি যে, একুশের প্রতি কোনো প্রকারের শ্রদ্ধা প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন। অধিকাংশ নীতিই চরমে টেনে নিয়ে গেলে সেটা অনেকখানি রিডাক্‌শিও আড আবসুর্ডুম হয় বটে, কিন্তু বহু ক্ষেত্রে উভয়ের বক্তব্য পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন ধরা পড়ে উভয়ের বক্তব্যের মধ্যে তেমন কিছু নীতিগত পার্থক্য নেই, পার্থক্য যেটুকু আছে—যদি আদৌ থাকে—তবে সেটুকু শুধু মাত্রা নিয়ে। অবশ্য কট্টরপন্থী লোক সর্বাবস্থায়ই কিছু না কিছু থাকবে। ঢাকা কলকাতার বিস্তর লোক আছেন যারা ঘোরতর আপত্তি তুলে বলেন, বাঙলা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা যদি কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হয় তবে সে বিদ্যালয়কে সরকার কোনো আর্থিক সাহায্য তো করতে পারবেনই না—ওই বিদ্যালয়কে কোনো প্রকারের স্বীকৃতিও দিতে পারবেন না।

রবীন্দ্রনাথ নীতিগতভাবে এবং কার্যত পারতপক্ষে বিশ্বভারতীর অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বাঙলার মাধ্যমেই করতেন—আর আত্মবিভাগের (স্কুলের) তো কথাই। অথচ শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন দাশ স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে, স্কুল-স্থাপনার প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদানার্থে একটি স্বতন্ত্র শাখা খোলেন, কিংবা প্রচেষ্টা করে কৃতকার্য হন নি—আমার ঠিক মনে নেই।

* * *

আমি মাসের পর মাস ঢাকায় কাটিয়ে এসেছি। বাঙলাদেশের অগ্রগতির পথে যে কত কণ্টক, কত অগণন সমস্যা তার একটা অতিশয় অসম্পূর্ণ লিস্টি আমি দিনের পর দিন পূর্ণ একটি মাস ধরে খবরের কাগজ থেকে এবং আত্মজনের বাচনিক—মাত্র এই দুটি পন্থায় নির্মাণ করার প্রচেষ্টাদি—অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে যাই নি, পূর্ববঙ্গীয় সাংবাদিকদের আমি প্রায় চিনি না বললেও অত্যুক্তি হয় না, কোনো প্রকারের স্টাটিস্‌টিক্‌স্ সংগ্রহ করার জন্য যত্রতত্র টো টো করার মত সামান্যতম

শারীরিক বল আমার নেই—বস্তুত প্রতি মাস অন্তত একটিবার বাসভবন দেহলি আমার ছায়াটি দেখেছে কি না সে-বিষয়ে প্রতিবেশীগণের মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।···শেষটায় নিরাশ হয়ে ফিরিস্তি নির্মাণকর্মে ক্ষান্ত দি।

বাঙলাদেশ সরকার অতি উত্তমরূপেই অবগত আছেন তাঁদের সমস্যা কি—এই একটি বিষয়ে আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই। '৭১-এর ন'মাস যেন বন্যার মত পূব-বাংলার লোককে হত্যা করে, ইতস্তত নিক্ষিপ্ত করে, গৃহহীন অন্নহীন আত্মীয়-আত্মজনহীন করে দিয়েছিল, কিন্তু, কিন্তু এখন? এখন দিনের পর দিন—কত দিন ধরে চলবে তৃষ্ণার্তের এক আঁজলা পানির তরে আকুতি? যে বন্যা কুল্লো মুল্লুক ভাসিয়ে ছয়ালাপ করে দিয়েছিল সেই বন্যাই যাবার বেলা নিয়ে গেছে তৃষাতুরের শেষ জলকণাটুকু! কিস্মৎ! কিস্মৎ!! কিস্মৎ!!!

বাংলাদেশের আপামর আচণ্ডাল ভদ্রতর, কী রাষ্ট্রের কর্ণধার, কী নাগরিক, কী জনপদবাসী সকলের সম্মুখে যে কী নিদারুণ পরীক্ষা সেটা এ বাঙলা থেকে তো কথাই নেই, ও বাঙলায় বাস করেও হৃদয়ঙ্গম করা অতিশয় সুকঠিন।

যত কঠিনই হোক না কেন, একটা সত্যে আমি বিশ্বাস করি:

"আপনি অবশ হলি,
তবে বল দিবি তুই কারে?
উঠে দাঁড়া, উঠে দাঁড়া,
ভেঙে পড়িস না রে॥
করিস নে লাজ, করিস নে ভয়,
আপনাকে তুই করে নে জয়—
সবাই তখন সাড়া দেবে,
ডাক দিবি তুই যারে॥
বাহির যদি হলি পথে
ফিরিস নে তুই কোনোমতে,
থেকে থেকে পিছন পানে
চাস নে বারে বারে॥
নেই যে রে ভয় ত্রিভুবনে,
ভয় শুধু তোর নিজের মনে—
অভয়চরণ শরণ করে
বাহিরে হয়ে যা রে॥"

দিনলিপি

সৈয়দ মুজতবা আলীর মাঝে মাঝে দিনলিপি রাখার অভ্যাস ছিল। এইসব দিনলিপির মধ্যে তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির অনেক মূল্যবান চিন্তা ও তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, ভাষা সম্বন্ধে বহু আলোচনা, পারিবারিক জীবনের বহু খুঁটিনাটি তথ্যে ভরা দিনলিপিগুলি। এইসব দিনলিপিগুলি থেকে হয়তো আত্মজীবনী লেখার বাসনাও তাঁর ছিল। এইরকম একটি অসম্পূর্ণ রচনা 'আত্মজীবনী লেখার প্রচেষ্টা'। মাত্র দুটি পৃষ্ঠার পর আর লেখা হয়ে ওঠেনি। উক্ত রচনাটিও এখানে অন্তর্ভুক্ত হল। বাংলা ১৩৬৭ সালে লেখক কলকাতা থেকে রাজশাহী যান। সেখানে থাকেন প্রায় দেড়মাস। ঐ সময় একটানা দেড়মাস ধরে দিনলিপি রাখেন। এই দিনলিপির মধ্যে রাজশাহী-পদ্মার অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা লেখকের নৈসর্গিক সৌন্দর্য-প্রিয়তার একটি অমূল্য নিদর্শন। ১৯৪৭ সালে লেখককে দক্ষিণভারতে কিছুকাল থাকতে হয়। দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র ও প্রকৃতি তাঁকে নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করে। এই সময়ের দিনলিপিতে সমুদ্র সম্বন্ধে বিচ্ছিন্নভাবে যে বর্ণনা লেখেন সেটিও এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হল।

—সম্পাদক

আত্মজীবনী লেখার প্রচেষ্টা

আমার অগ্রজ তাঁর বাল্য, কৈশোর ও পরিণত জীবন যে দেশকালপাত্রের ভিতর কাটে তার বর্ণনা লিখছেন। এতে করে প্রধানত শ্রীহট্টবাসী, গৌণত পূর্ব-পাকিস্তান, এমন কি আসামবাসীরাও উপকৃত হবেন। মুখবন্ধে তিনি বিশেষ করে নবীন সেনের দৃষ্টান্ত তুলে নিবেদন করেছেন, তিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবন যতদূর সম্ভব চেপে গিয়ে সেই সময়ের কথা বলবেন বেশী। এ অতি উত্তম প্রস্তাব ও সাতিশয় বিনয়ের লক্ষণ সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার মনে হয় শ্রীহট্ট জেলার কৃতী-সন্তানের কাছে তাঁর দেশবাসী তাঁর জীবন সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানতে উৎসুক। আর কিছু না হোক, স্কুল-কলেজের ছেলেছোকরারা অন্তত জানতে চাইবে, তিনি কি করে শিক্ষাজীবনে ম্যাথামেটিক্স-ফিজিক্স অধ্যয়ন করে পরবর্তী জীবনে খ্যাতনামা ঐতিহাসিক, নৃতত্ত্ববিদ, ভৌগোলিক, তথা আর্ট ও স্থাপত্যের পণ্ডিত হলেন। বস্তুত অধুনা প্রকাশিত তাঁর 'চর্যাপদ' সম্বন্ধে অতিশয় গবেষণামূলক প্রবন্ধ না পড়ার পূর্বে আমারও জানা ছিল না, ভাষাতত্ত্বেও তিনি কতখানি ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন।

কিন্তু এস্থলে এটা আমার মূল বক্তব্য নয়। মমাগ্রজ আমাকে অনুরোধ করেছেন, যেহেতু আমরা একই পাঠশালে একই স্কুলে পড়েছি, অতএব আমিও যদি আমার বাল্যস্মৃতি স্মরণ করি তবে তাঁর ভুলে যাওয়া কথাগুলিও তাঁর স্মরণে আসবে।

এটিও উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু বিপদ এই যে আমি প্রায় ষোল বছর বয়েসে, ইস্কুল পাস করার পূর্বেই দেশ ছেড়ে পশ্চিমবাঙলার শান্তিনিকেতনে চলে আসি এবং পরবর্তী জীবনের অধিকাংশ বাইরে বাইরে কাটে। গোড়ার দিকে বছরের দুই ছুটিতেই দেশে গিয়েছি, পরবর্তী জীবনে সেটাও সম্ভব হয়নি,—বছরের পর বছর কেটে গিয়েছে।

মানুষ বিদেশে দীর্ঘকাল থাকলে বাল্যস্মৃতি ম্লান হয়ে যায়। তার কারণ দেশে থাকলে দেশের লোকজন ঘরবাড়ী তাকে পুনঃ পুনঃ প্রাচীন দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এমন কি ক্রমে ক্রমে দেশের নানা প্রাচীন কীর্তিকাহিনীও সে শোনবার সুযোগ লাভ করে—বাল্যে যেগুলোর প্রতি স্বভাবতই তার কোনো কৌতূহল ছিল না।

আমার ভাগ্যে হয়েছে উল্টোটা। বছরের পর বছর কেটে গিয়েছে, সিলেটী বলা দূরে থাক, বাঙলা বলারও সুযোগ ঘটেনি। দেশের লোকজন, ছেলেবেলার

ঘটনাগুলিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে সেগুলোকে সজীব রাখার জন্য জলসিঞ্চন করার নর্মসখা প্রায় পাইইনি বললেও অত্যুক্তি হয় না। স্মৃতির অঙ্গানে চটুল নৃত্য জাগাতে হলে এক হাতের করতালি অসম্ভব।

অথচ স্মরণ করিয়ে দিলে এখনো অনেক কিছু মনে আসে।

পূর্বেই আমার ভ্রাতার বিষয়ের উল্লেখ করেছি। তাঁর স্মৃতিকাহিনীতে তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন : তিনি গোড়ার দিকে রীতিমত পয়লানম্বরী স্কুল-পালানো ছেলে ছিলেন। আমার তখন হঠাৎ যেন কোন্ যাদুমন্ত্রের বলে চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই ছবিটি। দু'তিনখানা তক্তাপোষ-জোড়া বিরাট খাটে সুদূরতম প্রান্তে দাদা দেয়ালে হেলান দিয়ে মুখের ভাব করেছেন, পাদমেকং ন গচ্ছামি ; বিদ্যামন্দির নৈব নৈব চ। বাবা-মা সাধাসাধি করছেন। কড়ে আঙুলে দোয়াত ঝুলিয়ে বড়দা স্কুলে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে বিরক্তি প্রকাশ করছেন ও সব্‌চেয়ে বেশী কাকুতিমিনতি করছেন আমাদের সম্পর্কে দাদা আলফী মিয়া। আর আমি এই পাঁচজনের বাইরে 'পাঁচের বাদ'। আমি শুধু ঘুরঘুর করছি চতুর্দিকে। আর ভাবছি, 'আমাকে যেতে দিলে আমি এখখুনি যাই'। তখনো স্কুল নামক ব্যাঘ্রটির সঙ্গে পরিচয় হয়নি বলে দাদার আতঙ্ক কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম হত না।

অথচ দাদা, বলতে বেবাক ভুলে গেলেন—না চেপে গেলেন—যে যখন যেতে আরম্ভ করলেন তখন এক লফ্‌তে গুয়াগাছের মগ্‌ডালে উঠে বসলেন অবহেলে। এবং সেই যে বসলেন, তারপর কখনো তাঁকে কেউ নামতে দেখেনি। পরে সপ্রমাণ হল তিনি আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে সব চেয়ে সেরা পড়ুয়া।

সামান্য দু'একটি উদাহরণ দি।

তখনকার দিনে আর কটি মুসলমান ছেলে ইস্কুলে যেত? এবং তাদেরও প্রধান আতঙ্ক ছিল অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি। অথচ সপ্তম শ্রেণীতে উঠে তিনি গায়ে পড়ে নিলেন মেকানিকস্—যার জন্য দরকার তুখোড় ম্যাথ্ জ্ঞান। এবং তখনকার দিনের দুই অঙ্কবিশারদ ক্ষীরোদবাবু (ইনি অল্পবয়সে গত হন) ও গোপালবাবুর প্রিয় শিষ্য হয়ে উঠলেন। পরবর্তী যুগে কলেজে নিলেন I. Sc., সেও এক বিস্ময়। বি. এস-সিতে সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স পেয়ে তাঁর ক্ষোভের অন্ত ছিল না। তার জন্য প্র্যাকটিকালের একটি দুর্ঘটনা দায়ী। স্থির করলেন, এম. এস-সিতে সেটা তিনি অধ্যাপক রামনের (তখনো রামনরশ্মি আবিষ্কৃত হয়নি ও তিনি ও তাঁর অন্যতম সহকর্মী শিষ্য কৃষ্ণন বিশ্ববিখ্যাত হননি) কাছে শিক্ষালাভ করে পুষিয়ে নেবেন।

দিনলিপি

(১২ই বৈশাখ ১৩৬৭—২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭)

CACUTTA—ISHURDI—RAJSHAHI

১২ই বৈশাখ ১৩৬৭

A terrible journey from Calcutta to Rajshahi.

Yesterday it was 107° here in Calcutta. Fancy catching the train at 16·00, hottest part of the day. Kendu, Mukuldi, Ghantu, Saumen & Prof Saurin Dasgupta at the station.

I do not recollect the times. From 19 to 21 or more at Darsana (India) From 21·30 to 23·45 or so, at Darsana (Pak).

1·35 Ishurdi. No room in the waiting room. Hot like hell even at that early hour. Wait wait till 6. Train left at 7·45. No fan in the compartment till 7·35. Hell again. I thought it was the last leap. No, another change at Abdullapur at about 8.15. jump up & down the railway line ditch. Hot platfrom! Wait for the train. Train left at 8-30. 9-30. at Rajshahi.

রাজশাহী

১৫ই বৈশাখ, ১৩৬৭

এ ক'দিন ধরে পূব বাঙলার সর্বত্রই অসাধারণ গরম যাচ্ছে। কোনো কোনো জায়গায় ১০৫° পর্যন্ত উঠেছে। ঢাকা ১০২°, দিনাজপুর ১০৬°। রাজশাহী তো terrific তবে তার উত্তাপ কাগজে দেয়নি। এখানকার লোকে বলছে ৫।৭ বছরের ভিতর এ রকম গরম পড়েনি। কাগজ বলছে, উত্তর পশ্চিম থেকে

আসা গরমের ফলে। এখানে এসেছি অবধি সেই হাওয়াই দেখছি। দক্ষিণে পদ্মা—সেখান থেকে এযাবৎ কোনো হাওয়া আসেনি। কালবৈশাখী বা অন্য কোনো প্রকারের বৃষ্টি, রাজশাহী অঞ্চলে অন্তত এখনও হয়নি।

অথচ একেবারে খোলা ছাদে শুয়ে ভোরের দিকে গায়ে একখানা চাদর টানতে হয়।

এখানে আজ এই প্রথম দক্ষিণের বাতাস পেলুম। কিন্তু ১০।১১টার ভিতর সেটা বন্ধ হয়ে গেল। তার পর উত্তর-পশ্চিমের বাতাস। তবে কালকের মত দুর্দান্ত নয় ও পদ্মাকে সাদা সাদা ফেনার ঢেউয়ে বিক্ষুব্ধ করেনি।

উত্তর-পশ্চিমের বাতাস কাল থেকে বন্ধ হওয়াতে গরম অল্প কম।

Message incomplete-এর বদলে একটা কাগজে ছিল massacre incomplete.

খবরটা ছিল কোথাকার যেন ম্যাসাকারের। কিন্তু শেষে messaere incomplete সেনসরের ম্যাসাকার না খবরের ম্যাসাকার বোঝা গেল না।

এবারের গরম পূব বাঙলায়ও ভীষণ। ডেলি কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় রোজই ফ্ল্যাশ করছে। পাঁচ বৎসরে এরকম হয়নি। আমার হিসেবে তারও বেশী। সাতমাস ধরে এদেশে বৃষ্টি হয়নি। Simply terrific.

পশ্চিম বাঙলার কোনো খবর পাচ্ছিনে। কিন্তু সেখানে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হয়নি, ঠাণ্ডাও পড়েনি। কারণ তাহলে পূব-বাঙলাকে যে তাতিয়ে তুলেছে উত্তর পশ্চিম থেকে আসা গরম হাওয়ায় সেটা এল কি করে?

শীতে বৃষ্টি হয়নি। গরমে দিনের পর দিন শুকনো কেটে যাচ্ছে, আদপেই বৃষ্টি হল না, এরকম অবস্থা পূব-বাঙলায় আমি কখনও শুনিনি।

১৮ই বৈশাখ, ১৩৬৭

আজকের কাগজ বলছে, দু'একদিনের ভিতর ঝড়ঝঞ্ঝা হতে পারে। এখানে তার একমাত্র লক্ষণ, আকাশে '০১ হয়, কি না-হয়, উটকো শরৎকালের হাল্কা মেঘ! এখন পশ্চিমের বাতাস বন্ধ। সকালে অল্প দক্ষিণা বাতাস পদ্মার উপর দিয়ে এল—সুশীতল না হলেও বেশ ঠাণ্ডা।

কলকাতায় গত ৩৪ বৎসরের মধ্যে এরকম পর পর এত অধিক তাপ দেখা যায়নি। ১৯৫৯ মাত্র এক দিন ১০৮° থেকে ফের গরমি কমে যায়।

৭।৫।৬০-এর খবরের কাগজ রাজশাহী থেকে ৫।৫-এর খবরে বলছে এখানে নাকি পয়লা মে'তে hottest day with 108° গেছে। ব্যস! তার আগে যে একটা খবর বেরল ২৮।৪-এ এখানে ১১০° গেছে?

ধর্ম জানেন আমি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু এই যে প্রতি সন্ধ্যায় বিদকুটে সব যন্ত্রপাতি নিয়ে খচখচানি আর তার সঙ্গে সঙ্গে বেসুরা বেতালা গান রাত বারোটা-তেরোটা অবধি এরও একটা সীমা থাকা দরকার।

ক্ষীণ চাঁদের আলো, মাথার উপর সপ্তর্ষি, দূর পদ্মার মৃদু গুঞ্জরণ, নারকলগাছের অল্প শিহরণধ্বনি—এছাড়া কোনো শব্দ নেই—শান্ত-গম্ভীর পরিবেশ, কেমন যেন রহস্যময়। এর উপর এই অসহ্য খচখচানি!

মানিকগঞ্জ এলাকায় পদ্মায় ভীষণ ঝড় ও নৌকাডুবি।

কয়েকদিন ধরে উত্তর-পশ্চিমের গরম হাওয়া বন্ধ।

আজ দুপুর আর বিকেল গেল গুমোট গরমে। ১০৮°-এর কম নিশ্চয় নয়।

উনিশটার সময় এল দক্ষিণ থেকে ঝড়—লু। অতিশয় সূক্ষ্ম সাদা ধুলোতে সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেল। 'দুরাশা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিঙে কুয়াশায়-ঢাকা পৃথিবী দেখে বলেছিলেন, ভগবান যেন রবর দিয়ে সৃষ্টি ঘষে তুলে ফেলতে চান। এখানে সাদা ধুলো দিয়ে। এ ধুলো পদ্মাচরের।

পদ্মা নদী পর্যন্ত আর দেখা গেল না।

কিছুক্ষণের জন্য সপ্তর্ষি পর্যন্ত লোপ পেল।

নটার সময় সামান্য একটু ক্ষান্ত দিয়ে ফের সমস্ত রাত জোর দক্ষিণের বাতাস বইল। ঠিক ঝড় নয়—ঝোড়ো বাতাস। এখনও চলছে।

আকাশের অতি উচ্চে যে আড়াইখানা ছেঁড়া মেঘ তারা পশ্চিমদিকে চলে গেল।

বিদ্যুৎ চমকালো না, মেঘ ডাকলো না।

বাতাস এ সময় যতটা ঠাণ্ডা হয় ততটাই—কোনো দিকে বৃষ্টি হয়ে থাকলে যতখানি শীতল হয় তার কিছুমাত্র না। নিতান্ত পদ্মার বারো মাইল জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে এসেছে বলে যা ঠাণ্ডা হওয়ার কথা।

একেবারে মেঘটেঘ না জমেই হঠাৎ ঝড়।

সেই ঝড় যখন তার চরম রুদ্রে তখন দেখি একটা দাঁড়কাক প্রাণপণ তার সঙ্গে লড়ছে। ইচ্ছে করলেই যেখানে খুশী সে আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু সে যেন আশ্রয় না খুঁজে অন্য কিছু খুঁজছে। তার হারিয়ে যাওয়া সঙ্গীকে?

কোথায় কালকের লূর পর আজ দিনটা ঠাণ্ডায় যাবে, আজ গেল সব চেয়ে গরম দিন।

ভোরে পদ্মাতে প্রথম স্নান। আমাদের বাড়ির সামনে পদ্মা একটা মাছের বঁড়শির মত হুক করেছে। সেই হুকে রাজ্যের মেয়েমানুষ ভোর থেকে নাইতে আসে। তাদের ঘন ঘন অঙ্গ বিতাড়ন এবং যত্রতত্র মর্দন থেকে বোঝা যায় তারা এই নিদাঘ যামিনী নিষ্কর্মা কাটায়নি; তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সেই হুকে তো আর নাইতে পারিনে। তাই হুক পেরিয়ে খানিকটে এগোতে হয়। তখন দেখি পায়ের তলায় লিকলিকে ভলভলে প্যাচপেঁচে পলিমাটি। বালুর সুখস্পর্শের বদলে এই স্লাইমি কাদার উপর হেঁটে যাওয়া, এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই কাদার ক্লেদময় স্পর্শে সর্বাঙ্গে কেমন যেন কিরকির করে। শতশত কিলবিলে বাঙ্ মাছের উপর দাঁড়ালে যে অনুভূতি হয় এ তাই।

জল ভারী সুন্দর। দক্ষিণের বাতাসে সঞ্চালিত হয়ে সর্বাঙ্গ সহস্র চুম্বনে শীতল করে দেয়।

রাত দশটায় ফের লু। কিন্তু কালকের মত জোরালো নয়। এবং ঠাণ্ডাও নয়। এ অঞ্চলে অন্তত কোথাও বৃষ্টি হয়নি।

লু কালকেরই মত এল হঠাৎ আচম্‌কা। আকাশে একরত্তি মেঘও ছিল না। এখন বুঝলুম পদ্মার ঝড় কেন ভয়ঙ্কর। আকাশে বাতাসে কোনো

প্রকারের ইশারা না দিয়ে হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে নেমে আসে। আস্তে আস্তে যে গতিবেগ বাড়বে তাও নয়। অসাবধান কেন, সাবধানী দাঁড়ীও এর হঠাৎ ধাক্কা সামলাতে পারে কি ?

সমস্ত রাত এবং এখনও হিল্লোলের পর হিল্লোলে দক্ষিণ বাতাস।

নবমী

ঠিক কালকেরই মত। অসহ, দুঃসহ না কালকের চেয়ে কম না বেশী এসব আর চিন্তা করার শক্তি নেই।

ঠিক কালকেরই মত রাত দশটায় লু। তবে গোড়াতে কমজোর ছিল। এখন ২২'৪৫ বাড়ছে। ধুলোতে লেখা যাচ্ছে না।

তারপর কিন্তু বাতাস কমে গিয়ে মশার উৎপাত শুরু হল। মশারি খাটাতে হল। সকালে দেখি, হিম পড়েছে। এই প্রথম।

আকাশে কণামাত্র মেঘের চিহ্ন নেই।

সিলেটে জোর বৃষ্টি।

আজ কোনো দিক থেকে কোনো প্রকারের বাতাস ছিল না। গরম অন্য দিনের তুলনায় কম বলেই মনে হচ্ছে। ঢাকা বলেছে, আমাদের এলাকা শুকনো শুকনিতেই যাবে। এটা বলার দরকার ছিল না। আকাশের দিকে তাকিয়ে কল্পনা মাত্র করতে পারিনে, কোন্ দিক হতে, কি কারণে মেঘ জমতে পারে আর বৃষ্টিই বা হতে পারে। এই যে দক্ষিণের বাতাস আসে সেই বা কোত্থেকে ? বঙ্গোপসাগর থেকে ? কলকাতা ছাড়িয়ে ? তা হলে এত জোর পায় কোথায় ? কলকাতার উপর দিয়ে তো এত জোরে বয়ে যায় না। তবে পদ্মাতেই এর জন্ম ? তাই বা কি করে হয়।

একটা জিনিস বিলক্ষণ বুঝেছি। হঠাৎ এমনই আচম্‌কা এই দক্ষিণের বাতাস আসে—কোনো প্রকার মেঘ না জমে—যে, যে কোনো নৌকার পক্ষে এটা কাল।

প্রথম ধাক্কা সামলাতে পারলেও সে বাতাস সামলে হাল ধরে নৌকো বাঁচানো শক্তিশালী পুরুষের দরকার। মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এই আচম্‌কা ঝড় সম্বন্ধে একাধিকবার সাবধান করেছেন।

আজ এগার দিন হল এখানে এসেছি। গরমের ঠেলায় চৈতন্য যেন সময়ের হিসেব রাখতে পারেনি। মনে হয় মাত্র তিন-চার দিন হল।

রাত এগারটায় দক্ষিণের বাতাস উঠলো। ধুলোর ঝড় না তুলে সমস্ত রাত ব্যজন করে গেল।

আজ দিনটা যেমন তেমন কাটল কিন্তু রাতটা গেল খারাপ। বাতাস ছিল না বললেই হয়। মশারির ভিতর বাইরে শুয়ে আরামহীন রাত।

দিনটা জেঁ্যাও তোঁ্যাও কাটে কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকেই আরম্ভ হয় গরমের সত্য উৎপাত। ঘরটা তেতে ওঠে চরমে—ওদিকে বিজলির জোর কমে গিয়ে পাখা আর ঘুরতেই চায় না। বাইরেও গরম। হাওয়া বন্ধ। কখন বইতে শুরু করবে তার ঠিক নেই। সেও বইবে গরমই। কারণ চতুর্দিকে বৃষ্টি হয়েছে বা হবার আশা আছে বলে কোনো কাগজ আশা দেয়নি।

রাতটা কাটল দুঃসহ গরমে। অন্য দিনের মত রাত বারোটায়ও ঠাণ্ডা হল না।

গেল দু'দিন ঢাকা ভরসা দিয়েছিল, রাজশাহী অঞ্চলেও বৃষ্টি হতে পারে। আজ তাও প্রত্যাহার করলে।

আজ আরো গরম।

সন্ধ্যার পর দক্ষিণ থেকে বাতাস কিন্তু ঠাণ্ডা নয়।

পূর্বে কিছুক্ষণ খরার বিজলি হানলে। সন্ধ্যায় ছেঁড়াছেঁড়া মেঘ জমেছিল। কিছুক্ষণের ভিতর তাও কেটে গেল। মেঘগুলো যেন কোথাকার বর্ষা-ভোজের পর ইতস্তত ছড়িয়ে ফেলা এঁটো পাতা। দেখলে হিংসে হয়, কোথাও যেন কপালীরা উত্তম বৃষ্টির উৎসব ভোজ করেছেন। আমাদের কপালে ছেঁড়া পাতা। ক্ষেমা-ঘেন্না করে সেগুলো চাটতে রাজী আছি—যদি তাঁরা বৃষ্টি হয়ে নামেন। তাও তাঁরা নামলেন না।

এখন (২৩'০০) জোর দক্ষিণের বাতাস কিন্তু আরামহীন। পদ্মা মাঝে মাঝে সমুদ্রেরই মত অনেকক্ষণ ধরে একটানা গর্জন রব ছাড়ে। বড় গম্ভীর—তবে সমুদ্রের মত উদ্দাম নয়। পাড়ে এসে ঢেউও মাথা কোটে না। সমুদ্র-পারেরই মত নারকোলপাতার একটানা ঝিরঝির শব্দ। অন্য পাতার সঙ্গে মেশা বলে ঠিক সমুদ্রপারের আওয়াজ নয়।

কাল রাত্রে বাতাস ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে এল বলে নিদ্রা হল ভাল।

ভোরে দেখি আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে মন্থর গতিতে রওয়ানা দিয়েছে। পদ্মার বুকে কিন্তু দুর্দান্ত দক্ষিণের ঝোড়ো বাতাস। সেই বাতাসে পাল তুলে দিয়ে চলেছে খান-চারেক বিশাল মহাজনী নৌকো। দক্ষিণের বাতাস কি কৌশলে পাল দিয়ে কাবু করে নৌকা উজানে পশ্চিম দিকে যেতে পারে সেটা আমার বুদ্ধির অগম্য।

এখন ১৩'৪৫-এ মৃদুমন্দ কিন্তু গরম বাতাস। মেঘ বেবাক অন্তর্ধান করছে। বুঝেছি এ ধরণের মেঘে বৃষ্টি হবে না। যদি হয় তবে হুড়মুড়িয়ে আসা কালো মেঘে—বিন নোটিসে, সন্ধ্যার দিকে। সে এখন মাথায়।

২০টায় লু উঠে (৩।৫-এর মত) ধুলোয় ধুলোয় ত্রিভুবন ধূলিতন্ত্রের তাঁবেতে গেল। বারোটা থেকে সকাল অবধি সুন্দর বাতাস। ঘরের ভিতরে শুয়েও ভোরে গায়ের চাদর খুঁজতে হল।

পদ্মার পাড়ে বাসা—আমাদের বাসা ছাড়িয়ে মাত্র দুটি কি তিনটি—পরিবারটি সিরাজগঞ্জের। বিরাট নদীর সঙ্গে এদের আশৈশব পরিচয় থাকার কথা।

তিন ভাই স্নান করতে গেছে এগারটায়। যার বয়েস বাইশ সে হঠাৎ নাকি চিৎকার করলে, 'ডুবলুম, গেলুম গেলুম।' অন্য ভাইরা মস্করা ভাবলে।

আমি যখন তাকালুম, বাড়ি থেকে, তখন ১১·৩০/১১·৩৫ নাগাদ। একটা নৌকা যোগাড় করে উড়ন জাল ফেলে ফেলে চেষ্টা করা হচ্ছিল ছেলেটাকে খুঁজে বের করার। ইতিমধ্যে গোটাতিনেক ছেলেও ডুব দিচ্ছিল—কেউ কেউ লগি পুঁতে তাই ধরে ধরে নামছিল। এদিকে ওদিকে বিস্তর ছেলে-ছোকরারা সাঁতার কাটছিল কিন্তু ডুব দিয়ে সন্ধান করার মত শক্তি ওদের নেই, কারণ ওখানে ৩/৪ লগি গভীর জল।

ইতিমধ্যে মিলিটারির দুজন লোক—একজনের মাথায় লোহার টুপি—পাড়ে এসে জুটলো। লোকজন তাদের চতুর্দিকে জটলা করলে। তারা চুপ করে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখলে। কিছু করলে না—করবার ছিলই বা কি?

তারপর আরেকটা নৌকা এল রাঘব জাল নিয়ে। সেটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজে লাগানো হল না। তবে কি রাঘব-জাল অতখানি গভীরে তলাতে পারে না।

প্রায় একটার সময় ওপার থেকে তরতর করে দক্ষিণ বাতাসে পাটল-রক্ত রঙের পাল তুলে একটা জুড়িন্দা নৌকো আসছে দেখা গেল—আমার মনে একটু আশা হল। এরা এসে সাবধানে খাড়ির ওদিকে প্রথম দাঁড়ালো। তার পর একটা একটা করে—আসলে জুড়িন্দা নয়—দুটোই খাড়ির মুখে এসে আর পাঁচ-জনেরই মত লগির খোঁচা দিয়ে দিয়ে সন্ধান করলে।

প্রায় দেড়টার সময় আস্তে আস্তে সব চেষ্টাই বর্জিত হল। যে জেলে জাল ফেলছিল সে খাড়ির ওপারে চলে গেল। জোড়া নৌকো এবারে লগি পুঁতে নৌকা বাঁধল। শুধু দু'তিনটি ছেলে তখনো মাঝে মাঝে ডুব দিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছিল।

ইতিমধ্যে বাচ্চু এসে বললে, 'ছেলেটি নাটোরের। বাপের এক ছেলে (আপিসের চাপরাসী বললে বাপের নাম ডাঃ রেবতীভূষণ চক্রবর্তী), এখানে মামা

বাড়ীতে এসেছিল, সাঁতার জানত অল্পই ; পাড়ার দুই ছেলে তাঁকে নিয়ে সাঁতরাতে যায়। ছেলেটা সাঁতারে অপটু। ডুবে যাচ্ছে দেখে ওরা সাহায্য করেও ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠেকাতে পারেনি।

আমি শুধু একটা জিনিস বুঝতে পারলুম না। ও যদি খাঁড়ির মুখেই ডুবে থাকে তবে ওখানে সন্ধান বেশী না করে করা তো উচিত ছিল আরো ভাটিতে। যত কমই হোক, স্রোত তো এখানে কিছুটাও আছে।

সন্ধ্যার পর ফের লু। এখন ২৩·৪৫ কিছুটা কমেছে। তবু squalls.

পদ্মা পূর্ণিমায় তাঁর নরবলি নিলেন!

[এই সর্বনাশা রূপ ছাড়াও পদ্মার প্রাকৃতিক-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে লেখক দিনলিপির এক স্থানে একটি বর্ণনা লিখে রাখেন। প্রসঙ্গক্রমে সেটি এখানে লিপিবদ্ধ করা হল]

পদ্মা—রাজশাহী

একে উজান, তার উপর পবন যেন বান ডেকেছে ভাটার দিকে। এতে কখনও নৌকো বাওয়া যায়? তাও যায়। স্পষ্ট দেখলুম দুজনাতে কি রকম তরতর করে নৌকো উজানে ঠেলে নিয়ে গেল—লগি মেরে মেরে।

পদ্মার সঙ্গে যাদের কারবার তারা সব পারে।

সপ্তমীর রাতে পদ্মা পেরিয়ে আসছে ধুধু করে দক্ষিণ বাতাস—কখনো বা দমকা দমকায়।

আমার সামনে বিরাট পদ্মা। তার চর, চরের পর ফের নদী, তারপর দূর সুদূরের ঝাপসা ঝাপসা গাছপালা—সেও চরের উপর। কিছুই দেখা যাচ্ছে না বলে মনে হয় আমি যেন অন্তহীন সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। বাতাসে জলে ধাক্কাধাক্কিতে যে ধ্বনি উঠছে সেটা ক্ষীণতর হলেও সমুদ্রগর্জনেরই মত। একই গাম্ভীর্য। সমুদ্রে যে রকম পাল পাল ঢেউ বেলাভূমির দিকে এগিয়ে আসে, এখানেও ঠিক তেমনি নদীর স্রোতের গতিকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে পূব-পশ্চিম জোড়া পালের পর পাল ঢেউ আসছে উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে, আমার দিকে। দমকা বাতাসে মাঝে মাঝে নদীর এখানে ওখানে ফেনা জেগে উঠছে—ঠিক সমুদ্রেরই মত।

এই ঝোড়ো বাতাসেও কিছুটা শীতলতা আছে বলে তার অস্থিরতা সত্ত্বেও সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে—নদীপারে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই।

মনে হল, আজ আরেকটা ছোট চর ভেসে উঠেছে।

বাতাসের উল্টোদিকে পাল তুলে দিয়ে নৌকা যেতে পারে, শুনেছিলুম, বিশ্বাস করিনি। এখন এখানে সেটা স্পষ্ট দেখলুম।

স্রোত বইছে পশ্চিম থেকে পুবে, হাওয়া বইছে পুব-দক্ষিণ থেকে উত্তর-পশ্চিম পানে। দু'খানা নৌকো পাল তুলেছে নৌকোর সঙ্গে গা মিলিয়ে প্যারালেল—বোধ হয় উল্টো বাতাস নৌকোর ভারের সঙ্গে আড়াআড়ি আটকা পড়ে হাওয়াটার বিপরীত ধাক্কা neutralize করে দেয়। এবং তারপর স্রোতের ভাটার বেগে গন্তব্যদিকে অগ্রসর হয়। কারণ খাঁড়ির ভিতরে ঢুকেই এরা পাল গুটিয়ে নিল—কারণ সেখানে হাওয়া কম।

পদ্মার এ অদ্ভুত সৌন্দর্য থেকে মুখ ফিরিয়ে খাতায় পোকার দাগ কাটতে হবে! বিরাট অথচ ছেঁড়াছেঁড়া একটা কালো ছায়া নদীর ওপার থেকে এপারে ভেসে আসছে দ্রুতগতিতে—তার পিছনে যেন তার বাছুর, সেও আসছে সঙ্গে সঙ্গে। এদের আকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে এই দুটি মেঘ আকাশে খুঁজে নিতে কণামাত্র কষ্ট হয় না। পারে উঠেই যেন এরা অদৃশ্য হয়—ওদের যেন পাসপোর্ট ভিজা নেই। একেবারে মিলিয়ে যায় তা নয়। কারণ পাড়ের বালি বড় সাদা। একটুখানি আমেজ যেন থেকে যায়। V. I. Pদের বডিগার্ডের মত ভিড়ের মাঝখানে মিলেও মেশেনি।

ঐ দূরে দূরে দু'একখানি ডিঙি নৌকা। তারও দূরে চরের পশ্চিমতম কোণে লম্বা সারির খড়ের ঘর। শুনেছি পদ্মার জল গত বৎসর থেকে এপারের দিকে আসছে—আমাদের বাড়ির সামনেকার জলধারা আর খাড়ি নাকি গত বছরেও ছিল না, মাঝগাঙের চর অবধি হেঁটে যাওয়া যেত—এদের ম্যাদ তাহলে আর ক'বছরের।

ওপারের হিন্দুস্থান ভোরের বৃষ্টি বর্ষণের ফলে বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

ঐ উপর দিয়ে গেল বাঘডোগরা থেকে কলকাতার প্লেন।

এপারে মহাজনী নৌকো যাচ্ছে নির্ভয়ে পুরো পাল চেতিয়ে। আরেকখানা বিনা পালেই যাচ্ছে উজান। হালের কাছের মাঝিটা পর্যন্ত নেই। কাৎ হয়ে হয়ে পশ্চিম-দক্ষিণের দিকের বাতাসে চলেছে সূর্যাস্তের দিকে।

কাল রাত্রে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। কিছুক্ষণ ধরে গুমোট থাকার পর বইল উত্তর থেকে বাতাস। হঠাৎ দেখি আমার ঘরের ভিতরই তুমুল কাণ্ড। উত্তর দক্ষিণ বাতাসে লাগিয়েছে হাতাহাতি। যেন ফিরোজ আর ভজু।

২৯শে বৈশাখ, ১৩৬৭

বাড়ির গেট বন্ধ করে যখন বেরলুম তখনো অতি অল্প হাওয়া। বিশ কিংবা পঁচিশ কদম যেতে-না-যেতেই হুড়মুড় করে যে লু ধেয়ে এল তখন রীতিমত সমস্যা হয়ে দাঁড়াল, এগুবো না বাড়ি যাব। নিতান্ত গোঁয়ার বলেই এগুলুম। অবশ্য গলির ভিতর ঢুকতেই অন্তত চোখ মেলে তাকাতে পারলুম।

কাজেই পদ্মাতে নৌকা চালানো যে কি হুঁশিয়ারির কাজ সেটা এ সময়ে এদেশে এলে একটা অভিজ্ঞতা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়।

রাত এগারোটা অবধি এই সূক্ষ্ম ধূলোর মাঝখানে খেতে বসতে ইচ্ছে করে না।

মাইল বারো দূরে, শারদার কাছে ছেলেটির মৃতদেহ আজ পাওয়া গেছে। তাই বলছিলুম, দু'ঘণ্টা পরেও যেখানে সে ডুবেছিল সেখানে ওরা জাল ফেলেছিল কোন্ আক্কেলে।

বাপের নাম রেবতী সান্ন্যাল। বিশী যা বললে সেটা বাচ্চুর কাহিনীর সঙ্গে মেলে। তবে প্রথমটায় তার 'গেলুম, গেলুম' কেউ বিশ্বাস করেনি, পরে দুটি ছোকরা তাকে ধরেও ছিল বটে তবে বয়সে কাঁচা বলে ঝাপটাঝাপটিতে দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়াতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

গরম অল্প কমেছে পূর্ববঙ্গের সর্বত্রই, কিন্তু এখানে প্রতি রাত্রে এই ধূলোর অত্যাচার অসহ হয়ে উঠছে।

মেঘ রোজই সকালের দিকে আকাশের এখানে ওখানে দেখা যায়। বোধহয় শেষরাত্রে বা ভোরে যখন হাওয়া বন্ধ হয় তখন জমবার সুযোগ পায়। তারপর হাওয়া উঠে দুপুর হতে-না-হতে মেঘ হাওয়া।

মেঘের চেহারা অনেকটা আকাশের ডাবরে নীল দুধে বদখদ দখল দিলে যেরকম হেথায় জমাট হোথায় জোলো দই জমে সেই রকম!

১২ তারিখ প্রিন্স আলী খান মোটর দুর্ঘটনায় গত হয়েছেন।

জিনিসটা অত সরল নয়।

প্রথমতঃ তিনি মারা গেলে করীম—প্রতিপক্ষ দলের আর কোনো ইমাম প্রার্থী রইলেন না।

দ্বিতীয়তঃ করীমের প্রতিপক্ষ দল নিজেদের অসন্তোষ হালে প্রকাশ করছিল। তাই করীম পক্ষীয় দলের পক্ষে এই 'দুর্ঘটনা'র ব্যবস্থা করা অসম্ভব ছিল না।

দুর্ঘটনায় দেখা যাচ্ছে,

(ক) আলী পূর্বে জানা ঠিকঠাক করা রাঁদেভুতে যাচ্ছিলেন—এলোপাতাড়ি bunmelu করতে বেরোননি। আততায়ীর পক্ষে আগেভাগেই জানা কঠিন ছিল না।

(খ) আলী অতি বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ ড্রাইভার। যে বয়সে মানুষ par excellence গাড়ি চালায় তাঁর বয়েস সেই। চালাচ্ছিলেন ৩৮ মাইল বেগে—প্যারিসে সে কিছুই নয়, তাও রাত্রিবেলা।

(গ) তিনি ধাক্কা মারেননি। মোড় নিতেই অন্য গাড়ি এসে তাঁকে ধাক্কা দেয়।

ঘুম থেকে উঠলুম প্রায় উনিশটায়। দেখি মেঘ জমেছে, কিন্তু সেরকম কালা ঘনঘটা নয় যা দিয়ে বোলপুরে বৃষ্টি নামে। সকালে মেঘ করেছিল কিন্তু অন্য দিনের মত দুপুরবেলা হাওয়ার জোড়ে অন্তর্ধান করেনি। আপিসের বড়বাবু বৃষ্টির ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

তারপর বিদ্যুৎ চমকাতে আরম্ভ করল। ক্রমে ক্রমে আকাশের সর্বত্রই। মেঘও ডাকল জোর। তবু বৃষ্টি নামে না।

৮-১০এ অতি সূক্ষ্ম বারিকণা দিয়ে বৃষ্টি আরম্ভ হল। মনে হল পূব-দক্ষিণে কোথাও বৃষ্টি হতে হতে এখানে এসে পৌঁচচ্ছে। অন্য দিনের তুলনায় হাওয়াও ছিল জোলো ও ঠাণ্ডা। অনেকক্ষণ পাঁয়তাড়া কষার পর বৃষ্টি এল উত্তর দিক থেকে। (ঢাকায়ও একাধিকবার এই ব্যাপার দেখেছি) তারপর আরম্ভ হল দক্ষিণ থেকে।

বিদ্যুৎ এমনই ঘন ঘন চমকাচ্ছিল যে পূর্ণ অর্ধসেকেণ্ডের তরে আকাশ একবারও অন্ধকার যায়নি। আর শিরা-উপশিরা ছড়ানো এতখানি আকাশ জুড়ে বিদ্যুৎ-জাল আমি ইতিপূর্বে কমই দেখেছি। আর মাঝে মাঝে রীতিমত অশনি-পাত। বলতে গেলে মনসুন 'ভাঙার' মত তোড়জোড় এবং তাণ্ডব। তবে বৃষ্টিটা সেরকম জোর নয়।

ঘণ্টা দুই পরে থামল। ধরণী শীতল হলেন।

বিজলী আলো বন্ধ হল ২১·০০। উৎপাত। খুলল ভোরে। মিলিটারি এদের ফাঁসী দিতে পারে না?

কাল রাত্রে দু'ঘণ্টা বৃষ্টির ফলেই আজ দেখি ঘাস চিকণ-সবুজ রঙ ধরেছে।

দিনটা গেল অবিশ্বাস্য আবহাওয়ায়। মোলায়েম ঠাণ্ডা। ১৫·৩০-এ যখন শুতে গেলুম তখন ঘর অন্ধকার করার জন্য দোর-জানলা বন্ধ করলুম বলে পাখা চালাতে হল। না চালালেও হয়তো চলত।

উনিশটায় সেই সুন্দর ঠাণ্ডা দমকা বাতাস। সমস্ত দিন মেঘলা ছিল—এখনও তাই। অল্প বিদ্যুৎও চমকাল।

ঠাণ্ডার ঠেলায় ফিরোজের আর জ্বর নেই।

আঠারো তারিখ লাটসায়েব আসবেন। তারই প্রস্তুতির জন্য রাবেয়াকে কাল ঢাকা যেতে হবে। বিশ তারিখ (ইংরাজী) মেজ ভাই আসবেন।

ফিরোজের আবার জ্বর (২১·০০)।

আশ্চর্য! রাতদুপুরে হাওয়া বিলকুল বন্ধ হওয়াতে ঘরে মশারির ভিতর আর আরাম বোধ হচ্ছিল না। ঐ সময়টাতেই তাহলে max-heat গেল!

আকাশে চাঁদ, তারা; মেঘ নেই।

ভোর থেকে মেঘলা ঠাণ্ডা আরামের বাতাস।

বিকেলের দিকে সামান্য একটু গরম।

সন্ধ্যায় অল্পক্ষণের জন্য পূব থেকে জোর বাতাস।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে পূবের বাতাসে বিদ্যুৎ চমকালো।

তার উপর বিদ্যুতের খেল উত্তর বাগে চলে গেল। বাতাসও কালকের মত আজও রাত্রে বন্ধ হয়ে গেল। এখন (২৩·৪৫) কষ্টদায়ক না হলেও মশারির ভিতর অনারাম হবে।

রাবেয়া দুপুরের গাড়িতে ঢাকা গেল।

সাঁওতালরা পূব বাঙলার কতখানি গভীরে ঢুকেছে জানিনে। উত্তর বাঙলায় বগুড়া ও বারেন্দ্রভূমিতে তারা আছে। এখানে বাড়ির সামনে মাটি কাটার কাজ করছে।

এরা বোলপুরের সাঁওতালদের মত বুনো-বুনো নয়। দু'তিন জনে হাত ধরাধরি করে মৃদু গুঞ্জরণে গান গাইতে গাইতে এদের রাস্তা দিয়ে যেতে দেখিনি। বোলপুরীয়াদের মত এদের growth stunted নয়। অনেকটা তন্বঙ্গী শ্যামা বাঙালীর মত। শাড়ীও পরে হুবহু বাঙালী ঝি মেছুনির মত। গামছা আছে, কিন্তু সেটা কোমরে জড়ায়নি। এদের রঙও তৈলচিক্কন নয়। একটু যেন অপরিষ্কারও। খিল খিল করে হাসতেও এদের দেখিনি।

সমস্ত বাংলায় ভীষণ ঝড়, রাত্রে খড়্গপুরে বৃষ্টি।

ভোরবেলা থেকে ধূ ধূ প্রচণ্ড উত্তরের বাতাস। ঘরে মশারির ভিতর গায়ে চাদর জড়াতে হল। আকাশ মেঘলা। একদিকে আসন্ন বর্ষণের কালো রঙ মাখা।...

ভোর থেকেই সুন্দর দক্ষিণের বাতাস।

কখন মেঘ জমতে আরম্ভ করেছে লক্ষ্য করিনি। পৌনে তিনটে নাগাদ স্নান করতে যাবার সময় দেখি, উত্তর-পশ্চিম কোণে কালো মেঘ। তার কিছুক্ষণ আগে থেকেই খানিকটে গরম আর গুমোট ছিল বলে পাখা চালাতে হয়েছিল। বাথরুমে থাকা অবস্থাতেই লু উঠলো। খেতে বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেশ জোর বৃষ্টি নামল।

উত্তর দিক থেকে। কয়েকদিন আগে W. F. বলেও ছিল বটে, উত্তর-পশ্চিম থেকে ঝড় বইতে পারে।

তোড়ে বৃষ্টি। দু'একবার শিলঙের মত দু ঝাপটা বৃষ্টি মেঘের মত বারান্দা পেরিয়ে ঘরে এসে ঢুকল।

বোধ হয় ১৫।২০ মিনিটের বেশী বৃষ্টি হয়নি—সমস্তটাই উত্তর থেকে—তবু

ঘরের মাঝখান অবধি. শুধু ভিজে যায়নি, রীতিমত জল দাঁড়াল। চৌকাঠ না থাকার ফল। বেশীক্ষণ এ রকম তোড়ে বৃষ্টি হলে ঘরে জিনিসপত্র রাখবার জায়গা থাকতো না।

রাবেয়া আজ ফিরল না কেন বুঝতে পারলুম না।

সন্ধ্যায় পদ্মার জল অদ্ভুত অলিভগ্রীন হল।

এখনও বেশ মোলায়েম ঠাণ্ডা। অতি মৃদু দক্ষিণের বাতাস (০০·৩০), তবে দু'চারটে মশার ভনভনানি কানের কাছে।

আজও সন্ধ্যার পর সামান্য বৃষ্টি হল। এ কদিন রাতদুপুরে হাওয়া বন্ধ হত। আজ আর তা হল না। পরদিন সকাল পর্যন্ত সুন্দর হাওয়া ছিল।

দুপুরবেলা খুব ঘন মেঘ জমল।

খুব হাঁকডাক। এন্তের জাঁক দেমাক। বুঝি আকাশ ফেটে পড়বে।

আধ আউন্স শিলাবৃষ্টিও হল।

তার পর তিন আউন্স বৃষ্টি। সেও পূর্বদিনের মত উত্তরের বাতাসে জলকণা।

তারপর হাওয়া বন্ধ।

এখন (১৯·৪৫) সুন্দর বাতাস।

পূবের বাতাস যখন বইছিল তখন পশ্চিমের স্রোতের সঙ্গে ধাক্কা লেগে পদ্মার বুকে যা সাদা ফেনার ঢেউ জাগালে, তাও আবার এমন chopped যে সে এক প্রলয় কাণ্ড।

বৃহস্পতিবার সকালের বসুমতী লেখে :—

…"অন্ততঃ আবহাওয়া অফিস বুধবার রাত্রে যে পূর্বাভাস দিয়াছেন তাহাতে অদ্য বৃহস্পতিবার ঝড়বৃষ্টি হইবার কোনো সম্ভাবনার কথা উল্লেখ তো নাই, বরঞ্চ বলা হইয়াছে যে, অদ্য আবহাওয়া শুষ্ক থাকিবে ও দিবাভাগের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইবে।"!

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কলকাতায় কালবৈশাখী, সামান্য বৃষ্টি। সেই যে গেল শুক্রবার বৃষ্টি হয়েছিল, তারপর আর কষ্টদ গরম পড়েনি। ফৈজু ভাই ঠিকই বলেছিল, একবার বৃষ্টি হলে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আমি ভেবেছিলুম, শান্তিনিকেতনের মত উটকো বৃষ্টি হয়ে ফের গরম পড়বে। তা হল না, Thank God—touch wood ! So far.

আজও বেশ ঠাণ্ডা। দিনে একবার ঝড় উঠেছিল। রাত্রে ২২টা নাগাদ অল্পক্ষণ সামান্য বৃষ্টি হল। এখন ০০·৩০-এ সারা আকাশ জুড়ে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর গুরুগুরু মেঘ ডাকছে—যেন খাঁটি বর্ষাঋতু। অতীব রমণীয়।

তারপর নামল তুমুল বেগে বৃষ্টি। সে কী বৃষ্টি। আর ঝঞ্ঝার বাতাস।

একেবারে খাঁটির খাঁটি বর্ষা।

প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা in Bonga from 64·5 to 7·30 in the morning.

সকাল থেকে রীতিমত ঠাণ্ডা বাতাস।

সমস্ত দিন মেঘলা আর ঠাণ্ডা। দুপুরবেলাও শুধু গেঞ্জি গায়ে দিয়ে থাকা যায় না। সকালে তো ড্রেসিং গাউন পরেই কাটাতে হল।

সমস্ত দিনটা গেল খাঁটি বর্ষাঋতুর মত।

রাত প্রায় দশটা থেকে কী বিদ্যুতের খেলা। বিদ্যুৎবহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।

গেল রাত্রির বৃষ্টিতে আকাশ থেকে শেষ ধূলিকণা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে বলে আজ সকালে দূরের চরের—মনে হয় ওপারের—গাছপালা পরিষ্কার ঘনশ্যাম দেখাচ্ছিল। দেশে ধানক্ষেতের ওপারের গ্রাম যে রকম দেখায়। দূর-দূরান্ত অবধি অবাধ দৃষ্টি ধেয়ে গিয়ে যা-কিছু দেখবার সব দেখা যায়। নদীর বড়ধারা যেখানে শূন্যে লীন হয়েছে—বালুচরের উপর যে কটি সবুজ ঘাস রাতারাতি গজিয়েছে। স্বচ্ছ—একেবারে স্বচ্ছ। মনে হল আমার চোখের উপর যে চামড়ার পরদাটা রয়েছে সেটাকেও যেন কাল রাত্রের বৃষ্টি ধুয়ে পুঁছে ঝকঝকে স্বচ্ছ সাফ করে দিয়ে গিয়েছে।

রাবেয়া সকালে পাবনা গিয়েছিল, সন্ধ্যায় ফিরে এল।

মাইজম ভাইসাহেব কাল ও আজ রাত্রে এখানে খেলেন।

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কী শীত, কী ঠাণ্ডা! সমস্ত রাত বৃষ্টি হয়েছে নাকি? এখন তো ধমকে ধমকে বাতাসের ঝাপটার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি আসছে উত্তর দিক থেকে (৭·৩০)। যেন ভরা বর্ষার ভোরের বৃষ্টি।

এই আজ প্রথম নদীতে স্নানার্থিনী নেই। একটিও না।

তবু তো স্নান এ দেশে fetish—necessity না হলেও। বৃষ্টি থামতেই সেই কনকনে ঠাণ্ডাতেই দু'তিনটি রমণীর আবির্ভাব। ওদিকে যে পোলটা তৈরী হচ্ছে তারও মজুররা কাজে লেগে গিয়েছে।

তিনজন জেলে উড়োন জাল ফেলে মাছ ধরছে। অন্যদিন এ সময়ে ধরে না। বোধ হয় গরম বলে এতক্ষণে মাছ জলের গভীরে ডুবে যায়—যেখানে জাল পৌঁছয় না।

দূরদূরান্ত অবধি কী সুন্দর পেলব ধরণী। বাতাস মাঝে মাঝে যখন গতিবেগ কমায় তখন বিশাল পদ্মার উপর যেন ছোট ছোট নাগ-নাগিনী ক্ষুদে ক্ষুদে ফণা তোলে। দূরে চরের সদ্যজাগা কচি সবুজের প্রলেপ দিয়েছে সবে-গজা ঘাস। তার পিছনে প্রাচীন গাছপালার ঘন সবুজ। তার পিছনে কাজল-নীল আকাশ।

সেই যে তের তারিখে বৃষ্টি হয়েছিল, তারপর আর গরম পড়েনি। সেই অতি সূক্ষ্ম ধূলিতন্ত্রেরও অবসান হয়েছে।

সমস্ত দিন মেঘলা আকাশ। আসন্নবর্ষণ না হলেও চেহারা বর্ষাকালেরই মত। সর্বাঙ্গসুন্দর নিম্বাস (Nimbus) না হলেও ঐ গোত্রেরই বটে। আকাশের কোনো কোনো জায়গা যেন নীলাঞ্জন-লিপ্ত। শুধু মাঝে মাঝে সাদা সাদা ভাব—কাজলটা যেন জলের সঙ্গে ঠিকমত লেপা হয়নি। আবার সমস্ত উত্তর আকাশ জুড়ে পুঞ্জ পুঞ্জ পাক-খাওয়া-খাওয়া কালোয় ধূলায় মেশানো সেই বনসঙ্কর নিম্বাস।

শেষ বালুকণা আকাশ থেকে বিলীন হয়েছে বলে ওপারের হিন্দুস্থান দেখা যাচ্ছে। আমার শালীর ছেলের বয়স ১৫।১৬, সে কত অনায়াসে বললে, 'ওপারে? ওপারে ইণ্ডিয়া।'

এই জেনারেশনের কাছেই পরদেশ 'ইণ্ডিয়া'। প্রার্থনা করি, তার পরের জেনারেশন যেন ইণ্ডিয়াকে মিত্রের চোখে দেখে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই দুই দেশ যদি ঠিকমত সহযোগিতা করে তবে চীনকেও সর্বক্ষেত্রে হারাতে পারবে।

কাল রাত্রে হাওয়া বন্ধ ছিল। পাখা না চালিয়েও খুব কষ্ট হয়নি।

সকালে আকাশ মেঘহীন ছিল। ক্রমে দক্ষিণের বাতাস মেঘ জমাতে আরম্ভ করল। Cumulus—Nimbus-এর দোআঁশলা। দক্ষিণের বাতাসটি গায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে যাচ্ছে।

ঢাকাতে শুক্র শনি রবিতে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার ফলে 'সংবাদ' উল্টো গান গাইছে।

মার্কিন বৈজ্ঞানিক বলছেন, ক্যালেণ্ডারের একই দিনে বৃষ্টি হয়। যদি অন্য সময় বেশী বৃষ্টি হয় তবে সে আকাশে মেটেওর-ফেটেওর কি সব কারণে।

আমার ক্যালেণ্ডার তো তা বলে না। তবে কি অন্য Geo-physical Calender রয়েছে?

দিল্লী থেকে সংবাদদাতা লিখছেন, ভারত পাকিস্তানে entente cordial বাড়ছে। সাধু!

সন্ধ্যায় হাওয়া বন্ধ হয়ে গুমোট। আকাশেও মেঘ নেই। রক্তাক্ত সূর্যাস্ত।

এই কি ফের গরম আরম্ভ? Pre-monsoon গুমোট?

রাবেয়া পাবনা গেল। কিসের যেন মুখপোড়ার Pre-census.

Birthday of রাসবিহারী বসু। আশুতোষের ৩৬তম মৃত্যুবার্ষিকী।

নজরুল্ ইসলামেরও জন্ম ১৩০৬ সালে।

কাজী আমিন উল্লা	মুনশী তুফায়েল আলী
„ ফকীর আহমদ	মুসম্মৎ Zaheda খাতুন
„ নজরুল ইসলাম	

তাঁর পিতৃব্য কাজী বজল-ই-করীমের কাছ থেকে নজরুল ইসলাম বিস্তর ফার্সী

শোনেন। আত্মীয়েরা তাঁকে দুখু মিয়া ডাকত, অন্যেরা 'ক্ষ্যাপা'। আসানসোল বেকারি। কাজী রফীকুদ্দীন সব্‌ইন্‌স্‌পেকটর অব পুলিস তাঁকে কাজীর সিমলা (Kazir Simla) গ্রামে (মৈমনসিংহে) পাঠান। সেখানে তিনি class X অবধি ওঠেন। ১৩২৯-এ ত্রৈসপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশিত। ২৩ বছর বয়সে ১ বছরের জেল। ৩৯ দিনের অনশন। আব্দুল্লা সুহ্রাওর্দীর অনুনয়ে অনশন ভঙ্গ—he carried a message from the nation requesting him to do so—Mrs. M. Rahman took charge of him—বিয়ে, আশালতা সেন (পরে নাম প্রমীলা)—কুমিল্লার মেয়ে—

সকাল থেকে গুমোট। ভাবলুম, এই বুঝি শুরু হল ফের গরম।

দুপুরে পাখা চালালুম। অবশ্য সবসুদ্ধ তেমন কিছু পীড়াদায়ক নয়।

সন্ধ্যা ছ'টায় ঘনঘটা করে এক মিনিটের জন্য দক্ষিণ থেকে ফাইন বৃষ্টি।

এখন অতি ফিনফিনে বৃষ্টি পূব থেকে (১৯'১৭)। ঠাণ্ডা। আরামদায়ক।

বিশীর বাড়ি থেকে রাত্রে ফিরে ঘরটা গরম বোধ হল।

রাত্রে দোমনা হয়ে শুলুম, গুমোটই, পাখা না চালিয়ে। ভোরের দিকে বৃষ্টি হয়েছে। ছাত ভেজা।

কলকাতায় বর্ষাকালীন আবহাওয়া বিরাজ করছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও দু'এক পশলা বৃষ্টি। Main monsoon proceeding to Calcutta.

সকালে চড়চড় করে গ্রীষ্মের রোদ উঠল। ভাবলুম, খেয়েছে, আমাদের ঠাণ্ডার হনিমুন শেষ হল।

তারপর কোথা থেকে ঘন মেঘ জমতে আরম্ভ করলো—যদিও ঠিক বর্ষণদ নয়। আর ধূধূ বাতাস। কাঁচের দরজা বন্ধ করে বসতে হয়েছে। কোদাল কাটা পদ্মায় সাদা ফেনা। গাছপালা, মেয়ে-মদ্দের শাড়ী ধুতি হেন বস্তু নেই যা শান্ত থাকতে পারে। চানের ঘাটেও হৈ-হৈ—জনা পঞ্চাশেক প্রচুর তোলপাড় করে স্নান করছে।

আর পূর্ব দিগন্তে মেঘে, জলে, বালুচরে কী অপূর্ব রহস্যময় সমন্বয়ে সব-কিছু পেলব করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে দু ফোঁটা বৃষ্টিও হয়েছে। সর্বব্যাপী অনিশ্চয়তা।

তারপর অনেকক্ষণ হালকা পাতলা বৃষ্টি হল—প্রায় ঘণ্টা-দেড়। বিদ্যুৎ না, মেঘের ডাক না। হাওয়া এখনও বইছে। তবে জোরটা কমেছে।

নারকোল গাছ এখানে সর্বোচ্চশির। কখনো মনে হয় windmill, কখনো বা আনাড়ি হাতে তৈরী দশভুজার মূর্তির মত।

দিনটা সুন্দর গেল। সন্ধ্যায় মেঘলা ছিল বলে ঈদের চাঁদ দেখার কোনো প্রশ্নই উঠলো না।

কত না দৃশ্য দেখা যায় এখানে ঝড় উঠলে।

খাড়ির ভিতরে দুখানি জালি বোট এবং আর সব নৌকো নিশ্চিন্ত। খাড়ির বাইরে কুণ্ডের বাইরে ছিল মহাজনী নৌকো—বালুভর্তি। সে খাড়ির ভিতর আশ্রয় নেবার জন্য রওয়ানা দিলে। একজন জল সেঁচচে—একজন হাল ধরেছে, আর দুজনা জোর বৈঠা চালাচ্ছে। ভাটাতে যাচ্ছে বটে কিন্তু পূব-দক্ষিণের হাওয়া বলে তাকে পুরো লড়াই লড়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগুতে হলো। খাড়িতে ঢুকে নিষ্কৃতি।

মাঝ-নদীর চর থেকে আসছে আরেকখানা মহাজনী। ওখানে হাওয়ার থেকে কোনো আশ্রয় নেই। হয়তো বা নৌকোতে বালু। সে যদি পুরো ভেজে তবে নৌকো ডুবিয়ে দেবে। তাই এই ঝড় মাথায় করে পূবের বাতাসের সঙ্গে লড়তে লড়তে এল। খাড়ির মোহনায় পৌঁছতে এতই বেগ পেতে হয়েছে যে সেখানে পৌঁছনো মাত্রই একজন রশি হাতে মাটিতে নেবে বাকিটা টেনে নিয়ে এল।

কিন্তু আশ্চর্য, আরেকখানা নৌকা মাঝগাঙে দাঁড়িয়ে—এদিকে আসছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। ওর কি ডর-ভয় নেই। ঝড়ের বেগ তো আরো বাড়তে পারে।

কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য, মাল্লাদের ভিতর কণামাত্র দৌড়ঝাঁপ বা অন্য কোনো প্রকারের উত্তেজনা নেই। লড়ালড়ি যুঝাযুঝি সব করে যাচ্ছে অতিশয় আটপৌরে চালচলন সহ। হৈ-হুল্লোড় করলে পুল তৈরীর জন তিরিশেক মজুর।

বেতারে সতর্ক বাণী দেওয়ার এক দেড় ঘণ্টার ভিতরই বৃষ্টি আরম্ভ হল। অবশ্য মেঘ জমতে আরম্ভ করেছিল সকাল থেকেই। ভোরে রৌদ্র ছিল। হাওয়া বইল দুপুর অবধি উত্তর থেকে। অথচ বৃষ্টি আর ঝড় এল পূব এবং দক্ষিণ থেকে।

এখন ঝড়ের দাপট কমেছে। ঘাট পাড় জনশূন্য। পুলের মজুর সব অন্তর্ধান করেছে। নৌকোর ভিতরে মাল্লারা আশ্রয় নিয়েছে। গয়লানী তুফানের শুরুতেই গাই দুটো ভিতরে নিয়ে গিয়েছিল, এখন ঘুঁটে সরাচ্ছে। ওপারে নৌকোটা ওখানেই দাঁড়িয়ে (ওখানে বোধ হয় চড়ার কাছে বলে জল কম) এবং এই বৃষ্টিতে দুটো বাঁদর ছোঁড়া সাঁতার কাটছে। বোধ হয় সেই প্রবাদটা শুনেছে, 'এমন সুবুদ্ধিমানও আছে যারা বৃষ্টির হাত থেকে এড়াবার জন্য পুকুরে ডুব দেয়।'

দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে দেখি (১৭·৩০), জোর বৃষ্টি হচ্ছে। যখন অল্পক্ষণের জন্য থামল তখন দেখি, বাগানে রাস্তায় জল দাঁড়িয়েছে—ওবেলা যে রকম দাঁড়িয়েছিল। দিনে দু'বার এরকম ধারা পূর্বে হয়নি।

এখনও খাঁটি বর্ষাকালের পিটির পিটির চলছে।

কেউ বলবে না এটা গ্রীষ্মকাল।

এরকম আর কয়েকদিন চললেই তো এ বৃষ্টি মৌসুমী বৃষ্টির সঙ্গে মিলে যাবে। কারণ খবর এসেছে মৌসুম বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে এগিয়ে আসছে।

এখন অবধি চলেছে বর্ষার মত। কখনো পিটির পিটির; কখনো দমকা হাওয়া। বাতাস একেবারে বন্ধ কখনো হয়নি। বিদ্যুৎও কম। যেটুকু তাও দূরে দূরে। বেতারকেও ব্যাঘাত করে না।

যেন খাঁটি বর্ষা ভোর।

একটুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে বলে ওপারের গাছপালা ঝাপসা হয়ে দেখা যাচ্ছে। নদীঘাট জনহীন। মাত্র দুটি মেয়ে মুখোমুখি হয়ে কোমরজলে শীতে জবুথবু-প্রায় দাঁড়িয়ে—অন্যদিন তারা তলওয়ারের মত খাড়া হয়ে ভীষণ বিক্রমে সর্বাঙ্গ মর্দন করতো—মাঝখানে একটা উপু কলসী ভাসছে। কাছে কাছেই দু' একটা শিশুক এসে জুটেছে। কাল সন্ধ্যায় একখানা জালিবোট ফিরে এসেছে। তার নবদ্বার বন্ধ। পাড়ে ছাতা মাথায় একটি লোক কোনো গতিকে পা টিপে টিপে নিচের দিকে নামছে। পোলটার মেরামতি হচ্ছে বলে ঢালু পাড়ির অনেকখানি নেমে ফের চড়ে সড়কে উঠতে হয়।

অতি সূক্ষ্ম বারিকণা ঐ ওপার হিন্দুস্থান থেকে ধেয়ে আসছে। ভুল বললুম, আস্তে আস্তে সব কিছু ঝাপসা করে দিয়ে এগিয়ে আসছে। যেন পাহাড়ে

কুয়াসার পর্দা এগিয়ে আসছে। এখন এসে পৌঁচেছে স্নানার্থিনীদের কাছে। বালুচর, ওপারের বনরাজি দেখা যাচ্ছে না—যদিও দূরত্বটা বোঝা যাচ্ছে। নদীর মাঝখানে অতি ঝাপসা দেখা যাচ্ছে কাল ঝড়ের সেই দুঃসাহসী দুঁদে-নৌকোটা। ভূতুড়ে, ফ্যানটম বোট যেন।

এ-ছবি জাপানীরা আঁকে চমৎকার।

আবার জোর দমকা হাওয়ায় মেশানো বৃষ্টি। সমস্ত দিন কাটলো ঝোড়ো বৃষ্টিতে—মাঝে মাঝে থেমেছিল বটে। এসেছে সর্বক্ষণ উত্তর দিক থেকে এবং এমনি ট্যারচাভাবে যে উত্তরের চওড়া বারান্দা ভেজা—শুকোবার ফুর্সৎ পায়নি। অথচ ঝড় সাইক্লোন তো আসবার কথা দক্ষিণ থেকে।

সেটাই বোধ হয় এল এখানে ২০'০০। খুলনা থেকে এখানে আসতে লেগেছে প্রায় ছ'ঘণ্টা। এখন একটানা শোঁ শোঁ শব্দ। তবে যে বেগে হঠাৎ এসেছিল, সেই বেগেই চলছে—বাড়েনি এখনো (২১'০০)। ঝড়ের গোঙরানোটা কিন্তু অদ্ভুত শোনাচ্ছে। বৃষ্টি খুব নয়। বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে না।

বর্ধমান—চারদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার পর ও মাঝে মাঝে বৃষ্টির পর কাল রাত থেকে অবিরাম বৃষ্টি।

২৮।৫ | অদ্য সিউড়িতে প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ। শুক্রবারেও হয়েছে।

কাল ২০'০০ থেকে এখন ৮'৩০ নাগাড়ে চলেছে বৃষ্টি—যদিও জোর নয়—আর ঝোড়ো বাতাস। বাতাস আসছে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে। কেন জানিনে বিজলির 'ফ্যুস' এত লাফাচ্ছে যে রেডিয়ো খুললেই এত শব্দ হয় যে কিছুই ভালো করে বোঝা যায় না। এই জলঝড়ে রাবেয়া পাবনা থেকে আসবে কি করে?

উজানে বর্ষা না নামলে নদীর জল বাড়ে না। কিন্তু এই লোকাল বৃষ্টিই পদ্মার জল বেশ বাড়িয়েছে। ভাটির দিকে হাওয়া বইছে বলে কোনো কিছুর সঙ্গে ধাক্কা না খাওয়াতে পদ্মার বুকে তেমন তরঙ্গ উঠছে না—কিন্তু যা উঠছে তাও এর পূর্বে কখনো দেখিনি।

বাসুর বিশ্বাস, এটাই মনসুন। কি করে হয়?

বর্ষাঋতু চলল ১৫'৩০ অবধি। তার পর ঘুমুতে গেলুম। ১৭ নাগাদ উঠে দেখি সব কিছু শুকনো, হাওয়া বন্ধ; বর্ষার ভাব পুরো কেটে গেছে। তবে

আকাশ মেঘলা, যদিও তার ভিতর দিয়ে চাঁদ দেখা গেল। চতুর্থী কি পঞ্চমী। পাবনা অঞ্চলে বোধ হয় বাস্ ছাড়ার সময় অবধি বৃষ্টি ধরেনি। বউ তাই আসেনি।

নৌকোগুলো ফের খাড়ির মুখে জড়ো হয়েছে। নদীপারে সন্ধ্যায় ফের জনসমাগম। এখনও বৃষ্টিহীন অল্প গুমোট আবহাওয়া। গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছে না।

সন্ধ্যার পর আমার অল্প—যদিও অতি অল্প গরম বোধ হচ্ছিল।

নটায় অতি সুন্দর মলয় বইতে লাগল। এখনও (০১·০০)।

এই দিনেই শান্তিনিকেতনে ৪·৩০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। Highest of the month according to V. B. Bulletin.

সকালবেলা শুকনো—যেমন তেমন।

দুপুরে ভ্যাপসা পীড়াদায়ক গরম। পাখা চালিয়েও শান্তি নেই। একদিনেই হেন পরিবর্তন! রাজশাহী গরম জায়গা—by nature.

বউ ফিরেছেন।

ঘুম থেকে উঠে বাইরে গুমোটে ফের কষ্ট। যদিও হাওয়া অল্প-স্বল্প ছিল। ঠাণ্ডা হতে হতে বেশ সময় লাগল। এখন ০১·০০ সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে।

আজ সন্ধ্যায় বেতার বললে, রুশিয়া স্পষ্ট বলেছে, যে সব আড্ডা থেকে বিদেশী প্লেন গুপ্তচরী করতে রুশ আকাশে উড়বে সে সব আড্ডার উপর বোমা ফেলা হবে। আরো বললে, এসব প্লেন যেন না ভাবে, তারা এমন উপর দিয়ে উঠতে পারবে যেখানে তাদের রকেট পৌঁছতে পারে না।

শাবাশ্! এইবারে তাহলে পাকাপাকি পাঁয়তাড়া কষা আরম্ভ হল। কিন্তু এসব কথা শুনে তো বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। রুশে মার্কিনে লড়ুক না, কিন্তু আমাদের নিয়ে কেন টানাটানি?

আরেকটা প্রশ্ন, ওদের রকেট যদি সব কিছুই যত উপরেই হোক না কেন নষ্ট করতে পারে তবে হাওয়াই আড্ডা ধ্বংস করার হুমকি কেন? ওদের মেরে ফেললেই পার। আমার মনে হয় পারে না। আর ঐ যে মার্কিন বিমান ভেঙেছে ওর চালক কম্যুনিস্ট।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কালকের মতই দিন গেল। চতুর্দিক থেকে ফোরকাস্ট-ও হয়েছে যে বৃষ্টি কমবে। আজও তাই কালকের মত শুকনো গেল। গরম, কিন্তু অসহ্য নয়। কালকেরই মত সন্ধ্যা থেকে ধূ ধূ হাওয়া।

সকালে চারবার দাস্ত হল। মাছের ডিম খেতে নেই। মনকে একাধিকবার বুঝিয়েছি।

আকাশ এত পরিষ্কার যে শরৎকালের মত তারা সব জ্বলজ্বল করছে। ছায়াপথ দেরিতে ওঠার পর তাকেও অতি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ভাটার সমুদ্রের মত পদ্মা কখনো গর্জন করছে জোর, কখনো ক্রন্দন খানিকটে কমিয়ে দিচ্ছে।

এত হাওয়া—সে শুধু একেবারে পদ্মার বুকের উপর খাড়া এই বাড়ির কল্যাণে। সে-কথা একাধিক লোক আমাকে বলেছেন।

কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারিনে। সমুদ্রপারেই বলো আর এখানেই বলো, ধূ ধূ হাওয়ার মাঝখানে মন যেন শান্তি পায় না, কোনো কাজে পুরোপুরি concentrate করা যায় না। একদিকে গায়ে ক্রমাগত হাত বুলোচ্ছে, অন্যদিকে কানের কাছে শব্দ করছে—একসঙ্গে দুটো disturbance

এ ক'দিন গরম ছিল ভ্যাপসা। ঘামও হচ্ছিল। বোধ হয় আজ তাই সকাল থেকে আকাশ মেঘলা করে, এই মিনিট দশ আগে (৮·৩) অতি সূক্ষ্ম এক পশলা বৃষ্টি এক মিনিটের তরে হল। তারপর দূর দূরান্ত অবধি সেই পাতলা জলকণাযবনিকা ঢাকা মাঝনদীর চর, ওপারের সবুজ রেখায় বিলীয়মান জনপদভূমির তরু-বনানী, আকাশের দিগ্বলয়প্রান্ত শ্যাম কাজলে মসীমাখা।

আবার পূবের বাতাস—এতদিন ছিল দক্ষিণের। তারই জোরে মহাজনী নৌকো চলেছে বুক ফুলিয়ে। এদের গতি এতই মসৃণ আয়াসহীন যে এর কাছে রাজহাঁসও হার মানে।

এরই মাঝখানে দেখি, আকাশ-ভরা মেঘের এক জায়গায় অতি ছোট একটা চক্র—তার ভিতর দিয়ে ট্যারচা হয়ে সূর্যরশ্মি পড়েছে শুভ্র বালুচরের উপর—আর সে রশ্মি যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে নীল মেঘের, নীল আকাশের উপর। বালুচর যেন আতশী কাচ হয়ে সূর্যের সঙ্গে চোখ-ঠারাঠারি করছে।

এইবারে রাক্ষুসী পদ্মা ধরেছেন জেব্রার ঢং।

আকাশের অনেক জায়গায় মেঘ ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। ফালি ফালি ডোরা ডোরা হলদে পদ্মার জল, আর অন্য জায়গায় নীলের ডোরা। সেই 'পরশুরামে'র দক্ষিণরায়, মোশয়, ডোরাডোরা আঁজি আঁজি!

শান্তিনিকেতনে যে রকম নিত্য নিত্য আবহাওয়ার চার্ট রেখেও এত বৎসর পরেও কোনও পূর্বাভাস দিতে পারিনে, এখানেও তাই। কখন যে কোন্ দিক দিয়ে ডিপ্রেশন হয় এবং ফলে ঝড়বৃষ্টি হয় (যদি সত্যই তাই হয়) তার কোনো হদিস আগের থেকে পাওয়া যায় না।

গত বছর অনেক দেরি অবধি বর্ষা চালু থেকে বন্যা ঘটালে।

শান্তিনিকেতনের মাটি ভেজা রইল অনেকদিন। কিন্তু শীতের বৃষ্টি, যেটা প্রতি বৎসরের পাওনা, হল না। এমন কি পূব বাঙলায়ও না—বেশীর ভাগ জায়গায় সাত মাস ধরে বৃষ্টি হয়নি।

জোর ঝঞ্ঝা ঝড় হওয়ার কথা বৈশাখ মাসে। হল না। হল ৩০শে বৈশাখে। সেটা আবার চলল একটানা ২৯।৩০ অবধি। সচরাচর কি এরকম হয়?

তার পর এখনো ঠিক গরম পড়েনি। পশ্চিম বাঙলা অন্তত ২৬ তারিখ অবধি ঠাণ্ডা ছিল।

ইতিমধ্যে কলকাতা একদিন বললে, মনসুন বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে আসছে। তারপর চুপ।

এখন প্রশ্ন সত্যকার আসল বর্ষা নামবে কবে?

এসব অস্বাভাবিক অবস্থার ফলে পেছিয়ে যাবে, না মাঝ-জুনে যথারীতি নামবে।

তেরো তারিখে বৃষ্টি নামার পূর্বে দিনকয়েক যে হাওয়া বন্ধ হয়ে গুমোট করেছিল তা নয়। কাজেই আজকের দিনের জোর হাওয়া দেখে বলা, যে বৃষ্টি হতে অনেক দেরি এটিও অভিজ্ঞতাবিরুদ্ধ।

সুন্দর বাতাসে ভোর আটটা অবধি সুনিদ্রা।

পদ্মার দিকে তাকাতেই দেখি, তিনি এক রাত্রেই ডুবে ডুবে অনেকখানি জল

খেয়েছেন। কুণ্ডের একটা পাশ ডুবে গিয়ে এখন স্রোতের ধারা প্রায় পাড়ের সঙ্গে সমান্তরাল। ছোট্ট চরটি সম্পূর্ণ অন্তর্ধান করেছে।

আকাশে ভালো করে মেঘ জমেছে। বর্ষা-সকালের আবহাওয়া।

খাড়ির সব-কটা নৌকাই যেন একে একে পাড়ি দিয়েছে উজানের দিকে পশ্চিম পানে। তাদের গতি এমনই মসৃণ পিচ্ছল অনায়াস যেন পাকা স্কেটিঙের সর্দারনীর বুক ফোলানো প্রফাইল দেখতে পাচ্ছি পারের থেকে।

এই দেখে মনে পড়ল, আমাদের দেশে যখন কোনো নৌকো পাল তুলে তর তর করে উজানে ধায়, আর দেখে অন্য কোনো নৌকো পাল নেই বলে বৈঠা মেরে মেরে অবিরাম ঘামছে তখন চেঁচিয়ে বলে, 'হালের বলদ বন্ধক দিয়ে পাল কেন।'

কত গরীব আমাদের দেশ! সামান্য একটুকরো কাপড় কেনার পয়সা নেই।

রাত সাড়ে দশটায় লু আরম্ভ হল। উত্তর দিকে দূরে দূরে মেঘের আড়ালে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। শব্দহীন। আকাশেও মেঘ নেই। আজ ধুলো কম। না হলে এই বাতাসেই আমরা ফের ধূলিতন্ত্রের অধীন হতুম। বৃষ্টির আশা কম। কালকের তুলনায় আজ ভ্যাপসা ছিল কম।

ঘণ্টাখানেক এই লু উৎপাত করে চলে যাওয়ার পর এখন (০১'০০) হাওয়া একদম বন্ধ। কী উৎপাত। কাল এই সময় কি হিল্লোলে হিল্লোলে তরঙ্গে তরঙ্গে হাওয়া আসছিল।

আজ সকালে স্নানের ভিড়। দশেরা? এ-সময়ে দশেরা কি রে বাবা? আজ দুপুর এবং এখন (১৮'৪০) সত্যই গরম। ভ্যাপসা, ধুলো, দক্ষিণের হাওয়া নেই। পূবের হাওয়া এখানে ঢোকে না। পদ্মা চলছে বোঝা যায় তার শব্দ থেকে—হাওয়া থেকে নয়। 'জ্যুস' শেষপ্রান্তে।

আজ কত রকম আবহাওয়াই না যাচ্ছে।

সন্ধ্যায় ছিল গুমোট। তারপর সন্ধ্যাবেলাতেই পূবের বাতাস। তার পর পূব-দক্ষিণ থেকে ধূ ধূ হাওয়া। দরজার একটা পাটি বন্ধ করে দিতে হল; না হলে কাগজ উড়িয়ে নিয়ে যায়। মেঘ ছিল অল্প—তাও খুব বর্ষণপ্রদ নয়, লম্বা লম্বা ফালি ফালি। তারপর অসহ্য গুমোট। হাওয়া এমনই মোক্ষম বন্ধ হল—

এরকম ধারা জীবনে কখনো দেখিনি—যে বেশ কিছু মশা সর্বাঙ্গের চতুর্দিকে ভন ভন করে অস্থির করে তুললো। ওদিকে উত্তর-পশ্চিম আকাশে ঘনঘন বিদ্যুৎ আর মেঘের ডাক। ঠিক বৃষ্টি হব হব ভাব। তারপর হঠাৎ জোর বাতাস ধূলিতন্ত্র। নিরাশ হয়ে দোর জানলা পর্যন্ত বন্ধ করলুম না।

এই হাওয়া-গুমোটের তামাশা ক'বার হয়েছিল জানিনে।

শেষ রাতে অনুভব করলুম, বৃষ্টি হয়েছে। সকালে দেখি ছাত বেশ ভেজা।

সকালে দেখি ছাত ভেজা। অল্প অল্প বাতাস। তাতে ধূলিকণার অত্যাচার কম। এখন ৫ ৫৫-এ ঢাকা ফোরকাস্ট দিলে আজ চাটগাঁ, দক্ষিণ ঢাকা ও দক্ষিণ রাজশাহী বিভাগে ঝড়-বিদ্যুৎ-বৃষ্টি তাবৎ কিছুই হবে। এই মুহূর্তে এখানে নিদারুণ গুমোট, বাবলাগাছের বিন্দুপারা পাতাটিও নড়ছে। বৃষ্টি হলে বাঁচি। তবে ঈদের বাজারের সর্বনাশ হবে।

ঈদ

আজ আবার নীল চাঁদ দেখলুম। এই নিয়ে জীবনে তিনবার। আর দু'বার বছরের ঠিক এই সময়েই দেখেছিলুম। এবারে ব্লু, কিংবা fine emareld green.

আজ চাঁদের শুক্লা দ্বাদশী। সূর্যাস্ত এখানে—রাজশাহীতে—আজ ১৮'৫২-তে। দেখলুম ঠিক ১৯'০০। পাঁচ মিনিটের ভিতরেই চাঁদ সোনালী হয়ে গেল। বোধহয় অন্ধকার বাড়ল বলে, চাঁদের জ্যোতিও বাড়ল। তাই সবুজ-নীলত্ব লোপ পেল। ১৯'৫৫-এ নিত্যিকার চাঁদ।

অতি সূক্ষ্ম মসলিন মেঘ তখন আকাশ ও চাঁদের গায়ে। এমন কি তখনও সূর্যাস্তের লালিমা আকাশের হেথা হোথা লেগেছিল।

আজ সকালে উঠে বুঝলুম, কালকেরই মত বৃষ্টি হয়েছে।

বেতার বললে, ঢাকাতে বৃষ্টি সত্ত্বেও নমাজের জনসমাগমে মানুষ কম হয়নি।

দিনটা মোটামুটি গরমই। তবে এখন ২২·১৫ হাওয়া বইছে। সন্ধ্যা থেকেই পূব থেকে ছিল। বর্ষা কাছে আসার সঙ্গে পূবের বাতাসের প্রাধান্য বাড়ছে।

কালকের চাঁদের কথা ভুলে গিয়েছিলুম বলে এবং visitors ছিল বলে নীল চাঁদ দেখার চেষ্টা করিনি। দুঃখ হচ্ছে।

সাঁওতাল রমণীর বর্ণনা—শান্তিনিকেতন।

স্পষ্ট মনে হচ্ছে চুলে তেল দেয় না।

খোঁপা কি আমাদেরি মত বাঁধে?

পরণে কমলা রঙের শাড়ী—বেগনী পাড়।

ডান হাতে বাজু বন্ধ।

গলায় সাদা পুঁতির হার।

কানে পেতলের সাদাসিধে গোল একটি কানফুল—just a big full stop।

ডান হাতে সুতো বাঁধা—ওতে কি কবজ?

RAJSHAHI—CALCUTTA

ফিরোজ ভজু স্টেশনে এসেছিল। তাদের মুখ শুকনো। থাক্ সে আমি বলতে পারব না।

বউ ঈশ্বরদী অবধি এল। আমাদের বগিটা অনেকক্ষণ ধরে শানটিং করলে।

আমার মনে হচ্ছিল, আমরা যেন হানিমুনে। বউ ঘুমিয়ে পড়ল। বেচারী ঐ ঢাকা এই পাবনা একাধিকবার বাসে করে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

রাত দেড়টার সময় আমার গাড়ি ছাড়ল। সেও শুকনো মুখে বিদায় নিল।

এ বড় পীড়াদায়ক। এসব কথা আর লিখব না। এ তো কাল্পনিক পীড়ার জাল বুনে বুনে উপন্যাস লেখা নয়।

সমুদ্র-প্রকৃতি

১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

বাড়ীর সামনে দিয়ে চলে গেছে পিচঢালা চওড়া কালো রাস্তা। তারি সঙ্গে গা মিলিয়ে একফালি ঘন সবুজ মাঠ, ছোঁড়ারা ক্রিকেট খেলে—তার সঙ্গে গা মিলিয়ে ফের আরেক ফালি সোনালী বালু পাড়—এক পাশে জেলেদের বস্তি, গাছ নেই পালা নেই কতকগুলো কুঁড়েঘর—বালু পাড়ির সঙ্গে গা মিলিয়ে আরেক ফালি লম্বা একটানা নীল সমুদ্র।

চোখে পড়ে চার ফালি কালো পথ, সবুজ মাঠ, সোনালী বালু আর নীল সমুদ্র। নীল হল কথার কথা। তা না হলে দিনে যে সুন্দরী কবার কাপড় বদলাল তার হিসেব রাখা দায়—বাকি তিনজন কুঁড়ের বাদশা, তাদের রঙের ফেরফার হয় না।

সমুদ্রের এক দিকটা গিয়ে লেগেছে আডিয়ার নদীর মোহনায়। দুইজনের ধাক্কাধাক্কিতে টক্কর খেয়ে একটা ঝিল তৈরী হয়েছে,—সে এঁকেবেঁকে আমাদের দিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে—জেলেদের গাঁ ছাড়িয়ে। ঝিলটা নিতান্তই খরা, তার উপর নৌকা চলে না, জেলে জাল ফেলে না, তার রঙেরও অদল বদল হয় না। তবু এঁকে বেঁকে গেছে বলে মাঠ, বালু সমুদ্রের ফালি কেটে সব জিনিস যেন দূরে নিয়ে গিয়েছে।

*　　*　　*

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

সকালবেলা দেখি বালুপাড়ের গায়ে যেন কে নীলাম্বরী শাড়ী শুকুতে দিয়েছে। আলোআঁধারে ভালো দেখা যাচ্ছে না। এদিকে দক্ষিণের বারান্দায় পূবের রোদ এসে পড়েছে, নিমগাছের ফাঁকে ফাঁকে। অনেকক্ষণ ধরে বাইরের দিকে চেয়ে রইলুম। মন বোধ হয় শান্ত ছিল তাই কোনো পরিবর্তন লক্ষ করিনি। বেলা যখন বেশ হয়েছিল তখন দেখি পূবের রোদটুকু বারান্দাটি যেন মুছে দিয়ে চলে গেছে।

ওদিকে দেখি নীলাম্বরী শাড়ীর উপর রূপালি জরির অগুনতি চুমকি

কুচি ফুটে উঠেছে। সাদাসিধে নীলাম্বরী কখন যে হঠাৎ জড়োয়া হয়ে গেল টেরই পাইনি।

একসারি খুঁটি পোতা, কাত হয়ে, দেখছিলাম সকালবেলা নীলাম্বরীর পারে। জেলেরা জাল টেনে তুলছে। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি তারা আর নেই—বালুচর পেরিয়ে, সবুজ মাঠের উপর জেলেনীরা চলেছে মাথায় ঝাঁকা করে বাজারের দিকে।

মাঠের গোরুগুলো ঠিক সেই রকম ছবিতে আঁকা। শুধু compositionটা বদলে গেছে। একদিকে বেশীর ভাগ জড়ো হয়েছে—অন্যদিকে দুটো-চারটে ছিটকে-পড়া।

পেছনের বস্তিতে জেলেনী কলতলায় কাপড় কাচছে। এমনি আঁটসাঁট গঠন যে সমস্ত শরীর দু ভাঁজ করে পায়ের কাছে কাপড় আছড়ানোতেও শরীরের কোনো জায়গা দুলে উঠছে না। আমাদের মালীর বউ নাইতে বসেছে। কাকের কা-কার সঙ্গে কাপড় কাচার ধোপধাপ আর কলতলায় ঝাঁট দেবার শব্দ।

জোয়ার আসার সময় হয়েছে। বাতাসের ফাঁকে ফাঁকে তার প্রথম মৃদু গর্জন শোনা যাচ্ছে।

সন্ধ্যেয় গিয়ে দেখি কপাল জুড়ে চওড়া লাল আবীর মেখেছেন, এক কান থেকে আরেক কান অবধি।

অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না—ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি ?

আজ সন্ধ্যেয় কি বাসর-সজ্জাটাই না পরেছিলে !

এতবড় কালো ঘোমটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে ?

* * *

১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

আজ সন্ধ্যেয় গিয়ে বললুম মাটির মানুষ আমি। মাটির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এসেছি যেখানে মাটির শেষ। তোমার নীল কোলে জায়গা দাও।

গরম বালুতে পা পুড়িয়ে রোজ আসি—তুমি আমার পা শীতল করে দাও। একদিনের তরে সমস্ত ভেতরটা ঠাণ্ডা করে দাও না কেন ?

গভীর অন্ধকার—পরশু মহাশিবরাত্রি—শুধু বাক্ আর স্পর্শ। গুরু গুরু গর্জন ঘন ঘন মিশে যাচ্ছে পাগলা হাওয়ার এদিক ওদিক ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে।

কখনো কানে আসছে দুয়ে মেলার শব্দ। কখনো হাওয়া যেন গর্জন থেকে খসে পড়ে যায়। তারপর হঠাৎ গমগমানি যেন নিজেকে একা বোধ করে থেমে যায়। নোনা বাতাস কপালের উপর হাত বুলিয়ে দিয়ে যায়, কখনো বা জোর লাগিয়ে চাদরখানা সরিয়ে দেয়।

তবু যেন অন্ধকারেরই জয়। দূরের গর্জন, মাঝামাঝি অন্ধকার, কাছের স্পর্শ সব কিছু তলিয়ে পড়ে কি যেন অজানা অন্য কোনো অন্ধকারের তলায়।

এই গভীর বিলুপ্তি অতল বিস্মৃতি নিয়ে আসে না কেন?

সমুদ্রপারে কখনো শান্তি পাওয়া যায় না—

* * *

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

ওমর খৈয়াম বলেছিলেন, আমার দুঃস্বপ্ন দুশ্চিন্তা কালো ভারতবাসীর মত। সুরাৎ মাহমুদ তার তলোয়ার চালাতেই তাদের আর সন্ধান পাওয়া যায় না—Scatters and slays with his enchanted sword—আমার হয়েছে সত্যিকার তাই, কাক—দুপুরের শান্তির প্রধান অন্তরায়। সমুদ্রের গুরুগম্ভীর গর্জন, দমকা হাওয়ার দোল-লাগা নারকেলপাতার শিরশিরি সব চাপা পড়ে যায় ঐ কর্কশ লুব্ধ চীৎকারের তলায়। এ চীৎকারে যেন সমুদ্রপারের পচা মাছের গন্ধ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

নীল ফরাস পেতে রেখেছ এতক্ষণ ধরে—নাচ শুরু হোক না।

সমুদ্রের বুক চিরে যেন অন্ধকার বেরিয়ে এসে, আলাদীনের জিনের মত সমস্ত আকাশ বালুপার কালো বিষ ঢেলে একাকার করে দিল।

জলের ভেতরে কি আরেকটি জিন এখনো পোরা রয়েছে নাকি? তার লাথালাথির গমগমানিতে সমস্ত আকাশ পর্যন্ত কেঁপে উঠছে।

পশ্চিম আকাশের লাল কাগজের ফানুস বাতিতে যেন হঠাৎ আগুন ধরল। দেখতে না দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়ে আলোটাও নিবে গেল। পূবে-পশ্চিমে একটানা অন্ধকার।

* * *

১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

বউমার ঘুম কিছুতেই ভাঙছে না। ডানদিকে বালুচরের লম্বা কোলবালিশ,

বাঁদিকে ঘন ঘোলাটে মেঘ পাকিয়ে পাকিয়ে বানিয়ে তোলা তুলতুলে আরেক কোলবালিশ। কে যে পাখার হাওয়া করছে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মেঘের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে ঘোলাটে শাড়ীর জমি হেথা-হোথা সর্বত্র বারে বারে কেঁপে উঠেছে। দুঃস্বপ্ন দেখছেন কিনা বলা যায় না, মাঝে মাঝে গুমরে উঠছেন, পাখার হাওয়ায় সেটা মিলিয়ে যাচ্ছে—পষ্টাপষ্টি কিছু বলার উপায় নেই।

পাখার হাওয়া ঝড়ের হাওয়া হতে চললো যে। হঠাৎ কখন এক পাশের শাড়ী দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সাদা ফ্যানার পেটিকোট—না লেসের সেমিজের শেষর দিকটা?

কালোজাম, গোলমোহর, নিম-নারকোলে কী মাতামাতি। সমস্ত অশান্ত হয়ে উঠেছে। বাইরের দিকে তাকাবার উপায় নেই। শুধু ঐ ইলেকটেরির খুঁটিটা এক পায়ে দাঁড়িয়ে। ওর কোনো নড়নচড়ন নেই। এত বড় সমুদ্র—তিনিও দুলে দুলে ওঠেন প্রাণের কাঁপনে—কিন্তু খুঁটিটার কাঁপন নেই, জীয়ন মরণও নেই।

পারের সবাইকে তাড়াবার জন্য আজ গুমরে গুমরে বড় বড় ঢেউ পারে এসে আছাড় খাচ্ছিল। কি মৎলব কে জানে। তাড়াতাড়ি অন্ধকার টেনে আনার জন্য আকাশে একরত্তি মেঘও ছিল না। কাল অমাবস্যা—আজ এত তাড়া কিসের?

অন্ধকার যেন পেছন থেকে তাড়া করে করে বাড়ীতে ভাগাল।

বারান্দায় বসে আছি জোর আলো জ্বালিয়ে কিন্তু বাইরের অন্ধকারের গায়ে যেন আঁচড়টি কাটতে পারছে না। ওদিকে সমুদ্র হুংকার দিয়ে বারে বারে শোনাচ্ছেন, আজ হোথায় যাওয়া বারণ। কাল মহাশিবরাত্রির আয়োজনে কোন কাপালিকদের ডমরু আজ সন্ধ্যে থেকেই বাজতে আরম্ভ করল।

নোনাগন্ধে খানিক খানিক আভাস পাচ্ছি।

* * *

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

বড়লোক দেউলে হওয়ার অনেক দিন পরও জাঁকজমক সমানই চলতে থাকে—বরঞ্চ অনেক সময় বেড়ে যায়। পালাপরবে গমগমানি বরঞ্চ বেশী হয়—

ওদিকে আটপৌরে খরচে টানাটানি চলে।

আকাশের একটানা লাল নিভে গেল কিন্তু টুকরো টুকরো মেঘে তার জাঁকজমক জেগে রইল অনেকক্ষণ ধরে—আরো বেশী লাল হয়ে। দেউলে-হয়ে-যাওয়া জমিদারের ইয়ারবকসী যেন এরা। মনিবের শেষের তলানিটুকু খেয়ে মাতলামির লালে লাল। হুজুর লুকিয়ে থেকে গাদা গাদা আবির ছুঁড়ছেন।

আটপৌরে আকাশ ম্লান কিন্তু মেঘে মেঘে পালাপরবের বাড়াবাড়ি জাঁকজমক। আড়াল থেকে অস্তগত সূর্য পেলা দিচ্ছেন। দাক্ষিণ্য থেকেই দারিদ্র্য ধরা পড়ে।

পূবে-পশ্চিমে দেখনহাসি, ইলেকটেরিতে খবর পাঠানো না বয়স্কাউটের নিশানে নিশানে কথাবার্তা। পশ্চিম লালের ইশারায় পূব লাল হল। সেই লাল ফিকে হচ্ছে—কি গোপন কায়দায় তার খবর পূবে পৌঁচচ্ছে? মাঝের বিস্তীর্ণ আকাশ তো ফিকে, কোনো রঙ নেই, ফেরফার নেই—কি করে এর হাসি ওর গায়ে গিয়ে লাগে—এর বেদনা ওর বুকের সাড়ায় প্রকাশ পায়!

* * *

২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

আকাশ যেন উবু হয়ে শুয়ে সমুদ্রকে চুমো খাচ্ছে—এদিকে সমুদ্রের পা ওদিকে মুখ। রঙে রঙে সমস্ত জিনিসটা ঘটল। প্রথম চুম্বনে দিগ্বলয় লাল হল। তারপর নিবিড়তর চুম্বনের কাতরতায় বেগুনি হল, সেই বেগুনি ফিকে হতে লাগল, এদিকে ঢেউয়ের দোলায় সুন্দরীর পা যেন কেঁপে কেঁপে উঠেছে—সমস্ত দেহ শান্ত। চুম্বনের তরঙ্গ শান্ত শরীরের ভিতর দিয়ে ওপার হতে এপারে এসে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফুলে ফুলে উঠছে—কেন্দ্রীভূত আনন্দ এপারে এসে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

তারপর বেগুনি সম্পূর্ণ কেটে গিয়ে ছাইরঙ হল। এ যেন সর্বশেষ নিবিড়তম চুম্বনে হৃৎপিণ্ডের শেষ রক্তবিন্দু ঠোঁট দিয়ে শুষে নিয়ে চলে গেল। এপার ওপার জুড়ে পড়ে রইল প্রাণহীন ফ্যাকাশে শবদেহ।

কালো চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকা পড়ল। তারপর আকাশে ছোট ছোট মোমবাতির পিদিম জ্বালিয়ে শবের পাহারা।

সেই কালো চাদরে সব কিছু ঢাকা। দক্ষিণমুখো হয়ে বারান্দায় শুয়ে আছি। বাঁদিক থেকে আসছে কান্নার শব্দ—শোক যেন উথলে উথলে উঠছে। ডানদিকে নারকোলের ডগায় বাতাসের ঝিরিঝিরি—যেন মাথার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে।

পায়ের তলায় ঝিল্লির রিনিরিনি। সামনে মোমের ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল জমে গিয়ে কালো চাদরের গায়ে লেগে আছে।

কিসের প্রতীক্ষা? কোন চন্দ্রোদয়ের? যেন তিনি সুধাভাণ্ড নিয়ে অতল গহ্বর থেকে উঠে এসে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে কোন মৃতদেহে প্রাণ দেবেন।

* * *

২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

সূর্য অস্ত যাব-যাব করছেন এমন সময় পারে পৌঁছলুম। আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ ছিল, অন্য দিনেরই মত। ভাবলুম কালকের মত আজও ফাগের খেলা জমে উঠবে। প্রথম লক্ষণ দেখাও দিল। আকাশ ফিরোজা সবুজ শাড়ী পরল—আস্তে আস্তে গয়না চাপাবো চাপাবো করছে, এমন সময় দেখি শাড়ী-খানাই ফিকে হয়ে হয়ে, কেমনধারা সেই ছাইনীল হয়ে গেল। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখি তারো সেই ফিকে শ্যাওলা সবুজ রঙ। চারদিকই কেমনধারা আধমরা ছাইরঙ ধরতে লাগল।

কালকের দিনের সব সাজসরঞ্জামই ছিল কিন্তু কেন জানিনে খেলা শুরু হতে হতে বন্ধ হয়ে গেল।

তখন দেখি আকাশে দ্বিতীয়বার অতি ক্ষীণ চাঁদের অত্যন্ত ম্লান ঝিলিক।

যেন হিমালয় তার সব রঙ, সব সৌন্দর্য মুছে দিলেন, আড়ম্বর-আভরণ-হীনতার মাঝখানে দুখিনী কন্যাকে ঘরে তুলবেন বলে। চাঁদের মুখে তাই কি ধীরে ধীরে হাসি ফুটতে লাগল?

অন্ধকার যখন ঘনতর হল তখন চাঁদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর সবাই, মেঘ জল বালুচর আপন আপন আলো নিভিয়ে দিয়ে চাঁদের দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে।

বরণশেষে বাড়ী ফিরলুম।

ফাল্গুন মাস—কিন্তু কোনো দিকে নবজাগরণের কোনো চিহ্ন নেই। এদেশে শীতের ঘুম নেই, বসন্তের জেগে-ওঠাও নেই।

* * *

২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

মাঝআকাশ থেকে একটুখানি ঢলে-পড়া তৃতীয়ার ক্ষীণ শশী; সূর্য হেলে পড়েছেন কিন্তু তখনো জ্যোতির্ময়। তাই ভস্মভাল শিবের ললাটে হীনজ্যোতি

শশাঙ্ক-কলা। উমা কি এখনো ঘরের কাজ শেষ করে উঠতে পারেননি – বেলা যে গড়িয়ে এল। জেলেদের পাড়ায় কাজকর্মে ভাঁটা পড়েছে—জেলেনীরা রঙীন-শাড়ী পরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে—সমুদ্রপারের লোক বোধ হয় স্বল্পভাষী হয়, ঢেউয়ের গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কথাবার্তার মেহন্নতে গল্পগুজব জমে না, ঝগড়াঝাঁটিতে গলা চিরে যায়—জেলেরা বোধ করি বাজার গেছে—নারকোলপাতার ছাউনির কুঁড়েঘর ঐ নারকোলগাছের গা ঘেঁষে যেন রোদ থেকে শরীর বাঁচাচ্ছে।

উমার কাজ শেষ হয়েছে। ভস্ম মুছে ফেলে, ঘোর আসমানি রঙ দিয়ে শঙ্করের কপাল ঢেকে দিয়েছেন—তার উপরে দিয়েছেন তিনটান টকটকে ফাগ—আর মাঝখানে এঁকে দিয়েছেন উজ্জ্বল, নবকান্তি, অকলঙ্ক শশাঙ্ক।

হাসি ফুটেছে। সমুদ্রের জল আসমানি রঙ নিয়েছে—ধূসর বালুচর সোনালি হল। সমুদ্রের লোনা হাওয়ার জোর কমল—উত্তর থেকে হিমালয়ের বাতাস এল নাকি উমার চঞ্চল অঞ্চল আন্দোলনে?

সমুদ্রের একটানা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে—তার মাঝে ডুকরে ডুকরে ওঠা গুমরানো।

নিমগাছ ডাল নাড়ছে, কালোজামের পাতা কাঁপছে, বারান্দার টবে বেত-গাছের সরু পাতা ক্ষণে ক্ষণে শিউরে উঠছে। দিনের বেলা তারা রং বদলায়, পাখী এসে বসে তাদের উপর, সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন সূর্যাস্তের কত রকম আলো তাদের উপরে এসে পড়ে—তারা সাড়া দেয়—তাদের জীবনপ্রবাহেও ঢেউ ওঠে, তারাও দোল খায়।

রাতের অন্ধকারে তারা শুধু সমুদ্রের কান্না শোনে—একমনে। বাতাস সে কান্না বয়ে নিয়ে আসে, আর সেই বাতাসের ডাকে সাড়া দিয়ে সমুদ্রের কান্নার সঙ্গে যেন নিজেকে মিশিয়ে দেয়।

সমুদ্রের কান্না থামে না বলে, ওদেরও যেন চোখে ঘুম নেই।

এখানকার সংসারের সব রকমের সব কটা তার যেন সমুদ্রের কান্নার সুরে বাঁধা।

* * *

২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

এ খেলা তিনদিন ধরে চলছে। আকাশ, সমুদ্র, বালুচর বিবর্ণ নিরস দেখায় যতক্ষণ সূর্য একেবারে না মিলিয়ে যান—মনে হয় আর সবাই ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে

আছে। সূর্য যেই অদৃশ্য হলেন অমনি কী গোপন লিপ্সায় আকাশের গাল লাল হয়ে আসে—ভাসুরঠাকুর উঠে যাওয়া মাত্রই কনেবউ যে রকম বরের দিকে তাকায়—প্রথমটায় আমেজ লাগার মত। তারি রেশ সমুদ্রের ফেনায় লেগে গোলাপী হয়ে ওঠে—তারি পরশ ভেজা বালুতে গোলাপ জামের ফিকে গোলাপী হয়ে দেখা দেয়। তারপর বরবধূতে কি কথাবার্তা হয় জানিনে—কনে লজ্জায় টকটক করতে থাকেন—ফাগ সিঁদুর সব রঙ তখন হার মানে। আর সে লালের সঙ্গে সঙ্গে পেছনের আকাশ হয় ঘন আসমানি, দূর সমুদ্রের জল হয় গাঢ় পান্না। সমস্ত দিনের মূর্ছা কেটে গিয়ে বিরাট আকাশ যেন গমগম করে ওঠে, পশ্চিম থেকে পূব জুড়ে লম্বা লম্বা রঙিন কড়িকাঠ যেন পূর্বাচল অস্তাচলকে জুড়ে দেয়, দূরে, পূর্বদক্ষিণ সমুদ্রের কোণে।

তারপর লজ্জা-সরম ইশারা ঠারাঠারিতে কি খুশি হয় জানিনে। দেখতে পাই পিদিম যেন কেউ নিভিয়ে দিল—না বৌ কালো কপাটের দরজা বন্ধ করে দিল—না কালো ঘোমটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে চোখের সামনে থেকে সরে গেল।

দুপুর রাতে ঘুম ভাঙল। এ কী কাণ্ড। চাঁদের আলো জ্বালিয়ে আকাশে তারার ঘুঁটি সাজিয়ে বরবধূতে এ কি খেলা!

* * *

৫ই মার্চ, ১৯৪৭

এখানে সমুদ্র নেই। উঁচুনিচু সবুজ ক্ষেত—মাঝে মাঝে তালগাছ আলের কাছে কাছে দাঁড়িয়ে। তারপর নিকটের পাহাড়—বড় বড় পাথর স্পষ্ট দেখা যায়। তার পেছনে দূরে নীলাভ পাহাড়—লাইন বেঁধে পূর্ব থেকে পশ্চিম সমস্ত দক্ষিণ দিকটা জুড়ে।

বর্ষাকালে এই শুষ্ক দেশও সম্পূর্ণ সবুজ হয়ে গিয়েছিল। বসন্তের মাঝামাঝি এরি মধ্যে ফালি-ফালি হলদে ক্ষেত বেরিয়ে সেই সবুজের গা যেন জখম করে দিয়েছে। সূর্যোদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত আকাশ কি যেন এক ব্যাকুল ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে স্থির দাঁড়িয়ে—পালাবার পর্যন্ত সাহস নেই। পূবের বাতাস আসছে ধীরে ধীরে এবং অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে। মৃদু তপ্ত এবং অল্প ভেজা-ভেজা। দুদিন বাদেই পশ্চিম থেকে হু-হু করে জোর গরম বাতাস বইতে আরম্ভ করবে—পূবের বাতাস এখনো ঠিক মনস্থির করতে পারছে না এদেশে আর আসবে কিনা।

পশ্চিমের হাওয়া পৌঁছায় নি বটে কিন্তু গাছপালা তার খবর পেয়েছে কোন্ আশ্চর্য উপায়ে—সব ফুল গা থেকে আছড়ে ঝেড়ে ফেলেছে। রক্তকরবী ঝরেনি কিন্তু কে যেন আগুন দিয়ে ঝলসে দিয়ে গেছে। শুধু বুগনভিলিয়া আর রাঙাজবা —না স্থলপদ্ম ?

এতদিন ঘুঘু ডাকেনি। তপ্ত মধ্যাহ্নে এখন অত্যন্ত ক্লান্ত তার ডাক। সমস্ত শীতকাল ময়ূর নিস্তব্ধ ছিল—মেঘ আসার কোনো লক্ষণ নেই তবু থেকে থেকে ডেকে ওঠে—ঠিক যেন একা কৈ ? একা কৈ প্রশ্ন শুধায়।

প্রজাপতি পালিয়েছে দল বেঁধে—না তাদেরো ডানা ঝলসে গিয়েছে ?

দুপুরবেলা শুনি সাপে যেন কার গলা চেপে ধরেছে—চাপা গলার ক্ষীণ আর্তরব —একি খাণ্ডবদহনের অগ্নিদেব পশুভোজনের বিরাট পর্ব আরম্ভ করেছেন ?

না দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ? সবুজ অঞ্চল গেছে—এখন যেন অঙ্গবস্ত্র প্যাঁচের পর প্যাঁচ খুলছে গ্রীষ্ম দুঃশাসন—বীভৎস আনন্দ যেন ধীরে ধীরে রসিয়ে রসিয়ে চেখে নিচ্ছে।

ধরণীর কণ্ঠশ্বাস রুদ্ধপ্রায় পত্রে-পুষ্পে ; কূপগহ্বর অন্ধের উপড়ে নেওয়া চোখের মত—ক্ষতজল পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছে।

* * *

৬ই মার্চ, ১৯৪৭

বহুকাল পূর্বে পড়েছিলুম কারো ফাঁসীর হুকুম হলে রুশিয়ার কোন জেলে জেলরের সুন্দরী মেয়ে কয়েদীর সঙ্গে প্রেম করতে যেত। তার সঙ্গে ফুর্তিফার্তি করে সেপাইদের হুকুম দিতে শেকলে তাকে আচ্ছা করে বাঁধবার। তার পর সেই মেয়ে সিগরেট ফুঁকে ফুঁকে আসত তার কাছে। হাত দিয়ে জ্বলন্ত সিগরেট তার চোখের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে ধরত। কয়েদী মাথা পেছনের দিকে সরিয়ে সরিয়ে দেয়াল পর্যন্ত নিয়ে যেত। তারপর মেয়েটা সিগারেট চোখের উপর চেপে ধরে তাকে অন্ধ করত।

দ্বিপ্রহরের সূর্য ক্রমেই কুয়োর জলের দিকে এগিয়ে আসছে—জল ক্রমেই নীচের দিকে নেবে যাচ্ছে। তারপর শেষের দিন আসবে যেদিন তার স্বচ্ছ টলটলে চোখ কানা হয়ে গিয়ে থলথলে ঘোলাটে কাদা বেরুবে। তারপর তাও শুকিয়ে গিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

থাকবে অন্ধকার কোটর।

* * *

৮ই মার্চ, ১৯৪৭

সকালবেলা এবারে এখানে পৌঁছে দেখি চতুর্দিক নিস্তব্ধ। পূব-পশ্চিম কোনো দিক থেকে হাওয়া বইছে না। সমুদ্র জমে-যাওয়া নীল বরফের মত—স্কেটিং রিঙ্ক। তারি মাঝখানে দক্ষিণ বাতাস এল জোর। নারকোল, গোল-মোহর, নিম, বকুল দুলে উঠল—সমুদ্রের সর্বাঙ্গ যেন হাল চালিয়ে চষে দিল।

এ দক্ষিণ বাতাস ঠাণ্ডা নয়, গরমও নয়। এ এসেছে সবাইকে চঞ্চল করে দেবার জন্য। কলতলায় সুন্দরী কাপড় সামলে স্নান করতে পারছে না, নারকোল ঘন ঘন মাথা দুলিয়ে আপত্তি জানাচ্ছে, কলতলার শ্রীকৃষ্ণ কিছুতেই বিড়ি ধরাতে পারছেন না—এক চোখ সুন্দরীর দিকে, পাশের বাড়ী বারান্দা থেকে ভিজে শাড়ী হেলতে হেলতে ধুলোয় জবুথবু হয়ে পড়ে গেল।

* * *

৯ই মার্চ, ১৯৪৭

সমুদ্রের গর্জনে নানা সুর। কোনোদিন অশান্ত উদ্বেলিত হাহাকার, কোনো দিন গুমরে-ওঠা চীৎকার, কোনো দিন একটানা করুণ আর্তনাদ। যেদিন জোর পূরবীয়া হাওয়া বয় সেদিন সব গর্জন ক্রন্দন ছিন্নভিন্ন হয়ে পারের দিকে আসে—আজ হঠাৎ দক্ষিণ বাতাস বন্ধ হল সন্ধ্যাবেলায়, কিন্তু পুবের বাতাস এল না। আজ তাই সমুদ্রের একটানা কান্না লহমার তরে বিরাম নিচ্ছে না। ওদিকে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ চুপচুপ দাঁড়িয়ে, আজ পর্যন্ত তাকে কখনো কোনো শিহরণে বিক্ষুব্ধ হতে দেখিনি।

কে শুনছে? পারে লোকজন নেই। গয়লাপাড়ার শেষ বাতি নিবে গেছে। ডাইনে বাঁয়ে কোনো কোনো বাড়ীতে আলো নেই। চুনকাম করা দেয়ালের গায়ে খোলা জানালা চৌকো চোখের মত বাইরের দিকে তাকিয়ে—কেমন যেন অন্ধের তাকানোর মত। মাঠে, রাস্তায়, বালুপাড়ে চাঁদের আলোর অতি ক্ষীণ স্তিমিত আস্তরণ। শুধু সমুদ্রের জলে যেখানে চাঁদের আলো পড়েছে সেখানে গালানো রূপা বালুচর থেকে সোজা পুব আকাশে গিয়ে মিলেছে।

জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। হঠাৎ কেমন যেন মনে হয় গাছগুলো সমুদ্রের মতই প্রাচীন। তারা বহুকাল ধরে এই নানা সুরের কান্না শুনেছে। তারা যেন তার কারণও জানে। একে অন্যের দিকে মাথা দুলিয়ে কি যেন বলে, আর সবাই শিরশিরিয়ে উত্তর দেয়, "ছিছি, ছিছি।"

* * *

১১ই মার্চ, ১৯৪৭

টলটল নীল রঙ সমুদ্রের আর দূরের আকাশ ঘন বেগুনি। পশ্চিমের আকাশ লাল টুকটুকে—মাথার উপরে প্রকাণ্ড এক থাবড়া মেঘ শুভ্রমল্লিকার স্তূপের মত জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণমুখো হয়ে আডায়ারের দিকে চললুম। যেতে যেতে যেখানে আডায়ার নদীর মোহনা সেখানে পৌঁছলুম। তিনদিকের ঢেউ সেখানে এলোপাতাড়ি মারামারি করে দিশেহারা হয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ছে। নদীর বালু জমে জমে সমুদ্র ঐ জায়গাটায় অগভীর। গোটা পাঁচেক জেলে গোড়ালি জলে সুতো দিয়ে মাছ ধরবার চেষ্টায় ডাইনে বাঁয়ে চলাফেরা করছে। সাদা পাল তুলে সায়েব মেম আডিয়ার উজিয়ে চেট্টিনারের বাড়ীর দিকে হু-হু করে ভেসে যাচ্ছে।

মোহনার জল নীল হতে আরো নীল হতে লাগল। দূরের আকাশ বেগুনি ছেড়ে গাঢ় নীল হতে লাগল। তারপর আস্তে আস্তে দুই নীলে মিলে গিয়ে মোহনার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল—দূরের আকাশ আধা আলো-অন্ধকারে আর প্রায় দেখা যায় না। সে-নীল এমনি জোয়ারের মত সব কিছু ছাপিয়ে কাছে আসতে লাগল, যেন মনে হল বাতাস পর্যন্ত নীল হয়ে গিয়েছে। জেলেদের ময়লা কাপড় সে-নীলে ছুপিয়ে রঙ ধরল—আমার মনে হল যেন নীল রঙ ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলেছি।

নীলের বানে সব কিছু ডুবে গেল। আমি চোখ বন্ধ করলুম। সেখানেও নীল—চোখের সাদা-কালো কী দুই-ই নীল হয়ে গেল?

* * *

১২ই মার্চ, ১৯৪৭

বালুপাড়ে কত অজানা পদচিহ্ন; তার উপর সাগরের ঢেউয়ের কী রাগ। দূর থেকে ছুটে এসে আছড়ে পড়ে, আকুলিবিকুলি হাত বাড়িয়ে মুছে দেবার কী অবিরাম চেষ্টা। উঁচু পাড়িতে বসে দেখি জোয়ারের জলে মুছেই যাচ্ছে, মুছেই যাচ্ছে। এদিকে লোকজনের চলাচল কমে গেল—নূতন পদচিহ্ন আর পড়ে না বললেই চলে। তারপর যতদূর দেখা যায় সাগরের জল ধুয়ে-মুছে সব কিছু পরিষ্কার করে দিয়েছে।

এবারে ভাটার জল আর এগুচ্ছে না। ঢেউ ভেঙে পড়ে লম্বা লম্বা হাত আর এগিয়ে দিচ্ছে না—এখন যেন লক্ষ লক্ষ রূপার নূপুর নেচে নেচে নাচের গরমে গলে গিয়ে জলে মিশে যাচ্ছে।

সকালবেলা গিয়ে দেখি সেই পরিষ্কার ধোয়া-মোছা বালিতে সাগর ঝিনুকের গয়না সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছে—প্রথম আলোর সঙ্গে সঙ্গে তারা ঝিলমিলিয়ে উঠল।

বাড়ীতে কুড়িয়ে আনলুম। দেখি ম্লান হয়ে গিয়েছে। যেন সুন্দরীর কানের দুল ভেলভেট বাক্সের কফিনে সাজানো ফ্যাকাশে মড়া।

* * *

১লা আগস্ট, ১৯৪৭

এবারে প্রথম সন্ধ্যায় সমুদ্রপারে গিয়ে দেখি সবাই যেন বেজার মুখে ঘাড় বাঁকিয়ে বসে আছেন। আপন আপন কাজ করে যাচ্ছেন সবাই কিন্তু আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে—বাড়ীর বউরা যেমন মুখ গুমসো করে শাশুড়ীর দিকে না তাকিয়ে আপন আপন কর্তব্য করে যান। আমি এদিক ওদিক ঘুরঘুর করে অনেকক্ষণ চলাফেরা করলুম কিন্তু কেউ একটিবারের তরেও সাড়া দিল না।

সবাই আপন আপন কাজ করলেন আবার—মিনিমাল রেট। আকাশ যে সেই শেলেটের রঙ নিয়ে মুখভার করে বসেছিল তার রদবদল হল না—জল যে সেই ফিকে শ্যাওলার রঙ নিয়েছিল তার উপরে সূর্যাস্তের কোনো রঙ এক লহমার তরে গায়ে মাখল না—আকাশ কতকগুলো সাদা মেঘের বুদ্বুদ ওড়াচ্ছিল, সেগুলোকে নড়ালো না, ফাটালো না—জলের ঢেউ একটানা দড়ি পাকিয়ে পারে এসে সেগুলোকে কুটিকুটি করে ছিঁড়ল, পারের দিকে এগুলো না, সমুদ্রের দিকে পেছুলো না।

আমি অবহেলায় লজ্জা পেয়ে বাড়ীমুখো হলুম।

এমন কি সেই চারজন জুয়াড়ি ঠিক সেই রকম উবু হয়ে আধা আলো-অন্ধকারে জুয়া খেলছে। এই চারটি মাস যেন হুশ করে তাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গিয়েছে।

* * *

১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭

ফোটোগ্রাফ তোলাবার সময় মানুষ যে রকম কাঠের পুতুল হয়ে বসে, আজ সকাল থেকে জল স্থল আকাশের সেই অবস্থা। যে মেঘের টুকরো ভোর হওয়ার সঙ্গে আডায়ারের আকাশে বাসা বেঁধেছিল সে এখনো ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে—টেলিগ্রাফের খুঁটিতে শূলবিদ্ধ হয়ে। কৃষ্ণচূড়ার চিকন পাতার স্পন্দন সমস্ত নিস্তব্ধতাকে যেন আরো নিস্তব্ধ রূপ দিচ্ছে, সিগরেটের ডগা থেকে ছাইটুকু মাটিতে পড়ল ডাইনে বাঁয়ে এতটুকু না পড়ে।

কী অসহ্য থমথমে গরম। যেন ইলেকট্রিক উনুনে রান্না হচ্ছে—আগুনের হল্কা চোখে পড়ে না। কালোজাম পচতে আরম্ভ করেছে, নিমপাতা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে, কলতলার কলরব চীৎকার-বিদীর্ণ। দূর জেলেপাড়া থেকে মেয়েটি কলসী কাঁখে করে, আসছে যেন রোদ্দুরের বন্যা উজান ঠেলে ঠেলে। এদিকে অজন্তা-স্তনওয়ালী মালীবউ সবুজ মেরুনের শাড়ী কাচছে, আর থেকে থেকে কপালের ঘাম মুচছে।

এতদিন হাওয়ার গর্জন আর সমুদ্রের হুঙ্কারে বাড়ীঘরদোর ডুবে থাকত বলে বাইরের পৃথিবীর বিচিত্র কোলাহল কানে এসে পৌছত না। আজ বাতাস নেই, সমুদ্র ক্লান্ত—তাই অনেক রকম শব্দ কানে এসে পৌচচ্ছে, এমন কি পাশের বাড়ীর কড়া পর্দানশীন মুসলমান মেয়েদের জীবনযাত্রার অর্ধগুঞ্জরণ এখানে এসে পৌচচ্ছে। রোজার শেষের দিক, কড়া গরম, হাওয়া বন্ধ—তাই সে গুঞ্জরণে ক্লান্তি জড়ানো।

পশ্চিমের বর্ষা এদেশে দুর্বল—পুবের বর্ষার এখনো ঢের দেরি। ইংরাজ রাজত্বের অবসান হয়েছে, দেশী লোক এখনো আসনে বসেননি—তারি ফাঁকে লাহোর কলকাতার অরাজকতার মত গরমের একচোট নির্মম প্রহার!

* * *

১৬ই আগস্ট, ১৯৪৭

যখন বন্ধু কলকাতায় তখন তিনি কাজকর্মে বড্ড ব্যস্ত থাকেন বলে চিঠিপত্র লিখতে পারেন না, যখন বোম্বায়ে তখন dull feel করেন বলে—তা সে বর্ষার জন্যই হোক অথবা কোনো কাজকর্ম নেই বলেই হোক—চিঠি লিখতে পারেন না; তার উপরে, তাঁরই ভাষায় মাঝে মাঝে চিঠি না লেখার spell আসে বলে চিঠি লিখতে পারেন না। এ তিন ফাঁড়া কাটিয়ে চিঠি লেখার শুভলগ্নে পৌছতে পৌছতে আমাদের বন্ধুত্ব এত পাকাপোক্ত হয়ে যাবে যে তখন চিঠি লেখার আর প্রয়োজন থাকবে না। 'অনুপস্থিতি' নাকি 'দুই বিরহী হৃদয়কে এক করে দেয়'—চিঠিপত্র না লেখার নীরবতা দুই হৃদয়কে আরো এক করে দেয়। তার উপর আরো একটা প্রবাদ রয়েছে—'নীরবতা হিরণ্ময়'।

আমার হাসি পেল, অগোচরে যে অবহেলা রয়েছে সে-ই এসব ফাড়া জুটিয়ে দিয়ে অপরাধী বিবেকদংশনে প্রলেপ লাগায় এবং অজানাতে সেই প্রলেপ 'যুক্তি'র রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। মানুষ ভাবে সে দুর্গন্ধপ্রলেপ বন্ধুর কানে সুধাবর্ষণ করবে।

* * *

১৭ই আগস্ট, ১৯৪৭

কয়েকদিন ধরে বেশীর ভাগ সময় হাওয়া বন্ধ থাকে বলে গরমে মনপ্রাণ কচ্ছপের মত হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে। কাল বেতারে বলল আজ এ অঞ্চলে বৃষ্টি হবে। সকালে দেখি হাওয়ার দিক পরিবর্তন হয়েছে। বর্ষার গোড়ার দিকে যে রকম পশ্চিম দিক থেকে হাওয়া বইত ঠিক সেই রকম গরম বাতাস বইতে শুরু করেছে কিন্তু উপরের আকাশে অম্বুহীন পাণ্ডুমেঘ পূবসাগর থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে পশ্চিমের দিকে চলেছে। দুপুরবেলা হাওয়া বন্ধ হয়ে গেল—বিকেলের দিকে ফের পূবের বাতাস বইতে আরম্ভ করল। ভাবছি এই দুটানার ভেতর আকাশ মনস্থির করে বর্ষণ করবেন কি করে। এযাবৎ যা অবস্থা তাতে তো মনে হয় না বৃষ্টি হবে। অথচ বর্ষায় সমুদ্রের প্রলয় নাচ দেখার জন্যই তো এখানে এলুম। গরমে প্রাণ যায়, নতুন বই আরম্ভ করতে কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ করিনে।

জানি অভ্যাস নেই বলে লিখতে কষ্ট বোধ হয়। মানুষ সে কষ্ট নানা কারণে সয়ে নিয়ে বই লেখে। কেউ টাকার জন্য, কেউ প্রিয়জনদের কাছে নিজের দাম বাড়াবার জন্য, কেউ আত্মম্ভরিতার তাড়নায়। আমার বেলা শুধু প্রথম কারণটা খাটে, অথচ টাকার জন্য লিখতে মন যায় না। মনে হয় তার চেয়ে অল্প মেহনতে খবরের কাগজে লিখে টাকা পাওয়া যাবে।

* * *

১৯শে আগস্ট, ১৯৪৭

মাদ্রাজ উপকূল দুই বর্ষার সঙ্গমভূমি। পশ্চিমের বর্ষা এখানে আসে ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু এখানে এসে তার আর সে ঝামর মুখ কৃষ্ণগম্ভীর হয়ে বর্ষণ-আশা সঞ্জীবিত করে না। ব্যাঙালোরেই দেখছি পশ্চিমের মেঘ পূব দিকে যাচ্ছে কি রকম পানসে চেহারা নিয়ে। এখানে দেখি সে মেঘ প্রায় সাদা হয়ে গিয়ে শরতের হংসশুভ্র ঝালর হয়ে নীল চন্দ্রাতপে দুলছে। এখান থেকে আর পূব দিকে যেতে চায় না, এক সমুদ্র পার থেকে রওয়ানা দিয়ে অন্য সমুদ্রপারে পৌঁছে আর যেন এগুবার উৎসাহ তার নেই।

তাই কোনো কোনো দিন দেখি অদ্ভুত দৃশ্য। নীচে পশ্চিম সাগরের মেঘ চুপচাপ দাঁড়িয়ে, আর উপরে পূব সাগরের মেঘ মন্থর গতিতে পশ্চিম দিকে

রওয়ানা হয়েছে। আর কখনো বা দেখি পশ্চিমের মেঘ সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে আর উর্ধ্বে অতি উর্ধ্বে পূবের মেঘ শান্ত শুভ্র স্থির হয়ে সমস্ত আকাশ জুড়ে বসে আছে—দুই স্তরের মাঝখানে বিপুল ব্যবধান।

কখনো আসে পশ্চিম থেকে গরম বাতাস—দাক্ষিণাত্যের তৃষ্ণার্ত উষ্ণ জনপদের বহ্নিদাহণের শুষ্ক ও চর্মদাহক। কখনো আসে বাতাস—ভিজে ভিজে। বঙ্গসাগরের ঠাণ্ডা জলের পরশ পেয়ে পেয়ে সুশীতল।

কাল রাত্রে দুই বাতাসে আর দুই সমুদ্রের মেঘে কি বোঝাপড়া হল জানিনে। মাঝরাতে বৃষ্টি আরম্ভ হল। বাতাস আর বৃষ্টি এল পশ্চিম দিক থেকে।

সকালবেলা দেখি সমস্ত আকাশ কালো কম্বল দিয়ে পালঙ্ক ঢাকা দিয়েছে—দুই মেঘের মাঝখানের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে তারা যে গভীর নিবিড় আলিঙ্গনে গড়িয়ে পড়েছে, বাকি পৃথিবীকে তারা দেখতে দিতে চায় না।

* * *

২৬শে আগস্ট, ১৯৪৭

অশান্ত ক্রন্দন।

সমুদ্রপারে অশান্ত মন নিয়ে যেতে নেই। মন জানে যে সমুদ্র প্রাণহীন তার গর্জনে অথবা ক্রন্দনে কোনো অর্থ নেই এমন কি গর্জন বা ক্রন্দন শব্দ দিয়ে এই অনুভূতিহীন ধ্বনিকে চৈতন্যের স্তরে নিয়ে আসা ভুল। সুস্থ লোক এতত্ত্ব জানে, এবং তার অবচেতন মনেও এ সম্বন্ধে কোনো দ্বিধা নেই বলে সমুদ্রের ধ্বনি সম্বন্ধে সে খানিকক্ষণ পরেই অচেতন হয়ে যায়।

কিন্তু যার অবচেতন মন বিক্ষুব্ধ সে বেশীক্ষণ বুদ্ধিমানের মতন স্বীকার করে বসে থাকতে পারে না যে সমুদ্রধ্বনি নৈসর্গিক প্রাণহীন শব্দ তরঙ্গ মাত্র।

সে শুধায়:

এর হৃদয়ের অন্তস্তলে কি আলোড়ন? সে আলোড়নের কেন্দ্র কোথায়? সে কি দূরে উদয়-দিগন্তেরও পেছনে? সেই আলোড়ন কি দৃষ্টির অগোচরে অন্তরালে উদ্বেলিত হয়ে হয়ে এই সিন্ধুপারে এসে আর নিজেকে সামলাতে না পেরে শুভ্র অশ্রুজলের কোটি কোটি শ্বেত বুদ্বুদে ভেঙ্গে পড়ছে?

না এ অনাদৃতা সুন্দরী? ক্ষণে ক্ষণে নীল অঙ্গনের উপর শুভ্র ফেনের আলিম্পন এঁকে রবিকরকে তার চটুল নৃত্যে প্রলুব্ধ করছে। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যভঙ্গের ভয়ে দ্রুততর গতিতে নব নব আলিম্পনের পরিবেশন করে যাচ্ছে। সব চেষ্টা বিফল হল বলে শেষ রশ্মি মেলাবার সঙ্গে সঙ্গে তার সকরুণ ক্রন্দন নিষ্ফল

আক্রোশ গর্জনে পরিণত হচ্ছে ?

না এ অভিমানী শিশু। দূর থেকে দেখতে পাই ছুটে আসছে, তার ঠোঁট কাঁপছে, ডাইনে বাঁয়ে কোণের কাছে বিকৃত ভঙ্গি নিয়ে ফাট-ফাট হচ্ছে, তারপর কাছে এসে পারের উপর আছড়ে পড়ে শতধা অশ্রুতে বিগলিত হয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠছে। পারের মা কিন্তু হাত বাড়িয়ে কোল দিলেন না। ওদিকে কে যেন সেই থমকে-গিয়ে-চুপ করে যাওয়া শিশুকে মায়ের পায়ের কাছ থেকে ভাঁটার টানে সরিয়ে নিল।

না কাণ্ড জ্ঞান বিবর্জিত মাতাল ? বেহুঁশ বেখেয়ালে ক্রেমন্থ খাঁতের উপর বোতলের পর বোতল সোডার ফেনা ঢেলেই যাচ্ছে, ঢেলেই যাচ্ছে। আর সেই মাতলামোর ভেতরে ও যতই দেখছে হুইস্কি-সোডার রঙ আসছে না ততই রোষে ক্রোধে গর্জন করে যাচ্ছে ?

* * *

৩১শে আগস্ট, ১৯৪৭

চোখ বন্ধ করে বসেছিলুম। অন্ধকার নেবে আসছিল মুমূর্ষুর চোখ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসার মত করে।

ভেতরে ভেতরে যেন সাড়া পেলুম—না সত্যি শুনতে পেলুম আমার পাশ দিয়ে কে যেন চলে গেল।

চোখ মেলে দেখি সত্যি তো। আমার চোখের সামনে দিয়ে কে যেন সমুদ্রের উপর সোনালী জল শাড়ী থেকে নিংড়ে ফেলে ফেলে, সমুদ্রকে যেন দুই ভাগ করে সোজা উদয় সীমান্তে পৌঁছে গিয়েছে—চোখ বন্ধ ছিল তাকে দেখতে পাইনি। শেষ প্রান্তে পৌঁছে ঐ সাদা দেয়াল বেয়ে অভিসারিকা যেন কার বাড়ীর ঝরোকায় দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেল সমুদ্রের উপর তার চলে যাওয়ার সোনালী চিহ্ন ঝলমল করছে—অবাক হয়ে তাই দাঁড়িয়ে আছে। মুখে ঘোমটা নেই।

পূর্ণচন্দ্র।

এক মিনিটের তরে। যার জন্য অভিসার সে যেন তাড়াতাড়ি এসে কালো মেঘের কম্বল দিয়ে সুন্দরীর মুখ ঢেকে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সোনালী রাস্তা যেন মন্ত্রবলে অন্তর্হিত হল। আকাশ-বলুপার সব আড়ি-পাতার-দল অন্ধকারে গা ঢাকা দিল।

* * *

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭

পাছে অন্য লোকের হাতে পড়ে যায় তাই খবরের কাগজ দিয়ে জানালে সন্ধ্যে সাতটা পনেরোয় দেখা হবে। আমাকে খুঁজে নিতে তোমার অসুবিধে হবে না জানতুম তাই ডাঙ্গায়-তোলা নৌকাখানার আড়ালে সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসলুম।

রাক্ষুসে সমুদ্র লক্ষ লক্ষ সাদা দাঁত দিয়ে বালুপারের গায়ে অবিরাম কামড়াচ্ছে। সূর্য ডুবল সাড়ে ছ'টায় আকাশের শেষ লালিমা মোছার সঙ্গে সঙ্গে বেলাভূমি নির্জন হতে লাগল, সাতটা বাজতে না বাজতে বেশ অন্ধকার হয়ে এল, জনমানবের চিহ্ন নেই, আমি এক নৌকার আড়ালে বসে—মনে কোন ভয় নেই, আমাকে ঠিক খুঁজে পাবে, কতবার পেয়েছ, কোনদিন ফাঁকি যায়নি।

নির্জন, অন্ধকার। তোমার আসার সময় হল বলে। চিরকাল এসেছ নিঃশব্দ পদক্ষেপে তাই শুধু চোখ দিয়ে তোমার প্রতীক্ষা করেছি।

অন্ধকারে ঘড়ির কাঁটা জলজ্বল করছে।

তোমার আসার সময় পেরিয়ে গেল।

তারপর সাড়ে সাতটা বাজল, পৌনে আটটা, আটটা। একি! তুমি তো কোনদিন এক মিনিটের তরেও আসতে দেরী করো না। আমাকে কোনদিন খণ্ডিত বিপ্রলব্ধ করোনি। তবে আজ! খবরের কাগজে দিয়ে লগ্ন মুহূর্ত পাকাপাকি জানিয়ে দিয়ে।

এক ঘণ্টা ধরে ঘড়ির কাঁটা দেখছি, বুকের কাঁটা গভীর হতে গভীরতর হয়ে ঢুকেছে।

সোয়া আটটায় উঠে দাঁড়ালুম।

বাড়ীর দিকে চলার মুখে একবার ফের শেষবারের মত পেছনের দিকে তাকালুম।

কৃষ্ণ-সপত্নের আলিঙ্গনে এতক্ষণ মুখ ঢেকে রেখেছিলে? তারি জটার ভেতর দিয়ে আমার অবমানিত প্রত্যাগমনের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে গিয়ে ধরা দিলে!

লজ্জা পেয়ো না সুন্দরী। বহু লাঞ্ছিত অপমানিত রক্তসিক্ত এ দেহে আর স্থান নেই যেখানে তোমার দৃষ্টিক্ষেপ নব অবমাননার অচেনা বেদনা হানতে পারে।

তুমি যেন বেত্রাহত গায়ে উল্কি সাজালে!

* * *

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭

পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ প্রায় চতুর্দিকেই খোলা বলে গোলচক্রবাল, গম্বুজের

মত আকাশ। মনে হয় সোনালী নীল আণ্ডার মাঝখানে বসে আছি হাঁসের বাচ্চাটির মত—ছেলেবেলায় বারুণীতে জাপানি খেলা কিনতুম, গোল কাঁচের ভেতর সোনালী হাঁসের ছানা।

এতদিন ধরে এই হাঁসের বাচ্চার মত অপেক্ষা করেছি এই নীল আণ্ডা ফাটবে কবে আর আমি এই বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে যাব। কিন্তু যতই ভাবি ততই কূল কিনারা পাইনে যে এই আণ্ডার বাইরে আছে কি। হাঁসের বাচ্চা ডিমের ভেতরে বসে কি ভাবে জানিনে কিন্তু সে যতই কল্পনার ছুট লাগাক না কেন, সে কি কখনো বাইরের পৃথিবীর কল্পনা করতে পারে। তাই কল্পনা করে কি লাভ।

দুপুর রাতে ঘুম ভাঙ্গল—দেখি চাঁদ যেন আকাশের আণ্ডাতে ফুটো। অনেকক্ষণ ধরে তাকালুম যে এর ভেতর দিয়ে মুক্তির পৃথিবীর সন্ধান মেলে কিনা।

* * *

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭

পশ্চিমের তপ্ত বাতাস থেকে থেকে কালোজাম গাছের ঝুঁটি ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণচূড়া আর নিমের চিকন পাতার ঝুঁটি হাতের মুঠির ধরা এড়িয়ে যায় বলে তারা শুধু দোল খায়।

কৃষ্ণচূড়ার বীজপুট চারমাস হল শুকিয়ে গিয়েছে কিন্তু কিছুতেই গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়তে চায় না, এরা না খসলে গাছ ফুল ফোটাবে কি করে?

এ যেন মরাস্বামী বিধবার সর্বচৈতন্য অভিভূত করে ভূতের মত চেপে বসে আছে, নূতন প্রেমের নব কিশলয় ফোটাতে দিচ্ছে না।

দূরে এক ফালি নীল সমুদ্র—বালুচর আর দিগ্বলয়ের মাঝখানে সেঁটে দেওয়া নীল রিবন। এর দিগন্তব্যাপী বিস্তীর্ণতা এখান থেকে কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। মৃত্যুর মত এর রং নীল। মৃত্যু অহরহ মানুষের চতুর্দিকে রয়েছে তবু মানুষ তার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন নয়—এ সমুদ্রেরও যে শেষ নেই সে কথা মন জানলেও সে সম্বন্ধে সে সচেতন নয়।

গাছ, সবুজ মাঠ, বালুপার, নীলজল সবকিছু রৌদ্রস্নানে পা এলিয়ে দিয়েছে—কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, কেউ শুয়ে শুয়ে। মেঘমুক্ত আকাশ শরতের নীলরঙ এখনো ধরেনি—বর্ষার ভয়ে এখনো সেই পুরানো ফ্যাকাশে বরষাতি দিয়ে গা জড়িয়ে রেখেছে। বাতাস নিষ্কর্মা ভবঘুরের মত এ-গাছে ও-গাছে ধাক্কা

দিচ্ছে—মেঘ বয়ে নিয়ে আসার বেগার থেকে যেন রেহাই পেয়েছে।

জেলে পাড়ার নারকোল পাতার ছাউনি বর্ষায় ভিজে কাকের মত জবুথবু হয়ে বসে ছিল। রৌদ্রে এখন যেন পালক শুকিয়ে উস্কো-খুস্কো হয়েছে। যদি একদিন উড়ে চলে যায় তবে নগ্ন দারিদ্র্যের এই চক্ষুশূল থেকে হেথাকার মানুষ নিষ্কৃতি পাবে।

গতিহীন, বেগহীন নির্জীবতা পূব বাঙলার নদীর পারে গড়ে ওঠা মানুষকে বাড়ীর কথা দেশের কথা বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেয়।

২৯শে জুন ১৯৫৫

স্বপ্ন

সকালবেলা ঘুম ভেঙে গেল স্বপ্ন দেখে।

কি স্বপ্ন ?

আমি যেন একটি রসিকতা তৈরী করার চেষ্টা করছি। ইংরিজিতে যাকে বলে humourous story—ঐ যে-সব বস্তু Tit-Bitsএ বেরোয়।

কি গল্প তৈরী করলুম ?

এক ভদ্রমহিলা ভিখিরি tramp কে শুধাচ্ছেন, 'তা, তুমি কাজকর্ম করো না কেন ?'

'ম্যাডাম, কাজ দেয় কে ?'

'আমি দিচ্ছি। আমার বাগানটি বড় অযত্নে আছে। তুমি ওটাকে একটু সাফ-সুৎরো করে দাও।'

ট্র্যাম একটু ভেবে বললে, 'তাই সই।'

মহিলা বললেন, 'যন্ত্রপাতির কি কি দরকার হবে তার একটা ফর্দ করা যাক্।' বলে তিনি একটা কাগজে 'কোদাল,' 'কাস্তে' এসব লিখলেন। তারপর ভ্যাগাবণ্ডকে বললেন, 'আমার আর তো কিছু মনে পড়ছে না। আচ্ছা তুমি কাগজ পেন্‌সিল্ নিয়ে ভেবেচিন্তে বাকিগুলো লেখো। আমি ততক্ষণ তোমার জন্য গোটা দুই স্যানউইচ নিয়ে আসি।'

ফিরে এসে দেখেন, ভ্যাগাবণ্ড লিখেছে, বেশ বড় বড় হরফে,—

এক খানা খাট

দুটি বালিশ !'

ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর আমি অনেকক্ষণ ধরে ভাবলুম। স্বপ্নে এ রকম গল্প বানাবার প্রবৃত্তি আমার হতে যাবে কেন? আমার বন্ধু-বান্ধবদের কেউই তো কখনো বলেননি যে তাঁরা স্বপ্নে রস-গল্প তৈরী করেছেন। কোন humourist-এর আত্মজীবনীতেও এরকম ঘটনার কোনো উল্লেখ পাইনি।

হ্যাঁ, জানি, কেউ কেউ একটা episode দেখেছেন। যেমন মনে করো, রবিবাবুর 'গানভঙ্গ'। তিনি দেখলেন, বড়বাবু (দ্বিজেন্দ্রনাথ) তাঁর বাল্যসখা এক বুড়োকে মজলিসে গান গাইতে হুকুম দিলেন। সে গান গাইতে গিয়ে কেঁদে ফেললে ব'লে, তিনি তার হাত ধরে তাকে সভাস্থলের বাইরে নিয়ে চলে গেলেন।

তাই নিয়ে রবিবাবু 'গানভঙ্গ' লিখলেন।

এরকম ধারা আরো বিস্তর হয়েছে।

কিন্তু এই humourous story by itslf, স্বপ্নেই সম্পূর্ণ তৈরী করে দেওয়া—উপরের episode গুলো, কিছুটা স্বপ্নে বাকিটা জাগরণে—এর উদাহরণ তো জানিনে। এটা কি করে হ'ল।

তখন মনে পড়ল, আইয়ুব, কচিতে, আমাতে একদিন কথা হচ্ছিল, আমরা উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাট্য সবই লিখতে পারি। ওৎরাবে কি না, সে হচ্ছে অন্য কথা। আমরাই হয়তো তখন বলব, এ গল্প কিন্তু গল্প হ'ল না, এ উপন্যাস কিন্তু উপন্যাস হ'ল না, ইত্যাদি। কিন্তু tit-bits-এর গল্প লেখা আমাদের সাধ্যের বাইরে। এ সব গল্পের উৎস কোথায়, কি করে আরম্ভ হয়, তার কোন পাত্তাই আমরা জানিনে। তাই যদি জোর করে কিছু লিখি তবে সেটা হবে nothing: আমাদের ছোট গল্প লোকে বলবে খারাপ ছোট গল্প, উপন্যাস পড়ে বলবে, খারাপ উপন্যাস, ইত্যাদি, কিন্তু আমাদের জোর-করে লেখা tit-bits প্রচেষ্টাকে লোকে চিনতেই পারবে না, বলবে এটা just nothing।

এ-আলোচনা আমাদের ভিতর কবে হয়েছিল আমার আর মনে নেই। দশ, পনেরো, পঁচিশও হতে পারে, কিন্তু এ আলোচনার কথা আমি বহুবার ভেবেছি।

তাই কি আমার 'অবচেতন' মন যে-সমস্যা তার গোপন কোণে সঞ্চয়ন করে রেখেছিল তাই দিয়ে এই গল্প গড়লে?

কলকাতার ৺কালীপূজো

সকাল ৮'০০ বিকটতম পিচ্-এ তীব্রতম ভলুমে মাইকবাদ্যসঙ্গীত।

চাপা দেবার জন্য রেড়িয়োর একটি যা তা স্টেশনে Classical music লাগালুম। ১০%-ও চাপা পড়লো না। কাজে মন দেবার চেষ্টা করলুম। ইয়াল্লা! হঠাৎ সেই Classical বন্ধ হয়ে তারাও পাল্লা দিতে আরম্ভ করেছে ঐ ফিল্মি গানা দিয়ে।

মোটর স্টার্ট নিচ্ছে না। রোজ সকালে সেটাকে অভিসম্পাত দি। আজ সেটা নন্দনকাননের মধুরতম সঙ্গীত বলে মনে হল—মাইকটা বেশ চাপা পড়েছে। কপাল আমার! অন্য দিনের তুলনায় তাড়াতাড়ি স্টার্ট নিল।

প্যাণ্ডাল যদি লং প্লেইং বাজাতো তবে হয়তো বেঁচে যেতুম। দুটো রেকর্ডের মাঝখানের নীরবতাটাই যন্ত্রণার বহর বুঝিয়ে দেয়। কনফুৎস বলেছেন, নিরেট দেওয়ালটা কোন্ কাজে লাগছে! লাগছে তো তার মাঝখানের ফাঁকটা—দরজাটা। এখানে ঠিক উল্টো। দুটো রেকর্ডের মাঝখানের ফাঁকটা না থাকলে ঐ চীৎকারে অভ্যস্ত হয়ে যেতুম।

ভাগ্যিস ওরা Classical বা রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজাচ্ছে না।

বিনোদ বলতো, জোর করে কুইনিন খাইয়েছে কিন্তু রসগোল্লা হলে আরো কষ্ট হত। এটা ঠিক নয়। Rape case আসামীর উকিল মেয়েটার Connivance ছিল প্রমাণ করতে গিয়ে শুধলো, 'কিন্তু তোমার ভালো তো লেগেছিল?' মেয়েটা বললে, 'উকিলবাবু, জোর করে কেউ মুখে রসগোল্লা পুরে দিলে সেটা কি তেতো হয়ে যায়?'

১০'১৫ গর্ব্বযন্তনা থেকে মুক্তি?

১০'২৫ Alas, false pain। ফের শুরু!

১১'৩২ বেশী না, পাঁচ পাঁচ মিনিটের ভিতর পাঁচবার, পিন গ্রুভে আটকে গাঁ ওঁ উঁ, গাঁ ওঁ উঁ। cf 'বন্ধ ছিলেম এই জীবনের অন্ধকূপে'।

দুপুর ১২·০০ আমার সুখ-শান্তিরও বারোটা। চিৎকার করে গলা ফেটে গেল। উত্তরের বারান্দায় গিয়ে বুড়ো শয়তান, আর শয়তানের আণ্ডা দুটোই প্যাণ্ডেলে জাত-ইডিয়েটের মত হাঁ করে লৌড-স্পীকারের দিকে তাকিয়ে আছে। খাসা excuse আছে—আমার ডাক শুনতে পায়নি।

আমি 'লবদ্বার' বন্ধ করে অতিষ্ঠ। আর এরা তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে ভূমার সন্ধানে একেবারে লাউডস্পীকারের সদরে।

এরাই মহাজন! পরিবেশ—তা সে যা-ই হোক—পছন্দ করতে জানে।

আর আমার প্রতিবেশীদের ঈর্ষায় বুক ফেটে যাচ্ছে—আহা, ওরা যদি আমার বদলে এ বাড়ির বাসিন্দা হত।

৩·০০ ওঃ! "কী ভুল করিনু আমি যোগী"

মডার্ন্ কবিতা আকছারই মেশিনারী থেকে নিরন্তর inspirtion পায়।

W. C.-তে বসে শুনছিলুম—উপায়ান্তর নেই অন্তত সেখানে—একটা গানে বার বার যেন পিন গ্রুভে আটকা পড়ে যাচ্ছে। শেষে বুঝলুম, অহহো। এটা deliberate নয়া টেকনীক। গাওয়াইয়া ঠিক groove-এ খাবি-খাওয়া পিনের অনুকরণে হুবহু একই শব্দ পাঁচবার—তারপর কিছু নির্ঝঞ্ঝাট গান—ফের একই শব্দ পাঁচবার—আবার ঐ গাঁ ওঁ উঁ, গাঁ ওঁ উঁর অনুকরণে গান গাইছে।

১৩·১০ আঃ কি আরাম! মহাসঙ্গীত থেমেছে। ঢাকের বাদ্যি নাকি থেমে গেলে ভালো লাগে (সে আমলে গ্রামাঞ্চলেও শব্দকাতর সজ্জন ছিলেন! আশ্চর্য); আমি বলি এই মহাসঙ্গীতর বদলে আমি ঢাকের বাদ্যি any day prefer করবো।

যে গুণী বলেছিলেন,

কী কল পাতাইছ তুমি!
বিনা বাইন্তে নাচি (নাচি) আমি॥

তিনি প্যাণ্ডেলের এ মহাবাদ্য শুনলে কি করতেন!

১৩·৪০ ওরে মূর্খ, ওরে উন্মাদ, ওরে ঘটোৎকচ! ঝাড়া তেরোটি বছর ইস্কুল কলেজে ইংরিজি পড়ে এই প্রবাদটুকু শিখিসনি, 'অরণ্যানীর লতাগুল্ম বিচ্ছিন্ন করে জনপদে পদার্পণ না করা পর্যন্ত হর্ষোল্লাস করে উঠিসনি।' কিংবা সেই বোগদাদী মূর্খ অন্‌নশ্‌শারের মত আণ্ডার ঝুড়ি সামনে রেখে রাজকুমারীকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখিসনি।

আবার আবার সেই কামান গর্জন।

লাঞ্চ খেতে গিয়েছিল। এবং এরা অত্যন্ত আইন সম্মত আচরণ করে বলে সরকারি কর্মচারীদের মত আধ ঘণ্টার বেশী লাঞ্চ আওয়ারে নেয় না। সোনারটাঁদরা বাঁচলে হয়।

'কামান গর্জন' বললুম, কিন্তু কামান গর্জন গম্ভীর সিংহ গর্জনের বত আদৌ কর্ণপটাহ-বিদারক নয়। এমন কি চ্যাংড়া মেশিনগানের ক্যাটক্যাটও প্যাণ্ডেলের তাণ্ডব-আরাবের সামনে জুঁই ফুলের গানের মত মোলায়েম।

সেদিন যেন কৃপা আমায় করেন ভগবান
মেশীন গানের সম্মুখে গাই জুঁই ঐ ফুলের গান।

গেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। হুঁ। কিন্তু এই প্রচণ্ড প্রলয় বাদ্যের সামনে তিনি কি গাইতেন?

১৪·০০ রাত্রে আমার সুনিদ্রা হয় না। আমার ভরসা দুপুর। দুপুর থেকে তিনটে অবধি দিবানিদ্রার। ঘুম লেগে আসছে, এবার কে যেন—কেসিয়াস ক্লে-ই হবে—পেটে মারে মোক্ষম গুত্তা। ফের no loudspeaker, এবারে ক্রুশের কাঁটা দিয়ে পাঁজরে খোঁচা। চললো নিদেন আধঘণ্টা।…যা দেখলুম, এ যাবৎ আমার ঘুমটাই একমাত্র হীরো যে ঐ বিটকেল মুজিকীর সঙ্গে lost battle-এর rearguard action লড়লে।

মা কালী! একটা প্রশ্ন শুধবো মা, তুমি দুপুর বেলা এ্যাট্ট দিবানিদ্রা দাও না? না এই উৎকট—সেই যে তুলসীদাস বানরদের লঙ্কা আক্রমণের সময়কার বিকট শব্দ অনুপ্রাস সহযোগে প্রকাশ করেছেন—

কটকটহি মরকট বিকট ভট কোটি কোটিগহ ধাবহি—

কি বলছিলুম মা, এই কটকহি-ই কি তোমার অতি বিকটিনী দিবানিদ্রা আয়েশের আফিং!

১৭·৩১ আমি তো অগা। তাই শুধোই, সন্ধ্যা তো হল। দেবীর আরতিটারতি হবে না? তখন তো শাঁখটাঁখ বাজার কথা। সেটা শুরু হলে বাঁচি।

ম্যাডাম কালী ভূতনাথের কোন্ পক্ষ যেন হন। না, সে বুঝি অন্নপূর্ণা—

ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে!

তা, ও, একই কথা। তা পাষাণ বাপ মরুক আর না-ই মরুক, ভাইয়ের অভিমানে যে বড্ড লাগে এটি বড়ই খাঁটি, আমাদের পাড়াগাঁয়ের ঘরোয়া বাঙালীর গোপন গন্ধে-ভরা বেদনা!

অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিল ভাই,
যে মোরে আপন ভাবে তার ঘরে যাই।

১৮·০০ শাঁখ বাজলো না, লাউডস্পীকারও থামলো না। উত্তরের বারান্দায় গিয়ে অবশ্যি শুধনো যায়। সর্বনাশ! ঈশ্বর রক্ষতু! আমার মত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, পাড়ার মুরুব্বিকে উৎসাহিত কৌতূহলী দেখে তারা না আমাকে ডবলাপ্যায়িত করার জন্য আরেকটা লাউডস্পীকার-এর সন্ধানে ভূতের ঘোড়া চেপে ছুট লাগায়!

১৯·০০ 'ডাক্তারে যা বলেক বলুক না কো', আমার দৃঢ়তম বিশ্বাস exercise physical movements of any sort স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় খতরনাক।

কিন্তু আর পারা গেল না। প্যাণ্ডেলের সঙ্গীত উচ্চতর হয়েছে। রাস্তায় নামতে হল।

প্রথমেই শুনলুম, 'লাউড্ স্পীকার বলছে, 'আজ রাত্রি আটটার সময় নির্ধারিত যাত্রা হবে না।' আমি প্রথমটায়

উল্লাস বোধ করেছিলুম। সঙ্গে সঙ্গে বললে 'কাল হবে'।

সেটা নিশ্চয়ই মিন লা. স্পী. হবে না। সেটা কি এর চেয়েও খুনীয়া হবে? কে জানে!

এখান থেকে প্রায় একশ গজ দূরে একটি ছোট্ট ঘরে আরেক কালী। প্যাণ্ডেল লাউডস্পীকার কিছুই নেই। দু'চারটি বউ বাচ্চাদের নিয়ে দাঁড়িয়ে। রাস্তায়ও যুবতী মা-ই বেশী। সন্তানের যেন অমঙ্গল না হয়।

২০১'৫ এবারে আরম্ভ হয়েছে যা তা অতুলনীয়। আধঘণ্টা ধরে রেকর্ড বাজছিল না। এখন organizer-রা বেসুরা গান গাইছেন, মাইক চরম চড়ায় তুলে। তবলাও চলছে। চতুর্দিক নিরব হয়ে যাওয়ার ফলে এবারে আমার suffering চরমে উঠেছে। কালীপূজোয় রাত জাগাটা তো স্বাভাবিক।

সকাল ১০' ৩০ ফের রেকর্ড চলছে।

গান

কীই বা হত তোমার রাজা
একটি মোরে দিলে
কীই বা ক্ষতি হত কারুর
বিরাট এ নিখিলে
তোমার বিশ্ব মধুকর
অমৃত বিভবে ভরা
কণাটুকু যেতো যদি তা
করুনা বর্ষিলে।

চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা
সাজাও আলোকমালা
তারায় তারায় বাঁধো তুমি
অলখ আলিপনা
তোমার এ যে পুন্যছবি
দিয়ে হত এর কি ক্ষতি
পিয়ার চেতনা আমার চোখে
যদি যেতো মিলে।

সুর
পণ্ডিত রতনজানকর
কলিকাতা ১৯৩৩।

কথা
সৈয়দ মুজতবা আলী

২১শে নভেম্বর ১৯৪৭

প্রিয় কণামিয়া, মৌলবী বাজার

কিসের কণা ভাবিয়া মনে হদীস নাহি পাই
হলপ তবু করিতে পারি তাঁহার সাথে নাই
জ্ঞানের যোগ, ইলিম আর বুদ্ধি যারে কয়
পেয়ছ মেলা সুযোগ তবু দাওনি পরিচয় !
না হলে এতদিনে
আসিতে হেথা, বলিতে হাসি, 'নিয়েছি আমি চিনে
যেমন করে মেঘের ডাকে ময়ূর উঠে নাচি
অলখকর-পরশ পেয়ে কুমুদ উঠে বাঁচি
—তপ্ত—খর নিদাঘ-দাহ দিবার অবসানে—।
অজানা কোন্ টানে ?
কিসের পরিচয় ?
ডাউকি হতে ছুটিল জল সাগরে হবে লয় ?
মেঘের বাণী, শুক্লা নিশি, সিন্ধু পারের ডাক,
চিনেছি আমি ভাষায় ভরা কভু বা নির্বাক।

উপযুক্ত তত্ত্বকথা করিতে সপ্রমাণ
চলিয়া আসো ত্বরিতগতি চড়িয়া মোটর যান।
সঙ্গে এনো তাবৎ লেখা তব
অছাপা ছাপা বেবাক মাল প্রাচীন আর নব।

কহেন গুণী, 'বাড়ীর জোরে বিশেষ এক প্রাণী
তেরিয়া হয়ে বীরেরে যায় হানি।'
আম্মো তাই সাহস করি তবে
—হুঙ্কারিয়া টঙ্গি ঘরে নাচিয়া ভৈরবে
মনের সুখে করিব গালাগাল,
বলিব, 'তব তাবৎ লেখা নেহাৎ জঞ্জাল
রদ্দি ওঁচা, ভ্যাপসা পচা, থাড্ডো কেলাশ অতি
ওরে রে দুর্মতি

বাড়াস কেন এ দুনিয়ার বিভীষিকার ভার
নাম যে কণা, কণামাত্র সন্দেহ নেই আর।'

১২ই জুন ১৯৫৫

মডার্ন কবিতা

এখানে কত রকম গরমই না পড়ে।
এবং বৃষ্টিও নামে কোনো প্রকারের নেটিশ না দিয়ে।
কাল দুপুর রাতে হঠাৎ ঝমাঝ্‌ঝম।
সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল, প্রাণ যেন গান গেয়ে উঠল।

আজ সকাল থেকে ভ্যাপ্‌সা গরম।
কি করি, কি করি, কি করে গরম ভুলি।

এমন সময় এক বন্ধু এলেন এক ঠোঙ্গা কালো জাম নিয়ে!
কত বৎসরের পরে কালো জাম!

মনে পড়ল,
বন্ধুরা হাসাহাসি করেছিল,
আমি যখন একদিন এই রঙের একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলুম,
কারণ আমার রঙ তখন ছিল ফর্সা,
—আজ আমার ছেলে ফিরোজের মত—।

হার্টটা দুম্ করে বন্ধ হয়ে গেল।

HEINE

[আজ সকালে হাইনের কবিতা অনুবাদ করলুম]

সত্যি সত্যি আমরা দুজনে মিলে
অদ্ভুত এক গড়েছি প্রেমের জোড়া
প্রিয়া মোর পায়ে না পারে দাঁড়াতে ভালো
আর আমি? আমি একবারে হায় খোঁড়া।

ব্যামোতে কাতর সে যেন বেরাল-ছানা
আমি তো কুকুর শুয়ে শুয়ে কাতরাই,
আমার মনেতে সন্দেহ আছে মেলা
দুজনার সাথে বেশ কিছু আছে বাই।

তার মনে লয় কমলিনী তিনি নাকি
কল্পনা করে গড়েছে আপন মনে
ফ্যাকাশে চেহারা—তাই লয় মোর মন
নিজেরে হেরো না, চন্দ্রমাসম গণে!

কমলিনী ঐ খুলিল পাপড়িগুলি
চন্দ্রমা পানে তুলে ধরে তার আঁখি
কোথায় না ভরা সফল জীবন পাবে—
হাতে তার, হায়, কবিতাটি শুধু রাখি।

রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষে

শতাব্দী হয়েছে পূর্ণ। আজি হতে শতবর্ষ পরে
নরনারী বালবৃদ্ধ কাব্য তব বক্ষোপরি ধরে
ভাবিয়া অবাক হবে কী করে যে হেন ইন্দ্রজাল
বঙ্গভূমে সম্ভবিল। পরাধীন দীন দগ্ধ-ভাল
অন্ধভূমি। তারি তমা বিনাশিতে উদিল যে রবি
স্বর্গের করুণা সে যে। বঙ্গ কবি হল বিশ্বকবি।
তারপর এ যুগের লোকে স্মরি মানিবে বিস্ময়
কোন পুণ্য বলে মোরা পেনু তার সঙ্গ, পরিচয়!

নববর্ষ

স্নেহের মুকুল,

তুমি তো আক্কেল ধরো, বলো তো আমারে
নববর্ষ লয়ে কেন ফাটাফাটি প্রতিবারে !
পুরনো বছরটারে বাতাস কুলার
দিয়ে কেন ঝাঁটা দিয়ে করে দেয় বার ?
কি দোষ করেছে, কও, পুরানো বছর
তারেই তো নিয়ে বাবা, করে নিলে ঘর
তিনশ পঁষট্টি দিন। গেল কি খারাপ,
উঠেনি কি সূর্য বুঝি, দেয় নি কি তাপ ?
উঠোন বাজারে মাছ ভালো মন্দ যাই,
ব্লেডেতে কাটিয়া মাছ দিন কাটে নাই ?
মদ্য খেয়ে চাচা বুঝি হয় নাই টং
পুপু পুটু মীরামাই করে নাই ঢং
যার যাহা, অভিরুচি ? টেটেন পটের
বীবী সেজে বেরয় নি ? মেজদা ঘটের
বুদ্ধিটি খরছ করে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের
মাথায় বুলায়ে হাত এনেছে এস্তের
খরছ করেনি তারো বেশী ? পদি সিসি
করেনি ক্যাটের ক্যাট ? ভাঙা ফাটা শিশি
করেনি কি বিক্রি, রামা, টুপাইস তরে ?
বৌদি চষেনি মাঠ চক্করে চক্করে
টাট্টু ঘোড়া যেন হায় ! যাবে অলিম্পিকে।
বড়দা করেনি রাঙ্গা বাড়িটারে পিকে ?
পাকু মাম গুড়গুড়ি বাবুজী জামাই
করেনি কি দিবারাত্রি শুধু খাই খাই ?
রকেতে দুজনা বসি করি নি কি প্ল্যান
টুপাইস কামাবো বলি—খুদা যদি দ্যান !

কে জানে জর্মনি বসে হয়তো ভাইয়া
করে রেখে আছে ব্লণ্ড গণ্ডা দুই বিয়া !

(২)

তবে কি পুরানা সাল ছিল দিশী সস্তা
তাহারে বিদায় দিয়া ভরি বস্তা বস্তা
আনিবে জর্মন মাল কিংবা সে বিলাতি
নববর্ষ—গ্যারান্টিড পাকা সে বেসাতি !
চলিবে দশটি সন এক নব বর্ষে
কই, দিদি, বলে না তো চোখেতে সরষে—
দেখি যবে, বলে কিনা এরেও বিদায়
দেওয়া হবে। বারো মাস হয়ে গেল, হায় !

(৩)

তুমি তো সেয়ানা মেয়ে চালাও সংসার
বলো দেখি তবে কেন এহেন ব্যাভার ?—
বাজে খর্চা একদম—পুরানাটা যবে
দিব্য কাজ দিয়ে যায় ; নয়া আনা তবে ?

বর

মুখ থান্ কেনে মেঘলা মেঘলা
চউক্ষে কেনে পানি
ঠোঁট ফুলাইয়া থাকলে পরে
কেমুন কইরা জানি।

কনে

ছলে বলে বানছো আমায়
কাইরা নিছো মন
কাইলকা যা কইছিলাম, নাগর
আছে নি স্মরণ ?

বর

জেওর-বেসর যত চাইছ
ঢ্যাইল্যা দিমু পায়
একটু খানি হাস কন্যা
পরাণ জ্বইল্যা যায় ॥

পিলসুজ পরে হেরো জ্বলে দীপশিখা ;
চতুর্দিকে যে আঁধার ছিল পূর্বে লিখা
মুহূর্তেই মুছে ফেলে।
কিন্তু অবহেলে
মাভৈ বলিয়া তারে ছেড়ে দেয় স্থান
যে-আঁধার পায়ে ধরে মাগে পরিত্রাণ।

'দিনলিপি'তে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের পরিচয়।

১। রাবেয়া—লেখকের স্ত্রী।

২। ফিরোজ—লেখকের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

৩। ভজু—লেখকের কনিষ্ঠ পুত্র।

৪। বিশী—প্রফুল্লকুমার বিশী (লেখক শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর মধ্যম ভ্রাতা)

পত্রাবলী

॥ পুত্রদ্বয়কে লিখিত পত্র ॥

(১)

১৮ই মে ১৯৫৫

বাবা ফিরোজ,

এই বারে তুমি আমাকে দেখেই চিনতে পারলে। এর পূর্বে যতবার তোমাকে দেখতে গিয়েছি তুমি আড় নয়নে তাকিয়েছ, তোমার মায়ের হাঁটুতে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে পেছিয়েছ আর ভেবেছ, এ লোকটা কে ?

এবারে চট করে তুমি আমাকে চিনে নিলে।

দু' মিনিট যেতে-না-যেতেই বললে 'মোটর'।

আমি তৎক্ষণাৎ বাক্স খুলে তোমাকে মোটর দিলুম।

তুমি খুশী হয়ে ভঙ্গুকে কাছে নিয়ে মোটর নিয়ে খেলা করলে।

খানিকক্ষণ পরে আবার এসে বললে, 'মোটর।'

আমি বললুম, 'ঐ তো ফিরোজ'। মোটরটা দেখিয়ে দিলুম।

তুমি বললে 'না, কঁ-কৃ-কৃ, 'কঁ-কৃ-কৃ' সেই মোটর।'

বুঝতে পারলুম না।

তোমার মা বুঝিয়ে দিলে, তুমি খেলনার মোটর চাও না, তুমি চাও আসল মোটর—যে মোটরে, তুমি যখন কটকে এসেছিলে, ঘুরে বেড়াতে।

তোমার ঠিক মনে আছে।

আব্বু

(২)

২৮শে মে ১৯৫৫

বাবা ফিরোজ,

তুমি যে সব কথা বলো তার মানে কি তুমি বুঝতে পার ? অনেক সময় তুমি না বুঝে আবোল-তাবোল বলে যাচ্ছো আবার অনেক সময় দেখি যা বলতে চাও ঠিক তাই বলেছ—কথাগুলো আদপেই অর্থহীন নয়।

মাঝে মাঝে তাই ধোকা লাগে।

তোমার মা বলছিলেন তুমি নাকি একদিন ঘড়িটাকে নিয়ে বড্ড ঝুলোঝুলি লাগিয়েছিলে। পাছে তুমি সেটা ভেঙে ফেলো তাই তিনি তোমাকে ওটা

কিছুতেই দিতে রাজী হচ্ছিলেন না। শেষটায় তুমি নাকি হঠাৎ মাটিতে পা মেরে বললে, 'লাথ মারো দুনিয়াকো'

বলেই গুম গুম করে বেরিয়ে গেলে!

পরে জানা গেল, ওটা নাকি ফিল্‌মি গানার এক লাইন! তুমি তোমার আজীজ ভাইয়ের কাছ থেকে শিখেছ!

আব্বু

(৩)

১২ জুন ১৯৫৫

বাবা ফিরোজ,

তুমি নাকি একদিন আদর করে ভজুকে জিজ্ঞেস করলে, 'ভজু, তোর আব্বু কোথায়?'

আমি তখন ঢাকাতে তোমাদের দেখতে গিয়েছিলুম। তুমি 'তোমার; আব্বু'কে পেয়ে ভারী খুশী। কিন্তু ভজুকে ভালোবাসো বলে দুশ্চিন্তা হল—আমার তো তাই মনে হয়—এর আব্বু একবারও আসেনি কেন?

আব্বু

(৪)

৪ জুলাই ৫৫

গাড়ীতে পাটনা থেকে হৈদ্রাবাদ।

বাবা ফিরোজ,

তুমি বড় হলে আমারই মত গরমকাতর হবে না প্রার্থনা করি। যদিও জানি গরমকাতর হবেই। কারণ সেপ্টেম্বর মাসেও এক মিনিটের তরে পাখা বন্ধ হলেও তোমার ঘুম ভেঙে যায়।

তাই মনে করি বর্ষা ঋতু তোমার জীবনেও সেই স্থান দখল করবে যেটা সে আমার জীবনে করেছিল।

বর্ষাকালে ফসল হয়, তাই অন্নপ্রাণ মানুষ তাকে ভালবাসে। যাদের কবিত্ব-বোধ আছে তারা তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়। আমার কাছে তার সর্বাধিক মূল্য তার শৈত্যে। তুমি বলবে, সে কি, বাবা তার কবি-মনোবৃত্তি নিয়ে এটাকেই সব চেয়ে বেশী দাম দিলে! হ্যাঁ বৎস, তাই।

যৌবনে আমি ১২৬° ভিতর দিয়ে খাইবার পাস পার হয়েছি। কষ্ট পেয়েছি, কাতর হয়ে পড়েছি, কিন্তু তাই বলে ভ্রমণের উৎসাহ কমেনি।

এখন কিন্তু মস্তকে বজ্রাঘাত হয়। এই গরমে কোথায় যাব! বাড়িতেই প্রাণ অতিষ্ঠ।

ভোজপুর। (শাহাবাদ Dt)

কচুরীপানা নেই।

আমবনের জমা-জলে গাছের কালো ছায়া। দেখে মনে হয়, গ্রামের কলহ বর্জন করে, গাঁওবুড়োরা সভায় বসেছেন।

ধান পর্যন্ত ফলাচ্ছে জলে ক্ষেত ভর্তি করে। মাঝে মাঝে পলিমাটি, আমার দেশে ওরকম নেই। বাঁশ!

বর্ষার ঘোলা জলে সন্ন্যাসীর স্নান। গঙ্গা থেকে দূরে, নিশ্চয়ই ইঁদারা নেই।

প্লাটফর্ম :

বুড়ী সম্পূর্ণ দন্তহীন—হাতে উল্কি বাহারে-পেড়ে শাড়ী বাসন্তী রঙের ওড়না—হাতে বিরাট বিরাট মকর-মুখো রূপোর বালা—সোনালী রেশমী চুড়ী। নাত্নী পাশে। সোনালী ওড়না, কিন্তু হাতে সোনা রূপো নেই, শুধু কাঁচ। নাত্নীর বয়স ১০।১২ কিন্তু সবসুদ্ধ নিয়ে বুড়ীটাই সুন্দরী।

আরেক মেয়ে লম্বা ঘোমটা টেনে, বস্তার আড়ালে কখনও ঘোমটা টেনে, কখনো মাছি তাড়াতে তাড়াতে আম খাচ্ছে—গোগ্রাসে।

(দিলদার নগর)

হঠাৎ মাঠ কতদূরে চলে যায়, আবার কাছে আসে।

বর্ষা এসে আমার দেশ আর এদেশের তফাৎ ঘুচিয়ে দিয়েছে—সম্পূর্ণ না, অনেকখানি।

বিহারের বিখ্যাত আমবাগানের পাশ দিয়ে ছুটে চলেছি।

(৫)

১৯.৭.৫৫

ফিরোজকে ট্রেনে

অতএব হাতের লেখা টলটলায়মান।

আমার মনে মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে তুমি কি আমার মত এত সব দেশ-

বিদেশ দেখবে? আজ আমি পাটনা থেকে দানাপুর—আরা—বক্সার হয়ে দিল্লী যাচ্ছি।

কী নিবিড় ঘন বর্ষাই না নেমেছে। আকাশ বাতাস সবই শ্যামল স্নিগ্ধ শীতল। কামরার সব শার্সী তোলা, তবু সব কিছু ঠাণ্ডা। বাইরের ভুবন ঝাপসা। দূর দিগন্তের সবুজ গ্রাম, তার উপর নীলাকাশের সুনীল মেঘ নেমে এসেছে। বৃষ্টি-কণা সারাক্ষণ তাকে ঝাপসা করে দিচ্ছে। কখনো দেখতে পাই, কখনো পাইনে।

ধরণী যেন সর্বাঙ্গ উন্মোচন করে নববরষণের মুক্তিস্নানে আনিদ্র আসুপ্ত হয়ে আছেন।

কী সুন্দর দৃশ্য। হয়তো তুমি একদিন দেখবে।

তোমার

আব্বু

(৬)

ট্রেনে-টলটলায়মান

২৫.৭.৫৫

বাবা ফিরোজ,

তুমি যখনই গাড়ীতে যাও না কেন, মোগলসরাই থেকে দুদিকে চোখ রাখবে। চুনার, বিন্ধ্যাচল অঞ্চল অপূর্ব সুন্দর।'

১৯২৬এ প্রথম এ জায়গা দেখি।

১৯৫৫য় আজ আবার যাচ্ছি।

সেই সৌন্দর্য!

আব্বু

(৭)

৩ অক্টোবর '৫৫

বাবা ফিরোজ,

আমার একটা বইয়ের নাম 'দেশে বিদেশে'। বাংলায় ইডিয়ম 'দেশ, বিদেশে'। অর্থাৎ সর্বত্র, অর্থাৎ 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে।' আমি কিন্তু 'দেশে বিদেশে' শব্দার্থে লিখেছি অর্থাৎ এ বইয়েতে কিছুটা 'দেশের' বর্ণনা পাবে যথা পেশাওয়ার ইত্যাদি, আর বাকিটা 'বিদেশের' অর্থাৎ এস্থলে কাবুলের।

'দেশ-বিদেশের' অন্য অর্থ ধরে।

আমি যদি কখনো 'দেশ-বিদেশে' লিখি তবে তাতে যত্রতত্র সর্বত্রর বর্ণনা পাবে। সে-বই তা হলে বিয়াল্লিশ-ভলুম হবে। তার ফুরসৎ আমার নেই।

রবিঠাকুর লিখেছেন, (রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৬ খণ্ড, পৃঃ ৩২৪) রাণী খুঁজতে বেরিয়েছিলাম দেশে বিদেশে।

তিনি 'দেশে বিদেশে' কি অর্থে ব্যবহার করেছেন। একটু অনুসন্ধান ক'রো তো।

আব্বু

পুঃ আজ আমি খুব বকবকানিতে আছি। এ চিঠির আগে আরেকটা চিঠি লেখা হয়ে গেছে।

(৮)

১৯.১০.'৫৫

বাবা ফিরোজ,

তোমরা যখন কটকে এসেছিলে তখন আমার alsatian কুকুর 'মাস্টার'কে বড় ভালবাসতে। বরঞ্চ বলা উচিত, মাস্টার তোমাদের অনেক বেশী ভালোবাসতো। কে কতখানি কাকে ভালোবাসতো সে কথা আরেকদিন হবে।

তোমার মা তখন স্থির করলেন, তোমাদের জন্য একটি কুকুর পুষবেন।

আমি যখন এবারে ঢাকায় গেলুম, তখন দেখি, ছোট্ট একটি ফুটফুটে কুকুর। কী সুন্দর। আর কী তেজ! এক লাথি মারলে সে তিন টুকরো হয়ে যাবে। অথচ আমাকে যা তাড়া লাগালে! তিন মিনিটেই কিন্তু দোস্তী হয়ে গেল যখন দেখলে, তোমরা সবাই আমার দিকে হাসি মুখে এগিয়ে আসছো।

ওর নাম কি? জাম্বু। সে কি, এক ফোঁটা পাপীর নাম জাম্বু!

তোমার মা বললেন, গাণ্ডেরিয়ায় তোমার মাসীমার যে কুকুর আছে তার নাম জাম্বু। তুমি যখন সেখানে থাকতে তখন ঐ জাম্বুর সঙ্গে তোমার খুব ভাব-সাব ছিল বলে ওকে তুমি জাম্বু বলে ডাকতে আরম্ভ করলে। বুঝলাম, তোমার বয়সে কুকুর মানেই জাম্বু।

তার সঙ্গে আমার কী বন্ধুত্বই না জমে উঠেছিল। আমি তাকে আদর করতুম, আর সে ন্যাজটি বর্মি পাখার মত গোল করে মেলে দিয়ে ফ্যাশানেবল মেয়েদের মত দোলাতে আরম্ভ করতো। যখন ঘুমিয়ে থাকতো তখনো মাঝে মাঝে চোখ একটুখানি খুলে দিয়ে মিটমিটিয়ে দেখতো আমি তার পাশে বসে আছি তো। তোমরা দু' ভায়েতে যখন তার উপর বড্ড বেশী চোটপাট করতে তখন সে এসে

আমার কাছে আশ্রয় নিত। অবশ্য বেশীক্ষণের জন্য নয়। আবার যেত তোমাদের কাছে। ভজু হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে কাছে এসে ন্যাজে দিত টান, আর তুমি দুই হাতে তার মুখ ফাঁক করে যে রকম উপর নীচ টানতে তা দেখে পুরাণের কোন এক বকাসুর-বধ না কিসের এক ছবি মনে পড়তো। জাম্বুর তখনকার অবস্থা সত্যই করুণ। মুখ দু'দিকে চেরা বলে চিৎকার পর্যন্ত করতে পারছে না। তোমাদেরও ডর ভয় নেই। বোঝো না যে-কোন মুহূর্তে ঐ একবৃত্তি কুকুর তোমাদের কুটি-কুটি করে দিতে পারে। কিন্তু সে নিয়ে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমার 'মাস্টার' যে কিনা তাগড়া 'অ্যালসেসিয়ান' তাকে নিয়েও তোমরা কটকে ঐ 'অপকর্ম' করতে। সেও জাম্বুর মত অকাতরে সইত।

* * * *

তোমার মা লিখেছেন, সে রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে পাগলা কুকুরের কামড় খেয়ে পাগল হয়ে যায়। তোমাদের স্কুলের চারটি মেয়েকে কামড়েছে। তোমাদের গায়েও নাকি আঁচড় রয়েছে। তোমাদের দু' ভাইকে ১০টা না ১২টা Injection নিতে হয়েছে। ভাবো দেকিনি, কী কাণ্ড। তোমরা দুজনাই আমারই মত delicate—নাজুক। তোমাদের কী কষ্ট হচ্ছে, তাই আমি ভাবতে ভাবতে—

[পত্র অসমাপ্ত]

(৯)

৩।১০।৫৬

আজ ঢাকাতে এলুম

বাবা ফিরোজ,

আজকাল আমি 'জলে ডাঙায়' লিখছি। তার ইতিহাস তোমাকে বলি। ১৯৫৩ ইংরিজির শীতের শেষে আমি মৈমনসিং গিয়েছিলুম। তখন আমি 'অবিশ্বাস্যে'র শেষ অধ্যায়গুলো লিখছি। রোজ সকালে বারান্দায় এক কোণে বসে বই লিখি (তুমি তখন বড্ড জ্বালাতন করতে—তোমার ইচ্ছে, আমি তোমার সঙ্গে খেলাধুলা করি) আর তোমার মা আমাকে মাঝে মাঝে চা দিয়ে যান।

একদিন চুপ করে বসে আছি। তোমার মা জিজ্ঞেস করলেন, 'লিখছ না যে।'

আমি বললুম, 'অবিশ্বাস্য' শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই বসে বসে ভাবছি অন্য

কি বই আরম্ভ করি।' তোমার মা এক মুহূর্ত না ভেবেই বললেন, 'বাচ্চাদের জন্য একখানা বই লেখ।'

আমি তদ্দণ্ডেই 'জলে-ডাঙায়' লিখতে বসে গেলুম। এর কয়েকটা instalment আমি ৪৮-৪৯ সনে 'বসুমতী'তে প্রকাশ করেছিলুম বটে কিন্তু তার পর ওটার কথা আর ভাবিই নি। তাই নূতন উৎসাহে বইটা লিখতে আরম্ভ করলুম।

উৎসাহের কারণ :—

(১) তোমার মা বলেছেন,

(২) দেখলুম, তোমার বয়স যখন ১২।১৪ হবে, তখন আমি তো এ-লোকে থাকবো না; তাই তোমার জন্য তোমার ঐ বয়সের উপযোগী—কিছু লিখে রেখে গেলে তুমি খুশী হবে। উপস্থিত 'জলে ডাঙায়' বসুমতীতে বেরচ্ছে।

আজ এখানে শেষ বর্ষা যাচ্ছে। এখানে এটাকে 'হাতিয়া' নক্ষত্রের বৃষ্টি বলে। এরপর নাকি এদেশে আর বৃষ্টি হয় না।

চওড়া বারান্দায় বসে শুনছি, ঝিল্লির ঝিলিঝিলি তার সঙ্গে ব্যাঙের 'কর্ কর্ কর্ কর্'। সামনে দেয়ালে বেয়ে ওঠা মধুমালতীলতা দুলছে, লাল সাদায় মেশানো ফুলগুলো কাঁপছে,—

দাঁড়াও, এই লতাকে যে 'মধুমালতী' বলা হয় তার কোনো হদীস নেই। কারণ এগুলো তো এসেছে রেঙুন থেকে—এখনও একশ' বছর হয়নি। অথচ 'মধুমালতী' প্রাচীন নাম। ইংরিজিতে একে বলে Rangoon Creepers, (ইংরিজিতে 'শিউলি'কে বলে Sorrow Flowers, টগরকে বলে Twister Jasmine, বেলকে বলে Wood apple, সজনেডাঁটাকে বলে Drum sticks, ঢ্যাঁড়শকে বলে Lady's fingers—এগুলো ইংলণ্ডে নেই বলে কোন ইংরেজ এগুলো বুঝবে না,—অর্থাৎ এগুলো Anglo-Indian শব্দ)। ঠিক ঐ রকম মাধবী কি ফুল কেউ জানে না। গুরুদেব এক নাম-না-জানা লতাকে মাধবী নাম দেন। তারপর গান রচেন, 'হে মাধবী দ্বিধা কেন?' 'পারুল'ও তাই। কেউ জানে না ওটা কোন্ ফুল। শান্তিনিকেতনের কাছে যে 'পারুল বন' আছে সেটা গুরুদেবের দেওয়া নাম। এখানকার ফুল সত্যই পারুল কিনা, কেউ জানে না।

ভেবেছিলুম বর্ষার মোলায়েম বর্ণনা দিয়ে তোমাকে আজ গল্প বলবো। তা আর হল না। পারুল মাধবীর শব্দতত্ত্ব নিয়ে সময় কেটে গেল।

কিন্তু আজ সত্যই মেদুর সন্ধ্যা। আজ সপ্তদশী। এখন আটটা বেজেছে। সপ্তদশীর চাঁদ কখন ওঠে ঠিক জানিনে। বাইরে অন্ধকারটা জমাট নয়। আকাশ যেন কোন ঘোর রঙের চশমা পরে তাকিয়ে আছে। বাতাস যেন ভিজে কাঁথা পরে আমার চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করছে। দু'এক ফোঁটা জল আমার লেখাকে চুপসে দিচ্ছে। সেক্রেটারিয়েটের ঘড়ি আটটা হাঁকছে। শামাপোকা জোরালো বাতির চতুর্দিকে ঘুরছে। ডানাগুলো আস্বচ্ছ (অস্বচ্ছ নয়) ইংরিজিতে যাকে বলে ডায়েফনাস্।

সমস্ত জীবন কাটলো এই রকম একা বসে বসে।

আব্বু

॥ কনিষ্ঠ পুত্রকে লেখা পত্র ॥

১৭।১০।৫৫

বাবা ভজু,

তোমাকে নাকি ফিরোজ জিজ্ঞেস করলো—আমি যখন ঢাকায় গিয়ে তোমাদের আদর করছিলুম—'কবীর, তোর আব্বু কই?'

আব্বু

উপরের পত্রগুলি যখন সৈয়দ মুজতবা আলী লেখেন, তখন তাঁর পুত্রেরা নিতান্তই শিশু। এ চিঠি তারা বড় হয়ে পড়বে, সেই আশাতেই লেখক লিখেছেন। প্রতি চিঠিতেই প্রবাসী পিতার বুভুক্ষু বাৎসল্য প্রকট। ফিরোজ—জ্যেষ্ঠপুত্র সৈয়দ মুশাররফ আলীর ডাকনাম, ভজু—কনিষ্ঠ পুত্র সৈয়দ জগলুল আলী।

।। শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তীকে (জরাসন্ধ) লিখিত পত্র ।।

(১)

প্রিয়বরেষু,

নববর্ষে আপনার সহী-সালামতের জন্য আল্লার দরগায় দোওয়া মাঙছি। আপনার "জরীন কলম" হ'ক, আপনি আরো বহু বহু বৎসর ধ'রে বাঙালীকে আনন্দ দান করুন, এটা আসল। তৎপর যা করে আসছেন, অর্থাৎ 'অপরাধ' কি, 'অপরাধী' কারে কয়, সে-সম্বন্ধে বাঙ্গালীকে চিন্তা করতে ও সহিষ্ণু হতে শেখান। আল্লার কসম, এগুলো আমার উপদেশ নয়। আমার হৃদয়ের কামনা, প্রার্থনা, আমি ভেবেছিলুম, আপনি আমার খোঁজ নেবেন। তা তো নিলেন না। অবশ্য আমারই কসুর অধিকতর। আসলে ব্যাপারটা এই, আমার বয়স ৬৪ (জন্মাষ্টমীর সূর্যাস্তে জন্ম !) এবং তার চেয়ে বেশী অথর্ব। উৎসাহের তোড়ে যদি বা আপনাকে pin down করলুম, তারপর সেটা আর follow up করতে পারলুম না।...৪।১।৭০ আবার রাজশাহী যাচ্ছি ধর্মপত্নী ও দুই সৈয়দজাদা (যথাক্রমে ১৭ এবং ১৫) সেখানে থাকেন, এটা আমার বাৎসিক 'হজ'।

পরশুদিন শচীনবাবুর ওখানে গিয়েছিলুম। তাঁর অজানতে দুখানা বই চুরি করে আনি। 'ন্যায়দণ্ড' তথা 'গল্প লেখা হল না'। পড়ে বড় আনন্দ পেয়েছি, বড় আনন্দ পেয়েছি। সে-কথা জানাবার জন্যই এই কার্ড। শেষের বইখানা বাবাজীউদের জন্য নিয়ে যাবো, জানেন বোধ হয়, আজকাল কোনো প্রকারের printed matter পাকিস্তানে নিয়ে যেতে দেয় না। ওদিকে বাবাজীবনরা আপনার, রাজশেখরবাবুর ভক্ত। 'সিব্রাম'ও ওদের ভারি পছন্দ। একদা মনে করতো 'সিব্রাম' greatest writer of Bengal. সে এক মজার ব্যাপার, বড় ব্যাটা ফিরোজকে একদিন বলেছিলুম, সিব্রামকে আমি চিনি। তাচ্ছিল্যি করে ব্যাটা বললেন, 'রেখে দাও ! তুমি আবার লেখক। সিব্রামদা তোমার সঙ্গে কথাই কইবে না।' আমি মনস্তাপ জানিয়ে সিব্রামকে আদ্যন্ত জানালুম। তারপর ফিরোজ ছুটিতে কলকাতা এলে তাকে সিব্রামের ওখানে নিয়ে গেলুম। সে এক দৃশ্য। সিব্রাম ফ্যালফ্যাল করে ফিরোজের দিকে তাকিয়ে, আর ফিরোজ মুগ্ধ নয়নে। সিব্রাম বেচারী ফিরোজের জন্য ফুলরি থেকে ফেরুরাদজীনির কেক কিনে এনেছিল। আমিও যে খুব একটা নিরেস লেখক নই সেটা সিব্রাম

একবার ফিরোজকে বোঝাতে গেলে সে with one murderous sweep of hands সেটা বন্ধ করে দিলে।...এবারে বলুন, কোন্ সাহসে ফিরোজকে বলি, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে ?

৫নং পার্ল রোড গুণমুগ্ধ
কলিকাতা-১৭ সৈ. মু. আলী

(২)

Dec. 6/7 '71

শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদবরেষু,

আপনার ৬।৪।৭০এর চিঠি আমি পাই সিলেটে। দেশে ফিরে আসা মাত্রই মোকা জুটে যায় জর্মনি যাওয়ার। তারই তদ্বির- (কে যেন বলেছেন "একদা বসুন্ধরা ছিলেন বীরভোগ্যা, এখন তদ্বিরভোগ্যা") তদারকির মধ্যিখানে—অবশ্য বিছানায় শুয়ে শুয়েই—আপনার সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ করবো তেমন কিস্মৎ আমার ছিল না। তড়িঘড়ি ফের বিদেশ।

আপনি সহৃদয়। তাই আব্দুর রহমান—সেও বড্ডই দরদী ছিল—আপনার হৃদয়ে সরাসরি ঢুকে গেছে। আপনার মত কোনো সজ্জন যখনই তার প্রশংসা করেন তখনই আমার মনে বড় বেদনা জাগে, তার সম্বন্ধে তো আরো অনেক অনেক কিছু বলার ছিল, কিন্তু আপনি কৃতী লেখক, বিলক্ষণ অবগত আছেন, কোনো চরিত্র অঙ্কনে একটা অপটিমাম মাত্রা আছে। কিংবা বলতে পারেন, আপনার ("আমার" না বলে "আপনারই" বললুম, কারণ সে ছিল আমার দৈনন্দিন জীবনের ডালভাত আর আপনার কাছে সে রস-প্রতিম)। আবদুর রহমান আমার কাব্যের উপেক্ষিতা উর্মিলা। কিন্তু থাক। নিজের কথাই সাত কাহন !

বলতে ভুলে গিয়েছি, ঐ তিন মাসের সফর এ্যাসন তক্‌লীফদেহ হয়েছিল যে মাসাধিককাল অধম দণ্ডবৎ, লাঠ্যাবৎ (বিবেকানন্দ পশু) হয়ে শয্যাশায়ী। নয়া পুরনা বেবাক আলীপুর আমার কাছে বার্লিনের চেয়ের সুদূরতর। মধ্যিখানে নকশলাইট—আমার কাছে most welcome ! ড্যাং ড্যাং করে চলে যাবো।

আমার দুই ব্যাটা ১৮ এবং ১৬ আপনার লেখার—যাকে বলে Fan—grand-admirers. শুধু বড় ব্যাটা শুধোলে, "এই জরাসন্ধবাবু (আমার বাচ্চারা তাদের জননীর মত—['আম্মো তাই'] ঈষৎ Old-fashioned হিন্দু নামে "বাবুটা" হরবকৎ

জুড়ে দেয়) বললেন, "মার্কিন criminologist ওঁকে বললে এ দেশে born criminal নেই, (অপরাধ নেবেন না, আমার কথাগুলো ঠিক ঠিক মনে নেই ; আপনার কেতাবখানাও নেই। বললে পেত্যয় যাবেন না, আপনার তাবৎ কেতাব কভু কড়ি ফেলে, কভু বা ফোকটে যোগাড় করেছি কিন্তু ধন্যি আমার চেলারা, তেনারা পঙ্গপালের মত আপনার বেবাক বই গিলে ফ্যালেন—except যেগুলো আমি কোন গতিকে বাবাজী ও তাদের গর্ভধারিণীর জন্য পাচার করি ; জানেন তো পাকিস্তানে আমাদের তাবৎ বই ব্যান্‌ড্‌ !) তার অর্থটা কি ?" মা কালীর দোহাই দিয়ে বলেছি, আপনি ভাববেন না, আপনার লেখাতে কোনো এমবিগিটি—ঝাপসাপারা—ছিল। আপনার রচনা limpid, sparkling, flows like oil from a bottle. আমি বললুম, "বাবাজী, যখন কলকাতা আসবে (ভারত-পাক "লড়াইয়ের" পর ওদের পক্ষে এ দেশে আসা কঠিন হয়ে গিয়েছে) তখন তোমাকে চারুবাবুর কাছে নিয়ে যাবো। সেখানে মোকাবেলা করো।" "চারুবাবু ! আমি বলছি জরাসন্ধের কথা।" আমি বললুম, "ঐ ঐ ! যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিরম্মুব্বুই। যাহা জরাসন্ধ তাহা চারুচন্দ্র।" তখন বলে কি জানেন, "ওঁর মত great writer তোমাকে কি তাঁর বাড়ীতে ঢুকতে দেবেন ? অর্থাৎ টাপেটোপে বোঝালে I am a very poor writer ; great writer—আপনি—আমাকে পাত্তা দেবেন কেন ?

"ন্যায়দণ্ড" কেন আপনার কুল্লে বই আমার ভালো লেগেছে, লাগে এবং লাগবে। আপনি "জনপ্রিয়" থাকুন। বিদগ্ধদের জন্য মেলা উত্তম উত্তম লেখক যথা কালিদাস, দান্তে রয়েছেন। আমি বিদগ্ধ নই। আমি (উপস্থিত আপনার এফিডেভিট মাফিক মেনে নিচ্ছি, তর্কস্থলে, যে আমি বিদগ্ধ, কল্‌চর্‌ড্‌, হাইব্রাও, connoisseur, gourmet, comme its fant, যাবতীয়) আপনার ভাষা ও শৈলী (language & style) অর্থাৎ form, বিষয়বস্তু (content) দুইই বড্ড ভালোবাসি। তদুপরি আপনি a great raconteur = recounter.

গুণমুগ্ধ,
সৈয়দ মু আ—

৫নং পার্ল রোড
পোঃ সার্কাস এভিনিউ
কলিকাতা-১৭

॥ শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রকে লিখিত পত্র ॥

(১)

ভাই গজেনদা,

কাল বিকেলে তোমার ১১।১২ র চিঠি পেয়েছি। (১) পারতপক্ষে P. O. Bolpur ছাড়া বাকি ঠিকানাটা আদ্যন্ত বাংলায় লিখবে। ('ডক্টর'টা কিছু-দিনের জন্য নামের পূর্বে জুড়ে দিয়ো। পাড়ায় ডাকঘরে আরেকটু পরিচিত হওয়ার পর drop করবে) কারণ আমাদের পাড়ার পিয়ন অল্পই ইংরিজি জানে। প্রায়ই অন্যলোকের চিঠি পাই, (যদিও typed); তার থেকে knowledge by in-ference, আমার চিঠিও অন্যের বাড়ি যায়। পরস্ত্রী আমার কাছে আসুক··· etc. etc. এই knowledge by inference সংস্কৃতে রসিয়ে দেওয়া আছে।

(ক) দেবদত্ত মোটা

(খ) দেবদত্তকে কেউ কখনো দিনের বেলা খেতে দেখেনি (অতএব knowledge by inference);

(গ) দেবদত্ত রাত্রে খায়।

(২) অবধূতের কিছুটা ছাপা হলেই পাঠাবে বুঝেছি, অন্য উপদেশ পরামর্শও বুঝেছি। কিন্তু যতদিন না আসে, বলতে পারো, বিষয়বস্তুটা কি? মনে হচ্ছে 'হিমালয়-ভ্রমণ'—তা ছাড়া?

(৩) 'পৌষ ফাগুনের পালা' তুমি খুব সম্ভব আমাকে এযাবত দাওনি। এবারে বীবীর ওখানে তালাশ করে দেখলুম যে কটা একবার দিয়েছিলে সেগুলো তখনই পড়া হয়ে যায়, এক 'পৌষ ফাগুন' তার সঞ্চয়নে নেই। অতএব পাঠিয়ে দিলে পড়বো নিশ্চয়ই—অবশ্য অবসর মত দিন পনেরোর ভিতর।

(৪) Same applies to 'সোহাগপুরা'।

কিন্তু দাদা, মতামত দিতে আমার বড় বাধো বাধো ঠেকে। তোমার মত কুতুবমিনারী লেখকের প্রশংসা করা বিড়ম্বনা, তোমার লেখা অপছন্দ করার অর্থ, আমার রুচির অভাব। এক মার্কিন নাকি লণ্ডনে Titianএর ছবি দেখে বউকে বলে, "Gee, I don't think I like that one." পাশে দাঁড়িয়েছিল একজন গাইড। বললে, "Sir, Titian is not being tested; your taste is being tested!"

তবেই কও, এই ডিলেমার সল্যুশন কি? By the way, before I end, যে কোনো দিন abruptly তোমাকে, ভানুকে সবাইকে চিঠি লেখা হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে—আমার অনিচ্ছায়। কেন, শুধোলে উত্তর বড় দীর্ঘ হবে। তখন চটো না।

নীচুপটি আ

পোঃ বোলপুর

বীরভূম।

(২)

ভাই গজেনদা,

তোমার বই পড়ছিলুম। বহুকাল পূর্বে (1921) দ্বিজেন্দ্রনাথ 'বড়বাবু' আমাকে বলেন, 'কথাটা "কষ্টে সৃষ্টে" নয়; হবে "কষ্টে শ্রেষ্ঠে"।' তিনি কি কি যুক্তি দিয়েছিলেন আজ আর মনে নেই। আমার মনে হয় 'কষ্টে সৃষ্ট' না হয় বোঝা গেল, কিন্তু 'কষ্টে সৃষ্টে'-র 'এ'কারটা এল কোত্থেকে? তদুপরি by itself 'কষ্টে সৃষ্টে' ঠিক মানে কি ধরে? আমরা আজকাল তো বুঝি 'অতিকষ্টে'। এবং 'অতিকষ্টে' সক্ষম হয়েছি অর্থাৎ 'সৃষ্টি' করেছি। তাহলে তো, 'অতি কষ্টে সৃষ্টে কাজটা করতে পেরেছি' অর্থ দাঁড়ায়, 'অতি কষ্টে সৃষ্ট সৃষ্টি করেছি। ডবল ডবল পুনরাবৃত্তি। অথচ 'কষ্টে শ্রেষ্ঠে', 'সুখে দুঃখে', 'হাসি কান্নায়', 'তকলীফে বেতকলীফে' কাজটা সেরেছি—এটাই তো ভালো।

তাই তোমার বইয়ের (পৌষ-ফাগুনের পালা) p. 524, line 4-এ গাঁইয়া উচ্চারণে 'কষ্টসৃষ্ট' নূতন করে প্রশ্নটা মনে তুললো।

তুমি এসব শব্দ সমাস নিয়ে মাথা ঘামাও, তাই আরেকটা বলি: 'চুল চেরা' বোধহয় আসলে ছিল 'চুন্-চেরা'—ফার্সীতে আছে—ঐ একার্থে। 'কখন'? 'কেন' (চেরা)? বলে অযথা সূক্ষ্মতর্ক করা। 'ন'টা কি ভুলে 'ল' হয়ে গিয়েছে! অবশ্য 'চুলচেরা' by itself সুন্দর image মনের চোখে আনে—কিন্তু সংস্কৃতাদিতে এর নজীর নেই!

Happy New year

আ।

পুনঃ 'ব্যবহারিক (না ব্যাবহারিক?) শব্দকোষ' সম্বন্ধে আমার সতর্কবাণী পেয়েছ? উত্তর কই?

॥ শ্রীনারায়ণ সান্যালাক লিখিত পত্র ॥

প্রিয়বরেষু

আজকের ভাষায় যাকে বলে 'রসোত্তীর্ণ', আপনার 'সত্যকাম' তাই হয়েছে কিনা সে বিচার না করে প্রথমেই বলি, এই obscurantism ও revivalism-এর যুগে আপনি এ-পুস্তক লিখে বাঙালী হিন্দুর চোখে জ্ঞানাঞ্জন লাগাবার চেষ্টা করেছেন। সে যদি—অঞ্জন মাখতে না চায়—আশা করি ইতিমধ্যে ভট্টপল্লী তথা নবদ্বীপের স্মার্ত সমাজ par excellence আপনাকে ছনো দেননি—তবে সে-দোষ আপনার নয়। এখনো যে দেশে বারেন্দ্ররাঢ়ী-বৈদিকে সহজে বিয়ে হয় না; পূর্ববঙ্গের শরণাগত গুহ রাঢ়ী ঘোষ-বোস দ্বারা কুলীন বলে স্বীকৃত হয় না, কায়েত মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে বামুন বাড়ী গেলে—এবং এ ব্যাটাদের তিন পুরুষের কেউ সন্ধ্যাহ্নিক করেনি কিঞ্চি এ-পুরুষ পঞ্চমকারে আকণ্ঠ নিমগ্ন—খড়ম পেটা হওয়ার সম্ভাবনা, বিয়ের মরশুমে যে-সব নিমন্ত্রণ পত্র আসে সেগুলো আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি, কটা অসবর্ণ বিয়ে হল তার শুমারী, % রাখার চেষ্টা করি। আমার এক অনুজপ্রতিম বারেন্দ্র (আপনারই মত সান্ন্যাল) মুখুয্যে 'শাদী' করেছে। সে-দেশে সত্যকামের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রতি ধর্মভীরু দ্বিজের কর্তব্য। আপনি সেই কর্মটি অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন। আপনাকে অভিনন্দন জানাই, শতংজীব, সহস্রংজীব, শঙ্কর আপনাকে জয়যুক্ত করুন!

আপনি আদৌ ভাববেন না, আমি কৌলিক ঐতিহ্য তথা আচার-অনুষ্ঠান বাবদে চার্বাক পন্থী। কিন্তু সে কাহিনী এখানে তুলবো না।

সত্যকাম তথা অন্য বহুবিধ কারণে যে সব ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণের উপনয়ন হয়নি, (অর্থাৎ, বিশেষ করে, যে-সব অব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ পর্যায়ে তুলতে হবে) তাদের নিয়ে 'ব্রাত্য'—সে তো আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশী জানেন। এক জর্মন পণ্ডিত ঝাড়া বিশটি বছর খেটে (কারণ ব্রাত্যদের সম্বন্ধে তথ্য হেথা হোথা সর্বত্র ছড়ানো) পাঁচশ পাতার কেঁদো কেতাব লেখেন, নাম স্রেফ ব্রাত্য। আমার বড়ই বাসনা ছিল, কেউ বইখানার অনুবাদ করে। হিন্দু উপকৃত হত। দেখতো সে একদা কতখানি dynamic, catholic ছিল, শুধু যুক্তি দিয়ে বিচার করতো না (আপনার কথায় 'যে সত্যের পিছনে, শিব সুন্দর নেই'—সেটা বেকার)

হৃদয়ের logicও শুনতো, বলতো : 'If tradition (স্মৃতি) help us, good ! If not, without it—and so much the better !' আর আজ !

আপনি সত্যকামের কাহিনী বললেন (আজকার দিনের লোক উপনিষদ মাথায় থাকুন, রবিঠাকুরও পড়ে না—তাই 'উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন' লাইনগুলো কেতাবের পয়লা বা আখেরে দিলে ভালো করতেন, মায় উপন্যাসটির নাম), রামমোহনও শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সতীদাহ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, agnostic বিদ্যেসাগরও শাস্ত্রের দোহাই দেন। তখন বঙ্কিম (for whose religious views I have little understanding, except that কৃষ্ণচরিত্র which is a mervellously written book with a very wrong thesis to prove !) তাঁকে লেখেন, আপনি শাস্ত্রের আশ্রয় নিচ্ছেন কেন ? শাস্ত্র কেউ মানে না। মানে লোকাচার। আপনি তাই Humanitarian grounds-এর উপর নির্ভর করুন।' বিদ্যাসাগর খুব সম্ভব কোনো উত্তর দেন নি। তিনি জানতেন, শাস্ত্রের বরাৎ দিলে তবু বা কিছু হতে পারে। Rational, humanitarian consideration have precious little chance.

অর্থাৎ Voltaire-এর যুগ এই পোড়া বাঙলাদেশে এখনো আসেনি ! আমরা জানা মতে ১নং চৈতন্য, ২নং বিবেকানন্দ—সাহস যা দেখাবার, to rebel against শাস্ত্র, এঁরাই কিছুটা দেখিয়েছেন।

মুসলমানের ভিতর, গোড়ার দিকে, কিছুটা দেখান আকরম খান। মোল্লাদের হুনো খেয়ে সে-বই আর reprint করেন নি। নজরুল ইসলাম গোড়ায় বিদ্রোহী, শেষের দিকে very traditionalist !

এবারে আপনি একটু Voltaire পড়ুন। বিশেষ করে CANDID.

আপনার গল্পের প্লটটি যদ্যপি উপনিষদ থেকে নেওয়া তথাপি ইটিকে সম্পূর্ণ অভিনব না বললে পাপ হবে। Very dexterously managed.

আপনার গল্প বলার ধরনটি চমৎকার। আপনি excellent raconteur.

তবে এ পুস্তকে romantic রাজবাড়ীর রোমাঞ্চকর ঘটনায় হঠাৎ ছেদ টেনে স্মার্ত নৈয়ায়িক পরিবারের দীর্ঘ কাহিনী সাধারণ পাঠককে খুশী করবে না। সে ওটা skip করবে। আম্মো করেছিলুম। তবে—অন্তত আমার কাছে—স্মার্ত যে কি করে নৈয়ায়িক হয়—Contradiction মনে হয়—সেটা দেখবার জন্য ফিরে এসে সেটি পড়ি। মন দিয়ে। কারণ এতে আমার personal interest আছে।

আমার যদ্দুর জানা, বৈশেষিক বৌদ্ধ জৈন চার্বাকপন্থীদের বাদ দিন ; এক বেদান্ত ছাড়া আমাদের সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, মীমাংসা সবকটাই ঈশ্বরকে ignore করে (ন্যায়), 'প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ' (সাংখ্য), বা—God-কে Special position দেয় না। ন্যায়ের ভিৎ সাংখ্য ও বৈশেষিকের উপর! আর স্মৃতি তো দর্শন নয়—নিছক theology (মাকড় মারলে ধোকড় হয়!) প্রকৃত নৈয়ায়িক স্মৃতিকে বিলকুল উপেক্ষা করে। কারণ স্মৃতি নির্ভর করে entirely on আপ্তবাক্য, authority-র ডাণ্ডা! ন্যায়ের প্রথম starting point (১) প্রত্যক্ষ (২) অনুমান (inferance e. g. ক) দেবদত্ত মোটা খ) দেবদত্ত দিনের বেলা খায়—গ) অতএব 'অনুমান' (I infer) দেবদত্ত রাত্রেও খায়, ৩) উপমান 'শব্দ' (credible testimony, যেটাকে 'শাস্ত্র' 'আপ্তবাক্য' 'সংহিতা' বলতে পারেন, এবং সেটা স্মৃতির the starting point, ('কস্যচিৎ ভাইপোস্য' বেনামিতে বিদ্যেসাগরের একটি humorous লেখাতে এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাবেন। সেখানে বড় ভাই নৈয়ায়িক, ছোট ভাই স্মার্ত। দুজনাকে নিয়ে রগড়।)। হ্যাঁ, আলবৎ, হিন্দুসমাজে বাস করতে হলে লোকাচার মানতে হয় তাই পাঁড় নৈয়ায়িকও অসবর্ণে বিয়ে দেয় না, সগোত্রে বিয়ে করে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু পট্টন্তরী তথা লোকাচারের অন্যান্য গোঁড়ামির Care করে না, অর্থাৎ সমাজপতি স্মার্তরা যতক্ষণ না খড়্গহস্ত হয়ে তার হুঁকো জল বন্ধ করার ভয় না দেখান। এঁরাই হচ্ছেন typical নৈয়ায়িক। আপনি বলবেন, আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন, নৈয়ায়িক পাঁড় স্মার্তের মত পট্টন্তরী নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করছে। আমি বলবো, 'আম্মো দেখেছি, মেড়ো লণ্ডনের খানদানী Dorchester হোটেলে হাত দিয়ে খানা খেয়ে টেবিলক্লথে হাত মুচছে।' কিন্তু Dorchester হোটেলের বর্ণনাতে সেটা typical নয় সেটা accidental (যেমন, প্রেমের triangle সৃষ্টি করে, সমস্যা সমাধান করতে না পেরে লেখক একজনকে মোটর অ্যাকসিডেণ্টে মেরে ফেললেন। ব্যস, সমস্যার সমাধান ভেল! আমি বললুম, 'এটা আবার কি?' লেখক গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'কেন, মানুষ মোটর দুর্ঘটনায় মরে না?' তুলনাটা টায়টায় মিললো না; মোদ্দা—reality is no criterion for artistic achievement ('রসোত্তীর্ণ হওয়া')।

আচার্য গোষ্ঠিকে নবন্যায়ের পণ্ডিত না করে খাঁটি স্মার্ত করলে এ ঝামেলা হত না। আচার্য গৌতম তো নৈয়ায়িক ছিলেন না—অবশ্য ন্যায় শাস্ত্রের তখন জন্মই হয় নি।

তা সে থাক! এটা অত্যন্ত বাহ্য। কেন যে আমি উল্লেখ করলুম জানিনে। বোধ হয় 'বিদ্যে' ফলাবার জন্য। কিংবা আপন নৈয়ায়িক গুরুর স্মরণে। পথ দিয়ে যেতে যেতে সরস্বতী পূজোর বহ্বাড়ম্বর তথা বাহ্যাড়ম্বর দেখে তিনি মুখ ফিরিয়ে আমাকে বলেন, 'বর্বর, অনার্য, দ্রাবিড়সম্ভূত!' আমি বললুম, 'স্বয়ং শংকরও তো সাকারকে দ্বিতীয়স্থান দিয়েছেন।' তিনি বললেন, 'তাঁর গুরু ছিল বৌদ্ধ, আর সে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ।' আমি বললুম 'তাতে তো আপনার খুশী হওয়ার কথা। ভগবন! আপনিও ভগবানের থোড়াই পরোয়া করেন—বৌদ্ধদের মত।' তিনি বললেন, 'ওরে মূর্খ! তোর কিচ্ছু হবে না। তোর শাস্ত্রচর্চা বন্ধ্যা-গমন, ন দেবায় ন ধর্মায়।' (সেই দিনই প্রথম শিখি, এস্থলে 'ন ধর্মায়' বৌদ্ধ ধর্মকে refer করে, অর্থাৎ আমার শাস্ত্রচর্চা (হিন্দু) 'দেবায়' কাজে লাগবে না, (বৌদ্ধ) 'ধর্মায়'ও না।

আবার বলি এটা অত্যন্ত বাহ্য।

আলী

নীচু পট্টি,
বোলপুর

॥ শ্রীযুক্ত বোপদেব শর্মাকে (জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী) লিখিত পত্র ॥

(১)

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

'যে কোন নিশ্বাসে' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আপনি লিখেছেন, 'যদি অর্থের সন্ধান কর, রসের সন্ধান কর, আওয়াজের অন্তরালে কোন ধ্বনি-ব্যঞ্জনার সন্ধান কর, তা হলেই তুমি প্রতিক্রিয়াশীল ফিলিস্টাইন প্রমাণিত হয়ে যাবে।'

অতিশয় খাঁটি কথা।

কিছুকাল পূর্বে আমি একখানা বিদেশী জর্নলে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পড়ি। নাম ছিল, বোধ হয়, Lady Chatterly's lovers. Lady Chatterly অশ্লীল কিনা সেই সম্পর্কে যে মোকদ্দমা হয় এবং তার পটভূমি নিয়ে তথ্যবহুল, ধীর, সংযত প্রবন্ধটি।

তাতে আছে, আদালত উকীল মক্কেল তাবৎ সজ্জন যখন শ্লীল অশ্লীলে পার্থক্য করার মত সংজ্ঞা পেলেন না তখন তাঁরা বললেন, "শুধোও সাহিত্যিকদের, তারা কি বলে"।

তারপর লেখক বলেছেন, 'সাহিত্যিকদের বেশীর ভাগই সরল চিত্তে স্বীকার করলেন, সেরকম কোনো dividing line-এর সংজ্ঞা তাঁরা দিতে অক্ষম।'

তারপর লেখক বলেছেন, 'কিন্তু একদল ঝানু সাহিত্যিক আছেন তাঁরা জানেন, অশ্লীলতম রচনাকেও (যেটা নিয়ে কারো মনে কোনো দ্বিধা থাকার কথা নয়) যদি তাঁরা ঘুণাক্ষরে অশ্লীল বলেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক চেঁচিয়ে উঠবে—(এবারে আপনার ভাষাতেই বলি, তুমি 'প্রতিক্রিয়াশীল ফিলিস্টাইন'।—এটা কিন্তু মিনিমামেস্ট !) "এরা—ফাসিস্ট, হিটলেরাইট, ইমপেরিয়ালিস্ট, এবং (হালের বুলি) কলনিয়ালিস্ট"।' এই দলের পিছনে আছেন কিছু কমুনিস্ট এবং কিছু অন্তত আমেরিকার পুস্তক প্রকাশক (এবং বিশেষ করে পর্ণগ্রাফির) সম্প্রদায়।

আঁদ্রে জিদ একবার কমুনিস্টদের সমালোচনা করে বেধড়ক মার খান। উপরে বর্ণিত 'ঝানু সাহিত্যিকরা' সেই তত্ত্বটি জানেন, এবং 'ফাসিস্ট' নামে পরিচিত হতে চান না।

Obscurantism-এর বিরুদ্ধে লেখা দুটি প্রবন্ধ আমার জীবনকে richer করেছে। একটি আনাতোল ফ্রাসের Life and Letters-এ আছে, দ্বিতীয়টি

Edmand Wilson-এর লেখা এলিয়টের সমালোচনা। ফ্রাঁসেব সেই আপ্তবাক্য পুনরায় স্মরণ করি: I have passed the age when one loves what one does not understand—I love light. নমস্কার জানাবেন। কাগজ খতম।

গুণমুগ্ধ

শান্তিনিকেতন। সৈ. মু. আলী

পুঃ বড়বাবু (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) বলতেন, to imitate-এর বাংলা 'অনুকরণ'; to ape-এর বাংলা 'হনুকরণ'। এ দেশে বিলিতির 'হনুকরণ' হচ্ছে।

(২)

শ্রদ্ধাপদেষু,

আপনার পত্রের সর্বশেষে আছে, 'আপনাদের প্রতিষ্ঠা কি এতই ঠুনকো জিনিস যে পাঁচজন অর্বাচীনের হাততালি না পেলেই তার বনেদ ধ্বসে যাবে।'

এতে প্রথম ইঙ্গিত আছে, আমি সাহিত্যিক (এটা উপস্থিত আমি মেনে নিলুম), (২) আমার প্রতিষ্ঠা আছে, (৩) সেটা বাঁচাবার জন্য আমি অর্বাচীনদের হাততালি খুঁজে বেড়াই। এই তিন নম্বরের ইঙ্গিতটা হে সৌম্য, ভালো করে না জেনে কি করা উচিত?

এখন বক্তব্য, আপনি চান, সাহিত্যিকেরা স্পষ্ট ভাষায় বলুন যে অধুনা সর্ব সাহিত্যে যে Obscurantism চলছে সেটা সাহিত্য নয়, ও পথে চললে সাহিত্যের সর্বনাশ হবে। এই তো? আশা করি আমি আপনার মুখে এমন কোনো কথা চাপাইনি যেটা আপনার বক্তব্য নয়।

অর্থাৎ আপনি চান, সাহিত্যিকরাই সাহিত্যের গতি নির্দেশ করুন।

তাহলে নিবেদন, সাহিত্যে থাকে রস, এবং সেই গোড়ার জিনিস নিয়ে আলোচনা করেন, আলঙ্কারিকেরা। তাঁরা বলে দেন কোনটা উত্তম রস, উত্তম সাহিত্য, আর কোনটাই বা অধম।

আলঙ্কারিক ভরত থেকে আরম্ভ করে অভিনব গুপ্ত ইত্যাদি—এঁরা কি

সাহিত্যিক ছিলেন? এঁরা কি কাব্য, নাট্য, আখ্যান, উপাখ্যান, মহাকাব্য ইত্যাদি প্রথম লিখে নিয়ে নাম করে ফেলে তবে সাহিত্যের গতি নির্দেশে হাটে নেমেছিলেন? আমার যতদূর জানা, এঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেননি। (Creative মাল)। অবশ্য এঁদের কারো কারো লেখা সরস, কিন্তু তবু তাঁদের সাহিত্যিক বলি না, বলি আলঙ্কারিক। ৺সুরেশ সমাজপতি, অতুল গুপ্ত এঁরা সাহিত্য সৃষ্টি (Creative সাহিত্য) করেছেন বলে জানিনে।

ইয়োরোপীয় সাহিত্যগুলির ইতিহাস তথা ইউরোপীয় আলঙ্কারিকদের কথা আমি বড় একটা জানিনে (আমি সমস্ত জীবন, ধর্ম, দর্শন, শব্দতত্ত্ব নিয়ে কাটিয়েছি)। কিন্তু আপনি বলতে পারবেন, প্লেটো থেকে আরম্ভ করে ক্রোচে পর্যন্ত, এঁদের কজন Creative liteature সৃষ্টি করে, সাহিত্যিক নামে প্রখ্যাত হওয়ার পর, 'অর্বাচীনদের হাততালি' উপেক্ষা করে সাহিত্যের গতি নির্দেশ করে গেছেন।

আব্দুল করীম খান, ফৈয়াজ খান ইত্যাদি বড় বড় গাওয়াইরা যে ফিল্মি গানার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লেখেন নি, কিংবা বক্তৃতার কেম্পেন করেননি সে কি 'অর্বাচীনের হাততালি' থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে? পাঠান মোগল আমলেও দেখতে পাই, চিত্র স্থাপত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন তাঁদের ইতিহাস-লেখকরা, এঁরা এমারৎ বানাতেন না।

মাইকেল আঞ্জেলো, রাফায়েল ইত্যাদি বড় বড় ভাস্কর চিত্রকরদের ক'জন বাৎলে দিয়েছেন ঐ সব কলা কোন্ পথ দিয়ে যাবে। সব যুগেই নিকৃষ্ট আর্ট, নিকৃষ্ট movement in art থাকে। এঁরা কি তখন পোলেমিক লিখেছিলেন!

এবারে একটি অতি নিকৃষ্ট উদাহরণ দেই—পাচক এবং ভোজনরসিক কি একই ব্যক্তি? আমার অগ্রজের মত ভোজনরসিক (তিনি খান অতি অল্প, বলেন, 'আমি পেটুক নই'—এটা অবশ্য এস্থলে অবান্তর) আমি ত্রিজগতে দেখিনি। তিনি ডিম সেদ্ধ করতেও জানেন না। আমার মা অতিশয় নিপুণা পাচিকা ছিলেন। হালের চপ-কাটলিস, পুডিং-মাডিঙের বিরুদ্ধে তিনি প্রবন্ধ লেখেন নি।

বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে আমার কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নেই, কারণ পূর্বেই নিবেদন করেছি, সাহিত্যের তথা লিটারারি ক্রিটিসিজম এবং এসথেটিকসের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি অল্প। আবছা আবছা মনে হয়; যাঁরা সাহিত্যসৃষ্টি করেন তাঁরা জানা-অজানাতে আপন আপন 'স্কুলের' সমর্থন করে সাহিত্যের গতি নির্দেশ করতে

বাধ্য, অর্থাৎ নিরপেক্ষ থাকতে পারবেন না। পক্ষান্তরে যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেন না, কিন্তু সাহিত্যরস আস্বাদন করেন তাঁরাই এ-কাজের উপযুক্ত—আমার আবছা-আবছা বিশ্বাস ইতিহাসের হেথা-হোথা ব্যত্যয় থাকলেও প্রধানত সাহিত্য-রসিকরাই সাহিত্যের গতি নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন (তাতে কোনো ফল হয়েছে কিনা তাও জানিনে)। আপনি একটু চিন্তা করে জানাবেন। ইতিমধ্যে অতিশয় অনিচ্ছায় সবিনয় নিবেদন, আল্লা সামনে, আমি সস্তা দামী কোনো হাততালির জন্য কখনো লিখিনি। তবে একথা নিশ্চয়ই সত্য, আমি পণ্ডিত-জনদের জন্য লিখেছি অতি অল্পই। প্রধানত লিখেছি সেই ম্যান ইন দি স্ট্রীটের জন্য, যে হয়ত সামান্য ইংরিজি জানে, বাংলাটা মোটামুটি বুঝতে পারে এবং সিরিয়স বই পড়তে নারাজ। হঠাৎ মনে পড়ল দশম শতাব্দীর কবি আব্দুর রহমান (অদহমান) তাঁর কাব্য, অপভ্রংশে লেখা সন্দেশ রাসকে বলেছেন, 'পণ্ডিতজন কুকবিতার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখেন না, আর অজ্ঞজন অজ্ঞতাবশত কবিতায় প্রবেশ করে না। এজন্য যে মূর্খ নয়, এবং পণ্ডিতও নয়, অর্থাৎ মধ্যম শ্রেণীর, আমার এ কাব্য তার জন্য।'

আপনি যদি এ কাব্য খানা পড়ে না থাকেন তবে দয়া করে জোগাড় করে নেবেন। Quite apart from our present discussion, এরকম উত্তম কাব্য আমি জীবনে কমই পড়েছি। আব্দুল রহমান কৃত সন্দেশ রাসক edited by হজারী প্রসাদ দ্বিবেদী, হিন্দী গ্রহরত্নাকর লিমিটেড, হীরাবাগ, বোম্বাই-৪)।

এবং finally বলুন তো, আমার নিজের প্রতি আমার যা কর্তব্য আছে সেটা পোলেমিকে ঢুকে সফল হবে, না, যেটুকু সময় পাই সেটা সৃষ্টি কর্মে (তা সে ভালো হক মন্দ হক) লাগালে। আমাকে আক্রমণ করে এ যাবৎ যে সব incompetent লেখা বেরিয়েছে আমি তো তার একটারও উত্তর দিইনি। তাতে সময় নষ্ট, শক্তিক্ষয় এবং সব বেফায়দা।

আমিও শারীরিক কুশলে নেই। বিশ্বভারতীতে চাকরী নিয়ে আমার সর্বনাশ হয়েছে।

আশা করি আপনি কুশলে আছেন। সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন।

শান্তিনিকেতন। গুণমুগ্ধ

সৈয়দ মুজতবা আলী

॥ প্রাণতোষ ঘটককে লিখিত পত্র ॥

Indian council for
cultural relations

২১শে সেপ্টেম্বর '৫০

প্রিয়বরেষু,

আসবার সময় আপনার সঙ্গে দেখা করে আসতে পারিনি—তখন কলকাতায় বড্ড ডামা-ডোল। এমন কি হাওড়া হয়েও আসিনি; এসেছিলুম দমদম হয়ে এ্যারোপ্লেনে।

এসে অবধি প্রায়ই ভেবেছি আপনাকে লিখি কিন্তু গোড়ার দিকে কাজে ব্যস্ত ছিলুম এবং শেষের দিকে দিল্লীর বাতাবরণের চাপে এমনি নির্জীব হয়ে পড়ি যে আর কোনো কাজে মন যায় নি—সামান্যতম চিঠি লেখাতে পর্যন্ত না।

মৌলানা সাহেব আমাকে কলকাতা থেকে ধরে নিয়ে আসেন উপরের প্রতিষ্ঠানটির সেক্রেটারি রূপে। আমার অপরাধ আমি আরবী, ফার্সী এবং ফরাসী জানি। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান (এবং বর্তমানে একমাত্র) কর্ম হচ্ছে আরবী-ফার্সী-তুর্কী-ভাষী মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংস্কৃতিগত যোগসূত্র স্থাপনা করা। দিল্লীর পররাষ্ট্র বিভাগ ভাষা এবং অন্যান্য বিষয়ে অজ্ঞতা বশতঃ এ-কর্মটি করতে পারেন নি বলে মৌলানা সাহেবের শরণাপন্ন হন। মৌলানা সাহেবের জন্ম মক্কায়, পড়াশোনা করেন অজহরে কাইরোতে। তিনি মধ্য-প্রাচ্যের সব ভাষাই জানেন এবং অতি উত্তম আরবী লিখতে পারেন।

উপস্থিত আমরা একখানা আরবী ত্রৈমাসিক চালাচ্ছি। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ করে মিশর এবং ইরাকের কৌতূহলের অন্ত নেই—আমরা সেই কৌতূহলের উপর নির্ভর করে ভারতবর্ষের সনাতন বাণী এবং পরবর্তী যুগের কৃষ্টি সামঞ্জস্য এবং বর্তমান যুগের গান্ধী রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সম্মুখে পরিবেশ করবার চেষ্টা করছি। সাধারণের মনোরঞ্জন করবার জন্য পঞ্চতন্ত্র অনুবাদ করছি (পঞ্চতন্ত্রের কিয়দংশ একাদশ শতাব্দীতে 'কালিয়া দিমনি' নামে আরবীতে ও 'ইয়ার-ই-দানিশ' নামে ফার্সীতে অনূদিত হয় এবং সেই সময় থেকে এই বই মধ্যপ্রাচ্যে 'আরব্য-রজনী'র মত জনপ্রিয় হয়ে আছে)।

তুর্কীতে সংস্কৃতের অধ্যাপক আছেন; আমরা ইরানে একজন সংস্কৃতের অধ্যাপক পাঠিয়েছি। কাইরো, বাইরুৎ, দমস্কস, বাগদাদেও পাঠাবার বাসনা রাখি।

তা ছাড়া ছাত্র-পাঠানো, বিদেশী ছাত্রের আমন্ত্রণ, ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ,

কলা-নিদর্শনের ফিল্ম ও ল্যান্টার্ন-স্লাইড, সঙ্গীতের রেকর্ড, বেতার-যোগে যোগাযোগ স্থাপনা—এসব বিস্তর কাজ সামনে পড়ে আছে। ভারতবর্ষের মৌলবী মওলানারা আমাদের কাজে সাহায্য করছেন,—পূর্বেই বলেছি বিদেশ থেকেও কৌতূহলের' উৎসাহ পেয়েছি।

আসছে বছর দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়া বিভাগ খোলা হবে। তখন কাজ হবে, সিংহল, বর্মা, মালয়, থাই এবং ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করা। তারপর ক্রমে ক্রমে চীন-জাপান, পশ্চিম ইয়োরোপ ও আমেরিকা।

ঈষৎ অবান্তর, তবু বলি—ইংলণ্ডে কোনো বুদ্ধ, মহাবীর, চৈতন্য, গাঁধী জন্মাননি তবু Brilish Council for Cultural Relations প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আর আমাদের কর্তারা উপস্থিত একলক্ষ টাকা খরচ করছেন। ওদিকে ইংরেজ দু'শ বৎসর ধরে বিদেশে আমাদের মুখে বিস্তর কলঙ্ক প্রলেপ প্রাণপণ 'প্রেমসে' লেপেছে—তার বিরুদ্ধে লড়তে হলে কত টাকার প্রয়োজন বিবেচনা করুন!

যাক্—আপনাকে আর পাঁচালী শোনাবো না—পূজোর হিড়িকে নিশ্চয়ই বড্ড ব্যস্ত আছেন।

তবু দিনকাল কি রকম কাটছে জানাবেন। আমি মাসিক দৈনিক বসুমতী বহুকাল হল দেখিনি—বাংলা বলতে এখানে 'দেশ' 'আনন্দবাজার' আর 'সত্যযুগের' সঙ্গে মাঝে মাঝে ঝলকের তরে দর্শন হয়। 'আনন্দবাজার' ইত্যাদি দৈনিক হাওয়ায় আসে এবং এখানে অপরাহ্ণ তিনটের সময় বিলি হয়।

এখানে বাসা পেয়েছি Constitution House-এ। পার্লামেন্টের মহামান্যবর সদস্যরা এখানে সেশনের সময় বাস করেন। এঁরা M. P.; কেউ বলে 'মহাপুরুষ' কেউ বলে 'মহাপাপী' কেউবা বলে 'মহা-পাষণ্ড'। খোদায় মালুম, কোনটা ঠিক।

আশা করি কুশলে আছেন।

মুজতবা আলী

102 Constitutin House
New Delhi—1

(২)

২৮।১।৫৭

সদন্তঃকরণেষু,

আপনি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, আপনি জানেন। কিন্তু উপস্থিত শোকাতুর হয়ে আছেন বলে নিবেদন করছি ;—

অশৌচ ও শ্রাদ্ধ-শান্তির ব্যবস্থার গূঢ় অর্থ, অশৌচের ক'দিন শোক করার পর, শ্রাদ্ধ শান্তি করে পুনরায়, সাধারণের মধ্যে আপন স্থান গ্রহণ করবে। শোকের অন্ত নেই, তাই পাছে মানুষ ক্রমাগত শোক করে করে তার কর্তব্য অবহেলা করে তাই শাস্ত্রকার ক'দিন পর দৈনন্দিন জীবনে ফিরে যাবে তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণের, অর্থাৎ তার জ্ঞান আছে বলে, আশা করা গিয়েছে, সে অল্পদিনেই মন বেঁধে কর্তব্য-কর্মে ফিরে যেতে পারবে—তাই তার অশৌচ (period of mourning) সব চেয়ে কম। পাছে না জেনে কেউ তাকে কোনো প্রকারের পীড়া দেয় তাই ঐ সময়ে শোকাতুরকে বিশেষ বেশ পরতে হয়—ইংরেজ যে রকম কালো পোশাক পরে, কিম্বা বাহুতে কালো পটি বাঁধে।

অতএব এখন কাজকর্মে মন দিন। কর্তব্য কঠোরতর হল, সাহায্য কমে গেল। কিন্তু দয়াময় চরম সহায়।

আমি কর্মে উপস্থিত থাকার জন্য বৃহস্পতিবার কলকাতা আসার ব্যবস্থা করেছিলুম কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পুনরায় দাঁত নিয়ে শয্যাশায়ী হলুম। কাল শেষ injection নিয়েছি। তবে আশা করি শীঘ্রই দেখা হবে।

আপনার

শান্তিনিকেতন সৈয়দ

(৩)

২১।২।৫৭

প্রিয়বরেষু,

আপনি আমি একই সময়ে চিঠি লিখেছি ; আশা করি আমারটা পেয়েছেন। সেটাতে দৈনিক বসুমতীতে কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার বাসনা রাখি তার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত ছিল।

লোহার ব্যবসাতে আপনাকে একদিন যেতে হবে সে-কথা আমি জানতুম কিন্তু এত শীঘ্র, সেটা ভাবিনি। এতে আপনি বিচলিত হবেন না। রবীন্দ্রনাথ

যদি পাট্টা কবুলীয়ৎ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কয়লা বেলচা নিয়ে বছরের পর বছর কাটিয়ে থাকতে পারেন তবে আমরাই বা এত নিরাশ হব কেন? তবে আপনার এই ব্যবসা থেকে একদিন বেরনো আপনার পক্ষে হয়তো কঠিন হতে পারে। ভীষ্মদেব শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, যে ব্যক্তি বৃক্ষের উচ্চ শাখাতে আরোহণ করেছে তাকে অহরহ জাগ্রত থাকতে হয়। কাবুলীরা বলে; এ যেন সিংহের পিঠে চড়ার মত। ঘুমাবার উপায় নেই। পড়ে গেলেই সিংহ খেয়ে ফেলবে। আমাদের গ্রাম্য কবিও বলেছেন,

এমন অনেক বন্ধু আছে, আশা গাছে দেয় রে তুলে,
ভালোবেসে নামায় এসে এমন বন্ধু ক'জন মেলে?

কিন্তু জগদ্বন্ধু তো আছেন।

বসুমতীর জন্য হয়তো সুদক্ষ একজন কর্মচারীর প্রয়োজন হবে। তৈরী মাল নয়। খানিকটা কাঁচা। যে আপনার নির্দেশ নেবার মত খানিকটা তালিম পেয়েছে কিন্তু স্বাধিকারপ্রমত্ত নয়। এখন থেকেই এবিষয়ে কিছু কিছু চিন্তা করে এদিক ওদিক নজর ফেলবেন। সময় এলে আমিও দু' একজনের নাম উল্লেখ করবো।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা এইবারে নিবেদন করি।

অরবিন্দ ঘোষ জেল থেকে খালাস পেয়ে উত্তরপাড়াতে বলেছিলেন, বিপ্লব কার্যে যুক্ত থাকার সময় প্রায়ই তিনি হৃদয়ঙ্গম করতেন, দেশকে তিনি কোন্ দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, সে সম্বন্ধে তাঁর যেন সুস্পষ্ট ধারণা নেই—পদাতিক নাই বা জানলো তার লক্ষ্য কোথায়, কিন্তু সেনাপতিকে সে বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হতে হয়। অরবিন্দ তারপর বলেন, কিন্তু কাজের চাপে নির্জনে গিয়ে সে-বিষয়ে চিন্তা করার অবকাশ তিনি পান নি। তাই তিনি বাঙ্গলার জনসাধারণ এবং কর্মীদের কাছ থেকে কিছু দিনের জন্য অনুপস্থিতি কামনা করেছিলেন। এ-সব খুব সম্ভব আপনার জানা কথা, এবং এটাও নিশ্চয় জানেন, তারপর চন্দননগর হয়ে পণ্ডিচেরী চলে যান।

লোহাতে ঢুকে আপনাকেও পরিষ্কার জানতে হবে লক্ষ্য আপনার কি। এখন ব্যবসাটির বিস্তৃতি ও পরিমাণ আপনি চিনে নেবেন। পরে কিন্তু আপনাকে একদিন নির্জনে গিয়ে চিন্তা করতে হবে আপনার লক্ষ্য কি, অর্থাৎ ব্যবস্থা সর্বাঙ্গসুন্দর হয় কি প্রকারে, কোন্ দিকে চললে মারের হাত থেকে যথা সম্ভব সুরক্ষিত হওয়া যাবে। কিছুদিন পর কিয়ৎকালের জন্য এই নির্জনের সাধনাটি

আপনি অবহেলা করবেন না। আমি আপনাকে কি উপদেশ দেব, কিন্তু আমার যদি দেবার মত কিছু থাকে তবে এই একটি মাত্র উপদেশ।

'বসুমতী'তে প্রকাশিত নামের তালিকাতে আমার নাম দেবার প্রয়োজন ছিল না। কারণ আমার সঙ্গে আপনার ঈশ্বর পিতৃদেবের কোনো লৌকিকতার সম্পর্ক ছিল না। তবে বাদ দিলেও দুশ্চিন্তা হত—আপনারা আমার মনের খবর পেয়েছেন কিনা তাই ভেবে।

ঐ সময়টা আমি দৈঃ এবং মাঃ উভয় বসুসমতীর প্রত্যেকটির ছত্র পড়েছি। 'যুগান্তর' এবং 'স্টেটসম্যান'ও। আপনারা শোকাতুর ছিলেন বলে, কোনো জায়গাতেই ৺পিতৃদেবের কোনো পাকা জীবনী বেরয়নি। তার জন্য মনে মনে ব্যবস্থা করবেন। ইতিমধ্যে তাবৎ কাগজের কাটিং একটা জায়গায় রাখবেন। আমি আসছে বছর একটি ছোট প্রবন্ধ লিখব। (আমার প্রথম ইচ্ছে হয়েছিল, শ্রাদ্ধের দিনই লেখাটি প্রকাশ করার, কিন্তু মন তখন শোকাতুর ছিল, দেহের পীড়াও ছিল—লেখাতে সংযম থাকতো না, এবং আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে পাঁচজন অজ্ঞ বলে ভুল বুঝতো)। ইতিমধ্যে কলকাতায় এলে কাগজপত্র নিজেই দেখে নেব। নতুবা সময় এলে আপনাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য স্মরণ করিয়ে দেব।

আজ এখানে শেষ করি।

আপনার ভ্রাতা এবং ভগ্নীদের আমার প্রীতিসম্ভাষণ জানাবেন।

"এ গৃহে শান্তি করুক বিরাজ মন্ত্রবচন-বলে,
পরম ঐক্যে থাকুক সকলে, ঘৃণা যাক্ দূরে চ'লে ;
পুত্রে পুত্রে মাতা দুহিতায় বিরোধ হউক দূর,
পত্নী-পতির মধুর মিলন হোক্ আরো সুমধুর ;
ভা'য়ে ভায়ে যদি দ্বন্দ্ব থাকে তা' হোক্ আজি অবসান,
ভগিনি যেন গো ভগিনীর প্রাণে বেদনা না করে দান ;
জনে জনে যেন কর্মে বচনে তোষে সকলের প্রাণ,
নানা যন্ত্রের আওয়াজ মিলিয়া উঠুক একটি গান।"

—অথর্ববেদ

শান্তিনিকেতন
মুজতবা আলী

॥ শ্রীঅমলেন্দু সেনকে লিখিত পত্র ॥

(১৪৯/এ বকুলবাগান রোড, কলিকাতা-২৫)

(১)

২ জুলাই, ৫৩

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমি শব্দতাত্ত্বিক নই, কাজেই আমার সাহায্য নিয়ে অভিধান নির্মাণ করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। বিশেষতঃ আমার কাছে ভালো অভিধান (আরবী, ফার্সী, তুর্কী ভাষায়) নেই যে সেগুলো দেখে ত্রুটিবিহীন অভিমত দিতে পারি।

যদি অপরাধ না নেন তবে বলি, কিছুটা ফার্সী শিখে নিন, যাতে করে অন্ততঃ সে ভাষার অভিধান কাজে লাগাতে পারেন।

আমি যে অর্থগুলো দিলুম সেগুলো ভাসাভাসা—সাহিত্যিকের জন্য প্রশস্ত, শব্দতাত্ত্বিকের জন্য যথেষ্ট নয়। এগুলো আমার বরাতে ফেলে অভিধানে ব্যবহার করলে অবিচার করা হবে।

শামী-কবাব – শাম (Syria) দেশে প্রচলিত এই অর্থে শামী-কবাব। মাংস পিষে বড়ার মত চেপ্টা করে ভাজা কাবাব। সীনা কলীজহ্—পাঁজরের মাংস টুকরো টুকরো করে তার সঙ্গে lever (আন্ত কিম্বা টুকরো টুকরো করে) মিশিয়ে শুকনো মাংসের ঝোল।

ফালুদা—প্রায় ice-cream.

জরীন কলম—সোনার কলম।

জহ্নুধারা—জহ্নু মুনির দেহ হইতে নির্গত (ধারা) কণা—জাহ্নবী অর্থে।

চাটিম চাটিম—তবলার বোলের অনুকরণে।

শব্দ—cf. সেতারের পিড়িং পিড়িং। Onomatopoeic.

পেতলে নিয়ে—পাতলা করে নিয়ে। পেতলে নিয়ে অচলিত Slang.

কানজোখা—কান পর্যন্ত উঁচু।

হাঁসুলি বাঁক—হাঁসুলির মত বাঁকা।

শুদ্ধদ্বরণিক—যা ইচ্ছা লিখুন।

আশা করি কুশলে আছেন।

মুজতবা আলী

(২)

১৮।৭।৫৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার প্রথম চিঠির উত্তর তখন ভালো করে দিতে পারিনি। চাকরির চাপ কখন যে জগদ্দল পাথরের মত নেমে আসে আর কখন যে হঠাৎ হাল্কা হয়ে যায় তার হদীস পাওয়ার চেষ্টা আবহাওয়া দপ্তরের ভবিষ্যদ্বাণী করার মত। না হলে তখনই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানানো উচিত ছিল, আপনি যে অশেষ পরিশ্রম স্বীকার করে আমার বইখানার ভুলত্রুটি ধরে দিয়েছেন তার জন্য। সংস্কৃতের উপর (কথা যখন উঠল তখন বলি কোনো ভাষার উপরই) আমার যথেষ্ট দখল নেই বলে নানা রকমের বালসুলভ ভুল করে থাকি। তার উপর বিশ্ববিদ্যালয় আইন করেছেন, মূল ভাষাতে যে রকম বানান থাকবে—অর্থাৎ দীর্ঘ হ্রস্ব, স শ—বাঙলাতে তার-ই কাছে আসবার চেষ্টা করবে। এরও ব্যত্যয় বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছেন—যদি বানানটি চালু হয়ে গিয়ে থাকে তবে পুরনো বানানই চলবে। আমি এই ব্যত্যয় মেনেই লিখেছিলুম 'সাবাস'। সে দিন হঠাৎ দেখি রবিঠাকুর তাঁর অতি শেষদিকের লেখাতে লিখেছেন 'শাবাশ' (কথাটা 'শাদ' ['আনন্দ'], যার থেকে 'শাদী', 'বিয়ে' অর্থে ব্যবহার হয়, 'বাশ্' —'থাকা' —খুব সম্ভব সংস্কৃত 'বস্' ধাতু) কিম্বা 'শাহ'—রাজা, বাশ্ থেকে হবে। যা-ই হোক না কেন 'শ', 'স' নয়) কাজেই আবার বানান বদলাতে হ'ল। এখন বলুন তো বাঙলা লিখি কি প্রকারে!

আরবী, ফার্সী, তুর্কী (তুর্কীস্থানের জগতাই তুর্কী ভাষা ও এশিয়া মাইনরের ওসমানলী তুর্কী ভাষাতে তফাৎ বাঙলা অভিধানে এখনো করা হয়নি), উর্দু, সংস্কৃত, পর্তুগীজ আর অনেক ভাষা থেকে শব্দ এসেছে। এসব তাবৎ ভাষা শিখে, তাদের বানানে হ্রস্ব দীর্ঘ জেনে তবে বাঙলা লিখতে হবে। উত্তর হতে পারে অভিধান দেখো। কোন্ অভিধান। রাজশেখরবাবুর বইখানা অতি উত্তম কিন্তু তিনিও তো ঐ কর্মটি করতে অক্ষম। জ্ঞানবাবুর অভিধান আরো বড়িয়া কিন্তু তিনি মেলা "গ্রাম্য" অথচ চালু কথা দেননি, এবং বানানের হ্যাপা সেখানেই তো বেশী। তবে?

'ওয়াকিফ-হাল' না লিখে আমি 'ওকিব-হাল' লিখেছিলুম, পাছে বাঙালী পাঠক এর 'ছদ্মবেশ' বর্জিত চেহারা চিনতে না পারে। বিশ্বভারতীর পুলিন সেন প্রথম কয়েক অধ্যায় প্রুফ দেখার সময় (সেগুলোর সমাস জোড়া, বানান consistency চমৎকার হয়েছে) ওটাকে 'ওয়াকিফ-হাল' করে দেন। তা

হলে হেস্ত-নেস্তকে 'হস্‌নীস্ত্‌' এবং 'অকুস্থল'কে 'ওয়াকেয়াস্থল' লিখতে হবে। সুচতুর পাঠক কিম্বা / এবং আপনার মত দিকসুন্দরী-বল্লভ (আমার সুরসিকা সব চেয়ে চিংড়ি ছোট-বোন ডিকশনারির নাম দিয়েছে 'দিকসুন্দরী'—অর্থাৎ যে সুন্দরী বানানের গোলকধাধাঁয় দিক বাৎলে দেন, তারপর ফিক করে হেসে বলেছিল, 'অবশ্য বাঙলাতে ওনারা দিক দেখান না, দিক্ করেন বেশী।' প্রভাত মুখো 'দিক্করী'—যে দিক্ করে—'রমণী' অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর 'কুর্চশেখর তুখাঞ্জন…' এবং 'খট্টে খট্টে দিক্করিগণ' পদ্য পড়েছেন কি? অপূর্ব!) পূর্বপর (context—'পূর্বপর' ঠিক প্রতিশব্দ কিনা জানি না—আপনাকে চিঠি লেখা এক 'গব্বযন্তনা') বিবেচনা করে মানে ধরতে পারবে ঠিকই কিন্তু সাধারণ পাঠকের উপর এই শব্দতত্ত্বের গর্দিশ কাঁপানো নিশ্চয়ই আর্য-আচরণ নয়।

কিন্তু যে প্রশ্ন মনে নিয়ে এ-পত্র লিখতে আরম্ভ করি সেটি—আপনার 'দিক-সুন্দরী' কতদূর এগলো? ইতিমধ্যে ওদুদ সাহেবের বইখানা বেরিয়েছে। দেখেছেন নিশ্চয়ই। ওটি কিন্তু অতি সাবধানে ব্যবহার করবেন।

(১) শিলওয়ার, শল্‌ওয়ার ইত্যাদি। জিন্দেগী, জিন্দগী। পশ্‌তু, পুশ্‌তু। আরবী-ফার্সী-উর্দুতে (জগতাই উসমানলী তুর্কীতে এবং সিন্ধী-মপলা ভাষাতেও —বিবেচনা করি আরবী হরপে লেখা সব ভাষাতেই) vowel points অর্থাৎ জের-জবর-পেশ দেওয়া হয় না। তাই লেখা হবে জ-ন-দ-গ-ী (দীর্ঘ vowel points দেওয়া হয়)। সেই ভাবে প-শ-ত-উ। প্রথম vowel points নিয়েই বেশীর ভাগ মতভেদ হয়। তার কারণ ওটা সাধারণত তাড়াতাড়িতে বলা হয়। তাই ওটাকে vague indistinct vowel বলা হয়। ইংরেজীতে about, polite, err-এও এই vague indistinct vowel. এই vague indistinct vowel থেকে পৃথিবীর যাবতীয় অন্যান্য vowelএর সৃষ্টি। (Daniel Jones-এর An English pronouncing Dictionary-র প্রথম পৃষ্ঠায় এর একটি উত্তম ছবি দেওয়া হয়েছে) (আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস প্রাচীন যুগে ঋ-এর উচ্চারণ ছিল এই vague indistinct vowel+a trill)। কাজেই শুনতে পাবেন—যদিও তাড়াতাড়ি বলা হয় বলে ঠিক ধরা যায় না—শিলওয়ার, শু……, শ… · etc। তাই আররী ইল্‌ম্‌* = জ্ঞান বাঙলায় 'এলেম', তাই ম-হ-ম-ম-দ বাঙলায় মুহম্মদ, মোহম্মদ, মহম্মদ, 'মামদো! (ঋষি < আর্য, মহম্মদ < মামদো!) অ-হ্‌-সা-ন (আরবী), ফার্সী—ইহ্‌সান, উর্দু—এহসান, বাংলা—আসান

* এর থেকে 'মালুম', 'তালিম', 'মুয়াল্লিম'।

(মুশকিল আসান)। ইংরেজ লেখে Peshawar : পাঠান বলে পি, কিম্বা প্‌শাব্‌র।

কাজেই ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ নেই।

রুবাইয়াতের অন্ত্যানুপ্রাস aaba হবে। তার একটা দৃষ্টান্ত পাবেন 'দেশে বিদেশে'র ৩৭৪ পৃঃ—সন্‌গে ওতন্‌ etc—'। মাঝে মাঝে a a a a ও হয়।

আরো দু'একটা কথা উত্থাপন করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু পেটের অসুখে কাতর হয়ে পড়েছি। বাঙালীর birthright—আমাশয়।

নমস্কারান্তে

A. I. R মুজতবা আলী

কটক

পুনশ্চ

আপনি আমার লেখার যে প্রশংসা করেছেন তার দাওয়াই হিসেবে আপনাকে 'উষা' কাগজের আষাঢ় ১৩৬১র (33 B, Amherst street থেকে প্রকাশিত) শেষ পাতা পড়তে অনুরোধ করি। লেখক 'সেন'। কে বলে বহ্নিরা বড্ড ঐক্যবদ্ধ? আপনি বলেন, আমার লেখা আসমানের তারা, উনি বলেন, পিঠের পাঁচড়া (সিলেটি প্রবাদ)।

আপনার রাস্তা Tawnsend না Tawnshend? অভিধান বলেন, দুইটারই উচ্চারণ Taunzend.

(৩)

২৩।৭।৫৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠি পেয়েই উত্তর দিচ্ছি। একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলুম।

বাঙলা ভাষায় আরবী, ফারসী এবং উর্দুর মূল এবং বানান নিয়ে সব চেয়ে বেশী আলোচনা হয়েছে 'মোহম্মদী' নামক মাসিকে। অথচ সেগুলোর ব্যবহার আজ পর্যন্ত কোনো কোষকার করেননি! রাজশেখরবাবুর অভিধানের প্রথম প্রকাশ ভুলে ভুলে ছয়লাপ ছিল। তার বহু ভুল দেখিয়ে এক বাঘা মৌলবী

সায়েব মোহম্মদীতে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত অনেক লেখা ঐ মাসিকে বেরিয়েছে। এমন কি গত বৎসর ঢাকা থেকে প্রকাশিত মোহম্মদীতে মৌলনা আক্রম (আক্রমন!) খাঁর অভিধানের (ইটি তিনি শেষ করতে পারেন নি) কিছুটা বেরিয়েছে। এই সব back number না দেখলে আপনার অভিধান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কারণ দু'চারটি শব্দের মূল আমাকে রীতিমত হকচকিয়ে দিয়েছিল।

'ছবী'কে না হয় 'ছবি' লিখলেন, কিন্তু 'বুকের মাঝে বাজলো যে বিন্' (বীণা) লিখবেন কি?

অথচ আপনিই নজীর লিখেছেন।

কোষকারের অন্যতম প্রধান কাজই তো নিক্তি ধরে মাপা, এটা অচলিত না সুচলিত না অচল। তা না হলে তো সবাই অভিধান লিখত—আমিও লিখতুম। এ যেন কসাই বলছে, বকরীর গলা কাটবো কি করে, বড় মায়া হয়।

তাই দেখুন Oxford-কে Concise করতে গিয়ে কোষকারকে কতখানি ভাবতে হয়েছে। এ শব্দটি ইংরাজিতে মাত্র একবার ব্যবহৃত হয়েছে—কিন্তু প্রয়োগ করেছেন শেক্‌স্‌পিয়ার—দেব কি দেব না?

এককালে 'চলন্তিকা'য় 'সৈয়দ' শব্দ ছিল না যদিও 'শেখ' ছিল, 'মোগল' 'পাঠান'ও ছিল। আমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তিনি 'সৈয়দ' দিলেন—অবশ্য কাকতালীয়ও হতে পারে।

পূর্ব বাঙলার ভদ্র সাহিত্যে আজকাল হরবকত, ফজর, জোহর, আসর, মগরিব, এশা এই 'পঞ্চসন্ধ্যার' (পাঁচ নমাজের) উল্লেখ থাকে। আমার মা-ও বলতেন মগরিবের একটু আগে, কিম্বা আসর মগরিবের দরমিয়ান (অর্থাৎ মধ্যে) এবং এই পদ্ধতিতে সময় বোঝাতেন। আপনি এগুলো দেবেন, না দেবেন না? ঐ তো আপনার গব্বযন্তনা—আমাদের কাছ থেকে এককণাও 'হমদরদী' পাবেন না। (সহ+অনুভূতি, হম্+দর্দ, Sym+Pathos)

ধর্ম জানেন, আমি মস্করা করিনি। আমার এখনো মনে পড়ছে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেনামীতে লেখা ('কস্যচিৎ ভাইপোস্য') ব্রজবিলাস কিম্বা তার পরের কোনো বেনামী লেখাতে আমি 'কট্টর' পেয়েছি।* এবং 'চাটিম চাটিম' 'আঁধারের আলোতে' না হলে 'শ্রীকান্তে' পড়েছি। কোনো এক মজলিসে পিয়ারী গাইবেন, তবলচী চাটিম চাটিম বোল তুলছে। আমি সিলেটের খাজা বাঙাল। এসব 'লবজো' আমি তো আর গড়তে পারিনে।

* 'ফয়তা' পেয়েছি 'ফতোয়া' অর্থে এবং ঐ অর্থেই 'তৈলবট'।

সুনীতিবাবুর শব্দগুলো দেখিনি। বলি কি প্রকারে? ওদুদ সায়েবের অভিধান সম্বন্ধে আর কিছু বলতে আমি নারাজ। অপ্রিয় কথা বলতে আমার বড় বাধে।

চট্ট+আর্য=চাটার্জী, বন্দ্যো+আর্য=ব্যানার্জী—ইত্যাদি। বড়বাবু (৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) বলেন, চট্ট+উপাধ্যায় ইত্যাদি থেকে নয়। তাঁর প্রবন্ধে এই আলোচনাটি পড়েছেন কি? যতদূর মনে পড়ে ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন।

Tawnshend, Tawnsend দুটোই ইংরেজীতে আছে। উচ্চারণ একই—Taunzend / Daniel Jones তাই বলেন। কিন্তু তাহলে অর্থাৎ বাঙলায় টাউনজেণ্ড লিখলে চিঠি মারা যাবে।

নমস্কারান্তে

কটক মুজতবা আলী

(৪)

১২।১০।৫৪

সদন্তঃকরণেষু,

পূজার পাঁচটা লেখা শেষ হতে না হতেই গৃহিণী দুটি শিশু নিয়ে এখানে উপস্থিত। একটার ২ বছর ৮ মাস, আরেকটার ৮ মাস। তাছাড়া আলসেশিয়ন কুকুরছানা, রোডেসের মুর্গীমোর্গা, হাঁস, ফুলবাগান সব্জীবাগান, বারবিট্ পাখী (গাছে, তার বাসার সুব্যবস্থা), পুকুরের পদ্ম,—কত বলবো? বিরাট ধুন্দুমার! আমি 'লবদ্বার' বন্ধ করে মুর্শীদের নাম জপ করছি। একদম Paradise lost!

অপরাধ নেবেন না কিন্তু আমার মনে হয়, ঢাকার লোক যদি কলকাতায় জন্মায় তবে তার দু কুলই যায়। কুটির স্ল্যাঙ সে শেখবার সুযোগ পায় না, আবার 'সামবাজারী'ও 'সেখে' না। অবশ্য যদি কেহ শ্যামবাজার অঞ্চলে মানুষ হয় তবে আলাদা কথা। পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আপনি সে অঞ্চলে বড় হননি। না হলে 'রেতে' এবং 'রান' সম্বন্ধে প্রশ্ন শুধাতেন না।

পক্ষান্তরে আমি পনরো বছর বয়সে সিলেটের যাবতীয় slang শিখে ঘটি দেশে আসি। তারপর বছর দুই শ্যামবাজারের 'রক্-ক্লাবে' বকাটে ছোঁড়াদের

সঙ্গে বিস্তর আড্ডা মারি। আমি নিজে বিশ্বকাটে এবং একটি 'তুখোড় ইয়ার' (বিদ্যাসাগর পশ্চ)।

অতএব এ বাবদে আপনি আমার কাছে 'ছোড্ড এড্ডা পোলাজ'। আপনি আমাকে যাবতীয় বিষয়ে টিড দিতে পারবেন, কিন্তু দাদা, বাঙাল ঘটির এ-হেন অপূর্ব মাকাল-ভেরেণ্ডা সংযোগ আপনি পাবেন না। এমনকি 'কুট্টি' গল্প সঞ্চয়ন আমার ভাঁড়ারে যা আছে তা কোনো ঢাকাইয়ারও নেই। কলকাতায় দেখা হলে আমার চ্যালেঞ্জ রইল।

আমার এই ইয়ার্কিপনা কখনো যায়নি। প্যারিস, ভিয়েনা, বার্লিন, লণ্ডন এবং প্রাগে এই কর্মটি আরও মনোযোগ সহকারে করি। আমার জীবনের নীতি,—বই পড়বে গুণীদের, আর মিশবে 'অজ্ঞদের' সঙ্গে। গুণীদের সঙ্গে মিশে আর লাভ কি? তাঁদের যা বলার তা তো তাঁদের কেতাবেই রয়েছে। বরঞ্চ তাঁরা often very disappointing. পক্ষান্তরে অজ্ঞদের কোনো pretension নেই। তাই পদে পদে তারা চমক লাগাতে জানে। তাই ইয়োরোপের বহু শহরে আমি সর্বদাই দিন কাটিয়েছি লাইব্রেরিতে, রাতটা 'পাবে'-'পাবে'—তাড়িখানায়। Smutty jokesএর আমার যা 'সঞ্চয়িতা' (বিধুশেখর শাস্ত্রী যখন রবিবাবুকে বললেন শব্দটা ভুল তখন তিনি কি উত্তর দিয়েছিলেন আজ আর মনে নেই কিন্তু ওটা বর্জন করেননি) সেটি—কি আর বলবো, দম্ভ করতে নেই, মুর্শীদের মান—'ক্রন্দসী' নিয়ে নিশ্চয়ই আমি শেষদিন পর্যন্ত কাজিয়া-কোঁন্দল করবো। 'যে অর্থটি লোকে নেবে সেইটিই অর্থ বাকী সব অনর্থ'—correct to a point. কিন্তু যে শব্দের অর্থ এখনো জনসমাজে liquid, সেখানে আসল অর্থ, অভিধানে যা বলে, কবি যা mean করেছেন সেইটে বাদ দিয়ে এমন অর্থ নেব যেটা ব্যাকরণকে বলাৎকার করে, অভিধানকে অপমান করে এবং 'অনর্থ' বের করে কবিতাটির রসভোগ থেকে বঞ্চিত করে? তাহলে বেগুনকে 'প্রাণনাথ' বললেই হয়! আশা করি এই সরেস কুট্টি গল্পটি জানেন। নাহলে 'পঞ্চতন্ত্রে'র 'রেডুক্‌ৎসিয়ো আভ্‌ আবসুর্ডুম' দ্রষ্টব্য।

আপনি ঠিক বলেছেন, কার্ত্তিক কেন কার্তিক হবে?

চাটিম চাটিমে আপনার দ্বন্দ্ব কি বুঝতে পারলুম না। সানাইয়ের পোঁ, সেতারের পিড়িং পিড়িং—ঠিক সেই রকম শরৎবাবু বললেন, তবলার চাটিম চাটিম্। 'পোঁ', 'পিড়িং পিড়িং'-এ যখন প্রশ্ন উঠছে না মিষ্টি না কর্কশ, তখন চাটিম চাটিমের বেলা উঠছে কেন? সব কটাই তো অনমটোপোয়েইক—না কি

জানি বলে ইংরিজিতে। তা হলে বাতাসের শনশন ভ্রমরের গুনগুন মিষ্ট না কর্কশ শুধাতে হয়।

শব্দে আপনি আসল root না দেখিয়ে immediate root দেখানোটা prefer করেন। তার থেকে বুঝতে পারছি, আপনার মন আমার যুক্তিতে সাড়া দেয়নি। পুনরায় নিবেদন করি।

(ক) কোনো অভিধান (একটু বড় সাইজের হলেই) immediate source থেকে শেষ শব্দ পর্যন্ত দেখায়, এবং

(খ) কোনো অভিধান (একটু ছোট সাইজের হলেই) শুধু শেষ শব্দ দেখায়।

আজ পর্যন্ত ত্রিভুবনে আমি কোনো অভিধান দেখিনি যেখানে (গ) শুধু immediate source দেখায়—এক রাজশেখরবাবুর অভিধান ছাড়া।

(Inter alia—'জোলাপ' সম্বন্ধে আমার আরবী অভিধান বলে শব্দটি ফার্সী গুলাপ (গুল্ [ফুল]+আপ্ [অপ্, cognate with sanskrit অপ্ = জল] থেকে। আরবী ভাষায় 'গ' এবং 'প' অক্ষর নেই বলে 'গুলাপ' শব্দ 'জুলাব' হয়ে গিয়েছে। সেই আরবী শব্দ পুনরায় ফার্সীতে ফিরে আসে 'জুলাব' রূপেই (যে রকম ফার্সী গওহর, আরবী জওহর,—তারপর আবার ফার্সীতে জওহর এবং গবেষণার ফলে পুনরায় 'গওহর'ও চালু হল। বাঙলাতেও তাই দুটোই আছে—গৌহর proper nounও চালু আছে, আবার 'জওহর' (Prime Minister) [আমাদের P.M-এর নাম অবশ্য জওয়াহির বা জওয়াহর জওহর-এর বহুবচন]। 'জহুরী', জউরী = jewellerও আছে)।

যে 'গুলের' (ফুলের) 'আব' (জল) খেলে জোলাপ অর্থাৎ purgative হয় সেটা বোধ হয় আসলে ইসুবগুল।

আমার কাছে ১০।১১ শতাব্দীর এবং পূর্বেকার আভিসেন্না ও অল-বীরুনীর ডাক্তারী বই নেই। থাকলে, হয়ত প্রমাণ করা সম্ভব হত যে এরা মেক্সিকো আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বেই purgative জুলাব জানতেন।

এ বিষয়ে আমি কিন্তু নিঃসন্দেহ যে বাঙলা-জোলাপ ইংরেজি থেকে আসেনি। উর্দু-হিন্দীতে জোলাপ রয়েছে, ফার্সীতে আছে, আরবীতে আছে, তার থেকে না নিয়ে নিয়েছি ইংরেজি jalap থেকে—যে শব্দ ইংরেজীতে আদপেই চালু নেই, সাধারণ ইংরেজি অভিধানেও থাকেই না, ১৭, ১৮ শতাব্দীতে বাঙলা দেশে ইংরেজরা ব্যবহার করতো বলে শুনিনি, সেইটে এল ইংরিজি jalap থেকে? উচ্চারণটাও লক্ষ্য করুন। ফার্সীতে পরিষ্কার জোলাব, উর্দুতেও তাই। আর

ইংরেজি jalap উচ্চারণ জ্যালাপ। ইংরেজি a-এর hat, fat, cat তো আমরা নিই হ্যাট, ফ্যাট, ক্যাট রূপে, কিম্বা হেট কেট রূপে, 'হোট' 'কোট' রূপে নয়। এই সম্পর্কে oxfordএ julep শব্দটাও দেখে নেবেন।

অবশ্য আরবরা ভুল করে থাকতে পারে। হয়ত তাদের জোলাব ফার্সী গুলাপ থেকে আসেনি। এসেছে স্প্যানিশ jalapa থেকে। তাই বা কি করে হয়? স্পেনিশে j অক্ষরের উচ্চারণ পরিষ্কার আরবীর (স্কচ loch-এর মত)। তারা কোন দুঃখে ওটাকে 'জ' করতে যাবে! আর আপনি যে সব যাবতীয় বেজাতের ফিরিস্তি দিয়েছেন তার মধ্যে একমাত্র স্প্যানিশদের সঙ্গেই আরবদের যোগসূত্র ছিল।

(Inter alia বাংলা লাশ, আমার মতে আরবী থেকে আসেনি। ফার্সী 'লাশ' শব্দ এসেছে আবেস্তান—সংস্কৃত 'নষ্ট' থেকে 'নাশ' হয়ে 'লাশ' হয়ে। তুর্কীর প্রশ্ন এখানে আদপেই ওঠে না।)

পোর্তুগীজ সম্বন্ধে আপনার অবোধ্য কি লিখেছিলুম মনে পড়ছে না। যদি সে চিঠি ছিঁড়ে না ফেলে থাকেন (আমার বিনীত অনুরোধ ছিঁড়ে ফেলবেন; না হলে আমি আপনি গত হওয়ার পর কোনো গাধা সেগুলো ছাপিয়ে দেবে এবং গুণীরা বলবেন, আমার Philologyতে claimও ছিল। আমার নেই; আমি আপনাকে কাঠবেরালির সেবা করছি মাত্র) তবে জানাবেন।

Mary, পোর্তুগীজ থেকে, এটা পাবেন 'মাইরি' শব্দের under-এ।

চ্যাটার্জী, ব্যানার্জি আপনার অভিধানে না থাকতে পারে কিন্তু চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি পঞ্চকুলীন ব্রাহ্মণ ঘোষ বসু ইত্যাদি পাঁচ কায়েত, শেখ সৈয়দ মোগল পাঠান, কৈবর্ত, নমশূদ্র, হাড়ি ডোম ইত্যাদি থাকবে না এও কি বিশ্বাস্য? এদের নিয়েই তো আপনার বাঙালী জাত।

'মোহম্মদীকে' লিখে কোনো উত্তর পাবেন না। পেলে পাবেন কলকাতার-ই সাহিত্য পরিষদ কিম্বা অন্য কোনো লাইব্রেরিতে।

'অবদান' তো চলে গেল। তা যাক্। উপায় নেই। আমি একটু মস্করা করে শব্দটা ব্যবহার করে থাকি।

এযাত্রা এই পর্যন্ত। আপনি যে লিখেছেন ৮ পাতা চিঠি শিগগির কারো কাছ থেকে পেয়েছি বলে ইত্যাদি, এত 'শিগগির' কথাটার ব্যবহার আমার কাছে সম্পূর্ণ নূতন মনে হল। আমি শিগগিরের ব্যবহার শুধু ভবিষ্যতের জন্যই দেখেছি। অতীত হলে দেখেছি, 'হালে', 'ইদানীং', 'এদানির', 'কিছুদিনের মধ্যে' ইত্যাদি

দেখেছি। এদের কোনোটাই আপনি যে অর্থ দিতে চেয়েছেন সেটি প্রকাশ করে না, কিন্তু তার জন্য 'শিগগিরের' প্রয়োগও দেখিনি। বিবেচনা করে জানাবেন।

বিজয়ার আলিঙ্গন জানবেন।

কটক ভবদীয়

মুজতবা আলী

পুনশ্চ—১৭।১০।৫৪

আমাদের 'জিলিপি' শব্দটা কোথা থেকে এসেছে জানেন কি? আমি জানিনে। পেটের অসুখের সময় দিল্লীতে গরম জিলিপি ঔষধার্থে খেতে বলা হয়।

(৫)

প্রিয়বরেষু,

হরিচরণবাবুর অভিধানে ৺ স্বরবর্ণের শেষে আছে। এবং তাতে এক পৃষ্ঠাব্যাপী চন্দ্রবিন্দু সম্বন্ধে আলোচনা আছে। আপনি সেটি পড়েছেন কি? তাতে পাণিনি থেকে কেচ্ছা শুরু।

আমি ১২।৩।৫৮ কলকাতা যাব। তার পর ঢাকা। ২০।৪।৫৮-এ কলকাতা ফিরে আসবো। কলকাতায় কোথায় উঠবো জানিনে। ঢাকার ঠিকানা, C/o, Mrs. Ali, Qamarunnesa Hostel, 10, Segun Bagicha, P. O. Ramna, Dacca.

আপনাকে দিয়ে আমার একটা কাজ করিয়ে নেবার বাসনা ছিল—অনেক দিন ধরে। ভরসা পেলে বলি।

Santiniketan সৈ. মু. আ.

॥ শ্রীমতী অর্চনা মিত্রকে (২৯।১ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড কলিকাতা-১৯) লিখিত পত্র ॥

(১) ১১

স্নেহের অর্চনা,

প্রথমে দুটি বড় প্যাকেট, পরে ছোট একটি, সর্বশেষে যে-পত্রিকায় তোমার 'বনফুল' আছে এ-সব পেয়েছি। এ পর্যন্ত মাত্র একটা ভুঁইফোঁড় প্রকাশক ভিন্ন এখানে কলেজ স্ট্রীটের কোনো প্রকাশকই পশ্চিম বাংলার কোনো বই বিক্রির ব্যবস্থা করেনি। তুমি একবার ঘুরে যাও না। Permit পেতে তোমার অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। তবে পশুপতি খান পায়নি। অন্তত কেউ একজন নিখোঁজ বা/এবং মারা গেছে না বললে নাকি পারমিট মেলে না। তোমার সেই ঠাকুরমা, যে তোমাকে হামেশা "দিক্" করতো, তাকে ঢাকাতে এনে গঙ্গাপ্রাপ্তি করাতে পারো না ?

এখানকার খাদ্যাদি আক্রা নয়। তবে ওষুধের দাম, বেবিফুড গয়রহ অগ্নিমূল্য। আশু ভবিষ্যতে চালের অভাব হবে কিনা বলতে পারিনে।...এখানে যা-সব হয়ে গিয়েছে তার গোর নিত্যি নিত্যি খোঁড়া হচ্ছে। একটা জিনিস আমাকে বড্ড বিচলিত করেছে। ধর্ষণের ফলে হাজার হাজার কুমারী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। এদের অনেকের চতুর্দশ কুলে কেউ নেই। সমাজেও এরা স্থান পাবে না, অনেকেই—আমাদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও। এই যে তার সন্তানটি হতে যাচ্ছে তার প্রতি এর অনুভূতিটা মিশ্র। একদিকে কোন্ পশুর চেয়ে অধম বর্বর পাঠানের সন্তান এটা, অন্যদিকে ত্রিসংসার ঐ তার একমাত্র সম্বল। এবং অনেক ক্ষেত্রে কি আমরা দেখিনি যে বিবাহিত রমণীর আইনত জাত সন্তান বর্বর পশুর মত সমাজের বিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে—তবু মা তাকে ছাড়তে পারে না!

আশা করি তুমি/তোমরা কুশলে আছে। গণ্ডো দুই সাহিত্যিক এখানে নিমন্ত্রিত হয়ে এল, কিন্তু কোনো লেখিকা স্থান পেল না। তাজ্জব!

আন্‌কল্—আ

১৩৯ F ধানমণ্ডী,
রাস্তা—১, ঢাকা—২,
বাঙলাদেশ।

(২)

খবরদার—!

আম্মো ছেলেবেলায় একটি হাতের লেখা কাগজ চালাই। অবশ্য দাদার উপদেশ আদেশের উপর ভরসা করে। কাগজটার নাম ছিল "কুইনিন"—ম্যালেরিয়ার সে আমলের দাপট থেকে আজকের দিনের মস্তানরা বিস্তর বহুৎ শিখতে পারবে। আমার বয়স ১৫, দাদার সতেরো। ঐ বয়সে সর্ব বালক হয় সব-জান্তা (all knowing age, কুকুর-ছানার যে-রকম ছ'মাস বয়সে হয় all growing age, চটি জুতো থেকে সোফার মখমল তাবৎ জিনিস চিবিয়ে কুটি কুটি করে), তদুপরি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাকে আগা-পাশ-তলা রিফর্ম করার দুর্বার কামনা জাগলো আমাদের চিত্তে। তাই কাগজের নাম করা হল "কুইনিন"—আমরা শুদ্দুমাত্র তেতো কথাই শোনাবো।

বলা বাহুল্য, আমরা অত্যল্পকালের মধ্যেই ঝাঁকে ঝাঁকে দুশমন বানিয়ে ফেললুম। কিন্তু কাগজ বন্ধ হওয়ার আরো একটি কারণ ছিল। আজ না হয় আমার হাতের লেখা বগের ঠ্যাঙ কাগের বাসার মত চিত্তিরবিত্তির। তখন ছিল রীতিমত খুশ্‌খৎ, বিলকুল বদ্‌খৎ বা "বদ্‌খদ" ("বদ্‌খদ" আর "বদ্‌খৎ" একই কথা) নয়। অতএব আমারই উপর পড়লো তাবৎ পত্রিকা আদ্যন্ত লেখার ভার। লাও ঠ্যালা!

এই দুই কারণে কাগজটি অচিরাৎ তাঁর সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করলেন।

আশীর্বাদ না জানিয়ে হুঁশিয়ারি জানালুম। সম্পাদকমণ্ডলী অপরাধ নেবেন না। কিমধকমিতি।

—সৈয়দ মুজ্‌তবা আলী

॥ শ্রীসবিতেন্দ্রনাথ রায়কে (ভানু রায়) লিখিত পত্র ॥

(১)

ভাই ভানু রায়,

As usual শনির সন্ধ্যায় প্রুফ পেয়েছি। আমার শরীর আরো খারাপ। ম্যাপে একটা অতি নচ্ছার আতসী কাঁচ দিয়ে হিটলারের Russian অভিযানের অজানা-অচেনা জায়গাগুলো pen down—ঘণ্টা দুই নাগাড়ে—করার দরুন কাল থেকে double image দেখছি—তাই একটু সময় লাগবে। তবে স্থির করেছি, যেমন যেমন হবে পাঠিয়ে দেবো। "ধ্বনি" যুদ্ধের তাবৎ material যোগাড় করার পর এই হাল—লিখতে গেলে—বেশীক্ষণ একসঙ্গে, হঠাৎ সব blotted out হয়ে যায়। খুব সম্ভব এই সপ্তাহেই কলকাতা গিয়ে nursing home-এ ঢুকবো—অবশ্য আমার main trouble এর জন্য। তখন ডাক্তার যদি outside worldএর সঙ্গে contact না রাখতে দেয়, কিংবা কাজ করতে না দেয় তবে, ভাই, তোমাকেই সব করতে হবে—'বড়বাবু' বাবদে। আমার ছোকরাটির অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আরো দু'একটি প্রাচীন দিনের লেখা—of course after 1949—পাওয়া গেছে। তোমার যদি মনে হয়, তোমার বইয়ের size যথেষ্ট বড় হচ্ছে না, তবে আমাকে পত্রপাঠ জানিয়ো। কবে কলকাতা যাবো জানিনে বলে এ কয়েকটা দিন জরুরী চিঠি বা প্রুফ Regd. পাঠিয়ো। এমনিতেই চিঠি হারায়—redirection-এ riskটা greater. 'ধ্বনি'র উত্তর কবে লিখতে পারবো? কে জানে! একটু wait করো Please.

আ

(২)

ভ্রাত ভানু,

আমি দুই ব্যাটাকে তাদের বাপপিতেম'র ভিটে দেখাতে সিলেট গিয়েছিলুম। ফিরে এসে তোমার কার্ডদ্বয় পেয়ে আনন্দিত হলুম। 'বড়বাবু' সম্বন্ধে আমি আর নূতন কি বলবো!

এবারে তিনশটি টাকার একখানা Cross চেক শ্রীমোহিত চৌধুরী, Bus

Proprietor, Nicha Patti, Bolpur. এই ঠিকানায় রেজিস্ট্রি করে পাঠালে কৃতজ্ঞ থাকব। সঙ্গে সঙ্গে একখানা p. c.-তে তাঁকে জানিয়ো, তাঁর নামে চেক গেল এবং টাকাটা আমার বাড়ি চালানোর খরচারূপে। তুমি যে আমার প্রকাশক সে খবরটাও দিয়ো।

বিমল মুখুয্যে (বড়দা)-কে ফোন (473419) করে জানিয়ো আমি মার্চের শেষ সপ্তাহে বা এপ্রিলে দেশে ফিরবো। তাকে স্বয়ং পরে লিখব। গজেনদাকে নমস্কার ও তোমাকে শুভ ঈদের আলিঙ্গন।

আশীর্বাদক

সৈয়দ মুজতবা আলী

নিচের ঠিকানায় একখানা "বড়বাবু" পাঠাতে পারো? Per Regd. Post.

A. S. Mahmud Esq.
Pakistan National Oils Ltd.
Motijheel (মতিঝিল)
Dacca E. Pak.

পুনঃ P. C.-তে 07 Paise স্ট্যাম্প লাগিয়ো।

Thanks.

॥ শ্রীমতী সুনন্দা সেনকে (লাবান, শিলং) লিখিত পত্র ॥

(১)

৬। ১১। ৫৮

বৌদি,

তোমার চিঠি পেলুম। আমি একটা জিনিস এ জীবনে কখনো করে উঠতে পারলুম না। আর পারবো না বলে পঞ্চাশের পর সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছি এবং সর্ব ভুবনের গালাগাল খাই। সেটা balancing of the budget—টাকার নয়, সেটা তো আছেই, কিন্তু তার জন্য গালমন্দ শুনতে হয় না—হয় সময়ের। আপন পড়া, তাও হতচ্ছাড়া, ছন্নছাড়া, নিয়ে এত বেশী সময় কাটিয়ে দিই যে অন্য কোন কাজ করে উঠতে পারিনে। বিশ্ব-সংসার চটে যায়, ভাবে হৃদয়হীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন। আমি পড়ে পড়ে গাল খাই। তোমার short hand কি ক্রমেই long hand হচ্ছে? পাস করছো কবে? চাকরি নেবে কখন?

আমি যা জমিয়েছিলুম তা ত বিলেতে গিয়ে ফুঁকে দিয়ে এলুম।

"যত টাকা জমাইছিলাম
শুঁটকী মৎস্য খাইয়া
সকল টাকা লইয়া গেল
গুলবদনীর মাইয়া।"

এবারে নাগাড়ে শুঁটকী মৎস্য পেলেও আর টাকা জমবে না। তবু ভরসা আছে গরমে শিলং আসবো। বউ বাচ্চা আসবে কিনা সে ত বর্তমান পরিস্থিতি থেকে কিছুই ঠাহর করতে পারছিনে।

আশা করি তোমরা কুশলে আছ। তোমার কর্তা কিরকম আছেন? বসন্তকালে বিরহ নাকি বড় পীড়াদায়ক—কবিরা বলেন।

শান্তিনিকেতন। আলী সাহেব

(২)

২৩শে নভেম্বর, ১৯৫৮

বৌদি,

আজ তোমার পাঠানো জামাটি পেয়েছি, আমি এই দুপুরের গরমে সেটা পরে উল্লাসে নৃত্য করছি। জানিনে, তুমি আমার একটি গল্প "চাচা কাহিনীতে" পড়েছ কিনা; তাতে বরোদার রাজা আবিসিনিয়ার রাজাকে একখানি লাল কাশ্মিরী শাল উপহার দেওয়াতে তিনি নাকি খুশীর তোড়ে, সেই রেড-সীর গরমে অঙ্গে শাল জড়িয়ে জাহাজময় উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করে করে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। আমার অবস্থা তাই, সেই বর্ণনা পড়ে নিয়ো—আমার হাল মালুম হবে। ইউরোপে পুরোনো বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে গল্পগুজোব করেছি আর ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে দেখেছি। এবং ভালো ভালো বর্দ্যো ব্যার্গাণ্ডি খেয়েছি। তবে অল্প-স্বল্প—ও জিনিস বেশী মাত্রায় খেলে সুখ পাওয়া যায় না। সত্যি বলছি বিনয় নয়—আমার লিখতে ভাল লাগে না, ওর ভিতর কেমন যেন একটা দম্ভ আছে। আজ এখানেই থাক, লেখাগুলো নিয়ে নাকের জলে, চোখের জলে।

শান্তিনিকেতন আলী সাহেব

॥ শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরীকে (লাবান, শিলং-৪) লিখিত পত্র ॥

[১৯৬৫ সালে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'পঞ্চতন্ত্র' কয়েক পর্যায়ে 'পণ্টক' শব্দ ব্যবহৃত হয়। পড়ে মনে হল উদ্দিষ্টরা একাধারে অবিজ্ঞ এবং চালাকের ভানকারী। একটু পালটিয়ে 'পণ্ঠক' শব্দটি অধিকতর অর্থবাহী হয় কিনা বিবেচনা করতে লেখায় যে উত্তর পাই সেই পূর্ণ চিঠিটি এতৎসহ প্রকাশের জন্য পাঠাচ্ছি। চিঠির বয়ান 'পণ্টক' শব্দের কৌলুলীর হলেও পরবর্তী এক কিস্তিতে তদীয় পণ্টক শব্দ ব্যবহার কালে উল্লেখ করেছিলেন—'অথবা পণ্ঠক, যেমন কোন পাঠক মনে করেন' (হুবহু ভাষাটি মনে নেই)।]

জনাব চৌধুরী সাহেব,

আপনার নামটি আমার স্পষ্ট মনে আছে, কিন্তু আশ্চর্য, চেহারাটি মনে নেই—(বোধ হয় শ্যামবর্ণ ছিপছিপে) সাধারণত উল্টোটাই হয়। নয় কি ?

'পঞ্চতন্ত্র' five days wonder, ওর স্থায়ী মূল্য নেই। এবং যেই হাল্কা-শৈলী ছেড়ে কদিচ কখনো সিরিয়স বিষয় নিয়ে আলোচনা করি অমনি পাঠক-কুল কড়া কড়া চিঠি লেখেন। আমি ভাঁড়—ওদের মতে—আমি আবার 'জ্যাঠামো' করতে যাই কেন ? আপনি কিন্তু প্রাচীন দিনে আত্মীয়তার স্মরণে দয়া রাখবেন।

'পণ্ঠক' বলতে আমার কি আপত্তি ? কিন্তু ঘটিরা বলে পাঁটা (পাঁঠা) মাতাব্যথা (মাথাব্যথা) কতা (কথা)। তাই পণ্টক। ঘটিরা 'পাঁঠা' বলে না, বলে পাঁটা।

তদুপরি 'পাঁঠা' বা 'পাঁটা' বা 'পণ্টক' অর্থ গবেট, গাড়ল—সে ত ঠিক হতে পারে না—ঠক হতে হলে তো বুদ্ধির প্রয়োজন।

আপনার আশীর্বাদ মাথা (মাতা) পেতে নিলুম।

শঙ্কর আপনাকে জয়যুক্ত করুন। কিমধিকমিতি ॥

পোঃ আঃ বোলপুর, খাকসার

পশ্চিমবঙ্গ সিতু

পুঃ দয়া করে 'জনাব', 'সায়েব', 'ভবদীয়' লিখবেন না। আমাকে আগেরই মত দেখবেন।

পাঠকের নিবেদন

'অবধূত' যখন তাঁর 'মরুতীর্থ' নিয়ে মুরুব্বীহীন হালে নিঃশব্দে বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করলেন তখন উভয় বাংলার বাঙালী পাঠক মাত্রই যে বিস্মিত হয়েছিলেন সে-কথা নিশ্চয়ই অনেকের স্মরণে আছে। এ তো মরুতীর্থ নয়; এ যে রসে রসে ভরা 'রসতীর্থ'।

হিন্দু তীর্থের প্রতি মুসলমানের কোনো কৌতূহল থাকার কথা নয়, কিন্তু এই গ্রন্থ প'ড়ে পূর্ব পাকিস্তানী একটি মুসলমান তরুণ আমাকে বলে, সে নিশ্চয়ই হিংলাজ দেখতে যাবে—সে তখন করাচীতে চাকরি করে, তার পক্ষে যাওয়া সুকঠিন ছিল না। আমি শঙ্কিত হয়ে বললুম, 'অমন কর্মটি করো না। আর্টিস্টের মডেলের সন্ধানে কেউ কখনো বেরোয়! যে 'ভিখারিণী-ছবি তুমি পর্শুদিন একশ' টাকা দিয়ে কিনলে তুমি কি সে ভিখারিনীর সন্ধানে বেরোও, যাকে মডেল-রূপে সামনে খাড়া রেখে আর্টিস্ট ছবি এঁকেছিল? বরঞ্চ বলব, তাঁর সঙ্গে দৈবাৎ রাস্তায় দেখা হলে তুমি তো উল্টো ফুটে চলে যাও! কারণ, সে তো তোমার হৃদয়ে কোনো ঈস্‌তেটিক্ আনন্দ দিতে পারে না। আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, অবধূত-মহারাজ সাধু ব্যক্তি; সে সাধুতা তিনি লেখক হিসাবেও রক্ষা করেছেন এবং তাঁর পুস্তকে তিনি অতিরঞ্জিত করেননি। কোনো কোনো সাধু-বাবাজী 'বড়-তামাক' সেবন করেন; অবধূত কখনো করেছেন কিনা বলা কঠিন—অন্তত তাঁর ডেরাতে সে 'খুশবাই' আমি পাইনি কিন্তু একথা বর্‌হক্ সত্য, তাঁর সৃষ্টিতে গঞ্জিকা-বিলাস বিলকুল নদারদ। কাজেই হিংলাজে গিয়ে তুমি টায়-টায় তাই পাবে, দফে দফে সে-সব জিনিসই পাবে যার বয়ান অবধূত 'ইমানসে' দিয়াছেন, তাঁর ইন্‌ভেনট্রিতে ফাঁকি পাবে না। এবং পাব না—এবং সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা—তাঁর বই পড়ে যে কাব্যরস, যে কলাসৃষ্টিরস, সে ঈস্‌তেটিক ডিলাইট পেয়েছিলে সেই অনবদ্য অমৃত। তার শেষ প্রমাণ, সূর্যোদয় তো আমরা নিত্যি নিত্যি দেখি; তবে সূর্যোদয়ের ছবি কিনি কেন?'

তাহলে প্রশ্ন, অবধূত কি খাঁটি রিয়ালিস্টিক লেখক?

অবধূত কি বাস্তব জগৎ ছাড়িয়ে যেতে পারেন না?

কল্পনার ডানা জুড়ে দিয়ে তিনি যদি আমাদের নভোলোকে উড্ডীয়মান না

করতে পারেন তবে বাস্তবের কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে কী এমন চরম মোক্ষলাভ![১]

এর উত্তর অতিশয় সরল। অবধূত যদি তাঁর কল্পনা, তাঁর সৃজনীশক্তি, তাঁর স্পর্শকাতরতা মরুতীর্থের পাতায় পাতায় ঢেলে না দিয়ে থাকতেন তবে পুস্তকটি রসকষহীন মরুই থেকে যেত। বড় জোর সেটা হত গাইড বুক। গাইড বুক, বড়ই প্রয়োজনীয় বস্তু, কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলেছেন, আর্ট আরম্ভ হয় ঠিক সেই জায়গা থেকে যেখানে প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়। রাধু মালী কেনেস্তারায় করে নাইবার জন্য যে-জল এনে দেয় তাতে প্রয়োজন মেটে বটে, কিন্তু নন্দলাল কর্তৃক বহুবর্ণে বিচিত্রিত কুম্ভ মস্তকে ধারণ করে যখন তন্বঙ্গী মরাল গমনে জল নিয়ে আসে তখন সঙ্গে সঙ্গে আসে আর্টের উপাদান, সেই জলের সঙ্গে সঙ্গে আসে কল্পনার উৎস, সৃষ্টির অনুপ্রেরণা—সেই পুণ্যবারিই মরুতীর্থকে 'শ্যামল সুন্দর' করে তোলে, সে তখন দেয় 'তৃষ্ণা-হরা সুধা-ভরা সঙ্গসুধা' এবং কে না জানে 'সঙ্গ' ও 'সাহিত্য' বড় কাছাকাছি বাস করে।

কিন্তু ঐ এক 'মরুতীর্থ'ই তো অবধূতের একমাত্র বা সর্বশ্রেষ্ঠ রসসৃষ্টি নয় যে সুদ্দুমাত্র এইটে বিশ্লেষণ করেই আমরা পুস্তক ও লেখকের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে যাবো, এবং প্রশ্ন, রসের হাটে ভ্রমণকাহিনী কোন্ কাতারে বসার হক্ক ধরে, বাজারের বৈচিত্র্য নির্মাণে তার সেবা কতখানি, সে পাবে কোন্ শিরোপা? বিশেষতঃ বাংলা সাহিত্যে? লোকে বলে 'ঘরমুখো বাঙালী'; কাজেই তার কাছ থেকে আর সব কিছুই আশা করা যেতে পারে, শুধু ভ্রমণকাহিনীটি মাফ করে দিতে হয়। তাই যদি হয়, তবে বলবো, 'পালামৌ'-র পরই 'মরুতীর্থ'। এবং তার পরও তাকে কেউ আসনচ্যুত করতে পারেনি। বলা বাহুল্য, এসব আলোচনায় আমরা গুরু রবীন্দ্রনাথকে বাদ দি।

তবে কি অবধূত শুধু ভ্রমণকাহিনীর কীর্তনিয়া—পার্ এক্সেলাঁস?

অধীন সমালোচক নয়, বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকও নয়। তার প্রধান পরিচয় —সে যা মনে করে—পাঠকরূপে। সে বই পড়তে ভালোবাসে এবং যদ্যপি ঈশ্বরেচ্ছায়, বা নসীবের গর্দিশে, যাই বলুন, সে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাওয়ার ফলে বাংলা ছাড়াও দু-একটি অতিশয় ধনী তথা খানদানী ভাষার সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচিত হয়েছে, তথাপি সে সব চেয়ে বেশী ভালোবাসে আপন মাতৃভাষা বাংলাতেই বই

১। 'যেখানে মানুষের আত্মপ্রকাশে অশ্রদ্ধা সেখানে মানুষ আপনাকে হারায়। তাকে বাস্তব নাম দিতে পারি, কিন্তু মানুষ নিছক বাস্তব নয়। তার অনেকখানি অবাস্তব, অর্থাৎ তা সত্য। রবীন্দ্রনাথ, রচনাবলী, ২৭ খণ্ড, পৃঃ ২৮৫।

পড়তে। এবং কোনো বই পড়ে—বিশেষ করে সে-বইয়ের লেখক যদি অখ্যাতনামা হয়, তাকে যদি নববধূর মত লজ্জিত শঙ্কিত পদে বাংলা বাসরে প্রবেশ করতে দেখে তবে আঙ্গিনা থেকে তার কল্যাণ কামনা করে, বয়েস ছোট হলে আশীর্বাদ জানায়। আবার বলছি, পাঠক হিসাবে। 'অবধূত' 'শংকর' আদিকে আমি উদ্বাহু হয়ে অযাচিত অভিনন্দন জানাই, বাংলা সাহিত্যের তাঁদের প্রবেশ-লগ্নেই। পরবর্তী কালে কেউ কেউ আমাকে আরো আশাতীত আনন্দ দিয়েছেন, কেউ কেউ দেন নি, কিন্তু সে নিয়ে আমার ক্ষোভ নেই, কারণ এ-দুজনা আমাকে নিরাশ করেন নি।

অবধূতের বয়স হয়েছে, তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য। আমিও তদ্বৎ। পূর্বেই নিবেদন করেছি, আমি সমালোচক বা অধ্যাপক নই,—তাঁর রচনা সম্বন্ধে আমার লিখবার যেটুকু হক্ক আছে সে শুধু, তিনি লেখক পার্-এক্সেলাঁস, আমি তার অসংখ্য গুণমুগ্ধ পাঠকদের ভিতর পাঠক পার্ এক্সেলাঁস, পাঠকোত্তম। আমি 'উদ্ধারণ পুরে'র কাছেই বাস করি, এর সঙ্গে আমার আবাল্য পরিচয়। এ 'ঘাট' দিয়ে উভয়ে একসঙ্গে না গেলেও শীঘ্রই আমরা 'ওপারে' মিলিত হব। সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে সৃষ্টির চরম রহস্য জেনে নেবার পূর্বেই অবধূতের 'সৃষ্টি' সম্বন্ধে আমার বিস্ময় প্রকাশ করে যাই।

আমার পরিচিত কোনো কোনো কনিষ্ঠের ধারণা—যার উল্লেখ এইমাত্র করলুম যে, অবধূত আসলে ভ্রমণকাহিনী লেখক। বাইরের দিক দিয়ে দেখতে গেলে এ ধারণা ভুল নাও হতে পারে। কারণ বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছি,—গেরুয়াধারীকে সরাসরি প্রশ্ন শুধনো অনুচিত—তিনি দীর্ঘকাল সন্ন্যাসী-শ্রমণজনোচিত স্থান পরিবর্তন বা পর্যটন করেছেন, এবং সে-কারণে তাঁর রচনাতে সব সময়ই অল্পবিস্তর আনাগোনা থাকে, এবং পরোক্ষভাবে সেটাকে ডাইনামিক করে তোলে। এটা সদ্‌গুণ, কিন্তু এটা অবধূতের একমাত্র গুণ তো নয়ই, প্রধানতম গুণও নিশ্চয়ই নয়।

আবার, কোনো কোনো কনিষ্ঠের ধারণা—এরা সাধারণত আমার সমুখে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে—অবধূত প্রধানত সন্ন্যাসীদের মধ্যে যে ফক্কুড়ী ধাপ্পাবাজী আছে সেটার নিরতিশয় নগ্নরূপ আমাদের সামনে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলিয়েছেন। এটাও পূর্বেকার মত আংশিক সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নয়। ফুক্কুড়ী, ধাপ্পাবাজী, বুজরুকী,[২]—এরই মোলায়েম নাম 'ধরাধরি' বা 'তদ্‌বীর' (অবধূতের

২। বুজরুকী শব্দটি এসেছে ফার্সী বুজুর্গ থেকে—অর্থ অতি ভদ্র; বুরকী, সাধুজন, উচ্চস্থানীয়; সেইটার অভিনয়, বাঙলায় ভণ্ডামী।

ভাষায়ও বোধ হয় আছে, 'বসুন্ধরা পূর্বে বীরভোগ্যা ছিলেন ; অধুনা তদ্বীর-ভোগ্যা')—এসব তো সর্বত্রই আছে, এবং এ-বাবদে সন্ন্যাসীদের নিদারুণ ঢিঢ দিতে পারে হালফিলের গৃহীরা, এবং কলকাতায় তাদের সন্ধানে বিস্তর তকলীফ বরদাস্ত করতে হয় না ; বস্তুত তাদের অনাচারে প্রাণ অতিষ্ঠ। হাট-বাজারে, মেলা-মজলিসে, সাহিত্য-বিদ্যালয়ে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে—যেখানে বিশ্বজ্ঞান, বিশ্বপ্রেম সেখানেই তো বিশ্ব ফক্কুড়ী—এ তো পাড়ার পদিপিসিও জানে। তার দাওয়াই কি, সেও তো অজানা নয়। শুধু অজানা—এ-খাটাশের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? অবধূত সমাজ-সংস্কারক নন—ডন্ কুইক্সটের মত নাঙ্গা তলওয়ার দিয়ে বেপরওয়া বায়ুযন্ত্র (উইণ্ডি-মিল) আক্রমণ করা তাঁর 'ধর্মে' নেই। লোকটি বড়ই শান্তিপ্রিয়। শুধু যেখানে বর্বর পশুবল অত্যাচার করতে আসে, এবং সে-পশুবল ফক্কুড়ীতেও সিদ্ধহস্ত সেখানে অবধূত, ফক্কুড়ীর মুষ্টি-যোগ ফক্কুড়ী ছাড়া নান্যপন্থা বিদ্যতে বিলক্ষণ জানেন বলেই সেটা বীভৎস রুদ্ররূপে দেখাতে জানেন। কিন্তু এটা তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র, শীলের দিক। লেখক হিসাবে এটা তাঁর নগণ্যতম পরিচয়। কারণ লেখক হিসেবে 'হীরো' রূপ তিনি কস্মিনকালেও আত্মপ্রকাশ করতে চাননি।

আর্ট ও জীবন নিয়ে সব চেয়ে বেশী আলোচনা করেছেন কবিরাজ গ্যোটে। সে আলোচনা বহুস্থলে এতই সূক্ষ্ম যে আপনার আমার মত সাধারণ পাঠক দিশেহারা হয়ে যেতে বাধ্য। তবে সে আলোচনার ভিতর না গিয়ে সরাসরি আর্টের ভিতর জীবন ও কোনো কোনো স্থলে লেখকের জীবনীরও অনুসন্ধান করা যায়। কিন্তু দ্বিতীয়টি সংকট-সঙ্কুল। একটি দৃষ্টান্তই এস্থলে যথেষ্ট। বাংলাদেশে কেন, পৃথিবীর হাস্যরসিকদের ভিতর 'পরশুরামে'র স্থান অতি উচ্চে। অথচ যে-সব সৌভাগ্যবান তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চেনবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরাই জানেন, হাস্যরস ঠাট্টা মস্করা দিয়ে তিনি মজলিস না জমিয়ে বরঞ্চ সুযোগ দিতেন আমাদের মত রামা-শ্যামাকে। একবার তাঁকে আমি একখানা চিঠিতে লিখি, তাঁর বাড়ীর ও পাড়ার ছেলেদের সামনে আমি ম্যাজিক দেখাব, তবে তিনি সে-স্থলে সশরীর উপস্থিত না থাকলেই ভালো। তিনি কাতর কণ্ঠে উত্তর লেখেন, 'আমাকে গুমড়োমুখো দেখে ভাববেন না, আমার রসবোধ নেই।' অবধূতের বেলা ঠিক তার উল্টো। তাঁর লেখাতে ব্যঙ্গ আছে, বিদ্রূপ আছে,—যেন হাসতে হাসতে তিনি বুজরুকির মুখোশ একটার পর একটা ছিঁড়ে ফেলছেন ; কোনো কোনো স্থলে সেই সুবাদে তিনি বিকট বীভৎস রসেরও অবতারণা

করেছেন কিন্তু অকারণে হাস্যরস অবতারণা করতে তাঁকে বড় একটা দেখা যায় না। অথচ অন্তরঙ্গজনের মধ্যে অবধূতের অন্য রূপ। সেখানে তিনি অভিনয়সহ যে বিশুদ্ধ হাস্যরস উপস্থিত করেন সে যে কী স্বচ্ছ, কী চটুল—যেন পার্বত্য নির্ঝরিণী আপন বেগে পাথর থেকে পাথরে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চলেছে—তাঁরাই শুধু জানেন যাঁরা তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ। তাঁর একটি অভিনয় এমনই অনবদ্য যে সেটি টেলিভিজনে দেখানো উচিত। চুঁচড়ো চন্নগর অঞ্চলে এক বিশেষ সম্প্রদায়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে ভোজন করা অভদ্রতার চূড়ান্ত। নিমন্ত্রণকারী সোনার থালার চতুর্দিকে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন সাজিয়ে নিমন্ত্রিতের সামনে গলবস্ত্র হয়ে, হাত কচলাতে কচলাতে প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বার বার শুধু ফরিয়াদ জানাবেন, তিনি অতিশয় দরিদ্র, সামান্যতম অন্নব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করতেও সম্পূর্ণ অক্ষম; এবং নিমন্ত্রিতজনও অতি-বড়-গাওয়াইয়ার মত তালের আড়ির সঙ্গে কুআড়ি লাগিয়ে, ইস্টিকের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই—থালার সামনের পিঁড়িতে বসাটাও নাকি পবিত্র, যুগ যুগ সঞ্চিত সর্ব ঐতিহ্যভঞ্জনকারী সখ্‌ৎ বেয়াদবীর চূড়ান্ত—বলবেন, প্রায় চোখের জল ফেলে, যে, এরকম অত্যুত্তম ব্যবস্থা তাঁর চতুর্দশ পুরুষের কেউ কখনো দেখে নি, এ বাড়ির গৃহিণী রন্ধনে সাক্ষাৎ দ্রৌপদী, আর হবেই বা না কেন, এঁরা যে পুরুষানুক্রমে দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের গৌরীশঙ্কর, 'নীলকণ্ঠ'! এহেন রসময় চাপান-ওতর বাস্তবে কতক্ষণ ধরে চলতো বা এখনো চলে সে অভিজ্ঞতা আমার নেই, কিন্তু অবধূত মৌজে থাকলে নিদেন আধঘণ্টা, এবং উভয়পক্ষের সেই নিছক কথার তুবড়ী-বাজী ফুলঝুরি শুধু লেখাতে প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ একা অবধূতই দুটি পার্ট একসঙ্গে প্লে করে যান। খণে গল-বস্ত্র কাঁদো-কাঁদো গৃহস্থ, খণে বাষ্পাকুল-কণ্ঠ নিমন্ত্রিতজন। ক্ষণে বিপজ্জলে আকণ্ঠনিমগ্ন কাতর নিমন্ত্রণ-কারী, ক্ষণে চরম আপ্যায়িত, কৃতজ্ঞতার ভারে আজানুনুব্জ, আনন্দাশ্রুতে চক্ষুদ্বয়সিক্ত নিমন্ত্রিত।

এবং এখানে এসে সত্যই অবধূতকে জোব্বার খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে হয়!

অথচ আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলুম, গেরুয়ার খুঁট না, যেন শৌখীন নিমন্ত্রিতের জেব থেকে বেরিয়ে এল ফুলফাটা-লেস-লাগানো হাওয়া-তোড়-হাল্কাসে-হাল্কা বেড্‌শীট সাইজের রুমাল! বিশ্বাস করবেন না, আমি পেলুম তুরতুরে আতরের খুশবাই। বলা বাহুল্য, নিমন্ত্রিতজন কণামাত্র খাদ্য স্পর্শ করবেন না—ভাবখানা এই, আমাদের কারোরই বাড়ীতে অন্নাভাব নেই, তদুপরি খানদানী

নবাব মাত্রই ডায়াটে থাকেন।

এই অভিনয় করার পরিপূর্ণ বিধিদত্ত দক্ষতা ছিল অতি বাল্যকাল থেকেই আরেকটি লেখকের—চেখফ্। পাঠশালে যাবার সময় থেকেই তিনি বাপ-কাকা পাড়া-প্রতিবেশী সকলের অনুকরণ করে অভিনয় করতে পারতেন—কেউ কেউ খুশী হয়ে তাঁকে লেবেন্‌চুস লাট্টুটা উপহারও দিতেন।

এই অভিনয়দক্ষতা আপন কলমে স্থানান্তরিত করতে পারলেই লেখকের 'সকলং হস্ততলং'—লেখা তখনই হয় convincing; তার বিগালতার্থ, অভিনয় করার সময় যেরকম প্রত্যেকের আপন আপন ভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা অপরিহার্য, লেখার বেলাও তাই। এখানে কর্মটি কঠিনতর। কারণ এখানে অঙ্গভঙ্গী করতে পারবেন না, চোখের জল ফেলে দেখাতে পারবেন না। অর্থাৎ টকি-সিনেমার কাজ গ্রামোফোন রেকর্ড দিয়ে সারতে হচ্ছে। আসলে তার চেয়েও কঠিন, কারণ, কণ্ঠস্বর দিয়ে বহুৎ বেশী ভেল্কিবাজী দেখানো যায়। অনেকের অনেক রকম ভাষা—কেউবা স্ল্যাঙ ব্যবহার করে, কারো বা ইডিয়ম জোরদার, কেউ কথায় কথায় প্রবাদ ছাড়ে, কেউ বলে ভশ্চাযের মত সংস্কৃত-ঘ্যাঁষা ভাষা, কেউ কিঞ্চিৎ যাবনিক—এ সব-কটা করায়ত্ত না থাকলে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের কথাবার্তা convincing ধরনে প্রকাশ করা যায় না। এ বাবদে বাংলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ: মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। আমি এ-বিষয় নিয়ে অন্যত্র দীর্ঘ আলোচনা করেছি; এ-স্থলে বলি, এ্ যেন একটা মিরাক্‌ল্। মাইকেল বাল্যাবস্থায় যশোর ছাড়েন, তারপর সেখানে আর কখনো যান নি। তদুপরি অনেক কাল কাটালেন বাংলার বাইরে। অথচ পরিণত বয়সে এই নাটকে, অর্ধশিক্ষিত হিন্দু কর্মচারী, তার অশিক্ষিত হিন্দু চাকর, অশিক্ষিত মুসলমান চাষা, তার চেয়েও অগা তার বউ, এবং আরো চার-পাঁচজন—সবাই মিলে অন্তত সাত-আট রকমের কথা বলে খাঁটির চেয়েও খাঁটি মধুর যশোরী ভাষায়, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শেডে।

'আলাল', 'হুতোম', 'পরশুরাম' পেরিয়ে এ-যুগে এলে পাচ্ছি দুজন-লখক যাঁদের কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপভাষার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় আছে। অবধূত জানেন খাস কলকাত্তাই—কিন্তু এ-কলকাত্তাই হুতোমের কলকাত্তাই নয়, কারণ এর থেকে বহু আরবী-ফার্সী শব্দ উধাও হয়ে গিয়েছে, ইংরিজি ও হিন্দী ঢুকেছে এবং অভাব-অনটনের ভিন্ন জীবন প্যাটার্ন নির্মিত হওয়ার ফলে এক নূতন ইডিয়ম সৃষ্ট হচ্ছে—এবং গজেন্দ্র মিত্র জানেন কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যবিত্ত

শ্রেণীর ঘরোয়া মেয়েলি ভাষা। যত দিন সাধুভাষা চালু ছিল ততদিন এ দুটোর অল্পই কদর ছিল, কিন্তু চলতি ভাষা—সেও প্রধানত কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভাষা—কল্‌কে পেয়ে আসন জমানোর সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর চাহিদা বাড়বেই। জনগণের কথ্য ভাষার শিকড় দিয়ে লিখিত ভাষা যদি নিত্য নিত্য প্রাণরস আহরণ না করে তবে সে একদিন শুকিয়ে গিয়ে 'ডেড ল্যান্‌গুইজ্‌' হয়ে যায়—সংস্কৃত, লাতিনের বেলা যা হয়েছিল, এ-দেশের 'শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে'র যা হয়েছে। তাই বাঙলা থেকে সাধুভাষা বর্জন করে আমরা ভালোই করেছি। ভাষাটির কাঠামো ছিল ঢাকার কিন্তু সব চেয়ে বেশী প্রচলন হল মেট্রপলিস্‌ কলকাতায়। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল ইসলাম এঁদের সকলেই রাঢ়ী ও কর্মভূমি কলকাতায়। এঁরা ঢাকার শব্দ, ইডিয়ম, প্রবাদ, বচন-ভঙ্গী আমদানি করতে পারেন না, আবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের এসব মাল—পূর্বে যাকে বলেছি 'শিকড় দিয়ে প্রাণরস আহরণ করা'—সাধুভাষার সঙ্গে ঠিক জুৎসই লাগসই হয় না, ফিট্‌ করে না। এখন সে অসুবিধা ঘুচেছে। (ঢাকা মেট্রপলিস্‌ হতে চলল—সেখানকার লেখকরা যদি সাধুভাষাতে প্রাণরস সঞ্চার করতে পারেন তবে সেও নবীন পত্র-পুষ্পে পল্লবিত হবে)।

কিন্তু এহ বাহ্য।

অবধূতের আনাগোনা বাঙলাদেশের বাইরেও বটে। বক্ষ্যমাণ 'নীলকণ্ঠে' যাদের সঙ্গে আমাদের ভবঘুরে প্রতিনিয়ত কথা বলছেন তারা বাঙালী নয়, অথচ বাঙলার মারফতেই তাদের চরিত্র convincing করতে হবে। সে আরও কঠিন কর্ম। কিন্তু লেখক যে রকম গোড়ার 'মজুমদার' 'রায়সায়েবের "ঘোড়ার" পিঠে চড়া', 'সুবাসী দিদি' কলকাত্তাইদের ফুটিয়ে তুলেছেন, ঠিক তেমনি অবাঙালী 'অমরনাথ' 'জুলিমেম' এবং আরও গণ্ডায় গণ্ডায়। ভাষা করায়ত্ত থাকলে হাতীকেও বাঙলা বলানো যায়!

* * *

অবধূতের প্রতিটি গ্রন্থ পড়ে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে, এ-লোকটি কিসের সন্ধানে দুনিয়াটা চষে বেড়ায়? তার পায়ে চক্কর আছে সে তো বুঝি, এবং বলা উচিত কিনা জানিনে—তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হয়ে খবরটা পেয়েছি—যে, তিনি তন্ত্রে বিশ্বাস করেন। তন্ত্রশাস্ত্রে যে তাঁর গভীর জ্ঞান আছে সে-তত্ত্ব আবিষ্কার করতে বেশীক্ষণ সময় লাগে না। কিন্তু তান্ত্রিক একবার পথ

পেয়ে গেলে তো ঘুরে বেড়ায় না! গ্যোটে বলেছেন, চরিত্রবল বাড়াতে হলে জনসমাজে যাও; জিনিয়াসের সাধনা করতে হলে নির্জনে, একাগ্র মনে। আমার মনে তখনই প্রশ্ন জেগেছে, 'আর যারা সাধু-সন্ন্যাসীর পিছনে পিছনে ঘোরে?' বরদার মহারাজ আমাকে বলেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সঙ্গে কাজ করার সময় প্রতি শনিবারের সন্ধ্যা থেকে সোমের সকাল অবধি সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধানে নর্মদার পারে পারে (হিমালয়ের পরেই নাকি সেখানে ওঁদের পরিক্রমা-ভূমি) ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ পেয়েও ছিলেন। সেই সন্ন্যাসীর করুণ কাহিনী পাঠক উপেন বাঁড়ুয্যের অদ্বিতীয় পুস্তক 'নির্বাসিতের আত্মকথা'য় পাবেন। এঁকে আনা হয়েছিল বারীন-উল্লাস-উপেনদের চরিত্রবল গড়ে দেবার জন্য। কিছুদিন এঁদের সঙ্গে থাকার পর ইনি প্রত্যেককে সনির্বন্ধ অনুনয়-বিনয় করেন, বিপ্লবীদের ভয়াবহ পন্থা পরিত্যাগ করতে। এঁরা যখন কিছুতেই সম্মত হলেন না তখন তিনি, সেই মুক্ত পুরুষ, শব্দার্থে সজল নয়নে বাগান-বাড়ি ছেড়ে চলে যান। যাবার সময় অতিশয় দুঃখের সঙ্গে যে ভবিষ্যৎবাণী করে যান সেটা আন্দামানে অক্ষরে অক্ষরে ফলে।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, কিন্তু কেমন যেন ঠিক বিশ্বাস হয় না, অবধূত খুব সম্ভব এরকম একটি লোকের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বা ঘুরে মরছেন। বিবেকানন্দ এ রকম লোক পান নি—বরঞ্চ অন্যেরা, তিনি কিছু পেয়েছেন কিনা, তার সন্ধানে লেগে যেত—এবং রামকৃষ্ণ মুক্ত পুরুষ হলেও এ ধরনের লোক নন। তিনি তো সর্বত্রই লোকচক্ষুর সম্মুখে বিরাজিত। তাঁর সন্ধানে বেরুনো নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাঁকে নিয়ে তো আমাদের কাজ চলে না। তিনি জীবন্মুক্ত। ছেলেবেলা থেকেই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। আমরা খুঁজি এমন একজন, যিনি পঞ্চাশবার ফেল মারার পর ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছেন। আমরা ফেল করেছি আড়াইশ' বার। তিনিই বুঝবেন আমাদের বেদনাটা কোন্‌খানে। যে সাধক সাধনার পথে খানা-খন্দে পড়ে হাড়-হাড্ডী গুঁড়িয়েছেন তিনিই তো শুধু আমাদের 'খবরদার! হাফিজ্‌!' চিৎকার করে আগে-ভাগে হুঁশিয়ার করতে পারেন।

কিন্তু কেন এই না-হক মানুষে'র সন্ধানে হায়রানি?

উত্তরে সর্বদেশের, সর্বযুগের গুণীজ্ঞানী মানী অভিমানী তত্ত্ববিদের সেরা বলেন, ভগবানের মহত্তম সৃষ্টি মানুষ, অতএব মানুষের সন্ধানে বেরুতে হয়। চণ্ডীদাসও বলেছেন 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। উত্তম

প্রস্তাব। অবধূতও বলেছেন, এই বক্ষ্যমাণ 'নীলকণ্ঠে'ই—'হিমালয়ের পথ ঘাট মঠ মন্দির নিয়ে বিস্তর লেখা হয়ে গেছে। সেই সব গ্রন্থ পাঠ করলে হিমালয় সম্বন্ধে জানতে বাকী থাকে না কিছুই। সুতরাং আর একবার হিমালয়ের পরিচয় দিয়ে লাভ কি! তার চেয়ে হিমালয়ের মানুষদের সম্বন্ধে কিছু বলে নি আমি। অনেকের কাছে হিমালয়ের সব থেকে বড় আকর্ষণ হিমালয়বাসী সন্ন্যাসীরা। আমি চেষ্টা করছি এই সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে কিছু জানাতে। (কারণ) অনেকের কাছে সন্ন্যাসীরা পরম পবিত্র রহস্যময় জীববিশেষ।'[৩] (এর পর অবধূত আরো তিনটি শব্দ দিয়ে একটি বাক্য রচনা করে মনে মনে প্রশ্ন শুধিয়েছেন বা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, কিংবা উভয়ই, কিন্তু সে-প্রশ্ন, সে বিস্ময় নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর মত ভাষার জউরী প্রথম যে একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন ঐ দিয়েই তিনি কর্ম সমাধান করতে পারতেন, অথচ কেদার বদ্রীর পথে গঙ্গা যমুনার এমনই হুহুঙ্কার যে নিদেন তিনটি বার চিৎকার না করলে মানুষ নিজের গলা নিজেই শুনতে পায় না)।

ফার্সীতে একটি দোঁহা আছে:

'কুনদ্ হম্ জিন্স্ ব্হস্ পর্ওয়াজ্,
কব্তর ব্ কব্তর বাজ্ ব্ বাজ্।'

The same with same shall take its flight
The dove with dove and kite with kite'

'স্বজাতির সনে স্বজাতি উড়িবে মিলিত হয়ে
পায়রার সাথে পায়রা, শিকরে শিকরে লয়ে।'

অতএব হিমালয়ের হোক বা পৃথিবীর অন্য যে কোন স্থলেরই হোক, সাধু-সন্ন্যাসীদের চিনতে হলে তাঁদেরই একজন হতে হয়। অবধূত এ বাবদে তাঁর একাধিক গ্রন্থে এ তত্ত্বটির উল্লেখ করেছেন। এই সর্বজনীন গণতন্ত্র আমাকেও

---

৩ শ্রীশ্রীঠাকুরকে অবধূত সাতিশয় শ্রদ্ধা করেন, এ-কথা আমরা জানি কিন্তু খণে বিশ্বাসী, খণে agnostic, খণে nihilist, খণে কি, খণে কি না—মা কালীই জানেন—এই লোকটির ধোঁকা যায় না, ঠাকুরের সর্বনী ও বাবদে। বলছেন, শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, ' "সব মতই মত সব পথই পথ।" বিদুর বাবার পথটা কি জাতের পথ তা আমি দেখেছি। ও-পথে ভগবানকে পাওয়া যায় না, শয়তানকে পাওয়া যেতে পারে।' "নীলকণ্ঠ" পৃ ১৬৯।৭০।

আনন্দ দেয়। লণ্ডনের এক প্রাতঃস্মরণীয়া সমাজসংস্কারিকা নারী যখন দেখলেন যে, পতিতাদের জন্য তিনি কোনো সেবাই করে উঠতে পারছেন না, তখন তিনি তাদেরই সমাজে প্রবেশ করলেন (আশা করি কেউ অন্যায় সন্দেহ করবেন না, যে আমি সাধুসন্ন্যাসী, পীর-দরবেশ ও পতিতাদের এক পর্যায়ে ফেলছি! এই অধমের পরিবারের মাত্র শতবর্ষ পূর্বেও রীতি ছিল যে সর্ব কনিষ্ঠকে সন্ন্যাস গ্রহণ করে বনে চলে যেতে হত)। মহিলাটি শেষ পর্যন্ত সেখানে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পর সে-সমাজ ত্যাগ করে যে গ্রন্থ রচনা করেন সেটি অতুলনীয়, অমূল্য।

অবধূত মৌনব্রত, অজগরব্রত, পনছীব্রত[৪] সবই করলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ব্যামো সঠিক চিনতে পারলেন প্রজ্ঞানাথ। সার্থক তাঁর নাম।

প্রজ্ঞাবলে ব'লে দিলেন 'তোমার পথ আলাদা। হয় তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে থাকবে নয়ত ছুটে বেড়াবে।' আর যোগাভ্যাস বাবদে বললেন 'তোমার জন্য ঐ নাক-টেপাটেপি নয়, তোমার ধাতে সইবে না। দূর ছাই বলে ফেলে দিয়ে আবার ছুটে বেড়াবে।'

সেই ভালো। নইলে তাঁর অবস্থা বিশ্বকবি বর্ণিত 'ঘোড়া'র মত হয়ে যেত। 'অন্য সকল প্রাণী কারণ উপস্থিত হলে দৌড়য়; এ দৌড়য় বিনা কারণে; যেন তার নিজেই নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার একান্ত শখ। পালাতে পালাতে একেবারে বুঁদ হয়ে যাবে, ঝিম হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে, তারপর "না" হয়ে যাবে।'

'না' হয়ে গেলে (নত্বং, নাহং, নায়ং লোক : !) 'নীলকণ্ঠ' লিখত কে!

কিন্তু আমরা ভুল করছি না তো?

স্পষ্ট দেখতে পারছি তিনটি 'অবধূত'। যে অবধূতকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিনি, যে অবধূত বই লেখেন এবং যে অবধূত লাট্টুর মত চক্কর খায়। তিন জনাই কি একই ব্যক্তি? নিশ্চয়ই নয়। অন্তত তৃতীয় অবধূতকে দ্বিতীয় অবধূতের সঙ্গে গোবলেট করলে দুজনারই প্রতি ভাহা অবিচার করা হবে। বহু সার্থক লেখক প্রথম পুরুষে রসসৃষ্টি করেছেন; তাই বলে কি লেখক ও তাঁর

---

৪ অজগর আহার সংগ্রহের জন্য কোনো প্রচেষ্টাই করে না—এর বিরুদ্ধ মতবাদ আমি দক্ষিণ ভারতে শুনেছি। একাধিক গুণী বলেন, সে নাকি বড় মধুর শিষ দিয়ে পশুশাবক, এমন কি অত্যধিক কৌতূহলী বালকবালিকাকে আকর্ষণ করতে পারে।

'আমি' চরিত্র একই ব্যক্তি? ডি ফো আর রবিনসন, সুইফট আর গালিভার কি একই ব্যক্তি? এমন কি এই নীলকণ্ঠেই তিনি যে একাধিকবার আত্মচিন্তা করতে করতে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন সে পরিচয়ের সঙ্গে লেখক অবধূতের কি সব সময় মিল আছে?

বিশেষ করে আমি একটি বিষয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ফার্সী অলঙ্কার শাস্ত্রে আছে—সার্থক রস-সৃষ্টি করতে হলে চাই শনাখ্‌তন্‌-ই-হদ্দ-হর্‌-চীজ্‌'। অর্থাৎ সনাক্ত করতে পারা (শনাখ্‌তন্‌) প্রত্যেক বস্তুর (হর্‌চীজ) সীমা (হদ্দ)।'[৫] তার বিগলিতার্থ; প্রচণ্ডতম আত্মসংযম। বার বার ভুলে যাই আমরা 'সব কিছু বলতে গেলে কিছুই বলা হয় না' বার বার প্রলোভন;[৬] আসে, আরো একটুখানি বলে নি; তাহলে কেচ্ছাটার আরো জেল্লাই বাড়বে। শৈলী ভাষা বাবদে পার্ফেক্‌ট্‌ আর্টিস্ট হাইনে পর্যন্ত প্রথম যৌবনে এ-প্রলোভন থেকে মুক্ত ছিলেন না। তিনি তাঁর গুরু, সংস্কৃতে সুপণ্ডিত, আলঙ্কারিক বারণ (ব্যারন্‌) ফন্‌ শ্লেগেলের কাছে তাঁর প্রথম কবিতাগুচ্ছ নিয়ে গেলে তিনি বলেছিলেন, 'এ কি! তোমার বল্লভার গালে অতগুলো তিল দিয়েছ কেন?' হায়, আমরা বার বার 'হদ্দ সনাক্ত' করতে পারিনে, ভাবি তিল যখন সৌন্দর্য বৃদ্ধি[৭] করে তখন এঁকে দিই মানস সুন্দরীর গণ্ডদেশে গণ্ডাদশেক তিল!

পূর্বে লিখিত কোনো কোনো অনবদ্য গ্রন্থেও অবধূত মাঝে মধ্যে ভুলে যেতেন 'স্টপ্‌ ইটিং হোয়াইল ইট্‌ ইজ্‌ টেস্টিং!'—অর্থাৎ খাঁটি বাঙালীর কৃত্রিম 'উচ্ছ্বাস' থেকে তিনি সব সময় নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন নি—বস্তুত তাঁর সব চেয়ে মশ্‌হুর কেতাবেই সব চেয়ে বেশী চন্দ্রশেখরীয় 'উদ্‌ভ্রান্ত' উচ্ছ্বাস—কিন্তু 'নীলকণ্ঠে' তিনি যে পার্ফেক্‌ট্‌ ক্যাডেন্‌স্‌ অব্‌ রেস্ট্রেন্‌ট্‌ দেখিয়েছেন, সেটি আজকের দিনের কোনো বাঙালী লেখকই দেখাতে পারবেন না। এবং এই 'হদ্দ সনাক্ত করাটা' তিনি 'নীলকণ্ঠে' করেছেন অবহেলে, অক্লেশে। যেন

---

৫ 'রসের সৃষ্টিতে সর্বত্রই অত্যুক্তির স্থান আছে, কিন্তু সে অত্যুক্তিও জীবনের পরিমাণ রক্ষা করে তবে নিষ্কৃতি পায়।' রবীন্দ্রনাথ, রচনাবলী, ২৭ খণ্ড, পৃ ২৮৪। পুনরায়, 'প্রাণের ধর্ম সুমিতি, আর্টের ধর্মও তাই।' সমপুস্তক, পৃ ২৬০।

৬ 'লোভ পরিমিতিকে লঙ্ঘন করে, আপন আতিশয্যের সীমা দেখতে পায় না।' পৃ ২৬০।

৭ হে শিবাজী, হে সুন্দরী, তব কপোলের ঐ ক্ষুদ্র তিল লাগি
হে তরুণী সাকী বোখারা সমরকন্দ দিতে পারি আমি।
এমনই হৃদয় মুগ্ধ করিয়াছ তুমি।

ভানুমতী কড়ে আঙুল দিয়ে লৌহ ত্রিপিটক অদৃশ্য করে দিলেন—ছাতি না ফুলিয়ে, মাস্‌ল্‌ না বাগিয়ে, ঘেমে নেয়ে কাঁই না হয়ে। এই এফর্টলেসনেস পৃথিবীর সর্বকর্মক্ষেত্রেই চরমতম কাম্য।

হেঁটমুণ্ডে শূন্যে ঝুলে আছেন যোগীবর, আরেক উলঙ্গ যোগী গড়াগড়ি দিচ্ছেন বরফের উপর, নায়ক স্বয়ং পেরিয়ে গেলেন মারাত্মক ধ্বস্‌, তারপর সেই স্বর্গীয় সঙ্গীত—পাঠক সর্বক্ষণ শুধোচ্ছে কি করে হল, তার পর কি হল? 'নো রিপ্লাই? সে কি মিসি বাবা!' এমন কি কলির কেষ্ট ঠাকুর—'অ! কন্‌ কি কর্‌তা? আমাগো লাঙ্গুলবারিয়ায় হিতেন সাধুর নামডাও শোনেন নাই কানে—পোরা-কপাল—' বসমতী যশোবতী গুজরাতী (জাতে 'পরেখ'—বাঙলা 'পরখ', পরশপাথর থেকে—ঠিক পরখ করে চিনে নিয়েছে সচ্চা মাল) ফরাসীতে যাদের বলে 'ভোয়াইওর' এস্থলে 'মাজোকিট ভোয়াইওর'—[৮] একমাত্র প্যারিসেই যাঁরা অজ্ঞাতবাসে ঘাপটি মেরে থাকেন, তাদেরই এক মহাপ্রভু দৈবযোগে হয়ে গেছেন নীলকণ্ঠে এসে মঠের মোহান্ত—ইনিই তাহলে নীলকণ্ঠের নীল গরল—এবং গণ্ডায় গণ্ডায় কত সাধু কত চোট্টা কত সাধারণ জন, কত মাছি কত পিসু। আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে স্পর্শ করেছে কেদারনাথ দর্শনাভিলাষিনী পুণ্যশীলা মেমসায়েব জুলি আর তার স্বামী এন্‌ডেন্‌। আমি হিন্দু নই, কেদারবদ্রী দর্শন করলে আমার অশেষ পুণ্য হবে, এ-ফতোয়া আমার তরে নয়, কিন্তু মনে

৮। সব দেশেই এক রকম লোক আছে যারা পাপাচারের, এমন কি অনৈসর্গিক পাপাচারের নিষ্ক্রিয় 'দর্শক'রূপে আপন কাম চরিতার্থ করে। ফরাসীতে 'দেখা' = 'ভোয়ার', 'দর্শক' = 'ভোয়াইওর' —(আমরা 'দৃশ্‌' থেকে 'দ্রষ্টা' ইংরেজ to see থেকে 'Seer', 'ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা' মুনি ঋষির জন্য ব্যবহার করি, ফরাসীতেও সেরকম 'ভোয়ার' থেকে 'ভোয়াইওর' সদর্থে ব্যবহার হওয়ার কথা ছিল কিন্তু হয় নি—সেখানে 'Voyant' = 'ভূতভবিষ্যৎ দ্রষ্টা' এবং 'Clairvoyant' = 'clear-seer' সমাসটিও আমরা চিনি। ফরাসী ভাষায় বাঙালী পড়ুয়া যেন দুম্‌ করে কোন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা মহাজনকে 'ভোয়াইওর' না বলে বসে। 'Romain Rolland, Oh, c'est un grand voyeur!' ব'লে এক গুজরাতী নিরীহ সজ্জন প্যারিসের ফরাসী সমাজকে প্রথমটায় স্তম্ভিত করে দেন; পরে তারা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ঠাঠা করে অট্টহাস্য তোলেন) এবং এই সম্প্রদায়ের কামনা—শব্দার্থে—পূর্ণ করার জন্য প্যারিসের 'অন্ধকার' অংশে প্রচুর প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু টিকিট এতই আক্রা যে অধীন সরজমিনে তদন্ত করতে পারে নি। এদের অন্যতম প্রোগ্রামে একজন আরেকজনকে বেধড়ক চাবুকও কষায়, পেরেকওয়ালা জুতো দিয়ে লাথি মারে, এবং নানাবিধ দুঃসহ যন্ত্রণা দেয়। এর গাহককে 'মাজোকি সই ভোয়াইওর' বলা হয় এবং একদা আরব ছোঁড়ারা প্রোগ্রামে প্রধান অংশ নিতে বলে—হয়তো—'ভোয়াইয়ু' শব্দের অর্থ—'স্ট্রীট আরব'।

করুন, আমি যদি কেদার যাবার জন্য স্বপ্নাদেশ পাই, আর ত্রিযুগীনারায়ণ পেরিয়ে গৌরীকুণ্ডে পৌঁছনো মাত্রই ঝাড়া তিন দিন ধরে চলে ঝড়, বজ্রপাত—তাঁবু পর্যন্ত উড়ে চলে যায়—'হাজার হাজার দৈত্য রে-রে করে চতুর্দিক থেকে ছুটে আসছে যেন—কী! 'বিধর্মী চলেছে মহামহিম (লর্ড)[৯] কেদারনাথকে দর্শন করতে, এতখানি স্পর্ধা বুঝি নীলকণ্ঠের সহ্য হচ্ছে না'—এবং সর্বশেষে 'বিরাট এক ধ্বস নেমে কেদারনাথের তিন মাইল আগের রামওয়াড়া চটি লোপাট করে নিয়ে গিয়েছে'—তখন আমার মনের অবস্থা কি হয়! বেচারী বিদেশিনী যবনী মেমসায়েব জুলির জীবনে এই দুর্দৈবই ঘটেছিল। একেবারে মুষড়ে গিয়ে ভেঙে পড়ে—স্বামীকে বললে, 'চলো ফিরে যাই।' তার স্বামী অবধূতকে বলছেন, 'জুলি মনে করছে, লর্ড কেদারনাথকে দর্শন করতে হলে যতটা পবিত্র হওয়া উচিত, ততটা পবিত্র আমি (স্বামী) নই।'

কেদারযাত্রী-গামীর কাফেলা তো চোখের সামনে দিয়ে যাচ্ছেই—তার এবং মানসাদি বহু তীর্থ-যাত্রীর বর্ণনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দিয়েছেন 'নীলকণ্ঠে'র বহু বহু পূর্বের বিস্তর 'জরীন-কলম' বাঙালী, ইংরেজি, জর্মন, ইতালিয়ান ইত্যাদি লেখক আপন আপন মাতৃভাষায়—কিন্তু নীলকণ্ঠে চলেছে অবধূতের বাছাই করা আরেকটি চরিত্রের কাফেলা, হেঁটমুণ্ড সাধক, যশোমতী, মেমসায়েব যাদের কয়েকজনের উল্লেখ এইমাত্র করেছি কিন্তু হায়, অবধূত, রসসৃষ্টিতে 'হদ্দ' কোথায় সেটা 'সনাক্ত' করে ফেলেছেন এবং আমাদের কৌতূহল যখন চরমে পৌঁছয়, আমরা কলরব তুলে শুধোই, 'এটা কি করে হল? তার পর কি হল' তখন তিনি মৃদু হাস্য করে স্টপ্‌স্ ঈটিং বিকজ ইট ইজ টেস্টিং। মাথা চাপড়ে বলতে ইচ্ছে করে 'পোড়া কপাল আমাগো। লাঙ্গলবারিয়ার হীতেন সাধুর লগে লগে আর বেবাকগুলির নামডাক ভী ভালা কইরা বুঝাইয়া কইলা না, করতা!'

কটাক্ষ করা এ-পাঠকের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে, কবিগুরু কি ক্লেরভইয়াঁসের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন যে তাঁর পরিনির্বাণের স্বল্পকাল মধ্যেই এই গৌড়ভূমিতে তিন-তিন হাজারী পাঁচ-পাঁচ হাজারী পাতার মনসব নিয়ে পিল পিল করে বেরুবেন উপন্যাসের আমীর-ওমারহ—কেতাব নয়, পুঁথি নয়,

---

৯। 'লর্ড' কেদারনাথ সম্বন্ধে আমার এক মুখুজ্যে ভাতিজাও লেখে 'ঠাকুর দেখতে তেমন কিছু না, কিন্তু সন্ধেবেলায় যখন ডিনারের ইভনিং জ্যাকেটটি পরেন তখন বড্ডই দাইডিয়ার দেখায়।' তবে কেদার না হয়ে ইনি পথমধ্যের অন্য কোন্ "লর্ড"ও হতে পারেন।

আস্ত এক-একখানা ইটের খান, না, তারই পাঁজা হাতে নিতে—এবং এদেরই উদ্দেশ্যে বলেছিলেন 'মানবের প্রাণের লয়টাকে দানবের লয়ে সাধনা করা চলবে। কিছুতেই তাল পৌঁচচ্ছে না শমে।' [১০] অবধূত সমে পৌঁছতে জানেন। তিনি নিজেই এক জায়গায় আধারহস্তছলে বলেছেন—কারণ সোজাসুজি ধর্মোপদেশ তিনি দেন না, নীতিও প্রচার করেন না—'সাক্ষাৎ অমৃত কি না! খাঁটি অমৃত কি আর তাড়ির মত ভাঁড় ভাঁড় খেতে হয়?' কারণ এর হদীস্-সবুৎ রয়েছে তাঁর, আমার, আপনার গুরু রচিত, পাতঞ্জলের যোগসূত্রের ন্যায়সাহিত্যের সূত্রাবলীতে: 'উপকরণের বাহাদুরি তার বহুলতায়, অমৃতের সার্থকতা তার অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যে। আর্টেরও অমৃত আপন সুপরিমিত সামঞ্জস্য।'[১১] এ তত্ত্বটি বুঝে নিলে অবধূতের বাক্‌সংযম পাঠককে গভীরতর আনন্দ দেবে—আপনা কল্পনাজাল বোনার পথ দেখিয়ে দেবে।

এ-বাবদে শেষ প্রশ্ন: নীলকণ্ঠে তথাকথিত অলৌকিক কারখানা, ধর্মের নামে নিকৃষ্টতম পাপাচার, লাঙ্গলবারিয়ার জীতেন সাধুর পন্থা, 'মাজোকিস্ট ভোয়াইওর' বিদুর বাবার পন্থা—পাতার পর পাতায় প্রাচীন নবীন একটার পর আরেকটা সমস্যা যেন পাণ্ডোরার কৌটো থেকে বেরিয়ে—ঐ কালাকমলী-চটির বেশুমার ছারপোকারই মত—চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, এবং সর্বাপেক্ষা মহামোক্ষম সমস্যা যেটি স্বয়ং অবধূতই তুলেছেন তিনটি শব্দ দিয়ে, যদ্যপি একটিই যথেষ্ট হত (তাজ্জব মানতে হয়, লোকটা কী সরল, কী 'নাইফ' এরকম সিংহের গহ্বরে মাথা গলায়!) এবং যার উল্লেখ আমি পূর্বেই করেছি সেটি আবার বলি—শোনা জিনিসই মানুষ ফের শুনতে চায়—'অনেকের কাছে সন্ন্যাসীরা হলেন পরম পবিত্র রহস্যময় জীববিশেষ।' তার পর বলছেন, 'সত্যিই কি তাই!' (তিনি অনায়াসে প্রথম শব্দটি মাত্র দিয়ে, তাও শেষের 'ই'টি খারিজ করে দিয়ে লিখতে পারতেন, 'সত্যি!'—কারণ ফার্সীতে বলে দানিশমন্দ্‌রা এক হর্‌ফ্ ব্যস আস্‌ত্—'বুদ্ধিমানের জন্য একটিমাত্র হরফই যথেষ্ট—সমূচালফ্‌জ্ [লজ্জো] তকফাজিল-ফজুল—বস্—এস্তের।' কিন্তু আমার মত অগা পাঠকও এস্তের। আমার মাথায় নিদেন তিনটে শব্দের তিনটে ডাণ্ডশ মারলে তবে কিনা একটা শব্দ মগজে সিঁধিয়ে ঘিলুর ঘিয়ে ভাজা হয়)।

সে-প্রশ্নের উত্তর? সে-সমস্যার সমাধান? এবং বাদবাকিগুলো?

১০-১১। রবীন্দ্রনাথ, সমগ্রগ্রন্থ।

এবার আর 'ফোনের মিসিবাবা' না—এবারে উচ্চতর পর্যায়ে যাই। বিচারপতি পন্টিয়ুস্ পিলাটুসের ('জেসিস্ট্রিং! পাইলট') সওয়ালে খৃষ্ট যখন বললেন 'আমি এসেছি সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে!' তখন পিলাটুস্ শুধোলেন 'সত্য কি?' হোয়াট ইজ ট্রুথ? এবং খৃষ্ট কোনো উত্তর দেবার পূর্বেই (উত্তর পাবেন কি না তার প্রতীক্ষা না করেই) কেউ কেউ বলেন, স্মিতহাস্য করে বিচারালয় ত্যাগ করলেন।[১২]

এখানেও তাই। অবধূত শুধোচ্ছেন বা/ এবং বিস্ময় প্রকাশ করে বলছেন, 'সত্যি?' এবং ঐখানেই দিলেন খতম করে! কিংবা স্থূলতুবী—'সিনে ডাইই'। কেন?

আবার তা হলে গুরুপদপ্রান্তে বসি। তিনি প্রব্লেম ও তস্য 'পাণ্ডিত্য-পূর্ণ', আকছারই দম্ভে প্রকম্পিত সলুশন্-বিজড়িত কাব্য উপন্যাসাদি সম্বন্ধে বলছেন, 'মেঘদূত কাব্য থেকে একটা তত্ত্ব বের করা যেতে পারে, আমিও এমন কাজ করেছি, কিন্তু সে তত্ত্ব অদৃশ্য ভাবে গৌণ।...কাব্য হিসাবে কুমারসম্ভবের যেখানে থামা উচিত সেখানেই ও থেমে গেছে, কিন্তু লজিক হিসাবে প্রব্লেম হিসাবে (আমার সমস্যা হিসাবে) ওখানে থামা চলে না। কার্তিক জন্মগ্রহণের পর স্বর্গ উদ্ধার করলে তবেই প্রব্লেমের শান্তি হয়। কিন্তু আর্টে দরকার নেই প্রব্লেমকে ঠাণ্ডা করা, নিজের রূপটিকেই সম্পূর্ণ করা তার কাজ। প্রব্লেমের গ্রন্থিমোচন ইন্টেলেক্টের বাহাদুরি, কিন্তু রূপ-কে সম্পূর্ণতা দেওয়া সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনার কাজ। আর্ট এই কল্পনার এলেকায় থাকে, লজিকের এলেকায় নয়'।[১৩] অবধূত এ তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করেছেন। নীলকণ্ঠ তার প্রকৃষ্টতম নিদর্শন।

* * *

১২। আসলে পিলাটুস উচ্চশিক্ষিত খানদানী রোমবাসী, ইংরেজ ভাইসরয়দের মত পরাধীন ইহুদিদের উপর শাসন করতে এসেছেন জেরুজালেমে। তাবৎ গ্রীকদর্শন তাঁর নখাগ্রদর্শনে এবং সোক্রাতেস যখন প্রশ্নে প্রশ্নে তথাকথিত পণ্ডিতজনকে না-জবাব করে দিতেন এবং পণ্ডিত শেষটায় বিভ্রান্ত হয়ে শুধালো 'তা হলে তুমিই বলো "সত্য কি?"—সোক্রোতেস তখন মৃদুহাস্য করে চলে যেতেন বা বলতেন 'আম্মো জানিনে'। এ-সব তত্ত্ব পিলাটুস জানতেন, এবং আরো ভালো করেই জানতেন, ইহুদিদের ভিতর দর্শনের কোনো চর্চা নেই। তাই 'সত্য'-এর স্বরূপ নির্ণয় তিনি রাস্টিক, সরল-বিশ্বাসী খৃষ্টের কাছ থেকে চান নি।

১৩। পুনরায় 'ইব্সেনের নাটকগুলি তো একদিন কম আদর পায় নি, কিন্তু এখনই কি তার রঙ ফিকে হয়ে আসে নি।' 'সাহিত্যের মাত্রা'। সমগ্রন্থ পৃঃ ২৬০।

উত্তম গ্রন্থের চুম্বক দেওয়া, বিশ্লেষণ করা, 'তুলনাত্মক সাহিত্যের' দৃষ্টিবিন্দু থেকে তাকে ঐ 'জঁার'-এর আর পাঁচখানা বইয়ের সঙ্গে তুলনা করা নিষ্প্রয়োজন; পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায় মাত্র। কিন্তু সে-পরিচয় দেওয়ার সময়ও লেখক—অবধূতের সর্বকালীন ও আমার জানা মতে তাঁর সর্বাগ্রগণ্য গুণমুগ্ধ পাঠক হিসেবে—এ-পরিচিতি দেবার হক্ক আমার একান্ত, অন্তত সেই কারণেই—অধমের মনে ধোকা লাগে, মিছরির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে তার সুতোটার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি না তো? কে জানে, আমি যে-সূত্রটি ধরে এ-পরিচিতি পেশ করেছি সেটা অতি অবশ্য সূত্র বটে, কিন্তু হয়তো ঐ মিছরির সুতোরই মত! সুতো চিবিয়ে তো কোনো পাঠক মিছরির রস পাবেন না! সান্ত্বনা এইটুকু যে, বহুশত বৎসর ধরে অস্মদ্দেশীয় আলঙ্কারিকমণ্ডলী কালিদাসের পরিচিতি দিতে গিয়ে লিখেছেন—এবং সেটিকে অজরামর করার হেতু গদ্যে প্রকাশ না করে শ্লোকাংশে বেঁধেছেন, 'উপমা কালিদাসস্য'। তাঁদের মতে অমুকের কাছে যাও 'পদলালিত্যের' জন্য, অমুকের কাছে যাও 'অর্থগৌরবের' তরে—আর কালিদাস?—ওঃ! তার 'উপমাটি' উত্তম; এবং তাঁদের শেষ সুচিন্তিত আপ্তবাক্য, সর্বগুণসম্পন্ন কবি কিন্তু মাঘ! আজ আমরা জানি, সুদ্ধমাত্র তুলনার বাহাদুরি দেখিয়ে কেউ মহৎ কবি হতে পারেন না—উত্তম তুলনা দিতে পারার গুণটি অলঙ্কারশাস্ত্রপেটিকাসঞ্চিত একটি নিরাড়ম্বর অলঙ্কার মাত্রই, এবং এ সাদামাটা তুলনা-অলঙ্কারের কথা দূরে থাক সর্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার পরিয়েও কুরূপাকে সুরূপাতে পরিবর্তিত করা যায় না—কালিদাস ছিলেন সর্বগুণ-সম্পন্ন অলঙ্কারাতীত বিশ্বকর্মা, তুলনা-নির্মাণে দক্ষতা ছিল তাঁর সামান্যতম কৃতিত্ব।...তাই এ-স্থলে আমি যে পরিচিত দিলুম সেটা হয়ত কালিদাসের বেলায় গোড়াতে যে-রকম হয়েছিল সেই রকম নিতান্তই আত্যন্তিক, ঐকান্তিক, অবান্তর, গুরুত্বহীন পরিচয়। কিন্তু ভরসা রাখি, কালিদাসের মত বিশ্বকর্মা না হয়েও অবধূত ভবিষ্যতে একদিন কালিদাসের মত সুবিচার পাবেন, কারণ, ন্যায়াধীশ-মহাকালের সম্মুখে সবাই সমান।

মহাকালের দরবারে কালিদাস অবধূত বরাবর—এ কথাটা আমাকে পুনরায় বলতে হল। কারণ আমি জানি, একাধিক জন, এমন কি অবধূতের গুণী গাহকও ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করে শুধোবেন, আমি যে এক নিশ্বাসে চেখফ্, কালিদাস ইত্যাদি প্রাতঃস্মরণীয়দের সঙ্গে অবধূতের নামোচ্চারণ করি তার অর্থ কি এই, যে, আমার মতে এঁরা সবাই সমগোত্রের! এর উত্তর যে-কোনো অন্ধ দিনের চোখ

ক্যারেটের আলঙ্কারিক, যে-কোনো বটতলার চতুরানন চতুর-আনী মোক্তার চতুর্মুখে চতুর্ভদ্র সাফাই গাইতে পারবেন কিন্তু আমার এ সবেতে কোনো প্রয়োজন নেই। অধীনের নাক-বরাবর অতিশয় সুচিন্তিত তথা অলঙ্কারশাস্ত্র-সম্মত নিবেদন মাত্র একটি: অবধূত কেন, তাঁর চেয়ে শতগুণে নিরেস কোনো কবিকেও যদি আজ অধিক পরিচয় করিয়ে দিতে চাই এবং প্রয়োজন-অনুরোধে তৃতীয় পক্ষের দোহাই কেটে তাঁকে/ তাঁদেরকে আবাহন জানাতে হয়, তবে কি আমি বে-ওকুফ নাদানের মত স্মরণ করবো পাড়ার আকাট যেদো-মেদোকে? না, গঙ্গাস্বরূপা তৃতীয় কন্যা মাতা কুন্তীদেবীর অনুকরণে স্মরণ করবো ধর্মরাজ, পবনেশ্বর, বাসবাধিপতিকে? কালিদাস, চেখফ, রবিকবিকে?—না, বিবাহ-বাসরের 'প্রীতি-উপহার'-রচক পোয়েট লরিয়েটকে, দাস্যমনোবৃত্তি-সঞ্জাত অধুনা-বিস্মৃত ভি. আই. পি কুলের চরম পদলেহনাবতার ভি. আই. পি'র ঘোষ-'কবিকে'? অবশ্য, অতি অবশ্য, যদি অবধূত মহাকালের মোকদ্দমা হেরে যান (যদ্যপি আমার বিশ্বাস ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্রকে সাক্ষারূপে না ডেকে যেদো-মেদোকে ডাকলে মক্কেল অবধূত মোকদ্দমা তো হারবেনই, এস্তক সুপ্রীম কোর্টে আপীল করবার তরে সার্টিফিকেট অবধি পাবেন না!) তবে সম্পূর্ণ দোষ আমারই। আমি যে-কেস হাতে নিয়েছি সেটি মর্মান্তক। কারণ অবধূত আমাকে বাঙলা সাহিত্যের হট্টগোলের মাঝখানে তাঁর নাম সুউচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করার জন্যে মোক্তার পাকড়াননি। বস্তুত আমিই সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়, আপন খুদ্, খুশ-এখ-তেয়ারে, অবধূতের সত্য মূল্য নিরূপণার্থে, সাহিত্য আদালতের 'নিরপেক্ষ-বন্ধু', 'আমিকুস্ কুরিআত্র্যা'রূপে অবতীর্ণ হয়েছি। সে-স্থলে হয়তো অবধূত বাধা দিতে পারতেন কিন্তু তিনি এবাবদে সুবুদ্ধিমান বলে সাহিত্যিক, দেওয়ানী, ফৌজদারী সর্ব আদালৎ এড়িয়ে চলেন। এটি 'এক্সপার্টি', এক-তরফা মোকদ্দমা।

কিন্তু আদালতের তুলনাটা কথায় কথায় উঠল। বঙ্কিমের 'রাজসিংহ', রবিকবির 'যোগাযোগ' কোনো আদালত বিচার করবে না। নীলকণ্ঠও কোনো এজলাসের সম্মুখে দাঁড়াবেন না।[১৪] সাহিত্যে সর্বকালের সবজনের সর্বশ্রেষ্ঠ

১৪। বছর কয়েক পূর্বে কিন্তু রসসমুদ্রে এহেন একটা টর্নাডো-ম্যালস্ট্রোম হব-হচ্ছে হব-হচ্ছে'র পাঁয়তারা কষছিল এমন সময় জানিনে কার হুকুমে শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না। রীতিমত 'বিল' তৈরী হয়েছিল; ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশসায়েব স্থির করে দেবেন, কোন্ নাটক উত্তম, অভিনয় করা যেতে পারে।

বিচারক পাঠক স্বয়ং। 'আদালতের' বাইরে আমিও নগণ্য পাঠক। সে কিরে আমি এ-প্রস্তাবনার প্রস্তাবনাতেই একাধিকবার বার কেটেছি। এবং আমি অতিবৃদ্ধ পাঠক বলে একাধিক নবীন পাঠক আমাকে শুধোবে,।

'নীলকণ্ঠ বইখানা ভালো ?'

'অত্যুত্তম।'

'সর্বোত্তম ?'

'এতাবৎ লিখিত বইয়ের মধ্যে সর্বোত্তম, কিন্তু এ-কেতাব সর্বোত্তম হবে না, যদি ইটি সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তাঁকে অনুপ্রেরণা না যোগায় যে এটাকেও পেরিয়ে গিয়ে তিনি আরো উত্তম কেতাব লিখতে পারেন।'

* * *

এবারে শেষ কথা।

'চেনা বামুনের গলে পৈতা কেন মিছে ?'—ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি। অবধূতের গলায় আমি আবার পৈতে পরাতে যাচ্ছি কেন—বিশেষত তিনি যখন উৎকৃষ্ট রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ? কিন্তু তিনি যে গেরুয়া পরেন, এবং যতদূর জানি, গেরুয়া পৈতে দুটো একসঙ্গে পরা নিষিদ্ধ। তবু যে আমি নব-'পরিচিতির' এই পৈতেটি তাঁর দণ্ডে জড়িয়ে দিচ্ছি তার কারণ তিনি মায়াজালে বদ্ধ হয়ে কিছুদিন ধরে আমাদের সঙ্গে বাস করছেন—তিনি যা করুন, করুন—আমাদের উচিত তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি-পরিচিতির পৈতেটি তাঁর সামনে নিবেদন করা। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি আল্লার কসম খেয়ে বলতে পারি, এ-পৈতেটিও ভস্ম করে তিনি একদিন অন্তর্ধান করবেন—নীলকণ্ঠের কণ্ঠে কিংবা ধূর্জটির জটায়। সেই পৈতেটি এই (এবং একমাত্র এই পৈতেটিই আমার চেনা এক নম্বরের অবধূত, দুই নম্বরের লেখক অবধূত ও তিন নম্বরের গ্রন্থের 'আমি' অবধূত তিনজনকেই একসঙ্গে পরানো যায়) :

তিন অবধূতেরই বোধ হয় সব চেয়ে প্রিয় শ্লোক—

ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শোকো জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥

'ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, নিন্দা করার প্রবৃত্তি, কুল, শীল তথা জাতের বড়াই' —এসব থেকে মুক্ত হতে হবে। অত্যুত্তম প্রস্তাব। তাই 'নীলকণ্ঠে' দেখতে পাই, খেতে না পেয়েও তাঁর কষ্ট হচ্ছে না দেখে তিনি উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করছেন—সন্ন্যাসীবর ক্ষুধা জয় করে ফেলেছেন!—পরক্ষণেই আনগ্ন গাত্রে বরফে গড়াগড়ি

দিলেও তাঁর শৈত্য বোধ হয় না দেখে তিনি তো সপ্তম স্বর্গে! নীলকণ্ঠের উচ্চতর স্তরে যে দুটি সাক্ষাৎ কৃতান্তদ্বয়, দারুণ অন্নাভাব ও নিদারুণ শৈত্য, এ দুটিই—নামে অবধূত এখন সিদ্ধিতে অবধূত—জয় করে ফেলেছেন! এবারে তিনি টেলিফোন খুঁজছেন, লর্ড কেদারনাথের সঙ্গে একটা রাঁদেভু স্থির করে তাঁর সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করবেন বলে!

আর লজ্জা ঘৃণা ভয় ইত্যাদি সে তো অবধূত কবে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে—পুস্তকে বিনয়বশত যা বলুক বলুক। আমি পুনরায় এক কোমর গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে পৈতে স্পর্শ করে পাঁচপীরের কসম খেতে রাজী আছি।

কিন্তু হায়, অবধূত এ-পৃথিবীতে এসেছেন অশুভক্ষণে। তাঁর নির্ঘণ্ট দীর্ঘ, তিনি কোন্ কোন্ পাশ হতে মুক্ত হতে চান, তিনি কোন্ কোন্ রিপু জয় করতে চান। অনেকগুলো জয় করতে করতে তো উঠছেন তিনি ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর লোকে—চিত্তলোক এবং ইহলোক উভয়েতেই—পৌঁছে গেছেন গরুড়চটি। সম্মুখে আর চড়াই নেই—কেদার ক্রোশমাত্র দূরে। অবধূত নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা দিলেন। কিন্তু, হা হতোস্মি, সকালে দেখেন, একি! রাতারাতি হড়্হড়িয়ে নেবে গেছেন যাত্রারম্ভস্থল দেবপ্রয়াগে!···আবার আরম্ভ হল নূতন করে রিপুজয় চিত্তজয় অজগর-পন্থা পক্ষী-পন্থা মারফৎ, আরোহণ করলেন না জানি আরো কত উচ্চ ভূমিতে। এবারে রাতারাতি হড়্হড়িয়ে চুঁচড়োয়—হ্যাঁ আমাদের এই চুঁচড়োয়!

কেন? কেন এ-দুর্দৈব?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস—অবশ্য অবধূত এবং বাঙালী পাঠক আমার সঙ্গে একমত না হলে আমি বিস্মিত হব না—তিন অবধূতে একজোটে যে-সব পাশ ছিন্ন করার মৎলব নিয়ে সেগুলোর নির্ঘণ্ট নির্মাণ করেন তখন একটি পাশের কথা বেবাক ভুলে গিয়েছিলেন। সেটি কি?

ইংরিজিতে বলে milk of human kindness। দুঃখীর প্রতি দরদ, অপমানিতের প্রতি সহানুভূতি, অত্যাচারীর প্রতি প্রকাণ্ড আক্রোশ (এমনিতে অবধূত রাগের পাশে বাঁধা পড়েন না)—এক কথায় পীড়িত বঞ্চিত, ধূলিলুণ্ঠিত জনের প্রতি ক্ষণে ক্ষণে তাঁর বুক যেন বেদনাভরে, করুণাভারে ভেঙে পড়ে যেতে চায় (যে অবস্থায় পূব বাংলার মেয়ে বলেছিল 'ইচ্ছা করে, হৃদয়ডারে, গামছা দিয়া বান্ধি'), কিন্তু থাক্, এটা গুছিয়ে বলবার মত ভাষা আমার নেই।

এই মিল্ক্ অব্ হিউমেন কাইণ্ডনেসের পাশ সম্বন্ধে না তিনি সচেতন, না তিনি তপস্যা করেন সেটা ছিন্ন করতে! তবে কি মুক্তপুরুষের হৃদয়ে আমাদের

মত বন্ধুজনের প্রতি করুণাধারা প্রবাহিত হয় না? অবশ্যই হয়। লক্ষগুণে বেশী নয়। কিন্তু তার পূর্বে মুক্ত হওয়ার জন্য এ-পাশও ছিন্ন করতে হয়।

কিন্তু আমি নিরাশ হচ্ছিনে। এই নীলকণ্ঠ হিমালয়েই, এই পথ দিয়ে যাবার সময়ই ক্ষুদ্রহৃদয়দৌর্বল্য বশতঃই (milk of human kindness!) ধর্মপুত্র স্বেচ্ছায়-সঙ্গী সারমেয়টিকে ত্যাগ করতে সম্মত হন নি। ধর্মরাজ তৎসত্ত্বেও তাঁর জন্য স্বর্গদ্বার খুলে দেন। সেই ব্যত্যয় কি আবার হতে পারে? নীলকণ্ঠের উপাসক মাত্রই এর উত্তর দিতে ভয় পাবেন। আমি তাঁর উপাসক নই। আমি নিরপেক্ষ তৃতীয়পক্ষ। আমি নির্ভয়ে বলবো, এই 'ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্বল্য' হৃদয়ে ধারণ করেই অবধূত নীলকণ্ঠের হৃদয়ে স্থান পাবেন। কিন্তু খৃষ্ট সাধুর স্মরণে বলি, 'মোক্ষ? মোক্ষ নিশ্চয়ই চাই, প্রভু, কিন্তু not just yet!' অবধূতের মোক্ষটিও যেন বিলম্বে আসে। কারণ, পূর্বোক্ত খৃষ্ট সাধুই বলেছেন, তখন মুক্ত পুরুষ মৌন হয়ে যান। অবধূত পূর্ণ তিন বৎসর নীলকণ্ঠে মৌনব্রতী ছিলেন—আমাদের কোনো ক্ষতি হয় নি, কারণ, তারপর তিনি বাংলা সাহিত্য-মজলিসে তাঁর সাধনার ধন সঙ্গীতে পরিবর্তিত করে গান গাইলেন এক যুগ ধরে।

এবারে মৌন হলে সাহিত্যের সাধারণ পাঠক, সাধারণ 'মানুষ' বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অথচ তিনিই গেয়েছেন,

'জয়, মানুষের জয়!'

এই একটিমাত্র জয়ধ্বনি আছে দগ্ধপৃথ্বীতলে যে জয়ধ্বনিতে কি হিন্দু কি মুসলমান, কি কৃষ্ণ কি শ্বেত সর্বমানুষ আত্মহারা হয়ে যোগ দেয়॥

এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি অবধূত বিরচিত "নীলকণ্ঠ হিমালয়" ভ্রমণকাহিনীর ভূমিকা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

একাদশ খণ্ড

(অপ্রকাশিত রচনা)

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ★ কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৬৬

সম্পাদক
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
সুমথনাথ ঘোষ
সবিতেন্দ্রনাথ রায়
মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা
শ্রীচুনী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ
সিল্ক স্ক্রীন

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও পি. এম. বাক্‌চি এণ্ড কোঃ, প্রাইভেট
লিমিটেড, ১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা-৬ হইতে
জয়ন্ত বাক্‌চি কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

সম্পাদকের নিবেদন ৵৹

বিচিত্রা

মধুহীন করিনি তো মোরা মনঃ কোকনদে ৩

অশ্রুসিক্ত সিন্ধুবারি ৭

Tagore as Nationalist ১৩

বিচিত্র ছলনাজাল ১৯

রামানন্দ-তর্পণ ২৪

অনাদিদেব! অনন্ত ভব! শতং জীব! সহস্রং জীব!! ২৭

মরহুম শেখ মুহম্মদ মুস্তাফা অল-মরাগী ৩০

পলডি ৩৫

উমেদারী ৩৬

এষাস্য পরমা গতি? ৪৩

গাঁধী-ঘাট ৪৫

হজরৎ সৈয়দ নিজাম উদ্দীন চিশতি ৪৮

হ য ব র ল (১—৭) ৫৩

ঘরে-বাইরে ৬৮

ভাষা সংস্কৃতি সাহিত্য

ঐতিহ্য ৭৩

'৪২—'৪৫ ৭৫

একদা যাহার বিজয় সেনানী ৭৯

জাতীয় মহাশব্দের স্বরূপ ৮২

অটোপ্রমোশন ৮৫

নট গিলটি ৮৮

অবনীন্দ্রনাথ ৯৪

ভারত-নাট্যম ৯৭

নর্তকী ৯৯

নারীর অধিকার ১১৭

ঘরে বাইরে শ্রমিক নীতি ১২২

আফগান ইতিহাসের মদনাঙ্ক ১২৪
বেলজেন, স্টেটস্‌মেন ১২৯
মধ্যপ্রাচ্য ১৩৮
মিশর ১৪১
যবনিকান্তরালে ১৪৪
হিটলার মাহাত্ম্য ১৪৭
ফ্রাঙ্কেনস্টাইন্‌ ১৫০
মার্শাল-মার্গ ১৫৩
আরব্য-রজনীর অরুণোদয় ১৫৫
মরুদ্যান না মরীচিকা ? ১৬২
দেহলি প্রান্তে (১—৫) ১৬৬
The Spirit of Tagore ১৮৪
A Letter from India ১৮৮
What Is In A Name ? ১৯৩
Love And Friendship ১৯৭
রায় পিথৌরার কলমে ২০৯
অপ্রকাশিত পত্রাবলী (৩১টি পত্র) ২৯৭
সংযোজন
নেড়ে (পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত গল্প) ৩৫২

সম্পাদকের নিবেদন

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের লেখকদের মধ্যে সৈয়দ মুজতবা আলী ছিলেন এক প্রচণ্ড ব্যতিক্রম। চিরাচরিত প্রথাসিদ্ধ রচনাভঙ্গিতে না লিখে তিনি একটি নূতন ধারা বা স্টাইল বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তন করেন। তাঁর ভঙ্গিতে আগে বিশেষ কাউকে লিখতে দেখা যায়নি। পরেও কেউ আসেননি। তাঁর সাম্রাজ্যে তিনি একক অধীশ্বর—এখনও পর্যন্ত। আলী সাহেবের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা যেমন ছিল বৈচিত্র্যময়, তেমনি তাঁর লেখনীরও অবাধ বিচরণ ছিল সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। একই লেখক উপন্যাস লিখেছেন, কবিতা লিখেছেন, ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন, জীবনী রাজনীতি শিক্ষা ধর্ম আমাদের জানাশোনা কোন বিষয়ই বাদ পড়েনি তাঁর রচনায়—এ দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। তবে তাঁর অসাধারণ রচনানৈপুণ্যের সঙ্গে আর একটি বিরাট ত্রুটি ছিল তাঁর লেখকরূপে। সে ত্রুটি বা দোষটি হল তাঁর নিজের রচনার মুদ্রিত-অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে নিদারুণ শৈথিল্য ও উদাসীনতা। উপন্যাস বা একটানা ধারাবাহিক প্রকাশিত রচনা ছাড়া আর যে সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি সংগ্রথিত করা বা সংকলনের ভার তিনি অনেক সময়ই প্রকাশক বা অপর কোন ব্যক্তির ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁর নিজের লেখা কোন্‌টা বাদ পড়ে গেল, কোন্ কোন্ পত্রিকার লেখা সঙ্কলিত হল না আদৌ সে হিসাব সংকলক বা প্রকাশকের পক্ষে রাখা সম্ভব হত না। লেখকের এ বিষয়ে শৈথিল্য বা উদাসীনতার কথা তো আগেই বলেছি। ইতিপূর্বে প্রকাশিত তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ ও রচনা রচনাবলীতে সংকলিত হবার পর, লেখকের পুত্রদের প্রচেষ্টায় আরও বেশ কিছু রচনা উদ্ধার হয়েছে। এই সব রচনার অধিকাংশ বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রের ফীচার কলমে ও বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় লেখকের নিজ নামে বা সত্যপির, রায়পিথৌরা প্রভৃতি ছদ্মনামে মুদ্রিত হয়েছে। সামান্য কিছু লেখা অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির আকারেই থেকে গিয়েছিল। এই সব রচনা নিয়েই সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলীর একাদশ বা অপ্রকাশিত রচনার খণ্ডটি প্রকাশিত হল।

এই খণ্ডটিতে মোটামুটি চারটি বিভাগ করা হয়েছে—বিচিত্রা, ভাষা সংস্কৃতি সাহিত্য, রায় পিথৌরার কলমে এবং অপ্রকাশিত পত্রাবলী। বিচিত্রা বিভাগে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কিত আলোচনা, বিদ্বজ্জন ও মহাপুরুষদের প্রসঙ্গ ও কিছু হাস্যকৌতুকপূর্ণ রচনা স্থান পেয়েছে। ভাষা সংস্কৃতি সাহিত্য বিভাগে—এই শিরোনাম বিষয়ক প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়েছে। রচনার মধ্যে মূল্য বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে নানান বিষয়ের উল্লেখ আলীসাহেবের রচনা-শৈলীর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম। সেই কারণে তাঁর প্রবন্ধগুলি বিশেষ কোন বিভাগে

শ্রেণীবদ্ধ করা যে কোন সম্পাদকের পক্ষেই এক সুকঠিন কর্ম। ভাষার আলোচনায় রাজনীতির প্রসঙ্গ টেনে আনা, ধর্ম বা সংস্কৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে রাজনীতিক পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর প্রভাব কি ও কতটা—এসব ব্যাপার তাঁর লেখনী কখনই এড়িয়ে যেত না। এই জন্যই এই বিভাগের অন্তর্গত অনেক রচনাতেই রাজনীতি, রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিস্তৃত আলোচনা ও বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিভাগে নর্তকী নামে যে নিবন্ধটি আছে, সেটি পাঠক পড়েই বুঝতে পারবেন, রচনাটি অসম্পূর্ণ। একটি প্রচুর সম্ভাবনাময় কাহিনী অর্ধপথেই থেমে গেছে। লেখকের কয়েকটি মূল্যবান ইংরাজী প্রবন্ধও এই অংশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দিল্লীতে থাকাকালীন সময়ে লেখক দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় রায়পিথৌরা নামে দীর্ঘদিন ফীচার কলম পরিবেশন করেন। এগুলি সমসাময়িক ঘটনাবলী প্রসঙ্গে লিখিত হলেও অনেক রচনাই সাময়িকতাকে অতিক্রম করে চিরন্তনত্ব দাবী করতে পারে। এইসব রচনা 'রায় পিথৌরার কলমে' বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গ্রন্থের শেষ অংশ লেখকের 'অপ্রকাশিত পত্রাবলী'। এই পত্রগুলির সবকটিই রাজশেখর বসুর দৌহিত্রী-পুত্র শ্রীদীপংকর বসুকে লিখিত। পত্রগুলি প্রকাশের ব্যাপারে ও তথ্য সংগ্রহে দীপংকরবাবুর আনুকূল্য ও সাহায্য অপরিসীম।

আগেই বলেছি,—রচনার বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা ও বহুমুখী আলোচনার জন্য আলীসাহেবের প্রবন্ধগুলির নিখুঁত শ্রেণীবিভাগ করা দুরূহ। লেখকের সাহায্য পেলে হয়তো আরও খানিকটা সুবিন্যস্ত করা যেত। তবু এই শ্রেণীবিভাগে যদি কোন ত্রুটি চোখে পড়ে তা সম্পাদকদের গোচরে আনলে তাঁরা উপকৃত ও কৃতজ্ঞ বোধ করবেন।

প্রকাশিত রচনাগুলির মধ্যে যেগুলির প্রকাশকাল ও পত্রিকার নাম যেমন যেমন পাওয়া গেছে, তাদের নীচে সেইমত উল্লেখ আছে। অন্যগুলি না পাওয়ায় দেওয়া সম্ভব হয়নি। সমসাময়িক বিষয়ের উপর লিখিত প্রবন্ধগুলির বিন্যাসের মধ্যে যথাসম্ভব পারম্পর্য রাখার চেষ্টা হয়েছে।

তবে সকলের বিপুল পরিশ্রম ও অনুসন্ধান সত্ত্বেও আমাদের আশঙ্কা, গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হল না এমন অনেক রচনাও সকলের অগোচরে বাইরে থেকে যাওয়া অসম্ভব ও বিচিত্র নয়। বাংলাসাহিত্যের অনুরাগী পাঠক-সুহৃদ্‌বর্গ তেমন কোন রচনার সন্ধান দিলে আমরা পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করতে পারি।

—সম্পাদক

বিচিত্রা

মধুহীন করিনি তো মোরা মনঃ কোকনদে

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পাঁচজনের সামনে কিছু বলতে গেলে আমি দিশেহারা হয়ে যাই। সমস্যা তখন: কোন্‌টা ছাড়ি, কোন্‌টা বলি? প্রবাদে কয়, বাঁশবনে ডোম কানা। যে-বাঁশটা দেখে, আহাম্মুখ ডোম সেইটেই কাটতে চায়। আখেরে আকছারই যা হয়, তাই ঘটে। একটা নিরেস বাঁশ কেটে বাড়ি ফেরে! রবীন্দ্রনাথের বেলা তবু খানিকটে বাঁচাওতা আছে। যে বাঁশই পেশ করিনে কেন, কেউ না কেউ সেটা পড়েছেন। তিনি "বুড়া রাজা প্রতাপরায়ের" মত "আহাহা বাহাবাহা" রবে সাধু! সাধু! রব ছাড়বেন।

মাইকেল শ্রীমধুসূদনকে নিয়ে সংকট উৎকটতর। আজ কেন, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও মাইকেল-কাব্য-নাট্য-পত্রাবলী বাবদে ওয়াকিফ্‌-হাল ছিলেন অল্পজনই, যাঁরা মাইকেল নির্মিত "মধুচক্র" থেকে "গৌড়জন যাহা আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি" রসাস্বাদ করতেন। পঞ্চাশ বছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বাঙলা ক্লাস নেবার সময় কেউ যদি "বলাকা"র কোনো অপেক্ষাকৃত বিরল শব্দের অর্থ বলতে না পারতো তিনি তখন হরহামেশা শাসাতেন, "দাঁড়া! তোদের তা হলে 'মেঘনাদ' পড়াবো, তখন বুঝবি কঠিন শব্দ কাকে বলে!" আমরা আতঙ্কে কুঁকড়ি সুকড়ি মেরে যেতুম।.....আর আজ!! তবে একটি আশার বাণী আছে। বছর তিরিশেক পূর্বে মডার্ন কবিরা যখন বাঙলা শব্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করলেন তখন একাধিক জন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে অনাদৃত শ্রীমধু শতাধিক বৎসর পূর্বে ঐ কর্মটি করেছিলেন তাঁর সর্ব প্রতিভা নিয়োগ করে অসীম উৎসাহে। এবং বিশেষ করে শ্রীমধু বড়ই উল্লাসবোধ করতেন, আলঙ্কারিক—অর্থাৎ যাঁরা কাব্য-রস কি, সে রসের উত্তম অধম বিচার, উত্তম রসসৃষ্টির সময় কোন্‌ কোন্‌ বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি এঁদের সে-সব আইন লঙ্ঘন করতে পারলে।

মাইকেলের আমলে ঈশ্বরচন্দ্র বিধবা-বিবাহের জাতশত্রু জনৈক মহেশচন্দ্রকে অপদস্থ করার জন্য প্রতি সপ্তাহে একটি বুলেটিন প্রকাশ করতেন। ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কটুবাক্য সর্ব অস্ত্র ঈশ্বরচন্দ্র এস্তেমাল তো করতেনই, মাঝে-মধ্যে অশ্লীলতার গা যে ছুঁয়ে যেতেন না সে-কথাও বলা যায় না। ঐ সময় গোঁড়ার দল মহেশকে "কবিরত্ন" উপাধি দেয়। ঈশ্বর প্রতিবাদ করে লিখলেন, "না, তাকে দেওয়া হয়েছে "কপি-রত্ন" খেতাব।" তারপর ঈশ্বর স্মৃতি, ন্যায়শাস্ত্রাদি থেকে তাঁর "কপি-রত্ন" সপ্রমাণ করার পর নিলেন অলঙ্কার। লিখলেন, সর্ব আলঙ্কারিক এক বাক্যে

বলেন, 'ব' অক্ষরটি কর্কশ, 'প' অক্ষরটি মোলায়েম। উপাধি দেবার বেলা অবশ্যই মোলায়েম অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব কপিরত্ন। কাকতালীয় কি না, বলা সুকঠিন, কারণ শ্রীমধু ইতিপূর্বে অলঙ্কার শাস্ত্র গুলে খেয়ে পেটতল করে তৈরী ছিলেন। মনে মনে বললেন, "বইট্টে! 'ব' বুঝি কর্কশ। আমি নাগাড়ে 'ব' এস্তেমাল করবো! সামলাও দেখি ঠ্যালাডা।" সীতা-সরমায় সদম্ভে লিখলেন,

শুনিয়াছি বীণাধ্বনি দাসী
পিকবর-রব নব পল্লব মাঝারে—

পর পর চারটে শব্দে চারটে 'ব'-এর অনুপ্রাস! এ অধম বহু বৎসর ধরে ত্রিযামা যামিনী যাপন করেছে অলঙ্কার অধ্যয়নে। সে চিৎকারিল উচ্চৈঃস্বরে,

"ভো ভো গৌড়জন
সবে। কী মধু নিমিল মধু অবহেলে
বারম্বার 'ব' অক্ষর বিভাসিয়া। বলো
কবে কবি কেবা, বর্ণিল বরদা বরে
বঙ্গভূমে পিকবর-রব নব?"
— — — — — ('ব' এবং 'ভ' অনুপ্রাস সমধ্বনিসূচক)

এ তো অতি সামান্য একটি উদাহরণ মাত্র। শ্রীমধুর কাব্য-নাট্যাদি যে কোনো সৃষ্টিকর্মের যেখানে খুশি হাত দাও, পাবে তাঁর সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি, পূর্বসূরীদের স্মরণান্তে ("নমি আমি কবিগুরু·····বাল্মীকি / হে ভারতের শিরচূড়ামণি", "কৃত্তিবাস কবি, এ বঙ্গের অলঙ্কার") তাঁদের ছাড়িয়ে যাবার সফল প্রচেষ্টা, অলঙ্কার নন্দন শাস্ত্র তুড়ি মেরে, সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতিতে নব নব সংকটের পথে নব নব অভিযানে নিষ্ক্রমণ, সৃষ্টির পর সৃষ্টি, অভূতপূর্ব সৃজন, যার থেকে অনাগত যুগের নবীন আলঙ্কারিক অভিনব নব নব সূত্র নির্মাণ করে গোড়াপত্তন করবেন নবীন নন্দন শাস্ত্রের—সর্বোপরি বঙ্গভাষার প্রতি তাঁর ঐকান্তিক অনুরাগ, বঙ্গ সাহিত্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর অচল অটল বিশ্বাস, সে ভবিষ্যৎকে সফল করার জন্যে তাঁর সর্বব্যাপী প্রত্যাশা—এমন কি, কোনো সার্থক মুসলমান কবি কারবালা নিয়ে একদিন রচনা করবেন অনবদ্য সমুজ্জ্বল (magnificient) এপিক[১] —এবং

১. "মেঘনাদ" রচনার সময় শ্রীমধু সুপণ্ডিত রাজনারায়ণ বসুকে লিখছেন, "I must tell you, my dear fellow, that though, as a jolly Christian youth, I don't care a pin's head for Hinduism, I love the grand mythology of ancestors. It is full of

এসব আশা-আকাঙ্ক্ষায় শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর অক্লান্ত বিদ্রোহ, দুর্বার সংগ্রাম।

আশ্চর্য! মাইকেল খ্রীষ্টান। তিনি বাঙলা ভাষার বৈরীদের সঙ্গে করলেন আমৃত্যু সংগ্রাম। তিনি আহরণ করতেন অসংখ্য রতনরাজি বহুতর ভাষা থেকে কিন্তু কি ইংরিজি, কি সংস্কৃত তাঁর মাতৃভাষা বাঙলার আসন দখল করে সেটা তিনি এক লহমার তরে বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাঁর তিনশত বৎসর পূর্বে আরেক অহিন্দু—মুসলমান, তাঁরই মত "বাঙাল"—সৈয়দ সুলতান বহু-বিচিত্র সম্পদ আহরণ করতেন আরবী ফারসী থেকে, কিন্তু তাঁর সাধনার ধন বাঙলাকে যারা স্থানচ্যুত করতে চায় তাদের স্মরণে এনে দিচ্ছেন অপূর্ব সুভাষিত,

"যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন।
সে-ই তার মাতৃভাষা, অমূল্য সে ধন॥"

অথচ শ্রীমধু স্কুলে পাঠ্যাবস্থায় স্বপ্ন দেখতেন ইংলণ্ডের। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার হাতের কাছে অল-ওস্তাদ ডঃ মনিরুজ্জামান সাহেব কর্তৃক সম্পাদিত মধুসূদনের নাট্যগ্রন্থাবলীখানি আছে মাত্র। অর্থাৎ ব্রজাঙ্গনা, মেঘনাদ, গয়রহ একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ নেই। অতএব তাবৎ কাব্য-উদ্ধৃতি আমার জরাজীর্ণ স্মৃতি দৌর্বল্যের উপর নির্ভর করে এ স্থলে লিখতে হচ্ছে—মায় সুলতানের সুভাষিত।

বিলেতের স্বপ্নে বিভোর শ্রীমধু তখন আকুল হৃদয়ে ইংরেজিতে কবিতা লিখছেন (বয়স চোদ্দ / পনেরো, "পৃথিবী", না "প্রথিবী" কোন্‌টা শুদ্ধ জানেন না; পরবর্তী-

poetry. A fellow with an inventive head can manufacture the most beautiful things out of it. (… …) What a vast field does our country now present for literary enterprise! I wish to God, I had time. Poetry, Drama, Criticism, Romance—a man would bare a name behind him, above all Greek, above all Roman fame". শুধু হিন্দু পুরাণাদিই না। অন্যত্র শ্রীমধু লিখছেন, "We have just got over the noise of Mohurrum. I tell you what—if a great Poet were to rise among the Mussulmans of India, he could write a magnificient Epic on the death of Hossain and his brother. He could enlist the feelings of the whole race on his behalf. We have no such subject." (অর্থাৎ হিন্দু পুরাণাদিতে নেই।) ডঃ মনিরুজ্জামান, নাট্যগ্রন্থাবলী, পৃঃ ৭৯৩, ৮১৬।

কালে নিজেই বলছেন সে-সময় কেউ "শিব" না লিখে "ষীব" লিখলে সেটাকে তিনি উদ্ভট মনে করতেন না),—

I sigh for the distant Albion shore
Its valley green its mountains high,
Though friends none relations have I nor
In that far clime, yet oh ! I sigh
To cross the vast Atlantic wave,
For glory or a nameless grave !

(উদ্ধৃতি নিশ্চয়ই ভুল আছে)

অনেক বৎসর পরে কবিগুরু রবির অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এর অনুবাদ করেন :—

দূর শ্বেতদ্বীপ তরে পড়ে মোর
আকুল নিঃশ্বাস,
যেথা শ্যামা উপত্যকা, উঠে গিরি
ভেদিয়া আকাশ।
নাহি সেথা আত্মজন, তবু লঙ্ঘি
অপার জলধি,
সাধ যায় লভিবারে যশ, কিংবা
অ-নামা সমাধি॥

গিয়েছিলেন মধু। গিয়েছিলেন বলেই বিদেশী ভাষার প্রতি সমসাময়িক সর্বজনীন চিত্ত-দৌর্বল্যজনিত মোহ থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন অতি সত্বর। বিদেশের প্রতি তাঁর কুহেলিকাচ্ছন্ন চক্ষুঃজ্যোতিও নিরাবিল হয়ে যায় যুগপৎ।

বস্তুত কলকাতায় ফিরে এসেও মধু সেই পরবাসীই থেকে গেলেন। শ্রীমধু চিরকালই খাঁটি যশোরে "বাঙাল"। কলকাতার 'ঘটি'-রাজরা যখন তাঁকে তাঁর সরস তথা দার্ঢ্যগুণসম্পন্ন, সরল অপিচ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভব প্রকাশে পটিয়ান, মধুর অপরঞ্চ গুরুগম্ভীর, অকৃত্রিম বিদগ্ধ বঙ্গভাষার সর্বাধিকারাধার প্রতিভূরূপে নতমস্তকে স্বীকার করে নিয়েছেন তখন অকস্মাৎ নয়া এক ভেল্কিবাজি দেখিয়েছিলেন যশোরের খাঁটি 'বাঙাল'। পশ্চিমবঙ্গের অকৃত্রিম ঘটির ভাষা পেরিয়ে মধু ছাড়লেন বাঙাল ভাষার রঙ বেরঙের আতশবাজি।

শ্রীমধু মাতৃভূমি সাগরদাঁড়ি ছাড়েন বাল্যে। কিন্তু এ কী তিলিস্‌মাৎ, কী অলৌকিক কাণ্ড! শুধু যে যশোরের হিন্দু ভদ্রলোকের ভাষা (ভক্ত-প্রসাদের

ভাষা) স্মরণে রেখেছেন তাই নয়, হিন্দু চাকরের ভাষা (রাম), বামুন পণ্ডিতের সংস্কৃতে ভেজা সপসপে ভাষা (বাচস্পতি), মুসলমান চাষার ভাষা (হানিফ), তার বউয়ের ভাষা (ফতেমার ভাষাতে বিদেশী-শব্দ হানিফের তুলনায় কম)—কে কতখানি সংস্কৃতে ভরা ভাষায় কথা বলবে, কে কোন্ পরিমাণে আরবী-ফার্সী এস্তেমাল করবে তার ওজন করে শ্রীমধু চালাচ্ছেন একসঙ্গে গোটা পাঁচ ছয় মূলত যশোরী ভাষার ভিন্ন ভিন্ন আড় বা ঢং—যাদুকর যে-রকম ছ'টা বল্ নিয়ে খনে এক হাতে খনে দু'হাতে নাচায়। এমন কি সদ্য কলকেতা ফের্তা কলেজের ছোকরাকেও দিব্য চেনা যাচ্ছে। বলছে "এমন ক্লেবর ছোকরা দুটি নেই।" ওদিকে ভক্তপ্রসাদ জমিদারির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে বরঞ্চ যাবনিক শব্দ দিব্য চেনেন। তাই ক্লেভার শব্দের দু'দুটি প্রতিশব্দ 'সুচতুর' 'মেধাবী'ও তাঁর পছন্দ হল না। বললেন, " 'জহীন' কিম্বা 'চালাক' বললে বুঝতে পারি।"—আজ আর জহীন শব্দ কোনো বাঙলার লোকই বোঝে না। আরবী "জেহ্ন্" দু'একখানা কোষে পাওয়া যায়। বলা নিতান্তই বাহুল্য 'চালাক' ফার্সী।

একাধিক লেখক ইয়োরোপীয় সাহিত্যে একাধিক ভাষা নিয়ে কারচুপি দেখিয়েছেন কিন্তু শ্রীমধুর ন্যায় এ-রকম ভেল্কিবাজি, কেউই দেখাতে পারেননি।

কলকাতার বুকের উপরে বসে তিনি নির্ভয়ে বাংলাদেশের 'বাঙাল' ভাষার ভিন্ন ভিন্ন রূপ শুধু যে পাঙক্তেয় করে তুললেন তাই নয়, তারা সেদিন যে-সব উচ্চাসনে বসেছিল সে-সব আসন নিয়ে খাস কলকেত্তাই বা অন্য কোনো আঞ্চলিক ভাষা উপভাষা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি।

যদ্যপি শান্তিনিকেতনের গীতিরস-পরিবেশে আমার কৈশোর কেটেছে, তবু শ্রীমধু আমার বড়ই প্রিয় কবি। তাই এতখানি লেখার পরও দেখি কই, কিছুই তো বলা হল না। মনস্তাপ রয়ে গেল।

সেটা হালকা করার জন্য অবনী ঠাকুরের অনুকরণে গান জুড়ি

"শ্রীমধুরে ঠ্যাকায় কেডা
খুল্‌নে যশোর কইল্‌কেতা।"

অশ্রুসিক্ত সিন্ধুবারি

এই ক্ষুদ্র রচনাটির অবতরণিকাতেই আমার একটি সামান্য কৈফিয়ৎ নিবেদন করার আছে। যদিও বহু বৎসর ধরে আমার লেখা কেউ বড় একটা পড়ে না, তবুও

"বেতার বাংলার" সম্পাদক মণ্ডলীতে দু'একজন নিতান্তই "অকালবৃদ্ধ" সজ্জন, তথা তাঁদের বড় কর্তা আমার প্রতি নিতান্ত অকারণ সদয়। 'বেতার বাংলা'ই স্বাধীনতার পর এই অনারারী পেন্‌সন্‌প্রাপ্ত অস্তমিত লেখকের কাছ থেকে সসম্মানে দাক্ষিণ্যসহ একটি রচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমারও স্পর্ধা বেড়ে গেল। জীবনে যা কখনো করিনি, সেই নিবেদন জানালুম; আসছে শ্রাবণের ১৩ তারিখ (২৯ জুলাই) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুদিবস। তাঁর সম্বন্ধে সামান্য কিছু নিবেদন করতে চাই। তাঁরা সম্মত হয়েছেন।

নিঃসঙ্কোচে বলবো, চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর হিন্দু সমাজের ইনিই সর্বোত্তম মহাপুরুষ। রবীন্দ্রনাথ যেসব মহাত্মাদের জীবনী লিখেছেন তার মধ্যে সর্বাধিক বিস্তীর্ণ স্থান দিয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্রকে। তিনি বলেছেন, "বিদ্যাসাগর নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাংলার ইতিহাসে অতিশয় বিরল; এত বিরল যে, এক শতাব্দীর মধ্যে কেবল আর দুই একজনের নাম মনে পড়ে এবং তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন রায় সর্বশ্রেষ্ঠ।"

আমার সবিনয় নিবেদন, আমি গুরুর সঙ্গে একমত নই। অবশ্য "আর দুই একজন" বলতে গিয়ে গুরু যদি ঈশ্বরচন্দ্রকে বাদ দিয়ে রামমোহনকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে থাকেন তা হলে সে অভিমত সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্য নেই।

গত দুই শতাব্দীতে যে-সব মহাপুরুষ বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন—রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ—তাঁরা সকলেই হিন্দুধর্মের মূর্তমান প্রতীক। ঈশ্বরচন্দ্র তা নন। হিন্দু শাস্ত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের জ্ঞান গত আড়াই শতাব্দীর কারো চাইতে কণামাত্র কম ছিল না। বরঞ্চ হিন্দু শাস্ত্রে আমার যে নগণ্য যৎসামান্য জ্ঞান আছে তার পথ-প্রদর্শক ঈশ্বরচন্দ্র। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, শাস্ত্রাধ্যয়ন-লব্ধ পাণ্ডিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র অতুলনীয়। বঙ্গদেশ বাদ দিন, সর্ব ভারতের হিন্দু শাস্ত্রাধ্যয়নের কেন্দ্রভূমি কাশীর শাস্ত্রীরা তাঁকে সমীহ করে চলতেন; ঈশ্বর যখন বিধবা-বিবাহ হিন্দু শাস্ত্র-সম্মত বলে বিধান দিয়ে চ্যালেঞ্জ করেন, কাশীর শাস্ত্রীরা মল্লভূমিতে নামতে সাহস পাননি।

অথচ, পাঠক বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্র মানতেন না। তাঁর ঋজু, সত্যশীল, দৈনন্দিন আচার-আচরণ সর্বধর্ম, বিশ্ব ধর্মসম্মত ছিল,—হিন্দু শাস্ত্রের বিধান তিনি সর্বজন সমক্ষে পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘন করেছেন—অথচ সে যুগের হিন্দু সমাজপতিরা হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ বিধবা-বিবাহ বিরোধী সমাজপতিগণ তাঁকে সমাজচ্যুত করার দুরাশা স্বপ্নেও স্থান দেবার মত সাহস সঞ্চয় করতে পারেননি। তিনি তাঁর

"অন্নসত্রে ভোজনকারিণী মুচি হাড়ি ডোম প্রভৃতি অপকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য স্ত্রীলোকদের মাথায় তৈলাভাবে বিরূপ কেশগুলিতে স্বহস্তে তৈল মাখাইয়া দিতেন।" স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখছেন "বর্ধমান-বাস-কালে তিনি তাঁহার প্রতিবেশী দরিদ্র মুসলমান-গণকে আত্মীয়-নির্বিশেষে যত্ন করিয়াছিলেন।" এ-স্থলে রবীন্দ্রনাথ ভাবোচ্ছ্বাসে আত্মহারা হয়ে "আত্মীয়-নির্বিশেষে" বাক্য প্রয়োগ করেননি—করেছেন—সজ্ঞানে সসম্মানে শব্দার্থে। বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা-বিবাহ বিরোধী ছিলেন। তাঁর এক উপন্যাসে তিনি ঐ নিয়ে কিঞ্চিৎ কৌতুক করেছেন। অথচ ঠিক ঐ সময়ই বঙ্কিমের অগ্রজ সদানন্দ, সাম্প্রদায়িক হীনমন্যতামুক্ত সঞ্জীবচন্দ্র অনুজ বঙ্কিমকে নিয়ে বর্ধমানে ঈশ্বর সকাশে উপস্থিত হয়ে কুশলাদির পর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভোজনেচ্ছু হন। ঈশ্বরচন্দ্র মোগলাই পদ্ধতিতে উত্তম মাংসরন্ধনে সুপটু ছিলেন। সঞ্জীব আহারের সময় বিদ্যাসাগরের রন্ধননৈপুণ্যের প্রশংসা করে বলেন, তিনি যে বহুগুণধারী, সে-তথ্য সঞ্জীব জানতেন, কিন্তু রন্ধনেও যে তিনি সুপটু সে তত্ত্ব তাঁকে বিস্মিত করেছে। বার্ধক্যে স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত ছলনাময়ী। তারই উপর নির্ভর করে সঠিক বলতে পারছি না, বিদ্যাসাগর "কিন্তু আপনার ভায়া তো ভাবেন, আমি—" বলার পর "মূর্খ" না ঠিক ঠিক কোন্ বিশেষণটি প্রয়োগ করেছিলেন। এর কিছুদিন পূর্বে বঙ্কিম ঈশ্বরচন্দ্রকে যে পত্র লেখেন তার সারমর্ম এই যে, "আপনি শাস্ত্র-দ্বারা কেন প্রমাণ করতে গেলেন, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন করা উচিত!" ঈশ্বরচন্দ্র আত্মম্ভরী বা দম্ভী ছিলেন না, কিন্তু তিনি আত্মদ্রষ্টা ছিলেন, তাই বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, বঙ্কিম প্রভৃতি "নব হিন্দু ধর্মের" প্রবর্তকগণ কী ব্যক্তিগত জীবন যাপন পদ্ধতিতে, কী শাস্ত্রজ্ঞানে কী প্রকৃত ধর্মতত্ত্বানুশীলনে তাঁর বহু বহু পশ্চাতে। ঈশ্বরচন্দ্র সে পত্রের উত্তর দিয়ে বঙ্কিমকে অহেতুক সম্মান দেখাবার প্রয়োজন বোধ করেননি। কিন্তু এর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর ঈশ্বর ও বঙ্কিম উভয়ই যখন পরলোকে তখন রবীন্দ্রনাথ মল্লভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে লিখেছিলেন, "অনেকে বলেন, তিনি (ঈশ্বরচন্দ্র) শাস্ত্র দিয়েই শাস্ত্রকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু শাস্ত্র উপলক্ষ মাত্র ছিল; তিনি অন্যায়ের বেদনায় যে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সে তো শাস্ত্র বচনের প্রভাব নয়।" এ যে কী মোক্ষম সত্য আমার গুরু আপ্তবাক্যপ্রায় বলেছেন, সে আমার অক্ষম লেখনী কি করে প্রকাশ করবে! প্রকৃত গুণী, মোহমুক্ত সত্যদ্রষ্টাই শাস্ত্রের এই জটিল তর্কজাল ছিন্ন করে মানুষকে ইঙ্গিত দেন, শেষ সত্যের উৎসস্থল কোথায়? কবি বলছেন, "তিনি (ঈশ্বরচন্দ্র) তাঁর করুণার ঔদার্যে মানুষকে মানুষরূপে অনুভব করতে পেরেছিলেন, তাকে কেবল শাস্ত্রবচনের বাহকরূপে দেখেননি।" শাস্ত্র মানুষকে সত্যের দিকে পথনির্দেশ করে, হয়তো বা অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে

উপদেশ দেয়, কিন্তু শাস্ত্র কবে কোন্ মানুষের পাষাণ-হৃদয়কে করুণা ধারায় প্লাবিত করতে পেরেছে ?

* * *

এতক্ষণ অবধি যাঁরা আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন তাঁরা হয়তো অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। শাস্ত্র, তাও হিন্দুশাস্ত্র, সেও গত শতাব্দীর পুরনো এক সমস্যা নিয়ে এত কচকচানি শুনে কীইবা এমন চরম মোক্ষ লাভ হবে ? কিচ্ছুটি না। তবে শুধু স্মরণে এনে দিতে চাই, মাত্র দু'টি বৎসর আগে স্বৈরাচারী নরঘাতক সম্প্রদায় আমাদের মুসলিম শাস্ত্র নিয়ে পেশাওয়ার থেকে সিলেট অবধি কী প্রতারণাই না করেছিল। আমাদের জনপ্রিয় নেতা, মুক্তি ফৌজের আত্মোৎসর্গ, জনপদবাসীর বিদ্রোহ এর সবই নাকি ছিল ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ! আমরা ইংরিজি পঞ্জিকার উপর নির্ভর করে দিবারাত্রির নামকরণ করাতে এতই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে এখনো বলি ২৫ মার্চ বৃহস্পতিবার রাত্রি এগারোটার সময় এক অভূত-পূর্ব তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু মুসলিম পঞ্জিকানুযায়ী বৃহস্পতিবারের সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল পবিত্র জুম্মাবার, শুক্রবারের রাত্রি। তারপর এল শুক্রবারের দিন। আল্লাতালার আদেশ :

"ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু, ইজা নূদিয়া লিস্‌সলাতি মিন্‌নি-ইয়োমিল্-জুমুয়া (তি), ফাস্ আ'ও ইলা জিক্‌রিল্লাহ (ই)"

"হে ইমানদারগণ, যখন জুমার (সম্মিলন দিবসের) নমাজের জন্য তোমাদের প্রতি আহ্বান (আজান) ধ্বনিত হয় তখন আল্লাকে স্মরণ করার জন্য ধাবমান হও।"

শব্দার্থে "ধাবমান" হয়েছিলেন আমার এক বন্ধুর পরহেজগার প্রতিবেশী ২৬ মার্চ জুমার নমাজের দিনে। তিনি জানতেন যে পুরোদিনের তরে কারফু। তাঁর স্ত্রী তাঁকে বার বার মানা করেছিলেন। বাড়ির সামনের রাস্তা জনশূন্য। অপর ফুটের হাত পাঁচেক ডাইনে মসজিদ। তিনি বিবিকে বললেন, "আমি এক দৌড়ে মসজিদে পৌঁছে যাব।" রাস্তা যখন প্রায় ক্রস্ করে ফেলেছেন তখন তীর বেগে এল মিলিটারী গাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে গুলির শব্দ। আরেকটি শহীদ। ইনি অতিশয় উচ্চ পর্যায়ের শহীদ। কারণ আল্লার আদেশ অনুযায়ী শব্দে শব্দে "ধাবমান" হয়েছিলেন তিনি আল্লার নাম জিক্‌র করতে। কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে করে, আল্লার আদেশ পালন করতে যে বাধা দেয় (কারফু জারী ক'রে), যে-মানুষের আদেশে আল্লার আদেশ লঙ্ঘন করে তাঁকে খুন করে সে মানুষ শহীদহন্তারূপে কি খেতাব পায়! এবং এই ইয়াহিয়াই ডিসেম্বর মাসে পরাজয় আসন্ন জেনে আপন শীয়া

ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়ে সুন্নীদের মসজিদে গেলেন জুম্মার নমাজ পড়তে। সুন্নীদের ভিতর তখন গুঞ্জরণ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে,—"এই শীয়াটাই যত নষ্টের গোড়া" যেন হুজুররা এ্যাদ্দিন ধরে জানতেন না ইয়াহিয়া খান পুরো পাকা কিজিল পাশ্ শীয়া।

বিশ্বধর্মে দীক্ষিত ঈশ্বরচন্দ্র আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি উদাসীন ছিলেন কিন্তু ধর্ম নিয়ে প্রতারণার প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম ঘৃণা। তাই একদা তিক্ত কণ্ঠে তিনি ব্যঙ্গ করেছিলেন,

"প্রতারণাসমর্থে বিদ্যয়া কিং প্রয়োজনং ?
প্রতারণাসমর্থে বিদ্যয়া কিং প্রয়োজনং ?"

পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, দুটি ছত্রই হুবহু একই বানানে লেখা, কিন্তু অর্থে আসমান-জমীন ফারাক, এবং দুই ছত্রে মিলে একই সত্য নির্ধারণ করে।

প্রতারণা-সমর্থ জনে, যে প্রতারণা করতে সমর্থ তার (শাস্ত্র) বিদ্যার কি প্রয়োজন ? প্রতারণা দ্বারাই সে সব-কিছু গুছিয়ে নেবে। দ্বিতীয় ছত্রে কিন্তু পড়তে হবে প্রতারণা অসমর্থ। এখানে সন্ধি করলে পূর্ব ছত্রের মতই "প্রতারণা-সমর্থ" রূপ নেয়। অর্থ : প্রতারণা করতে যে জন অসমর্থ কোনো বিদ্যাই তার কোনো কাজে লাগবে না। অর্থাৎ বিদ্যা কোনো অবস্থাতেই কারো কোনো কাজেই লাগে না। কাজ হাসিল হবে প্রতারণা মারফৎ। বড্ড সিনিক্-এর মত তত্ত্বটি প্রকাশ করলেন বিদ্যাসাগর। বিশেষ করে বোধ হয় এই কারণে যে তাঁকে বিদ্যার সাগর উপাধি দেওয়া হয়েছিল। এবং হয়তো বা ঐ সময়েই মাইকেল তাঁর প্রশস্তি আরম্ভ করেন। "বিদ্যার সাগর তুমি, বিখ্যাত ভারতে" শ্রীমধুর মধুময় ছত্রটি বিদ্যার সাগর দিয়ে আরম্ভ হয়। সর্বশেষে এ তথ্যটিও প্রাতঃস্মরণীয় যে, বহু-লোক বহু উপাধি পায় কিন্তু সেগুলো এ রকম টায় টায় খাপ খায় না বলে লোকে উপাধিধারী কাউকে কখনো তার পদবী যেমন "বাঁড়ুয্যে" কখনো "কালীকৃষ্ণ" কখনো "ন্যায়রত্ন" বলে উল্লেখ করে। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে কখনো বাঁড়ুয্যে মশাই (যতদূর মনে পড়ে বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ দু'জনাই বন্দ্যোপাধ্যায়, সংক্ষেপে বাঁড়ুয্যে, হয়তো বা রামমোহনও) বা "ঈশ্বরচন্দ্র" বলে উল্লেখ করেনি। প্রবন্ধ-লেখার সময় অবশ্যই আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ বলে উল্লেখ করি ভাষার অনুপ্রাস, কবিতার ছন্দ শ্রুতিমাধুর্য বা অর্থগৌরব অনুযায়ী যখন যে-রকম মণিকাঞ্চন সংযোগ হয়—হয়তো বা কিঞ্চিৎ হার্দিক নৈকট্যের ইঙ্গিতসহ। কিন্তু বিদ্যাসাগর নিত্যদিনের চিরন্তন বিদ্যাসাগর। শুনেছি বিধবা-বিবাহ আইন পাস হবার পর ফরেসডাঙ্গার (চন্দননগর) তাঁতীরা কাপড়ের পাড়ে বোনে—"বেঁচে থাকো বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে তুমি।" এবং এ-উপাধি যে কত সত্য, কত গভীর তার

চরম স্বীকৃতি দিয়েছেন সে-যুগের অন্যতম ধর্মগুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস। তিনি স্বয়ং এসেছিলেন বিদ্যেসাগরের দর্শন লাভার্থে তাঁর ভবনে। উভয়ের পন্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। রামকৃষ্ণ সাধক, আর বিদ্যেসাগর ছিলেন মোক্ষ, মুক্তি, বৈকুণ্ঠলাভ বা শিবত্ব প্রাপ্তি বাবদে নিরঙ্কুশ উদাসীন। বিদ্যাসাগর অতিশয় সযত্নে রামকৃষ্ণকে সম্মুখের আসনে বসালেন। রামকৃষ্ণ মুগ্ধ নয়নে এক দৃষ্টিতে দীর্ঘকাল তাঁর দিকে তাকিয়ে শেষটায় ভাবোদ্বেল কণ্ঠে বললেন, এতদিন দেখেছি শুধু খাল বিল ডোবা; এই বারে সত্যই "সাগর দর্শন হল।" রামকৃষ্ণ "বিদ্যাসাগর" না "দয়ার সাগর"—শ্রীমধুর মধুর ভাষায় "করুণার সিন্ধু তুমি!"—বা উভয়ার্থে বলেছিলেন সেটা পরিষ্কার হয়নি; আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস উভয়ার্থে। বলা নিতান্তই অনাবশ্যক যে, রামকৃষ্ণ স্পষ্টভাষী ছিলেন। সে-যুগের বহুজন সম্মানিত বঙ্কিমচন্দ্র "কৃষ্ণচরিত্র" তথা নব-হিন্দু ধর্মব্যাখ্যান মাসের পর মাস লিখে যাচ্ছেন তখন তিনি প্রায়ই রামকৃষ্ণের সঙ্গে তত্ত্বালোচনা বা যাই-হোক সে-সন্ধানে যেতেন তাঁর আশ্রয়স্থলে—বিদ্যেসাগর কখনো যাননি। একদিন রামকৃষ্ণ হঠাৎ বঙ্কিমচন্দ্রকে বললেন, "আপনার নাম যে-রকম বঙ্কিম, আপনি ভিতরেও বাঁকা বটে।" সম্পূর্ণ মন্তব্যটি আমার মনে নেই। তবে সেটা যে অতিশয় শ্রুতিমধুর ছিল না তা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

বিদ্যেসাগর অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্রকণ্ঠে ব্যত্যয়হীন বিরোধিতা প্রকাশ করতেন বলে তাঁকে অজ্ঞজন রূঢ়স্বভাবের লোক বলে কখনো কখনো মনে মনে সন্দেহ করেছে। এ স্থলে কবি ভর্তৃহরির দুটি ছত্র তুলে দিলেই বিষয় সরল হবে:

"আচারনিষ্ঠে ভণ্ড বলেছে,
ধীরজনে ভীরু, সরলে মূঢ়
প্রিয়ভাষীজনে ধনহীন গোণে,
বীরেরে নির্দয়, তেজীরে রূঢ়।"

(সত্যেন দত্তের অনুবাদ)

এই ব্যর্থশক্তি নিরানন্দ জীবনধনদীন যুগে এ-কথা স্মরণে এনে বড় আনন্দ পাই যে বিদ্যাসাগরের মত রূঢ়তাবর্জিত তেজীজন এ-দেশে জন্ম নিয়েছিলেন। আমি বিদ্যাসাগর-চরিত্র যদি কণামাত্র চিনে থাকি তবে রূঢ়তম কণ্ঠে রূঢ়তার প্রতিবাদ জানিয়ে বলবো, তাঁর মত বিনয়ী লোক ইহসংসারে হয় না।

রামকৃষ্ণের মুগ্ধ মন্তব্যের উত্তরে বিদ্যেসাগর মৃদু হেসে বলেছিলেন, "সাগরেই যখন এসেছেন তখন খানিকটে লোনা জল নিয়ে যান।" রামকৃষ্ণ মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে সুস্পষ্টভাষায় প্রতিবাদ করেছিলেন।

পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বৎসর ধরে দেশ বিদেশে যখনই আমি কাউকে চোখের জল ফেলতে দেখেছি তখনই আমার মনে জেগেছে প্রথম দিনের প্রশ্নটা, করুণাসাগর "লোনা জল" বলতে সেদিন কি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ?

তবে কি তিনি বলতে চেয়েছিলেন, তাঁর সর্ব সত্তাতে আছে শুধু চোখের জল, অশ্রুধারা—লোনাজল ?

Tagore as Nationalist

আজকের দিনে অটোগ্রাফ, অটোগ্রাফের বই কথাগুলোর পাঁচ ছয়ের বাক্য ও জানে। আমি যে যুগের কথা বলছি তখন কলকাতার সবচেয়ে নামকরা বিলিতি দোকানে ও অটোগ্রাফের বই চাইলে সেলসমেনদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়ে যেত লিটিসটা কি এবং শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেলেও মাত্র দু'এক মাসের।

তাই আজকের দিনের মত আমরা তখন অবহেলায় কোয়া স্যুয়ারে বিয়েই সন্তুষ্ট হতুম না, এবং যাঁদের কাছে যেতুম তাঁরাও বেশ যত্ন করে, স্বাভাবিকটে ভেবে-চিন্তে কিছু একটা মনে রাখবার মত কথা লিখে দিতেন।

শরৎচন্দ্র তখন থাকতেন বাজে শিবপুরে, ছোট্ট এক খানি বাড়িতে। খুঁজে নিতে রীতিমত বেগ পেতে হত। তুখোড় আর্টিস্টের ছেলে বললেও হয়—বিলাস শান্তিনিকেতন।

শরৎচন্দ্র শুধোলেন, 'আমারই কাছে এসেছ কেন?'

কিছুমাত্র না ভেবে বললুম, 'আপনার লেখা আমার বড় ভালো লাগে।'

শরৎচন্দ্র কলম হাতে নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ চিন্তা করে লিখলেন, 'তোমার কাজই যেন আমার সকল কাজের বড় হয়।'

এখানে সবটুকু বুঝিয়ে বলতে হয়। শরৎচন্দ্র তখন খ্যাত-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। ওদিকে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে ফিরে সমসহযোগ আন্দোলনের সমালোচনা করে প্রবন্ধ লিখেছেন। এই নিয়ে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথে কিছুটা মনিমুক্ত হয়ে গিয়েছে—যদিও তেমন কিছু তীব্র নয়,

এবং সকলেই জানেন রবীন্দ্রনাথের প্রতি শরৎচন্দ্রের ছিল অকৃত্রিম এবং গভীর শ্রদ্ধা — তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত — এবং রবীন্দ্রনাথও তাঁকে দেখতেন অত্যন্ত স্নেহের চোখে।

আমি শান্তিনিকেতনের ছাত্র, একথা জেনেই কোনদিন শরৎচন্দ্র বিশেষ করে আমার দৃষ্টি তাঁর লেখার কাজের দিকে আকৃষ্ট করলেন। তদুপরি আমি তো বলেওছি যে তাঁর লেখা আমার বড় পছন্দ।

তারপর একটোপাক বই নিয়ে এলুম, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কাছে।

আমরা তাঁর ছাত্র বলে তিনি একটু বিশেষ যত্ন নিয়েই আমাদের একটোপাক বইয়ে ভালো লেখা, উদ্ধৃতি এমন কি কবিতাও লিখে দিতেন। অই খুশী হয়ে বললেন, রেখে যাও, ভালো করে লিখে দেব।' দিন পনেরো পর এক সামনে নিয়ে দিয়েছিলুম। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, কিন্তু সময় করে তাঁও পারেননি। কয়েকদিন পর আবার একবার আমাদের

দিলেন। এবারে ও পূর্ববঙ্গ। কিন্তু হয়তো আমার বিমর্ষ ভাব লক্ষ্য করলেন, তুই দাঁড়া। আমি একখানি লিখে দিচ্ছি।'

তার পর অলস হস্তে আমার অটোগ্রাফ বইয়ের পাতা উল্টোতে লাগলেন। হঠাৎ চোখে পড়ল, শরৎচন্দ্রের লিখবার ঠাঁক। সঙ্গে সঙ্গে আর কোনো চিন্তা না, ভাবনা না। প্রথম সাদা পাতাতেই লিখে দিলেন,

'আমার দেশ যেন ঐশ্বর্য লাভ করে, সকল দেশের সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ দ্বারাই তার সার্থকতা।'

× × ×

এই কথাটির ভিতরেই আছে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা।

রবীন্দ্রনাথ যে অলস দেশকে কতখানি ভালোবাসতেন, কতখানি শ্রদ্ধা করতেন, সে দেশ যেন জবসমাজ মাঝে আপন আসন বেছে নেয়, পূর্ব-পশ্চিম যেন সে দেশের ভাগ্যবিধাতার সিংহাসন পাশে এসে সম্মিলিত হয় এই মহান প্রার্থনা— আজ কোন কাঙালির কণ্ঠে তাঁর কণ্ঠস্বর মন্দ্রিত ধ্বনিত হচ্ছে না?

কিন্তু তিনি জানতেন, দেশের প্রতি ভালোবাসার মত নির্মল জিনিসও যখন স্বার্থান্ধ প্রমত্ততার সঙ্গে

সংযুক্ত হয়, তখন তার বিকৃততম রূপ দেখা দেয় ধরার বিষ্টুর মধ্যে ন্যায়। কটুর জাতীয়তাবাদী তখন নৃশংস, তার ধর্মবোধ তখন লোপ পায়। আজ থেকে শতাধিক বৎসর পূর্বে তাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ-রাগিণী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতা-নাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে
শুষ্ক বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম — প্রলয়মন্থন ক্ষোভে
ভ্রাতৃবক্ষে বিবস্ত্রা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি

জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মকে ভাসাতে চাহে রক্তের বন্যায়।
কবিদল চিৎকারিছে ফাটাইয়া ভীতি
শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি গীতি।

আজ তাই পুনরায় স্মরেন কবি,
সকল দেশের সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ
দ্বারাই আমার দেশের সার্থকতা ॥

সৈয়দ মুজতবা আলী

বিচিত্র ছলনাজাল

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনেছি, স্বকর্ণে একাধিকবার তাঁর মৃত্যুদিন যেন পালন না করা হয়। করতে হয় তো করি যেন তাঁর জন্মদিন।

স্বভাবতই আমাদের সকলের মনে প্রশ্ন জাগবে, কেন?

রবীন্দ্রনাথ তো চার্বাকপন্থী ছিলেন না। চার্বাক বলতেন, দেহ ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার পর পুনরাগমন কোথায়? এ স্থলে পুনরাগমন সমাসটি পুনর্জন্ম বা শেষ বিচারের দিন, যে কোনো অর্থে নেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তো এতখানি জড়বাদী ছিলেন না।

বরঞ্চ তিনি বার বার কত বার যে বলেছেন, মৃত্যুতে একদিকে আছে পরিসমাপ্তি অন্যদিকে আছে নব অভ্যুদয়। তাঁর অতিশয় অন্তরঙ্গ সখা ও শিষ্য, কবি সত্যেন্দ্রনাথের তিরোধানে তিনি যেন, যে অমর্ত্য-লোকে তাঁর প্রিয় কবি নতুন আনন্দ গান ধরেছেন তার সুর শুনতে পাচ্ছেন:

"—সে গানের সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রুসাথে
মিলিত মধুর
প্রভাত আলোকে আজি;
আছে তাহে সমাপ্তের ব্যথা,
আছে তাহে নবতম আরম্ভের
মঙ্গল-বারতা;
আছে তাহে ভৈরবীতে
বিদায়ের বিষণ্ণ মূর্ছনা,
আছে ভৈরবের সুরে
মিলনের আসন্ন অর্চনা।"

শুধু কি তাই? যারা এ জীবনে কৃপণ ভাগ্য বশে বিড়ম্বিত হয়েছে, কবি তাদের মৃত্যুতে তাদের জন্য বিরাট একটা অপ্রত্যাশিত বৈভব গৌরব দেখতে পাচ্ছেন। আল্লাহতালা রবীন্দ্রনাথকে তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে বহু বিচিত্র অমূল্য সম্পদ দিয়েছিলেন কিন্তু একটি অতি সাধারণ ব্যাপারে তাঁর প্রতি বিমুখ। তাঁর পত্নী, দুই কন্যা, এক পুত্র (অন্য পুত্র রথীন্দ্রনাথ নিঃসন্তান, এক কন্যা মীরা দেবী)—এই চারজন পর পর মারা যান। এঁদের বয়স যথাক্রমে, স্ত্রী—উনত্রিশ, কন্যা—তেরো (নিঃসন্তান), পুত্র—এগার, কন্যা—বত্রিশ (নিঃসন্তান)। এর

পরও রবীন্দ্রনাথ রেহাই পাননি। পুত্র রথীন্দ্রনাথ তো নিঃসন্তান—রবীন্দ্রনাথ জানতেন তাঁর পুত্রবধূর কোনো সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অন্য পুত্র এগারো বৎসর বয়সে গত হয়েছে—কলেরায়। পুত্রের দিক দিয়ে তাঁর কোনো সন্তান-সন্ততি নেই। আছে কেবল কন্যা মীরার একটি পুত্র ও কন্যা। রবীন্দ্রনাথের আশা ছিল এই মেয়ের দিক দিয়ে তাঁর বংশ রক্ষা হবে। আমাদের হজরতের বেলা যা হয়েছে। ছেলেটির নাম নীতীন্দ্রনাথ, ডাক নাম নীতু। মীরাদেবী দাম্পত্য-জীবনে সুখী হতে পারেননি বলে পুত্রকন্যা নিয়ে পিতার কাছে চলে আসেন ১৯১৯/২০-তে। বলা বাহুল্য ২৭ বছর বয়সে কোন কন্যা যদি চিরতরে পিত্রালয়ে চলে আসে তবে পিতার মনের অবস্থা কি হয়; মীরা দেবীর বিবাহিত জীবনের কঠোর দ্বন্দ্বের অনেকখানি সন্ধান পাঠক পাবেন 'যোগাযোগ' উপন্যাসে। কিন্তু সেখানে কুমুদিনীর পিতার মৃত্যু তার বিবাহের পূর্বেই হয়ে গিয়েছিল, বলে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে কন্যা মীরার প্রত্যাবর্তন কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, সেটা উপন্যাস থেকে জানবার উপায় নেই। পাছে কেউ ভুল বোঝেন, তাই বলে রাখা ভালো, কুমুদিনীর পিতা এবং মীরা দেবীর পিতা রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে বিন্দু-বিসর্গের মিল নেই।

এতদিন এ-সব বিষয়ে আমি সবিস্তর আলোচনা করাটা যতখানি পারি এড়িয়ে গিয়েছি কারণ মীরাদির স্নেহ আমি বাল্যবয়সে পেয়েছি। তাঁর মেয়ে নন্দিতা ডাক নাম 'বুড়ী'-কে আমি তার পাঁচ বৎসর বয়স থেকে চিনি। আমার বয়স তখন ষোল (নীতুর বয়স নয়); পাঁচ বৎসর ধরে নানা মান-অভিমানের ভিতর দিয়ে আমাদের প্রতি সম্পর্ক নিবিড়তর হয়। এর প্রায় ত্রিশ বৎসর পর দিল্লীতে আমরা যখন প্রতিবেশী তখন তো আর কথাই নেই। এর দশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ গত হয়েছেন। বুড়ীর সঙ্গে শেষ দেখা হয় বছর চারেক পূর্বে। বুড়ী নিঃসন্তান বলে কথাবার্তার সময় আমি কাচ্চাবাচ্চাদের প্রসঙ্গ কখনো তুলতুম না। এখন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ, তাঁর স্ত্রী প্রতিমা দেবী, মীরা দেবী, তাঁর সন্তানদ্বয় কেউ আর এলোকে নেই; আমার অক্ষম লেখা কারো পীড়ার কারণ হবে না।

এক যে ছিল চাঁদের কোণায়
চরকা-কাটা বুড়ী,
পুরাণে তার বয়স লেখে
সাতশ' হাজার কুড়ি।

রবীন্দ্রনাথ ১৯২১-এ যখন এ-কবিতাটি লেখার পরদিন আমাদের পড়ে শোনান, তখন বুড়ী সেখানে উপস্থিত ছিল। পাঁচ বছর বয়সের বুড়ী কবিতাটির আর

কতখানি বুঝবে। তবে তার দাদা নীতুর বয়স নয়। সে নিশ্চয়ই অনেকখানি বুঝেছিল। মাঝে মধ্যে বুড়ীকে 'বুড়ী বুড়ী' বলে ক্ষ্যাপাতো বলে ঐ কবিতার শেষের দিকে আছে :

বয়সখানার খ্যাতি তবু
রইল জগত জুড়ি
পাড়ার লোকে যে দেখে সেই
ডাকে, 'বুড়ী বুড়ী'।

নীতুর মত সুন্দর প্রিয়দর্শন ছেলে আমি জীবনে কমই দেখেছি। তার বিশেষ বন্ধু ছিল, আমার রুমমেট চাটগাঁয়ের (বোধ হয় পাহাড়তলী অঞ্চলের) জিতেন হোড়। নীতু প্রায়ই আমাদের রুমে এসে গালগল্প জমাতো। সে ছিল স্বল্পভাষী, আর জিতেন কথা কম বললেও ছিল বাক-চতুর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আপন পুত্র কন্যাকে কতখানি ভালোবেসেছিলেন সে আমার জানার কথা নয়, কিন্তু নীতুকে তিনি তাঁর সমস্ত হৃদয় উজাড় করে যে কতখানি ভালোবেসেছিলেন তার সাক্ষ্য দেবে সে যুগের দু'পাঁচজন যাঁরা এখনো এ পারে আছেন।

পাঠকের মনে থাকতে পারে কবির 'ঠাকুরদা' গল্পে নয়নজোড়ের বাবুদের কাহিনী। সে বাবুদের শেষ বংশধর পাড়ার ঠাকুরদা অর্থাভাবে "ভৃত্যাভাবে অনেক সময় ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া তিনি নিজের হস্তে অতি পরিপাটি করিয়া ধুতি কোঁচাইতেন এবং চাদর ও জামার আস্তিন বহু যত্নে ও পরিশ্রমে গিলে করিয়া রাখিতেন—"

রবীন্দ্রনাথের 'ভৃত্যাভাব' ছিল না এবং তাঁর উড়িয়া সেবক বনমালী যে পাঞ্জাবির আস্তিন ও ধুতির কোঁচা খুব একটা সাধারণভাবে গিলে করতো, তা নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিপুণ হাতের সুচিক্কণ গিলে করার পদ্ধতির সঙ্গে সে পাল্লা দিতে পারবে কেন ? একদিন নীতু এসেছে আমাদের রুমে। পরনে গিলে করা 'অতি পরিপাটি' সিল্কের ধুতি পাঞ্জাবি, কাঁধে সিল্কের উড়ুনি। আমাদের জানালে সে দিনটা তার জন্মদিন। শেষটায় ধরা পড়লো, স্বয়ং দাদামশাই স্বহস্তে কাপড়-জামা গিলে করে তাকে সাজিয়ে দিয়েছেন।

১৯৩১-৩২-এ নীতু জর্মনিতে গেল পড়াশুনো করতে। কয়েক মাসের ভিতরই হল ক্ষয় রোগ। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর সখা সি এফ এ্যাণ্ডরুজ বিলেত থেকে জর্মনি গেলেন তার দেখ-ভাল করতে। অবস্থা খারাপের দিকে খবর পেয়ে মীরা দেবীও গেলেন জর্মনি। ঐ সময় বরানগরে রবীন্দ্রনাথ কিছু দিন কাটাতে এসেছেন প্রশান্ত রাণী মহলানবিশের সঙ্গে। ৭ই অগস্ট (আমি প্রচলিত বইপত্রে সঠিক

তারিখ বের করতে পারিনি) নীতু মারা গেল।

রাণী মহলানবিশ লিখছেন, "পরদিন রয়টারের টেলিগ্রামে দেখলাম জার্মানীতে নীতুর মৃত্যু হয়েছে।" এ খবরটা রবীন্দ্রনাথের কাছে ভাঙা যায় কি প্রকারে ?

"শেষে স্থির হল খড়দায় কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীকে ফোন করে আনিয়ে আমরা চারজন এক সঙ্গে কবির কাছে গেলে কথাটা বলা হবে। প্রতিমাদিরা এলে সবাই মিলে কবির ঘরে গিয়ে বসা হল। রথীন্দ্রনাথকে কবি প্রশ্ন করলেন, "নীতুর খবর পেয়েছিস ? সে এখন ভাল আছে, না ?" (এর কারণ কবি তার আগের দিন, এনগ্রুজের কাছ থেকে চিঠি পান—তখনো এ্যার মেল চালু হয়নি—যে, নীতুর তখন একটু ভালোর দিকে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে—লেখক) রথীবাবু বললেন, "না, খবর ভালো না।" কবি প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। (ঐ সময় থেকেই কবি কানে একটু খাটো হয়ে গিয়েছিলেন—লেখক)। বললেন "ভালো ? কাল এনগ্রুজও আমাকে লিখেছেন যে নীতু অনেকটা ভালো আছে। হয়তো কিছুদিন পরেই ওকে দেশে নিয়ে আসতে পারা যাবে।" রথীবাবু এবারে চেষ্টা করে গলা চড়িয়ে বললেন, "না, খবর ভালো নয়। আজকের কাগজে বেরিয়েছে।" কবি শুনেই একেবারে স্তব্ধ হয়ে রথীবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। একটু পরেই শান্তভাবে সহজ গলায় বললেন, "বৌমা আজই শান্তিনিকেতনে চলে যান, সেখানে বুড়ি একা রয়েছে।"

এটা যে কত বড় শোক তার জন্যে কোন মন্তব্য বা টীকার প্রয়োজন হয় না। ঐ সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেয়ে মীরার জন্য যে দুটি কবিতা লেখেন, তিনি বা মীরাদি তখন কোনো পত্রিকায় সে দুটি প্রকাশ করেননি। প্রকাশিত হয় তিন বৎসর পরে "বীথিকা" কাব্যগ্রন্থে ; তাই অনেকেরই দৃষ্টি এ কবিতা দু'টির প্রতি আকৃষ্ট হয়নি।...সকলেই জানেন, ঈশ্বরে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল অতিশয় গভীর। 'দুর্ভাগিনী' কবিতায় স্তম্ভিত হয়ে দেখি, সে বিশ্বাসে চিড় লেগেছে।

"—চিরচেনা ছিল চোখে চোখে
অকস্মাৎ মিলালো অপরিচিত লোকে।"

তখন দুর্ভাগিনী মাতা যখন সান্ত্বনার জন্য ইষ্টদেবতার সম্মুখীন হল তখন কি পেল সে।

"—দেবতা যেখানে ছিল সেথা জ্বালাইতে গেলে ধূপ, সেখানে বিদ্রূপ।"

ঈশ্বর-বিশ্বাসীজন এর চেয়ে নির্মম নিষ্ঠুর কী বলতে পারে ! ঈশ্বর বিদ্রূপ করেন।

এখানেই কি শেষ? প্রায় তাই। কিন্তু দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করলে তার মূল্যও দিতে হয়। একে একে অনেক বন্ধু চলে গেলেন ওপারে। এদিকে তাঁর শরীরও ভেঙে পড়েছে। মৃত্যুর ষোল মাস পূর্বে খবর এল কলকাতায় এনড্রুজ গত হয়েছেন। বন্ধুত্ব তো ছিলই কবে, সেই নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগের থেকে, তদুপরি বিশ্বভারতীর বছরের পর বছর ব্যাপী অর্থকষ্ট কঠিন সঙ্কটে পৌঁছলেই কবিকে না বলে, এণ্ড্রুজ তাঁর মিত্র মহাত্মা গান্ধীর মাধ্যমে অহমদবাদের কোটিপতিদের কাছ থেকে বিপদতারণ অর্থ সংগ্রহ করতেন। এনড্রুজের স্বাস্থ্য ছিল কবির চেয়ে অনেক ভালো। কবির মানসপুত্র, বিশ্বভারতীর খুল্লতাত চলে গেলেন জনকের আগে। আমি অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, কিন্তু পাঁচটি বৎসর তিনি আমাদের সেই গ্রীক লাতিন থেকে আরম্ভ করে বর্তমান ইংরেজি সাহিত্য পড়িয়েছেন। আরো কত কী! সে তো ভোলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে-ভাইপোকে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন, তাঁর চেয়ে মাত্র এগারো বছরের ছোট সুরেন্দ্রনাথ গত হলেন ঠিক তার এক মাস পরে, কবির জন্মদিনের মাত্র চার দিন পূর্বে:

আজি জন্মবাসরের বক্ষ ভেদ করি
প্রিয়-মৃত্যুবিচ্ছেদের এসেচে সংবাদ

সর্বশেষে লিখছেন, শেষ জীবনে সুরেন্দ্রনাথের ভাগ্য বিপর্যয়ের স্মরণে, যেটি পূর্বেই উল্লেখ করেছি,

তাঁর মৃত্যুর জ্বলন্ত শিখার
আলোকে তাহার দেখা দিল
অখণ্ড জীবন, যাহে জন্ম মৃত্যু এক
হয়ে আছে;
সে মহিমা উদবারিল যাহার উজ্জ্বল
অমরতা
কৃপণ ভাগ্যের দৈন্যে দিনে দিনে রেখেছিল ঢেকে।

শোকের পর শোক, প্রতি শোকে কবি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বার বার অনুসন্ধান করছেন,—এ কী সব অর্থহীন? এর চরম মূল্য কি কোনোখানেই নেই?

অথচ তিনি অতি উত্তমরূপেই জানতেন, এ সংসারে এমন কোনো মহা সুপার-ম্যান অবতীর্ণ হননি যাঁর তিরোধানবশতঃ তাবল্লোক গভীর শোকসাগরে নিমজ্জিত হবে, কিম্বা আপন আপন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দের দ্বার খুলে তার থেকে নিষ্কৃতির পথ খুঁজে নেবে না। তাই তাঁর শেষ জন্মদিনের প্রাক্কালে বলছেন:

জানি জন্মদিন
এক অবিচিত্র দিনে ঠেকিবে এখনি,
মিলে যাবে অচিহ্নিত কালের পর্যায়ে
পুষ্পবীথিকার ছায়া এ-বিষাদে করে না করুণ,
বাজে না স্মৃতির কথা অরণ্যের মর্মরে গুঞ্জনে
নির্মম আনন্দ এই উৎসবের বাজাইবে বাঁশি
বিচ্ছেদের বেদনারে পথপার্শ্বে ঠেলিয়া ফেলিয়া।

অতি সত্য কথা। কিন্তু যে লোকটা আমাদের এত কিছু দিয়ে গেল, অনাগত যুগের তরেও তুলনাহীন বৈভব রেখে গেল, তাঁকে স্মরণ করবো না এই দিনে? এই দ্বন্দ্বর কি কোন সমাধান নেই? যে এত দিল তাকে স্মরণে না আনা সে তো ছলনা।

কবিগুরুর সর্বশেষ কবিতা স্মরণে আনি:

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা জালে,
হে ছলনাময়ী!

এক দিকে "বিচ্ছেদ বেদনা", অন্য দিকে "নির্মম আনন্দ" এ তো ছলনা। তাই

অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার॥

রামানন্দ-তর্পণ

স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রাপ্য সম্মানের শতাংশের একাংশও পাবেন বলে আমি আর আশা করি না।

এই যে আজ আমরা অজন্তা বাঘ গুহার ছবি নিয়ে এত দাপাদাপি করি, অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ নন্দলাল বসুর কীর্তিকলাপ নিয়ে গর্ব অনুভব করি,—আমাদের চোখের সামনে এঁদের তুলে ধরলো কে? এবং তখন তাঁকে কী অন্যায় প্রতিবাদের সামনে না দাঁড়াতে হয়েছিল। শুধু প্রতিবাদ নয়, নীচ আক্রমণ।

আজ আর তাই নিয়ে ক্ষোভ করি না। তার কারণ, প্রতিবাদ এবং ভিন্নমত (অপজিশন) না থাকলে অসৎ মানুষ যে আরো কতখানি অসততার দিকে এগিয়ে

যায় সে তো আজ চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পারছি। রামানন্দের শতদোষ থাকতে পারে কিন্তু তিনি অসৎ একথা বললে আমাদের মত লোক মানবজাতির উপর শ্রদ্ধা হারাবে। তিনি সৎ ছিলেন তৎসত্ত্বেও তাঁর অপজিশনের দরকার ছিল। পেয়েছিলেন পূর্ণমাত্রার চেয়েও বেশী।

এই বক্তব্যটি আবার উল্টো করেও দেখা যায়।

আশুতোষ কৃতী পুরুষ। রামানন্দ ও আশুতোষের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন। কিন্তু একটি বিষয়ে দুজনাতে বড়ই মিল। দুজনাই জহুরী। ভারতের সুদূরতম প্রান্তের কোন্ এক নিভৃত কোণে কে কোন্ গবেষণা নিয়ে পড়ে আছে, আশুতোষ ঠিক জানতেন। তাকে কি করে ধরে নিয়ে আসা যায় সেই সন্ধানে লেগে যেতেন। রামানন্দের বেলাতেও ঠিক তাই। কোথায় কোন্ এক অখ্যাত-নামা কাগজে তার চেয়েও অখ্যাতনামা এক পণ্ডিত তিন পৃষ্ঠার একটি রচনা প্রকাশ করেছে—ঠিক ধরে ফেলতেন রামানন্দ। আপন হাতে চিঠি লিখে তাঁকে সবিনয় অনুরোধ জানাতেন তাঁর কাগজে লেখবার জন্য। শুধু তাই নয়, এ-পণ্ডিত কোন্ বিষয়ে হাত দিলে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিপূর্ণ জ্যোতি বিকশিত হবে সেটি ঠিক বুঝতে পারতেন—সে দিকে ইঙ্গিতও দিতেন কোনো কোনো স্থলে।

তাই রামানন্দ ছিলেন আশুতোষের অপজিশন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তখন কৈশোরে পা দিয়েছে। ত্রুটি-বিচ্যুতি অতিশয় স্বাভাবিক। আশুতোষ তার গুরু, রামানন্দ তার গার্জেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় সৌভাগ্য যে সে এই মণি-কাঞ্চন সংযোজিত বিজয়মাল্য একদিন পরতে পেরেছিল।

* * *

সে যুগের প্রবাসীতে এক মাসে যা নিরেট সরেস বস্তু বেরুতো, এ যুগের কোনো মাসিক কোনো সাপ্তাহিক পত্রিকা পূর্ণ এক বছরেও তা দেখাতে পারবে না। অবশ্য এ কথাও স্বীকার করি,—ঈশান. ঘোষ 'জাতক' অনুবাদ করলেন বাঙলায় (জর্মন, হিন্দী বা অন্য কোনো অনুবাদ তার শত যোজন কাছেও আসতে পারে না) এবং তার সমালোচনা করলেন বিধুশেখর। এ যুগে কই ঈশান, কোথায় বিধুশেখর ? এ সুবাদে আরেকটি কথার উল্লেখ করি। রামানন্দের উৎসাহ না পেলে বহু পণ্ডিতই হয়তো তাঁদের গবেষণা ইংরেজিতে প্রকাশ করতেন ; বাঙলা সাহিত্যের বড় ক্ষতি হত।

* * *

রামানন্দ ছিলেন চ্যামপিয়ন অব্ লস্ট কজেস্—তাবৎ বাঙলা দেশে দু'জন

কিংবা তিনজন হয়তো লেখাটি পড়বে, তিনি দিতেন ছাপিয়ে, কারণ দার্শনিক রামানন্দ জানতেন 'কাণ্টিয় দর্শন ও পতঞ্জলির পথমধ্যে কোলাকুলি'[১] জাতীয় প্রবন্ধ লিখতে পারে এমন লোক দ্বিজেন্দ্রনাথের মত আর কেউ নেই। আমাদের বড় সৌভাগ্য যে রামানন্দ মাসের পর মাস দ্বিজেন্দ্রনাথের 'অপাঠ্য' প্রবন্ধরাজি প্রকাশ করেছিলেন, কারণ দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রায়ই কোনো প্রবন্ধ লেখার কিছুদিন পরেই সেটি ছিঁড়ে ফেলতেন। (ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে আমার যেটুকু সামান্য জ্ঞান সে দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছ থেকে। বাকিটুকু রমন মহর্ষির কাছ থেকে ও বিবেকানন্দ পড়ে। হিন্দু দ্বিজেন্দ্রনাথ আমাকে সুফীতত্ত্বের মূল মর্মকথা বুঝিয়ে দেন। সুফী-তত্ত্বে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে)।

এই দ্বিজেন্দ্রনাথ বাঙলায় শর্টহ্যাণ্ড বই ছাপিয়েছিলেন। তার ১২।১৪ বছর পর রামানন্দের অনুরোধে বৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথ সেটি আবার নূতন করে লেখেন। রামানন্দ তাবৎ বইখানা নিজের খর্চায় ব্লক করে ছাপান (কারণ এতে প্রতি লাইনে এত সব সিম্‌ব্‌ল্‌ বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন ছিল যে এছাড়া গত্যন্তর ছিল না)। এটা আরেকটা লস্‌ট্‌ কজ্‌। এ রকম বই কেউ পড়েও না। কিন্তু রামানন্দ ঘন ঘন তাড়া না লাগালে এই অতুলনীয় পুস্তক সৃষ্ট হত না।

আবার অন্যদিকটা দেখুন। পাবলিসিটি কারে কয় সেটা মার্কিনদের পূর্বেই রামানন্দ জেনে গিয়েছিলেন। সে যুগের যে কোনো 'প্রবাসী' সংখ্যা নিলেই পাঠক তত্ত্ব কথাটি বুঝে যাবেন।

রামানন্দ কোহিনূর বেচতেন আবার সঙ্গে সঙ্গে মুড়িও বেচতেন। কিন্তু কখনো ভেজাল বেচেননি।

এই পাব্‌লিসিটি ব্যাপারে স্বর্গত চারু বাঁড়ুয্যেকে স্মরণে এনে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানানো উচিত।

'প্রবাসী'র কথা (এবং সুদ্ধমাত্র সে কথা লিখতে গেলেই পুরোপুরি একখানি ভলুম লিখতে হয়; আমার মনে হয় প্রবাসীর কর্মকর্তারা যদি 'প্রবাসী সঞ্চয়ন' জাতীয় একটি ভলুম বের করেন তবে বড় ভালো হয়—এতে থাকবে প্রবাসী থেকে বাছাই বাছাই জিনিস) বাদ দিলেই আসে 'মডার্ণ রিভ্যু'র কথা। তখনকার দিনে মডার্ণ রিভ্যু খাস লণ্ডনে প্রচারিত যে কোনো কাগজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতো। আজও প্রাচ্যভূমিতে এর চেয়ে সেরা ইংরিজি মাসিক বেরোয়নি।

১। হুবহু শিরোনামাটি আমার মনে নেই বলে দুঃখিত।

প্রবাসী ও মডার্ণ রিভ্যু ('বিশাল ভারতে'র সঙ্গে আমি পরিচিত নই ; পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে—'হিন্দীর পৃষ্ঠপোষক রামানন্দ'—লিখবেন) এই পত্রিকার মাধ্যমে রামানন্দ ভারতের রাজনৈতিক চিন্তায় এনে দেন স্পষ্ট চিন্তন, স্পষ্টভাষণ ও সর্বোপরি নির্ভীকতম সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার প্রচার। আমার মত বহু মুসলমান তখন রামানন্দকে চিন্তার জগতে নেতা বলে মেনে নিয়েছিলেন।

তারপর এমন একদিন এল যখন তাঁকে অনুসরণ করা আমার পক্ষে আর সম্ভবপর হল না। কিন্তু একশ বার বলবো, তিনি তাঁর বিবেকবুদ্ধিতে যেটি সত্য-পথ বলে ধরে নিয়েছিলেন সেই পথেই এগোলেন। কোন সস্তা রাজনীতির চাল তাতে এক কানাকড়িও ছিল না।

বিশ্বভারতীতে আমি ছাত্র থাকার সময় পরম শ্রদ্ধেয় স্বর্গত রামানন্দ কিছু-দিনের জন্য অধ্যক্ষ ছিলেন। সে-সময়ে তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য না হয়েও তাঁর সংস্পর্শে এসে ধন্য হয়েছি। অন্য সব কথা বাদ দিন, আমাকে স্তম্ভিত করেছিল তাঁর চরিত্রবল। এবং সঙ্গে সাতিশয় মৃদুকণ্ঠে কঠোরতম, অকুণ্ঠ সত্যপ্রচার।

* * *

এদেশে এরকম একটি লোক আজ চাই। কর্তাদের কানে জল ঢেলে দেওয়ার জন্য।

* * * *

ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

অনাদিদেব ! অনন্ত ভব !
শতং জীব ! সহস্রং জীব !!

একদা শান্তিনিকেতন আশ্রমে সংগীতের কর্ণধার ছিলেন—অবশ্য কবিগুরুকে বাদ দিয়ে—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী। পরম শ্রদ্ধেয় মমাগ্রজসম শ্রীযুত অনাদিকুমার দস্তিদার (শতং জীব, সহস্রং জীব !) তখন ছাত্র। কিন্তু আমি তাঁকে কখনো ছাত্র বলে ভাবতেই পারিনি। তাঁর আসন কার্যত এই দুই গুরুর পদপ্রান্তে ছিল বটে, কিন্তু অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের তুলনায়—ফরাসী-ইংরাজী-বাংলা ক্লাসে আমার সতীর্থা, সুকণ্ঠী, সুবিনয়ী অনন্ত সুরলোকবাসিনী শ্রদ্ধেয়া রমা মজুমদার—যাঁর অকাল মৃত্যুতে কবিগুরুর শোক তাঁর পরমাত্মীয়া-বিয়োগ শোককেও প্রায় অতিক্রম করেছিল—একমাত্র ইনি ছাড়া শ্রীঅনাদি ছিলেন অনেক উচ্চে ; দুই গুরুর আদেশনির্দেশ শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রভৃতি সর্বকর্মের অব্যবহিত

প্রধান। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি রচনায় মনোনিবেশ করলেন। অভিজ্ঞজনমাত্রই জানেন, এক সংগীতসাধনাই মানুষকে অজগরের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে, তদুপরি তাঁর স্কন্ধে চাপানো হল বিশ্বভারতীর "সাহিত্য সভার" সম্পূর্ণ কর্মভার। ঐটিই ছিল সেকালে বিশ্বভারতীর মায় কলাভবনাদির বয়স্ক ছাত্রছাত্রী তথা শিক্ষকদের সাহিত্যচর্চার একমাত্র মুক্ত, পাঞ্চজন্য প্রতিষ্ঠান। গুরুদেব শান্তিনিকেতনে থাকলে সর্বদাই এর অনুষ্ঠানাদির সভাপতিত্ব করতেন। একে তো অধিকাংশ আশ্রমবাসী, সহজেই অনুমেয় কারণে, গুরুদেবের সম্মুখে প্রবন্ধ পাঠ করতে সংকোচ এমন কি কিঞ্চিৎ শঙ্কা অনুভব করতেন, তদুপরি গুরুদেবের নিয়মনিষ্ঠা, সময়ানুবর্তিতা, রুচিসম্মত পদ্ধতিতে সভার আয়োজন করা, পরবর্তী সভায় পূর্ব সভার সুষ্ঠু প্রতিবেদন রচনা করা যে কোনো আর্টস্ বিভাগের ছাত্রের পক্ষেই নিঃসন্দেহে সুকঠিন কর্মরূপে বিবেচিত হত; এবং অনাদিদা ঐ সময়ে যুগপৎ অভ্যাস করছেন শাস্ত্রীয় ও রবীন্দ্রসংগীত, তদুপরি নবাগতদের সংগীতে শিক্ষাদান, এবং স্বরলিপি রচনায় প্রচুর কালক্ষেপণ। ইতিমধ্যে যদি বাইরের কোনো কলেজ থেকে ক্রিকেট বা ফুটবল টীম খেলার নাম করে শান্তিনিকেতনের "চিড়িয়াখানা" দেখতে আসতো তখন অনাদিদার উপরেই ভার পড়তো সন্ধ্যাবেলায় তাদের জন্য সংগীতামোদের ব্যবস্থা করা।

অজাতশত্রু নিরীহ, স্বল্পভাষী এই লোকটির স্কন্ধে যে কত প্রকারের গুরুভার বে-দরদ চাপানো হয়েছিল তার ফিরিস্তি তিনি, স্বয়ং, আজ আর দিতে পারবেন না।

হয়তো বা আমিই সেই লাস্ট্ স্ট্র দ্যাট ব্রোক দি ক্যামেল্স্ ব্যাক!

তাই যদি হয়, তবে সে অপরাধের জন্য অংশত দায়ী শ্রীযুত অনাদি।

অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই এ-স্থলে বলে রাখি, অনাদিদার রবীন্দ্রসংগীতানুভূতি ও জ্ঞান, শাস্ত্রীয় সংগীতের পটভূমিতে রবীন্দ্রসংগীত পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ, সে সংগীতের ক্রমবিকাশ বিবর্তন, রবীন্দ্রসংগীতের প্রচলিত স্বরলিপির মূল্যায়ন, সে-যুগে দিবান্ধ কলকাতাতে রবীন্দ্রসংগীত প্রবর্তন—এর কোনোটা সম্বন্ধেই আমার মতামত প্রকাশ করাটা হবে অমার্জনীয় অপরাধ। বাইরের থেকে শুধু এইটুকু বলতে পারি, সর্বশেষের কর্মটি করতে গিয়ে তাঁকে বিস্তর তিক্ততা, অর্থকৃচ্ছ্রতা, রুচিহীনের সদম্ভ প্রলাপ এবং উপদেশ, একাধিক স্থলে বাধ্য হয়ে "ভঁয়সকে সামনে বীণ বাজানা" অর্থাৎ সুর-কালা প্যাঁচাগলা মুর্গী-মগজ 'কলচর'-লোভিনী বিত্তবান-নন্দিনীকে রবীন্দ্রসংগীত শেখাবার বন্ধ্যাগমন (শেষোক্তটি অনাদিদার জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষীর মুখে শোনা) ইত্যাদি নানাপ্রকারের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে

হয়েছিল। যে নম্রস্বভাব স্বল্পভাষী প্রিয়দর্শন তরুণকে প্রায় "মুখচোরা" বলা যেতে পারে, তাঁর ছিল, সুপ্রতিষ্ঠিত জনের পক্ষে প্রশংসনীয়, নবীন পন্থা নির্মাণকারীর পক্ষে নিন্দনীয় একটি অপরিবর্তনীয় স্বভাব—তর্কাতর্কির প্রতি প্রকৃতিগত সহজ অনীহা, কিন্তু প্রচুরতম সহিষ্ণুতা মিশ্রিত। সহিষ্ণুতা মিশ্রিত ধৈর্যকে কুরাণ শরীফ এক শব্দে বলেন "সব্‌র্" যার থেকে বাংলা "সবুর্" সুদ্ধমাত্র অপেক্ষা করা, স্থল-বিশেষ ধৈর্য ধারণ করা অর্থে ব্যবহার হয়। আল্লাতালা অগণিতবার তাঁর প্রেরিত পুরুষকে অবিশ্বাসীদিগের প্রতি "সব্‌র" করতে আদেশ দিয়েছেন। অনাদিদেব অকৃপণ হস্তে এই মহৎ গুণটি অনাদিদার উপর বর্ষণ করেছিলেন।

এসব গুণ নির্ণয় আমার পক্ষে ধৃষ্টতা—কিন্তু অনাদিদার অফুরন্ত "সব্‌র্"ই আমার ভরসা। কারণ তিনি শব্দার্থে, ভাবার্থে, সর্বার্থে ছিলেন আমার গার্জেন, এখনো তাঁকে গার্জেনরূপেই মানি। আমি স্থির প্রত্যয়, তিনি আমাকে কখনো বর্জন করতে পারবেন না। আমি পাষণ্ডতর আচরণ করলেও। তাঁর স্নেহ আমার নিকৃষ্ট রচনাকে আদরের চোখে দেখে।

একে বাঙাল,—খাজা বাঙাল—তদুপরি বাচাল, সর্বোপরি সহজ মেলামেশায় অভ্যস্ত মহিলা মিশ্রিত ব্রাহ্মসমাজ ঘেঁষা তৎকালীন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আবহাওয়া বাবদে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, বয়স ষোল বছর হয়-কি-না-হয়, চঞ্চল প্রকৃতির মুসলমান ছেলের পক্ষে সে বাতাবরণে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার উৎকট সংকট, বিভীষিকাময় খণ্ড প্রলয় থেকে তাকে উদ্ধার করেন, আশ্রয় দেন, প্রথম দিন থেকেই ; স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, সম্ভ্রান্তবংশজাত অতি সহজ আড়ম্বরহীন আচরণ দ্বারা, পথ নির্দেশ করেন সামান্যতম নিতান্তই অবর্জনীয় দু'চারিটি শব্দ দ্বারা—অনাদিদা। শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমার গার্জেন। তাঁর শান্ত সমাহিত আচরণ সংযতবাক্ দিক নির্দেশ আমাকে প্রথম দিনই মুগ্ধ করেছিল, তিনি তাবৎ ছাত্রদের মধ্যমণিরূপে কতখানি সম্মানিত—সে-সত্য-নির্ধারণ করতে আমাকে আশ্রম পরিক্রমা করতে হয়নি—এদের মধ্যে আছেন আশ্রমপালিত লেখকদের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীযুত প্রমথনাথ, পাণ্ডিত্য তথা রসময় সর্বরচনপদ্ধতিতে সিদ্ধহস্ত বাগ্‌বিদগ্ধ গোস্বামীগৌরব শ্রীযুত পরিমল, অহরহ চটুল হাস্যরসে উচ্ছলিত শ্রীযুত অনিলকুমার, প্রসিদ্ধ চিত্রকর সত্যেনদা, বিনোদবিহারী, সিংহলাগত কিশোর শ্রমণ শরণাঙ্কর সাধু, একাধিক ভাষায় অগ্রগামিনী এবং স্বল্পকাল মধ্যেই নৃত্যকুশলীরূপে সুপরিচিতা শ্রীমতী হটীসিং (ঠাকুর), সর্বসংগীত প্রচেষ্টায় অনাদিদার প্রীতিময়ী সহচারিণী রমা মজুমদার··· কিন্তু এ-নির্ঘণ্ট অফুরন্ত। স্বয়ং গুরুদেব, দিনেন্দ্রনাথ, পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী তাঁকে

শুধু যে অশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন তাই নয়, ছাত্রদের মধ্যে তিনি যে রবি-সঙ্গীতের ভাণ্ডারী, কার্যত সেটা বার বার স্বীকার করেছেন তাই নয়—আমার মনে হয়, শিষ্যকে গুরু যে স্বীকৃতি যে সম্মান দিতে পারেন অনাদিকুমার পেয়েছিলেন সেটি পরিপূর্ণমাত্রায়। তাঁর পূর্বে বা পরে কোনো শিষ্য গুরুপদপ্রান্ত থেকে এতখানি সম্মান আহরণ করতে পারেননি।

কিন্তু আজ যতই প্রাচীন দিনের ছবি চোখের সামনে তুলে ধরি ততই মনে হয়, এ-সব কারণ তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রতিদিন গভীরতর করেছে বটে কিন্তু তিনি আমার গার্জেন ছিলেন একেবারে অকারণে, আমি তাঁর প্রথম আদেশেই দ্বিধাহীন চিত্তে কেন পালন করেছিলুম তার কারণ অনুসন্ধান করার কোন প্রয়োজন আমি কস্মিনকালেও অনুভব করিনি। বাহান্ন বৎসর পর আজও তিনি আমার গার্জেন। কারণ অনুসন্ধান করে আমার কোন্ মোক্ষলাভ হবে? এই বৃদ্ধ বয়সে আমি গার্জেনহীন হতে চাইনে।

ইন্দিরা সঙ্গীত শিক্ষায়তন স্মারণ গ্রন্থে প্রকাশিত।

মরহুম শেখ মুহম্মদ মুস্তাফা অল-মরাগী

অজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য ওস্তাদ শেখ অল-মরাগী দেহত্যাগ করিয়াছেন। অজহরে চীন, মালয়, ভারতবর্ষ, তুর্কীস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যপ্রাচ্য লইয়া একদিকে জিব্রাল্টার পর্যন্ত, অন্যদিকে তুর্কী হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীস, আলবেনিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, ইত্যাদি বল্কানদেশ ও রুশ, আফ্রিকার নানা প্রদেশ এমন কি আরব সাগরের মালদ্বীপ লাক্ষা দ্বীপ হইতে বহু মুসলমান ছাত্র অজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে যায়। তাহাদের জন্য ছাত্রাবাস আছে; ভারতবাসীদের জন্য বিশেষ বাসস্থান ও অন্যান্য বন্দোবস্ত আছে।

অজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কিঞ্চিৎ বর্ণনা এখানে হয়ত সম্পূর্ণ অবান্তর হইবে না। পৃথিবীর যে কোনো বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা ইহার বয়স অন্ততঃ তিনশত চারিশত বৎসর বেশী। ইয়োরোপে যখন বর্বর, অন্ধকার মধ্যযুগ তখন অজহরের বিদ্যায়তন গ্রীক দর্শনের আরবী তর্জমা বাঁচাইয়া রাখিয়া তাহাকে বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ভারতবর্ষ ও চীন বাদ দিলে সে যুগে অজহরই ছিল মধ্য ও পশ্চিম ভূভাগের শিক্ষাকেন্দ্র। দমস্কস ও বাগদাদে পণ্ডিতরা যে জ্ঞান-চর্চা করিয়াছিলেন, তাহা কেন্দ্রীভূত হয় কাইরোর অজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

পরবর্তী যুগে সেই অজহরের প্রচলিত ইবনে রুশদের (লাতিন ও বর্তমান

ইয়োরোপীয় ভাষায় আভেরস নামে খ্যাত) দর্শন লাতিন তর্জমাযোগে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। ইয়োরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের তৃষ্ণার সৃষ্টি করেন ইবনে রুশদ ও ইবনে সীনা (আভিচেন্না বা আভিসেনা)। ইঁহাদের দৌত্যে ইয়োরোপ আপনার গ্রীক-দর্শন আবার ফিরিয়া পায়। তখনই প্রথম লাতিনে গ্রীক দর্শন, আয়ুর্বেদের অনুবাদ হইল। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে ছেলেরা যে গাউন পরে, তাহা অজহরের নকলে। মধ্যযুগে নিঃস্ব বিদ্যার্থীরা এই বিরাট গাউন বা 'আবায়' দ্বারা ছিন্নবস্ত্র ঢাকিয়া বিদ্যায়তনে উপস্থিত হইত।

এক হাজার বৎসর ধরিয়া ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা ফী-সবীলিল্লা (অর্থাৎ 'আল্লার পথে', দান-খয়রাতের ধর্মপথে) হিসাবে অজহরকে জমিজমা অর্থদা নকরিয়া গিয়াছেন। সে সম্পত্তির আয় এখন প্রচুর, কিন্তু অধ্যাপক ও ছাত্রসংখ্যা তদপেক্ষা প্রচুর। তবু অজহর কোনো ছাত্রের নিকট হইতে অর্থ (ফীজ্) গ্রহণ করেন না, প্রত্যেক ছাত্রের জন্য বাসস্থান দেয় ও প্রত্যেক ছাত্রকে মাসিক তিন হইতে পাঁচ টাকা দক্ষিণা দেয়। তাহারি জোরে নিত্যান্ত কপর্দকহীন ছাত্র দুই-তিনজনে মিলিয়া ক্ষুদ্র মেস করিয়া ও গ্রাম হইতে কিঞ্চিৎ আটা-আলু আনাইয়া দিন গুজরান করিতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর সভ্যজগতে যখন বিদ্যা ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্যদ্রব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে, যখন ধন না থাকিলে তোমার বিদ্যায় অধিকার নাই, যখন ধন থাকিলে তুমি হেলাফেলায় বিদ্যায়তনের আবহাওয়া মর্জিমাফিক বিষাক্ত করিতে পারো, তখনও অজহর বিশ্বাস করে যে, বিদ্যায় সকলের সমান অধিকার! যে কোনো ছাত্র, যে কোনো দেশ হইতেই হউক অজহরে উপস্থিত হইয়া তাহার অতিঅল্প আরবী জ্ঞান দেখাইতে পারিলেই বিদ্যায়তনে ভর্তি হইতে পারে ও বরাদ্দ দক্ষিণা পায়। পূর্বে অ-মুসলমান ছেলেদেরও লওয়া হইত, কিন্তু শুনিয়াছি, কয়েকটি ক্রীশ্চান পাদ্রী ছাত্র ধর্ম শিক্ষার ভান করিয়া নানা অপ্রিয় বাক্য বলিয়া এমন কাণ্ড করিলেন যে ভবিষ্যতের ভয়ে ভীত অজহর তাঁহাদিগকে দেশে ফিরিয়া যাইতে বলিল, কে জানে, কোন দিন তাঁহাদের 'প্রটেকশনে'র প্রয়োজন হইবে। এই আফ্রিকার আরেক অংশেই তো সেদিন এক নিগ্রোকে বলিতে শুনিলাম, ইয়োরোপীয়রা যখন প্রথম আমাদের দেশে আসিল, তখন তাহাদের হাতে ছিল বাইবেল, আমাদের ছিল জমি। এখন অজহরীর তুলনা করা ভুল হইবে।

অজহরের ছাত্ররা ধর্মশাস্ত্র পড়ে। সম্প্রতি ইংরিজি ফরাসী ইতিহাস, ভূগোল ও অন্যান্য বিষয়ও পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের সর্বাপেক্ষা অভ্রভেদী নেশা খবরের কাগজ পড়ার। সকালে যে কোনো ক্লাসে প্রবেশ করুন না কেন, দেখিবেন শতকরা ত্রিশটি ছেলে আপন আপন খবরের কাগজ নিবিষ্ট মনে

পড়িতেছে। এদিকে পড়িতেছে তেরশত বৎসরের পুরানো শাস্ত্র ওদিকে দুনিয়ার হালচালের প্রতি কড়া নজর। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। আমাদের টোল বা মাদ্রাসার নিরীহ শান্ত ছাত্রের সঙ্গে অজহরীর তুলনা করা ভুল হইবে।

কাইরোতে আরো দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে; একটি মিশর সরকার চালান (অজহর নিজের সম্পত্তিতে চলে) ও অন্যটি মার্কিনরা। এই দুইটি আমাদের কলিকাতা-ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের মত হরেকরকম্বা করে।

কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনে অজহর পয়লা নম্বর।

সাইবেরিয়া হইতে জিব্রাল্টর পর্যন্ত শেখ অল-মরাগীর শিষ্যেরা শোকাতুর হইবেন। অনুমান করি, অন্ততঃ ছয় মাস ধরিয়া তার চিঠি, সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যা, শেখের জীবনী ইত্যাদি পৃথিবীর নানা দেশ-বিদেশ হইতে নানা ভাষায় কাইরোর দিকে প্রবাহিত হইবে ও শেখের পূতজীবন ও অপূর্ব প্রতিভা বিশ্ব-মুসলিমকে কি প্রচুর পরিমাণে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, তাহা সপ্রমাণ করিবে।

অজহরের নিয়ম যে যিনি প্রধান শেখ বা রেক্টর হইবেন, তাঁহার শুধু পণ্ডিত হইলেই চলিবে না, তাঁহার চরিত্র যেন অকলঙ্ক হয়। অগাধ পাণ্ডিত্য ও অনাড়ম্বর ধর্মপরায়ণতার সম্মেলন শেখ অল-মরাগীতে ছিল বলিয়াই তাঁহার হাজার হাজার শিষ্যের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা তিনি অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শেখের পাণ্ডিত্যের বিচার আজ করিব না। ধর্মভীরু ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে অনিচ্ছায় রাজনীতিক্ষেত্রে নামিতে হইয়াছিল। শেখ বিশ্বাস করিতেন যে, দেশে যখন অত্যাচার অবিচার চলে, তখন তাহারই একপার্শ্বে সঙ্গোপনে ধর্মচর্চা করিয়া অনাচারকে নীরবে স্বীকার করিয়া লওয়া অধর্ম, পাপ। তাই যখন বিদেশী শক্তির চাপে পড়িয়া মিশরের রাজা ফুয়াদ ওয়াফদ দলকে তাড়াইয়া প্রচলিত শাসনবিধি উপেক্ষা করিয়া স্বিদকী পাশাকে 'চোটা মুসোলিনি' কায়দায় (তখনো হিটলার আসর জমাইতে পারেন নাই) ডিক্টেটর বানাইলেন ও স্বিদকী সদম্ভে প্রচার করিলেন যে তিনি 'বজ্র-বাহু দ্বারা মিশর শাসন করিবেন', তখন শেখ অল-মরাগী নির্ভীক বলদৃপ্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। স্বিদকীর প্ররোচনায় রাজা শেখকে হুকুম দিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য আশীজন ওয়াফদহিতৈষী অধ্যাপককে যেন বরখাস্ত করা হয়। শেখ উত্তর দিলেন যে, অধ্যাপকেরা ওয়াফদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া ধর্মাচরণ করিয়াছেন মাত্র। ইহাদিগকে শাস্তি দিবার কোনো কথাই উঠিতে পারে না। স্বিদকীর প্ররোচনায় রাজা অটল; বিদেশী শক্তিও অজহরের মেরুদণ্ড ভাঙিতে পণ করিয়াছে।

শেখ পদত্যাগ করিলেন। তামাম মধ্যপ্রাচ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সকলের মুখে এক প্রশ্ন, রাজা শেখের পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিলেন কি করিয়া।

স্বিদকী তাঁহারই এক ক্রীড়নককে অজহরের শেখ নিযুক্ত করিলেন—কোনো ধর্মভীরু পণ্ডিতই তখন স্বিদকীর পদলেহন করিতে সম্মত হন নাই। নূতন শেখ আশীজন দেশমান্য অধ্যাপককে পদচ্যুত করিলেন। অজহরের হাজার বৎসরের ইতিহাসে ঐ একমাত্র মর্কট সিংহাসনে বসিয়াছিল।

তারপর অজহরের ছাত্রেরা যে কাণ্ড করিল, তাহা স্বিদকী সম্প্রদায়ের চিরকাল মনে থাকিবে। ট্রাম জ্বালাইয়া বাস পোড়াইয়া, বোমা ফাটাইয়া স্বিদকীর স্বাধিকার প্রমত্ততাকে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করিল। বাঙালী পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এস্থলে উল্লেখ প্রয়োজন যে, সা'দ জগলুল পাশার আমল হইতে আজ পর্যন্ত মিশরে যত রাজনৈতিক আন্দোলন হইয়াছে, তাহাতে নেতা ও কর্মীর অধিকাংশ অজহরী। তাঁহাদের জাল মিশরের সর্বত্র ছড়ানো। তুলনাস্থলে ১৯২০-এর খেলাফত আন্দোলনের একাগ্রতা পাঠককে স্মরণ করাইয়া দেই।

স্বিদকীর মেরুদণ্ড ভাঙিল। আন্দোলনের শেষ দিকে তাহার দক্ষিণহস্তে সেই দম্ভকর বজ্রবাহুতে পক্ষাঘাত হইল। মিশরী পরম সন্তোষের সঙ্গে বলিল—'আল্লা-হু-অকবর'। বিদেশী শক্তি ম্রিয়মাণ। রাজার চেতনা হইল। ওয়াফদকে আবার ডাকা হইল।

অজহরের ছাত্রেরা পরমানন্দে শেখ অল-মরাগীকে অজহরে ফিরাইয়া আনিতে গেল। শেখ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, যে দেশের রাজা বিদেশীর ক্রীড়নক হইয়া গণ্যমান্য দেশপ্রিয় অধ্যাপকদের লাঞ্ছনা করে, তাহার অধীনে কর্ম করার মত বিড়ম্বনা আর কিছু নাই। ছাত্রেরা অনেক অনুনয় বিনয় করিল; কিন্তু শেখ অটল। তখন তাহারা শেখের অন্ধ বৃদ্ধ গুরুর দ্বারস্থ হইল। তিনি বলিলেন, 'শেখকে গিয়া বল আমি বৃদ্ধ, মৃত্যুর সম্মুখীন, কিন্তু এমন কোনো পুণ্য করিতে পারি নাই যে, জিন্নতের (স্বর্গের) আশা করিতে পারি। আমার একমাত্র ভরসা যে, মরাগীর মত শিষ্য আমার কাছে অধ্যয়ন করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও যদি কর্তব্য-পথ হইতে বিচ্যুত হন, তবে জিন্নতে যাইবার আমার শেষ আশা বিলীন হইবে।'

শেখ অল-মরাগী তৎক্ষণাৎ গুরুবাক্য শিরোধার্য করিয়াছিলেন।

শেখের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সমস্যা ছিল ইয়োরোপীয় সভ্যতার কতটুকু গ্রহণ করা যায়। বিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় জগৎকে উপেক্ষা করিয়া স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষণ অসম্ভব অথচ ইয়োরোপের জড়বাদের তাণ্ডবলীলা তাহার শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে দেশে প্রবর্তন করার অর্থ দীন-দুনিয়ার সর্বনাশ।

মনে পড়িতেছে, প্রশ্ন উঠিয়াছিল রেডিয়োতে কুরাণ পাঠ শাস্ত্রসম্মত কিনা। উগ্রপন্থীরা বলিলেন, রেডিয়োর প্রচুর চলতি শুঁড়িখানা ও বেশ্যালয়ে। সেই উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ততার আবহাওয়ায় কুরাণ পাঠ কুরাণের অবমাননা। শেষ ফতোয়া দিয়াছিলেন, শেখ অল-মরাগী। তিনি বলিলেন, 'ধার্মিকের গৃহে কুরাণ পাঠ অহরহ হইতেছে। কিন্তু আমি চাই কুরাণ যেন সর্বত্র পৌঁছে। আকণ্ঠ নিমজ্জিত পাপী তো কুরাণ শুনিতে ধার্মিকের দ্বারস্থ হয় না। সুরাসক্ত যদি অনিচ্ছায়ও একদিন রেডিয়োতে কুরাণ পাঠ শুনিয়া বিচলিত হয়, ধর্মপথে চলিবার তাহার বাসনা হয়, তবে বেতার ধন্য হইবে।'

এই হিমালয়ের ন্যায় বিরাট পণ্ডিতের কথা যখন ভাবি, তখন মনে পড়ে তাঁহার ব্যবহারের জন্য শেখ সেই গাড়ী চড়িয়া দূর আবদীন প্রাসাদে যাইতেন রাজার সঙ্গে দেখা করিতে। সেই সময় মোটর ভ্রমণেচ্ছুক ছেলেরা, বিশেষতঃ গ্রাম্যরা শেখের অফিসের সামনে ঝামেলা লাগাইত। শেখ গাড়িতে উঠিয়া ছেলেদের ডাকিয়া যেন নৌকাতে কাঁঠাল বোঝাই করিতেন। কাহাকেও বাদ দিবার ইচ্ছা শেখের নাই অথচ গাড়ি যত বিরাটই হউক, সে তো গাড়ি। দামী রোলস বটে (এক ধর্মপ্রাণ শেখের ব্যবহারার্থ অজহরকে ভেট দিয়াছিলেন) কিন্তু শেখের আপ-সোসের অন্ত নাই যে, যথেষ্ট পরিমাণে প্রশস্ত নহে।

আবদীন প্রাসাদের সম্মুখে ছেলেরা নামিয়া যাইত। শেখ পই পই করিয়া আদেশ করিতেন, কেউ যেন ছিটকাইয়া না পড়ে; তিনি যাইবেন আর আসিবেন। তারপর দশবার করিয়া গুণিতেন কয়টি ছেলে আসিয়াছে ও দশবার করিয়া সে আদমশুমারী ভুলিয়া যাইতেন।

রাজাকে সৎপথে চলিবার উপদেশান্তে শেখ বাহির হইয়া সেই একপাল ব্যাঙকে এক ঝুড়িতে পুরিবার চেষ্টা করিতেন। কেউ এ কাকেতে ঢুকিয়াছে, কেউ ঐ দোকানে গুম হইয়া গিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরিবার পথে শেখের দুর্ভাবনার অন্ত নাই। কেউ বাদ পড়িয়া যায় নাই তো, ড্রাইভারের আশ্বাসবাক্য কিছুতেই বিশ্বাস করিতেন না। বারে বারে বলিতেন, গাড়ি যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হইতেছে।

সেই শেখ জিন্নতবাসী হইলেন। আল্লাতালা তাঁহার আত্মাকে নিজের কাছে ফিরাইয়া লইয়াছেন। 'নিশ্চয়ই আমরা তাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছি ও অবশ্যই আমরা তাঁহারই নিকটে ফিরিয়া যাইব।'

আনন্দবাজার পত্রিকা ২.৯. ১৯৪৫

পল্‌ডি

আমাদের দেশে কালিদাস সম্বন্ধে যে-সব গল্প চলতি আছে, তার অনেকগুলোই তাঁর প্রথম যৌবনের হাবামি নিয়ে। উত্তর ভারতেও নিরেট হাবামির গল্প বানানো হলে সেগুলো সাধারণতঃ শেখ চিল্লির ঘাড়ে চাপানো হয়। (এর উল্টো দিকও আছে—চালাকির গল্প বলতে হলে আমরা সেটা গোপালভাঁড়ের কাঁধে চাপাই)। এই করে করে কোনো কোনো দেশে অজ মূর্খামি অথবা মারাত্মক ফন্দিবাজীর গল্পগুলো কোনো এক বিশেষ কল্পনামূলক বা সত্যিকার চরিত্রের চতুর্দিকে জড়ো হয়।

জার্মানীতে নিরেট হাবামির গল্পগুলো জমেছে পল্‌ডি নামক মহাখানদানী, পয়সাওয়ালা এক হস্তীমূর্খের চতুর্দিকে। পল্‌ডির সবিশেষ পরিচয় দেবার দরকার নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে লোকটি অষ্টপ্রহর ফিট-ফাটনাইন, দুনিয়ার তাবৎ লোকের সঙ্গে তার দহরম-মহরম এবং তার ব্রেন-বক্সে কিছু আছে কি-না সে সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অচেতন। গুণের মধ্যে দেখা যায়, পল্‌ডি অত্যন্ত সহৃদয় এবং খাঁটি খানদানী মনিষ্যির মত পাঁচজনকে আপ্যায়িত করবার জন্য তার চেষ্টা-ত্রুটির অন্ত নেই।

পল্‌ডির বাকি পরিচয় পাঠক নীচের লেখাগুলো থেকে পাবেন।

"সে কি পল্‌ডি, আমাকে এখনো চিনতে পারছিস নে? স্কুলে তোরি পাশে এক বেঞ্চিতে বসতুম যে!"

"মাফ করবেন। আপনি নিশ্চয়ই ভুল করেছেন। স্কুলে আমার পাশে ও রকম লম্বা দাড়িওয়ালা কেউ বসত না।"

*

"সে কি পল্‌ডি, আপনি দাঁড়কাক পুষেছেন কেন?"

"সত্যি বলব? আমি হাতেনাতে দেখতে চাই, এই যে লোকে বলে দাঁড়-কাক তিনশ' বছর বাঁচে কথাটা সত্যি কিনা।"

*

"হাঁ হাঁ, ঠিক বুঝেছি কাপ্তেন সায়েব। আপনার কম্পাস সব সময় উত্তর দিক দেখিয়ে দেয়। কিন্তু মনে করুন আপনি যদি আর কোনো দিকে যেতে চান, তাহলে কি করেন?"

*

অধ্যাপক—"এখন আপনাদের যে তারাগুলো দেখাব তাদের আলো পৃথিবীতে আসতে পাঁচ ঘণ্টা লাগে।"

পল্‌ডি (নেপথ্যে)—"আমি অতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না। আমরা আটটার সময় খানা খাই।"

*

"আমার রিটর্ন টিকিট চাই।"

"কোথাকার ?"

"কি মুস্কিল ! এখানে ফেরবার।"

*

"এই যে পল্‌ডি, সুখবর শুনুন, আজ সকালে আমি ঠাকুরমা হলুম।"

"কি যে বলেন। আর এরি মধ্যে দিব্যি চলাফেরা করতে আরম্ভ করেছেন !"

*

পল্‌ডি—"ঐ যে দুর্গ দেখতে পাচ্ছেন, ঐখানে আমার জন্ম হয়। আপনি কোথায় জন্মেছিলেন ?"

টুরিস্ট—"হাসপাতালে।"

পল্‌ডি—"কী ভয়ানক। কেন, আপনার কি হয়েছিল ?

আনন্দবাজার পত্রিকা

উমেদারী

জনাব সহযোগী সম্পাদক মহাশয়

কদম্‌-মবারকেষু,

মহাত্মন !

আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, সম্পাদক মহাশয়ের পরিবর্তে এ পত্র তস্য সহযোগীর উদ্দেশে প্রেরণ করা সখৎ বে-আদবি। কিন্তু আপনি স্বয়ং বিসমিল্লাতেই গলদ করে বসে আছেন বলে আমাকেও বাধ্য হয়ে এই প্রোতকল-বিরুদ্ধ অনাচার করতে হল।

আপনি উত্তমরূপেই জানেন, আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে জানেন, আমার জীবনের সর্বোচ্চাশা, কোনো একটি পত্রিকার সম্পাদক হওয়া—তা সে আজেবাজে মার্‌কা লণ্ডন-টাইমস্‌-ই হোক, কিংবা তখ্‌ৎ-ই-তাউস-কম্‌-কুৎব্‌মিনার-রূপী 'কালি ও কলম'ই হোক্‌। অতএব আমার জিগর-কলিজার চিল-চেল্লানীর

ফরিয়াদ, আমাকে সম্পাদক পদটি দিলেন না কেন ?

প্রত্যহ ক্রমিক বেকারীর দাওয়াই কর্মখালির বিজ্ঞাপন চা-পানান্তে রকে বসে সেবন করি—সেও আপনার মত হর-ফন্-মৌলা হুজুরি জনের অজানা নয়। কই, কোনো কাগজে তো আপনার কাগজের জন্য "সম্পাদক প্রয়োজন" এমত বিজ্ঞাপন দেখিনি। আপনি আরো জানেন, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক ভ্যাকেন্সির জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হয়—তা সে কেরানীর চাকরিই হোক আর লক্ষ লক্ষ চাকরি যে মহারাজ দেন তাঁর চাকরিই হোক !

বলতে হবে না, বলতে হবে না ! আমি জানি, আপনি বলবেন, 'কিন্তু আখেরে চাকরিটি পায় কে ? আপনি পান ? আমি পাই ? স্বপনকুমার পায় ? আসলে কর্তৃপক্ষ মাত্র একটি ব্যাপারে গাফিলী করেন ; বিজ্ঞাপন দেবার সময় চাকরিটা যাকে দেবেন তার ফোটোগ্রাফ সঙ্গে ছাপিয়ে দিয়ে যদি ঘোষণা করেন, "None need apply whose photograph does not resemble this !" তা হলেই সর্ব ঝামেলা চুকে যায়।'

বুঝেছি, বুঝেছি, সব বুঝেছি। ক সের ধানে ক সের চাল—সরি, বলা উচিত ক সের গম নিলে ক সের চাল পাবে, কিংবা কটা লুপ্ নিলে কটা বউ পাবে—এসব কাশীমিত্তির নিমতলা আমি চিনি, মুসলমানের ব্যাটা হয়েও। মামদোর উপর ব্রহ্মদত্যি !

আমি আপনাকে সোজাসুজি—বাড়িতে না থাকলে 'লটকাইয়া লটকাইয়া' নোটিশ দিলুম, আমি অডিটার জেনরেল, এনফরস্মেন্ট ব্রাঞ্চ, ইনকাম ট্যাক্স সব্বাইকে আপনার কীর্তি জানিয়ে উড়ো চিঠি লিখবো ; তখন বুঝবেন ঠ্যালা কারে কয়। ভালো করে বুঝিয়ে বলি।

'মস্তান' 'মস্তানী' 'মস্তানগিরী' শব্দগুলো চেনেন ? ঐ যে সিদিনা ছুঁচলো গোঁপ, ছুঁচলো জুতো, ছুঁচলো পাতলুন গয়রহ সমন্বিত গোটাকয়েক ছোঁড়া এসে পুজোর চাঁদা চাইলে—যে ভাবে আপনার দিকে চেয়ে 'চাইলে', তাতে আপনি বাপ্পো বাপ্পো করে টাকা দিতে দিতে ইষ্টনাম স্মরণ করলেন না (কত খসলো ?) ? মনে মনে আন্দেশা করলেন না, বড় আহাম্মুখী হয়ে গিয়েছে ঢাকা বারান্দায় ট্যুব লম্পটি লাগিয়ে। ওটা গেল। ওরা যদি সন্তুষ্ট না হয়।···কালই দেখতে হবে, বাজারে গডরেজ ইস্পাতের বাল্ব্ হয় কিনা !'

এই হল গে মস্তানী—বাঙলা ভাষায় বাঙলা কথা।

কিন্তু শব্দটা যাবনিক। অর্থাৎ এর উপর আপনার চেয়ে আমার হক ঢের ঢের বেশী। তদুপরি আপনি বর্ণশ্রেষ্ঠ, আমার 'বন্নো'-টি আর বললুম, না ঐ সামনে

শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা—মা-আমার অধমের বন্‌নো পেলে জেল্লাই টেকরাতেন।

শব্দটির বহর দেখুন! Drunk, intoxicated, libidinous—কামোন্মাদ; lustful, wanton, furious; an animal in rut—ভাদ্রমাসীয় সারমেয়, excessively drunk and polluted with neat wine—দ্বন্দ্বটা লক্ষ্য করুন! মদটা উত্তম শ্রেণীর (বা নির্জলা) কিন্তু অস্থলে পড়ে বেবাক নোংরা করলো (গোমূত্র পবিত্র, কিন্তু দুধে পড়লে—তুলনীয়), intoxicated with the wine of rashness—কাঁচের দোকানে পাগলা ষাঁড়, ইত্যাদি ইত্যাদি আরো বিস্তর আছে।

ধন্য, ধন্য যিনি এই শব্দটি বাঙলায় চালিয়েছেন! পাড়ার মস্তানদের কোনো গুণ এতে অবহেলিত হয়নি, বড় তামাকের কল্‌কে পেয়েছে। 'ভূমা' 'খল্বিদং' ইত্যাদি ডাঁট ডাঁট শব্দ এঁয়ার কাছেই আসতে পারে না।

তারই দোহাই কেড়ে আপনাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি:—

আমাকে পত্রপাঠ সহযোগী অসহযোগী—অনারারী হলেও কণামাত্র আপত্তি নেই, কিন্তু খবরদার, সেস্থলে সেটা যেন পারমেনেন্‌ট্‌ হয়—কোনো একটা সম্পাদক যদি না করেন তবে ঐ কথাই রইল! আপনার ট্যুব লম্পোটির প্রতি আমার কিঞ্চিন্মাত্র জুগুপ্সা নেই। আমি দেখে নেব, আপনি কি করে যজমান বাড়িতে আতপ চাল আর কাঁচকলা পান—যার উপর ভরোসাঁ করুকে কারওয়ার বৈঠিয়েছেন, অর্থাৎ 'কালি' ও 'কলম' যোগাড় করেছেন। পয়সায় তিনটে বাগচীর 'কালি' 'বড়ি' আর খাগড়ার 'কলম' তো।

তা বেশ করেছেন।

কিন্তু মনে রাখবেন, ঐ 'কালি ও কলমের' হাফ হিস্সেদার আমি। 'কালি' না হয় আশু-প্রত্যাশিত মা কালীর চর্মনির্যাস হতে পারে কিন্তু 'কলম'* শব্দটি আরবী, যাবনিক। আরব নবী হজরৎ ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর। তাই বোধ হয় আল্লা-পাক কুরান শরীফে বাণী দিয়েছেন তাঁকে (আল্লাকে) স্মরণ করে আবৃত্তি করো, তিনি কলমের মাধ্যমে জ্ঞান দান করেছেন।...আপনার পত্রিকার নামকরণের ওকৃতে কলমকে স্মরণ করে আপনি আল্লা-নির্দেশিত পথেই যাত্রারম্ভ করেছেন!

এ দৃশ্য দেখে গুণীজ্ঞানীরা বিস্মিত হবেন না। ভবিষ্য পুরাণের প্রক্ষিপ্তাংশে নাকি স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, 'কলিযুগস্য লক্ষণম্ কিং?'—থাক্ সংস্কৃত। মোদ্দা: কলিযুগে 'ব্রাহ্মণে যবনাচরণ করবে, আর যবন আর্যশাস্ত্র রচনা করবে।'

* যদ্যপি কেউ কেউ বলেন ওটা নাকি মূলে গ্রীক

আপনার পথ আপনি বেছে নিয়েছেন ; আম্মো অধুনা গৌড়ভূমে যে নব্যন্যায় সৃষ্ট হয় তারই অনুকরণে একখণ্ড উপাদেয় 'নব্যস্মৃতি' লিখেছি। আপনার শুভবুদ্ধি যদি আমাকে সম্পাদকমণ্ডলীতে ভূম্যাসনও দেয় তবে মল্লিখিত সেই 'স্মৃতিশাস্ত্র' কালি ও কলম মারফৎ তাবল্লোকে শনৈঃ শনৈঃ প্রচারিত হবে। এই সুবাদে কিঞ্চিৎ পূর্বাস্বাদ সার্‌ভ্‌ করছি (ফরাসি মেনু-তে যে আইটিম্ "অর্‌ দ্য ভ্‌র্‌ hors d-oeuvre' নামে সুপরিচিত); যেহেতু অর্বাচান গৌড়সন্তান যাবনিক উপাহারলয়ে তথা ভোজন হর্ম্যে পূর্বাভিজ্ঞতানটনবশত বংশারণ্যে ডোম্বান্ধের ন্যায় আচরণ করত হাস্যাস্পদ হয়, সেহেতু মদ্‌গ্রন্থে 'ফিরপোতে হবিষ্যান্ন' নামক একটি বিশেষ উল্লাস আছে, তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ কল্লোলে। কোন্ কোন্ তিথিনক্ষত্রে ফিরপো গমনে যাত্রা শুভ তথা যাত্রা নাস্তি একাদশীতে তথায় ষণ্ডপুচ্ছযশ সেবন অবিধেয় কি না ইত্যাদি ইত্যাদি তাবৎ জটিল জটিল সমস্যার নিঘণ্টু তথা দফে দফে সবিস্তর বর্ণন অধমাধমের নব্যস্মৃতিতে যাবনিক সংস্কৃতে আলেকজানদ্রিয়ান ছন্দে গ্রথিত আছে। একাধিক আই সি এস কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। তাঁরা অবশ্য তাঁদের যবন পূর্বশূরীগণ কর্তৃক স্থাপিত প্রথা অনুযায়ী যথারীতি পুস্তক না পড়েই প্রশংসাপত্র দিয়েছেন কিন্তু এস্থলে পাণ্ডুলিপি পূর্বাহ্নে অনধীত থাকাতে ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নি—'দি ক্যারাভান (চালিয়াতি উচ্চারণ কারাভাঁ) পাসেজ'—কাফেলা অগ্রগামী। ইতিমধ্যে আমেরিকা-প্রত্যাগত স্বামী বিটলানন্দ (বিটেল নয়, Beatle) ও শ্রীদিদি স্বপ্নযোগে পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন করত আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। মারকিন বীটল সম্প্রদায়ের জন্য 'মারিযোয়ানা' হশীশ-ভাঙ-চণ্ডু ইত্যাদি মিশ্রিত 'পঞ্চরঙ' (এটিই প্রকৃত অকৃত্রিম বস্তু—'পঞ্চরসের' অনুকরণে নির্মিত 'Punch' নিরেস, নীরস ভেজাল) এবং বিশেষ করে 'মার্তণ্ড-তাপিত-বকযন্ত্রোদ্‌গীর্ণ-খর্জুর-নির্যাস'—শাহ্‌-ইন্‌-শাহ জহাঁগীরের সুপ্রিয় পেয় 'ডব্‌ল্‌-ডেস্‌টিল্‌ড্‌-এরেক্‌' এই মহা-কারণবারিরই শ্বেতাঙ্গ দত্ত অভিধা—কি প্রকারে কোন্ শুভলগ্নে পান বিধেয় সবিস্তারে এ তাবৎ শ্লোকবদ্ধরূপে গ্রথিত আছে।—সহজে প্রত্যয় যাবেন না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঘোর সত্য যে যুক্ত ফ্রন্টের কমন-ইষ্ট তথা প্রতিপক্ষ উভয় সম্প্রদায়ই এ-স্মৃতি সোল্লাসে কামনা করেছেন। বাসনা ধরেন, খবরই প্রসাদাৎ বিধান, ফতোয়া, ফরতা প্রয়োগ করত একে অন্যকে স্মৃতিভ্রষ্ট জাতিচ্যুত করতে সক্ষম হবেন। আমেন—যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ!

সম্পাদকতার পরিবর্তে এই দেবদুর্লভ গ্রন্থের কপিরাইট অতীব সুলভ। ন্যাখতোনান্যাথ আপনাদের বাক্‌-সাহিত্য তামাম বেঙ্গলকে তাক লাগিয়ে অবাক সাহিত্যে পরিণত হবে! বাঙলা কোন্ ছার, আপনি 'হেলায় লঙ্কা করিবা জয়'।

এইবারে বলুন, শুধু মস্তানীই করি? উদারার খাদেও চড়াকসে নামতে জানি।

* * *

কিন্তু, যাই-বলি-যাই-কই, কিন্তুক ব্যাকরণে একটা বিভীষণ ভুল করে বসে আছি আমি। সেটাকে আমার ওয়াটারলু পানিপথ গাল্লিপলি আপনার প্রাণ যা চায় তাই তুলে বেইজ্জৎ করতে পারেন। আমার মন নির্দ্বন্দ্ব ছিল, আপনি আপনার পেটুয়া কাকা মামা শালাদের কাউকে দুম্ করে সম্পাদকের দিওয়ান-ই-খাস এর সন্‌গ্-ই-মর্‌মর্ তখতে বসিয়ে দেবেন। ও হরি! কোথায় কি? বসিয়ে দিয়েছেন বিদগ্ধ ভদ্র কুলীন সন্তান মিত্রজ শ্রীযুত বিমল মহোদয়কে। সর্বনাশ! আমার। আপনার তো সর্বরক্ষা! এ যে আমার কুল্লে ফরিয়াদের কী বেহদ্ মুখ-তোড় জবাব তার জবাব কড়ি দিয়ে কেনা যায় না। 'কালির' উপর বিমল! সোনার পাতর বাটি আপনিই সব্বপয়লা গড়লেন। কালি সরোবরে বিমল হংসকে ছেড়ে দিয়েছেন। কবীর (বেজোড়ের) বলেছেন, 'বিরল হংস'। 'ম' স্থলে 'র'? তা ঐ ম র ম র ম রা করে করেই শ্রীবাল্মীকি রামচন্দ্র পেয়েছিলেন!

কহাঁ আসমান কা সিতারা, ঔর কহাঁ— — —! কোথায় আসমানের তারা আর কোথায় পাছার পাঁচড়া! কোথায় শ্রীবিমল আর কোথায় আমি!

সাহিত্যিক রূপে খ্যাতি জমানো সর্ব ভূমিতেই সুকঠিন। কঠিনতম গুজরাত মারওয়াড়ে। ঝাড়া দশটি বছর আমি তৎ তৎ অঞ্চলে বসবাস করেছি এবং লক্ষ্য করেছি ঐ সব ভূমিতে 'সাহিত্যিক' নামক বস্তুটি কালোবাজারেও পাওয়া যায় না। অবশ্য শুনে তাক লেগে যাবে ঐ সব অঞ্চলে কালোবাজার হেথাকার তুলনায় ঢের ঢের কম। সো কৈসন? উত্তরে সেই উর্দু প্রবাদটি স্মরণ করিয়ে দি— 'মহল্লেকী রেণ্ডী মা বরাবর'—আপন মহল্লার বেশ্যা মায়ের মত, অর্থাৎ, ঢলাঢলি করবি তো কর, কিন্তু আপন মহল্লাতে নয়। তাই ওদেশের মহাজনরা—উভয়ার্থে—আপন আপন জন্মভূমিকে কর্মভূমিতে পরিণত করেননি। ঐসী গতি সন্‌সার-মেঁ। তা সে যাক্। বলছিলুম কি, ওদেশে সাহিত্যিক বস্তুটি ডুমুরের ঠ্যাং। যদিস্যাৎ সেই ব্রহ্মাণ্ডদুর্লভ প্রাণীটি ওদেশে দেখা দেয় তবে তাকে কারো সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার সময় বলে 'সাহিত্যিক ছে' অর্থাৎ 'ইনি সাহিত্যিক'। অন্য পক্ষ তখন মনে মনে বলছে 'বেচ্‌চারা! না জানি, বউ বাচ্চা ক'মাস ধরে অনাহারে আছে!' এপক্ষ তখন গম্ভীরতম কণ্ঠে সুরে অহমদাবাদ-গুজরাত-সৌরাষ্ট্র-কচ্ছকে বিস্ময়ে নির্বাক করে দিয়ে বলে 'গের বাঁধ্যুছে!' অর্থাৎ 'ঘর বেঁধেছে?'

'কী বললে? কী কইলে? হুঁ ব্যোলা?' বরঞ্চ চিংড়ি মাছ হিমালয়ের চূড়োয় চড়ে আল্‌পস্‌-চূড়া-প্রবাসিনী চিংড়িনীকে ডেকে তার সঙ্গে রসালাপ করতে পারে—সরু গলির এ-পার ও-পার যে রকম নিত্যি নিত্যি হয়—কিন্তু সাহিত্যিক আপন কামানো কড়ি দিয়ে বাড়ি বেঁধেছে! জয় প্রভু পরস্‌নাথ!

বিমলবাবু কড়ি দিয়ে কি কি কিনেছেন বলেননি। দাদখানি বেল মশুরির তেল থেকে শুরু করে নিশ্চয়ই 'গের'—ঘর—বাড়ি!

ওদিকে দেখুন, পাঠান মোগল ইংরেজকে তিনি কি রকম গুলে খেয়েছেন! শ্রীমিত্র হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রকে হারাতে পারেননি—কে-ই বা পারে—কিন্তু তাঁর ইতিহাস চর্চা বঙ্কিমের চেয়ে কম নয়। সে যুগের তুলনায় আজ লাইব্রেরিতে ফারসী ইতিহাস ঢের ঢের বেশী। এবং সব চেয়ে বড় কথা, অর্বাচীনরা যখন ভেবেছিল, ঐতিহাসিক উপন্যাসের জমানা খতম, 'সাত হাত মিট্টিকে নীচে' তখন শ্রীবিমল দেখিয়ে দিলেন, কোনো বিষয়বস্তু কোনো যুগ, কোনো জঁার—genre-ই চিরতরে লোপ পায় না। ঐতিহাসিক উপন্যাস আজও লেখা যায়—ঈশপের গল্প পাঁচ হাজার বছর পরেও লেখা চলবে, কলমের জোর থাকলে।

ঐ কলমের জোরটাই আমাকে নিধন করেছে, সহযোগী মশাই, ঐ পোড়া কলমের জোর।

নইলে, স্মরণ করুন, কুবুদ্ধির তাড়নায় একদা আপনি স্বয়ং 'পঞ্চতন্ত্র' ছাপাননি? মহাত্মা বিষ্ণুশর্মার 'জঁার' পৃথিবীর কোন্‌ দেশে অপরিচিত? এই শর্মাই বা তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করবে না কেন? কিন্তু আপনার আমার জোড়া কপাল—দৈবের লিখন, আহা, খণ্ডাইতে সাধ্য কার—গর্দিশের গেরোতে গেরনে গেরাস করলে।...শুনলুম বইখানা আপনার হাতছাড়া হয়েছে। তাহলে মৌলা আলীর উদ্দেশে ব্রতোপবাস করে, সেখানে আচারাৎ চতুর্দশ শাক নিবেদন করত চলে যান সোজা কালীঘাট। সেখানে কালী কেলকেত্তাওয়ালীর পদপঙ্কজে বীবী শীরনী চড়িয়ে—এর সমূচহ বিধি বিধান 'নব্যস্মৃতি'তে পাবেন—'ব্রহ্মময়ী মা, বজ্রযোগিনী মা' স্মরণ করতে করতে বাড়ি ফিরে পূজোপাটার বিশেষ বেশ গরদের ইজের-পাজামা ফের শিকের হাঁড়িতে ঝুলিয়ে রাখবেন। কারণ অধুনা 'তোমার বাহন যেটা, দুষ্ট সেই ইঁদুর ব্যাটা—'

সোঁদর বনের বড়-মেঞার মুরশিদ, দক্ষিণ রায়ের ভ্রাতা গাজীপীরের ফির্‌পো প্রবেশ ছাড়পত্র ঈভনিং-জ্যাকেটটির নিকুচি করেছে!

* * *

কিন্তু এই ওয়াটারলুর সামনেও আমার একটি শেষ বক্তব্য আছে।

শ্রীবিমল ক'খানা বই লিখেছেন আমি জানিনে বলে লজ্জিত। কিন্তু তাঁর প্রত্যেক বই যেন অনার্‌জ্‌ সহ পাশ সে তথ্য আমার অজানা নয়! পক্ষান্তরে আমার চোদ্দটি সন্তান—আপনাদের প্রদত্ত 'গ্রেস' সত্ত্বেও—হারাধনের দশটি ছেলের 'রাজেন্দ্রসঙ্গমে' কপপুর! সবকটা বিলকুল না-পাশ।

তাই শ্রীবিমল better কোআলিফাইড!

এই তো আপনার বুদ্ধি!

চৌদ্দটি ব্যাঙ্ক যে ডকে তুলেছে সে সন্ধি সুড়ুক বেশী জানে, না যে সগৌরবে বেশুমার ব্যাঙ্কের উন্নতি করেছে সে বেশী জানে? কালোবাজার, ট্রিপ্‌ল্‌ একাউন্ট রাখা, ব্যাঙ্কের টাকায় তেজীমন্দী খেলা, ইনকমট্যাক্স দেওয়া দূরের কথা তাদের কাছে রিলীফ রূপে দাদন চাওয়া—এ-সব না করতে পারলে আপনার সদ্য ভরা 'কালি' সাহারা হয়ে যাবে না, আপনার 'কলম' মুষলে পরিণত হয়ে যদুবংশ ধ্বংস করবে না!' ঈশ্বর রক্ষতু!

তবু গাঁইগুঁই করছেন? অর্থাৎ, এটা বোঝার মত এলেমও আপনার পেটে নেই। তাহলে মারি সেখানে বোমা!

এক বিশেষ সম্প্রদায়ের তালেবর ব্যবসায়ী ভাবী জামাতার সঙ্গে ব্যবসাতে বাবাজীর তজরুবাহ্‌-অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে মাত্র একটি প্রশ্ন শুধোন। উত্তর শুনে সোল্লাসে বললেন, 'ওয়াহ্‌, ওয়াহ্‌ বেটা জীতে রহো! ঔর ক্যা পুঁছু?—(আর কি শুধবো!) সাত দফে গণেস্‌ উল্টায়া! কামাল্‌ কিয়া, কামাল্‌ কিয়া! বঢ়হীয়া দামাদ (জামাতা), উম্‌দা দামাদ!'

এই 'কামাল্‌ কিয়া' শুনেই কাজী কবি মুস্তফা কামালের উদ্দেশে গেয়েছিলেন, কামাল! তুনে "কামাল কিয়া", ভাই!

আমার নাম মুস্তফা নয়—বঙ্গসন্তান তবু আকছারই আমাকে ঐ নামে চিঠি লেখেন, আমিও ঐ নামের ধোঁকার টাট্টির পিছনে আশ্রয় নি, পাওনাদারের হুনো খেয়ে—

আমায় চ্যান্স দিন, স্যর, আমি আপনার কাগজের তরে কামালের আক্‌মল্‌ করে ছাড়ব! ও! আপনি বুঝি আরবী ভাষা আমার চেয়েও বেশী মিসাণ্ডার-স্টেণ্ড করেন। 'কামালের' স্যুপারলেটিভ 'আক্‌মল্‌'—যেমন 'কবীর'-এর 'আক্‌বর্‌', 'হামিদ'-এর 'আহ্‌মদ্‌'! 'বাঁদরের' বোধ হয় 'আব্‌দর্‌'—নইলে হারাম ব্র্যাণ্ডি-পানি দেবে কেন?

* * *

শ্রীবিমলকে না নিলেও আপনি যে মিত্তির একটি নিতেনই—সে আমি জানি।

'মুখুয্যে "কুটিল" অতি বন্দ্যো বটে সাদা', অপিচ 'ঘোষ বংশ মহাবংশ, বোস বটে সাদা, মিত্তির "কুটিল" অতি দত্ত মহারাজা'।

এ কম্মটি ভালই করেছেন। সর্বশেষে দেখছি একটি নমস্য বস্তিও জুটিয়েছেন। কবিগুরুর দক্ষিণ-হস্তের সাক্ষাৎ প্রতীক আপনাদের কাগজের মেরুদণ্ড গড়ে দিচ্ছেন।...হ্যাঁ হ্যাঁ পবলিসিটি করতে জানতেন না, বস্তি সন্তান 'শ্রীম'।

* * *

তবু বলছি, আমাকে নিলে ভালো করতেন!

এষাস্য পরমা গতি?

"সত্যেরে দেখিব আমি জ্যোতির্ময় রূপে;
আমার চরম মোক্ষ, আমি গন্ধ ধূপে
ভস্ম হব পরি লয়ে সে দীপ্ত তিলক
অগ্নিতে আছেন যিনি, জলে বিশ্বলোক—
অন্তস্তলে, ওষধিতে, বনস্পতি মাঝে—
মম সত্তাবীণা যেন তাঁরি স্পর্শে বাজে॥"

সে যুগ অতীত হল। তারপর ঋষি
কহিলেন, "এ জীবন অন্ধ অমানিশি।
সত্য বাক্য, সত্য চিন্তা, তথা সত্য কর্ম—
ত্রিরত্ন তোমার হোক—সঙ্ঘ, বুদ্ধ ধর্ম
দীপ্যমান সর্বলোকে অন্ধ তমোনাশা
ঈশ্বরের দাস্য ত্যজ, ত্যজ শূন্যে আশা।"
বুদ্ধ-জীন ক্ষত্রিয়ের অমিতাভ ভাষা।
তাপিত শূদ্রের বুকে এনেছিল আশা॥

অতিক্রমি আরবের দুস্তর মরুরে
ভারতের শ্যাম-সুধা-পঞ্চনদ ক্রোড়ে
আশ্রয় লভিল যবে নব সত্যদূত
বক্ষেতে বাহুতে তার এক ধর্ম পূত
একেশ্বর। প্রণমিয়া এ ভূমিরে

—যে দেশ ত্যজিয়া এল নাহি চাহি ফিরে—
কহিল, "সত্যেরে আমি যে সুন্দর রূপে
লভিয়াছি, তব শুভ্র পাষাণের স্তূপে
করিব প্রকাশ আমি। এস সর্বজন,
জাতিবর্ণ নাহি হেথা। মুক্ত এ প্রাঙ্গণ
আচণ্ডাল তরে।" শুনি সে উদাত্ত বাণী
শান্ত হল অভিযান, যুদ্ধে হানাহানি॥

তারপর? তারপর লজ্জা, ঘৃণা, পাপ,
অপমান; প্রকাশিল অন্তহীন শাপ॥
যুগ্মক্ষাত্র তেজে তার পাপ-প্রক্ষালন
চেষ্টা হল ব্যর্থ যবে। করিল বরণ
ভেদ-মন্ত্র ছিদ্রান্বেষী, পরস্পরাঘাত,
হইল বিজয়টিকা—সে অভিসম্পাত॥

দীর্ঘ রাত্রি অবসানে অরুণ আলোতে
মেলি সুপ্ত আঁখি দেখি চলে মুক্তস্রোতে
নাগরিক বৃদ্ধ ক্ষুদ্র; জনপদে জাগে
দীন-দুঃখী, পাপী-তাপী। তারি পুরোভাগে
মোহনের সাথে চলে যে ছিল নির্ভয়
মহাপুরুষের নামে দিতে পরিচয়,
আজাদি মোতিরমালা চিত্ত কেড়ে লয়
সরোজিনী পঙ্কে কোটে—জয় জয় জয়!
চক্রনেমি আবর্তন পূর্ণ হল ভেবে
কৃতজ্ঞ হৃদয় নিয়ে প্রণমিনু দেবে।

হায়রে বিদীর্ণ ভাল, হারে অর্বাচীন
চক্রনেমি আবর্তিল; কিন্তু হল লীন
সম্মুখের সুখস্বর্গ। কি অভিসম্পাতে
ভাগ্যচক্র প্রবেশিল সেই অন্ধরাতে॥

ভূতনাথ গিরিশৃঙ্গে উভয়ে প্রয়াণ
নববীজমন্ত্র লাগি। নাহি অসম্মান!
নাহি অসম্মান তাহে। হেথা নাগরিক
দ্বি-ধা হয়ে তর্ক করে দীর্ণে দিগ্বিদিক।
কৌলীন্য বিচারে তাই কী জাত্যাভিমান!
দম্ভ কিবা?—কে পড়িছে বেশী স্টেটস্‌ম্যান!

গাঁধী-ঘাট

আজ যদি রাষ্ট্রসঙ্ঘ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনতে চান, তাহলে আমাদের কোনো দুর্ভাবনা নেই। আমাদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কি সে-বিষয়ে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই, এবং সে-সঙ্গীত সর্বাঙ্গসুন্দর করে কে কে গাইতে পারবেন সে-বিষয়েও আমাদের মনে অত্যধিক দ্বিধা নেই। তার কারণ আমাদের সঙ্গীত এখনো জীবন্ত—তার ঐতিহ্য কখনো ছিন্নসূত্র হয়নি।

কিন্তু স্থাপত্যের বেলা আমাদের মস্তকে বজ্রাঘাত হয়। এককালে ভারতবর্ষে যে অত্যন্ত নয়নাভিরাম ভবন অট্টালিকা ছিল সে-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ—সংস্কৃত কাব্য-নাটক—শিল্প-শাস্ত্রে তার ভূরিভূরি বর্ণনা পাওয়া যায়—কিন্তু ঠিক কি করে সেগুলো আবার নির্মাণ করা যায়, সে সম্বন্ধে আমাদের কারো মনে কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। মোগল-পাঠান বাদশারা ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে বুখারাস-মরকন্দ-ইরানের শিল্পকলা মিশিয়ে এদেশে বিস্তর ইমারত গড়েছিলেন, কিন্তু তার প্রধান নিদর্শন পাওয়া যায় মসজিদ, কবর ও দুর্গ নির্মাণে। আজকের দিনে এসব ইমারতের আমাদের প্রয়োজন নেই, কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহ-নির্মাণ করতে গিয়ে আমরা তাজমহল বা জুমা-মসজিদের দ্বারস্থ হতে পারিনে।

ইংরাজ যখন নয়াদিল্লী গড়তে বসল তখন যে এ সমস্যা তার সামনে একেবারেই উপস্থিত হয়নি তা নয়। ঠিক সেই সময়েই রসজ্ঞ হ্যাভেল সায়েব ভারতীয় শিল্প-কলা সম্বন্ধে একখানা প্রামাণিক পুস্তক প্রকাশিত করেন। তার শেষ পরিচ্ছেদে তিনি ভারতীয় ইংরেজ বড়কর্তাদের সাবধান করে দেন, তাঁরা যেন নয়াদিল্লীতে শিব দিয়ে বাঁদর না গড়েন। হ্যাভেল্ স্পষ্ট ভাষায় ইংরেজ স্থপতি ইঞ্জিনীয়ারদের বলে দেন, "ভারতবর্ষের স্থাপত্য-ঐতিহ্যের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তোমাদের কর্ম নয়। যে-সহরে দিওয়ান-ই-খাস, জুমা মসজিদ, কুতব মিনার রয়েছে, সেখানে ভারতীয় স্থপতিকে বাদ দিয়ে কোনো কিছু সৃষ্টিকার্য করার দম্ভ ক'রো না।"

কিন্তু হ্যাভেল্ যখন দেখতে পেলেন যে ইংরেজের স্বাধিকার-প্রমত্ততা তাকে সম্পূর্ণ বধির করে ফেলেছে, তখন তিনি ইংলণ্ডের গণ্যমান্য ইংরেজদের তরফ থেকে একখানা স্মারকলিপি তখনকার দিনে সেক্রেটারী অব স্টেটকে পাঠান। যতদূর মনে পড়ছে, সে-স্মারকলিপিতে বার্নার্ড শ' এবং এচ. জি. ওয়েলসের নামও ছিল।

চোরা ধর্মের কাহিনী শোনে না, কিন্তু ধর্মের কাহিনী না শুনলেই যে মানুষ চোর হবে তার কোনো মানে নেই। সে মূর্খ হতে পারে, শিশু হতে পারে অথবা ইংরেজ বড়কর্তাও হতে পারে। এস্থলে দেখা গেল, ইংরেজ বড়কর্তারা দিল্লীতে বসে শ' সায়েবকে সরাজ্ঞান করলেন,—কথাবার্তা থেকে ধরা পড়ল লণ্ডনী শ'র তুলনায় তাঁরা নিজেদের এক এক জনকে একশ' মনে করেছেন। তারপর দিল্লীতে তাঁরা যে চাজ প্রসব করলেন পণ্ডিতী ভাষায় তাকে বলে গর্ভস্রাব, ইংরেজীতে muck, trash বললে তার খানিকটে অর্থ ধরা যায়—শিব গড়তে বাঁদর গড়ার জন্য কোনো জুৎসই কথা ইংরিজীতে নেই, পর্বতের মূষিকপ্রসবও অন্য জিনিস।

তারি অন্য নিদর্শন কলকাতার ভিক্টোরেয়া মেমোরিয়ল। এ জিনিসটা ক্রিস্‌মাস্ কেক্ না শ্বেতহস্তী, এখনো ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারিনি। এটা নাকি বানানো হয়েছিল তাজমহলের সঙ্গে টক্কর দেবার জন্য। হবেও বা। শূর্পনখাও তো সীতার সৌন্দর্য দেখে হার মেনে নেয়নি। সেকথা থাক্, তবে এইটুকু না বলে থাকা যায় না,—তাজ দেখে মনে হয়, চেঁচিয়ে বলি, "ধর্, ধর্, এক্ষুণি ডানা মেলে আকাশে উড়ে যাবে।" ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ল দেখে চেঁচিয়ে বলি, "বাঁধ্ বাঁধ, এক্ষুণি ডুবে যাবে।"

* * *

গান্ধী-ঘাট নির্মাণ করতে গিয়ে তাই স্থপতিকে কোন্ সমস্যার সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল স্পষ্ট বুঝতে পারি। অজন্তাযুগে ফিরে যাবার উপায় নেই, মোগল স্থাপত্যে ঘাট নির্মাণের উদাহরণ নেই। আর ইউরোপীয় স্থাপত্যের বহু জিনিস আমাদের কাজে লাগে বটে, কিন্তু তা দিয়ে রসসৃষ্টি হয় না, আর হলেও আমাদের ভারতীয় মন চট করে তা দেখে সাড়া দেবে কি না সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। (ইউরোপীয় সব কিছু বর্জনীয় সে কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়—তাহলে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের নভেল বাদ দিতে হয়)।

তাহলে এক হতে পারে—সব কিছু বাদ দিয়ে নিছক কল্পনার হাতে লাগাম ছেড়ে দেওয়া। তাতে মন সাড়া দেয় না। আমরা কি তবে হটেনটট? আমাদের ভাণ্ডারের কি কোনো ঐশ্বর্য নেই যে আমরা শুধু দুখানা হাত নিয়ে ব্যবসা ফাঁদব?

আর হতে পারে—প্রয়োজন মত হিন্দু, পাঠান, মোগল, ইংরেজ সকলের কাছ থেকে রসবস্তু ধার নেওয়া। যেখানে নিতান্তই অনটন, সেখানে স্থপতি চালাবেন তাঁর কল্পনা। তাঁর নৈপুণ্য তাঁকে শিখিয়ে দেবে কি করে ভিন্ন ভিন্ন রসবস্তুর সংমিশ্রণে এমন জিনিস নির্মিত হয়, যা রসস্বরূপ এবং শুধু তাই নয়—অখণ্ড রসস্বরূপ।

আমার মনে হয়, গান্ধী-ঘাট অখণ্ড এবং সার্থক রসসৃষ্টি হয়েছে। তার সম্পূর্ণতাটাই আমার চোখে পড়েছে প্রথম এবং আমি তাকে সম্পূর্ণভাবেই রসবস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছি। দেখে মুগ্ধ হয়ে যখন মনস্থির করলুম যে এ-সম্বন্ধে আর পাঁচজনকে বলতে হবে, তখনই বিশ্লেষণ কর্ম আরম্ভ করতে হল এবং তাতেও স্থপতির পরিমাণ-জ্ঞান দেখে আশ্চর্য হয়েছি। পাঁচটা মসলা একত্র করা কঠিন কর্ম নয়—হোটেলের পাচকেরা নিত্য নিত্য করে; কিন্তু সার্থক রান্না মা-মাসীরই হাতে ফুটে ওঠে। জগাখিচুড়ি ও মধুপর্ক ভিন্ন জিনিস।

স্মৃতি-সৌধ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, তাই তাকে উচ্চ হতে হয়। স্থপতি সেখানে ঐতিহ্যগত মন্দিরের শরণাপন্ন হয়েছেন। ঘাটে মেয়েদের জন্য কাপড় ছাড়ার ভালো ব্যবস্থা করতে হয় আর পর্দার কড়াক্কড়ি মোগল-পাঠানরাই করেছে বেশী। তাই 'পাষাণ'-যবনিকা দিয়ে যে গর্ভগৃহ নির্মাণ করা হয়েছে তার অনুপ্রেরণা এসেছে দিল্লী আগ্রা থেকে। আর সর্বশেষে ঘাটে আশ্রয় পাবে বহু লোক; তাদের জন্য স্থপতি সৌধবক্ষ হতে যে পক্ষ সম্প্রসারিত করেছেন তার শৈলী ইয়োরোপীয় (এবং ইয়োরোপীয়ের আবিষ্কৃত কংক্রিটেই এ বস্তু সম্ভবপর)। আজকালকার দিনে কে না জানে প্রতীক্ষমাণ নরনারী সবচেয়ে বেশী দেখা যায় প্লাটফর্মে এবং প্লাটফর্ম জিনিসটা যখন বিলিতি, তখন তার বেদনা-বোধটা কোথা থেকে আসবে তার জন্য বড্ড বেশী কল্পনাও খাটাতে হয় না।

কিন্তু প্লাটফর্ম দেখে মনে যদি কোনো রসের সৃষ্টি হয়, তবে সে তো বীভৎস রস। আমার মনে হয়, স্থপতি এখানে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। এই পক্ষ সম্প্রসারণে এমন একটা সরল স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গী বা sweep আছে। বামদিকের গর্ভগৃহ ও সৌধ-শিখরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই গতিভঙ্গী এতই সুষ্ঠু হয়েছে যে, সমস্ত স্মৃতি-সৌধটি স্থাণুবৎ না হয়ে গতিবেগ পেয়েছে। মন্দিরটির খণ্ড গম্ভীর—পাষাণ যবনিকা কারুকার্যময়—পক্ষ সম্প্রসারণ পূর্বক আপন বৃক্ষলতা দিয়ে সম্পূর্ণ সৌধের ভারকেন্দ্র রক্ষা করেছে।

তাই মনে হয়, আড়ম্বরহীনতাই এ সৌধের প্রধান ধর্ম। আমার বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, গান্ধীঘাটে যে আড়ম্বরহীনতার গোড়াপত্তন করা হয়েছে তার সঙ্গে মিল রেখে আমাদের ভবিষ্যতের সব স্থাপত্য প্রচেষ্টা আড়ম্বরহীনতায়ই আপন

প্রধান সর্তকতা খুঁজে পাবে। শুধু বলতে চাই, মহাত্মাজীর জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কোনো স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতেই হয় তবে তাকে আড়ম্বরহীন হতেই হবে।

কিন্তু আমাদের এ সব বিশ্লেষণ হয়ত প্রয়োজন নেই। আমরা সহরে থাকি, গঙ্গাবক্ষের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ক্ষীণ। মা গঙ্গার বুক বেয়ে যে-জনপদবাসী উজান-ভাটা করে, তারা কী বলে সেই কথা জানবার জন্য আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে রইলাম।

শৈলীর প্রভাব এ স্মৃতি-সৌধ কতটা বহন করছে তার বিশ্লেষণ তারা করবে না। তাদের শেষ কথা, ভাল-লাগা মন্দ-লাগা এবং কলা-বিচারে সেই শেষ কথা। তবে আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, সম্পূর্ণ বিদেশী বস্তু আমাদের জনসাধারণকে বেশী দিন রস দিতে পারে না। এ-সৌধ আমাদের ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে যখন শিরোত্তোলন করেছে তখন আর যা হয় হোক, এ বস্তু নিন্দাভাজন হবে না।

অবিমিশ্র আনন্দের বিষয়, এ-ঘাটের পরিকল্পনা করেছেন এক বাঙ্গালী যুবক। তাঁর নাম হবিবুর রহমান। ইনি শিবপুরের কৃতী ছাত্র ও পরে আমেরিকায় গিয়ে অনেক বিদ্যাভ্যাস, অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। এই পুণ্যকর্মের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে শ্রীমান দেশবাসীর আশীর্বাদ লাভ করবেন।

এ-ঘাটে গঙ্গাবক্ষে স্নান করে দেশবাসীর দেহ পবিত্র হোক, মহাত্মার জীবন স্মরণে তাঁদের আত্মা মহান হোক।

ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

আনন্দবাজার পত্রিকা

হজরৎ সৈয়দ নিজাম উদ্দীন চিশতি

সুলতান উল্-মশায়িখ্, (গুরু-সম্রাট), মহবুব্-ই-ইলাহি (খুদার দোস্ত), হজরৎ সৈয়দ নিজাম উদ্দীন চিশতি, শেখ উল্-আওলিয়ার (গুরুপতি) ৬৪৬ পরলোক-গমনোৎসব (উর্স্) নিজাম উদ্-দীন দর্গায় মহা সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি' রাজেন্দ্র প্রসাদ মহাশয় অনুষ্ঠানে সভাপতি হবেন বলে কথা ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি স্বহস্তে উর্দু ভাষায় একখানি চিঠি লিখে তাঁর অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ জানান এবং শেখ নিজাম উদ্-দীনের জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন। রাষ্ট্রপতি সচরাচর হিন্দীতে চিঠিপত্র লিখে থাকেন বলে উর্দু-প্রেমী সভাস্থ হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খৃষ্টানগণ উর্দুর প্রতি তাঁর এই সহৃদয়তা দেখে ঘন ঘন উল্লাস প্রকাশ করেন।

আফগান রাজদূত বলেন, শেখ নিজাম উদ্দীন আফগান এবং ভারতের সম্মিলিত আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতীক। খুরাসান-হিরাতে একদা সুফীতত্ত্বের যে চিশতি-সম্প্রদায় সৃষ্ট হয় নিজাম উদ্-দীন সেই 'সম্প্রদায়ে'র অসাম্প্রদায়িক বাণী এদেশে প্রচারিত করেন। আফগান রাষ্ট্রদূত প্রদত্ত নিজাম উদ্-দীনের পটভূমি এবং ইতিহাস বর্ণন পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং অতিশয় মনোরম হয়েছিল।

মিশরের রাজদূত বলেন, নিজাম উদ্-দীনের বাণী সর্বসম্প্রদায় ভেদের অতীত ছিল বলেই তাঁর চতুর্দিকে হিন্দু-মুসলমান-শিখ সমবেত হয়েছিলেন।

আজকের দিনের ভারতীয় রাষ্ট্রও সেই ধর্ম-নিরপেক্ষ ভিত্তিতে গড়া বলে সে রাষ্ট্র ভারতের ভিতরে বাইরে বিশেষ করে মিশরে এতখানি আদৃত হয়েছে। নানা সম্প্রদায়ের লোক সভাতে উপস্থিত ছিলেন বলে তাঁরা মিশর-রাজদূতের এই উক্তিতে ঘন ঘন করতালি দেন।

ইরাকের রাজদূত বলেন, আজ পৃথিবী আরেক বিশ্বযুদ্ধের সামনে এসে পড়েছে। আজকের দিনে সবচেয়ে বেশী দরকার শান্তির বাণী প্রচার করা। খাজা নিজাম উদ্-দীন ইসলামের শান্তির বাণী প্রচার করেছিলেন বলেই তিনি সব সমাজের এতখানি শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন।

ইরাকী এবং মিশরী রাষ্ট্রদূত দুজনেরই মাতৃভাষা আরবী। তাঁরা ইংরেজি ভাষণের ফাঁকে ফাঁকে বিশুদ্ধ উচ্চারণে কুরাণ থেকে কয়েকটি 'আয়াত' উদ্ধৃত করেন। দিল্লীর হিন্দু-মুসলমান-শিখ অনেকেই আরবী জানেন, অন্ততঃ পক্ষে কুরাণ-তিলাওত (কুরাণ-পাঠ) শুনতে অভ্যস্ত। এঁদের কুরাণ উদ্ধৃতি ও মধুর আরবী উচ্চারণ শুনে সকলেই বড় আনন্দলাভ করেন।

পাকিস্তানের রাজদূত যুক্তপ্রদেশবাসী—তাই তাঁর উর্দু উচ্চাঙ্গের। তিনি উর্দুতে বক্তৃতা দিলেন বলে জনসাধারণের সুবিধে হল। আর উর্দু সাহিত্যিক যাঁরা ছিলেন, তাঁদের তো কথাই নেই। পাকিস্তানের রাজদূত বলেন, আমরা নিজাম উদ্-দীনের বাণী জীবনে মেনে নিলে সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হতে পারবো।

সর্বশেষে মৌলানা সাহেব বক্তৃতা দেন। মৌলানা সাহেবের উর্দু ভাষার উপর যা দখল তাঁর সঙ্গে আর কারো তুলনা হয় না। বক্তা হিসেবেও তাঁর জুড়ি এ দুনিয়ায় আমি দু'একজনের বেশী দেখিনি। উচ্চারণ, বলার ধরন, শব্দের বাছাই, গলা ওঠানো-নামানো, যুক্তিতর্ক উপমার সিঁড়ি তৈরী করে করে ধাপে ধাপে প্রতিপাদ্য বিষয়ের দিকে গুরুচণ্ডাল সবাইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এসব তাবৎ বাবদে তিনি ভারতবর্ষের যে কোনো বক্তার সঙ্গে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারেন।

মৌলানা সাহেব বললেন, নিজাম উদ্-দীনের বাণী যে কতখানি সফল হয়েছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ চোখের সামনেই। এই যে হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খৃষ্টান এখানে আজ ভক্তিভরে সমবেত হয়েছে তার থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, তাঁর বাণী সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ছিল—তিনি ইসলামের সেই শিক্ষাই নিয়েছিলেন, যে শিক্ষা কোনো বিশেষ ব্যক্তি, সমাজ বা ধর্মের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট নয়, সে শিক্ষা সর্বধর্মের প্রতি সমান ঔদার্য দেখায়, তার নীতি এবং দণ্ড হিন্দু-মুসলমান-শিখ সকলের উপর সমভাবে প্রযোজ্য।

* * *

অনুষ্ঠানটি হয়েছিল 'নিজামী সাহিত্যসভার' আমন্ত্রণে। এক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ (পণ্ডিত) যুবক সভার সম্পাদক। তিনি বিশুদ্ধ উর্দুতে যে একখানা আমন্ত্রণ-রচনা পাঠ করলেন, তা শুনে মনে হল অতখানি বাঙলা জানলে রায় পিথৌরা বাঙলাদেশে নাম করে ফেলতে পারতেন।

* * *

নিজাম উদ্দীন বাঙলা দেশে বিখ্যাত হয়েছেন 'দৃষ্টিপাতের' মারফতে। গিয়াস উদ্-দীন তুগলুক শা'র সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য আর 'দিল্লী দূর অস্ত' গল্প এখন সকলেই জানেন।

৬৩৪ হিজরার (ইং ১২৩৬) সফর মাসে নিজাম উদ্দীন বুদায়ুনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম মুহম্মদ, পিতার নাম আহমদ। তার পাঁচ বছর বয়সে বাপ মারা যান, মা তাঁকে মানুষ করেন। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি দিল্লীতে এসে গিয়াসপুর গ্রামে আস্তানা গাড়েন (হুমায়ুনের কবরের পূব-উত্তর কোণে এখনো সে ঘরটি আছে) এবং পাক-পট্টনের সিদ্ধ-পুরুষ বাবা ফরীদ শকর-গঞ্জের কাছে দীক্ষা নিয়ে আবার দিল্লীতে ফিরে আসেন।

চিশতি সম্প্রদায়ের তিন মহাপুরুষ ভারতবর্ষে সুপরিচিত। 'আজমিড় শরীফের' খাজা মুইন উদ্-দীন চিশতি ভারতে চিশতি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। ভারতীয় মুসলমানের কাছে মক্কা-মদীনার পরই আজমীর তৃতীয় তীর্থ, বহু হিন্দুর কাছে কাশী-বৃন্দাবনের পরই 'আজমিড় শরীফ'।

মুইন উদ্-দীনের পরেই তাঁর সখা কুৎব্ উদ্-দীন বখ্তিয়ার কাকি। ইনি সম্রাট ইলতুৎমিশের (অলতমাশ্) গুরু ছিলেন এবং দিল্লীর অধিকাংশ পণ্ডিতের বিশ্বাস 'কুতুব মিনার' দাসবংশের প্রতিষ্ঠাতা কুৎব্ উদ্-দীন আইবকের নামে বানানো হয়নি —বানানো হয়েছিল পীর কুতব্ উদ্-দীন বখতিয়ার কাকির নামে। এর দরগাহ্ কুতুব মিনারের কাছেই। সেখানে শেষ মুগল বাদশার অনেকেই দেহরক্ষা

করেছেন। প্রতি বৎসর সেখানে দরগার চতুর্দিকে ফুলের মেলা বসে।

তাঁর পরই বাবা ফরীদ উদ্-দীন শকর-গঞ্জ।

* * *

সুলতানা রিজিয়ার ভগ্নীপতি গিয়াস উদ্-দীন বল্‌বন্ থেকে আরম্ভ করে মুহম্মদ তুগলুক পর্যন্ত বহু বাদশাই নিজাম উদ্-দীনের শিষ্য ছিলেন। রাজাদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী হৃদ্যতা তাঁর ছিল আলাউদ্-দীন খিলজী, খিজ্‌র্ খান (এই খিজ্‌র্ খান এবং দেবলা দেবীর প্রেমের কাহিনী সম-সাময়িক কবি আমির খুসরো ফার্সী ভাষায় লেখেন একথা বাঙালীর কাছে অজানা নয়—আকবর বাদশাহ প্রায় তিন শতাব্দী পরে বাঙলা দেশে জলবিহারের সময় এই কাব্য শুনে মুগ্ধ হন) এবং মুহম্মদ তুগলুকের সঙ্গে আলাউদ্-দীন খিলজীকে পীর নিজাম উদ্দীন মঙ্গোল আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে দেন—মহম্মদ তুগলুকের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতার প্রধান কারণ ধর্মশাস্ত্রে উভয়ের গভীর পাণ্ডিত্য। মুহম্মদ তুগলুককে সাধারণতঃ 'পাগলা রাজা' বলা হয়, কিন্তু তাঁর আর যে দোষই থাকুক তিনি সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত ছিলেন। মোল্লারা তাঁকে জেহাদের জন্য ওস্কাতে চাইলে তিনি শাস্ত্রবিচারে তাদের ঘায়েল করে ঠাণ্ডা করে দিতেন।

কিন্তু পীরের সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁর মিত্র এবং শিষ্য কবি আমির খুসরোর সঙ্গে। খুসরোর পরিচয় এখানে ভালো করে দেবার প্রয়োজন নেই; ভারত আফগানিস্থানের সুরসিক জনমাত্রই তাঁকে প্রাতঃস্মরণীয় কবিরূপে স্বীকার করে থাকেন।

পীর নিজাম উদ্-দীনের সঙ্গে বরঞ্চ জলাল উদ্-দীন খিলজি এবং গিয়াস উদ্দীন তুগলুকের প্রচুর মনোমালিন্য ছিল কিন্তু খুসরোকে সম্মান এবং আদর করেছেন বল্‌বন্ থেকে আরম্ভ করে মুহম্মদ তুগলুক পর্যন্ত সব রাজাই। এমন কি যে গিয়াস উদ্-দীন তুগলুক নিজাম উদ্-দীনের কুয়োর কাজ বন্ধ করে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন তিনি পর্যন্ত খুসরোকে সভাস্থলে বিস্তর ইনাম-খিলাত দেন।

মুহম্মদ তুগলুক পণ্ডিত ছিলেন তাই তাঁর লাইব্রেরিখানা ছিল বিশাল—মুহম্মদ সেই লাইব্রেরি দেখা-শোনার ভার দেন খুসরোকে। ঐতিহাসিক জিয়া উদ্-দীন বরনী আর খুসরো সঙ্গে না থাকলে মুহম্মদ তুগলুক হাঁপিয়ে উঠতেন। বাঙ্গলাদেশ যাবার সময় মুহম্মদ মিত্র খুসরোকে সঙ্গে নিয়ে যান এবং সেখানে লেখনাবতীতে থাকাকালীন খবর পৌঁছল নিজাম উদ্-দীন দেহরক্ষা করেছেন।

* * * *

বজ্রাঘাত বললে কম বলা হয়। খুসরোকে কোনো প্রকারেই সান্ত্বনা দেওয়া

গেল না। সর্বস্ব বেচে দিয়ে উন্মাদের মত দিল্লীর দিকে রওনা হলেন। সেখানে তাঁর পৌঁছনর খবর পেয়ে তাঁর অসংখ্য মিত্রেরা ছুটে গেলেন তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য। নিজাম উদ্-দীনের পরেই পীর হিসাবে দিল্লীর আসন তখন নিয়েছেন খাজা নসীর উদ্-দীন 'চিরাগ দিল্লী' অর্থাৎ 'দিল্লীর প্রদীপ'—কুতব্ সাহেব আর নিজাম উদ্-দীনের পরেই তাঁর দর্গা দিল্লীতে প্রসিদ্ধ) এবং ইনি ছিলেন খুসরোর পরম মিত্র। তিনি পর্যন্ত খুসরোকে তাঁর শোক ভুলিয়ে সংসারে আবার ফিরে নিয়ে যেতে পারলেন না।

আচ্ছন্নের মত খুসরো দিবারাত্রি নিজাম উদ্-দীনের কবরের পাশে বসে সেদিকে তাকিয়ে থাকতেন। দীর্ঘ ছয় মাস কাটানোর পর তাঁর প্রতি খুদার দয়া হল। ২৯শা জুল কিদা ৭২৫ হিজরিতে (ইংরাজি ১৩২৫) মৃত্যু তাঁকে তাঁর গুরু এবং সখার কাছে নিয়ে গেল।

খুসরো বাণীর একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন বলে হিন্দুর বসন্ত পঞ্চমী উৎসবে প্রতি বৎসর যোগ দিতেন।

এখনও প্রতি বৎসর দিল্লীর হিন্দু-মুসলমান বসন্ত পঞ্চমী দিনে নিজাম উদ্-দীনের দর্গায় সমবেত হয়ে খুসরোকে স্মরণ করে।

* * * *

দিল্লীর বাদশা মুহম্মদ শা, দ্বিতীয় আকবরের (ইনিই রামমোহনকে বিলেত পাঠান) পুত্র মিরজা জাহাঙ্গীর, ঐতিহাসিক বরনী, আকবরের প্রধান মন্ত্রী আতগা খান (হুমায়ুন কৃতজ্ঞ হয়ে এঁর স্ত্রীকে আকবরের 'দুধ-মা' নিযুক্ত করেছিলেন), আকবরের 'দুধ-ভাই' আজীজ কোকল্তাশ্, নাদির শা'র এক পুত্রবধূ যিনি দিল্লীতে মারা যান, এরকম বহু লোক তাঁদের দেহরক্ষা করেছেন পীর নিজাম উদ্-দীনের গোরের আশেপাশে। স্থাপত্যের দিক দিয়ে এঁদের অনেকেরই কবর অতুলনীয়—সে কথা আরেক দিন হবে।

* * * *

নিজাম উদ্-দীনের দরগায় গোরের জায়গা যোগাড় করা সহজ নয়। সম্রাট-নন্দিনী জাহানারার গোর এখানেই। দৈর্ঘ্যে ১৩ ফুট ৯ ইঞ্চি, প্রস্থে ১১ ফুট ৬ ইঞ্চি। এইটুকু জায়গার জন্য তিনি তিন কোটি টাকা দাম হিসেবে রেখে দিয়েছিলেন। আওরঙ্গজেব শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করে প্রমাণ করলেন, ভ্রাতার হক্ক দুই-তৃতীয়াংশ টাকার উপর। তাই তিনি দাম দিলেন এক কোটি!

কবরের কাছে ফার্সীতে লেখা :—

"বগৈরে সবজে ন" পুশদ্ কসী মজার মরা,

কে কব্‌র-পুশে গরীবান্ হমীন্ গিয়া বস্ অস্ত্ ।"
"বহুমূল্য আভরণে করিয়ো না সুসজ্জিত
কবর আমার
তৃণ শ্রেষ্ঠ আভরণ দীনা আত্মা জাহানারা
সম্রাট-কন্যার ।

হ য ব র ল

১

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে অর্থ সাহায্য চাওয়া হইয়াছে ।

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুত জানকীনাথ শাস্ত্রী লিখিতেছেন—'.. ...পূর্বে পরিষদে উপযুক্ত মেধাবী ছাত্রদিগকে আহার ও বাসস্থান দিয়া অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়া হইত । কিন্তু বর্তমানে জরুরী অবস্থায় আর্থিক অসুবিধার জন্য সে ব্যবস্থা রহিত করিবার উপক্রম হইয়াছে ।' যদি তাহাই করিতে হয় ও মেধাবী ছাত্রেরা সংস্কৃত অধ্যয়ন ত্যাগ করে, তবে পরিষদ চলিবে কাহাদের লইয়া ? ধনী মেধাবী ছাত্র তো বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় । দেশের বিত্তশালীদের বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি যে, আজও বাজারে যে সমস্ত সংস্কৃত পুস্তক-রাজি পাওয়া যায়, তাহা কাহার অধ্যবসায়ের ফলে ? দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সংস্কৃতের জন্য কতটুকু করিয়াছেন ও এই সব চতুষ্পাঠী, টোল পরিষদ কতটুকু করিয়াছেন ? বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তো দুইখানা কাব্য ও তিনখানা নাটক লইয়া নাড়াচাড়া করেন, ভারতীয় দর্শনের জন্য তো রহিয়াছেন ইংরেজীতে রাধাকৃষ্ণণ ও দাশগুপ্ত । সরকার সাহায্যবর্জিত দেশীয় এই প্রতিষ্ঠানগুলি ও ইয়োরোপের, বিশেষতঃ জর্মন পণ্ডিতমণ্ডলীই তো সংস্কৃতের শতকরা ৯৫ খানি পুস্তক বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন । এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়েও যাঁহারা 'দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হিসাবে গণ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন টুলো আর কয়জন নির্জলা মেড ইন বিশ্ববিদ্যালয় ?' উইনটারনিৎস লেভীকে যেসব হিন্দু ও জৈন পণ্ডিতের দ্বারস্থ হইতে দেখিয়াছি, তাঁহারা তো খাঁটি টুলো । অনেকে ইংরেজী পর্যন্ত জানিতেন না । এ যুগের জ্ঞানীদের শিরোমণি প্রাতঃস্মরণীয় দ্বিজেন্দ্রনাথও তো টুলো ।

আশ্চর্য যে, পাঠান-মুগল যুগের ভিতর দিয়া চতুষ্পাঠী, টোল সুস্থ শরীরে বাহির হইয়া আসিল । পণ্ডিতেরা অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিলেন, পাণ্ডুলিপি

বাঁচাইয়া রাখিলেন, নূতন টীকা-টীপ্পনী লিখিলেন আর আজ ধর্মগন্ধ-বিহীন সদাশয় ইংরেজদের আমলে, দেশে যখন জাত্যাভিমান বাড়িয়াছে, জাতীয়তাবোধের জয়পতাকা উড্ডীয়মান, দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হইবার জন্য হার্দিক প্রচেষ্টা সর্বত্র জাজ্জ্বল্যমান, তখন অর্থাভাবে আমাদের দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি লোপ পাইতে বসিয়াছে। যদি লোপ পায়, তবে এও বলি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সংস্কৃতের বৈদগ্ধ্য বাঁচাইয়া রাখিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

* * *

এই সম্পর্কে আরেকটি কথা মনে পড়িল। কুলোকের বদসল্লায় পড়িয়া সেদিন বায়স্কোপে গিয়াছিলাম একখানা পৌরাণিক ছবি দেখিতে। যাহা দেখিলাম, সে সম্বন্ধে মন্তব্য না করাই প্রশস্ত। কিন্তু একটি জিনিস লক্ষ্য করিলাম। হিন্দীতে যে সংস্কৃত শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ হয় তাহা বাঙালী শ্রোতা দিব্য বুঝিতেছেন ও অর্ধশিক্ষিতা বাঙালী অভিনেত্রীরাও দিব্য শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে মন্ত্র পড়িতেছেন। তাহা হইলে কি বাঙলা দেশের ইস্কুল-কলেজে এখনও শুধু সংস্কৃত উচ্চারণ শিখাইবার সময় হয় নাই? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কাশী হইতে পণ্ডিত আনাইয়া বাঙালীকে বেদ-মন্ত্র শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে শিখাইয়াছিলেন। সে ঐতিহ্য আজ ক্ষীণ। মফঃস্বলের ব্রহ্মমন্দিরে সংস্কৃত উচ্চারণে বাঙলা পদ্ধতি আবার আসর জমাইয়াছে। বোম্বাইয়ের স্টুডিয়োর আবহাওয়া যদি বাঙালী অভিনেত্রীকে সংস্কৃত উচ্চারণ শিখাইতে পারে, তবে বাঙলা দেশের ইস্কুল-কলেজ তাহা পারে না, সে কি বিশ্বাসযোগ্য?

গুরুজনদের মুখে শুনিয়াছি, গিরিশবাবুর কোরাণের তর্জমা এককালে নাকি বহু হিন্দু পড়িতেন এবং তখন নাকি সে তর্জমার কদর হিন্দুদের মধ্যেই বেশি ছিল; কারণ মুসলমানেরা তখনও মনস্থির করতে পারেন নাই যে, কোরাণের বাঙলা অনুবাদ করা শাস্ত্রসম্মত কি না।

পরবর্তী যুগে মীর মশারক হুসেন সাহেবের বিষাদ-সিন্ধু বহু হিন্দু পড়িয়া চোখের জল ফেলিয়াছেন (পুস্তকখানা প্রামাণিক ধর্মগ্রন্থ নহে; অনেকটা পুরাণ জাতীয়, বিস্তর অবিশ্বাস্য অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ)। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ লালন ফকীরের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন। পরবর্তী যুগে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি গঙ্গোপাধ্যায় আরবী-ফারসী শব্দযোগে তাঁহাদের লেখায় কিঞ্চিৎ মুসলমানী আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারা লোকপ্রিয়তা হারাইলেন। তারপর আসিলেন নজরুল ইসলাম। সাধারণ বাঙালী হিন্দু তখন প্রথম জানিতে পারিলেন

যে, মুসলমানও কবিতা লিখিতে পারেন ; এমন কি, উৎকৃষ্ট কবিতাও লিখিতে পারেন। কাজী সাহেবের কবিতার ব্যঞ্জনা বুঝিবার জন্য প্রচুর হিন্দু তখন মুসলমান বন্ধুদের 'শহীদ' কথার অর্থ, 'ইউসুফ' কে, "কানান" কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কাজী সাহেব তাঁহার ধূমকেতু কাগজে মুসলমান সমাজের পঙ্কিল দিকটা যত না আক্রমণ করিলেন, তাহার অপেক্ষা বহু কম করিলেন ইসলামের সুন্দর ও মঙ্গলের দিকের বর্ণনা। ইতিমধ্যে মৌলানা আকরম খান প্রমুখ মুসলমান লেখকেরা ইসলাম ও তৎসম্বন্ধীয় নানা পুস্তক লিখিলেন। খুব কম হিন্দুই সেগুলি পড়িয়াছেন। এখনও মাসিক মোহাম্মদীতে ভালো ভালো প্রবন্ধ বাহির হয়, কিন্তু সাধারণ হিন্দু মোহাম্মদী কিনেন না ; বিশেষতঃ পদ্মার এপারে। সুখের বিষয়, মৌলবী মনসুরউদ্দীনের 'হারামণি'তে সংগৃহীত মুসলমানী আউল-বাউল-মুরশিদিয়া গীত হিন্দু-মুসলমান গুণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ লইয়া সঞ্চয়নখানি প্রকাশিত হয়।

বাঙালী-হিন্দু মুসলমানদের দ্বারা লিখিত পুস্তক যে পড়েন না বা কম পড়েন, তাহার জন্য তাঁহাকে সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। কারণ মুসলমানদের ভিতর শক্তিমান লেখক বড় কম। একবার ভাবিয়া দেখিলেই হয় যে, আজ যদি কোন মুসলমান শরৎবাবুর মত সরল ভাষায় মুসলমান চাষী ও মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি আঁকেন, তবে কোন্ হিন্দু না পড়িয়া থাকিতে পারিবেন। আরব্যোপন্যাসের বাংলা তর্জমা এখন হাজার হাজার বিক্রয় হয়—যদিও তর্জমাগুলি অতি জঘন্য ও মূল আরবী হইতে একখানাও এযাবৎ হয় নাই, আবু সইদ আইয়ুবের লেখা কোন্ বিদগ্ধ বাঙালী অবহেলা করেন ? কিন্তু তিনি সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন ; মুসলমান জীবন অঙ্কিত করা বা মুসলমানী কৃষ্টি বা সভ্যতার আলোচনা তিনি করেন না। বাঙালী কবীরকে কে না চিনে ?

মুসলমানদের উচিত কোরান, হদীস, ফিকাহ, মহাপুরুষ মুহম্মদের জীবনী (ইবনে হিশামের উপর প্রতিষ্ঠিত) মুসলিম স্থপতি শিল্পকলা ইতিহাস (বিশেষ করিয়া ইবনে খলদুন), দর্শন, কালাম ইত্যাদি ইত্যাদি—কত বলিব—সম্বন্ধে প্রামাণিক, উৎকৃষ্ট সরল সস্তা কেতাব লেখা। লজ্জার বিষয় যে, ফার্সীতে লিখা বাঙলার ভূগোল-ইতিহাস বাহার-ই-স্তানে গাঈবীর বাঙলা তর্জমা এখনোও কেহ করেন নাই।

শুনিতে পাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'ইসলামিক কালচার' বিভাগ আছে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু অধ্যাপকেরা নানা রকম পুস্তক প্রবন্ধ বাঙলায় লিখিয়া 'বিশ্ব' 'বিদ্যালয়' নাম সার্থক করেন। মুসলমান অধ্যাপকেরা কি লেখেন ?

লিখিলে কি উজবেকী স্থানের ভাষায় লেখেন ?

মুসলমানদের গাফিলি ও হিন্দুদের উপেক্ষা আমাদের সম্মিলিত সাহিত্য-সৃষ্টির অন্তরায় হইয়াছে। দুইজন একই ভাষা বলেন ; কিন্তু একই বই পড়েন না। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্ !

২

এক ইন্দো-আমেরিকান আড্ডায় ছিটকাইয়া গিয়া পড়িয়াছিলাম। আড্ডা-ধারীরা একোণে ওকোণে তিন-চার জনায় মিলিয়া ছোট ছোট দ'য়ের সৃষ্টি করিয়া হরেক রকম বিষয়ে আলাপচারী করিতেছিলেন। আমি যে কোণে গিয়া পড়িয়াছিলাম সেখানে একজন মার্কিন দুঃখ করিয়া সেই সনাতন কাহিনী বলিতে-ছিলেন, গাড়ীওয়ালারা বিদেশীদের কি রকম ধাপ্পা দেয়, দোকানীরা কি রকম পয়সা মারে, টিকিট কাটিতে হইলে ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষটায় বলিলেন 'অদ্ভুত দেশ, ফার্স্ট ক্লাস গাড়ীতে পর্যন্ত মুখ ধুইবার জন্য সাবান তোয়ালে থাকে না ; জিজ্ঞাসা করিলে রেল কর্মচারী বলে, যদি রাখা হয় আধ ঘণ্টার ভিতর সাবান-তোয়ালে কর্পূর হইয়া যাইবে।' আমি উষ্মার সহিত একটা ঝাঁজালো উত্তর দিব দিব করিতেছি এমন সময় একটি জর্মন মহিলা বলিলেন, 'জর্মনীতে থার্ড ক্লাসেও সাবান-তোয়ালে থাকে ও সেগুলি চুরি যায় না। কিন্তু দুরবস্থার সময় এই নিয়ম খাটে না। ১৯১৮ সনে জর্মনীর দৈন্য এমন চরমে পৌঁছিয়াছিল যে, সাবান-তোয়ালে মাথায় থাকুক গাড়ীর সর্ব প্রকার ধাতুর তৈয়ারী রড, হ্যাণ্ডেল, হুক, কব্জা পর্যন্ত উপিয়া গিয়াছিল। জর্মনী হুনরী-কারীগরদের সকলেই ড্রাইভার-স্প্যানার চালাইতে ওস্তাদ। শেষ পর্যন্ত কব্জার অভাবে গাড়ীগুলির দরজা পর্যন্ত ছিল না। অথচ সেই জর্মনীতেই ১৯২৯ সালে কেউ যদি ভুলে বাথরুমে হাতঘড়ি ফেলিয়া আসিত তবে নির্ঘাৎ ফেরত পাইত।' উত্তর শুনিয়া মার্কিনের চোখের উল্টা দিক বাহির হইয়া আসিল। বলিলেন, 'কই, আমাদের দেশে তো এমনটা কখনো হয় নাই।' আমি বলিলাম 'ব্রাদার, তোমরা আর দৈন্য দেখিলে কোথায় ?' মনে পড়িল হেম বাঁড়ুয্যের সেক্সপীয়ারের তর্জমা,

অঙ্গে যার অস্ত্রাঘাত হয়নি কখন,
হাসে সেই ক্ষতচিহ্ন করি দরশন।

* * *

বাড়ী ফিরবার সময় ঐ খেই ধরিয়া অনেক কিছু ভাবিলাম। যান্ত্রিক সভ্যতা

তো আমাদের হয় নাই। আমাদের যা কিছু বৈদগ্ধ্য-ঐতিহ্য-সভ্যতা এককালে ছিল তাহা বিরাজ করিত গ্রামের সরল অনাড়ম্বর জীবনকে জড়াইয়া। কৃষ্টির দিক দিয়া গ্রামগুলি তো উজাড় হইয়াছে কারণ গ্রামের কোনো মেধাবী ছেলে যদি কোনো গতিকে বি. এ. পাস করিতে পারে, তবে সে তো আর গ্রামে ফিরিয়া যায় না। গ্রাম তাহাকে কি চাকরি দিবে? ১২৲ টাকার স্কুল মাস্টারী, না ১৫৲ টাকার পোস্টমাস্টারী? এত কাঠ খড় পোড়াইয়া, বুকের রক্ত জল করিয়া, স্বাস্থ্য বরবাদ করিয়া বি. এ. পাস করিল কি কুল্লে ১৫৲ টাকার জন্য। সে আর গ্রামে ফিরে না। সার সহরে চলিয়া যায়, তুষ ধামে পড়িয়া থাকে। অথচ একশত বৎসর পূর্বেও গ্রামের হিন্দু ছেলে নবদ্বীপ ভট্টপল্লী, কাশীতে অধ্যয়ন করিয়া দিগ্‌গজ পণ্ডিত হইয়া গ্রামেই ফিরিত; সেইখানেই বাস করিত। মুসলমান ছেলে দেওবন্দ, রামপুর পাস করিয়া, ওস্তাদ-দস্ত মস্ত পাগড়ী পরিয়া সেই গ্রামেই ফিরিয়া আসিত, সেই গ্রামেই বাস করিত। তাঁহারাই গ্রামের চাষী মজুরকে ধর্মপথে চলিবার অনুপ্রেরণা দিতেন।

গ্রামে শিক্ষাদীক্ষা আজ নাই, তবু তো চাষা মজুর পশু হইয়া যায় নাই। আমি বহু কর্মীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু কেহই একথা বলেন নাই যে, দুর্ভিক্ষের সময় আমাদের চাষারা কুকুর-বিড়াল খাইয়াছে। কুকুরের সঙ্গে খাদ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করিয়াছে কিন্তু এ সমাধান তাহার মাথায় আসে নাই যে, কুকুরটাকে মারিয়া তো জঠরানল নিবানো যায়! আরও শুনিয়াছি যে, গোরা সিপাহী টিনের খাদ্য ছুঁড়িয়া দিলে হিন্দু-মুসলমান স্পর্শ করে নাই; পাছে গোরু বা শুয়োর খাইতে হয়।

অথচ সভ্যতার শিখরে উপবিষ্ট প্যারিস সহরের বাসিন্দারা নাকি দুর্দিনে কুকুর-বিড়াল ইস্তক চড়ুই পাখী পর্যন্ত সাফ হজম করিয়া ফেলিলেন।

ধর্মের গতি সূক্ষ্ম; কে সভ্য কে অসভ্য কে জানে?

৩

সেই ইন্দো-মার্কিন মজলিসের আরেক কোণে যখন ঘুরিতে ঘুরিতে পৌঁছিলাম, তখন শুনি এক মার্কিন বলিতেছেন, "যাকে জিজ্ঞেস করো সেই বলে 'টেগোর পড়—গীটাঞ্জলি, গাড্‌না, চিত্রা'; পড়েছি, সুখ পেয়েছি। কিন্তু আমি চিত্রকর, তোমাদের দেশে কেউ ছবি-টবি আঁকে না?" আমি বলিলাম, "কি অদ্ভুত প্রশ্ন, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিত হালদার ও নন্দলালের চেলা রমেন্দ্র চক্রবর্তী, বিনোদ

মুখোপাধ্যায়, বিনায়ক শিবরাম মশোজী, রামকিঙ্কর বহিজ—এঁদের নাম শোনো নি ?" মার্কিন বল্লে, "ঐ তো বিপদ, সকলেই বলে 'নাম শোনো নি ?' নাম তো বিস্তর শুনেছি। কিন্তু এঁদের ছবির এ্যালবম কই—এক চক্রবর্তী ছাড়া! ১৫ থেকে ২০ টাকার ভিতর তুমি আমাদের যে কোনো গুণীর,—দা-ভিঞ্চি, রেমব্রান্ত, সেজান্—যাঁরি চাও উৎকৃষ্ট এ্যালবাম পাবে। ইস্তেক তোমাদের দেশের বাজার এগুলোতে ছয়লাপ করে রেখেছিল, যখন লড়াইয়ের গোড়ার দিকে এদেশে আসি। এই যে এঁদের নাম করলে, দাও না কারু 'কমপ্লীট ওয়ার্কস' ? বেশি দরকসর করব না—আমরা কারবারী, আদ্ধেকই দাও না ?"

নতমস্তকে ঘাড় চুলকাইয়া টালবাহানা দিলাম, "লড়াইয়ের বাজার ; জাপানী-জর্মন প্রিন্টিং বন্ধ ; লড়াইয়ের পরে—।" আমেরিকানটি ভদ্রলোক। লড়াইয়ের পূর্বে এ্যালবম ছিল কি না সে বিষয়ে অতিরিক্ত অন্যায় কৌতূহল দেখাইয়া আমাকে বিপদগ্রস্ত করিলেন না।

শুনিতে পাই, সেই একমাত্র চিত্রকর যাঁহার এ্যালবম পাওয়া যায়, সরকারের ব্যবহারে ত্যক্ত হইয়া অধ্যাপকের কর্ম ছাড়ি-ছাড়ি করিতেছেন। 'কারবারী' মার্কিন চিত্রকর চিনে, 'কলচরড' বাঙলা সরকার চিনে না।

* * *

যুদ্ধের ফলে নানা অপকার, নানা উপকার হইয়াছে। তাহার খতিয়ান করিবার সময় এখনও আসে নাই। তবু একটি জিনিসের কথা ভাবিলেই মন উৎফুল্ল হইয়া উঠে। আসাম হইতে চীনে মোটরে যাইতে পারিব।

হিউয়েন সাং মঙ্গোলিয়া, তুর্কীস্থান, কাবুল হইয়া ভারতবর্ষ আসেন। অসহ্য কষ্ট তাঁহাকে সহিতে হইয়াছিল, ত্রিশরণ তাঁহার সহায় না হইলে সে অসম্ভব দুস্তর মরুভূমি, সঙ্কটময় হিন্দুকুশ উত্তীর্ণ হইয়া তিনি তথাগতের পুণ্যভূমিতে পৌঁছিতে পারিতেন না। ভারতবর্ষে তিনি কাশ্মীর, তক্ষশিলা, বিহার হইয়া বারেন্দ্রভূমি পর্যন্ত আসেন। সেখানে কামরূপের হিন্দুরাজার নিমন্ত্রণ পান। প্রথমে কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধচিত্তে যাওয়া-না-যাওয়া সম্বন্ধে মনে মনে বিচার করিয়া শেষ পর্যন্ত লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

কামরূপের রাজা তাঁহাকে উচ্চ পাহাড়ে তুলিয়া পূর্বদিকে হস্তপ্রসারণ করিয়া বলিলেন, "ঐ তো আপনার দেশ। আমার কতবার মনে হয়, আপনার দেশ একবার দেখিয়া আসি—কিন্তু এদিকে কোনো পথ এখনও নির্মিত হয় নাই।"

দেশের দিকে তাকাইয়া ভিক্ষু হিউয়েন সাংয়ের হৃদয় বিকল হইয়া গিয়াছিল। এত কাছে, অথচ এত দূরে! দুঃখ করিয়া ভাবিয়াছিলেন পথটি যদি থাকিত, তবে

কত শীঘ্র কত অল্প কষ্টে তিনি আত্মজনের কাছে উপস্থিত হইতে পারিতেন।

বর্ষার নির্মম বৃষ্টির অবিশ্রান্ত আঘাতে এই রাস্তার মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দেয়। তৈয়ারী হইয়াছে বটে, কিন্তু সরকার সেটিকে চালু রাখিবেন কি না বলিতে পারি না। যদি থাকে, তবে নানা সুবিধার মধ্যে ভারত-চীনে মধ্যস্থতাবিহীন সরল (পথ কুটিল হওয়া সত্ত্বেও) যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রহিবে। আমরা মনের আনন্দে চীন ঘুরিয়া আসিব। হিউয়েন সাংয়ের আত্মা সন্তোষ লাভ করিবে।

* * *

স্থলপথ দিয়া বন্ধ ভারত হইতে আরেকটি জায়গায় অল্পায়াসে যাওয়া যায়—সে কাবুল। শরৎকাল আসিয়াছে, তাই মনে পড়িল। এখন সেখানে ফল পচিতেছে, খাইবার লোক নাই।

ধনীরা শিলঙ যান, মুসৌরী-সিমলা যান, কাশ্মীর পর্যন্ত অনেকে ধাওয়া করেন, কিন্তু কাহাকেও কাবুল যাইতে দেখি না। অথচ যাওয়া যে খুব কষ্টকর তাহা নহে। পেশাওয়ার হইতে কাবুল মাত্র দুইশত মাইল মোটর পথ। প্রথম কুড়ি মাইল, খাইবার পাশের ভিতর দিয়া—সে কি অপূর্ব, রুদ্র দৃশ্য! দুই দিকে হাজার ফুট উচ্চ প্রস্তর গিরি দুশমনের মত দাঁড়াইয়া—নীচে সরু আঁকাবাঁকা রাস্তার উপর দিয়া কত চিত্র-বিচিত্র পোশাক, পাগড়ী পরিয়া কাফেলা-ক্যারেভান কাবুল চলিয়াছে, মাজার-ই-শরীফ চলিয়াছে, আমুদরিয়া পার হইয়া বোখারা যাইবে আসিবে। এদিকে গজনী-কান্দাহার হইয়া হয়ত হিরাত পর্যন্ত যাইবে আসিবে। ঘোড়া-গাধা-উটের পিঠে কত রঙয়ের কার্পেট, কত ঝকঝকে সামোভার, কত কারাকুলি পশম। সন্ধ্যায় নিমলা পৌঁছিবেন—সেখানে শাহজাহান বাদশার তৈয়ারী চিনার (সাইপ্রেস জাতীয়) বাগানের মাঝখানে নয়ানজুলির পাশে চারপাইর উপর না-গরম-না-ঠাণ্ডায় রাত কাটাইবেন—জলের কুলকুল শুনিয়া। ব্রাহ্মমুহূর্তে হাজার হাজার নরগিস (নারসিসস) ফোটার সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধে সঞ্জীবিত হইয়া চেতনালোকে ফিরিয়া আসিবেন।

সেইদিনই বিকালে কাবুল। পথের বর্ণনাটা আর দিলাম না। যে একবার দেখিয়াছে ভুলিবে না। শরতের কাবুল কোন হিল স্টেশনের ন্যূন তো নহেই—অনেকাংশে উত্তম। প্রচুর ফল, উৎকৃষ্ট দুম্বার মাংস, হজমী পানীয় জল, রুদ্র-মধুর দৃশ্য ও কাবুলীর সরল সহৃদয় বন্ধুত্ব। ঐতিহাসিক চিন্তার খোরাক পাইবেন বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী মোগল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, বাবুর বাদশাহের দীন ম্লান কবর কাবুলের পর্বতগাত্রে দেখিয়া।

* * *

অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ট্রামে প্রায়ই দেখি অসম্ভব ভিড়, অথচ চারিটি মহিলা চারিটি লেডিজ-বেঞ্চে আরামে বসিয়া আছেন। বসুন, আপত্তি নাই। কিন্তু যদি চারিটি মহিলা দুইখানা বেঞ্চিতে বসিতেন, তবে অন্ততঃ অন্য মহিলা না আসা পর্যন্ত চারিজন বৃদ্ধ বা ক্ষুদ্র ঐ খালি দুই বেঞ্চিতে বসিতে পারেন বা পারে। কোনো কোনো মেয়ে বলেন, ট্রামে-বাসে ছেলেরা অভদ্র ; ছেলেরা বলিবে মেয়েরা নির্মম।

লক্ষ্য করিয়াছেন যে, আজকাল ট্রামে-বাসে ছেলে-বুড়ো কমিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা কলিকাতার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যান কি প্রকারে, এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

৪

মহাত্মা গান্ধী কয়েকদিন হইল কস্তুরবা স্মৃতিরক্ষা কমিটিতে বলেন, 'গ্রামের কুটির-গুলিতে আলোক স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা আনিবার জন্যই কস্তুরবা স্মৃতি ভাণ্ডারের উৎপত্তি। গ্রামের স্ত্রীলোকদিগকে মানসিক, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। বনিয়াদী শিক্ষা বলিতে ইহাই বুঝায়।' মহাত্মাজীর প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

এই উপলক্ষে আমরা একটি বিষয়ের দিকে সকলের দৃষ্টি সবিনয় আকর্ষণ করি। যদি গ্রামে উপযুক্ত শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কোনো প্রকার কুটীর শিল্পও প্রবর্তন করা যায় তবে গ্রামের উৎপাদনী শক্তি ও সঙ্গে সঙ্গে ক্রয় করিবার ক্ষমতা বাড়িবে। তবে প্রশ্ন এই যে, শহরে উন্নত কলকব্জা দিয়া যেসব জিনিস প্রস্তুত হইবে তাহার সঙ্গে কুটীর শিল্প প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে কিনা। জাপান এই সমস্যার সমাধান করিয়াছিল গ্রামের কুটীর শিল্পের সঙ্গে শহরের কারখানার ঘনিষ্ঠ যোগ-স্থাপন করিয়া। 'অর্থাৎ যন্ত্রজাত মালের অনেক ছোট ছোট অংশ এমনা আছে যেগুলি গ্রামে বসিয়া অবসর সময়ে হাত দিয়া তৈয়ারী করা যায়—বিশেষ বিচক্ষণতা বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। শহরের কারখানাই কুটীরকে কাঁচা মাল ও টুকিটাকি যন্ত্রপাতি দেয় ও কারখানাই কুটীরের তৈয়ারী মাল সংগ্রহ করিবার ভার নেয়। কাজেই কুটীর শিল্পী এই ধান্দা হইতেও রক্ষা পায় যে গ্রামের বাজারে তাহার তৈয়ারী মাল কিনিবে কে ? রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব ডাইরেক্টার শ্রীযুক্ত মণিলাল নানাবটী এককালে জাপানে এই সমস্যা সমাধানটি বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া এদেশে ফিরিয়া এ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বাঙলাদেশের কয়েকজন

যুবাকেও আমরা চিনি যাঁহারা জাপানে বহু কলা শিখিয়া আসিয়াছেন। হয়ত তাঁহারাও এই বিষয়টি আলোচনা করিয়াছেন।

কস্তুরবা ফণ্ডের অর্থ ব্যয় করিয়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি কোনো কুটীর শিল্প প্রবর্তন করা হয় তবে তাহার জন্য আলাদা খরচ করিতে হইবে না। এইটি বিশেষ সুবিধা।

৫

ছেলেবেলার একটি কবিতা মনে পড়িল, প্রাক্‌শরতের বর্ণনা—

অনিচ্ছায় ভিক্ষা দেয় কৃপণ যেমতি
পড়ে জল সুবিরল সূক্ষ্মধার অতি।

সদাশয় সরকার যে কায়দায় রাজবন্দীদিগকে মুক্তি দিতেছেন, তাহাতেই কবিতাটি মনে পড়িল। সেদিন একজন অধুনা-নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'জেলে কি রকম দিন কাটিল?' বলিলেন, 'প্রথম তিন বৎসর ভালোই, কারণ মন স্থির করিয়া লইয়াছিলাম যে, সরকার যখন আর কখনো ছাড়িবেই না, তখন দুঃখে সুখে এইখানেই বাকী জীবনটা কাটাই। হঠাৎ দেখি সরকার ইঁহাকে ছাড়ে, উঁহাকে ছাড়ে। বন্ধু-বান্ধবদিগের সঙ্গসুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া সরকার একবার জেলে পুরিল, তারপর জেলের ভিতরে যাঁহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হইল (তাঁহারাই তো প্রকৃত বন্ধু—চাণক্য বলিয়াছেন, 'রাজদ্বারে যে সঙ্গে তিষ্ঠে সে বান্ধব', এ তো তারো বাড়া একেবারে ভিতরে, কারগারে) তাঁহারাও একে একে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন দ্বিতীয়বার বন্ধুবিচ্ছেদ—ডবল জেল। খালাস পাইবার সময় আবার অনেক বন্ধুকে ফেলিয়া আসিয়াছি। এখন তেহারা জেলের সুখ পাইতেছি।'

সরকারের অবৈতনিক মুখপাত্র হিসাবে বলিলাম, 'মেলা বন্ধুত্ব করা ভালো নয়। তোমাদের শঙ্করাচার্যই বলিয়াছেন।'

বন্ধু বলিলেন, 'বাড়ী গিয়া দেখি, মা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। শয্যা-গ্রহণ করিয়াছেন। শুনিলাম, প্রথম তিন বৎসর ঠিক খাড়া ছিলেন, কিন্তু শেষের এক মাস আশা-নিরাশায় দুলিয়া, অপেক্ষা করার ক্লান্তিতে, কে কে খালাস পাইয়াছে, কে কে পায় নাই, তাহাদের সঙ্গে মিলাইয়া আমার মুক্তির সম্ভাবনা কতটুকু হিসাব করিতে করিতে একদিন শয্যাগ্রহণ করিলেন।' সংস্কৃত প্রবাদটি বুঝিলাম যে, অধমের নিকট হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াও সুখ নাই।

শুনিতে পাই বড় কর্তাদের কেহ কেহ নাকি বলিয়াছেন, 'পূজার পূর্বে অথবা পরে সকলেই খালাস পাইবেন।' পূজার বিশেষ করিয়া পূজার পূর্বে ও পরের নিষ্কৃতিতে যে কি নিদারুণ পার্থক্য তাহা বুঝিবার মত বাঙালী কি বড় দপ্তরে কেহই নাই ?

* * *

মৌলানা আকরম খাঁ সাহেব সরকারকে হজ যাত্রীদের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

মোগল বাদশাহ আকবর গুজরাট জয় করিলে পর মোগলরা প্রথম সমুদ্র দর্শন করে, প্রথম সমুদ্র বন্দর তাহাদের হাতে আসে। সেই বৎসরই হুমায়ুনের বিধবা মহিষী ও হারেম মহিলারা সুরট বন্দর হইতে নৌকাযোগে মক্কা যান। স্থলপথে যাওয়া বিপদসঙ্কুল ছিল বলিয়া ইতোপূর্বে মোগল মহিলারা কখনও হজ যাইতে পারেন নাই। কিছু দিন পরেই আকবর একজন মীর উল-হাজ অর্থাৎ হজ অফিসার (ইংরাজ সরকার যেন না ভাবেন, যে তাঁহারাই সর্বপ্রথম এই সৎ কর্মটি করিয়াছেন) নিযুক্ত করেন। অহমদাবাদবাসী সম্ভ্রান্ত পীর বংশীয় মীর আবু তুরাব বহু হজ যাত্রী ও ভারত সরকারের তরফ হইতে দশ লক্ষ টাকা সঙ্গে লইয়া সুরটের বন্দর-ই-হজ (তাপ্তী নদীতে একটা ঘাট এখনও এই নামে গুজরাতে সুপরিচিত) হইতে পাল তুলিয়া মক্কা পৌছেন। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে ঐ অর্থ মক্কার শরীফ (গবর্নর), আলিম উলেমা (পণ্ডিত-শাস্ত্রী) ও দীনদুঃখীদিগকে অতি আড়ম্বরে ও বদান্যতার সহিত বণ্টন করা হয়। মক্কায় ভারতের জয়ধ্বনি উঠে ; ভারতের হাজীরা সর্বত্র রাজার আদর পান। ফিরিবার সময় আবু তুরাব পয়গম্বরের পদচিহ্নিত একখানা পবিত্র প্রস্তর আনয়ন করেন। 'আকবর নামা'য় বর্ণিত আছে বাদশাহ আকবর সেই প্রস্তরকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য আপন স্কন্ধে বহন করিয়াছিলেন। প্রস্তরখানি অদ্যাপি আহমদাবাদে আছে।

যতদূর মনে পড়িতেছে, হৃতগর্ব মোগল সম্রাট রফী উদ্-দরজাতের সময় পর্যন্ত বৎসর বৎসর মীর উল-হাজ সরকারের পক্ষ হইতে অর্থ লইয়া মক্কা যাইতেছেন। 'মিরাত-ই-অহমদী' নামক ফার্সীতে লিখিত গুজরাতের ইতিহাসে এই সম্বন্ধে অতি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আছে। পুস্তকখানির লেখক আলী মহম্মদ খান গুজরাত সুবার দেওয়ান বা রাজস্বসচিব ছিলেন। তখনকার দিনে রাজনীতি ও ধর্মনীতি অঙ্গাঙ্গি-ভাবে বিজড়িত ছিল বলিয়া এই অর্থব্যয়কে অপব্যয় মনে করা হইত না। আজও পৃথিবীর যে কোন এম্বেসি বিদেশে ইহা অপেক্ষা বেশি অর্থের অপব্যয় করেন।

ভারত যদি আজ স্বাধীন হইত তবে আকরম খাঁ সাহেবের মত মৌলানার

ধর্মেচ্ছা সরকার সানন্দে পূর্ণ করিতেন। মৌলানা সাহেবকে মুখ খুলিয়া বলিবার প্রয়োজনই হইত না।

৬

লিখিতে মন যায় না। যে সব বন্ধুরা জেল হইতে খালাস পাইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া ও তাঁহাদের কারাকাহিনী শুনিয়া নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মে, মনে হয় এই অর্থহীন প্রলাপের কি প্রয়োজন? জানি, সহৃদয় পাঠকবৃন্দ অধমের লেখা সহ্য করেন, কেহ কেহ পত্র লিখিয়া তাহাকে উৎসাহিত করেন, কিন্তু যে সব কাহিনী শুনি, নিষ্কৃতদের যে ভগ্নস্বাস্থ্য দেখি তখন সে কাহিনী, সে অবস্থা সত্যের লেখনী সংযোগে পাঠকের হৃদয়মনে সঞ্চারিত করিতে পারি না বলিয়া বহু বৎসরে যে সামান্য সাধনা-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা পণ্ডশ্রম বলিয়া ধিক্কার দিই।

নিষ্কৃতদের অভিজ্ঞতা এতই সহজ, এতই সরল যে, তাহা প্রকাশ করিতে গিয়া বাক্যালঙ্কার বিড়ম্বিত, 'মার্জিত' লিখনশৈলী অপমানিত।

সহৃদয় পাঠক এই ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য মার্জনা করিবেন।

* * *

আমার এক বন্ধু যাহাকে বলে উন্নাসিক। অতি সদর্থে। তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা এতই প্রবল, দেশের মঙ্গলেচ্ছা এতই অনাবিল যে, বিদেশীয় কয়েকটি সাহিত্যসম্পদে গৌরবান্বিত ভাষা জানা সত্ত্বেও সে-সব সাহিত্যের উত্তম উত্তম কাব্য দর্শন পড়িবার তাঁহার সময় হইত না—নাটক নভেল মাথায় থাকুন। তুলনামূলক রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি—তাহাদের ইতিহাস—ইত্যাদি পড়িতে পড়িতে তাঁহার সময় ফুরাইয়া যাইত।

কারাপীড়নে অধুনা তিনি আর কিছুতেই চিত্তসংযোগ করিতে পারিতেছিলেন না বলিয়া (সেতারখানাও ফেরৎ পাঠাইয়াছেন) আমার কাছে True Story, Dctective Story জাতীয় তরল বস্তু চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। দুঃখে-সুখে মিশ্রিত হৃদয় লইয়া পাঠাই। খবর পাইলাম সদাশয় I. B. সেগুলি এ যাবৎ তাঁহাকে দেন নাই। সরকারের এই কি ভয় যে, তিনি ডিটেকটিভ গল্প হইতে আণবিক বোমা বানাইবার কায়দা রপ্ত করিয়া সর্বজনীন দাতব্য কারাগার প্রতিষ্ঠান লণ্ডভণ্ড করিয়া দিবেন—না ট্রু স্টরি হইতে আদিরসাত্মক গল্প পড়িয়া তাঁহার চরিত্রদোষ হইবে। সরকারের হেফাজতে যখন আছেন, তখন তাঁহার 'চরিত্র রক্ষা'

করা তো সরকার-গার্জেনেরই কর্ম !

* * *

আরেক বন্দী ছিলেন বড়ই অরসিক। তিনি একখানা biologyর প্রামাণিক পাঠ্যপুস্তক চাহিয়া পাঠান। নামঞ্জুর। কয়েকজন রাজবন্দী একযোগে কারণটি অতি বিনয় সহযোগে জানিতে চাহিলেন। উত্তরটি অক্ষরে অক্ষরে তুলিয়া দিতেছি।

"মশাই, আপনারা যে কখন কি চেয়ে বসেন, তার তো ঠিক-ঠিকানা নেই। আজ এ biology, কাল ও biology, পরশু সে biology !"

রাজবন্দীদের কেহ দার্শনিক, কেহ ঐতিহাসিক, কেহ নৃতত্ত্ববিদ। সকলেই হতবুদ্ধি; ব্যাপারটা না বুঝিতে পারিয়া একে অন্যের মুখের দিকে তাকান। Biology যে আবার পঁচিশ কেতার হয় তাহা তো তাঁহারা কখনো শুনেন নাই !

রহস্য সমাধান হইল; I. B. নৈরাশ্যের দরদীয়া সুরে বলিলেন, "কোন দিন যে শেষটায় গান্ধীর biology চেয়ে বসবেন না তারি বা ভরসা কোথায় ? তখন আমি কোথায় যাই বলুন তো ?"

I. B. বিদ্যাসাগর biology ও biographyতে মিশাইয়া ফেলিয়াছেন।

গুরু সাক্ষী, ধর্ম সাক্ষী, দোষ দিতেছি না। অত পাণ্ডিত্য না ধরিলে বড়-কর্তা I. B.র সেনসর হইবেন কেন ? ইহার চেয়ে অল্প বিদ্যায়ও আইনস্টাইনকে রিলেফটিভিটি শিখানো যায়, অপিসারটিকে আমরা সবিনয় সাবধান করিয়া দিতেছি। তিনি যদি হুঁশিয়ার হইয়া না চলেন, তবে একদিন দেখিবেন যে, তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের সম্মান রক্ষার্থে অক্সফোর্ডের বড়কর্তারা তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরের তখতে বসাইয়া দিয়াছেন।

আরেক বন্দী অতি সুপুরুষ। কাঁচা সোনার বর্ণ, ঢেউ খেলানো বড় বড় কালো চুল, খড়্গের মত নাক, আর দরাজী কপাল। যতদিন বাহিরে ছিলেন মাতা ও স্ত্রীর উৎপাতে মাঝে মাঝে দাড়ি কামাইতেন—অর্থাৎ মুখমণ্ডল ঘন-বর্ষার কদম্ব-পুষ্পের সৌন্দর্য ধারণ করিলে পর। জেলে গিয়া পরমানন্দে তিনি দাড়ি গজাইতে আরম্ভ করিলেন। সময় বিস্তর বাঁচিল, রাগ করিলে উৎপাটন করিবার সুলভ সহজ বস্তু জুটিল—আর চিন্তা-বিক্ষোভের কারণ তো হামেসাই উপস্থিত হইবে।

জেলে যে অতি আরামে আছেন এই বুঝাইবার জন্য তিনি সর্বদাই পত্নীকে রসে টৈটম্বুর পত্র লিখিতেন। তাহারি একখানাতে নিজের তরুণ দাড়ির বর্ণনা দিয়া বলিলেন, 'চেহারাটা এখন অনেকটা ক্রাইস্টের মত হইয়াছে।'

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ইস্তেহারের কথা আমরা আর পাঁচজন প্রায় ভুলিয়া গিয়া

ছিলাম। সর্ব ধর্মে সকলের সমান অধিকার অথবা এই রকম কিছু একটা। ঠিক মনে নাই।

I.B.র স্মরণশক্তি পৃথিবীর ইতিহাসে বিস্ময়জনক ও হৃদিত্রাস-সঞ্চারক। ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। পাছে ক্রাইস্টপন্থী কাহারো মনঃপীড়ার সঞ্চার হয়, এই ভয়ে সেনসার এন্তার দুশ্চিন্তার ভার নামাইলেন ছত্রটি গিলোটিন করিয়া।

সহৃদয় পাঠক গীতা অথবা ঐ জাতীয় কোনো পুণ্যগ্রন্থে আছে না, ধর্মসংস্থাপনার্থে শ্রীকৃষ্ণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন?

হে biology Biography অভিনয়করণকারী নটবর সেনসর, তোমাকে বার বার নমস্কার—

'নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্বত অব সর্ব'

'তোমাকে সম্মুখ হইতে নমস্কার, তোমার পশ্চাৎ দিকে নমস্কার' তুমি যে 'অনন্তবীর্য' অনন্তবিক্রম ধরো তাহাতে সন্দেহ করিবার মত যুগ্ম-মস্তক কার স্কন্ধে?

খ্রীষ্টধর্ম 'ওয়াজ ইন্ ডেঞ্জার'—তুমি তারে করিলে উদ্ধার।

* * *

বৃথা বাক্যব্যয়। বর্তমান যুগ সাংখ্যের—অর্থাৎ Statistics এর। তাই শুদ্ধ স্টাটিস্টিক্স্ নিবেদন করি।

১৯২০এ অসহোযোগ আন্দোলনে ভদ্রলোক যোগ দেন। ১৯২৭এ নানা-প্রকারে প্রপীড়িত হইয়া মস্কো চলিয়া যান। ১৯২৮এ অসুস্থ শরীর লইয়া বার্লিন। ১৯৩৩এর কয়েক দিবস জর্মন জেল। ১৯৩৪এ দেশে প্রত্যাবর্তন।

১৯৩৫ এখানে বৌণ্ড ডাউন। ১৯৩৬এর গ্রীষ্মে গ্রেপ্তার ও সাত মাসের জেল। ৩৭-৩৮ বাহিরে। সেপ্টেম্বর ৩৯-৪১ জেলে—প্রায় এক বছর। ৪১-৪২ এক বৎসর বাহিরে। ৪২এর এপ্রিল পুনরায় লক্ষ্ণৌয়ে গ্রেপ্তার ও বন্দী—তারপর ফতেহগড়—তারপর বাঙলা দেশের জেল—সর্বকারাগারতীর্থ পরিক্রমা করিয়া এখন তিনি তথাগত—আজও তিনি জেলে। একটানা তিন বৎসর আট মাস। কত রোগশয্যা মৃত্যুদর্শন কত হাসপাতাল, আত্মীয় স্বজনের কত আকুলি বিকুলি কত কর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কত প্রতিশ্রুতি কত আশা-নৈরাশ্যের সুখস্পর্শে পদাঘাত।

ইতোমধ্যে পত্নীর ছয় মাস কারাবাস, ভগ্নীদর্শনাগতা শ্যালিকার তিন মাস ও নিরীহ পাচকের নয় মাস!

ভদ্রলোকের নাম শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভগ্নস্বাস্থ্যবশতঃ ওজন কমায় তিনি এখন ছোটলোক এবং ছোট-লোকের সঙ্গই তিনি বাঞ্ছা করেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা ১.১২.৪৫

সহৃদয় পত্রলেখকগণের প্রতি আমার সকরুণ নিবেদন এই যে, আমি অতি অনিচ্ছায় অনেক সময় তাঁহাদের পত্রের উত্তর দিতে অক্ষম হই। তাঁহারা যে-সব বিষয় লইয়া আলোচনা চাহেন সেগুলিও সব সময় করতে সক্ষম হই না। তাহার প্রধান কারণ 'আনন্দবাজার' বাঙলা পত্রিকা; অধিকাংশ পাঠক ইংরাজি জানেন না। কাজেই তাঁহারা বহু বিষয়ের রস গ্রহণ করিতে পারেন না। আমি প্রধানতঃ তাঁহাদিগের সেবা করিতে চাহি বলিয়াই 'আনন্দবাজারে' লিখি। গুণীরা 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে' লেখেন। আবার কোনো কোনো পাঠক শাসাইয়া বলিয়াছেন, 'সত্য-পীর সাবান ইত্যাদি সামান্য বিষয় লইয়া আলোচনা করে কেন, সাবানের আলোচনাও তাহার নিকট হইতে শুনিতে হইবে নাকি?'

আমার বক্তব্য, আমি অত্যন্ত সাধারণ রাস্তার লোক, ম্যান ইন দি স্ট্রীট। দুর্বলতাবশতঃ মাঝে মাঝে পণ্ডিতি করিবার বাসনার উদ্রেক হয়। এবং করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া লাঞ্ছিত হই। সহৃদয় পাঠক, আপনার কি সত্য সত্যই এই অভিলাষ যে, অধম প্রতি শুক্র শনি সিন্নি (শিরনি) ও পূজার পরিবর্তে বিদ্বজ্জন-মণ্ডলী কর্তৃক তিরস্কৃত হউক?

অতঃপর বক্তব্য 'সাবান' বস্তুটি বুদ্বুদ সমষ্টি বলিয়া কি সে সম্বন্ধে আলোচনা বুদ্বুদেরই ন্যায় অসার? গুরুজন, জার্মান পণ্ডিত ও যোগীকে এক সাবানে সম্মিলিত করিতে সমর্থ হইলাম সে কি কম কেরদানি? হায় পাণ্ডিত্য করিতে গিয়া বিড়ম্বিত হই, সাবানের মত নশ্বর বস্তু লইয়া আলোচনা করিতে গিয়াও পণ্ডিতের যষ্টিতাড়না হইতে নিষ্কৃতি নাই। উপায় কি?

ভাবিয়াছিলাম অদ্য ইলিশ মাছ কি প্রকারে 'দম পোখ্‌ত' রান্না করিতে হয় তাহা সবিশদ বর্ণনা করিব। সে অতি অদ্ভুত রান্না। আস্ত মাছখানা হাঁড়িতে রাখিবেন, আস্ত মাছখানা রান্না হইয়া বাহির হইবে। অনভিজ্ঞের কণ্ঠত্রাস-সঞ্চারক ক্ষুদ্র কাঁটাগুলি গলিয়া গিয়াছে, বৃহৎ কাঁটাগুলির তীক্ষ্ণতা লোপ পাইয়াছে।'

পূর্ববঙ্গে কোনো কোনো অঞ্চলে এই প্রকার রান্নার কায়দা এত গোপন রাখা হয় যে, মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি যাইবার সময় শপথ করিয়া যাইতে হয় যে, সে শ্বশুর-বাড়ির কাহাকেও পঞ্চম মকারের বাঙালী বল্লভ এই 'ম' কারটার গভীর গুহ্য তত্ত্বটি শিখাইবেন না।

সেই গোপন তত্ত্বটি আজ যবনিকান্তরাল হইতে প্রকাশ্য দিবালোকে বাহির করিব মনস্থির করিয়াছিলাম। সর্বরহস্য সর্বকালের জন্য সমাধান করিয়া বহু বধূর

নির্যাতন, পরিবারে পরিবারে দ্বন্দ্ব কলহের অবসান করিব ভাবিয়াছিলাম কিন্তু গম্ভীর পাঠকের তাড়নায় মনস্কামনা পূর্ণ হইল না।

ফলে ইলিশের কাঁটা আরো একশত বৎসর বহু অনভিজ্ঞের গলায় বিঁধিবে—কিন্তু আমার তাহাতে পাপ নাই।

বাঙালদের কথাই হউক।

এক বাঙাল বেগুন চাহিতে গিয়া 'বাইগন' বলিয়াছিল; তাহাতে 'ঘটির' রসোদ্রেক হয় ও বার বার ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে থাকে, "কি বলিলে হে? কি কথা বলিলে?" বাঙাল লজ্জিত হইয়া কিছুক্ষণ নিজের উচ্চারণ লুকাইবার চেষ্টা করিয়া শেষে বিরক্ত হইয়া বলিল, "বেশ কইছি, বাইগন কইছি, দোষডা কি হইল?" ঘটি আত্মপ্রসাদজাত মৃদুহাস্য করিয়া বলিল, " 'বাইগন'! ছোঃ! কী অদ্ভুত উচ্চারণ। আর শোনো ত আমরা কি রকম মিষ্টি উচ্চারণ করি, 'বেগুন'!" বাঙাল চটিয়া বলিল, "মিষ্টি নামই যদি রাখবা তবে 'প্রাণনাথ' নাম দেও না ক্যান? চাইর পইসার 'প্রাণনাথ' দেও। একসের 'প্রাণনাথ' দেও। হইল?"

উচ্চারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আদেশ উপস্থিত। পত্রলেখক বলিয়াছেন যে সংস্কৃত উচ্চারণ লইয়া যখন আমি এত মাথা ফাটাফাটি করিতে প্রস্তুত তখন বাঙলাকে অবহেলা করিবার কি কারণ থকিতে পারে? বাঙলা উচ্চারণ কি সংস্কৃত উচ্চারণ অপেক্ষাও অধিক জরুরী নহে?

নিশ্চয়ই! কিন্তু মুশকিল এই যে, বাঙলা উচ্চারণ এখন অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতেছে। প্রধানতঃ রেডিয়োর কল্যাণে। পূর্ববঙ্গে এক ব্যাপক চেষ্টা দেখা যাইতেছে, মোটামুটি যাহাকে পশ্চিম বঙ্গের উচ্চারণ বলা হয় তাহার অনুকরণ করিবার।

অথচ 'বেগুন' অপেক্ষা 'বাইগন'ই আমার কানে মধুর শোনায়। কিন্তু মাধুর্যই তো শেষ কথা নয়। পশ্চিম বাঙলার 'চ' ও 'জ' অপেক্ষা পূর্ববঙ্গের যে মোলায়েম 'চ' 'জ'য়ের গার্হস্থ্য সংস্করণ আছে তাহা অনেক পশ্চিমবঙ্গবাসীরও ভালো লাগে, কিন্তু উচ্চারণ দুইটি যে ঈষৎ অনার্যোচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ভুল বলিলে ভুল বলা হয় না।

কিন্তু তর্ক ও আলোচনা করিবার পূর্বে প্রথম প্রশ্ন আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য কি? বাঙলা প্রাণবন্ত, বর্ধনশীল ভাষা। তাহার নানা উচ্চারণ, নানা বর্ণ, নানা গন্ধ থাকিবে। থাকা উচিত। অথচ চট্টগ্রাম বাঁকুড়াকে বুঝিবে না। মেদিনীপুর শ্রীহট্টকে বুঝিবে না—সে কথাও ভালো নহে।

অধম যখন যেখানে যায় সেখানকার উচ্চারণ শিখিবার চেষ্টা করিয়া হাস্যাস্পদ

হয়। ইহা ছাড়া যে অন্য কোনো সমাধান আছে ভাবিয়া দেখে নাই। পাঠক কি বলেন ?

পূর্ববঙ্গের কথা উঠিলেই মনে হয় যে, তাহার লোক-সাহিত্যের প্রতি কি অবিচারই না করা হইয়াছে। এ যাবৎ, সেই অফুরন্ত সাহিত্য হইতে কতটুকু প্রকাশিত হইয়াছে ? গীত, বারমাস্যা ছাড়াও 'আমির হামজা' 'গুলে বাকওয়ালী' প্রভৃতি বিদেশী কেচ্ছার পূর্ববঙ্গীয় রূপান্তর যে কী আনন্দদায়ক তাহা সুরসিক মাত্রই জানেন। 'লয়লা-মজনু' শুষ্ক মধ্য আরবের নায়ক-নায়িকা, যেখানকার কবি গাহিয়াছেন,—'হে প্রিয়া, প্রার্থনা করি পরজন্মে যেন তুমি এমন দেশে জন্মাও যে দেশের লোক জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিবার মত বিলাস উপভোগ করিতে পারে।'

সেই শুষ্ক আরবের নায়িকা লায়লী পূর্ববঙ্গের কেচ্ছায় অন্য রূপ গ্রহণ করিয়াছেন নৌকায় চড়িয়া—উটে নহে প্রিয়সন্দর্শনে যাইতেছেন। ছৈয়ের ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া কমল তুলিতেছেন, সিঙ্গাড়া তুলিতেছেন। পদ্ম খোঁপায় গুঁজিতেছেন।

পূর্ববঙ্গের কবির সাহস অসীম যে রসসৃষ্টি করিয়াছেন তাহা অপূর্ব।

আনন্দবাজার পত্রিকা ১২.১. ১৯৪৬

ঘরে-বাইরে

প্রতি সোমবার তোমাদের আনন্দমেলার জানালার বাইরে বসে তোমাদের কথা-বার্তা শুনি আর ভাবি 'হায়, আমাকে কেউ ভেতরে ডেকে নেয় না কেন ?' জোর করে সবাই আমাকে বসিয়ে রেখেছে গুরুজনদের সঙ্গে, বয়স আমার বেশি বলে। কেউ জানে না, আমার বয়স 'কমতির' দিকে ; বয়স কমতির দিকে কি তার মানে জানো না ? কেন সুকুমার রায়ের হ য ব র ল পড় নি ? ওরকম বই দুখানা হয় নি। তাতে টেকো বুড়ো জিজ্ঞেস করছে, 'বয়স কত ?' ছেলেটি বললে, 'আট'। টেকো জিজ্ঞেস করলে, 'বাড়তি না কমতি ?' ছেলেটি বললে, 'সে আবার কি ?' টেকো বললে, 'তাও জানো না ? এই মনে করো আমার বয়স চল্লিশ, একচল্লিশ, বিয়াল্লিশ হচ্ছে, তখন 'বাড়তি'। বিয়াল্লিশে পৌঁছুতেই ঘুরিয়ে দিলুম, তখন ফের একচল্লিশ, চল্লিশ, উনচল্লিশ হয়ে 'কমতিতে' চলল। তা না হলে বুড়ো হয়ে মরি আর কি ? এখন আমার বয়স চোদ্দ। 'কমতি' চলছে !' শুনে ছেলেটি হেসেই খুন—টেকো বুড়োর বয়স নাকি চোদ্দ!

হেসো না, সত্যি বলছি আমার বয়স কমতির দিকে। সেদিন দেখি 'চিঠির

খলি'তে তোমাদেরই এক বন্ধু নদীয়ার সভ্য (১৪৪১৬) সত্যপীরের লেখা নিয়ে 'মৌমাছি'র সঙ্গে আলোচনা করেছে। জানালার পাশে বসেছিলুম, তখুনি ডিঙিয়ে এসে 'আনন্দ-মেলা'র খেলাঘরে ঢুকে পড়লুম। ভাবলুম অসভ্য থেকে সভ্য হয়ে গিয়েছি; এইবার দুনিয়ার নানাদেশ ঘুরে যে নানাগল্প যোগাড় করে রেখেছি তারি এক একখানা ছাড়ব আর তোমরা বুঝে নেবে আমার বয়স 'কমতির' দিকে কিনা।

পয়লা নম্বর এই বেলা শুনে নাও।

স্বর্গীয় জগদানন্দ রায় শান্তিনিকেতনে ইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। জগদানন্দ রায়ের নাম শোনোনি, বই পড়নি? তবে ভুল করেছ। তিনি একদিন ক্লাসের একটি ছেলের কান মলে দিচ্ছিলেন। শান্তিনিকেতনের ভেতরে অবিশ্যি মারধোর করা বারণ, কিন্তু একদম কেউ যদি সে আইন না ভাঙে তবে লোকে জানবে কি করে যে আইনটা আদপেই আছে। তা ছাড়া তিনি তাকে কানে ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে নিয়েছিলেন—সে তো তখন আর আশ্রমের ভেতর নয়—উপরে। আশ্রমের ভেতরেই তো মারধোর বারণ। তা সে আইনের কথা থাক—জগদানন্দ-বাবু ছেলেদের এত প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন যে কেউ কখনো ওসব জিনিসে খেয়াল করত না।

কিন্তু ঠিক ঐ সময় বড়বাবু বেড়াতে বেরিয়েছেন, আর দূর থেকে দেখতে পেয়েছেন। 'বড়বাবু' কে জানো? তিনি রবীন্দ্রনাথের সব চেয়ে বড়দাদা। গুরুদেব, গান্ধীজী ওঁকে বড়দাদা বলে ডাকতেন। গেল শতক আর এই শতক নিয়ে হিসেব করলে আমাদের দেশে দুজন সত্যিকার দার্শনিক জন্মেছেন—একজন বড়দাদা, আরেকজন স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

ব্যাপারটা দেখে বড়বাবু বাড়ি গিয়ে জগদানন্দবাবুকে একটি দোহা লিখে পাঠালেন,

"শোনো হে জগদানন্দ দাদা,
গাধারে পিটিলে হয় না অশ্ব, অশ্বেরে পিটিলে হয় যে গাধা!"

আমরা তো হেসেই খুন। 'গাধাকে পিটলে ঘোড়া হয় না', সে-কথা তো সবাই জানতুম, কিন্তু ঘোড়াকে পিটলে যে সে গাধা হয়ে যায় এটা বড়বাবুর আবিষ্কার! আর জগদানন্দ দাদার সঙ্গে গাধা শব্দের মিল শুনে আমাদের খুশি দেখে কে?

জগদানন্দবাবু মনের দুঃখে সেদিন থেকে কানমলা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা ২৪. ৯. ১৯৪৫

ভাষা সংস্কৃতি সাহিত্য

ঐতিহ্য

হটেনটট এবং ভারতবাসীতে পার্থক্য কোথায় ?

শিক্ষাবিদ পণ্ডিতেরা সমস্বরে বলেন, "কোনো পার্থক্যই নেই। উত্তম বাতাবরণে রেখে উপযুক্ত শিক্ষা দিলে প্রাপ্তবয়স্ক হটেনটট ও ভারতীয়ে কোনো পার্থক্য থাকে না।"

কিন্তু ঐতিহাসিক বলেন, "পার্থক্য বিলক্ষণ আছে। হটেনটট যখন তার শিক্ষাদীক্ষা সমাজ এবং রাষ্ট্রনির্মাণে নিয়োগ করে, তখন পদে পদে তার কাছে ধরা পড়ে, যে-ঐতিহ্য যে-সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে উন্নত সমাজ আগুয়ান হয়, তার সে ঐশ্বর্য নেই। এবং নেই বলে তাকে যে প্রতি সমস্যায় অন্য সংস্কৃতি থেকে ধারই শুধু করতে হয় তা নয়, তার সম্পূর্ণ ক্ষমতার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ দিতেও সে তখন অসমর্থ হয়।"

দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা সরল হয়ে যায়। বেদ উপনিষদের ঐতিহ্য না থাকলে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিশ্বকবি হওয়া সম্ভবপর হত না, যোগচর্চার ঐতিহ্য না থাকলে শ্রীঅরবিন্দ সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে পারতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধ্যানৈশ্বর্য না পেলে বিবেকানন্দ বিশ্বজনকে মোহিত করতে পারতেন না। বৈষ্ণব-ধর্মের বিশ্বপ্রেম এদেশে না থাকলে মহাত্মাজী যুযুৎসু-ইংরেজকে অহিংস পদ্ধতিতে পরাজিত করতে পারতেন না।

যুগ যুগ সঞ্চিত আমাদের এই যে ঐতিহ্য, একে অবহেলা করেই ইংরেজ তার আপন শিক্ষাপদ্ধতির বিকৃত অনুকরণ এদেশে বিস্তার করেছিল। যে সম্পদে আমাদের গৌরব, ইংরেজ সে-সম্পদ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেনি, ধরলে আজ আমরা এতদূর আত্মবিস্মৃত হতুম না।

শুধু তাই নয়, সংস্কৃত-চর্চা যদি শুধু ইংরেজের স্কুল-কলেজেই সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে আমাদের ঐতিহ্যের পনেরো আনা এতদিনে লোপ পেয়ে যেত। কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় আজ পর্যন্ত কয়খানা সংস্কৃত বই প্রকাশ করেছে, তার সঙ্গে এক নির্ণয়সাগর প্রেসের তুলনা করলেই ইংরেজ স্থাপিত বিদ্যায়তনের দৈন্য ধরা পড়ে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে ইংরেজের অবহেলা, ইংরেজ রাজত্বের অর্থনৈতিক নিপীড়ন সত্ত্বেও আমাদের ভট্টপল্লী, কাশী, পুণা, মাদুরা এখনো লোপ পায়নি।

হটেনটটের সঙ্গে এইখানেই আমাদের পার্থক্য। আমরা ভারতবর্ষে যে নবীন রাষ্ট্র নির্মাণ করতে যাচ্ছি, তার জন্য আমাদের ভাণ্ডারে আছে ঐতিহ্যগত অফুরন্ত

সম্পদ। কিন্তু এই সম্পদ কাজে লাগাবার কোনো লক্ষণ তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। রাষ্ট্রভাষা কি হবে, শিক্ষার মাধ্যম কি হবে সে নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি এবং সে সংস্কৃতির প্রধান বাহন টোল-চতুষ্পাঠী কি প্রকারে আমাদের প্রধান প্রধান শিক্ষায়তনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আমাদের শিক্ষাকে ঐতিহ্যালোকমণ্ডিত সর্বাঙ্গসুন্দর করবে, তার তো কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না।

জানি, শুধু টোল-চতুষ্পাঠীর শাস্ত্রচর্চা নিয়ে বিংশ শতাব্দীর বিদ্যাচর্চা সম্পূর্ণ হয় না; কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা জানি, দেশের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন শিক্ষা বৃহত্তর ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিক প্রস্তুত করতে পারবে না।

তথাকথিত প্রগতিপন্থীরা হয়তো বলবেন, "অতীতের 'জঞ্জাল' বাদ দিয়ে 'মুক্ত মনে' অগ্রসর হও।"

উত্তরে নিবেদন করি, "১৯১৯ সালে রুশও এই কথাই বলেছিল। অতীতের 'জঞ্জাল'কে বিসর্জন দিতে গিয়ে তখন সে যে শুধু ধর্মকে নিষ্পেষিত করেছিল তা নয়, টলস্টয় পুশকিন টুর্গেনিভের মত লেখকের ঐতিহ্যও বাদ দিয়ে সে 'নূতন সংসার' পেতেছিল। কিন্তু যেদিন জার্মানী তার সে-সংসারে আগুন ধরালো তখন দেখা গেল, সে-সংসার বাঁচাবার জন্য আগ্রহের বড়ই অভাব। তখন আবার খোলা হল গির্জাঘর, আবার ডাকা হল অনাদৃত ঐতিহ্য-পন্থীদের, আবার চিৎকার করা হল 'পবিত্র রাশিয়া'র (Holy Russia) নামে, আবার আহ্বান প্রচারিত হল টলস্টয়, পুশকিনের দেশকে বাঁচাবার জন্য।

রুশ সেদিন হুঙ্কার দিয়ে বলেছিল, "জয়তু ইভান দি টেরিব্‌ল্।" "জয়তু ঐতিহ্যঘন মার্কস" বলেনি।

ভারতবর্ষকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করবে কে? ভারতীয় ইতিহাসের সে ধারার সন্ধান কোথায়—যে-ধারা বহু জাতি, বহু বর্ণ, বহু আর্য, বহু অনার্যকে এক করে নিয়ে বিশাল থেকে, বিশালতর হয়ে বিশ্বমানবকল্যাণের সাগর সঙ্গমের দিকে বিজয় গর্জনে অগ্রসর হয়েছিল?

ঐতিহ্যগত সে-সংস্কৃতি ধারার সঙ্গে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদি সংযুক্ত না হয়, তবে হটেনটটে ভারতীয়ে কোনো পার্থক্য থাকবে না।

দৈনিক বসুমতী

কেহ বলেন বিয়াল্লিশের আন্দোলন ফলপ্রসূ হয় নাই ; কেহ বলেন আন্দোলন কংগ্রেসের ছিল না, ফলপ্রসূ হইল কি না তাহাতে কংগ্রেসের লজ্জিত বা মর্মাহত হইবার কিছুই নাই ; কেহ বলেন, না, আন্দোলন কংগ্রেসেরই এবং বহু দেশপ্রেমিক তাহার সর্ব দায়িত্ব লইতে প্রস্তুত আছেন।

এসব তো তৈলাধার পাত্র ও পাত্রাধার তৈল লইয়া হাতীবাগানের নৈয়ায়িকদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্ক। জিজ্ঞাসা করি আগস্ট মাসে সমস্ত দেশব্যাপী জাগরণে যাঁহারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহারা কি উকিল ডাকিয়া আইন মিলাইয়া আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন ? মনে পড়ে বোম্বাই সহরের স্কুল-কলেজের ছেলেরা সেদিন উৎসাহের আবেগে কি কাণ্ডটাই না করিয়াছিল। যাহা কিছু করিয়াছিল, তাহার কোনোটাই হয়ত স্বরাজের পথ সুগম করিয়া দেয় নাই. পক্ষান্তরে কোনোটা হয়ত স্বরাজ সাধনার পথে অন্তরায় ছিল, কিন্তু সেই রাসায়নিক বিশ্লেষণই তো শেষ কথা নয়। গরুড়ের ক্ষুধা লইয়া মানুষ যখন জাগে, তখন কি তার খাদ্যাখাদ্য বিবেচনা বোধ থাকে ? কিন্তু ক্ষুধাকে নমস্কার করি, সেই জাগরণকে দেশের চরম মোক্ষ বলিয়া জানি, স্বরাজ আজ পাইলাম অথবা দশ বৎসর পরেই পাইলাম। ভুলিলে চলিবে না যে কংগ্রেস পূর্ণ অখণ্ড ভারতবর্ষের মুখপাত্র। কংগ্রেসের আন্দোলন দেশের আন্দোলন, ও স্বরাজ লাভের জন্য দেশের জনসাধারণের ব্যাপক আন্দোলন মাত্রই কংগ্রেসের আন্দোলন—সে স্বতঃস্ফূর্তই হউক আর ধৈর্যচ্যুতিবশতই হউক।

কারণ, এই জাগরণই কি সত্য নয় ? এই জাগরণের পুরোভাগে থাকিয়া যাঁহারা প্রাণ দিলেন তাঁহারা কি স্বরাজ পান নাই ? তাঁহাদের আত্মা অবিনশ্বর লোকে যায় নাই ? রাজার রাজা যিনি তাঁহার ক্রোড়ে কি তাঁহারা আসন পান ; স্বরাজ যেদিন আসিবে সেদিন দুই মুষ্টি অন্ন হয়ত বেশি পাইব; হয়ত রমণীরা আরো বেশি অলঙ্কার পরিবেন ; হয়ত পণ্ডিতেরা আরো. বেশি পুস্তক লিখিবেন, হয়ত বিসূচিকায় কম প্রজা মরিবে, কিন্তু মুখ্য যাহা পাইব তাহা তো স্বাধীনতা ; এবং নিশ্চয় জানি সে স্বাধীনতার প্রথম যুগে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত দেশকে গড়িতে গিয়া আমাদিগকে অনেক দুঃখ অনেক দৈন্য সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু তবুও যাহা আসিবে তাহা স্বরাজ।

সেই স্বরাজ কি তাঁহারা পান নাই—যাঁহারা প্রাণ দিলেন যাঁহারা কারাগারে উৎপীড়িত হইলেন ? জাগ্রত হইয়া মরিবার পূর্বে যে কয়দিন, যে কয় দণ্ড তাঁহারা বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ে তাঁহাদের মনে, তাঁহাদের সর্ব অস্তিত্বে, সর্বচৈতন্যে

তো তখন স্বরাজ। তখন তাঁহারা পুলিশের এ আইন মানেন নাই, কানুন ভাঙ্গিয়াছেন, রাজাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, রাজপুরুষের হুঙ্কারের সম্মুখে অট্টহাস্য করিয়াছেন। তাঁহারা তো তখন দেহেমনে মুক্ত পুরুষ। তাঁহারা তো চলিয়াছেন, চলার পথে—

নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রুম।
পাপো নৃষদ বরো জনঃ ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি।

চলিতে চলিতে যে শ্রান্ত তাহার আর শ্রীর অন্ত নাই, হে রোহিত এই কথাই চিরদিন শুনিয়াছি। যে চলে, দেবতা ইন্দ্রও সখা হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলেন। যে চলিতে চাহে না, সে শ্রেষ্ঠ জন হইলেও সে ক্রমে নীচ (পাপী) হইতে থাকে, অতএব অগ্রসর হও, অগ্রসর হও।

পুষ্পিণৌ চরতো জঙ্ঘে ভুষ্ণুরাত্মা ফলগ্রহিঃ
শেরেঽস্য সর্বে পাপ্মানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতাঃ॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি।

যে চলে, দেহের দিক হইতেও তাহার অপূর্ব শোভা পুষ্পের মত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তাহার আত্মা দিনে দিনে বিকশিত হইতে থাকে; এই তো মস্ত ফল। তারপর তাহার চলার শ্রমে চলিবার মুক্ত পথে তাহার পাপগুলি আপনিই অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়ে। অতএব, অগ্রসর হও, অগ্রসর হও।

চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি।

চলাই হইল অমৃত লাভ, চলাই তার স্বাদু ফল, চাহিয়া দেখ ঐ সূর্যের আলোকসম্পদ যিনি সৃষ্টির আদি হইতে চলিতে চলিতে একদিনের জন্যও ঘুমাইয়া পড়েন নাই। অতএব অগ্রসর হও, অগ্রসর হও। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ; ভারতের সংস্কৃতি, পৃ. ১৩।৪)

চলা ও পৌঁছা সে মৃত্যুঞ্জয় বীরদের এক হইয়া গিয়াছিল। কে বলিবে তাঁহারা শুধু কর্মই করিয়াছিলেন, ফল পান নাই। স্বাধীন জাতি যে-আনন্দ ভোগ করিবার সুযোগ কখনও পায় না—অধীনতা হইতে স্বাধীনতা অর্জনের যে আনন্দ, বিরহের পর রাধার কৃষ্ণ মিলনের যে আনন্দ—সেই আনন্দ সেই অমৃত মৃত্যুক্ষণে তাঁহারা পান করিয়া অমর হইলেন।

আর যাঁহারা অধর্ম অন্যায়ের স্বহস্তনির্মিত কারাগারের পাষাণ-প্রাচীরের

অন্তরালে সঙ্গীহীন বন্ধুহীন কর্মহীন জীবনযাপন করিলেন, তাঁহারা তো আরও নমস্য। স্বরাজ তাঁহারা কারারুদ্ধাবস্থায় অন্তরে অন্তরে হারাইলেন না তাঁহাদের আত্মত্যাগ রুদ্ধগতি অন্তর্মুখী হইয়া পর্বতকন্দরে আবদ্ধ বর্ষার স্রোতের মত ফুলিয়া ফুলিয়া স্ফীত হইয়া তাঁহাদিগকে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিল, তাহা অন্তর্যামীই জানেন। এই মাত্র বলিতে পারি, কর্তব্যকর্ম উপেক্ষা না করার যে-বিবেকানন্দ, তাহা তাঁহারা সকলেই পাইয়াছেন—আজ যাঁহারা নষ্ট স্বাস্থ্য, ভগ্নোৎসাহ, হৃতআদর্শ হইয়াও নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, তাঁহারাও তো কিয়ৎকালের জন্যও পরমহংস হইয়াছিলেন। আজ যদি তাঁহাদের কেহ কেহ নির্জীব, প্রাণহীন হইয়া থাকেন, তবে তাহার জন্য দায়ী কে? দায়ী আমরা। আমরা যাহারা তখন উঠিয়া দাঁড়াই নাই, সে রাজাধিরাজদের হাত ধরিয়া সম্মুখে চলি নাই, আমরা যাহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের লোভে, ক্ষুদ্র ভয়ের ভ্রূকুটিতে গৃহকোণে আশ্রয় লইয়াছিলাম। শ্যামল নির্মল কোমল উত্তরীয় বিছাইয়া নিদ্রালস নয়নে দেখিলাম প্রসারিত হস্ত আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল, শুনিলাম চরৈবেতি, চরৈবেতি, কিন্তু উঠিলাম না। তবু জানি, সে হস্ত আমাদের আশীর্বাদ করিয়াছিল—তাঁহারা তো স্বরাজ পাইয়াছেন; এই পাপীদের জন্যই তো তাঁহাদের আত্মদান, বলিদান।

কারাগারে কি প্রতিদিন প্রতিক্ষণ তাঁহারা অপেক্ষা করেন নাই, আশা করেন নাই যে, আমরা, তাঁহাদের ভ্রাতা-বন্ধুরা তাঁহাদের দেবত্বের এক কণাও অন্তত পাইয়াছি? বিদেশী রাজের দয়ায় যেন একদিন তাঁহাদের নিষ্কৃতি পাইতে না হয়। তাঁহারা কি আশা করেন নাই যে, একদিন আমরা তাঁহাদিগকে মাথার মণি করিয়া বাহিরে লইয়া আসিব? এখনও যাঁহারা মুক্তি পান নাই, তাঁহাদের জন্যই বা আমরা কি করিতেছি?

তারপর আসিল দুর্ভিক্ষ। তাঁহাদের অভাব আমরা যে তখন কি নিদারুণ ভাবে বুঝিয়াছিলাম, তাহা বাঙলা দেশ কখনো ভুলিবে না। অন্নাভাবে মরিল বহু লোক, কিন্তু তাহারও বেশী লোক মরিল প্রয়োজনীয়, উপযুক্ত সংগঠনের অভাবে। এক বিদেশী তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কোটি কোটি জনগণের মধ্যে সামান্য যে-কয়টি দেশসেবক জেলে আছেন, তাঁহারা ছাড়া দেশে কি অন্য কর্মী নাই?" শিরে করাঘাত করিয়া বলিয়াছিলাম, "নাই, এই হতভাগা দেশে ভগবান যে-কয়টি মানুষ নির্মাণ করেন, তাঁহাদিগকে তিনি সর্বগুণই অকৃপণভাবে ঢালিয়া দেন। তাঁহাদের কেহ কবি, কেহ চিত্রকর, কেহ দার্শনিক, কিন্তু সকলেই সেসব গুণ উপেক্ষা করিয়া দেশসেবাকে প্রধান স্থান দেন। কবিকে কবি বলিলে কবি লজ্জিত হন, দার্শনিককে দার্শনিক বলিলে তিনি

আর বন্ধুর মুখদর্শন পর্যন্ত করিতে চাহেন না; তিনি হয় হইতে চান স্বাধীনতা জেহাদের সিপাহী নতুবা শহীদ। কাব্যে-দর্শনে যেসব কৃতিত্ব পূর্বে দেখাইয়াছিলেন, সেগুলিকে অবান্তর, অপরিপক্ক বালসুলভ চপলতা বলিয়া ধিক্কার দেন, বিদেশীকে বলিয়াছিলাম, ইঁহারাই আমাদের সাত রাজার ধন মানিক, সর্পের মণি। মণি অপেক্ষা সর্প অনেক বৃহৎ, কিন্তু মণিহারা ফণী, আর আমাদের দেশপ্রেমী কর্মী ব্যতীত দেশ একই অভিসম্পাত।'

জানি, কেহ কেহ সস্তায় দেশের জনসাধারণের মন কাড়িবার জন্য কাজের ভান করিয়াছিলেন, অথবা যেখানে ভান করিতে সক্ষম হন নাই, সেখানে ঈষৎ কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু এও জানি, তাঁহাদের বিরুদ্ধ-আন্দোলনের ফলেই বহু দেশপ্রেমিককে বহু কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল—সেকথা ভুলি নাই, ভুলিবার ইচ্ছাও রাখি না। তবে সে বিচারের দিন এখনও আসে নাই।

তারপর ছিন্নভিন্ন কর্মীদের মধ্যে অবসাদের যুগ আসিল। পলায়িত, পুলিস তাড়িত ইঁহারা এই গৃহে ঐ গৃহে আশ্রয় খুঁজিলেন। আমরা অধঃপাতের শেষ সীমায় পৌছাই নাই বলিয়া ইঁহারা আশ্রয় পাইলেন। কিন্তু তখন তাঁহাদের উদ্যমহীন ভগ্ন জীবন দেখিয়া অন্তরে অন্তরে কি যাতনাই না ভোগ করিয়াছি। এক বন্ধুকে বলিয়াছিলাম, তুমি তো এককালে ভালো কবিতা লিখিতে, লেখো না দুই একটি; আমার বাড়িতে কি অমনি অন্নধ্বংস করিবে? মনে আছে আমার রুগ্ন বন্ধু ঈষৎ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোর বাড়ি দেখি জেলের চেয়েও খারাপ। জেলেও তো সরকার বিনা পয়সায় খাইতে দেয়, তুই যে কবিতা চাস। না হয় তোর বাগানে জল ঢালিয়া দিব।' আশ্চর্য হইলাম, মাসের পর মাস গ্রাম হইতে গ্রাম অনশনে, পথশ্রান্তিতে, মানসিক উদ্বেগে কাটাইয়াও তাহার সেই বিমল রসিকতা করিবার ক্ষমতাটি যায় নাই। আশা আছে; তাহা হইলে আশা আছে—ইঁহাদের মেরুদণ্ড কোনো রাজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিতে পারিবে না। ইঁহাদের অবসাদ ক্ষণিক, ইঁহাদের স্থিতি মায়া, মিথ্যা। ইঁহারা আবার অগ্রসর হইবেন।

এখনও আমাদের আত্মজনরা কারাগারে আছেন। নিষ্কৃতি তাঁহারা পাইবেন কিন্তু তাহা মুক্তি নহে। তাঁহাদিগের মুক্তি দানের সম্মান আমাদের হাতে ছিল; আমরা খোয়াইয়াছি।

বোম্বায়ের সম্মেলনে ইঁহাদের অশরীরী সত্তা উপস্থিত থাকিবে। আমরা যেন এমন কিছু না বলি বা করি যাহাতে তাঁহাদের মনে আঘাত লাগে অথবা তাঁহাদের কর্তব্যবোধের বিপক্ষে যায়। নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত কর্মীরা ইঁহাদের সঙ্গে এতদিন কারাগারে

কাটাইয়াছেন। তাঁহাদের কপালে কারাগারের লাঞ্ছনা-লাঞ্ছন অঙ্কিত, তাঁহারাই ইঁহাদের চিনেন; তাঁহারাই যেন সেখানে প্রধান হোতা প্রধান বক্তা হন।

আর যাহারা অগ্রদানী হইয়াছিল, তাহারা যেন সে-সভায় প্রবেশাধিকার না পায়।

আর যাঁহারা পুণ্যলোকে চলিয়া গিয়াছেন, যেখানে রাজায় প্রজায় ভেদ নাই, যেখানে আলিপুর, দমদম নাই, যেখানে পূজার থালাতে ভাইয়ের রক্ত ছিটাইবার লোক নাই, সেখান হইতে তাঁহাদের আত্মা এই সম্মেলনের কর্মকর্তাগণকে শুভবুদ্ধি দান করুক।

'দেশ' পত্রিকা, ২২. ৯. ১৯৪৫

একদা যাহার বিজয় সেনানী

দিল্লী যে অত্যন্ত "দূর অস্ত্", সে খবর প্রবাদ বাক্যের ভিতর দিয়ে আমরা বহুকাল পরেই জানতুম। সে খবর নূতন করে হৃদয়ঙ্গম করলুম যখন সেদিন শুনতে পেলুম দিল্লীতে ভারতীয় পররাষ্ট্র বিভাগ এবং বিদেশে ভারতীয় রাজদূতাবাসের কর্মচারী-দের জন্য ব্যাপক শিক্ষা-ব্যবস্থা হয়েছে এবং হচ্ছে। দিল্লী "দূর অস্ত্" বলেই খবরটা এত দেরিতে পৌঁছল।

দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ সব বিষয়েই কলকাতাকে ছাড়িয়ে যাক, তাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষায় ভারতবর্ষের কোনো শহর কলকাতাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে বা শিগগীরই যাবে, এ সংবাদ শুনলে আমার চিত্ত অধীর হয়ে ওঠে। এই ব্যাকুলতাকে অবাঙালীরা নাম দিয়েছেন 'প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা', 'দেমাক', 'স্নবারি'। হবেও বা। 'কোন গুণ নাই—' লেখকের কর্ণে যে এ-সব কটুকাটব্য মধু বর্ষণ করে, সে-কথা 'বসুমতী'র পাঠক নিশ্চয়ই এতদিনে ধরে ফেলতে পেরেছেন। "জিন্দাবাদ ইস কিস্‌মকী সঙ্কীর্ণতা।"

অর্ধশিক্ষিত কাবুলীরা বলে, "কাবুল বে-জর্ শওদ, লেকিন্ বে-বর্ফ্ণ বাশদ" অর্থাৎ 'কাবুল স্বর্ণহীন হোক আপত্তি নেই, কিন্তু বরফহীন যেন না হয়।' কারণ কাবুলীরা জানে, বরফ-গলা জল না পেলে গম ফসল ফলবে না, আর শুধু সোনা চিবিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। কলিকাতা শিক্ষাদীক্ষায় অন্ততঃ কাবুলের চেয়ে শ্রেয়ঃ, তাই বলি 'কলকাত্তা বে-জর্ শওদ, লেকিন বে-ইল্‌ম্ ন্ বাশদ।' "কলকাতা স্বর্ণহীন হোক আপত্তি নেই (যেটুকু স্বর্ণ আছে তাও তো বাঙালীর হাতে নয়) কিন্তু বিদ্যাহীন যেন না হয়।"

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বীজমন্ত্র "Advancement of learning"।

শুনেছি, ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের অন্ধানুকরণ করতে চান না বলে Learning কথাটার 'এল' হরফটি বাদ দিয়ে 'মৌলিকতা' এবং 'নিজস্বতা' বজায় রেখেছেন। তাঁদের "Earningও জিন্দাবাদ!"

দিল্লীতে যে নূতন শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে তার প্রধান অঙ্গ নানা বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়া। বিবেচনা করি, এই শিক্ষার ফলে একদিন দিল্লীতে বহু ভাষা শিক্ষার আব্‌হাওয়া নির্মিত হবে এবং ফলে চাকরি পাবার পরীক্ষায় বাঙালী ছেলেরা হেরে যাবে।

অথচ এই কলকাতাতেই বহুবার বহু চেষ্টা হয়েছে ফরাসী জর্মন ইত্যাদি ভাষাকে ব্যাপক ভাবে চালু করবার। বিশ্ববিদ্যালয়, Y.M.C.A., সিনজেভিয়ার আমারই জানা মতে বহুবার ফরাসী জর্মনের নৈশ বিদ্যালয় খুলেছেন, ততোধিক-বার বন্ধ করেছেন। বাঙালী ছেলের মন পাননি বলে।

আর সবাই তাই নিয়ে বাঙালী ছেলেকে বিস্তর কড়া কথা বলেছেন কিন্তু আমরা বলিনি। কারণ বাঙালী ছেলে যদিও আর পাঁচটি ছেলের তুলনায় জ্ঞানান্বেষণ করে বেশী, তবু তারও তো একটা সীমা আছে। তার উপর আরেকটি তত্ত্বও ভুললে চলবে না। বাঙালী ছেলে স্বর্ণলোভী নয়, কিন্তু অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন তারও আছে। ফরাসী, জর্মন তাকে এতদিন চাকরির পথে কোনো সুবিধা করে দিতে পারতেন না।

এখন হাওয়া বদলেছে অথবা দু'তিন বৎসরের ভিতরই হাওয়া বদলাবে। শুনেছি, পণ্ডিতজী নাকি আপসোস করে বলেছেন, 'বিদেশী বিভাগের জন্য, যথেষ্ট পরিমাণে উপযুক্ত লোক পাওয়া যায়নি।' বিবেচনা করি, ভাষা বাবদে ভারতীয়েরা যে অন্যান্য দেশের তুলনায় কতটা পশ্চাৎপদ, সে-খবর পণ্ডিতজীর কাছে অজানা নয়।

এস্থলে একটি বিষয় সবিস্তর নিবেদন করি। পররাষ্ট্র বিভাগ ও বিদেশের রাজদূতাবাসের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করবার সময় প্রধানতঃ দেখা হয় প্রার্থী কয়টি ভাষা জানে। উপস্থিত একই প্রার্থী ফরাসী, জর্মন, উভয় ভাষাই জানে এরকম লোক পাওয়া যায়নি। তাই এখন কোন্ নীতির মাপকাঠি মেনে চাকরি দেওয়া হচ্ছে জানি নে। তার মানে নানারকম সন্দেহ আছে,—সেগুলো প্রকাশ করলে সরকারের বিরাগভাজন হবার সমূহ সম্ভাবনা।

তা সে যাই হোক, কিন্তু এ-কথা নিশ্চয় জানি, বিশ-ত্রিশ বৎসর পরে সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতির উদ্ভাবনা হবে। আজ যেসব ভারতীয় রাজদূত প্যারিস, জিনিভা, চিলি, মস্কোতে আছেন, তাঁদের ছেলে-মেয়েরা বিদেশী ভাষা শিখছে। এসব

রাজদূতেরা আবার ঘন ঘন বদলী হন। আজ যিনি পিকিং-এ কাল তিনি ওসলোত, তিন বৎসর পর তিনি রোমে, পাঁচ বৎসর পর তিনি হয়ত হেলসিঙ্কিতে। তাই তাঁর ছেলে-মেয়েরা দশ-বারো বৎসরের ভিতর গোটা চার ছয় ভাষাতে সড়গড় হয়ে যায়। বিশ-ত্রিশ বৎসর পর এরা চাকরির বাজারে নামবে।

যে ছেলে সমস্ত ছাত্রজীবন কলকাতা বা বর্ধমানে কাটালো, সে ভাষা বাবদে যতই মেধাবী হোক না কেন, তার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব উপযুক্ত রাজদূতের ছয় ভাষা জাননেওয়ালা ছোকরার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ফরেন আপিসে বা বিদেশী রাজদূতাবাসে চাকরি পাওয়া। তাই বিশ-ত্রিশ বৎসর পরে সেই সব পরিবারের ছেলেরাই এসব চাকরি পাবে, ভবিষ্যতের জন্য তাবৎ বিদেশী চাকরি এবং ফরেন আপিস সেই সব প্রদেশের একচেটিয়া হয়ে যাবে। বাঙালীরা যদি এখন এসব চাকরিতে কিছুটা না ঢুকতে পারে, তবে বিশ-ত্রিশ বৎসর পরে তার পক্ষে নাসিকাগ্র ঢোকানোও সম্পূর্ণ অসম্ভব হবে।

পরিস্থিতিটার যে বর্ণনা দিলুম সেটা কাল্পনিক নয়। অন্যান্য সব দেশের পররাষ্ট্র দপ্তরের বেলায় যা আমাদের বেলাও তাই।

তাই বলি, সাধু এখন থেকেই সাবধান। বাঙালী যদি এই বেলা কলকাতাতে বিদেশী ভাষা শেখাবার ব্যাপক ব্যবস্থা না করে, তবে আপন ঘুম ভাঙলে দেখতে পাবে, দিল্লীর কৃপায় এক খানদানী চক্করের সৃষ্টি হয়েছে এবং সে চক্রব্যূহ ভেদ করা তখন আর বাঙালীর পক্ষে সম্ভবপর হবে না।

পাঠক হয়তো বলবেন, "এই আড়াইখানি চাকরির জন্য অতো চেল্লাচেল্লি করছো কেন?"

আড়াইখানা চাকরির কথাই শেষ কথা নয়। ফরেন আপিস ও বিদেশে স্থাপিত অগুণতি রাজদূতাবাস যে কি বিশাল শক্তি ধারণ করে, তার খবর বেশির ভাগ লোকই জানে না। কারণ এদের ক্রিয়াকলাপ আইনতঃ 'গোপনীয়'—স্ট্রিক্টলি 'কন্‌ফিডেনশিয়াল'। যখন এদের নীতি এবং কর্মপদ্ধতি অত্যন্ত ধিক্কার-জনক হয়ে যায়, তখন হঠাৎ কোনো কোনো সময় কেলেঙ্কারী কেচ্ছা ছড়িয়ে পড়ে। 'কেটোর' 'গিল্টিমেন' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন, একমাত্র লণ্ডন ফরেন আপিস গত যুদ্ধের জন্য কতটা দায়ী।

বাঙালী যদি গবেট না হত তবে ফরেন আপিসে তাদের স্থান করার জন্য আমাদের এত কান্নাকাটি করার প্রয়োজন হত না।

তা ছাড়া, ভারতীয় সভ্যতা বৈদগ্ধ্যের প্রতিভূ হওয়ার জন্য বাঙালীর হক অনেকের চেয়েও বেশি। ভারতবর্ষ মহাত্মা গান্ধীর দেশ, রবীন্দ্রনাথের দেশ।

এঁদের বাণী বিদেশে প্রচার করার হক্ এঁদের মাতৃভাষার সঙ্গে যাঁরা সুপরিচিত তাঁদের কিছুটা আছে বৈকি! তাই প্রশ্ন, দিল্লীর ফরেন আপিসে আমরা এ যাবৎ ক'টি স্থান পেয়েছি? এবং ভবিষ্যতে যাতে পাই, তার জন্য কলকাতার কি ব্যবস্থা করেছি? বিশ্ববিদ্যালয় কি করছেন?

মাসিক বসুমতী

জাতীয় মহাশব্দের স্বরূপ

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা হিন্দী অথবা হিন্দুস্থানী (অথবা অন্য যে-কোনো নামেই ডাকো না কেন) হবে একথা পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু (এ স্থলে বাঙালী পাঠককে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি যে, আমাদের প্রধান মন্ত্রীর নাম আমরা এখনো ঠিক বানান করতে শিখিনি। এ বড় পরিতাপের বিষয়। পণ্ডিতজীর নাম 'জওহর' নহে—যদিও তাঁরনাম এই শব্দেরই রূপান্তর। পণ্ডিতজীর নাম 'জওয়াহির'—দেবনাগরী অক্ষরে 'জবাহির' বা 'জবাহর' লেখা হয়—এবং এই শব্দটি প্রাচীন পহ্লবী শব্দ 'জওহরের' বহু বচন। কথাটা আসলে "গওহর" কিন্তু আরবী ভাষাতে 'গ' অক্ষর নেই বলে আরবরা তৎপরিবর্তে 'জ' অক্ষর ব্যবহার করে। 'জওহর' শব্দের অর্থ মূল্যবান প্রস্তর কিন্তু আসল অর্থ essence অথবা নির্যাস। পণ্ডিতজীর নাম 'জওয়াহির' বলেই ইংরেজীতে Jawahar লেখা হয়—Jawhar লেখা হয় না। এ স্থলে অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যদি হিন্দীতে 'জবাহির' লেখা হয়, তবে ইংরিজীতে পণ্ডিতজী Jawahir না লিখে Jawahar লেখেন কেন? তার কারণ, সর্বশেষ স্বরবর্ণটি এতই হ্রস্ব যে, তার উচ্চারণ ঠিক 'i' না 'a' শোনা যায় না বলে 'a' ব্যবহার করা হয়েছে—অবশ্য আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী 'i' হরফটি ব্যবহার করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত) বহু উপলক্ষ্যে প্রকাশ করেছেন এবং এ সম্পর্কে যে সব মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন, সেগুলো আমাদের সকলেরই ভেবে দেখা উচিত।

কিন্তু আমাদের—অর্থাৎ সাধারণ বাঙালীর—প্রধান বিপদ এই যে, হিন্দী, হিন্দুস্থানী এবং উর্দু—এই তিন ভাষার ভিন্ন ভিন্ন রূপ কি, সে সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই। মোটামুটি জানি যে, হিন্দী দেবনাগরী অক্ষরে লেখা হয়, আর উর্দু আরবী বা ফারসী অক্ষরে। কিন্তু এই হিন্দুস্থানী বস্তুটি কি, এবং সেটি লেখা হয় কোন্ অক্ষরে?

সে-কথা বুঝতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন খাঁটি হিন্দী এবং খাঁটি উর্দুর স্বরূপ চেনা। হিন্দী ভাষা বাঙালারই মত প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশের ফল

—উর্দু তাই। অর্থাৎ অতি সাধারণ হিন্দী এবং উর্দুতে কোনো পার্থক্য নেই। 'তুম কব আয়োগে?' 'মেঁ কল কানপুর জাঙ্গা' ইত্যাদি সরল সাধারণ কথায় হিন্দী উর্দুতে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু চিন্তা এবং অনুভূতির জগতে প্রবেশ করে যখন বলি, "ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়োজন" তখন হিন্দী বাঙলার মত প্রধানতঃ সংস্কৃতের স্মরণ নিয়ে বলে, "ভারতবর্ষ কী রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে লীয়ে অর্থনৈতিক উনতিকী প্রয়োজন হৈ" এবং উর্দু সেস্থলে আরবী ফারসীর শরণ নিয়ে বলে "হিন্দুস্থান কী সিয়াসতী আজাদীকে লীয়ে ফিস্‌কী তরকীকী জরুরৎ হৈ।"

ভাষার দিক দিয়ে এই হল প্রধান পার্থক্য।

বাঙলার সঙ্গে এই আলোচনাটা মিলিয়ে নিয়ে তাকালে দেখি বিদ্যাসাগরী বাঙলা হিন্দীরই মত, আর 'আলালের ঘরের দুলাল' অনেকটা উর্দুর কাছে চলে যায়। কিন্তু বাঙলার সুবিধা হচ্ছে এই যে, আমরা আজ বিদ্যাসাগরী এবং আলালী উভয় ভাষাই বর্জন করেছি অথবা বলতে পারি আমরা দুটোই গ্রহণ করে নিয়েছি। 'পরশুরাম' প্রয়োজন মত কখনো সংস্কৃত ঘেঁষা কখনো ফারসী ঘেঁষা বাঙলা লিখে যে অপূর্ব রস সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন, সে রস বাঙলা ভাষার ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। আমরা বাঙলা লিখতে এখন আর এ বিচার করিনে, কোন্ শব্দ আসলে ফরাসী আর কোন্ শব্দ সংস্কৃত।

দিল্লী এবং যুক্তপ্রদেশে এক কালে উর্দুর প্রাধান্য ছিল বলে হিন্দীতে বিস্তর আরবী ফারসী শব্দ ঢুকতে পেরেছে—বাঙলার তুলনায় অনেক অনেক বেশী। কিন্তু বাঙালায় বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ ভাষা বাবদে যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে গিয়েছেন, হিন্দীতে সেরকম কোনো নিষ্পত্তি হয়নি। তাই হিন্দী ভাষা-ভাষীদের মধ্যে কিছুদিন হল এক 'ছুৎবাই' বা puritan আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে।

এ-আন্দোলনের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত অমরনাথ ঝা। শান্তিনিকেতন সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে তিনি গত ডিসেম্বর মাসে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রদের সম্মুখে রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে হিন্দীতে এক ভাষণ দেন। ওঝাজী আধ ঘণ্টাটাক বক্তৃতা দেন —আমি অবিহিতচিত্তে সে বক্তৃতা শুনি। লক্ষ্য করলুম যে, সেই বক্তৃতাতে তিনি একটি মাত্র অসংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করলেন না। যে-সব আরবী ফারসী শব্দ, হিন্দীর সঙ্গে মিশে গিয়ে বহুকাল হল এক হয়ে গিয়েছে (বাঙলাতে যে রকম 'অকুস্থানের' 'অকু', ময়না-তদন্তের 'ময়না', 'সবুজ' 'সবজি', 'গরীব' ইত্যাদি শব্দের জাত-বিচার আজ আর কেউ করে না) শ্রীযুক্ত অমরনাথ সেগুলো পর্যন্ত বর্জন করে বক্তৃতা দিলেন। এমন কি 'ইসকে বাদ' না বলে 'ইসকে পশ্চাৎ সে' বললেন।

উপসংহারে শ্রীযুক্ত অমরনাথ বললেন, 'হমলোগোঁকী রাষ্ট্রভাষা 'সংস্কৃতময়ী' হিন্দী হোগী'। অর্থাৎ হিন্দী উর্দুর দ্বন্দ্বের আর কোনো প্রশ্নই উঠে না। হিন্দুস্থানীও না, এমন কি আমাদের রাষ্ট্রভাষা হিন্দী থেকেও অসংস্কৃত সর্বপ্রকার শব্দ বাদ দিয়ে তাকে সংস্কৃতের পর্যায়ে তুলতে হবে।

বাঙলার সঙ্গে মিলিয়ে এই তত্ত্বটি প্রকাশ করতে হলে বলতে হবে, 'পরশুরামী সুকুমার রায়ী বাঙলা তো নয়ই, বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথী বাঙলাও না, আমরা এখন সব কিছু বলব এবং লিখব বিদ্যাসাগরী বাঙলায়।'

মহাত্মাজী এ জাতীয় অতিশুদ্ধ, কট্টর হিন্দীর নিন্দা করেছেন, অতিশুদ্ধ উর্দুকেও ঠিক তেমনি নিন্দা করেছেন। মহাত্মাজী চেয়েছিলেন, এই দুইয়ের সংমিশ্রণে গড়ে-ওঠা, নবীন নবীন চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশে সক্ষম, তার জন্য নূতন শব্দ গ্রহণে অকুণ্ঠিত, প্রাণবন্ত সজীব ভাষা। সে-ভাষা শেষ পর্যন্ত কি রূপ নেবে সে সম্বন্ধে মহাত্মাজী কিছু বলেননি, কিন্তু উপস্থিত সে ভাষার শব্দসম্পদ দেখাবার জন্য তিনি স্বয়ং একটি অভিধান নির্মাণ করেছিলেন ও সপ্তাহে সপ্তাহে আপন সাপ্তাহিকে সেটি প্রকাশ করেছিলেন।

এই ভাষার নাম হিন্দুস্থানী। এ ভাষা তেজবাহাদুর সপ্রুর অতিশুদ্ধ উর্দু নয়, পণ্ডিত মালবীয়ের (মালব্য নয়) অতিশুদ্ধ হিন্দী নয়,—হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসি-মুসলমান-খৃষ্টানীর মহাশঙ্খ রাষ্ট্রভাষা।

পণ্ডিত জওয়াহিরলাল এই জাতীয় ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চান। পণ্ডিতজী ভাষাবিদ্ অথবা শব্দতাত্ত্বিক নন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি এই তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হয়েছেন যে, আমাদের রাষ্ট্রভাষা যখন শেষ পর্যন্ত তার জন্মভূমি যুক্ত-প্রদেশেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সৌরাষ্ট্র মগধ সর্বত্রই সে ভাষা ব্যবহৃত হবে তখন সে ভাষা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ থেকে নানা প্রকারের শব্দ গ্রহণ করতে বাধ্য। ইংরিজী ভাষা ভারতবর্ষে এসে Dawk, Juggernant, Choroot প্রভৃতি কত শব্দ গ্রহণ করেছে তার হিসেব নেই—যে-দেশে গিয়েছে সেখানেই নূতন নূতন শব্দ গ্রহণ করে আপন ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করেছে।

তাই আজ ইংরিজীর সঙ্গে শব্দ-সম্পদে পাল্লা দিতে পারে এমন ভাষা পৃথিবীতে নেই। ফরাসী ভাষা বিদেশী শব্দ গ্রহণে অত্যন্ত বিমুখ, তাই ফরাসী ভাষা ইংরিজীর তুলনায় গরীব। পণ্ডিতজী উদারচিত্ত, গভীর দৃষ্টি দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করেছেন ভারতবর্ষের আদর্শ কি, সে আদর্শে পৌঁছতে হলে কি প্রকারের ভাষার প্রয়োজন।

বিশাল ভারত, বৃহত্তর ভারতবর্ষের স্বপ্ন যাঁরা দেখতে চান, একমাত্র তাঁরাই মহাত্মাজীর বাণী, পণ্ডিতজীর আবেগ বুঝতে পারবেন।

অটোপ্রমোশন

বহুকাল ধরে আমি স্বদেশবাসীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে সাহিত্যাচার্য বঙ্কিমচন্দ্রের নামের পূর্বে "ঋষি" অভিধা যোগ করতে পারতুম না বলে কেমন যেন ঈষৎ সংকোচ অনুভব করতুম। তারপর হঠাৎ (ঢাকাতে এদানির রংদারী ভাষায় "হঠাৎ করে") এক শুভপ্রাতে আমার জনৈক মুরুব্বি পথে যেতে যেতে শুনতে পেলেন আমি তারস্বরে পরীক্ষার জিওমিট্রি মুখস্থ করছি। এক লহমার তরে থমকে দাঁড়িয়ে শুনলেন, পরক্ষণেই কণ্ঠস্থ করছি এলজেব্রার ফরমূলা, তারপর আরবী টেক্সটের ইংরেজী অনুবাদ, তারপর সূর্য গ্রহণের শুভঙ্করী—ক্ষণে এটা, ক্ষণে ওটা, ক্ষণে সেটা। সমুচা বছরটি কাটিয়েছি হেথা হোথা সর্বত্র গ্যাংজাম করার মোকা পেলেই তার ন্যায্য, হক্কসম্মত হিস্যেটি উপভোগ করে—এ তত্ত্বটি আমার মজবুর মুরুব্বিটি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। এখন যে আসন্ন পরীক্ষার সামনে দিশেহারা হয়ে ক্ষণে এ-সবজেক্ট ক্ষণে ও-সবজেক্ট খামচাচ্ছি সেটা হৃদয়ঙ্গম করতেও তাঁর রত্তিভর তকলীফ বরদাস্ত করতে হল না। জানলা দিয়ে খোঁচা খোঁচা দাড়ি-ভর্তি কদম্ববদনখানা গলিয়ে বাঁকা হাসি হেসে বললেন, "ওরে ভাল্লুক, তোর সর্বাঙ্গে যে চুল। তেড়ি কাটবি কোথায়?"

হঃ!—দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে সেই খাট্টা বর্‌হক্ তত্ত্বটা গিলে নিয়ে ভাবলুম, "হায়, দু' একটা সবজেক্ট হেথা হোথা নেগলেক্ট করে থাকলে মামেলা এৎনা ঝামেলাময় হোত না। হয় টুকলি মেরে, নয় গুড বয় মেজদাকে খুঁচিয়ে তার মদৎ-কাঁকুই দিয়ে না হয় ডবল তেড়ি কেটে পরীক্ষার হল্ সমুদ্দুর পেরিয়ে যেতুম ড্যাং ড্যাং করে। কিন্তু ঐ যে পাড়ার ভেটকি-লোচন, বদনা-বদন, গাড়ু-গঠন মুরুব্বিটা যে উপমাটা দিয়ে তত্ত্বকথা বললে তার দাওয়াই কই? হ্যাঁ—সব্বাঙ্গে যখন ঘা তখন মলম লাগাই কোথায়?

কাটা ঘায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে, দিলদরাজ মেকদারে আইডিন ছিটিয়ে যাবার বেলা মুরুব্বি বললেন, "জানিস্, বঙ্কিমচন্দর কি বলেছেন?—

ছাত্রজীবন ছিল
সুখের জীবন
যদি না থাকিত, রে,
এ-গ্-জা-মি-নে-শ-ন!"

তদ্দণ্ডেই চড়াক্‌সে আমার মাথায় খেলে গেল, কেন আর সব্বাই বঙ্কিমের নামের পূর্বে "ঋষি" খেতাব এস্তেমাল করেছেন। তিনি নাকি বি. এ. না কি যেন

কোন্ পরীক্ষায় ফার্স্ট না সেকেণ্ড হয়েছিলেন। আমি ম্যাট্রিকের সামনেই মুক্ত-কচ্ছ, বে-এক্তেয়ার। হাড়ে হাড়ে বুঝলুম, কী গর্ব্বযন্তনার ভিতর দিয়ে বি. এ'র বাচ্চা তিনি বিইয়ে ছিলেন—নইলে এমনতরো একখানি টালমাটাল গর্দিশের বয়ান জুৎসই চারটি পদে প্রকাশ করা তো চাট্টিখানি কথা নয়, মাইরি।

সেই অবধি আম্মো বঙ্কিমকে ঋষি নামে ডাকি—বিশেষ করে অগুনতি যে-সব পরীক্ষায় দফে দফে ফেল মেরেছি তার পূর্বে এবং পরে।

বস্তুত ঐ কম্মে গত অর্ধ শতাব্দী ধরে আমাকে পয়লা নম্বরী স্পেশালিস্ট বলে গণ্য করা হয়েছে।

তাই বলে বিদ্যা-তন্দুর পাঠক মোটেই ভেবো না, টুকলি মারা বা টুকলি মেরেও ফেল করাটা খুবই একটা ফ্যালনার ব্যাপার। কথাটা বুঝিয়ে বলতে হয়।

বহু যুগ হয়ে গেছে, যাত্রাগান বা থিয়েটার দেখতে যাইনি। তাই বলতে পারবো না এখনো নাট্যজগতে 'এন্‌কোর এন্‌কোর' অর্থাৎ 'ফিন্‌সে'-র রেওয়াজ আছে, না উঠে গেছে। কথাটা ফরাসী 'আঁকোর'-এর বিদেশী শব্দের উচ্চারণ বিগড়ানো বাবদে অলিম্পিক-শিকারী ইংরেজী উচ্চারণ—না, বলা উচিত ছিল দুরুশ্চারণ। কোনো একটা সীন নাট্যামোদীগণকে বেহদ খুশ করে দিলে তাঁরা ঘন ঘন করতালি দিতে দিতে চীৎকার করতেন "এনকোর, এনকোর", "আবার অভিনয় করো, ফিন্‌সে বাৎলাও।" এমন কি ভীষণ গদাযুদ্ধের শেষে দুর্যোধন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর "এনকোর এনকোর" পড়লে তাকেও ফের আকাশ ছোঁয়া লম্ফ মেরে ফিন্‌সে ষষ্ঠত্ব পেতে হত—একবার মরেছে তো কি হয়েছে!

আমি যথারীতি একবার ফেল মেরেছি। পাড়ার হাড়েটক সেই জ্যাঠার সঙ্গে আচানক দেখা। বিটকেল হাসি হেসে বললেন, "কিরে! ফেল মেরেছিস তো?"

আমি ভিট-কিলিমির একখানা সরেস হাস্যে তাঁকে ঘায়েল করে বললুম, 'বলেন কি, স্যার! এ্যামন খাসা খাসা এ্যানসার ছেড়েছিলুম যে এগজামিনার বললে, এনকোর! তাইতে ফের আসছে বছর ম্যাট্রিক দিচ্ছি।'

কিন্তু কী দরকার এসব বখেড়ার? আমি তাই অটোপ্রমোশনের দারুণ চ্যাম্পিয়ান। প্রথমেই দেখুন 'অটো' দিয়ে যে-সব জিনিস তৈরি হয় তার সব কটাই অত্যুত্তম। গ্রীক 'অটো' (আসলে 'আউটো') আর সংস্কৃত 'স্বতঃ' একদম একই শব্দ। কবিগুরুর সর্বাগ্রজ তাই অটোমবিল কার (মোটর গাড়ির) অনুবাদ করেছিলেন স্বতঃচল—স্বতশ্চল শকট। এখন, পাঠক, তুমিই বলো নিজের থেকে চলে স্বতশ্চল শকট ভালো, না ঠেলাগাড়ি ভালো! এই যে তুমি ন' মাস ধরে লড়াই লড়লে সে সময় লাখ খানেক 'অটোমেটিক' স্বতঃক্রিয় রাইফেল পেলে।

আল্লাকে পাঁচ শুকরিয়া জানাতে বেশী, না লাখ মাজল লোডার, গাদা বন্দুক ? এই যে তুমি স্বাধীনতা পেয়েছো, তোমার প্রধান লক্ষ্য কি ? নিশ্চয়ই "অটো+ আর্কেইন" অর্থাৎ "অটার্কি", অর্থাৎ "স্বতঃ সম্পূর্ণ" অর্থনীতি—যাতে করে তামাম দুনিয়াটা চষে হাতীর দরে ছাগল কিনতে না হয়। কিংবা ধরো 'অটোবায়োগ্রাফি'। আমার সে ক্ষ্যামতা থাকলে আমি কি আমার অটোজীবনী লিখতুম না ?—নিজেকে আসমানে চড়িয়ে নিদেন তখৎ-ই-তাউসে বসিয়ে একটি ছবি যা আঁকতুম, মাইরি। চেহারায় উত্তম কুমার, গানে হেমন্ত মুখো, নৃত্যে উদয় শঙ্কর, সংগ্রামে ওসমানী! অবশ্য আমার জীবনী কেউ লিখবে না। কিন্তু 'পাল্লিষ্টের অপমৃত্যু' নাম দিয়ে আর পাঁচজনকে হুঁশিয়ার করার জন্য আমার উদাহরণ দেখিয়ে কেউ যদিস্যাৎ লিখে ফেলে ? তবেই তো চিত্তির! টুকলি মারতে গিয়ে ক'বার যে টার্ন আউট হয়েছি সেটাও ফাঁস করে দেবে যে।

তাই বলি, অটোপ্রমোশন বা স্বতঃ উন্নয়ন অত্যুত্তম প্রস্তাব।

তবে হ্যাঁ, আমার একটা শর্ত আছে।

অধ্যাপক রোল কল করে (না করলেও খয়র!) একটু জিরোবেন। আমরা যে যার খুশী মত ক্লাস থেকে বেরিয়ে হেথা হোথা ঘুরে বেড়াব, জেবে রেস্ত থাকলে অবশ্যই মরহুম মধুর মধ্বালয়ে ; যে কটা মূর্খ নিতান্তই পড়াশোনা করতে চায়, তারা তাঁর লেকচার শুনবে, পরীক্ষা দেবে, পাশ করবে। যারা ফেল মারবে তারা পাবে আমাদের মত অটোপ্রমোশন। কিন্তু চাকরির বেলা কি অটো, কি খেটো (খেটে যারা পাশ করেছে) সবাই পাবে সমান চান্স। যে মহাপুরুষ সর্ব প্রথম অটোপ্রমোশনের প্রস্তাব করেছেন তিনি সাতিশয় হক কথা বলেছেন—যে, চাকরি-দেবার বেলা যে চাকরি দেয় সে তো বাজিয়েই নেয়। সে তো পরীক্ষা নেবেই। তবে দু'দু বার পরীক্ষা কেন, বাওয়া ? একটা লোকের ফাঁসি হয় ক'বার ? একই অপরাধে তো দু'দু বার সাজা হয় না। আমার কথায় পেত্যয় না মানলে শুধোন গে পাকিস্তানের প্যারা ব্যারিস্টার ভুট্টোকে! সে জানে বলে তার দেশের আটক বাঙালীদের প্রথম ডিসমিস করে, পরে জেলে পোরে।

আর কে সে গুণরাজ খান আপনাকে ভ্যাচর ভ্যাচর করে আপ্ত বাক্য শুনিয়েছে যে, সে-পরীক্ষায় খেটোরা ত্রিং ত্রিং করে পয়লা দোসরা হবে আর অটোরা গুড়ি গুড়ি হামাগুড়ি দিয়ে বাড়ি ফিরে তৌবা-তিল্লা করবে ? আমি কথা দিচ্ছি, বিস্তর খেটো ভেটোতে না-মঞ্জুর হবেন আর এস্তের অটোর ফোটো তুলবে প্রেস ফোটোগ্রাফার।

এ বাবদে প্রকৃত সত্যটা এই বেলা শুনে নিন :—

"পরীক্ষার জন্যে সর্বোত্তম প্রস্তুত ক্যান্‌ডিডেটের কাছেও পরীক্ষা হিমালয় পর্বতবৎ। ইহসংসারে গাড়লস্য গাড়লও এমন সব প্রশ্ন শুধোতে পারে যার উত্তর পণ্ডিতস্য পণ্ডিতও দিতে পারেন না।"

Examinations are formidable even to the best prepared for the greatest FOOL may ask more than the wisest man can answer—CORLTON.

পরীক্ষা মাত্রই লটারী—বাংলা কথা।

নট গিলটি

সদ্য-সম্প্রতি কিয়জ্জনের কৃপাধন্য মশকুর এ অধমের ছোট্ট একটি রচনা কলকাতার অন্যতম সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। আমি স্ফীতমুণ্ড ন্যাজমোটা লেখক নই; তাই বিবেচনা করি সেদিন সে পত্রিকার চরম দুর্দিন ছিল। কথায় বলে, 'অভাবে স্বয়ং শয়তানও মাছি ধরে ধরে খায়।' রচনা-বাড়ন্তের সে কুগ্রহে প্রাগুক্ত পত্রিকার সম্পাদক প্রবাদটি স্মরণে এনে অধমের নাকিস লেখাটি প্রকাশার্থে প্রেস বাগে চিড়িয়াপারা উড়িয়ে দিলেন, অর্থাৎ দুগ্‌গা বলে ঝুলে পড়লেন।

কলকাতার নাগরিক সুলভ বিদগ্ধজন আমার লেখা বড় একটা পড়েন না। পণ্ডিতজন আদৌ না, অর্থাৎ উৎকট সংকটেও মাছি ধরে ধরে খান না। যে দু' একজন ভিন্ন গোয়ালে বাস করেন তেনারা দু-চার ছত্র পড়ে তাচ্ছিল্যি ভরে সুনিন্দিত রায় দেন "আস্ত একটা ভাঁড়"।

আমি শ্রীরাধার ন্যায় সে নিন্দা

"চন্দন মানিয়া অঙ্গেতে লেপিনু
চরম আনন্দ ভরে।"

কেন? সে কথা আরেক দিন হবে।

অপিচ, মহানগরীতে পাওনাদারদের তাড়ায় হেথায় পালিয়ে এসে শুনি, সে-খাকছার ধূলির ধূলি ভাঁড়ামিটা এতদ্দেশীয় অপর্যাপ্ত গুণিন্ তথা কবিকুল পড়েছেন এবং মর্মাহত হয়েছেন—তবে আমার যে আত্মজন এ-সন্দেশটি পরিবেশন করলেন তিনি তিল ব্যাজ না সয়ে তড়িঘড়ি যোগ দিলেন 'সে মর্মবেদনা উন্মাসহ নয়, অতিশয় সবিনয়।'

শোনা মাত্রই আমার মন-বন-উপবনের ভিতর দিয়ে যেন কোনো অভিসারিণী হাওয়া হাওয়ায় ভেসে গেল। আমার রক্তে তার নূপুরের রিনিরিনি যেন ঝিল্লির

ঝিনিঝিনি হয়ে বেজে উঠলো।

মুর্শীদের দিব্যি গিলে বলছি, আমি পীড়া-সন্তোষী নই। এই খানদানী ঢাকা শহরে আমার লেখা পড়ে যদি একটি মাত্র গুণিন্ ক্ষণতরে রত্তিভর পীড়া অনুভব করেন তবে তাই নিয়ে আমি উল্লাস অনুভব করবো, এমনতরো বিঘ্ন-সন্তোষী পিচেশ আমি নই। আমি উল্লাস বোধ করেছি দশরথের ন্যায়। 'পুত্র হবে রে, পুত্র সন্তান হবে আমার'—এই একটি বাক্য পুনঃ পুনঃ চিৎকার করতে করতে মুক্তকচ্ছ হয়ে সোল্লাসে তিনি নৃত্য জুড়ে দিয়েছিলেন। পুত্র-বিরহের শোকে যে তাঁর মৃত্যু হবে সে শাপটি তিনি তখন বেবাক ভুলে গিয়েছিলেন। আম্মো তাই 'নৃত্য' জুড়েছি আর চিৎকার করে পাড়ার পাঁচজন রক-এর পাঁচো ইয়ারকে শোনাচ্ছি, "পড়ে হে পড়ে; এখনো লোকে আমার লেখা পড়ে।" সমুচা ভুলে গিয়েছি, আমার লেখা তাঁদের মর্মবেদনার কারণ হয়েছে।

কিন্তু হায় সব নেশারই একটা অবসান আছে। তারপর আসে খুম্মারের খোঁয়ারী। তখন মাথাটা করে তাজ্জিম মাজ্জিম; উডহাউসের নায়ক উস্টার দেখতে পেত সারি সারি গোলাপি হাতী তার বেডরুমের মধ্যিখান দিয়ে সবুজ শুঁড় নাচাতে নাচাতে পিল পিল করে জীভস্-এর প্যানট্রি বাগে এগোচ্ছে। আমারও ফাঁপানো, মোটা ন্যাজটা যখন ধীরে ধীরে চুপসে যেতে লাগল তখন খোঁয়ারির শিকার খৈয়ামের মত দহিল হৃদয়বন তীব্র ক্ষোভানলে। মনে মনে আন্দেসা করলুম, এ তো বড় আশ্চর্য! ভাঁড় আমি। আমার ভাঁড়ামি পানসে হতে পারে কিন্তু বেদনা দেবে কোন তাগতে? তাহলে যে মারা যাবে তার "আব ও দানা",

দুইটি বস্তু প্রতি মানুষেরে
টানিতেছে জোর জোর।
দানা-পানি টানে একদিকে আর
আর দিকে টানে গোর॥

দো চীজ আদ মরা
কশদ জোর জোর
এক-ই আব-দানা
দিগর খাক-ই গোর॥

পূর্বেই নিবেদন করেছি, পাওনাদারদের তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে কলকাতা ছেড়েছি। এখানেও আমার লেখা যদি গুণিনদের বিরাগভাজন হয় তবে সম্পাদক আমার লেখা ছাপবেন কোন দুঃখে, "আব ও দানার" কড়ি ঢালবেন কোন গরজে?

এবং অতি অবশ্যই হেথাকার পাওনাদার গুষ্টিও আমার হালটা চটসে মালুম করে নিয়ে লাগাবে হুনো। তখন হয় ভুট্টো সাহেবের মত চুপসে পলায়ন, নয় 'খাক-ই-গোরই' 'আব ও দানার' সঙ্গে টাগ-অব-উয়োরে জিতবেন। আমিও, 'বিনাপত্যে' সুড় সুড় করে সীতা দেবীর মত 'ধরণী গো মা, স্থান দাও কোলে' ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেই নিজের 'ইন্নালিল্লাহি'—যাক গে, বাকিটা থাক। কিন্তু একটা পরম পরিতৃপ্তি নিয়ে আমি পুল-সিরাতের দিকে রওয়ানা হব—যে সব গুণিনকে আমি অজানতে পীড়া দিয়েছি তাঁরা আদল-ইনসাফসহ 'ফি নারি' পড়তে পারবেন।

কিন্তু সর্ব-সাকুল্যে যে দু-পাঁচটি উটকো পাঠক এই আষাঢ়ের সজল ছায়ায় মেঘে ভরা বৃষ্টি ঝরা ঝিল্লিমন্দ্রে মুখরিত সন্ধ্যায় আমার প্রতি অহেতুক সদয় হয়ে এ লেখাটি পড়ছেন তাঁরা হয়তো এতক্ষণ বেসবুর হয়ে বলতে আরম্ভ করেছেন, 'এত্তা ধানাই-পানাই কি ঝামেলা নিয়ে সেইটে খুলেই কও না, মাইরি। মেঘে মেঘে যে বেলা হয়ে গেল।'

'তাই কইচি, গুরু, তাই কইচি। তোমরাই বিচার করো।'

গবিতা, অর্থাৎ মডার্ন কবিতা, গদ্য কবিতা যার নাম। গদ্য কবিতার বেশ-ভূষাতে চোখে পড়ে, এতে মিল নাই, অনেক ক্ষেত্রে ক্লাসিক কবিতা সুলভ ছন্দও থাকে না, ততোধিক ক্ষেত্রে ছত্রগুলোও একই দৈর্ঘ্যের নয়। বাইরের বেশভূষা অর্থাৎ বাহ্যরূপ পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলে প্রথমেই মনের চোখে ধরা পড়ে, ক্লাসিক বা প্রাক গবিতাতে যে রকম প্রতি ছত্র এবং সম্পূর্ণ কবিতাটির সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা অর্থ পাওয়া যায় গবিতাতে তা নেই। এক একটা ছত্রের অর্থ হয়তো পরিষ্কার কিন্তু গোটা কবিতার মূল অর্থ, 'লাইট মোতীফ' যে কি সেটা অধিকাংশ স্থলে বিলকুল ধরা যায় না, হয়তো আদৌ নেই। গবিতা পড়ে সনাতন পন্থীরা সোজাসুজি বলেন, 'এর তো মানে বুঝতে পারলুম না আদৌ। এর তো মাথামুণ্ডু কিছুই নেই।' যদ্যপি আমি খাক-ই-গোরের প্রত্যন্ত প্রদেশে দণ্ডায়মান তথাপি আমি এ সম্প্রদায়ের সদস্য নই।

গবিতা কথাটা উভয় বাঙলায়ই চাউর হয়ে গিয়েছে। অবশ্য গবিতা যাঁরা রচনা করেন, পড়ে আনন্দ পান, প্রশংসা করেন তাঁরা এ-শব্দটা ব্যবহার করেন না। তাঁরা মনে করেন, শব্দটা তাচ্ছিল্যজাত ব্যঙ্গসূচক। কিন্তু ইতিহাসে এমন উদাহরণও আছে যেখানে পরদেশী দত্ত অবজ্ঞাসূচক নাম বা পদবী পরে ঐ দেশের লোক গ্রহণ করেছে। কবিগুরু রচিত ভারতের জাতীয় সঙ্গীতে মাত্র তিনটি নিতান্তই অবর্জনীয় বিদেশী শব্দ আছে,—'মুসলমান ও খ্রীষ্টানী' এবং আরেকটি শব্দ পরে আসছে।

প্রথমটি আরবী দ্বিতীয়টি গ্রীক। কিন্তু এহ বাহ্য। আসল রগড় জাতীয় সঙ্গীতের 'হিন্দু' শব্দটি নিয়ে। চলন্তিকার মত অতি সংক্ষিপ্ত অভিধানও বলছেন, 'হিন্দু' শব্দটি ফার্সী। এ শব্দটি সংস্কৃতে নেই, যদিও আসলে 'সিন্ধু' থেকে এসেছে। ফারসীতে 'হিন্দ্' বলতে কালো বোঝায় এবং বিলক্ষণ তুচ্ছার্থে। অর্থাৎ ইরানীদের মতে ভারতীয়রা আর্যেতর, কারণ ব্যাটারা 'কেলে' 'কেলে'। কিন্তু এই হিন্দ্ এবং তৎনির্গত একাধিক শব্দ তৎসাময়িক আন্তর্জাতিক জগতে এমনই ছড়িয়ে পড়ল যে শেষটায় ভারতীয়েরাই নিজেদের 'হিন্দু' নামে পরিচয় দিতে আরম্ভ করলো। ওদিকে অবশ্য ফার্সীতে মূল তুচ্ছার্থটা লোপ পেল। কিন্তু অতদূরে যাই কেন? মরহুম মুহম্মদ আলী ভাই ঝিঁড়া ভাইয়ের 'ঝিঁড়া' শব্দের গুজরাতিতে অর্থ 'ক্ষুদে' (যেমন ক্রিকেটার বিনু মাঁকড়ের মাঁকড় শব্দের অর্থ পিঁপড়ে) এবং কিঞ্চিৎ তুচ্ছার্থে। ঝিঁড়া নাম দেবার উদ্দেশ্য সরল। এত ক্ষুদে ঝিঁড়া, যে মৃত্যুদূত তাকে দেখতেই পাবে না। আমাদের ক্ষুদিরাম, নফর চট্টো, এককড়ি, তিনকড়ি এসব একই ঝোপের চিড়িয়া। আকছারই কিন্তু এককড়ে, ক্ষুদে বা কেষ্টা কেউই নামটা তুচ্ছার্থে না অন্যার্থে সে নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু ঝিঁড়াভাই যখন মুসলিম লীগের সর্বাধিকারী হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন তখন আরবী-ফার্সীর বিস্তর কদরদানরা বড্ডই সংকোচ অনুভব করলেন। ঝিঁড়াকে তখন 'জিন্নাহ'এ রূপান্তরিত করেন। অর্থাৎ পাড়ার মেধো ও-পাড়ার মধু না হয়ে স্বপাড়াতেই মধুসূদন হয়ে গেলেন। পাছে লোক 'জিন্নাহ' শব্দটির গাঁইয়া মূলরূপটি ধরে ফেলে তাই জিন্নাহ শব্দের 'হ-টি' হে 'হুত্তি' দিয়ে লেখা হল দো-চশমী সাদামাটা 'হে' দিয়ে নয়। কারণ প্রথম 'হে'-টি শুধু মাত্র একদম খাঁটি ন' সিকে আরবী শব্দেই ব্যবহার করা হয়। ঐ একই সময় লীগের আরেক মহাজন আবদুর রহমান সিদ্দী রাতারাতি হয়ে গেলেন আবদুর রহমান স্বিদ্দিকী!.....তা সে যাক গে—এইসি গতি সংসারমে। প্রভু খৃষ্টের প্রধান শাকরেদ (সেণ্ট) পীটার গ্রীক নামের অর্থ পাথর—প্রাণহীন (ইংরিজি 'পেট্রিফাইড' শব্দ তুলনীয়)। তাঁর প্রাণ হরণ করবে কোন শয়তানের যুবরাজ বিয়েলজবাব্ বা তার খাস প্যারা ডিয়াবলস (ডেভিল)। অথচ পীটারকে পাষাণ হৃদয় বা সনগদিল রূপে ভাবলে নিশ্চয়ই সেটা সম্মানসূচক নয়। ইনজিল গ্রন্থে আছে, প্রভু ইসা মসীহ পীটারকে বলেছিলেন, 'তুমি পিতর, আর এই পাথরের উপরে আমি আপন মণ্ডলী (গির্জা) গাঁথিব।' এরপর কোন খৃস্ট-ভক্ত পীটার নামকে হেনস্তা করবে? প্রস্তর, পীটারকে ফরাসীতে বলে পীয়ের এবং ঐ দেশে সে নামটি যে কতখানি জনপ্রিয় সবাই জানেন। রোমা রোঁলা তাঁর সবচেয়ে রোমাণ্টিক প্রেমের কাহিনী 'পিয়ের

এ ল্যুস'এর নায়কের নাম বেছে নিয়েছেন পিয়ের—যে নাম আমাদের ফিরোজ বা কেষ্টার ন্যায় প্রতি গ্রামে বর্ষায় ব্যাঙাচির মত কিলবিল করে।.....আর সেক্সপীয়র, খাতিম উল ইসম রূপে বলেই গিয়েছেন,

'নামে কি করে ?
গোলাপে যে নামে ডাকো,
গন্ধ বিতরে।'

(হেম বন্দ্যোর অনুবাদ)

আমার অপরাধ ফৌজদারী আইনে নয়, আলংকারিক বা নন্দন শাস্ত্রী-রূপে কবিগুরুর ভাষায় 'সাহিত্যিক দণ্ডনীতির ধারায় অপরাধের কোঠায়' পড়া উচিত—অবশ্য সমসাময়িক কতিপয় মডার্ণ কবিই এ স্থলে ফরিয়াদি, কবিগুরু নন, আমি নামকরণে গুবলেট করে ফেলেছি। 'পদ্মলোচন' নাম যার প্রাপ্য তাকে দিয়ে বসেছি 'ভেটকি-লোচন', 'চন্দ্র-বদন'কে দিয়েছি 'বদনা-বদন', 'রতি-গঠনকে' বলেছি 'গাড়ু-গঠন'।

আমার বিরুদ্ধে ফরিয়াদ আমি গবিতা রচকদের 'গবি' বলে উল্লেখ করেছি।

সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, আমি 'প্রবীণ' 'বহু জনমান্য মুরব্বি' লেখক। কোনো চ্যাংড়া লেখক এ হেন বাক্য বললে তাঁরা গায়ে মাখতেন না। মুরব্বিজনের সামান্যতম পদস্খলন স্বচ্ছ নীরে একটি মাত্র কৃষ্ণ কুন্তলের মত চোখে পড়ে, পক্ষান্তরে চ্যাংড়া চিংড়ির আবিল জলে বিরাট প্রস্তর খণ্ড হর-হামেশা ঘাপটি মেরে আত্মগোপন করে থাকে।

অতএব আমাকে এখন সাফসফা বলতে হবে আমি দোষী না নির্দোষ।

ধর্মাবতার পাঠকগণ!

ইতিপূর্বে একাধিক পাঠক পাকী ওজনে, নসিকে কর্কশ কণ্ঠে আমাকে 'গণ্ডমূর্খ' খেতাব দিয়ে আমাকে পাঠক-পঞ্চায়েতের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সেটা অপ্রমাণ করার জন্য হুলিয়া শমন জারী করেছেন, এ-পার গঙ্গায় আমার স্বধর্মীজন আমার বিরুদ্ধে কাফের ফতোয়া ঝেড়েছেন (তেনাদের প্রাণঘাতী ফতোয়ার চেয়ে তেনাদের বিজাংগা বিটকেল বাংলা রচনা আমাকে ঘায়েল করেছে ঢের ঢের বেশী); ওনাদের অত্যুৎসাহী জনৈক ফকীহ প্রবর ঐ মর্মে প্যামফলেট ছাপিয়ে মেলাতে ফেরি করে বিলক্ষণ টু'পাইস কামিয়েছেন ; ওপার গঙ্গায় আমাকে হিন্দু ধর্মবিদ্বেষী, সনাতন ধর্মের অপমানকারী প্রতিপন্নার্থে দৈনিকে কঠোর মন্তব্য করেছেন জনৈক উত্তেজিত লেখক। এর কঠোরতর উত্তর অবশ্য দিয়েছেন কলকাতাবাসী পাবনার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের এক ব্যঙ্গ নিপুণ পণ্ডিত ; পক্ষান্তরে

আমি মুসলমানের কলঙ্ক এর প্রতিবাদ পূব বাংলার কেউ করেননি, না করে ভালোই করেছেন ; আমি বঙ্গভাষা জননীকে প্যাজ রসুন (আরবী-ফার্সী যাবনিক শব্দ এস্তেমাল করে) খাইয়ে মা-জননীকে ধর্মচ্যুতা করবার পাপ-প্রচেষ্টায় অষ্টাহ সচেষ্ট কেষ্ট-বিষ্ণুবৎ-ইত্যাকার অভিযোগ ঝাড়া সিকি শতাব্দী ধরে আমার বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে। যে সব অভিযোগ ওপার বাঙলার কোনো সম্পাদকই ছাপাতে রাজী হননি সেগুলো ব্যক্তিগত পত্ররূপে সরাসরি ডাক-মারফত, মমালয়ে হানা দিয়ে ঢিঢিক্কার দিয়েছে, আমি পাকিস্তান দরদী ইয়াহিয়া ভুট্টোর স্পাই। পক্ষান্তরে এপার বাংলায় আমি হিন্দু মহাসভার স্পাই এ-অভিযোগ কখনো শুনিনি। কিন্তু এদের তুলনায় আমার প্রতি অহেতুক মেহেরবান পাঠক বেশুমার, বিস্তরে বিস্তর। এঁদেরই নীরব দোওয়ার বরকতে এ-অধম চাঁদপানা চেহারা করে মুখ বুজে সুখ-নিদ্রায় দিব্য কালযাপন করেছে, ভান উইন-কলকে হার মানিয়ে সিকি শতাব্দী ধরে। সর্বপ্রকারের সাফাই মাথায় থাকুন, কোনো প্রকারে তর্কাতর্কিতেও নামেনি।

কিন্তু আমি উভয় বঙ্গের নিরীহতম পাঠকের ও মর্মদাহের নিমিত্ত হতে পারি —সম্মানিত মডার্ন কবিদের তো কথাই ওঠে না—আমার বিরুদ্ধে এহেন বেদরদ, বেইনসাফ অকরুণ ফরিয়াদ কস্মিনকালেও ক্ষীণতম কণ্ঠেও মর্মরিত হয়নি। নগণ্যতম পত্রিকার ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র অক্ষরেও ছাপা হয়নি।

আমি মর্মবেদনায় অভিভূত, মোহ্যমান।

কারণ কাজী কবি কর্তৃক অনূদিত ওমর খৈয়াম রচিত রুবাইয়াতের ভূমিকা লেখবার জন্য কবির আত্মজন তথা প্রকাশক পরিবেশক আমাকে যখন অনুরোধ করে আমার অকিঞ্চন জীবনের সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেন তখন নতমস্তকে সে-অবতরণিকার সর্বশেষে সে যে-রুবাঈটি সর্বান্তঃকরণে সসম্মানে তুলে ধরে সেটি সংসারের যাত্রাপথে তার প্রিয় সহচর :—

কারুর প্রাণে দুখ দিও না,
করো বরং হাজার পাপ,
পরের মনে শান্তি নাশি
বাড়িও না তার মনস্তাপ।

অতএব, ধর্মাবতারগণ, পুনরায় সম্বিতস্থ হয়ে আমি আত্মপক্ষ সমর্থনার্থে কিয়দ্দিনের মহলাৎ কামনা করে মোকদ্দমা মুলতুবি রাখার হুকুম ভিক্ষা করি।

মুচলিকাবদ্ধ হচ্ছি, 'গুণরাজ খান' নিক্সনের মত হালফিল তুফীম্ভাব অবলম্বন করত, নানাবিধ কৌটিল্যসুলভ সুচতুর মুষ্টিযোগ (ডিপ্লোমেটিক কু) প্রসাদাৎ মোকদ্দমাটা প্রলম্বিত করে করে জনগণের দিলচস্পী একদিন যখন ঔদাসীন্যে

পরিণত হবে তখন তারই ফায়দা উঠিয়ে চুপসে বেমালুম কেটে পড়ার মত এলেম আমার পিতৃপিতামহের উদরে 'কস্মিনশ্চিত' সত্যযুগস্য শুভলগ্নেও ছিল না, বর্তমান বা ভবিষ্যে আমার পেটে এটম বোমা মারলেও বেরুবে না।

বিচিত্রা পত্রিকা ঢাকা

অবনীন্দ্রনাথ

ঊনবিংশ শতকের বাঙালী অন্ততঃ এই সত্য জানিত যে সংস্কৃত-সাহিত্য শ্লাঘার বস্তু। সেই যুগে ভারতীয়ের আত্মমর্যাদাকে ইংরেজ নানা প্রকারে ক্ষুণ্ণ করা সত্ত্বেও পৃথিবী তখন স্বীকার করিয়া নিয়াছে যে সংস্কৃত সাহিত্য পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য—যে গ্রীক সাহিত্য লইয়া ইউরোপ এত গর্ব করে, তাহার সঙ্গে সংস্কৃত অনায়াসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে এবং লাতিন অপেক্ষা সে বহুলাংশে বিত্তবান।

বাঙ্গালার অনুপ্রেরণা সংস্কৃত হইতে আসে; সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাঙালীর অল্পবিস্তর আশ্বাস ছিল। তদুপরি বহু ভাষায় সুপণ্ডিত মধুসূদন যখন সর্বভাষা বর্জন করিয়া বঙ্গভাষার সার্থক রস সৃষ্টি করিলেন, তখন বাঙালীর আত্মবিশ্বাস দৃঢ়তর হইল।

কিন্তু অন্যান্য কলাসৃষ্টিতে বাঙালী তথা ভারতীয়ের কণামাত্র উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল না। বাঙালী যে চিত্রে কিম্বা ভাস্কর্যে নিজস্ব কোনো প্রকারের রসনাভূতি প্রকাশ করিতে পারিবে কিম্বা বিশ্বের সম্মুখে নিজস্ব চারুকলা উপস্থিত করিয়া বিশ্বজনের প্রশস্তি অর্জন করিতে পারিবে এই বিশ্বাস যে বাঙালীর ছিল না তাহাই নহে, সামান্য যাহা বাঙালীর নিজস্ব কলাশিল্পরূপে তখনও বিদ্যমান ছিল বাঙালী তাহার সম্মুখে লজ্জায় অধোবদন হইত। কালীঘাটের পটকে সম্মান দেওয়া দূরে থাকুক বাঙালী তখন তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অচেতন।

তাই অবনীন্দ্রনাথের সাহস দেখিয়া স্তম্ভিত হই। আজ অজন্তা আর্ট, মোগল চিত্রশিল্প বিশ্বরসিকের কাছে সুপরিচিত। আজ চিত্রকলার প্রামাণিক ইতিহাস পুস্তক পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই প্রকাশিত হউক না কেন তাহাতে অজন্তা মোগল চিত্রের উল্লেখ না থাকিলে সে পুস্তক অসম্পূর্ণ বলিয়া গণ্য হয়, গ্রন্থকারের সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ রসবোধ নিন্দিত হয়। কিন্তু যে যুগে অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় ঐতিহ্যাগত কলাশিল্পে অনুপ্রাণিত হইয়া রসসৃষ্টির নব নব অভিযানে বহির্গত হইলেন। সে যুগেও অজন্তা বঙ্গদেশে ন্যায্য সম্মান পায় নাই। আজ অবিশ্বাস্য মনে হয়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ব্যক্তি মাত্রই স্মরণ করিতে পারিবেন, অজন্তা চিত্র প্রকাশ করার জন্য 'প্রবাসী' পত্রিকাকে কতখানি হাস্যাস্পদ হইতে হইয়াছিল।

সেই বিড়ম্বিত অজন্তা সেই লাঞ্ছিত মোগল চিত্রের আদর্শ সম্মুখে লইয়া চিত্র অঙ্কন করিবার মত দুঃসাহস অসাধারণ পুরুষেই সম্ভব।

জানি, অবনীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্কন না করিলেও অজন্তা মোগল একদিন তাহাদের ন্যায্য সম্মান পাইত, কিন্তু একথা আরও নিশ্চয়রূপে জানি, অবনীন্দ্রনাথ না থাকিলে অজন্তা মোগল নবজীবন লাভ করিয়া আমাদের শতশত শিল্পীকে উদ্বুদ্ধ অনুপ্রাণিত করিতে পারিত না। নবভগীরথ অবনীন্দ্রনাথ কলাক্ষেত্রে যে জাহ্নবী অবতরণ করাইলেন তাহার "সোনার ধান" বঙ্গদেশের ভাণ্ডার সম্পূর্ণ করিয়া এখন সমস্ত ভারতবর্ষের অন্নদান আনন্দদান করিতেছে।

আজ যে ভারতবর্ষের সুদূরতম প্রান্তে ভারতীয় শিল্পী চিত্রাঙ্কন করিবার 'ভাষা' পাইয়াছে, তাহার পশ্চাতে অবনীন্দ্রনাথের কি অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অবিচল নিষ্ঠা ছিল সেকথা কয়জন শিল্পী কয়জন শিল্পীরসিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, কিম্বা সশ্রদ্ধ স্মরণ করে?

অবনীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন করেন এবং পরবর্তী যুগে নিজস্ব শৈলীতে রসবিকাশ করিয়া স্বদেশে বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেন একথা সকলেই জানেন, কিন্তু নিজস্ব শৈলী নির্মাণের জন্য তিনি যে চীন জাপান প্রত্যেক প্রাচ্য দেশের শিল্পে বৎসরের পর বৎসর গভীর সাধনা করিয়াছিলেন তাহার সন্ধান তাহার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করেন আজ কয়জন শিল্পী-ঐতিহাসিক?

জাপানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী টাইকান ভারতবর্ষে আসেন প্রথম যৌবনে—অবনীন্দ্রনাথও তখন যুবক। এক দিকে টাইকান যেরকম অবনীন্দ্রনাথের সাহচর্যে ভারতবর্ষে সর্ব চারুকলাবিকাশ প্রচেষ্টার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া আপন শৈলী সর্বাঙ্গ-সুন্দর করিতে সমর্থ হন ঠিক সেই রকম অবনীন্দ্রনাথও জাপানী শৈলী হইতে এমন সব কলাকৌশল আয়ত্ত করেন যাহার প্রসাদে তাঁহার অঙ্কন-পদ্ধতি বহু রসের সংমিশ্রণে অপূর্ব সামঞ্জস্য ধারণ করে। অবনীন্দ্রনাথের প্রধান কৃতিত্ব ছিল এই-খানে। যে কোনো কলা নিদর্শন, দেখা মাত্রই তিনি তাহার প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারিতেন এবং সেই নিদর্শন হইতে কোন্ বস্তুটি তাঁহার শৈলীতে সম্পূর্ণ এক হইয়া তাহাকে সমৃদ্ধিশালী করিবে সে রসবোধ ছিল তাঁহার অসাধারণ। তাই যখন অবনীন্দ্রনাথের চিত্র বিশ্লেষণ করি তখন আর বিস্ময়ের অবধি থাকে না যে এই সঙ্কীর্ণ মানবজীবনে একজন মানুষ কি করিয়া এতখানি কলাকৌশল আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইল।

তাই বোধ হয় অবনীন্দ্রনাথের কৃতী শিষ্যগণ এত ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন করিয়া বঙ্গদেশের কলাজগৎকে এতখানি চিত্রবিচিত্রিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

যে গুরু বহুবিধ সাধনা করিয়া সত্যরস পাইয়াছেন, একমাত্র তিনিই প্রত্যেক শিষ্যের আপন বৈশিষ্ট্য সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাকে সেই পন্থাতেই কত নব নব অভিজ্ঞতা কত নব নব বিকাশ আছে তাহার সন্ধান দিতে পারেন। সার্থক চিত্রকার এই জগতে অনেক আছেন, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের মত সার্থক গুরু এই সংসারের সর্বত্রই সর্বযুগেই বিরল। আজ ভারতবর্ষে এমন প্রদেশ নাই যেখানে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য বিরল ; কারণ অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য নন্দলালের কাছে যাঁহারা কলাশিল্প আয়ত্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের গর্বের অন্ত নাই যে অবনীন্দ্রনাথ তাঁহাদের গুরুর গুরু।

স্পর্শমণির স্পর্শ লাভ করিয়া মৃত্তিকা স্বর্ণ হয়, কিন্তু সেই স্বর্ণ তো স্পর্শমণির মত অন্য মৃত্তিকাকে স্বর্ণরূপ দিতে পারে না। অথচ যে প্রদীপ অন্য প্রদীপ হইতে একবার অগ্নিশিখা আহরণ করিয়া প্রদীপ্ত হইয়াছে সে পৃথিবীর সর্বপ্রদীপকে প্রজ্বলিত করিতে পারে। সাধনাতে সিদ্ধিলাভ সংসারের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত্তিকার স্বর্ণরূপ প্রাপ্তির ন্যায়। তিনি কিন্তু তাঁহার সাধনার ধন অন্যকে দিতে পারেন না। অবনীন্দ্রনাথের সাধনা দীপ্ত সাধনা। তিনি আপন জীবনে যে রসের সন্ধান পাইয়া নিজেকে প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন, সেই অগ্নিশিখা দিয়া বহু শিষ্য আপন আপন অণুদীপ প্রজ্বলিত করিয়াছেন। আজ তাই বঙ্গদেশে তথা তাবৎ ভারতবর্ষে চারুকলার যে অনির্বাণ দীপান্বিতা প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহার প্রথম প্রদীপ অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলা-বিশ্লেষণ অন্যকার কর্ম নয়। তাঁহার রসবোধ, তাঁহার চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতি আধুনিক ভারতীয় চারুকলাকে কতখানি প্রভাবান্বিত করিয়াছে সে আলোচনা করিবার দিন এখনও আসে নাই। কারণ তাঁহার অনুপ্রেরণা আরো বহু বৎসর ধরিয়া ভারতীয় চিত্রকলাকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করিবে—তাঁহার আসন গ্রহণ করিতে পারে, এমন কোনো পুরুষকে এখনও দিকচক্রবালে দেখিতে পাইতেছি না।

কিন্তু একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে এক অদ্ভুত আস্বচ্ছ রূপ আছে—এ রূপ পৃথিবীর অন্য কোনো চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই অবর্ণনীয় রূপ তিনি সঙ্গীত হইতে গ্রহণ করিয়া চিত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। সকলেই জানেন অবনীন্দ্রনাথ বহু বৎসর ধরিয়া সঙ্গীত সাধনা করেন। সঙ্গীত ধ্বনি দৃষ্টিবহির্ভূত ; তিনি ধ্বনিকে রূপায়িত করিয়াছেন—তাই তাঁহার চিত্রের এই আস্বচ্ছ শৈলী।

অদ্যকার দিবসে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্মরণ করি :—

"যখন আমি ভাবি বাঙ্গলায় শ্রদ্ধালাভের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি কে তখন প্রথমই আমার যে নামটির কথা মনে আসে, তাহা হইতেছে অবনীন্দ্রনাথের। দেশকে তিনি আত্মগ্লানির পাপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। অপমানের পঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিয়া দেশকে তিনি উহার ন্যায্য সম্মানজনক স্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শিল্পচেতনার পুনরুন্মেষণার মধ্য দিয়া ভারতে এক নবযুগের অভ্যুদয় হইয়াছে এবং তাঁহার নিকট হইতে সমগ্র ভারত নূতন করিয়া তাহার পাঠ গ্রহণ করিয়াছে। এইভাবে তাঁহার সাফল্যের মধ্য দিয়া বাঙ্গলা গৌরবময় আসন লাভ করিয়াছে।"

ভরত-নাট্যম

শ্রীমতী যোগম ও মঙ্গলমের ভরত রীতিতে নৃত্য দেখিয়া আমরা বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। বিশুদ্ধ নৃত্যরস ও আঙ্গিকের দিক দিয়া ইহার পূর্ণ বিশ্লেষণ গুণীরা করিবেন। আমরা অন্যান্য নানা আনন্দের সঙ্গে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছি রসের ভিতর দিয়া উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কৃষ্টিগত সাদৃশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া।

উত্তর ভারতে বিশেষ করিয়া বাঙলা দেশে আমরা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করি শৃঙ্গার রসের দ্বারা। আমাদের পদাবলীতে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তের প্রেম শ্রীরাধার বিরহের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়। এ রস উত্তর ভারতে সম্পূর্ণ অপরিচিত নহে কিন্তু বিষ্ণু-নারায়ণের রাম অবতার সেখানে তুলসীদাস প্রধানতঃ ভক্তিরসের দ্বারা জনগণের হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যুবক-যুবতীর প্রেমবেদনা শ্রীরাধার কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে বিশেষ করিয়া বাঙলা দেশের পদকীর্তনে ও রাজপুতনার মীরাবাঈয়ের ভজনে।

কিন্তু পদাবলীতে কি শুধু শৃঙ্গার? শৃঙ্গার প্রধান রস বটে কিন্তু তাহার সঙ্গে কী সূক্ষ্ম ভক্তিই না মিশ্রিত আছে!

তোমার চরণে আমার পরাণে
লাগিল প্রেমের ফাঁসি।

তোমার 'পরাণে' আমার 'পরাণে' নয়, তোমার 'চরণে' আমার 'পরাণে'। কিন্তু চরণে ও পরাণে বাঁধা হয় ভক্তি ও স্নেহবন্ধন অথচ কবি বলিলেন—প্রেমের ফাঁসি। ভক্তির সঙ্গে প্রেম, না প্রেমের সঙ্গে ভক্তি, কি বলিব?

এই প্রেমে সূক্ষ্ম ভক্তি মিশ্রিত আছে বলিয়াই তাহার প্রকাশ করিতে পারেন বিদগ্ধ কীর্তনিয়ারা। রাধার বিরহ গাহিতে গাহিতে যখন তাঁহাদের চক্ষু নিবিড় বেদনায় প্লাবিত হয় তখন সে বেদনার কতটুকু গায়কের নিজের যৌবনের প্রিয়া-বিরহের স্মরণে আর কতটুকু বার্ধক্যের তীব্র অনুভূতি—শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ অস্তিত্বের পরম সত্তা শ্রীভগবানকে জীবনে উপলব্ধি করিতে না পাওয়ায়! জীবনের বহু দহনে দগ্ধ হইয়া যে বৈদগ্ধ্য পরিপূর্ণতা লাভ করে তাহার অভাব হইলে শৃঙ্গার হইতে ভক্তি লোপ পাইয়া যে রস থাকে তাহা অনেক সময় সম্পূর্ণ পার্থিব হইয়া বিকৃতরূপ ধারণ করে।

শ্রীমতীদ্বয়ের গৌর (কৃষ্ণ) চন্দ্রিকায় এই ভক্তি ও প্রেমের অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিলাম। মনে হইল 'চরণ' ও 'পরাণে'র ফাঁসিতে যে ব্যঞ্জনা তাহা কাব্যের গুঞ্জরন কুঞ্জবন ত্যাগ করিয়া শ্রীমতীদের অঙ্গে সঞ্জীবিত হইল—চিন্ময়ী মৃন্ময়ী রূপ ধারণ করিল। কাব্যে ভক্তি ও শৃঙ্গারের মিলন অপেক্ষাকৃত কঠিন, নৃত্যাভিনয়ে অপেক্ষাকৃত সরল। চোখে মুখে বিরহের বেদনা অথচ করদ্বয় ভক্তিনমস্কারে যুক্ত। দুই রসের অবর্ণনীয় সম্মেলন। অভিনয়ে এই সম্মেলন অপেক্ষাকৃত সরল বলিয়াই মনে হয় শ্রীমতীরা অল্প বয়সেই তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

নটরাজের বাঙলা কাব্যে প্রবেশ অগ্রদূত রবীন্দ্রনাথের শঙ্খ ঘোষণায়। নটরাজ 'দুঃসাহসী যৌবনকে উদ্ধার' করেন; কবি যখন নৃত্য আরম্ভ করেন তখন তাঁহার 'পদে পদে' যেন নটরাজের 'চঞ্চল চরণ ভঙ্গী' পড়ে এই প্রার্থনা করেন; কবি দেখেন নটরাজের নৃত্য 'বিদ্রোহী পরমাণুকে সুন্দর' করিয়া তোলে। শ্রীমতীদ্বয়ের নৃত্যে এই রস রূপ গ্রহণ করিয়া নবীন রসের সৃষ্টি করিল আর নবীন ব্যঞ্জনা পাইলাম নটরাজকে রসস্বরূপে আরাধনা করিবার। "হে চিদম্বরমের প্রভু, ত্রিলোক ও কামের ধ্বংসকর্তা নটরাজ, তুমি কি আমার দ্বারপ্রান্তে একবার ক্ষণেকের জন্য দাঁড়াইবে না, আমাকে আহ্বান করিবে না।"

নৃত্যের সঙ্গে দ্রাবিড় গীতের সঙ্গত শুনিয়া আমাদের মনে পড়িল 'ওগো মা রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সমুখ পথে।' সে তো চাহিবে না, তাহার রথের চাকা আমার দরজায় দাঁড়াইবে না, তবু চিদম্বরমের পরম প্রভুকে ক্ষণেক দাঁড়াইবার জন্য মানুষের কী আকুল ব্যাকুল ক্রন্দন নিবেদন। শ্রীমতীদ্বয়ের নৃত্যে কৃষ্ণ নটরাজের প্রতি ভক্তি শৃঙ্গার রসের অভিব্যক্তিই যে সর্বোৎকৃষ্ট ইহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। অপেক্ষাকৃত তরুণরা হয়ত ইহাদের নৃত্যে তালবোল সম্বলিত জটিল আঙ্গিকে শুদ্ধ রস পাইয়াছেন; আমরা বাল্যকাল হইতে কীর্তন রসে আপ্লুত বলিয়া

এই রসই প্রধানতঃ লক্ষ্য করিয়াছি। এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করিলাম যে, উত্তর দক্ষিণের দেবদেবী যে একই তাহা নহে—সে তো সকলেই জানেন—অধিকন্তু আমাদের রসপূজার সঙ্গে তাঁহাদের রসপূজার স্থূল সূক্ষ্ম উভয় প্রকারের যোগ আছে। আমাদের পূজাকে পূর্ণাবয়ব করিবার জন্ম দক্ষিণের ভরত নৃত্য উত্তরে প্রচারিত হউক।

আনন্দবাজার পত্রিকা
১২. ৮. ১৯৪৯

নর্তকী

মাদ্রাজ শহরের দক্ষিণতম প্রান্তে সমুদ্রের গা ঘেঁষে বাড়িটি। চওড়া বারান্দা—আর সে এতই চওড়া যে স্পষ্ট বোঝা যায়, এ বাড়ির ঘরগুলো বারান্দা বানানোর উপলক্ষ্য মাত্র। বারান্দাটাই মুখ্য, ঘরগুলো না থাকলে চলে না বলেই নিতান্ত এক পাশে কোণ ঠেসে পড়ে আছে।

বারান্দাতেই জীবন-যাত্রা। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন ছাড়া অন্য কোনো সময়েই ঘরের ভিতরে যাবার প্রয়োজন হয় না—মাদ্রাজ উপকূলের তির্যকতম বর্ষায়ও না। খাটটা একটুখানি ঠেলে নিয়ে নিম নারকোল কালোজাম গোলমোহরের দাপা-দাপির এক পাশে দিব্য আরামে ঘুমনো যায়।

সমুদ্রের গর্জন অষ্টপ্রহর লেগে আছে বলে সবাই কথাবার্তা কয় গলা বেশ চড়িয়ে। কোন দিন যদি হঠাৎ একটুখানি গর্জন কমে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করি সবাই কি রকম খামখা চেঁচিয়ে কথাবার্তা বলছি। আমার বন্ধু গৃহস্বামী কনকপ্রসাদ রাও হোটেল রেস্তোরাঁয় কাউকে চেঁচিয়ে কথা বলতে শুনলেই আমাকে কানে কানে বলতেন, 'লোকটার জন্ম হয়েছে নিশ্চয়ই সমুদ্র-পারে। তার সপ্তকের মধ্যমে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে—কিছুতেই নামতে পারছে না।'

কনকপ্রসাদের সেই ফিসফিসও রেস্তোরাঁর আর সবাই স্পষ্ট শুনতে পেত। তিনি ছেলেবেলাটা কাটিয়েছেন ওয়ালটেয়ারের সমুদ্র-পারে।

কনকপ্রসাদ ডাক্তার, আর আমি রোগী। মাদ্রাজ উপকূলে গিয়েছি ভাঙা স্বাস্থ্য জোড়া লাগাবার আশায়। কনকপ্রসাদের হুকুম মাফিক পাকা একটি ঘণ্টা সমুদ্র-পারে শুধু পায়ে পাইচারি করত হয়, চারটে কাঁচা আণ্ডা গিলতে হয়, গোনাগুনতি এক ডজন কমলানেবু খেতে হয়, আরো কত কি এটা-ওটা-সেটা তার হিসেব জানেন কনকপ্রসাদের বউ! গিন্নী আমাকে এ-সব গেলান ভটচায বামুনের বউ যে রকম বাড়িসুদ্ধ সবাইকে শাস্ত্রের বিধান গেলায় ভটচাযের চেয়েও

বেশী—কারণ ঠাকুর বরঞ্চ জানেন 'মাকড় মারলে ধোকড় হয়', কিন্তু ব্রাহ্মণীর কাছে নিপাতন বলে কোনো জিনিস নেই। ডাক্তার জানে, দু'টো নেবু এক দিন কম খেলে আমি কিছু শয্যাশায়ী হব না; ভটচাযও জানেন, সরস্বতী পূজার দিনে বই ছুঁলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না, কিন্তু ডাক্তারের বউ ভটচায-গিন্নী ও-সব বোঝেন না। আমাকে বারোটা কমলানেবু খেতে হত তুলসীতলায় প্রদীপ দেওয়ার মত, রিচুয়াল হিসেবে।

ঘড়ি ধরে সূর্যাস্তের ঠিক কুড়ি মিনিট আগে হুকুম হত সমুদ্র-পারে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরোবার। বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি তদারক করতেন,—আমি পিচ-ঢালা কালো রাস্তার ফালি ওপার হয়ে, সবুজ মাঠের ফালি পেরিয়ে গিয়ে, সোনালী বালুতে ধাক্কা খেতে-খেতে সমুদ্র-পারে পৌঁছে মাকুটার মত উত্তর-দক্ষিণ করছি কিনা।

করতুম। 'পড়েছি যবনের হাতে'-র যবনকে যখন আর কারো হাতে পড়ে খানা খেতে হয়, তখন আর বুঝিয়ে বলতে হবে না, অখণ্ড-সৌভাগ্যবতী কনক-প্রসাদ-গৃহিণী কি ধরনের মানুষ ছিলেন।

পাইচারি করতুম আর হিংসেয় আমার বুক ফেটে টুকরো টুকরো হত একটি তামিল ব্রাহ্মণকে সমুদ্রপারে একটা জেলে নৌকার গা ঘেঁষে আরাম্‌সে বসে থাকতে দেখে। মাদ্রাজ শহরের শেষ-প্রান্ত বলে এখানে কেউ বড় একটা বেড়াতে আসে না—তাই মাসের আঠাশ দিন এই তামিল ব্রাহ্মণ আর আমাতে মিলে এ রাজত্বে পুরুষ-প্রকৃতির মত সৃষ্টি চালাতুম। ব্রাহ্মণটিই পুরুষ, কারণ তিনি নির্বিকার, নিশ্চল, নিশ্চুপ হয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতেন আর আমি প্রকৃতি—শাটল কর্কের মত কখনো হেথায়, কখনো হোথায় গুত্তা খেয়েই যাচ্ছি, একটানা দশ মিনিটের বেশি জিরোবার হুকুম নেই। সেশ্বর সাংখ্যে প্রকৃতি-পুরুষের উপরেও আছেন আরেক জন। তিনি ডাক্তারের বউ।

ব্রাহ্মণের সামনেই আমি মাকু চালাতুম। কখনো কখনো ঘাড় বাঁকিয়ে দেখেছি, তিনি আমার দিকে এক বারের তরেও তাকান কি না। উহুঁ। তাঁর দৃষ্টি সমুদ্র পেরিয়ে সোজা দিগ্বলয়ের দিকে। হয়ত তিনি কোনো মারাত্মক রকমের সাধনা নিয়ে পড়ে আছেন,—শুনেছি, কোনো কোনো বিশেষ সাধনা যেমন গুহা-গহ্বরে করতে হয়, কোনোটা নাকি তেমনি করতে হয় সিন্ধু-পুলিনে, নির্জনে, গুরুগম্ভীর গর্জনের মাঝখানে। সাধকরা বলেছেন, লোকালয়ে বহু শব্দ, অরণ্যেও পশু-পক্ষীর অহেতুক কলরব; সমুদ্রের গর্জন আর সব ধ্বনি ডুবিয়ে দেয় বলে ঐ গম্ভীর মন্ত্রের দিকে মনোনিবেশ করে চিত্তবৃত্তি নিরোধের পয়লা ধাপ অতি অনায়াসে পার হওয়া যায়।

তা হয়ত যায়, ব্রাহ্মণ হয়ত হয়েছেন। আমার তাতে কোনো হিংসে নেই—হিংসে হয় শুধু দেখে, ভদ্রলোক কি রকম আয়েসে গা ডুবিয়ে দিয়ে সিন্ধুর গর্জন-গান শোনে, আকাশে রঙের নাচ দেখে, ইস-পার উস-পার জুড়ে যে চাঁদের আলোর ঝিকিমিকি লাগে তারই দিকে আপন-ভোলা হয়ে তাকিয়ে থাকে।

লোকটি সুপুরুষ। স্লেটার সায়েব দক্ষিণ ভারত সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন, মানুষ নাকি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিল, তাকে যেন প্রলোভনে ফেলা না হয়, আর তার-ই উত্তরে নাকি ভগবান তামিল রমণী সৃষ্টি করেছেন। দোহাই ধর্মের, এ মত আমার নয়, স্লেটার সায়েবের, কারণ আমি তো বুঝে উঠতে পারি নে তামিল রমণী যদি সৌন্দর্যহীনাই হবে তবে এ রকম সুপুরুষ ব্রাহ্মণ জন্ম নিল কার গর্ভে?

কী অপূর্ব কাঁচা সোনার রঙ। সমুদ্রের নীল জলে ধোওয়া সোনালি বালু যে রকম ঝলমল করে ওঠে, ঠিক তেমনি ভদ্রলোকের রঙ। নীল আকাশ আর নীল সমুদ্রের পাশে তাঁর মুখ, হাত-পা যে রকম আপন তেজে অপ্রকাশ হয়ে থাকতো, তা তাঁকে সমুদ্র-পারে না বসিয়ে দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস হবে না। খুব কাছে গিয়ে দেখিনি তবু দূর থেকেই লক্ষ্য করেছি তাঁর শান্ত চোখ, ছোট একটুখানি মুখ, চওড়া কপাল আর গোল করে কামানো মাথার মাঝখানে এক ঝুঁটি মিশ-কালো চকচকে চুল। তামিল ব্রাহ্মণদের এ-রকম ঝুঁটিবাঁধা চুল দেখলেই আমার মনে প্রশ্ন জাগে, মানুষ ইচ্ছে করে নিজেকে এরকম কুরূপ কুৎসিত করে তোলে কেন? কিন্তু এঁর চুল দেখে এই প্রথম বুঝতে পারলুম, তামিল নটবর কোনো শিব গড়তে গিয়ে কোন্ বাঁদর মাথায় তুলে নিয়েছে। এই বিদ্‌ঘুটে ঢঙের কামানো মাথায় ঝুঁটিবাঁধা চুলও যে কী আশ্চর্য সুন্দর হতে পারে, তা আমি দেখলুম এই প্রথম আর এই শেষ।

পরনে লুঙ্গীর মত করে ধুতি, মাদ্রাজী ধরনের কুর্তা, পায়ে চপ্পল্ কাঁধে তোয়ালে—যাকে বলে ন' সিকে মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ; নস্যি নিতে দেখিনি, বাদ পড়েছে মাত্র এইটুকু।

এ সবেতে আমার হিংসে হয় না, আমার হিংসে হত তার বসার ধরনটুকু দেখে। মুখে দুশ্চিন্তার লেশ নেই, বসেই আছেন বসেই আছেন, সূর্য ডুবলো, চাঁদ উঠলো, তাঁর কাছে যেন সবই সমান। বাড়ি ফেরার তাড়া নেই, আকাশে মেঘ জমলে ও বৃষ্টির ভয়ে তাঁকে আপন আসন ত্যাগ করে ব্যস্ত হতে কখনো দেখিনি।

পাকা তিনটি মাস ধরে আমি পুলিনবিহারী, আর তিনি পুলিনাসীন হয়ে রইলেন। আমি তাঁকে লক্ষ্য করলুম নিত্যি নিত্যি—এ-রকম সৌম্যকান্তি

লোককে অবহেলা করা কঠিন। তিনি আমাকে লক্ষ্য করলেন কিনা, বলতে পারবো না। কারণ আর যে দু'চারজন মাঝে-মাঝে এদিকে বেড়াতে আসেন, তাঁদের কাউকেও ওঁর সঙ্গে কথা বলতে দেখিনি। তাই অনুমান করলুম, কাউকে লক্ষ্য করা এঁর অভ্যাস নয়, না হলে নিশ্চয়ই কারো না কারো সঙ্গে এঁর আলাপ-পরিচয়, অন্ততঃ নমস্কারমূটা হয়ে যেত।

আমার আলাপ করতে ইচ্ছে হয়েছিল কিনা ঠিক বলতে পারবো না। কারণ আমি জানি, এ-রকম শান্ত ধীর সংযত সংহত লোকের সামনে চপল মানুষ লজ্জা পায় আপন চপলতা নিয়ে, আর সেটা ঢাকতে গিয়ে চপলতা বেড়ে যায় আরো বেশী। অথচ আলাপ করবার লোভও যে হয়নি, সে-কথাও বলতে পারি নে।

তবু হয়ে গেল এক দিন যোগাযোগ। বিনা মেঘে বজ্রপাত হয় শুনেছি, কিন্তু বিনা মেঘে বৃষ্টিপাত হয় এ-তত্ত্ব আমার জানা ছিল না। আমি ছিলুম একদৃষ্টে ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে। কবি নই, তবু মনে মনে ভাবছিলুম, এই যে দূর থেকে রোষে ক্রোধে তর্জনে গর্জনে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে সিন্ধুপারে লুটিয়ে পড়ে ঢেউগুলোর বিগলিত আত্মনিবেদন এর ঠিক জুতসই তুলনা কি বললে ঠিক ঠিক ওৎরাবে। মনে মনে ভাবছিলুম দুত্তোর ছাই, কবিরা বাণ্ডিল বাণ্ডিল তুলনা ছাড়ে কথায় কথায় আর আমার মাথা এমনি নিরেট যে, একটা পর্যন্ত তুলনা খুঁজে খুঁজে বের করতে পারছি নে! ভাগ্যিস, এ যুগের পরীক্ষায় কবিতা রচনা করতে হয় না, না হলে বাবাকে পরীক্ষার ফীজ দিতে দিতে ফতুর হতে হত।

হঠাৎ ঝমাঝ্‌ঝম বৃষ্টি। ছুট ছুট ছুট। এ-বৃষ্টিতে ভিজলে আমার তিন মাসের মেহন্নতে জমানো স্বাস্থ্য তিন টুকরো হয়ে যাবে। সেই নৌকাটার পাশ দিয়ে বেরুচ্ছি, এমন সময় দেখি তামিল ভদ্রলোকটি আমার দিকে ইঙ্গিত করছেন—সমুদ্রের গর্জন ছাপিয়ে চিৎকার করা মানুষের কর্ম নয়। আমি কাছে যেতেই বললেন, "নৌকর উপরে উঠে বসুন, আমি পাল দিয়ে আপনার গা ঢেকে দিচ্ছি। একটু পরেই আমার চাকর ছাতা নিয়ে আসবে।"

এ ছাড়া অন্য উপায়ও ছিল না। যত তেজেই ছুট মারি না কেন, বাড়ি পৌছতে পৌছতে কাঁই হয়ে যাব।

গা বাঁচিয়ে বসার পর উত্তেজনা কাটতেই খেয়াল গেল, তামিল ভদ্রলোক কথা বলেছেন পরিষ্কার রাঢ়ী বাঙলায়! কি করে হল? এক মুহূর্তেই ভুলে গেলুম, এ-রকম শান্ত সংহত লোককে হড়বড় করে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা অনুচিত—চিৎকার করে পালের তলা থেকে শুধালুম, "এ-রকম বাঙলা বিদেশী বলতে পারে না। আপনার বাড়ি কোথায়?"

ভদ্রলোক শুনতে পেলেন কিনা, জানি নে। আমি কোনো উত্তর না পেয়ে বৃষ্টি-বাদল ভুলে গিয়ে ভাষা-সমস্যার সমাধানে লেগে গেলুম। অসম্ভব! এ-রকম অতি পরিষ্কার নদের বাঙলা মাদ্রাজী শিখবে কি করে? কিন্তু বাঙালী এ-রকম পাকা সেরী ওজনের কট্টর মাদ্রাজী বেশ-ভূষাই বা পরতে যাবে কেন? তাও না হয় বুঝলুম, কারণ বাঙালী বিদেশী ভূষা গ্রহণে হামেশাই তৈরী, কিন্তু মাথা ন্যাড়া করে ঝুঁটি বাঁধতে তো বাঙালীর রাজী হওয়ার কথা নয়। ফরাসী পণ্ডিত ফুশে সায়েব গণপতির মাথা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, গণপতি অর্থাৎ গণ অর্থাৎ যূথ অর্থাৎ হাতীর রাজা। এক কালে তিনি পুজো পেতেন সাদাসিধে হাতীরূপেই—আজো যেমন হনুমানজী, বৃষরাজ পান। তার পর ক্রমে ক্রমে তাঁর নিচের দিকটা বদলে গিয়েছে—কিন্তু মাথাটি তিনি বদলাতে রাজী হননি, কারণ শিরাভরণ মানুষ সহজে বদলাতে চায় না। ফুশের কথাটি ঠিক—পূর্ব বাঙলার মুসলমান ধুতি পাঞ্জাবির সঙ্গে টুপি পরে, পাঞ্জাবী শিখ পাঠান স্যুট পরে পাগড়ীর সঙ্গে। তার উপর আরেকটা তত্ত্ব আমার বিলক্ষণ জানা আছে—বাঙালী আপন শরীরের অবহেলা করুক আর নাই করুক, চুলটিকে সে কেতা-দুরুস্ত রাখবেই। তাই তো গেঁয়ো কবিতায় আছে,

বাইরে তোমার লম্বা কোঁচা
ঘরেতে চড়ে না হাঁড়ি
খেতে মাখতে তেল জোটে না
কেরাসিনে বাগাও তেড়ি।

কেরাসিন দিয়ে কেশ-প্রসাধন করবে, তবু চুলের মায়া ছাড়ে না যে-বাঙালী, সে মাথা ন্যাড়া করে পরতে যাবে মাদ্রাজী ঝুঁটি!

কিন্তু নদের বাঙলা!

শুনলুম, "ছাতা-বরসাতি নিয়ে চাকর এসেছে, আপনি বাড়ি যান।"

আমি বেরিয়ে এসে শুধালুম, "আর আপনি?"

"ঠিক আছে" বলে কি ঠিক আছে, সেটা ভাল করে না বুঝিয়েই তিনি রওয়ানা দিলেন উত্তর মুখো হয়ে সমুদ্রের পারে পারে আর আমি পশ্চিম দিকে, বালু, ঘাস আর পিচের রাস্তা পেরিয়ে বাড়িমুখো।

অভদ্রতা হল অস্বীকার করি নে, কিন্তু তর্কাতর্কি করলে নেমকহারামী হতো। যে হাত ছাতা এগিয়ে দেয় সেটাকে তো আর কামড়ানো যায় না।

অপরিচিত মনিব সম্বন্ধে চাকরকে প্রশ্ন করা আরো বেশী অভদ্রতা। তাই কিছু জিজ্ঞেস করলুম না। বেশীক্ষণ সে সঙ্গে ছিলও না—সবুজ ফালির মাঝখানেই

অখণ্ড সৌভাগ্যবতীর পাঠানো ছাতা-বরষাতির সঙ্গে দেখা। বাড়ি পৌঁছে গেল মাথার উপর দিয়ে আরেক ঝড়। কনকপ্রসাদ ছাতা ধরবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু শোনে কে? অখণ্ডসৌভাগ্যবতী বারে বারে বলেন দোষ তাঁরই, ছাতা পাঠিয়ে আমাকে এত্তেলা দেওয়া উচিত ছিল তাঁরই, কিন্তু ধমকটা দেন আবার আমাকেই। মেয়েদের বোধ হয় এই রকমই স্বভাব। বাচ্চা সংসারে আনেন ওনারাই আবার বাচ্চাকে গালাগাল দেন তেনারাই।

তাড়াতাড়ি খাইয়ে-দাইয়ে আলো নিবিয়ে দিয়ে আমাকে শুইয়ে দেওয়া হল।

দক্ষিণ মুখো হয়ে কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি। বাঁ দিক থেকে আসছে সমুদ্রের কান্নার শব্দ—শোক যেন উথলে উথলে উঠছে। ডান দিকে নারকোলের ডগায় বাতাসের ঝিরিঝিরি—যেন মাথার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। পায়ের তলায় ঝিল্লির রিনিরিনি। সামনের আকাশে মোমবাতির ফোঁটা-ফোঁটা চোখের জল জমে গিয়ে তারা হয়ে কালো চাদরের গায়ে লেগে আছে।

তামিল না বাঙালী, বাঙালী না তামিল?

এবং তার চেয়েও বড় সমস্যা, কাল দেখা হলে পরে তাঁর সঙ্গে যেচে গিয়ে কথা কইব, না উপেক্ষা করে যাবো? কোন্‌টা বেশী শোভন হবে?

সকাল বেলা ঘুম ভাঙতেই বুঝলুম, অল্প জ্বর। খবরটা কিন্তু চেপে গেলুম। আমাকে আজ বিকেলে যে করেই হোক সমুদ্র-পারে যেতে হবে। যদি না যাই তবে পুলিনাসীন হয়ত ভাববেন আমি ইচ্ছে করেই তাঁকে কাট্ করেছি আর তারই ফলে তিনি চিরতরে কেটে পড়বেন।

অন্য দিনের তুলনায় একটু তাড়াতাড়িই বেরলুম।

সমস্যার ঝটিতি সমাধান হয়ে গেলে নিজের কাছে তখন নিজেকে কেমন যেন বোকা বনতে হয়। মানুষ তখন ভেবেই পায় না, এই সামান্য, সরল জিনিস নিয়ে সে আপন মনে এত তোলপাড় করেছিল কেন? আমার হল তাই। পরদিন সমুদ্র-পারে পৌঁছন মাত্রই ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে এলেন প্রসন্ন বদন দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে। কিছু না বলে আমার পাইচারিতে যোগ দিলেন এত সহজে যেন তিনি নিত্যি নিত্যি এমনি ধারা আমার সঙ্গে জোড়া-সাত্রীর টহল দেন। চলার ধরণটিও সুন্দর। হাত দু'খানি পিছনে নিয়ে মাথাটি নিচু করে পায়ের দু'টি পাতা এক দম সোজা ফেলে ফেলে।

সিন্ধু পার আর ড্রইং-রুম এক জিনিস নয়। ড্রইং-রুমে দু'জন লোক যদি চুপ করে বসে থাকে তবে সেটা নিশ্চয়ই বেখাপ্পা বলে মনে হয়। সমুদ্র-পারে হয় না।

বয়সে আমার চেয়ে যখন উনি বড় তখন পরিচয় ঘনানো না ঘনানো তো তাঁরই হাতে।

আমার জিরোবার সময় এলে বললেন, "চলুন, নৌকোটার পাশে গিয়ে বসি।" আমি তাঁর বাঁ দিকে বসতে যাচ্ছিলুম—বললেন, "না, ডান দিকে বসুন। নৌকোটা তাহলে আপনার দৃষ্টি ঢেকে দেবে না।"

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর বললেন, "আপনি সাহিত্য-চর্চা করেন?"

আমি বললুম, "না, তবে খবরের কাগজে মাঝে মাঝে কলাম লিখি।"

"কবিতা লেখেন না? এখানে তো তার বিস্তর মাল-মশলা।"

আমি বললুম, "সমুদ্র, আকাশ আর বালু-পাড় এ তিনটে জিনিসই আমার কাছে এতই সহজ আর সরল বলে মনে হয় যে মনে মনে তার প্রকাশের ভাষা খুঁজতে গিয়ে বারে বারে হার মেনেছি!"

বললেন, "কথাটা ঠিক। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন,

'অপরিচিতের এই চির পরিচয়,
এতই সহজে নিত্য ভরিয়াছে গভীর হৃদয়
সে কথা বলিতে পারি এমন সরল বাণী
আমি নাহি জানি'।"

আমি শুধালুম, "আপনি সাহিত্য-চর্চা করেন?"

বললেন, "দেশে থাকতে করতুম। কোন্ বাঙালী ছেলে করে না? আর আমাদের আমলে বাঙালীর ছিল ঐ একমাত্র ব্যসন, আর কিঞ্চিৎ ধর্মচর্চা। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ কিম্বা শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ।"

সেদিন আর বেশী কথাবার্তা হল না। বাড়ি ফেরার জন্য যখন উঠলুম তখন বললেন, "কিছু মনে করবেন না, আমি বয়সে বড় তাই আপনাকে আমি আমার আপন পর্যবেক্ষণ থেকে একটি কথা বলি। আকাশ সমুদ্র বালু-পাড় এগুলো আপনার কাছে এখন এতই সহজ ঠেকছে যে আপনি সেগুলোকে প্রকাশ করবার ভাষা পাচ্ছেন না। আরো কিছু দিন যাক, তখন আকাশের থমথমানি আর সমুদ্র-গর্জনের ভাষা এক দিন আপনার কাছে অনেক নূতন কথা বলতে আরম্ভ করবে।"

আমার লোভ হচ্ছিল জিজ্ঞেস করতে তিনি সাহিত্য-চর্চা করেন কিনা, কিন্তু চেপে গেলুম।

পরদিন বেড়াতে গেলুম অনেকগুলো প্রশ্ন এমনি কায়দা করে বানিয়ে নিয়ে যে তিনি কিছুটার উত্তর দিতে বাধ্য হবেনই হবেন। কিন্তু আমারই হিসেবে ভুল। ভদ্রলোক আমার পাইচারিতে যোগ না দিয়ে আপন আসনে চুপ করে বসে রইলেন

নিত্যিকার মত। আমার মনটা খুঁৎ-খুঁৎ করতে লাগল।

কিন্তু ঠিক বাড়ি ফেরার সময় তিনি উঠে এসে আমাকে বললেন, "দেখুন, আপনাকে একটা কথা বলি। আপনি হয়ত নিঃসঙ্গ ভ্রমণ পছন্দ করেন তাই ইচ্ছে করেই আজ আমি দূরে ছিলুম। আমার কিন্তু দুই-ই সমান। আপনার ইচ্ছে হলেই আমার সঙ্গে এসে কথাবার্তা বলবেন আর আমি যখন চলা-ফেরাটা পছন্দ করি নে তখন আপনার ইচ্ছে হলেই একা-একা পাইচারি করতে পারবেন।"

ব্যবস্থাটা আমারও মনঃপূত হল।

তার পর দশ দিন ধরে রোজ বিকেলে বৃষ্টি। পাইচারি তখন মৌতাত হয়ে দাঁড়িয়েছে—বাধা পড়ায় হন্যে হয়ে উঠলুম। অনভ্যাসের ফোঁটা অভ্যেস হয়ে যাওয়ার পর ফোঁটা না কাটলে চড়চড় করে আরো বেশী।

এগারো দিনের দিন উঠলো কড়া রদ্দুর। বাড়ির বারান্দা থেকেই দেখতে পেলুম, দুপুর হতে না হতেই সমুদ্রপারের বালু শুকিয়ে গিয়েছে। মনটা আশ্বস্ত হল,—ভেজা বালুতে বসা যায় না বলে পাকা এক ঘণ্টা এক নাগাড়ে পাইচারি করা সহজ কর্ম নয়।

দশ দিন ধরে মনে মনে প্রশ্নগুলো আরো গুছিয়ে নিয়েছি।

বিকেল বেলা তারই একটা অতি সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করতেই ভদ্রলোক হেসে উঠলেন। বললেন, "আমি বুঝতে পেরেছি আমি কে, কি বৃত্তান্ত জানবার জন্য আপনি ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। পৃথিবীতে এক রকম মানুষ আছে যারা সামান্যতম প্রহেলিকার সামনেও 'যাক্ গে ছাই, আমার কি ?' বলে ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে আপন পথে চলে যেতে পারে না। আপনি সেই ধরনের। কিন্তু আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমিও স্থির করেছি আপনার সব প্রশ্নেরই উত্তর দেব এবং এমন আরো কিছু বলবো যা আপনার প্রশ্নেরও বাইরে।

"আমিই বলে যাই, আপনার সব প্রশ্নের উত্তর আপন অজানাতেই আপনি জেনে যাবেন।

"পুদুকোট্টাই থেকেই আরম্ভ হোক। তার আগের পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বলবার মত বিশেষ কিছু নেই। জন্মেছি কৃষ্ণনগর, পড়াশোনা করেছি কলকাতায়, আর বিস্তর ছুটি কাটিয়েছি হয় শিলঙে না হয় ব্রহ্মপুত্র পদ্মায় ডিসপাচ জাহাজে। বাবা কাঠের ব্যবসা করতেন এবং আমা দ্বারা ব্যবসা হবে না জানতেন বলেই মরার পূর্বে আমার জন্য ভালো ভালো শেয়ার কিনে রেখে যান।

"তাই শ্রাদ্ধাদি চুকিয়ে পঁচিশ বৎসর বয়সে ভ্রমণে বেরবার পথে কোনো বাধাই ছিল না। প্রথমে দেখলুম উত্তর ভারত তন্ন তন্ন করে—আমার ইতিহাসে সখ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখা ইতিহাসের কঙ্কাল তক্ষশিলা কাশী, দিল্লী আগ্রা গিয়ে রক্ত-মাংস পেয়ে যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। তখন ইচ্ছে হল দক্ষিণ দেখবার। ওয়ালটেয়ার, রাজমহেন্দ্রী, বেজওয়াড়া সেরে এলুম মাদ্রাজ—তার পর কাঞ্চিবরম্, চিদম্বরম্, মাদুরা, তাঞ্জোর করে করে শেষটায় পৌঁছলুম গিয়ে পুদুকোট্টাই।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "পুদুকোট্টাই দেশী রাজ্য কিন্তু ঠিক কোন্ জায়গায় আমার মনে পড়ছে না।"

বললেন, "না পড়ারই কথা। তবু জায়গাটার নাম মাঝে মাঝে কাগজে বেরোয়। আমাদের যেমন কুচবিহার, খাস দক্ষিণ অঞ্চলের তেমনি পুদুকোট্টাই। কিন্তু বাঙলা দেশের মাহাত্ম্য জানতে হলে যেমন কুচবিহার যাবার দরকার নেই, এদেশে এসে তেমনি পুদুকোট্টাই না গেলেও চলে।

"আমার ওখানে যাওয়ার একমাত্র কারণ আমার এক তেলুগু সতীর্থের পিতা সেখানে মহারাজার প্রাইভেট-সেক্রেটারি ছিলেন। য়লমঞ্চলি মাদ্রাজে এসে আমাকে এক রকম জোর করে পুদুকোট্টাই ধরে নিয়ে গেল।"

ভদ্রলোক থামলেন।

সেদিন ষোড়শী। চাঁদ উঠবে অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর। বাড়িতে বলে গিয়েছিলুম চাঁদের আলোতে বাড়ি ফিরব। পূবের আকাশে তখন অল্প অল্প চিলিক্ লেগেছে—আমার চতুর্দিকে ঘন অন্ধকার আর তার সঙ্গে মেশানো রয়েছে সমুদ্রের গম্ভীর গর্জন ধ্বনি। তার ভিতর দিয়েও আমি স্পষ্ট অনুভব করলুম ভদ্রলোক তাঁর গল্পের, তাঁর জীবনের এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছেন যেখান থেকে এগোবার সময় ভেবে-চিন্তে কথা বলতে হয়।

চাঁদ উঠলো। আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি চোখ বন্ধ করে আছেন। হঠাৎ বললেন, "আপনি পিয়ের লোতির 'ইংরেজ-বর্জিত ভারতবর্ষ' পড়েছেন? আমি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা অনুবাদের কথা জিজ্ঞেস করছি।"

আমি বললুম, "কী আশ্চর্য! আজ সকালের ডাকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী পেয়েছি। আর আজ সকালেই আমি লোতির পণ্ডিচেরী-বর্ণন পড়ছিলুম।"

অতি শান্ত স্বরে বললেন, "সবই যোগাযোগ। মানুষ তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে কি করে যতক্ষণ না যোগাযোগের উপর তার কর্তৃত্ব লাভ হয়? কিন্তু আজ আর না। বাড়ি ফিরে গিয়ে আমাকে এক গাদা প্রুফ দেখতে হবে। কাল সকালেই ফেরৎ পাঠাবার কথা। আপনি কাল আসবার সময় লোতির বইখানা সঙ্গে নিয়ে আসবেন।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "লোতির বইয়ের কোন্ অংশের কথা আপনি ভাবছিলেন ?"

বললেন, "পণ্ডিচেরি বাসের সময় তিনি যে ভরত-নাট্যম্ দেখেছিলেন, তার বর্ণনাটা পড়ুন।"

আমি বললুম, "আপনিই পড়ুন। আপনার উচ্চারণ আমার চেয়ে অনেক পরিষ্কার—আর ঢেউয়ের আওয়াজ ছাপিয়ে আমার গলা চড়াতে গেলে কষ্ট হয়, অল্পেতেই হাঁপিয়ে পড়ি।"

হেসে বললেন, "গলা নামিয়ে নিলেই হয়।"

তখন লক্ষ্য করলুম, এ-ভদ্রলোক যে ক'টি বার কথা বলেছেন, সব সময়ই গলার পর্দা নামিয়ে দিয়ে। কনকপ্রসাদ তাহলে জানেন না যে, সমুদ্রের গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কথা কইতে হলে যেমন চড়িয়ে বলা যায়, তেমনি নামিয়ে বলতেও বাধা নেই। অত্যন্ত দ্রুত বাজিয়ে যে-রকম তবলচীকে কাবু করা যায় তেমনি অত্যন্ত বিলম্বিত লয় নিলেও তাকে হার মানানো যায় আরো সহজে।

'দীর্ঘায়ত-নেত্র-বিশিষ্ট, রং-করা একটি তরুণ মুখ,—ইন্দ্রিয়াসক্তি-পরিব্যঞ্জক মুখ, তিমির-রাজ্যের সুখ—খুব লঘু ভাবে, তাড়াতাড়ি একবার এগিয়ে আসিতেছে, —আবার পিছিয়া যাইতেছে। চোখের দুইটি তারা মিনা-র সাদা জমির উপর বসানো কৃষ্ণমণির মত কালো দুইটি তারা আমার চোখের উপর নিবদ্ধ। এই যে হৃদয়-দুর্গ অধিকার করিবার জন্য একবার আমাকে আক্রমণ করিতেছে, আবার পলায়ন করিয়া ছায়ান্ধকারের মধ্যে মিশিয়া যাইতেছে,—এই সমস্ত ক্ষণ উহার চোখের দুইটি কালো তারা আমার চোখের উপর সমান ভাবে নিবদ্ধ রহিয়াছে।...

'জনতার মধ্যে এই রমণীকে ছাড়া আমি আর কিছুই দেখিতেছি না—উহার ঐ সঁীথি-বিভূষিত মস্তক ছাড়া আর কিছুই দেখিতেছি না। রমণী, হীরক-মাণিক্য-খচিত বলয়-কেয়ূরাদি ভূষণে আস্কন্ধ-বিভূষিত বাহুযুগকে ভুজঙ্গ গতির অনুকরণে কত রকম করিয়া বাঁকাইতেছে—কিন্তু না, সর্বাগ্রে উহার চোখের দৃষ্টি আমার চোখের অন্তস্তল পর্যন্ত এমন ভাবে ভেদ করিতেছে যে, আমার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে; ঐ চোখে নানা প্রকারের ভাব খেলিতেছে—কখনো পরিহাসের ভাব, কখনো স্নিগ্ধ কোমল প্রেমের ভাব...উহার মণিরত্নখচিত শিরোভূষণের ও কর্ণ-নাসিকার অলঙ্কারের এরূপ উজ্জ্বলতা এবং ঐ উজ্জ্বল সোনার সঁীথিটি এমন পরিপাটি রূপে উহার মুখটি বেড়িয়া আছে যে, তাহাতে ঐ সুন্দর শ্যামল মুখখানিতে কি জানি একটা অস্পষ্ট দূরত্বের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে—আমাকে স্পর্শ করিলেও যেন

সে দূরত্ব ঘুচিবার নহে।

"এই নর্তকী নৃত্যশালার এক প্রান্তে কিছুক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে ছিল—সহসা আবার আসিয়া উপস্থিত। কুপিতা নায়িকার ন্যায় রোষ-কষায়িত-নেত্র হইতে আমার উপর তীক্ষ্ণ বাণ-বর্ষণ করিতেছে; আমি যেন উহার নিকট কি একটা অপরাধ করিয়াছি—তাহারই জন্য যেন সে স্বর্গ-মর্তকে সাক্ষী রাখিয়া আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছে···

"তার পর, নর্তকী হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, সে হাসি পরিহাসের হাসি, ঘৃণার হাসি, জনতার নিকট আমাকে হাস্যাস্পদ করিবার জন্য আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া হাসিতে লাগিল। জানা কথা, উহার ভর্ৎসনা যেমন কৃত্রিম, এইরূপ উপহাসও সেইরূপ কৃত্রিম। কৃত্রিম হউক, কিন্তু আসলের ঠিক নকল—চমৎকার নকল।

"নর্তকী, কণ্ঠ একটু উত্তোলন করিয়া, একটু গম্ভীর স্বরে, তীব্র হাসি হাসিতেছে তাহার হাসি—মুখ দিয়া, ভুরু দিয়া, উদর দিয়া, কম্পমান বক্ষ দিয়া যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে। হাসির আবেশে উহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছে এবং এইরূপ হাসিতে হাসিতে সে দূরে সরিয়া যাইতেছে। সে হাসি দুর্দমনীয়, সে হাসি শুনিলে অন্যকেও হাসিতে হয়।

"আর যেন আমার মুখদর্শন করিবে না, এই ভাবে অত্যন্ত অবজ্ঞা সহকারে, মুখ ফিরাইয়া, নর্তকী দ্রুত পদক্ষেপে পিছাইতে পিছাইতে চলিয়া গেল। আবার ফিরিয়া আসিল। আমার উপর তাহার প্রবল ভালোবাসা পড়িয়াছে, সে সর্বজয়ী মদনের নিকট পরাভূত হইয়া, আমার দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া কর-যোড়ে মার্জনা ভিক্ষা করিতেছে, আমাকে তাহার সর্বস্ব দান করিবে বলিয়া অনুনয় করিতেছে, ইহাই তাহার শেষ প্রার্থনা। এবার যখন চলিয়া গেল, তখন তাহার দেহ একটু হেলিয়া পড়িয়াছে, ওষ্ঠদ্বয় একটু ফাঁক হইয়া তাহার মধ্য হইতে শুভ্র দন্তরাজি প্রকাশ পাইতেছে; তাহার নাসিকায় হীরকের টুকরাগুলি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। সে চায়—সে নিতান্তই চায়, আমি তাহার অনুসরণ করি, সে তাহার বাহুর দ্বারা, তাহার কম্পিত বক্ষের দ্বারা, তাহার অর্ধনিমীলিত নেত্রের দ্বারা আমাকে ডাকিতে লাগিল, সে চুম্বকমণির মত, সর্বান্তঃকরণে আমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল, আমিও মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থায়, ক্ষণেকের জন্য তাহাকে অনুসরণ করিলাম, কেন না, সে আমাকে সত্যই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল।

"আবার সেই ভর্ৎসনা, সেই দুর্দমনীয় হাসি, নেত্রভঙ্গীতে সেই বিদ্রূপের ভাব, আবার সেই নিরঙ্কুশ প্রেমের আহ্বান·····'।"

ভদ্রলোক থামলেন। আমি বললুম, "জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষা সব সময়ই আমার কাছে কেমন জানি একটুখানি আড়ষ্ট বলে মনে হত। কিন্তু আপনার পড়ার ধরনটি এমনি সুন্দর যে সেটা আর কানে বাজে না।"

বলেই বুঝতে পারলুম, রসভঙ্গ করা হল।

কিন্তু ভদ্রলোক বিচলিত হলেন না। বললেন, "জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তো আর রবীন্দ্রনাথের গড়ে-তোলা ভাষার সুযোগ পাননি। এমন কি আমার মনে হয়, তিনি যেন বঙ্কিমকেও এড়িয়ে যেতেন—বরঞ্চ তিনি যদি দ্বিজেন্দ্রনাথের লঘু-শৈলীর দিকে একটু নজর দিতেন তা হলেও হয়ত তাঁর ভাষা খানিকটা গতি-বেগ পেতো।"

তার পর জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি ভরত-নাট্যম্ দেখেছেন?"

আমি বললুম, "দেখেছি, কিন্তু লোতির চোখ দিয়ে দেখিনি। এখন যদি আবার দেখতে পাই তবে তার থেকে অনেক বেশী রস বের করতে পারবো। আমার লজ্জা বোধ হয় যে বিদেশী লোতি প্রথম দর্শনেই ভরত-নাট্যমের এতটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে পেল আর আমি এ-দেশের লোক হয়েও বিদেশীর সাহায্য নিয়ে আপন নৃত্য চিনতে যাচ্ছি।"

"রসের ব্যাপারে দিশী-বিদেশী বলে কোনো পার্থক্য তো নেই। আর অন্যের সাহায্য নিতেই বা আপত্তি কি?

'ঐ যে ঝড়ের মেঘের কোলে
বৃষ্টি আসে মুক্ত-কেশে আঁচলখানি দোলে'

শোনার পরই তো আমি প্রথম লক্ষ্য করলুম, দূর-দূরান্ত থেকে যখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষা ধেয়ে আসে গ্রামের দিকে তখন তার সৌন্দর্য আমার কোন চেনা জিনিসকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার মাধুর্য দিয়ে আমার হৃদয় ভরে দেয়। বেশির ভাগ লোকই তো প্রকৃতিকে চিনতে শেখে কবির সৃষ্টির ভিতর দিয়ে। আপনি যদি ভরত-নাট্যম্ লোতির সাহচর্যে শেখেন, তবে তাতে আর আপত্তি কি? কিন্তু আপনাকে একটুখানি সাবধান করে দিই এই বেলা—লোতির বর্ণনাতে কোন জিনিসের অভাব লক্ষ্য করেছেন কি?"

আমি খানিকটা ভেবে নিয়ে বললুম, "না তো।"

"কেন? লক্ষ্য করেননি, লোতি দেখেছেন প্রধানতঃ অভিনয়ের দিকটা। নাচের দিকটা তাঁর চোখ এড়িয়ে গিয়েছে। যে অঙ্গ-সঞ্চালন যে পদক্ষেপের উপর নির্ভর করে সমস্ত নৃত্যটি তার রূপ পেল, যে রূপ আমার হৃদয়ের ভিতর তার ছাপ মেরে রসসৃষ্টি করল সেই তো আসল নৃত্য,—অভিনয় তো তার সামান্য একটি অংশ মাত্র। মনে করুন, আপনি 'মেঘ' শুনছেন—তাতে বর্ষার খানিকটা বর্ণনা

থাকে কিন্তু সেইটেই তো সব চেয়ে লক্ষণীয় জিনিস নয়। তা হলে তো আসল রাগটি আপনাকে এড়িয়ে গেল—সত্যকার রসটি আপনি পেলেন না। রসের মা-ও বাচ্চাকে ভুলিয়ে রাখতে চান বর্ণনার ঝুমঝুমি দিয়ে—যে-বাচ্চা তখনো সন্তুষ্ট না হয়ে আরো বেশি কান্নাকাটি জুড়ে দেয় মা তাকে শেষ পর্যন্ত রসের স্তন্য না দিয়ে থাকতে পারেন না।

"আমার অদৃষ্ট ভালো বলতে হবে যে নাচ দেখার অভ্যাস না থাকা সত্ত্বেও প্রথম দর্শনেই খাঁটি রসটাকে ধরতে পেরেছিলুম। আমি দম্ভ করছি নে, আর এতে আশ্চর্য হবারও কিছু নেই। দেখেননি, গাঁয়ের কত রাখাল ছেলের ভিতরেও এমন রসবোধ থাকে যে প্রথম শ্রবণেই তারা অজানা-অচেনা রাগ-রাগিণী চিনে ফেলে। শুধু তাই নয়, আপন বাঁশী দিয়ে বিনা কসরৎ বিনা মেহন্নৎ সেগুলো শুনিয়েও দেয়। তাই যখন প্রথম ভরত-নাট্যম্ দেখলুম—"

আমাকে বাধ্য হয়ে বাধা দিতে হল। শুধালাম, "কোথায়?"

"ওঃ! আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, পুদুকোট্টাই থেকে আমার কাহিনী আরম্ভ হওয়ার কারণ আমি ওখানে প্রথম ভরত-নাট্যম দেখি। পুদুকোট্টাই মহারাজার সেক্রেটারির ছেলে য়লমঞ্চলি ভেঙ্কটরাও রামেশ্বরাইয়া চৌধুরী—আমার সতীর্থ—পুদুকোট্টাইয়ে আমার 'শুভাগমন উপলক্ষে' ভরত-নৃত্যমের ব্যবস্থা করেন। গাইয়ে বাজিয়ে নর্তকী আনানো হয় বিশেষ তোয়াজ করে মদুরা থেকে। লোতির জন্য যেমন করে পণ্ডিচেরির লোক বিশেষ নাচের ব্যবস্থা করেছিল আমার জন্য তেমনি য়লমঞ্চলি মদুরার তরুণী নর্তকীদের সব চেয়ে নামকরাকে মুজরার জন্য ডেকেছিল। পুদুকোট্টাইয়ে দ্রষ্টব্য জিনিস কিছুই নেই—একমাত্র অজন্তা শৈলীতে আঁকা কিছু গুহা-চিত্র ছাড়া, অবশ্য সে অপূর্ব জিনিস, অজন্তাকেও ছাড়িয়ে যায়—তাই য়লমঞ্চলি আমাকে এমন কিছু দেখাতে চাইলো যা আমি পূর্বে কখনো দেখিনি। স্কটিশে পড়ার সময় বিদেশী য়লমঞ্চলিকে আমি যে সামান্য হৃদ্যতা দেখিয়েছিলুম সে যেন তারই শোধ দেবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গিয়েছিল।

"কি বলছিলুম? হ্যাঁ—আমি প্রথম দর্শনেই ভরত-নৃত্যমে রস পেয়ে গেলুম। য়লমঞ্চলি আমাকে অভিনয় আর মুদ্রাগুলো পাশে বসে বুঝিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু আমার প্রাণ নেচে উঠলো নর্তকীর রসসৃষ্টির শুদ্ধ নৃত্যের দিকটা অনুভব করতে পেরে। লোতির বর্ণনায় শুনলেন, নর্তকী প্রেমের কত চিত্র-বিচিত্র অভিনয় করল—লোতি নৃত্যের দিকটা লক্ষ্য করেননি বলে তার আসল রস, তার মূল রস ধরতে পারেননি। সেটা এক কথায় বলতে গেলে বলা যেতে পারে,—'প্রেম'। প্রত্যেক রাগ-রাগিণীর যেমন একটা মূল বক্তব্য থাকে, প্রত্যেক ছবির যেমন একটা মূলবিষয়-

বস্তু বা 'লাইট-মতিফ' (Leit-motif) থাকে, ঠিক তেমনি সে রাত্রের ভরত-নৃত্যে আমি যে মূল রসটি ধরতে পারলুম সেটি অলঙ্কার-বিবর্জিত শুদ্ধ 'প্রেমে'র অনুভূতি।

"লোতি বলেছেন, নর্তকীর আহ্বান শুনে দেশ-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে ক্ষণেকের তরে তিনি নর্তকীর অনুসরণ করেছিলেন ; আমিও ঠিক তেমনি একবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলুম। য়লমঞ্চলি আমার কোটের আস্তিনে সামান্য টান দিতেই আবার স্বপ্ন-ভঙ্গ হয়। শুনলুম বলছে, 'সুন্দরম্'—"

আমি শুধালাম, "সুন্দরম্ তো বাঙলা নাম নয়।"

বললেন, "আমার নাম রামেন্দ্রসুন্দর চৌধুরী। য়লমঞ্চলি মাঝখানের 'সুন্দর'টা নিয়ে মাদ্রাজী রসমের 'ম' লাগিয়ে সেটাকে দ্রাবিড়স্থ অর্থাৎ 'ভদ্রস্থ' করে নিয়েছিল।

"য়লমঞ্চলি বলেছিল, 'সুন্দরম্, নৃত্যটা তাহলে তোমার মত অরসিককেও চঞ্চল করে তুলেছে ; আমার মেহন্নত সফল হল।' আমি বলেছিলুম, 'এ মেয়েটির নাচ আমাকে আরো দেখতে হবে।' য়লমঞ্চলি বলেছিল, 'সিনেমাতে প্রত্যেক ট্রেলার দেখার সময় যে রকম মনে হয়, ও ছবিটা আমাকে দেখতেই হবে আর তার পর ট্রামে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ ট্রেলারের কথা বেবাক ভুলে যায়, ভরত-নৃত্যমের বেলাও তাই। কাল-পরশুর ভিতরেই তুমি সব কিছু ভুলে যাবে।'

"আমি কিছু বলিনি, কারণ যেখানে প্রতিপাদ্য বিষয় যুক্তির জন্য শুদ্ধ মাত্র তুলনার উপর-নির্ভর করে সেখানে তর্ক করে কোন লাভ নেই। ট্রেলার তো চেষ্টা করে চোখের উপর কৌতূহলের চটক লাগাবার—তাই মানুষ দু'মিনিট পরেই সে ভেল্কি-বাজির কথা ভুলে যায়। ভরত-নাট্যম তো আমাকে দিল এক অভিনব রসের সন্ধান, যে-রস আপন গৌরবে 'স্বে মহিম্নি', ক্ষুদ্র কৌতূহল জাগাবার যার কোন প্রয়োজন নেই।

"নাচ শেষ হয়েছিল রাত প্রায় একটার সময়। বাড়ি ফিরে আমার চোখে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। পুদুকোট্টাই শহরে কোনো প্রকারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নেই কিন্তু রাজবাড়ি এবং সেক্রেটারীর বাঙলোর মাঝখানের পাঁচিল-ঘেরা লনটি সত্যই মনোরম। বাঙলোর এক পাশে জলের চৌবাচ্চা। বারান্দার ডেক-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে চাঁদের আলোয় দেখলুম রাজার পোষা হরিণ জোড়ায় জোড়ায় এসে জল খেয়ে গেল—নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারণে। চাঁদ হেলে পড়তে লাগল, সারিবাঁধা গাছের ছায়া দীর্ঘতর হল, রাজার হরিণ আলো-ছায়ার আলিঙ্গনের মাঝখানে একে অন্যের গা ঘেঁষে ঘেঁষে পূর্বাকাশে আলোর আভাস লাগার পূর্বেই মিলিয়ে গেল।

"আমার মন এক অজানা অস্বস্তিতে ভরে উঠল।"

রামেন্দ্রসুন্দর থামলেন। সূর্য অস্ত গিয়েছে। আকাশের লাল আভা মিলিয়ে

যাওয়ার দরুন সমুদ্রের বেগুনি জল আবার গাঢ় নীল হয়ে হয়ে শেষটায় একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে। এখন আর দেখাই যায় না। আজ চাঁদ উঠবে অনেক দেরীতে।

রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, "পর দিন সন্ধ্যেয় আমার মাদ্রাজ ফেরার ট্রেন। য়লমঞ্চলি স্টেশনে এল এগিয়ে দিতে। রাজাকে প্রজা যত না ডরায়, তার চেয়েও বেশি ডরায় তার সেক্রেটারীকে এবং সব চেয়ে বোধ হয় বেশি ডরায় তার বড় ব্যাটাকে। য়লমঞ্চলি দুঃখ করে বললো, 'ঐ দেখো, আমি আসবো বলে ওয়েটিং-রুম প্ল্যাটফর্ম ঝেঁটিয়ে সাফ করে দেওয়া হয়েছে। ভিড়ের মধ্যিখানে তুমি বসবে ট্রাঙ্কটার উপর, আমি হোল্ডলটা চেপে, আইসক্রীমটা পানটা খাবো, আড়-নয়নে এদিক ওদিক তাকাবো, তা না। চলতে গেলে সামনে পাইক, পিছনে বরকন্দাজ। কারো দিকে যদি সিকি-নয়নেও তাকাই সঙ্গে সঙ্গে খবর রটে যাবে, য়লমঞ্চলি কোডাই-কানাল গেছেন 'হনি-মুন' করতে। তোমাকে যে ইস্টিশনটা ভালো করে দেখাবো তারও উপায় নেই।' এ রকম অনবরত বকর-বকর করে য়লমঞ্চলি আসন্ন বন্ধু-বিচ্ছেদটা কাটাবার চেষ্টা করছিল।

"কিছু ভুলও বলেনি। কারো শুভাগমন উপলক্ষে সিঁড়ির উপর যে লাল কাপড় পাতা হয় সেটা দেখে আমারও ভয় লাগে। মনে হয়, ওয়েটিং-রুম রাক্ষসীর লাল জিভ লকলক করে বেরিয়েছে রাস্তা পর্যন্ত অতিথি অভ্যাগত সবাইকে গিলে ফেলবার জন্য।

"য়লমঞ্চলি বলল, 'চলো, প্ল্যাটফর্মে শেষের দিকে—যদি কিছু দেখবার মত থাকে।' পাইক-বরকন্দাজকে ধমক দিয়ে বলল, 'তোরা সব বস গিয়ে ওয়েটিং-রুমে—আমরা আসছি।'

"দূর থেকেই দেখতে পেলুম এক গাদা বাজনার যন্ত্রপাতি। কাছে আসতেই জন পাঁচেক লোক দাঁড়িয়ে উঠে আমাদের নমস্কার করল। নর্তকী পিছন ফিরে কার সঙ্গে কথা বলছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতে পেয়ে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। আমার দিকে চোখ যেতেই আমি তাকে একটি ছোট্ট নমস্কার করলুম। লজ্জায় তার মুখ-কান লাল হয়ে গেল। আরো ভ্যাবাচাকা খেয়ে কি যে করবে বুঝেই উঠতে পারলো না—তারপর হঠাৎ যেন লুপ্ত বুদ্ধি ফিরে পেয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে নর্তকীদের কায়দায় আমাকে বার বার সেলাম করলো।

"য়লমঞ্চলি বললো, 'চলো।' একটু দূরে এসে বললো, 'পুদুকোট্টাই ভিন্ন অন্য যে কোন জায়গা হলে আমি তোমাকে পঙ্কজমের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতুম।'

'পঙ্কজম্', 'পঙ্কজম্'—'ম' যোগ করলে যে শব্দের সৌন্দর্য বাড়ে তা এই প্রথম লক্ষ্য করলুম।

"লোতি বলেছেন, 'জনতার মাঝখানে নর্তকীকে দেখাচ্ছিল পথ-হারা পরীর মতো।' আমার মনে হয়েছিল, 'নৃত্যের ভিতর দিয়ে যে রমণী সুধা-পারাবারের সন্ধান পেয়েছে, যার প্রতি পদক্ষেপ প্রতি হস্তবিন্যাস অফুরন্ত রসের ধারা বইয়ে দেয় প্রতিক্ষণে, সে তার ধ্যানলোক থেকে নিজেকে বিমুক্ত করে আর পাঁচজনের সঙ্গে কথা কয় কোন্ ভাষায়, খায়-দায়, ওঠে-বসে কি প্রকারে? খান আব্দুল করীম খান সাহেবের গান শোনার পর কখনো কল্পনা করা যায় যে তিনি ঐ গলা দিয়েই দৈনন্দিন কথাবার্তা বলছেন? নৃত্যের বশে যে-পদযুগ প্রজাপতির ডানা হয়ে আকাশে-বাতাসে উড়তে থাকে সেই পা-দু'খানি কি করে চলতে পারে শান-বাঁধানো প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে?

"পঙ্কজমের নৃত্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল নাচের মজলিসে কিন্তু স্টেশনে মুগ্ধ হলুম পঙ্কজম্‌কে দেখে। ভরত-নাট্যমের বেশ আমার কাছে সব সময়ই দৃষ্টিকটু বলে মনে হয়েছে। উত্তর-ভারতের রাজপুত-মোগলাই নর্তকীরা পরে চুড়ীদার টাইট-পাজামা আর তার উপর মলমলের ঘাগরা। পাজামা বড় অপ্রিয়দর্শন জিনিস—সেটাকে আস্বচ্ছ ঘাগরা কিছুটা ঢেকে দেয় বলে উত্তর-ভারতের নর্তকীর সজ্জায় খানিকটা সৌন্দর্য আছে, কিন্তু ভরত-নাট্যমের নর্তকী পাজামার উপরে পরে মারাঠি ধরনের কাছা-মারা শাড়ি—দু'টো জিনিসই বাঙালীর চোখকে বড্ড বেশি পীড়া দেয়। উরু আর পদবিন্যাস দেখাবার জন্য মোগলাই পাজামার প্রয়োজন সে-কথা বুঝতে পারি, কিন্তু সেটার উপর মারাঠি শাড়ি চাপিয়ে যে নর্তকীর কোন সৌন্দর্যবর্ধন হয় সেটা আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি।

"স্টেশনে পঙ্কজমের পরনে ছিল মিলের মামুলী শাড়ি আর বাঙালোর সিল্কের কাঁচুলী। কিন্তু নাচের সময় যে-নর্তকীর প্রতি অঙ্গ বিশ্লেষণ করে দেখা সমঝদারের কর্তব্য, সেই যখন আটপৌরে কাপড় পরে নাচের বাইরে এসে দাঁড়ায় তখন তার দিকে তাকানো শালীনতার লক্ষণ নয়। লোতি নর্তকীর দেহের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'তার গাত্র ধাতু-স্তম্ভের ন্যায় সুচিক্কণ'—আর আমি এক পলকে যেটুকু দেখতে পেয়েছিলুম তার স্মরণে আজ বলতে পারি, সে গাত্রে এতটুকু অনাবশ্যক মেদ ছিল না, এমন কি কোমর আর কাঁচুলির মাঝখানের অনাবৃত স্থলেও না।

"আমার বয়স তখন কম, তাই আমি যে লজ্জা করে দু'বার তাকাতে পারিনি সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না, কিন্তু নর্তকীও যে লজ্জা পেল সেইটে দেখে আমার আশ্চর্য

বোধ হল। কত লোক তাদের দিকে তাকায় প্রতিদিন, কই, তারা তো লজ্জায় জড়সড় হয় না? তবে কি আমার সঙ্কোচ-ভরা তাকানোটাই তার মুখে ব্রীড়ার ভাব এনে দিয়েছিল?

"সেটা ঢাকবার জন্যই বোধ করি একটুখানি হেসেছিল।

"আমি জানি, সাদা চামড়ার প্রতি বাঙালীর দুর্বলতা আছে কিন্তু এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দাঁতের আসল সৌন্দর্য ফুটে ওঠে শ্যামবর্ণের ভিতর দিয়ে—বিদ্যুল্লতার শিহরণ তো কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকেই।"

আমি বললুম, "তুলনাটি বেশ।"

বললেন, "সাহিত্য-সৃষ্টি যে করে না তার পক্ষে খুব মন্দ নয়। কিন্তু আমি তো কিছুমাত্র বানিয়ে বানিয়ে বলছি নে। আর তা করলেও বিশেষ কোনো ফল হবে না। কারণ সাহিত্য-রস সৃষ্টি করবার জন্য যে খাটুনির প্রয়োজন তার উপযুক্ত সময় আমার আদপেই নেই। আমি যে কাজ নিয়ে পড়ে আছি তাতে সাহিত্য-রস সৃষ্টি করতে গেলেই সমঝদার পাঠক সন্দেহ করবে, তথ্যের অভাব আমি বাক-চাতুরী দিয়ে ঢাকতে চাই। থাক্ সে কথা।

"সমস্ত রাত আমার ঘুম হয়নি। অস্বীকার কোরব না, পঙ্কজমের নাচ আমাকে মুগ্ধ করেছিল আগের রাত্রিতে, আর আজ সন্ধ্যায় আমাকে মুগ্ধ করলো তার মামুলী আটপৌরে ভাব—সাধারণ মেয়ের সাধারণ ব্রীড়া, সাধারণ লজ্জা। নাচের পূর্বে নর্তকীকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে বিশেষ করে আমার জন্যই তাকে আনানো হয়েছে, এবং সেও তার সমস্ত কলা-নৈপুণ্য প্রয়োগ করেছিল আমার দেশ-কাল-পাত্র বোধ বিস্মৃতিতে বিলোপ করে দেবার জন্য তবু আমি কিছুতেই ভুলতে পারিনি,

'হৃদয় ব্যথিল মোর অতি মৃদু গুঞ্জরিত সুরে—
ও যে দূরে, ও যে বহুদূরে,
যত দূরে শিরীষের ঊর্ধ্ব শাখা, যেথা হতে ধীরে
ক্ষীণ গন্ধ নেমে এসে প্রাণের গভীরে—'

"আশ্চর্য! সঙ্গীত, পদ-বিন্যাস, অঙ্গ-সঞ্চালন, ভ্রূভঙ্গী, ওষ্ঠাধর কম্পন, অসিত নয়নের কৃষ্ণবিদ্যুৎবহ্নি দিয়ে যে-রমণী নিবিড়তম অন্তরঙ্গতায় শতাধিক বার আমার চিত্তজয় করেছিল কাল রাত্রে, তাকে তখন মনে হয়েছিল 'ও যে দূরে, ও যে বহুদূরে' আর আজ যখন সে লজ্জায় মুখ ফিরালো তখন মনে হল, সে তো অত দূরে নয়, সে যে অনেকখানি কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

"আর সেই মুহূর্তেই আমি পেলুম ভয়। অজানা এক অদ্ভুত ধরনের ভয়, বহু

বিশ্লেষণ করেও আমি তখন সে ভয়ের কারণ বের করতে পারিনি। পরে এক দিন পেরেছিলুম—সে কথা পরে হবে।

"লোতি বলেছেন, ভরত-নাট্যম দেখে তাঁর ক্লান্তি বোধ হয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভয়ও হচ্ছিল পাছে নর্তকী তার নৃত্য বন্ধ করে দেয়—তা হ'লে তো তিনি আর তাকে দেখতে পাবেন না। গাড়িতে শুয়ে শুয়ে আমারও মনে হচ্ছিল, নর্তকী আমাকে যে ভাবে অভিভূত করে ফেলেছে সেটা আমার পক্ষে মঙ্গলদায়ক নয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে আশাও পোষণ করেছিলুম, সে যেন মাদ্রাজের আগে কোন স্টেশনে না নেমে যায়। জানতুম এ-গাড়ি কলম্ব থেকে আসা প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাচ্ছে মাদ্রাজ—অল্প দূরের যাত্রীকে এ গাড়িতে উঠতে দেয় না—তবু তো সামনে রয়েছে বড় বড় স্টেশন, তাঞ্জোর আর তার পর বিল্লপুরম্। সেখান থেকে ডাইনে পণ্ডিচেরি, বাঁয়ে তিরুআন্নামলাই হয়ে বাঙালোর, মহীশূর কত কি।

"রাত তখন তিনটে হবে। আমি আর কিছুতেই আমার কৌতূহল দমন করে উঠতে পারলুম না, পঙ্কজম্‌রা ইতিমধ্যে কোথাও নেমে গিয়েছে কি না জানবার জন্য। আমি তখন ছেলেমানুষ ছিলুম অস্বীকার করি নে তবু মনে হয়েছিল ছেলে-মানুষীটার বাড়াবাড়ি হচ্ছে—আমার ভিতরকার ছেলেমানুষ তখন বুড়ো সেজে বিজ্ঞ মনকে বোঝাচ্ছে, বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে দু'পা হেঁটে নিলে ঘুম পেলেও পেতে পারে—যেন আমি ইতিপূর্বে ট্রেনে আর কখনো বিনিদ্র যামিনী যাপন করিনি!

"না নামলেই ভালো হত। দেখি, কাঁটাল-বোঝাই নৌকার মত থার্ড ক্লাসের ভিড়ের এক কোণে পঙ্কজম্ জড়সড় হয়ে বসে আছে। ভিড়ের মাঝখানে নর্তকীকে আর লোতির 'পথহারা পরীর' মত দেখাচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল স্টীম-রলারের এক পাশে যেন কোনো প্রকারে প্রাণ বাঁচিয়ে ফুটে রয়েছে পথপ্রান্তের বনফুল। দুঃখ হল, কিন্তু আশ্চর্য হলুম না, কারণ ইন্দোর না গোয়ালিয়র কোথায় যেন একবার দেখেছিলুম, ওস্তাদ ফৈয়াজ খান বসে আছেন থার্ড ক্লাসের জগদ্দল ভিড়ের মাঝখানে। গুণীর কদর পৃথিবী করে না—হয়ত ভালোই। অন্ততঃ ভরত-নাট্যমের নর্তকীদের পয়সা হলে তাদের নাচ তিন বৎসরের ভিতরেই বন্ধ হয়ে যায় —গাদা গাদা ভাত, রসম্ আর মণ মণ ঘি খেয়ে তারা দেখতে না দেখতে রাগ্‌বি বলের ঢপ ধরে ফেলে,—নৃত্য তখন সে-দেহ-বর্তুল ত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় খোঁজেন। কিন্তু তখনকার মত দুঃখ হয়েছিল এ-কথা অস্বীকার করি নে—কারণ তখনো আমার এ-সব গূঢ়তত্ত্ব জানা ছিল না।

"ততক্ষণে আমি মনস্থির করে ফেলেছি। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পৌঁছলুম মাদ্রাজ। আমার সঙ্গে ছিল বাড়ির পুরনো চাকর তারাপদ। মাল-বোঝাই

কুলির পিছনে যেতে যেতে তাকে জিজ্ঞেস করলুম যে প্ল্যাটফর্মে পঙ্কজমকে লক্ষ্য করেছে কি না—পুতুকোট্টাইয়ের নাচে সে আমার সঙ্গে গিয়েছিল তাই লক্ষ্য না করাটাই আশ্চর্যের বিষয় হত। তারাপদ বিচক্ষণ লোক। উত্তর শুনে বুঝলুম, সে প্রয়োজনেরও বেশী অনেক কিছু লক্ষ্য করেছে—এমন কি আমি যে রাত তিন-টের সময় একবার গাড়ি থেকে নেমেছিলুম সেটাও তার চোখ এড়িয়ে যায়নি।

"বললুম, 'আমি হোটেলে যাচ্ছি। তুমি দেখে এসো তো এরা সব কোথায় ওঠে।'

'তারাপদ আমাকে ছেলেবেলা থেকেই চেনে—আমার জীবনের কিছুই তার কাছে অজানা ছিল না। তাই সে একটু আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকালো। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললো, 'আচ্ছা'।'

[রচনাটি অসম্পূর্ণ—মাসিক বসুমতী অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যা ১৩৫৬]

নারীর অধিকার

ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী এম-এ ডি-ফিল (অক্সন) "নারীর অধিকার" সম্বন্ধে একখানা রচনা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার প্রধান বক্তব্য নরনারীর অধিকার সমান হওয়া উচিত। আমাদেরও সেই মত। কিন্তু প্রবন্ধে লেখিকা এমন অনেকগুলি যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, যেগুলি সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ একমত নহি। আমাদের মূল বক্তব্যে উপস্থিত হইবার পূর্বে দুই একটি সাধারণ আলোচনার প্রয়োজন।

প্রথমত লেখিকা বলিয়াছেন, "সেই (অর্থাৎ বৈদিক) সুবর্ণযোগে নরনারীর মধ্যে কোনরূপ সামাজিক বৈষম্য করা হইত না।" কিন্তু "বৈদিক যুগের পরবর্তী স্মৃতিযুগে নানা দিক হইতেই সমাজের দুরবস্থা উপস্থিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নারীগণের পূর্ব গৌরবোজ্জ্বল অবস্থারও অবসান ঘটে।"

লেখিকার সঙ্গে আমরা একমত। কিন্তু প্রশ্ন, এই বৈদিক যুগের সুবর্ণকাল হইতে নারী যে হঠাৎ স্মৃতি-যুগের লৌহকালে পতিত হইল তাহার জন্য দায়ী কে? লেখিকার পরবর্তী বাক্য "স্মার্ত-সমাজপতিগণ নারীগণের জন্য নানাবিধ বেদ-বিরুদ্ধ আইন-কানুন প্রচলিত করেন এবং ফলে নারী সকল স্বাতন্ত্র্য, সকল ন্যায্য অধিকার হারাইয়া ক্রীতদাসীরূপে পরিণত হন।" কিন্তু স্মার্ত-সমাজপতিগণ কেন করিলেন? লেখিকা সেদিকে কোনো ইঙ্গিত করেন নাই। আমাদেরও আশ্চর্য বোধ হয়; কথা নাই, বার্তা নাই, স্ত্রী-পুরুষ সমান অধিকার ভোগ করিতেছে, হঠাৎ পুরুষ ভেরিয়া হইয়া স্ত্রীকে ক্রীতদাসী বানাইয়া কি চরমসুখ পাইল? লেখিকা দর্শন-

শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ; কারণ বিনা কার্য হয় না,—এই তত্ত্ব তো তিনি আমাদের চেয়ে অনেক বেশী বোঝেন।

আমরা যদি বলি যে, নারীগণই দায়ী, তবে আমরা লিঙ্কনের কথাতেই সায় দিব। আমাদের বক্তব্য, নারী যে তাহার অধিকার হারাইল তাহার প্রধান কারণ অর্থনৈতিক।

বৈদিক যুগে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার ছিল, তাহার কারণ যে পুরুষ তখন বেশী ন্যায়ধর্মী ছিল (ও স্মৃতি যুগে অধর্ম পথে চলিল) তাহা নহে। বৈদিক যুগের প্রথম দিকে সমাজ যাযাবর অবস্থায়, শেষের দিকে প্রধানত কৃষি ও গো-পালন সংগঠনে প্রতিষ্ঠিত। এই উভয় ব্যবস্থাতেই স্ত্রীলোকের অর্থনৈতিক মূল্য পুরুষের অপেক্ষা বিশেষ ন্যূন নহে—প্রায় সমান সমান। সেই যাযাবর কৃষি সমাজ ব্যবস্থার চতুর্দিকে যে ধর্ম ও আচার-ব্যবহারের রীতি-নীতি নির্মিত হইল সেইগুলি সেই কারণেই সমান সমান। গ্রামাঞ্চলে তাই আজও দেখিতে পাইবেন, চাষীর মেয়ে-বউয়ের অধিকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী—চাষীর মেয়ে গতর খাটায়, ছেলেও গতর খাটায়—মেয়ের উৎপাদনী শক্তি ধান ভানিতে, চাউল কুটিতে, গোয়াল ধুইতে ব্যয়িত হয়। তাহার মূল্য পুরুষের শস্যোৎপাদনের অপেক্ষা কোনো অংশে হীন নহে। তাই চাষার মেয়ের বিবাহে পণ-প্রথা প্রায় নাই, কারণ বর বিবাহ করিয়া বাড়ীতে বোঝা লইয়া যাইতেছে না, লইয়া যাইতেছে উৎপাদনী শক্তি। মধ্যবিত্ত ঘরে কন্যা শুধু রন্ধন গৃহ সম্মার্জনই করে, তাহার অর্থনৈতিক মূল্য চাষীর মেয়ের তুলনায় কম। চাষীর মেয়ের দাম যে কত বেশী তাহার আর একটি উদাহরণ দেই। মুসলমানী চাষী মেয়ে বিধবার বিবাহ হয়। যে চাষীর বউ ভালো খাটিতে পারে, তাহার স্বামী বিয়োগ হইলে অতি অনায়াসে পুনরায় বিবাহ হয় ; অপেক্ষাকৃত অলস বিধবার বিবাহে হাঙ্গামা বেশী। মধ্যবিত্ত শ্রেণীতেও দেখিবেন যে মেয়ে মাস্টারী করিয়া টাকা রোজগার করে তাহাকে বৌদি, দাদা চোপা দিতে সাহস করেন না। অনেক সময়ে পরিবারে তাহার অধিকার সর্বাধিক।

আমাদের মনে হয়, বৈদিক যুগের শেষের দিকে অর্থাৎ স্মার্ত-যুগ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র ব্যবস্থা জটিল হইতে আরম্ভ করিল। সে জটিল ব্যবস্থার ভিতর বুদ্ধির প্রবেশ লাভ ঘটিল। ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজ্য চালনা, সেনা-সংগঠন, যুদ্ধবিদ্যা, নৌ ও জলনিকাশ আয়োজন ইত্যাদি ব্যাপারে 'গতরের' অপেক্ষা বুদ্ধির, সৃজনী শক্তির প্রয়োজন অধিক। যে পুরুষ সেই সমাজ পরিবর্তনের যুগে যত বেশী দান করিতে পারিল তাহার সম্মান ততই বাড়িল। বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সৃষ্টি হইল ;

সে সমাজে স্ত্রীলোককে গতর খাটাইবার আর প্রয়োজন নাই ; সে-সমাজে স্ত্রীলোক অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয়—অর্থনৈতিক দৃষ্টিবিন্দু হইতে।

যদি বলি সেই অর্থনৈতিক যুগ পরিবর্তনের সময়, নূতন রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের সময় স্ত্রীলোকের অবদান নগণ্য ছিল বলিয়া তাহাদের অর্থনৈতিক মূল্য কমিল, কাজেই সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ও ধর্মের নানাবিধ অনুষ্ঠানে তাহার অধিকার হ্রাস পাইল, তবে কি ভুল বলা হয় ? লেখিকা দার্শনিক। নিরপেক্ষ ভাবে কোনো বিদ্যান্বেষণের জন্য চিত্তের যে উৎকর্ষের প্রয়োজন হয় তাহা তাঁহার আছে। তিনি যদি সমাজতত্ত্বের এই বিশেষ অর্থনৈতিক অঙ্গটি দার্শনিক মননবৃত্তি দিয়া আলোচনা করিয়া নারী জাতিকে সারতত্ত্বটি বুঝাইয়া বলেন, তাহা হইলে আমাদের মহদুপকার হইবে, সন্দেহ নাই। পুরুষের দ্বারা আলোচিত এই সব বিষয় আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারে না।

দ্বিতীয়ত শ্রদ্ধেয়া লেখিকা সতীদাহ, কৌলীন্য-প্রথা ইত্যাদির বিরুদ্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "এইরূপ স্মার্ত ভট্টাচার্যগণের সম্পূর্ণ বেদ-বিরুদ্ধ, বৈষম্য-মূলক, অন্যায্য (আমরা অনার্যও বলিব—লেখিকা) বিধি-বিধানে নারীগণ ক্রমশ দুর্গতির চরম গর্ভে নিক্ষিপ্ত হন।"

কোনো সন্দেহ নাই ; কিন্তু প্রশ্ন, মাত্র পুরুষেরাই কি দায়ী ? সতীদাহই ধরুন। পুরুষেরা তো বিধান দিলেন—না হয় মানিয়াই লইলাম, যদিও বুঝিতে পারিলাম না কেন যে এ হেন বিকট বিকৃত মনোবৃত্তি এই ভারতবর্ষের পুরুষেই সঞ্চারিত হইল—কিন্তু প্রশ্ন, নারী কি নারীকে এই হৃদয়হীন আচারে সাহায্য করে নাই, প্ররোচিত করে নাই ? শোকাতুরা বিধবাকে হৃদয়হীনা নারীরা কি চতুর্দিকে ঘিরিয়া সতীদাহের ফলস্বরূপ নানা রকম স্বর্গ-সুখের বর্ণনা দেয় নাই ? জ্বলন্ত চিতায় পতি-অনুগমন না করিলে যে কোন অজানা শতগুণে যন্ত্রণাদায়ক নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইবে তাহার বীভৎস চিত্র অঙ্কন করে নাই ? পতি-অনুগমন করিলে যে সে কি 'ভয়ঙ্কর' প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া যুগ যুগ ধরিয়া সমাজের আদর্শস্থলা হইয়া থাকিবে তাহার জাজ্জ্বল্যমান—চিতাগ্নি অপেক্ষা সহস্র গুণে জাজ্জ্বল্যমান চিত্র অঙ্কন করিয়া পতিশোকাতুরা বিগতপ্রজ্ঞা, হতবুদ্ধি বিরহবিধুরাকে প্রলুব্ধ করে নাই ? হয়ত বিধবা সারা জীবন অজানা কোণে কাটাইয়াছে ; হঠাৎ লোকচক্ষুর সম্মুখে দেবীরূপে বিভাসিত হইবার লোভ তাহাকে প্রধানত দেখাইল কে ? সেই রোরুদ্যমান অন্তপুরে স্মার্ত পণ্ডিতেরা তখন প্রধান নায়ক, না তাঁহাদের পত্নীরা, মাতারা ? কে জানে ?

নিরম্বু উপবাসের বিধান দিয়া যখন স্মার্ত পণ্ডিত গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেলেন

তখন মাতা কি অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে প্রকাশ্যে অথবা গোপন জল দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলেন? এস্থলে তো গায়ের জোরের কথা উঠিতেছে না। পুরুষ যে পৈশাচিক আচারের সৃষ্টি করিল, নারী তাহাকে ধর্মজ্ঞানে স্বীকার করিল কেন? গোপনে জল দিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত—'মঞ্জুলিকা'র মাতারা সব ছিলেন কোথায়? অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধকে গৌরী দানের সময় সর্বাবস্থায় কি মা-জননীরা আপত্তি জানাইয়াছিলেন, না সমাজের উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিবার প্রমত্ততা তাঁহাদের স্কন্ধেও ভূতের মত চাপিয়াছিল? না, অন্যান্য নারীর (পাঠিকা লক্ষ্য করুন, নারীই) গঞ্জনা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কন্যাকে অন্তর্জলি বরের সঙ্গে সপ্তপদী হইবার জন্য অগ্রপদী করিলেন?

বিধবা বিবাহ প্রচেষ্টা নিষ্ফল করিল শুধু পুরুষ? "ওমা, কি ঘেন্না, ছ্যা ছ্যা," বলিয়াছে কাহারা—ঐক্যতানে, নির্মম ভাবে?

তাই শ্রদ্ধেয়া লেখিকাকে সবিনয় নিবেদন করি যে, শুধু পুরুষের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে চলিবে না, আপন ভুল বুঝিয়া নারীকে নারীর বিরুদ্ধে সতর্ক হইতে হইবে, আপন ঘর প্রথম গুছাইতে হইবে। নারী আন্দোলন ব্যাপকভাবে করিতে হইলে হৃদয়হীন আচারের একসিকিউটিভ অফিসার নারীগণকে 'তুমিও ভালো, আমিও ভালো' বলিয়া আগাইয়া গেলে চলিবে না—মেয়েরাই line of supply কাটিবে—স্রেফ অভ্যাসজনিত হৃদয়হীনতা দ্বারা।

এখন মূল বক্তব্য—শ্রদ্ধেয়া লেখিকা কি বৈদিক যুগেই ফিরিয়া যাইতে চাহেন? বৈদিক যুগই কি বিংশ শতাব্দীতে আমাদের আদর্শ? শুনিয়াছি, বৈদিক যুগেও নাকি পিতা ও ভ্রাতাহীন অরক্ষণীয়াকে ঘৃণ্যবৃত্তিতে যোগদান করিতে হইত। তাহাকে বরদাস্ত করিতে হইবে? জানি ঋষি ঐ কু-ব্যবস্থার সমর্থন করেন নাই—কিন্তু আদর্শ বাছিবার সময় নিরঙ্কুশ আদর্শ লইব না কেন? আর এক বিপদ এই যে, বৈদিক যুগ বলিতে অথর্ব বেদের যুগও তো বোঝায়। সেখানে দেখি জ্বর হইলে রোগীকে 'দুই নদীর মোহনায় খড়ের ঘরে শোয়াইয়া খাটে ব্যাঙ বাঁধিয়া মন্ত্রোচ্চারণের ব্যবস্থা—কুইনিনের উল্লেখ নাই। লেখিকা কি সত্যই এই চিকিৎসায় ফিরিয়া যাইতে চাহেন? স্বামী অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইলে সে নারীকে ধ্বংস করিবার যে কৌশল বর্ণিত হইয়াছে (ভাগ্যিস, তাহা ফলপ্রসূ নয়) শ্রদ্ধেয়া লেখিকা কি বিংশ শতাব্দীর নারীকে তাহাই বরণীয় বলিয়া উপস্থাপিত করেন? বিবাহ-চ্ছেদ বা ডিভোর্সের দিকে অগ্রসর হওয়াই কি অধিকতর যুক্তিযুক্ত নহে? অরক্ষণীয়ার বর লাভের জন্য যে প্রজাপতিমন্ত্র শিখানো হইতেছে, এ যুগে তাহাই আমাদের চরম আদর্শ?

আমাদের তো মনে হয়, কি স্মার্ত, কি বৈদিক, সর্বশাস্ত্র মাথায় থাকুন। নারীকে অগ্রসর হইতে হইবে যুগ যুগ সঞ্চিত নিরপেক্ষ অর্থনীতি, রাজনীতি—বিশেষ করিয়া সমাজ-নীতির—প্রসূত জ্ঞানের সাহায্যে—কোনো 'সুবর্ণ-বৈদিক যুগে' ফিরিয়া যাইবার জন্য নহে, কোনো রঘুনন্দনকে ভুল বলিয়া প্রমাণ করিয়া নহে—তাঁহাকে ও সে যুগকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া।

আমাদের মত সাধারণ কোনো নারী বৈদিক যুগে ফিরিয়া যাইতে চাহিলে আমি কোনো উচ্চবাচ্য করিতাম না—কারণ যদিও তাহা স্বীকার করিতাম না তবু সে-নারীর মনস্তত্ত্ব বুঝিতে পারিতাম। কারণ দেখিয়াছি বহু আন্দোলন গোড়ার দিকে 'ধার্মিক' বা 'পশ্চাদমুখী' হয়—অর্থাৎ কোনো কাল্পনিক সুবর্ণযুগে ফিরিয়া যাইতে চাহে। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম যে স্বাধীনতার আন্দোলন হয় তাহাতে বাঙলাদেশে 'মা কালী'কে লইয়া দাপাদাপি করা হইয়াছিল—আজ আমরা আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন 'মা কালী'কে বাদ দিয়াই করিয়া থাকি ('মা কালী' নারী; তাঁহাকে যে স্বাধীনতা আন্দোলনে আজ পুরুষ সিংহাসন হইতে নামাইয়া দিয়াছে তাহার জন্য আমরা নারীরা দুঃখিত নই)। কয়েকদিন পূর্বে কলিকাতায় যে আন্দোলন হইয়া গেল, তাহাতে 'মা-কালী'কে আবাহন করা হয় নাই। মুসলিম লীগ নূতন আন্দোলন, তাই সে আন্দোলন ধর্মপ্রধান। ইসলামের সহিত সুপরিচিতা নহি বলিয়া মুসলমান ভ্রাতারা কোন্ সুবর্ণ যুগে যাইতে চাহেন জানি না, কিন্তু ইতিহাস স্মরণ করিয়া ভরসা রাখি তাঁহারাও একদিন ধর্মালোচনা রাজনীতি হইতে বাদ দিয়া 'বাঙলা কথা' বলিতে শিখিবেন—অর্থাৎ স্পেডকে স্পেড বলিবেন। লেখিকা দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা—তিনি স্থির বিচারে আমাদিগকে পথ দেখাইবেন। কোনো দার্শনিক কি সত্যই কোনো বিশেষ সুবর্ণ-যুগে বিশ্বাস করেন?

বঙ্কিম একদিন বলিয়াছিলেন, 'যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বাস্য নহে, যাহা বিশ্বাস্য তাহাই শাস্ত্র।' আমরা বলি যাহা বৈদিক যুগ তাহাই কাম্য নহে, যাহা কাম্য তাহাই বৈদিক যুগ। যদি ভবিষ্যৎ সমাজ ও রাষ্ট্রের নারী ব্যবস্থা আমাদের মনঃপূত না হয়, কিন্তু চৌকশবৈদিক, তবুও বেদচতুষ্টয়কে পরম শ্রদ্ধাভরে নমস্কার করিয়া লেখিকার সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলিব,—

If you Vedas come, with you ; if you do not come inspite of you.

[সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় ডঃ রমা চৌধুরীর "নারীর অধিকার" শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিত। নিবন্ধটি লেখকের স্বনামে প্রকাশিত হয় নাই। 'ইন্দ্রাণী সরকার' এই ছদ্মনাম লেখক ব্যবহার করেন।]

ঘরে বাইরে শ্রমিক নীতি

শ্রমিক দল সংখ্যাগৌরবের বিজয়শঙ্খ বাজাইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। সে শঙ্খরবের প্রতিধ্বনি সর্বদেশে মুখরিত হইয়াছে। কেহ বা ভয় পাইয়াছেন, কেহ ভরসা পাইয়াছেন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, আমাদের সকলের অগোচরে, এমন কি, স্বয়ং ইংরেজের অজানাতে ইংলণ্ডে রাতারাতি রাজনৈতিক বিপ্লব নিঃশব্দে ঘটিয়া গেল। ইংরেজের স্বভাবই এই রকম—তাহার বাম হস্তের আচরণ দক্ষিণ হস্ত জানিতে পারে না। এ স্থলে আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, স্বয়ং বামহস্তই জানিত না যে সে কি করিয়া বসিয়াছে।

গৃহে যখন এ রকম বিপর্যয় বিপ্লব ঘটিল, তখন বাইরেও কিঞ্চিৎ হইবে, এই রকম ভয় বা আশা অনেকেই পোষণ করিতেছেন। আমাদেরও দুশ্চিন্তা বাহির লইয়া।

প্রশ্ন এই, শ্রমিক দলের প্রথম কার্য কি হইবে। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, যে সব নিতান্ত প্রয়োজনীয় কর্ম পূর্ববর্তী শ্রমিক দল না করিয়া অপ্রিয়ভাজন হইয়াছিলেন সেগুলি তাঁহারা এইবার করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইবেনই।

ইতঃপূর্বে বহু সদুদ্দেশ্য লইয়া শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলী কর্মভার গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রচেষ্টা, তাঁহাদের আদেশ-উপদেশ পদে পদে খণ্ডিত করিয়াছিল প্রগতি পরিপন্থী, শ্রমিক স্বার্থ-বিরোধী আমলারা। এতদিন ধরিয়া তাহারা যে পদ্ধতিতে রাজ্য শাসন করিয়াছিল, তাহার উল্টা করিলে তাহাদের পদমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় ও তাহাদের আত্মীয়স্বজন..গোষ্ঠীবর্গের স্বার্থহানি হয়। দেশে-বিদেশে কাহারোই বুঝিতে অসুবিধা হয় নাই যে, ইহাদের নবীন তিলকটি শুধু যে অনভ্যাসের তাহা নয়, চন্দনে বিছুটি মাখানোও বটে।

তবে প্রশ্ন, ইহাদিগকে পদচ্যুত করা হইল না কেন? সে সাহস শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলীর ছিল না; অন্তরায়ও বিস্তর ছিল। প্রথমতঃ, আমলাতন্ত্র যে পাকাপোক্ত শতাব্দ-বৃদ্ধ আইনকানুন নজীর রেওয়াজের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা নূতন আইন না গড়িয়া ভাঙা অসম্ভব; দ্বিতীয়তঃ, শক্তি গ্রহণের প্রথমাবস্থায় তাহা করিতে গেলে প্রগতিপন্থীরা তারস্বরে সে আইনের এমনি কদর্থ করিত যে, দেশের পাঁচজন ভাবিত যে, শ্রমিক দলের নেতারা অধর্ম বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া প্রাচীন আমলাদের তাড়াইতেছেন—সেই সব আপন আপন আত্মীয়স্বজনকে দিবার জন্য। এই কুৎসা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য শ্রমিক মন্ত্রীরা অনেক সময় জানিয়া শুনিয়াও শ্রমিক বিরোধী কর্মচারীদের গাত্রে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

দেশের ভিতরে তো এই। বিদেশে যে সব কনসুলেট, লিগেশন, এম্বেসি

সেগুলি ধনপতিদের আত্মীয়স্বজনে পরিপূর্ণ। তাহারা রাজার হালে থাকে, তাহাদের প্রধান কর্ম সরকারী অর্থে, শ্রমিক দলের অনর্থে ভোজ দেওয়া ও ভোজ খাওয়া। তাহাদের অধিকাংশ অভিজাত শ্রেণীর; শ্রমিক দলের মুখপাত্র হইতে তাহাদের যেমন লজ্জা, তেমনি ঘৃণা। তাহারা পদে পদে শ্রমিক মন্ত্রিদলের মতামত উপেক্ষা করিয়া পুরাতন নীতি চালাইবার চেষ্টা করিয়াছে ও রাজনৈতিক ধড়িবাজিতে তাহারা বংশানুক্রমে পরিপক্ক বলিয়া দেশের কর্তাদের আদেশ-উপদেশ যে অর্বাচীনতানিবন্ধন, তাহা বিদেশে সপ্রমাণ করিয়া ছাড়িয়াছে। শ্রমিক দলকে অপদস্থ করিতে ইহারাই সর্বাপেক্ষা উদগ্রীব ও অকুতোভয়। ইহাদের পৃষ্ঠে সম্মার্জনী সঞ্চালন সুকঠিন, প্রায় অসম্ভব।

এই দেশী-বিদেশী আমলাদের পিছনে রহিয়াছে রক্ষণশীল ধনপতির দল। ইহারা ব্যাঙ্ক, কারবার, ধর্মসঙ্ঘ (চার্চ), বিশ্ববিদ্যালয়, আইন আদালত, প্রেস ইত্যাদির শক্তি-কুঞ্চিকা লইয়া বসিয়া আছে। শ্রমিক দল ইহাদের এক ধাক্কায় সরাইবার চেষ্টা করে নাই। ইহাদের সহযোগে রাজ্য-চালনা করিয়া ধীরে ধীরে ইহাদের রাজনৈতিক শক্তি কমাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে হস্ত অপেক্ষা আস্ত্র বৃহত্তর হইয়া পড়াতে সফল হয় নাই। পূর্বে প্রকাশিত "পরাজিত জর্মনী" প্রবন্ধেও উল্লেখ করিয়াছি যে, বাইমার রিপাবলিকের সোশাল ডিমোক্রেট সভ্যগণ শক্তি পাইয়াও এ-সাহস সঞ্চয় করিতে পারেন নাই—যুঙ্কার, সামরিক কর্তা-ব্যক্তি, ধনপতিগণের রাজনৈতিক শক্তি কমাইবার চেষ্টা করেন নাই। কংগ্রেস যখন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করেন, তখন তাঁহারাও এই বিপদে পড়িয়াছিলেন।

এটলি সাহেব ইতিমধ্যেই কয়েকটি মোক্ষম কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন;—প্রথমতঃ, নূতন মন্ত্রিসভায় অ-প্রাচীনদিগকে স্থান দেওয়া হইবে। অর্থাৎ প্রাচীন শ্রমিকপন্থীদের এতটা সাহস নাই যে, রক্ষণশীলদের নির্মমভাবে আঘাত করিতে পারে। তাহাদের চক্ষুলজ্জা বেশী ও হস্তকণ্ডুয়ন কম। আমরাও বলি, শবদাহে তরুণদেরই প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, যদি তখন শবদেহ উচ্চবাচ্য করে অর্থাৎ মৃতদেহ ভূতগ্রস্ত হয়, তবে 'শ্রমিক দল রক্ষণশীল দলের বিরোধিতার জন্য প্রস্তুত আছেন।' এই কথাটিই ট্রেড ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট জর্জ আইসাক সাহেব আরো লবণ-লঙ্কা মিশাইয়া হুঙ্কার দিয়া বলিয়াছেন, "পূর্বের ন্যায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা আর নয়, এইবার দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রগামী হইবে।" বাঙলা কথায় 'যুদ্ধং দেহি।'

তৃতীয়তঃ, খবর আসিয়াছে যে, কনস্যুলেট, লিগেশন, এম্বেসিগুলির সংস্কার করা হইবে। এতদ্ব্যতীত নানাবিধ খবর আসিয়াছে, তবে সেগুলি সরকারী শীলমোহর-

যুক্ত নয়—তন্মধ্যে প্রধান এই যে, কতকগুলি মোটা কারবার অচিরাৎ রাষ্ট্রধন করিয়া ফেলা হইবে।

উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু প্রশ্ন এই; ধনপতিরা কি এতই নির্জীব যে, চতুর্দিকে বিস্তৃত তাহাদের শক্তিধারাগুলিকে একত্রীভূত করিয়া প্লাবনের দ্বারা শ্রমিকদিগকে ভাসাইয়া দিবার চেষ্টা করিবেন না? ইহার উত্তর কেহই আপ্তবাক্যের ন্যায় নির্ভুল দিতে পারিবেন না, আমরাও অক্ষম। তবে ভাগ্যফল গণনাকালে যেমন কোনরকম গ্যারান্টি কেহ চাহে না, আমাদের নিকটও আশা করি কেহ নির্ভুল ফল গণনা আশা করিবেন না।

মনে হইতেছে বিনা বিপ্লবে শ্রমিক দল এত বড় শ্রেণীস্বার্থবিরোধী কার্যপরিক্রমা সফল করিতে পারিবেন না। অথচ বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে রক্তপাতের সম্ভাবনাও তো রহিয়াছে এবং দেশের অভ্যন্তরবর্তী কর্মকলাপে এই সব বর্বর রক্তপাত নীতি তো ইংরেজ বহুকাল হইল বর্জন করিয়াছে। তবে উপায় কি?

উপায় আছে ও সেইখানেই আমাদের মত গরীব ভারতবাসীর ভয়। আমার মনে হয়, ধনপতিদিগকে দেশে ধনক্ষয় ও শক্তিক্ষয়ের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে বিদেশে। বেদে কথিত আছে, যম পিতৃপুরুষের প্রথম যিনি স্বর্গ অধিকার করেন। মনে হয় পরবর্তী যুগে ইন্দ্র তাহাকে খেসারৎ হিসাবে নরক দান করেন।

অস্ট্রেলিয়া, কানাডা গিয়াছে। বিধ্বস্ত, বিধ্বংস ইউরোপে মার্কিন প্রবেশাধিকার চাহিতেছে। চীনের বাণিজ্যাধিকারও নাকি তাহাদিগকেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে ইংরেজ ধনপতিরা যায় কোথায়?

তাই ভয় হইতেছে শ্রমিক দল নির্বিকার চিত্তে ভারতবর্ষকে ডাকিনীর হস্তে সমর্পণ করিবেন। ভূরি ভূরি প্রমাণ দিবার উপায় নাই—যদিও পূর্বতন শ্রমিক মন্ত্রিদল ভারতবর্ষের প্রতি কি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই ভুলেন নাই! তবে একটি সামান্য নজীর নিবেদন করিতেছি। বর্মা বিজয়ের পর সেখানে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার যে নূতন পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহাতে বর্মীরা পুনরায় মূষিক হইবে। এই প্রাণদণ্ডাজ্ঞায় স্বাক্ষর আছে মোটা মোটা অক্ষরে, কট্টরদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া শ্রমিক নেতাদেরও।

আনন্দবাজার পত্রিকা ৩. ৮. ১৯৪৫

অফগান ইতিহাসের মদনাঙ্ক

যে অঙ্কটি আমি লিখিতেছি তাহার মূল ঘটনাগুলি যে কোনো আফগান ইতিহাসে পাওয়া যায় কিন্তু পশ্চাতে যে দাবাবড়ের চাল চলিয়াছিল, তাহা আমি

কাবুলে মোল্লা মৌলবী ও রাজপরিবারের লোকের কাছ হইতে সংগ্রহ করি। যাঁহারা মোগল বাদশাহ অওরঙ্গজেবের পরবর্তী ফররুখ-সিয়র, নিকু সিয়র, রফি-উদদৌলা, রফি উদ-দরজাত, মুহম্মদ শাহ প্রভৃতি বাদশাহের দ্রুত পরিবর্তনশীল ও ঘটনাময় জীবন লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, সে যুগের ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা পড়ার পরেই মনে হয়, ইতিহাস পড়িতেছি না, পড়িতেছি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর রোমান্টিক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আফগানিস্থানের আমীর ছিলেন হবীবউল্লা খান। তাঁহার ভ্রাতার নাম নসরউল্লা খান ও দুই পুত্রের নাম যথাক্রমে ইনায়েতউল্লা খান ও আমীর (পরে) আমানউল্লা খান। পাঠক ভয় পাইবেন না; উপস্থিত এই কয়টি নাম স্মরণ করিয়া রাখিলেই আফগান ইতিহাসের প্রধান নায়কদের ভাগ্য-চক্রগতি লক্ষ্য করিতে পারিবেন।

হবীবউল্লার ভ্রাতা নসরউল্লা দেশের মোল্লাদের এমনি প্রিয়পাত্র ছিলেন যে, জ্যেষ্ঠ পুত্র ইনায়েতউল্লা তাঁহার মৃত্যুর পর আমীর হইবেন এই ঘোষণা হবীবউল্লা করিতে সাহস পান নাই। বরঞ্চ দুই ভ্রাতাতে এই নিষ্পত্তিই হইয়াছিল যে, হবীবউল্লার মৃত্যুর পর নসরউল্লা আমীর হইবেন ও তাঁহার মৃত্যুর পর আমীর হইবেন ইনায়েতউল্লা। এই নিষ্পত্তি দৃঢ়তর করিবার বাসনায় হবীবউল্লা-নসরউল্লায় মীমাংসা করিলেন যে, ইনায়েতউল্লা নসরউল্লার কন্যাকে বিবাহ করিবেন। হবীব-উল্লা মনে মনে বিচার করিলেন যে, আর যাহাই হউক, নসরউল্লা জামাতাকে হত্যা করিয়া 'দামাদ-কুশ' (জামাতা-হন্তা) আখ্যায় কলঙ্কিত হইতে চাহিবেন না। ঐতিহাসিকদের স্মরণ থাকিতে পারে, জয়পুরের রাজা অজিত সিং যখন সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া জামাতা দিল্লীর বাদশাহ ফররুখ-সিয়রকে নিহত করেন, তখন দিল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতার 'দামাদ-কুশ' 'দামাদ-কুশ' চিৎকারে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি দিল্লী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। রাস্তার বালকেরা পর্যন্ত নির্ভয়ে অজিত সিংহের পাল্কির দুই পাশে ছুটিয়া চলিত ও সিপাই বরকন্দাজের তম্বি-তম্বা উপেক্ষা করিয়া তারস্বরে ঐক্যতানে 'দামাদ-কুশ' 'দামাদ-কুশ' বলিয়া চিৎকার করিত। এমন কি জয়পুরেও তিনি এতই অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, এক বিশেষ পত্র দ্বারা তিনি জামাতা হত্যার কারণ দর্শাইয়া সাফাই গাহিয়াছিলেন। পত্রখানা অধুনা বোম্বায়ের এক ঐতিহাসিক ত্রৈমাসিকে বাহির হইয়াছে।

হবীবউল্লা-নসরউল্লা-ইনায়েতউল্লা সকলেই এ চুক্তিতে অল্পাধিক পরিমাণে সন্তুষ্ট হইলেন। অসন্তুষ্ট হইলেন মাতৃহীন ইনায়েতউল্লার বিমাতা, আমানউল্লার মাতা, হবীবউল্লার দ্বিতীয় মহিষী। আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হইতে পারে, কিন্তু তিনিও

দাবার ঘুঁটিগুলির দিকে কড়া নজর রাখিয়া স্থির করিলেন, নসরউল্লা, এনায়েত-উল্লার মত দুই প্রধান ঘুঁটিকে মারিয়া তাঁহার নিজের বড়ে-পুত্র আমানউল্লাকে দিয়া তিনি রাজা (হবীবউল্লাকে) মাত করিবেন।

এমন সময় কাবুলের অতি উচ্চ খানদানী বংশের মুহম্মদ তর্জী সিরিয়া-নির্বাসন হইতে দেশে ফিরিলেন। সঙ্গে তাঁহার পরমাসুন্দরী তিন কন্যা, কাওকাব, সুরাইয়া ও বীবী খুর্দ। ইঁহারা দেশ-বিদেশ দেখিয়াছেন, লেখাপড়া জানেন, উত্তম বেশভূষা পরিধান করিতে পারেন ; ইঁহাদের উদয়ে কাবুল-কন্যাদের মুখ অতি ম্লান, কুৎসিত, 'অমার্জিত' বা 'অনকলচরড' (অজ্ঞ জঙ্গল অমদেহ—যেন 'জঙ্গলী') মনে হইতে লাগিল।

হবীবউল্লা রাজধানীতে ছিলেন না। আমানউল্লার মাতা—যদিও আসলে দ্বিতীয়া মহিষী, কিন্তু ইনায়েতউল্লার মাতার মৃত্যুতে প্রধানা মহিষী হইয়াছেন—এক বিরাট ভোজের বন্দোবস্ত করিলেন। প্রধান অতিথি তর্জী পরিবার, কন্যাগণ-সহ। রাণী অন্তরঙ্গ আত্মীয়স্বজনকে হুকুম দিলেন যে, ইনায়েতউল্লাকে কাওকাবের প্রতি যে কোন প্রকারে আকৃষ্ট করিতেই হইবে। বিপুল রাজপ্রাসাদের আনাচে-কানাচে দুই একটি কামরা বিশেষ করিয়া খালি রাখা হইল। সেখানে যেন কেহ হঠাৎ গিয়া উপস্থিত না হয়।

খানাপিনা চলিল, গানবাজনায় রাজবাড়ি সরগরম। রাণী স্বয়ং ইনায়েত-উল্লাকে কাওকাবের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন, আর অতি সন্তর্পণে কানে কানে কাওকাবকে বলিলেন, "ইনিই যুবরাজ (মুঈন উস-সুলতানে), আফগানিস্থানের ভবিষ্যৎ আমীর।" কাওকাব ইঙ্গিতটা হয়ত বুঝিয়াছিলেন। অসম্ভব নহে। তা ছাড়া শঙ্করাচার্যও তো বলিয়াছেন, তরুণ তরুণীর রক্ত অনুসন্ধান করে। প্ল্যানটা ঠিক উতরাইয়া গেল। বিশাল রাজপ্রাসাদে ঘুরিতে ঘুরিতে ইনায়েত কাওকাব পুরীর এক নিভৃত-কক্ষে বিশ্রম্ভালাপে রত হইলেন। ইনায়েত ভাবিলেন, স্বেচ্ছায় ঐ কক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন (ধর্মশাস্ত্রে যাহাকে বলে ফ্রীডম অব উইল), রাণী জানিতেন তাঁহার জালে ঠিক মাছ ধরিয়াছে (ধর্মশাস্ত্রে যাহাকে বলে প্ল্যানড্ ডেস্‌টিনি)।

প্ল্যান মাফিকই রাণী হঠাৎ যেন লক্ষ্য না করিয়া, সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন। তরুণ-তরুণী ঈষৎ লজ্জিত হইয়া সম্মানার্থে নত মস্তকে দাঁড়াইলেন। রাণী সোহাগ মাখিয়া অমিয়া ছানিয়া সপত্নী-পুত্রকে বলিলেন, "বাচ্চা, তোমার মাতা নেই, আমিই তোমার মাতা। তোমার সুখ-দুঃখের কথা আমাকে বলিবে না তো কাহাকে ? তোমার বিবাহের ভার তো আমার স্কন্ধেই। এই কন্যা যদি তোমার

মন হরণ করিয়া থাকে তবে এবম্প্রকার ব্রীড়াবনত হইতেছ কেন? তর্জী-কন্যার পাণিগ্রহণ অতীব শ্লাঘনীয়। তোমার হৃদয় কি বলে?"

হৃদয় আর কি বলিবে? ইনায়েত তখন কাওকাব ও রাণীর দুই জালে বদ্ধ মক্ষিকা।

হৃদয় যাহা বলে বলুক। মুখে কি বলিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কাবুলের চারণরা পঞ্চমুখ। কেহ বলেন, তিনি মৌনতা দ্বারা সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন; কেহ বলেন, মৃদু আপত্তি জানাইয়াছিলেন, কেন না জানিতেন যে, নসর-কন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ প্রায় স্থির; কেহ বলেন, মৃদুস্বরে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কেন না পূর্বমুহূর্তেই নাকি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া প্রেম নিবেদন করিয়া বসিয়াছিলেন—হয়ত ভাবিয়াছিলেন প্রেম আর বিবাহ তো ভিন্ন ভিন্ন শিরঃপীড়া—পরমুহূর্তেই এড়াইবেন কি করিয়া; কেহ বলেন, শুধু 'হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ' করিয়াছিলেন তাহা হইতে 'হস্ত-নীস্ত' ('হাঁ'-'না'—যে কথা হইতে বাঙলা 'হেস্ত-নেস্ত' আসিয়াছে) কিছুই বুঝিবার উপায় ছিল না। কেহ বলেন, তিনি কিছু প্রকাশ করিবার পূর্বেই রাণী কক্ষ ত্যাগ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ কাবুল চারণবর্গের পঞ্চমুখ পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী বলে।

অর্থাৎ সেই অবস্থায় রাজা হউক, রাজপুত্র হউক, প্রজা হউক, দাস হউক, সাধারণ লোক গুরুজনের সম্মুখে যাহা করিয়া বা বলিয়া থাকে, ইনায়েত তাহাই করিয়াছিলেন।

কিন্তু কি বলিয়াছিলেন, তাহা জানিবার যত না প্রয়োজন, তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, রাণী-মা মজলিসের সম্মুখে গিয়া সে বলার কি অর্থ প্রকাশ করিলেন। জালবদ্ধ ভারতবাসী মাত্রই জানে, আমরা ক্ষীণকণ্ঠে দেশে আবেদন ক্রন্দন করিয়া কি বলি না বলি তাহার উপর নির্ভর করিয়া নূন, মুদলেয়ার বিশ্বের মজলিসে নিজেদের ভাষণ তৈয়ার করেন না। তাঁহাদের কণ্ঠ রাজকণ্ঠ। সে প্ল্যানে খোলে, প্ল্যানে বন্ধ হয়।

রাণীর কণ্ঠ মজলিসের আনন্দোল্লাস ধ্বনি ক্ষণিকের মত ছাপাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিল, "আজ পরম আনন্দের দিন। যুবরাজ ইনায়ত তর্জী-কন্যা-কাওকাবকে বিবাহ করিবেন। খানা-মজলিস রাত্রি দুইটার সময় ভাঙিবার কথা ছিল; তাহা বাতিল। সূর্যাস্ত পর্যন্ত আনন্দোৎসব চলিবে। আজ রাত্রেই আমি কন্যাপক্ষকে প্রস্তাব পাঠাইতেছি।"

মজলিসের ঝাড়বাতি দ্বিগুণ আভায় জ্বলিয়া উঠিল। চতুর্দিকে হর্ষধ্বনি, আনন্দোচ্ছ্বাস। দাসদাসী ছুটিল বিবাহ প্রস্তাবের 'তত্ত্বের' তত্ত্বতাবাস করিতে।

সব কিছুই রাজবাড়িতে সেই দ্বিপ্রহর রাত্রে মৌজুদ পাওয়া গেল ? আশ্চর্য হইবার সাহস কাহার ?

তর্জী হাতে স্বর্গ পাইলেন ; কাওকাব হৃদয় স্বর্গ পাইয়াছেন।

সঙ্গে সঙ্গে রাণী হবীবউল্লার নিকট 'সুসংবাদ' জানাইয়া দূত পাঠাইলেন। মাতা ও রাজমহিষীরূপে তিনি ইনায়েতউল্লার হৃদয়ের গতি কোন দিকে জানিতে পারিয়া তর্জীকন্যা কাওকাবের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ স্থির করিয়াছেন। প্রগতিশীল আফগানিস্থানের ভবিষ্যৎ রাজমহিষী সুশিক্ষিতা হওয়ার একান্ত প্রয়োজন। কাবুলে এমন দ্বিতীয় বধূ নাই যিনি রাজপ্রাসাদ অলঙ্কৃত করিতে পারেন। প্রাথমিক মঙ্গলানুষ্ঠান খোদাতালার মেহেরবাণীতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মহারাজ অতিসত্বর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 'আকদ-রসুমাতের (আইনত পূর্ণ বিবাহ) দিবস ধার্য করিয়া পৌরজনের হর্ষবর্ধন করুন।

হবীবউল্লা পত্র পাইয়া ক্ষিপ্ত হইলেন, কিন্তু রাগান্ধ হইলেন না। আর কেহ না হউক, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, মূর্খ ইনায়েত নসরকন্যাকে হারায় নাই, হারাইতে বসিয়াছে রাজসিংহাসন। কিন্তু হবীবউল্লা যদিও অত্যন্ত অলস ও কামুক ছিলেন, তবু বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না যে, সমস্ত ষড়যন্ত্রের পশ্চাতে রহিয়াছেন মহিষী। বিমাতার এত প্রেম তো সহজে বিশ্বাস হয় না। হবীবউল্লা কখনো পূর্ববঙ্গে আসেন নাই ; কিন্তু প্রবাদটি জানিতেন,

সতীন মা'র কথাগুলি
মধুরসের বাণী
তলা দিয়ে গুঁড়ি কাটেন
উপর থেকে পানি।

ক্রোধ সম্বরণ করিয়া হবীউল্লা অতি কমনীয় নমনীয় উত্তর দিলেন। খোদাতালাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে মহিষী শুভবুদ্ধিপ্রণোদিতা হইয়া এই বিবাহ স্থির করিয়াছেন। তর্জীকন্যা কাওকাব যে সর্বাংশে রূপগুণসম্পন্না তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। কিন্তু শুধু কাওকাব কেন, সুরাইয়াও সর্বাংশে কাওকাবের ন্যায় সুশিক্ষিতা, সুরূপা, সুমার্জিতা। দ্বিতীয় পুত্র আমানউল্লাই বা খাস কাবুলী জংলী বিবাহ করিবেন কেন ? অতএব তিনি মহিষীর সৎদৃষ্টান্ত অনুকরণে সুরাইয়ার সঙ্গে আমানউল্লার বিবাহ স্থির করিয়া সেই মর্মে তর্জীর নিকট প্রস্তাব এই পত্র লিখিবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠাইয়া দিয়াছেন। সত্বর তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া—ইত্যাদি ইত্যাদি।

হবীবউল্লা জানিতেন রাণীর মতলব, এনায়েতের স্কন্ধে কাওকাবকে চাপাইয়া

দিয়া, আমানউল্লার সঙ্গে নসরকন্যার বিবাহ দিবার। তাহা হইলে নসরউল্লার মৃত্যুর পর আমানের আমীর হইবার সম্ভাবনা অনেকটা বাড়িয়া যায়। হবীবউল্লা সে পথ বন্ধ করিবার জন্য আমানের স্কন্ধে সুরাইয়াকে চাপাইলেন। যে-রাজমহিষী কাওকাবের বিদেশী শিক্ষাদীক্ষার প্রশংসায় শতমুখ তিনি কোন লজ্জায় সুরাইয়াকে ঠেকাইবেন। বিশেষত যখন চিহলসতুন হইতে বাগইবালা পর্যন্ত সুবে কাবুল জানে যে সুরাইয়া কাওকাব হইতে উৎকৃষ্টা বই নিকৃষ্টা নহেন।

রাণীর মস্তকে বজ্রাঘাত। বড়ের কিস্তিতে রাজাকে মাত করিতে গিয়া তিনি যে বিপদগ্রস্ত হইলেন। হবীবউল্লাকে অভিসম্পাত দিলেন, 'নসরকন্যাকে তুই পেলিনি, আম্মো পেলুম না। তবু মন্দের ভালো, নসরউল্লার কাছে এখন ইনায়েত আমান দুইই বরাবর। ইনায়েতের অক্ষ এখন আর নসরকন্যা সীসায় পক্ষপাতে পুষ্ট হইবে না তো!—সেই মন্দের ভালো।'

এখন কি কর্তব্য। রাণী মন্ত্রণা করিলেন, এখন দ্রষ্টব্য যে হবীবউল্লা যেন এমন সময় মারা যান, যে-সময় আমানউল্লার শুভযোগ আছে—ফলিত জ্যোতিষার্থে নহে, এই অর্থে যে তখন যেন নসর, ইনায়েত কেহই রাজধানীতে না থাকেন। কিন্তু মানুষ মরে ভগবদিচ্ছায়—সে আমীরই হউক, আর ফকীরই হউক। অতএব হবীবউল্লাকে হত্যা করিতে হইবে—গুপ্তহত্যা।

রাণী হবীবউল্লার দুশমনদের ডাকিয়া পাঠাইলেন।

কিন্তু এইখানে আফগান ইতিহাসের দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হয়। সে অঙ্ক লিখিবেন—কৌটিল্য, কারণ সে অঙ্ক নির্জলা রাজনীতি, অর্থনীতি; আমি মদন-পর্যায় বাৎস্যায়নের হইয়া লিখিয়া দিলাম।

আমি শুধু ভাবি যে তর্জী এই গজকচ্ছপ যুদ্ধে কী বিমলানন্দই না উপভোগ করিয়াছিলেন। ডবল কন্যার জন্য রাতারাতি ডবল রাজপুত্র!

'দেশ', পূজাসংখ্যা, ১৩. ১০. ১৯৪৫

বেলজেন, স্টেটসম্যেন

১

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি কারাদমদমম্
শ্বেতাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃ পরম।

(পরিবর্তিত মহাভারত—বকের প্রশ্নে যুধিষ্ঠির)

২৭শে অক্টোবরের স্টেটসমেন কাগজের সম্পাদকীয় বেলজেন ও এই দেশের জেলের তুলনা করিতে গিয়া নানা কথা বলিয়াছেন। সেগুলির উত্তর 'আনন্দ-

বাজারে' প্রকাশিত হইয়াছে। বেলজেন ও ভারতীয় জেলে তুলনা করা যায় কিনা, বক্ষ্যমান প্রবন্ধে তাহাই দ্রষ্টব্য।

তৎপূর্বে দুই একটি কথা অবতরণিকা হিসাবে বলিয়া লইলে ভালো হয়। প্রথমতঃ, বেলজেন, বুখেনবাল্ট, ওরানিয়েনবুর্গ, ডাশাওয়ের সঙ্গে আমাদের চাক্ষুষ পরিচয় নাই—স্টেটসমেন সম্পাদকেরও নাই। আলিপুর, দমদমা, লাহোর, লালকেল্লা চিনিবার সৌভাগ্য আমাদের অনেকেরই হইয়াছে ও এখনও হইতেছে। স্বয়ং বিশ্বকবি, পরম খানদানি—কত যে খানদানি তাহার প্রমাণ কবির 'স্যর' উপাধি, তাঁহার পিতামহের 'প্রিন্স' উপাধি স্টেটসমেনের জাতভাইদেরই দেওয়া—চিরটা কাল কাটাইলেন পদ্মার বিশাল বক্ষে ও শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত প্রান্তরে। কিন্তু তিনি পর্যন্ত কারারুদ্ধদের প্রতি উল্লেখ করিয়া গাইলেন,

বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন ইত্যাদি

(অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার)

ইংরাজ যাহা করিতে পারেন নাই—রবীন্দ্রনাথ তাহাও করিয়াছেন। আলিপুরের জেলখানাকেও তাঁহার কাব্যে অমর করিয়া গিয়াছেন;—শুনছি নাকি বাঙলা দেশের গান হাসি সব ঠেলে / কুলুপ মেরে করছে আটক আলিপুরের জেলে।

* * *

টুটল কত বিজয় তোরণ লুটলো প্রাসাদ চূড়ো,
কত রাজার কত গারদ ধুলোয় হল গুঁড়ো
আলিপুরের জেলখানাও মিলিয়ে যাবে যবে,
তখনো এই বিশ্বদুলাল ফুলের সবুর সবে।

(পূরবী)

স্টেটসমেনের খুব সম্ভব সব এই জায়গার সঙ্গে পরিচয় নাই। যাঁহারা এই সব জায়গায় স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় গমনাগমন করেন, তাঁহাদের সঙ্গেও বোধ করি, স্টেটসমেনের কোন যোগাযোগ নাই। তিনি ফিরপোতে খান, পেলিটিতে নাচেন; সেসব জায়গায় যাবার মত অর্থ ও ইচ্ছা রাজবন্দীদের থাকার কথা নহে। আর দুর্ভাগ্যক্রমে উভয়ের যোগাযোগ যদি কখনো হয় তবুও ধরিয়া লইতে পারি যে, স্টেটসমেন তখন পরম উৎসাহে জেলের নিদারুণ কাহিনী আকণ্ঠ পান করেন না। এদিকে সরকারও জেলে যে-সব অত্যাচার অনাচার হইতেছে সেসব অভিযোগের কোন উত্তর দেন নাই—স্বয়ং 'স্টেটসমেন' ও তাঁহার 'স্টেট' অথবা

কূটবুদ্ধি দ্বারা তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। তবেই প্রশ্ন, স্টেটসমেন বিচার করিতেছেন কি প্রকারে? তাহার আভাসও তিনি দিয়াছেন; ভাবটা এই, ইংরেজের যে জাজ্বল্যমান আদর্শবাদের ইতিহাস রহিয়াছে তাহা হইতে কিছুতেই কল্পনা করা যায় না যে, ভারতের জেলগুলি বেলজেনের দ্বিতীয় সংস্করণ। ইংরাজ যে অনেক মহৎ কীর্তি করিয়াছেন সে বিষয়ে কাহারো মনে সন্দেহ নাই—অবশ্য ধর্মতঃ বলিতে গেলে সকল জাতই কিছু না কিছু মহৎ কীর্তি করিয়াছেন ও পরিমাণ নির্ভর করে প্রোপাগাণ্ডা শক্তির উপর। কিন্তু অভিযোগ উপস্থিত হইলে তো পূর্ব ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া সব কিছু হাসিয়া বা 'হিট ব্যাকের' ভয় দেখাইয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বিশেষতঃ ভারতের জেলগুলি তো ডীন ইনঙ জাতীয় ধর্মভীরু মহাজন দ্বারা চালিত হয় না—হইলে কোন্ পাষণ্ড বেলজেনের সঙ্গে দেশী জেলের তুলনা করিত?

এমন লোক যদি পাওয়া যাইত, যিনি জার্মান ও ভারতীয় উভয় জেলেরই বিকট রস আস্বাদন করিয়াছেন, তাহা হইলে মীমাংসা সহজ হইত। কিন্তু তাহা তো হইবার উপায় নাই। কারণ যে জর্মন জেলে মার খাইয়াছে সে ইংরাজের স্নেহ পায়, আর যে আলিপুর ফের্তা তাহাকে নাৎসিরা 'বৎস' বলিয়া কোল দেয়। কিন্তু সৃষ্টির কি বিচিত্র প্যাটার্ণ নির্মাণ! এই রকম একটি লোকও জন্মিয়াছেন এবং কি কৌশলে যে তিনি এই অলৌকিক সাধনাটি সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন তাহার রহস্য আমরা আজও নিরূপণ করিতে সমর্থ হই নাই।

সেই খানদানি বিশ্বকবির ঘরের ছেলে শ্রীযুক্ত সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা ভাবিতেছি। তিনি জর্মন জেলের নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন ও এদেশের জেলের আরাম যে কতবার কত বৎসর ধরিয়া উপভোগ করিয়াছেন সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। তিনি যদি স্বাস্থ্যসমেত দমদমা হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা আমাদের বহু সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন।

প্রথম প্রশ্ন: ইংরাজ সভ্যতার নিকট বহু প্রকারে 'ঋণী' অথচ 'নেমকহারাম' ভারতবাসীই কি এ তুলনা প্রথম আরম্ভ করিয়াছে? উত্তরে একখানা সুবিখ্যাত পুস্তক হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব।

"I once did my best to persuade Goering to use his influence with a view to their (i. e. concentration camps) abolition. His answer was typical. After listening to all I had to say, he got up without a word and went to

a book-case, from which he took a volume of the German Encyclopaedia. Opening it at Konzentrationslager (concentration camps) he read out "First used by the British in the South African War." He was pleased with his own retort, but the truth of the matter was that, though it was he who had originally formed the camps, when he was Minister of Police for Prussia, he had no longer anything to do with them. They were entirely under the control of Himmler."*

"আমি একবার গ্যোরিঙকে যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যেন তিনি তাঁহার প্রভাবের জোরে এইগুলি (অর্থাৎ ডাশাও ও বুখেনবাল্ডের কনসানট্রেশন ক্যাম্পগুলি) উচ্ছেদ করিয়া দেন। তিনি যে উত্তর দেন, সে তাঁহাকেই মানায়। আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা তিনি কান দিয়া শুনিলেন ও একটি মাত্র বাক্য-ব্যয় না করিয়া উঠিয়া গিয়া পুস্তকের সেলফ হইতে জর্মন বিশ্বকোষের এক খণ্ড লইয়া আসিলেন। কনসেনত্রাৎসিয়োনসলাগারের (কনসানট্রেশন ক্যাম্প) স্থানটি খুলিয়া জোরে পড়িতে লাগিলেন, "সর্বপ্রথম ইংরাজ কর্তৃক দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে ব্যবহৃত"। গ্যোরিঙ আমার মুখের উপর পাল্টা জবাব দিয়া নিজে নিজে খুশী; কিন্তু সত্য কথা এই যে, যদিও তিনিই প্রাশার পুলিস মন্ত্রী হিসাবে ঐ সব ক্যাম্পগুলি প্রথম নির্মাণ করেন, সেগুলির উপর তখন তাঁহার আর কোন হাত ছিল না। হিমলারই তখন সর্বেসর্বা।"

জর্মনীতে গ্যোরিঙই এগুলি প্রথম নির্মাণ করেন তাহা তো বুঝিলাম, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার অভিযোগের তো কোন সদুত্তর হইল না। বিশ্বাস না হয় ২য় পৃষ্ঠা খুলিয়া পড়ুন। পাঠক আশা করি, বলিবেন না যে, যে-লোকটির পুস্তক হইতে আমি উদ্ধৃত করিতেছি তিনি নিতান্ত সফরীপ্রোষ্ঠি! গ্যোরিঙের সঙ্গে কোন অধম দরহম-মহরম করিতে সক্ষম। লেখক মহামান্য সম্রাটের অতিমান্য প্রধান রাজদূত, সর্বাধিকারী (প্লেনিপটেনশিয়ারী) শ্রীযুত স্যর নেভিল হেণ্ডারসন। তিনি জর্মনীতে ১৯৩৭ হইতে ১৯৩৯এর যুদ্ধারম্ভ পর্যন্ত চেম্বারলেন সরকারের মুখ-পাত্র হিসাবে ছিলেন। ম্যুনিকে বিনা ক্লোরোফর্মে যখন চেকদের পদযুগল কপাৎ করিয়া কাটা হয় তখন তিনিই রামদাখানা আগাইয়া দিয়াছিলেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা ৭. ১১. ১৯৪৫

* Failure of a mission P. 29.

সে যাহাই হউক, আণবিক বোমার ন্যায় কনসানট্রেসন ক্যাম্প (ক-ক) নামক আপামর ত্রাসসঞ্চারক প্রতিষ্ঠানটি কে প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। আমরা শুধু সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে সব জনমান্য জর্মন বিশ্বকোষ ও গ্যোরিঙ নিজেদের কারাগারগুলিকে আফ্রিকাস্থ ইংরাজ কারা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন। এবং ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য সে-যুগে ইংরাজ-জর্মনে শত্রুতা ছিল না—হেণ্ডারসন তখন গ্যোরিঙের পরম মিত্র—তাঁহার সঙ্গে নিত্য নিত্য খানাপিনা করিতেছেন, পূর্ব প্রাশায় তাঁহার জমিদারীতে শিকার খেলিতে গিয়াছেন। এই হৃদ্যতাকে শ্লেষ করিয়াই তৎকালীন বার্লিনস্থ মার্কিন রাজদূত ডডের কন্যা মার্তা তাঁহার পুস্তকে 'জর্মনীতে আমার কয়েক বৎসর'য়ে লিখিয়াছিলেন, 'হেণ্ডারসনকে লইয়া খুব মাতামাতি হইতেছিল'—'হি ওয়জ ওয়াইণ্ড এ্যাণ্ড ডাইনড'!

দ্বিতীয় তুলনাটি একটি গল্প দিয়া আরম্ভ করি। শুলৎসে ও শ্মিটে বার্লিনের রাস্তায় দেখা। শুলৎসে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নাকি বেশ কিছুকাল ক-কতে কাটিয়ে এসেছ? নানা লোকে নানা কথা কয়; তুমি তো সবকিছু দেখেশুনে এসেছ—সত্যি খবর তুমি বলতে পারো।" শ্মিট হাসিয়া বলিল, "উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত। আমাকে দিয়েছিল একখানা সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট—ড্রইং রুম, ডাইনিং রুম, বেড রুম, ড্রেসিং রুম, বাথ। তোফা লুই ক্যাঁজ ফর্নিচার। পাঁচবেলা আহার। ব্রেক-ফাস্টে পরিজ, ভাজা সামোন, মোলায়েম সসিজ, নরম মুর্গী, গরম কটলেট—" শুলৎসে অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, "সে কি কথা? মূলারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে তো সম্পূর্ণ অন্য কথা বলল—তা শুনে তো গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়।" শ্মিট বাঁকা হাসি হাসিয়া বলিল, "বলেছিলেন নাকি? বেশ করেছিলেন। খুব করে-ছিলেন। তাই তো আবার পাকড়ে নিয়ে গেছে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে-ছিলেন।"

গল্পটি হইতে এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল যে জর্মনীর জনসাধারণ ক-ক সম্বন্ধে নানাবিধ গুজব শুনিয়া সত্য নিরূপণে উৎসুক থাকা সত্ত্বেও হিমলার কোনো বিবৃতি দেন নাই।

আমাদের জানামতে ভারত সরকারও মৌলানা আজাদের ভাষায়, 'অমানুষিক অত্যাচারে'র কোনো প্রতিবাদ করেন নাই। খবরটি স্টেটসমেনও দুসরা নবেম্বরের কাগজে বাহির করিয়াছেন। শিরোনামা দিয়েছেন—"Atrocities in Indian

Jail." Government Silence Criticized! স্টেটসমেন কি উদ্দেশ্য লইয়া খবরটি ছাপাইয়াছেন জানি না। বোধ হয় সরকার যাহাতে 'হিট ব্যাক' বা 'উল্টা চড়' মারেন সেই উদ্দেশ্যে। আমাদের পরম দুর্ভাগ্য স্টেটসমেন ইংরাজ সরকারের চোপদার নহেন—চোপাদেনেওয়ালা বটেন, ভারতীয়দের কাছে কাগজ বেচিয়া ভারতীয়দেরই—। চোপাদার না হইয়া চোপদার হইলে বহু পূর্বেই স্বরাজ আসিত।

সদাশয় সরকারকে কোনো অনুরোধ আমি কখনো করি না। কিন্তু এখন করিতেছি, "হে সরকার বাহাদুর, দমদমায় সুপারিনটেণ্ডেণ্টের নোকরীটি খালি পড়িলে স্টেটস্‌মেনকে দিয়ো। মাগগী ভাতা আমরাই বারোয়ারি করিয়া দিব।"

বেলজেনের ভিতরে কি অত্যাচার হইত ও ভারতীয় জেলে কি অত্যাচার হইতেছে তাহার আলোচনা আমরা করিব না। কারণ বেলজেন জাতীয় যে আধা ভজন ক-ক জর্মনীতে ছিল সেগুলি মিত্রশক্তি তন্ন তন্ন করিয়া, দলিলদস্তাবেজ ঘাঁটিয়া, মাটি খুঁড়িয়া, ফোটো তুলিয়া, বাইস্কোপ বানাইয়া, তেইশ লোক ঘুরাইয়া সর্বত্র বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছেন। ইংরাজরাজত্বে ভারতে এদেশবাসীরা যে দিন অক্ষরে অক্ষরে সে সুযোগ পাইবে সেই দিনই ভিতরকার তুলনা সম্ভবপর হইবে। তদুপরি আরেকটা মারাত্মক তফাৎ রহিয়াছে। ক-ক মাত্র আধ ডজন-খানেক ছিল। ভারতবর্ষে জেলের সংখ্যা কত ঠিক জানি না। বোধ হয় ছয়টির বেশীই হইবে। সেই পঙ্গপালের আনাচে-কানাচে সরকারের জানা-অজানাতে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হুঁশিয়ার খেয়াল-খুশীতে কি হইতেছে না হইতেছে তাহার হিসাবনিকাশ করিতে হইলে বিরাট সেনসাস আপিসের হাজারো ডেরা বসাইতে হবে। আর বসাইয়াই বা হইবে কি? রবীন্দ্রনাথই বলিয়াছেন—

রাজকারা বাহিরেতে নিত্যকারাগারে

জেলের বাহিরেও তো জেল। এই যে মাত্র সেই দিন কলিকাতার বুকের উপর অসংখ্য লোক না খাইয়া মরিল তাহা কোন্ বেলেজেনে কি সংখ্যায় হইয়াছে স্টেটসমেনই জানেন।

পাঠক স্বপ্নেও ভাবিবেন না, আমরা ক-কর পক্ষে সাফাই গাহিতেছি। এমন অপকর্ম করিলে যেন আমরা কোনো দিন স্বাধীনতা না পাই। যুদ্ধ লাগিবার পূর্বেও ইংলণ্ড সরকার জানিতেন ডাশাও ও ওর‍্যানয়েনবুর্গে কি হয় না হয়; পূর্বে উল্লিখিত হেণ্ডারসেন সাহেবের পুস্তকে তাহার উল্লেখ আছে। তবে যুদ্ধ না লাগা পর্যন্ত সরকার এ সমস্ত জর্মনীর নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়া কোনো উচ্চবাচ্য করেন নাই। যুদ্ধ লাগার পর সরকার ইহাদের প্রচুর নিন্দা করিয়া তাঁহাদের মতে

'প্রামাণিক' ব্লু-বুক প্রকাশ করেন। নিঃস্বার্থ সত্যের খাতিরে, না ইংরাজ জনগণের মন জর্মন বিমুখ করিবার জন্য তাহা আমাদের জানা নাই। কিন্তু ভারতবাসীরা যুদ্ধ লাগার পূর্বেও নাৎসি অনাচারের নিন্দা করিয়াছেন।

হলপ করিয়া বলিতে পারিব না, কিন্তু ভাসা ভাসা মনে পড়িতেছে স্বয়ং স্টেটসমেনও ক-কর নিন্দা করিয়া যুদ্ধ লাগার পূর্বেই লিখিয়াছিলেন। তাই জিজ্ঞাস্য, কংগ্রেসের বড় বড় নেতারা ভারতীয় জেলের নির্মম নিন্দা না করা পর্যন্ত স্টেটসমেন কয়বার জেল-তদন্ত চাহিয়াছেন। দেশের মৃদু প্রতিবাদ গুঞ্জরণ কি স্টেটসমেনের মত ভারী কাগজের পাতলা কানে কখনো পৌঁছায় নাই? আশ্চর্য!

কিন্তু এসব কথা থাক। স্টেটসমেনের কথায় বেলজেন চলে নাই, আলিপুর চলে কি না জানি না।

কিন্তু আসল তফাৎ কোথায় ও সে তফাৎ কাহার স্বপক্ষে কাহার বিপক্ষে যায় পাঠক বিবেচনা করিবেন।

(১) যুগ-পরিবর্তনকারী আন্দোলনের পুরোভাগে সব সময় শান্তশিষ্ট ভদ্র-মণ্ডলী থাকেন না—বড় বড় অভিযানেও না। ভারতে ইংরাজ রাজত্বের প্রথম প্রতিষ্ঠাতারা খানদানি ঘরের সুবোধ ছেলে ছিলেন না। ক্লাইভ হেস্টিংস ইত্যাদি সব দুঁদে দস্যি ছেলে—এ্যাডভেঞ্চারার! অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ঔপনিবেশকগণ সম্বন্ধেও নানা কথা শুনিয়াছি। ইহারা 'কিড গ্লাভস' বা মোলায়েম নিয়মে বিশ্বাস করে না।

জর্মনীর ভদ্রঘরের সুবোধ ছেলেরা যখন ফরাসী-ইংরাজ তথা লীগ অব নেশনের বিস্তর খোসামোদ করিয়া রাজ্য চালনা করিতে পারিলেন না, তখন তাহাদিগকে পদাঘাত করিয়া আসিল দুঁদেরা। তাহাদের সর্দার হিটলার, হিমলার, শ্লাইখার, র‍্যোম জাতীয় ঐতিহ্যহীন অশিক্ষিত নিষ্ঠুর, জেল নীতিতে অনভ্যস্ত শত্রুর প্রতি নৃশংস সাক্ষাৎ খাণ্ডার। তাহারা মোলায়েম নিয়মে বিশ্বাস করে না। তাহারা যে নিষ্ঠুর প্রথা অবলম্বন করিতে পারে ইংরেজের তো সে 'হক্' নাই।

ক্লাইভ ভারতীয়দের কোন্ বেকায়দায় শায়েস্তা করিতেন জানি না কিন্তু তাহার পর তো দুই শত বৎসর কাটিয়াছে। এতদিনে তো সে দুরন্তপনা চলিয়া যাইবার কথা। যদিও নেহরুজী বলিয়াছেন যে, এদেশের আই সি এস আপিসাররা অপদার্থ তবু তো স্বীকার করিতে হয় ইঁহাদের অনেকেই অতি ভদ্র ঘরের ছেলে, বেশীর ভাগই ইংলণ্ডের সর্বোত্তম বিদ্যায়তনে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন বলিয়াই জানি, নাৎসি বড়কর্তাদের ন্যায় নীচ তাড়িখানায় মাতলামি করেন না, র‍্যোম জাতীয় জঘন্য অনৈসর্গিক লিপ্সা ইঁহাদের আছে একথা কখনো শুনি নাই।

কাজেই তাঁহাদের ব্যবহারের সমালোচনা আমরা করি। তাঁহাদের হুকুমে চিমটিটি কাটা হইলে সে বেলজেনের মুষল অপেক্ষাও নিন্দনীয়।

বাঙলার লাট দুনিয়ায় নামকরা রাজনৈতিক, ভারতের বড়লাট বড় বড় লড়াই করিয়া নাম করিয়াছেন—হারাজেতার কথা সব সময় উঠে না—ইঁহাদের 'বিশ্বরূপ' আছে। ইঁহাদের আমলে জেলে ক্ষুদ্রতম অন্যায় হইলেই ইঁহাদের বিশ্বমূর্তির মৃত্তিকা নির্মিত পদযুগ বাহির হইয়া পড়িবে। আমাদের ইচ্ছা ইঁহাদের 'বিশ্বরূপ' যেন অটুট থাকে, ভারতের জেলে যেন রাজনৈতিক বন্দী না থাকে। তাঁহারা সেই মহৎ কার্যটি তো অনায়াসেই করিতে পারেন।

২। ক-কর বহু বন্দী নাৎসীদের ব্যক্তিগত শত্রু ছিল। কেহ হিটলারকে মারিবার চেষ্টা করিয়াছে, কেহ হিটলারের বন্ধু হর্সট বেজেলকে খুন করিয়াছে, কেহ রোমকে চাবকাইয়াছে, কেহ গোবেলসকে অপমান করিয়াছে। নাৎসীরা শক্তি পাইয়া যে ইহাদের হত্যা করিবে ও বহুদিন ধরিয়া জিঘাংসার আনন্দ পাইবার জন্য না মারিয়া অত্যাচার করিবে, ইহা তো বোঝা যায়, যদিও ক্ষমা করা যায় না।

কিন্তু এদেশের কোন রাজবন্দী কোন্ বড়কর্তার ব্যক্তিগত শত্রু? জেলে যাইবার পূর্বে কোন্ বন্দী কোন্ জমাদার-হাবিলদার-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-হাকিম-লাটের ব্যক্তিগত শত্রুতা করিয়াছে? বরঞ্চ উল্টো কথাই তো শুনিয়াছি। বিপদ আপদে এই সব সর্বত্যাগীদের নিকট হইতেই তো তাঁহারা সাহায্য পান—সরকারের লাল ফিতার কালা অনাচারের প্রতিবাদ করিতে হইলে তো গোপনে ইঁহাদের দ্বারস্থ হন; কৌন্সিলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করান, খবরের কাগজে দুর্নীতি নিবারণের আন্দোলন করান ইহাদেরই দ্বারা।

৩। হিমলার নিজে স্যাডিস্ট ছিলেন এবং যখন দেখিলেন যে সুস্থ জর্মন জেলার ওয়ার্ডাররা বন্দীদিগকে অমানুষিক অত্যাচার করিতে রাজী হয় না তখন তিনি সমস্ত জর্মনী হইতে বাছিয়া বাছিয়া একদল স্যাডিস্ট সংগ্রহ করেন এবং তাহারাই ক-ক-গুলিতে পাশবিক অত্যাচার করিয়া অনৈসর্গিক আনন্দ লাভ করিত।

ইংরাজ সরকার স্যাডিস্ট বাছাই করেন এ অভিযোগ কখনো শুনি নাই। গণ্ডমূর্খ বাছাই করার নীতি কোথাও কোথাও আছে শুনিয়াছি।

সর্বশেষে সর্বাধিক মারাত্মক পার্থক্যটি দেখাইবার চেষ্টা করিব।

৪। নাৎসীরা হৃদয়মন দিয়া বিশ্বাস করিত যে, তাহারা দেশের দশের তথা বিশ্বজনের 'মঙ্গলার্থে' নাৎসী আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে ও সেই 'পুণ্য প্রচেষ্টা'য় অগ্রসর হইতেছে। যাঁহারা তাহাদের বাধা দিবার চেষ্টা করেন তাঁহাদের বেশীর

ভাগই কম্যুনিস্ট। আদর্শে আদর্শে সেখানে লাগিল নিদারুণ দ্বন্দ্ব। যে জিতিল সে অন্যকে 'দেশদ্রোহী' 'সমাজদ্রোহী' ও 'বিশ্বদ্রোহী' হিসাবে চরম শাস্তি দিল।

কিন্তু ভারতে তো তাহা নহে। সদাশয় সরকার যে সৃষ্টির কোন আদিম প্রভাতে সদম্ভে বলিয়াছেন 'ভারতবর্ষে চরম আদর্শ স্বরাজ লাভ' তাহা আমাদের স্মরণ নাই। তদবধি মহামান্য সম্রাট হইতে আরম্ভ করিয়া লাট-বেলাট সকলেই সেই কথাটি বার বার বলিয়াছেন।

দমদম আলিপুরের বন্দীরাও ঐ আদর্শেই বিশ্বাস করেন। আদর্শে আদর্শে এখানে কোনো দ্বন্দ্ব নাই। তফাতের মধ্যে এই যে, সদাশয় সরকার স্বরাজ দিবার শুভ দিনটি কত হাজার বৎসর পরে কোন্ প্রলয় রাত্রির পূর্ব মুহূর্তে ছাড়িবেন তাহা বলেন নাই, বলিবার বাসনাও রাখেন না। ভাবটা এই 'সবুরে মেওয়া ফলে'। দেশসেবকেরা বলেন, "মেওয়া ফলিয়ে যে পচিবার উপক্রম করিল। দুর্ভিক্ষে পচিতেছে, অশিক্ষা-কুশিক্ষায় পচিতেছে, রোগ-মহামারিতে পচিতেছে, নৈরাশ্য-হাহাকারে পচিতেছে। আর কত অপেক্ষা করিব?"

অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে 'timing' বাঙলাতে যাহাকে বলি 'লগ্ন' সেই লইয়াই তফাৎ। এবং এই সামান্য তফাতের জন্য এত লাহোর, এত লালকেল্লা? ইংরাজরা তো খৃষ্টান। প্রভু যীশু বলিয়াছেন, 'হে ভগবান অদ্যকার রুটি অদ্যই দাও।' আরো বলিয়াছেন, 'কল্যকার ভাবনা আজ ভাবিয়ো না', অর্থাৎ অদ্যকার কর্তব্য, আজই সমাপ্ত করো। আমরা নেটিভরা সংস্কৃতে বলি 'শুভস্য শীঘ্রং', আরবীতে বলি 'অল-ইন্তিজারু আশাদ্দু মিনাল মওত' অর্থাৎ 'অপেক্ষা করা মৃত্যু-যন্ত্রণার অপেক্ষাও পীড়াদায়ক'।

সর্বজনকাম্য মঙ্গলদায়ক স্বরাজ লাভের জন্য যাঁহারা কিঞ্চিৎ 'অসহিষ্ণু' তাঁহাদের জন্য শাস্তি!

নিন্দুকে বলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এদেশে আছে উদর পূর্তির জন্য। যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলে সে তো আরো নিদারুণ। তাহার অর্থ তো এই দাঁড়াইবে যে, স্বাধীনতাকামীরা নিঃস্বার্থ ভাবে যে পুণ্য কর্ম করিতেছেন, স্বার্থান্বেষীরা তাহাতে বাধা দিতেছে। তাহা হইলে তো সেই বাধা দানের প্রতীক আলিপুর, দমদমা নির্মাণ করাই পাপ। সেখানে কি 'শাস্তি' দেওয়া হইতেছে না হইতেছে তাহার আলোচনা তো অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয়—বেলজেনের সঙ্গে তুলনা কোথায়?

হিটলার কখনো কোনো ক-ক হইতে কাহাকেও খালাস করিয়া মিত্রভরে আহ্বান করিয়া বলেন নাই 'আইস, তোমার সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া দেশের মঙ্গল

সাধন করি।' কারণ নাৎসীদের হিসাবে তাহারা দেশদ্রোহী কুষ্ঠরোগী।

আনন্দবাজার পত্রিকা ৯. ১১. ১৯৪৫

মধ্যপ্রাচ্য

মধ্যপ্রাচ্য লইয়া সদাশয় সরকার সমূহ বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। বিপদে পড়িলে মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পায় ও তখন রাগের বশে হাঙ্গামহুজ্জৎ করে ও যত্র তত্র কটুবাক্য নিক্ষেপে লিপ্ত হয়। বেভিন-ভিশিনস্কিতে যে বাক্যালাপ হইল তাহার ভাষাতে কিঞ্চিৎ বিশেষ রস-সম্পর্কের আত্মীয়তাবাচক শব্দ প্রয়োগ করিলেই মুক্ত মৎস্যহট্টে সে ভাষা জয়ধ্বনি লাভ করিবে।

সরকারের উষ্মার কারণ পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত। ১৯১৯ সনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সরকার দেখেন, তখন যুদ্ধের রক্তক্ষয়ের ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রভু জিহোভা তাহাকে ইরাণ দিয়াছিলেন, ইরাক দিয়াছিলেন, হিজাজ দিয়াছিলেন, ট্র্যান্সজর্ডান দিয়াছিলেন, প্যালেস্টাইন দিয়াছিলেন, এমন কি তাবৎ মিশরদেশ এবং সুদান দিয়াছিলেন, ইস্তেক বসফরস-দার্দানেলেজসহ তুর্কী দিয়াছিলেন। একমাত্র সিরিয়া-লেবাননে ফরাসী ঈষৎ নাসিকাগ্র প্রবেশ করাইয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে তাহা কর্তন করিতে বিশেষ অসুবিধা হইত না।

অর্থাৎ তাবৎ মধ্যপ্রাচ্য সরকারের হাতে, খানিকটা সরকারী খানিকটা বে-সরকারী ভাবে। এবং এই মধ্যপ্রাচ্যে সরকারের ফরফরদালালি খবরদারি সরদারি মৌজুদ ছিল বলিয়াই রমেলকে হারানো সম্ভবপর হইল, অতিকষ্টে সরকার মহতী বিনষ্টি হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

১৯৪৫-৪৬ অবস্থা ভিন্ন। মধ্যপ্রাচ্যে সরকারের একচ্ছত্র আধিপত্য। ফরাসী সম্পূর্ণ ঘায়েল। সে জখমী কুকুরের ন্যায় দেশের ক্ষতস্থল লেহন করিতেছে, মধ্যপ্রাচ্যের শিকার তাড়না করিবার মত উৎসাহ ও শক্তি তাহার আদপেই নাই। প্রমাণস্বরূপ এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দিনকয়েক পূর্বে সিরিয়া যখন ফরাসীকে তম্বী করিয়া বলিল 'কুইট সিরিয়া' তখন তাহাকে কর্ণমর্দন করিবার মত 'বাঘা' ক্লেমাসোঁ আর নাই, মেরা ভেদো বিদো (ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব Bidault) সকরুণ কণ্ঠে কহিলেন, "ইংরাজ সরকার সিরিয়া সম্বন্ধে যাহা কর্তব্য বিবেচনা করেন, আম্মো তাহাই করিব।" অর্থাৎ জ্ঞানদাসী ভাষায় বলিলেন, 'বধু, তোমার গরবে গরবিনী হম, ভীতুয়া তোমার ভয়ে।'

কিন্তু হায়, এই নশ্বর সংসারে অবিমিশ্র আনন্দ কোথায়? ফরাসী নাই, জর্মন নাই; তাবৎ মধ্যপ্রাচ্য সরকার পুরষ্টু পাঁঠার ন্যায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া

বেড়াইতেছেন, চণ্ডীমণ্ডপের ভয় নাই, তথাপি প্রশ্ন যদিস্যাৎ বিপদ উপস্থিত হয় তবে ত্রাণ করিবে কে। পূর্ববঙ্গে একটি প্রবাদ আছে,—

একা ঘরে বউ হয়ে খেতে বড় সুখ,
মারের বেলায় ধরবে কে, ঐ বড় দুখ।

অর্থাৎ যে বাড়ীতে শাশুড়ী নাই, ননদী নাই, জা নাই সে বাড়ীতে একা বউ নিত্য নিত্য নূতন রান্না করে, স্বামীকে খাওয়ায়, নিজে মনের সুখে খায়, কিন্তু বিপদ কিল মারার গোসাঁই যখন কাঁঠাল পাকানো আরম্ভ করেন, তখন তাহাকে ঠেকাইবার মত কেহই থাকে না। কাজেই বিচক্ষণা বউ একটি যত অপ্রিয়ই হউক না কেন বিধবা সধবা জা ননদীর সন্ধানে থাকে।

সদাশয় সরকার অধুনা সেই সন্ধানে আছেন। কারণ ইরাণ হইতে লিবিয়া পর্যন্ত সরকার যত ঘোঁৎঘোঁৎই করুন না কেন, কিল মারার গোসাঁই রাশিয়া দরজার কাছে বসিয়া কখন যে কি করিয়া বসে তাহার ঠিক নাই। তখন তাহাকে ঠেকাইবে কে? ফরাসী নাই, জর্মনী নাই, ইটালী নাই, এমন কি জাপানও নাই। অন্যকে দিয়া লড়ানোর কায়দা সরকার এত যুগ ধরিয়া রপ্ত করিয়াছেন; অন্য সবই লড়িয়া লড়িয়া প্রাণ দিয়াছে। তবে কি আখেরে সরকারকেই লড়িতে হইবে? সে যে অভূতপূর্ব অচিন্তনীয়।

তবে ভয় নাই, বোকা মার্কিন রহিয়াছে। জর্মনীকে শেষ পর্যন্ত সে-ই শায়েস্তা করিয়াছে। রুশকেও কেনই বা সে-ই শায়েস্তা করিবে না?

উপস্থিত তাহাকে প্যালেস্টাইনের ফাঁদে বাঁধা হইয়াছে।

প্যালেস্টাইনের জমিজমার উপর সদাশয় সরকারের কোন লোভ নাই একথা তাহার পরম শত্রুও স্বীকার করিবে। সেখানে তেল নাই, লোহা নাই, কয়লা নাই, কিছুই নাই যাহার উপর লোভ করা যাইতে পারে। যাহাও বা সামান্য কিছু আছে, যথা লবণ সমুদ্র হইতে উৎপাদিত রাসায়নিক দ্রব্যসামগ্রী তাহাও ইহুদীরা এমন দাম দিয়া কিনিতে প্রস্তুত যে, সুচতুর ইংরাজ কারবারী সে দাম দিতে রাজী হইবে না। কাজেই প্যালেস্টাইনে ইংরাজের স্বার্থ সেখানে সমর, নৌ ও বিমান ঘাঁটি নির্মাণ করিয়া মধ্যপ্রাচ্য হাতের কব্জায় রাখা। এবং প্যালেস্টাইনে যদি মহাপ্রলয় পর্যন্ত সরকারের থাকার বাসনা থাকে, তবে সে দেশ আরব বা ইহুদী কাহাকেও ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। অতএব সেখানে সেই সনাতন অথচ চিরনবীন পন্থা, ভাগ করিয়া রাজত্ব করো, চালাইতে হইবে। সেই দ্বি-ধা-করণ উচাটন-মন্ত্র জপিয়া জপিয়া সরকার পুনরায় প্যালেস্টাইনকে পাকিস্থান-ইহুদীস্থান রূপে দ্বি-ধা করিতে চাহিয়াছেন—১৯৩৮ সালে প্রথম এই প্রস্তাবটি করা হয়, তখন

ইহুদী আরব দুই দলই হুঙ্কার দিয়া তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করিয়াছিল। এখনও করিবে সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই নীতি ইংরাজ একা চালাইতে পারিবে না বলিয়া দোসর খুঁজিতেছিল। মূর্খ মার্কিন ধরা দিয়াছে। আমেরিকার বহু ধনপতি ইহুদী, তাহারা বস্তা বস্তা ইহুদী প্যালেস্টাইনে চালান করিতে বসে—এদিকে সদাশয় সরকার আরবকে কথা দিয়াছিলেন যে, আর ইহুদী আমদানী করা হইবে না। কাজেই সরকার মার্কিন ইহুদী ধনপতিদিগকে বলিলেন, ১৫০০ ইহুদী প্রতি মাসে প্যালেস্টাইন চালান করিতে দিব কিন্তু আরব আপত্তি করিলে—এবং আরব অতি অবশ্য করিবে—সে ঠেলা তোমাদিগকে সামলাইতে হইবে। ইহুদী ধনপতি তৎক্ষণাৎ রাজী হইল—যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ায় তাহার বিস্তর টমিগান, মেসিনগান বেকার পড়িয়া আছে। সেই সব মাল গোপনে ও ইহুদী মাল প্রকাশ্যে প্যালেস্টাইনে চালান করিতেছে—আরবের নাকের ডগার উপর দিয়া। আরব আপত্তি করিলে ইহুদীরা ঐ সব বন্দুক কামান দিয়া আরবকে নির্বংশ করিবে।

সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকান ইংরেজের সঙ্গে যুগ্ম কৌন্সিলে বসিয়া ইহুদীদিগের সুরাহার তদারকী করিতেছে। মার্কিন ইহুদী খুশী, এখতেয়ার চালাইতে পারিয়া—ইংরাজ খুশী মার্কিনকে অক্টোপাশের পাশে জড়াইতে পারিয়া।

এতদিন মার্কিন ইংরেজের হইয়া লড়িত এখন ইংরেজের হইয়া নোংরা পলিটিক্সও করিবে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতীক মার্কিন কুসংসর্গে পড়িয়া নিরীহ আরবকে ধর্ষণ করিবে। মূর্খের ইহাই পরম গতি।

এই বিশাল ভূখণ্ডের অধিকাংশ এককালে তুর্কীর সুলতানের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ১৯১৮-এর যুদ্ধের পর সুলতানের প্রায় সকল ক্ষমতা যায়—ক্রুসেডের আমল হইতে খৃষ্টশক্তিবর্গ সুলতানকে হৃতবল ও হৃতসর্বস্ব করিবার যে প্রচেষ্টা চালাইয়াছিল, তাহা ১৯১৮-এ সফল হয়। সুলতানের তখন এমন অবস্থা যে খাস তুর্কীতেও তাঁহার স্বাধীনতা লোপ পাইয়াছে।

তা পাউক। কিন্তু যে সব ভূখণ্ড সুলতানের হাতছাড়া হইল সেগুলি স্বরাজ পাইল না। ইংরাজ ও ফরাসীতে মিলিয়া আরবদিগকে এমনি নির্মম শোষণ করিতে লাগিল যে, তাহাদিগের মোহমুক্ত হইতে বেশী দিন লাগিল না। সুলতানের কড়াইসিদ্ধ হইতে লাফ দিয়া বাঁচিতে গিয়া আরব যে ইংরাজ-ফরাসীর নগ্ন অগ্নিতে পড়িয়াছে, সে কথা বুঝিতে পারিল।

তখন সর্বত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মিশরের প্রাতঃস্মরণীয়—সর্ব-স্বাধীনতাকামীর প্রাতঃসন্ধ্যাস্মরণীয়—সা'দ জগলুল পাশা তখন মিশরের জন্য যে

সংগ্রাম করিলেন, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

প্যালেস্টাইনে মহামুফতী সেই প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হইলেন; আজ তিনি গৃহহারা দেশত্যাগী।

নজদের ইবনে সাউদ মক্কা হইতে ইংরাজের ক্রীড়নক শেরিফকে তাড়াইয়া পূর্ণ হিজাজের স্বাধীনতা অর্জন করিলেন। ইবনে সাউদ আজ পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান। শুধু শক্তিমান নহেন, ন্যায় ও ধর্মাচরণে দেশের দশের মঙ্গল সাধন কর্মে তিনি লিপ্ত।

এই সব বিভিন্ন ভূখণ্ডের আরবের ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে না। প্যালেস্টাইনের আরব এই কথা বলে না যে, সে সিরিয়ার আরব হইতে ভিন্ন। এবং একথাও বুঝিয়াছে যে ইরাক, মিশর, সিরিয়া যদি পৃথক পৃথক ভাবে স্বাধীনতা অর্জনে লিপ্ত হয় তবে ইংরাজ-ফরাসী সেই সনাতন 'দ্বি-ধা করিয়া পরাধীন রাখো' বা 'ডিভাইড এণ্ড রুল' নীতি বলবৎ রাখিবে। এ কথা, এ নীতি সর্বাপেক্ষা অধিক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন ইবনে সাউদ।

সমস্ত আরবকে কি করিয়া এক পতাকার নীচে সম্মিলিত করিয়া খ্রীষ্ট-শোষক-নীতি নির্মূল করা যায় তাহার সাধনা ইবনে সাউদ গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া করিয়াছেন।

হয়ত আজ সে সুদিন আসিয়াছে।

খবর আসিয়াছে, ইবনে সাউদ মিশরের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রামানলে মধ্যপ্রাচ্য শীঘ্রই উদ্দীপ্ত হইবে, তাহাতে প্রধান কর্মকর্তা হইবেন ইবনে সাউদ। মিশর হিজাজ-নজদ অপেক্ষা অনেক 'সভ্য' অর্থাৎ ইয়োরোপীয় কায়দাকানুনে পরিপক্ক তাই হিজাজ-নজদের আরবের ধমনীতে যে উষ্ণ স্বাধীন রক্ত প্রবাহিত তাহার সঙ্গে মিশরী রক্তের তুলনা হয় না। তাই হিজাজী আরব সংগ্রামের পুরোভাগে থাকিবে।

মধ্যপ্রাচ্যে সম্মিলিত আরবশক্তি যখন সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে সংগ্রাম ঘোষণা করিবে তখন যেন ভারতবর্ষও তাহার সুবর্ণ সুযোগ না হারায়।

আনন্দবাজার পত্রিকা

২৩. ২. ১৯৪৬

মিশর

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতি কি দুর্দান্ত হৃদয়হীনরূপে প্রকাশ পাইতে পারে, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মিশর দেশ। সে সাম্রাজ্যনীতি ইংলণ্ডে কে রাজত্ব করিতেছে তাহার

উপর বিন্দুমাত্র নির্ভর করে না ; শ্রমিক দলই হউন আর রক্ষণশীল দলই হউন মিশর সম্বন্ধে কূটনীতি কখনও পরিবর্তিত হয় না। সে নীতি দ্বি-ধা করিয়া সিধা রাখো নহে, কারণ সাম্রাজ্যবাদের পরম দুর্ভাগ্যবশতঃ মিশরে দ্বিখণ্ডিত করিবার মত দুই বর্ণ, ধর্ম বা সম্প্রদায় নাই। মিশরের প্রাচীনতম অধিবাসীরা 'কপ্ট'। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা ধর্ম পরিবর্তন করিয়া করিয়া সর্বশেষে খৃষ্টান হয় এবং আরব অভিযানের পর ইহাদের অধিকাংশ মুসলমান হইয়া যায়। মুষ্টিমেয় যে কতিপয় খৃষ্টান 'কপ্ট' এখন মিশরে আছে, তাহাদিগকে সাম্প্রদায়িক আরক খাওয়াইয়া উন্মত্ত করিবার চেষ্টা যে কখনো করা হয় নাই এমন নহে, কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয় সা'দ জগলুল পাশার বদান্যতা সাম্রাজ্যনীতির ক্ষুদ্র প্রলোভনকে পরাজিত করে ও 'কপ্ট'রা অল্পদিনের মধ্যেই সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় যে, তাহাদের চরমস্বার্থ কাহার উপরে নির্ভর করিলে সুরক্ষিত হইবার সম্ভাবনা বেশী। ইদানীং মিশরে যে ব্যাপক আন্দোলন হইতেছে, তাহাতে 'কপ্ট'রা হয় যোগদান করে, না হয় এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া সহানুভূতির সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে ; কিন্তু কোন অবস্থাতেই তৃতীয়পক্ষের সঙ্গে যোগদান করিয়া ইহকাল পরকাল বিনষ্ট করিতে সম্মত হয় না। মিশরের অন্যতম প্রধান নেতা, অর্থনীতিতে তাবত মিশরীয়দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণ মুকরিম পাশা আবিদ খৃষ্টান 'কপ্ট'। ব্যক্তিগত কারণে ওয়াফদ দলের নেতা মুস্তফা নহ্‌হাজ পাশার সঙ্গে তাঁহার কখনো কখনো মনোমালিন্য হইয়াছে ও তিনি ওয়াফদ-বিরুদ্ধ মন্ত্রিসভায় অংশগ্রহণ করিয়াছেনও বটে, কিন্তু দেশের অনিষ্টকারী কোন দলের সঙ্গে যোগদান করিয়া তিনি কখনো স্বধর্মাবলম্বীদিগের জন্য অন্যায় পারিতোষিক গ্রহণ করেন নাই।

মিশর সম্বন্ধে তাই সরকারের চিরন্তন নীতি—যত কম পারো দাও, যতদিন পারো ঠেকাইয়া রাখো। দ্বিতীয়তঃ, দেশ চুপচাপ থাকিলে কোন নূতন সন্ধি-শর্তের আলোচনা আদপেই করিবে না, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হিংস্র, অহিংস কোন আন্দোলন হইলেই বলিবে,—আমাদিগকে ভয় দেখাইয়া কিছুই হইবে না, প্রথম আন্দোলন থামাও, তারপর সন্ধি-শর্ত লইয়া আলোচনা হইবে। গত সপ্তাহে মিশরে যে হানাহানি হইয়া গেল, তাহার উত্তরে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ বলিয়াছেন, উই শাল্ট বি ইন্টিমিডেটেড। এ নীতি কিছু নবীন নহে। আমরাও বলি, বর্ষাকালে ছাত মেরামত করিবার উপায় নাই, কারণ বৃষ্টিপাত হইতেছে, শীতকালে করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ বৃষ্টি কোথায় ?

কিন্তু মিশরীরা আমাদের মত সহিষ্ণু নহে। ১৯১৯ সাল হইতে ব্যাপক আন্দোলনের ফলে তাহারা সম্পূর্ণ পরাধীনতা হইতে ১৯৩৯ সালে আভ্যন্তরীণ বহু

সুযোগ সুবিধা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

সম্পূর্ণ স্বাধীনতা মিশর কখনও পায় নাই ও আমাদের বিশ্বাস ভারতবর্ষ স্বরাজ না পাওয়া পর্যন্ত ইংরেজ অধ্যুষিত কোন অঞ্চলই সম্পূর্ণ স্বরাজ পাইবে না।

মিশরের সম্পূর্ণ স্বরাজ পাওয়ার পথে অন্তরায় মিশরস্থিত ইংরাজবাহিনী। শুদ্ধ মিশরী বাহিনী একটি আছে বটে ও একদিন তাহাদের শোভাযাত্রা দেখিবার সুযোগও আমার হইয়াছিল। বন্দুক কামান দেখিয়া এক নাগরিককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এগুলি কি নেপোলিয়ন এদেশে ফেলিয়া গিয়াছিলেন?" উত্তরে নাগরিক করুণ কণ্ঠে বলিল, "সে সৌভাগ্য কোথায়? এগুলি ১৯১৮-এর যুদ্ধের বরবাদ জঞ্জাল। ইংরাজের কাছ হইতে হীরার মূল্যে কেনা। এগুলি কখনো কোন কাজে লাগিবে না। কিন্তু বন্দুক-কামান ছাড়া সৈন্যবাহিনী নিতান্ত হয় না বলিয়াই ক্রয় করা হইয়াছে।"

১৯১৯ হইতে ১৯৩৯ পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মিশরস্থ ব্রিটিশ বাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া মিশরের রাজনৈতিক আন্দোলন পর্যবেক্ষণ করিয়াছে। ওয়াফদ দল যখনই ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া পূর্ণ স্বরাজের পথে দেশকে অগ্রগামী করিতে চেষ্টা করিয়াছে তখনই রাজার উপর চাপ পড়িয়াছে ওয়াফদকে বিতাড়িত করিবার। সে চাপ উপেক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই কারণ তাঁহার সেনাসামন্ত কোথায়? অত্যধিক দৃঢ়গ্রীব হইলে সিংহাসনচ্যুত হইতে কতক্ষণ? সাম্রাজ্যবাদের দুর্বিষহ তাড়নার ফলে রাজা পুনঃপুনঃ দেশের জনমত পদদলিত করিয়া ওয়াফদ দলকে বিতাড়িত করিয়া কখনো ইসমাইল স্বিদকীপাশাকে 'চোটা মুসোলিনী'—তখনো হিটলার সর্বাধিকারী হন নাই—রূপে দেশ শাসন করিতে দিয়াছেন; কখনও ইয়াহ্ইয়া পাশার মত নপুংসককে প্রধান মন্ত্রী করিয়া দেখিয়াছেন, দিনের পর দিন মন্ত্রণা সভায় তিনি ওয়াফদ কর্তৃক কিরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছেন। সেণ্ট্রাল এসেম্বলির উভয়কর্ণকর্তিত নির্লজ্জতা শুধু এদেশে নহে, মিশরে ও অন্য সর্বপরাধীন দেশে দুর্গন্ধ সাম্রাজ্যবাদ-বাতে স্ফীত বেলুনের ন্যায় উড্ডীয়মান হয়। দেশের লোক তাজ্জব মানিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া নানাবর্ণের সেই বেলুনের খেলা দেখে; জানে, সূত্র কাহার হস্তে এবং ইহাও জানে, সাম্রাজ্যবাদের পত্তন হইলে পর এগুলিকে নষ্ট করিবার জন্য সূচ্যগ্রই যথেষ্ট।

কিন্তু পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি—মিশরীরা অসহিষ্ণু। কোন মহাপ্রলয়ের পূর্ব মুহূর্তে স্বরাজ সপ্রকাশ হইবেন, সে আশায় বসিয়া থাকিতে জানে না। কাজেই যখনই কোনো নপুংসক বা চোটা মুসোলিনী জনমত উপেক্ষা করিয়া রাজ্যচালনা করিবার চেষ্টা করিয়াছে তখনই তাহারা ব্যাপক আন্দোলন চালাইয়াছে; গত

সপ্তাহে যাহা করিয়াছে তাহা যে কতবার করা হইয়াছে তাহার হিসাব রাখিতেও মিশরীরা ভুলিয়া গিয়াছে।

১৯৩৯ পর্যন্ত এই লীলা চলিয়াছিল। যুদ্ধ লাগার অল্প কিছুদিন পরেই ব্রিটিশ দেখিল যে, মিশরকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত না করিলে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব। ওয়াফদ-দল ইংরেজকে সেই সঙ্কটের সময় সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিল বটে, কিন্তু দেশের সর্বস্ব বিনাশ করিয়া নহে। কে জানে, বাঙলাদেশের দুর্ভিক্ষের ন্যায় সেখানে কোনো অঘটন ঘটনের প্রয়াস চলিতেছিল কি না—কারণ, জাপানের ইম্ফল আগমন ও রমেলের অল-অলামেন গমন তো একই রোগ—বৈদ্যরাজ যখন একই তখন ঔষধও একই হইবে না কেন? সে যাহাই হউক, ওরাফদ সরিয়া দাঁড়াইল, আকাশে দেখা দিলেন দুর্গন্ধবাতপূর্ণ বেলুন, আলী মেহের পাশাই প্রধানমন্ত্রীরূপে। তৃতীয়বার বলি, মিশরী অসহিষ্ণু। আততায়ীর হস্তে আলী মেহের প্রাণ হারাইলেন। তখন আসিলেন নুক্রাশী পাশা। ইতিমধ্যে যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। মিশরীরা দেখিল, বহু কষ্টে, বহু রক্তপাতে অর্জিত তাহাদের আভ্যন্তরীণ আংশিক স্বাধীনতা যুদ্ধের হট্টগোলের ভিতরে হারাইয়া ফেলিয়াছে। সন ১৯১৯-এ ফিরিয়া আসিয়াছে। অর্থাৎ সমস্ত রাত প্রাণপণ নৌকা বাহিয়া সূর্যোদয়ের সময় দেখে—নৌকা বাড়ির ঘাটে।

চতুর্দিকে কচুরীপানা। মিশরী মরীয়া হইয়া সেই পানা কাটিতে উদ্যত। পানা বলে—মধ্যপ্রাচ্যের জল শীতল রাখিবার জন্য বিশ্ব শান্তির জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে আমরা আছি। মিশরীরা বলে তাহা হইলে সুয়েজখালের ঐ পারে প্যালেস্টাইনে গিয়া থাকিলেই পারো।

ইহার সদুত্তর অসদুত্তর সরকার কিছুই দেন নাই।

আনন্দবাজার পত্রিকা ১. ৩. ১৯৪৬

যবনিকান্তরালে

ফরাসী বইয়ের দোকান থেকে যে কেতাবখানা কিনেছিলাম, তার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব এ রকম একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম সে কথাটা মনে পড়েছে। কারবারে আদালতে হরবকতই ওয়াদা-খেলাফ করা হয়, আইন-আদালত ব্যবসায়ী-কারবারি তার জন্য প্রস্তুতও থাকেন কিন্তু খোস গল্পের বাজারে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মানে মকমল ডিক্রী কবুল করে নেওয়া। কিন্তি রদবদলের কথা তুললেই সবাই চেঁচিয়ে বলে, 'দেউলে হওয়ার নোটিশ দাও, বুরুজ হয়ে গেছ মেনে নাও।'

করি কি? কারণ কেতাবখানা ভালো না। অর্থাৎ আমার মতের সঙ্গে

কেতাবখানা সায় দেয়নি। নিরপেক্ষ পাঠক হুঙ্কার ছেড়ে বলবেন, 'অবাক করলে। তোমার মতের সঙ্গে কেতাবখানার মত মিলল না বলেই কেতাবখানা খারাপ। এ তো বড় তাজ্জবকী বাৎ।'

নিবেদন করছি। আমি আপনারই মত ভারতীয়। সন ২৯-এ যখন জর্মনি যাই তখন হিটলার জর্মনিতে কল্কি, কিন্তু পেয়েছেন বটে বসবার জন্য ইঁট পাননি। ১৯৩৮-এ যখন শেষ বারের মত জর্মনি ছাড়ি তখন স্বয়ং চেম্বরলিন জর্মনিতে উড়োউড়ি করছেন হিটলারের মন পাবার জন্য। কাজেই হিটলার সম্বন্ধে আমার দু'চারটে তথ্য জানার কথা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আপনি হয়ত আরো বলবেন, 'ফরাসী গ্রন্থকার তোমার চেয়েও ঢের বেশী জানে।'

কবুল। কিন্তু হিটলার বাবদে ফরাসী গ্রন্থকারের চেয়ে আপনার আমার মত ভারতীয়ের নিরপেক্ষ থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশী। কারণ ফ্রান্স আমাদের জানের দুশমন নয়, জর্মনি আমাদের দিলের দোস্তও নয়। ফ্রান্স জর্মনি দুইই আমাদের কাছে বরাবর—এবং এ সম্বন্ধে এণ্টনি ফিরিঙ্গি যে মোক্ষম তর্জাখানা ঝেড়েছেন সেটি অশ্লীল বটে, কিন্তু এমন তাগসই আপ্তবাক্য আর কেউ কখনো শোনাতে পারেননি!

থাক সে কথা।

কেতাবখানার নাম 'লে সেক্রে দ্য লা গের'। (Les Secrets de laguerre) অর্থাৎ যুদ্ধের খবর। গোপন গ্রন্থকারের নাম রেমো কার্তিয়ে। সায়েব বিস্তর কাঠ খড় পুড়িয়ে, ন্যুরনবের্গ মোকদ্দমার দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে এ-কেতাবখানা তৈরী করেছেন। বইখানার ষাটের সংস্করণ আমার হাতে পড়েছে। ছাপা ১৯৪৬ সনে। তাই বিবেচনা করি আরো অনেক সংস্করণ ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে। গ্রন্থকার আরো বিস্তরে বিস্তর কেতাব পয়দা করেছেন। তার মধ্যে নাম করা চার্চিল, রুজোভেল্ট এবং পিটার দি গ্রেটের জীবনী।

তাহলে কোন সাহসে এ গুণীর সঙ্গে কাজিয়া করি? তবে সায়েবদের প্রবাদেই রয়েছে "Fools rushing where angels fear to tread" অর্থাৎ "বামুন যেথা ঢুকতে নারে, চাঁড়াল সেথা লম্ফ মারে।" ষাট হাজারী বাজারে গুণীজন ঢুকতে ভয় পেতে পারেন, আমার কি পরোয়া!

মসিয়ো কার্তিয়ের সঙ্গে আমার প্রথম এবং প্রধান ঝগড়া যে তিনি কোনো জায়গায় রুশের কথা তোলেননি। মসিয়ো গোটা লড়াইটার দোষ একমাত্র হিটলারের কাঁধেই চাপাতে চান। রুশ শেষ মুহূর্তে যদি জর্মনির সঙ্গে সন্ধি না করত তবে যে হিটলার কস্মিনকালেও পোলাণ্ড আক্রমণ করবার হিম্মৎ যোগাড়

করতে পারতেন না সে কথাটা কার্তিয়ে সায়েব কর্তন করে গিয়েছেন। হয়ত উত্তরে মসিয়ো বলবেন, রুশ এ-যুদ্ধের জন্য কতটা দায়ী সে কথাটা যে সব দলিল-দস্তাবেজে স্বপ্রমাণ হয়, সেগুলো ন্যুরনবের্গে পেশ করা হয়নি।

কথাটা ঠিক। গোড়ায় গলদ এখানটায়ই যেহেতুক রুশ (এবং মিত্র পক্ষ) ফরিয়াদি তাই রুশের বিরুদ্ধে যে সব দলিল-দস্তাবেজ অকাট্য সাক্ষ্য দেবে সেগুলো চেপে রাখা হয়েছে। তাই যদি হয় তবে হিটলার তথা জর্মনপক্ষের পুরা তসবির ফুটবে কি প্রকারে?

কিন্তু এ গোড়ার গলদের গোড়ায়ও আরেকটা গলদ রয়েছে। সেটাও ন্যুরনবের্গ এবং কাজে কাজেই মসিয়োর চেপে গেছেন। হিটলারের সঙ্গে রুশের মিতালি হওয়ার পূর্বে এই হিটলার এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গকে লাই দিয়ে আসমানে চড়াল কে?

ইংরেজ। ১৯৩০-৩২-এ জর্মনির প্রধান মন্ত্রী ক্র্যানিঙ যখন ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করে জীনীভা-লণ্ডনে মাকু চালাচ্ছিলেন, তখন ইংরেজ হাত গুটিয়ে বসে ছিল। ক্র্যানিঙ কান্নাকাটি করে ইংরেজকে বহুবার বলেছিলেন, "জর্মনির এ-দুর্দিনে যদি তোমরা দু'মুঠো ময়দা দিয়ে সাহায্য না করো, তবে আমাদের সোস্যালিস্ট সরকার টিকতে পারবে না। ফলে হিটলার আর তাঁর কট্টর ন্যাশনালিস্ট দলের হাতে গোটা দেশটা চলে যাবে। আর তারা যে শান্তি চায় না, চায় যুদ্ধ, সে কথা তারা লুকিয়ে রাখেনি, তোমরাও বিলক্ষণ জানো। বিশ্বশান্তি যদি চাও, তবে উপস্থিত জর্মনকে বাঁচানোই তোমাদের প্রধান কর্তব্য।"

ইংরেজ তখন কানে তুলো দিয়ে বসে ছিল। তার কারণ, ইংরেজ তখন মনে মনে অন্য প্যাঁচ কষচে। ইংরেজের সে প্যাঁচের পিছনে যুক্তি ছিল এই—ক্র্যানিঙের সমাজতন্ত্রী দলকে দানাপানি দিয়ে তাগড়া করে কোনো লাভ নেই। ইংরেজ রুশে যদি কোনো দিন লড়াই লাগে তবে সমাজতন্ত্রী জর্মনি পত্রপাঠ রুশের সঙ্গে যোগ দেবে। অথচ ইংরেজের প্রধান উদ্দেশ্য রুশকে বিনাশ করা। তাই ইংরেজের উচিত ক্র্যানিঙ আর সমাজতন্ত্রী দলকে গদি থেকে সরিয়ে এমন এক খাণ্ডারকে বসানো, যে ব্যক্তি রুশের নাম শুনলেই মারমুখো হয়ে ওঠে। 'মাইন কাম্পফে' হিটলার অন্ততঃ সাতান্ন বার বলেছে, মোকা পেলে সে রুশকে তুলোধুনো করে ছাড়বে। অতএব 'হাইল হিটলার' আর ক্র্যানিঙকো কান পকড়কে নিকাল দো।

এই যুক্তির জোরেই ইংরেজ জর্মনিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে দিল না। হিটলার শক্তি পেলেন। জর্মনি কট্টর ন্যাশনালিস্ট এবং রুশদ্রোহী হয়ে উঠল। ইংরেজ ড্যাম গ্ল্যাড।

তারপর ইংরেজ হিটলারকে দানাপানি দিতে আরম্ভ করল। হিটলার যখন রাইনল্যাণ্ডে সৈন্য পাঠালেন তখন হুকুম দিয়েছিলেন যে যদি ইংরেজ বা ফরাসী তখন সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করে, তবে পিছু হটে বার্লিনে ফিরে আসবে—কারণ জর্মন বাহিনী তখনো যথেষ্ট তাগড়া হবার সুযোগ পায়নি। হিটলারের জেনারেলরা একবাক্যে বলেছিলেন, ইংরেজ ফরাসী যুদ্ধ ঘোষণা করবেই করবে। হিটলার বলেছিলেন, 'করবে না' কারণ তিনি বিলক্ষণ জানতেন ইংরেজের দুষ্ট মতলব জর্মনি যা চায় তাকে তাই দেওয়া যাতে করে গাট্টাগোট্টা হয়ে একদিন রুশের মোকাবেলা করতে পারে।

এ ব্যাপারটার ইঙ্গিত ন্যুরনবের্গের দলিল-দস্তাবেজ থেকে পাওয়া গিয়েছে। মসিয়ো কার্তিয়ে সেটা চেপে যাননি।

এই হল পটভূমি।

দৈনিক বসুমতী

হিটলার মাহাত্ম্য

মসিয়ো কার্তিয়ের কেতাব 'লে সেক্রে দ্য লা গের' (Le Secrets de la Guerre)-এর সঙ্গে আপনাদের খানিকটে পরিচয় গেল 'যবনিকান্তরালে' হয়ে গিয়েছে। সময় থাকলে তার কেতাবখানা অনুবাদ করে আপনাদের শুনিয়ে দিতুম—উপস্থিত তার থেকে মূল তথ্যগুলো নেওয়া যাক।

একটা বিষয়ে মসিয়োর প্রশংসা না করে থাকা যায় না। ইভা ব্রাউনের সঙ্গে হিটলারের কি সম্পর্ক ছিল তা নিয়ে তিনি কেলেঙ্কারি কেচ্ছা তো রচনা করেনই নি, বরং ব্যাপারটা অনেকখানি সহানুভূতি দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছেন। মসিয়োর মতে হিটলার যদিও আহার-পানাদি ব্যাপারে সংযমী ছিলেন, তবু একথা বললে ভুল হবে যে, হিটলার স্ত্রীজাতিকে ঘৃণার চোখে দেখতেন অথবা স্ত্রী সংসর্গ তিনি আদপেই পছন্দ করতেন না। হিটলারের চরিত্র সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন গ্যোরিঙ, কাইটেল, য়োড্‌ল্‌, র‍্যাডার, জ্যোনিৎস, জেনারেল ব্লমবের্গ, এন ব্রাউ-খটিশ, ফন বণ্টস্টেট, হালডের, মিলচ, পাউলুস, ফন্‌ ফাল্কেনহর্স্ট, ইত্যাদি বড় বড় জাঁদরেলরা। এঁদের সবাই যে হিটলারের ইয়ার-বক্সীর দলে ছিলেন তাও নয়। এঁদের মত নিলে দেখা যায়, হিটলারের নারীলিপ্সা আর পাঁচজনের মতই ছিল; কিন্তু দেশের কাজ নিয়ে অহরহ তাঁর মন এমনি মগ্ন থাকত যে, তাঁর যৌন ক্ষুধা কখনো তার সম্পূর্ণ বিকাশ পায়নি।

এখানে মসিয়ো ঠিক তত্ত্বটা ধরতে পেরেছেন। হিটলার জর্মন জাতি, তার

ঐতিহ্য এবং ভবিষ্যৎ সফলতাকে এত ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন যে, অন্য কোনো জিনিস তাঁর মনের ভিতর ঠাঁই পেত না। আর পাঁচজন সঙ্গীসাথীর জন্য হিটলার অনেক সুখ-সুবিধা করে দিয়েছিলেন ; কিন্তু নিজের জন্য তিনি কিছুই করেননি। এমন কি বেরেস্টেঘগার্ডেনে তিনি যে প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন তাতে তাঁর নিজের জন্য কামরা আসবাবপত্র ছিল কমই। তিনি তাঁর সহকর্মীদের জন্য সেখানে উত্তম বন্দোবস্ত করে রাখতেন ; এমন কি যাঁরা কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরুন স্ত্রী পরিবারের কাছে যাবার সুবিধে পেতেন না তাঁদের পরিবারকে বেরেস্টেঘগার্ডেনে আনিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করে দিতেন। হিটলারের সহচরেরা বলেন কিন্তু বেরেস্টেঘগার্ডেনের জীবনযাত্রার সঙ্গে ইভা ব্রাউনের প্রায় কোনো যোগাযোগই [illegible] না। তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতেই ভালবাসতেন ও অতি দৈবাৎ কেউ তাঁকে দেখতে পেত।

ইভা ব্রাউন সুন্দরী ছিলেন এবং হিটলারকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। মসিয়ো এ সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করেননি ; এবং না করে আমার মতে ভালোই করেছেন। ইভা ব্রাউনের জীবনকাহিনী আমি অন্যত্র পড়েছি এবং তাঁর প্রেমের কাহিনী পড়ে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করেছি। হিটলারকে তিনি তেমন করে পাননি, আর পাঁচটি মাটির গড়া তরুণী তাদের বল্লভকে যে রকমধারা পায়। এই না-পাওয়ার দুঃখ ইভা ব্রাউনকে শেষদিন পর্যন্ত কাতর করে রেখেছিল। অসাধারণ মানুষকে ভালোবাসতে পাবার দুঃসহ সৌভাগ্য ইভা ব্রাউন বুঝতে পেরেও কোনোদিন মেনে নিতে পারেননি।

মসিয়ো কিন্তু আরেকটি খাঁটি তত্ত্বকথা আবিষ্কার করেছেন।

হিটলার যখন রাইনল্যাণ্ডে সৈন্য পাঠান তখন তাঁর জেনারেলরা তারস্বরে প্রতিবাদ করেছিলেন, তিনি যখন পর পর অস্ট্রিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করেন তখনো তাঁরা আপত্তি করে বলেছিলেন ইংরেজ ফরাসী তাহলে জর্মনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে, হিটলার বলেছিলেন করবে না। তাই যখন হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করবার জন্য জেনারেলদের প্রস্তুত হতে আদেশ দিলেন তখন তাঁরা আর অতটা তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করেননি, ইংরেজ ফরাসী যুদ্ধ ঘোষণা করল বটে ; কিন্তু হিটলারের ব্লিৎসক্রীগ বা বিদ্যুৎগতিতে যুদ্ধ এমনি অল্প সময়ের মধ্যে এতটা সফল দিল যে, জেনারেলরা হতভম্ব হয়ে হিটলারের কাছে নাকে খৎ দিলেন।

এবং শুধু তাই নয়। ন্যুরনবের্গের দলিলপত্র থেকে মসিয়ো সপ্রমাণ করেছেন যে, পোলাণ্ড অভিযানের সমস্ত প্ল্যান করেছিলেন স্বয়ং হিটলার। হিটলার আপন

জেনারেলদের সঙ্গে যুদ্ধ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন সত্য; কিন্তু গোটা যুদ্ধটা কি ভাবে চালাতে হবে, কখন চালাতে হবে, কতটা ডিভিশন লাগাতে হবে, সেনাদলের কোন্ ভাগ কোন্ গতিতে কোন্ দিকে অগ্রসর হবে, এ সমস্ত ব্যাপার হিটলার একা বসে বসে রাতের পর রাত খেটে খেটে তৈরী করতেন।

অথচ আশ্চর্য, হিটলার কোনো দিন কোনো মিলিটারি স্কুলে যুদ্ধবিদ্যা শেখেননি। কাউকে গুরু বলে তিনি তো স্বীকার করেনইনি, এমন কি ঝুনো জাঁদরেলদের উপদেশও তিনি অবজ্ঞা করে যেতেন।

হিটলার গুরু বেছে নিয়েছিলেন রণবিদ্যার পূর্বাচার্যগণদের ভিতর থেকে। কাইটেল বলেন, হিটলার রণবিদ্যা শিখেছেন শ্লিফেন, মল্‌টকে এবং ক্লাউজেবিৎসের কাছ থেকে। পৃথিবীর যত বড় বড় যুদ্ধাভিযান হয়ে গিয়েছে, হিটলার সব কটা অধ্যয়ন করেছিলেন বহু বিনিদ্র যামিনী যাপন করে। বিশেষ করে ফ্রেডরিক দি গ্রেটের প্রত্যেকটি অভিযানের সঙ্গে তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

ফ্রান্সকে হারিয়েছেন একা হিটলার,—বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, গ্রীস জয় করেছেন একা হিটলার। মস্কো, স্তালিনগ্রাদ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন একা হিটলার।

এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে হিটলার-বৈরী মসিয়ো কার্তিয়ে বার বার বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এবং হিটলারের সামনে মাথা নিচু করেছেন। যুদ্ধ চালনায় অনভিজ্ঞ, মিলিটারি একাডেমির সঙ্গে সম্পর্কহীন এই অর্বাচীন কি অলৌকিক ক্ষমতাবলে এই সব বিরাট অভিযানের পরিকল্পনা সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তুলতে সক্ষম হল? কি করে বুঝতে পারল যে, ট্যাঙ্ক এবং এরোপ্লেন দিয়ে এমন এক অভূতপূর্ব গতিবেগ প্রবর্তন করা যায়, যার সামনে ফ্রান্স ইংলণ্ডের পূর্বার্জিত সর্ব অভিজ্ঞতা নিষ্ফল, সর্ব কলাকৌশল 'বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে'?

শেষ পর্যন্ত হিটলার পরাজিত হলেন। কেন পরাজিত হলেন তার অনুসন্ধান মসিয়ো কার্তিয়ে করেছেন। তাতে আর কিছু প্রমাণ হোক আর না হোক, অন্ততঃ এ তত্ত্বটি সপ্রমাণ হয়নি যে স্তালিন অথবা আইজেনহাওয়ার হিটলারের চেয়ে বেশী সমরবিদ্যা জানতেন।

তাই মসিয়ো কার্তিয়ে সসম্ভ্রমে বলেন, 'এই ভয়ঙ্কর লোকটির সব কিছু হয়ত ইতিহাসের স্মৃতিপট থেকে মুছে যাবে; কিন্তু তিনি যে সব যুদ্ধাভিযানের পরিকল্পনা রেখে গেলেন সেগুলো যুদ্ধ-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সেই রকম মনোযোগই দিয়ে পড়বে যে মনোযোগ দিয়ে ছাত্রেরা ফ্রেডেরিক দি গ্রেটের অভিযান অধ্যয়ন করে।'

এ বিষয়ে কারো মনে কোনো দ্বিধা নেই।

দৈনিক বসুমতী

ফ্রাঙ্কেন্‌স্টাইন্‌

যে ভূতকে মারার জন্য তামাম দুনিয়ার তাবৎ সর্ষে জড়ো করে পিষে ছাতু করে ফেলতে হল, সেই ভূতকে জ্যান্ত করবার জন্য নাকি নবীন ভগীরথ নূতন তপস্যায় মগ্ন হয়েছেন।

হিটলার 'দানব' মারা গিয়েছে চার বৎসরও হয়নি—পরশু দিন এক জর্মান কাগজে পড়লুম, জেনারেল হাল্‌ডারকে বড়কর্তা বানিয়ে নূতন জার্মান চমু গড়ে তোলবার জন্য মার্কিন এবং জার্মান উজীর-নাজিরের দল উঠে পড়ে লেগে গিয়েছেন। সংবাদটা চট করে কেউ বিশ্বাস করবেন না বলে খবরের কাগজখানা সযত্নে তুলে রেখেছি। কাগজখানা অন্য আরেকটি কাজে লাগবে। যাঁরা দিশী প্রবাদ-বাক্যের উপর নির্ভর করে এ-দুনিয়ায় চলা-ফেরা করেন, তাঁদের সামনে সপ্রমাণ করে দেব, মাথা না থাকলেও মাথা-ধরা হতে পারে,—জর্মান রাষ্ট্র নামে আজ কোনো পৃথক সত্তা নেই বটে, কিন্তু জার্মান বাহিনী তৎসত্ত্বেও গড়ে উঠতে পারে।

এই খবরের কাগজখানার রসবোধও আছে। সম্পাদক লিখেছেন, "গ্যোবেল্‌স্‌ সায়েব মরার পূর্বে দু'খানা বোম্বাই-সাইজ টাইম বম্‌ রেখে গিয়েছিলেন; তার পয়লাখানার ভিতরে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, 'হে জার্মানগণ, মার্কিন-ইংরেজ যে বলছে স্বাধীনতা আর সাম্য-মৈত্রীর জন্য তারা লড়ছে, সে কথা আরব্যোপন্যাসের মত অবিশ্বাস্য—তারা লড়াই জিতলে তোমরা যে 'স্বাধীনতা' পাবে সে দুরাশা কোরো না।"

এ বম্‌টা ফাটল মার্কিন-ইংরেজ জার্মানী দখল করার সঙ্গে সঙ্গে। 'স্বাধীনতা' মাথায় থাকুন,—অনাহারে রোগে-শোকে কত জার্মান যে এযাবৎ মহাপ্রভুদের 'সুশাসনে' মারা গিয়েছে, তার আদম-সুমারী এখনো আরম্ভ হয়নি। গ্যোবেল্‌স্‌ সায়েবের দুই নম্বরের বোমাতে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল 'কিন্তু জার্মানীকে বাদ দিয়ে মার্কিন-ইংরেজের চলবে না, সে-কথাও বলে দিচ্ছি। রুশকে ঠেকাতে পারে ইহজগতে একমাত্র জার্মান জাতই।'

জার্মান সম্পাদক বলছেন, 'এইবারে দুই নম্বরের বোমাখানা ফেটেছে।' যে জার্মানবাহিনীর ঠেলায় মার্কিন-ইংরেজ-রুশ মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছে, সেই জার্মানবাহিনীকে ফের জ্যান্ত করবার জন্য গণ্ডায় গণ্ডায় ভাগীরথী পশ্চিম জার্মানীতে নাবানো হচ্ছে—অর্থাৎ আমেরিকা থেকে বিস্তর খানাদানা আসছে, কলকব্জা বানাবার জন্য টাকা-পয়সা আসছে, রূঢ় কয়লার খনির আগুন যজ্ঞিবাড়ীর

মত ফের অষ্টপ্রহর জ্বলতে আরম্ভ করেছে, বন্দুক-কামান বানাবার কারখানাগুলো ধ্বংস করা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এক কথায় বলতে গেলে মার্শাল নামক যে গৌরীসেন দুনিয়ার আর সর্বত্র কাঁচা টাকা ঢালছেন, তিনি সব বিখ্যাত 'মার্শাল প্ল্যান' জার্মানীতেও চালাতে নারাজ নন, সে-কথাও বলে দিয়ে গিয়েছেন।

অর্থাৎ ভূতটা যাতে রাতারাতি দাবড়াতে আরম্ভ করতে পারে, তার জন্য রক্ত সংক্রমণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। মার্কিন নাগরিকের বড় দুঃখে জমানো টাকা—সবাই জানেন, মার্কিন টাকাকে রক্তের চেয়েও মূল্যবান মনে করে—ভাগীরথী বেয়ে পশ্চিম জার্মানীতে পৌঁচচ্ছে, পুষ্পকরথ চড়ে বার্লিনে ঝরে পড়ে সেখানকার মার্কিন-দোস্ত জার্মানদের কানে বেটোফেনের সঙ্গীতের চেয়েও মিষ্টি ঠুংঠাং করে বাজছে।

অবিশ্বাস্য, সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। কিন্তু পৃথিবীর তাবৎ জিনিসই যখন তুলনামূলক (এ কথাটাও 'রিলেটিভিটি' নাম দিয়ে এক জার্মানই প্রচার করে গিয়েছেন) তখন এর চেয়েও অবিশ্বাস্য আরেকখানা খবর যদি পরিবেশন করি, তবে হয়ত পাঠক উপরের খবরখানা বিশ্বাস করে ফেলবেন।

শাখ্‌টের নাম অনেকেই শুনেছেন। ইংরেজই তার হুনর-ভানুমতী দেখে তাকে wizard নাম দিয়েছে। টাকাকড়ি, ব্যাঙ্কিং বাবদে হেন ফন্দিফিকির নাকি নেই, যা তাঁর কাছে অজানা,—শুধু তাই নয়, এই স্বল্পপরিসর জীবনেই নাকি তিনি জার্মানের ধন-দৌলত দুবার বাঁচিয়ে দিয়েছেন। একবার ১৯২১-এ ইনফ্লেশন নামক নূতন জিনিস আবিষ্কার করে, এবং দ্বিতীয়বার দেউলে জার্মানীকে হিটলারের আমলে তালেবর করে দিয়ে।

সেই শাখ্‌টের বিরুদ্ধে এখনো নানা মোকদ্দমা চলছে। অপরাধ? তিনি নাকি গ্যোরিঙ, রিবেনট্রপের মত হিটলারের নন্দী-ভৃঙ্গীর দলে ছিলেন। তা সে যাই হোক তিনি কিন্তু এ-যাবৎ খালাসই হয়ে আসছেন, গোটা দুই মোকদ্দমা এখনো মুলতুবী আছে।

মোকদ্দমার ফাঁকে শাখ্‌ট্‌ সাহেব একখানা প্রামাণিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। বিষয়, মার্শাল প্ল্যান। অস্মদ্দেশীয় কোনো দেশী-বিদেশী ভাষায় সেটি অনূদিত হয়নি বলে পাঠককে সেটি নিবেদন করছি।

শাখ্‌টের পেটে বহুৎ এলেম। তাই তাঁর ভাষা এবং বর্ণনশৈলী অতীব সরল। অতুলনীয় ভাষায় তিনি যে ক'টি কথা লিখেছেন, তার সারমর্ম হচ্ছে, 'হে মার্কিনগণ, মার্শাল প্ল্যান নামক যে দলিলে তোমরা আমাদের দস্তখত চাইছ তার দাম কিছুই নেই—অর্থাৎ তোমাদের মনে যদি ক্ষীণতম আশাও থাকে যে,

আমরা একদিন এ প্ল্যানের ঋণ পরিশোধ করতে পারব, তবে সে আশা শিকেয় তুলে রাখো।' (এ স্থানে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিই যে, একদিন কাইজার যে রকম বেলজিয়ামের সঙ্গে সন্ধিপত্রকে 'স্ক্র্যাপ অফ পেপার' বলেছিলেন, শাখ্‌ট্‌ সেই কথাই বলেছেন অপেক্ষাকৃত সংস্কৃত ভাষায়) তার কারণ—

১। ঋণশোধ করার মত সোনা আমাদের কাছে নেই, কখনো হবে না। কাজেই সে প্রশ্ন উঠতেই পারে না।

২। তাহলে তোমরা টাকার বদলে চাইবে তৈরী মাল (finished goods), কিন্তু তা নিয়ে তোমাদের লাভটা কি? তোমরা সে মাল বেচবে কোথায়? আপন দেশে? কিন্তু তোমরা তো নিজেই শিল্পপ্রধান (industrial) দেশ। আমাদের মাল যদি বাজারে ছাড়ো, তবে তোমাদের শিল্প কোণঠাসা হয়ে তোমাদের শিল্পের বিনাশসাধন হবে না? (শাখ্‌ট্‌ বলেননি, কিন্তু আমাদের স্মরণ আছে, ইংরেজ, বিশেষ করে ফরাসী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীর কাছ থেকে এ রকম ফোকটে পাওয়া মাল নিয়ে মহা বিপদগ্রস্ত হয়েছিল)। তবে কি তোমরা আমেরিকার বাইরে পৃথিবীর অন্যান্য বাজারে আমাদের দেওয়া মাল বেচবে; তাহলে সে সব জায়গায় তো প্রথম মার্কিন মাল সরিয়ে তারপর আমাদের মাল চালাতে হবে।

এই কথাটুকু বলে শাখ্‌ট্‌ সাদা কালিতে একটা কথা লিখেছেন—তার মর্ম আপনাদের আশীর্বাদে আমি ধরতে পেরেছি। তিনি লিখেছেন, 'বলিহারি তোমাদের বুদ্ধি' (এইটুকু সাদা কালিতে), 'হিটলারও তো ঠিক এই সুবিধেটাই চেয়েছিল। সেও তো বলেছিল যে, দুনিয়ার বাজার তোমরা চেপে ধরে বসে আছ। তোমাদের সোনার ধানে সব নৌকো ভরে গিয়েছে, তাকে আদপেই ঠাঁই দিচ্ছে না এবং শেষটায় হিটলার বাজার পাবার আশায়ই তো তোমাদের সঙ্গে লড়ল। যে বাজার তোমরা লড়াই করে বাঁচালে, সেই বাজার তোমরা খুশ-এখতেয়ারে 'ফ্রি, গ্র্যাটিস এণ্ড ফরনাথিং' আমাদের হাতে তুলে দেবে?

তারপর শাখ্‌ট্‌ কৌটিল্যের মত একখানা মোক্ষম তত্ত্বকথা ছেড়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমেরিকার মত শিল্পে উন্নত দেশ পয়সা যদি ধার দেয়, তবে ফেরৎ পাবার আশা করতে পারে একমাত্র সে সব দেশ থেকেই, যারা কাঁচামাল (raw material) বিক্রী করে। কারণ কাঁচা মালের প্রয়োজন তোমাদের সব সময়ই থাকবে।'

এবং শেষ কথা বলেছেন, 'অতএব, হে মার্কিনগণ, যদি কিছু ধারফার দাও, তবে ওটা দানের মত করেই দিয়ো। ওর জন্য মনের কোনো কোণে মায়া রেখ

না। ও পয়সা কখনই ফেরৎ পাবে না।'

শাখ্‌টের লেখা এ-সুসমাচার পড়ে মার্কিনরা কি বলেছেন, তার সন্ধান এখনো পাইনি।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, গাঁটের পয়সা খরচ করে, খাতকের টক-কথা বরদাস্ত করে, জার্মান 'দানব' গড়ে তোলা—এত সব বয়নাক্কা কেন?

বেদনাটা কোথায়? ভয়টা কিসের?

রুশ বর্গী আসছে। বুলবুলিতে যখন সব ধান খেয়ে ফেলেনি তখন সে ধান পাঠাও বস্তা বস্তা জার্মানীতে। সেখানে জার্মান মুর্গী পোষো। তারপর রুশ-দর্গায় জবাই করো, ফাঁড়াগর্দিশ যখন উপস্থিত হবে।

অবশ্যি জার্মানীও জানে, কার যেন ভালোবাসা, কিসের যেন মুর্গী পোষা।

দৈনিক বসুমতী

মার্শাল-মার্গ

সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, ভালো-মন্দ সংসারের সব জিনিস জোড়ায় জোড়ায় দেখা এক-রকম লোকের স্বভাব। এদের পিছনে রয়েছেন সাংখ্যকার—তিনি বলেন, প্রকৃতি এবং পুরুষ এই দুই মূল বস্তু স্বীকার করে নিলে বাদবাকী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ছকে ফেলে বিশ্লেষণ করে ফেলা যায়।

আজকের দিনে এঁরাই বলেছেন, 'সংসারে মাত্র দুটি পন্থা এখন দেখতে পাচ্ছি। তার একটা কম্যুনিজম, অন্যটি ক্যাপিটালিজম। কম্যুনিজম বলতে এখন বোঝায়, স্তালিন যে-রাজ্য চালান তার প্রতি বশ্যতা স্বীকার করে পৃথিবীর সর্বত্র সে-রাজ্য বিস্তারকল্পে আপন আপন দেশে শক্ত দল গড়ে তোলা এবং তার আদর্শ হবে স্তালিনকে কেন্দ্র করে শ্রমিক-মজুরের বিশ্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। আর ক্যাপিটালিজম বলতে বোঝায়, আপন আপন দেশ নিজের পছন্দমত অর্থনীতি রাজনীতি চালিয়ে আপন আদর্শের দিকে চলবে।

কম্যুনিস্টরা বলে, 'দেশে দেশে তোমরা যে জাতীয়তাবোধকে উস্কানি দিচ্ছো তার ফল কি হয় ১৯১৪-১৮ এবং ১৯৩৯-৪৫-এও কি তা দেখতে পেলে না? আর লড়াইয়েই যদি সব দুঃখ শেষ হয়ে যেত তা হলেও কোনো ভাবনা ছিল না—কিন্তু আসল মারটা তো আসে লড়াই শেষ হয়ে যাওয়ার পর। তখন আরম্ভ হয় অভাব-অনটন, বেকার-সমস্যা, রোগ-শোক, মহামারী। প্রত্যেক দেশ তখন চেষ্টা করে নিজেকে শক্তিশালী করার জন্য, সর্বপ্রকারের সহযোগিতা তখন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এক দেশে মন মন ধান নষ্ট হয় খাওয়ার লোক নেই বলে, আরেক দেশে লক্ষ

লক্ষ লোক মরে খাবার চাল নেই বলে।'

ক্যাপিটালিস্টরা উত্তরে বলে, 'তোমাদের 'ভূস্বর্গ' রুশিয়াতে কি অভাব-অনটন নেই? রোগ-শোক-মহামারী কি সেখান থেকে লোপ পেয়েছে? বরঞ্চ শুনতে পাই, তোমাদের 'ভূস্বর্গ' রুশিয়াতে গত ত্রিশ বৎসরে যত লোক না খেতে পেয়ে মরেছে তার অর্ধেক লোকও আর কোথাও না খেতে পেয়ে মরেনি। কিন্তু এহো বাহ্য। আসল কথা হচ্ছে এই, তোমরা কেন ধরে নিচ্ছ যে তোমাদের পন্থা ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় সহযোগিতা সম্ভবপর নয়। তোমরা কেন ধরে নিচ্ছ, আমাদের ভিতর চিরকালই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, খুনোখুনি, মারামারি চলবে?'

এইখানটায় এসে কম্যুনিস্টরা একটু বিপদে পড়েন। কম্যুনিস্টদের আপ্তবাক্য, তাদের বেদ-বাইবেল-পুরাণ হল মার্কস সায়েবের কেতাব। তাতে স্পষ্ট লেখা রয়েছে, 'ক্যাপিটালিজমের আসল ধর্ম হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মাৎস্যন্যায়। যত দিন যাবে মারামারি খুনোখুনি করবে তারা ততো বেশী। একে অন্যকে বিনাশ করে শেষটায় তারা সকলেই সমূলে বিনষ্ট হবে—অর্থাৎ ক্যাপিটালিজম তখন শিব হয়ে গেল। সেই শ্মশানে তখন ফুটে উঠবে কম্যুনিজমের রসমঞ্জরী।' কিন্তু গত লড়াইয়ের সময় দেখা গেল, ক্যাপিটালিস্ট দেশগুলো দিব্য একজন আরেকজনের সহযোগিতা করল, শুধু তাই নয়, শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে দ্বন্দ্ব শান্তির সময় উগ্র হতে উগ্রতর হতে চলছিল সেই দ্বন্দ্ব লড়াইয়ের সময় উগ্রতম না হয়ে সব শ্রেণী এক অদ্ভুত সহযোগিতার পরিচয় দিল। ক্যাপিটালিস্টের বড় গোসাঁই চার্চিলের ডাকে ইংলণ্ডের চাষা-মজুর যে স্বতঃপ্রবৃত্ত সাড়া দিল, সে রকম ধারা সাড়া স্তালিনকেও আপন দেশে দেখাতে বেগ পেতে হবে।

প্রমাণ হয়ে গেল, অন্ততঃ এই ব্যাপারে মার্কস সায়েবের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হল (আরেক ব্যাপারে যে তিনি ভুল বলেছিলেন সেটা হচ্ছে, রুশিয়াতে সর্বপ্রথম মজুর-রাজ বসতে পারে তার তিনি কল্পনাও করতে পারেননি—কিন্তু সে প্রস্তাব এখানে অবান্তর), এবং এই প্রমাণটি অতি প্রাঞ্জল ভাষায়, আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সপ্রমাণ করে দিলেন রুশিয়ার সব চেয়ে বড় অর্থনৈতিক পণ্ডিত 'ভাগা'-সায়েব! মস্কোর বুকের উপর বসে রুশিয়ার সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক জ্ঞানকেন্দ্রের সভাপতি হিসাবে তিনি যখন এই মার্কসদ্রোহী 'কাফির' ফতোয়াখানা ছাড়লেন তখন স্বয়ং স্তালিন দিশেহারা হয়ে গেলেন। ভাগাকে ডিসমিস করা হল। অর্থাৎ তাঁকে পেন্সন দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হল।

বেদনাটা এইখানেই। কম্যুনিস্টরা কখনো আঁচতে পারেনি যে, ক্যাপিটা-লিস্টদের ভিতরে এখনো এতটা প্রাণশক্তি রয়েছে যে, তারা এখনো বাঁচতে জানে,

অর্থাৎ বিপদ সামনে দেখলে তারা আর দিশেহারা হয়ে মারামারি করে লাইফ-বোটটাকে ভেঙে তো ফেলেই না, এমন কি প্রাণ বিসর্জন দিয়ে, সহযোগিতা করে, আসল জাহাজখানাকেই ফের চালু করে তোলে। তারাও প্ল্যান-মাফিক কাজ করতে শিখে গিয়েছে। এই প্ল্যানের নামই মার্শাল-প্ল্যান।

দৈনিক বসুমতী

আরব্য-রজনীর অরুণোদয়

আরব্য উপন্যাসের কৃপায় বিশ্বজন খলীফা হারুন অর্-রশীদের বাগদাদ চেনে। মীর মুশরফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু' একদা বাঙালী মাত্রেই পড়তো এবং সেই সূত্রে ফুরং (ইউফ্রেটিস), কারবালা এবং কুফা নগরী, বাগদাদ শহরের সঙ্গে সুপরিচিত ছিল। ইদানীং মোটরগাড়ী চালু হওয়ার ফলে অনেকেই পেট্রোলের খবর রাখেন এবং ইরানের মুসাদ্দিক যখন আপন পেট্রোল আপন ঘরে তুলতে চাইলেন, তখন সেই সূত্রে অনেকেই ইরাকের তেলের খবরও পেলেন। বাস্তিল পতনের দিন বাগদাদে যে রাষ্ট্র-বিপ্লব আরম্ভ হয়েছে, তার পিছনে রয়েছে এই 'স্নেহ' বা তেলের উৎস—যদিও সেটা এখন রণ-দামামার অট্টরবের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছে।

আরবভূমি (জজীরাতু ল্-অরবীয়া) ইরাক (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মেসোপটোমিয়া নামে পরিচিত), সীরিয়া (অশ্-শাম্ বা শাম্—শামী কাবাব যেখান থেকে এসেছে), লেবানন (লুব্নান). ট্রান্স-জর্ডন বা শুধু জর্ডন (উরদুন), সউদী আরব (মক্কা-মদীনা নিয়ে হিজ্জাজ এবং মধ্য আরবের নেজ্দ্ নিয়ে এ রাষ্ট্র গঠিত), ইয়েমেন (ইয়েমেন শব্দের অর্থ আরবীতে দক্ষিণ ও শাম্ অর্থ উত্তর—অর্থাৎ আরবভূমির দক্ষিণ এবং উত্তর সীমানা) ও প্যালেস্টাইন নিয়ে সম্পূর্ণ আরব ভূখণ্ড। এ-ছাড়া আদস বন্দর অঞ্চলের এডেন প্রটেকটরেট-হাদ্রামূত, ওমন, কুয়েৎ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশ আছে এবং এসব জায়গায় ইংরেজের প্রাধান্য!

(আদনের ঠিক সামনেই সোকোত্রা দ্বীপ। একদা এ দ্বীপ ভারতবর্ষের অধিকারে ছিল। সোকোত্রা নাকি সংস্কৃত 'সুখাধার' শব্দ থেকে এসেছে।)

আরবভূমির ৯৫ থেকে ৯৮ জন লোক মুসলমান এবং এদের ভাষা আরবী। কিন্তু লেবাননের শতকরা ৫৩% লোক খৃষ্টান এবং বিপদে পড়লেই পশ্চিমের খৃষ্টানদের কাছে সাহায্য চায়। অবশ্য এদের ভিতরও বেশ কিছু জাতীয়তাবাদী আছে, যারা দেশের ঝগড়াঝাঁটির ভিতর বিদেশীর আগমন পছন্দ করে না। খৃষ্টানদের মাতৃ-ভাষাও আরবী। রাষ্ট্রের নেতা সাধারণতঃ খৃষ্টানই হয়ে থাকেন ও প্রধানমন্ত্রী মুসলমান।

১৯১৪ সাল অবধি প্যালেস্টাইনের শতকরা নব্বুই থেকে পঁচানব্বুই জন

অধিবাসী ছিল মুসলমান, বাদবাকী খৃষ্টান এবং ইহুদী। এখন অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে।

এই দুই অতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বাদ দিলে তাবৎ আরবভূমি ইসলামের অনুপ্রেরণায় চলে। কিন্তু খৃষ্টান আরবদের জাতীয়তা আন্দোলনে আকর্ষণ করার জন্য অনেক সময় ধর্মনিরপেক্ষ প্রপাগাণ্ডা চালানো হয়। ইদানীং সীরিয়া ও বাগদাদে কম্যুনিস্ট মতবাদ প্রচারিত হওয়ার ফলে এই ধর্মনিরপেক্ষতা আরো জোর পেয়েছে। সোমবার রাত্রে বাগদাদ বেতার কেন্দ্র যে আনন্দোল্লাস করছিল, তাতে ঘন ঘন 'আল্লাহ আকবর' (আল্লা সর্বমহান) ধ্বনি হুঙ্কারিত হলেও সমগ্র আরবভূমির ইসলামী ঐক্য সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করা হয়নি। বলা বাহুল্য, বাগদাদ কাইরোর আরব খৃষ্টানরাও দৈনন্দিন জীবনে ভগবানের নাম স্মরণ করার সময় 'আল্লাহু আকবর' বলে থাকে।

আফ্রিকার মিশরকে যদিও আরবভূমি বলা যায় না, তবু স্মরণ রাখা ভালো যে সেখানকার শতকরা নব্বুইজন লোকের ধর্ম ইসলাম ও শতকরা ৯৮ জন (খৃষ্টান কপট্‌দের নিয়ে) আরবী বলে থাকে। এবং এই মিশরই আরবভূমির নব জাগরণের অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে—প্রধানতঃ দৃষ্টান্ত দ্বারা। তাই মিশরকে বাদ দিয়ে জজীরাতুন অরবীয়া সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করা যায় না।

ইরাকের বর্তমান রাষ্ট্র-বিপ্লবের পরিপূর্ণ ইতিহাস দিতে হলে হজরৎ মুহম্মদ সাহেবকে দিয়ে আরম্ভ করতে হয়, এবং তার সরল অর্থ সৈয়দ আমির আলী কৃত 'হিস্ট্রী অব্‌ দি সেবাসীন্‌স্‌' পুস্তকখানা সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি করে আরো একটি নূতন ভল্যুম তার সঙ্গে জুড়তে হয়। সংবাদপত্র তার জন্য প্রশস্ত নয়, অতএব যেটুকু না বললেই নয় সেটুকু সংক্ষেপে সমাধান করি।

মহাপুরুষ মুহম্মদ ও তাঁর শিষ্যগণের সময় মদীনা ছিল আরব-ভুবনের কেন্দ্রভূমি। পরবর্তী যুগে দামাস্কস্‌ (দিমিশ্‌ক—শামের রাজধানী), তারপর বাগদাদ এবং সর্বশেষে ইস্তাম্বুল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর (এ-দেশে যখন খিলাফৎ আন্দোলন আরম্ভ হয়) খলীফার সঙ্গে মুস্‌লিম জগতের কেন্দ্রভূমি লোপ পায়। এরপর রাজা ইবনে সউদ মক্কাকে কেন্দ্রভূমি করার চেষ্টা করে নিষ্ফল হন এবং অধুনা নজীব-নাসির কাইরোকে মুসলিম-জহান না হোক আরব-ভুবনের কেন্দ্রভূমি করার চেষ্টা করছেন। সউদী আরব অবশ্য এ-চেষ্টা এখনো ছাড়েনি, কারণ হাজার হোক এখনো প্রতি বৎসর পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মুসলমান নরনারী হজ করতে মক্কা যায়—এবং কুরান শরীফে মক্কাকেই ইসলামের কেন্দ্রভূমি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নাসির আর যা-খুশী তাই করতে পারেন, কিন্তু নামাজ পড়ার সময় তাকে মক্কার দিকেই মুখ করতে হয়।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মধ্যপ্রাচ্যে যে তুমুল হট্টগোল লেগেছে, যার পানে পৃথিবীর ক্ষুদ্র বৃহৎ তাবৎ রাষ্ট্র—মায় মার্কিন রুশ—এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে, সে সম্বন্ধে সউদী আরব কোনো উচ্চবাচ্য করছে না। হয়তো সে ভাবে মার্কিনের সঙ্গে লড়াই করে এরা সব নিঃশেষ হয়ে যাক্—বিশেষ করে নাসির—তাহলে তারপর আমি আরব-মিশরের উপর রাজত্ব করবো। এ অভিলাষ যে ভ্রমাত্মক সে কথা আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। কারণ মার্কিন যদি নাসির-মতবাদকে ধ্বংস করে তবে তাকেও একদিন ঐ একই বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। সে-কথা পরে হবে।

* * *

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে তাবৎ আরবভূমি তুর্কীর খলীফার হুকুমে চলতো। এমন কি মক্কার শরীফ (পবিত্র কৃষ্ণ প্রস্তর কাবার রক্ষাকর্তা) হজরৎ মুহম্মদের কুরেশ বংশধর হাশিমী-প্রধানকেও (এই হাসিমী বংশেরই দুই প্রধান যথাক্রমে বর্তমান ইরাক ও জর্ডনের রাজা) তুর্কী খলীফার হুকুমমতো চলতে হত। যুদ্ধ লাগার পর ইনি ইংরেজের সাহায্যে নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন। এটাকে কিন্তু বিদেশী তুর্কের আধিপত্য থেকে আরবের মুক্তি প্রয়াসের ন্যাশনালিজম নাম দিলে ভুল করা হবে, যদিও এই জিগির তুলেই শরীফ হুসেন আরবদের কিছুটা সমর্থন পেয়েছিলেন। আসলে এটা ডাইনেস্টিক বা রাজবংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা। মূলত অবশ্য এর পিছনে ছিল ইংরেজ। যারা লরেন্সের 'সেভ্‌ন্ পিলারজ অব উইজ্‌ডম্' পড়েছেন বাকি কাহিনী তাঁদের আর বলতে হবে না। এই শরীফগোষ্ঠী এবং তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ ইংরেজের সাহায্যে তুর্কীর প্রচুর ক্ষতি করতে পেরেছিল বটে, কিন্তু তুর্কীর যুদ্ধে পরাজয় যে প্রধানতঃ ঐ কারণেই হয়েছিল এ-কথা আজও কেউ বলেনি।

আরব জয়চন্দ্র এই যে খাল কেটে ঘরে কুমীর আনলেন, তারই খেসারতী সম্পূর্ণ আরবভূমিকে আজো চোখের জলে নাকের জলে দিতে হচ্ছে। লাভের মধ্যে তাঁর এক বংশধর এখন জর্ডনের টলটলায়মান সিংহাসনে বসে তাঁরই প্রপিতামহের স্মরণে ইংরেজকে ডাকছেন এবং অন্যজন নাকি এ সবের অতীত হয়ে অন্য লোকে চলে গিয়েছেন। কিন্তু এ-সব পরের কথা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হাশিমীগোষ্ঠী অবাক হয়ে দেখে, 'সেল্‌ফ্-ডিটারমিনেশন্ অব্ দি পিপলস', 'জনগণের স্বরাজলাভ' ইত্যাদি জিগির তুলে যে পাশ্চাত্ত্য শক্তিপুঞ্জ হাশিমী তথা আরবদের কিয়দংশ তুর্কীর বিরুদ্ধে ভাতিয়েছিল, তারাই তাবৎ আরবভূমি গ্রাস করে বসে আছে! এমন কি মক্কার শরীফ হুসেনকেও

নাকি বলতে হবে, তিনি এখন আর তুর্কীর খলীফার মনোনীত প্রতিনিধি নন, এখন তিনি ইংলেণ্ডের (খৃষ্টান !) রাজার প্রতিনিধি হয়ে মুসলমানের পুণ্যভূমি মক্কা-মদীনার তদারকী করবেন ! অর্থাৎ ইস্তেক কাবা পর্যন্ত খৃষ্টানের তাঁবেতে চলে গেল ! মহাপুরুষ মুহম্মদের পরে এ দুর্দৈব ঘটলো এই প্রথম। বিশ্ব মুসলিমের জিগরে তাতে কতখানি চোট লেগেছিল, সে কথা আর বর্ণনা দিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। এ-দেশে পর্যন্ত তার ঢেউ এসে যে খেলাফতী আন্দোলনের উচ্ছ্বাস জাগিয়ে তুলেছিল সে-কথা বয়স্কদের স্মরণে থাকার কথা।

কিন্তু ইংরেজ কবলো ব্যাকরণে সামান্য একটি ভুল। আরবভূমি ভাগাভাগি করার সময় সে ফ্রান্সকে দিল শিকার করা হরিণের ল্যাজটুকু অর্থাৎ সীরিয়া। ফ্রান্স গেল ভয়ঙ্কর রেগে। কিন্তু ঐ নিয়ে তো আব আরেকটা বিশ্বযুদ্ধ বাধানো যায় না। ফ্রান্স লেগে গেল দাদের সন্ধানে।

ইতিমধ্যে মুস্তফা কামাল পাশা তুর্কী থেকে ইংরেজ আধিপত্য সরাবার জন্য লাগালেন লড়াই। ফ্রান্স বিষমোল্লাসে, অবশ্য গোপনে, সীরিয়ায় সঞ্চিত তার অস্ত্রশস্ত্র দিল মুস্তাফা কামালেব হাতে তুলে। লয়েড জর্জ তুর্কীর ইংরেজ সৈন্যদের বাঁচাবার জন্য বিশ্ব-খৃষ্টানকে আহ্বান করলেন। ফ্রান্স তো গোপনে কামালকে সাহায্য করছেই—আমেরিকাও ততদিনে কেটে পড়েছে—কেউ সাহায্য করলো না। ইংরেজ সৈন্য তুর্কী ছেড়ে পালালো। কামাল নয়া তুর্কী গড়ে তুললেন। সঙ্গে সঙ্গে সীরিয়াও পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে গেল।

ইংরেজ তখন প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের এনে সেখানে সাম্রাজ্যবাদীর ঘাঁটি নির্মাণে তৎপর হল।

* * * *

এই তাবৎ ঘাত-প্রতিঘাতেব ভিতর মধ্য আরবিস্তানের উষর মরুভূমি নেজ্‌দের ওয়াহ্‌হাবী (সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে বাংলা দেশের স্বাধীনতাকামী বীর দুদু মিয়া ও তীতু মীর দুজনাই ওয়াহ্‌হাবী ছিলেন) রাজা ইবনে সউদ তাঁব সুযোগেব প্রহর গুণছিলেন। এই সউদী বংশ শবীফের হাশিমী বংশের জন্মশত্রু। মক্কার শরীফ যখন ইংরেজের তাঁবুতে চলে যাওযায় মক্কাও কার্যতঃ খৃষ্টানের হাতে চলে গেল তখন 'কাবা ইন্‌ ডেনজার' এই মর্মভেদী বাণী প্রচার করে তিনি আরব বেদুইনদের এক ঝাণ্ডার নিচে জমায়েৎ কবে চললেন মক্কাব উদ্দেশে। শরীফ প্রমাদ গুণে তারস্বরে ইংরেজের সাহায্য চাইলেন। ইংরেজের তখন দুহাত ভর্তি। সে কোনো সাহায্য করতে পারলো না। স্বাধীন রাজা ইবনে সউদ মক্কা-মদীনার রাজা হলেন। বিশ্ব মুসলিম আশ্বস্ত হল।

সমস্ত আরবভূমি যায় যায় দেখে ইংরেজ তখন জর্ডন ও ইরাকে দুই হাশিমী রাজা বসালো। আবদুল্লাকে জর্ডনে ও ফৈসলকে ইরাকে। ইরাকের শেষ রাজা এই ফৈসলের পৌত্র।

(২)

মিশর দেশ যদিও আফ্রিকায় অবস্থিত ও সেখানকার আরব ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে দেশীয় রক্তের প্রচুর সংমিশ্রণ হয়েছে তবু সেখানকার ভাষা আরবী, জনসাধারণ প্রধানত মুসলমান এবং সবচেয়ে বড় কথা কাইরোর অল-অজ্‌হর বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র। ইরাক, লেবানন, সিরিয়া এমন কি ইসলামের জন্মভূমি মক্কা-মদীনার ছাত্ররাও উচ্চশিক্ষার জন্য অজ্‌হরেই যায়। ভারতীয় ছাত্রদের জন্যও সেখানে বিশেষ হোস্টেল আছে। মক্কাতে যে রকম হজ্জের সময় বিশ্ব-মুসলিম নানা রকমের রাজনৈতিক মতবাদে তালিম পায়, কাইরোতে ঠিক সেই রকম সম্বৎসরই রাজনৈতিক চর্চা হয়। তদুপরি নাইল-প্লাবিতা মিশরভূমি অর্থশালিনীও বটেন।

কাজেই মিশরকে আরব ভূখণ্ডের অংশ বলেই ধরে নিতে হয়। এবং তা হলে উপস্থিত এ-ভূখণ্ডে চারিটি শক্তি বিরাজমান।

১। মিশর। এর জনসাধারণ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের তিক্ত আস্বাদ প্রচুর পেয়েছে। তবু তারা সহজে যে কোনো রাজনৈতিক দলে ভিড়ছে তা নয়, প্রায় বাধ্য হয়েই তাকে রাশার সঙ্গে কিঞ্চিৎ মিতালী করতে হয়েছে।

২। সউদী আরব। মিশরের সঙ্গে তার দৃশ্যমান কোন শত্রুতা না থাকলেও সউদী আরবও বিশ্ব-মুসলিমের কেন্দ্রভূমি হতে চায় ও সে-স্থলে মিশরের সঙ্গে তার শত্রুতা না থাকলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রগতির দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতে গেলে এ ভূমি সবচেয়ে পশ্চাৎপদ। আমেরিকাকে তেল বিক্রি করে এরা প্রচুর পয়সা কামায় বলে এরা কিছুটা মার্কিন-ঘেঁষা। কিন্তু সুযোগ পেলে মার্কিনকে ঝেড়ে ফেলে নিজের তেল নিজেই বিক্রি করার চেষ্টা করলেও করতে পারে। এদের বংশগত শত্রুতা কিন্তু হাশিমীদের সঙ্গে—অর্থাৎ জর্ডন ও ইরাকের রাজপরিবারের সঙ্গে।

৩। হাশিমী পরিবার। এঁদের একজন এখনো জর্ডনের রাজা। অন্য জনের রাজত্ব গেছে এবং বাগদাদ বেতার কেন্দ্র আজকাল অতি গর্বের সঙ্গে 'জম্‌হুরীয়াতুল ইরাকীয়া' অর্থাৎ 'ইরাক রিপাবলিক' বলে আত্মপরিচয় অভিজ্ঞান বাণী প্রচার করে ও সমস্ত রাত ধরে 'রব্বুল-আম' অর্থাৎ 'জনগণ অধিনায়কে'র

প্রশস্তি গায়। এই 'রব্বুল-আম' সমাসটি আমি ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি। সাধারণত আল্লার প্রশস্তি গাওয়ার সময় বলা হয়, 'রব্বুল্ আলিমীন' (দুই ভুবনের দৃশ্য ও অদৃশ্য—অধিনায়ক), কিম্বা 'রব্বুল্ মুসলিমীন' (মুসলিমদের অধিনায়ক) কিম্বা ঐ জাতীয় কিছু একটা।

৪। সীরিয়ার গণতন্ত্র। খাস আরব ভূখণ্ডে একা বলে (লেবানন যদিও রিপাব্লিক তবু সেখানকার খৃষ্টান-প্রাধান্য দুই গণতন্ত্রের সৌহার্দ্যের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল) সে মিশরের সঙ্গে মিলে গিয়ে যুক্তগণরাষ্ট্র নির্মাণ করেছিল। সীরিয়াতে রুশ-প্রাধান্য বেশ কিছুটা আছে এবং পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে সুয়েজ-সঙ্কটের সময় সীরিয়া রাশাকে তার দেশে জঙ্গী বিমান অবতরণ করতে দেয়। বর্তমানে ইরাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে সীরিয়ার শক্তি বৃদ্ধি হল।

রাষ্ট্র হিসাবে লেবানন এদের থেকে একটু আলাদা থাকে। লেবাননের খৃষ্টান প্রাধান্য তার অন্যতম কারণ। আধুনিক ইয়োরোপীয় শিক্ষাদীক্ষায় কিন্তু ইসরাইলের পরেই তার স্থান। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকানরা এখানে একটি কলেজ খোলে ও পরে সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। এদের প্রকাশিত বহু আরবী পুস্তক প্রাচ্যপ্রতীচ্যে যশ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে জেসুইট্‌রাও আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয় খোলে। এসব সত্ত্বেও লেবাননে রাজনৈতিক ঐক্যসাধন করা কঠিন। খ্রীষ্টান ও মুসলমানের সংখ্যা যদিও প্রায় সমান তবু খ্রীষ্টানরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত, মুসলমানরাও প্রায় সমান সমান শীয়া সুন্নীতে বিভক্ত এবং তার উপর দ্রুজ মুসলমানরাও রয়েছে। আমেরিকানরা যখন বলে, তাদের লেবাননে নামার অন্যতম উদ্দেশ্য সে দেশের খৃষ্টানদের রক্ষা করা তখন সেটা নিছক মিথ্যা নয়। যদিও ধর্মের জন্য ব্যাপক খুনোখুনী সেখানে হয়েছে বলে জানি নে। বরঞ্চ দ্রুজ মুসলিমদের উপর সুন্নী মুসলমানদের প্রচুর আক্রোশ বহু যুগ ধরে বর্তমান।

আরবরা ইসরাইলকে আরব ভূখণ্ডের অংশ বলেই ধরে এবং সুযোগ পেলে ইহুদিদের যে সমূলে বিনাশ করবে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বলতে গেলে ইসরাইলই এখন আরবভূমির সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি। ইসরাইল তার প্রাণের মায়ায় মার্কিন-ইংরেজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং এক লেবানন ছাড়া আর সকলেই তার জানের দুশমন্।

তুর্কী আরব ভূখণ্ডের অংশ নয়, এবং তুর্কীর মাতৃভাষা ওস্‌মানলী-তুর্কী ভাষা কিন্তু যেহেতু তুর্করা মুসলমান এবং বহু যুগ ধরে আরব ও মিশরের উপর রাজত্ব করেছে তাই আরবের ভবিষ্যতের সঙ্গে তার ভবিষ্যৎও বিজড়িত। অবশ্য তুর্কীর সবচেয়ে কঠিন শিরঃপীড়া রুশকে নিয়ে। রুশের ভয়ে শেষ পর্যন্ত সে মার্কিনের

শরণ নিয়েছে। রুশ কৃষ্ণসাগরে নৌ-বাহিনীর মোহড়া দেবে এ খবর বৃহস্পতিবার দিনে রাষ্ট্র হয়। মার্কিন সৈন্যও ঐ সময়ে তুর্কীতে নামে।

তাহলে মোটামুটি দাঁড়ালো এই ;—

জর্ডন, ইসরাইল ও তুর্কী মনেপ্রাণে মার্কিন সাহায্য চায়। ইসরাইলের সবাই চায়, জর্ডনের জনগণ খুব সম্ভব চায় না কিন্তু রাজা চান, লেবাননের কর্তৃপক্ষ চান কিন্তু বিদ্রোহীরা অবশ্যই চায় না, তুর্কীর অধিকাংশ লোক অনিচ্ছায় চায়। সিরীয়া, ইরাক ও মিশর মার্কিন-ইংরেজকে তাড়াতে চায়। রুশের সাহায্য কতখানি প্রত্যাশা করে বলা কঠিন। জীবনমরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়ালে যে রুশকে আমন্ত্রণ জানাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিম্বা রুশ নিজের থেকেই নামতে পারে। বিশ্ব-কম্যুনিস্ট রুশের দিকে তাকিয়ে আছে সে গণতান্ত্রিক এবং স্বাধীনতা-কামীদের সাহায্য করে কিনা, কাজেই শেষ পর্যন্ত হয়তো তাকে অনিচ্ছায়ই নামতে হবে। 'অনিচ্ছায়' এই কারণে বললুম যে যুদ্ধ-বিশারদ পণ্ডিত ক্লাউজেভিস্ বলেছেন, 'সংগ্রামে নামবে তোমার সুবিধামত পছন্দ-মাফিক সময়ে—শত্রুর আহ্বানে নয়।' আমেরিকা হয়তো স্থির করেছে, রুশের আর শক্তিবৃদ্ধি হতে দেওয়া নয়, এইবারেই লড়ে নেওয়া ভালো। রুশ হয়তো ভাবছে, 'এখনো আমার সময় হয়নি।'

প্রত্যক্ষত তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সঙ্কটের পাত্র উপচে পড়লো ইরাক নিয়ে। সেখানে ইংরেজের তেলের স্বার্থ কিন্তু এ-সম্পর্কে ইংরেজের রাজনৈতিক বুদ্ধির তারিফ না করে থাকা যায় না। সুয়েজ কানালের ব্যাপারে ইংরেজ তো আমেরিকাকে নামাতেই পারলো না, বরঞ্চ বিশ্বজনের নির্মম কটু-কাটব্য শুনতে হল, পরাজয়ও মানতে হল। এবারে ইংরেজ প্রথমে নামালো মার্কিনকে, নিজে নামলো পরে। তবে ভয় হয়, ভালোয় ভালোয় সব কিছু মিটে যাবার পর হয়তো মার্কিনরা ইরাকের তেলের বখরা চেয়ে বসবে। বাংলায় বলি, 'ফেলো কড়ি মাখো তেল।' এ-ক্ষেত্রে হবে 'ফেলো তেল, পাবে না কড়ি।'

বাগদাদের এ-বিপ্লব অনেকদিন আগেই হওয়া উচিত ছিল। নূরী অস্-সঈদ ('সৈয়দ' নয়) ত্রিশ বৎসর ধরে যে রাজনীতি চালিয়েছেন তার মধ্যে তার ইংরেজ-প্রীতিই যে সবচেয়ে নিন্দনীয় ছিল তা নয়। কিন্তু সভ্যতার যে প্যাটার্নের তিনি ইচ্ছা-অনিচ্ছায় প্রতিভূ ছিলেন সেটা সামন্তবাদ প্যাটার্ন। ইংরেজের কাছে তেল বিক্রী করে যে পয়সা আসতো সেটা সামন্তবাদের খপ্পরেই চলে যেত। ওদিকে ভিতরে ভিতরে জনসাধারণ নূরী এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নেতাদের চেয়ে প্রগতি চিন্তায় অনেক বেশী এগিয়ে গিয়েছিল। তবু নূরী হয়তো সামলে নিতে পারতেন

যদি না তিনি 'ছোটা ডিকটেটরি' স্টাইলে শুধু রাজার সাহায্যে দেশ না চালাতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর জনসাধারণ কতখানি এগিয়ে গিয়েছে তিনি বুঝতে পারেন নি। এ প্যাটার্নটা মিশরের সঙ্গে মিলে যায়। ওয়াফদ্ দলের নেতা এবং রাজা ফারুকও বুঝতে পারেননি মিশরীয় ফল্লাহ (চাষা) কতখানি এগিয়ে গিয়েছে। ফলে রাজা সিংহাসন হারালেন, ওয়াফদের অস্তিত্ব লোপ পেল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় মিশর এবং ইরাকে গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব করলো আর্মি-অফিসাররা। প্রকৃত গণ-আন্দোলনে দেশের সেনানীও যোগ দেবে এ তো ন্যায্য কথা কিন্তু আর্মি-অফিসারদের নেতৃত্বে এবং মোল্লা-পুরুতের নেতৃত্বে কোনো তফাৎ নেই। এদের কেউই সত্যকার গণতন্ত্র চায় না। 'ডিসিপ্লিন', 'শাস্ত্রাধিকারের' দোহাই কেড়ে এরা জনসাধারণের গণতান্ত্রিক মর্যাদা ও অধিকার পদে পদে খণ্ডন করতে চায়।

আমরা শান্তিকামী, এবং পণ্ডিতজী বাগদাদ সম্পর্কে যা বলেছেন তা যে বাগদাদের চিত্ত জয় করতে সক্ষম হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কাল রাত্রে বাগদাদ বেতার পণ্ডিতজীর সম্পূর্ণ উক্তিটি একাধিকবার প্রচার করেছে—শ্রদ্ধার সঙ্গে।

আনন্দবাজার পত্রিকা

মরূদ্যান না মরীচিকা?

১৪ই জুলাই ইরাকে যে রাষ্ট্রবিপ্লব হল তাহ দিয়ে ব্যাপারটার আরম্ভ নয়। এর কিছু'দন পূর্বেই লেবাননের প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপুঞ্জকে জানান যে, তাঁর দেশে যে অল্প-স্বল্প বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে তার পিছনে প্রতিবেশী রাষ্ট্র সিরিয়ার প্ররোচনা এবং অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্য রয়েছে। ফলে রাষ্ট্রপুঞ্জ লেবাননে কয়েকজন 'পরিদর্শক' পাঠান এবং এঁরা যখন তদারকিতে ব্যস্ত এমন সময় ফাটল ইরাকী বোমা! প্রেসিডেন্ট শামুন তখন রীতিমত ভয় পেলেন, কারণ ইরাক যে সিরিয়ার সঙ্গে যোগ দিয়ে লেবাননকে আরও বিপদে ফেলবে, সে সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন দ্বিধা ছিল না। বস্ত্রাকর্ষিতা দ্রৌপদীর ন্যায় তিনি তখন গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। অন্তত তাই করলে ভাল হত। তিনি স্মরণ করলেন মার্কিনিংরেজকে। ফলে মার্কিন সৈন্য নামল লেবাননে এবং ইংরেজ গেল তারই দোসর জর্ডনে।

সঙ্গে সঙ্গে রুশ উদ্ধত এবং অকুণ্ঠ ভাষায় বললে, কর্মটি সর্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ। রাষ্ট্রপুঞ্জ যখন তার পরিদর্শক মারফতে লেবাননের তদারকিতে লিপ্ত তখন রাষ্ট্রপুঞ্জের অন্য

কোন সদস্যকে কিছুমাত্র না জানিয়ে এরকম সৈন্য নামানো বিশ্বশান্তি নষ্ট করা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

বিশ্বের পরম সৌভাগ্য যে, তখন রুশ উত্তপ্ত দুর্যোধনের ন্যায় 'সূচ্যগ্রেণ—' রব ছেড়ে সিরিয়া কিংবা ইরাকী সীমান্তে সৈন্য পাঠায়নি, ভান করেছিল মাত্র। আসলে সে তার সুবুদ্ধির পরিচয় দিল বিশ্বের দৃষ্টি সে দিকে আকৃষ্ট করে এবং তাই নিয়ে আলোচনার বৈঠক ডাকবার জন্য।

তখন রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ জরুরী সাধারণ সম্মেলন বসল। একাশিজন সদস্যের সবাই, কিংবা প্রায় সবাই সেখানে উপস্থিত। পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ বেতার-প্রতিষ্ঠান-গুলো নিজেদের প্রোগ্রাম বন্ধ করে রাষ্ট্রপুঞ্জের আলোচনা সর্ববিশ্বে প্রসার করার জন্য এগিয়ে এল। ক্রিকেটের ভাষায় বলতে গেলে যার নাম 'বল্ টু বল্ কমেণ্টারি'। সেই একাশিজন সদস্যের কেউ যে মৌনব্রত অবলম্বন করবেন সে আশা বা দুরাশা কোন সুস্থ শ্রোতাই করেননি। পনর মিনিট থেকে কে ক' ঘণ্টা বলবেন তারও কিছু ঠিক-ঠিকানা ছিল না। সেই তাবৎ বক্তৃতা কণামাত্র কাট-ছাঁট না করে পুরোপুরি বেতারিত হল। সঙ্গে সঙ্গে ইংরিজি, ফরাসী, স্প্যানিশ ও রুশে অনুবাদ। আমাদের বিশ্বাস, বৈঠকের সভাপতি ছাড়া আর কেউই সব বক্তৃতা শোনেননি। তবে প্রতি বৈঠকের শেষে রাষ্ট্রপুঞ্জের বেতার-টীকাকার প্রতি বক্তৃতার সারাংশ শ্রোতাদের শুনিয়ে দেন।

বক্তৃতাগুলো যে শোনবার মত ছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের শ্রীযুত আর্থার লালও উত্তম বক্তৃতা দেন। সংযত কণ্ঠে, উত্তম উচ্চারণে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতি পরিপূর্ণ সম্ভ্রম দেখিয়ে। তবে এ সম্বন্ধে শ্রীযুত আলভা যা বলেছেন সেটাও সম্পূর্ণ ভুল নয়। যেখানে স্বয়ং আইসেনহাওয়ার এবং বৃহৎ বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী তথা পররাষ্ট্রমন্ত্রী আপন আপন দেশের হয়ে কথা বলেন, সেখানে শ্রীযুত লালের পদমর্যাদা কিঞ্চিৎ অপর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হওয়া বিচিত্র নয়। সোজা বাংলায়, অনেক সময় ধারের চেয়ে ভারেই কাটে বেশী।

'কূটনৈতিকরা সর্বক্ষণ কুটিল কথা বলেন,' বক্তৃতা শুনে এ বিশ্বাস আমার ভাঙল। বস্তুত এঁদের ভিতর অনেকেই ছিলেন গভীর দার্শনিক। ইরাক-জর্ডন-লেবাননের খেই ধরে এঁরা বিশ্বশান্তি সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত চিন্তা করেছেন এবং বার বার সেই সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হবার চেষ্টা করছিলেন যে, শান্তির জন্য কীভাবে জনমত দৃঢ়তর করা যায়, কোন্ নীতি অবলম্বন করলে আজ-এখানে কাল-সেখানে অশান্তিবহ্নি প্রদীপ্ত হয়ে উঠবে না। বিশ্বজন যে এঁদের আলোচনা উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছে এ সম্বন্ধে তাঁরা বিলক্ষণ সচেতন ছিলেন। বস্তুত একদিন বৈঠক বসতে ১১ মিনিট

দেরি হওয়ায় সভাপতি বলেন, বিশ্বজন যখন আমাদের আচরণের প্রতি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, তখন আমাদের আরও সাবধান হওয়া উচিত।

আইসেনহাওয়ার কোন প্রস্তাব উত্থাপন করেননি। তিনি অনেকটা 'আসামী'র মত সাফাই গাইলেন, আমরা লেবানন ত্যাগ করতে সর্বদাই প্রস্তুত—যদি লেবানন সে ইচ্ছা জানায় কিংবা অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যায়।

তাই রাষ্ট্রপুঞ্জের রইল দুটি প্রস্তাব—

১। রুশের পক্ষ থেকে : কালবিলম্ব না করে মার্কিনিংরেজ মধ্য-প্রাচ্য থেকে সরে পড়ুক।

২। নরওয়ে এবং অন্য কয়েকটি রাষ্ট্রের প্রস্তাব : সমস্ত ব্যাপারটা রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি-জেনারেল মিঃ ডাক্ হামারশ্যেল্টের হাতে ছেড়ে দেওয়া হক। সৈন্য সরানোর কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করবেন তিনি।

এ প্রস্তাবে সৈন্য সরানোর পুরো ভরসা নেই, তবে প্রস্তাবকরা বললেন, যেহেতু আইসেনহাওয়াব বিশেষ শর্ত প্রতিপালিত হলে সৈন্যাপসারণে প্রস্তুত তখন সেক্রেটারি-জেনারেলের কার্যকলাপ ঐ দৃষ্টিবিন্দু থেকেই পরিচালিত হবে। সৈন্য অপসারণের খানিকটে ভরসা এতে পাওয়া গেলেও কবে সেই শুভ কর্মটি সমাধান হবে, এ সম্বন্ধে কোন হদিস মূল প্রস্তাব কিংবা তার টীকাতে পাওয়া গেল না। স্পষ্ট বোঝা গেল, এ প্রস্তাবের পশ্চাতে রয়েছেন মার্কিনিংরেজ এবং তাদের খয়েরখাঁরা।

এ দুই প্রস্তাব নিয়ে যখন পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা হচ্ছে তখন শোনা গেল, এশিয়ো-আফ্রিকী রাষ্ট্রগুলি একটি তৃতীয় আপোসী প্রস্তাব সম্বন্ধে চিন্তা করছেন। তার মূল উদ্দেশ্য হবে, সৈন্য সরানো হোক—অ্যাট এন্ আর্লি ডেট, কূটনৈতিক ভাষায় কি বোঝায় তা জানেন শুধু ভাবগ্রাহী জনার্দন। কারণ কথিত আছে, কোন ডিপ্লোমেট যখন বলেন 'নো', তার সোজা অর্থ 'পারহ্যাপস্'; যখন তিনি বলেন 'পারহ্যাপস্', তখন তার সোজা অর্থ 'হ্যাঁ'; এবং তিনি যদি কখনও বলেন 'হ্যাঁ', তা হলে বুঝতে হবে তিনি ডিপ্লোমেট নন।

তখন দেড় দিনে গোটা পাঁচেক বৈঠক হয়েছে মাত্র, এমন সময় মধ্যপ্রাচ্যের তাবৎ আরব রাষ্ট্র একজোট হয়ে সভার মাঝখানে ফাটাল এক বিরাট বম্। সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে তাঁরা নাকি সবাই একটি প্রস্তাবে সম্মত আছেন—এবং জর্ডন ও লেবাননও নাকি তাতে আছেন! প্রস্তাবটি নাকি ইতিমধ্যে গিয়েছে আরবদের ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের আপন আপন রাজধানীতে। তাদের প্রধানমন্ত্রীরা সম্মতি জানালেই প্রস্তাবটি রাষ্ট্রপুঞ্জের বৈঠকে পেশ করা হবে।

বৈঠকে তখন লেগে গেল ধুন্দুমার! যাদের নিয়ে এত শিরঃপীড়া তারাই যদি

একমত হয়ে কোন প্রস্তাব পেশ করে তবে অন্যদের আর ফপরদালালি করবার রইল কী? উৎকট সঙ্কটটা দেখা দিয়েছে লেবানন আর জর্দন বাইরের সাহায্য চাইল বলে; তারা যদি 'শত্রু'র সঙ্গে যোগ দিয়ে বলে তারা নিশ্চিন্ত, তখন মার্কিনিংরেজেরই বা বলবার রইল কী, রুশের হুঙ্কারও তো অর্থহীন।

এ প্রস্তাবের সম্মতি মধ্যপ্রাচ্যের ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র থেকে না আসা পর্যন্ত সভা মুলতুবি করে দিলেই হত, কারণ ওটা এলে যে সর্বজনগ্রাহ্য হবে সে-সম্বন্ধে কারও মনে কোন দ্বিধা ছিল না। তবু বক্তৃতা চলল। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল, বক্তৃতাতে আর কোন ঝাঁজ নেই। উকীল যদি জানতে পারে হাকিম মোকদ্দমার রায় আগেভাগেই লিখে ড্রয়ারে রেখে দিয়েছেন, তখন তার বক্তৃতা আর জমে না।

উত্তর আসতে বোধ হয় ত্রিশ-চল্লিশ ঘণ্টা লেগেছিল। মাঝখানে একটা রাত কেটে গেল। বৃহস্পতিবার রাত্রে সাড়ে বারটায় (নিউ ইয়র্কে বেলা দুটো) যখন দিনের দ্বিতীয় বৈঠক বসবার কথা তখনও খবর আসেনি। সভা নির্ধারিত সময়ে বসল না। টীকাকার 'ক্যানড্ মিউজিক' অর্থাৎ রেকর্ডসঙ্গীত বাজাতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত সুসংবাদ এল। দশটি আরব রাষ্ট্র, যথাক্রমে লেবানন, জর্দন, তুনিসিয়া, মরক্কো, লিবিয়া, মিশর, ইরাক, সউদী আরব, ইয়েমেন, সিরিয়া, একমত হয়ে একে অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবেন না বলে সম্মত হয়েছেন; কাজেই বিদেশী সৈন্য সরানো হক—অ্যাট অ্যান আর্লি ডেট। এবারে অবশ্য, 'আর্লি ডেটে' ভয় পাবার কিছু নেই।

সভাজন একবাক্যে 'সাধু সাধু' রব ছাড়লেন। জাতিপুঞ্জের এটি স্মরণীয় দিবস। এরকম 'ভিটো-হীন' সভা পূর্বে হয়েছে বলে স্মরণে আসছে না। 'জয়তু আরব ন্যাশনালিজম!'

* * *

সবাই উল্লসিত হয়েছেন আরব ঐক্য দেখতে পেয়ে, আরব ন্যাশনালিজম জাগ্রত হয়েছে দেখে। আমরাও হয়েছি।

কিন্তু চিন্তা করে দেখা যাক এতে লাভ হল কার? যদি বলি মার্কিনিংরেজের, তবে যেন কেউ আশ্চর্য না হন। মার্কিনিংরেজের বাসনা, লেবানন ও জর্দন রাষ্ট্রদ্বয় যেন অক্ষত থাকে। তাই তারা জায়গা দুটিতে সৈন্য নামিয়েছিল। এখন তো মিশর, ইরাক, সিরিয়া অর্থাৎ অন্যান্য 'দুশমন' আরব রাষ্ট্রগুলিই সে ভার আপন আপন কাঁধে তুলে নিল! মার্কিনিংরেজ সৈন্যাপসরণের পর যদি জর্দনে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন স্বতঃস্ফূর্ত গণতন্ত্রের আন্দোলন আরম্ভ হয়, তবে তো

গণতান্ত্রিক মিশর, ইরাক, সিরিয়াকে যে শুধু হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে তাই নয়, যেহেতু তাঁরা মৈত্রীসূত্রে বদ্ধ হয়েছেন, অতএব জর্দনের রাজা তাঁদের কাছ থেকে সাহায্য কামনা করতে পারেন। সাহায্য করুন আর নাই করুন—সর্বসম্মত প্রস্তাবে হয়ত অতদূর যাওয়া হয়নি—জর্দন থেকে কোন রাজদ্রোহী ইরাকে পালিয়ে এলে তাকে তো জর্দনের হাতে ফেরত দিতে হবে।

আর কিছু না হক, মিশর ইরাক প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে এখন বসে বসে দেখতে হবে, জর্দন এবং লেবাননের প্রগতিশীল নেতারা কিভাবে ইংরেজ এবং মার্কিনের খয়েরখাঁ বাদশা হুসেন এবং তাদের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর হাতে লাঞ্ছিত হন। অন্তরে অন্তরে এদের কল্যাণ কামনা করলেও প্রকাশ্যে জয়ধ্বনি করতে হবে রাজা হুসেনের। মার্কিনিংরেজ সৈন্য অপসারণের পরও অদৃশ্য সৈন্যসঙ্কুল মার্কিনিংরেজ ঘাঁটি হয়ে রইল জর্দন লেবানন!

প্রতিক্রিয়াশীলরা আরব ভুবনে নূতন পাট্টা (লীস্) পেল!

এত দাম দিয়ে ঐক্য!

দেহলি প্রান্তে

১

ভারতের আর সর্বত্র যে প্রকারে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে, দিল্লীতেও প্রায় সেই রকমই; তবে কি না দিল্লী রাজধানী, এখানে ভারতের বড় কর্তারা বসবাস করেন, নানা দেশের রাজদূতরা নানা প্রকারের বেশভূষা পরে আমাদের পালা-পরবে আসেন, ভারতের সব প্রদেশের লোক দিল্লীতে বড় বড় আসন নিয়ে বসেছেন, তাই এখানকার পালা-পরব যতই আমাদের নিজস্ব হোক না কেন, তার চেহারা শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক হয়ে যাবেই যাবে।

তবে কি না দিল্লীর লোক কলকাতা কিম্বা বোম্বায়ের তুলনায় গরীব বলে কলকাতা বা বোম্বায়ের লোক যখন পার্টি দেন, তখন তার জৌলুস-রওশন, শান-শওকত হয় অনেক বেশী। এখানকার অধিকাংশ বড় লোক চাকরি করেন, চাকরিতে পয়সা কোথায়? পয়সা তো বোম্বাই-কলকাতার ব্যবসায়ীদের হাতে। আমাদের পার্টিতে চা আর মোমফলী; কলকাতার পার্টির কথা স্মরণ করে আর মন খারাপ করব না।

তা হোকগে। পালা-পরবে কে কত পয়সা খরচ করল সেইটেই আসল কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে শহরের পাঁচজন এদিনে আনন্দিত হয়েছে কিনা, এবং সে

আনন্দ—তা সে যে কোনো পন্থাতেই হোক—প্রকাশ করবার সুযোগ পেল কি না?

* * *

তা হয়ত পেয়েছিল। অন্ততঃ আমি যে পাঁজরাপোলে থাকি, সেখানেও নৃত্য-বাদ্য এবং উত্তম আহারাদির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বাইরের লোককেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁদের বেশীর ভাগই আসতে পারেননি। সকলের বাড়ীতেই পরব—গ্রামসুদ্ধ লোকের বড় ছেলের বিয়ে যদি একই দিনে হয়, তবে কে যাবে কার বাড়ী?

কাজেই আমরা আপোষে আনন্দ করলুম। 'বন্দে মাতরম' থেকে আরম্ভ করে খাস দিল্লীর গজল, কসীদা বিস্তর গাওয়া হল। লাউড-স্পীকার দিয়ে সেসব গান রবাহূতদের শোনানো হল এবং সর্বশেষে কোর্মা-পোলাওয়ের ভূরিভোজন হল।

আমরা যখন পত্রপুষ্প, বেলুন-ঝালর ভর্তি বিরাট ঘরে বসে গান শুনতে, একে অন্যের সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা কইতে ব্যস্ত ছিলুম, তখন আমাদের চাকরবাকরের ছেলেমেয়েরা আমাদের আনন্দোৎসব উঁকি মেরে মেরে দেখছিল। আমার গায়ে গণ্ডারের চামড়া—আমার অস্বস্তি বোধ হয়নি, কিন্তু আমার দু'একটি সহৃদয়, স্পর্শকাতর বন্ধু আমার দৃষ্টি সে-দিকে আকর্ষণ করে বললেন, তাঁদের আনন্দ সর্বাঙ্গসুন্দর হচ্ছে না।

আমি বললুম, 'সে-সব দিন গেছে। আগের আমলে পালা-পরবের মানেই ছিল কাঙালী-ভোজন। গরীব দুঃখীরা খেয়ে খুশী হত, কর্তারা খাইয়ে খুশী হতেন আর পাড়ার জোয়ান মদ্দেরা পরিবেশন করে সুখ পেত। ঐ ছিল তখনকার দিনের 'ম্যাস্ কনটাকট্'। এখন আমরা 'ম্যাস্ কনটাক্ট্' করি খবরের কাগজে আর মিটিঙে—সেসব মিটিঙে আবার 'ম্যাস্' আসেও না।

* * *

আমার আরেক লক্ষ্মী-ট্যারা ঠোঁটকাটা বন্ধু আছেন। তিনি কখনই কোনো বস্তু সোজা দেখতে পান না। আমাকে বললেন, 'আজ আর এমন কি দিন যে 'মোচ্ছব' করতে হবে?'

আমরা সবাই তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকালুম।

বললেন, '২৬শে জানুয়ারী আমাদের সত্যকার স্বাধীনতা দিবস। ১৫ই আগস্টে তো আমরা স্বাধীনতা পাইনি—পেয়েছি ডমিনিয়নত্ব।'

সুশীল পাঠক, আপনারা একটু বিবেচনা করে দেখবেন।

* * *

স্বাধীনতা দিবসেই আমি পিছন পানে তাকাই। ভাবি, এই এক বৎসরে দেশ

কতখানি এগলো ?

বিত্তসম্পদের দিক দিয়ে কতখানি এগিয়েছি বা পিছিয়েছি, তার হিসেব আমার পক্ষে করা সুকঠিন, সুকঠিন কেন অসম্ভব। চিন্তা এবং ভাবের জগতের উন্নতি-অবনতির সম্বন্ধে যে বুক ঠুকে কিছু বলব, সে শাস্ত্রাধিকারও আমার নেই। তবু যখন ঐ জগতেরই 'দাঁড়ায়ে বাহির দ্বারে মোরা নরনারী', তখন রবাহূতরূপে গুণিজনের আলোচনার কিছু কিছু বুঝতে পেরে যেসব সমস্যার সামনে এসে পড়েছি, সেগুলো নিবেদন করি।

পণ্ডিতজী সব সময়েই বলেন, সাম্প্রদায়িকতা এবং হিংসাবৃত্তি (ভায়োলেন্স) ত্যাগ না করলে ভারতের উদ্ধার নেই। হিংসাবৃত্তি কাদের, কেন তারা হিংস্র, সে-কথা আমি ভালো করে জানিনে, কারণ রাজনীতি আমি বুঝিনে এবং যাঁরা হিংস্র, তাঁরা বোধ হয় রাজনৈতিক মতবাদবশতঃই হিংস্র হয়েছেন, তাই তাঁদের নিয়ে আমার কিছু বলার নেই।

সাম্প্রদায়িকতা যেখানে ঐতিহ্য এবং বৈদগ্ধ্যগত (ট্র্যাডিশনাল এবং কালচারেল) সেখানে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

আমাদের দেশের প্রত্যেক সম্প্রদায় কোনো না কোনো ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এদেশে হিন্দু সম্প্রদায়, মুসলমান সম্প্রদায়, খৃষ্টান সম্প্রদায় ইত্যাদি (এদের ভিতরে আবার উপসম্প্রদায় আছেন, কিন্তু সেগুলো নেশন বা জাতির সামনে এখনো আমাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি)। অধিকাংশ হিন্দু বিশ্বাস করে, হিন্দু ধর্ম সর্বোত্তম ধর্ম, অধিকাংশ মুসলমানেরও বিশ্বাস ইসলাম পৃথিবীর শেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। এ বিশ্বাস থেকে এদের টলানো উপস্থিত কিম্বা অদূরভবিষ্যতে অসম্ভব। এবং তার প্রয়োজনও নেই, কারণ যতক্ষণ অবধি এ বিশ্বাস আমাদের জাতীয় (নেশনাল) জীবনে কোনো তোলপাড় সৃষ্টি না করে ততক্ষণ আমাদের কোনো ভাবনা নেই। আমার মা দুনিয়ার সব মায়ের চেয়ে ভালো রাঁধতে পারতেন। এ বিশ্বাস অধিকাংশ পুত্রই আপন মা সম্বন্ধে পোষণ করে, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু যদি কেউ বলে, মুসোলিনী হিটলার সেটা বলতে পারতেন যে, বাদবাকী দেশকে তাঁর মায়ের রান্নাই খেতে হবে, তা হলেই চিন্তির।

হিন্দুরা ১৯৫২ সালে এ আশা করেন না যে, মুসলমানরা হিন্দু হয়ে যাবে কিম্বা মুসলমানরাও অনুরূপ প্রত্যাশা করেন না। মনে হচ্ছে একে অন্যের ধর্ম মেনে নিয়েছেন, তাই এখন দাঁড়িয়েছে বৈদগ্ধ্য সংস্কৃতি-কৃষ্টির প্রশ্ন।

সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের বৈদগ্ধ্য দেশের বৈদগ্ধ্য নিরূপণ করে। ইতিহাসও তাই বলে। কিন্তু বৈদগ্ধ্য আর ধর্ম এক জিনিস নয়, সেটা বিবেচনা করে দেখতে হবে।

অন্তকার ইংরেজ, গ্রীক এবং রোমান বৈদগ্ধ্য স্বীকার করে নিয়েছে, এখনো প্রতিদিন সে তার সাহিত্য, নাট্য, অলঙ্কার ইত্যাদি গ্রীক এবং লাতিন বৈদগ্ধ্য থেকে চেয়ে নিয়ে আপন বৈদগ্ধ্য সমৃদ্ধ করে—কিন্তু সে গ্রীক এবং রোমান দেব-দেবীর পূজো করে না, অর্থাৎ গ্রীক এবং রোমান ধর্ম স্বীকার করে না। আমরা মোন্-জোদড়োর সভ্যতা নিয়ে গর্ব করি, কিন্তু আজ যদি সপ্রমাণও হয় যে, মোন্-জোদড়োবাসী ইঁদুরের পূজো করতো, কিম্বা নরবলি দিত, তাই বলে আমরা এসব কর্মে লিপ্ত হব না।

এইখানেই আমাদের সমাধান। হিন্দুধর্ম ধর্ম—ধর্ম-হিসেবে সম্মানিত হবে, বহু হিন্দু তাঁদের জীবনের চরম মোক্ষ বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ পদ্ধতিতে পাবেন (কোনো কোনো অহিন্দুও পাবেন—যেমন মনে করুন, জর্মন শোপেনহাওয়ার উপনিষদকেই আপন জীবনমরণের কাণ্ডারী বলে ধরে নিয়েছিলেন) কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনে আমরা দেখব বেদ থেকে রবীন্দ্রনাথ (এমন কি নজরুল ইসলাম) পর্যন্ত আমাদের বৈদগ্ধ্য-ভাণ্ডারে কে কি কি সম্পদ দিয়ে গিয়েছেন?

এই সুদীর্ঘ চার হাজার বৎসরের ইতিহাসে বহু অ-হিন্দু আমাদের বৈদগ্ধ্যে অনেক কিছু দিয়ে গিয়েছেন, আমরা গ্রীক (যবন—আয়োনিয়ান) ইরানির কাছ থেকে জ্যোতিষ এবং ভাস্কর্যের (গান্ধার-কলা) অনেক কিছু শিখেছি এবং যুগ যুগ ধরে বহু মানবের কাছ থেকে নিয়েছি ও দিয়েছি। এই দিয়ে আমাদের বৈদগ্ধ্য গড়া হয়েছে (সুবোধ ঘোষের আনন্দবাজারের স্বাধীনতা সংখ্যায় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

ধর্মের এই বৈদগ্ধ্যগত মূল্য সম্যকরূপে বোঝার জন্য প্রয়োজন শাস্ত্রপাঠ এবং শাস্ত্রের অনুপ্রাণিত অন্য সব পুস্তক অধ্যয়ন। তা না, আজ যে রকম বহু স্থলে হচ্ছে—এবং পণ্ডিতজী এই জিনিস থেকে আমাদের সাবধান করছেন—বহু বিবেকহীন লোক ধর্মের নামে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান সবাইকে ওস্কাবে।

তাই আজ একবাক্যমনে ভারত ভাগ্যবিধাতাকে নমস্কার করি, যিনি পঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাত-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসিক-মুসলমান-খৃষ্টানীকে সম্মিলিত করেছেন—সেই দেবের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা পুনরায় ভারতের সর্ব ধর্মবিশ্বাসীকে আহ্বান করি—

মার অভিষেকে এস এস ত্বরা
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে—
আজি ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বার্ষিকী মহানগরী দিল্লীতে সাড়ম্বরে সমাধান হল। বিস্তর ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী, তরো-বেতরো কামান, বন্দুক, রাজপুত মারাঠা গুর্খা শিখ সৈন্যবাহিনী, নৌবহরের অফিসার-মাল্লা-খালাসী, রেডক্রস-নার্সিংও ইত্যাদির বহুসহস্র লোক বহুতর ব্যাণ্ডবাদ্যি বাজিয়ে রাষ্ট্রপতিকে সম্মান জানানোর পর এক দীর্ঘ মিছিল বানিয়ে শহরবাসীকে তাক লাগিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে তিন ঝাঁক জঙ্গী বিমান বিকট শব্দ করে বিদ্যুৎগতিতে মাথার উপর দিয়ে আকাশের বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে উড়ে গেল।

প্রাচীন যুগের লোক—কাণ্ডকারখানা দেখে আমার তো পিলে চমকে গেল। বাপরে বাপ—শান্তির সময়ই যখন এদের এরকম চেহারা তখন লড়াইয়ের সময় না জানি এরা কি রকম মারমুখো হয়ে ওঠে।

আমাদের কর্তাদের কাণ্ডজ্ঞান আছে। আমার মত আরো পাঁচটা লোক যে এরকম ঘাবড়ে যাবে সে-কথা তাঁরা আঁচতে পেরে তাপ দাওয়াইয়ের ব্যবস্থাও করেছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সংস্কৃতি বৈদগ্ধ্যের প্রতীক সম্বলিত একখানি মোলায়েম মিছিলের ব্যবস্থাও তাঁরা করেছিলেন।

কোন প্রদেশে আপন সংস্কৃতির কি প্রতীক বেছে নিয়েছিলেন তার সবিস্তর বর্ণনা খবরের কাগজে বেরিয়েছে—আপনারা নিশ্চয়ই পড়েছেন। ছবিও বেরিয়েছে, কাজেই ভালোমন্দ বিচার করতে কোন অসুবিধে হবে না।

আমি কূপমণ্ডুক বাঙালী, বাঙলা দেশ নিয়েই আমার কারবার।

বাঙলাদেশের প্রতীকরূপে সরস্বতী পূজোর নক্সা এই মিছিলে দেখানো হয়েছিল। দিল্লীর খবরের কাগজগুলোতেও আগের থেকে বলা হয়েছিল, বাঙলা দেশ বাণীর সাধক, তাই বাঙলা দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার সরস্বতী পূজা।

মনে বড়ই গর্ব হয়েছিল। কারণ বাঙলা দেশ সম্বন্ধে রায় পিথৌরা এখনও যেটুকু আশ্বাস মনের কোণে পোষণ করে সেটুকু তার বিদ্যাচর্চা নিয়ে। যেদিন এইটুকুও যাবে সেদিন বাজার শেষ।

বাঙালীর বেশীর ভাগ বেকার, চাকরিতেও সে অন্য প্রদেশের কাছে মার খায়, বাঙলার মোটা মোটা ব্যবসা কে করে, সেকথা তুলে নিরর্থক প্রাদেশিক বিদ্বেষ জানাতে চাইনে, দিল্লীতে বাঙালী কল্কে পায় না, সুভাষের পর বাঙলা দেশে নেতা জন্মাননি, কত লক্ষ বাঙালী উদ্বাস্তু হয়ে জীবন্মৃত অবস্থায় আছে তার হিসেব নিতে মন বিমুখ। 'তথাস্তু বলিয়া দেবী কৈলা বরদান। দুধে-ভাতে থাকিবেক তোমার

সন্তান।' পোড় খেয়ে খেয়ে নাস্তিক মন এ বাক্যে আর বিশ্বাস করে না, কিন্তু একটি সত্যে এখনো আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, বাঙলা দেশ এখনো বিদ্যার সম্মান করে।

রায় পিথৌরা গর্দিশের ফেরে দিল্লীতে বাস করেন। যে কালাপানির নামে বাঙালী একদিন ভিরমি যেত সেই কালাপানিতেই যখন আজ বাঙালী পেটের ধান্দায় মাথা কোটে তখন দিল্লী বাস তো স্বর্গবাস। তবু বলি, ওয়ারী বালিগঞ্জে মিলে যদি একদিন আন্দামানকে দ্বিতীয় বাঙলা বানাতে পারে তবে আমি দিল্লী ত্যাগ করে সেই কালাপানিই যাব।

দিল্লীকে নমস্কার। এখানে সব কিছু আছে অস্বীকার করিনে—ইস্তেক বাঙালী-বল্লভ ইলিশ মাছও পাওয়া যায়। এখানে পারমিট পাওয়া যায়, এম্বেসি-লিগেশনে ঘোরাঘুরি করলে দাওয়াত পাওয়া যায়, চোখ-কান খোলা রাখলে 'করেন' যাবার মোকাও মেলে, শুবো-সাম মিটিঙ-মাটিঙ যখন লেগেই আছে তখন একটুখানি তত্ত্বতাবাশ করলে সভাপতি হয়ে কাগজে ছবি তোলানো কঠিন কর্ম নয়, আরো কত কী আছে সেসব কথা ফাঁস করে দিয়ে আমি খামোখা কম্পিটিটর বাড়াতে চাইনে।

কিন্তু বিদ্যাচর্চা—রামচন্দ্র!

বিদ্যার বাহন বই। গুণীরা তাই আজীবন বই জমান। এখানকার গুণীরাও বই জমান—তবে সে বই চেক বই।

দিল্লীতে বিদ্বান নেই, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু দিল্লীতে বই নেই। এখানকার বিদ্বানরা তাই, ঢাল নেই, তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দারের দল।

এক হিসেবে ভালোই। এখানে এন্তার বিদ্যাচর্চা থাকলে মূর্খ রায় পিথৌরা দুমুঠো অন্ন কামাতো কি করে? এ্যাদ্দিনে তার সব 'পাণ্ডিত্য' ফাঁস হয়ে যেত আর কুলোর বাতাস খেতে খেতে কহাঁ কহাঁ চলে যেতে হত।

কি বলতে গিয়ে কোথায় এসে পড়েছি।

বাঙলা দেশ বাণীর সেবা করে সে কথা তো মানলুম—তা সে না হয় আজকের দিনে নোটবুক মুখস্থ করেই হোক।

কিন্তু প্রজাতন্ত্র দিবসে আমার মনে হল, এই প্রজাতন্ত্র সফল করার জন্য বাঙালী যে কতটা আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে দিয়ে জ্বলেছে তার খবর বোধ হয় অবাঙালীদের একটুখানি জানানো উচিত।

বিবেকানন্দ, বঙ্কিম, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র এরকম মহাত্মা বাঙলার বাহিরে বোধ হয় বিস্তর জন্মাননি। কি কৌশলে এঁদের নিয়ে দ্রষ্টব্য রসবস্তু নির্মাণ করা যেত বাঙালী শিল্পীরা সে কথাটি এই বেলা ভেবে রাখলে ভাল হয়।

আসছে বছরও তো এই পরব হবে।

* * *

লাহোর রাওলপিণ্ডিতে নাকি গুটিকয় 'চিরকুমার সভা' অর্থাৎ 'ব্যাচেলরস্ ক্লাবের' গোড়াপত্তন করা হয়েছে। সদস্যদের আদর্শ আমরণ অবিবাহিত থাকা; কেউ যদি কোনো কুহকিনীর পাল্লায় পড়ে সন্মার্গভ্রষ্ট হওয়ার উপক্রম করে তবে আর পাঁচ ভাইয়ের কর্ম হবে তখন তাঁকে সে রমণীর কেশ-পাশ নাগ-পাশ থেকে আজাদ করা।

বিবাহ-প্রস্তাবকে যখন সর্বোত্তম প্রস্তাব বলা হয় তখন এ প্রস্তাবটিকে আমরা অত্যুত্তম প্রস্তাব বলে মেনে নিচ্ছি। বিশেষতঃ যখন হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের সব মহাজনরাই জানেন যে, পশ্চিম পাঞ্জাবে নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা বেশি। চিরকুমার অনেককে এমনিতে থাকতে হত—ক্লাব বানিয়ে চেল্লাচিল্লি করে যদি 'নেসেসিটি'কে 'ভার্চু' বানানো যায়, বাঙলায় যাকে বলি—'উড়ো-খই গোবিন্দায় নমঃ' তা হলে হাটের মধ্যিখানে হাঁড়ি ভেঙে কার কি ফয়দা?

উঁহু, সেটি হচ্ছে না। একদল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি উল্টো ক্লাবের পত্তন করেছেন ছোকরাদের বাউণ্ডুলোমি থেকে খারিজ করে 'কবুল', 'কবুল', 'কবুল' বলাবার জন্য—এ ক্লাবে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা আছেন কিনা সে খবর এখনো আমরা পাইনি।

এঁদের বক্তব্য, "ইসলাম চিরকৌমার্য সখ্‌ৎ না-পসন্দ করে; বিয়ে না করলে মুসলমান মুসলমানই নয়, এসব অনৈসলামিক কায়দা-কেতা—পাকিস্তানকে না পাক করে ফেলবে।"

শুনে তাজ্জব মানলুম।

বিয়ে করতে চাইলে সে সম্বন্ধে অনেক উপদেশ কুরান-শরীফে আছে; কিন্তু কেউ বিয়ে না করতে চাইলে কুরান তো তার উপর কোনো অভিসম্পাত দেননি। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, মিথ্যে সাক্ষী দেওয়া, পরকীয়া, আল্লাকে অস্বীকার করা এসব অপকর্ম যে 'গুনাহ' সে কথা কুরানে স্পষ্ট লেখা আছে, এমন কি এসব কর্ম করলে ইহলোকে এবং পরলোকে তার কি সাজা সে কথাও সবিস্তর বয়ান করা হয়েছে কিন্তু শাদী না করা গুনাহ (পাপ) এ কথা তো কুরানের কোথাও নেই। তাহলে যে লাহোরের মুরব্বিরা বললেন, বিয়ে না করা অনৈসলামিক সেটা তাঁরা পেলেন কোন্ বগল-নামা থেকে?

মুরুব্বিরা হয়ত বলবেন, "আরে বাপু, কুরানেই কি সব কথা লেখা আছে? এই যে নিত্যি নিত্যি পাঁচ বকৎ নেমাজ পড়ছো সে কথাই কি আর কুরানে পষ্টা-পষ্টি লেখা আছে?—আছে 'হদিসে'। কুরানের পরে রয়েছেন 'হদিস'—'হদিস' ভী মানতে হয়।" শ্রুতির পর যে রকম স্মৃতি, কুরানের পর তেমনি

হদিস—না মেনে উপায় নেই।

বুখারী (আমাদের যে রকম মনু) সাহেব যে হদিস সঞ্চয়ন করেছেন তাতে মহাপুরুষ মুহম্মদ কখন কাকে কি উপদেশ দিয়েছিলেন তার উত্তম বর্ণনা রয়েছে। আরো অনেকেই করেছেন, কিন্তু বুখারী সাহেবকেই এ বাবদে সবচেয়ে বেশী মান্য করা হয়—কি লাহোর, কি দিল্লী, কি কাইরো, কি মরক্কো, সর্বত্রই।

বুখারী সাহেব বয়ান করেছেন, "একদা এক দীন মুসলিম মহাপুরুষ (মুহম্মদ) সমীপে আগমন করতঃ নিবেদন করল, 'হে আল্লার প্রেরিত পুরুষ, এই অধম অতিশয় অর্থহীন। স্ত্রীধন প্রদান করিয়া বিবাহ কবিবার ক্ষমতা আমার নাই—অথচ আমি কামাগ্নিতে অহরহ দগ্ধ হইতেছি। অনুমতি করুন, আমি অস্ত্রোপচার করতঃ ক্লৈব্যাবস্থা প্রাপ্ত হই।' মহাপুরুষ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, 'না। তুমি উপবাস করো এবং আল্লাসমীপে অহরহ প্রার্থনা করো যেন তিনি তোমার মুসকিল আসান (সরল) করিয়া দেন।' "

পূর্বেই নিবেদন করেছি, লাহোর পিণ্ডিতে মেয়েছেলে পুরুষের তুলনায় কম। চিরকুমাররা অবশ্য বলেছেন, তাঁদের অর্থাভাব বিয়ে না করার অন্যতম কারণ। এঁদের যুক্তি ও যে ব্যক্তি মহাপুরুষের কাছে গিয়েছিল তাঁর যুক্তি একই। সর্বাব্যবস্থাতে বিয়ে করা যদি চরম কাম্য হত তবে মহাপুরুষ নিশ্চয়ই তাকে বিয়ে করতে আদেশ দিয়ে বলতেন (মুরুব্বিরা সচরাচর যে রকম বলে থাকেন), "রুটি দেনে-ওলার মালিক খুদা, তিনিই পেট দিয়েছেন, তিনিই রুটি দেবেন। তুমি বিয়ে করো।"

অর্থাভাব থাকলে চুরিচামারি করে বিয়ে করা অনুচিত সে কথা মহাপুরুষ মেনে নিয়েছিলেন—লাহোরের মুরুব্বিরা মানছেন না। তাই বোধহয় শাস্ত্রে বলে ধর্মের গতি সূক্ষ্ম।

আর যদি বলা হয়,

"মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন" ইত্যাদি—তা হলে নিবেদন, যে খাজা নিজামউদ্দীন আউলিয়া সম্বন্ধ গত সপ্তাহে নিবেদন করেছিলুম, তিনি এবং অধিকাংশ সুফীই চিরকৌমার্যব্রত অবলম্বন করে মহবুব-ই-ইলাহি (ব্রহ্মবান্ধব) উপাধি লাভ করেছিলেন।

৩

বোম্বায়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণণ বলেন, এদেশের সব চেয়ে বড় কর্তব্য আপামর জনসাধারণের ভিতর শিক্ষার প্রচার ও প্রসার করা এবং বেকার সমস্যার

নিরঙ্কুশ সমাধন করা।

এ অতি সত্য কথা—এমন কি পৃথিবীর বর্বরতম দেশও এ তত্ত্ব মেনে নেবে। কিন্তু প্রশ্ন, শিক্ষার বিস্তার এবং প্রসার করা যায় কি প্রকারে? পূর্ববঙ্গে একটি প্রবাদ আছে,

'যত টাকা জমাইছিলাম
শুঁটকি মাছ খাইয়া
সকল টাকা লইয়া গেল
গুলবদনীর মাইয়া!'

যত রকমের খাজনা হতে পারে, যত প্রকারের ন্যায্য অন্যায্য ট্যাক্স হতে পারে, সবই তো চাঁদপানা মুখ করে দিচ্ছি। সরকারের হাতে সে টাকা জমা হচ্ছে—এবং তার বেবাক খরচ হয়ে যাচ্ছে এ-খাতে ও-খাতে সে-খাতে, অর্থাৎ গুলবদনীর মাইয়াই সব টাকা নিয়ে যাচ্ছে, শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তার শতাংশের এক অংশও উদ্বৃত্ত থাকছে না।

কাজেই গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলি কি করে, পুরনোগুলোই বা চালু রাখি কোন্ কৌশলে?

* * *

কিন্তু আমার মনে হয় পুরনো স্কুল চালু রাখা আর নূতন স্কুল খোলাই শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রধান কর্ম নয়। খুলে বলি;—

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, কোন বিশেষ গ্রামে গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে একটি ভালো পাঠশালা উত্তমরূপে চালু আছে, প্রতি বৎসর দশ-বারোটি ছেলে শেষ পরীক্ষা পাশ করে বেরিয়ে যাচ্ছে, কেউ কেউ বৃত্তিও পাচ্ছে, কিন্তু তবু যে কোনো সময় আপনি সে গ্রামে গিয়ে যদি হিসেব নেন, কটি ছেলে লিখতে পড়তে পারে, তবে দেখবেন দশ বারোটির বেশী না, বাদবাকি আর সবাই লেখাপড়া ভুলে গিয়েছে এবং যে দশ-বারোটি এখনো কেঁদে কুকিয়ে পড়তে পারে তারাও শীঘ্রই সম্পূর্ণ নিরক্ষর হয়ে যাবে। অবশ্য আমি এস্থলে সাধারণ চাষা-মজুরের কথাই ভাবছি—মধ্যবিত্ত কিম্বা বিত্তশালী পরিবারের কথা উঠছে না।

এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবেন—আমরা চাষার ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে দিয়ে ভাবি, আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু একথা ভাবিনে, তারা পরীক্ষায় পাশ করার পর পড়বে কি? এরা যে পুনরায় নিরক্ষর হয়ে যায়, তার একমাত্র কারণ তাদের কাছে পড়বার মত কিছু থাকে না।

ইয়োরোপের চাষা মজুর আমাদের মত গরীব নয়। তারা যে নিরক্ষর হয়ে

যায় না তার একমাত্র কারণ তারা খবরের কাগজ পড়ে এবং মেয়েরা ক্যাথলিক হইলে প্রেয়ার বুক আর প্রটেস্টাণ্ট হলে বাইবেল পড়ে। অবরে সবরে হয়ত একখানা নভেল কিম্বা ভ্রমণকাহিনী পড়ে, চাষা বাড়ীতে না থাকলে হয়ত তার হয়ে চিঠি-চাপাটিও লেখে, কিন্তু এগুলো আসল কারণ নয়—আসল কারণ খবরের কাগজ, প্রেয়ার বুক এবং বাইবেল।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমাদের চাষা খেতে পায় না, সে খবরের কাগজ কেনবার পয়সা পাবে কোথায়?

তাই দেখতে পাবেন, যে চাষা কোনোগতিকে তার ছেলেকে পাঠশালা পাশের সময় একখানা রামায়ণ কিম্বা মহাভারত কিনে দিতে পেরেছিল তার বাড়ীতে তবু কিছুটা সাক্ষরতা বেঁচে থাকে। এই আংশিক বাঁচাওতাটা কিন্তু প্রধানতঃ বাঙ্গলাদেশে। হিন্দী ভাষীদের তুলসীরামায়ণ পড়ে সে লাভ হয় না, কারণ তুলসীর ভাষা আর আধুনিক হিন্দীতে প্রচুর তফাৎ। তুলসীব ভাষা দিয়ে আজকের দিনে চিঠি লেখা যায় না—কাশীরাম কিম্বা কৃত্তিবাসেব ভাষার সঙ্গে কিন্তু আধুনিক বাঙ্গলার খুব বেশী পার্থক্য নেই।

তাই দেখতে পাবেন, মুসলমান চাষা পাঠশালা পাশের পর খুব শীঘ্রই নিরক্ষর হয়ে যায় কারণ সে রামায়ণ-মহাভাবত পড়ে না এবং বাঙ্গলা ভাষায় এ রকম ধরণের সহজ সবল মুসলমানী ধর্মপুস্তক নেই। ভাবতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পরিস্থিতিটা কি রকম তার খবব আমার জানা নেই, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করলে আমরা শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিস্তব হদীস পাবো।

তাহলে ওষুধ কি?

যে উত্তর সকলের প্রথম মনে আসবে সে হচ্ছে, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরী বসানো। কিন্তু অত টাকা যোগাবে কোন গৌরী সেন? সরকার তো দেউলে। তাহলে?

এইখানে এসে আমিও আটকা পড়ে যাই। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নূতন ইস্কুল খোলার চেয়েও বড কাজ পড়ার জিনিস সাক্ষর ছেলেমেয়েদের হাতে দেওয়া—বিনি পয়সায় কিম্বা অতি অল্প দামে।

আমি বহু বৎসর ধরে এ সমস্যা নিয়ে মনে মনে তোলপাড় করেছি, বহু গুণীর সঙ্গে আলোচনা করেছি, দেশ-বিদেশে উন্নত অনুন্নত সমাজে অনুসন্ধান করেছি—তারা এ সমস্যার সমাধান কি প্রকারে করে, কিন্তু কোনো ভালো ওষুধ এখনো খুঁজে পাইনি। আমার পাঠকেরা যদি এ সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত আমাকে জানান, তবে তার আলোচনা করলে আমরা লাভবান হব সন্দেহ নেই।

* * *

অন্য এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণ বলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়দের কর্তব্য ছাত্রদের 'স্পিরিচুয়াল ডিরেকশন্' দেওয়া।

আমার মনে হয়, এই মাত্র আমরা যে সমস্যা নিয়ে বিব্রত হয়েছিলুম সেই সমস্যারই এ আরেকটা দিক।

'স্পিরিচুয়াল' বলতে শ্রীরাধাকৃষ্ণণ নিশ্চয়ই 'রিলিজিয়াস' বলতে চাননি—তাহলে হাঙ্গামা অনেকখানি কমে যেত—তাই মোটামুটিভাবে ধরা যেতে পারে, তিনি আত্মার প্রয়োজনের দিকটাতেই ইঙ্গিত করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কর্ম ছাত্রকে তার দেশের বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করা—এবং বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, ভারতীয় বৈদগ্ধ্যে আত্মার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজনের অধিক সুস্বাদ আহার্য রয়েছে। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে অধ্যাপকেরা যদি ছাত্রকে ভারতীয় বৈদগ্ধ্যের প্রতি অনুসন্ধিৎসু করাতে পারেন, সে বৈদগ্ধ্যের উত্তম উত্তম বস্তুর রসাস্বাদ করাতে শেখান, তবে ছাত্র নিজের থেকেই তার প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক ধন চিনে নিতে পারবে। সকলেরই কাজে লাগবে এমন মুষ্টিযোগ যখন মুষ্টিগত নয়, তখন ছাত্রের সামনে গন্ধমাদন রাখা ছাড়া উপায় নেই—যে যার বিশল্যকরণী বেছে নেবে।

কিন্তু সমস্যা তৎসত্ত্বেও গুরুতর। ছেলেদের পড়তে দেব কি? ভারতীয় বৈদগ্ধ্যের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ সংস্কৃত-পালিতে, তিন ভাগ ইংরাজিতে, আর মেরে-কেটে দু ভাগ বাঙ্গলায়। অথচ আজকের দিনে সব ছেলেকে তো আর জোর করে বি-এ অনার্স অবধি সংস্কৃত পড়াতে পারিনে। এবং তাতেই বা কি লাভ? ক'জন সংস্কৃতে অনার্স গ্র্যাজুয়েটকে অবসর সময়ে সংস্কৃত বইয়ের পাতা ওল্টাতে আপনি আমি দেখেছি। সংস্কৃত গড় গড় করে পড়া শিখতে হলে টোল ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অতএব মাতৃভাষাতেই আমাদের বৈদগ্ধ্য-চর্চা করতে হবে।

এবং সেখানেই চিন্তির।

আজ যদি আপনি বেদ, উপনিষদ, ষড়দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার, নৃত্য-নাট্য-সঙ্গীত-শাস্ত্র অলঙ্কার বাঙ্গলা অনুবাদে পড়তে চান তবে একবার ঘুরে আসুন কলেজ স্কোয়ারে বইয়ের দোকানগুলোতে, যে সব বইয়ের বাঙ্গলা অনুবাদ হয়ে গিয়েছে সেগুলোই যোগাড় করতে গিয়ে আপনাকে চোখের জলে নাকের জলে হতে হবে। আর কত শত সহস্র পুস্তক যে আপনার পড়তে ইচ্ছে হবে, অথচ অনুবাদ নেই—তার হিসেব করবে কে?

হিন্দীওলাদের তো আরো বিপদ। আমাদের চেয়ে ওদের অনুবাদ সাহিত্য

অনেক বেশী কম জোর। এই দিল্লীর কনট সার্কাসে আমি হিন্দী বইয়ের দোকানে সার্কাসের ঘোড়ার মতই চক্কর লাগাই—আজ পর্যন্ত কোনো সংস্কৃত বইয়ের উত্তম হিন্দী অনুবাদ চোখে পড়ল না যেটি বাড়ীতে এনে রসিয়ে রসিয়ে পড়ি।

মারাঠী ভাষায় তবু কিছু আছে, গুজরাতীতে তারো কম। আসামীতে তো প্রায় কিছুই নেই, ওড়িয়ার খবর জানিনে—তবে যেহেতু শিক্ষিত আসাম এবং উড়িষ্যা সন্তান মাত্রই বাঙ্গলা পড়তে পারেন তাই তাঁদের জন্য বিশেষ দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

মোদ্দা কথায় ফিরে যাই। রাধাকৃষ্ণণ তো দায় চাপিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর—অর্থাৎ অধ্যাপকদের উপর। কিন্তু হায়, তাঁদের তো দরদ নেই এ সব জিনিসের প্রতি। আর স্বয়ং রাধাকৃষ্ণণের যদি দরদ থাকতো তবে তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয় ছেড়ে উপ-রাষ্ট্রপতি হতে গেলেন কেন ?

কলকাতাতে বর্ষা বসন্ত আছে বটে, কিন্তু তাতে করে কলকাতাবাসীর জীবনযাত্রায় কোনো প্রকারের ফের-ফার হয় না। হৈ-হুল্লোড়, পার্টি-পরব, কেনা-কাটা, মারা-মারি একই ওজনে চলে। দিল্লীতে কিন্তু ভিন্ন ব্যবস্থা। এখানে দুই ঋতু—গ্রীষ্ম আর শীত। শীতকালে এন্তার দাওয়াত, নেমন্তন্ন, দিনে দশটা করে মিটিঙ, হপ্তায় দুটো করে আর্ট প্রদর্শনী, আজ ভরতনাট্যম, কাল কথাকলি, পরশু য়েহুদী মেনুহীন, আর এক গাদা সঙ্গীত সম্মেলেন, কবিসঙ্গম, মুশাইরা। গ্রীষ্মকালে এসব-কিছুতে মন্দা পড়ে যায়, শুধু যেসব দেশের বাৎসরিক পরব গরমে পড়েছে, সেসব দেশের রাজদূতেরা বাধ্য হয়ে "রিসেপশন" দেন, আর সবাই শার্ক ফিন আর কালো বনাতের মধ্যিখানে প্রচুর পরিমাণে ঘামেন। পার্টিগুলোর জৌলুশেরও খোলতাই হয় না, কারণ ডাকসাইটে সুন্দরীরা পাহাড়-পর্বত ঘুরতে গেছেন—পার্টিতে যদি রঙ-বেরঙের শাড়ীর বাহারই না থাকলো তবে সে পার্টি অতি নিরামিষ (নিরম্বু তো বটেই, এ-সব পার্টিতে জল মানা) তাই পাঁচজন পার্টি থেকে ভদ্রতা রক্ষা করেই তাড়াতাড়ি কেটে পড়েন।

এসব হল নিউ-দিল্লীর কাহিনী।

পুরানী দিল্লীতে কিন্তু একটা জিনিসের অভাব কখনো হয় না। প্রায় প্রতি-দিনই কোনো না কোনো নাগরিককে অভিনন্দন করার জন্য কোনো না কোনো পার্কে তাঁবু আর শামিয়ানা খাটিয়ে, দিগধিরিঙে লাউড-স্পীকার ঝুলিয়ে যা চেল্লা-চেল্লি আরম্ভ হয়, তাতে পাড়ার লোক ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে—দরজা জানলা বন্ধ

না করে একে অন্যের সঙ্গে কথা পর্যন্ত কওয়া যায় না।

এ রকম একটা অভিনন্দন পার্টিতে আমি দিন কয়েক পূর্বে গিয়েছিলুম। যে দু'জনকে অভিনন্দন করা হল, আমি তাঁদের নাম শুনিনি, দিল্লীর ক'জন লোক তাঁদের নাম শুনেছে তাও বলতে পারবো না।

দুজনারই যে প্রশস্তি গাওয়া হল, তা শুনে আমার বিদ্যেসাগর মহাশয়ের একটি ছোট লেখার কথা মনে পড়ল। এ লেখাটি সচরাচর কেউ পড়েন না বলে উদ্ধৃতির প্রলোভন সম্বরণ করতে পারলুম না।

'কবিকুলতিলকস্য কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' এই ছদ্ম নামে বিদ্যেসাগর মহাশয় লিখছেন—

'আমি এ স্থলে —নাথ বিদ্যারত্নকে নদিয়ার চাঁদ বলিলাম। কিন্তু শ্রীমতী যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা দেবী —মোহন বিদ্যারত্নকে নবদ্বীপচন্দ্র অর্থাৎ নদিয়ার চাঁদ বলিয়াছেন। উভয়েই বিদ্যারত্ন উপাধিধারী, উভয়েই স্ব স্ব বিষয়ে সর্বপ্রধান বলিয়া গণ্য, বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়ও উভয়ের একই ধরণের। সুতরাং উভয়েই নবদ্বীপ-চন্দ্র অর্থাৎ নদিয়ার চাঁদ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য পাত্র, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু এ পর্যন্ত এক সময়ে দুই চাঁদ দেখা যায় নাই। সুতরাং একজন বই, দুই জনের নদিয়ার চাঁদ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উভয়ের মধ্যে একজন এক বারেই বঞ্চিত হইবেন, সেটাও ভালো দেখায় না; এবং ঐ উপলক্ষে দুজনে হুড়া-হুড়ি ও গুঁতাগুঁতি করিয়া মরিবেন সেটাও ভালো দেখায় না। এ জন্য আমার বিবেচনায় সমাংশ করিয়া দুজনকেই এক এক অর্ধচন্দ্র দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করা উচিত। শ্রীমতী যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা দেবী আমার এই পক্ষপাত-বিহীন ফয়তা* ঘাড় পাতিয়া লইলে আর কোনো গোলযোগ বা বিবাদ-বিসংবাদ থাকে না। এক্ষণে তার যে রূপ মরজি হয়।'

* * *

নিত্যি নিত্যি কারণে অকারণে হৈ-হুল্লোড় করার অভ্যাস দিল্লীবাসী বাঙালীর উপরও বেশ কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে। আজ এখানে সাহিত্য সভা, কাল

* 'চলন্তিকা' 'ফয়তা এবং ফতোয়া' শব্দে পার্থক্য করে অর্থ দিয়েছেন; "ফয়তা (আরবী ফাতিহহ্)—মুসলমান ধর্ম অনুসারে উপাসনা"—এবং "ফতোয়া (আরবী ফৎবা)—মুসলমান শাস্ত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা। কাজীর রায়।" বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু সর্বদাই 'ফয়তা' শব্দ ব্যবহার করেছেন ফতোয়া অর্থাৎ 'বিধান' 'রায়' অর্থে।

ওখানে বর্ষামঙ্গল প্রায়ই এসব 'পরব' হয়। এবং অনেক সময়ে মনে হয়েছে, এ সব পরবে সত্যকার কাজ যেন ঠিকমত হচ্ছে না।

তাই আমি চেষ্টা করেছি, ছোট গণ্ডীর ভিতর অল্পসংখ্যক লোক নিয়ে প্রতি-সপ্তাহে কিম্বা প্রতিপক্ষে 'স্টাডি সার্কল' বসাবার, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ যাবৎ কৃতকার্য হতে পারিনি। আমার বয়স হয়েছে, তদুপরি আমি খ্যাতনামা সাহিত্যিক নই, কাজেই আমার দ্বারা এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পত্তন সম্ভবপর নয় অথচ এর প্রয়োজন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

কেন্দ্র হিসাবে দিল্লীর মাহাত্ম্য ক্রমেই বাড়বে। কেন্দ্রের হাতে অর্থ আছে এবং সে অর্থের কিছুটা প্রাদেশিক সরকাররাও পান—সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের সেবার্থে। বাঙলার প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রের কাছ থেকে বাঙলা সাহিত্যের জন্য কত টাকা বাগাতে পারবেন, সে তাঁরা জানেন, কিন্তু আমরা যারা দিল্লীতে আছি এ বাবদে আমাদেরও যথেষ্ট কর্তব্য আছে।

আমরা যদি ছোট ছোট কর্মঠ সাহিত্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারি, তবে শেষ পর্যন্ত আমাদের কর্মতৎপরতা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। আজ যে বাঙলা সাহিত্যের প্রতি আমাদের দরদের অভাব তার প্রধান কারণ আমরা সাহিত্যের সত্যকার চর্চা করিনে।

তার অন্যতম জাজ্বল্যমান উদাহরণ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো আমরা বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যের জন্য কিছুই করে উঠতে পারিনি অথচ সেখানে রুশ ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে।

* * *

দিল্লীতে ব্যাঙের ছাতার মত একটা জিনিস বড্ড বেশী গজাচ্ছে। এঁরা হচ্ছেন আর্ট ক্রিটিক সম্প্রদায়। এঁরা ছবি বোঝেন, মেনুহীন শোনেন, আবার আলাউদ্দীন সায়েবকেও হাততালি দেন, এঁরা ভরতনাট্যম আর মণিপুরী নিয়ে কাগজে কপচান চীনা সেরামিক এবং দক্ষিণ ভারতের ব্রোঞ্জ সম্বন্ধে এঁদের 'জ্ঞানের' অন্ত নেই।

এঁদের একজন তো সবজান্তা হিসেবে এক বিশেষ গণ্ডীতে রাজপুত্রের আদর পান, বিলক্ষণ দু'পয়সা তাঁর আয়ও হয়। তা হোক, আমার তাতে কণামাত্র আপত্তি নেই—পারলে আমিও ওঁর ব্যবসা ধরতুম।

কিন্তু আমার দুঃখ ভদ্রলোকটি বড়ই বাঙলা এবং বাঙালী বিদ্বেষী। অবনীন্দ্র-নাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল এবং তাঁদের শিষ্য উপশিষ্যেরা যে 'বেঙ্গল স্কুল' গড়ে তুলেছেন, সেটাকে মোকা পেলেই এবং মাঝে মাঝে না পেলেও বেশ কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেন। তাঁর মতে যামিনী রায়, যামিনী রায় এবং আবার যামিনী

রায়। বাঙলা দেশের আর সব মাল বরবাদ, রদ্দী। নিতান্ত 'প্রাদেশিক' বদনাম থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য।

ইনি যে সব 'আর্ট-সমালোচনা' প্রকাশ করেন, তার সুস্পষ্ট প্রতিবাদ হওয়া উচিত। যাঁরা এসব জিনিসের সত্য সমঝদার, তাঁদের উচিত বেরিয়ে এসে আপন দেশের সুসন্তানদের কীর্তি বার বার স্বীকার করা। 'ডেকাডেন্স' বা 'গোল্লায় যাওয়ার' অন্যতম লক্ষণ আপন দেশের মহাজনগণকে অস্বীকার করা বা খেলো করে দেখানো।

এ জাতীয় লেখাকে 'পোলেমিক' বলে—বাঙলায় 'মসীযুদ্ধ' বলতে পারি। এবং মসীযুদ্ধে বাঙালীর পর্বতপ্রমাণ ঐতিহ্য সম্পদ আছে। ভারতচন্দ্র পদ্যময় পোলেমিক, আর বাঙলা গদ্য তো আরম্ভ হল খাঁটি মসীযুদ্ধ দিয়ে। রামমোহন তো কলমের লড়াই লড়লেন, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সর্বসম্প্রদায়ের গোঁড়াদের সঙ্গে। তার পরের বাঘ বিদ্যেসাগর। তিনি যে পোলেমিক লিখেছেন, সে লেখা লিখতে পাবলে পৃথিবীর সবচেয়ে বড আইনজীবী নিজকে ধন্য মনে করবেন—অধমের মতে পোলেমিকে বিদ্যেসাগর মশাই মিলটনেরও বাড়া। আর মসীযুদ্ধে ব্যঙ্গ কি করে প্রয়োগ করতে হয় তার উদাহরণ তো আপনারা একটু আগে 'অর্ধচন্দ্র' দানে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। তাবপর তিন নম্বরের মল্লবীর বঙ্কিম। তিনি হেষ্টি সাহেবের (নাম ঠিক মনে নেই) বিরুদ্ধে সনাতন হিন্দু ধর্মের হয়ে যে লড়াই লড়লেন সে তো অতুলনীয়। বরঞ্চ বলবো, 'কৃষ্ণ চরিত্রের' চেয়েও বড ক্যানভাসে কাজ করেছেন বঙ্কিম এ মসীযুদ্ধে, এবং এ সত্যও আজ অস্বীকার করবো যে, আজ যদি কোনো হেষ্টি পুনরায় দেখা দেয় তবে তার সঙ্গে ওবকম পাণ্ডিত্য আর ইংরেজী জ্ঞান নিয়ে (এখানে সাহিত্যিক বঙ্কিমের কথা হচ্ছে না—সে সাহিত্যিক যে নেই সে কথা ইস্কুলের ছোঁড়ারা পর্যন্ত জানে) লড়নেওলা আজ বাঙলা দেশে নেই।

তারপর রবীন্দ্রনাথ; তিনিও তো কিছু কম লড়েননি। তবে তাঁর রুচিবোধ বিংশ শতাব্দীর ছিল বলে তাঁর লেখাতে ঝাঁঝ কম, কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে লেখা চিঠিতে কী তিক্ততা, কী ঘেন্না!

গল্প শুনেছি উর্দুর কবিসম্রাট গালিব সাহেব তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জওক্ সাহেবের একটি দোহা এক মুশাইরায় (কবি-সঙ্গমে) শুনে বার বার জওক্‌কে তসলীম করে বলেছিলেন, 'আপনি দয়া করে আপনার ঐ দুটি ছত্র আমায় দিয়ে দিন, আর তার বদলে আমি আমার সম্পূর্ণ কাব্য আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি।'

রবীন্দ্রনাথের ঐ শেষ চিঠির পরিবর্তে পৃথিবীর যে কোনো পোলেমিস্ট্ তাঁর সব পোলেমিক দিতে সোল্লাসে প্রস্তুত হবেন।

শরৎচন্দ্র যদি তাঁর মসীযুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে না করে সে যুগের আর যে কোনো লোকের সঙ্গে করতেন, তবে তিনিও মসীযোদ্ধা হিসেবে নাম কিনে যেতে পারতেন। আর কেনেনই নি বা কি করে বলব? তাঁর 'নারীর মূল্য' পোলেমিকের প্রথম চাল। বাঙলা দেশ এ পুস্তকের বিরুদ্ধে কলম ধরলে তিনি যে কী মাল ছাড়তেন, তার কল্পনা করতেও আমি ভয় পাই।

ধর্মে বিবেকানন্দ পোলেমিস্ট্, ব্যঙ্গ কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল।

* * *

এতখানি ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও কোনো বাঙালী এই সব ভুঁইফোড় 'আর্ট ক্রিটিক'দের জোরসে দুকথা শুনিয়ে দেন না কেন?

চীনের সহিত ভারতের লুপ্ত সাংস্কৃতিক যোগসূত্র পুনরায় স্থাপনা করিবার জন্য যে চৈনিক-বিদগ্ধমণ্ডলী ভারতে আগমন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীযুক্ত টিং সি-লিন ও শ্রীযুক্ত ফুঙ য়ু-লনকে ডক্টরেট উপাধি দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি মহোদয় স্বহস্তে উপাধি এবং প্রশস্তি প্রদান করেন। দিল্লী নগরীর তাবৎ গুণীজ্ঞানী সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুত সি-লিন বৈজ্ঞানিক। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় অর্বাচীন চীন বিজ্ঞান-চর্চায় কি প্রকারে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতিমার্গে ধাবমান হইতেছে তাহার সবিস্তার বর্ণনা করেন এবং পুনঃ পুনঃ সভাস্থ ভদ্রমণ্ডলীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, চীনের সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা জনগণের মঙ্গলার্থে নিয়োজিত হইতেছে। শ্রীযুত সি-লিন স্পষ্ট বলেন নাই কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ভারত যদি এই উত্তম উদাহরণ অনুসরণ করে তবে 'জন-গণ-মন' অধিনায়কের শুধু মৌখিক নয়, আন্তরিক এবং সফল প্রশস্তি গীত হইবে।

শ্রীযুক্ত য়ু-লান দার্শনিক। বক্তৃতারম্ভেই তিনি বলেন, যে প্রদেশে তাঁহার জন্ম সেই প্রদেশেরই এক সজ্জন বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতবর্ষে ত্রি-রত্নের সন্ধানে আসিয়াছিলেন। ভারত তখন তাঁহাকে প্রচুর সম্মান দেখাইয়াছিল এবং অদ্যকার সম্মানে শ্রীযুক্ত লান সেই সুবর্ণযুগের কথা স্মরণ করতঃ হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন যে এ সম্মান তাঁহাকে নয়, তাঁহার দেশবাসীকে প্রদর্শন করা হইতেছে।

তৎক্ষণাৎ আমার মন ফা-হিয়েন ও হিউয়েনৎ সাঙের স্মরণে দেশ-কাল-পাত্র ভুলিয়া প্রাচীন ভারতের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হইল। মুদ্রিত নয়নে দেখিতে

পাইলাম রাষ্ট্রপতি যেন শ্রীশ্রীরাজামহাধিরাজ হর্ষবর্ধনের বেশ ধারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান পরিব্রাজক হিউয়েনৎ সাঙ। কোথায় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনগৃহ যেখানে মাত্র পঞ্চশত নরনারী উপস্থিত? যে প্রয়াগ সম্মেলনে হিউয়েনৎ সাঙ উপস্থিত ছিলেন সেখানে পঞ্চলক্ষাধিক নরনারী উপস্থিত থাকিয়া মহাযানের গুণকীর্তন ও শ্রবণ করিয়াছিল। হায়, কোথায় অদ্যকার পঞ্চশত আর কোথায় সেদিনের পঞ্চলক্ষ!

এবং সেদিন ভারতে নিষ্ঠা ছিল, বেদ-চর্চা ছিল এবং ত্রিশরণ-প্রচলিত সত্য ধর্মের অনুসন্ধানে অগণিত নরনারী ধন-প্রাণ নিয়োজিত করিত। হিন্দু বৌদ্ধ, জৈনধর্ম এবং দর্শন তখন যে বিকাশ লাভ করিয়াছিল তাহা আজিও বিশ্বজনের বিস্ময়ের বস্তু। সিংহল, বর্মা, ইন্দোচীন, মালয় ও চীন হইতে অগণিত শ্রমণগণ ভারতে শাস্ত্রের অনুসন্ধানে আসিতেন। দেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক স্ব স্ব ভাষায় শাস্ত্ররাজির অনুবাদ করিয়া জীবন ধন্য গণ্য করিতেন।

আর আজ বিরাট দিল্লী নগরীতে একটি মাত্র শিক্ষায়তন নাই যেখানে বৌদ্ধধর্মের চর্চা হয়, পালি শিখিবার কোনো প্রকারের ব্যবস্থা এই মহা-নগরীতে নাই। অত্রস্থ মহাবোধি প্রতিষ্ঠান অনাদৃত।

* * *

চৈনিক বিদগ্ধমণ্ডলী এই দেশে আসিবার সময় বহুশত চিত্র ও অন্যান্য কলা-সামগ্রী সঙ্গে আনিয়াছেন। এক বিশেষ চিত্র-প্রদর্শনীতে সেই ছবিগুলি রাখা হইয়াছে এবং স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করিয়াছেন।

ভারতবাসীর পক্ষে এই প্রদর্শনীতে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বস্তু তুন-হুয়াঙ গুহা চিত্রের প্রতিকৃতি। এই চিত্রগুলি অজন্তা বাঘ প্রভৃতি গুহাতে যে বিষয় ও শৈলীতে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহাদের প্রভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। নিতান্ত অজ্ঞজনও এক দৃষ্টিতেই সে তত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবে। বিজ্ঞজন চিত্রগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখিয়া যে কত শত নব নব তত্ত্ব এবং তথ্য উদ্ধার করিতে পারিবেন তাহা কিছুদিন পরে তাঁহাদের প্রবন্ধরাজিতে প্রকাশ পাইবে।

যে বিষয়-বস্তু আমার কাছে পরিচিত নহে, যে আদর্শের ঐতিহ্য আমার বৈদগ্ধ্যে নাই সেখানে বিদেশাগত, নবীন বিষয়-বস্তু তথ্য আদর্শ গ্রহণ করি কি প্রকারে এবং আপন কলাপ্রচেষ্টায় তাহাদিগকে অঙ্গীভূত করিই বা কি প্রকারে।

বুদ্ধের জীবন এবং অবদান চীনের কাছে অতিশয় বিস্ময়ের বস্তু-রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। চীনদেশের আপন মহাজন লাওৎ-সে ও কনফুসিয়ো যে মার্গ দেখাইয়া গিয়াছিলেন সে মার্গগুলি মহান কিন্তু বুদ্ধদেবের সর্বস্ব-ত্যাগের নিরঙ্কুশ

বৈরাগ্যবাদের সঙ্গে চৈনিক মহাপুরুষদের আদর্শবাদের কোনো সাদৃশ্য নাই। তদুপরি চীন বর্বরদেশ নয়। বহুশত বৎসরের তপস্যার ফলে চীন কলা-প্রচেষ্টায় নিজস্ব শৈলী বর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সে শৈলী বর্জন না করিয়া এই ভারতীয় শৈলী চীন গ্রহণ করে কি প্রকারে?

তাই আমরা এই চিত্রগুলির সম্মুখে বিস্ময়ে হতবাক হই। স্পষ্ট দেখিতেছি চিত্রগুলি চৈনিক অথচ যে কোনো বিশেষ অংশের বিশ্লেষণ করিলেই সেখানে অজন্তা দেখিতে পাই। ঐ তো সব বিষধর সর্প, ঐ তো করালদংষ্ট্রা রাক্ষসের দল, পশ্চাতে শাণিত তরবারি হস্তে পিশাচ না কবন্ধ, সম্মুখে লীলায়িত ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান তিলে তিলে নির্মিত মুনি মনহরণী তিলোত্তমা-শ্রেণী এবং মধ্যস্থলে নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধমুক্ত-তথাগত।

এই চিত্র বাল্যকাল হইতে কত সহস্রবার দেখিয়াছি। এই প্রদর্শনীর কল্যাণে তাহাকে আবার 'অজানা-জনের সাজে' চিনিয়া মুগ্ধ হইলাম।

THE SPIRIT OF TAGORE

Let us remember the spirit of the Great Poet with *shraddha*, for the day of *shraddha* has come once again.

The world outside Bengal knows him as the Great Poet, eminent novelist, brilliant short story writer, guru of an educational renaissance, and prophet of international peace and goodwill, but the spirit behind the creative impulse which assimilated the best of the nineteenth century Bengal—the Bengal of Raja Rammohun Roy, Maharshi Devendranath Tagore, Keshab Chandra Sen—and then went forward in search of fresh adventures has never been revealed to the outside world. It is found in the very best poems and songs of the Poet and unfortunately have not been translated into English or Indian languages. Perhaps the translators, including the Poet himself, felt that Odes addressed to the Vedic deities and poems interpreting characters, symbols, situations and ideologies of Indian mythology will not find a sympathetic chord in the Christian heart, for it can hardly be denied that the devotional songs of Tagore which have actually been translated into English are popular in the Christian world on account of their resemblance with the Songs of David and his love songs often run parallel to the Songs of Solomon of the Old Testament.

It is true that the English reading public has a rough idea of Tagore's rcligious thought through some of his essays but they belong, to a period when he had reached only the end of the first stage of his spiritual development which consists chiefly of what he had received from his father, the Maharshi. He speaks of the Brahman as realised by the Upanishadic rishis and reinterprets their vision in his characteristic lyrical style. Being a poet and thus attached to the world and its creatures he rejects Shankara's position of regarding them as mere illusions : for him the seekers of *Vidya* only or *Avidya*

only, both go unto perdition, the Lord is rather to be sought everywhere, in the Fire, in Water, in the innermost recess of Creation (*Ye deva agnau yo apsau etc.*), and this vision has to be translated into aesthetic expression. Thus, when he remembers his departed beloved, he sees her everywhere—she is transformed into the greenness of the green vegetation, the azure of the blue sky (*shyamale shyamal tumi, nilimay nil*). Through English translations we know Tagore thus far, and no farther.

He then gives up composing devotional songs addressed to Brahman. One wonders why. The clue is to be found in his next great poem called *Tapobhanga*. It becomes clear to the reader in retrospect that the impersonal Brahman lacked the warmth and colour to appease the desire of the mundane heart which yearns to love, the hungry eyes which want to see God—if not the direct vision, at least in the mind, through forms they have already seen on the earth. To which God was Tagore to turn—*kasmai devaya havisha vidhema* ?

Bengali poetry is based on Vaishnava traditions. Chandidasa and Vidyyapati, the two great predecessors of Tagore had followed the footsteps of Jayadeva and countless poets after them have also sung the love of Radha and Krishna but nineteenth century Bengal had no great Vaishnava figure like Shri Ramakrishna and Swami Vivekananda who as henotheists had Shakti to the most exalted eminence. Tagore turned to Shiva, for, is not Rudra also the Nataraja, and had not the Poet as a small boy learnt from his father to seek the benign face of Rudra for protection—*Rudra yat te dakshinam mukham tena ma'm pahi nityam* ?

Tapobhanga is a great poem. In it Tagore sees the Lord of Time deep in *tapas*. It is during these necessary and inevitable periods of *tapas* that the creation becomes dry and shrivels up in the heat (*tapas*), pain, suffering and all

the miseries of the world are nothing but the creation of Nataraja's dance and all these find their symbol in the resplendent sufferings of Uma in her seperation (*vichchheder dipta duhkhadahe*) caused by Shiva's having withdrawn himself into himself—for is he not the *Yogisha* also ? At this stage enters the Poet. He calls himself the emissary of the conspiring Heaven (*tapobhanga duta ami Mahendrer*). Shiva wakes up, the auspicious moment for the marriage of the celestial couple has come, smile blossoms forth on the cheeks of Uma in sweet bashfulness (*smita hasya sumadhur laj*). The Lord calls the Poet, and taking the flower garland and mangalyas, he joins the seven rishis in the marriage procession (*saptarshir dale, kavi sange chale*). This time it is not Madana, it is the Poet. And what an imagery ! Along with the *saptarshi*, on the high firmament, it is the Poet, for the whole universe to gaze at and admire. What a role for all poets of all ages to play !

And then Tagore composed the famous Nataraja Odes. "Oh, Nataraja, thy matted locks become loose when Thou commencest Thy *Pralaya-dance*", "Nataraja, break my slumber with Thy dance steps", (*nrityer tale tale supti bhangao*). They have the same *motif* as in the *Bharata-nritya* song, "Oh, Lord of Chidambaram, wilt Thou not stop Thy chariot at my cottage door for a moment ?" Tagore is indebted to South India for his Nataraja cycle. The God is practically unknown as Nataraja in the North.

Tagore passes through several tragic experiences before he reached the third and the final stage. The world knows how the Poet, shaking with age, and rage composed the epistles in defenee of India's national heroes, of the correspondence between the two poets, Tagore and Naguchi. It has an inkling also of the Poet's feeling when he saw the World War II shattering to bits the edifice of international peace and goodwill he had been building up but alas, it

knows nothing of the greatest tragedy of his life—the Indian nation had not come forward to receive his favourite child, the Vishvabharati. As the aged Poet proceeded along the dolorous path carrying his cross, no St. Veronica came to offer him the kerchief to wipe his perspiration and blood. The poet fell under the weight.

He fell seriously ill, and through unbearable physical pain and agony, he saw new visions. He translated them into semi-aesthetic, quasi-philosophical verses, loosely knit together and entirely lacking the usual Tagorian finish. He recovered and dictated some more of his recollections and these two collections are called 'Sick-bed' (*roga-shayya*), and 'Recovery' (*Arogya*). His last poems are called "Shesh-lekha".

The reader will remember how stoutly Tagore had maintained in his youth that deliverance was not for him through renunciation of his world (of *rupa-rasa-gandha-sparsha*) by means of any *yogic* practice. Now, for the first time, the world, including his body, became nothing but a continuous source of the most excruciating agony. He cried in despair, "Through pain and pain again, I have realised the world is not unreal".

Aghate aghate janilam
E jivan mithya nay.

What! Not beauty, not truth, but pain—the Buddhist point of departure—should be the *raison d'etre* of all existence!

There are many such wonders for the reader of the three collections mentioned above. Personally I feel certain, although I cannot prove it except by means of 'aesthetic logic', that Tagore had turned to concentration in the *raja-yoga* style at this last phase of his spiritual experience which alone can explain many of the visions, e. g. those describing his body and mind floating away while the soul watches on, the dumb creatures with masses of inert matter on the eve of

the first creation.

The last poem, composed half an hour before the fatal operation, absolves him once again, of the accusation that he was an escapist. "Thou has scattered on the path of Creation many a deceitful snare, O Deceitful one (*Chhalanamayi*), many a false hope (*mithya-vishvas*) !

This is the final recognition of Untruth, *per se* by the Poet. This brings him closer to the Sankhya system, nearer to Zarathustra who accepted both the Principle of Good and the principle of Evil as co-existing from Eternity. In the dynamic process of arriving at a harmony beyond the conflicting diversity of reality, the Poet has covered the entire gamut of all the Indo-Aryan and Indo-Iranian systems of philosophy in aesthetic realisations. This harmony, this *weltanschauung*, this *summum bonum* is known to us all in the simple word, 'shanti'.

A LETTER FROM INDIA

I am sure when you hear my English accent you will not believe me that I was ever in England, but it is Allah's truth that I spent several months there—'believe it or not' as the Americans say. But then I spent most of my time in the Reading Room of the British Museum where hailing each other across the tables and discussions on weather in general and the one prevailing in London in particular are not very highly appreciated. Indeed, I should say even in the House of Commons you get better opportunities to improve your conversational English than in the British Museum.

But that is not the point, any way. What I mean is that if it was possible for me to visit England, why should you not be able to come to this country next winter ? Now, do not suspect me as being the representative of a tourist

organization, hotel keeper or a guide. I am suggesting the trip for, I really believe, having seen many of the winter resorts of Europe that India is worth visiting in winter.

Naturally the first question you will ask is what we have here to offer you ?

Well, to begin with the weather. Right from the begining of October till, let us say, the middle of March you will have nothing but bright sunshine, a deep blue sky with a few white clouds once in a while, nice comfortable warm days and slightly chilly nights when all you need is a warm pull-over even for going out for a stroll by moon-light. It may rain for a day or two during this period which will be quite a pleasant change and you will have the experience of what is called warm rains in the East.

Are you interested in architecture ? Well, Delhi is the Mecca of architecture. There are at least five distinct architectural styles to be seen here which will take your breath away. The Kutb Minar is supposed to be the most graceful tower in the whole world and Fergusson considers it to be superior to Giotto's campanegla. The remains of the Quwwat al-Islam mosque just near the Kutb, built from the remains of ancient Hindu temples with its noble arches and delicate ornamentations on the stone walls, the spandrels with medallions of lotus-motif, the forts of the Tughlus with massive walls, sometimes as much as sixty feet deep, which loom large against glorious sunsets every evening, the noble but sweet Humayun's tomb built in red stone and white marble, the audience halls in the Red Fort and finally the Taj Mahal at Agra—only a hundred and twenty miles far from Delhi.

I assure you, it will not merely mean looking at a few beautiful buildings, it is much more than that. Let me explain.

You have all heard of the rich literatures of the East,

Sanskrit, Arabic, Persian and Chinese but where has the average European time or opportunity to learn one or more of these languages to enjoy them ?—The same as we have no time to learn Greek, Latin, French or German. Architecture and painting make up this loss to a considerable extent. As you go from building to building chronologically you see for yourself how the architects and their patrons conceived of beauty in their life and how they tried to transform into stone and morter through arches, domes and pillars, how one artist failed to solve a difficult aesthetic problem, and how after serveral attempts a more gifted artist finds the way out, how rebels suddenly appear in the field and violently reject everything of the past, and then, as it were, comes a fresh renaissance and finally masters who assimilate every achievement of the past and make a new anthology of the most beautiful pieces of architecture.

It is precisely as if you are following from the birth of a literature till its developed state.

And what strikes me as most important is the fact that you are not merely reading books, you are not merely seeing buildings but you are coming into the closest touch with the minds and hearts of a people, and then, you come to the grand discovery, how alike they are, all over the world. You, who are accustomed to a certain type of architecture in your country, will realize how, inspite of the difference in styles and execution, the aesthetic ideals are the same and how the artists all over the world have tried to come nearer to the supreme realisation of Beauty which is Truth.

I have been speaking of Delhi, a city which I love not only because of its architecture but for many more things.

For example I love the lazy, comfortable way our bazars are run. No one is in a hurry—the philosophy of our bazar people appears to be, 'why be in a hurry when life is so short, take it easy'. If you are a stranger the shopkeeper

may try to save some of your precious time but if you happen to be one of the 'regulars' Allah protect you ! He will ask you about the health of every single individual of your family—there is no question of your cutting him short—offer you tea which the boy will take ages to serve. In the meantime three customers have come and gone and you are nowhere near your purchases. At long last he produces the perfumes you want to buy for your son's wedding. He wraps up a little fine cotton on a tiny piece of wood and soaks it in the *attar*—scent—and says with a sigh that our last Emperor Bahadur Shah could not live for a day without it. Now you have not got the purse of the Emperor, so yon get worried as to what the price will be like. He sighs again and produces a second variety in the same process and reminds you that this was the favourite of Her Majesty, the Empress. "Alas", he adds, "who are the people now that care for such refined delights—you are one of the very few—, the market is flooded with cheap scents from all over the world. May Allah hasten my death, he prays so that I may disappear before the aristocratic *attars* vanish from this world".

Meanwhile, as far as prices are concerned, our aristocrat 'at business table' does not appear to be a great believer of 'vanity of Vanities, all is Vanity'. At the rate he is making profit, he need not die for another thousand years. Even if all attars disappear from the world he should be able to live happily on the profits he has already made,

It is the nose which enjoys the attar, no wonder you pay through your nose.

That reminds me, the heavy smell of oven-baked chickens had entered the same nose through all the powerfull age-old attars. What, you have not heard of oven-baked chickens, commonly known as tandori-murghi in Delhi ? Why, in that case you must positively undertake a pilgrimage to India. I am told, some of your great men went round the world to

prove that it was round—the discovery of an oven-baked chicken is most emphatically a million times more laudable task. You will go down in history as the first European who brought to England the delicate *chicken a la oriental, chicken des Hindous, poulet au Delhi n'importe quoi*, according to your knowledge of French or absence of it.

I shall not tell you how it is made. "Come to Swizerland and see Davos", they say ; I shall say, "come to India and see how a *poulet au Delhi* is made."

It is not a chicken, it is a dream. Forget the Taj Mahal and the Kutb Minar...you cannot eat them. The *poulet* will melt in your mouth like butter, its aroma will give you greater delight than the sweetscented tresses of your beloved and finally it will bring the same bliss, the same *summum bonum*, in our language *moksha and nirvana* which extremely complicated religious practices alone can bring.

That might remind you of death, for you might have heard that *nirvana* comes after death. That is not true, for one of our poets has said, "If I cannot get *nirvana*—salvation —in this life when I have command on actions what chances have I to get it after death ?"

And even if death overcomes you due to excesses in *poulet au Delhi*, never mind. I shall quote another scripture, this time in pure Sanskrit, to prove my thesis. I am afraid I shall have to twist it slightly, but then that is precisely what all scholars do ; it is the laymen, the uninitiated the rustic who goes by the literal meaning of scriptures.

The quartrain says,

"Parannam prapya, Durbuddhe,
Ma praneshu dayam kuru,
Parannam durlabham loke,
Pranah janmani janmani".

"Eat, eat, to they full, o, man of little knowledge,
And do not show any mercy for your life,

For you come across cheap exotic food rarely in life,
But life will be given to you by God free of cost
every time you are born.

Let me remind you that we Indians believe in rebirths. We believe that we come to this earth again and again till we have reached perfection.

So then, if you do not come to India, inspite of all the pleadings I have made on her behalf, this winter or in this life, I pray, you may be born in India in your next birth.

WHAT IS IN A NAME ?

There appears to be little doubt that India is going to be divided soon, but at the same time there appears to be a lot of confusion in the public mind about the name to be given to the Non-Pakistan area.

Some are in favour of 'India', others again are suggesting 'Hindustan' (or 'Hindusthan'). Some are indifferent like Shakespeare who thought that a name did not matter at all, others are keen on a proper choice and cite Tagore who considered it all important and pointed out that if Draupadi, the proud possessor of five heroes as husbands (panchavira-patigarvita), had been named Urmila, her resplendent kshatriya womanhood would have been hurt at every step by this soft and tender name.

We agree with Tagore not because we are thinking in aesthetic terms, but because in addition to his artistic argument there are a few philological and historical arguments which have to be considered before we arrive at a decision.

Philologists have pointed out that the ancient Iranians changed their 's' to 'h' at an early stage of their linguistic development with the result that our 'asura' became their 'ahura' which is the first part of Ahura-Mazda ; precisely in

the same manner the river 'Sindhu' became 'Hindu', 'Hindo', and 'Hind' to which was added the word 'stan', meaning 'land' which again is cognate with Sanskrit 'sthana'. (It will be remembered that like all other non-Indian Aryans, the Iranians lost their aspirates at an early stage—cf. 'ph' in 'philosophy' which is pronounced as a fracative 'f'—with the result that 'sthan' became 'stan' in the Iranian languages). Hindustan thus came to mean the 'Land of the Indus'.

The Arabs turned it into 'Hind' and used it as a general appellation for the whole of India. They still call all Indians, irrespective of the fact whether they are Hindus or Muslims, 'Hindi' of which the plural is 'Hunud', a term, which surprisingly enough, is occasionally used by Indian Muslims in referring contemptuously to the Hindus.

The Greeks had lost their aspirates by the time they learnt the word from the Iranians and consequently took it as 'Indos' (in modern Greek the 'd' is pronounced soft, almost wet, as 'th' in the English 'this') which gave birth to the English 'India', French 'L'Inde', German 'Indien', etc.

Columbus thought that he had discovered India and it caused considerable confusion which persists in the European languages to this day.

Thus the German, for example, calls our country 'Indien', the people 'Inder', but another word from the same root 'Indianer' is used to designate the Red Indians. During my stay in Germany, I had often great difficulty in explaining to elderly German gentlemen that I was an 'Inder' not an 'Indianer'. To them both names meant very much the same.

The French call India 'L'Inde', but the people, irrespective of the fact whether they are Hindus or Muslims, 'Hindou'. I have often been present in 'scenes' where the young Muslim from India was indignantly maintaining that he was not a Hindu but a Muslim and the Frenchman trying in vain to explain that he was not referring to his religion but his

nationality. Some Frenchmen coin a new word 'Brahminist' to designate the Hindu by religion. The word 'I'indien' applies to the Red Indian.

The American follows the Frenchmen. He calls our country 'India' all right but terms us all as 'Hindus'. Thus it happened, some years back, when American papers announced that "One Abdur Rahman, a Hindu, was arrested for having landed in the States without a passport." When this news item was reproduced in India we had a hearty laugh at the Yankee's ignorance but of course the American papers were not referring to the religion of Abdur Rahman but to his nationality.

Will it be wise to increase the confusion at this stage by giving the appellation Hindusthan to India? Already the wrong impression is gaining ground in Europe and America that Pakistan contains only Muslims : if we start calling the rest of India by the name Hindusthan we are bound to strengthen the impression that this new 'Hindusthan' contains only Hindus. Surely the Muslims, Sikhs, Parsis, Christians, Jains and even the Hindus—barring the Mahasabha, perhaps —have no such intention. *Vis-a-vis* Pakistan, which is going to be a theocratic state, the *raison d'etre* of the rest of India has got to be non-religious (areligious) and anti-communal,

But before recommending 'Hindusthan' to the rest of the world, let us consider the luck the word has had in India itself. Urdu uses only 'Hindustan',' very seldom 'Bharata'. Hindi, Gujerati and Marathi use both names in popular language but in their poetical flights on Sanskritic wings they shed 'Hindusthan'. Bengali and Assamese rarely use 'Hindusthan', and when they refer to a 'Hindusthani' they mean a person coming from Western India just as they use 'Madrasi' to cover all South Indians (!) And finally the South Indian languages have been using Bharatavarsha (-Bhumi, -Mata. -Khanda, -Desha) without paying any attention to

'Hindusthan' whatsoever.

It is strange indeed that whereas the word 'Hindu' which is Persian got entrance into all Indian languages and even hybrid *samasas* (composites) like 'Hindu-dharma' and 'Hindu-samaja' have become a part of the Indian languages, the composite 'Hidusthan' (where 'sthanam' is a purer Sanskrit word than 'Hindu') was given no passport by the Bharat Government. It is like Subhadranandana Abhimanyu entering the chakravyuha while respectable elders bearing the tail fail to penetrate !

What about Bharata, then ? Unfortunately the word is unknown in Sindhi, Baluchi, Poshto, Kashmiri and is very rarely used in Urdu. The rest of the world does not know it either. And surely the Congress has not given up all hopes for the return of the prodigal. 'Vande Bharatam' (!) does not work : 'mataram' has a better chance.

Netaji used 'Hind' for the simple reason that he had to deal mostly with the Puajabis—Hindus, Muslims and Sikhs —to whom the word is familiar, but it does not appeal to the rest of India.

I therefore feel that there is no alternative but to maintain the *status quo*. We shall continue to use 'India' when we write and speak English, and 'Bharatavarsha' and 'Hindusthan' according to the predilection and genius of the different Indian languages, as in the past. The man in the street would like to have one single word for India in all the Indian languages, but we must not forget the fact that India is a sub-continent and many people have many associations and many sentiments. Our attitude in this matter should be more Swiss than French. There are four languages in Switzerland : the French Swiss calls his country 'La Suisse' ; the German Swiss 'Die Schweitz' ; the Italian Swiss 'Svizzera'—I regret I have forgotten the Roumansh word. It is true that the Swiss have another common word for their land in all the

languages—'Helvetia', but it is used only on the postage stamp ! It happens to be a Latin word too, and the Swiss have much less to do with dead Latin (Helvetia) than we have with the living English (India).

LOVE AND FRIENDSHIP

Only the other day a young friend of mine, a rising barrister, suddenly descended upon me and insisted that I should immediately accompany him to his house as his parents had suddenly arrived there from their native village and would like me to have dinner with them. I knew that this young man and his wife are very hospitable and although he took his glass of brandy it was in abundance for the guests, but he told me something in the car which upset me considerably. It appears that an astrologer had paid them a visit just a couple of hours back and had predicted that his mother would leave this world before his father.

Now I know that every Hindu woman (and in India by far, and large Muslim women also) always pray or to put in Bengali that she may be laid on the funeral pyre with the vermilion mark on the parting of the hair (sinthisindur) which is a sign that she is not a widow. That is to say she would rather die as an *akhandasaubhagyavati* rather than live for a hunderd years as a gangaswarupa (these terms are not familiar in Bengal and some other provinces but will be easily understood) but nevertheless it is a cruel *faux pas* to speak of the death of a wife before her husband.

But I was completely bowled over when I met the parents and heard the opinion of the mother regarding her predicted death as an *akhandasaubhagyavati.* "Oh no," "she said firmly but sweetly, "I would not dream of popping off (in Bengali "tensne jawa"—a humorous slang like say kicking the bucket) before him," while she looked at the thin emaciated and a

very silent gentleman with infinite tenderness in her eyes. "Oh, no," she continued, "If I should die earlier he will be as utterly helpless as an orphan of six months, He will just perish inspite of my three daughters-in-law who are extremely fond of him but cannot give him the company he is accustomed to." And I was thoroughly convinced that she was perfectly right.

Here then was a case of love turning into friendship in old age, which has been described by the Grand Maitre of tender scenes, Alphonse Daudet in, his famous short "Lex Vieux."

While staying in an abandoned mill in Provence he received a request from a Parsian friend to call on his grand-parents who lived a few miles away. Daudet goes and on seeing them says, "I was touched to find them so like each other ! With a fringe and some yellow ribbons he (the grandfather) might have been called Mamette (the grandmother)." Even in their infirmity they resembled. Daudet sitting between the two of them had to go on and on chattering away (Et, patati : et patata) on their dear and above all *brave* (in the French sense) grandson Maurice. 'The old man would draw closer to me to say 'Speak louder— She's a little hard of hearing—'

And she on her part would say :

'A little louder, pray...He does not hear very well...'

Through the communicating door Daudet saw two little beds and' "I could not keep my eyes off them. They were hardly bigger than cradles and I pictured them at break of day when they are still buried under their fringed curtains. Three O'clock strikes. This is the hour when all old people wake :

'Are you asleep, Mamette ?'

'No, my dear'."

Here I must draw the reader's attention to the very

important fact that in the French original it is not "mon cher" which would be "my dear" but "MON AMI" which strictly speaking is "MY FRIEND". And that is exactly what I have been driving at right from the begining. Love, passionate love, turns into friendship and it is impossible to say when and how the process begins. But when it is completed the husband and wife, at least acording to Daudet, resemble each other. It is therefore not quite wrong that in certain parts of the Persian-speaking countries a couplet is recited by the bridegroom, after the formal wedding ceremony is over :

"Man tu shudam, tu man shudi, man tan shudam, tu jan shudibad as in Ta kasi no guyad, man digaram, tu digari"

"I have become you, and you have become me, I have become the body and you have become the jan.

So that no one may say after this you are different and you are different".

We have the same in Sanskrit and I am told that just like the Persian couplet it is recited by the bridegroom and the bride in certain parts of India :

"Yadet hrdayam mama tadastu hrdayam tava
Yadet hrdayam taba tadastu hrdayammama."
"Let this heart of mine become thy heart
Let this heart of thine become my heart".

If two hearts melt into one, it is but natural that in course of years, as Daudet points out, they should resemble one another bodily also. Indeed there is a couplet in mixed Bengali which says :

"Sunori sunori tehar nam
Sundari Radhe hoilo Shyam"

Ordinarily it is translated as "Recalling his (Krisna's) name over and over again the beautiful Radha became dark (Shyam, dark, Krisna)" but other pundits maintain that she actually looked like Krisna. But as they were not married to

one another and did not live for any length of time together actual friendship did not grow up between them. Had Lord Shrikrisna returned to Vrindavan again it might have been different. Some say he did visit again when Shriradha was a full hundred years old ! Well, I presume that was rather late in the day for either love or friendship.

A personal experience

"It can't hurt now" was Mr Sherlock Holmes's comment when for the tenth time in as many years I (Watson) asked his leave to reveal a delicate incident. In my case it is not *ten* hut close upon forty ! When I was a student in Bonn from 1930 to 1932 I fell deeply in love—not a calf-love—with a medical student who belonged to Stuttgart area. As I spoke precious little German when I met her for the first time and she spoke it perfectly well as also showed keen interest in India and Indian things (actually Tagore visited the Marburg university in summer 1930 and Mariana bought everything available by him and on him) we were drawn very close together. Well, in Germany Studentenliebe (love or/& friendship among univeristy students) is equated with Semesterliebe (love or/& friendship only for a Semester which is a university term of six months)...German students are passionately fond of shifting from one university to another at the end of a Semester till they settle down for good at some particular university to prepare their thesis but neither I nor Mariana dreamed of seperation. I got my doctorate in the beginning of 1932 and left Mariana and Bonn in tears. Shortly afterwards Mariana wrote to me to say that she just could not stand the sight of Bonn, the Rhine and above all the Venusberg where we used to go out for long walks and on Saturday nights often used to greet the rising sun. Bonn was a small university town forty years ago and practically everyone who had anything to do with the uni-

versity students knew that our love was "feste" (unshakeable) "solide" (solid, *pucca*) and when I left for India and Mariana for Munich it was palpable to our colleag, at Mensa (students' restaurant), the old woman at the newspaper kiosk, waiters, the few policemen on beat that Bonn could boast of and finally even my good old professor Carl Clemen who had international fame in Comparative Religion and knew that we were inseperable would raise his hat and bow profusely whenever he met her in the street that ours was not the notoriously proverbial Semesterliebe but of full five Semesters when circumstances seperated us.

Five years is a pretty long time, and when you are seperated by thousands of miles. Our correspondence became irregular, for we had nothing else to tell each other except the cruel pangs of seperation. Such depressing letters are not conducive to increase the tempo in correspondence, besides, I knew, that she, being the only child of an aristocratic family, was expected by her parents to marry and continue the name of the family, at least from the maternal side. Mariana's sense of *noblesse oblige* was one of the strongest traits of her character and although I am perfectly certain that her parents, to whom I was presented as a *de rigueur*, whenever they visited Bonn, never brought to bear any pressure on her to marry, much less a *marriage de convenance* which though not quite *a la mode* was quite commeil faut among the Swabian elite (I am deliberately using these French expressions to show the profound French influence on the German aristocracy).

Mariana married in, I believe, 1936. I went to Germany a number of times since then but just as her *noblesse oblige* made her get married my common sense—no *amour propre*——prevented me from getting in touch with her. It is just not done.

Last year, however, I somehow came to know that her husband had died thirteen years ago. I wrote to her and got

an immediate reply. She did not write in detail. She said she had two sons aged twenty four and nineteen. She concluded by saying that as a large number of Indians are visiting Germany since independence why should I not find a way to do the same. She finished her letter by "As long as I am alive you are most welcome to my house".

Alas for Mariana! She does not know the Sanskrit proverb "Vasundhara virabhogya" (the world belongs to the heroes viras) but today it is "Vasundhara tadbirbhogya", it belongs to those who are masters of tadbir, pulling the strings, buttering up the paladins of the imperial court or / and the various foreign missions. As I am fast approaching the other world destined for me (sadhonachitadham) I would rather employ whatever tadbir I am capable of for gaining a better seat, if not in Dante's paradise, at least in the purgatory.

But Allah's ways are inscrutable. Certain quite unexpected circumstances and a couple of friends created a situation which found me in an Air India plane bound for America over Europe. The service was excellent, the food delicious but as that particular plane did not stop anywhere in Germany I got down at Zurich and took a train to Luzern which I have visited at least four times and shall never be tired of saying "Gruess Gott" to her again.

The Meeting

I caught an evening plane and reached Stuttgart when the light was fading. But there could be no mistake that it was Mariana. As she came towards me from the parking place I could distinctly see the same gait, the same bearing, and I believe with a view to please me she had put on a Kostúm and even the same coiffeur she used to have forty years ago. As I approached her she smiled but I did not ask her whether she recognized me at the first glance—who knows what

disappointing answer I might get.

Of course she had grown old (I should say "elderly", according to a German who told me that there are no old ladies in Germany but elderly ladies). She had crow's feet at the corner of her eyes, lines on her forehead and upper lip and her eyes had lost some of their sparkle but inspite of all, the contour of her face and the body was the same. Her "figu" (face in French) had, as I have said, had lines but strange to tell, her figure (taken in the English sense) had not. I was glad to note that she needed no artificial teeth, for often enough they change entirely the contour of the face, and you feel, for good or bad, as if you are not looking at a familiar face. Or as Daudet puts it, looking at a friend through a fog.

"It is actually only forty miles to my village home as the crow flies," she said as she started to drive in a tiny but delightful car, "but it is a strain to drive through the crowded Stuttgart and in the country the lights dazzle my eyes. During the past years I have driven to Stuttgart only twice." I apologized profusely and remembering that Mariana had poor eyes even forty years ago said, "I could have taken an earlier plane, if I only knew. Besides, I could have come from Stuttgart to your home by train. I told you so in my letter." But I knew in the heart of my hearts that she knew, ever since we met for the first time that while travelling as good as an Eskimo in Berlin. But I believe that was not the main reason. She really wanted to do something for me symbolic at the very first moment of our meeting which will give us a good start in our new relationship for, after all, the Germans themselves define friendship as a relationship of mutual attraction between two persons based on sympathy, understanding, respect for each other, common interest and readiness to help one another. I felt that I had not made a mistake in seeking out Mariana after forty years. I was certain that she was not boasting of the trouble she had taken to

come to Stuttgart, for she replied immediately as she always did, "Dont be silly!" which came as naturally as her mentioning the difficulty of driving in the dusk.

Pea soup, Wiener Schnitzel (escalope de veau a la viennoise) and that famous Rhine wine, hoc, par excellence (Liebfraumilch or Liebfrauenmilch). Strange! how she remembered my favourite dishes & wines which I love & could hardly afford in my student days. After dinner she told me important and occasionally very unimportant events of the past forty years of her life. Mariana's parents were Antinazis and her husband was dragged to the denazification court which caused his untimely death.

I wish I could write in greater detail of my stay at the huge zamindari home where Mariana lived lonely and all by herself; the sons came only during the holidays but I presume, here, the "Moderns" expect "hot stuff" from me and I shall have to disappoint them. Our days flowed smoothly like oil from a bottle without any tempestuous entracts. Of course we were inseperable. Even while she cooked one by one all my favourite dishes I gave her company in the kitchen. During those days Herr Brandt and his Foreign Minister Herr Scheel were stoutly defending their Ostpolitik in the Parliament and although the whole of Germany was watching it on the television screen, we, having given only one chance to the two Herren, went back to our reminiscences.

But I left Mariana with a deep wound in my heart which will never heal. Amongst other things she said, as if it were of little consequence "You know, when it can be really very, very cold here and the whole locality is snowbound it is really cheerless and I feel extremely lonely. Well, I think it can't be helped". She changed the topic.

And this winter was particularly cruel in Europe just to spite me. Sitting in a warm temperature of seventy

degrees I read that it had snowed even in the south of Italy after many years. Mariana must have been buried in at least six feet of snow. She does need a friend.

Friendship

Nonetheless some great thinkers have maintained that true friendship can exist only between a man and a man and there is no doubt that there are classical examples which have been sung by great poets. The friendship between Achilles and Patroclus, Krisna (Parthasarathi) and Arjuna, the Prophet Muhammad and Abu Bakr, and in recent times German literature has been considerably enriched by the friendship between Goethe and Schiller, as English by Hallam and Tennyson.

Perhaps there is a lurking suspicion in the minds of those thinkers that the friendship between a youngman and a maiden must ultimately turn into love.

Bana, in his famous novel Kadambari, has introduced the *motif* of friendship between a young prince Chandrapida and the daughter of a king, taken captive by Chandrapida's father called Patralekha and brought up by the queen as her own daughter but much to our disappointment, does not elaborate the theme. Tagore has discussed it *in extenso* in his article "The Neglected in Poesy" (Kavye Upekshita) where he counts her along with Lakshman's wife Urmila, the two companions of Shakuntala—Priyambada & Anasuya.

According to Bana, when Chandrapida was sixteen, her mother sent through a chamberlain (kanchuki) a charming young girl, who had not reached her full youth (anatiyauvana), with the message that the prince should accept her as the "bearer of pan-supari" (tambulakarankavahini) that she should not be treated as a servant, but as disciple, a *Friend* (suhrid) so that she might become his parmanent companion.

Tagore comments, Patralekha is not a wife, not a beloved, not a servant ; she is the companion (sahachari) of a male. This curious friendship is like a sand beach between two seas. How can it escape destruction ? That puissant and perrennial attraction which exists between young folk in their early youth—why does it not attack the narrow dam and destroy it ?

"But alas ! the poet has made the poor orphan princess sit for all times on that narrow strip ; what could be a grosser negligence of the poet towards this ill-fated war prisoner ? Living as she did behind a thin curtain she never attained her normal status. She kept awake near the heart of a man but could never step into it".

But not even the thinnest muslin curtain seperated them when it was a matter of friendship. She accompanied him everywhere "like his own shadow" and there proximity was more than ordinary, or shall I any bizarre. While out on military conquests, Chandrapida would make her first sit on an elephant and then take his place behind her. While in the military camp, the prince would converse with his friend Vaishampayana deep into the night. *FRIEND* (sakhi) Patralekha would spread her blanket on the earth and sleep near the Prince.

This relationship is indeed very touchingly sweet but it rejects the full recognition of the right of womanhood. Bana has brought them as close as possible and yet he does not for a moment show any alarm, he does not appear even to be worried that the narrow strip of the sandy beach may be washed away and friendship turn into love. According to Tagore, here, Bana has shown his extreme indifference towards the woman in Patralekha. Had he but shown the least bit of concern with their intimacy—an intimacy which is utterly free from all bashfulness such as is enjoyed between two women only—it would have been some compliment paid

to Patralekha, a recognition of her womanhood, however small.

Finally, to crown it all, Chandrapida falls in love and marries Kadambari. But Patralekha occupies such a very insignificant place in Chandrapida's life that the poet does not bother to throw her out. Indeed Kadambari does not feel the least bit jealous of Patralekha either. Indeed the latter serves as a messenger between Kadambari and Chandrapida when the former is away and she stays with her for some time.

But, asks Tagore, was she not disturbed at all by the scenes of amour which were acted between the prince and her wife? Did not the heat of the prince's impetuous youth ever make the blood in her vein run faster? With supreme nonchalance Bana, according to Tagore, does not pay the least attention to this divine aspect of Chitralekha's life and does not touch even the fringe of the question.

But who knows? Perhaps Bana wanted to paint a new conceit unknown to Sanskrit Kavya and he was afraid to bring them closer lest the reader should expect the eternal triangle, the stock-in-trade of many a Sanskrit dramatist. Perhaps the character and even more the situation of Chitralekha is tragic but it is certainly unique.

Tolstoy firmly believed in the friendship between man and woman. In his criticism of the famous short story of Chekhov "Darling", he goes to the length of considering Mary Magdalene as a source of inspiration of Lord Jesus, and "the relations of friendship and sympathy between St. Clara and Francis were very close and there can be no doubt that she was one of the truest heirs of Franci's inmost spirit". (E. B) In Bengal we remember Sister Nivedita not only as a disciple of Swami Vivekananda (whose birthday is being celebrated as I write this) but as one of his closest friends, associate in all his activities and the most important inspirer in his

life. It is by far the best example of friendship I know of, for unlike Magdalene and St. Clara Nivedita had to go beyond her creed, country and kinsfolk.

Whether we believe it or not :

"Love is only chatter
Friends are all that matter."

There is no doubt whatsoever when the Persian says,

"Dushman chih kunad
agar mehrban bashad dost."

"What can enemies do, if a friend is mehrban."

রায় পিথৌরার কলমে

এই পর্যায়ের লেখাগুলি সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯৫১-১৯৫২ সালে রায় পিথৌরা ছদ্মনামে আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখেন। সম্ভবতঃ লেখাগুলি এযাবৎ কোন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

—সম্পাদক

১

একদা হিন্দুকুশের উত্তরপ্রান্ত ও পারস্যের পূর্ব সীমান্তের বল্‌হিক ও কপিশা, গান্ধার (বর্তমান বল্‌খ্‌, কাবুল, জলালাবাদ) এই সব অঞ্চল ভারতের অংশরূপে গণ্য করা হইত এবং এই সব প্রদেশ হইতে বহু বিদ্যার্থী ভারতে আগমনপূর্বক বিদ্যাভ্যাস করিত। পরবর্তী যুগে নালন্দা তক্ষশিলায় দূরতর দেশ হইতে আগত বহু ছাত্র বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের চর্চা করিত, এ তথ্যও আমাদের অবিদিত নহে।

বৌদ্ধ ধর্মের পতনের পর মুসলমানেরা এই দেশের বড় বড় নগরে বিস্তর মক্তব-মাদ্রাসা স্থাপনা করেন। প্রাচীন পন্থানুযায়ী তুর্কীস্থান, বল্‌খ্‌, কাবুল, জলালাবাদ হইতে পূর্বেরই ন্যায় বহু মুসলমান ছাত্র এই দেশে জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য আগমন করিত। অদ্যাবধি বহু উজবেগ (বাঙলায় তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত 'উজবুক'), হাজারা, আফগান তুর্কমান ভারতের দেওবন্দ, রামপুর, রাঁচীদের মাদ্রাসায় আগমন করিয়া ন্যূনাধিক চতুর্দশ বৎসর যাপন করতঃ শেষ উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিত। ভারত বিভাগের পরও এ স্রোতধারা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ; কারণ পাকিস্তানে দেওবন্দ, রামপুরের মত উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যায়তন নাই।

ব্রিটিশ যুগে ইতিহাস অন্যরূপ ধারণ করিল। ব্রিটিশ স্কুল-কলেজ যে শিক্ষা দিল, আমরা তাহা বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিলাম, কিন্তু আমাদের প্রতিবেশীরা এই শিক্ষা যে কতদূর পদার্থহীন, তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়া আপন সাধ্যমত স্বদেশে বিদ্যায়তন নির্মাণ করিতে যত্নবান হইল। এই ব্যবস্থা ইংরেজেরও মনঃপূত হইল। পৃথিবীর সহিত আমাদের যোগসূত্র যত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয় ইংরেজের স্বার্থ ছিল সেই দিকে।

স্বরাজ লাভের পর আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি যে উন্নততর হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনা করার জন্য পুনরায় একটি ক্ষীণ স্রোত বাহিয়া অল্পবিস্তর বিদ্যার্থী এই দেশে আগমন করিতেছে।

বার্লিন, ভিয়েনা, প্যারিস, জিনিভা উদ্বাহু হইয়া বিদেশাগত ছাত্রকে অভ্যর্থনা করে, তাহাদের সুখ-সুবিধার জন্য বহু প্রকারের ব্যাপক ব্যবস্থা করে। এই দেশে সেই জাতীয় কোনো আন্দোলন অদ্যাবধি আরম্ভ হয় নাই।

তাই যখন দিল্লীর জনৈক প্রধান রাজকর্মচারী কয়েকদিন পূর্বে দিল্লীবাসী বিদেশী ছাত্রদের নিমন্ত্রণ করিয়া আদর আপ্যায়ন করিলেন তখন আমার অবিমিশ্র উল্লাস হইল। নিমন্ত্রণাগত একটি ছাত্র বলিল যে, প্রায় দুইশত বিদেশী ছাত্র

দিল্লীতে অধ্যয়ন করিয়া থাকে এবং তাহাদের একটি আপন প্রতিষ্ঠানও আছে।

পূর্ব আফ্রিকাগত দুইটি নিগ্রো ছাত্রের সঙ্গে পরিচয় হইল ও তাহাদিগের সঙ্গে আলাপ করিয়া হৃদয়ে বড়ই আনন্দ হইল। অতিশয় ভদ্র এবং নম্র স্বভাব এবং মনে হইল, এই দেশের প্রতি তাহারা ভক্তি পোষণ করে। আমাকে বিনয় এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল—তাহা হইতে তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতাও অনুভব করিলাম। নিমন্ত্রণ হইতে প্রত্যাগমনের সময়ে আমাকে তাহারা পূর্ব আফ্রিকায় সহৃদয় নিমন্ত্রণ জানাইল।

দিল্লীবাসীর কর্তব্য ইহাদিগের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করিয়া ইহাদিগকে আতিথেয়তা প্রদর্শন করা এবং সঙ্গে সঙ্গে আপন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিধি প্রসার করা। রাষ্ট্রের কর্তব্য ইহাদিগের প্রবাসক্লেশ লাঘব করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

* * *

এই শীতে বঙ্গদেশ হইতে যাঁহারা দিল্লী আগমন করিবেন, তাঁহাদিগকে আরও সদুপদেশ দিবার বাসনা হইতেছে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে দেখিতে পাই বহু সদুপদেশ বহুতর অমঙ্গলের সৃষ্টি করিয়াছে—অতএব নিবেদন যাঁহারা সস্ত্রীক আসিবেন, এই উপদেশ তাঁহাদের জন্য নহে। কারণ আমার উপদেশ যদি গৃহিণীরা মাত্রাজ্ঞান হারাইয়া পালন করেন, তবে দাম্পত্যকলহ শুরু হইবার সমূহ সম্ভাবনা এবং বঙ্গভূমে প্রত্যাবর্তন করিবার পাথেয় অবশিষ্ট না থাকিবার গুরুতর ভয়ও রহিয়াছে। সবিস্তর নিবেদন করি।

চাঁদনি চৌকে গৃহিণী কত বস্তু ক্রয় করিবেন, তাহার অল্পবিস্তর ধারণা আপনার হয়ত আছে, কিন্তু অধুনা ভারত সরকার দিল্লীতে যে কটেজ ইনডাস্ট্রিস এম্পোরিয়াম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাতে গৃহিণী প্রবেশ করিলে আপনার কি দুরবস্থা হইবে, তাহার কল্পনা আমি করিতে অক্ষম। অমৃতসহর হইতে ডিব্রুগড়, কুমায়ুন হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত যত প্রকারের কুটীর-শিল্প আছে, তাহার তাবৎ নিদর্শন সরকার এই গৃহে সঞ্চয় করিয়া এক বিরাট প্রদর্শনী খুলিয়াছেন।

তাহাতে কাহার আপত্তি, কিন্তু হায় সেইগুলি বিক্রয়ার্থে। যাদুঘরে গৃহিণীকে লইয়া যান পরমানন্দে, নির্ভয়ে। মনিব্যাগ, চেক বুক পকেটে বিরাজমান—কোনো ভয় নাই—গৃহিণী অশোকস্তম্ভ কিংবা যক্ষিণীর প্রতিমূর্তি ক্রয় করিতে চাহিলেও আপনাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতে হয় না, কিন্তু এই স্থলে যমুনার স্রোত পর্বতাভিমুখী। সরকার এই প্রতিষ্ঠানে যে সব তরুণীদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহারা বিক্রয় করার কলাকৌশল এমনি মোক্ষম আয়ত্ত করিয়াছে যে, আমার

গৃহিণীর মত কৃপণাও লোহিত-বর্তিকা প্রজ্বলন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন (এই বিষয়ে অত্যধিক বাক্যব্যয় করিব না, আমি আমার দাম্পত্য জীবনে শান্তি কামনা করি)।

যদিও বা আপনি এই কুম্ভীরের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়েন, তথাপি আপনার জন্য দিল্লীতে আর একটি ব্যাঘ্র রহিয়াছে।

কাশ্মীর সরকারের নিজস্ব কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠান।

বড়ই মনোরম বিপণি। কত প্রকারের শাল-দুশালা, পট্টু-ধোসা, পাপিয়ের মাশের কলাসামগ্রী, ধাতুনির্মিত তৈজসপত্র—দেখিতে দেখিতে আপনার গৃহিণী চঞ্চল হইয়া উঠিবেন, তাঁহার নিঃশ্বাস ঘন ঘন বহিতে থাকিবে, কল্পনার চক্ষে তিনি দেখিবেন কোন্ শাল ক্রয় করিলে তিনি ডলি মলি তাবৎ সুন্দরীদিগকে কলিকাতার সান্ধ্যক্লাবে নির্মমভাবে পরাজয় করিতে সক্ষম হইবেন আর আপনিও সঙ্গে সঙ্গে রক্তবর্তিকার যে বিভীষিকা দেখিতে পাইবেন, তাহার কল্পনা করিয়া আমার বিঘ্ন-সন্তোষী হৃদয় বিপুলানন্দ লাভ করিতেছে। আমার নিজস্ব নিদারুণ অভিজ্ঞতা এই স্থলে বর্ণন করিব না।

ধর্ম বলেন, আমার অনুচিত এই সব প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করা, কিন্তু আমি নিরুপায়। দিল্লীতে বাস করি, এই দুইটি মনোরম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি সুপরিচিত। আমার কি কর্তব্যবোধ নাই যে, আপনাদিগকে সত্যসুন্দর মঙ্গলের সন্ধান দিব না? আমি কি এতই কাপুরুষ যে, সামান্যা অবলাদিগের ভয়ে সত্য গোপন করিব?

অবশ্য আমার সাহস সম্পূর্ণ অন্য কারণে। 'আনন্দবাজারে'র স্কন্ধ কর্তন করিলেও সেই মহাজনগণ আপনাকে আমার বাসস্থানের উদ্দেশ দিবেন না। তাঁহারা নরহত্যার ঘোরতর বিরোধী। আপনার মঙ্গলও তাঁহারা সর্বান্তঃকরণে কামনা করেন।

* * * *

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দার্শনিকগণ দেহলিপ্রান্তে সমবেত হইয়া সপ্তাহাধিক কাল নানাপ্রকারের গবেষণা আলোচনা করিবেন। ইঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে কি প্রকারে উভয় ভূখণ্ডের জ্ঞানবিজ্ঞান একত্র করিয়া পৃথিবীতে সত্যশিবসুন্দরের শাশ্বত প্রতিষ্ঠা করা যায়।

ফ্রান্স, জর্মনি, সুইটজারল্যাণ্ড, ইতালী, ইংলণ্ড, জাপান, মিশর, তুর্কী, সিংহল, আমেরিকা ও ভারতের দর্শন-শার্দুলগণ ইতোমধ্যে স্ব স্ব সহানুভূতি ও সহযোগিতা জ্ঞাপন করিয়া পত্র বিনিময় করিয়াছেন।

দর্শনের সেবা করিবার সৌভাগ্য না ঘটিয়া থাকিলেও দার্শনিকদের সেবা করিয়াছি বলিয়া ইঁহাদের সকলেই আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত নহেন।

বিশেষতঃ জর্মনীর অধ্যাপক হেল্‌মুট্ ফন্ প্লাজেনাপ্। সংস্কৃতে ইঁহার পাণ্ডিত্য গভীর এবং বর্তমান ভারতের সঙ্গেও তাঁহার বিলক্ষণ পরিচয় আছে। ইঁহার অন্যতম পুস্তক 'বুদ্ধ হইতে গাঁধী' পুস্তক পাঠ করিয়া আমি পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ দিয়াছি। ইনি একাধারে দার্শনিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক এবং আলঙ্কারিক। তাঁহার ভারত-প্রেম অতুলনীয়। ইনি জর্মনীর পক্ষ হইতে ভারত আগমন করিবেন।

তাঁহার পিতা জর্মন ব্যাঙ্কে বহুকাল একচ্ছত্রাধিপত্য করিয়াছেন। তিনিও ভারতীয় বহু বিদ্যায় সুপণ্ডিত। স্পষ্ট স্মরণ নাই, তবে বোধ হইত তিনি কবি ইকবালের সতীর্থ ছিলেন। তাঁহার কাব্যাংশ জর্মনে অনুবাদ করিয়া ইকবাল তাই লইয়া গৌরব অনুভব করিতেন।

পাঠক, দেহলী-প্রান্তের এই আসন্ন সভার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে তুমি লাভবান হইবে।

২

কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সেক্রেটারী ডক্টর তারাচান্দ ভারতীয় রাজদূতরূপে ইরাণ যাইতেছেন।

ডক্টর তারাচান্দ যুক্তপ্রদেশ তথা দিল্লী অঞ্চলে সুপরিচিত। সংস্কৃত, ফার্সী আর উর্দু এই তিন ভাষাতে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য বহু বিদ্বজ্জনের প্রশংসা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। ভারতে মুসলিম সংস্কৃতির অবদান সম্বন্ধে তিনি যে গবেষণা করিয়াছেন, তাহাতে যে শুধু তাহার পাণ্ডিত্যই প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নহে,—চিত্র, সঙ্গীত, নাট্যকলায় তাঁহার সূক্ষ্ম রসানুভূতি তাঁহার পুস্তকরাজিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে সক্ষম হইয়াছে। দারাশীকুহ'র সম্বন্ধে তাঁহার প্রামাণিক প্রবন্ধ দেশবিদেশে অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। পণ্ডিত তারাচান্দ শব্দ এবং ধ্বনিতত্ত্বে সুপণ্ডিত বলিয়া দারার যুগে সংস্কৃত উচ্চারণ কিরূপ ছিল তাহা তিনি দারাকৃত সংস্কৃত শব্দের ফার্সী লিখন পদ্ধতি হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তারাচান্দের সংস্কারবর্জিত মন হিন্দু-মুসলমান উভয় বৈদগ্ধ্যের সম্পূর্ণ সম্মান দিতে সক্ষম হইয়াছে।

ইরাণ এবং মিশরে এতদিন যাবৎ দুইজন মুসলমান ভারতীয় রাজদূত ছিলেন। কাজেই ঐ দেশবাসীদের মনে এই ভুল ধারণা হওয়া অসঙ্গত নয় যে, ভারতবর্ষের

হিন্দুরা বুঝি আরবী ফার্সীর চর্চা করেন না এবং মুসলমানেরাও বুঝি সংস্কৃত, হিন্দী তথা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন।

মৌলবী তারাচান্দ যখন উত্তম উচ্চারণ সহযোগে রুবী-সাদী, হাফিজ-আত্তারের বয়ত আওড়াইয়া ইরাণের মজলিস-মুশায়েরা সরগরম করিয়া তুলিবেন তখন যে তিনি অকুণ্ঠ প্রশস্তিকীর্তন শুনিতে পাইবেন তাহার কল্পনা করিয়াও আমরা উল্লাস বোধ করিতেছি।

ডক্টর তারাচান্দের যাত্রা জয়যুক্ত হউক।

* * *

শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং ছাত্র, নেপাল যাদুঘরের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের চিত্রপ্রদর্শনী দিল্লীতে সুরসিকজনের প্রশংসা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

হিন্দুর যেমন শাক্ত বৈষ্ণব, মুসলমানের যেমন সীয়া সুন্নী, ইংরেজের যেমন লেবার কনসারভেটিভ, দিল্লীর তেমনি "অল ইণ্ডিয়া ফাইন্ আর্টস এ্যাণ্ড ক্রাফ্‌টস্ সোসাইটি" এবং "শিল্পীচক্র"। প্রথমটি আভিজাত্যাড়ম্বরে আমন্ত্রিত। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী—এবং অত্যন্ত অনটনের সময় অর্থমন্ত্রী—ইঁহারাই এই প্রতিষ্ঠানের শিল্পপ্রদর্শনী উপলক্ষে হোতা হইবার অধিকার ধারণ করেন। বিদেশাগত যাবতীয় রাজদূতমণ্ডলী, তাঁহাদের ভামিনীকামিনীগণ নগরশ্রেষ্ঠী, ধর্মাধিকারী এবং তাঁহাদের পুত্রকলত্র এই সব প্রদর্শনীতে যোগদান করিবার জন্য যে সব রথ আরোহণ করিয়া আগমন করেন একমাত্র সেইগুলিকেই পরিবেক্ষণ করিবার জন্য রবাহূত অনাহূতগণ যজ্ঞশালার প্রান্তভূমিতে দ্বিতীয় শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজন করিয়া ফেলে।

উত্তম উত্তম চিত্র প্রদর্শিত হয়। দৈনিক মাসিক সর্বত্র সাধুবাদ মুখরিত হইয়া উঠে। নিজেকে ধন্য মনে করি। সার্থক আমাদের দিল্লীবাস!

আর 'শিল্পীচক্র' নিতান্তই অব্রাহ্মণ শ্রেণীর জনপদ প্রচেষ্টা। ইহাতেও উত্তম উত্তম চিত্র প্রদর্শিত হয়। মন্ত্রিবর্গ সচরাচর এই স্থলে আগমন করিবার সময় করিয়া উঠিতে পারেন না, তবে বিদেশাগত রাজদূতমণ্ডলীর সুরসিক দর্শকেরা 'শিল্পীচক্রকে' অপাংক্তেয় করিয়া রাখেন নাই। অনেকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অতিশয় সৌজন্যের সঙ্গে জীর্ণবাস শিল্পীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেন। তাঁহাদের ললনাগণ উদার স্মিতহাস্যে শিল্পীকে আপ্যায়িত করেন।

দুইটি প্রতিষ্ঠানই দিল্লীনগরের জন্য প্রয়োজনীয়। উভয়েই আপন আপন আদর্শ পালন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

অর্থাভাবে 'শিল্পীচক্র' অনেক সময় আপন প্রদর্শনীগুলিকে অনাড়ম্বর এমন

কি জীর্ণ বেশে পরিবেশন করেন। রসিকজন তাহাতে দুঃখিত হন, কিন্তু বিচলিত হন না। কদলীপত্র অতিথি-সেবকের দৈন্যের পরিচয় দিতে পারে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কদলীপত্রে আতপান্ন ভক্ষণ বিস্বাদ প্রতীয়মান হয় না, কিন্তু সে দৈন্য রুচিহীনতার পরিচয় দেয় না। বিনোদবিহারীর চিত্র চিত্র-বিচিত্ররূপে পরিবেশিত হয় নাই। রসিকজন তাহাতে বিন্দুমাত্র চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার কলাপ্রচেষ্টা অনায়াসে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

কিন্তু এই সংসারে কাণ্ডজ্ঞানহীনেরও অভাব নাই। রসবোধ তাহাদের নাই জানি কিন্তু কিঞ্চিৎ বুদ্ধি থাকিলে অরসিকজন আপন রসহীনতা প্রকাশ করে না। এস্থলে যে ব্যক্তি বিনোদবিহারীর নিন্দা করিয়াছেন তিনি রস হইতে বঞ্চিত সে তত্ত্ব আমরা বিলক্ষণ জানি, কিন্তু তিনি যদি ভাষণ না করিতেন, তবে হয়ত পণ্ডিত-রূপেই শোভাবর্ধন করিতেন। তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই; শুধু যে নগরে গুণিজনের অহেতুক নিন্দা হয় সে নগরের নাগরিকমাত্রই নিজেকে বিড়ম্বিত মনে করেন।

* * *

কলিকাতা মহানগরীতে ফুটবল খেলা দেখিবার মত ধৈর্য এবং শক্তি আমার আর নাই এবং দিল্লী শহরে দেখিবার মত প্রবৃত্তিও নাই।

এক বন্ধু বলিলেন, 'বিবেচনা করে এই রাজস্থান এবং পূর্ববঙ্গের মল্লযুদ্ধ যদি তুমি দেখিতে চাও তবে তোমাকে অন্ততপক্ষে তিনশটি রৌপ্যমুদ্রা ব্যয় করিয়া কলিকাতা গমনাগমন করিয়া তাহা দেখিতে হইবে। অপিচ, উভয় পক্ষের যুযুধান ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেত। দিল্লীশ্বর বা জগদীশ্বর বলিলে যেখানে সামান্যতম অতিশয়োক্তি হয় মাত্র সেই রাষ্ট্রপতি সশরীরে উপস্থিত থাকিয়া ক্রীড়াজনিত ক্ষাত্র-ধর্মের উৎসাহ উদ্দীপনা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিবেন, সে স্থলে তুমি ন্যূনাধিক তিনটি রৌপ্যমুদ্রা ব্যয় করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছ? হা ধর্ম! ঘোর কলিকাল! ধিক্ তোমাকে।'

সবিনয় প্রশ্ন করিলাম, 'মূল্য-পত্রিকা ক্রয় করিবার জন্য কত প্রহর পূর্বে কুরুক্ষেত্রের প্রধান তোরণে উপস্থিত হইতে হইবে?'

সবিস্ময়ে উত্তর করিলেন, 'এ কি বাতুলের প্রশ্ন? অর্ধঘণ্টাই প্রশস্ত।'

এই সুসংবাদ শুনিয়া চিত্তে পুলক সঞ্চারিত হইল না। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলের পীঠস্থান কলিকাতা নগরে মল্লযুদ্ধ দেখিতে হইলে দ্বাদশপ্রহর পূর্বে ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্ধন বন্ধুবান্ধবসখাসজ্জন লইয়া উপস্থিত হইতে হয়, আর এই মহানগরী ইন্দ্রপ্রস্থে মাত্র অর্ধঘণ্টা।

আমার দ্বিধা অমূলক নহে।

ইন্দ্রপ্রস্থের সজ্জনগণ মল্লক্রীড়া নিরীক্ষণ করিলেন, ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া করতালি দিলেন, যত্রতত্র অবান্তর সমালোচনা করিলেন, ভদ্রজনোচিত পদ্ধতিতে উভয় পক্ষের মঙ্গল কামনা করিলেন এবং ক্রীড়াশেষে দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা সুখে বিগতস্পৃহ মুনিজনের ন্যায় শান্তসমাহিত চিত্তে স্ব স্ব ভবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এইবার আমি বলিলাম, হা ধর্ম!

বিকট চিৎকার, ছত্রহস্তে লম্ফঝম্প, শ্রাবণের বারিধারার মত শোকাশ্রু আনন্দবারি বর্ষণ, মল্লবিশেষের নামোল্লেখ করিয়া তীব্রকণ্ঠে তাহার চতুর্দশ পুরুষকে অভিসম্পাত, পার্শ্বে দণ্ডায়মান বিপক্ষানুরাগীকে নিদারুণ চপেটাঘাত, ফলস্বরূপ অনুরাগীদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ, তস্য ফলস্বরূপ ছত্র ও পাদুকা ক্ষয়, রক্তপাত অঙ্গাঘাত, গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর জয়ী হইলে সন্দেশ বিতরণ, পরাজিত হইলে গৃহিণীকে কটু বাক্যবর্ষণ—

কিছুই না?

এবম্বিধ ক্রীড়া দর্শনে কালক্ষেপ করে কোন্ সুরসিক!

৩

একই সময়ে দিল্লী সহরে দুইটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে; প্রথমটিতে দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে মধ্য ইউরোপের চিত্রতারকাগণ যে কলা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার নিদর্শন; দ্বিতীয়টিতে ইন্দোনেশিয়ার কলা সৃষ্টির সর্বাঙ্গসুন্দর সঞ্চয়ন।

এই দুইটি প্রদর্শনী দেখিয়া মনে পুনরায় প্রশ্ন জাগে, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য কি একই রসের অনুসন্ধান করিয়াছে এবং সেই রস যদি একই রস হয়, তবে তাহা উভয় ভূখণ্ডের ব্যক্তি এবং সামাজিক জীবনে কতখানি প্রসার লাভ করিয়াছে?

কলের জিনিস সস্তায় তৈয়ারী হয় বলিয়া ইউরোপের বাড়িঘর, তৈজসপত্র, বেশ-ভূষা, এমনই এক সর্বজনীন রূপ গ্রহণ করিয়াছে যে, তাহাতে আর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তির রসানুভূতি প্রকাশ পায় না। স্বীকার করি, ইউরোপীয় রমণী পর্দা কিনিবার সময় আপন রুচির উপর নির্ভর করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ পর্দা অন্য লক্ষ লক্ষ পর্দার সঙ্গেই মিলিয়া যায়। পর্দার ক্ষেত্রে কোনো কোনো রমণী হয়ত নিজের হাতে তাহার উপর কিছু কিছু কারুকার্য করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য আনয়ন করেন, কিন্তু টেবিল-চেয়ার, বাসন-কোসনের বেলা তাহার কিছুমাত্র অবকাশ থাকে না।

কল সব কিছু তৈয়ার করিয়া দিতেছে, সেখানে মানুষ রসসৃষ্টি করিবার অবকাশ পাইতেছে না—অথচ সে রকম মানুষ সব দেশেই আছে বিস্তর—তাহাদের তখন উপায় কি ?

তখন মানুষ নিত্য ব্যবহার্য তৈজসপত্রকে আর কারুকার্য বিভূষিত না করিয়া সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কলাসৃষ্টি আরম্ভ করে। ফলে চিত্র এবং ভাস্কর্য মানুষের রসসৃষ্টির মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হয়। তাই কলের জিনিস যেখানে সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত—দৃষ্টান্ত-স্থলে মধ্য ইউরোপ—সেখানেই প্রচুর পরিমাণে চিত্র অঙ্কিত হয়, মূর্তি নির্মিত হয়। আমার বিশ্বাস প্যারিস বার্লিন দুই শহরে যে পরিমাণ চিত্র অঙ্কিত হয়, সমস্ত প্রাচ্য দেশে এত ছবি আঁকা হয় না।

আর একটি তত্ত্ব এস্থলে লক্ষণীয় ; নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের কোনো অভাব এই সব চিত্র পূরণ করে না বলিয়া তাহারা দশের মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা করে না এবং ক্রমে ক্রমে নিরতিশয় ব্যক্তি-কেন্দ্রিক হইয়া দাঁড়ায় এবং খুব বেশী হইলে মাত্র সেই গোষ্ঠীরই চিত্তবিনোদন করিবার চেষ্টা করে যাহারা রসের সংসারে সমগোত্রীয় এবং তাহার শেষ ফল এই হয় যে, এ-ধরণের চিত্র এবং ভাস্কর্য অতিশয় অ্যাবস্ট্রাক্ট রূপ ধারণ করে।

* * *

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই মধ্য-ইউরোপীয় চিত্রকলার এই পরিণতি ঘটিয়াছিল। প্যারিস যদিও বহু বৎসর যাবৎ এই আন্দোলন আলোড়নের কেন্দ্রভূমি ছিল, তথাপি বার্লিন যখন একবার এই আন্দোলন গ্রহণ করিল, তখন তাহার পরিণতি অদ্ভুত অদ্ভুত রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল !

দিল্লীর চিত্রপ্রদর্শনীতে আজ আমরা প্রধানতঃ সেই সব চিত্রের কিয়দংশ দেখিতে পাইতেছি।

ইহাতে ভালো চিত্র নাই, এই কথা আমার বলিবার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু মানুষের অধীর চিত্তকে যে শান্তি দেয়, তাহার সন্ধান এই প্রদর্শনীতে বড়ই কম। যেখানে সমস্তক্ষণ চিত্রকার নূতন ভাষা, নূতন শৈলী, নূতন আঙ্গিকের অনুসন্ধানে ব্যস্ত, সেখানে দর্শক শান্ত সমাহিত রসের সন্ধান করিলে নিরাশ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি ?

গুণের দিক দিয়া অতি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, এই চিত্রগুলিতে প্রাণ আছে। প্রচেষ্টার ফল ভালো হউক, মন্দ হউক, প্রচেষ্টা মাত্রই দর্শকের চিত্তে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং সে চাঞ্চল্য গতানুগতিক কিম্বা মৃত কলা অপেক্ষা অতি অবশ্য সর্বথা কাম্য।

* * *

ইন্দোনেশিয়ার কলা সেই দেশের জনসাধারণের কলা। প্রদর্শনীতে যেসব বস্তু রাখা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এমন কি তৈজস এবং মূর্তিগুলি পর্যন্ত হয় গৃহসজ্জায় নয় পুতুলরূপে আনন্দদানের জন্য ব্যবহৃত হয়।

এবং সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, কি বালির পুতুল, কি গরুড়ের মূর্তি, কি পরিধান বস্ত্রের নক্সা, কি বেতের ঝাঁপি, বারকোশ, কি বালা ব্রুচ আংটি, কি 'বাতিকের' কারুকার্য সর্বত্রই স্পষ্ট বোঝা যায় এখানে কোনো নূতন শৈলীর অনুসন্ধানে উন্মত্ত নৃত্য নাই। রস কি করিয়া প্রত্যেক বস্তুটির ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে হয় তাহার সন্ধান ইন্দোনেশীয়ার কলাকার বহু শতাব্দী পূর্বেই পাইয়াছিলেন এবং সেই সত্যপথ ধরিয়া তাঁহারা প্রতিদিন জীবনের নিত্য ব্যবহার্যের আর কোন্ বস্তুকে আরো সুন্দর করা যায় তাহার চেষ্টা করিয়াছেন। এককালে আমাদের দেশের শিল্পীরাও প্রত্যেকটি জিনিসকে রসরূপ দিবার চেষ্টা করিতেন; এখন তাঁহাদের পরাজয়ের পালা আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিদিন মিলের কাপড়, এলুমুনিয়মের বাসন আপন সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। বিবেচনা করি, এমন দিনও আসিবে যখন দুর্গা প্রতিমা কলে তৈয়ারী হইয়া এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

এই প্রদর্শনীর বহু বস্তুর সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিয়াছি, এ জিনিসটির কি কোনো দোষ কোনো ত্রুটি নাই? স্পষ্ট ভাষায় বলি, এমন বহু জিনিস দেখিলাম যাহাতে সত্যই কোনো প্রকারের ত্রুটিবিচ্যুতি নাই। সর্বাঙ্গসুন্দর কলাসৃজনের এইরূপ অভিনব সঞ্চয়ন আমি আমার জীবনে আর কোথাও দেখি নাই।

রসবস্তু বিচারে কোনো প্রকারের ব্যক্তিগত দুর্বলতা বা ভৌগোলিক ক্ষুদ্রতার স্থান নাই এই সত্য বারম্বার স্বীকার করিয়াও যদি নিবেদন করি, কোনো সুন্দরী রমণীর মুখে যদি আমি আমার মাতার সাদৃশ্য দেখিতে পাই তবে সেই সুন্দরী কি আমার কাছে প্রিয়তর মনে হন না?

মাতা, ভগ্নী সকলকেই বাল্যকাল হইতে দেখিয়াছি, ঢাকাই শাড়ি পরিতে। দাওয়ায় বসিয়া কত সহস্রবার দেখিয়াছি, বাঁশের বেড়ায় শাড়ি শুকাইতেছে এবং সেইসব পাড়ের নক্সাই তো আমাকে রসশাস্ত্রের প্রথম অ আ ক খ শিখাইয়াছে। জ্বরের ঘোরে যখন বালক তাহার দৃষ্টিশক্তির কর্তৃত্ব হারাইয়া ফেলে তখন সে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে মাসীমার শাড়ির পাড়ের দিকে। চেতন অর্ধচেতন উভয় মনই বাল্যকাল হইতে আপন অজানাতে এই সব বস্তু দিয়াই তাহার 'শিল্পসূত্র' (ক্যানন্‌স অব আর্ট) নির্মাণ করে।

অকস্মাৎ এই প্রদর্শনীতে দেখি, ঢাকাই পাড়ের নক্সা! দেহলি প্রান্তের রসযজ্ঞশালার প্রান্তভূমিতে ঢাকাই নক্সা অনাদৃতা। তাই অর্ধপরিচিত সমুদ্রপারে আদৃত (না হইলে এই নক্সা প্রদর্শনীতে স্থান পাইবে কেন) এই নক্সা দেখিয়া আমার চিত্ত অভিভূত হইয়া গেল।

প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা শ্রীযুত বিনোদ এবং মহরাজা উভয়ই ইন্দোনেশিয়ার কলাতে ভারতের প্রভাব সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। তদুপরি এই তথ্যও জানি ভারতের বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ অঞ্চলই ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে সর্বাধিক বাণিজ্য করিয়াছে। আরো জানি ঢাকাই শাড়ির নক্সা উড়িষ্যা এবং মাদ্রাজ অঞ্চলে প্রচলিত নহে।

তাহা হইলে আমার সুপরিচিত ঢাকাই শাড়ির নক্সাই তো এই নক্সাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

তাহা হইলে আমারই অনাদৃত আমার দেশের তন্তুবায় একদা রসভূমিতে ইন্দোনেশিয়া জয় করিতে সক্ষম হইয়াছে। পাঠক আপনাকে শ্রদ্ধা করি, আপনি পারেন না। আমিও পারি নাই।

* * *

কবিগুরু কর্তৃক রচিত বালি দ্বীপ কবিতাটির কয়েকটি ছত্র এই উপলক্ষ্যে উল্লেখ করি :—

"সন্ধ্যাতারা উঠিল যবে গিরিশিখর 'পরে,
একেলা ছিলে ঘরে।
কটিতে ছিল নীল দুকূল, মালতীমালা সাথে,
কাঁকনদুটি ছিল দু'খানি হাতে।
চলিতে পথে বাজায়ে দিনু বাঁশি—
'অতিথি আমি' কহিনু দ্বারে আসি।
তরাসভরে চকিত করে প্রদীপখানি জ্বেলে
চাহিলে মুখে; কহিলে 'কেন এলে।'
কহিনু আমি, 'রেখো না ভয় মনে—
তনুদেহটি সাজাব তব আমার আভরণে।'
আধোচাঁদের কনকমালা দোলানু তব বুকে।
মকরচূড় মুকুটখানি করবী তব ঘিরে
পরায়ে দিনু শিরে।
জ্বালায়ে বাতি মাতিল সখীদল,
তোমার দেহে রতনসাজ করিল ঝলমল।—"

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কৌতূহল সব দেশেই আছে, কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করা যায় আজ পর্যন্ত কোন্ দেশ সবচেয়ে বেশী কৌতূহল দেখিয়েছে এবং সেই কৌতূহল পরিতৃপ্ত করার জন্য সবচেয়ে বেশী চেষ্টা করেছে কে, তা হলে সকলের পয়লা নাম নিতে হয় জর্মনির।

আর কিছু না; শুধু যদি এই মাপকাঠিই নিই, ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, কাব্য, অলঙ্কার সম্বন্ধে সব চেয়ে বেশী বই লেখা হয়েছে কোন্ ভাষায় তা হলেই জর্মনি পয়লা প্রাইজ পেয়ে যাবে। এখানে অবশ্য এমন সব কেতাবের কথা উঠছে না যেগুলো শুদ্ধমাত্র ভারতবর্ষকে কব্জা রাখার জন্য ইংরেজ লিখেছে বা লিখিয়েছে, কিম্বা এমন সব কেতাবের কথাও উঠছে না যেগুলো পড়া থাকলে হাতী শিকারের সুবিধে হয় অথবা ক্রিকেট খেলার 'পিচ' বানাবার সময় কাজে লাগে। সোজা বাঙলায় যাকে বলে 'শাস্ত্র-চর্চা' আমি সেই শীল সেই অধ্যবসায়ের কথা ভাবছি।

* * *

জর্মনিতেও ভারতের চর্চা আরম্ভ হয় পঞ্চতন্ত্র নিয়ে। পঞ্চতন্ত্রের পেহলভী তর্জমার আরবী তর্জমার লাতিন তর্জমার জর্মন অনুবাদ হয় ট্যুবিঙ্গেন শহরে সেখানকার রাজার আদেশে। তারপর আঠারো আর উনিশ শতকে জর্মনি সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত আর অর্ধ-মাগধী শিখে ভারত সম্বন্ধে যে চর্চাটা করল তার সামনে দাঁড়িয়ে বার বার মাথা নিচু করতে হয়। এ চর্চাতে যে শুধু ভাষাবিদ পণ্ডিতেরাই যোগ দিলেন তা নয়, জর্মন দার্শনিক, সাহিত্যিক, কবিরা পর্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ভারতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত হলেন।

* * *

প্লাতো, দেকার্ত আর তার পরেই কাণ্ট।

দার্শনিক কাণ্টও যে ভারত নিয়ে চর্চা করেছিলেন এ তত্ত্ব ক'জন লোক জানে?

কাণ্টের সময় ভারত সম্বন্ধে ইয়োরোপের জ্ঞান এত সামান্য ছিল যে কাণ্টের পক্ষে ভারতীয় দর্শন চর্চা করা সম্ভবপর হয়নি, কিন্তু গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল বলে যে সামান্য দু'একটি খবর তিনি জানতে পেরেছিলেন তারই জোরে বলে যান, "ক্রীশ্চান মিশনারীরা ভারতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখেন, ভারতীয় পণ্ডিতরা অত্যন্ত উৎসাহ এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে খৃষ্টধর্মের বাণী শোনেন; কিন্তু ভারতীয়রা আশ্চর্য হল এই দেখে যে ক্রীশ্চান মিশনারীদের হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল নেই।"

এ তত্ত্ব আজ আমরা সবাই জানি, কিন্তু আশ্চর্য সে যুগে কাণ্ট ওটা জানলেন কি করে? খৃষ্ট ধর্ম যে এদেশে প্রচার এবং প্রসার লাভ করল না সেই তো তার প্রধান কারণ। ভাবের জগতে তো 'ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক' অচল!

* * *

গ্যোটে 'শকুন্তলা'র প্রশস্তি গেয়েছিলেন—তারই খেই ধরে রবীন্দ্রনাথ একখানা উত্তম প্রবন্ধ লেখেন সে কথা আমরা সবাই জানি।

তারপর বিখ্যাত কবি হাইনরিশ হাইনে কল্পনার চোখে ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভারী চমৎকার কয়েকটি কবিতা লেখেন। জর্মন ছেলে বুড়ো কোনো ভারতীয়কে পেলেই সে সব কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়ে আনন্দ পায়। ভারতীয় গর্ব অনুভব করে—অবশ্য বলে রাখা ভালো নিছক কল্পনার উপর খাড়া বলে হাইনের কবিতাতে দু'একটি বর্ণনার ভুল থেকে গেছে। গঙ্গার জলে হাইনে পদ্ম ফুটিয়েছেন এবং সেই পদ্মর সামনে হাঁটু গেড়ে পূজো করছে ভারতীয় তরুণী।

তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ ওদিকে আবার বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের কলহে হাইনে গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রের দ্বন্দ্ব দেখতে পেয়েছেন এবং জর্মনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

* * *

আসল কৃতিত্ব কিন্তু জর্মনরা দেখিয়েছে বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত পুরাণ গীতা, শ্রৌত সূত্র, গৃহ্য সূত্র, ষড়দর্শন, ভক্তিবাদ, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র নিয়ে।

ঋগ্বেদের অনুবাদ উনিশ শতকে হয়; তারপর তুলনাত্মক ভাষা চর্চার ফলে ঋগ্বেদ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেকখানি বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও সেই পুরাতন অনুবাদই চালু থাকে। মাক্‌স্‌ম্যুলারের পর ঋগ্বেদ অনুবাদ করবার মত দুটো মাথা কটা লোকের ঘাড়ে আছে?

*

সেই সাহস দেখালেন আরেক জর্মন পণ্ডিত—মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গেল্‌ড্‌নার।

গেল্‌ড্‌নারের ঋগ্বেদ-অনুবাদ আশ্চর্য বই। গ্রাসমান, লুডবিশ, মাক্‌স্‌ম্যুলারের যুগ থেকে ১৯২০ (মোটামুটি) পর্যন্ত ঋগ্বেদ সম্বন্ধে যত প্রবন্ধ যত ভাষায় লেখা হয়েছে তার সামান্যতম মূল্যবান জিনিসও কোনো না কোনো উপলক্ষ্যে গেল্‌ড্‌-নারের অনুবাদে স্থান পেয়েছে। ফলে এই হয়েছে যে আজ ঋগ্বেদ সম্বন্ধে প্রামাণিক কোনো তথ্য অনুসন্ধান করার সময় বিশ্বভুবন খুঁজে বেড়াতে হয় না—গেল্‌ড্‌-নারের জর্মন অনুবাদখানাই যথেষ্ট।

* * *

কিন্তু এর শেষ কোথায়? ঋগ্বেদ সম্বন্ধে যা বলা হল তাও তো অতিশয় সংক্ষেপে। এখন যদি আর তিনখানা বেদ নিয়ে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করি, তাহলে লিখতে হবে আরেকখানা মহাভারত এবং সে মহাভারত ব্যোটলিঙ্ক-রোটের সংস্কৃত-জর্মন অভিধানের আকার ধারণ করবে।

ব্যোটলিঙ্ক-রোটের অভিধানখানি সার্থক বই। এ অভিধানকে হার মানাতে পারে এ রকম অভিধান পৃথিবীতে নেই।

এর পশ্চাতে একটুখানি ইতিহাস আছে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি জর্মনরা বলল, 'ভালো অভিধান ছাড়া আর তো সংস্কৃত চর্চা করা অসম্ভব হয়ে উঠল। এর একটা কিছু ব্যবস্থা করা উচিত।'

ব্যোটলিঙ্ক-রোট দুই গুণী অভিধানখানা লিখতে রাজী হলেন। বিরাট সাত ভলুমে সে অভিধান শেষ হল, কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল এ অভিধান ছাপাতে যাবে কোনো প্রকাশক—এত রেস্ত আছে কোন্ গৌরী সেনের?

গৌরী সেন রাজা ছিলেন না—তাই তুলনাটা টায়-টায় মেলে না। কারণ শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এ অভিধান ছাপাবার মত পয়সা আছে শুধু রাশিয়ার জারের।

তখন জর্মন পণ্ডিতরা পাকড়াও করলেন তাঁকে—জারটি ভালো মানুষ ছিলেন (রামচন্দ্র! কম্যুনিস্ট ভায়ারা না আবার চটে যান) এবং টাকাটা অকাতরে ঢেলে দিলেন।

শুধু এই অভিধানখানিকে ভালো করে কাজে লাগানোর জন্যই জর্মন ভাষা শেখা উচিত।

মনে পড়ছে, প্রথম যৌবনে 'ক্রন্দসী' শব্দের সামনে কাঁদ কাঁদ হয়ে মেলা অভিধান ঘাঁটার পর ব্যোটলিঙ্ক-রোটের অভিধান খুলে শব্দটার হদিস পাই। (স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহোদয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধার অন্ত নেই—তিনি বাঙালীর গৌরবস্থল ও প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। তাই তাঁর সামান্য দোষ-ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত করলে তাঁর আত্মা বিরক্ত হবেন না বলে আশা রাখি। তাই এই উপলক্ষ্যে নিবেদন করি, জ্ঞানেন্দ্রমোহন তাঁর অভিধানে 'ক্রন্দসী' শব্দ উল্লেখ করে যে বলেছেন 'সংস্কৃত অভিধানে পাই নাই, কিন্তু রোদসী পাইয়াছি' পুনরায়, 'কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক উদ্ভাবিত' এই দুটি বাক্যই খুব ঠিক নয়।)

* * *

বপ, ডয়সেন, অণ্ডেনবুর্গ, য়াকোবি, হিলেব্রাণ্ট, ড্যুটওয়া এঁদের সবাইকে বাদ

দিয়ে তাঁদের কথায়ই আসি না কেন যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ হয়েছে।

এই ধরুন ল্যুডার্স। গেল্ড্‌নারের পরেই চতুর্বেদে পণ্ডিত ছিলেন এই বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক।

মোন-জো-দড়ো নিয়ে যখন বিশ্বভুবন মাথা ফাটাফাটি করছে, এ কোন্ সভ্যতা, এর বয়স কত, একে গড়ে তুলল কে, তখন জর্মনি ল্যুডার্সকে অনুনয় করে বলল, 'চতুর্বেদে হেন বস্তু নেই যা আপনার অজানা। আপনি মোন-জো-দড়ো ঘুরে এসে বলুন, বেদে বর্ণিত কোনো কিছু কি মোন-জো-দড়োতে আছে যার থেকে প্রমাণ করা যেতে পারে যে মোন-জো-দড়ো আর্য সভ্যতা।'

ল্যুডার্স ঘুরে গিয়ে বললেন, 'না, বেদের সঙ্গে এর কোনো যোগাযোগ নেই।'

ব্যস্। সব মাথা-ঘামানো বন্ধ।

সব শাস্ত্রেই ল্যুডার্সের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। শেষ বয়সে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রটি অধ্যয়ন করে তার সঙ্গে গ্রীক অলঙ্কার শাস্ত্র মিলিয়ে যখন বক্তৃতা দিতেন তখন দেখেছি তাঁর শ্রোতারা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনে যেতেন। এ রকম পণ্ডিত জর্মনিতে আবার জন্মাবেন কবে?

* * *

কিম্বা ধরুন কির্ফেল।

জৈন শাস্ত্রের মহাপণ্ডিত যাকোবির (ইনি স্বাধীনভাবে হিসেব করে লোকমান্য টিলকের সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হন) শিষ্য কির্ফেলকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'উপস্থিত কোন বিষয় নিয়ে মগ্ন আছেন?'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'পুরাণ নিয়েই তো জীবনটা কাটল। অন্য জিনিস ভালো করে পড়বার ফুর্সৎ পেলুম কই।'

জিজ্ঞাসা করি, পুরাণের দেশ ভারতবর্ষে কয়জন লোক পুরাণের জন্য প্রাণ দেয়? একজনকে জানি—বাঙালী মাত্রই তাঁকে জানে।

কিন্তু আজ এ শিবের গীত কেন?

এ সপ্তাহে দিল্লীতে বক্তৃতা দিয়ে গেলেন জর্মন পণ্ডিত অধ্যাপক ডক্টর হেলমুট ফন্ গ্লাজেনাপ। বিষয় ছিল, জর্মনির উপর ভারতীয় প্রভাব। সে বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলুম।

শ্লেগেল থেকে আরম্ভ করে উইণ্টারনিৎস-ল্যুডার্স পর্যন্ত তিনি পণ্ডিতের ভারতীয় জ্ঞান চর্চার ইতিহাস দিলেন। বয়স হয়েছে, স্মরণশক্তির উপর আর নির্ভর করতে পারিনে, তবু টুকতে পারিনি।

তাই যেটুকু মনে ছিল তার সঙ্গে পিথৌরার অভিজ্ঞতা জুড়ে দিয়ে আপনাদের

সামনে নিবেদন করলুম।

প্ল্যাজেনাপ তার বক্তৃতা শেষ করেন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে এবং তার উত্তর দিয়ে।

জর্মনি ভারতীয় শাস্ত্র নিয়ে এত চর্চা করে কেন?

উত্তরে বলেন, 'উভয় জাতিই উচ্চ চিন্তাতে আনন্দ পায়।'

আমরাও স্বীকার করি।

৫

ইংরেজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সেবা করাতে, ফরাসী উত্তম ছবি আঁকতে, জর্মন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত রচনা করাতে কৈবল্যানন্দ অনুভব করে আর বাঙালী 'বলেছিলুম, তখুনি বলেছিলুম' বলতে পারলে অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণী করাতে সে সুপটু এ-কথা সপ্রমাণ করতে পারলে জীবনে তার আর কোনো বাসনা থাকে না।

তাই আমিও আজ সোল্লাসে বলছি, 'বলিনি, তখনি বলিনি শ্রীযুত মুখুয্যে মশাইকে লাটসাহেব বানিয়ে ভারত সরকার অতি উত্তম কর্ম করেছেন?' ভদ্রলোক মাইনে নেন নামমাত্র, আর আজ শুনতে পেলুম, তিনি নাকি বলেছেন, এত বড় বিরাট লাট-ভবনের তাঁর প্রয়োজন নেই, তিনি মাত্র দু'একখানি ঘর নিয়ে বাদ বাকি অন্য কাজের জন্য ছেড়ে দেবেন।

কিন্তু একটা জিনিসে মনে একটু খটকা লাগল। শুনলুম, লাটবাড়ির ফালতো ঘরগুলোতে নাকি আপিস বসবে।

* * *

আমার জনকয়েক গুণী বন্ধুবান্ধবের বিশ্বাস তার চেয়ে যদি ঐ ঘরগুলো দিয়ে কোনো প্রকারের বৈদগ্ধ্যগত প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা যায়, তবে লাটবাড়ির সম্মান বজায় থাকবে, বাঙালীরও উপকার হবে।

এই ধরুন না, রবীন্দ্রভবন। কলকাতার কবি রবীন্দ্রনাথ। কলকাতা-বাঙলা দেশের রাজধানীও বটে। তবু এই কলকাতা শহরেই যদি আপনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোনো প্রামাণিক গ্রন্থ লিখতে চান, তবে আপনাকে একাধিক জায়গায় ছুটোছুটি করতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত সব জিনিস পাবেন কিনা, সে বিষয়েও আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

লাটবাড়িতে এ ব্যবস্থাটা করলে হয় না?

কিম্বা মনে করুন, একখানা উত্তম চিত্রশালা খুললে হয় না?

আরো কত কিছু করা যেতে পারে। আমার পাঠকেরা গুণী লোক,—মাথা না

চুলকিয়েও গুম্ গুম্ করে পঁচিশখানা ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা বাৎলে দিতে পারবেন। আমার মনে হয়, গুণীদের এ বিষয়ে চুপ করে থাকা উচিত নয়। আমাকে যদি পত্রযোগে জানান, তবে আমি তাঁদের মোক্তার এবং মুহুরিরূপে পাঠক-ধর্মাবতারের এজলাসে পেশ করতে পারি।

কিন্তু আপিস, না স্যর, লাটবাড়িতে আপিস—ও কোনো কাজের কথা নয়। শালিগ্রাম দিয়ে মশারির পেরেক পোঁতা? (ক্ষিতিমোহনবাবুর কপিরাইট)।

* * *

দুই দোরে ডবল পর্দা, দরজায় হুড়কো, ভেন্টিলেটরে কালো কাগজ সাঁটা তবু দুপুর বেলা ঘরে বসেই আমেজ করতে পারলুম বাইরে কিছু একটা হচ্ছে—ভূতের নৃত্য কিম্বা পিশাচিনীর শ্রাদ্ধ।

অতি সন্তর্পণে দরজা ফাঁক করে দেখি—মারাত্মক কাণ্ড।

আসমানজমীন গাছপালা সব কিছুর যেন জণ্ডিস হয়েছে। অতি সূক্ষ্ম ধুলোর ঝড় বইছে—এখানে যাকে বলে আঁধি—আর সেই ধুলো আকাশে-বাতাসে এমনি ছড়িয়ে পড়েছে যে মনে হয়, যেন জণ্ডিসের কুয়াশায় সব কিছু আচ্ছন্ন।

মনে হল যেন, পরশুরামের সেই ছবি দেখছি। কুয়াশার ভিতর দিয়ে শোনা গেল "সব আছে, সব আছে হরিনাথ, সব আছে।"

নিজাম প্রাসাদে, জানিনে, কোন কাষ্ঠরসিক গুটিকয়েক ঝাউগাছ গজিয়েছেন। বিরাট বিরাট গাছ—এদের আসল জন্মভূমি পাহাড়ে। সমস্ত বৎসর এরা বিরস বিবর্ণ মুখে কাটায়, শুধু শীতকাল এলে দেশের হাওয়া পেয়ে যেন চঞ্চল নৃত্যে নেচে ওঠে।

গ্রীষ্মকালে গরমের তেজে এদের থোকা থোকা সবুজ নীডল (পাতা) ঝলসে গিয়ে একদম হলদে হয়ে যায়, আর যেন কোনো গতিকে গাছের গায়ে আঁকড়ে ধরে টিকে থাকে।

দেখি ঝড়ের হাওয়া ঠাস ঠাস করে ঝাউয়ের গায়ে থাবড়া মারছে আর খাবলা খাবলা নীডলের গুচ্ছো তুলোর মত এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ছে। মাটিতে পড়ে গিয়েও এদের নিষ্কৃতি নেই। আঁধির জল্লাদ খুন করে চলে গেল, এখন তারই মুর্দফরাস এদের ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—বাগানের এদিক থেকে ওদিক, আবার ওদিক থেকে এদিক।

তিনটে বাজল, চারটে বাজল—ঝড়ের বেগ—বেড়েই চলেছে। কি অলুক্ষণে কাণ্ড!

* * *

রাত তখন আটটা। শুনলুম, প্রধান মন্ত্রীর প্লেন অতি কষ্টে নাকি এ্যারোড্রোমে নামতে পেরেছে, আর তার আধঘণ্টাটাক পরেই মাদ্রাজের প্লেন মাটিতে নামতে না পেরে দুর্ঘটনায় খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গিয়েছে—একটি প্রাণীও বাঁচেনি।

আমি জানি, আপনারা বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু সমস্ত দুপুর আমার মনে কেমন যেন একটা অজানা ভয় জেগে রয়েছিল, কিন্তু শেষটায় যে এতগুলো জীবন নষ্ট হবে, তার কল্পনাও মনে করতে পারিনি। আর কল্পনা করলেই বা কি করতে পারতুম?

পরদিন সুহৃদ ডাক্তার মজুমদার এবং লেডি ডাক্তার স্বরূপের সঙ্গে দেখা। এঁরা দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে অকুস্থানে যান। যে ক'জনের তখনো প্রাণ ছিল, তাদের হাসপাতালে নিয়ে যান, কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না।

আমার মনে শুধু এইটুকু সান্ত্বনা যে, আমার বন্ধু মজুমদার এবং আমার শিষ্যা (ডাক্তারিতে না) শ্রীমতী স্বরূপ আর্তজনের সাহায্য করাতে কোনো ত্রুটি তো করেনই নি—স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন। এঁরা সফদরজঙ্গ হাসপাতালে কর্ম করেন—এ্যারোপ্লেন দুর্ঘটনা সম্পর্কে এঁদের কোনো সরকারী দায়িত্ব নেই। ভগবান এঁদের মঙ্গল করুন।

* * *

দিল্লীস্থ শান্তিনিকেতন-আশ্রমিক সঙ্ঘ এবং নিউদিল্লী বাঙালী ক্লাব যুগ্মভাবে সুসাহিত্যিক শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশীকে ২৫শে বৈশাখ উপলক্ষে দিল্লীতে নিমন্ত্রণ করেছেন। শ্রীযুত প্রমথনাথের লেখার কদর কে কতটা দেন, তার বিচার রায় পিথৌরা করবেন না। কিন্তু এ-কথা ঠিক, বাঙলা সাহিত্যের সেবা আজকের দিনে যাঁরা করেন তাঁদের মধ্যে শ্রীযুত বিশীই রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য পেয়েছিলেন সব চেয়ে বেশী। রবীন্দ্রনাথ তখন প্রৌঢ়। তাঁর স্বাস্থ্য তখন অটুট, ওদিকে কবিত্বের দিক দিয়ে দেখতে গেলে তিনি তখন পরিপূর্ণতায় পৌঁছে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তখন অক্লান্ত অধ্যাপনা করছেন ও সঙ্গে সঙ্গে কাব্যসৃষ্টিও চলছে। এবং সর্বশেষ কথা, প্রমথনাথ রবীন্দ্রনাথের স্নেহ পেয়েছিলেন অকৃপণভাবে।

রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুত বিশীর কাব্য এবং সাহিত্য প্রচেষ্টার প্রশংসা করতেন আবার প্রয়োজন হলে কঠিন সমালোচনাও করতেন। নিতান্ত আত্মজন না হলে রবীন্দ্রনাথ কারো কঠোর সমালোচনা করতে চাইতেন না। (আর সাহিত্যের বাইরে তেল কিম্বা কালির জন্য তিনি যে-সব সার্টিফিকেট দিয়েছেন, সেগুলোর মূল্য কতটুকু সে তো সবাই জানেন) তাই শ্রীযুত বিশী সেদিক দিয়েও ভাগ্যবান।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, বাঙলা দেশ শ্রীযুত বিশীর সামর্থ্যের সম্পূর্ণ ফললাভ করতে পারেনি।

* * *

পূর্ব এবং মধ্য আফ্রিকার বহু ভারতীয় বসবাস করেন। মহাত্মা গান্ধীর কর্ম-জীবন এঁদের নিয়েই আরম্ভ হয়।

এ সব জায়গায় বর্ণের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হচ্ছেন, খাস ইয়োরোপীয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন ভারতীয় তার পর বোধ করি আরব এবং সর্বশেষে দেশের মাটির ছেলে-মেয়েরা অর্থাৎ নিগ্রোরা।

ইংরেজ যে ভারতীয়দের ভালো চোখে দেখে না, সে তো জানা কথা কিন্তু সেখানকার ভারতীয়রা যখন নিগ্রোকে তাচ্ছিল্য করে, তখন আমার মনে বড় লাগে। 'অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান' রবীন্দ্রনাথ যে কতবড় এই বেদবাক্য বলে গিয়েছেন, সে কথা তাঁরা জানেন না (আমরাই জানি কি ?)।

পূর্ব আফ্রিকার ভারতীয় হাই-কমিশনার শ্রীযুক্ত আরাসাহেব পন্ত দিল্লী এসেছেন। তিনি বলেন, আফ্রিকা, ইংরেজ, ভারতীয়, আরব, নিগ্রো সবাইকে মিলিয়ে একটা অখণ্ড সমাজ যদি না গড়ে তোলা যায় তবে ভবিষ্যতে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। তাঁর বিশ্বাস এই অখণ্ড সমাজ গড়ে তুলতে পারে প্রধানতঃ তথাকার ভারতীয়রাই। তাই তিনি মনে করেন, এখানকার ভারতীয়েরা যেন পূর্ব আফ্রিকার ভারতীয়দের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করেই সন্তুষ্ট না হন, তাঁরা যেন সেই অখণ্ড সমাজের দিকে দৃষ্টি রেখে আপন প্রচেষ্টা ধাবিত করেন।

মহাত্মাজীর সহকর্মী শ্রীযুত কাকাসাহেব কালেলকর পূর্ব আফ্রিকায় গিয়ে বহু সৎকর্ম করেছেন। আপন অভিজ্ঞতা একখানা উত্তম হিন্দী পুস্তকে প্রকাশ করেছেন—সে পুস্তকের ইংরেজি অনুবাদও হচ্ছে।

আরেকটি গুণী লোক পণ্ডিত শ্রীঋষিরাম। ইনি উপস্থিত আফ্রিকাতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার করছেন। আমাকে প্রায়ই চিঠিপত্র লেখেন এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের যে সব ছবি পাঠান, সেগুলো দেখে ভগবানকে বলি, আসছে জন্মে যেন নিগ্রো হয়ে জন্মাই।

উঁহুঁ ; সেটি হবার জো নেই।

তন্দুরী, মুর্গী মাফিক দিল্লীর গ্রীষ্ম জাহান্নম তন্দুরী-আদমী বনে যাওয়ার পর তো।

পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবস পালন করাতে দিল্লী যা উৎসাহ দেখায়, কলকাতার তুলনায় সে কিছু কম না। অবশ্য দিল্লী সহরে গণ্ডা গণ্ডায় সুসাহিত্যিক নেই; কাজেই রবীন্দ্রজীবনী এবং সাহিত্য সম্বন্ধে যতখানি বহুমুখী এবং বিস্তৃত আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন ঠিক ততখানি হয়ত হয়ে উঠে না।

এবারে কলকাতা থেকে এলেন শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশী সেই অভাব খানিকটে পূরণ করতে। কালীবাড়ি ক্লাবে শ্রীযুত বিশী বিরাট জনতার সামনে বক্তৃতা দেন। শ্রীযুত বিশী সম্বন্ধে দিল্লীর নগণ্য নাগরিকরূপে রায় পিথৌরা কি ধারণা পোষণ করেন, সে সম্বন্ধে গত সপ্তাহে নিবেদন করেছি এবং এ সপ্তাহে সপ্রমাণ হয়ে গেল যে, তাঁর ধারণা ভুল নয়।

অন্যান্য স্থলে ভাষণ দেন শ্রীযুত হুমায়ুন কবীর এবং শ্রীযুত দেবেশ দাশ। একই দিনে প্রায় সব কটি পরব হয়েছিল বলে রায় পিথৌরা দু'একটির বেশী সামলে উঠতে পারেন নি। তবে এঁদের পাণ্ডিত্যের খবর রাখি বলে লোকমুখে যখন শুনলুম এঁদের বক্তৃতা সত্যই উপভোগ্য হয়েছিল তখন সে কথা অনায়াসেই বিশ্বাস করতে পারলুম।

'শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক সঙ্ঘ' চিত্রাঙ্গদা গীতিনাট্যের প্রায় সব কটি গান গাওয়ার ব্যবস্থা করেন। শ্রীযুত নীলমাধব সিংহ নিষ্ঠার সঙ্গে গানগুলির পরিচালনা করেন এবং অনুষ্ঠানটি যে সফল হয়েছিল, তার প্রধান কারণ ছেলেমেয়েরা গানগুলো অতি সযত্নে বহু পরিশ্রম করে আয়ত্ত করেছিল। শ্রীমান কৌশিক ও শ্রীমতী নন্দিতা এবং আরো অনেকেই অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য সাহায্য করেন। রায় পিথৌরাও মাঝে মাঝে 'উপর চাল' মারার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে কেউ বড় একটা আমল দেয়নি।

* * *

অনেকেই বলেন, একই দিনে অনেকগুলো পরব না করে কোনো এক কেন্দ্রীয় স্থলে মাত্র একটি বিরাট সভা করা উচিত। আমি এ-মত পোষণ করিনে। দিল্লী বিরাট শহর এবং এক স্থল থেকে অন্য স্থল যাওয়ার যা কুব্যবস্থা তাতে করে সেই কেন্দ্রীয় সভায় দিল্লীর অধিকাংশ রবি-ভক্তরাই উপস্থিত হতে পারবেন না। তাই একই দিনে কালীবাড়ি, লেডী আরউইন স্কুল, লোদী কলনী এবং বিনয়নগরে যদি রবীন্দ্র-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয় তবে সেই ব্যবস্থাই ভালো।

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় একটি সভা হলে আরো ভালো। গেল বৎসর 'টেগোর সোসাইটি' নিউদিল্লী এবং টাউন হলে তার আগের বৎসর দিল্লী বিশ্ব-

বিদ্যালয়ে বড় বড় সভার আয়োজন করেছিলেন। এ বছর কেন হল না বোঝা গেল না। তবে একটা কারণ এই যে, দিল্লীতে 'প্রফেশনাল' সাহিত্যিক কিম্বা সাহিত্যসেবী কেউ নেই—সকলকেই কোনো-না-কোনো দপ্তরে সুবো-শাম কলম পিষতে হয়, তাই সবাই প্রতি বৎসর সব কিছু করে উঠতে পারেন না।

রবীন্দ্র জন্মোৎসব আরো কিছুদিন ধরে চলবে। এ জিনিস যত বেশী দিন ধরে চলে ততই ভালো।

* * *

খাদ্য-মন্ত্রী শ্রীযুত কানহাইয়ালাল মুন্সী বিদায় নেবার সময় বলেন ভারতবর্ষের কোনো খাদ্য-মন্ত্রীই কিচ্ছুটি করতে পারবেন না, যদি তিনি বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রকে চাপরাসীরূপে না পান।

তাতেও কিছু হবে না। মন্ত্রীদের চাপরাসী মহাশয়গণের প্রধান কর্ম চেয়ারে বসে বেঞ্চিতে পা তুলে দিয়ে মেঘগর্জনে ঘুমনো। পর্জন্য যদি চাপরাসী হন তবে তিনি ঐ গর্জনই ছাড়বেন—ঐ একই পদ্ধতিতে—বৃষ্টি নামাবেন না।

দ্বিতীয়তঃ পর্জন্যকে চাপরাসী ইতঃপূর্বে একবার হয়ত হয়েছিল তবে কি না যার চাপরাসী তিনি হয়েছিলেন সে বেচারী খুন হয় এক মানুষেরই দ্বারা।

স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে, তবু আবছা মনে পড়ছে,—

ইন্দ্র যম আদি করে বাঁধা আছে যার ঘরে
ছয় ঋতু খাটে বার মাস
সমীরণ ভয়ে ভয়ে চলে মৃদু গতি হয়ে
দেব রক্ষ যক্ষ যার দাস।

সেই শ্রীমান রাবণ যখন বেঘোরে প্রাণ দিলেন, তখন ইন্দ্রকে পুনরায় চাপরাসী করতে যাবে! কে?

আমার মনে হয়, মুন্সীজী উত্তমরূপে বিবেচনা না করে এ প্রস্তাবটি করেছেন। যদি ধরেই নি, তিনি ইন্দ্রকে কব্জাতে এনে ফেলেছেন—তা হলে? তা হলে তো তাঁকে রাবণ বলে ডাকতে হবে। রাম, রাম!

* * *

কিন্তু আসল কথা সেইটে নয়।

ইন্দ্র কে, বৃষ্টিই বা কি?

শাস্ত্র বলেন, জল কারারুদ্ধ করে রাখে বৃত্র এবং সেই বৃত্রকে বধ করে ইন্দ্র জলকে মুক্তি দিয়ে মানুষের জন্য নাবিয়ে নিয়ে আসেন। কোনো মুনি বলেন, হিমালয়ের গিরিকন্দরে বৃত্র জলকে বরফে পরিণত করে দেয় বলে সে জল আর

জনপদভূমিতে নেমে আসতে পারে না। ইন্দ্র হচ্ছেন বসন্তের সূর্য। শীতের শেষে তাঁর রৌদ্রবাণ বরফকে খণ্ড খণ্ড করে দেয় আর গভীর গর্জনে জলধারা নেমে আসে গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্র দিয়ে। অন্য মুনি বলেন, বৃত্র জলকে কারারুদ্ধ করে রাখে কালো মেঘে। ইন্দ্র তার উপর বজ্র হানেন, বিদ্যুৎ চমকায়, দামিনী ধমকায়, আর সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে বৃষ্টিধারা, নববরিষণ।

এই মুনিগণের মতবাদের প্রতি লক্ষ্য রেখে রবীন্দ্রনাথও গেয়েছেন,—

দহনশয়নে তপ্তধরণী
পড়েছিল পিপাসার্তা।
পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকের
অমৃতবারির বার্তা।
মাটির কঠিন বাধা হল ক্ষীণ,
দিকে দিকে হল দীর্ণ
নব-অঙ্কুর জয়পতাকায়
ধরাতল সমাকীর্ণ
ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর, হে গম্ভীর।

আমার মনে হয়, ইন্দ্রদেব তাঁর কর্ম এখনো করে যাচ্ছেন বৈদিক যুগে যে রকম করে গিয়েছিলেন। বেদের ঋষি সে যুগে তাঁর প্রশস্তি যে রকম ধারা গেয়েছিলেন, এ যুগে রবীন্দ্রনাথও তাঁর প্রশস্তি ঠিক সেই রকমই গেয়েছেন।

বৃষ্টি হয়, বরফ গলে ও জল নামে, কিন্তু আমরা সেই জলের ব্যবহার করতে জানিনে।

মিশরে বৃষ্টি হয় না। বৃষ্টি হয় সুদানে। কিন্তু মিশরীয়রা নাইল দিয়ে যে জল নেমে আসে, সেই জল নালা কেটে কেটে চতুর্দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে আপন জমি ভেজায়—মাঠে মাঠে ক্ষেতে ক্ষেতে সোনার ফসল ফলে ওঠে।

আমরা সেই কর্মটি করিনে। আমাদের নদী-নালা দিয়ে কি কিছু কম জল সাগরে গিয়ে পড়ে? আমরা কি সে জলের সদ্ব্যবহার করছি?

* * * *

মুন্সীজী যে ব্যাকরণে ভুলটি করলেন, তাতে কোনো ক্ষতি নেই।

তিনি সুসাহিত্যিক—গুজরাতিতে উত্তম উত্তম পুস্তক লিখেছেন, কিন্তু আমার বড় দুঃখ সেগুলো বাঙলাতে অনূদিত হয়নি।

ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস লেখাবার জন্যও মুন্সীজী ব্যাপক বন্দোবস্ত করেছেন।

আমার মনে হয়, মুন্সীজীর পক্ষে রাজনীতি বর্জন করাই ভালো।

সেক্সপীয়র বলিয়াছেন, "এই সত্য জানাইবার জন্য ভূতের কি প্রয়োজন ছিল, মহারাজ—" ডঃ শাখ্‌ট্‌ যে অতিশয় গুণী—লোককে সেকথা জানাইবার জন্য রায় পিথৌরারও প্রয়োজন নাই।

কিন্তু আশ্চর্য হইলাম লোকটির অসাধারণ অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা এবং সদাজাগ্রত তীক্ষ্ণতা লক্ষ্য করিয়া উদয়াস্ত নানাপ্রকারের লোকের সঙ্গে নানাবিধ আলোচনার পর সামান্য মানুষ অপরাহ্নের দিকে তৈলহীন প্রদীপের ন্যায় নির্জীব হইয়া পড়ে। তখন সে জিজ্ঞাসুর প্রশ্ন শুনিতে পায় না, শুনিলেও বিষয়বস্তুটি সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া সদুত্তর দিবার জন্য চেষ্টিত হয় না।

এবং আমরা যে কয়টি প্রাণী তাঁহার চতুর্দিকে সমবেত হইয়াছিলাম, তাহাদিগের প্রত্যেককে অর্থনীতি ক্ষেত্রে অপোগণ্ড শিশু বলিলে কিছু মাত্র সত্যের অপলাপ হয় না। অথচ কী অদ্ভুত ধৈর্য ও মনোনিবেশ সহকারে আমাদের প্রত্যেকটি প্রশ্ন সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া লইয়া সোৎসাহে উত্তর দিতে লাগিলেন। কণ্ঠে বর্ণনামাত্র ক্লান্তি নাই, বচনভঙ্গীতে বিন্দুমাত্র ক্লৈব্য নাই।

এই বিশাল সংসারে অরসিক জনের অভাব নাই। তাঁহাদের একজন ডঃ শাখ্‌টের স্কন্ধে জর্মানির পুনরায় সশস্ত্রীকরণের দায়িত্ব চাপাইবার চেষ্টা করিলেন। ডাঃ শাখ্‌ট্‌ তাহার কি উত্তর দিলেন, সেই কথার পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। যে বিরাট আট ভলুমে নুরেনবের্গ মোকদ্দমার দলিল দস্তাবেজ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেই জ্ঞানী পাঠক সেই ব্যাপারের তাবৎ বর্ণনা পাইবেন।

আমার ইচ্ছা হইতেছিল হঠাৎ অট্টহাস্য করিবার। যে মার্কিন, ফরাসী, ইংরেজ রুশের প্রতিভূ শাণিত বুদ্ধি উকিলগণ শাখ্‌ট্‌কে নুরেনবের্গে কণামাত্র বিচলিত করিতে পারেন নাই, অবশ্যম্ভাবী আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ যুক্তি এবং অকাট্য প্রমাণ দ্বারা পদে পদে বিপক্ষকে নিদারুণ বিড়ম্বিত করিলেন, তাঁহাকে তর্কে পরাস্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন, বামনের শশাঙ্ক-করতলকরণ ইত্যাদি যাবতীয় তুলনাকে হাস্যাস্পদ করিয়া ফেলে।

বুদ্ধিমানের সংখ্যা ইতরজনের তুলনায় কম হইলেও সেই সভাতে তাঁহাদের অনটন ছিল না। সহসা তাঁহারাই একজন উচ্চকণ্ঠে বলিলেন।

"শবব্যবচ্ছেদ কর্মে কি মোক্ষলাভ? ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ; তাহার সম্মুখে লক্ষ লক্ষ সমস্যা। বরঞ্চ যদি শাখ্‌ট্‌ মহাশয় সেই সব ব্যাপারে আমাদিগকে জ্ঞানদান করেন, তবেই আমাদের সার্থক উপকার হয়।"

সোল্লাসে সকলেই সম্মতি জানাইলাম।

পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিল। শাখ্‌ট্‌ বলিলেন, "আমি পরিকল্পনাটি পড়িবার জন্য সময় করিয়া উঠিতে পারি নাই। আগামীকল্য কাশ্মীরের পথে পাঠ করিবার বাসনা রাখি। কিন্তু কি প্রয়োজন এই সব বিশাল কলেবর পরিকল্পনা করিবার? তাহা হইতে অনেক শ্রেয়ঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ আরম্ভ করিয়া দিবার এবং আমার বিশ্বাস সেই সব কর্মই সর্বপ্রথম আরম্ভ করিয়া দেওয়া উচিত, যাহাতে বিপুল বিত্তের প্রয়োজন হয় না এবং যে স্থলে এক, দুই কিম্বা তিন বৎসরের ভিতরই ব্যয়িত অর্থ সুফল প্রদান করিয়া হস্তে পুনরাগমন করিতে থাকে। তাহাতে রাজকোষের অর্থ সঞ্চয় হইবে, সেই অর্থ তৎক্ষণাৎ অন্য কর্মে নিয়োজিত করিয়া দেশ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইবে। জনগণের মনে রাষ্ট্রের প্রতি আস্থা দৃঢ়তর হইবে এবং এই পন্থাতেই আশু সুফল লাভের সম্ভাবনা।"

ভারতবর্ষে বহু বিত্ত সঞ্চিত আছে, সে কথা কাহারো অজ্ঞাত নয়। এই অর্থ প্রধানতঃ যুদ্ধের সময় উপার্জিত হয় ও বণিকগণ সে বিত্তের রাজকর বা ইন্‌কাম-ট্যাক্স দেন নাই বলিয়া এক্ষণে সে অর্থ কোনো প্রকারের পরিকল্পনায় নিয়োজিত করিতে পারিতেছেন না। রাষ্ট্র শ্যেন দৃষ্টিতে বিত্তশালীদের প্রতি কর্ম পর্যবেক্ষণ করিতেছে এবং আপন ন্যায্য রাজকর উদ্ধারের জন্য সর্বস্ব পণ করিয়া বসিয়াছে এবং ধনিকগণও রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবার ভয়ে সেই অর্থ গোপন রাখিতেছেন।

ডঃ শাখ্‌টের বিশ্বাস, দেশের উন্নতির জন্য যখন এই অর্থের একান্ত প্রয়োজন এবং অন্য কোনো সূত্র হইতে কোনো প্রকারের অর্থ লাভের আশাও নাই, তখন অতীতে কে কোন্ উপায়ে বিত্তশালী হইয়াছে, তাহার আলোচনা না করিয়া এবং ধনিকগণকে লাভের প্রলোভন দেখাইয়া অর্থ বাহির করিয়া দেশ নির্মাণ কর্মে নিয়োজিত করাই ভারতের পক্ষে প্রশস্ততম পন্থা।

ডঃ শাখ্‌ট্‌ পুনঃ পুনঃ বলিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, যখন একথা স্থিরনিশ্চয় হইয়া গিয়াছে, যে দেশ নির্মাণ কর্ম আরম্ভ করিতেই হইবে, তখন আর এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর অর্থ কোথা হইতে আসিবে। যে কোনো কৌশলেই হউক অর্থ একত্র করিতে হইবে এবং কর্ম আরম্ভ করিয়া দিতেই হইবে।"

আমি ভাবিয়াছিলাম, ডঃ শাখ্‌ট্‌ অর্থনৈতিক পণ্ডিত; তাঁহার কণ্ঠে শুনিব শান্ত সমাহিত উপদেশ। বিস্মিত হইলাম যে, তিনি তাঁহার বক্তব্য অতিশয় উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে প্রকাশ করিলেন এবং দেশ নির্মাণ সম্বন্ধে আপনার মতামত আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য শুধু যুক্তিতর্ক নয়, স্থির বিশ্বাসের গভীর অনুভূতিও নিয়োগ করিলেন। স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম ভারতের প্রতি তাঁহার প্রেম

অকৃত্রিম ও তিনি আমাদের মঙ্গল কামনা করেন।

* * *

প্রায়ই দেখিতে পাই, ইংরেজ এবং মার্কিন এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত আমাদের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার বিজ্ঞাপন কিম্বা বরপক্ষের স্বগুণ কীর্তন লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। তাঁহারা করুন, আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই।

কিন্তু প্রশ্ন, তাঁহারা ভারতীয় বিজ্ঞাপনের দিকেই কটাক্ষ হানেন কেন?

সুইজারল্যাণ্ড হইতে জর্মন ভাষায় প্রকাশিত একখানি বিশ্ববিখ্যাত সাপ্তাহিকে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি পড়িলাম। আমার সঙ্কীর্ণ জ্ঞান এবং বুদ্ধি অনুযায়ী তাহার অনুবাদ নিবেদন করিলাম।

"আমি আমার এক ত্রিংশতি বর্ষীয়া সুন্দরী বান্ধবীর জন্য একজন জীবনসঙ্গী অনুসন্ধান করিতেছি। আমার আশা, সেই জীবনসঙ্গী যেন আমার বান্ধবীর পঞ্চ-বর্ষীয় পুত্রের স্নেহময় পিতার আসন গ্রহণ করেন। আমার বান্ধবী উত্তম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তন্বঙ্গী, ১৭৫ সেন্টিমিটর দীর্ঘ (প্রায় পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি—অনুবাদক), ক্যাথলিক, গৃহকর্মে সুনিপুণা এবং বহু রমণীসুলভ মোহিনী গুণ ধরেন। উচ্চশিক্ষা ও দৃঢ় চরিত্রবল ছিল বলিয়া জীবনে বহু দুর্যোগ সত্ত্বেও তিনি তাঁহার রসবোধ হইতে বঞ্চিত হন নাই। পাঠক, তুমি যদি এই জাতীয় অমূল্য সম্পদের গুণগ্রাহী হও এবং প্রেমময়ী জীবনসঙ্গিনী আকাঙ্ক্ষা করো, তবে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত ফটোগ্রাফসহ নিম্নে উদ্ধৃত পোস্ট বক্সে পত্র লেখ। বিষয়টি গোপনীয়ভাবে আলোচিত হইবে বলিয়া উভয় পক্ষ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন।"

বিস্তর মস্তক কণ্ডুয়ন করিয়াও হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলাম না, এই কাতর-রোদন এবং ভারতীয় অরক্ষণীয়ার মধ্যে মূলতঃ পার্থক্য কোথায়? এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে, রমণী ভদ্রবংশোদ্ভবা, আমরা বলি মুখোপাধ্যায়, কুলীন, খড়দা মেল। এস্থলে বলা হইয়াছে, তিনি ক্যাথলিক, আমরা বলি তিনি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য কিম্বা কায়স্থ। গৃহকর্মে সুনিপুণার প্রতি লোভ হটেনটট্ হইতে প্যারিসের বিদগ্ধজন সকলেরই আছে এবং আমরা সুন্দরী বলিয়াই ক্ষান্ত দিই, এই স্থলে কিন্তু দৈর্ঘ্যের উল্লেখ পর্যন্ত রহিয়াছে। অবশ্য আমরা জীবনের ঝঞ্ঝাবার্তার বিষয় উল্লেখ করি না, কারণ আমাদের বিজ্ঞাপন সচরাচর বিধবা রমণীর জন্য নহে। সুতরাং পঞ্চবর্ষীয় পুত্রের উল্লেখও আমাদের পক্ষে অপ্রয়োজন।

শুধু তাই নয় বরপণ বস্তুটিও ইয়োরোপে অবিদিত নয়। নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রায়ই দেখা যায়।—

"শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান যুবা বিবাহ ও বাণিজ্য করিতে ইচ্ছুক। বিশ হাজার

ফ্রাঙ্কের প্রয়োজন।"

স্পষ্টই বুঝা গেল, এস্থলে অর্থ অনর্থ নয়। যে কুমারীকে যুবা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, তাহার কুল-গোত্র রূপ-লাবণ্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক হইলেই হইল।

কিন্তু ইহাকেও পরাজিত করিতে পারে এমন বিজ্ঞাপনও দেখিয়াছি।—

"নিজস্ব বাড়ি আছে এমন রমণীকে একটি স্বাস্থ্যবান সুশিক্ষিত যুবক বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। বাড়ির ফটোগ্রাফ পাঠান।"

৮

বিবেচনা করি এই শীতকালেও বহু শত বাঙালী দিল্লী আসিবেন। যাঁহারা নিছক পারমিটের জন্য এখানে আসিবেন ভগবান তাঁহাদিগের মঙ্গল করুন। আমাদের সঙ্গে তাঁহাদিগের কোনো প্রকারের যোগাযোগের আশঙ্কা নাই।

কিন্তু যাঁহারা নিতান্ত মহানগরী দিল্লী দেখিবার জন্যই আগমন করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কদলী বিক্রয় করিবার দুষ্টবুদ্ধি যাঁহাদের নাই তাঁহাদের উদ্দেশ্যে দুই-একটি নিবেদন আছে।

প্রথমতঃ পাড়ার পাঁচজনের কাছে বড়াই করিবার জন্য অনর্থক পঞ্চাশটা কবর মসজিদ দুর্গ মন্দির দেখিয়া কোনো লাভ নাই। সবকিছু আখেরে ঘুলাইয়া যাইবে —লোদীদের বাগানে কুতুবমিনার চাপাইয়া বসিবেন, লালকিল্লার মাঝখানে শের শাহের মসজিদ দেখিয়া কি আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন তাহার স্বপ্ন দেখিবেন, বিড়লা মন্দিরের সঙ্গে কুতুবের যোগমায়া মন্দির মিশাইয়া লইয়া অতিশয় অদ্ভুত স্থাপত্য নির্মাণ করিয়া বসিবেন। অতএব নিবেদন, অল্প দেখিবেন কিন্তু অতি উত্তমরূপে দেখিবেন। একটি ক্যামেরা—তা সে বক্স কিম্বা বেবিই হউক—সঙ্গে আনিবেন এবং যদিও ভালো ভালো দালান ইমারতের উত্তম উত্তম ফটো সর্বত্রই কিনিতে পাওয়া যায় তবুও আপন রুচি অনুযায়ী ছবি তোলাতে যে বিশেষ আনন্দ আছে, সেই তত্ত্ব সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

দ্বিতীয়তঃ ভারতের একখানা ইতিহাস সঙ্গে আনিবেন।

ভালো বায়োস্কোপ দেখিবার পর হৃদয়ে স্বতই বাসনা জাগে পুস্তকখানি পড়িবার। ঐতিহাসিক স্থাপত্য দর্শনের পর ঐ একই অভিলাষ জন্মে। যখন শুনিবেন, এই ত্রিপোলিয়া তোরণের উপরেই বাদশা ফররুখসিয়ার তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী জাহানদার শাহকে বন্দী করিয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন এবং আট বৎসর যাইতে না যাইতেই সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় সেই ফররুখসিয়ারকে অন্ধ করিয়া ঐ

ত্রিপোলিয়া তোরণের উপরেই বন্দী করেন ও পরে তাঁহাদের আদেশেই তিন নরপিশাচ তাঁহাকে ঠগীদের পদ্ধতিতে ফাঁসি লাগাইয়া খুন করে, তখন আপনার মনে কৌতূহলের সঞ্চার হইবে তাবৎ ইতিহাস আদ্যোপান্ত পাঠ করিবার। আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন গাইড মাত্রই বিশুদ্ধ গঞ্জিকা না হউক কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জনের পক্ষপাতী। গাইড হিসাবে আমারও ন্যূনাধিক সে দুর্বলতা আছে; কিন্তু ইতিহাসের অত্যাচারে সেই দুর্বলতা সম্যক প্রস্ফুটিত হইবার অবকাশ পায় না।

তৃতীয়তঃ স্থাপত্য দর্শন কর্ম আরম্ভ করার পূর্বেই স্মরণ রাখিবেন দিল্লীতে হিন্দু স্থাপত্যের বিশেষ কিছু নাই। প্রত্নতাত্ত্বিকরা বিস্তর পরিশ্রম করিয়াও দিল্লীতে প্রাক. কুশান যুগের কোনো কিছু আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই। অতএব হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ জাতীয় কোনো বস্তু দেখিবার আশা পোষণ না করাই প্রশস্ততর।

একেবারে যে কিছুই নাই তাহাও নয়। কুতুবমিনারের কাছেই রাজা চন্দ্রের (এই চন্দ্রটি কে তাহা ঐতিহাসিকেরা এখনো বলিতে পারেন না) একটি মনোহর লৌহস্তম্ভ আছে; ফিরোজ তুগলুক নির্মিত ফিরোজ শাহ কোটলাতে একটি অশোক স্তম্ভ এবং উত্তর দিল্লীতে আর একটি; গিয়াসউদ্দীন তুগলুক নির্মিত তুগলুকাবাদের প্রায় ক্রোশ পরিমাণ দূরে সূর্যকুণ্ড (এই কুণ্ডটি সত্যই হিন্দু না মুসলমান সে বিষয়ে মুনিদের ভিতর এখনও মতভেদ আছে); এবং কুতুবমিনারের কাছে যে কুওওৎ উল-ইসলাম মসজিদ আছে তাহার স্তম্ভগুলি—এই স্তম্ভগুলি হিন্দু এবং বৌদ্ধ মন্দির হইতে নেওয়া হইয়াছিল এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

* * *

সংবাদ শুনিলাম, যে স্থলে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সেই স্থলে রাষ্ট্রপতি বৌদ্ধ শাস্ত্র ও পালি ভাষার চর্চার নিমিত্ত এক প্রতিষ্ঠানের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে সেখানে নাকি তিব্বত, চীন, বর্মা, শ্যাম এবং সিংহলের ভাষা শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইবে।

সংস্কৃতের কোনো উল্লেখ নাই!

হায়, আমি মূর্খ, আমার ধারণা ছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বৌদ্ধ ধর্ম ও শাস্ত্র-চর্চা হইত তাহা মহাযান বৌদ্ধধর্মের এবং মহাযানের অধিকাংশ এবং হীনযানের বহুলাংশ শাস্ত্র পালিতে নয়, সংস্কৃতে লিখিত। আমি মূর্খ, আমি তো জানিতাম, হিউয়েং সাঙ এই মহাযান শাস্ত্রই সংস্কৃতের মাধ্যমে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আমি নিতান্ত জড়ভরত, আমি তো জানিতাম নালন্দাতে শিক্ষাদান প্রদানের মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। আমি অতিশয় নির্বোধ, আমার

কুসংস্কার ছিল সংস্কৃতের সাহায্য ভিন্ন বৌদ্ধধর্মের উচ্চতম বিকাশ, অর্থাৎ বৌদ্ধ-দর্শন ও তর্ক কণামাত্র আয়ত্ত করা যায় না।

কিন্তু সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে। নবনির্মিত সংস্কৃত বিবর্জিত নালন্দার নব-বিদ্যায়তনের মোহমুদ্গর আমার মোহ চূর্ণ চূর্ণ করল, সদ্‌গুরুর ন্যায় অজ্ঞান তিমির অন্ধকারে জ্ঞানাঞ্জন শলাকার ন্যায় চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিল।

এখন শুনিব, গ্রীক ভাষা শিখা থাকিলেই ইয়োরোপীয়ন দর্শন করায়ত্ত হয়। ফরাসী জর্মন (কিম্বা কেবল মাত্র ইংরিজির মাধ্যমে) শিখিয়া দেকার্ত, কাণ্ট, হেগেল পড়িবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। প্লাতো, এরিসততেল অধ্যয়ন করা থাকিলেই তাবৎ ইয়োরোপীয় দর্শন হস্ততলগত।

* * *

কোন রাজাকে নাকি এক বুদ্ধিমান বিশেষ একপ্রস্থ "পোশাক" নির্মাণ করিয়া দিয়াছিল। সে পোশাক নাকি অসাধু জনের চক্ষুগোচর হইত না। রাজা একদিন সেই "পোশাক পরিধান" করিয়া শোভাযাত্রায় বাহির হইলে পাত্র অমাত্য অসাধুরূপে সন্দিহান হইবার ভয়ে করতালি ধ্বনি করতঃ "পোশাকের" ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

হঠাৎ একটি ক্ষুদ্র বালক চিৎকার করিয়া বলিল, "কিন্তু পোশাক কোথায়, মহারাজ তো কিছুই পরেন নাই।"

চীন হইতে প্রত্যাগত ভারতীয় অমাত্য ও অন্যান্য গুণীজন বারম্বার চিৎকার করিয়া বলিতেছেন চীন দেশ কম্যুনিস্ট নয়। ইঁহাদের কোনো অসাধু অভিসন্ধি নাই সে সম্বন্ধে আমি স্থিরনিশ্চয়, কিন্তু আমি প্রত্যাশা করিতেছি সেই বালকের। কখন না চিৎকার করিয়া বলে, "চীন তো কম্যুনিস্ট" এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলের সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হয়।

* * *

আমি এই তত্ত্বটি এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলাম না। ইংরেজ যখন বলে "জানো, লোকটি ভারতীয়, কিন্তু একদম আমাদের মত ; ভারতীয়দের সঙ্গে তাহার কোনো সামঞ্জস্য নাই" কিম্বা যখন কোনো বাঙালী বলে "জানো, লোকটা আসলে ছাতুখোর কিন্তু আচার ব্যবহারে ঠিক বাঙালীর মত," তখন আমি আশ্চর্য হই। "ছাতুখোর" ছাতুখোর থাকিয়াও কি বাঙালীর প্রশংসা অর্জন করিতে পারে না ?

অর্থাৎ চীনকে কম্যুনিস্টরূপে স্বীকার করিয়াও কি তাহার প্রশংসা করা যায় না কিম্বা তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যায় না ? তারস্বরে চিৎকার করিয়া বলিতে হইবে

"চীন কম্যুনিস্ট নয়, সে আমাদেরই মত" তবেই বন্ধুত্ব সম্ভবে ? এবং চীন কি আমাদের এই চিৎকার শুনিয়া উল্লসিত হইবে ?

ইংরেজ যখন বলে "এই ভারতীয় মোটেই ভারতীয়ের মত নয়, একদম আমাদের মত" তখন কি আমরা উল্লাস বোধ করি ?

* * *

মনু-নিষিদ্ধ পক্ষী ভক্ষণ করতঃ হিন্দু-সন্তান ইহলোক পরলোক নষ্ট করুক এ অভিসন্ধি আমি কিছুতেই করিতে পারি না ; তৎপূর্বে যেন আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হয়।

কিন্তু আমার বহু "পারসিক, মুসলমান, খৃষ্টানী" বন্ধু আছেন, তাঁহাদের কল্যাণার্থে নিবেদন করি তাঁহারা যদি কখনো দিল্লী আসেন তবে যেন একবার আফগানী নান (তন্দুরপক্ক রুটি বিশেষ) এবং "তন্দুরী মুর্গী" ভক্ষণ করিয়া 'দেহলী' বাস সার্থক করেন।

এই দুই বস্তু বস্তুতঃ গান্ধার দেশীয়—অর্থাৎ পেশাওয়ার হইতে কাবুল পর্যন্ত এই দুই বস্তু সানন্দে ভক্ষণ করা হয়। কিন্তু বিচলিত হইবেন না, ইহাদিগকে ভক্ষণ করিবার জন্য পাঠান দন্ত কিম্বা উদরের প্রয়োজন নাই। ঈষৎ অবান্তর, তবুও নিবেদন করি পাঠানের দন্ত বাঙালী অপেক্ষা বহু নিকৃষ্ট। বড়ই কোমল জিনিস এবং তন্দুরের অভ্যন্তরে সুপক্ক করা হয় বলিয়া সর্বাঙ্গসুন্দর মাধুর্য ধারণ করে। গান্ধার দেশে লঙ্কার প্রচলন সঙ্কীর্ণ বলিয়া তন্দুরীতে কোনো প্রকারের তীব্র আস্বাদ নাই।

একদা এই দুই বস্তু দেহলী প্রান্তে প্রচলিত ছিল না। দেশ বিভক্তির ফলে এক পেশাওয়ারী শিখ মহোদয় এই দুই মহাশয়কে দিল্লীতে প্রচলন করিয়াছেন। ভগবান তাঁহার মঙ্গল করুন।

কিন্তু সাধু ভক্ষক, সাবধান। মস্তক কর্তন করিবার ভীতি প্রদর্শন করিলেও তন্দুরী ছুরি কাঁটা দিয়া খাইবে না। উভয় হস্ত সঞ্চালন দ্বারা তন্দুরীকে খণ্ড বিখণ্ড করতঃ সোল্লাসে সশব্দে হোটেল রেস্তরাঁ সচকিত করিয়া নির্লজ্জভাবে 'কড়কড়ায়েত মড়মড়ায়েত' করিবে। যদি সাহস না থাকে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়ো।

* * *

স্বর্গীয় পরিমল রায়ের শোকসন্তপ্ত বন্ধুবর্গ এই সংবাদ শুনিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইবেন।

ইউ এন ও রায়ের বিধবাকে সারাজীবনের জন্য মাসিক চারি শত টাকার ভাতা এবং তদুপরি রায়ের পুত্র ও কন্যার শিক্ষাব্যয় আপন স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছেন।

ইউ. এন. ও'র জয় হউক।

এক ইংরেজ সংবাদপত্র পড়িতে পড়িতে বাষ্পাকুলকণ্ঠে অশ্রুমোচন করিয়া বলিল, 'হায়, হায়, কোটিপতি স্মিথ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।'

সখা সান্ত্বনা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তিনি কি আপনার নিকট-আত্মীয় ছিলেন?'

প্রথম ইংরেজ বলিল, 'না, আমার দুঃখ তো সেই জন্যই।'

ডক্টর মুখোপাধ্যায় বাঙলা দেশের ছোট লাট হওয়াতে আমার শোক বহুলাংশে সেই জাতীয়ই। বরঞ্চ বলিব, অনেক বেশি; কারণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আমি বিলক্ষণ চিনিতাম কিন্তু হায়, তখন কি জানিতাম যে তিনি একদিন লাট সাহেবের গদিতে আরোহণ করিবেন! এই সরল শান্ত অমায়িক লোককে কি কখনো রাজ্যপালরূপে কল্পনা করিতে পারিয়াছি? তাহা হইলে কি তাঁহাকে এইরকম অবহেলা করিতাম? তিনি যখন সাদর আমন্ত্রণ করিয়া বলিতেন, 'আসুন, আসুন: বঙ্গদেশ হইতে কতিপয় সুপক্ক আম্র আগমন করিয়াছে; ভক্ষণ করিয়া আপনি তৃপ্ত হউন, আমিও আনন্দ লাভ করি', হায়, তখন জানিলে কি আমি ক্ষিপ্রগতিতে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতাম না, অতিশয় সবিনয় তাঁহার কুশল সন্দেশ জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার চিত্তজয় করিবার জন্য সচেষ্ট হইতাম না? হায়, কী মূর্খ আমি, ধিক আমাকে!

কিন্তু প্রলাপ বকিতেছি। রে রসনে, তুমি সংযত হও।

আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। মুখোপাধ্যায় অসাধারণ সজ্জন ব্যক্তি। যদিস্যাৎ সাক্ষাৎ হয় তবে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে রসাল ভক্ষণে পুনরপি সাদর আমন্ত্রণ জানাইবেন।

সত্যই বলিতেছি, আমি ও আমার প্রতিবেশিগণ সকলেই মুখোপাধ্যায়ের রাজ্যপালত্ব প্রাপ্তিতে অবিমিশ্র উল্লাস উপভোগ করিয়াছি। একে অন্যকে আনন্দ অভিনন্দন জানাইয়াছি এবং বলিয়াছি, 'কলিকাতায় আর বাসস্থানের দুর্ভাবনা রহিল না।'

মুখোপাধ্যায় মহাশয় আজীবন আর্তসেবা, জ্ঞানসঞ্চার এবং সত্যের অনুসন্ধান করিয়াছেন। ভগবানের সাহায্য ও গুরুজনের আশীর্বাদ তাঁহার উপরে নিশ্চয়ই ছিল; কিন্তু দৃষ্টতঃ সর্বপ্রকার সৎকর্ম তিনি স্বীয় পুরুষকারের দ্বারাই সম্পন্ন করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি যে পদমর্যাদা ও তৎসংযুক্ত রাজদণ্ড হস্তে পাইলেন তাহার সাহায্যে প্রচুরতর সৎকর্ম সাধন করিতে পারিবেন এমত আশা নিশ্চয়ই

দুরাশা নয়। আর যদি না করিতে পারেন তবে বুঝিব ফিরিঙ্গি-প্রবর্তিত এ পদ এখনও 'স্বদেশী' হয় নাই। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও যদি এ পদের রূপ পরিবর্তন না করিতে পারেন তবে আর কেহই পারিবে না।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিষ্ঠাবান খৃষ্টান, অগণিত মুসলমান তাঁহাকে অন্নদাতা বস্ত্রদাতা রূপে ভক্তি করে আর হিন্দু সমাজের তিনি স্বজন ছিলেন তো বটেই। তিন সম্প্রদায়ই মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সানন্দ অভিনন্দন জানাইবে।

মুখোপাধ্যায় দীর্ঘজীবন লাভ করতঃ দেশের দশের মঙ্গল সাধন করুন।

শতং জীব, সহস্রং জীব।

* * *

শ্রীযুত কাটজুর বঙ্গত্যাগে বহু লোক তাঁহার অভাব অনুভব করিবেন। তিনি অমায়িক, নিরহঙ্কারী ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি ধীরে ধীরে বঙ্গভূমির প্রতি বিলক্ষণ অনুরক্তও হইয়াছিলেন।

দিল্লীবাসী বাঙালীরা শ্রীযুত কাটজুর দিল্লী আগমনে উল্লসিত হইলেন। ধর্ম জানেন, আজ বাঙালীর বেদনা বুঝিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারে কোনো 'মুরুব্বি' নাই। বঙ্গদেশাগত বাঙালী প্রয়োজনবশতঃ দিল্লীতে আগমন করিলে এক্ষণে অন্তত শ্রীযুত কাটজুর দ্বারস্থ হইতে পারিবে; দিল্লীবাসী বাঙালীও মনে মনে সে আশা পোষণ করে।

শ্রীযুত কাটজু নিশ্চয়ই তাহাদিগকে হতাশ করিবেন না।

* * *

সাংস্কৃতিক যোগসূত্র দৃঢ়তর এবং নবীন যোগসূত্র স্থাপনা করিবার জন্য কতিপয় চৈনিক বিদগ্ধ পুরুষরমণী মহানগরীতে পদার্পণ করিয়াছেন। ইঁহাদের শুভাগমনে সর্বসম্প্রদায়ের লোককে এক হইয়া ইঁহাদিগকে স্বাগত অভিবাদন জানাইতে দেখিলাম। কংগ্রেস সরকার যদিও প্রধান অতিথিসেবক, তবু দেখিতেছি কম্যুনিস্ট ভ্রাতাদের আনন্দোল্লাস কিছুমাত্র কম নহে এবং অন্যান্য শ্রেণীও বিস্মৃতির ভয়ে যত্র-তত্র ঘনঘন পদচারণা করিতেছেন।

চৈনিকমণ্ডলী উদয়াস্ত যেসব অভিনন্দন সভায় উপস্থিত হইতেছেন তাহার নির্ঘণ্ট দিতে গেলেই এ পত্রের অধিকাংশ ব্যয় হইয়া যাইবে। এই রবিবারেই দেখিতেছি তিনটি পর্বে এই অভাজনকেই উপস্থিত থাকিতে হইবে। অভিজাত প্রতিষ্ঠান "অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস্ এণ্ড ক্রাফটস্ সোসাইটি", ব্রাত্য "শিল্পীচক্র" ঐ দিন উহাদিগকে সম্মান দেখাইবেন ও সন্ধ্যায় চৈনিক রাজদূত বিদেশাগত বিদগ্ধ মণ্ডলী এবং দিল্লী নাগরিকদিগকে পানাহারে তৃপ্ত করিবেন। চৈনিকদের

অতিথিবাৎসল্য তাঁহাদিগকে কতদূর মুক্ত হস্ত করিতে পারে তাহার ভূরি ভূরি অভিজ্ঞতা আমার আছে—এই পর্বেও তাহার ব্যত্যয় হইবে না। তাহার বর্ণনা একদিন সুযোগ সুবিধা মত নিবেদন করিব।

বিদগ্ধমণ্ডলীকে অভ্যর্থনা করিবার সময় নানা মহাজন নানা জ্ঞানগর্ভ বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন; কিন্তু একটি বিষয়ের উল্লেখ কেহই করেন নাই বলিয়া অতিশয় সভয়ে তাহা নিবেদন করি।

সকলেই জানেন বৌদ্ধ শাস্ত্রের বহু মূল সংস্কৃত এবং পালি গ্রন্থ চিরতরে লোপ পাইয়াছে; কিন্তু এই সব গ্রন্থের চীনা (এবং তিব্বতীয়) অনুবাদ এখনও চীন দেশে পাওয়া যায়। এইসব গ্রন্থ পুনরায় ভারতীয় ভাষাতে (কিংবা ইংরাজিতে) অনুবাদ না করিলে বৌদ্ধধর্মের সর্বাঙ্গসুন্দর স্বরূপ আমাদের সম্মুখে বিকশিত হইবে না এবং এই সুবৃহৎ কর্ম ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানবিশেষের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

এই চৈনিক বিদগ্ধমণ্ডলীর সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া যদি ভারত সরকার এই সুবর্ণ সুযোগে একটা সুব্যবস্থা করিয়া লইতেন তবে আমরা উচ্চকণ্ঠে সাধুবাদ জানাইতাম।

যে দুইটি ভারতীয় উপর্যুক্ত বিষয়ে আজীবন পরিশ্রম করিয়াছেন, কই, তাঁহাদের কাহাকেও তো এই উপলক্ষ্যে দিল্লীতে দেখিলাম না।

* * *

ইন্দ্রলুপ্তজন বিল্ববৃক্ষতলে একাধিক বার যায় না—ইহা আপ্তবাক্য।

ক্রিকেট খেলা দেখিতে গিয়াছিলাম। আর যাইব না।

"রে রে পাষণ্ড" শব্দোচ্চারণ করিয়া উভয় পক্ষ যুদ্ধে অবতরণ করিলেন না। মল্লপক্ষদ্বয় একে অন্যকে ভীতনেত্রে পর্যবেক্ষণকরতঃ অতিশয় সন্তর্পণে ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। দর্শকমণ্ডলী ততোধিক সন্তর্পণে করতালিধ্বনি করিলেন। দশ মিনিট যাইতে না যাইতে যখন প্রথম মল্ল গতাসু হইলেন তখন যে হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল সে ধ্বনি "রক্তদুর্গ" মস্তকে থাকুন "দেহলি-তোরণ" পর্যন্ত পৌঁছিল না। ক্রীড়ারম্ভেই অন্যতম মল্লের পরলোকগমন যে কি গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিস্থিতি তাহা কি দর্শকমণ্ডলী সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলেন না? তবে কি মুহুর্মুহুঃ মল্লপতন না হইলে দর্শকজনমধ্যে আনন্দোল্লাসের সঞ্চার হয় না? বহ্বান্ন ভক্ষণই কি সুরুচির লক্ষণ? ভূমাতে সুখ তাহা জানি, কিন্তু অল্পেই বা কি কম? ঋষিবাক্য আছে, যাহা অল্প তাহাই মিষ্ট।

চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী মহানগরী ত্যাগ করার পূর্বে বক্তৃতা-ভাষণে বিপুল শ্লেষ বর্ষণ করিয়া যান। প্রতি আমন্ত্রণে প্রত্যেকটি নিমন্ত্রণে তিনি সাতিশয়

প্রাঞ্জল ভাষায় সর্ববিধ বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। তাহারই একটিতে তিনি জনগণকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, 'হে দিল্লী যুবক সম্প্রদায়, যখনই দেখি তোমরা মাতা, কন্যা কিম্বা প্রিয়াকে দ্বিচক্রযানের পশ্চাদ্দেশে বসাইয়া তাঁহাদের ভার আপন স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছ তখন আমি উল্লাস বোধ করি।'

মল্লভূমির তোরণপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলাম, অসংখ্য যুবক উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে বহু বালাকে আনয়ন করিলেন।

এই দৃশ্য কলিকাতায় বিরল।

এক ইংরাজই বলিয়াছেন, দ্বাবিংশাধিক লোমাবৃত মূর্খ (টুয়েনটি টু ফ্ল্যানেলড্ ফুলস) একটি চর্মাবৃত গোলক লইয়া জীবনমরণ পণ করিয়াছে দেখিবার জন্য আসে আরও বিংশতি সহস্র মূর্খ! ইহারই নামান্তর ক্রিকেট!

ভদ্রলোক ক্রিকেটের মূল তত্ত্বটাই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই। রথদর্শন এস্থলে অবান্তর।

এই যে কপোত-কপোতী তরুণ-তরুণী নানা ভঙ্গী নানা অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে আপন আপন আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, তন্বঙ্গী কোমলাঙ্গীগণ অঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন অংশ—অধুনা উদরও অঙ্গ-স্বরূপ গণ্য করিতে হইবে—প্রদর্শনকরতঃ বিমলানন্দ উপভোগ করিতেছেন, উচ্চ হাস্যে প্রতিবেশীর দৃষ্টি আকর্ষণকরতঃ তাহাদের চিত্তে ঔৎসুক্য লহরীর সঞ্চার করিতেছেন, তদ্বিনিময়ে তরুণগণ ক্রিকেট শাস্ত্রে তাঁহাদের গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিতেছেন যেন এক স্বয়ম্বরসভায় আপন গুণস্বরূপ সালঙ্কার বর্ণনা করিতেছেন, ইহাই তো মুখ্য, ইহাই তো তত্ত্ব, এষাস্য পরমাগতি।

১০

ইউফ্রেতিস তাইগ্রীসের পারে আসিরিয় বাবিলনীয় সভ্যতা বেরোল, নীল নদের পারে মিশরীয়, পীতনদের পারে চৈনিক। গঙ্গাপারের আর্যসভ্যতা এদের চেয়ে কয়েক হাজার বছরের ছোট। তাই প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বহুকাল ধরে মনে মনে আশা পোষণ করেছিলেন যে গঙ্গা কিম্বা সিন্ধুর পারে হয়ত বা একদিন কোনো এক প্রাক্-আর্য এবং আসিরিয় বাবিলনীয় মিশরীয় সভ্যতার সমসাময়িক ঐ জাতীয় প্রাচীন সভ্যতা বেরবে।

তাঁদের সে আশা পূর্ণ করলেন স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্ব-জগৎ একদিন বিস্ময় মেনে শুনলো সিন্ধু নদের পারে মোন্-জো-দড়ো নামক স্থানে রাখালদাস এক প্রাক্-আর্যসভ্যতা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। এ সভ্যতা সম্বন্ধে এস্থলে সবিস্তর বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। শিক্ষিত ভারতীয় মাত্রই এ

সভ্যতার উৎপত্তি বিকাশ পতন সম্বন্ধে কিছু না কিছু খবর রাখেন।

গোড়ার দিকে পণ্ডিতেরা মনে করেছিলেন এ সভ্যতা কেবলমাত্র সিন্ধু পারে-পারেই বিকশিত হয়েছিল। তাই তাঁরা এর নামকরণ করেছিলেন 'সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা'। কিছু দিন পরে ক্রমে ক্রমে সে ভুল ভাঙল—দেখা গেল, এ সভ্যতা সিন্ধু পেরিয়ে এবং ছাড়িয়ে সুদূর অবধি বিস্তৃত ছিল।

তারই সন্ধানে অরেলস্টাইন ভাওয়ালপুর স্টেট (পাকিস্তান) ও তারই সীমান্তে বিকানীর রাজ্যে ১৯৪১ সনে খোঁড়াখুঁড়ি করেন। তার প্রতিবেদন অরেলস্টাইন অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকরূপে বর্ণনা করেছেন—তার কিছুটা প্রকাশিত হয়েছে, কিছুটা পরে প্রকাশিত হবে।

নানা কথার ভিতর অরেলস্টাইন একথাও বলেন যে, ভাওয়ালপুর স্টেটের ফোর্ট আব্বাসের পূর্ব দিকে আর কোন জায়গায় মোন-জো-দড়ো সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়নি। অরেলস্টাইন এ মন্তব্যটি করেন ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে। আজকের ভাষায় বলা হবে, পাকিস্তানেই মোন-জো-দড়োর শেষ নিদর্শন পাওয়া যায়—পূর্বদিকে অর্থাৎ ভারতে পাওয়া যায় না।

কেন্দ্রীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের সহ অধ্যক্ষ শ্রীযুত অমলানন্দ ঘোষ এ বছরে শীতকালটা বিকানির স্টেটে খোঁড়াখুঁড়ি করে ফিরে এসেছেন।

তাঁর প্রধান কর্মস্থল ছিল সরস্বতী নদীর মধ্যভূমি—মনু এ ভূমিকে পুণ্য-ভূমি ব্রহ্মাবর্ত নামে উল্লেখ করেছেন। দৃষদ্বতীর উত্তরে এবং সরস্বতীর দক্ষিণে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র—মহাভারতকার বলেছেন, কুরুক্ষেত্রে বাস স্বর্গলোকে বাস করার ন্যায়।

শ্রীযুত অমলানন্দ ঠিক কোন্ কোন্ জায়গায় তাঁর অনুসন্ধানকর্ম সমাধান করেছেন তার সবিস্তর বর্ণনা খবরের কাগজের মারফতে পেশ করা কঠিন—এখন অসুবিধা এই যে তার জন্য ম্যাপের প্রয়োজন; মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে তিনি সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী দুই নদীর পারে পারে অনুসন্ধান করতে করতে তাদের সঙ্গমভূমি এবং তারও পশ্চিমে অনূপগড় পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। অনূপগড় থেকে প্রায় ছ'মাইল দূরে ভাওয়ালপুর রাজ্যের সীমানা। শ্রীযুত ঘোষ ভাওয়ালপুর যাননি। ভাওয়ালপুর যাওয়ার উপায় নেই,—সে জায়গা পাকিস্তানে সবাই জানে।

অরেলস্টাইনের মত গুণী বলে গেলেন এ তল্লাটে কিছু পাবে না—এমন কি শ্রীযুত ঘোষ যেসব জায়গা খুঁড়েছেন তারও দু'একটা স্টাইন খুঁড়ে নাকচ করে দিয়ে গিয়েছিলেন—আর তখন যদি ঘোষ সেখানে গিয়ে দুম করে হারাপ্পা মোন-জো-

দড়োর খোঁজ পান তখন ব্যাপারটা কি রকম হয় বলুন তো ?

এই বেলা পাঠককে একটু সাবধান করে দি।

যাঁরা মোন-জো-দড়ো সভ্যতা খুঁটিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁরা জিজ্ঞেস করবেন, তবে কি ঘোষ মোন-জো-দড়ো সভ্যতার নরনারীর জাত-গোত্র ঠিক করে ফেলেছেন—তারা আর্য না দ্রবিড় না অন্য কোনো জাত—, তবে কি ঘোষ হারাপ্পা-লিপির পাঠোদ্ধার করতে পেরেছেন, তবে কি তিনি সপ্রমাণ করতে পেরেছেন যে, আর্য এবং হারাপ্পা সভ্যতাতে সঙ্ঘর্ষ বেধেছিল, তবে কি তিনি বলতে পারেন হারাপ্পা সভ্যতা হঠাৎ কর্পূরের মত উবে গেল কি প্রকারে ?

ঘোষ এসব প্রশ্নের একটারও উত্তর দেননি। তবুও আমি ঘোষের প্রত্নতাত্ত্বিকতায় এত উল্লাস বোধ করছি কেন ?

প্রথমতঃ, দৃঢ়নিশ্চয় সপ্রমাণ হয়ে গেল যে, মোন-জো-দড়ো হারাপ্পা সভ্যতা শুধু সিন্ধু দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না, পূর্ব দিকে উজিয়ে উজিয়ে বিকানির পেরিয়ে পূর্ব পাঞ্জাব অবধি এসে ঠেকেছিল অর্থাৎ আগে যে বলা হয়েছিল মোন-জো-দড়ো হারাপ্পা সভ্যতা গুটি কয়েক জায়গাতে (শহরে) সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। সপ্রমাণ হল বেলুচিস্তান থেকে পূর্ব পাঞ্জাব এই সাতশো মাইল এক বিরাট সভ্যতার লীলাভূমি ছিল এবং এই বিস্তৃতি সে যুগের পৃথিবীর যে কোনো সভ্যতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, এ সভ্যতা লোপ পাওয়ার পর এক দ্বিতীয় সভ্যতার সন্ধান ঘোষ পেয়েছেন। তার বৈশিষ্ট্য যে সে হারাপ্পার রঙ ও নক্সার হাঁড়ি কলসী বানায়নি—তার রঙ গ্রে (মেটে) এবং একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে এ সভ্যতা হারাপ্পার পরের সভ্যতা। এই মেটে সভ্যতার (গ্রে ওয়েসার) নরনারী কারা সে সম্বন্ধেও এখনো কিছু বলা যায় না, তাদের যুগনির্ণয়ও সুকঠিন, তবু মোটামুটি আন্দাজে বলা যেতে পারে যে, এদের সভ্যতার কেন্দ্রক্ষণ খৃঃ পূঃ ৬০০। তাহলে নীচের দিকে হয়ত মৌর্যদের সঙ্গে এদের পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু উপরের দিকে হারাপ্পার সঙ্গে এর সংযোগ হয়নি। কারণ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, হারাপ্পা সভ্যতা যেসব আবাসভূমি পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল (কিম্বা নৈসর্গিক কোনো কারণে নির্মূল হয়ে গিয়েছিল) সেগুলোতে এরা আপন বাসভূমি নির্মাণ করেনি। (মুসলমানরা রায় পিথৌরা, অর্থাৎ পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে তাঁরই রাজধানীতে আসন গেড়েছিল ; সাতশো বছর পরে আজও রায় পিথৌরার দুর্গের দেয়াল কুতুবমিনারের চতুর্দিকে দেখতে পাওয়া যায়।) তাই যাই হোক না কেন, এদেরই খেই ধরে ভবিষ্যতে মেলা আবিষ্কার হতে পারে সে বিষয়ে আমার মনে

কোনো সন্দেহ নেই।

তৃতীয়তঃ, যে আরেক সভ্যতার সন্ধান ঘোষ পেয়েছেন তার নাম দিয়েছেন, 'রঙ্গমহল' সভ্যতা, কারণ বিকানিরের আধুনিক রঙ্গমহল অঞ্চলে এ সভ্যতার বিস্তর উদাহরণ তিনি পেয়েছেন। 'রঙ্গমহল' মুসলমানী যুগের শব্দ—অর্থাৎ এ সভ্যতার অন্ততঃ হাজার বছর পরেকার, কিন্তু রঙ্গমহল জায়গাটি বিকানিরে সুপরিচিত বলে এ নামকরণ করা হয়েছে।

এ সভ্যতা মেটে সভ্যতার পরবর্তী এবং নিঃসন্দেহ কুশান যুগ পর্যন্ত পৌঁছেছিল, —এমন কি গুপ্ত যুগ পর্যন্ত, কারণ গুপ্ত যুগের গান্ধার শিল্পের নিদর্শনও এতে রয়েছে।

এ তিন সভ্যতার নির্মাতা কারা, ঠিক ঠিক কোন্ যুগে এরা ভারতবর্ষে বসবাস করেছিল, একে অন্যের সঙ্গে এদের দ্বন্দ্ব হয়েছিল কিনা, এসব তত্ত্ব এবং তথ্য জোর গলায় আজ বলা অসম্ভব।

শ্রীঅমলানন্দ ঘোষ বিকানিরে যে অদ্ভুত অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুসন্ধান করেছেন তাতে মেলা প্রশ্ন মাথা তুলেছে।

যেসব প্রশ্নের তিনি উত্তর দিয়েছেন সেগুলো পূর্বেই নিবেদন করেছি, কিন্তু নূতন প্রশ্ন উত্থাপন করাও প্রত্নতাত্ত্বিকের কর্ম। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, সুযোগ এবং সুবিধা পেলে—ঘোষ এখনো যুবক—তিনি অনেক কাজ করে বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হবেন।

গত বৃহস্পতিবার আমাদের এক ঘরোয়া বৈঠকে ঘোষ আমাদের এ বাবদে বক্তৃতা দিয়ে তালিম দেন। সব জিনিস ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনি বলে হয়ত ঘোষের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। ঘোষ সহৃদয় লোক, এ লেখা যদি তাঁর হাতে পৌঁছয় তিনি মাপ করে দেবেন এ আশা মনে পোষণ করি। আমার উদ্দেশ্য, গুণীরা যেন এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হয়ে শ্রীমান ঘোষকে উৎসাহিত করেন।

১১

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে মিস মেয়ো কিম্বা বেভারলি নিকলস্ যে উদ্দেশ্য আর যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এদেশে এসেছিলেন শ্রীমতী রজোভেল্ট আদপেই সে রূপ নিয়ে আসেননি। ভারতবর্ষের ভাল-মন্দ পাপ-পুণ্য নিয়ে তিনি যেমন কড়া কড়া কথা বলার প্রয়োজন বোধ করেন না ঠিক তেমনি তিনি অকারণে অসময়ে আমাদের পিঠ চাপড়ে আমরা যে বড্ড সুবোধ ছেলে সে কথাও স্মরণ

করিয়ে দিতে চান না।

তাঁর দৃষ্টি আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যার দিকে। আজকের দিনে আমেরিকারই অঢেল রেস্ত আছে; ভারতের উন্নতির জন্য এদেশীয় বহুলোক খাটবার জন্যও তৈরী আছেন। এ দুয়ে মিলে যে অনেক সৎকর্ম সমাধান হতে পারে সে বিষয়ে কারো মনে কোনো দ্বিধা নেই। শ্রীমতী রজোভেল্ট ঠিক এই জিনিসটিই মনে রেখে এ দেশে বহু পর্যবেক্ষণ করেছেন ও দিল্লীর তাবৎ সভা এবং পার্টিতে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন—অতিশয় সহিষ্ণুতার সঙ্গে সর্ব প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর দিয়েছেন।

এদেশের অনেকেরই মনে ভয়,—শুধু কম্যুনিস্ট না, অন্য পাঁচজনেরও—আমরা যদি একবার মার্কিন টোপ গিলি তাহলে আর মার্কিন রাজনৈতিক বঁড়শি থেকে কস্মিনকালেও ছাড়া পাব না। এর উত্তরে প্রথম বক্তব্য ইংরিজি প্রবাদ, 'নো রিস্ক্, নো গেন' সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়। দেশী প্রবাদের ভাষায় বলি, সাপ মারতে গেলে লাঠি ভাঙবেই ভাঙবে একথা হলফ করে বলা যায় না; মাঝে মাঝে নাও ভাঙতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ আমার বিশ্বাস পৃথিবীর বুদ্ধিমান জাত এখন আর ডাণ্ডা বুলিয়ে অন্য দেশের উপর রাজত্ব করতে চায় না। এখন সে চায় অর্থ নৈতিক রাজত্ব—অর্থাৎ পৃথিবীর আর পাঁচটা জাতের কাছে নিজের সুবিধেয় মাল বেচতে। তবে যদি বলেন, আমেরিকার কাছ থেকে রেস্ত নিলে আমরা তাদের অর্থ নৈতিক আওতায় এসে যাব তাহলে নিবেদন, রুশ ভিন্ন পৃথিবীতে আজ কোন্ জাত মার্কিনী আওতার বাইরে? এই যে মহামান্য ইংরেজ মহাপ্রভুরা দুনিয়ার সর্বত্র দাবড়ে বেড়ান তেনাদের অবস্থাটা কি? আজ যদি তাঁরা মার্কিনের সঙ্গে বড্ড বেশী তেড়িমেড়ি করেন তবে কাল কাক-কোকিল ডাকবার আগেই মাংসটা আণ্ডাটার দাম চড় চড় করে আসমানে চড়ে মগ ডালটার উপর বসে ঠ্যাং দুলাবে। বাজার করতে গিয়ে তার চরণের ধুলোটি স্পর্শ করা যাবে না।

তবে হাঁ, আলবৎ, স্বেচ্ছায় আমরা এ রকম অবস্থা বরণ করে নেব কেন?

আমার অন্ধ বিশ্বাস ভারত বিরাট দেশ তাই সে কারো ধামাধরা না হয়েও বেঁচে থাকতে পারবে। তার পূর্বে অবশ্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন কৃষির সুব্যবস্থা করা। তার জন্যে প্রয়োজন জলের বাঁধ, বিজলীর আলো। আরো দরকার কৃষির জন্য উন্নত কলকব্জা, সার। এসবের জন্য উপস্থিত রেস্তর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, একবার তার কৃষি আপন পায়ে দাঁড়াতে পারলে তখন

আর কোনো ভাবনা থাকবে না।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, রায় পিথৌরা অতিশয় অমায়িক লোক। তিনি কারো কাছে অঋণী হয়ে মরতে চান না, তাই যদি এসব বাবদে রুশরা সাহায্য করতে চান, তবে তিনি তাদেরও সাহায্য নিয়ে রুশ জাতটাকে কৃতার্থম্মন্য করতে প্রস্তুত আছেন।

রুশের আওতায় পড়ে যাব? তার ভয় আরও কম। পূর্বে বলেছি, 'বুদ্ধিমান' জাত অন্য দেশের উপর রাজত্ব করতে চায় না। তাই ইন্দোচীনে ফ্রান্সের কাণ্ডকারখানা দেখে কি বলব ভেবে পাইনে।

গোড়ায় আমেরিকা ইন্দোচীনের ঝামেলায় নামতে চায়নি। ওদিকে ফ্রান্সের গাঁটে এত কড়ি নেই যে, সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে একখানা আস্ত লড়াই চালাবার মত বিলাস উপভোগ করতে পারে। তাই ফরাসিসরা মেলা কায়দা-কেতা করে, মেলা নল চালিয়ে মার্কিনকে নামালে তার দ'য়ে।

ওদিকে মার্কিন নামা সত্ত্বেও রাধা-নাচের ন' মন তেল জ্বালাতে গিয়ে ফ্রান্সের আপন দেশে লাল বাতি জ্বলে আর কি। ফ্রান্সে এখন বহু বিচক্ষণ লোক দ'টা থেকে কোনো গতিকে বেরতে পারলে বাঁচেন কিন্তু হায় ইতোমধ্যে মার্কিন চটে গিয়ে বলছে, 'ইয়ার্কি পেয়েছ? আমাকে নামিয়ে দিয়ে এখন কেটে পড়তে চাও? সেটি হচ্ছে না—যে জল ঘোলা করেছ সেটা তোমাকেও খেতে হবে।' মার্কিনী ভাষায়, 'ইন ইয়োর ওন জুস'—আপন রসে সিদ্ধ হও।

ফ্রান্সের লোক বেহুলার ভাসান শোনে নি—তাহলে ইন্দোচীনের ঘাটের দিকে যেতো না—

'ও ঘাটে যেয়ো না বেউলো
বেউলো আমার মা
চাঁদের ব্যাটা দুশমন নখা
দেখলে ছাড়বে না।'

* * *

শ্রীযুত সুবিমল দত্ত ভারতের রাজদূত হয়ে জার্মানি যাচ্ছেন। উপস্থিত জার্মানির রাজধানী 'বন' শহরে—তাই বলে কেউ যেন না ভাবেন দত্ত মহাশয় বনবাসে চললেন।

বন জার্মানির সেরা সুন্দর শহর। সামনে রাইন নদী, পিছনে 'ভিনাস' পাহাড়, রাইনের ওপারে 'সীবেন গেবির্গে' বা 'সপ্ত পর্বত। চতুর্দিকে বাগান, চতুর্দিকে সুন্দর সুন্দর ঘর-বাড়ি—শহরের ভিতরেও বিস্তর কাঁচা সবুজ পার্ক।

আর লোকগুলো ভারি চমৎকার। বন শহরটা জার্মানের সীমান্তে, বেলজিয়ামের গা ঘেঁষে। ফ্রান্সের সঙ্গেও তার বিস্তর দহরম মহরম। বন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রচুর বিদেশী ছাত্র পড়াশোনা করে, ততোধিক টুরিস্ট বনে প্রতিবছর বেড়াতে আসে তাই বন-বাসিন্দা চিরকালই একটুখানি আন্তর্জাতিক বিশ্বনাগরিক প্রকৃতির—খাঁটি প্রাশানদের মত কুনো আর দাম্ভিক নয়।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ইংরেজের তাড়া খেয়ে খেয়ে বহু ভারতীয় শেষ আশ্রয় নিত জার্মানিতে। জার্মানরা কোনো কালেই ভারতীয়দের আশ্রয় দিতে কার্পণ্য করেনি। তাই যখন যুদ্ধের পর অনেক জাত কে কত ক্ষতিপূরণ পাবে তার আলোচনা করছিল তখন ভারতীয় সরকার স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন যে, জার্মানদের উপর আমাদের কোনো দাবী-দাওয়া নেই। যে সব ভারতীয়দের জার্মানির সঙ্গে কোনো প্রকারের যোগাযোগ ছিল তাঁরাই এ সংবাদ শুনে উল্লাস বোধ করেছিলেন।

যৌবনে বন শহরে রায় পিথৌরা জার্মান সতীর্থদের সঙ্গে বসে স্বাধীন ভারতের সুখস্বপ্ন দেখতেন। সে সব সতীর্থেরা সংস্কৃত ও ভারতীয় ঐতিহ্যের আলোচনা করতেন বলে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতেন না ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা হারালো কি করে। এবং তাই বোধ হয় তাঁরা জোর গলায় বার বার বলতেন, ভারতবর্ষ খুব শীঘ্রই পুনরায় তার স্বাধীনতা ফিরে পাবে। কিম্বা হয়ত আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বলতেন, কে জানে?

স্বাধীনতা লাভের পরই আমি এঁদের কাছ থেকে বহু আনন্দ অভিনন্দন পাই। একজন লিখলেন, 'তুমি তোমার ব্রিটিশ পাসপোর্ট দেখাতে সব সময়ই লজ্জা অনুভব করতে। এইবার ভারতীয় পাসপোর্ট বুকে দুলিয়ে সোজা জার্মানি চলে এস।'

ভারতের স্বাধীনতা লাভে এঁরা কতখানি উল্লাস বোধ করেছেন সে কথা আমি জানি, কিন্তু প্রকাশ করার মত ভাষার দখল আমার নেই।

দত্ত মহাশয়কে জার্মানরা সাদরে গ্রহণ করে নেবে সে-কথা আমি নিশ্চয় জানি, তার প্রধান কারণ দত্ত মহাশয় অতিশয় অনাড়ম্বর লোক। জার্মানির প্রতি তাঁর প্রীতি আছে—কিছুদিন পূর্বে ডাঃ শাখট যখন ভারতে আগমন করেন তখন উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ হয়েছিল।

যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাঁরা বলতে পারবেন জার্মানির সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগসূত্রের ফলে আমাদের কি কি লাভ হবে। আমি বলতে চাই, তার চেয়েও আমাদের বেশী লাভ হবে যদি আমাদের মধ্যে বৈদগ্ধ্যগত আদান প্রদান

নিবিড়তর হয়। জার্মানিতে সর্বপ্রথম সংস্কৃত চর্চা আরম্ভ হয় বন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখনও সে চর্চা জোর এগিয়ে চলছে। বনের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র উত্তমরূপে স্থাপিত হলে এদেশে সংস্কৃত-চর্চা অনেকখানি উৎসাহ পাবে।

রাজদূতের মেলা কর্ম, অনেক ঝামেলা। কিন্তু দত্ত উচ্চশিক্ষিত লোক; তিনি কৃষ্টিগত যোগসূত্র স্থাপনে উৎসাহিত হবেন এ বিশ্বাস আমার আছে।

রুশদের বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। তাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি আছে।

একদা মিশনারীরা এদেশে অকাতরে বিনামূল্যে লক্ষ লক্ষ বাইবেল বিতরণ করেছিলেন। ফ্রী বলে সেগুলো লোকে পড়ত না। তখন মিশনারীরা বাইবেল বিতরণ একদম বন্ধ করে দিলেন। ফলে আজ যদি আপনি বাইবেল পড়তে চান, তবে গাঁট থেকে অন্ততঃ টাকা দশেক না খসালে একখানা ভালো বাইবেল পাবেন না। কাজেই অবস্থা পূর্ববৎ—বাইবেল এখনো কেউ পড়ে না।

রাশানরা দিল্লীর বাজারে ছেড়েছে এন্তার মার্কস, লেনিন, স্টালিন, লের্মেণ্টফ চেখফ, কিন্তু একদম ফ্রী নয়, আবার ন্যায্য মূল্য থেকে অনেক সস্তা। দেড় টাকায় লের্মেণ্টফ পেয়ে যাচ্ছেন—ভালো কাগজ উত্তম ছাপা। আপনাকে ঠেকায় কে? এবং যেহেতু কাঁচা পয়সা ফেলে তেল কিনেছেন তখন সে তেল আজ না হোক কাল মাখবেনই।

এ সব বইয়ের চাপে পড়ে মার্কিন মুল্লুকের সস্তা কেতাব ছাড়া ইংরিজি আর কোনো কেতাব আমার বাড়ির সামনের স্টলে পাওয়া যাচ্ছে না। স্টলওলা বললে, রাশায় ছাপা ইংরিজি বই বিক্রী করলে কমিশনও নাকি বেশী পাওয়া যায়।

আমার শুধু দুঃখ রাশানরা যত না মার্কস-এঙ্গেলস্ লেনিন-স্টালিন ছাড়ছে তার শতাংশের এক অংশও টলস্টয়, পুসকিন, দস্তায়ফ্স্কি, তুর্গেনিয়েফ দিচ্ছে না।

১২

ভূতনাথ এবং তস্য বন্ধু মদনগোপাল কি করিয়া যে গঞ্জিকাসক্ত হইল তাহার সঠিক সন্ধান মেলে না। পরোপকারার্থে তাহারা প্রায়ই নিমতলা, কেওড়াতলা গমনাগমন করে; হয়ত বা সেই উপলক্ষ্যে বন্ধুদ্বয় এই ধূম্রাত্মক রসে বিমজ্জিত হইয়াছিল।

গুরুজনরা এই সংবাদ শুনিয়া বিচলিত হইলেন। তাঁহারা ভূতনাথ ও মদন-গোপালকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'ভদ্রসন্তানের একি আচরণ! আমরা বড়ই মর্মাহত হইয়াছি।'

ভূতনাথ মদনগোপাল অতিশয় নম্র স্বভাব ধারণ করে ; নতমস্তকে গুরুজনদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল।

কোনো প্রকারের আপত্তি অনুযোগ কিম্বা উচ্চবাচ্য করিল না বলিয়া গুরুজনদের হৃদয় ঈষৎ দ্রবীভূত হইল। একজন বলিলেন, 'পালা-পার্বণে, অবরে-সবরে না হয় কিঞ্চিৎ সন্মার্গভ্রষ্ট হইলে ; কিন্তু নিত্য নিত্য—' এই মাত্র বলিয়া সহৃদয় গুরুজন তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

ভূতনাথ এবং মদনগোপাল ঐ পন্থাই অবলম্বন করিবে মৌনভাবে এই রকম একটা প্রতিশ্রুতি দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

গৃহের দেহলি প্রান্তে গোধূলি লগ্নে ভূতনাথ এবং মদনগোপাল নির্জীবের মত পড়িয়া আছে। গঞ্জিকালগ্ন গতপ্রায়—ধূম্ররস না পাইয়া উভয়ই অতিশয় বিরস বদন। কিন্তু উপায়ান্তরই বা কী ? গুরুজনকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছে, পালাপার্বণ ব্যতীত গঞ্জিকারসে নিমজ্জিত হইবে না।

হঠাৎ রোদনধ্বনি শোনা গেল। মদনগোপাল তৎক্ষণাৎ সংবাদ নিতে প্রস্থান করিল। মুহূর্তেক মধ্যেই দ্রুতগতিতে প্রত্যাগমন করিয়া চিৎকার করিল, 'ওরে ভূতো, ঝপ্ করিয়া একটা চিলিম সাজো। চুনীর মাতা গত হইয়াছেন।'

ভগবান দয়াময়। পালা-পার্বণের সন্ধানে থাকিলে চুনীর মাতার মৃত্যুও পালারূপেই গণ্য করা যাইতে পারে।

রায় পিথৌরা ভূতনাথ গোত্রীয়।

হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান আমার সম্মুখে স্ব স্ব পালাপার্বণে আনন্দে নিমজ্জিত হইবেন এবং আমি "দাঁড়ায়ে বাহিরে দ্বারে মোরা নরনারী"র একজন হইয়া সেই রসস্রোতে নিমজ্জিত হইতে পারিব না, এই কুব্যবস্থার কল্পনামাত্র করিতেই অমি শিহরিয়া উঠি। তাহা হইলে আমি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অধিবাসী হইলাম কোন্ দুঃখে ? অস্মদ্দেশীয় মহাপুরুষগণ হিন্দুর মন্দিরদ্বার উন্মোচন করেন, ঈদোৎসবে মুসলমান সখাগণ দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়েন, এই তাবৎ অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ সম্মুখে বিদ্যমান থাকিতে আমিই বা কোন সম্প্রদায়-বিশেষের পালাপার্বণে নিজেকে কূপমণ্ডুকের ন্যায় সীমাবদ্ধ করিব !'

বড়দিন আসিল কিন্তু হায় কোথায় সেই ইংরেজ সম্প্রদায় যাঁহাদের প্রসাদাৎ গুরুভোজন এবং গুরুতর পানের সুব্যবস্থা হইত। খৃষ্ট জন্মদিনের পূর্ব সন্ধ্যায় দেহলি প্রান্তে তাই অতিশয় বিরস বদনে মনে মনে ইংরেজকে অভিসম্পাত দিতেছিলাম, "স্বরাজ প্রদান করিলে তো করিলে (সে তো অস্থিমজ্জায় বারম্বার অনুভব

করিতেছি) কিন্তু এই দেশ ত্যাগ না করিলে কি তোমাদের বাইবেল অশুদ্ধ হইয়া যাইত ? অন্ততঃপক্ষে খৃষ্টদিগকে খৃষ্টধর্মে বাপ্তিস্ম করিবার সর্ববাসনা কি তোমাদিগের চিরতরে লোপ পাইয়াছে।"

দেহলি প্রান্তে বিশ্বেশ্বর বলুন, কাবা বলুন, এখানকার চক্রবর্তী কনট (পাঞ্জাবী উচ্চারণ 'ক্লাট সার্কল') সার্কল। সুসজ্জিত বিপণিমণ্ডলী চক্রাকারে এক সুরম্য উদ্যানকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং অপূর্বদর্শন কামিনীগণ সুরম্য বেশ-ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া এই আপন-চক্রে ঘূর্ণায়মান হইতেছেন। কোনো ললনা পাদুকা ক্রয় করিতে উপবেশন করিয়াছেন—রাতুল নখাগ্র ('চরণ' বর্বর-যুগে প্রচলিত ছিল) সম্প্রসারিত করিয়া মধুর কণ্ঠে কাম্য পাদুকার নখ-শির বর্ণনা করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখের পাদুকা-স্তূপ হিমাচলকে অনায়াসে লজ্জা দিতে পারে, সেই গগনচুম্বী স্তূপের পশ্চাতে আপণ-স্বামী কিম্বা আপন স্বামী কাহাকেও আর দেখা যাইতেছে না। আহা কি মধুর দৃশ্য !

কোনো নাগরী কঞ্চুলিকার জন্য গলবস্ত্র হইয়াছেন—অর্থাৎ ময়ূরকণ্ঠী চীনাংশুক খণ্ড অমলধবল গলে জড়িত করিয়া পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিতেছেন বর্ণসামঞ্জস্য শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে সুবিন্যস্ত হইতেছে কি না। সখিগণ নানা প্রকারের সদুপদেশ দিতেছেন, পরমগুরু পতিদেব বস্ত্রমূল্য শ্রবণকরতঃ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছেন, ক্ষীণ-কণ্ঠে প্রতিবাদকল্পে ওষ্ঠাধর উন্মোচন করিবার পূর্বেই নাগরীর নাসিকা স্ফীত হইতে লাগিল।

রায় পিথৌরা দ্রুতগতিতে বিপণি ত্যাগ করিলেন।

হায় খৃষ্ট জন্মোৎসব ! বিপণি-আপণ প্রদর্শন করিয়াই আমার উৎসব সমাধান হইবে ?

অকস্মাৎ স্কন্ধোপরি চপেটাঘাত। দেখি, পার্সী মিত্র, রুস্তম ভাই মিনুচিহর নাদির শাহ। "তুমি মোহময়ী (বোম্বাই) ত্যাগ করিয়া দেহলি প্রান্তে কেন ?"

"কর্মোপলক্ষে।"

"উত্তম উত্তম।"

"খৃষ্ট জন্মোৎসব পালন করিতেছ না ?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম, "খৃষ্টান বন্ধু কেহই নাই।"

নাদির শাহ স্কন্ধোপরি পুনরায় চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "এইমাত্র অনটন, তুমি কি বিস্মৃত হইয়াছ যে আমার পিতামহ জরথুস্ত্র ধর্ম ত্যাগকরতঃ খৃষ্টের স্মরণ লইয়াছিলেন। আইস বৎস, এই নির্বান্ধব পুরীতে কোনো ভোজন এবং পান-

শালাকে আমাদিগের পৃষ্ঠপোষকতা দান করিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থম্মন্য করি।"

নাদির শাহ অতিশয় গুণী ব্যক্তি। ভোজনগৃহে প্রবেশকরতঃ সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিল, "শিশির ঋতুতে ব্র্যাণ্ডীই প্রশস্ত। তৎপর অন্য বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা হইবে।"

আমি বলিলাম, "আমার দুর্বলতা আহারাদির প্রতি।"

নাদির শাহ বলিল, "ভ্রাতঃ, আমার মাতামহী বিশুদ্ধ ইরানবাসিনী, বাল্যকাল হইতে আমি ইরানী খাদ্য ভূরি ভূরি আহার করিয়াছি। প্রথম যৌবন দিল্লীতে কর্তন করি—মোগলাই খাদ্য আমার অপরিচিত নহে। গৃহিণী ফরাসিনী; অতএব ভ্রাতঃ, বিবেচনা করো এই সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা কিছু বেশী।"

প্রথম আসিল ফরাসিস পদ্ধতিতে অরদ্যভ্র্ (hors-d'oeuvre)। নানা অংশে বিভক্ত যে বিরাট খুঞ্চা আসিয়া উপস্থিত হইল তাহাতে অন্ততঃ দশাধিক রকমের খাদ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জর্মন (ফ্রাঙ্কফুর্টার) সসিজ, ভর্জিত এবং অভর্জিত বেকন এবং হ্যাম, জলপাই তৈলসিক্ত টোস্টাদীন রৌপ্যবর্ণের সার্দিন মৎস্য, অতিশয় নমনীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অমলেট খণ্ড, সিরকা-নিমজ্জিত পলাণ্ডু-ত্রপুষী-কোষাম্র (প্যাজ-কাঁকুড়-জলপাই), রুশদেশ হইতে সদ্যাগত 'কাভিয়ার' বা মৎস্য-ডিম্বের স্যাণ্ডউইচ, সেই রুশ পদ্ধতিতে মাইয়নেজ মধ্যে সুপক্ক কুক্কুট-ডিম্ব। অন্য খাদ্যবস্তুগুলির গোত্রবর্ণ অনুমান করিতে পারিলাম না।

নাদির শাহ বলিল, "ক্ষুধাকে তীক্ষ্ণতর করিবার উপাদান। স্পর্শ করিবে মাত্র—অনাহারের জন্য ব্যাপকতর ব্যবস্থা।"

ধন্য নাদির শাহ।

বলিল, "সূপ খাইলে অনর্থক উদর পূর্ণ হইয়া যায়। অতএব সূপ সর্বথা বর্জনীয়। ডাচেস অব উইনজার নিমন্ত্রণে কদাচ সূপ পরিবেশন করেন না। অতএব এক্ষণে আসিবে তন্দুর-মৎস্য।"

আমি বললাম, "তন্দুর-মুর্গী খাইয়াছি কিন্তু তন্দুর-মৎস্য?"

অর্থাৎ তন্দুরে প্রস্তুত মৎস্য—ওভেন-বেক্‌ড্ ফিশ।

সে মৎস্য দেখিয়া মনে হইল অপক্ক বস্তু। যেন মৃত মৎস্য খাইতে দিয়াছে। অথচ স্পর্শ করিবামাত্রই তিনি নমনীয় কমনীয় খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইলেন। তন্দুরের উষ্ণতা চতুর্দিক হইতে সমভাবে মৎস্যের সংলগ্ন হইয়াছে বলিয়া তিনি অপূর্ব রসনাভিরাম রসবস্তু হইতে সক্ষম হইয়াছেন।

নাদির শাহ আদেশ দিল, "ইহার সঙ্গে কিঞ্চিৎ ভিয়েনীজ ক্রোয়াসাঁ ভক্ষণ করো।"

তুর্করা যখন ভিয়েনার নগরদ্বারে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয় তখন সেই ঘটনার স্মরণার্থে ভিয়েনা-বাসীরা অর্ধচন্দ্রের (ক্রোয়াসঁ-ক্রিসেণ্ট) আকারে এক কোমল অথচ মর্মরিত রুটি নির্মাণ করে। অতিশয় উপাদেয় লঘু খাদ্য।

অতঃপর তন্দুরী মুর্গী এবং আফগানী নান-রুটি। তাহার বর্ণনা আমার সুরসিক পাঠকদিগকে পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি।

নাদির শাহ একার্ধাধিক নিষিদ্ধ পক্ষী ভক্ষণকরতঃ বলিল, "এইবারে সত্য আহার আরম্ভ হউক।" ওয়েটারকে বলিল, "মটর-কোপ্তা-বিরয়ানী, আলু-মটরশুঁটি মুর্গী কারি, কিঞ্চিৎ কোপ্তা নরগিস্ (কলিকাতার ডেভিল) এবং অত্যল্প শূল্যপক্ক মিশরী কাবাব (কলিকাতার শিক কাবাব)। আর দেখো, মুর্গী-কারিতে যদি যথেষ্ট ঝোল না থাকে তবে এক পাত্র রৌগন-জুশ এবং কিঞ্চিৎ ক্রীম-লেটিস্ সালাড্। উপস্থিত (এবং এই শব্দটি নাদির যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করিল) ইহাই যথেষ্ট।"

আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বলিতে পারো, মূর্খেরা সালাড্ কেন জলপাই (অলিভ) তৈল দিয়া প্রস্তুত করে? সেই তৈলে না আছে গন্ধ না আছে কোনো প্রকারের তীব্রতা। সালাডের পক্ষে বঙ্গদেশে প্রচলিত সরিষার তৈলই প্রশস্ততম। তুমি এক কাজ করো। কিঞ্চিৎ মাস্টার্ড জলে তরল করতঃ সালাডের সঙ্গে সংমিশ্রণ করিয়া দাও।"

ধন্য ধন্য নাদির শাহ; তুমি বঙ্গভূমিতে পদার্পণ না করিয়াও কি প্রকারে অবগত হইলে আমরা স্ফীততণ্ডুল সরিষার তৈল সহযোগে ভক্ষণ করি।

আহারে ক্ষান্ত দিয়া নাদির বলিল, "ইহারা ঘৃতসিক্ত উত্তম পরোটা নির্মাণ করিতে জানে না। নতুবা পোলাও-কারির অন্তরালে মধ্যে মধ্যে সেই বস্তুর চর্বণ রসনাকে বহ্বান্ন ভক্ষণে উৎসাহিত করে।"

অতঃপর নাদির শাহ বলিল, "মিষ্টান্ন সম্বন্ধে অহেতুক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়ো না। আমি তাহার সুব্যবস্থা করিয়াছি।"

রসগোল্লা লেডিকিনি এবং সন্দেশ !!

নাদির বলিল, "শুনিয়াছি, কলিকাতার তুলনায় নিকৃষ্ট। তুমি অপরাধ নিয়ো না।"

ধন্য নাদির। নাদির ভারত জয় করিয়াছিল; তুমি খাদ্যব্রহ্মাণ্ড জয় করিয়াছ।

আশা করি, এই খাদ্যনির্ঘণ্ট দেহলি প্রান্তাগত বঙ্গবাসী স্মরণ রাখিবেন। আমাকেও।

ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু বহু পুস্তক এদেশে লোপ পেয়েছে, কিন্তু অনুবাদ তিব্বত, চীন, মধ্য এশিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং পূর্ব তুর্কিস্থানের নানা ভাষাতে এখনো পাওয়া যায়। শুধু বৌদ্ধ মঠেই যে এদের সন্ধান মেলে তা নয়, মধ্য এশিয়ার বালির নীচ থেকেও এসব অনুবাদের বই এখন বেরচ্ছে।

ভারতবর্ষীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ এবং তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নির্মাণের জন্য এসব অনুবাদ গ্রন্থ অবর্জনীয়। কিন্তু প্রশ্ন এই বিরাট কর্মভার গ্রহণ করতে যাবে কে?

কিছুকাল পূর্বে নাগপুরে শ্রীযুক্ত রঘুবীর ভারতীয় সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক পরিষদ ('ইণ্টারন্যাশনাল একাডেমি অব্ ইণ্ডিয়ান কালচার') প্রতিষ্ঠা করেন। এ-পরিষদের কাজ যাতে করে দেশ-বিদেশের গুণী-জ্ঞানীদের সাহায্যে ভালো করে গড়ে ওঠে, তার জন্য পরিষদ জাপান, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, বর্মা, সিংহল, ভারতবর্ষ, ফ্রান্স, ইতালি, জর্মনি, ইংলেণ্ড, হল্যাণ্ড এবং যুক্তরাজ্যের পণ্ডিতদের সহায়তা চেয়ে আহ্বান জানান এবং ইতিমধ্যেই সহৃদয় উত্তর পেয়েছেন।

দিল্লীতে এসে শ্রীযুক্ত রঘুবীর বললেন, পশ্চিম জর্মনির মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুত নোবেল মহাযান বৌদ্ধধর্মের 'সুবর্ণ প্রভাসসূত্র' পুস্তকখানা সর্বপ্রথম প্রকাশ করবেন। পরিষদ ক্রমশঃ কি কি পুস্তক বের করবেন তার একটি খসড়াও অধ্যাপক নোবেল তৈরী করেছেন।

এ অতি উত্তম প্রস্তাব কোনো সন্দেহ নেই। ভারতের বৈদগ্ধ্যগত ইতিহাসের প্রতি যাঁরই কণামাত্র মমতা আছে, তিনিই এ কর্মে সহায়তা করবেন এ বিশ্বাস আমাদের মনে আছে। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, একমাত্র ভারতীয় পণ্ডিতেরাই যদি একাজে সহায়তা করেন, তা হলেই অল্পদিনের ভিতর বিস্তর উন্নতি দেখানো সম্ভবপর হবে।

এ কাজের জন্য টাকা কোথা থেকে আসবে সে প্রশ্ন অবান্তর।

এ কাজ যখন সম্পূর্ণ করতেই হবে, তখন টাকাও যোগাড় করতেই হবে।

কিন্তু প্রধান প্রশ্ন এসব বই পড়বে কে?

সংস্কৃত ভাষার (পালি ও প্রাকৃতের কথা থাক) চর্চা বাঙ্গলা দেশে এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, সেকথা যাঁরা 'আনন্দবাজারে' 'চিঠিপত্রে জনমত' পড়ে থাকেন তাঁরাই জানেন। কেউ কেউ ইস্কুল-কলেজে সংস্কৃত চর্চার জন্য যে 'ব্যবস্থা'

করতে চান, সেটা বাচ্চাকে ক্রমে ক্রমে মায়ের দুধ ছাড়ানোর মতনই। অন্যেরা বাচ্চাটাকে বাকি জীবন আধমরার মত করে রাখতে চান। যাঁরা ভাল করে সংস্কৃত পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে চান, তাঁরা যেন কল্কে পাচ্ছেন না বলে মনে হচ্ছে। বাঙ্গলার বাইরেও অবস্থা প্রায় একই। টোল-পাঠশালা বাঁচিয়ে রাখবার জন্য পণ্ডিতদের দুমুঠো অন্ন দেবার প্রস্তাব কেউ করেছেন বলে জানিনে।

শেষটায় কি হবে বলা শক্ত তবে আশা করি, পাঠক আমার উপর চটে যাবেন না, যদি নিবেদন করি যে, এ দেশে সংস্কৃতচর্চা ব্যাপকভাবে হওয়ার আশা দুরাশা। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ, যেখানে ক্লাসিক্স্ পড়ানোর জন্য গণ্ডা গণ্ডা জলপানি রয়েছে, সেখানেই যখন বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতির মোহে পড়ে ছাত্রেরা ক্লাসিক্স্ বর্জন করেছে, তখন এ গরীব দেশ সংস্কৃতের জন্য কাকে কি প্রলোভন দেখাতে পারে?

অথচ স্বরাজ পাওয়ার পরও ভারতীয় তরুণ যদি আপন সংস্কৃতি চর্চা না করে, তবে সে এদেশে গড়ে তুলবে কি বস্তু? জলের বাঁধ, বিজলীর প্রসার, কারখানার ছয়লাপ করে করেই তো একটা জাত বেঁচে থাকতে পারে না। আত্মার ক্ষুধাও তো রয়েছে,—আজ না হয় পেটের ক্ষুধায় সেটাকে অস্বীকার কিম্বা অবহেলা করে যাচ্ছি।

অতএব আমি মনে করি, ভারতীয় সংস্কৃতি সহজবোধ্য করে তুলতে হবে।

অর্থাৎ তিব্বতী চীনা থেকে যে সব বই অনুবাদ করা হবে, সেগুলো যেন হিন্দী, বাঙ্গলা ইত্যাদি ভাষাতে সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করার ব্যবস্থা করা হয়। ইংরিজিতে অনুবাদ না করলেও ক্ষতি নেই—আজকের দিনের ছেলে-ছোকরারা যখন দাশগুপ্তের ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস ইংরিজিতে পড়ে না, কিম্বা পড়তে পারে না, তখন আর চীনা বইয়ের ইংরিজি অনুবাদ করে কি লাভ?

আমার মত পাঁচজন বুড়ো মাথা চাপড়ে হয়ত জিজ্ঞেস করবেন, 'আমাদের এ অবস্থা হল কেন? সংস্কৃত কি তবে এদেশ থেকে লোপ পেয়ে যাবে?' উত্তরে বলি, কালধর্ম।

১৪

এই খোলা মাঠের 'সিনেমা' বানাতে আমাদের এতদিন লাগল কেন? ইয়োরোপে ঠাণ্ডা, কুয়াশা, গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যা হতে হতে দশটা বেজে যায়—তাও ভালো করে অন্ধকার হয় না। সেখানে আকাশের তলায় সিনেমা বানানোর কথাই ওঠে না। আবার কাইরো শহরে বছরে আড়াই ইঞ্চি বৃষ্টি হয় কি না হয়, কুয়াশা সেখানে অজানা, আবহাওয়া না-গরম-না-ঠাণ্ডা, সেখানে তাই খোলা

সিনেমার খোলতাই। দিল্লী এ ছুটোর মধ্যিখানে, বরঞ্চ বলব কাইরোর গা ঘেঁষে, তবু খোলা সিনেমা খোলা হল মাত্র গত সপ্তাহে।

ব্যবস্থা কিন্তু উত্তমই হয়েছে। যে জায়গাটি বেছে নেওয়া হয়েছে, সেটিও পুরানা দিল্লী আর নয়াদিল্লীর মাঝখানে—ফিরোজ শাহ কোটলার পিঠে পিঠ লাগিয়ে। সিনেমার পর্দাখানা বানানো হয়েছে মামুলী পর্দার ডবল সাইজে—বেশ শক্ত করে বাঁধা হয়েছে, যাতে করে হাওয়ায় না দোলে, তবে চতুর্দিকে কালো বর্ডার লাগানো হয়নি বলে চোখ অস্বস্তি অস্বস্তি বোধ করে।

বিরাট ব্যবস্থা, তাই টিকিটের জন্য মারামারি কাটাকাটি করতে হয় না। ভিতরে গিয়ে যে কোনো এক কোণে আপন আসন বেছে নিয়ে দিব্য বায়স্কোপ দেখা যায়, কেউ এসে ধাক্কা লাগায় না, মশাই আমার সীটে বসেছেন যে মাইরি, সিগারেটের ধুঁয়োর উৎপাত নেই, মোলায়েম ঠাণ্ডায় অনায়াসে দু'দণ্ড ঘুমিয়ে নেওয়া যায়।

এখনো অবশ্য তাবৎ ব্যবস্থা কাইরোর মত সর্বাঙ্গসুন্দর হয়নি। সেখানে ভালো টিকিট কাটলে একখানি ছোট টেবিল পাওয়া যায়, পছন্দমত কটলিস-সসেজ, কবাব-কোপ্তা খেয়ে খেয়ে ইয়ার-বক্সীদের সঙ্গে গুষ্টিসুখ অনুভব করতে করতে বায়স্কোপ দেখা যায়।

হবে, হবে, সেও হবে।

এক নরওয়েবাসী তার বন্ধুকে বললে, 'এই গরমিকালে আফ্রিকায় বেড়াতে যাচ্ছি।'

বন্ধু তাজ্জব মেনে বলেন, 'গরমিকালটাই বাছলে! সেখানে যে ও সময়ে 'শেড-টেম্পারেচার' ১১২ ডিগ্রী।'

প্রথম বন্ধু ভুরু কুঁচকে বললে, 'তা আমাকে ছায়ায় বসতে বাধ্য করবে কে?'

'ওপন্ এ্যার সিনেমা'তেও তাই। টিকিটের দাম যখন কুল্লে এক টাকা, তখন ছবি ভালো'না লাগলে সেখানে আপনাকে বসতে বাধ্য করবে কে?'

বিশ্বাস করবেন না এই ক'দিনে ন'খানা ছবি দেখেছি। বাঙ্গলায় যাকে বলেন গোগ্রাসে গোস্ত গিলেছি। এখনো ঢেকুর উঠছে।

দু'একখানার পরিচয় ইতিমধ্যেই 'আনন্দবাজার' এবং 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে' নিবেদন করেছি। যেগুলো দেখেছি তার মধ্যে 'মিরাক্‌ল্ ইন্ মিলান' সব চেয়ে উত্তম, আর যেসব ছবি দেখার সুযোগ হয়নি, তার মধ্যে গুণীদের মতে, 'বাই-সাইক্‌ল্ থিফ' 'ইউকিওয়ারিসু' নাকি একেবারে রঙের টেক্কা।

*　　*　　*

মিশরী ছবি ছিল 'ইব্‌ন্‌ উন্‌-নীল' (অর্থাৎ নীলনদসন্তান)। এ ছবি দেখে সত্যি মনে হয়, একদম ভারতীয় ছবি, শুধু 'তারকারা' কুর্তা-পাজামা, ধুতি-পাঞ্জাবি না পরে আলখাল্লা আর জাব্বাজোব্বা পরেছে। নায়িকা ভিরমি গিয়েছেন, তাঁর মাথা রেল লাইনের উপরে পড়ে আছে, দূর থেকে পাঞ্জাব মেল (থুড়ি, আলেক-জেণ্ড্রিয়া মেল) গুম গুম করে ছুটে আসছে, নায়ক তার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন—এই গেল এই গেল অবস্থায় শেষ মুহূর্তে নায়িকার উদ্ধার।

ফারাক এইটুকু, বাঙলা ছবিতে তখন ডুয়েট গান আরম্ভ হয়ে যায়, 'কেন গো বাঁচালে মোরে—নিঠুর বঁধুয়া', এখানে তা হয়নি। (চীনা ছবি 'হোয়াইট হেয়ার্ড গার্ল' কিন্তু গান বাবদে বাঙলা ছবিকেও ছক্কা-পাঞ্জা-বোম্‌ দিতে পারে)।

'নীলনদসন্তান' নিরেস ছবি বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। এ ছবি উন্নাসিকের (অর্থাৎ আপনার আমার) জন্য বানানো হয়নি। সদর এবং মহকুমা সহরে এ ছবি বিস্তর কদর পাবে। তাই আমি 'হণ্টরওয়ালী', 'মিস্‌ ফ্রণ্টিয়ার মেল', 'ডাকু কী দিলরুয়া', 'জাম্বু কা বেটা'র নিন্দেও কস্মিনকালে করিনি।

'বুদ্ধের জীবনী' জাপানী ছবি। অতি নবীন কায়দায় কার্টুন দিয়ে সিলুয়েট্‌ দিয়ে ছবিখানা তৈরী। তাও আবার স্টিলিসাইজড,—তাই ভারতীয় নারকোল অশথ গাছ ঠিক ওৎরালো কিনা, তাই নিয়ে কোনো শিরঃপীড়া হয় না। সঙ্গীত অত্যুত্তম, সব কিছু নিয়ে ছবিখানা সত্যই উপাদেয়।

*　　*　　*

বুদ্ধের জীবনের সব চেয়ে যে জিনিস চীনা জাপানীদের আকৃষ্ট করে, সে হচ্ছে 'মারের বিভীষিকা এবং প্রলোভন !' চীন দেশের গুহাতে বুদ্ধ-জীবনীর এ অধ্যায়টি বিস্তর রং ফলিয়ে বহু প্রকারে আঁকা হয়েছে। জাপানী 'বুদ্ধের জীবনী' ছবিতেও দর্শক 'মারপর্ব' অনেকক্ষণ ধরে দেখতে পাবেন।' সেখানে নাচগানও চমৎকার।

আমাদের বিশ্বাস কার্টুনে ছবি বানালে ডিস্‌নিকে নকল না করে উপায় নেই। ফরাসী ছবি 'সাহসী জন' দেখে সে বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। যেখানেই 'চিত্রকার' নূতন কিছু করতে গিয়েছেন, সেখানেই তিনি মার খেয়েছেন বেধড়ক, আর যেখানে ডিস্‌নিকে নকল করেছেন, সেখানে তিনি পানসে—নকল করলে যা হয়।

'বুদ্ধের জীবনী' ডিস্‌নিকে নকল না করে সার্থক সৃষ্টি।

'মিসেস ডেরি' সম্বন্ধে 'হিন্দুস্থানে' আলোচনা করেছি। ভাষা এবং তার চতুর্দিকে গড়ে ওঠা বৈদগ্ধ্য যে জোর করে কোনো জাতের ঘাড়ে চাপানো যায় না, তার অত্যুত্তম প্রমাণ পাওয়া যায় 'মিস ডেরিতে'। গান, অভিনয়, সব কিছুই এ ছবিতে ভালো হয়েছে।

* * *

আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছে 'মিরাকল ইন মিলান'। অলৌকিক ঘটনা নিয়ে যে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ এ ছবিতে করা হয়েছে, সেটি ধরা পড়ে শেষমুহূর্তে। এ ছবি দেখলে 'বিরিঞ্চি বাবাদের' প্রতি ভক্তি একটুখানি কমতে পারে।

* * *

জনৈক লেখক এক খ্যাতনামা কাগজে রবীন্দ্রনাথ যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি, ঔপন্যাসিক এবং দার্শনিক সে কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। লেখক স্বীকার করেছেন, তিনি বাঙলায় রবীন্দ্রনাথ পড়েননি।

বিভারলি নিকল্‌স্‌ও এই ধরনের বই লিখেছিল। মিস মেয়োর কথা আর বললুম না, কারণ দু-একজনকে বলতে শুনেছি, মেয়োর উদ্দেশ্য হয়ত খারাপ ছিল না কিন্তু রবীন্দ্র-সমালোচকটার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁদের মনে প্রচুর সন্দেহ রয়ে গিয়েছে।

নিক্‌ল্‌সের বই যখন হুশ হুশ করে বিক্রী হচ্ছে তখন খ্যাতনামা প্রকাশক আমাকে বইখানার উত্তর লিখতে অনুরোধ করেন। বেশ দু পয়সা যে পাবো সে লোভটাও দেখালেন।

আমি উত্তরে সবিনয়ে বললুম, 'মনে করুন এক হটেনটট লণ্ডনে তিন মাস থাকার পর যদি সেক্সপীয়র, রাফায়েল, এঞ্জেলো, বেটোফন, পাভলোভাকে কটুকাটব্য করে বই লেখে তবে কি কোনো সুস্থ ইয়োরোপীয় তার উত্তর লিখবে?'

প্রশ্ন হচ্ছে নিকল্‌স্‌ এবং আমাদের রবীন্দ্র-সমালোচক এ ধরনের বই বা প্রবন্ধ লেখে কেন?

এরা চায় পয়সা, কিন্তু জানে ভারতবর্ষ তথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রামাণিক রচনা লেখবার মত মুরদ এদের নেই। ওদের বই কেউ কিনবে না। কিন্তু যদি গালা-গাল দিয়ে লেখে তবে বহু লোক সে সব বইয়ের তীব্র প্রতিবাদ করবে, ফলে হট্ট-গোলের সৃষ্টি হবে এবং সেই ডামাডোলে বিস্তর বই বিক্রী হবে। অশ্লীল বইও এই পদ্ধতিতে বাজারে কাটে।

অতএব আমাদের উচিত কি?

চুপ করে থাকা।

তবে আমি আলোচনাটা উত্থাপন করলুম কেন? তার কারণ বহু সরল পাঠক এই ছুঁচোমিটা না ধরতে পেরে হট্টগোলের সৃষ্টি করে বই বিক্রীর সহায়তা করেন। আমার বক্তব্য, সবাই যেন এ বাবদে একদম 'নিশ্চুপ' 'ডেড্ সাইলিণ্ট' পন্থা অবলম্বন করেন। আলোচনা উত্থাপিত হলেই নাক সিঁটকে বলবেন, 'মাপ করবেন, স্যার, এ বিষয়ে আমার কণামাত্র উৎসাহ নেই।' বলেই অন্য কথা পাড়বেন। বলবেন, 'দেখো দিকিনি, রায় পিথৌরা কি চমৎকার লেখে' কিম্বা উল্টোটা। যাই করুন না কেন, রায় পিথৌরার তাতে করে দু পয়সা আমদানী বাড়বে না।

* * *

ইংরেজ বড় হুঁশিয়ার জাত। তারা এই পদ্ধতিতে ভালো বইও খুন করতে জানে।

লায়োনেল ফীলডেন নামক এক ব্যক্তি এদেশে কয়েক বৎসর 'অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর' বড় কর্তা ছিলেন। এদেশে ইংরেজের কীর্তিকারখানা দেখে ভদ্রলোক বিলেত গিয়ে সে সম্বন্ধে একখানা চটি বই লেখেন—একদা ডিগবি যে রকম "প্রসপারাস" ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া লিখেছিলেন।

ইংরেজ বইখানা সম্বন্ধে এমনি ঠোঁট সেলাই করলে যে বইখানা অতি অল্প লোকই পড়েছেন।

ঋষিরা তাই বলেছেন, নীরবতা হিরণ্ময়, 'সাইলিন্স্ ইজ গোল্ডেন!'

* *

দিল্লীর উপর দিয়ে বড় গর্দিশ গেল। বিস্তর ফিল্ম দেখানো হল, 'তারকাদের' মিছিল হল, হাইফেৎস্ বেয়ালা বাজালেন, পণ্ডিতজী 'নেশনাল ট্রেজার্স ফাণ্ড' খুললেন, সবচেয়ে বড় পোলো ফাইনাল হল, এলেনর রুজভেল্ট এলেন, তার উপর গোটা তিনেক চিত্র-প্রদর্শনী! মানুষ ক'দিক সামলায়? সব সামলাতে গেলে রায় পিথৌরার কুইনটুপ্লেটের প্রয়োজন।

বাসু ঠাকুর যে বাড়ির খুশ-নাম ষোল আনা রাখতে পেরেছেন তা নয়। অবশ্য তিনি অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, দুজনার কাছ থেকে যা শিখেছেন তার অনেকখানি কাজে লাগাতে পেরেছেন।

বাসু ঠাকুরের ছবিতে প্রচেষ্টা আছে। ভদ্রলোক অনেক কিছু দেখেছেন এবং ভেবেছেন তার চেয়েও বেশী। তুলির জোর তো আছেই, তার চেয়েও বেশী মূর্তি গড়ার হাত। বাসু ঠাকুরের সৃষ্টি তাই যে শুধু আনন্দ দেয় তা নয়, ছবিগুলোর সামনে অনেকক্ষণ ধরে অনেক কিছু ভাবা যায়। প্রদর্শনী বহুদিন ধরে

খোলা থাকবে।

* * *

ক্রিকেট ম্যাচে যখন পাশের বে-রসিক নানারকম উদ্ভট প্রশ্ন শুধায় তখন উদ্ভট উত্তরও পায়।

"ওগুলো কি?"

বিরক্তির সঙ্গে, "উইকেট।"

"ওগুলো দিয়ে কি হয়?"

ততোধিক বিরক্তির সঙ্গে, "ক্লান্ত হলে খেলোয়াড়দের বসবার জন্য।"

পোলো খেলা দেখতে গিয়ে আমার সেই অবস্থা; 'চক্কর' কি, 'হাফ গোল' কারে কয়, ফাউল কখন হয় আর কখন হয় না, তাই বোঝবার পূর্বে খেলা শেষ হয়ে গেল।

তবু, আহা, দেখবার জিনিস! এক গোল থেকে আরেক গোল অবধি (ফুট-বল তিন সাইজ) ঘোড়াগুলো যা ছুট দেখালে তার জন্যই ও খেলা দেখার প্রয়োজন। রাজা-রাজড়াদের গদি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ-খেলাও ঝিমিয়ে আসছে। মরে গিয়ে ঠাণ্ডা হওয়ার পূর্বে এক দফা দেখে নেবেন।

১৫

খৃষ্টের ছ'শ বছর আগে বৈশালীতে গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। বলা হয়, বুদ্ধদেব এই বৈশালী রাজ্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হন এবং আপন সঙ্ঘ নির্মাণের সময় তার অনেকখানি অনুকরণ করেন। এই বৈশালীতেই মহাবীর জীনের জন্ম।

বৈশালীর স্মরণে এখনো সেখানে প্রতি বৎসর উৎসব হয়। এবারকার উৎসবে শ্রীযুত কানহাইয়ালাল মুন্সী সভাপতিত্ব করেন।

শ্রীযুত মুন্সী বলেন, আমরা যদি ভারতের ভিতর দিয়ে বিশ্ব-ঐক্য এবং বিশ্ব-ঐক্যের ভিতর দিয়ে ভারতকে অখণ্ড রূপে চেনার চৈতন্য না জাগিয়ে তুলতে পারি তবে আমাদের স্বাধীনতা লোপ পাবে, স্বাধীনতা গেলে আমাদের আত্মার মৃত্যু হবে, আত্মার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের 'মহতী বিনষ্টি'।

এ উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে কারো মনে কোনো প্রকারের সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন, ভারতীয় কিম্বা বিশ্ব-ঐক্যের সাধনার সঙ্গে প্রাদেশিক বৈদগ্ধ্যের সংঘাত আছে কি নেই? আমরা যখন বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যের চর্চা করি, আমি যখন বৃদ্ধ বয়সে উত্তমরূপে হিন্দী শিখতে এবং লিখতে নারাজ তখন আমাকে বাঙালী কূপমণ্ডুক এবং ভারতীয় ঐক্যের পয়লা নম্বরের দুশমন বলা হবে কি না?

বাঙলার তরুণ সম্প্রদায় যদি আজ আদাজল খেয়ে (আর অন্য বস্তু আছেই বা কি যে খাবে ?) হিন্দী চর্চায় বসে যায়, বাঙলা বর্জন করে হিন্দীতে উত্তম উত্তম কাব্য, কথাসাহিত্য রচনা করে তামাম ভারতকে ভেল্কিবাজি দেখিয়ে দেয় প্রবীণ হয়েও সুনীতি চট্টো নাকি দেখাতে পেরেছেন—তা হলে আমার কণামাত্র —আপত্তি নেই (যদিও একথা বলবো যে কেউ যদি হিন্দী শিখে কোনো ভালো বই বাঙলায় অনুবাদ করে তবে আমি খুশী হই বেশী) কিন্তু দয়া করে আমার মত প্রবীণদের আর এ গর্দিশে ফেলবেন না।

একটা গল্প মনে পড়ে গেল।

গৃহিণী শুনে স্তম্ভিত যে বড়বাবুকে মাসের কুড়ি তারিখে হাওলাত দেয় তাঁরই আপিসের এক বেনে কেরানী। বড়বাবুর মাইনে সাতশ', আর কেরানীর ত্রিশ। গৃহিণী চেপে ধরলেন, তাঁকে গিয়ে দেখে আসতে হবে সে কি করে বাড়ি চালায়। কর্তা বহুবার গাঁইগুঁই করে শেষটায় না পেরে গেলেন একদিন সন্ধ্যের পর তারাপদর বাড়িতে।

বাড়ি অন্ধকার। ডাকাডাকিতে আলো জ্বলল। তারাপদ নেবে এল হাতে পিদিম পরনে এই টুকুন্ গামছা। বড়বাবুকে ছেঁড়া চ্যাটাইয়ে বসিয়ে শুধাল, 'কোনো লেখা-পড়ার কর্ম আছে কি ?'

'না। কেন ?'

'তা হলে পিদিমটা নিবিয়ে ফেলতে পারি আর গামছাখানা খুলে রাখতে পারি।'

বড়বাবু যা দেখবার জন্য এসেছিলেন তা দেখা হয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। পাড়ার মুখে পৌঁছতে না পৌঁছতেই চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'গিন্নি, শিখে এসেছি, শিখে এসেছি কিন্তু আমা দ্বারা হবে না।'

বড়বাবুর মত আমারও জানা হয়ে গিয়েছে, হিন্দী শিখলে আমার বহুৎ ফায়দা হবে, কিন্তু ঐ যে বড়বাবু বললেন, 'আমা দ্বারা হবে না' সেই মোক্ষম কথা!

উর্দুতেও এই মর্মে একটি উত্তম কবিতা আছে। মোমিন নামক কবিকে বলা হয়েছিল, 'আর কেন ? সমস্ত জীবন তো কাটালে পাপ কর্ম করে করে ; এইবার একটু ধর্মে মন দাও!'

মোমিন বললেন,

"উম্র সারী তো কটী ইশ্‌কে বুতাঁ মে
মুমিন !
আখরী ওক্তমে ক্যা খাক্ মুসলমাঁ
হোঙগে ?"

"সমস্ত জীবন তো কাটলো প্রেম-প্রতিমাদের
মহব্বতে, রে মুমিন,
এখন এই আখেরি সময়ে কি ছাই
মুসলমান হব।"

তাই হিন্দী-উর্দু মাথায় থাকুন। যেটুকু টুটিফুটি শেখা আছে সেই 'করেঙ্গা', 'খায়েঙ্গা', 'হাই', 'হুই' করে জীবনের বাকি কটা দিন 'প্রেমসে' চালিয়ে নেব।

কিন্তু যদি বলি, বাঙলার চর্চা যে আমি আমার কট্টর বাঙালীত্বর জন্য করছি তা নয়—বাঙলার সেবার ভিতর দিয়েই আমি ভারতীয় ঐক্যের সেবা করছি; তাহলে হিন্দীপ্রেমী বাঙালীরা হয়তো আমাকে তাড়া লাগাবেন। তবু সেইটেই হক্ কথা, সেইখানেই খাঁটি জাতীয়তাবাদ।

আমাকে বিশ্বনাগরিক হতে হলে তো আর বিশ্বসংসারের ভাষা শিখতে হয় না, কিম্বা এসপেরাণ্টোও কপচাতে হয় না। আমি মালাবারের ভাষা জানিনে তবু মালাবারের লোককে আমার বড় ভালো লাগে। আমি কিঞ্চিৎ ইংরিজি জানি এবং তার অনুপাতে ইংরেজকে অপছন্দ করি অনেক বেশী।

অতএব ভারতকে ভালবাসা যায় হিন্দী না শিখেও। রোমাঁ রোলাঁ হিন্দী জানতেন না তবু তিনি ভারতবর্ষকে চিনতেন ও ভালবাসতেন অনেক দুবেজী পাঁড়েজীর চেয়ে ঢের ঢের বেশী।

সুইটজারল্যাণ্ডের নিজস্ব 'সুইস' বলে কোনো ভাষা নেই। সুইসরা ফরাসী, জর্মন, ইতালীয় ও রোমানি ভাষায় কথা কয়। এবং শতকরা নব্বুইজন একাধিক ভাষা বলতে পারে না। ফরাসী-সুইটজারল্যাণ্ডে অতি অল্প লোকই জর্মন জানে, ইতালীয়-সুইটজারল্যাণ্ডেও তাই। অথচ এই চার ভাষায় গড়ে ওঠা সুইটজারল্যাণ্ড একতায় জর্মনি ইতালীকে অনায়াসে হার মানাতে পারে।

আরবদেশের ভাষা আরবী, ধর্ম ইসলাম, জাতে তারা সেমিটি। আরব মাত্রেরই এই তিন-তিনটে ঐক্যসূত্র আছে—পৃথিবীতে এরকম উদাহরণ বিরল। তবু দেখুন তারা ক'টা রাষ্ট্রে বিভক্ত—তাদের ভিতর রেষারেষি কি রকম মারাত্মক! সউদী আরব, ইয়েমেন, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, জর্ডন, মিশর, কুওয়াইত, বাহরেন। আলজিরিয়া, তুনিসিয়া, মরক্কোর কথা আর তুললুম না—সেখানে মুব-রক্ত কি মেকদারে আছে জানিনে। তাই যখন করাচী 'বিশ্ব-মুসলিম সঙ্ঘ' গড়ার খেয়ালি-পোলাও খায় তখন হাসি পায়। আরবদের এতগুলো ঐক্যসূত্র থাকতেও তারা সম্মিলিত হতে পারছে না, তার উপর তুর্ক, ইরানী, পাকিস্তানী, জাভার মুসলমানকে ডেকে এনে একতা স্থাপন করা!

আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, যে ভারতীয় বৈদগ্ধ্য ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে তার বুনিয়াদ প্রদেশে প্রদেশে। প্রত্যেক প্রদেশ আপন নিজস্ব ভাষা এবং সাহিত্য, আপন জনপদসুলভ আচার-ব্যবহার চারুশিল্প, আপন প্রদেশপ্রসূত ধর্ম এবং সম্প্রদায় এসব তাবৎ বস্তুর চর্চা করে যে ফললাভ করবে তারই উপর একদিন দাঁড়াবে বিরাট কলেবর, বৈচিত্র্যসুশোভিত, সর্বজনগ্রাহ্য ভারতীয় বৈদগ্ধ্য।

আমার এক কাষ্ঠরসিক বাঙালী বন্ধু এই দেহলি-প্রান্তেই বিনিদ্রযামিনী যাপন করছেন হিন্দী চর্চায়—ইনি সেই ব্যক্তি যিনি কাবলীওয়ালাদের সঙ্গে দোস্তী জমান।

তিনি বিস্তর হিন্দী পড়েছেন। ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করেছেন, হিন্দীর পুল্লিঙ-স্ত্রীলিঙ্ তাঁকে কণামাত্র বেকাবু করতে পারে না, হিন্দীর 'ফাউলার' শ্রীবর্মার "অচ্ছী হিন্দী" তাঁর নখাগ্র-দর্পণে।

তিনি বলেন—আমি বলছিনে, কারণ আমার শাস্ত্রাধিকার নেই—হিন্দী ভাষা বাঙলার তুলনায় এখনও এত কাঁচা এত 'লিক্উয়িড্' যে, এ ভাষাতে যে কোনো উত্তর ভারতীয় অনায়াসে উত্তম হিন্দী লিখতে পারবে। তিনি বিশ্বাস করেন, ভালো বাঙলা লিখতে হলে যে মেহন্নত যে খাটুনির প্রয়োজন তার অর্ধেক পরিশ্রমে অত্যুত্তম হিন্দী লেখা যায়।

তাই তিনি বলেন, বাঙালীর তো সব আছে। এখন তার একমাত্র পন্থা, হিন্দী মার্কেট ক্যাপচার করা—সুহৃদ ব্যবসায়ী তাই হামেশাই কারবারী ইডিয়াম ব্যবহার করেন—অর্থাৎ 'অচ্ছী হিন্দী' শিখে, রবীন্দ্রনাথ শরচ্চন্দ্রের কাছ থেকে নেওয়া শৈলী এবং ভাষা হিন্দীর উপর চালিয়ে দিয়ে হিন্দী সাহিত্যে রাজত্ব করা।

হয়ত হক্ কথাই কয়েছেন কিন্তু আমার মন সাড়া দেয় না।

প্রথমতঃ এই প্রস্তাবে কেমন যেন একটা উৎকট প্রাদেশিকতা রয়ে গিয়েছে, কেমন যেন একটা 'একদা যাহার বিজয়-সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়' গোছ ইম্পিরিয়ালিজম রয়েছে এবং বাংলা সাহিত্যই বা এমন কোন্ গৌরীশঙ্করের চূড়োয় পৌঁছে গিয়েছে যে তার সেবকদের হিন্দী জয় করবার জন্য ছুটি দিতে পারি?

১৬

এককালে এদেশে বিস্তর ফার্সী চর্চা হত। সরকার, মুন্সী, বখশী, কানুনগো, এসব যাঁদের পদবী তাঁদের বাপ-পিতেমো উমদাসে উমদা ফার্সী শিখে এককালে মোগল রাজত্ব চালিয়েছেন। সরকার তো চীফ সেক্রেটারী, বখশী মানে চীফ পে মাস্টার অর্থাৎ একাউণ্টেণ্ট জেনারেল! বাপস্—এসব আপিসারদের সঙ্গে

দেখা হওয়া মানে তো বাঘের সামনে দাঁড়ানো। কান দিয়ে ধুয়ো বেরতে থাকে। আর ওনরা রেগে গেলে তো হাড্ডি বিলকুল পিলপিলিয়ে যায়।

যাক্ মোদ্দা কথায় ফিরে আসি। এই সব বখশী-মুন্সীরা কিন্তু আজকের দিনের সেক্রেটারী একাউণ্টেণ্টের মত ছিলেন না—অর্থাৎ ফার্সী সাহিত্যেরও চর্চা করতেন, 'মুশায়েরায়' (কবি-সম্মেলনে) কবিতা পড়তেন, 'বয়ৎবাজী'তে (কবির লড়াই) মাথায় গামছা বেঁধে নেমে যেতেন।

স্বর্গত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এই ঐতিহ্যের ভিতর আপন কবিত্বপ্রতিভার বিকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আসল দরদ ছিল বাঙলা সাহিত্যের প্রতি। তাই তিনি হাফিজ সাদীর উত্তম উত্তম কবিতা অতি সরল বাঙলায় অনুবাদ করেন। এ কবিতাগুলো পড়ে হিন্দুরাই যে শুধু 'গুলিস্তানে'র গুলের খুশবো আর বুলবুলের মিঠি বোলী শুনতে পেতেন তাই নয়, উনবিংশ শতকের শেষের দিকের বাঙালী মুসলমান যখন বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের জোর চর্চা আরম্ভ করলেন, তখন তাঁরা কৃষ্ণচন্দ্রের 'সদ্ভাবশতক' অতিশয় ভক্তি ও ভালবাসার সঙ্গে মুখস্থ করলেন। আমার বাল্য বয়সে আমি বৃদ্ধদের (হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীরই) গদগদ হয়ে আবৃত্তি করতে শুনেছি—

নেত্র নাই বাঞ্ছা হেরি বিধুর বদন
কর্ণ নাই চাই শুনি ভ্রমর গুঞ্জন।

এবং সর্বশেষে

প্রেম নাই প্রিয়লাভ আশা করি মনে
হাফেজের মত ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে ?

কিন্তু এসব গাজন আজ কেন ?

গেল সপ্তায় বারোটি ইরানী দিল্লী এসেছিলেন ; তার মধ্যে আটজন ছাত্র, দুজন শিক্ষক। এঁরা এসেছেন পশুচিকিৎসার শিক্ষাদান এবং গবেষণা দেখতে। এঁদের ভেতর দেড়জন জানেন ইংরিজী আর একজন ফরাসী।

কাজেই ফরেন-আপিসের দাওয়াতে গিয়ে দেখি ছেলেরা নিজেদের ভিতর গুজুর গুজুর করছে। কী আর করি—আমার মুরুব্বী ফার্সীর বাঘা মৌলবী স্বর্গত জয়রাম মুন্সীর নাম স্মরণ করে চালালুম 'হাস্ত' 'হুস্ত'। ফার্সী ভাষাটা কঠিন নয় আর ইরানীরা ভদ্রতায় লক্ষ্ণৌ কিম্বা চীন দেশীয়কে হার মানাতে পারে। সুতরাং তাঁরা আমার ফার্সী শুনে মার তো লাগালেনই না বরঞ্চ উৎসাহের সঙ্গে গাল-গল্প জুড়ে দিলেন।

মুরুব্বী জয়রাম মুন্সী সদ্ভাবশতক পড়ে পড়ে আমাকে তার মূল কি, কোন

কবি সেটি রচনা করেছেন এসব হদীস দিতেন—গুলস্তান বোস্তান তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। কিন্তু হায়, আমাকে 'শেষ-শিক্ষা' দেবার পূর্বেই খুদাতালার আপন গুলস্তানে তাঁর নিমন্ত্রণ এসে গেল, এখানকার পাট তুলে দিয়ে সেখানে গজলকসীদা গাইবার জন্য।

আমি সে রাতের খানাতে কৃষ্ণচন্দ্রের বাঙলা অনুবাদের টুটিফুটি ফার্সী অনুবাদ করতে লাগলুম, আর ছেলেরা টক্ টক্ করে তার মূল ফার্সী বলে যেতে লাগল। আমার ভারী আনন্দ হল যে, পশুচিকিৎসা যাদের পেশা তারা যে এতখানি সাহিত্যচর্চাও করে!

আর তারা খুশী যে, ভারতের শেষ প্রান্ত বাঙলা দেশের লোক তার আপন ভাষায় হাফীজ সাদী গেয়েছে দেখে।

* * *

বাঙালীদের কাছে আমার একটি নিবেদন আছে।

সুভাষচন্দ্র বসু বার্লিনে যে বাড়িতে বাস করতেন সে বাড়িটির প্রতি বাঙালী মাত্রের কিঞ্চিৎ দরদ থাকা দরকার। অনেক ভারতীয়েরও আছে, একথা আমি নিশ্চয় জানি। বিশেষতঃ ৪৬-৪৭ সনে দাক্ষিণাত্যে তাঁর যে কি প্রতিপত্তি ছিল তাও আমি দেখেছি।

কেন্দ্রীয় সরকার কি এ বাড়িটি কিনে নিতে পারেন না? বার্লিনে আমাদের যে রাজদূতাবাস বসবে তাঁরা ভাড়াটে বাড়িতে থাকবেন এবং সস্তায় থাকতে হলে আখেরে ভারতীয় সরকারকে বার্লিনে বাড়ি কিনতে হবে। কাজেই এই বাড়িটি কিনলে ভারতীয় সরকার কিছু অপকর্ম করবেন না।

আর যদি ভারতীয় সরকার এ বাড়িটি কিনতে রাজী না হন, তবে বাঙালী কি এ বাড়িটি কিনতে পারে না? তুমি আমি গরীব সে আমি জানি, কিন্তু সবাই মিলে যদি একটা চেষ্টা দেওয়া যায়, তবে কি কর্মটা একেবারেই অসম্ভব?

এ নিয়ে একটা ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত।

আমরা বাড়িটি সম্বন্ধে অন্য সব খবরের তত্ত্বতাবাস করছি। ইতোমধ্যে কিন্তু আন্দোলনটা আরম্ভ করে দেওয়া উচিত।

* * *

শ্রীমতী রজোভেল্ট আমেরিকা ফিরে গিয়ে বলেছেন, ভারতীয়রা আধ্যাত্মিক এবং তারা সেই আধ্যাত্মিকতা পেয়েছে তাদের ধর্ম থেকে।

এ তো বাঙলা কথা। আধ্যাত্মিকতা আসে তো ধর্ম থেকেই—এতে আর নূতন কি বলা হল?

উঁহু। ইংরিজীতে কথাটা অন্যরকম শোনায়। শ্রীমতী বলেছেন, ভারতীয়রা

স্পিরিচুয়াল এবং তাদের স্পিরিচুয়ালিটি এসেছে তাদের রিলিজিয়ান থেকে।

অর্থাৎ স্পিরিচুয়ালিটি এবং রিলিজিয়ান সচরাচর এক জিনিস নহে। ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় বহু লোক স্পিরিট (আত্মার) সাধনা করে, কিন্তু অনেকে রিলিজিয়ান জানে না।

তাই সপ্রমাণ হল রিলিজিয়ান এবং ধর্ম এক জিনিস নহে। এবং সেই কারণেই 'হিন্দু ধর্ম' বলে কোনো জিনিস থাকতে পারে না। ধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি তার অর্থ সনাতন ধর্ম। এ ধর্মের আগে 'হিন্দু' শব্দ লাগানো যায় না। ঠিক যে রকম 'হিন্দু ভগবান' 'মুসলমান ভগবান' কিম্বা 'খৃষ্টান ভগবান' হতে পারেন না ঠিক তেমনি 'হিন্দু ধর্ম' আমার কানে অদ্ভুত শোনায়।

শুধু হিন্দুরাই নয়, বৌদ্ধরাও যখন ত্রিশরণ মন্ত্রে 'ধর্মাং শরণং গচ্ছামি' বলেন তখন তো 'ধর্মের' পূর্বে বৌদ্ধ শব্দ লাগান না। কুরাণে ধর্ম শব্দের জন্য পাই 'দীন' কিম্বা 'দীনুল্লা' অর্থাৎ যে 'দীন আল্লার দিকে নিয়ে যায়'। অন্য শব্দ 'ইসলাম'। 'ইসলাম' শব্দের ধাতু, 'ভগবানের ইচ্ছার সম্মুখে নিজেকে আত্মসমর্পণ করা।'

তাই ধর্ম শব্দের আগে 'হিন্দু' কিম্বা 'মুসলমান' শব্দের প্রয়োগ আমি বুঝে উঠতে পারিনে। ধর্ম সর্বমানবের জন্য,—তার আবার হিন্দু-মুসলমান কী ?

গত বৎসর এই সময়ে রমণ মহর্ষি দেহত্যাগ করেন। 'ইসলাম' শব্দের স্মরণে মহর্ষির কথা মনে পড়ল।

দাক্ষিণাত্যের তিরু-আন্নামলাই গ্রামে রমণাশ্রমে কয়েক মাস থাকার সৌভাগ্য আমার জীবনে একবার হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ সচরাচর কাউকে দর্শন দিতেন না আর রমণ মহর্ষিকে উদয়াস্ত একই ঘরে পাওয়া যেত। নানা লোক নানা প্রশ্ন করত, মহর্ষি উত্তর দিতেন। অবশ্য রেসে কোন্ ঘোড়া জিতবে জিজ্ঞেস করলে চুপ করে থাকতেন, এমন কি ভগবান কেন সংসারটা তৈরী করলেন, তার উত্তরও দিতেন না। বড্ড বেশী খোঁচাখুঁচি করলে বলতেন, 'তোমার তা জেনে কি দরকার।'

একদিন আরেকটুখানি বাড়িয়ে উত্তর দিলেন। বললেন, 'তুমি যে প্রশ্নটা করলে সেটার উত্তর আমি যদি দি, তবে সে উত্তর তুমি বুঝবে কি দিয়ে ? অবশ্য তোমার মন দিয়ে। এখন তবে প্রশ্ন, তুমি তোমার মনটাকে বুঝতে পেরেছ কি ? যে ফিতেটা দিয়ে তুমি জমি মাপতে যাচ্ছো তারই যদি দৈর্ঘ্য না জানো, তবে মেপে লাভটা কি ? তাই সকলের পয়লা মনটাকে চিনতে হয়।'

একদিন দেখি জনাচারেক বয়স্ক তামিল মুসলমান মহর্ষিকে প্রণাম করে সামনের মেঝেতে বসল। দেখে মনে হল চাষাভূষা শ্রেণীর কিম্বা কোচম্যান হাণ্ডি-ম্যানও হতে পারে।

অনেকক্ষণ মহর্ষির দিকে তাকিয়ে থেকে শেষটায় একজন অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে তামিল ভাষায় বলল, 'আমরা আপনাকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বিরক্ত করতে চাইনে বলে বাড়ি থেকেই সবাই মিলে একটিমাত্র প্রশ্ন ঠিক করে নিয়ে এসেছি। আপনি যদি উত্তর নাও দেন, তাতেও আমাদের আক্ষেপ নেই, কারণ আপনার দর্শন আমরা পেয়েছি সেই যথেষ্ট।'

শিশুর মত মহর্ষি সরল হাসি হাসলেন। বললেন, 'বলো।'

প্রবীণটি বললে, 'মানুষের জীবনে সবচেয়ে কাম্য ধন কি?'

তৎক্ষণাৎ মহর্ষি উত্তর দিলেন, 'ইসলাম।'

চারজনই অনেকক্ষণ ধরে মহর্ষির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর প্রণাম করে সন্তুষ্ট চিত্তে বেরিয়ে গেল।

আমি জানি, মহর্ষি কোন্ অর্থে ইসলাম বলেছিলেন। এ চারজন বাড়ি ঘরে গিয়ে নিশ্চয়ই 'ইসলাম' শব্দের তত্ত্বানুসন্ধান করবে এবং আল্লার কৃপা থাকলে সত্য ধর্মে পৌঁছবে।

১৭

ভারতীয় পার্লামেণ্টের বাঙালী সদস্যগণকে নয়াদিল্লীর কালীবাড়ি গত শুক্রবার সন্ধ্যায় এক বিশেষ সভায় আমন্ত্রণ করে অভিনন্দিত করেন। উল্লেখ প্রয়োজন নিমন্ত্রিত বাঙালীগণ সকলেই বঙ্গবাসী নন, এঁদের কেউ কেউ বাঙলাদেশের বাইরে থেকে নির্বাচিত হয়ে পার্লামেণ্টে আসন পেয়েছেন। তা ছাড়া বাঙলা ভাষাভাষী উড়িয়া বিহারী আসামী সভ্যদেরও আমন্ত্রণ করা হয়েছিল এবং তাঁদের কেউ কেউ সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং নিমন্ত্রিত সদস্যগণকে মাল্যদানকরতঃ একে একে সভার সঙ্গে পরিচিত করান।

এই উপলক্ষ্যে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা কালীবাড়ির নূতন পুস্তকালয় এবং পঠন-গৃহের দ্বার উন্মোচন করেন।

শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ বলেন, বাঙালীর আজ বড় দুর্দিন—বাঙলার সামনে আজ নানা কঠিন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে এবং সেগুলো সমাধান করতে হলে আমাদের ব্যক্তিগত কিম্বা দলগত দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে সুদ্ধমাত্র খাঁটি বাঙালীরূপে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হতে হবে। এবং এ কর্মে যে শুধু বাঙালীই যোগ দেবেন তাই নয়; বিহার, উত্তর প্রদেশের বাঙালীরাও তাঁদের সহযোগিতা দেবেন।

শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ আরো বলেন, ভারতের ইতিহাস এবং ভাগ্য নির্মাণে

বাঙালীর দান নগণ্য নয়; আজ যদি বাঙালী তার দুরূহ সমস্যাগুলোর সমাধান না করতে পারে তবে যে শুধু বাঙালীই লোপ পাবে তা নয়, তাতে করে সমস্ত ভারতবর্ষ দুর্বল হয়ে পড়বে। (বাঙলা শর্টহেণ্ড জানিনে, কাজেই প্রতিবেদনে ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলে আশা করি বক্তা অপরাধ নেবেন না।)

এ তো অতি খাঁটি কথা—এ কথা অস্বীকার করবে কে?

কিন্তু প্রশ্ন আমাদের সমস্যাগুলো কি, এবং তার সমাধানই বা কি? ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ যদি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতেন তবে আমরা উপকৃত হতুম। তবে হয়ত প্রীতিসম্মেলন দীর্ঘ ভাষণের উপযুক্ত স্থান নয় বলেই তিনি এ নিয়ে সবিস্তর আলোচনা করেননি। কিন্তু তবু অধমের বক্তব্য, অন্যত্র শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ যে সব ভাষণ দেন সেগুলো তিনি তাঁর দলের মতবাদের দৃষ্টিবিন্দু থেকেই দিয়ে থাকেন। তাঁরই কথামত তিনি যদি খাঁটি বাঙালী হিসেবে নিরপেক্ষ বক্তৃতা দিতেন তবে আমরা অর্থাৎ যারা কোনো দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নই—উপকৃত হতুম। শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে দিল্লীবাসী বাঙালীগণকে নিরাশ করবেন না।

রায় পিথৌরার কথায় কেউ বড় একটা কান দেয় না—আর দেবেই বা কেন, সে তো আর কেষ্ট-বিষ্টু কেউ-কেডা নয়—এবং তাই সে বড় খুশী। সব দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে সে তাই তখন পরমানন্দে যাচ্ছেতাই (হায়, যদি ঠিক 'যা ইচ্ছা তাই' ঠিক ঠিক ভাষায় প্রকাশ করতে পারতুম তবে তো এতদিনে দেশবিদেশে কবি, সাহিত্যিক হিসেবে নাম করে ফেলতে পারতুম—দু'পয়সা ভি আসত) বলে যায় এবং তারই মত আরো কয়েকজন দায়িত্বহীন পাঠক সেগুলো পড়ে বলে, 'ঠিক বলেছ।' এঁদেরই জন্য আমি কলম ধরি; তাই আমার মনে হয়—স্বাধীনতার পর বাঙলার আকার ছোট হয়ে যাওয়াতে আমাদের নূতন নূতন সমস্যার অন্ত নেই।

তাই দেখতে হবে বাঙলার আয়তন কি প্রকারে বাড়ানো যায়।

ভাষার ভিত্তিতে ভারতীয় প্রদেশগুলোকে যদি নূতন করে গড়ে তোলা হয় তবে বাঙলার আয়তন বাড়বে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু তার বিরুদ্ধেও যুক্তি আছে।

বাঙলার বাইরেও বাঙালী সংস্কৃতির স্থান আছে। এ কথা কে না জানে, উড়িষ্যা, আসাম ও পূর্ব বিহারের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই উত্তম বাঙলা জানেন, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির সঙ্গে তাঁরা সুপরিচিত, তাঁদের বাড়ির মেয়েরা রবীন্দ্র-সঙ্গীত গান এবং এ সব প্রদেশের অশিক্ষিত জনও বাঙলা ফিল্ম দেখে।

আজ যদি এই সব প্রদেশের বাঙলাভাষী অঞ্চলগুলো বাঙলাকে দিয়ে দেওয়া হয় তবে বহু বাঙলাপ্রেমী বিহারী, আসামী এবং উড়িষ্যাবাসী আমাদের উপর

বিলক্ষণ রেগে যাবেন এবং ক্রমে ক্রমে সেই রাগের বশে বাঙালী সংস্কৃতি বর্জন করতে আরম্ভ করবেন।

এই পরিস্থিতির কথা ভাবলেই আমি বড্ড ভয় এবং ক্লেশ পাই।

কারণ বাঙলাদেশের পরিমাণের চেয়েও আমি বহু বহু গুণে বেশী মূল্য দিই বাঙালী সংস্কৃতির পরিব্যাপ্তিকে। আমার ধ্যানের বাঙলা বাঙলাদেশে সীমাবদ্ধ নয়—পশ্চিমবাঙলার গুটিকয়েক জেলাই তার বিহার-ভূমি নয়—আমার ধ্যানের বাঙলা আসাম, বিহার, উড়িষ্যার সুদূরতম প্রান্ত অবধি—না, কম বলা হল, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, দিল্লী, জয়পুর যেখানেই বাঙলা সংস্কৃতির ছাপ পড়েছে, ছায়া পড়েছে সেখানেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঙলা। পূর্ব-বাঙলাও তাই এ-ধ্যানের বাঙলার ভিতরে।

টমাস মান্ যখন যুদ্ধের পর বিভক্ত জর্মনির পশ্চিমাঞ্চলে নিমন্ত্রিত হন তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তিনি পূর্বাঞ্চলেও যাবেন কিনা? উত্তরে মান্ বলেছিলেন, যেখানেই জর্মন সংস্কৃতি সম্মান পায় সেখানেই আমার মাতৃভূমি।

এই ধ্যানের বাঙলা যেন বিনষ্ট না হয়।

জমিদারী বাড়ানো ভালো কিন্তু জমিদারী বাড়াতে গিয়ে যদি হাজার হাজার মিত্রকে শত্রু করতে হয়, তাঁদের সঙ্গে যদি আমার আহার-বিহার বন্ধ হয়ে যায়, তাঁরা যদি আমার সভ্যতা সংস্কৃতির চর্চা বর্জন করেন তবে দেখতে হবে, ভাবতে হবে, আমার কর্তব্য কি?

ওদিকে মানভূম, সিংভূমের বাঙালীর প্রতি আমাদের কর্তব্যবোধ ধর্মবোধও আছে। কোনো কোনো অদূরদর্শী বিহারীরা নাকি ঐ সব অঞ্চল থেকে বাঙলা চর্চা তুলে দিতে চান—আমি হলফ করে কিছু বলতে পারব না, কারণ ও সব অঞ্চলে গিয়ে উৎকট সব সমস্যার সম্মুখীন হবার দায় থেকে শ্রীগুরু আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন; তাই যদি হয় তবে সেই বা চোখ কান বন্ধ করে সয়ে নেব কি প্রকারে?

এই পিন্‌সার মুভমেণ্টের সামনে আমি হিমশিম খেয়ে গিয়েছি।

কিন্তু ঠিক এইখানেই তো পিথৌরাতে শ্যামাপ্রসাদে তফাৎ। এ সমস্যার সমাধান পিথৌরা জানে না, দায়ও তার নয়; শ্যামাপ্রসাদ যদি শ্যামার প্রসাদ পান তবে সমস্যা-সমাধান করতে পারবেন বলে আশা করি। না হলে নেতা হলেন কেন?

তবে শেষ কথা এই; তিনি নিজেই যা বলেছেন সেইটাই সত্যি। এ সমস্যার সমাধান তাঁকে করতে হবে তাঁর পার্টিগত দৃষ্টিবিন্দু বর্জন করে, একদম হানড্রেড এণ্ড

টেন পার্সেণ্ট নির্জলা, নির্ভেজাল খাঁটি বাঙালীরূপে।

এবং শ্যামাপ্রসাদের বাঙালীত্ব সন্দেহ করবে কে? যদি কেউ করে, তবে বিদ্যেসাগর মহাশয়ের ভাষাতে বলি (সাবধান, চ্যালেঞ্জ করবেন না, আমি গেল কয়েক মাস ধরে শুধু বিদ্যাসাগরই পড়েছি), "তার বাপ নির্বংশ হ'ক!"

বাঙালীকে একথা ভুললে চলবে না, সে বাঙালী। সে হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, খ্রীশ্চান নয়,—সে বাঙালী।

আমার পরম শুভানুধ্যায়ী, বিদ্রোহী বীর, পরলোকগত উপীনদা এ সম্বন্ধে 'নির্বাসিতের আত্মকথা'তে যা লিখেছেন সেটা বাঙালী যেন বার বার পড়ে, উদয়াস্ত সেই মন্ত্র জপ করে।

একবার বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়লেই একথা সবাইকে মেনে নিতে হয়।

বাঙলা-সাহিত্যের আঁতুড়ঘর বৌদ্ধ-মন্দিরে—চর্যাপদ নিয়ে, বেদবেদান্ত নিয়ে নয়। তারপর তার বৈষ্ণব রূপ। আজ বৈষ্ণবধর্ম হিন্দু ধর্মের অঙ্গ, কিন্তু যে যুগে সে জন্মগ্রহণ করে সে যুগে সে ব্রাত্য—ব্রাহ্মণ চণ্ডীদাস ধোপানী রামীকে বলছেন,

তুমি বেদ-বাদিনী হরের রমণী
তুমি হও মাতৃপিতৃ
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারে ভজন
তুমি বেদ মাতা গায়ত্রী।

এ যদি বিদ্রোহ না হয়, এ যদি স্বাধীন চিন্তাপদ্ধতি না হয়, তবে স্বাধীনতা কি? তারপর বাঙলা গদ্যের সূত্রপাত রামমোহনে। তিনিও বিদ্রোহী—প্রচলিত হিন্দু ধর্মের কতই না জঞ্জাল তিনি লৌহ-সম্মার্জনী দিয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে গেলেন। তারপর বাঙলার শ্রেষ্ঠতম সন্তান বিদ্যাসাগর মহাশয়—তাঁকে বর্ণনা করার ভাষা আমার আয়ত্তের বাইরে—তিনিও 'সনাতন' ধর্মের বিরুদ্ধে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কর্মের বিজয় পতাকা তুলেছেন। তারপর মাইকেল—রাম রাম! তিনি তো কেরেস্তান; কিন্তু শুধাই, আজ এবং সে যুগেও কেউ তাঁকে তাই নিয়ে তাচ্ছিল্য করেছে? ওদিকে পূর্ব-বাঙলায় মুসলমানরা কেচ্ছা-সাহিত্য, মুর্শীদীয়া, জারী, দর্বেশী রচনা আরম্ভ করেছেন—হিন্দু দীনেশচন্দ্র তো সেগুলো অবহেলা করলেন না! আজ মৈমনসিংহী গীত কবিতা বাংলার অলঙ্কার। তারপর বঙ্কিম; তিনি তো বৃন্দাবনের রসরাজকে সর্বজনসমক্ষে খুন করলেন (এবং আশ্চর্য, যে ব্রাহ্মসমাজ বৈষ্ণব ধর্মকে তাচ্ছিল্য করে কদম্ববৃক্ষকে 'অশ্লীল বৃক্ষ' বলেন—আমার

শোনা কথা—সেই সমাজের মহাপুরুষ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই দেখে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'রসরাজ চলে গেলে আমাদের থাকবে কি ?')। এবং পশু, পশু, যে বাঙালী বঙ্কিমকে 'ঋষি' উপাধি দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে সেও রসরাজকে বর্জন করেনি। ঠিক ঐ সময়ে কিনা বলতে পারব না, কাঙাল হরিনাথের (কাঙাল যদি ছেলের মত ছেলে হত তবে তুমি জানতে। কাঙাল জোর করে কোল কেড়ে নিত, তুমি পারতে না মা ছাড়তে) সখা মীর মুশররফ হুসেন 'বিষাদসিন্ধুতে' মুসলমানের কারবালার কাহিনী লিখলেন ; এ-বই "হৃদয়তাপের ভাপে-ভরা ফানুস", তত্ত্ব এতে নেই, তবু বাঙালী আজও সে বই কেনে। তারপর রবীন্দ্রনাথ—তিনি কতখানি স্বাধীন চিন্তার প্রতীক ছিলেন সে কথা আপনারা আমার চেয়ে ঢের বেশী জানেন ; তিনি হিন্দু নন, ব্রাহ্ম নন—তিনি বাঙালী। তারপর সুকবি নজরুল ইসলাম। মুসলমান। তাঁর তখল্লুস্ (পেননেম) 'বিদ্রোহী কবি'। একে মুসলমান, তায় বিদ্রোহী। অথচ বাঙালী হিন্দু তাঁকে কী শ্রদ্ধাই না দেখিয়েছে—আজও তাঁর জন্মদিনে তাঁর রোগশয্যার চতুর্দিকে বহু বাঙ্গালী জড়ো হয়। ক্ষীণ আশা নিয়ে যদি তিনি ক্ষণেকের তরে চৈতন্য পেয়ে আরো কিছু দেন ('টুকরো খবর' দ্রষ্টব্য)। সর্বশেষ 'পরশুরাম'। তিনি আমাদের প্রচলিত ধর্ম নিয়ে যে উৎকট মস্করা করেন সে তো অবিশ্বাস্য। অন্য কোনো দেশ হলে বহু পূর্বেই তিনি লিন্‌চট্, বার্নট এট দি স্টেক, কাফিররূপে কতলিত হতেন।

বাঙালী বাঙালী। হিন্দুধর্মের প্রতি তার সোহাগ নেই, মুসলমানকে সে অবহেলা করেনি, কেরেস্তানও তার ভাই। এ রকম উদারতা কটা জাত, কটা সাহিত্য দেখিয়েছে ?

আমি তো বিশ্বসাহিত্য জানিনে। অগ্রজপ্রতিম সখা শ্রীযুত সুনীতিকুমার জানেন। তিনিই বলুন না ? ভুল সপ্রমাণ হলে 'দেহলীপ্রান্ত' থেকে কলকাতা অবধি নাকে খৎ দেব।

অথচ কি আশ্চর্য ! হিন্দু ধর্ম বাঁচিয়ে রেখেছে বাঙালীই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ এঁরা বাঙালী। আপনারা যদি সাহস দেন, তবে সে প্রলাপও একদিন নিবেদন করব।

উদ্ধৃতিতে ভুল থাকলে অপরাধ নেবেন না। এই পাণ্ডববর্জিত ইন্দ্রপ্রস্থে চণ্ডীদাস পাই কোথায় ?

বিদেশ থেকে মহামেহন্নত করে বিরাট বিরাট ছবি এদেশে এনে কেউ যদি প্রদর্শনী খোলে, তবে সে সম্বন্ধে সামান্যতম অপ্রিয় বাক্য বলতেও ভদ্রজনের বাধো বাধো ঠেকে। অথচ মৌনতা দ্বারা সম্মতি অর্থাৎ সন্তুষ্টি প্রকাশ করলে যে-ভদ্র-মহোদয়গণ সোভিয়েট চিত্রপ্রদর্শনী খুলেছেন তাঁদের প্রতি অন্যায় করা হয়। আমরা যদি চুপ করে থাকি, তবে তাঁরা ভাববেন এ ছবিগুলো আমাদের পছন্দ হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধরণের ছবিই পাঠাবেন। আর আমরা যদি বলি, না, আমাদের প্রাণে এ ছবিগুলো কোনো স্পন্দন জাগাতে পারেনি, তবে হয়ত ভবিষ্যতে তাঁরা তাঁদের বিশাল ভাণ্ডার থেকে অন্য ধরনের ছবি পাঠাবেন।

* * *

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ছবিগুলো ঘোর বস্তুতান্ত্রিক বা রিয়ালিস্টিক। স্থূলতঃ এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। রুশ বস্তুতান্ত্রিক রাষ্ট্রসঙ্ঘ, তার ছবি যে একদম বস্তুরূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে সে-ই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু প্রশ্ন বস্তুতান্ত্রিক ছবি হলেই তাকে কি রঙিন ফোটোগ্রাফী হতে হবে? প্রদর্শনীর অধিকাংশ ছবি তাই; একশ বৎসর আগে, ইম্প্রেশেনিজম আরম্ভ হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে অর্থাৎ ইয়োরোপীয় চিত্রকলার অবনতির যুগে, এ রকম ছবি আঁকা হয়েছিল। ভারতবর্ষে রবি বর্মা এ ধরনের ছবি এঁকেই এদেশে নাম করেছিলেন। এসব ছবিতে মুন্সীয়ানা বিস্তর, খাটুনি এন্তার, কিন্তু এরা ছবির পর্যায়ে ওঠে না।

* * *

তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, রুশরা ভালো আঁকবার চেষ্টায় যে কাঠ-খড় পোড়াচ্ছে তার তুলনায় আমাদের অধিকাংশ চিত্রকররা কোনো মেহন্নতই করছেন না। ভালো করে লাইন টানার কিংবা তুলি ধরার পূর্বেই এঁরা সব সেজান গগাঁ মাতিসের অতিশয় দুর্বল অনুকরণ করে 'অরিজিনাল' ছবি আঁকতে আরম্ভ করে দেন। প্রকৃতি বা জীবজন্তু পর্যবেক্ষণ না করে, আপন হৃদয়ের জারক রসে সেটা না জারিয়ে নিয়ে তাঁরা আকাশকুসুমবৎ কাল্পনিক অদ্ভুত অদ্ভুত জন্তু-জানোয়ার বানাতে আরম্ভ করে দেন। সব ফাঁকি, সব ফক্কিকারি—পিছনে কোনো মেহন্নত নেই, কোনো সাধনা নেই।

রাশাতে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। মেহন্নত এবং উৎপাদনের মাপকাঠি দিয়ে সেখানে অর্থ এবং সম্মানের ওজন করা হয়।

রাশানরা খেটেছে, তাই ভবিষ্যতে এরা ভালো ছবি আঁকতে পারলে বিস্মিত হব না।

সর্বশেষ বক্তব্য, প্রদর্শনীতে উত্তম ছবিও কয়েকখানা আছে—জারের পূর্বেরও পরেরও। তবে সেগুলো খুঁজে বের করতে হয়।

* * *

ইতোমধ্যে দিল্লীতে আর্ট নিয়ে গুটিকয়েক সম্মেলন হয়ে গেল। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন, আমাদের জীবনের সঙ্গে আর্টের সম্পর্ক ক্রমেই ছিন্ন হয়ে আসছে এবং আমাদের উচিত আমাদের শিক্ষায়তনগুলিতে আর্ট শেখাবার সুব্যবস্থা করা।

* * *

আর্ট শেখানো উচিত—একথা বলতে গিয়ে কিন্তু অনেকেই দুটো জিনিস মিশিয়ে ফেলেন।

দেশসুদ্ধ লোককে ছবি আঁকতে কিংবা গান গাইতে (স্থাপত্য অর্থাৎ বিরাট বিরাট এমারৎ তৈরী করা শেখানোর কথাই ওঠে না) শেখানোর চেষ্টা করা ভুল —কোনো দেশ করেও না। কিন্তু এ-সব কলারস আস্বাদন করার শক্তি ও রুচি জন্মানো প্রত্যেক শিক্ষায়তনেরই কর্তব্য। এবং তার ব্যবস্থা আমাদের ইস্কুল কলেজের কোথাও নেই। আমাদের ইস্কুল কলেজের দেয়ালে অজন্তা, রাজপুত, মুগল কলা, ত্রিমূর্তি, নটরাজ, কনারক, খাজুরাহো, কুৎব্ তাজের ফটোগ্রাফ টাঙানো থাকে না; কাজেই সেগুলোতে কি কলারস রয়েছে সে-কথা মাস্টার অধ্যাপক কাউকেই ছাত্রকে বুঝিয়ে বলতে হয় না।

আমাদের তাবৎ ঝোঁক সাহিত্যের দিকে। গদ্য এবং পদ্যে কি রস কোথায় লুকোনো আছে, আমাদের শিক্ষকেরা সেটা পই পই করে বোঝান, শুকনো চসার পর্যন্ত আমাদের বাধ্য হয়ে চিবোতে হয়, এসব বিষয়ে রচনা লিখতে হয় ও সাহিত্যের ইতিহাস কণ্ঠস্থ করতে হয় (কবিতা কি করে লিখতে হয় তার তালিম অবশ্য দেওয়া হয় না—লাতিন ইস্কুলে যে রকম লাতিন পদ্য এবং টোলে যে রকম সংস্কৃত পদ্য রচনা করতে শেখানো হয়)। বহু বৎসর ধরে এই কর্ম চলে এবং শেষটায় কেউ কেউ সাহিত্যানুরাগী হন। যাঁরা ইস্কুল কলেজে থাকাকালীন, কিংবা ছাড়ার পর, কবিতা লেখেন সেটা প্রধানতঃ তাঁদের নিজের চেষ্টার ফলে—ইস্কুল কলেজের তালিম দেওয়ার ফলে নয়।

কিন্তু প্রশ্ন সাহিত্য ভিন্ন অন্য বস্তুতে শিক্ষা দেবে কে ?

* * *

কালই একজন খ্যাতনামা ভারতীয় ঐতিহাসিকের লেখা একখানা ভারতের ইতিহাস পড়ছিলুম। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বে অসাধারণ পণ্ডিত; কাজেই ভারতের প্রতি যুগের এই তিন বস্তু তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করেছেন। কোন ভ্রাম্যমাণের রোজনামচা কতখানি বিশ্বাস করা যায়, কোন্ মুদ্রা থেকে কতখানি ইতিহাস নিংড়ে বের করা যায়, পূর্বাচার্য ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কে কতখানি বিশ্বাস্য কতখানি অবিশ্বাস্য এসব তত্ত্ব তিনি সূক্ষ্ম চাল্‌নির ভিতর দিয়ে বার বার চালিয়ে নিয়ে খাঁটি মাল পরিবেষণ করেছেন।

কিন্তু প্রতি অধ্যায়ের পর যখন ঐ যুগের শিল্পকলা নিয়ে তিনি আলোচনা আরম্ভ করেন তখন তিনি আর পূর্ববর্ণিত অতি সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে আলোচনা ফাঁদেন না। তখন শুধু 'এ্যাজ্ ফার্গুসন সেজ' কিংবা 'একর্ডিং টু কানিঙহাম' অথবা 'কার স্টিফেন ইজ রাইট হুয়েন হি সেনটেনস্'। তাঁর নিজের কিছু বক্তব্য নেই।

আমি একথা বলব না, আমাদের ঐতিহাসিকের কোনোপ্রকার আপন রসবোধ নেই। সাহিত্যরস তাঁর দিব্য আছে, ভাস কালিদাস সম্বন্ধে তিনি সূক্ষ্ম পদ্ধতিতেই আলোচনা করেছেন; অর্থাৎ তিনি যৌবনে যে শিক্ষা ও রুচির তালিম পেয়েছিলেন তার বিকাশ করে উত্তম ইতিহাস লিখেছেন। কিন্তু চারুশিল্প বাবদে তিনি কখনো কোনো তালিম পাননি বলে ভারত-ইতিহাসের সেই সুবৃহৎ —হয়ত সর্বোত্তম—অধ্যায় তিনি লিখতে পারেননি।

তাই প্রশ্ন, চারুকলার ইতিহাস (হিস্ট্রি) পাব কবে ?

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে আর্ট হিস্ট্রি পড়াবার সুব্যবস্থা আছে। প্রতি বৎসর কয়েকটি ছেলেমেয়ে এ বিষয় অধ্যয়ন করে ডিগ্রী নেয়—একটি মিশরি ছেলে সরকারী বৃত্তি পেয়ে এ বিষয় পড়তে কলকাতা এসেছে —এবং খুব সম্ভব পরে বেকার থাকে।

আমার মনে হয় আর্ট হিস্ট্রি ফার্স্ট ইয়ার থেকেই পড়ানো উচিত। লজিক, সংস্কৃতের ন্যায় যে কোনো ছেলে যেন বিষয়টি বেছে নিতে পারে। যারা এতে অনার্স নেবে তারা যেন 'জেনরেল আর্ট হিস্ট্রি'র কোনো বিশেষ অংশ—সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রভাস্কর্য, স্থাপত্য ইত্যাদির যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে গভীরতার চর্চা করে।

এই সব গ্রাজুয়েট পরবর্তীকালে ইস্কুল-শিক্ষকের কর্ম নিলে সেখানে অনায়াসে কলা-চর্চার গোড়াপত্তন করতে পারবেন।

* * *

দিল্লী সম্মেলনে ইস্কুলের ড্রইং মাস্টারদের নিন্দে করা হয়েছে। জানি,

সম্মেলন যা বলেছেন সে সব অতি খাঁটি কথা কিন্তু তবু আমার বেদনা বোধ হল।

ছেলেবেলায় যে দুটি ড্রইং মাস্টার আমাদের ছবি আঁকা শেখাতেন তাঁরা রাফায়েল টিশিয়ান ছিলেন না; এমন কি আজ বুঝতে পারি, তাঁরা উত্তম ছবির আদর্শ বলতে রঙিন ফোটোগ্রাফই বুঝতেন—তখনো অজন্তা মুগল আমাদের ক্ষুদ্র মহকুমা শহরে এসে পৌছয়নি।

সেজান চিত্রকর, জোলা সাহিত্যিক। এঁর ছবি ওঁর চিন্তাধারাকে ওঁর চিন্তাধারা এঁর ছবির উপর প্রভাব বিস্তার করে অপূর্ব সৃষ্টির সহায়তা করেছিল।

আমার ড্রইং মাস্টাররা সংস্কৃত এবং ফারসীর শিক্ষকদের মত অবহেলিত, অনাদৃত ছিলেন।

এঁরা যদি কোনো কলা-ঐতিহাসিক শিক্ষকের দিগ্‌দর্শন পেতেন, তবে ভ্রান্তপথ বর্জন করে আমাদের ঐতিহ্যগত কলা-সৃষ্টির নির্মাণে নিজেকে অতি সহজে নিয়োজিত করতে পারতেন এবং তাতে করে এঁদেরও জীবন সার্থক হত।

সবাই অবহেলা করে এঁদের বলত 'পটুয়া'—এমন কি সহকর্মিগণও এঁদের সঙ্গে ব্যবহার করতেন এমনভাবে যেন এঁরা ব্রাত্য, অপাংক্তেয়—যোগাযোগের ফলে জাতে উঠেছেন। ডাঙ্গায় নগণ্য মাইনে, জলে অবহেলা—শেষটায় একজন ঢাকার থিয়েটারের সীন এঁকে আর সব মাস্টারদের পয়সার দিক দিয়ে কানা করে দিলেন। কিন্তু আমি জানি, তিনি সুখী হননি। আমাকে তিনি স্নেহ করতেন; নিজে সে কথা বলেছেন। আজ বুঝতে পারি, কেন তিনি সুখী হননি।

রঙিন ফোটোগ্রাফি হোক কিম্বা আর যাই হোক, যখন তিনি মাস্টার ছিলেন, তখন তাঁর একটা আদর্শ ছিল, স্টেজের সীন আঁকতে সে আদর্শটি লোপ পেল—পেলেন তিনি টাকা।

* * *

বহু বহু বৎসর পরে আমি বার্লিন শহরে কয়েক মাস বাস করেছিলুম। সেখানে কয়েকজন মেধাবী চিত্রকরের সঙ্গে হৃদ্যতা হয়। এঁদেরই একজন আমার ঘরে এ-বই ও-বই নাড়াচাড়া করছেন। তার ভিতর ছিল 'চয়নিকা'—ঐ একখানা বই আমি সব সময়ই বিদেশে সঙ্গে নিয়ে যেতুম, বিস্তর বই নিয়ে যাবার উপায় নেই বলে।

সে বইয়ের প্রথম সাদা পাতায় আঁকা ছিল আমার ড্রয়িং মাস্টারের আপন তুলিতে আঁকা 'সূর্যোদয়'।

আমার জার্মান আর্টিস্ট বন্ধু হতবুদ্ধি হয়ে সে ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, "হোয়াট এ রটন্ পেন্টিং—বাট্ হোয়াট মাস্‌টারি অভার টেক্‌নীক্!"

পূর্ব-পশ্চিমের বহু গুণী-জ্ঞানী দার্শনিক-পণ্ডিতজন দেহলি প্রান্তে সমবেত হইয়া সপ্তাহাধিককাল 'মানবের মূল্য' ও 'শিক্ষা-দর্শন' সম্বন্ধে বহুমুখী আলোচনাকরতঃ স্ব স্ব দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন—কেহ কেহ ভারত ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন।

চরম সত্য ভঙ্গের প্রাক্কালে সমবেত দার্শনিকমণ্ডলী এক বাক্যে স্বীকার করেন, পূর্ব ও পশ্চিমের চিন্তাধারা এবং জীবনদর্শনে কোনো প্রকারের দ্বন্দ্ব কিম্বা অন্তর্নিহিত পার্থক্য নাই।

তৎসত্ত্বেও আমার মনে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দ্বিধা রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে তত্ত্ব এস্থলে সবিশদ আলোচনা না করিয়া অন্য একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

পূর্ব-পশ্চিমের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য আছে সে-কথা স্বীকার করিয়া লইলেও তো কোনো মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। আমরা ইউনিটি বা ঐক্যের সন্ধান করিতেছি—সমতা বা ইউনিফর্মিটি আমাদের কাম্য নহে। বঙ্গবাসী পাঞ্জাববাসীর ন্যায় রুটি এবং মাংস না খাইলে কি উভয়ের ঐক্য অসম্ভব? বরঞ্চ বলিব, পাঞ্জাবী এবং বাঙ্গালী উভয়েই আপন আপন বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়া আপন মনীষার নব নব বিকাশ নব নব উন্মেষণ করিয়া যদি বৃহত্তর ঐক্যে সম্মিলিত হয়, তবে সেই ঐক্যই হইবে সত্য ঐক্য।

প্রাচ্য প্রতীচ্য সেইরূপ যদি আপন আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া সহযোগিতা করে, তাহাতেই তো বৃহত্তর মঙ্গল; বরঞ্চ বলিব, একে অন্যের অনুকরণ করিয়া ক্ষুদ্র সমতার সন্ধান করিলে উভয়ই আপন আপন ঐতিহ্যভ্রষ্ট হইয়া আড়ষ্ট এবং ক্লীব দর্শনের পীড়াদায়ক পুনরাবৃত্তি করিবে মাত্র।

* * *

জনৈক ফরাসিস্ দার্শনিক বলিলেন, প্রাচী বরঞ্চ প্রতীচী সম্বন্ধে বহু জ্ঞান ধারণ করে, কিন্তু প্রতীচী সেই অনুপাতে প্রাচীর অল্প পরিচয় লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

আপাতদৃষ্টিতে তাহাই মনে হয়। কারণ যে সব ভারতীয় পণ্ডিত এই দার্শনিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের অনেকেই বহু বৎসর ইয়োরোপে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন এবং সেই সূত্রে ঐ মহাদেশ সম্বন্ধে নানাপ্রকারের তত্ত্ব এবং তথ্য সঞ্চয় করিয়া স্বদেশপ্রত্যাগমন করিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন, মাক্স ম্যুলার,

য়াকোবি, লেভি, উইণ্টারনিৎস, গেল্ডনার এবং পূর্ববর্তী যুগে যে সব ইয়োরোপীয় পণ্ডিত ভারতবর্ষে বাস করিয়া বহু সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করিয়া উত্তম উত্তম সংস্করণে প্রকাশ করিলেন ; কানিংহাম, ফার্গুসন, স্টিফেন, হেভেল ভারতীয় কলা সম্বন্ধে যে প্রকারের গবেষণা করিলেন, সেই তুলনায় কয়জন প্রাচ্য দেশবাসী গ্রীক কিম্বা লাতিন পুস্তকের চর্চা করিয়া ইয়োরোপীয়দিগকে জ্ঞান দান করিয়াছেন ? কয়জন ভারতীয় কিম্বা চৈনিক বিদগ্ধ ব্যক্তি ইয়োরোপীয় কলার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে প্রামাণিক এবং সর্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক লিখিতে সক্ষম হইয়াছেন ? ব্যোটলিঙ্ক-রোট্ যে বিরাট সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, সেই জাতীয় গ্রীক অভিধান যখন ভারতে রচিত হইবে তখন বুঝিব আমরা সত্যই প্রাতীচ্য বৈদগ্ধ্যের কিঞ্চিৎ সন্ধান পাইয়াছি।

* * *

এই হেমন্ত শিশিরে দেহলি-প্রান্তে যে সব কলা প্রদর্শনী দেখিলাম, তাহার মধ্যে দুইজন চিত্রকরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : শ্রীযুত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত অবনী সেন।

শ্রীযুত অবনী সেন গত সপ্তাহে তাঁহার বিগত কয়েক বৎসরের চিত্রকলা দেহলি-প্রান্তে উপস্থিত করিয়াছেন এবং সেইগুলি দেখিয়া বহু গুণী মুগ্ধ হইয়াছেন।

অবনী সেন সরল এবং অনাড়ম্বর চিত্রকার। তিনি জীবজন্তু, প্রকৃতি, পুরুষ নারী দেখিয়াছেন অতিশয় সযত্নে এবং সেইগুলির প্রকাশ দিয়াছেন নিজস্ব সরল পদ্ধতিতে। শুদ্ধমাত্র মনোরঞ্জন করিবার জন্য কিম্বা 'আর্টিস্টিক' হইবার জন্য তাঁহার চিত্রে কোনো প্রকারের ছলনা নাই। দিল্লী নগরীতে এ বড় বিস্ময়কর বস্তু। সামান্য দুই তিনটি প্রদর্শনী ব্যত্যয়রূপে বিচারাধীন না করিলে অধিকাংশ স্থলেই দেখিয়াছি কেহ করিতেছেন মাতিসের নকল, কেহবা সেজানের, কেহবা ভানগগের। তবুও ঈষৎ সান্ত্বনা পাইতাম যদি ইঁহারা সত্যই পূর্বোল্লিখিত কৃতী পুরুষগণের অনুকরণ করিতেন। আমার মনে হয় ইঁহারা তাঁহাদিগের সত্য বৈশিষ্ট্য সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই, ইঁহারা অনুকরণ করিয়াছেন এই সব গুণীদের অবান্তর অংশগুলিকে। শুনিয়াছি শিলার নাকি ডেক্সে গলিত আপেল না রাখিলে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন না। দিল্লীতে প্রদর্শিত অধিকাংশ চিত্রকারের চিত্রে গলিত আপেলের দুর্গন্ধ পাইয়া সন্দেহ হইল ইঁহারা শিলারের অনুকরণ করিয়াছেন,—শিলারের প্রতিভার সন্ধান ইঁহারা পান নাই, কিম্বা বলিব, অশ্বত্থামার ন্যায় পিষ্টতণ্ডুল দর্শনে উদ্বাহু হইয়া নৃত্য করিয়াছেন।

সাহিত্যে এই কর্ম অহরহ হইতেছে—তাহার সন্ধান সকলেই রাখেন, কিন্তু চিত্রে এই দুষ্কর্ম মর্মান্তিকরূপে শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে।

তাই নিবেদন করিতেছিলাম, অবনী সেন কোনো গলিত আপেলের সন্ধানে কালক্ষয় করেন নাই। বিচিত্র পৃথিবীকে তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, সেই দর্শন তাঁহার হৃদয়ে যে অনুভূতি যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে, তিনি তাহারই প্রকাশ দিয়াছেন কোনো প্রকারের ছলনা না করিয়া।

এই প্রশস্তিই যথেষ্ট।

* * *

কলিকাতা মহানগরী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন বৈদেশিকদের যে সব প্রতিমূর্তি আমাদিগের নগরে নগরে বিরাজ করিতেছে ইহাদিগকে লইয়া আমাদের কর্তব্য কি? এই প্রশ্ন দিল্লীতেও উপস্থিত হইয়াছে।

কেহ বলিতেছেন, এইগুলিকে কোন যাদুঘরে রাখিয়া দেওয়াই প্রশস্ততম পন্থা।

কেহ বলিতেছেন, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকগণের মূল্যবান তথ্য আহরণের সূত্র বিনষ্ট করা হইবে।

কেহ বলিতেছেন, এইগুলি স্থানান্তর করিতে যথেষ্ট অর্থব্যয় হইবে এবং যে বিরাট ভাণ্ডার ইহাদিগের জন্য নির্মাণ করিতে হইবে তাহার জন্য অর্থব্যয় এক গৌরী সেনেই সম্ভবে।

কেহ বলিতেছেন, এইগুলিকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দাও। ইঁহারা ইংলণ্ডের 'কৃতী' সন্তান; স্ব স্ব নগরে ইঁহারা প্রাতঃস্মরণীয় এবং প্রাতর্দর্শনীয় হইয়া বিরাজ করুন।

এক ইন্দোনেশিয়ান বান্ধব আমাকে একাধিকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "আপনারা বৈদেশিকদের এই প্রতিমূর্তিগুলি সহ্য করিতেছেন কেন?"

আমি প্রশ্ন করিলাম, "আপনারা ওলন্দাজ প্রতিমূর্তিগুলির কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?"

মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "দণ্ডাধিককাল মধ্যেই চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছি।"

* * *

স্বীকার করি বৈদেশিকের প্রতি কিম্বা তাহাদের প্রতিমূর্তির প্রতি আমার এইরূপ জাতক্রোধ সহজে উপজাত হয় না। ভিনাস কিম্বা মজেসের প্রতিমূর্তি দেখিয়া আমি আনন্দ পাই, কোনো প্রকারের ক্রোধ চিত্তকোণ স্পর্শ করে না।

কিন্তু এই প্রতিমূর্তিগুলি যে অত্যন্ত কুৎসিত। যত দিন পর্যন্ত এই প্রতিমূর্তিগুলি নগরে নগরে বিরাজমান থাকিবে ততদিন আমাদের ভবিষ্যৎ ভাস্করদের সুরুচি নির্মাণের পক্ষে ইহারা নিদারুণ অন্তরায়—"ফিল্মী গানা" যেরূপ ইয়োরোপীয়

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গ্রহণের পক্ষে অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল যেরূপ ভারতীয় স্থপতির রুচি-বিকার ঘটাইতেছে। কিন্তু হায়, ফিল্মী গানা বন্ধ করিবার উপায় নাই, মেমোরিয়াল ধূলিসাৎ করিই বা কি প্রকারে।

ঐতিহাসিকেরা যে এই প্রতিমূর্তিগুলি হইতে বহুতর গবেষণার উপাদান পাইবেন সে কথা স্বীকার করি না, কিন্তু এ তথ্য অনস্বীকার্য যে, ইহাদের জন্য ভাণ্ডার নির্মাণ করা অর্থের অতিশয় অন্যায় অপব্যয়।

* * *

ইঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারেন কিনা সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য, ইংলণ্ড মাতা ইঁহাদিগকে আপন বক্ষে স্থান দিবেন কি?

কারণ একদা একখানা বিরাট ইংলণ্ডীয় কামান—সেই কামান এই দেশে নাকি বহু শৌর্যবীর্য দেখাইয়াছিল—কোনো এক ইংরেজ মহাপ্রভুর উৎসাহে স্বনগরে প্রেরিত হয় এবং নগরের মধ্যবর্তী উদ্যানে প্রতিষ্ঠিত হয়। নগরবাসিগণ সেই বিকটদর্শন কামান দেখিয়া তদ্দণ্ডেই সেই চক্ষুশূলকে অপসারণ করিবার জন্য তারস্বরে চিৎকার করে। বহু প্রকারে তাহাদিগকে বলা হইল, এই ভুবনবিখ্যাত কামান ভারতের অমুক দুর্গের প্রাচীর ভগ্ন করিতে সহায় হইয়াছে, অমুক নগরে শত শত ইংরেজের প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে; এই কামানের জন্মস্থল এই নগর, অতএব এই নগর ইহাকে সম্মান না করিলে ইহার উপযুক্ত সম্মান করিবে কে?

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। নাগরিকগণ দুর্যোধনের ন্যায় সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি দানে অনিচ্ছুক এবং কতিপয় পাষণ্ড বলিল, এই কামানের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং এই কামান কোথায় কোন্ অপকর্ম করিয়াছে তাহার লুপ্ত ইতিহাস জানিবার জন্য তাহারা কিছুমাত্র ব্যগ্র নহে।

অতএব আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা যদি এই প্রতিমূর্তিগুলিকে ইংলণ্ডকে সহৃদয়তার সঙ্গে দান করি তবে তাহারা সেগুলি স্বব্যয়ে লইয়া তো যাইবেই না, পরন্তু করুণকণ্ঠে বারম্বার নিবেদন করিবে, 'আপনারা না মহাত্মাজীর শিষ্য; আমাদিগের গত অপরাধের জন্য কি এই প্রকারের নৃশংস প্রতিহিংসা লইতে হয়?'

অতএব সেই শর্করায়ও মৃত্তিকা।

২০

যাঁরা ভালো করে পৃথিবীর ইতিহাস পড়েছেন তাঁরা খাঁটি খবর দিতে পারবেন, আমি সামান্য যেটুকু পড়েছি, তার থেকে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে মহাত্মাজীর মত

মহাপুরুষ এ পৃথিবীতে দ্বিতীয় জন্মাননি।

বুদ্ধদেবকে কোনো ব্যাপক রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়নি, খৃষ্টের সামনে যে রাজনৈতিক সমস্যা এসে পড়েছিল (ইহুদীদের পরাধীনতা) তিনি তার সম্পূর্ণ সমাধান করেননি ; শ্রীকৃষ্ণ এবং মুহম্মদ অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করার আদেশ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এই চার মহাপুরুষকেই কোটি কোটি লোক শত শত বৎসর ধরে স্বীকার করে নিয়ে জীবনযাত্রার পথ খুঁজে পেয়েছে কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস মহাত্মাজী যে বুদ্ধ এবং খৃষ্টের অহিংস পন্থা নিয়ে যে রাজনৈতিক সফলতা লাভ করেছিলেন এ জিনিস পৃথিবীতে পূর্বে কখনো হয়নি। প্রেম দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে হিংসার উপর জয়ী হওয়া যায় এ-কথা পৃথিবী বহু পূর্বেই মেনে নিয়েছিল কিন্তু অস্ত্রধারণ না করে রাজনীতির ক্ষেত্রেও যে জয়ী হওয়া যায় সেই অবিশ্বাস্য সত্য প্রমাণ করে গিয়েছেন মহাত্মাজী। আমার ভয় হয়, একদিন হয়ত পৃথিবী বিশ্বাস করতেই রাজী হবে না যে মহাত্মাজীর প্রেম ইংরেজের বর্বর সৈন্যবলকে পরাজয় করতে সক্ষম হয়েছিল। অবিশ্বাসী মানুষ আজ স্বীকার করে না যীশু মৃতকে প্রাণ দিয়েছিলেন ; পাঁচশ বছর পরের অবিশ্বাসী দুটোকেই হয়ত এক পর্যায়ে ফেলবে।

* * *

পাঠক হয়ত জিজ্ঞেস করবেন, মহাত্মাজী রাজনৈতিক ছিলেন ; তিনি কোনো নবীন ধর্ম প্রচার করে যাননি। তবে কেন তাঁকে ধর্মগুরুদের সঙ্গে তুলনা করি।

নবীন ধর্ম কেন সৃষ্টি হয় তার সব কটা কারণ বের করা শক্ত কিন্তু একটি জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি। কি বুদ্ধ কি খৃষ্ট সকলকেই তাঁদের আপন আপন যুগের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সঙ্কটের সমাধান করে নিতে হয়েছিল। এ বিষয়ে পিথৌরার চর্চা বড়ই অগভীর—সে কথা পাঠককে আবার জানিয়ে রাখছি।

বুদ্ধদেবের সময় উত্তর ভারতবর্ষের বনবাদাড় প্রায় সাফ হয়ে গিয়েছে এবং ফলে আশ্রমবাসীগণ নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছিলেন। সঙ্ঘ নির্মাণ করে তাঁদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা বুদ্ধদেবকে করে দিতে হয়েছিল। 'আমার ভাণ্ডার আছে ভরে, তোমা সবাকার ঘরে ঘরে'—অর্থাৎ যৌথ পদ্ধতিতে বিরাট প্রতিষ্ঠান (সংঘ) নির্মাণ ভারতে এই প্রথম। দ্বিতীয়তঃ তখন প্রদেশে প্রদেশে এত মারামারি হানাহানি যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ভালো করে প্রসার পাচ্ছিল না। শ্রমণগণ এসব উপেক্ষা করে শান্তির বাণী নিয়ে সর্বত্র গমনাগমন করার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক অন্তরায় দূর হয়। তাই শ্রেষ্ঠীরা সব সময়ই সংঘের সাহায্যের জন্য অকাতরে অর্থ দিয়েছেন।

খৃষ্ট ইহুদীদের স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন। তবে তাঁর পন্থা ছিল ইহুদীদের নৈতিকবলে এতখানি বলীয়ান করে দেওয়া, যাতে করে পরাধীনতার নাগপাশ নিজের থেকে ছিন্ন হয়ে যায়—অরবিন্দ ঘোষও পণ্ডিচেরীতে এই মার্গেরই অনুসন্ধান করেছিলেন।

কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ যে শুধু কুরুপাণ্ডবের যোগসূত্র স্থাপনা করার জন্য কূটনৈতিক দূত তাই নন, শেষ পর্যন্ত তিনি পাণ্ডববাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদও গ্রহণ করেছিলেন।

মুহম্মদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আরবের যুযুধান, ছিন্নবিচ্ছিন্ন বেদুইন উপজাতি-গুলোকে এক করে শক্তিশালী জাতি গঠন করা।

মহাত্মাজীকে সবাই রাজনৈতিক হিসেবে মেনে নিয়েছেন কিন্তু পৃথিবীর মহা-পুরুষদের সঙ্গে তুলনা করলে তাঁকে ধর্মগুরু বলে স্বীকার করে নিলেই ঠিক হবে।

* * *

প্রশ্ন উঠতে পারে তাই যদি হয়, তবে মহাত্মাজী কোনো নবীন ধর্ম প্রবর্তন করে গেলেন না কেন?

সে তো খৃষ্টও করে যাননি। খৃষ্ট তিরোধানের বহু বৎসর পর পর্যন্তও তাঁর অনুচরগণ বুঝতে পারেননি যে তাঁরা এক নবীন ধর্মের প্রদীপ হাতে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। রামমোহন, নানকও দেখা দিয়েছিলেন ধর্মসংস্কারক রূপে,—তাঁরা বীজ রোপণ করে গিয়েছিলেন,—শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত হল নবীন ধর্ম পরবর্তী যুগে।

মহাত্মাজীর নবীন—অথচ সনাতন—ধর্ম প্রবর্তিত হতে সময় লাগবে।

সেই 'ধর্মং শরণং গচ্ছামি!'

* * *

গল্প শুনেছি এক গুরু যখন বুঝতে পারলেন তাঁর এক নূতন শিষ্য একদম গবেট তখন তাকে উপদেশ দিলেন বিদ্যাচর্চা ছেড়ে নিয়ে অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করতে। শিষ্য প্রণাম করে বিদায় নিল।

বহু বৎসর পরে গুরু যাচ্ছিলেন ভিন গাঁর ভিতর দিয়ে। একটি আধাচেনা লোক এসে নিজের পরিচয় দিয়ে গুরুকে আপন বাড়িতে নিয়ে গেল। সেই গবেট শিষ্য। গুরু তার যত্ন পরিচর্যায় খুশী হয়ে শুধালেন, "তা বাবাজী আজকাল কি করো?"

শিষ্য সবিনয় বলল, 'টোল খুলেছি।'

গুরুর মস্তকে এটম বোমাঘাত! খানিকক্ষণ পরে সামলে নিয়ে শুধালেন, 'তা কি পড়াও?'

শিষ্য বলল, 'আজ্ঞে সব কিছুই, তবে ব্যাকরণটা পড়াইনে।'

গুরু আরো আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'সে কি কথা? আমার যতদূর মনে পড়ছে তুমি তো ব্যাকরণটাই একটুখানি বুঝতে।'

শিষ্য বললে, 'আজ্ঞে, তাই ওটা পড়াতে একটুখানি বাধো বাধো ঠেকে।'

* * *

রায় পিথৌরা যে সর্ববাবদে এই শিষ্যটির মত সে কথা আর লুকিয়ে রেখে লাভ কি? এই দেখুন না, দিনের পর দিন সে সম্ভব অসম্ভব কত বিষয়ে কত 'তত্ত্ব কথাই' না বেহায়া বেশরমের মত লিখে যাচ্ছে। কারণ? কারণ আর কি? সর্ববিষয়ে যার চৌকশ অজ্ঞতা তার আর ভাবনা কি?

কিন্তু প্রশ্ন গবেট শিষ্য কিঞ্চিৎ ব্যাকরণ জানত বলে ঐ বিষয়ে পড়াতে তার বাধো বাধো ঠেকত। পিথৌরার কি সে রকম কোনো কিছু আছে?

সেই তো বেদনা, সুশীল পাঠক, সেই তো ব্যথা।

মা সরস্বতী সম্বন্ধে কোনো কিছু লিখতে বড় বাধো বাধো ঠেকে। চতুর্দিকে গণ্ডা গণ্ডা সরস্বতী পুজো হয়ে গেল। আমি গা-ঢাকা দিয়ে, কিম্বা পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি।

আর কোনো দেবতার সেবা করার মত সুবুদ্ধি আমার হয়নি—প্রথম জীবনে মা সরস্বতীই আমার স্কন্ধে ভর করেছিলেন আর আমি হতভাগা তাঁর সেবাটা কায়মনোবাক্যে করিনি বলে আজ আমার সব কিছু ভণ্ডুল বরবাদ হয়ে গিয়েছে। এখন মা সরস্বতীর দিকে মুখ তুলে তাকাতেও ভয় করে। হায়, দেবীর দয়া পিথৌরার প্রতি হয়েছিল, কিন্তু মূর্খ তাঁকে অবহেলা করে আজ এই নিদারুণ অবস্থায় পড়েছে।

* * *

হায়, আমি যদি আজ আমার এক বন্ধুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে পারতুম,

"নিতান্ত বালক যবে পুরাণের দেব-সভাস্থলে
চুপে চুপে দেখিয়াছি ইন্দ্র যম বরুণের গলে
মন্দারের মালা আর হস্তে নানা রতন সম্পদ—
বৈভব সৌন্দর্য কত। অপরূপ নর্ম লঘুপদ
উর্বশীর সম্মোহনী ইন্দ্রজাল নৃত্যচ্ছন্দময়
শুনেছি সুরের কণ্ঠে হর্ষধ্বনি আর জয় জয়।
লক্ষ্মীর বৈভব হেরি নিষ্কম্প তরুণ আঁখি মম,
মহেন্দ্র-অঞ্চলার পশ্চাতে ফিরিছে ছায়াসম।

হে পিথৌরা, আজি আমি লজ্জা নাহি মানি,
মুগ্ধ মোরে করেছিল সর্বাধিক শ্বেত বীণাপাণি।
কি মন্ত্রে সে ভানুমতী বালকের চিত্তাসনখানি
জয় করে নিয়েছিল; মর্ম তার আজও নাহি জানি।

* * *

উনবিংশ শতকের বাংলাদেশের প্রধান দার্শনিক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর কত যে এবং কী অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তার সন্ধান বাঙলা দেশ আজ আর রাখে না। অথচ সমসাময়িক যুগে বাঙলার জ্ঞান দর্শন-শাস্ত্র চর্চার উপর তিনি যে গভীর প্রভাব রেখে গিয়েছেন তা সে সময়ের যে কোনো লেখকের রচনা থেকে বোঝা যায়।

সেই দার্শনিককে একব্যক্তি বলেন, 'আপনার মত পাণ্ডিত্য বাঙলাদেশের কারো নেই—একমাত্র আপনিই বাঙলায় মন্দাক্রান্তা ছন্দে কবিতা লিখতে সক্ষম।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ আপন পাণ্ডিত্যের প্রতি ইঙ্গিত করে একখানি চতুষ্পদী মন্দাক্রান্তায় লেখেন।

ইচ্ছা সম্যক জগ দরশনে
কিন্তু পাথেয় নাস্তি
পায়ে শিকলি মন উড়ুউড়ু
এ কি দৈবের শাস্তি
টঙ্কা দেবী করে যদি কৃপা
না রহে কোনো জ্বালা
বিদ্যাবুদ্ধি কিছু না কিছু না
শুধু ভস্মে ঘি ঢালা।

দ্বিজেন্দ্রনাথেরই যখন এই অবস্থা তখন আর আমাদের ভাবনা কি?
জয় মা বীণাপাণি!

২১

স্বরাজ পাওয়ার পর একটা পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু সেটা কেউই লক্ষ্য করছেন না কারণ জিনিসটা চট করে চোখে পড়ে না।

স্বরাজ লাভের পূর্বে খুব কম বিদেশী ছেলেই ভারতে পড়াশোনা করতে আসত। পাঠক হয়ত আশ্চর্য হয়ে বলবেন, 'সেই তো স্বাভাবিক; আমাদের যে শিক্ষা-ব্যবস্থা তার থেকে তো সুস্থ মানুষ দূরে থাকতেই চাইবে। এদেশে আবার পড়াশোনা

করতে আসবে কে? টাকা থাকলে আমরাই আমাদের ছেলেমেয়েদের বিদেশে পড়াশোনা করতে পাঠাই।'

কথাটা খুব ঠিক। বাঘা বাঘা যে সব ন্যাশনালিস্টরা 'ভারতীয় ঐতিহ্য' 'ভারতীয় কৃষ্টি'র জিগির গেয়ে সভাস্থল গরম করে তোলেন তাঁরা পর্যন্ত ছেলেমেয়েকে বিদেশী ঐতিহ্যের ইস্কুল-কলেজে পড়াবার জন্য তাদের অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ পাঠান।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও বিদেশী ছেলেরা ভারতে পড়তে আসে। তার প্রধান কারণ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এবং পদ্ধতি যতই খারাপ হোক না কেন আমাদেরই মত কু-ব্যবস্থা মেলা প্রাচ্য দেশে এখনো মজুদ এবং আমাদের চেয়েও অধম ব্যবস্থা কোনো কোনো দেশে আছে।

* * *

মিশরের শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় এদেশেরই মত। তাই মিশরের লোক যদি এদেশে কালেভদ্রে আসে, তবে খুব বেশী আশ্চর্য হওয়ার কথা নয়। অবশ্যই মিশরীয়রা এদেশে আরবী পড়তে আসবে না—আমরা যে রকম সংস্কৃত পড়ার জন্য মক্কা কিম্বা মদিনায় যাইনে। তাই যে মিশরী ছেলেটি এসেছে সে শিখতে চায় মোগল-চিত্রকলার ইতিহাস।

উপযুক্ত গুরুর হাতে পড়েছে; কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারলুম, ইতোমধ্যেই বেশ খানিকটা উন্নতি করতে পেরেছে।

* * *

আমার বিশ্বাস আমাদের চেয়েও অনুন্নত কিম্বা আমাদের মত দুর্ভাগা দেশের ছেলেরা প্রধানতঃ আসবে ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি ইত্যাদি শিখতে—কিছুদিন পূর্বে শুনতে পাই, ইরান থেকে নাকি কিছু ছেলে আসবে কৃষি-বিদ্যা শিখতে। এবং তারপর আসবে আমাদের চারুকলার নিদর্শন দেখতে এবং তার ইতিহাস শিখতে। সাহিত্য বা দর্শন শিখতে যে বেশী ছেলে আসবে না সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ কারণ সংস্কৃত শেখার ব্যবস্থা ভারতের বাইরে প্রাচ্য দেশে নেই বললেও চলে, তাই তারা সে বাবদে প্রাথমিক উৎসাহ পাবে না এবং দর্শনের চর্চা আজ পৃথিবীর সর্বত্রই কমে আসছে।

কিন্তু চারুকলা সম্বন্ধে সকলেরই কৌতূহল ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে কাইরো আনকারায় যে ভারতীয় চিত্র প্রদর্শনী খোলা হয় সেগুলোতে বিস্তর লোক এসেছিল এবং প্রেস সেগুলোর প্রচুর সুখ্যাতি করেছে। (কাইরোতে গত বৎসর ভারতীয় নর্তক-নর্তকীরা রাজার মত সম্মান এবং রাজ-সম্মানও পেয়েছিলেন)।

শুধু তাই নয়, ওরাও আমাদের দেখাতে চায়। কিছুদিন পূর্বে ইন্দোনেশী চারুকলা প্রদর্শনী দিল্লীতে হয়ে গেল সে কথা সকলেই জানেন। আর রুশকে যদি আধা-প্রাচ্য জাত বলা হয়, তবে রুশ কলা-প্রদর্শনীর কথাও স্মরণ করতে হয়।

* * *

এই যে মিশরি ছেলেটি এসেছে মোগল চিত্রকলার ক্রমবিকাশের ইতিহাস শিখতে, এরপর আসবে আরো ছাত্র আমাদের প্রাচীনতর চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য শিখতে।

কিন্তু এ সব পড়াবার ব্যবস্থা আমাদের ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে? এই যে সব ছেলেরা আসছে এবং আসবে তারা যখন দেখবে আমাদের সাধারণ শিক্ষিত লোক আমাদের চারুকলার কোনো মর্মই বোঝে না, কোনো তত্ত্ব রাখে না তখন তারা ভাববেই বা কি?

এদিকে নিমন্ত্রিতেরা এসে পড়েছেন ওদিকে রান্নার কোনো প্রকার আয়োজন নেই। 'আরেক ছিলিম তামাক ইচ্ছে করুন',—অর্থাৎ টালবাহানা দিয়ে—আর কতক্ষণ এদের ঠেকিয়ে রাখা যাবে?

* * *

এই সম্পর্কে পণ্ডিতবর আবু রয়হান মুহম্মদ বিন্ আহম্মদ অল বীরূনীর নাম মনে পড়ল।

কয়েকদিন পূর্বে কলকাতায় তাঁর সহস্রতম জন্মোৎসব হয়ে গেল। ইরান আফগানিস্থান আরো নানাদেশে এ উৎসব সমাধা হচ্ছে।

অল বীরূনী ছিলেন ফিরদৌসির মত গজনীর মাহমুদের সভাপণ্ডিত। ফিরদৌসির নাম অনেক বাঙালী শুনেছেন—যখন বাঙলা দেশে ফার্সী চর্চা ছিল তখন এক বাঙালী কবি ফিরদৌসি মাহমুদকে গালাগাল দিয়ে যে কবিতা লিখেছিলেন তার অনুবাদ পর্যন্ত করেন :—

রাজা যদি হইতেন রাণীর কুমার
মণিময় তাজ শিরে দিতেন আমার।

অল বীরূনী সম্বন্ধে এক বাঙালী লেখক লিখেছেন :—

"মাহমুদের ইতিহাস নূতন করে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁর সভাপণ্ডিত অল বীরূনীর কথা বাদ দেবার উপায় নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে ছয়জন পণ্ডিতের নাম করলে অল বীরূনীর নাম করতে হয়। সংস্কৃত-আরবী অভিধান ব্যাকরণ সে যুগে ছিল না (এখনো নেই), অল বীরূনী ও ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে

কোনো মাধ্যম ভাষা ছিল না। তৎসত্ত্বেও এই মহাপুরুষ কি করে সংস্কৃত শিখে, হিন্দুর জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, কাব্য, অলঙ্কার, পদার্থবিদ্যা রসায়ন সম্বন্ধে 'তহকীক-ই-হিন্দ্' নামক বিরাট গ্রন্থ লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন সে এক অবিশ্বাস্য প্রহেলিকা।

'একাদশ শতাব্দীতে অল-বীরূনী ভারতের সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ লিখেছিলেন—প্রত্যুত্তরে আজ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় আফগানিস্থান (ইরান) সম্বন্ধে পুস্তক লেখেননি। এক দারাশীকুহ ছাড়া আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কেউ আরবী ও সংস্কৃতে এ রকম অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখাতে পারেননি।'

এতে কিছুই বলা হল না।

ভালো করে বলবার জন্য যে জায়গার প্রয়োজন তাও এখানে নেই। তাই শুধু অল-বীরূনী যে সব সংস্কৃত বই পড়ে তাঁর কেতাব লিখেছিলেন তার কয়েকটির নাম দেওয়া হল :—

সাংখ্য, পাতঞ্জল, গীতা, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্য পুরাণ, বায়ু পুরাণ, আদিত্য পুরাণ, পুলিস সিদ্ধান্ত, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, খণ্ডখাদ্যক, উত্তর খণ্ডখাদ্যক, বৃহৎ সংহিতা সিদ্ধান্তিকা, বৃহৎ জাতকং, লঘু জাতকং, করণসার, করণতিলক।

অনেকের মনে হতে পারে অল-বীরূনী হয়ত ক্রীশ্চান মিশনারিদের মত হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু ধর্মকে নিন্দা করার জন্য তাঁর বই লিখেছিলেন। তাই তাঁর ভাষাতেই বলি।

'এ বই তর্কাতর্কির বই নয়। হিন্দুদের কাছ থেকে শুধু সে সব সিদ্ধান্তই আমি তুলিনি যেগুলো যুক্তি দিয়ে ভুল প্রমাণ করা যায়। বরঞ্চ বলি, আমার পুস্তকখানিতে সুদ্ধমাত্র তাদের তত্ত্ব ও তথ্যের ঐতিহাসিক বর্ণনা দেওয়া হল। হিন্দুদের বিশ্বাস ও চিন্তার আমি হুবহু বর্ণনা দেব এবং পরে গ্রীকদের বিশ্বাস ও চিন্তার উল্লেখ করে দেখাব এই দুই জাতের মধ্যে মিল রয়েছে।'

আশ্চর্য! ১০৩০ খৃষ্টাব্দে লোকটি গ্রীক ও ভারতীয় দর্শনের মিল দেখতে পেয়েছিলেন!

* * *

রায় পিথৌরা ভয়ঙ্কর বেরসিক লোক আমি ঠিক বুঝে গিয়েছি। 'মিস্ কলকাতা অর্থাৎ শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রহমানকে রায় পিথৌরা চেনে তার বিয়ের পর থেকেই অথচ তার মনে কখনো সন্দেহ জাগেনি যে এঁর সৌন্দর্য এমনই মারাত্মক রকমের যে ইনি একদিন সুন্দরীদের মধ্যে কুতুব মিনার হয়ে উঠবেন।

তবে হাঁ, ইন্দ্রাণীকে নিয়ে রাস্তায় বেরুলেই লক্ষ্য করতুম পথচারীরা আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। একদিন ইন্দ্রাণীকে বললুম, 'তোমাকে নিয়ে রাস্তায় বেরনো মুশকিল। সবাই কি রকম প্যাট প্যাট করে তাকায়। অস্বস্তি বোধ হয়।'

ইন্দ্রাণী বললে, 'ছোঃ! আমার দিকে তাকাবে কেন? তাকাচ্ছে তোমার দিকে।'

!!! বলে কি! তবে হাঁ, ইন্দ্রাণীর সৌন্দর্যের পরই কলকাতায় সে যুগে দ্রষ্টব্য বস্তু ছিল রায় পিথৌরার গগনচুম্বী পাতালস্পর্শী টাক।

এর থেকে বোঝা গেল, ইন্দ্রাণীর বুদ্ধি আছে। ক্যাসা কায়দায় আপন বিনয় আর ভদ্রতা দেখিয়ে দিল।

কিন্তু আমার বিশ্বাস ইন্দ্রাণীর রূপের চেয়ে গুণ অনেক বেশী।

ইন্দ্রাণী বহু পরিশ্রম আর অনেক সাধনা করে উত্তম ভরত নাট্য শিখেছে। আসছে বার নাচ দেখালে 'মিস্ কলকাতাকে' মিস করবেন না।

* * *

সেদিন এক অবাঙালী পিথৌরাকে ধাঁতিয়ে গেলেন। পিথৌরা নাকি বড্ড বেশী 'বাঙালী' 'বাঙালী' বলে চ্যাঁচাচ্ছে।

আরে বাপু, রায় পিথৌরা কে এমন কেষ্ট-বিষ্টু যে তার চিৎকারে কারো কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হবে?

একটা গল্প মনে পড়ল।

পূর্ব বাঙলার গয়না নৌকো ঘাটে ভিড়তেই ভাড়াটেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে সব জায়গা দখল করে নিল। একটা চাষা ধরনের লোক কিছুতেই ঢুকতে না পেরে ছইয়ের বাইরে সেই হিমে বসে রইল।

জায়গা দখলপর্ব শেষ হতে ভিতরে আলাপচারি আরম্ভ হয়েছে।

'আপনার নাম?'

'আজ্ঞে, তারাপদ হালদার। আপনার?'

'আজ্ঞে কেষ্টবিহারী পাল।'

তৃতীয় ব্যক্তিকে, 'আর আপনার?'

'আজ্ঞে শশধরচন্দ্র গুণ।'

করে করে নৌকোর ভিতরকার সকলের চেনাশোনা শেষ হল। তখন এক মুরুব্বী বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার নামটা তো জানা হল না, বাবাজীবন।'

লোকটি অতিশয় সবিনয় বললে, 'আজ্ঞে, আমার নাম,—আজ্ঞে আমার নাম

পাঁচকড়ি বৈঠা।'

'বৈঠা! এ আবার কি বিদঘুটে পদবী রে বাবা! বাপের জন্মে শুনিনি।'

লোকটি আবার বৈষ্ণবতর বিনয়ে বলল, 'আজ্ঞে, আপনারা,—হালদার, পাল, গুণ সব নৌকোর ভিতরে বসে আছেন। নৌকো চালাবে কে? তাই আমি বৈঠা একা একাই নৌকো চালাচ্ছি।'

বাঙালী কেষ্টবিষ্টুরা নৌকোর ভিতরে বসে আপন ধান্দায় মশগুল। তাই রায় পিথৌরা বৈঠা হরবকৎ চেল্লাচেল্লি করে।

২২

পিথৌরাকে ধমক দেওয়া হয়েছে, তিনি কেন মাঝে মাঝে 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে' এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় একই মাল পরিবেষণ করেন।

উত্তরে নিবেদন, আগাগোড়া একই বস্তু পিথৌরা দুই কাগজে কখনো লেখেন না। তবে মাঝে মাঝে দু-একটি বিষয় এমনই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় যে, তখন সেগুলো উভয় কাগজে উল্লেখ না করে থাকা যায় না।

এই ধরুন, কাল যদি ওখলায় বেড়াতে গিয়ে দেখি, যমুনার জল উজান বইছেন—পদাবলীতে এরকম অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে, কিন্তু স্বচক্ষে কখনো দেখিনি—তাহলে সে ঘটনার বয়ান কি উভয় কাগজেই দেওয়া উচিত নয়? আমার ক'জন পাঠক আর 'আনন্দবাজার' 'হিন্দুস্থান' দুটোই পড়েন যে, এরকম একটা ঘটনা একদলকে বিলকুল জানাবো না?

যাঁরা বাঙলায় রায় পিথৌরা পড়তে পারেন, তাঁরা যে কোন্ দুঃখে ইংরিজিতে পড়েন, তা-ও তো বুঝতে পারিনে। রস আর আড্ডা জমাবার জন্য ইংরিজি কি একটা ভাষা!

* * *

এই ধরুন, গেল সপ্তায় এখানে যা হল সে অভূতপূর্ব।

রাষ্ট্রপতি ভবনে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চারজন একনিষ্ঠ সাধককে স্বহস্তে চারখানা শাল গলায় পরিয়ে দিলেন। দিল্লী শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের ওস্তাদ ইহুদী মেনুহীনও আনন্দের আতিশয্যে ঘন ঘন করতালি দিচ্ছিলেন।

'রাষ্ট্রপতি ভবন' বলাতে ঘটনার পরিবেশ ঠিক ঠিক ওৎরালো না। যদি বলতুম, 'ভাইসরিগেল লজে' কাণ্ডটা ঘটলো তাহলে পাঠক খানিকটা আমেজ করতে পারতেন। কারণ বড়লাট আদরকদর করতেন, তাঁরই জাতভাই সায়েব-

সুবোদের কিংবা রাজা-রাজড়াদের।

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর পরনে ছিল কুর্তা আর পাজামা—মাথায়ও কাপড়ের টুপি। এ বেশ পরে 'ভাইস'দের আমলে ওস্তাদজী নিশ্চয়ই সেখানে আমল পেতেন না, সম্মান পাওয়ার কথা দূরে থাক—সে খেয়ালি পোলাও খেতে যাবেন না।

সাদাসিধে কাপড়-জামা-পরা ওস্তাদ আলাউদ্দীন সাহেব যখন শান্ত মুখচ্ছবি নিয়ে রাষ্ট্রপতির সামনে দাঁড়ালেন, আর তিনি সহাস্যবদনে ওস্তাদের কাঁধে শাল রাখলেন, তখন আমার ইচ্ছে হচ্ছিল, চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে বলি, 'সাধু, সাধু, সাধু!'

'সাধু, সাধু' বলার রেওয়াজ এখনো এদেশে ফের চালু হয়নি, কিন্তু সে নিয়ে আমার মনে কোনো আক্ষেপ নেই। সভাস্থলে যা করতালি-ধ্বনি উঠলো, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, দেশের লোক ভারী খুশী আমাদের অনাদৃত অবহেলিত গুণীরা যে রাজ-সম্মান পেলেন। রাষ্ট্রপতিকে আমি বহু জায়গায় বহু সার্টিফিকেট-সনদ দিতে দেখেছি, কিন্তু এই চারজন ওস্তাদকে সম্মান দেখাবার সময় তাঁর মুখে যে আনন্দ ফুটে উঠেছিল, তার থেকে বোঝা গেল, তিনিও ওস্তাদদের সম্মান দেখাতে পেরে খুশী হয়েছেন। এবং সত্যই তো, শুধু যে ওস্তাদরা সম্মানিত হলেন তাই নয়, এঁদের সম্মান দেখিয়ে রাষ্ট্রও তো সম্মানিত হল।

* * *

আলাউদ্দীন সাহেব অতিশয় নিরভিমান ও ধর্মভীরু লোক। তিনি শান্ত মুখে দাঁড়িয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে কি কোনো তোলপাড় চলছিল না? প্রথম যৌবনে যেদিন তিনি মা সরস্বতীকে বরণ করে নিয়েছিলেন, সেদিন কি তিনি আশা করতে পেরেছিলেন যে, এমন দিনও আসবে, যখন তিনি রাষ্ট্রপতির স্বহস্তে সম্মানিত হবেন? আজীবন তো তিনি দেখলেন উচ্চাঙ্গ সংগীতের লাঞ্ছনা অবমাননা। বরঞ্চ তাঁর বাল্যকালে সে সঙ্গীতের অনেকখানি কদর ছিল, তারপর ষাট-সত্তর বৎসর ধরে তিনি তাঁর চোখের সামনে দেখলেন, কত ওস্তাদ না খেয়ে মারা গেলেন, কত মেধাবী তরুণ উৎসাহের অভাবে আপন প্রতিভার বিকাশ করতে পারল না। ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে সর্বস্বান্ত হওয়ার নিদারুণ বেদনা অনেক সাংসারিক লোকই জানেন, কিন্তু এখানে তাঁর চোখের সামনে যা গেল, সে তো তাঁর আপন বিত্ত নয়—যুগ-যুগ সঞ্চিত তাবৎ দেশের সঞ্চিত সঙ্গীত-সম্পদ যে তাঁর চোখের সামনে ভেসে গেল।

না, তা তো নয়। আলাউদ্দীন সাহেবের আজ বড় আনন্দ, ভারতীয় সঙ্গীত

আর লোপ পাবে না। রাষ্ট্রের, দেশের, দশের সকলেরই সস্নেহ দৃষ্টি পড়েছে ওস্তাদের উপর, অর্থাৎ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের উপর।

* * *

ওস্তাদ মুশ্‌তাক হুসেন খানও অতিশয় বিনয়ী লোক কিন্তু তিনি অত্যন্ত প্রাণবন্তও বটেন। রাজ-সম্মান পেয়ে তাঁর মুখে দম্ভ ফুটে ওঠেনি, তিনি হলেন উল্লসিত এবং অভিভূত।

তাই তিনি যখন গান গাইতে আরম্ভ করলেন, তখন তাঁর গলা দিয়ে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। আর সে কী গলা—ওঠানো-নামানোর কায়দা! উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম, আকাশ-পাতাল সব দিক থেকে তিনি যেন টেনে এনে নয়া নয়া ধ্বনি নয়া নয়া সুর আপন গলার ভিতর দিয়ে বের করতে লাগলেন। কখনো গম্ভীর উচ্চকণ্ঠে—সে কণ্ঠ নিষ্কম্প প্রদীপশিখার মত যেন স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পেলুম—আর কখনো যেন নির্ঝরিণীর গতিবেগের মত, কখনো আবার তাঁর গলা থেকে মারবেলের গুলীর মত গোল গোল তানের সারি পিল পিল করে বেরুতে লাগল।

আর কী উৎসাহ, কী উদ্দীপনা! ঘন ঘন শাকরেদদের দিকে তাকান, ভাবখানা এই, 'পছন্দ হচ্ছে তো'? সমের সময় তবলচির দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসির ইশারা মারেন, আদর দেখিয়ে তাম্বুরাওলার কাঁধে কাঁধ রেখে স্বর যাচাই করে নেন, আর মাঝে মাঝে দু' হাত দিয়ে কানের ডগা ছুঁয়ে আপন অশরীরী ওস্তাদের সামনে যেন নিজের অপূর্ণতার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করছেন।

বহু বাঘা ওস্তাদের মজলিসে শাকরেদদের বিবর্ণমুখে বসে থাকতে দেখেছি। মেহেরবান মুশ্‌তাকের সামনে তারা আনন্দে ফেটে পড়ার উপক্রম। গুরুর দিকে তারা তাকাচ্ছিল যেন শ্রীরাধা গোপীজনবল্লভের দিকে তাকাচ্ছেন।

ওস্তাদ মুশ্‌তাকের চেয়েও ভালো ওস্তাদের গান আমি শুনেছি, কিন্তু ওরকম প্রাণবন্ত, সচল রঙ্গে রঙ্গে রঙ্গিমা সঙ্গীত আমি পূর্বে কখনও শুনিনি।

* * *

দাক্ষিণাত্যের আইয়ার ও আয়াঙ্গারকে দেখেই মনে হল, এঁরা দুজনই অতিশয় ধর্মভীরু সজ্জন। দক্ষিণের ব্রাহ্মণবাড়ীতে থাকার সুযোগ আমার জীবনে বহুবার হয়েছে। সঙ্গীতের প্রতি তাঁদের অনুরাগ গৃহদেবতার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

বিশ্বাস করবেন না, দক্ষিণের এক আইয়ার ব্রাহ্মণের বাড়িতে সঙ্গীতোৎসবের শেষে পাঁচটি (একটি নয়, দুটি নয়, পাঁচটি) তামিল কন্যাকে আগাগোড়া 'জনগণমন অধিনায়ক' গাইতে শুনলুম। হাতে তাদের গানের বই ছিল না; তবু 'রাত্রি

প্রভাতিল' শেষ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত তারা একবার মাত্র না থেমে গড় গড় করে গেয়ে গেল—অবশ্য দক্ষিণী কায়দায়।

শুধাই, এই বাঙলা দেশেই ক'টি ছেলেমেয়ে তাবৎ 'জনগণমন অধিনায়ক' কণ্ঠস্থ বলতে পারে ?

আসল কথায় ফিরে যাই।

দক্ষিণী গুরুরা দুই সম্মান পেলেন। রাজ-সম্মান এবং উত্তর ভারতের সম্মান। উত্তর ভারত দক্ষিণী গানের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়, সেকথা আপনি আমি বিলক্ষণ জানি, কিন্তু গুরুদের পয়লা সা আর পয়লা পিড়িঙের সঙ্গে সঙ্গেই সভাস্থ তামাম উত্তর ভারত বে-এক্তেয়ার। দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি সঙ্গীত-রসজ্ঞাকে আমি এখানে চিনি। দেখি, তাঁরা চোখ বন্ধ করে চেয়ারে মাথা হেলিয়ে দিয়েছেন। একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

কণ্ঠে এবং যন্ত্রে যে এত গোপনবাণী লুকানো আছে, কে জানত ? রায় পিথৌরা মূর্খ এবং অরসিক—সঙ্গীতের সে কিছুই বোঝে না, তাই সব জিনিসই তার ভালো লাগে। তাই যদি নিবেদন করি, দক্ষিণী সঙ্গীতের তত্ত্ব না বুঝেও যদি তার মর্মে সাড়া জেগে উঠে, তবে কি স্বীকার করবেন না গুরুদের সঙ্গীত পশুর প্রাণেও মানবতা জাগাতে পারে। কিন্তু রায় পিথৌরা চুলোয় যাক ; দেখি, উত্তর ভারতীয় উন্নাসিকেরাও মুগ্ধ হয়ে দক্ষিণ ভারতের কৃতিত্বকে যেন উদ্বাহু হয়ে অভ্যর্থনা করছেন।

উত্তর-দক্ষিণের এরকম মিলন আমি এর আগে কখনো দেখিনি।

* * *

আলাউদ্দীন সাহেব আমার দ্যাশের লোক। ভেবেছিলুম তাঁকে কত কথা বলব। গলা ভেঙে গেল, কিছুই বলতে পারলুম না। রবীন্দ্রনাথের নাতনী নন্দিতাও সঙ্গে ছিল। ওস্তাদকে সেলাম করল। ওস্তাদ বললেন, 'মা, কত দিন পরে দেখা !'

ওস্তাদ মুশ্‌তাক হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে বেরুচ্ছিলেন তাঁর বন্ধু কাশ্মীরী পণ্ডিত হাকসার। আমি লখনওয়ী কায়দায় ঝুঁকে ঝুঁকে তাঁকে তিনবার কুর্নিশ করলুম। ওস্তাদ সদয় হাসি হেসে (এবং সবিনয়ে) আমার কুর্নিশ নিলেন দেখে আমার আর সেদিন মাটিতে পা পড়েনি।

* * *

ততক্ষণে দক্ষিণী গুরুরা চলে গিয়েছেন।

তাঁদের প্রণাম করতে পারলুম না বলে মনে আক্ষেপ নেই। ভক্তি থাকলে

অদৃশ্যে প্রণামও যথাস্থানে পৌঁছয়।

* * *

নিরপেক্ষ পাঠক, এইবার বলো তো 'হিন্দুস্থানে' এ-বয়ানে ইংরিজিতে লিখেছি বলে বাঙলায় যদি আনন্দবাজারে না লিখতুম তাহলে তোমার প্রতি অবিচার করা হত না?

২৩

খবর এসেছে নাগপুরে জাপানী ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে। অতি উত্তম প্রস্তাব।

ভারতবর্ষ আজব দেশ। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজের মত বড় বড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে জাপানী ভাষা পড়াবার ব্যবস্থা নেই—ওদিকে এদের তুলনায় ক্ষুদ্র নাগপুরে জাপানী পড়াবার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ঠিক তেমনি আজ যদি আপনি উত্তম চীনা ভাষা শিখতে চান তবে আপনাকে যেতে হবে হয় শান্তিনিকেতন নয় পুণায়। অন্য জায়গায় বিশেষ কোনো বন্দোবস্ত নেই।

(এই দিল্লী শহরে বহুভাষা শেখাবার কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু সেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার নেই।)

নাগপুরে পুণায় জাপানী চীনা শেখাবার বন্দোবস্ত, অথচ বড় বড় শহরে নেই। এ যেন সেই মাকড় সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গের ধাঁধা, কোথায় জাল আর কাথায় জেলে— ?

আট পা আঠারো হাটু,
জাল ফালাইতা গেল ঘাটু।
শুকনায় ফালাইয়া জাল
মাছে উঠি দিলা ফাল!

—কোথায় ভাষা শেখার ব্যবস্থা, আর কোথায় ভাষা-শিখনেওলা!

* * *

ওদিকে আজ্জম পাশা বলছেন ভারত এবং আরব মুল্লুক এক হয়ে প্রাচ্যের প্রধান শক্তি তৈরী হবে, এদিকে আমরা ভারতবর্ষে বলছি, আলবৎ, আমরা জগৎকে জীবননীতির তৃতীয় পন্থা বাৎলাবো ইত্যাদি কতই না বাক্যাড়ম্বর।

যেসব ঐক্যের স্বপ্ন আমরা দেখছি সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন ভাষা না শিখে কি করে বাস্তবে পরিণত হবে কেউ আমায় বুঝিয়ে বলতে পারেন?

লণ্ডনে প্রাচ্য এবং আফ্রিকার নানা ভাষা শেখার জন্য বিরাট প্রতিষ্ঠান রয়েছে —প্যারিসেও তাই। জর্মনির ছোট ছোট বিশ্ববিদ্যালয়েও বহুতর ভাষা শেখা যায় (এক সংস্কৃতের জন্যই জর্মনির এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচজন সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন—সংস্কৃত শিখত মাত্র একটি ছেলে ও তাও এডিশনাল হিসেবে), ইটালিতে প্রাচ্য ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা বহু দিনের অথচ এই বিরাট ভূমি ভারতে যেটুকু ব্যবস্থা আর সেকথা নিজেদের ভিতর তুলতেও লজ্জা বোধ করে।

শুনেছি, আমাদের ফরেন আপিসের একদা তিন চার শ লোকের প্রয়োজন হয়েছিল এবং ভাষা জাননেওলা উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া গিয়েছিল মাত্র আট না দশজন!

তবুও ভাষা শেখাবার কোনো ব্যাপক ব্যবস্থা কোথাও হচ্ছে না।

মাদ্রাসাগুলো মরে যাচ্ছে—আরবী-ফার্সির চর্চা কমে আসছে।

আর সংস্কৃত তো "ডেড ল্যানগুইজ"। তাই টোলগুলো মরুক—আপত্তি নেই!!

কী দেশ!

* * *

দিল্লীর বিখ্যাত সাধু নিজামউদ্দীন আওলিয়ার প্রখ্যাত সখা এবং শিষ্য কবি আমির খুসরোর জন্মোৎসব কয়েক দিন হল আরম্ভ হয়েছে। আমির খুসরোর কবর নিজামউদ্দীনের দরগার ভিতরেই—এবং সে দরগা হুমায়ুনের কবরের ঠিক সামনেই। (এ দর্গায় আরো বহু বিখ্যাত ব্যক্তির কবর আছে।)

খুসরোর পিতা ইরাণের বল্‌খ্‌ (সংস্কৃত বল্‌হীকম—ভারতীয় কোনো কোনো নৃপতি বল্‌খ পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেছিলেন বলে কিম্বদন্তী আছে) থেকে ভারতবর্ষে আসেন। পুত্র খুসরো কবিরূপে দিল্লীর বাদশাহদের কাছে প্রচুর সম্মান পান।

ফারসী তখন বহু দেশের রাষ্ট্রভাষা। উত্তর ভারতবর্ষ (ফার্সী এদেশের ভাষা নয়) আফগানিস্থান (সে দেশেরও দেশজ ভাষা পুশতু) তুর্কীস্থান (তারও ভাষা চুগতাই) এবং খাস ইরাণে তখন ফার্সীর জয়-জয়কার। এমন কি বাঙলা দেশের এক স্বাধীন নৃপতি কবি হাফিজকে বাঙলা দেশে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

খুসরো ফার্সীতে অত্যুত্তম কাব্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন। ভারতের বাইরে বিশেষ করে কাবুল-কান্দাহার এবং সমরকন্দ-বোখারা খুসরোকে এখনও মাথার মণি করে রেখেছে।

আলাউদ্দীন খিলজী, তাঁর ছেলে খিজর খান, বাদশা গিয়াসউদ্দিন তুগলুক,

তাঁর ছেলে বাদশা মুহম্মদ তুগলুক (ইংরেজ ঐতিহাসিকদের 'পাগলা রাজা') এঁরা সবাই খুসরৌকে খিলাত-ইনাম দিয়ে বিস্তর সম্মান দেখিয়েছেন।

গুজরাতের রাজা কর্ণের মেয়ে যখন দিল্লী এলেন তখন তাঁর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে রাজকুমার খিজর খান তাঁকে বিয়ে করেন। ইংরেজের মুখে শুনেছি, বিয়ে নাকি প্রেমের গোরস্তান, অর্থাৎ বিয়ে হওয়ার পরই নাকি সর্বপ্রকারের রোমানস্ হাওয়া হয়ে যায়। এখানে হল ঠিক তার উল্টো। এঁদের ভিতর যে প্রেম হল সে প্রেম পাঠান-মোগল হারেমের গতানুগতিক বস্তু নয়—তাই অনুপ্রাণিত হয়ে খুসরৌ তাঁদের প্রেমকাহিনী কাব্যে অজর অমর করে দিলেন। সেই কাব্যের নাম 'ইশকিয়া'—বাঙলা ভ্রমণের সময় সম্রাট আকবর সেই কাব্য শুনে বারম্বার প্রশংসা করেছিলেন। কর্ণের মেয়ের নাম দেবলা দেবী। শুনেছি, বাঙলায় নাকি 'দেবলা দেবী' নাটক বহুবার অভিনীত হয়েছে।

গিয়াসউদ্দীন তুগলুক নিজামউদ্দীনকে দু'চোখে দেখতে পারতেন না। সে কাহিনী 'দৃষ্টিপাতে' সালঙ্কার বর্ণিত হয়েছে—'দিল্লী দূর অস্ত!' কিন্তু গিয়াস নিজামের মিত্র খুসরৌকে রাজসম্মান দিয়েছিলেন। খুসরৌ বড় বিপদে পড়েছিলেন,—একদিকে সখার উপর বাদশাহী জুলুম, অন্যদিকে তিনি পাচ্ছেন রাজসম্মান।

মুহম্মদ তুগলুক রাজা হওয়ার পর তাবৎ মুশকিল আসান হয়ে গেল। ঠিক মনে নেই (পোড়ার শহর দিল্লী—একখানা বই পাইনে যে অর্ধবিস্মৃত সামান্য জ্ঞানটুকু ঝালিয়ে নেব), বোধ হয় খুসরৌ বাদশা মুহম্মদের লাইব্রেরিয়ান ছিলেন।

সে এক অপূর্ব যুগ গেছে। সাধক নিজামউদ্দীন, সুপণ্ডিত বাদশা মুহম্মদ তুগলুক, ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরণী এবং সভাকবি আমির খুসরৌ।

প্রথম দেহত্যাগ করলেন শেখ-উল-মশাইখ নিজামউদ্দীন আওলিয়া, তারপর তাঁর প্রিয়সখা আমির খুসরৌ, তারপর বাদশা মুহম্মদ শাহ তুগলুক এবং সর্বশেষ জিয়া বরণী'।

ইংরেজ আমাদের কত ভুল শিখিয়েছে। তার-ই একটা—এসব গুণীরা ফার্সীতে লিখতেন বলে এঁরা এ-দেশকে ভালোবাসতেন না। বটে? সরোজিনী নাইডু ইংরিজিতে লিখতেন, তাই তিনি ভারতবর্ষকে ভালোবাসতেন না!

খুসরৌ মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে ভালোবাসতেন এবং সে ভূমির অশেষ গুণকীর্তন করে গিয়েছেন।

এবং দূরদৃষ্টি ছিল বলে তিনি যেটুকু দেশজ হিন্দী জানতেন (হিন্দীরও তখন শৈশবাবস্থা) তাই দিয়ে হিন্দীতে কবিতা লিখে গিয়েছেন।

শুধু তাই নয়, ফার্সী এবং হিন্দী মিলিয়ে তিনি উর্দুর গোড়াপত্তন করে গিয়েছেন—জানতেন একদিন সে ভাষা রূপ নেবেই নেবে।

আবার বিপদে পড়লুম; হাতের কাছে বই নেই তাই চেক-আপ করতে পারছিনে—পণ্ডিত পাঠক অপরাধ নেবেন না—যেটুকু মনে আছে নিবেদন করছি—

'হিন্দু বাচ্চেরা ব নিগর্ আজব হুসন্ ধরত হৈ
দর্ ওক্‌তে সুখ্‌ন্ জদন মুহ ফুল ঝরত হৈ
গুফ্‌তম "কে বি আ আজ লবেৎ বোসে বিগরীম—"
গুফ্‌ৎ "আরে রাম! ধরম নষ্ট করত হৈ"!'

*

হিন্দু বাচ্চা কী অপূর্ব সৌন্দর্যই না ধারণ করে,
কথা বলার সময় মুখ থেকে যেন ফুল ঝরে।
বললুম, 'আয়, তোর ঠোঁটে চুমো খাব—'
বললে, 'আরে রাম! ধর্ম নষ্ট্ করত হৈ!'

অপ্রকাশিত পত্রাবলী

[সৈয়দ মুজতবা আলীর এই পত্রগুলি রাজশেখর বসুর দৌহিত্রী-পুত্র শ্রীদীপংকর বসুকে লিখিত। শ্রীদীপংকর বসুর সৌজন্যে পত্রগুলি প্রকাশিত হল। এ ছাড়াও অনেক মূল্যবান, আলোচনাপূর্ণ পত্র সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলীর একাদশ খণ্ডে স্থান পাচ্ছে। রাজশেখরবাবুকে সৈয়দ মুজতবা আলী কি পরিমাণ শ্রদ্ধা করতেন, তা প্রতিটি পত্রেই উজ্জ্বল ভাবে পরিস্ফুট। প্রায় সম পরিমাণ স্নেহ শ্রীদীপংকর বসুর প্রতি প্রকাশ পেয়েছে। এই চিঠিগুলিতে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ছাড়াও সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে লেখক গভীর ভাবে আলোচনা করেছেন। লেখকের ব্যক্তিমানস বোঝার পক্ষে এবং তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে এই পত্রগুলি পাঠক-গবেষকের অবশ্যই প্রয়োজনে লাগবে তাতে সন্দেহ নেই।

—সম্পাদক]

স্নেহের দীপংকর,

আমার আশ্চর্য বোধ হয়, রাজশেখরবাবু যে বাড়িতে আছেন, একদিন যে বাড়ির গদিতে তুমি বসবে, অর্থাৎ তিনি যে বেঞ্চিটায় বসেন সেটাতে বসে তুমি তাঁরই মত অতিথি অভ্যাগতকে আপ্যায়িত করবে—তখন অন্য লোকের অটোগ্রাফ সঞ্চয় করার তোমার কি প্রয়োজন ? ফার্সীতে বলে 'এক বাচ্চা-ই-বাবুর বস্ অস্ত্' (এর সবকটা শব্দই তোমার জানা থাকার কথা : বাবুর — সিংহ ; বস্ — ব্যস — যথেষ্ট ; অস্ত্ — সংস্কৃত অস্তি) 'সিংহের একটি বাচ্চাই যথেষ্ট', কুক্কুরীর মত সে লিটার প্রসব করে না। আমাদের গুরুদেবও মধুরতর করে বলেছেন, 'The rose which is single need not envy the thorns which are many !' (কবি হাইনে আরেক কদম এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, 'এবং সিংহশিশু যখন কুকুরের চেয়েও ছোট থাকে তখনো তার ক্ষুদ্র আঁচড় থেকে বোঝা যায়, ওটা সিংহের আঁচড় !' এক বুড়ো রাবিশ কবি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'গ্যোটের ছেলেবেলার কবিতা থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায় এটা সিংহ-শিশুর আঁচড়, অমুকের বৃদ্ধ বয়সের কবিতা থেকেও বোঝা যায় ওটা ইঁদুরের আঁচড়।)

তাই রাজশেখরবাবুকে একখানা ডাইরি দিয়ে বলো, তাঁর মনে যখন যা কিছু আসে সেইটে যেন তোমার জন্য লিখে রাখেন। তুমি বড় হয়ে প্রতিদিন তারই মাত্র একটি করে পড়বে, এবং তাঁর অনুপস্থিতিতেও তাঁর সান্নিধ্য লাভ করবে।

আর শশিশেখরবাবুর* লেখা পড়ে আমার নিজের লেখার প্রতি ঘৃণা ধরে। এ লোকটা অত দেরিতে কলম না ধরে যদি যৌবনে আরম্ভ করতেন তবে আর সবাইকে কানা করে দিতেন। শুনেছি ওঁর পিতাও নাকি একটি খাণ্ডার ছিলেন। আমি যেদিন প্রথম রাজশেখরবাবুর নাম শুনি তখনই সন্দেহ করেছিলুম যে নামদাতা পণ্ডিত এবং রসিক লোক। তবু ভাবলুম, এটা হয়তো accident. তার

* শশিশেখর : শশিশেখর বসু। রাজশেখর বসুর অগ্রজ। ইনি পরিণত বয়সে ইংরাজী ও বাংলা দুই ভাষাতেই সরস ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। তাঁর সব রকম লেখা অত্যন্ত উপভোগ্য ও পাঠকসমাজে আদৃত হয়। তাঁর 'যা দেখেছি যা শুনেছি' গ্রন্থখানি বিপুল সমাদর লাভ করে।

—সম্পাদক

পর যখন অন্যান্য ভাইদের নাম শুনলুম তখন আর মনে কোনো দ্বিধা রইল না।

আজ এখানেই শেষ করি। তুমি যখন বেআইনি ভাবে রাখশেখরবাবুকে লেখা আমার চিঠি পড়েছ, তখন, সাধু সাবধান, খেয়াল রেখো, তিনি যেন বেআইনি ভাবে তোমাকে লেখা আমার চিঠি না পড়েন।

শিগগিরই কলকাতাতে টেস্ট্ আরম্ভ হবে। তার প্রস্তুতির জন্য তোমাকে একটি কবিতা (বেতারের ভাষায় 'স্বরচিত কবিতা') পাঠালুম। গত মার্চ মাসে ঢাকায় দেখি আমার এক ভগ্নী (এম. এ. পড়ে বাঙলায়, তবে 'রাতারাতির' চিংড়ির মত চটপটে নয়, লেখক মনোজবাবুর সঙ্গে তার দোস্তী) ঘড়ি ঘড়ি রেডিয়ো খুলে West Indies vs Pakistan খেলার স্কোর শুনছে। অথচ ক্রিকেটের ক অক্ষর তার কাছে গোমাংস কিম্বা শূয়রের। তাকে এই কবিতাটি দিয়েছিলুম। ঢাকাতে লেখা বলে আরবী ফার্সী শব্দের প্যাঁজ-ফোড়নটা কিঞ্চিৎ ঝাঁঝালো!

আশীর্বাদক

সৈয়দ মু. আলী

২

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার তাবৎ লিখনই পেয়েছি। উত্তর কেন দিতে পারিনি সেটা বলতে গেলে আসল মহাভারত না হোক রাজশেখরীয় মহাভারত নিশ্চয়ই ছাড়িয়ে যাবে। উর্দুতে বলে,

'মুসীবৎ কা অহওয়াল্ হর এক্ এক্ সে কহ্না—
মুসীবৎ সে হৈ য়হ্ মুসীবৎ জ্যাদহ্!'

'বিপদের কাহিনী প্রত্যেককে বয়ান করে বলার হ্যাপা আসল বিপদের চেয়েও বড় বিপদ।'

তোমার দাদুকে একটু বাজিয়ে নিয়ো তো, আমি তাঁকে একখানা বই উৎসর্গ করতে চাই। তাঁর অনুমতি আছে কি না? টাপে-টোপে ঠারে-ঠোরে শুধিয়ো। বেশ খুশী মনে যখন থাকেন। তোমাকে বলছি, বইখানা আমার সমজদার বন্ধুদের প্রশংসা পেয়েছে বলেই এ প্রগল্‌ভতা করছি।

রবীন্দ্রকাব্যের নূতন নূতন অর্থ শুধু নয়, এমন সব কঠিন প্যাসেজও আমি মোলায়েম করতে পারি যা অন্যে পারে না। আমি একটা দিগ্‌গজ নই—পারি

অন্য কারণে। সেটা দেখা হলে বাৎলে দেব।

ইতিমধ্যে এটার মানে কি বলো তো!

ওরে, এতক্ষণে বুঝি / তারা-ঝরা নির্ঝরের স্রোতঃপথে পথ খুঁজি খুঁজি/গেছে সাত ভাই চম্পা। যাত্রা, "পূরবী", রচনাবলী ১৪ খণ্ড, পৃ-১৯। এখানে সবাই কাৎ।

পূর্বেই বলেছি, আমি মেলা 'মুসিবতে' আছি। আশীর্বাদ জেনো—

সৈয়দ মু. আলী

৩

স্নেহাস্পদেষু,

আমি যখন লণ্ডনে ছিলুম তখন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথও সেখানে ছিলেন। আমাকে শুধিয়েও ছিলেন, আমার কোন-কিছু করে দেবেন কি না। বললেই তিনি খুশী হয়ে বার্ট্রাণ্ড রাসল্ বার্ণার্ড শ'র নামে আমাকে চিঠি দিতেন। আমি চাইনি।

হিটলার শক্তিতে আসার পূর্বে তার দলের দু'একজন আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড ছিল। হিটলার যখন খ্যাতি-প্রতিপত্তির মগডালে তখন তারা চেপে ধরেছিল আমাকে হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে। বলেছিল, 'ফ্যুরারের মেলা গুণ আছে কিন্তু ভাষা বাবতে তুই জর্মন ভাষাতে যা জমাবি' ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি যাইনি। আমি কোনো কালেই হিটলার-ভক্ত ছিলুম না।

তোমার দাদুকে কিন্তু দেখবার বাসনা আমার ছিল কিন্তু সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি বলে বাসনাটা ধামা চাপা দিয়ে তার উপর শিল-চাপা দিয়েছিলুম। ইতিমধ্যে আমার এক বন্ধু বললেন, 'ওহে, রাজশেখরবাবু তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

আমার ভয়ে মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি তাঁকে ফোন করে শুধালুম, কখন এলে দর্শন পাব।

আমার বিশ্বাস তোমার দাদু পূর্বোক্ত কোনো ইচ্ছাই প্রকাশ করেননি। আমার বন্ধু আমার মনের গতি জানতে পেরে ধাপ্পা মেরে আমার রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়েছিল।

সেদিন যতীনবাবুও তাঁর ঝোলা নিয়ে বসেছিলেন। আমি দুজনারই ন্যাটাই ভক্ত অর্থাৎ এঁদের কোনো দোষ-ত্রুটি আমার চোখে পড়ে না।

আমি এমনই nervous হয়ে গিয়েছিলুম যে সেটা ঢাকবার জন্য আপন

অজানাতে জাত-ইডিয়েটের মত বক্‌বক্‌ করতে আরম্ভ করেছিলুম এবং আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে এটাও বেশ বুঝতে পারছিলুম, ভারী অন্যায় হচ্ছে, বড্ড বাচালতা হচ্ছে, বেহদ্দ পাগলামী হচ্ছে,—অথচ কিছুতেই থামতে পারছিলুম না।

হয় তোমার দাদু পয়লা নম্বরের অভিনেতা, নয় তিনি অতিশয় সহৃদয়, সহিষ্ণু শ্রীকণ্ঠবাবু। বেশ হাসিমুখে আমার বকবক শুনেছিলেন, এমন কি বললে বিশ্বাস করবে না, ভাই, আমার মনে হচ্ছিল আমার বকবকানিটা তাঁর অপছন্দ হচ্ছে না। যতীনবাবুকে আমি অতটা ডরাইনি। সেটা অবশ্য তাঁরই প্রশ্ন শুধোবার সহৃদয়তা থেকে।

তার মানে তোমার দাদু একটা কিছু কট্টর হাম-বড়া লোক? আদপেই না। কিন্তু আমার এটা অহেতুক ভয়। তাঁর কাছে তো আমি কিছুই গোপন রাখতে পারবো না। তিনি ধরে ফেলবেন আমার দম্ভ, আমার আত্মস্তুতি প্রচেষ্টা, আরো সাতান্ন রকমের মানসিক এবং চরিত্রগত দুর্বলতা এবং ব্যাধি আমার যা আছে। আমি জানি তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল—একমাত্র ভণ্ডামি জিনিসটা তিনি আদপেই বরদাস্ত করতে পারেন না। শুধু ধর্মরত ভণ্ড বিরিঞ্চি বাবা নয়, মোলায়েমীর ভণ্ড পেলব রায় দোদুল দে গয়রহ বিস্তরে বিস্তর—এমন কি গণ্ডেরীর খোলাখুলি জোচ্চুরি তিনি প্রশংসার চোখেই দেখছেন, হয়তো ভাবছেন বুদ্ধু বাঙালী ব্যবসায়ী এর কিছুটা পেলে বর্তে যেত।

আমি ভণ্ড নই। বড়ফাট্টাই করার লোভ একেবারে কখনো হয় না, সে-কথা বলব না। কিন্তু সেটা রসিয়ে বলতে পারি বলে কেউ বড় গায়ে মাখে না। পাছে অপরিচিত লোক misunderstand করে তাই আমি কারো সঙ্গে দেখা করিনে, পারতপক্ষে কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দি না, মিটিঙে পার্টি-পরবে যাই না অতিশয় নিতান্ত unavoidable না হলে। কাউকে বলো না, বাজারে রটিয়েছি, আমার 'আন্‌জিনা থ্রমবসিস' (দুটো হার্ট ট্রাবলকে মিক্‌স্‌ করে এই ঘ্যাঁটটি তৈরী করেছি), ডাক্তারের সখৎ মানা ভিড়ে মেশা। তৎসত্ত্বেও শুনে আনন্দিত হবে—অন্তত আমি তো বটি—বাজারে আমার ভয়ঙ্কর দুর্নাম, আমি দম্ভী, বদরাগী ইত্যাদি, তাই কারুর সঙ্গে মিশিনে। যখনই খবর পাই, অমুক এসব রটাচ্ছে, অমনি তার কাছে লোক পাঠিয়ে ধন্যবাদ জানাই, সে আমার উপকার করছে বলে (অর্থাৎ এই বদনাম শুনে visitor-রা আমাকে জ্বালাতন করবে না বলে) এবং আমার বইয়ের এক খণ্ড তাকে present করি।

ঠিক তেমনি যারা আপন জন তাদের সঙ্গ পেলে আমার সব দুঃখ উপশম হয়। আমার দাদাদের সঙ্গে আমি দিনের পর দিন পরমানন্দে কাটাতে পারি। আমার

মেজদা অনেকটা তোমার দাদুর মত। আমি বক্‌বক্ করলে শুধু যে শোনেন তাই নয়, চোখ দিয়ে উৎসাহও দেন।

যতীনবাবুকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ো।

আমি কলকাতায় আসি অতিশয় কালে-কস্মিনে। আমি জানি, তুমি বিশ্বাস করবে না, আমি সত্যই অত্যন্ত কুনো লোক। যেটুকু ভ্রমণ করেছি সেটা নিতান্ত বিপদে পড়ে, গরজের ঠেলায়। কাবুল গিয়েছিলুম সহজে টাকা রোজগার করে সেই টাকা দিয়ে জর্মনি গিয়ে পড়াশোনা করার জন্য। ঠিক সেই কারণেই মিশর, প্যারিস, লণ্ডন যাই—অর্থাৎ পড়াশোনা research করার জন্য। একবার মাত্র স্বেচ্ছায় ভ্রমণ করেছি। ইহুদি, খৃষ্ট ও ইসলামের সঙ্গমভূমি প্যালেস্টাইন গিয়েছিলুম অতিশয় স্বেচ্ছায়—মিশরে যখন ছিলুম। আমার ছোট বোনেরা বলে, 'ছোড়দার longest walk হচ্ছে তার deck chair (আমি ডেকচেয়ারে পড়াশুনো করি) থেকে বাথরুম অবধি। ব্যবস্থা থাকলে সেখানেও taxi নিতেন।' কলকাতায় এলে তোমার দাদুকে দেখতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। কিন্তু বিরক্ত করতে বড্ড ভয় পাই। তবে এবারে ঠিক ঠিক আসব। আমি অন্তত ছ'টা কই মাছ খাব। দাদু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন। তুমি স্মরণ করিয়ে দিয়ো। ৪৮ ঘণ্টার নোটিশ দেবার কথা। তৎসত্ত্বে যদি বাজারে কই না পাওয়া যায় তবে চিংড়ি, season হলে তোপসে। দেখ দিকিনি, কি রকম expensive taste—বাঙালের ঘোড়া রোগ। আমাদের এখানে এর একটাও পাওয়া যায় না।

তারা ঝরা নির্ঝরের স্রোতঃপথ—milky way, আর সাতভাই চম্পা হল কৃত্তিকা নক্ষত্রের খাঁটি বাংলা নাম। ইংরেজীতে (আসলে গ্রীক) Pleiad অর্থাৎ milky way-এর পিছনে পিছনে পথের খোঁজে খোঁজে যেতে যেতে কৃত্তিকাও অস্ত গেছে। শরৎকালের প্রতি রাত্রেই হয়—বেশ কিছুদিন ধরে। আর milky wayকে 'তারা নির্ঝর' বলে রবিবাবু তাঁর physics এবং astronomy জ্ঞান দেখিয়েছেনও বটে। শুনেছি সৃষ্টির আদিতে নাকি বিস্তর তারা ঠিকরে পড়ে 'ছায়াপথ' milky way সৃষ্টি করেছে। আসলে কিন্তু সকলেরই Waterloo ঐ 'সাতভাই চম্পা'। ওটা যে কৃত্তিকা সেটা হরিবাবুর অভিধানে আছে। আমার যে গুরুর কাছে আমি সব চেয়ে বেশী অনুপ্রেরণা পেয়েছি তিনি ছিলেন আইরিশম্যান, নাম (ঈশ্বর) মার্ক কলিন্‌স্। বিশ্বাস করবে না, আমি জীবনে কোনোদিন দেখিনি যে, কোনো একটা text-এর সামনে এসে বললেন, 'এ ভাষা আমি জানিনে।' তা সে chinese-ই হোক, আর ওঁরাওঁ-ই হোক। আমাকে ইংরিজি ফরাসী জর্মন পড়াতেন। আর ইংরিজি শব্দতত্ত্ব শেখাবার সময় দুনিয়ার কুল্লে ভাষার সঙ্গে (কারণ 'ইংরিজি'

দুনিয়ার কোন্ ভাষা থেকে শব্দ নেয়নি বলতে পারব না) পরিচয় করিয়ে দিতেন। একদিন রাত্রের অন্ধকারে মাঠে দাঁড়িয়ে কন্‌স্টেলেশন চিনছি এমন সময় তিনি পিছন থেকে আমার পরীক্ষা নিতে নিতে কৃত্তিকার খাঁটি বাঙলা নাম শেখালেন। সে প্রায় ৪০ বছর হল। তখন ওর ফার্সী নাম পরওয়ীজও শিখিয়েছিলেন। Omar Khoyyam-এর যে ইংরিজি অনুবাদ (Fitzgerald) করেছেন তাতে Parwiz শব্দটি আছে। সেটি "The vine has struck a fibre" দিয়ে আরম্ভ। পার্সীদের মধ্যে এ নামে এখনও নামকরণ হয়। এই ৺কলিনসের মত মহাপণ্ডিত পূর্ব পশ্চিম কোথাও আমি পাইনি। অথচ কেউই তাঁকে চেনে না। কারণ যৌবনে লিখেছিলেন ডক্টরেট থিসিস, এবং বৃদ্ধ বয়সে রবীন্দ্রনাথের চাপে একখানা চটি প্যামফলেট—ব্যস্। এবং দ্বিতীয়খানা পড়ে কেউই বুঝল না, ওটা সাপ না ব্যাঙ। নাম ছিল On the Octoval system of Reckoning In India, প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে প্রাক আর্য দ্রাবিড়রা, আর্যদের মত decimal system অর্থাৎ দশের স্কেলে গণনা করতো না—তাদের scale ছিল আটের। ৮×৮=চৌষট্টিতে তাদের শ'—তাই চৌষট্টি যোগিনী ইত্যাদি (এর বাইপ্রডাক্ট—দুর্গা আর চৌষট্টি যোগিনী অনার্যা—অবশ্য এটা মূল বক্তব্য নয়)। এই গোনার স্কেল যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়, এবং duodecimal-টাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ ১২র স্কেল—এটা না জানা থাকলে তোমার দাদুকে জিজ্ঞেস করে নিয়ো। আমি এসব জানি অতি অল্পই। দেখা হলে ৺কলিন্‌সের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ো। তাঁর পাণ্ডিত্য যে কী অতল অগাধ ছিল সেইটে সালঙ্কার শোনাব।

এবারে বলো তো বৎস, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের—'অন্তর মম বিকশিত করো'-তে নন্দিত করো, নন্দিত করো, নন্দিত করো হে কোত্থেকে লোপাট 'চুরি' করেছেন ? (উত্তর শেষ পৃষ্ঠায় উল্টো করে লেখা)।

'ধর্মশিক্ষা' এখনো পাইনি। নিশ্চয়ই পড়ব। 'ধার্মিকরা' চটুন, কোনো আপত্তি নেই। আর আমরাও 'মহেশ' বা 'হরিনাথ' নই। আর তোমরা তো কায়স্থ। তোমাদের মহা সুবিধে—কোন 'ধর্মকর্ম' করার আদেশ তোমাদের উপর নেই। কিঞ্চিৎ আতপ চাল আর দুটো কাঁচকলা বামুনকে ডেকে দিয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। হিন্দুধর্ম বড় Specialistদের ধর্ম। বামুনরা Specialist —(যে রকম ধরো Cancer-এর স্পেশালিস্ট হয়) সেই Specialists যখন রয়েছে তখন তুমি আমি খামকা অত তকলীফ বরদাস্ত করে আনাড়ির মত এমেচারি করতে যাব কেন ? Specialist মোটর মেরামৎ করে, তবে Specialist-ই স্বর্গে যাবার সিঁড়ি তৈরি করে দেবে না কেন ? ভৃশুণ্ডীর মাঠে

খামকা ক্ষীরি বামনীর ভিটেতলা থেকে সোজা যেখানে দেবদূতরা গোলাপী উড়ুনি পরে ফটাফট সোডার বোতল খুলছে সেখানে যাবার পথ ওরা যখন জানে তখন ওদের হাতে দু'পয়সা ঠেকিয়ে দিলেই হয়—যাংলা কথা! আমার অবশ্য সমূহ বিপদ। একে তো সব মুসলমানকেই পাঁচ বেকৎ নামাজ করতে হয়, তার উপর আমি আবার সৈয়দ, মুহম্মদের বংশধর (সাবধান! চাট্টিখানি কথা নয়—তোমার দাদু এ বাবদে প্রশ্ন শুধোলে আমি বলেছিলুম, 'ক্যান্ মশায়, আপনারা যদি চন্দ্রবংশ, সূর্যবংশ হতে পারেন—অর্থাৎ চন্দ্র সূর্যের পুত্র হতে পারেন তবে আমার claim তো অনেক modest. আমি একজন মানুষ মাত্র পূর্ব-পুরুষ হিসেবে চাইছি!'), তার উপর আমাদের বংশ গুরুবংশ (যদিও থিয়েটারে আবদালা সাজিনে—খবিদং দ্রষ্টব্য ওটা দিলীপ রায়—না? Religiosity-র worst example ঐ লোকটা! বাপ্‌স্!), এবং finally কাইরোর ভুবন-বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে ঝাড়া দেড়টি বছর শুদ্ধমাত্র স্মৃতি (মাকড় মারলে ধোকড় হয়—নবমীতে অলাবু ভক্ষণ, পশ্চিমে যাত্রা নাস্তি) নিয়ে research করেছি।

আমার মত 'জ্ঞানপাপী' এ জগতে দুর্লভ। আমার কি গতি হবে, বলো তো। জাবালি? মহেশ?

আচ্ছা, বলো তো, আমি কেন অত শত ধর্মগ্রন্থ পড়েছি, এবং এখনো পড়ি? আমার ডক্টরেটও History of Religion-এ। জর্মন মাল, বাবা, চালাকি নয়—ছে ছে পয়সা জাপানী মাল নয়। বলতে পারলে বুঝি তোমার পেটে কত এলেম্।

তোমার দাদু রসিক লোক, রসজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁর রসবোধ আছে। এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু 'রসশিল্পী' বা 'রসসাহিত্যিক' বলার কোনো অর্থ হয় না। শিল্পী রস বানাবে না, তবে কি কচুপোড়া তৈরী করবে! 'রম্যরচনা'-ও ঐ একই দরের কথা। এখানকার গাড়লরাও লেখে 'বিশ্বভারতী University'। 'বিশ্বভারতী' মানেই তো 'University'!!

তদুপরি, নিছক রস সৃষ্টির জন্যই তো রাজশেখর কলম ধরেননি। তিনি কি গোপাল ভাঁড়! তওবা, তওবা!!

আমার বইটার নাম শব্‌নম্। অর্থাৎ 'শিশিরবিন্দু', হিমিকা, গৌরী। উপন্যাস। অতি মোলায়েম। নির্ভয়ে প্রিয়জনের হাতে তুলে দেওয়া যায়।

যতীনবাবু—শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন। রাজশেখর বসুর দীর্ঘকালের বন্ধু ও নিয়মিত সঙ্গী।

আমি অবসর সময়ে আস্তে আস্তে 'পূরবী'র টীকা লিখছি। কবে শেষ হবে আল্লায় মালুম!

আশীর্বাদ জেনো।

শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গর থেকে: 'পরমে ব্রহ্মণি যোজিত চিত্ত, নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব।' যার চিত্ত পরব্রহ্মে যুক্ত, তিনি নন্দিত হন, নন্দিত হন, নন্দিত হন।*

৪

স্নেহাস্পদেষু,

কয়েকদিন পূর্বে তোমাকে চার পৃষ্ঠার একখানা চিঠি লিখি; ইতিমধ্যে তোমার দাদুর লেখাটি পাই। তিনি এত বেশী চমৎকার লেখেন, যে, আমরা চমৎকৃত হয়েও চমৎকৃত হইনে। তিনি আমাদের অভ্যাস খারাপ করে দিয়েছেন।

যা বলেছেন, সে সম্বন্ধে আমি আর কি বলব?

তবে ঐ যে বলেছেন, কর্ণেজপন সেইটে যে হয়ে উঠে না। Prophetরা সেই কর্ণেজপন নিজেরাই করে যান, Politicianরা তার হদ্দ রাখে না। হিটলার চূড়ান্তে পৌঁচেছিল। কিন্তু প্লাতো, কিংবা এ যুগের রবীন্দ্রনাথ এঁরা আদর্শ রাষ্ট্র সম্বন্ধে যা বলেছেন তার কর্ণেজপন তো কেউ করে না। বিশেষ করে প্লাতো।

বিশেষ করে আমরা সব blasé হয়ে গিয়েছি। একটা গল্প শোনো। বর্মার যুদ্ধে একটা লোকের মাথা উড়ে গেল। সে মাটিতে পড়ে গেল। খানিকক্ষণ পর আরেকজন সেপাইয়ের আঙুলের ডগাটি উড়ে যাওয়াতে সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। কাপ্তেন বললে, 'তুই কি কাপুরুষ রে! ঐ লোকটার মাথা উড়ে গেল, আর সে একটি শব্দ না বলে চুপ করে শুয়ে পড়ল। তুই কি না একটা আঙুলের ডগা যেতেই হাউমাউ করে উঠলি!'

ট্রাম ঠিকমত থামায়নি বলে একটা লোক চোট পেল (মনে কর, আমাদের 'চিকিৎসা-সঙ্কটে'র হীরো যে রকম)। আমি তাই নিয়ে মৃদু কোলাহল করতে একটা লোক ভেংচি কেটে বললে, 'ও! মশাই বুঝি মফস্‌সলের লোক। দেখেন-নি কত লোক না খেয়ে মরে গেল, কত রেফুজী মর মর—আর আপনি চোটপাট লাগিয়েছেন একটা লোকের সামান্য চোট লেগেছে বলে।'

* লেখক এই পত্রের উল্টোদিকে এই অংশ উল্টো করে লেখেন।

ছোট হক, বড় হক, তুমি কিছু একটা আপত্তি করলেই, বড় বড় পাপের ফিরিস্তি শোনানো হবে তোমাকে। অর্থাৎ পাপাচার দেখে দেখে সবাই এমনি ব্রাজে হয়ে গিয়েছে যে কারো কানে আর জল যায় না।

ভেজালের কথাটা অতিশয় খাঁটি। যে যুগে আইন করা হয়েছিল তখন ভেজাল ছিল অতি সামান্যই—ওটা নিয়ে তখনকার চাণক্যরা বিশেষ ভাবিত হননি। তাঁরা তখনকার জমিদারী প্রথার ফল জালের জন্য ফাঁসি, পরে চোদ্দ বছর জেল আইন করেন। এখন জাল খুবই কম, ভেজাল বেড়েছে—আইন সেই মান্ধাতা আমলের।

এখন উচিত খুনের বেলা যে আইন সেইটে চালানো। তিনজন লোক যদি পিস্তল নিয়ে কাউকে খুন করতে গিয়ে, মাত্র একজন গুলি চালায় এবং তার একটা গুলিতেই লোকটা মরে তবে তিনজনেরই ফাঁসী—আদালত শুধোয় না, কার গুলিতে অকু-টা ঘটল। ভেজালের বেলাও তাই হওয়া উচিত। অর্থাৎ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের আদ্যন্তমধ্য—Managing Director থেকে চাপরাসী পর্যন্ত—সকলেরই তখন জেল-জরিমানা হওয়া উচিত।

এবং জানো, এখনও আইন—ভেজালের যে জিনিস পুলিস বাজেয়াপ্ত করেছিল সেটা ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতী না হলে ফিরৎ দিতে হয়!

আরো কত কী!

ক্ষিতিমোহনবাবুর শেষ রসিকতা। বর্ধমান হাসপাতালে মৃত্যুর দুদিন আগের কথা।

তাঁকে দেখতে এসে এক বন্ধু শুধালে, 'রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর ব্যবস্থা কি হচ্ছে?' তিনি বললেন, 'সিলেট অঞ্চলে 'শ' অক্ষর উচ্চারণে 'হ' হয়। কাউকে 'শতায়ু হও' বলতে গেলে হয়ে যায় 'হতায়ু হওয়া।'

বাকিটা তিনি আর বলেননি। 'হতবার্ষিকীই' হবে বলে মনে হচ্ছে।

গুরুদেব বলে গেছেন তাঁর শতবার্ষিকীতে ২৫৲ টাকা খরচ হবে। শত বার সিকি—।০ × ১০০ = ২৫৲।

তোমার বয়স কত?

কি পড়?

ভাই বোন ক'টি?

তাদের বয়েস কত?

আশীর্বাদ জেনো। সৈ. মু. আ

কাটিওটা ফেরৎ চাই?

C/o Inspectress of Schools,
P. O. Ghoramara, Rajshahi. E. Bengal.

স্নেহের দীপংকর,

হঠাৎ যেন চোখের সামনে একটা বিরাট সমুদ্র শুকিয়ে গেল।

যবে থেকে এখানে এসে খবর পেয়েছি, আমার নিজের মনই কিছুতেই সান্ত্বনা মানছে না। আমি যেন কিছুই ভেবে উঠতে পারছিনে। এখানে রওয়ানা হওয়ার আগের দিন সন্ধ্যার সময় রাজশেখরবাবুকে সভাতে দেখে কী আনন্দই না হয়েছিল! ইনি তা হলে অনেকটা সুস্থ হয়েছেন—সভাতে যখন আসতে পেরেছেন। এবারে তাহলে রাজশাহী থেকে ফিরে এসে নির্ভয়ে দেখা করতে যেতে পারব। এখানে এসে এই খবর। আমার স্ত্রী কাগজ এনে দিলেন। তিনি শ্রীযুক্তা আশা* পালিতের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়েছেন।

এত দিন ধরে রোজই ভাবছি, তোমাকে লিখি। কিন্তু কি লিখি? পরমাত্মীয় বাড়ীর মুরুব্বি গত হলে কি হয় সে কি আমি জানিনে? তার উপর তাঁর সেই বিরাট ব্যক্তিত্ব। বাড়ীখানা যেন ভরে থাকতো। আর আমার চোখের সামনে তিনি অহরহ ছিলেন প্রত্যক্ষমাণ। কত বার ক্ষোভ করে ভেবেছি, যদি ওঁর মত একটা গল্পও লিখতে পারতুম।

বাঙলা দেশের সব লেখক এক জোট হলেও তাঁর মত একটি ছত্রও লিখতে পারবে না। তিনি চলে গেলেন। এখন এই অর্বাচীনদের রাজত্বে বাস করতে হবে।

আজ থাক। আমার সত্যই কোনো কথা বেরচ্ছে না।

কলকাতায় ফিরেই তোমার খবর নেব। তোমাকে আমার প্রাণ খুলে সব বলবো। ইতিমধ্যে তোমাকে একটি কথা বলি। আমি পৃথিবীর কোনো সাহিত্য আমার পড়া থেকে বড় একটা বাদ দিইনি। রাজশেখরবাবু যে কোনো সাহিত্যে পদার্পণ করলে সে সাহিত্য ধন্য হত। একথা বলার অধিকার আমার আছে।

আশীর্বাদ জেনো
সমশোকাতুর
সৈয়দ মুজতবা আলী

এই পত্রটি রাজশেখরবাবুর পরলোক গমনের সংবাদ পেয়ে লেখা।

* রাজশেখর-দৌহিত্রী